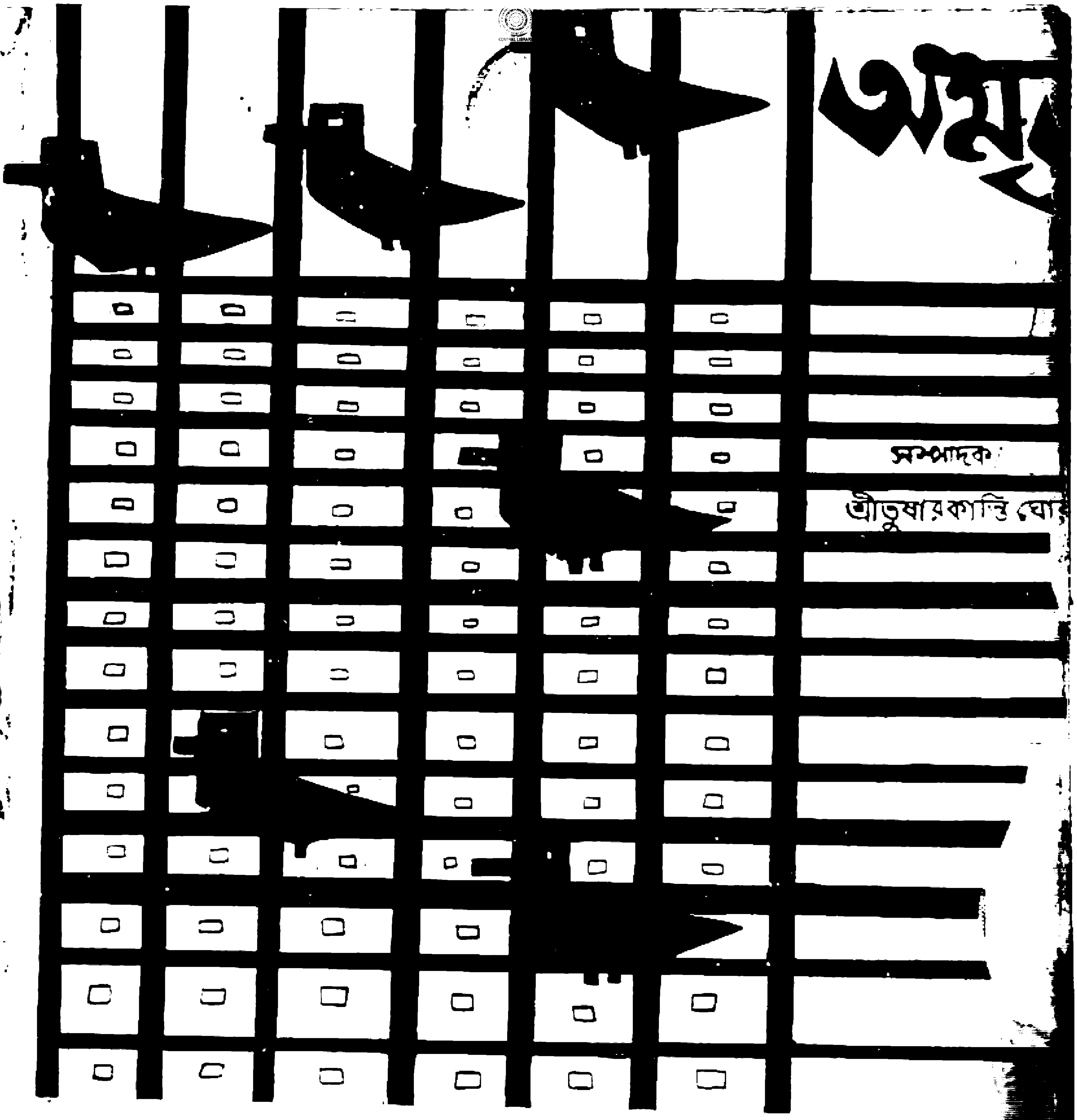

বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৬শ সংখ্যা]   শুক্রবার, ১লা মাঘ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ   [মূল্য

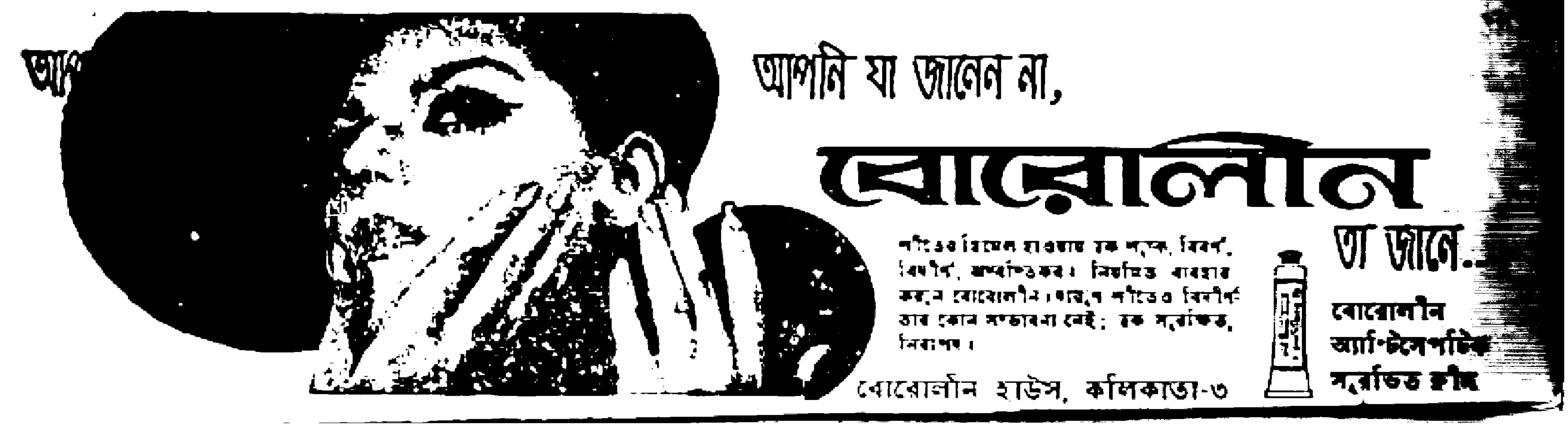

বৃদ্ধ বয়সেও
স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে
CHYABANPRAS
সাধনা
চ্যবনপ্রাশ
বহুমূল্য আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন
সকল বয়সেই সমান উপকারী
প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ.,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য
বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত হয়ে দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে।
SC-6/70

CENTRAL LIBRARY

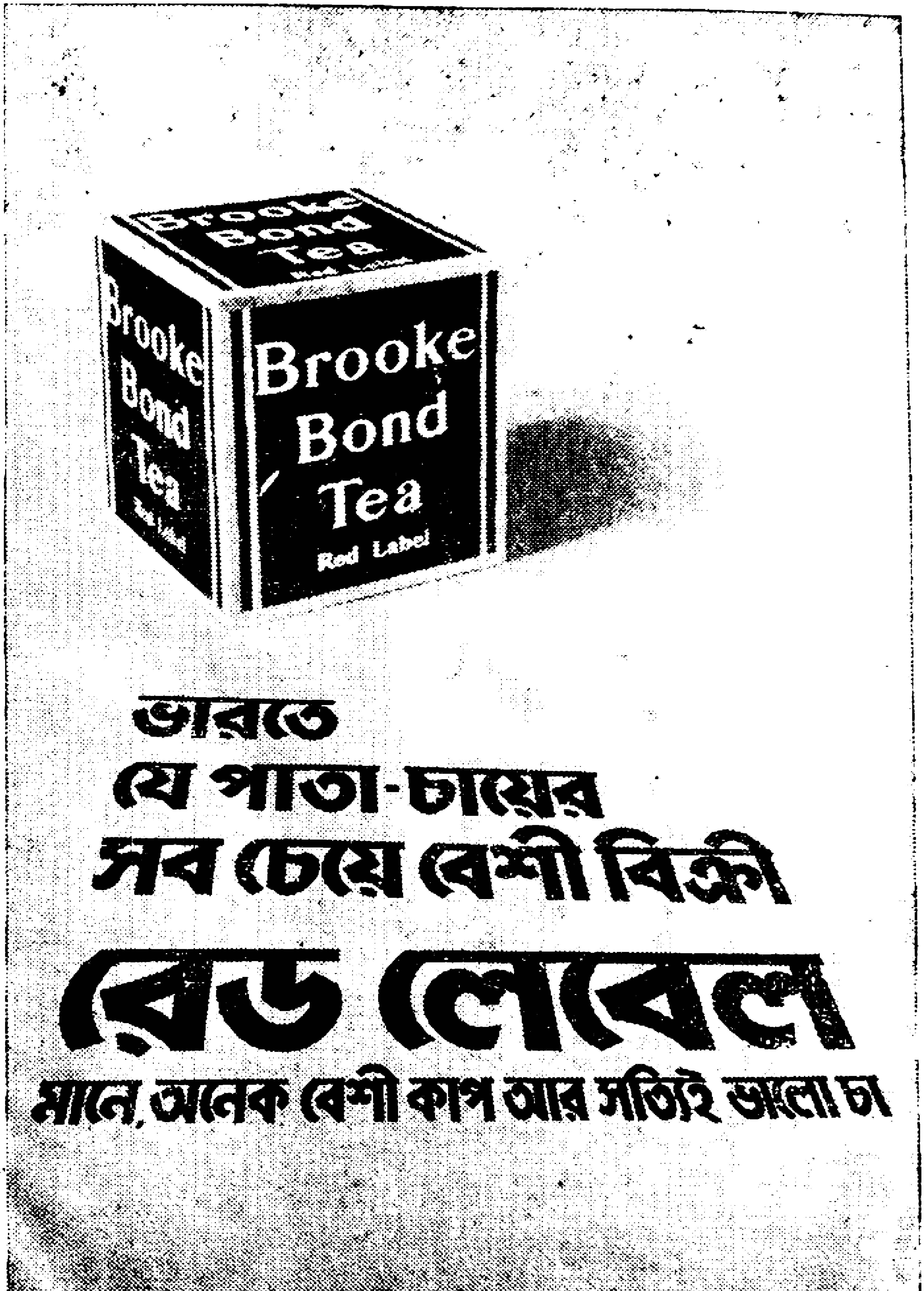

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কেন?

দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ়তর করবার জন্য;

দেশের অত্যাবশ্যকীয় শিল্প যেমন, লোহা এবং ইস্পাত, পেট্রোকেমিক্যালস্, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রাসায়নিক সার, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধপত্র, তার শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং বেসরকারী একচেটিয়া কারবারীদের হাত থেকে মুক্ত করা;

ভারী এবং মৌলিক শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন জোগানো।

কিছু বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ
31শে মার্চ, 1969 অবধি (কোটি টাকায়)

হিন্দুস্থান স্টীল	1099
হেভী ইলেকট্রিক্যাল কর্পোরেশন	224
হিন্দুস্থান এ্যারোনটিক্স	197
তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন	189
ন্যাশনাল কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশন	178
নিভেলী খনিজ কয়লা (লিগনাইট)	173
ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস	162
সার কর্পোরেশন	156
ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন	143
হেভী ইলেকট্রিক্যালস (I)	112
ইন্ডিয়ান ড্রাগস এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস	67
শিপিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া	55

একা বেসরকারী শিল্পের পক্ষে এত টাকার মূলধন জোগাড় করা অসম্ভব হতো এবং যেহেতু এইসব শিল্পকে লাভজনক করে তুলতে বেশ ক'বছর সময় লাগে, সেজন্য বেসরকারী পক্ষ এগিয়ে আসতে সঙ্কোচ করতো।

জনগণের কল্যাণে
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প

70/445

১০ম বর্ষ
৫ম খণ্ড

অমৃত

৩১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 15th January, 1971. শুক্রবার, ১লা মাঘ, ১৩৭৭ 40 Paise

১০৩৮ | ৩৬-৫১ ৮৮৮৮
১৩৭৭ - ৯৬ বৈ.
১৩৭৮

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩
ফোন ঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা		বিষয়	লেখক
৮৬৮	চিঠিপত্র		
৮৭০	সাদাচোখে		—শ্রীঅমদর্শী
৮৭২	দেশেবিদেশে		—শ্রীশ্রীপুণ্ডরীক
৮৭৫	সম্পাদকীয়		
৮৭৬	তোমাকে নিবেদিত	(কবিতা)	—শ্রীদুলাল ঘোষ
৮৭৬	কাজীরাঙা	(কবিতা)	শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ
৮৭৬	তোমাকে	(কবিতা)	—শ্রীসীমা মিত্র
৮৭৭	সন্তপা	(গল্প)	—শ্রীশৈলেন রায়
৮৮১	ফুলশরীচরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীনলীমাধব চৌধুরী
৮৮৬	মুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
৮৮৯	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৮৯৪	আগাল	(গল্প)	—শ্রীদুর্গাদাস ভট্ট
৮৯৭	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯০১	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
৯০৩	সাহিত্যে নতুন চিন্তা		—শ্রীঅনলা সেন
৯০৮	মনের কথা		শ্রীমনোবিদ
৯১১	পিঞ্জর	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৯১৫	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৯১৭	পুষ্প প্রদর্শনী		
৯১৮	ভবিষ্যৎ অন্ধকার		—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
৯২১	ফুরুণ	(গল্প)	—শ্রীমনোতোষ সরকার
৯২৫	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
			—শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৯২৬	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৯২৮	কারিয়ালা : পাহাড়ী গণনাট্য		—শ্রীঅজিত দে
৯২৯	দাদাসাহেব ফালকে		—শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য
৯৩২	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৯৩৯	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৯৪১	খেলার কথা		—শ্রীঅজয় বসু
৯৪৩	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীসুনীল সাহা

পি. ব্যানার্জীর
অর্শ চিকিৎসা
৩০ পিল টাঃ ২·৫০
১৬ পুরিয়া চূর্ণ ২·২৫
মলম ৩০ গ্রাঃ ২·৫০
বিনামূল্যে বিবরণী দেওয়া হয়
পি. ব্যানার্জী
৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫
৫৩, গ্রে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

নিবেদন
ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত
আধুনিক চিকিৎসা
পুস্তকের ২য় সংস্করণ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়াছে এবং বহুল পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। সেই ৩য় সংস্করণের মূল্য হয় টাকা ও শোভন সংস্করণের জন্য আট টাকা নির্ধারিত হইয়াছে।
পুস্তকের পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া অর্ডার বুক করিলে, পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পরেই আমরা রেজিষ্ট্রি ডাকে প্রেরণ করিয়া দিব। কোন ডাক খরচা লাগিবে না।

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

মফঃস্বলে লিটল ম্যাগাজিন

গত ৬ই নভেম্বরের বৈকুণ্ঠের খাতা বিভাগে মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন পর্যায়ের আলোচনাটির জন্যে গ্রন্থদর্শী মহাশয়কে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি বিশ্বাস করি আমার মতো আরও অসংখ্য মানুষ যারা লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে যুক্ত তারা সকলে অমৃত পত্রিকার এই ভূমিকা গ্রহণের জন্যে সম্পাদককে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করবেন। অতীতে বহুবার অমৃতের পাতায় লিটল ম্যাগাজিন সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থের অন্তরঙ্গ তাঁর 'কলমে' এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে বাজারে নতুনের বহু পত্র-পত্রিকার বিবরণ ও সংবাদ অমৃতের পাতায় থাকে। সুতরাং এই পত্রিকার আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও উৎসাহের মধ্যে যে নিছক লোক দেখানো ভাব নেই তা বারবার প্রমাণিত সত্য। এটা অমৃতের শুধুমাত্র প্রশংসা নয়। প্রসঙ্গক্রমেই এ সত্য সবার সামনে থাকা দরকার। কারণ বাংলা দেশের অন্যান্য সাপ্তাহিকে যখনমাত্র গোটাকয়েক ম্যাগাজিনকেই তাঁদের পাতায় স্থান দিয়ে কৌলিন্য দান করেন, সেখানে অমৃতের এই ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের ইতিহাস রচিত হবার সময় ভবিষ্যতে অমৃতের কথাও তাই সগৌরবে লিখিত হবে বলেই মনে করি।

এবার মূল আলোচনার সূত্র ধরে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের পেছনে যে অসুবিধা কেনা ও পরিশ্রম তা শহর ও মফঃস্বল সর্বত্রই সমান। গ্রন্থদর্শী সেসব বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু বাংলার বাইরের কাগজগুলোর অসুবিধা বোধহয় আরও ব্যাপক। বিশেষতঃ ক্রমশঃ যে হারে হিন্দীর দাপট বেড়ে যাচ্ছে তাতে বাইরের পত্রিকাগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বজায় রাখার যে চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাও বোধ হয় ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসবে। এত বাধা-বিপত্তি সত্বেও বাইরে থেকে বেশ কিছু পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে সমর্থ হচ্ছে। পাটনার সপ্তদ্বীপা, জব্বলপুরের সাতপুরা, ভাগলপুরের লেখা, হাইলাকান্দির সর্পিল, দিল্লীর আত্মা, রাঁচীর স্বপ্নলিপি, নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সুখের কথা সন্দেহ নেই। কোলকাতা, মফঃস্বল বা বাইরের কাগজগুলির সামনে অন্ততঃপক্ষে দু-চারটি সমস্যা একই ধরনের। লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষণ সমিতি জাতীয় কিছু সংস্থার নাম কিছুদিন থেকে শুনে আসছি। তাঁরা অবশ্য কতদূর কি করছেন তা সবার বোধ হয় জানার সৌভাগ্য হয়নি। সকলেই কম বেশী যে দুটি সমস্যার ভারে ক্রমশঃই দুর্বল ও হীনশক্তি হয়ে পড়ছে আমি তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ম্যাগাজিন পাঠাবার ডাক খরচের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রায় প্রতি-বছর ডাক খরচ ক্রমশঃই বৃদ্ধির পথে। যেসব ম্যাগাজিনের কম করেও ৫০০ জন গ্রাহক আছে তাদের ডাক খরচের বহর সহজেই অনুমেয়। ডাক-বিভাগ মাসিক পত্রিকা পর্যন্ত একটা সুবিধাজনক হারে কাগজ পাঠাবার সুযোগ দিয়ে থাকেন। প্রশ্ন হচ্ছে এই সুবিধা দ্বি-মাসিক ত্রৈ-মাসিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে কেন সম্প্রসারিত হবে না? উত্তরোত্তর যে হারে এই ডাক ব্যয় বাড়ছে তাতে ছোট পত্রিকাগুলির প্রকৃত নাভিশ্বাস উঠতে আরম্ভ হয়ে গেছে।

সরকারী বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির ব্যাপারটাও অদ্ভুত। শুধুমাত্র বড় বড় ও প্রভাবশালী পত্রিকারাই এই আনুকূল্য পায়। লিটল ম্যাগাজিনগুলি কেন বঞ্চিত হবে? এই মূল্য যখন সাধারণের পকেট থেকেই সংগৃহীত হয় তখন তা বন্টনে এই অবাঞ্ছিত নীতি কেন? সরকার কিছু বাস্তব-সম্মত সর্ত রাখতে পারেন লিটল ম্যাগাজিনগুলোর সামনে। যারা সে সর্ত পূরণে সমর্থ হবে তারা বছরে ক্রমান্বয়ে কি এই বিজ্ঞাপন পেতে পারে না?

নিউজ-প্রিন্টের কোটায় বন্দোবস্ত ও বন্টনেও সেই একই পর্বত-প্রমাণ বাধা ও অসুবিধা। যা হচ্ছে না তা নিয়ে হা-পিত্যেশ না করে, যা আছে তাকে বজায় রেখে আরও উন্নতির চেষ্টা করা কি গঠনমূলক নয়?

আজকের হালকা ও সেক্স সাহিত্যের যুগে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কান্বিত, তাঁদের সে চিন্তা অমূলক। কারণ পাঠক ও কাল বড় নির্মম সত্য। এ সত্যের কাছে আসলই টিঁকে থাকে পরবর্তী কালের জন্যে, নকলের ছাড়পত্র নিষ্ঠুরভাবেই প্রত্যাখ্যাত হবে। আর সেই সত্যের ধারা বজায় রাখার ব্যাপারে লিটল ম্যাগাজিনের অবদানের কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সৎ সাহিত্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে চালু রাখতে হলে পত্রিকাগুলোরই বেঁচে থাকা দরকার। আর সেই বেঁচে থাকার পেছনে এই সমস্যার প্রতিকার করার পথ খুঁজে বার করতে হবে এবং সে জন্যে সারা ভারতের বাংলা ও অন্যান্য ভাষার লিটল ম্যাগাজিনের পরিচালক ও পাঠকগোষ্ঠীকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

অমৃতে এ বিষয়ে আরও আলোচনা প্রকাশিত হলে আনন্দিত হব।

জীবনময় দত্ত
সম্পাদক সপ্তদ্বীপা
পাটনা—১।

তুলসীচরিত প্রসঙ্গে

আপনার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত' পাঠের আনন্দ আপনাকে জ্ঞাপন না করে পারছি না। বিচিত্রধর্মী রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ 'অমৃত' পাঠ করে উৎকর্ণ হই এই সুদূর প্রবাসে। সমস্ত রচনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে—'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' এবং 'তুলসীচরিত'। বিশেষত তুলসীচরিত সম্বন্ধেই আমার সপ্রশংস অভিমত জানাতে চাই। অভিনব বেশে, বাসে, বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়েছে এই উপন্যাস। এটির উপস্থাপনে সর্বাগ্রে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আর লেখককে জানাই আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। এই লেখকের অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জেগেছে মনে। আপনার পত্রিকা মারফৎ এ বিষয়ে জানতে পারব আশা করি।

সুহাসিনী গাঙ্গুলী
ভাবনগর,
গুজরাট।

(২)

ননীমাধব চৌধুরী মহাশয়ের কোনো রচনা আমি আগে পড়িনি। অমৃতে বর্তমানে ধারাবাহিক প্রকাশিত তাঁর তুলসীচরিত পড়তে পড়তে একটা নতুন জিনিস অনুভব করলুম। সেটা হচ্ছে বাংলাভাষার অনাস্বাদিত স্বচ্ছতা। এমন নিরাভরণ স্বচ্ছ অথচ গভীর ভাবোদ্দীপক রচনা বাংলা ভাষায় সম্ভব বলে ধারণা ছিল না। বাংলা ভাষার আদিযুগ থেকেই, সম্ভবত ভাষাকে কৌলীন্য প্রদানের জন্য, নানা আভরণে ভূষিত করেছেন প্রায় সকলেই। তার জন্য খর্ব করতে হয়েছে ভাষার স্বচ্ছতাকে। যুগে যুগে এই আভরণের হয়েছে পরিবর্তন, হয়েছে আধুনিকীকরণ। জড়োয়া গয়নার বদলে কখনো এসেছে ফুলের সাজ,

চিঠিপত্র

কখনো রূপো-গিল্টী, কখনো বা রূপো দস্তাপাতা। কিন্তু এত অনাড়ম্বর প্রকাশ-কর্ম রূপ আগে দেখেছি কিনা মনে পড়ে না।

তুলসী-চরিত্রের কাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় বোধহয় এখনও আসেনি। ননীমাধববাবুর রচনার সাহিত্য-গুণ বিশ্লেষণ করতেও বসিনি। তবে তিনি বাংলা গদ্যের রচনারীতির যে নতুন সম্ভাবনার নির্দেশ দিলেন তার জন্যে লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা—১৯

একটি নতুন ধরনের গ্রন্থের জন্য

বেশ কয়েকদিন আগে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমার ঘটেছিল। একটি সহজ সরল, কর্তব্যনিষ্ঠ নিরলস ব্যক্তির জীবন সাধনার প্রভাব স্বভাবতই চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তিনি অসমীয়া এবং বাংলা ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছেন। তাঁর বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ সুকৃতির পরিচয় তুলে ধরছি। তিনি ৪০ বছর কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে বাংলা পুঁথির বিবরণ প্রকাশের গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন। এই বস্তুটি বাংলা সাহিত্যে অভিনব তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক স্বীকৃতিতে জানা যায়, তিনি Prof. Theodur Aufrecht'র পথ অনুসরণ করেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। Prof. Aufrecht সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ Works এবং Auothrs দু'ভাগে রেখেছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য বাংলা পুঁথির, বিবরণে তিনটি অংশের পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রথমত বর্ণক্রমানুসারে গ্রন্থের তালিকা, দ্বিতীয়ত বর্ণক্রমানুসারে লেখকের তালিকা এবং বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট। বর্ণক্রমানুসারে গ্রন্থের তালিকায় একই নামে হাজার গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেছে এবং সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি Dated Manuscripts এবং undated Manuscripts করেছেন। আবার Dated কে সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ এবং undated -কে সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ করেছেন। বহু সালের পরিচয় সংগ্রহে পর্যবসিত করেছেন। এমন কি শতাব্দের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। তাঁর এই গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা উপকৃত হবেন বলা যায়। উল্লিখিত দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বলা যায় লেখকদের বর্ণক্রমানুসারে নামের তালিকার পাশাপাশি তাঁদের গ্রন্থের নাম থাকবে। এবং বিষয়বস্তু অনুসারে তালিকায় বিষয়বস্তুর পাশাপাশি গ্রন্থাবলী থাকবে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একটা কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, গবেষণার ক্ষেত্রে লেখক গ্রন্থ এবং বিষয়বস্তুর হিসাব-নিকাশ হাতের কাছেই মিলবে। এবং গ্রন্থাবলী কোথায় কোথায় মিলবে তারও সহজ উপায় পাওয়া যাবে। তবে দুঃখের কথা তাঁর কাজটির প্রতি সরকারের শিক্ষাদপ্তর নজর দিচ্ছেন না। আমাদের মত জায়গায় থেকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থটি ছাপানো সম্ভব নয়, কখনও নয়।

তাঁর এই কাজের প্রশংসা এবং সহানুভূতি অনেকেই করেছেন। যেমন বলা যেতে পারে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> "I am certainly of opinion that this great work ought to be published. .... I have been very favourably impressed by this work, which shows not only a very fine scholarship and critical acumen but is also the result of near about 40 years of sincere labour"....

সবশেষে আমার তথা অগণিত সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীর আবেদন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এই বলে রাখতে চাই—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের

"Catalogus Catalogorum of Bengali Manuscripts"

গ্রন্থটির ছাপানোর দায়িত্ব নিন—অন্যান্য প্রগতিশীল দেশ যেমন সহজেই নিয়ে থাকে।

রতন বিশ্বাস
সম্পাদক
প্রান্তরেখা
শিলিগুড়ি

'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ প্রসঙ্গে'

গত ২রা পৌষ অমৃতের চিঠিপত্রে 'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ' প্রসঙ্গে শ্রীসত্যানন্দ গুহের বক্তব্য পড়ে অবাক হলাম। তিনি কি করে 'মনের কথা', 'নিকটেই আছে' এবং 'সুখের মেলাকে' বিস্বাদের পর্যায় ফেলতে পারলেন ভাবতে পারছি না। মনোবিদ্যা ও শারীর-বিদ্যার বিচিত্র সংমিশ্রনের এক অদ্ভুত সুন্দর মিশ্রণ শ্রীমনোবিদের 'মনের কথা' বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্ভবত এই প্রথম। এ ধরণের প্রশংসনীয় উদ্যোগকে বিস্বাদের পর্যায়ে ফেলার কোন সংগত কারণ দেখিনা। শ্রীসন্দীপের 'নিকটেই আছে'তে জীবনস্রোতে বহমান কতকগুলো বিচিত্র বাস্তব চরিত্র আমাদের পরিবর্তনীকে স্মরণ করিয়ে মনকে ভীষণ নাড়া দেয়। আর আধুনিক এই তিক্ত জটিল নগর-কেন্দ্রিক জীবনে জব্বার সাহেবের সুখের মেলার সাহিত্যরস আমাদের এক মুহূর্তে টেনে নিয়ে যায় গ্রাম-বাংলার জনজীবন ও তার পরিবেশকে চাক্ষুষ দেখাতে। তাছাড়া স্বাদ-বিস্বাদ মানুষের ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর নির্ভর করে। শ্রীসত্যানন্দ গুহের হাল্কা মনের সিদ্ধান্ত 'দুর্বল উপস্থাপনা' এবং 'ভেজাল' অগণিত পাঠক এবং সাহিত্য-রসিকদের বিরাগ সৃষ্টি করবে। আমি অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক। অমৃত বাংলা ভাষার এক অপূর্ব সাপ্তাহিক। অমৃত আমাদের খাঁটী অমৃত পরিবেশন করেন। কোন তার 'দুর্বল উপস্থাপনা' নয়, এবং কোনটাই 'ভেজাল' নয়।

নাসিরুদ্দিন আহম্মদ, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ।

উত্তর বাংলার লোকসাহিত্যের উপাদান সম্পর্কে

৪ই জানুয়ারী 'অমৃতে' প্রকাশিত আমার লেখা 'উত্তর বাংলার লোক-সাহিত্যের উপাদান' প্রবন্ধটিতে কয়েকটি ছাপার ভুল আছে। ৮৩০ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের মাঝখানে 'চাঁদসাগরের' জায়গায় 'চান্দসদাগর' এবং ঐ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের শেষের দিকে 'অবলা' শব্দটি 'অনলা' পড়তে হবে। ৮৩২ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের প্রথম দিকে 'শুদ্ধ' শব্দটির জায়গায় 'স্বশুর' হবে এবং ঐ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের প্রথম এবং শেষ-দিকে 'সোনার' জায়গায় 'সোনার', মাচা উমাচাউ'-এর স্থানে 'মাচাউ শাচাউ' এবং 'অংশ' কে 'অংশে' পড়তে হবে। ৮৩৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের মাঝখানে 'তাকে লাঞ্ছনা' নয়, 'তাকে কত লাঞ্ছনা' হবে। ঐ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের শেষের দিকে ছাপানো 'আলোচকে 'আলোর' ধরতে হবে। ৮৩৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের প্রথম দিকে 'কান্ডে'-র জায়গায় 'কান্ডের' শব্দটি বসবে।

উপরে লিখিত সংশোধনগুলিকে মাথায় রেখে পাঠকদের প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রঞ্জিত চক্রবর্তী কলিকাতা—৩৭,
৮।১।৭১

শাদা চোখে

রাজ্য রাজনীতিতে হালফিল এক ভাবনার উদয় হয়েছে। যাঁরা রাজনীতির চর্চা করেন এমন অনেক গুণীর মুখেই শোনা যাচ্ছে যে বর্তমানে জনসাধারণ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদিকে সি পি এম শিবির, অন্য অন্যদিকে তাঁদেরই মতে নন্-সি পি এম্ ক্যাম্প। কাজেই নন্-সি পি এম্ ক্যাম্পে ডিভিসান্ হলে তাঁরা মনে করছেন সি পি এম্-এরই সুবিধা হবে বেশী।

জনতাকে এই দুই শিবিরে যাঁরা বিভক্ত করতে চান—পর্যালোচনা করলে দেখা যায় —তাঁরা হচ্ছেন সি পি এম এবং 'গণ-তান্ত্রিক ফ্রন্টের' সমর্থকরা। এইভাবে শ্রেণী বিন্যাস করলে নির্বাচনের পূর্বেই এমন আবহাওয়া সৃষ্টি হবে যে সি পি এমই একমাত্র শক্তিশালী দল যারা বিকল্প সরকার গড়তে পারেন। সি পি এম-এর বিরুদ্ধবাদীরা মনে হয় জ্ঞাতসারেই এরকম একটি মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে, বাম কম্যুনিস্টরা তাঁদের পালে হাওয়া লাগাতে সমর্থ হচ্ছেন। তদুপরি তাঁদের দল রাজ্যের প্রায় সমস্ত বিধানসভার আসনে লড়বার কথা ঘোষণা করে আবহাওয়াকে আরও বেশী করে অনুকূলে টানবার চেষ্টা করছেন।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট শ্লোগানের উদ্গাতা বাংলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া বার বার এই বক্তব্যই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে সি পি এম্ ও তার সঙ্গী আরও দু'একটি ক্ষুদ্র দলকে রুখতে হলে একটা সর্বাত্মক ঐক্য গড়ার দরকার। এবং এই ঐক্যের ভিত্তি হওয়া উচিত আদর্শ, প্রোগ্রাম এবং সর্বোপরি হিংসার প্রতি বিদ্বেষ। তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় কোন বামপন্থী দলই হিংসাকে বা হিংসাত্মক পন্থাকে একেবারে কোনদিন গ্রহণ করবে না, একথা বলতে পারে না, পারবেও না। পারিপার্শ্বিক বিবেচনা করে কৌশলের খাতিরে সাময়িক-ভাবে হিংসাকে তাঁরা নিন্দা করতে পারেন। বামপন্থীরা নীতিগতভাবে গণ-একশান সমর্থন করেন। এবং এই গণ-আন্দোলনের গতিপথে যদি তথা-কথিত হিংসাত্মক কিছু ঘটে তাকে বামপন্থীরা নিন্দা করতে চাইবেন না। কাজেই শ্রীসুশীল ধাড়া পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিরোধী জোট করতে চাইছেন তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। এবং ইতিমধ্যেই তাঁর বিরোধী থেকে বাম কম্যুনিস্টরা লাভ-বানই হয়েছেন, একথা বলা যায়।

একজন বিখ্যাত বামপন্থী নেতা সেদিন সখেদে বলছিলেন বামপন্থীরা কোন মুখে ভোটারদের কাছে আবার আবেদন জানাবেন সেকথা ভেবে তাঁর শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠছে। রাজ্যের আম জনতা ২৮০টা আসনের মধ্যে ২১৮টি আসন যুক্তফ্রন্টকে দিয়েছিল। কিন্তু ১৪ শরীকের দল ১২টা মাসে রাজ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে কোন মুখে আবার ভোট চাইতে যাবেন? তিনি মনে করেন, জনতা আশা ভঙ্গের বেদনায় গুলীবিদ্ধ বাঘের মত গজরাচ্ছে। তাঁদের মুখোমুখী হওয়া এখন খুবই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বাম কম্যুনিস্টরা বুদ্ধিমান। তাঁরা জনতার এই মনোভাবকে বোঝেন। তাই আগেভাগেই একদলীয় শাসন না হলে অনিশ্চয়তা বাড়বে একথা প্রাণপণে জনতাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। আর অনবধানতাবশত অন্যরাও বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে একই শ্লোগান দিচ্ছেন। তফাৎ শুধু এই যে তাঁরা ঐক্য শ্লোগান তুলে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে জনতার আস্থা অর্জনে চেষ্টা করছেন, আর অন্যরা আবার দলসমষ্টির মাধ্যমে সেই হাওয়া পালে লাগাতে চাইছেন। যুক্তফ্রন্টের পতনের পর বাম কম্যুনিস্টরা যে বিচ্ছিন্নতার যুগ-ছিলেন, বিরোধী শিবিরের তত্ত্বগত বিভ্রান্তির ফলে সেই অবস্থা অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়। অন্যবামের জোট এইখানেই অনেক-খানি ব্যর্থ হয়েছেন।

অনেক দেরীতে হলেও অন্যবাম কংগ্রেসকে প্রধান রাজনৈতিক শত্রু হিসাবে পরিগণিত করেছেন। বাম কম্যুনিস্ট পরি-চালিত ছয় পার্টির জোটও একই কথা বলেছেন। হালফিল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী-দল, যাঁরা দুই জোটের বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরাও বলেছেন যে বামপন্থীদের মধ্যে লড়াই হলে কংগ্রেসের সুবিধা হতে বাধ্য। তাই এই দল দুই জোটের নেতাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে যে দলের শক্তি যেখানে বেশী অন্য বাম-পন্থীদল সেখানে যেন কোন প্রার্থী না দেন। অর্থাৎ সাধারণভাবে আসনভিত্তিক সমঝোতার উপর জোর দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, কংগ্রেস যেন আর ক্ষমতায় ফিরে আসতে না পারে। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায়, আর এস পি দুই ফ্রন্টের লড়াইয়ের মধ্যে আত্মঘাতী যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ দেখতে পেয়েছেন। দুই জোট ও আর এস পির বক্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ করলে দেখা যায়, কংগ্রেসই যে এখনও পর্যন্ত শক্তিধর শত্রু এই বক্তব্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। অর্থাৎ এন্টি-কংগ্রেসইজম-এর পর্যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় নি।

এই রকম তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও কিভাবে বাম কম্যুনিস্টরাই একমাত্র শক্তিশালী দল হিসাবে ক্ষমতা দখল করতে পারবেন বলে কোন কোন মহল থেকে আব-হাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তা বুঝে ওঠা কঠিন। রাজনৈতিক ভাষাকাররা কিভাবে ভুলে যাচ্ছেন যে ১৯৬৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হলেও একক দল হিসাবে শতকরা ৪০টি ভোট পেয়েছিলেন। আবার ১৯৬৭ সালে শতকরা ৪০টা ভোট পেয়ে ১২৮টি আসন দখল করেছিলেন। ১৯৬২ সালে শতকরা ৩৫টি ভোট পেয়ে সর্বাধিক আসন লাভ করে নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ভাষাকাররা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে কংগ্রেস বাম-পন্থীদের মত কোন শ্রেণী সংগঠন গড়েন না। নির্বাচনে তাঁরা যা ভোট পান তা সর্ব-স্তরের মানুষের কাছ থেকে আসে। এবং সেই ট্র্যাডিশনাল ভোটের এখনও তেমন কিছু হেরফের ঘটেনি। বামপন্থীরা হয়ত মনে করছেন, কংগ্রেসে বিভাজন হওয়ার ফলে একটি বিশেষ অংশ আদি কংগ্রেসের

দিকে ঝুঁকে যাবে। মনে হয় ধারণাটা ভুল। কারণ, তাঁরাই বলেন বাংলা দেশের জনতার প্রগতিশীলতার দিকে প্রবণতা বেশী। অতএব ট্রাডিশনাল যাঁরা কংগ্রেসের সমর্থক তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই শাসক কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকবেন একথা বলা চলে। যাঁরা অদ্যাবধি বিশেষ কারণে বামপন্থী বলে নিজেদের আখ্যাত করছেন, তাঁরা নির্বাচন যতই আসন্ন হয়ে উঠবে ততই পুরোনো বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার জন্য যে বাধ্য হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

নির্বাচনী ফলাফলের যাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করছেন তাঁরা এই সমস্ত বিষয় নজরে রেখে তবে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করবেন। নতুবা গোড়ায় গলদ হবার সম্ভাবনাই বেশী। সমস্ত আসনেই প্রার্থী দাঁড় করালেই ক্ষমতায় পৌঁছান যায় একথা বোধহয় ঠিক নয়। সংগঠন কিছু কিছু ক্ষেত্রে জোরদার থাকার অর্থও এই নয় যে সব আসনেই লড়াই করবার ক্ষমতা থাকে। অবশ্য বেশী সংখ্যক আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে হেরে যাওয়ার পর একক দল হিসাবে বেশী ভোট পেয়েছেন বা গণ-সমর্থন লাভ করেছেন এই কথা বলার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। ক্ষমতা দখল করতে না পারলে রাজনীতিতে ঐরকম আত্মপ্রসাদের কোন মূল্যই নেই।

অবশ্য, বাম কম্যুনিস্টরা বলতে পারেন, তাঁরা সরাসরি লড়াইয়ের দিকে এর ফলে অনেকখানি এগিয়ে যাবেন এবং ভবিষ্যতে সংগঠিতকরণের কাজ আরও দ্রুততালে এগিয়ে যাবে। সেটা যেমন অনেকখানি সত্য, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ক্ষমতার আস্বাদন পাওয়ার পর ক্ষমতা ক্রমাগত হারাতে থাকলে দলের অভ্যন্তরে প্রশ্নও দেখা দিয়ে থাকে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মূল সুর এখনও এন্টি-কংগ্রেসইজম-এর পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বনিত হচ্ছে। যে দল যে ভাবেই তাকে প্রকাশ করুন না কেন, ঐ এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই রাজ্য রাজনীতি ঘুরপাক খাচ্ছে। আর এই অবস্থাকে স্বীকার করে নিলেই বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের মধ্যে হঠাৎ আসন বণ্টনের প্রশ্নে মিতালি ভেঙে যাওয়ার উত্তরটা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। খবরে প্রকাশ, বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেসকে বেশী আসনে লড়াই করতে দিতে রাজী নয় বলেই নাকি তাঁরা "বন্ধুর মত" নিজেদেরকে মেনে নিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাম কম্যুনিস্ট পার্টিই যদি 'প্রধান শত্রু' হয় তবে তাঁরা মিলতে পারলেন না কেন? উত্তর : বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলালেও নাকি —নব কংগ্রেসকে এমন সংখ্যক আসন ছেড়ে দিতে রাজী নন যাতে শেষোক্ত দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সুযোগ পায়—; যদি আম-জনতা তাঁদের প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তবে শাসক কংগ্রেসকে বেশী আসনে লড়াই করতে দিলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা অধিক সংখ্যক আসন লাভ করবেন। অতএব, সেক্ষেত্রে সরকার গঠনের প্রশ্নে বাংলা কংগ্রেসের ভূমিকা নগণ্য হয়ে যেতে বাধ্য। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আসতে দিতে চান না। তাঁরা চান, ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে শাসক কংগ্রেস একটি সাহায্যকারী দল হিসাবে থাকুক মাত্র। এ অবস্থা শাসক কংগ্রেসের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। অবশ্য এখনও বলা যায় না, যে আবার বোঝাপড়ার জন্য চেষ্টা চলবে না। তবুও যে-অবস্থায় এসে আলোচনা ভেঙে গেল তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।

যেভাবেই সমঝোতা হোক না কেন রাজ্যের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে কিনা এ প্রশ্নটা শেষ পর্যন্তই থেকে যাবে। কেননা দুই বামপন্থী ফ্রন্টের লড়াইয়ের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। বাম কম্যুনিস্টরা বিরাট কিছু পকেটে খুবই শক্তিশালী একথা ঠিক। তেমনি অদ্যাবধি যে অষ্ট বামের জোট হয়েছে সেই জোটও অনেক পকেটে, শক্তিধর। দুই জোটেরই শ্রেণী সংগঠন আছে। নেতৃত্বও আছে। একে অন্যকে উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা।

তা সত্ত্বেও দুই জোটের কোন প্রকার বোঝাপড়া হওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিক হয়েই একের বিরুদ্ধে অন্যকে লড়তে হবে। সমঝোতার কোন রাস্তা থাকলে, যুক্তফ্রন্টের পতনের পরই বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সরকার গড়ার মত ক্ষমতা এই দু-জোটের ছিল। কিন্তু শরীকী সংঘর্ষের চূড়ান্ততার জন্যে তা ঘটেনি। সে অবস্থার পরিবর্তন এখনও দেখা যায় নি। ফলে, রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতা পুনরায় প্রায় ১৯৬৭ সালের প্রাক নির্বাচনী অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থার যেটুকু হের-ফের ঘটেছে তা হচ্ছে বামপন্থীরা কেউ কেউ হয়ত সংগঠন খানিকটা বাড়াতে পেরেছেন মাত্র। কিন্তু শুধু সংগঠনের জোরে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনী আসরে কিস্তিমাৎ করার মত অবস্থার এখনও সৃষ্টি হয় নি। বামপন্থীদের কথা তুলেই বলছি, জনতা আগের থেকে এখন অনেক জাগ্রত। তাঁরা গুণাগুণ বিচার না করে অন্ধের মত ভোট দিয়ে আসবেন একথা স্বীকার করা যায় না। জনতার মধ্যে একটি বিরাট অংশের যেমন দলের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আরও একটি বিরাট অংশের মধ্যে বিচারের প্রবণতাও আছে। প্রতিক্রিয়ার নির্বাচনে এই শেষোক্ত অংশই বিরাট ভূমিকা পালন করে এসেছে। এবং এদের উপরই রাজ্যের ভবিষ্যৎ অদ্যাবধি অনেকখানি নির্ভর করছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এবারের নির্বাচনে জয়পরাজয়ের খতিয়ান আগে থেকে ঠিক করা খুবই কঠিন। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে নব কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার ফলে রাজ্য রাজনীতিতে আবার একটি নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে। কারণ অজয়বাবু দীর্ঘদিন ধরেই বলছেন যে, বাংলা কংগ্রেস তাঁদের শিবিরে এলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হবে না। তাঁরা ক্ষমতা পেলে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রীর পদও ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু এতো সত্ত্বেও বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কারণ, শ্রীসুশীল ধাড়া ডান কম্যুনিস্ট ও এস ইউ সির সাথে বাম কম্যুনিস্টদের কোনো পার্থক্য দেখছিলেন না। শ্রীমুখার্জি নাকি শ্রীধাড়ার সঙ্গে এই বিষয়ে একমত ছিলেন না। তাই শ্রীমুখার্জি এতদিন বিশেষ কিছু বলেন নি। যে মুহূর্তে নব কংগ্রেস বেশী সংখ্যক আসন দাবী করেছিলেন তখনই শ্রীমুখার্জি আসরে অবতীর্ণ হন। শ্রীধাড়াও বুঝতে পারেন যে ঐ দাবী মেনে নিলে শ্রীমুখার্জির সরকার গঠনে ভূমিকা থাকবে না। অতএব, শ্রীধাড়াও ঘুরে বসলেন।

এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার আগেই হয়ত নতুন করে সমঝোতার আলোচনা উঠবে। কিন্তু তা কি রূপ নেবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত বোঝা কষ্টকর হয়ে উঠবে। অভিজ্ঞতা এই যে, আসনই মুখ্য। আদর্শ, নীতিগত বক্তব্য বা প্রোগ্রাম এসব গৌণ। কিন্তু এই হরণ-পূরণের মধ্যেও মূল সুর থাকবে শাসক কংগ্রেসকে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে সাহায্যকারী হিসাবে পাওয়া। শাসক কংগ্রেসকে পুনরায় শাসনে আসতে সাহায্য করা নয়। দুই বামপন্থী জোটই এই তত্ত্বকে মেনে নিয়ে দুই কংগ্রেস—আদি ও নবকে—কাজে লাগাতে পারে। রাজনীতিতে এমন অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটে। প্রেম ও রাজনীতির অভিধানে অন্যায় বলে কোন বস্তু নেই।

—সমদর্শী

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট ঃ ২ লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
৫৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

কলকাতায় সুভাষ [illegible] সম্প্রচারসচিব [illegible] সমীক্ষার [illegible] আসরে ও [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এঁরা ছিলেন [illegible]

দেশে বিদেশে

দেশে এখন সাজ সাজ রব। সামনে তীব্র যুদ্ধ। যার নাম ভোটযুদ্ধ।

প্রদীপ জ্বালবার আগে যেমন সলতে পাকানো, যুদ্ধের আগে তেমনি শিবির সমাবেশ। "ইন্দিরা হটাও" ধ্বনি উঁচুতে উঠিয়েছে একটি শিবির খাড়া করা হয়েছে। এই শিবিরে আপাতত আছে তিনটি দল— বিরোধী-কংগ্রেস, জনসংঘ ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল। তবে এই শিবিরের সেনাপতিরা আশা করছেন যে, অন্ততপক্ষে স্বতন্ত্র পার্টি শীঘ্রই তাঁদের সাথে এসে যোগ দেবে।

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে বেতারে তিন দলের এই সমঝোতা গড়ে উঠল সেটা রীতিমত নাটকীয়। অনেকে কথাটা আরম্ভ হয়েছিল বিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির। সকলে তখন আর একটা উক্তি ছিল—শুধু 'ইন্দিরা হটাও' না, নির্বাচনের পর যাতে কেন্দ্রে একটা বিকল্প সরকার গড়ে তোলা যায় সেজন্য একটা ন্যূনতম কর্মসূচী নিয়ে ভোটের আসরে নামা। স্বতন্ত্র পার্টির নেতা শ্রীমিনু মাসানির পকেটে এই ধরনের একটা কর্মসূচীর খসড়াও নাকি ছিল। কিন্তু আলোচনা চলতে চলতে কোন এক সময় বিরোধী কংগ্রেসের নেতাদের মনে ভাব থাকবে, যে পার্টি কাগজে-কলমে এখনও সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার পক্ষে স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘের মতো দলের সঙ্গে একটা কর্মসূচীর ভিত্তিতে হাত মেলানোর ব্যাপারটা খুব মানানসই হবে না। এই বিলম্বিত বিবেকের তাড়নায় নির্বাচনী সমঝোতার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। কেননা শ্রীমিনু মাসানি বললেন যে, একটা সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ছাড়া অন্য কোন ভিত্তিতে সমঝোতা করার জন্য তাঁর পার্টি তাঁকে ক্ষমতা দেয় নি। মঞ্চের এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল স্বতন্ত্র পার্টি আর এক পাশ দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করল সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল। যে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল ৫ বছরকাল যে-কোন কোয়ালিশনে যোগ দেওয়ার শর্ত হিসাবেই মেহনত-বাঁধা কর্মসূচীর কথা বলে এসেছে সেই পার্টি ইদানীং উত্তরপ্রদেশে ও বিহারের সংযুক্ত বিধায়ক সরকারে যোগ দিয়ে দেখিয়েছে যে, শাসক কংগ্রেসকে জব্দ করার সুযোগ পেলে পার্টি কর্মসূচী নিয়ে বেশী কড়াকড়ি করতে উৎসুক নয়। অতএব সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্য দুই পার্টির একটা বোঝাপড়া হতে দেরী হল না। [illegible] ঠিকই রইল, নামের শুধু কিঞ্চিৎ বদল—স্বতন্ত্র পার্টির জায়গায় সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি। বিরোধী কংগ্রেসের নেতারা এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন। প্রথমত, তাঁরা জানেন,

বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মত রাজ্য সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির [illegible] সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির [illegible] বিরোধী [illegible]

[illegible] দুটি [illegible] ইশতাহার [illegible] এই [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] একটি বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন [illegible] এই বিকল্প ব্যবস্থা তৈরির জন্য আমরা এই নির্বাচনে [illegible] সম্মত হয়েছি। আমাদের চেষ্টা হবে যাতে সারা দেশে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে একজন করে স্বীকৃত প্রার্থী দাঁড় করানো যায়। এই স্বীকৃত প্রার্থীকে আমাদের পার্টির সবাই সমর্থন করবে। একটি সমন্বয় কমিটি [illegible] ভঙ্গ করবে এবং প্রার্থী মনোনীত করবে। এই পার্টিগুলি ও অন্য পার্টি সহযোগিতা করবে তাদের নিয়ে ঐ সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে।'

যে তিন দলের মধ্যে এই চুক্তি হয়েছে তারা একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের পৃথক নির্বাচনী ইশতাহার নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে নামবে এবং কোথাও যৌথ নির্বাচনী অভিযানের কোন [illegible] উঠবে না। নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে, ইন্দিরা-বিরোধী ভোটগুলি যাতে ভাগ না হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করার জন্যই [illegible] আর কোন উদ্দেশ্য এখন নেই।

সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির একজন মুখপাত্র প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'কে বললে আমাদের অভিন্ন কর্মসূচী নেই? আমাদের কর্মসূচী আছে। তার একটি মাত্র দফা। সেটা হচ্ছে 'ইন্দিরা হটাও।'

'কিন্তু, তারপর কি?'

'তারপর কি সেটা পরে দেখা যাবে।'

স্বতন্ত্র দল যদিও এখন এই তিনদলীয় বোঝাপড়ার বাইরে রয়েছে তাহলেও নির্বাচনের আগে তার যে এর মধ্যে ভিড়ে না পড়বে এমন নয়। [illegible] স্বতন্ত্র নেতা রাজাগোপালাচারি মাদ্রাজ থেকে বলেছেন, কর্মসূচীর কথা ভাবতে [illegible] কারণ নেই। একবার [illegible] ঘটনার চাপে রাজনীতিকে [illegible] নিজের পথ করে নেবে। স্বতন্ত্র পার্টির জাতীয় [illegible] হচ্ছে [illegible]। [illegible] যদি [illegible] রাজ্যগুলিতে [illegible] ইন্দিরা হটাও [illegible] একটি পার্টিকে পাওয়া যাবে।

বিরোধী মহলের ইচ্ছা ছিল, ভারতীয় ক্রান্তি দলকেও এই শিবিরে সামিল করবেন। ভারতীয় ক্রান্তি দল [illegible] উত্তরপ্রদেশে তাদের শক্তি বাড়বে। কিন্তু [illegible] সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। ভারতীয় ক্রান্তি দলের নেতা চরণ সিং [illegible] এক সময় বলেছিলেন, ইন্দিরা-বিরোধী দলগুলির মনোনীত একমাত্র প্রার্থী হিসাবে উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলি কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজী আছেন যদি নাকি তাঁকে [illegible] প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। চরণ সিং বলেছেন তিনি এমন কোন শর্ত দেন নি। সংযুক্ত এবং [illegible] এই [illegible] যে, ভারতীয় ক্রান্তি দল মহাজোটে যোগ দিয়ে [illegible] প্রতিপত্তির প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত

সম্প্রতি ইরাণের ইস্ফাহান শহরে যে ট্রেন দুর্ঘটনা হয় তাতে ৬০ জন লোক মারা যায়

করতে পারে, আবার শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসে তাদের উপর কমুনিস্ট প্রভাব কমাতে পারে। দুটো পথই তারা খোলা রাখতে চাইবে।

*

এখন বোঝা যাচ্ছে যে, লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে তিনটি রাজ্যে বিধানসভারও অন্তর্বর্তী নির্বাচন হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রায় সপ্তাহখানেক টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন যে, এখানে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন একই সঙ্গে হবে। তামিলনাড়ুতে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে একটা নূতন নজীর স্থাপন করেছেন। সেখানে আজ হোক বা কাল হোক বিধানসভার নির্বাচন করতেই হবে। আর ওড়িশায় জনকংগ্রেস দল স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে কোয়ালিশন ভেঙ্গে দিয়ে বেরিয়ে এসে মন্ত্রিসভায় পদত্যাগের অথবা পদচ্যুতির, বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার এবং লোকসভার সঙ্গে একযোগে বিধানসভার নির্বাচনের দাবী জানিয়েছে।

তামিলনাড়ু বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনাটি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অভিনব। ঘটনাটির অভিনবত্ব এইখানে যে, আপাতদৃষ্টিতে মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির দিক থেকে বিধানসভা ভাঙ্গার পরামর্শ দেওয়ার কোন হেতুই ছিল না। বিধানসভায় করুণানিধির ডি-এম-কে মন্ত্রিসভার নিরঙ্কুশ ও নিরাপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধীকে যেমন লোকসভায় অন্য দলের সমর্থনের ভরসায় সরকার চালাতে হয়েছে করুণানিধিকে তেমন কিছু করতে হয়নি। অথবা কেরলের মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন যখন রাজ্যপালকে বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে বলেছিলেন তখন যেমন বিধানসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল করুণানিধির বেলায় তেমন কিছু হয় নি।

ডি-এম-কে এভাবে অকাল নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অনেক পর্যবেক্ষক অনেকভাবে দিয়েছেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে ডি-এম-কে যদিও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছিল তাহলেও ইদানীংকালে ডি-এম-কের বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিকূল হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। সাধারণ নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর নাগেরকয়েল কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে দাঁড়িয়ে কামরাজ বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচনগুলিতে বিরোধী কংগ্রেস দলের সাফল্য লক্ষ্য করার মতো। শাসক কংগ্রেস, সি-পি-আই, মুসলিম লীগ, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের সঙ্গে মোর্চা তৈরি করে ডি-এম-কে দলকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। এই অবস্থায় ডি-এম-কে দল আর ঝুঁকি না নিয়ে এখনই নির্বাচনে নেমে পড়ে পাঁচ বছরের জন্য গদী সুনিশ্চিত করার তাগিদ অনুভব করে থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, ডি-এম-কে দলের মধ্যেও করুণানিধির নেতৃত্ব ইদানীং কতকটা বিপন্ন হয়ে উঠেছে। আর বেশী দেরী করলে নেতৃত্বের অন্য দাবীদারেরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন, একথা ভেবেও করুণানিধি এখনই ভোটের আসরে নেমে পড়তে চেয়ে থাকতে পারেন। তৃতীয় যে যুক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হল এই যে, শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে ডি- এম- কে-র যে নির্বাচনী সমঝোতা আছে তাকে লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে বিধানসভার কাজে লাগাতে পারলে ডি- এম- কে-রই সুবিধা। পরবর্তীকালে আলাদা করে বিধানসভার নির্বাচন করলে ডি- এম- কে সেই সুবিধা নাও পেতে পারে। এ সম্পর্কে করুণানিধি যে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে কিছুটা সলা-পরামর্শ করেছেন তারও ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ডি- এম- কে-র সভায় আলোচনার পরই করুণানিধি দিল্লীতে ছুটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। তিনি দিল্লী থেকে মাদ্রাজে ফিরে আসার পরই তামিলনাড়ু বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল।

বিধানসভা ভাঙ্গার দুদিন আগেই তামিলনাড়ু সরকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন। একটি ঘোষণার দ্বারা ৫ একর পর্যন্ত সেচের সুবিধাযুক্ত জমির উপর খাজনা মকুব করা হল এবং আর একটি ঘোষণার দ্বারা সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার বাড়িয়ে দেওয়া হল। ভোটারদের কথা মনে রেখেই যে এই দুটি সুবিধা দেওয়া হল তাতে ভুল নেই।

*

তৃতীয় যে রাজ্যটি সম্ভবত বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে সেটি হল ওড়িশা। উত্তরপ্রদেশে শ্রীচরণ সিংয়ের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে শাসক কংগ্রেস বেরিয়ে যাওয়ার পর যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল ওড়িশায় এখন সেই পরিস্থিতি। ১৯৬৭ সালের পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যে সব কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ওড়িশা জনকংগ্রেস-স্বতন্ত্র কোয়ালিশনই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সিংদেও-এর নেতৃত্বে এই কোয়ালিশন সরকারের ৪৬ মাস পার হতে চলল। কিন্তু সেই দীর্ঘস্থায়ী কোয়ালিশনও শেষ পর্যন্ত টিকল না। জনকংগ্রেস কোয়ালিশন ত্যাগ করেছে এবং মন্ত্রিসভা থেকে জনকংগ্রেস মন্ত্রীরা বেরিয়ে এসেছেন।

ওড়িশায় এই ভাঙ্গনের আশু উপলক্ষ হল কেন্দুপাতার দুজন ব্যবসায়ীকে কিছু টাকা ছাড় দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত। কেন্দুপাতা দিয়ে বিড়ি তৈরি হয়। রাজ্য সরকার জঙ্গল থেকে এই পাতা সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন। এই রকম দুজন ব্যবসায়ীকে চল্লিশ মাস থেকে সস্তায় কেন্দু পাতা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জন কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানায়। মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতিতে বলেন যে, কয়েকটি কেন্দুপাতা বিক্রয় কেন্দ্রে পাতার দাম বেশী। কিছু ব্যবসায়ী রাজনীতিকদের সহায়তায় ঐসব বিক্রয় কেন্দ্র থেকে অন্যত্র চোরাই চালান দিচ্ছিল। এতে সরকারের অনেক টাকা লোকসান হচ্ছিল। এর প্রতিকারের জন্যই উক্ত ব্যবসায়ীদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জন কংগ্রেস এই ব্যাখ্যা মানতে রাজী হয় নি। পরে মুখ্যমন্ত্রী এই ছাড় দেওয়ার আদেশ স্থগিত রাখেন। কিন্তু জন কংগ্রেস তার আগেই মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এসে বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দাবী জানায়।

মুখ্যমন্ত্রী মিঃ সিংদেও পদত্যাগ করতে রাজী নন। তিনি বলছেন, বিধানসভায় তাঁর এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, জন কংগ্রেসের অনেক সদস্য নিজেরা এসে তাঁকে বলে গেছেন, দলের সিদ্ধান্ত যাই হোক, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করছেন। এদিকে জন কংগ্রেস, উৎকল কংগ্রেস, শাসক কংগ্রেস, পি এস পি ও সি পি আই জানিয়েছে যে, তারা বিকল্প সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা করবে না।

উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং শাসক কংগ্রেসের সমর্থন হারাবার পরও পদত্যাগ করতে অস্বীকার করে ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। ওড়িশায় অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী সিং দেও রাজ্যপালের কাজ কতকটা সহজ করে দিয়েছেন। তিনি রাজ্যপালের নির্দেশ মেনে নিয়ে আগামী ১৯ জানুয়ারী বিধানসভায় রায়ের সম্মুখীন হতে সম্মত হয়েছেন। ওড়িশায়ও বিধানসভা ভাঙ্গবে কিনা এবং লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে বিধানসভারও নির্বাচন সেখানে হবে কিনা তা ১৯ জানুয়ারির ঐ ভোটের ফলাফলের পর বোঝা যাবে। —পুণ্ডরীক

১৮-১-৭১

সম্পাদকীয়

আবার নির্বাচন

দুই দুইবার পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন দেখেছে গত তিন বছরে। তার পরিণতি শুভ হয়নি। তাই এবার নয়াদিল্লী দ্বিধান্বিত ছিল, পশ্চিমবঙ্গে আবার বিধানসভা নির্বাচন এক্ষুনি করা সমীচীন কিনা। অনেক দলই ছিল গররাজী। অনেকে আবার বলছিলেন, লোকসভার নির্বাচন যখন ঘোষিত, বিধানসভার দোষ কোথায়? দোষ বিধানসভার নয়। বিধানসভার সদস্যরা এমন সুযোগ পেয়ে দুইবারই পশ্চিমবঙ্গবাসীদের নিরাশ করলেন। শুধু তাই নয়, দুইবারের ব্যর্থতার পর বাংলাদেশে আজ এক নৈরাজ্যের অবস্থা। নিরাপত্তা বলতে কোনো বস্তুই নেই এখন পশ্চিমবাংলায়।

আমলাতন্ত্র দিয়ে স্থায়ী সরকারের কাজ চলে না। এটা জানা কথা। মন্ত্রী না থাকলে পুলিশবাহিনীর তদারকীই বা ঠিকমত চলে কী করে? এসব তো পুঁথিগত প্রশ্ন। সত্যি কথা, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে কত দিনই বা বিধানসভাহীন রাজ্যশাসন করা সম্ভব। সম্ভব হলেও সঙ্গত কিনা এ-প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে। সেজন্যেই প্রায় সব রাজনৈতিক দলই ভোটের কথা বলেছেন। তাঁদের যুক্তি হল এই যে, নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে এই অস্থিরতা বন্ধ হবে না। নির্বাচন যত পেছোবে উগ্রতা তত বাড়বে। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করেই কি নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা গেছে? বরং অবস্থা দিনের পর দিন অবনতির দিকে। নয়াদিল্লীর ওপর তাই চাপ পড়ছিল নির্বাচন নিয়ে কী করা যায়। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী অনেক বিচার-বিবেচনার পর মত দিয়েছেন, মার্চেই পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার সঙ্গে বিধানসভারও নির্বাচন হবে।

রাজনৈতিক মহলের কলগুঞ্জন এখন নির্বাচনী ডামাডোলে কোলাহলের রূপ নেবে। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস ও কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের যে চেহারা ছিল, তা এখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। কংগ্রেস যেমন দ্বিধাবিভক্ত, বামপন্থী জোটও তেমনি। মাঝামাঝি রয়েছে বাংলা কংগ্রেস। বাংলা কংগ্রেস বামপন্থীদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে দুবার মন্ত্রিসভায় গিয়েছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পড়েছিল তার ওপর। দুবারই মন্ত্রিসভা মাঝপথে পরিত্যক্ত। প্রথমবার কংগ্রেসের পরোক্ষ বিরোধিতার কারণে। দ্বিতীয়বার নিজেদেরই দোষে। এখন তারই জের চলছে। যুক্তফ্রন্টের আর অস্তিত্ব নেই। আট পার্টি ও ছ-পার্টি জোটের মধ্যে চৌদ্দ দল ভাগাভাগি হয়ে গেছে। পরস্পরের মুখ-দেখাদেখিও বন্ধ। ইতিমধ্যে প্রশাসনের ব্যর্থতা, শিক্ষার ব্যর্থতা, দুর্নীতি, বেকারী ইত্যাদি সমস্যা এখন ভয়াবহ মূর্তি ধরে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত। একে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

রাজনৈতিক মহলে জোর তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেসের মধ্যে নির্বাচনী বোঝাপড়ার আলোচনা অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে শেষপর্যন্ত আসন বণ্টনের প্রশ্নে ভেঙে যায়। শাসক কংগ্রেস সম্ভবত এখন একাই নির্বাচনে লড়বে। হয়তো বা কোনো কোনো আসনে কোনো দলের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। কেরলে মধ্যবর্তী নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মার্কসবাদী-বিরোধী একটা বোঝাপড়া করে অত্যাশ্চর্য ফল পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে তার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা সফল হয়নি। আট পার্টি জোটের বামপন্থীরাও এখন যতটা না কংগ্রেস-বিরোধী, তার চেয়ে বেশি সি পি এম বিরোধী। সি পি এম সে-কথা জানে বলেই নিজের অনুগত দলগুলোকে নিয়ে নির্বাচনী আঁতাত সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। যতদূর মনে হয় এবার আসল লড়াই হবে শাসক কংগ্রেস বনাম সি পি এম। সি পি এম একাই ২২৭টি আসনে প্রার্থী দেবার কথা ভাবছে। এবং তাদের জোটের অন্যান্যরা মিলে বাকী ক'টি আসনে লড়বে। আট পার্টির দলগুলো এখনো নিজেদের মধ্যে আসন বণ্টনের প্রশ্নটি ফয়সালা করতে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় স্তরে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার পক্ষপাতী হলেও, রাজ্য স্তরে শাসক কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে চায়, আট পার্টির অন্যান্য শরিকদের চাপে। সুতরাং নির্বাচনে ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবার বেশ জমজমাট হবে আশা করা যায়।

কিন্তু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে গেলে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটাররা যদি নির্বিঘ্নে এবং নির্ভয়ে ভোট দিতে না পারেন, তাহলে নির্বাচনের উদ্দেশ্যই যাবে ব্যর্থ হয়ে। এই কাজে সরকারকে তো উদ্যোগী হতেই হবে সর্বশক্তি দিয়ে। নির্বাচনে যোগদানকারী সকল দলকেই এ-বিষয়ে সতর্ক, সজাগ ও সহযোগী মন নিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হবে। নয়তো নির্বিঘ্নে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না।

কাজীরাঙ্গা ॥ শান্তিকুমার ঘোষ

খড়্গের গৌরব নিয়ে
গণ্ডার ফিরছে ঘাসে
ঘাসের ভিতর ঘাসে
সহজে জলায়।

ক্ষত্রিয়ের দিন আজ বহুকাল পর :
দূরে ওই হিমবন্ত পাহাড়ের শ্রেণী,
নীচে ব্রহ্মপুত্র বয় মাতোয়ারা।

এখানে উহারা কেন—গোপন শিকারী
এ যে স্যাংচুয়ারি!
এইখানে গণ্ডারের পিঠ খুঁটে খায় নির্ভয়ে পাখিরা,
শ্রাবনের দিনে উঠে যায় পাহাড়ের 'পর;
শরবনে বহুৎসব বৎসরান্তে মারীকে তাড়ায়
আগুনের বেড় এক (সভ্যতার বেড় যেন)
ঘিরে ফেলে কাজীরাঙ্গা!

বাইনকুলার ঘুরে যায়...দুলে ওঠে উদ্ভিদ আঁধার
শৈবাল-শয্যায় শুয়ে তন্দ্রা আসে গণ্ডারের :
ছায়ার মতন ফেরে খড়্গের শিকারী
অথর্ব ব্যাপারী,
হংকং বাজার থেকে সে এসেছে বহুদূরে কাজীরাঙ্গা;
জন্ম-অপমান শয্যা ছেড়ে
হয় যদি অতর্কিতে যৌবনের উজ্জীবন
রাইনোর খড়্গে!

তোমাকে নিবেদিত ॥ দুলাল ঘোষ

কি এমন পেয়ে হাতের মুঠোয়, তুমি পরম নিশ্চিত হলে
সুখ, শান্তি, ভালোবাসা...
চোখের তারায়—
কি সে সংকেত
তুমি ধরে নিলে, কুটিল অন্ধকার ছিঁড়ে
ফিরে পাবে সেই ফুটন্ত সকাল...

আসলে আমার কিছু নেই, না রূপ না যৌবন
প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ক্ষয়ে গেছে দেহ
শুধু পুরনো কাঠামোয় শক্ত বাঁধনে
কোন ক্রমে বেঁচে থাকা—
মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে...
বলো না, কি এমন সাধ্য-সাধনায় তুমি ধরে নিলে
লখিন্দর ফিরে পাবে, লৌহ বাসর ঘরে।

আমি অসহায়, নেই সুখ, শান্তি, ভালোবাসা...
না রূপ, না যৌবন
শুধু কাঁটা-তার ছিঁড়ে পথ করে চলা ছাড়া—
তবে কেন বিপুল প্রত্যাশায় রাত জেগে আছো
বলো না, কি দেখে এমন পরম নিশ্চিত হলে
ধরে নিলে বন্ধ্যা হৃদয়ে—
আমি তোমায় উপহার দেবো রক্তাক্ত গোলাপ...

তোমাকে ॥ সীমা মিত্র

তোমাকে আগে কতই না ভালো লাগত
দিনে অন্ততঃ একটিবার না দেখলেই নয়—
পাশে বসিয়ে গান গাওয়া গান শোনা
আগামী দিনের তোমার আমার প্রবন্ধের
খরকুটো জমানো।
আনন্দ দিত তোমার ছেলেমানুষী মুখখানা।
সেদিন তুমিই ছিলে যথেষ্ট,
আজ অন্য চাহিদা—তুমি অসহ্য;
যা শুধু 'বার-গার্ল' দিতে পারে
আমি লুটেপুটে নিতে পারি
ঘোর ঘোর চোখে প্রতিটি রেখা দেখার চেষ্টা
যা পাই না তোমার মধ্যে।
তুমি আজ শুধুই ব্যর্থতা
স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী রজনীগন্ধা—অন্য কিছু নও।
হাসনুহানা হতে পারনি!
তাই এখন আমার এত অধঃপতন
তোমার প্রেম দূরে থেকে দেখি,
কাছে যাওয়ার সাহস দুঃস্বপ্নে জর্জরিত।
তবু কেন জানি না
মনে পড়ে তোমাকে।

সুতপা

শৈলেন রায়

শীতটা এবার খুব জোর পড়েছে। অথচ সকাল সকাল কোর্টে যাওয়া দরকার। একটা জরুরী কেস রয়েছে। হন্তদন্ত হয়ে কালীঘাট ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এসে শুনলাম, আজ ট্রাম স্ট্রাইক। গত রাত্রে কী নাকি একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। তাই স্ট্রাইক। রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন ট্যাক্সির খোঁজ করছিলাম হঠাৎ একটা গাড়ি এসে পাশে দাঁড়াল। গাড়ির দাঁড়ানো প্রথমে খেয়াল করিনি। কে যেন ডাকল, 'তপুদা ও তপুদা।' গাড়ির জানালার একটা মুখ। খুব চেনা মতন। অথচ চিনতে পারছিলাম না। ওর চোখে সান-গ্লাস আঁটা।

'আপনি এখনও ঠিক আগের মত আছেন। ভুলো ভুলো মতন। প্রফেসর হলে ভাল মানাতো।' বলে শব্দ করে হেসে উঠল ও। গগলস খুলে হাতে নিল। ওর মুখ কিছুটা লাল হয়ে উঠেছে। আগেও এরকম হতো। আগে বলতে সেই বছর পনেরো তো বটেই।

হঠাৎ মনের পর্দার নীচু পর্দা থেকে সুতপা ভেসে উঠল।

ও ডাকল, 'অত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, উঠে আসুন।'

বসতে না বসতেই ও বলল, 'লোকজন সবাই কী রকম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।'

'সুন্দরী মেয়ে অনেকেই দেখে।'

'তাই নাকি! চোখ নামিয়ে নিতে নিতে ও বলল, 'তাছাড়া আমি তো আর মেয়ে বলতে যা বোঝায়, তা নেই।'

'সব বয়সেই কিছু কিছু মেয়ে মেয়েই থেকে যায়।'

'ওমা, আপনি তো আজকাল বেশ কথা বলতে শিখেছেন, আগে তো সাত কথায় এক কথা বলতেন।'

উত্তর না দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। গাড়ি সোজা রাস্তা ধরে চলছিল।

সুতপা একসময় বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে উকীল হয়েছেন, কোন কোর্টে যাবেন?'

'আলিপুর।'

সুতপা ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলল, 'আলিপুর।' আমার দিকে ঘুরে বসে কিছুক্ষণ আমাকে দেখবার চেষ্টা করল ও। চোখ না ফিরিয়েও ঘাড়ের ওপর ওর দৃষ্টির স্পর্শ পেতে লাগলাম, ঘাড় শির শির করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গোটা শরীর। মনে হতে লাগল, লোভে পড়ে সুতপার সঙ্গে গাড়িতে না ওঠাই উচিত ছিল, এটুকু পথ হেঁটেই মেরে দেওয়া যেত। শুধু শুধু একটা অশান্তি। অথচ অশান্তিটা যে কেন, কে জানে।

'অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল, কতদিন বলুন তো?'

এখানে চুপ করে থাকা চলে না। বললাম, 'বছর পনেরো হবে।'

'সেটেই না। ষোল বছর তিন মাস, দিনক্ষণ পর্যন্ত হিসেব করে বলে দিতে পারি। কিন্তু কী লাভ অতশত হিসেব করে?'

কোন লাভ নেই' চুপ করে রইলাম। গাড়ি হাজরা রোড ধরে পশ্চিম দিকে এগোতে লাগল।

এখানে এসে বোধ অনেক কিছু পাল্টে গেছে। রাস্তাঘাটে বড় বড় গর্ত, চারধারে জঞ্জাল। থাকেন কি করে এমন নোংরা জায়গায়?'

এতক্ষণে নিজেকে স্বাভাবিক মনে হল. বললাম, না থেকে উপায়? খাবো কি?'

'পেটে কিদে থাকলে খাবার ভাবনা? ডোরি-অন-সনে একজনও জজ উকীল নেই। ঠিক পসার জমিয়ে ফেলতে পারতেন।'

'কোলকাতার একটা টান আছে, ছেড়ে যাওয়া যায় না।'

'কিসের টান? কে কে আছে?'

'কেউ নেই। মাটির টান।'

'বা, মাটির আবার টান থাকে নাকি?'

বড় একটা গর্তে পড়ে গাড়ি লাফিয়ে উঠল। আর একটু হলে সুতপা গায়ের ওপর এসে পড়েছিল প্রায়। দূরে সরে যেতে যেতে বলল, 'এই মাটি, তার আবার টান।' ও নাক-মুখ কোঁচকালো, ওকে সুন্দর দেখালো। শুধু যে সুন্দর তাই না, মনে হল, ও তরুণী, ওর বয়স বড়জোর কুড়ি কিম্বা বাইশ। আসলে, মনে মনে নিজেদের বয়েস একবার হিসাবও করে ফেললাম, সুতপার বয়স সাঁইত্রিশ আটত্রিশের কম হবে না কিছুতেই। সেই কবে, বিয়ের পর বরের সঙ্গে বিদেশে চলে গেল। কম করেও বছর পনেরোর আগের কথা। সুতপার তাবার আর্বাণী ষোল বছর তিন মাস।

'আপনি কিন্তু আগে বেশ কথা বলতেন।'

বাধ্য হয়েই হাসতে হল। 'কিছুক্ষণ আগেই বললে, আগে সাতটা কথার জবাবে একটা উত্তর দিতাম।'

সুতপা চোখের কোণ দিয়ে কী রকম করে যেন তাকাল। মনে হল ও বিরক্ত হয়েছে। বিরক্ত হলেও, চুপ করে রইল। আঙুলের মাথায় আঁচল পাকাতে পাকাতে এক সময় বলল, 'রাস্তাটা ড্রাইভারকে চিনিয়ে দেবেন!'

'চেনবার কিছু নেই, সোজা রাস্তা।'

'সোজা রাস্তাও মানুষ মাঝে মাঝে চিনতে পারে না, অলিগলিতে ঢুকে পড়ে।'

বাইরে অগণিত লোক চলেছে, মানুষের চলার বিরাম নেই। বিরাট এই মিছিলের মধ্যে একদিন নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম গন্তব্য না থাকলেও চলার বিরাম ছিল না, চলা, শুধু চলা।

প্রায় বছর পনেরো হয়ে গেল বোধ। সুতপার তাবার ষোল বছর তিন মাস।

সুধাংশু আমাদের সঙ্গে পড়ত কলেজে ছটফটে স্মার্ট ছেলে। হৈ-হুল্লোড় নিয়েই আছে। যদিও আমার চরিত্র ওর ঠিক বিপরীত কী করে যেন ভাব হয়ে গেল। শুধু ভাব না, বন্ধুত্বও। সুধাংশু মাঝে মাঝে বলতো 'তুই যে আমার বন্ধু ভাবতেও অবাক লাগে। বন্ধুত্ব হওয়া উচিত ছিল কানাই, অশোক ওদের সঙ্গে, এক নেচারের আমরা। আর্বাণী এক নেচারের বলেই হয়ত ভাব হল না। আমাদের বন্ধুত্বটা দেখে দেখে শেষ পর্যন্ত ভাব করলো কার সঙ্গে জানিস? বোস্ট ঠাণ্ডা আর শয়তান পুরুতটার সঙ্গে। আর্বাণী তোকে শয়তান বলছি না। কিন্তু কোথায় যেন পুরুতটার সঙ্গে তোর একটা মিল রয়ে গেছে।'

সুধাংশুর কথায় রাগ করতাম না, ওর কথার ধরনই এরকম। যাকে যা খুশী বলে দেবে। হয়তো এটাই ওর দিকে আকৃষ্ট হবার একটা বড় কারণ।

সুধাংশুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম। ওই জোর করে ধরে নিয়ে যেত, ওর মা নানা রকম খাবার-টাবার দিতেন। ওরা বেশ বড়লোক ছিল। বাড়িতে কাজ-কর্মের লোকজন, গ্যারেজে মোটর গাড়ি, বাড়িটা বড় আর সুন্দর। সেই সব কারণেই ওদের বাড়িতে যেতে ভাল লাগত, না আরও কোন কারণ ছিল, ঠিক বুঝতে পারতাম না।

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্রীজের ওদিক থেকে ট্রাম, গাড়ি সব আসছে। ওদিক সাফ না হলে এদিককার রাস্তা বন্ধ। সুতপা বলল, 'কোলকাতায় মুস্কিল এক পা হাঁটতে গেলেই বাধা।'

হঠাৎ অনেকটা যেন মুখ ফসকেই বেরিয়ে গেল, 'বাধা যে কাটাতে জানে তার কোন বাধা থাকে না।'

ও কী বুঝল কে জানে, শব্দ করে হেসে উঠল। আমাকে চোখের ফাঁক দিয়ে দেখলেও একবার। আমি এখন ওদিককার জানালা দিয়ে রাস্তাঘাট মানুষজন দেখছিলাম। নাকি কিছুই দেখছিলাম না, শুধু সুতপাকেই দেখছিলাম। সুতপা যেন একটু মোটা হয়েছে। যদিও বসে থাকলে মানুষকে ঠিকমত বোঝা যায় না, তবুও আমি মনে মনে ওকে মেপে নেবার চেষ্টা করছিলাম। একটু মোটা, একটু ফর্সা, গালে একটু মাংসও লেগেছে। চুলগুলো আগের মতই আছে। ছোট করে ছাঁটা, ঘাড় অবধি, বাতাসে ফুর-ফুর করে উড়ছে। মনে হচ্ছে, এই সব চুলে চাপা চাপা একটা মিষ্টি গন্ধ থাকে। অন্তত আগে থাকতো।

কেন যে বিশ্রী কাণ্ডটা করে বসলাম। এক-একটা কাণ্ড-কারখানার জন্যে আজীবন পস্তাতে হয়। কিন্তু ঘটে যাওয়া কাজটা কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যায় না। যদি যেত, এতদিন পর নতুন করে কানের দুপাশ গরম হয়ে উঠতো না।

সেদিন আমাকে বসিয়ে রেখে সুধাংশু এই আসছি বলে বেরিয়ে গেল। ঘরে শুধু সুতপা। ও তখন ফ্রক পরতো। ওর পায়ের গোছা যেন পুষ্ট ছিল, আর ছিল লম্বা লম্বা সোনালী চুল, গোড়ালির ওপর থেকে উরু পর্যন্ত যা দেখে অনেকদিন মনে হত, ওর পায়ে হাত বুললে খুব নরম নরম লাগবে।'

সুতপা আমাকে দেখে যেন বিস্মিত হল। 'ওমা আপনি একা-একা?'

'ও এই আসছি বলে বেরিয়ে গেল, অথচ এখনও এল না।'

সুতপা হেসে উঠল, 'না এল তো কী হয়েছে। আপনি তো আর জলে পড়েননি। পড়লেই বা সাঁতার জানলে উঠে আসা যায়।'

ওর কথা শুনে মনে হল, সুতপা আর ছোট নেই। আজ এইটে পড়া মেয়েরা ছোট থাকে না।

সুতপা এসে একটা চেয়ারে বসল। মাঝে একটা টেবিল। সুধাংশুর পড়ার টেবিল। দুপাশে আমরা দুজন। সুতপা একটা কাগজ পেন্সিল টেনে নিয়ে বলল, 'দাঁড়ান আপনার একটা পোর্ট্রেট আঁকি। নড়বেন না, হাসি-হাসি মুখ করে বসে থাকুন। বেশ পবিত্র পবিত্র ভাব করে। একটা ফুলটুলের কথা ভাবুন না।' কথা বলতে বলতে ও পাকা শিল্পীর মত পেন্সিলটাকে কাৎ করে ধরে কাগজে লম্বা লম্বা টান দিতে লাগল। যে মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সুতপা যদি সত্যি সত্যি আমার একটা ছবি আঁকে, যে ছবিটার সঙ্গে আমার আদৌ কোন মিল না থাকলেও আমি সুখী হব, ঠিক সেই মুহূর্তে ও নদীতে জোয়ার আসার মত শব্দ করে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

হাসতে-হাসতে ওর মুখ লাল হয়ে উঠল। মাথা নুয়ে পড়ল, ছোট-ছোট চুলের গোছা মুখের সামনে এসে চোখ, নাক, কপাল ঢেকে দিল। তখনই হঠাৎ সেই বিশ্রী কাণ্ডটা করে বসলাম। ওর নুয়ে-পড়া মাথায় নাক ছুঁইয়ে চুলের গন্ধ নিলাম, একটা গন্ধ, দারুণ মিষ্টি, খুব মৃদু, অথচ সমস্ত বুকটা যেন সেই গন্ধে ভরে গেল।

সুতপা হাসি থামিয়ে ধীরে-ধীরে মাথা তুলল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আমি যাই।'

ও চলে গেল। একটা কথা ওকে বলার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ওকে কী করে বলি, আমি কোন ফুলটুলের কথা ভাবি নি সুতপা, আমি শুধু ভাবছিলাম, আমার ছবিটা, যা তুমি আঁকছিলে, তা যতই খারাপ হোক, এমন কি ছবি দেখে আমাকে যদি একটুও চেনা না যায়, তবু আমি দারুণ খুশী হবো, খুশী হবো এই কারণে যে, তুমি আমার ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলে, কয়েকটা মুহূর্ত শুধু আমার কথাই ভেবেছিলে।

সুতপা চলে না গেলেও একথা ওকে বলা যেত না। সুতপাকে একথা বলা চলে না।

গাড়ি চলতে শুরু করল। একটা ট্রাম ঘটাং-ঘটাং করে নেমে এল। পাশ দিয়ে চলে গেল। অনেকগুলো লোক বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওদের মধ্যে অনেকেই নির্ঘাৎ সুতপাকে দেখছে, সুতপা দেখবার মত।

কানের পাশ দিয়ে চুল সরিয়ে দিয়ে সুতপা ঝুঁকে পড়ল। ঝুঁকে পড়ে গঙ্গা দেখতে লাগল। ওকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম, ওর গলা বেশ লম্বা, এই সব গলাকে গ্রীবা বলে। ও একটা সরু চেন পরেছে। ওর চিকন চামড়ার ভাঁজে চেনটা ঢাকা পড়ে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল চেনটাকে টেনে বার করি, বলি, 'একটা মোটা চেন পরলেই পার, তোমাদের তো পয়সার অভাব নেই।'

সুতপা হঠাৎ কথা বলে উঠল, 'কলকাতার মানুষদের যে কী কষ্ট! বাসে-ট্রামে অমানুষিক ভিড়!'

যদিও সুতপা বাইরের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল, আমি যেন নিমেষের জন্য ওর চোখের তারায়-তারায় ঘনিয়ে-আসা বিষণ্ণতা দেখতে পেলাম। মনে হল বলি, 'আমার কোন কষ্ট হয় না, অভ্যেস হয়ে গেছে।'

কিন্তু সুতপা তো আমাকে নিয়ে কিছু বলে নি।

ট্রাম পুলের মাঝ বরাবর এসে গিয়েছে। সুতপা এখনও গঙ্গা দেখছে। আমার দৃষ্টিও সেদিকে গিয়ে পড়ল, একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গেল। এখন জোয়ার। বড়-বড় গোটা-কয়েক নৌকা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে।

আমরা তিনজন। আমি, সুধাংশু আর সুতপা। সুতপা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সুধাংশু বুক ফুলিয়ে প্রথমে গিয়ে নৌকায় উঠল। আমাদের ডাকল। উঠতে যাব, হাতে টান পড়ল। সুতপা। ও বলল, 'ধরুন।' ওর হাত ধরে ধীরে-ধীরে নৌকায় পুল পেরিয়ে চেতলায় এলাম, মাটিতে পা দিয়েই সুতপার অন্য মূর্তি। ভীষণ শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'কী ভীতু আপনি, মেয়েদের হাত ধরে পোল পেরোন!' ওর কথায় সুধাংশুও হেসে উঠল। পরক্ষণেই তাড়া দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি চল, মা উঠে পড়লে আর আস্ত রাখবে না। তুই-ই যত নষ্টের গোড়া। সবটাতেই ফেউ।' বলে সুধাংশু চোখ দিয়ে সুতপাকে তিরস্কার করল।

সুতপা সঙ্গে সঙ্গে ভেংচি কেটে উঠল, 'ফেউ!' আমি ছিলাম বলেই তোমার ক্যাবলাকান্ত বন্ধু এপারে এলো, না হলে— হাত ছাড়িয়ে শরীর বেঁকিয়ে ও কী রকম এদিকে পড়ার ভঙ্গী করল।

সুধাংশু আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুতপায়ে চলতে লাগল। চেতলায় ওর এক বন্ধুর পেয়ারা বাগান আছে। বাগানে বড় বড় পেয়ারা হয়েছে, সুধাংশু তখন খুব পেয়ারা খেতে ভালবাসতো।

'সুধাংশু এখন কোথায় আছে? আগে মাঝে-মধ্যে চিঠি দিত। বছর দুয়েক ধরে সব বন্ধ করে দিয়েছে।'

সুতপা যেন চমকে উঠে এদিকে ফিরল। 'হঠাৎ দাদার কথা কেন মনে হল?'

ওর এই প্রশ্নটা সত্যি সত্যি বিস্ময়কর। সুধাংশু আমার বন্ধু ছিল। অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

'এতক্ষণ পরে হঠাৎ ওর কথা আপনার মনে হল কেন? ঠিক এই জায়গায় এসে?'

গাড়ির চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। ডানদিকে জেলখানার উঁচু পাঁচিল, বাঁদিকে এঁকে-বেঁকে-যাওয়া নদী, নদীর ওপর গোটা কয়েক নৌকাও। ঢেউয়ের তালে তালে ওরা নাচছে। নাচছে না, দুলছে।

সুতপা আবার বলল, 'দাদা এখন কানপুরে আছে। ওর বিয়ে হয়ে গেছে, একটা ছেলেও হয়েছে।' সুতপার গলা হঠাৎ খুব শান্ত শোনাল।

'আমাকে একটা নেমন্তন্ন চিঠি পর্যন্ত দিল না।'

'দাদা ওরকমই, কাউকে নেমন্তন্ন করে নি। একজন পাঞ্জাবী মেয়েকে বিয়ে করেছে। তারপর আপনার খবর কি? বিয়ে থা হলো?'

'আমার খবর তোমার অ-জানা নেই।'

'ওমা, সে কী! আপনি খুব ফেমাস কোন কেউ, যে সবাই আপনার খবর রাখবে?'

'কারও কারও কাছে সাধারণ মানুষও ফেমাস হয়।'

'তাই নাকি? নিজের সম্বন্ধে খুব অদ্ভুত ধারণা তো। বিয়ে না করে শুধু শুধু কী করছেন?'

'কি আবার করবো, খাচ্ছি, নাচ্ছি, দিনগত পাপক্ষয় করছি।'

'প্রেম প্রেম?'

'মেয়ে পাওয়া গেল না।'

'এত মেয়ে, অথচ পেলেন না?' আঙুল দিয়ে বাইরের দিকে দেখাল সুতপা। তিন-চারটি মেয়ে দল বেঁধে চলেছে, কোন অফিসে কাজ করে হয়তো। 'মাঝেরটি মন্দ নয়। তবে বড্ড রোগা। রোগাই তো আপনার পছন্দ, তাই না? আগে তো তা-ই ছিল।'

বলতে ইচ্ছে হল, তুমি তো কোনদিনই রোগা ছিলে না, সুতপা। মোটা না হলেই মানুষ রোগা হয় না।

একথা সুতপাকে বলা যায় না।

জেলখানা ডাইনে রেখে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এত বেলা হল, অথচ একটুও বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সবেমাত্র ভোর হল। শহরের ঘুম এখনও ভাঙেনি বুঝি। দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা আমার অভ্যেস, আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হয়েছিল। একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিলাম। কোর্ট বসার আগে একটা জরুরী দলিল টাইপ করতে হবে, শেষবারের মত মক্কেলদের বুঝিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে। শুধু বুঝিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া। একঘেয়ে ক্লান্তিকর। ধূর্ত কতকগুলো মানুষ, এমন ভাব দেখাবে যেন কিছুই বোঝে না, অথচ তলে তলে কী অসম্ভব শয়তান। সব সময় ফন্দি আঁটছে কী করে কাকে ঠকাবে, কী করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবে।

'এত প্রফেশন থাকতে উকীল হতে গেলেন কেন?'

'যে কোন একটা প্রফেশন তো নিতেই হোত। ডাক্তার, জজ, ইঞ্জিনীয়ার—'

'ইঞ্জিনীয়ার অনেক ভাল।'

'কি ভাল?'

'বউকে খুব আদরে রাখে। শাড়ি, বাড়ি, গয়না দেয়।'

'থামলে কেন? আর, আর কী দেয়?'

'আবার কী দেবে? মেয়েরা যা যা চায়, সব দেয়।'

'শুধু সঙ্গ দিতে পারে না। কাজ কাজ করে মরে।'

সুতপা চকিতে আমাকে দেখে নিয়ে নড়ে-চড়ে বসল। গলা উঁচিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দেখল, বলল, 'মোটেই না। কাজ থাকলে কর্তব্যপরায়ণ মানুষ কাজ ফেলে রাখতে পারে না। বাব্বাঃ, কোলকাতায় যে কী লোক হয়েছে! এদিকটা তো বলতে গেলে শহরের বাইরে, তবু লোকের বিরাম নেই। দেখুন, দেখুন, লোকটা কী রকম দৌড়চ্ছে। এত বড় ভুঁড়ি, যদি পড়ে-টড়ে যায়।' বলতে বলতে সত্যি-সত্যি লোকটা আর একটু হলে পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল। সুতপা হাসিতে ভেঙে পড়ল। ওর মাথা নুয়ে পড়ল। আমার দিকে একটু হেলেও পড়ল। মাথার দু-পাশ দিয়ে ছোট ছোট চুলগুলো মুখের দিকে নেমে এল। ইচ্ছে হল নাক ডুবিয়ে ওর চুলের গন্ধ নি-ই, পরখ করে দেখি সেই গন্ধটা এখনও আছে কিনা, সেই যে চাপা চাপা মিষ্টি গন্ধটা।

কিন্তু সুতপার চুলের গন্ধ নিতে নেই।

অনেকক্ষণ ধরে হাসল সুতপা। একসময় মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখে জল এসে গিয়েছে, মুখটা অসম্ভব লাল দেখাচ্ছে, দু হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে আবার হাসিতে ভেঙে পড়ল সুতপা। গাড়ি চলতে লাগল। আর একটু পরেই কোর্ট, আর মাত্র মিনিট কয়েক সময়।

ডাকলাম, 'সুতপা।'

সুতপা উত্তর দিল না।

আবার ডাকলাম, 'সুতপা মুখ তোল। এবার নামবো।'

ধীরে ধীরে মুখ তুলল সুতপা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'কী অদ্ভুতভাবে লোকটা পড়ে যাচ্ছিল। আর একটু হলে সত্যি সত্যি পড়ে যেত।'

'মানুষকে পড়তে দেখলে তোমার হাসি পায়?'

'হ্যাঁ, অসাবধান হয় বলেই তো পড়ে।'

'সাবধান মানুষেরও পতন ঘটে। কখন যে কার কী হয়!'

ছোট মেয়ের মত ঘাড় নাড়তে নাড়তে সুতপা বলল, 'পথ দেখে না চললেই মানুষ পড়ে যায়। পড়ে নিজেই শুধু ব্যথা পায় না, অপরকেও সময় সময় খুব ব্যথা দেয়।'

আমার তখন মনে পড়ছিল, ভীরু ভীরু মতন একটি ছেলে পায়ে পায়ে বড় হলঘর পেরিয়ে ডাইনে যে ঘরটায় পাখা ঘুরছিল, সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিরাট ঘর, বিরাট একটা টেবিল, সেই টেবিলের সামনে দরজার দিকে মুখ করে বিরাট এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, মুখে বিরাট এক চুরুট। ছেলেটি যে ঘরে ঢুকল ভদ্রলোকের সেদিকে খেয়াল নেই। তন্ময় হয়ে কী যেন দেখে চলেছেন তিনি। ছেলেটি গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। কিছু একটা বলতে চাইল। কিন্তু তার গলায় কোন আওয়াজ ছিল না।

অনেকক্ষণ পর ভদ্রলোক মুখ তুললেন, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চিনবার চেষ্টা করলেন যেন। বললেন, 'তুমি হঠাৎ এই সময়ে?'

সুধাংশু বলল, 'আপনি ডেকেছেন।'

'হ্যাঁ ডেকেছি। একটা সু-খবর তোমাকে দেওয়া দরকার। নিজেই দিতে চাই।' বলে পাশের ড্রয়ার ঠেলে একটা প্যাকেট বার করলেন। মোটা মোটা আঙুলে ছিঁড়ে প্যাকেটটা দুলিতে দুলিতে মাঝে মাঝে

CENTRAL LIBRARY

মেয়েটির দিকে তাকাতে লাগলেন, মেয়েটির হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। ভদ্রলোকের সব কিছুই বিরাট, নাক, মুখ, চোখ, আসলে সব কিছু। মাথাটাও জল-হস্তির মত। শুধু বুদ্ধিটা অসম্ভব সূক্ষ্ম, মাকড়সার জালের সুতোর মত। সূক্ষ্ম কিন্তু দারুণ শক্ত। এই সুতোর টানে অনেক জটিল মামলা নিজের দিকে টেনে নেন তিনি।

বিয়ের চিঠি।

একটা চিঠি সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'দ্যাখো, ডিজাইনটা পছন্দ কিনা।'

'ডিজাইন দেখাতেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'খবরটাও নিজের মুখে দিতে চাই। এ মাসের দশই, অর্থাৎ আর দশদিন পর সুতপার বিয়ে।'

'না।'

'না মানে?'

'সুতপা এ বিয়েতে রাজী হবে না।'

ভদ্রলোক ভারী শরীর চেয়ারে ছেড়ে দিতে দিতে হাসলেন। হেসে হেসে বলতে লাগলেন, 'একটা বয়সে মেয়েরা খুব সেন্টিমেন্টাল হয়, অনেকে সেই সুযোগ নিতে চায়। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে, ভুল পথে চলেছে, তখন খুব তাড়াতাড়ি সামলে নেয়। মেয়েদের এটাই পিকিউলিয়ারিটি।' এমনভাবে উনি কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন, যে, মনে হচ্ছিল উনি কোন কলেজের সাইকোলজির প্রফেসর আর ক্লাশে লেকচার দিচ্ছেন।

'আমি ওর সঙ্গে একবার দেখা করবো।'

'না। তা ছাড়া সুতপা এখানে নেই। বিয়ে কোলকাতার বাইরে হবে। ছেলে বড় চাকরি করে, ইঞ্জিনীয়ার, ছুটি নিয়ে আসতে পারবে না। আমাদেরই যেতে হবে। ইচ্ছে করলে বিয়েতে যেতে পার। এই তোমার নিমন্ত্রণ চিঠি।' বলে একটা চিঠি টেবিলের এদিকে ছুঁড়ে দিলেন। দিয়েই আবার বললেন, 'কিন্তু সেলফ রেসপেক্ট থাকলে যাওয়া উচিত হবে না। সবচেয়ে বড় কথা কী জানো, সুতপা এ বিয়েতে খুশী হয়েছে। এই দ্যাখো, কী লিখেছে।' আর একটা ভাঁজকরা কাগজ এদিকে ছুঁড়ে মারলেন ভদ্রলোক।

'মেয়েরা—বিশেষ করে আধুনিক মেয়েরা কী চায় জানো, চায় অর্থ, মান, প্রতিপত্তি। সব কিছুই দীপঙ্করের রয়েছে। দীপঙ্করই পায়।'

একরকম ছুটেই বাইরে বেরিয়ে এল ছেলেটি। একটা ক্ষ্যাপা কুকুর যেন ওকে তাড়া করেছে। বাইরে অগণিত মানুষের বিরাট মিছিলের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিল সে। চলা, চলা, শুধু চলা।

সুতপার দিকে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ল। সুতপা আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বলল, 'কী ভাবছিলেন?'

'অনেকদিন আগের একটা ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। চার বছর পনেরো আঠেরোয়?'

সুতপা হেসে বলল, 'ষোল বছর তিন মাস, কি তার চেয়েও বেশী।'

'এবার নামবো।' বলে উঠতে যাচ্ছিলাম।

সুতপা বাধা দিল। 'রুদ্র দেখবো। কতদিন দেখি না। সেই যে আপনি দেখিয়েছিলেন, তারপর একদিনও না।'

গাড়ি থামল না, চলতেই লাগল। নিমেষের জন্য মনে হল, টাইপিস্ট নিবারণবাবু ভাঙা টাইপরাইটারটার সামনে বসে রয়েছেন, মক্কেলের দল হয় এসে গেছে না হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। সমস্ত ব্যাপারটাই হঠাৎ খুব আকর্ষণকর বলে মনে হতে লাগল। শুধু আকর্ষণকর নয়, বিষম একঘেয়ে আর ক্লান্তিকর। সুতপার ওপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল। মনে মনে বললাম, 'একটা ক্লান্তিকর দিনের হাত থেকে আজ আমাকে মুক্তি দিলে সুতপা। কী বলে যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো!'

'এক এক সময় কী মনে হয় জানেন, মনে হয় এই যে আমরা বেঁচে আছি, একজন আর একজনের সঙ্গে প্রতারণা করছি, দিন কাটছে, রাত হচ্ছে, আবার সকাল আসছে, কী অদ্ভুত, কী বিচিত্র ছলনা!'

'হঠাৎ এ কথা কেন?'

'হঠাৎ মনে হল। আরও মনে হয়, আমরা হয়তো সবচেয়ে কম ভালবাসি নিজেকে। যদি বাসতাম, নিজেকে খুশী করতে চাইতাম। নিজেকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলতাম না।'

ডাইনে বেঁকে গাড়ি উত্তর দিকে ছুটতে লাগল। এদিকটা ফাঁকা। লোকজন খুব কম। দু দিকে বড় বড় বাড়ি। বিরাট বিরাট কম্পাউন্ড। নিস্তব্ধ এক জগতের মধ্য দিয়ে আমরা যেন ছুটে চলেছি, আমি, আর সুতপা।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'তুমি সুখী হয়েছো?'

সুতপা আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। ও যদিও আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিন্তু ওর চোখের ভাষা আমি পড়তে পারছিলাম। সেখানে কোন ভাষা ছিল না। ও আমাকে দেখছিল না। কিছুই দেখছিল না। শুধুই তাকিয়েছিল।

'সুতপা।'

'উঁ।'

'কথা বলছো না কেন?'

'কী বলবো।'

'সব কথা ফুরিয়ে গেছে?'

সুতপা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসল। আমার দিকে তাকাল। ও আবার আমাকে দেখতে শুরু করেছে। 'কী বলছিলেন?'

'না, তেমন কিছু না।'

'তেমন তেমন কথা শুনতে আর ভাল লাগে না, তেমন-না কথা বলুন, শুনবো।'

'তুমি খুব দুষ্টু ছিলে। দুষ্টু আর রাগী। একবার আমার হাতে কামড় বসিয়েছিলে। এই দ্যাখ।'

সুতপা হাত বাড়াতে গিয়েও গুটিয়ে নিল। 'আর আপনি! আপনি ছিলেন বেজায় বোকা। এখনও যে রকম আছেন?'

'কী জানি। লোকে তো বলে ধুরন্ধর উকিল।'

সুতপা হেসে উঠল। হেসে-হেসে বলতে লাগল, 'লোকে যা বলে বলুক, আমার মনে হয় আপনি আগের মতই আছেন। মুখচোরা আর লাজুক এই যে কাজের ক্ষতি করে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি, মুখ ফুটে বাধা দিতে পারছেন না। বলতে পারছেন না, আমি যাব না, আমার কাজ রয়েছে। আপনি শুধু লাজুকই না, বেজায় ভিতু একজন পুরুষ।' অতর্কিতে সুতপার মুখের ওপর একটা কঠিন ছায়া নেমে এল। ওকে ক্রুর মনে হতে লাগল, ও আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। তাকিয়ে আমার অন্তস্তল দেখবার চেষ্টা করছে। ও আবার বলতে লাগল, 'এই পুরুষদের আমি ঘৃণা করি।' ওর মুখ বিকৃত দেখায়।

'তুমি আমাকে ঘৃণা করো?'

'হ্যাঁ করি। কেন করব না। আপনি ভুলে গেলেও আমি তো ভুলতে পারি না, সেদিন যদি একটু সাহস দেখাতেন, একবার যদি আমাকে ডাকতেন—'

'কোন দিন?'

'কিছুই মনে পড়ছে না আপনার। অথচ এক মুহূর্তও আমি সেই মুহূর্তের কথা ভুলতে পারছি না। সিঁড়ির ওপরে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। প্রতি মুহূর্তেই মনে করছি, এই বুঝি এদিকে ফিরে তাকালেন, একজন শক্তিমান পুরুষের মত আমার কাছে এসে বললেন, সুতপা এসো—বলতে-বলতে সুতপা দু হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে বিকৃত গলায় বলে উঠল, 'অথচ আপনি একটা চোরের মত ছুটে পালিয়ে গেলেন। বাবা যা বলেছিলেন, তাই প্রমাণ করে দিলেন।'

একটা হাত সুতপার পিঠের ওপর রেখে গাঢ় স্বরে বললাম, 'সেদিনের ব্যাপারটা তুমি যদি শোনো—'

'আমি আর কিছু শুনতে চাই না। কী লাভ শুনে। আপনি যদি আর একটু সাহসী হতেন তপুদা!' বলতে-বলতে সুতপা মুখ তুললো।

সুতপা কাঁদছে।

গাড়ি চলছে। ঠাণ্ডা হাওয়া গাড়ির মধ্যে ঢুকছে। বাইরে রোদ ঝলমল করছে। একটা উজ্জ্বল দিনের শুরু।

চোখের জল মুছে নিল সুতপা। শান্ত স্বরে ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলল, 'গাড়ি ঘুরাও। সাবকো কোর্টমে উতার দেও।' আমার দিকে ফিরে ফিস-ফিস করে বলল, 'সত্যি-সত্যি একটা সীন করলাম। আপনি যে বলতেন না, মেয়েদের মাথায় কিছু নেই, কথাটা খুব সত্যি।' বলে সুতপা আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

বহু দিন পরে শুধু দূর থেকে একটা চাপা মিষ্টি গন্ধ যেন নাকে এসে লাগল। সুতপার চুলের গন্ধ, নাকি গন্ধটা দূর থেকে আসে নি, বুকের মধ্যেই ছিল, ওপরে উঠে এল।

CENTRAL LIBRARY

তুলসীচরিত

নীষবিব চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিকেলে অশোকবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। চাকুরি ছাড়বার কথাটা তাঁকে বললাম। কেন ছাড়লাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন না, আমিও বললাম না। বললেন কোন হাসপাতালের সংগে যোগ রেখে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করতে আরম্ভ করো তুলসী। বড় রাস্তার ওপরে একটা ভাল ডাক্তারখানা হচ্ছে, যদি সেখানে ঘণ্টাদুই বসতে চাও সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

বললাম, দু'তিন দিন পরে জানাব আপনাকে।

ভেতরে গিয়ে অশোকবাবুর স্ত্রীর সংগে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে দেখলাম খাঁচা ঘরে আলো জ্বলছে। দোর ঠেলতে জেঠামণি বললেন, তুলসী, ফিরলি নাকি? আয়।

ঘরে ঢুকে দেখলাম জেঠামণি কি লিখছেন। বললাম, তুমি লিখছ এখন ডিস্টার্ব করতে চাই না। বললেন, তোকে শোনাব বলে এটা লিখছি। এককাপ চা নিয়ে এসে এখানে বোস।

তুমি চা খাবে?

না। তুই খা আমার সামনে বসে তাইতে গরম হয়ে উঠব।

বললাম, এটা তোমার কি কথা হল জেঠামণি?

সত্যি কথা বলা হল। শোন কি আইডিয়া মাথায় এসেছে।

ভাবছিলাম সত্য কি? সত্য কি এক না বহু? খটকা লাগে যাঁরা সব হৃদয়-গ্রন্থী ছিন্ন করে সত্যের সাক্ষাৎ লাভের কথা বলেছেন তাঁরা ঠিক কথা বলছেন কি?

প্রকৃতির সত্য বলে একটা সত্য আছে, অতি প্রত্যক্ষ সে সত্য। সব জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, সব প্রাণী প্রকৃতির সৃষ্ট, তার বেঁধে দেয়া নিয়মে তারা জন্মে, বেঁচে থাকে, মরে। প্রাণী জন্মাক, বেঁচে থাকুক, বংশবৃদ্ধি করুক, মরুক, এছাড়া প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে প্রকৃতির আর কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য আছে বলা যায় না। বেঁচে থাকবার জন্য প্রকৃতি যে পথ বেঁধে দিয়েছে সেটা হচ্ছে খাওয়া, এ ওকে খাবে। যদি কেউ এ পথ ধরে বেঁচে থাকবার চেষ্টা না করে সে মরবে। প্রকৃতির সত্য সারভাইভেল অব দি ফিটেস্ট, মানে টিঁকে থাকাটাই বড় কথা। মেরে, কেটে, খেয়ে টিঁকে থাকবার বিদ্যায় যে ওস্তাদ সেই হচ্ছে ফিটেস্ট। এ বিদ্যার পাঠ রয়েছে প্রাণীর ইনসটিংক্টএ। বংশ পরম্পরায় এই নিষ্ঠুর দানবিকতার উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মেছে সব প্রাণী এবং মানুষ।

ইনসটিংক্ট থেকে ওপরে ওঠবার কিছুটা চেষ্টা করেছে মানুষ মস্তিষ্কের বা বুদ্ধির বিকাশের ফলে। ইনসটিংক্ট থেকে বুদ্ধির বিকাশের অনেকদিন পরে যে বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মাথায় এই সত্য ধরা পড়ল যে প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মকে অতিক্রম করতে না পারলে মানুষ হয়ত বর্বরতার যুগ পার হতে না পেরে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মেসোজোইক যুগের অতিকায় প্রাণীদের মতো তিনি মানব জীবনের পরম সত্য আবিষ্কার করলেন। সে সত্য এই যে, ইনসটিংক্টকে বাইপাস করে মানুষকে নিজের মঙ্গলের পথে চলতে হবে, তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে ভালবাসা, মৈত্রী, সংযম, সহানুভূতি, দুর্বল জরামরণশীল মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই পথে চলা হচ্ছে প্রকৃতিকে বাইপাস করা। মানুষের সংগে মানুষের হৃদয়ের বন্ধন যে প্রকৃতির দাসা-পীড়িত মানুষের মনের মুক্তির উপায়, মানুষের নিশ্চিত আশ্বাস ও নির্ভর লাভের উপায় এই সহজ, সরল সত্য কারুর চোখে পড়ে না।

তাহলে দেখ সত্য এক নয়। প্রকৃতির সত্য থেকে মানুষের সত্য আলাদা কিনা, হৃদয়গ্রন্থী উন্মোচনে নয় হৃদয়গ্রন্থী বন্ধনের মধ্যে মানবজীবনের পরম সত্য রয়েছে কিনা ভেবে দেখ।

বললাম, জেঠামণি, এই আইডিয়ার কথা তোমার মুখে আগে শুনেছি মনে হচ্ছে।

বললেন তা শুনে থাকবি হয়ত। মাথার আশপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকদিন ধরে, ভাল করে ধরা দিতে চায় না।

হৃদয়ের বন্ধন বলতে কি বোঝায়?

বললেন, তুলসী সেটা বোঝবার বয়েস হয়েছে তোর। এই চাকুরিবাকুরির ব্যাপার নিয়ে এত ভাবছিস যে তোর বুদ্ধির ধার কমে গিয়েছে, দু'দিন রেস্ট নিয়ে শান দে। তোর মধ্যে আমার মধ্যে, আমার মধ্যে দেবাশিসের মধ্যে যে বন্ধন রয়েছে সেটা কিসের বন্ধন? হৃদয়ের যে আকর্ষণে মানুষ এ ওর কাছে এগিয়ে আসে তাকে বলে হৃদয়ের বন্ধন, ভালবাসা।

বললাম, এই হচ্ছে তোমার মতে মানবজীবনের সত্য?

আমার মতে হবে কেন? এ সত্য চিরকাল রয়েছে, কেউ দেখতে পায়, কেউ পায় না?

(৩৪)

আমার শেষ ইনস্টলমেন্ট

রবিবার সকালে নয়টা নাগাদ প্রথম একটা সাইকেল রিকসা ডেকে আনল দেখলাম। মনে পড়ল সকালে চা দেবার সময় তুলসী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সাড়ে আটটায় সে দেবাশিসের বাড়ী যাবে।

একটু পরে তুলসী বেরিয়ে এল। স্নান সেরে নিয়েছে, টাটকা দেখালো চেহারা কিন্তু মুখের ভাব কিছু গম্ভীর মনে হল।

তার দিকে তাকিয়ে বললাম, দেবাশিসের বাড়ীতে যাচ্ছিস? তোর মেজাজ একটু অপ্রসন্ন ঠেকছে মুখ দেখে। একটু বসে মেজাজটা ভাল করে নিয়ে যা।

একটু হেসে বলল, মিছে ভয় পাচ্ছ জেঠামণি। আমার মেজাজ বেশ নরম আছে, যেতে যেতে গলে যাবে।

আর কিছু বলতে ভরসা পেলাম না। মনে হল কালকার মানবজীবনের সত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা কোন ইম্প্রেশান করেনি ওর মনে।

তুলসী চলে গেলে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার রিসার্চ বিভাগ থেকে ধার করা একখানা জার্নালের পাতা ওল্টাতে লাগলাম। দেবাশিসের বাড়িতে তুলসীর এই যাবার ব্যাপারের ওপর আমি বিশেষ গুরুত্ব দেইনি, কারণ, আমার মনে হয়েছিল তুলসীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তার রেজিগনেশন দেবার আসল হেতু জানবার অভিপ্রায় ছিল দেবাশিসের। আমার কাছে জেনে নেবার কথা তুলসী বললেও আমাকে কোন প্রশ্ন করবার ইচ্ছা ছিল না তার।

সাড়ে এগারো বাজে তুলসী তখনও ফিরল না। মহামায়া স্নান করবার তাগিদ দিয়ে বলল, দেরি হতে পারে তুলসী আমিষ রান্না সেরে রেখে গিয়েছে, ভাত হয়ে এল।

আমি উঠছি একজন সাইকেল পিয়ন তার এক চিট নিয়ে এল। জেঠামণি ও পিসিমাকে খেয়ে নেবার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছে তার খাবার ব্যবস্থা ওখানে হয়েছে। আড়াইটে নাগাদ ফিরবে জানিয়েছে।

আড়াইটে নয় চারটের পরে তুলসী ফিরল দেবাশিসের গাড়ীতে। দেখলাম গাড়ী থেকে কিছু জিনিসপত্র নামল।

বললাম, তোর ঘড়িতে বোধহয় আড়াইটে বাজে তুলসী?

হেসে বলল, নেয়ে চারটে বাজে।

বাইরের দুয়োরটায় কিছু কেনাকাটি করবার ছিল, মিঃ ভাদুড়ীকে রাতে খেতে বললাম।

বললাম, এক কাপ চা নিয়ে মিনিট দশ বসতে পারবি কি?

আসছি বলে চলে গেল ভেতরে। কিছু বুঝতে পারলাম না মুখ দেখে, ভাবভঙ্গী দেখে; চুপ করে বসে রইলাম। আধঘণ্টা পরে চা নিয়ে এসে সামনে বসল।

বললাম, কি জবাব দিলি দেবাশিসকে?

কিসের জবাব জেঠামণি?

অবাক করলি তুলসী। দেবাশিস বিয়ের কথা বলেনি তোকে?

না, বলেনি না তো।

তবে কি বলবে বলে ডেকেছিল তোকে?

বলল, সে এক মহাভারত জেঠামণি। চা খাও তুমি, বলছি। তোমার কাছে যখন পড়তেন মিঃ ভাদুড়ী সেই সময় থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের জীবনচরিত শোনালেন। কি ধরনের স্ট্রাগল করেছিলেন তিনি, কেন তা করতে হয়েছিল, তখন যে মনোভাব ছিল, এখন যে মনোভাব হয়েছে, তখনকার দেখবার চোখ থেকে এখনকার দেখবার চোখের পরিবর্তনের কথা শোনালেন। জীবনচরিত যা শোনালেন তার প্রায় সবটা চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছেন বললেন। বাকী কথাগুলোতে তোমার ভাইপোর মধ্যেকার মনস্টার যে মরেছে সেটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন। অনেকটা এবড়ো খেবড়ো পথ ভাঙতে হল কথার মধ্যে। আপেল, পিয়ারা আখরোট, খেজুর নিয়ে কফি খাওয়ালেন মাঝখানে, হাতঘড়ি দেখছি দেখে বললেন, এ বেলা এখানে তোমার খাবার ব্যবস্থা করেছি দেরী হতে পারে ভেবে। লোক পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি মাস্টারমশাইকে।

ওঁর কথা শেষ হলে বললাম, যে সব কথা বললেন তার খানিকটা আগে শুনেছি আমি।

মিঃ ভাদুড়ী কিছু বললেন না। আরও বললাম, আর দুটি মাত্র কথা বলব, মনে নোট করে রাখুন। প্রথম কথা, আমি কোন সুখ-সুবিধের প্রত্যাশী নই। দ্বিতীয় কথা, পনের ষোল বছর বয়েস থেকে আমার সব ভালবাসা জেঠামণিকে দিয়েছি, ওঁর কাছে যা পেয়েছি তাতে আমার সারাজীবন চলে যাবে।

একটু হাসলেন, বললেন, বেশ, আমার আর কিছু বলবার নাই।

খেয়ে উঠতে একটা বেজে গেল। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে বেরোবার মুখে ওঁকে রাতে খাবার কথা বললাম, গাড়ীটা চাইলাম। কেনাকাটা করতে একটু দেরি হয়ে গেল।

চুপ করে তুলসীর কথা শুনছিলাম, ভাবছিলাম নানা কথা। উঠে দাঁড়িয়ে কাপের দিকে চেয়ে তুলসী বলল, চা খাওনি দেখছি, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তুলসী-কথা শুনছিলে। নতুন চা আনছি।

কিছু বলবার আগেই হাত থেকে কাপ নিয়ে চলে গেল।

একটা কথা মোটামুটি বুঝলাম। তুলসী দেবাশিসকে পছন্দ করে, আর একটু এগোতে পারলে পছন্দ ভালবাসায় পরিণত হতে পারে হয়ত। বিয়ে করবার মত নরম ভাব দেখা যাচ্ছে না কেন তার মধ্যে ধরতে পারছিলাম না। নরম করবার জন্য দেবাশিসকে সময় দিতে কিম্বা পছন্দ ভালবাসায় পরিণত না হতে পারে এ সম্ভাবনাও রয়েছে। তুলসীর বন্ধুত্ব ছাড়া দেবাশিস আর কিছু পাবে না তাহলে।

সামনে তুলোর বস্তার দিকে তাকিয়ে কখন তা থেকে কাপড় তৈরী হয়ে হাতে আসবে বসে বসে তার দিন গোনবার ইচ্ছে নাই আমার। যা ইচ্ছে হয় ওদের করুক।

তুলসী তার নতুন কাজে যোগ দিয়েছে, অশোক একটা ডিসপেনসারীতে বসবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। মহামায়ার ছেলেমেয়ে ঢোকা বন্ধ করেছে আমার জন্য আলাদা লোক রেখে। সংসারের খরচপত্র নিজেই চালায়, দরকার হলে মাসের শেষের দিকে আমার কাছে কিছু চায়। আমি ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার রিসার্চ বিভাগে বেশী করে সময় দিতে আরম্ভ করেছি। চোখ কান মাথা যখন সচল রয়েছে নির্বিকল্প সমাধির দিকে তাদের ঠেলে দিয়ে কি সুবিধে হবে?

কলকাতায় থাকলে দেবাশিস রবিবার সকালের দিকে আসে, দুপুরে খায়, গল্প করে চা খেয়ে চারটে নাগাদ চলে যায়। আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসে না, তুলসীর নিমন্ত্রণে আসে।

তুলসী নতুন চাকরি নেবার প্রায় মাস চারেক পরে।

তুলসী তার কাজ সেরে তখনও ফেরেনি। খাঁচা ঘরে বসে একখানা বই পড়ছিলাম। দোরে আস্তে টোকা পড়তে বললাম, এসো।

দেবাশিসকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু আশ্চর্য হলাম, কারণ, শুনেছিলাম সে বাইরে গিয়েছে, আরও এক সপ্তাহ পরে ফিরবে।

সংক্ষেপে জানাল এখানে জরুরী কাজ থাকায় সে আজ সকালে ফিরেছে। তুলসী এখনও কাজ থেকে ফেরেনি শুনে আর বসল না, পকেট থেকে একখানা খামে মোড়া চিঠি বের করে টেবিলের ওপরে রাখল; বলল, চিঠিখানা তুলসীকে দেবেন। যদি কলকাতায় থাকি আগামী রবিবারে আসব।

দেবাশিসের এই অপ্রত্যাশিত আসা, তুলসীর নামে চিঠি দেয়া এবং না বসে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া একটু বিস্মিত করল আমাকে, মনে হল এটাকে রুটিন-মাফিক ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করা যায় না।

দেবাশিস চলে যাবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তুলসী ফিরল। সেজন্যই হাসিখুশি, চেহারায় [illegible] হাতে [illegible] গোলাপের তোড়া।

হাসি মুখে বলল, আজ অশোকবাবুর বাড়ী থেকে কল পেয়েছিলাম, ওঁর স্ত্রীর অসুখ। রোগীকে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলাম। এক ডিশ সন্দেশ আর এই ফুল ফি পাওয়া গেল।

বললাম, কাপড় বদলে এখানে আয়, একটা কথা আছে।

চেয়ার টেনে বসে পড়ল। বলল, কি কথা বল।

বললাম, কিছুক্ষণ আগে দেবাশিস এসেছিল, তোর নামে একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েছে।

চিঠিখানা তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে টেবিলে রাখল। তারপর উঠে হাতের তোড়াটা দুভাগে ভাগ করে দুটো ফুলদানিতে রাখল। এ কাজ সেরে আবার টেবিলে বসে চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।

যতক্ষণ চিঠি পড়ছিল চোখ রেখেছিলাম তার মুখের ওপরে।

পড়া শেষ হলে আস্তে আস্তে চিঠিটা খামে ভরে আমার দিকে তাকাল।

বলল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? কিছু পাবে না সেখানে। তার চেয়ে তোমার হাতের চিঠিখানা পড়ে ফেল।

একটু দুষ্টামির হাসি দেখলাম মুখে।

খাম থেকে চিঠি বের করে ঠেলে দিল আমার দিকে।

কাপড় ছাড়তে হবে এবার বলে বেরিয়ে গেল খাঁচা ঘর থেকে।

দেবাশিস লিখেছে—

যে কথা এতদিন নানাভাবে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি কিন্তু বোঝাতে পেরেছি কিনা সন্দেহ উঠেছে মনে কলমের মুখে সে কথা তোমাকে বলবার চেষ্টা করছি।

আমার ইতিহাস খানিকটা জান তুমি। সে ইতিহাস ভাল না। কিন্তু সে ইতিহাসের নায়ক অতীতের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

ছাব্বিশ বছর বয়সে পৌঁছে একটা জায়গায়—আটকে গিয়েছে আমার জীবন। এ রকম যে হতে পারে এর আগে কল্পনা করিনি। আমি রিয়ালিস্ট মানুষ, ইন্টেলেক্টে বিশ্বাসী, কোন আদর্শবাদে আস্থা নাই আমার। যে কাজে ব্যস্ত থাকতে আমাকে দেখছ তার মূলে রয়েছে নিজের শক্তির ব্যবহার করে এমন কিছু করবার ইচ্ছা যাতে আমার অর্থের প্রয়োজন মিটবে, বহুলোকের অন্নবস্ত্রের সমস্যা মিটবে। যতটা করেছি এ পর্যন্ত তার অনেক বেশী করবার ইচ্ছা আছে। সময়, পরিশ্রম ও মন লাগালে তা করা যাবে হয়ত।

কিন্তু করতে পারব কিনা জোর করে বলতে পারছি না। কারণ, যে মন নিয়ে কয়েক বছর কাজ করেছি সে মনের পরিবর্তন হয়েছে, কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ তৃপ্তি আর সে খুঁজে পাচ্ছে না।

এতদিন জানতাম আমি অসংসারী মানুষ। ভালবাসা, সহানুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, [illegible] এবং আরও অনেক জিনিস দিয়ে মানুষের মধ্যে যে সংসারী বা গৃহীদের

বিকাশ হয়েছে সে জন আমার মধ্যে কখনও আসবে না জানতাম। কিন্তু এ ধারণা ভাঙতে শুরু হয়েছিল তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে।

আজ নিজেকে দিয়ে উপলব্ধি করছি আমার কাজ যত আড়ম্বরের হোক, কাজের খ্যাতি যত বিপুল হোক কাজের লোকের খোলসের মধ্যে যে আমি রয়েছি সে আসলে অতি ক্ষুদ্র, দুর্বল জীব। এই ক্ষুদ্র জীবের হৃদয় যে সার্থকতাবোধ বা তৃপ্তি কামনা করে তা কাজের সাফল্য বা অর্থের পথ ধরে আসে না, আরেকটি ক্ষুদ্র মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে বন্ধন স্বীকারের পথে সে সার্থকতা আছে। এই বন্ধন স্বীকারের বাহ্যরূপ গৃহ। দুটি মানুষের মিলন থেকে যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা।

বোম্বের হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে, মৃত্যু সম্ভাবিত জেনে তোমাকে খবর দিয়েছিলাম কেন জানো? চিরদিনের জন্য চোখ বন্ধ করবার আগে একবার চোখ ভরে তোমাকে দেখবার জন্য। কপালে একখানা স্নেহকোমল হাতের স্পর্শ, এক ফোঁটা চোখের জলের জন্য আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়েছিল মন। আর কারো কাছে নয়, একমাত্র তোমার কাছে এই সান্ত্বনাটুকু চাইছিল মন, সান্ত্বনা না পেতে পারে জেনেও একবার দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি।

তুমি সাড়া দিয়েছিলে আমার প্রার্থনায়। এজন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আজ শুধু এইটুকু জানাতে চাই যে আমার স্বাধীনতা হারিয়েছি আমি। তুমি কি করবে, করবে না সেটা তোমার হাতে।

পড়া শেষ হলে চিঠিখানা ভাঁজ করে খামে পুরে এক পাশে রেখে দিলাম কাগজ চাপার নীচে।

মনে হল হাঁ, দেবাশিসের ভেতরকার মনস্তাত্ত্ব মরেছে সন্দেহ নাই, জায়েন্ট বিজয়ী হয়েছে। এতদিন পরে গৃহকোণের আশ্বাস, সুখ শান্তির কথা মনে এসেছে। সারাদিন কাজের মধ্যে থেকেও মনের ফাঁক ভরছে না দিখেছে, তুলসীকে ভালবাসে দিখেছে। তুলসী রাজি হলে আপত্তি করবার কিছু নাই। তুলসীর মন আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু বিয়েতে রাজি হচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না। ওর বিয়েটা হয়ে গেলে দায়মুক্ত হতে পারি আমি।

দিন চলে যায়।

দেবাশিসের চিঠির কোন উত্তর সে দিল কিনা তুলসী আমাকে জানাল না। চোখে দেখছি তার কর্মব্যস্ত জীবনের ধারায় কোন তরঙ্গ ওঠবার লক্ষণ নাই।

কলকাতায় থাকলে দেবাশিস রবিবারে আসে। লক্ষ্য করছিলাম জরুরী কাজে তার বাইরে যাবার ও নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করবার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে।

এক রবিবারে বেশ সকালে সে উপস্থিত হল। চা খাওয়া হলে উঠে পড়ল, বলল, কাজের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে আজ, দু' সপ্তাহ বাইরে থাকতে হবে।

তুলসী এক চোখ বুজে তার দিকে তাকাল।

বলল, দু' চার মিনিট বসুন মিঃ ভাদুড়ী। আমরা মনে রাখব যে আপনার জরুরী কাজ আছে, শুধু সময় নষ্ট করবার জন্য আটকে রাখব না আপনাকে। আপনার নিজের সম্পর্কেই একটা কথা, যা আপনি ভুলে গিয়েছেন মনে হয়, সেই কথাটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমরা।

এই ডাক্তারী বক্তৃতা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম আমি। হেসে দেবাশিস আবার বসে পড়ল।

গম্ভীর মুখে তার দিকে চোখ রেখে তুলসী বলল, বেশী বাইরে যাওয়া বন্ধ করুন মিঃ ভাদুড়ী। এ কথা জেঠামণির তুলসীর নয়, ডাঃ তুলসী ভট্টাচার্য বলছেন। আপনার চেহারা দেখে চট করে ধরা যায় না কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত। অনিয়ম ও বেশী ঘোরাঘুরি চলছে। আপনার খারাপ হেপাটাইটিস হয়েছিল একথা মনে থাকা উচিত। বাইরে যেতে হয় তো মোটা মাইনে দিয়ে যে সব লোক রেখেছেন তাদের কাউকে পাঠান, যতটা কাজ হবার হবে। আপনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন এখন থেকে সাবধান না হলে। Don't take avoidable risks to your health.

আমি দর্শক ও শ্রোতা মাত্র। তুলসীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দেবাশিসের দিকে চাইলাম।

সে হাসছিল। তুলসী থামতে বলল, ভবিষ্যতে সাবধান হব, এ যাত্রা যেতে হবে।

তুলসী বলল, ভেবে দেখুন কাউকে পাঠানো চলে কিনা। যা বলছি সিরিয়াসলি বলছি।

তেমনি হেসে দেবাশিস বলল, তুমি ভাল ডাক্তার, তোমার কথা বিশ্বাস করি আমি। এক মিনিটকাল সবাই নিস্তব্ধ রইল।

নিস্তব্ধতা ভেঙে দেবাশিস বলল, ঝোঁকের মাথায় চাকুরি ছেড়ে দিলে, ভেবেছিলাম কাজ শিখে নিলে তোমার হাতে দায়িত্বের খানিকটা ছেড়ে দিতে পারব। একটু ভেবে দেখ না প্রস্তাবটা।

তুলসী হেসে বলল, আবার চাকুরি নিলে কত টাকা বেশী দিতে পারবেন? আপনি যা দিচ্ছেন তার চেয়ে বেশী রোজগার করি এখন।

বলল, যদি আসতে রাজি থাক ডিরেক্টর হয়ে আসবে। চাকুরি নিয়ে আসতে বলছি না।

আমি বললাম, ওর কি শেয়ার আছে, না শেয়ার কেনবার টাকা আছে যে, ডিরেক্টর হয়ে ঢুকবে?

বলল, ওকে রাজি করান মাস্টারমশাই, তারপর দেখা যাবে।

বললাম, কি তুলসী রাজি আছিস?

তাড়া দিয়ো না জেঠামণি। ভেবে দেখতে হবে।

এই আলাপের দিন-তিনেক পরে রিসার্চ বিভাগের প্রাইভেট চেম্বারে বসে একখানা জার্নাল দেখছিলাম। দেবাশিস ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে নিয়ে কাছে বসল। জার্নাল সরিয়ে রেখে বললাম, কোন কথা আছে? তুমি বাইরে যাওনি?

পকেট থেকে একখানা লম্বা খাম বের করে টেবিলে রাখল, বলল, জেনারেল ম্যানেজারকে পাঠিয়েছি। ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় আমার অর্ধেক শেয়ার তুলসীর নামে ট্রান্সফার করে দলিল রেজেস্টারী করা হয়েছে। এই যে দলিল।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তুলসী রাজি হয়েছে?

বলল, তাকে কিছু বলিনি। বোম্বেতে হাসপাতালে থাকবার সময়ে এই ব্যবস্থা করেছিলাম। দলিল রেজেস্টারী করা হয়েছে মাসখানেক আগে।

একটু পরে উঠে গেল, বলল, দলিলটা আপনার কাছে রাখবেন। তুলসীকে কিছু বলবার প্রয়োজন নাই। আরও বলল, কাল বাইরে যাচ্ছি। তিনদিন পরে ফিরব।

বাড়ী ফিরে, দেবাশিস জানাবার দরকার নাই বললেও তুলসীকে জানালাম সে যেসব কথা বলেছিল। দলিলটা সামনে রাখলাম।

চুপ করে রইল। কি রিএ্যাকশান হল বুঝতে পারলাম না।

বললাম, দলিলটা রেখে দে।

বলল, তোমার কাছে থাক।

পরের রবিবার দেবাশিস আসল না। তারপরের রবিবারে এসে তুলসীকে কি একটা কৈফিয়ৎ দিচ্ছে মনে হল। তারপর থেকে দেখলাম রবিবারে দেবাশিস একটু বেলা করে আসে, চান করে খায়, কাজ থাকলে একটু বসে চলে যায়, নইলে চারটা পর্যন্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে শেয়ার ট্রান্সফারের দলিলের কথা তুলসী বা দেবাশিস কেউ তুলল না। তারপর এক রবিবারে দেখলাম সকালে দেবাশিসের সাইকেল পিয়ন তুলসীর নামে চিঠি নিয়ে এল তার এক পুরনো আমেরিকান বন্ধু কাল পৌঁছেছেন, তার বাড়ীতে আছেন, এজন্য আজ আসতে পারবে না। পিয়নকে বসিয়ে রেখে একটু পরে একটা স্লিপ এনে তার হাতে দিল তুলসী, পিয়ন সেলাম করে চলে গেল। আমাকে বলল মিঃ ভাদুড়ীকে লিখলাম বন্ধুকে নিয়ে আসতে।

এগারোটার সময় বন্ধুকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে দেবাশিস এসে তুলসীকে ডাকল। তার সঙ্গে তুলসী বন্ধুকে নামিয়ে আনতে গেল।

আমরা তিনজন পেট পুরে খেলাম বারোটা নাগাদ। কিছু কম পড়ে থাকলে তুলসীর পড়েছিল। রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখবার সাহস হল না।

সাড়ে চারটায় চা ও খাবার নিয়ে তুলসী দর্শন দিল। বললাম, এখন খাবার দিচ্ছিস—

ইংরাজিতে বলল, তোমার জন্য নয় অন্য দুজন ভদ্রলোককে দেয়া হচ্ছে।

CENTRAL LIBRARY

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম তার দিকে। হলদে রঙের কাপড় বদলে এমন চেহারা করেছে যে চোখ ফেরাতে দেরি হচ্ছিল, মুখে দেবীর হাসির মত কিছু এসে গিয়েছিল। বাংলায় বলে উঠল, জেঠামণি ভাল হবে না বলছি।

আমেরিকান ভদ্রলোকটি একবার তুলসীর দিকে একবার আমার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে খাবারের ডিশটি নিয়ে এগিয়ে দিলেন। দেবাশিসও হাই তুলল একটু হেসে।

তুলসীর জন্য শুধু চা এল আমার মত। দেবাশিস নিজের ডিশটা এগিয়ে ধরল তুলসীর দিকে, বলল, দু-একখানা নিমকি নাও।

একখানা নিমকি তুলে নিয়ে তুলসী বলল, ধন্যবাদ।

বোধহয় আবার একটু হাসি এসেছিল মুখে, তুলসী আবার ধমকাল, জেঠামণি, কি হচ্ছে?

চা খাওয়া শেষ হলে দেবাশিস ও তার বন্ধু চলে গেলেন। দেবাশিস জানাল তার বন্ধুটি এক সপ্তাহ তার কাছে থাকবেন ইস্টার্নের কাজ দেখতে, তারপর তাঁকে নিয়ে বেরোবে কটা জায়গা দেখতে।

দেবাশিস বাইরে যাবার আগে তুলসীর সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল কিনা আমার জানা নাই। দিন-দশ পরে দেবাশিস কলকাতায় ফিরল, বন্ধুটি দেশে ফিরে গিয়েছেন শুনলাম।

মাস-দুই কেটে গিয়েছে এরপর। বাড়ীতে যে ঘরটাতে লেবরেটরী ছিল, তার যন্ত্রপাতি ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার রিসার্চ বিভাগে দান করে কিছু পরিবর্তন করে আমার থাকবার ঘর করে নিয়েছি। খাঁচা ঘর, বাইরের বারান্দা ছেড়ে দিতে হয়েছে তুলসীকে। তার কাছে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার কর্মচারীরা কেউ কেউ, দু-চারজন রোগী আসে, অন্য লোকও আসে। দেবাশিস রবিবারে রবিবারে আসে। কথাবার্তা তুলসীর সঙ্গে হয়। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

নিজের ঘরে শুয়ে বসে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার রিসার্চ বিভাগ থেকে ধার করে আনা জার্নাল বই পড়ি। স্পেস রিসার্চ সম্বন্ধে কতকগুলো প্রবন্ধ হাতে এসে পড়েছে, মন দিয়ে সেগুলো পড়ি। পার্থিব ব্যাপারগুলোর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল নাকি প্রোঃ প্রমথ গাঙ্গুলী? হেসে নিজেকেই প্রশ্ন করি মাঝে মাঝে। মন বলে শেষ হল কিনা জানি না, তবে তুমি হাত না লাগালে কোন কাজ অচল হয়ে থাকবে এ-অহংকার ছাড়বার সময় হয়েছে। স্পেস রিসার্চের খবর নেবার উপযুক্ত মানসিক অবস্থা এতদিনে এসে গিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যার পরে মহামায়ার সঙ্গে তুলসীর আলাপের খানিকটা কানে এল।

তুলসী বলছিল, আচ্ছা পিসীমা, একজন ধর্মকর্ম, ভগবান কিছু মানে না, শুধু মানুষকে মানে, আরেকজন সব মানে, মানুষকে ঈশ্বরের অংশ বলে মনে করে, একজন নাস্তিক, একজন আস্তিক, এ দুজনের মধ্যে মিল কোথায় পাওয়া যায়?

মহামায়া বলল, বড় মিল তো রয়েছে দুজনের মধ্যে। যে মানুষকে মানে আর যে মানুষকে ঈশ্বরের অংশমাত্র বলে মনে করে তারা দুজনেই তো মানুষকে মানছে। মানুষের ওপরে বিশ্বাসে দুজনের মধ্যে মিল রয়েছে দেখতে পাচ্ছিস না?

তুলসী বলল, ধরো নাস্তিক যদি আস্তিকের গলায় তোমার দেয়া তুলসীর মালা নিয়ে হাসে তাহলে কি মনে করতে হবে?

মহামায়া বলল, 'হাসি কত রকমের আছে তুলসী, কি রকমের হাসি সেটা জানা হবে। এক রকমের হাসি আছে যা কারো মুখে দেখলে মনে করতে হবে সে তোকে মানে না। তোর গলায় তুলসীর মালার দাম মনের বিশ্বাসে, সোনার মালার দামও মনের বিশ্বাসে। দামী বলে লোকে মনে করে সোনার মালাকে সেইটুকু ওর দাম। তুলসীর মালা তোর চোখে দামী সেইটুকু ওর দাম। তোকে যে মানে সে কি পারে তোর গলায় তুলসীর মালা দেখে হাসতে? দাদাও তো হাসেন তোর মালা দেখে, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখা দেখে, রাগ হয় কি তোর তাতে?

বুঝতে পারলাম খানিকটা। এ সব কথা জানে তুলসী তবু পিসীমার কাছে নিজের মনের কথার সমর্থন খুঁজছে। ভাল করেছে পিসীমার কাছে গিয়ে, আমার কাছে আসলে বলতাম হয়ত, মুক্তোর মালা মানায় তোর গলায় তুলসী, ওটা কি যে পরেছিস? আমার যা হাসি পায়—

চটে গিয়ে তুলসী হয়ত বলত, তুমি অতি বড় নাস্তিক জেঠামণি, অকমারি হয়েছে তোমাকে কিছু বলা!

এ সব প্রশ্নের উৎস কোথায় সেটাও কিছু বুঝলাম বই কি।

দিন কেটে যাচ্ছিল। কিছু কিছু খবর কানে আসছিল মাঝে মাঝে। এই রাস্তার ওপারে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার অফিস বাড়ী থেকে নাকি উঠে যাচ্ছে। হাসপাতালের কাজ ছাড়বার নোটিশ দিয়েছে তুলসী, গাইনোকোলজিতে স্পেশালাইজ করবে বলে পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হচ্ছে ইত্যাদি।

সেদিন বোধহয় মঙ্গলবার। সকালে খাঁচা-ঘরে একবার উঁকি দিয়েছিলাম, নূতন একটা প্লেটের পাশে বড় একটা লাল গোলাপের তোড়া চোখে পড়ল। সারাদিন কেটে গেল, তুলসীর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। বুঝলাম বাইরে গিয়েছে। সন্ধ্যার পরে হাতে কটা গোলাপ নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল। ফুলগুলো একটা ফুলদানিতে রেখে সামনে বসল। একটু যেন অন্যমনস্ক, কিছু ভাবছে। বুঝলাম কিছু বলবে বলে এসেছে। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনিট দুই পরে বলল, ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার কর্মচারীদের সুবিধের জন্য একটা নার্সিং-হসপিটাল করলে কেমন হয় জেঠামণি?

বললাম, তা ঘর কোথায় হবে হাসপাতাল?

আস্তে আস্তে বলল, এই বাড়ীতে। কটা ঘর বাড়াতে হবে, ভাঙাচোরা করতে হবে।

তুলসীর মাথার প্ল্যানের খানিকটা প্রকাশিত হল। বাকীটা জানবার কৌতূহল দমন করে চুপ করে রইলাম।

উত্তর না পেয়ে চটে গেল। বলল, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ? স্বর নামিয়ে এনে বলল, তোমার আর পিসীমার জন্য একটা ব্যবস্থা হবে বই কি।

বললাম, বাড়ীটা তোকে লিখে দিয়েছি জানিস, আমরা ভাইবোন মরবার পরে পাবি। এখনি তাড়াতে চাস নাকি আমাদের। আমার মরবার সবুর সইছে না?

কেমন করে তাকাল, একটু পরে উঠে এসে কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল আগের দিনের মত।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, কেন অমন কথা বললে? আমি কোথায় থাকব তোমাকে ছেড়ে? কে তোমাকে দেখবে? কিছু করব না আমি এ রকম কথা বললে, যেমন আছি তেমনি থাকব।

মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, তোকে না দেখলে আমার দিন কাটতে চায় না তুলসী, তুই আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবি? কি করতে চাস খুলে বলতো।

একটু শান্ত হয়ে মুখ তুলল, দেখলাম দু'চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে।

বলল, বলছি। আর বলো না মরবার কথা। যা বলব তাই করবে বাধ্য ছেলের মত, নইলে সব ভেস্তে দেব ঠিক বলছি।

বললাম, ছেলেরা তেমন বাধ্য হয় না তুলসী, পরে দেখতে পাবি, আমি তোর বাধ্য ছেলের শখ মেটাব।

আবার মুখ গুঁজল কোলে। একটু পরে মুখ তুলে বলল, জেঠামণি, যা বলব কোন কথা না বলে করবে তো ঠিক?

বললাম, একটু আপত্তি করবার ফাঁক দিস তুলসী, নইলে আমি যে তোর বাধ্য ছেলে বুঝতে পারবি কি করে? না, না করতে করতে শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ করব হয়ত তোর মত।

চট করে পাশ থেকে উঠে গেল ওপাশের দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে ফুট দুই তফাতে সরে গেল, বলল, তোমার কথার কি মানে হয়?

দেখলাম তখনও দু'এক ফোঁটা জল চিক-চিক করছে গালে। বললাম, সব কথার মানে জিজ্ঞেস করা একটা খারাপ অভ্যাস। অভ্যাসটা ছাড়। মানে জানতে হয়—মাথা খাটিয়ে জানবার চেষ্টা কর। সে চেষ্টা করতে দেখছি না। যখন জিজ্ঞেস করলি বলছি, স্থিরভাবে শোন, চটে যাবার স্বভাব ছেড়ে দিবে। বলব কি?

বলো।

বললাম, খাঁচা-ঘরে দেবাশিসের ফটোর দিকে তোকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি অনেকদিন। কদিন আবার আঁচল দিয়ে ফটোখানা মুছতে দেখেছি। একদিন ফুল

কাটিয়ে দিলি ভালমন্দা-না করে, এখনও টাল-বাহনা করছিস। বোঝাপড়া করে নিতে এতটা সময় লাগে নাকি? এর মধ্যে মাথার হাত বুলিয়ে সাত-আট লাখ টাকার দোকান মেরে দিয়ে ইস্টার্ণ ইন্ডিয়ার একজন কর্তা হয়ে বসেছিস, নতুন গাড়ী চড়ে বেড়াচ্ছিস দেখতে পাচ্ছি। দয়া করে বল দেখি আর কতদিন ঝুলিয়ে রাখবি একে?

আমাকে অবাক করে দিয়ে হাসতে লাগল তুলসী। দু' ফুট সরে এল আবার, মাথার পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, জ্যেঠামণি, কথা দিয়েছ আমার বাধা হবে?

তা-তো দিয়েছি, কিন্তু কথাটা বলতে দেরি করছিস কেন এত?

বলব, বলব। এ-বাড়ীতে মেটার্নিটি হাসপাতাল করতে পারব তো?

বললাম, যা ইচ্ছে হয় করিস বাপু, বুড়ো বয়সে আমার কপালে দুর্গতি আছে বুঝতে পারছি।

কিছু বুঝতে পারছ না তুমি। তুমি, পিসীমা আমাদের কাছে থাকবে। কাল নিয়ে যাব তোমাদের ঐ বাড়ীতে, দেখবে পিসীমার জন্য কেমন সুন্দর পুজোর ঘর, তুলসী-মঞ্চ তৈরী করিয়েছি। শুভদিন দেখে তুলসী গাছটি ও বাড়ীতে নিয়ে যাব। বুঝতে পারলে এবার?

উত্তর দেবার আগে গাড়ীর হর্ণ বাজল। বললাম, দেখতো কে এল?

হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে চোখের একরকম ভঙ্গী করে বলল, খেতে বলেছি আজ রাতে। তোমরা দুজন আশীর্বাদ করবে আজ।

চুপ করে বসে রইলাম একা।

মিনিট দশ পরে দেবাশিসকে নিয়ে ঘরে এল তুলসী। দেখলাম জমকালো শাড়ি পরেছে, হাতে শাঁখ। দেবাশিসের পরনে ধুতি, পাঞ্জাবি, খালি পা।

বলল, উঠে বসো জ্যেঠামণি। পিসীমা ধান-দুর্বা নিয়ে আসছেন, আশীর্বাদ হবে এখন।

বললাম, শাঁখ বাজাবে কে?

পিসীমা বাজাবেন, না পারলে আমি বাজাব।

বললাম, আশীর্বাদ তো সব সময়ে করছি তোদের, নতুন করে—

বলল, মানে মনের আশীর্বাদ আর চলবে না জ্যেঠামণি, মাথায় ধান-দুব্বো দিয়ে আশীর্বাদ করতে হবে।

আচ্ছা, তাই করব।

ধান-দুর্বা দুজনের মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করলাম, জীবনের পরম সত্য অন্তরে উপলব্ধি করে সুখে সংসার করো তোমরা।

মহামায়া আশীর্বাদ করল আমার পরে।

মহামায়াকে বাজাতে না দিয়ে নিজেই তিনবার শাঁখ বাজাল তুলসী।

তার কাণ্ড দেখে হাসতে লাগলাম। দেবাশিসও হাসছিল।

শাঁখ নামিয়ে তুলসী বলল, বসুসাহেব, তুমি হাসছ কেন, ওঁদের দেখাদেখি?

মুখ ফেরাল দেবাশিস।

একটু পরে তুলসী বলল, বসুসাহেব, জ্যেঠামণির সঙ্গে গল্প করে বসো, পিসীমাকে নিয়ে আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি, কিছু রান্না বাকী আছে।

মহামায়াকে নিয়ে তুলসী চলে গেল।

দেবাশিস দাঁড়িয়ে ছিল, একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, বসো।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। অনেক কথা মনে আসছিল। দেবাশিস ও তুলসীরই কথা।

প্রথম যৌবনে ক্ষুরধার বুদ্ধির দর্পে আইকোনোক্লাস্টের উন্মত্ততা নিয়ে দেবাশিস মানুষের জীবন, সমাজ, সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করতে গিয়েছিল। হয়ত মনে করেছিল তার আগে এ-কাজ আর কেউ করেনি। কালাপাহাড়ী উন্মাদরা তাই মনে করে।

জীবনের উলঙ্গ রূপ প্রত্যক্ষ করে মনস্তাত্ত্বিক পরিণত হয়েছিল সে। শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও। কিন্তু তাতে দেবাশিস মনস্তাত্ত্বিক নয়। সবজান্তার দর্প ও যৌবনের উত্তেজনা বিপথগামী করেছিল তাকে।

সে উন্মত্ততা কেটে গিয়েছে জীবনকে ঠিকভাবে দেখবার চোখ তৈরী হয়েছে।

তাই দেখা গেল যৌবনের শেষ পর্বে উলঙ্গ জীবনকে রূপরসের আচ্ছাদনে সাজিয়ে দেখবার তাগিদবোধ এসেছে তার মধ্যে। মানব-জীবনের যে পরম সত্য হিরন্ময়-পাত্রের আবরণে আচ্ছাদিত রয়েছে, সে সত্যের দিব্যরূপের সন্ধান এতদিনের পর সে পেয়েছে মনে হয়। এর জন্য ভাগ্যের কৌতুকে তাকে সাহায্য-ভিক্ষা করতে হয়েছে এমন একটি মেয়ের কাছে যার স্বভাব একেবারে বিপরীত। তুলসী প্রাঙ্গণের পবিত্র আবহাওয়ায়, তুলসী-মঞ্চে মাটির প্রদীপ দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, গলবস্ত্রে প্রণাম করবার অভ্যাস নিয়ে শিশুকালে যে মানুষ হয়েছে, দেবতার একান্ত নিষ্ঠা যার মজ্জাগত।

এটা প্রতিক্রিয়ার ফল নয়, দেবাশিসের আবিষ্কার এটা। মহৎ আদর্শে যার বিশ্বাস আছে, দেবতার নির্ভরশীলতা আছে সেই তো একান্তভাবে নির্ভরের যোগ্য পাত্রী।

দেবাশিস মাথা নামিয়ে কি ভাবছিল আমার মত। চাইলাম তার দিকে। নিজের মনে বললাম, ভাগ্যের কৌতুক বটে, কিন্তু মিষ্ট কৌতুক। তুলসী ভালবাসতে জানে, জীবনের ফাঁকগুলো, জীবনের সব দৈন্য, ভালবাসার ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দিতে জানে, তার বলিষ্ঠ ভালবাসা মানুষকে সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা দেবার শক্তি রাখে।

বললাম, দেবাশিস, এবার আমাকে ছুটি দিতে হবে। তীর্থদর্শনে বেরোতে চাই।

মৃদু হাসল দেবাশিস, বলল, তুলসীকে বলবেন।

নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে রয়েছি দুজনে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে তুলসী ডাকল, পিসীমা ডাকছেন তোমাকে, এসো। আমাকে বলল, রান্না হয়ে এল জ্যেঠামণি, একটু পরে খেতে দেব।

দেবাশিসকে নিয়ে তুলসী চলে গেল।

কিছুক্ষণ একা ঘরে বসে থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম।

একটা বিষাদের ভাব এসেছিল মনে, ঠেলে-ঠুলে মনের বাইরে পাঠালাম সেটাকে। গেল অনিচ্ছায় একটু ছায়া রেখে।

ভাবছিলাম আমাকে দিয়ে তুলসীর প্রয়োজন তো শেষ হল; সে ভালবাসবার নতুন মানুষ খুঁজে পেল, সংসার পেল, কর্মের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পেল। যে মেয়েটি হারিয়ে যেতে বসেছিল, বারোটি শহুরে স্নেহে, যত্নে মানুষ করেছি যাকে আজ সে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হল। আমার কাজ ফুরিয়ে গেল।

জীবনের মধ্যাহ্নে গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে বুকভরা রিক্ততা ও বিতৃষ্ণা নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম এই আধা-জঙ্গলে, পথের বান-প্রস্থে। বিনা উৎপাতে নিজের সামান্য কাজ নিয়ে থাকব। চির-উৎপীড়িতা ছোট বোনটিকে যতদিন টিকে থাকে, নিরুপদ্রব আশ্রয়ে রাখব এই আশা নিয়ে এসেছিলাম। আরও একটু আশা ছিল গোপন মনে, জীবনের নষ্ট ঐশ্বর্যের কিছুটা যদি পুনরুদ্ধারের সুযোগ আসে এই নতুন অধ্যায়ে। নষ্ট ঐশ্বর্য মানে স্নেহ, প্রীতি, মানুষে বিশ্বাস। এ আশার কথা একবার বলেছি গোড়ার দিকে।

চিরকেলে অনাগ্য মনের, 'কল্যাণী' ভাবনায় মানুষ হয়ে অকপটে স্বীকার করছি, ভাগ্যদেবতা সংসার থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত দুর্বল মানুষটিকে অকৃপণ হস্তে এই ঐশ্বর্য দান করেছেন। তুলসীর প্রতি, দেবাশিসের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। রক্ত-সম্পর্কের কেউ নয় এরা, মাথায় করে রেখেছে তবু। তুলসীর ঋণ তো অপরি-শোধনীয়।

অন্ধকারের মধ্যে বসে ভাবছিলাম এইসব। আরও ভাবনা আসছিল। ভাব-ছিলাম তুলসীকে ছাড়বার সময় এসেছে, ছাড়তে হবে তাকে।

কি করে তুলসীকে মুক্তি দেব আমার কখন থেকে ভাবছিলাম। বড় শক্ত কাজ। ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি কতটা সময় কেটেছে। অন্ধকারের মধ্যে এক সময়ে কে এসে পাশে দাঁড়াল, বুঝলাম। দু'হাতে গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথা রেখে বলল, এমন করে কি ভাবছিলে জ্যেঠামণি? তুলসীর ভার কাঁধ থেকে নেমে গেল ভাবছিলে?

বললাম, আজকের দিনে আর চোখের জল ফেলিস না মা। তোকে কোনদিন ভার বলে মনে করেছি কি, যে আজ একথা বলছিস? বুড়ো মানুষ, ভাবনা করা ছাড়া তার আর কি করবার আছে বল? দেবাশিস কোথায়?

তোমার ও-পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওঠ তো তুই। খেতে দিবি কি এখন?

দেব। এসো আমার সঙ্গে।

হাত ধরে নিয়ে চলল যেন চোখে দেখতে পাই না আঁধারে।

(শেষ)

সুখের মেলা

ডালিম ফুলের পরিণতি

জীবনের যত গান ভাজে সারা রাত ধরে গাইবে সুন্দর। একটা পিঁজে-মুরগী চুরি করে আনার কথা আছে গোবিন্দর। তার দিদি বাঁধ পাল দেয় তো নাকের ডগায় ধরে দেবে দেড়টা টাকা। কিন্তু মুরগী নয়, আস্ত ম্লুকরা জ্যান্ত একটা খরগোস শিকার করে এনেছে গোবিন্দ। ঝিঙে ক্ষেতের মধ্যে মাথা গুঁজে লুকিয়ে বসেছিল নাকি আর পাকা তেলার বাড়ি দিয়েছে তবে এক-ঘা। ছুটেছে সারা মাঠে খানিকক্ষণ। তারপর আর এক-ঘা দিতেই ঠ্যাং ভেঙে বাছাধন ড্যাডাং ড্যাং!

তোফা মাংসে আর ভাত!

সুন্দরের কাকা নিতাই বলুইে বলে গেল, 'একটু দিয়ে সোন্দর। তাড়ি দিয়ে 'পকাবোরেন' মজাসে!'

খেতে বসে গোবিন্দর যেন মনমরা ভাব। সুন্দর ভাবে, একটু তরকারী দিয়ে এলে কেমন হতো ডালিমদের? বলতেই গোবিন্দ ছুটে গেল বলপাড়ায় মুড়ে নিয়ে খানিকটা মাংস-ঝরন্ দিয়ে আসতে।

কুয়াশা নিবর ভোরের আকাশে তখন পান্ডুর চাঁদটা ডোবে ডোবে। গোবিন্দ ঘুমিয়ে পড়েছে কিছুক্ষণ হল। এগিয়ে এসে দাঁড়াল একটা মূর্তি।

চমকে উঠল সুন্দর। ডালিম এসেছে তার কাছে। উঠে পড়ে ছুটে গিয়ে বুকের মাঝখানে চেপে ধরলে ডালিমকে। কতক্ষণ!

ঘুম ভেঙে গেছে গোবিন্দর। সুন্দর উঠে যাবার সময় বাঁশির খোঁচা লেগে গিয়েছিল তার পাঁজরে। উঠে বসল। উঠোনে দাঁড়িয়ে একটা সরলরেখা। চুপ করে আবার শুয়ে পড়ে গোবিন্দ। ডালিম আসবে সে তা জানত। বন্ধু ব্যথা পাবার ভয়ে সে সাহস পায় নি বলবার। ডালিম নিজে বলুক যদি পারে তো।

'সুন্দর!' কান্নাতে ভেজা কণ্ঠস্বর ডালিমের।

'কি ডালিম?'

'পরশু যে আমার বে'!' কেঁদেই ফেললে ছোকরী। কাঁপা কাঁপা হাতে সুন্দরের সারা মুখ হাত বুলোতে লাগল সে।

'পরশু?' বাঁধন ছিঁড়ে যায়। একটি সরল রেখা ভেঙে দুটো হয়ে যায়। গোবিন্দ দেখে। তারও চোখে জল।

'হাঁ। পরশু। ভৈরবীতলার নিতাই সরদার মাকে বলেছে চার কুড়ি টাকা দোব। মা তাতেই রাজি হয়েছে।'

'চার কুড়ি!'

মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে সুন্দরের।

– চার কুড়ি টাকা!

পরশু দিন!

'আচ্ছা, তুমি এখন যাও ডালিম। তুমি যাও'...

ধপ্ করে বসে পড়ল সুন্দর। তাহলে তার আর পাওয়া হল না ডালিমকে। ডালিমের পায়ের ওপরে চোখের জল ফেলে মাথা কুটে কুটে কাঁদতে লাগল সুন্দর। ডালিম তার মাথার চুলগুলো কেবল মুঠো করে চেপে চেপে ধরতে লাগল আর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। শেষে সে সইতে না পেরে সুন্দরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে—নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে—পাগলের মতন হাউ হাউ করে বুক ভাঙা কান্নায় ফেটে পড়ে—ছুটে পালিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে—অন্ধকারে।

হলদির জলে অস্তমান চাঁদের সোনাগলা হলুদ বর্ণের আলো তখনো ঝিলমিল করছে। একটু পরেই সব নিখাদ আঁধারে ডুবে যাবে!...

গোবিন্দ উঠে বসে পায়ের ওপরে হাত বুলোতে লাগল সুন্দরের। ধরা গলায় ডাকলে, 'সুন্দর! সুন্দর-দা!'

সাড়া দেয় না সুন্দর। অনড় অসাড়। মারা গেছে যেন সে।

বারবার ডাকায় বিরক্ত হয় সুন্দর। লাথি মারে গোবিন্দকে : 'যা শালা বেরো! ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ মারামারি এখন।'

আরো খানিকটা, তবুও বসে থাকে গোবিন্দ। তার কি দোষ! অভিমানে বুকটা ভারি হয়ে ওঠে তার। উঠে চলে যায় সে ধীরে ধীরে।

সকালে রায়েদের কাজে যাবার কথা। চার-পাঁচজন রাজমিস্ত্রি লেগেছে—জোগাড় দিতে হবে। সে কথা মনেও হল না সুন্দরের। লোক এল। যাবে না, জবর। পাঁচ সিকে দেড় টাকা রোজ দেবে, কিন্তু যাবে না বলছে না সুন্দর! বসে বসে দুপুর হল—দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর সন্ধ্যে। না, কিছুই কূল-কিনারা খুঁজে পায় না সুন্দর।

টাকা! টাকা দিয়ে কেড়েছে চায় অবলা তার মেয়েকে। নিতাই সরদার বুড়ো। টাক-পড়া, দাঁত ভাঙা—অবিকল সেই হোটেল-অলা বেঁটে রামহরির মতন। শুধু বুড়ো বর নয়, সতীনের সংসার। তবে আর নেয় না নাকি নিতাই তার আগের স্ত্রীকে। দশ বিঘে জলজমি, গোয়ালে গরু, পুকুরভরা মাছ : খেতে-পরতে কোনো কষ্ট পাবে না ডালিম। মরার আগে অবলা যে ক'টা টাকা কামিয়ে নিতে পারে ডালিমের বিয়েতে, সেইটাই হবে তার বাকি জীবনের আয়ু।

অবলার কোনো দোষ নেই। দোষ নেই ডালিমের—নিতাই সরদারেরও। টাকার জয় হয় সংসারে। দোষ তার নিজেরই। অন্ধ ভালবাসার। কাকা শুনে বলে, 'দুনিয়াটা বড় ক্যাচাংয়ের জায়গা রে বাবা! কি আর করবি, ছাই মেখে সাধু হয়ে যা!'

সুন্দর শেষে একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেললে মনে মনে। পরদিন বাঁশের 'চোঙা' থেকে সব ক'টি টাকা ঢেলে নিয়ে চলে গেল শহরে। সেখান থেকে ফিরতে বিকেল। বেশ হাসি হাসি মুখটা। ছেলেদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে ড্যাং-কোড়ে খেললে খানিকটা। খেটে খেটে 'নাক্সে দম'। ডালিম ওদিকের জাম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। তাকে যেন গ্রাহ্যই করে না সুন্দর। তাকায় না একবারো ভাল করে ফিরে। সেই থেকে নিতাই দলুইয়ের বাড়িতে তাড়ির আড্ডায়। কাকা বলে, 'তাড়ি খাবি নি, মদ খাবি নি তো কি খাবি রা ছোঁড়া? ক'দিন বাঁচবি বল। ভাল ভাল ভদ্দরলোকও আজকাল তাড়ি মদ খায়।'

সে তো বটেই। গেলাস পাঁজর টানলে সুন্দর। গাঁজা ফোটা দু' দুদিনের কড়া মাল। পেটে পড়তেই কিম্ম শুরু করে দিলে। কাকা-কাকীকে গড় করে উঠোনে গোটা চারেক ডিগবাজি খেয়ে বেরিয়ে এল সে।

মুখ-আঁধারী সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

নেশায় চুর!

'পা টলে টলে খানায় পড়ে
এতো বড় মজা,
এক পয়সার দারু কিনে
চাট করেছি তাজা!'...

কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে সুন্দর টলে টলে ডালিমদের বাড়ির পিছন দিকে ফিরে এল। বাড়িতে এসে টান হয়ে শুয়ে পড়ে রইল ধুলোয়। সেখান থেকে উঠে আবার নদীর ধারে।

আকাশে খন্ড খন্ড কালো মেঘ।

আর একটা রাত। আজ আসবে নাকি ডালিম!

গোবিন্দটাও আর দেখা করলে না। কেন, কেন সে মারতে গেল তাকে? এই ছন্নছাড়া জীবনকে সোনার তারে বাঁধবার কল্পনা সে নিজে যদি না-করে তো কে

আর কবে দেবে তাঁকে? আজ যদি তার বাপ থাকত। মা থাকত!— বাপ-মা! আর সোনার পাখি বোনটা! কোথায় যে গেল তারা!...

দরদর অশ্রুধারা গড়ায় সুন্দরের দু' গাল বেয়ে।

গোবিন্দও কি তাকে পর ভাবলে!

'গোবিন্দ!' ফক করে কেঁদে ফেললে সুন্দর।

'সুন্দর-দা!'

'গোবিন্দ!' বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরে সুন্দর গোবিন্দকে।

পাড়ার লোকে আর আত্মীয়-কুটুম্বের ভিড়ে অবলার বাড়ি-ঘর মুখরিত। বিয়ে হয়ে গেল ডালিমের, নিতাই সরদারের সঙ্গে। নগদ দু' খান সোনার গয়না। চার কুড়ি টাকা। চলতনে আগুন রঙের পেটো শাড়িটা ডালিমের দেহের ঢেউয়ের বাঁকে বাঁকে ভাঁজ ভাঁজ হয়ে লেপটে রয়েছে। আহা! চোখ দুটো যেন জুড়িয়ে যায় ডালিমের পানে তাকালে!

আর ওই নাকি বরের ছিরি! সামনের দাঁত ভাঙা। টোপর হুড়কে পড়ে যেতে মাথার ওল বেরিয়ে পড়ল। মেয়েদের খিল খিল হাসি। 'বরের বাবা বর! গালে মাসে নেই। খাঁড়-পাঁজরে চেহারা!... না হয় দুটো টাকাই আছে। ডালিমের ডালিম ফুলের মতন যৌবন নিয়ে কি করবে ও বুড়ো?' কিন্তু...সুন্দর বিয়ে-বাড়িতে গেল। গেল আর ফিরে এল তার দেবার জিনিস কটা দিয়ে।

শাড়ি, ব্লাউজ, রুপোর ছগাছা চুড়ি, সাবান, বাস-তেল, সিঁদুর! এমনি করে চল্লিশ টাকার মালপত্র। সব দিয়ে এল ডালিমকে।

কাঁদতে লাগল ডালিম উলবায়।

অবলা এক সময় কাজের ফাঁকে বললে, 'আহা অমন 'ছাওয়াল' আর হয় নে গো! কোথা গেল সে? দেখ লো তোরা কেউ!'

ফিরে এসে সুন্দর একটা কাটারী দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেললে প্রথমে রক্তরাঙা ডালিম ফুলের গাছটাকে। তারপর কাটলে থোকা-থোকা সাদা সাদা ফুলে ভরা কামিনী ঝাড়টাকে! সাদা খইয়ের মতন ঝরা ফুলে তার উঠোন ভরে গেল!

গোবিন্দর সঙ্গে একবার দেখা করে আড়বাঁশিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে বাঁসুলী ছেড়ে।

ক'দিন পরেই শ্বশুর-বাড়ি থেকে গাঁয়ের পথে ফিরে এল ডালিম। ঘাটে দেখা গোবিন্দর দিদি সাবিত্রীর সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলে সে সুন্দরের কথা।

গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে সুন্দর।

যাবার বেলা শুধু দিয়ে গেছে তার আড় বাঁশিটা। কেটে ফেলে দিয়ে গেছে ডালিম আর কামিনী গাছ দুটো, তাদের উঠোনের।

গোবিন্দ বললে, 'কোথায় শহরের কোন চালকলে কাজ করবে বলে গেল সুন্দর।'

দীর্ঘ একটা নিশ্বাস পড়ল ডালিমের হৃদের পাঁজর ভেঙে।

তারপর দু' দুটো বছর...

সিঁথির সিঁদুর মুছে ফিরে এল ডালিম বাঁসুলীতে। মা তখন তার মারা গেছে। আছে যৌবনের আগুনভরা দেহ। আর হৃদয় জোড়া অসহায়তা।

ঘরটা দাদনা, ভাঁসা, আড়কাঠা, পড়ে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে বুড়োর মতন হুমড়ি খেয়ে আছে। চালে কাক বসে না প্রাণ ভয়ে।

হলদির হাওয়ার গোপন কানাকানি মানুষে মানুষে। ডালিমের রূপের আকর্ষণ যেন বিষাক্ত শায়ক। মানুষের অন্তরকে বিদীর্ণ করাই যেন ধর্ম।

কোনো সংস্থান নেই ডালিমের বাঁচার মতন। স্বামী মরার পর সতীন চন্ডী আবার এসে হাত-পা ছড়িয়ে জুড়ে বসল সংসারে। মুখে তার তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম সর্বদাই যেন খই ফোটে। লাঞ্ছনা আর গালমন্দ। সে নাকি তার রূপের ফাঁদে ফেলে তার শায়-শক্ত মানুষটার মাথা খেয়েছে চিবিয়ে। মুড়ি-ঝাঁটা মেরে তাকে দিয়েছে দূর করে খেদিয়ে। কিন্তু এতখানিরও বুঝি দরকার ছিল না। ডালিম কোনো একদিন চলেই আসত বাঁসুলীতে।

কিন্তু বাঁসুলীতেও যে আগুনের জ্বালা!

মাটিও যদি আজ থাকত তার!

ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা! জীবিকা সংগ্রহের জন্যে পথে বের হতে হয় ডালিমকে। ফাগুনের শুকনো হলদির হাঁটুজল পার হয়ে সিধু বৈদ্যদের বাড়িতে যেতে আসতে দেখা হয় কত লোকের সাথে। তাদের চাউনিতেও কেমন ধরনের কুটিলতা।

নিতাই দলুই সম্পর্কে কাকা হলে কি হয়! বলে, 'ডালিম, তুই আমার ঘরে আয়। পাঁচজনের মুখ বন্ধ করে দোব পাঁচ গন্ডা টাকা খরচা করে এক পেট খাইয়ে দিয়ে।'

'বুড়ো হয়ে মরতে যাও খুড়ো...ছিঃ! ছিঃ! এ কি কথা তোমার!' কেঁদে ফেলে ডালিম।

অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়—দেখা হয় না শুধু সুন্দরের সঙ্গে। কতদিন দেখে নি সে সুন্দরকে! কেমন আছে সে?

[illegible] [illegible] শাড়ী [illegible] ফ্রকে [illegible] দীঘল [illegible] হলদির [illegible] সুবর্ণা। ঠোঁট দুটো [illegible] ধরা দুটি চাঁদ। [illegible] দিয়ে নিজে গোটা দেহ [illegible] পাকেচ [illegible] কেমন যেন [illegible] ক্লান্ত পা দুটো [illegible]। এমনি একদিনের শড়ন্ত বেলায় হঠাৎ পথে দেখা হল তার সুন্দরের সঙ্গে।

কালো, শীর্ণ চেহারা। গায়ে ময়লা হাফ সার্ট। পায়ে টায়ার [illegible] স্যান্ডেল, পরনে কলাপাতা রঙের হেঁটো লুঙ্গি। হাতে আড়বাঁশি। চোখ দুটো অন্ধকারের মতো জ্বল জ্বল করছে কোটরের ভেতরে। রুক্ষ খাঁড়ার মতো [illegible] উঠেছে। চুল-গুলো এলোমেলো।

চোখে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল।

একটু মুহূর্ত! [illegible] ঘাড় ফিরিয়ে চলে গেল।

বুকের মধ্যে হঠাৎ [illegible] বয়ে চলেছে [illegible] আছাড় খেয়ে!...

একটা কথাও বললে না সুন্দর। কত রোগা হয়ে গেছে! চালকলের তেলকালি ময়লা ধুলোর সুন্দর হারিয়ে ফেলেছে তার গ্রাম্য শ্যামশ্রী। চেনাই যায় না সহজে। কিন্তু কথা বললে না কেন সুন্দর? কি অপরাধ করেছে সে তার কাছে!

কান্নার চাপে গুমরে ওঠে ডালিমের বুকের ভেতরটা। সুন্দর এসে কোথায় গেল কে জানে! বনকলমে ভরে গেছে তাদের বাড়ির উঠোনটা। বন্য শ্বাপদের নির্বিঘ্ন আস্তানা। কেটে ফেলা ডালিম আর কামিনী গাছ দুটোর গোড়া থেকে আবার শাখা বেরিয়ে ঝাড় বেঁধেছে। ছিটে বেড়ার নোনা-ধরা দেওয়ালের কংকাল বেরিয়ে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। ডালিম নির্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে ফিরে এল।

পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গেছে তখন।

পরদিন সাত-সকালেই হরিশপুরের জমিদার দুর্লভ চক্রবর্তীর খলিফা গোমস্তা বুড়ো সনাতন পোদ্দার এল ডালিমের বাড়িতে।

'সালাবাদ ডাক করেছেন। ক' বছরের খাজনা বাকি। নিলেম হয়ে গেছে। ভিটে-

ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ও পুরুষত্ব হীনতার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

Vacuum massage ২৲ টাকা 'ভাইটোবাম' সেবন ১ কৌটা ৩৲ টাকা, মোট ৫৲ টাকায় ১ মাসে সুফল নিশ্চিত। সময়—দুপুর ১২টা হতে বিকাল ৫॥টা। ২৪ টাকা M.O. পাঠালে ১ মাসের ঔষধ ও যন্ত্র পাঠাই।

ক্যাপ্টেন—জে, এল, বসাক, M.B.I.M.S.,A.M.M.C.(EX)

৫বি, জগদীশনাথ রায় লেন, দর্জিপাড়া, বেথুন কলেজের উত্তর, কলিকাতা-৬

মাটি ছাড়তে হবে দিন ঠাপরোন।' ঢোরা চোখে ঢৌরিয়ে ঢৌরিয়ে কথা বলে সনাতন। ফোলা ঠোঁটের বাইরে তবু বড় বড় দুটো দাঁত। ফুট করে সোনার টিপ পরানো লম্বা হুঁকো পানের পিক করে পড়েছে পরিপাটি বুক পকেটওলা পাঞ্জাবিটার।

'দাঁড়াও বাবু, নিতাই খুড়োকে ডাকি।'

'ধীরে মাগী, চ' তুই আগে। রাজাবাবু রেগে তালপাতা! কার ঘাড়ে কটা মুণ্ডু আছে—বাবু বলে, ছুঁড়িকে বেঁধে আনবি!'...

নিতাই খুড়ো। গড় করলে গোমস্তা বাহাদুরকে!

'দশ বছরের খাজনা বাকি! হা না তিন বছর সঙ্গে একবার দেখা কর। পায়ে-হাতে ধরে একটু... মানে হে' হে'...

'তাতো বটেই—তাতো বটেই।' সায় দেয় নিতাই।

সনাতন ফস্ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, 'ধরা রে নিতে।'

ডালিম জানে এ ডাকের অর্থ কি! দিন চারেক আগে হঠাৎ পথের মাঝখানে দেখা দুর্লভ বাবুর সঙ্গে। পালকী থেকে নেমে বাড়ি যাচ্ছেন। সঙ্গে দারোয়ান। হাতে বন্দুক আর ঠোঁট দিয়ে ঝুলছে গোটা দুই মানিক জোড় পাখি! পথরোধ করে বললেন, দাঁড়াও! কোথায় বাড়ি?'

বাবুর গায়ে ভর ভর করছে মদের গন্ধ। তুলোপর, চুলগুলো রূপোর মতন সাদা চকচকে। চোখে ভারি পাওয়ারের সোনার চশমা।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থেকেই বাবু চিবুকটা ধরে তুলে তার মুখটা দেখলে। বললে, 'বাঃ! কোথায় বাড়ি গো সুন্দরী?'

'বাঁসলীতে। বাসুদেব হাজরার মেয়ে আমি।'

'তিনেক হয়েছে কত টাকা লাগবে জিগেস করো তো কাকা। টাকা আমি দেব।'

'আঃ এত মাগী। পিপীলিকার ডানা হয় মরিবার তরে। টাকা যদি নিতে হয়, তো দুশো টাকা দিতে হবে; পারবি?'

সনাতন গোমস্তা হাত-পা ছটকাতে থাকে।

'একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলে নুন কিনে কর্ত্তে যায়—টাকা! মোক্ষ কথা! টাকা! হরামজাদীর কথা দেখ না! এখন এই কথায় দরুণ তোকে পনেরো দিন বাবুর পা টিপিয়ে তবে ছাড়ব!'

'তোর মত তের লোক্যা (পতিতর পালিত নাগর) বাবুর মাথায় মারি আধোয়া ঝাঁটা! বেরো হতচ্ছাড়া, হাড়হাভাতে, পোড়ার মুখো, মিনসে! দালালী মারাতে এয়েছ! বেরো বলছি!'...

গাছ-কোমর বেঁধে ঝাঁটা হাতে নিয়ে সটান এগিয়ে আসে ডালিম।

নিতাই হাঁ করে থাকে। সাক্ষী হবার ভয়ে পাশ কাটায় 'আসছি' বলে।

মেয়েটার কি 'আস্পর্ধা'! দুর্লভ চক্রবর্ত্তীর নাম শুনলে গর্ত্তের সাপ গর্ত্তে সেঁদিয়ে যায় ল্যাজ গুটিয়ে আর তার মহামান্য গোমস্তা বাহাদুরকে কিনা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করা!

'কত বড় বাচাল মাগী তুই, দেখিয়ে তবে ছাড়বে এই সনা গোমস্তা। হাড় পেকে গেছে তোর মতন কত গণ্ডাকে এই দুটোকে খুঁসে। দিনে পাঁচটা-দশটা! বিধবা, সধবা, কুমারী, বকে ইচ্ছে।'...

'বেরো ছোটলোক, বিষ খসে যাবে তোর। বেরো!' খা দুই ঝাঁটার মাড়ি কষিয়ে দিতেই হাতের ছড়িটা খুঁজে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বটে কিন্তু তারপর হঠাৎ পাঁই পাঁই করে কাছা-কোঁচা খুলে দৌড় মারলে সনাতন গোমস্তা। কেননা ঝাঁটা ফেলে দা'টি খুঁজতে দৌড়োচ্ছিল ডালিম : 'গুখোর বেটাকে আজ দু'টুকরোই ফেলব আমার উঠোনের মাঝখানে। রক্তগঙ্গা বইয়ে দোব।'

পাড়ার লোক শুনে ভয়ে আর বিস্ময়ে দিলে গালে হাত। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে আড়ি।

গোবিন্দ বলে, 'জলে কুমীর না থাকই ভাল। মরছোছ সব শালা খেয়ে ফেলবে।'

নিতাই দলুই বলে, 'ডালিম ই-কাজটা কিন্তন তোর ভাল হলনি কো। জমিদার-বাবু যখন ডেকেছে... এবার'...

কেন কার জন্যে তার দেহকে লাঞ্ছিত করতে চায় না ডালিম, অতুল উদ্দাম সম্ভোগকে সে পায়ে ঠেলে ফেলে দিতে গেল কিসের জোরে—কিসের আশায়?

কান্নায় ভেঙে পড়ল ডালিম। তার কালো আকাশ বুঝি আরো কালো হয়ে গেল।

বড় অসহায় অক্ষম সে।

বাইরে থমথমে রাত। পৃথিবী জোড়া কুটিল রহস্যের মৌনতা। আশপাশের বন-বাদাড়ে খস্‌খস্ শব্দ।

বুক ঢিপ ঢিপ করছে ডালিমের।

ক্ষীণায়ু লম্ফের আলোটা মৃত্যুর পূর্বে হেঁচকি টানতে শুরু করেছে। ভাঙা ছাউনির ফাঁক দিয়ে এক টুকরো আকাশে জ্বলজ্বল করছে কতকগুলো তারা।

বুক ভাঙা কান্নার সমুদ্রে কালবৈশাখীর গর্জন :

চারপাশে বিধ্বস্ত প্রেতের হানবার জন্য ফণা তুলে দুলছে ঢেউয়ের ভুজঙ্গরাশি।

'মা! মাগো!'

কালরাত্রির মৌনতা ভেঙে হঠাৎ কে যেন ডাক দেয় :

'ডালিম!'

চমকে উঠে ঘরের এককোণে জড় হয়ে বসে ডালিম। হাতে টেনে তুলে নেয় একখানা গাছ কাটারী।

ভাঙা আগড়ের পাশে এসে দাঁড়ায় লোকটা।

'ডালিম!'

'কে? সুন্দর! সুন্দর! তুমি!'

'হাঁ।' আলোটা নিভে গেল হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া লেগে। দোরটা খুলে বেরিয়ে এল ডালিম।

অন্ধকারে হাতখানা বাড়িয়ে সুন্দর একখানা হাত ধরলে ডালিমের।

সহায়হীন দুর্বলতা আর অবলম্বন লাভের আকস্মিক উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে ডালিমের দেহটা। পড়ে যাবে নাকি ডালিম! অসম্ভব! সুন্দরের বুকের ওপরে মাথা গোঁজে ডালিম।

কিন্তু সুন্দর বলে, 'এস তাড়াতাড়ি।'

'কোথায়?'

'পরে বলব। আমি যেখানে যাব যেতে যদি আপত্তি না থাকে তো চলে এস চট করে। সময় নেই। পেছনে বিপদ!'

তারার আলোয় অচেনা পথ চিনে দুজনে চলেছে হাত ধরাধরি করে। শিথিল আঁচল টেনে কোন্ উন্মন মায়াবিনী চলে গেছে কবে তারার কুসুম ছড়িয়ে সারা আকাশের ছায়াপথ বেয়ে।

পৃথিবী গভীর তন্দ্রায় সুসুপ্ত।

ঝুঁ ঝুঁ শব্দে ঝিঁঝিঁ ডাকে।

রাতচরা পাখি ডাকে একটানা গভীর কুহক-স্বরে।

জমাট হিমশৈল গলে গলে পড়ছে সুন্দরের সুখকর স্পর্শোত্তাপে। অক্লান্ত—অঝোরে! বুকের পাষাণ ভাঙা কান্না বুঝি আর বাগ মানে না ডালিমের।

সুন্দর বলে, 'জমিদারের পেয়দা-পাইক আজ রাতে তোকে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে নিয়ে পালাত। যে কদিন এই বাঁসলীতে ফিরে এসেছিস ডালিম, আমার সোনামুখী, তোর পাশে পাশে থেকে আমি পাহারা দিইচি। অবস্থা দেখে ফিরে গেছি শহরে। কদিন 'ইস্টাইক' গেল। তাই ফুরসত পেতুম আসবার। গোবিন্দ সব খবর দিত আমাকে। তাই... একটা ঘরও ঠিক করে রেখে এইচি।'

কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে থাকে সুন্দর, 'কি হালে আমার দু-দুটো বছর যে কেটেছে ডালিম, তুই যদি জানতিস! কত রাত কত দিন তোর কথা ভেবেছি। কত কেঁদেছি—কত বাঁশি ভেঙে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু মধুমুখী তোকে আমি ভুলতে পারিনি। তোর খোঁপায় দেওয়া সেই রাঙা ডালিম ফুলটার কথা মনে পড়ে ডালিম?'

'হাঁ। মা বলেছিল, ভালবাসার রাঙা ডালিম ফুল!'

তারার আলোয় অশ্রুভাসা ডালিমের মুখখানা করতলে ধরে চুম্বন করলে সুন্দর। বললে, 'যদি কোনোক্রমে আজ আর না আসতে পারতুম ডালিম, আর কোনো দিন তোকে দেখতে পেতুম না। তুই হঠাৎ খাঁচার কেউটের মতন সনা গোমস্তাকে ছোবল হানবি আমি ভাবতেও পারি নি। আজ রাত্রে খুব অঘটন ঘটত তোর কপালে—খুব ভয় করছিল না?'

'সুন্দর, তুমি আমার পাখি, আমার সোনা!' ডালিম তপ্ত হাসিকান্না মাখা মুখ-খানা চেপে ধরলে সুন্দরের বুকের মাঝ-খানে। সাহারার হাহাকার জ্বালা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসে। গভীর প্রশান্তিতে তন্দ্রাঘন চোখ দুটি আরো বিহ্বল হয়ে আসে ডালিমের। টপ্ টপ্ করে দুটো চোখের জল ঝরে পড়তে থাকে সুন্দরের, ডালিমের মাথার ওপরে।।

—আবদুল জব্বার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতি

মননশীল লেখক ও প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী দিলীপকুমার রায় তাঁর 'ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ' নামক সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে সংস্কৃতি বিষয়ে লিখেছেন—

'সংস্কৃতি শব্দটির বৈদিক অর্থ মন্ত্রাদি-শোধন : কিনা, শুদ্ধিদান—মন্ত্রশক্তির সাহায্যে। সংস্কার বলতে বোঝায় যে বিধর্ম তার সগোত্র—কেবল আধ্যাত্মিক ইমেজ আছে, এই যা। সাহেবি 'কালচার' শব্দটির প্রতিরূপ হিসেবেই বাংলায় এ-শব্দটির প্রবর্তন করেন প্রথম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। আমাদের বাংলাভাষাকে তিনি ভেঙে সাজিয়েছেন তাঁর অসামান্য প্রতিভায়, তাই তাঁর কথা না শুনবে কে?'

কৃষ্টি কথাটি তিনি পছন্দ করতেন না। তাদের দেশে কৃষ্টি নিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার মধ্যেই তাঁর মনোভঙ্গী পরিস্ফুট। এ ছাড়া ১৯৩২-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে একটি চিঠিতে লেখেন—(এই গ্রন্থে অংশত উদ্ধৃত)—

'কালচার শব্দের একটা বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে—চোখে পড়েছে কি? কৃষ্টি! ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের বাধা অনুগত হলে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে? এ'টেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কামড়ে ধরে, ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেছে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা? অন্য প্রদেশের ভদ্রতাবোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার হচ্ছে 'সংস্কৃতি'।'

রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের কারণ হয়েছিল কৃষ্টির যথেচ্ছ ব্যবহার—আজ অবশ্য বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটির যথেষ্ট প্রচলন ঘটেছে। সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলা। দিলীপকুমারের এই গ্রন্থে সেইসব দিকই প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। সেইদিক থেকে গ্রন্থটির নামকরণ সঙ্গত হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন উঠতে পারে। লেখক এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন—

'প্রবন্ধগুলির এ নামকরণ করেছি কেন এ প্রশ্ন স্বতঃই অনেকের মনে উদয় হতে পারে, অর্থাৎ কেন 'ধর্মবিজ্ঞান' নামকরণের শেষে 'শ্রীঅরবিন্দ' জুড়ে দিলাম? উত্তর এই যে, প্রবন্ধাবলীর মধ্যে দু একটি প্রবন্ধে তাঁর নামোল্লেখ না থাকলেও এ বইটির Leitmotiv শ্রীঅরবিন্দই বটে। এ-চমৎকার জর্মন বিশেষ্যটির প্রতিরূপ খানিকটা আমাদের বাংলায় বলা যেতে পারে—ধুয়া। ফিরে ফিরে নানা অস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগের পরে শ্রীঅরবিন্দের সুর বেজে উঠেছে বারবারই। তাই এ নামকরণ।'

শ্রীঅরবিন্দের নানা কথায় এই গ্রন্থটি যেমন ভরে আছে তেমনই সেই সঙ্গে আছে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি নানাবিধ সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচনায় শিরোনামটি এই গ্রন্থ অন্তর্গত অনুরূপ নামাঙ্কিত প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। লেখকের এই গ্রন্থটির মধ্যে সংস্কৃতিই প্রাধান্য পেয়েছে তাই এই শিরোনামটাই নির্বাচন করে নিলাম।

এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অসীম। ১৯৬৬ খৃঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত লেখকের এই ভাষণটির মধ্যে অনেক মূল্যবান বক্তব্য আছে যা চিন্তাশীল পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে। 'জার্মান মনীষী স্পেংলারের মতে মানুষের নিয়তি তাকে ঊর্ধ্বপথে টেনে তুলতে চায় এবং সেই টানটি নিস্তেজিত হলে কালচারের অন্তঃশক্তির মরণদশা ঘনিয়ে আসে—যা থাকে সে তার কাঠামো ওরফে 'সভ্যতা'।' —এই সভ্যতা বা সভ্যতার খোলসটুকু নিয়ে মানুষ মাতামাতি করে। সংস্কৃতির অধোগতির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন স্পেংলার—যে সভ্যতন্ত্র জীবনরীতি, ধনশালিতা, শক্তিমদ, বুদ্ধিবাদ—এরা সংস্কৃতির অভিজ্ঞান নয়। পরমা সংস্কৃতি বলব সেই প্রেরণাকেই যা আমাদের নিয়তিকে সার্থক করে ঊর্ধ্বাভিসারে, ইন্দ্রিয়ভোগের সোনার হরিণের পিছনে মিথ্যে ধাওয়া করায় না।'

লেখক স্পেংলারের এই উক্তির সঙ্গে ভারতের মনীষী সাধুসন্ত মুনি-ঋষিদের কথা টেনে এনেছেন। 'অমৃতের অধিকারীই যদি না হই তাহলে অন্যবিধ আর কিসে প্রয়োজন? যা আমাদের উপলব্ধির পথে চালিত করে তারই নাম পরমা সংস্কৃতি—সংস্কৃতির সংস্কৃতি।' লেখক বলেছেন এই সংস্কৃতির সন্ধান করতে হবে 'ধর্মের মণিকোঠায়। শক্তির সাম্রাজ্যে নয়—ধনের ধনধামে নয়, এমন কি বুদ্ধির বিশ্ববিদ্যালয়েও।'

এই প্রবন্ধটি আরো বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে কারণ মনীষী লেখকের দীর্ঘজীবনের উপলব্ধিপ্রসূত এই বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি, আবেগ ও বলিষ্ঠতা

আছে। তাঁর মতে 'মানবজীবনে এই পরমা সংস্কৃতির স্ফুরিবকে সোনা ফলেছে সবচেয়ে আমাদের ভারতবর্ষেই বটে—'

এই গ্রন্থ অন্তর্গত অনেকগুলি প্রবন্ধই বিশেষ আলোচনার যোগ্য। 'বিজ্ঞানের ট্রাজেডি ও স্মৃতি', 'বিজ্ঞানের পুতুল পুজো', 'বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা', 'বিজ্ঞানের জনহিত ধর্ম', 'শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় ও প্রসঙ্গতঃ' প্রভৃতি প্রবন্ধাবলীর মধ্যে লেখকের সমাজাগত বিজ্ঞান সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এডিংটনের 'নেচার অব দি ফিজিক্যাল ওয়ার্লড', অ্যালেক্সিস ক্যারেলের 'ম্যান দি আননোন', আইনস্টাইনের 'আই বিলিভ', হোয়াইটহেডের 'সায়েন্স অ্যান্ড দি মডার্ন ওয়ার্লড', জীনসের 'মিস্টিরিয়স ইউনিভার্স' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থাবলী থেকে নানা প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক নিজের যুক্তি সপ্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

'ক্যারেলের বইটি মানুষের আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক আলোচনা। একটি অন্তর্মুখী অন্যটি বহির্মুখী। কিন্তু মজা এই যে, শেষে উভয়েই এসে পৌঁছেছেন একই সিদ্ধান্তে যে জীবন তথা বিশ্ব এতই আশ্চর্য ও অগাধ যে দূর্ভেদ্য দিয়ে কেউই তল পেতে পারে না এ-যুগল রহস্যের। এই রহস্যের (মিস্ট্রি) কথা ভেবেই আইনস্টাইন ও বোগজেরের খবর দিতে গিয়ে শেষ অধ্যায়ে আপ্লুত হয়েছিলেন। আইনস্টাইন স্বকণ্ঠে বলেছিলেন 'রিলিজিয়াস রেভারেন্সে'র। শ্যাইৎজার 'রেভারেন্স ফর লাইফ'-এর। জীনসও তাঁর 'মিস্টিরিয়স ইউনিভার্স'-এ আকাশতত্ত্ব ও বেগতত্ত্বের খবর দিতে গিয়ে শেষ অধ্যায়ে মানুষের ধর্মভাবকে মান দিয়েছেন। এরই নাম—বিজ্ঞানের স্মৃতি।'

এই প্রবন্ধটি পত্রাকারে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে। তার পর অনেক জোড়া হয়েছে এবং ছাঁটা হয়েছে একথা বলেছেন লেখক। প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন যে তিনি নানা প্রবন্ধে আইনস্টাইন বা রাসেলের মত অনেক হিতকারী কথা বলেছেন—বিশেষ করে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন : 'আজকের জগতে বিজ্ঞানের দান বিশ্বব্যাপী হলেও শুধু বৈজ্ঞানিক কীর্তি-কলাপে তুষ্ট থাকলে চলবে না—যদি ঐ সঙ্গে আমাদের নীতিবোধের বিকাশ না হয়।' শ্রীঅরবিন্দের 'রিজন অ্যান্ড রিলিজিয়ন' থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন লেখক :

'মানুষের মন আজ টের পেতে শুরু করেছে যে, বিজ্ঞান কোনো গভীর সমস্যারই মূল ধরতে পারেনি। পেরেছে শুধু বাইরে আলো ফেলে দেখাতে নানা শক্তির ক্রম-প্রগতির কার্যকারণের সূত্রটি মাত্র।'

এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'কাজী নজরুল ইসলাম' : 'নীরেন্দ্রনাথ রায়' ও 'তুলসীচরণ গোস্বামী' এই তিনটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। এই তিনটি বিশিষ্ট বাঙালিকে যাঁরা দেখেছেন বা জানতেন তাঁদের কাছে বিশেষ করে 'এই প্রবন্ধ তিনটির বিশেষ আবেদন আছে। দিলীপ-কুমারের আন্তরিকতাপূর্ণ রেখাচিত্রে মানুষগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে বাঙালী মনীষার একটি খণ্ড চিত্রও এই প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাবে। এই তিনটি প্রবন্ধও সাহিত্য রসসমৃদ্ধ এবং নানাবিধ খুঁটিনাটি তথ্যে পরিপূর্ণ। স্থানাভাবে এই প্রবন্ধগুলির পূর্ণ পরিচয়ও দেওয়া গেল না। পরিশিষ্ট অংশে শ্রীঅরবিন্দের 'Art for arts' sake নামক বিখ্যাত আলোচনাটি সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত হয়েছে।

পরিশেষে, এই গ্রন্থের প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই। গল্প ও উপন্যাসে প্লাবিত বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবন্ধের গ্রন্থ ইদানীং বিরল হয়ে এসেছে। গভীর চিন্তার প্রকাশক গুরুভার প্রবন্ধ গ্রন্থ জনপ্রিয় উপন্যাসের মত কাটে না তাই ইদানীং এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহের অভাব আছে, সেই অবস্থায় এমন একখানি সুমুদ্রিত মননশীল প্রবন্ধের বই প্রকাশের ব্যবস্থা করায় পাঠক সমাজের কাছে তাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজন।

—[illegible]

ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ — লেখক—শ্রীদিলীপকুমার রায়। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য—বার টাকা।

সাহিত্যের খবর

সাহিত্যে পুরস্কার ।। যিনি পুরস্কার পান তাঁর বিশেষ কিছু এসে যায় না; কিন্তু যিনি পুরস্কার পান নি, তাঁর অনেক কিছু এসে যায়। তাই দেখি, সাহিত্যে পুরস্কার প্রদান সম্পর্কে অনেকে বিক্ষোভ জানালেও কিন্তু মনে মনে পুরস্কার লাভের ইচ্ছা অধিকাংশই পোষণ করে। প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক রবার্ট পেন ওয়ারেন সোজাসুজিভাবে তাই বলেছেন—'না, আমি পুরস্কারের বিরুদ্ধে নই। আমি পুরস্কার লাভ অপছন্দ করি না। যদি বলি অপছন্দ করি, তাহলে একটা ডাহা মিথ্যে বলা হবে।'

কথাগুলো বলেছেন মাত্র কয়েকদিন আগে ওয়াশিংটনের এক সাহিত্য সভায়। এই সভায় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেস' কর্তৃক প্রদত্ত 'ন্যাশনাল মেডেল ফর লিটারেচার' গ্রহণের জন্য। এই পুরস্কারের সঙ্গে আরো পেয়েছেন পাঁচ হাজার ডলার। ১৯৬৫ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে এবং এর আগে যাঁরা এই পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ডব্লু, এইচ, অডেন, কনার্ড আইকেন, ম্যারিন মুর, থর্নটন উইলডার ও এডমণ্ড উইলসন।

রবার্ট ওয়ারেন এর আগেও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁর 'পুলিৎজার' পুরস্কারের কথা। তিনিই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি কবিতা ও উপন্যাসের জন্য দুবার এ পুরস্কার পেয়েছেন। অন্যান্য যে সব পুরস্কার তিনি পেয়েছেন তার মধ্যে 'সেন্ট ভিনসেন্ট মিলে পুরস্কার' 'বোলিনজেন পুরস্কার', 'এডনা পুরস্কার' ইত্যাদি উল্লেখ্য।

ওয়ারেনের বর্তমান বয়স ৬৫। এ পর্যন্ত তাঁর ৮টি উপন্যাস এবং শতাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও কয়েকদিনের মধ্যে আর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হবে। তাঁর স্ত্রী এলিনর ক্লার্কও একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও বেশ বিচিত্র। বাড়িতে কুকুর-বেড়ালে ভর্তি। এদের নিয়ে তাঁর অনেক সময় কেটে যায়। অবশ্য আঠার বছরের এক কন্যা, সতের বছরের এক পুত্র এবং সবশেষে তাঁর স্ত্রী রয়েছেন, যাঁদেরকে নিয়ে তাঁর সুখের পরিবার।

ইংরেজি অনুবাদে সংস্কৃত নাটক ।। এক সময়ে পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখকরা সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তখন তাঁরা কিছু কিছু সংস্কৃত বইয়ের ইংরেজি অনুবাদও

করেন। কিন্তু তারপর এ ব্যাপারে বেশ ভাটা পড়ে। সম্প্রতি আবার এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকজন প্রখ্যাত ভারতীয় ও বিদেশী অনুবাদক সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ প্রকাশে অগ্রণী হয়েছেন। শ্রী সি. সি. মেহতা তিনটি সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন সম্প্রতি। এই নাটকগুলি হলো. রাজা মহেন্দ্র বিক্রমের 'ভাগবত-অজ্জুকম' এবং 'মত্তবিলাস' আর বৎসরাজের 'উভয় অভিসারিক'। যাঁরা সংস্কৃত জানেন না, তাঁদের কাছে এই অনুবাদগুলি খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ॥

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের জামশেদপুর শাখার পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মেলন সম্প্রতি টেলকো সবুজ কল্যাণ সঙ্ঘ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডাঃ রাজ্যেশ্বর সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শাখা সভাপতি ডাঃ অজিতকুমার বাগচি সকলকে স্বাগত জানান এবং এই সম্মেলনের ঐতিহ্য বর্ণনা করেন। শাখা সম্পাদক শ্রীউষাকান্ত রায় স্থানীয় বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতার আবেদন জানান।

দ্বিতীয় দিনে কথাসাহিত্য শাখার অধিবেশনে জনপ্রিয় সাহিত্যিক শংকর উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক সুচিন্তিত ভাষণে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জার্মান ভাষায় ভারতীয় রূপকথা

ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ এখন বিদেশে হচ্ছে খুব ধীর গতিতে। তাও আধুনিক কবিতা কিংবা গল্প-উপন্যাসের নয়, প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের। অরুণ রায়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের ওপর একটি বই লিখেছিলেন ডঃ মোদে। পূর্ব জার্মানী থেকে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে জার্মান ভাষায়।

সম্প্রতি জার্মান ভাষায় ভারতীয় রূপকথার একটি সংকলন বেরিয়েছে লাইপৎসিগ স্টেট পাবলিশিং হাউস থেকে। তাদের খবরে প্রকাশ, রূপকথাগুলি অনুবাদ করেছেন লিলো তপচিনস্কি, হেরমান কাকাবেদজে এবং মেরী নিকারেদজে।

এই সংকলনে স্থান পেয়েছে একশটিরও বেশী ভারতীয় রূপকথা। 'বিশ্ব রূপকথা গ্রন্থমালা' নামে বহু খণ্ড সমাপ্ত একটি সিরিজের অন্যতম বই হিসেবে সংকলনটি বেরিয়েছে। শোনা যায়, জার্মান ছেলে-মেয়েদের কাছে বইটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশে এখন সাহিত্যের হাওয়াটা অনেকটা এলোপাথাড়ি। বই বেরুচ্ছে কম। কাজ যাদের চাড় যাদের, সাহিত্যের কাগজ-খাতা নেই। মাঝে মাঝে দু'একটা সভা হয় এখানে ওখানে। বিষয় সাহিত্যের আলোচনা নয়, সাহিত্যিকের জন্ম কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী। এই শীতে কোথাও গল্প-কবিতা পাঠের আসর বসলে মন্দ হতো না।

সেদিন কফি হাউস থেকে বেরিয়ে আসছি। জনৈক তরুণ ঔপন্যাসিক প্রশ্ন করলেন, সাহিত্যের খবরাখবর কি?

বললুম, আপনারাই তো স্রষ্টা। লিখছেন কেমন?

—না, এবার লিখতে পারছি কই। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। এখন আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি। লেখার ধরণধারণও পালটাতে হবে। গতানুগতিক রম্যোপন্যাস লিখে আর দিন কাটছে না। হয়তো সামনেই আসছে দিনবদলের পালা।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনলুম, অমৃতে প্রকাশিত 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড বেরোবে শীঘ্রই। যেমন মুক্তি য়া শিবাজীর 'কুরুক্ষেত্র' বেরিয়েছে কয়েকদিন আগে। সদ্য পরলোকগত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ উপন্যাস ছাপা হতে চলেছে দ্রুতগতিতে। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক একটা কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন প্রকাশের জন্য। তাও হয়তো ছাপা হবে অদূরভবিষ্যতে।

এখন লিটল ম্যাগাজিন বেরুচ্ছে কম। আবার ঝাঁক বেঁধে সবাই নেমে পড়লে আর এমন অবস্থা থাকবে না। অনেক—অনেক কাগজ বেরুতে থাকবে কোলাহল করে। কেবল সময়ের প্রতীক্ষা।

জাতীয় পুস্তক প্রদর্শনী

সরকারী উদ্যোগে ভারতীয় বইয়ের একটি প্রদর্শনী চলছে এখন মাদ্রাজে। গতবার কলকাতায় এই প্রদর্শনী হয়েছিল। স্বভাবতই বাংলা বইয়ের সংখ্যা ছিল একটু বেশি। এবার মাদ্রাজে বাংলা বই প্রদর্শিত হচ্ছে কম। প্রকাশকদের বক্তব্য, বই পাঠিয়ে লাভ নেই। শুধু শুধু গাঁটের পয়সা খরচ করে যাওয়া। না পাওয়া যায় বই ফেরত, না পাওয়া যায় বইয়ের দাম।

অন্য একজন প্রকাশকের মতে, গত দুই বছরে বাংলাদেশের প্রকাশকরা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বই ছাপতে পারেননি, যা সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে পাঠানো যায়।

প্রকাশকদের আর্থিক দুর্ভিক্ষের, এবং স্থানীয় পাঠকের ওপর অতি-নির্ভরশীলতার জন্য—জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালী পাবলিশাররা ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীটির উদ্বোধন হয়েছে ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ সাল। আগামী পনেরোই জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে।

সিগারেট নয়, মিনি পত্রিকা

ডবলডেকার বাসের গায়ে, সামনের কাচ বরাবর ধরেই একটা লাল রঙে ছাপা কাগজ দেখা যাচ্ছে। তরুণতম কবি-সাহিত্যিকরা উত্তেজনার একটা খোরাক জোগাতে যাচ্ছেন। কেউ লক্ষ্য করছেন, কি করছেন না—সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। বোধহয়, রোম পোড়ার সময়ে নীরোর বেহালা বাদনের শিক্ষাটি ওদের জানা নেই। কিংবা জেনেশুনেই তাতে তাঁরা উল্লাস বোধ করছেন

সেদিন কফি হাউসে একটি ছেলে মিষ্টি হেসে বলল, নিন। হাতে নিলুম। ধন্যবাদ জানাতেই বলল, সিগারেট নয়, মিনি পত্রিকা। আমি কৌতূহলী হয়ে তার ভাঁজ খুললুম। লম্বা সাইজের একটা কাগজে (হ্যান্ডবিলের মতো) কিছু গল্প-কবিতা ছাপা হয়েছে। সবই সংক্ষিপ্ত। দেখতে মন্দ লাগছিল না।

ভাবছিলাম, আর কিছু করার না থাকলে এভাবেই কিছু উত্তেজনা যদি পায়, তাহলে ওরা পাক।

পত্রিকাটির নাম 'মাঝি'। ফিলটার টিপড সিগারেটের মতো পাকিয়ে, একপ্রান্তে হলুদ কাগজ দিয়ে গোল করে এঁটে দেওয়া। পুরো দশটা পত্রিকা পাওয়া যায় একটি সিগারেটের প্যাকেটে। তার ওপরে লেখা আছে 'মাঝি'। সতর্কতাসূচক একটা লাইন: সিগারেট নয়, মিনি পত্রিকা। যেন কেউ ভুল করে—সিগারেট ভেবে ধূমপানের চেষ্টা না করেন।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের আকাদমি প্রকাশ ভবন থেকে 'ডী ফ্রাউ ইম মডার্নেন হিন্দী রোমান' (ভারতীয় নারীর সমস্যা ও ১৯৪৭—পরবর্তী হিন্দী উপন্যাসে তার প্রতিফলন) নামে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জি ডি আরে এ-ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ এই প্রথম। গ্রন্থে ১৮ জন সমসাময়িক লেখকের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন গুরু দত্ত, ভাগবতী চরণ বর্মা, অমৃতলাল নাগর, জৈনেন্দ্র কুমার, অজ্ঞেয়, যশপাল, রেণু, রাজেন্দ্র যাদব, নাগার্জুন ও উপেন্দ্রনাথ আস্ক। গ্রন্থের ডঃ ডি আনসারি ভারতীয় নারীর বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

—চার্বাক

নতুন বই

শ্যামাপ্রসাদ : ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব : বীরেশ মজুমদার। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩। পাঁচ টাকা।

বাংলা তথা ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি বিরল ব্যক্তিত্ব। যেমন ঘটনাবহুল তাঁর জীবন, তেমনি গভীর তার প্রতিক্রিয়া। এই গ্রন্থের লেখক ব্যক্তিগতভাবে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি সমর্থন না থাকায় কুণ্ঠিত ছিলেন লেখার ব্যাপারে। পরবর্তীকালে বিরোধী নেতা হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ যে ভূমিকা পালন করেন, তাতে তাঁর প্রতি লেখকের আকর্ষণ বাড়ে। এই গ্রন্থ সেই আকর্ষণের ফল।

বইটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথাক্রমে (১) প্রথম জীবন—শিক্ষাক্ষেত্র, (২) রাজনীতি ক্ষেত্রে—স্বাধীনতার পূর্বে, (৩) রাজনীতি ক্ষেত্রে—স্বাধীনতার পরে : (ক) রাষ্ট্রপতির ভাষণের আলোচনায়, (খ) বিনা বিচারে আটক আইন, (৩) রাজনীতি ক্ষেত্রে —কাশ্মীর (৪) গণ আন্দোলন ও আত্মোৎসর্গ : বীরেশবাবু লিখছেন : 'যদি ইহা জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া বর্তমান তরুণ বিচারবুদ্ধিকে অনুসরণ করিবার প্রেরণা জাগাইতে না পারে, তাহা হইলে আমার অক্ষমতাই শুধু তাহার জন্য দায়ী, একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা নাই।''

'আমাদের ধারণা, তিনি সফল হয়েছেন। ঐতিহাসিক বর্ণনাতেও তিনি সার্থক। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : "শ্যামাপ্রসাদের নাতিদীর্ঘ জীবনে দেশে এমন অনেক গুরুতর ঘটনা ও অবস্থা বিপর্যয় ঘটিয়াছে, যাহাতে তিনি একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকলের সম্যক আলোচনা দ্বারা লেখক শ্যামাপ্রসাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"

মহেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও মনীষা [জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ]—সম্পাদক মনীলবিহারী ঘোষ।। বিবেকানন্দ জন্মস্থান সমিতি, ১৮।১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৬।। দাম : দশ টাকা।।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'অই আম কোয়াইট প্রাউড অব হিম।' যাঁরা মহেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরাই জানেন, তাঁর মনীষার পরিচয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ বলেছিলেন : 'মহিম আমার সাদা কাপড়ে সন্ন্যাসীর বড়া।' তবু মহেন্দ্রনাথ দত্ত সাধারণ্যে তেমন পরিচিত নন। বিবেকানন্দের জীবন ও দীপ্তি তাঁকে নিষ্প্রভ করেছে। তার ওপরে, তিনি ছিলেন সঙ্কলনের সম্পাদকের মতে, গভীর মননশীলতা ও অধ্যাত্মমানস— ভারত সংস্কৃতির দুই স্রোত—স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে মহেন্দ্রনাথ আয়ত্ত করেছিলেন। এই সঙ্কলনের বিভিন্ন লেখায় মহেন্দ্রনাথের জীবন, পারিবারিক ইতিহাস, এবং চরিত্রের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রচনাগুলি তিনটি ভাগে এবং দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। লিখেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, কুমারেশ ঘোষ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, শৈলেন্দ্রনাথ দে এবং আরো অনেকে। ইংরেজী প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে সাতটি। মহেন্দ্রনাথের কতকগুলি লেখার পুনর্মুদ্রণ সংযোজিত হওয়ায় সঙ্কলনটি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। দশম অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে তাঁর গ্রন্থপঞ্জীর বিবরণ।

সাধারণ পাঠকের পক্ষেও সঙ্কলনটি সুখপাঠ্য এবং সংগ্রহযোগ্য বলে আমরা মনে করি। মহেন্দ্রনাথকে লেখা আচার্য নন্দলাল বসুর চিঠিগুলি মূল্যবান।

কি পাই নি? (উপন্যাস)—পারুল ঘোষ। অনুরাধা প্রকাশনী। ১।৭, নন্দলাল বসু লেন, কলকাতা-৫। দাম : পাঁচ টাকা।

পরাধীন ভারতের মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত কাহিনী এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় এই উপন্যাসের বুনন ও বিস্তার। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এসেছে অহিংস, সেবাধর্ম গান্ধীবাদ। এই দুই প্রবাহের প্রাণগঙ্গায় পরিপূর্ণভাবে অবগাহন করেছিল এদেশের মুক্তি পাগল অসংখ্য মানুষ। অগ্নিমন্ত্র ও অহিংসা প্রেমে দীক্ষিত দুটি কেন্দ্রচরিত্র সন্ত্রাসবাদী মহিমানাথ ও অহিংসবাদী দ্বারকানাথকে ঘিরে আরো অসংখ্য জীবন আবর্তিত হয়েছে আপনাপন প্রাণধর্মে। সেই পুরনো দিনের কাহিনীকে জীবন্ত করে তুলেছেন শ্রীমতী পারুল ঘোষ।

পার্বতী (ছোট গল্প)—মাধুরী রায়। প্রকাশক : দীপক রায়। ২-এ কবীর রোড, কলকাতা-২৬। দাম : তিন টাকা।

ছোট ছোট আটটি গল্প। একটি দিনের কাহিনী, ফরেস্টার পার্বতী যাযাবর, পাহাড়ী গাছের ইতিহাস, রাজকন্যার কোঠো কাঠি সাহেবের মেয়ে ও ঘুম...পাহাড়ের কথা নিয়েই পার্বতীর সৃষ্টি। সমস্ত গল্পের পটভূমি পাহাড়ী অঞ্চল—কার্সিয়াং-দার্জিলিং। এই পাহাড়ে যে সরল সাধারণ মানুষেরা বসবাস করে নানাভাবে রুজি-রোজগার করে অধিকাংশ কাহিনীই সেই সব সরল—সাধারণ মানুষদের দুঃখ সুখকে ঘিরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন লেখিকা।

বিপ্লবী গজাদা—নিমাইকুমার ঘোষ : মোহন লাইব্রেরী। ৩৫-এ সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা-৯। দাম : তিন টাকা।

জীবন যন্ত্রণা আর যুগ যন্ত্রণার কাহিনী পড়তে পড়তে মনপ্রাণ যখন ক্লান্ত ঠিক তখনই বিপ্লবী গজাদার মতো মজার কাহিনী রিলিফের মতো কাজ দেয়। গজাদা একটি কাল্পনিক চরিত্র। এই কৌতুক কাহিনী বিস্তার করেছেন শ্রীনিমাইকুমার ঘোষ।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

পার্থসারথি (পৌষ, ১৩৭৭) সম্পাদক : প্রীতিকুমার ঘোষ। ৫।এ অক্রূর বোস লেন, কলকাতা-৪। পঁয়তাল্লিশ পয়সা।

ধর্ম সম্পর্কীয় জাতীয়তাবাদী পত্রিকা। ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা তাত্ত্বিক আলোচনা এতে আছে। আছে কবিতাও। লিখেছেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী তুলসী, শান্তশীল দাস, শুক্লা ঘোষ, বীরেশ্বরপ্রসাদ বকসী, হরিপদ চক্রবর্তী, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অনিলবরণ রায়, রাধাচরণ রায় প্রমুখেরা। ধর্মপিপাসু পাঠক-পাঠিকাদের ঈশ্বর-ভাবনার অনেক খোরাক এতে আছে।

জাগরণী (১ম বর্ষ : ২য় সংকলন) সম্পাদক : দেবকুমার বসু। ৬ ঈশ্বর মিল লেন, কলকাতা-১৬। পঁচিশ পয়সা।

তরুণ লেখক-লেখিকাদের গল্প-প্রবন্ধ-কবিতার সংকলন এতে স্থান পেয়েছে।

টলিউড (জানুয়ারী ১৯৭১)—সম্পাদক অমিতাভ মিত্র।। ৩৬।৪।৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দাম ১-৫০ টাকা।।

হলিউডের অনুকরণে টলিউড? না অন্য কোনো ইঙ্গিত? পত্রিকাটির নামকরণের রহস্য আমাদের জানা নেই। চেহারা চরিত্র দেখে অনুমান হয় সিনেমা-মার্কা একটা কাগজ করাই সম্পাদকের উদ্দেশ্য। এ সংখ্যায় লিখেছেন সুস্মিতা দাস, প্রহ্লাদ সাহা, অমিতাভ মিত্র, অখিল রায়, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পত্রিকাটির জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করে সম্পাদক লিখেছেন : 'হতাশার অন্ধকারে এক ঝলক বেপরোয়া বিদ্যুতের আলোর এক পলকে দেখলাম স্থানটুকু, ধাঁধিয়ে গেল চোখ দুটো। তবুও ঝাঁপ দিলাম। টলিউডের জন্ম হল।' অবশ্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পাদক সন্দিহান।

ইনি সুচিত্রা দেবী

পাকা গিন্নী—দুই ছেলের মা
ঘুমপাড়ানী গল্পের ঝুড়ি

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

বারো মাস তিরিশ দিনই সুচিত্রা ব্যস্ত— সারাদিন তার কাজ লেগেই আছে। সে বলে, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব ঝক্কিই সামলানো যায়।

তাইতো সুচিত্রা হরলিক্সের ওপর অতটা নির্ভর করে। হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্সের পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন সুচিত্রাকে সারাদিন উদ্যম আর উৎসাহ যোগায়।

হরলিক্স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এত গুণ। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি এবং বাড়তি শক্তি দেয়।

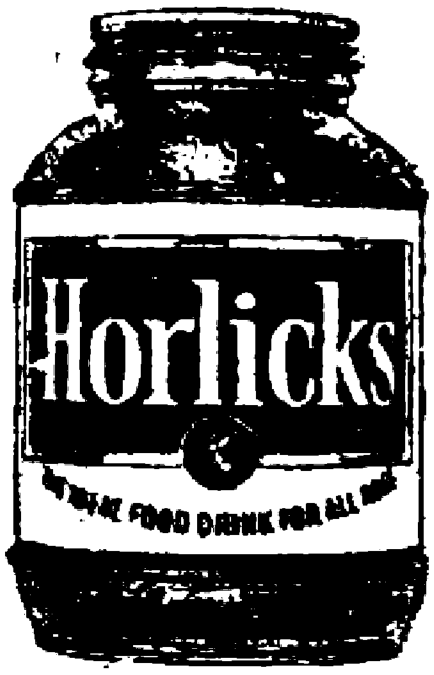

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1863A

জাগাল

দুর্গাদাস ভট্ট

রাতের ঘোর ফুরিয়ে আসা মাত্রই দিনটি যেন আপন মর্যাদায় উজ্জ্বল হয়েছিল। দমকা বাতাসে হু হু করছে চারধার। বাদলী তার অশান্ত মন নিয়ে আকাশ দেখছিল।

পুকুর থেকে হাঁসের দল উঠে এসে পালকের ফাঁকে ঠোঁট দিয়ে জল ঝাড়ছে। ছটফট করছে। সামনের গোবর্ধন নালার ওপর বুকে থাকা ঝোপা ফুলে ভরা গাছটা ঝাঁকি দিতে ইচ্ছে হল বাদলীর। ঝাঁকি দিল। পাকাফুলের বৃষ্টি হ'ল চারধারে। অদূরের খোলা মাঠে ভেড়ার পাল চরছে। অচেনা একজন বটতলায় বসে রোমশ একটা ভেড়াকে কাত করে ফেলেছে, কাঁচি দিয়ে লোম কাটছে।

আজ যেন সবকিছুই সুন্দর হয়ে এসে ধরা দিয়েছিল। বসে বসে সাঁওতাল ধনবন্তের মত [illegible] বুলিয়েছিল বাদলীর চুলগাছে হাত বুলিয়েছিল। কে যেন অজানার গোচরে। বাইরের জগতে এত আয়োজন—তবু বসন্তের দেখা নেই।

অভ্যাসমতই গোবরজল দিয়ে উঠোন নিকালো। গোয়াল থেকে গরু-দুটো বার করে এনে গোয়াল পরিষ্কার করল। গরু-দুটোকে সামনের মাঠে নিয়ে গিয়ে খোঁটায় লম্বা দড়ি দিয়ে চরতে দিয়ে এল। এবার উনুন নিয়ে বসা। উনুনে জ্বালিয়ে ভাত চাপিয়ে দিয়ে চুলের জট ছাড়াতে বসবে বাদলী। কিন্তু সব কাজের মধ্যেই একটা নরম স্তর জেগে উঠছে।

এত দেরী তো হওয়ার নয়, বাদলী দেখল কলা ঝোপের ওপর রোদ এসে পড়েছে। কুয়াশা নেই। অন্যদিন এতক্ষণ স্নানের জন্যে তৈরী হয় বসন্ত। তেল মাখতে মাখতে গান করে। সে সব কথায় রাগ বিবাদ গালাগালি সবই থাকে। বাদলীও রেগে ওঠে। আজ সে যেকোন অবস্থার জন্যে প্রস্তুত তবুও মন্দটা সরছে না।

ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে উনুনের কাঠটা বাড়িয়ে দিয়েছে বাদলী। সকালটা শিখার শীতের সকাল উষ্ণ হয়ে উঠছে। ও স্পষ্টই বুঝতে পারছে বসন্ত আজ স্নানের আগে ভাত খেতে চাইবে। আর ভাত খেতে খেতেই চোখ জুড়ে ঘুম আসবে। সোহাগ কিম্বা ঝগড়া কোনটাই মনে পড়বে না বসন্তের। তা না পড়ুক তবু বেশ

দেরী না করে আর। এমন তো ওর হয় না এত দেরী। মাথা উঁচু করতেই দেখতে পেল তার গাইগরুটা একটা মাঠে ঘাস খেতে খেতে চোখ তুলে চাইছে। জল তেষ্টা পেয়েছে হয়ত। উঠে গিয়ে ওকে নালার ধার পর্যন্ত এনে জল খাওয়াল বাদলী। তারপর আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে খোঁটায় বাঁধল। ঘুরতে গিয়ে দেখল দূর থেকে ধরাধরি করে কারা যেন একটা মানুষের দেহ বয়ে নিয়ে আসছে। তবু চিনতে ভয়। যতক্ষণ না চিনে থাকা যায়। উদ্ভট সত্যটাকে যতক্ষণ না চিনে থাকা যায়। সেইটুকুই নিরাপদ। তবু ভিতরটা যেন চিনচিন করে উঠছে। পট করে চোখ চেয়ে বিকট একটা ঘটনাকে চিনে নেওয়া মাত্রই নিজেকে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলার মত হয়। তবু কাঁদতে পারে না। এগুতে পারে না। শুধু তারাপদ বলে—ভয় নেই গো প্রাণ আছে। ভাল করে বদ্যিআত্তি করো।

কালী বলে—ডাক্তারকে খবর দিইছি। এল বলে।

এখন দুপুর। খড়ের চাল দেওয়া ঘরটিতে শোকের রোদ ঘিরে আছে। দূরে হট্টিটি ডাকছে। দরজার ফাঁক দিয়ে রোদের টুকরো ভিতরে এসেছে। খাটিয়ার ওপর বুক চিতিয়ে পড়ে আছে বসন। কালো একখানা মাংসল পাহাড়। ডাক্তার এসে সব গুলি ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিয়ে গেছে। মাথায় চোট লেগেছে বেশী। প্রথমে যে সব জায়গায় রক্ত ভেজা ভেজা হয়েছিল ডাক্তারের নির্দেশমতো গরম জল আর তুলো দিয়ে সেগুলিকে মুছিয়ে দিল। জ্ঞান ফিরেছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে।- একটা অজানা প্রতিজ্ঞা কিম্বা প্রত্যয়, বাদলীর মনে হচ্ছে একটা কিছু বলতে চাইছে বসন। সমস্ত মন প্রাণ নীরবে চিৎকার করছে। বাদলী ওর বুকের ওপর গাল রাখে। এই সেই বুক যা রাতের ভিতরেও ঘুম কাড়ত। আলিঙ্গনের ঘনিষ্ঠ তাপ সারাটা দিন তার সব কাজ ভুলিয়ে দিত। বাপ বংশীলাল, মা যমুনা, ছোট বোন ফুলকি তাকিয়ে দেখত। এ কেমন বাদলী যে যৌবনবতী হয়ে উঠে তাবৎ সব যৌবনকে পিছিয়ে ফেলে তেজী ঘোড়ার মতো টগবগ করছে। অকারণে হাসছে বিনা কারণে কাঁদছে। কান্নাহাসির সব সুর রাতের সোহাগে ডুবে যাচ্ছে। বেষ্টিত হচ্ছে, নীরবে। চুপিসারে।

বিয়ে না দিয়ে উপায় ছিল না বলেই বিয়ে হল। বংশীলাল এই উপলক্ষে পাড়ার সকলকে পেটপুরে খাওয়াল। হাড়িয়ার বান ডাকল। গণ্ডারেতও বসল।

—এই ভাল হলরে বংশী। বসনের জোতজমি নেই ঠিকই। অমন পাহাড়ের মত দেহখান তো আছে। তোর মেয়ে সুখেই থাকবে।

এখন, আজ এই মাটিলেপা ঘরের ঘনা আলোর ভিতর থেকে বুকফুড়ে উঠছিল।—অনেকদিন পরে বসনকে সে নিবিড় করে পেয়েছে। ওর হাত বোলাচ্ছে। বাদলী বুঝতে পারছে না তার করতল-স্পর্শে বসনের কতটুকু আরাম। আবেশ। বসন শুধু এক-আধবার চমকে চমকে উঠছে। বেলা বেড়ে ওঠার সঙ্গে ঘরের ভিতরটা আগের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। বসনের প্রতিটি ভঙ্গী মুখের রেখা যেন পড়তে পারছে বাদলী। ও মাঝে মাঝে চোখ খুলছে আবার পিটপিট করছে।- ঠোঁটের ফাঁকে চাপা হাসছে যেন। বাদলীর মনে হয় আভাসে কি একটা বলতে চাইছে বসন। বাদলী তাই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

বসনের ঠোঁট নড়ে।

—আমাকে খতম করবে ওরা। আমিও দুটোর ঠ্যাঙ্ ভেঙে দিইছি।

—কেন? ওরা কি করেছিল।

—ধান চুরি করতে এসেছিল। ওরা জানে না এ চত্বরের জাগাল হচ্ছে বসন বাগ্দী আমার সঙ্গে চালাকি!

—কিন্তুক তোমার হালটা কেমন করেছে। আর একটু হলেই...

বাদলীর সন্ত্রস্ত চোখদুটির ওপর হাত বাড়িয়ে কাছে টানতে চাইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই কঁকিয়ে উঠল। বগলের কাছে আঘাত আছে। তাতে চাপ পড়ায় ব্যথা পেয়েছে বসন। বাদলী তাড়াতাড়ি ওর হাতটা শুয়ে থাকা বুকের ওপর স্থাপন করে দেয়। নিজেও আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে শুয়ে বসে।

—মোকো না চুলা নিভে গিইছে, ঠিক করে দিয়ে আসছি।

—না গো...

বসনের গলায় অন্তর যেন ফেটে বেরোয়।

—কেন কি হল?

বাদলী বিছানা থেকে উঠে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল তড়িৎ গতিতে ফিরল।

—তুমি যেও না, তবু মনে হবে আমার কাছাকাছি কেউ আছে। তখন কত থাকলাম, আশে-পাশে আরো কয়েকজন ছিল, কিন্তু কেউ এল না আমি ওদের মারলাম। ওরাও আমার মাথায় বাড়ি মারল। আমি ধান আগলাতে পারলাম না...

বাদলীরও চোখের সামনে একখানা জমাট রাত পাক খাচ্ছে, সে রাত আদৌ অপরিচিত নয়। ক্ষণে অক্ষণে আল পথ ধরে সে পাকা ধানের চৌহদ্দিতে গিয়েছে। কখনো হিমঝরা রাতে চাঁদ উঠেছে কখনো অন্ধকার। আবার আলোর চোখ সওয়া হয়ে এলে বাদলী দেখেছে নির্দিষ্ট জমির এক কোণে বাঁশের মাচানের ওপর বসে আছে বসন। বিড়ি ফুঁকছে। এইভাবে একা একা এতটা পথ অতিক্রম করে আসায় বাদলী ধমক খেয়েছে। কিন্তু এই নির্জন অন্ধকারে ধান পাহারা দেওয়াটা যে নিরাপদ নয় সে কথাটাও বলতে ছাড়েনি বাদলী।

সকাল তখন শেষ হয়ে আসছিল। রোদে তেজ ধরেছে। বাদলীর মনে হল ওকে সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা। ভয় দেখানো নিরর্থক। শরীরটা এখন কমজোরী হয়েছে তাই ভয়ের কথা মুখ ফুটে বলছে বসন। ওর একটু ঘুমঘুমে ভাব দেখে নিজের ফেলেরাখা কাজগুলো শুরু করল। নিভে যাওয়া চুলা ধরিয়ে কাঠকোটালি গুঁজে দিল। নিজের চোখেই ঘরদুয়ার আজ অপরিষ্কার ঠেকছে। জল ন্যাতা নিয়ে মাটির মেঝে মুছতে বসল বাদলী। কাজের ফাঁকে মানুষটাকে দেখলে আর বেদনা-মিশ্রিত খানিকটা সুখ লাল হয়ে উঠছে। সকাল থেকেই কেমন যেন হাল্কা মনে হচ্ছিল আজ। মাঠ গাছ কলাঝোপের সবুজ বিস্তার পাতানিবিড় ঝোপঝাড়ও এই ঠাণ্ডা-গরমে মেশা সকালে তাকে হাত বাড়িয়ে ডাকছিল। নিজেকে কেমন যেন ভাবুক মনে হচ্ছিল বাদলীর। সে যে এমন করে ভাবতে পারে ইতিপূর্বে জানত না এমন সময় পেটের বাচ্চাটা নড়ে উঠল। বাদলী জানে না এইটাই ঠিক পরম সুখের

সুজনী প্রেসের বই — প্রকাশিত হল
রাজ চক্রবর্তী
প্রণীত—
সেই মন সেই দাহ
প্রেম, পতন ও প্রবঞ্চনার রোমাঞ্চময় একটি অনন্য উপন্যাস ১২·০০
লাস্ট অপারেশন
প্রথম সংস্করণ — নিঃশেষিতপ্রায়
বহু প্রশংসাধন্য লেখকের আরেকটি রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস ৫·০০
পরিবেশক : ১) ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলি—৬
২) মডেল পাবলিশার্স, ২৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

কারণ। যে সম্ভোগ এতোদিন সম্পদের আকারেই ছিল। অন্তত তার নিজের কাছে। পড়শীরা যদিও অনেক আগেই অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন, তবু বাসন্তীর মন যেন ততটা জেগে ওঠেনি। আজ শেষ রাত থেকে নড়ে উঠে সব প্রশ্নের অবসান ঘটিয়েছে। ঘরে ঘরে এমন একটি শীতের দিন আলাদা ভাবে রূপ পেয়েছে। প্রায় অলৌকিক। যেখানে বসনও আছে। অন্য-দিনের মতো হুটোপুটি করে ছুটছে না। সবুজ কাপড়চোপড়ের নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো বাসন্তীর বুকের কাছে শুয়ে আছে।

তবে কি বসনের এইভাবে ঘরে থাকাটাই সে চাইছিল? আনমনে মাথাকে ঝাঁকাল বাসন্তী। ভাতের ফেনা উপচে উঠে উনুনে পড়ল। আগুনটা আবার নিবু নিবু হয়ে আসতেই শুকনো পাতা দিয়ে কাঠ-গুলিকে আবার উস্কে দিল। টগবগ করে ভাত ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাহ্নের কাজের দিকে মন ফিরালো বাসন্তী।

খাওয়া শোয়া আর অন্তরের ভিতর থেকে আসা কথায় এখন ওরা মুখর। দুদিন যেতে না যেতেই বাঁচবার মত মন পেয়েছে বসন। ঘরে দাওয়ায় বসে বাসন্তীর কাজকর্ম দেখছে। হাঁটা-চলায় আগের এখনো বাসন্তীর ওপরেই নির্ভর করতে হয়। যে মানুষটা চোখের পলকে পার হত। এক ঝাঁকুনিতে বাসন্তীকে বুকের ওপর টেনে আনে। হাতের মুঠোয় বাসন্তীর পলকা দেহ দুটো তুলে নিয়ে ঠিক চাপ দিলেও হয় না কঁকিয়ে ওঠে বাসন্তী। ফিক করে হেসে উঠত বসন— হাত নেড়ে ফুলের পাপড়ি দুম করে বসনের বুকের ওপর ভিজ বাঁধিয়ে দিত বাসন্তী। ছুটে পালাত। আর এখন? বাধ্য শিশুর মতো বসনই বসে আছে। বাসন্তীও পালায় না। অকারণে ছুটোছুটি করে না। বসন এখন এত বাধ্য যে বাইরে নিয়ে যাবে। উঠোনে বসালে উঠবে। এখন গোয়াল পরিস্কার করছে বাসন্তী। তারপর উঠোনটা গোবরজল দিয়ে নিকোবে। যদিও ইতি-মধ্যে দুই বেলা হয়ে গেছে। কিন্তু দুধ জ্বাল দেওয়া হয়নি। দুধ জ্বাল দিয়ে গরম দুধে চিঁড়ে আর কলা দিয়ে বসনকে খেতে দেবে। সেই আশাতেই বসে আছে বসন। জুলজুল করে চাইছে। বাসন্তীর ঘোরা-ফেরা অবাক চোখ দিয়ে উপভোগ করছে।

সকালটা মেঘে ঢাকা ছিল। কিছু পরে এলোমেলো হাওয়ার শুরু। বাতাসটা বেশ কনকনে লাগছে। বাসন্তী দেখল দাওয়ায় উঠোনে কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করার পর ঘরের মধ্যেকার খাটিয়ার ওপর গিয়ে বসন আবার শুয়েছে। খালি গায়ে শুধু একখানা পাতলা চাদর জড়ানো। অথচ গরম চাদরটা ইতিমধ্যেই সে তার হাতের কাছে রেখেছিল। উনুনে দুধ জ্বাল দিয়ে দ্রুত তাড় চড়াল বাসন্তী। তারপর ঘরে এসে চাদরটা হাতের ওপর ভাঁজ করে নিয়ে বসনের পিঠের কাছে বসল। বসন তখন খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে জানলা দিয়ে মাঠ দেখছিল। সকালের কুয়াশা উষ্ণ রোদের স্পর্শে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। চাদরটা জুতসই করে গুছিয়ে নিল বাসন্তী হাতের ওপর। তারপর বসনের পিঠখানা ঢেকে দিল। ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরল বসন। বাসন্তী আরো ঘনিষ্ঠ হল। ওর কোমর ধরে টেনে আনল বসন। বসন শুয়ে, বাসন্তী ওর মাথার কাছে দাঁড়ানো। বাসন্তীর পেট বসনের প্রায় গালের পাশে। থলথলে নরমে ওর অজানায় একটি নবাঙ্কুর ধুকপুক করছে। বসন একবার কান পাতে। তার সমগ্র অস্তিত্ব মুহূর্তেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে একটা জোড়াখোড়া অবয়বকে গড়ে তুলতে চাইছে। যার স্পষ্ট চেহারাটাকে ধরতে পারছে না বসন। ওরা দুজনেই এই চেনা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ঘর এই দুয়ার, পানাবিদ্ধ ডোবা, মোল কুয়াশায় ঘেরা চেনা ভূখণ্ডটি রূপ কথার রাজ্য বলে মনে হয়: যা ধরতে গেলে পালিয়ে যায়, ছুঁতে গেলে হারিয়ে যায়। একটা দুর্লভ আবেশে চোখদুটো বুজে রয়েছে বাসন্তী। এই মুহূর্তকে বাঁচতে দাও। এই স্নিগ্ধ শান্ত নিবিড় স্পর্শ-সুখ যার সঠিক অর্থ খুঁজে যার কথা যায় না, সেই অনুভব সমস্ত বাসন্তী আর বসনকে ঘিরে নির্জন খেলা শুরু করেছে।

বাইরে যেন অপেক্ষা করছিল। মানুষের তার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে এগিয়ে আসে। ঘরের বাইরে সরু একটি খাল। যা অনুরবর্তী মালী অবধি গড়িয়ে গিয়েছে। উঠোন থেকে নামতে পাশের উঁচু ডাঙার ওপর কদমবেল গাছটার ওপর দুটো শালিক বসে আছে। তারা যেন কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল। খালের ওপর দিয়ে এপারওপার করার জন্যে যে আস্ত খেজুর গাছ ফেলেটি শুইয়ে রাখা আছে। তার ওপর দিয়েই টলতে টলতে এগিয়ে আসছে ওরা...আমাদের বসন্ত জাগানে কোথায় গো...গাঁয়ের বড়লোক জোতদার মহেন্দ্র বিশ্বাস হাঁক দিচ্ছে সঙ্গে তার মোসাহেবের দল। ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ায় বসন। গায়ে যেন অসুরের বল ফিরে এল— ওরে বাসন্তী, ওদের ডাক, ওদের ঘরে এনে বসা।

একে একে ঘরে এল ওরা। কেউ কেউ উঠোনেও বসল। অনেক কথার শেষ কথাটা শুনতে পাচ্ছে বাসন্তী। ঝাঁপের ফুটো দিয়ে মহেন্দ্র আর বসনকে দেখছে। মহেন্দ্রর মুখের ভাব যেন তাল তাল ননী। গদগদ। স্নিগ্ধ।

—হ্যাঁ বসনই হচ্ছে জাগান বুড়োর কুলমণি বেটা......তাই নামে সুখো।

সুখো নামক মোসাহেবটি জোরে জোরে মাথা নাড়ায়।—তা বাপ্‌, নিজের ক্ষেতন তুচ্ছ করে কর্তব্য করতে আর কেউ পারে না। এ আমি হককথা বলছি।

অপর একজন বলে। মহেন্দ্রর বড় মুখে বড় কথা ফোটে এবার।

হ্যাঁ আমার তামাম জমির জাগান এবার থেকে বসন। বিঘে পিছু ৫ আঁটি ধান তোর প্রাপ্য তুইই পাবি বসন। কিছু নগদ টাকাও পাবি। জানিস তো আমি এককথার মানুষ। আর গ্রীষ্মকালে যখন মাঠ ফাঁকা তখন কি করবি? বসনের দিকে একটা সুস্থ প্রতিশ্রুতির কথা ছুঁড়ে দেয় মহেন্দ্র। বসনের তখন বেহুঁশ দশা। সে বসে আছে কি দাঁড়িয়ে আছে জানে না। মুখ দিয়ে একটি অস্ফুট শব্দ ফেটে বেরোয়।

—ক...ক...কর্তা...

—গ্রীষ্মকালেও তোর ভাবনা নেই। আমার আমকাঁঠালের বাগানটাও এবার তোর হাতে জিম্মা দিয়ে নিশ্চিন্দি হতে চাই বসন।

বাসন্তী আর শুনতে পারেনি। তার কান মাথা দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। সে স্পষ্ট দেখছে বাগানেরা সেই সোনালী দিন যা এতক্ষণ তাকে ভাবিয়ে রেখেছিল, সেখানে আর একটুকু জায়গা নেই। ঘর দুয়ার, উঠোন কচি পানায় নিবিড় ডোবায় থেকে শুরু করে সুদূর মাঠটাও ধমকানে থকথক করছে। খোঁটায় বাঁধা আসন্নপ্রসবা গাভীটি বার বার মুখ তুলে বাসন্তীর দিকে চাইছে। ওর বোধহয় আকণ্ঠ তৃষ্ণা। ওকে এখুনি জল খাওয়ানো দরকার।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩১)

তখন কোরবানের পশুটা ভয়ে হাম্বা হাম্বা ডাকছে। যেন সে তার বাছুর হারিয়ে এই মানুষের মেলায় চলে এসেছে। সে তার অবলা চোখে সব দেখছিল। ভিড় ক্রমে বাড়ছে। ফেলুর একটা হাতে এত শক্তি! অন্য হাতটাতো ওর মরা। শুকনো লতার মতো শুধু গায়ে লেগে আছে। যে কোন সময় ফেলুর ইচ্ছা হয় ওকে টেনে ছিঁড়ে শরীর থেকে ফেলে দিতে।

ফেলু জীবটাকে এক হাতেই মসজিদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এক হাতেই সে ধর্মের নামে কত কিছু করতে পারে মানুষেরা দেখুক। অঞ্চলের মানুষেরা দেখুক, ফেলু, যে ফেলু এক হাত গেছে বলে সবাই পঙ্গু ভেবেছিল, যার বিবি আতরের গন্ধে পাগল হয়ে যায়, দিক-বিদিক ফাঁক পেলেই ছোটে, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, সেই ফেলু আজ এক হাতে এমন যে পুষে বড় করা জীব, জীব থেকে সে কত বেশি অনুদান পাবে আশা করেছিল, দিন নেই রাত নেই ঘাস চুরি করে এনে খাইয়েছে, দুবলা বাছুরটাকে সে কি আশ্চর্যভাবে সবল করে তুলেছে, সেই বাছুরকে সে এখন বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে ধর্মের নামে কোরবানী দেবে। কত বড় ফেলু এই যেন দেখানোর ইচ্ছা। যেমন সে হাডুডু ডু ডু বলে প্রতিপক্ষের উপর চেপে বসত তেমনি সে এখন ধর্মের নামে শরীরে জোস পাচ্ছে। এক হাত গেছে বলে তার কোন সরম নেই। বরং অন্য হাতটা এত বেশি শক্ত, এবং এত বেশি সাহস তার প্রাণে যে ধর্মের নামে এককোপে দশটা কাফেরের গলা নামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জ্বালা এই কোরবানের পশু নিয়ে। এতটা পথ সে বেশ টেনে এনেছে। দিতে দুটো প্যাঁচ দিয়ে বেঁধেছে বলে খুব বেশি একটা ছুটতে পারে নি। এখন কি বুঝতে পেরে চার পায়ের উপর শক্ত হয়ে গেছে। নড়ছে না। এতবড় মেলার ভিতর তাকে ছোট করে দিচ্ছে। সে যে ফেলু এটা কেন হালার গরু বোঝে না।

এই দশ ক্রোশের মতো পথ মোটা-মুটি ভালোয় ভালোয় চলে এসেছে। কোন গোঁয়ার্তুমি ছিল না। কিন্তু মসজিদে নিয়ে যেতে যত গোঁয়ার্তুমি। তা তুমি এক বাগি গরু আর আমি এক এক চক্ষু ফেলা। কে কারে পায় দেখা যাক। বলেই সে শক্ত হাতে আবার লেজটা মুচড়ে দিল। পাশের লোকেরা বলছে, আরে দ্যাখো মিঞা সিপাইগ কান্ড। নড়ে চড়ে নাই। ফাঁকা আওয়াজ করে। তোমাগ ডর দেখায়।

ফেলু তাচ্ছিল্য করে সব। তার ত সব জানা। জানা বলেই সে ভোররাতে আজান দিয়েছে। লোক জড় করেছে মিছিলের জন্য। মশাল জ্বালিয়ে সে সারারাত এ গাঁ ও গাঁ ঘুরেছে। সে মিছিলের শেষে। মিছিল যায় ধর্মের মিছিল। মিছিলে হাজার সবুজ পতাকা, লাঠি, সড়কি এবং দুলো উড়ছে। ওরা যায় আর যায়। যারা আরও দূরের মানুষ রাতে রাতে ওরা মশাল জ্বেলে বের হয়েছে। ওরা এসে গোলাকান্দালের বড় বটগাছটার নিচে সবাই থামবে। সেখান থেকে আবার লম্বা মিছিল। বিশ্বাসপাড়া, নয়াপাড়া, মুড়াকি, বর্দি এবং দক্ষিণ মাঠ থেকে যারা মিছিল বের করেছে ওরা হাসান পীরের দরগায় এসে থেমেছে। ওরা দেখেছিল হাসান পীরের দরগাতে তখন পাগল ঠাকুর। এতবড় মিছিল দেখেই তিনি বের হয়ে এসেছেন। তিনি বুঝি পীরের সঙ্গে একরকম কথা বলছিলেন। আর কোরবানের পশুটার কথা ছিল হাসান পীরের দরগা পর্যন্ত জোড়ে কদম দেবে—কারণ তখনও মিছিলটা পুরো মিছিল নয়, ওদের আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি শুনে আরও মানুষ এই মিছিলে যোগ দেবে, যারা দেবে না, কাফের তারা, তারা পবিত্র ইসলাম নয়, এমন সব লেখা আছে বড় বড় ইস্তাহারে। দরমাতে সব বড় বড় ইস্তাহার এঁটে নিয়েছে। মাথার উপর সেই সব ইস্তাহার। আর ক্রমে ওরা এগুচ্ছিল। হিন্দু গ্রামের পাশে এলেই ভয়াবহ ধ্বনি। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থরা ভয়ে বের হচ্ছে না মাঠে। কেবল পাগল ঠাকুর হাসান পীরের দরগায় মরা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার উপর অজস্র শকুন। ওরাও দেখছে একটা ধর্মের মিছিল যায়। কেউ কেউ উড়ে গেল। ফতনুর যাচ্ছে মিছিলটা দেখতে।

কোরবানের পশুটা পথে বেশ হাঁটছিল। আর এখন শক্ত হয়ে আছে। ফেলু কিছুতেই নড়াতে পারছে না; ঠিক যেমন হাসান পীরের দরগা পথে হলে একটা মশালের মিছিল দেখে চার পা শক্ত করে দিয়েছিল। সে এটা জানত। দলটা বড় হলে মিছিলে মশাল জ্বললে কোরবানের পশুটা ভয় পাবে। গলাটা টান টান করে রাখবে। দড়ি টানলে এক পা নড়বে না। চোখে-মুখে আতঙ্ক। আমারে তোমরা কোন পীরের দরগায় নিয়া যাইবা। এই ত যাচ্ছিল একজা পীরের দরগা, হাসান

পীরের দরগা—এহানে আমারে খাইখা যাও। মনের সুখে ঘাস খাই। কিন্তু শালীর শালী কোরবানের জীবটা একেবারে দুর্লাক চালে সেই যে হাঁটছিল আর থামেনি। মাঝে মাঝে ঘাস দেখলে মুখ দিতে চেয়েছে, কিন্তু ফেলুরে পা যাবে কোথায়! এক পা তুলে হড়কে শালা লাথি। যেন এই লাথি সে জীবের পাছায় মারছে না, মারছে বিবির পাছায়। শক্ত পা ওর নিষেধে এত বেশি রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর হয়ে যায় যে আহা হোক কম হোক বিবি তারে খাবে। খেতে না পড়লে নিশ্চিত রাতে পালাবে। নাকি মানে মানে সে তালাক দেবে বিবিকে! তালাক দিলে লাভ হবে বিঘা দুই ভুঁই আর জমি যা আকালুদ্দিন দশকুড়ি দশ টাকায় কবজ রেখেছে সব খালাস পাবে। সে যে এখন কি করে বুঝতে পারছে না। এতবড় দুঃসুখে এসেও সে তার সামান্য কর-কাঁতর কথা ভুলে থাকতে পারছে না। শিশু এক হাতে নালি ছিঁড়া। বোকবা মিঞা মরণ আমি কামন একখানা! হালার কাওয়া।

হালার গরু! গরু তোমার মুখ দিমু ভাইলা! তুমি নড়তেচড়তে চাও না। কেবল মুততে চাও। গরুটা ভয়ে কেবল মুতছে। যে জীবটা এতক্ষণ বেশ আসছিল, বেশ হাঁটছিল, যেন সেও সবাইর সঙ্গে নামাজ পড়তে রওনা হয়েছে, সেই জীব এখন ঘাড় শক্ত করে পা বালিতে ঢুকিয়ে টান টান করে রেখেছে গলা। আর টানাটানি করলেই হড় হড় করে মুততে দিচ্ছে। সে যে কি করে এতবড় চরে! এত ভিড়ের ভিতর তাকে জীবটা কি আটে করে দিচ্ছে! কিছুতেই সে হাঁটিয়ে নিতে পারছে না। ক্রমে সবাই নদীর পাড়ে উঠে যাচ্ছে। দলে দলে ইস্তাহার মাথার উপর তুলে নাচাচ্ছে। আলি সাহেব একটা চোঙ মুখে টিবির উপর উঠে একের পর এক হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের কথা বর্ণনা করছে। ধর্মের প্রতি আবহমানকাল ধরে যে হিন্দুদের দ্বন্দ্ব, সেই হুলার কথা দৈর্ঘ্য ভাষায় প্রকাশ করছে। সবাই শুনতে শুনতে কান খাড়া করে দিচ্ছে। গরম রক্ত এবার টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে। শুধু দেশে হক কাফের আছে, কাফের নিধন করে পতাকা ওড়াও। কোরবানের পশুটা পর্যন্ত গলা তুলে শুনছে শেষ—সেই যেন ঢাক বাজে ঢোল বাজে—জীবের গলা কাটলে শুধু থাকে রক্ত, অবলা জীবের মুখে ফেনার মত রক্ত ফুটছে, এ জীবের তবে নিস্তার হাকা দায়। ফেলু মরিয়া হয়ে হ্যাঁচকা টান দিল জীবটাকে। এবং হ্যাঁচকা খেয়ে সে পড়ে যেত, ফলে আর এক হাত সম্বল থাকত না, হাতটা তার ভাঙত। কিন্তু তখনই দুটো ফাঁকা আওয়াজ পীলখানার মাঠ পার হলে। ভিড়ের ভিতর থেকে ফেলু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ফাঁকা আওয়াজেই যে যেদিকে পারছে ছুটছে। এবং চরের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু দূরে এসেই ফেলু বুঝি টের পেল ওটা ফাঁকা আওয়াজ। সে একটা মানুষের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বুঝে ফেলল সবই ফাঁকা আওয়াজ। গরুটা ফাঁক বুঝে লেজ তুলে ছুটতে চাইছে। সেও শালা ফাঁকা আওয়াজ। সে বলল, হালার কাওয়া। তুমি গরুর পো টের পাইছ, গলায় তোমার আমি চাকু চালামু। আল্লার নামে কোরবানী দিমু।

আলি সাহেব যখন টিবিতে উঠে চেঁচাচ্ছে। —ভয় নেই। আপনারা ভয় পাবেন না। সব ফাঁকা আওয়াজ। আল্লার কুদরতে বন্দুকের নল থেকে গোলাগুলি বের হবে না। সব ধোঁয়া বের হবে। সব ধোঁয়া! ধোঁয়া! আপনারা কদম কদম বাড়িয়ে যান।

কদম কদম বাড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে যান সামনে। আজ সবে-বরাত। সব মৃত আত্মারা বের হয়ে পড়েছে। তারা আজ মুক্ত। তারা দেখছে আপনারা যা সব হাওয়াল পাওয়াল আছেন—আল্লার দুনিয়ার ফিকির করছেন। আলি সাহেব কলিকাতা শহরে থাকেন। কথায় বর্তার পূর্ব দেশের মানুষের মতো বলে আপনার জন হয়ে যান মাঝে মাঝে। তিনি বললেন, গরু, ভেড়া দুম্বা যা কিছু কোরবানী দেবেন, সবই তারে দিবেন। আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন, তারে তা ফিরিয়ে দেবেন। না পারেন নিজেরে দেবেন।

এই শুনে সবাই আবার এগুতে থাকল।

বাবুরা ছাদ থেকে দেখছিলেন এক ফাঁকা আওয়াজেই সব ছুটে পালাচ্ছে! বাবুদের ছেলেরা এমন দেখে কি মজা! আনন্দে ছুটে এসেছে নদীর পাড়ে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ দূরবীণ নিয়ে বসে রয়েছে। মাঝে মাঝে বড়বাবুকে দেখতে দিচ্ছে। শংকা তার কমছে না। কারণ আবার সবাই চরে এসে জমা হচ্ছে। ওরা বুঝতে পেরে গেছে পুলিশ সাহেব ভিড়টা এগুতেই ফাঁকা আওয়াজের নির্দেশ দিয়েছেন। ওরা টের পেয়ে ফের মরিয়া হয়ে গেছে। সে দেখল, যারা কোরবানীর জন্য পশু নিয়ে এসেছে তারা এবার সকলের আগে হাঁটছে। ভয় নেই। বিন্দুমাত্র শংকা নেই। আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন তারে তা ফিরিয়ে দেবেন—না পারেন, নিজেরে দেবেন। ওরা যেন নিজেকে দিতে এবার যাচ্ছে।

বল্লমের ইস্পাতে সূর্যাস্তের রোদ পড়ে ভীষণ এক কাণ্ড। হাজার হাজার এমনি সব ইস্পাতের ফলা আকাশের দিকে কারা ছুঁড়ে দিচ্ছে। ওরা কদম কদম এগিয়ে আসছে। কেউ যেন দামামা বাজাচ্ছে। তালে তালে উঠে আসছে কালীবাড়ির দিকে। বাজার বাঁয়ে রেখে ঠিক তারকবাবুর মাঠ বরাবর উঠে আসছে। মঠে এখন কেউ নেই। কিছু কনস্টেবল। হাতে বন্দুক। একপাশে ঘোড়া পুলিশ সাহেব। বাবুরা কৃতীলোক। ভূপেন্দ্রনাথ বাবুদের চিঠি নিয়ে সদরে দেখসাক্ষাৎ করে এতবড় একটা বন্দোবস্ত করেছে। নতুবা সুরাবর্দি সাহেবের আমল। লীগের রাজত্ব দেশে। সামসুদ্দিন বড় গোছের নেতা। সে আর এ-সবে মাথা দিতে পারে না। হরদম সে কলকাতা যাচ্ছে। আসছে। বাবুরা কৃতী না হলে এমন হয়। বন্দুকের সঙ্গীণে সূর্যাস্তের আলো। ওরা সবাই এখন নিলিং পজিসনে আছে। কেবল আদেশের অপেক্ষায়। হিন্দু-মুসলমানে এমন মারমুখী দাঙ্গা ওকে রুখতেই হবে।

ওরা উঠে আসছে তো আসছেই। ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাচ্ছে না। শুধু অবলা জীবের চোখ ভয়ে শাদা হয়ে গেছে। কান খুলে গেছে তার। ফেলু একটু হড়কে গেলেই মাগি গরুটা লেজ তুলে পালাবে। এই যে তামাশা—শালা সে কে, সে কিসের নিমিত্ত এসেছে এখনো বুঝেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। একবার ফেলুর হাত ফিরে গেলেই হল, তখন দেখবে কার সাধ্য তারে আটকায়। কিন্তু ফেলুর এক হাতেই এত শক্ত যে সে গলায় টের পাচ্ছে। দড়িটা টানাটানিতে গলায় বসে

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : ৫৫-২৪৪১, ৩৩-১৫৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ :: ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

যাচ্ছে। জীবটা শ্বাস নিতে পারছে না। সুতরাং শ্বাস ফেলার জন্য সেও কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে।

—হল্ট। একসঙ্গে বিশটা রাইফেলের ট্রিগারে শব্দ। ওরা সেফটি অন করে নিয়েছে। আর এক পা এগুলেই ট্রিগার টিপবে।

আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন তাকে তা ফিরায়ে দেবেন। দামামা বাজছে তালে তালে। মহরমের মতো ঢোল বাজছে। আর তালে তালে সেই এক পবিত্র কোর-আনের বাণী ভেসে বেড়াচ্ছে যেন কানে, না পারেন নিজেরে দিবেন। ওরা নিজেদের দিতে যাচ্ছে।

রূপগঞ্জ থানার ইসমাইল দারোগা চোঙ মুখে হাতে লেখা কাগজ পড়ে যাচ্ছিল, আপনারা আর অগ্রসর হইবেন না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই আইন ভঙ্গ করা হইবে। একশো চোয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করিলে গুলি করিতে বাধ্য থাকিব। আমাদের গোস্তাকি ক্ষমা করিবেন। অন্যথায় আমরা আপনাদের ধর্মকর্মের দাসানুদাস। বলেই সে পুলিশ সাহেবের সামনে এসে সেল্যুট করল এবং কানে কি ফিস ফিস করে বলল। তারপর কাগজটা ফিরিয়ে দিল।

লাল বর্ণের মানুষ। চোখ মুখ এমনিতেই লাল। সূর্যাস্তের জন্য সে মুখ আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। বয়স খুব অল্প। দেখে মনে হয় শংকায় ওর গলা শুকিয়ে আসছে। দামামার শব্দে কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ওরা এগিয়ে আসছে ত আসছেই।

নানা রকমের শব্দ উঠছে, গরু ভেড়ার শব্দ, ঢাক-ঢোলের শব্দ, চোঙ মুখে বক্তৃতা। উত্তেজনা জিইয়ে রাখা চাই। সাহেবের মাথায় সব শব্দ রেল গাড়ির চাকার মতো ঝম ঝম করে বাজছে। এবং ঠিক তক্ষুনি ওরা এত কাছে এসে গেছে যে হাতের কাছে পেলে মশালে আগুন জেবলে ওদের সবাইকে পুড়িয়ে মারবে। একটা বর্শা ঠিক তক্ষুনি ইসমাইল দারোগাকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে মারল কে! জনতার ভিতর থেকে হাজার হাজার বর্শা যেন ছুঁড়ে দেবে এবার তারা। এত প্রচণ্ড বেগে বের হয়ে গেল যে ইসমাইল টের পেল না, পিছনের দিকে তাকাতেই দেখল সাহেবের কান উড়ে গেছে।

ইসমাইল এবার চোখের উপর সর্ষে ফুল দেখতে থাকল।

যেন এতগুলি মানুষের জীবন রক্ষার্থে সাহেব নিজের রক্তাক্ত মুখ ঢেকে হুকুম দিলেন—ফায়ার।

বাস ফায়ার। বাস্ গুলি ছুটতে থাকল। বন্দুকের নল থেকে এবার আর ধোঁয়া বের হচ্ছে না। কেবল গুলি বের হচ্ছে। তিন রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েই সিপাইরা ফের এটেনশান হয়ে গেল। হুকুম পাবার জন্য ফের কান খাড়া করে রাখল। কিন্তু কে কাকে হুকুম দেবে। আহত পুলিশ-সাহেবকে এখন ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাছারিবাড়িতে। শিলাবৃষ্টির মতো সেই উচ্ছৃঙ্খল জনতা চরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। নিমেষে চর ফাঁকা। সূর্যাস্তের লাল রঙ, আর কত মানুষের তাজা রক্ত মাটি ভেসে যাচ্ছে। আর সেই কোরবানীর পশুগুলি পড়ি-মরি করে ছুটছে। কেবল ছুটছে। ধুলোধুঁয়ার ভেতর গেল চোখে-কানে। সে টের পাচ্ছে না কখন ওর ডান হাত উড়ে গেছে। হাতটা যা এতদিন রক্তশূন্য ছিল, অচল অসাড় হাত, যা সে বার বার কতবার ভেবেছে সময় ও সুযোগ-মতো একদিন কসাই যেমন কাটার মতো শুকনো হাতটা ঘ্যাঁচ করে কেটে ফেলবে, পারেনি। বড় মায়া তার হাতের জন্য। অসাড় হাতটার জন্য সে কষ্ট পায়, তবু সে পারে না ফেলে দিতে— আজ একটা বন্দুকের নল থেকে গুলি বের হয়ে সোজা ওর হাত উড়িয়ে নিয়ে গেল। প্রাণটা উড়ে যেত, একটু ডান দিক ঘেঁসে গেলেই বুকের অন্দরটা ফালা ফালা হয়ে যেত।

এমন তার ধুলোধুঁয়ার ভেতর গেছে যে সে এই অন্ধকারে কোথায় ছুটে যাচ্ছে টের পাচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে হাতটা থেকে একটু একটু করে পানসে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে যে কোরবানী দেবে বলে একটা পশু নিয়ে এসেছিল—সেটা না থাকলে খালি খালি লাগার কথা—তা পর্যন্ত সে টের পাচ্ছে না। সে একা, কেউ নেই পাশে। সে দাঙ্গার আসামী। তাকে ধরার জন্য এবার যেন সবাই বের হয়ে পড়ছে। কেউ পাশে নেই। সবাই যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। ওর চোখের সামনে তিন চল্লিশটা মানুষ জবাই করা পশুর মতো হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। এই অন্ধকারেও সেই সব লাশ তাকে ধরার জন্য ছুটছে,—কোনখানে যাও মিঞা। আমাগ তার কাছে লইয়া যাও।

ফেলু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। অন্ধকারে মাঠের উপর বলতে বলতে যাচ্ছে—হা আল্লা এডা কি হইল! কোথায় গ্যালা মিঞা ভাইরা! এই বড় এখন মন বদলে যায়!

কেবল মনে হচ্ছে লাগল ওর মাথার ভিতর এখন কে মহরমের ঢোল বাজাচ্ছে। কেউ তার কথার জবাব দিচ্ছে না। দিলেও সে শুনতে পাচ্ছে না। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই।

পশু, হাতটা নেই বলে শরীর হাল্কা। শুধু কতস্থানটা টনটন করে ব্যথা করছে। তাও সে কানেচোখে ধুলোধুঁয়ার জন্যে যাওয়ায় টের পাচ্ছে না। সে উথাল-পাথাল ছুটছে। কোনদিকে যে যেতে হবে, কোথায় কিভাবে ছুটলে পথ সংক্ষিপ্ত হবে সে তা পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। কেবল সে যেখানে হিন্দুগ্রাম পড়ছে, সেসব গ্রাম এড়িয়ে যাচ্ছে। সে একটাও মিছিলের লোক পাশে দেখতে পেল না। সে, কেন লোক ছুটছে দেখতে পেলেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে। ওকে ধরতে আসছে হয়ত। বাবুদের সব ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ছেলেরা বন্দুক কাঁধে বের হয়ে পড়তে পারে, এবং খবর রটতে কতক্ষণ, সবাই জেনে গেছে বুঝি তিন-চল্লিশটা লাশ পড়ে আছে শীতলক্ষার চরে। সে হেরে যাওয়া মানুষ। বড় মাঠের অন্ধকারে সে টের পাচ্ছে না সে এখন কোথায় আছে। বাগি গরুটা থাকলেও এ সময় ওর সামান্য বুঝি সাহস থাকত।

নিজের বলতে তার এখন কিছু নেই। এমন কি এতদিনের হাতটা যা পাগল ঠাকুর হাতটা নিয়ে ভেগে গিয়েছিল, সে যে কি ভালবাসার হাতটা শরীরে জুড়িয়ে রেখেছিল, এবং কত হেকিম দাবীর যে জন্যই হাতটার জন্য, হাতে বালো তাবে কড়ি বেঁধেছে এই মর্মসুখে এসে তার তাও গেল। এখন হাজার কাওয়া, সে বলা কেবল, সে ইচ্ছা কেবল। হাজার কাওয়া পাগল ঠাকুর তারে এমন করেছে। সে কেন জানি একা! এই অন্ধকার মাঠে এসে তার হাতটার জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সবাই দেখতে পাবে সকাল হলে একটা মরা হাত নদীর চরে পড়ে আছে। লাশগুলোর সঙ্গে মরা হাতটা বড় বেমানান।

সে আর পারছে না। চারপাশে ঘন অন্ধকার এবং কিছু জোনাকি জ্বলছে ভূতুড়ে চোখের মতো। সে যে কতক্ষণ তাড়া খেয়ে ছুটেছে এবং কতটা পথ এসে গেছে এখ ভরসায় অনুমান করতে পারল না। মনে হল সে একটা বড় গাছের নিচে এখন দাঁড়িয়ে আছে। সে এবার গাছটার নিচে শুয়ে পড়বে ভাবল। সকাল হলে সে বুঝতে পারবে কোথায় এসেছে এবং কিভাবে যে দেশে ফিরে যাওয়া যাবে, আকালুদ্দিন যদি আগে আগে ফিরে যায়। সে নেই গাঁয়ে। ওর তবে পোয়াবারো। সে ফের উঠে আবার ছুটবে ভাবল। কিন্তু দাঁড়াতেই মনে হল, শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। অবশ হয়ে গেছে পা। এত শক্তি পায়ে তার, আর এখন সে এক পা নড়তে পারছে না। সে বসে পড়ল এবং তার ঘুম এসে গেল।

সকালবেলার তাজা রোদের ভিতর তাকে কে যেন ঠেলছে। তাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। শেষ রাতের ঘুমে সে এমন অচেতন যে, সে কিছুতেই চোখ মেলতে পারছে না। ওর পিঠে কে চেটে চেটে দিচ্ছে। পিঠে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে। তবু সে আলসে উঠতে পারছে না। চোখ মেলতে পারছে না। সে যে দাঙ্গা করতে গেছিল গতকাল তা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে। এবং চোখের উপর সূর্যের আলো এসে পড়লে সে ধড়ফড় করে জেগে গেল। প্রথম সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, ওর বাঁগি গরু এটা। গরুটা ওর পিঠে জিব দিয়ে এতক্ষণ চেটেছে। যাবে পিঠে যা নুন ছিল চেটে চেটে খেয়েছে। হালার গরু বড় সেয়ানা। পথ চিনে ঠিক চলে এসেছে। না কি গরুটা ওর সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। সে খেয়াল করেনি। গরুর আর ধুনমুসার নালায় কথা নয়। সে তাড়াতাড়ি ভাবল, গরুটার মুখে একটা চুমু খাবে। কিন্তু খেতে গিয়েই মনে হল ওর বাঁ হাতটা কাঁধে আর ঝুলে নেই। গরুটা দেখে ফেললে ভীষণ সরমের ব্যাপার। সে তাড়াতাড়ি গামছা দিয়ে ক্ষতস্থানটা ঢেকে দিল। পাইগরু আর বিবি সব সমান। দুবলা স্বামী টের পেলে কেবল মাঠে পালাবার চায়।

সে বাঁগি গরুটা নিয়ে উঠে চারদিকে তাকাতেই এবার বুঝল—সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঠিক পথেই চলে এসেছে। এই সেই হাওরের বিল সামনে, এখানে কাটা মোষের মাথা ফেলে চলে গিয়েছিল কারা। এখানেই জালালি জলে ডুবে মরেছিল আর পাগল ঠাকুর জালালির মৃতদেহ নিয়ে মাঠের উপর ভরে ছুটেছিলেন সারা জোৎস্নায়।

সে গরুটাকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় দুলকি চালে। যেন সে তার বিবিকে নিয়ে মেহমানবাড়ি বেড়াতে গেছিল। দেখলে কে বলবে ওর মরা হাতটা নদীর চরে পড়ে আছে। হাতটা কার, এই হাত, দুবলা হাত, না কি সারা রাত রক্ত পড়ায় হাতটা এমন শীর্ণ হয়ে গেছে—হাতটা নিয়ে একটা ভীষণ কাণ্ড বেঁধে যাবে। মানুষটা কে, কোন মানুষের এমন একটা শীর্ণ হাত থাকতে পারে।

কিন্তু গ্রামের কাছে এসেই ওর বুকটা শুকিয়ে গেল। বিবিটা ওর ঘরে আছে ত! যদি থাকে তবু ভয়। ওর কাটা হাত দেখে বিবিটা আহ্লাদে হাসবে। ক্ষতস্থানে দুবলা ঘাসের রস ছেঁচে দিতে দিতে মুখ গোমরা করে থাকবে। যার যত তার ভালবাসা। ফেলুর দুঃখে আমরে ঘুম আসবে না। তর ছিনালি আমার ভাল লাগে না বিবি। তর ছিনালি দ্যাখলে নিজের গলায় কোরবানীর চাকু চালাইতে ইচ্ছা হয়। আমারে ফালাইয়া কোনখানে যাইস না। তুই ঘরে থাকলে বাথানের গরুর মত আমি হাম্বা হাম্বা করমু। আমি বেইমানি করমু না। কথা সে যাইবি না। সে নিজেই কেমন একা একা নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

এখন ফেলুকে দেখলে মনেই হয় না গতকাল সে গিয়েছিল ওই জীব নিয়ে শীতলক্ষ্যার চরে। সে জীবটাকে কোরবানী দেবে বলে নিয়ে গিয়েছিল।

সকালবেলা বড়বৌ দেখেছিল ফেলু যাচ্ছে মাঠের উপর দিয়ে। গরুটাকে সে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না। বরং গরুটাই তাকে যেন টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গরুটা আগে আগে হাঁটছে। ফেলু পিছনে। সে তার আদরের গরুটাকে নিয়ে গিয়েছিল কোরবানী দেবে বলে। কিন্তু কি ব্যাপার! ফেলু ফিরে এসেছে! সঙ্গে এসেছে বাঁগি গরুটা! শীতলক্ষ্যার চরে নামাজ পড়ার কথা। বাড়িতে ওরা সারা দিনরাত দুঃশ্চিন্তায় থেকেছে। কোন খবর আসেনি। দাঙ্গা বেঁধে যেতে কতক্ষণ। একবার ইচ্ছা হল ঈশমকে দিয়ে খবর নেয়। কি খবর নিয়ে এসেছে ফেলু।

বিকেলে ঈশম গিয়েছিল ফেলুর কাছে। ফেলু ঈশমের সঙ্গে কথা বলেনি। সে একটা ছেঁড়া কাঁথায় শরীর ঢেকে শুয়েছিল। তার এ-গ্রাম থেকে গেছে আকালুদ্দিন। আকালুদ্দিনের খবর নিয়ে জানল, সে ফিরে আসেনি। আন্নুকে হাতের ইশারায় মস্ত কাফিলা গাছটার নিচে ডেকে নিয়ে গেল, আন্নু বলেছে, তাকে কিছু বলছে না মানুষটা। এসেই যে কাঁথা গায়ে শুয়ে পড়েছে আর উঠছে না। এমনকি আন্নুকে খুব কাছে যেতে দিচ্ছে না। কেবল মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে।

সুতরাং বিকেলের দিকে ঈশম কোন খবর নিয়ে আসতে পারল না। আর কার কাছে খবর পাওয়া যায়। সে সুলতানসাদি যাবে কিনা ভাবল। অথবা নদীর চরে চুপচাপ বসে থাকলে টের পাবে, হাটুরে মানুষেরা যাবে, তারা ঠিক খবর নিয়ে আসবে। বিকেলে সে আর বাড়ি বসে থাকল না। ছইয়ের নিচে বসে তামাক খেতে থাকল এবং হাটুরে মানুষেরা যখন ফিরছে, কি বলাবলি করছে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

ঈশমই সন্ধ্যার পর এসে খবর দিয়েছিল, খুব দুঃসংবাদ। জমিদারবাবুরা চল্লিশটা লাস নামিয়ে দিয়েছে। সময় বড় খারাপ। বড় মামীর চোখের দিকে তাকালেই ঈশম যেন ভয় পেয়ে যায়। সে বলল, বড়-মামী এডা যে কি হইতাছে বুঝি না।

শচি বলল, তুই কাইল চইলা যা মুড়াপাড়া। ঠিক ঠিক কি হইছে জাইনা আয়।

—কাইল ক্যান। আইজ রওনা দেই। তবে কাইল বিকাল বেলা ফিরা আসতে পারমু।

ঈশম পরদিন বিকেলে এসে সব বিস্তারিত বললে হিন্দু গ্রামের সব মানুষেরা ভীষণ খুশী হয়েছিল। ওরা সেদিন রাতে বিজয় উৎসব করেছিল গ্রামে। ওরা খোলকরতাল বাজিয়ে হরি সংকীর্তন দিয়েছে।

(ক্রমশ)

নিকটেই আছে

বদ্যি

তখনই সিপ্রাকে পই-পই করে বলে-ছিলাম, দেখো একটা টাকার জন্য ও-রকম কোর না। ঝড়, জল, বৃষ্টি, ঠান্ডা, গরম সব সময় যে লোকটাকে হাতের কাছে পাও তাকে এক-আধ টাকা বেশী দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এক ধমকে আমায় বোবা করে দিল সিপ্রা, আমি কি তোমার কাজের ব্যাপারে কিছু বলি কখনো যে তুমি আমার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ? এমনিতেই তিন টাকা দি, তাই বেশী। পাশের ফ্ল্যাটের মল্টুদারা কত দেয় জানো? দু'টাকা মাত্র, বুঝলে। ওরা যখন যা চাইবে, তক্ষুনি যদি সায় দাও, তাহলে একটা টাকায় আমি সংসার চালাতে পারব না। তুমি বেশী করে দাও, আমিও বেশী, বেশী মাইনে দেব। মাইনে কম দিতাম বলেই তো বিমলা কাজ ছেড়ে চলে গেল। আগেরটা বাড়ীতে উনিশ টাকা নেবে, সেখানে আমরা দিতাম মোটে তেরো টাকা। তুমি যদি সাধুরামকে চার টাকা দিতে চাও তো দাও, তবে আমার সংসার খরচের টাকায় টান দেবো না। বাড়ীতটা নিজের পকেট থেকেই দিও।

এরপর আর কিছু বলা চলে কি? একেবারে ফাঁসী ধরে টান দেবেছে গিন্নী, তাই চুপ করে গেলাম। সব কুড়িয়ে কাড়িয়ে পেয়েছি চারশ ঘর আনি—এক পয়সা বেশীও না, কমও না। কোথেকে একটা টাকা বেশী দেব? সে মুরোদ নেই। তাই চুপ করে গেলাম।

ওদিকে মওকা বুঝে সাধুরামও ডুব মারল। পর-পর, দু-তিন দিন এল না। বাথরুমের কোণে ময়লা ফেলার টিনটা উপচে সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। বালতি বালতি জল ঢেলেও পায়খানা সাফ হয় না। গন্ধে নাড়ি উল্টে যাবার উপক্রম। বাড়ীর সেকেলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই একটা বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছিলাম। সে কথাটা সিপ্রাকে বলতেই, তোলা উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপাতে চাপাতে দাঁতের ফাঁকে কর-কর গোলাপী ঠোঁটের আধখানা কামড়ে ধরে ঝাঁঝালো গলায় বলল, যাও না স্নানের আগে তুমিই ময়লাটা ফেলে এসো। নীচের তলার ননীবাবু তো রোজ নিজেই ময়লা ফেলেন, বাথরুম ধুয়ে দেন।

একটা কথা বললেই যদি এগারটা শুনতে হয়, বিশেষ করে আমার কি কি করণীয়, সে-সব কাজের ফিরিস্তি শুনতে হয়, তারচেয়ে কথা না-বলাই ভাল। তাছাড়া বড় রাস্তার ওপর বাড়ী। আমি এখন দু'নম্বর। পরে গায়ে গামছা জড়িয়ে হাতে ময়লা ফেলার টিন ঝুলিয়ে ফাঁড়ির গায়ে লাগানো ডাস্ট-বিনে নোংরা ফেলতে যেতে পারব না। রাস্তার দোকানদাররা সবাই চেনে আমায়। বড় রাস্তার দিকের বারান্দাটায় যে আমি কখনো খালি গায়ে দাঁড়াই না, সর্বদাই কিছু না কিছু একটা গায়ে দিয়ে নি, সেই আমি কি-না ময়লা-ফেলার টিন নিয়ে...। ধুর তাও কি হয়।

হয় না বলেই, আর কথা না বাড়িয়ে সকালের কাগজখানা নিয়ে সোজা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। হাত-ঘড়িতে দেখলাম সোয়া সাতটা। একটু চা হলে মন্দ হত না। কিন্তু—কাকে বলব? একে বিমলা কাজ ছেড়ে চলে গেছে, তার ওপর সাধু-রামের এই কীর্তি এখন কিছু ফরমায়েস করলেই সিপ্রা শুনিয়ে দেবে নীচের তলার স্বাবলম্বী ননীবাবু বা পাশের ফ্ল্যাটের বৌ-অন্ত-প্রাণ মল্টুদা কি কি করেন। তার চেয়ে চুপ থাকাই ভাল।

কাগজ আর পড়তেও ইচ্ছে করে না। কাগজখানা মুড়ে, বগলদাবা করে, রেলিংয়ে বডিটা হেলিয়ে দিয়ে রাস্তার শোভা চোখ কান খুলে দেখতে লাগলাম। এখনো ভিড় জমেনি। ঢাউস ঢাউস সরকারী বাস গদাই-লস্করী চালে দক্ষিণ-উত্তর, উত্তর-দক্ষিণ করছে। টাং-টাং করে বাজনা বাজিয়ে ট্রাম ছুটছে। ফাঁকা ট্যাক্সি কেমন ফাঁকিতে ভেকির ভোকির করে অন্যের ঘাড়ে গাড়ির গড়িয়ে চলেছে। আর— [illegible] উল্টোদিকের কাঁচা ড্রেন থেকে কাঁধের [illegible] দিয়ে ফুলকো লুচি তোলার [illegible] বড়ির পাড়া, কুমড়ার খোসা, [illegible] টাকরা ময়লা তুলছে। [illegible] এখানে, আর ওদের [illegible] বাড়ীতে চোখ

পার হয়ে উঠেছে। রেলিংয়ে ফেলা বডিটা সোজা করে তুলে, বাবুকেত্তর গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁক পাড়লাম—এই সাধু, সাধুরাম।

ময়লা ছাঁকতে ছাঁকতে তেরচা একটা চাউনীতে আমায় দেখল সাধুরাম। তারপর ঝাঁঝরিখানা তুলে সার বিড়ির দোকানের কোণে তুলে রেখে সরে দাঁড়াল। হাফ-প্যান্টের ওপর হাতকাটা শতচ্ছিন্ন একটা গেঞ্জি শুধু ওর গায়ে। কালো-কুষ্টি একটা মাফলার গলায় জড়ানো হেলেটার। ছুঁচোর গোঁফের রেখা ঠোঁটের কোণ বেয়ে নাকের কাছে এসে পড়েছে। হাতছানি দিয়ে ডাকলাম—শোন ইদিকে।

এল। তলায় এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে চাইল আমার দিকে। ঝুঁকে পড়ে বললাম—আসিস-নি কেন দু'দিন? কোন জবাব না দিয়ে দাঁতে নখ খুঁটতে লাগল। বললাম এ-ভাবে নং ডিসটাম্বস কনভারসেশনে কাজ হবে না শোন। চেঁচিয়ে বললাম—ওপরে আয়। এইবার মুখ খুলল ব্যাটা—নেহি যাব। অবাক হয়ে গেলাম—নেহি কেন রে? সংক্ষেপে যা বলল তার অর্থ ওপরে মাইজী আছেন। দেখলেই গালাগালি করবেন, তার চেয়ে তুমিই বাবু নীচে এস।

আসতাম। নীচে এলাম। কি ব্যাপার, তুই কাজ ছাড়লি কেন?

তিন টাকায় পোষায় না বাবু—সাফ জবাব দিল সাধুরাম।

[illegible] দিনের তেজমূতে কলম [illegible] —তিন টাকায় পোষায় না তো পাশের ফ্ল্যাটের [illegible] যে কাজ করিস।

এ-আম [illegible] শুধু ময়লাটা ফেলে দি। আর কিছু তো করি না। সাধু আমাদের ময়লা ফেলে, বাথরুম ধুয়ে দেয়, পায়খানা সাফ করে দেয়। একদিন অন্তর সিঁড়িটাও ঝাঁট [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

কেন ব্রুক সরকার চৌধুরী বাবু। একটু দাঁড়ান এই সাড়ে নটার ভিতর এসে যাবেন।—বিনীত ভাবে আমার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেয় সাধুরাম।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় ডিউটি শুরু সাধুরামের। সকালে চার ঘন্টা, সাড়ে নটা পর্যন্ত। বিকেলে আড়াই ঘন্টা, আড়াইটা থেকে পাঁচটা। করপোরেশনের ব্রুক মজদুর সাধুরাম নিত্য সাড়ে ছ' ঘন্টা রাস্তা আর ড্রেন সাফ সুতরো করে। মাস গেলে পায় একশো পঞ্চাশ টাকা আট আনা। পুরো টাকাটা কোনদিন হাতে পায় না। পাবে কি? ও-তো টেম্পরারী স্টাফ। দশ মাস কাজ করছে। এর আগে ওর জায়গায় কাজ করত ওর কাকা রামায়ণ সিং। যক্ষা-রোগে ভুগতে ভুগতে ধুঁকতে ধুঁকতে গয়া জেলার হিমানি গাঁয়ে ফিরবার আগে ব্রুক সরকারের হাতে পায়ে ধরে ভাইপোকে কাজে বসিয়ে দিয়ে গেছে রামায়ণ।

এর জন্য কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি সাধুরামকে। দেশের এক বিঘা জমি মহাজনের কাছে রেখে দিতে পাঁচশো টাকা ব্রুকবাবুর পায়ে প্রণামী দিতে হয়েছে। বদলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্রুক সরকাররাই দেন। পরে করপোরেশনের ডিসট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের একটা অ্যাপ্রুভাল আদায় করে নিলেই হল! পাঁচশো টাকাতে শ্যাম, কুল দুই-ই বজায় রেখেছে সাধু।

কিন্তু চৌধুরীবাবু দারুণ কড়া লোক। সাধুরামের মত অর্জনাদের কাছ থেকে চাকরী পাইয়ে দেওয়ার দরুণ পাঁচশো পেয়েই তিনি খুশী নন। আরও তার চাই। কি মাসে পঁচিশ টাকা মাইনে থেকে আদায় করেন। সাধুরামরা যে পঁচিশ টাকা গচ্চা দেয় প্রতি মাসে, সেটা আবার পুষিয়ে নেয়, করপোরেশনের কাজে ফাঁকিবাজি দিয়ে, বাড়ী বাড়ী কাজ করে। সকালে এসে একটু-আধটু রাস্তা ঝাঁট দিয়ে সাধুরাম তার বে-আইনী কারবার শুরু করে দেয়। এগারোটা বাড়ীর ময়লা সাফ করে, ডাস্টবিন ফেলে, বাথরুম ধোয়। এগারোটা বাড়ী থেকে ওর মাস গেলে আয় হয় তিন টাকা। ব্রুক সরকার চৌধুরী সব জানেন। জানেন বলেই ভোর সাড়ে পাঁচটার পর তার টিকিও কেউ দেখে না এই তল্লাটে। আবার আসেন সেই নটার পর। ইতিমধ্যে বাড়ী বাড়ী কাজ শেষ করে সাধুরামরা আবার ঝাঁটা, বুরুশ নিয়ে রাস্তা সাফ করার কাজে লেগে পড়ে। আইন বাঁচিয়ে সাধুরামদের এই বে-আইনী বাড়তি আয়টুকুর জন্য চৌধুরীবাবু বাড়ী পিছু কি ধার্য করেছেন এক টাকা। এতদিন এক টাকাতেই তুষ্ট ছিলেন। চলতি মাসে রেট বাড়িয়ে ডবল করে দিয়েছেন। তাই সাধুরাম নাচার। সেও রেট বাড়িয়েছে। নইলে তার থাকে কি? ওদিকে দেশে সাতটা প্রাণী ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। যে করেই হোক আশী নব্বই টাকা কি মাসে দেশে পাঠাতে হবে। নইলে যে সব না খেয়ে মরবে।

মন্টুদারা এ-মাস থেকে তিন টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। তাই ওদের কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে সাধুরাম। অন্য সব বাড়ী নারাজ। তাই সাধুও হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবে আমি যদি একটা টাকা বাড়াই তাহলে কাল থেকে সাধু আমার বাড়ীতে আগের মতই আসবে।

বেশ তাই দেব। তবে আজই বাথরুমটা সাফ করে দিয়ে যা। গন্ধে যে আর টিঁকতে পারছি না।—সব শুনে ওর কথাতেই রাজী হয়ে যাই।

এ-পাশ ওপাশ তাকিয়ে সোজাসুজি আমার চোখে চোখ রেখে সাধু জবাব দিল—আজ না বাবু। ঐ দেখুন সরকারবাবু আসছেন। জায়গায় না পেলে চাকরী খতম করে দিবেন। কাল ঠিক টাইমে আসব। কথা কটা শেষ করেই, একফাঁকে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল সাফ করার ঝাঁকরিটা তুলে নিয়ে কাজে লেগে যায় সাধুরাম। রাস্তায় তখন অফিসের ভিড় জমে উঠেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারলাম না কোনজন ব্রুক সরকার চৌধুরীবাবু। দারুণ ব্যবসা ফেঁদেছেন ভদ্রলোক। চাকরী করে দেওয়ার জন্য এককালীন পাঁচশো, কি মাসে পঁচিশ শ্যাম বাড়তি আয়ের শাঁস-টুকু সব নিজের পকেটে ঢোকাচ্ছেন। সাধুরাম তো আর প্রতিবাদ করতে পারবে না। প্রতিবাদ করলেই যে তার চাকরী নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ও-তো টেম্পোরারী—'বদলি'-স্টাফ। শুধু জানতে ইচ্ছে হয় কত হাজার সাধুরাম এই শহরটাকে নিত্য দুবেলা ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে? আর ক'শো চৌধুরীবাবু ওদের মাথার ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে টু-পাইস রোজগার করেন?

গিন্নিকে এখনো বলিনি সাধুরামের সঙ্গে আমার নতুন চুক্তির কথা। বললেই তো এখুনি খাঁকিয়ে উঠবে—কেন তুমি আমার সংসারের ব্যপারে নাক গলাতে যাও? আরে বাবা কত দুঃখে যে নাক গলাই সে কথাটা যদি জানতে। যাক কাল থেকে তো আর এই ঝামেলা থাকবে না। একটা টাকা বেশী দিলেই যখন নিস্তার মিলবে, তখন দরকার কি মিথ্যে ঝনঝাট বাড়ানোর।

—নন্দিবর্ধন

সাহিত্যে নতুন চিন্তা

অনন্য সেন

সমাজে শিল্পীর অবস্থান নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সত্যিকার শিল্পী কখনই ঘটনায় নিস্পৃহ দর্শকমাত্র হতে পারেন না। জীবন থেকে শিক্ষালাভ করেন শিল্পী। বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে তা থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং বাস্তবের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারও করে থাকেন। শিল্পী অবশ্য বাস্তবতার অংশবিশেষকে নানা পদ্ধতিতে গ্রহণ অথবা বর্জনে সমর্থ। গ্রহণ-বর্জনের এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণত শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি, প্রজ্ঞা ও জীবনাদর্শের উপর নির্ভরশীল।

সাহিত্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের আত্মিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ, মতাদর্শের সংঘর্ষে এক তীক্ষ্ণ ও অনন্য অস্ত্র। জনসাধারণের তত্ত্বগত মৌলিক ও নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। এই ভূমিকাকে কোনোক্রমেই খাটো করা চলে না। সমাজে সাহিত্যের কদর তার বৌদ্ধিক বা ক্ষণিক আনন্দের জন্যে নয়, বরং সর্বোপরি তার জনগণকে সেই উঁচুর বাসনায় বিশেষ দায়িত্বের সঙ্গে সচেতনতার জন্যেই।

এমন অনেক তাত্ত্বিক গুরুদের সন্ধান মিলবে, বেশ জোরের সঙ্গেই তারা বলে থাকেন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে। ধর্মস্থানের মতো শিল্পকেও রাজনীতির ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলা উচিত, এই হল এঁদের মূল্যায়ন। শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে যোগাযোগ এদের মতে অসম্ভব। সংগ্রাম কেবল শিল্পীর নিজের মধ্যে ডুব দেওয়া। কেননা, পূর্ণ প্রশান্তিই একমাত্র শিল্পকৃতির পটভূমি। শিল্পীর পেশা যে কতখানি স্বতন্ত্র ও অতিপ্রাকৃতিক প্রকৃতির, অন্যান্য মানুষের থেকে শিল্পী যে পৃথক, তাঁর জীবিকা যে কত বিচিত্র, এটা প্রচার করার জন্যেই উপরোক্ত চিন্তাধারার সমর্থনে শিল্পীদের প্রচার করা হয়ে থাকে।

তিনি [illegible] নন। কেউ বা কী চায় তা। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, এই [illegible] যখন [illegible] বিস্ফোরণে বিদীর্ণ হয়, শিশুর স্বপ্ন জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয় যখন, কামান-বন্দুকের মৃত্যুবর্ষী নলগুলো যখন তাক করে মাথা উঁচিয়ে থাকে সভ্যতা, পৃথিবী আর কবিতার দিকে, যখন আমাদেরই মতো মানুষ আমাদের চোখের সামনে মারা পড়ে, আমাদের যা কিছু কীর্তি আর যা আমরা করছি সবই নিশ্চিহ্ন হয় বছরের পর বছর প্রতিদিন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় যখন ভিয়েতনামে রক্তপাত ঘটতে থাকে—নব্য স্বাধীন দেশগুলিতে গৃহযুদ্ধের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয়, স্বদেশভূমি বিতাড়িত মানুষেরা নারকীয় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়, দেশী ধনীদের মধ্য দিয়ে বিদেশীরা যেখানে চরম নিপীড়ন চালায়, তখন রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করে, সব কিছু দেখেশুনেও অন্ধ ও বধিরের ভাণ করে শান্তি ও স্বস্তিতে বাস করা কতখানি অসম্ভব ব্যাপার। পরিপার্শ্ব পৃথিবী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বোধই কবিতার প্রাণ। কবিদের মধ্যে ঠিক এই চেতনারই অভাব ঘটে থাকে: তাঁদের পথ হয় সিদ্ধ [illegible] দুর্বোধ্য। কবি আর্নেস্ট [illegible]—গভীর অন্তঃসার, সত্যিকার—অকেজো। জীবনের জন্যে সংগ্রাম ও তাতে যোগদানের ফলে কবির সৃষ্টিকর্ম ব্যাহত তো হয়ই না, বরং তা কবিকৃতির মহত্ত্ব অর্জনে সহায়ক। তাঁরা পাখিরাই কেবল [illegible] বাতাস, প্রাণসংহারক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিনে গান গাইতে দ্বিধা হয়। শিল্পের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে, লেখকদের বিশিষ্ট দায় সম্পর্কে চেতনা সম্পাদনে, পৃথিবী ও মানবজাতির ভাগ্য নির্ণয়ে হাতে হাত মিলিয়ে সুনির্দিষ্ট হবে এই সংগ্রাম। তাই আজকের লেখককে হতে হবে জনসংযোগকারী নাগরিক, চিন্তানায়ক, বিচারক। এমন কি [illegible] হতে পারলে আরো ভালো।

সুতরাং সমাজকে কেন্দ্র করে কবি, শিল্পী জীবনকে বাদ দিয়ে চলতে পারবে কি? সমাজ সংগ্রামের পরিবেশেই [illegible]

তিনি। একজন তরুণ কবি দ্বিধাহীনকণ্ঠে তাই স্বীকার করেছেন :

> সৃষ্টি শুধু, শ্রমে-ঘামে!
> তোমার ও শক্তি যেন না রয় অক্ষত,
> মত্ত হও, হয়ো নাকো শীতল, হিসেবি,
> যত এ দহন আর যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হৃদয়,
> ততই অত্যন্ত শিখা তোমার হে, কবি।
>
> (লেনার্ড ইয়াকুলেভ্‌ কো)

> ঈশ্বরদত্ত একটি স্ফুলিঙ্গ
> যদি থাকে হৃদয়কন্দরে
> আমাদের শিখতে হবে প্রত্যেকের কাছে,
> আমাদের লিখতে হবে প্রত্যেকের জন্যে।
>
> (এভ্‌গেনি এভ্‌তুশেঙ্কো)

কথাটা মিথ্যা নয়, শিল্পী মানুষের বস্তুনিষ্ঠ হোক লেখার টেবিল। লেখার টেবিল থেকেই কবি সমগ্র পৃথিবীর কাছে বক্তা হন। নোবেল পুরস্কার জয়ী কবি রসুল গামজাতোভ বলেছেন : 'রচনার অস্ত্র হাতেই আমরা সময়ের সংঘর্ষে যুদ্ধে নামি। অস্ত্রাঘাতকে যথার্থ করার জন্যে হাতিয়ারকে সব সময়ে ঝকঝকে ধারালো করে রাখতে হয়। আর এই হাতিয়ার মরচে ধরে ভোঁতা হয়ে যায়, যদি জীবনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সংগ্রামের আহ্বান আমাদের চার দেওয়ালের আবরণ ভেদ করতে না পারে, যদি আমরা নিজেরাই দরজা খুলে দিয়ে জনগণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে ও তাদের চোখে চোখ রাখতে না পারি। চারপাশের দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে তা যদি আমাদের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে অসমর্থ হয়, তাহলে আমাদের রচনার অস্ত্র অচিরেই ভোঁতা হয়ে পড়ে থাকবে।'

যেভাবে কাজ করা [illegible] [illegible] [illegible]

আলেক্সাই টলস্টয় একবার বলেছিলেন : "অনেকে ভেবেছিলেন যে আজ কামানের গর্জন শিল্পের মধুকণ্ঠকে ডুবিয়ে দেবে। যুদ্ধের সময় সাহিত্য তার উৎকর্ষ হারিয়ে ফেলবে, সাহিত্য বিকৃত হয়ে পড়বে, হয়তো বা একেবারে নীরব হয়ে যাবে। কিন্তু ফ্যাসিজম যে বর্বর বাহিনী পাঠিয়ে সোভিয়েট দখল করতে চেয়েছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে সোভিয়েট শিল্প ও জনগণের বিপুল বীর্যের বহুমুখী প্রকাশ সাধন করছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লব জনতার হাতে শিল্পের মহান দুয়ার খুলে দিয়েছিল; তখনই রাতারাতি অবশ্য জনশিল্প জন্মায়নি, কিন্তু বহু বাধা অতিক্রম করে সোভিয়েট শিল্প আজ জনগণেরই শিল্প হয়েছে, সোভিয়েত সংস্কৃতি আজ বহু বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করছে।'

সোভিয়েট সমাজ ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে নতুন বিষয়বস্তু, রূপায়ণের নতুন পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে সোভিয়েট সাহিত্য। সৃজনশীল সন্ধান, নানা রীতির, নানা ধরনের ও নানা জাতের লেখা এবং প্রত্যেক লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিস্বরূপ বিকাশের বিপুল সুযোগ মেলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে। যে কোন দেশের প্রকাশিত বই-এর বিপুলতা থেকে সাহিত্যের গুণাগুণ পরিমাপ করা যায় না। বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রচনা পাঠের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় উচ্চশ্রেণীর রচনার সন্ধান। গোর্কি বলতেন, টলস্টয়ই বিশ্ব। সুতরাং তিনিই যেন গোটা রাশিয়ার প্রতীক। আজকের সোভিয়েত লেখকদের মধ্যেও ঠিক এমনই প্রতিভাধর, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন লেখকদের সন্ধান মেলে। সাহিত্য পরিসংখ্যান নয়। সাহিত্য হোল প্রতিভা—পরিসংখ্যানে অ-পরিমাপযোগ্য।

(২)

তরুণ লেখকদের প্রথম সম্মেলনে ১৯৪৭ খৃঃ সামরিক মর্যাদার সঙ্গে ফৌজী পোশাক ত্যাগ করেছেন এমন একজন তরুণ কবি ও সৈনিককে বলেন : 'এরপর আপনারা বাঁচার আনন্দ সম্বন্ধে লিখবেন।' সম্মেলনে যোগদানকারী কবিদের মনে কথাগুলি দৃঢ় রেখাপাত করে। প্রতিটি নতুন প্রজন্মে নব নব উদ্দীপনা অননুকরণীয় ভাষায় রূপ লাভ করে থাকে—প্রবীণদের এই ধারণার সঙ্গে কবিরা উপরোক্ত কথা কটিকে পরস্পর সম্পর্কিত জ্ঞান করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁরা উত্তরসূরীদের এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সদ্য-আগত তরুণদের কবিতার বিচার করতেন। এ-বিশ্বাস তাঁরা রাখেন যে নবাগত তরুণরা সারাজীবন সাহিত্যক্ষেত্রের সেবক ও একনিষ্ঠ বন্ধু থাকবেন।

তরুণ লেখকদের সোভিয়েত প্রথম সম্মেলনে সেইসব অল্পবয়স্করা যোগ দিয়েছিলেন, যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ও তার অব্যবহিত পরে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সমালোচকদের কাছে এ'রা যুদ্ধকালীন প্রজন্ম হিসেবে পরিচিত। এই যুদ্ধকালীন প্রজন্ম সোভিয়েত কবিদের নবীনতম প্রজন্মের কাব্যকৃতির বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তরুণ কবিরা যে তাঁদের রচনায় পিতৃপুরুষ ও অগ্রজদের শৌর্য ও কীর্তির যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ফিরে ফিরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষয়ের অবতারণা করছেন, এই ব্যাপারটি অগ্রজ কবিদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। তরুণদের কবিতায় শুধু বিগত যুদ্ধের স্মৃতির রেশটুকু মাত্র নেই, আরও বেশি কিছু আছে। এই তরুণরা সেই নতুন যুগের মানুষ, যাঁরা পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার, সোভিয়েতের বিজয়, সোভিয়েত জীবন ও শান্তির সপক্ষে দাঁড়াতে সর্বদাই প্রস্তুত। এইসব কিছু জয় করে নিতে গিয়ে একদিন যে কী মূল্য দিতে হয়েছে তা এ'রা জানতেন, এ'রা বোঝেন এদের কতখানি মূল্যবান মনে করতে হবে, রক্ষা করতে হবে কীভাবে।

কেউ যুগের হাওয়ায় প্রভাবিত হয়ে আজকের কবি পূর্ববর্তী প্রজন্মের চেয়ে দ্রুত পরিণত হয়ে উঠেছেন। আজকের দিনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সময়ের সঙ্গে তাল রেখে মৌল সমাজ অগ্রগতিতে তরুণ কবিদের নির্ভীক ও দৃঢ় অংশ গ্রহণ। নানা ব্যাপারে আজ কবিদের অনুরাগ কল্পনাতীত রকম বাস্তব ও গভীর। তারুণ্যের কাব্য সাবালক হয়ে উঠেছে। ঐকান্তিক পক্ষভুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে উচ্চমানের দায়িত্ববোধের প্রমাণ দিয়েছে। আমাদের কালের সমসাময়িক মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ-সমস্যার প্রশ্নে মনোযোগী হয়ে উঠেছে এই কবিতা। সময়ের অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য রক্ষা করার এবং জাতিগত ঐতিহ্য অতীতের সংস্কৃতি ও সংগ্রামের বিপ্লবী ঐতিহ্য থেকে বিকাশমান আধুনিক ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন হবার প্রতিপক্ষ থাকায়, এ কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং মননশীল বোঝাপড়ার পথ সুগমতর করে তুলেছে।

বিভিন্ন তরুণ কবির রচনায় একটি মৌল মিল লক্ষ্য করা যায়। অপর কেউ যে-কথা যে-ভাবে বলেছেন তার পুনরাবৃত্তি না করাই এই মিলের ভিত্তি। অনেক সময় প্রথাগত উচ্চারণ ও প্রকাশ পদ্ধতির বাইরে অনন্য ভঙ্গির সন্ধানে তরুণরা অতিরিক্ত মাতামাতি করলে তার নিন্দা করা হয়। কারণ, সত্যিই খাঁটি কবির পক্ষে কাব্যশরীর বা ভঙ্গীর মৌল প্রকাশ-পদ্ধতির সন্ধান আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হতে পারে না। আজকের তরুণরা আপনাদের সব কিছুর নতুন ভাবনায়, প্রকৃতির রূপান্তর ঘটানোর বাসনা ওঁদের হাতে। ওঁরা বিশ্বনিখিলের রহস্য ভেদ করেছেন, প্রবেশ করেছেন গভীরে। ওঁরা পাঠককে আহ্বান করছেন বিস্তৃততর দিগন্তের দুনিয়ায়। সত্যাকার সৎ আর দুঃসাহসী মানুষের জন্যে অবারিত সেই জগতের দ্বার। সাহিত্যে এ পর্যন্ত অভিনব বহু পরিণতি আমাদের পরিচিত, তাদের সকলের চেয়ে জটিল এই তরুণরা। এ'রাই প্রধান কুশীলব সমকালের।

তরুণ কবিদের জীবনের অভিজ্ঞতাও বহু বিচিত্র। কেউ-বা কাজ করেছেন সেনাদলে, কেউ কলকারখানায়, কেউ খামারে, কেউ গৃহনির্মাণ প্রকল্পে, কেউ মাছ ধরার জাহাজে, আবার কেউ-বা স্কুলে। আর এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, এ'রা বহু বিচিত্র মানুষের সাহচর্যে এসেছেন, মানুষের জীবনের গভীরে ডুব দেবার দুর্লভ অধিকার অর্জন করেছেন এ'রা।

কবি আলেকজান্ডার ব্লক বলেছিলেন একবার, 'শিল্প হোল ভুবনের সঙ্গীত-প্রবাহের সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি। সৃজনশীল ব্যক্তির সঙ্গীতপ্রবাহ এবং জনগণের মধ্যে প্রবাহিত সূক্ষ্ম সঙ্গীত—যাকে বলা যায় জনগণের আত্মা, এই দুয়ে মিলেই জন্ম দেয় মহৎ শিল্পের।' —সোভিয়েত কবিদের রচনায় গুণগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে, একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তাছাড়া চেকভের সেই বিখ্যাত উক্তিটি সব সেরা লিখিয়ে হলেন তাঁরাই, যাঁরা বাস্তববাদী, যাঁরা জীবনকে যেমনটি দেখেন তেমনই আঁকেন। তবে যেহেতু এঁদের লেখায় প্রতিটি হরফকে বহতা রসধারার মতো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যবোধে অভিষিক্ত, পাঠক সেইহেতু তা থেকে শুধু যে জীবনের হুবহু স্বাদটুকু লাভ করেন তাই নয়, জীবনের পক্ষে যা হওয়া উচিত তাও অনুভব করেন এবং করে মুগ্ধ হন।'

(৩)

সম্প্রতিকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগতভাবে কবিদের এবং সাধারণভাবে কবিতা-বিষয়ে বিতর্কের অবধি নেই। কবিতা পাঠের সান্ধ্য আসরগুলিতে হাজার হাজার শ্রোতার সমাগম লেগেই আছে। কবিতার বইয়ের সংস্করণ এক লক্ষ কপি ছাড়িয়ে চলে। ২,২৫০ খানা কবিতার বই ছাপা হয় বছরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি মিখাইল ইসাকোভস্কি বলেছেন, এখন কোথাও একটা থামা দরকার। 'সাহিত্যের সমস্যা' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে সাম্প্রতিক সোভিয়েত কবিতার গুণগত ও পরিমাণগত অনুপাতের হার-বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। 'আজকাল প্রতিদিনই অনেক খণ্ড করে কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে। এদের সবই প্রায় কাব্যক্ষেত্রে নবাগতদের লেখা। প্রায় সবই রীতিমতো দুর্বল রচনা। যে-কেউ পংক্তির শেষে মিল দিতে পারে, তাকেই কবি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।'

বলা বাহুল্য, ইসাকোভস্কির প্রবন্ধের ফলে কবিদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। সমালোচক ও পাঠকরা পিছিয়ে

চমৎকার স্বাদ
হচ্ছে এক জিনিষ
আর শক্তিদায়ক পুষ্টি যোগানো
আরেক জিনিষ
আর কেমন মজা কোরে চিবিয়ে
খেতে খেতে সেই পুষ্টিলাভ
করা যায়! পার্লে গ্লুকো বিস্কুটে
দুধ, গম, আর চিনির যাবতীয়
উপকারিতা পাওয়া যায়—
প্রোটিনে আর ভিটামিনে
একদম ভরপুর।
PARLE
Gluco
তাইতো
পার্লে গ্লুকো বিস্কুট
বাচ্চাদের পক্ষে সবিশেষ উপকারী
ভারতের সর্বাধিক
বিক্রীত বিস্কুট
everest/...

হইতেন না। সাহিত্যের সমসাময়িক পত্রিকার চিঠিপত্রের স্তম্ভে এবং সাহিত্য উপরে অন্যান্য পত্রপত্রিকায় উত্তপ্ত তর্কবিতর্ক ছড়িয়ে পড়ল।

কবিতার উন্নততর মানের জন্যে ইসাকোভ্স্কির আবেদন অবশ্যই সকলেই সমর্থন করেন। কিন্তু এই মান উন্নয়নের পন্থা কী, তাই নিয়ে মতভেদ বেশ দেখা গেল প্রচুর। কেউ কেউ বললেন, পঞ্চাশের দশকে কবিতা-ব্যাপারে— যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল, তার কারণ এই সময়ে এভ্তুশেন্কো, রোবের্ত রোঝ্দেস্তভেন্স্কি এবং আন্দ্রেই ভোজনেসেন্স্কির মতো তরুণ কবিরা প্রথম কলম ধরেছিলেন। সমালোচক ভ্লাদিমির ওগ্নেভের মতে, 'উপরোক্ত কবিদের রচনা সম্পর্কে প্রাথমিক উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসার পর আইভ অহংকার সম্বল করে ও জনপ্রিয়তার জন্যে চুলকানি নিয়ে একদল পালাকার সেই সুনামের সন্ধানে ছুটে এসেছিলেন।'

অপর কারো কারো মতে, প্রথমোক্ত তরুণ কবিদের কাব্য-সাফল্যের মূলে প্রধানত ছিল তাঁদের রচনার 'রোমাঞ্চক-গুণ।' 'অমৃত' হিসেবে সাময়িকভাবে তাঁরা নাকি আসর জমিয়েছিলেন। অথচ ঐ একই সময়ে আরও অনেকে লেখার উপাদান সংগ্রহ অথবা সাহিত্যিক মূল্যমানবিশিষ্ট রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। বহু পাঠক আবার মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক পূর্ব-সূরীদের সপক্ষে কলম ধরেছেন। পত্রিকার কবিকুল ও পদ্য-লেখার বাড়বাড়ন্ত-সমান সুযোগ-সুবিধে পাওয়ায় এঁরা মর্মাহত। তবুও একটি দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী লেখেন সৎসাহিত্য ও কুসাহিত্যের সহ-অবস্থান এক চিরকালীন ব্যাপার। এঁদের মতে, বাছবিচার কাজটা পাঠককেই করতে হয়, হাজিমুঠি থেকে সোনা খুঁজে নিতে হয় তাঁদেরই। আর কবিতা যদি বেশি-বেশি প্রকাশিত হয়, তবে তার অনেকখানিই দ্বিতীয় শ্রেণীর হতে বাধ্য। সোভিয়েত কবিতার প্রসার ও ঐশ্বর্য অনবরত বেড়ে চলেছে, তাই এই বৈচিত্র্যের তালগোলে দুর্বল কবিতার অধিকারীরাও প্রতিপত্তি অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

সাধারণভাবে সকলের ধারণা, বর্তমান এই কাব্যোচ্ছ্বাসময়ী অবস্থায় অনেক কিছুই লেখা হচ্ছে যা হয়তো সাময়িকভাবে কিছু মূল্যবান।

এ প্রসঙ্গে কবি সের্গেই নারোভচাতভ বলেন: 'প্রথম প্রথম আমরা এই ভেবে আনন্দিত হয়েছিলাম যে কবিরা, তাঁদের চিন্তা ও অনুভূতির দ্বার উন্মোচন করেছেন। পরে তীক্ষ্ণ আবিষ্কার করলাম, উন্মোচন করা চিন্তা ও অনুভূতির সাতাশ মহিমা ছিল শুধু তিনে ফোরাজিক খেলাই বোঝানো হচ্ছে [illegible]। অনেকের কবিতাই পর পর ছত্রে [illegible] তা মাইল মাইল লম্বা হবে, অথচ তার মধ্যে মর্মকথা ও সৎ আবেগের পরিমাণ কতটুকু ইঞ্চি-খানেক হবে কিনা সন্দেহ। প্রত্যেকেই আজ নাকি কবিতা লিখতে পারে। অথচ আমরা কী করে ভুলি যে বলিষ্ঠ শব্দ-সমষ্টির গর্তে তাকে যিনি ধারণ করাতে পারেন একমাত্র তিনিই যথার্থ কবি।' কবি ভ্ভেগেনি ভিনোকুরভ বলেন, 'সৎ কবিতা। অসত্যের প্রতিরোধ করে থাকে।' 'মিথ্যা কখনো হৃদয়ে গান হয়ে থাকে না, ছন্দে-মিলে মেলে না।'

সকলেই স্বীকার করেন যে, এই অবস্থার প্রতিকারের সবচেয়ে সেরা উপায় হলো পত্রিকা-সম্পাদক ও সমালোচকদের রচনা-নির্বাচন ও সমালোচনার মান উন্নয়ন। কিন্তু কথাটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে ততটা নয়।

আর্সেনি তার্কোভ্স্কি বলেন: 'জিজ্ঞেস করতে পারেন, দেশের এক-একজন যাচ্ছেতাইয়ের উৎপত্তির জন্যে একটা গোটা সংগীতশিক্ষার স্কুল চালানোর প্রয়োজন আছে কিনা। আমি বলি, আছে। স্মরণ, সংগীত-শিক্ষার স্কুল শুধু প্রতিভা-বান তৈরি করার আখড়া নয়, অর্কেস্ট্রার সদস্যকে রীতিমত শিক্ষাদানও তার উদ্দেশ্যের অংশীভূত।

'সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। বহুকাল ধরে শুধু হবে এমন একখানি কাব্যগ্রন্থের প্রয়োজনে, বছরে ৩০০ বা ৪০০ কবিতার বই প্রকাশ অযৌক্তিক নয়। তাছাড়া, পরস্পর প্রতি-যোগিতা, ও উৎসাহদানেরও একটা মূল্য আছে। আর বই প্রকাশ না করা হলে একজন লেখক কীভাবেই বা নিজের মূল্য প্রমাণ করতে পারেন? এমন তো প্রায়ই দেখা যায় যে কোনো লেখকের প্রথম বইটি অনুল্লেখ্য হলেও দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ভালো এবং তৃতীয় বইটি আরো ভালো হয়েছে।'

ইলিয়া সেল্ভিন্স্কি কিন্তু বলেন, 'বস্তু এমনি বাছাইবাছাই করলে শস্য থেকে তুষ আলাদা করা খুব কঠিন কাজ নয়। [illegible]ও একথা বলেছিলেন যে 'পদ্য রচনার বাতিক মারাত্মক মহামারীর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। একে উৎসাহ না দিয়ে এ-রোগের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করা দরকার।' ...'সাহিত্যের ভালোমন্দ বিচারের কোনো অভ্রান্ত মাপ-কাঠি নেই। কিন্তু পাঠক, সমালোচক ও কবিরা যদি একযোগে সর্বপ্রকার অলস, তুচ্ছ, [illegible] কবিতা বর্জন করেন, তাহলেই একমাত্র কবিতার মানোন্নয়ন সম্ভব। আর এই কাজটি যথাযথ সম্পন্ন হলে তবেই কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা রাখা চলে।'

[illegible] বিশিষ্ট উদ্ভাবন কবি ও ঔপন্যাসিক [illegible] একটি রচনায় কবির ও কবিতার লক্ষ্য, শিল্প সৃষ্টির পরিশ্রম [illegible] উঠেছে। নিজেকে কবি হিসাবে গড়ে তোলা দীর্ঘ সাধনার ব্যাপার। কাজটি মোটেই সোজা নয়। এর অর্থ, কারো স্বাভাবিক ক্ষমতাকে শিল্প সৃষ্টির উপযোগী সচেতন ইচ্ছাশক্তির অধীন করা। অল্প কয়েকজনই এ-কাজে স্বল্প আয়াসে সফল হন। আমাদের মতো বেশির ভাগকেই কিন্তু এর জন্যে দীর্ঘ অনুসন্ধান বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণা, পরাজয় ও ব্যর্থতার পথ অতিক্রম করতে হয়।

শেষ পর্যন্ত লেখক যাঁদের সাহিত্যে চিত্রিত করেন এমন সব চরিত্রই লেখকের ফুটিয়ে তোলার উপাদান। চরিত্রচিত্রণে লেখকের যোগ্যতা তাঁর চেতনার অন্তরের স্তর [illegible] উৎস, পৃথিবীর [illegible] ব্যক্তির [illegible] তাঁর আন্তর প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। শুধু ভদ্র-চরিত্র নয়, পাক্কা বদমায়েস চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য। এ-থেকে কারো অব্যাহতি নেই। ব্যাপারটা এইরকম যেন মানবিক আচরণের সব [illegible] সম্ভাব্য রকমফের লেখকের মধ্যেই স্তরে স্তরে বিদ্যমান।

... 'যে-মাটিতে গাছ জন্মায় তার আলো-রূপ নিয়ে গাছের মাথাব্যথা নেই। গাছের কাজ ফুল-ফল [illegible] আর ফল ফলানো। এমন কি গাছে কে কখন ধরল তা [illegible] গাছের, ঠিক ততখানিই যে-মাটিতে তার জন্ম সেই মাটি, এই জানে না সে।' কিন্তু প্রকৃতির এই [illegible] দেখে মানুষের আত্মসন্তুষ্ট হওয়া মানায় না। অন্যান্য অনেক গুণের সঙ্গে প্রকৃতি কিন্তু মানুষকে [illegible] উপযুক্ত ফল [illegible] দায়িত্ববোধের অধিকারী করেছে মানুষকে।

পাঠকের উপর প্রভাব বিস্তারের উপায় দুটি। এক, তাঁর কাছে তাঁর নিজস্ব আন্তর প্রকৃতি বা অন্তর্লোক উদ্ঘাটিত করা; আর নৈতিক, দুই, তাঁর কাছে লেখকের অন্তর্জগতের স্বরূপ উন্মোচন করা। এর মধ্যে কোনটি [illegible] উপায় জানি না। [illegible] বিভিন্ন লেখকের প্রত্যেক রচনায় [illegible] পদ্ধতি [illegible] আবার [illegible] একই লেখকের বিভিন্ন রচনায় [illegible] পদ্ধতির [illegible] লক্ষ্য করেছি। তাঁর দিক থেকে আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল [illegible] যে [illegible] একটি পদ্ধতিই আকস্মিক নয়।

অতীতের প্রায় সমস্ত মহৎ লেখক মানুষকে কখনও বাস্তবে সে যেমন সেই-ভাবে, আবার কখনও কল্পনায় সে যেমনটি হলে ভালো হয় তেমনভাবে চিত্রিত করেছেন। ঠিক এই ব্যাপারটিই মিলিত-ভাবে সাহিত্যে নতুন ধরণের মানুষ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। পৃথিবীতে তাদের অবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্কে তাদের নতুন বৈশিষ্ট্যে এক নতুন জাতের মানুষ।

মোটকথা সৃষ্টিশীল রচনা স্বপ্নের দ্যুতিতে আলোকিত না হলে আমার কাছে তা নিষ্প্রাণ ঠেকে।'

(৪)

রুশ সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, যে একটিমাত্র সামাজিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বাসনা রুশ দেশের সাহিত্য সমাজের একটি দীর্ঘকালের বৈশিষ্ট্য। গত উনিশ শতকে প্রগতিশীল লেখকদের প্রায়ই প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক পত্রিকাগুলির সম্পাদক-মণ্ডলীকে ঘিরে এবং তথাকথিত সাহিত্যের সান্ধ্যগুলিতে মিলিত হতে দেখা যেত। ১৯১৭ খৃঃ অক্টোবর বিপ্লবের পর দেশের প্রায় সমস্ত লেখককে নিয়ে বহুবিধ সাহিত্যসংঘ, গোষ্ঠী ইত্যাদি গড়ে উঠতে থাকে। রুশ ফেডারেশনের লেখক ইউ-নিয়নের পাশাপাশি রুশ প্রোলেতারীয় লেখক সংঘ ও অন্যান্য বহুগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। শতাব্দীর বিশের দশকের সূচনায় একমাত্র মস্কোতেই তিরিশটিরও বেশি সাহিত্য সমিতির অস্তিত্ব দেখা যায়। এছাড়া জাতীয় প্রজাতন্ত্র বা রুশ দেশের প্রত্যন্ত উপকণ্ঠগুলিতে, সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির ফলেও পূর্বোক্ত সমস্ত লেখকের শক্তিকে, প্রতিটি লেখকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে আঘাত না করেও, একটিমাত্র সামাজিক সংগঠনে সংহত করার প্রয়োজ-নীয়তা দেখা দেয়। এরই ফলে গড়ে ওঠে লেখক ইউনিয়ন।

যাঁরা মনে করেন ১৯৩৪ খৃঃ 'সব লেখককে একই ছকে ধরিয়ে দেওয়ার' চেষ্টা করা হয়েছিল তাঁরা ভ্রান্ত। সোভিয়েতের লেখকদের প্রথম কংগ্রেসেই প্রতিনিধিরা শিল্প-সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতিকে শিল্পগত প্রকরণ, রচনাশৈলী ও প্লট তৈরির সমস্যা সমাধানের হাতে-ধরা মন্ত্রপূত মনে করার অতি-সরলী-করণের ঝোঁকের বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করে দেন। লেখক ইউনিয়নের সংবিধিতেও তখন লিপিবদ্ধ করা হয়: 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা শিল্পসৃষ্টিতে, বহু বিচিত্র প্রকরণ, রচনাশৈলী ও রচনার ধরণসৃষ্টিতে সৃষ্টিশীল উদ্যোগ প্রয়োগের অসামান্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই আদর্শ সামনে রেখেই তখন থেকে সোভিয়েত সাহিত্য বিকশিত হয়ে চলেছে। তখন থেকে এপর্যন্ত একজন লেখককেও কীভাবে তিনি লিখবেন তার নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

মিখাইল শোলোকভ, ১৯৫৪ খৃঃ ডিসেম্বরে, সারা সোভিয়েত লেখক সম্মে-লনে বলেছিলেন: 'আমাদের সম্পর্কে অর্থাৎ সোভিয়েত সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিদেশে বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুরা বলে থাকেন, আমরা নাকি পার্টির নির্দেশে লিখি। ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। আমরা প্রত্যেকেই লিখি আপন হৃদয়ের নির্দেশে, আর আমাদের সেই হৃদয়টি পড়ে থাকে পার্টি ও জনগণের কাছে, সাহিত্যকর্ম দিয়ে আমরা যাদের সেবা করি।'

সোভিয়েত সমাজ ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে নতুন বিষয়বস্তু, রূপায়ণের নতুন পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে সোভিয়েত সাহিত্য। সৃজনশীল সন্ধান, নানা রীতির, নানা ধরণের ও নানাজাতের লেখা এবং প্রত্যেক লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিস্বরূপ বিকাশের বিপুল সুযোগ মেলে সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতি বলতে গোর্কি বুঝিয়ে-ছিলেন: জীবনকে দেখে কর্মকাণ্ডরূপে, সৃষ্টিশীল ধারারূপে। এর লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মূল্যবান ব্যক্তিগত সামর্থ্যগুলির অনিরুদ্ধবিকাশ সাধন। উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মানুষের বিজয় অর্জন, তার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু, পৃথিবীতে বাঁচার আনন্দ অর্থাৎ যা মানুষ চায় এবং পৃথিবীকে সমস্ত মানুষের এক পরিবারের আবাসভূমিতে রূপান্তরিত করার মানুষের যে ক্রমবর্ধমান দাবি তার সঙ্গে যে ইচ্ছার পূর্ণ সংগতি রয়েছে।'

পক্ষাবলম্বন না করেই জীবনের সত্যকে চিত্রিত করার, যে-ব্যাপারে বিমুখ হবার চেষ্টা অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যে এর ফলে সত্যের বিকৃতি ঘটে এবং পরিণতিতে সত্যই বর্জিত হয়ে থাকে।

তর্ক উঠতে পারে, সম্ভবত কোনো লেখকই সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত জীবনচিত্র পরিবেশন করতে পারেন না। কথাটা সত্যি। লেখকের কাছে এ-বস্তু দাবি করা অন্যায় ও অবাস্তব। তবে জীবনের যত সীমাবদ্ধ অংশই লেখকের রচনার বিষয় হোক না কেন, তাঁকে সমগ্র জীবন সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়, জীবনের সামগ্রিক গতি ও পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত এমন বহুবিধ কর্মপ্রবাহের অংশ হিসাবে সর্বদা প্রতিটি ক্রিয়াকলাপকে বিচার করতে হয়।

কোনো কোনো সোভিয়েত লেখক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের সমালোচকরা বলেন, তাঁরা নাকি 'বোধ বিশ্লেষণী বুদ্ধিসম্পন্ন, বাছবিচারে বোধ পটু'। কিন্তু ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ঐ সব লেখকের 'বাছবিচার'-এর অর্থ আর কিছুই নয় কেবল তাঁদের সাহিত্যে জীবনের অন্ধকার, অসাড় অংশের বর্ণনা। এই সমালোচকরা 'সত্য' বলতে একমাত্র না হলেও প্রধানত, 'স্বরূপ উদ্-ঘাটন, নীচতম ও নৈতিক দিক থেকে অস্বাভাবিক চরিত্র-চিত্রের প্রদর্শনীকে বোঝান।

কোনো সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করবেন না যে বিকাশের বিশেষ পর্যায়ে সমাজের কেন্দ্রবিন্দুর, দুর্নীতিদুষ্টের সমালোচনা শিল্পের স্বাভাবিক কর্তব্য। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বাস্তবতার উপলব্ধি ও তার বিবর্তন সাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি এটি। কিন্তু কোনো শিল্পই, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্প তো নয়ই, শুধুমাত্র ঐ কর্তব্যটুকু পালনের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না।

শিল্পীকে শুধু বর্জন করতে জানলেই চলে না, তাঁকে গ্রহণ করাও শিখতে হয়। অসুবিধে ও দুর্নীতিদুষ্ট সম্পর্কে তিনি শুধু সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেই চলে না, সেই অসম্পূর্ণতা পূরণে তাঁকে সাহায্যও করতে হয়, সমাজবিকাশের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন প্রতিটি প্রবণতাকে সমর্থন জানাতে হয়।

'সত্য' কথাটির অর্থ যে 'স্বরূপ উদ্‌ঘাটন' এই মত অনেক জনসাধারণের জীবনে সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে অতি-রঞ্জিত ধারণার ফল। এ-কারণেই দাবি করা হয়, সাহিত্য সমাজের বিবেক। অসম্পূর্ণতাকে নগ্ন করে দেখিয়ে এবং দুর্নীতিকে তীব্র কশাঘাত করে সাহিত্য-সমাজকে উজ্জীবিত করে ও নিশ্চল নিশ্চেষ্ট অবস্থা থেকে বাঁচায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী লেখক ভবিষ্যদ্বক্তা, ত্রাণকর্তা এবং ব্যক্তিত রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে জনগণের একমাত্র রক্ষক ছাড়া কিছু নন। হাতিয়ার হিসেবে কলমের শক্তি যে কী, তা সোভিয়েত সমাজের চেয়ে বেশি আর কেউ বোঝে না। তবু লেখক অন্য সকলের চেয়ে বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, এটা সোভিয়েতের মানুষও সত্য বলে মনে করেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে লেখক সকলের চেয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি কিংবা সবচেয়ে সঠিকভাবে সবকিছু বোঝেন, অথবা, জনগণের সঙ্গে তিনিই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সুখদুঃখের কথা তাঁর পক্ষেই সবচেয়ে ভালোভাবে জানা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জীবন ও শিল্পের এবং শিল্পী ও সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক অপর সকল উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিবর্তন শিল্পীকে অস্বীকার করতে হবে, এও তাঁরা মানেন না।

মনের কথা

অহিফেন-স্বপ্ন
চন্দ্রবাবু ও ইউরিপিডিস

চন্দ্রবাবু আমার কাছে রোগী হিসেবে আসেননি, কাজেই তাঁর মনের কথা সঠিক ভাবে জানবার সুযোগ ঘটেনি। কন্‌শীর আত্মীয়ো তাঁর সুরাপান ও অহিফেনসেবনের কারণ [illegible] পাঠক সমক্ষে [illegible]। তাঁর [illegible] অন্যতম [illegible] এ তিনি [illegible] (ট্রেক্‌র-এর ভাষায় ইগোট্রিপ)। অন্তর্মুখীনতা আত্মপ্রকাশের অন্তরায়। অন্তর্মুখীনতা সুরাপানে উৎসাহী হয় অন্তর্মুখীনতা দূর করতে, আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছে বহির্মুখীনতা। [illegible] "চন্দ্রবাবু কি কখনো তাঁর নিজের কথা জানাতে পারে নিজেকে জাহির করতে পারে, নিজের চেয়ে নিজের কাছে [illegible] আত্মপ্রচারের [illegible] পারে।" চন্দ্রবাবু অনেক জানেন, অনেক পড়েছেন, অনেক শিখেছেন; অথচ অন্যকে [illegible] কোনো [illegible] স্বাভাবিক অবস্থায় সে-কথা জানাতে পারতেন না। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় নিজের কথা বলার মত ভাল-গারিটি থেকে [illegible] হয়ে থাকেন। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি নিজের বিদ্যা জাহির [illegible] ভাগ্যবান না হলেও সসম্মোহ [illegible] প্রচেষ্টা। আমি যখন তাঁকে দেখেছি তখন তিনি আলকোহল ছেড়ে অহিফেনের সেবায় রত। [illegible] আলকোহল [illegible] সম্পন্ন। [illegible] বহির্মুখীন [illegible] আরো বেশি [illegible] প্রচারের অভ্যাস ছাড়তে পারেননি [illegible] থেকে আমার মনে হয়েছিল [illegible] দ্বারা প্রতিষ্ঠা [illegible] আলকোহলের [illegible] হয়েছিল। এই ধরনের মানুষ অনেকখানি [illegible] হজম করতে [illegible] মাত্রা সুরার প্রভাবে [illegible] হয়ে পড়ে, তখন তাঁরা [illegible] থেকে অন্যদের

কেরানি অবস্থায় বেলেল্লাপনার উপভোগ করে, তাদের থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। অন্যদিক দিয়ে যারা চন্দ্রবাবুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই সব নামী ও দামী মানুষদের দুর্বলতা চন্দ্রবাবুকে খানিকটা খুশি করতো, নিজের অসাফল্যের (সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ না করার দরুণ) বেদনা ভুলে থাকতে সাহায্য করতো। কয়েক ঘন্টার জন্যেও তিনি এদের চোখে চোখ রাখবার বিধ্বস্ত করতে পারতেন, নিজের হীনমন্যতার গ্লানি থেকে মুক্ত থাকতে পারতেন। আলকোহল-আসক্তির মূলে ছিল এই মানসিকতা। কিন্তু প্রতিষ্ঠালাভ যখন অসম্ভব মনে হল, পরিচিত মহলে যখন বন্ধুপত্নীর প্রতি দুর্বলতার দরুন মর্যাদাহানি ঘটলো, তখন সুরার প্রতি অনাসক্তি জন্মালো। বহির্মুখীন হয়েও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে উঠতে পারলেন না, কাজেই বহির্মুখীন হবার চেষ্টা থেকে অন্তর্মুখীনতাকে প্রশ্রয় দিলেন; মদ ছেড়ে আফিমের জন্য দ্বন্দ্ব করলেন। আর একটি কথা, চন্দ্রবাবুর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ও বাজারে বিলাতি মদের সরবরাহ কমে যাওয়া—চন্দ্রবাবুর সুরাবর্জন ও অহিফেন [illegible] খানিকটা প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়ই।

অহিফেনসেবী চন্দ্রবাবুও স্বপ্ন দেখতেন। তিনি ডিকুইন্সীর মত লিপিবদ্ধ করেননি, তবে মাঝে মাঝে তদের কাছে প্রকাশ করতেন। সে সময় তাঁর হাবভাব অনায়ত্ত হয়ে যেত। স্বরগ্রামে উদারা-মুদারা-তারা ওঠানামা করত, আধবোজা চোখ মাঝে মাঝে বিস্ফারিত হয়ে উঠত, চোয়াল শক্ত হয়ে যেত। বলার ভঙ্গীতে নাটকীয়তা প্রকাশ পেত। তাঁর স্বপ্নে ডিকুইন্সীর মত রঙ-রসের সমারোহ থাকতো না, ক্লিওপেট্রা অথবা [illegible] থাকতো না। তাঁর স্বপ্নে শোনা যেত বন্দুকের আর মরণের আর্তনাদ। তিনি স্বপ্নে শুনতে পেতেন সাইক্লোনের তুমুল শব্দ; সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস আর ভূমিকম্পের আওয়াজ; দেখতে পেতেন এক [illegible] মূর্তি-

মস্তক বিকটাকার কালপুরুষকে, যাকে যদুকুল ধ্বংসের পূর্বমুহূর্তে যাদবগণ দেখেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখতে পেতেন মুষলপর্বে বর্ণিত লৌহমুষল প্রসব করছে। রাজা উগ্রসেন রাজ্যে সুরা প্রস্তুত বন্ধের হুকুমনামা জারী করা সত্ত্বেও বেআইনী চোলাই চলছে। স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ সকলেই সুরাপানে মত্ত হয়েছে। সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতায় বৃষ্ণিবংশীয় বৃদ্ধ-বালক সকলেই আক্রান্ত। সমুদ্রতীরে পানরত সঙ্গ্রামমত্ত যুবকবৃন্দ অনিয়ন্ত্রিত হাস্যপরিহাস করে চলেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ধ্বংসলীলার জন্য অন্ধ-করা দিয়েরা কৃষ্ণকে দোষারোপ করছে। কৃষ্ণ-বলরামের নেতৃত্ব মানতে চাইছে না যাদবদের একাংশ। গাভীরা সিংহনাদ করছে, ছাগশিশু মত্ত হয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী লড়াই শুরু করে দিয়েছে যাদবরা। সাত্যকী কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করেছে, ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যকী ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দের বেষ্টন করে উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র দিয়ে আঘাত করছে। নর্তকীরা মত্ত অবস্থায় যাদবদের কণ্ঠলগ্ন হয়ে সমুদ্রতীরে নির্লজ্জ রতি-ক্রীড়ায় রত। সমাজের প্রতি অনাস্থা জানাচ্ছে। তিনি দুর্গাপুজোর পরমার্থিক শক্তিসম্পন্ন করে যাদবদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। [illegible] সবাই ধ্বংস হল। সমুদ্র থেকে এক বিশাল জলস্তম্ভ আকাশে উঠলো। মাটি ফুঁড়ে অগ্নিশিখা বেরুচ্ছে। পাহাড়ের চূড়া ভেঙে সাগরে পড়ছে। দ্বারকা নিশ্চিহ্ন, নিশ্চিহ্ন দুরাচার অনাচার ব্যভিচারে লিপ্ত দ্বারকা, নগরবাসী সভ্য মানুষ। গাণ্ডীব তোলার ক্ষমতা হারিয়েছেন গাণ্ডীবী। [illegible] অনার্য দস্যুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হলেন। অনার্য মানবগণ আর্যদের মনোলোভন আর সুন্দরী রমণীদের অধিকার করে অন্তর্হিত। [illegible] নাগরিক-সভ্যতা প্রকৃতির [illegible] বিচ্ছিন্ন সভ্য মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে পরাভূত।

চন্দ্রবাবুর এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করতেন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে, সিগার-এর

দিকে তাকিয়ে। এই রকম সাধুভাষায় অনর্গল কথা বলে যেতেন। তখন তাঁকে আর আফিং-উপাসক অন্তর্মুখীন বলে মনে হত না। বরঞ্চ মনে হত সুরামত্ত এক উন্মাদ প্রলাপ বকে চলেছে। অন্তর্মুখীন বহির্মুখীন হয়ে গেছে। একদিন এই অবস্থায় আমি তাঁকে দেখেছিলাম। ঘোর কেটে যেতে স্বাভাবিক সহজ সুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তামসিকতা মদ খায় আবার মদ তামসিকতা বাড়ায়। তামসিকতা কি জানেন? পশুপ্রবৃত্তির তাড়না। তোমাদের বিজ্ঞান এই রিপুটিকে বাড়িয়ে তুলেছে। প্রকৃতিকে জয় করেছ মনে করে তোমরা অহংকৃত। নগর-সভ্যতা গড়ে তোমরা উল্লাসে নৃত্য করছ, তোমাদের অবস্থা একদিন হবে ঐ স্পারটার দানবদের মত। আমি কোলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি। তোমাদের শহরনগর সব একদিন স্পারটার মত ধ্বংস হয়ে যাবে। সে-দৃশ্য সইতে পারব না বলেই পালিয়ে এসেছি। ইউরিপিডিসের মত একটা নাটক লিখব মতলব করেছি। ইউরিপিডিসও এথেন্স ছেড়ে ম্যাসিডনের পাহাড়ে-গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এথেন্সে তখন হানাহানি কাটাকাটি চলেছে। স্পারটাতে যেমন বুকিভোজ ইত্যাদি নানা উপজাতির লড়াই হয়েছিল, এথেন্সেও ঠিক তেমনি চলছিল। নানা দল-উপদলের লড়াই। নেতারা হাতিয়ে দিয়ে মজা দেখছিল। একদিন যোদ্ধাদের তরোয়ালে যে নিজেদের গলা কাটতে পারে, সে-কথা ভাবেনি। মদ, মদ, সেখানেও মদের স্রোত বয়ে চলেছিল। একদিকে মনের মধ্যে গর্বের প্রবাহ, অন্যদিকে রক্তের মধ্যে সুরার প্রবাহ। বুড়ো ইউরিপিডিস বুঝতে পারলেন এরা মরবে। সত্তর বছরে তিনি সেই মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়ে লিখলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক দি বাক্কে। আমার এখনও সত্তর হয়নি। সত্তরে পৌঁছে আমিও ঐরকম একখানা নাটক লিখব। এই সভ্যতার মৃত্যু-কাহিনী লেখা থাকবে আমার সেই নাটকে। সভ্যতার কুষ্ঠ হয়েছে, সেই জন্যে তাকে সাদা মনে হচ্ছে। তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লেপ্রা-ব্যাসিলাস। হিংসাদ্বেষ অহঙ্কারের চারণভূমি তোমাদের সভ্যতার পীঠস্থান নগর-শহর। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুৎসিত হয়ে পড়েছে মানুষ। উৎকণ্ঠা অশান্তিতে ভরা মন নিয়ে মানুষ আর চলতে পারছে না। সভ্যতার মধ্যে বাস করে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার কথা বলা আহাম্মুকী। নগর ছেড়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে যাও, নিজেকে সেখানে খুঁজে পাবে। কিন্তু সভ্যতার স্বাদ একবার যে পেয়েছে, সে আর প্রকৃতির সঙ্গে এক হতে পারে না। বিচ্ছিন্নতা দূর করতে তাকে মদের আশ্রয় নিতেই হয়। প্রকৃতির মদ আর চোলাই মদ, এই দুয়ে মিলে তাকে মত্ত করে তোলে।

—আচ্ছা, তুমি কি মনে কর ডাক্তার? বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে কি কাজ হয়? বুদ্ধিবাদী ব্রাহ্মাকিশোর গলা টিপে মারতে পারে। জ্ঞান আমরা কোন্ কাজে লাগাই? প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজে জ্ঞানী-গুণীরাই অগ্রণী। নারীর সৌন্দর্য কেন? পুরুষকে প্রলুব্ধ ও প্রমত্ত করার জন্যে। ন্যায় কি? বদলা নেওয়াকে নীতিসম্মত করার বিধি। দেবতা মানবের চেয়ে বহুলোভী ও ভয়ঙ্কর; মানুষের ভেতরকার পশু বনের পশুর থেকে অনেক বেশী দানব। বিশ্বাস না হয় তো ইউরিপিডিসের ঐ নাটকটা পড়ে দেখ।

—আমিও ঐরকম একটা নাটক লিখতে চাই। থিবিসনগরী গড়ে তুলে রাজা ক্যাডমাসের মনে অহংভাব জেগেছিল। তার বংশধর পেনথিয়াস আরো অহঙ্কারী। ডায়োনিসাস পেনথিয়াসের ভাই, দেবতার ঔরসে জন্ম। তাই আরো অহঙ্কারী, আরো ভয়ঙ্কর। পেনথিয়াসের নাগরিক মন চেয়েছে, রাজত্ব বজায় রাখতে চায় পুরনো সভ্যতার ঐতিহ্য দিয়ে, সৈন্য আর সোনার সাহায্যে। ডায়োনিসাস নিয়ে এল পাগলা হাওয়া, সুরার ঝরণা, মনমাতানো গান। বেরিয়ে পড়লো থিবিস ছেড়ে মেয়ে-পুরুষের দল। সভ্যতার কঙ্কাল ছেড়ে প্রকৃতির রাজ্যে, বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে। শুরু হলো সংগ্রাম। একদিকে পুরনো ঐতিহ্য, অন্যদিকে অর্বাচীনের নাচগান। একদিকে নগর, অন্যদিকে প্রকৃতি। ধ্বংস হলো থিবিস, ধ্বংস হলো সভ্যতা। পেনথিয়াসকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো নিজের হাতে তার সুরামত্ত মা-বোনেরা। দেবতার প্রতিশোধ লালসা মিটলো। ওরা গণহিস্টিরিয়ায় ভুগছিল।

—তোমরা ক্যালকাটানরা কার বংশধর? জব চার্ণকের? না, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের? ফিরিঙ্গীদেবতা ডায়োনিসাসের দলে, না নরদেবতা পেনথিয়াসের দলে? যার দলেই হও না কেন, বাঁচার আশা করো না। জানো, মায়ের হাতে আমি সন্তানের মুণ্ড দেখতে পাই। পেনথিয়াসের মায়ের হাতে সন্তানের মুণ্ড। সে ছেলেকে চিনতে পারছে না। দেখেছি দেখতে পাই বাপের শবদেহের উপর উল্লাসে নৃত্য করছে বালক-বালিকার দল। তাদের হাত বাপের রক্তে রাঙা। আবার একটু পরেই দেখি তারা, ঐ ডায়োনিসাসের ভক্তরা নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়েছে। তখন আর তারা গ্রীক-পোষাকে নেই, তারা সব যাত্রার দলের কৃষ্ণ-বলরাম সেজে গদাচক্র নিয়ে যুদ্ধ করছে। থিবিস থেকে একেবারে দ্বারকায় চলে আসে আমার স্বপ্ন-রাজ্য। যাদবরাও কি হিস্টিরিক?

এইরকম সুসংবদ্ধ অর্থবহ স্বপ্ন কেউই দেখে না। দিবাস্বপ্নও এরকম হতে পারেনা। চন্দ্রবাবু তাঁর চিন্তাধারা সাজিয়ে-গুছিয়ে আমাকে শোনাচ্ছেন। আফিং-প্রসাদে তাঁর কল্পনার বিস্তার ঘটেছে। তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করছেন। নিজেকে সত্যের প্রচার করবার চেষ্টা করছেন। কিম্বা হয়ত, অনেকদিন ধরে এই রকম চিন্তা করে করে তাঁর চোখের সামনে দৃশ্যগুলো জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। হয়ত, যা বলছেন, সেটা বিশ্বাস করেন, তাই চোখেমুখে ঐরকম অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছে। হিস্টিরিয়ার রোগীর মত মনে হচ্ছে ওঁকে। কিন্তু অন্তর্মুখীন টাইপের সঙ্গে হিস্টিরিক টাইপের অনেক তফাৎ। ইয়ুং-এর ইন্ট্রোভার্ট এবং পাভলভের দার্শনিক টাইপের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের চিন্তাবৃত্তির স্তর (দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর) বেশী প্রবল। এ-সবটাই বোধহয় অভিনয়। ভদ্রলোক আমাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে অভিনয় করছেন। আবার ভেবে দেখলাম, আমার এ-অনুমানও ঠিক নয়। কেননা, আমার অধ্যাপক বন্ধুর

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

অমিতা রায়ের নতুন নাটক

ছুটির খেলা

নাটকের ঘটনা গড়ে উঠেছে রমণীয় প্রাকৃতিক জগতে অবস্থিত একটি ছোট বোর্ডিং হাউসে, যেখানে কয়েকজন শহুরে স্ত্রী-পুরুষ উঠেছেন ছুটি কাটাতে। তাদের মধ্যে একজন ব্যতিক্রম হল রঞ্জন—যার ছুটির বার্তায় গভীর কল্পনায় মনে মোহ জাগায়। দুজন বড় কাছাকাছি চলে আসে। অন্যান্য সকলের মনেও যেন একটু নেশা লাগে। কিন্তু এই ছুটির খেলা তো একদিন শেষ হবেই। ...সেইদিন ঘনিয়ে এল, স্বপ্নের ঘোর গেল কেটে।......

॥ তিন অঙ্কের নাটক : দাম দু'টাকা ॥

প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বলেন, "...সমস্ত নাটকটির উপরে একটি গীতিকাব্যিক সৌন্দর্য ও রহস্য যেন ছড়িয়ে আছে। এ নাটকের সংলাপ প্রায় মার্জিত ও কাব্যময়, সেজন্য এর আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থায়ী।"

জেনারেল বুকস

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

কাছে শুনেছি, এই স্বপ্নবৃত্তান্ত আমার অনুপস্থিতিতে তাঁকেও শুনিয়েছেন। আগে অনেক ভদ্রদের এই অভিনয় দেখিয়েছেন। কমলাকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করতে চান নাকি ভদ্রলোক? মোট কথা, চন্দ্রবাবুর কাছ থেকে অন্যমনা বাঘের মতই হতবাক হয়েই বিদায় নিলাম। ভদ্রলোকের মানসিকতা নিরূপণ করতে পারলাম না। তাঁর মনের কথা মনোবিদের কাছে দুর্বোধ্যই রয়ে গেল।

কয়েকদিন আগে এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু দেখা করতে আসেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে চন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি জানতে চাইলেন, হ্যালুসিনেশনের শারীরবৃত্ত ও মনস্তত্ত্ব। যতটা পারি সহজ করে তাঁকে জানালাম। 'অমৃত'-এর পাঠকরা আমার সে-বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত। বন্ধু হ্যালুসিনেশন দেখছেন। রিটায়ার করে হাজারীবাগের দিকে বাড়ী করেছেন। সেখানেই চাকর-ঠাকুর নিয়ে তাঁর সংসার। ছেলেরা কৃতবিদ্য; নিজেদের কর্মস্থলে আছে। বন্ধু বিপত্নীক। একা থাকেন। রাতে খাওয়ার আগে কিঞ্চিৎ মাত্রায় আফিং সেবন করে থাকেন। সেই সময় বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তিনি হ্যালুসিনেশন দেখেন, হ্যালুসিনেশন শোনেন। মনের অন্য কোনো রকম বিশৃঙ্খলার কথা তিনি সেদিন বলেননি। তিনি স্বপ্ন দেখছেন না। স্বপ্ন কেউ জেগে দেখে না বললেন তিনি। চন্দ্রবাবুর মত অবশ্য নাট্যরসের আমদানী করার চেষ্টা করলেন না বন্ধু। ইটপাথরের মত নিরেট তিনি চিরকাল। হ্যালুসিনেশন তাঁকে ভাবাধর্মী করে তোলেনি। চন্দ্রবাবুর মত ডি কুইন্সীর অক্ষম অনুকরণের চেষ্টাও তিনি করলেন না। হয়ত, ডি কুইন্সীর নামই শোনেননি, কমলাকান্তের নাম শুনলেও পড়ে দেখেননি। সোজাসুজি কথাগুলো বলে গেলেন।

—প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে বাঘের ডাক শুনতে পাই। প্রথমটায় মনে হয়, জঙ্গলে সত্যিই বুঝি বাঘ এসেছে। তারপর শুনি সিংহের ডাক। এ-তল্লাটে বাঘ দু-একটা থাকলেও থাকতে পারে, সিংহ কোথা থেকে আসবে? ভুল শুনছি নাকি? ঘুমিয়ে পড়িনি ত? হাতের চুরুটটায় টান দিয়ে বুঝতে পারি যে জেগে আছি। তারপর কুলীদের হৈ-হল্লা শুনি। পাল্কী নিয়ে রাস্তা দিয়ে বেহারারা চলছে শুনতে পাই, কানের সেই পরিচিত কোরাস, 'হুকুম দৌড়' 'হুকুম দৌড়'। হয়ত একটু ঝিমুনী আসে। জোর করে তাকাই। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। একটা উঁচু গম্বুজের ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাই। চিনতে পারি। এটা আমাদের গড়ের মাঠের মনুমেণ্ট। এখন নাম শহীদ মিনার, তাই না? সামনে তাকিয়ে দেখি আদি গঙ্গার খালের মত ক্ষীণ জলস্রোত বয়ে চলেছে। বুঝতে পারি এটা এক সময় ছিল হুগলী নদী। এখন, টালীর নালা হয়ে গেছে। বুকের কাছটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তাহলে আমাদের কোলকাতার এই অবস্থা হয়েছে। মনে পড়ে যায় কোথায় যেন পড়েছি এই সব কথা। ফারাক্কার বাঁধে কাজ হল না। হুগলী শুকিয়ে গেল। তার আগে কোলকাতার মানুষগুলো শহর ছেড়ে বনে পালাল, আর সুন্দরবনের পশুগুলো কোলকাতায় এসে আস্তানা পাতলো। একটু দূরে একটা বিরাট অজগর হাঁ করে এগিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাব, এমন সময় শুনি ঠাকুর এসে খবর দিচ্ছে যে, খানা তৈয়ার। সামান্য একটু চমকে উঠে তার দিকে তাকাই। বন্ধুর কথা শেষ হল। রোজই এরকম দেখছি, তা নয়। তবে মোটামুটি এরকম বলা চলে। অন্য লোকের সঙ্গে যে-সন্ধ্যা গল্পগুজবে কাটে, সে-সন্ধ্যায় এসব দেখি না, শুনি না। বাইরে কোথাও গেলে হ্যালুসিনেশন থাকে না। দু' রাত কোলকাতায় কাটিয়েছি, কোনো গোলমাল ঘটে নি। আফিমের মাত্রা একই আছে। খাবার আগে নিয়মিত আফিম খাচ্ছি, কিন্তু হ্যালুসিনেশন নেই।

বন্ধুবর স্থানীয় এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে দু' বছর আগে রিটায়ার করেছেন। কলেজের হাঙ্গামা-হুজ্জুত এড়াবার জন্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আমি জানতাম। হুগলী নদীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন। ফারাক্কা প্রকল্পে কোনো কাজ হবে না, তাঁর ধারণা। তাঁর এক পৌত্র কিছুদিন আগে ছুরিকাহত হয়ে মারা গেছে। ছেলেটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিল। তাঁর হ্যালুসিনেশনের কারণ অতি সহজেই বোঝা গেল। কোলকাতায় থাকতে মাঝে মাঝে দেখা হলেই তিনি বলতেন, হোগলাবন কেটে কোলকাতা হয়েছিল, আবার দালান কোঠা ভেঙে এটা হোগলাবনই হয়ে যাবে। চন্দ্রবাবু স্বপ্নের উপর রং চড়িয়ে আমাকে শুনিয়েছেন, সাহিত্য করতে চেয়েছেন, আমার বন্ধু দু'চার কথায় তাঁর হ্যালুসিনেশন আমাকে বলেছেন। বন্ধুকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম তাই তাঁর হ্যালুসিনেশনের হদিশ পেলাম, চন্দ্রবাবু ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেলেন। শুধু, বুঝলাম তাঁর স্বপ্নের মধ্যে, প্রতিটি ইচ্ছার মধ্যে অহং-এর আধিক্য। যে তামসিকতাকে তিনি ঘৃণা করেন, সেই তমোভাবে তিনি ঘোরতর আচ্ছন্ন।

এইবার চিকিৎসা। হাসপাতাল ছাড়া উপায় নেই। অনেকে রাতারাতি আফিম বন্ধ করার পক্ষপাতী, কেউ কেউ আবার ধীরে ধীরে মাত্রা কমানোর সপক্ষে। আফিম বন্ধ হলে অনেক রকমের উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। সেগুলো দূর করার জন্যে ট্রাঙ্কুইলাইজার দেওয়া হয়। আজকাল আবার দুটো একটা নতুন ওষুধ দিয়ে আরো ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। ভিটামিন ও নিকোটিনিক এ্যাসিড ইনজেকশন খুবই কার্যকর। ০.৩ গ্রাম এ্যাসপিরিন দিনে দু-চারবার খেতে দিলে বেশ উপকার হয়। নানা রকমের ফিজিওথেরাপীর বন্দোবস্ত ভাল ভাল হাসপাতালে থাকে। মরফিন আসক্তদের বেলায় অ্যাসিটিল-কোলিনের মাত্রা বেশী পাওয়া যায়। সোভিয়েত চিকিৎসক রাযখেনের নতুন চিকিৎসাবিধিতে কোলিনোলাইটিক ও কুরারের মত ওষুধের প্রয়োগ করা হয়। এতে নাকি খুব সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

—মনোবিদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিনয় উন্মাদের মত যে ছেলেটি মেয়েটির হাত মুচড়ে দিয়েছিল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ধস্তাধস্তি। চিৎকার হৈ-হট্টগোল। চার-পাঁচজন তাকে ঘিরে অনবরত আঘাত করেছিল। সে লড়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু পিঠে ছোরার আঘাতের পর চিৎকার করে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। এবং আস্তে আস্তে চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে এসেছিল।...

তীব্র ওষুধের গন্ধে বিনয় সচকিত হয়ে চারদিকে তাকাল। দু'একজন করে ভিজিটার্স আসছে। ওদেরও আসবার সময় হয়ে এল। সেই ঘটনাই এতক্ষণ ধরে সে ভাবছিল। এখন মনে হয় ওইসব ব্যাপারে তার এগিয়ে না গেলেই হোত। দূরে কোথায়ও সরে যেত। অথবা বাড়ি ফিরে যেত। কিন্তু তা পারেনি। কী আশ্চর্য সাহস সেই ফর্সা মেয়েটির!

শেফালী কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল, জেনেশুনে তুমি বিপদ ডেকে আনলে কেন?

বিনয় নীরবে তাকিয়েছে স্ত্রীর দিকে। কোন উত্তর দেয়নি। কিই বা বলবে। সবাই পাশ কাটিয়ে বাঁচতে চায়। কী বিশ্রী অবস্থা চারদিকে! ভাবলে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। এই রকম কথা বলাই স্বাভাবিক শেফালীর পক্ষে। দুটি মেয়েকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে অপমান করছিল বাজে কতগুলি ছেলে, তাতে তোমার কী! আরও অনেকে আশেপাশে ছিল। সঙ্গিনী সহ ভ্রমণ করছিল। কই তারা তো কেউ এগিয়ে আসেনি। তুমি গেলে কেন?

এই সব কথা ঠিক বলেনি শেফালী। তবে বিনয় আন্দাজ করতে পারে। শেফালীর মনে ডুব দিয়ে জানতে পেরেছে সে। এই রকমই মনোভাব শেফালীর।

—চুপ করে এড়িয়ে যেতে পারবে না। একটু থেমে শেফালী অল্প হেসেছিল, বুঝেছি। মেয়েদুটির কাছে শিভালরি দেখাতে চেয়েছিলে। তাই না?

—জানি না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বিনয় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অশিক্ষিতা নয় শেফালী। নির্বোধও নয়। অতএব দুর্বোধ্যকে ইচ্ছে করেই ওকে খুঁচিয়ে দেখছে। উত্তপ্ত করছে ওকে। দেখতে চায় সে ক্রোধে ফেটে পড়ে কিনা। এখন মনে হয় বিনয়ের, অনেক ব্যাপারে, সব মেয়ে সমান। শিক্ষা কালচার কোন কাজে লাগে না। বিশ্রী পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষাবোধ, নীচতা—এর পিছনে বিরাট কোন কারণ খোঁজার দরকার নেই, যে-কোন তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে দপ করে জ্বলে উঠতে পারে।

আজ এত দেরী হচ্ছে কেন ওদের আসতে? অসহিষ্ণুভাবে ঘড়ির দিকে তাকাল বিনয়। সাড়ে পাঁচটা প্রায় বাজে। নাকি আজ কেউ আসবে না! আশেপাশের পেসেন্টদের মাথার কাছে প্রিয়জনদের ভীড়। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল বিনয়।

ওই তো ওরা আসছে। বিমল আর শেফালী।

—দেরী হয়ে গেল। বিমল বেডের একপাশে বসে বলল, তোকে আজ অনেকটা ফ্রেস দেখাচ্ছে।

নীরবে হাসল বিনয়। শেফালী অপেক্ষা করছে। চোখমুখ কেমন গম্ভীর। মা আজ এলেন না। হয়তো শরীর ভাল নেই। বিমল সিগারেট ধরিয়েছে দেখে সে চাইল একটা।

না। শেফালী ভ্রু কুঁচকে বলল, কয়েকটা দিন সিগারেট না খেলে কি হয়। বিমলবাবু, আপনি ওকে সিগারেট দেবেন না।

—কিছু হবে না। কই ছাড় একটা সিগারেট।

—বৌদি কিন্তু আমার উপর রেগে যাবেন। বলে দাঁত বের করে হেসে বিমল সিগারেট গুঁজে দেয় বিনয়ের ঠোঁটে। দেশলাই জেলে ধরিয়ে দেয়।

খানিকক্ষণ গল্প করে বিমল উঠে দাঁড়াল, আমি আসছি। বলে সে বিনয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হেসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

মনে মনে হাসল বিনয়। শেফালীর দিকে তাকাল। নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। কথা বলছে না। কেন কে জানে। আগে হলে নানারকম প্রশ্ন করত সে। আজ তার কোনরকম ইচ্ছে বা উৎসাহবোধ করছে না।

—মার কী হয়েছে? আজ এলেন না যে বড়!

—জানি না। নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর শেফালীর।

—শরীর খারাপ? কিছু বলেননি মা?

—না। শুধু আমাকে পাঠালেন। ▲

CENTRAL LIBRARY

শেফালী স্থির হয়ে বসে ছিল না। টুকটাক কাজ করছিল। অনেকটা যন্ত্রের মত। কিন্তু আর কোন কথা খুঁজে পেল না। শেফালীর কথাবার্তা বা চলাফেরায় ইদানীং সে অন্যকিছু দেখতে পাচ্ছে। ও কেন সর্বদা সবার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়। সবার সঙ্গে মেলামেশা করতে চায় না। কেমন নাকউঁচু ভাব ওর। এখানে বেশ কয়েকদিন এসেছে। কোন মহিলা যদি দু'একটা প্রশ্ন করেছে, দায়সারা গোছের উত্তর দিয়েছে শেফালী। কথা বলার সময় ঠোঁটের কোণে ঈষৎ বিরক্তি দেখা গেছে। ব্যাপারটা কী? আগে তো শেফালী এমন ছিল না।

বিমল একটু দেরী করে ফিরল। কী ব্যাপার? বিনয় উদাসীনভাবে বাইরে তাকিয়ে। আর শেফালী মাথা নীচু করে বসে। রীতিমত অবাক সে। ভেবেছিল এসে দেখবে ওরা আলাপে মত্ত। দেখবে বিনয়ের উজ্জ্বল মুখ। শেফালীর মুখে হাসি। কিন্তু এখন দুজনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন কেউ কাউকে চেনে না। মান অভিমানের পালা চলছে বোধহয়।

বিনয় একটু হাসল, বাইরের হালচাল কী রকম বল তো?

—কে জানে। বিমল ভেংচি কাটে, কোন খবর রাখি না। সময় কোথায়? খবরের কাগজের হেডিং পড়ে আমরা আলোচনা করি, ঝগড়া করি পরস্পরের সঙ্গে!

এক নিঃশ্বাসে আরও অনেক কিছু বলল বিমল। হঠাৎ মুখ ফসকে 'শালা' বা ঐ জাতীয় একটা শব্দ বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর শেফালীর দিকে তাকিয়ে ওর যেন সঙ্কোচের সীমা রইল না।

একই সঙ্গে ওরা দুজনে চলে যায়। যাওয়ার আগে অবশ্য শেফালী ছোট্ট করে বলেছে, আজ আসি।

পরের দিন সবচেয়ে প্রথমে এল মীরা।

—বোস। বাড়িতে গিয়েছিলি? খুব শান্ত কণ্ঠস্বর বিনয়ের। যদিও মীরাকে দেখে অনেক প্রশ্ন উঁকি মারছে মনে। কিন্তু বাইরে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না।

—না। আশ্চর্য দাদা! কী অবস্থার মধ্যে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি সব জান তুমি। কিন্তু একবারটি খোঁজ পর্যন্ত রাখলে না! তোমার কাছে আমি এরকম ব্যবহার আশা করিনি।

—কেন চলে গেলি? বিনয় মৃদু হাসল, কই যাওয়ার আগে একবারটি তো জানালিনা। থাকগে মীরা। ও সব কথা আজ থাক। কেমন আছিস।

—বেশ ভাল। খারাপ থাকব কোন দুঃখে। কিন্তু দাদা, তোমার এ অবস্থা কেন? অবশ্য শুনেছি সব। তোমার স্কুলে ফোন করাতে সব জানতে পারলাম।

খুব একচোট হেসে নেয় মীরা। ফল কেটে প্লেটে সাজায়। বিনয় নীরবে দেখতে থাকে। মীরার দু'চোখের নীচে কেমন কালো দাগ। মনে হয় কাল রাতে ঘুমোয়নি। কেন? কোনদিন কিছু লুকোয়নি ওর কাছে। আজ গোপন করছে কেন? রাগ বা অভিমান বোধ হয়। সাহস আছে মীরার। এখন শেষ পর্যন্ত টিকতে পারলে হয়। ঘরে বাইরে বিরুদ্ধতা। হ্যাঁ, লড়াই করে বাঁচতে হবে। পারবে কী মীরা শেষ-পর্যন্ত লড়াই করে বাঁচতে?

—ওসব ফলটল খেতে আর ভাল লাগে না। বিনয় প্লেটের দিকে বিরসচোখে তাকিয়ে বলে, আমাকে তেলেভাজা এনে খাওয়াতে পারিস মীরা। খুব গরম তেলেভাজা।

—পাগলামী কর না দাদা। আগে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফের। তারপর যত পার তেলেভাজা খেয়ো।

—তুই তো জানিস, তেলেভাজা আমার কত প্রিয়।

—জানি। যে কদিন এখানে আছ ও-সব খেতে চেয়ো না। এখন এই ফল তোমাকে খেতেই হবে। আমি কিন্তু বেশি-ক্ষণ বসব না। ওরা আসবার আগেই চলে যাব।

এক টুকরো আপেল মুখে পুরে বিনয় বলল, তোর বাসার ঠিকানা রেখে যা। যাব একদিন। পল্টুকে কোথায় রেখে এলি?

সংক্ষেপে মীরা ওদের কথা জানায়। অফিস প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। মুখচোখ অনেকটা ফ্যাকাসে বিবর্ণ দেখায়।

—জানি না ওখানে আর কাজ করতে পারবো কিনা। মিঃ কাপুর সব জেনেছেন। তোমার রজতদা আমাকে জব্দ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

বিনয় কী বলবে ভেবে পেল না। মীরা কোন সাহায্য চায় না। কোনরকম পরামর্শ চায় না। শুধু যা ঘটে গেছে তাই জানাচ্ছে। হয়ত ভেঙে পড়েছে কিন্তু বাইরে তা পাঁচজনকে ডেকে বলতে চায় না। অতএব চুপচাপ শোনা ছাড়া তার করবার কিছু নেই।

—আমি চললাম। মীরা উঠে দাঁড়াল, আগে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফের। তারপর এক-দিন যেয়ো। আর দাদা, দোহাই তোমার, মানুষের উপকার এখন থেকে একটু কম করার চেষ্টা কর! নিতান্ত তোমার গায়ে আঁচড় না লাগলে কোন ব্যাপারে যেয়ো না। ইস্ বুকে ছোরা লাগলে...!

সবার এক কথা। মীরার দেওয়া ঠিকানা বালিশের নীচে রেখে দেয় বিনয়। নিজেকে বাঁচিয়ে চল। রাস্তা ঘাটে ট্রেনে ট্রামে সর্বত্র সবাই নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চায়। কোথাও ভীড় দেখলে উঁকি মেরে দেখতে পার, জিজ্ঞেস করতে পার; 'কী হয়েছে মশাই? কী বললেন, পকেটমার? মারুন শালাকে!' এই বলে কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে থেক না, চলে যেকো নিরাপদ স্থানে, যেখান থেকে দাঁড়ালে তুমি মজা দেখতে পাবে অথচ কোনকিছু তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। গণ্ডির রেখার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। যারা বুদ্ধিমান তারা তাই করে। আর বোকারা বিনা দোষে মার খায়। সে কোন দলে? নিজের প্রতি বিনয়ের এই প্রশ্ন বহুদিনের।

—বিনু' নরম স্পর্শ মাথার চুলে। বিনয় চোখ খুলে মাকে দেখল। তারপর শেফালীর দিকে চোখ পড়ল। ফের তাকাল মার দিকে। এবং দুজনের চোখেই সে কি যেন খুঁজতে লাগল।

সাতদিনের ছুটি ফুরোতে আর বাকি নেই। পরশু অফিস জয়েন করতে হবে। এর মধ্যে অনেক কিছু ভেবেছে মীরা। কিন্তু স্বস্তি আসেনি মনে। এরপর মিঃ কাপুর তাকে কী চোখে দেখবেন কে জানে। চাকরী থাকবে কিনা তাও সে নিশ্চিত হলে না। সে মিথ্যে কথা বলেছে। স্বামী বেঁচে থাকতেও গোপন করেছে তার কথা। এটা নাকি মারাত্মক অপরাধ। এর সঙ্গে কোম্পানীর সুনাম-দুর্নাম জড়িয়ে আছে। মিঃ কাপুরের কথার কোন প্রতিবাদ করেনি মীরা। মুখ বুজে শুনেছে সব।

মাঝে মাঝে ভাবে, তাকে নাজেহাল করে রজতের লাভ কী। সে-তো আর ফিরে যাচ্ছে না। কোন প্রলোভনেও ফিরে যাবে না। যে সম্পর্ক ভেঙে গেছে, কোন দিন তা আর জোড়া লাগবে না। রজত কী জানে না এসব? না-কি যতদিন বেঁচে থাকবে এভাবেই তাকে যন্ত্রণা দেবে, অপ-মানিত করবে। মনে হয়, সে যদি সবার অলক্ষ্যে বাইরে কোথাও চাকরী নিয়ে চলে যায়, বাঁচতে চায় সম্মানের সঙ্গে—সেখানেও ঝড়ের বেগে হাজির হবে রজত তাকে উচ্ছেদ করে দিতে। কোথাও সে লুকোতে পারবে না। অর্থাৎ রজতের হাত থেকে তার রেহাই আর নিষ্কৃতি নেই!

জানালা কপাট বন্ধ। বিছানায় শুয়ে মীরা এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। দুপুর এখন বড় বেশী দীর্ঘ মনে হয়। ঘুমোতে পারলে আজেবাজে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেত। কিন্তু ছুটি নেওয়ার পর থেকে একদিনও দুপুরে সে ঘুমোতে পারেনি। চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তার। পল্টু ওপরে অনুভার পাশে শুয়ে রয়েছে। অথবা লোটনের সঙ্গে হয়ত খেলা করছে। অনুভার বড় ছেলে ছোটন, বছর পনের কি ষোল বয়স, ক্লাস নাইনে পড়ে। তারপর পরপর দুই মেয়ে। একজনের বয়স বার। অন্যজনের দশ। তারপর লোটন। পাঁচ বছরের। এর পরেও নতুন অতিথি আসছে ওদের সংসারে।

চোখের সামনে ভেসে উঠল অনুভার উঁচু পেট। ইস্ কী কষ্ট! এত বাচ্চা-কাচ্চা কেন, একটু রাশ টেনে চলতে পারে না—আজকাল কত কী ওষুধ বেরিয়েছে। হিমাদ্রীবাবুর নিরীহ মুখ মনে পড়ল। বাইরে থেকে শান্ত দেখলে কী হয়, রাতে ওরই চেহারা হয়ে যায় অন্যরকম। বেচারী অনুভাকে ভদ্রলোক কোন রাতেই বোধকরি রেহাই দিতে চায় না। লোকটা এক নম্বরের কামুক।

দিন দিন পল্টুর কথা ভেবে ওর মুখ বন্ধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝেই পল্টু প্রশ্ন করে, 'মা, বাবা কোথায়? আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।' আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। যা তা একটা বলে মুখ বন্ধ করতে বেশিদিন পারবে না। একদিন তাকে সত্য কথা বলতেই হবে। সেদিন যদি পল্টু

রেখে বসে? যদি তাকে ত্যাগ করে চলে যায়! যদি বলে, মা, কেন এতদিন আমাকে বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলে?' কী উত্তর সে দেবে সেদিন? পল্টু ভুল বুঝতে পারে। ও চলে গেলে সে আর বাঁচবে না। মীরা হঠাৎ টের পায় দু-চোখের কোল বেয়ে জল নীচে গড়িয়ে পড়ছে। বালিশ ভিজে গিয়েছে।

বাথরুমে গিয়ে চোখমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ফিরে এল মীরা। টেবিল ঘড়িটা টিক্‌টিক করে বাজছে। মোটে তিনটে। স্টোভ ধরিয়ে একবার চা করবে কিনা ভাবল। থাক, আর কিছুক্ষণ বাদে চা করা যাবে। কিছুতেই ঘরে থাকবে না ছেলেটা। কেন পাশে শুয়ে থাক। ওপরে না গেলে পেটের ভাত হজম হবে না। লোটনের ডাক শুনলে ছেলেকে আটকে রাখে কার সাধ্য। জোর করলে কেঁদে-কেটে একাকার। অনুভা নীচে নেমে এসে খোঁচা দিয়ে কথা বলে, 'এইটুকু ছেলে কী সব সময় ঘরে থাকতে পারে! ছেড়ে দাও, একটু খেলা করুক। সব সময় আগলে রাখতে চেয়ো না মীরা। তাতে ফল ভাল হবে না।'

মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশি। অনুভার কথা শুনলে সমস্ত শরীর জ্বলে যায় মীরার। লোটনের সঙ্গে বেশি মেলা-মেশা সে পছন্দ করে না। এখানে থাকলে পল্টুর বারটা বেজে যাবে। মেয়ে দুটি বিশেষ সুবিধের না। ওদের আবার নাম মিলিয়ে রাখা হয়েছে: গীতা মিতা। সংক্ষেপে গীতু মিতু। বারো বছরের মেয়ে গীতুর সাজগোজের ঘটা দেখলে টেরা হয়ে যেতে হয়। মেয়েটা এরই মুখে পেকে ঝুনো নারকেল। প্রথমে ভেবেছিল সাত্তিকাবের ভদ্র একটি পরিবারের মধ্যে এসে পড়েছে। এখন ধারণা পাল্টে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

আর একটা ব্যাপারে সে মনে মনে ঈষৎ শঙ্কিত। যদিও এখন পর্যন্ত আপত্তিকর কোন কিছু সে লক্ষ্য করেনি। তবু মনে মনে ভয় আশঙ্কা জাগে যদি মা থাকলে শোভন ঘরে ঢুকত না বা কথা বলার চেষ্টা করত না। কয়েকদিন যাবৎ অন্য ব্যাপার সে লক্ষ্য করছে। যখন-তখন শোভন ঘরে ঢুকছে। অবশ্য ঢোকার আগে প্রতিবারই জানিয়ে ঢুকছে। বিশেষ করে দুপুরবেলা ঘরে ঢুকে গল্প করবে। এ কয়েকদিন সুযোগও এসেছে। পল্টু থাকত না। দরজায় নক্ করত শোভন। হাসি-মুখে বলত, ইস্ আপনি বিশ্রাম করছেন। আমি বরং অন্য সময় আসব।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেছে।

মীরা তাড়াতাড়ি জানালা কপাট খুলে দিয়েছে। হাসিমুখে বলেছে, 'বসুন না। বিশ্রাম আর কোথায়। শুধু এপাশ ওপাশ করছিলুম।' তারপর নানারকম কথা! তা শোভন এত কথা বলতে পারে। আগে ভাবেনি মীরা। নানা প্রসঙ্গ। রাজনীতি, সিনেমা, খেলাধুলো—আলোচনায় কোন কিছু বাদ দেয়নি। উপায় কি! হাসিমুখে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছে। বার-বার শাড়ির আঁচল দিয়ে বুক ঢেকেছে। চা বানিয়ে কাপ এগিয়ে দিয়েছে শোভনকে। তারপর পল্টু এলে নিষ্কৃতি পেয়েছে মীরা।

এমনি ভেবে দেখলে ব্যাপারটা এমন কিছু দোষের না। অস্বীকার করবে না—শোভনের সঙ্গে গল্প-গুজব করতে খারাপ লাগে না। বরং ভালভাবেই সময় কেটে যায়। দুপুরের নির্জনতায় একা থাকলে নানা চিন্তা উঁকি মারে। ফলে মন খারাপ হয়ে ওঠে। তার চেয়ে সমস্ত দুর্ভাবনা থেকে যদি অনেকটা সময় ভুলে থাকা যায় মন্দ কী। এ-ছাড়াও আর কতগুলি দিক আছে। কোন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তোলে না শোভন। অযাচিত ভাবে সহানুভূতি দেখাতে আসে না। করুণার সুরে কথা বলে না। ফলে স্বস্তি মীরার।

কিন্তু অন্যদিকের কথাও ভাবতে হয়। অনুভা টের পেয়েছে কিনা তা সে জানে না। হয়তো জানে। হিমাদ্রীবাবুও জানার কথা। ওদের কাছে ব্যাপারটা অশোভন মনে হতে পারে। গল্প করার আর কী সময় নেই? নির্জন দুপুরেই কী গল্প করার উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছে শোভন? আর ওর সঙ্গে এত গল্পেরই বা কী থাকতে পারে?

নিঃসন্দেহে এসব দৃষ্টিকটু ঠেকবে ওদের কাছে। হয়ত বাড়াবাড়ি দেখলে অনুভা ফের খোঁচা দিয়ে কথা বলবে। অসম্ভব কিছু নয়। মেয়েদের গায়ে কলঙ্কের ছাপ একবার পড়লে আর রক্ষে নেই। অনুভা আজ পর্যন্ত কিছু না বললেও সে বুঝতে পারে, তার সম্পর্কে কৌতূহলের সীমা নেই। শুধু বাঁদুর ভয়ে কিছু জিগ্যেস করতে পারছে না। এসব সে অনুমান করতে পারে। কেচ্ছা শুনতে মেয়েদের আগ্রহ যে কী প্রবল তা সে বেশ ভালভাবেই জানে।

আচ্ছা, শোভন কী চায় তার কাছে? নিছক গল্প করবার জন্যেই কী আসে? না-কি অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করছে। নারী-পুরুষের মধ্যে নিছক বন্ধুত্ব হতে পারে তা সে অস্বীকার করছে না। কিন্তু তার ভয় নানাদিকে। ভয় হয় শেষ পর্যন্ত শোভন তার নীরবতাকে অন্য কিছু মনে করে। ছিঃ, কথাটা ভাবতেই তার সমস্ত শরীরে এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পল্টু, সোনামাণিক, তুই আমার সর্বস্ব! তাকে বুকের পাশে পেলে আর আমি চাই না কিছু।

এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আজ যদি শোভন আসে, সে যেন দরোজার উপর করাঘাতের শব্দ শোনবার জন্যে উন্মুখ, নিজেকে সাবধান করে দেবে। কিছুতেই হাসবে না। গম্ভীর চোখ-মুখ দেখলেই শোভন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে ওর উপস্থিতি তার ভাল লাগছে না। পারবে তো শেষ পর্যন্ত গম্ভীর থাকতে? যদি শোভন সব বুঝেও না বোঝার ভান করে বসে

আরও সর্বের কাছে, অলকা বিকেল
এবং আশা বহন বৃষ্টির কবি
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
সদ্যপ্রকাশিত অবিস্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ
রাত্রিকে দিনকে
মূল্য চার টাকা মাত্র
●
পদ্মা আমার গঙ্গা আমার
বাংলাদেশের ওপর
কবি দক্ষিণারঞ্জন বসুর
আবেগধর্মী এক অপূর্ব কবিতা সংকলন।
আমাদের সবার মনের কাছে
এক বাংলাই সত্য,
তারই প্রকাশ এই সুন্দর সংকলনটিতে।
মূল্য তিন টাকা মাত্র
: মধুরেণ সিন্ডিকেট :
৬৪/১৩ বেলগাছিয়া রোড, কলি-৩৭

জানুন পড়ুন ও বিবাহিত জীবন সুখী করুন।
নরনারীর যৌন চরিত্রে রাশি লগ্নের প্রভাব ও যোটক বিচার ...মূল্য—১২, টাকা মাত্র
প্রখ্যাত আবিষ্কারক জ্যোতির্বিদ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর গবেষণালব্ধ অভিনব এই পুস্তক (অষ্টাদশ-মহাপুরাণের আলোচনাসহ মুখবন্ধ) জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক সম্পূর্ণ নূতন পদক্ষেপ।
প্রাপ্তিস্থান :
জ্যোতিষ বার্তালয় — ১।২এ, নীলাম্বর মুখার্জী স্ট্রীট, (কড়িয়াপুকুর), কলিকাতা—৪
মহেশ লাইব্রেরী — ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২
রঘুনাথ লাইব্রেরী—বিধান সরণী, কলি—৬

CENTRAL LIBRARY

থাকে, তবে সে কী করবে। ঘাড় ধরে তো আর বের করে দিতে পারবে না। অথবা মুখ ফুটে উচ্চারণও করতে পারবে না, শোভনবাবু, আপনি এ সময় কোনদিন আসবেন না। দুপুরবেলা একা ঘরে বসে গল্প করতে দেখলে লোকে কী ভাববে বলুন তো?' অসম্ভব। মরে গেলেও এসব সে বলতে পারবে না। তবে সে কী হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে। 'জানি না, কিছু জানি না!' মীরা দু'চোখ বন্ধ করার জন্যে যেন বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল।

রাত্রের রান্নার জন্যে মীরা বেশি হাঙ্গামা করে না। এক ফাঁকে সে এসে পল্টুর পিছনে দাঁড়াল। সামনে বই। আবোল-তাবোল বকছে ছেলেটা। একমাথা ঘন কালো চুল। টকটক করছে গায়ের রঙ। টানা টানা নাক চোখ মুখ। সব ওর বাবার মত। তার কিছু পায়নি। বড় হলে এও কী ওর বাবার মত হবে? দুর্বিনীত অত্যাচারী।

—কী হচ্ছে? মৃদু ধমক দিল মীরা, খালি দুষ্টুমী। ঠিকমত পড়।

—আমি আর পড়বো না। পল্টুর উচ্চারণে কোন জড়তা নেই। বাঁচু সে চার বছরে পড়বে।

—কেন? মীরার ভ্রু কুঁচকে যায়, কটা বাজে শুনি। মোটে সাতটা। হাত ধুয়ে আসছি। এসে যেন দেখি তুমি পড়ছো।

রান্নার ঝামেলা মিটিয়ে মীরা বাথরুমে ঢুকল। আর ভরসা হয় না। পল্টুকে যত তাড়াতাড়ি পারে কোন বোর্ডিংয়ে রাখবে। ইদানীং ওর দিকে কেমনভাবে যেন তাকিয়ে থাকে ছেলেটা। হ্যাঁ, সিঁথির দিকে তাকায়। কী লজ্জা! ওর মনে সন্দেহ জাগবার আগেই কোন ব্যবস্থা করা দরকার। কী ব্যবস্থা করবে? পরশু জয়েন করার পর ভাবা যাবে। চাকরী ঠিক থাকলে সব হবে। নইলে...। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। তাড়াতাড়ি সে চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দেয়।

এখনি বাঁধু এসে পড়বে। মীরা ঘাড়ে গলায় পাউডার ছিটোয়। পল্টুর দিকে আড়চোখে তাকায়। একমনে বই-এর দিকে ঝুঁকে ছবি দেখছে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত প্রশ্ন করছে ওকে। সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওর প্রশ্নবানে। তারপর ধমক। তারপর কান্না।

হ্যাঁ, বাঁধুর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকতো! পল্টুর সামনে যে-ধরনের আলোচনা শুরু করে, বাচ্চা হলেও তাতে অনেকটা বুঝতে শিখেছে, ওর সামনে বেছে-বেছে কথা বলতে হয়। আর রোজ সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে আড্ডা মারা, এতে কী পড়াশুনোর ক্ষতি হয় না?

ছেলেটাও তেমনি। হাঁ করে কথা গেলে। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। রোজ রোজ এসব ভাল লাগে না মীরার। অথচ মুখ ফুটে বাঁধুকে নিষেধ করতেও পারে না। ফলে অস্বস্তিকর অবস্থা। আজকাল আর ভাল লাগে না বেশি হৈ-চৈ। বরং একটু একা থাকা, অন্ধকার ঘরে জানালার সামনে চেয়ার টেনে বসা, নিজেকে নিয়ে কিছুক্ষণ...। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলিকে ছুঁতে ইচ্ছে করে। মনে হয় বয়স অনেক বেড়েছে। আবার সে কৈশোরে ফিরে যেতে চায়। বাবার কথা মনে পড়ে। হঠাৎ মীরা চমকে উঠল দরোজার কড়া নাড়ার শব্দে।

দরোজা খোলার আগে কী একটা কথা ভেবে কেঁপে উঠল মীরা। না, সে এসময় আসবে না। তবু যদি আসে, লোকটা তো সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হারাতে বসেছে, পল্টুর সামনে...। আর ভাবতে পারে না সে। তাড়াতাড়ি খিল খুলে বাঁধু আর প্রদীপকে দেখল।

হাত জোড় করে প্রদীপ নমস্কার করল, কেমন আছেন? অনেকদিন পর দেখা।

—এই চলে যাচ্ছে। মীরা হাসিমুখে বাঁধুর দিকে তাকাল, ভেতরে আয়।

—না। বাঁধুর সারা মুখ উদ্ভাসিত, আমার ঘরে চল। খুব ঘুমিয়েছিস বুঝি? মুখ-চোখ ফোলা।

লম্বা একহারা চেহারা প্রদীপের। সুদর্শন যুবক। বাঁধুর ভাগ্য ভাল। অমন একটা ছেলেকে বাগাতে পেরেছে।

—কবে হচ্ছে বলুন? মীরা মুচকি হাসল, আমরা কবে লুচি মাংস খাব।

—থাক থাক না! বাঁধু যেতে যেতে বলে, তাড়াতাড়ি আয় মীরা।

ওরা চলে যেতে মীরা পল্টুর কাছে এসে দাঁড়াল। প্রায় সাড়ে আটটা। পল্টু ঝিমুচ্ছে। ওর পিঠে জোরে একটা কিল মারল সে। পাজী ছেলে। সারাদিন হৈ-চৈ করবে। সন্ধ্যের পর পড়তে বসতে না বসতেই ঘুমিয়ে পড়বে।

রোজকার মত আজও ঘুম-ঘুম চোখে খেয়ে শুয়ে পড়ল পল্টু। মশারি গুঁজে বালিশের চারধারে গুঁজে মীরা আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। আপন প্রতিবিম্বের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল। আশ্চর্য! সে যেন নিজেকে চিনতে পারছে না। পথে-ঘাটে চলার সময় লক্ষ্য করেছে, লোকে বিশেষ দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকায়। বাঁধুর কথা মনে পড়ল। মুখপোড়ার লজ্জা-সরম কম। কী যাচ্ছেতাই কথা! ওকে নাকি এখন কলেজের মেয়েদের মত দেখায়। একেবারে তন্বী, যুবতী। কে বলবে চার বছরের সন্তানের মা?

ছি-ছি! নিজেকে ধিক্কার জানাল মীরা। এসব চিন্তা মনে আনাও পাপ। লাইট নিভিয়ে সে নিঃশব্দে দরোজা ভেজিয়ে বাইরে আসে। ওঘরের হৈ-চৈ কানে আসছিল তার। আলতো পায়ে এগিয়ে গেল সে। শোভনের কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নানারকম চিন্তা এল তার। দোতলা থেকে পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে মেয়েলি হাসি। এত পাজিল গীতুটা। এখন থেকে কড়া শাসনে না রাখলে উচ্ছন্নে যাবে মেয়েটা। শোভনের সামনে যেতে সে চায় না। ওর চোখের দৃষ্টি যেন কী রকম। ঘরে গিয়ে পল্টুর পাশে শুয়ে পড়বে কিনা একবার ভাবল। কিন্তু বাঁধু কী সহজে রেহাই দেবে? ওর কি। নতুন জীবনের স্বপ্নে মশগুল। প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বেচারি!

শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারল না মীরা। পর্দা সরিয়ে ঢুকতেই সবাই ওর দিকে তাকাল।

—আসুন। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল প্রদীপ, আপনার দেরী দেখে ভাবছিলাম আর বোধহয় আসবেন না।

—আপনি বসুন। মীরা বাঁধুর পাশে খাটের ওপর বসল। একবার আড়চোখে তাকাল শোভনের দিকে। একমুখ দাড়ি। বিশৃঙ্খল মাথার চুল। একমনে সিগারেট টানছে।

বাঁধু ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে নীচু গলায় বলে, জানিস, আজ অফিস পালিয়ে দুজনে সিনেমা দেখেছি। প্রদীপটা ভারী অসভ্য! অন্ধকারে কিস করেছে আমাকে।

ওরা এদিকে তাকিয়ে। মীরা নীচু করে বলে, চুপ কর। বেহায়া কোথাকার।

—এ ভারী অন্যায়। এখানে ফিসফাস করা চলবে না।

—ঠিক। শোভন একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় প্রদীপের দিকে, আমাদের অস্তিত্বকে ওরা অস্বীকার করছে।

—বাঃ, সব কথা কী তোমাদের বলা যায়। বাঁধু খাট থেকে নেমে দাঁড়াল, মেয়েদের গোপন কথা শুনতে এত আগ্রহ কেন!

সোঁ-সোঁ শব্দে জল ফুটছে। চায়ের সরঞ্জাম ঠিকঠাক করতে থাকে বাঁধু। মীরা চুপচাপ ওদের কথাবার্তা শুনতে থাকে। প্রাণ খুলে মিশতে পারছে না। তবু বাইরে হাসিমুখে তাকে কথা বলতে হয়। জোর করে হাসতে হয়।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

সংক্রামক রোগ ও সামাজিক পরিবর্তন

কলেরা রোগটিকে কি সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়েছে? হয় নি। পৃথিবীর কোনো না-কোনো অংশে এই রোগটি মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিছুকাল আগে মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় এই রোগটি বেশ প্রচণ্ডভাবেই দেখা দিয়েছিল। আমাদের দেশে তো কলেরা রোগ প্রতি বছরের ঘটনা। প্রশ্ন উঠতে পারে, কলেরা বা এই ধরনের সংক্রামক রোগগুলোকে কেন একেবারে দূর করা যায় না? কেন এই রোগগুলোর বিরুদ্ধে এমন একটা বিরতি-হীন লড়াই চালিয়ে যেতে হয়? মানুষ যতোদিন ধরে এই পৃথিবীতে আছে ততোদিন ধরেই কি এই রোগগুলো আছে! তা যদি না হয় তাহলে কখন কী অবস্থায় এই রোগগুলোর প্রাদুর্ভাব? আমাদের কি বরাবরই প্রতি বছরে এমনি কলেরার ইনজেকশন, বসন্তের টিকে ইত্যাদি নিয়ে চলতে হবে? মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের সঙ্গে কি এ-সব রোগের কোনো সম্পর্ক আছে?

গত ১০ই সেপ্টেম্বরের নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকায় অধ্যাপক ফ্রেঙ্ক ফেনার এফ-আর-এস (অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা সিটির অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন কার্টিন মেডিকেল রিসার্চ স্কুলের অধ্যক্ষ) বিষয়টি নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। এবারের বিজ্ঞানের কথায় অধ্যাপক ফেনারের এই আলোচনা সহজ ভাষায় উপস্থিত করার চেষ্টা করছি।

বিগত দশ হাজার বছরে মানুষ অনেক বদলে গিয়েছে। শরীরের গঠনের দিক থেকে নয়, সামাজিক সংগঠনে। এই বদল অসম্ভব দ্রুত ও অতিমাত্রায় ব্যাপক। অন্য সমস্ত জীব থেকে মানুষ এখানে আলাদা। যদি বংশের হিসেব ধরা যায় তাহলে এই দশ হাজার বছরে ধরো মানুষের ইতিহাসে বংশ পায় হয়েছে মাত্র প্রায় পাঁচশোটি। এত অল্প সময়ের মধ্যে শরীরের গঠনগত কোনো পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়, দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে।

আদি প্রস্তর যুগের গোটা সময়টা ধরে মানুষ বাস করতো ছোটো ছোটো দলে, কোনো এক জায়গায় স্থিত হয়ে নয়, ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়ে। এক-একটি দলে মানুষের সংখ্যা হত শ'খানেক। এক দল অপর দলের সংস্পর্শে কদাচিৎ আসত, এলেও খুব বেশিক্ষণের জন্যে নয়। তারপরে কৃষিকাজ শুরু হবার পরে শুরু হল মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন। কিন্তু এ-জীবনও একেবারে স্থিত নয়, কৃষির প্রয়োজনেই মাঝে মাঝে জায়গা বদলাত। আজ থেকে প্রায় দু' হাজার বছর আগে কৃষি কাজে সেচ শুরু হতে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে এল স্থিতি। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক সংগঠনে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তনগুলো এসেছে গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে, বিশেষ করে গত কয়েক শত বছরের মধ্যে। গ্রাম-জীবন থেকে শহর-জীবনের সূত্রপাত খুব বেশি দিনের কথা নয়, বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রবর্তনের সময় থেকে।

মানুষের সামাজিক সংগঠনে এত যে সব পরিবর্তন তার দৃষ্টান্ত কিন্তু আজও পাওয়া যায়। প্রায় সমস্ত রকমের সামাজিক সংগঠনের নিদর্শন আজও পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশে টিকে আছে। আদি প্রস্তর যুগে যারা খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত ও শিকার করত, যারা প্রথম কৃষি-কাজ শুরু করেছিল, যারা পশু পালনের যাযাবর জীবন কাটাত, শিল্পপত্তনের গোড়ার দিকের শহর (যেখানে কোনো মলনির্গমের ব্যবস্থা ছিল না) ও পরের যুগের সর্বব্যবস্থা-সমন্বিত শহর—প্রত্যেকটি নিদর্শনই এখনো পাওয়া যায়।

এই নিদর্শনগুলিকে সামনে রেখে আলোচনা করা যেতে পারে সংক্রামক রোগের ওপরে সামাজিক সংগঠনের ক্রিয়া কতখানি।

প্রথমে ধরা যাক কতকগুলো জীবাণু-গত (ব্যাক্টিরিয়া) ব্যাধির কথা, যার দ্বারা পরিপাকনালী ও অন্ত্রের পথ আক্রান্ত হয়। এই রোগগুলো স্থানিক হতে পারে বা টাইফয়েড ব্যাসিলাস ধরনের হলে সর্বব্যাপ্ত হতে পারে। এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে—খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে। নিঃসৃত হয় মানুষের বা তার গৃহপালিত জীবের মল যা কখনো কখনো প্রস্রাবের সঙ্গে। নিঃসরণ চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে, যখন রোগের প্রকোপ থাকে সবচেয়ে বেশি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে এই রোগ সহজে টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু যেখানেই মানুষ স্থিত হয়েছে, এক জায়গায় অনেক মানুষের বসবাস, এক জায়গা থেকেই সকলের জলের জোগান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়, সেখানে এই রোগ ছড়াবেই। শিশুকে এই রোগ ধরলে হয় তার মৃত্যু, আর যদি বেঁচে যায় তো বাকি জীবন এই রোগ থেকে অব্যাহতি। অতএব এমনও হতে পারে, প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মানুষ আপাতত চোখের দেখায় পুরোপুরি নিরোগ, কিন্তু তার্ও এই বিশেষ রোগের জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত—যেহেতু শৈশবে একবার ভুগে উঠেছে তাই আর দ্বিতীয়বার ভুগতে হচ্ছে না।

আধুনিক শহরগুলিতে এই রোগ দূর হয়েছে তার কারণ জীবাণুমুক্ত জল সরবরাহ ও উন্নত মলনির্গম ব্যবস্থা।

এই বর্গেরই আর একটি রোগ হচ্ছে ফুড পয়জনিং। আধুনিক শহরগুলিতেই এই রোগের প্রকোপ বেশি। এই রোগটি কিন্তু ছড়ায় জীবজন্তু থেকে এবং তা ঠেকানো শক্ত। কেননা, মানুষের ও জীব-জন্তুর খাদ্য আমদানী করা হচ্ছে বিশ্বের নানা দেশ থেকে আর তারই সঙ্গে রোগের জীবাণুও চলে আসছে। শুধু এই একটিই কারণ নয়, আরো আছে। আধুনিক শহুরে জীবনের ধরনটাই এমন যে রোগের জীবাণু ছড়ানো কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না।

আদি প্রস্তরযুগে কি এ-সব রোগ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু ছড়াতে পারত না। সে-সময়ে হয়তো একজন শিকারী একটি জন্তু শিকার করেছে, সেই জন্তুর মাংস খেয়ে তার এই রোগটি হল। সেই মাংস আরো যারা খেল তাদেরও হল। কিন্তু ছড়াবে কি করে? ছড়াতে পারল তখনই যখন মানুষ গ্রামের পত্তন করল, একই জায়গা থেকে সকলের জলের যোগান মলের ব্যবস্থা করল, কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকল অনুন্নত। পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা উন্নত হবার পরে এই রোগ দূর হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি খাদ্য-সামগ্রী ও খাদ্য-প্রস্তুতের বিশেষ ধরনের জন্যেই আবার এই রোগ দেখা দিয়েছে।

এবারে আরো একটি রোগের দিকে তাকানো যাক। মীজ্‌ল বা হাম। এটি একেবারেই মানুষের রোগ, মানুষ থেকেই মানুষে ছড়ায়, একবার ভুগে উঠলে দ্বিতীয়বার আর এই রোগে ভুগতে হয় না। রোগের জীবাণু (ভাইরাস) নিঃসৃত হয়ে থাকে মাত্র কয়েক দিন ধরে। এবং এই রোগ যেমন দ্বিতীয়বার হয় না, জীবাণুরও দ্বিতীয়বার নিঃসরণ নয়। কাজেই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে থাকা মানুষের মধ্যে এই রোগ ছড়াবার ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। জন্তুজানোয়ার এই রোগের বাহন হতে পারে না, মানুষ থেকেই মানুষে ছড়ায়, কাজেই বিচ্ছিন্ন কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে (আজকের দিনেও যারা হয়তো কোনো একটি দ্বীপে বসবাস করছে) এই রোগ কিছুতেই টিঁকে থাকতে পারে না।

যদি টিঁকে থাকতে হয় তাহলে সারা বছর ধরেই এই রোগের একজন না একজন রোগী থাকা দরকার। যদি ঠিক একজনের পরে একজনের হয়ে চলে তাহলে এই রোগীর সংখ্যা হওয়া চাই অন্তত তিন। কিন্তু বাস্তবের হিসেব এত সরল নয়। সেখানে একজনের পর একজন রোগের আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করে না, অনেকগুলোই একসঙ্গে যায়। হিসেব করে দেখা হয়েছে, রোগীর সংখ্যা যদি হয় বছরে অন্তত তিন হাজার তাহলে রোগটি টিঁকে যাবার সম্ভাবনা। মোট অধিবাসীর সংখ্যা অন্তত তিন লক্ষ না হলে এমন ব্যাপার কিছুতেই ঘটা সম্ভব নয়। বাস্তব সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, যে-সব দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কম সেখানে হামরোগ স্থায়ী বাসা বাঁধতে পারে না।

হামরোগ মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়, তাই যদি হবে তাহলে ধরে নিতে হয় ছ' হাজার বছর আগের ছোট ছোট দলে বিভক্ত মানুষের মধ্যে এই রোগের অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে পরে এই রোগ এল কোথা থেকে? সম্ভবত পাগলা কুকুর থেকে কিম্বা গবাদি পশুর বিশেষ এক ধরনের সংক্রামক রোগ থেকে। যে জীবাণু থেকে কুকুরের ও গবাদি পশুর এই বিশেষ রোগ তার সঙ্গে হামরোগের জীবাণুর মিল আছে। একটি থেকে অপরটির উদ্ভব অসম্ভব নয়। ছ' হাজার বছর আগের প্রথম শহরে সম্ভবত এই ভাবে থেকেই রোগটি ছড়িয়েছে।

চিকেন পক্‌স বা জল-বসন্তের কথা ধরা যাক। এই রোগটিও মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। হামরোগের মতো এই রোগটিও একবার হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার হয় না। কিন্তু এই রোগটিকে যদি টিঁকে থাকতে হয় তাহলে কিন্তু হামরোগের মতো অধিবাসীর সংখ্যা তিন লক্ষ হওয়ার দরকার নেই, এক হাজারেরও কম হলেই চলে। এর কারণ, জলবসন্তের জীবাণু (ভাইরাস) বহু বছর পর্যন্ত মানুষের শরীরে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে, তারপরে এক সময়ে আবার সক্রিয় হয়। তখন কিন্তু রোগের যে চেহারা প্রকাশ পায় তা জল-বসন্ত নয়, তার অন্য নাম—যদিও এই অন্য নামের রোগের ফোস্‌কার মধ্যে জলবসন্তের জীবাণুও থেকে যায়। এ থেকে কোনো শিশু আবার সহজেই জলবসন্তে আক্রান্ত হতে পারে। এমনিভাবে জলবসন্তের একটি রোগীও যদি পাওয়া যায় তাহলেই রোগটির আবার ছড়িয়ে পড়তে বাধা নেই।

সর্দির কথা ধরা যাক। সাধারণ সর্দি, শীতকালে শহরের অধিকাংশ মানুষই যে রোগে ভুগে থাকে। এই রোগের কারণ আশিটি বা তারও বেশি বিভিন্ন ধরনের জীবাণু।

এক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে এমন ছোট গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে এই রোগ টিঁকে থাকতে পারে না। এমনও দেখা গিয়েছে, বিমান-চলাচল শুরু হবার আগে যে-সব দ্বীপের মানুষের সঙ্গে বাইরের জগতের কোনো সংস্পর্শ ছিল না, সেখানে সর্দিও ছিল না, বিমান-চলাচল শুরু হবার পরে বাইরের মানুষের যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গেই সর্দি শুরু হয়ে গিয়েছে। যখন থেকে বহু মানুষ একজোট হয়ে থাকতে শুরু করেছে ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শ বেড়েছে তখন থেকেই সর্দির জীবাণুর উদ্ভব।

আদি প্রস্তর যুগের মানুষ অন্তত সর্দি বা হাম বা জলবসন্ত রোগে ভুগত না, একথা জোর দিয়েই বলা চলে। সে-সময়ে মানুষ থাকত ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, একদল অপর দলের সংস্পর্শে খুব কমই আসত—কাজেই মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় এমন রোগ সে-সময়ে টিঁকে থাকা অসম্ভব ছিল। এমন কি সেই আদি প্রস্তর যুগেও জীব হিসেবে মানুষ ছিল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী।

কৃষি কাজ শুরু হবার পর থেকেই মানুষের অভ্যাসে বড়ো রকমের পরিবর্তন আসে। মানুষকে আর ঘুরে বেড়াতে হয় না, খাদ্যের যোগান থাকার ফলে অনেক মানুষ এক সঙ্গে থাকতে পারে। এতদিন পর্যন্ত সে প্রকৃতিজগৎ থেকে খাদ্য আহরণ করত, ফলে তার দলের সংখ্যা বাড়তে পারত না। কিন্তু যখন সে নিজেই খাদ্য-উৎপাদক খাদ্যের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে দলের মানুষের সংখ্যাও বেড়ে চলে। পত্তন হয় গ্রামের, তারপরে কৃষি কাজে সেচ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ও নগরের। শুরু হয় বহু বহু মানুষের এক সঙ্গে বসবাস। অধিবাসীদের সংখ্যা সেই সীমানা অতিক্রম করে যায় যাতে সংক্রামক রোগ টিঁকে থাকার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, নব্য প্রস্তর যুগে সংক্রামক রোগের প্রথম শুরু কি-ভাবে? যে-সব জীবাণু থেকে রোগের শুরু তা এল কোথা থেকে? এ-প্রশ্নের জবাব অনেকখানি অনুমান-নির্ভর। তাহলেও একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে উৎস হচ্ছে জন্তু-জানোয়ার। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে অনেকেরই প্রচুর বাচ্চা হয়ে থাকে, সংখ্যা বৃদ্ধিও যথেষ্ট, দল বেঁধেই থাকে, এই আশ্রয়ে জীবাণুর পক্ষে টিঁকে থাকা অসম্ভব নয়। তারপরে কোনো রকমে একবার যদি মানুষের আশ্রয় পেয়ে যায় তখন মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়াটা অবধারিত।

আজকের দিনে মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, সেই সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগও। শহরগুলো ক্রমবর্ধমান। শহরের মানুষের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিমানে যাতায়াত শুরু হবার পরে পৃথিবীর কোনো অংশের মানুষই আর বিচ্ছিন্ন নয়। এ-অবস্থায় সংক্রামক রোগ ছড়াবেই। বসন্ত বা কলেরার মতো কঠিন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক অবশ্যই থাকবে কিন্তু সর্দির মতো সামান্য রোগের বিরুদ্ধে? থাকলেও তার ব্যাপক ব্যবহার হয়তো সম্ভব হবে না, যুক্তিযুক্তও নয়। আর অন্য কোনো উপায়ে সর্দি ঠেকানো যাবে তারও উপায় নেই।

শুধু সর্দি কেন, জলবসন্ত বা ম্যালেরিয়ার মতো রোগ সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ব্যাপক কর্মসূচী সত্ত্বেও এই দুটি রোগের টিঁকে থাকার মতো অবস্থার কোনো হেরফের ঘটছে না। অর্থাৎ মানুষ যদি আবার সেই আদি প্রস্তর যুগে ফিরে না যায়, তবে সংক্রামক রোগ দূর হতে পারে বড়ো জোর কোনো একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। জাতীয় ভিত্তিতে দূর করাটা খুবই শক্ত, সারা বিশ্বে দূর করাটা একেবারেই অসম্ভব।

অতএব, দাও ফিরে সে অরণ্য—সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার এটাই একমাত্র পথ।

—অয়স্কান্ত

CENTRAL LIBRARY

পুষ্প প্রদর্শনী

আলিপুর এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটি আয়োজিত পুষ্প প্রদর্শনীর দৃশ্য।
ফটো : অমৃত

লেমিংদের দেশত্যাগ

ভবিষ্যৎ অন্ধকার ?

—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ইউরোপের পত্র-পত্রিকায় স্ক্যানডি-নেভিয়ান পর্বতমালায়, উত্তর ফিনল্যাণ্ডের তুন্দ্রা অঞ্চলে এবং উত্তর-পশ্চিম রাশিয়া থেকে ইঁদুর জাতীয় লক্ষ লক্ষ লেমিংদের এক তাজ্জব মৃত্যু অভিযানের বিবরণ প্রকাশিত হয় গত বছরের গ্রীষ্মে। লেমিংরা তাদের অরণ্য-পর্বত ও প্রান্তরের বসতি ত্যাগ করে দীর্ঘ মৃত্যু-মিছিল করে সমুদ্রে চলেছে। সমুদ্রে পৌঁছে তারা দূরে দিক-চক্রবালের অভিমুখে সাঁতার দিতে সুরু করে। তারা ভাল সাঁতারু নয়, তাই অল্পক্ষণের মধ্যেই জলের সলিল সমাধি হয়। লেমিংদের ঐ গণআত্মহত্যা নতুন নয়। বছর চারেক অন্তর তারা ঐ মরণ-অভিযান করে থাকে। '৭০ সালের অভি-যানটি গত দশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় বলেই তা নিয়ে এত চাঞ্চল্য। জীব বিজ্ঞানীরা লেমিংদের ব্যাপক আত্ম-নিধনের আপাত কারণ সম্পর্কে বিবিধ ব্যাখ্যা দিলেও এবিষয়ে তাঁরা একমত যে নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যই লেমিংরা ঐ মারাত্মক পন্থা গ্রহণ করে থাকে।

বস্তুত, মানুষের হস্তক্ষেপের দ্বারা বিপর্যস্ত না হলে প্রকৃতির রাজ্যে প্রায় সব জীবের মধ্যেই জন্ম ও মৃত্যুর, সংখ্যার [illegible] সংখ্যায় [illegible] প্রয়ো-[illegible] [illegible] প্রাকৃতিক [illegible] পারস্পরিক [illegible] পরি-[illegible] [illegible] [illegible] কিম্বা [illegible]। ঐ [illegible] ব্যবস্থার [illegible] পদ্ধতির [illegible] আপনা থেকেই গর্ভপাত, শিশু হত্যা কিম্বা পিতা-মাতার অনাদরে মৃত্যু, জন্মগতভাবে যৌন [illegible] অবনতি,—অন্যান্য সব [illegible] ব্যর্থ হলে স্বেচ্ছায় বিকারে বা উন্মত্তনায় মৃত্যু। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে ঐ প্রাকৃতিক পদ্ধতি শুধু জীব-জগতে নয়, আদিম মনুষ্য-সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপরোক্ত পদ্ধতির মধ্যে জীববিজ্ঞানীরা প্রজনন এলাকার স্থান দেন সর্বাগ্রে। কারণ একটি এলাকায় অধিকার কায়েম করার অর্থ হচ্ছে সেই এলাকার অটিঘাট সম্পর্কে তার শত্রুদের চেয়ে অধিকারীর অধিকতর জ্ঞানলাভ।

সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা এক বিচিত্র উপায়ে জীবের উৎসাহ ও কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। সে তার নিজের এলাকায় তার চেয়েও শক্তিশালী অনধিকারীর হামলাবাজি বন্ধ করাতে সক্ষম হয়। তাছাড়া এক-একটি এলাকায় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা জীব-জন্তুরা দৈহিকভাবে পরস্পরের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ফলে তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব কমে যায়। সুতরাং বিপদজনক ঘেঁষা-ঘেঁষিতে যা মারাত্মক খুনোখুনিতে পরিণত হতে পারতো তা পরস্পরের এলাকার সীমান্তে হাঁক-ডাক, হম্বি-তম্বিতেই শেষ হয়। সর্বোপরি এলাকা বিশেষের অধিকার জীবদম্পতি এবং তার সন্তানদের খাদ্য সংস্থান সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়।—সুতরাং প্রকৃতির রাজ্যে, জীব-জন্তুর সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর হরিণ, পাখি ও [illegible]-দের মধ্যে প্রজনন ঋতুর প্রাক্কালে পুরুষ-দের প্রণয়-প্রতিযোগিতার প্রণয়ী [illegible] সব প্রেমিকদের যৌন-মনোরঞ্জন [illegible] একটি এলাকার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। আর সে বিষয়ে ব্যর্থ, অক্ষম, দুর্বল পুরুষেরা সেই যৌন-প্রতি-দ্বন্দ্বিতা থেকে হটে গিয়ে তাদের মত অন্য পুরুষদের দলে গিয়ে ভেড়া দেয়। কিম্বা নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ জীবন যাপন করে। এইভাবে এলাকা বিশেষে প্রাণীর সংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

যে-সব প্রাণীর মধ্যে এলাকা অধি-কারের প্রথা নেই, তাদের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রে শিশু হত্যা কিম্বা পিতামাতার অনাদরের দ্বারা সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। এবিষয়ে আফ্রিকা মহাদেশের উইলডি-বীস্ট বা নুহরিণ এবং তার হিংস্রক সিংহদের সম্পর্কে আলোচনাতেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। নুহরিণেরা দেখতে অনেকটা, তারা যাঁড়ের মত ঝাঁক বেঁধে বিচরণ করে। এক-একটি এলাকায় এক-একটি যাঁড়-হরিণের যৌন সম্ভোগের এক-চেটিয়া অধিকার ছাড়া, তাদের পালের বিশেষ কোন কৌতূহলোদ্দীপক নিয়ম-কানুন নেই। তানজানিয়া প্রভৃতি পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর সমতলভূমি থেকে বর্ষারম্ভে তারা দলে দলে হাজারে হাজারে প্রচরণে (মাইগ্রেশনে) যায়। সেই যাযাবর বৃত্তির-কালে দলের গর্ভিনীরা অতি-সহজে, প্রায় চলা তাদের মত অনায়াসে শাবক প্রসব করে। প্রকৃতির ঐ বিচিত্র বিধানে নব-জাতকেরাও জন্ম থেকেই স্বনির্ভর। ভূমিষ্ঠ হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ধাবমান দলের সঙ্গে দৌড় দেবার মত ক্ষিপ্রপদ হয়ে ওঠে। সেই সময় [illegible] যদি ভাগ্যক্রমে [illegible] [illegible] করে দৌড়ায় তবে সেই [illegible] [illegible] লেহন করে তাকে [illegible]। কিন্তু বাচ্চাটি যদি [illegible] কাছে পৌঁছোতে [illegible] [illegible] বিপন্ন বাচ্চাটির [illegible] না। তখন সেই অনাথ [illegible] পালের পায়ে পায়ে নিষ্ঠুর চাট খেয়ে খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত শেয়াল কিম্বা হায়নার উদরস্থ হবে। এইভাবে প্রতি বছর

শত শত বাছুর বর্জন করে নরহরিণেরা তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।

অরণ্য রাজ্যে পশুরাজ সিংহের মানুষ ভিন্ন কোন হন্তারক নেই। তাদের আধি ব্যাধি, মারী-মড়ক নগণ্য। তাদের লোম ও কেশরে পরজীবী লোলুপ পোকা-মাকড় মশা, মাছি, উকুন এঁটুলী জোঁক ধরে কম। সিংহীদের গর্ভধারণের অন্তর সংক্ষিপ্ত এবং প্রতি প্রসবে শাবক সংখ্যাও কয়েকটি। তবু সিংহেরা সংখ্যার সমস্যায় পীড়িত হয় না। এমনকি তানজেনিয়ার সারেনগেতি সমতলের মত স্থানে যেখানে মৃগয়ার প্রাচুর্য, সেখানেও সিংহ সংখ্যার বিশেষ তারতম্য ঘটে না। কারণ সিংহ-গোষ্ঠিতে শিশু হত্যার দ্বারা সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের প্রথা হচ্ছে শিকার মিললে পুরুষেরা খাবে আগে। তারপর মেয়েরা, শেষে শিশুরা। কোন শিশু সে নিয়ম ভঙ্গ করলে তার কপালে হয় প্রচন্ড প্রহার, নয় নিষ্ঠুর মৃত্যু। প্রাচুর্যের সময় সিংহ-শিশুদের পক্ষে ব্যবস্থাটা হয়তো তত মারাত্মক হয় না। কিন্তু অনটনের সময় অনেক শিশুরই অনাহারে প্রাণ যায়।

সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে শিশু হত্যা এককালে আদিম মানুষের মধ্যেও ব্যপক ভাবে প্রচলিত ছিল। সভ্য মানুষের আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হবার আগে পর্যন্ত এই সেদিন অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এবং এস্কিমোদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিশু নিধন ব্যবস্থা চালু ছিল। নিহত শিশুদের মধ্যে বেশির ভাগই হতো মেয়ে। তাই ওই দুটি আদিবাসীর মধ্যে নারী-পুরুষের আনুপাতিক হার হোত ১৫০—১০০ জন। রাজপুতদের শিশু-কন্যা হত্যা এবং আমাদের গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি ভিন্ন কারণে ও সংস্কারের জন্যে অনুষ্ঠিত হলেও ফল দাঁড়াতো একই। অন্যান্য যে-সব পন্থায় প্রস্তর যুগ থেকে মানুষ সচেতনভাবে কিম্বা পশুদের মত প্রাকৃতিক নির্দেশে অনুভূতি চালিত হয়ে, সংস্কার বশে, সামাজিক পরিণতি ইত্যাদি কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে তা হচ্ছে যুদ্ধ, অর্থাৎ অপর গোষ্ঠিকে ক্ষেত্রবিশেষে থেকে উৎখাত চেষ্টা, নরমাংস বা স্বগোত্র ভোজন, খুন-খারাপী, নরবলি, যৌন-সম্ভোগের ওপর বিবিধ বিধি নিষেধ আরোপ এবং বাধ্যতামূলকভাবে গর্ভপাত ইত্যাদি। এছাড়া মারী মড়ক, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগও মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

ম্যালথাসের ধারণা অর্ধসত্য

১৭৯৮ খৃঃ রেভারেন্ড টমাস ম্যালথাস এই তথ্য প্রচার করেন যে যতদিন না খাদ্যাভাব ঘটে ততদিন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলে এবং যে হেতু খাদ্য উৎপাদন ঘটছে গাণিতিক হারে এবং মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে জ্যামিতিক হারে তাই মহামন্বন্তর আসন্ন। কিন্তু ম্যালথাসের সেই ভয়াল ভবিষ্যৎ বাণীর পর নতুন মহাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ-মহাদেশে মানুষের বসতি বিস্তার, উর্বরা জমিতে চাষ-আবাদ, চাষের উন্নতর পদ্ধতির আবিষ্কারে মানুষের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে জগৎব্যাপী মন্বন্তর দেখা দেয় নি, যদিও অঞ্চল বিশেষে কিম্বা বিশেষ বিশেষ দেশে দুর্ভিক্ষে বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে এবং আজো ঘটছে। আজকে বহু অনুসন্ধিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জীব-বিজ্ঞানী, সমাজ-বিজ্ঞানী ও মনোস্তাত্ত্বিকেরা এই তথ্যে উপনীত হয়েছেন যে খাদ্যাভাব ছাড়াও সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে ঘেঁষা-ঘেঁষিতে প্রাণী জগতে যে স্নায়ু উত্তেজনা বা বিকার দেখা দেয় তাও মারাত্মক হতে পারে।

যেমন, ১৯১৬ খৃঃ যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব উপকূলে চেসপিক উপসাগরে জেমস দ্বীপে চার-পাঁচটি সিকা হরিণ ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ খৃঃ সেই হরিণের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩০০তে। তারপর ১৯৫৮ খৃঃ অর্ধেক হরিণ মারা গেল। পরের বছরও মৃত্যু অব্যাহত থাকলো। শেষপর্যন্ত হরিণের সংখ্যা যখন ৮০তে নেমে গেল তখন মড়ক বন্ধ হলো। অর্থাৎ, গণ-মড়কের যা সাধারণ নিয়ম, মূল সংখ্যা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মৃত্যু ঘটা, তা ঘটে যাবার পর মৃত্যু বন্ধ হলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে হরিণদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়ে থাকুক তাদের খাদ্যাভাব ঘটে নি। তাদের বসতির ঘনত্ব ছিল একর প্রতি একটি। তাহলে হঠাৎ এই মড়কের কারণ কি? পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তাদের বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থিগুলি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্নায়ু উত্তেজনাই হচ্ছে তার কারণ।

স্নায়ু উত্তেজনাও যে জীবসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটা বড় কারণ হতে পারে তা গত বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতীয়মান হয়। ১৯০৯ সালে উত্তর আমেরিকার অসংখ্য স্নো-শু খরগোস এক অদ্ভুত আক্ষেপ বা কাঁপুনি রোগে মারা যেতে থাকে। তাদের মাথা ও ঘাড় সংকুচিত ও পা প্রসারিত হতে থাকে। সেই অবস্থায় তারা একটা আচম্বিত লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে খাবি খেতে থাকে। কোন-কোনটি আবার জবুথবু, হতচেতন হয়ে মারা যেতে থাকে। মৃত খরগোসগুলি ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেল মূত্রগ্রন্থি, থাইরইড ও মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ এবং লিভারে চর্বি-বৃদ্ধি তাদের মৃত্যুর কারণ। খাদ্যাভাব কিম্বা মারী নয়। একর পেছু ৫০, এমনকি ১০০ খরগোস হলেও তাদের স্নায়ু স্বাভাবিকই থাকে। কিন্তু ২০০ পৌঁছোলেই নাটকীয়ভাবে গণমৃত্যু দেখা দেয়। সূচনায় লেমিঙদের যে গণ-আত্মহত্যার কথা বলা হয়েছে, সেই লেমিঙদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের বেশিরভাগই যুবক, অনাহারী কেউ নয় তবু স্ত্রী লেমিঙরা কেউ গর্ভবতী নয়। অথচ সবাই উত্তেজিত। এমন উত্তেজিত যে স্ত্রী-পুরুষ মুখোমুখি হলে পুরুষের প্রাণবায়ু উড়ে যায়। জোরে কোন শব্দ হলে গন্ডায় গন্ডায় মরে যায়। সুতরাং জে জে খ্রিস্টিয়ানের মত বিজ্ঞানীরা তার ব্যাখ্যা করেছেন যে, খাদ্যাভাবে অনাহারে মৃত্যুর অনেক আগেই সংখ্যাবৃদ্ধি জীবজগতে একটা গণস্নায়ুবিকার ঘটায়। বড়দের মধ্যে প্রতিযোগিতা, ছোটদের সংখ্যাবৃদ্ধি, নবাগতদের অতিবৃদ্ধিতে গোষ্ঠীর বিশৃঙ্খলা স্নায়ু উত্তেজনা ও প্রচন্ড অবসাদ ঘটায়। তারপর চক্রাকারে শীতে কষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাই শীতশেষে বসন্তে যৌন তাগিদ চরমে ওঠে। আচম্বিতে গণমৃত্যু ঘটে।

ঘেঁষাঘেঁষির কি ধরনের দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটে কোন জীববিজ্ঞানী ধাড়ী ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। একটি খাঁচায় বহু ইঁদুরকে ঠেসাঠেসি করে ভরে দিয়ে (১৪×১০ ফিট খাঁচায় ৮০টি)। দেখা গেছে পুরুষগুলো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে পরস্পরের লেজ কামড়াচ্ছে। মেয়েগুলো মাতৃবাৎসল্য ভুলে যাচ্ছে। কোন

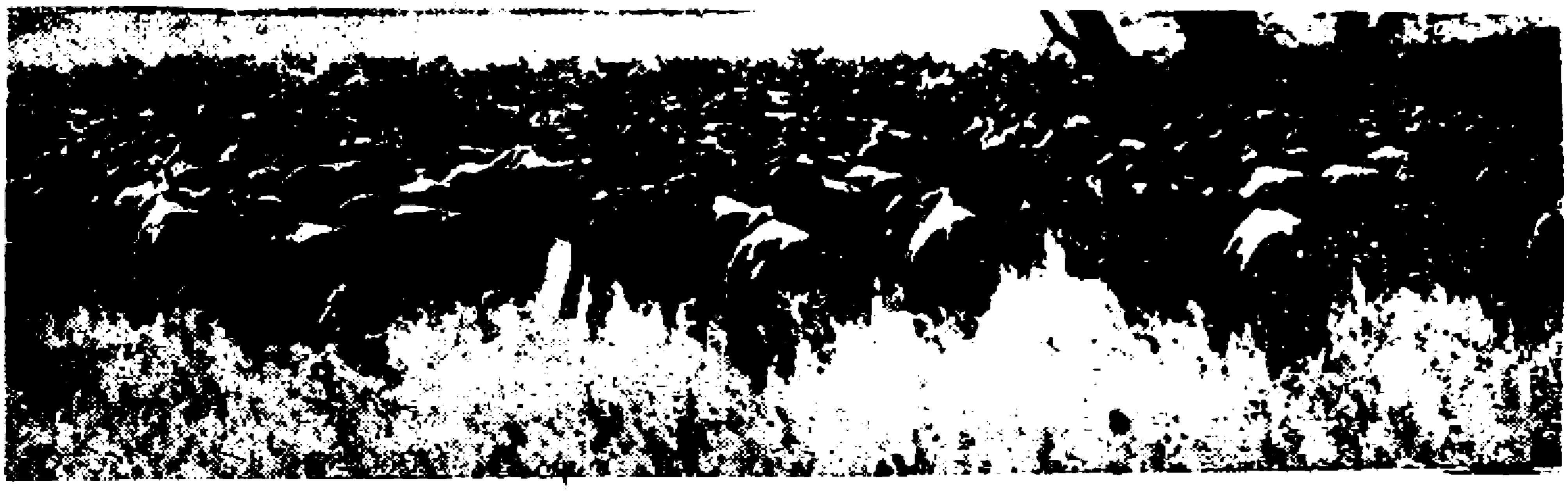

আচরণ উল্টে গিয়ে উভয় লিঙ্গের মধ্যেই সমলিঙ্গা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আরো দেখা গেছে যে, মেঠো ইঁদুর হচ্ছে নির্দিষ্ট এলাকাবাসী। সাধারণভাবে ঐ জাতের মেয়ে ইঁদুর তার নির্দিষ্ট পুরুষ ইঁদুরের সঙ্গেই যৌনসঙ্গম করে। ফলে সে যদি গর্ভধারণ করে এবং তার চারদিনের মধ্যে অন্য কোন পুরুষ ইঁদুরের সঙ্গে তার সঙ্গম হয় তবে গর্ভপাত হয়ে যায়। এটা ইঁদুরের অসতীত্ব নয়। কারণ আরো পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে অন্য পুরুষ ইঁদুরের দর্শনলাভেও তাদের গর্ভপাত ঘটতে পারে। শেষে আরো দেখা গেল যে একটি খাঁচায় অপর একটি পুরুষ ইঁদুরকে রাখার পর তাকে সরিয়ে নিয়ে একটি গর্ভবতী ইঁদুরকে তাতে ভরলেও তার গর্ভপাত ঘটে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পরপুরুষের গন্ধই নীরব ভ্রূণগুলি জরায়ু থেকে বেরিয়ে আসে। এও স্নায়ু উত্তেজনার ফল।

জন্ম নিয়ন্ত্রণে জৈব উৎকর্ষের অবনতি

প্রকৃতি রাজ্যের নিজস্ব আইন কানুনের সামঞ্জস্য অনুযায়ী জীবজগতের স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। কোন কারণে তার ব্যতিক্রম ঘটলে জীবজগতে তার নানারূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। আমেরিকার এরিজোনার বিশাল সমতলে ৭০০০ হরিণ নেকড়ে, পিউমা প্রভৃতি শ্বাপদের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাস করতো। মৃগ সমাজের ওপর শ্বাপদদের হিংস্রতার ফলে রুগ্ন বিকলাঙ্গ, দুর্বল প্রাণী বিদায় নিত এবং তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ হোত। ফলে [illegible] মৃগসমাজের স্বাস্থ্য অটুট থাকতো। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে মানুষ সেই শ্বাপদদের নিধন শুরু করে তাদের প্রায় নিঃশেষ করে দিল। হঠাৎ হরিণদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ১৯২০ খৃঃ দাঁড়াল ৬০,০০০-এ। ১৯২৪ খৃঃ-এ ১০০,০০০। তারপরই এলো গণমৃত্যু। এ বছরে সেই সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ালো ৫০,০০০ এবং ১৯৩৯ খৃঃ মাত্র ১০,০০০। দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে অতি-চারণ ও খাদ্য-ঘাটতি তার একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু [illegible] ঐ অস্বাভাবিক হরিণ সংখ্যার [illegible] হ্রাসের ব্যাখ্যা হয় না।

সেন্ট পল নামে [illegible] যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের [illegible] চেষ্টায় ইতিপূর্বে [illegible] ১৯১১ খৃঃ [illegible] আহার বৃদ্ধির [illegible] দ্বীপে কেন হরিণ [illegible] একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। [illegible] ও ২১টি মেয়ে হরিণ ঐ দ্বীপে [illegible] হয়। [illegible] হরিণ-সংখ্যা [illegible] বৃদ্ধি পেতে থাকে। [illegible] তাদের সংখ্যা [illegible] ৫২০ [illegible] ২০০০ [illegible] অকস্মাৎ [illegible] ১৯৫০ খৃঃ তাদের সংখ্যা [illegible] অভাব নয় [illegible] সংখ্যা হ্রাসের কারণ কি? [illegible] একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন, [illegible] কিম্বা অন্য কোন হত্যাকের অভাবে দুর্বল, [illegible] পঙ্গু, অক্ষমদের বাছাই-সাফাই না হওয়ার ফলে দ্বীপের সমগ্র হরিণপালটির জৈবিক গুণ, উৎকর্ষ এবং জীবনীশক্তি ক্রমে আসছিল, তাই এই নাটকীয় পতন।—আজ যেভাবে মানুষের সমাজকে আধ-খাদি মুক্ত করা হচ্ছে, অক্ষম, পঙ্গু ও রুগ্নদের শুধু দীর্ঘায়ু নয়, প্রজননের অবাধ অধিকার প্রভৃতি দেওয়া হচ্ছে তাতে কোন বিজ্ঞানী ভাবছেন মানুষের ভাগ্যেও ঐ জাতীয় পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠছে।

জনবৃদ্ধি ও সামাজিক উত্তেজনা

পূর্ববর্তী আলোচনায় তানজেনিয়ার সিংহ সম্প্রদায়, লামিঙদের গণ-আত্মহত্যা ইত্যাদির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে খাদ্য-সঙ্কট তীব্র হবার আগেই জীবরাজ্যে সংখ্যার অতিবৃদ্ধিতে ভয়াল সব প্রতিক্রিয়া ঘটতে থাকে। আজ পৃথিবীব্যাপী মনুষ্য সমাজের অতিবৃদ্ধিতে যদিও ম্যালথাস শংকিত-মহামন্বন্তর সর্বদাই আমাদের মনে হানা দিচ্ছে, তবু লক্ষণ দেখে মনে হয় যে সেই মহামন্বন্তর ঘটবার অনেক আগেই বহু অভাবিত ও আতঙ্কজনক অনর্থ ঘটে যাবে। অবস্থার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধির জন্যে দেখা প্রয়োজন কিভাবে মনুষ্যবসতি ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

১৮০০ খৃঃ পৃথিবীতে এমন একটি শহরও ছিল না যার জনসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষের অধিক। লন্ডন তার ৯৫৯৩১০ নাগরিক নিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম জনকেন্দ্র বলে বিবেচিত হতো। ১৮৫০ খৃঃ লন্ডনে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২০ লক্ষ। ১৯১০ খৃঃ পৃথিবীতে ১১টি শহরের জনসংখ্যা ১০ লক্ষ অতিক্রম করে গেল। ১৯০০ খৃঃ অনুরূপ শহরের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭। আজ পৃথিবীতে অন্ততঃ তিনশো শহর আছে যাদের জনসংখ্যা ৫ লক্ষের অধিক বলে অনুমান করা হয়। কালিফোর্ণিয়ার বার্কলের 'ইনটার নাশনাল পপুলেশন অ্যান্ড আর্বান রিসার্চ সেন্টারের' প্রধান অধ্যাপক কিংসলে ডেভিসের মতে ১৯[illegible] খৃঃ মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক [illegible] এক লক্ষের অধিক জনসংখ্যা[illegible] শহরে বাস করবে। শতাব্দীর শেষে ২০[illegible] পৃথিবীতে শহরবাসীদের সংখ্যা গ্রামাঞ্চলবাসীদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে।—জনসংখ্যার ঐ নগরমুখী বেগ কিভাবে বর্ধিষ্ণু, [illegible] দক্ষিণ আমেরিকার পরিসংখ্যাত পর্যালোচনাতেই প্রতীয়মান হবে। ১৯২০ খৃঃ সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় কোন লোকই ১০ লক্ষের অধিক জনসংখ্যাসম্পন্ন শহরে বাস করতো না। আজ ২ কোটি ১০ লক্ষের ওপর লোক অনুরূপ শহর সমূহে বাস করে।

বর্তমানে কলকাতার বছরে তিন লক্ষ লোক বাড়ছে বলে অনুমান। শতাব্দীর শেষে তার জনসংখ্যা সাড়ে তিন থেকে ছয় কোটি ষাট লক্ষে দাঁড়াতে পারে। প্রারম্ভে খুব বেশি ৩০ লক্ষ লোকের জন্যে পরিকল্পিত নগরীটির অবস্থা তখন কি দাঁড়াবে তা কি কেউ কল্পনা করতে পারেন? ইতিমধ্যে শহরে আবর্জনার পাহাড় জমছে, ট্রামে-বাসে ওঠা অসম্ভব, স্কুলে ভর্তি হওয়া কঠিন সমস্যা, পানীয় জলের অভাব, সিনেমা-থিয়েটার ভীড়ে দুর্গম। আর যখন জনসংখ্যা আরো ৮ কিম্বা ১০ গুণ বেড়ে যাবে তখন?

'শহর থেকে লোক অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে,' ইত্যাদি ভ্রান্ত কথায় সে সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ শহরের বাইরেও বেশি জায়গা থাকবে না। আজ যদি পৃথিবীর সব মানুষকে যতটা সম্ভব ততটা ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে প্রত্যেকটি নর-নারী ও শিশু পরস্পরের মধ্যে ১৫০ গজ জায়গা পাবে। ২০০০ খৃঃ তা গিয়ে দাঁড়াবে ১২০ গজে, ২০৭০ খৃঃ ৬০ গজে। এ অবশ্য অরণ্য-মরু-পাহাড়-তুষারাবৃত মেরু পৃথিবীর সবখানি স্থলভূমি ধরে। শুধু বাসোপযোগী ভূমির হিসাবে তা হবে অনেক কম। পূর্বোবর্ণিত জেমস দ্বীপের হরিণদের মস্তিষ্কে যখন রক্তক্ষরণ দেখা দেয় তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে গড়ে জায়গা ছিল ৮০ গজ!

পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ইন্দোনেশিয়া, [illegible] স্থানগুলির অবস্থা হবে চরম। চীনের [illegible] এই জন্যে উদ্বেলিত হলো না যে, [illegible] জনসংখ্যা পাকিস্থান, ভারতের (পাকিস্থান বাদে) দেড় গুণ এবং আয়তন [illegible] প্রায় ৬ গুণ। সুতরাং আমাদের [illegible] তার স্থানাভাব নেই। ইন্দোনেশিয়ার [illegible] ঘনত্ব চীনের চারগুণ এবং আমেরিকার [illegible] গুণ এবং ভারতের [illegible] বেশি (ভারত বর্গমাইল : [illegible] ৫৭০) তবু কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলে তার [illegible] জনসংখ্যা পাঠানোর অবাধ সুযোগ [illegible] অতিশয় উন্নত শাসন ব্যবস্থা [illegible] শিক্ষিত, সুশৃঙ্খল [illegible] বিরাট সম্পদশালী [illegible]। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার তুলনা চলে না।—যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার [illegible] হতে থাকে তবে আমাদের ত্রিশ-চারিশ [illegible] মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা [illegible] যেখানে কলকাতায় লোকসংখ্যা [illegible] বেড়ে গেছে। গোটা পশ্চিমবাংলাটা [illegible] কলকাতার মত হয়ে গেছে। বর্তমানে যে-ভাবে কলকাতার ট্রাম চলে তেমনিভাবে বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর প্রভৃতি শহরগুলি থেকে ঘন-ঘন ট্রেন এলেও তাতে লোকে বাদুড়-ঝোলা হয়ে ঝুলছে। পানীয় জল দুর্লভ হয়ে গেছে, সিনেমা খেলার মাঠ কোথাও ভীড়ের চাপে ঢোকবার উপায় নেই। দেশে শিক্ষা নেই, শৃঙ্খলা নেই, আশ্রয় নেই। প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। সর্বত্র ঠেলাঠেলি, মারামারি, হট্টগোল, চীৎকার, যানবাহনের শব্দ। হয়তো খাদ্যের জঘন্য অনটন, এমনকি, পানীয় জলের জন্যে হাহাকার। সেদিন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে?

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ রবার্ট আর্দ্রে এবং গর্ডন রাট্রে টেলারের সোশ্যাল কনট্রাক্ট এবং ডুমসডে বুক নামক দুটি পুস্তকের কাছে ঋণী।

মনোতোষ সরকার

তীর্থ

গতকালের বিকেলে কেন জানি তাড়াহুড়ি ছুটি হয়ে গেছিল অফিসে। হাতে কোন কাজ না থাকায় এমনি হাঁটতে শুরু করে দিল বাসব। উদ্দেশ্যহীনভাবে। এখানে সেখানে। সিনেমা দেখার কথা মনে উঁকি-ঝুঁকি দিলেও তাকে আমল দেয়নি বাসব। কি বই দেখবে? বাংলা? যে-ক'টা ভাল বই চলছে তা দেখা হয়ে গেছে। হিন্দী? ও-সব বই দেখার মত মনের ধৈর্য এখন নেই বাসবের। আর ইংরেজী? কোন হলেই তেমন বই দেখানো হচ্ছে না। তাহলে? আজ যেন ঘুরতেই ভাল লাগছে বাসবের এবং হেঁটে হেঁটে।

এই রকম হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল তীর্থকে।

এ-সব অনেকবার যাকে খুঁজেছে। সেই তীর্থকে। অনেকদিন ধরে। কিন্তু খুঁজে পায়নি। তখন ভেবেছে পাবে না বুঝি। আর কোনদিন। কোথায় যে হারিয়ে গেল তীর্থ! অথচ প্রয়োজন ছিল। তীর্থকে খুঁজেছে তাই। খুঁজেছে। অনেকবার। অনেকদিন ধরে। কিন্তু অনেককে ত আর খুঁজে পাওয়া যায় না শেষপর্যন্ত। আর তাদের জন্য আপসোষ থাকে না হয়ত। এমন অনেক নাম ত হারিয়ে যায়। হারিয়ে গেছে। তাদের যে আর কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না— এটা ভাল করেই জানে বাসব। বিশ্বাসও করে। তবুও কেন যেন সেই নামগুলোর সংগে তীর্থর নামটা কিছুতেই মেলাতে চায় না। তীর্থকে যে ফিরে পেতে চায়।

আবার। আশা রাখে আবার ফিরে পাবে তীর্থকে।

সত্যি কোথায় পাবে তীর্থকে? সম্ভাব্য সব ঠিকানায় হাজির হয়েছে বাসব। কিন্তু সেই তীর্থ যে কোনখানেই নেই। এমনকি তার বাসার ঠিকানা থেকেও হারিয়ে গেছে। অনেকদিন। এই তীর্থ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আপনজন-প্রিয়জন কারো কাছে থেকেও তীর্থকে আর পাওয়া যাবে না। সত্যি কি আর পাওয়া যাবে না তীর্থকে। বাসবের ভাবনাগুলো ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকা গাড়ীগুলোর মত অনড়। তখন। সেই মুহূর্তে এই ট্রাফিক জ্যাম হয়ত এক সময় আর থাকবে না। থমকে থাকা গাড়ীগুলোও আপন আপন গন্তব্যে

রওনা হবে। কিন্তু বাসবের ভাবনাগুলো কি গতি পাবে এই সব অনড় গাড়ীগুলোর মত? কোনদিন কি তীর্থকে পাওয়া যাবে? আবার?

তাই ত ভেবেছে বাসব। আর ভাবতে ভাবতে চলেছে। এই রাস্তা ধরে। ওই রাস্তা ধরে। যতক্ষণ চলেছে ততক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে। এই ফুটপাতে আর ওই ফুটপাতে। বাস-স্টপে আর ট্রাম-স্টপে। যদি দেখতে পায় তীর্থকে। আবার। এখন—হয়ত এখন নয় অন্য সময়ে। আজকে—হয়ত আজকে নয় অন্যদিন। অথবা কোনদিন—

অন্য কোনদিন নয় আজকে, আজকে নয় এখন, এখন নয় এই মুহূর্তে দেখতে পেল তীর্থকে। এই ফুটপাতে নয় ওই ফুটপাতে।

কি করছে তীর্থ? কথা বলছে? কারো সঙ্গে? কার সঙ্গে? এর চেয়ে আর বে বেশী দৃষ্টি চলে না এই ফুটপাত থেকে ওই ফুটপাতে। তবুও আরও বেশী করে দেখতে চেয়েছিল।

ডাকবে নাকি বাসব? এখান থেকেই তীর্থকে ডাকবে? এখন—এই মুহূর্তে? যদি শুনতে না পায় এই ডাক? তাহলে? অথবা এই ডাককে যদি অগ্রাহ্য করে? তখন? ডাক শুনে যদি পালিয়ে যায়? তবে? আবার কি খুঁজে পাবে তীর্থকে? তাই ডাকতে সাহস পেল না বাসব। দৃষ্টিটাকে সরল রেখা করে ছুঁয়ে থেকেছে তীর্থকে। এখান থেকেই। এই ফুটপাত থেকে। তারপর দৃষ্টিটাকে ছোট করে করে গুটিয়ে নিয়েছে। আর এদিক থেকে হাঁটতে চেয়েছে ওদিকে। এই ফুটপাত থেকে ওই ফুটপাতে। যেখানে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে তীর্থ। হয়ত কথা বলছে। কার সঙ্গে? এখনও তা জানে না বাসব। কি কথা বলছে? তাও জানতে চায় না বাসব। তীর্থকে শুধু পেতে চায়। পেতে চেয়েছে। অনেকবার। অনেকদিন। আর মুখোমুখি হতে চেয়েছে। এখন—এই মুহূর্তে।

পা রেখেছে বাসব ফুটপাত থেকে রাস্তায়। তখন, ঠিক তখন আলো জ্বলেছে। লাল, হলদে তারপরে নীল। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ী আবার ছুটে চলেছে। আর পিছিয়ে এসেছে বাসব। আবার। এই ফুটপাতে। চলন্ত গাড়ীগুলোর বাধায় দৃষ্টির রেখাটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। ভেঙে ভেঙে যাওয়া দৃষ্টির রেখাটা কিছুতেই আর তীর্থকে ছুঁতে পারছে না। কেমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা তখন। বাসবকে ঘিরে। তীর্থকে খুঁজে পেয়েও ফিরে না পাবার বেদনা বুঝি বাসবকে অনেক বেশী কষ্ট দিচ্ছে। নীল আলোটা কখন আবার লাল হবে? তাই ভাবছে বাসব। তাহলেই বুঝি তীর্থকে কাছে পাবে আবার। আর দৃষ্টির রেখাটা তখন এ-ফুটপাত থেকে ওই ফুটপাতে কয়েকটা কাল্পনিক বিন্দু তৈরী করেছে এবং সেই বিন্দুগুলোর মধ্যে রেখা টেনে টেনে বৃত্ত রচনা করতে চেয়েছে বাসব। আর সেই বৃত্তের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছে তীর্থকে।

কখন আবার সেই নীল আলো হলদে হয়েছে। আর বাসব আস্তে আস্তে একটা উত্তেজনার দিকে এগিয়েছে। বাসবের দৃষ্টিটা তীর্থকে ঘিরে থাকলেও হলদে আলোর কাছে লাল আলোর ভিক্ষে চেয়েছে। আর তখন—ঠিক তখন গাড়ীগুলো কেমন থেমে গেছে। এক এক করে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। হলদে আলোটাও সরে গেছে। সেখানে তখন লাল আলো চোখ রাঙাচ্ছে। শাসাচ্ছে যেন সবাইকে। আর বাসব আবার পথে নেমেছে।

'কেমন আছিস তীর্থ?' বাসব তীর্থর পাশে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হতে চেয়েছে।

'আপনি?'

'আপনি কিরে—আমি বাসব।'

'হ্যাঁ, তুমি বাসব, চিনতে পারিনি—এখন এখানে?' কেমন সঙ্কোচ-মাখানো কতগুলো শব্দ তীর্থর মুখে।

'তোকে দেখেই ত এখানে এলাম। কোথায় আছিস? কি করছিস আজকাল?'

তীর্থর তখন কেমন অসহায় অবস্থা। এই মুহূর্তে। বাসবের পোষাক-আষাক, চেহারা এবং উপস্থিতি সব মিলিয়ে তীর্থকে কেমন বে-মানান লাগছে এখন।

'কিরে কথা বলছিস না যে?'

তীর্থ কথা বলবে কি, নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য অতি ব্যস্ত তখন। নিজের হত-দৈন্য চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে জামা-কাপড়ের মধ্যে আরও দৈন্যের ছবি। তার ওপর ফুটপাতে বসা নীচুমানের সব্জী নিয়ে সব্জীওয়ালার সঙ্গে সামান্য কটা পয়সা নিয়ে অযথা কথা-কাটাকাটি। সবই কেমন বিসদৃশ। তীর্থর লজ্জা ঢাকবার যেন আর মুখ নেই।

'সামান্য কটা পয়সা ত দিয়ে দে। তারপর চল আর দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই। চায়ের দোকানে গিয়ে বসা যাক বরং। কি বল্—' হাত ধরে টেনেছে তীর্থকে।

ইতস্ততঃ করেছে তীর্থ। একবার তাকিয়েছে বাসবের দিকে। তারপর বাসবের সারা শরীরে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে হোঁচট খেয়েছে। নিজের নির্লজ্জ দৈন্যতার মুখোমুখি হয়ে আরও লজ্জা পেয়েছে। আর কেমন অসহায় বোধ করেছে। হাতে ছেঁড়া বাজারের থলে, তাতে আবার সস্তা দরের সব্জী, এর জন্যও অস্বস্তিবোধ কম নয়।

'কইরে, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি?' বাসব আবার তাগাদা দিয়েছে।

'আজ থাক বরং অন্যদিন—' থেমে গেছে তীর্থ।

'তাই কি হয় কখনো? কতদিন ধরে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি।'

'জানি। সব খবর পেয়েছি আমি।'

'তবে? দেখা করিসনি কেন?'

'কেন?' থেমে গেল তীর্থ। আর কোন কথা বলতে পারেনি। কেমন গুম মেরে গেল তখন।

এদিকে বাসব আজ যখন পেয়েছে তীর্থকে তখন কিছুতেই ছাড়বে না। জোর করে নিয়ে ঢুকবে চায়ের দোকানে। সেখানে বসে নিজের অহঙ্কারকে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করাবে তীর্থর সামনে। এটাই চাইছে বাসব। কারণ, তার জীবনে এই একটাই সাধ নাম যাকে কোনদিন বাগে পায়নি বাসব। অথচ আজই পেয়েছে। তাই অত সহজে এই সুযোগকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

'কি খাবি বল?' বাসবই প্রথম জিগ্যেস করল।

'কি খাব—কি খাব—আচ্ছা চা-ই বল।'

'চা ত সব সময়েই খাস—আরও অন্য কিছু বল।'

তীর্থ কিছুই বলতে চায় না। কি ভেবে তাকিয়ে থাকে বাসবের মুখের দিকে। এমন একটা মুহূর্তে যে বাসবের মুখোমুখি কোনদিন হতে হবে তাকে এ যেন ভাবাই যায় না। আর এভাবে দেখা না হলে হয়ত অসম্ভবই ছিল এক রকম।

তীর্থ কথা না বললেও বাসব বলতে চেয়েছে। বয়কে ডেকে অর্ডার দিয়েছে শেষ-পর্যন্ত। বলেছে, 'ফিস ফ্রাই আর পুডিং দুটো করে।'

তবু তীর্থ কেমন অন্যমনস্ক। এমন একটা ব্যাপারের জন্য তীর্থর অপ্রস্তুত মনটা কিছুতেই সহজ হতে পারছে না।

বাসব তবু বলে, 'বিয়ে করেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় বাসা করেছিস?'

'এই বাগমারীর কাছাকাছি।' অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কথা বলতে হচ্ছে তীর্থর।

ইতিমধ্যে খাবার এসেছে। ছুরি দিয়ে কেটে কাঁটা দিয়ে ফিস-ফ্রাইয়ের টুকরোটাকে মুখে পুরেছে বাসব। তারপর জিভ দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেছে, 'খেয়ে নে।'

'খাব ত নিশ্চয়, এখানে এসেছি যখন।'

'কি করছিস আজকাল?'

'কেন?' ছুরি-কাঁটাকে অলস করে রেখে বাসবের দিকে তাকিয়েছে তীর্থ। তারপর আবার বলেছে, 'মাস্টারী করি। তুই ত বিয়ে করেছিস বাসব তাই না?" সহজ হতে খুবই চেষ্টা করছে তীর্থ।

'হ্যাঁ।' পুডিং-এর প্লেটটা সরিয়ে রেখে চায়ের কাপটা টেনে নিতে নিতে বলেছে বাসব, 'সত্যি তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার এত প্রয়োজন ছিল—'

'কেন?' বাসবকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল তীর্থ।

কেন? তাই ত ভাবতে বসল বাসব। ভাবতে ভাবতে ফিরে গেল সেই ছেলেবেলার কালে। যেখানে তীর্থ একমাত্র বাসবের প্রতিদ্বন্দ্বী। কি লেখাপড়ায়, কি খেলায়, কি ডিবেটিং-এ। বাসবও ছেলে খারাপ ছিল না কিন্তু এই তীর্থকে কোনদিনের জন্যও ডিঙোতে পারল না। সেবার পরীক্ষার প্রশ্ন ইচ্ছে করেই শক্ত করা হয়েছিল এবং ইচ্ছে করে খাতাও দেখা হয়েছে খুবই স্টিক করে। তাই নম্বর কিছুতেই বেশী উঠবে

না। পঞ্চাশ পেল বাসব এবং বাসব ভেবেছিল নিশ্চয় তীর্থকে হারাতে পারবে। কিন্তু কোথায়, বাহান্ন নম্বর পেয়ে তীর্থ ঠিক বাসবকে টেক্কা দিয়েছে। একবার ঠিক হল ক্লাসের সব ছেলেরা মিলে স্কুলের বার্ষিকী দিবসে ফুটবল খেলবে। তীর্থর ইচ্ছে ছিল বাসব ওদের সঙ্গে খেলুক কিন্তু বাসব ইচ্ছে করেই অপর দলে খেলল। বাসব চেয়েছিল তীর্থকে কাটিয়ে নিয়ে গোল দেবে. তাই যতবার বল নিয়ে এগিয়েছে, ততবারই তীর্থর কাছ থেকে বাধা পেয়েছে অথচ তীর্থ যখন একবার মাত্র সুযোগ পেয়েছে এবং সেই সুযোগে বাসবকে কাটিয়ে গোলে বল ঠেলে দিয়েছে। এক গোলে তীর্থরা জিতে গেল। তীর্থকে নিয়ে কি নাচানাচি সেদিন। ডিবেটিং-এও কোনদিন হারাতে পারল না তীর্থকে। সেই থেকে তীর্থর ওপর কেমন রোখ চেপে রইল বাসবের। তারপর স্কুল ছাড়বার পর ছাড়াছাড়ি হল দুজনে। কিন্তু তীর্থের ওপর থেকে সেই চাপা বিদ্বেষ কিছুতেই তুলে নিতে পারল না। কলেজ থেকেও বেরিয়ে এল বাসব। কিন্তু কোথায় তখন তীর্থ? এখন ভাল চাকরী পেয়েছে বাসব। বিয়ে করেছে ভাল ঘরে। সুখী হয়েছে বাসব। এবং এখন আবার পেতে চেয়েছে তীর্থকে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন-প্রিয়জন সবার কাছে গেছে বাসব। কিন্তু না, কোথাও আর তীর্থকে খুঁজে পেল না বাসব। অথচ তীর্থকে তার প্রয়োজন ছিল। তাই ত কেমন করে যেন আজ সত্যি সত্যি তীর্থকে আবার পেয়ে গেল। বাসবের এই চাকরী, জামা-কাপড়ের বাহার আর সুখী মনটা তীর্থর এই অসহায় অবস্থার ওপর এক হাত নিতে চেয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে যে প্রতিদ্বন্দ্বী মনটাকে কাঁইয়ে রেখেছিল বাসব, সে বুঝি একটু একটু করে মাথা-চাড়া দিচ্ছিল। এবং এই চরম মুহূর্তে বুঝি ফেটে পড়তে চাইল।

'কই তোদের বাড়ীতে যেতে বললি না ত তীর্থ?' চায়ে চুমুক দিতে দিতে এক সময় বলেছিল বাসব।

একটুক্ষণ থেমে থেকেছে তীর্থ। মনে মনে কি ভেবেছে। তারপর সহজভাবেই বলতে চেয়েছে, 'বাবি তাতে ঘটা করে বলবার কি আছে।'

'এই রোববারে যাব তোদের বাড়ী, কেমন? বাড়ীতে থাকিস আবার!' খোঁচা দিতে গেছে বাসব।

'থাকব। লিখে নে ঠিকানাটা।' থামল তীর্থ। একটু আগে বাসবের খোঁচা-খাওয়া তীর্থর মুখটা গম্ভীর হতে যেয়েও হাসির বান ডাকল সেখানে। 'তোর বৌকে নিয়ে আসিস, বুঝলি।'

'আচ্ছা।' কোন খেলায় যেন মেতে উঠল বাসব।

রাত্রিরে রমা চেপে ধরেছে বাসবকে, 'কিগো, সকালের হাসির ব্যাপার সম্বন্ধে বললে না ত কিছু?'

'পরে বলব। জানো রোববারে আমাদের নেমন্তন্ন।' কথাটাকে ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে নিয়েছে বাসব।

'কোথায়?' রমা জিগ্যেস করেছে এবার।

'তীর্থদের বাড়ী।'

'কোন্ তীর্থর কথা বলছ? তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু সেই তীর্থ?'

মাথা নেড়েছে বাসব।

এই তীর্থ সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে রমা। বাসবই বলেছে। একে হারাবার জন্য বাসবের কত চেষ্টা। কিন্তু কোনবারই হারাতে পারেনি। তাই রমা হাসতে হাসতে বলতে পেরেছে, 'একে ত কোনদিন হারাতে পারনি, তাই না?'

'হ্যাঁ।' থেমে গেছে বাসব। আর মনে মনে ভেবেছে এতদিন বাদে প্রথম ধাপের খেলায় হারিয়ে দিতে পেরেছে তীর্থকে এবং রোববারে আবার রমার সামনে শেষ খেলাতে হারাতে পারলে ছেলেবেলার সব পরাজয়ের শোধ ঠিক ঠিক নিতে পারবে বাসব। হঠাৎ থমকে থাকা বাসবের মনটা অজানা এক আনন্দে ময়ূরের পেখম তুলল।

রোববারে অনেক ভোরেই ঘুম ভেঙে গেছে বাসবের। সকাল থেকেই মনটা বেশ ঝরঝরে। সপ্তাহের ক্লান্তি এক রাত্রিরের মধ্যে মুছে গেছে মন থেকে। হাত-মুখ ধুয়ে আসতে আসতেই রমা এসে হাজির হয়েছে। হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ। বলেছে রমা, 'আজ যে গুড বয় দেখছি। ডাকতে হয়নি, চা খেতে তাগাদা করতে হয়নি।'

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ তুলে নিয়েছে বাসব। আর ফিরিয়ে দিয়েছে কিছু হাসি। বলতে চেয়েছে, 'আজকের কথা মনে আছে ত?'

'কি কথা?' না বোঝার ভাণ করে মজা করতে চেয়েছে রমা।

'তীর্থদের বাড়ীতে যেতে হবে না?'

'কেন?' বাসবের মুখের দিকে তাকাতে চেয়েছে রমা।

'ওদের ওখানে আমাদের নেমন্তন্ন, সেটা কি ভুলে গেলে?' বিস্কুটে কামড় দিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছে বাসব।

'ও হ্যাঁ, বলেছিলে বটে তুমি।'

'তুমি তাড়াতাড়ি সেরে নাও সকাল, আমি ততক্ষণে বাজারটা একবার ঘুরে আসি।'

'বাজারে কেন? নেমন্তন্ন আছে না বললে?' অবাক হয়েছে যেন রমা।

'হ্যাঁ। বাজারও করতে হবে, নেমন্তন্নেও যেতে হবে।' রমাকে অবাক করে রেখেই ঘর হতে বেরিয়ে পড়ল বাসব।

• • •

বসন্ত থেকে ট্যাক্সিটা সোজা ডি আই পি রোড ধরে চলেছে। লেক টাউনের কাছে আসতেই রমা বলেছে, 'কি ব্যাপার বল ত?'

'কিসের কি ব্যাপার?' রমার মুখোমুখি হতে চেয়েছে বাসব।

'তীর্থবাবুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন অথচ পুরো বাজারটা করে নিয়ে চলেছ তুমিই? মাছ, মাংস, শাকসব্জী কিছুই ত বাদ দাওনি দেখছি।'

হেসেছে বাসব। কিন্তু মুখে কোন জবাব দেয়নি।

'কি মতলব তোমার বলতে পার?' রমা ত কিছুই বুঝতে পারছে না এসবের। সব কেমন রহস্য। সমস্ত ব্যাপারটুকুই কেমন তখন থেকে হেঁয়ালী ঠেকছে রমার কাছে।

ট্যাক্সিটা ইতিমধ্যে তিন নম্বর বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে পড়াতে বাসব বলল, ট্যাক্সিওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে, 'ডাইনে মানিকতলা মেইন রোড।' তারপর রাস্তার ধারে বড় মিষ্টির দোকানের কাছে দাঁড় করাতে বলল আবার। দোকান থেকে মিষ্টি, দই কিনে এনে ট্যাক্সিওয়ালাকে এবার বলল, 'চালিয়ে।'

'একি করছ তুমি?' রমা এক সময় কথা বলে উঠল। রহস্যটা যেন আরও ঘন হয়ে উঠেছে রমার কাছে।

এবারও হাসল বাসব।

ট্যাক্সিটা ততক্ষণে রেলপুল পেরিয়ে গেছে। ট্যাক্সির গতিটাকে কমিয়ে ড্রাইভার জিগ্যেস করল, 'আভি কিধার চলেগা সাহাব?'

'বাঁয়ে।' ড্রাইভারকে বাসব নর্থ রোডে ঢুকতে বলেছে; তারপর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নম্বর মেলাতে গেছে। কিন্তু না, তীর্থর দেওয়া নম্বর ত পাচ্ছে না। তাহলে? ট্যাক্সিটাকে অবশেষে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে বাসব রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে জিগ্যেস করেছে নম্বরের কথা। কারণ, এটা জানে বাসব নম্বরের যদি কোন অস্তিত্ব থাকে, তাহলে চায়ের দোকানের কেউ না কেউ তা বলে দিতে পারবে। চায়ের দোকান পেয়ে যেন অনেক ভরসা পেয়েছে বাসব।

পাড়ার কতগুলো ছোকরা চায়ের দোকানে বসে গুলতানি করছিল তখন। সবাই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বাসবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাওয়ালা ওই ছেলেগুলোর মধ্যে একজনকে বলল, 'হাঁরে পল্টা, পঁচিশের বাই পাঁচ নম্বর বাড়ীটা কোথায় রে?'

পল্টা সত্যি সত্যি কি যেন ভাবল কতক্ষণ। বাসবের মুখের দিকেও তাকাল। এবার ট্যাক্সির ভেতরে দৃষ্টি রেখে বলল, 'ওটা ত ডাক্তারবাবুদের বাড়ী মনায়।' তারপর আবার, বাসবের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আপনি এক কাজ করুন, সামনের ওই গলিটার ভেতরে যান। এবং ডানদিকের শেষ বাড়ীটাই পঁচিশের বাই পাঁচ।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হল বাসব। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে এ-কথাই ভাবছিল বাসব যে তীর্থটা বুঝি তাকে একটা ভুল নম্বর দিয়েছে এবং এই নম্বরটা শত চেষ্টা করলেও কোনদিন আর খুঁজে পাবে না। তীর্থকে হাতে পেয়েও বুঝি শেষ চেষ্টাটা করতে পারল না।

বাড়ীটার কাছে ট্যাক্সির হর্ণ বাজতেই কে একজন দরজাটা খুলে দিল। এক মুখ ঘোমটা টেনে জিগ্যেস করল, 'কাকে চাই?'

'তীর্থ আছে?' বাসবই জিগ্যেস করল।

'উনি বাজারে গেছেন। আপনি কি—'

'আমি বাসব।'

'আসুন।'

'রমা নেমে এসো।'

রমা এগিয়ে গেল ভদ্রমহিলার সঙ্গে। পেছনে বাজারের থলে ও মিষ্টি-দই হাতে বাসবও এগোল।

'একি করেছেন আপনারা। উনি এলে ভীষণ রাগ করবেন।'

হেসেছে বাসব। 'তাতে কি হয়েছে তীর্থ ত বাজার করত না হয় আমিই করলাম।'

কোথায় ছিল কে জানে, একটা বাচ্চা মেয়ে এসে তীর্থের স্ত্রীর কাপড় ধরে পার্থর হাতে মিষ্টির কৌটো দেখে বলল, 'মা আমি মিষ্টি খাব।' অদ্ভুতের মত বায়না করে কাঁদতে লাগল মেয়েটা।

লজ্জায় পড়ে গেল তীর্থর স্ত্রী। বলল, 'একি পানু, হ্যাংলামী করো না।' তারপর, পানুর গালে একটা চড় দিয়ে আবার বলল, 'বাবা আসুক বাড়ীতে পিঠের চামড়া তুলে দেবে।'

এসব কথায় রমারও কেমন লজ্জা লজ্জা করছিল। বলল, 'ছিঃ দিদি, ওরা ত বাচ্চা, ওরা ত বায়না করবেই। দাও ত আমাকে মিষ্টির কৌটোটা বাসবের হাত থেকে কৌটো নিয়ে রমা তার থেকে একটা মিষ্টি তুলে দিল পানুর হাতে।

'দাঁড়াও তোমার বাবা আসুক।' তীর্থর স্ত্রী আবার গর্জাল।

মিষ্টি হাতে পেয়ে কান্না থামিয়ে আবার কোথায় যেন সরে পড়ল পানু।

'আসুন। আপনারা কি শেষ পর্যন্ত এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবেন?' ওদের ঘরে বসিয়ে তীর্থর স্ত্রী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

তীর্থর স্ত্রী চলে যেতে রমা জিগ্যেস করল, 'কি ব্যাপার হল বলত?'

'তাই ত!'

'কি যে ব্যাপার করছ কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার জন্য বলতে গেলে বাচ্চা মেয়েটো মার খেল।'

'বোধহয় তাই।' কেমন অপরাধী মনে হল নিজেকে। কিন্তু এমন একটা ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না বাসব। সে তীর্থকেই জব্দ করতে গেছিল। তীর্থর ওপর তার যত আক্রোশ। ছেলেবেলায় প্রতি ক্ষেত্রে তীর্থই তাকে জব্দ করে এসেছে। আজ হাতে সুযোগ পেয়ে এবং তীর্থকে খুঁজে পেয়ে পুরনো দিনের পরাজয়ের জের টেনে প্রতিদ্বন্দ্বী তীর্থর অসচ্ছলতার সুযোগ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু একটু আগে যে ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য কেমন অনুতপ্ত এখন বাসব।

এদিকে গলা পাওয়া গেল তীর্থর। 'বাসব তোরা এসেছিস নাকি?'

'হ্যাঁ, এদিকে আয়।' বাসব বলল।

এগিয়ে এল তীর্থ। বড় ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত মনে হল তীর্থকে। বলল, 'তোরা এসব কি করেছিস বলত? এই এত বাজার— লাবণ্য বলছিল।' তীর্থকে যেন এবার একজন অক্ষম, অপদার্থ বলে মনে হচ্ছিল।

'তাতে কি হয়েছে? তুই কি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করিস না?'

'তা করব না কেন, করি।'

'তা হলে?'

'কিন্তু আমার মেয়েটা যা করেছে তার জন্য সত্যি আমি লজ্জিত। বৌদি আপনি কিছু মনে করলেন না ত? শত খেয়েও মেয়েটার লোভ গেল না।'

রমা এমনিতেই কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল প্রথম থেকেই। বাসবের পুরো ব্যাপারটাই পীড়া দিচ্ছিল তখন থেকে। তারপরে আবার এই ঘটনা—তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপনি খামোখা ব্যস্ত হবেন না।'

তীর্থ এবার বলল, 'কেগো লাবণ্য বাসবদের চা দিলে?'

'এই নিয়ে আসছি।'

খেতে বসেছে বাসব আর তীর্থ। রমাকেও বলা হয়েছিল এই সঙ্গে খেয়ে নিতে। কিন্তু রমা নিজেই রাজী হয়নি। লাবণ্যর সঙ্গে খাবে বলেছে।

তীর্থ বলল, 'বাসবকে একটু দেখে-শুনে দাও লাবণ্য।'

'ঠিক আছে, অত ব্যস্ত না হলেও চলবে।'

'আমি আর কি করেছি বল, তোরটাই ত তুই খাচ্ছিস। বরং আমরাই আবার উলটে তোরটা খাচ্ছি। বাসবের বাটিতে আরও মাছ এবং মাংস দাও লাবণ্য।'

এর জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিল না বাসব। রমারও যেন কেমন লাগছে। এরকম জানলে কিছুতেই রমা এখানে আসত না। বাসবের ওপর ভীষণ রাগ হতে লাগল। এত ছেলেমানুষী করার কোন মানে হয় না।

'সত্যি আর দেবেন না, এমনিতেই ত অনেক বেশী দিয়েছেন—' হাত দিয়ে লাবণ্যকে বাধা দিতে লাগল বাসব।

'নে নে খা। আর লজ্জা করতে হবে না। তোর জিনিস তুই খাচ্ছিস।' আবার খোঁচা দিল যেন তীর্থ।

'আমার আনা হলেও তোদের জন্যও ত এনেছি এটা ভুল করছিস কেন?' বাসব পালটা দেবার চেষ্টা করল।

'ও বুঝেছি বৌদি খাননি এখনও, তার জনাই বেশী করে ভাবছিস তুই।' তীর্থ মজা করার জন্য বলল এই কথাগুলো।

'না না কি বলছেন আপনি?' অপ্রস্তুত রমা বলতে চেষ্টা করল এবার।

'দই-মিষ্টিগুলো সত্যি ভাল এনেছিস। আর রান্নাগুলো বেশ ভালই করেছে লাবণ্য। তুই জানিস না বোধহয় লাবণ্য রান্না এমনিতেই ভাল করে।' তীর্থ অনেক বেশী মুখর। বাসবের চালেঞ্জের মুখো-মুখী দাঁড়াতে আর ভীত নয়। ক্লান্তি নেই, কোন জড়তাও নেই। প্রথম জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই তীর্থ যেন আবার জেড়ে ফুঁড়ে এসে দাঁড়িয়েছে বাসবের সামনে। এবারও বুঝি রেহাই নেই বাসবের। বাসবের সব চালাকি যেন ধরা পড়ে গেছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে গল্প করতে করতে কখন দিনের রঙ পালটে গেছে। আলোর তেজও কমে এসেছে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাসব বলেছে, 'এবার উঠব তীর্থ।'

'হ্যাঁ, যাবি ত নিশ্চয়।'

'আবার কবে দেখা হবে আর একটু থাকুন না!' লাবণ্য বলল।

'কেন আপনারা একদিন আসুন তা হলে আবার দেখা হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব একদিন।'

এদিকে ট্যাক্সি এসেছে। হর্ন দিচ্ছে বাইরে। কাউকে দিয়ে তীর্থই আনিয়েছে ট্যাক্সিটা।

'চলিরে তীর্থ, চলি বৌদি। আচ্ছা তোর মেয়েটা কোথায়?'

'খেলতে গেছে কোথাও।' লাবণ্য বলেছিল।

এগিয়ে গেল বাসব। পেছনে রমা ও লাবণ্য। এবং সব শেষে তীর্থ। তীর্থই দরজা খুলে দিল ট্যাক্সির। বলল, 'উঠুন বৌদি। বাসব ওঠ।' দরজাটা ফের বন্ধ করে দিয়ে কি যেন ভাবল তীর্থ। ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিয়েছে ততক্ষণে। হঠাৎ বলল আবার, 'দাঁড়া বাসব আমি এখুনি একবার আসছি ভেতর থেকে। তক্ষুনি আবার ফিরে এল তীর্থ। হাতে কিসের যেন একটা প্যাকেট নিয়ে।

ট্যাক্সি নড়ে চড়ে উঠেছে। তীর্থর কথা পেলেই যেন ছুটে লাগায়।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল তীর্থ। তারপর হাতের প্যাকেটটা বাসবের হাতে দিয়ে এবার বলল, 'এই নে।'

'এটা আবার কি?' তীর্থর দেওয়া চকচকে ঝকঝকে নতুন দামী শাড়ীটা হাতে নিয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে গেল বাসব। আর হাত দুটোও থেকে থেকে কেমন কাঁপছে যেন।

'আমার সাধ্যমত উপহার। বৌদির সঙ্গে যখন আমার এই প্রথম দেখা হল তখন কিছু একটা দিতে হবে ত। তাই—'

নতুন শাড়ীটার গন্ধ বাসবকে কেমন কাঁদাচ্ছে তখন। তবুও তীর্থকে আবার ভাল করে দেখছে বাসব। কিন্তু তীর্থর অতি সরল দুটো চোখের ওপর থেকে দৃষ্টিটাকে সরিয়ে কিছুতেই আর রমার দিকে তাকাতে পারছে না বাসব।

গোয়েন্দা কবি পরাশর
প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
টর্চের আলোর রহস্য তখনই পরিষ্কার হয়ে যায়।
দরোয়ান তখনও অজ্ঞান আর পুলিশও প্রথমটা কেমন যেন ভড়কে যায়।
নিজেকে সামলাতে অবশ্য তার দেরী হয় না।
কে আপনারা?
কিন্তু এখন এখানে ঢুকেছেন কেন? কার হুকুমে?
দেখতেই পাচ্ছেন আমরা পুলিশের সহায় শিউপ্রসাদ জি'র লোক।
হুকুম কারুর নেবার ফুরসৎ পাইনি। তবে ঢুকেছি ঐ দরোয়ানেরই একটু খবর নিতে।
কাকে দরোয়ান বলছেন? এই দুষমন জন্তুকে?
হ্যাঁ, ওই এ বাড়ির দরোয়ান!
এখন ব্যাপারটা কি হয়েছিল যদি দয়া করে বলেন?
গোড়ায় একটু দ্বিধা করলেও পুলিশ শেষ পর্যন্ত জানায়...
এই লোকটি মানে, আপনাদের দরোয়ান...
চুপি চুপি এ ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকছিল।
বিবরণের মাঝখানেই পরাশর দরজার তালাটা পরীক্ষা করতে যায়।
হ্যাঁ, এইত, তালাটা খোলা। কিন্তু এ ঘরে ঢুকছিল কেন? কি আছে এ ঘরে?

অঙ্গনা

অভিযান : ভ্রমণ

বেশ কিছুদিন আগের কথা। একদল মেয়ে অভিযাত্রী দুঃসাহসিকতার পথে পা বাড়িয়েছেন। পায়ে হেঁটে চলেছেন দীঘা। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে দীঘায় সমাপ্তি। কোন সহায়-সম্বল না নিয়ে নেহাত পথের দু'ধারের গাঁয়ের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে ও'রা বেরিয়ে পড়েছেন। সকলের শুভেচ্ছাই ও'রা পেয়েছেন। অপার আনন্দে পথ হেঁটেছেন। দিনের খাদ্য এবং রাতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে অনেকে সাগ্রহে এগিয়ে এসেছেন। সকলের সম্মিলিত শুভেচ্ছা নিয়ে ও'রা একদিন ভোরবেলায় শঙ্খনিনাদ আর পুষ্পমাল্যের অভ্যর্থনায় দীঘা পৌঁছে গেলেন।

সেদিন থেকেই পথ ও'দের আপন করে নিয়েছে। তারপর ও'রা আবার পদব্রজে যাত্রা করেছেন। এবার লক্ষ্য হলো দিল্লী, যদিও চলতি কথায় দিল্লী বহুত দূর কিন্তু প্রথম সাহসিকতার ভরসায় এবার এই দূরত্বকেই ও'রা বেছে নিলেন। যাত্রা শুরু হলো। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ও'রা গিয়ে পৌঁচেছেন আর সবাই ও'দের অভ্যর্থনা করতে ছুটে এসেছেন। এক ভদ্রলোক তো শুধু খবরের কাগজ দেখে ও'দের নিজের বাড়িতে নিয়ে তুললেন। সারা পথেই এরকম অভ্যর্থনা। সবাই আন্তরিকতায় ভরপুর। এক মা তো ও'দের রাতের আশ্রয় দিয়ে সারারাত গল্পগুজবে কাটিয়ে দিলেন। পরদিন ভোরবেলা বিদায় দিতে গিয়ে তিনিও ও'দের সঙ্গী হয়ে যান আর কি! এমনি তাঁদের আপ্যায়নে কলকাতা থেকে দিল্লীর পথ ও'দের কাছে মনে হয়েছে স্বপ্নজগৎ। এতো যে আত্মীয় ছড়িয়ে আছে পথের দু'ধারে তা ও'দের অজানাই ছিল। আর পথে না বেরোলে তো এদের পরিচয় মেলে না। তাই এই পথ-পরিক্রমা। দিল্লী পৌঁছে ও'দের জুটেছে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন।

এই দুটি অভিযানের উদ্যোক্তা ছিল এক্সপ্লোরারস ক্লাব। হেঁসেল-হাঁড়ির সঙ্গে একান্ত পরিচিত মেয়েদের এবার ঠেলে দেওয়া হলো অজানা অচেনা পথে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, ঘরকুনো মেয়েরা পথের সঙ্গে পরিচিত হোক। পথের দু'ধারে যে আত্মীয়তা ছড়িয়ে আছে তার পরিচয় লাভ করুক। সবচেয়ে বড় কথা যে, নিজের পায়ে ভরসা রেখে চলতে শিখুক। পশ্চিমে এভাবে চলা অনেক দিনের চল। কিন্তু আমাদের মেয়েরা এভাবে পায়ে হেঁটে, নিঃসম্বল অবস্থায় এবং আহার ও আশ্রয় যাচ্ঞা করে বেরিয়ে পড়বে পথের ডাকে এটা ছিল কল্পনাতীত। এই মেয়ে অভিযাত্রীরা সে অতীত কল্পনাকে বর্তমানে রূপ দিলেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, আমরা কোনটাতেই পিছিয়ে নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলতেই আমরা অভ্যস্ত।

ও'দের দেখে পথ চলায় এক নতুন উৎসাহের জোয়ার এলো। অনেক মেয়ে এবার এই পরীক্ষায় মেতে উঠলো। সবাই এমনি নিঃসম্বল অবস্থায়, শুধু জনসাধারণের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে পথের ডাকে সাড়া দিয়ে যাত্রা শুরু করলো। পথের ডাক ও'দের কাছে অনেক দিন পৌঁছে গেছে কিন্তু ভরসার অভাব ছিল। সে-অভাবটুকু কাটিয়ে উঠতেই ও'রা বেরিয়ে পড়লেন। আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ নয়। সবচেয়ে মজার কথা যে, এ-ব্যাপারে সকলের চোখ ফোটালো এই মেয়ে অভিযাত্রী দল। পথকে ও'রাই প্রথম আপন ভেবে ঝাঁপ দিয়েছিলেন অজানিতের স্রোতে।

এবার এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের উদ্যোগে আর একটি অভিযান হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, অভিযাত্রী দলের সব সদস্যাই মহিলা। পদব্রজের পরিবর্তে দ্বি-চক্র যানে কলকাতা থেকে শিলং পাড়ি দিতে হবে। সেই পথের পরিজনদের আতিথ্য স্বীকার করে। ও'রা সফল হয়েছেন। নির্দিষ্ট দিন এবং সময়ে ও'রা শিলং পৌঁছে গেছেন। সাইকেলে অভিযান ও'দের এই প্রথম। ও'রা কলকাতায় ফিরেও এসেছেন। এবার জানা যাবে, ও'দের যাত্রাপথের বিচিত্র ইতিহাস। তবে কোন সন্দেহ নেই যে, একাধিক সহানুভূতিশীল হৃদয়ের সঙ্গে ও'দের পরিচয় ঘটেছে। গুটিকয় মেয়ের এহেন দুঃসাহসিকতার নেশায় সবাই ধন্য ধন্য করছেন। সবাই বাহবা দিচ্ছেন মেয়েদের এই এগিয়ে যাওয়াকে।

পায়ে হেঁটে, বা দ্বিচক্র যানে এ ধরনের অভিযান আমাদের দেশে সম্প্রতি হচ্ছে। আশা করা যায়, এই সংখ্যা আরো বাড়বে। কিন্তু এরকম ভ্রমণের উপযোগী কোন ব্যবস্থা গড়ে উঠছে না। পশ্চিমের দেশে এধরনের অভিযাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই করা হয়ে থাকে। তাই ও'রা নিজের দেশ ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে বেরিয়ে পড়েন বিশ্ব পরিভ্রমণে। সারা পৃথিবীকে জানতে হবে। ভ্রমণের তো আর শেষ নেই। আর এতে আনন্দও অপার।

আবার সকলের পক্ষে পায়ে হেঁটে বেড়ানো সম্ভব নয়। তাদের ভরসা করে থাকতে হয় অন্য কিছুর উপর। কিন্তু সেরকম কোন ব্যবস্থাও নেই। তাই নিজের দেশ খুঁটিয়ে দেখাটাও আমাদের অনেকের ভাগ্যে হয়ে ওঠে না। ভ্রমণ সম্বন্ধে সেজন্যই আমাদের আগ্রহ এতো কম। নিজের দেশের ভূগোল ভাল করে জানি না।

একটা শোনা কথা মনে পড়ে গেল। আমার এক পরিচিতা বিদেশে গিয়েছিলেন।

শীতের ফ্যাশানের পরিবর্তন আমরা প্রতি বছরই দেখে আসছি। এইতো কয়েক বছর আগেও আমরা শীতের পোশাকে ক্লোক, বেল্ট, কলারের ও ফেব্রিক কার্ডিগান দেখেছি। তারপর সব পোশাকেই ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। এবারে শীতে ফ্যাশান-বিলাসীরা বেল-বটম ও কুর্তার সঙ্গে ছোট গরম চাদর সুন্দর করে গায়ে জড়িয়ে রাখছে। এটাই নাকি লেটেস্ট।

যতটা না বেড়াতে তারচেয়েও বেশি শিখতে। একদিনের এক ঘটনার কথা তিনি বলছিলেন। রেলে চড়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলেছেন [illegible] ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে [illegible] পরিচয় হলো পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে [illegible] কথার পর ও'দের দেশ সম্বন্ধে [illegible] শুরু করলেন। পার্শ্ববর্তিনী [illegible] বলে গেলেন। ভূগোল [illegible] ইতিহাস খুঁটিনাটির খুঁটিয়ে। তিনি [illegible] অবাক। মনে করলেন, এ বোধহয় ইতিহাস-ভূগোলের মাস্টার হবেন। কিন্তু [illegible] করে ভুল ভাঙলো! জবাব এলো, [illegible] অফিসের [illegible] টাইপিস্ট তিনি। [illegible] এসব জায়গার অধিকাংশ [illegible] ভ্রমণে [illegible] করলেন, [illegible] কিছুই জানা না [illegible] তিনি বুঝলেন কেন ও [illegible] ইতিহাস-ভূগোল এতো [illegible] আর আমরা জানি না। নিজের দেশ [illegible] কোন সুযোগই তো [illegible] নেই [illegible] আগ্রহের অভাবটাই হলো [illegible] নিজের চৌহদ্দি ঘুরে [illegible] আমাদের নেই বললেই চলে। তাই ইতিহাস-ভূগোলও আমাদের অপরিচিত।

ডেনমার্কের মেয়েরা এই সুযোগটি পায় পুরোপুরি। ইতিহাস বিখ্যাত ৫০০ দ্বীপ-মালার দেশ ফুনেন ও'রা ঘুরে বেড়াতে পারেন একটিমাত্র সাইকেল সম্বল করে। ও'রা এক সপ্তাহ সময় হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন দল বেঁধে। শুধু ইহাই ও'দের ছুটি কাটানো। মনে হয় পৃথিবীতে এধরনের ভ্রমণের ব্যবস্থা এই প্রথম। এবং এই ব্যবস্থা ও'দের দেশে পুরোপুরি সফল হয়েছে। বিদেশীদেরও এই দ্বিচক্র যানে ভ্রমণ বেশ আকর্ষণ করেছে। তাই শুধু ডেনমার্কের মেয়েমহল নয়, সবাই দেশ ভ্রমণের অপার আনন্দে বেরিয়ে পড়ছেন দ্বিচক্র যানে।

ফুনেন বা ফিন হলো ডেনমার্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপমালা। এ অঞ্চলেই দেশের বৃহত্তম কৃষিক্ষেত্র এবং ফলের বাগান। তাছাড়া এটি ডেনমার্কের হৃদয়স্থল। জুটল্যাণ্ড এবং জীল্যাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত।

সুন্দর সুন্দর কৃষি বাড়ি, বাগান, গীর্জা আর দুর্গে ভর্তি এই দ্বীপমালা। সবকিছু ঘুরে দেখার সুন্দর ব্যবস্থা। শহরে যাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন এখানে এসে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পান। ঘন নীল আকাশ আর সবুজ ক্ষেত তাঁদের চোখ জুড়োয়। তাজা পরিবেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে কোথাও রাজপথের ধার দিয়ে যেতে হয় না। ভ্রমণের মধ্যে এই সুযোগ খুবই মূল্যবান। সব সময়ই মনে লেগে থাকে এক বিরাট আবিষ্কারের নেশা।

খাওয়া-দাওয়া বা বিশ্রামের জন্য কোন ভাবনা নেই। পথের মাঝে মাঝেই সরাইখানা আছে। সেখানে যেমন দিনের খাওয়া সেরে নেওয়া যায় তেমনি রাতের বিশ্রামের বন্দোবস্তও আছে। যাত্রা থেকে দিনের শেষ পর্যন্ত এরকম দুটো সরাইখানার সন্ধান মিলবেই। দিনে ৩০ মাইল মতো চলতে হয়। এর বেশি চলা হয়ে ওঠে না। [illegible] একনা সাইকেল চালানো প্রয়োজন। [illegible] চলতে থামতে হয়। দুচোখ ভরে দেখতে হয় সবুজ দৃশ্য। ঐতিহাসিক স্থানগুলি ঘুরে বেড়াতে হয়। আবার একটু বা বেশি চল করার ব্যবস্থাও আছে। পথের ধারে ধারে ছড়িয়ে আছে সমুদ্রসৈকত।

ভ্রমণ শুরু এবং শেষ হয় সেভেনবর্গে এসে। এ জায়গাটি একটি বিখ্যাত সী-সাইড। এমনিতেই এখানে অনেকের সমাগম হয় সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার জন্য।

ঘুরতে ঘুরতে ভ্রমণার্থী এসে হাজির হয় ব্রালিকো মোল্লেতে। সবচেয়ে পুরোন ওয়াটার মিল। রাজা ভালদেমার আটের-ডামের রাজত্বকালে এটি তৈরি হয়। মোটা হল—১৩৭০ সাল। এখন মিউজিয়মে রূপান্তরিত। সুন্দরভাবে বর্ণনা করা আছে এখানে কিভাবে কর্মীরা কাজ করতেন আর থাকতেন।

একটি অত্যন্ত পুরোন শহরে রাত্রিবাস করতে হবে অভিযাত্রীকে। শহরের নাম ফ্যাবোর্গ। সরু সরু গলি আর কাঠের তৈরি বাড়ি এই শহরের বৈশিষ্ট্য। আজকের সভ্যতার বিরাট জাঁকজমকের মধ্যে এমন একটি শান্তির স্থান পেয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়া চলবে। প্রাচীনত্বের গৌরব আছে শহরটির। ১২৫১ সাল থেকে এই শহর এভাবে আছে। শহরের লাগোয়া একটি মিউজিয়মে দেখা যাবে ফুনেনের শিল্পীদের আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি। এছাড়া মার্চেন্টস হাউস এবং নানা ঐতিহাসিক নিদর্শনের সন্ধান মিলবে।

১৪২১ সালে নির্মিত হর্ন চার্চ ভ্রমণকারীকে মুগ্ধ করবে। সম্পূর্ণ গোলাকৃতি এই গীর্জার দেওয়াল হচ্ছে সাত ফুট চওড়া। এই গীর্জা একই সঙ্গে একটি দুর্গ এবং দেবস্থান।

১৭৭২ সালে নির্মিত ফ্রেনগেরাপ-এর ম্যানর হাউসটি ফুনেনের অন্যতম আকর্ষণ। সর্বজনীয় তালিকায় এটি পড়ে।

এসব ঐতিহাসিক স্থান তো আছেই। আরো আছে অনন্যসুন্দর দৃশ্যাবলী। ফুনেনের প্রাদেশিক রাজধানী ওডেন্সে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যাবে দুচোখ ভরে। এই জায়গাটি আরো একটি কারণে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত রূপকথা কাহিনী লেখক হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসনের জন্মস্থল এই শহর। লেখকের বাড়িটি এখন যাদুঘরে পরিণত। ভ্রমণকারীর পক্ষে তার আকর্ষণ কিছু কম নয়। অনেক কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটে এখানে।

ফুনেনের সঙ্গে একটি আধুনিক সেতুর বন্ধনে যুক্ত থুরোর সুন্দর বাগানের দ্বীপ টাসিং [illegible] একটি দিন কেটে যাবে এই শহর ঘুরে বেড়াতে। সারাদিন সাইকেল চালিয়েও [illegible] ক্লান্তি লাগবে না। [illegible] শুধু বাগান; এত শোভায় নিজেকে [illegible] হয়ে যেতে হয়।

[illegible] শতকের ভালদেমার দুর্গ অন্যতম দ্রষ্টব্য। ব্রেগনিঙ্গেও গির্জা থেকে সারা শহরটি দেখা যায়। লাগোয়া গ্রাম-গুলিকে মনে হবে যেন সবুজ গালিচা। যদি ভ্রমণকারীর মাছ ধরার শখ থাকে তবে সে শখ পূরণ করবে ট্রোয়েনেস এবং ভিসিং ভিকেন।

টাসিঙ্গে-এর গির্জা প্রাঙ্গণে চিরনিদ্রায় অভিভূত এলভিরা মাডিগানের সমাধি ভ্রমণকারীকে স্মরণ করিয়ে দেবে বিখ্যাত সুইডিস ফেন্সের আসল নায়িকাকে। প্রিয়ের নামও ছিল এই। তিনি ঘুমিয়ে আছেন তাঁর প্রেমিকের পাশে।

এবার ভ্রমণের সমাপ্তি লগ্ন উপস্থিত। চোখের সামনে ফুটে উঠবে ছবির মতো একটি গ্রাম। ডেনমার্কের সবচেয়ে সুন্দর এবং সমৃদ্ধ গ্রাম এটি। আর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অষ্টাদশ শতকের নিদর্শন। ভ্রমণশেষে মন-ফূর্তির জোয়ার।

খাওয়া বা থাকা এই বেড়ানোর কোন সমস্যা নয়। এমনকি সাইকেল ভাড়ারও ব্যবস্থা আছে। আর খরচও তেমন নয়। তাই সবাই এই ভ্রমণে উৎসাহ পান। বিশেষ উৎসাহ মেয়েদের। এই ভ্রমণে ওদের কোন দুর্ভাবনাই নেই।

অভিযানের দুরন্ত নেশায় বেরিয়ে পড়ছেন অভিযাত্রীরা। কিন্তু বেড়াতে চান যাঁরা তাঁদের সুব্যবস্থার এহেন নজীর আমাদের গড়ে উঠছে না কেন? নাহলে নিজের দেশ নিজের কাছেই অচেনা থেকে যাবে।

—প্রমীলা

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী দুর্গামাতা রচিত—

দৈনিক বসুমতী—এইরকম বড়ভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে......তাঁরা অভিন্ন ও একাত্মা।

যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত।...... গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহুচিত্রশোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮

গৌরীমা

আনন্দবাজার পত্রিকা—বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরী মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫

—শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬, গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

কারিয়ালা : পাহাড়ী গণনাট্য

গণ-আন্দোলন আর গণ-নাট্যের সঙ্গে শহরের মানুষজনের শুধু নয়—শহর থেকে দূরের মানুষজনেরও পরিচয় নেহাৎ কম দিনের নয়।

কিন্তু শহুরে সভ্যতার বাইরে নাগরিক পালিশকরা কলমলে আলোকউজ্জ্বল পরিবেশের কৃত্রিমতা এড়িয়ে পাহাড়ের কঠোর-কঠিনের মধ্যে লালিত সহজ কণ্ঠ পাহাড়ীরা ক্লান্তি দূর করার এবং স্বভাবসুন্দর আনন্দ আহরণের জন্যে যে গণ-নাট্য-এর শরিক হয় শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বুঝি তুলনা মেলে না।

হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ী গণনাট্য অনুষ্ঠান তারই একটি জীবন্ত নিদর্শন। পাহাড়ীরা কিন্তু একে গণনাট্য বলে না—বলে 'কারিয়ালা' আর গাঁয়ের মানুষজনের মধ্যে যারা এতে অংশ নেয়—অর্থাৎ অভিনেতারা ওদের কাছে পরিচিত 'কারিয়ালাচিস' বলে।

মাহাসু জেলার শাকরোরি আর থারি গ্রামের এবং মাণ্ডি জেলার মাসন্দ এলাকার কারিয়ালাচিস দলের খুব নামডাক। কারিয়ালায় এদের জুড়ি মেলা ভার। দিওয়ালি আর বৈশাখী পর্বের সময় এই ক'টি দলই কাছে দূরের নানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে আনন্দের পসরা বিলিয়ে বেড়ায়।

পাহাড়ী জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দবেদনার রসে রসিয়ে গ্রামবাসীরা যে মুক্ত আবহাওয়ার জীবনের গান গায় পূর্ব-প্রকৃতির ছবি না দিয়ে, হিমাচল প্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে তা আবার বন্ধারা-ও বলে পরিচিত। কারিয়ালা আর বান্ধারা মূলতঃ একই বস্তু, শুধু আঞ্চলিক তফাতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত।

গহন, গভীর অন্ধকার পাহাড়ের কোলে প্রাকৃতিক-সম্পদের সীমাহীন মুক্ত অঞ্চলে, পাহাড়-মহলে অমিত প্রবীণ ঐসব গ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির মর্মগ্রাহক ছবি ধরা পড়েছে ওদের গণনাট্য, অর্থাৎ কারিয়ালা-বা বান্ধারা-র— বিবর্তনের ধারায় প্রভাবিত জনগণের জীবনের নিখাদ সজীব কাহিনী।

অকৃপণ শ্রমে অন্ন সংস্থানের ওরা যখন নীরস সেই পাথরের বুকেও সবুজের কণা বইয়ে দিয়ে মাঠের ফসল ঘরে তোলে তখনই আসে ওদের জীবনের জিরিয়ে নেওয়ার অবসর, হাসি-ঠাট্টা নাচ-গানের বিলাসী আরাম। এই অবসর কালটাকে পাহাড়ীরা বেশ রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করে কারিয়ালা আর বান্ধারা-র আসর জমিয়ে।

ভাঙা খাট-খাটিয়া আর লোহালক্কড় সাজিয়ে গুছিয়ে একটা মঞ্চ তৈরী করে কারিয়ালাচিসরা তাদের রাত-ভোর করা গণ-নাট্যের আসর বসায় গাঁয়ের মধ্যে।

আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠানের ধরনে ওদের এই সব আসরে নাচ গান কৌতুক রসের মাধ্যমে গ্রামগাথা, পৌরাণিক কাহিনী, চলতি ঘটনা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক একাঙ্ক নাটকই সাধারণত পরিবেশিত হয়।

নাচ-গানে বেশির ভাগই পাহাড়ীরা দাদরা আর কাহারবা তাল দুটোকেই জনপ্রিয় করে তুলেছে। স্থানীয় চলতি বাজনার মধ্যে থাকে নাগারা (আমাদের কাড়া-নাকাড়া জাতীয় কি?), ঢোল, সানাই, শিঙা। তবে আজকাল শহুরে যন্ত্র হারমোনিয়মও ঠাঁই করে নিয়েছে তাদের ঐকতানে।

সুপ্রচলিত জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী পাহাড়ীরা বেছে নিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-কাহিনী থেকে। এই সব নাটকে নারদমুনিকে একটি প্রধান রসিক চরিত্রে চিত্রিত করা হয়ে থাকে।

সামাজিক নাটকে স্থানীয় কালোপযোগী চলতি প্রয়োজনের দিকেই নজর দেয়া হয় বেশি। বর্তমান সময়ের একাঙ্কগুলিতে পরিবার পরিকল্পনা, বিবাহবিধি সরলীকরণ আর কৃষিপদ্ধতির উন্নতিকরণ ইত্যাদি বিষয়বস্তুগুলিই খুব বেশি স্থান পাচ্ছে।

কারিয়ালার ভিত্তিমূল উজ্জ্বল কৌতুকরস সৃষ্টির ওপর প্রোথিত। বেশির ভাগ সংলাপের অংশ ছড়া কবিতায় গাঁথা। এই

অজিত দে

আদিমতম নাট্যরীতি শ্লেষ-ব্যঙ্গো আর তামাসা-রসিকতায় এমনি উৎকটভাবে খোলামেলা যে তা শুনে গাঁয়ের দর্শকরা হেসে হেসে একেবারে নাজেহাল হয়ে যায়।

এই তামাসা ব্যঙ্গের সংলাপ আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আদি রসে রসিয়ে রঞ্জিত দেশজ উপাদানে করে রচিত, ফলে দর্শকমনে হাসির বান ডেকে যায়।

কিন্তু এতো যে রসসমৃদ্ধ—সে রস হোক না অশ্লীল, কারিয়ালার সংলাপগুলো তা আমাদের দেশের তরজা গানের মতো সবই পূর্ব প্রস্তুতিহীন তাৎক্ষণিক মৌখিক রচনা। প্রত্যেক শিল্পীই নাটকের বিষয়বস্তু আর অবস্থা-সন্নিবেশ অনুযায়ী তখুনি-তখুনি মুখে মুখে রচনা করে আবৃত্তি করে। অনেক সময় শিল্পী যখন ঠিক লাগসই কথা বা ভাষা হাতড়ে খুঁজে পায় না, আর বোবার মতো ত ত ত করে তখন সে হাত-মুখ বেঁকিয়ে উৎকট হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি দিয়ে সেই অভাব পূরণ করে। দর্শকও তার অদ্ভুত বিকৃত দেহভঙ্গি দেখে আনন্দে মজায় একেবারে লুটিয়ে পড়ে।

চটুল মজাদার সুরে গাওয়া গ্রাম্যগীতিও কারিয়ালার অন্যতম মাধ্যম। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের বহুপ্রচলিত পাহাড়ি আর ঝিনঝোটি রাগের সুরে বাঁধা গানগুলি এদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে গাঁয়ের মানুষজনেরা একটা খোলামেলা চত্বরে বিরাট এক মহোৎসব জ্বালিয়ে চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়। একটু দূরের একটা কোণে ছোট্ট পালকি, চাদর দিয়ে কোনো রকমে একটু আড়াল করে নিয়ে কারিয়ালাচিসরা সাজগোজ করে নেয়। গ্রাম্যগীতি বা নাচের উৎসবের মতো কারিয়ালা-তে কিন্তু মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে না। মেয়েদের ভূমিকায় পুরুষেরাই মেয়ে সেজে নামে আমাদের সেকালের যাত্রার মতো।

'মেক-আপ'ও ওরা পৌঁছিয়ে থাকে না। এ কাজে ওরা দিশী গাছ গাছড়ার রং, শোনপাটের দড়াদড়ি আর ছাগল ভেড়ার লোম ব্যবহার করে। আজকাল আবার আধুনিক প্রসাধন রূপসজ্জনের উপকরণের দিকে ওরা নজর ফিরিয়েছে।

অনুষ্ঠান শুরুর গোড়াতেই মঞ্চে আবির্ভূত হয় লক্ষ্মীদেবীর মতো সাজগোজ করা এক নারীমূর্তি—এই চরিত্রের ওরা নাম দিয়েছে চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলীকে ওরা আমাদের লক্ষ্মীদেবীর মতো ধনৈশ্বর্যের দেবী হিসেবে পুজো করে।

চন্দ্রাবলী এসে মহোৎসবের চারদিকে হাতে ধূপধুনোর পাত্র নিয়ে বারকয়েক ঘুরে মঞ্চ-অঙ্গন অভিনেতা আর দর্শকদের আশীর্বাদ করে শুদ্ধ পবিত্র করে। পবিত্রকরণ শেষ হলেই শিল্পীদল বাজনা শুরু করে দেয়।

প্রায় মিনিট দশেক ধরে চন্দ্রাবলী মহোৎসবের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচে—তার পরেই আরম্ভ হয় সোয়াং—অর্থাৎ একাঙ্কিকা পর্ব।

কতকগুলি বাছা বাছা একাঙ্কিকা ওদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়—এবং কারিয়ালাচিস-রা প্রায় প্রত্যেক আসরে সেইগুলো অভিনয় করে। কয়েকটির নাম—'সাধুদের সোয়াং', 'নগরীর ঝগড়া', 'পলাতকা বুড়ি', 'সুদখোর আর তার চাকর', 'পিলপিল সাহেব' এবং 'নাগিন'।

এর মধ্যে 'সাধুদের সোয়াং' একাঙ্কিকাটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এই একাঙ্কিকার পাত্রদের মধ্যে আছেন দুটি জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত সাধু আর একজন সাধুর বেশে রসিক ভাঁড়। পণ্ডিত সাধুরা যা বলেন, যা যা করেন ভাঁড় সাধুটি ঠিক তার উল্টো ধারায় গিয়ে হাসির বান ডাকায়।

এই একাঙ্কিকাগুলির মাঝে মাঝে 'নাটি' আর 'গাঁথা' নাচ আর গ্রাম্যগীতির ছোট ছোট বাঁটবিরতির চাটনী দিয়ে একঘেয়েমি কাটানো হয়।

কিন্তু, হায়রে! আধুনিক সংস্কৃতির কুলভাঙা বানে আজকাল গ্রাম্যগীতির বদলে হিন্দী ফিল্মী গানেরও ঢল নেমেছে পাহাড়ী গণনাট্যের আসরে।

এমনিধারায় রাত-ভোর করা আনন্দ-দুরাত্ত যখন শেষের পথে এসে থামে তখন পূবে আকাশে পাহাড়ের কাঁধ টপকে কাঁচা সোনা রোদের ছটার ইসারা পেয়ে কারিয়ালাচিস-রা তাদের নতুন আসরের দিকে যাত্রা শুরু করে।

দাদাসাহেব ফালকে

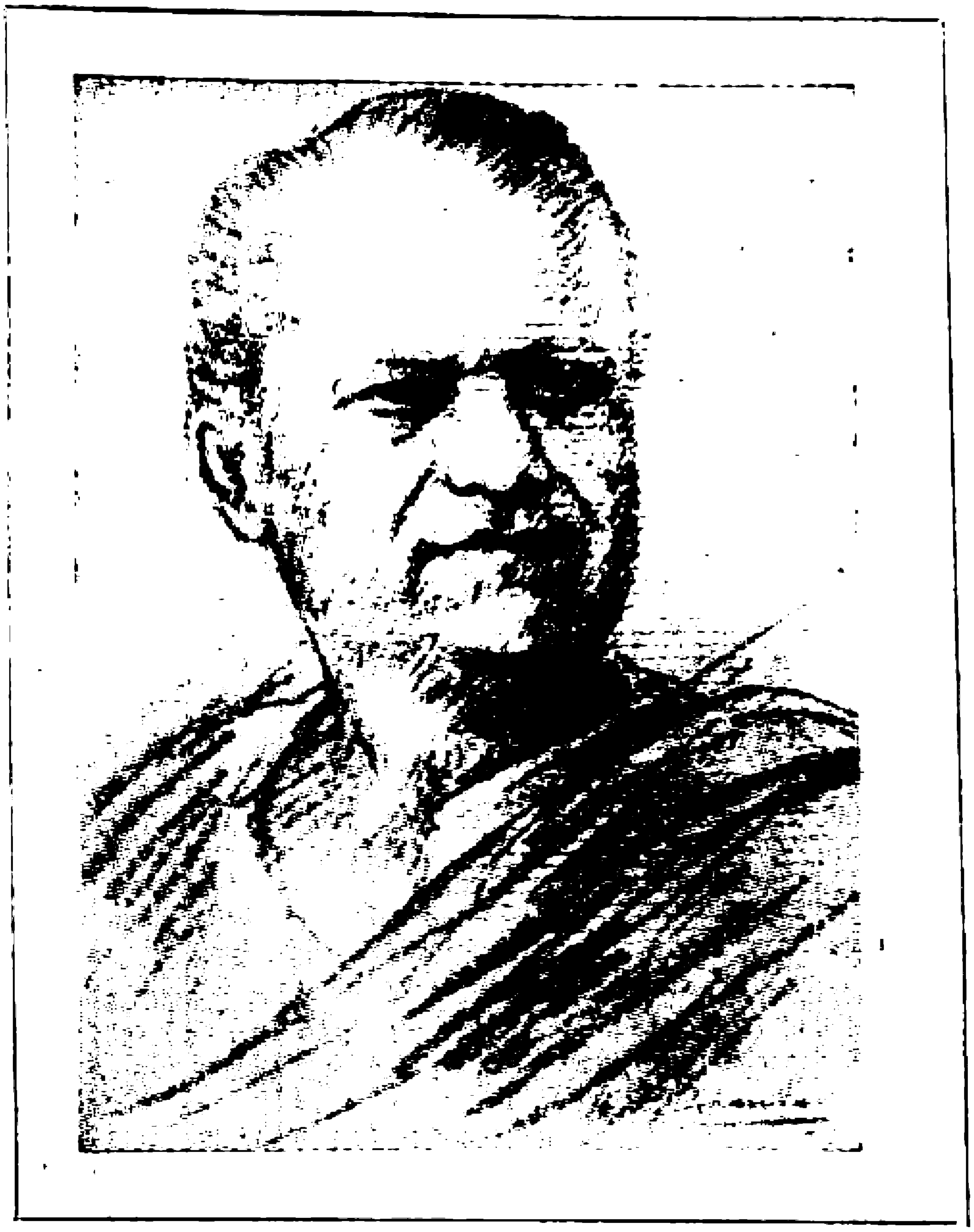

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সময় ১৯১০।১১ সাল। ভারতে ইংরেজ শাসন আরো জাঁকিয়ে বসেছে। অন্যদিকে জেগে উঠেছে বাংলা-মহারাষ্ট্র—জেগে উঠছে ভারত। ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাতেই হবে। নানাজনে বেছে নিলেন নানা পথ। স্বাদেশিকতার উৎস মুখ গেল খুলে। স্বদেশ আর স্বদেশীয়দের প্রতি দেখা দিয়েছে আগ্রহ আর সহানুভূতি। এই পটভূমিকায় জন্ম নিল প্রথম ভারতীয় কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'—পরিচালক প্রযোজক থেকে সব কিছু যার ঢুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে—চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যিনি বিখ্যাত দাদাসাহেব ফালকে নামে।

'রাজা হরিশ্চন্দ্র' ও ফালকের সঙ্গেই মনে পড়ে আরেকটি নাম—লোকমান্য তিলকের 'কেশরী' পত্রিকার। ১৯১০ সালে 'রাজা হরিশ্চন্দ্রে'র মুক্তির পর 'কেশরী'তে প্রকাশিত হলো দাদাসাহেবের এক সাক্ষাৎকার। সুখ্যাত সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ ও বিশ্লেষণের মাধ্যম 'কেশরী'তে ফিল্ম সম্পর্কে রচনার প্রকাশ আশ্চর্যজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওই প্রবন্ধের লেখক ও দাদাসাহেব দুজনেই মনে করতেন ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ একটি স্বদেশী কাজ। তাই বিষয়টির শিরোনামও ছিল 'স্বদেশী চলচ্চিত্র'।

স্বদেশী কথাটার বহু অর্থের মধ্যে একটি হচ্ছে, ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয়দের জন্য ভারতীয় বিষয়। এখানে একজন ভারতীয় ভারতীয়দের জন্য একটি ভারতীয় ফিল্ম তৈরী করলেন। চলচ্চিত্রের প্রতি এই যে জাতীয়তাবোধ তা কিন্তু আজও সমানে প্রবাহিত। শৈল্পিক গুণের কথা বাদ দিয়ে শুধু ভারতীয় বলেই বহু চিত্রকে এখনও বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

ফেরা যাক গোড়ার কথায়। স্মরণ করা যাক দাদাসাহেবের জীবনকথার। বরোদার কলাভবন ও বোম্বাই-এর জে. জে. স্কুল অব আর্টে ফটোগ্রাফি ও অঙ্কন বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষালাভের পর তিনিই হলেন কলাভবন ফটোগ্রাফি স্টুডিওর অধিকর্তা।

কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের ফটোগ্রাফার এনগ্রেভিং-এ দক্ষ শ্রীফালকে চাকুরী ছেড়ে নামলেন ব্যবসায়। শুরু করলেন বোম্বাইতে লক্ষ্মী আর্ট প্রিন্টিং প্রেস। কিন্তু কিছুদিন বাদেই অন্য অংশীদারদের সঙ্গে ঘটলো মনান্তর। ছেড়ে দিলেন ব্যবসা। সূচিত হলো ভারতীয় কাহিনীচিত্রের আগমনী পর্ব।

দিনটা ছিল ১৯১০ সালের কোন এক শনিবার। ক্লান্ত অস্থির মন নিয়ে দাদাসাহেব ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বোম্বাই-এর সমুদ্রবেলায়। হঠাৎ ঢুকে পড়লেন এক সিনেমার তাঁবুতে। সেদিন সেখানে দেখানো হচ্ছিল 'দি লাইফ অব ক্রাইস্ট'। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যান তিনি। মনের পর্দায় দ্রুত ঘটে চিত্রপরিবর্তন। প্রদর্শনী শেষ হলো। অদ্ভুত রোমাঞ্চিত অথচ আচ্ছন্ন অবস্থায় শ্রীফালকে টিকিট কেটে আবার ঢুকে পড়েন পরবর্তী প্রদর্শনী দেখতে।

সেদিন সারারাত তিনি ঘুমতে পারলেন না। স্বাদেশিকতার আলোয় ধোয়া মনে জমাট বেঁধেছে ততক্ষণে এক কঠিন সংকল্প —তৈরী করতে হবে ভারতীয় চলচ্চিত্র। পরদিন সকাল থেকেই মেতে উঠলেন ছবি তোলার কাজে। কলাকৌশলের নানাদিক সম্পর্কে আগেই জ্ঞান ছিল। অভিনয় আর নাট্যপরিচালনাও করেছেন। তাই জ্ঞানার অভাব হলো না এতটুকু। অথচ চারিদিকে শুধু তখন অজস্র অসুবিধা। যন্ত্রপাতি নেই—নেই সুযোগসুবিধা—অর্থ কিংবা সহানুভূতি। এর উপর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সব কিছুকে করে তুলেছে আরো

শোচনীয়। তবু ওরি মধ্যে দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হবে তরী।

তাঁর আর তাঁর পরিবারের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাস্তবরূপ নিলো ভারতীয় কাহিনীচিত্র। [illegible] হাতে কলমে [illegible] বাংলায় হীরালাল সেনও তুলেছেন [illegible] উদ্যান। কিন্তু একথা আজ প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন দাদাসাহেব ফালকেই [illegible] ভারতীয় কাহিনীচিত্রের জনক।

প্রথম কাহিনীচিত্র [illegible] দাদাসাহেব ১৯১৩ খ্রীঃ [illegible] সাক্ষাৎকারে বলেন, [illegible] জীবিকায় কিছু [illegible] আমি অন্যের হুকুমে [illegible] ভিন্নমুখী করার [illegible] চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখাতে [illegible] চলচ্চিত্রের কৌশল [illegible] হয়। এদিকে আমার [illegible] ফটোগ্রাফির কাজ [illegible]—কাজেই বিশেষভাবে আমি সিনেমাটোগ্রাফের দিকে আকর্ষিত হই। [illegible] ভারতেও এ শিল্প শুরু করা যায় কিনা [illegible]

এ শিল্প সম্পর্কে যতগুলি লেখা [illegible] বই সংগ্রহ করতে পারি তাই পড়তে থাকি। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্যাটালগও চেয়ে পাঠাই। সব মিলিয়ে শেষে এই সিদ্ধান্তে আসি, হাজার পাঁচিশ টাকা লগ্নী করলে ভারতেও এ শিল্প চালু করা যায়।'

এই আত্মপ্রত্যয় দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বিলেতে যাওয়ার। কিন্তু তার জন্য চাই টাকা। শ্রীফালকে তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের সৌভাগ্য টাকাটা সহজেই যোগাড় হলো। ফটোগ্রাফির মালপত্রের ডিলার শ্রীনাদকর্ণীর দাদাসাহেবের শৈল্পিক বোধের উপর ছিল গভীর আস্থা। তাই তিনি বিলেত যাবার টাকাটা দিলেন ঋণ হিসেবে। ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে [illegible] হয়ে আছে এক সুখদায়ক ঘটনা হিসেবে।

১৯১২ সালে দাদাসাহেব বিলেতে গেলেন। সেখানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে হাতে কলমেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকেন [illegible] সময় সিনেমার যন্ত্রপাতি বিক্রেতারা ওইসব বস্তু কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে ক্রেতাদের কাছে বক্তৃতা দিতেন।—এক—এক দফতর বিভিন্ন প্রজেক্ট [illegible] এবং প্রত্যেক উৎপাদক সংস্থা [illegible] নিজের মালকেই শ্রেষ্ঠ বলে দেখাতে চাইতেন। তাই [illegible] সময় ও পরিশ্রম [illegible] এসব [illegible] তাঁদের শিখাতে একটুও [illegible] করতেন না। [illegible]

এইভাবে [illegible] তিনি [illegible] [illegible] পত্রিকা [illegible] সময় [illegible]। তাঁর বিলেত থাকার চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক বায়োস্কোপ-এর সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে আমি তাঁর কাছে সিনেমার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে উপদেশ চাই। এ শিল্প সম্পর্কে এতটা জ্ঞান আমি শুধু বই পড়ে সংগ্রহ করেছি শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। আমি নিরামিষাশী, [illegible] পান বা ধূমসেবন করি না শুনে [illegible] তাঁর কিছুটা শ্রদ্ধাও জন্মাল। [illegible] আমার চলচ্চিত্র নির্মাণের সংকল্পের কথা [illegible] তিনি বলেন, আমি এক [illegible] আত্মহত্যার করতে চলেছি। [illegible] অন্যান্য জিনিস ছাড়াও ভারতীয় [illegible] এ শিল্পের পক্ষে অনুকূল নয় বলে তিনি মনে করেন।

[illegible] আমি তাঁকে সম্ভাব্য অসুবিধা ও তা [illegible] কথা জানালাম। সব শুনে তিনি বেশ খুশীই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন থেকে ৩০।৩৫ মাইল দূরে হেপওয়ার্থ সিনেমা কোং'র ম্যানেজারকে ফোন করে তিনি ফিল্ম ফ্যাক্টরীটি বিস্তারিতভাবে দেখার ব্যবস্থা করলেন।...কোং'র ম্যানেজার আমাকে রেল স্টেশনে নিতে এলেন। তিনি শুধু আমাকে সব কিছু দেখালেনই না, আমার জন্য সেট্ পার্টি-এর বিশেষ মহলার ব্যবস্থা পর্যন্ত করলেন।

অর্জিত জ্ঞান নিয়ে দাদাসাহেব দেশে ফিরে এলেন। দু' দুয়েক ফুটের মত ছবি তুলে অর্থলগ্নীকারকদের দেখালেন। টাকা যোগাড় হলো। কিন্তু বন্ধক রাখতে হলো স্ত্রীর গহনা নিজের ইনসিওর পলিসি ইত্যাদি সব কিছু।

দাদাসাহেব ফালকে কাজের জন্য নাসিককে পছন্দ করলেও অন্য কারণে দাদার মেন রোডে তাঁর স্টুডিও স্থাপন করলেন। ১৯১২ সালের শেষে তিনি শুরু করলেন 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'র কাজ। এবার যেন তিনি সব্যসাচী। একাই অভিনয় শেখাচ্ছেন, ক্যামেরার হাতল ঘোরাচ্ছেন আবার আলো, সেট প্রত্যেকটি জিনিস নিজেই ঠিক করছেন। দারুন পরিশ্রম করে ছ'মাসে ছবিটির কাজ শেষ হলো। সেকালীন রেওয়াজ অনুযায়ী এতে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করেন ছেলেরাই। ১৯১৩ সালের ৮ মে বোম্বাই-এর করনেশন সিনেমায় ছবিটি মুক্তি পেলো। সম্ভবত ছবিটির প্রাক মুক্তি প্রদর্শনী হয় বোম্বাই-এর অলিম্পিক থিয়েটারে ২১ এপ্রিল।

ছবিটি বোম্বাইতে দু মাস প্রদর্শিত হবার পর সুরাট ও পুণার কালিওয়ালা থিয়েটারে দেখান হয়। এখান থেকে এটি যায় কলম্বো, রেঙ্গুনে ও কলকাতায়, এবং সব জায়গায়ই এটি জনসমর্থন আদায় করে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র'র পর তিনি তোলেন 'মোহিনী ভস্মাসুর' ও 'সাবিত্রী সত্যবান'। এ ছবিগুলিও লণ্ডনে প্রদর্শিত হয়। ফালকের কারিগরিক কুশলতাতেই তারা শুধু মুগ্ধ হননি। সেখানে তাঁর চিত্রের অর্ডার পর্যন্ত দেওয়া হয় এবং লণ্ডনে চিত্র নির্মাণের জন্যও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবং শুধু লণ্ডন নয় আফ্রিকার জাঞ্জিবারেও তাঁর ছবি দেখানো হয়।

চার বছর পর্যন্ত ভারতের একমাত্র চিত্র-প্রযোজক ফালকে জনচিত্তের চাহিদা বুঝতে পেরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বক্স অফিস হিট ছবির ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন তাঁর 'লঙ্কাদহন' ও 'কালীয় মর্দন' ছবি নিয়ে।

কথিত আছে বোম্বাই-এ 'কালীয় মর্দন' ছবিতে এত ভীড় হতো যে এটি পুরনো ওয়েস্টএণ্ড সিনেমায় সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একনাগাড়ে প্রদর্শিত হতো এবং কোন একটি কেন্দ্র থেকে টাকা বলদগাড়ীতে করে বয়ে নিয়ে যেতে হত।

দাদাসাহেবের প্রথম দিকের ছবিগুলি ফালকেস 'ফিল্ম' নামেই পরিচিত। বছর দুয়েক বাদে তিনি একটি কোম্পানী নির্মাণ করেন হিন্দুস্থান ফিল্ম কোং নামে। এখানে বছরে প্রায় ১২।১৪টি ছবি তৈরী হতো। ছবির মানের চেয়ে সংখ্যার দিকে জোর দেওয়ায় এ সময় ফালকে আশংকা প্রকাশ করেন যে, 'এভাবে চললে এ শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে।'

যাই হোক হিন্দুস্থান ও ভারত ফিল্মের অংশীদার ও কারিগরী উপদেষ্টা ফালকের এ প্রতিষ্ঠান নির্বাকযুগে বহু সফল ছবি তৈরী করে।

দাদাসাহেব সম্পর্কে আরেকটি কথা তিনি শুধু কাহিনীচিত্রই নয় বহু শিক্ষামূলক বিজ্ঞানভিত্তিক বা তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, স্টপ মোশন ক্যামেরায় তোলা 'গ্রোথ অব এ পী প্ল্যান্ট', 'গেম অব ম্যাচ স্টিকস' ইত্যাদি। কীভাবে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় সে সম্পর্কেও তাঁর একটি ছবি আছে। তাঁর 'পাঁচাচ পানজেতে হাসারস, 'সিমহস্তা' বা 'ল্যাসওয়ার্ক আর্ট তেলপাও' ছবিতে তথ্যচিত্রের উৎকৃষ্ট গুণের সমাবেশ ঘটে। এসব বিভিন্ন ছবিতে তিনি যেসব ট্রিকশট ব্যবহার করেছেন তা আজ রূপকথার বিষয়।

শতাধিক চিত্রের নির্মাতা ফালকের বহু ছবিই হিট করে। এর কারণ তিনি সংখ্যার চেয়ে ছবির গুণগত মানের উপরই বেশী জোর দিতেন।

মূলত সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীকেই চলচ্চিত্রে প্রকাশ করলে অন্যান্য বিষয় নিয়েও তিনি যে ছবি তুলতেন একথা আগেই বলা হয়েছে। মোটামুটিভাবে সেগুলির একটি তালিকা দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

(১) সামাজিক—কমা [illegible] (নারদ)—(১৯২০): সন্তাজি মালোজি (কেলাস কাউওয়াইফ) (১৯৩০)

টাকশাল (১৯২১)

ফটো : সুভাষ সরকার

(২) **ঐতিহাসিক**—শিবাজীস এসকেপস ফ্রম মোগল ফোর্ট অ্যাট আগ্রা—(১৯২৪); বাবাজী নিম্বলকর—(১৯২৬)

(৩) **জীবনী**—বুদ্ধদেব (১৯২২) গোরাকুম্ভর (১৯২০)

(৪) **তথ্য ও শিক্ষামূলক**—গ্রোথ অব এ পী প্ল্যান্ট (১৯১২)
টেলিগ্রাম—?
গ্লাস ফ্যাক্টরী—?
ভেরুলাচি লেনি (ইলোরা কেভস)?
লক্ষ্মীচা গালিচা?

আজকের ভারতীয় কাহিনীচিত্রের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণেই তিনি স্মরণীয়। ফালকের অনেক গুণগ্রাহীর কথার অনুকরণে বলতে হয়, ফালকের অধ্যবসায় ও স্থিরপ্রতিজ্ঞা ভারতে এ শিল্পের স্থায়ী ভিত্তি রচনা করে এবং শত শত শ্রমিক-শিল্পীকে নতুন জীবিকারও সন্ধান দেয়।

তিনি বলতেন, চলচ্চিত্র প্রমোদের মাধ্যম সন্দেহ নেই তবে এর মধ্য দিয়ে অদ্ভুতভাবে জ্ঞানেরও প্রসার ঘটে। এবং সে যুগে বসেও তিনি বলেছিলেন, সিনেমাশিল্প শেখার জন্য ফিল্ম ইন্সটিটিউট জাতীয় একটি সংস্থা স্থাপন করা উচিত।

দাদাসাহেবের বিভিন্ন লেখায় তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু প্রতিভাত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত সে সব লেখার অনুবাদ হয়েছে এবং তা রক্ষিত হয়েছে ভবিষ্যতের জন্য। এগুলো হচ্ছে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, তদন্ত কমিশনকে সাক্ষ্য, বক্তৃতা ও 'রঙ্গভূমি' নামে একটি দীর্ঘ নাটক যাতে পরোক্ষভাবে নিজের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করেছেন।

ভারতীয় কাহিনীচিত্রের জনক দাদা-সাহেব ফালকের দূরদর্শিতা আভাসিত হয় ১৯২৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী 'সিনেমাটো-গ্রাফ এনকোয়ারি কমিটিতে' (১৯২৭ সালে নিযুক্ত) প্রদত্ত মৌখিক সাক্ষ্যে। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন দেওয়ান বাহাদুর টি. রঙ্গচারী। সাক্ষ্যদানকালে ফালকে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রযোজনার মান উন্নয়ন, প্রযোজকদের সমস্যা, মানের দিকে নজর না দিয়ে অযথা খরচের প্রবণতা, সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি আরো বলেন, চলচ্চিত্র বিজ্ঞাপনের পোস্টারে চুম্বন বা আলিঙ্গনের ছবি না দেওয়াই ভালো। দরকার পড়লে ওটা সেন্সারও করা যেতে পারে।

তাঁর ধারণা চুম্বনের ব্যবহার ছাড়াও অন্য দৃশ্যের মাধ্যমে ছবিকে জনপ্রিয় করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে চলচ্চিত্রে চুম্বনের বিরোধী না হলেও তিনি বলেন, চুম্বনের ব্যবহার শিশু ও উঠতি তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করবে।

সেদিন চলচ্চিত্রের যেসব সমস্যার দিকে তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করেন, আজ কিন্তু তার সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি।

এই বলিষ্ঠ প্রতিভাধর শিল্পী সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনে হয়, এহেন ব্যক্তিকেও শেষ জীবনটা নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়। জীবিকার প্রয়োজনে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক ফালকেকেও এ শিল্প ছেড়ে অন্য ব্যবসায় নামতে হয়।

॥ নব প্রকাশন ॥

ডঃ সুকুমার সেন

বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ

বৈষ্ণব পদসাহিত্য ও পদাবলীকার বিষয়ক অমূল্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি গবেষক, এম. এ. এবং অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অপরিহার্য।

[দাম ১৫·০০]

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২

বি-এফ-জে-এ আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় সংস্থা সভ্যদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ

বি এফ জে এ কর্তৃক

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্বর্ধিত

সাংবাদিকতায় পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে অমৃতবাজার পত্রিকা ও অমৃত সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে সম্বর্ধিত করেন। শ্রীঘোষ বি এফ জে এ'র প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমানে তিনি এই সংস্থার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বি এফ জে এ সভাপতি শ্রীঅমলেন্দু ভদ্র অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বি এফ জে এ'কে গৌরবের শিখরে পৌঁছে দেওয়ায় শ্রীঘোষের ভূমিকা ছিল মুখ্য। শ্রীভদ্র বলেন, সরকারী উচ্চ মহলে চিত্র সমালোচকদের স্বীকৃতি আদায়ে তাঁর ভূমিকা সকলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, 'আপনাদের ভালবাসায় আমি অভিভূত।' তিনি বলেন, বি এফ জে এ'র প্রয়োজনে তিনি যথাসাধ্য করবেন। শ্রীঘোষ ছবি দেখতে ভালবাসেন। প্রমোদকর আদায়ের বর্তমান প্রথা বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে জেনে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শ্রীঘোষ বলেন, পঃ বঙ্গের সংবাদপত্রে চলচ্চিত্রের পাতার উন্নতি হয়েছে। এই পাতায় চলচ্চিত্র বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশের বিষয়ে চলচ্চিত্র-সমালোচকদের গুরুত্ব দেওয়ার কথা তিনি বলেন। পরিশেষে তিনি তাঁর জীবনের কয়েকটি মজার ঘটনা শোনান। স্বাগত ভাষণ দেন বি এফ জে এ সম্পাদক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

'লোকায়ন'-এর নাট্যোৎসব : লোকায়ন সংস্থা আগামী ১৮ই জানুয়ারী থেকে ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন অবন মহলে। প্রথম দিনে অরুণ রায়ের পরিচালনায় অভিনীত হবে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বীপের রাজা ও দ্বিতীয় দিন ওই একই নাট্যকারের গন্ধরাজের হাততালি। তৃতীয় দিন পরিবেশিত হবে রবীন্দ্রনাথের শ্যামা। সঙ্গীতাংশে থাকছেন সুমিত্রা সেন, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখার্জী ও রাখাল রক্ষিত। নৃত্যে শক্তি নাগ, নরেশকুমার ও আরতি মজুমদার।

প্রেক্ষাগৃহ

পরলোকে জাদু সম্রাট

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই সংবাদ এল বুধবার, ৬ জানুয়ারী সকালে উত্তর জাপানের হোক্কাইডোর আসাহিকাওয়া শহরের একটি হোটেলে বিশ্ববিশ্রুত জাদু-সম্রাট পি, সি, সরকার (প্রতুলচন্দ্র সরকার) চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন।

প্রকাশ, ডাক্তাররা বলেছেন, শ্রীসরকার বেশ কয়েক বছর ধরে উচ্চ রক্তচাপ রোগে ভুগছিলেন; সেই কারণেই তিনি আগের রাত্রের হিমাঙ্কের নীচে সত্তা করতে পারেননি ঐ শৈত্যজনিত অবসাদও তাঁর শরীরের অবস্থাকে খারাপ করে তুলেছিল।

২০ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত ২০০টি প্রদর্শনী করবার জন্যে শ্রীসরকার হোমা এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ষোলজন সদস্যবিশিষ্ট একটি দল নিয়ে জাপানে গিয়েছিলেন। সাতটি মাত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবার পরেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন।

বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম জাদুকর পি. সি. সরকার ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) টাঙ্গাইল মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৩০ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে অঙ্কে অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হবার আগেই তিনি পেশাদারী জাদুকর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই আত্মপ্রকাশের ঘটনাটি আমাদের চোখের সামনে আজও ভাসছে। সাল-তারিখ মনে নেই; বোধকরি ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিক। কলকাতায় সুরেন ব্যানার্জি রোডের ওয়াই, এম, সি, এ গৃহের দ্বিতলের হলঘরটি বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের দ্বারা পূর্ণ। অনুষ্ঠানসূচীতে আছে নৃত্য ও ম্যাজিক। নৃত্য প্রদর্শন করলেন ইকনমিক জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী অক্ষয় নন্দী মহাশয়ের কন্যা কুমারী অমলা নন্দী, যিনি আজ উদয়শঙ্করের সহধর্মিণী, বিশ্ববিখ্যাত অমলাশঙ্কর। তাঁর সেদিনের লীলায়িত ভঙ্গীতে 'গঙ্গাস্নান' নৃত্যটি আজও আমাদের স্মরণ আছে। ম্যাজিক যিনি দেখালেন, তিনি কিছুটা তোৎলা, হয়ত নার্ভাস বলে তোৎলামোটা বেশী; কিন্তু খেলা যা দেখালেন, তা চমৎকার, রীতিমত বিস্ময়কর। এই অনুষ্ঠানের যিনি ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই বিখ্যাত ইম্প্রে-

পি সি সরকার

সারিও, পরলোকগত হরেন ঘোষের মুখে ম্যাজিসিয়ান যুবকের নাম শুনেছিলুম— প্রতুলচন্দ্র সরকার। ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম, এই দু'জনেই বড়ো হবে, অবশ্য ছেলেটি যদি তার তোৎলামো কাটিয়ে উঠতে পারে। আপ্রাণ চেষ্টায় বাচনের এই অক্ষমতাকে দূর করে সেদিনের প্রতুলচন্দ্র পরে হয়ে উঠেছিলেন জাদু-সম্রাট পি, সি, সরকার। ১৯৩৪ সালেই তিনি বর্মা, শ্যাম, সিঙ্গাপুর ও চীনে গিয়েছিলেন তাঁর জাদু-বিদ্যা দেখাতে। জাপানে তিনি প্রথম যান ১৯৩৭ সালে। সেই থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রতি বছরই তিনি ভারতের সীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তাঁর 'ইন্দ্রজাল"-দল নিয়ে পরিভ্রমণ করেছেন এবং গর্বের কথা, প্রতি দেশেই জাদুবিদ্যায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তিনিই একমাত্র জাদুকর, যাঁকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দু' দুবার 'স্ফিনক্স' স্বর্ণ পদক পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করেছে। জার্মানী তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুকর বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৬২ সালে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। জাদু-সম্রাটের 'ভারতের জল' (ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া), মনুষ্যদেহকে শায়িত অবস্থায় শূন্যে রেখে মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করা, বদ্ধচক্ষু অবস্থায় নানা ভাষার লেখা পাঠ, হস্তপদ-বদ্ধ অবস্থায় তালা-লাগানো সিন্ধুক থেকে নিজেকে অদৃশ্য করা, টেবিলের ওপর শায়িত নারীদেহকে মোটরচালিত করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডকরণ ইত্যাদি ভূরি ভূরি জাঁকজমকপূর্ণ ভোজবিদ্যা অনুষ্ঠান শিশু-যুবক-বৃদ্ধকে সমভাবে সম্মোহিত রেখেছে। সেই রাজোচিত মুকুটধারী ঝলমলে পোশাক-পরা মানুষটির সামনে আমরা বারংবার বোকা বনেছি এবং যত বেশী বোকা বনেছি, তত বেশী করে ভালোবেসেছি। ইংরাজীতে জাদুকরকে বলে SORCERER ; এরই সঙ্গে কিছু মিল রেখে কি তিনি তাঁর পদবীর ইংরেজী বানান লিখতেন SOR-CAR, কে জানে?

জাপান তাঁর প্রিয় ক্রীড়াভূমি ছিল; বহুবার তিনি জাপান থেকে আমাদের চিঠি লিখেছেন, ছবি পাঠিয়েছেন। এবারেও জাপান থেকে বার্তা পেলুম—নিদারুণ বার্তা—তিনি আর নেই। তাঁর শোকার্ত স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়েকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। আমরাও তাঁদের মতোই আত্মীয় বিয়োগ ব্যথায় শোকার্ত।

চিত্র-সমালোচনা

আমার নাম জনি নয়

গীতাই, ত্রিমূর্তি ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড নির্মিত ইস্টম্যানকলারে তোলা ছবি 'জনি মেরা নাম"-এর নায়কের নাম আদপেই জনি নয়, যদিও সে নিজেকে 'জনি' বলে জাহির করত। তার আসল নাম ছিল—সোহন। যেমন নামের বেলায়, তেমনই কাজের ক্ষেত্রেও। যদিও তাকে প্রথম দেখা গেল হাজত-ঘরের লোহার রেলিং লুকিয়ে লুকিয়ে ক্স্যাত দিয়ে কাটতে, আসলে কিন্তু সে একজন গোয়েন্দা বিভাগীয় পুলিশ ইন্সপেক্টর। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেক্টর সোহন জনি নাম নিয়ে যে-ভাবে আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারীদের দলে মিশেছে এবং যে-সব অসমসাহসিক কাণ্ড করেছে, তা' মাত্র বোম্বাই শহরে তৈরী ছবির কাহিনীতেই সম্ভব। বাস্তব জগতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ধুরন্ধর গোয়েন্দারাও এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে তাজ্জব বনে যাবেন, এমনই অবিশ্বাস্য সে-সব কার্য-কলাপ। সোহন ওরফে জনিকে কখনও দেখা যায়, পুলিশ কমিশনারের ঘরে, আবার কখনও চোরাকারবারীর খাস কামরায়—বায়ুর মতো সে অবাধ গতি। সে কেন যে কোথায় যাচ্ছে, তাও বোঝা দুষ্কর। কখনও সে চোরাকারবারীর দলভুক্ত সুন্দরী রেখার প্রেমের ঢেউয়ে আছড়ে পড়ছে, কখনও আবার তার নিখোঁজ ভাই মোহনের সন্ধানে ব্যস্ত, আবার কখনও প্রধান চোরাকারবারী রায় ভূপেন্দ্র সিং বলে পরিচিত লোকটির প্রকৃত পরিচয় জানতে ব্যস্ত।—সত্যি কথা বলতে কি, এমন অবাস্তব জগাখিচুড়ী কাহিনী সাম্প্রতিককালের মধ্যে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

কিন্তু হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শকরা হয়ত' ততটা কাহিনীর বাস্তবতা-অবাস্তবতা নিয়ে মাথা ঘামায় না, যতটা তারা চায় যে-কোনো রকমে আনন্দে ভগমগ হতে। 'জনি মেরা নাম' দেখে তারা যে তা হয়েছে বেশ প্রচুরভাবেই, তা' প্রেক্ষাগৃহে তাদের নানাভাবে মুখর প্রতিক্রিয়া দেখে ও শুনে বুঝতে কষ্ট হয় না। সোহন ওরফে জনিরূপী দেবআনন্দ যে তাদের প্রচণ্ডভাবে আনন্দ দান করেছেন, তারও প্রমাণ মিলেছে। ম্যায় বুরা কাম করতা হ্যায়, লেকিন ইমান কি সাথ-গোছের সংলাপ শ্রীআনন্দের মুখ থেকে বেরোবা মাত্র সাধারণ দর্শকরা যেন লুফে নিয়েছেন। 'জুয়েল থীফ' থেকে 'জনি মেরা নাম'—খুব দীর্ঘ পথ নয় দেবআনন্দের পক্ষে। মনে হয়, দেবআনন্দ আসলে ভালো, অথচ দেখতে দুর্বৃত্ত-চরিত্র চিত্রিত করতে ভালোবাসেন। তা' বাসুন, ক্ষতি নেই, কিন্তু এই ধরনের চরিত্রাভিনয় দেখে জনসাধারণের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, তা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। হেমা মালিনী সুন্দরী; নাচে, গানে, অভিনয়ে তিনি দর্শকমন জয়ের ক্ষমতা রাখেন এবং আলোচ্য চিত্রে নায়িকা রেখার ভূমিকাতেও তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রচণ্ড শক্তিশালী আন্তর্জাতিক চোরকারবারী রণজিৎ সিংয়ের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছেন বহু দিনের অদর্শনের পর প্রেমনাথ। এই ভূমিকাতে তিনি তাঁর সু-নাটকৈশ্বর্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন এ-কথা অনস্বীকার্য। অপরাপর ভূমিকায় পদ্মা (তারা), জীবন (চোরাকারবারীর দক্ষিণ হস্ত) প্রাণ (মোহন ওরফে মোতি), সজ্জন (রায় ভূপেন্দ্র সিং) এবং আই. এস. জোহর (তিনটি বিভিন্ন চরিত্রে) চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। ফটোগ্রাফি এবং ইস্টম্যান রঙীন দৃশ্যাবলীতে কল্যাণজী-আনন্দজী সুর যোজনা করেছেন জনরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে। তাঁদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে কিশোরকুমারের গাওয়া "নফরত করনে বালোঁকে সীনে মে পেয়ার ভর দুঁ" ও "পলভরকে লিয়ে কোই

ষ্টার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
শর্মিলা
নাটকীয় সংঘাতে ও অভিনয়-মাধুর্যে অনুপম!
প্রতি বৃহস্পতি ৬টায় ও শনিবার : ৪টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥টা ও ৬টায়
॥ রচনা ও পরিচালনা ॥
দেবনারায়ণ গুপ্ত
॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, [illegible] গাঙ্গুলী, গীতা দে ও [illegible]।

আটাত্তর দিন পরে/জয়া ভাদুড়ী

হয়ে পথ্য কর নে" গান দুখানিকে তো এখনই লোকের মুখে মুখে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

বিমূর্তি ফিল্মস লিমিটেড কৃত "জাল মেরা নাম" কাহিনীগত অবাস্তবতা সত্তেও জনপ্রিয়তালাভে সমর্থ হবে নিঃসন্দেহে।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

স্টুডিওর ধর্মঘটের জনাই বিশ্বজিৎ তাঁর বাংলা ছবি 'জীবন প্রভাতে'র কাজ টেকনিসিয়ানে করতে পারলেন না। তার পরিবর্তে ইন্ডিয়ান হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে দু' দিন কাজ হলো। অংশ নিয়েছিলেন প্রযোজক বিশ্বজিৎ ও নায়িকা সন্ধ্যা রায়। বহুদিন বাদে বিশ্বজিৎবাবু আবার ফিরে এলেন ছবি প্রযোজনার কাজে। 'কুয়াশা' জিজ্ঞাসা'র পর এইপ্রথম বাংলা ছবির কাজ শুরু করলেন বিশ্বজিৎ। আগে 'রক্তাভিষেক' নামে একখানি হিন্দী ছবি করার কথা হয়েছিল। আপাততঃ সে ছবির কাজ বন্ধ রেখেই আগে বাংলা ছবির কাজ শেষ করতে চান বিশ্বজিৎবাবু। 'জীবন প্রভাত' ছবির পরিচালক হচ্ছেন প্রযোজকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনৈক বিশ্বাস। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ... মাঝারে ... এ ছবির ইনডোরের কাজ খুব শিগগির শুরু হয়ে যাব শুনেছি।

তরুণ মজুমদারের নবতম ছবি 'নিমন্ত্রণের' কাজ প্রায় শেষ পথে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীমজুমদারের পূর্ববর্তী ছবি 'কুহেলী' এখনও মুক্তি পায় নি। দুটি ছবিরই প্রধান নারী চরিত্রে রূপ দিয়েছেন শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়। মুক্তি পায় নি অথচ বহুদিন যাবৎ শেষ হয়ে বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে এমনতরো ছবির সংখ্যা অনেক। 'এখানে পিঞ্জর' মুক্তি পাচ্ছে এক সপ্তাহ বাদে। বিজয় বসুর 'নববাগ' শেষ হয়ে গেছে প্রায় ছ' মাস আগে, সেন্সরও হয়ে গেছে। তপেশ্বর প্রসাদের 'প্রতিবাদে'রও একই অবস্থা। অরবিন্দবাবুর 'ধনী মেয়ে'র কাজ শেষ। সেন্সর অবশ্য এখনও হয় নি। সুধীর মুখার্জীর 'চৈতালী' তো বহুদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। সলিল সেনের 'অপর্ণা' এখন শেষ হবার পথে। আরও আরও অনেক আছে। এ বছরের মুক্তি তালিকায় কটা নাম আসবে কে জানে?

মঞ্চাভিনয়

শিল্পী যাযাবরের 'প্রমত্ত প্রহসন' ও 'সব হিসেবের বাইরে' : একটি নাটকের সার্থক প্রযোজনা শুধু আঙ্গিকের চমৎকারিত্বের ওপরই নির্ভর করেনা, মঞ্চের আলোর যথার্থ কাহিনী ও চরিত্রগত সংঘাতের সমাবেশেই সার্থক নাটকীয় গতিবেগ সঞ্চারিত হয় : আর এই অটুট গতিবেগই প্রযোজনার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সচেতন প্রতি সচেতনতা নিবিড় ও সম্পূর্ণ না হয়ে উঠলে কোন গোষ্ঠীর নাট্যপ্রয়াসকে মুক্ত কণ্ঠে অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা বোধ হয়। সম্প্রতি 'রঙমহল' শিল্পী যাযাবরের 'প্রমত্ত প্রহসন' ও 'সব হিসাবের বাইরে' নাটক দুটির মঞ্চরূপ দেখতে দেখতে একটা সংশয়ের মধ্যে আবর্তিত হোচ্ছিল সমস্টুকু অনুভূতি। সংশয়টা হোল, শুধু আলোকসম্পাত আর মঞ্চসজ্জার ঘনঘটাকেই কি সার্থক নাটক বলে মেনে নেওয়া যায়?

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রমত্ত প্রহসন'কে 'শিল্পী যাযাবর' বলেছেন 'একটি বহু-বিতর্কিত নাটক'। কিন্তু একটি বিতর্কিত নাটকের নেপথ্যে সম্ভব ও অসম্ভবের সীমারেখার মধ্যে যে গভীরতা লুকিয়ে থাকে, তা আলোচ্য নাটকের সংলাপে সংঘাতে সবসময়ে ছিল কিনা সন্দেহ। বিষয়বস্তুর মধ্যে খুব স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত কিছু না থাকলেও, সংলাপের সরসতায় 'প্রমত্ত প্রহসন' কিছুটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। এ নাটকের প্রযোজনায় নির্দেশক জগন্নাথ বসু আন্তরিকতার পরিচয় চিহ্নিত করতে পেরেছেন, কিন্তু অকারণে শিল্পীদের মঞ্চ ছেড়ে অন্য কোনে গিয়ে অভিনয় করার ব্যাপারটা কিছুতেই সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় বহন করেনা। হঠাৎ 'নটবর' ও 'জাহেদা' কেন 'ব্যালকনি'তে উঠে গেলো? তাছাড়া প্রতিটি আঙ্গিক রচনার পেছনে বক্তব্যের একটা সাজেসান থাকে। 'প্রমত্ত প্রহসনের' আঙ্গিকগত অভিনবত্ব কি সব সময়ে এক একটি বিশেষ বক্তব্যের ব্যঞ্জনাময় রূপ হোতে পেরেছে? এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও শিল্পীদের অভিনয়ের ব্যাপারে আমরা মোটামুটি সংশয়মুক্ত। নটবর নরেনের ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন নির্দেশক জগন্নাথ বসু; তাঁর বাচনভংগী সাত্যই সুন্দর। কৃষ্ণা চক্রবর্তীর 'জাহেদা জবেরী' ও দর্শককে মুগ্ধ করেছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন গৌতম বসু, হীরক মুখোপাধ্যায়, দীপকের চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাবল্লভ দাস, গৌতম চক্রবর্তী, ভোলানাথ ধর। বক্তব্যের সমর্থন না থাকলেও আলোকসম্পাত মাঝে মাঝে সুন্দর দু' একটি পরিবেশ রচনা করতে পেরেছে।

দ্বিতীয় নাটক কবিতা সিংহের 'সব হিসেবের বাইরে' হাউস সারজেন 'সত্যেন'এর জীবন সমস্যা নিয়ে একটি অসাধারণ সংঘাতসমৃদ্ধ সৃষ্টি হোতে পারতো। কিন্তু এতো দ্রুত ঘটনার সমাবেশের জন্য সামগ্রিকতা রসোত্তীর্ণতায় বিলীন হোতে পারলোনা। নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাপার অসম্পূর্ণ থাকায় 'সব হিসেবের বাইরে'র 'সত্যেন' 'বাসন্তী' মনে দাগ কাটতে পারলোনা, অথচ ওদের যন্ত্রণায় অসাধারণ কিছু নাট্যমুহূর্ত গড়ে উঠতে পারতো। এ নাটকের অভিনয়ে 'সত্যেন'রূপী জগন্নাথ বসু সব সময়ে প্রত্যাশিত ছবি তুলে ধরতে পারেন নি; কৃষ্ণা চক্রবর্তীর 'বাসন্তী' প্রাণের স্পর্শ পায়নি। স্বাতী লাহিড়ীর ...দের হতাশ করেছে। শুধুই

হোমী ওয়াদিয়ার
মহান
চিত্রের
শুভ-মুক্তি
শুক্রবার
১৫ই জানুয়ারী
সচীন • হেমা কুমারী • জয়শ্রী গডকর • মনহর দেসাই
শ্রীকৃষ্ণ লীলা
হোমী ওয়াদিয়া
এস.এন. ত্রিপাঠী
মহান পৌরাণিক চিত্র
"সম্পূর্ণ রামায়ণের"
স্রষ্টাদের
আর একটি
নয়নাভিরাম চিত্র
শ্রী কৃষ্ণ লীলা
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি : কৃষ্ণায় প্রতিদিন চারটি প্রদর্শনী
কৃষ্ণা - নিউ সিনেমা - প্রিয়া - মিত্রা - রূপালী
(তাপনিয়ন্ত্রিত)
(তাপনিয়ন্ত্রিত)
ছায়া - ইন্টালী - দীপ্তি
নবভারত — ন্যাশনাল — কমল — প্রভাত — অজন্তা — রাজকৃষ্ণ
কল্যাণী — লীলা — এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

অভিনয়ের চমক এ নাটকের সম্পদ। তবে মঞ্চসজ্জার মধ্যে পরিচালকের শিল্পবোধের ছাপ আছে। তেমনি একটি সংযত আলোর বিন্যাস সেটাকের সংগে সামঞ্জস্য রেখে চমক আভাসটাই একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যে এমন কিছু কিছু ক্লাসিক সৃষ্টি আছে, যা প্রত্যেক যুগের সংগে মিতালী রেখে আগামী দিনের উপলব্ধিতেও প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে। প্রায় দু'হাজার বছর আগে রচিত রাজা শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটক এমনি একটি চিরন্তন সম্পদ। যে বাস্তব দৃষ্টিভংগী ও প্রগতিশীল চিন্তা এর মধ্যে ছায়া ফেলেছে তা যে কোন দেশের নাট্যকার ও নাট্য-প্রযোজককে উদ্বুদ্ধ করবে নিশ্চয়ই। সম্প্রতি সংগীত-কলা-মন্দিরের শিল্পীরা এই অসাধারণ নাট্যকাব্যটিকে হিন্দী রূপে মঞ্চের আলোয় তুলে ধরে নাট্য-প্রযোজনার ইতিহাসে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে মৃচ্ছকটিকের বাংলা নাট্য-রূপ পরিবেশন করে এর আগে থিয়েটার ইউনিটের শিল্পীরা নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন কুড়িয়েছিলেন। হিন্দী নাট্যরূপ দিয়েছেন তা সহায়ে দিনে।

নর্তকী বসন্তসেনা আর দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্তের নিবিড় ও একনিষ্ঠ প্রেম কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটি তখনকার দিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক ছবিও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। মদনিকা, শর্বিলক, শকার, মৈত্রেয় সব চরিত্রেই যেন বাস্তব জীবনের আলো হাওয়া লেগে আছে। এই ধরনের ক্লাসিক নাটককে মঞ্চে পরিবেশন করতে গেলে মঞ্চসজ্জা, আলোক-সম্পাত ও আবহসংগীতের মধ্য দিয়ে যে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় তার প্রত্যেকটি রূপ রূপায়ণে এর প্রযোজনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এর জন্য প্রথমেই নির্দেশক শ্রীবিদ্যুৎপ্রসাদ তেওয়ারীকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। শ্রীতেওয়ারীর সূক্ষ্ম শিল্পবোধ যাতে মনে আমাদের দৃষ্টি বিমুগ্ধ করেছে সেইভাবে তেমনি একটি নাটকের নক্সা পরিকল্পনায় তাঁর গভীরতম চিন্তার প্রতিফলন দেখেছি।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই আন্তরিকতার পরিচয় রেখেছেন। আনন্দস্বরূপ মিত্রের 'চারুদত্ত' হয়েছে শান্ত এবং সংযত। উষা গাঙ্গুলী 'বসন্তসেনা' চরিত্রের গভীরতা স্পর্শ করতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রাণবন্ততা বোধ হয় সব সময় সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেনি। 'মদনিকার' ভূমিকায় আশ্চর্য সুন্দরভাবে সাবলীল অভিনয় করেছেন বীণা মিশ্র। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে রাজেন শরৎ শেঠ (মৈত্রেয়), সুবল ঘোষ (চেট), রাজেন্দ্র শর্মা (শকার), অমর গুপ্ত (শর্বিলক), সুরেশ শর্মা (সম্ভক), রাজকুমার শর্মা (আর্যক), মানিক চৌধুরী (মদনক), কাশীলাল শ্রীমল (নারায়ণ)। নেপথ্য থেকে যাঁরা নাটকটির সাফল্যমণ্ডিত সাহায্য করেন তাঁরা হলেন সুরেশ দত্ত (মঞ্চসজ্জা), শম্ভু জৈন (পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা), রবি জৈন (সম্পাদিত), আবদুল রেহমান, শ্রীপতি (আবহসংগীত), অজিত মিত্র (আলোকসম্পাত)।

দাবী। পরিচালনা : অসিত মুখোপাধ্যায়। নায়িকা : মাধবী চট্টোপাধ্যায় —ফটো : অমৃত

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা : রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় এই প্রথম পাঁচদিনব্যাপী একাঙ্ক নাটকের একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হোল। নাট্যানুশীলনের ক্ষেত্রে এই আয়োজন নিশ্চয়ই একটি সম্ভাবনাময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় যে শ্রেষ্ঠ পনেরোটি সংস্থা চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলা থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রযোজিত নাটকগুলোতে আধুনিক নাট্যচর্চার সবটুকু স্বাতন্ত্র্যই ধরা পড়েছে। শহর কলকাতার দর্শকের কাছে মফস্বলের নাট্যসংস্থাগুলোর অনুশীলন নিষ্ঠার ছবি তুলে ধরার যে প্রয়োজন আছে, সেই সত্য থেকেই এই একাঙ্ক নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে আন্তরিকভাবে জড়িত বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীদের মধ্যে একটি নিবিড় সহমর্মিতার সেতু-বন্ধন করতে রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ রীতিমত আগ্রহী।

প্রতিযোগিতার ফলাফল :

শ্রেষ্ঠ সংস্থা : সেন র‍্যালে অ্যাথলেটিক ক্লাব—'আমরা কবরে যাব না', শ্রেষ্ঠ নাট্যকার : তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়—'শোকগান', রতন কুমার ঘোষ—'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', শ্রেষ্ঠ পরিচালক : কৃষ্ণেন্দু কারক—'আমরা কবরে যাব না' (সেন র‍্যালে অ্যাথলেটিক ক্লাব), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : সুব্রত সান্যাল—'এক যে ছিল রাজা' শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : নীলিমা চক্রবর্তী—'তাহের নামটি লখন' (কলকাতা মিউনিসিপাল এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব)।

হায়দরাবাদে রবীন্দ্র ভারতী ভবনে গত ১ ডিসেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেন মাসাব ট্যাংক অঞ্চলের স্থানীয় বাঙালীরা। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীপুষ্প গুপ্ত। অভিনয়ে অংশ নেন অমরেশ গাঙ্গুলী, পুষ্প গুপ্ত, সমীর ঘোষ, শিবশংকর ঘোষ, ননীগোপাল দাশগুপ্ত, শম্ভু সিংহ, তমসা মিত্র, মদন বসু, অলোক মণ্ডল, আত্রেয়ী দেব, তৃপ্তি মিত্র, উত্তমা দাস, স্বপ্না দাশগুপ্তা, বীথি ঘোষ, কণা গাঙ্গুলী, সন্ধ্যা বোস ও পাপিয়া লোমাত্র। সংগীতে ছিলেন শান্তা গাঙ্গুলী, সংঘমিত্রা দাস, মঞ্জুলা দাস ও হরভিজৎ গুপ্তশর্মা। সংগীত ও নৃত্য পরিচালনা করেন অমরেশ গাঙ্গুলী, আত্রেয়ী দেব ও উত্তমা দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন ডি. কে. ডাওয়াল ও বি. বি. সেনগুপ্ত।

হুগলী জেলার অন্যতম প্রবীণ নাট্য-সংস্থা মাহেশ উদয় সংঘ-এর ১০৭তম অভিনয়রজনী উদ্‌যাপিত হল গত ১০ ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে। সংঘের শিল্পী-গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করলেন তাঁদের বহু অভিনীত ও পুরস্কৃত নাটক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত 'মাকড়সা'। সামগ্রিক সুঅভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন প্রদ্যোৎশংকর দাশগুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং শিবনাথ নাথ।

লোকায়ন : আসছে ১৮-২০ জানুয়ারী 'অবন মহলে' তিনদিনব্যাপী একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন লোকায়ন নাট্য সংস্থা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামা' এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপের রাজা' ও 'গন্ধরাজের হাততালি' নাটক তিনটি উৎসবে মঞ্চস্থ হবে। পরিচালনা করবেন অরুণ রায় ও শান্তি নাগ (শ্যামা)।

বিবিধ সংবাদ

নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে 'গ্রো হট, গ্রো কোল্ড' এর রজতজয়ন্তী সপ্তাহ ওয়ার্নার ব্রাদার্সের বহুল আলোচিত এই ইতালীয় ছবিটি এ সপ্তাহে ২৫তম সপ্তাহে পড়লো, ছবিটির জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় আরো কিছুদিন এ ছবি বিদেশী ছবির আসর গরম করে রাখবে। বম্বেতে ছবিটি একই প্রেক্ষাগৃহে ২০ সপ্তাহের বেশী প্রদর্শিত হয়েছে। এমনকি সুদূর সিংহলেও ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সমস্ত বিদেশী ছবির বক্স অফিস রেকর্ড ভঙ্গ করে দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে কলকাতাতেও 'ক্লিওপেট্রা' এবং 'সাউণ্ড অফ মিউজিক' এর পর একই প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘদিন ধরে কোনদিন বিদেশী ছবি প্রদর্শিত হয়নি।

এই মনস্তত্ত্বমূলক ও যৌন-মনীষক পদ্মকাহিনীর প্রধান ভূমিকায় আছেন ব্রিটেনের রোসমেরী ডেক্সটার; ইতালীর লিউনিদাবো গেস্পা, এবং সুইডেনের বিবি এ্যান্ডারসন ও গুনোর ব্রেজোন্ডাণ্ড প্রভৃতি। ছবিটির পরিচালক ইতালীর মাইকেল আঞ্জেলো আন্তোনিওনি এবং ফেডারিকো ফেলিনির সম্প্রদায়ভুক্ত ইতালীয় ছবির 'নব্য বাস্তবতার' অন্যতম সদস্যভুক্ত (ফ্লোরেন্স চর্চারসিনি)। ছবিটি স্টুডিওর বাইরে ইতালীর সিসিলি দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশে গৃহীত হয়েছে। নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহেও ইতিপূর্বে কোন বিদেশী ছবি ২৫ সপ্তাহ চলেনি; সুতরাং এটাও বক্স অফিসের রেকর্ডই নয়—প্রেক্ষাগৃহের প্রদর্শনীর একটি রেকর্ড বলা চলে।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ (২৪ পরগণা) ষষ্ঠ বার্ষিক শিক্ষা শিবির ইছাপুর পার্ক গ্রাউণ্ডে ১১ থেকে ২২ ডিসেম্বর চারদিন ধরে বিপুল উদ্যম ও উৎসাহে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন শ্রীব্রজরঞ্জন রায় ও স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীঅজিতকুমার মজুমদার। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে আয়োজিত স্বাস্থ্যসম্পদ সংস্থার প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘটে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ পোদ্দারের পৌরোহিত্যে। শিক্ষাশিবিরের সার্থক রূপায়ণের জন্য শ্রীবিমলেন্দুনাথ দত্ত ও অন্যান্য বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দেন কার্যকরী সভাপতি শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সিংহ।

চারদিনব্যাপী এই শিক্ষাশিবিরে জেলার বিভিন্ন সংস্থা এবং স্কুলের দুশ কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থী যোগ দেন। সামরিক শৃঙ্খলার মধ্যে শিবির-জীবনের চারদিন নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের কাছে দেশ জাতি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা, মিলেমিশে কাজ করার প্রবণতা, নিয়মশৃঙ্খলা, মন ও শরীর গড়ে তোলার শপথ সানন্দে গ্রহণ করে কিশোর-কিশোরীরা এই শিক্ষাশিবিরে।

জীবনজিজ্ঞাসা/পরিচালক পীযূষ বসু এবং উত্তমকুমার

বিভিন্ন দিকের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন : সর্বশ্রী ডি কে মানডেভিল, অধ্যাপক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী দে সরকার, শুভেন্দু মল্লিক, ডি বি আসকন্দিনার, সন্তোষ চক্রবর্তী, কার্তিক দাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রুণু ভট্টাচার্য, শিবানী বসু, নীলিমা গঙ্গোপাধ্যায়, নব-নিবেদন প্রমুখ।

নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপনে 'এইচ-এম-ভি'র 'হরবোলা' কণ্ঠশিল্পী শ্রীচণ্ড গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা যে কি বিপুল, নিঃসন্দেহে তার প্রমাণ পাওয়া গেল গত ২৩ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর লেক স্টেডিয়াম হলে। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর লেক স্টেডিয়াম হলে 'চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে অন্যান্যবারের মতন নেপথ্য থেকে মুখ দিয়ে নানান জন্তুর ডাক ও বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে নাটকীয় আবেগ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে, তুলে দর্শকদের বিস্মিত করেছেন। যে সকল ডাক আর শব্দ যন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা অসম্ভব 'হরবোলা গঙ্গোপাধ্যায়' নিজে তার পরিশ্রমে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন। 'সোনালী দিং' ও 'নকল রাজা'

রঙ্গনা বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল হেদুয়া মোড় (৫৫-৬৪৪৬)
নান্দীকার
শনি ৬ রবি ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
২১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ৬টায়
নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলেত ফেরৎ-পরিচালক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত এবং অপর্ণা সেন। —ফটো : অমৃত

নায়ক দুটি মুখোস নাটকে দর্শকের মন জয় করে আসল প্রশংসা অর্জন করেছেন। সম্প্রতি অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি অনুষ্ঠানে একেবারে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তিনি পার্ক সার্কাস নিউ রোড ক্লাব-এর আয়োজিত সর্বভারতীয় এক বিচিত্রানুষ্ঠানে কৌতুক অভিনেতা হিসাবে অংশগ্রহণ করে [illegible] দর্শকদের মন জয় করেন। [illegible] সমবেত দর্শকমণ্ডলীর অনুরোধে পুনরায় তিনি কয়েকটি [illegible] মাধ্যমে হরবোলার ডাক পরিবেশন করেন।

চিলড্রেন্স হাট : গত ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতার কিন্ডার গার্ডেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয় 'চিলড্রেন্স হাট'-এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব সভা রাজ মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। ইউ এস আই এস-এর ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার ডাইরেক্টরের পত্নী শ্রীমতী ডেনা কোর্টনী প্রধান অতিথিরূপে এক ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষার উদ্যোগ আয়োজনের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব এডুকেশানের সভাপতি শ্রীভূপেনচন্দ্র মুখার্জি অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা-নুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে সভাপতি তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে বিশেষ জোর দেন এবং সার্থক পরীক্ষার্থীদের উৎসাহদানে পুরস্কার বিতরণী উৎসব আয়োজন করায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রশংসা করেন। প্রধান অতিথি মিসেস ডেনা কোর্টনী পুরস্কার বিতরণ করেন। বহু গণ্যমান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে উপসংহারে একটি চমকপ্রদ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রিন্সিপাল মিসেস লীলা মিত্র সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বাঙলার সিনেমা মাসিক পত্রিকা

আলোছায়া

প্রতি সংখ্যায় থাকে সম্পূর্ণ উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প, শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প, বিভিন্ন প্রবন্ধ ফিচার, কাল সমালোচনা, মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা ও অসংখ্য সিনেমার ছবি।

প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ : বার্ষিক ৬

১৬/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মূকাভিনয় : সম্প্রতি ডুইং অফিস রিক্রিয়েশান ক্লাবের উদ্যোগে রঙমহল মঞ্চে আয়োজন করেছিলেন শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর একক মূকাভিনয় ও নাটক 'সেকসাইড'। এ দিন শিল্পী শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী পরিবেশিত মূকাভিনয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল 'আত্মহত্যা'। বর্তমান নিতুর হুকার সর্বক্ষেত্রে কমিশনের সমস্যায় এক কৌতুক-দীপ্ত এবং চিত্তগ্রাহী রূপ প্রকাশিত হয়েছে এই ফিচারে। এছাড়া 'ফটোগ্রাফার' ফিচার-টিও আকর্ষণীয়।

দক্ষিণী : আগামী ২৪ জানুয়ারী, রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় 'কলা-মন্দিরে' দক্ষিণীর বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। অনুষ্ঠানে দক্ষিণীর শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন।

মূকাভিনয় : সম্প্রতি মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু মঞ্চে মূকাভিনয় পরিবেশন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। শ্রী-অঙ্গের চলাফেরা ও প্রসাধনের অদ্ভুত অনুকরণ সবাই প্রশংসার দাবী রাখে। নৈতিক মর্যাদাবোধের আচরণ বিধি অনুকরণও উল্লেখযোগ্য। 'অফিস যাত্রী', 'নটিবর', 'প্রেমিক' ইত্যাদি ফিচারগুলি মনে রাখার মত। সম্প্রতি রঙমহল মঞ্চে অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী শ্যামলেন্দুর মূকাভিনয় প্রত্যেকটি দর্শককে প্রচুর আনন্দ দান করে।

মা-কালী ব্যায়াম সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব : বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মা-কালী ব্যায়াম সমিতি পাঁচদিন ধরে তাদের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব পালন করলেন। নিজামাণ মল্লিক লেন সমিতির নিজস্ব স্কুল প্রাঙ্গণে ১৮ ডিসেম্বর প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী রমা চৌধুরী, প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলাশাসক শ্রীদীপক রুদ্র। শ্রীগৌরকিশোর ভট্টাচার্যের ভক্তিগীতির পর শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় —'শিল্পী-সম্মেলনী' অভিনয় করেন শ্রীকিরণ মৈত্রের 'ধারেঘন্টা'। আহরণমূলে নীলমণি দাস ও নীরোদ সরকারের পরিচালনায় সমিতির সভ্যরা শারীরিক কলা-কৌশল প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় দিন সারা-রাত্রীব্যাপী বিচিত্রা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বপ্না বন্দ্যো-পাধ্যায়। মান্না দে, রবি ঘোষ, বনশ্রী সেন-গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা যোগ দেন। তৃতীয় দিন শ্রীসন্তোষের মুখোপাধ্যায়-এর ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের পর এম-এন্ড এন্টারপ্রাইজ অভিনয় করেন 'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' এবং উৎসবের শেষদিন হাওড়া উৎসাহী সঙ্ঘের শিল্পীরা মিলে 'রক্তে রাঙা মাটি' যাত্রাভিনয় করেন।

ন্যাশনাল কোম্পানী স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত 'টম্ কাকার ঘর' নাটকে নিমু ভৌমিক ও অলকা সিনহা।

মল্লারের অনুষ্ঠানে একটি দৃশ্য

জলসা

বাণীচক্র 'আম্রপালী' : রবীন্দ্রসদনে সম্প্রতি নিবেদিত বাণীচক্র প্রযোজিত 'আম্রপালী' এক উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আম্রপালীর যৌবনসমৃদ্ধ রূপ, এই রূপের কারণে তার জীবনের ট্র্যাজেডী এবং অবশেষে বুদ্ধচরণে আত্মনিবেদন করে সকল জ্বালার পরিসমাপ্তিতেই এক সুন্দর রূপ বুদ্ধযুগের আম্রপালী। নৃত্যে ও সঙ্গীতে এই কাহিনীর সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন বাণীচক্রের শিল্পীরা।

শান্তি নাগের নৃত্য পরিচালনা স্বমানে প্রতিষ্ঠিত তবে কোনো কোনো অংশে (যেমন পুতুলরূপী শিশু আম্রপালীকে কোলে নিয়ে দর্শকদের দৃষ্টির গোচরে আনা) স্থূল রুচির পরিচয়। এই বক্তব্যকে নৃত্যশৈলী ও মুদ্রা দ্বারা আরো শিল্পব্যঞ্জক আভাষিত করা যেত। অনল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতপরিচালনা প্রশংসনীয়। নৃত্য ও অভিনয়ে প্রথমেই উল্লেখ্য হলেন আরতি মজুমদার (আম্রপালী), নরেশকুমার (বিম্বিসার), গণেশ সিংহ (বৈশালীরাজ)। এঁরা ছাড়াও শম্ভু ভট্টাচার্য (বেতালভট্ট) শান্তি নাগ (মালী) দেবানন মুখোপাধ্যায় (গৌতম বুদ্ধ), তপতী ঘোষাল অভিনীত চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন। নেপথ্যসঙ্গীতে মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র গীত গানগুলি দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য কণ্ঠ ললিতা ধরচৌধুরী। দীনেশ চন্দ্রর আবহসঙ্গীত যথাযথ। দিলীপ ঘোষের ভাষ্যপাঠ, বিমল মুখোপাধ্যায়, গুরুকুমার ঘোষ ও নিমাই দে'র রূপসজ্জা, সুনীল দাস ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ সামগ্রিক সাফল্যের সহায়ক।

সুর সপ্তকের 'কচ ও দেবযানী' : কবিগুরুর 'বিদায় অভিশাপ' অবলম্বনে মিহির সেন নাট্যরূপায়িত 'কচ ও দেবযানী' সুরসপ্তকের এক সুপরিচিত প্রযোজনা। এর আগেও রবীন্দ্রসদনে এই নৃত্যনাট্য দেখেছি। কিন্তু এবারের পরিবেশনা আরো পরিশীলিত এবং সেই কারণেই অধিকতর চিত্তগ্রাহী।

নৃত্যনাট্য সুরু শিক্ষা সমাপনান্তে কচের স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্-মুহূর্তে দেবযানীর কাছে বিদায় গ্রহণ দৃশ্য দিয়ে। তারপর বিয়োগকাতরা দেবযানীর বিলম্বিত অতীতচারণ তথা ফ্ল্যাশব্যাকে কচ ও দেবযানীর পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা ও প্রণয়ের বিচিত্র আবেগের প্রকাশ নৃত্যে গানে ও অভিনয়ে মূর্ত হয়েছে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনা ভঙ্গীতেই পরিণত শিল্পকৃতির পরিচয় ছিল আর এ পরিচয়কে সার্থক করেছে সঙ্গীত ও নৃত্যাংশগীর সমবেত প্রয়াস।

কচের ভূমিকায় নরেশকুমারের রূপ ভিন্নয় হার্দ্য ও যথাযথ, তবে চরিত্রটিতে আরও একটু ব্যক্তিত্ব আরোপ করা উচিত ছিল। কথাকলি ও মণিপুরের আঙ্গিকে নৃত্য উজ্জ্বলের। দেবযানী চরিত্রকে চিত্তস্পর্শী করে তোলার আন্তরিকতায় কোনো কার্পণ্য রাখেন নি পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়। তবে উল্লাসমুখর মুহূর্তের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হয়েছে তার করুণ মুহূর্তের অভিব্যক্তি। ভাস্কর বসুর সুনির্বাচিত গানগুলি নৃত্যনাট্যের শিল্পসুষমার পরিস্ফুটন ঘটিয়েছে। বিশেষভাবে প্রশংসার দাবীদার বাণী ঠাকুর। তাঁর পরিবেশনার ক্রমোন্নতি রবীন্দ্র সদনের 'শ্রাবণ সন্ধ্যা'য় আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে কিন্তু এবারে তাঁর গাওয়া গানগুলিতে ('তবু মনে রেখ, যদি নাহে ভয় করব না', 'দীপ নিভে গেছে', 'ওলো সই, না যেওনা') রয়েছে পরিণত শিল্পবোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সেরা সর্বাধিকারী 'তুমি যে সুরের আগুন' গানটি যথাযোগ্য ভাবের অনুরণন সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র দুটি গানেই ('তুমি যেও না', 'বড় আশা') কারুণ্যসমৃদ্ধ কণ্ঠের ঐশ্বর্যের মাধুর্য বিস্তার করেন। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়-গীত 'ভালবেসে সখী' ও 'হে নিরুপমা' রাগপ্রধান ভঙ্গীতে চিত্তহারী। দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া থাক স্মৃতিসুধায় ও 'তুমি রবে নীরবে' ধ্রুপদী গাম্ভীর্যে নাটকের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। নৃত্য ও সঙ্গীত পরিচালক দুলাল দাসগুপ্ত ও অমিত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। সু-ব্যবস্থাপনার জন্য ধন্যবাদার্হ প্রযোজক বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মল্লার প্রযোজিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' : গত সপ্তাহে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে 'মল্লার' প্রযোজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠান কলারসিক মহলকে কয়েকটি উপভোগ্য মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। উপলক্ষ্য উক্ত সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা উৎসব পালন। উৎসবের সূচনা সুজিত নাথ ও প্রভাস দত্ত পরিচালিত সমবেত গীটার বাদ্যের অনুষ্ঠান দিয়ে। পরের অনুষ্ঠান ছিল 'চল যাই ঘুমের দেশে'। মনের দিক থেকে শিশুরাই প্রকৃতির সবচেয়ে কাছাকাছি। তাই প্রকৃতির অন্তরশায়ী স্বপ্ন, রঙ, কল্পনার দেশ যেন তাদের কাছে স্বতোৎসারিত। এই স্বপ্নের দেশে সেদিন আমরা বয়স ও অভিজ্ঞতার বাধা অতিক্রম করে ক্ষণিকের জন্য প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম। এই নির্মল আনন্দের শরিক হতে পারার জন্য ধন্যবাদ দেব কাকে? শিশু

শিল্পীদের? নাটচরিত্রে জ্যোতিভূষণ চাকীকে? সংগীতপরিচালক রুবী দত্তকে না নৃত্যপরিচালিকা রুবী দত্তকে? বোধহয় সকলেই সমান কৃতিত্বের অধিকারী আর সুন্দর টীম ওয়ার্ক-এর জন্য সাধুবাদ প্রাপ্য 'মল্লার' সংগীতানুষ্ঠানের প্রতিটি সভ্যের। সর্বশেষ ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল কথা-সরিৎ সাগর অনুসৃত নৃত্যনাট্য 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা'। বাসবদত্তা ও উদয়নের প্রণয়-বিরহ মিলন কাহিনীই এই নৃত্যনাট্যের পটভূমি। এই সরস কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠেছিল অরুণরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর মিত্র, দীনেশ চন্দ, সলিল ভট্টাচার্য, কণিষ্ক সেন ও রুবী দত্তর সংগীত, সংলাপ, আবহ-সংগীত, মঞ্চনির্দেশনা, আলোক ও নৃত্য-নিরূপণে। তরুণ উদয়নের ভূমিকায় রুবী দত্ত সুন্দর। নৃত্যে তো বটেই, অভিনয়েও। অবন্তিকার ভূমিকায় ইন্দ্রাণী সেন ও পদ্মাবতীর ভূমিকায় এর্মিলি রায় অভিনীত চরিত্রের দায়িত্ব প্রশংসনীয়ভাবেই পালন করেছেন। উমা বসু ও উমা ঘোষ যোগীন্দ্র-নারায়ণ ও বিদূষকের ভূমিকায় উত্তীর্ণা। একমাত্র ত্রুটি ছিল উদয়নের ভূমিকায় নেপথ্য গীত বিভিন্ন কণ্ঠের সংগীতে। এভাবে চরিত্রের সংগতি ক্ষুণ্ণ করা অনুচিত। মনপ্রাণ ভরিয়ে দিয়েছে নেপথ্য শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান। অশোকবাবু গীত গানগুলি অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। সুস্মিতা সেনের গানও শোনবার মত। সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়ের গানও। দিলীপ চক্রবর্তী, শ্যামলী চক্রবর্তী ও অরুণরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও এদিক দিয়ে উল্লেখ্য।

পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়

সি এল টি'র নৃত্যানুষ্ঠানের দৃশ্য

নবফাল্গুনীর সংগীতানুষ্ঠান : গত ২৭শে ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত সংগীত সংস্থা 'নব-ফাল্গুনীর' বিংশতিতম মাসিক অধিবেশন শুরু হয় শ্রীমতী শুক্লা মুখোপাধ্যায়ের নজরুল-গীতি ও ভজন গান দিয়ে। প্রাণগোপাল গোস্বামীর নিপুণ তবলাসংগতে আন্তরিকতা-সিক্ত গানগুলি যথেষ্ট উপভোগ্য হয়। পরের একক তবলা অনুষ্ঠানে প্রাণগোপাল গোস্বামী ত্রিতালে পরিবেশিত টুকরা, চক্রধার, বোল—ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে উল্লেখযোগ্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। পঙ্কজ চক্রবর্তীর তবলাসংগতে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পূরিয়া কল্যাণ রাগে খেয়াল ও তারানা গেয়ে শোনালেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। শুদ্ধকল্যাণ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালে বিস্তার ও তানে রেওয়াজী, স্বরও শুদ্ধ। বিশেষ অনুরোধে শ্রীমতী চক্রবর্তী তিনটি ঠুংরী গেয়ে আসরের পরিসমাপ্তি ঘটান। এর সঙ্গে উপযুক্ত তবলাসংগতে ছিলেন রাজা রায়।

স্বরশ্রীর অনুষ্ঠান : গত ২৬শে ডিসেম্বর ল্যান্সডাউন রোডে এক উচ্চাঙ্গ-সংগীতাসরের আয়োজন করেছিলেন প্রতিষ্ঠান নেত্রী সুরশ্রী কল্যাণী রায়।

শিল্পী পরিচিতি ও উপস্থিত অভ্যাগতদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনে ছিলেন শ্রীঅপ্রিয়া মুখোপাধ্যায় ও কল্যাণী রায়।

শ্রীমতী রত্নেন্দু ছাত্রী শ্রীলা মিত্রের সেতার দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তরুণ শিল্পীর 'হংসধ্বনি' রাগ পরিবেশনায় শিক্ষা ও অনুশীলনীর স্বাক্ষর প্রীতিদায়ক। কণ্ঠসংগীতে ছিলেন বোম্বের শ্রীমতী অনিমা রায়। এ'র অনুষ্ঠান তালিকায় ছিল পূরিয়া কল্যাণ রাগে খেয়াল, তেলেনা ও ঠুংরী। শিল্পীর সংগীত ধারণা যতখানি পরিণত পরিবেশনা তার সঙ্গে ঠিক সমমনস্কের সংগতি রাখতে পারে নি। উভয় শিল্পীর সঙ্গে তবলা ও হারমোনিয়াম সংগতে ছিলেন যথাক্রমে মানিক দাস ও শুভেন্দু কর্মকার।

রবীন্দ্র সদনের উদ্যোগে 'ভারতীয় সম্মেলক যন্ত্রসংগীত'-এর অনুষ্ঠান

রবীন্দ্র সদন সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় আসছে ১৭ জানুয়ারী, ৭১ তারিখে একটি ভারতীয় সম্মেলক যন্ত্রসংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রখ্যাত প্রবীণ সুরকার শ্রীতিমিরবরণ এবং উদীয়মান শিল্পী শ্রীভাস্কর মিত্রের উপর। এই প্রথম এ ধরনের অনুষ্ঠান করা স্থির হয়েছে।

সম্মেলক যন্ত্রসংগীতের ব্যবসায়িক সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার দিন এখনো আসেনি। কারণ, বিভিন্ন নৃত্য, নাট্য বা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নিজেদের শিল্পসৃষ্টি উপস্থাপনা করবার আমন্ত্রণ পেলেও ঐকতানগোষ্ঠী একমাত্র নিজেদের প্রযোজনা ছাড়া এ পর্যন্ত এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান করবার সুযোগ পেয়েছেন বলে জানা যায়নি। বিদেশে এই ধরণের সম্মেলক যন্ত্রসংগীতের শ্রোতা বা দর্শক সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু এদেশে ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্মেলক যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠান খুবই বিরল। অথচ মনে হয়, সাধারণ মানুষ সম্মেলক যন্ত্রসংগীত বিমুখ নয়। তাই রবীন্দ্র সদন সমিতি সম্মেলক যন্ত্রসংগীতের স্বকীয় উন্নতিবিধান এবং উপযুক্ত সমঝদার শ্রোতৃমণ্ডলী গঠনের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলার কথা

ঢাকের কাঠি অন্যের হাতে

চার বছর পর এশীয় ক্রীড়ার আর একটি অনুষ্ঠান এবারে হোলো। বলা বাহুল্য যে ভারত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। চতুর্বার্ষিকী এশীয় ক্রীড়ার পুনরনুষ্ঠান ও সেই প্রতিযোগিতায় ভারতের অংশ নেওয়া, সবই পুরানো ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। নতুন বলতে যে একটি ঘটনাকে চিহ্নিত করা যায় তা হলো, এশীয় ক্রীড়ায় যোগদান অন্তে স্বদেশে প্রত্যাগত ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সম্বর্ধনা।

এই সম্বর্ধনা জানানো হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এবং এই উপলক্ষ্যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিনিধিদের পিঠ চাপড়ে উৎসাহিত করেছেন।

আমাদের দেশে খেলাধুলোকে যে চোখে দেখা হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ক্রীড়াবিদদের সম্বর্ধনা জানানোর রীতিটি কিছুটা অভিনব। ক্রীড়াবিদরা উচ্চ ও উচ্চতর মহলের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তাঁদের মনোবল বাড়ে জানি। কিন্তু এশীয় ক্রীড়ার ঠিক পরেই ব্যাঙ্কক প্রত্যাগত দলটিকে সম্বর্ধনা জানানোর আয়োজনের সূত্রে শুধুই কি ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিনিধিদের মনোবল বাড়াবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল? না, সেই সঙ্গে অনুচ্চারিত কণ্ঠে এই কথা বলে বেড়াবার প্রয়াস পাওয়া হয়েছিল যে ব্যাঙ্ককে ভারতীয় ভূমিকা রীতিমতো সফল হয়েছে?

ভারতীয় ভূমিকা সফল হয়েছে এবং ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা যা করতে পেরেছেন তার জন্যে তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য, এই মনোভাবের তাগিদেই যদি শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্কক প্রত্যাগত প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে শিক্ষা মন্ত্রক এখনও ভুলের স্বর্গেই বাস করছে এবং সে স্বর্গ ছেড়ে বাস্তব দুনিয়ায় নেমে আসার ইচ্ছাও এই মন্ত্রকের নেই। ভুলের স্বর্গের বাসিন্দা সেজে থাকতেই যার এতো লোভ তারই হাতে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের বাঁচন মরণের প্রশ্নটিকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাঙ্কক যাত্রার মুখে যদি ক্রীড়া প্রতিনিধিদের বিদায় সম্ভাষণ জানানো হোত তাহলে সত্যিই ওঁদের মনোবল বাড়তো। কিন্তু প্রতিযোগিতা অন্তে বাড়তি মনোবলের যখন প্রয়োজন নেই, তখন ঘটা করে সম্বর্ধনা সভা সাজালে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন এই সম্বর্ধনা? কোন্ ভূমিকার মূল্যায়নে এমন সোচ্চার তারিফ?

ষষ্ঠ এশীয় ক্রীড়ায় ভারত এমন কি করেছে যে ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে ফেরামাত্রই সম্বর্ধনা জানাতে হবে? চার

অজয় বসু

বছর আগেকার সঙ্গে এবারের ভূমিকার তফাৎ কি, বস্তুতঃ?

চার বছর আগে ওই ব্যাঙ্ককেই পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ায় ভারত পেয়েছিল মোট একুশটি পদক। আর এবার পেলো পঁচিশটি। সংগৃহীত পদকের হিসেবে চারের তফাৎ থাকলেও এই ব্যবধানকে বড় বলে মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। যেহেতু ১৯৬৬ সালের অনুপাতে অন্ততঃ বিশজন বাড়তি প্রতিযোগীকে এই ১৯৭০-এ ব্যাঙ্ককে পাঠানো হয়েছিল। বাড়তি এই বিশজনকে যদি ১৯৬৬তে ব্যাঙ্ককে পাঠানো হোত তাহলে সেদিন ভারতের সংগ্রহশালায় আরও চারটি পদক জমা পড়তো কিনা তাই বা কে বলতে পারে। সুতরাং পদক বেশি পাওয়া গিয়েছে এই ধারণায় আহ্লাদে আটখানা হয়ে ব্যাঙ্ককে প্রেরিত প্রতিযোগীদের বাড়তি সংখ্যার দিকে চোখ বুজে থাকাটা ঠিক হবে না।

১৯৬৬তে ভারত হকিতে স্বর্ণপদক পেয়েছিল। এবারে জুটলো রূপো। এই নজীরকে কি বলবো? ভারতীয় হকির উজ্জ্বলতর ভূমিকা? বিভিন্ন মহল থেকে বলার চেষ্টা হচ্ছে যে, ফাইনালে হারলেও ভারত ভাল খেলেছিল। তাই ভারতীয় হকির ভূমিকা আগের অনুপাতে অনুজ্জ্বল এমনটি যেন মনে না করা হয়। তাই যদি হয় তাহলে ১৯৬৬-র ফাইনালে ভারত কি খুব ভাল খেলেছিল? অথচ স্বর্ণ সঞ্চয় করেছিল। তাহলে সেবারের সেই স্বর্ণ স্বীকৃতি ঘিরে উচ্ছ্বাস ও আনন্দে গলা ফাটিয়ে চীৎকার জোড়া হয়েছিল কেন?

খেলায় হার হারই, জিৎ জিৎই। ভাল খেলে হার যে কি বস্তু তা আমার জানা নেই, যেমন জানা নেই সোনার পাথরবাটি কি চীজ! জিততে হলে ভাল খেলতে হয়, স্টিক হাতে ড্রিব্‌লিং করা, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা, গোলের সুযোগ সৃষ্টি করে সেই সুযোগের অপচয় ঘটানো—এসব ভাল খেলার লক্ষণ নয়। ভাল খেলা তাকেই বলে যে পদ্ধতি অনুসরণে বিপক্ষকে ফাঁদে জড়িয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। আমাদের হকি দল ব্যাঙ্ককে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি। কাজেই খেলা ভাল হয়নি। মানে ফলপ্রসূ হয়নি। তবে অপেক্ষাকৃত তরুণ দল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কিছুটা প্রতিশ্রুতি হয়তো জাগিয়ে থাকতে পারে।

ষষ্ঠ এশীয় ক্রীড়ায় যে ভারতীয় দলটি সত্যিই অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেছে তা হলো ওয়াটারপোলো টিম। শুনেছি যে সব সেরা পর্যায়ের খেলোয়াড়ের এই দলে ঠাঁই মেলে নি। নির্বাচনে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব হয়েছে। তবু ভারতীয় ওয়াটারপোলো দল ব্যাঙ্কক থেকে রূপো নিয়ে ফিরেছে। ১৯৫১ সালের পর থেকে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্তারা বলে আসছিলেন যে আমাদের ওয়াটারপোলোর মান নীচু। এই অপবাদ যে মিথ্যা

প্রচার তারই প্রমাণ এবারে পাওয়া গেল। বহু দিনের এক মিথ্যে ধারণাকে যাঁরা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন, শুধু তাঁদেরই যদি সম্বর্ধনা জানানো হোতো, তাহলেও নয় শিক্ষা মন্ত্রকের অনুষ্ঠানের যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারতাম। কিন্তু সকাইকে রাজধানীতে ডেকে, মালা-চন্দনে আপ্যায়িত করে শিক্ষা মন্ত্রক সব যেন কেমন গুলিয়ে দেবার মতলব ফেঁদেছেন।

গত চার বছরে ভারতীয় ক্রীড়ার মান এশীয় মানের অনুপাতে আগে এগোয় নি এই সত্যকে চেপে রাখার জন্যে এই সম্বর্ধনার ব্যবস্থা নয় তো? শুধু প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় ভূমিকায় সাজানো রঙিন ছবিটিকে বারবার তুলে ধরা হলে হয়তো সাময়িক বাহবা চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে! কিন্তু তাই বলে কি সকলের চোখে এই-ভাবে ধুলো দেওয়া যাবে?

বেশি সংখ্যক অ্যাথলিট পাঠাবার সূত্রে এবার অ্যাথলেটিক্সে তিনটি বাড়তি পদক পাওয়া গেছে। কিন্তু ওদিকে অ্যাথলেটিক্সে স্বর্ণপদক সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় ভারতকে এবার একধাপ পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। নজীরটি লক্ষ্য করে অনেক দুঃখেই বিখ্যাত অ্যাথলিট মিলখা সিং বলেছেন—'এর আগে প্রতিবারই আমাদের অ্যাথ-লিটেরা অন্ততঃ পাঁচটি করে স্বর্ণপদক পেয়ে আসছিলেন। এবারই প্রথম চারটি খেতাব আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো! সোনা কমলো, রূপো বাড়লো। তাহেই কি বুঝতে হবে যে এশীয় মানের পরি-প্রেক্ষিতে আমাদের অ্যাথলেটিক মানের গতি ঊর্ধ্বমুখী? এবং তার জন্যে অ্যাথ-লিটদের সম্বর্ধনা জানানো দরকার?

১৯৬৬তে ভারতীয় কুস্তিগীরেরা একটি রৌপ্য ও পাঁচটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে-ছিলেন। এবারে পেলেন সব মিলিয়ে পাঁচটি—আগের বারের অনুপাতে একটি কম। এতে আফশোষ নেই যেহেতু আগের বারে মল্লক্রীড়ায় যা পাওয়া যায় নি সেই স্বর্ণপদক নিয়ে ফিরেছেন মাস্টার চাঁদগীরাম।

ফুটবলে ও পালতোলা নৌ চালনায় একটি করে ব্রোঞ্জ পাওয়া মন্দের ভাল। সাঁতার, সাইক্লিং, বাস্কেটবলে কোনো পদক আসে নি এবং মুষ্টিযুদ্ধে স্বর্ণসমেত দুটি পদক ভারতীয়েরা পেলেও আগের বারের অনুপাতে এ বিভাগে স্থিতাবস্থাই বজায় থেকেছে।

এক আধটি পদক এদিক ওদিক হলেও সমষ্টির বিচারে বলা যায় যে, সদ্য সমাপ্ত ষষ্ঠ এশীয় ক্রীড়ায় ভার-তীয়েরা শুধু স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই পেরেছেন। তার বেশি কিছু করা সম্ভব হয় নি। গত চারের পদক ছিল ব্যাংককে যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল তার প্রায় সবকটি বিভাগে যোগ দিয়ে ভারত সবসমেত পঁচিশটি পদক সংগ্রহ করতে পেরেছে। এতো বড় দেশ আমাদের এই ভারতভূমির সামর্থ্য মাত্র পঁচিশটি পদকে সীমাবদ্ধ রয়েছে জেনেও যাঁরা আমাদের ক্রীড়া প্রতিনিধিদের সাদর সম্ব-র্ধনা জানাতে এবং আমাদের ক্রীড়াকর্ম-কর্তাদের পিঠ চাপড়াতে কুণ্ঠাবোধ করেন না তাঁদের আদিখ্যেতা আকাশ সমান। এই অন্ধ মনোভাবের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে ভারতীয় ক্রীড়ার ভবি-ষ্যত বলে কিছুই থাকবে না। চিরায়ু কর্ম-কর্তাদের চক্রান্তে যেভাবে চলছে তাতে ভবিষ্যত বলতে যে কিছু আছে তাই মনে করা যায় না। কর্মকর্তারাও নিজেদের ঢাক নিজেরাই বাজিয়ে চলেছেন। এরপর সরকারী প্রশাসকেরা যদি ঢাকের সেই কাঠিগুলি নিজেদের হাতে তুলে নেন তাহলে গোদের ওপর বিষফোড়ার যন্ত্রণাই শুধু বাড়বে। গোদের ভার বিন্দুমাত্রও লাঘব হবে কি?

খেলাধূলা

দর্শক

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা

'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সাংবাদিক জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন (সি-এ-বি) ইডেন উদ্যানে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। এই সভায় এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্মারক হিসাবে তাঁকে একটি রূপোর থালা এবং মানপত্র দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সি-এ-বি'র সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। এখানে উল্লেখ্য, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ দীর্ঘ দশ বছর বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন এবং বর্তমানে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান। তাঁর সভাপতি থাকার সময়ে এসোসিয়েশন নানা দিক থেকে সাফল্যের উচ্চ শিখরে উঠেছিল। সি-এ-বি'র সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন 'ক্রিকেটের পরিভাষায় সাংবাদিকতার দুর্ভাগ্যপূর্ণ দুরূহ উইকেটে কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে তুষারবাবু ৫০ রান করে আজও অপরাজিত আছেন এবং শতরান পূর্ণ করে তিনি যেন অপরাজিত থাকেন।'

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর হাস্যকৌতুক ভরা বক্তৃতায় সমবেত সকলেই প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। বাংলা দেশে ক্রিকেট খেলার ক্রমাবনতির কথা উল্লেখ করে তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বাংলার ক্রিকেট সংস্থা, সংশ্লিষ্ট ক্লাব এবং ক্রীড়ানুরাগীদের বাংলার ক্রিকেট খেলার উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং বাংলা 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে তাঁর সাংবাদিক-জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি দিচ্ছেন সি-এ-বি'র পক্ষ থেকে স্মারক হিসাবে রূপার থালা উপহার দিচ্ছেন।

নতুন অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে আড়াই মাসের ক্রিকেট খেলার সফর শুরু করবে। বোম্বাইয়ের অজিত ওয়াদেকার ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী এই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। অধিনায়ক নির্বাচন পর্বের শেষ দিকে দু'জন প্রার্থী ছিলেন—মনসুর আলি এবং অজিত ওয়াদেকার। ভারতবর্ষ মনসুর আলির নেতৃত্বে এ পর্যন্ত ৩৬টি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলে সাত বার জয়ী হয়েছে (হার ১৭ ও ড্র ১২)। ১৯৬১-৬২ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী হলে দলের সহ-অধিনায়ক মনসুর আলী দলের নেতৃত্বভার লাভ করেন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাঁর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ শেষ তিনটি টেস্ট খেলায় পরাজয় বরণ করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজ ধরে ৬ বছরে মনসুর আলীর নেতৃত্বে দশটি টেস্ট সিরিজ খেলেছে (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৭-৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা বাদে অধিনায়ক ছিলেন)। তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের জয় ২ (১৯৬৪ সালে ও ১৯৬৮ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে), পরাজয় ৫ (১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৬-৬৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ড ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে) এবং সিরিজ ড্র ৩ (১৯৬৪ সালে ইংল্যান্ড, ১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যান্ড)। ভারতবর্ষ মনসুর আলীর নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে বিদেশের মাটিতে প্রথম 'রবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছিল। মাত্র ২১ বছর বয়সে মনসুর আলী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অধিনায়কের পদ লাভ করেন। তাঁর আগে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই বয়সে কেউ অধিনায়ক নির্বাচিত হন নি। মনসুর আলীর পিতা পরলোকগত ইফতিকার আলী ১৯৪৬ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় [illegible] অধিনায়ক পদ [illegible] নজির আর মাত্র একটি আছে।

অজিত ওয়াদেকার

[illegible] ভারতীয় ক্রিকেট দলের [illegible] মনসুর আলীর পক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাওয়া সম্ভব হবে না যেহেতু তিনি আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে লোকসভার প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। হরিয়ানার গুরগাঁও নির্বাচন কেন্দ্রে মনসুর আলীর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট অধিনায়ক লালা অমরনাথ।

জয়পুরে ভারতবর্ষ বনাম উগান্ডার হকি টেস্ট খেলা আরম্ভের আগে রাজস্থানের অর্থমন্ত্রী শ্রীমথুরাদাস মাথুর উগান্ডার মহিলা হকি দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করছেন। ভারতবর্ষ ৬—১ টেস্টখেলায় (৪-১) রাবার জয়ী হয়েছে।

দলীপ ট্রফি

সেমি-ফাইনাল

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দলীপ ট্রফি আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে উত্তরাঞ্চল দলের থেকে ৫৬ রান বেশী করার সুবাদে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দলের এই প্রথম খেলা।

উত্তরাঞ্চল দলের অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী টসে জয়ী হয়ে পূর্বাঞ্চল দলকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম দিনের খেলায় পূর্বাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের ৪ উইকেটে খুইয়ে ২৪২ রান সংগ্রহ করেছিল। অম্বর রায় ৫০ রান এবং শ্যামসুন্দর মিত্র ২১ রান করে অপরাজিত ছিলেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে প্রকাশ পোদ্দার এবং গোপাল বোস ৮০ মিনিটের খেলায় দলের ৮১ রান তুলেছিলেন। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দলের অধিনায়ক রমেশ সাক্সেনা এবং অম্বর রায় তুলেছিলেন ৭১ রান। পোদ্দার ১৩৫ মিনিটের খেলায় তাঁর ৬৫ রান সংগ্রহ করে আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ৩১৩ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন রানের বাকি ৬ উইকেটে ৭১ রান যোগ হয়েছিল। খেলার বাকি সময়ে উত্তরাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেট খুইয়ে ১৭২ রান সংগ্রহ করে। সুরীন্দর অমরনাথ ৪০ এবং হায়দার আলী ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। দিলীপ দোশী ৪৮ রানে ৪টি উইকেট পান।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ২৫৭ রানের মাথায় শেষ হলে পূর্বাঞ্চল দল ৫৬ রানের ব্যবধানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় সুরীন্দর অমরনাথ (৮৬ রান) এবং হায়দার আলী (৭৪ রান) ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১৩৭ মিনিটের খেলায় দলের ১২৪ রান তুলেছিলেন। পূর্বাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ১১৯ রানের মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। সরজিৎ সিং উত্তর দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৯ রান করেন। খেলার সমাপ্তি ঘোষণার পর খেলা শেষ হতে মাত্র ৫৮ মিনিট বাকি ছিল। এই সময়ে উত্তরাঞ্চল দলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৬ রান সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। উত্তরাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ১২১ রানের (২ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে আয়োজিত দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতার অপর দিকের সেমি-ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল প্রথম ইনিংসে রান বেশী করার সুবাদে গত দু'বারের দলীপ ট্রফি বিজয়ী পশ্চিমাঞ্চল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। পশ্চিমাঞ্চল দলের অধিনায়ক চান্দু বোরদে টসে জয়ী হয়ে দক্ষিণাঞ্চল দলকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান।

দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা মোটেই শুভ হয়নি। মাত্র ১৩ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে যায়। প্রথম দিনের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৪৬ রান সংগ্রহ করে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান জয়ন্তীলাল ১১৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। হাতিয়া ৭৪ রানে ৩টি উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ৩৭১ রানের মাথায় শেষ হলে পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১০৭ রান সংগ্রহ করে। তাদের ১ রানের মাথায় ১ম এবং ১০ রানের মাথায় ২য় এবং ৩য় উইকেট পড়ে যায়। প্রধানতঃ আবিদ আলী ৩৪ রানে ৪টি উইকেট নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল দলকে কাবু করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল পশ্চিমাঞ্চল দল ২৬৪ রানের পিছনে পড়ে আছে।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১৮৬ রানের মাথায় শেষ হলে দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৮৫ রানে অগ্রগামী হয়। দক্ষিণাঞ্চল দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ১০২ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং পশ্চিমাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ৬৫ রানের (২ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

।। অসাধারণ লেখকের অসাধারণ প্রশ্ন ।।

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম

বাংলা পকেট বই

এই অভিযানে প্রথম সারির লেখকগণ :—

আশাপূর্ণা দেবী, অবধূত, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গ্রাহক করা চলিতেছে

প্রত্যেকটি নূতন উপন্যাস ॥ সওয়াশ পৃষ্ঠার বই ॥ মূল্য দুই টাকা ॥
গ্রাহকগণকে শতকরা কুড়ি টাকা হারে কমিশন ॥ এজেন্টদের বিশেষ সুবিধা ॥
পত্র লিখিয়া যোগাযোগ করুন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গন্নারবেগম (নূতন মুদ্রণ) ৯্ **না** ৩্ **কালিন্দী** (নূতন মুদ্রণ) ১০্
শুকসারী কথা ৮॥ **রাধা** ৮্ **অভিযান** ৭্

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

শিলাপটে লেখা ৮্ **স্বয়ংবৃতা** ৬্ **কাজীকর** ৮্
বিদেশিনী ৪্ **চলাচল** ৭্ **কাল তুমি আলেয়া** ১২॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে ১০্ **আমি কান পেতে রই** ১৪্
নারী ও নিয়তি ৩্ **মনে ছিল আশা** ৪॥

শঙ্কু মহারাজের
অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা

পঞ্চম-মুদ্রণ ।। মূল্য সাড়ে আট টাকা
(চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইতেছে)

আসন্ন প্রকাশ ।। নূতন বই

লীলা মজুমদারের আধুনিকতম উপন্যাস
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

পাখী এবার ফেরাও

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের
এক অসাধারণ রচনা ।। বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ

জঙ্গলে জঙ্গলে ৬্

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

১ম খণ্ড ॥ নূতন একাদশ মুদ্রণ ॥ কুড়ি টাকা
প্রকাশিত হইয়াছে

বিভূতি-রচনাবলী

৪র্থ খণ্ড ॥ ৫ম খণ্ড

জানুয়ারীর শেষে
প্রকাশের সম্ভাবনা

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২ : ফোন—৩৪-৮৭৯১ ॥ ৩৪-৩৪৯২

লাভ করুন

$6\frac{3}{4}\%$

5 বছরের
পোষ্ট অফিস মেয়াদী জমায়

3 বছরের জমায় $6\frac{1}{4}\%$ এবং 1 বছরের জমায় $5\frac{1}{2}\%$ সুদ পাবেন।

করমুক্ত সিকিউরিটি এবং অন্যান্য জমার সুদ
সমেত 3000 পর্যন্ত সুদের টাকায়
কর দিতে হবে না।

বিশদ বিবরণীর জন্য আপনার বাড়ীর কাছের পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিন।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

davp 70/370

সেরা বাংলা উপন্যাস

পিটার রঙ্গনাথম

সাদা শিকারী কালো শিকার

দাম নয় টাকা

নীলিমেশ রায়চৌধুরী

জ্যুলেরিমের নেপথ্যে

দাম—চার টাকা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুটবল খেলার আইনকানুন	৪·০০
ক্রিকেট খেলার আইনকানুন	৪·০০
খেলার রাজা ফুটবল	৫·০০

চিরঞ্জীব

ভারতীয় ফুটবল	৩·০০
র‍্যাবোর্ন থেকেই ইডেনে	২·০০

ভারত কন্যা কেরালা ৬·০০

সুদীন চট্টোপাধ্যায়

ভারত কন্যা কেরলা ৬·০০

কৃষাণু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরণীয় মানুষের স্মরণীয় প্রেম ১০·০০

নীললোহিত

দেখা না দেখা ৬·০০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরা নারী নগরী ৭·০০

নিগূঢ়ানন্দ

বাবু আর বিবি	১০·৫০
মজলিসওয়ালার নগরী	১২·০০

রণজিৎকুমার সেন

মহাকালের স্বাক্ষর ৮·০০

রমাপতি বসু

ভালবাসার রীতিনীতি	৬·০০
উর্বশীর নরক	৬·০০

তান্ত্রিকাচার্য ভৈরবানন্দ

বিজনতীর্থ সীতাকুণ্ড ৯·০০

অবেশ দেও

ভারতের নায়িকা ৬·০০

ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশান্ত মধুকর ৭·০০

জ্ঞানতীর্থ

১, বিধান সরণী, কলিকাতা-১২

১০ম বর্ষ | ৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৮শ সংখ্যা | মূল্য ৪০ পয়সা

Friday 22nd January, 1971 | শুক্রবার, ৮ই মাঘ, ১৩৭৭ | 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৯৪৮	চিঠিপত্র		
৯৫০	সাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
৯৫২	কৃষি বিপ্লব ও বিজ্ঞান		—শ্রীনাসিরুদ্দিন মুখোপাধ্যায়
৯৫৫	সম্পাদকীয়		
৯৫৬	তোমারই হউক জয়		
৯৫৭	সুভাষ-জীবনে দ্বৈতবাদ		—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
৯৫৯	টিরানোসোরাই	(কবিতা)	—শ্রীবিষ্ণু দে
৯৫৯	জলের চৈতন্য কেন্ট	(কবিতা)	—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৬০	আমার কথা		—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
৯৬৪	স্বদেশে প্রত্যাবর্তন	(গল্প)	—শ্রীমিহির আচার্য
৯৬৯	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৭০	মুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
৯৭৩	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৭৯	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৯৮০	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৯৮৬	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৯৮৯	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্দিৎসু
৯৯১	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৯৯৩	খরা	(গল্প)	—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৯৯৯	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
১০০১	পিঞ্জর	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
১০০৮	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
১০০৯	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
১০১১	কে সে	(গল্প)	—শ্রীগোষ্ঠ শেঠ
১০১৪	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
১০১৯	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
১০২০	খেলার কথা		—শ্রীকমল ভট্টাচার্য
১০২১	স্মরণীয় ক্রিকেটার ডন ব্র্যাডম্যান		—শ্রীপ্রবীর ঘোষ
১০২৩	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম বসু রায়

VANGUARD

JHAMAPUKUR HOSIERY-CAL-9

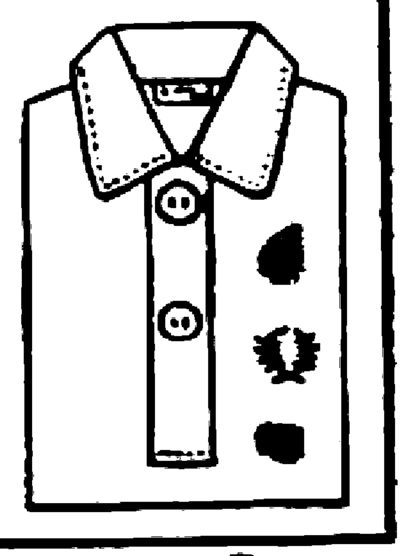

★ COOLTY & TURKISH

★ WHITE & COLOURED

★ ALL SIZES AVAILABLE

JHAMAPUKUR HOSIERY FACTORY (PRIVATE) LTD

22/A, Kalidas Singha Lane, Calcutta-9. 35-4832

চিঠিপত্র

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' প্রসঙ্গে

বিগত ৩৫শ সংখ্যা 'অমৃতে' সারদা-মঙ্গলের আলোচনা প্রসঙ্গে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর চিঠিটির প্রতিবাদে আশিসকুমার রায়ের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সারদামঙ্গল কাব্যটি যে 'খণ্ড গঠিত কবিতা' এবং 'আত্মসর্বস্বতায় পূর্ণ' এ বিষয়ে আশিসবাবু দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দ্বিমত না হওয়ার কতগুলো কারণ উপস্থাপন করতে চেষ্টা করছি।

সারদামঙ্গল কাব্য বিহারীলালের মানসলক্ষ্মীর বন্দনা গান। বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়ে কবির আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মনিবেদন। কবিচিত্ত এখানে কেন্দ্রবাসিত প্রধান চরিত্র, কিন্তু আলম্বন বিভাব সারদা'। এই সারদাকে অবলম্বন করেই বিরহমিলনের পালাগান রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হইবে না।" কিন্তু বিহারীলালের নিজেরই কথায় জানা যায় খণ্ড কবিতারূপে 'সারদামঙ্গল' পরিকল্পিত হয়নি। কবি বেদনাময় কবিচৈতন্যের প্রকাশে, সঙ্গীতের সুরের আবেশে এবং রোমান্টিক কবি-কল্পনায় সারদামঙ্গলকে গীতিকবিতার ভাবস্পন্দনে জাগিয়ে তোলার জন্য সারদাকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-স্তরে রেখে কাব্য-সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু অরূপ ভাবকে কবি স্পষ্ট রূপমূর্তি দান করতে পারেন নি। তাঁর Mysticism-ই এর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রহস্যধ্যানে নিমগ্ন হয়ে কাব্য সৃষ্টি না করে কবি কাব্য-লক্ষ্মীরই আরতি করেছেন। কিন্তু কাব্যে শুধু রহস্য থাকলেই চলে না, কবিকে কাব্য-সৃষ্টি দ্বারা সেই রহস্যকে রসরূপে প্রকাশ করতে হবে। বিহারীলালের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাইতো মোহিতলাল মজুমদারকে বলতে শুনি, 'এইজন্য বিহারীলালের কাব্য হইতে অতি উৎকৃষ্ট বিচ্ছিন্ন শ্লোক বা শ্লোকসমষ্টি উদ্ধার করা যত সহজ ভাবে ও আকারে একটি সম্পূর্ণ কবিতা সংগ্রহ করা তার তুলনায় কঠিন।' এই প্রসঙ্গে তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি দিলে যে বক্তব্যটি আরো স্পষ্টতর হবে: 'এই শ্রেণীর গীতি-কবিতায় যে ভাবগুলির অবতারণা করা হয় সেগুলি স্ফটিকের ন্যায় এমন স্বচ্ছ হয় যে সেই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া মূল কাব্যের কেন্দ্রানুগ মর্মটি সহজেই দেখা যায়।...তাই এই কাব্যেও ভাবকে ঠিক তত্ত্বখানি পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ করিয়া উপস্থাপিত করা উচিত ছিল এবং তাহা হইলে বিভিন্ন ভাব-দর্পণে মূল তত্ত্বের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারিত। কিন্তু সারদামঙ্গল কাব্যে বিহারীলাল যে ভাবগুলি উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেগুলি অলৌকিক দর্পণ নয়, লৌকিক মৃৎপিণ্ড; ইহার উপর প্রতিবিম্ব পড়ে না।'

রণজিৎ দেব
শিবমন্দির, জলপাইগুড়ি

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা
লেখকের বক্তব্য

এবারের শারদ সাহিত্য বিষয়ে অমৃতে আমি কয়েকটি আলোচনায় সূত্রপাত করেছিলাম মাত্র। অনেক কবি-সাহিত্যিক, পাঠক-পাঠিকা সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে প্রমাণ করেছেন আমাদের এই সমস্যাসঙ্কুল সময়েও সাহিত্য জীবনযাপনের এক অপরিহার্য অঙ্গ, নিছক সময় কাটানোর উপকরণ নয়। উৎসাহব্যঞ্জক আলোচনা করে পরিপূরক বক্তব্য রেখে অনেকে এই জাতীয় আলোচনার গুরুত্ব ও দায়িত্বের প্রতি আমার আস্থাকে সুদৃঢ় করেছেন। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এবারে ভালো লিখেছেন এমন কোন বিশেষ কবি-সাহিত্যিকের উল্লেখ না-থাকাটা আমারই ত্রুটি, তেমনি তরুণতর কবিদের মধ্যে যাঁরা ভাল লিখেছেন তাঁদের আরও অনেকের উল্লেখও বাঞ্ছনীয়। মফস্বল বাংলা, উত্তর বঙ্গ ও বহির্বঙ্গের পত্র-পত্রিকার বিষয়ে আরও বিস্তৃত তথ্যবহুল আলোচনা করতে পারলে সন্দেহ নেই আমার আলোচনা ব্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ হতে পারত। পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে কবি-লেখক বা পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করে উক্ত আলোচনার অসম্পূর্ণতার দিকটা সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের উৎসাহ ও কর্তব্যবোধ সাহিত্যের প্রতি অসীম আগ্রহ ও শ্রদ্ধারই পরিচায়ক। এই জাতীয় সামগ্রিক সাহিত্য পর্যালোচনায় যেখানে পরিশ্রমের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, তথ্যাদিও যেখানে বহু বিস্তৃত ও ব্যাপক, সেখানে কোন একটি রচনা-ই সম্পূর্ণতার দাবি করতে পারে না। উৎসাহী সচেতন সাহিত্যরসিক পাঠক-পাঠিকার সময়োপযোগী অংশ গ্রহণেই তা অনেকাংশে সম্পূর্ণ ও যথাযথ রূপ লাভ করতে পারে। আমার আলোচনায় বর্তমান সময় ও সমাজ জিজ্ঞাসায় রূপ সাহিত্যে কতটা কি প্রতিফলিত হয়ে চলেছে সেই সাধারণ প্রশ্নটা তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ভিন্ন কোটির সাহিত্য-ভাবনাও যথাযোগ্য মর্যাদাসহ স্থানলাভ করেছে। চেষ্টা ও আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ও বাংলার বাইরের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সবগুলি পড়া সম্ভব হয়নি। আদৌ সম্ভব কিনা তাও বিবেচ্য। সব কবি সাহিত্যিকদের নামোল্লেখও কি সম্ভব! কয়েকটি পত্রিকা আমার বিলম্বে হাতে পাওয়ার দরুণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উল্লেখ করা যায়নি। আমার দিক থেকে এইটুকু বলার কথা যে, কোন লেখক, পত্রিকা বা পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রতিই আমার অনাগ্রহ নেই।

পর্যবেক্ষক
কলিকাতা—৩

মুখের মেলা

আব্দুল জব্বারের 'মুখের মেলা' যতই পড়ছি, উত্তরোত্তর মুগ্ধও হচ্ছি তত বেশী। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে এমন তথ্যবহুল, সরস ও উপভোগ্য রচনা আস্বাদন করেই এই মুগ্ধতা। প্রতিটি রচনাই পল্লীবাংলার মানুষ ও প্রকৃতির তাজা স্পর্শে ভরা। শুধু তাই নয়, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে লেখকের পরিচয়ের প্রগাঢ়তাও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়—এবং এই প্রগাঢ়তার জন্যই লেখাগুলি এত জীবন্ত, এত প্রাণবন্ত। লেখকের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব সত্যিই প্রশংসনীয়।

জব্বার সাহেবের বর্ণনার ভাষা খুবই সহজ সরল, তাজা এবং ঝরঝরে। তাঁর বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যেও সরলতা বিদ্যমান।

এই প্রসঙ্গে অমৃত পত্রিকার গত ২৩শে পৌষ সংখ্যায় 'চিঠিপত্রে' প্রকাশিত মধু বসু মহাশয়ের 'মুখের মেলা' শীর্ষক চিঠি পড়ে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে তাঁর বক্তব্যের আমি প্রতিবাদ করছি। লেখক তাঁর রচনাগুলিতে যে রসের পরিবেশনে এমন কিছু বাড়াবাড়ি করেন নি যাতে মূল রচনার রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটে, কিম্বা এই সব সরেস রচনার মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয়। আর একথা তো ভাবাই যায় না যে লেখক পাঠকের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য যৌনরসকে টনিক হিসেবে ব্যবহার করছেন।

আব্দুল জব্বার মহাশয়ের লেখাগুলির কোনো কোনোটায় সামান্য কিছু দোষ আছে বলে আমার মনে হয়। গ্রামবাংলার সমাজ-চিত্রকে গল্পের আকারে পরিবেশন করতে গিয়ে তিনি কোথাও কোথাও কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন; ফলে কোনো কোনো রচনা কিছুটা কৃত্রিম বলে মনে হয়।

পল্লীবাংলার দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত নানান ধরনের মানুষ, তাঁদের আচার-

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

ব্যবহার এবং সেখানকার প্রকৃতিকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য কিছুটা দুর্বলতা সত্ত্বেও লেখাগুলি খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং মূল্যবানও বটে। এই লেখাগুলি অমৃত পত্রিকায় উপস্থাপিত করার জন্যে লেখককে জানাই অকুণ্ঠ সাধুবাদ, ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক মহাশয়কেও।

কল্যাণ ঘোষ
আশুতোষ কলেজ, কলকাতা-২৬

মৈমনসিংহ-গীতিকা

কিছুদিন পূর্বে আপনার সম্পাদিত 'অমৃতে' ব্যোমকেশ মজুমদার শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উপর অযথা দোষারোপ করেছেন, তিনি গীতি সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের প্রাপ্য যশোপহারক বলে।

এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেছেন—গীতিকারের কাহিনী ও আঞ্চলিক শব্দসমূহের অযথা সংস্কার সাধনের জন্যে।

এই বিষয়ে বাগ্বিতণ্ডায় না করে তাঁকে অনুরোধ করছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মৈমনসিংহ-গীতিকার (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) ভূমিকা অংশটি পাঠ করতে। তাহলেই তিনি তাঁর অভিযোগের উত্তর পাবেন।

সুনীল পাল
কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' শীর্ষক চিঠিতে লীলা রায়ের বক্তব্যের সঙ্গে অনেকাংশে একমত না হতে পেরেই এই চিঠি লিখছি।

মাননীয়া লেখিকার মতে অমৃতে মফঃস্বলের পাতা নাম দিয়ে মফঃস্বলের লেখকদের জন্য দু তিনটে পাতা জুড়ে দিলে মফঃস্বলের লেখক-লেখিকাদের সুবিধা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় লেখককে, ইনি মফঃস্বলের লেখক বা ইনি শহর কলকাতার লেখক, এইভাবে ভাগ করা অন্যায়। লেখকের মান এইভাবে বিচার করলে লেখকের রচনায় অবিশ্বাসী হয়ে পড়তে হয়। হ্যাঁ, মফঃস্বলের লেখকদের অগ্রাধিকার দিতে রাজী হওয়া উচিত, কিন্তু তা বলে তাঁদের মাথায় 'মফঃস্বলের লেখক' এই রাজটীকা পরিয়ে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। বর্তমানে অনেক লিটল ম্যাগাজিনে এইরূপ টীকা পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে মফঃস্বলের লেখকদের। আমার সেইসব লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের কাছে এবং আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, মফঃস্বলের লেখকদের অগ্রাধিকার দিন, কিন্তু কোন রাজটীকা পরা করে তাঁদের পরাবেন না।

মুকুলেশ মুকুল
কৃষ্ণনগর

(২)

অমৃতের 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তির মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়ায় আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই প্রসঙ্গে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিটল ম্যাগাজিন ও এর গ্রাহক-লেখক সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে চাই। বলা বাহুল্য মফঃস্বল ও কলকাতার কোন লিটল ম্যাগাজিনেরই আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। এগুলি প্রধানত বিজ্ঞাপনের টাকার উপর নির্ভরশীল। কোন লিটল ম্যাগাজিনেরই গ্রাহক-সংখ্যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার মত নয়। কিন্তু এজন্যে দায়ী কে? লিটল ম্যাগাজিনের যাঁরা গ্রাহক-পাঠক, তাঁদের অধিকাংশই আবার এর লেখক। খুব অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই কেবল পত্রিকা পাঠের উদ্দেশ্যে লিটল ম্যাগাজিনের গ্রাহক হন। লিটল ম্যাগাজিনগুলি গ্রাহকদের লেখা প্রকাশে অগ্রাধিকার দেয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই তরুণ লেখকগণ আত্মপ্রকাশের তাগিদে লিটল ম্যাগাজিনের গ্রাহক হন। লিটল ম্যাগাজিনগুলির অনিয়মিত প্রকাশ এবং হঠাৎ কোন না কোন লিটল ম্যাগাজিনের অপমৃত্যু ঘটায় অনেকে এর গ্রাহক হতে সাহস পান না। অনেক সময় লিটল ম্যাগাজিনগুলি গ্রাহক সংগ্রহ করার জন্য চাতুরীর আশ্রয় নেয়। কোন কোন লিটল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রের মাধ্যমে লেখা আহ্বান করেন এবং লেখার সংগে অতি অবশ্য ডাক-টিকিট প্রেরণ করতে বলেন। কিন্তু মূল্যের বিষয় প্রেরিত ডাক-টিকিটে লেখককে লেখা সম্পর্কে কোন মতামত না জানিয়ে স্ব-স্ব পত্রিকার গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হয়। আমার বক্তব্য, লেখকের থেকে এভাবে আত্মপ্রচার করা কেন? শুধু তাই নয়, লিটল ম্যাগাজিনের গ্রাহক হলেও পত্রিকা প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই বলি, লিটল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ যদি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন এবং গ্রাহকদের পত্রিকা প্রাপ্তির (যথাসময়ে) কোন নিশ্চয়তা না থাকে তা হলে কেউই লিটল ম্যাগাজিনের গ্রাহক হতে উৎসাহিত হবেন না। লিটল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের এ-ব্যাপারে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বলে মনে করি। লিটল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের উচিত দুইটি সংখ্যা প্রকাশের মধ্যেকার ব্যবধান যথাসম্ভব হ্রাস করা।

অজিতকুমার দাস
হাওড়া।

(৩)

অমৃত পত্রিকার ৩৫শ সংখ্যায় 'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী লীলা রায়ের অমৃতযুগ সৃষ্টির আহ্বান নব-প্রজন্মের সম্ভাবনাপূর্ণ সাহিত্যিকদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করেছে সন্দেহ নেই। এ আহ্বানে সাড়া দিলে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'অমৃতের' ভূমিকা ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে। কিন্তু মফঃস্বলের লেখকদের জন্য আলাদাভাবে 'মফঃস্বলের পাতা' খোলার ব্যাপারটা যুক্তিযুক্ত নয়। এ যেন ভোজের নিমন্ত্রণে বারবাড়ির উঠানে পাতা পেড়ে কাঙালীভোজনের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় মফঃস্বলের লেখককুলের সায় থাকতে পারে বলে মনে হয় না। সম্ভবত তাঁদের সম্পর্কে শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকার অধিকাংশ সম্পাদকগণ যে ঔদাস্যের মনোভাব পোষণ করে থাকেন সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখিকার এই সহানুভূতিমাখা প্রস্তাব। দূর মফঃস্বল থেকে গল্প বা কবিতা সাধারণত ডাকযোগেই লেখকেরা পাঠিয়ে থাকেন এবং তাঁদের অনেকেরই শহরে এসে পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করার সুযোগ ঘটে ওঠে না। এ সুযোগ কলকাতার লেখকদের আছে। মফঃস্বলের লেখকদের ডাকযোগে পাঠানো রচনা অবহেলিত হবে, বিচিত্র কী। এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে সম্পাদকদের প্রতিবাদ যথারীতি মামুলী ও গতানুগতিক। আশা করব, এ গতানুগতিকতা থেকে অমৃত নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। আলাদা পাতা জুড়ে নয়, সবার সঙ্গে এক হয়েই মফস্বলী লেখকদের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ রচনা যেন যথেষ্ট পরিমাণে অমৃতের পাতায় আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়। তারাশঙ্করের জন্য 'মফস্বলের পাতা' খোলার প্রয়োজন ঘটেনি। মুক্তার সন্ধানে মুক্তাডুবুরী 'কল্লোলের' যে ভূমিকা,—প্রয়োজন সেই ভূমিকার। সেই প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে 'অমৃত' যুগসৃষ্টির কাজে অগ্রণী হোক, এ আশা সবার, আমারও।

রণজিৎ ভট্টাচার্য
কালেশ্বরধাম, বর্ধমান

[আমরা মফঃস্বলের লেখকদের রচনা সাগ্রহে পড়ি, এবং কোথাও প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর দেখলেই তা সত্বর সঙ্গে প্রকাশ করি। কেননা, 'অমৃত' প্রধানত নতুন লেখকদেরই কাগজ। অঃ সঃ]

CENTRAL LIBRARY

শাদা চোখে

আগামী ১ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬৭ সাল থেকে রাজ্য রাজনীতিতে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে সেই অস্থিরতার অবসানের জন্যে আর একবার গণআদালতের রায় নেওয়া হবে। অস্থিরতা মানুষের মনেও। কাজেই স্থিরতা আসবে কিনা বলা বড় কঠিন। সমস্যাজর্জরিত এই রাজ্যে সরকার যদি স্থায়ীও হয় তবে চট করেই সামাজিক অস্থিরতা কাটবে, এমন গ্যারান্টি দেওয়া শক্ত। তবু চেষ্টা করাও যে প্রয়োজন তাতে দ্বিমত নেই।

অতীত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মানুষ ভবিষ্যতের সমস্যার সম্মুখীন হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বর্তমানে অনেক অভিজ্ঞ তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই ভোটযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেও তাঁরা লক্ষ্যহীন হবেন না বলে আশা করা যায়। বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাঁরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণে ব্রতী হবেন। শ্লোগানের চাকচিক্যে ভুলে যদি পদস্খলন ঘটে তবে আবার অস্থিরতা আসবে। আর রাজনৈতিক অস্থিরতা আসলে সামাজিক অস্থিরতা আরও প্রবল হয়ে উঠবে। তবে একথাও মনে রাখা দরকার, অস্থিরতা সব সময়েই অখণ্ড নয়। অস্থিরতা অনেক সময়েই নয়া জমানার ইঙ্গিতবাহীও হয়ে থাকে। অস্থিরতা নতুন সৃষ্টির দ্যোতনা মাত্র। যে অস্থিরতা এই রাজ্যকে কাঁপিয়ে তুলেছে তার শুভদিক একটা আছে। সেটা হচ্ছে বাঙালী নতুন করে চিন্তা করছে। চিন্তাই নয়া পথের নিশানা দেয়।

এই রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হচ্ছে কংগ্রেসের একক শক্তি হিসাবে পতন, এবং তার বিকল্প হিসাবে যে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তার ব্যর্থতা। শ্রীঅজয় মুখার্জি ও তাঁর সহযোগীরা অদ্যাবধি সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেন নি। বরঞ্চ বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টির পথে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁরা সঞ্চয় করেছেন তাকে পরিহার করে যে নতুন পথ সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন জনসাধারণ সাগ্রহে তার পরিণতির দিকে নজর রেখেছেন।

১৯৬৭ সালেও পশ্চিমবঙ্গে তিনটি শিবির স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীমুখার্জি কংগ্রেস ত্যাগ করলেও তখনও কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিধানসভা ও লোকসভা আসনে সেদিনও লড়াই করতে বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেসের সেই শক্তি নেই। এখন কংগ্রেস সম্পত্তি খোঁজে ব্যস্ত। উদ্দেশ্য হৃত গৌরব নিজেদের পক্ষে কথঞ্চিৎ উদ্ধার করা। ক্ষমতা দখলের চিন্তা তাঁদের নেই এমন কথা ঠিক নয়, তবে এককভাবে সেই প্রচেষ্টা চালাতে কংগ্রেস যে ভরসা পাচ্ছে না আসন ভাগাভাগির মধ্যে সেটা সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের আর একটি অংশ যাঁরা এযাবৎকাল কংগ্রেস (আদি) বলে চিহ্নিত হয়ে আসছিলেন, অনেকেই তাঁদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে চিহ্নিত করছেন। তাঁদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু যাঁরা নির্বাচন কমিশনারের মতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বলে স্বীকৃত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও এ রাজ্যে শক্তির এমন সমাবেশ দেখছি না যার বলে তাঁরা তাঁদের চিহ্নিত সমাজতন্ত্রের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। কোয়ালিশান করার অর্থই হচ্ছে কনসেশান দেওয়া। আর ঐ কনসেশান কতটুকু দিতে পারলে কোয়ালিশান বজায় থাকে তার অনেক নজীর ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। যা হোক, বোধ হয় কনসেশান কম দেওয়ার জন্যই কংগ্রেস এই ভোটযুদ্ধে বাংলা কংগ্রেসকে প্রধান সহযোগী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আর তাঁদের অভীষ্ট পথ যাতে কণ্টকাকীর্ণ না হয় সেজন্য তাঁরা সমাজতন্ত্রী সমর গুহ, নরেন দাস, কাশীকান্ত মৈত্র ও ডঃ কৃপাল বসুর সহযোগী হাতগুলোকে সমাদরে গ্রহণ করেছেন। দেখা যাক, অবস্থা কি দাঁড়ায়।

বস্তুতপক্ষে, পশ্চিম বাংলার নির্বাচনে এবার তিনটি জোট গঠিত হয়েছে। ফ্রন্ট হিসাবে তিনটিই হচ্ছে। অবশ্য আরও অনেক দল নির্বাচনে লড়বেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ফ্রন্টের মধ্যে তিনটিই হবে মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। বাম কম্যুনিষ্ট নির্দেশিত বড়বাম ১৯৬৭ সালেও আলাদা ছিলেন। তবে সহযোগীদের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সেবার এস এস পি ও এস ইউ সি সমেত বামপন্থী ফ্রন্টের মধ্যে সি পি এমের সহযোগী ছিলেন। সমস্ত বামপন্থী দল, সেবার নির্বাচনের পূর্বে এক হতে পারেন নি। সেবারও তাঁদের মুখ্য শত্রু ছিল কংগ্রেস। এবারও বড়বাম ও অন্তবাম একই কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু মিলতে পারেন নি। কারণ, সেবার ছিল আসন ভাগাভাগির সমস্যা। এবার কিন্তু খানিকটা নীতিগত ও কৌশলগত সমস্যা তাঁদের পৃথকভাবে রেখেছে।

১৯৬৭ সালে যখন নির্বাচন আসে তখন দুই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের কোনটা আসল কম্যুনিষ্ট পার্টি বা কোনটা সবচেয়ে মিলিটান্ট বা ভাগাভাগির পর কার শক্তি বেশী এ সমস্ত বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা ছিল সর্বাধিক। ফলে, কে কিভাবে কাকে টেক্কা মারবে তার জন্য ছলে, বলে ও কৌশলে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কাজেই, আসন বন্টনের প্রশ্নে ১৯৬৭ সালে বামপন্থীরা ঐকমত্য হতে পারে নি। ফলে উফ্রন্ট ও পাফ্রন্টের জন্ম হয়েছিল। বর্তমানে আদি কংগ্রেস ও নবকংগ্রেসের মধ্যে যে বৈরীভাব গড়ে উঠেছে সেদিন দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে শত্রুতা এর চেয়েও অনেক বেশী ছিল। এখন যেমন আদি কংগ্রেস 'প্রতিক্রিয়াশীল', তেমনি সেদিন ছিল ডান কম্যুনিষ্টরা সংশোধনবাদী। তারপর, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই, কি সংশোধনবাদী কি 'বিপ্লবী' সকলেই এক হয়ে রাজভবনে গিয়ে হাজির হন। দাবী ছিল, উফ্রন্ট ও পাফ্রন্ট এক হয়েও গেছেন। ফলে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, অতএব তাঁদের সরকার গড়তে দিতে হবে। আর শ্রীঅজয় মুখার্জিকে ডেকে তখনি তার বন্দোবস্ত করা হোক। সেদিনকার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ইতস্তত করছিলেন, কারণ, নিয়ম হচ্ছে সরকার গঠনের প্রশ্নে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করলেও একক বৃহত্তম দলকে বা তার দলপতিকে ডেকে সরকার গড়তে সক্ষম কিনা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার। এ পন্থা পরিষদীয় গণতন্ত্রসম্মত। শ্রীমতী নাইডু কর্তব্যে অবহেলা করেন নি। কিন্তু সেদিন কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ সদম্ভে বলেছিলেন ১২৬টা আসন নিয়েই কংগ্রেস বিরোধী আসনে বসবে। তাঁর ধারণা ছিল বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী এতগুলো দল একত্রে সরকার চালাতে পারবে না। অতএব, ভেঙেই যাবে। তখন নির্বাচন পুনরায় অনুষ্ঠিত হলে কংগ্রেসকেই জনতা আবার সাদর আমন্ত্রণ জানাবে, আর পরিষদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে উজ্জ্বল। প্রথম ধারণা তাঁর সঠিক হলেও শেষোক্তটি ভুলই প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে দুই ফ্রন্ট এ কিন্তু

ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। কিন্তু সেদিনের কংগ্রেস নেতৃবর্গ শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে মিটমাট করে ফেললে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস আজও অপরিবর্তিত থাকত।

এবারও জোট বাঁধার গতি-প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কোন একটি জোটের পক্ষে কঠিনই হবে। এবারও দুই বামপন্থী জোট কংগ্রেসকে প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন। বাম কম্যুনিস্টরা তাঁদের কৌশলের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁরা কংগ্রেস (শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার দলসহ) স্বতন্ত্র-সিন্ডিকেট-জনসঙ্ঘের সমানভাবে বিরোধী। এস এস পি'র সঙ্গে তাঁদের কোন রফা হবে না, কারণ এস এস পি শেষোক্ত দলগুলির সঙ্গে আসনের ব্যাপারে সমঝোতা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরা কেন্দ্রে কি দুই শক্তিকেই হটাতে পারবেন? সে শক্তি তাঁদের হবে কি? কিন্তু তবুও রাজনীতিতে তাঁরা বিশুদ্ধবাদী হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যে বিশুদ্ধ লাইন বাম কম্যুনিস্টরা নিয়েছেন তার ফলে এবারকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর তাঁরা নিশ্চয়ই কোয়ালিশনের কথা তুলবেন না।

এসব বক্তব্য বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কোন মহলে ধারণা, এবারও নির্বাচনের পর দুই বামপন্থী জোট আবার একাত্ম হবে যাবে। তাঁদের আশা ফলবতী হবে না—এমন কথা যেমন জোর করে বলা যায় না, তেমনি আশা পূরণ হবে একথাও জোর দিয়ে বলা খুবই কঠিন। কারণ, এবারের অনৈক্য আদর্শগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাম কম্যুনিস্টরা চাইছেন, রাজনৈতিক প্রচারের চাপে তাঁরা অন্য দলকে সরিয়ে সংখ্যাধিক্য পাবেন। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি এই কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত বলেই শ্রীঅজয় মুখার্জির পদত্যাগের পর বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মিতালি করে আর সরকার গঠনে রাজী হন নি। সরকারে থেকে দলীয় প্রভুত্ব বিস্তারে বাম কম্যুনিস্টরা যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন অন্যান্য বামপন্থীরা এমন কি কংগ্রেসও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ, এটা তাঁদের প্রস্তাবের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাজেই এদিক থেকে অষ্টবাম ও কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস সমমতের অংশীদার।

এই বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনটি ফ্রন্টের জন্ম হয়েছে। কিন্তু এত বিভিন্নতা সত্ত্বেও তলে-তলে প্রত্যেকটি জোটই স্থানীয় ভিত্তিতে সমঝোতা করার চেষ্টা যে করছেন তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য, অধিক সংখ্যক আসনে জয়লাভ করা, এবং এই অভিপ্রায় নিয়েই সুযোগ বুঝে রাজনীতির ঘুড়ি চালান হচ্ছে। হালফিল কাশ্মীরের গণভোট ফ্রন্টকে বেআইনী ঘোষণা করার সঙ্গে-সঙ্গে ডান কম্যুনিস্টরা তার নিন্দা করে আসর জমিয়েছেন। এমন কি এই সুযোগে সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবকে পকেটস্থ করার জন্য তাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। বাম কম্যুনিস্টরাও বসে নেই। সৈয়দ সাহেব এখন দিল্লীতে। কিন্তু তাঁর বিবৃতি সংবাদপত্রে পৌঁছে গেছে। সৈয়দ সাহেব সেই বিবৃতিতে বলেছেন, কোনো প্রস্তাবিত ফ্রন্টের সঙ্গে তাঁর দল 'ফেডারেশন অফ মাইনরিটি এন্ড আদার কম্যুনিটিজ' যোগ দেওয়ার কথা আদৌ হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যখন দল গঠন করেন তখনই কাজেম আলি মীর্জার সঙ্গে এক সাংবাদিক বৈঠকে বদরুদ্দোজা সাহেব গদ-গদ কণ্ঠে বলেছিলেন যে, বাংলা দেশের চারটি মহান সন্তানের মধ্যে শ্রীঅজয় মুখার্জি অন্যতম। তাঁর মতে আর তিনজন ছিল—নেতাজী, দেশবন্ধু ও ফজলুল হক সাহেব। তারপর ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কথা হয় নি এমন নয়। কিন্তু সৈয়দ সাহেব তা অসত্য বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অন্য কথাই শোনালেন স্বয়ং কাজেম আলী সাহেব। তিনি বললেন—কথা হয়েছে—সৈয়দ সাহেবও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, এবং সেকথা দলীয় নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই হয়েছে। সৈয়দ সাহেবের এরকম মতিগতি পাল্টালো কেন? যাই হোক, আখেরে সৈয়দ সাহেব কি করেন দেখা যাক।

আবার আর এস পিকে নিয়েও রাজনৈতিক জটিলতা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবে আর এস পি নেতারা যাই বলুন না কেন—তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রন্টে না গিয়ে বড়বাম বা বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আসন ভিত্তিক একটু সমঝোতা করা। কিন্তু বাম কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত তাতে, শর্ত আরোপ করে বসলেন। এই শর্ত মানতে আর এস পি রাজী ছিলেন না এমন নয়। তাঁরা শুধু বলেছিলেন সংবাদটা গোপন রাখতে। কিন্তু শ্রীদাশগুপ্ত সেটা প্রচার করে দিলেন। ফলে, আর এস পি নেতারা বিপাকে পড়লেন। কিন্তু এর পরও তাঁদের নিষ্কৃতি দিতে রাজী হলেন না শ্রীসুন্দরায়া। ক্রুদ্ধভাবে জানালেন, কেরালায় আর এস পি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেটা মনে রাখা দরকার! এবং শুধু তাই নয় নতুন করে শর্ত দিয়ে জানালেন, সেই কেরালা ইউনিটের বিরুদ্ধে আর এস পি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর আর এস পি বাম কম্যুনিস্টদের সরকার গঠনে সাহায্য করে নি। স্বাভাবিকভাবেই শ্রীসুন্দরায়ার সন্দেহ জন্মাতে বাধ্য। তা সত্ত্বেও আর এস পি'র কিছু-কিছু নেতা নাকি তাঁদের আসন নিরাপদ করবার জন্য বাম কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে নিজেদের বন্ধু যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে কিছুকিছু কথাবার্তা বলছেন। এটা যদি করেই হয়ত শ্রীসুন্দরায়া আর এস পি'র কাছে সোজাসুজি সব জানতে চেয়েছেন। যা হোক, আর এস পি'র নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা সত্ত্বেও তলে-তলে দলের কতিপয় নেতা যে আলোচনা চালাচ্ছেন তা স্পষ্টই শোনা যায়। এমনি করে তলে-তলে অনেক স্রোতই বইছে। আর এই সমস্ত ফল্গু ধারার উপস্থিতি বোঝা যাবে তখনই যখন নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসবে। অষ্টবাম সম্বন্ধেও একথা খাটে। বাংলা ও জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

—সমদর্শী

'কালি ও কলম' অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি সংখ্যা) সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। পাঠক-পাঠিকাদের প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও দিতে না পারায় আমরা খুবই দুঃখিত। ঐ সম্বন্ধে এখনও কিছু কিছু লেখা আসছে। মাঝে মাঝে সেগুলো ছাপা হবে।

চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা **কালি ও কলম** পৌষ ১৩৭৭

সৎ ও সুন্দর সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা ও উপস্থাপনার বাহন

এই সংখ্যায় আছে জরাসন্ধ-র ধারাবাহিক উপন্যাস, অধ্যাপক ফণিভূষণ আচার্য-র 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : চর ইসমাইল থেকে গোলপার্ক', কাশীর 'উত্তরা' পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ' সাহিত্যিক ও সাংবাদিক গৌরচন্দ্র চক্রবর্তীর 'বিহার অরণ্যে বিভূতিভূষণ' যজ্ঞেশ্বর রায়ের উপন্যাসোপম রচনা 'স্বস্তয়েবাস্মি' ও দেবনারায়ণ গুপ্তের 'রঙ্গমঞ্চে পঞ্চকন্যা' অন্যান্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন : বানিক রায়, জিতেন্দ্রলাল নাথ, গন্ধরাজ, হরি মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুজয় ঘোষাল, আশিস সান্যাল, সুধীর করণ, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, বন্ডীধর গুপ্ত।

সাধারণ সংখ্যা ·৭৫ পয়, ষান্মাসিক ৪·৫৮, বার্ষিক ৯·০০

প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কৃষিবিপ্লব ও বিজ্ঞান

নন্দিতা মুখোপাধ্যায়

'কৃষি-বিপ্লব' যে আমাদের কালের একটি প্রধানতম যুগান্তকারী ঘটনা, তাতে আজ আর কারোরই বোধহয় সন্দেহ নেই। নানান রকম উপায়ের মাধ্যমে ফসলের ফলন বাড়ানোর প্রচেষ্টা বরাবরই হয়ে আসছে, কিন্তু সে উপায়গুলি ছিল সবই একান্তভাবে প্রকৃতিনির্ভর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির কবলে পড়ে সেই সব প্রচেষ্টা হত নিষ্ফল। কদাচিৎ কখনও পর্যাপ্ত ও সময়োচিত বর্ষণের সহায়তা পেলে তবেই কৃষক তার পরিশ্রমের ফসল নিশ্চিন্ত মনে ঘরে তুলতে পারত।

কিন্তু এ যুগের কৃষি বৈজ্ঞানিকের সাফল্যে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটেছে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অল্প সময়ে বেশী ফসল উৎপাদনের নিশ্চিত উপায় আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। কৃষি-বিপ্লব আজ সারা দুনিয়ায় সাড়া জাগিয়েছে, পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশই পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ করে খাদ্য সমস্যা প্রায় সমাধান করে ফেলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এখনও তা হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন আমাদের দেশের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকার্যের উপায়গুলিকে খুব অল্প জায়গাতেই কাজে লাগান হয়েছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি বিভাগের কর্ণধাররূপে যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকেরই এই নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক ও গবেষণামূলক কৃষিকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। আমাদের সবজান্তা প্রশাসক সম্প্রদায় তাঁদের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গজদন্ত মিনার থেকে নেমে এসে কৃষি বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পূর্ণ সহযোগিতা না করলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্য দেশগুলির সঙ্গে তাল রেখে কিছুতেই আমরা এগিয়ে যেতে পারব না।

ভারতের কৃষিজীবীদের সম্পর্কে একটা বদনাম খুবই সুপ্রচলিত, তাঁরা নাকি গতানুগতিক ধারার পক্ষপাতী, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা যে প্রথায় কৃষি কাজ করে গেছেন সে পথ ছেড়ে ভুলেও নাকি তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থা গ্রহণ করতে চান না। কিন্তু এ বদনাম যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তা বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। নতুন প্রথায় কৃষিকাজ যে সত্যিই অনেক বেশী লাভজনক এ সত্য যে সমস্ত কৃষকেরা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা এই নতুন প্রথা গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। গ্রামের কৃষককে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষ করার উপকারিতা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করাতে পারলে তবেই কৃষি-বিপ্লব সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারবে; তাই এই নতুন আন্দোলনের প্রথম থেকে সেই দিকেই দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

এতদিন জেলা কৃষি কর্মচারীর সঙ্গে সুদূর গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর কৃষকের যোগাযোগের সেতুর কাজটি করতেন গ্রামসেবকেরা। কিন্তু গ্রামসেবকদের কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্তই সীমিত, তা কৃষকদের এই নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলবার পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নয়। কাজেই শুধু তাঁদের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না, কৃষি বৈজ্ঞানিক ও মাঠের কৃষকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেগুলি এই যোগাযোগের পথই সুগম করে তুলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মসূচী প্রধানত ত্রিমুখী। শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রসারমূলক কাজ। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকেরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষিকার্য সংক্রান্ত সমস্ত রকম সমস্যার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং তার ফলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারমূলক কাজকর্মের শাখাটি, প্রয়োগশালার গবেষণার সুফলগুলিকে মাঠে-ময়দানে কাজে লাগাতে পারেন। প্রত্যেকটি রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যদি সেই অঞ্চলের জল-বায়ু ও জমি সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন এবং কৃষকদের মধ্যে সেই গবেষণার ফলাফলগুলি প্রচার করার কাজে যদি রাজ্য কৃষি বিভাগ পূর্ণ সহযোগিতা করেন তবেই কৃষি দপ্তর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষক সমাজের মধ্যে একটি সুদৃঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং তার দ্বারাই সেই,

অঞ্চলের কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটা সম্ভব হবে।

সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যাতে এক দল কৃষি বৈজ্ঞানিক কোন একজন কৃষকের কয়েক বিঘা জমিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফসল ফলিয়ে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখাবেন পূর্বপ্রচলিত প্রথার তুলনায় এই আধুনিক পদ্ধতিতে কত বেশী পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। সারা দেশের সমস্ত কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলিতেই এইভাবে কৃষিক্ষেত্রে নিজেরা কাজ করে বৈজ্ঞানিকেরা কৃষকদের নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলবেন। রাজ্য কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের সাহায্যে এবং আকাশবাণীর ঘোষণার দ্বারা বিশেষ পদ্ধতি প্রদর্শনের দিনগুলিতে আশে-পাশের সমস্ত কৃষকদের সেই নির্দিষ্ট কৃষিক্ষেত্রের পাশে সমবেত করা হবে, যাতে তাঁরা স্বচক্ষে দেখে অধিক ফলনশীল ফসল চাষের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রত্যেকটি ধাপ ও তার প্রয়োগ-কৌশল শিখে নিতে পারেন।

এই সমস্ত কাজকর্মের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে হবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে কৃষি বিভাগ ও কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে বেশ একটা সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে নি। এই সহযোগিতা গড়ে তোলার ব্যাপারে রাজ্য কৃষি ও পশুপালন দপ্তরের নির্দেশকদের দায়িত্ব যথেষ্ট। তাঁদের মধ্যে একাধারে প্রশাসন ও নির্দেশন ক্ষমতা এবং নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই দু দিকের কোন একটি দিকেই যদি ঘাটতি থাকে তাহলেই কাজকর্ম সুসমঞ্জসভাবে চলতে পারে না। কাজেই ভারত প্রশাসন কৃত্যক (আই-এ-এস) থেকে এসে কোন কর্মচারী যখন কৃষি বিভাগের পরিচালক হয়ে বসেন তখন অনেক সময়েই আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকর্ম সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতার ফলে গবেষণা ও প্রসারমূলক কাজকর্মের অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়। কৃষি বৈজ্ঞানিকদের যদি প্রয়োজনীয় প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থায় তাদের কিছুদিন ট্রেনিং দিয়ে বিভাগ পরিচালনার ভার অর্পণ করা যায় তাহলে মনে হয় রাজ্য কৃষি বিভাগ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষির উন্নতি-কল্পে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারবে, আমলাতান্ত্রিক লালফিতার ফাঁসে জড়িয়ে পদে-পদে কৃষির অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীরা অনেক সময়েই সাধারণ কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে অপারগ হন এবং প্রায়ই তাঁদের কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের উপদেশ ও নির্দেশের ওপর নির্ভর করে কাজ চালাতে হয়। যে সব সমস্যা রাজ্যের কৃষি দপ্তরের নির্দেশেই সমাধান হয়ে যাওয়া সম্ভব, সেগুলিও প্রায়ই অযথা বিলম্বের ফলে আরও জটিল হয়ে ওঠে শুধু মাত্র এই কারণে যে, যাঁরা সমস্যার গুরুত্ব বুঝে তার সমাধান করতে সক্ষম তাঁদের হাতে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, আর যাঁদের হাতে আদেশ-নির্দেশ পরিচলনা সব কিছুর ক্ষমতা অর্পিত তাঁদের সমস্যার গুরুত্ব বুঝবার মত প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান নেই। রাজ্য কৃষি দপ্তরের সর্বোচ্চ স্তরে প্রশাসন দক্ষতা এবং প্রযুক্তিকৌশলের মণিকাঞ্চন সংযোগ খুব কমই ঘটে থাকে।

প্রযুক্তিবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে যখন কোন প্রায়োগিক (টেকনিক্যাল) বিভাগের ভার ন্যস্ত হয় তখন কত রকম অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার দু-একটি উদাহরণ দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

বেশীদিনের কথা নয়, কোন একটি অনগ্রসর রাজ্যের জনৈক অতিউৎসাহী ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হুকুম জারী করলেন সেই বছরের শঙ্কর ভুট্টার সমস্ত ফসল পরের বছরের চাষের জন্য বীজ হিসাবে রেখে দিতে হবে। কিন্তু এই বীজ থেকে চাষ করলে পরবর্তী ফসলে শঙ্করত্ব আর বজায় থাকবে না এবং সেই কারণে উৎপাদনী শক্তিও যথেষ্ট হ্রাস পাবে. এ কথাটা বুঝিয়ে দেবার মত জ্ঞান যে সব কৃষিবিদ কর্মচারীদের ছিল, তাঁরা কমিশনার সাহেবের দাপটে মুখ খুলতেই পারেন নি।

পূর্বাঞ্চলের কোন একটি রাজ্যে তখন কৃষি বিভাগের নির্দেশকের পদে জনৈক আই-এ-এস কর্মচারী, সেই সময় সেখানে অধিক ফলনশীল তাই চুং ধানের চাষে এক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। সমস্ত কৃষি-ক্ষেত্রেই ধানগাছগুলি হলদে ও নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল, স্থানীয় কৃষি কর্মচারী ভেবেছিলেন রোগটা এক রকমের বীজাণুর আক্রমণ, যার আজ পর্যন্ত কোন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই ধান চারাগুলি বাঁচাবার বিশেষ কোন চেষ্টাই হল না। পরে খবর পেয়ে দিল্লী থেকে বিশেষজ্ঞেরা গিয়ে দেখলেন স্থানীয় কর্মচারীরা রোগ নির্ণয়ে ভুল করেছিলেন, রোগটা দুরারোগ্য মোটেই ছিল না। আসলে এক ধরনের পোকার আক্রমণ ঘটেছিল এবং এই আক্রমণের প্রথম অবস্থাতেই কিছু কীট-বিনাশক ওষুধ ছড়াতে পারলেই অধিকাংশ ফসলই বাঁচান যেত। বিপদ হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ রাজ্যেই জেলায় ও গ্রামে কৃষি বিভাগের যে সব কর্মচারীরা কাজ করেন, তাঁরা অত্যন্ত সীমিত ও পুঁথিগত জ্ঞান নিয়েই কাজ চালিয়ে যান। প্রতিদিন যে কত নতুন নতুন আবিষ্কার কৃষি বিজ্ঞানকে কি বিপুল অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ তাঁরা বিশেষ রাখেন না। কৃষির

অভিধান সিরিজ

SAMSAD
ENGLISH—BENGALI
DICTIONARY

(সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ)

* সর্বব্যবহারীর উপযোগী উচ্চমানের পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ। * অধুনা প্রচলিত শব্দসংকলন * ইংরেজী ও বাঙলায় উচ্চারণ-সংকেত * ইংরেজীতে প্রয়োগের উদাহরণ ও বাঙলায় শব্দার্থ। পৃ ১২৭২+১৬। [টাঃ ১৫·০০]

SAMSAD BENGALI-ENGLISH DICTIONARY

পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গালা-ইংরেজি অভিধান। অর্ধ লক্ষাধিক শব্দ ও শব্দসমষ্টি। পৃঃ ১২৮৭+৪। [টাঃ ১২·০০]

SAMSAD LITTLE ENG BENG DICTIONARY

ত্রিশ হাজারের অধিক শব্দ ও শব্দসমষ্টি। সর্বদা ব্যবহারের উপ-যোগী আয়তনে। মজবুত অথচ পাতলা কাগজ। পৃ ৮২০+১২। [বোর্ড বাঁধাই টাঃ ৭·৫০; সাধারণ বাঁধাই টাঃ ৫·০০]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

তেতাল্লিশ হাজারের অধিক শব্দ ষোলশোর অধিক শব্দসমষ্টি। পৃঃ ৯০৬+১৬। [টাঃ ৮·৫০]

সাহিত্য সংসদ

৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী হাতে পাবার পরই অধিকাংশ কর্মচারী পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়ে দেন। তাঁরা যদি রাজ্যটিতে সেই সময় যদি কোন কৃষি বৈজ্ঞানিক কৃষি-নির্দেশকের পদে থাকতেন তাহলে হয়ত ধানের চারার রোগটি তিনি সূত্রপাতেই বুঝতে পারতেন এবং যথাযোগ্য প্রতিকারও সম্ভব হত।

বহুদিন আগে সেই 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের সময়ও এই রকম বহু গুরুতর ভুল ঘটেছিল। কারণ তখনও প্রশাসন বিভাগ থেকেই এমন বহু কর্মচারী এ ব্যাপারে কর্তা হয়েছিলেন যাঁদের কৃষি-কার্য সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান বিন্দুমাত্রও ছিল না।

জাপানী প্রথায় ধানচাষ নিয়ে কিছু-দিন আগেই যথেষ্ট মাতামাতি হয়েছিল, কিন্তু আশানুরূপ সুফল কিছুই পাওয়া যায় নি। আসল ব্যাপার হয়েছিল এই যে, খাদি গ্রামোদ্যোগের একজন কর্মী জাপান ভ্রমণে গিয়ে এই প্রথায় চাষ দেখে চমৎকৃত হয়ে ফিরে এসে কর্তাব্যক্তিদের জানিয়ে-ছিলেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন দপ্তরের কর্ণধারেরা এই জাপানী প্রথা আমাদের দেশের জল-বায়ুতে সফল হবে কিনা সে বিষয়ে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণা না করেই ব্যাপারটা চালু করে দিয়েছিলেন।

১৯৫২ খৃঃ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট আন্দোলনের শুরু থেকেই কৃষির উন্নতির জন্য অনেক পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়েছে শুধু অর্থের অপব্যয়, আসল কাজ কিছুই হয় নি। কারণ বেশীর ভাগ প্রকল্পেরই উচ্চতম পদগুলি অলংকৃত করেছেন যাঁরা তাঁদের সঙ্গে গ্রামের কৃষকদের জীবনের সমস্যা-গুলির পরিচয় একেবারেই নেই। কৃষকদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝবার এবং তাঁদের কাছে আধুনিক কৃষি পদ্ধতির বাণী পৌঁছে দেবার ভার ছিল গ্রামসেবকদের ওপর, যাঁদের নিজেদেরই ঐ বিষয়ে জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

আর একদিকেও আমাদের শৈথিল্য মর্মান্তিক। আজ পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত দেশ অন্যান্য দেশে তাদের দূতাবাস-গুলিতে একজন করে কৃষি বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত রেখেছে যাতে বিশ্বের সর্বত্র থেকে কৃষি বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের খবরটি পেতে বিন্দুমাত্রও দেরী না হয়ে যায়। কিন্তু ভারতের দূতাবাসগুলির মধ্যে একমাত্র রোমের দূতাবাসে একজন এগ্রি-কালচারাল অ্যাটাচি আছেন এবং বলা-বাহুল্য তিনি একজন আই. এ. এস. কর্মচারী। যদি মেক্সিকোর ভারতীয় দূতাবাসে একটিও কৃষি বৈজ্ঞানিক থাকতেন তাহলে এই অধিক ফলনশীল মেক্সিকোর গম আরো দশ বছর আগেই আমাদের দেশে পৌঁছে যেত, এবং হয়ত ১৯৬৭ সালের দুর্ভিক্ষও এড়ানো যেত। তাসখন্দের লম্বা আঁশের তুলোর খবরও আমরা বহুদিন পাইনি। কারণ রাশিয়া বা জাপানে আমাদের দূতাবাসে কোন উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ ছিলেন না।

সম্প্রতি কোপেনহেগেনে যে আন্ত-র্জাতিক কৃষিশিক্ষা বিষয়ে কনফারেন্স হয়ে গেল তাতে বহু দেশের কৃষিবিদ্যাবিদরা যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের তরফ থেকে গিয়েছিলেন কয়েকজন আই. এ. এস. কর্মচারী, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত কখনও কৌতূহলের বশেও কোন কৃষি কলেজের ধারে কাছেও যান নি।

আমাদের কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি দপ্তর-গুলিতে কর্মচারীরা পর্বতপ্রমাণ ফাইলের স্তূপ নিয়ে হিমসিম খান। কাগজে কলমে প্রচুর উত্তর প্রত্যুত্তর রিপোর্ট আর নোট লেখার বিরাম নেই, কিন্তু যাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেতে ফসল ফলাচ্ছেন তাঁরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে সেইটিই আসল বিচার্য। আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে প্রধানত তিনটি দিক থেকে। প্রথম হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞতা, দ্বিতীয়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও উপকরণের অভাব, এবং তৃতীয় পর্যাপ্ত অর্থের অভাব। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা খুব একটা নৈরাশ্যজনক নয়। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করবার জন্য হাজির রয়েছেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক আর বৈজ্ঞানিকের দল; তাঁরা সব সময় রাজ্য কৃষি কর্মচারীদের সহযোগিতা করতে ও কৃষক সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে প্রস্তুত। আধুনিক কৃষিকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সার, যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি উপকরণ বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত কারখানাতেও প্রস্তুত হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং দেশী, বিদেশী বহু সংস্থা ঋণ দিয়ে আর্থিক সমস্যাও অনেকটা সমাধান করে ফেলেছেন।

এখন এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে কৃষি প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

'অল ইন্ডিয়া এগ্রিকালচারাল সার্ভিস' চালু হবার প্রস্তাব কয়েক বছর আগে নানা বাধায় ফলে মুলতুবী রাখা হয়েছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনে এই প্রস্তাবকে অবিলম্বে কাজে পরিণত করা প্রয়োজন। কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের চাকুরীরত অবস্থাতে স্বল্পকালীন ট্রেনিং কোর্সের ব্যবস্থা করে সমস্তরকম আধুনিক কৃষিপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দিতে হবে, যাতে তাঁদের ছাত্রাবস্থায় অধিত প্রযুক্তিবিদ্যায় কেবল ফাইল ঠেলতে ঠেলতে মরচে পড়ে না যায়। অবশ্য এইজন্য একটি কেন্দ্রীয় স্টাফ কলেজ স্থাপিত করার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই উঠেছে। এই কাজের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহায্যও সহজেই নেওয়া যেতে পারে।

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে, কৃষি প্রশাসনের উচ্চতম স্তরে শুধু প্রশাসন দক্ষতাকেই বড় করে দেখলে চলবে না, কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষককেও নেতৃত্ব ও নির্দেশনার ক্ষমতা দিতে হবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রশাসক-কুলের জ্ঞান এখনও খুব স্বচ্ছ নয়। সেইজন্যই অনেক ক্ষেত্রে রাজ্য কৃষি দপ্তর ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতার ভাবও গড়ে উঠছে না। কিন্তু রাজ্য কৃষি দপ্তর ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরস্পরের পরিপূরক, এই মনোভাব নিয়ে কাজ করে যেতে পারলে তবেই কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে।

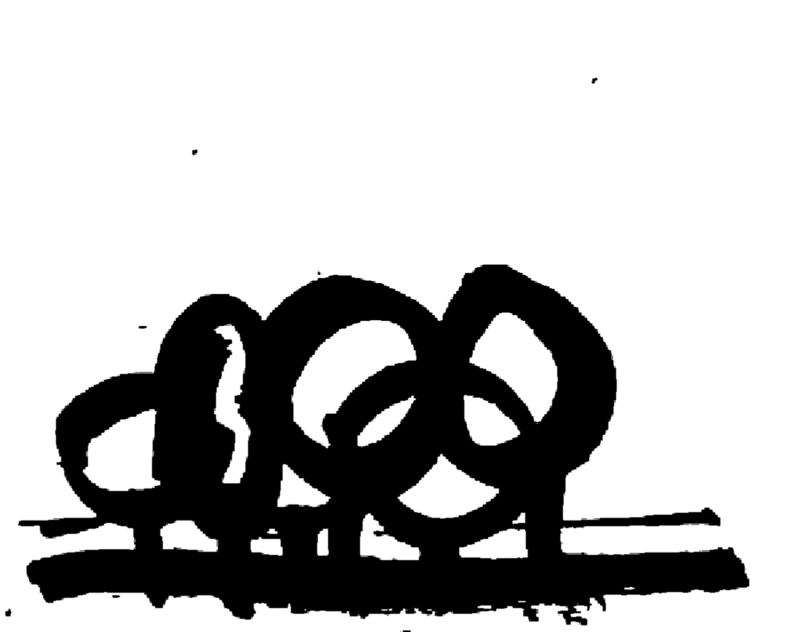

সম্পাদকীয়

বাঙালীর কর্মসংস্থান

বিষয়টি নিয়ে ভাবা হচ্ছে অনেকদিন থেকেই। বাংলাদেশে বাঙালী যুবকদের সকল কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় কিনা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে লোকান্তরিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলাদেশে বৃহৎ সরকারী শিল্পোদ্যোগ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী অধুনা মৃত আবদুস সত্তার সাহেবও বঙ্গসন্তানদের চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেবার নির্দেশ দিয়ে অনেক অবাঙালী শিল্পপতির বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে অবস্থার ঘটেছে অবনতি। বাঙালী বেকারবাহিনীর সংখ্যা বেড়ে প্রায় ভীতিপ্রদ পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। এখন তাই আবার নতুন করে চিন্তা শুরু হয়েছে এই বেকার বাঙালী যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুবিধা করা যায় কী উপায়ে।

বাঙালীর কর্মহীনতার জন্য তার পূর্বপুরুষদের উদাসীনতা কম দায়ী নয়। বৃটিশ আমলে বাংলাদেশেই শিল্পের পত্তন হয়েছিল সবার আগে। হুগলী নদীর দুই তীর বরাবর কত কল-কারখানা। কলকাতা ও তার আশেপাশে দেশী বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এই রাজ্যে রয়েছে কয়লাখনি। ইস্পাত শিল্পেও এই রাজ্যে গোড়াপত্তন হয়েছিল অনেক আগেই। তা ছাড়া পাটের কল তো ছিলই। নব্যশিক্ষিত বাঙালী এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির দখলীস্বত্বভোগকারী বাঙালীর একটা শ্রেণী এই ধরনের কায়িকশ্রমের জীবিকাকে আগে ভালো চোখে দেখত না বলেই পাশের রাজ্য থেকে, বিহার ও ইউ. পি. ওড়িশা ও অন্ধ্র থেকে অদক্ষ শ্রমজীবী মানুষেরা এসে বাংলার শিল্পকর্মে হাত দেয়। গত পঞ্চাশ-একশো বছরে বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণী বলতে এই অবাঙালীপ্রধান শ্রমিকদেরই বোঝাত। এমনকি যে সমস্ত কাজে বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন সামান্য সেই প্রহরী দারোয়ান প্রভৃতি কাজেও বাঙালীদের আকর্ষণ ছিল না বললেই চলে। আজ দিন বদলেছে। কর্মের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে সর্বত্র। বাঙালী তরুণেরা কাজের জন্য উৎসুক, কিন্তু কাজ নেই।

রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট কমিশনার সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, এখন থেকে নতুন কাজে বাঙালীদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কমিশনারের উদ্দেশ্য সৎ এবং বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই নির্দেশ খানিকটা আশার সঞ্চার করবে। কিন্তু শুধু নির্দেশেই কি কাজ হবে? প্রথমত, কাজ কতটা আছে এবং থাকলেও নিয়োগকর্তারা এই বিধান মেনে চলতে বাধ্য কিনা এবং মানবেন কিনা। সম্প্রতি একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি বলেছেন যে, বাঙালী বেকার যুবকদেরই সকলের আগে কাজ দিতে হবে। কিন্তু সব শিল্পপতির মানসিকতা তো একরকম নয়। বাংলাদেশে শ্রমিক অশান্তি বেশি—ধর্মঘট, হরতাল, ঘেরাও এখানে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক লেগে থাকে। এজন্য বাঙালী যুবক কর্মীদের প্রতি একটা বিরূপতা আছে কোনো কোনো মহলে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবং দিনে দিনে বেকার যত সংখ্যা বাড়ছে তত কাজ খালি হচ্ছে না বা নতুন কাজ তৈরী হচ্ছে না। তাই শুধু সরকারী নয়, সরকারী ও বেসরকারী উভয়ের মিলিত উদ্যোগে এই বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। বাঙালীদের মধ্যে একটা 'ভদ্রলোকে'র মানসিকতা আছে। এর ফলে শিক্ষিত বাঙালী ধোপ-দুরস্ত জামা কাপড় পরে টেবিল-চেয়ারে বসে কাজ করতে যতটা উৎসুক, অন্যান্য হাতের কাজে, যাতে শ্রম বেশি, জামা-কাপড় নোংরা হয় বা ঝুঁকি আছে এমন কাজের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই ছিল কম। অর্থাৎ কেরানীর কাজের জন্য ভীড় যত বেশি, কারখানায় শ্রমিকের কাজের জন্য ততটা নয়। তবে এখন অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মানসিকতাও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন সব রকম কাজের জন্য বাঙালী প্রার্থী প্রচুর। এবং তারা দক্ষতার সঙ্গেই সব রকম কাজ করতে পারবে, এ বিশ্বাসও জন্মেছে আজকের তরুণদের মনে।

কিন্তু কর্মপ্রার্থী লক্ষ জোড়া হাতের জন্য সমপরিমাণ কাজ কোথায়? এবং প্রত্যেকের শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা না করতে পারলে কর্মসংস্থানের আসল উদ্দেশ্য—সামাজিক স্থিতি কি সহজে আনা সম্ভব ? তাই বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দুটো উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের এগোতে হবে—কর্মসংস্থান এবং শিক্ষিত বেকারের সামাজিক আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ। অবাঙালী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এতদিন বাঙালীদের যে ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছে তার ফল কী বিষময় তা এখন সবাই খানিকটা বুঝতে পারছেন। এই অশান্তি ও উচ্ছৃংখলার অনেকখানি অবসান ঘটানো সম্ভব যদি আমাদের শিক্ষিত তরুণদের যথাযোগ্য কর্মসংস্থান করে দেওয়া যায়। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কমিশনার বাঙালীদের অগ্রাধিকার দেবার নির্দেশ দিয়ে বাস্তব পরিস্থিতিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এখন বাকী দায়িত্ব পালন করবেন সরকার এবং বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের কর্তাব্যক্তিরা। বাংলাদেশকে বাঁচাবার এই পথকে আর অবহেলা করলে সমূহ বিপত্তিরই সম্ভাবনা।

তোমারই হোক জয়

সুভাষ জীবনে দ্বৈতরূপ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বিশ শতকের শুরুতেই আমাদের রাজনীতিক চেতনা প্রথম স্পষ্ট চেহারা নেয় এবং তখনই তা পরস্পর বিরোধী দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। একটা ধারা ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ এবং তা সফল করার জন্যে এক দিকে যেমন দেশের ইতস্তত ছোট-বড় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটতে থাকে, অন্য দিকে তেমনি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সহায়তা লাভের জন্যে আনাগোনাও শুরু হয়ে যায়। আর একটা ধারা ধরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ, আন্দোলন, বিক্ষোভ, সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে একের-পর-এক। সেই সঙ্গেই ঐক্য, অহিংসা ও সংগঠনের আদর্শ প্রচারিত হতে থাকে। এই দুটো ধারা পরোক্ষভাবে অবশ্য একে অন্যের পরিপূরকতা করেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এরা কেউ কারোকে স্পর্শ করে নি। সুভাষচন্দ্রই প্রথম জাতীয় নেতা, যিনি দুটি ধারাকে একত্র মেলান। তাই তাঁর জীবনে আমরা দেখি একই সঙ্গে অগ্নিযুগের সংগ্রামী পৌরুষ, আবার কংগ্রেসী রাজনীতির সংগঠনী দৃষ্টিভঙ্গী। দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি আমাদের ইতিহাসে অনন্য।

এই অনন্যতার গুণেই তিনি যবে ভারতের অন্তর্লোকে যত বড় শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এমন আর কারোকে হতে দেখা যায় না। ভারতে এমন শহর নেই যেখানে পথে, পার্কে শিক্ষায়তনে তাঁর একটা-দুটো মূর্তি না চোখে পড়ে। সর্বত্র তাঁর নামে পাঠাগার, সংস্কৃতি ভবন, ক্রীড়া-সত্র। সমস্ত মাতৃভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনী, বক্তৃতা ও রাজনীতিক মতবাদের ব্যাখ্যান। এমন সর্বাত্মক স্বীকৃতি ও আনুগত্যের মূলে আছে তাঁর আপোষহীন সংগ্রামশীল ব্যক্তিত্ব, সেই সঙ্গেই আছে তাঁর সমৃদ্ধ ও কল্যাণাশ্রিত ভাবী সমাজ গঠনের আদর্শও। আমাদের প্রধানতম রাজনীতিক কর্মপ্রবাহ শুরু থেকেই নির্দেশিত হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। তাই তাতে চিন্তার ঐশ্বর্য ছিল বরাবরই। কিন্তু ফুটন্ত সংগ্রামের তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক এসেছিল শুধু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নায়কদের কাছ থেকে। একাধারে দুদিকের পূর্ণতা হয়েছিল সুভাষচন্দ্রে, তাই রাজনীতিক মঞ্চে আবির্ভূত হবার সঙ্গে-সঙ্গে তরুণ সমাজের অধিনায়ক হতে পেরেছিলেন তিনি এত অনায়াসে। তাঁর সেই সার্বিক নেতৃত্বের পূর্ণ পরিচিতি এখনো ভাল করে উদ্ঘাটিত হয় নি।

যাঁরা নেতাজী হিসাবে তাঁর সেনাপতির রূপটিকে প্রধান করে দেখেন, তাঁরা ভুলে যান যে, আমাদের আন্দোলনের রাজনীতিকে তিনিই প্রথম গঠনের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহাকে ডেকেছিলেন তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি জাতীয় পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করতে। তিনি বলেছিলেন, শুধু স্বাধীনতা লাভ নয়, লব্ধ স্বাধীনতাকে জীবনের উপযোগীও করতে হবে। সেই সাহা পরিকল্পনার খবর যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন, নদী নিয়ন্ত্রণ, সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, ছোট-ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানার দ্বারা গ্রাম ভারতের আত্মনির্ভরশীলতা বিধান এক দিকে, অন্য দিকে অতিকায় ইস্পাত কারখানা, মোটর ও বিমান নির্মাণশালা, পারমাণবিক বীক্ষণশালা...দুইয়েরই স্থান সুচিহ্নিত হয়েছিল তাতে, যদিও দ্বিতীয়টিকে করা হয়েছিল প্রথমটির অনুবর্তী। আগে বিত্ত উৎপাদন, তারপর তার বিনিয়োগ, এই ছিল তাঁর নীতি। দুঃখের বিষয় এই সাহা-সুভাষ পরিকল্পনার শেষার্ধকেই শুধু অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে দেশে। তাই দেশের ধনভাণ্ডার হয়েছে নিঃশোষিত। গ্রামগুলি হয়েছে অরক্ষিত, আর শহরগুলি হয়েছে অতিস্ফীত এবং ভারসাম্য ভ্রষ্ট। এই পরিকল্পনার অপরার্ধে দৃষ্টি দিয়ে এখনো সঙ্কটমুক্ত হওয়া যায় কিনা, সে বিচার বিশেষজ্ঞদেরই করণীয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উজ্জ্বলতম কীর্তি অবশ্য আজাদ হিন্দ সরকারই এবং তার পৃষ্ঠপোষিত আজাদ হিন্দ ফৌজও। ইংরেজ শাসিত ভারতে এই ফৌজই প্রথম বাইরে থেকে ভারতের মাটিতে হানা দেয় এবং পরাধীন দেশের এক প্রান্তে স্বাধীনতার পতাকা ওড়ায়। ইংরেজের উন্নত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সাহিত্য সাধনার অনন্যসাধারণ ফসল
মানিক গ্রন্থাবলী
সদ্য-প্রকাশিত ॥ ৬ষ্ঠ খণ্ড ॥ ১৪·০০
তৃতীয় খণ্ড ॥ নিঃশেষিত ॥ ১২·৫০
দ্বিতীয় খণ্ড ॥ (২য় সং) ॥ যন্ত্রস্থ
প্রথম খণ্ড ॥ (২য় সং) ॥ ১২·০০
পঞ্চম খণ্ড ॥ ॥ যন্ত্রস্থ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ॥ ৪·০০
মানিক জীবন ও সাহিত্য ॥
ডঃ সরোজমোহন মিত্র ॥ ১২·৫০
বিঃ দ্রঃ—যাঁরা নিয়মিত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করবেন, তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। যোগাযোগ করুন।
গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

অনুসরণের মুখে এই অভিযান বেশী দিন আত্মরক্ষা করতে পারে নি যদিও, তবু ১৮৫৭র বিদ্রোহ ছাড়া সামরিক অভিযানের পথে স্বাধীনতা লাভের উদ্যম আর কোন দিন হয় নি বলে, এই গৌরবজনক প্রচেষ্টার সামনে জাতি চিরদিনই মাথা নুইয়ে দেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স জার্মানীর দ্বারা অধিকৃত হলে, জেনারেল দ্য গল দেশের বাইরে স্বাধীন ফরাসী সরকার স্থাপন করেছিলেন এবং উত্তর আফ্রিকার আল-জিরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো প্রভৃতি তদানীন্তন ফরাসী উপনিবেশে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে প্রত্যাক্রমণের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

সে স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে পারেন নি তিনি। ফ্ল্যান্ডার্সে যে প্রত্যাক্রমণ হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের মিলিত শক্তি। তা সত্ত্বেও দ্য গলের দেশপ্রেম, ফ্যাসিস্ট প্রাসের বিরুদ্ধে জাতির প্রতিরোধ শক্তি জাগিয়ে রাখার বলিষ্ঠ প্রয়াস ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ শুধু প্রতিরোধের আদর্শটিই সঞ্জীবিত রাখে নি, তাকে কর্মেও রূপ দিয়েছিল। তাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তার দাম অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধাবসানের পরই যে ইংরেজ ভারতের মৃত্তিকা থেকে সাম্রাজ্যের কারবার গুটিয়ে সরে পড়েছিল, তার একটা বড় কারণ আজাদ হিন্দ সম্ভূত উন্মাদনা, যা বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহে, জব্বলপুরের বৈমানিক বিদ্রোহে উত্তর প্রদেশের পুলিশ ধর্মঘটে এবং সারা ভারতব্যাপী রেলপথ ও ডাক-তার ধর্মঘটে রূপ পেয়েছিল। চতুর ইংরেজ বুঝেছিল আর নয়, এবার সরে পড়তে হবে।

অবশ্য আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও জুগিয়েছিল তাকে কিছুটা দুঃসিয়ারী। লাল চীন যখন ইয়াংসী পার হয়ে দক্ষিণে পৌঁছল এবং কুয়োমিন্টাং সরকার পিছু হঠতে শুরু করল ফরমোজার দিকে, তখন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা সবাই দেওয়ালের লেখা পড়তে পেরেছিলেন। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, সবাই তখন দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের হাতে রাজ্যপাট ছেড়ে পালানই শ্রেয় বলে বুঝেছিলেন। ইংরেজের ক্ষেত্রে নেতাজীর আজাদ হিন্দ এই বোধকে ত্বরান্বিত করেছিল। ফরাসীকে দিয়েন-বিয়েন ফুর পর জেনেভা হয়ে পালানর রাস্তা খুঁজতে হয়েছিল। মোটের ওপর বলা এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামে নেতাজীর অনুপ্রেরণা ঠিক ততটাই কাজ করেছিল, যতটা করেছিল ১৯০৪ সালে রুশো-জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থার বিজয়ী এডমিরাল [illegible] দৃষ্টান্ত। [illegible] যে,

তখন থেকেই ভারতের সন্ত্রাসবাদী তরুণরা জাপানের শরণার্থী হতে থাকেন সামরিক সহায়তার আশায়? নেতাজী এই ধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর আগে ছিলেন রাসবিহারী বসু, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, আরো অনেকে।

আজাদ হিন্দের গঠন ও প্রস্তুতিতে জাপানের সাহায্য যাই থেকে থাকুক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতবাসীই এর পিছনে ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকায় এবং তাঁদের সুপ্ত দেশপ্রেম জাগিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। তদানীন্তন জাপানের অভিপ্রায় কি ছিল বলা কঠিন। হয়ত ভাল ছিল না, কারণ ব্যারন তানাকার যে পরিকল্পনা ধরে জাপান কোরিয়া দখল করেছিল, মাঞ্চুরিয়ায় ও চীনে অভিযান শুরু করেছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যিক দুনিয়ার একটু-একটু করে থাবা বাড়াচ্ছিল, তার অভিযানে ভারতের নামটাও অনুপস্থিত নয়। অবশ্য নিখিল এশিয়ার সহসমৃদ্ধি বলয় গড়ার নামেই এই সর্বগ্রাসের নীতি ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জাপানের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করেন নি। ভারতের সংগ্রাম নামক বইয়ে তিনি বলেছেন, নীতি ও আদর্শে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়েও রাশিয়া যদি বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পেরে থাকে তাহলে ভারত কেন পারবে না বৃটিশের বিরুদ্ধে জাপানের সঙ্গে হাত মেলাতে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ হল নিছক প্রত্যয়ের কথা। তাছাড়া নেতাজী জানতেন চীন ও ভারতকে কবলিত করা জাপানের পক্ষে সাধ্যাতীত। তাই উদ্বেগ বোধ করেন নি তিনি।

টিরানোসোরাই ॥

বিষ্ণু দে

এশিয়ার আফ্রিকার
আদিম ও অতিকায় জন্তুদের মতো
লুপ্ত হবে অচিরেই।

আজও শক্তিমদঅন্ধ, তাই নিজে বোঝো না জানো না
আজ কিংবা কাল ঐ অসমঞ্জস দেহ
সর্বংসহা মাটির তলায় হবে গত
বাধাতুর অন্ধ পৃথিবীতে, শুধু যাবে গোণা
কটা হাড় ছিল কার, কবে, এখানে ওখানে।

কুৎসিত বেয়াড়া যত বেপে শরীর
আর স্থূল হিংস্রতায় চৈতন্য বীভৎস
অজ্ঞান পশুদের পাবে শোকহীন নির্বংশ মরণ।

প্রকৃতির পরীক্ষায় আদিপর্বে পেরোছিলে
সম্পত্তির অভাবে অস্থির
অপশক্তি, তাই আজও ভাবো চিরজীবী
কিন্তু বৃথা চাও আজ নৃশংস উৎসবে
হতাহত বঞ্চিত সমাজে নিজেদের স্বচিকাভরণ।

বরন্ধ বিজ্ঞানে আজ বহু পরীক্ষায় স্থির জানি
অন্তে সেই নিয়ম লঙ্ঘন,
যানি দীর্ঘসূত্র ছিল আমাদের মানবতা এতদিন।
আজ তার ছিঁড়েছে বন্ধন, ছোঁড়ে প্রায়।
সীমাহীন ধৈর্যে জানে তার ক্ষীণ কণ্ঠে তীক্ষ্ণ তূর্যে বাজে
সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর সূর্যের বাজনা,
আফ্রিকার এশিয়ার।।

জলের চৈতন্যে কেউ ॥

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জলের ভিতরে ডুবে আছে কত মুখ, কত বিমূর্ত কল্পনা
হাজামজা মাঠ, শৈশবের চিকেমাত, বিবর্ণ দুপুরে
মাঝে মাঝে পান্‌কৌড়ির মত উঠে আসে জলের উপরে
ঘোটস্রোত, শব্দের ইমারতগুলি ভেসে চলে হাওয়ায় নৌকায়।

আমাদের শোক-তাপ, স্বাচ্ছন্দ্য, বিবেক জন্মাবধি ডুবে আছে
জলের তলায়, হামাগুড়ি দিয়ে যারা ডুবুরির মত অন্ধকারে
সুখ হাতড়ায়, দুচারটে পোঁড়ি গুগলি উঠে আসে সুখের মতন
অবিবেক ভালবাসা তপ্ত বালি শুষে নেয় নৈকষ্য কুলিন।

কবে আমরা ক্ষণিক চমকে ফুল কুড়াতে চেয়েছিলাম
সর্পিল অরণ্যে
হেমন্ত গোধূলি থেকে বসন্তের স্বভাব-সোহাগে হাতে হাত রাখা
তারপর শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ চমক, কোথায় হারিয়ে গেল
গন্ধবহ লজ্জাবতী, তারপরের দিনগুলি বৃষ্টিহীন মেঘের প্রবাসে।

এই দুঃস্বপ্ন, তুলসীমঞ্চ, বুকের উষ্ণতা, বারোমাস
নিষ্ফল খননেই
[illegible] [illegible] কোথাকে ডুবে যায় জলের তলায়
[illegible] কালীঘাটে [illegible] তাপে দগ্ধ হচ্ছে জীবিকা, সত্য
জলের চৈতন্যে কেউ স্বাতী নক্ষত্রের বিন্দুকের বুকে বড় হয়।

আমার কথা

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রশ্ন : চণ্ডীদাসকে নিয়ে বাঁকুড়া-বীরভূমের একটি বিবাদ আছে অনেকদিনের। এবার উড়িষ্যা গিয়ে শুনলাম জয়দেবকে নিয়েও নাকি দুই প্রতিবেশী প্রদেশে কিঞ্চিৎ রেষারেষি আছে। ভয় হয় অধুনা বীরভূম নিবাসী আপনাকে নিয়েও শ' দু-শ' বছর বাদে এরকম একটা বিবাদের আশঙ্কা আছে। আপনি তো সব্যসাচীর মতো বাংলা ও ওড়িয়া দুই ভাষাতেই কলম চালিয়েছেন?

উত্তর : ষোল বছর বয়স থেকে বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত কখনো লিখেছি 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'তে। কখনো লিখেছি 'উৎকল সাহিত্য' ও 'সহকার'-এ। মধ্যে মধ্যে ইংরেজীতে লিখতুম, কলেজ ম্যাগাজিনে বা তার বাইরে। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে ইংরেজীতে সাহিত্যসৃষ্টি করা যায় না, সাংবাদিকতা করা যায় ও সেটাই আমি করব। সাহিত্য-সৃষ্টিও দুই ভাষায় করা যায় না, তার জন্যে বরণ করে নিতে হয় একটিকেই। আমরা মোগল আমলের জমিদার, সেই সূত্রে ওড়িশাকে আপনার করে নিয়েছি। ওড়িশাও আমাদের আপনার করে নিয়েছে। বরণ করে নিতে হলে ওড়িয়াকেই বরণ করে নিতে হয়। রাধানাথ রায় তাই করেছিলেন। আমি কিন্তু উল্টোটি করি।

প্রশ্ন : আচ্ছা, প্রথম সাহিত্য পদবাচ্য আপনি যে লেখাটি লিখলেন—অর্থাৎ লেখার ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন—তার ভাষা কি ছিল—ওড়িয়া না বাংলা?

উত্তর : সংগ্রহ করে রাখার মতো রচনা প্রথম 'প্রবাসী'তেই বেরোয়। তার আগের কাঁচা হাতের লেখা ওড়িয়াতে শুরু হয়। ওই ছিল আমার স্কুলের ভার্নাকুলার।

প্রশ্ন : ভাষা সমস্যার কথা তুলব না। কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে করে মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজী—একসঙ্গে এই তিনটি ভাষার চর্চা ও ব্যবহারে আপনার কোনো অসুবিধে হতো না?

উত্তর : স্কুলে যখন আমার সাহিত্যিকতার হাতে খড়ি তেমনি সাংবাদিকবৃত্তি অবলম্বনের সংকল্প। সাংবাদিক হবো আমি [illegible] ভ্রমণ, সারা দুনিয়া ঘুরব। তার প্রকাশভাষী মাধ্যম ইংরেজী। ইংরেজীকে আমি সাহিত্যচর্চার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিহার করিনি। বরঞ্চ তার পরিপূরক বলে গ্রহণ করেছি। পরবর্তী বয়সে আমি সাংবাদিকতার মায়া কাটিয়ে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মায়ায় আবদ্ধ হই। সেখানেই ইংরেজী চর্চা অপরিহার্য। কিন্তু তা বলে আমি তাকে সাহিত্যিকতার বাহন হতে দিই নি। তবে ওড়িয়াচর্চা আমি ইচ্ছা করেই ত্যাগ করেছি। একসঙ্গে অতগুলো ঘোড়ায় হাত দিলে কোনোটাই চলনসইয়ের উপরে উঠত না।

প্রশ্ন : আপনাদের বাড়ীতে কি সাহিত্যের আবহাওয়া ছিল? শুনেছি আপনার বাবা ঢেঙ্কানল রাজ এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন আর আপনি ছিলেন শান্তশিষ্ট বড় ছেলে। অনুমান করি অন্যান্য জ্যেষ্ঠদের মতো আপনার উপরেও পড়াশুনোর যথেষ্ট চাপ ছিল। সাহিত্য আলোচনার তাগিদ ও অবকাশ পেতেন কী করে তাহলে?

উত্তর : ঢেঙ্কানাল ছিল কোচবিহারের মতো একটি দেশীয় রাজ্য। আমার বাল্যকালে সেখানকার স্কুল ছিল ওড়িশার বাছা বাছা স্কুলগুলোর একটি। রাজারা ছিলেন প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। হেডমাস্টার ব্রজেন্দ্রলাল দত্ত থিওসফিস্ট। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মনোমোহন ঘোষ ব্রাহ্মভাবাপন্ন। এঁরা সাহিত্য-রসিক। বাবাও তাই। বাড়ীতে লাইব্রেরী ছিল। বাবা আমাকে লাইব্রেরীর ভার দিয়েছিলেন। স্কুলের লাইব্রেরীতে গিয়ে পছন্দমতো বইপত্র বেছে নিয়ে বেশীরভাগ সময় পড়তুম বইয়ের পড়া। ইংরেজী ভাষায় সেলফ এডুকেটর, এনসাইক্লোপীডিয়া, ইতিহাস, জীবনী, বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বই, 'প্রবাসী' প্রভৃতি বাঙালীর বিখ্যাত মাসিকপত্র, আর 'সবুজপত্র'। ওড়িয়া ভাষায় তখনকার দিনে খুব কম বই কাগজপত্র বেরোত। যা পেতুম পড়তুম। মানচিত্র ছিল আমার নখদর্পণে। প্রাণের বাসনা ছিল আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সাংবাদিক হওয়া। এর জন্যে দায়ী 'মডার্ন রিভিউ' পাঠ।

প্রশ্ন : আচ্ছা, প্রথম আপনার লেখা যা ছাপা হয়ে বেরুল তার বিষয়ে আপনার নিশ্চয় মনে আছে? সে বিষয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

উত্তর : স্কুলের প্রাইজ হিসাবে পাই টলস্টয়ের 'তেইশটি গল্প'। তার থেকে বাংলায় তর্জমা করি 'তিনটি প্রশ্ন'। পাঠিয়ে দিই 'প্রবাসী'তে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—চারু হস্তলিপি বলে, মঞ্জুর। পরের সংখ্যাতেই দেখি টলস্টয়ের নামের সঙ্গে আমারও নাম। এ যোগাযোগ তখন মনে হয়েছিল আকস্মিক। পরে দেখি চিরস্থায়ী।

প্রশ্ন : আপনি তো ম্যাট্রিক পাশ করলেন ১৯২০ সালে—কটক থেকে না? শুনেছি সেই বছরেই আপনার মা মারা যান এবং স্কুলে থাকতে ওড়িয়া মাধ্যমে পড়াশুনো করেও আপনি নাকি পরীক্ষার হলে বসে স্থির করলেন বাংলায় পরীক্ষা দেবেন—পরীক্ষায় আশানুরূপ ভালো করতে পারেন নি বলে আপনি ঘর থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়—উদ্দেশ্য ছিল নাকি সাংবাদিক হবে আমেরিকা যাওয়া। সে কথা কি সত্যি? সেই কি ছিল উড়িষ্যা প্রবাসীর প্রথম বাংলা দেশে আসা?

উত্তর : ম্যাট্রিক পরীক্ষা ১৯২১ সালে, কটক কেন্দ্র থেকে। সেটা অসহযোগের যুগ, আমি বিচলিত। তৈরি ছিলুম না, গুরুজনের কথায় রাজী হলুম, ভার্নাকুলারের দিন প্রশ্নপত্র বিলি করতে যিনি এলেন তিনি জানতে চাইলেন আমার ভার্নাকুলার কী? বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয়েছে ওড়িয়া, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বাংলা। তিনি বাংলা প্রশ্ন দেন, আমি তারই উত্তর দিই। পরে এ নিয়ে জবাবদিহি করতে হল। পাশ করি ঠিকই, কিন্তু ফল খারাপ হয়। ইতিমধ্যে বাকে হারাই। কলকাতা যাই সাংবাদিকতা শিখে সুযোগ পেলে আমেরিকা যাত্রা করতে। কাকার আহ্বানে কটকে ফিরে কলেজে ভর্তি হই। হাঁ, সেই ছিল প্রথম বাংলোদেশ দেখা।

প্রশ্ন : উড়িষ্যা তো হল পুরী শ্রীক্ষেত্রের দেশ। দেশের ধর্মীয় আবহাওয়ার সঙ্গে কি আপনার কখনো গভীর যোগাযোগ ঘটেছিল?

উত্তর : আমরা শাক্ত পরিবার। ঠাকুমার মৃত্যুর পর বাবা বৈষ্ণবদীক্ষা নেন ও বাড়িতে গোপাল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায়ই কীর্তন হতো। ছেলেবেলায় আমি ধর্মপ্রাণ ছিলুম। পুরীতেও মাস ছয়েক পড়েছি। ঠাকুমাকে প্রায়ই জগন্নাথের মন্দিরে নিয়ে গেছি। কিন্তু স্কুল থেকে যখন বেরোই তখন আমি ব্রাহ্মভাবাপন্ন সমাজ সংস্কারক। মূর্তিপূজা থেকে, জাতপাত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে আমার মন। বিশ্ববিদ্যা-

CENTRAL LIBRARY

সময়ের দ্বিতীয় পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার সময় ধর্মের ঘরে লিখি, Monotheistic eclectic Hinduism.

প্রশ্ন : আপনি যখন কটক র‍্যাভেন্শ কলেজে ভর্তি হলেন তখন তো 'সত্যবাদী যুগের' অবসান ঘটেছে। রাজনীতিক আন্দোলন এসে সাহিত্যের জগতে অধিকার বিস্তার করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তখন ওড়িয়া জাতীয়তাবাদীরা অল্প-বিস্তর বিরূপও ছিলেন নাকি? সেই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভক্ত হয়ে আপনি কী করে বন্ধুকে পেলেন সেই কথা ভাবি। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হিসাবে তখন আপনার উড়িষ্যাজোড়া নাম। কিন্তু ভালো ছাত্র হওয়া আর নতুন একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরি করে তার নেতৃত্ব করা—এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। এই প্রসঙ্গে 'সবুজ' দলের বিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

উত্তর : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর বিরূপ ভাব যাঁদের মধ্যে ছিল তাঁরা প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যসাহিত্যের অন্ধ ভক্ত। 'ছান্দ' তাঁদের মতে ওড়িয়া বৈশিষ্ট্যের শেষ কথা। আধুনিক ওড়িয়া কবিতা ইংরেজী ও বাংলা রীতির, সুতরাং বিজাতীয়। আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের তিন প্রধানের একজন বাঙালী ও দুজন ব্রাহ্ম, তাঁদের পুত্রকন্যাদের বিবাহ বাঙালীদের সঙ্গে। 'পদ্মমালী' উপন্যাসের লেখকও বাঙালী। 'কাঞ্চীকাবেরী' নাটকের লেখকও বাঙালী। 'উৎকলদীপিকা'র সম্পাদকও বাঙালী। 'উৎকল সাহিত্যে'র সম্পাদক ব্রাহ্ম। তাঁর পুত্রকন্যার বিবাহ বাঙালীদের সঙ্গে। এঁদের বাদ দিলে আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যকে খর্ব করা হয়। তাই বিরূপতার যদি বা ছিল সেটা সীমাবদ্ধ ছিল। আমাকে স্পর্শ করেনি। তবে আমার বন্ধুরা ও আমি 'সবুজ' শব্দটা ওড়িয়ায় ব্যবহার করতুম। সেটা ওড়িয়া শব্দ নয়। আমাদের মতবাদও অত্যাধুনিক। সমালোচকেরা শ্লেষ করে বলতেন 'সবুজ দল'। 'দল' শব্দটার আরেক অর্থ 'পানা' বা 'শ্যাওলা'। শ্লেষটাই পরে বিশেষত্বসূচক হয়। বন্ধুরা যখন দলবদ্ধ হন তখন আমি পাটনা থেকে লন্ডনে। নেতা আমি নই। শব্দটা হয়তো আমারই দেওয়া।

প্রশ্ন : সেই সময়কার লেখা আপনার কবিতার বিষয়ে ডঃ মায়াধর মানসিংহ কী বলেন শুনেছেন? "His poems, though small in number, are aesthetically among the finest treasures of Oriya Literature."
আচ্ছা, আপনার ওড়িয়া রচনার একটা সংগ্রহ বের করা যায় না?

উত্তর : আমার ওড়িয়া কবিতা বলতে এক ডজন। ওড়িয়া প্রবন্ধ বলতে দু'ডজন। এত কম লিখে আর কেউ এত ভালোবাসা পেয়েছে কিনা জানিনে। সংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে।

প্রশ্ন : শোনা যায় আপনার 'কমলবিলাসীর বিদায়' বলে কবিতায় ওড়িয়া ভাষা পরিহার করে বাংলা ভাষায় চলে আসার একটা ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। ওই রকম সময়েই তো আপনি কটক ছেড়ে চলে গেলেন পাটনা এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পড়তে পড়তে আই-সি-এস পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। সে তো ঘটেছিল ১৯২৬ সালে না? তারপর কী হলো?

উত্তর : 'কমলবিলাসীর বিদায়' ১৯২৩ সালে লিখে আমি ওড়িয়া সাহিত্য থেকে বিদায় নিই। তার তিন বছর আগেই কটক কলেজ ছেড়ে পাটনা কলেজে ভর্তি হয়েছি। পাটনায় চার বছরও আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আমার অধ্যাপক যাঁরা ছিলেন তাঁরা নানা দেশের ও নানা প্রদেশের বিদ্বান। সেখানেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক মিটিং-এ গান্ধীজীকে প্রথম দেখি। সর্বভারতীয় নেতাদের প্রায় সবাইকে একসঙ্গে পাই। ভারতের সঙ্গে পরিচয় গভীর হয়। সচ্চিদানন্দ সিংহের লাইব্রেরিতে বসে ভারতকেও আবিষ্কার করি।

প্রশ্ন : বিলেতে আপনি যখন সিভিলিয়ান শিক্ষানবীশ ছিলেন তখন তো ইংলণ্ড ও য়ুরোপে বহু ঘুরেছেন, পাশ্চাত্য দেশের মনোজগৎ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেছেন, আপনার সেই সময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তো 'পথে প্রবাসে' বইখানি লিখেছিলেন, না? আমার মনে আছে 'বিচিত্রা'য় যখন এ লেখা ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় তখন ছাত্রমহলে, সাহিত্যিক মহলে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বই আকারে 'পথে প্রবাসে' তো বের হয় ১৯৩১-এ। যদিচ এ বই লিখেই আপনার প্রথম সাহিত্যিক খ্যাতি, আপনার প্রথম যে বই সে তো প্রবন্ধের বই, 'তারুণ্য' তার নাম, বেরিয়েছিল ১৯২৮ সালে। কেমন, ঠিক কি না? তারপর তো আপনি সিভিলিয়ান হয়ে দেশে ফিরলেন, আর কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন বাংলা দেশ। স্থির করলেন আপনার সাহিত্য সৃষ্টির বাহন হবে মাতৃভাষা। লোকে বলে নিজের নামে লেখা প্রকাশে সরকারী বাধা ছিল বলে নাম নিয়েছিলেন 'লীলাময়'। আচ্ছা এ নামের সঙ্গে কি আপনার স্ত্রী লীলা দেবীর নামের কোনো যোগাযোগ আছে?

উত্তর : বিলেতে আমি ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ এই দু'বছর ছিলুম। এর ফলশ্রুতি কেবল 'পথে প্রবাসে' ও 'তারুণ্য' নয়, এই দু' বছরের ক্রমে বাঁধা আরো বারো বছর ধরে লেখা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 'সত্যাসত্য'। ইউরোপের সঙ্গে ভারতকে মিলিয়ে দেবার এ সুযোগ না পেলে আমি বাংলা সাহিত্যের আসরে তত সহজে আসন করে নিতে পারতুম না। এই সঙ্গে আর একটি সংযোগ। সিভিলিয়ান হয়ে বাংলাদেশে নিযুক্তি। ধরুন, যদি আমাকে বিহারে চাকরি করতে হতো তাহলে আমি মাঝে মাঝে কলকাতা এলেও তার বাইরে দেখতুম বড়জোর দার্জিলিং আর শান্তিনিকেতন। কিন্তু অবিভক্ত বাংলার যতখানি দেখেছি ততখানি দেখবার সুযোগ পেতুম না। সরকারী বাধা ছিল বলে ছদ্মনাম গ্রহণ করি 'লীলাময় রায়'। তার এক বছর পরে যাঁর সঙ্গে দেখা তিনিই আমার সঙ্গে চরণ মেলাবার জন্যে নাম নিলেন 'লীলা রায়'।

প্রশ্ন : আচ্ছা, সিভিলিয়ান হিসেবে আপনার প্রথম কর্মক্ষেত্র তো ছিল পদ্মার ওপারে রাজশাহী জেলার নওগাঁ সাবডিভিশন—না? সেখানে গিয়েই তো আপনি শিলাইদহের, রবীন্দ্রনাথের দেশে গিয়ে পড়লেন—ছেলেভুলানো ছড়া ও বাউল গানের রাজত্বে। বোধকরি 'হারামণি'র মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে সেইখানেই আপনার আলাপ। তারপর শুনেছি ২১ বছরের কর্মকালে ২১ বার আপনি বদলী হয়েছেন, সংযুক্ত বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরেছেন কখনো মহকুমা শাসকরূপে কখনো বা জজ হয়ে। এও শোনা যায় যে ব্রিটিশ কর্তারা খানিকটা ইচ্ছা করেই আপনাকে বেশিদিন এক জায়গাতে টিকতে দেননি। উড়িষ্যায় থাকতে

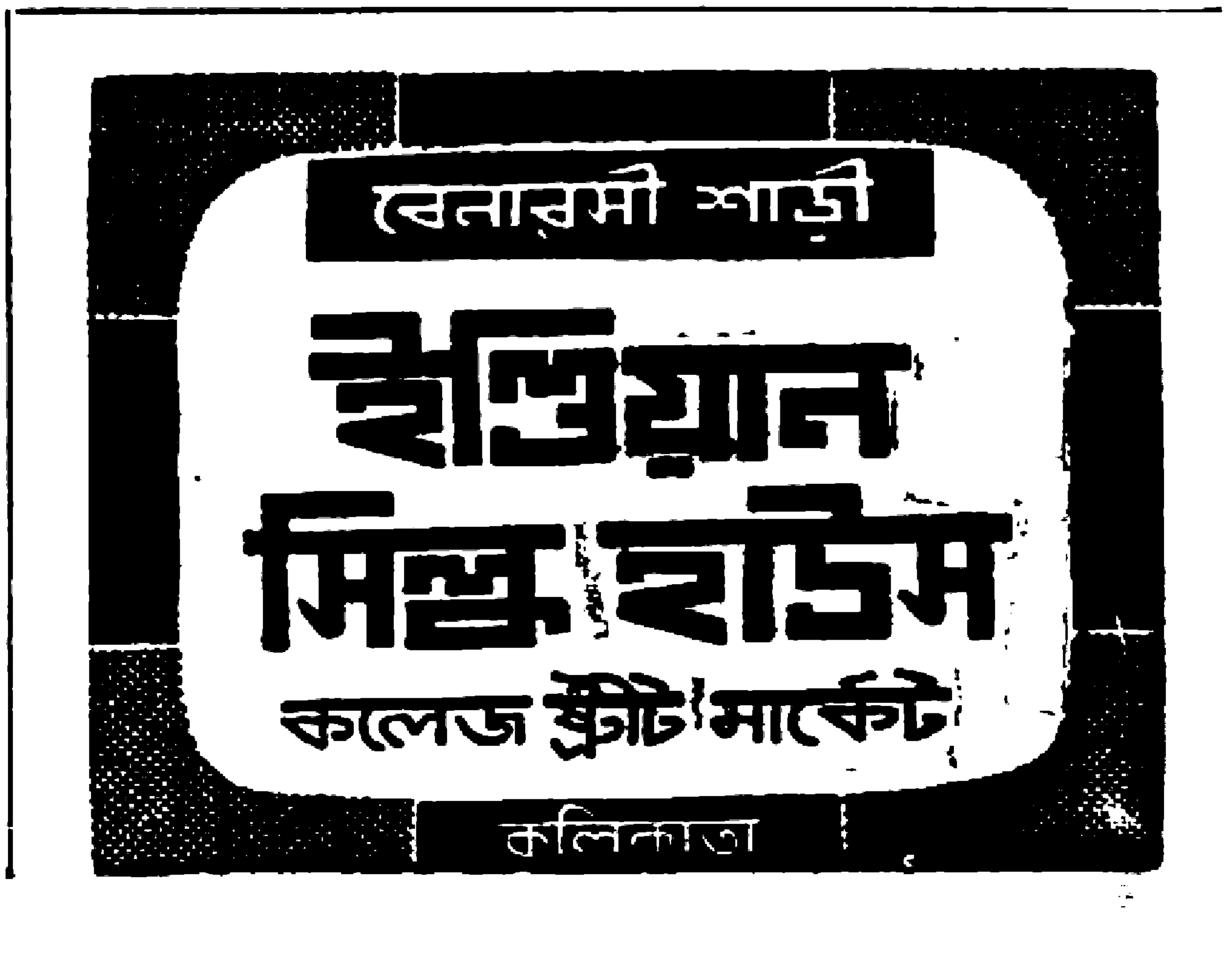

আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী—তাঁর সম্পর্কে আপনার নাকি স্বদেশী ছোঁয়াচ লেগেছিল। তাহলে তো পরিস্থিতি বেশ সঙ্কটজনক হয়ে থাকবে নিশ্চয়। ইংরেজ আপনাকে বলেছে স্বদেশী ভক্ত—আর স্বদেশীরা আপনাকে অপবাদ দিয়েছে আমলাতন্ত্রের সিভিলিয়ান দালাল বলে। আপনার তখনকার কর্মজীবন বিষয়ে দু-চার কথা জানতে ইচ্ছা করে।

উত্তর : চাকরির প্রথম স্টেশন বহরমপুর। শেষ স্টেশন কলকাতা। একুশ বছরে একুশবার বদলী। তবে এটা ইচ্ছে করে নয়। দৈবচক্র। রাজশাহীর নওগাঁ আমার প্রথম মহকুমা। রবীন্দ্রনাথের পতিসর সেইখানেই। মনসুর উদ্দীন সাহেবের সঙ্গে নওগাঁতেই আলাপ। কুষ্টিয়া মহকুমাতেও কাজ করেছি। সেখানে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ ও লালন ফকিরের আস্তানা। পদ্মাকে পাই সেখানে ও রাজশাহীতে যখন আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। পদ্মা ও মেঘনাকে ছেড়ে চট্টগ্রামে যাই, সেখানে পাই সমুদ্রও আর কর্ণফুলীকে। তেমনি ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রকে। ঢাকায় বুড়িগঙ্গাকে, কুমিল্লায় গোমতীকে। পূর্ববঙ্গ যে পর হয়ে যাবে তখন তো জানতুম না, জানলে আরো বেশী করে দেখতে চেষ্টা করতুম। তবে আবহাওয়া ১৯৩৭-এর পর থেকে গরম হতে আরম্ভ করে। তার আগে পর্যন্ত চলছিল ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের অহিংস বা সহিংস সংগ্রাম। আমি ছিলুম ইংরেজ শিবিরে। মনটা ভারতীয় শিবিরে। দুই শিবিরের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। দেশের লোক তো আমাকে ভুল বুঝবেই। তেমনি ইংরেজরাও কখনো কখনো কী-পোস্ট দেয়নি। ওরই মধ্যে একটু ভালো যা দিয়েছে তাও সাময়িকভাবে। বাংলাদেশে একটা সংগ্রাম সারা হতে না হতে আরেকটা সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের। এটার পদ্ধতি আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ নয়। এটার পদ্ধতি দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঠাণ্ডা লড়াই, কারণে অকারণে ঝগড়া। আবার দুই শিবির। এক শিবিরের না এক শিবিরে সব ভারতীয় কর্মচারীদের ভিতরে ভিতরে ভিড়ে যেতে হয়। পার্টিশন হলো বলে এটা হলো, বাইরে থেকে দেখলে সেইরকমই মনে হবে বটে, কিন্তু প্রকৃত কথা, এটা হলো বলেই পার্টিশন হলো। আমাকে জজ করে দেওয়ায় আমি বাঁচতে পেরেছি, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট করলে আরো বাধা পেতুম। অন্যথা দুই পক্ষই আমাকে ভুল বুঝত। জজ হয়ে সাক্ষীর মতো দূর থেকে দেখেছি তিন তিনটে ত্রিপক্ষ সংগ্রাম, নাৎসীদের সঙ্গে গণতন্ত্রী তথা সমাজতান্ত্রিক শক্তিদের, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের, জাতীয়তাবাদী তথা অসাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে বিরুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের। মহাযুদ্ধে জয়লাভ করলেও ইংরেজের আর সে বল ছিল না, সে মানে মানে সরে গেল। তেমনি সমগ্র দেশের জন্য সংগ্রাম করে থাকলেও কংগ্রেসের সারা ভারত আজকে রাখার মতো বল ছিল না। সেও এক ভাগ ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দিল। তেমনি সারা বাংলা দেশের জন্য হামলা করে থাকলেও মুসলিম লীগের সারা বাংলা আজকে রাখার মতো বল ছিল না। সেও একভাগ নাচার হয়ে ছেড়ে দিল। এই শোচনীয় অধ্যায় যখন সমাপ্ত হলো তখন উপলব্ধি করলুম যে আমি একটা বৃহৎ শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে বৃহৎ ভারত ও বৃহৎ বঙ্গ দর্শন করেছি। এমনটি আর কেউ কোনোদিন দেখতে পাবে না। এক স্টেশনে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অফিসার মিলে মিশে কাজ করা ইতিহাসে ওই শেষ। একটা মিশ্র প্যাটার্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

প্রশ্ন : তারপর ১৯৪৭ এল। দেশ দুখণ্ডে ভাগ হয়ে হলো ভারত ও পাকিস্তান, রক্তের বন্যা বইল বাংলায়, বিহারে, পাঞ্জাবে, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর কঠিন চেষ্টায় গান্ধীজী প্রাণ দিলেন। কবি ও লেখকরূপে আপনার স্পর্শকাতর মনে এসব ঘটনার প্রভাব পড়েছিল নিশ্চয়। খুব সম্ভব এই কারণেই আপনি নির্দিষ্ট কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার প্রায় বছর চারেক আগে সিভিল সার্ভিস থেকে ইস্তফা দিলেন। তারপর তো ১৯৪৯ সালে চলে এলেন এই শান্তিনিকেতনে। পুরী নয় দার্জিলিং কালিম্পং নয়, এই রোদে পোড়া লালমাটির দেশে কেন যে বাকী জীবন কাটাতে এলেন, কেনই বা স্বর্ণসুখের সোনার চাকরি ছেড়ে দিলেন—এসব প্রশ্ন নিয়ে অনেকেই কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করে থাকেন। আশা করি আপনি এসব প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার নিরসন করবেন।

উত্তর : আমার সাহিত্য ইতিমধ্যে মাথায় উঠেছিল। লিখতে সময় পাইনে, সময় পেলেও প্রেরণা পাইনে। গভীর অশান্তির মধ্যে পার্টিশনের পূর্বের ও পরের বারো বছর কেটেছে। আবার আমাকে বরণ করতে হবে দুটোর থেকে একটা। চাকরি না সাহিত্য - দুই হাতে দুই ঘোড়ার লাগাম ধরে সার্কাস দেখিয়েছি আমি। কিন্তু বেশীদিন পারতুম না। প্রকৃতি আমাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে একটার জন্যে আরেকটা ছাড়তে হবে, নইলে অকালে সার্কাস সাঙ্গ হবে। চাকরি ছাড়ার কথা চাকরির গোড়া থেকেই ভেবেছি, ছাড়িনি তার প্রধান কারণ সাহিত্য করে সংসার চলত না, সাংবাদিকতা করলে সাহিত্য চলত না। ইংরেজ যাবার সময় স্থির হয়ে যায় যে আনুপাতিক পেনসন আমরাও পাব, যদি অকালে অবসর নিই। অকালে দেহত্যাগের চেয়ে অকালে চাকরিত্যাগ ভালো নয় কি? নইলে করতে হতো সাহিত্যত্যাগ। একদিন চাকরির মায়া কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসি ১৯৫১ সালে। তার উপর সেই ১৯২৪ সাল থেকেই একটা টান ছিল যেবার প্রথম দেখি। নিজে ছাত্র হতে পারিনি, ছেলেমেয়েদের ছাত্রছাত্রী করে দিই। এখন ওরা বড়ো হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। আমরা দুটি প্রাণী বাকী। বাকী জীবনটা যে এইখানেই কাটবে এমন কোনো স্থিরতা নেই।

প্রশ্ন। এবার আপনার সাহিত্যকর্ম বিষয়ে দু-চার কথা জিজ্ঞেস করব। আপনি তো কবিতা লিখেছেন, ছড়া কেটেছেন, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস প্রচুর লিখেছেন। কোনোকালে নাটক লিখেছেন কিনা জানি না। আত্মপ্রকাশের এই যেসব বিচিত্র মাধ্যম—এর মধ্যে কোন রাস্তা আপনার দিক থেকে সবচাইতে প্রশস্ত মনে হয়।

উত্তর। উপন্যাসের মাধ্যমে যত কথা বলতে পারা যায় তত আর কোনো মাধ্যমে নয়। কিন্তু আর্ট হিসাবে কাব্য ও নাটক আরো উঁচু। পারলে নাটকও লিখতুম, লিখেওছি, কিন্তু কবিতা আমি পারি। সাধ্যের অতীত নয়, অথচ আর্টকে রয়েছে। ওতেই আমার সবচেয়ে তৃপ্তি। কিন্তু যাই লিখি না কেন, ছড়া বা প্রবন্ধ বা গল্প প্রত্যেকটি আমার কাছে আর্ট। আর্ট মুক্ত করে।

প্রশ্ন। আপনি তো বেশ অনেক বছর ধরে লেখার ব্যাপারে যান্ত্রিক, অর্থাৎ হাতে না লিখে টাইপরাইটার ব্যবহার করেন। লিখেছেনও প্রচুর। আচ্ছা, এত লেখা উৎপাদনের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ যান্ত্রিকতার ছোঁয়াচ এসে যায় না কি? আপনার সৃষ্টিকর্মের ধরনধারণ, রীতিপদ্ধতি, লেখকরূপে আপনার দিনচর্চা এসব নিয়ে অনেকে কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করে থাকেন। এবিষয়ে আপনার নিজের কথাটুকু জানতে ইচ্ছা হয়। আপনি কি চরিত্র ও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, সূচনা ও পরিণাম ইত্যাদি সব কথা আগাম স্থির করে ধরাবাঁধা রাস্তায় প্ল্যানমাফিক চলেন? কর্মজীবনে থাকতে এত সব লেখার সময় বা অবসরই-বা পেতেন কেমন করে? এত শত লেখার মালমশলা অভিজ্ঞতাই বা কোথা থেকে পেলেন?

উত্তর। টাইপরাইটারে লিখলে কপি তৈরি করার পরিশ্রম বাঁচে। টাইপরাইটারে বার্নার্ড শ লিখতেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতেন। যন্ত্রে লিখলেই যান্ত্রিক হয় না। যান্ত্রিক হয় যদি ফরমুলা অনুসারে লেখা হয়। আমি প্রত্যেকটি গল্প উপন্যাসের জন্যে নতুন করে ভাবি, প্রত্যেকটি লাইনের জন্যে শব্দের জন্যে মাথা ঘামাই। এটাও আমার কর্মজীবন। অবসর মানে সরকারী কর্মচারীর অবসর, সরস্বতীর সেবকের নয়। সরকার আমাকে হপ্তায় একদিন ও বছরে কয়েকদিন ছুটি দিতেন। সরস্বতী তাও দেন না। আমি পুরো সময়ের লেখক হতে চেয়েছিলুম, পুরো সময়ের লেখক হয়েছি। স্বাধীন লেখক হতে চেয়েছিলুম। স্বাধীন লেখক হয়েছি। কাজে ফাঁকি দিতে চাইনি কাজে ফাঁকি দিইনে। কী পরিমাণ পরিশ্রম এক একটি রচনার পিছনে আছে পাঠকদের বোঝানো যাবে না। তাঁরা এক বছরের পথ একঘণ্টায় অতিক্রম করবেন। কষ্ট করে বুঝতে চাইবেন না। যত লিখি তার চেয়ে না লিখি ঢের বেশী। ছাঁটাই করা পৃষ্ঠাও

জমতে জমতে বইয়ের সমান হয়। কোথায় শুরু করব, কোথায় শেষ করব, স্টাইল কী রকম হবে, ভাষা কী রকম হবে, টেকনিক কী রকম হবে এসব স্থির না করে আমি শান্তি পাইনে। তবে সব কিছু অগ্রিম স্থির করা যায় না। লেখার একটা মস্ত সুখ হচ্ছে সারপ্রাইজ। আমার হাতে কলম, কিন্তু লেখা আপনাকে আপনি লিখিয়ে নেয়। এক একটি বই এক একটি আশ্চর্য। সৃষ্টির আনন্দের মতো আর কী আছে! এই যে ক্ষমতা ভগবান আমাকে দিয়েছেন এটার সদ্ব্যবহার করে আমিও কিছু দান করে যাচ্ছি।

প্রশ্ন। এই পর্যন্ত আপনি যেসব বই লিখেছেন তার মধ্যে সৃষ্টিকর্মের দিক থেকে কিংবা রচনাশৈলীর দিক থেকে কোনটি আপনার সবচেয়ে পছন্দ? 'বিনুর বই'-এর মতো এমন আপনার আর কোন কোন লেখা আছে কি যার মধ্যে দিয়ে আপনি আপন কথা বলেছেন?

উত্তর। ইংরেজরা যেমন বলে আমিও তেমনি বলি, আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমার কোনো প্রিয়পাত্র নেই। বহু প্রবন্ধে আমার আপন কথা বলেছি। 'বিনুর বই' মোটামুটি আমারই লেখকজীবনের কথা।

প্রশ্ন। লোকে বলে যেসব মনস্বী, সাধক ও শিল্পী আপনার ব্যক্তিগত ও সাহিত্য-জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন তলস্তয়, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। এ বিষয়ে আপনার নিজের কথাটুকু শুনতে চাই।

উত্তর। আমার লেখকজীবনের প্রথম থেকে আজ অবধি দুটি জিজ্ঞাসা আমাকে অহরহ ব্যাপৃত রেখেছে। সত্যজিজ্ঞাসা ও রূপজিজ্ঞাসা। আমি যদি রূপদক্ষ না হতে চাইতুম তবে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা আমাকে দগ্ধ করত না। কিন্তু আমি যেহেতু আমি সেহেতু আমি প্রথম জিজ্ঞাসার ভর্তার। একটি না একটি জিজ্ঞাসা আমাকে নিয়ে গেছে দেশবিদেশের সাধক ও মনস্বী ও শিল্পীদের কাছে। টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী এই ত্রয়ী আমাকে সবচেয়ে বেশী শিখিয়েছেন। আর যাঁদের কাছে গেছি তাঁদের একজন রমাঁ রলাঁ, একজন প্রমথ চৌধুরী। রচনা কেমন করে রূপবান হবে এ ভাবনা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। গতানুগতিকের উপর বিরাগ 'সবুজপত্র'ই ধরিয়ে দেয়। বাউল বৈষ্ণব সহজিয়ার প্রতি আমার একটি আত্মীয়তাবোধ আছে। এঁদের কাছেও আমি গেছি আমার জিজ্ঞাসা নিয়ে। উত্তর পেয়েছি মিস্টিক ভাষায়।

প্রশ্ন। সাহিত্যজীবনে যেমন আপনাকে নিগ্রহ সইতে হয়েছে তেমনি নিশ্চয় পুরস্কারও পেয়েছেন অনেক। মৌচাকে ঢিল আপনি তো খুব কম ছোঁড়েন না। আবার হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ বিস্তর শুনিয়েছেন। এবিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

উত্তর। গোড়া থেকেই আমার ব্রত জীবনে আপস করলেও আর্টে আপস করব না। তা বলে গায়ে পড়ে আঘাত করতেও চাইনে। আমি স্বভাবত নির্বিবাদী। অথচ আমার লেখনী আমাকে বারবার কী বিপদেই না ফেলেছে! আর কেউ না করলে আমাকেই করতে হয় অপ্রিয় কৃত্য।

প্রশ্ন। আপনি তো বৃহত্তর জীবন থেকে সরে এসে শান্তিনিকেতনে একান্তে বসবাস করছেন। অথচ সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্যই হলো মন দেয়ানেয়া। শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলামেশার আপনি কি খুব সুযোগ পেয়েছেন?

উত্তর। শান্তিনিকেতনে আপনাদের সহযোগিতায় সাহিত্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমার আহ্বানে পূর্ব পাকিস্থান থেকে কয়েকজন সাহিত্যিক এসে পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিত হন। পূর্বপশ্চিম সাহিত্যিক সমাবেশ সেই প্রথম। পরে বাধা পাই। আপাতত সেই শেষ। বরাবরই আমি আন্তর্জাতিক পি-ই-এন সংস্থার ভারতীয় কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। পি-ই-এন'এর সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও জাপানে গেছি। সাহিত্য আকাদেমি যখন দিল্লীতে প্রতি-ষ্ঠিত হয় তখন তার উপর মহলে আমিও ছিলুম। বছর পাঁচেক সেই উপলক্ষে দিল্লী যাতায়াত করতে হতো। জবাহরলাল, রাধা-কৃষ্ণন, আজাদ প্রভৃতির সঙ্গে বসে ভার-তের বিভিন্ন সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশ লক্ষ করেছি। সাহিত্য আকাদেমির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহুদিন পূর্বেই ছিন্ন হয়েছে। তার দায়িত্ব বহন করতে সমর্থ পাইনি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়তে চাইনি। মাঝে মাঝে যোগ রেখেছি।

প্রশ্ন। সংসারজীবন ও সাহিত্যজীবনের মধ্যে যিনি সমন্বয় করতে পারেন—আপনি তাঁকেই বলেছেন জীবনশিল্পী। আপনার নিজের জীবনকে এভাবে শিল্পিত করে তোলার প্রয়াস কতো সফল হয়েছে—আপনার মুখেই জানতে ইচ্ছা করি।

উত্তর। জীবনটাই যার কাছে একটা শিল্পকর্ম তাকেই বলি জীবনশিল্পী। তিনি যে-কোনো শিল্পীই নন। যেমন গান্ধীজী। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শিল্পী তথা জীবন-শিল্পীর মিলন দেখেছি। এরকম কদাচিৎ চোখে পড়ে। আমার কথা যদি বলেন, আমারও আদর্শ তাই কিন্তু একদা এ নিয়ে যেমন যত্নবান ছিলুম এখন তেমন নই। অকল্পনীয়, অপ্রত্যাশিত ঢেউ এসে আমাকে ধাক্কা দিয়েছে, জীবনটাকে ঠিক করতেই আমি ব্যতিব্যস্ত। সেইসঙ্গে সাহিত্যপ্রয়াস-কেও। জীবনকে জীবনের মতো, শিল্পকে শিল্পের মতো করি আগে। তারপরে জীবনকে শিল্পকর্মের মতো করার কথা ভাবব। নিজের সীমা বুঝতে পারাই বিজ্ঞতা।

(১৯৬৫)

এই সাক্ষাৎকার আংশিকভাবে বেতারে প্রচারিত হয়। এখন পূর্ণভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। উত্তর স্থলে স্থলে পরি-বর্তিত হয়েছে। ক্ষিতীশ রায় প্রশ্নকর্তা।

ভারতের
আদিতম
রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দি কাশি,
স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।
দৈনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের
দৌর্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি
সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

মিহির আচার্য

হেডমিসট্রেস রমলাদি আবার বললেন: 'ভেবে দেখো, এই দুর্দিনে চাকরিটা ছেড়ে দিলে ভবিষ্যতে অর্থকষ্টে...'

মিনতি হেসে বলল : 'আমার কোন উপায় নেই রমলাদি। এই ছ' বছর অনেক ভাবলাম। এ হয় না, সম্ভব নয়। আর্থিক অভাবটা দূর করতে গিয়ে আমি যে নিঃস্ব অর্থহীন হয়ে পড়ছি। অনেক সময় দস্যুর মতো নিজেকে ভীষণ স্বার্থপর লাগে। স্বজনের সংসারের দায়িত্ব এড়াতেই আমি পালিয়ে এসেছি। সুকুমারের প্রতি আমার অনেক কর্তব্য আছে। দূরে থেকে আমি তা পালন করতে পারি নে।'

'কিন্তু সুকুমারবাবু তো শুনেছি সামান্য চাকরি করেন। ও'র একার রোজগারে...'

'কী মানে হয়? বস্তুত ক্ষেত্রে ওর সংসার আর আমার সংসার তো এক হতে পারছে না। আমি মেয়ে নিয়ে এখানে ও ছেলে নিয়ে ওখানে। ওর সংসারের বাজেট আমার সংসারের সঙ্গে এক নয়। ও বা একা, তাই। তাহলে কোন্ সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ওর বা আমার আত্মত্যাগ। মানুষ তো নিছক পয়সা রোজগারের যন্ত্র নয়, রমলাদি।'

'কিন্তু সুকুমারবাবু কী তোমার এই সিদ্ধান্তে সুখী হবেন?'

মিনতি বলল : 'আরো কয়েক বছর আগে হলে হত। এখন আর হবে না।'

'তবে? ভেবে দ্যাখো।'

'সেইটেই তো চিন্তার কারণ হয়েছে। আমি ওর কাছে প্রয়োজনহীন হয়ে পড়ছি। আরো কয়েক বছর গেলে আমি ওর চেনা থেকে একেবারে বাতিল হয়ে যাব। সে-লজ্জা সে-দুঃখ মেয়ে হয়ে আমি সহ্য করতে পারব না।'

'তারচেয়ে ছুটি নিয়ে যাও। দ্যাখো মানিয়ে নিতে পারো কিনা। দরকার হলে ফিরে আসবে। নতুবা চাকরি ছেড়ে দেবে।'

মিনতি বলল : 'তাহলে আর আমি কোনদিন এই বন্ধন থেকে উদ্ধার পাবো না। ইতিমধ্যেই আমি অভ্যেসের দাস হয়ে পড়েছি। এই আত্মনির্ভরতা, এই অনায়াস স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা আমাকে অনেকখানি কাবু করে ফেলেছে। ফিরে গিয়ে আমার সংসারে ছেলে মেয়ে স্বামীর প্রয়োজনে নিজেকে আটকে রাখতে পারব কিনা সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট দুর্ভাবনা আছে। তবু আমাকে চেষ্টা করতে হবে।'

রমলাদি হেসে বললেন, 'তাহলে আর তোমার ইউনিভার্সিটির ডিগ্রির মানে কী হল? কী কাজে লাগল?'

মিনতিও হাসল। 'কেন? আমার ছেলে-মেয়েদের দেখতে পারব। আলাদা টিউটর

তো রাখা যাবে না? আর যদি নেহাতই দরকার হয় কলকাতায় কী চেষ্টা-চরিত্তির করে একটা চাকরির জোগাড় করা যাবে না?'

রমলাদি বললেন, 'বুঝেছি। তুমি স্বামীকে ছেড়ে থাকতে চাও না, এই তো?'

মিনতি বলল : 'দিদি, এই ইচ্ছেটা কী খুব অন্যায় হবে? বিয়ে যখন করেছি, আমরা আলাদা থাকব কেন? দেখলাম তো কোন লাভ হল না। মাঝে-মাঝে ওকে সাহায্য করেছি। এই সাহায্য করার অহংকারটা আমাদের দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ওর কাছে আমি টাকা পাঠানোর যন্ত্র ছাড়া কিছু নই। এই আর্থিকতার গন্ধটাই বিশ্রী।' একটু থেমে : 'বেঁচে-থাকা মানেই দায়িত্ব নেয়া। সেটা উপযুক্ত সন্তানের দরিদ্র বাবার কাছে টাকা সাহায্য করার ব্যাপার নয়। আমার অসুখ-বিসুখ হলে কিম্বা মেয়ের, তখন মনে হয় আমাদের জন্যে কারুর কিছু করার নেই, ডাক্তার দেখান থেকে ওষুধ-খাওয়া পর্যন্ত আমাদেরই করতে হয়। ঈশ্বর না করুন, যদি আমার মেয়েরই কিছু একটা হয়ে যায়, আমি ওর বাবার কাছে কী জবাবদিহি করব? কিম্বা আমার স্বামীই যদি অসুস্থ হন, এই তো সেবার ওর টাইফয়েড হল, আমাকে জানান নি পর্যন্ত...'

'তোমার চাকরি করতে আসাই উচিত হয়নি।'

'ভেবেছিলাম পারব। দেখলাম পারব না। সুখের চেহারা একেকজনের কাছে একেক রকম।'

'এইতো সান্ত্বনা, সুখী, জয়া। ওরা...'

মিনতি বলল : 'ওদের মনের কথা কী আমরা জানি রমলাদি? বেঁচে থাকার সর্বসাধারণের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট ছক নেই দিদি। সেইখানেই ভুল হয়। একদা ভেবেছিলাম বাইরে থেকে কিছু টাকা আনতে পারলেই সংসারের মুখ উজ্জ্বল হবে। চিন্তাটা সর্বজনীন। ব্যক্তিবিশেষের সীমাবদ্ধতার দিকটা তখন আমি ভাবিনি। কেউ পারে কেউ পারে না। সকলের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো ছক নেই।'

রমলাদি বললেন, 'দ্যাখো তুমি কী করবে। তবে বছরের মাঝামাঝি, মেয়েদের কথা ভেবে...'

মিনতি বলল : 'চিন্তা যখন শেষ হল, বছরের মাঝামাঝি এসে পড়লাম। কী করব! বড় মেয়েরা জানবে, ওরাও তো একদিন আমারি মতো সমস্যায় পড়বে। আমি ওদের কাছে কোনোদিন শিক্ষিকার খোলস পরে থাকতে চাইনি। ওরাও জানুক আমার একটা আসল সংসার আছে, যেখানে আমার জায়গা, আমার একমাত্র আশ্রয়।'

রমলাদি হাসলেন। 'তুমি একেবারে শরৎচন্দ্রের নায়িকা হয়ে যাচ্ছ।'

'কী করব? আমার মানসিক শারীরিক সুখবোধের তো যন্ত্রণা রয়েছে, আমি যে মেয়ে সেটা ভুলব কী করে?'

চাপা খবরটা আগুনের মতো জ্বলে উঠল।

সান্ত্বনা বলল : 'ভণ্ড।'

সুখী বলল : 'স্বামী সোহাগ দেখানো।'

জয়া বলল : 'আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিত। এই অন্ধকার নিরানন্দ বোকার রাজত্ব থেকে...'

'তুই থাম।'

'মিনতিদি বেঁচে গেল।' জয়া নিশ্বাস ফেলল।

'যেন আমরা মরে রয়েছি। যত ন্যাকামো। ওর স্বামী নিশ্চয় লটারির টিকিট পেয়েছে।' সুখীর ভাবখানা সে ইচ্ছে করলেই মিনতির পথকে অনুসরণ করতে পারে।

জয়া বলল : 'আমি মিনতিদির কাছে যাই।'

'এই খবরদার। আমাদের ওপর টেক্কা দেয়া। যেন আমরা মরে গেছি। কেঁদেকেটে আবার যখন ফিরতে হবে।'

'অমন কথা বোলো না।'

উৎসাহের অভাবে ওরা কুঁকড়ে গেল। কিংবা মিনতি-সম্পর্কে একটা ভয়। অথবা ভয়টা নিজেদের জন্যে। সংশয় দ্বিধা ম্রিয়মানতায় ওরা আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

সন্ধেবেলা গাড়ি ডেকে মিনতি যখন উজ্জ্বল হেসে ওদের বলল : 'আসি।' ওরা উত্তর খুঁজে না পেয়ে বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

।। ২ ।।

'তুমি।' দরজা খুলে সুকুমারের প্রথম সম্ভাষণ।

'কেন? ভেবেছিলে অন্য কেউ?' মিনতির গলায় গাম্ভীর্য।

'না, এমন অসময়ে...'

'সময়-অসময় কী? আমাকে কী নিয়ম ধরে আসতে হবে? আহা।'

'ছুটি নিলে?' সুকুমার ওর শরীরের ওপর চোখ বুলোলো : 'শরীর খারাপ?'

মিনতি এবার রাগল। কিংবা ক্রোধ প্রকাশটাই এখন তাকে আশ্রয় দেবে! বলল : 'এত জেরার মুখে পড়ব জানলে কে আসত। আমার বাড়িতে আসব তবু অন্যকে কৈফিয়ত দিতে হবে?'

সুকুমার ট্যাক্সি থেকে মিনতির বেডিং ট্রাঙ্ক উদ্ধার করল। মিনতি আগে ভিতরে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

সুকুমার সদর বন্ধ করে দিল।

ওঘরে মিনতির জোরালো গলা। সুকুমারের মনে হল ওর গলার স্বরটা যেমনি কিশোরের মতো অস্ফুট। বোধহয় গৌতমকে বিছানা থেকে ঠেলে তুলেছে। ওর নিজস্ব সম্পত্তিগুলো যথাযথ আছে কিনা সরেজমিনে তদন্ত করে নেয়া।

সুকুমার বলল : 'ওকে সাত-সকালে তুলছ কেন?'

মিনতি বলল : 'আহ্, মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি। বেশ করছি। তোমার কথা বলতে হবে না।'

সুকুমার মেনে নিল। ঘুম ভেঙে উঠে সব অস্ফুট লাগছে। মিনতির খবর না-দিয়ে হঠাৎ চলে-আসা। অনেক রাত্রির পরে ভাঙা আসরের মতো এলোমেলো। সুকুমার হাই তুলে আবার শয্যায় গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু চেতনায় মিনতির অস্তিত্বের রহস্যটা অন্যথা হল না। মালিও বোধকরি মার সঙ্গে ও ঘরে। গৌতমকে দুজনে ঘুম থেকে ডেকে তুলবেই। বাইরে এখনো কুয়াশা, সুকুমার ভাবল : ওরা যা ইচ্ছে করুক, তাকে চুপ করে থাকতে হবে। কিন্তু বিষয়টা কী? মিনতির আগমনগুলো তো দীর্ঘ ছুটির সঙ্গে নির্দিষ্ট। কোনো অপ্রস্তুত রোমাঞ্চ নেই তার মধ্যে। মিনতির স্বভাবে রোমান্টিকতার এক ফার্দিং-ও নেই।

মিনতির ডাকে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ। 'তুমি। কেন লক্ষ্মীর মা?'

মিনতি কড়া মেজাজে বলল : 'কেন লক্ষ্মীর মা থেকে আমার চা কী খারাপ হবে?'

'দূর্ দূর্ তুমি কষ্ট করবে কেন?'

'আমার কষ্টের কথা ভেবে তোমার ঘুম হচ্ছে না। তোমরা না ভীষণ স্বার্থপর।'

'তাই বুঝি?'

'লক্ষ্মীর মাকে আমি ছুটি দিয়েছি—'

সুকুমার বলল : 'মানে?'

'কেন? আমি ওকে ছুটি দিতে পারিনে?'

ভাঙন শুরু অনেককাল আগে। কেরল কংগ্রেস, জন-কংগ্রেস, উৎকল কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস এবং শেষ অধ্যায় আদি কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেস। সবাই দাবীদার গান্ধীবাদের কিন্তু সবাই গান্ধীকে বাদ দিয়েই সারা দেশে অশান্তির ইন্ধন জোগাচ্ছে আর দিল্লির মসনদ থেকে

ইন্দিরার আর্তনাদ

শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই আছে—

বেদুইন

সাড়ে আট টাকা

সঞ্চিতা—২২এ কলেজ রো। কলিকাতা-১

'তা পারো। কিন্তু ওর কাজগুলো করবে কে?'

'কেন? আমি বিনিমাইনের দাসী আছি? তোমার টাকা বেঁচে গেল?'

'পাগলামো।' সুকুমার এবার বিরক্ত হল।

মিনতি হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে উঠল। ওর নাকের পাতা কাঁপছে।

'আমার চলে-আসাটা তুমি ভালো মনে নিতে পারছ না।'

'আচ্ছা, ছেলেমানুষি।' সুকুমার বলল।

মিনতি বলল : 'তোমার ভাবটা দেখে মনে হচ্ছে আমি তোমার সংসারের অতিথি, দু-দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি। আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে তুমি বাঁচো।' কে জানে, মিনতি এ সকল কথা বলছে কেন নাকি তার ভেতরেরই প্রথম সংশয়টা কাটাবার জন্যে সে প্রস্তুতি করছে।

সুকুমার বলল : 'তোমার কষ্টের জন্যেই বলা...'

মিনতি বলল : 'আমার কষ্টের কথা একটু কম ভাবলে বেঁচে যাই।'

মিনতি ঝড়ের মতো চলে যেতেই সুকুমার ক্লান্ত হয়ে সিগারেট ধরাল। সকাল থেকে সমস্ত দিনটা হঠাৎ বিনা নোটিশে হরতালে-স্তব্ধ মহানগরীর মতো ভারি হয়ে উঠল। এখন মুহূর্তগুলোর ওপর কড়া পাহারা, গুনে গুনে খরচ করতে হবে। বড় বেশি আত্মসচেতন হয়ে পড়ে সুকুমার। লক্ষ্মীর মা কী বাজারে গেছে? নাকি সে কাছ থেকেও ছুটি নিয়েছেন মনিব? আপিস যাওয়া আছে, গৌতমের ইস্কুল। অথবা আজ বাড়িশুদ্ধ গো-অ্যাজ-ইউ-লাইক। আচ্ছা : সুকুমারই বা এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন। মিনতির তো যে কোনো সময়েই এ বাড়িতে আসার অধিকার। না হয় না-জানিয়েই এসেছে। নাই বা ঘোষণা করুক ওর স্বাধিকের মেয়াদ। অপ্রস্তুত ঘটনাগুলোও কী কম মজাদার। নাঃ মজা করার বয়েস নেই, সুকুমার নিজেকে ধমকাল : আপিসে আর্জেন্ট ফাইল জমে গেছে। সে ইচ্ছে করলেও ছুটি নিতে পারে না। এবং গৌতমেরও কয়েকমাস বাদে পরীক্ষা। মিনতির খেয়ালের খেসারত তারা দিতে পারে না। তাছাড়া সংসারের বাজেটেরও একটা ব্যাপার আছে। মিনতি বলুক কতদিন থাকবে। বাড়তি দুধের জন্যেও তো বলে আসতে হবে। রেশনের চালে না হয় কদিন চলে যাবে।

সুকুমার এবার উঠে পড়ল।

ওঘরে ভাইবোনে স্ট্যাম্প অ্যালবাম নিয়ে মেতে উঠেছে। দৃশ্যটা কদাচিৎ চোখে পড়ে। আপন মনে মাথা নেড়ে দৃশ্যটাকে যেন সমর্থন জানায় সুকুমার। তার মতো বয়স্কের সঙ্গে একা থাকতে থাকতে গৌতম বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। ওর সাথী দরকার, সমবয়সী। এরা দুজন কাছে না থাকলে পরস্পরের আকর্ষণটা বোঝা যায় না। গৌতম দিদিকে খুব ভালোবাসে। অথচ একা থাকতে ওর এই ঝোঁকটা বোঝা যায় না। যেন একটা দুর্লভ চিত্র দেখছে তেমনি স্তব্ধ হয়ে কিছু-ক্ষণ দাঁড়িয়ে সরে এল সুকুমার। বুকের ভেতরটা কেমন করছে। সে কী আবেগে জড়িয়ে পড়ছে। এই দৃশ্য থেকে বঞ্চনাজনিত ব্যথা অনুভব করে সুকুমার। এবং তখনি একটা রাগ দুঃখ ঈর্ষা তাকে কালো করে তোলে।

'বাজার যেতে হবে?'

বারান্দায় বেরিয়ে এল সুকুমার।

মিনতি বলল : 'তার আমি কী জানি?'

সুকুমার হেসে উঠল। 'রাগ কোরো না। আমার তো বারো মাস শিবের সংসার। তুমি না এলে বুঝতে পারিনে সংসারের প্রয়োজনটা।'

মিনতি বলল, 'আহ্‌।'

সুকুমার রান্নার ঘরে পা দিল।

'কই, কি আনতে হবে বলো? দেরি হয়ে যাবে।'

মিনতি বলল : 'ভাবখানা এমন দেখাচ্ছ আমার ওপর নির্ভর করে তুমি সংসার চালাচ্ছ? আমাকে তুমি খোড়াই কেয়ার করো।'

সুকুমার হাসল। 'এই বয়েসে কারুর ওপর নির্ভর করা কী ভালো হবে? বদভ্যেস হয়ে যাবে।'

'তাই বুঝি একা স্বর্গসুখে থাকতে চাও? নিজেকে হালকা তরুণ ভাবা যায়?'

'নিশ্চয় কর্তাদের বলে যে আমাদের ... কোনো ছাপ নিতে হয় না। অনেক সুবিধে।'

'তাই সেখানে পাচ্ছি। আমাকে অভ্যাসের যা ছাঁচা দেখলাম।'

'না, এই বয়েসে শাশুড়ি-অভ্যাসও ভালো লাগে না। সেবার দুদিনের জন্যে সুরেশ এল, বড়দির ছেলে, যেদিন সত্যিই ও চলে গেল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।'

হঠাৎ মুখ তুলে কঠিন গলায় মিনতি জিগ্যেস করল : 'এসব কথা আমাকে শোনানোর অর্থ কী? তুমি কী আমাকেও তাড়িয়ে দেবার আয়োজন করছ?'

'এই, কী হচ্ছে, ওরা শুনতে পাবে যে—'

'থাক। আমি আর কিছুতে ভয় পাইনে। আসার পর থেকে তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ যে আমি তোমার সুখের শত্রু। কেন, আমি কী করেছি? আমাকে এমন অবহেলা করার মানে কী?'

'এই, প্লিজ—নাটক কোরো না।'

'নাটক।' চোখ গোল করল মিনতি : 'নাটক তুমিই করছ। এসে পড়ে যেন অন্যায় করেছি। এখানে আসতে আমাকে আগে থেকে ঘণ্টা নেড়ে আসতে হবে? তবে বিয়ে করেছিলে কেন? ইয়ার্কি, না?'

মিনতির এই অহেতুক উক্তার কারণ বুঝতে না পেরে সুকুমার প্রথমত স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু বিরক্ত হল না। কেমন যেন এই উত্তেজনার আবহাওয়ায় সে একধরনের আরাম বোধ করছে। কতদিন যে ঝগড়া হয়নি মিনতির সঙ্গে। স্বাদটাই ভুলে গেছে। কিন্তু...বিষয়টা কী? এতদিন পর মিনতি বিয়ের তাৎপর্য তাকে বোঝাতে চাইছে। সত্যিই তো জানা দরকার। মিনতিই বলুক বিয়ে মানেটা কী? না, সে ইয়ার্কি করতে চায় না।

'মা, খিদে পেয়েছে।' গৌতম।

'বাবাকে বল—'

সুকুমার তাড়াতাড়ি বলল : 'দোকান থেকে মিষ্টি এনে দেবো?'

মিনতি মুখ বেঁকিয়ে বলল : 'ও বুঝি রোজ মিষ্টি খায়?'

'না, তা নয়।' সুকুমার বেসামাল।

'টোস্ট করেছি। লালিকে ডেকে নিয়ে এসো।' গম্ভীর গলায় গৌতমকে আদেশ করল মিনতি।

গৌতম পালাল।

'আমি তাহলে বাজার ঘুরে আসি—' সুকুমার অনুমতি চাইল।

'খেয়ে যাও।'

'আচ্ছা।' পরিতৃপ্ত জন্তুর মতো সুকুমার ঘরে গিয়ে সিগারেট ধরাল।

দাম্পত্যের কী নিজস্ব কোনো গন্ধ আছে! এবং এতদিন পর সেই ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধটা শোধন করে এসেছে নাকি! সুকুমার, তোমার বয়েস কমছে না বাড়ছে হে? কী যেন প্রশ্নটা? বিয়ে করেছিলে কেন! আহ্‌, যেন জিগ্যেস করছ : ভাত খাই কেন? কলেজ জীবন থেকে আপিসের হক ক্রমশঃ নি-বাহ্‌। ভালোবাসা। চাকুরে জেনে ... স্বাচ্ছন্দ্য। লালি, গৌতম...। পরিচ্ছন্ন ... জীবন। সব হল, সব পেলাম। তাহলে প্রশ্নটার উত্তর হল : একটি সম্পূর্ণ জীবনের চিত্রনির্মাণের জন্যে। শিল্পীর মতো, নাকি মিস্ত্রির মতো।

মিনতি খাবার নিয়ে এল।

'ওরা খেয়েছে?'

'হুঁ।'

'এখুনি বাজারে না গেলে মাছ পাওয়া যাবে না।'

'যাও।'

সুকুমার খাবার খেয়ে বাইরে বেরুতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বাজার-করাটা আজকে তার কাছে গুরুদায়িত্বের

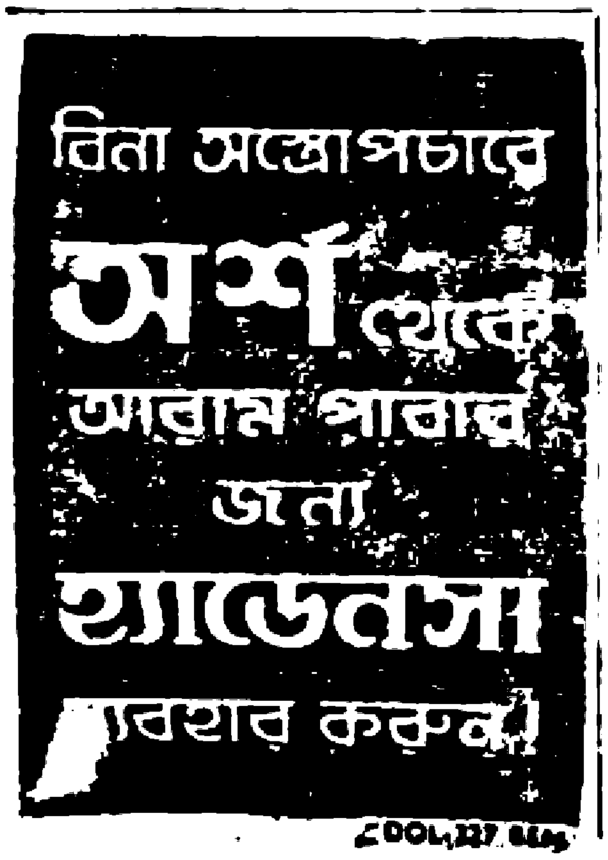

মতো মনে হচ্ছে। বহুদিন পর বাজার-করার আনন্দ পাচ্ছে সে। লালি চিংড়িমাছ ভালোবাসে। ফুলকপি না বাঁধাকপি? টমেটো? সুকুমার কবিতার চিত্রশালা নির্মাণ করছে যেন। ঘেমে নেয়ে দিগ্‌বিজয় করে ফিরল সুকুমার।

বাজার দেখে মিনতি ওর খুশি গোপন করল না।

তবু যতক্ষণ আপিসে যাবার আগে পর্যন্ত সুকুমার বাড়িতে রইল ততক্ষণ একটা উদ্‌বেগ, একটা অর্থহীন অশান্তি তাকে কামড়াতে লাগল। আপিসে কাজের ফাঁকে তার অনামনস্কতা নিজেকেই অবাক করে দিল। তার মাঝেমাঝেই মনে হতে লাগল বাড়িতে-কিছু একটা তার জানার অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করে রয়েছে। আর, মনে পড়তেই সে অকারণ অস্থিরতা অনুভব করছে। সুকুমার কী প্রথম বিয়ের দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছে। সেই অনামনস্কতা উদ্বেগনতা বেদনার দিনগুলো। নিজেকে যেন স্বাধীন ভাবা যাচ্ছে না। অন্তরঙ্গতা নামক একটা বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ছে। মিনতির অস্তিত্বটা আরো অন্ধকারের ঢেউয়ের মতো বারবার চেতনাকে সিক্ত করে দিচ্ছে।'

সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে হঠাৎ অগাধ লজ্জা কলেজেপড়া প্রবাসী ছেলের বাড়িতে ফেরার মতো গ্রাস করে ফেলল সুকুমারকে। জোনাকির আলোর মতো আনন্দগুলো যেন ইতস্তত চমকে চমকে উঠছে। বিবাহিত জীবনের একটি বিশেষ দিন ইন্দ্রিয়ে ঘন হয়ে আসছে। পঞ্চকাল বাদে সমস্ত ধাঁধাকে সরিয়ে যে দুর্লভ রাত্রে প্রথম তার অস্তিত্বের তীব্রতাকে তরবারির মতো প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করতে পেরেছিল। সেই আশ্চর্য সফলতার সুখ, লজ্জা, বেদনা, এবং...।

দরজায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে-ডোবা পাথরের মতো নিশ্চুপ বাড়ির দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ পর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। এত থমথমে কেন, এত নির্জনতা। মি-ন-তি। ফুসফুস যেন ফেঁসে গেল।

লক্ষ্মীর মা বলল : 'দিদিমণি বেরিয়েছেন। চা করে দেবো?'

সুকুমার বলল : 'না।'

লক্ষ্মীর মা অবাক হয়ে রইল।

'আলোটা নিবিয়ে দাও।'

অন্ধকার অন্ধকারে সুকুমার নিঃসাড়ে পড়ে রইল।

বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত সুকুমার। আহ্‌। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

'একী ব্যাপার। অন্ধকারে শুয়ে আছ কেন? শুনলাম চাও খাওনি।'

সুকুমার ধূসর চোখে তাকিয়ে রইল।

'কথা বলছ না কেন? আমার ওপর রাগ করেছ? বেরুলে কী ইচ্ছে মতো ফেরা যায়? জানো না ট্রাম-বাসের ব্যাপার।'

'মিনতি—'

'অ্যাঁ'

'আমি কৈফিয়ত চাইনি।'

'এখখুনি তোমার চা করে দিচ্ছি। রাগ কোরো না। দেখো আর কোনোদিন দেরি হবে না। আপিস থেকে ফিরলেই দেখবে আমি ছবির মতো বসে আছি।'

'ঠাট্টা?' আশ্চর্য, কী করে মিনতি ওর মনের কথা বুঝতে পারে!

'নাগো।' মিনতির চোখের পুকুর বর্ষার জলে থইথই করছে। 'লালি, গৌতম, ওঘরে পড়তে বোসো।'

চা খাবার নিয়ে ফিরে এল মিনতি।

'দ্যাখো তো ছিটটা কেমন হবে? গৌতমের বুশশার্ট করে দেবো। ওর ভারি শখ।'

'ভালো।'

'লালির এই শার্টফ্রক। এইজন্যেই একটু বেরিয়েছিলাম।' মিনতি হাসল।

অকস্মাৎ ওর মুখের দিকে চেয়ে সুকুমারও হেসে ফেলল। তার বদখত মনের আয়নার ওপর পরদাটা টেনে দেবার দ্বিতীয় কোনো উপায় সুকুমার খুঁজে পেল না। কী ডেস্পেরাস, স্বগত উচ্চারণ করল সুকুমার। ঊর্ধ্বশ্বাস নাটকের মতো।

'তুমি একটুও বদলাওনি।' মিনতি ছোট্ট করে বলল।

'তাই বুঝি?'

'কী করে একলা থাকো?'

'জানিনে।'

'আমার একটুও ভালো লাগে না। তুমি দশজনের মতো নও।'

'দশজনের মতো?'

'চুপ।'

'এতদিন পর তোমার এই জ্ঞান নিয়ে তুমি কী করবে?'

'দেখো না কী করি।'

'আমাকে বেঁধে নিয়ে যাবে?'

মিনতি হাসল ফের। 'ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে আমাদের কাজ অনেক কমে আসে। এখন...'

সুকুমার বলল : 'কী বলছ? ওদের কী চিরকাল ছোটো করে রাখবে?'

'তখন মনে হয় আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বুড়ো আর কাতর। নিজের মুখ আয়নায় দেখতে ভয় পাই।'

'আমার কাছে সে-ভয় নেই বুঝি!' সুকুমার হাসল।

'না। তাহলে তো মরেই যেতাম।' মিনতি রান্নার তদারকে চলে গেল।

সুকুমার উঠে গিয়ে ওঘরে বসল। লালি, গৌতম। আশ্চর্য, এদের কাছে কাতর হয়ে যাচ্ছে মিনতি। এই, যারা স্বাভাবিক সূর্যালোকের মতো তাদের মা বাবার অস্তিত্বকে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে রয়েছে। ওদের চেতনায় কী মা বাবা একদিন থাকবে না এই তরফের নির্মম সত্যের উপস্থিতি আছে! এ বিশ্বাসই করবে না। মিনতি ভুল করছে। কিংবা—

'বাপি—'

'কী রে?' বা-পি শব্দটা জন্মজন্মান্তরের বাসনার মতো তাঁর অন্তস্তলকে মথিত করে তুলছে। শৈশবে লালির কান্না যেমন মনের তন্ত্রীগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে যেত। বস্তুত সুকুমারও তার শৈশবে ফিরে যাচ্ছে। হ্যারিকেনের আলোয় সতরঞ্চি পেতে এক দঙ্গল ভাইবোন, সেই পড়া-পড়া খেলা। হায়, সেই স্মৃতি সময়ের তীব্র স্রোতে কবে ভেঙেচুরে গেছে। ভাইরা কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠিত, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। আহ, শৈশব, সেই মুগ্ধ-বোধ দিনগুলি। অন্যায়ভাবে এদের, এই ছেলেমেয়েদের শৈশবের স্মৃতিটাকে কী তারা বঞ্চিত করছে না! এমনি বিচ্ছিন্ন করে, স্বার্থপর করে তুলে। বা...পি-ই-ই-ই।

'আয় লুডো খেলি।' সুকুমার আহ্বান জানাল।

'মা পড়তে বলেছে।'

'বলুক।'

'মা বকবে!'

'বকুক।'

নিষেধের বেড়াভাঙা উচ্ছ্বাসে ওরা মেতে উঠল।

'অমা একী হচ্ছে...' আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মিনতি বলল। তারপর হাটু

সুজনী প্রেসের বই — প্রকাশিত হল

রাজ চক্রবর্তী
প্রণীত—

সেই মন সেই দাহ
প্রেম, পতন ও প্রবঞ্চনায় রোমাঞ্চময় একটি অনন্য উপন্যাস ১২·০০

লাস্ট অপারেশন
প্রথম সংস্করণ — নিঃশেষিতপ্রায়
বহু প্রশংসিত লেখকের আরেকটি রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস ৫·০০

পরিবেশক : ১) ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলি—৬
২) মিত্রালয় পাবলিশার্স, ২৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

জুড়ে বসে গৌতমের ছয় পড়তেই চিৎকার করে উঠল : 'এই বাবার পাকা ঘুঁটিটা কাট।' গৌতম দুর্জয় আক্রমণে বাবাকে পর্যুদস্ত করল। তারপর তুমুল কোলাহল। সুকুমারের ছদ্মরাগ, ছেলেদের মজা। হেসে কুটিকুটি হয়ে গড়িয়ে পড়ল মিনতি।

রাত্রি নামল নিঃশব্দ শিশিরপাতে।

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? এই!'

'না।' মিনতির শরীরের গন্ধ।

'কথা বলছ না কেন?'

'ভাবছি।'

'আমাকে নয় নিশ্চয়।'

'তোমাকেই।'

'এই এতক্ষণ ধরে? সত্যি, কী ভাবলে বলো না?'

'শুনতে চাইলে আমার ঘুম পাবে।'

'আহা, তাহলে এতক্ষণ জেগে রইলে কেন?'

'কী জানি।' মিনতির শরীরের গন্ধ।

মিনতি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তারপর? এবার কী হবে?' সুকুমার জানতে চাইল।

'মানে?' মিনতির পুন প্রশ্ন।

'সকাল সন্ধ্যা রাত্রি। একটা দিন শেষ...'

'আবার একটা সকাল সন্ধ্যা রাত্রি...'

'হুঁ—'

'জীবনে অনেক সকাল সন্ধ্যা রাত্রি। হিসেব কে করবে?'

'আমাকে করতে হয়।'

'কোরো না।' মিনতি পাশ ফিরল।

'তা কী পারি?'

'পারবে। আমি করতে দেবো না।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'একেক সময় তোমাকে বুঝতে...'

'কোনোদিন চেষ্টা করেছ?'

'বোধহয়...'

'আমরা কেউ কাউকে কখনো...'

'যা আমরা পারিনে, কোনোদিনও...'

'চিন্তার নিষ্ক্রিয়তা আমাদের আটকে দিচ্ছে। সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করলে'

'তোমার সে-সাহস আছে?' সুকুমার শুন্য হাসল।

'তুমি সাহায্য করলে...' মিনতি ফিসফিস করে বলল।

'আমার সাহায্যের ওপর তোমার আস্থা আছে?'

'তাহলে কার কাছে যাব?'

সুকুমার বলল : 'আমি স্বার্থপরের মতো অনেক কিছু দাবি করতে পারি তোমার কাছে। কিন্তু তা হয় না। আমার জোরগুলো তোমাকে খাটো করে। এই ঘর-গৃহস্থালির বাইরে তোমার একটা স্বতন্ত্র জগৎ এতদিনে গড়ে উঠেছে। একে আমি নিছক অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বলে ভুল করতে পারিনে।'

মিনতি বলল : 'আমার কথা তোমাকে অত ভাবতে হবে না।'

'আমি দালির মুখে সব শুনেছি।'

'কী?'

'চাকরি ছেড়ে দিয়েছ।'

মিনতির নিশ্বাস সুকুমারের কাঁধে। মিনতির আঙুলগুলো সুকুমারের গলায়।

'তুমি বিশ্বাস করোনি?' মিনতি বলল : 'তোমাকে জানাতে সাহস হয়নি। তুমি রাগ করোনি তো?'

'না।'

'তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমি বাড়তি বোঝা হলাম।'

'না। আমি ভাবছি তুমি একদিন এই স্থূল সংসারের বোঝা টেনে ক্লান্ত হয়ে যাবে কীনা। জীবনধারণের প্রক্রিয়াগুলো অফিসের রুটিনের থেকেও নীরস, একঘেয়ে।'

'তোমার জন্যে, তোমাদের জন্যে খাটছি জানলে...' মিনতি বলল : 'বাড়িতে বসেও অনেক কাজ করা যায়। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া দেখা। ও-ফ্ল্যাটের কুমকুমার দুপুরে পরামর্শের জন্যে এসেছিলেন। ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা নার্সারি ইস্কুল খুলেছেন। আমাকে বলছিলেন সাহায্য করতে। পাড়ার কিছু ডোনেশনও পেয়েছেন। ইস্কুল বড় হলে সকলেই কিছু কিছু ভাগ করে নিতে পারবে। তোমরা বেরিয়ে গেলে এই দুপুরটা...'

সুকুমার পাশ ফিরল। অন্ধকারে মিনতির মুখের পাণ্ডুলিপি, কপাল বেয়ে একরাশ চুল, গভীর কালো চোখ, পুরু বাঁকানো ঠোঁটের ধনুক...

অস্ফুটে কী বলতে উদ্যত হয়েছিল মিনতি হঠাৎ নির্ভুল লক্ষ্যে ওর ভাঙা কথাগুলোকে কেড়ে নিল সুকুমার। বাঁশির সুরের মতো কেঁপে কেঁপে উঠল মিনতি, অনেক মুদ্রা সৃষ্টি করে সজীব প্রার্থনার মতো রাত্রির বেদনায় হারিয়ে গেল।

রাত্রি নদীর মতো বয়ে চলল।

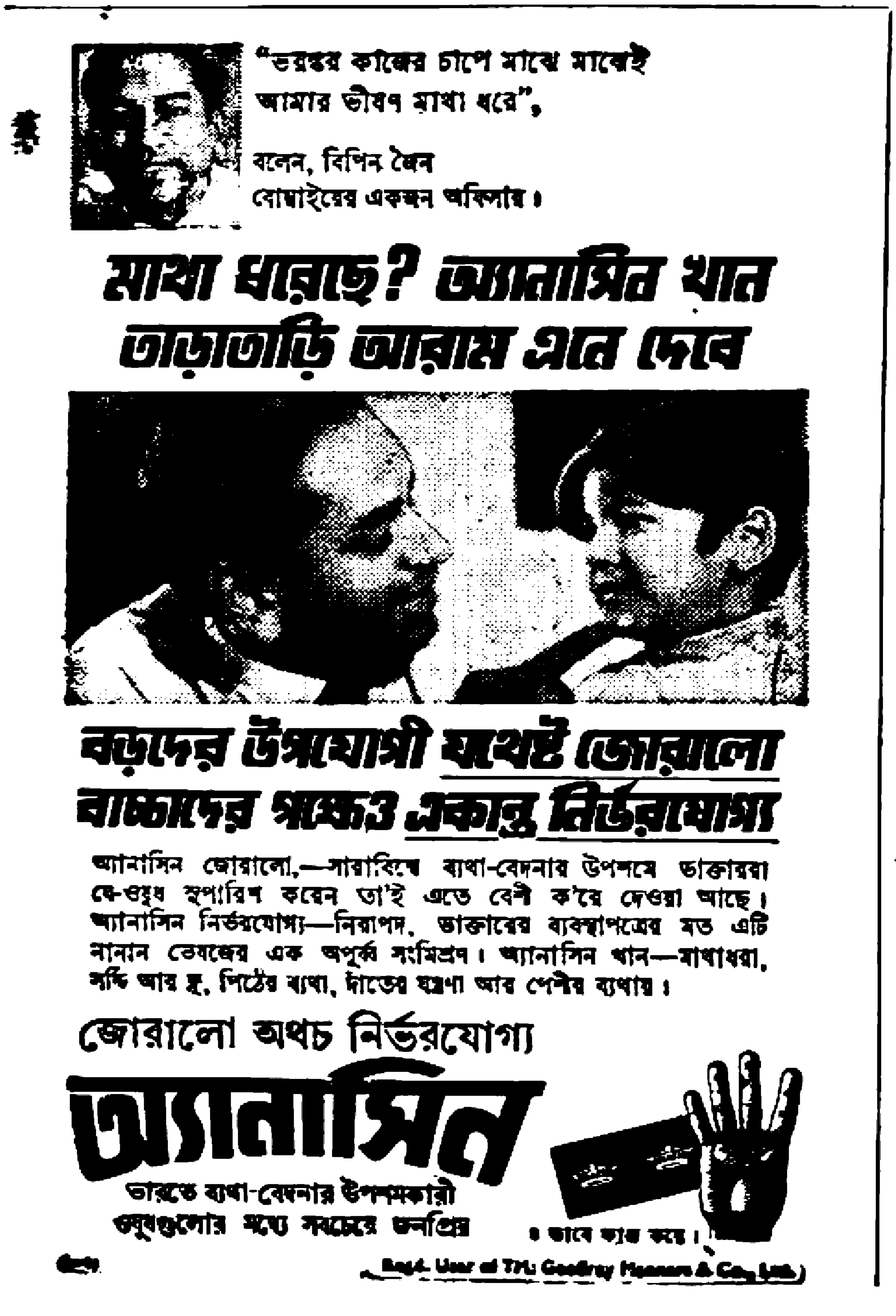

এই আমাদের দেশ

অতুলনীয় আদিনা মসজিদ দেখতে পাণ্ডুয়া চলুন

গৌড়-পাণ্ডুয়ার কথা মনে হলেই প্রাচীন ইতিহাসের দরজা খুলে যায়। সেকালের দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজারাজড়ারা যেখানে তৈরী করেছিলেন শিল্প সুষমামণ্ডিত মন্দির-মসজিদ আজ তা ঘন অরণ্যের রূপ নিয়েছে। কালের হাঁ-মুখ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে এখনও যা বেঁচে আছে তা দেখেও বিস্মিত হতে হয়।

হাওড়া থেকে ফারাক্কার ট্রেনে চড়ে বসে ফারাক্কায় পৌঁছালুম। ফারাক্কা থেকে গঙ্গা পেরিয়ে খেজুরিয়াঘাট। খেজুরিয়াঘাট থেকে আবার ট্রেনে মালদহ। মালদহে নেমে খাওয়া দাওয়া করে নেওয়া যায়। কারণ গৌড়-পাণ্ডুয়া ঘুরতে হলে মালদহেই হল্টিং স্টেশন করতে হবে। এখানে প্রাইভেট হোটেল পাবেন। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিস্ট লজ আছে সেখানেও থাকতে পারেন। শহরটা একটু ফাঁকা-ফাঁকা, তবে পরিচ্ছন্ন। মালদহ থেকে পিচঢালা রাস্তায় টাঙ্গায় চড়ে পাণ্ডুয়া যেতে পারছেন। মাইল ছয়েক টাঙ্গায় যেতে হবে। দু পাশে ঘন-পাতলা গাছের সারি। রাস্তা থেকে মাইল দুয়েক দূরে মহানন্দা নদী। বলা যায় আদিনা রেল স্টেশনের পর থেকেই বেশ বন-জঙ্গল।

পাণ্ডুয়া ঢুকেই প্রথমে আপনার চোখে পড়বে 'বড় দরগাহ'। এই দরগাহতেই পীর সৈয়দ মখদুম শাহ জলাল তব্রিজীর সমাধি আছে। এককালে এই দরগাহতে প্রতিদিন মুসলমান ফকিররা পেত খাওয়া-দাওয়া। সম্পত্তির আয় থেকেই খরচ চলে যেত। প্রায় বাইশ হাজার বিঘে সম্পত্তির আয় ছিল। এজন্য এই দরগাহের আর এক নাম বাইশ হাজারী দরগাহ। দরগার সামনের চত্বরে এক বিরাট নিম গাছ। এ নিয়ে একটা প্রবাদ আছে। লোকে বলে ফকির সাহেবের দাঁতন থেকেই নাকি এই নিম গাছের জন্ম। রাভেনশ বলেছেন, ফকির দেহ রেখেছিলেন দাক্ষিণাত্যে, সেখানকার কবরটিই আসল, তারই অনুকরণে এখানকার কবর তৈরী। দরগার ভেতরে জুম্মা মসজিদ তৈরী করেছিলেন আলি মুবারক ১৩৪৫ সালে। মসজিদের ভেতরে যেখানে ফকির জলাল তব্রিজী বসে উপাসনা করতেন তার চারদিক রূপোর বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। এখন অবশ্য সে বেড়া আর নেই। বছরে দুবার এখানে বেশ বড় রকমের মেলা হয়। মুসলমান ফকিররা সমবেত হন।

পাঁচটি খিলান দিয়ে এই দরগা। চত্বরের এক ধারে বহু দিন আগে একটা ডালিম গাছ ছিল, পুত্র কামনায় মহিলারা এই গাছে ইঁটের টুকরো ঝুলিয়ে যেতেন। বড় দরগার পাশেই হিন্দু মন্দিরের আকারে একটা ছোট মসজিদ আছে। দরগাতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পীর জলাল সাহেবের বড় দরগায় ঢোকবার মুখেই ছোট দরগাহ্। এটিকে ছয় হাজারী দরগাও বলা হয়। বিখ্যাত সাধক নূর কুতব-উল-আলম ও আলাউল-হকের সমাধিস্থান। আলা-উল-হক গৌড় সাদুল্লাপুরের পীর শেখ আখি সিরাজউদ্দিন সাহেবের শিষ্য ছিলেন। তাঁরই পুত্র সাধক হজরত নূর-কুতব-উল-আলম রাজা গণেশের সমসাময়িক ছিলেন। এই দরগাটি তৈরী করেছিলেন সুলতান শমস-উদ্দীন ইসুফ শাহ। কবরের এক-তলার ছোট ঘরটিকে বলা হয় চিল্লিখানা। এই ঘরেই কুতব আলম উপাসনা করতেন। দরগার উত্তর দিকের পাঁচিলের বাইরে ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত চতুষ্কোণ কষ্টি পাথরের স্তম্ভ ও আরও মূল্যবান পাথর পাওয়া গিয়েছিল।

ছোট্ট দরগার গম্বুজ তিনটি, তার মধ্যে একটি ভাঙ্গা। তার সামনেই পাঁচিল-ঘেরা পুকুর। যার প্রাঙ্গণে কবরের সারি। অনেক পাথর আছে যার গায়ে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই আছে।

ছোট দরগা থেকে কয়েক পা এগোলেই সোনা মসজিদ। আর এক নাম কুতুবশাহী মসজিদ। এটি ভেঙেচুরে শেষ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর গম্বুজ ছিল দশটি, এখন একটিরও চিহ্ন নেই। কষ্টি পাথরের ফলকে লেখা থেকে জানা যায় এ মসজিদ মুখদুম উবেদ কাজি তৈরী করিয়েছিলেন।

আর একটি দেখবার মত সৌধ একলাখী সমাধি। সমাধির দক্ষিণ দিকে কষ্টি পাথরের প্রবেশ পথের পাশের পাথরে হিন্দু মূর্তি খোদিত আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রচুর নিদর্শন একলাখী সমাধিতে বিদ্যমান। পাথরের দেওয়ালে লতাপাতা খোদাই। গৌড়ের চিকা মসজিদের মত নকসা। প্রস্তর নির্মিত চূড়ায় গণেশ মূর্তি খোদিত। এতে রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জলালউদ্দিনের, তাঁর পত্নীর ও পুত্র সুলতান শমস-উদ্দীন আহম্মদ শাহের সমাধি আছে। একলাখী বাংলার পাঠান সুলতানদের স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ। এটি তৈরী করাতে খরচ পড়েছিল এক লাখ টাকা। মনে হয় সেজন্যেই এর নাম একলাখী।

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত মসজিদ আদিনা। কিন্তু তারও শেষ অবস্থা। হুগলীর ইমামবাড়া, মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদের থেকেও এটি বড়। লম্বায় ৫০০ ফুট, চওড়া ৩০০ ফুট, উঁচু ৬০ ফুট। এই রকম বিশাল মসজিদ ভারতবর্ষে নাকি আর কোথাও নেই। মুসলমান যুগের স্থাপত্য শিল্পের এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মসজিদের ভেতরে কষ্টি পাথরের একটি ছোট ঘর, এখানে আচার্য উপাসনা করতেন। উপাসনা বেদীটি কাল পাথরের, ঠিক হিন্দু মন্দিরের আদলে তৈরী। বিরাট ব্যারাকের মত একটি হল-ঘরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, এখানে নাকি এক হাজার লোক এক সঙ্গে নামাজ করতে পারত। কয়েকটি ভাঙ্গাচোরা ঘরের কষ্টি পাথরের চৌকাঠে লতা-পাতার পরিচ্ছন্ন নক্সা। মসজিদের উপাসনা ঘর দোতলা বলা যায়, এখানে বাংলার সুলতানের বসবার জায়গা ছিল। কেউ বলেন বেগমরা এখানে নামাজ পড়তেন।

মসজিদের অধিকাংশ স্তম্ভ, মিনার ভেঙ্গে গেছে, এখনও যা অবশিষ্ট আছে তা দেখেও বিস্মিত হতে হয়। কোন-কোন গোল থাম এত চকচকে যে তাতে মুখ দেখা যায়। ঘরের দেওয়ালে তোগরা অক্ষরে কোরাণের শ্লোক খোদিত আছে।

স্থানীয় লোকজনরা বলেন, এখানে আদিনাথ নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আদিনা নামটি তারই অপভ্রংশ। এই কিংবদন্তীকে ভিত্তি করে বহু দিন আগে সাঁওতালরা এই মসজিদ অধিকার করতে আসে কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয় নি। উপাসনা বেদীর উপর ওঠবার ছটি ধাপ আছে তার শেষের ধাপে একটি হিন্দু দেব মূর্তির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। মসজিদের গায়েও কোথাও-কোথাও গণেশের মূর্তি খোদিত আছে। হ্যাভেল প্রমুখ স্থপতি শিল্পীরা অনুমান করেছিলেন, আদিনা মসজিদ ও গৌড়ের অনেক প্রাসাদ পুরাতন হিন্দু মন্দির ভেঙে তৈরী করা হয়েছে। আদিনা মসজিদের খিলান দেখবার মত, কষ্টি পাথর কেটে-কেটে নকসা করা হয়েছে। দুশো বছর মুসলমান শাসনের যুগে সারা ভারতে প্রস্তর শিল্পের যে সমস্ত নমুনা পাওয়া যায় তাতে বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহের কবরের সঙ্গেই কেবলমাত্র আদিনা মসজিদের তুলনা করা যেতে পারে। আদিনা মসজিদের বেদীটি দেখে মনে হয় এটি যেন আম দরবার ছিল।

পাণ্ডুয়ার ধ্বংসস্তূপ, কবরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এই কথাই মনে হয়, সযত্নে এটিকে সংরক্ষণ করলে প্রাচীন ভারতের দক্ষ শিল্পীদের সৃষ্টিকে আরও বহু বছর জীবন্ত করে রাখা যেত।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখের মেলা

স্যায়দালী সেখের খোঁয়াড়

হাঁস-মুরগী গরু-ছাগল ঘোড়া-মোষ নানা রকমের পশুপাখি নিয়ে গাঁয়ের চাষীবাসীরা সংসার প্রতিপালন করে। তাদের শহরে দেখবার এখনো—পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশেও তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় বের হয়নি বলে যে খোঁয়াড় বা জেলখানাও থাকবে না এমন নয়। সব দেশের সরকারই বিনা খরচায় দুটো উপায়ের ব্যবস্থা করে রেখেছেন—এক নম্বর হল খোঁয়াড়, দু'নম্বর কোর্টবাড়ি। পশু-পাখিদের মানবিকতার বালাই নেই কিন্তু পাশবিকতা তো আছে? পশুর ক্রিয়াকর্মকে আমরা পাশবিকতা বলি। কিন্তু পশুর চালচলন এক রকম কাজ হলেও তাকে পাশবিকতা বলি না। ঘোড়া যখন সওয়ার বয়ে নিয়ে ছোটে কিম্বা গাধা যখন মোট বয় তখনো না। গরু যখন গাড়ি টেনে নেয় তাকে পাশবিকতা বলতে পারি? যখন অন্যের ফসল খেয়ে ফেলে অজ্ঞানে, তখনো কি পাশবিকতা বলব? তাহলে তাদের ধরে নিয়ে বা খোঁয়াড়ে পুরে দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয় কেন? সরকারী বিধান আছে গরু-ছাগল মোষ-ঘোড়া হাঁস-মুরগী উট-হাতী যাই হোক না কেন ফসল নষ্ট করলেই তাকে ধরে খোঁয়াড়ে দিয়ে এস। খোঁয়াড়ওলা তোমাকে সামান্য কিছু খেসারত দেবে। আর যার পশু তার অর্থদণ্ড হবে চতুর্গুণ টাকা আদায় করা হবে তার কাছে।

সোজা কথাটা দাঁড়াল তাহলে এই, আমার অজান্তে মূর্খ এই গরুটা তোমার ফসল সাবাড় করেছে বলে তার যতখানি অপরাধ কিছুটা খেসারত দিলেই তোমার লোকসানের কিছু লাঘব হবে বটে, যদিও আইনে সে-কথা বলে না. কিন্তু আমার অসাবধানতার অপরাধটা আমি মানুষ নামক প্রাণী হলেও কিঞ্চিৎ অত্যাচারের পর্যায়ে পড়বে—অজ্ঞান পশুর জেল হবে, আর আমার হবে জরিমানা।

পাশবিক কথাটা উল্টে-পাল্টে ভেবে দেখেছেন? গৃহ-পালিত পশু তেমন কোনো পাশবিক অত্যাচার করে না, বরং উপকার করতে করতে জীবন দেয়, তাদের দুধ, মাংস, পশম, হাড়, চামড়া সবই আমরা ভদ্রলোকের মতন ব্যবহার করি, অথচ তাদের কাছ থেকে কি এমন পাশবিক অত্যাচার পাই? অরণ্যের বাঘ, ভালুক, সিংহ এরা অবশ্য পাশবিকতা কি জিনিস ঘোর মানবিকতাবাদী সাধুপুরুষ হলেও আপনি সামনে পড়লেই তা জানিয়ে দিতে এতটুকু কসুর করবে না। কিন্তু তাদের ধরে গলায় দড়ি বেঁধে কোন পালোয়ানই বা কার খোঁয়াড়ে নিয়ে আসছে বলুন! আর কোন্ দুঃসাহসী সরকারী খোঁয়াড়ওলাই বা তাদের রাখবে?

ছোটবেলায় বায়স্কোপ দেখবার ঝোঁক ধরলে মামাদের মটর, খেসারী কিংবা-কাঁকুড় বা অন্য ফসলের ক্ষেতের পাশে বসে থাকতাম ডাণ্ডা কাঁধে নিয়ে গা-আড়াল দিয়ে। কারো গরু-ছাগল ক্ষেতে এসে পড়ে ফসলে মুখ দিলেই ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতাম খোঁয়াড়ে। ছোটমামা দেখলে বলতেন, বেঁধে রেখে দে, যাদের গরু-ছাগল, নিয়ে যেতে এলে দুটো বচন দিয়ে দিতে হবে বিধান দেয়েদের। 'খোঁড়ে দিসনি—গরীব লোক হলে কাঁদাকাটা করবে।'

পাঁঠা ধরলে আনন্দের আর শেষ নেই। ল্যাজে এক টুকরো ইট বেঁধে দিয়ে দৌড় করাও। অথবা খাসী বা ছাগল হলে মাটিতে শুইয়ে কান মুড়ে চোখ চাপা দিয়ে তার ওপরে দাও একটা কচুপাতা—তার ওপরে একটা মাটির ঢেলা—ব্যাস, দম ফেটে মারা যাবে তবু উঠবে না! আর ছাগলগুলো বেশি চালাকি করে রোজ রোজ ফসল নষ্ট করালে ছাগলকে ধরে জলে চুবিয়ে দিলেই খেল খতম! কানে জল ঢুকে গেলেই ছাগল মারা যাবে দিনকতক ভ্যাবানির পর। এসব করার চাইতে খোঁয়াড়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা আমাদের পয়সার দরকার। কিন্তু বড়মামা দেখলে ছাগল কেড়ে নিয়ে খড়কাটা বঁটি হাতের কাছে পেয়ে গেলেও তাই দিয়েই ভ্যাস্ করে জবাই করে ফেলবেন। যার ছাগল সে চিৎকার করে ইউনিয়ন বোর্ডে নালিশ ঠুকে এলে বড়মামা উচিত মূল্য দিয়ে দিতেন। পঁচিশ রকমের আমের কলম বারুইপুর থেকে বয়ে এনে বসিয়েছিলেন তিনি, কামিনীর মায়ের ছাগলে সব গাছ রোজ নষ্ট করত; বড়মামা বলতেন, 'গরু খেলে গাছ আবার গজায়, কালমুড়ো জাত-বকরী খেলে আর গাছ হবে না—শালার জাত একেবারে দাঁত দিয়ে কুরে কুরে গাছের মাজ পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। ধরতে পারলেই জবাই করব আমি।'

তা তিনি করেছিলেন। তাই তাঁকে লুকিয়ে গরু-ছাগল নিয়ে আমরা স্যায়দালী সেখের খোঁয়াড়ে যেতাম। স্যায়দালী সেখ খলখল করে হেসে এগিয়ে এসে গরু-ছাগলের দড়ি ধরে নিয়ে বলত, 'আয় ভাই, কত দিতে হবে? আচ্ছা পাঁচ আনা নে।'

সেই পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে দশ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে ছোটবেলায় সিনেমা দেখে এসেছি। তারপর দু'দিন পরে যখন দেখেছি সেই গরু-ছাগল ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ও-পাড়ার বৌটা এসে কাঁদছে, তখন আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে!

স্যায়দালী বলছে, 'ন্যাকা সেজে চোখের পানি ফেললে কি গরু-বকরী ছেড়ে দোব? তিনটে টাকা দিয়েছি যাদের ফসল তছরুপ করেছিল তোদের পাগলে। গরু দিনে এক টাকা, রাখালী বাবদ চার আনা, খোরাকী আট আনা—মানে দিনে সাত সিকে রেট—দু'দিনে চোদ্দ সিকে, সাড়ে তিন টাকা। ছাগল আট আনা, রাখালী বাবদ দু'আনা, খোরাকী চার আনা। চোদ্দ আনা দ্বিগুণে আটাশ আনা—মানে এক টাকা বারো আনা। একুনে পাঁচ টাকা চার আনা। ফেলে দিয়ে গরু-ছাগল নিয়ে যাও।'

'তুমি আমার ধরম বাপ, তুমি আমার গরু-ছাগল ফিরে দাও। ছেলেদের 'টাইফয়' জ্বর—'বার্লি' কিনবার পয়সা নেই। একখানা থালা বন্ধক দিয়ে দুটো টাকা এনেছি সাহাদের দোকান থেকে। এবারের মতন ছেড়ে দাও বাবা। তোমার দুটো পায়ে ধরি। আর কখনো গরু-ছাগল ছাড়ব না। পয়সার অভাবে পাট কিনে দড়ি কেটে গরুদের গলায় দিতে পারি নি। পচা দড়ি ছিঁড়ে জানোয়ারগুলো মানুষের ফসলে মুখ দিতে চলে যায়। পিয়ালীতে আমার বাপের বাড়ি—সেখানের বড় বড় মাঠে ধান উঠে যাবার পর যদ্দিন না আষাঢ়ের 'ভেজা' লাগে গরুর 'বাথান' উদোম চরাট খেয়ে বেড়ায়। মাঠের কাদা আর ওকড়া ফল জড়িয়ে গরুর ল্যাজটা বকের মতন তাল হয়ে যেত। আমরা বাছুর সমেত গরু ঘরে এলে ছাড়িয়ে দিতাম। এদিকে বড় মাঠও নেই, আর গরুর বাথানও চরাট খেতে পায় না। জায়গার অভাবে মানুষও যেমন পাতকোর ব্যাং হয়ে আছে—গরু ছাগলও তেমনি। একটু ফসলে মুখ দিলেই খোঁয়াড়ে পুরে দিয়ে যায়। 'ধম্মো'র বাবা, তোমার দুটো পায়ে ধরি—আমার অবলা পাগলদের ছেড়ে দাও।'

স্যায়দালী সেখের খুনীর মতন নির্মম চেহারা, গুলিভাটা লাল চোখ। হাতে ধরে আমিও বলেছি, 'দিয়ে দাও দাদা'—এখন তার চোখ দুটো স্থির হয়ে দাঁড়ায় মেয়েটির পায়ে ধরার ঠেলায়, তারপর ঘুরতে থাকে তার লাল চোখ দুটো। সজল হয়ে ওঠে। বলে, 'আচ্ছা যা মা, ধরম বাপ বলে যখন শালীর বেটি তুই মোর পায়ে ধরেছিস, নিয়ে যা আজকের মতন। হঠাৎ স্যায়দালী বজ্রনির্ঘোষে চিৎকার করে বড় বড় সজল স্থির বিস্ফারিত চোখ মেলে বলতে থাকে: 'কিন্তু আর কোনোদিন যেন কারো ফসলে তোর গরু-ছাগলে মুখ না দেয়—তাহলে বিশ টাকা 'চার্জো' করে তোর বিষ ছাড়িয়ে দোব মুই। মুই হন্দ স্যায়দালী সেখ। সরকারের খোঁয়াড় নিতে পঞ্চাশ টাকা লাগে বছরে। আমি সরকারের 'শাসন-কর্তা'!'

সত্যিই শাসনকর্তার মতন চেহারা আর মেজাজ স্যায়দালী সেখের। এক কলসী তাড়ি খেয়ে একটা তেল পাকানো লাঠি কাঁধে নিয়ে বসে থাকে সে তার 'দলিজে' মানে সদর দরজায়। মানুষকে হয়রান করে মারার জন্যে দূর গ্রাম থেকে গাধা, ঘোড়া, মোষ, ভেড়া, গরু, আনে কেউ কেউ। খুঁজে মরুক এখন কোথায় কোন খোঁয়াড়ে দিয়ে এসেছে কে তাদের অবলা জানোয়ারকে। তিন মাস পেরিয়ে গেলে নিলাম হয়ে যাবে—যে কেউ ডেকে কিনে নিতে পারে। বাইরে থেকে জীব-জন্তু এলে স্যায়দালী তার খোঁয়াড়ের পাশ বই বার করে কড়ে আঙুলের মতন ইঞ্চি পেন্সিল বার করে তার মুখে বার বার থুথু দিয়ে নাম ধাম গরু কি ছাগল কত দেওয়া হল ইত্যাদি বানান করে করে লিখে নেয়। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত তার বিদ্যা—তিরিশ বিঘে সম্পত্তি—নিজে অবশ্য গাড়ি-গরু চালায়, হাল-লাঙল করে—বিশটা মামলা করেছে—খুন করে পাঁচ বছর জেল খেটেছে যৌবনে—তাই বেশ রাশভারি লোক। 'ধনঞ্জয়' বা 'গোবর্ধন' নাম বললে তার বানান করতে মুশকিল হয় স্যায়দালীর। বলে, 'দশ দুটো একটা সিদে' গোছের নাম। তোর নাম ভোলা আর এনেছিস একটা গাধা।' কিন্তু গরু খোঁয়াড়ে দিতে যদি আসে ধনঞ্জয় আর ছাড়াতে আসে গোবর্ধন, তাহলেই তখন আমাদের বলে, এই তোরা তো অনেক ল্যাঠামাছ পুড়িয়েছিস (অর্থাৎ লেখাপড়া শিখেছিস), বানানটা বলে দে তো।'

সবাইকে যে ছাড়পত্র দেয় স্যায়দালী এমন নয়। না চাইলে দেবে না। কেননা সরকারী দেনা-পাওনার রেট অনেক কম। দূরের লোক হলে—নিজের গরু হলেও ছাড়পত্র নিতে হবে। নইলে 'গরুচোর' বলে পথে ধরলে তখন? উত্তম মধ্যম মার। মারের চোটে 'পগার' চিলে করে ফেলবে!

খোঁয়াড়ের উপায় মন্দ নয়। সরকার যখন খোঁয়াড় বিক্রির জন্যে ডাক দেন ডেকে নিতে পারলেই হল। এক বছর ডেকে নিলে জনমে আর তা যায় না। কেবল বাৎসরিক সরকারী ট্যাকসোটা আদায় না দিলে অঞ্চল পঞ্চায়েতে চিঠি আসবে। গিয়ে একদিন দিয়ে এস।

গাই গরু খোঁয়াড়ে এলে যদি তার দুধ হয় স্যায়দালী ছাঁদন বেঁধে হাতে সরষের তেল মাখিয়ে চোক-চাক করে দুয়ে নেয়। বাছুর সমেত এলে তো কথাই নেই। এমন 'চার্জো' করবে যে 'চোখে খড়ো ফুল ফুটে যাবে।' 'গালে খোঁয়া উড়তে থাকবে'।

'পাজান' ভাবি পাটনাইয়ে ছাগল এলেও দুধ দুয়ে নিয়ে মজাসে ঘটিখানেক

করে চা খাবে সায়রদালীর বউ। কালো, মোটা গাড়িখানেক চেহারা। নাকে ফাঁদি নথ।

সায়রদালীর খোঁয়াড়ে কয়খানা গরুকেই ছেড়ে এসে আমরা পাড়ার সব ছেলেরা তার পিঠে উঠে দৌড় করিয়ে আনন্দ করতাম।

একদিন একটা মাদী কুকুরের গলায় দড়িটা বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে গেলাম সায়রদালীর খোঁয়াড়ে। বললাম, 'সায়রদালী-দা, নবাবের এই কুকুরটা—মাদী কুত্তা—সদাই ছোঁক-ছোঁক করে—ছোটা নোংরায়ে হয়ে গেছে—চার পাঁচটা বাচ্চা বিইয়েছে—অনেক দুঃখ হয়, ধরে নিও—আমাদের হাঁড়ির ভাত খেয়েছে—একে 'খোঁয়াড়' দিয়ে গেলাম—লাও রসিদ লিখে—চার পয়সা দিলেই হবে।'

সায়রদালী সেখ উঠে পড়ে তেল পাকানো তেঁতুলে বিছের মতন লাগচে লাঠিখানা বাগিয়ে তুলে ধরে ছুটে এল: 'তবে রে শালা, কুকুর খোঁয়াড়ে দিতে এয়েচ'...

কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে মার দৌড়!—দৌড়—দৌড়...

ধরতে পারলে আমাদেরই খোঁয়াড়ে পুরে রেখে দিত বোধহয় সে। কেন না সে হল সরকারের শাসনকর্তা! খোঁয়াড়ওয়ালা সায়রদালী সেখ!

আবদুল জব্বার

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪০)

এর ভিতর সেদিন দুজন মানুষ এসেছিল ফেলুর বাড়ি। মাথায় তাদের কালো রঙের টুপি। লাল রংয়ের পুচ্ছ টুপিতে। কালো রঙের পাতলা সস্তা আদ্দির পাঞ্জাবী। নিচে সাদা গেঞ্জি। গেঞ্জিটা ভেতর থেকে জেল্লা মারছে। পরনে খোপ কাটা লুঙ্গি। পাতলা নুর থুতনিতে। ওরা এসে লম্বা কাফিলা গাছটার নিচে দাঁড়াল। গরুর ঘরটা ফেলুর এখন পড়ে গেছে। একটা ঘর সম্বল। শোলার বেড়া ঘরে। নাড়া দিয়ে আন্নুর জবলার একটা আতাবেড়া পর্যন্ত করতে হয়েছে। একটু আড়াল না করে রাখলে বিবি ধনেখালি শাড়ির মতো। চিৎপাত হয়ে থাকে খালি উঠোনে। যারা পথ দিয়ে যায়—এক খুবসুরত বিবি বান্ধা আছে এই ঘরে। ওরা চোখ মেরে যায়। ফেলু এটা বোঝে। এখানে, এই বড় কাফিলা গাছটার নিচে এলেই শালা মনুষ্য জাতির লোভ বেড়ে যায়। উঁকি দিয়া দ্যাখে—ফেলু বাড়ি আছে কি নেই। বিবিটা তার কি করছে! দেখে ফেললে আন্নুকে, লোভে দু ঠোঁটে চুকচুক করতে থাকে। হালার কাওয়া।

সে সেজন্য এক হাতেই সব ঠিকঠাক করে রাখছে। কেউ যেন তার বিবিকে যখন তখন দেখতে না পায়, চারপাশে নাড়ার বেড়া, সব সময় বিবি ভিতরে থাকুক এমন ইচ্ছা তার। এটা শীতকাল নয়। গ্রীষ্মের দিন। এ-দিনে বড় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে যায়। কারণ সেই যে সূর্য মাথার উপর উঠে কিরণ দিতে থাকে, কিছুতেই আর পশ্চিমে নেমে হালার কাওয়া অস্ত যেতে চায় না। চারপাশটার যত জমি সবই রোদে খাঁ খাঁ করছে। গাছের পাতা ঝরছে। উড়ছে। পুকুরের জল শ্যাওলায় নীল রঙ। নদীতে পায়ের পাতা ডোবে না। মানুষের দুর্দিন বলতে যা বোঝায়, একটু পাতা পর্যন্ত পড়ে থাকে না গাছের নিচে। গরীব দুঃখী মানুষেরা সব গাছের পাতা সংগ্রহ করে রাখছে। বর্ষার দিনে আগুনে জ্বালাবে বলে। সারাদিন এখন আন্নু পাতা জড় করছে বাঁশ ঝাড়ের অন্ধকারে। আতাবেড়ার আড়ালে বসে ফেলুর পরানে ডর থাকে না। ফেলুর বাঁ-হাতটা উড়ে গিয়ে যে ঘাটা হয়েছে, কিছুতেই শুকোচ্ছে না। এখন প্রায় কুষ্ঠের আকার ধারণ করেছে। সারাক্ষণ ভনভন করে মাছি বসছে। সে বসে গামছা দিয়ে ঘায়ের মাছি তাড়াচ্ছিল তখন। আর ঘাটাতে গরম রসুন গোটার তেল লাগাচ্ছিল। ঘায়ের ভিতরটা সারাক্ষণ জ্বলে। খাঁ খাঁ করে দাবদাহের মতো। হেকিমি কবিরাজিতে কাজ দিল না। গোপাল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল চুপিচুপি অষুধ আনতে। কিছুতেই কিছু হয় নি। মূলে আছে এক এক মানুষ। পাগল মানুষ। মুড়াপাড়ার হাতী দিয়ে মানুষটা তার এমন শক্ত শরীর বিনষ্ট করে দিল। সে যে কি করে! হালার কাওয়া এখন বাতাসে ফু দিয়া পাখি উড়ায়। পদ্য কয় দুই চাইর লাইন। মেম সাহেবানির কইলজা চিবাইতে না পাইরা গাছের নিচে থাকে বইসা। হেসে কন, গ্যাছ চোরত শালা! মাইনসে কয় সাধুসন্ত! ফকির। পীর হইতে পারে। ফেলু কয়, ঐ হালার কাওয়া যত নষ্টের গোড়া।

তখনই সে দেখল, কাফিলা গাছটার নিচে মোল্লাজানের মতো দুই মানুষ। ফিক্ ফিক্ করে দুই গালের ফাঁকে হাসছে। ফেলু মানুষ দুটাকে দেখেই দ্রুত চোখ নামিয়ে আনল। আবার দুই মোল্লা মোতাবেক মানুষ। তারা কেন এসেছে সে জানে। গত সালেও একবার এসেছিল ওরা। সে সেদিন হাঁসুয়া নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল। সে শালা কারে ডরায়। সে টুন্ডা ফেলু। তবু মনের রোখটা ঠিক বেঁচে আছে। এখনও ফেলু হাঁক দিলে অন্নুর কলিজা কাঁপে। সে তেমনি হাঁকল, কেডা মিঞা গাছের নিচে খাড়ইয়া আছেন।

—আমি ভাইসাব আমিনুল্লা।

—আপনার কি মনে কইরা?

—আইছিলাম একবার আকালুসাবের খোঁজে।

—তা সাহেব কি উহান আমার খাড়ইয়া আছে।

—তা ঠিক না।

—তবে কি ঠিক! উহানে পাখি খুঁইজ্যা বেড়ান।

ওরা এবার আমতা আমতা করতে থাকল।

—মিঞা মনে করেন থাকি না কিছু!

—তা ঠিক না। মনে লইল একবার ফালু মিঞার খবর নিয়া যাই।

—তা ভাল কাম করছেন। তামুক খান তাইলে।

—যাই তবে। যখন কইলেন যাইতে।

ফেলুর চোখটা এবার আতাবেড়ার ও-পাশে উঠে গেল। অন্নুটা আবার মানুষের গলা পেয়ে উঁকি দিচ্ছে কি-না! উঁকি দিলেই সে বাঁ হাতের কাছে হাঁসুয়া পায় তবে ফিক্ দেবে বেড়ার ফাঁকে। এমন চোখে মুখে যখন ফেলু আতাবেড়ার দিকে তাকাচ্ছে তখন আমিনুল্লা বলল, নাই।

চমকে উঠল ফেলু। —কি নাই।

—আকালুসাব নাই।

—নাই ত কই গ্যাছে। ফেলুর পরানে জল এল।

—গ্যাছে নারানগঞ্জে।

—গ্যাছে ক্যান!

—গ্যাছে মামলা করতে।

—তা পয়সা থাকলে মামলা করব না। আপনের মত গাছের নিচে খাড়াইয়া থাকব!

—সেই কথা!

ওরা এসে এবার নির্ভয়ে হোগলার উপর বসল।

—নেন তামুকটা টান দ্যান। নিভা যাইব।

আমিনুল্লা বলল, আপনের তাইসাব কড়া তামাক পছন্দ।

ফেলু দেখল বিবিটা কোথায় এখন! বলল, বড় পছন্দ। তারপর সে ডান হাত দিয়ে গামছায় আড়াল করা ঘা থেকে মাছি তাড়াল। ফেলুর শরীর থেকে কেমন একটা দুর্গন্ধ উঠছে। ফেলু বুঝি টের পেয়ে গেছে বিবি মানুষের গন্ধ পেয়ে বাঁশ ঝাড়ের নিচ থেকে উঠে এসেছে। কোন এক অদৃশ্য স্থান থেকে সে তাজা মানুষদের দেখছে।

ফেলু উঠে যাবার সময় ওরা দেখল, সে তার হাতটা গামছার আড়ালে ঢেকে রেখেছে। ওরা বুঝতে পারল দুর্গন্ধ উঠছে ঘা থেকে। তাছাড়া ওর এই হাতটা কবে গেল জানে না। ওরা জানত, এই মানুষের হাত পাগল ঠাকুর হাতী দিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। বাঁ-হাতের কব্জি কতকাল ফুলে ফেঁপে ছিল। তারপর হাতটা একেবারে শুকিয়ে গেল। শুকনো লতার মতো হাতটা ওর শরীরে ঝুলত। হাতটার কোন কর্মকর্ম ছিল না। কোন বোধ ছিল না। রক্ত চলাচল না হলে যা হয়। সেই হাত ওর ন্যাজের লোকের মতো কবে খসে পড়েছে কেউ জানে না। সে সারাক্ষণ বাঁ দিকের হাতে একটা গামছা ফেলে রাখে। কাঁধের নিচে লাল দগদগে ঘা। ঘা দেখে ওদের শরীর কেমন গুলাতে থাকল। এত বড় একটা ঘা নিয়ে মানুষটা বেঁচে আছে কি করে। ওরা এসেছিল এই পথে আন্নুকে একবার দেখবে বলে। বিবি নাকি এ-তল্লাটে চান্দের মতন খুবসুরত আর আকালুসাব আছে বিবির পিছনে এবং ফেলু এই বিবিকে নিয়ে মাঠে বিলেতে যায় বিকালে, ধানের চাড়া, মটর ডাল যা পায় জমি থেকে চুরি করে আনে।

ফেলু ভিতরে কি যেন খোঁজাখুঁজি করতে গেছে। সে ফের আসছে। কলকিতে আগুন। সে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আসছে কলকিতে। আর একটা চোখ ওর সজাগ, সে গোপনে দেখছে দুই মিঞার চক্ষু কি কয়, কোন দিকে চক্ষু তাড়া করে। বিবি তার বড় নবেজান। ওরা একসাথ চুরি করে বিবিকে দেখে যাবে বলে। এরা সবাই আকালুর বান্দা। আকালুকে খুশী করতে পারলে এই ইবলিশদের আর কিছু লাগে না। তবু ফেকু তামুক সেবন, যেন আল্লা মেহেরবান বলে বসে যাওয়া মুখোমুখী তারপর হাঁক দেওয়া—তোবরা মিঞা! মনে কয় আমি কিছু বুঝি না।

না কি সে মনে মনে আকালুকে ভয় পায়। ভয় পায় বলে ভেবে এসেছে—বইসা খান মিঞা, গরীবখানায় বইসা খান। আবার কখনও কখনও ফেলুর মনে হয় ওরা এসেছে শুধু ছাগলের ব্যাপারির মতো। আকালুই হয়ত পাঠিয়েছে। জমি বাড়ি সব তার বন্ধক। তালাকনামা লিখে দিলে যদি বন্ধক ছুটে যায়, সব মিলে যায়, তবে মন্দ হয় না। এবং দুই বিঘা ভুঁই মিলে গেলে সে কিছু একটা ফসল করে বাকি দিন গুজরান করে ফেলতে পারবে। ওরা ব্যাপারির মতো খোঁচা দিয়া দাখতে চায় ফেলুর বিবির দামদর কত।

কিন্তু মিঞা দুজন ফুড়ফাড় তামুক খেয়ে বসে থাকল। কিছু আর বলছে না। ওরা আতাবেড়ার ফাঁকে আন্নু বিবির মুখ দেখে ফেলেছে। দেখেই কেমন গুম হয়ে গেছে। ঘরে যেন শয়তানের একটা পরী মন্ত্র পড়ে বেঁধে রেখেছে। ডানা কেটে দিয়েছে। উড়তে পারছে না। কষ্টে বিবির চোখ মরা গাছের মতো।

বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়েই আন্নু অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু আতাবেড়ার ও-পাশ থেকে কচ্ছপের মতো গলা বের করেছিল। আর কিছু ওরা দেখতে পায় নি। আন্নু আর অধিক দেরি করতে পারে না। ওর গায়ে ফুটো-ফাটা হাজার রকমের তালিমারা শাড়ি।

একবার আকালু একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিল। শাড়ি দেখে ফেলু তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিল। এবং যা হয়, কেউ কিছু দিলেই আন্নুর পিঠ আর ঠিক থাকে না। তবে আন্নু তেল সাবান, গন্ধ তেল এবং চিরুনি খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখে। পরবের দিনে অথবা মানুষটা মেঘনাতে চাইন মাছ শিকারে গেলে পাটের বিবি সেজে বসে থাকে আকালু কখন আসবে। অবশ্য আন্নু জানে ফেলু কোন নির্দিষ্ট তারিখে ফিরে আসে না। আগে অথবা পরে আসে। ফেলু ফেরার আগেই সে ফের তার ফুটো-ফাটা শাড়ি অথবা গামছা পরে বাঁশঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফেলু ফিরেই শুকনো মুখ দেখে বলবে, তুই এখানে বিবি?

—তোমার লাইগা মনডা বড় কান্দে।

আর সেই ফেলুর এখন কিছুই নেই। সে মেঘনা নদীতে আর চাইন মাছ শিকার করতে যেতে পারে না। সে টের পায় বিবি তার কাছে আসে না। কেবল দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্গন্ধে টেকা দায় এমন চোখ মুখ তার। এখন বিবি কেবল আকালুর বিবি হতে চায়। আকালুর বিবি হওয়ার জন্য সে হাতে পায়ে ধরে কাঁদতে পারত, আমারে তালাক দ্যাও মিঞা, আমি যাই সাগরেরি জলে, তুমি আমারে ছাইড়া দ্যাও। কিন্তু পারে না, প্রাণে বড় ডর। মান্দাতা আমলের কোরবানীর চাকুটার ভয়। সেই ভয়ে বাড়ির চারপাশটায় বিবি ঘুর ঘুর করে। বিবি তার হকের ধন। আন্নু তার দু বিঘা জমি জিম্মাতের মতো। ওর বাড়ি ঘরের মতো সে বিবিকে ভোগের নিমিত্ত পেয়েছে। তার ভোগ শেষ না হলে কোন শালা লেবে। যেমন তার দুটো মাটির সানকি, একটা পেতলের বদনা, বাঁশঝাড়, পাটকাঠির ঘর, উড়াটে জমি, এক বিবি, সে তো দশটা পাঁচটা বিবি রাখে নি ঘরে, তবু তার এই সামান্য সম্পত্তির জন্য কি লোভ আকালুর। তার হাত দিয়ে সে এখন এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সে সকালেই আকালু তাজিয়া নাচাবে উঠোনে। ফেলু এবার বলল, তা মিঞা আকালু মামলা করতে গেল ক্যান!

কালু মিঞা বলল, ওডা ত তোমার জানার কথা।

—আমার জানার কথা! কি যে কন! ফেলু একেবারে বিনয়ের অবতার বনে গেল। সে যে এ-সব টের পায় না তা নয়। সব টের পায়। এই দুই হোমন্দির পুত আইছে আকালুর পক্ষে। আকালুর হিনাজি করতে আইছে।

আমিনুল্লা মোল্লা মোতাবেক বলল, আছে তোমার নামে এক নম্বর ঠুইকা দিছে।

ফেলু চোখ বড় বড় করে ফেলল। সে মামলামোকদ্দমাকে বড় ডর পায়। ওর নামে মামলা রুজু করলেই দুদিন পর পর ছোটো নারায়ণগঞ্জে। তার তাজা বিবিটা একা একা থাকবে। ফাঁক বুঝে তাজিয়া নাচাবে আকালু। সে ভীষণ শক্ত হয়ে গেল। সে মামলা করতে গেলে বিবিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। তবু সে মামলার নামে ঘাবড়ে গেল। তার এখন প্রায় ভিক্ষা সম্বল। তার নামে এতবড় মানুষটা মামলা করতে গেল!

বস্তুত এই আমিনুল্লা আর কালু মিঞা এসেছিল যেনতেন প্রকারেণ ফেলুকে ধামকি দিতে। বুদ্ধিটা আকালুসাবেরই।

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : [illegible]
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ও [illegible] রোড, কলিকাতা-৭

'সকালের জল খাবারের সঙ্গে তামা আমি রোজই খাই।'

এ ছাড়াও আছে লোহা, ক্যালসিয়াম, আর আয়োডিন ! প্রকৃতপক্ষে, উনি খাবারের সঙ্গে পাচ্ছেন ৮টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজদ্রব্য আর একান্ত প্রয়োজনীয় ১১টি ভিটামিন। একসঙ্গে উনি পাচ্ছেন মাত্র ১টি ভিমগ্রানের ট্যাবলেটে।

ভিমগ্রানে সব ক'টি ভিটামিন আর খনিজদ্রব্য রয়েছে যা স্বাস্থ্য রাখার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়—ফলে, তা উৎসাহ যোগায়, ক্ষমতা বাড়ায়। যেমন ধরুন, তামা—ঠিকমত রক্ত গড়ে তোলে, কর্মক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া, ভিমগ্রানে যেসব ভিটামিন আর খনিজদ্রব্য আছে, তার কল্যাণে ওঁর গায়ের চামড়া ভাল থাকে, চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, দাঁত আর হাড় শক্ত হয়।

এখন পাবেন ● গোল আকারে

ভিমগ্রান®

মাল্টিপল ভিটামিন্স-মিনারেল্স ট্যাবলেট্স

মাত্র একটি ভিমগ্র্যান আপনাকে সারাদিন কর্মক্ষম রাখে

SQUIBB®
SARABHAI CHEMICALS

সেই ফেলুকে যখন তখন ভয় দেখাতে বসেছে। টাকার জোরে আকালু বাঁশ কাটাচ্ছে। আকালুর দল ভারি। সে পঙ্গু, তার অর্থবল নেই। সে গরীব। সে আকালুর কাছে কিছু না। তবু যে তার পিছনে কেন লাগে! একটা বিবি তার। —হাশে কত খুবসুরত বিবি আছে মিঞা। তোমার টাকার অভাব নাই। শহরে যাও, ধইরা আন। ফেলু বড় অসহায় বোধ করল। এই কাজটা ভাল না মিঞা। ফেলু দু হাত তুলে মোনাজাত করল আল্লার কাছে। আমি অধমের আল্লা। তুমি আমার কব্বর কেন্দ্রা দিও। বিবিরে নিয়া যদি তামাসা করে না ক্যান। গলার নালি হ্যাঁচ কইরা দিমু তবে মিঞা।

আন্নুবা বলল, তা মিঞা কথা কওনা ক্যান?

—কি কমু কন!

—একটা কবসালা কইরা ন্যান। আকালু সাব নেতা মানুষ, তার লগে তুমি পার!

—কি কবসালা?

—তালাকনামা লিখা ন্যান। গোপনে কাজটা হইয়া যাউক।

ফেলুর মনে হল বজ্রাঘাত মাথার। অথবা মনে হচ্ছে ওর মাথায় কারা হাতুড়ি পেটাচ্ছে। সে সেই দিনের মতো উঠে দাঁড়াল। খাটো গামছার ঢাকা। তবু মাছি ভনভন করছে। খড়খড়ি উঠে গেছে শরীরে। তার শরীর সেই আদিকালের একটা গাছের মতো। ডালপালা ভেঙে গেছে। তবু সে মহাসমারোহে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। মহাসমারোহে পৃথিবীর বড় বল যোগ সহ্য করতে করতে সহসা নিজের ভিতর দুটো হাত গজিয়ে নিতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে আর পারছে না। ভয়ঙ্কর কঠিন

উঁচু ওর মুখে এসে পৌঁছল। সে তা প্রকাশ করল না। করলেই ওরা পালাবে। সে ঘরের ভিতর টলতে টলতে ঢুকে গেল। তখন দুই মিঞা বুঝতে পারল ফেলু ক্ষেপে গেছে। ওর উঠোনে এখন বসে থাকলে এই দিনের বেলাতেই সে হাঁসুয়া দিয়ে গলা দু-খান করে দেবে। ফেলু যত সত্বর ঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছে তার চেয়ে দ্রুত ওরা মাঠে দৌড়ে নেমে গেল।

ফেলু ঘর থেকে বের হয়ে দেখল ওরা উঠোনে নেই। হাতে ওর সেই কোরবানের চাকুটা। উঠোনের এক কোণে ওর রাগি গরুটা ফেলুকে জাবর কাটতে কাটতে দেখছে। ফেলু উঁকি দিয়ে কি যেন মাঠে খুঁজছে। উঠোনের চারপাশে তাকাচ্ছে। ফেলু তাকাতেই দেখল আর্জির যেন সব বুঝে গেছে। সে তার রাগি গরুটাকে বলল, দুই মিঞা কোনদিকে গ্যাল আর্জির! গলার নালিতে কত খুন আছে একবার দ্যাখতাম।

বাড়ির শেষে ফেলু বড় কামিনী গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। গাছটা থেকে আঠা পড়ে পড়ে গোড়া আর চেনা যায় না। ডালপালা নেই। পাতা দুটো একটা। দেখলে মনে হয়, গাছটা মরে গেছে। শুধু ফেলু জানে গাছ ভিতরে তেমনি তাজা, এখনও এক কোপে কত আঠা যে ওগলায়। গাছটা মাথায় খুব লম্বা নয়। খুশি মতো ফেলু ডালপালা কেটে বাড়ির চারপাশে বেড়া দেয়। কাণ্ড এখনও এত নরম যে সে একবার দায়ের-দিয়ে গাছটা এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়েছিল। সে এই গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালেই বড় মাঠ দেখতে পায়। আর দেখতে পায় সেই ষণ্ড। সে দেখল আজ দুই মিঞা ভয়ে প্রায় মুখপোড়া ষণ্ডের মতোই ল্যাজ তুলে ছুটছে। সে এবার চিৎকার করে উঠল, অঃ হালায় পো হালারা,

হুতার মত পালাও ক্যান। খাড়াও। দ্যাহি মরদখানা ক্যামন। বিবিরে নিয়া আমার ভাঁজিয়া নাচাইতে পার কিনা দ্যাহি।

তখনই দেখল ফেলু কোথেকে সেই ধন্দের ষণ্ড মাথা নিচু করে উঠে আসছে। কালো রঙ। কি কালো, প্রায় ঈশান কোণের কাল বোশেখিতে মেঘের রঙ এমন হয়। দুই শিঙ তরবারির মতো আকাশের দিকে উঠে গেছে। কি ধারালো, নিমেষে সে বসুন্ধরা এফোঁড়ওফোঁড় করে দেবে যেন।

ফেলু তার এক চোখে দেখছে ষণ্ডটাকে। ষণ্ড ও-পাশ থেকে আর এক চোখে দেখছে। ফেলু একটা গোলাপফুলের মতো কোরবাণীর চাকুটা দু আঙুল ধরে রেখেছে। ষণ্ডটা এতক্ষণে ফেলুকে হয়ত তেড়ে এসে কামিনী গাছটায় গেঁথে দিত—কিন্তু হাতে এক কোরবাণীর চাকু। দেখলেই ষণ্ড টের পায়, বড় ধারালো ওটা, গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিলে নালি ফাঁক। যেন ফেলু ওটা একটা গোলাপফুল তুলে এনেছে বাগান থেকে। আও মিঞা, খাড়াইলা ক্যান। বাগিচা থাইকা তোমার লাইগা ফুল তুইলা আনছি। আও। আও। বলে এক হাতে ফেলু ষণ্ডটাকে উদ্দেশ করে উরু থাবড়াতে থাকল। আর চাকুটাকে নাচাতে থাকল হাতের উপর।

ষণ্ড নিমেষে বেয়াকুব ভালমানুষ হয়ে গেল। শিঙ দিয়ে আর মাটি তুলল না। গোঁতা খেল না আর মাটিতে। সরল হবার মতো হেঁটে হেঁটে পাশাপাশি দেখতে দেখতে নেমে যেতে থাকল। যেন এক পোষমানা জীব, ফেলুকে দেখেই মাঠে ঘাস খেতে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু ফেলুর কেমন দুই মিঞাকে কাছে না পেয়ে জিদ চড়ে গেল। মিঞার বদলে এই ষণ্ড। সে মাঠে নেমে লড়াই করবে, সে হাঁকল, হা হা হা। ষণ্ডটা এবার ঘুরে দাঁড়াল। মাঠের দুই পাশে দুইজনা। দুই জীব। আদিম এবং উৎকট চোখ মুখ দুই জীবের। ফেলুর নেই ডানদিকের চোখটা, ষণ্ডের নেই বাঁ দিকের চোখটা। জীবের চার পা। ফেলুর দু পা, এক হাত। এখন ওরা এত কাছাকাছি যে উভয়ের অর্ধেকটা দেখছে। সবটা দেখতে পাচ্ছে না। ফেলু এখন যেন চিনতেই পারছে না, এটা জীব না অন্য কিছু। কি তার ধর্ম, কি তার স্বভাব। ষণ্ডটাও বুঝতে পারছে না সামনের জীবটা মানুষ, না পীর, না ইবলিশ। ষণ্ডের মনে হল, হালার এক আজব জীব। সে ভয়ে লেজ খাড়া করে বিলের দিকে ছুটতে থাকল। পথে আসছিল তারিণী সেন। তারিণী কবিরাজ। ঘোড়ায় চড়ে আসছে। এত বেশি জোরে ছুটছে ষণ্ড যে তারিণী সেনের ঘোড়া পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে।

ফেলু জোরে জোরে হাঁকল, হাকিমসাব আপনের ষণ্ড আমারে ডরাইছে।

তারিণী কবিরাজ যাচ্ছে ঠাকুরবাড়ি। বুড়ো ঠাকুরের এখন-তখন অবস্থা। সঙ্গে

জানুন পড়ুন ও বিবাহিত জীবন সুখী করুন।

নরনারীর যৌন চরিত্রে রাশি লগ্নের প্রভাব ও যোটক বিচার ...মূল্য—১২, টাকা মাত্র

প্রখ্যাত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ শ্রীসুকদেব গোস্বামীর গবেষণালব্ধ অভিনব এই পুস্তক (অষ্টাদশ মহাদ্রোণের আলোচনাসহ মুখবন্ধ) জ্যোতিষ জগতের এক সম্পূর্ণ নূতন পদক্ষেপ।

প্রাপ্তিস্থান :

জ্যোতিষ কার্যালয়
১।২এ, নীলমণি মুখোর্জী স্ট্রীট, (কাঁকুড়গাছি), কলিকাতা—৫

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

বুকল্যান্ড লাইব্রেরী—বিধান সরণী, কলি—৬

রেখেছে মকরধ্বজ। পকেটের ভিতর ঘোড়ার পিঠে কত রকমের সব লাল নীল রঙের বড়ি। ঘোড়ার পিঠে তারিণী কবিরাজ একবার উঠছে আবার নামছে। মাঠের উপর এমন একজন মানী লোককে আসতে দেখে সে ভাবল একবার যাবে কবিরাজমশাইর কাছে। হাতের ঘাটা তাকে দেখাবে। এই না ভেবে সেও ঘোড়ার পিছনে লেজ খাড়া করে ছুটতে থাকল।

সকাল থেকেই বাড়ির ভিতর সবাই ব্যস্ত। সোনা অর্জুন গাছের নিচে এসেছিল পাগল জ্যাঠামশাইকে ডেকে নিয়ে যেতে। তিনি গাছটার নিচে বসে আছেন। কিছুতেই বাড়ির ভিতর যাচ্ছেন না। সোনা নিয়ে যেতে না পারলে বড়বৌ আসবে। তখনই সে দেখল সম্মান্নীয় তারিণী কবিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসছে। সে জ্যাঠামশাইকে ফেলে ছুটে গেছে—তারিণী দাদা আইতাছে। বড়বৌ এবং শচীন্দ্রনাথ খবর পেয়ে উঠোনে নেমে এল। নরেন দাস ছুটে এল। কবিরাজমশাই বড় ঘরে ঢুকে বলল, ঠাকুরদা কেমন আছেন?

বড়বৌ সব উত্তর দিচ্ছিল কবিরাজ-মশাইকে। কারণ বৃদ্ধ মানুষটির কথা বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল ভোরে তিনি সবাইকে কাছে ডাকলেন। বড়বৌ, শচি, শশীবালা, ধনবৌ সবাইকে। তাঁর বড় ইচ্ছা নৌকাবিলাস পালাগান শোনার। সহজমপুরের যোগেশ চক্রবর্তীকে খবর দিতে হবে। ঈশম যাবে ভাবছিল—তখনই হঠাৎ চোখ বুজে যেন কি বুঝতে পারলেন, বললেন, না দরকার নেই। কাল আমার একশ বছর পূর্ণ হবে। তোমরা আত্মীয়স্বজন সবাইরে খবর দাও। তারপর থেকেই হেঁচে বাড়িতে। তিনি বলেছেন, পরদিন ভোররাতে সবার মায়া কাটাবেন। আর সহজে বনে মত বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকবেন না।

ফেলু দৌড়ে এসেছিল গোপাট পর্যন্ত। সে আগে এসে ধরতে পারল না। ঠাকুরবাড়ি সে কোনদিন উঠে যেতে সাহস পায় না। সে হারামাদ মানুষ। ওকে দেখলেই ভয় পায় সকলে। সে সেজন্য গোপাটের মাথায় গাছের নিচে বসে থাকল, কখন কবিরাজমশাই আবার ঘোড়ায় চড়ে গোপাটে নেমে আসবে।

তারিণী সেন বলল, ঠাকুরদা আমি তারিণী। কি কষ্ট হইতাছে কন!

মহেন্দ্রনাথ হাত সামান্য উপরে তুলে ইসারায় যেন বললেন, কোন কষ্ট না। এখন তাঁর সব কৃপা। তোমরা আর আমাকে তাড়না করবে না, এমন মুখ চোখ তাঁর।

শচি বলল, তারিণীকাকা কি মনে হয়?

—টিকব না। যা কইছে ঠিকই কইছে।

—কিছু খাইতে চায় না।

—সবাই কাছে বইসা থাক। অষুধ দিয়া আর কোন দরকার নাই।

মন' মানে না। বড়বৌই বিকেলে ঈশমকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তারিণী কবিরাজের কাছে। তিনি প্রবীণ মানুষ। প্রবীণ বৈদ্য। তিনি এই সংসারের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত। এবং প্রায় আত্মীয় সম্পর্ক। সেই থেকে মানুষজন সব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আত্মীয়স্বজন যা আছে সবার কাছে এবং তারিণী কবিরাজকে খবরটা দিতে বলা হয়েছিল। খবর পেয়েই চার ক্রোশ পথ ঘোড়ায় চড়ে চলে এসেছেন। ঈশম আসেনি। সে আসবে দক্ষিণে যত আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের খবর দিয়ে। হারান পাল গেছে উত্তরে, নরেন দাস গেছে পুবে আর শশীমাস্টার গেছে মুড়াপাড়া। সে যাবার সময় গোলাকান্দাল, পেরাব পোনাব এবং দূরে দূরে যেসব গ্রামে আত্মীয়স্বজন আছে সবাইকে খবর দিয়ে চলে যাচ্ছে—সে বলে যাচ্ছে, মুড়াপাড়া যাচ্ছি। ঠাকুরের দুই ছেলে আছে তাদের খবর দিতে। ঠাকুরকর্তা আগামীকাল দেহ রাখবেন।

আর দীনবন্ধু থাকল নানারকম কাজ-কর্মের তদারকিতে। কোথায় দাহ করা হবে ঠিক আছে। অর্জুন গাছটার নিচে রাখা হবে। তিনি গাছ লাগিয়ে তাঁর দাহ করার জায়গা ঠিক করে রেখেছেন। কোন আমগাছ কাটা হবে, সেটাও ঠিক করে রাখতে হয়।

তারিণী কবিরাজ বলল, পাগল কর্তারে দ্যাখতাছি না।

—অর্জুন গাছের নিচে বসে আছে।

—ডাইকা আনেন। কাছে বইসা থাকুক।

বড়বৌ সোনাকে পাঠিয়েছিল ডাকতে। কিন্তু তিনি আসছেন না। দীনবন্ধু একবার খবর নিয়ে গেল, কি রকম লাগছে। কেমন আছে?

বড়বৌ বলল, বিকেলের টানে চলে যাবে মনে হয়।

—ধনবৌদিরে কন রান্নাবান্না শেষ করতে। পোলাপান যা আছে অগ খাওয়াইয়া দ্যান। আপনেরা অ দুইডা মুখে দ্যান।

বড়বৌ সে সবের কোন উত্তর দিল না। বলল, দেখুন তো ঠাকুরপো আপনার দাদাকে নিয়ে আসতে পারেন কিনা?

—তাইন কোনখানে।

—অর্জুন গাছটার নিচে বসে আছে। সোনাকে পাঠিয়েছিলাম। আসছে না।

—আপনি যান বৌদি। আপনি না গেলে আসব না।

—যাই কি বরে বলুন। তারিণীদা এসেছে, ওর জন্য জলখাবার করতে হবে। ধন রান্না করছে। মা তো বিছানাতেই চুপ-চাপ বসে আছেন। কাল থেকে কিছু খাচ্ছেন না। কোন দিকে সামলাই বলুন।

সুতরাং দীনবন্ধু অর্জুন গাছটার নিচে গিয়ে ডাকল, এখানে বইসা থাকলে হইব! বাড়ি যান।

পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ দেখল দীন-বন্ধু তাকে নিতে এসেছে। সে পিছন ফিরে বসে থাকল।

শচি এল। সেও নিয়ে যেতে পারল না। শচি ফিরে এসে বলল, আপনি যান। দেখুন আনতে পারেন কিনা।

অগত্যা সব কাজ ফেলে বড়বৌ পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়াল। দেখল, তাঁর মানুষ এখন ঘাসের উপর বসে আছে। দুটো একটা পাতা গাছ থেকে ওর মাথার উপর ঝরে পড়ছে। সে কাছে গেলেও মানুষটা চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। কাছে গিয়ে মাথার চুলে নরম আঙুলে বিলি কাটতে থাকল। প্রায় সন্তানের মতো যেন তার আদর। সে বলল, ওঠ। এ-সময় এখানে বসে থাকতে নেই। চারপাশে তিনি ছড়িয়ে আছেন। সবাই বলছে তিনি তোমাকে খুঁজছেন। ওঠ। ওঁর পায়ের কাছে বসে থাকবে। কোথাও আর যেতে হবে না।

বড়বৌ একটু দূরে দূরের গোপাটে কাকে যেন অসহায় হয়ে বসে থাকতে দেখল। কে বসে আছে এমনভাবে! ঝোপজঙ্গলের জন্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বড়বৌ উঁকি দিলে জঙ্গলের ও-পাশে মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সুতরাং ফের বলা এই মানুষকে, কিছু না কিছু একা একা বলে যেতেই হয়, সে তো আর কোন জবাব দেবে না। সে বলল, মেজ ঠাকুরপো, ধন ঠাকুরপোকে খবর দেবার জন্য শশীমাস্টারমশাই গেছেন। কবিরাজদা এসেছেন। এসেই তিনি তোমার খোঁজ করেছেন। তোমার বোনের কাছে লোক পাঠানো হয়েছে। পাল, ইছপুরা লোক গেছে। তোমার মামাবাড়িতে খবর দিতে গেছে হারান পাল।

সে সব খুলে বলছে। কিভাবে কি সব কাজ হচ্ছে সংসারে সব বলছে। এই মানুষ বাড়ির বড় ছেলে! তাঁর সব জানা উচিত। তিনিই দাঁড়িয়ে থেকে সব করাতেন। তাঁর হয়ে বুঝি বড়বৌ আর শচি সব করছে। সুতরাং ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, না কোথাও ভুল থেকে গেল মানুষটাকে এমন জানানো। বলতে বলতে নিজের কাছেই ভুল ধরা পড়বে। আঃ তাই তো, সোনার

মামাবাড়িতে লোক পাঠানো হয় নি। তাঐ-মশাই খুব দুঃখ পাবেন। সে তাড়াতাড়ি সোনাকে ডেকে বলল, তোর মেজো কাকাকে ডাক তো।

বাঁদু-খুড়ো বলল, সোনার মামাবাড়িতে কে গেছে?

—কেউ যায় নাই।

—কাউকে পাঠিয়ে দিন।

এ-সময়ে কি কি করণীয়, বড় ছেলে বলেই তাঁর সব জানা উচিত। অথবা এই যে সব করা হচ্ছে, আত্মীয়পরিজনদের খবর দেওয়া হচ্ছে—তিনি যেন সবই জানেন এবং তাঁর পরামর্শ মতোই হচ্ছে এমন সম্মান দেখানো প্রয়োজন। বড়বৌ এ-জন্য সব বিস্তারিত বলে যাচ্ছে মানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে।

বড়বৌ বলল, কি দেখছ?

মণীন্দ্রনাথ গাছের ডালের দিকে চোখ তুলে দিলেন।

বড়বৌ বলল সামনে শুধু মাঠ। ফসল নেই। জমি চাষ করা। বৃষ্টি পড়লেই পাটের বীজ বুনে দেওয়া হবে। এ-সময়ে তুমি কিছু দেখতে পাবে না।

মণীন্দ্রনাথ পা ছড়িয়ে বসলেন। যেন তিনি কোন বড় নদীর পাড়ে বসে আছেন। সকাল বেলা। রোদ উঠে গেছে। ... দক্ষিণ থেকে বাতাস বইছে। এখন চুল এই বয়সে। ... একটাও পাকে নি। ... হেমেন্দ্রনাথের মতো বড় বড় চুল। বাতাসে চুল উড়ছে। মাঠে জল কম। ঘোলা জল। জলাজমির সবুজ আভা মরে যাচ্ছে। শুকনো কঠিন মাঠ। ... বালিয়াড়ি ... কিছুক্ষণ পরই নদীর চরে উড়তে থাকবে।

বড়বৌ বলল, তিনি যাই করে থাকেন, তোমার ভালো ... করেছেন।

মণীন্দ্রনাথ ছোট ছেলের মতো অবিচলিত চোখ নিয়ে দেখলেন বড়বৌকে। কোন কথা বললেন না। কথা বলেনও না তিনি। বেশি পীড়াপীড়ি করলে তাঁর প্রিয় ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করেন। বড়বৌ এই অভিমানী মানুষটিকে দেখে ভাবল, তিনি হয়ত এখনি কোন কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। বড়বৌ তাড়াতাড়ি বলল, শোন, এ-সময় সবাইকে কাছে থাকতে হয়। তুমি তাঁর বড় ছেলে। কত আশা ছিল তাঁর তোমাকে নিয়ে।

মানুষটা এবার মাথা গুঁজে দিল দু হাঁটুর ভিতর। ওঁর কি কান্না পাচ্ছে! সংসারে রাগে, অভিমানে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন! বড়বৌ প্রায় এখন জননীর মতো। বড়বৌ মাথায় কেবল হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।—লক্ষ্মী এস। এমন করতে নেই। তুমি যদি পাশে না থাক, তিনি মরেও শান্তি পাবেন না।

পাগল মানুষ সেই যে মাথা গুঁজে দিয়েছেন হাঁটুর ভিতর, কিছুতেই মাথা তুলছেন না। বড়বৌ হাত ধরে টানছে, ওর মাথার ঘোমটা সরে গেছে সামান্য, বাঁ হাতে ঘোমটা টেনে ঠিক রাখছে। বুকের আঁচল সরে যাচ্ছে। কোপের ও-পাশে একটা মানুষ লুকিয়ে বসে আছে। সব দেখছে বসে বসে। সকালের রোদ্দুর গাছের ডালে, পাতার ফাঁকে মাটিতে এসে পড়েছে। মুখে বড়বৌর সকালের রোদ্দুর বড় মায়াময়। মুখে কপালে তার ঘাম। কপালে সিঁদুর বাসি দাগের মতো। লালপেড়ে কাপড়, শ্যামলা রঙ তার, আর এই শ্রী সকালবেলার মাঠে বড় মাধুর্য বয়ে আনছে। কেউ কাঁঠালের আড়ালে বসে থেকে কোপের ভিতরে সব দেখছে। সুন্দর আলতাপরা পা, পাতার উপর লালপেড়ে শাড়ি কি শরীর, মনে হচ্ছে। অথচ এত টানাটানিতেও মানুষটা উঠছে না। সামনের জমিতে সেই ষাঁড়টা এখন নিরিবিলি ঘাস খাচ্ছে। কোথায় কি হচ্ছে কিছু দেখছে না।

বড়বৌ টেনে তুলতে না পেরে বলল, তুমি তো জানো তোমাকে ভালো করার জন্য তিনি কি না করেছেন।

পাগল মানুষের হাই উঠছে। তার এ-সব শুনতে আর ভাল লাগছে না।

বড়বৌ এক এক করে এবার এ-সংসারের পুরোনো ইতিহাস বলে গেল। মানুষটার যদি যদি চৈতন্য হয়। এমন সময়ে এ-পাগলামি বড়বৌরও ভাল লাগছে না। কবে একবার মহেন্দ্রনাথ নদী পার হয়ে শ্মশানে চলে গিয়েছিলেন, মৃতদেহের জন্য সেই শ্মশানে একা একা রাত্রিবাস এবং মৃতদেহ চুরি তারপর সেই কাপালিকের জন্য কত কিছু হোমের কাঠ, বিল্বপত্র আর অমাবস্যা রাতের অন্ধকারে নিশীথে শিবা ভোগ এবং নদীর পাড়ে শ্মশান ভূমিতে এক ভয়ঙ্কর কঠিন যাগযজ্ঞে এই মানুষের আরোগ্য কামনা করেছিলেন। যেমন তিনি জীবনে একবার মিথ্যা ভয় করে, সন্তানের ভালবাসা কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি তিনি প্রৌঢ় বয়সে প্রায় তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে হার-জিতের বাজিতে পড়ে গিয়ে—যা কিছু অকল্পনীয়, যা কিছু মানুষের আরো সিদ্ধ, ভূত অথবা পিশাচ কোন কিছুই বাদ রাখেন নি। যেন তিনি দেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য ক্রোশের পর ক্রোশ নিশীথে হেঁটে যেতেন, কোন ফকির অথবা আউলবাউলের উদ্দেশে। তাঁর বড় ছেলে পাগল। কেউ বান মারতে পারে, বন্ধন করে দিতে পারে—তিনি মন্ত্রসিদ্ধ মানুষের খোঁজে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও তেমন মানুষ খুঁজে পেলেন না। শুধু মিথ্যার অহঙ্কার। যাগযজ্ঞ, তুকতাক সব মিথ্যার সঙ্গে লড়াই। যেদিন যথার্থই হেরে গেছেন, সেদিন থেকে আর ঘরের বার হলেন না। সবাই দেখল, মানুষটা অন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছে মানুষটা হেরে গিয়ে সারারাত মাঠে শীতের ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে মানুষটার দুটো চোখই চলে গেল। এখন সেই মানুষ নিজেও চলে যাচ্ছেন। বড়বৌর মায়া হতে লাগল। কোন রকমে একবার নিয়ে যাওয়া, এই শেষ সময়ে শিয়রে অথবা পায়ের কাছে বসিয়ে রাখা। সে কেমন কান্না কান্না গলায় বলল, তোমার এতটুকু মায়াদয়া নেই। তিনি তোমাকে কিভাবে চারপাশে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছেন।

পাগল মানুষ দেখল তখন একটা ষাঁড়, বড় ধর্মের ষাঁড় ঘাসের জন্য ফোঁপাচ্ছে। কঠিন মাটি, জল নেই কতদিন। ঘাস পুড়ে গেছে। সূর্য মাথার পর থেকে যেন নামে না। কঠিন দাবদাহে ষাঁড়টা লাফাচ্ছিল। এমন কি সেটা এই পুকুরপাড়ে উঠে আসতে পারে। কেমন ভয়ে ভয়ে পাগল ঠাকুর এবার উঠে দাঁড়ালেন।

মনের ভিতর ভয় জাগলেই তিনি দেখতে পান এক কাটামুণ্ডু হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। দুই কান তার লম্বা। সাপের চোখের মতো চোখ। নীল এবং অন্ধকার। তিনি দেখতে পান কখনও মুণ্ডুটা অতিকায় বাদুর হয়ে তাঁর চোখের উপর ঝুলছে। তিনি তখন কাটা মুণ্ডুর ভয়ে পিছনে ছুটতে থাকেন। নিশিদিন সেই কাটামুণ্ডু কে যেন সুতো দিয়ে অদৃশ্য এক স্থান থেকে তার চোখ বরাবর ঝুলিয়ে দিয়ে বলছে, এই দ্যাখো, এই হচ্ছে তোমার ধর্ম। তার সবটা থাকে না। কিছুটা থাকে। যা দেখলেই সাঁতাকালের মানুষ ভয় পায়। নিশীথে সে এক অতিকায় বাদুর হয়ে যেতে পারে। বক বক সব তার দোসর। তুমি তার ভয়ে কীটের সামিল। খুশি মতো তখন তোমাকে বলি অথবা জবাই দেওয়া চলে। তখনই ভয়ে মণীন্দ্রনাথের নির্জন এক আশ্রয়ের কথা মনে হয়। বড়বৌ সেখানে সাদা পাথরে লাল বর্ণের ফলমূল আহার নিমিত্ত রেখে দিয়েছে। পানীয়র নিমিত্ত রেখেছে ঠান্ডা জল। সে তখন একা একা সেই জানালায় পাশে বসে হাঁটতে থাকে।

বড়বৌ দেখল, মানুষটা এবার পাড়ের দিকে ফিরছে।

(ক্রমশঃ)

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট ঃ ২ লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
৫৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নদীর পারে ঘর

ইংরেজ লেখিকা দাফনে দ্য মরিয়ার এ যুগের একজন জনপ্রিয় লেখিকা। ১৯৩৮ খৃঃ তাঁর 'রেবেকা' উপন্যাসটি প্রকাশের পর সারা বিশ্বে সাড়া জাগে। বলিষ্ঠ কল্পনাকুশলতার সঙ্গে মানবিক সমস্যার সংমিশ্রণে প্রচলিত বিষয়বস্তুর বাইরে কাহিনী রচনা তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'রেবেকা'র জনপ্রিয়তায় লেখিকা বিস্মিত হলেন। বাংলা ভাষাতেও প্রায় পনের বছর আগে এই উপন্যাসটির অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী নির্ভলি মজুমদার। দাফেনের বাবা সার জিরালড দ্য মুরিয়র ছিলেন একজন প্রখ্যাত নট এবং থিয়েটার-ম্যানেজার, আর তাঁর পিতামহ জর্জ দ্যু মরিয়র ছিলেন 'পাঞ্চ' পত্রিকার সর্বজনপ্রিয় কার্টুনিস্ট এবং 'ট্রিলবি' এবং 'পিটার ইবেটসন' নামক দুটি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থের লেখক। এছাড়া দাফেনের এক প্রপিতামহী ছিলেন সম্রাট নেপোলিয়ান-এর রক্ষিতা—বংশধারায় সেই মহিলার পদবীটুকু আজো চলে আসছে। 'দি দ্য মুরিয়রস' গ্রন্থে বিগত শতাব্দীর পারিবারিক কথা লেখিকা নিজেই লিখেছেন।

দাফনের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা হয় বাড়ীতে আর সব বোনদের সঙ্গে, তারপর প্যারিসে পড়াশোনা করার পর ১৯২৮ খৃঃ থেকে তাঁর ছোটগল্প সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩১ খৃঃ প্রথম উপন্যাস 'দি লাভিং স্পিরিট' বেরোয়। এর পর আরো দুটি উপন্যাস লেখেন। খ্যাতি বৃদ্ধি পেল পিতার জীবনী রচনার পর। এই জীবনী-গ্রন্থের নাম—'জিরালড-এ পোর্ট্রেট'। এই জীবনীর রচনা রীতি প্রশংসিত হয়। এই সঙ্গেই বেরোয় কর্ণিস পটভূমিকায় 'জ্যামাইকা ইন' কিন্তু আসল প্রতিষ্ঠা ১৯৩৮ খৃঃ 'রেবেকা' প্রকাশিত হওয়ার পর। এতখানি জনপ্রিয়তা যে সম্ভব তা দাফনে কোন দিন আশা করেন নি। উনচল্লিশ সংস্করণ ছাপা হয়েছে গ্রন্থটি প্রকাশের কুড়ি বছরের মধ্যে এবং অন্তত কুড়িটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। রহস্যাভরা এই উপন্যাসের চিত্ররূপ পরিচালনা করেছেন আলফ্রেড হিচকক এবং সার লরেন্স অলিভার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন এই ছবিতে।

সেই অবধি দাফনে দা মুরিয়র লিখেছেন প্রচুর। তাঁর আর একটি জীবনীগ্রন্থ 'ব্যার্থওয়েল ব্রনতে'র খ্যাতি যথেষ্ট। দ্য মুরিয়র ১৯৬০তে 'দি প্লাস ব্রোয়ার্স', ১৯৬৫ খৃঃ 'ফ্লাইট অব দি ফ্যালকন' এবং ১৯৬৯ খৃঃ 'দি হাউস অন দি স্ট্রান্ড' রচনা করেছেন। প্রতিটি উপন্যাসই অসীম জনপ্রিয়তার অধিকারী।

অর্ধ সত্য ও অর্ধেক কল্পনার খাদ মিশিয়ে তিনি লিখেছেন 'দি হাউস অন দি স্ট্রান্ড'। কর্ণওয়ালের কিলমার্থে লেখিকা নতুন বাড়ী করেছেন। এই কর্ণওয়ালের পরিবেশ তাঁকে এই উপন্যাসটি রচনার প্রেরণা দিয়েছে। টাুই আর ব্রেথ-এর 'মানর' এবং 'প্রিয়রির' অনেক ঐতিহাসিক তথ্য তিনি উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাসের জন্য তিনি অজস্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তার শিল্পসম্মত ব্যবহার করেছেন কল্পনার জগতে এনে।

রিচার্ড ইয়ং একজন পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশক, জীবনে বীতস্পৃহ, ক্লান্ত। তার স্ত্রী ভিটা এবং দুটি সৎ-সন্তানের জ্বালায় সে জর্জরিত। তাই চলে এসেছে কর্ণওয়ালে তার বন্ধু ম্যাগনাসের বাড়ী বাস করার জন্য। ম্যাগনাস একজন বিজ্ঞানী। নানাবিধ গবেষণায় তার দিন কাটে। একটি চিত্তবিভ্রান্তকারক দাওয়াই আবিষ্কার করেছিল ম্যাগনাস, রিচার্ড জ্বালা থেকে ত্রাণ পাওয়ার বাসনাতেই হয়ত এই দাওয়াই পরখ করে দেখল। এই দাওয়াই-এর কৃপায় রিচার্ড চলে গেল এমন এক জগতে যে জগৎ ছশ বছরের প্রাচীন। এই প্রাচীন জগতে সে এক অদৃশ্য পর্যবেক্ষক, সে সবই দেখতে পাচ্ছে, সব কিছুর সাক্ষী কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, এই অবস্থায় সে এমন এক জগতের সন্ধান পেল তা তার নিজের জীবনের চেয়েও অনেক চমকপ্রদ, অনেক উত্তেজনাময়। এই অতীতলোকের কল্পনাবিলাস কিন্তু তার বাস্তব জীবনে এক প্রতিক্রিয়া শুরু করে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে 'রিচার্ড বিভ্রান্ত, বিমূঢ়।

এই উপন্যাসের লেখিকা দাফনে দা মুরিয়র অত্যাশ্চর্য লিপিকুশলতায় বর্তমানের রিচার্ড এবং তার দ্বিতীয় সত্তা অতীতের রোজার কিলমার্থ চরিত্রের জীবনের এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন — দুটি জীবনই পৃথক, উভয়ের সঙ্গে সম্পর্করহিত, কিন্তু মৃত্যু বিপর্যয় এবং জীবনরণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সমান। কর্ণওয়ালের টাুই আর ব্রেথ প্যারিস নামক পল্লীর অতীত এবং বর্তমানের খুঁটিনাটিতে এক অবিস্মরণীয় বাস্তবানুগ রেখাচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা।

'দি হাউস অন দি স্ট্রান্ডে' দ্য মরিয়র যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তা বর্তমান কালের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে চিত্তবিভ্রমকর অতীতের প্রভেদ কতটুকু? 'দি হাউস অন দি স্ট্রান্ড' দুটি পরিপূরক জগতের কাহিনী মাত্র নয়, এ এক বিচিত্র রহস্যালোকের কাহিনী।

গ্রন্থারম্ভে লেখিকার বর্ণনায় রিচার্ড ভাবছে : প্রথমেই দেখলাম এখানকার বাতাসের মধ্যে এক স্বচ্ছতা আর তার পর দেখলাম তীক্ষ্ণ সবুজ রঙের ঘাস। কোথাও এতটুকু কোমলতা নেই। দূরের পাহাড়গুলি আকাশে মিশিয়ে নেই, বরং পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। এত কাছে যেন আমি এখনই তা স্পর্শ করতে পারি। এই নৈকট্য আমার মনে বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করেছে। টেলিস্কোপের ভিতর কোন কিছু দেখে শিশুর মনে যে বিস্ময় ও চমক লাগে এ সেই চমক। আমার কাছাকাছি সব কিছুই কঠিন আকৃতির, ঘাসগুলি কেমন ছাড়া-ছাড়া—যে মাটি আমার পরিচিত এ সে মাটি নয়, তার চেয়ে কঠিন ও কর্কশ।

আমি আশা করেছিলাম — সব রকমই আশা করেছিলাম—এ আরেক রকমের রূপান্তর। একটা ভাল হওয়ার মত মানসিক প্রশান্তি—স্বপ্নের একটা আচ্ছন্ন মাদকতা—আমার সব কিছুই কেমন কুয়াশা মাখা, কোন রকম পরিষ্কার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না—এ এক বাস্তবতা। এমনই সুস্পষ্ট বাস্তবতা যা ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় আর কখনও অভিজ্ঞতা হয় নি। এখন সব অনুভূতিই সুতীব্র। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে সচেতন: চোখ, কান, ঘ্রাণশক্তি, সব কিছুই কেমন যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে হঠাৎ।

সবই হয়েছে কিন্তু স্পর্শের অনুভূতি নেই, আমি আমার পায়ের তলার মাটি অনুভব করতে পারছি না। ম্যাগনাস আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, সে বলেছিল, 'অচেতন পদার্থের সংস্পর্শে তোমার দেহ আসছে তা তুমি বুঝতে পারবে না। শুধু

চলবে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে, ওদের সঙ্গে ধাক্কা মারবে কিন্তু কিছুই অনুভব করবে না। তার জন্য চিন্তা করো না। কোন অনুভূতি ব্যতিরেকেই যে তুমি চলাফেরা করতে পারছ এইটাই অর্ধেক আশ্চর্য!'

আমি অবশ্য এই কথা রসিকতা মনে করেছিলাম, একটা পরীক্ষায় আমাকে নামাবার জন্য সে নানা রকম উৎকোচে প্রলুব্ধ করেছিল। এখন দেখছি ওর কথাই ঠিক, আমি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি—এ এক পরম বিস্ময়ের অনুভূতি কারণ আমি যেন বিনা চেষ্টাতেই চলাফেরা করছি, মাটির সঙ্গে কোন সংস্পর্শ অনুভূত হচ্ছে না।

'ডাঃ জেকিল অ্যান্ড হাইড' যে বিস্ময় পাঠকের অন্তরে সৃষ্টি করে, ডাফনে দ্য মুরিয়রের এই উপন্যাসটিতে সেই বিস্ময় পাঠককে আচ্ছন্ন করে তুলবে আর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগবে লেখিকার অনন্যসাধারণ লিপিচাতুর্য যা অতীত ও বর্তমানকে এক সূত্রে বাঁধতে পেরেছে। বর্তমানের যুগ বাস্তবের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। ডাফনে দ্য মুরিয়রের আর সব উপন্যাসে যে স্বচ্ছতা আর উজ্জ্বলতা বর্তমান এই উপন্যাসটিতেও তার অভাব ঘটে নি। পেঙ্গুইন সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত 'দি হাউস অব দি স্ট্র্যান্ড' উপন্যাসের এক সুলভ সংস্করণ এদেশে পাওয়া যাচ্ছে।

—অভয়ঙ্কর

THE HOUSE ON THE STRAND: (A Novel) By DAPHNE DU MAURIER. — (Penguin Books) — Messrs: Rupa & Co., 15 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.

সাহিত্যের খবর

ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা ॥ সাধারণতঃ ভারত সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ ফরাসী জনসাধারণের একটু কম বলেই শোনা যায়। কিন্তু সে ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হল অধ্যাপক অলিভার লাকম্বের ভাষণ পড়ে। অধ্যাপক লাকম্বে সাবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক দর্শন ও ভারততত্ত্বের অধ্যাপক। সম্প্রতি তিনি ভারত সফর করছেন। গত ২০ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে মুরলীলাল গোয়েঙ্কা ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলেন সেখানকার শিক্ষণধারা পরিদর্শন করতে। বিকেলে তাঁকে এক সভায় সম্বর্ধনা জানান হয়। ঐ সভায় তিনি বলেন—ফরাসী দেশে ভারত সম্পর্কে জানবার আগ্রহ রয়েছে। সেখানে সংস্কৃত, পালি, হিন্দি, বাংলা, উর্দু ও তামিল ভাষা ও সাহিত্য নিয়মিত পড়ানো হয়ে থাকে। প্যারিসে ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে পড়াবার জন্য কুড়িটি অধ্যাপক পদ রয়েছে বলে তিনি জানান।

কিরঘিজ লেখক আইতমাতোভ ॥ প্রতি দেশের সাহিত্যেই রূপকল্প ব্যবহারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রখ্যাত কিরঘিজ লেখক চিঙগিজ আইতমাতোভ সুন্দরভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন—'ভারতে সুন্দরী রমণীদের হাঁটার সঙ্গে গজেন্দ্রগমনের তুলনা দেওয়া হয়, আর আমাদের দেশে এই উপমা দেওয়া হয় বাচ্চা উটের হাঁটার সঙ্গে।' সাহিত্যরসিকদের কাছে কথাগুলো খুবই উল্লেখযোগ্য মনে হবে। ভেবে দেখুন, বাংলাদেশে যদি কোন কবি কোনো সুন্দরী নারীর হাঁটার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন—'উটের বাচ্চার মত হেঁটে যাও যখন সুন্দরী'—তখন কিন্তু পাঠক না হেসে পারবেন না। অথচ আরেক দেশে এটি স্মরণীয় উপমা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। আইতমাতোভ কিছুদিন আগে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে' এসেছিলেন। তখন অমৃতের প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ইংরেজি তিনি জানতেন না। ফলে দোভাষীর সাহায্য নিতে হয়েছে তাঁর সঙ্গে কথা বলার প্রতি সময়ে। চেহারা অনেকটা আমাদের ভুটানের লোকদের মত।

কিরঘিজ সাহিত্যের সাম্প্রতিককালে তিনিই বোধকরি সর্বশ্রেষ্ঠ। উপন্যাস, ছোটগল্প এবং চলচ্চিত্রের কাহিনীকার তিনি। বর্তমানে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজেও গভীরভাবে জড়িত আছেন। এছাড়া তিনি 'নোভি মির' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং দেশের সর্বোচ্চ সোভিয়েটের সদস্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'গুলসারি, বিদায়' প্রথমে ধারাবাহিকভাবে 'নোভি মির' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে পুস্তকাকারে। এর কাহিনীবস্তু গড়ে উঠেছে একটি সমবায় খামারের একজন বৃদ্ধের চরিত্র নিয়ে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'জামিল্যা', 'লাল রুমাল খামারে ছোট্ট পপলার গাছ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জাপানের তোমেন্টিক বুক ক্লাব ॥ জাপানের চারটি প্রকাশন সংস্থা একটি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। গত ডিসেম্বর মাসে উক্ত প্রকাশন সংস্থার প্রতিনিধিরা টোকিওতে এক সভায় মিলিত হয়ে ঠিক করেন যে 'জাপান বুক ক্লাব' নামে তাঁরা একটি সংস্থা গঠন করবেন। এর মাধ্যমে তাঁরা পুস্তক প্রকাশ এবং বিক্রীর সুব্যবস্থা করতে পারবেন। যে চারটি সংস্থা এর উদ্যোক্তা, তাঁরা হলেন 'জাপান পাবলিশার্স এ্যাসোসিয়েশন', 'জাপান ম্যাগাজিন পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন', 'নিপ্পন শুপ্পন তোরিতসুগি কায়োকাই' এবং 'জাপান বুক সেলার্স ফেডারেশন'।

পূর্ব ইউরোপের নতুন কালের সাহিত্য ॥ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সাহিত্য নতুন কালের সাহিত্যিকরা রচনা করেছেন, তার একটি অভিনব ইংরেজি অনুবাদ সংকলন সম্প্রতি শিকাগো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন চার্লস নিউম্যান ও জর্জ গোমোরি। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ—অর্থাৎ সাহিত্যের সমস্ত বিভাগ থেকেই কিছু কিছু রচনা নির্বাচন করে এখানে সংকলন করা হয়েছে। প্রতিটি রচনাই সুন্দরভাবে অনূদিত। বইটিতে একই সঙ্গে লেখক এবং অনুবাদকের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। ফলে রচনাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে লেখক সম্পর্কেও একটা ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়। তবে বইটি সম্পর্কে কিছু সমালোচনাও চোখে পড়লো। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক হেনরি নিউজেলেকসি বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, বইটিতে লেখক নির্বাচন ঠিক মত হয়নি। এতে সংকলিত স্ট্যামিশল মারা গিয়েছেন ১৯০৯ খৃঃ। যদি তিনি এই সংকলনে স্থান পেয়ে থাকেন, তাহলে কাফকাকে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। অবশ্য এরকম সমালোচনা সমস্ত সংকলন সম্বন্ধেই উঠতে পারে। এই সংকলনটির সবচেয়ে উল্লেখ্য দিক হল, সম্পাদকদ্বয় বিষয় বৈচিত্র্যের দিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। যেমন লেজেক কোলাকোস্কির লেখা 'বিসাস খ্রাইস্ট : প্রোফেট এণ্ড রিফর্মার প্রবন্ধে' ইতিহাসে যিশুখৃস্টের অবদান অত্যন্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার 'অ্যাটিলার নিশা' নামক উপন্যাসে জুলিয়াস হে রোমান সাম্রাজ্যের শেষ দশক বর্ণনা করেছেন এমনভাবে যাতে মনে হয়েছে, সেই যুগ যেন ফুটে উঠেছে আমাদের সামনে। কবিতা নির্বাচনেও সম্পাদকদ্বয় এই বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের নতুন কালের রচনার উপরও একটি সংকলন প্রকাশে নাকি এই সংস্থা উদ্যোগী হয়েছেন।

একটি ডাচ্ ভাষার উপন্যাস ।। এডওয়ার্ড হুর্নিক ডাচ ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখক। সম্প্রতি আমস্টারডম থেকে তাঁর একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। উপন্যাস হিসেবে তেমন কিছু নয়, তবে এর মধ্যে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা এমন করুণভাবে ফুটে উঠেছে যে, তা সহজেই পাঠকের মন আকর্ষণ করে।

হুর্নিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বন্দী অবস্থায় হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এ দীর্ঘ কয়েক মাস কাটিয়েছিলেন। সেই নিদারুণ অত্যাচারের কথা তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি। আলোচ্য 'দ ওভার-লেভেনদা' উপন্যাসেও সেই অভিজ্ঞতাই ফুটে উঠেছে। কাহিনী অংশটিও মর্মস্পর্শী। একজন সাংবাদিক সমুদ্রতীরে এক স্প্যানিশ হোটেলে উঠেছেন। সেখানে যে ঘরে তিনি থাকেন, তার থেকে সমস্ত শহরটা দেখা যায়। এখানেই পড়লো একদিন বোমা। দেখতে দেখতে সমস্ত শহরটা শ্মশানে পরিণত হয়ে গেলো। সবাই পালিয়ে গেল শহর থেকে। কিন্তু সাংবাদিকটি রয়ে গেলেন সেখানে। বোমে তার ভয় নেই। ভয় এই চরম নৈঃশব্দ্যকে। একটি কাকাতুয়ার ডাক শুনলেও যেন আতঙ্কে শিউরে ওঠেন তিনি। তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো বিগত দিনের কথা। তিনি তখন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দী। সেখানে তিনি দেখেছিলেন তার বাল্যপ্রণয়ী লোরাকে। লোরার সঙ্গে আবার তার চিঠি-পত্র লেখা আরম্ভ হল। কিন্তু বেশীদিন নয়। তাকে একদিন ধরে নিয়ে গ্যাস চেম্বারে মারা হল। যখন গ্যাস চেম্বার থেকে তার নগ্ন দেহ বের করে ক্যাম্পে আনা হল, তখন দূর থেকে তিনি দেখতে পেলেন লোরার বীভৎস চোখের চাহনি। যেন সে বাঁচবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল ঈশ্বরের কাছে। এখানেই কাহিনীটির শেষ। এই কাহিনী এবং বাস্তব বর্ণনার জন্যই বইটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

চার্বাক

নতুন বই

পূর্ব-পশ্চিম (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত। আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামা-চরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। তিন টাকা।

অচিন্ত্যকুমার মূলত গদ্যের মহলের মানুষ হলেও তাঁর অন্তর কবিতার সুষমায় পরিপূর্ণ। তাঁর গদ্যরচনাতেও আমরা পাই কবিতার স্বাদ। শব্দের ব্যঞ্জনায়, অনুভূতির ধ্বনিবিদতায় তিনি সিদ্ধকাম কবি। 'পূর্ব-পশ্চিম' তাঁর সদ্যপ্রকাশিত কবিতা সংকলন। এর প্রতি পৃষ্ঠায় আমরা সেই কবিকে পাই যিনি তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে বাংলাদেশকে অনেক আশ্চর্য ঋজু, সংহত ও চিত্রকল্প উদ্ভাসিত কবিতা উপহার দিয়েছেন। 'পূর্ব-পশ্চিমে'র অনেক কবিতাই বাঙলী পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি মমতায় এই কবিকণ্ঠ উদ্বেলিত। ভাঙা বাংলার হৃদয় বেদনায় এমন চিত্ররূপময় কবিতা খুব কমই লিখিত হয়েছে আধুনিক-কালে। অসামান্য কল্যাণস্পর্শে উজ্জীবিত এই কবিতা 'পূর্ব-পশ্চিম' দেশের অখণ্ড চেতনাকে নিবিড় ভালবাসার মন্ত্রে জাগ্রত করেছে। তেমনি এক সহৃদয় কবিতা 'হৃদয়হারা'। প্রাণের অপরাজেয় শক্তিতে কী অসীম বিশ্বাস তাঁর। তাই তিনি বলেন, 'প্রাণ আছে, প্রাণ আছে—শুধু প্রাণই এক আশ্চর্য সম্পদ। এক ক্ষয়হীন আশা। এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।' ছিন্নমূল মানুষের বেদনাকে তিনি শিল্পীর সংবেদনশীলতায় রূপায়িত করেছেন 'উদ্বাস্তু' কবিতায়। মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাস রাখাই শিল্পীর কাজ। অচিন্ত্যকুমার সুন্দরের রহস্যসন্ধানে যখন আত্মমগ্ন তখনও তিনি মানুষের মহিমাকেই প্রত্যক্ষ করেন। সেখানেই তাঁর কবিসত্তার অনন্যতা। কবির নিঃসঙ্গতাকে তিনি ভাষা দেন রূপকের গভীরতায়। তিনি বলেন, 'কে সে দুঃখী মহাবীর। প্রত্যেক নির্মম একক। সেই শিল্পী সেই কবি সুহৃত্তম সেই সে লেখক।' তাঁরও সং-গ্রাম চলে অনন্ত প্রবাহে। মানুষকে নিয়েই দেশ, তার ভাষাতেই প্রকাশিত হয় দেশপ্রেম। এই পবিত্রতায় তিনি পরিশুদ্ধ করেন নিজেকে। তাই তিনি নিজেকে বলেন যোদ্ধা —'কাগজ কলম কালি—এই সব আমার আয়ুধ।' অচিন্ত্যকুমার শব্দের শিল্পী। স্রোতস্বিনীর মতো প্রবহমান এই শব্দস্রোত ভাবের গভীরতায় আমাদের বিমোহিত করে রাখে। 'পূর্ব-পশ্চিম' এই প্রবীণ কবির নবতম জীবন-ভাষ্য। তাকে অন্তর থেকে আমরা গ্রহণ করি একজন জীবনবাদী কবির সত্যোপলব্ধির মহৎ প্রকাশরূপে। সুরম্য প্রচ্ছদে ও মুদ্রণে গ্রন্থটি আকর্ষণীয়।

—কৃষ্ণ ধর

ব্রহ্মোপাসনা (ধর্মগ্রন্থ)—রামমোহন রায়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ২১১ বিধান সরণি, কলকাতা-৬। দাম : ১·৫০ টাকা।

নানারকম যুক্তি, তর্ক ও প্রতিপক্ষের প্রতি উত্তর-প্রত্যুত্তরে লেখাগুলি সমৃদ্ধ। এমনকি ধর্মীয় চিন্তাভাবনায়ও তিনি আশ্চর্যরকমে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। এই সঙ্কলনে গৃহীত কয়েকটি

প্রকাশিত হ'ল
সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
সতীকান্ত গুহের
শিশু ও কিশোরদের মঞ্চসফল উচ্চ প্রশংসিত নাট্য সংকলন
নূতন দিনের রূপকথা তিন টাকা

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সতীকান্ত গুহ একটি বিশিষ্ট নাম। এই গ্রন্থে তিনি শিশু ও কিশোরদের অভিনয় উপযোগী তিনটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক উপহার দিয়েছেন। অভিনয় ছাড়াও ছোটরা এই নাটকগুলি পড়ে অজস্র আনন্দের খোরাক সঞ্চয় করতে পারবে। বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটি এক অমূল্য সংযোজন।

আমাদের সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ

সতীকান্ত গুহের	আশিস সান্যালের
আলোর পাহাড়	**স্বপ্নের উদ্যান ছুঁয়ে**
দাম : ৩·০০	দাম : ৩·০০

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

লেখা আগে বেরিয়েছিল পুস্তিকাকারে। ঈশানচন্দ্র রায়ের ভূমিকাসহ ছাপা হয়েছে 'গায়ত্রীর অর্থ', 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' ও 'ক্ষুদ্রপত্রী'। আলোচনাকালে রামমোহন যে-সকল শাস্ত্রীয় বচন ব্যবহার করেছেন, সেসব উদ্ধৃতির অনুবাদ যথাসম্ভব রামমোহনের ভাষাতেই দেওয়া হয়েছে। ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বক্কাইস অক্ষর।

প্রকাশক এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে ধর্ম-পিপাসু পাঠকের কাছে ধন্যবাদার্হ হবেন নানা কারণে। ব্রহ্মসংগীতসহ অন্যান্য কিছু কিছু রচনা এতদিন অন্যের নামে চলে আসছিল। এই গ্রন্থে সেসব লেখাও পুনঃমুদ্রিত হয়েছে রামমোহনের নামে।

BENGALI LITERATURE IN ENGLISH (Bibliography) — By Jogamohon Mukherji, M. C. Sarkar & Sons Private Limited. 14, Bankim Chatterji Street, Calcutta 12. Price Rupees Eight only.

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিক থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহু বাঙালী লেখক ইংরেজী বই লিখেছেন, অনেকের লেখা ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। বেশী-দিন আগের কথা নয়, গত দু'তিন দশকে অনেক আধুনিক লেখকের লেখা অনূদিত হয়েছে ইংরেজীতে। মাইকেল-বঙ্কিমকে আমরা ভুলতে পারিনি, যেহেতু তাঁদের খ্যাতির জন্যই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজমোহন'স ওয়াইফ'কেও মনে রাখতে হয়েছে আমাদের। মাইকেল ইংরেজীতে শুরু করে, পরে বাঙলা ভাষায় লিখতে থাকেন। আর, শুধু শুরু বরাবরই লিখে গেছেন ইংরেজীতে। যেমন পরবর্তীকালের সরোজিনী নাইডু।

এম, সি, সরকার বর্তমান গ্রন্থপঞ্জীটি ছেপে বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ হবেন। এতদিন যেসব গ্রন্থের নাম জানার জন্য গবেষককে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতা ওল্টাতে হতো, এখন অনায়াসেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে এই বইয়ে।

বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে পড়ে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন ১৯৪৮ সালে। সমর সেন এবং অন্যান্যরা অনুবাদ করেছিলেন মানিকবাবুর কতকগুলি গল্প। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসটিরও অনুবাদ করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই তো সেদিন মণীন্দ্র রায়ের 'মোহিনী আড়াল'-এর অনুবাদ করেছেন সুজিত মুখোপাধ্যায়। তারও উল্লেখ আছে বইটিতে।

সংকলনের উদ্দেশ্য হয়তো স্বদেশী পাঠককে সন্তুষ্ট করা নয়, বিদেশী গবেষককে সাহায্য করা। কেননা, বাংলা ভাষায় কি বই, কখন, কোথায় অনূদিত হয়েছে—তার খবরাখবরে সাধারণ পাঠক ততটা আগ্রহী হবে কি না বলা শক্ত। তবু আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ বলে মনে হয় এই গ্রন্থটিকে।

ভবিষ্যতে এই সঙ্কলনের আদর্শে যদি বাংলা বইয়ের কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী বেরোয়, তাহলেও আমরা বিস্মিত হবো না: সুলভ মূল্যে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা থেকেও একটি করে জাতীয় বার্ষিক সঙ্কলন বেরুতে পারে।

আমরা প্রকাশক এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্সকে ধন্যবাদ জানাই। সঙ্কলক জগমোহন মুখোপাধ্যায়ও পাঠকের ধন্যবাদ পাবেন।

ধর্মপথিক রবীন্দ্রনাথ (আলোচনা)—বীরেন্দ্র-কুমার ঘোষ। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা-৬। দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে বিশ্বখ্যাতির অধিকারী হলেও তাঁর ধর্মজীবনও উল্লেখ-যোগ্য। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতবাদ অবশ্য সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায়, মানবতারই নামান্তর। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর জীবন ও সাহিত্যে প্রতিফলিত সেই অন্তঃভাবনার ওপরে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছেন। তিনি লিখেছেন : 'রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির যে ধর্মচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, সেইগুলি আলোচনাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।'

এর আগেও রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত বিষয়ে বহু আলোচনা, সমালোচনা হয়েছে। সবই সাময়িক পত্রিকার পাতায়। সম্ভবত বীরেন্দ্রবাবুই প্রথম গবেষণামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে : 'দর্শনশাস্ত্রের ছাত্ররা যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্র দর্শন আলোচনা করেন এবং দর্শনশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সেসব টেকনিক্যাল রূপ ও ভাষা দেন, এই গবেষণা কাজের মধ্যে সে-শ্রেণীর ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে না।' রবীন্দ্র-নাথের বিভিন্ন রচনা থেকে তিনি যে চিন্তাধারা লক্ষ্য করেছেন, হয়তো কবির নিজস্ব উক্তির সঙ্গেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মোট নয়টি পরিচ্ছেদে বইটি সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে বীরেন্দ্রবাবু প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, সভ্যতার প্রসার, ঐশ্বরিক সত্তার অনুভব, দেবতার কল্পনা ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতে, উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার ধর্মীয় অবস্থা, উনিশ শতকের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় (রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যবর্গ), উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় দর্শন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন. প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকের চারটি অধ্যায়ে অনুপস্থিতই রয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায় থেকে তাঁর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ ও ধারণাকে আত্মস্থ করে, আচারের তুচ্ছতা ও সংস্কারকে অস্বীকার করে—মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সুখপাঠ্য ভাষায় লেখক তা প্রমাণিত করতে পেরেছেন।

লেনিন চিরকালীন (দীর্ঘ কবিতা)—কালী-পদ ভট্টাচার্য। শোভনা প্রেস পাবলি-কেশনস, ১৮, সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ, কলকাতা-১৭।। দু টাকা।।

ছোট আকারের পকেট-বুক ধরনের বই। বইটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে: 'লেনিনের, ভাবকের এবং আগামীকালের লেনিন সরণীর পথিকদের হাতে।' ১০৮ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ কবিতায় শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য লেনিনের জীবন ও জাগরণের বাণী প্রকাশ করেছেন সাবলীল ছন্দে। তিনি লিখেছেন: 'যুগের আহ্বানে মুখরিত করবে দিকচক্র-বালে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি তুলে বিশ্ব জাগিয়ে অন্তরালে। সূর্যোদয় তপস্যায় জাগি লেনিনের নিত্য-জাগরণী।'

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

OCARINA (Oct.-Nov. 1970) — Chief Editor : AMAL GHOSH, 30-B, Chamiers Road, Madras 28. Price : Re 1.00

বাংলা দেশের বাইরে সুদূর মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক আলোচনার দ্বিমাসিক সঙ্কলন। পত্রিকাটির লক্ষ্য সর্বভারতীয়। বাংলা, মালয়ালাম প্রভৃতি কবিতার ইংরেজী অনুবাদে সমৃদ্ধ। প্রাচীন ও ধ্রুপদী কবিতার অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি। মূল লেখকদের মধ্যে আছেন তিরুভাল্লুভর, মনোজ দাস, পি পার্থসারথী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, জগদীশ ভট্টাচার্য, রামেন্দু দেশমুখ্য, পরমা-নন্দ সরস্বতী, নীলাম্বপেরুর, মধুসূদন নায়ার, জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকে। ছাপা হয়েছে বঙ্গনাথনের একটি প্রবন্ধ। প্রচ্ছদটি সুরুচিসম্পন্ন ও সুন্দর। সিল্ক স্ক্রিনে ছাপা। সাধারণত প্রায় প্রত্যেক পত্রিকারই প্রথম সংখ্যায় যেমন দোষ-ত্রুটি থাকে, এ পত্রিকাটিতেও সেই অসম্পূর্ণতা কম-বেশী রয়ে গেছে। আশা করবো, সম্পাদক ভবিষ্যতে আরো প্রতিনিধিত্বমূলক আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের রচনা উপ-স্থাপিত করতে পারবেন।

বাংলা সাহিত্যপত্র : সম্পাদক উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬, বাবুপাড়া লেন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। চল্লিশ পয়সা।

লেখকদের মধ্যে আছেন সুনীল কর্মকার, সৈয়দ কওসর জামাল, সুদীপ ঘোষ, মদনমোহন বিশ্বাস, দাউদ হায়দার, বিমান চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চৌধুরী এবং আরো অনেকে। গল্প, হাল্কা রচনা, সমা-লোচনা—সবই আছে। অনেকের কাছে সংখ্যাটি ভাল লাগবে।

বইকুণ্ঠের খাতা

বই পাড়ার হালচাল : প্রকাশকের বক্তব্য

বাংলাদেশে বিদেশী বইয়ের অন্যতম পরিবেশক 'রুপা অ্যান্ড কোম্পানী'। তার অন্যতম কর্ণধার ডি. মেহরার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সেদিন। কলকাতা সম্পর্কে আশাবাদী। বললেন : "আমার বয়স বাট। কলকাতায় জন্মেছি কলকাতা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না। ভারতে এমন শহর আর নেই।"

চোখে পড়ল একটি বিজ্ঞাপন : 'উই নো অব নো মোর রিওয়ার্ডিং প্রফেশান দ্যান বুক সেলিং।' কথা বললেন, নম্র সুরে—প্রাণখোলা কণ্ঠস্বর।

বললুম, আপনার কাছে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। শুনছি, বইয়ের বাজারে নাকি এখন দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে? আপনারা তো বিদেশী বই সরবরাহ করেন। আমি জানতে চাই, কি ধরনের বই এখানে বেশী বিক্রী হয়? ক্রেতা ও পাঠক কারা?

কিছুটা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, বাংলাদেশে রীডার আছে। এখানে সবরকম বই-ই বিক্রী হয়। তবে অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানে পাঠকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। কলকাতার পাঠক নতুন বইয়ের চেয়ে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থ পছন্দ করেন বেশী। বুক-সেলাররা মূলত বিক্রী করেন নাটক, নভেল, ফিকশান—আর, স্কুল-কলেজে টেক্সট বুক ও টেকনিক্যাল বইয়ের চাহিদা।

কোনো বিশেষ ধরনের বইয়ের প্রতি কি পশ্চিমবাংলার পাঠকের ঝোঁক নেই?

—আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশ কিংবা দেশ-সম্পর্কিত বই এখানে ভালো বিক্রী হয়। কম্যুনিস্ট লিটারেচার বিক্রী হয় খুবই। তবে, হুজুগের বই এখানে বিশেষ বিক্রী হয় না।

বললুম, যেমন?

—কিছুকাল আগে 'পাকিস্তান মিলিটারী রুল অব পিপলস পাওয়ার' নামে একটা বই এসেছিল কলকাতায়। ভেবেছিলুম অনেক বিক্রী হবে। কার্যত দেখা গেল সে ধারণা ভুল। বইটি কলকাতায় বিক্রী হয়েছে পঞ্চাশ কপি। বোম্বেতেও তাই। কিন্তু দিল্লীতে মাত্র দু'ঘণ্টায় বিক্রী হয়েছিল ১০০ কপি।

একটু থেমে বললেন, কলকাতায় বেশী দামের বই বিক্রী হয় না। ক্রিয়েটিভ রচনার চাহিদা বেশী। দিল্লীতে বেশী দামের বই বিক্রী হয়। বোধহয়, বিদেশীদের আনাগোনা বেশী বলে। তা ছাড়া, দিল্লীর লাইব্রেরী-গুলো কলকাতার চেয়ে অনেক বেশী গ্রান্ট পায়।

আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশে বিদেশী বইয়ের কারবার ভালো চলতে পারে?

পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, এখানে অ্যাকচুয়েল রীডার আছে। ভারতের আর কোথাও এমন পাঠক নেই। বাঙালী পড়ুয়া জাত। আমার ধারণা, এখানে বিদেশী বইয়ের ব্যবসা ভালো চলতে পারে। সুযোগ লাগাতে পারলে বই-ব্যবসায় ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলতে পারা যায়।

বললুম, কলকাতায় এখন বইয়ের ব্যবসা কি খারাপ যাচ্ছে?

—সেল কমে গেছে। বুঝতে পারছি না কি করবো। আমরা পেঙ্গুইনের বই স্টকে রাখি। তা ছাড়া চৌত্রিশটি বৃটিশ প্রকাশকের প্রতিনিধি। সস্তা বই-ই বেশী আনি না। বাংলা বই কিছু কিছু ছেপে-ছিলুম। এখন আর ছাপতে সাহস হচ্ছে না। আগে মাসে অন্তত একটা বই ছাপতুম। এখন বছরে দু' তিনটের বেশী ছাপছি না।

আপনাদের ব্রাঞ্চ কোথায় কোথায় আছে?

—বোম্বে, দিল্লী, এলাহাবাদ।

ওখানকার অবস্থা কি রকম?

—এখানকার মতো এতটা খারাপ নয়।

একটু থেমে বললেন, বড় পাবলিশাররা হয়তো টিকে থাকতে পারবেন। তাঁদের টিকে থাকতেই হবে। ছোট প্রকাশক-

আরও সর্বের কাছে, অলকো বিকেল
এবং আশা যখন বৃষ্টির কবি
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
সদ্যপ্রকাশিত অবিস্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ
রাত্রিকে দিনকে
মূল্য চার টাকা মাত্র
●
পদ্মা আমার গঙ্গা আমার
বাংলাদেশের ওপর
কবি দক্ষিণারঞ্জন বসুর
আবেগধর্মী এক অপূর্ব কবিতা সংকলন।
আমাদের সবার মনের কাছে
এক বাংলাই সত্য,
তারই প্রকাশ এই সুন্দর সংকলনটিতে।
মূল্য তিন টাকা মাত্র
: মধুরেণ সিণ্ডিকেট :
৬৪/১০ বেলগাছিয়া রোড, কলি-৩৭

সেই টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেকে মনে করেন, খাদ্যবস্ত্রের মতো বই নাকি জীবনধারণের পক্ষে এসেনসিয়েল নয়। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। বই না হলে—এমন মানুষ আছেন—যাঁর একদিনও চলে না। আমি তো রোজ দু তিন ঘণ্টা বই না পড়লে অস্বস্তি বোধ করি।

বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর বক্তব্য

বেঙ্গল পাবলিশার্সে গিয়েছিলুম খোঁজ খবর নিতে। সাহিত্যিক মনোজ বসু বললেন, বইয়ের সাম্প্রতিক বাজার কেমন জানি না, এখন ব্যবসা-বাণিজ্য দেখছেন ময়ূখ। ও বলতে পারবে।

ময়ূখ বসু বললেন, এখন গল্প-উপন্যাসের মরশুম নয়। তবু অন্যান্য বছরের তুলনায় খারাপ যাচ্ছে। কোনো বই-ই বিক্রী হচ্ছে না। রাজনৈতিক উপন্যাস, রমারচনা জাতীয় বই অবশ্য কিছু কিছু বিক্রী হয়। কিন্তু সে ব্যাপারে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা চলছে। একই বিষয়ের ওপর বই বেরিয়ে যাচ্ছে অনেকগুলো। তবু ভালো বই হলে বিক্রী হয়। আমরা মন্মথ রায়ের 'ভিয়েতনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে' বের করেছিলুম। ভালো বিক্রী হয়েছে।

মনোজবাবুকে বললুম, বর্তমান পরিস্থিতির ওপরে লেখা বই কি ভালো বিক্রী হবে বলে মনে হয়? আপনি তো লিখেছেন?

—অমৃতে এবার পুজো সংখ্যায় একটি উপন্যাস লিখেছি 'আমি সম্রাট' নামে। অনেকে প্রশংসা করছেন। বোধহয় সেরকম বইয়ের চাহিদা আছে। এ তো সময়েরই দাবী।

তিনি আমাকে একটি চিঠি দেখালেন। অমৃতের ঠিকানায় এসেছিল। রিডাইরেক্ট হয়ে বাড়ীতে গেছে। বললেন, সাধারণ পাঠকও বর্তমান পরিস্থিতির ওপর ভালো লেখা চায়। উপন্যাসও তো কালেরই দর্পণ।

বললুম, বাংলা বইয়ের বাজার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

বললেন, বাজার ছোট, বাঙালী প্রকাশকদের দৃষ্টিও তেমন হয়ে ওঠেনি। কিছুকাল আগে দিল্লী গিয়েছিলুম। সঙ্গে সুনীতিবাবু ছিলেন। দেখেছি, লেখকদের সম্পর্কে অবাঙালী প্রকাশকদের ধারণা কতো উঁচু। ও'রা লেখকদের রেসপেক্ট করেন ধনী প্রকাশকরাও দরিদ্র লেখকদের হেলাফেলা করেন না।

একটু থেমে বললেন, এককালে বাঙালীরা হিন্দী প্রচার করেছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিশাল ভারত' এবং এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস সে কর্তব্যই পালন করেছে। এখন হিন্দী বই বেশী বের করছেন, পাঞ্জাবী প্রকাশকেরা। বাঙালী প্রকাশকদের সেদিকে তেমন দৃষ্টি নেই।

উদাহরণ দিয়ে বললেন, হিন্দী প্রকাশকেরা পকেট বুক এডিশনে বহু উপন্যাসের হাজার হাজার কপি বিক্রী করে। আমার অনেক বই ওরা হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন। 'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদও বেরুবে শীঘ্রই।

বাংলা বইয়ের অবস্থা খারাপ কেন?

—অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যই সব কিছু গোলমাল ঘটে যাচ্ছে।

ময়ূখ বসু বললেন, জাল লেখকের বইতে বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা জনপ্রিয় লেখকদের নাম দিয়ে বহু বই ছেপে যাচ্ছেন। তবে আমরা বইয়ের বাজারটাকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্য অন্য কথা ভাবছি, আমেরিকান বুক ক্লাব ধরনের একটা ক্লাব তৈরী করে। যাঁরা এ ক্লাবের সদস্য হবেন, তাঁরা উপযুক্ত কমিশনে আমাদের প্রকাশিত বইগুলি কিনতে পারবেন। আগে একবার পেপার বুক-এ কিছু উপন্যাস ছেপেছিলুম। তখন সাকসেসফুল হইনি। আবার বের করছি। দেখা যাক, কি হয়।

মনোজবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, বাংলাদেশের লেখকরা কি এখন কেবল লেখালেখি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারছেন?

—দু' একজন পারছেন। অনেকের পক্ষেই অসুবিধা হচ্ছে।

'মিত্র ও ঘোষ' বলেন

'মিত্র ও ঘোষ'-এর শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্রও অস্বস্তি বোধ করছেন এখন। বললেন, গতবারের চেয়ে এখন বইয়ের বাজার খুবই খারাপ। লাইব্রেরী গ্রাণ্ট হয়তো বিভিন্ন গ্রন্থাগার পাচ্ছেন, কিন্তু বই কিনতে পারছেন না। তার কারণ, আগে লাইব্রেরীয়ানরা ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবৈতনিক। ইদানীং ওরা গ্রাণ্টের টাকা থেকে যৎসামান্য পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়ে থাকেন। ফলে, যেখানে বছরে দু' তিন শ টাকা গ্রাণ্ট দেওয়া হয়, সেসব লাইব্রেরী বই কিনতে পারছেন না কিছুতেই।

আর অন্য কোনো কারণ কি আছে?

—বই পাড়ায় লোক আসছে না। কলকাতা সম্পর্কে অনেকে ভীত।

ব্যবসায়ের পুরনো মাধ্যমগুলি কি ঠিক আছে?

—সবই ঠিক আছে। কেবল বিক্রী হচ্ছে না। যাঁরা দু দশ কপি নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরাও ফেরত পাঠাচ্ছেন বিক্রী হচ্ছে না বলে। এদিকে আরেক ফ্যাসাদ দেখা দিয়েছে। দপ্তরীখানার তাগাদা। ওরা বই ধরে রাখতে চায় না। ছাপা ফর্মাগুলোই বা কোথায় রাখবো? সেজন্যে ভাড়া গুনতে হচ্ছে। বই বিক্রী হলে, এ অবস্থা হতো না।

বললুম, প্রতিকারের উপায় কি?

—স্কুল-কলেজের অবস্থা স্বাভাবিক হলে হয়তো ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসতো। অন্যান্য বার প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় কিছু বই বিক্রী হতো। এবার সে সম্ভাবনাও নেই।

সাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষ বললেন আরেকটা সমস্যার কথা। বইয়ের ওপর থেকে ট্যাক্স উঠে গেছে। কিন্তু ইদানীং বাড়তি খরচার দায়ে পড়েছি আমরা। একে তো ডাকের খরচ বেড়েছে, তার ওপরে এখন প্যাকিং চার্জের ওপরেও সেলট্যাক্স বসেছে অর্থাৎ, একটা বই পাঠাবার জন্য আমরা যে প্যাকিং চার্জটা দাবী করি—মনে করা যাক তার পরিমাণ এক টাকা—এখন তার ওপরেও ক্রেতাকে সেলস ট্যাক্স দিতে হচ্ছে।

বললুম, তা হলে বইয়ের ব্যবসা চলবে কি করে?

—চলতে পারে, সরকার যদি কটেজ ইণ্ডাস্ট্রির মতো বুক ইণ্ডাস্ট্রিকেও নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেন, তাহলে। খাদি ইণ্ডাস্ট্রিকে তো ও'রা এভাবেই বাঁচিয়ে রেখেছেন।

গতবারের তুলনায় কি এ সময়ে আপনারা তেমন বই বের করতে পারেননি?

—গতবার এ সময়ে আমরা যত বই বের করেছি, এবার তার অর্ধেকও করিনি।

গজেনবাবু বললেন, এখন আমার আলমারীতে '৩০।৪০টি ছাপবার মতো পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে।

লেখক তৈরীতে প্রকাশকদেরও তো একটা ভূমিকা আছে? আপনারা কি তা পালন করে যাচ্ছেন?

লেখক আমরা তৈরী করি না। পাঠকরা তৈরী করেন। এবং লেখক নিজেই তৈরী হন। কোনো প্রকাশক লোকসান দিতে হবে জেনে বই ছাপতে পারেন না। অন্তত কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাগজওয়ালারা কি সাহিত্য-রুচি তৈরীর ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নিয়েছে? ও'রা পাঠককে চালিত করছেন বলা যায়। আমরা সে-দায়িত্ব কি পালন করতে পারি?

একটু থেমে বললেন, জীবন শুরু করেছিলুম ক্যানভাসার হিসেবে। জানি, কি করে, কি করতে হয়। 'হিন্দু' কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি বাংলা বইয়ের। তাতেও বই বিক্রী হয়েছে। কিন্তু যে-বই একেবারেই বিক্রী হবে না, তা ছাপবো কোন্ ভরসায়?

বললুম, বাংলা বইয়ের দাম কি এখন বেশী হচ্ছে না?

—কাগজ, ছাপার খরচ, বাঁধাই ইত্যাদির দাম যে-হারে বেড়েছে, আমরা সে-তুলনায় অনেক কম দামে বই দিই। আসল কথাটা, দামের নয়—জাতীয় জীবনের অস্থিরতা।

আপনারা তো সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বই করতে পারেন? কেবল বাংলা বইয়ের ওপর নির্ভর করে লাভ কি?

—কলকাতায় বসে হিন্দীতে বই ছাপলে চলবে না। সেজন্যে দিল্লী-বোম্বেতে দোকান খুলে বসতে হয়। বাংলাদেশের লেখক-পাঠকদের খবরাখবরই আমরা জানি। ওখানে না গেলে ওখানকার খবরাখবর ও মাধ্যমগুলি ঠিক বোঝা যাবে না।

অন্য মত, ভিন্ন প্রসঙ্গ

বইপাড়া ঘুরে দেখেছি, প্রকাশকের রকমফেরে, একেকজনের মতামত একেক রকম। কেউ বলেন, মন্দার সময়। কারোর মতে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা স্বাভাবিক। অবশ্য প্রত্যেকেই এক ধরনের অস্থিরতার কথা বলেন, যার রূপ বা স্বরূপ কি বা কেমন, তা কেউ ব্যাখ্যা করেন না। একজন ছোট প্রকাশককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাজ-কারবার কেমন চলছে?

মনমরা হয়ে তিনি বললেন, আমরা পাঠ্য বইয়ের প্রকাশক। সাহিত্যের কারবারী নই। নতুন বই একটা বের করে ফেলেছি ঝোঁকের মাথায়। কি হবে বলতে পারি না।

মণ্ডল অ্যাণ্ড সন্সের সুধীরকুমার মণ্ডল বললেন, ভালোই। অন্য বছরের তুলনায় খারাপ হবে বলে মনে করি না। এবার ক্লাস এইটের একটা বিজ্ঞানের বই নতুন অ্যাপ্রোভড্ হয়েছে। স্কুলে স্কুলে ক্যানভাসার পাঠিয়েছি। শুনেছি, মাস্টার-মশাইরা বই পাল্টাচ্ছেন কম।

অন্য একজন প্রকাশক বললেন, বইয়ের বাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে আজ নয়, ১৯৬৫ সাল থেকে। আগে এ-লাইনে প্রতিযোগীর সংখ্যা কম ছিল। এখন অনেক বেশী। সেজন্যই ভেবেছিলাম, ব্যবসার ধরণ-ধারণ পাল্টাবে। দু-একটা প্রবন্ধ, উপন্যাসের বইও ছেপেছিলাম। কিন্তু সুবিধা করতে পারিনি।

ব্যাখ্যা করে বললেন, অর্থাৎ নির্ভেজাল সাহিত্য কিংবা পাঠ্যপুস্তক ছেপে এখন আর ব্যবসা চালানো যাবে না। দুটোই চাই। কিছু পাঠ্যবই, কিছু গল্প-উপন্যাস ছেপে নিজেদের সচল রাখতে হবে। হয়তো সে-জন্যেই বাকসাহিত্য, প্রকাশভবন, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী, মিত্র ও ঘোষ-এর মতো সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত পাঠ্যবই ছাপেন। অন্যদিকে মডার্ন বুক এজেন্সী, ক্যালকাটা বুক হাউসের মতো প্রকাশকেরা বের করছেন সিরিয়াস প্রবন্ধের বই—গবেষণামূলক গ্রন্থ।

আসল কথা কি জানেন?

বললাম, কি?

—আসল কথা হলো, বাংলাদেশে অধিকাংশ প্রকাশকের মূলধন যোগান দেয় স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইগুলি। কোনো কারণে, ওখানে মার খেলে অনেকের ব্যবসা উঠে যাবে, কলেজ স্ট্রীটের সরগরম ভাবটা আর থাকবে না। আমাদের দেশে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ওরিয়েন্ট লং-ম্যান-এর মতো প্রকাশক নেই। নির্ভরযোগ্য ভালো বইয়ের সংখ্যাও কম। কোনো প্রকাশকই জোর করে বলতে পারেন না, তাঁর বইটিই শ্রেষ্ঠ। একই ধরনের অজস্র বই থাকায় প্রতিযোগিতার পরিমাণটাও বেশী। ক্যানভাসার পাঠিয়ে, মাস্টারমশাইদের ধরে, বেশী কমিশনের প্রলোভন দেখিয়ে বই পাঠ্য করাতে হয়। দু হাজার বই ছেপে তিনশ' কপি নমুনা হিসেবে না বিলোলে একটা এডিশনই শেষ হতে চায় না।

আর এই পাঠ্য-বইয়ের লেখকদের কথা বলছেন?

অধিকাংশই স্কুল-কলেজের শিক্ষক। তাঁরা পূর্ব-প্রকাশিত বইগুলির ভাষা অদল-বদল করে একেকটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দেন। বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা পর্যন্ত এই ফাঁকিবাজির প্রথাটাকেই প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হন। কেননা, তাঁরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা রয়েলটি পান না। প্রকাশকের কাছে সেই গ্রন্থকারেরই মর্যাদা বেশী, যিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করে আসছেন, এবং যাঁর নামে দশ-বিশটা স্কুলে বই পাঠ্য হয়ে যাবে অনায়াসে—তাঁরই।

একটু হেসে বললেন, বুঝতেই পারছেন, অসুখটা অনেক গভীরে। তার উপশম এক-দিনে হবে না। প্রকাশকরা যদি ঝুড়ি ঝুড়ি বই না ছেপে দুটো-চারটে নির্ভরযোগ্য বইয়ের ওপর নির্ভর করতেন এবং শিক্ষকেরা যদি গ্রন্থকার হবার লোভ সামলাতে পারতেন—তাহলে হয়তো প্রতিযোগিতার অসুস্থ ভাবটা কমতো, ছাত্ররাও উপকৃত হতো নির্ভুল একেকটি বই পড়ার সুযোগ পেয়ে।

—গ্রন্থদর্শী

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

(তের)

গেস্ট হাউসে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম সিগরেট শেষ। তাই গেস্ট হাউসে না ঢুকে এগিয়ে গেলাম ক্লেজ লোকের মোড়ে এফ-আর-আই-এর ঐ ছোট্ট মার্কেটের দিকে। বেশী দূরে নয়, মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম।

এফ আর আই'এর এই মার্কেটটা সত্যিই ছোট। মাত্র কয়েকটা দোকান। প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়। চাল-ডাল-আটা-ময়দা থেকে ওল্ড স্পাইস—উইলকিনসন সোর্ড—হেয়ার ক্রিম্‌ডার পর্যন্ত। একটা রেস্তোরাঁও আছে। এফ-আর-আই আর মিলিটারী অ্যাকাডেমির ছেলেরাই এর একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। আমি নিজেও এখানে চা খেয়েছি। চা খেতে খেতেই ছেলেছোকরাদের সরস আলোচনা কানে ভেসে এসেছে। বুঝেছি, চা খাওয়াটা এদের কাছে গৌণ, মুখ্য হচ্ছে কিছু গোপন আলোচনা করা। এফ-আর-আই'এর প্রেসিডেন্টের ভাইঝিকে অনেকটা বৈজয়ন্তীমালার মত দেখতে বা আই-এম-এ-এর ফিলেডিয়ামে বাও মেজর জেনারেলের ক্যাপ্টেন ছেলে মিস সাক্সেনাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, এসব খবর একমাত্র এই রেস্তোরাঁয় এলেই জানা যেতে পারে। আর কোথাও না।

সকালে-বিকেলে এই মার্কেটে কিছু লোকজন দেখা যায়। দুপুরের দিকে ফাঁকা থাকে। আজও ফাঁকা। তবু রেস্তোরাঁয় কয়েকটা ছেলের জটলা দেখলাম।

আমি কোনার দিকের দোকানে গেলাম। দেখলাম একজন আর্মি অফিসার কিছু কেনাকাটা করছেন। আমি চুপ করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানদার অফিসারকে একটা টুথপেস্ট এগিয়ে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়েস প্লীজ?

'সিগরেট হ্যায়?'

'জি হাঁ। কোনসে সিগরেট চাইয়ে?'

'দো প্যাকেট উইলস ফিল্টার।'

অফিসারটি পার্স থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে একটা ফিজিং বোতল চাইলেন। ফিজিং বোতল আর চেঞ্জ পাবার পর অফিসারটি চলে গেলেন। আমিও দু'প্যাকেট সিগরেট নিয়ে একটা দশ টাকার নোট দিলাম। চেঞ্জ ফেরত দেবার সময় দোকানদারটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ইউ আর এ নিউকামার স্যার?

হ্যাঁ।'

'ডু প্লীজ ভিজিট এগেন।'

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

গেস্টহাউসে ফিরতে গিয়েও ফিরলাম না। বাঁ দিকে ঘুরে গেলাম। নিউ ফরেস্টের সর্বত্রই শান্ত, স্নিগ্ধ, ফাঁকা-ফাঁকা। এদিক আরো ফাঁকা। লোকজন নেই বললেই চলে। বিকেলের দিকে আই-এম-এর কিছু কিছু ক্যাডেটদের এ পথ দিয়ে সাইকেলে যাতায়াত করতে দেখা যায়। কখনও কখনও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায় কিন্তু এখন, এই অপরাহ্ন-বেলায় কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

শাল-তমাল-পাইনের মধ্যে দিয়ে সুন্দর মসৃণ পিচের রাস্তা নিজের খেয়াল খুশী মত ঘুরপাক খেয়ে এগিয়ে গেছে। আমিও সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। ডান দিক দেখছি, বাঁদিক দেখছি, সামনে দেখছি। কখনও কখনও আবার পিছন ফিরে দেখছি। ভারী সুন্দর। ভারী ভাল লাগছে। দেখতে দেখতে দুটো চোখ মাতাল হয়ে উঠেছে, স্বপ্নালু হয়ে উঠেছে।

মাতাল স্বপ্নালু দুটো চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে গলফ কোর্সের কাছে হাজির হলাম। একটু বসলাম। এবার একটা সিগরেট ধরালাম।

আমি গান গাইতে জানি না কিন্তু এখানে বসে সিগারেট খেতে খেতে তরুণ ব্যানার্জির একটা খুব পুরানো গান 'শেষ প্রহরের তারু নয়ন ব্যথায় ছল ছল, তবু তুমি নীরব কেন একটু কিছু বলো' আপন মনে গাইতে লাগলাম। গানটা আমি জানি না। ঐ প্রথম দুটো একটা লাইনই মনে আছে।

সিগারেট খাওয়া শেষ হলো। আমার গানও বন্ধ হলো। এবার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ এই গানটা মনে এলো কেন?

কেন?

সেও তো এক ইতিহাস!

আমাদের শিলচরের নাজিরপট্টীর আর-ডি-আই হলে বছর বছর জলসা হতো। কলকাতা থেকে নামকরা আর্টিস্টরা যেতেন। সারা শিলচর শহর ভেঙ্গে পড়ত ওদের গান শুনতে। শিলচরের যেসব মানুষ কাজকর্ম চাকরি-বাকরির জন্য আইজল বা শিলং-এ থাকতেন, তাদের অনেকেও এই জলসা শুনতে আসতেন। করিমগঞ্জ আর হাইলা-কান্দি থেকে তো বাস বোঝাই করে লোক আসত আর-ডি-আই'এর জলসা শুনতে। ছোটবেলায় মায়ের কোলে বসে আমি জলসা শুনেছি কিন্তু সেসব দিনের কথা আমার মনে নেই। শুনেছি আমাদের নাজিরপট্টীর এই আর-ডি-আই হলে সায়গল, পঙ্কজ, ভীষ্মদেব, জগন্ময়, যূথিকা রায় ও আরো কত নামকরা আর্টিস্ট গান গেয়েছেন। কে সি দে শেষবার এসে নাকি গেয়েছিলেন 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান'। কে সি দে'র এই গান শুনে সারা শিলচরের মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল বলে মায়ের কাছে গল্প শুনেছি।

আমি যেবার বুকে ব্যাজ লাগিয়ে প্রথম ভলান্টিয়ার হলাম তখন বোধহয় সেভেন কি এইটে পড়ি। লাল আর হলুদ রিবনের পরে আর ডি আই-এর রবার স্ট্যাম্প দেওয়া ব্যাজ পরে আমার সে কি উন্মাদনা। কত ছেলে-মেয়ের অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে শচীন-তরুণ-শ্যামল-মানবেন্দ্র আর সন্ধ্যা-প্রতিমা-ইলার সই জোগাড় করে দিয়েছিলাম, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

মিলিটারী অ্যাকাডেমির তিন-চারজন ক্যাডেট খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল।

এবার আমার খেয়াল হলো, আমি কি ভাবছি? কোন কারণে একবার শিলচরের কথা মনে এলেই হলো!' শত সহস্র টুকরো টুকরো স্মৃতির মেঘ আমার মনের সারা আকাশ ছেয়ে যায়। শিলচর ছাড়া তখন আর কিছু ভাবতে পারি না। কতদিন শিলচর ছেড়ে এসেছি কিন্তু এখনও সেসব স্মৃতি অম্লান। শিলচরের স্মৃতির চাইতে বড় আকর্ষণ আজও আমার নেই। তাইতো এই গলফ কোর্সে বসে তরুণ ব্যানার্জির ঐ গান গাইতে গাইতে আবার শিলচরের নাজির-পট্টীতে হারিয়ে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। উকিলপট্টীর জয়াদি আমার হাতে একটা স্লিপ দিয়ে বললেন, এই মানিক, এই স্লিপটা তরুণবাবুকে দিয়ে আয় তো।

উকিলপট্টীকে আমরা অনেকেই শিলচরের বালীগঞ্জ মনে করতাম। জয়াদিদের বাড়ীর একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। এছাড়া শিলচরে জয়াদি একটাই ছিল। রূপ-গুণের জন্য উনি তখন বহু আলোচিতা। আমি তখন স্কুলে পড়লেও মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে টিকর বস্তীতে যেতাম। জি সি কলেজের ছেলেরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা করত জয়াদিকে দেখতে, কথা বলতে। এসব আমি জানতাম, বুঝতাম। সেই জয়াদি যখন লম্বা বিনুনিটা দুলিয়ে প্রায় ছুটে এসে আমার হাতে স্লিপটা দিয়ে গেল, তখন আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

'স্লিপটা দিলে উনি কি বলেন আমাকে বলে যাবি। বুঝলি?'

'আচ্ছা।'

আমি স্টেজের পিছনে গ্রীনরুমে গিয়ে তরুণবাবুর হাতে স্লিপটা দিতে গিয়ে

উত্তেজনায় বলেছিলাম, জয়াদির রিকোয়েস্ট। রাখবেন তো?'

উনি হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই।

আমি আনন্দে, উত্তেজনায় ছুটে গিয়ে-ছিলাম জয়াদির কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, তরুণদা বললেন, 'নিশ্চয়ই গাইব।'

সবার সামনে জয়াদি আমার গাল টিপে আদর করে বললেন, ভেরী গুড।

কিন্তু আজ কি সে জন্য আমি এই গানটা গাইছিলাম? না, না। অনেক দিন, অনেক বছর পরে আমি নিজেই এই গানটা শুনতে চেয়েছিলাম। কলকাতায় পোস্ট-গ্রাজুয়েট হোস্টেলে থেকে এম-এ পড়ছি। আই এস সি পাশ করে মানসী কলকাতায় এলো ডাক্তারী পড়তে। মানসী মেডিক্যাল কলেজ রি-ইউনিয়নের জলসায় একটা এক্সট্রা কার্ড জোগাড় করে আমাকেও নিয়ে গিয়েছিল। সেই জলসাতে আমি নিজেই ঐ গানটা শুনতে চেয়েছিলাম, শুনেছিলাম। মানসীর পাশে বসে ঐ গানটা ভীষণ ভাল লেগেছিল। সেই ভাললাগার স্মৃতি আজও অম্লান?

নিশ্চয়ই।

তা নয়ত নিউ ধরেস্টের এই গল্ফ খেলার মাঠের ধারে একলা বসে বসে ঐ গানটাই মনে এলো কেন? এই অনিত্য পৃথিবীতে কিছুই তো থাকে না। সবাই চলে যায়। কেউ দুদিন আগে, কেউ দুদিন পরে। আমার চার পাশের অনেকেই চলে গিয়েছেন। আমি পড়ে আছি কিন্তু কদিন? যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে আমিও চলে যেতে পারি। ছোটবেলায় মনে হতো সবকিছু থাকবে। প্রথম জীবনে মামা আর মাগোর কাছে থাকবার সময় ভেবেছি এসব আনন্দ চিরদিন উপভোগ করব। কিন্তু পারলাম কি? কেউ পারে? মামা বেঁচে থাকার সময় একটি দিনের জন্যও ফটক বাজার যাইনি। যাবার প্রয়োজন হয়নি, তাগিদ বোধ করিনি। মামা মারা যাবার পর সেই আমি রোজ থলি হাতে করে ফটক বাজার গিয়েছি, দরদস্তুর করে আলু-পটল-কুমড়ো-বেগুন কিনেছি। যে আমি বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন মাছ খেয়েছি, মামা মারা যাবার পর সেই আমি মাগোর পাশে বসে মাছ খেতে ভয় পেতাম, ঘেন্না করতাম।

কত কথা মনে পড়ছে! একলা একলা থাকার এই হচ্ছে বিপদ। এই হচ্ছে মজা!

মামা মারা যাবার পর সামান্য কিছু-দিনের জন্য আমি আর মাগো বাবার কাছে গিয়েছিলাম। আমি মাছ খেতাম না দেখে আমার ছোটমা— বিমাতা অস্বস্তি বোধ করতেন। মাছ খাবার জন্য উনি আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন। আমি ভীষণ বিরক্ত হতাম।......

একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিতেই মনে হলো, কি আবোল-তাবোল ভাবছি? কোন মাথা নেই, মুণ্ডু নেই। কি ভাবতে কি ভাবছি?

ভাবছিলাম, মানুষ চলে যায়, থেকে যায় তার স্মৃতি। টুকরো টুকরো স্মৃতি। কখন, কিভাবে, কি কারণে সে স্মৃতি মনে পড়বে কেউ জানে না, জানতে পারে না।

সন্ধ্যাবেলায় ডক্টর সরকারের বাড়ীতে গিয়ে 'বেল' বাজাতেই দরজা খুলে দিলেন ওঁর মেয়ে। মিসেস রায়ের কাছে ওর নাম শুনেছি। বুলা। নিশ্চয়ই ডাকনাম। ভাল নাম জানি না। শুধু ভাল নাম কেন, ওর সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না।

পর্দা সরিয়ে হাসি মুখে বললেন, আসুন।

ঘরের ভিতরে যেতেই বললেন, বসুন।

বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলাম, ডক্টর সরকার আসেন নি?

বুলা আমার সামনের দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললো, আপনি চা খেতে খেতেই বাবা এসে যাবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি আসবেন তো?

বুলা হাসল। আঁচল টেনে গলায় জড়াতে জড়াতে হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে প্রশ্ন এলো, মানসীও ঠিক এমনি করে গলায় আঁচল জড়াতে জড়াতে হাসতো না? লেক রোডে ওর মাসীর বাড়ীতে গেলে ঠিক এমনি করে হাসতে হাসতেই বলত না, কি ক্ষিদে পেয়েছে নাকি সিনেমার টিকিটের টাকা কম পড়েছে?

বুলার হাসি দেখে এসব কথা মনে পড়ছে কেন? আজকাল তো অনেক মেয়েই গলায় আঁচল জড়ায়। এটাই তো ফ্যাশান। কিন্তু তার জন্য অতীত দিনের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি মনের মধ্যে ভীড় করছে কেন?

আমি মানসীকে জিজ্ঞাসা করতাম, গলায় আঁচল না জড়ালে বুঝি ঠিক স্টাইল হয় না?

'আমার সব কিছুতেই তো তুমি স্টাইল দেখ।'

'তবে কি?'

'ডি-সেকশন করার সময় আঁচল দুলে থাকলে কাজ করা যায় না। তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'মড়া কাটার সময় গলায় আঁচল জড়িয়ে ছুরি-কাঁচি চালাও বলে এখন জড়াচ্ছ কেন?'

'কেন খারাপ লাগে?'

'না, না, খারাপ লাগবে কেন? বরং......

আমি থেমে যেতাম। মানসী থামতে দিত না। বরং কি?'

'না কিছু না।'

'না বললে কিছু পাবে না।'

আমি উঠে গিয়ে ওর কানে কানে ফিস-ফিস করে বলতাম, বরং ভাল লাগে। খুব ভাল লাগে। ইউ লুক ভেরী অ্যাট্রাকটিভ।

ডক্টর সরকারের মেয়ে বুলা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমার সামনে সেই মানসীই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু এক টুকরো মুহূর্তের জন্যই মনে হলো। পর মুহূর্তেই দেখলাম, মানসী নয়, বুলাই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বোধ হয় একটু হাঁ করেই বুলাকে দেখলাম! ভারী ভাল লাগল।

স্মৃতির ঘর কেটে যাবার পর জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন?

'এর মধ্যেই পিসী সব বলে দিয়েছেন?'

'খারাপ কিছু বলেন নি।'

'তা জানি। পিসীর ধারণা বাবার মত লোক হয় না আর ওঁরা বলেন মাধুরীর মত মেয়ে হয় না।'

আমি হাসলাম।

'বসুন। চা আনছি।'

বুলা ভিতরে চলে গেল। আমি একলা ড্রইংরুমে বসে রইলাম। একলা বসে আছি অথচ ঠিক নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে না তো! বরং ভালই লাগছে।

একটু পরে একটা ছোকরা চাকর এক প্লেট পাকোড়া আর নাটস এনে আমার সামনে রেখে চলে গেল। দু-এক মিনিট পর বুলা এক কাপ কফি দিয়ে বলল, কফি দিলাম। আপনি তো কফিই বেশী পছন্দ করেন।

'এর মধ্যেই সে খবর জানা হয়ে গেছে?'

বুলা একটু হাসল। তারপর বলল, আসলে খুব বেশী লোকের সঙ্গে এখানে ঘনিষ্ঠতা হয় না বা হতে পারে না। এই লিমিটেড সোসাইটিতে নতুন কেউ এলে তার সম্পর্কে জানাজানি হতে সময় লাগে না।

প্লেট থেকে একটা নাটস মুখে দেবার পর খেয়াল হলো উনি তখনও দাঁড়িয়েই আছেন।

'আপনি বসবেন না?'

'এই ত বসছি।' বুলা সামনের সোফায় বসল।

'একটু আগেই চা খেয়েছি, এখন আর কফি খাব না।'

'তাহলে নাটস আর পাকোড়া নিন।'

'এগুলো আপনার জন্যই দিয়েছি।'

'তা তো জানি কিন্তু আপনি একটু না নিলে আমিও শান্তিতে খেতে পারছি না।'

কফি-নাটস-পাকোড়া খাওয়া শেষ হলো।

'আপনার মাকে দেখছি না কেন?'

'বৌদির ছোট্ট বাচ্চা সামলাতে মা কল-কাতায় গিয়েছেন।'

'আপনার দাদা কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

কথা বলতে বলতেই পকেট থেকে সিগ-রেট বের করে জিজ্ঞাসা করলাম, খেতে পারি?'

'খাই অল মিনস।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সিগারেট ধরালাম।

'কই আপনার বাবা তো আসছেন না?'

'আমি টেলিফোন করছি।'

বুলা টেলিফোন করতে ভিতরে চলে গেল। আমি পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সিগ-রেট টানছি। সেই ছোট্ট চাকরটা ট্রে নিয়ে এসে কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে গেল। [illegible]

টানতে টানতে অনেকটা পড়ে—দিয়েছে।' খেয়াল হলো অ্যাশ্‌ট্রে তো নেই। ড্রইংরুম থেকে উঠে সামনের বারান্দায় গিয়ে ছাই ফেলে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ বুলা এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

'কেন?' আসতে দেরী আছে নাকি?'
না।'

বুলার পিছন পিছন আমি ভিতরের একটা ঘরে গেলাম। টেলিফোন তুলে নিলাম।
'আমি সাগর বলছি।'

ডক্টর সরকার ওপাশ থেকে বললেন, তুমি সাগর! সর্বকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পার কিন্তু আমি তো সরকার! অনেক নিয়ম-কানুনে বাঁধা।
আমি হাসলাম।

'একটা চিঠি টাইপ হচ্ছে। এটা সই করেই আসছি। ডোন্ট মাইন্ড!'
'না, না, মনে করার কি আছে?'

টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। ড্রইংরুমটা নেহাতই সাধারণ। ভাবতে পারিনি ভিতরের ঘর এত সুন্দর হবে।
চমৎকার।'
'কি চমৎকার?'
'আপনাদের এই ঘরটি।'
বুলা চুপ করে দাঁড়িয়ে।
'এই ঘরটা বুঝি আপনার বাবার?'

'এটা আমার ঘর।'
'কনগ্রাচুলেশনস ফর ইওর টেস্ট।'

বুলা আবার হাসল। 'ঘরটাকেই সবাই পছন্দ করেন, মানুষটাকে না।'

কথাবার্তার ধরণটাও অনেকটা মামণীর মত। নতুন শাড়ী পরেই একবার মামণীকে দেখাতে আসত। মামণীকে দেখাবার পর আমার ঘরে আসবেই। কোন কথা না বলে ঘুর্ণি করে আমার পড়ার টেবিলের পাশে দাঁড়াত।

'বাঃ! সুন্দর শাড়ীটা তো?'
'শাড়ীটা সুন্দর আর আমি কুৎসিত, তাই না?'

আমি বলতাম, তোমার মত ইয়ং সুন্দরী মেয়েকে আমার মত হ্যান্ডসাম ইয়ং ছেলের প্রশংসা করা কি ঠিক?

বুলাকেও ঐ রকম একটা উত্তর দিলেই ভাল হত কিন্তু দিলাম না, পারলাম না।

'আপনাকে ভাল-মন্দ বলার অধিকার তো আমার নেই।'

ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় বুলা বলল, এ ঘরেই বসুন না কেন।
'আজ থাক।'

ড্রইং রুমে ফিরে আসার পর বুলার সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলছিলাম। একটু পরেই ডক্টর সরকার এলেন।

ঘরে ঢুকেই গাড়ীর চাবিটা মেয়ের হাতে দিয়ে আমাকে বললেন, আই অ্যাম সো সরি! প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আজ ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী ফিরব কিন্তু কিছুতেই হলো না।

'আজ তো বরং তাড়াতাড়ি ফিরেছেন। সুতরাং আমিই আপনাকে ধন্যবাদ জানাব।'

বুলা হেসে ফেলল। 'দেখছ বাবা, তোমার কি রেপুটেশন?'

ডক্টর সরকার মিষ্টি হাসলেন। 'মাধুরী অমনিই বলে।'

বুলা বলল, তোমরা চা খাও। আমি গাড়ীটা তুলে আসি।

'আরে না-না। গাড়ী তুলিস না। সাগরকে ছেড়ে আসতে হবে তো।'

আমি আপত্তি করলাম. আমাকে ছাড়তে যেতে হবে না, আমি নিজেই যেতে পারব।'

ডক্টর সরকার আমার আপত্তি গ্রাহ্যই করলেন না, এই রাত্তিরে তুমি হেঁটে যাবে, তাই না?

চা খেতে-খেতে ডক্টর সরকার বললেন, আমি এমন গাড়ী চালাই যে সাইকেল রিকসাও আমাকে ওভারটেক করে চলে যায় বাট বুলা? এক্সেলেন্ট ড্রাইভ করে।

'তাই নাকি?'

'তবে কি? আমি তো আমার ছেলে-মেয়ের কাছেই গাড়ী চালান শিখেছি।'
'তাই বুঝি?'

'তবে ঐ সেকেন্ড কি থার্ড গিয়ার পর্যন্ত! টপ গিয়ারে গাড়ী চালিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।'

আমি না হেসে পারলাম না।
'তুমি ড্রাইভ করতে পার?'
'না।'

'শিখে নাও। বুলা দু দিনের মধ্যে তোমাকে শিখিয়ে দেবে।'

বুলা ভিতরে ছিল। একটু পরে ড্রইংরুমে এলে ডক্টর সরকার বললেন, হাঁরে বুলা, সাগরকে ড্রাইভ করা শিখিয়ে দিবি তো।

বুলা মজা করে জানতে চাইল, এক্ষুনি শিখবেন?

'আঃ! তুইও তোর মা'র মত কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিস।'

আমি বুলার দিকে তাকালাম, বুলা আমার দিকে তাকাল। দুজনেই হাসলাম।

ডক্টর সরকার এবার প্রসঙ্গ পাল্টালেন। 'আমার স্ত্রী কলকাতায়।'
'হ্যাঁ, তাই শুনলাম।'

'আমার নাতি হয়েছে। খবর পেয়েই আমরা সবাই গিয়েছিলাম। আমি আর বুলা ফেরে এলাম, উনি থেকে গেলেন।

ডক্টর সরকার একটু পরে আবার বললেন, ছোট বাচ্চা নিয়ে বৌমার পক্ষে স্কুল-টিউশন করা মুশকিল। তাই ওকে কিছু দিন কলকাতায় থাকতেই হবে।
'আপনার বৌমা কি পড়াচ্ছেন?'
'বৌমা মুরলীধর গার্লস কলেজের লেকচারার।'

বুলা আর একবার ভিতর থেকে ঘুরে ড্রইংরুমে এলো। 'তুমি জামা-কাপড় চেঞ্জ করবে না?'

'হ্যাঁ এই যাচ্ছি।' ডক্টর সরকার উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, তুমি একটু বুলার সঙ্গে গল্প কর, আমি আসছি।
ডক্টর সরকার চলে গেলেন। আমি একবার হাতের ঘড়ি দেখলাম।
'আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে?'

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কেউ তো আমার জন্য বসে নেই, সুতরাং দেরী হবার কিছু নেই।

কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত বোধ করলাম। আমার নিঃসঙ্গতার বেদনা প্রকাশ করতে চাই নি কিন্তু তবুও প্রকাশ হয়ে পড়ল।

'তাহলে ঘড়ি দেখছেন কেন?'
'ওটা অভ্যাস।'
'আমাদের এখানে আসার আগে ঘড়িটা খুলে আসবেন।'
আমি শুধু হাসলাম।
'বাবার সঙ্গে গল্প করতে বসলে ঘড়ি-টড়ি দেখা চলবে না।'
'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' বুলা একটু থেমে আবার বলল, খুব বেশী লোকের সঙ্গে বাবা গল্প-গুজব করতে পারেন না কিন্তু যাঁদের পছন্দ করেন তাঁদের সঙ্গে ঘন্টার-পর-ঘন্টা কাটাবেন।

'আমাকে পছন্দ-অপছন্দ করার সময় তো এখনও আসে নি।'
পিসী যখন রিকমেন্ড করেছেন তখন আর চিন্তা নেই।'

খাবার টেবিলে বসেও বেশ গল্প হল। মাঝে একবার বুলা মন্তব্য করল, আপনার মামণী বা পিসীর মত রান্না করতে আমি জানি না। সুতরাং.....
'আপনি মামণীর কথাও শুনেছেন?'
'পিসী যতটুকু জানেন ততটুকুই জেনেছি।'

খাওয়া-দাওয়ার পর ডক্টর সরকার বলেছিলেন, যে কদিন এখানে আছ, রোজ একবার করে ঘুরে যেও। তাছাড়া শহর যাতায়াতের পথে আমার বাড়ীর সামনে দিয়েই যেতে হবে।

ডক্টর সরকার আর বুলা দুজনে এসেই আমাকে গেস্ট-হাউসে ছেড়ে গেলেন। আমি নেমে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানালাম।

বুলা বলল, কাল আসবেন।

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

নিশ্চয়ই আছে

বই-এর ক্যানভাসার

"১৯৭১ সালের প্রাইমারী পুস্তকের তালিকা

মাননীয় শিক্ষক মহাশয় ও মহাশয়া সমীপেষু,

আমরা সানন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে প্রতিবারের ন্যায় এবারও (১৯৭১) আমাদের প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকগুলিতে উচ্চহারে কমিশন দিচ্ছি।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও যাহাতে আমাদের প্রকাশিত পাঠ্য-পুস্তকগুলি আপনার স্কুলে পাঠ্য তালিকায় স্থান পায় এ বিষয়ে আপনার সক্রিয় সহযোগীতা কামনা করি।

ইতি—

নমস্কারান্তে"

—হুঁ, আপনারা তো 'সানন্দের সঙ্গে' ঘোষণা করেই খালাস, কিন্তু যে কোম্পানীর সামান্য একখানা চিঠিতেই এত বানান ভুল, সিনট্যাক্সের গণ্ডগোল, গুরু-চণ্ডালীর ছড়াছড়ি—না মশাই, না, এসব বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। আমরা 'সহযোগীতা' করতে পারব না। আপনি বরং অন্য স্কুলে যান।—ঘর ভর্তি ক্যানভাসারে। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা নানা রঙের কাগজে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল আর লিফলেটে হেডস্যারের টেবিলটাকে দেখাচ্ছে যেন একখানা ময়ূরপঙ্খী ঘুড়ি। ঘুর ঘুর করছে টেবিলের চারপাশে আরশোলার মত ক্যানভাসারের পাল। হেডু মন দিয়ে লিফলেটগুলো পড়ে কোনটা সরাসরি বাতিল করছেন, কোনটা বা অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যারের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ফাইলিংয়ের জন্য।

ভোর ছটায় এসেছে তারিণী। এককোণায় ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে যেন ফাঁসীর আসামী। এতক্ষণে বিচারক রায় দিলেন। এবার কি করা? নেপালচন্দ্র জি এস এফ পি স্কুলের হেডস্যার ঠিক স্কুলের নামখানার মতই জাঁদরেল, জাঁকালো। অনুনয়ে, বিনয়ে দই ঘুঁটে হয়তো বা ঘোল বানানো সম্ভব কিন্তু নেপালচন্দ্র গভঃ স্পনসরড ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের বাইশ বছরের পুরোনো হেডস্যার কেষ্টবাবুকে রাজী করানো অসম্ভব।

অক্ষয় মুচকি হেসে চাপা গলায় বলল—এবার কেটে পড় তারিণী। চলবে না তোদের বই এই স্কুলে।

অক্ষয় বান্দা ক্যানভাসার। দেড়যুগ এই লাইনে। সাউথের প্রায় সবকটা স্কুলই ওকে চেনে। বহু স্কুলের হেডস্যার থেকে আরম্ভ করে মিউনিসিপ্যালিটির খোদ এডুকেশন অফিসার পর্যন্ত খাতির করে ওকে। এক এক সিজিনে সত্তর আশীখানার ওপর বই ধরায়। কম করেও শতখানেক স্কুলে ওর নিত্য আনাগোনা। পাল্লা দিতে পারবে কেন তারিণী। মাত্র দু বছর এই লাইনে। লাইনের মার প্যাঁচই আজো সব রপ্ত নয়। এই হাতাহাতি লড়াইয়ের মাঠে পাবলিশার যদি এরকম একখানা গুল আমায় তো কি করে বই ধরাবে তারিণী? অক্ষয়, বিজন খুড়ো, সাধন সরকার, ধনঞ্জয় পাল সব বাঘা বাঘা ক্যানভাসার—তাদের মাঝে তারিণী কোন ছার স্বয়ং পাবলিশার এলেও বই ধরাতে পারত কিনা সন্দেহ।

সাতখানা বই, স্কুল নেবে না জেনেও টেবিলে ফেলে, হেডস্যারকে নমস্কার ঠুকে অফিসের বাইরে বেরিয়ে এল তারিণী। তখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। পরীক্ষা শেষ, খাতা দেখা চলছে। ছেলেরা কেউ নেই। শুধু সাতজন শিক্ষকের মধ্যে দুজন এসেছেন স্কুলে—হেডস্যার কেষ্ট কুণ্ডু আর অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডু বিপিন ঘোড়ুই। সরু গলি রাস্তার ওপরে একটা দোতালা বসত বাড়ীর একতলায় এই স্কুল। খান তিনেক ছোট ছোট ঘর আর এক চিলতে বারান্দা—সব এতেই ঠাসাঠাসি করে চারশো ছেলে আর সাতজন মাস্টারমশাইকে জায়গা হয়ে যায়। এলাকার সবচেয়ে বড় প্রাইমারী স্কুল এটাই। সাতখানা বই ধরাতে পারলে কম করেও টাকা পঁচিশেক কমিশন পেত তারিণী। বইয়ের যা কেস ভ্যালু তার ডবল কমিশন। ওয়ান টু ফোর, ধারাপাত টু, ইংলিশ গ্রামার সব রকমের বই ছাপিয়েছে তারিণীর পাবলিশার। সবচেয়ে কম যেটার দাম সেটাই আশী পয়সা—দু ফর্মার ধারাপাত। ইংলিশ গ্রামারখানার দাম তিন টাকা, ক্লাস ফোরের জন্য। কিন্তু একখানাও ধরাতে পারল না তারিণী। সকালটাই মাটি হয়ে গেল।

অথচ কেষ্টবাবু রাজী হলে যে শুধু এই স্কুলে তাই নয়, আরো আশ পাশের দু দশটা স্কুলে হেসে খেলে বই গছানো যেত। কেষ্টবাবুর মতামতকে খাতির করে সবাই: শুধু কেষ্টবাবু ঘুষ খান না। মেরিট বিচার করেই বই বাছেন। তাই কেষ্টবাবু সিলেক্ট করেছেন, এটুকু শুধু বাতলাতে পারলেই আরো কয়েকটা স্কুল তারিণীর বই নিত। কিন্তু লিফলেটখানাই দিল সব মাটি করে।

দেবে না? যেমন কিনা ঐ পাবলিশার। নিজে বই লেখে, বউকে দিয়ে লেখায়—সেই সব বই তারিণীর হাত দিয়ে স্কুলে স্কুলে পাঠায়। তারিণী নিজে ভুল-টুলগুলো ধরতে পারে না ঠিকই, কিন্তু মাস্টার মশাইদের মুখ পড়াতে তো অসুবিধে হওয়ার নয়। তাঁরা সব পড়াশোনা করা লোক—খাঁটি আর ভেজাল ঠিক চিনে ফেলেন। মাঝখান থেকে তারিণীর হয়রানির আর শেষ নেই।

দু বছর ধরে লাইনটাকে বুঝবার চেষ্টা করছে, কিন্তু হচ্ছে না কিছুতেই। এই বয়সে কি আর বোঝা যায়? তিন বছর সিনেমার গেট-কিপার ছিল তারিণী। বুড়ো বয়সে পিকেটিং করতে গিয়ে চাকরী খুইয়ে শেষে বইয়ের ক্যানভাসার হয়েছে। তাও সারা বছরের চাকরী নয়। দশ মাস তো পাবলিশারেরই ফাই-ফরমাস খাটে। তখন বড়জোর ষাট-সত্তর টাকা হাতে পায় মাস গেলে। ডিসেম্বর আর জানুয়ারী—এ দুটি মাসই ওর ভরসা। গত বছর এ দু মাসে সব মিলিয়ে জুলিয়ে শ চারেক অবধি কমিশন আদায় করেছিল। এবার যে কি হবে?

ঘরে বয়স্থা মেয়ে। বিয়ে আর হবে না। বস্তির ঘরে ঘরে প্রেম করে আলতা, স্নো, চুলের ফিতে আর সিনেমার টিকিট আদায় করে বেড়ায়। বাপের দৌলতে আগে ফ্রি-মাগনা 'শেষ সপ্তাহে' ছবি দেখবার নেশাটা বাগিয়েছিল—এখন বস্তির উঠতিরা তার জোগান দিচ্ছে। ছেলেটাকে খেতেই দিতে পারে না নিয়মিত, তার পড়াবে কি? সিনেমা হলের সামনে তেলেভাজাওয়ালা বালমুকুন্দর জোগানদার হয়েছে তারিণীর দশ বছরের ছেলে কানু। স্ত্রী সারা বছরই বিছানায় পড়ে থাকে। পেটে দিন-রাত একটা জ্বালা দাউ-দাউ করে জ্বলছে। হাসপাতালে গেছিল—ডাক্তার বলেছে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখাতে, তাদের কিছু নাকি করার নেই। এই তো তারিণীর হাল। নতুন করে লাইন বাগাতে গিয়ে পুরোনো মানুষটা কেমন দিন দিন বেহাল হয়ে পড়ছে। ওদিকে পাবলিশারের তাড়া। এদিকে ক্যানভাসারদের ধাক্কা—কোথায় যে যাবে তারিণী?

দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে অন্যমনস্কের মত হাঁটছিল তারিণী। হঠাৎ মনে পড়ল—আজ না তেইশ তারিখ। আজই তো মিটিং-এর কথা। মিটিং বসবে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে: সতেরোটা প্রাইমারী স্কুল চালায় মিউনিসিপ্যালিটি। এই সতেরোটা স্কুলে সাতখানা বই ধরাতে পারলে—ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে তারিণীর। সে যে অনেক টাকা। একটা স্কুলে সাতখানা ধরাতে পারলেই যেখানে কমিশন পাবে পঁচিশ টাকা, সেখানে সতেরোখানায়!...। তাড়াতাড়ি পা চালায় তারিণী।

বাস রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে মিনিট সাতেকের পথ—কাঁচা ড্রেনের ওপর বাঁশের সাঁকো। তার পরেই মিউনিসিপ্যালিটির এডুকেশন অফিসার গণেশ রায়ের বাড়ী। রায়বাবু বাড়ীতেই ছিলেন। দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এসে তারিণীকে দেখে বললেন—কি চাই? এখানে কেন? বাসায় আসা আমি একদম পছন্দ করি না জানেন, অফিসে দেখা করবেন। কথা কটা শেষ করেই দরজার পাল্লা দুটো সাঁটতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মাছের থলিটা ভেতরে চালিয়ে দিয়েছে তারিণী।

অফিসেই দেখা করব স্যর। যাচ্ছিলাম এ পথ দিয়ে। পথেই বাজার পড়ল। দারুণ টাটকা গলদা স্যর। তাই এক কেজি নিয়ে এলাম। জানি স্যর চিংড়ি খুব ভালবাসেন।

আধ ভেজানো দরজা মুহূর্তে হাট হয়ে গেল। সতেরোটা প্রাইমারী স্কুল যার গোঁফের রেখায় ওঠে বসে তার গোঁফ সমেত আস্ত মুখখানাই বাঁধাকপির মত ঝুড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। এসব আবার কেন? ছি, ছি।

আবার ন্যাকামো হচ্ছে। নাচতে নেমে ঘোমটা টানছ! দাঁড়াও, তোমায় ঘোমটা আমি খুলবই। অক্ষয় বা ধনঞ্জয় কাউকে ঢুকতে দেবো না তোমার কাছে নাচওয়ালী—তুমি শুধু আমারই। বিনয়ে গদগদ তারিণী। শর্তাচ্ছন্ন ব্যাপারের আড়াল সরিয়ে গ্রিল বসানো জানলার মত হাফ-সার্টের বুক পকেট খুঁজে দুটো দশ টাকার নোট তুলে এনে সামনে উঁচিয়ে ধরে বলল, বই পিছু তা স্যর পাঁচ টাকা। এই বিশ ধরুন। মিটিং হয়ে গেলে বাকী টাকাটা বাড়ীতেই দিয়ে যাব।

মুহূর্তে বাঁধাকপির পাতাগুলো টান-টান হয়ে উঠল। এডুকেশন অফিসার গণেশ রায় ছোট ছোট চোখ দুটো একবার বোধ-করি লোভের জিভ দিয়ে মনে মনে চেটে নিলেন। তারপর ভুরু আর গোঁফ সমান্তরাল ভাবে নাচিয়ে বললেন, ত্রিলোক প্রকাশনীর অক্ষয়বাবু কিন্তু এবার পার বই ছ'টাকা দিচ্ছেন। তাছাড়া দাস বুক স্টলের সাধন সরকার, মোহিনী পাবলিশিংয়ের বিজন সাহা, আনন্দ বুক স্টলের ধনঞ্জয় পাল সবাই রাজী হয়ে দিতে। পাঁচে ঠিক পোষায় না তারিণীবাবু।

কেমন জানি মরীয়া হয়ে ওঠে তারিণী। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সব স্কুলেই বই বাঁধায়ের কাজ চলছে। আজ পর্যন্ত মাত্র ছটা স্কুলে বই গছাতে পেরেছে। তাও সব কখানা নয়—চারটে মাত্র। এরপর কাল বাদে পরশু থেকে পড়বে বড় পরবের ছুটি। স্কুল খুলবে সেই দু তারিখ, জানুয়ারীর। আর জানুয়ারীতে বই ধরানো প্রায় অসম্ভব। অধিকাংশ স্কুলই তদের বই ডিসেম্বরেই ঠিক করে, বুকলিস্ট ছাপাতে দেয়। তখন তারিণী কি করবে? আঙুল চুষবে? ওদিকে অক্ষয়, ধনঞ্জয়, বিজন খুড়ো, সাধনরা তো মার্কেট ক্যাপচার করে ফেলবে। এ'কদিনে। কিন্তু পাঁচের বেশী দিলে তারিণীর থাকবে কি? আট মাসের ওপর ঘরভাড়া বাকী। মুদি ফিরিয়ে দিচ্ছে আজ দু মাস ধরে—প্রায় একশো টাকা ধার ওখানে। বৌটার চিকিচ্ছে হচ্ছে না কিছুই। বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। তবু যদি এ দুটো মাসে বাড়তি কিছু আসে তাহলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। আর সেই সঙ্গে দেখবে যদি বাবুটাকে কোন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া যায়। চিন্তার শুকনো মরা পাতাগুলো রুক্ষ বিস্তীর্ণ ভালবাসার তারিণীর ভেতরে ভেতরে ঝড়ের দাপটে ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে। সাতখানা বই, সতেরোটা স্কুল—মানে প্রায় সোয়া চারশো টাকা। বেশ, তাই সই। বেশীই দেব। ছয় নয় সাত করে দেব বই পিছু। কিন্তু বই ধরাতেই হবে। তারিণীর বোবো গলা চিরে কান্নার মত বেরিয়ে আসে কথা কটা—ছয় না স্যর সাত করেই দেব। দয়া করে একটা হিল্লে করে দিন।

মাছের থলিটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে বরাভয় দানের মত মুদ্রা করে আশ্বাস দেন গণেশ রায়, তাহলে আজ বিকেলে বাকী টাকা কটা নিয়ে অফিসে দেখা করবেন। ব্যবস্থা করে দেব। কথা কটা শেষ করতে করতে ছিপে গাঁথা নোট দুখানা একটানে নিজের মুঠোয় টেনে নেন এডুকেশন অফিসার।

তারিণীর দুটো দশ টাকা, বারো টাকা কেজির এক কিলো গলদা ও আরো তিন-খানা দশ টাকার নোটের প্রতিশ্রুতির বিনি-ময়ে সাতখানা বই, সতেরোটা স্কুলে ধরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে আবিষ্কার করল—অক্ষয় বাস রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে গুটি গুটি চলেছে। যাত্রা একই লক্ষ্যে। জানে না গণেশ রায়কে কিনে টাঁকে গুঁজে ফেলেছে তারিণী। এখন ধারা-পাতে যদি বৃষ্টির ধারার মত ভুল বেরোয়, বা ইংলিশ গ্রামারে যদি ইংরেজিরই ছিটে-ফোঁটা নাও থাকে তবুও তারিণীর বই স্কুলে স্কুলে চলবে। এ স্কুলগুলো তো আর নেপালচন্দ্র গভঃ স্পনসরড ফ্রি প্রাইমারী স্কুল নয়, এখানে তো আর কেষ্টবাবুর মত বাধা হয়ে বসে নেই। বারোয়ারী সতেরোটা স্কুলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা গণেশ রায়। বাবু গণেশ রায় হাটে বসে নিজেকে বিকোচ্ছেন—যে বেশী দাম হাঁকবে তাঁর জন্যই।

শুধু তারিণী জানে না, অক্ষয় আরো চড়া দাম হাঁকছে কিনা?

—[illegible]

মনের কথা

শৃংখলিত প্রমেথিউস
প্রমথবাবুর আত্মকথা

পাহাড়ের চূড়ায় ভারী পাথরে বাঁধা প্রমেথিউস। হাতে-পায়ে শিকল নড়বার উপায় নেই। সারাদিন রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। রক্তচক্ষু ঈগল ধারালো ঠোঁট দিয়ে তার লিভারটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। রাতের বেলায় লিভারটা আবার বেড়ে প্রমাণসাইজের হয়ে যাচ্ছে। পরের দিন আবার নিষ্ঠুর ঈগল লিভারটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এমনি করে স্বর্গের আগুন চুরির শাস্তি ভোগ করছে মানবদরদী প্রমেথিউস। আগুন নিয়ে যারা খেলা করে তাদের এমনি দশাই হয়। এই দেখুন, এই জায়গাটা আমার, এই লিভারের জায়গাটা জ্বলে যাচ্ছে। ঈগলের ঠোঁটে আগুন ছিল বোধ হয়।

এই পর্যন্ত বলে প্রমথবাবু চোখ বুজলেন। যন্ত্রণায় তাঁর দেহটা কুঁকড়ে গেছে, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়েছে।

বাড়ীর লোকদের কাছে রোগ-ইতিহাস শুনলাম। এই রকম বাড়াবাড়ি চলেছে গত একমাস ধরে। প্রথম প্রথম পেথিডিন ইনজেকশন দেওয়া হত, আজকাল ইনজেকশন দিচ্ছেন না। দুবার একস-রে করা হয়েছে, বড় বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে। পেটের মধ্যে কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। লিভারটা সামান্য একটু বেড়েছে এইমাত্র। তাঁরা বলছেন রোগটা দেহে নয় মনে। বছর খানেক ধরে প্রমথবাবু অসুস্থ। প্রথমে সুরু হয় আগুনের ভয়: বাড়ীর পাশের বস্তিটা যেদিন আগুন লেগে পুড়ে যায়; তার কিছুদিন পর থেকে আগুনের ভয় দেখা দিয়েছে। দেশলাই জ্বালাতে ভয় হতে লাগল। পকেট থেকে দেশলাই কোনো রকমে সাহস করে যদিও বের করতে পারতেন, কাঠি ঘসে আগুন জ্বালাতে পারতেন না। হাতটা অবশ হয়ে যেত, আঙুলগুলো অল্প অল্প কাঁপতে থাকত। সিগারেট ধরানো হত না। দেশলাই ছেড়ে লাইটার ব্যবহার করতে লাগলেন। দু-চারদিন পরে সেই অসুবিধা। লাইটার জ্বালাতে গেলেও আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে যায়, অল্প অল্প কাঁপতে থাকে, লাইটার হাত থেকে পড়ে যায়। এই সময় একরাতে 'আগুন' 'আগুন' বলে চীৎকার করে খাট থেকে মেঝেতে পড়ে যান। বোধহয় বস্তির আগুন লাগার দৃশ্য স্বপ্ন দেখছিলেন। ঘরের মধ্যে কোথাও দেশলাই থাকলে রাতে ঘুম আসত না। পাশে বসে কেউ সিগারেট ধরালে ভয়ে চমকে উঠতেন। রান্না ঘরে বসে খেতে চাইতেন না, কয়লার উনুনের আঁচ দেখলেও অশান্তি হত। তবে কাজ-কর্ম কোনো রকমে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর অশান্তির কথা বাড়ীর লোকরাই শুধু জানত। বাড়ীর লোক বলতে ভাই, ভাইপো ও বৌদি। প্রমথবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ। শীর্ণ চেহারা, মুসলমানদের মত দেখতে। একটা জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরী করেন। শৈশব থেকে নানারকম রোগে ভুগছেন, তাই বিয়ে করার কথা মনে হয়নি। দিন-রাত লেখাপড়া নিয়েই আছেন। পুরনো পুঁথিপত্র কেনেন, পড়েন, নোট রাখেন, আবার কিছুদিন পরে বেচে দিয়ে একসেট নতুন বই কিনে আনেন। রামায়ণ, মহাভারতের অনেক সংস্করণ ওঁর আছে। গ্রীক মাইথোলজি আর নাটকের বইও প্রচুর। আজ বছরখানেক ধরে কোনো নতুন বই কেনেননি। আত্মজীবনী লিখছেন। কয়েকটা বাঁধানো খাতা ভর্তি হয়ে গেছে। বন্ধু-বান্ধব বড় কেউ নেই। স্কুল-কলেজের কোনো সহপাঠীকে বাড়ীতে আসতে দেখা যায় না। পুরনো ইতিহাস পুরাণ পড়া আর ধূমপান করা, এই ওঁর একমাত্র নেশা। কথাবার্তা খুব কম বলেন। আজকাল ঐ লিভারের ব্যথাটা ওঠবার পর থেকে একটু বেশি কথা বলছেন। এরপর দুদিন ধরে প্রমথবাবুর আত্মকথা পড়লাম ও তাঁর মুখে তাঁর রোগ-বৃত্তান্ত শুনলাম। তাঁর সংগে অনেক কথা হল। চেহারার বিশেষত্ব নেই, কিন্তু চিন্তাধারায় ও মানসিকতায় প্রমথবাবু একেবারে অনন্য। তাঁর সব কথা খুব সংক্ষেপে বিবৃত করছি। যতটা সম্ভব তাঁর জবানীতে বলার চেষ্টা করব।

—আগুন নিয়ে আমার কৌতূহল শৈশব থেকে। দেশলাই-এর বাকস চুরি করে পুকুর পাড়ে বসে একটার পর একটা জ্বেলে যেতাম। আঙুলে আগুনের তাপ না লাগা পর্যন্ত কাঠিটা ধরে থাকতাম। তারপর শেষ কাঠিটা জ্বেলে শুকনো পাতায় আগুন ধরাতাম। পাতাগুলো প্রাণ পেয়ে নড়ে উঠত। আগুনের তাপে কুঁকড়ে যেত। শীতকালে মাঝে মাঝে দাউ-দাউ করে অনেকগুলো জড়ো করা পাতা জ্বলে উঠত। চেয়ে চেয়ে দেখতাম। একদিন আগুন গিয়ে আমাদের খড়ের গাদায় পৌঁছুতে দারুন অগ্নিকান্ড ঘটে যায়। বাড়ীর লোকদের সে কি আতংক আর আগুন নেভাবার জন্য ছুটোছুটি! ভয় পেয়ে আমি ছুটে পালিয়ে অন্য পাড়ায় গিয়ে লুকিয়েছিলাম। কেউ বুঝতে পারেনি কি করে আগুন লাগল। বাবার পায়ে একটা লোহার বেড়ি লাগানো থাকত। মাঝে মাঝে তিনি গুম মেরে যেতেন। তারপর খুব চেঁচামেচি করতেন। ঠাকুর ঘরের মধ্যে তাঁকে বেঁধে রাখা হত। এই সময় আমার দেশলাই চুরির ইচ্ছেটা দারুন রকম বেড়ে যেত। দাদার জামার পকেট হাতড়ে দেশলাই-এর সংগে বিড়ির টুকরো, কাগজের টুকরো, খুচরো দুআনি, যা পেতাম চুরি করতাম। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে খুব পিটুনি খেতাম। কিন্তু আগুন দেখবার ইচ্ছে আমার কমত না।

...বাবা মারা যাবার পর আমরা দেশের জমিজমা বেচে কোলকাতায় চলে আসি। দাদার ব্যবসাতে তখন আমাদের বেশ দু-পয়সা রোজগার হচ্ছিল। আমার এই সময় থেকে হাঁপানির সূত্রপাত। শীতের মুখে কয়েকদিন খুব বাড়াবাড়ি চলত। বসে রাত কাটাতে হত। সেই অবস্থাতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম বস্তির লোকেরা আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসে হাত-পা গরম করছে। আগুনটা মাঝে মাঝে উসকে দিচ্ছে, শিখাটা হাওয়ায় কেঁপে উঠে আবার বেঁকে নিভে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে খড়ের গাদায় আগুন লাগার ছবিটা ভেসে উঠত। হাঁপানি কমে যেত, আমি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। এল ৪২-এর আগস্ট। চারদিকে আগুন জ্বলে উঠল। বস্তির ছেলেদের সংগে মিশে আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় গিয়ে ট্রাম-বাসে আগুন লাগাতাম। আমি ছিলাম একাজে সব থেকে উৎসাহী। একদিন পুলিশের লাঠিতে জখম হলাম। বেশ কয়েক সপ্তাহ ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুয়ে থাকতে হল।...স্কুল থেকে কলেজে ঢুকলাম। বোধহয় ৪৯ সাল। আমার বয়স ১৮।১৯। আবার গোলমাল সুরু হল রাস্তায় রাস্তায়। কিসের গোলমাল, কিসের আন্দোলন, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। আমার কাজ ছিল আগুন লাগানো। মিনিট কয়েকের মধ্যে ট্রাম কি বাস থামিয়ে, পেট্রল কি কেরোসিন ছিটিয়ে, সেটাকে আগুন ধরিয়ে, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে আমি জ্বলন্ত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এক অপূর্ব আনন্দে আমার মন ভরে যেত। বাড়ীর লোক বা পাড়ার ছেলেরা আমার এই খেয়ালের কথা জানতো না। অন্য পাড়ায় গিয়ে আমি আমার 'অ্যাকশন স্কোয়াড' নিয়ে কাজ চালাতাম। একদিন ধরা পড়লাম। জেলে থাকতে হল বছর দুয়েক। চেনা লোকেরা ভাবল আমি বুঝি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছি। না, রাজনীতির সংগে আমার কোনো সংযোগ ছিল না। অবশেষে হাঁপানিতে ভুগতাম ব'লে আমার স্থান হল জেল হাসপাতালে। আমার ঘরে অনেকটা বেড খালি ছিল। তার একটাতে এক মানুষ

আগুন ধরে গেল। ওয়ার্ডবয় নার্সদের চেষ্টায় অল্পেতেই আগুন নিভলো। আমার তৃপ্তি হল না, হাঁপানিও কমলো না। এই সময় আমি পড়াশুনো সুরু করি। আগুনের ইতিহাসচর্চা আরম্ভ করি। এক ছোকরা ডাক্তারের সংগে ভাব হয়। তার কাছ থেকে ডাক্তারী বই, বিশেষ করে মনের রোগের বই পেতাম। কিছুটা পড়ে কিছুটা ঐ ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারি, আমি মনের অসুখে ভুগছি। 'পাইরোম্যানিয়া' অস্বাভাবিক অগ্নিপ্রীতি, এই রোগের নাম। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর দাদার দৌলতে একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরী পাই। 'অগ্নিবীমা' বিভাগের কাজ আমি বেছে নিই। ট্রাম-বাস পোড়ানোর ইচ্ছেটা কমে যায়। শীতের প্রথমটায় হাঁপানির আক্রমণটা আগের মতই চলতে থাকত, আর তখন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়তাম। খবরের কাগজ পুরনো বই জড়ো করে দেশলাই-এর কাঠি সংযোগে আগুন জ্বালিয়ে এই অস্থিরতা দমন করতাম। তারপর কয়েক বছর শীতের সুরুতেই ছুটি নিয়ে জংগলের দিকে বেড়াতে যেতাম। বনের, আগুন দেখার ইচ্ছে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম। নিজে শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে অগ্নিপিপাসা মেটাতাম। আর সংগে সংগে চলত আত্মবিশ্লেষণের চেষ্টা! কেন আমি অস্বাভাবিক? কেন আমি অসুস্থ। কেন আমি পাইরোম্যানিয়াতে ভুগছি। ফ্রয়েড পড়লাম। হ্যাভেলক এলিস পড়লাম। তাঁদের মতে শৈশবের অতৃপ্ত যৌনকামনার সংগে নাকি এই পাইরোম্যানিয়ার সম্পর্ক আছে। অনেক হাতড়েও অতৃপ্ত কামনার হদিশ পেলাম না। যৌনব্যাপারেও আমি বোধহয় অস্বাভাবিক। স্ত্রীজাতির প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। যৌনউত্তেজনাও বোধহয় সাধারণের থেকে আমার অনেক কম। এক ডাক্তারের সংগে এ নিয়ে কথা বলেছিলাম। যৌন কামনার নাকি কোনো অ্যাভারেজ বা মিনিমাম স্ট্যাণ্ডার্ড নেই। এক-একজনের এক একরকম। কথাটা মনে লেগেছিল। অথবা যৌনকামনায় তীব্রতা না থাকার দরুন ব্যপারটা নিয়ে আদৌ কোনো চিন্তাই করিনি। ঐ উত্তরেই তাই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। আমার তখন চিন্তা ফ্রয়েড আর আমার আগুন নিয়ে। আগুন দেখার ইচ্ছা মানুষের সহজাত কামনা। হেলেন নয়, সীতা নয়, গ্রীকদের আর রাম অনুচরদের আগুন দেখার আদিম প্রবৃত্তি, ট্রয় আর লঙ্কা ধ্বংসের কারণ। হ্যাভেলক এলিস লিখেছেন পাইরো-ম্যানিয়া কথাটা অচল, সেকেলে! পাইরো-ল্যাগনিয়া কথাটাই ঠিক। আমি মানি না এলিসের কথা। কামেচ্ছা আর আগুন লাগাবার প্রবণতার মধ্যে, অন্তত আমার বেলায়, কোনো সম্পর্ক নেই। আগুনকে বশে আনার ফলে মানুষ সভ্য হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের কালই সভ্যতার কাল। পণ্ডিতদের এই মতও অভ্রান্ত নয়। এখানেও গোঁজামিল আছে। আগুনকে আমরা বশে এনেছি কিন্তু তার ফলে নিজেরা অগ্নিদগ্ধ হচ্ছি। আগুনকে কি সত্যিই বশে এনেছি? তাহলে ট্রাম পোড়ে কেন? আমি খড়ের গাদায় ট্রাম গাড়ীতে আগুন লাগাই কেন? বোমার আগুনে শহর পোড়ে কেন? ধানক্ষেত পোড়ে কেন?

প্রমেথিউস স্বর্গের আগুন চুরি করে পাপ করেছিল। আগুন এনে মানুষের সর্বনাশ করেছে প্রমেথিউস। জিউস তাকে শৃংখলিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। 'প্রমেথিউস বাউণ্ড' নাটকটা ঠিকই লেখা হয়েছে। শেলীর 'প্রমেথিউস আনবাউণ্ড'এ মানুষের উচ্চ আকাংক্ষার প্রকাশ, যে আকাংক্ষার আগুনে সে দিন-রাত জ্বলে-পুড়ে মরছে! এইস্কিলাস নিজের লেখা ঐ নামের নাটকটা অগ্নিতে সমর্পণ করেছিলেন। বুঝেছিলেন, আগুন মানুষের কোনো কাজে লাগে না। মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাকে ধ্বংস করে। আমরা সর্বাগ্নিতে অনেক কিছু আহুতি দিই, কিন্তু উচ্চাশাকে মনের কোণে সংগোপনে জীইয়ে রাখি। তাই আমরা অসুখী, তাই আমরা অশান্ত। আমি আগুন জ্বালিয়ে নিজেকে তৃপ্ত করতে, তুষ্ট করতে চেয়েছি। পেরেছি কি?

এই রকম অনেক কিছু বলেছিলেন প্রমথবাবু। তাঁর ডায়েরীর পাতা আর মুখের কথার কিছু অংশ মাত্র পাঠকদের পরিবেশন করেছি। তিনি স্বীকার করলেন যে বস্তিতে তিনিই আগুন দিয়েছিলেন। আশেপাশে কিছুদিন ধরে আগুন জ্বলছিল। ৪২-এর মত, ৪৯-এর মত তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল, অ্যাকশন স্কোয়াড তৈরী করে আবার কাজে নেমে পড়তে। কিন্তু এই বয়সে আর সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু একেবারে চুপ করে থাকা যায় না। অধীর উম্মাদনায় তাঁর রাতে ঘুম হচ্ছিল না। হাঁপানির টানটা খুব বেড়ে উঠেছিল। তাই গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে চুপি চুপি জমানো ময়লার গাদায় খানিকটা পেট্রল ঢেলে তিনি আগুন লাগালেন। অগ্নিশিখা কয়েক মিনিটের মধ্যে রাতের অন্ধকার দূর করে বাতাসে কাঁপতে লাগল। এবার কিন্তু তাঁর তৃপ্তি হল না। বস্তির বাচ্চাদের করুণ আর্তনাদে তিনি বিচলিত হলেন। আগুন নেভাতে অন্যদের সঙ্গে মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। অনেক বাচ্চা বুড়োদের আগুন-ঘেরা ঝুপড়ি থেকে বাইরে নিয়ে এলেন। অনেকের প্রাণরক্ষা করলেন। দুটো ছেলেকে কিছুতেই বাঁচান গেল না। প্রমথবাবুর চোখের সামনে জলন্ত মশালের মত জ্বলে দুটো ছুটোছুটি করতে লাগল, চিৎকার করে মাটিতে শুয়ে গড়াতে লাগল, তাদের মা-বাপের হাহাকারে চারদিক ভরে গেল। প্রমথবাবু ছুটে বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। ভোরের দিকে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই সময় থেকে অগ্নিপ্রীতি অগ্নিভীতিতে রূপান্তরিত। এই সময় থেকে তিনি প্রমেথিয়ুসকে বন্দিদশার [illegible] মুক্ত করলেন। মাসখানেক আগে হঠাৎ এক রাতে মনে হল তিনিই বোধ হয় প্রমেথিয়ুস। প্রমথ আর প্রমেথিয়ুস এক কথা। শিবের অনুচর তিনি আর জিউসের অনুচর প্রমেথিউস। শিবের চোখের আগুন তিনি মর্তের মানুষদের দেখাতে চেয়েছেন আর প্রমেথিউস অলিম্পাস-এর আগুন দিয়ে মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন : দুই-ই সমান অপরাধ। শিবের আদেশে শ্মশানের শকুনি ধারাল ঠোঁট দিয়ে তাঁর লিভার টেনে বের করছে। অসহ্য যন্ত্রণায় দিন-রাত তাঁকে ছটফট করতে হচ্ছে।

অতিবিচিত্র এই প্রমথবাবুর কাহিনী। পাইরোম্যানিয়া (আগুন লাগানোর অদম্য প্রবণতা) ক্লেপ্টোম্যানিয়ার (উদ্দেশ্যহীন চৌর্যপ্রবণতা) রোগী সাধারণত চিকিৎসকদের কাছে আসে না। পুলিশ ও জেলের ডাক্তাররা হয়ত এদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন, আমার এই ধরনের রোগী সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। পরোক্ষ অভিজ্ঞতা অর্থাৎ পুঁথির বিদ্যার সঙ্গেও প্রমথবাবুর কেসটি ঠিকমত মেলাতে পারলাম না।

প্রমথবাবুর মানসিক বিকারের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক। প্রমথবাবু বোধ হয় পাইরোম্যানিয়াকদের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। এরকম জ্ঞানগর্ভ কথা এর আগে এই ধরনের লোকের কাছে কেউ বোধ হয় শোনেন নি। প্রথমে দেখি, আগুনের উপর মোহ, পরে অগ্নিভীতি। অগ্নিভীতির কারণ তাঁর নিজের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। এর আগে তাঁর পাইরোম্যানিয়ার দরুণ কোন প্রাণহানি হয় নি। এই প্রথম নিজের চোখে নিজের অগ্নিসংযোগের ভয়াবহ পরিণতি দেখার ফলে তাঁর এধরনের পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। কেন তাঁর শৈশব থেকে এই আগুন জ্বালাবার প্রবণতা? তাঁর আত্মচরিতটা খুঁটিয়ে পড়েছি, তাঁকে অনেক প্রশ্নও করেছি। প্রমথবাবুরা ছিলেন অবস্থাপন্ন জোতদার। তাঁর ঠাকুরদার আমলে দুষ্ট প্রজাদের দমন করতে 'লাল ঘোড়া' ছোটানোর নিয়ম ছিল। প্রজাদের ঘরের দরোজা বন্ধ করে ঘরে আগুন দিয়ে তাদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হত। ডায়েরীটায় এই রকম দু-একটা শোনা কথার উল্লেখ আছে। বাবার আমলে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল বোধ হয়। ব্যাপারটা খুব গোপনে সম্পন্ন হয়েছিল। এক প্রতিপত্তিশালী প্রজা জোর করে ধান কেটে নিজের গোলাজাত করেছিল। জোতদারবাবু বিষ দাঁত ভাঙ্গা সাপের মত ক্রোধে ফুলে-ফুলে উঠেও কোন কিছু করতে পারেন নি। সেই সময়টায় তিনি উন্মাদ হয়ে দাপাদাপি করেছিলেন। কাকা ও মা বাবার উন্মত্ততা দূর করার দাওয়াই হিসেবেই বোধ হয় নেপাল বাগ্দীকে একশো টাকা দিয়ে—জোতদারের গোলায় আগুন লাগিয়ে ছিলেন। এই সময়টা প্রমথবাবুর কাকা অসুস্থ দাদার চিকিৎসার জন্যে কোলকাতায় ছিলেন। প্রমথবাবু মায়ের সঙ্গে ছাতে দাঁড়িয়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখেছিলেন। প্রমথবাবুর আত্মচরিতে এক জায়গায় লিখেছেন, মায়ের চোখে প্রশান্তির ছায়া দেখলাম। বাবা থাকলে কি নেরোর মত বাঁশী বাজাতেন?

—মনোবিদ

ছায়া

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সবচেয়ে উঁচু চূড়াটা সাড়ে তিন হাজার ফিট। সেটা টপকাতে পারলেই ঠিক ওপারে ফরেস্ট বাংলোটা। অরণ্যসঙ্কুল উড়িষ্যার এ অঞ্চলটার দুর্গমতা সবচেয়ে বেশি। শুধু পাহাড় আর জংগল। শাল, বিজাশাল, মহুয়া, চার, আসন, আর সহস্র রকমের বনৌষধিতে ভরা গভীর জংগল ছড়িয়ে গেছে সমতলের দিকে রঘাগড়া, ভঞ্জপেঠা, কিয়াঝাড়, নিকারপাই অবধি। এসব জায়গায় দিনের বেলাতেই মানুষকে বাঘে ধরে। বাঁয়ে কোরাপুটের পার্বত্য উপত্যকা, ডাইনে পাহাড় পার হয়ে বর্গাপুর।

সূর্য ডোবার আগেই অনন্তপুর ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু গোটাকতক পাহাড় টপকাতেই মাঝপথে জীপ গেল বিগড়ে। দুপাশের কালো জংগলের দিকে তাকিয়ে ফরেস্ট রেঞ্জার ঘনশ্যাম পানিগ্রাহী ফিকে হাসি হেসে ড্রাইভারকে বললেন, চক্রধারী, তোমার সংগে তো আমাদের এমন শত্রুতা কিছু ছিল না বাবা। একেবারে জানে এনে বাঘের মুখে ধরে দিচ্ছ! এখানে রাত কাটাতে হবে নির্ঘাৎ—

চক্রধারী ইঞ্জিনের খোলের ভিতর মুখ ঢুকিয়ে মেরামতের কাজ চালাচ্ছিল। পানিগ্রাহীর কথার ওপরেই বলে উঠল—ধরে দিয়ে তো আর পালাতে পারবো না সার।

আমাকেও তো যেতে হবে বাঘের পেটে সেই সঙ্গে। সেটাও তো ভয়ের কথা।

ভয় পাবারই কথা। দু-পাশে থম-থম করছে নিস্তব্ধ গভীর অরণ্য। তার লতা-জটিল অন্ধকার রাজত্বের নৈঃশব্দ্য সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে আদিম অন্ধকার ছায়া মেলে এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ। যা-ও দু-একটা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছিল এদিক ওদিক তাও থেমে থেমে আসছে। মাথার উপরকার একটুখানি খোলা আকাশে ধূসর ছায়া ঘনিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ বুঝতে পারছি এটা হল জানোয়ারদের শিকারে বার হবার সন্ধিক্ষণ।

এমন সময় চক্রধারী বনেট বন্ধ করে এসে স্টার্ট লাগাল জীপে। সৌভাগ্যের কথা, জীপও সুবোধ বালকের মতো স্টার্ট নিয়ে নিল। জীপের ভিতর চেপে বসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে পানিগ্রাহী হাত জোড়া করে কপালে ঠেকালেন।

জীপ এগিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে। জীপের দুটো হেডলাইট জ্বলছে। একটা পথের মোড় ফিরেই এসে পড়লাম একটা খাড়া চড়াই-এর সামনে। সম্মুখের পথটা সোজা উঠে গেছে ওপর-দিকে। অন্ধকারে পথের ওপর জীপের আলোটা পড়তে বেশ খানিকটা দূরে হঠাৎ চোখে পড়ল কি একটা সাদামতো যেন নড়াচড়া করছে।

পানিগ্রাহী বললেন—কি হে চক্রধারী, ওটা কি জানোয়ার?

চক্রধারী কোন জবাব দিল না। পাহাড়ে চড়ার গিয়ারটা বেশ করে চেপে দিয়ে সে জীপের স্পীড বাড়িয়ে দিল। জীপটা গোঙাতে গোঙাতে উপরে উঠতে লাগল। একটু পরে চক্রধারী জবাব দিল—স্যর, ওটা একটা মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

—এাঁ, বল কি? এই সময়ে এই পথে মানুষ! সন্ধ্যার পর এ-রাস্তায় বুনোরাও যায় না মানুষখেকো বাঘ আর ভালুকের উৎপাতে।

জীপ আরও একটু এগিয়ে যেতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। দেখতে পেলাম একটা লোক দু-হাতে দুটো বড় বড় কানেস্তারা টিন নিয়ে সেই খাড়া পাহাড়ী রাস্তায় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। উঠছে সে অতি কষ্টে। এক-একবার টিনদুটো তার হাত থেকে ফস্কে যাবার উপক্রম করছে। সেগুলোকে ঠিক রাখতে গিয়েই বোধহয় তার পাও যাচ্ছে এখন-তখন ফস্কে। একবার সে হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল নীচের দিকে। কিন্তু হাতের টিনদুটো ছাড়ল না। উঠে দাঁড়িয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে তুলতে লাগল টিন-দুটো। যেন সে টাগ্-অব্-ওয়ার চালাচ্ছে ও-দুটোর সঙ্গে। আমরা তার কাছাকাছি আসতেই লোকটা পা ফস্কে পড়ে গেল আবার রাস্তার পাশে। তারপর আর নড়ে-চড়ে না। ওঠে না।

—জীপটা একটু থামাও তো—পানি-গ্রাহী হুকুম করলেন। জীপটা থামল। নেমে লোকটার কাছে গেলাম। নামবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুকের ভিতরটা যেন জমে যাবার উপক্রম হল। একে শীত-কাল, তার ওপর এই আড়াই হাজার ফিট উঁচুতে জঙ্গলে পাহাড়ী রাস্তা। হাত-পা হিম হয়ে আসতে লাগল।

চক্রধারী এগিয়ে গিয়ে রূঢ়ভাবে ধমকে উঠল—এই, কে তুমি? এই অন্ধকারে এ-পথে চলেছ, ভয়-ডর নেই?

লোকটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। রোগা চিমড়ে চেহারা। মাথায় বড় বড় নোংরা ঝাঁকড়া চুলের রাশ। তাতে তেল পড়েনি বোধহয় বছরের পর বছর। গাল-দুটো বড় বড় গর্ত হয়ে তুবড়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পরনে একটা চিট্-ময়লা শতচ্ছিন্ন ধুতি। গায়েও ঐ রকম নোংরা তুবড়ানো ছেঁড়া একটা হাফ-সার্ট। চেহারা দেখে বোঝা গেল লোকটা আদিবাসী নয়।

জীপের আলোর সামনে পড়ে সে দু' হাত দিয়ে দু-চোখ চেপে ধরেছিল। চড়া আলোতে চোখ মেলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। সে হাত সরিয়ে আমাদের দিকে চাইল। টকটকে রাঙা দুটো চোখ। যেন এই মাত্র ঘুম ভেঙে উঠল। অতি কষ্টে টেনে টেনে চাইতে চেষ্টা করতে লাগল।

পানিগ্রাহী জিগ্যেস করলেন—কে তুমি? নাম কি?

—আজ্ঞে সর্বজিৎ পাত্র।

—বাড়ী কোথায়?

—রাস্তায়।—দুটো চোখ হাতের তেলোতে চেপে ধরে জবাব দিল লোকটা। তার মুখ দিয়ে দেশী মদের বীভৎস গন্ধ ভক-ভক করে বার হয়ে আসছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টলছিল সে।

—এঃ! নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ধমকে উঠলেন, পানি-গ্রাহী।—তোমার ভয়-ডর নেই? জান তো এখানে মানুষখেকো বাঘের আড্ডা?

—বাঘে খেলে তো সাহেব বেঁচে যাই। কিন্তু কোন বাঘ এই ক'খানা হাড় চিবোবার জন্যে এত খাটতে চাইবে বলুন?—জড়িয়ে জড়িয়ে জবাব দিলে লোকটা।

বলেই সামনে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বিড়-বিড় করে বললে—উঃ বড্ড শীত। সাহেব একটা বিড়ি দেবেন দয়া করে? দু'-চোখ কিন্তু সে আগের মতোই বন্ধ করে রাখল। হাতটা পেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল।

চক্রধারী ধমকে উঠল দাঁত খিঁচিয়ে—শালা, লজ্জা করে না? বে-আইনী চোলাই মদ নিয়ে যাচ্ছিস ওপরের বুনোদের বস্তিতে। সবশুদ্ধ ধরে থানায় নিয়ে যাব।

লোকটা এবার চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসল। আধ-বোজা চোখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—সাহেব, আপনারা তো সরকারী লোক। হাকিম মানুষ। বিচার করুন। লজ্জা কেন হবে আমার? পেটের জন্যে খাবার বয়ে নিয়ে যেতে কি কারুর লজ্জা হয়?

—মদ আর খাবার এক জিনিস?

—সাহেব মিছে কথা বলছি না। আমি স্রেফ এই খেয়েই সপ্তায় সাতটা দিন কাটাই। বিশ্বাস না হয়, আমাকে আপনার কাছে রেখে পরখ করে দেখুন। কারুর মুখের খাবার কেড়ে নেওয়া কি আমাদের গণতন্ত্রে আইনসিদ্ধ?

লোকটা হাত জোড় করে দু'চোখ বুঁজিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল।

চক্রধারী পানিগ্রাহীর দিকে ফিরে তাকাল—সাহেব এই মাতালটার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। এত মদ খেয়েও আইন আওড়ায়। চলুন আমরা যাই।

পানিগ্রাহী বললেন—তোমাকে থানায় নিয়ে যাব, চল।

লোকটা এতটুকু বিচলিত হল না। বললে—তাহলে তো বেঁচে যাই। বাইরে যা ঠাণ্ডা। তারপর এই ভারী বোঝাদুটো—বলে আপন মনেই বিড়-বিড় করে বকতে লাগল—মিত্তেকে বলেছিলুম অতটা থাইও না। যেতে হবে অনেকটা দূর। তা শালা, বান্নার টাকাটা আগাম পেয়ে ফুর্তির চোটে আমাকে আকণ্ঠ ঠেসে দিলে। আর শালার এই পা-দুটো, এমন নেমকহারাম! কিছুতেই কথা শুনবে না। চড়াই-এর পথে এক ইঞ্চিও নড়তে চাইবে না। যেন নবাব-বাচ্চা। তার ওপর এই ভারী বোঝা!

চক্রধারী বললে—সাহেব মিথ্যে দেরী করছেন। চলুন যাই। ও থাক এখানে। ওর কপালে থাকে তো আজ রাতটা টেঁকে যাবে। নৈলে—

পানিগ্রাহী বাইরে কড়া অফিসার হলেও ভিতরে ভিতরে ভারী নরম মনের মানুষ। বেশ বুঝলাম বাঘের মুখে একটা লোককে (তা সে যেই হোক) ফেলে যেতে তাঁর মন একেবারেই রাজী হচ্ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর কঠিন গলায় বললেন—শয়তানটাকে তোল গাড়ীতে টিনদুটো সুদ্ধ। আমার সঙ্গে নিয়ে চল বাংলোয়। দেখি ও কেমন মাতাল। নিজের হাতেই ওকে আজ আমি শিক্ষা দেব।

লোকটাকে আর ওঠাতে হল না। সে দিব্যি তড়বড়িয়ে উঠে গিয়ে বসল জীপের পিছনের সীটে। চক্রধারী তার টিনদুটো ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। জীপ ছেড়ে দিল। লোকটা বসে বসে ঝিমুতে লাগল।

ঝিমোতে ঝিমোতে আপন মনে বিড়-বিড় করে বকতে লাগল।

এক-একবার হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল। কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে চেঁচিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় নিজেকে গালাগাল করে উঠল। জীপের আওয়াজ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগল—শালা সর্ব্বকাল; হারামজাদা সর্ব্বকাল, শুয়োরের বাচ্চা। এই নানারকমের কটু-বাক্য।

চক্রধারী তাকে সমানে ধমকে যেতে লাগল বার-বার।

ফরেস্ট বাংলোতে গাড়ী পৌঁছতেই পাণিগ্রাহী মাতালটাকে বামাল সমেত নামাবার হুকুম দিয়ে আমাকে নিয়ে এসে বসলেন বৈঠকখানায়। তারপর হাকলেন—চক্রধারী, মাতালটাকে এখানে হাজির কর।

সর্ব্বকাল পায়কে ধরে নিয়ে এল বাংলোর চৌকিদার, সঙ্গে চক্রধারী। ধর্মভীরু পাণিগ্রাহী নিজে তো মদ স্পর্শ করেন না, কারুকে খেতে দেখলেও ভারী বিরক্ত হন। আমার দিকে চেয়ে বললেন—ওকে আমি আজ মজা দেখাচ্ছি। আবগারীর হাতে ছাড়বার আগে আমার দাওয়াই দেব আর ওকে।

চক্রধারীকে বললেন—গাড়ীটা নিয়ে একবার গাঁয়ে যাও তো। ফরেস্ট অফিসের পাশেই আছে কবিরাজখানা। কবিরাজ অনন্ত শর্মাকে ডেকে আন, আর ষ্টোমাক পাম্পটা যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন তিনি।

আমার দিকে ফিরে পাণিগ্রাহী আবার বললেন—এখানকার ফরেস্ট স্টাফ প্রায়ই মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে থাকে দিনের পর দিন। কাজকর্ম কিছুই তখন হয় না তাদের দিয়ে। তাদের জন্যে আমি এই ষ্টম্যাক পাম্পটা আনিয়ে রেখেছি কবিরাজখানায়।

চক্রধারী তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে চেঁচিয়ে বললেন—যাও; ষ্টম্যাক পাম্পটা নিয়ে এস।

সর্ব্বকাল পায় আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল। ষ্টম্যাক পাম্পের কথাটা কানে যেতেই ঝিমুনি ছুটে গেল। হুমড়ি খেয়ে এসে সে ভেঙে পড়ল পাণিগ্রাহীর পায়ের ওপরে। একটু আগেই তার কথাবার্তায় যে বেপরোয়া ভাবটা ছিল সেটা উবে গেল এক নিমেষে। আর্তনাদ করে উঠল—সাহেব, আমাকে গুলী করে মারুন। ষ্টম্যাক পাম্প দেবেন না।

তার চেঁচানিতে আমরা অবাক হলাম। ষ্টম্যাক পাম্প দিলে মানুষ এমন কিছু খুন হয়ে যায় না। এরকম বলিদানের পাঁঠার মতো চেঁচানি চেঁচাচ্ছে কেন লোকটা।

লোকটা তখন চেঁচিয়ে যাচ্ছিল—পেট ধুয়ে ফেললে সাহেব আমি বুক ফেটে মরে যাব। সে যন্ত্রণার হাত থেকে আপনি আমাকে দয়া করে বাঁচান। বরঞ্চ আমাকে আপনি এক ঘায়ে খতম করে দিন, তা সইবে।

তার চীৎকার শুনে রান্নাঘর থেকে চৌকিদার দৌড়ে এল। হাবভাবে মনে হল, সেও বুঝি সে কাকুতি বুঝল লোকটাকে। সাহেবের সামনে ঐ রকম কোর্তাপ তার সহ্য হচ্ছিল না।

পাণিগ্রাহী কিন্তু কি মনে করে চক্রধারী আর চৌকিদারকে হাতের ইঙ্গিতে বাইরে চলে যেতে বললেন।—দেখলাম সর্ব্বকাল দুটো হাঁটুর ভিতর মাথাটা রেখে উবু হয়ে বসে আবার ঝিমুনি সুরু করেছে।

পাণিগ্রাহী এবার আস্তে আস্তে ডাকলেন—সর্ব্বকাল!

—আজ্ঞে হুজুর!

—কতো বয়স তোমার?

—আপনি অনুমান করুন।—মাথাটা সম্মুখ মুখটা তুলে ধরল সর্ব্বকাল। ভুরু থেকে দুটো চোখ সন্দেহে কুঁচকে আছে।

—পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে বোধহয়।

—তার থেকে বিশটা বছর বাদ দেন সাহেব।

—হাঁ, বল না এই বাহো-কি তেরো। কচি খোকা তুমি! খেঁকিয়ে উঠলেন পাণিগ্রাহী।—পেটের থেকে মাল না নামলে মাথা তোমার ঠিক হবে না দেখছি।

আপনি ব্রাহ্মণ, আমার বাবার বাসী। পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি সাহেব। বিশ্বাস না হয় আমার ম্যাট্রিক সার্টি-ফিকেটটা—

—ও, ম্যাট্রিক পাশও করেছ?—নরম গলা পাণিগ্রাহীর।

হাঁ সাহেব, পাশও করেছি, সরকারি কাজও করতাম এক সময়ে—

—তা তোমার এ-হাল কেন? নিশ্চয় অফিসের ক্যাশ ভেঙেছিলে? তারপর জেল থেকে পালিয়েছ? তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় তুমি জেলপালান ঘুঘু।

সর্ব্বকাল চুপচাপ বসেছিল। মুখে কোন কথাবার্তাই ছিল না আর। কিন্তু আমি দেখছিলাম পাণিগ্রাহীর মুখের ভাবটা ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। সেই কঠোর ঘৃণা ক্রমশ গলে গিয়ে মুখটা নরম হয়ে আসছে। ভুরু দুটো কোঁচকান অবস্থা থেকে ক্রমশঃ সোজা হয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে চক্রধারী আর চৌকিদার আমাদের জন্যে গরম চা তৈরী করে এনে সামনে ধরে দিল। তাতে চুমুক দিয়ে পাণি-গ্রাহী বললেন—দুধ-ছাড়া এক কাপ কড়া চা এনে দাও তো সর্ব্বকালকে।

দু' মিনিটের মধ্যে কড়া চা এসে গেল। সেটা সর্ব্বকালের সামনে ধরে দিতেই সে তৃষ্ণার্ত গরুর মতো সেই গরম চায়ের গ্লাসটাতে চো-চো করে চুমুক দিতে লাগল।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে পাণিগ্রাহী নরম সুরে বললেন—পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নেশা করে ঐ চেহারা করেছ। লিভার পচে, মুখে রক্ত উঠে মরবে যে। আমি তোমার বাবার বয়সী। আমার কথাটা শোন। এ পাপ ছেড়ে দাও।

সর্ব্বকাল চায়ের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে জিভ কেটে বললে—পাপ আমি করিনে। পাপ আমার সয় না!

—ফের মিছে কথা। চৌকিদারকে বলব নাকি গুঁতো মেরে মুখখানা থেঁতো করে দিতে? মিছে কথা বললে জিভ কেটে নেব। দারুণ রাগে ফেটে পড়লেন পাণিগ্রাহী।

—তা বলতে পারেন, কিন্তু মিছে কথা আমি বলিনে। সর্ব্বকাল শক্ত করে তার কথার খুঁট ধরে রইল।

—নাঃ, তুমি স্বয়ং ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। ভেংচে উঠলেন পাণিগ্রাহী

—হুজুর মিছে কথা আমি বলিনে। পাপ আমি করিনে। পাপ আমার সয় না। ছেলেবেলায় একবার মিছে কথা বলেছিলাম, পাপ করেছিলাম। মা-বুড়ী আমাকে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছিল পরের বাড়ী ধান ভেনে। শেষে দুচোখে ছানি পড়ে যায়। কিছু দেখতে পেত না। একটা বাক্সের ভিতর টাকা জমাত। সুদে খাটাত। যা পেত, দশ টাকার নোট করে জমিয়ে রাখত। জমি কিনবে, বাড়ী করবে। টাকার ওপর বড় মায়া ছিল বুড়ীর।—একবার আমি সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে মার বাক্স থেকে টাকা চুরি করি। তারপর ক্যালেন্ডারের পাতা মাপ করে কেটে ভরে রাখি বাক্সের ভিতরে। মা বুড়ী জমি কেনবার জন্যে টাকা দিতে গিয়ে বাক্সম। জমির মালিক বলে—টাকা কোথায়? এতো সব ক্যালেন্ডারের কাগজ।

—বুড়ী রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আমাকে চেপে ধরেছিল।—নিশ্চয় এ তোর কাজ।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম—আমি তোর টাকার খবর জানিই না। এ তোর মেয়ে করেছে।

—পরেরদিন সকালে দেখি ইঁদুরমারা সেঁকো বিষ খেয়ে বুড়ী মরে পড়ে আছে।

এবার সর্ব্বকালের গলা দিয়ে আর্তনাদের মতো একটা আওয়াজ বার হল। রাঙা টকটকে চোখদুটো তার গর্ত থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল। খাবি খেতে খেতে তার গলা চিরে কথাগুলো বার হতে লাগল—জানেন সাহেব, আমার সেই মা, যার বুকের দুধ গিলে এই শালা শুয়োরের বাচ্চা সর্ব্বকাল বড় হয়েছে, সে মা ধান ভেনে ভেনে

ফটো : শ্যামলকুমার দাশ

ইস্কুলে পড়িয়েছে, সেই মা—তার সব অপরাধের বোঝা নিয়ে আত্মঘাতী হল।

কিছুক্ষণ সে দম মেরে মাথাটা নীচু করে বসে রইল। তারপর বললে—মনে বড় ধিক্কার এসেছিল। মাকে চিতেয় তুলে দিয়ে দু'পায়ে মাথা রেখে বলেছিলাম—মা দিয়ে কথা আর জীবনে দেব না। পাপ কাজ জীবনে করব না। সেই থেকে সাহেব পাপ আমি কোনদিন করিনি।

—এইসব নিষিদ্ধ এলাকার মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হওয়া পাপ নয়? বে-আইনী চোলাই মদ চালান দেওয়া পাপ নয়?

সর্ব্বজিৎ এবার ফ্যালফ্যাল করে পানি-গ্রাহীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছু-ক্ষণ। তারপর একটু ফিকে হাসি হেসে বললে—আইনের কথা যদি বলেন, সাহেব, আমাদের দেশের আইন তো পাপ-পুণ্যির সংগে ঠিক মিলিয়ে তৈরী হয়নি। এদেশে আইন এক জিনিস আর পাপ-পুণ্যি আর এক জিনিস হুজুর।

—সে আবার কি কথা! সব দেশেই আইন তৈরী হয়েছে অন্যায়কে শাস্তি দিয়ে দাবিয়ে রেখে ন্যায়কে টিকিয়ে রাখবার জন্যে।

আবার মুখ তুলল সর্ব্বজিৎ। নেশায় ঢুলু-ঢুলু চোখদুটো টান টান করে মেলে ধরল পানিগ্রাহীর মুখের উপর। সেইভাবে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা প্রশ্ন ছুটে বার হয়ে এল তার মুখ থেকে—এটা আপনি কি কথা বললেন সাহেব? আপনার বাবা-মার কিরে। একবার সত্যি করে বলুন দেখি সাহেব আপনার এই সরকারী চাকরিটা বজায় রাখতে কোনটাকে হাতের পাঁচ করতে হয়েছে? ন্যায়কে না অন্যায়কে? সত্যিকে না মিথ্যাকে?

মনে হল পানিগ্রাহী এখুনি হয়তো ওর মুখে একটা জবরদস্ত থাপ্পড় মেরে এই ধৃষ্টতার জবাব দেবে। কিম্বা বন্ধ করে দেবেন ওই মুখের কথাগুলো চৌদ-পুরুষের ছবি দিয়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য! তিনি সে-সব কিছুই করলেন না। দেখলাম, পানিগ্রাহী যেন কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন ফ্যাল-ফ্যাল করে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, বেশ কিছু-ক্ষণ পরে তিনি সজাগ হলেন। সংগে সংগে ভিন্ন পথ ধরলেন তিনি।—তোমার কথা-বার্তা শুনে বোধ হচ্ছে তুমি বেশ বুদ্ধি-মান। এই জঘন্য জীবন ছেড়ে ভদ্র হতে তোমার ইচ্ছে করে না?

—ভদ্র?—সর্ব্বজিৎ মুখের ভাবটা এমন করল যেন সে কুইনিন খেয়েছে। পরম-মুহূর্তেই বললে—নাঃ, আসবে না।

—খুবই আশ্চর্যের কথা। তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, মোটামুটি লেখা-পড়াও শিখেছ, তবু—

—হুজুর তা হলে বলি শুনুন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর চাকরি পেয়ে-ছিলাম। থানার কেরানী। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীরা হিংসেয় প্রায় ফেটে মরবার যো হয়েছিল। থানার কেরানী, মাইনে যাই হোক উপরি পাওনার সীমা-সংখ্যা নেই। দু'দিনেই তুই বড়লোক হবি সর্ব্বজিৎ। কোটাবাড়ি বানাবি। ক্ষেত-খামার করবি। সুন্দরী বৌ আসবে ঘরে।

সর্ব্বজিৎ চাকরিতে যেদিন ঢুকল সে রাতেই স্বপ্ন দেখল তার মাকে। মা তার বলছে—তুই ওখানে কাজ করতে গেলি বাবা, ওটা যে পাপের রাজত্বি। ওখানে যে দুয়ের টাকায় দিনকে রাত, রাতকে দিন বানাচ্ছে।

সর্ব্বজিৎ বলেছিল—মা তুই কিছু ভাবিসনি। খুব আমার গো-রক্ত। তুই দেখিস—

অনেক কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে বোনটার বিয়ে দিয়ে দিল সর্ব্বজিৎ। পাত্র যোগাড় করে দিল থানার বড়বাবু। মাস চারেক শ্বশুরঘর করার পর সেই বোন ফিরে এল আবার সর্ব্বজিতের কাছে। জামাইটার বাতের ব্যামো। তার ঘর সে করবে না।

সব শুনে দারোগাবাবু বললেন—কি আর করবে বল, সবই বরাত। নৈলে অত জমি-জমা—। তা তুমি এক কাজ কর সর্ব্বজিৎ। আমার বৌটা তো চিররুগ্না। তোমার বোন যদি আমার সংসার দেখা-শোনা করে, ছেলেপিলেগুলোকে সামলায়, তারও মন-মেজাজ ভাল থাকে, আমারও সাশ্রয় হয়।

সর্ব্বজিৎ ভাবল ভালই হল। ঘরে বসে বসে কেবল কোঁদল করে। তার চেয়ে দারোগাবাবুর ছেলেমেয়েগুলোকে নাড়া-চাড়া করুক, থাকবে ভাল।

সে রাজী হয়ে গেল।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ সর্ব্বজিৎ পাত্রের মুখের ভাবটা পাল্টে গেল। চোখ-দুটো ঘুলো হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল সে—শালা সর্ব্বজিৎ, তুই ভেবেছিলি, তুই ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে সরকারি কাজ চালাবি। শালা বড়ো, ভেবেছিলে চালাকি করে ঘুষ খাওয়া এড়াবি। ওরে গাধা, তাই কি হয় কখনো? তুই ব্যাটা এক নম্বরের পাঁঠা। তুই গেলি পঞ্চপাণ্ডবের ফাঁকতে ছাতার আড়াল দিয়ে আটকাতে।

এ হাতে পয়সা গুঁজে দেয়, ও হাতে ধরে বাড়ী বয়ে আনে জিনিসপত্তর, ভেট।

CENTRAL LIBRARY

সর্ব্বজিৎ নানান ছলে-ছুতোয় এড়িয়ে যায়। অফিসের বড়বাবুর নজর এড়াল না। একদিন ডেকে মিষ্টি মিষ্টি করে বললেন—ওহে সর্ব্বজিৎ, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই, হে। পস্তাবে। কি করে আদায় করতে হয় শেখো।

কিন্তু সর্ব্বজিৎর চাল বেগোড়ায় না। ঘুষ সে কিছুতেই নেবে না।

আরও কয়েকটা মাস যেতেই বড়বাবু নিজ মূর্তি ধরলেন। তুমি তো বড় ভয়ানক ছোকরা হে! আমাদের এখানকার এতদিনের উপরি পাওনার রেওয়াজ উঠিয়ে দিতে চাও। ফল ভাল হবে না কিন্তু!

প্রতি কাজে খুঁত ধরতে লাগলেন বড়বাবু।

দারোগাবাবুর বাড়ী থেকে রোজ বাজারের ফর্দ আসত। কিন্তু তার সঙ্গে আসত না কোন পয়সাকড়ি। বড়বাবু আগে নিজেই সব ব্যবস্থা করতেন। এবার সর্ব্বজিৎর হাতে ফর্দটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন—যাও বাজার করে নিয়ে এসো।

সর্ব্বজিৎ বললেন—পয়সা?

বড়বাবু তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন—দারোগাবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এস।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সর্ব্বজিৎ দারোগাবাবুর কাছে। বললে—বাজারের ফর্দ পাঠিয়েছেন, টাকা তো দেননি।

দারোগা গম্ভীর মুখে সর্ব্বজিৎর হাত থেকে ফর্দটা নিয়ে বলেছিলেন—অপদার্থ! তোমাকে দিয়ে আমার অফিসের কাজ চলবে না।

পনেরো দিনের মধ্যেই সর্ব্বজিৎর চার্জ-সীট হল! টেম্পোরারি চাকরির এখানেই খতম।

চাকরি খুইয়ে বোনের হাত ধরে সে বাড়ীতে ফিরে এল। এসে শুনল বোনটা ছ' মাস অন্তঃসত্ত্বা।

মাথাটা খারাপ হয়ে গেল সর্ব্বজিৎর। বোনকে কাটতে গেল একটা ধারাল দা দিয়ে। বল কে করেছে এ-কাজ।

ভয়ে ভয়ে বোন সব কথা বলে ফেলল। আসামী দারোগাবাবু।

বুকে উঠে সে গেল মোকাবিলা করতে দারোগাবাবুর সঙ্গে। ফল হল—পিঠের জামাটা সরাতে সরাতে সর্ব্বজিৎ বললে—দু'জন কনস্টেবল জুতো দিয়ে পিটিয়ে আমার পিঠের এক পর্দা ছাল তুলে নিয়েছিল দারোগার হুকুমে। বলেছিল—শালা, তোর বোনটা বাজারের বেশ্যা। তাকে আমার বাড়িতে তুলে দিয়ে আমার বদনাম?

বোনটা সত্যি সত্যি হুজুর বাজারের বেশ্যা হয়ে গেল। আশপাশের লোকেদের কু-দৃষ্টি আর কু-কথার চোটে সে বালাজিদের বাজারে গিয়ে নাম লেখালে!

আবার সর্ব্বজিৎর মুখ-চোখের ভাবটা পাল্টে গেল। আবার সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল চোখ পাকিয়ে কুদ্ধ কুচক্রে!—খুব তো লম্ফঝম্প করলি মনে মনে। পারলি রে শালা তুই নিজের হাতে খুন করতে দারোগাটাকে? নিজের বোনের ইজ্জত খোয়া যেতে দেখলে বুকে আগুন জ্বলে না কার? তুই শালা কেঁচো, পারলি কি তার শোধ নিতে। আসল কাজের বেলায় হেঃ পালিয়ে এলি ল্যাজ গুটিয়ে। শালা, তুই কি মানুষ রে? তুই একটা আরশোলার অধম। নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা। কি লজ্জা ছিঃ ছিঃ। শেষে কিছু করতে না পেরে আকণ্ঠ মদ গিলে মরলি!

সর্ব্বজিৎ হাঁপাচ্ছিল। তার মুখের দু'পাশে সাদা সাদা ফেনা জমে উঠেছিল। লাল চোখদুটো অস্বাভাবিক বড় হয়ে ঠেলে বার হয়ে আসছিল। একটু থেমে সে বললে—একটা বিড়ি দেবেন সাহেব?

বোধহয় তার ভিতরের দম ফুরিয়ে এসেছিল। প্রয়োজন হয়েছিল কিছু একটা দিয়ে স্নায়ুকে চাঙ্গা করে তোলা।

পানিগ্রাহী বিড়ি সিগারেট খান না। আমি আমার প্যাকেট থেকে একটা চারমিনার বার করে ধরিয়ে দিলাম সর্ব্বজিৎকে। সে তাতে চোঁ করে একটা প্রকাণ্ড দম দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল অনেকক্ষণ ধরে। ধোঁয়াটা তার সামনে কুণ্ডলী পাকাতে লাগল। আর সে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল গুম হয়ে।

পানিগ্রাহী নিস্তব্ধতা ভাঙলেন।—মদ নেশাটা কি তখন থেকেই রপ্ত হল?

—না সাহেব বিষকে হজম করতে সময় লাগে। তবে মনের জ্বলুনি যে কিসে হয় তার কাছে ও মদ তাড়ি আফিং ওসব কিছুই কিছু নয়। তবে মাতাল হলে কিছুটা সে জ্বলুনির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বুকটা যখন হু-হু করে জ্বলে তখন ঢোকে ঢোকে মদ খেয়ে সে জ্বলুনি থামাতে হয়। মদ না খেলে সাহেব আমার চলে না। আমি দু'দণ্ড মদ না খেলে শুকনো কাঠের মতো ফেটে মরব।

—বাড়ী ঘর জমি-জমা যা ছিল সব বেচে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলাম। তারপর রুজি-রোজগারের ধান্দায় আজ এটা কাল সেটা। কোথায় কটকের ধানকলে চাকরি, কোথায় ঢেঙ্কানলের জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা। কালাহাণ্ডিতে হরিণের চিকের কারবার। দু' বছরে দশ-বারোটা কাজ নিলাম ছাড়লাম। ছাড়লাম মানে ছাড়তে বাধ্য হলাম। উড়িষ্যার সম্বলপুর থেকে পুরী, ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ সব ঘেঁটে ফেললাম।

বলতে বলতে আবার সর্ব্বজিৎর মুখের ভাব বদলে গেল। মুখচোখ পাকিয়ে দম করে বুকে একটা ঘুঁষি মেরে বললে—সুশালা বোকা বাঁদর! তোর জন্যে সবাই ব্যবসা-বাণিজ্যের রাস্তা ছেড়ে ঝাঁট দিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে রেখেছে, না? মিথ্যে কথা বলতে পারবে না, ব্যবসা করবে? লোক ঠকাতে পারবে না কারবার করবে? হারামজাদা তুমি ন্যাকা? কিছু তুমি জান না?

তারপর দারুণ রাগে গর্জন করে উঠল সে—মিথ্যে আর জাল-জোচ্চুরি ছাড়া কোন পথটা তোর খোলা আছে বাঁচবার? ভাগ শালা সত্যপীরের বাচ্চা, অপদার্থ নচ্ছার! গলায় দড়ি দিয়ে মর।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে লাগল—কি কুক্ষণেই যে তোর পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিলাম রে হতভাগির বেটী। যা হোক আমাকে এমন ফাঁসিয়ে গেলি যে জীবনে আমি আর কিছু করতে পারলাম না। তখন কি আমি এতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে এ-শালার দুনিয়ায় ভালর কোন জায়গা নেই। যেগুলো বোকা বদ্ধুকে, মানুষ বুকের পাটা নেই, নেই কণ্ঠ এতটুকু বুদ্ধি তারাই থাকে শুধু ভাল হয়ে। লোকে ভাল হয় খারাপ হবার সুযোগ আর সাহস পায় না বলে। দূর দূর, এ শালার দুনিয়ার ধিক্কার!

সর্ব্বজিৎ শেষে এসে ঠেকল সাঁওতাল দুনিয়ার ওপর। শহর, লোকালয় ছেড়ে সে চলে গেল পাৰ্বতী-কালীমাটির একটা কোণের জায়গায়। সেখানে জঙ্গলে আছে বাঘ, ভালুক আর মানুষ। আর তার মাঝে মাঝে আছে বুনোদের বস্তি। আছে কোল, মুণ্ডা হো, খাড়িয়া।

এদিকে মনে যতই আগুন জ্বলুক, শরীর রাগ মানে না। সর্ব্বজিৎ ভিড়ে পড়ল একটা মুণ্ডা মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটা সর্ব্বজিৎর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে যেন ছায়ার মতো। ক্ষেতে চাষ করে সর্ব্বজিৎর সঙ্গে, ঘর ছায়, বন সাফ করে। ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনো করে।

মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হতেই সর্ব্বজিৎ তাকে বিয়ে করে ফেললে। সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে সে শুরু করল বড় করে চাষের কাজ। পাথুরে জমি সাফ করে চাষের উপযুক্ত জমি তৈরী করা বড় সহজ কথা নয়। সর্ব্বজিৎরা স্বামী-স্ত্রীতে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বেশ খানিকটা জমি তৈরী করে ফেললে। ফসল ফলল তাতে। ক্রমশঃ একটা একটা করে চার সন্তান হল তাদের। সর্ব্বজিৎ এতদিন পরে মনের মতো ঘর খুঁজে পেল।

—বেশ কটা বছর ছিলাম সাহেব।—জ্বলজ্বলে মুখে বললে সর্ব্বজিৎ।

পরের চাকরি বদমায়েশি, তা সে সরকারি হোক আর বেসরকারি হোক। স্বাধীন কাজ করে খাব, মেহনতের রোজগার খাব, কারুর কোন তোয়াক্কা করব না। গরীব ছিলুম বটে, কিন্তু মাথা উঁচু করে থাকতে পারতাম। আর বুনোদের সঙ্গে থাকার একটা সুবিধে হল, ওদের পাপ-পুণ্যির ধারণাগুলো আমাদের মতো

উচিৎ নয়। আমার সঙ্গে ওদের বনিবনা হোত খুব।

সিগারেটে গোটাকতক লম্বা লম্বা টান দিয়ে সেটা পাশের মেঝেতে ঘষড়ে নিভিয়ে রেখে সর্দ্দার এবার একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দু'চোখ বুজিয়ে মাথার চুলগুলো মুঠো করে পাকিয়ে ধরে বললে—এরপর এল সেই সর্বনাশা খরা।

ওঃ, সে যে কি খরা! সাহেব আমার জন্মে অমন খরা দেখিনি। অমাট জুড়ে গাছপালা মায় ঘাসের সবুজটুকু শুকিয়ে হলদে হয়ে যায় দেখেছেন কি? দেখেছেন কি তাজা গাছের গুঁড়িগুলো শুকিয়ে ফট-ফট করে ফেটে যায়? মানুষ, গরু-ছাগল হাঁস-কুঁকড়ো সব শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে যায় দেখছেন কি? দু'বছরের মধ্যে একফোটা বৃষ্টি নেই। নদীনালা খালবিল সব শুকিয়ে কাঠ, মাটি ফেটে চৌচির। কোথাও এতটুকু জল নেই রস নেই। সে বড় ভয়ানক অবস্থা সাহেব, চোখ মেলে দেখা যায় না। বুদ্ধি একেবারে জবুথবু হয়ে যায়।

পাঁচখানা গাঁয়ের ভিতর একটা পুকুর কি একটা টিউবওয়েল নেই। তেষ্টার জলের জন্যে গাঁয়ে গাঁয়ে হাহাকার। পাঁচ মাইল দূরে একটি মাত্র টিউবওয়েল। সেখানে ভীড় লাগল পিঁপড়ের সারের মতো।

একদিন দুপুরে সর্দ্দারের ছোট ছেলেটা তেষ্টায় কাতরাতে লাগল। তার মা গিয়েছিল জল আনতে। আসতে দেরী হচ্ছিল। দেড় বছরের ছেলেটার কাতরানি শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল ছটফটানিতে। অসহায়ের মতো সর্দ্দার দেখতে লাগল সেই ছটফটানি কি রকম আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত লটকে পড়ল বাচ্চাটা সর্দ্দারের কোলে। তারপরে আর নড়ন-চড়ন নেই তার। বুকের ধুকধুকিটুকু বন্ধ হয়ে গেছে।

ঘণ্টাচারেক পরে তার মা ফিরে আসতে সর্দ্দার মরা ছেলেটার শরীরটা তার কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বার হয়ে পড়েছিল রাস্তায়। আদিবাসী মেয়েটা বুক চাপড়ে হাহাকার করেছিল। কিন্তু তার চোখে ছিল না একফোটা জল। সমস্ত শরীর শুকিয়ে কাঠ, জল পড়বে কোথা থেকে?

চারদিকে লোক মরে উজাড় হয়ে গেল। জল নেই, খাবার নেই। খবর পেয়ে দেশহিতৈষীরা এসে জুটলেন। কাগজে কাগজে হৈ-চৈ উঠল। সরকারের তরফ থেকে জেলা হাকিম এলেন খোঁজ-খবর নিতে। হাকিম তহশীলদারকে জিজ্ঞাসা করলেন— পুকুর কাটান বাবদে দেখছি বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচা হয়েছে। পুকুর কোথায়?

তহশীলদার একটা নীচু জমি দেখিয়ে বললেন—এই যে স্যর।

হাকিম সন্দেহের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন —এটা তো মাঠ। এ-কি পুকুর?

তহশীলদার একগাল হেসে বিনয়ের সঙ্গে বললে—হ্যাঁ, স্যার। এটাই পুকুর ছিল। খরাতে সব জল শুকিয়ে গেছে। এই যে এই দেখুন—

বলে একটা ম্যাপ খুলে ধরে দিলে হাকিমের সামনে।

সর্দ্দার তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। ছেলেটা মরে যাওয়াতে তার বুকের ভিতর তখনও আগুন জ্বলছিল। চেঁচিয়ে উঠল সে পাগলের মতো!—শালা এক নম্বরের চোর। পুকুর এখানে ওর বাবার জন্মেও ছিল না।

তহশীলদার চোখ রাঙিয়ে ধমকে উঠল—চোপ রও মিথ্যেবাদী।

তহশীলদারের চাপরাশী ঘুসি উঁচিয়ে গেল তাকে মারতে। হাকিমসাহেব থামিয়ে দিলেন।

সর্দ্দার কিন্তু রেহাই পেল না। সাত-দিনের মধ্যেই পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে একটা মিথ্যা খুনের মামলায় তাকে আসামী করে বেঁধে নিয়ে গেল। যাবার সময় সর্দ্দার দেখে গেল বাড়ীতে একদানা খাবার নেই।

বিচারে অবশ্য খালাস পেয়েছিল সর্দ্দার। দশটা দিন মিথ্যে হাজতবাস করে ফিরে এল সে। এসে দেখল ঘরবাড়ী সব খালি। ফাঁকা ঘরগুলো হাঁ করে যেন গিলতে আসছে তাকে।

বৌটা গেল কোথায় ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে। এ-বাড়ী ও-বাড়ী খোঁজ নেয় সর্দ্দার। কিন্তু সারা গাঁটাই তো তখন শ্মশান। কে কার খোঁজ রাখে?

পাগলের মতো খুঁজে খুঁজে হয়রান সর্দ্দার। একবার ভাবল হয়তো বৌটা চলে গেছে তার বাপের কাছে। সেখানে খোঁজ নেবে কিনা ভাবছে ঘরের দাবায় বসে। একটা বীভৎস পচা দুর্গন্ধ এসে ঢুকল নাকে এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে। মানুষ পচা গন্ধ!

সর্দ্দার এদিক-ওদিক শুঁকে দেখে গন্ধটা আসছে কুয়োর দিক থেকে। বলতে বলতে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল সর্দ্দার।

সাহেব, সেই শুকনো কুয়োর ভিতর আমার বৌ, দুটো ব্যাটা একটা বেটী—ওঃ হো হো হো—

দম-দম করে বুকটা চাপড়াতে লাগল সর্দ্দার।—ওরে হারামজাদা: শুয়োরের বাচ্চা! ওরে গাধা, এতো দেখে শুনেও তোর এতটুকু হুঁস হয়নি? তুই গেলি সরকারের লোকের সঙ্গে লাগতে? এখন ঐ কুয়োর গর্ত নিজের হাতে মাটি ফেলে বুজো। পাথরে জমি ভেজা তোর চোখের জলে। ওরে শালা, কে তোর কান্নার দাম দেবে? তোর পাপ-পুণ্যের হিসেবের তোয়াক্কা করে কে?

সর্দ্দারের সমস্ত শক্তিটা বোধহয় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। সমস্ত ঘরটায় একটা বিশ্রী থমথমে আবহাওয়া চেপে বসেছিল।

সে মুখ খুলল বেশ অনেক পরে। বিড়বিড় করে বলতে লাগল—বিলেত আমেরিকা থেকে খাবার এল জল এল। তুই বেলচ্ছ বেহায়ার মতো তাই গিলে বেঁচে রইলি—

পানিগ্রাহী বললেন—হ্যাঁ, ওরা সে সময়ে প্রচুর সাহায্য করেছিল। সর্দ্দার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল আবার। চোখ পাকিয়ে বললে—শেয়াল কুকুরের জাত আমরা। আমরা কি মানুষ! বেনো জল এল আর গেল। তাতে কি দেশের খরা গেল?

হঠাৎ আমাদের দিকে চোখ তুলে সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে বলতে লাগল—সাহেব, খরা তো বাইরের নয়, এ খরা হল আমাদের মনের খরা। লোকের মনে এতটুকু দয়া নেই, ভালবাসা নেই, মমতা নেই। শুধু দুপুরের রোদের মতো সব শুষে খাবার ইচ্ছে। ছিষ্টি যে নাশ হয়ে যায় গ্রাহ্য নেই।

বলতে বলতে সর্দ্দার কাতরে উঠল— সাহেব দয়া করে আমার টিনের একটা আমাকে দিতে হুকুম করুন। যন্ত্রণাটা খুব বেড়ে উঠেছে বুকের ভিতরে। ওটা না পেলে আমি নির্ঘাৎ মরে যাব—

পানিগ্রাহী একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। নীচু গলায় বললেন— চক্রধারী ওর টিনটো ওকে দিয়ে দাও!

বিজ্ঞানের কথা

প্রযুক্তিবিদ্যার জগতে

সমৃদ্ধ অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে টেকনোলজি বা প্রযুক্তিবিদ্যা। দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলেও এই ভিত্তিটি বজায় থাকা চাই। অতএব যে-কোনো দেশের অর্থনীতিতে ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ইঞ্জিনিয়ারিং পুরোপুরি একালের ব্যাপার নয়। কোনো না কোনো আকারে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চর্চা বহুকাল ধরে চলে আসছে। আগুনের ব্যবহার, কৃষি, মাটির পাত্র নির্মাণ ও চাকা যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের নাম আমরা জানি না, কিন্তু তাঁরা হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক। আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা যে এতখানি উন্নত তার মূলে তাঁদের অবদান সর্বাধিক।

যুগে যুগে মানুষ বহু বৃহৎ নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেছে। সবের পিছনেই রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক বা কৃৎকৌশল। খৃীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে নির্মিত হয়েছিল পিরামিড। সেই নির্মাণকার্যে যদিও বিজ্ঞানের চেয়ে মানুষের শ্রমের প্রয়োজন ছিল বেশি, তা সত্ত্বেও নির্মাণকার্যগত সমস্যা নিয়েও স্রষ্টারা নিশ্চয়ই মাথা ঘামিয়েছিলেন। এতগুলো মানুষকে দিয়ে কিভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করানো যায়, সেটাই তো ছিল বড় একরকম একটা সমস্যা। অতীতের বহু অট্টালিকা, বহু খাল ও পুল, বহু পয়ঃপ্রণালী দেখে বোঝা যায় সেগুলো নির্মাণ করতে নির্মাণকারীদের কম সামর্থ্য ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়নি।

প্রাচীনকালে কৃৎকৌশলগত উন্নতির গতি ছিল ধীর, যদিও বহু বিজ্ঞানের ভিত্তি সেই সময়েই। কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যাক। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন পিথাগোরাস (খৃীষ্টপূর্ব ৫২৮-৫০০), জ্যামিতি নিয়ে ইউক্লিড (খৃীষ্টপূর্ব ৩০০), মেকানিকস ও হাইড্রোস্ট্যাটিকস নিয়ে আর্কিমিডিস (খৃীষ্টপূর্ব ২৮৭-২১২), চিকিৎসা বিদ্যা নিয়ে হিপোক্রাটিস (খৃীষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৭৭) ও গ্যালেন (খৃীষ্টপূর্ব ২০০-১৩০)।

গ্রীক বিজ্ঞানের যুগ শেষ হয়ে যাবার পরে রেনেসাঁস পর্যন্ত সৃজনমূলক চিন্তার স্রোত প্রায় রুদ্ধ ছিল। তারপরেই অনেকগুলো বিখ্যাত নাম। যেমন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, একাধারে শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ার; উদ্ভাবক, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চর্চাতেও সমান উৎসাহী। তাঁর নোট বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো বহু ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং ও বিবরণে ভরা। তাঁকে বলা চলে মেকানিক্যাল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চর্চা করে গিয়েছেন এমন বিখ্যাত ব্যক্তির সংখ্যা তৎকালে অনেক। মিকেলাঞ্জেলোকেও নিশ্চয়ই কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে হয়েছিল।

ব্যাপক উৎপাদনের শুরুও এই সময়ে, মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন হবার সময় থেকে।

১৭৫০ সাল নাগাদ ইংল্যাণ্ডে শুরু হয় শিল্প বিপ্লব। চলে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত। এই শিল্প বিপ্লবের সময়েই শিল্প বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি তার কাঠামোটি প্রতিষ্ঠিত। এই সময় থেকেই যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক হারে উৎপাদন শুরু। এই সময় থেকেই ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থার পত্তন— শুধু পরিবহণগত নয়, চিন্তারও।

শুরু বস্ত্রশিল্প। ১৭৩৩ সালে কে আবিষ্কার করেছিলেন সঞ্চরণশীল মাকু। ১৭৬৫ সালে জেম্‌স হারগ্রীভ্‌স নামে এক অশিক্ষিত ছুতোর আবিষ্কার করেছিলেন ঘূর্ণন্ত সুতো পাকাবার কল। এই দুটি আবিষ্কার ও পরবর্তীকালে আর্করাইট ও কম্পটনের আবিষ্কারের ফলে গৃহজাত হস্তশিল্পের অবসান ঘটে ও কারখানা-ব্যবস্থার পত্তন হয়।

শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন। উদ্ভব হয় ট্রেড ইউনিয়নবাদের সংস্কারসাধন হয় আইনের, অবসান ঘটে দাস ব্যবস্থার, রূপায়ণ হয় রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন বহু মানবিক সংস্কারের। সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের রূপটিও প্রকট হয়ে পড়ে যা সৃষ্টি করে অভূতপূর্ব এক সমাজ-সচেতনতা।

তারপর থেকেই প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত বিকাশ ঘটেছে, বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আর তার আনুষঙ্গিক ফল হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে বহু প্রকারের বৃত্তি ও পেশা। আজকের দিনে বিশ্বের সকল উন্নত দেশে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অবশ্যই বিজ্ঞান।

আজকের মানুষ রকেটবাহিত হয়ে চাঁদে যাচ্ছে। [illegible]-রকেটটিও আবার দূর-নিয়ন্ত্রিত, [illegible] স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত। অন্যতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত এ-ঘটনা। এমনি দৃষ্টান্ত আরো অনেক। রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর জানছে, সাইক্লোট্রনের সাহায্যে পরমাণুর ভিতরকার খবর—সবকিছুই নিখুঁত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও নির্মাণকার্যের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানকালের জীবনের প্রতিটি দিক রূপায়িত হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে।

বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেই ইঞ্জিনিয়ারদের সংগঠন আছে। ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর সমস্যা, যন্ত্রের উন্নতিসাধনের সমস্যা, কর্মস্থানের পরিবেশগত উন্নয়নের সমস্যা ইত্যাদি নিয়েই সংগঠনের মধ্যে ইঞ্জিনিয়াররা প্রধানত আলোচনা করে থাকেন। দেশের পরিচালনার ভার যাঁদের হাতে তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে শুনে থাকেন।

ইঞ্জিনিয়াররা হচ্ছেন মাথার মণির মতো।

আরো পেঁয়াজ খান

একদল সোভিয়েট বিজ্ঞানী গত দশ বছর ধরে মানুষের শরীরের ওপরে পেঁয়াজের ক্রিয়া নিয়ে গবেষণার পরে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পেঁয়াজে এমন সব প্রয়োজনীয় পদার্থ আছে—যেমন ভিটামিন সি, ভিটামিন বি-২, ক্যারোটিন ইত্যাদি—যা বহু প্রকারের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে।

গবেষণাটি চলেছে খারকভে। গবেষণার ফলে পেঁয়াজ থেকে কয়েকটি নতুন ভেষজও তৈরি হয়েছে। এমনি একটি ভেষজের নাম অ্যালিলসেপাম। এই ভেষজটি পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়ক ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার উন্নতিসাধক। পাকস্থলীর ও অন্ত্রের বহু প্রকারের রোগে পেঁয়াজ থেকে প্রস্তুত ভেষজ ব্যবহার করে খারকভের বিজ্ঞানীরা সুফল পেয়েছেন।

একই সঙ্গে শুকনো পেঁয়াজ নিয়েও গবেষণা চালানো হয়েছে। পরীক্ষাকার্যে একদল খরগোশের শরীরে কৃত্রিম রোগ সৃষ্টি করা হয়। তারপরে প্রয়োগ করা হয় শুকনো পেঁয়াজ থেকে প্রস্তুত ভেষজ। দেখা যায়, খরগোশের শরীরে রক্তের কোলেস্টেরিন স্তর অনেক নিচে নেমে গিয়েছে।

টাটকা পেঁয়াজের রস নিয়েও এই বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বহুপ্রকারের রোগে পেঁয়াজের রস যে নিরাময়ের সহায়ক তার প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন। এমনকি ডিপথেরিয়া ও যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতাও পেঁয়াজের রসের আছে।

খারকভের এই বিজ্ঞানীরা দশ বছর গবেষণা চালাবার পরে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন : আরো বেশি পেঁয়াজ খান! কি ছোট কি বড়ো, পেঁয়াজ সকলের পক্ষেই উপকারী। পেঁয়াজ বহুপ্রকারের রোগের আক্রমণ ঠেকাতে পারে। যাঁরা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন, যাঁদের অন্ত্রের নিঃসরণগত ক্রিয়ার গোলমাল আছে, খারকভের বিজ্ঞানীরা তাঁদের আরো বেশি করে পেঁয়াজ খেতে বলছেন। তাতে উপকার ছাড়া অপকার হবে না।

খাদ্যবস্তু হিসেবে পেঁয়াজ এমনকি আমাদের দেশেও অপেক্ষাকৃত সস্তা। পেঁয়াজ মজুদ করে রাখাও অপেক্ষাকৃত সহজ। বহুকাল মজুদ থাকলেও পেঁয়াজের গুণ নষ্ট হয় না। খাদ্যবস্তু হিসেবে পেঁয়াজের ওপরে অনায়াসেই আরো বেশি নির্ভর করা যেতে পারে।

যদি কাঁচা পেঁয়াজ খেতে কেউ নারাজ থাকেন তাঁকে জানাই—আস্ত একটি করে কাঁচা পেঁয়াজ রোজ যদি চিবিয়ে খেতে পারেন তাহলে আপনার দাঁত নিরোগ থাকবে। বিখ্যাত একজন দন্ত-চিকিৎসক একথাটি বলেছেন।

মানুষের শরীর জীবাণুর আক্রমণ ঠেকায় কি করে?

ইংরেজ বিজ্ঞানী ডঃ জন বুলেন এ-বিষয়ে একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। তত্ত্বটি এখনো সাধারণভাবে গৃহীত নয় তবে তত্ত্বের সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্ট। যদি এই তত্ত্বটি শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয় তাহলে চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণায় বড়ো রকমের ধাক্কা পৌঁছবে।

ছোটো কথায় তত্ত্বটি এই : মানুষের শরীর জীবাণুর আক্রমণ ঠেকিয়ে থাকে জীবাণুরা যাতে লোহের যোগান না পায় তার ব্যবস্থা করে। শরীরের ভিতরে জীবাণুর বাড়বৃদ্ধির জন্যে যে মৌলিক পদার্থটি অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন তা হচ্ছে লোহ। এই লোহ থেকে যদি জীবাণুকে উপোস করিয়ে রাখা যায় তবে জীবাণুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

শরীরের ভিতরের জীবাণুগুলো লোহের যোগান পায় কোথা থেকে? একটি প্রোটিন থেকে, যার নাম ট্রান্সফেরিন। এই প্রোটিনটিকে বলা চলে রক্তের মধ্যে লোহের বাহন। অর্থাৎ রক্তের মধ্যে লোহ আসছে ট্রান্সফেরিনের মাধ্যমে। যদিও লোহের সঙ্গে ট্রান্সফেরিনের বন্ধন রাসায়নিক কিন্তু জীবাণুর এমন একটা বিশেষ আয়োজন আছে যে, এই রাসায়নিক বন্ধন শিথিল করে লোহ আত্মসাৎ করতে পারে। এই লোহের যোগান বজায় থাকলেই জীবাণুর বাড়বৃদ্ধি। ডঃ বুলেন বিশ্বাস করেন, মানুষের শরীরে রোগের আক্রমণ ঠেকাবার যে ব্যবস্থা আছে তা সক্রিয় হলে জীবাণুর বাড়বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য লোহের যোগান বন্ধ হয়ে যায়।

রোগের আক্রমণ ঠেকাবার ব্যবস্থায় বা প্রতিষেধক ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা দুটি পদার্থের : অ্যান্টিবডি ও কমপ্লিমেন্ট। অ্যান্টিবডি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক যৌগ, রক্তের শ্বেতকণিকার দ্বারা সৃষ্ট। শরীরের মধ্যে যখনই বাইরে থেকে কোন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় অ্যান্টিবডি। শেষোক্ত পদার্থটি এখনো পর্যন্ত কিছুটা রহস্যজনক একটি রাসায়নিক যৌগ, রক্তের মধ্যে যা পাওয়া যায়।

শরীরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবার পরে বাইরের পদার্থ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে অন্তত তিনটি উপায়ে। অ্যান্টিবডি ও কমপ্লিমেন্ট একযোগে এমন একটি ব্যবস্থা করে যাতে জীবাণুর মধ্যে লোহ আত্মসাৎ করার বিশেষ আয়োজন কার্যকর না হয়। কিম্বা এমন একটা ব্যবস্থা করে যাতে লোহ আত্মসাতে বাধা সৃষ্টি হয়। তার মানে, জীবাণুর মধ্যে যে আয়োজনটি থাকার জন্যে ট্রান্সফেরিন থেকে লোহ বেরিয়ে আসে তা যাতে জীবাণুর সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে, কোন-না-কোন ভাবে তারই একটি ব্যবস্থা।

এই তত্ত্বের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব নেই। একটি বেশ জোরাল সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। মনে করা যাক, একটি জীবদেহে কোন একটি জীবাণুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিষেধ খাড়া আছে। অর্থাৎ এই জীবাণুর আক্রমণে এই জীবদেহ কখনোই কাবু হয় না। ধরা যাক এই বিশেষ জীবদেহে এই বিশেষ জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ধরা যাক জীবাণু তখনো শরীরের মধ্যে জীবিত। এমনি অবস্থায় যদি শরীরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লোহঘটিত যৌগ সরবরাহ করা যায় তাহলে দেখা যাবে শরীরের প্রতিষেধ ভেঙে পড়ছে ও জীবাণুর বাড়বৃদ্ধি ঘটছে। কেন এমন হয়? প্রচুর পরিমাণে লোহঘটিত যৌগ সরবরাহ করার ফলে রক্তে লোহের যোগান বেড়েছে এবং জীবাণুগুলো সরাসরি লোহ টেনে নিতে পারছে। প্রতিষেধ-ব্যবস্থার আর কোন কার্যকারিতা তার ফলে থাকছে না। কেননা প্রতিষেধ-ব্যবস্থার ফলে মূল যোগান থেকে লোহ টেনে নেওয়া সম্ভব না হলেও বাড়তি যোগান থেকে অনায়াসেই সম্ভব হচ্ছে। কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই : প্রতিষেধ গড়ে ওঠা শরীরেও যদি প্রচুর পরিমাণ লোহ সরবরাহ করা যায় তাহলে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবডি থাকা সত্ত্বেও জীবাণুর বাড়বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

এই তত্ত্ব এখনো পর্যন্ত সমর্থিত নয়। সমর্থিত হলেও এই মুহূর্তে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাবে তাও নয়। তবে এই তত্ত্বটি যদি সঠিক হয় তাহলে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনতে পারে। তখন চেষ্টা থাকবে শরীরের নিজস্ব প্রতিষেধ-ব্যবস্থাটিকে আরো শক্তিশালী করে তোলার।

—অয়স্কান্ত

পিঞ্জর

সুভাষ সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—আপনার শরীর কি ভাল নেই?

শোভনের আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠল মীরা। ওকে এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। উঃ কী ধারালো চোখ! চোখাচোখি হবার ভয়ে সে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। জবাব দেবার ইচ্ছা ছিল না! কিন্তু ও কী ভাববে। কোনরকম সন্দেহ জেগে উঠুক তা সে চায় না।

—বেশ আছি। সামান্য হাসল সে, বরং আপনিই ঠিক নেই।

—সত্যি। প্রদীপ রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। একবার চোরা-চাহনী দিল বীথির দিকে। বীথির সাজ-সজ্জা একটু বিশেষ ধরণের। উগ্রতা ফুটে বেরুচ্ছে। বারবার বুক ঢাকছে বীথি। তেরচা চোখে দেখছে প্রদীপকে। কোন কিছু চোখ এড়াল না মীরার।

শোভন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আজ সারাদিন রোদের মধ্যে ঘুরেছি। তোমাদের মত আরামের চাকরী নয়। রোদ-বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে কাজ। আর ভাল লাগে না। ভাবছি সব ছেড়ে রাজনীতি সুরু করি। দিন-দিন দেশটার যা হাল হচ্ছে...!

—থাম দাদা! বীথি ঠাট্টার সুরে বলে, চা খাও। তারপর স্নানটান করে এসো। মাথা ঠান্ডা হবে।

—হোয়াট ডু ইয়ু মিন? শোভন সোজা হয়ে বসল, দেখলে প্রদীপ। সব কথায় ঠাট্টা। বিয়ে তো করছো—পরে টের পাবে। তোমাকে ডোবাবে মেয়েটা!

প্রদীপ অপ্রস্তুতভাবে হাসল। বেচারীর অবস্থা দেখে মনে মনে হাসল মীরা। বীথির মুখ কালো হয়ে উঠেছে। ভাইবোনে কী ঝগড়ায় মেতে উঠবে?

কিন্তু শোভন আর বসল না। হঠাৎ কিছু না বলে বেরিয়ে গেল।

—শোভনদা রেগে গেছেন।

—ভারী বয়ে গেল! বীথি ভেংচি কাটল, শুধু বড় বড় কথা। বহুদিন শুনে আসছি। দাদা ওইরকম। আজ ব্যবসা কাল চাকরী পরশু রাজনীতি। বিয়ে করবে না। ও যে কী চায় জানি না। এখন আবার রাজনীতি ওর মাথায় ঢুকেছে। এই রকম ভাবেই জীবন কাটাবে। শুনলে তো ওর কথা। আমি তোমাকে ডোবাবো প্রদীপ?

প্রদীপ হাসল, বাদ দাও বীথি। ঠাট্টা করেছেন শোভনদা। তাই না মীরা দেবী?

—তাই হবে। সংক্ষিপ্ত উত্তর মীরার, বীথি আমি এবার যাই।

—যা না। তোকে কী বেঁধে রেখেছি!

—বাঃ আমার ওপর রাগছিস কেন? মীরা তাকাল প্রদীপের দিকে, আপনারা গল্প করুন। আমি চলি।

অনুভা ঘরে ঢুকল। প্রদীপ নত হয়ে প্রণাম করতে যায়। মীরা আড়চোখে একবার তাকায়। রীতিমত হাঁপাচ্ছে অনুভা। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এই সময়ে অল্প হাঁটা-চলা করা উচিত।

—থাক। বেঁচে থাক বাবা। অনুভা পাশে সরে যায়, রাতে খেয়ে যেও প্রদীপ।

—আজ থাক। বাড়িতে বলে আসিনি বৌদি।

—বৌদির কথা শুনতে হয়। খেয়ে যাও। তুমি একবার বল না বীথি। বলে খুকখুক করে হাসতে থাকে অনুভা।

—কী হচ্ছে বৌদি! বীথি চোখ পাকিয়ে বলে, তোমরা কথা বল আমি আসছি।

পালিয়ে যায় বীথি। কেননা অনুভার হাসি ঠাট্টা একটু স্থূল ধরনের। শুনলে কান চেপে ধরতে ইচ্ছে করে। প্রদীপের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করে অনুভা। মীরা চুপচাপ শোনে। একটু পরে বীথি ঘরে ঢোকে। ওকে একপাশে টেনে নেয়। প্রদীপ সম্পর্কে নানা কথা। এদিকে রাত ক্রমশ বাড়ছে। মীরা এক সময় ওদের কাছ থেকে রেহাই পায়।

ঘরে ফিরে কিছু খেতে ইচ্ছে করল না। নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল পল্টুর পাশে। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করল মীরা। শেষে কখন ঘুমিয়ে পড়ল টের পেল না।

।। বারো ।।

অফিস থেকে ফিরে পোশাক না পাল্টে ড্রইংরুমে বসে রইল রজত। অনেকক্ষণ। কিচেন থেকে ছ্যাকছোঁক শব্দ ভেসে আসছে।

CENTRAL LIBRARY

সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। একমাত্র রামু থাকল। নিঃশব্দভাবে তার সেবা করে যাচ্ছে।

—সাব!

ট্রের ওপর ধূমায়িত কফি। হাত বাড়িয়ে কফির কাপ টেনে নেয় রজত। রামু চলে যায়।

সিগারেট ধরাল রজত। আজ ক্লাবে যায়নি। কদাচিৎ এ সময়ে বাড়ি ফেরে। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা ক্লাব। খানিকক্ষণ হৈ-হুল্লোড়। বেশি রাতে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে আসা। স্নান করে খেয়ে বিছানায় পড়া মাত্র গাঢ় ঘুম। এভাবেই দিনগুলো কাটছে। লতা ছিল। এখন নেই।

নিঃশব্দে খানিকটা হাসল সে। নতুন আর একটা সিগারেট ধরাল। টেবিলের ওপর বাসি কাগজ। একটা ছবি। বন্যায় ভেসে যাচ্ছে ঘর বাড়ি। চারদিকে অথৈ জল। একটা ডুবন্ত বাড়ির ছাদের ওপর একটা বিড়াল স্থির হয়ে বসে। চমৎকার ছবিটা। চোখ সরিয়ে আনল রজত কাগজ থেকে। ধবধব করছে দেয়াল। ঝকমক্। কয়েকটা ক্যালেণ্ডার। হাসি হাসি মুখ পাহাড়ী মেয়েদের। পিঠে বাচ্চা। নীচু হয়ে ঝুঁকে চা-পাতা তুলছে। সোফায় হেলান দিয়ে শরীর এলিয়ে দিল সে।

হ্যাঁ, লতা নেই। সরিয়ে দিয়েছে ইচ্ছে করে। এখন লতা নিশ্চয়ই মিঃ সেনের ঘরে। অথবা কোন হোটেলে কি বারে মুখোমুখি দুজনে বসে। মিঃ সেন খুব স্মার্ট। ভাল লেগেছে মেয়েটিকে। সত্যি মেয়েটা খারাপ নয়। অবসর সময়ে সঙ্গিনী হিসেবে বেশ ভালই।

কিন্তু মেয়েটা অতিরিক্ত কিছু চাইছিল। প্রেম ভালবাসা একান্ত নীরব গৃহকোণ; ভীষণ হাসি পেল রজতের এইসব কথা ভেবে, সেই জন্যেই ইদানীং কোন মেয়ে বা মহিলার সঙ্গে হৃদয় সম্পর্কিত কোন কথা সে বলতে চায় না, বরং ওসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে। লতার অভিপ্রায় জেনে আর সে এগোল না। মিঃ সেনের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিল ওকে।

বার বার মীরার কথা মনে পড়ছে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অথচ ভোলা তার উচিত। কী একগুঁয়ে আর জেদী! সব জানিয়ে দিয়েছে। এখন দেখবে সেখানে আর চাকরী করতে পারে কিনা। পল্টুকে সে তার কাছে এনে রাখবে। যদি না দেয়?

অশান্তভাবে উঠে দাঁড়াল রজত। পায়ে পায়ে শোবার ঘরে এল। সমস্ত শরীরে ঘাম। বিশ্রী গরম। পোশাক পাল্টে বাথরুমে ঢুকল। শাওয়ার বাথের নীচে দাঁড়াল অনেকক্ষণ।

বারান্দায় আবছা অন্ধকার। ইজিচেয়ারে বসে রজত আকাশের তারা গোনার ব্যর্থ চেষ্টা করল। পাশের ফ্ল্যাট থেকে সুর ভেসে আসছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত। কান পাতা করে রইল। একটু পরে ড্রইংরুমে ফিরে এলো। বুক সেলফের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা বই টেনে নিল সে। কয়েকটা পাতা ওলটপালট করে যথাস্থানে রেখে দিল বইটা। তারপর রেকর্ড প্লেয়ার বাজাল। সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে......।

যদি পল্টুকে না দেয় মীরা? সে কী করবে?

কব্জী উল্টে হাতঘড়ি দেখল রজত। সবে সাড়ে আটটা। পাশের ফ্ল্যাট থেকে মিহিকণ্ঠের ক্ষীণ হাসি ভেসে আসছে। কে হাসছে অমন করে? কে জানে। সে জানে না, চেনে না ওদের। এই বছর পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থেকেও ভাল করে আলাপই হয়নি ওদের সঙ্গে। এখন কেউ এলে মন্দ হয় না।

—রামু! রামু! চিৎকার করে ডাকল রজত।

—সাব! সঙ্গে সঙ্গে দরোজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল রামু। ভাবলেশহীন চোখ-মুখ। একবার মনিবের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—খানা রেডি?

—হাঁ সাব। নিয়ে আসবো?

রজত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর উঠে গিয়ে রেকর্ডপ্লেয়ার বন্ধ করল। কী যে হল আজ। কেন ক্লাবে না গিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। যত রাজ্যের আজেবাজে চিন্তা। অল রাবিশ। ধীরে সুস্থে মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে লাগল সে। ব্যাটা রান্না করে তোফা। মীরার চেয়ে ভাল। ওই যাঃ। আবার তার কথা মনে পড়ছে! বলে কিনা স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করবে। সেই যে চিঠি রেখে নাটক করে চলে যাওয়া। কিছুই সে ভোলেনি।

পরের দিন অফিসে কাজের মধ্যে ডুব দিতে পারল না রজত। বার বার মনে হচ্ছিল সে হেরে গেছে। অথচ পরাজয়কে সহজে মেনে নিতে পারছে না। প্রথমে ভেবেছিল, মীরা বেশিদিন রাগ করে দূরে সরে থাকতে পারবে না। ঠিক ফিরে আসবে। জীবন তো সমান্তরাল রেখায় চলে না। একসঙ্গে থাকলে মনোমালিন্য হয়। আবার শান্তিও ফিরে আসে। একদম চিরকালের জন্যে চলে যাওয়া, বিবাহকে অস্বীকার করা—এ যে বড় বেশি দুঃসাহস মীরার পক্ষে! এত সাহস হল কোত্থেকে?

একপাশে ফাইল সরিয়ে রাখল রজত। চারটে বাজে। এবার সে বেরোবে। হ্যাঁ, মনস্থির করে ফেলেছে। সরাসরি মীরার কাছে দাবী জানাবে : পল্টুকে দাও। আমার ছেলে—আমিই মানুষ করবো। তোমার সংস্পর্শে থাকলে ও মানুষ হবে না। যদি সেও পল্টুর ওপর দাবি করে বসে? যদি বলে, ‘পল্টু আমারও ছেলে। ওকে কেন আমি তোমার হাতে তুলে দেব?’

ইস্, বললেই সে কী মাথা নীচু করে চলে আসবে! দরকার হলে জোর করবে। ভয় দেখাবে। কিন্তু কী জেদী মেয়ে! সব জানিয়ে এসেছে। এর পরও কোন্ মুখে সেখানে চাকরী করতে যায়। একদম লজ্জা নেই।

একটু আগেই রজত বেরোল। ফুটপাত ধরে মন্থরগতিতে হাঁটতে লাগল। পাঁচটার আগে পৌঁছন চাই। সেইসব দিনের কথা ওরা ভুলে গেছে। মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ। সে এগিয়ে না গেলে শুকিয়ে মরতো সব। একবার মনে হয়েছিল নীহারের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু লাভ কী। সে ভদ্রমহিলাকে ওরা কেউ পাত্তাই দেয় না। তাছাড়া মীরা এখন ওদের সঙ্গে থাকে না। সব খবর সে রাখে। যত নষ্টের গোড়া বিনতাটা। বোনটির মাথায় কী যে ঢুকিয়েছে......ভাবপ্রবণ হলে যায় হয়। শুধু কথার সার।

খালি ট্যাক্সী দেখে ডাকল রজত। নরম গদীর ওপর আলগোছে বসল। বাইরে ভীষণ ভীড়। রাস্তার কথা বলার চেয়ে বাড়ি যাওয়াই ভাল। রাস্তায় কোনরকম সীন করতে চায় না সে। তার চেয়ে ঘরে বসে মুখোমুখি বোঝাপড়া হবে। কি ভেবে আপনমনে হাসল। খুব চমকে যাবে মীরা। চোখের সামনে ভেসে উঠল ভীতিবিহ্বল বিস্ফারিত একটি মুখ।

ড্রাইভারকে বাড়ির ঠিকানায় যেতে বলল সে। একদিন সে মীরার পিছু নিয়েছিল। ছায়ার মত ওকে অনুসরণ করেছে। একটা সিগারেট ধরাল রজত। ভেতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। কী অপমান!

বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি থামাতে বলল রজত। তারপর মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দিল। প্রায় সাড়ে পাঁচটা। হয়তো এখনও আসেনি। ছটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কিন্তু আধঘণ্টা কোথায় অপেক্ষা করবে। এদিক ওদিক তাকাল। একটু দূরে একটা রেস্টুরেন্ট।

শুধু চা-এর অর্ডার দিতে গিয়ে কী ভেবে মাংসের চপও দিতে বলল সে। রাস্তার দিকে মুখ করে বসল। দুদিকে সারি সারি পর্দা ঘেরা কেবিন। মেয়েলি কন্ঠের হাসি। অন্যমনস্কভাবে চপের একটা অংশ ছুরি দিয়ে কেটে মুখে পুরল রজত। আশে-পাশের নানা টেবিলে সশব্দ হাসি, ফুটবল, সিনেমা, রাজনীতি; স্পষ্ট কোন কিছু তার কানে আসছিল না। সে কোন মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেনি।

রাস্তায় আলো জ্বলেছে। ঘড়ি দেখল রজত। ছটা বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ। কী ভাবে সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে! টের পাওয়া যায় না। ছোঁয়া যায় না। আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে সে। এখন যেন কোন-রকম উৎসাহ পাচ্ছে না। কী হবে পল্টুকে... কে দেখবে ওকে? পল্টু কী ওকে চিনতে পারবে? যদি ওকে দেখে ‘বাবা’ ডাক দিয়ে

ছুটে আসে? সে নিশ্চয়ই সংযত করতে পারবে না নিজেকে। দু'হাত বাড়িয়ে দেবে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল। রজত থমকে দাঁড়াল। এ কোথায় সে এল? হ্যাঁ, কোন ভুল হয়নি তার। রাস্তার দিকের জানালা বন্ধ। এখনও কী ফেরেনি মীরা?

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় রজত। দরোজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। সে একমুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়ায়। তারপর দরোজায় ওপর টোকা মারল কয়েকবার। দ্রুত পদশব্দে পর্দা তুলে বেরিয়ে এল মীরা। চোখাচোখি হল রজতের সঙ্গে। পলকে মীরার মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সে কোন কথা বলতে পারে না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মীরার সিঁথিতে সামান্য সিঁদুরের আভাস। সেদিকে তাকিয়ে রজত একটু অবাক।

—কার সঙ্গে কথা বলছিল মীরা?

রজত মীরার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। চোখাচোখি হয় বিনয়ের সঙ্গে। বিনয়ের কোলে পল্টু। পল্টুর দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকায় রজত। পল্টুও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখমুখের চেহারা আস্তে আস্তে পাল্টে যায়। আস্তে আস্তে যেন তার সব মনে পড়ছে। হাসি হাসি মুখ। চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর ছটফট করে ওঠে বিনয়ের কোলে।

—বাবা! বাবা!

রজত তাড়াতাড়ি এসে কোলে তুলে নেয় পল্টুকে।

—ছেড়ে দাও ওকে। তুমি কেন এসেছো? মীরা রজতের কোল থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে পল্টুকে। কিন্তু পল্টু আরও জোরে আঁকড়ে ধরে রজতকে। আর কান্নার সুরে বলে, তোমার কাছে যাব না। আমি বাবার কাছে থাকবো। বাবা! বাবা!

নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘরে। তিনজনে কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারে না। রজত মীরার চুপসে যাওয়া মুখ দেখতে পায়। বিনয়ের গম্ভীর মুখ। মনে মনে রজত হাসে। পল্টু আপন মনে কথা বলে চলেছে। ঠিক কী বলছে স্পষ্ট সে শুনতে পায় না। যা আশঙ্কা করেছিল তা নয়। ঠিক পল্টু ওকে চিনতে পেরেছে। শত হলেও রক্তের টান তো!

—আমি পল্টুকে নিতে এসেছি। স্পষ্ট উচ্চারণ রজতের। কোনদিকে সে তাকাল না। পল্টুকে মেঝেতে নামিয়ে একটা চেয়ারে বসল। কেউ তাকে বসতে বলেনি। ওর উপস্থিতি যেন বজ্রের মত। ফলে ওরা দিশেহারা টালমাটাল। ধীরে সুস্থে সে একটা সিগারেট ধরাল।

—পল্টুকে নিতে এসেছো! মীরার চোখমুখ বিস্ফারিত, ওকে আমি তোমার কাছে ছেড়ে দেব না। পল্টু, চলে আয় আমার কাছে।

মীরা এগিয়ে এল কয়েক পা। কিন্তু পল্টু রজতকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বলে, না না না! আমি বাবার কাছে থাকবো।

—দেখলে তো। রজত মৃদু হাসল, সুতরাং জোর করা বৃথা। ও বড় হয়ে উঠেছে। আমাদের ভিতর যাই হয়ে থাক, ওর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে। ওকে আমি সামনের মাসে বোর্ডিংয়ে ভর্তি করে দেব। চিন্তা কর না। ও যাতে সুশিক্ষা পায় যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

মীরার দু'চোখ বেয়ে জল এল। দু'হাতে সে মুখ লুকোয়। বিনয় ওর মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বলে, কাঁদিস না। পল্টুর কথা তুই ভুলে যা। আমি জানতাম, শেষ পর্যন্ত তোকে আঘাত হানবে রজতদা। সমস্ত দিক থেকে হেরে গিয়ে লোকটা উন্মাদ হয়ে গেছে!

—চমৎকার! ব্যঙ্গের হাসি রজতের মুখে, তোমার অন্তর্দৃষ্টির তারিফ করতে হয়। বিনয়, তুমি ছেলেমানুষ। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। যদি বেঁচে থাকি দেখবো, আমরা কে কিভাবে হেরে গেলাম। আচ্ছা, এবার আমি উঠছি।

মীরা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে এসে জড়িয়ে ধরতে যায় পল্টুকে। পল্টু তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে। রজতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে কান্না শুরু করে। রজত মীরাকে বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে পল্টুকে কোলে তুলে দ্রুত ঘর ছেড়ে বাইরে এল। পিছনে আর্ত চিৎকার। রজত লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়। একটা ট্যাক্সীতে উঠে পড়ে। গাড়ি ছুটে চলে। পল্টুর দিকে হাসিমুখে তাকায়। পল্টুর চোখে জল।

॥ তের ॥

নীরব দর্শকের মত বিনয় চুপচাপ বসে থাকে। ঘরের মধ্যে অনেকের উপস্থিতি টের পায়। মীরাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই। নানা-রকম প্রশ্ন করছে। মীরা কোন উত্তর দিচ্ছে না। তাকাচ্ছে না কোনদিকে। সর্বস্ব হারিয়ে সে যেন নিঃস্ব, অসহায় তার চোখ-মুখের চেহারা।

—আমার নাম বীথু।

বিনয় হাত জোড় করে নমস্কার করল, বুঝতে পেরেছি। আপনার কথা খুব বলত মীরা।

—'আপনি' নয়। ছোটবোনকে কী 'আপনি' করে কেউ বলে?

—বেশ। মৃদু হাসল বিনয়, শোন বীথু। তুমি তো সবই জান। মীরার মনের অবস্থাটা বুঝতেই পারছো। তাই বলছি ওকে এখন একটু একা......।

—নিশ্চয়ই। বীথু বিনয়ের সঙ্গে অনুতা আর শোভনের পরিচয় করিয়ে দিল। মীরাকে জেরার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করছিল অনুতা। ব্যাপারটা বিনয়ের কাছে চরম বিরক্তিকর।

অনুতা বলল, কেস করা উচিত। জোর করে ছেলে নিয়ে যাবে, কেন দেশে আইন আদালত নেই। কী বলেন বিনয়বাবু?

কী আর বলবে বিনয়। সে শুধু মৃদু হেসে সায় দিল। তার লক্ষ্য ছিল শোভনের দিকে। চেনা চেনা মুখ মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না। এরকম হয়, হঠাৎ কাউকে দেখলে, ভীড়ের মধ্যে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, খুব পরিচিত মনে হয়। তারপর স্মৃতির সিন্দুক খুলে পাগলের মত খোঁজা, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া।

—আমার কী মনে হয় জানেন? শোভন একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় বিনয়ের দিকে, এখন মীরা দেবীর একা থাকা উচিত নয়। দ্যাট ম্যান, কিছু মনে করবেন না, রজত-বাবুর কথা বলছি—রিয়েলি এ ক্রুয়েল ফেলো! আপনি মশাই ওকে সহজে রেহাই দেবেন না।

বিনয় অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করল। এরা, দেখা যাচ্ছে, মীরার সত্যিকারের আপনজন! এদের আন্তরিকতায় তার মুগ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু সে আর এখানে বসে থাকতে পারছে না।

—দেখি কি করা যায়। বিনয় আর কথা বাড়াল না। শোভনের কথা বলার ঢং তাকানো কেমন যেন। একটু চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। মানুষকে এত অল্প সময়ে বিচার করা যায় না। কিন্তু বিনয়ের স্বভাব, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকে যাচাই করা। ঘনিষ্ঠ না হলে সহজে সে মুখই খোলে না।

একটু পরে ওরা সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ঘরে বিশ্রী স্তব্ধতা। বিনয় চুপচাপ মীরার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেচারী বড় কঠিন আঘাত পেয়েছে। পল্টুর শোক ও ভুলতে পারবে কিনা সন্দেহ। রজতদা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চায়। সুযোগ পেয়েছে। জানে কোথায় আঘাত দিলে মীরা ভেঙে পড়বে।

সে কোন বাধা দেয়নি। দেবে কী, পল্টুর কাণ্ড দেখে অবাক। কিছুতেই মীরার ডাকে সাড়া দিল না। রজতদা ডাকা মাত্র ওর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। পল্টু যদি যেতে অস্বীকার করত, কান্নাকাটি অথবা অসম্মতি জানাত, তখন কিছু একটা করা যেত। রজতদা জোর করলে প্রতিবাদ করতো।

এ ছাড়াও আপত্তির কারণ অনেক। মীরার ওভাবে পল্টুকে সঙ্গে করে চলে আসা, যদিও প্রথম দিকে সেই অনেক

আশ্বাস জানিয়েছে: আজ মনে হয়, ওদের মধ্যে কিসের বিরোধ, কেন একসঙ্গে থাকতে পারল না? স্পষ্ট করে কিছু বলেনি মীরা। হয়ত বলা সম্ভব নয় ওর পক্ষে অথবা বলতে চায় না। যাই হোক, আজ মনে হয়, সমস্ত রকম কাজের জন্যে ফল ভোগ করবে মীরা একাই। কেননা সে অন্যের পরামর্শ চায় না। গুরুতর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় সে একাই। এতে আপত্তির কিছু নেই। ক্ষমতা থাকে, লড়ে যাও একা! অন্যকে বিব্রত করা ঠিক না।

—মীরা!

একবার বিনয়ের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় মীরা। একটু পরে ফিরে আসে। চোখমুখে জলবিন্দু চিকচিক করছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মোছে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। পল্টুর বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না বিনয়। মীরার হাবভাব মোটেই ভাল লাগছে না। কিছু বলুক। চিৎকার করুক। প্রাণভরে কাঁদুক। সেও ভাল। কিন্তু এভাবে পাষাণ প্রতিমার মত স্থির হয়ে দাঁড়ানো, উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকানো, আর সে সহ্য করতে পারছে না। কোনরকম সান্ত্বনা দেবার ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছে না।

আবার বিনয় নরম গলায় ডাকল, মীরা! লক্ষ্মী বোন এদিকে তাকা।

বিনয়ের মুখোমুখি দাঁড়াল মীরা, ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, টলটল দুটো বড় বড় চোখ।

—পল্টুকে ছাড়া আমি বাঁচবো কিভাবে দাদা! দু হাতে মুখ ঢেকে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল মীরা।

—ছি! বিনয় এগিয়ে এসে মীরার মাথায় হাত রাখল, এত নরম মেয়ে তুই জানতাম না। চোখ মোছ। শোন যা বলছি। ও কি, লক্ষ্মী আমার কথা শোন!

মীরার ফোলা ফোলা চোখমুখ। ওর দিকে তাকাতে পারছিল না বিনয়। বলল, বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে আয়।

বিনয়ের কথা শোনে মীরা। এবার ওর ফিরতে একটু দেরী হয়। পায়চারী করে বিনয়। ঘন ঘন সিগারেট টানে। খুব শক্ত পরশমত বাঁচা। স্বাধীনভাবে বাঁচার চেষ্টা এখন তার কাছে অলীক মনে হয়! বরং ছকের মধ্যে চলাফেরা সহজ। সেভাবেই তো সব্‌ই একটির পর একটি দিন...। ঠাট্টা করে বলে দিনগত পাপক্ষয়। কিন্তু ঐ তো সত্য। বড় নিষ্ঠুরভাবে সত্য!

—তুমি রাতের খাবার এখানেই খেয়ে যাও। স্থির শান্ত উচ্চারণ মীরার। ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বিনয়।

—আজ থাক। শোন, যা হবার হয়ে গেছে। কেঁদে লাভ নেই কিছু। এখন তুই কী করবি? আমাদের ওখানে ফিরে চল।

—না! আমি একা থাকতে চাই দাদা।

—ভাল করে ভেবে দ্যাখ। তুই মার সঙ্গে কী একটু মানিয়ে চলতে পারবি না?

—না। কিছু মনে কর না দাদা। মাকে তুমি জান। ফিরে গেলে প্রথম প্রথম দু'-চারদিন কিছু হবে না। ফের শুরু হবে চিৎকার, অশ্রাব্য ভাষার ঝগড়া, কী দরকার লোক হাসিয়ে!

বিনয় গম্ভীর মুখে বলল, বেশ তাই হবে। আমি চললাম। যখনই দরকার হবে ডাকবি।

—কেন দরকার ছাড়া বুঝি খোঁজ নেবে না! বিনয়ের পিছন পিছন সদর দরোজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল মীরা।

বিনয় জোর করে হাসার চেষ্টা করল, তা নয়। চিন্তা করিস না। দেখবি ঠিক তোর খবর নিচ্ছি।

হনহন করে এগিয়ে যায় বিনয়। অনেকটা হাঁটার পর পিছন ফিরে তাকায়। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে রয়েছে মীরা। মুখ ফিরিয়ে সে আরও জোরে হাঁটতে থাকে। মীরার বিরুদ্ধে রাগ বা অভিমান কিছুই হচ্ছে না। একমাত্র বিরক্তি ছাড়া। বড় স্বার্থপর মীরা! অন্যের কথা ভাবে না। এত যে কান্না পল্টুর জন্যে, দুদিন পরে ওকেও ভুলে যাবে। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাকগে যা খুশি করুক। সে আর মাথা ঘামাবে না। তবে প্রতিবার কোন না কোন ঘটনায় তার এ সঙ্কল্প ভেঙে যায়।

॥ তেত্রিশ ॥

দরোজা খুলে রান্নাঘরের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যান নীহার। বিনয় একটু থমকে দাঁড়ায়। মার মুখ গম্ভীর। আজকাল মুখে হাসি নেই। মাকে কী জানাবে ওদের কথা? পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সে। সেই একভাবে বসে আছেন মা। উনুনের দিকে মুখ, চোখে বিষাদ। মার এই চেহারা তার খুব পরিচিত। কী এত ভাবেন? বাবার কথা কী? নাকি মীরার জন্যে দুশ্চিন্তা। বাইরে ক্রোধ প্রকাশ করলেও, মীরার স্বাধীনভাবে চলাফেরায় অসন্তুষ্ট হলেও, মনে মনে ওর কথা ভেবে ছটফট করেন। অতি কষ্টে দুঃখ চেপে রাখেন। সহসা মার জন্যে বিনয়ের প্রাণ কেঁদে উঠল।

—মা। মাগো!

নীহারের পাশ ঘেঁষে উবু হয়ে বসে বিনয়। বহুদিন পরে মার কোলে আশ্রয় পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল। বিয়ের পর থেকে সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে একটা দূরত্বের দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। তার মনে হল আগের মত মা আর তাকে ডাকেন না। মাথায় হাত বুলিয়ে দেন না।

ভাবলেশহীন চোখে নীহার তাকালেন, কী?

—তুমি একা বসে রয়েছো। শেফালী কোথায়?

—জানি না। মুখ ফিরিয়ে নেন নীহার। বলেন, তোমরা কে কোথায় কখন যাও— আমি কী করে জানবো। বুড়ো লোকের সংসারে আস্তে আস্তে প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে!

—বুঝেছি। বিনয় মৃদু হেসে মার গলা জড়িয়ে ধরে, কী হল? রাগ করেছো তুমি।

—ছেড়ে দে। নীহার ছটফট করে ওঠেন, কিন্তু আমার আজকাল কিছু ভাল লাগছে না। আমাকে তুই কোন তীর্থস্থানে পাঠিয়ে দে। শেষ বয়সে আর সংসারের ঝামেলা...।

—আমাদের ছেড়ে পারবে তুমি থাকতে?

—না পারার কী আছে। সবাই পারছে। চোখের সামনে তো সব দেখছিস।

—সত্যি তুমি রেগে গেছো। কেন? শেফালী কোথায়?

—ও তো ওপরে। ফাঁক পেলেই ছুটে যায়। কিছু বলি না। আজকালকার মেয়ে। সেদিন তো আর নেই যে, পাঁচ কথা বললে মুখ বুজে থাকবে। মানুষ চেনা বড় কঠিন।

নীহারের অপ্রসন্ন মুখের দিকে কণকাল তাকিয়ে থাকে বিনয়। সত্যি ভীষণ অন্যায়। শেফালীর এরকম যখন তখন উপরে মা বাবার কাছে যাওয়া অশোভন।

ঘরে ফিরে পোশাক পাল্টায় বিনয়। সাড়ে নটা বাজে। কখন গেছে শেফালী কে জানে। বিছানায় চিত হয়ে শোয়। ঘরের চারিদিকে তাকায়। শেফালী কোন কথা শুনবে না। বেশি কথা বিনয় বলে না। আজ মনে হয় বিয়ে করা তার উচিত হয়নি। ভেবেছিল বিয়ের পর নিঃসঙ্গ থেকে মুক্তি পাবে। মানুষকে ভালবাসতে পারবে। জীবনের প্রতি আসক্তি জন্মাবে। এখন মনে হয়, বিয়ের পর, আরও বেশি বন্ধন তাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত বিস্বাদ ঠেকছে সব কিছু। বিশ্বাস হয় না, এক সময়ে সে প্রেমে পড়েছিল শেফালীর। প্রেম ভ্রম বাজে ব্যাপার।

হঠাৎ সে শেফালীর কণ্ঠস্বর শুনল। বারান্দায় পায়ের শব্দ। একটু পরে শেফালী ঘরে ঢুকল। বিনয় চোখ বুজে ঘুমোবার ভান করল। একটা হাত চোখের ওপর। আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিট পিট করে তাকাল সে।

—শুনেছো! ঘুমোলে নাকি। এত তাড়াতাড়ি।

এ কি! চিমটি কাটছে কেন শেফালী। রাত বাজে দশটা—বলে কিনা তাড়াতাড়ি। বিনয় আড়মোড়া ভেঙে তাকাল। চোখাচোখি হল শেফালীর সঙ্গে।

—ঘুম ভাঙল। হাসি হাসি মুখ শেফালীর, কখন ফিরলে?

—তুমি কখন ফিরলে? গম্ভীর মুখ বিনয়ের। তীক্ষ্ণচোখে সে তাকায়। ওসব

হাসিতে সে ভুলছে না। শেফালী ভেবেছে কী?

হাসি মিলিয়ে যায় শেফালীর। সে একমুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, এখন খাবে তুমি।

—তিনতলায় কী আজকাল রোজই যাওয়া হচ্ছে?

—খোঁচা দিচ্ছ কেন। মাঝে মধ্যে যাই। ওরা ডাকে, না গিয়ে পারি না। বেশ তো আর যাব না।

—আমার মার দিকটাও তো চিন্তা করতে হয়।

—কেন, মা কিছু বলেছেন? তেরচা চোখে তাকায় শেফালী। আস্তে আস্তে এগিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে।

—মা কী বলবেন। সব কথা বলার দরকার হয় না। বিনয় আর কথা বাড়াতে চাইল না। অসহ্য লাগছে তার। শেফালীর ব্যবহার, কথা বলার ঢং দেখে সে মনে মনে রীতিমত আহত।

—তোমরা যেভাবে চাইবে সেভাবেই চলবো। শেফালীর কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনায়, মানুষকে চেনা বড় কঠিন!

—কী বলতে চাও! বিনয় অতিকষ্টে উত্তেজনা দমন করল, তোমার কী ভাল লাগছে না আমাদের এখানে থাকতে? তোমার চলাফেরায় কোনদিন একটা কথা বলিনি। তবে?

শেফালী ঘুরে দাঁড়াল, কিছু না। থাক আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চল, তোমাকে খেতে দি।

বিনয় আর কিছু বলল না। নীরবে খাওয়া শেষ করল। হাতমুখ ধুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে দরোজা খুলে বারান্দায় দাঁড়াল। একবার ভাবল ছাদে যায়। পরক্ষণেই মনে হল ঘুম আসছে তার। আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে ছেলেমেয়েদের পড়ার শব্দ রেডিওতে আধুনিক গান, ছিটকে আসা অস্পষ্ট হাসি, কথাবার্তার টুকরো টুকরো অংশ শুনতে পেল সে।

এভাবে একসঙ্গে থাকার কোন মানে হয় না। হ্যাঁ, শেফালী সম্পর্কে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার মনে হল, বিরোধ ক্রমশ বেড়ে চলবে। হঠাৎ মনে পড়ল রঞ্জিতদা আর মীরার কথা। মীরাও শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে থাকতে না পেরে পালিয়ে আসে। তার আসাটাকে এখন সুনজরে দেখছে না সে। কিন্তু তার নিজের বেলায়? সেই বা কেন মানিয়ে চলতে পারছে না শেফালীর সঙ্গে? সব দোষ কী শেফালীর?

ঘরে ফিরে যায় বিনয়। শেফালী জানালার সামনে দাঁড়িয়ে। মা শুয়ে পড়েছেন। খিল আটকে দেয় সে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। মাথার চুল কপালের ওপরে অনেকটা উঠে গেছে। পাতলা হয়ে আসছে চুল। একটু পাউডার ছিটোল ঘাড়ে গলায়।

শেফালীর পিছনে এসে দাঁড়াল সে। নরম গলায় বলল, চল শোবে। বলে পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল। সজোরে কাছে টানল।

—আঃ ছাড়! দুহাত দিয়ে বিনয়কে সরিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেফালী, ভাল লাগে না।

শেফালীর চোখ মুখ ঠোঁটে ঘন ঘন চুম্বন করল বিনয়।

—ছেড়ে দাও! থাক আর আদর করতে হবে না। তোমার খেয়াল মাফিক আর আমি চলতে পারছি না। আমাকে তুমি রেহাই দাও।

নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল শেফালী। আলিঙ্গন আস্তে আস্তে শিথিল হতে থাকে। বিনয় বিছানার দিকে এগোয়।

চিৎকার হৈচৈ একটা কিছু করতে পারলে বিনয় স্বস্তি পেত মনে মনে। কিন্তু নিঃশব্দে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। স্তম্ভিত হয়ে গেছে শেফালীর কথা শুনে। মুক্তি চায়। রেহাই পেতে চায়। এ কী নিছক ক্রোধের কথা? শেফালী কী সত্যিই মুক্তি চায়?

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শেফালী। এক-পলক সেদিকে তাকাল বিনয়। মশারির ঘেরা টোপের মধ্যে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসল। কিন্তু কোথায় সে যাবে? না, কোন রকম অস্বাভাবিক আচরণ তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিছানায় পাশাপাশি শেফালীর সঙ্গে তাকে শুতে হবে। আরও বহু বছর। মৃত্যু পর্যন্ত! আর সে ভাবতে পারছে না। ঝিমঝিম করছে মাথা।

আসলে শেফালী কী চায়? বহুদিন মনে পড়ে, স্ত্রীর সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার সে করেনি কোনদিন। বড়জোর পছন্দ অপছন্দের কথা বলেছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে। তাদের মধ্যে এমন কী ঘটতে পারে যে, একজন মুক্তি পেতে চায়?

সারারাত ঘুমোতে পারল না বিনয়। এপাশ ওপাশ করে কাটাল। শেফালী বিছানায় এসে শোয়নি। মেঝেতে আলাদা মাদুর পেতে শুয়েছে। কোন বাধা দেয়নি সে।

পরের দিন স্কুলে গেল না বিনয়। ভোরবেলা স্নান করল। শেফালীর সঙ্গে কথা বলবে না, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া, মনে মনে স্থির করল। মা যেন কিছু বুঝতে না পারেন। মা জানতে পারলে খুব আঘাত পাবেন। বিয়ের ব্যাপারে তার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি।

দুপুর পর্যন্ত বই পড়ে সময় কাটাল বিনয়। একটানা পড়তে পারেনি। ঘন ঘন সিগারেট খেয়েছে। পায়চারী করেছে একমনে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে লোকজনের যাওয়া আসা। অস্পষ্টভাবে কানে ভেসে এসেছে জাহাজের ভোঁ ভোঁ শব্দ। আড়চোখে দেখেছে শেফালীর চলাফেরা। আর সব সময় একধরনের অস্বস্তি। অনেকটা জ্বর জ্বর ভাব। কখনও বিছানায় শুয়ে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সিলিংয়ের দিকে।

এখন নিস্তব্ধতা চারিদিকে। মা ঘরে নেই। তিনতলায় সেনগিন্নির সঙ্গে বোধহয় গল্প করতে গেছেন। শেফালী বারান্দায় মাদুর বিছানায় শুয়ে। বিনয় একবার ভাবল ডাক দেবে কিনা শেফালীকে। খোলাখুলি কথা বলার দরকার। হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনতে চায়। তারপর একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু কী ব্যবস্থা সে করতে পারে?

বিছানায় শুয়ে বিনয় ঘুমোবার চেষ্টা করল। সারারাত ঘুমোতে পারেনি। এখন ঘুম আসা উচিত। আজেবাজে চিন্তা থেকে যদি সে মুক্তি পেত! কিন্তু মজা হচ্ছে—মন আয়ত্তের বাইরে। নিজের শরীরের ওপর অধিকার থাকলেও, মন পাগলা ঘোড়ার। আপন খেয়ালে ছুটবে। রুখবে কার সাধ্য!

বারান্দায় এল সে। অন্যদিকে ফিরে শুয়েছে শেফালী। দু চোখ বোজা। অসতর্ক কয়েকটা রুক্ষ চুল কপালের ওপর মৃদু হাওয়ায় উড়ছে। একদৃষ্টিতে বিনয় তাকিয়ে রইল। ঘুমন্ত শেফালীকে এমন মনোযোগ দিয়ে কোনদিন দেখেনি। কী কমনীয় মুখ! কোথাও কুটিলতার চিহ্ন নেই। নাকি ঘুমোলে সবাইকে এমন শান্ত সমাহিত মনে হয়!

মাথা নীচু করে স্ত্রীকে চুম্বন করতে গিয়েও কী ভেবে বিনয় থমকে যায়। তারপর নিঃশব্দে ফিরে আসে ঘরে। আবার সেই কথা মনে পড়ছে। মনে সহজ হতে পারছে না সে। ঘড়ি দেখল। তিনটে বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিল সে।

—শুনছো। জোর গলায় ডাকল বিনয়। শেফালী চমকে উঠে বসল। বিনয়ের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নীচু করল।

—আমি একটু বেরুচ্ছি। আর কোন কথা না বলে বিনয় তাড়াতাড়ি বারান্দা পেরিয়ে দরোজা বন্ধ করে খুলল। পিছনে তাকাল না। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো।

।। পনের ।।

পরপর অনেকগুলি ট্রাম আসছে। একটাতে উঠে পড়ল বিনয়। জানালার ধার ঘেঁষে বসল। এখনও ভীড় শুরু হয়নি তেমন। কোথায় যেতে পারে মনে মনে ভাবল অনেকক্ষণ। বস্তুত এতক্ষণ ঘরে ছিল, ছটফট করেছে। শেফালীর কথা ভেবে বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল। ওর দিকে তাকাতে

এর নাম অপর্ণা

মায়ের চোখের মণি, ১০০ অবধি স্কিপিং করতে পারে
আর নামতা পারে ১১ ঘর অবধি!

আসল জিনিসটি ওর চাই!

অপর্ণা কেবল বলে, 'আমি কবে হব মায়ের মত বড় ?'
ওর মা তাকে বলেন, 'খুব ভাল হবি, খুব কাজের হবি'।
আর তাইতো মা ওকে রোজ হরলিক্‌স খেতে দেন—
যাতে ওর বাড়ন্ত শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়।
হরলিক্‌সই হলো আসল জিনিস।
পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন থাকাতে
হরলিক্‌স ছেলেমেয়েদের শরীর গড়ে তুলতে বিশেষ
সাহায্য করে।

হরলিক্‌স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য
পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এতো গুণ।
হরলিক্‌সের ওপর মায়েদের অগাধ বিশ্বাস।
ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্‌স খেতে
নির্দেশ দিয়ে আসছেন।
রোজ হরলিক্‌স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের
স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।
হরলিক্‌স প্রতিরোধের পুষ্টি আর স্বাভাবিক শক্তি দেয়।

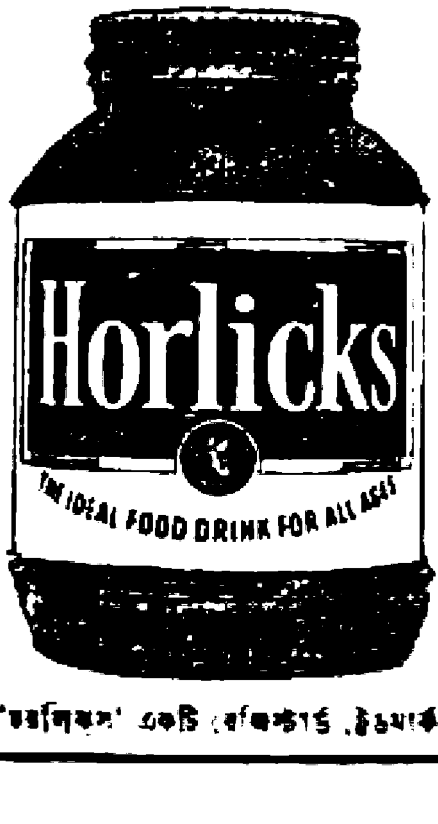

'হরলিক্‌স' হ'লো আসল জিনিস

'হরলিক্‌স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

পারেনি, সহজভাবে কথা বলতে পারেনি। সব সময় ভাল-না-লাগা একটা অনুভূতি...।

সাড়ে চারটার মত বাজে। বিনয় ধর্মতলা পর্যন্ত টিকিট কাটল। একবার সিনেমায় যাবার কথা মনে হল। যে-কোন হলে টিকিট কেটে ঢুকে যাবে। সে ভুলতে চায় শেফালীর কথা। সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে চায়। প্রতি মুহূর্তে এমন শ্বাসরোধকারী মানসিকতা নিয়ে বাঁচা অসম্ভব। এই তো তার চারপাশে অসংখ্য নরনারী। কই কে এমন তার মত ছটফট করছে? বাড়ি ফেরার ব্যস্ততা অনেকের চোখেমুখে। কেউ মার্কেটিংয়ে যাচ্ছে। কেউ হয়ত সিনেমায় যাবে অথবা প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছে। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য আছে। তাদের গন্তব্যস্থান ঠিক আছে। কিন্তু সে অনেক ভেবেও কোথায় যাবে ঠিক করতে পারল না। এমন কোথায়ও যেতে পারলে ভাল হয়, যেখানে মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশার ফলে সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারবে।

একবার বিমলের কথা মনে পড়ল। অনেকদিন যেতে বলেছে। নানা কারণে যাওয়া হয়নি। বিমলকেও সে আসতে বলেছিল কোন এক রোববারে। আসেনি। না, ওর ওখানে যাবে না। আসলে ওর সঙ্গ ভাল লাগে না। ওর কথাবার্তা চালচলন সবকিছু কেরানিসুলভ। আলোচনার প্রসঙ্গও প্রায় একধরনের। তাছাড়া অফিসের কথা শুনতে ভাল লাগে না। ওর অভিযোগ সবার বিরুদ্ধে। সবাই চোর শঠ প্রতারক। শুধু ওই সাচ্চা! খালি আস্ফালন। অর্থাৎ খুবই করুণার পাত্র। ওর কাছে জীবন হচ্ছে ভোরবেলার জেগে গরম এক কাপ চা, খবরের কাগজ, বাজার, অফিস আর রাত্রে অভ্যাসমাফিক সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মশারি তুলে স্ত্রীর পাশে শোওয়া।

হঠাৎ বিনয়ের মনে হল তাকে লক্ষ্য করে কে যেন বলছে, 'তুমিই বা নিজেকে আর সবার থেকে আলাদা ভাবছো কিভাবে? নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পার না, আবার বড় বড় কথা ভাবছো! তুমি চরম স্বার্থপর, আত্মমুখী ও আত্মকেন্দ্রিক। তুমি কোন দায়িত্ব স্বীকার করতে চাও না অথচ বিয়ে করেছো। স্বার্থহীনভাবে বাঁচতে চাও। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, অত সহজ নয় জীবন! কষ্ট স্বীকার কর। কমপ্লেকসকে বাদ দিয়ে সাদা চোখে সব কিছু দেখার চেষ্টা কর। দম্ভ পরিত্যাগ কর। বাস্তবদৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করতে শেখ। আর কবে শিখবে? বয়স তো কম হল না। তিরিশ পেরিয়েছে। এখন আর ভাবালুতা মানায় না হে যুবক!'

চারিদিকে তাকিয়ে বিনয় ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। পর পর অনেক ট্রাম দাঁড়িয়ে। লোকজন রাস্তায় ক্রমশ বাড়ছে। ভীড়ের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে হাঁটতে থাকে। কোন পরিচিত ব্যক্তির মুখোমুখি সে এখন হতে চায় না।

মাঝে মাঝে তাকে উদ্দেশ্য করে কে বা কারা যেন রক্তচোখে অভিযোগ করে। ঘাড় ফিরিয়ে সামনে পিছনে তাকিয়ে নির্বোধ মুখের মিছিল শুধু চোখে পড়ে। ঘর্মাক্ত মুখ। ফ্যাকাসে। দু'চোখের নীচে কালি। কী পুরুষ কী নারী—খুব কম লক্ষ্য করা যায় স্বাস্থ্যে ভরপুর হাস্যোজ্জ্বল চোখমুখ।

মেট্রো সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে সে বাইরের ছবি দেখতে থাকে। আজ শেফালী সঙ্গে থাকলে...। খুব কম ওকে নিয়ে সিনেমায় এসেছে। সত্যি, সেই দুর্ব্যবহার করেছে শেফালীর সঙ্গে। অবহেলা করেছে। ভালবাসা দরকার। হাসিমুখে দুটো কথা বললে অনেক তিক্ততার অবসান ঘটে।

হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, বিনয় আপনমনে মাথা নাড়ল কয়েকবার; নিছক রাগের বশে শেফালী 'মুক্তি দাও' বলে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। ও জানে না, কেউ কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সবাই তো মুক্তি চায়। রেহাই পেতে চায় সবরকম বন্ধন থেকে। কেউ পেয়েছে কী না—ধর্মে বা ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই—সে সঠিক জানে না। তার মনে হয় মৃত্যুই হচ্ছে চরম মুক্তি। স্বাভাবিক মৃত্যু। আত্মহত্যা বা অন্য কিছু নয়। যদিও আত্মহত্যার সপক্ষে বিশিষ্ট এক ফরাসী লেখকের সরব ঘোষণার কথা তার জানা।

টিকিট কেটে বিনয় ভেতরে ঢুকল। লবিতে কয়েকটা সোফা। একটায় বসে সিগারেট ধরাল। ছবি শুরু হতে কিছুটা দেরী। দেয়ালে বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবি। এবং আগামী দু' একটি ছবির বর্ণাঢ্য বিজ্ঞাপন।

জেদ বা অভিমান করে দূরে সরে থাকা বোকামী। এমনিতেই বাইরের নানারকম চাপে স্নায়ু দুর্বল। এরপর আর স্ত্রীর সঙ্গে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মতান্তর পোষায় না। বরং শেফালীর হাসিমুখ...।

হঠাৎ বিনয় চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি সে একটু দূরে সরে যায়। আত্মগোপন করে ভীড়ের মধ্যে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকায়। দু'জনের হাসিমুখ। মীরা আর শোভন।

হলের ভিতর ওরা ঢুকে গেলে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। না, ওকে সম্ভবত ওরা দেখতে পায়নি। হাতঘড়ি দেখল। মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে। হাসিমুখ মীরার। এই তো ক'দিন আগে পল্টুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল রক্তভলা। কী কান্না মীরার! 'আমি পল্টুকে ছাড়া বাঁচবো কী করে দাদা!' সে শুধু মনে মনে হেসেছিল।

হনহন করে বেরিয়ে এল বাইরে বিনয়। টিকিটটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

—দাদা, একস্ট্রা আছে?

—ওই যে। বিনয় ছেঁড়া টুকরো টিকিটের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাল।

—ছিঁড়ে ফেললেন? ভদ্রলোক অবাক দৃষ্টিতে তাকাল বিনয়ের দিকে।

মৃদু হেসে বিনয় এগিয়ে যায়।

কী ভাবল ভদ্রলোক কে জানে। চুলোয় যাক! ভীড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি হাঁটার ফলে বেশ জোরে ধাক্কা লাগল একজন মহিলার সঙ্গে। মহিলার হাতের ব্যাগ ফুটপাথে ছিটকে পড়ে। হতভম্ব বিনয় কী করবে বুঝতে পারে না। বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

ব্যাগ কুড়িয়ে মহিলা কাছে এগিয়ে আসে। ফর্সা একহারা চেহারা। উগ্র পোশাক। চোখমুখ লাল। দ্রুত বুক ওঠানামা করছে। বিনয় বিপন্ন দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল।

—ভদ্রভাবে রাস্তায় চলতে শেখেন নি?

—মাফ করবেন। বিনয় নীচু গলায় বলল, ভীষণ লজ্জিত। তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে...।

ইতিমধ্যে কৌতূহলী কয়েকজন পথচারী ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

—কী হয়েছে? একজন স্বাস্থ্যবান যুবক এগিয়ে এসে ভদ্রমহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমি দেখেছি এই লোকটা আপনাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরেছে।

বিনয়ের মনে হল তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সে কাতর চোখে মহিলার দিকে তাকাল। টের পেল পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে গলগল করে ঘাম নীচে নেমে যাচ্ছে।

—কিছু না। উনি কেন ধাক্কা মারবেন। চলুন সমীরদা। বলে মহিলা বিনয়ের একটা হাত ধরে মৃদু টান দেয়। চোখের ইসারায় হাঁটতে নির্দেশ করল।

মুহূর্তে যে-যার চলে যায়। বিনয় মৃদুস্বরে বলল, ধন্যবাদ। মহিলার মুঠো থেকে হাত সরিয়ে নিল, বিশ্বাস করুন আমি ইচ্ছে করে ধাক্কা দেইনি।

জবাব না দিয়ে মহিলা মৃদু হাসল। আড়চোখে তাকাল বিনয়ের দিকে।

নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে বিনয়। ব্যাপার কী? মহিলা চলে যাচ্ছে না কেন? রীতিমত সুন্দরী। বারবার ওভাবে তাকাচ্ছে কেন? এখন তো চলে যাওয়া উচিত। তা নয় অপাঙ্গে তাকিয়ে মুচকি হাসা। তবে কী... তবে কী...।

—আচ্ছা চলি কেমন। হাতজোড় করে নমস্কার করল বিনয়, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

—শুধু ধন্যবাদ। গভীর চোখে তাকাল মহিলা, খুব ব্যস্ত বুঝি?

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

অঙ্গনা

ক্রীড়াক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে

কারো কারো অভিযোগ, সমানাধিকারের বিধিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি সত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হয় না। তাদের দেখা হয় দ্বিতীয় নজরে। মেয়েদের প্রতি দ্বিতীয় নজরের প্রবণতা যে পুরুষের মধ্যে খুব বেশি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এটা খুব লক্ষ্য করা যায়। পুরস্কারের হার পুরুষ এবং মহিলা প্রতিযোগীর বেলায় বেশ তারতম্য হয়। পুরুষের তুলনায় মহিলা বিজয়ী অনেক কম পুরস্কার পান। এরকম চলে আসছে অনেক দিন। তখন অবশ্য নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথাটা চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আসতো না। সে দিন বদল হয়ে গেছে কবে। সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতিতে এখন আমরা সবাই মুখর। নানা ব্যাপারে মেয়েদের স্বার্থরক্ষার জন্য কারো কারো চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে। কর্তৃপক্ষ সজাগ এবং সতর্ক। পান থেকে চুণ খসবার উপায় নেই। কিন্তু সেই বেওয়াজ সমানে চলছে। তার কোথাও কোন পরিবর্তন হয় নি। ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলা-পুরুষের ফারাকটুকু অক্ষুন্ন রেখেই সমানাধিকারের বুলি সবাই আউড়ে যাচ্ছেন। ভেবেছিলেন, এখানে যেমন চলছে চলুক, অন্যত্র যেন কোন গোলমাল না হয়। এ ভেবেই তাঁরা প্রতিযোগিতার পর প্রতিযোগিতার আয়োজন করছিলেন আর বিজয়ীর পুরস্কারের ব্যবধানটুকু বজায় রেখে চলছিলেন।

কিন্তু তাঁদের এ হেন সুখ স্বপ্নের পরমায়ু আর কত দিন বলা কঠিন। ক্রীড়াক্ষেত্রে এবার প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বের সেরা মহিলা টেনিস খেলোয়াড়রা দাবী করেছেন যে, তাঁদের পুরুষের সমান মর্যাদা দিতে হবে। আমেরিকার প্যাসিফিক সাউথ ওয়েস্ট টুর্নামেন্টের খেলা নিয়েই এই বিতর্কের সূত্রপাত। এই টুর্নামেন্টে পুরুষ ও মহিলা বিজয়ীর পুরস্কারে আকাশ-পাতাল তফাৎ। পুরুষ বিজয়ী এখানে পাবেন ১২,৫০০ ডলার। এ হলো মহিলা বিজয়ীর পুরস্কারের প্রায় সাতগুণ। এসবই অবশ্য সিঙ্গলস বিজয়ীর বরাদ্দ। অপর একটি খেলায় মহিলা বিজয়ী পান মাত্র ২০০০ ডলার। এটি অবশ্য শুধু মেয়েদের জন্যই আয়োজিত। সাংবাদিকদের এই খবর দিয়ে শ্রীমতী রোজমেরী ক্যাসেল বলেন যে, এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। বিশ্বের নামজাদা নামকরা টেনিস খেলোয়াড়রা সাউথ প্যাসিফিক ওয়েস্ট টুর্নামেন্ট বর্জন করেন।

এর উৎস হচ্ছে একটি আমেরিকান পত্রিকা। তাতে বলা হয়েছে যে, দর্শকরা পুরুষদের খেলা যেমন উপভোগ করে, তেমনি মেয়েদেরও। এরপরই মহিলা খেলোয়াড়রা পুরস্কারের বৈষম্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

প্রতিবাদ জানাচ্ছেন পশ্চিম জার্মানীর মেয়েরাও। তাঁরা বলেছেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের দেখা হচ্ছে দ্বিতীয় নজরে। সম্প্রতি তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় মেয়েদের খেলাধুলা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক। এতে উপস্থিত ছিলেন সব ক্রীড়াসংস্থার প্রতিনিধি। সম্মেলনের শেষের দিকে প্রতিনিধিদের ক্ষুব্ধ কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। ওঁরা অভিযোগ করেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি দীর্ঘ দিনের এই বৈষম্য এখনো চলছে কেন? উপস্থিত প্রতিনিধিরা দাবী করেন, এই বৈষম্য দূর করে মেয়েদের খেলাধুলোয় নতুন আবহাওয়া চালু করতে হবে। এতে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই, ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি বর্তমান অনুসৃত নীতি তীব্র সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। আর সেই সুযোগ নিয়েই এবারের সম্মেলনে ঝড় ওঠে।

ঝড় উঠেছে সত্যি কথা। কিন্তু সেই ঝড়ে পুরোনো এবং স্তূপীকৃত সংস্কারের সমাজ থেকে সহজে উপড়ে যাবে বলা খুবই শক্ত। কারণ, এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা কমিটি শুধুমাত্র সমালোচনা করতে পারে এবং পরিবর্তনের দাবী জানিয়ে নতুন পথ অনুসরণের অনুরোধ করতে পারে। তারপর আর তাঁদের করণীয় কিছু নেই। দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসংস্থাকে প্রভাবিত করার অধিকারী তাঁরা নয়।

দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসংস্থা স্বাভাবিক নিয়মেই দীর্ঘ দিন এ সম্পর্কে বেশ উদাসীন ছিল। গত কুড়ি বছরের হিসেব নিকেশ করলে দেখা যাবে যে, মেয়েদের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য তাঁরা বিশেষ কিছুই করেন নি। এমন কি মেয়েদের এতদসংক্রান্ত ছোটখাটো সংস্থাগুলিকে স্বীকৃতি পর্যন্ত দিতে তাঁরা প্রচুর গড়িমসি করেছেন এবং কোথাও কোথাও স্বীকৃতিও দেন নি। অর্থাৎ ইচ্ছা করেই মেয়েদের খেলাধুলোকে পিছিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এখন আর সে সুবিধা নেই। সবাই চাইছেন, মেয়েদের খেলাধুলোর যথার্থ গুরুত্ব আরোপিত হোক। তাই পরিবর্তনের একটা হাওয়াও বইছে। খেলাধুলোয় মেয়েদের অগ্রণী করার ব্যাপারে যথেষ্ট সুযোগ এখন বর্তমান।

সম্মেলনে কোন কোন মহিলা বক্তা মেয়েদের খেলাধুলায় দ্বিতীয় নজরে দেখার জন্য সরাসরি পুরুষদের দায়ী করেন। তাঁরা নানা তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটান তাঁদের বক্তৃতায়। কেউ কেউ ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতির ব্যাপারে নানা অসুবিধার কথা বললে উপস্থিত মহিলা প্রতিনিধিরা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এবং তাঁরা বলেন যে, পুরুষদের গা জিয়োনোর জন্য ইতিপূর্বের সব ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেছে। এছাড়াও তাঁরা আরো নানা অভিযোগে মুখর হয়ে ওঠেন। সর্বোচ্চ ক্রীড়াসংস্থা কোন সময়েই খেলাধুলোয় মেয়েদের আরো আগ্রহ সঞ্চারের জন্য এবং তাঁদের আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টাই করে নি।

একজন মহিলা বক্তা সম্মেলনে সবচেয়ে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটান। সর্বোচ্চ ক্রীড়া-সংস্থায় মহিলা সদস্য গ্রহণের দাবী তাঁরা জানিয়ে এসেছেন দীর্ঘদিন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন আমলই দেওয়া হয় নি। বরাবর পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহিলাদের স্বার্থ রাখার জন্য সেখানে কেউ নেই। পুরুষ প্রতিনিধিরা হচ্ছেন দেশের খেলাধুলার একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা। এভাবে মেয়েদের দীর্ঘদিন বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ ক্রীড়া-সংস্থার মহিলা প্রতিনিধিত্বের দাবীকে দূরে সরিয়ে রেখে এভাবে মেয়েদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করা হয়েছে।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের এতক্ষণে যেন হুঁশ হলো। কেউ এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারলেন না। সবাই প্রায় মাথা নীচু করে বসে রইলেন। এমন সময় সংস্থার নবনির্বাচিত সভাপতি উঠে সকলের মুখ রক্ষা করলেন। তিনি বললেন, সর্বোচ্চ ক্রীড়াসংস্থার মোট নজন প্রতিনিধি আছেন। এতকাল প্রতিনিধিদের সবাই ছিলেন পুরুষ। এবার থেকে নিয়মের একটু রদবদল করা হবে। সংস্থার নবম সদস্যটি হবেন একজন মহিলা। তিনি মহিলাদের ব্যাপারটা দেখাশোনা করবেন। তবে এ ব্যাপারে তাকে যোগ্য হতে হবে। মহিলা স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার মতো ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে তাঁকে। অবশ্য পুরুষ সহযোগীরাও তাঁকে সাহায্য করবেন।

নব নির্বাচিত সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় খেলাধুলায় মেয়েদের ব্যাপারে পূর্বতন কর্তাদের অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সে জন্য তিনি সংস্থাকে নতুন করে [illegible] করার কথা বলেন। সংস্থার কাজ বিগত কুড়ি বছরে মোটেই সন্তোষজনক হয় নি। যা হওয়া উচিত ছিল ঠিক তার উল্টোটাই হয়েছে। যে সুযোগ সুবিধা পাওয়া গিয়েছিল তার প্রতি যথার্থ মনোযোগ দেওয়া হয়নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগের অসদ্ব্যবহার করা হয়েছে। তাই সংস্থাকে এই সমালোচনার মুখোমুখি পড়তে হয়েছে।

সংস্থার কাজকর্ম এবং বিশেষত মেয়েদের ক্রীড়াক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ দেবার জন্য ও বৈষম্য বিলোপের উদ্দেশ্যে তিনি জনসংযোগ আরো বাড়াতে বলেন। সংস্থা সম্পর্কে লোকের আগ্রহ যত বাড়বে ততই খেলাধুলার মান উন্নত হবে। এর সদস্য-সংখ্যাও বাড়াতে হবে এবং বিশেষভাবে মহিলা সদস্য। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা দশ মিলিয়ন। তবু জনগণের মনোযোগ এদিকে পড়ছে না। এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে বের করতে হবে।

সংস্থাকে আরো কর্মক্ষম করার জন্য তিনি এর চারটি কর্মবিভাগ করে প্রত্যেক বিভাগের কাজ নির্দিষ্ট করে দেন।

ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে সংবাদপত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এক সময়ে সংবাদপত্রের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাওয়া যেতো। খেলাধুলায় মেয়েদের মান উন্নয়নে সবাই তখন হাত লাগিয়েছিল। এখনো যে এই সহযোগিতা কমে গেছে এমন কথা বলা যায় না। তবে গত বছর এথেন্সে যে ঘটনা ঘটে গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সবাই একটু বিমনা হয়ে পড়েছে। এথেন্সে ইউরোপীয়ান অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় একজন এমন প্রতিযোগী ছিলেন যাঁর উপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। এই দুর্বলতা কাটিয়ে আগামী মিউনিখ অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য মেয়েদের সমস্ত দাবী মেনে নেওয়া হবে বলে সভাপতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের সমানাধিকারের সমস্ত দাবী ধাপে ধাপে পূরণ করা হবে এবং বৈষম্যও লোপ করা হবে। একাজে প্রয়োজনবোধে সংবাদপত্রে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা হবে।

সমবেত মহিলা প্রতিনিধিদের কয়েকজন সাংবাদিকদের কাছে এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছেন, কেন মেয়েদের খেলাধুলায় বিশেষ উন্নতি এবং অগ্রগতি সাধিত হয়নি। যদিও কিছু কিছু প্রচেষ্টা ছিল তবুও কোন লাভ হয় নি। কোন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ার মূলে ছিল আন্তরিকতার অভাব। যদিও এ সময়ে মেয়েদের সদস্যসংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। এই সদস্যসংখ্যা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মেয়েদের খেলাধুলায় আগ্রহ বাড়লেও তার সুপ্রয়োগ ঘটে নি। এবার তাই মেয়েরা কোমর বেঁধে লেগেছে এ বিষয়ে আরো মনোযোগ দেবার জন্য।

দশ বছর আগে বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার মেয়েদের সংখ্যা ছিল স্বল্প। তখন পুরুষেরা ছিল মেয়েদের সাতগুণ। কিন্তু এখন সে সংখ্যা পাল্টে গেছে। পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার এখন দাঁড়িয়েছে প্রতি তিনজনে একজন। এই হলো আর একটি তথ্য যেখান থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খেলাধুলায় মেয়েদের আগ্রহ আর আগের মতো পিছিয়ে নেই। তাই সর্বোচ্চ ক্রীড়া-সংস্থার মহিলা বিভাগের কাজও বেড়েছে অনেক।

আগামীতে যিনি মা হবেন খেলাধুলার জগত থেকে তিনিও বিদায় নিতে চান না। এরকম প্রমাণও এখন পাওয়া যাচ্ছে। সারা দেশে একটি কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, কিপ ফিট উইথ স্পোর্ট। এ শুধু কথার-কথা হতে পারে না। খেলাধুলার দিকে সবাই যখন ঝুঁকছে তখন তার সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। আর ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের সমান সুযোগ দিয়ে সমস্ত বৈষম্য বিলোপ করলেই মেয়েদের আগ্রহ আগামী দিনে নতুন প্রতিশ্রুতি হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

—প্রমীলা

ফেরা

গোষ্ঠ ঘোষ

সারা রাত ধরে বাইরে টিপ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে শুনেছি কান পেতে। ভোরে উঠে দেখি সারা আকাশ জুড়ে কৃষ্ণ মেঘের মেলা। ইনসপেকসন বাংলোর জনহীন পুরীতে আমি একা, তার চার দেওয়ালের মাঝে একটি মানুষ নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সময় গুনে চলেছে সারারাত রাত।

নিখুঁত করে সাজানো বাংলোর ড্রয়িং রুম। ডাইনিং হলে সাল মাইকার টেবল চেয়ার—বাসনের কাঁচের আলমারী ঝকঝকে তকতকে। বারান্দায় সামনে পেছনে টবে টবে সাজানো অর্কিড, রং বেরংয়ের লতা পাতা, দেশীয় রাজ্যের যবনিকা পাতে মধুব-ভঞ্জের পথে ঘাটে বনবীথিকার সে সৌন্দর্য আর নেই, তাই পথ চলতে গিয়ে দুধারে সাজানো গাছের শোভা দেখতে আজ কেউ থমকে দাঁড়ায় না, তবু বাইরে থেকে যারা এখানে আসে তাদের চোখে পথের ধারে সাজানো শাল মহুয়ার উপবন—ইউক্যালিপ-টাসের সারি সারি গাছের বাগান বেশ লাগে।

বাংলোতে বসে বাঙ্গিংপোসী বাদাম পাহাড়ের পর্বতমালা চোখে পড়ে, মাইলের পর মাইল জুড়ে উঁচু নীচু পাহাড়। সবুজের জলপাথা পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে। পাহাড় জুড়ে সন্ধ্যার ধূসরতা নামতে দেখে মনে হয় বিধাতা পুরুষের অপূর্ব সৃষ্টিরহস্য এ সব পাহাড় মানুষের মনে অহঙ্কার দূর করার জন্যে, মানুষের সৃষ্টি কত তুচ্ছ স্রষ্টার সৃষ্টিরহস্যের গুপ্তেশ্বরতার কাছে।

পাহাড়ের শৃঙ্গ ছাড়িয়ে অত উঁচুতে মেঘ উঠতে পারে না জানি। ভোরে উঠে দেখি জলভরা সাদা কালো মেঘ কুয়াশার মত পাহাড়ের গায়ে জমে। জোর বর্ষা নামেনি কদিন। দুদিন ধরে ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি পড়েই চলেছে। পাহাড়ের চারধারে গুরুগম্ভীর মেঘ জমতে দেখে মনে হল—যে কোন সময় আকাশ ভেঙ্গে বাদল নামতে পারে।

কাল সকালে খড়গপুর স্টেশনে নেমে অনেক দিন পর বাংলার মাটির ছোঁয়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, নিজেকে মনে হল প্রবাসী সন্তান মায়ের কোলে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। স্টেশন ছেড়ে আসতে পা আটকে এল—পঁচিশ বছর আগেকার স্মৃতি এখনও সেখানে জমে। স্টেশনের বাইরে গোলবাজারে গুজরাটী রেস্তোরায় চা খেতে উঠলাম—পঁচিশ বছর আগেকার দোকান আজও ঠিক তেমনি আছে। শুধু মালিকানা বদলে পুত্রের হাতে পরিচালনার ভার এসেছে।

পঁচিশ বছর আগে এমনি এক দুঃখো নিয়ে খড়গপুরে কর্মভার নিয়ে এসেছিলাম। ভবিষ্যৎ ভেবে কত দুর্ভাবনা করেছি সেদিন। বাইশ বছর পরে কাজের খাতিরে আমায় আসতে হয়েছে অতীতে ফেলে যাওয়া পরিচিত সে শহরে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশ কাল সবই বদলে গেছে। বিংশ শতাব্দীর মানুষ বড় বেশী বদলেছে এসময়ে। বয়স বাড়লে মানুষের আবেগ অনুভূতি কমে আসে সাধারণভাবে। আমার বেলায় কিন্তু তার বিপরীত। বয়স বেড়েছে, দায়িত্বের বোঝাও—কিন্তু আবেগ ও অনুভূতি বেড়েছে দ্বিগুণ।

রাতে ট্রেনে এক রকম জেগেই কেটেছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন সারা রাতের ভেতর এসেছে মাত্র চারশ' কিলোমিটার পথ। কখন ভোর হয়েছে, রোদ উঠেছে, বন্ধ কামরার ভেতর থেকে তা জানতে পারি নি। ভোর হওয়ার আগে জানালা খুলে উঁকি দিয়ে দেখেছি ট্রেন টাটানগরে দাঁড়িয়ে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ধীর গতিতে শালজঙ্গল, কাঁকর মাটির রাস্তা ঘেরা গিধনি, ঝাড়গ্রাম, সর্ডিহা, কলাইকুণ্ডা স্টেশন ছাড়িয়ে খড়গপুর জংসনে এসে দাঁড়িয়েছে, নিমপুরা ইয়ার্ড ও শিল্পনগরী খড়গপুরের নতুন সাজ চোখে বেশী করে ধরা পড়ে। শিল্পশ্রী বৃদ্ধির মান ধরা পড়েছে পথের দুধারে সাজানো বাংলো দেখে। সর-ডিহা কলাইকুণ্ডা সামরিক বিমানঘাঁটির আশেপাশে শাল জঙ্গলের গা ঘেঁষে জেগে ওঠা রেস্তোরাঁ। পিচ ঢালানো রাস্তা বিজলী বাতির আলোকস্তম্ভ চোখে পড়ল। দেখলাম কালের সঙ্গে সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন এসেছে। শুধু বদলে যায়নি আমার মন। সে আজও পঁচিশ বছর আগেকার অনুভূতি নিয়ে খুঁজে ফেরে মালঞ্চ নিমপুরার ফেলে আসা পুরাতন পরিচিত শহরতলীকে।

গোলবাজার তেমনি আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম তার চারধার—কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না। মসজিদ, গুরুদ্বার, গির্জার পাশ কাটিয়ে গোরস্থানের পাশ দিয়ে চলেছি জাতীয় সড়কের পাশে। মনে পড়ল, কত রাতে গোরস্থানের পাশ দিয়ে ফিরতে গিয়ে গা ছমছম করেছে অজানা ভয়ে। আজ তার পাশাপাশি রেল কলোনীর বিরাট বিরাট সৌধ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নিয়ন আলোয় ঝলমল করছে। দূর থেকে মালঞ্চ রোডে নাইডু বিল্ডিং চোখে পড়ল। সামনে ভেসে উঠল এক পল্লীবধূর সরল মুখচ্ছবি—কোলে তার দু বছরের মেয়ে একগোছা তাজা গোলাপের মত। কতদিন আগেকার ছবি—মনে হয় যেন এই সেদিনের। পঁচিশ বছর বয়সের মেয়ে আজ কুলবধূ—পল্লীবধূ সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। থমকে দাঁড়ালাম বাড়িটার দিকে চেয়ে। তাকিয়ে দেখলাম—তিনতলার একখানি ফ্ল্যাট। অজান্তে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে প্রশ্ন করল—সেদিন কি আর ফিরে পাওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম প্রবোধদার ভবিষ্যৎবাণী—অনেক বড় হতে হবে। সংসারের তুচ্ছ ছোটখাটো ঘটনাকে বীরের মত মন থেকে ঝেড়ে ফেল।

মস্ত বদলী হয়ে চলে যাওয়ার পথে খড়গপুর ছেড়ে গেছি কতকাল আগে। আমার মনের বন্ধ আলমারির অন্ধকারে ভরা কোন তাকে তার স্মৃতি এতদিন ধূলি ধূসরিত হয়ে পড়েছিল জানি না। আজ মহুয়াবন পথে আবিষ্কার করলাম—আমার মন থেকে কিছুই হারিয়ে যায় নি—সব জমা

CENTRAL LIBRARY

হয়ে আছে আমার অন্তরের মণিকোঠায়—স্মৃতির অ্যালবামের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। শুধু হারিয়ে গেছে সেদিনের হাসিখুসীতে ভরা যুবক—আজকের ভারাক্রান্ত জরাজীর্ণ প্রৌঢ়ত্বের মাঝে।

উড়ন্তকুণ্ড-নিমপুরার পথে চোখে পড়ল ডি সুরিয়া নারায়ণের পুরাতন বাংলো। কমলা সুরিয়া নারায়ণের চলচলে শ্যামল মুখখানি ফুটে উঠল। পঁচিশ বছর আগেকার কমলা আজ পঞ্চাশের কোঠায়। আমারই সমবয়েসী সে। আমার অফিসে কাজ করত। ঘর বাঁধার কত রঙ্গীণ স্বপ্ন দেখেছি তার চোখেমুখে। অবসর পেলেই সে আমায় শোনাত তার মনের কথা। কেমন করে সে আমায় বিশ্বাস করতে শিখেছিল কে জানে? বিশ্বাসের জোরে মেয়েদের মনের অতি বড় গোপন কথাও সে আমায় শুনিয়েছে।

কমলা দেখতে সুশ্রী নয়। বসন্তের দাগ সুস্পষ্ট তার উজ্জ্বল শ্যাম মুখে। তাই তাকে ফুলের ডোরে বাঁধতে কেউ এগিয়ে আসেনি তখনও। তাতে কোন ক্ষোভ ছিল না তার। জরাজীর্ণ পিতার শেষ যাত্রার পথের কথা ভেবে কমলা মুষড়ে পড়ে। তার ভবিষ্যৎ পথের নিশানা না পেয়ে।

তখন মাঘের শেষ। আকাশে বাতাসে শীতের মৃদু আমেজ। সেদিন ছিল মাঘী-পূর্ণিমার চাঁদনীরাত। কমলা আমায় নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের বাসায় রাতের খাওয়া খেতে। আগেই বাসার পাট চুকিয়ে প্রবোধদার বাড়ীতে উঠেছিলাম, নিমন্ত্রণে আপত্তি জানাবার কোন কারণ ছিল না। সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে কমলাদের বাসায় যাই। অসুস্থ বাবা ও বৃদ্ধা ঝি ছাড়া তাদের বাড়ীতে কেউ থাকে না।

রেলওয়ের রিটায়ার্ড অফিসার সুরিয়া নারায়ণ—অন্ধ্রের অধিবাসী। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আমায় ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার যে সারগর্ভ উপদেশ দিয়েছিলেন তা আজও আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন—চাকরী জীবনে স্বীকৃতি জোটে কাজের উপর নয়—উপরওয়ালার খেয়াল খুসীর উপর নির্ভর করে। তাই চাকরী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত বঞ্চিতের অভিশাপ হয়ে দেখা দেয় বেশীর ভাগ অফিসারদের জীবনে। কমলা সব শুনেও একটা কথা বলে নি।

খাওয়ার শেষে সামনের লনে দাঁড়িয়ে সে আমায় বলেছিল—অফিসে অনেকে আপনাকে উপহার দিয়েছে অনেক কিছু। আমারও ইচ্ছে হয়েছিল দেবার। লজ্জায় চেপে রেখেছি। দুটি বছর ধরে আপনার কাছ থেকে যে সব অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছি তার বিনিময়ে উপহার দেবার মত কোন কিছু আমার নজরে পড়েনি। সবই তুচ্ছ মনে হয়েছে।

এখানে কেউ নেই। তাই আমার ক্ষুদ্র উপহার দেখে কেউ হাসবে না—শুধু দেখবে নীল আকাশের বুকে পূর্ণিমার চাঁদ—ছায়া-ঘেরা বনবীথিকা। সাক্ষী থাকবে রাত্রি। ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে সে বলেছিল, বন্দে দিয়ে কমলার দিয়ে কিছু লিখবেন—দু বছর ধরে তাকে যা দেখে গেলেন তার নিখুঁত একটা চিত্র আঁকবেন কালি-কলমের আঁচড়ে।

তাকে কথা দিয়ে এসেছিলাম—কিন্তু তার কথা লেখা হয়ে ওঠে নি। এত বছর পর, আজকে অদেখা কমলার কথা মনে করে তার কথা লিখে গেলাম।

কমলার জবাব খুঁজতে খুঁজতে কলাই-কুণ্ডা বিমান বন্দরের পাশ দিয়ে জোরে গাড়ী ছুটিয়ে বেরিয়ে এসেছি। শালবনের ভেতর দিয়ে সোজা নতুন পথ। মাইলের পর মাইল জঙ্গল পথ ছেড়ে চোখে পড়ে আদি-বাসী কিষাণের গ্রাম। খড়িমাটির আলপনা আঁকা তাদের ছোট্ট কুটির। আদিবাসীদের হাতে সাজানো ছবির মত জাপানী প্রথায় সবুজ ধানের ক্ষেত।

শস্য শ্যামল ক্ষেতের বুক বেয়ে কালো মেঘের ছায়া ফিরে বয়ে এসেছে হিমেল হাওয়া পাহাড়ের গায় লুটোপুটি খেয়ে, শালবনের একটানা সন্‌সন্‌ শব্দ গাড়ীর গায়ে আছড়ে পড়ে মনে আনে দূরের পরশ। লোধাশোল পেরিয়ে—ঝাড়গ্রাম মোহনপুর ডাইনে বাঁয়ে ফেলে বহরাগড়ার রাস্তার নিশানা দেখে চলেছি। চড়াই বনপথ থেকে দীঘলচুলের বেণীর শেষ প্রান্তের মত দূরে রাস্তার উপর চোখে ভেসে উঠল একটি তোরণ—ইংরেজী বাংলা ও হিন্দীতে লেখা—নানা কথা, ড্রাইভার জানায়—বাংলা বিহার সীমান্ত গ্রাম—চিঁচড়া-দারিসোল।

এতক্ষণ ভুলেছিলাম আমি বাংলা ছাড়া, বাংলার মাটিতে অতিথির মত এসেছিলাম কয়েক ঘণ্টার মত। অনাহূতের মতই আমায় বাংলা ছেড়ে যেতে হচ্ছে। চেক-পোস্টে গাড়ী থেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুটো লেখার উপর আমার দৃষ্টি আটকে রইল—বাংলো তোমার আশা পথ চেয়ে রইল—যাত্রা তোমার শুভ হোক্।

চেক্‌পোস্ট ছেড়ে বিহারের সিংভূম জেলার শস্যশ্যামল ক্ষেতের মাঝপথ ধরে গাড়ী ছুটে চলেছে। পল্লীর নিভৃত নিকেতনে আমার মনে তার ছবি মিলিয়ে আলপনা এঁকে কখন রাজপথ ছেড়ে বনপথ ধরেছি, বিহার উড়িষ্যা সীমান্তে। দূরে কেওনঝড় ময়ূরভঞ্জ পর্বতমালার নিদ্রা শিখরে শিখরে তখনও চোখে ভাসছে—বাংলো দেশ তোমার আশাপথ চেয়ে।

পূব আকাশে অরুণোদয়ের আগে ময়ূর-ভঞ্জের পাহাড় উপত্যকা ঘেরা শালপিয়ালের বনপথ ধরে একশ সত্তর মাইল দূরে রাজ-ধানী ভুবনেশ্বরের পথে বেরিয়ে পড়েছি। গতকাল সন্ধ্যে অবধি মনে মনে সময়ের ছক্ করেছি ভুবনেশ্বর হয়ে পুরীর সমুদ্র-তটে জগন্নাথের নাথ পুরুষোত্তম দর্শন করে ফিরে আসব পরদিন। রাতে বন্ধুর সাইটিকা ব্যথার কথা জানিয়ে সঙ্গে যেতে অসম্মত হলেন। একা যেতে হবে এতখানি পথ ভেবে মনমরা হয়ে স্থির করলাম ভুবনেশ্বর পৌঁছে দেখব প্রভু জগন্নাথ আমায় দর্শনে টানেন কিনা।

বর্ষা বাদল মাথায় করে অতি ক্ষিপ্রতায় গাড়ী চলেছে রাজধানীর পানে। আকাশ ভেঙ্গে অঝোরে ঝরছে বৃষ্টিধারা—গুরু-গম্ভীর মেঘের গর্জন। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলক খেলছে দিগ্বলয় রেখায় রেখায়। স্তব্ধ প্রকৃতির থমথমে ভাব। ছত্রিশ মাইল দূরে বালেশ্বর-ময়ূরভঞ্জ সীমান্তে বুড়িবালাম নদীর অপর পারে রোদের ঝলক দেখে মনে আশা জাগল রাজ-ধানীতে সময়ে পৌঁছানো যেতে পারে।

পথে বুড়ি বালামের তীরে খুঁজেছি শহীদ যতীন মুখার্জী আর তার সঙ্গীদের, স্মৃতি-নদীর চরে বালুকা বেলায়। যে সব কিশোর বুকের রক্ত অর্ঘ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে তাদের স্মৃতি কি দেশবাসী ভুলেছে। তাই বুড়িবালামের তীরে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে খুঁজে ফিরলাম বাঘা যতীনের বীরত্ব কাহিনী। খুঁজতে খুঁজতে চোখে পড়েছে বুড়ীবালামের সুদীর্ঘ সেতুর স্তম্ভে স্তম্ভে বিজয় বৈজয়ন্তী হাতে ধরে অতন্দ্র প্রহরীর মত জেগে বাঘা যতীনের দল। বুড়িবালাম, সালন্দী নদী ছাড়িয়ে পাঁচনম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে এগিয়ে এসেছি অনেকটা পথ। আম কাঁঠালের ছায়া ঘেরা বৈতরণী নদীর তীরে তাঁবু ফেলেছে বানে ভাসা গ্রামের উদ্বাস্তুর দল। সর্বস্বান্ত বন্যাগ্রস্ত মানুষরা উদ্বাস্তু শিবিরে মাথা গুঁজে দিন কাটায় সরকারী লঙ্গরখানার লপসী, চিড়ে মুড়ি খেয়ে।

বানের জলে ডোবা ধানের ক্ষেতে জেগেছে বালুর চর, বাড়ন্ত ধানের চারায় শিরে শিরে জমে থাকা লাল পলি লুকিয়ে ফেলেছে আধমরা চারাগুলিকে। আউসের শিষ মাথায় ধরে শুয়ে আছে মাঠের পর মাঠ পলিমাটী, কাঁকর বালুকা ঢাকা হয়ে। মজে যাওয়া মাঠের পানে তাকিয়ে কিষাণের দুচোখ বেয়ে ঝরতে থাকে শ্রাবণের বাদলধারা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা ভাবে বানের জলে ভেসে যাওয়া মাঠের বুকে তারা ফলিয়েছে সোনার ফসল বছরের পর বছর। হেমন্তের শেষে সোনার ফসল তুলে উঠোন ভরে তোলার রঙীন স্বপ্ন দেখেছে এই সেদিনও। সে স্বপ্ন সফল করতে আগামী ফসলের পানে তাকিয়ে তাদের সময় গুনতে হবে দীর্ঘ একটা বছর।

ব্রাহ্মণী নদীর পুলের পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম বালুচরে ঢাকা খরস্রোতা নদীর পানে, ওপারে পাহাড় কেটে তৈরী হয়েছে নতুন পুল। পাহাড়ের তট-দেশে নদীর কোল ঘেঁষে শিবের মন্দির, স্নানের ঘাট—সাধুর আস্তানা। গাঁয়ের মেয়েরা ব্রাহ্মণীর ঘাটে স্নান সেরে শিবের মাথায় বেলপাতা চড়িয়ে প্রণাম করে দূরের গাঁয়ে ফিরে যায় আপন আপন ঘরে। আস্তপচায়ের নৈবেদ্য সাজিয়ে কেউ প্রসন্ত

করে পতি পুত্রের কল্যাণ—কেউ ধনদৌলত—কেউ রোগ নিরাময়। পুল পার হয়ে গাড়ী থেকে প্রণাম জানিয়েছি মহাদেবকে, মানত করতে মন সায় দেয়নি।

দুদিক থেকে মহানদী-কাঠজুড়ী নদী-ঘেরা পুরাতন রাজধানী কটক শহর—বদ্বীপের মত, কালের কবলে কাঠজুড়ী মহানদীর প্লাবনে কটকের অস্তিত্ব কোনদিন লোপ পেতে পারে ভেবে নতুন রাজধানীর পত্তন হয়েছে ভুবনেশ্বরে। সরকারী দফতর সব স্থানান্তরিত হয়েছে সেখানে। শুধু পড়ে আছে উড়িষ্যা হাইকোর্ট অতীতের ঐতিহ্য বুকে ধরে।

কখন মহানদী কাঠজুড়ীর পুল পেরিয়ে জোবরা ক্যানেলের উপর এসেছি জানি না। ক্যানেলের সুউচ্চ সেতুর উপর থেকে নজরে পড়ল লাজনম্র নববধূর বেশে রাজধানী ভুবনেশ্বর—উদয়গিরি খণ্ডগিরির প্রচ্ছদপটে আঁকা ছবির মত শহর। যুগে যুগে শিল্পরাজ যে আশিস জানিয়েছেন, ভাবীকালের ভারতীয় স্থপতিরা তাঁর সে আশিসকে রূপ দিয়েছেন পাহাড় জঙ্গলঘেরা কাঁকর পাথরের বুকে রাজপথের দুধারে মনমাতানো স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শনের মাঝে।

বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, আলো জল—সব প্ল্যান করে তৈরী—ছবির মত দেখতে। কোন সে নিপুণ শিল্পী—যার কল্পনা রূপ নিয়েছে ধু ধু মরুপ্রান্তরের মত শুন্য পার্বত্যভূমির দিকে দিকে—পটে আঁকা ছবির মতন। কার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত স্বপ্ন দিয়ে গড়া বিশ্বকবির বিরাট এ কল্পনা।

ভুবনেশ্বরের সঙ্গে কলকাতার তুলনা করে দেখলাম জরাভারে সে শহর ধুঁকছে—গুনে চলেছে শেষের দিন আর কতদূরে। এককালে প্রাচ্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহর, শিল্পে, বাণিজ্যে, আভিজাত্যে প্রাচ্যের দেশগুলির ঈর্ষার ইন্ধন জোগাত। পাশ্চাত্যে লণ্ডন শহরের পর দ্বিতীয় নগরী কলকাতা ইংরেজ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের এডেন বন্দর থেকে প্রাচ্যে বার্মা, সিঙ্গাপুর, মালয় নির্ভর করত তার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। অবহেলা অনাদর সয়ে সয়ে কলকাতা শেষ হতে চলেছে,—সে সব হারাতে বসেছে—শক্তি, সামর্থ্য, ঐশ্বর্য। সবার উপর আভিজাত্য—যার উপর নির্ভর করে সে ভারতের দিকে দিকে জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র প্রচার করেছিল, যে বাংলাকে লক্ষ্য করে মহামতি গোখেল বলেছিলেন—বাংলা যা আজ ভাববে—সারা ভারত কাল তা ভাবতে শিখবে—সে বাংলা আজ দ্বিখণ্ডিত। স্বাধীন ভারত বাংলার মহিমা আজ ভুলে গেছে—তাই কলকাতা অবজ্ঞায় অবহেলায় দূরে সরে আছে।

দফতরের কাজ শেষ করে ছত্রিশ মাইল দূরে মহোদধির পারে নীলমাধব দর্শনে চলেছি। শরতের ম্লান সন্ধ্যা নেমে এসেছে চিল্কা হ্রদের ওপারে। তারই মূর্ছনা বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে মহাসাগরের পরপার হতে দূর দূরান্তের পথে। নিশ্চিন্ত আরামে গাড়ীতে বসে চলেছি। দূর থেকে জগন্নাথের ধ্বজা চোখে পড়লে হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে বললাম—করুণাময়—অপার করুণা তোমার।

আমার আকুল আবেদনে তুমি সাড়া দিয়ে আমায় টেনে এনেছ তোমার দরবারে কি এক অমোঘ আকর্ষণে। বিলীয়মান সূর্যরশ্মির এক ঝলক চোখে মুখে আবির কুঙ্কুম মাখিয়ে জানিয়ে গেলেন—তিনি ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু, চিরযুগে তাঁর স্থান ভক্তের হৃদয়।

সন্ধ্যার অনতি পরে স্বর্গদ্বারে সাগর বেলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি স্বাস্থ্যান্বেষী সেবীদের—মহামানবের সাগর তীরে। কেউ এসেছে স্বাস্থ্যের সন্ধানে—কেউ মনের খোরাক জোগাড়ে—কেউ দেশে দেশে ঘুরে ফিরছে মানুষের সন্ধানে। মনের মানুষ খুঁজে পেয়ে কেউ এসেছে নতুন করে ঘর বাঁধার কল্পনাজাল বুনতে।

মানুষের মেলায় এসে আমিও খুঁজে ফিরছি এমনি এক মানুষকে মানুষের মাঝে। ক্ষেপার পরশ পাথর খুঁজে ফেরার মত। শাল পিয়ালের বনে বনে, নদীনালার তীরে তীরে, রাজপথ জনপথের দুধারে পাহাড় অরণ্যের গুহায় গুহায় সভ্যতার সুরু থেকে মানুষ মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছে, আমি তাদেরই একজন।

ময়ূরভঞ্জ পাহাড়ের আড়ালে যে সূর্যকে উঁকি দিতে দেখেছিলাম সাতসকালে, সে অস্ত গেল দুশ মাইল দূরে পুরীর ঊর্মি-মালার অন্তরালে সারাদিনে সে এক চক্রবাল থেকে অন্য চক্রবালে ঘুরে এসেছে—আমিও ছুটে এসেছি তার পেছনে পেছনে।

কাজের চাকায় আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে বেঁধে রেখেছি সারা দিনমান। রাতের অন্ধকারে বিশ্রামের অবসরে সাগর বেলায় হোটেলের নিভৃত কক্ষে শুয়ে একমনে শুনে চলেছি—কার মর্মব্যথা গুমরে উঠছে বহুদূর থেকে। সাগরের উত্তাল তরঙ্গে ভর করে সে ব্যথার গুঞ্জন ছুটে এসেছে আমার কাছে। সে ব্যথার ঢেউ আমার মনের গহনে উঠছে, ভাঙছে—অশ্রুধারায় উপচে পড়ছে শেষে।

নির্জন সাগরের কোলে, ফেনিল উচ্ছ্বাসের মাঝে কার মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস শুনি কান পেতে। দীর্ঘ জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা কত পাহাড় পর্বত, নদনদী, গিরি-কান্তার পেরিয়ে মহাসাগরের হাহাকার রব ধরে ছুটে এসেছে আমার পেছনে পেছনে। রাতের অন্ধকারে তাই আমার চোখে ঘুম নেই। দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায় হেলান দিয়ে আঁধারে ভরা সাগরের পানে তাকিয়ে। অশ্রুভারাক্রান্ত মনের বেদনা জানাতে সাগরের শুভ্র জলরাশি গড়িয়ে পড়ছে বালুকা বেলার বুকে শত মিনতি নিয়ে।

ভোরের আলোয় চোখ খুলে খুঁজে ফিরেছি কে সে? সারারাত ধরে তার ব্যথার কাহিনী আমায় শুনিয়ে গেল বিনিয়ে বিনিয়ে। নীল সাগরের জলরাশির পানে তাকিয়ে উত্তাল তরঙ্গের মাঝে দেখতে পেলাম ফেলে আসা অতীতের শত সুখ-দুঃখের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা কুঞ্জবীথিতলার হারিয়ে যাওয়া এক মানুষকে।

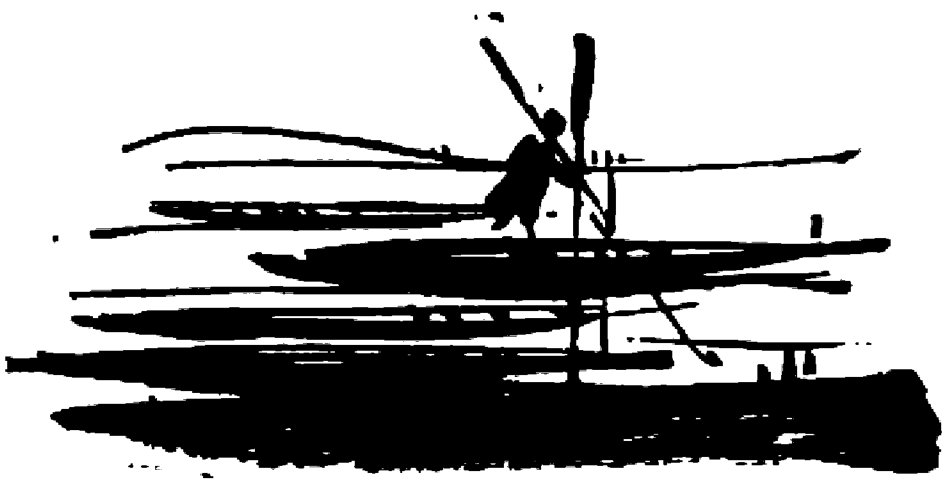

(ওপরে) হরপার্বতী, (নীচে) কৃষ্ণলীলা ডানদিকে (ওপরে) বিলেত ফেরৎ—অপর্ণা সেন, (মধ্যে) নিমন্ত্রণ—সন্ধ্যা রায়, (নীচে) প্রতিবাদ — বিশ্বজিৎ এবং মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়।

প্রেক্ষাগৃহ

একাঙ্কিকা প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রসদনে সম্প্রতি পাঁচদিনব্যাপী যে একাঙ্ক নাট্য উৎসব হয়ে গেল, সেই উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, 'সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই নাট্যশাখাটি কী রূপ পেয়েছে এবং কোন্ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে', তারই একটি সুস্পষ্ট চিত্র ঐ উৎসব মারফৎ ধরা পড়বে।

পাঁচ দিনে পনেরোখানি একাঙ্ক নাটক অভিনয় করবার জন্যে যে পনেরোটি দল উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা এসেছিলেন বর্ধমান, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী—মাত্র এই চারটি জেলা থেকে। অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের 'একাঙ্ক নাট্য-আন্দোলনের রূপটি এই উৎসবের মাধ্যমে ধরা পড়েনি। রবীন্দ্রসদনের কার্যনির্ধারক সমিতির সম্পাদিকার বিবৃতি থেকে জানা যায়, যথেষ্ট সময় হাতে না থাকায় তাঁরা সবক'টি জেলার নাট্যকে দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি।

যে-পনেরোটি একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়েছিল, সেগুলি নিশ্চয়ই বর্তমান কালের সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণাকে মূর্ত করে তুলেছে। চিন্তার গভীরতায় সবগুলি যেমন সমান নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এদের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষণীয়। রমেন লাহিড়ী রচিত 'রাজযোটক'—যা হচ্ছে শেকভের 'দি প্রোপোজাল'-এর অনুবাদ—দুই 'খড়ের আগুন'-ধর্মী বিবাহাকাঙ্ক্ষী যুবক-যুবতীর 'চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা' নিয়ে সুন্দর একটি হাল্কা হাসির নাটক। এ-নাটকের ঘটনা কোনো বিশেষ কাল বা দেশে সীমাবদ্ধ নয়। শৈলেশ (পিকু) গুহ নিয়োগীর 'বিহারীলাল' ছোট ছোট নাট্যসংস্থার আর্থিক ও সাংগঠনিক সমস্যাকে দর্শকসমক্ষে তুলে ধরে; অবশ্য দর্শকরা এই সব সমস্যা ও তাদের সমাধান সম্পর্কে যে খুব বেশী আগ্রহী, প্রেক্ষাগৃহের প্রতিক্রিয়া থেকে তা বোধ হয় না। তরুণ সংঘের নাট্যশাখা ফোকাস নিবেদিত 'হুল-বদলের মেলায়'ও একটি হাসির নাটক; রচয়িতা হচ্ছেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য। 'ছাট ট্রান্সপ্লান্টেশান'কে বাহ্য বিষয়বস্তু করে আজকের দিনের মানুষের নানাবিধ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আপ্রাণ চেষ্টা এই একাঙ্কিকার ভিতর দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে পরিস্থিতি রচনায় হাল্কা হাস্যরস সৃষ্টির দিকে নজর দিতে গিয়ে নাট্যকার সম্ভাবনাতাকে প্রায়ই উপেক্ষা করেছেন। চব্বিশ পরগণার বাণীরূপা অভিনীত ও বাবলু দাশগুপ্ত রচিত 'কেন এই অবক্ষয়' নাটকে একটি হ্যান্ডব্যাগকে কেন্দ্র করে বাসযাত্রী ও পথচারীদের মধ্যে একটি রহস্যপূর্ণ আবহের সৃষ্টি করা হয়েছে বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত একটি চমকের মাধ্যমে নাটকের গতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটায় আমাদের মনে হয়েছে, ঐ চমকটুকুর (কোনো বাসযাত্রীর ফেলে-যাওয়া হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে একটি সদ্যমৃত শিশুর সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাগটির মালিক বলে দাবিদারদের দাবি পরিত্যাগ করা) জন্যেই অতিরিক্ত বাগাড়ম্বরের ঘনঘটা। চিত্তরঞ্জন থেকে আগত নাট্যরূপা নিবেদিত 'রাত্রি' নাটকের মর্মার্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'রাত্রির অন্ধকার পেরিয়ে আলোক প্রত্যাশী সমগ্র মানুষের সংস্কার মুক্তির ও অনাচারের প্রতিরোধের বলিষ্ঠ ঘোষণা, সার্থক জীবনবোধের পূর্ণ উপলব্ধি এই নাটকের মূল উপজীব্য।' নাট্যরূপা দলের সময়ে হয়ত এই উদ্দেশ্যই ছিল; কিন্তু শেষপর্যন্ত এই নাটক থেকে যা সোজা উপলব্ধি করা যায়, তা হচ্ছে মৃত্যু থেকে মৃত্যুভয় ভয়ংকর এবং সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যাশ্চর্য প্রবচন ধরনের নাটক হচ্ছে ইন্দ্রজালের শিক্ষামূলক অভিনীত

প্রাক্ বসন্তে H.M.V. রেকর্ডে
আপনার পছন্দমত দু'খানা
অনবদ্য গান গেয়েছেন

শ্রীমতী

মীরা সমাদ্দার

45N A.B.C. ক, খ, গ
83401 ভালবেসে করি ভুল

এই দশকের সব থেকে আনন্দদায়ক প্রমোদচিত্র !

২২শে জানুয়ারী, শুক্রবার উদ্বোধন হচ্ছে !

আমাদের বর্তমান সমাজের সব থেকে মর্মান্তিক সমস্যাগুলি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে দেখানো হয়েছে এই চিত্রে—যেখানে কেউই অসৎ হয়ে জন্মায়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অপরাধের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে—শ্বাসরুদ্ধকারী উৎকণ্ঠা, তীব্র গতিবেগ এবং গীত-মূর্ছনা মুখরিত এক মন্ত্রমুগ্ধকর চিত্রার্ঘ !

পরিচালক নরেশ সাইগল সঙ্গীত মদন মোহন

অপেরা - জেম - প্রিয়া - প্রভাত - খান্না

নারায়ণ — কল্পনা — বাবুনমহল — অশোক — জয়শ্রী — চলচ্চিত্রম
লীলা — লক্ষ্মী — অন্নপূর্ণা — শ্রীকৃষ্ণ — শ্রীলক্ষ্মী — শ্রীদুর্গা
রূপমহল (বর্ধমান) — অনুরাধা (দুর্গাপুর) — রূপকথা (আসানসোল)
বিহার টকিজ (ঝরিয়া)। অপসরা (রাউরকেল্লা) ও অন্যান্য চিত্রগৃহে।

প্রিয়াতে দৈনিক চারটি প্রদর্শনী।

—অজন্তা পিকচার্স রিলিজ—

ও সন্তোষ দত্ত রচিত 'যবনিকা কম্পমান'। আসলে এটি পাঁচটি বঞ্চিত, শোষিত, উৎপীড়িত চরিত্রের পাঁচটি মর্মন্তুদ কাহিনী। পাঁচটি শিল্পী বারে বারে পাঁচটি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পাঁচটি অঙ্ক থেকে দশ মিনিট স্থায়ী নাটকে অভিনয় করেছেন এবং শেষপর্যন্ত সকলে মিলিত কণ্ঠে বলেছেন : ভাবীকাল, বর্তমানের আবর্জনাস্তূপ সরিয়ে দিয়ে তুমি এস। 'হুল-বনের মেলায়' নাটকের রচয়িতা রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের আর একটি নাটক—'এক যে ছিল রাজা' অভিনীত হয়েছে নৈহাটি থেকে আগত বান্ধব গোষ্ঠী দ্বারা। নাটকটি রূপকধর্মী, এর বক্তব্য পরিষ্কার—প্রজাপুঞ্জ যদি সংগঠিত শক্তি নিয়ে অত্যাচারী শাসকদলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে, তাহলে শাসকদলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রূপকের রূপটি যথাসম্ভব বজায় রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে পরিস্থিতি ও সংলাপ কিছুটা মোটা ধরনের বাস্তবরেখা হয়ে নাটকের সমগ্র রূপকে ক্ষুণ্ণ করেছে। সমান কথাই একটু ছোট করে বলা হয়েছে আরও দুটি নাটকে—এক, দুর্গাপুর থেকে আগত মহুয়া সম্প্রদায় নিবেদিত ও রবি সাহা রচিত 'আখের স্বাদ নোনতা' এবং দুই, নিমতাবাজারের জাগরণ সংঘ অভিনীত ও রতনকুমার ঘোষ লিখিত 'সমুদ্র সন্ধানে'-তে। দুটি নাটকেই বলা হয়েছে সমাজের বঞ্চিত মানুষরা একযোগে আঘাত হানতে পারলে তীব্র, কাপুরুষ শোষক শ্রেণীর পরাজয় সুনিশ্চিত।

নবীন নাট্যকারদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নাট্যকার রতনকুমার ঘোষের আরও দুখানি নাটক এই উৎসবে অভিনীত হয়েছে—এক, আতপুরের জাগৃতি সম্প্রদায় নিবেদিত 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' এবং দুই, হাওড়া থেকে আগত লোকরূপ দ্বারা উপস্থাপিত 'মহাকাব্য'। আমরা অন্যত্র বলেছি এবং এখনও বলছি, শ্রীঘোষ তাঁর চিন্তায় ভাবনায় মৌলিক এবং অভিনব, কিন্তু নাটকের মধ্যে তাঁর চিন্তা আজও বেশ সুসংবদ্ধভাবে যথেষ্ট দানা বাঁধতে পারে না সব সময়ে। ধরুন, তাঁর 'মহাকাব্য' নাটকটি। তিনি বলতে চেয়েছেন, জনসাধারণ তাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসে; কিন্তু বারে বারে তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। অথচ দেখা যায়, নেতৃবৃন্দ দেশের ভালো-মন্দের দিকে অন্ধ থেকে নিজেদের মতবাদকে ভালোবাসেন এবং জনসাধারণকে তাঁদের প্রদর্শিত পথের পথিক করতে চান। তিনি আরও বলতে চেয়েছেন, এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ অঙ্কে দেখা যাবে, জনসাধারণ আর নেতৃত্ব দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে নিজেরাই দেশকে ভালোবাসবার পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু তিনি এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে-রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন, তার মধ্যে স্বেচ্ছাধিপতি, সংগ্রাম সিংহ, অনিন্দ্য ও বিচিত্রকুমার পর্যন্ত বোঝা গেলেও তাঁর সৃষ্ট সর্বশূন্যোকে হৃদয়ঙ্গম করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এবং বাজীকর কে? নাট্যকার স্বয়ং? অথবা কোনো যথার্থ দেশভক্ত? 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' না 'পিতামহদের উদ্দেশে'? উদ্দেশ্য কথাটা অভিপ্রায় অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন, কি উদ্দেশ্যে আগমন? আর উদ্দেশ কথার অর্থ হচ্ছে লক্ষ্য; যেমন, আমি অমুককে উদ্দেশ করে কথাটা বলছি। নাটকটির নামকরণ 'পিতামহদের উদ্দেশে' হলেই শোভন ও নাট্যকারের উদ্দেশ্যানুযায়ী হত। নাট্যকার কল্পনা করেছেন, পঞ্চবিংশ শতাব্দীর লোক সভ্যতার পথে অগ্রসর হবার ব্যাপারে অকৃতকার্যতার দরুণ বিংশ শতাব্দীর লোকেদের দোষী সাব্যস্ত করে তাদের বিচার করছে। বিংশ শতাব্দীর প্রতিভূস্বরূপ, মঞ্চ তথা নাটকে তিনি উপস্থিত করেছেন, লেখক, প্রশাসক ও বাহককে। বাহক অর্থে নিশ্চয়ই নির্বাহী বা এক্সিকিউটিভ। আমরা তো জানি, জুডিসিয়ারি অর্থাৎ বিচার বিভাগ প্রশাসক বা গভর্নমেন্টকে সব সময়ে মানতে বাধ্য নয় এবং তার কর্মের সমালোচনা করবার অধিকারী। কিন্তু নির্বাহী অর্থাৎ নাট্যকার যাকে বাহক বলেছেন, সে তো প্রশাসকের ইচ্ছার অধীন। কাজেই অন্যায়ের জন্যে তাকে আলাদা করে অভিযুক্ত করা যায় কি হিসেবে, তা বোঝা শক্ত। এবং পঞ্চবিংশ শতাব্দীর লোকেদের নামকরণেও যথেষ্ট ত্রুটি আছে। নাটকের বিশেষ করে একাঙ্ক নাটকের ভাষাকে অযথা প্লাবিত না করে ঋজু করারও প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নয়।

সেন-র‍্যালে অ্যাথলেটিক ক্লাব অভিনীত ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী লিখিত 'আমরা করবো যাব না' আরউইন শ রচিত 'বেরি দি ডেড' দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও একটি অত্যন্ত সু-রচিত নাটক। ভিয়েতনামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত আমেরিকান সেনাবাহিনীর মধ্যে বহু সাধারণ সৈনিকই যে এই যুদ্ধকে অন্যায় ও মানবতা-বিরোধী বলে মনে করছেন, এই বক্তব্যকে যথেষ্ট নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে নাটকটির মাধ্যমে। নাটকটির উপস্থাপনা দেখে মনে হয়, জোনাল লাইটিংয়ের সাহায্যে নাটকটি অভিনয়ের কথা ভাবা হয়েছে। রবীন্দ্র সদনে সম্ভবত এই ধরনের আলোর ব্যবস্থা করার সুবিধা না থাকায় সেন-র‍্যালে ফ্রিজ (বা ট্যাবলো) প্রথায় অভিনয় করেছেন। নৈহাটীর কুশীলব নিবেদিত ও ভোলা দত্ত রচিত 'কিউবা' নাটকটিতে রক্তস্নাত কিউবার পটভূমিকায় মানুষের মুক্তিযুদ্ধের চিত্র আঁকবার প্রয়াস দেখা যায়। সাধারণ মানুষও কেমন করে ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে পড়ে, তাও দেখানো হয়েছে; কিন্তু পরিস্থিতি দৃষ্টি সর্বত্র বাস্তব ও বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া ভাষা সম্বন্ধে সতর্কতার প্রয়োজন। বরাহনগর মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব মধুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'তার নামটি রঞ্জনা' নাটকটি অভিনয় করেছেন। বিদেশী নাটকের অনুসরণে রচিত এই নাটকের মূল উপজীব্য হচ্ছে আবেগপ্রবণতা। একটি যুবক ফাঁসীর মঞ্চের মুখোমুখী দাঁড়িয়েও নিজের বহুকালের অদেখা ছোট বোনের কাছে কিছুতেই স্বীকার করল না যে, সে তারই সেই হারিয়ে-যাওয়া দাদা। বোন তাকে কবুল করাতে ব্যর্থ হয়ে চলে যাবার পরে তার করুণ আত্মপ্রকাশ দর্শকদের চক্ষুকে কাঁদবার জন্যে সজল করে তোলে। কিন্তু যুবকটি তার বেকারত্বের জন্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় সমাজবিরোধী খুনীরূপে চিহ্নিত করে কোন্ সামাজিক প্রতিবাদ জানিয়ে গেল, তা আমরা বুঝতে পারলুম না। হুগলী জেলার উত্তরপাড়া থেকে আগত আমরা সংস্থাটি তাপস গঙ্গোপাধ্যায় রচিত, পরিচালিত এবং অভিনীত 'স্লোগান' নামে যে একাঙ্ক মৌলিক নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন, সেটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্লিন্নতার আবহাওয়ায় যুবক সম্প্রদায়ের উদ্দেশে লিখিত। লেখক আশাবাদী, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, কৌতুকপ্রবণতা ও সহানুভূতিপূর্ণ বাস্তববোধ প্রশংসনীয়। যদিও বেকারত্বের সমস্যার সমাধান তিনি বড় সহজে করেছেন,

সচিত্র সিনেমা মাসিক পত্রিকা

আলোছায়া

প্রতি সংখ্যায় থাকে রহস্য উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প, শ্রেষ্ঠ শিল্পী দল, বিভিন্ন অভিনয় বিচার, গান স্বরলিপি, মনস্তাত্ত্বিক যৌনকথা ও অসংখ্য সিনেমার রঙীন ছবি।

প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ : বার্ষিক ৬

১৬/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

ষ্টার

। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা ।

অমিলা

নাটকীয় সংঘাতে ও অভিনয়-মাধুর্যে অনুপম।

প্রতি বৃহস্পতি ৬টায় ও শনিবার : ৪টায়

প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥টা ও ৬টায়

।। রচনা ও পরিচালনা ।।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

:: রূপায়ণে ::

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সত্য চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস সান্যাল, গীতা দে ও বঙ্কিম ঘোষ।

বাস্তব ক্ষেত্রে তা তত সহজ নয়; তবু তাঁর আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আজকের দিগভ্রান্তিকৃত নৈরাশ্যের মধ্যে আমাদের মুগ্ধ করেছে।

এই একাঙ্ক নাট্য উৎসবের ব্যবস্থা করে রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ নাট্যামোদীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

স্টুডিও থেকে

গোত্রান্তর : মৃণাল সেনের নতুন ছবি 'গোত্রান্তর' এখন প্রস্তুতির পথে। পাটনা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ হয়েছে বেশ কিছুদিন। ছবির নায়িকা আরতি ভট্টাচার্য খুব ভালো কাজ করছেন—একজন সংশ্লিষ্ট কুশলীর মতো, যদিও তিনি বাঙালী, কিন্তু হিন্দী উচ্চারণ ও ভাবভঙ্গীতে নিপুণ অভিনেত্রীর মত কাজ করে চলেছেন।

আচার আচরণ ও উচ্চারণে বিহারী-য়ানার প্রভাব কিছুটা তাঁর জন্মগত বলা চলে। জন্ম জামসেদপুরে। ছোটোবেলাই শুধু নয়, যৌবনেরও কয়েকটা বছর কেটেছে বাংলা-বিহারের সেই সীমান্ত শহরে। বাবা চেয়েছিলেন মেয়ে ডাক্তার হোক। কিন্তু বিধি বাম। অভিনয়ের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক আকর্ষণ। তাই কলকাতায় এসে যোগাযোগ ঘটে গেল। রঙমহলে 'নহবত'-এর একটি প্রধান ভূমিকায় কাজ পেয়ে গেলেন।

সেই শুরু। ইতিমধ্যে বম্বে গিয়েছিলেন একাধিক বার, দু-একটি ছবিতে ছোটোখাটো কাজও করেছেন। মন ভরে নি, ফিরে এসেছেন কলকাতায়। শেষ পর্যন্ত মৃণালবাবুর কাছ থেকে ডাক পেয়ে আবার ফিরে এসেছেন পাদপ্রদীপে। মৃণালবাবুর এ ছবিতে এক দেহাতী মেয়ের চরিত্র তাঁর। ভয়ানক ছটফটে অথচ কাজের সময় যথেষ্ট সিরিয়াস্ তিনি। কথায় কথায় হিন্দী শের তৈরী করতে পারেন, পুরোপুরি দেহাতী ঢঙে সেই সকল শের যখন নিজেই বলেন তখন বোঝা দায় তিনি বাঙালী না বিহারী।

হিন্দী সাগিনা মাহাতো : 'সাগিনা মাহাতো'র হিন্দী ভার্সান 'হবে হচ্ছে' এ রকম খবর বহুবার পাওয়া গেছে। সেই 'হবে হচ্ছে'র অবসান ঘটিয়ে গত বৃহস্পতিবার টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় সত্যি সত্যিই শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হলো হিন্দী 'সাগিনা মাহাতো'র। এখন কাজ চলবে কিছুদিন। রঙীন এ ছবিখানি প্রযোজনা করছেন শ্রীহেমেন গাঙ্গুলী এবং পরিচালক স্বভাবতঃই শ্রীতপন সিংহ। মহরৎ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে দিলীপকুমার ও সায়রাবানু বম্বে থেকে এসেছেন কলকাতায়। ও'রা আরও কিছুদিন থেকে শ্যুটিং-এ অংশ নেবেন।

অরুন্ধতী দেবীর নতুন ছবি : 'মেঘ ও রৌদ্র'র পর থেকেই অরুন্ধতী দেবী লীলা মজুমদারের লেখা 'পদী পিসির বর্মিবাক্স' গল্প নিয়ে ছবি করছেন—এমন সংবাদ বহুবার এ পাতায় ছাপা হয়েছে। চিত্রগ্রহণের কাজও হয়েছিল। আউটডোর লোকেশন অরুন্ধতী দেবী দেখেও এসেছেন। সম্প্রতি তিনি এ ছবির কাজ রিজিউম্ করেছেন এন-টির দু নম্বরে। আউটডোরের কাজ পরে হবে। প্রধান চরিত্র পদী পিসির ভূমিকায় আছেন ছায়া দেবী এবং অন্যান্য চরিত্রে শিল্পীদের মধ্যে আছেন রবি ঘোষ, জহর রায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত হরিধন মুখোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার।

এখনই : 'এখনই' ছবির কাজ তপনবাবু শেষ করে ফেলেছেন বহুদিন আগেই। এ ছবির প্রধান কটি চরিত্রে রূপদান করেছেন অপর্ণা সেন (ঊর্মি), স্বরূপ দত্ত (অরুণ), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (সুজিত), মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় (বুনু), ভাস্কর চৌধুরী (বিমান), রুমি বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দিনী), দিলীপ বসু (টিঙ্কু), চিন্ময় রায় (হিপি) ও আরও অনেকে। ওপরের নামগুলোর মধ্যে একমাত্র দিলীপ বসু ছাড়া প্রত্যেকেই বাংলা ছবির দর্শকের কাছে অচেনা কেউ নয়ই বরং জনপ্রিয় নাম বলা যায়। তবে 'এখনই' মুক্তির পর তপনবাবুর নতুন আবিষ্কার টিকলুবেশী এই দিলীপ বসু যে দর্শকের মধ্যে সাড়া জাগাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। যে সব দৃশ্যে ওর কাজ দেখেছি, তার স্মার্টনেস, সেটের বাইরে ও ভেতরে তার

মুক্তাঙ্গনে
২৭শে জানুঃ
সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ
জন থিয়েটারের
শৃংখল
কার্যাঃ : ২২, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিঃ-৬
—হলে টিকেট—

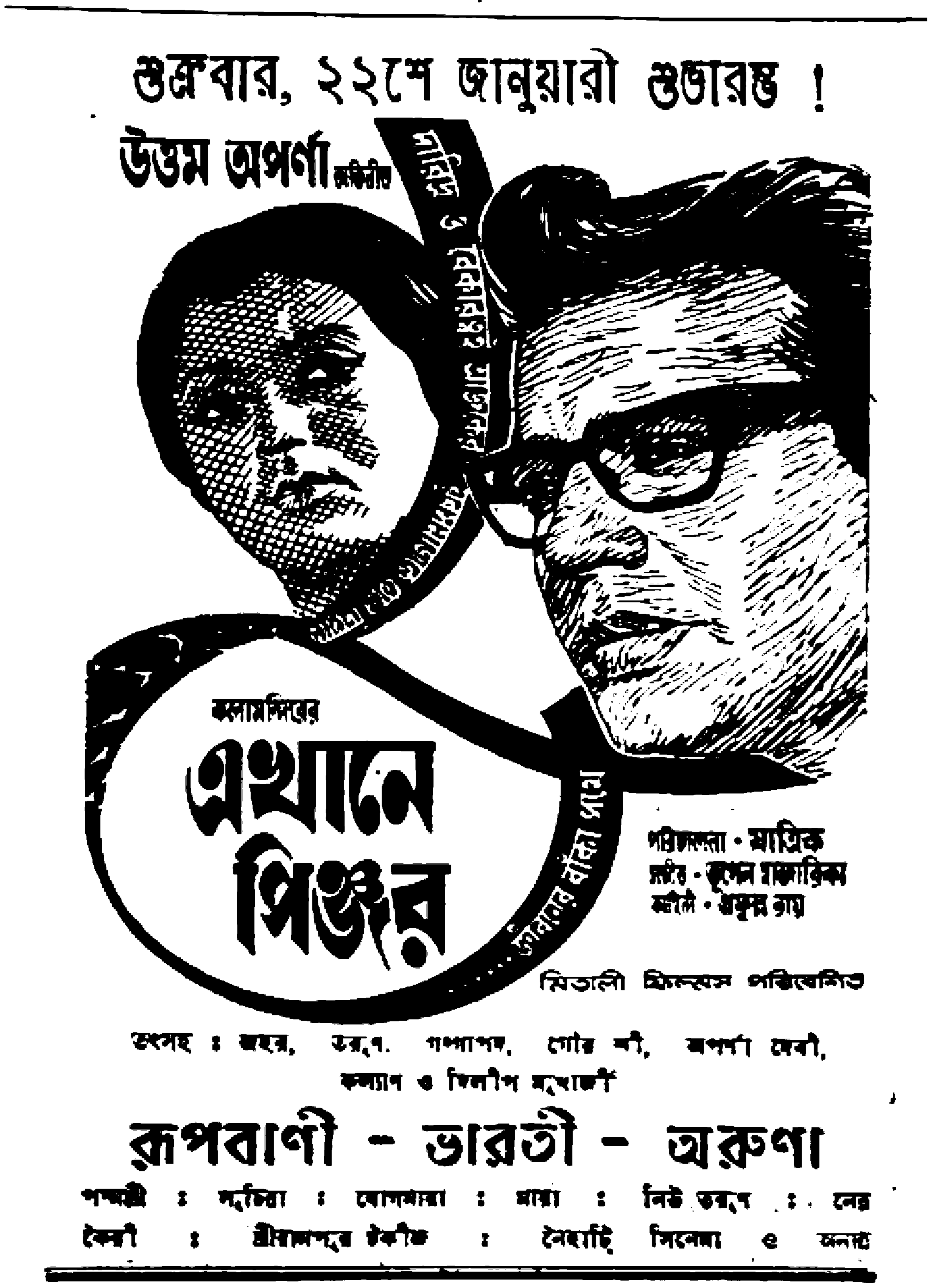

জনতার আদালত—শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী এবং নবাগতা চৈতালী দত্ত

সহজ সরল কথাবার্তা টিকলুর চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছে। নতুন ছবি অবশ্য বিশেষ কিছু তার হাতে নেই, কিন্তু এ ছবির মুক্তির পর কি হবে বলা যায় না।

মঞ্চাভিনয়

রোটারী ক্লাবের শেষ লগ্ন : দক্ষিণ কলকাতার রোটারী ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে মনোজ বসুর শেষ লগ্ন নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। সুধীর মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় পরিবেশিত এই নাটকটির নির্দেশনায় শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন অভ্র ভট্টাচার্য।

পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্যসংস্থা
২০শে জানুয়ারী সকাল দশটা মরু ঝঞ্ঝা
২৫শে জানুয়ারী সকাল দশটা কল্যাণগাদ নাটক
বিশ্বরূপা

রঞ্জনা বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে শ্যামপুর রাস্তার মার্কুলার (৫৫-৬৮৪৬)

নান্দীকার
২৩শে শনি ও ২৪শে রবি
২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
২৬শে মঙ্গলবার ২॥টে ও ৬টায়
শের আফগান
২৮শে বৃহস্পতিবার ৬টায়
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্রাভিনয়ে যাঁরা সব সময়ে আন্তরিক নিষ্ঠা দেখান তাঁরা হোলেন বিভূতি সরকার (রাজমোহন), বিনোদ ভট্টাচার্য (নিশিকান্ত), সুধীর মুখোপাধ্যায় (গোবিন্দ), সুনীত ঘোষ (বনমালী), চিন্ময়ী বসু (সুরবালা), কৃষ্ণা সরকার (তমালবাসিনী), জয়ন্তী সেন (গৌরী)।

দুটি দক্ষিণ ভারতীয় নাটক : দক্ষিণ ভারতীয় নাটক পরিবেশন করে 'কলকাতা কালাই কাবহগম'এর শিল্পীরা নাট্যানুরাগীদের কাছে একটি স্বতন্ত্র স্থান ইতিমধ্যেই এনে দিয়েছেন। সম্প্রতি এই সংস্থার অষ্টমবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে ত্যাগরাজ হলে একটি তামিল নাটক ও একটি মালয়ালম নাটক মঞ্চস্থ হোল। প্রথম দিনে এস, এস, ভি রামানির 'নান্ নি আভাই' তামিল নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে শিল্পীরা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। এ এস নারায়ণের দক্ষ পরিচালনায় নাটকটির কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন গ্যারি গোপাল, নারায়ণ, আথী, শেখর। সি এন জসে'র মালয়ালম নাটক 'মানলকাদু' পরিচালনায় কে সুব্রাহ্মানিয়াম প্রায় সব সময়েই নিজের সপ্রতিভ ভূমিকাটিকে স্পষ্ট করে রাখতে পেরেছিলেন। এ নাটকের উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হোলেন পম্পন, নান্দ কুরুপ, মিস গঙ্গা, মিস চেলাম, রামমূর্তি, কৃষ্ণমূর্তি, অনাথকৃষ্ণন, চাক্কো।

লৌহকপাট : সম্প্রতি কমার্শিয়াল ইউনিয়ন স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' নাটকটি পরিবেশিত হোল বিশ্বরূপার মঞ্চে। যাঁরা সুঅভিনয় করে প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন তাঁরা হোলেন প্রভাত সরকার (কবর মুন্সী), সুব্রত ভট্টাচার্য (মলয়), অজিত মিত্র (ভূতনাথ), দিলীপ মুখার্জী (সালাম), শান্তি সাহা, বিদ্যুৎ গুহ, মুকুল রায়। সুন্দরভাবে নাট্যানুষ্ঠানটিকে পরিচালনা করেছেন অমিয় দে, অনুপকুমার রায়, অজিতকুমার রায়।

ইছাপুর অনুশীলনী আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা :—শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : 'এক যে ছিল রাজা' (বান্ধিক, নৈহাটী), শ্রেষ্ঠ পরিচালনা : তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় ('সুরের সন্ধানে', শিল্পায়ন, ইছাপুর), শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য (এক যে ছিল রাজা), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : নৃপেন দেব, (তৃতীয় কণ্ঠ, করবী); শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : পুতুল চক্রবর্তী (স্ফুলিঙ্গ, চন্দ্রবিন্দু)।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের পুরস্কারবিতরণী সভা

গত ২২শে ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের পুরস্কার-বিতরণী উৎসবের উদ্বোধন সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রমা চৌধুরী। বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে বিদ্যাভবনের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন। নৃত্যে অরুণেশ্বর ও কমলিকার ভূমিকায় রূপদান করেন দেবাহূতি দেব ও শান্তা রায়চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন শাশ্বতী দত্ত, স্বাগতা ভট্টাচার্য, মাধুরী নিয়োগী, ইলা সামন্ত, রাখী রায়চৌধুরী, গীতা দাশগুপ্ত, গৌরী মুখোপাধ্যায়, শুক্লা সাহা। অরুণেশ্বরের গানগুলি গেয়েছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী ও মনীষা দত্ত, তন্দ্রা দত্ত, তপতী গাঙ্গুলী, রীণা দাশগুপ্ত, জয়ন্তী মুখার্জী, সীমা ঘোষ, অনুরাধা সরকার, প্রজ্ঞা দাশগুপ্ত, রাখী রায়চৌধুরী। নাচ ও গানের প্রশংসনীয় সমন্বয় লক্ষ্য করবার মত। গ্রন্থনাংশে ছিলেন তপতী গাঙ্গুলী ও প্রভা দাশগুপ্ত।

সংস্কৃত নাটকের জয়যাত্রা

সুপরিচিত সুধী-দম্পতি ডক্টর যতীন্দ্র বিমল ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যা ডক্টর রমা চৌধুরী স্থাপিত (১৯৪০ অব্দে) 'প্রাচ্যবাণী' সংস্থা গবেষণা, গ্রন্থ প্রকাশন, প্রচার, নাট্য, প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃত এবং পালি নাট্য চর্চা ইত্যাদি শিক্ষামূলক কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে লিপ্ত আছেন। ডক্টর চৌধুরী সম্প্রতি বিরচিত সংস্কৃত নাট্যসমূহ ভারতের সর্বত্র এবং বাহিরেও অভিনীত হয়ে বিদগ্ধ সমাজে অভিনন্দিত হয়েছে। ১৯৭০ অব্দে এই অ্যামেচার নাট্য সম্প্রদায় আ-সমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণকালে কচ্ছ, কাশ্মীর ও কন্যাকুমারিকাতে বেশ কয়েকটি আধুনিক ও সংস্কৃত নাটক মঞ্চস্থ করে বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদৃত হয়েছেন। বিগত নভেম্বর মাসের মধ্যে এঁরা ভারত-সরকার আয়োজিত সর্বভারতীয় বৈদিক-সম্মেলনে ডাঃ রমা চৌধুরী রচিত তিনটি সংস্কৃত নাটক অভিনয় করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

জলসা

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন : ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সারারাতব্যাপী চারটি আসরের আয়োজন অতীতের আনন্দ-ভরা সম্মেলনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সারারাতব্যাপী আসরের ফলশ্রুতিস্বরূপ রাত্রের রাগ ছাড়াও আমরা কিছু ভোরের রাগ শোনবার অবকাশ পেলাম।

সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, সঙ্ঘের উদ্দেশ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা-বর্ধন। তানসেন সঙ্গীত বিদ্যায়তন, প্রদর্শনী, সঙ্গীত, বক্তৃতামালা, মাসিক অধিবেশন, নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও নিখিল ভারত তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন—এই পঞ্চবিধ পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির লক্ষ্যে নিষ্ঠা ভরে কাজ করে যাচ্ছেন—তাঁর পরিকল্পনা সঙ্গীতানুরাগীর সাড়া ও সহযোগিতা পেয়েছে। তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে কণ্ঠসঙ্গীতে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ছায়ানট রাগ রূপায়ণ ও পরিবেশনা পদ্ধতির গুণে শ্রোতাদের প্রশংসা পেয়েছে, তবে তানের সঙ্গে আর একটু বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। আলো মুখোপাধ্যায়ের পূরিয়া ধানশ্রী মাঝামাঝি। শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যাদ্বয় সুচিত্রা সেনগুপ্ত ও তপতী সরকারের 'কেদারা' সু-পরিবেশিত, বিশেষ করে বিস্তারাংশে। তানাংশ অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ঝিঁঝোটি রাগে খেয়াল ও পরে টপ্পা গেয়ে শোনান। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য। কিন্তু ঝিঁঝিটের মত সহজ মধুর রাগে এমন বীররসের প্রাধান্য কেন? টপ্পার ঐতিহ্যকে ইনি সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। রবি কিচলু ও বিজয় কিচলু গীত আগ্রা ঘরানার 'ভৈরব' পরিচ্ছন্ন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'বাগেশ্রী' শুধু রাগশুদ্ধতা অথবা তানসমৃদ্ধিতেই নয় প্রাণবন্ত গায়নশৈলীতে উপভোগ্য হয়েছে। তবে সবচেয়ে চিত্তগ্রাহী তাঁর ঠুংরী। বিশেষ শেষের ঠুংরীটি যেখানে তিনি মারু গাম্বাজের আলতো ছোঁয়ায় মিনতির ভাবটি মূর্ত করে তুলেছেন। কেরামৎ খাঁ ও সগীরুদ্দিনের তবলা ও সারেঙ্গী সঙ্গত অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। মুনাব্বর আলি খাঁ শোনালেন 'রামকেলী'। তাঁর আগের রুক্ষভাব ক্রমশঃ কোমল হয়ে আসছে বলেই তাঁর অনুষ্ঠান চিত্তস্পর্শী হয়ে উঠছে। ঠুংরীতে মুনাব্বর খাঁর কৃতিত্বের কথা বলাই বাহুল্য।

কণ্ঠসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সুনন্দা পট্টনায়ক স্ব-মানে সু-প্রতিষ্ঠিত। সঙ্গীতানুরাগীবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে দুটি ভজন গেয়ে শুনিয়েছেন। ধ্রুপদানুষ্ঠানের একমাত্র শিল্পী সুবোধ দে পরিবেশন করেন জয়জয়ন্তী ও পটমঞ্জরী। এঁর নম তান, আলাপ ও ধ্রুপদের সাবেকী বন্দেজ শোনবার মতো। তবে শান্ত ভাবটি যদি বজায় থাকত এ অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠত। অসুস্থতার কারণে শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় গাইতে পারেন নি।

যন্ত্রসঙ্গীতের প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে পদ্মভূষণ বিসমিল্লা খাঁ ও পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। মিঞা বিসমিল্লা বাজিয়েছেন বৈরাগী ভৈরব। সাধক শিল্পীর একটি ফুৎকারে শুদ্ধ স্বরশ্রুতির অনুরণনে সারা প্রেক্ষাগৃহ ভরে ওঠে। রাগ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী যেন ভাবের অতলে সমাহিত হয়ে যান—আর তাঁর ধ্যানলোকের বৈরাগ্য ও শান্তির আবেশ শ্রোতাদের মনে আবেশ সৃষ্টি করে। উপসংহারের 'ভৈরবী'তে এই আকৃতি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ বছর এই সম্মেলনেই বিসমিল্লাজীর অনুষ্ঠান প্রথম শোনা গেল। আর এ শোনা যে সার্থক—বাজনা শেষ হয়ে যাবার পরেও মনের মধ্যে সুরের অনুরণন গুঞ্জন স্মৃতিই তার প্রমাণ। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বহুদিন বাদে শোনা গেল আহির ভৈরব। শিল্পীকে ধন্যবাদ প্রতিবারের মত বহুশ্রুত 'ললিত' রাগকেই অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু করে তোলেন নি বলে। আহির ভৈরব রাগটির সঙ্গে আলি আকবর খাঁ সাহেব প্রথম শ্রোতাদের পরিচয় করান উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' চিত্রের মাধ্যমে। তারপর রবিশঙ্কর ও আলি আকবরই সারা ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাসরে এই রাগকে জনপ্রিয় করে তোলেন। আজ এই রাগ শ্রোতাদের অত্যন্ত আদরের। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এখন খ্যাতি ও সঙ্গীত-পরিণতির মধ্যগগনে। তাঁর হাতে এ রাগ শুনতে পাওয়াটা শ্রোতাদের পক্ষে দুর্লভ সৌভাগ্য। তাঁদের আশা বিফল হয় নি। ধ্রুপদী বিস্তারে, বিলম্বিত, গমক-জোড়, লড়ী জোড়, বাগার-বাণী বাজের সুগম্ভীর আধারে রাগের ক্রমবিকাশ একটি-একটি করে দল-মেলা ফুলের পাপড়ির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। বিলম্বিত গতের ও দ্রুত গতের বন্দেজে গুরু আলাউদ্দীন খাঁ তথা [illegible] ঘরানার গায়কী ও তন্ত্রকার পদ্ধতিতে একাধারে আঙ্গিক-সিদ্ধতা ও কল্পনার ঐশ্বর্যের আশ্চর্য সমন্বয়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। 'ভৈরবী' দিয়ে ইনি অনুষ্ঠানের মধুর পরিসমাপ্তি ঘটান। বলরাম পাঠকের 'আহিরী'তে বাঁ-হাতের টিপ ও মীড়ের কারুকার্য মুগ্ধকারী, তবে বাজ তেমন জোরালো না হওয়ায় বাজনায় কোনো শিল্পী-ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় নি। মণিলাল নাগের 'সুহা-কানাড়া' কি রাগ বিচারে, কি তানের বাহারে উচ্চাঙ্গের বাজনা। তবে অনেক বড় বড় তেহাই এবং ছন্দের নানান বৈচিত্র্যের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার জনাই হয়ত গতের মুখে ফিরে আসার মজা থেকে শ্রোতাদের বঞ্চিত করেছেন। গুরু আলাউদ্দীন-সৃষ্ট 'হেমবেহাগ' রাগে বেহালা বাজিয়ে শোনান রবীন ঘোষ। সুবিন্যস্ত বিস্তার, সুর ও ছন্দে শিল্পীর নিষ্ঠা ও রেওয়াজ চিহ্নিত। এক জায়গায় স্বরসমন্বয় অত্যন্ত চিত্তহারী, তবে নিয়ম ও শৃঙ্খলার দিকে বড় বেশী নজর থাকায় মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্তির অভাব অনুভূত হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পদ্ধতি মানা অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু রসসৃষ্টির তাগিদে মাঝে মাঝে দুঃসাহসী হওয়ারও প্রয়োজন আছে। সরোদে ছিলেন প্রবীণ শিল্পী শ্যাম গাঙ্গুলী ও নবীন আমজাদ আলি খান। শ্যাম গাঙ্গুলী আলাউদ্দীন খাঁ-সৃষ্ট 'হেমন্ত' বাজালেন। শ্রীগাঙ্গুলীর পাণ্ডিত্য ও শিল্পবোধের সুন্দর সামঞ্জস্যে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য। সর্বশেষ অনুষ্ঠান আমজাদ আলি খাঁর গুর্জরী তোড়ি মধুর তান ও সুরে ভোরের বাতাস মাতিয়ে দিয়েছে। সঙ্গতে প্রথিতনামা ও উদীয়মান সকল শিল্পীই আপনাপন মানানুসারে সম্মেলনের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন।

সপ্তক সঙ্গীত শিক্ষা পরিষদ : শ্রীরামপুর টাউন হলে ১ জানুয়ারী সপ্তক সঙ্গীত শিক্ষা পরিষদের বিচিত্রানুষ্ঠান ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। তরুণ গীতিকার লক্ষ্মীকান্ত রায় ও কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানান হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। শ্রোতাদের অনুরোধে গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব রেকর্ডের জনপ্রিয় দুটি গান শোনান। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী কমল চক্রবর্তী, মানিক চট্টোপাধ্যায়, সমীর ভাদুড়ী, কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শিল্পী চক্রবর্তী ও প্রখ্যাত কৌতুক অভিনেতা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ দত্ত।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলার কথা

ভারতীয় ক্রিকেট ইরাণী ট্রফি-দলীপ ট্রফি

চলতি বছরের ক্রিকেট মরশুমে কোন বিদেশী ক্রিকেট দলের ভারতে আসার কথা নেই। তাই ক্রিকেট রসিকদের কাছে এ-বছরের একমাত্র আকর্ষণ রঞ্জি ট্রফি, দলীপ ট্রফি ও ইরানী ট্রফির খেলা। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে (১৯শে—২২শে ডিসেম্বর) ইরানী ট্রফির খেলা হয়ে গেল কলকাতার ইডেন উদ্যানে। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল ভারতের অবশিষ্ট দলের সঙ্গে গতবারের রঞ্জি ট্রফি 'বিজয়ী বোম্বাই দল। দুটি দলই তৈরী হয়েছিল ভারতের বর্তমান কালের বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে। অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ছিলেন বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় তরুণ। এই জন্যেই ইরানী ট্রফির খেলাটি কলকাতার ক্রিকেট অনুরাগীরা খুব আকর্ষণীয় হবে ভেবেছিলেন। এছাড়া এই খেলা সম্পর্কে আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেটি হলো, এই বছরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য ভারতীয় দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন করা হবে মোটামুটি এই খেলাটির উপর ভিত্তি করেই।

আমরা প্রত্যেকেই ভেবেছিলাম যে, খেলাটি অত্যন্ত উপভোগ্য হবে। কিন্তু দুঃখের কথা, খেলার আকর্ষণ যত প্রবলই হোক না কেন, খেলাটিকে কখনই সজীব-উপভোগ্য হয়ে উঠতে দেখি নি। একথা জোর করেই বলা যায় বাংলার দর্শক তথা ক্রীড়ারসিকদের কারও মন ভরে নি এ খেলাটি দেখে। তার প্রধান কারণ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মেজাজের অভাব ছিল।

শেষ পর্যন্ত খেলায় বোম্বাই যোগ্য দল হিসেবে জয়ী হয়েছে। দল হিসেবে ভারতের অবশিষ্ট দল কিম্বা বোম্বাই—দুটিই সমান ক্ষমতার অধিকারী দল। তবে ভারতের অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়দের খেলায় প্রাণের অভাব ছিল। তাঁরা ব্যক্তিগত খেলা নিয়েই যেন বেশি ব্যস্ত ছিলেন। কি করে আগামী ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে নিজের জায়গাটুকু পাকাপাকি করে নেওয়া যায় তারই চিন্তা অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়দের মাথায় বেশী প্রবল ছিল। ফলে, প্রত্যেক খেলোয়াড় ব্যক্তিগত খেলা দেখাবার জন্য একটু বেশীমাত্রায় সচেষ্ট ছিলেন। এই অবস্থা উদীয়মান খেলোয়াড়দের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। দলের প্রয়োজনে যে ধরনের খেলা হওয়া উচিত অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়দের খেলায় তার অভাব বিশেষভাবে দেখা গেছে। অথচ, বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়রা বরাবরই দলীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে খেলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 'টিম ওয়ার্ক'। ওঁদের খেলা দেখে মনে হয়েছিল, যেন একটা সুখী পরিবার মাঠে নেমেছে। ক্রীড়া বিজ্ঞানের মূলকথা হলো বোঝাপড়া। খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া একান্ত প্রয়োজন। এই মূলমন্ত্রটিকে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়রা সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। ফলও তাঁরা পেয়েছেন নৈকি। দলের শক্তি তাঁদের যাই হোক না কেন, শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাপকাঠিতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

খেলায় অবশিষ্ট দলের জয়ন্তীলাল, সেলিম দুরাণী, কানিৎকার, অম্বর রায় এবং বোম্বাইয়ের মানকড় এবং ওয়াদেকরের ব্যাটিং বলার মতো হয়েছে। বোলিংয়ে যাঁরা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা হলেন বোম্বাইয়ের একনাথ সোলকার এবং অবশিষ্ট দলের মহিন্দর অমরনাথ। সত্যিই এঁদের বোলিং প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য একথাও বলতে হয় এইসব খেলোয়াড়দের খেলা উল্লেখযোগ্য হলেও, মানের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারে নি।

কমল ভট্টাচার্য

কিন্তু শুধু খেলোয়াড়দের দোষ দেওয়া চলে না। ইডেনের উইকেটের জন্যেই এঁদের খেলা উচ্চমানে উঠতে পারে নি। অত্যন্ত প্রাণহীন 'স্লো' উইকেট আমাদের ইডেনে। খেলোয়াড় যত দক্ষই হোন না কেন, এই রকম প্রাণহীন স্লো' উইকেটে দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। কোন খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব নয়—না ব্যাটসম্যান না বোলার। ফলে মনোনয়ন কমিটির সদস্যদের ভারতীয় দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, আগামী ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে আমাদের খেলোয়াড়দের খেলতে হবে প্রত্যেকটি প্রাণবন্ত উইকেটে। অর্থাৎ 'হার্ড এ্যাণ্ড ফাস্ট' উইকেটে।

বোম্বাই দলের ফিল্ডিং কিন্তু খুব চমৎকার হয়েছিল। তবুও এক মুহূর্তের জন্যেও খেলায় প্রাণের সঞ্চার হয়নি। ইরানী ট্রফির খেলা, এত বড় খেলা, অথচ এ খেলা দেখে কেউ ক্রীড়ামোদীই সত্যিকারের আনন্দ পান নি। খুব আফশোষের কথা।

এ বছরের শুরুতেই পয়লা জানুয়ারী থেকে এই ইডেন উদ্যানেই পাতা হয়েছিল ক্রিকেটের আর এক মস্ত আসর—দলীপ ট্রফির সেমি-ফাইনাল খেলা। খেলা হয়েছিল পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে। এই খেলাটিকে নিয়েও কলকাতার দর্শকদের মনে কম উত্তেজনা ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, ইরানী ট্রফির খেলা দেখে দর্শকরা যতোটা নিরাশ হয়েছেন ঠিক ততটা আনন্দ পেয়েছেন দলীপ ট্রফির খেলা দেখে। খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মেজাজ সব সময়েই উপভোগ করেছেন দর্শকরা।

খেলার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই যাঁদের কথা মনে আসে তাঁরা হলেন পূর্বাঞ্চল দলের প্রকাশ পোদ্দার এবং গোপাল বোস। সত্যিই ওঁদের দুজনের ব্যাটিং দেখবার মতো হয়েছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি বলের সদ্ব্যবহার করেছেন ওঁরা দুজনে। যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন খুব সজীবতার সঙ্গে রান তুলেছেন ওঁরা। মোট কথা ওঁদের খেলার মধ্যে এমন একটা গতি ছিল, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁদের খেলার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল তাঁরা কখনই বোলারকে অযথা প্রাধান্য দেন নি। সমস্ত খেলার মধ্যে কোন সময়েই আলতো বল বা মারার মত বলের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য উত্তরাঞ্চলের সুরিন্দর অমরনাথ ও হামিদ আলির ক্ষেত্রে। এঁরাও বোলারকে অযথা প্রাধান্য দিয়ে খেলার গতিরুদ্ধ করেন নি।

এঁদের পরেই আসে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক রমেশ সাকসেনা এবং অম্বর রায়ের খেলার কথা। রমেশ সাকসেনা যতক্ষণ খেলেছিলেন ততক্ষণ ওঁর মধ্যে দেখেছি এক অদ্ভুত তৎপরতা। অত্যন্ত নির্ভীকভাবে সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রত্যেকটি বল খেলেছেন উনি। রমেশ সাকসেনার খেলা বহু দর্শককে মুগ্ধ করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অম্বর রায়ের খেলা তুলনামূলকভাবে তাঁর সাম্প্রতিককালের খেলার থেকে ভালো হয়েছে। তবে রমেশ সাক্সেনা এবং অম্বর রায়ের খেলা মোটামুটি ভালো হলেও এঁদের খেলায় বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। উইকেটে পরোপরি সেট হয়ে যাওয়ার পরও এঁদের বোলারকে অযথা প্রাধান্য দিতে দেখেছি। অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে এটা আমরা নিশ্চয়ই আশা করিনি। বোলারকে অযথা প্রাধান্য দেওয়াতে এঁদের খেলায় সময়ে সময়ে যথেষ্ট প্রাণের অভাব দেখা দিয়েছিল।

ফিল্ডিং যখন রক্ষণাত্মক আকারে সাজানো হয়, অর্থাৎ খেলোয়াড়দের দূরে

দূরে ছড়িয়ে রাখা হয়, তখন আস্তে মেরে 'সিঙ্গল' রানের উপরেই খেলা উচিত। কারণ দূরের ফিল্ডারদের ফাঁক গলিয়ে বাউন্ডারীর বাইরে বল পাঠানো কোন মতেই সম্ভব নয়। অম্বর এবং সাকসেনাকে দেখেছি এই একই ভুল করতে। জোরে মারার ফলে তাঁরা বার-বার 'সিঙ্গল' রান সংগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আর ঠিক এই কারণেই পূর্বাঞ্চলের রানের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। তবে খেলা যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত জয় হলো পূর্বাঞ্চল দলেরই। এই গৌরব অর্জনের পিছনে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশী বলে মনে হয়, তাঁরা হলেন দিলীপ দোশী এবং গোপাল বোস—দোশীর মারাত্মক বোলিং (৪৮ রানে ৫ উইকেট) গোপাল বোসের চমৎকার ফিল্ডিং।

উত্তরাঞ্চলের চরম বিপর্যয়ের মুখে সুরিন্দর অমরনাথ (৩৬ রান) এবং হায়দার আলি (৭৪) রান যেভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে নির্ভয়ে খেলেছেন তাতে ক্রিকেট রসিকরা সত্যই মুগ্ধ হয়েছেন। তরুণ বোলার ও ব্যাটসম্যান হায়দার আলি আলতো বলগুলি যথেষ্ট জোরের সঙ্গে খেলে খেলাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। উত্তরাঞ্চলের ওপেনার আকাশলালের (৪২ রান) খেলার মধ্যে যে দৃঢ়তা দেখেছিলাম তা সত্যিই মনে রাখবার মতো।

দলীপ ট্রফির ফাইনাল খেলা হয়ে গেল বোম্বাইতে। উত্তরাঞ্চলকে হারিয়ে পূর্বাঞ্চল এই প্রথম ফাইনাল খেললো দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে।

গত ১২ই জানুয়ারী শেষ হয়ে গেল দলীপ ট্রফির ফাইনাল খেলা। এই খেলায় দশ উইকেটে জিতে গেল দক্ষিণাঞ্চল দল। একথা স্বীকার করতেই হবে, প্রকৃত যোগ্য দল হিসাবেই দক্ষিণাঞ্চল দল জয়ী হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চল দল খেলার সব দিক দিয়েই পূর্বাঞ্চলের থেকে শক্তিশালী ছিল। তবে একথা বলতে হয় ভাগ্যদেবী পূর্বাঞ্চলকে প্রতিবার একাধিকবার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন সময়েই পূর্বাঞ্চল দল তার সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। একথা প্রত্যেকেই জানেন যে, কোন শক্তিশালী দলকে পরাজিত করতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজন ফিল্ডিংয়ে দক্ষতা। ফাইনাল খেলায় যদি পূর্বাঞ্চলের ফিল্ডিং উচ্চমানের হতো, তাহলে হয়তো দলীপ ট্রফি এবার পূর্বাঞ্চলের ঘরে আসতো। দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দল যেভাবে ফিল্ডিংয়ে ব্যর্থতা দেখিয়েছে তা সত্যিই কল্পনার বাইরে। এই দলের পরাজয়ের একমাত্র কারণ বলা যেতে পারে খেলার গোড়ার দিকে দু-দুটো ক্যাচ ফেলে দেওয়া।

অথচ এই পূর্বাঞ্চল দল যথেষ্ট উচ্চমানের ফিল্ডিং দেখিয়ে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সেমিফাইন্যাল খেলায় নিজেদের জয়কে সম্ভব করে তুলেছিল। একমাত্র দিলীপ দোশী ছাড়া আর কেউ এই দলে ছিলেন না, যিনি ভালো উইকেটে একজন জাত ব্যাটসম্যানকে সরাসরি আউট করতে পারেন। সুতরাং ফিল্ডিংয়ে দক্ষতা এক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, উত্তরাঞ্চল বা দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের খেলার ফলাফল যাই হোক না কেন, ভারতের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ দল দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দল যা খেলেছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। কারণ হিসেবে বলতে হয়, শুধু শক্তিশালী বোলারদের নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল দল তৈরী হয়েছিল। জয়সীমা, আবিদ আলি, বিশ্বনাথ, আব্বাস আলি বেগের মতো ব্যাটসম্যান ছাড়াও যে দলে প্রসন্ন, গোবিন্দরাজ, চন্দ্রশেখর, আবিদ আলি, ভেঙ্কটরাঘবনের মতো বোলার আছেন, সেই দলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৩৮২ রান তোলা সহজ কথা নয়। এছাড়া আরও একটা কথা আছে, দু দলেরই সেরা ব্যাটসম্যানের অনুপস্থিতি। দক্ষিণাঞ্চলের পতৌদি যেমন খেলেন নি, অনুপস্থিত ছিলেন। তেমনি পূর্বাঞ্চলের সেরা ব্যাটসম্যান অম্বর রায়-সুন্দর মিত্রও অনুপস্থিত ছিলেন। ক্ষতি দু দলেরই হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলের ক্ষতি বেশী।

দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলায় আমরা যাঁর পরিচয় সঠিকভাবে পেলাম তিনি গোপাল বোস। গোপাল বোস যদিও দলের সেরা অল-রাউন্ডার, কিন্তু তাঁকে আমরা জানতাম বোলার হিসেবে। বাংলার অধিনায়ক অম্বর রায়ই গোপালকে ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যে খেলোয়াড় সাত কি আট নম্বর হিসেবে মাঠে নামতেন, তিনি প্রথম ইনিংসের খেলায় তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে নেমে ১১৩ রান সংগ্রহের সূত্রে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, পূর্বাঞ্চলের তিনি একজন সেরা 'অল-রাউন্ডার'।

স্মরণীয় ক্রিকেটার ডন ব্র্যাডম্যান

প্রবীর ঘোষ

১৯৩০ সালে উডফুলের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরে যায়। সেদিন ডন ব্র্যাডম্যান ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান দলের তরুণ ব্যাটসম্যান। ১৯২৮-২৯ সালের ক্রিকেট মরসুমে স্বদেশের মাটিতে তিনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চারটে টেস্ট ম্যাচ খেলে মোট ৪৬৮ রান (গড় ৬৬-৮৫) সংগ্রহের সূত্রে দলের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন। ১৯২৮-২৯ সালে টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে (ব্রিসবেন) ব্র্যাডম্যান তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে মাত্র ১৮ ও ১ রান করে আউট হন। দ্বিতীয় টেস্টে তিনি দলে স্থান পাননি। ১৯২৮-২৯ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর খেলা দেখে কেউ ধারণা করেন নি ডন ব্র্যাডম্যান একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হবেন। মাত্র চারটে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্র্যাডম্যান ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ড সফরে যান। ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে তাঁর এই প্রথম বিদেশ সফর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সালে ব্র্যাডম্যান তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট সিরিজে মোট ৯৭৪ রান (গড় ১৩৯-১৪) সংগ্রহ করে টেস্ট খেলার এক সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান করার যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা আজও কেউ স্পর্শ করতে পারেননি।

১৯৩০ সালে লীডস্-এর তৃতীয় টেস্ট খেলার প্রথম দিনের (১১ই জুলাই) ৩৪০ মিনিটে তাঁর রান সংখ্যা দাঁড়ায় নট আউট ৩০৯। এইদিন (১১ই জুলাই) অস্ট্রেলিয়া যে ৪০৮ রান করেছিল তার মধ্যে একা ব্র্যাডম্যানেরই রান ছিল নট আউট ৩০৯ রান, যা আজও একদিনের টেস্ট খেলার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড হয়ে আছে। এই খেলার প্রথম ইনিংসে তিনি মোট ৩৩৪ রান করে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা সাত বছর পর ১৯৩৮ সালে ওভাল মাঠে লেন হাটন (ইংল্যান্ড) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৬৪ রান করে ভেঙেছিলেন। ১৯৩০ সালের টেস্ট সিরিজে ব্র্যাডম্যানের খেলা দেখে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট রসিকরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন—এমন খেলা তাঁরা জীবনে আর দেখেন নি। সেই সিরিজে ব্র্যাডম্যান এক নতুন যুগের সূচনা করলেন যার নাম ব্র্যাডম্যানের যুগ। তাঁর ব্যাটের গ্রিপ্ ধরার বৈশিষ্ট্যকে বলা হত—ব্র্যাডম্যান গ্রিপ্।

ক্রিকেটকে বলা হয়—

A game of glorious uncertanties কিন্তু ব্র্যাডম্যানের খেলায় কোন অনিশ্চয়তা ছিল না। সেঞ্চুরি তিনি করবেনই—অথবা তার কাছাকাছি রান। এ যেন তাঁর খেলার বাঁধাধরা ব্যাপার। তাই কৌতুকচ্ছলে তাঁকে বলা হত— "a run-getting machine."

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সালের টেস্ট সিরিজে মোট ৯৭৪ রান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৩১-৩২ সালের টেস্ট সিরিজে মোট ৮০৬ রান তুলে ডন ব্র্যাডম্যান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। প্রধানতঃ ব্র্যাডম্যানের স্বাভাবিক খেলা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ডি আর জার্ডিন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৩২-৩৩ সালের টেস্ট সিরিজে মাথা খাটিয়ে দলের ফাস্ট বোলার লারউডকে দিয়ে বিপজ্জনক 'বডি লাইন বোলিং' উদ্ভাবন করে বেশ কিছুটা সফল হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩২-৩৩ সালের টেস্ট সিরিজে ব্র্যাডম্যানের মোট রান দাঁড়ায় ৩৯৬ (গড় ৫৬-৫৭)। তবে জার্ডিন এবং লারউডকে বডিলাইন বোলিং নিয়ে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের পর লারউডকে টেস্ট খেলায় দেখা যায়নি।

ক্রিকেটের ইতিহাসে ব্র্যাডম্যান একজন অনন্য মনীষা এবং পুরুষাকারে প্রদীপ্ত পুরুষ-সিংহ। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান বলতে একমাত্র তাঁকেই বোঝায়।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে মোট রান সংখ্যায় এ পর্যন্ত মাত্র হ্যামন্ড (ইংল্যান্ড) তাঁর রান সংখ্যাকে অতিক্রম করেছেন—হ্যামন্ডের মোট রান ৭২৪৯। কিন্তু তাঁর থেকে অনেক কম সংখ্যক টেস্ট ইনিংস খেলেছেন ব্র্যাডম্যান। মাত্র ৮০টি ইনিংস খেলে ৬৯৯৬ রান করেছেন—গড়ে ৯৯-৯৪ রান। হ্যামন্ডের গড় ৫৮-৪৫। ইংল্যান্ডের কলিন কাউড্রের শুধু সরকারী টেস্ট খেলায় এ পর্যন্ত (জানুয়ারী ১৯, ১৯৭১) মোট রান দাঁড়িয়েছে ৬৯৭০।

ক্রিকেটার হিসাবে ডন ব্র্যাডম্যান দর্শকদের হৃদয়ে ক্রিকেটের মহাসঙ্গীত রচনা করে গেছেন। তাঁদের চিত্তে এক অনাস্বাদিত রোমান্টিক ভাবের সৃষ্টি করেছেন, যা, তাঁর খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা চিরকাল অনুভব করবেন। ক্রিকেট খেলায় যে আশা মৃত্যুঞ্জয়ী, যে আশা জড়তানাশা তাকেই তিনি দর্শকমনে সঞ্চারিত করেছেন, তাঁদের উদ্দীপ্ত করেছেন তাঁর গৌরবদীপ্ত খেলোয়াড়-জীবনে।

স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের ক্রিকেট জীবন নিয়ে অনেক প্রবন্ধ-বই লেখা হয়েছে। আরও হবে, কারণ তাঁর ক্রিকেট-জীবন বিশ্ব-ক্রিকেট ইতিহাসেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর সেই ভাস্বর জীবনের আদর্শ তাঁর উত্তরসূরীদের উদ্বুদ্ধ করবে, প্রেরণা যোগাবে অনাগত যুগ ধরে।

তাই সর্বদেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা তাঁর শতায়ু কামনা করেন। বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসে এত জনপ্রিয়তা, এত প্রীতি, এত সম্মান আর কোন ক্রিকেটার পান নি।

ক্রিকেট যতদিন থাকবে ততদিন সারা বিশ্বের ক্রিকেট-রসিকরা তাঁর নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবেন।

ব্র্যাডম্যানের বিশ্ব রেকর্ড

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ব্র্যাডম্যান যেসব বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন তার মধ্যে নীচের বিশ্বরেকর্ডগুলি আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

এক সিরিজে সর্বাধিক রান: ৯৭৪ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩০। খেলা ৫, ইনিংস ৭, নট আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৪, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৩৯-১৪)

একদিনে সর্বাধিক রান : ৩০৯ রান (৩৪০ মিনিটে) বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস, ১৯৩০)

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউন্ডারী : ৪৬টি (৩৩৪ রানের মধ্যে, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস, ১৯৩০)

সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ২৯টি (৫২টি টেস্টের ৮০ ইনিংসে, ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮)

এক সিরিজে সর্বাধিক 'ডাবল' সেঞ্চুরী : ৩টি (লর্ডসে ২৫৪ রান, লিডসে ৩৩৪ রান এবং ওভালে ২৩২ রান), বিপক্ষে ইংলণ্ড, ১৯৩০

সর্বাধিক গড় : ৯৯-৯৪ (খেলা ৫২, ইনিংস ৮০, নট আউট ১০ বার এবং মোট রান ৬৯৯৬)

পার্টনারশিপ রেকর্ড

২য় উইকেট : ৪৫১ রান—ব্র্যাডম্যান ও পনসফোর্ড, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ওভাল, ১৯৩৪

৫ম উইকেট : ৪০৫ রান—ব্র্যাডম্যান ও বার্নেস, ইংলন্ডের বিপক্ষে, সিডনি, ১৯৪৬-৪৭

৬ষ্ঠ উইকেট ৩৪৬ রান—ব্র্যাডম্যান ও ফিংগলটন, ইংলন্ডের বিপক্ষে, মেলবোর্ন ১৯৩৬-৩৭

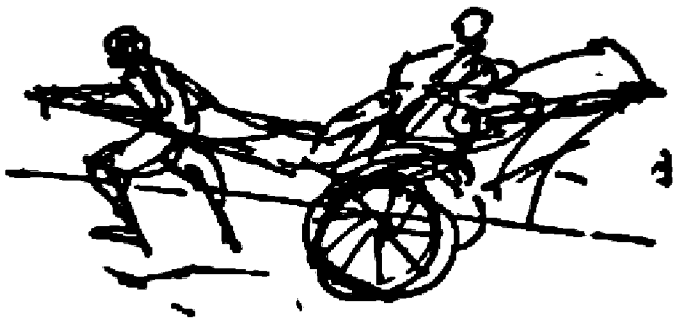

খেলাধুলা

দর্শক

দলীপ ট্রফি
ফাইনাল খেলা

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৭০-৭১ সালের দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল ১০ উইকেটে পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করে মোট ৫ বার (১৯৬৩-৬৪ সালে পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে যুগ্মভাবে একবার) দলীপ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল দলের ফাইনালে খেলা হল ৮বার এবং অপরদিকে পূর্বাঞ্চল দলের মাত্র একবার। দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতার গত দশ বছরের খেলায় মাত্র এই দুটি দল দলীপ ট্রফি জয়ী হয়েছে—পশ্চিমাঞ্চল ৬বার (১৯৬৩-৬৪ সালে দক্ষিণাঞ্চল দলের সঙ্গে যুগ্মভাবে একবার) এবং দক্ষিণাঞ্চল ৫বার।

প্রথম দিনের খেলায় পূর্বাঞ্চল ৫ উইকেট খুইয়ে ৩২৩ রান সংগ্রহ করেছিল। ৩য় উইকেটের জুটিতে গোপাল বোস (১১৩ রান) এবং রমেশ সাকসেনা (৯০ রান) ১৬৮ মিনিটের খেলায় ১৭৭ রান সংগ্রহ করে খেলার ভিত শক্ত করেছিলেন। গোপাল বোস ২০৫ মিনিটে তাঁর ১১০ রানে ১৯টা বাউন্ডারী করেন।

দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ৩৮২ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিনে তাদের বাকি পাঁচ উইকেটে মাত্র ৫৯ রান উঠেছিল। খেলার বাকি সময়ে দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের তিন উইকেট খুইয়ে ১৭৯ রান সংগ্রহ করেছিল। জয়সীমা ৫৪ রান এবং আবিদ আলী ২১ রান করে অপরাজিত থাকেন। দক্ষিণাঞ্চল দলের খেলার সূচনা খুব আলগা হয়েছিল—৪৫ মিনিটের খেলায় মাত্র ৩০ রানের মাথায় তাদের দ্বিতীয় উইকেট পড়ে যায়। এই অবস্থায় আব্বাস আলী বেগ এবং জয়সীমা তৃতীয় উইকেটের জুটি বেঁধে ১৪৫ মিনিটের খেলায় দলের ১১৭ রান তুলে দলের ভাঙ্গন প্রতিরোধ করেন।

তৃতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ৪৫১ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৬৯ রানে অগ্রগামী হয়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে জয়সীমা (১৩১ রান) এবং আবিদ আলী ২১২ মিনিটের খেলায় দলের ২০৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন। পূর্বাঞ্চল দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের খারাপ ফিল্ডিংয়ের দরুণই দক্ষিণাঞ্চল দলের এত বেশী রান উঠেছিল। পূর্বাঞ্চল দল এইদিন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে পূর্বাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১০০ রানের মাথায় শেষ হলে দক্ষিণাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৬২ রান তুলে দশ উইকেটে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পূর্বাঞ্চল : ৩৮২ রান (গোপাল বোস ১১৩ এবং রমেশ সাকসেনা ৯০ রান। গোবিন্দরাজ ১১৪ রানে ৫ এবং চন্দ্রশেখর ১০২ রানে ৩ উইকেট)।

● ১০০ রান (শুক্লা ৪৪ রান। গোবিন্দরাজ ৪০ রানে ৩ উইকেট)।

দক্ষিণাঞ্চল : ৪৫১ রান (জয়সীমা ১৩১, আবিদ আলী ১২০ এবং বেগ ৮০ রান। সাংভি ১০৪ রানে ৩ উইকেট)।

● ৬২ রান (কোন উইকেট না পড়ে। বেলিয়াপ্পা ৩৫ নট আউট)।

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া
চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যাণ্ড : ৩৩২ রান (বয়কট ৭৭ এবং এড্রিচ ৫৫ রান। গ্লিসন ৮৩ রানে ৪ এবং ম্যালেট ৪০ রানে ৪ উইকেট)
● ৩১৯ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বয়কট ১৪২ নট-আউট, ওলিভিয়েরা ৫৬ এবং ইলিংওয়ার্থ ৫৩ রান। ম্যালেট ৮৫ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২৩৬ রান (রেডপাথ ৬৪ এবং ওয়াল্টার্স ৫৫ রান। আণ্ডারউড ৬৬ রানে ৪ উইকেট)
● ১১৬ রান (লরী ৬০ নট-আউট এবং স্ট্যাকপোল ৩০ রান। জন স্নো ৪০ রানে ৭ উইকেট)।

সিডনিতে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ২৯৯ রানে জয়ী হয়ে ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। এই সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায় এবং বৃষ্টির ফলে তৃতীয় টেস্ট খেলায় একটা বলও খেলা হয়নি। সিডনি মাঠে এই নিয়ে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ৪৩টি টেস্ট খেলা হল, তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ২০, ইংল্যাণ্ডের জয় ১৭ এবং খেলা ড্র ৩।

প্রথম দিনে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ২৬৭ রান সংগ্রহ করে। প্রথম উইকেটের জুটিতে বয়কট এবং লাকহার্স্ট ১১৬ রান সংগ্রহ করে খেলার ভিত বেশ শক্ত করলেও চা-পানের পর খেলতে নেমে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ১৮ রানের বিনিময়ে ৪টে উইকেট ফেলে দেয়। যেখানে এক সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ২ উইকেট পড়ে ২০১, সেখানে প্রথম দিনের খেলার শেষে রান দাঁড়াল ৭ উইকেট পড়ে ২৬৭। খেলার এক সময় অস্ট্রেলিয়ার অফ-স্পিন বোলার ম্যালেট ৩৯টি বল দিয়ে মাত্র ৪ রানের বিনিময়ে ৩টে উইকেট নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৩২ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের সূচনা মোটেই সুবিধের হয়নি—১৪ রানের মাথায় ১ম এবং ৩৮ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ওয়াল্টার্স এবং রেডপাথ ৯৯ রান সংগ্রহ করে সাময়িকভাবে অস্ট্রেলিয়ার পতন রোধ করেন। ইংল্যাণ্ডের ফিল্ডিংয়ে গলদ না হলে অস্ট্রেলিয়াকে আরও শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হত।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৩৬ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ড ৯৬ রানের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। ন্যাটা স্পিন-বোলার আণ্ডারউড শেষপর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কাল হয়ে দাঁড়ান। আণ্ডারউড মাত্র ৫ রানের বিনিময়ে ৩টে উইকেট পান।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৭৮ রান সংগ্রহ করে জয়লাভের পথ সুগম করে নেয়। বয়কট ৮৪ এবং ওলিভিয়েরা ৫৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ইংল্যাণ্ড ২৭৪ রানে অগ্রগামী এবং দুদিনের খেলা বাকি।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৩১৯ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪১৬ রানের পিছনে ধাওয়া করে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

অস্ট্রেলিয়া শেষপর্যন্ত পরাজয় এড়াতে পারলো না। পঞ্চম দিনে লাঞ্চের পর অস্ট্রেলিয়া মাত্র তিন মিনিট খেলেছিল। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ১১৬ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ড ২৯৯ রানে জয়ী হয়। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে জন স্নো ৪০ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে ইংল্যাণ্ডকে জয়লাভে প্রকৃত সাহায্য করেন। তাঁর এই ৪০ রানে ৭ উইকেট—টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠ বোলিংয়ের পরিচয়। তাঁর পূর্বের রেকর্ড ছিল ৪৯ রানে ৭ উইকেট (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিংস্টনের ২য় টেস্ট, ১৯৬৮)।

আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

হায়দরাবাদে আয়োজিত ২৬তম আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগের ফাইনালে মহারাষ্ট্র জয়ী হয়ে উপর্যুপরি ৫ বার চাড্ডা কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে উপর্যুপরি ২ বার রহিমতুল্লা কাপ পেয়েছে। বালকদের জুনিয়ার বিভাগে নারাঙ্গ কাপ জয়ী হয়েছে মহীশূর।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : রেলওয়ে ৩—২ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৩-০ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

জুনিয়র বিভাগ : মহীশূর ৩-০ খেলায় উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করে।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

হায়দরাবাদে আয়োজিত ৩৫তম জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগের ফাইনালে উত্তরপ্রদেশের শ্রীমতী দময়ন্তী তাম্বে (কুমারী জীবনে সুবেদার) উপর্যুপরি ৩বার খেতাব জয়ী হয়েছেন। পুরুষ বিভাগের ফাইনালে রেলওয়ের সুরেশ গোয়েল রেলওয়েরই দীপু ঘোষকে পরাজিত করে গতবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

একমাত্র মহারাষ্ট্রের কুমারী শোভা মূর্তি তিনটি বিভাগের ফাইনালে খেলে দুটি খেতাব জয়ের সূত্রে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ সিঙ্গলস : সুরেশ গোয়েল (রেলওয়ে) ১৫-১১, ৫-১৫ ও ১৭-১৬ পয়েন্টে দীপু ঘোষকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলা সিঙ্গলস : শ্রীমতী দময়ন্তী তাম্বে (উত্তরপ্রদেশ) ১১-৮ ও ১১-০ পয়েন্টে কুমারী শোভা মূর্তিকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : দীপু ঘোষ এবং রমন ঘোষ (রেলওয়ে) ১৫-৬ ও ১৫-৩ পয়েন্টে নান্দু নাটেকার এবং অনিল প্রধানকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী শোভা মূর্তি এবং কুমারী মৌরিন মাথিয়াস (মহারাষ্ট্র) ১৭-১৪ ও ১৫-১২ পয়েন্টে কুমারী রফিকা লতিফ এবং কুমারী সুনিলা আপ্তেকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী শোভা মূর্তি এবং নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ১৫-৭ ও ১৫-১১ পয়েন্টে কুমারী তুলসী ব্যানার্জি এবং অনিল সোম্বীকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

রোভার্স কাপ ফাইনাল

বোম্বাইয়ের কুপারেজ মাঠে ১৯৭০ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় দ্বিতীয় দিনে কলকাতার মোহনবাগান ১-০ গোলে বোম্বাইয়ের মাহিন্দ্র অ্যাণ্ড মাহিন্দ্র ক্লাবকে পরাজিত করে মোট চারবার রোভার্স কাপ জয়ী হয়েছে। ইতিপূর্বে তারা ১৯৫৭, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৮ সালে রোভার্স কাপ পেয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে মোহনবাগানের রোভার্স কাপের ফাইনালে খেলা হল মোট ১২বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি ৭ বার) এবং অপরদিকে মাহিন্দ্র এ্যাণ্ড মাহিন্দ্র ক্লাবের একবার। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য ভাবে ড্র হয়। দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধে মোহনবাগান বিপক্ষের আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে খেলার ৫২ মিনিটে গোল দেয়, সুভাষ ভৌমিক দলের জয়সূচক গোলটি দেন। এই গোল খাওয়ার পর বোম্বাই দল ৬১ মিনিটে গোল শোধ দেওয়ার শেষ সুবর্ণ-সুযোগ নষ্ট করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে যে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ক্রিকেট খেলার সফর সুরু করবে তার খেলোয়াড় নির্বাচন পর্ব শেষ হয়েছে। দলের নির্বাচিত ১৬জন খেলোয়াড়ের মধ্যে পাঁচজন খেলোয়াড় ভারতবর্ষের পক্ষে কোন টেস্ট ম্যাচ খেলেননি। তাঁরা হলেন—জয়ন্তীলাল, কৃষ্ণমূর্তি গোবিন্দরাজ, গাভাস্কার এবং জিলিবর। দলের এগারজন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে জয়সীমা, সারদেশাই, দুরাণী এবং প্রসন্ন—এই চারজন খেলোয়াড়ের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের অভিজ্ঞতা আছে। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় হলেন সেলিম দুরানী (বয়স ৩৬) এবং সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় সুনীল গাভাস্কার (বয়স ২০)। সাধারণের অভিমত অভিজ্ঞ এবং তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দলটি তৈরী হয়েছে এবং যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তবে বাংলার উইকেটকিপার জিলিবরের নির্বাচন কোন কোন মহলকে বিস্মিত করেছে। দলে নির্বাচিত ১৬জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বোম্বাইয়ের ৫জন, হায়দরাবাদের ৫জন, মহীশূরের ২জন এবং একজন করে খেলোয়াড় আছেন তামিলনাড়ু, দিল্লী, বাংলা এবং রাজস্থানের।

খেলোয়াড়বৃন্দ : অজিত ওয়াদেকার (অধিনায়ক), এস ভেঙ্কটরাঘবন (সহ-অধিনায়ক), অশোক মানকাদ, কে জয়ন্তীলাল, জি আর বিশ্বনাথ, ই ডি সোলকার, এস এম গাভাস্কার, এম এল জয়সীমা, ই এ এস প্রসন্ন, বি. এস বেদী, আর জিলিবর (উইকেট কিপার) পি কৃষ্ণমূর্তি (উইকেট-কিপার), ডি গোবিন্দরাজ, আবিদ আলী, ডি এন সারদেশাই এবং এস এ দুরাণী।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

আগ্রায় ২১তম জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগের খেতাব জয়ের সূত্রে সর্বাধিক বার খেতাব জয়ের রেকর্ড (১০ বার) করেছে। তাছাড়া তাদের উপর্যুপরি সর্বাধিকবার খেতাব জয়ের রেকর্ড (১১ বার) অক্ষুণ্ণ আছে। মহিলা বিভাগের ফাইনালে বাংলা দলের কাছে গত চার বছরের চ্যাম্পিয়ান মহারাষ্ট্র পরাজয় বরণ করেছে।

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা

গৌহাটিতে ১৯তম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে খেতাব জয়ের সূত্রে পাঞ্জাব মোট ৯ বার এবং উপর্যুপরি ৫ বার বিক্রম মেথী ট্রফি জয়ী হয়েছে। মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ান হিসাবে তিলোত্তমা বসু কাপ জয়ী হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ।

পরলোকে সনি লিস্টন

ভূতপূর্ব বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান চার্লস 'সনি' লিস্টনের অকালমৃত্যুতে একটি অস্বাভাবিক বৈচিত্র্যময় জীবনের অবসান হল। তাঁর স্ত্রী সাত দিন শহরের বাইরে ছিলেন। বাড়ি ফিরে ঘরের মধ্যে লিস্টনকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেন। এই মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটনে জোর পুলিশী তদন্ত চলেছে। অখ্যাতি এবং খ্যাতির মধ্যে লিস্টনের জীবন কেটেছিল। একবার ডাকাতি করার অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হয় এবং কারাগারে তিনি মুষ্টিযুদ্ধ শিখে ফ্লয়েড প্যাটারসনকে উপর্যুপরি দুবার (১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে) পরাজিত করে হেভীওয়েট বিভাগে বিশ্বখেতাব লাভ করেন। পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের আসরে নেমে তিনি প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিস্টন ৭ম রাউণ্ডে ক্যাসিয়াস ক্লে-এর কাছে নক-আউটে পরাজিত হয়ে বিশ্ব খেতাব হাতছাড়া করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

'সকালের জল খাবারের সঙ্গে
তামা
আমি রোজই খাই!'

এ ছাড়াও আছে লোহা, ক্যালসিয়াম, আর আয়োডিন ! প্রকৃতপক্ষে, উনি খাবারের সঙ্গে পাচ্ছেন ৮টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজদ্রব্য আর একান্ত প্রয়োজনীয় ১১টি ভিটামিন। এতসব উনি পাচ্ছেন মাত্র ১টি ভিমগ্র্যান ট্যাবলেটে।

ভিমগ্র্যানে সব ক'টি ভিটামিন আর খনিজদ্রব্য রয়েছে যা খাদ্য খাবার হতে একান্ত প্রয়োজনীয়—ফলে, তা উৎসাহ যোগায়, ক্ষমতা বাড়ায়। যেমন ধরুন, তামা—রক্তে রক্ত গড়ে তোলে, কর্মক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া, ভিমগ্র্যানে যেসব ভিটামিন আর খনিজদ্রব্য আছে, তার কল্যাণে ওঁর গায়ের চামড়া সুস্থ থাকে, চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, দাঁত আর হাড় শক্ত হয়।

এখন পাবেন
গোল
আকারে

ভিমগ্র্যান®
মালটিপল ভিটামিনস-মিনারেলস ট্যাবলেট

মাত্র একটি ভিমগ্র্যান
আপনাকে সারাদিন
কর্মক্ষম রাখে

SQUIBB®
SARABHAI CHEMICALS

shilpi-VIM-1A/70 Ben

কালিম্পঙে বেড়িয়ে আসুন

কম খরচে অথচ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে
কালিম্পঙে ক'দিন কাটিয়ে আসা কঠিন নয়, মোটেই।
আমাদের 'ইকনমি ট্যুরিস্ট লজ' তো সেইজন্যেই আছে।
সবান্ধবে সেখানে গিয়ে উঠতে পারেন।
আর যাঁরা বিলাসবহুল আরামে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ
করতে চান, তাঁরা আমাদের 'লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজে' উঠবেন।

বুকিং এর জন্য লজের ম্যানেজার
বা নীচের যে কোনো ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
ট্যুরিস্ট ব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ সরকার
দার্জিলিং (টেলিগ্রাম : DARTOUR) অথবা
৩/২ ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭১   টেলিগ্রাম : TRAVELTIPS

দার্জিলিং, মালদা, বহরমপুর,
শান্তিনিকেতন, দুর্গাপুর, দীঘা এবং
ডায়মণ্ড হারবারেও ট্যুরিস্ট লজ আছে।

TCP/TS 1570

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, January 29th 1971   শুক্রবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৭৭ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১০২৮	চিঠিপত্র	—
১০৩০	সাদা চোখে	—শ্রীসমদর্শী
১০৩২	দেশেবিদেশে	—শ্রীপুণ্ডরীক
১০৩৫	সম্পাদকীয়	—
১০৩৬	খেলার পরে (কবিতা)	—শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়
১০৩৬	প্রবাসে যাবার আগে (কবিতা)	—শ্রীঅনন্ত দাশ
১০৩৬	যতদিন (কবিতা)	—শ্রীগার্গী চক্রবর্তী
১০৩৭	কলকাতার ইতিবৃত্ত	—শ্রীসুধীরকুমার সেন
১০৩৯	এতটুকু বাসা	—শ্রীবিপ্র ঘোষ
১০৪২	সহোদরা (গল্প)	—শ্রীসুবন্ধু ভট্টাচার্য
১০৪৬	মুখের মেলা	—আব্দুল জব্বার
১০৪৯	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৫৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১০৫৯	বইকুণ্ঠের খাতা	—শ্রীশ্রুতিনন্দী
১০৬১	তোমাকে (উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
১০৬৩	যে বাঁশি গান গায়	—শ্রীবনবিহারী মোদক
১০৬৬	নিকটেই আছে	—শ্রীসন্দিৎসু
১০৬৮	মনের কথা	—শ্রীমনোবিদ
১০৭১	পিঞ্জর (বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
১০৭৭	বিজ্ঞানের কথা	—শ্রীরবিচন্দ্রকান্ত
১০৭৯	কৃষ্ণপক্ষ (গল্প)	—শ্রীচিত্রা সেনগুপ্ত
১০৮৬	গোয়েন্দা কবি পরাশর	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
		—শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
১০৮৭	অঙ্গনা	—শ্রীপ্রমীলা
১০৮৯	থিয়েটার-পাগল এক দেশ	—শ্রীবিমল বসু
১০৯১	জলসা	—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
১০৯৩	আমেরিকার নীরব চলচ্চিত্র	—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
১০৯৪	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনান্দীকর
১১০১	খেলার কথা	—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
১১০৩	খেলাধুলা	—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীবাপীব্রত পোদ্দার

JHAMAPUKUR HOSIERY FACTORY (PRIVATE) LTD
22/A, Kalidas Singha Lane, Calcutta-9. 35-4832

চিঠিপত্র

উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের উপাদান

গত ২৪শে পৌষ তারিখের সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীস্বর্ণজিৎ চক্রবর্তী মহাশয়ের একটি লেখা দেখলাম। এই প্রবন্ধে শ্রীচক্রবর্তী মহাশয়ের শুধু আঞ্চলিক অভিজ্ঞতাই অধিক ফুটে উঠেছে মনে করি। তাঁর প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লেখা আছে—'অথচ অনুকরণপ্রিয়তা উত্তরের গ্রাম বাংলাকে প্রভাবিত করতে পারে নি।' তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না। তাঁর জ্ঞাতার্থে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, সার্বভৌম বঙ্গের লোক-সংস্কৃতির বা লোকগীতির মধ্যে 'সুরমা-মেঘনা-পদ্মা' পারের লোক সংস্কৃতিই সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য ও আকর্ষণীয়। শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ ধামাইল, ভাটিয়ালী, মারফতি, গোবিন্দ-কীর্তন, গোপিনীকীর্তন ও সূর্য-ব্রতের গান, ময়মনসিংহের গীতিকা এবং কুষ্টিয়ার লালন ফকিরের গানই বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে গৌরব অর্জন করেছে। সুরমা পারের রাধারমণ, সৈয়দ শাহনূর, হাছন রজা, মৃণাল দাস, সুখময় দাস, মনোমোহিনী দাস, পঞ্চানন্দ দাস, সর্বানন্দ দাস, রূপচাঁদ, আফজল আলী, মেঘনা পারের দীন শরৎ, কাঙ্গাল আতপ ও সেখ জালালোদ্দিন এবং পদ্মা পারের লালন ফকিরের কীর্তি সর্বজনবিদিত। শ্রীচক্রবর্তী মহাশয় আরও জানিয়েছেন যে, মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণ দেব নাকি ঐ দেশীয় ছিলেন। অবশ্য তিনি বহু বৎসর রাঢ় দেশে এবং পরে ময়মনসিংহে অতিবাহিত করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার সুপ্রসিদ্ধ জলসুখা গ্রামে। কবি [illegible] দেব তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এবং উভয়ে মিলে কাব্য লেখেন। একটি ভণিতায় আছে 'নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভ হয়।' শ্রীহট্ট জেলায় তাঁদের কাব্য খুবই প্রচলিত।

লেখকের জ্ঞাতার্থে আরও জানাচ্ছি যে 'মনসা-মঙ্গল বা পদ্ম-পুরাণ' প্রথম লেখেন শ্রীহট্টের কবি হরি দত্ত (হরিহর দত্ত)। তাঁর অনেক পরে বরিশালের বিজয় গুপ্ত, এবং শ্রীহট্টের ষষ্ঠীবর দত্ত 'মনসা-মঙ্গল' কাব্য লেখেন। শ্রীহট্ট জেলায় ষষ্ঠীবর দত্তের কাব্য সর্বাধিক প্রচলিত। ষষ্ঠীবর দত্তের লেখায়ও ভণিতা যুক্ত আছে।

'কহে ষষ্ঠীবর কবি, কণ্ঠে ভারতী দেবী,
জয়দেবী যারে প্রিয় হয়।'

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ষষ্ঠীবর দত্তের বিদুষী পত্নী চন্দ্রাবতীও একখানা পুরাণ কাব্য লেখেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'মনসা-মঙ্গল' কাব্য লেখেন। তাঁরও কাব্যে ভণিতা আছে—

'কহে কবি চন্দ্রাবতী, ষষ্ঠীবর পতি।
ত্রিজগতের মা তুমি, তোমার কি দুর্গতি।।
এই আশীর্বাদ কর মা গো, জুড়ি দুই হাত।
সুখেতে রাখিও মোরে, পুত্র সঙ্গিনাথ।।'

শ্রীহট্ট জেলায় এ পর্যন্ত ২৫ জন মনসা-মঙ্গলের কবির নাম পাওয়া গেছে। তাঁদের সকলের বিরচিত পুরাণ কাব্যও শ্রীহট্ট-সাহিত্য পরিষদে রাখা হয়েছে। এ সমুদয় কাব্য ভাব-গম্ভীর ও শব্দ-সম্পত্তিতে ভরপুর।

সুরেশচন্দ্র দেবনাথ
কীডগঞ্জ, এলাহাবাদ।

"বইকুণ্ঠের খাতা" 'গাহা সত্তসঈ' প্রসঙ্গে

আপনাদের বহুল প্রচারিত অমৃত পত্রিকায় 'বইকুণ্ঠের খাতা' বিভাগে গ্রন্থদর্শী প্রতি সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যের হাল আমলের এক একখানি উল্লেখযোগ্য রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। তার জন্য তাঁকে গ্রন্থপিপাসু মাত্রেই ধন্যবাদ জানাবেন। শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য কৃত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা সাত বাহন-রাজ হাল-সঙ্কলিত 'গাহাসত্তসঈ'-এর বাংলা পদানুবাদ বইখানির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গত শুক্রবার ১৬ই পৌষ, ১০৭৭। পার্বতীবাবু বাংলা কাব্য পাঠকদের বহুদিনের এক সযত্ন পালিত আশা এই মূল্যবান গ্রন্থে পূরণ করেছেন। এ কাজ তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি একাধারে কবি ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। সেই কারণে প্রাকৃতের অনাস্বাদিত মেজাজ বাংলা ছন্দের স্বচ্ছ পেলব প্রবহমানতায় তিনি এক অভিনব কাব্যিক রসের আমেজ এনে দিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থদর্শী বলেছেন—'কিন্তু কে এই সাত বাহন-রাজ হাল? ঐতিহাসিকেরা তাঁর বিশেষ কোন পরিচয় লিখে রেখে যান নি।' কথাটা সত্য, এ বিষয়ে বহুদিন আগে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে। 'হরপ্রসাদ-সংবর্ধন - লেখমালা' গ্রন্থে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব 'রাজা হাল ও পার্টলি পুত্র' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—হাল ছিলেন—সাতবাহন বা শালিবাহন বংশের একজন রাজা। মৎস্যাদি পুরাণে রাজবংশ কথন প্রসঙ্গে আমরা হালের নাম পাই; তাঁহার রাজ্যকাল মাত্র পাঁচ বৎসর বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। লিপিতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে হালের একশত বৎসর পূর্বে সাতবাহন রাজা প্রথম পুলোমা (যাঁহাকে নাসিকাদি স্থানের শিলালিপিতে বাসিঠীপুত্র পুলুমায়ি' বলা হইয়াছে) খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর মাঝখানে পড়েন। সুতরাং আমরা হালকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোন কোন প্রতীচ্য পণ্ডিত অনুমান করেন যে, সপ্তশতীকে অত প্রাচীনকালের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না, ইহার ভাষার পদের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ প্রায়শই দৃষ্ট হয় এবং নাসিক প্রভৃতি স্থানের শিলালিপির প্রাকৃতে ও অশ্বঘোষের প্রাকৃতে তাদৃশ লোপ দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সপ্তশতীর ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। সে প্রাকৃতের প্রধান লক্ষণই হইতেছে—ব্যঞ্জনবর্ণের প্রায়শ লোপ। তাহার কারণ, মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে যখন প্রথমে সংস্কৃত ভাষার প্রচার হয়, তখন তাহাদের জিহ্বার জড়তা এতটা ছিল যে, তাহারা সংস্কৃত কোন পদের মধ্যে কিংবা অন্তে স্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ না করিয়া, তাহার পরিবর্তে স্বরবর্ণের প্রয়োগ করা অল্পায়াসসাধ্য মনে করিত। উত্তর ভারতের প্রাকৃতে ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ দেখা যায় না; সে স্থানের অধিবাসীদিগের উচ্চারণের রীতি অন্য রূপ ছিল। সেই জন্য অশ্বঘোষের প্রাকৃত কিংবা উত্তর ভারতের অপর কোন প্রাকৃতের সঙ্গে সপ্তশতীর ভাষার তুলনা করিয়া তাহার কাল নির্ণয় করা উচিত হইবে না। নাসিক প্রভৃতি স্থানের শিলালিপির ভাষার সঙ্গে তুলনা করিয়া ফরাসী পণ্ডিত (Senart) সেনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাসিঠীপুত্ত পুলুমায়ি ও তাঁহার পিতা গোতমীপুত্ত সাতকর্ণির একশত বৎসর পরে সপ্তশতী রচিত। সেনার সাধারণ মতের অনুসরণ করিয়া এই দুই রাজাকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফেলিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখাইয়াছি যে, তাঁহারা খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং শিলালিপির ভাষা পর্যালোচনা করিলেও হালের সপ্তশতীকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত বলা যায়।'

রামদেব মুখোপাধ্যায়
বালি, হাওড়া।

CENTRAL LIBRARY
CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

এই আমাদের দেশ

গত ১৬ পৌষ ১৩৭৭ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'এই আমাদের দেশ'-এর অন্তর্গত 'ওলন্দাজ পর্তুগীজ - নবাব্দত চুঁচুড়া-হুগলীতে' শীর্ষক রচনাটি পড়লাম।

হুগলীর নামকরণ নিয়ে লেখক তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে, এখানে প্রচুর হোগলা বন থাকায় এই শহরের নামকরণ হয়েছে 'হুগলী।' এটি যেমন ঠিক কথা, তেমনি এটিও ঠিক যে, পর্তুগীজরা হুগলীতে এসেই কতকগুলো গুদোমঘর তৈরী করেছিল। এই গুদোম কথাটির উৎপত্তি হোল পর্তুগীজ 'Gudao' কথা থেকে। দিশী ভাষায় যার নাম হোল 'ওগলী।' এই 'ওগলী' থেকেই প্রচলিত হয়েছে 'হুগলী' নামটি।

দ্বিতীয়, সেন্ট জন আর্মেনীয় গির্জাটির নির্মাণ কাজ সুরু করেন জোহানস মার্কার ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি এটি শেষ করে যেতে পারেননি। শেষ করেছিলেন তাঁর ভাই। গির্জার সামনের দিকটা তখনও তৈরী হয়নি। সে হয়েছিল অনেক পরে ১৮২২ সালে। কলকাতার এক আর্মানী সাহেবের বিধবা স্ত্রী মাদাম বেগরাম ঐ গির্জাটি নতুন করে তৈরী করে দেন।

কাসিম খাঁর প্রসঙ্গে এটুকু বলতে চাই যে, ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে কাসিম শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন এই হুগলীতে। কিংবদন্তী, দিল্লীর এক সম্রাট বাংলাদেশকে মনে করতেন 'দোজখ' অর্থাৎ নরকের দেশ। তাই কোন আমীর ওমরাহ বা কোন পদস্থ ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধ করলে তাঁদের শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা না করে নির্বাসন দেওয়া হতো এই বাংলা দেশে। মালিক কাসিম ছিলেন ঐ ধরণের অপরাধী। তাই শাস্তি স্বরূপ তাঁকে আসতে হয়েছিল হুগলীর শাসনকর্তা হিসেবে। এই মালিক কাসিমের নাম অনুসারেই হুগলী-চুঁচুড়ার হাটের নামকরণ হোল 'মলিক-কাসিম-হাট।' লেখক তাঁর প্রবন্ধে এই নামকরা হাটের উল্লেখ করতে বোধহয় ভুলে গেছেন।

পরিশেষে হাজী মহম্মদ মহসীনের দ্বারা তৈরী হুগলী কলেজ, ইমামবাড়া ইত্যাদি তৈরী প্রসঙ্গে পাঠকদের মনে স্বভাবতই উদয় হতে পারে, হাজী মহম্মদ মহসীন অত্যন্ত গরীব হয়েও কি করে এরূপ ব্যয়সাধ্য কাজ নিষ্পন্ন করেন।

মহসীনের সম্পর্কিত বোন ছিলেন মন্নু-বেগম। তিনি ছিলেন অগাধ ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। পিতার মৃত্যুর পর মন্নু বেগমের অভিভাবক হলেন মহসীন। তিনি তাঁর বোনের তখন বিবাহ দিলেন মির্জা সালাউদ্দিনের সঙ্গে। কয়েক বছর যেতে না যেতেই মন্নু বেগম বিধবা হয়ে গেলেন। কাজেই মহসীন আবার হলেন তাঁর অভিভাবক। তারপর কিছুকাল পরে মন্নু বেগম ইহলোক ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক করে গেলেন মহসীনকে। কিন্তু বিষয়ে অনাসক্ত মহসীনের এত ধন-সম্পত্তি পছন্দ হোল না। তাই তিনি একটা চরম দানপত্র লিখে দেওয়ার কথা মনে মনে ভাবতে লাগলেন। তারপর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহসীন সেই সম্পত্তি সৎ কাজে ব্যয় করবার জন্যে লিখে দিলেন এক চরম দানপত্র। যার ইংরেজী অনুবাদ আজও লেখা রয়েছে ইমামবাড়ার দেওয়ালে। এই সম্পত্তি দেখার কাজে মহসীন মাতোয়ালী নিযুক্ত করলেন রাজাউলি খাঁ এবং সাকিরউলি খাঁকে। কিন্তু এঁরা দুজন চক্রান্ত করে এই সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করলেন। ফলে এ ব্যাপারে গভর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করতে হলো। সে হলো ১৮১০ সালের কথা। প্রিভি কাউন্সিলের মধ্যস্থতায় এই সম্পত্তি অবশেষে গভর্ণমেন্টের হস্তগত হয়। তারপর সরকার ঐ টাকায় মহসীনের নামে তৈরী করে দিলেন ইমামবাড়া, হাসপাতাল ও হুগলী কলেজ।

হরিপদবরণ ঘোষ
চুঁচুড়া, হুগলী

মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

মফস্বলে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গ্রন্থদর্শী যে আলোচনা করেছেন সে জন্যে অমৃতের একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে গ্রন্থদর্শী ও অমৃত সম্পাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে আমাদের করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'উদক' এবং 'সর্পিল' যে গ্রন্থদর্শীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সে বিষয়ে ধ্রুবতীর অধ্যাপিকা যেমা বড়ুয়া ১৬ই পৌষ তারিখের অমৃতে আলোকপাত করেছেন। সে জন্যে অধ্যাপিকা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু ১লা মাঘের অমৃতে পাটনার সপ্তর্ষির সম্পাদক জীবনময় দত্ত 'সর্পিলে'র লেখক হয়েও করিমগঞ্জের 'সর্পিল'কে কেন যে হাইলাকান্দিতে ঠেলে দিলেন তা বুঝতে পারলাম না। আবার জীবনময়বাবুর গল্প তো আমি 'উদকে'ও পড়েছি। 'উদক' যে করিমগঞ্জ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় সে কথা জেনেও জীবনময়বাবু কেন যে উদকের নাম বেমালুম চেপে গেলেন তাও ঈশ্বর জানেন। জীবনময়বাবুর ভুলগুলো যে ইচ্ছাকৃত তা বলছি না, কিন্তু একজন ম্যাগাজিন সম্পাদক তথা সরবরাহে আর একটু সচেতন হবেন এটুকু আশা নিশ্চয়ই করতে পারি। মফস্বলের এক অখ্যাত অমৃত পাঠকের এই চিঠিখানি অমৃতে প্রকাশিত হলে বাধিত হব।

মুকুলদেব পুরকায়স্থ
করিমগঞ্জ,
আসাম।

পিঞ্জর প্রসঙ্গে

আমি 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। সবদিক থেকে 'অমৃত' প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বলে আমার মনে হয়। 'অমৃত' হাতে পেয়েই আমি এখন যেটা প্রথমেই পড়ি, তাহল সুভাষ সিংহ মহাশয়ের 'পিঞ্জর' উপন্যাস। এরজন্য লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাই। গল্পের সহজ সরল ভাষা ও বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ খুবই ভাল। লেখক মীরার মানসিক দ্বন্দ্ব ও রমেশের আচরণ সুন্দরভাবে ফোটাতে পেরেছেন। বিনয় ও শেফালীর ঘটনা পাঠককে স্বাভাবিক আনন্দ দান করবে। সাদার পাশে কালোর মতো এই দু-জোড়া নায়ক-নায়িকার সংস্থাপন নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। লেখকের কাছে গল্পের সুন্দর পরিণতি যেমন আশা করব, তেমন সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আশা করব এ ধরনের আরও উপন্যাস।

অশোককুমার সাউ,
দক্ষিণ দুর্গাপুর,
হাওড়া।

'অমৃত প্রসঙ্গে'

'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকাটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার জগতে একটি অদ্বিতীয় সংযোজন, একথা আমি একবাক্যে স্বীকার করবো। এই পত্রিকার দুটি নিয়মিত বিভাগ 'নিকটেই আছে' ও 'দুখো মেলা' আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এছাড়া গল্প, কবিতা, উপন্যাস, খেলাধুলো, সিনেমা ইত্যাদি তো রয়েছেই।

অসীম দত্ত
কলকাতা-৪০।

শাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে কি? অথবা এই ধরনের পরিবেশে নির্বাচন আদৌ সম্ভব কি? এ দুটি প্রশ্ন রাজ্যের প্রায় সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের মনকেই বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন অনেকেই মনে করছিলেন নির্বাচনের কথা ঘোষিত হলেই অবস্থাও ভাল হতে শুরু করবে। কিন্তু নেতাদের ধারণা অনেকটা আশাবাদীদের চিন্তাধারণার মতই মনে হচ্ছে। দিন যত এগুচ্ছে পরিবেশ ততই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। যাঁরা নির্বাচন চান না তাঁদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু যাঁরা নির্বাচনকে অপরিহার্য বলে মেনে নিয়েছেন তাঁরাও এখন ইতস্ততঃ করছেন, এবং কি পরিণাম ঘটতে পারে, এই আশঙ্কা সতর্কভাবে কথাবার্তা বলছেন।

পরিবেশ আবার ভয়াবহভাবে অশান্ত রূপ নেওয়ার মূলে রয়েছে দলগুলির হৃত সংগঠন পুনরুদ্ধার করার সঙ্কল্প। কারণ প্রত্যেকেই জানেন বর্তমানে রাজ্যের অনেক স্থানে দলীয় এলাকা চিহ্নিত হয়ে গেছে। কাজেই শুধু 'এলাকার' উপর নির্ভর করে একটি নির্বাচনী ক্ষেত্রে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। অন্যান্যবার এ রকম 'এলাকা' ছিল না এমন নয়। তবে সেই 'এলাকা' ছিল সাংগঠনিক ক্ষেত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রার্থীরা প্রচার করেও ঐ সমস্ত 'সাংগঠনিক এলাকা' থেকে খুব বেশী ভোট টেনে নিতে পারত না। অবাধে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা ছিল বলে নির্বাচনী প্রার্থীরা দলের অনুকূলে টানবার চেষ্টাও করতে পারত। কিন্তু এবার তার বিপরীত অবস্থা। এক 'এলাকার' লোক অন্য 'এলাকায়' এবার যেতে পারবে বলে মনে হয় না। গেলেও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ভোট চাওয়ার অর্থটা কি দাঁড়াবে পাঠকগণ তা অনায়াসেই অনুমান করতে পারেন, আবার 'এলাকার' মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভোট কেন্দ্র স্থাপিত হবে। অতএব, ঐ ক্ষেত্রে একজন ভোটারও যদি 'এলাকা' সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দেন তবে তাঁর অবস্থা কি হতে পারে তা ভাবতেও শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। এ হচ্ছে বাস্তব সত্য, বাস্তব ঘটনা। রাজ্যের সমস্ত বিধানসভা ক্ষেত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে একথা বলছি না। তবে প্রায় ১০০টা আসনের ক্ষেত্রে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার অধিকর্তারা এই প্রশ্নগুলি কিভাবে এড়িয়ে যাবেন বা যাচ্ছেন জানি না। তবে চিরাচরিত নিয়মে সত্যকে গোপন রেখে বড় কর্তাদের খুশী করার জন্য অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে এমন রিপোর্ট যদি ওপরে পাঠিয়ে থাকেন, তবে তাঁরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ক্ষতিই করেছেন। এবং শুধু তাই নয়, আরও অশান্তির পরোক্ষ ইন্ধন জুগিয়েছেন।

একথা অবশ্য সকল গণতান্ত্রিক মানুষই স্বীকার করবেন যে এ যাবৎ এই রাজ্যে যত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কোনবারই এমন পরিস্থিতি ছিল না। যাঁরা নির্বাচন বয়কট করতে চান তাঁরা তা করতে পারেন। কেউ যদি বলেন, নির্বাচন হতে দেব না তখন তা রাষ্ট্র শক্তির মোকাবেলার প্রশ্ন আসে। সে অবস্থাও উপলব্ধি করা কঠিন নয়। শত দুর্যোগের ঝুঁকি নিয়েও নির্বাচন চালাবার জন্য প্রস্তুত হতে পারা যায়। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তা সত্যিই অদ্ভুত। নির্বাচনে বাধা দেওয়ার জন্য নয়, নির্বাচনে দলীয় শক্তি বাড়াবার জন্য যেভাবে 'এলাকা' বিস্তারের লড়াই চলছে তা সত্যিই ভয়াবহ। যখন এই রাজ্যে 'কাকদ্বীপ' অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখনও এমন সাংঘাতিক রূপ প্রকট হয়নি। কোথাও কোথাও যে সে সময় নির্বাচনী প্রচারে বাধা আসেনি তা নয়—কিন্তু তা আজকের মত অত ছিল ও ব্যাপক ছিল না। এখন ত এক পাড়ার লোক ভিন পাড়ায় যেতেও সাহসী নয়। প্রাণটিকে রক্ষার জন্য পর্যন্ত আজকাল ভিন পাড়ায় যেতে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। নির্বাচনী প্রচার ত দূরের কথা। এই বাস্তব ঘটনাকে কেউ যদি উপেক্ষা করে যুক্তি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা নিজেদেরই ক্ষতি করবেন মাত্র। অবাধ নির্বাচনী প্রচার করার অধিকার না থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব কি? আর সেই নির্বাচনে নাগরিকদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ সুযোগ না থাকলে নির্বাচনের গুরুত্ব থাকে কি? সেই নির্বাচন প্রতিনিধিত্বমূলক হতে পারে কি? কোন রকমে একটা নির্বাচন হয়ে গেলেই কি গণতন্ত্র রক্ষা পাবে? না গণতন্ত্রের প্রতি লোকের আসক্তি ও বিশ্বাস শিথিল হবে? কোনটা সত্য?

বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে যদি ভোটার তাঁরা নিরাপদ বোধ করছেন বলে ত মনে হয় না। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এই আশঙ্কার কথা প্রায়শই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আগে দেখা গেছে প্রায় সব নির্বাচনী ক্ষেত্রেই শতকরা ৬০ ভাগ লোক গড়ে তাঁদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এবার আশঙ্কা হয় হয়ত ভোটাররা অত্যন্ত কম সংখ্যায় ভোট কেন্দ্রে হাজির হবেন। কারণ, জীবন বিপন্ন করে সাধারণ নাগরিক ভোট দিতে সাহসী হবেন কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। যাঁরা নিতান্ত দল-অনুগত তাঁরা হয়ত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি শতকরা ৩০ জন ভোটার ভোট দিতে আসেন তবে তাকে নৈতিক দিক থেকে সাধারণ নির্বাচন বলে মেনে নেওয়া উচিত কি? প্রথম যখন নির্বাচন এই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন নাগরিকরা ভোট সম্বন্ধে তত সজাগ ছিলেন না। কিন্তু আজ তাঁরা অনেক বেশী সচেতন। কর্তৃপক্ষ হয়ত বলবেন যে আমরা ত ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলাম, লোক যদি না আসে আমরা কি করতে পারি। এ যুক্তি কিন্তু খুব বিচারসহ হবে না। কেননা, শান্ত পরিবেশে যদি ভোটার ভোট না দেন তবে সে দায়িত্ব নাগরিকদের। কিন্তু বর্তমানের অশান্ত পরিবেশ—যদি শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের নিশ্চেষ্ট করে তোলে তবে তাঁদের দোষ দেওয়ার কিছু থাকবে কি? এই প্রশ্ন বিশেষভাবে প্রণিধান করা একান্ত কর্তব্য।

এটা হল নির্বাচনের একটি দিক। অন্যদিকে সরকারী প্রস্তুতি আছে কিনা সেই সম্পর্কেও অনেকের মনে বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথমে নির্বাচন হবে কি হবে না, এই দোটানার মধ্যে পড়ে রাজ্য নির্বাচনী সংস্থা হাবুডুবু খেয়েছে। তারপরও যখন নির্বাচনের দিন স্থির হলো, তখন কত তারিখ অবধি ভোটার তালিকায় নাম তোলা যাবে সেই সম্পর্কে টানা-হ্যাঁচড়া চলল। ১৮ই

জানুয়ারী নাম তালিকাভুক্ত করার শেষদিন ছিল। সরকারী যন্ত্রটি সেভাবেই চলছিল। কারণ, নাম তালিকাভুক্তির কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর নতুন করে ভোটারের একটা তালিকার তাকে সংযোজিত করে তালিকার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার বিধান আছে। আর সেই চূড়ান্ত তালিকার ভিত্তিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবারে নির্বাচনের সময় অত্যন্ত নিকট। রাজ্য নির্বাচনী 'মেশিনারী' এত পটু নয় যে সংশোধিত ভোটার তালিকা পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব। আবার সেই নতুনভাবে ভোটার হওয়ার সময় নির্দিষ্টও মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীসেনবর্মা মহোদয় এক কলমের খোঁচায় আরও এক সপ্তাহ অর্থাৎ ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন। এই রাজ্যে যাঁরা নির্বাচন পরিচালনা করবেন, সেই সমস্ত অফিসাররা আগে জানতেই পারলেন না যে শ্রীসেনবর্মা এরকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন। আকাশবাণী মারফৎ এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলা অধিকর্তারা বিস্মিত হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাকরণে টেলিফোন করে প্রকৃত অবস্থা কি তা জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। মহাকরণ থেকে উত্তর গেল, হ্যাঁ শ্রীসেনবর্মা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ঐ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব, প্রতিশ্রুতি এবার সার্কুলারের রূপ নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই জেলাতে গিয়ে হাজির হবে। সরকারী কাজ যেভাবে চলে তাতে একজন জেলা অধিকর্তা ইচ্ছা করলে আইনানুগভাবেই সার্কুলার না পাওয়া পর্যন্ত ঐ সংগৃহীত খবরের মর্যাদা না দিয়ে প্রয়োগবিধি স্থগিত রাখতে পারেন। কিন্তু ভোটার হওয়ার তারিখ বাড়ানোর ফলে নতুন সংশোধিত তালিকা প্রার্থীরা পাবেন কিনা সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, পুরনো যে ভোটার তালিকা আছে, সরকার তা প্রার্থীদের সরবরাহ করতে অক্ষম। কেননা যা ছাপানো ছিল তাই দিয়ে নাকি সরকারী কাজ চালাবারই চেষ্টা হচ্ছে। নতুন করে ছাপাবার পরিকল্পনাও নেই কিম্বা সংগতিও নেই। যতদূর জানা যায় এক একটি নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট পরিচালনার জন্য সরকারের জনাই ৩০ কপি করে ভোটার তালিকা লাগে। বর্তমানে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভোটার তালিকা চাইছেন সরকার পক্ষ থেকে নাকি বলা হচ্ছে, এই ত সেই '৬৯ সালে তালিকা নিয়ে গেছেন, ঐ তালিকা দিয়ে কাজ সারুন। যদিও বা স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির এক আধটা পাওয়ার আশা আছে নতুন কোন দল বা প্রার্থী ভোটার তালিকা পাবেন না বলেই মনে হয়। অতএব, বুঝুন, নির্বাচন কিভাবে হবে। কে ভোটার কে ভোটার নন, না জেনেই 'ভোট দিন', 'ভোট দিন' চেঁচিয়ে আসর গরম করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। নির্বাচনের আগে যাঁরাই প্রার্থী হোন না কেন—প্রত্যেকের পক্ষ থেকেই তালিকা ধরে ভোটার অনুসন্ধানের কাজ চলে। জীবিত কি মৃত, এখানে থাকেন কি অন্যত্র চলে গেছেন বা বয়সটা ঠিক মত উঠেছে কিনা—ইত্যাদি আগেভাগে খুঁটিয়ে দেখা হয়। যদি ভোটার তালিকাই প্রার্থীরা না পান তবে সুষ্ঠু নির্বাচন কিভাবে হবে তা বোঝা দুষ্কর। কোন দল কিভাবে ভোটার সংগ্রহ করবেন তাও আন্দাজ করা মুশকিল হয়ে উঠবে। কাজেই বলছিলাম, ঘোষণা করেই সরকার নিয়ম রক্ষা করছেন। আনুষঙ্গিক কর্তব্য সাধিত না হলে যে গোড়ায় গলদ হয়ে যাবে—প্রশাসনের অধিকর্তারা সেই সম্পর্কে অবহিত আছেন কিনা, এই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীসেনবর্মা আসমুদ্র-হিমাচল পরিভ্রমণ করে নির্বাচনের জন্য তাঁর দপ্তর সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে বলে ঘোষণা করে যাচ্ছেন। তিনি নাকি আবার পশ্চিমবঙ্গে এই নির্দেশও দিয়ে গেছেন যে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী এবার ভোট কেন্দ্রে যেতে ভোটারদের যাতে ২ কিলোমিটারের বেশী হাঁটতে না হয় সেভাবেই ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে, রাজ্যে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা বর্তমানে যেরূপ, তাতে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির জন্য অধিকসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ১ লক্ষ ৩০ হাজার পুলিশের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন। এবং এই তথ্য শ্রীসেনবর্মার নিকটও পেশ করা হয়েছে। শুধু ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্যই এতসংখ্যক পুলিশ দরকার। কিন্তু গোটা রাজ্যে ভোট গ্রহণের দিন বা আগে থেকে যে অবস্থার উদ্ভব হবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে তার জন্য কি ব্যবস্থা? ইতিমধ্যেই অনেক নেতাকে নিরাপত্তার জন্য পুলিশী সাহায্য দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের প্রত্যেক প্রার্থীই ভি আই পি। কেননা, আগেভাগে ত কেউ বলতে পারবে না, কে জয়ী হবেন বা জয়ী হবেন না। অতএব, এই ভবিষ্যৎ সদস্যরা যদি স্বীয় নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রহরা দাবী করেন তবে তাঁদের বক্তব্যকে উপেক্ষা করা যাবে কি করে? তখন কি কর্তৃপক্ষ যাঁদের ইতিমধ্যে দেহরক্ষী দিয়েছেন তাঁদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অন্যদের দাবীর মোকাবিলা করবেন? এই সমস্ত ভি আই পি ছাড়া আবার অন্যরাও আছেন যাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কেও সরকার দৃষ্টি না দিয়ে পারবেন না। অতএব, অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে, গুণীরা উপলব্ধি করতে পারবেন কি? অন্যদিকে আবার পুলিশের নিরাপত্তার জন্যও পুলিশ দরকার হয়ে পড়ছে। কাজেই, কিভাবে এই গণতান্ত্রিক যজ্ঞ সমাধা হবে তা চিন্তার বিষয়।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলিও কে কার সঙ্গে জোট বাঁধবে—এ নিয়ে ফয়সালা করতে পারছে না। ফলে, একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক মানসিকতাও গড়ে উঠছে না। প্রত্যেকেই ভাবছে অন্য দল থেকে নিশ্চয়ই কিছু প্রভাবশালী লোক বেরিয়ে আসবে। এবং তখনই প্রার্থীদের নাম যথাযথভাবে প্রকাশ করা ঠিক হবে। আগে নয়। কেননা আগেভাগে কারও নাম প্রার্থী হিসাবে প্রকাশ করলে—দলে যতই নিয়মানুবর্তিতা থাকুক না কেন—সেই ঘোষিত প্রার্থীকে নির্বাচনী লড়াই থেকে সরিয়ে আনা কষ্টকর হবে। অতএব, অসুবিধা বাড়িয়ে ত কোন লাভ নেই। এই জন্যে শতকরা ১০০ ভাগ নিঃসন্দেহ না হলে দলের প্রার্থী কে হবে কেউ মুখ খুলছেন না। যে প্রচার চলছে শুধু তা প্রতীকে ভোট দেবার আবেদন মাত্র। শুধু যে দলছুট হবার ভয়ে এ রকম প্রচার করা হচ্ছে তা নয়। যতই আস্ফালন করা হোক না কেন প্রত্যেক সম্ভাবিত জোটের শরিকরাই একথা পুরো বিশ্বাস করছেন যে কোন একটি ফ্রন্টের পক্ষে এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা শক্ত। তাই দলছুট যোগাড় করার চেষ্টায় সকলেই কালহরণ করছেন।

বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের মিলনের সূত্র আবার হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে জোটবন্দীর রাজনীতিতে এক নতুন অনিশ্চিতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে হয়ত নিচের চাপে পড়ে আবার মিলনের পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মিলনের পথে বারবার বাধা আসার কারণ কি? অন্য কিছু নয়—কংগ্রেস এযাবৎ কারেন্ট ফ্রন্টের রাজনীতিতে অভ্যস্ত ছিল না। এই হালফিল কংগ্রেসকে এই নতুন নীতির সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে। ফলে এতদিনের একক শাসক কংগ্রেস তার নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না। কাজে কাজেই আসন বন্টনের বা ভাগাভাগির প্রশ্নে প্রতি মুহূর্তেই হোঁচট খেতে হচ্ছে। বাংলা কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এই ফ্রন্টের রাজনীতির কলাকৌশল সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ হয়ে গেছে। কাজেই ফ্রন্ট ভাঙলেও তাকে সামলিয়ে নেওয়া বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে খুব কঠিন হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আলোচনা ভেঙে যাওয়ার ফলে শাসক কংগ্রেসকে যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে হবে একথা তাঁদের ভেবে দেখা দরকার।

যাহোক, জোট বাঁধার অনিশ্চয়তা, সরকারী অব্যবস্থার পূর্বাভাস সব মিলিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তাতে মনে হয় মানুষের মনে আরও সংশয় ঘনিয়ে তুলছে। ফলে যদি বেশীর ভাগ ভোটাররা ভোট কেন্দ্রমুখী না হন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। সামান্য কয়েক শতাংশ রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই হয়ত ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের কাঠামো রক্ষা করবেন। এই আশঙ্কা দূরীভূত করবার জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এগিয়ে আসুন, এই দাবী জানাচ্ছি।

—সমদর্শী

শাসক কংগ্রেসের সংসদীয় বোর্ডের সভা

দেশে বিদেশে

'আসছে মার্চে এই কুয়াশা কেটে যাবে আর সব কিছুই কুয়াশার মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।'—এয়ার ইন্ডিয়ার 'মহারাজা' এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর সেই কুয়াশার মত পরিষ্কার মার্চ মাসের দিকেই এখন এগিয়ে চলেছে দেশ নানা দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি ও জোট বাঁধার মধ্য দিয়ে।

বিরোধী কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও এস এস পি—এই চার পার্টির ফ্রন্ট ইতিমধ্যে নীতিগতভাবে স্থির করেছে যে, লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে তারা বিকল্প সরকার গঠন করবে। অবাধ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশ্বাসী স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে একত্রে মিলে সমাজতন্ত্রীরা কিভাবে সরকার চালাবেন এবং সংবিধানের আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে একই সরকারের মধ্যে বর্তমান সংবিধানের কাঠামোতে আস্থাবান জনসংঘের সহাবস্থান কিভাবে সম্ভব দেখবো অবশ্য কুয়াশার মতোই পরিষ্কার।

ইন্দিরা-বিরোধী চার-পার্টি ফ্রন্ট যখন নয়াদিল্লীতে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার স্লোগান নিয়ে লোকসভার আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন শাসক কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দলের নির্বাচন অভিযান শুরু করে দিয়েছেন সম্পূর্ণ বিপরীত স্লোগান নিয়ে। তাঁর কথা হল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে কোয়ালিশন সরকারগুলির যে হাল হয়েছে তা লক্ষ্য করে ভোটদাতারা যেন কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাযুক্ত একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। রাজ্যগুলিতে কোয়ালিশন সরকার ভেঙে গেলে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা যায়, কিন্তু কেন্দ্রে তেমন কিছু করা সম্ভব নয়, সুতরাং একদলীয় সরকার স্থাপন করা আরও জরুরী।

এবারকার নির্বাচন অভিযান যে খুব শান্তিপূর্ণ হবে না তার লক্ষণ ইতিমধ্যে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রথম দফার নির্বাচনী সফরে বেরিয়েই তিনটি রাজ্যের তিনটি শহরে বিক্ষোভ সম্বর্ধনার সম্মুখীন হয়েছেন। সুরাট, বোম্বাই ও ভুবনেশ্বরে তাঁর জনসভায় ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়েছে ও হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এয়ার-ইন্ডিয়ার মহারাজা যে কুয়াশার কথা বলেছেন তার মধ্য দিয়ে এটুকু আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে যে, এবারকার লোকসভা নির্বাচনে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ হবে একদিকে শাসক কংগ্রেস আর একদিকে বিরোধী কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন চার-পার্টি ফ্রন্ট। দুই কংগ্রেসের এই লড়াই প্রতিফলিত হয়েছে 'জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ' প্রতীকের জন্য দলের মধ্যে লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে। এই প্রতীকের লড়াইয়ের মীমাংসা এখনও হয় নি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে এই লড়াইয়ের দুই রাউন্ড হয়ে গেছে। প্রথম রাউন্ডে জিতেছিল শাসক কংগ্রেস, কেননা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার দীর্ঘ শুনানীর পর রায় দিয়েছিলেন যে, জগজীবন রাম যে দলের সভাপতি সেটিই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং তারাই কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক 'জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ' ব্যবহার করার অধিকারী। কিন্তু বিরোধী কংগ্রেস দল আইনের পাল্টা চাল চেলে প্রতিপক্ষকে লোকসভার আগামী নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এই রায়ের সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করতে পেরেছে। বিরোধী কংগ্রেসের আবেদন গ্রহণ করে সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চ আদেশ দিয়েছেন যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের রায় যেন কার্যকর করা না হয়। সুপ্রীম কোর্টের এই আদেশের অর্থ হল, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দেশে সর্বত্র বিধানসভাগুলি ও লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের জন্য যে প্রতীকটি সংরক্ষিত ছিল সেটি এবার দুই কংগ্রেসের কোনটিই ব্যবহার করতে পারবে না। বিরোধী

রুশ বিশেষজ্ঞ দল কলকাতায় যে ভূগর্ভ রেল তৈরী করার প্রস্তাব দিয়েছেন, তার মানচিত্র। দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত এই রেলপথটি হবে সাড়ে ১৬ কিলোমিটার লম্বা এবং তাতে স্টেশন থাকবে ১৭টি। দমদমের বর্তমান রেল স্টেশনের পাশেই ভূগর্ভ রেলের স্টেশন হবে। সেখান থেকে বেলগাছিয়া রোডের রেলপুল পর্যন্ত লাইনটি বর্তমান রেল লাইনের সমান্তরালে মাটির ওপর দিয়েই আসবে। বেলগাছিয়া থেকে একটি পুরোপুরি সুড়ঙ্গ কেটে লাইনটি বেলগাছিয়া রোড-আর জি কর রোডের নিচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে শ্যামবাজারে। তারপর ভূপেন বসু অ্যাভিনিউ, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, জওহরলাল নেহরু রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড ও দেশপ্রাণ শাসমল রোড হয়ে লাইনটি শেষ হবে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোয়। এই অংশটুকু 'কাট এণ্ড কভার' পদ্ধতিতে তৈরি হবে। রুশ বিশেষজ্ঞরা চালাও ২৫ পয়সা ভাড়া ধার্য করার সুপারিশ করেছেন।

কংগ্রেসের সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা সুপ্রীম কোর্টের আদেশ সম্পর্কে বলেছেন যে, এর দ্বারা তাঁদের দলের প্রতি ন্যায় বিচার করা হল। নিজলিঙ্গাপ্পার দল অবশ্য নিজেরাও 'জোড়া বলদ' প্রতীক পেল না, কিন্তু প্রতিপক্ষ যে এই পুরানো প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ পাবে না, আপাতত এটুকুতেই বিরোধী কংগ্রেস সন্তুষ্ট।

এদিকে চার-পার্টি ফ্রন্ট নিজেদের মধ্যে লোকসভার আসন বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেছে। যতদূর খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই আলোচনা এখন পর্যন্ত খুব বেশী দূর এগোয় নি। গুজরাটে অনেকগুলি আসন নিয়ে বিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে স্বতন্ত্র পার্টির টানা-হ্যাঁচড়া চলছে। সেখানে বিরোধী কংগ্রেস দল এমন কি স্বতন্ত্র নেতা মিনু মাসানিকেও আসন ছেড়ে দিতে নারাজ। বোম্বাই শহরে লোকসভার একটি আসনের উপর বিরোধী কংগ্রেস নেতা এস কে পাতিল ও এস এস পি নেতা জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ কেউই দাবী ছাড়তে রাজী নন। বলা হয়েছে যে, আসন ভাগের আলোচনা যেভাবে চলছে সেভাবে চললে সারা ভারতে লোকসভার অন্তত ৪০টি আসনে ফ্রন্টের চার পার্টির মধ্যে পারস্পরিক শক্তির লড়াই এড়ান সম্ভব হবে না।

তবে, এই ফ্রন্টের চার দল একটা বিষয়ে একমত হতে পেরেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, উত্তরপ্রদেশে রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এস এস পির রাজনারায়ণ। ভারতীয় ক্রান্তি দলের চরণ সিং নাকি আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনিও রাজনারায়ণকে সমর্থন করে ঐ কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে যোগ দেবেন। বিনিময়ে চার-পার্টি ফ্রন্টের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, শ্রীসিং ও

ভূগর্ভ রেল যে-পথে যাবে

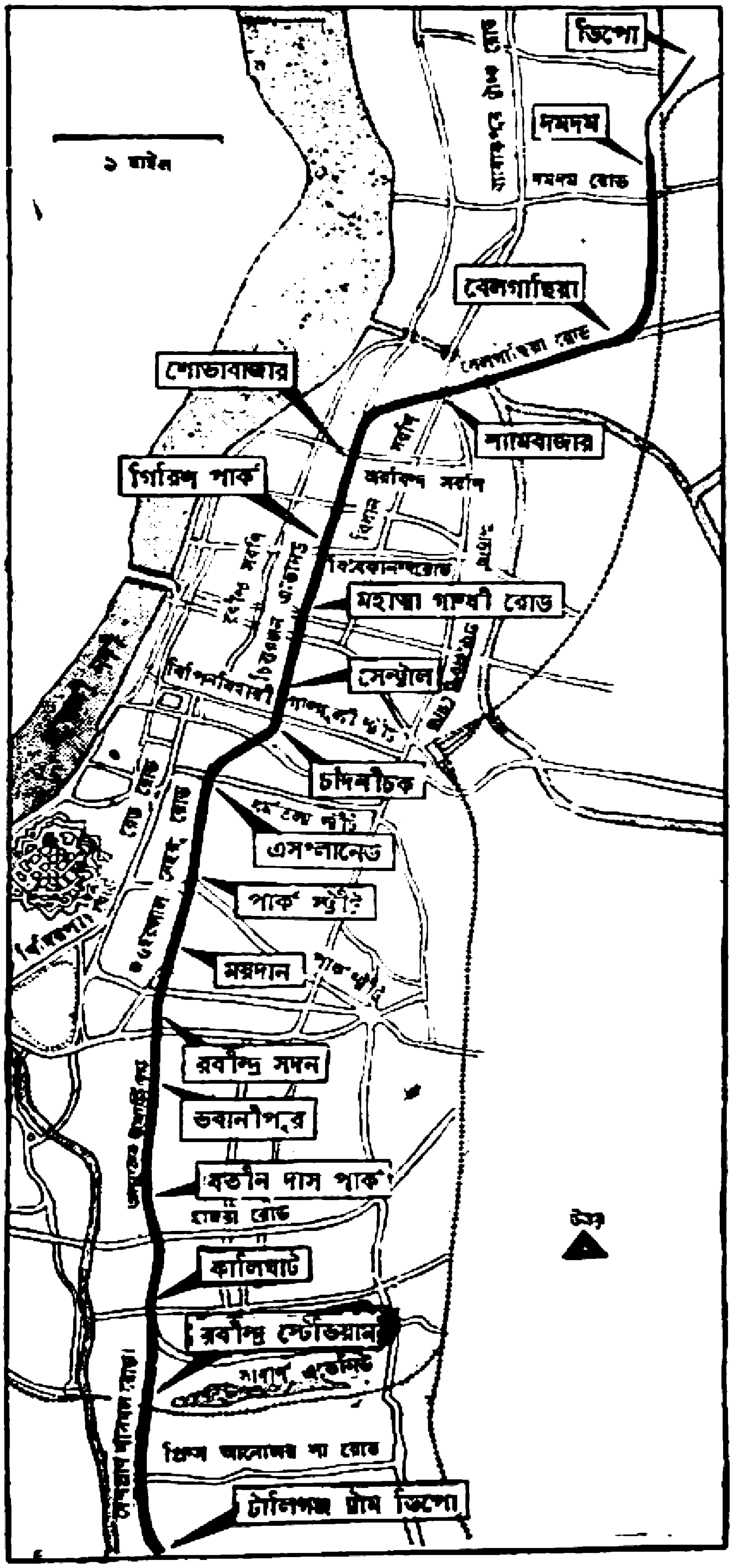

কৃষ্ণপুর-ভাঙড় কাটা খাল

অন্যান্য বি কে ডি নেতারা যেসব নির্বাচন কেন্দ্রে দাঁড়াবেন সে সব কেন্দ্রে ফ্রন্টের কোন প্রার্থী দেওয়া হবে না।

ফ্রন্টের চার-পার্টির ভিতর জনসঙ্ঘ ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে। দুটি ইস্তাহারের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী। যেমন, জনসঙ্ঘ মনে করে, ভারতবর্ষের বর্তমান সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে তার বৈপ্লবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব এবং অপর পক্ষে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল মনে করে, এই সংবিধানের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। সম্পত্তির অধিকারকে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করতে চায় না আর জনসঙ্ঘ ঐ অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দিতে চায় না। তবে হরেক প্রতিশ্রুতির দিক থেকে দুই দলের কেউ-ই কম যায় নি। জনসঙ্ঘের আশ্বাস, তিন বছরের মধ্যে সমস্ত দক্ষ কর্মীর জীবিকার সংস্থান করা হবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত বেকারকে কাজ দেওয়া হবে। তাদের আরও প্রতিশ্রুতি, দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের হার বছরে দশ শতাংশেতে তোলা হবে। সঙ্গে সঙ্গে জনসঙ্ঘ এই আশ্বাস দিয়েছে যে, জনগণের উপর নূতন ট্যাক্স না চাপিয়ে এবং জিনিসপত্রের দাম না বাড়িয়ে এসব কাজ করা হবে। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের আশ্বাস, সরকারী নোকরির ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, (সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সংজ্ঞা অনুসারে নারীরাও অনুন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত), তিব্বতকে চীনের অধিকার থেকে মুক্ত করা হবে, কৃত্রিম দেশবিভাগ রদ করা হবে ইত্যাদি।

*

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সংগে যে সব রাজ্য-বিধানসভারও অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে তার সংখ্যা আর একটি বাড়তে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু বিধানসভার নির্বাচনের কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষ যে রাজ্যের বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে আগামী মার্চের নির্বাচনপর্বের সঙ্গে সামিল করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেটি হচ্ছে উড়িষ্যা। সেখানে রাজেন্দ্রনাথ সিং দেওয়ের মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেও রাজ্যপাল ডাঃ শৌকতুল্লা শাহ্ আনসারি প্রায় দিন-দশেক অপেক্ষা করে ছিলেন একটি বিকল্প সরকার গঠন করা যায় কিনা তার সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। একদিকে শাসক কংগ্রেস, পি এস পি, সি পি আই প্রভৃতি দল আর একদিকে স্বতন্ত্র পার্টি, উৎকল কংগ্রেস প্রভৃতি সরকার গঠনের দাবীদার ছিলেন। দুই পক্ষই আরও কিছু সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁদের আর সময় দিতে অস্বীকার করে বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন যে, তাকে অবিলম্বে জানান হলে তিনি উড়িষ্যার লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে একই সময়ে বিধানসভার নির্বাচনের আয়োজন করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যপালের সুপারিশ পাঠাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, উড়িষ্যার পুরোনো কংগ্রেসী ও অধুনা জনকংগ্রেস দলের নেতা ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব তাঁর কিছু অনুগামীকে নিয়ে শাসক কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন।

*

কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলেন যে, সিঙ্গাপুরে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের অষ্টাদশ সম্মেলনেই কমনওয়েলথ নামক রাষ্ট্রজোটের পরমায়ু শেষ হবে। এই আশঙ্কা অবশ্য সত্য হয়নি। কিন্তু বৃটেনের রক্ষণশীল হীথ সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী সরকারকে অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য গোঁ ধরে বসে থাকায় কমনওয়েলথে যে গভীর সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসার কোন রাস্তাও সিঙ্গাপুরে দেখা যায় নি। প্রশ্নটি একটি কমিটির কাছে পাঠিয়ে ব্যাপারটা আপাতত ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে মাত্র।

২২-১-৭১ —পুন্ডরীক

সম্পাদকীয়

জনসাধারণের সাধারণতন্ত্র

আরেকটি সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা উদ্‌যাপন করলাম সারাদেশে। ছাব্বিশে জানুয়ারির এই দিনটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য আজ আরও বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কারণ ভারতের সাধারণতন্ত্র এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। ঔপনিবেশিক শক্তির দীর্ঘ শতাব্দীর শাসন অবসানের পর ভারত উপমহাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার পতাকা যখন উড্ডীন হয় তখন একটিমাত্রই আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের যে, এই স্বাধীনতা যেন গণতন্ত্রসম্মত ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এশিয়ার মানুষ যে সংগ্রাম করেছিল তার পুরোভাগে ছিল ভারত। ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতার জন্য যে-পথ বেছে নেবে, এশিয়ার অন্যান্য দেশে তার প্রভাব পড়বে নিঃসন্দেহে। তাই আমাদের স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্রের তাৎপর্য শুধু ভারতের জন্যই নয়, গোটা এশিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এটা অবশ্যই গৌরবের কথা যে, ভারত বেছে নিয়েছিল জনকল্যাণ সাধারণতন্ত্রের কাঠামো। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এই সাধারণতন্ত্রী সংবিধান প্রবর্তিত হয়। দুই দশকের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে তৃতীয় দশকে প্রবেশ করল এই গণতান্ত্রিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতা সম্পর্কে আজ বিচারের দিন এসেছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশ যখন গণতান্ত্রিক পরীক্ষায় বারবার ব্যর্থ হয়েছে, তখন ভারত তার সীমিত শক্তি নিয়ে ও বহুবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্যেও এই সাধারণতন্ত্রী সংবিধানের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে এটা কম কৃতিত্ব নয়। নিশ্চিতই ভারতের মানুষকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের ইচ্ছামত সরকার নির্বাচনের এবং পর পর কয়েকটি সাধারণ নির্বাচনে এই অধিকার তাঁরা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কালের নিয়মে অনেক জিনিসই বদলায়। সাধারণতন্ত্রী সংবিধানেরও অনেক সংশোধন করা হয়েছে গত কুড়ি বছরে। এবং প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতেও এর সংশোধন করা হবে জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে।

> **নিবেদন**
>
> মুদ্রণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মাত্রাধিকভাবে বেড়ে যাওয়ায়, বিশেষ করে নিউজ প্রিন্টের বহুলাংশে মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ থেকে সাপ্তাহিক 'অমৃত'-র প্রতি কপির দাম আরও ১০ পয়সা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছি। অর্থাৎ ঐদিন থেকে প্রতি কপির মূল্য ৫০ পয়সা হবে।
>
> আশা করি এই সামান্য মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও আগের মতোই আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের আনুকূল্য লাভ করতে সমর্থ হব।
>
> সার্কুলেশন ম্যানেজার

গণতান্ত্রিক অধিকারই একটি জাতির পক্ষে মহামূল্যবান তা সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অধিকার কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটাও সমান মূল্যবান। ভারতবর্ষে আজ যে-প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের বৈষয়িক উন্নতির পথ সুগম রাখা। পঞ্চান্ন কোটি মানুষকে নিয়ে গণতান্ত্রিক পরীক্ষা সহজ কথা নয়। বিশেষ করে যে-দেশের মানুষের বৃহৎ অংশ দরিদ্র, অশিক্ষিত ও পশ্চাদ্‌পদ সে-দেশে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে এই গণতন্ত্রের অপব্যবহারও করতে পারে। কারণ অজ্ঞ, দরিদ্র জনসাধারণ সংখ্যায় বেশি হলেও তাদের শক্তি কম, ন্যায়বিচারের জন্য তাদের হাত পাততে হয় শিক্ষিত অগ্রসর শ্রেণীর কাছেই। তাই গণতন্ত্রকে আজ মিলিয়ে দিতে হবে সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে। গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের সমার্থক করে তুলতে হবে।

এই প্রশ্ন নিয়েই আজ চলছে বিচার। এই প্রশ্নেই বহুদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত শাসক পার্টি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন আজ সেই সমবেত শক্তিকে লড়াই করতে হবে প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বিরুদ্ধে। প্রতিক্রিয়াপন্থীরা কম শক্তিশালী নয়। তারাও একটা জোট বেঁধে আসন্ন নির্বাচনে প্রগতিবাদীদের জানিয়েছে চ্যালেঞ্জ। আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাই লড়াই হবে প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়ার, সামাজিক ন্যায়বিচার বনাম সামাজিক স্থিতাবস্থার। ভারতের সাধারণতন্ত্রী সংবিধানের মুখবন্ধে স্পষ্টতই উল্লেখ করা ছিল যে, দেশে সর্বসাধারণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যখনই কাজ করতে চাওয়া হয়েছে, তখনি শক্তিশালী স্থিতস্বার্থের প্রতিভূদের কাছ থেকে এসেছে বাধা। তার ফলে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের নানারকম ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। সেই ব্যাখ্যার জোরে আমাদের সংবিধান এমন একটি পরীক্ষার সামনে উপস্থিত হয়েছে যে তার সুষ্ঠু সমাধান না হলে আমাদের সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবার আশঙ্কা। প্রধানমন্ত্রীও এ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত যে, জনগণের কল্যাণ করার পথে কোনো বাধাই বরদাস্ত করা চলে না। আজ ভারতবর্ষে যে বিপুল জনজাগরণ ঘটেছে, লক্ষ লক্ষ তরুণমনে যে-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কোনো মতেই ব্যর্থ হতে দেওয়া চলে না। এই ব্যর্থতা ঘটতে দিলে তা জনগণকে বিপথে চালিত করার সম্ভাবনা। আমরা যেন ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিত গ্রহণ করে ভারতের সাধারণতন্ত্রকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারি। এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্যই হল এই।

খেলার পরে ॥ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

চাকার ঘর্ঘর মন্দ্র থেমে গেলে
নৈঃশব্দ্যে কঠিন অন্ধকার
হেসে ওঠে। আমাদের আপাদ মস্তক যান্ত্রিক ছিল কি?
কথা ছিল, যান্ত্রিকতা পরিহার করা: কথা ছিল,
হাতে পায়ে বুকে মুখে স্বাভাবিক হওয়া, ঐকতানে
কথায় ও কাজে সমে থাকা, সামঞ্জস্যে।

অথচ এখন দেখি সিঁড়ি-ভাঙা
দুরারোহ শিখরে শিখরে। একেকটা সিঁড়ির
অববাহিকাও আছে। থাকা ভালো কিনা
আমি তা জানি না। সময়ের চাকা ঘোরে নিজস্ব নিয়মে,
অবশ্যই, তবু মনে হয় কখনো সময়
ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগতি পায়,
বিমান কি রকেটকে ছাড়ায়: কখনো মনের
গতি তার।

তবু তো সময় কোনো কিছুতেই লক্ষ্য নয়।
অথচ আবিল হয় কখনো কখনো সময়ের প্রতীক ও পরিচয়,
কিন্তু যান্ত্রিকতা আজ অস্তিত্বের মূলে নাড়া দেয়
প্রায়শই। যে-খেলা খেলার জন্যে, আজ তার
জয়ের মুকুট অধিকার
প্রধান প্রেরণা, তাই লীলা ব্যাভিচার, কিংবা অতিচার গতি।

নিয়তি, নিয়তি ফেলে মধ্যপথে যতি,
না-মেনে উপায় নেই দুর্বলের,
সবল, সাহসে ভর করে, খেলা শেষ হলে পরে
নিজ মূর্তি প্রায়শ প্রকট হয়, কখনো গোপন,
অথচ আদিতে আকাঙ্ক্ষিত কী ছিল তা
ভেবেও দেখে না।

অন্ধকার পরিখার পারে
যেখানে সূর্যের আলো, সেখানেই ফল্গুস্রোত
ছিল, হাওয়ার স্তব্ধতা কুয়াশায়,
অথবা মেঘের ঘোরে রহস্যও, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব।

চাকার ঘর্ঘর মন্দ্র থেমে গেলে
রহস্যে কঠিন অন্ধকার
হেসে ওঠে।

প্রবাসে যাবার আগে ॥ অনন্ত দাশ

সমস্ত ক্ষোভের চিহ্ন একে একে মুছে ফেলি
সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে সামুদ্রিক ক্ষত
উল্কাপাতে আহত হৃদয়
পিছনে পথের চিহ্ন মুছে যায়
সামনের জ্বলন্ত উদ্যানে
অবশিষ্ট দিন।

কারা যেন অন্ধকারে মুছে দিচ্ছে আলোর আলপনা
নিশুতি নৌকায় কারা পারাপার করে
ঊর্ধ্বমুখী চাঁদে
ভীষণ বিষণ্ন রাত কাঁদে
অরণ্যে উদাস পাখি, আকাশের প্রেক্ষাপটে
দৃশ্যাবলি পাল্টে যায়
হাতের তালুর নীচে
অতিদ্রুত ছায়া নেমে আসে

কণ্ঠে আর্তনাদ নিয়ে আমি ছুটে যাই
তীরবিদ্ধ পাখি যেন সারারাত ছটফট করি
বিস্ফোরণে — জ্বলন্ত উদ্যান
প্রবাসে যাবার আগে অন্ধকারে আমি দেখি
কারো চোখ সিক্ত হয়ে ওঠে
দুঃখের শিশিরে।

যতদিন •••॥ গার্গী চক্রবর্তী

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হয়ে অশরিরী সত্তাগুলো
পাহাড়ের বুকে মিলিয়ে যায়। আমার দেহটা
লাঠিতে ভর দিয়ে কিছু দূর এগোয়; তারপর আর
পারে না, বসে পড়ে হাঁটু ভেঙে। কান পেতে
থাকে: কিন্তু শুনতে পায় না আর — সেই সব
পিয়ানোর সুর, সেই সব বৃষ্টির অজস্র শব্দ। শুধু
চার পাশে...অরণ্যের বোবা আর্তনাদ। রাত্রি
নেমে আসে—পৃথিবী ঢেকে যায় ঘুমের কুয়াশায়।

কিন্তু আমার দেহটা দু চোখ মেলে
প্রেতাত্মার ছায়া দেখছে। শব্দহীন যন্ত্রণা।
কফিনের স্পর্শ এনে দেয় আমার শরীরে।

গল্প নয়, সত্যি। তবে শেষটা গল্প না
স্বপ্ন ছায়া না ছবি কিছুই জানি না।
দিনটা প্রায় শতাব্দীর পর, মনে হল
আমার শেষ স্মৃতি। — দু একটা পাখীর
ডাক ভোরের প্রথম আলোর আস্বাদ
হয়তো-না আমার সমস্ত স্মৃতির উপর
দু একটা ফুল দিয়ে যাবে — নীল ফুল
ও সবুজ পাতার সান্ত্বনা দিয়ে যাবে আমার
সবুজ ঘাসেই থাকে আমি নতজানু,
বিদায়। এ তো আমি নিশ্চিত জানি — যতদিন
আকাশ, বাতাস, সমুদ্র বেঁচে থাকবে।

কলকাতার ভবিষ্যৎ

সুধীরকুমার সেন

উত্তর-দক্ষিণে হুগলী নদীর দু' তীর ধরে বাঁশবেড়িয়া থেকে কাঁচরাপাড়া এবং হাওড়া থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত যে ৪১০ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চল—সাধারণো দীর্ঘকাল ধরে যার পরিচয় বৃহত্তর কলকাতা বলে—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট তারই আজকের নবলব্ধ নাম। এই নাম অবশ্য কোন গৌরবের নয়, আবর্জনা, রোগ-মহামারীর সূতিকাগৃহ, জলাভাব, যানবাহনের নিদারুণ অভাব, গৃহের অভাব—সব কিছু নাগরিক অস্বাচ্ছন্দ্যকে যদি একটি নামে পরিচিত করতে হয় তাহলেও সর্বসম্মতিক্রমে বলা যাবে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট। অথচ এই বিশাল এলাকা—যার জনসংখ্যা আজ ৮৫ লক্ষে পৌঁছেছে, তার মধ্যে আছে কলকাতা ও হাওড়া দুটো কর্পোরেশন, ৩৩টা মিউনিসিপ্যালিটি এবং ৩৭টা অঞ্চল, মিউনিসিপ্যালিটি না থাকলেও যা শহররূপে পরিচিত। এই বিশাল জনবহুল এলাকায় শহরের সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্যও নেই, আবার গ্রামের স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন পরিবেশও নেই—অসংখ্য কল-কারখানা, হাট-বাজার বিপণী সমন্বিত এই সুবিস্তৃত অঞ্চল একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের হৃৎপিণ্ড, অন্যদিকে তা সমগ্র রাজ্যদেহে এক দুরারোগ্য দুষ্ট ক্ষত।

এই ক্ষতের উপশমের জন্য পরিকল্পনার আড়ম্বর কম হয় নি, কখনো বা সাময়িক প্রলেপও কিছু লাগান হয়েছে বটে কিন্তু তাতে আসল রোগের কোন উপশম হয় নি বরং বেড়ে তারা যা আকৃতি দাঁড়িয়েছে তাই-ই আজকের কলকাতা, বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবন যেখানে যন্ত্রণা, বিদেশীরা যে স্থান বর্জন করে এবং জীবিকার্জনের একমাত্র আকর্ষণই যেখানে মানুষকে টেনে রাখে ও টেনে আনে, অথচ জীবিকাও আজ সেখানে অতি দুর্লভ।

এই শহরের চেহারা পাল্টানোর জন্য কয়েক বছর আগে সি এম পি ও (ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান অর্গানাইজেশন) যে পরিকল্পনা তৈরী করে তাও অর্থের অভাব, কর্তৃত্বের বিরোধ প্রভৃতির জন্য রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। সি এম পি ও'র পরিকল্পনাগুলো ছিল এই :

১। কলিকাতা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্টের ২০ বছর মেয়াদী (১৯৬৬—১৯৮৬) মৌল উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২। ঐ ডিস্ট্রিক্টের জল সরবরাহ, পয়ঃনালী ও জলনিকাশী পরিকল্পনা, যার ব্যাপ্তি ধরা হয়েছিল ১৯৬৬ খৃঃ থেকে ২০০০ খৃস্টাব্দ, ৩। ২০ বছর (১৯৬৬—৮৬) মেয়াদী পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা, ৪। হাওড়া অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা যার শুরু ১৯৬৬ খৃঃ আর শেষ '৮৬ খৃঃ।

সি এম পি ও শুধু পরিকল্পনা তৈরী সংস্থা, রূপদানের কোন কর্তৃত্ব তার ছিল না। এই জন্যই সি এম পি ও পরিকল্পনাকে রূপদানের জন্য ১৯৭০ খৃঃ ২১ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আইনরূপে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি অ্যাক্ট চালু হয় এবং ঐ বছরেরই ৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকার সি এম ডি এ গঠন করেন। চেয়ারম্যানসহ (বর্তমানে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ) সাতজন এর সদস্য। এই সংস্থাকে পরামর্শ দানের জন্য আছে ২২ জন সদস্যের একটি অ্যাডভাইসার কাউন্সিল।

সি এম ডি-এর এই বিরাট পরিকল্পনার বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। টাকা আসবার সূত্রগুলো এই : কেন্দ্র, রাজ্য বা অপর কোন সংস্থার কাছ থেকে সাহায্য বা ঋণ বাবদে প্রাপ্ত অর্থ; বাজার থেকে ঋণ; কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকায় পণ্য প্রবেশ কর হিসাবে সংগৃহীত অর্থের হিস্যা। ১৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৪৪ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ যোজনায় বরাদ্দ হিসাবে ধরা

আছে। চলতি আর্থিক বছরে (৭০-৭১) বরাদ্দ আছে ২০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা।

দফাওয়ারী বরাদ্দ

উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ অর্থকে বিভিন্ন দফায় এইভাবে বিভক্ত করা হয়েছে :

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

১। জল সরবরাহ—২৮৮০·১৭
২। পয়ঃনালী ও জলনিকাশ—২৮১০·৫৮
৩। পরিবহন—৩১৫২·৬৫
৪। আবর্জনা অপসারণ—২৬০·৭৭
৫। বস্তী উন্নয়ন—১০০০·০০
৬। বস্তী দখল, পরিস্কার ও সংস্কার—১১৮·১৬
৭। মানিকতলা কাজ ও বাসস্থানের সংস্থান—৩১·৮৫
৮। কোনা, কল্যাণী প্রভৃতি উন্নয়ন—১৩৬০·০০
৯। হাসপাতাল, প্রাথমিক বিদ্যালয়—১৬৬২·০৪
১০। শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্তের গৃহ সংস্থান—৬০০·০০
১১। ট্রাম, স্টেট বাস প্রভৃতি—৯২৮·০০

রূপদানের দায়িত্ব

কলকাতার সামগ্রিক পরিকল্পনাকে ভাগ করা হয়েছে ১২টি প্রকল্পে। এর ভেতর ২৬টি প্রকল্প সি এম ডি এ গঠিত হওয়ার আগেই অনুমোদিত হয়। এর পর আরো ৪৬টির অনুমোদন মিলেছে এবং মাত্র ২০টি চূড়ান্ত রূপদানের প্রতীক্ষায় আছে।

সি এম ডি এ যেখানে নিজে কোন প্রকল্পের রূপদান করবে না, সেখানে অন্য কোন সংস্থার ওপর তা কার্যকরী করার ভার দিয়ে অর্থ সঙ্কুলান-এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেবে। যে সংস্থাগুলোর মারফৎ কাজ করান হবে তা এই :

সরকারী বিভাগ

১) সি এম পি ও'র মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সেকশন, ২) জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তর, ৩) সেচ ও জলপথ দপ্তর, ৪) পূর্ত দপ্তর, ৫) পূর্ত (সড়ক) দপ্তর, ৬) পূর্ত (বিশেষ সড়ক) দপ্তর, ৭) স্লামক্লীয়ারেন্স বোর্ড, ৮) গৃহনির্মাণ দপ্তর, ৯) ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোং সংস্থা।

বিধিবদ্ধ সংস্থা

১) ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, ২) হাওড়া ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, ৩) ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন অথরিটি, ৪) ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোঃ, ৫) ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং।

স্বশাসিত সংস্থা

১) কলিকাতা কর্পোরেশন, ২) হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও ৩) অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটি।

যেগুলোর কাজ চলছে

জল সরবরাহের জন্য প্রকল্পের সংখ্যা মোট প্রকল্প ১৯টি। এর মধ্যে ৭টি শেষ হয়ে গেছে, ১২টিতে কাজ চলছে। এর মধ্যে আছে কলিকাতা কর্পোঃর পলতা থেকে জল সরবরাহ বৃদ্ধির প্রকল্প, ১০টি মিউনিসিপ্যালিটিতে জল সরবরাহের প্রথম পর্যায়ের প্রকল্প এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মিউনিসিপ্যালিটিবহির্ভূত শহর এলাকায় জল সরবরাহ, মানিকতলা-তপসিয়া ট্যাংরা এলাকায় জল সরবরাহ প্রকল্প, হাওড়া, বালী মিউনিসিপ্যালিটি ও সংলগ্ন এলাকায় ওয়াটার ওয়ার্কস স্থাপন ও গার্ডেনরীচে ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মাণ।

পয়ঃনালী, জলনিকাশ

মোট ৩৪টি প্রকল্প। কাজ চলছে ২২টির। এর মধ্যে আছে কলকাতার আউট-ফল চ্যানেলের সংস্কার ও বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশনের সামর্থ্য বৃদ্ধি। পামারবাজার পাম্পিং স্টেশনের সামর্থ্য বৃদ্ধির কাজও সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

পরিবহন

মোট প্রকল্প ২৪টি, শেষ হয়েছে ১টি, কাজ চলছে ১২টিতে। এই পরিকল্পনায় বি টি রোড, যশোর রোড, হাওড়া-আমতা রোডের আমূল সংস্কার হবে। কলিকাতা কর্পোরেশন পাবে ১৮টি রাস্তা সংস্কারের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে দেওয়া হবে মোট ৩৭ লক্ষ টাকা এবং কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটিকে ৬ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া আছে বালিগঞ্জ-কসবা ওভার ব্রীজ নির্মাণ, ব্রাবোর্ণ রোড থেকে হাওড়া ব্রীজ অ্যাপ্রোচ পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রভৃতি। স্টেট ট্রান্সপোর্টকে দেওয়া হবে গাড়ী বাড়াবার জন্য এক কোটি টাকা, ট্রামওয়েকে ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

আবর্জনা অপসারণ

এর মোট দুটি প্রকল্পতেই কাজ চলছে। একটিতে হাওড়া অঞ্চলের জন্য লরী প্রভৃতি কেনার বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকল্পে আছে ধাপার আবর্জনা ফেলার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং লরী ক্রয়।

বস্তী উন্নয়ন

কলকাতার রেজিষ্ট্রিকৃত বস্তীর সংখ্যা নাকি ৩ হাজার, এতে লোক বাস করে সাত লক্ষ। কিন্তু বৃহত্তর কলকাতায় মোট ১৫ লক্ষ লোক বস্তীতে বাস করে বলে হিসেব করা হয়েছে। কলকাতায় বর্তমানে ৩ লক্ষ বাসিন্দা অধ্যুষিত বস্তীর উন্নয়ন প্রভৃতির পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বস্তীবাসীদের জন্য বহুতল বাড়ী নির্মাণের প্রকল্প আছে। এ বাবদ ব্যয় হবে পরিবার-পিছু প্রায় ৪ হাজার টাকা। ইতিমধ্যে বস্তীর সংস্কার, জল সরবরাহের উন্নতি, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

পাতাল রেল

কলকাতার যানবাহন সমস্যার সমাধানে দীর্ঘকাল ধরে যে নানা রেলপথের পরিকল্পনা চলছিল তার সম্ভবত কিনারা হয়েছে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে। কলকাতায় কি ধরনের রেলপথ চলতে পারে তৎসম্পর্কে সমীক্ষার জন্য কয়েক মাস আগে এ'রা ভারতে আসেন। কাজ শেষ করে সম্প্রতি এ'রা সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব অনুযায়ী রেলপথের দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে ১৬ কিলোমিটার, খরচ পড়বে ১২০ কোটি টাকা। প্রথম পর্যায়ে তৈরী হতে সময় লাগবে ছ' বছর। গোড়ার দিকে এই পাতাল রেলপথে ৫৯ হাজার যাত্রী বহন করা যাবে, শেষ পর্যন্ত বাড়ান যাবে ৮৭ হাজারে।

পরিকল্পনাটি ভাগ করে প্রথম পর্যায়ে টালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসী এবং পরে ডালহৌসী থেকে দমদম করা যেতে পারে। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের মতে, যেখানে ভূতাত্ত্বিক অবস্থার জন্য খোঁড়ার কোন সুবিধা নেই, সেখানেই টানেল করা হবে। ময়দান এলাকায় লাইন পাতার জন্য 'কাট অ্যান্ড কভার' পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে, এতে ট্রাফিক চলাচল সামান্য সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে হবে।

রেল পরিকল্পনাটির সঙ্গে অবশ্য সি এম ডি এর কোন সম্পর্ক নেই, এটি রেলওয়ে তথা কেন্দ্রীয় সরকারের, বায়ও সমগ্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের। পরিকল্পনা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই প্রকল্প অনুমোদন করলেই কাজ শুরু হতে পারবে।

কলকাতা এক দীর্ঘকালের উপেক্ষিত নগরী। সরকারী ও মিউনিসিপ্যাল স্তরে প্রশাসনিক ঔদাসীন্য ছাড়া, রাজনৈতিক দলাদলিও কলকাতার উন্নয়নে গুরুতর বাধা। বিশেষভাবে গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। এই সমস্যাগুলো এড়ানোর ওপরেই নির্ভর করবে সি এম ডি এর সাফল্য। রাজনৈতিক আবহাওয়া যদি অনুকূল না হয়, তাহলে পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ থাকবে'

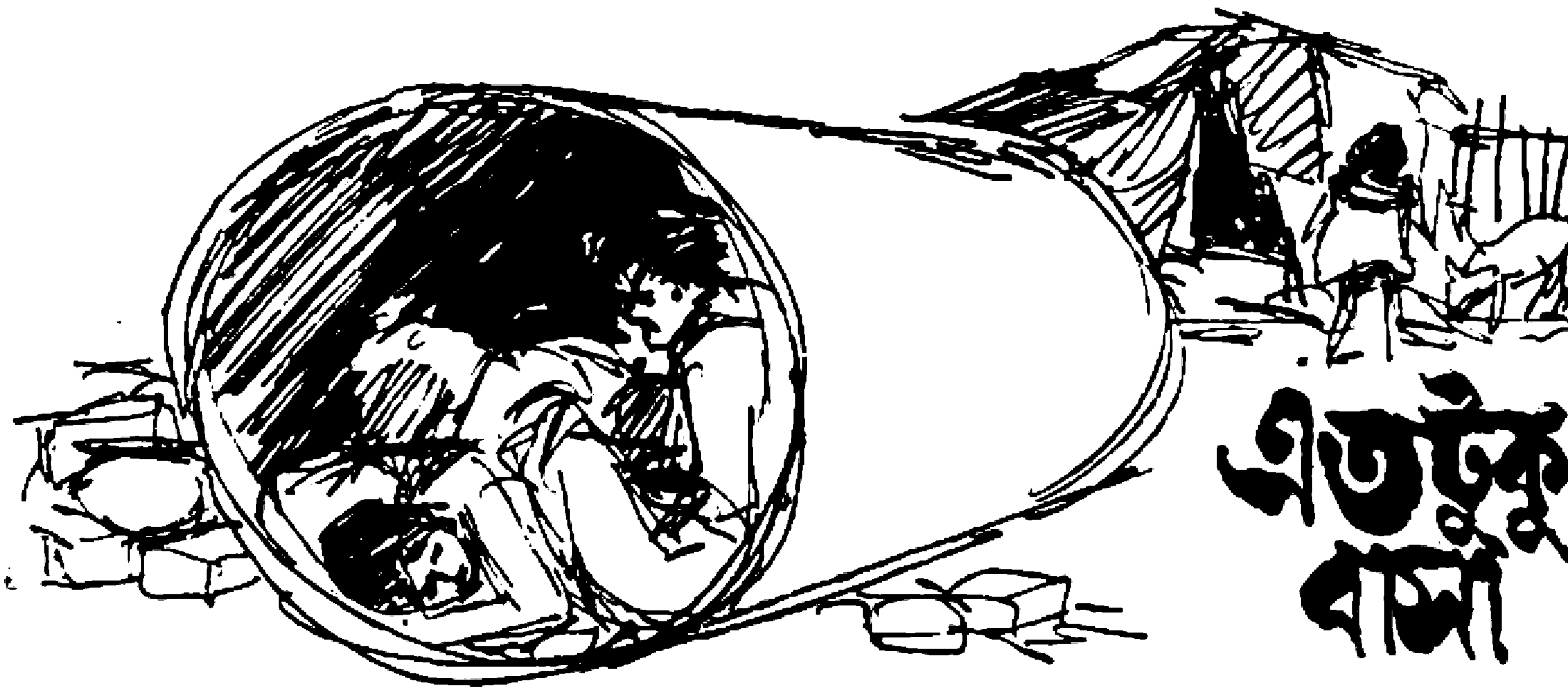

এতটুকু বাসা

বিপ্র ঘোষ

কলকাতা বা বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে বাসা-বাড়ী পাওয়া কত দুষ্কর ও তার সমাধান খুবই প্রয়োজন এ সম্পর্কে কোন কথা-ই মানুষের কানে ক্লান্তিকর লাগবে, কেন-না এটা সবাই জানে। সুতরাং সে-সব কথায় না গিয়ে সরাসরি গৃহ-সমস্যার সামগ্রিক ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাটা তুলে ধরা যাক।

প্রায় ন' বছরের পুরোনো ১৯৬১ খৃঃ আদমসুমারি অনুযায়ী বৃহত্তর কলকাতা বা ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান জেলায় (সি-এম-ডি) লোকসংখ্যা হোল ৬৭ লক্ষ। তার মধ্যে ৩,৬৬,০০০ লোক কেন বাসা-বাড়ীতে বাস করেন না—হাসপাতালে, কলেজে, চায়ের দোকানে থাকেন। আর ফুটপাতে থাকেন প্রায় ৩০,০০০ লোক। মনে রাখবেন এই ফুটপাতবাসীরা সবাই ভিক্ষুক নন, যাযাবর নন, অনেকেই কলে-কারখানায় বা অফিসে কাজ করেন। ফুটপাতবাসীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ন খুবই কঠিন যে-হিসাব দেওয়া হোল তা কমের দিকেই—অর্থনীতির ভাষায় কনসার্ভেটিভ এস্টিমেট। জনসংখ্যার অবশিষ্টাংশ 'বাসায়' থাকেন। মোট ১৩,২৯,০০০ বাসা ইউনিটে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন তার অর্থ হোল প্রতি ৪-৭৩ জন-পিছু একটি ইউনিটটী গাণিতিক হারের উপযোগ্য হিসাবটা এমনিতে খুব ভয়াবহ দেখাতে লাগে না। কিন্তু এই বাসা-ইউনিটের আয়তন যদি আমরা হিসাবে ধরি তাহলে খানিকটা আন্দাজ করা যাবে যে বাসা-বাড়ীর মানুষ কীভাবে থাকতে বাধ্য হন। ১৯৬১ খৃঃ সুমার অনুযায়ী সি-এম-ডি অঞ্চলে বাসা ইউনিটের গড় পরিসর হোল ১-৫৫ খানি ঘর। প্রতি ঘরে ২-৯৯ জন লোক থাকেন গড়ে। আজ থেকে বারো বছর আগের একটা হিসাবে কলকাতায় এক-জন ৪০ বর্গ ফুটেরও কম জায়গায় মাথা গুঁজতে পেতেন। এটা তো পাটিগণিতের গড় হিসাব। গৃহ-বন্টনের বৈষম্য যদি মনে রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে নিম্ন-আয়ের মানুষরা মাথা পিছু ৪০ বর্গফুটেরও অনেক কম জায়গায় মাথা-গোঁজার ঠাঁই পান—উপরন্তু সবাই একলা থাকেন না, অনেকেই পুত্র-পরিবার নিয়ে থাকেন। মরণকালে কবর দিতে ছ' ফুটের বেশী জায়গা কারুরই লাগে না। কিন্তু জীবিত অবস্থায় ঐ পরিমাণ জায়গায় থাকতে বাধ্য হওয়াটা কী রকম লাগে?

কিন্তু তা-ও কি বাসা-বাড়ীগুলো মানুষের বসবাসের যোগ্য? বেশীর ভাগ বাড়ী কাঁচা বাড়ী—জলনিকাশন ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে—মেরামতির অভাবে বহুযুগের পুরনো বাড়ীতে শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় সি-এম-ডির বিপুল জনসংখ্যা কর্মক্লান্ত দিনের শেষে বিশ্রামের মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করে বাসায় এসে ঢোকেন। আর কাঁচা বস্তীর জীবন তো সম্পূর্ণ আলাদা জগত।

সি-এম-ডি অঞ্চলে বাসা-বাড়ীর যোগান ও প্রয়োজনের ব্যবধান ক্রমশই দুস্তর থেকে দুস্তরতর হচ্ছে। বাসস্থানের আয়তনের একটা গড় মান যদি ধরা যায় ঘর পিছু ২-৫ জন লোক আর হাউসিং ইউনিট পিছু দুখানা ঘর তাহলে ১৯৮৬ সালের হিসাব অনুযায়ী গৃহহীনদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে ৪৩০,০০০ ঘর অথবা ২,১৫,০০০ বাসা-বাড়ীর প্রয়োজন। ১৯৮৬ খৃঃ পর্যন্ত সি-এম-ডি অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গাণিতিক হিসাব করা গেছে তাতে দুকামরা বিশিষ্ট ১৩ লক্ষ বাসা-বাড়ীর দরকার। তার অর্থ হোল এখন যত-সংখ্যক বাসা-বাড়ী আছে ('১৯৬১) তার শতকরা ৮৪ ভাগ বাড়ী আগামী ১৬ বছরে দরকার হবে। ষাটের দশকে গোটা সি-এম-ডি অঞ্চলে প্রতি বছর ৬,০০০ থেকে ৯,০০০ পাকা ইউনিট তৈরী হয়েছে। ঐ সময়কার বর্ধিত জনসংখ্যাকে ঠাঁই দিতে গেলে ৫৩,০০০ বাড়ী প্রতি বছর দরকার। কিন্তু এই বর্ধিত জনসংখ্যা জায়গা না পেয়ে ঠাঁই করে নিয়েছে ভীড়ে উপচে পড়া বাড়ীতে বা বস্তীতে, জবর দখল করা জমিতে, ফুটপাথে, রাস্তায় ছাউনি গেড়ে! বাড়ীর এই অপ্রতুলতা কলকাতার ধনী বাড়ীওয়ালাদের কাছে স্বর্গ-রাজ্য—অস্বাভাবিক বেশী ভাড়া, সেলামি ইত্যাদি আর এক অন্য প্রসঙ্গ—মহাভারত।

এ' তো গেল বাসস্থানের চাহিদার ও প্রয়োজনের কথা। বাড়ী তৈরী করে চাহিদা বা প্রয়োজন মেটানোর সমস্যা অনুধাবন করতে গেলে প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে, সি-এম-ডি অঞ্চলে ব্যক্তিগত বে-সরকারী সংস্থার উদ্যোগে নির্মিত পাকাবাড়ীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। বাৎসরিক যা প্রয়োজন তার মাত্র শতকরা দশভাগ পূরণ হয়েছে হাল আমলে। এই অল্প বাড়িটিরও বেশীর ভাগ সম্পন্ন হয়েছে সরকারী বা আধা-সরকারী সংস্থা দ্বারা। এর নানা কারণ আছে, তবে একটা বড় কারণ হোল সি-এম-ডি অঞ্চলে বিপুল জনসংখ্যার অসম্ভব দারিদ্র্য—যে-দারিদ্র্যের ফলে তাদের বাসস্থানের প্রয়োজন থাকা

সত্ত্বেও পাকা স্ট্যান্ডার্ড বাড়ীতে একটা মোটা-মুটি সুলভ ভাড়া দিয়েও বাস করা তাঁদের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। সি-এম-ডি অঞ্চলে পারিবারিক মাসিক আয়ের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে নীচের দিকের ৪৫ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ১৮৪ টাকারও কম। যদি আয়ের ১৫ শতাংশ বাড়ীভাড়া বাবদ খরচ করা সম্ভব বলে ধরা যায় (তা-ও সম্ভব কিনা বলা শক্ত) তাহলে এঁদের পক্ষে মাসে ২৮ টাকার বেশী মাসিক ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। ঐ সমীক্ষায় আরও দেখা যায় যে নীচের দিকের ৮৫ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ৫১৮ টাকার নীচে। ১৫ শতাংশ হারে এঁদের পক্ষেও মাসিক ৭৮ টাকার বেশী মাসিক ভাড়া বহন করার সামর্থ্য নেই। কিন্তু বাড়ী তৈরীর খরচ এমন বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে যে উপরোক্ত ভাড়ায় ন্যূনতম মানের স্ট্যান্ডার্ড বাড়ী ভাড়া দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। খরচ কোনকালেই উঠবে না—লাভ তো দূরের কথা।

গৃহ-নির্মাণে অস্বাভাবিক ব্যয়বাহুল্যের নানা আর্থিক ও অন্যান্য কারণ আছে। প্রথমত বাড়ী তৈরীর মালমশলার দাম অত্যন্ত বেশী, বহু জিনিস দুষ্প্রাপ্য-ও বটে। ভারত-সরকারের পাঁচ বছর আগেকার হিসাব অনুযায়ী গৃহ-নির্মাণে মালমশলার খরচে ৬০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ মোট খরচ বেরিয়ে যায়। এ পাটিগণিতের হিসাব খুব বেশী দরকার নেই। সি-এম-ডি অঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতা ও হাওড়ার জমির দাম গত বারো-তেরো বছরে কী প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গেছে তা সবাই জানে। (গত চার বছরে কিঞ্চিত কমেছে, তা-ও আগের তুলনায় এখনও অনেক বেশী।) কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর দক্ষিণ জমির নীলাম করার পলিসি, ভূ-সম্পত্তি কেনাবেচার কারবারে লিপ্ত কোম্পানীগুলির স্পেকুলেশন, চড়া দামে বিক্রয় ইত্যাদি ব্যাপার অত্যধিক চাহিদার যুগে জমির দামকে আকাশ-ছোঁয়া করে দিয়েছে। হালে কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় বেসরকারী উদ্যোগে গৃহনির্মাণ কাজে যে মন্থর গতি দেখা দিয়েছে বা বেশী ভাড়া-বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের (৩০০ টাকা ও তদূর্ধে) চাহিদা কমার ফলে যে ঐ ভাড়া যে খানিকটা পড়ে গেছে তাতে উপরে বর্ণিত স্বল্প আয়ের লোকেদের ভাগ্যের কোন হের-ফের বড় একটা হয় নি। গৃহ-চাহিদায় মন্দাটা খুবই আংশিক উপরন্তু গৃহ-নির্মাণে মন্দাটা সস্তা গৃহ-নির্মাণকেও স্পর্শ করেছে, তার ফলে স্বল্প-আয়বিশিষ্ট লোকেদের অথবা পরিবারের মধ্যে বাসা-বাড়ীর জন্য হাহাকার আরও বেড়ে গিয়েছে।

গৃহ-নির্মাণ শিল্পে দ্বিতীয় বড় বাধাটা আন্দাজ করা খুবই সহজ—মূলধন জোগাড় করা। উপরের আলোচনায় পরিষ্কার যে সি-এম-ডি অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল আয়ের লোক বা পরিবারের পক্ষেও নিজের বাড়ী তৈরী করা প্রায় অসম্ভব; ঋণ-করা অবশ্যম্ভাবী, অথচ প্রাইভেট ঋণদানকারীদের ঋণের স্বল্পপরিমাণ, চড়া সুদের হার ঋণ করার ব্যাপারে মস্ত বাধা। কতকগুলি বিকল্প ব্যবস্থা আজকাল অবশ্য চালু হয়েছে—প্রাইভেট ট্রাস্ট, জীবনবীমা কর্পোরেশান ইত্যাদি। যদিও জীবনবীমা কর্পোরেশান পলিসি-হোল্ডার ছাড়া আর কাউকেই ঋণ দেয় না তবুও এ'কথা সত্য যে জীবনবীমা কর্পোরেশানের ঋণের শর্ত খুব অনুদার নয়।

সব দিক দেখে শুনে একথা সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে বে-সরকারী উদ্যোগে ব্যাপকহারে গৃহনির্মাণ শিল্পে মূলধন নিয়োগের সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং গৃহ-সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারী বা আধা-সরকারী সংস্থাসমূহের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়—যে দায়িত্ব সমগ্র আর্থনীতিক খাতিরেই অস্বীকার করা যায় না। তবে একথা সত্য যে সামগ্রিক সুসংহত আর্থনীতিক পরিকল্পনায় গৃহ-নির্মাণ সবচেয়ে অগ্রাধিকার পায় না। তাছাড়া বর্তমানে পরিকল্পনায় যা অবস্থা—বিনিয়োগের জন্য সম্পদ ক্রমশই এত অপ্রতুল হয়ে যাচ্ছে যে সি-এম-ডি অঞ্চলে আগামী বিশ বছরে গৃহ-সমস্যার পূর্ণ সমাধানের আশা সম্পূর্ণ দুরাশা। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে আংশিক সমাধান অসম্ভব, সমস্যার বোঝা বেশ খানিকটা হাল্কা করা দুঃসাধ্য। তার জন্য চাই সুসংহত, বাস্তব সরকারী গৃহ-নির্মাণ পলিসি। কাঁচা হোক বা পাকা হোক চালু বাসস্থানকেও বাসযোগ্য করাও এই পলিসির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সে-ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে গেলে সরকারী স্কীমগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ-নির্মাণ ও পূর্ত বিভাগের আওতায় যে সোস্যাল হাউসিং স্কীম চালু আছে সেই বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যে গৃহ-নির্মাণের জন্য অনুদান বা ঋণ দিয়ে থাকে। এই স্কীমের আওতায় সি-এম-ডি অঞ্চলে সাতটি স্কীম প্রচলিত আছে :

১। অনুদান সাপেক্ষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কিম।

২। নিম্ন আয়ের লোকেদের জন্য গ্রুপ হাউসিং স্কিম।

৩। বস্তি অপসারণ ও উন্নয়ন স্কিম।

৪। অর্থনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িতদের জন্য স্কিম।

৫। মধ্যবর্তী আয়ের লোকেদের জন্য স্কিম।

৬। রেন্টাল হাউসিং স্কিম।

৭। ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন ও ডেভেলাপমেন্ট স্কিম।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহ-নির্মাণ দফতর ছাড়া, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর, কলকাতা ও হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এই স্কিমগুলি রূপায়িত করার চেষ্টা করেন।

(১) স্কিম খাতে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের গৃহ-নির্মাণের জন্য অনুদান ও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ রাজ্য সরকারকে দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকার নিজে এই বাবদ টাকাটা খরচ করতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে কোন হাউসিং বোর্ড, রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভকে ঋণ দিতে পারেন। মাসিক ৩৫০ টাকার অনূর্ধে যে-সব শ্রমিকের আয় (১)নং স্কিমের বাড়ী তাঁদের জন্য। এই স্কিম অনুযায়ী ১৯৫৬-৬৬ খৃঃ এই দশ বৎসরে এক অথবা দুই কামরা বিশিষ্ট বাড়ী বিভিন্ন সংস্থা নির্মাণ করেছেন—তার সংখ্যা হোল ৮,০৬৮। অথচ অনুমতি ছিল ১২,১৮৮টি বাড়ীর। কাজ না হওয়ায় প্রয়োজনীয় অর্থ ফেরত চলে গিয়েছে।

(২)নং স্কিম অনুযায়ী, বাৎসরিক ৩ হাজার টাকার আয়ের লোকেদের বাড়ী তৈরীর দামের ২৫ শতাংশ অনুদান ও ৭৫ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (সুদ আছে) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বার্ষিক ৬ হাজার টাকা আয় হ'লে বাড়ী নির্মাণের খরচের ৮০ শতাংশ ৩০ বৎসর মেয়াদে ৫ শতাংশ সুদের হারে ঋণ দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ গৃহ-নির্মাণ দফতর ও কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গত চার বছর আগে ১৩০০র কিছু বেশী বাড়ী এই স্কিম অনুযায়ী নির্মাণ শেষ করেছেন।

(৩)নং স্কিম অনুযায়ী বস্তী অপসারণ ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দামের ৩৭½ শতাংশ অনুদান এবং ৩৭½ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেন। রাজ্য সরকার ২৫ শতাংশ অনুদান দিতে পারেন—তবে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এতদিন পর্যন্ত বস্তী অপসারণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৫৮ খৃঃ আইন অনুযায়ী কলিকাতা কর্পোরেশানের চৌহদ্দির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, সি-এম-ডির অন্যান্য অঞ্চল বাদ ছিল। হালে সি-এম-ডি-এ হাওড়াতে বস্তী উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী পয়ঃপ্রণালী পাকা করা, সুষ্ঠু জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত, আবর্জনা অপসারণ, পানীয় জল সরবরাহের নিয়মিত ব্যবস্থা করার কথা।

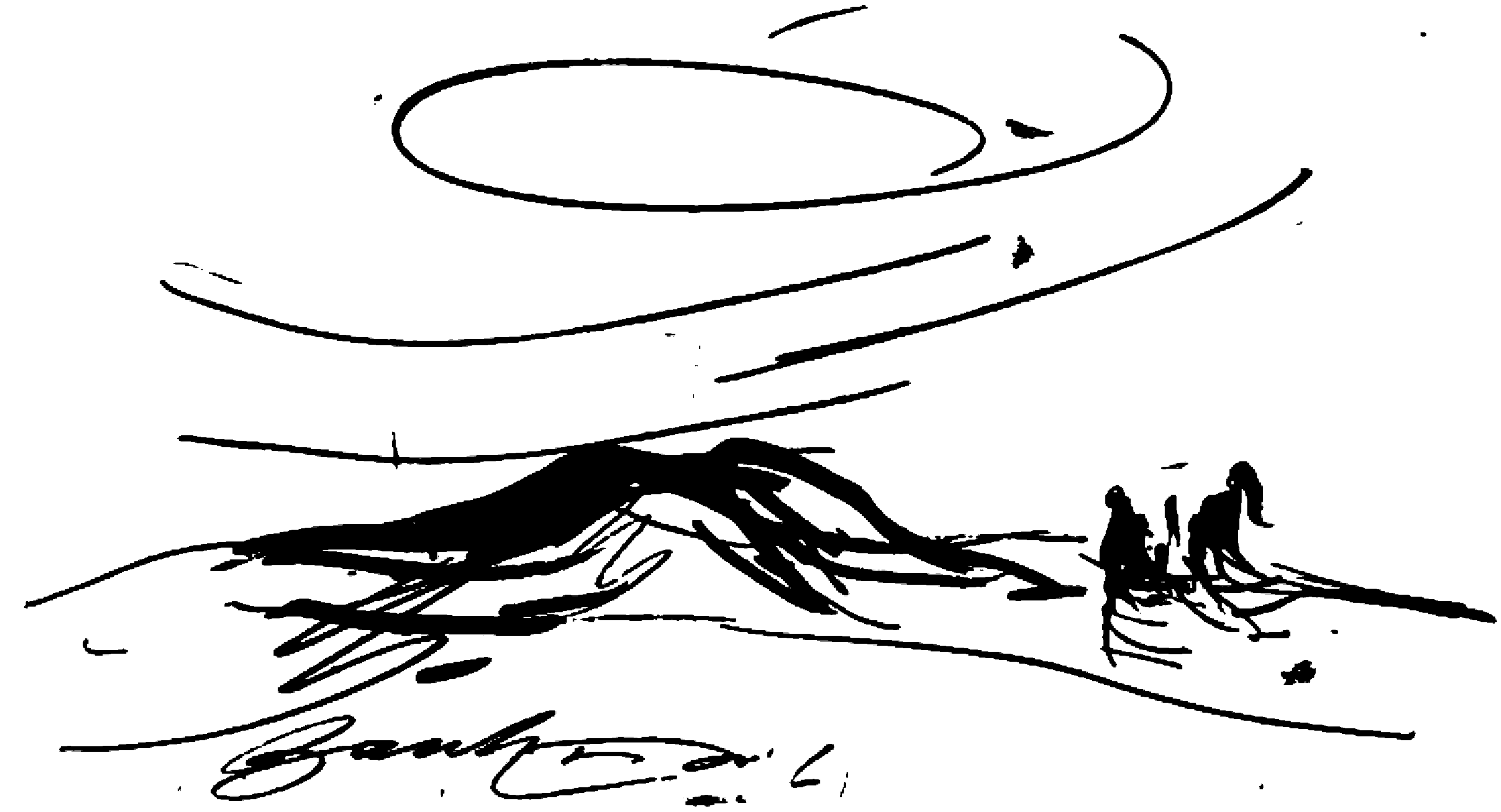

বস্তী অপসারণ করে ছোট টেনেমেন্ট তৈরী করার ব্যাপারে গত চার বছর আগে পর্যন্ত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট তৈরী করেছিল ৪,১৭৬টা টেনেমেন্ট। আর সরকারী গৃহ-নির্মাণ দফতর ১,১১২টি টেনেমেন্ট।

বস্তী অপসারণ ও উন্নয়ন স্কিম সম্পর্কে সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হোল কাজের শোচনীয় মন্দ্রগতি। সমস্যাটি এত ব্যাপক, বৃহৎ ও স্বতন্ত্র ধরণের। সে-আলোচনা আলাদাভাবে করা প্রয়োজন।

(৪)নং স্কিম অনুযায়ী কলিকাতার (ও বম্বে) বাইরে বসবাসকারী কোন লোকের মাসিক আয় ১৭৫ টাকা অথবা কলকাতার (ও বম্বে) ভিতরে বসবাসকারী কোন লোকের আয় যদি মাসিক ২৫০্ টাকার অনুর্ধে হয় তাহলে এই স্কিমের আওতায় আসবে। এই স্কিম অনুযায়ী বাড়ী তৈরীর দামের ৭৫ শতাংশ ৩০ বৎসরের মেয়াদে ৫½ শতাংশ সুদের হারে ঋণ পাওয়া যায় আর বাকের বাকী ২৫ শতাংশ অনুদান পাওয়া যায়। **আশ্চর্যের কথা এই স্কিম অনুযায়ী কোন প্রকল্পই আজ অবধি আরম্ভ হয় নি।**

(৫)নং স্কিম অনুযায়ী, যে-লোকের **বার্ষিক আয় ৬,০০০ টাকার নীচে নয় অথবা বার্ষিক ১৫,০০০ টাকার অনুর্ধে, তাদের সুবিধা দেওয়া হবে। ঋণের পরিমাণ নির্মাণ খরচের ৩০ শতাংশ, তবে ২০,০০০ হাজার টাকার বেশী কোনক্ষেত্রেই নয়। ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা ছিল, এই ঋণ সরবরাহ করবে লাইফ ইন্সিওরেন্স করপোরেশন। ১৯৬৪-৬৫ খৃঃ মধ্যে সর্বসাকুল্যে ৫,৭৩৯ খানা বাড়ী, বেশীর ভাগই সি-এম-ডি অঞ্চলে নির্মাণ করা হবে। ১৯৬৫ খৃঃ পর্যন্ত মাত্র ৬৬টি ইউনিট তৈরী হয়েছিল। তার মানে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন ফেরত চলে গিয়েছিল।**

(৬)নং স্কিম অনুযায়ী, রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের জন্য লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন থেকে বিশ বৎসরের মেয়াদে ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ী তৈরী করা হবে। বাড়ী পিছু খরচ করা হবে ১৮,০০০ হাজার টাকা। গত তিন বৎসর আগেকার হিসাব হোল সি-এম-ডিতে এইরকম মোট ৪০০ ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

(৭)নং স্কিম অনুযায়ী রাজ্য সরকার জমি দখল ও গৃহ-নির্মাণের জন্য জমি উন্নয়ন করার জন্য দশ বৎসরের মেয়াদে ঋণ পেতে পারে। এই স্কিমের উদ্দেশ্য হোল শহর অঞ্চলে জমির দামে একটা ন্যায্য স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনাকে একটা সুষ্ঠু অবস্থায় নিয়ে আসা। সি-এম-ডি অঞ্চলে তৃতীয় যোজনা পর্যন্ত ২২১·২ একর জমি সরকারী অ্যাকুইজিশনের আওতায় আনা হয়েছে। চতুর্থ যোজনার কাজ একেবারে নামমাত্র।

উপরোক্ত স্কিমগুলি ছাড়া রাজ্য সরকারের গৃহ-নির্মাণ দফতর, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে অন্য স্কিম অনুযায়ী কিছু গৃহ নির্মাণ করেছে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের অধীনে প্রায় ৪৫০ ফ্ল্যাট আছে যা সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিককে ভাড়া দেওয়া হয়।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা বেশ স্পষ্ট সি-এম-ডি অঞ্চলের জন্য সরকারের সুষ্ঠু, সুসংহত কোন নির্দিষ্ট হাউসিং পলিসি নেই, আছে অসংখ্য স্কিমের জটের ভিতর কতকগুলো অ্যাড-হক প্রকল্প। উপরন্তু প্রশাসনিক গাফিলতির জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প অনুযায়ী গৃহ-নির্মাণ কাজ আরম্ভ না করার দরুণ সেই অনুমোদিত অর্থ ফেরত চলে গেছে; কারণ গৃহ-সমস্যার দিনে এইরকম ত্রুটি অমার্জনীয়। যে-প্রকল্পগুলি যতটুকু রূপায়িত হয়েছে সেই-গুলি লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে নীচুতলার আয়ের জনসাধারণ যে-সমস্ত স্কিমে খানিকটা উপকৃত হোতে পারে, সেখানেই প্রকল্প অনুযায়ী কাজ একেবারেই না হওয়া অথবা কম হওয়া—এইরকম নজির বড় বেশী চোখে পড়ে। ধনিকদের গৃহ-নির্মাণ ব্যাপারে শিল্পপতিদের দায়িত্ব কেন থাকবে না তার কোন সদুত্তর আজকাল কেউ দিতে পারবে না। সম্প্রতি এটা একটা চলতি নীতি। সুষ্ঠু সরকারী নীতি, বে-সরকারী মূলধনকে গৃহ-নির্মাণ শিল্পে খানিকটা আইন করে নিয়ে আসা গৃহ-সমস্যার সমাধানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

সি-এম-ডি অঞ্চলে, বিশেষ করে কলিকাতা ও হাওড়ায় জমির অস্বাভাবিক চড়া দর যদি নামিয়ে আনতে হয়, জমি নিয়ে যদি ফাটকাবাজি বন্ধ করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক নীলাম নীতি পরিত্যাগ করা ও কলকাতা অঞ্চলে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে জমিকে মিউনিসিপ্যালিটির আওতায় আনা।

প্রথমে ছিটকিনি খোলার শব্দ, তারপর 'মা যাচ্ছি'—দুটোই আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলাম। বুলা ভেবেছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাকে দেখে অবশ্য তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমার মাথাটা ডান দিকে কাত করা, চোখ দুটো বোজা, ঘুমোলে মানুষ যে রকম নিঃশ্বাস নেয় সে রকমই নিঃশ্বাস নিচ্ছি। সুতরাং বুলার ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

আসলে আমার ঘুম অনেক আগেই ভেঙেছে। কিন্তু যেহেতু ডাক্তারের নির্দেশে আমার হাঁটা-চলা করা বারণ, শুধু শুয়ে থাকাই আমার একমাত্র কাজ, তাই অনেক সময় আমি চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকি। একটা লোক কতক্ষণ ঘুমোতে পারে? আমি যখন সুস্থ ছিলাম তখন আমি

রাত জেগে বই পড়লে ছ-সাত ঘণ্টা ঘুমোতাম। কোনদিন একটু বেশি রাত জেগে বই পড়লে অতটা সময়ও ঘুমোবার জন্য পেতাম না। কিন্তু তাতে আমার কোন অসুবিধে হয় নি। এখন আমার ঘুমোবার অফুরন্ত অবসর। কোন কাজ নেই। কিছু পড়বারও নেই। আমি ইচ্ছে করলে দিনের মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই ঘুমোতে পারি। কিন্তু ঘুমোতে চাইলেই কি ঘুম আসে?

আমি তাই অনেক সময় চোখ বুজে শুয়ে থাকি। আর সাত-পাঁচ ভাবি। ভাবি, আমার অতীত জীবনের কথা, বর্তমানের কথা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। ডাক্তার যদিও আমাকে ভাবনা-চিন্তা করতে বারণ করেছে, বলেছে 'সব-সময় মনটা প্রফুল্ল রাখবেন', তবুও অষ্ট-প্রহর রাশি রাশি ভাবনা আমার মাথায় এসে জড়ো হয়। অলস মনে ভাবনা এসে ভীড় করবেই। মাঝে মাঝে তাই আমি হালকা ধরনের বই পড়ি। কিন্তু বেশিক্ষণ পড়তে পারি না। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে। তখন আমি বই বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকি।

আজ অবশ্য অন্য কথা। আজ সকালে বুলা হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে বসলেই আমার মনে পড়েছে সেই চিঠিটার কথা। দিন দশ-বারো আগে চিঠিটা আমার হাতেই পড়েছিল। আমি যেহেতু বাইরের ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা থাকি সুতরাং কোন চিঠি-পত্র এলে আর এই সেটা সবার আগে নজরে পড়ে। সেদিনও দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে আছি। এমন সময় কিসের ছোঁয়া লাগাতে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। জেগে দেখি আমার বিছানার উপর একটা ইনল্যাণ্ডের চিঠি পড়ে আছে। বুঝলাম পিওন জানলার ফাঁক দিয়ে চিঠিটা ফেলে দিয়ে গেছে।

প্রায়ই এ রকম হয়। পিওনটি খুব ভদ্র এবং সুবিবেচক। সে ভর-দুপুরে গৃহস্থের ঘুম না ভাঙিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে চিঠিটা ফেলে দিয়ে গেছে।

চিঠিটা পেয়ে প্রথমে সেটা কার চিঠি তা বুঝতে একটু দেরি হয়েছিল। বুলার একটা ভালো নাম আছে। সেটা কলেজের খাতা ছাড়া আর কোথাও ব্যবহৃত হয় না। সচরাচর বুলা সেন নামেই তার চিঠিপত্র আসে। তাই চিঠির উপর বুলার সেই অনতি ব্যবহৃত নামটি দেখে আমি একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। তাছাড়া তখন আমার সদ্য ঘুম ভেঙেছিল। আমার চোখে তখনও দুপুরের ঘুমের রেশ জড়ানো। তাই প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর যখন তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল এবং যখন বুঝলাম যে চিঠিটা বুলারই তখনই মনে প্রশ্ন জাগল, চিঠিটা কে লিখেছে? নিশ্চয়ই কোন আত্মীয়-স্বজন বা ওর কোন বান্ধবী। কিন্তু চিঠির উপরে প্রেরকের কোন নাম-ঠিকানা নেই। তাছাড়া বুলার নাম-ঠিকানা যে লিখেছে তার হাতের লেখাও আমার খুব পরিচিত বলে মনে হল না। একবার মনে হল এটা সোনাকাকুর হাতের লেখা। পরে একটু খুঁটিয়ে দেখে মনে হল, না, এ তাঁর হাতের লেখা নয়। তবু সন্দেহ নিরসনের জন্য ইনল্যাণ্ড চিঠির দু-ভাঁজের মধ্যে যতটুকু পড়া যায় তাই পড়বার চেষ্টা করলাম। আর দু-এক লাইন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম এ চিঠি সোনাকাকুর লেখা নয়। এ চিঠি কার লেখা আমি জানি না। কিন্তু এ চিঠি আমার পড়া উচিত নয়। আমি তাই আর সে-চিঠি পড়বার চেষ্টা করি নি।

তবে স্বীকার করতে লজ্জা নেই সেদিন আমার খুব কৌতূহল হয়েছিল। যদিও বুলার যা বয়স তাতে ওর পক্ষে প্রেম করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে এখন রীতিমত সাবালিকা। উচ্চশিক্ষিতা। সুতরাং তার নিজের ভালো-মন্দ বোঝবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু তবুও বুলা, সেই বুলা, যাকে আমি জন্মের পর থেকে কুড়ি বছর ধরে দেখে আসছি, যার নিকার-বোকার ছেড়ে ফ্রক, ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরা পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনাই আমার চোখের সামনে ঘটেছে তার পছন্দটা কি রকম তা জানবার আমার খুব কৌতূহল হয়েছিল। তাকেই বা কার পছন্দ হয়েছে তাও জানবার তীব্র আগ্রহ হচ্ছিল বৈ-কি। ছেলেটি কেমন দেখতে? মোটা-সোটা, ফোলা-ফোলা মুখ, ছোট ছোট চোখ শান্তশিষ্ট কোন তরুণের মতো না ছিপছিপে, কোঁকড়া চুল, চশমার আড়ালে দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ কোন দামাল-ছেলের মতো? বুলা যাকে নির্বাচন করেছে তাকে আমি পাস-মার্ক দিতে পারি কি না সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে না পারায় বড়ো অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

চিঠিটার উপরে পোস্টঅফিসের ছাপ দেখে বুঝলাম সেটা কলকাতার বাইরে থেকে এসেছে। মফস্বলের একটি শহর থেকে। কি করে সেখানে ছেলেটি? চাকরি? না অন্য কিছু? কিছুই তো জানবার উপায় নেই। এমন কি ছেলেটির নামও জানতে পারা গেল না। বুলাকে একথা মুখ ফুটে আমি জিজ্ঞাসাও করতে পারবো না। এমন কি আমি যে তার এই একান্ত গোপন ব্যাপারটাও জেনে গেছি তাও তাকে জানানো চলবে না। কারণ তাহলে বুলা খুব লজ্জা পাবে। আর আমার সম্বন্ধেই বা সে কী ধারণা করবে!

বুলার হাতে চিঠিটা দিতে আমার খুব লজ্জা করল। মাকে ডেকে তার হাতে সেটা দিয়ে বললাম, বুলার চিঠি—

মা চিঠিটা নিয়ে উলটে-পালটে দেখে বলল, কে লিখেছে?

—কে জানে। হয়তো ওর কোন বান্ধবী-টান্ধবী হবে।

মা চিঠি নিয়ে বুলাকে দিতে চলে গেল। মায়ের কাছে সত্য গোপন করাটা অন্যায় হল জানি। কিন্তু উপায় কি? আমার মা-বাবা সেকেলে লোক। তাঁরা বাড়ীর মেয়েদের বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা আদৌ পছন্দ করেন না। আমার কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কোন সহপাঠিনীকে সেইজন্য আমি বাড়ীতে আনতে সাহস পেতাম না। কিন্তু যুগ পালটেছে, কাল পালটেছে। এখনকার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মেলা-মেশাটা যে নিতান্তই স্বাভাবিক এবং অপ্রতিরোধ্য তা মা-বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। অথচ তাঁদের সন্তানেরা বাড়ীতে বহুই অনুগত আর বাধ্য থাকুক না কেন তাদের উপরেও যে এই যুগের প্রভাব পড়ছে তার প্রমাণ বুলার নামে প্রেমপত্র আসে। তার প্রমাণ, আমিও তো এক সময় মঞ্জিরাকে ভালোবেসেছিলাম—

কিন্তু সে কথা থাক। আমার প্রেমোপাখ্যান বর্ণনার জন্য এ কাহিনীর অবতারণা করা হয় নি।

আমি ঠিক করলাম বুলার চিঠির কথা মা-বাবা ছোট ভাই বোনদের কাউকেই জানানো চলবে না। এবং তার একমাত্র উপায় মাকে খুলে না বলা। মা জানলেই বাড়ীর আর কারোরই জানতে বাকি থাকবে না। তাছাড়া বুলাকে প্রশ্নে প্রশ্নে নাজেহাল করে তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে মা এমন একটা দুর্ভোর অবতারণা করবে যা আমার কাছে মোটেই অভিপ্রেত নয়। হয়তো কুড়ি বছরের বুলার চুলের মুঠি ধরে তাকে মারতেও শুরু করতে পারে। বাবা সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলে হয়তো তেমন কোন দুর্ভোর অবতারণা করবেন না। কিন্তু আমার বাবার জন্য আমার খুব মায়া হয়। তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। যখন তিনি উপার্জনক্ষম পুত্রের ভরসায় ছিলেন তখনই আমি অসুখে পড়ি। সুতরাং এই সাত-আটটি প্রাণীর অন্ন যোগাতে, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়াশোনার খরচ যোগাতে এবং অসুস্থ ছেলের চিকিৎসা করাতে তাঁর যে শুধু সদাগরী অফিসের চাকরি করলেই চলে না তা আমি সহজেই অনুমান করতে পারি। অফিসের পর বাবা নিশ্চয়ই কোন পার্ট-টাইম চাকরি বা ঐ জাতীয় কিছু করেন না হলে বাড়ী ফিরতে তাঁর রাত দশটা-সাড়ে দশটা হয় কেন? যখন বাড়ী ফেরেন তখন তাঁর পরিশ্রম-ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না। নিজের অসুস্থতার জন্য নিজেরই উপর রাগ হয়। সুতরাং সেই বাবাকে বুলার খবর দিয়ে আমি আর তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে চাই না। একেবারে চরম যদি কিছু ঘটে তাহলে তখন তো তিনি জানতে পারবেনই। আমি যেচে তাঁর দুশ্চিন্তার

ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক নূতন অধ্যায়

নরনারীর যৌন চরিত্রে রাশি লগ্নের প্রভাব ও যোটক বিচার

জানুন পড়ুন ও বিবাহিত জীবন সুখী করুন।

প্রখ্যাত আবিষ্কারক জ্যোতির্বিদ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর গবেষণালব্ধ অভিনব এই পুস্তক (অষ্টাদশ মহাপুরাণের আলোচনাসহ মুখবন্ধ)। মূল্য—১২ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশক
জ্যোতিষ বার্তালয়
১১২এ, নীলাম্বর মুখার্জী স্ট্রীট
(কাঁকুলিয়াপুকুর), কলিকাতা-৪

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২
রঘুনাথ লাইব্রেরী
১১৫।১এ, বিধান সরণী, কলি-৬

CENTRAL LIBRARY

খোকা বাড়াই কেন? তাছাড়া বুলা নিজেই যদি নিজের পাত্র ঠিক করে নেয় তাহলে বাবাও অন্তত একটি কন্যার দায় থেকে মুক্ত হতে পারবেন। আমি কবে সুস্থ হয়ে চাকরি করতে পারবো তার তো কোন স্থিরতা নেই। অথচ বাবার যা সামান্য আয় তা দিয়ে সংসারের খরচ সামলে বুলার বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং বাবার বিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকলে বুলাকে আজীবন হয়তো কুমারী হয়েই থাকতে হবে। বিবাহ-যোগ্য মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য নেই, অথচ বুলা কোন যুবকের সঙ্গে প্রেম করছে শুনলে বাবা তাও সহ্য করতে পারবেন না। লোক-লজ্জার ভয় আছে তো। আমি তাই বাবাকে বুলার চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও জানাই নি।

আর যার কথা সবচেয়ে বেশি ভেবে আমি ঐ চিঠির কথা কাউকে বলতে পারি নি সে হচ্ছে স্বয়ং বুলা। বুলা যদি জানতে পারে যে আমিই বাবা-মার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছি তাহলে ও আমাকে কী ভাববে? আমার শিক্ষা কালচার রুচি সবকিছুকে তখন সে ঘৃণা করতে শুরু করবে না? একালের কোন আধুনিক শিক্ষিত যুবক এ কাজ করতে পারে? আমার বাবা-মা যে দৃষ্টিতে বুলার এ ব্যাপারটা দেখবেন আমিও কি সেই দৃষ্টিতে দেখবো? আমার মনটা তাঁদের থেকে আরও আধুনিক আরও প্রগতিশীল হওয়া উচিত নয় কি? সুতরাং আমি কী করে বুলাকে বাধা দেবো? তাছাড়া আমি নিজেও তো বাবা-মার ধারণা অনুযায়ী নিষ্কলঙ্ক পবিত্র নই। আমার সঙ্গে সুচিত্রার সম্পর্কটা বাড়ির কেউ না জানুক আমি তো জানি। সেইজন্য আমার বুলার সম্বন্ধে একটা ভয় ছিল। কিন্তু আমার বাবা-মা যে ধরনের ভয় করেন আমার ভয়টা সে ধরনের নয়। আমার ভয়টা একটু অন্যধরনের।

কিন্তু সে ভয়ের কথা এখন থাক। কদিন ধরে আমি দেখতে পাচ্ছি চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে বুলার মধ্যে কেন এক অদ্ভুত ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এখন সে অকারণে একটু বেশি হাসে, মায়ের কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, রেডিওটা খুলে দিয়ে গানের সঙ্গে গলা মেলায়। কখনও বা ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে খুনসুটি করে। অথচ দিন দশ-বারো আগে যখন ঐ চিঠিটা আসে নি তখন প্রায় সর্বদাই ওর মুখটা গম্ভীর হয়ে থাকত। ওই চিঠিটা কে পাঠিয়েছে তার নাম-ধাম আমি জানি না, কিন্তু ওটা যেন পরশমণির কাজ করেছে। ওর স্পর্শে বুলার সমস্ত শরীর-মন গান গেয়ে উঠেছে। শরতের সকালের মতো ওর মুখটা খুশির রোদে ঝিলমিল করছে। তার এতদিনের বিষণ্ণতা সে কাটিয়ে উঠেছে। আমি কী করে ওর মন থেকে আশার অঙ্কুরটি টেনে ছিঁড়ে ফেলবো? ওর দু-চোখে যে আশার প্রদীপ-শিখা জ্বলে উঠেছে তা আমি কী করে এক ফুঁ-য়ে নিভিয়ে দেবো?

আজ সকালে বুলা যখন হারমোনিয়াম নিয়ে হঠাৎ গান গাইতে শুরু করল তখন প্রথমে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজই তো উনিশে জুলাই। আজকেই তো বুলার সঙ্গে সেই অজ্ঞাতপরিচয় ছেলেটির দেখা হওয়ার কথা। বুলার চিঠি থেকে আমি যেটুকু আমার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়েছিলাম তাতে লেখা ছিল আজই সেই ছেলেটির কলকাতায় আসবার কথা। তারিখটা আমার মনে ছিল। আজ তাই অনেকদিন পর বুলাকে হঠাৎ হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে শুনে আমার খুব মজা লাগছিল। কারণ বুলার মনের এই গোপন খুশির কথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি।

আজ সারা সকাল ধরে বুলার গতিবিধি আমি নিঃশব্দে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কাউকে তা বুঝতে দিই নি। বুলা আজ সকালে পর পর অনেকগুলো গান গেয়েছে। তারপর মায়ের ফাই-ফরমাস একটু বেশি আগ্রহ নিয়েই খেটে দিয়েছে। অন্য দিনের থেকে আজ অনেক বেশি সময় নিয়ে চান করেছে। আমি বাইরের ঘরে শুয়ে শুয়ে সব টের পেয়েছি।

অন্যদিন খাওয়ার সময় বুলা প্রায়ই এটা-ওটা ফেলে দেয়। খাওয়ার ব্যাপারে তার সঙ্গে মায়ের প্রায়ই কিছু কিছু কথা কাটাকাটি হয়। এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই মা বুলাকে বলছে, এটা খাবে না ওটা খাবে না এমন রাজরাণীর মতো মুখ করেছ কার ঘরে পড়বে কে জানে। দেখবো তখন এত আব্দার কোথায় থাকে—

বুলা উত্তর দেয়, আমি বিয়েই করবো না—

মা বলে, না বিয়ে করবেন না—ধিঙ্গি হয়ে ঘুরে বেড়াবেন—

আজ কিন্তু বুলার সঙ্গে খাওয়া নিয়ে মায়ের কথা কাটাকাটি বিশেষ হল না। শুধু মাকে একবার বলতে শুনলাম, আর দুটো ভাত দিই—এইটুকু খেয়ে কেউ সারা-দিন থাকতে পারে—

বুলা না-না করে উঠল। কিন্তু তার সেই আপত্তির মধ্যে অন্যদিনের মতো কোন তেজ ছিল না। আজ বুলার কণ্ঠস্বরকে আশ্চর্য স্নিগ্ধ ও নম্র বলে মনে হল।

খাওয়ার পর বুলার ঘুম চাই-ই চাই। এ সময় হাতে একটা সিনেমা-পত্রিকা বা কোন রহস্য উপন্যাস না হলে বুলার চলে না। আর বুলার সংগ্রহ করার শক্তিও প্রচুর। সে এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা কারোর বিয়েতে সদ্য-পাওয়া নতুন নতুন উপন্যাস নিয়ে আসে। তার ফলে আমারও সেগুলো দেখার সুযোগ ঘটত। আজ কিন্তু বুলা পত্রিকা পড়ে সময় নষ্ট করল না। আজ তার তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া দরকার।

দুপুরে আমার একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। তাও কয়েক মিনিটের জন্য। তারপর শুয়েছিলাম ঘুমের ভান করে। কিন্তু আসলে ঘুমোচ্ছিলাম না। চুপচাপ শুয়েছিলাম। আর চোখ বুজে সাত-পাঁচ ভাবছিলাম।

এর মধ্যে বুলা কখন উঠেছে, সাজ-গোজ করেছে আমি কিছুই জানতে পারি নি।

হঠাৎ নাকে একটা সুগন্ধ যেতেই এবং গুন-গুন গান শুনতেই আমি বুঝতে পারলাম বুলা এখন বেরুচ্ছে।

ও-ঘর থেকে মা জিজ্ঞাসা করল, কটায় ফিরবি?

বুলা গলা নামিয়ে উত্তর দিল, সন্ধ্যের মধ্যে ফিরব।

মা বলল, ছবিদের বাড়িতে এতক্ষণ থাকার কি দরকার?

—কি করব। ও যে ছাড়তে চায় না।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম বুলা কী অসংকোচে মিথ্যে কথা বলছে। ছবিদের বাড়িতে আজ হয়তো ও যাবে না কিম্বা গেলেও কয়েক মিনিটের জন্য মায়ের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য যাবে। কিন্তু এমনভাবে বলছে যেন ছবির পীড়াপীড়ির জন্যই ও নিতান্ত অনিচ্ছায় যাচ্ছে।

মা আবার শুধোল, সিনেমায় যাবি নাকি?

বুলা জুতো পরতে পরতে উত্তর দিল, [illegible] ছবি যদি টিকিট কেটে রাখে তাহলে যেতেই হবে।

—তাহলে তো ফিরতে অনেক রাত হবে।

বুলা এ কথার কোন উত্তর দিল না। ও যখন পিছন ফিরে জুতো পরছিল তখন আমি একবার ওর সাজ-সজ্জা দেখে নিয়েছি। আজ বুলা চমৎকার সেজেছে। গত বছর পুজোর সময় আমি ওকে যে বেগুনি রঙের সিল্কের শাড়ীটা দিয়েছিলাম সেটাই পরেছে। তার সঙ্গে মানিয়ে পরেছে একই রঙের সিল্কের ব্লাউজ। বুলার গায়ের ধপধপে ফর্সা রঙের সঙ্গে বেগুনি রঙটা দারুণ খুলেছে। পিঠের ওপর দিয়ে লম্বা করে বেণীটা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

তারপরেই ছিটকিনি খোলার খুট করে শব্দ এবং 'মা যাচ্ছি।'

আমি বুলার উদ্দেশে মনে মনে বললাম, তোর যাত্রা শুভ হোক। তুই যে আশা নিয়ে যাচ্ছিস তোর সে আশা যেন পূরণ হয়। আমার হয়নি, তোর যেন হয়।

মা এসে দরজায় ছিট্‌কিনি আটকে দিয়ে গেল। আমি শুয়ে শুয়ে তাও লক্ষ্য করলাম।

বিকেলে মা যখন আমাকে চা-খাবার দিয়ে গেল তখন যেন আমাকে জানাবার জন্যই বলল, বুলা ছবিদের বাড়িতে গেছে।

আমি অজ্ঞতার ভান করে বললাম, তাই নাকি। কখন ফিরবে?

—কি জানি। আমায় তো বলে গেল সন্ধ্যে হবে।

আমার মাকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আজ বুলার জীবনে কত বড় একটা দিন তা তুমি জানো না মা। আজ যদি বুলার ফিরতে দু-এক ঘন্টা দেরি হয় তুমি তাকে কিছু বোলো না।

মা চলে যেতেই আমার রুচিরার সঙ্গে কলেজের বাইরে গোপনে প্রথম দিন সাক্ষাৎ করার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। সেদিন রুচিরা আমার জন্য কলেজের সামনে বিকেল পাঁচটায় সময় অপেক্ষা করবে কথা দিয়েছিল। আমি যতই নির্দিষ্ট জায়গার দিকে এগোচ্ছিলাম ততই ভয় উদ্বেগ আশঙ্কা আনন্দ এইসব কিছু মিলে আমার একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থা হয়েছিল। কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে আমার পা যেন চলতে চাইছিল না। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল রুচিরা হয়তো আসে নি। হয়তো ও আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাটা ভুলেই গেছে। কিন্তু কলেজের সামনের ফুটপাথ ধরে কিছুটা এগুতেই আমি দূর থেকে রুচিরাকে দেখতে পেয়েছিলাম। বুকের উপর দুখানা হাত আড়া-আড়িভাবে রেখে ও সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। সেদিন আমার সমস্ত আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণিত করে রুচিরা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। নিজেকে সেদিন অশেষ সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়েছিল।

তারপর রুচিরার সঙ্গে কতদিন গোপনে দেখা করেছি, এক সঙ্গে পার্কে বা রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিয়েছি, সিনেমা দেখেছি, কিন্তু প্রথম দিন ওর সঙ্গে গোপনে দেখা করার সময় আশঙ্কা উদ্বেগ নিষিদ্ধ আনন্দ এই সবকিছু মিলে যে অদ্ভুত একটা মানসিক অবস্থা হয়েছিল তা আর কখনও হয় নি।

সেই রুচিরা এখন মিলিটারী অফিসারের ঘরণী হয়ে পরম সুখে আছে। শুনেছি কাশ্মীরে থাকে। আমার মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে, রুচিরার কি সেই সব পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে?

কিন্তু রুচিরার কথা এখন থাক...

বুলা যখন ফিরল তখন আটটা বেজে গেছে। বাবা তখনও ট্যুইশনি সেরে ফেরেন নি। আমার ঠিক পরের ভাই রোজ সন্ধ্যে-বেলা ওদের স্কুলের মাস্টারমশাইর কাছে পড়তে যায়। সাড়ে সাতটার মধ্যে সে ফিরে আসে। আজও ও পড়ে ফিরে এসেছে। আমার এক দূরসম্পর্কের পিসীমা এবং পিসেমশাই আমার অসুখের খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছিলেন। পিসীমা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বুলা কোথায়? মা বলেছিল, ওর এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে। আমি লক্ষ্য করেছিলাম মায়ের উত্তর শুনে ওঁরা একটু অবাকই হয়েছিলেন। এত বড় মেয়ে সন্ধ্যের পরও বাড়ির বাইরে একা থাকে এটা ওঁদের পছন্দ নয়। আমার পিসীমা আবার একটু গোঁড়া ধরনের। আমি মনে মনে এই ভেবে মজা পাচ্ছিলাম যে বুলা প্রকৃতই কোথায় গেছে তা যদি ওঁরা জানতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই শিউরে উঠবেন।

অবশ্য বুলার জন্য আমারও যে কিছুটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না তা নয়। আটটা বাজতেই দরজার কড়া যখন নড়ে উঠল তখনই আমি বুঝেছিলাম যে বুলা এসেছে। মা দরজা খুলে দিতেই বুলা যখন ঘরে ঢুকল তখন ওর মুখটা আমার খুব ফ্যাকাশে বলে মনে হল। ওর রক্তশূন্য পান্ডুর মুখটা দেখে আমার কিরকম একটা সন্দেহ হল। তারপর ভাবলাম হয়তো অনেক ঘোরাঘুরি করেছে বলেই অত ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

লক্ষ্য করলাম বুলা আমার দিকে একবারও তাকাল না। আমার দৃষ্টি থেকে নিজের মুখটা আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করল। তারপর ভিতরের ঘরে ঢুকে গেল।

মাকে একবার বলতে শুনলাম, এত রাত হল যে। বুলা তার উত্তরে কী বলল আমি শুনতে পেলাম না।

তখন রাত কটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে এগারোটা সাড়ে এগারোটার কম হবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘরটা অন্ধকার ছিল। হঠাৎ আমি ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ শুনতে পেলাম। প্রথমে চমকে উঠলাম। তারপর মনে যে প্রশ্নের উদয় হল তা হল, এত রাতে আমার ঘরে কে কাঁদছে? আর তখনই হঠাৎ আমার মনে হল, বুলা কাঁদছে। অন্ধকারে যদিও কিছু দেখা যায় না তবুও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আমার শিয়রের কাছে যেখানে পড়ার টেবিলটা আছে বুলা সেখানে বসে কাঁদছে।

বুলার কান্না শুনে ওর ফ্যাকাশে মুখটা দেখে আমার যে সন্দেহটা দানা বেঁধেছিল সেটাই সঠিক বলে আমার মনে হল। আমার মন বলে উঠল, বুলা প্রতারিত হয়েছে। ও ঠকেছে। কেন যে একথা আমার মনে হল তা আমি বলতে পারবো না। যে ছেলেটি বুলাকে চিঠি লিখেছিল তার সঙ্গে ওর আদপেই দেখা হয়েছে কিনা আমি জানি না। ওদের দুজনের মধ্যে কী কথা হয়েছে তাও আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মন বারবার বলতে লাগল বুলা নিশ্চয়ই ঠকেছে। আর কেন যেন আমার মনে হল এছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। কারণ বুলা আমারই বোন তো। আমরা একই ভাগ্য নিয়ে মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাকেও তো রুচিরা নামে সেই মেয়েটি ফাঁকি দিয়েছিল। আমি প্রতারিত হয়েছিলাম। বুলা আমারই বোন। ওর ভাগ্য অন্যরকম হবে কী করে?

মা রান্নাঘর থেকে ডাকল, বুলা, খাবি আয়।

বুলা বলল, আমি খাবো না। আমার বড় মাথাব্যথা করছে।

বুলার কষ্ট আমি বুঝতে পারি। এ এমন এক ধরনের কষ্ট যার ভাগ কাউকে দেওয়া যায় না। গোপন করে রাখতে হয়। অথচ এ দুঃখ মনে মনে লালন করেও এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যায়। আমিও তো রুচিরার কথা আজও ভুলতে পারি নি। আজও তো তার কথা ভেবে কোন কোন গোধূলিবেলায় আমারও মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। তাহলে বুলার আর দোষ কি।

মা আবার বলল, মাথা ধরলে শুয়ে পড়গে। ও-ঘরে বসে আছিস কেন?

বুলা সংক্ষেপে বলল, যাচ্ছি।

আমি জানি বুলা আরও কিছুক্ষণ এ ঘরে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার চোখের জল নিঃশেষিত না হয় ততক্ষণ সে কাঁদবে। এ বাড়িতে আর একখানা ঘর নেই যেখানে বসে সে নিঃশব্দে কাঁদতে পারে। ভাই-বোনেরা যদি তাকে কাঁদতে দেখে তাহলে সে খুব লজ্জায় পড়ে যাবে। মা-বাবার চোখে ধরা পড়ে গেলে সে কী কৈফিয়ৎ দেবে? সুতরাং এই ঘরটা তার সব থেকে নিরাপদ আশ্রয়। বুলা নিশ্চয়ই ভেবেছে, দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সে তার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে না।

মনে মনে বললাম, বোকা মেয়ে। তোর কেমন গোপন কথা আমার জানতে বাকি নেই। কিন্তু পাছে তুই লজ্জা পাস তাই তোকে আমি প্রকাশ্যে কোন সহানুভূতি জানাতে পারছি না। কিন্তু তোর জন্য আমার হৃদয়ে ভালোবাসা সহানুভূতি সমবেদনা সব জড়ো করে রেখেছি। কারণ আমি তো জানি ভালোবেসে প্রতারিত হবার দুঃখ কি অসীম।

বুলা আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আহা, বুলা কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে ও ওর মনের ভার হালকা করুক। ততক্ষণ যেন এ ঘরে কেউ না আসে। কেউ না।

আমি অন্ধকার আগলে আমার দুঃখী বোনকে পাহারা দেব।

সুখের মেলা

নন্দর কাহিনী

হাতে লাঠি। মাথায় যাতো হাত গোলাপী রঙের একটা শাড়ির পরুড়। জরির আঁচলটা উষ্ণীষের মতন করে ঊর্ধ্বগামী করা। টিকোলো লম্বা নাক। কালো মোচার মতন একজোড়া গোঁফ। ফর্সা সাদা এলো গা। পরণে কালো চওড়া পাড় দামী ধুতি। বয়স বছর আটাশ হবে। বিরাট একটা কাপড়ের পোঁটলা গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে লোকটা সবুজ ঘাসের ঢাল জমি দিয়ে গান গাইতে-গাইতে নেমে এলো দীঘির পাড় পেরিয়ে একেবারে নিচে—বিস্তীর্ণ জলের কাছে। যেখানে হিস-হিস শব্দ তুলে দুটি যুবতী মেয়ে কাপড় কাচছিল এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরিয়ে হাতের ভাঁজ-করা কাপড় ফেলছিল তারা পটাস-পটাস শব্দ করে—ক্রমাগত একটানা ছন্দ মাপা তালে। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল নারকেল গাছ সমান উঁচু পাড়-ঘেরা দীঘির সীমানার মধ্যে। বট গাছের ডালপালার ঝোপের মধ্যে পাকা ফল খাবার জন্যে এসে জুটেছে কাক-কোকিল-শালিক। মাছধরা চারকাঠির মাথায় বসে আছে একাগ্রমন শিকার সন্ধানী একটা লাল ঠোঁট সবুজ-নীল মাছরাঙা।

লোকটা এসে লাঠি ধরে দাঁড়াল মেয়ে দুটির ঠিক সামনে।

মেয়ে দুটি হাসল। একজন ফর্সা আর একজন কালো।

লোকটা বললে, 'এই আমার গাধা! এর নাম শালা! যে কেউ শালা বলে ডাকতে পারে, আমার আপত্তি নেই।'

'আর তোমার নামটা বুঝি বোনাই?' পাটায় কাপড় ফেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে মুখটা লাল হয়ে-যাওয়া ফর্সা যুবতী মেয়েটি বুকের কাপড় সামলাতে-সামলাতে শুধোলে অন্য মেয়েটির দিকে কটাক্ষ হেনে।

নাটকীয় কায়দায় দাঁড়ায় লোকটা। তারপর ব্যঙ্গস্বরে বলে, গেছানু শালা কলকাত্তায়। হাঁ, ইয়া বড় শহর। শহর তো নয় যেন নগর। অনেক নাগর আছে সিথা! তা যে এক বড় বাড়িতে শালা ঠাকুদ্দা বুড়হা নিগ্যালো মোকে। একটা সাহেব-পানা ছোঁড়া মোর গোঁফ দুটো হাত দিয়ে দেখে চোখ মেরে চলে গেল? আরে বাপ, শালা হাঁকরে!'

মেয়ে দুটো হি-হি করে হেসে উঠে গাধাঅলাটার গায়ে জল ছিটিয়ে দিলে।

'হাঁ মাইরি! বিশ্বাস কর তুই পরী! পরীর পানা একটা জোয়ানী মেয়ে এসে কাপড় ফেলে দিয়ে বললে, ও বাবা! এ কে! ও পেসাদ বুড়ো? নাতি? তা এত বড় করে গোঁফ কেন? শালা আশ্চায্যি, মেয়েটো পর্যন্তও আঙুলের মাথায় দাঁইড়ে আমার মতন লম্বা হয়ে গোঁফে পাক দিয়ে দিলে!'

হি-হি...হি-হি পাতিহাঁসের মতন জলে যেন কোলাহল তুললে পরী আর মন্দাকিনী।

'তারপর এলো বাড়ির বউরাণী! কি দুধে-আলতা গোলা চেহারা মাইরি! চোখ দুটো ঝিলিক-ঝিলিক। এই তার শাড়ি। মাথায় পরে আছি। শালা কি বাস। যেন চাঁপা ফুলের গন্ধ মাইরি!'

পরী বললে, 'তোমার সঙ্গে কথা বললে না বউটা?'

'হাঁ। বললে, কি নাম?'

"আজ্ঞে, নন্দচন্দ দাস।"

'আজ্ঞে, জিব শালা মোর ঘোরে না। 'ন্যাকাপড়া' জানি না। বউটা খইয়ের মতন সাদা দাঁত মেলে চোখ দিয়ে হাসতে লাগল। শুধোলে, 'বিয়ে করেছ ?'

'আজ্ঞে, বয়েস পার হয়ে গেছে, তাই কেউ মেয়ে দেয় না।'

'কত তোমার 'বয়েস' গো ? বছর পঞ্চাশ হবে ?'

'কি জানি। ঐ বুড়ো জানে।'

'নিজের বয়স, অন্যে জানবে কেন ?'

'আজ্ঞে ও অন্য লোক নয়, আমার বাবার বাবা। আমাদের কত্তা। আমার ছেড়ে আমার বাবার জন্মের খবর, সাল, তারিখ সব জানে। ও শালা বুড়োই সব হিসেব রাখার মালিক।'

'বউটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বোধহয় বুঝলে আমি যতখানি বোকা ঠাউরে ছিল, ঠিক ততখানিটা নই। বুড়ো বলে বসল, শালার মাথার ছিট আছে। কার কাপড় কারে দিয়ে দেয়। ভাল মতন মেয়ে দেখলে ভাল দেখে শাড়ি দিয়ে দেয়।'

আমি বললুম 'আরে বেস শালা বুড়ো! মুই কি লেখাপড়া জানি যে নাম নম্বর পড়তে পারব ?' মাইরি, শহর এক আজব জায়গা। যে দিদিমণি আমার গোঁফে পাক দিয়ে দিয়েছিল, তার কোটের পকেটে মাইরি একটা পত্তর পেয়েছি। একেবারে নির্জলা প্রেমপত্তর।'

নন্দ বসে পড়ল পা মেলে। গাধাটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, 'আরে শালা, শ্বশুরের হাওয়াল, বোঝাটা ফেলে এট্টু ঘুরে বেড়িয়ে, ঘাস খেয়ে এসো না ধন। যাও, ভগমান তোমার ভাল করবে। মনের মতন বউ পাবে। গাঁক-গাঁক করে চেল্লাও বেয়ে খানিকক্ষণ।'

গাধাটা সত্যিই বোঝাটা ফেলে দিলে। তারপর গুটি-গুটি এগুতে থাকলে নন্দ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার লেজের বালামচি ধরতে যেতেই হুক্‌কা হুক্‌কা স্বর তুলে মারলে দৌড়।

নন্দ গাল চিবুচ্ছিল। ঠোঁট দুটো লাল হয়ে গেছে। বললে, 'শালা গাধাটা একদিন কাপড়ের বোঝা নিয়ে পড়ল জলের মধ্যে। বোঝা ভারী হয়েযেতে আর চাগাতে পারে না। মার ডাণ্ডা, তারপর কোঁতাতে-কোঁতাতে শালা বোঝাটা বয়ে নিয়ে এলো। সেই থেকে ও-সুমুন্দি জলের ধারে যাবে না।'

নন্দ একটা নীল খাম বার করে পড়তে লাগল : 'পার্বতিন, আমার ছোট্ট মিষ্টি একটা কীস নিয়ো। 'তোমার নার্গিস চোখ বুলবুলের বাসা পুড়িয়ে দিয়েছে।' কবে দেখা হবে সেই প্রতীক্ষায় আছি। তোমার দিদির বর আমাকে সেদিন চোখ মেরেছে। আমাকে ফোন করতে বারণ করেছে। আমার সঙ্গে বিয়েতে তোমার আপত্তি নেই বলেছ। অথচ আবার দেখা হবে কিনা শুধোতে ফোনে তুমি বললে 'কি জানি!' দেখো পার্বতিন, এই অনিশ্চয়তা শাহ্‌সাহেবের অচলার মধ্যেও ছিল তাই সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তোমার স্থির নিশ্চয় হওয়া দরকার। জানি তুমি সোসাইটি গার্ল। অনেক তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে। সবাইকে কি তুমি কথা দিয়েছ ? তাহলে তারী মজা তো ? ইতি, তোমার প্রবীর।'

পরী আর মন্দার চোখে জিজ্ঞাসা।

নন্দ চিঠিটা মুচড়ে-মুমড়ে দীঘির জলে ফেলে দিলে। বললে, 'এই ওদের জীবন। ইন্দ্রজালের মধ্যে পড়া সোনার হরিণী! লে-লে তোরা কাপড় কাচ। গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক করে নে। আমি বলে শালা পাগল। মাথায় এট্টু ছিট আছে, আবার বিয়ে করি নি!'

মেয়ে দুটো খিল-খিল করে হাসে।

মন্দা বলে, 'পরীকে তুমি বিয়ে করো না, ওর সঙ্গে তোমার এত 'আসনাই'।'

নন্দ বলে ফেললে পরীর ভাতার হতে পারে একমাত্র আমার ঐ প্রিয় অন্চের 'শালা' নামক গাধাটা!'

মন্দা জিব কেটে বললে 'এ-মা-গো!'

পরীর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল হঠাৎ। বললে, 'হারামীর শালা কথা বলবি না নন্দ! তোর আর তোর বুড়ো ঠাকুদ্দার আর তোদ গাধার ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব ডান্ডা মেরে! আমার বাপ যদি বাসগাড়ি থেকে পড়ে ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে না যেত তাহলে কি তোদের কাপড় কাচতে আসতুম! পাঁচটা ভাইবোন, তাদের পেট চলে না। মা ধায় আর একজনের ভাঁটিতে কাপড় সেদ্ধ করতে। আমাদের ভাঙা কপাল বলে ঠাট্টা করতে পারলি তুই।' কাঁদতে লাগল পরী।

নন্দ অনুশোচনায় হাঁ করে রইল তার দিকে তাকিয়ে। আকাশে সাদা মেঘের চাঁই ভেসে চলেছে। গাধাটা দীঘির পাড়ের মাথায় আকাশের পটে আঁকা ছবির মতন দাঁড়িয়ে তারস্বরে চীৎকার করছে: হুক্‌কা হুক্‌কা... কাহো কাহো...

নন্দ হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, 'এই পরী, শালা তুই কাঁদবি না মোটে—আমি সইতে পারি না। একটা কথা শালা গাধার মতন বলে ফেলেছি। কানে প্যাক খাচ্ছি।'

জলে নেমে গিয়ে পরীর হাত ধরে চোখের জল মুছে দিতে গেল নন্দ।

পরী তাকে ঠেলে দিলে। গোঁফ ধরে একটা টান মেরে ঝাঁকিয়ে উঠল। দূর হও। তোমার জর্দানিতে বেরে 'প্যানসিল' ধরে শহরের সুন্দরী মেয়েদের শাড়িতে নম্বর দাও গে যাও!'

'ওরে বাস! কেউটে যে! তোর পায়ে ধরছি। আমিই না হয় তোর গাধা হচ্ছি।'

মন্দা বললে, 'এই—বুড়ো আসছে।'

সত্যি! সাদা মাথা, সাদা গোঁফ কালো কুচকুচে, লাল গামছা কোমরে বাঁধা নন্দর বুড়ো প্রসাদ দাস আসছে গুটি গুটি।

জলে নেমে গিয়ে কাপড় কাচতে শুরু করে দিল নন্দচন্দ্র দাসও। হিস হিস হিস।

বুড়ো বললে, 'নন্দ কখানা কাপড় কেচেছে?'

নন্দ বললে, 'ঐ তো—এতগুলো।'

পরী বললে, 'ও আমার কাপড়!'

মন্দা বললে, 'আমার কাপড়ের সঙ্গে কেচেছে সাতখানা বোধ হয় হবে ঠাকুদ্দা!'

'শালার মাথায় বাড়ি মারব। তোর চারটে থেকে লোক উঠে কাপড় কাচছে। লম্বা লম্বা কথা। শালা লাশতে বসলেই যত ছোঁড়ারা আসবে। তোর বাপটা লেখাপড়া শিখে অমনি বিগড়ে গেল। জাত ব্যবসায় ঘেন্না ধরল। বলত পরে পরনের কাপড় কাচব না। কারখানায় গেল কাজ করতে। কিসে কি হল, গুন্ডারা মেরে দিলে! বুড়ো বয়েসে পুত্তুর শোক, তুই শালা বোকা কি বুঝবি। বলি শালা বে' কর না হয় ঐ পরীকে। বলে, ভদ্দরলোক কক্ষনো বে' করে না! ওঃ! শালা ভদ্দরলোক! মাস্টারদের অপমান করেছে বলে সেক্রেটারীকে মেরে ইস্কুলটাও ছেড়ে গেল। ঘাটেও না, ঘরেও না শালা, ষাঁড়ের গোবর! সব এই পঁচাশী বছরের বুড়োর ঘাড়ে। এখন চলবে কি করে?'

পরী বলে, 'রজকের ঘর পুড়লেই বড়লোক। তোমারও তো ঘর পুড়ে গেল দাদু!' হি হি করে হাসতে লাগল পরী। বললে, 'সেই কাপড় চোপড় বেচে এক বিঘে জমি কিনলে, দু কামরা ঘর করলে, পানবিড়ির দোকান খুললে! অনেক টাকার গরম কাপড় মেরে দিলে! শলিহারী সাধুলোক বাবা তোমরা!'

বুড়ো খেঁকিয়ে ওঠে, 'ঘর পোড়ে নি বলছিস তুই ছুঁড়ি?'

'সে তো রান্নাঘর! সুতোর কটা কাপড় নাহয় পুড়েছিল। কলকাতা শহরের বড়লোকদের সিল্ক, তসর, গরদ, মটকা, পশমের দামী দামী কাপড়গুলো?'

নন্দ বললে, 'বেশ করেছে দাদু! বড়লোকদেরই কাপড়! তার বদলি দাদু ঢের পায়ে ধরে এসেছে। ব্যাস, খেল খতম। তারা যে আমার বাপকে গুন্ডায় মেরে ফেললে তার বেলা?'

পরী হঠাৎ বলে বসল, 'তাহলে ভালটা কে?'

'এ্যা!' নন্দ হাঁ করে পরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'বলি ভালটা কে তাহলে?' পরী চোখ ট্যারা করে তাকিয়ে রইল এমন মনোরম অথচ নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে যে নন্দ কোনো উত্তর করতেই পারলে না।

বুড়ো কাচা কাপড়গুলো মেলে দিতে গেলে মন্দা তাকে সাহায্য করতে উঠে গেল।

তারা দুজনে লাল-নীল-হলদে-সবুজ নানান রঙের শাড়ির প্রান্ত ধরে রোদ্দুর-ঝলমল-করা ঘাসের ওপরে বিছিয়ে দিতে লাগল।

নন্দ বললে, 'ভাল তুই, পরী! তোর পিদিম পিদিম দুটো চোখ। তুই আমাকে বিয়ে করবি?'

'আবার?'

'কেন আমার চাইতেও গাধা কি তুই পাবি আর?'

'দাদু, নন্দ বাজে কথা বলছে!'

'ও শালা আবার কাজের কথা বলে কবে দিদি?'

'এই!'

'কি?'

'বিয়ে করবি?'

'ঘরপোড়াদের গুন্ডো ছেলেকে আমি বিয়ে করি না। তোমাকে বিয়ে করলে তাড়াতাড়ি বিধবা হতে হবে। তোমার বাপের আক্রোশ জ্বলছে তোমার ভেতরে। তুমি খুন জখম করে জেলে যাবে অথবা মরবে।

'পরী!' চীৎকার করে উঠল নন্দ।

পরী ধারালো চোখে হাসতে লাগল মিটিমিটি।

তার গালটা টিপে দিলে নন্দ। চুমো খাবার ভঙ্গি করলে। তারপর হঠাৎ উঠে হনহন করে চলে গেল পাড় ঘাস দুরে পথ পার হয়ে। পরী ভাবে, রজকের ছেলে, তোমার মনে সুখ নেই, একটা হিংস্র কেউটে খেলা করছে সারাক্ষণ তোমার ভেতরে।

পরদিন সকালে পরী সকালে কাপড় কাচতে এসে যখন শুনলে নন্দ মারামারি করতে গিয়ে মারা গেছে আগের দিন। শুনে সে 'হায়রে কপাল!' বলে বসে পড়ল তারপর হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

প্রসাদ বুড়ো দীঘির পাড়ে এসে পরীর কান্না দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। কাল বিকেল থেকে নন্দ বেরিয়েছে কোথায় কে জানে! তার বন্ধু-বান্ধব ছোঁড়ারাও কেউ নেই।

'কি হয়েছে পরী! কাঁদিস কেন? তোর বাপটা কি মরে গেছে?

'নন্দ নেই গো দাদু! সে পিস্তলের গুলীতে খুন হয়ে মারা গেছে—যে তার বাপকে খুন করেছিল তাকেও নিকেশ করে গেছে!'...

প্রসাদ দাস বসে পড়ল। তার কোটরে ঢোকা চোখ দুটো ঘুরতে লাগল। মাথা কুটতে লাগল। টলতে টলতে বাড়িতে ফিরে এসে কেরোসিন ঢেলে নিজের ঘরদোর আগুন ধরিয়ে দিলে সে। লোকজন ছুটে এসে জল ঢেলে আগুন নেভাতে গেলে ডান্ডা নিয়ে সে তেড়ে গেল,—'কোনো শালা আগুন নেভাবি না! মাথা ফাটিয়ে দোব!'

পরী তখনো দীঘির জলে আকাশের কালো মেঘের টুকরো ভেসে যাওয়া দেখছিল নরম ঘাসের ওপরে পা ছড়িয়ে বসে। মন্দা আসেনি। আর আসবেও না। দীঘির পাড়ের সব স্মৃতি মুছে যাবে। ঠিকই সে আঁচ করেছিল। নন্দ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেত। দুর্বোধ্য কিসব বকতো। শুধু নন্দর গাধাটা এখন ঘুরে বেড়াবে স্বাধীনভাবে নন্দর পরিতৃপ্ত দুর্দান্ত আত্মার মতন।

—আবদুল জব্বার

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪১)

সোনা বিকেলের দিকেই দেখল এই বাড়ি মানুষজনে গিজগিজ করছে। ঘোড়ায় চড়ে এল তারিণী সেন, তিনি ঘোড়ায় চড়ে ফের নেমেও গেলেন। ব্রাহ্মণদী থেকে রায়-মশাইরা খবর পেয়ে বের হয়ে পড়েছেন। গোপালদি থেকে এসেছে অর্জুন সাহা, তার বৌ মা সবাই। লতাব্দি থেকে এসেছেন অম্বিকা রায়। এসেছেন হাজি সাহেব, তার দুই ছেলে। আবেদালি, হাসিমের বাপ মনজুর, সবাই এসেছে। ওরা বৈঠকখানা ঘরে বসে রয়েছে। মনজুর আম গাছ কেটে কাঠ করার দায়িত্ব নিয়েছে। যেখানে যা কিছু খবর এখন, সে শুধু এক খবর, বুড়ো কর্তার মহাপ্রয়াণ হচ্ছে। শতবর্ষ পার করে মানুষটা আর একদিনও সবুজ বনে মুক্ত বৃক্ষ হয়ে বাঁচলেন না।

সারাদিন ধরেই এ-ভাবে মানুষজন আসছে যাচ্ছে। ছোট কাকা শিয়রে বসে গীতা পাঠ করছেন। রায়মশাই পিঁড়িতে বসে মহাভারত থেকে বিরাট পর্ব পড়ে শোনাচ্ছে। ঠাকুমা পায়ের কাছে সারাদিন বসে আছে। জ্যাঠামশাইকে ধরে এনে পাশে বসিয়ে দিয়েছে জ্যাঠিমা। মুখের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে ডেকেছে, বাবা, বাবা।

তখন যেন এই মানুষ কত দূরে চলে যেতে যেতে কার ডাক শুনে চোখ মেলে একটু তাকাচ্ছেন, তারপরই চোখ বুজে আবার কোন দূরাগত মায়ার সন্ধানে বের হয়ে পড়েছেন। জ্যাঠিমা বলছেন, বাবা, বাবা, আপনার বড় ছেলে। বলে জ্যাঠিমা শীর্ণ হাতখানা তুলে, পাগল মানুষের মাথায় ধরে রাখছে। বাবা, বাবা, আপনি আশীর্বাদ করুন আপনার পাগল ছেলেকে। তাঁকে বলুন, তুই আর কোথাও যাবি না। ওকে আপনি বলে যান সে কি করবে।

সোনা দেখেছিল তখন ঠাকুর্দার চোখে জল। দু চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। জ্যাঠিমা খুব ধীরে ধীরে সেই জল মুছিয়ে দেবার সময় ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। সবারই চোখ ছলছল করছে। ছোট কাকা বোধ হয় দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি কিছুক্ষণের জন্য গীতা পাঠ বন্ধ রেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। বুঝি এ-সময় ঠাকুর্দার পাশে জ্যাঠামশাইর এই চেহারা সহ্য করা যায় না। বুক ফেটে কান্না উঠে আসে।

জ্যাঠিমা বললেন, আপনি, ওকে কিন্তু চোখে চোখে রাখবেন সব সময়।

সোনার কেমন অস্বস্তি লাগছিল। বুকের ভিতর ওরও একটা কষ্ট হচ্ছে। যা সে ঠিক এখন ছুঁতে পারছে না। ঠাকুর্দা মরে গিয়ে স্বর্গ থেকে সবসময় চোখে চোখে রাখবেন। জ্যাঠিমা কাঁদছেন। সোনার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। আর ভয় কি। এখন থেকে সবসময় একজন পাহারাদার পাওয়া গেল। তিনি সব লক্ষ্য রাখবেন। তবে আর কান্নার কি আছে! তবু কেন জানি কান্না পায়। সোনারও কান্না পাচ্ছিল। এতক্ষণ যে বুকের ভিতর অস্বস্তি, এই কান্নার জন্য। ঠাকুরদা মরে যাবে। এটা ভাবতেই এখন ওর কান্না পাচ্ছে। অর্জুনগাছের নিচে ঠাকুরদাকে পোড়ানো হবে, বাবা জ্যাঠামশাই মন্দির বানিয়ে দেবেন। সোনা বিকেলে মন্দিরের চাতালে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে বসে থাকবে। বর্ষাকাল এলে চাতালের পাশে জল উঠে আসবে। জলের নিচে রূপালি রঙের পুঁটিমাছ। সে এবং জ্যাঠামশাই ছিপ ফেলে পুঁটিমাছ ধরবে।

সে নিজে এ-ভাবে জ্যাঠামশাইকে কোন না কোন কাজের ভিতর নিযুক্ত করে রাখবে। কোথাও যেতে দেবে না। কোন কাজের ভিতর এই যেমন মাছধরা, ফলের দিনে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ফল-পাকুড় পেড়ে আনা, ফসলের দিনে ঈশমদাদার পাশে বসে জমি পাহারা দেওয়া বিদ্যালয়ে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং কোন গাছের নিচে বসিয়ে রেখে ক্লাশ সেরে আসা, ফেরার পথে কোঁচড়ে জাম-জামরুল, অথবা চিনাবাদাম, চৈমোসে দু পকেট ভিরাই, দুজনে পথে পথে খেতে খেতে আসা—এমন একটা ছবি ওর চোখের উপর ভেসে উঠল। ঠাকুরদার কানের কাছে এ-সব বলে দেবার ইচ্ছা তার। ঠাকুরদা কেন কাঁদেন আপনি। আমি ত আছি। সারাজীবন জ্যাঠামশাইর সঙ্গে সঙ্গে আমি থাকব। তাঁকে ফেলে কোথাও যাব না।

কিন্তু এত মানুষজন ঘরের ভিতর, ওরা আসছে যাচ্ছে, দেখে উঠোনে নেমে যাচ্ছে, ঠাকুরদার সততা সম্পর্কে ওরা কথাবার্তা বলছে, এমন মানুষ হয় না, কথিত আছে রাম রাজত্ব করেন, সীতা বনবাসে যান—প্রায় যেন এ-সংসারে তেমন চিত্র, এক পাগল মানুষ নিশিদিন হাটে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, এক সীতার মতো সাধ্বী নারী জানালায় দাঁড়িয়ে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করে অথবা সংসারের কাজকর্মে ডুবে থাকে সে।

সোনা ঠাকুরদার কানের কাছে গিয়ে বলতে পারল না, আমি সোনা কথা বলছি, আপনার ছোট নাতি। জ্যাঠামশাইকে আমি দেইখা রাখুম। আপনে কাঁদছেন কেন? কিন্তু এত লোকজনের ভিতর সে যে কি করে বলবে! তবু সে কোনরকমে, শিয়রের দিকে ভিড়ের ভিতর মাথা ঠেলে ঠিক ডান-দিকে এসে গেল। একটা মোটা কম্বলে শরীর ঢাকা ঠাকুরদার। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন। সব শরীরটা তাঁর কাঁপছে। সোনা কোনরকমে মাথার কাছে মুখ নিতেই, কান্না যেন তাকে জোর করে সরিয়ে নিল। ওর চোখে জল। সবাই হয়ত ভেবেছে, সোনা এখন ঠাকুরদার গলা জড়িয়ে কাঁদবে। সে বলতে পারল না, আমি কাঁদছি না, আমি গলা জড়িয়ে কাঁদব না। সোনাকে এখন তবু কারা জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওকে বোঝা প্রবোধ দিচ্ছে, ঠাকুরদা বুড়ো হয়েছে, মরে যাচ্ছে, কাঁদছ কেন? কি ভাগ্যবান মানুষ তিনি। তাঁর কত সুনাম! তোমরা কাঁদলে ঠাকুরদার আত্মা শান্তি পাবে না।

সে এসে দাঁড়াল জামরুল গাছটার নিচে। তারিণী কবিরাজ গোপাটে ঘোড়ার উপর বসেই একটা মানুষের কি যেন লেখছে। সেই মানুষ ফেকু শেখ। সে একজন প্রবীণ মানুষকে তার কুষ্ঠের মতো ঘা দেখাচ্ছে। এবং লোকজন চারপাশে। সোনার মনটা ক্রমশ ভারি হয়ে আসছিল। তারিণী সেন ঘোড়ায় চড়ে চলে যাচ্ছে। যারা দূরের মানুষ' তারা উঠে আসছে। তারা কত রকমের সব মহৎ গল্প ঠাকুরদা সম্পর্কে বলছে। সব প্রাচীন গাথার মতো মনে হয়। একজন মানুষ মরে গেলে বুঝি তার অতীত সবার চোখে ঘুরেফিরে আসে। সোনার এখন এ-সব শুনতে ভাল লাগছে। সে সব মানুষদের ভিতর ঘুরেফিরে—তার ঠাকুরদার অতীত ইতিহাস, সত্যবাদিতা, পৌরুষ এবং দানশীলতা সম্পর্কে সব শুনেছে। কিন্তু একজন শুধু বলেছে, তিনি একবার মিথ্যা

তার করেছিলেন, তার বড়ছেলেকে। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। অথচ তার করলেন, তিনি অসুস্থ, বাঁচা দায়। তিনি সেই মিথ্যা তার করে ছেলেকে আনিয়েছিলেন, এবং বড় ছেলে তার ফিরে এলেই, বিবাহ। বড় ছেলে তার বৈঠকখানায় সারাটা দিন মাথা নিচু করে বসে রয়েছিল। পিতার সম্ভ্রমের কথা ভেবে কেমন নিরন্তর দুঃখী মানুষের মতো মুখ। সে মানুষটা সবাইকে রামায়ণ গানের মতো তার বর্ণনা দিচ্ছিল। যেন পিতার সত্যরক্ষার্থে পুত্রের বনে গমন। জীবনের সব কিছু ভালবাসা বনবাসে রেখে আসা।

সোনার কেন জানি মনে হল, মানুষ কখনও সারাজীবন সত্য কথা বলতে পারে না। ঠাকুরদা যখন পারেননি, তখন আর কেউ পারবে না। বড় জ্যাঠামশাই কেন যে পাগল হয়ে গেলেন! এমন একটা মিথ্যা তার না করলে তার বড় জ্যাঠিমা এ-সংসারে আসত কি করে। বড় জ্যাঠিমার, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেবল সেবা সুশ্রূষা সকলের, নিজের বলতে তাঁর কিছু নেই—আর কি সুন্দর তাঁর কথা! সোনা জ্যাঠিমার মতো অনায়াসে এখন কথা বলতে পারে। তার কখন খিদে লাগে তিনি টের পান। সে কখন অসুস্থ বোধ করে জ্যাঠিমা চোখ দেখে ধরে ফেলেন। এবং সোনা যে বড় হয়ে গেছে তাও তিনি আজকাল ধরতে পেরে কেমন মাঝে মাঝে বলে দেন, আর কি তোমাদের এখন পাখা হয়েছে, উড়ে যাবে। আমাদের কথা তোমরা কেউ ভাববে না।

সে শুধু তখন বলতে পারে—না জ্যাঠিমা, আমি কখনও এমন হব না। ভাল হব আমি। আমি এই পরিবারের জন্য সব করব। ঠাকুরদা মরে যাচ্ছে বলে কি হয়েছে। আমরা ত আছি। আমি মেজদা বড়দা। সংসারের সব দুঃখ আমরা মুছে দেব। কত কিছু তার এখন বলতে ইচ্ছা হয়। সুন্দর, যা কিছু মহৎ এই পৃথিবীতে আছে সব কিছু তার হতে ইচ্ছা হয়। সে জামরুল গাছটার হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠাকুরদা মরে যাচ্ছে। মৃত্যু সম্পর্কে নানা-রকম ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে তার। ওর মনে হয় ঠাকুরদা মরে কোথাও যাবেন না। সবাই অনর্থক কাঁদছে। সংসারের এমন ভালবাসা ফেলে কেউ কখনও দূরে গিয়ে থাকতে পারে না। তিনি এ-বাড়িতেই থাকবেন। তবে অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। মরে গিয়ে মানুষ কোথাও বেশিদূর যেতে পারে না। ঠাকুরদাও বেশিদূরে যেতে পারবেন না। সংসারে তার বড় জ্যাঠিমার মতো বৌ আছে, পাগল জ্যাঠামশাইর মতো ছেলে আছে, ঈশমদাদার মতো মানুষ আছে, মার মতো ধনবৌ আছে তবে তিনি যাবেন কোথায়। তিনি থাকবেন এ-সংসারেই থাকবেন। সকলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। বিপদে আপদে তিনি সকলকে দেখবেন।

আবার এও কেন জানি মনে হয় সোনার, ঠাকুরদা মরে গেলে আকাশের নিচে বড় বটগাছটার মাথার একটা নক্ষত্র হয়ে জ্বলবেন। তিনি বড় ধার্মিক মানুষ, পুত্রের স্নেহ আচরণের জন্য জীবনপণ করে বাজি ধরা ঈশ্বরের সঙ্গে—এ-সব তাঁকে দেবতা বানিয়ে দেবে। তিনি এত পুণ্যবান মানুষ, যে সে দেখল এখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। লণ্ঠন জেলে মানুষজন আসছে। সে মাথা তুলে আকাশ দেখে বুঝল, চাঁদের চারপাশে গোল মণ্ডল। সেখানে দেবতারা সব চুপচাপ বসে একজন পুণ্য জ্ঞানী মানুষের অপেক্ষায় আছেন। তিনি এলে তাঁর নিবাস ঠিক করা হবে। একজন পুণ্যবান মানুষ মাটি ছেড়ে চলে আসছে—সে কোথায় থাকবে, তার বাড়ি বাগান, ঠাকুরপূজার ঘর এ-সবের আয়োজন করছেন তাঁরা। তার ঠাকুরদা যথার্থই পুণ্যবান মানুষ। তিনি আকাশে নক্ষত্র হয়ে যাবেন। এবং তাঁর পাগল ছেলে কোথায় নিরুদ্দেশে যায় ঠিক তিনি সেখান থেকে টের পাবেন এবং তাকে চোখে চোখে রাখবেন। ঠাকুরদার আর জন্ম হবে না। তিনি আকাশ থেকে দেখতে পাবেন সোনা কি করছে, জ্যাঠামশাই হেঁটে হেঁটে কোথায় চলে যাচ্ছেন, ঈশমদাদা তরমুজ খেতে পাহারা দিতে দিতে ঘুমোচ্ছে কিনা—যেন সংসারের সব ফাঁকি এবার তিনি ধরে ফেলবেন। এবং রাতে ছোট কাকাকে স্বপ্নে বলে দেবেন, আগামী বছর দুর্দিন কি সুদিন। সোনাকে বলে দেবেন, জ্যাঠামশাই কোথায় কোন গাছের নিচে বসে আছে। দুঃখ বলতে যেটুকু সংসারে আছে ঠাকুরদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে যাবে।

সোনা যখন এসব ভাবছিল তখন কেউ বলে গেল—তুমি সোনা যাও, ঠাকুর্দার মুখে গঙ্গাজল দ্যাও—তখন ফেলু টাবার পুকুর-পাড়ের দিকে ছুটছে। সে জোনাকি ধরার জন্য ছুটছে। একটা জোনাকি ওকে সেই মাঠ থেকে উড়ে উড়ে এতদূর নিয়ে এসেছে।

—কবিরাজমশয় আমার ঘাওডা সারাইয়া দ্যান। আপনের গোলাম হইয়া থাকমু।

—তুই কেডারে!

—আমি ফেলু। আপনের ফ্যালা। হাডুডু খ্যালছি কত। আপনের মনে নাই আমার নামডা!

—অঃ তুই ফ্যালা। তা তর কি হইছে।

—ঘাও হইছে।

—কাছে আয় দ্যাখি।

—এই যে কবিরাজ মশয়। দ্যাখেন।

ফেলুর মাথার উপর মাছি উড়ছিল। কাছে যেতেই কি দুর্গন্ধ। —আরে ফ্যালু তুই ত মইরা যাইবি।

—এডা কি কন কবিরাজ মশয়। আমি মইরা গ্যালে আমুডার কি হইব।

—তর যে বড় কঠিন অসুখ শরীরে!

—ঘাওডা আর ছাড়ব না!

তারিণী কবিরাজ ঘাটার চারপাশে টিপে টিপে দেখল।

—জ্বলে?

—হ জ্বলে। দাবদাহের মত জ্বলে।

—জোনাকি জ্বললে নিভলে যেমন জ্বলে তেমন জ্বলে না!

—হ কবিরাজ মশয় ঠিক ধরছেন। জ্বালাডা ধপ কইরা নিভা যায় আবার দপ কইরা জ্বইলা ওঠে।

—বড় কঠিন অসুখ রে ফ্যালা। তুই এক কাম করতে পারস।

—কি কাম কন দেখি। যা কন মাথা পাইতা দিমু।

—শতমূলের গাছ চিনস।

—চিনতে কতক্ষণ। বলে সে গামছা দিয়ে ওর ঘাটা ফের ঢেকে দিল। তারিণী সেন ঘোড়ার উপর বসে রয়েছে। সে নামছে না। ফেলুকে খুব কাছে আসতে বারণ করছে। সে চোখ বুজে কি যেন ভাবছে। তার পরই যেন বলে দিল, ঠিক কবিরাজীতে তর ব্যারামের অষুধ নাই। এডা আমি শিখছিলাম এক হেকিমদার মানুষের কাছে। সে কইছে, কুষ্ঠরোগে এডা লাগে।

—আমার কি কুষ্ঠ হইছে কবিরাজ মশয়।

—ঠিক কুষ্ঠ না। তবে তর এই ঘাও আর ছাড়নের কথা না। সূর্যমুখ ঘাও। রোদ উঠলেই জ্বালাটা বাড়ে। রোদ পইড়া আইলে কমে জ্বালা।

—হ বাড়ে কমে।

—সারে না। কবিরাজি মতে এর অষুধ নাই।

—আমি যে কি করিম কবিরাজ মশয়।

—এটা কইরা দ্যাখতে পারস। আর তুই উলুং ল্যাঙরার গাছ চিনস!

—না গ কবিরাজ মশয় চিনি না।

—চিন কি তবে! সারা জন্ম শুধু ভাত গিলো চলে।

—তা চলে কবিরাজ মশয়। হায় কি যে আমার হইল!

—আইজ হ পূর্ণিমা। বৈশাখী পূর্ণিমা।

—হ কবিরাজ মশয়।

—দিনটা ভাল আছে। শুক্লা তিথিতে এই জ্যোৎস্নায় একশটা জোনাকি ধইরা ফ্যাল। পঞ্চকাল জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ। তারপর যখন দ্যাখবি জলটা ঘোলা ঘোলা হইয়া গ্যাছে তখন শতমূলি গাছের

মনে গোলমরিচ গণ্ডা দুই জোনাকির জলে বেটে লাগাবি। কবিরাজীশাস্ত্রে এ-সব লেখা নাই। পেঁয়াজ রসুনে তখ শরীরটা ত আর শরীর থাকে না। দুরদুর বইনা যায়। কবিরাজি অষুধ কামে লাগব না। দিয়া গালায় একবার লাগাইয়া দ্যাখতে পারেন। লাগানোর আগে জোনাকির জল দিয়া ঘা ধুইয়া নিবি।

কবিরাজ মশাই এবং লাওয়া গাছের নিমিত্ত কি কইলেন যেন।

—পরকাল কষ্ট পাইবি। তার আগে পাতটা সিদ্ধ কইরা কিছু বাসকের ছাল, অর্জুনের ছাল, আমরুল, লবঙ্গ ফেইলা দিয়া একটা পাচন খাইতে পারেন। শরীরের রক্ত তর খারাপ। কালোমেঘের পাতা সিদ্ধ কইরা খাইতে পারেন। রক্তটা ঠিক হইলে ঘাও শুকাইতে সময় লাগব না। বলেই তারিণী সেন মাঠের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটালো ফেলু দেখল চারপাশে তার জ্যোৎস্না। একটা জোনাকি, একটা একটা করে একশটা। একশটা জোনাকি। ওর চোখের উপর এখন জীবনের সবচেয়ে দামী এবং নামী বস্তু জোনাকি। তখনই সে দেখল মরীচিকার মতো একটা জোনাকি বেশ পুচ্ছ তুলে উড়ে যাচ্ছে।

সে জোনাকিটাকে ডান হাতে খপ করে ধরতে গেল।

হাওয়ায় হাওয়ায় দুলে দুলে জোনাকিটা যাচ্ছে। ফেলু ছুটছে তার পিছনে। মাঠের ভিতর ওর মনে হল আর একটা জোনাকি। এত কাছের জোনাকি হাতের বাইরে চলে যাবে, সে স্থির থাকতে পারছে না। যত সোজা মনে করেছিল জোনাকি ধরা, যত সহজে সে ভেবেছিল খপ করে ধরে কোঁচড়ে ফসলের মতো তুলে নেবে তত সে দেখল মরীচিকার মতো হাতের ফাঁকে জোনাকি উধাও। সে বলল, হালার কাণ্ডয়া।

সে সুতরাং জিদের বশে, অথবা এক দুই মিলে এক গণ্ডা, পাঁচ গণ্ডা মিলে এক কুড়ি, পাঁচ কুড়িতে শ। একশ জোনাকি। সে গণ্ডার হিসাব জানে। কুড়ির হিসাব জানে। শয়ের হিসাব তার জানা নেই। সে যে এত বড় হাডু ডুডু খেলোয়াড় ছিল, নাম তার ফেলু ছিল, ভয়ে তাকে কেউ কাইচি চালাত না, তার নামে কিংবদন্তি ছিল কত, ফেলু খেলার দিন সারারাত তেল মাখে গায়ে, রসুন গোটার তেল। তেলটা তার ভিতর বসে যায়। সে পিছল করে রাখে শরীর। ঠিক পাঁকাল মাছের মতো সে বের হয়ে যায়। যত বড় প্যাঁচ দাও, যত বড় কাইচি চালাও, কি মতেসই সে যে ফস্ ফাঁস বের হয়ে আসে কেউ টের পায় না। কেউ বলে মানুষটা এক ফকিরের কাছে তাবিজ নিয়েছে, মাদুলি গলায় বড় জোরে তার, পার তো সেটা কেড়ে নাও। তাহলে ফেলু

ভূতের ভয়ে মামদোবাজি খেলা খেলে ফ্যালা।

এখন সেই কালো মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে। গলায় তার সেই কালো তার জড়ানো। রুপোর চাকতি। সে একটা জোনাকির সঙ্গে পারছে না। তার সব কেড়ে নিল এক মানুষ। পাগল মানুষ। মনে হল তার তখন ঠাকুরবাড়ি লণ্ঠন হাতে কারা উঠে যায়। বড়ো ঠাকুর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। কত লোক যাচ্ছে দেখতে তাকে, আর ফেলু এখন কানা খোঁড়া বলে কেউ একবার তাকাচ্ছে না। তার যা ইজ্জত, ধর্ম সব কেড়ে নিয়েছে মানুষটা। সে উন্মত্ত হয়ে ছুটছে। জোনাকিটা সাদা জ্যোৎস্নায় তারি খেলা খেলছে বটে। কাছে এসে যাচ্ছে, খপ করে ধরতে যাচ্ছে, আবার উড়ে যাচ্ছে, হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে, উপরে উঠে যাচ্ছে, সে ভেবেছে ছেড়ে দেবে, অন্য কোণে খুঁজবে জোনাকি। যেখানে জল ঘোলা, অথবা পচা ডোবা সে সেখানে চলে যাবে, তখনই আবার জোনাকিটা চোখের সামনে নেমে আসছে। যেন ধরা দিতে আসছে। সে বলল,—আহারে আমার সুন্দর জোনাকি। আয় তরে ধইরা লই। পরান আমার তর লাইগা কত না কান্দে!

সে খপ করে ধরতে গেল। আর উড়ে গেল ফের জোনাকি। হাওয়ায় দুলতে দুলতে কঠিন রুক্ষ মাঠের উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল সে।

ফেলুর মনে হল শরীরে তার পাখা গজিয়েছে। জোনাকির মতো দুই পাখা মেলে সেও যেন উড়ছে। কঠিন রুক্ষ মাঠের উপর দিয়ে সে ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে সে ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিটা যত দুলে দুলে যাচ্ছে, সেও তত দুলে দুলে যাচ্ছে। সে কি এক হাজার আরব্য রজনী গল্পের নায়ক হয়ে যাচ্ছে। তার যে কি ইচ্ছা হচ্ছে এখন, আহা সে কোথায় যাচ্ছে, তার যে কি ইচ্ছা, আল্লার কুদরতে সে আবার সব ফিরে পাবে, এমন কি এটা যখন ফকির প্রদত্ত অষুধ, দানরি ফার্দারিতে কি না হয়, মনে হয় তার জোনাকিটা তাকে উড়ে উড়ে আল্লার দরবারে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা এই জোনাকি বুঝি তাকে একশটা জোনাকির খবর দেবে। খবর দিলেই সে খপ করে ধরে ফেলবে, জলে ভিজিয়ে একবার গোলমরিচ বেটে লাগাতে পারলেই নিরাময় হবে শরীর। এমন কি তার সেখানে একটা বাঘের জোর গজানোর মতো সুন্দর হাত গজাতে পারে। সে তার ডান হাতটা নেড়ে বাঁ হাতটা আবার গজালে—কি কি করবে, প্রথমেই তার কি করণীয় এমন ভাবতে ভাবতে সে যে কোথায় চলে যাচ্ছে!

ফেলু টাবার পুকুর পাড়ে এসে দেখল জোনাকিটা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে পড়েছে। সে ভাবল, খায়ে বেশ মজা, তুমি লুকোচুরি, গন্ধ ফোটালে। না চক্ক, তুমি

আমারে লক্ষ্মী কোনখানে নিয়া যাইলা। বলেই সে ঝোপটার অন্তরালে উঁকি মারল, ঠিক মাইজলা বিবির সনে যেন এখন পিরিত তার। সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঝোপের ভিতর, যেমন সে একবার বট-গাছটার নিচে উঁকি দিয়েছিল, কখন মাইজলা বিবি তারে দেখা দেবার তরে পানিতে নেমে আসে।

এখানেও ঠিক সেই উঁকি দিয়ে থাকা। জোনাকিটা ঝোপের এ-পাশে উড়ে এলেই খপ করে ধরে ফেলবে। আর কি আশ্চর্য সে দেখল জোনাকিটা তার গলে ভিড় গেছে। এখানে সে যে উড়ে এল, সে তার গলে ভিড়ে যাবার জন্য। মরি হায় হায়। কলিজা কামড়ায়, সে নাগাল পাচ্ছে না জোনাকিডারে। একডা দুইডা জোনাকি না, হাজার গন্ডা জোনাকি। কেবল ঝোপের ভিতর বসে থাকতে ভালো। নাড়া খেলেই উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে।

সে বুঝল নড়লে উপায় নেই। চুপচাপ চিত হয়ে পড়ে থাকা। যেই না উড়তে উড়তে কাছে চলে আসবে খপ করে ধরে ফেলা। ফেলু সেই আশায় ঝোপের ভিতর চিত হয়ে শুয়ে থাকল। শিকারী মানুষের মতো সে জোনাকি ধরার কায়দা শিখে ফেলেছে। সে চুপচাপ শুয়ে থেকে বেশ ফল পেল। গণ্ডা দুই জোনাকি এখন তার করতলে। কোঁচড়ে রেখে সে আবার মরা মানুষের মতো পড়ে থাকল। টুপটাপ কি যেন পড়ছে ডাল বেয়ে। সে সে-সব লক্ষ্য রাখছে না। ওরা বেশ উড়ে উড়ে আসছে। কোনটা ধরতে পারছে, কোনটা ধরতে পারছে না। ওর বুক জ্বালা করছে। গামছা দিয়ে ঘা ঢেকে রেখেছে। মনে হল ফোঁটাগুলো শরীরে পড়ে নিচে ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টিপাত নয়। কারণ আকাশ পরিষ্কার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিপাতের মতো কিছু পড়ছে। এক ফোঁটা দু ফোঁটা পড়ছে। সে আশ্চর্য

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট : ২ লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
৫৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

ফটো : আশীষকুমার রায়

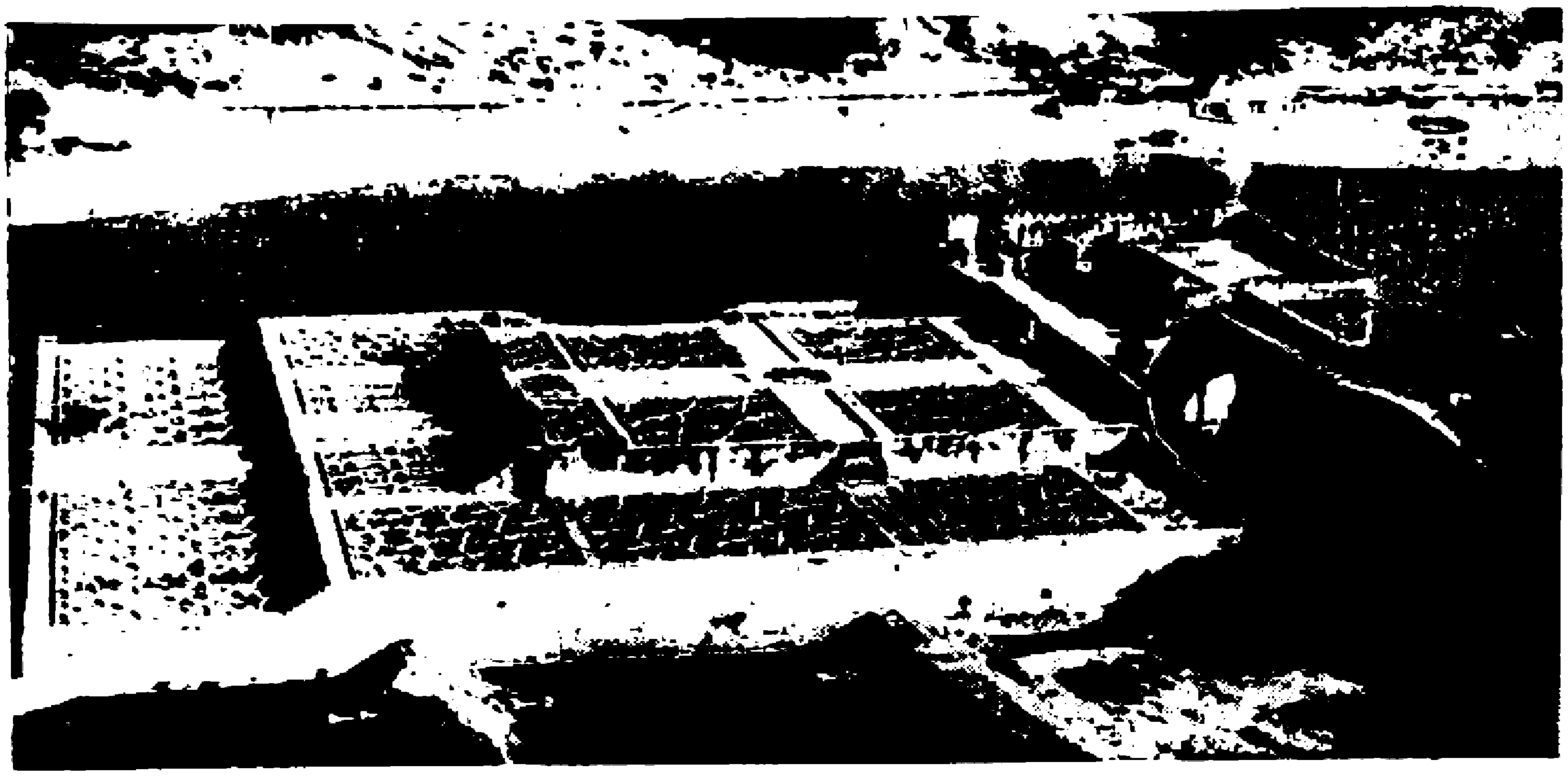

দিয়ে দেখল আঠা আঠা। তখনই আবার ওর মুখের কাছে দুটো জোনাকি খেলা দেখাচ্ছে। সে হাতটা তুলে একটা ধরে ফেলল। অন্য জোনাকিটা দূরে সরে গেল। দলে ভিড়ে গেল। ওরা সবাই কেন উড়ে আসছে না। চারপাশে গুঞ্জন করছে না। ফোঁটা পড়ছে। বুকে পিঠে ফোঁটা আঠার মতো। সে সে-সব ভ্রুক্ষেপ করছে না। পড়ুক। উঠে গেলেই এমন রাত আর মিলবে না। কাল, পরশু বিচার ঠিক না থাকলে অবশ্যে কাজ দেয় না। সে বলল, আন্নু রে আবার আমি ফেলু শেখ। তরে নিয়া উঠানে যামু। আমার শরীরে গন্ধ থাকব না। তরে নিয়া যামু শহরে। আকালু, তুই আর কি আতর আইনা দিবি, আমি নিজু তরে পারস্য দেশের আতর। আমার শরীর সবল হইলে কি দিতে না পারি তরে। খপ্। খপ্ করে সে ফের আর একটা জোনাকি ধরে ফেলল। আকালু, ধরে যায় নাই ত। বিবি তুই আমারে দুইটা মাস সময় দে। তবে আমি জোনাকির মত উড়াইয়া নিমু বাতাসে। খপ্।

সে খপ্ করে আরও একটা জোনাকি ধরে ফেলল। আর কি আশ্চর্য! খপ্। সে দেখল মুখের ভিতর আঠায় একটা জোনাকি আটকে গেছে। খপ্। সে তুলে মৌচাকে রেখে দিল। আনন্দে সে আঠার মতো রসটুকু ঠোঁটে ছোঁয়াল। আরে রাজার খাওয়া এর যে কত মধু। মধু বর্ষণ হইতাছে। উপরে কোন বড় বৃক্ষ আছে। বৃক্ষ তুমি কার?

—রাজার।

—এখন কার?

—এখন তোমার।

—তবে মধু বর্ষণ কর। ডালে তোমার মধুর চাক যখন আছে, বর্ষণ কর। চান্দের রাইতে মধুতে আমার শরীর ভাইসা যাউক আমি শুইয়া থাকি। জোনাকিরা উইড়া আসুক। মরা কাঠ ভাইবা বসলেই, খপ্। সে খপ করে আরও একটা জোনাকি পায়ের পাতা থেকে তুলে আনল। ওর গোটা শরীর আঠাময় হয়ে গেছে। এখন সে ওদের না ধরলেও পারে। গোটা শরীরে জোনাকি, বিন্দু বিন্দু জোনাকি এক দুই করে উড়ে এসে পড়তে থাকল।

তাকে আর মানুষ মনে হচ্ছিল না। প্রথম একটা কাঠের গুঁড়ি মনে হচ্ছিল। উপরে ঝোপ ঝাড়। তার উপর বড় বৃক্ষের ডাল। ডালে প্রকাণ্ড মধুর চাক। কোন বন্য জীব হয়ত মধুভাণ্ডে মুখ দিতে এসে কামড় খেয়ে চলে গেছে। সব মধু এখন ঝোপের উপর বৃষ্টিপাতের মতো পড়ে পড়ে নিচের মানুষটাকে ভিজিয়ে দিয়েছে। সে নড়ছে না। নড়লে জোনাকি উড়ে আসবে না। ওকে একটা কালো কাঠের গুঁড়ি ভেবে এক দুই করে সব জোনাকি শরীরে বসে গেলে সে যেন জোনাকির রাজা হয়ে গেল। তার ঘরে বিবি আন্নু যে এখন একা আছে, একেবারে সে তা ভুলে গেছে। আন্নুর কাছে সে আবার রাজার মতো ফিরতে পারবে, সে আবার ফসলের মাঠে ছুটতে পারবে—কি আনন্দ, কি আনন্দ। সে মসগুল হয়ে গেছে। নানা রকম লতাপাতার স্বপ্ন দেখছে। একশটা জোনাকি সে গুনে এক কুড়ি পাঁচ গণ্ডা করে ফেলেছে। কিছু সে বেশি সংগ্রহ করেছে। সে উঠে বসল। এখন রাতের শেষ প্রহর। কালো মোষের মতো এক খণ্ড মেঘ আকাশের চাঁদ ঢেকে দিলে সে দেখল, যেন সে এক আশ্চর্য মানুষ হয়ে গেছে। তার শরীরে এখন অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু জোনাকি জ্বলছে। আঠায় ওরা আটকে গিয়ে আর উড়তে পারছে না।

তখনই তার মনে হল বিবিটা ঘরে একা একা ঘুমাচ্ছে। তাকে আছে আকালুদ্দিন। সে আর দেরি করতে পারল না। মাঠের উপর দিয়ে পাগলের মতো ছুটতে থাকল।

আর তখনই শচীন্দ্রনাথ বলছে, বাবা জল খান। গঙ্গাজল। হাইজাদির পরান আইছে আপনের মুখে গঙ্গাজল দিতে।

বুড়ো মানুষ হাঁ করার চেষ্টা করল। তার শ্বাসকষ্ট প্রবল। নাকের বাঁশি ফুলছে। নাভিশ্বাসে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। গোটা শরীর দুলছে তাঁর। বুকের ভিতর সমুদ্রের তরঙ্গে যেন এক পালবিহীন নৌকা দুলে দুলে এই সসাগরা ভূমণ্ডল পার হচ্ছে।

সোনা ঠাকুরদার মুখে সেই যে গঙ্গাজল দিতে এসেছিল আর নড়ে নি। সেও পায়ের কাছে চুপচাপ বসে রয়েছে। এখন পর্যন্ত চন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ কেউ ফিরে আসে নি। তারা আসে নি বলেই এখনও

আত্মাটা আছে। ওদের জন্য ঠাকুরদার প্রাণপাখিটা বুকের ভিতর এখনও বসে আছে। ওরা এলেই ওদের দেখে সে উড়ে যাবে। নাক অথবা কানের ভিতর দিয়ে সে বের হবে। চোখের ভিতর দিয়েও বের হয়ে আসতে পারে। চোখের ভিতর দিয়ে বের হলে চোখটা খোলা থাকবে। নাকের ভিতর দিয়ে বের হলে ডগা হেলে যাবে। আর মুখের ভিতর দিয়ে বের হলে তিনি হাঁ করে থাকবেন। ওর বড় ইচ্ছা দেখার ঠাকুরদার প্রাণপাখিটা কিভাবে বের হয়ে আসে।

সোনা, সেই আত্মা পাখির মতো না পাখির হৃৎপিণ্ডের মতো, আত্মার কি চেহারা, বুকের কোন জায়গাটায় থাকে, কি সে খায়, নিঃশ্বাস ফেলে কি করে বের হবার মুখে সে আত্মাটাকে দেখতে পাবে কিনা, সংসারে এই আত্মা কেউ কোন দিন দেখেছে কিনা, একটা ছোট্ট হাওয়ার মতো, তাই হয়ত সেটা দেখা যায় না—তবু ওর মনে হয়েছে, নিরিবিলি চুপচাপ বসে থাকলে টের পাওয়া যাবে আত্মা বড় অভিমানী বস্তু। চারপাশের দরজা জানালা বন্ধ করে দিলে কোথায় যাবে তুমি, আবার ফিরে এসে এই দেহ তোমাকে আশ্রয় করতে হবে। অথচ সোনা ঘরটার চারপাশে তাকালে দেখল, দরজা জানালা বন্ধ করলেও অজস্র ফাঁকফোকর রয়েছে। সে কিছুতেই তাকে আর আটকে রাখতে পারবে না। সেই চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূর মতো ওর ইচ্ছা এখন নিশ্ছিদ্র কোন ঘরে নিয়ে তুলতে পারলেই—ঠাকুরদা আবার শতবর্ষ বেঁচে যাবেন। কেন যে মানুষ মরে যায়, বাঁচে না, সেও একদিন মরে যাবে ভাবতে ভারি কষ্ট হল তার। ঠাকুরদার মতো, বাবা মা, জ্যাঠা-মশাই, ছোট কাকা সবাই মরে যাবে। সে বড় হলে একটা এমন ঘর তৈরি করবে, যেখানে হাওয়া ঢুকতে পারে না। সে ঘরটায় সে তার মা বাবা অথবা জ্যাঠা-মশাইকে রেখে দেবে। অভিমানী আত্মা বের হয়ে যখন দেখবে যাবার পথ নেই, তখনই ফের সে ভিতরে ঢুকে যাবে অথবা সে যদি বের হয়ে যায়, সে ঈশ্বরকে বলবে আমাকে দিব্যদৃষ্টি দাও ভগবান। আমি আত্মার পিছনে পিছনে ছুটব। খপ করে ধরে ফেলব তাকে। যায় আত্মা তাঁকে আমি ফিরিয়ে দেব। তখনই কে যেন বলল, বের করে আনুন। ঘর থেকে বের করে আনুন। বাইরে এই ধরণীর শান্ত চন্দ্রালোকে শত-বর্ষ পার করে মানুষটা এবার মুক্ত হোক। ঠাকুরদাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাবার সময়ই হুঁশ হল সোনার, এতক্ষণ সে কি সব আজেবাজে ভেবেছে। ঠাকুরদাকে সেও ধরাধরি করে উঠোনে নিয়ে নামাল। শিয়রে একটা লণ্ঠন রেখে দেওয়া গেল। শেষ প্রহরে ফিরে এল ভূপেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ। তারা ঠাকুরদার পায়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে থাকল। দেখলে মনে হবে ওরা যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

দেখলে মনে হবে ফেলুও যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সে বাড়িতে উঠেই ডাকল, আন্নু দ্যাখ আমি আইছি। তারিণী কবিরাজ ধন্বন্তরি। তার অষুধ পাইছি আমি। দ্যাখ আমার শরীরে কি জ্বলতাছে। দ্যাখ। তুইলা রাখ। পানিতে ভিজাইয়া রাখ। আর মাসাধিককাল আমার কষ্ট। আন্নু, আন্নু, তুই ঘরের ভিতর আছস, রা করস না ক্যান। ডর কইব না কিন্তু। কথা ক। কথা ক কইতাছি। কাঁঠাল গাছটার নিচে আমি খাড়াইয়া আছি। তুই আয়। খুইটা খুইটা জোনাকি তুইলা নে শরীর থাইকা।

কোন সাড়া শব্দ নেই ভিতরে। ঝাঁপের দরজা ভেজানো। বাঁশ দরজাটা ফেলুর সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল অন্নুডা কথা কয় না। কি কারণ। কাকে উদ্দেশ করে যে বলা! যেন সে জাফরিকে উদ্দেশ করে বলছে, আমারে চিনতে কষ্ট হয় জাফরি। আমার শরীরে কি জ্বলতাছে দ্যাখ। আমি ইবারে ভাল হইয়া যামু। সার্থের তগ আর অভাব অনটন থাকব না। আন্নু, আন্নু রে!

না কোন সাড়া দিচ্ছে না। বড় অভিমানী মেয়ে। সে এই ভেবে বলল, রাইতে ফিরি নাই, কারণ ধন্বন্তরি আমারে কইল, ফ্যালা, পূর্ণিমার রাইতে একশটা জোনাকি ধইরা রাখ। কামে লাগব।

—তা কি কাম? সে নিজেই প্রশ্ন করছে নিজেকে। যেন সে আন্নুর হয়ে জবাব দিচ্ছে। কাম হইছে দুরারোগ্য ব্যাধি ছাইড়া যায়। আমি ঝোপ জঙ্গল খাইড়া দ্যাখ কি কৌশলে জোনাকি ধইরা আনছি।

তবু সাড়া দিচ্ছে না। রা করে না। ঘুম ত ওর বোলতালা। ঘুমালে আর উঠতে চায় না। সে এবার ঝাঁপের দরজাটা সামান্য ঠেলে ভিতরে উঁকি দেবে ভাবল, অথবা ভাববে, আন্নু ওঠ। আর ঘুমাইস না। ভোর হইতে আর দেরি নাই।

এই কি হয়ে গেল! দরজাটা পড়ে যাচ্ছে কেন! ভিতরের দিকে একটা বাঁশের আটকানো থাকে। ঘুমোবার আগে অন্নু বাঁশটা ঠেস দেয়। বাইরে থেকে সহজে ঠেলে দিলে দরজাটা খুলে দেওয়া যায় না। কিন্তু এমন অদ্ভুত, যে দেখল দরজাটা পড়ে যাচ্ছে ভিতরে কেউ যেন বাঁশ সরিয়ে রেখেছে। সে বলল, আমার লাইগা দরজা খোলা রাখছস! তা ভাল। যত ঘুম পরীর মত, ঘুমাইলে আর হুঁশ থাকে না। কাপড়চোপড় উইঠা যায়। একখানে তুই অন্যখানে তর কাপড়। তা তুই এডা ভাল করস নাই। আল্লায়, নারানগঞ্জে যাইব মোকদ্দমা করতে। তবে আমি কোরবানি দিমু। বলেই সে হা হয়ে গেল।

যা ভেবেছিল তাই। ঘর খালি। সে এতক্ষণ জোরজার করে মনকে প্রবোধ দিয়েছে। যেন পাশেই আছে, সাড়া দেবে। জলের তরঙ্গ ভাইসা যায় মত বিবি তার সুমুখে খেলছে। সে বলল, তা ভাল হইছে। সে জোরে জোরে বলল, তা ভাল হইছে! সে চিৎকার করে আসমান জমিন কাঁপিয়ে দিয়ে উঠল, তা ভাল হইছে! ওর হাতের মুঠিতে সেই কোরবানির চাকু! ভাল হইছে! আমার পরাণ কাইরা নিছে আকালুদ্দিন।

—তুমি আকালুদ্দিন কই যাইবা। হালার কাওয়া। বলতে বলতে সে কেমন পাথর হয়ে গেল। জলের উপর সেও ভূলুণ্ঠিত হল। বাচ্চাদের মতো কাঁদল, অন্নু তুই আমারে ফালাইয়া কৈ গ্যালি। আমার মাটি জমিন কার লাইগা!

(ক্রমশঃ)

• আলকালকা টনিক • কিংস হেমাটোন
• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• ক্যাসিরা সিরাপ • ইউট্রোটোন
কিং এণ্ড কোম্পানীর নিজস্ব গবেষণায় প্রস্তুত ঔষধগুলি এখন আপনার সেবায় নিয়োজিত।
প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং
৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী :
২০বি, পার্শী বাগান লেন, কলিকাতা-৯
GRACE/K/30/70
কিং এণ্ড কোম্পানীর (সকল শাখার) ঔষধ বিভাগ প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বাংলার নারী-সমাজ

বাংলার নারী-সমাজ বাঙালী জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা রচনা করেছেন তাঁদের কল্যাণহস্তের পবিত্র স্পর্শে। যুগ যুগ ধরে এই নারী-সমাজ নানাবিধ সামাজিক উত্থান-পতনের মধ্যে ক্লেশে ও দুর্দশায় দিন যাপন করেছেন আবার নিদারুণ দারিদ্র্য ও দীনতার মধ্যেও গৃহকোণে উজ্জ্বল দীপশিখার মতো বিরাজ করে সকল আঁধার, সকল মালিন্য বিদূরিত করেছেন। এই নারী-সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, গল্প, উপন্যাস ও নাটকে তাঁদের দুঃখভোগ ও নির্যাতনের কাহিনীর সঙ্গে মহিমামণ্ডিত মাতৃমূর্তিও জ্যোতির্ময়ীরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বাঙালী রমণী-জীবনের নানা বৃত্তান্ত ছড়িয়ে আছে প্রাচীন লোকগাথা এবং অজস্র পুঁথি-পত্রে। অনেক ছড়া, প্রবাদবাক্য, লোকগাথা, উপকথা প্রভৃতির মধ্যেও বাঙালী রমণী-জীবনের কথা ছড়ানো আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইদিক থেকে গবেষণা করে বাঙালী রমণীর ভূমিকা, সামাজিক মর্যাদা, সমাজজীবনে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিষয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রখ্যাত লোক-সংস্কৃতি গবেষক শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত। তাঁর 'এ স্টাডি অব ওমেন অব বেঙ্গল' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার নারী-সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গবেষণা কর্মে তিনি ধনী দরিদ্র উভয়বিধ সমাজের জীবনধারা নিয়ে সমীক্ষা করেছেন। তাঁদের জীবনের ঐতিহ্যআশ্রয়ী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, গার্হস্থ্য, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারা পুঁথিপত্র এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন। এই গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে তিনি ইতিহাস মনস্তত্ত্ব এবং নানা ধরণের ছড়া ও প্রবাদের পটভূমি সন্ধান করেছেন। সেই সঙ্গে লোক-কথার উৎপত্তি এবং শ্রেণীগত ভিত্তি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন শুধু মাত্র আক্ষরিক অর্থটুকু গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেছেন—'এই গ্রন্থ রিসার্চ-রিপোর্ট ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, রিপোর্টগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ না করে গ্রন্থাকারে একত্রে মুদ্রিত করতে সক্ষম হয়েছি।' এই কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। অবশ্য তার জন্য গ্রন্থ পাঠে অসুবিধা হয় না।

জায়া ও জননী, কন্যা ও ভগিনী, বিধবা, বন্ধ্যা, প্রভৃতি সর্ববিধ স্তরের রমণী-সমাজ এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এ ছাড়া বিবাহিত ও অবিবাহিত মহিলা কর্মীদের বিষয়ও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

বাঙলা বা বঙ্গ শব্দটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে। দশম শতাব্দীতে ভুসুকপাদের চর্যাপদে প্রাচীন বাংলার কথা আছে, চর্যাপদে ব্যবহৃত ভাষাই বাঙালীর প্রাচীন ভাষা এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বঙ্গদেশের সঠিক সীমানা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত আছে। তবে ঐতিহাসিক তর্ক থেকে সরে এসেও গৌড়, সমতট, তাম্রলিপ্ত, হরিকেল প্রভৃতি অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব ও সীমানা সম্পর্কে বিশেষ বিতণ্ডা নেই। মুসলমান রাজত্বেই বাঙলাদেশ কথাটির উৎপত্তি হয় এবং শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে সুবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা গড়ে ওঠে। তারপর ক্রমে আধুনিক বাঙলার উৎপত্তি হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলা হয়েছে এবং বাঙলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

গ্রন্থকার বাঙালীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিচার করে বলেছেন বাঙালী সভ্যতা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং প্রাচীন সুমের সংস্কৃতির সঙ্গে তার আত্মীয়তা-সূত্র যতখানি দৃঢ় বৈদিক আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগ সেই অনুপাতে ক্ষীণ। মৌর্য যুগে বাঙালীর সঙ্গে আর্যদের সংযোগ ঘটে এবং গুপ্ত যুগে এই সংযোগ সুদৃঢ় হয়। গ্রন্থকারের মতে বাংলা দেশের কৌলীন্য ব্যবস্থার উদ্ভব গুপ্ত যুগে। এই বিষয়ে এদেশে প্রচলিত মত কিন্তু অন্যরূপ। তবে জাতি-ধর্ম ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থকার দিয়েছেন। এই শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে

সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে। বিবাহ, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং সেই সঙ্গে ভাষাগত বন্ধনের সামাজিক জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা বর্তমান।

লোক-কথা কোনো বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির দর্পণ নয়, তবে এইসব লোক-কথা, ছড়া ইত্যাদির মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস, আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা মনে করেন যে লোক-কথা এবং প্রবাদের মধ্যে জনমানসের প্রতিফলন ঘটে। কোনো ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা এইসব লোককথা বা প্রবাদ গড়ে ওঠে না, একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ই এইসব প্রবাদ, ছড়া, লোক-কথা প্রভৃতির রচনাকার।

গ্রন্থকার তাঁর সমীক্ষায় 'গৃহিণী গৃহ-মুচ্যতে' এই শ্লোকটিকে স্মরণ করে বলেছেন একটি নারী-সমাজের ওপর পারিবারিক শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই লেখক বঙ্গ-রমণীকুলের সামাজিক মর্যাদা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বিশ্লেষণে বাঙলা দেশের যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন এবং সেই সঙ্গে সর্ব-ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর কথাও মনে রেখেছেন। পৃথিবীর আর সব দেশের মেয়েদের মত বাঙালী মেয়ের জীবনেও যে সেই একই ধরণের প্রেম, প্রীতি, আশা, আশঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা, সংসারনিষ্ঠা, স্বামী-পুত্র অন্য পরিজনদের প্রতি আকর্ষণ বর্তমান তার অজস্র প্রমাণ প্রচলিত প্রবাদ, ছড়া ও লোক-কথার মধ্যে বর্তমান। বাঙালী রমণীর জীবন বৈচিত্র্য-হীন নয়।

প্রাচীন কালে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ অসহায় অবস্থার প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে নি এবং এই মনোভঙ্গী এদেশের সামাজিক জীবনের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। এদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অবস্থা একটা সুদৃঢ় চাপ সৃষ্টি করেছে।

নারীরা সাধারণতঃ রক্ষণশীল মনোবৃত্তির অধিকারিণী। গৃহে নারী সর্বময়ী কর্ত্রী। প্রাচীন শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের স্থান অতিশয় মর্যাদার এবং সম্মানের। শাস্ত্রে আছে নারীরা যেখানে পূজা পান সেইখানেই দেবতাদের আবাস। স্বামীর সকল কর্মে গৃহিণী বা অর্ধাঙ্গিনী অংশীদার। সস্ত্রীক ধর্ম আচরণ করার নির্দেশ আছে। সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্বামীর মত স্ত্রীরও একটি ভূমিকা আছে। স্ত্রী শক্তি-স্বরূপিণী, তিনিই প্রকৃতি এবং পুরুষের সৃজনীশক্তির উৎস। ভারতীয়রা স্ত্রী-জাতিকে শুধু জীবনের শরিকদার হিসাবে বিবেচনা করে না, স্ত্রী-জাতি মাতৃজাতি। ভারতীয় নারীদের চরম বিকাশ মাতৃত্বে। জননী আর জন্মভূমি এদেশে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়।

—গ্রন্থকার নারী-জাতি সংক্রান্ত লোক-কথা, প্রচলিত সংস্কার, বিধি-নিষেধ, বিশ্বাস ও আচার-আচরণ, ব্রত অনুষ্ঠান, লোক-কাহিনী, লোকগাথা, ইত্যাদির মাধ্যমে জননী, বিমাতা, জায়া, কন্যা ভগিনী ইত্যাদির স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রাচীন এবং মৌখিক সাহিত্যে নারী, বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগে নারী, বিবাহ এবং বিবাহ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে নারী, কর্মরত রমণীর সামাজিক অবস্থা, স্বাধীনতা সংগ্রামে রমণীর ভূমিকা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থকার নানাবিধ প্রামাণ্য-গ্রন্থাবলী এবং সেনসাস রিপোর্ট প্রভৃতি সহযোগে বিশ্লেষণ করেছেন।

এছাড়া জীবনধারার রীতি-নীতি, সৌন্দর্য, তোষণ-রীতি, চোখ, কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রেম, রমণীর শক্তি, লজ্জা, চাঞ্চল্য কৌতূহল, চোখের জল, মুখের হাসি, ইত্যাদি অতি পরিচিত বিষয়গুলি সম্পর্কিত বিবরণগুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

গ্রন্থটিতে অনেকগুলি ছবিও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রায় চারশত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থে সব রকমের সম্ভাব্য দিক আলোচিত হয়েছে এবং সেখানেই গ্রন্থকারের অসামান্য কৃতিত্ব। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণায় দীর্ঘদিন নানা বিভাগে কাজ করেছেন এবং 'ফোকলোর' এবং 'হিউম্যান ইভেন্টস' নামক দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন. আলোচ্য গ্রন্থটিতে যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

—অভয়ঙ্কর

A STUDY OF WOMEN OF BENGAL by SANKAR SENGUPTA. Published by Indian Publications 3, British Indian Street, Calcutta-1. Price Rs. Fifty only.

সাহিত্যের খবর

অনুবাদের সমস্যা : একটি আলোচনা সভা।। গত সপ্তাহে লক্ষ্ণৌ শহরে অনুবাদের সমস্যা বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রথমে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যে ইস্তাহার বিতরণ করা হয়, তা থেকে জানা যায়, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং বেসব বেসরকারী উদ্যোগে অনুবাদ হয়েছে, সাহিত্যকর্ম হিসেবে তার সফলতা বিচার এই সভার উদ্দেশ্য। আলোচনা সভার প্রথম বক্তা রাম বিলাস সিংহ ভাষান্তর এবং অনুবাদের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সাহিত্য অনুবাদকে একই সঙ্গে সাহিত্য এবং ভাষার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী উদ্যোগে যেসব অনুবাদ হয়েছে, তা এই দাবী পূর্ণ করতে পারেনি। কৃষ্ণনারায়ণ [illegible] [illegible] যে, অনুবাদে কেবল শব্দই নয়, মূল ভাব এবং অনুদিত ভাষার অনুবাদককে দক্ষ হতে হবে। ঠাকুর প্রসাদ সিংহ এবং অমৃতলাল নাগরও সভার বিষয়টির উপর আলোচনা করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি হল:—(১) সরকারী উদ্যোগে যেসব অনুবাদ হচ্ছে, তার মান স্থির করার জন্য লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের সমিতি গঠন করতে হবে। (২) বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদকের জন্য সরকারকে পুরস্কার ঘোষণা করতে হবে। (৩) বেসরকারী অনুবাদক সংস্থা বা পত্রপত্রিকাকে সরকারের সাহায্য দিতে হবে।

নাম্বুদ্রিপদের সাহিত্য পুরস্কার লাভ।। এবার কেরল সাহিত্য আকাদমির পুরস্কার লাভ করেছেন [illegible] সি [illegible] নেতা ও [illegible] [illegible] [illegible] দায়রালাম [illegible] নাম্বুদ্রিপদকে রাজনীতিবিদ হিসেবেই আমাদের জানা ছিল। কিন্তু সাহিত্যেও যে তাঁর অধিকার আছে, এই পুরস্কার প্রাপ্তির ভেতর দিয়ে তা জানা গেল।

বঙ্গীয় কবি পরিষদের অধিবেশন।। গত রবিবার, বঙ্গীয় কবি পরিষদের শীতকালীন অধিবেশন ২৪-পরগণার আগড়পাড়া বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দীনেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী হাসিরাশি দেবীকে 'কাব্য সারস্বত' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। সভায় কয়েকজন কবি কবিতা পাঠ করেন। এছাড়া সমরেন্দু মৈত্র, রাধানাথ সিংহ ভাষণ দেন। পরিষদের সম্পাদক হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকীয় বিবরণী পেশ করেন।

টলস্টয় দিবস।। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক টলস্টয়ের ৬০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সম্প্রতি মাদ্রাজে একটি সুন্দর

সাহিত্য সভা আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে টলস্টয়ের উপর একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসালাহ্‌দ্দীন। তিনি বলেন—যদিও টলস্টয় উচ্চাভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবু তিনি তাঁর শ্রেণীর বিশেষ সমালোচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্বহারার জীবন যাপন করেন। তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।' প্রখ্যাত তামিল লেখক শ্রীঅখিলান টলস্টয়ের গল্প এবং উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে বলেন—'টলস্টয় বিশ্বসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছেন।' শ্রী টি এম সি রঘুনাথম বলেন—'আমি যখন সবে লিখতে আরম্ভ করি, তখনই টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত হই। প্রখ্যাত তামিল লেখক ভারতীও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।' জি গর্দান, এম-পি শিভসানম প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন।

পুস্তক প্রদর্শনী।। গত ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর রাঁচির কেনদ হলে বৃহৎ গ্রন্থের একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হল। হাজারিবাগ রিউনিসিপ্যালিটির চ্যারম্যান ডঃ এস এন রায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে প্রায় চার হাজার বই প্রদর্শিত হয়েছে। কয়েকদিন আগে পাতিয়ালাতেও অনুরূপ একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ কৃপাল সিং নারাং এর উদ্বোধন করেন। ডঃ এইচ কে মনমোহন সিং, এস সুরজিৎ শেঠি, এস হুকুম সিং প্রমুখও এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। প্রদর্শনীটি চারদিন সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে।

সেফেরিসের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ।। জর্জ সেফেরিসের কবিতার কিছু কিছু অনুবাদ ইংরেজিতে এর আগেও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি 'দি সেক্রেট পোয়েমস' নামে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি অনূদিত গ্রন্থ বেরিয়েছে। মূল গ্রীক থেকে অনুবাদ করেছেন কাইজার ও পল মার্চেন্ট। প্রখ্যাত সমালোচক কিমন ফ্রাইয়ার বইটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আলোচ্য অনুবাদে সেফেরিসকে সবচেয়ে বেশি চেনা যায়। অনুবাদকদের কৃতিত্ব এখানে যে, তাঁরা মূলের শব্দ, ছন্দ ইত্যাদিকেও ইংরেজিতে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, অনুবাদ ত্রুটিহীন। তবে এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনুবাদে একটা স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়।

পার্শিয়ান সাহিত্য সম্পর্কে।। পার্শিয়ান সাহিত্যের উপর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে। রইবেন লেভী লিখিত এই বইটির নাম 'এ্যান ইনট্রোডাকসন টু পার্শিয়ান লিটারেচার'। ইউনেসকো বইটিকে সম্মানিত করেছেন। বস্তুতপক্ষে পার্শী সাহিত্য সম্বন্ধে বিদেশীদের জানাবার পক্ষে এটি খুবই মূল্যবান। প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয়। এর পরবর্তী পরিচ্ছেদে পার্শিয়ান কবিতার গতি-প্রকৃতি এবং তারপর বিশিষ্ট লেখকদের উপর আলোচনা। এরকম একটি বই রচনার জন্য গ্রন্থকার যে সকলের অভিনন্দন লাভ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

সর্বাক

নতুন বই

বালজাক (জীবনী)—বজ্রেশ্বর রায়। প্রকাশ ভবন। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

বালজাক মারা গেছেন ১৮৫০ খৃঃ। আজও তাঁর বই নানান দেশের ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশ হয়ে থাকে। বিশ্বসাহিত্যের এই অবিস্মরণীয় পুরুষ আজও পরমশ্রদ্ধেয়। বালজাকের জীবন যেমন অস্থির, বেদনাময়, সমগ্র সৃষ্টিতেও পড়েছে তেমনি তাঁর যুগের ছায়া। সামন্ততন্ত্রী সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে হৃতসর্বস্ব মানুষের যে দুর্বিষহ জীবন, তার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। অকল্পনীয় উচ্চাশা, অভিজাত সমাজে স্থান পাওয়ার প্রলোভন, ঐশ্বর্যপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণ বালজাকের পরিণতিকে যে কি ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল, তাও একটি সার্থক উপন্যাসের মতই আকর্ষণীয়। বালজাক ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। কার্ল মার্কস বলেছেন, ধনবৈষম্যের রাষ্ট্র ও পরাক্রমী অভিজাত সমাজের অনিবার্য অবক্ষয় বালজাকের আগে এমন স্বচ্ছ চোখে আর কেউ দেখাতে পারেন নি। এ অবক্ষয়ের মূল্যায়ন ঐতিহাসিক, অর্থনীতিক, পরিসংখ্যানবিদ প্রভৃতির বহু মূল্যবান রচনা অনেকবার করে পড়েছি। কিন্তু এঁদের কাছ থেকে আমি যা শিখেছি তার থেকে ঢের ঢের বেশী শিখেছি বালজাকের উপন্যাস পড়ে। বালজাক তাঁর রচিত চরিত্রাবলীর মারফত যেন এক বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করে গেছেন। ইতিহাস রাজনীতি ধর্ম দর্শন—সব মিলে এক নতুন জগত যেন তিনি গড়ে তুলেছেন। এই দরদী কথাশিল্পী নিজস্ব দর্শনের আলোয় দেখেছিলেন জটিল পৃথিবীকে।' তাইন লিখছেন, 'তাঁর বই পড়তে পড়তে কষ্টের শব্দ উচ্চারণ করবে না এমন মানুষ কম। তাঁর রচনারীতি অতি ভাবভারাক্রান্ত এক জটিল শিল্প-শৈলী। সেখানে চিন্তাগুলি বারংবার পরস্পরের সংগে জট পাকিয়ে গেছে, নানা ভাবনার ভীড়ের মধ্যে তারা ক্রমাগত আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে...। তবু তারই মধ্যে থেকে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে অসংখ্য চরিত্র। জীবনে আমরা যাদের মুখোমুখি হই, ওইসব চরিত্রের ঘৃণা হিংসা ধিক্কার বিকৃতি ও ক্ষুধা তাদের চেয়েও অনেক বেশী বাস্তব ও বলিষ্ঠ। এই সব চরিত্রের অধিকাংশই নামে মানুষ, আসলে কীট-পতঙ্গ। তারা কেউ বীভৎস উকুন, কেউ বিষাক্ত বোলতা, কেউ হিংস্র মাকড়। সভ্যতার আস্তাকুঁড়ে তাদের জন্ম, সেখানেই তারা বাঁচছে, বাড়ছে—খুঁজছে, ছিঁড়ছে, গিলছে, ঢিবি করছে। আর সেই সব কিছুর উর্ধে স্বর্গ, নীতি, শিল্প বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের বজ্রমন্ত্রে উদ্বেলিত হয়েছে আর এক বিষম দুঃস্বপ্নের আশ্চর্য এক রূপকথার দেশ।" সেই রূপকথার দেশ আজও মন টানে পাঠকের। আজ বালজাকের পথ ধরে ফরাসী সাহিত্যের অভিনব শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যে চলেছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। কুশলী কথাশিল্পী বালজাক তাঁর কালের মানুষের আকুল ভাষায় যে ইতিহাসকে অঙ্কিত করে গেছেন আজও চলেছে তার বিশ্লেষণ।

বালজাকের জীবনকথা, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিটি পর্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। সেই জীবনের আলেখ্য তুলে ধরেছেন শ্রীবজ্রেশ্বর রায়। সমাজের অবক্ষয়কে ভিত্তি করে সংসাহিত্যের নামে লোমহর্ষ পরিবেশনা আজ যেখানে আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়ে শ্রীরায় এমন একজন মানুষের জীবনকথা রচনা করলেন, যিনি কলুষিত সভ্যতাকে অবলম্বন করে সার্থক শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্রীরায়ের বইটি সমাদর পাওয়ার যোগ্য। তাঁর ভাষা মনোজ্ঞ, রচনাভঙ্গী গতিশীল। বইটি পড়তে পড়তে লেখক বালজাককে যেমন চেনা যায়, তেমনি চেনা যায় মানুষ বালজাককে। এবং সেইসঙ্গেই স্পষ্ট অনুভব করা যায় তাঁর সময়কেও। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

থামো, সুন্দর মুহূর্ত (কাব্যগ্রন্থ)—শান্তিকুমার ঘোষ। বিশাখা, ২৮।১ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা—১৯। দু টাকা।

কবিতা বেশী না লিখলেও শান্তিকুমার ঘোষ শান্ত মেজাজের ভাবগম্ভীর কবি। কখনো তাঁকে সোরগোল করতে দেখা যায় নি। আবার কখনো অনুপস্থিতও মনে হয় নি কবিতার আসরে। এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই তিনি পাঠককে আকর্ষণ করেন নিজের দিকে। কথা বলেন আত্মগত সুরে।

এই সঙ্কলনের প্রথম কবিতা 'প্রবমরী চলে গেল'—যেন স্বপ্নাতুর কোনো প্রেমিকের উচ্চারণ। পাঠককে আবিষ্ট করেন তিনি অনায়াসে। যখন বলেন : 'বিস্ময়ের ঢেউ তুলে প্রবমরী গেল কালের বন্যায়'— তখনও কানে বাজে আরেকটি পংক্তি : 'এই গ্রহ থেকে ওই উপগ্রহে ডানায় ডানায় শুনি আকাশ-বিহার।'

মোট ত্রিশটি কবিতা উপহার দিয়েছেন তিনি এই গ্রন্থে। চিত্রকল্পবহুল প্রতিটি কবিতাই যেন স্পর্শকাতর, স্বল্পবাক একটি মানুষের মালায়ুখী অভিব্যক্তি ও আত্ম-সম্প্রসারণ। দু-একটি কবিতা হাল্কা ছন্দের আড়ালে কিছুটা লঘুতার স্বাদ এনেছে।

সম্ভবত 'থামো, সুন্দর মুহূর্ত' শান্তিকুমার ঘোষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম বই বেরুবার প্রায় এক দশক পরে এই সঙ্কলনটি বেরোয় মনে হয়। বইটি হাতে পেয়ে বাংলা কবিতার পাঠক তাঁকে একজন শক্তিমান কবি হিসেবে চিনে নিতে পারবেন।

একটি শিরশিরিন্দু (কাব্যগ্রন্থ)—সত্যব্রত রায়। কণ্ঠস্বর, ৯৩।২এ বিধান সরণী, কলকাতা ৪। তিন টাকা।

কবিতার প্রাণশক্তি কোথায় নিহিত? তার উৎস সন্ধানে সমালোচক তৎপরতা দেখান, কবি ভ্রূক্ষেপ করেন না। হয়তো এটাই সার্থক কবির লক্ষণ। সার্থক সমালোচকেরও। একজন সৃজনশীল, অন্যজন পর্যবেক্ষণরত। কবি সত্যব্রত রায় অতি-সাম্প্রতিকের যন্ত্রণায় পীড়িত হলেও সন্তোষ এবং সান্ত্বনা চেয়েছেন অতীতের কাছ থেকে। নবজন্মের আকাঙ্ক্ষায় তিনি বলেন : "অভিজ্ঞানে ছবি এঁকে মৌন প্রতীক্ষায়/খুঁজি এক বেহুলাকে—যে আমাকে নবজন্ম দেবে।" এই সঙ্কলনের একত্রিশটি কবিতায় কবি এমনসব উপমা ও চিত্রকল্প উপহার দিয়েছেন, যা পাঠককে মুগ্ধ করে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

এবং : (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা)—ডিসেম্বর, ১৯৭০। সম্পাদক অমিয় সিংহ ও গৌরী বন্দোপাধ্যায়। ২৩-এম, সরস্বতীবাগান লেন, কলিকাতা—২৭। মূল্য এক টাকা।

'এবং' পত্রিকাটি রচনা-গৌরবে ইতিমধ্যেই প্রশংসা অর্জন করেছে—বর্তমান সংখ্যাটি পরলোকগত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিতর্পিত। ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, উষা ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, শান্তনু দাস, নির্মলেন্দু গৌতম, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় সিংহ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুধু সাধা মামুলী ধরণের আলোচনায় পত্রিকাটিকে না সাজিয়ে সম্পাদক দুজন বিশেষ ধরণের রচনায় 'এবং'কে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তার জন্য তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য। এই সংখ্যার একটি মাত্র কবিতা সর্বরসের শরায়ণ, নামটিও তার নারায়ণ লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সাহিত্যপত্র হিসাবে 'এবং' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

বঙ্কিমচন্দ্র। নতুন বিশ্লেষণ

উনিশ শতকের ভারতীয় লেখকদের মধ্যে সোভিয়েতের মানুষের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই সবচেয়ে বেশী পরিচিত। রুশ পাঠক-পাঠিকারা তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করে ১৯২০ খৃঃ। সে-সময়ে 'ভোস্তোক' নামক একটি পত্রিকায় 'বন্দেমাতরম' প্রকাশিত হয়েছিল। আর বাংলা থেকে তা রুশভাষায় অনুবাদ করেছিলেন বিখ্যাত রুশ ভারততত্ত্ববিদ মিখাইল তুবিয়ান্সকি। তাতে অনুবাদকের একটি ভূমিকাও ছিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলো রুশভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে আছে 'রাজসিংহ', 'চন্দ্রশেখর', ('সাহেব আসছে' এই নামে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়) 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল।' আর অনূদিত হয় ছোটগল্প 'রাধারাণী' এবং 'ইন্দিরা।' তাছাড়া ব্যঙ্গাত্মক রচনা সংগ্রহ 'কমলাকান্তের দপ্তর'ও অনূদিত হয়। এই রচনা অন্য কোনো ভাষায় আগে কখনো অনূদিত হয়নি। কোনো ভারতীয় ভাষায়ও হয় নি। তার কারণ এই লেখা অনুবাদ করা খুবই কষ্টসাধ্য। এতে ভাষার এমন অপূর্ব কলাকৌশল আছে যা অনুবাদে আনা খুব শক্ত। রুশ অনুবাদক বরিস কারপুশকিনই প্রথম এই কঠিন কাজে হাত দিলেন এবং এই রচনার সমস্ত ব্যঙ্গ শ্লেষ এবং ভাষার আশ্চর্য শিল্পকে অনুবাদে রূপায়িত করে তুললেন।

বাংলা দেশের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও রচনা সম্পর্কে ভেরা নোভিকোভা যে গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করেছেন তা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকখানি বাড়ায়। এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সাহিত্যিক জীবন কি রকম ছিল, সে সম্পর্কেও এক গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। লেখিকা লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার কাজে রত। সেজন্য তাঁর খ্যাতিও সামান্য নয়। এবং এই গবেষণার কাজে তিনি বহু বছর কঠিন পরিশ্রম করেছেন। বহুদিন আগে, ১৯৫০ সালে, 'বঙ্কিমচন্দ্র'কেই তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি বেছে নেন। এই গবেষণা-গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি মহাফেজখানার নানা দলিলপত্র এবং পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। কাঁটালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালায় (১), এশিয়াটিক সোসাইটিতে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন পাঠাগারে এবং সংগ্রহশালাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর যেসব দুর্লভ সংস্করণ রক্ষিত আছে, সেইসব প্রাচীন সংস্করণগুলিও তিনি পাঠ করেছেন। তার মধ্যে এমন সংস্করণও আছে যা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হয়েছিল। সেইজন্য এই বিশ্লেষণ নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক হয়ে উঠেছে। একজন অসাধারণ লেখক এবং গণতান্ত্রিক মানুষ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে রুশ পাঠকদের কাছে উপস্থিত করে এবং তাঁর রচনাবলীর সাধারণ বিশ্লেষণ করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নিরূপণেই ভেরা নোভিকোভা ক্ষান্ত হননি, তিনি উনিশ শতকের মধ্য এবং শেষ ভাগের সামাজিক এবং সাহিত্যিক পটভূমিকে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন এবং লেখকের রচনায় সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যের যোগসূত্র

আবিষ্কার করেছেন। ('জাগরণ', 'দীনবন্ধু মিত্র', 'সংবাদদাতা', 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রথম বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক' প্রভৃতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

বঙ্কিমচন্দ্রের (২) জীবনদর্শনের জটিল প্রশ্নটিও ভেরা নোভিকোভা এড়িয়ে যান নি। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় অন্বেষারও পর্যালোচনা করেছেন। কি করে জাতি এবং শ্রেণী বিভাগের অবসান ঘটানো যায় তাঁর অন্বেষা সেই সমস্যার সমাধানের পথ সন্ধান করেছে। আর সে পথ তিনি খুঁজেছেন হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনের মধ্যে। ভাগবতগীতার একটা নতুন ধর্মীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যার মধ্যে এবং এসবের ভিত্তিতে একটা নতুন ধর্ম, নব হিন্দুধর্ম সৃষ্টির মধ্যে। সে 'ধর্ম' হবে দেশপ্রেমের ধর্ম, দেশকে ভালবাসার ধর্ম।' বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ-চরিত্র' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে ভেরা নোভিকোভা দেখিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিশেষ অবস্থায় জনগণের সামাজিক এবং জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ধর্ম একটা কার্যকর অস্ত্র বলে মনে হয়েছিল। তখনও মধ্যযুগীয় অবস্থার অবসান ঘটেনি। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের সূচনার দিকে বহু ভারতীয় পাতি বুর্জোয়া দেশপ্রেমিক এবং গণতান্ত্রবাদী এই চিন্তাধারারই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ভেরা নোভিকোভার বইটিতে তিনটি প্রবন্ধ আছেঃ 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (জীবনী ও তৎসংক্রান্ত টিকা), 'বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র' এবং ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্র)।'

পূর্ববর্তী যেসব বাঙ্গালী এবং বিদেশী সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই শিক্ষক, গণতন্ত্রবাদী এবং দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রকে উপেক্ষা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণার এই অভাবের দিকটা ভেরা নোভিকোভা প্রবন্ধকার ও প্রকাশক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে পূরণ করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শিক্ষক, প্রচারক এবং সম্পাদক হিসেবে তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রভাব তাঁর সময়ের বাংলা দেশের সাহিত্যিক এবং সামাজিক জীবনের উপর প্রচণ্ডভাবে পড়েছিল। এবং এই প্রভাব ভারতের জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। বইটির এই অংশ পাঠ করলে একটি প্রতিভাবান মানুষের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একজন অনুপ্রাণিত মানুষের ছবি ভেসে ওঠে। তিনি বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনি ফরাসী শিক্ষা এবং ইউরোপীয় ভাববাদী সমাজবাদের বীজ প্রথম বাংলা দেশের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একজন অসাধারণ সমালোচক, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয়ের জ্ঞানসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ, দেশের একজন পণ্ডিত ঐতিহাসিক এবং একজন জননেতা যাঁর প্রবন্ধাবলীর বিষয়বস্তু ছিল দেশের সমসাময়িক সমস্যা (কৃষকদের অবস্থা, নারীজীবনের দুর্গতি, জাতীয় সম্পদের লুণ্ঠন, শিক্ষার সমস্যা, বেকারী ইত্যাদি বিষয়ে)।

ভেরা নোভিকোভা তাঁর গবেষণা-গ্রন্থের অনেকটা জায়গা জুড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। এই উপন্যাসগুলো শুধু যে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তা নয়, এই উপন্যাসগুলো জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণাস্থলও। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংগ্রামের কাহিনী ঐসব উপন্যাসে উপস্থিত করা হয়েছে। এবং তাতে জ্বলন্তভাবে যেন দেশের বীরত্বপূর্ণ অতীতের সংগে পরাধীন অপমানকর বর্তমানের তুলনামূলক রূপ ফুটে উঠেছে। আর এভাবেই স্বদেশবাসীর মনে তিনি দেশাত্মবোধ ও জাতীয়-চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিতরা এইসব উপন্যাসের মূল্যায়ন সম্পর্কে আজও একমত নন। সুকুমার সেন, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কিন্তু ভেরা নোভিকোভা তাঁদের সংগে একমত নন। পক্ষান্তরে তিনি জোর দিয়ে এটা বলতে চেয়েছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তার নিজস্ব ধারণা তৈরি করেছিলেন আর তা তৈরি হয়েছিল ইউরোপের রোমান্টিক উপন্যাস লেখকদের রচনা পাঠ করে (যেমন ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস)।

'রাজসিংহ', 'আনন্দ মঠ', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর' এবং অন্যান্য উপন্যাস বিশ্লেষণ করে নোভিকোভা দেখিয়েছেন যে অতীতের যেসব ঘটনাবলী ইতিহাসে স্থান পেয়েছে সেই ইতিহাস রচনার মধ্যে কোন শিক্ষার ব্যাপার নেই কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের উপাদানকে ব্যবহার করেছিলেন গভীর অনুভূতি মিশিয়ে এবং একজন খাঁটি শিল্পীর মত অতীতের বিস্মৃত অথবা বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাবলীকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। নোভিকোভা আবার এটাও দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত প্রাচীন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তারা যে শুধু শিল্পসম্মত তাই নয়, লেখক সমকালের মনস্তত্ত্বকে সেসব চরিত্রে প্রয়োগ করেছেন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অদল-বদল করেছেন এবং সেই সমস্ত ঘটনাবলীর পরম্পরা রক্ষা করেননি। নোভিকোভা 'রাজসিংহ' এবং 'আনন্দ মঠ' বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র এসব করেছিলেন শিল্পসম্মত এবং দেশপ্রেমিক ভাবধারাকে আরো সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে।

প্রবন্ধ লেখিকা অনেক জটিল এবং কঠিন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। প্রাচ্য সাহিত্যের সেসব সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয়নি। আর তা হল লেখকের শিল্প পদ্ধতির সংগে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের সমস্যা।

ভেরা নোভিকোভা উপসংহারে বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি ঐতিহাসিক বাস্তবকে নিজের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলেন। তিনি যেভাবে ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করেন, নায়কদের চরিত্র কাব্যমণ্ডিত করেন, তার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রগতিশীল রোমান্টিক লেখকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

—ইলেনা আক্‌সুতিন

---

(১) লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিষয়ক গ্রন্থাগারে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর একটি সংকলন রক্ষিত আছে। একদা এই সংকলনটির মালিক ছিলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট রুশ ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ইভান মিনায়েভ। গ্রন্থে লেখকের হস্তাক্ষর দেখে মনে হয় যে অধ্যাপক মিনায়েভ যখন ১৮৭০ এবং ১৮৮০ সালে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, লেখকের সংগে তখন তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। চোখের সামনে তুলে ধরেছেন এবং লেখকের রচনার সংগে প্রাচীন ঐতিহ্যের যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন। ('জাগরণ', 'দীনবন্ধু মিত্র', 'সংবাদদাতা', 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রথম বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক' প্রভৃতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

(২) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর সূচনার দিকে বাংলা দেশের সামাজিক চিন্তা' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে ভারততত্ত্ববিদ এরিক কোমারোভ বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার পর্যালোচনা করেছেন (ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের অবদান বিষয়ে ১৯৫৮ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্র) এবং ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ পত্রিকায় প্রকাশিত এলিজাভেতা পারেভস্কিয়ার 'বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামত' প্রবন্ধ।

বইকুণ্ঠের খাতা

গবেষণার অতীত-বর্তমান

'গবেষণা' বস্তুটি ইদানীং অনেক সহজ, অথচ এককালে তা ছিল না। ছিল অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের অবিরল আগ্রহ। আশু প্রাপ্তির কোনো আশা না রেখেই আগেকার দিনের সাহিত্যপ্রাণ মানুষেরা একেকটি বিষয়ের পেছনে নিজেদের নিযুক্ত রাখতে পারতেন দীর্ঘকাল। তাঁদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, একালীন অনেক গবেষক সম্পর্কে অনীহা জাগে। কেন, কি কারণে যে তাঁরা ডক্টরেট পান—তাই বা কে বলবে? তাঁদের পাশাপাশি আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কিম্বা আচার্য যদুনাথ সরকারের নাম করতে গেলে কেমন যেন কষ্ট হয়। কেউবা ইংরেজীর লোক হয়ে ইতিহাসের চর্চা করেছেন, কেউবা প্রাচীন কিম্বা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের। তাঁদের সামনে ডিগ্রী-ডিপ্লোমার প্রলোভন তো নয়ই, ডক্টরেটের অদৃশ্য হাতছানিটিও ছিল না।

অর্থাৎ সেকালে ছিল নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা, যা আজকের দিনে একান্তই দুর্লভ। বিষয়ের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না হওয়া পর্যন্ত কখনো কেউ হঠাৎ করে কিছু লিখতে বসতেন না। এই তো সেদিন ক্ষুদিরাম দাস যখন 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' লিখছিলেন, তখন তাঁর সামনে ডি-ফিল, ডি-লিট-এর আমন্ত্রণ ছিল না বলেই মনে হয়, সে বই হাতে পেয়ে অনেকের কাছে একটি 'গবেষণা গ্রন্থ' বলেই মনে হয়েছিল।

এখন অভিযোগটা দীর্ঘস্থায়ী আক্ষেপ-এর চেহারা নিচ্ছে। ভয় হয়, কেউ না কুৎসা ছড়াবার দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করে বসেন। প্রায়শ দেখতে পাচ্ছি, একেকটা গবেষণা গ্রন্থ বেরুচ্ছে আর বাংলা সাহিত্যের পাঠক ততোধিক বিমুখতায় সে সব বই সম্পর্কে অনাগ্রহী হয়ে পড়ছেন। নতুন কিছু পাবার জন্যে যে-পাঠক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, তাঁদের দাবীটাকে তো একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। উপেক্ষা করবোই-বা কেমন করে?

সেদিন জনৈক তরুণ অধ্যাপক ক্ষোভের সঙ্গে বলছিলেন : 'তথ্যসন্ধান ছাড়া যে গবেষকের আর কিছু করণীয় আছে, তা বোধহয় আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিখে আসতে পারি নি, পারছি না। গতকালের বিষয়কে যে বর্তমানের আলোকে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে, নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া দরকার—সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি গবেষকেরা। নতুন চিন্তাকে অভ্যর্থনা জানাবার মতো মানুষও কেন কমে যাচ্ছে?'

অভিযোগ করে তিনি বললেন : 'এজন্যে দায়ী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দিকে দেখুন, চাকুরী ক্ষেত্রে সকল শিক্ষকেরা ওখানে অধ্যাপনা করেন, কিন্তু ব্যবস্থার অদল-বদলে প্রায় সকলেই গররাজী—চিন্তা-ভাবনায় একেবারে অচল অনড়। রবীন্দ্রনাথের শেষ কয়েক বছর ও সভ্যতার সঙ্কট নিয়ে যদি কেউ গবেষণা করতে চান, তা হলেই অনেকে ঘাবড়ে যাবেন। আধুনিক কবিতা কিম্বা ছোট গল্প নিয়ে তো ওঁরা মহাফাঁপরেই পড়বেন। যদি-বা কোনো অধ্যাপক এসব বিষয় নিয়ে গবেষণার অনুমতি দেনও, তাহলেও তাঁর রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূল না হলে সেই থিসিস-এ কেউ ডক্টরেট পাবেন—এমন কথা কোনো গবেষক ভাবতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা থামওয়ালা বাড়ীগুলি ভেঙে গেছে, কেবল তার স্মৃতি বয়ে অনড় থাকতে হবে তরুণতম অধ্যাপকদেরও।'

আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি নি। একেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ অধ্যাপকদের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা নতুন চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বলেই জানি। কেবল ইউনিভার্সিটির দোষ দিয়ে এ সমস্যার প্রতিকার হবে বলে মনে হয় না, নিজেদের জড়ত্বকেও সঙ্গে সঙ্গে ঘোচাতে হবে। সতীনাথ ভাদুড়ী কবে মারা গেছেন, তবু তাঁর ওপরে গবেষণা করার মতো একজন তরুণের আবির্ভাব হলো না। রমেশ সেন, জগদীশ গুপ্তের ছোট গল্প নিয়ে কি আজও কেউ থিসিস করেছেন, না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেই তেমন কোনো গবেষণা হয়েছে? জানি, হওয়া দরকার বললেই হয় না, গবেষণা গ্রন্থটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও গবেষককে ভাবতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় রেফারেন্স বই হিসেবে স্থান পাবে কিনা তাই নিয়ে মনে-মনে অঙ্ক কষতে হয়।

যাঁরা এই সব সুবিধা এবং প্রলোভনকে জয় করতে পারেন, তাঁরা শুধু পাঠকের কাছ থেকেই প্রশংসা পান না, অনতিপ্রকাশ্য সত্যকে অনাবৃত করে নিজেরাও তৃপ্তি পান। তাতে সাহিত্যেরও কিছু কাজ হয়। আবিষ্কারের আনন্দটা তাঁদের অবশ্যপ্রাপ্য।

হিমাংশুভূষণ সরকার ও রবীন্দ্রনাথ

তেমনি একজন মানুষ হিমাংশুভূষণ সরকার, যিনি প্রায় সারা জীবন নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছেন ভারত ও বহির্ভারতে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধানে। আজ থেকে বহুকাল আগে, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তিনি একটি বিস্তৃত গবেষণামূলক বই লিখেছিলেন—'ইণ্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্সেস অন দি লিটারেচার অব জাভা অ্যাণ্ড বলি' নামে। রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে তাঁকে লিখেছেন :

'পশ্চিম ভারত ভ্রমণে বেরোবার মুখে তোমার 'ইণ্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্সেস অন দি লিটারেচার অব জাভা অ্যাণ্ড বলি' নামক বইখানি পেয়ে রাস্তায় যেতে-যেতে পড়েছিলুম। অনেক কাল থেকেই এই রকম বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করেছি। অবশেষে এখানি পেয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হলো। এতে যে সুবিস্তৃত গবেষণার পরিচয় পেয়েছি তা আমাদের দেশে দুর্লভ। এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আলোচনায়

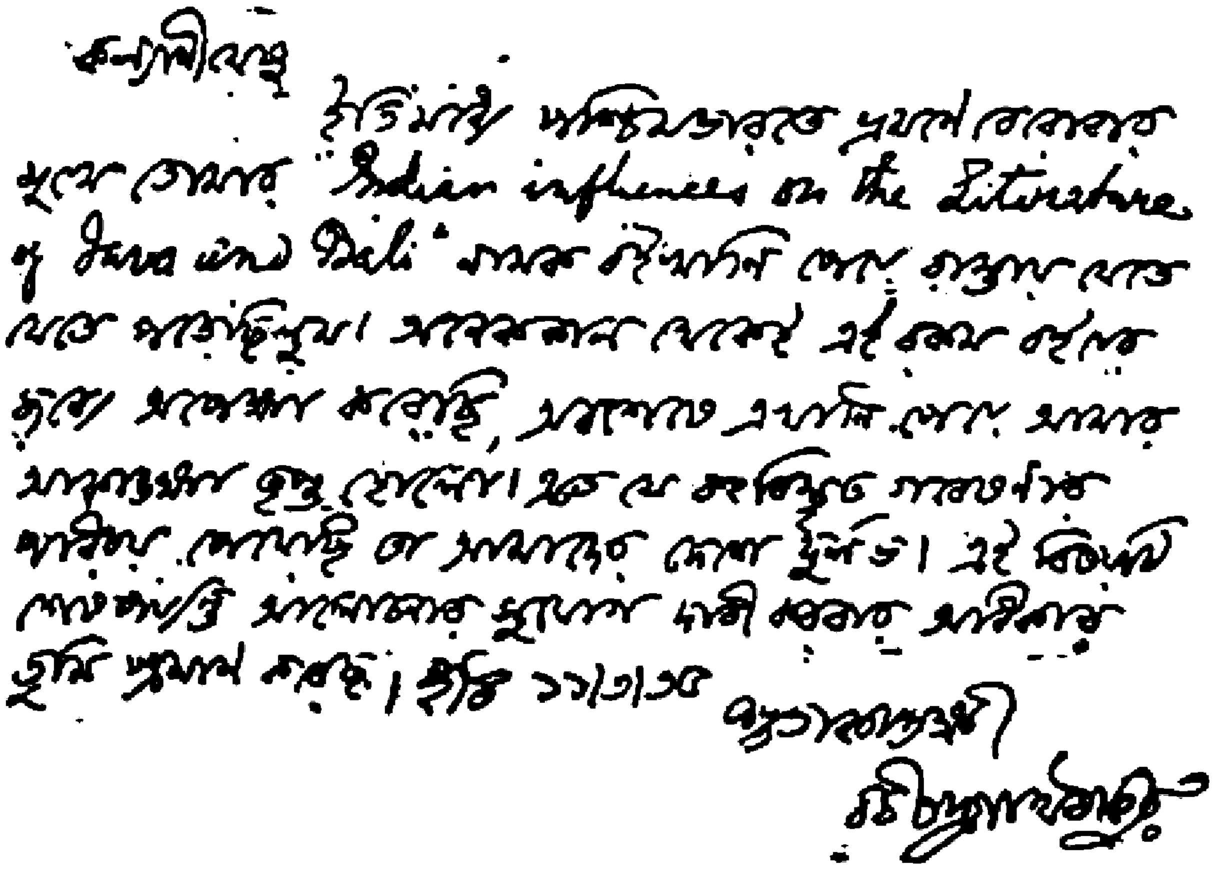
কল্যাণীয়েষু
ইতিমধ্যে পশ্চিমভারতে ভ্রমণে বেরোবার মুখে তোমার "Indian influences on the Literature of Java and Bali" নামক বইখানি পেয়ে রাস্তায় যেতে যেতে পড়েছিলুম। অনেককাল থেকেই এই রকম বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করেছি, অবশেষে এখানি পেয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হোলো। এতে যে সুবিস্তৃত গবেষণার পরিচয় পেয়েছি তা আমাদের দেশে দুর্লভ। এই বিষয়টি শেষপর্যন্ত আলোচনার সুযোগ দেশী লেখকের আজিকার তুমি প্রদান করছ। ইতি ১১।৩।২৫
শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

সুযোগ দাবী করবার অধিকার তুমি প্রমাণ করেছ।'

মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের এমনি আরো কিছু চিঠির কথা। আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' পড়েও তিনি খুশি হয়েছিলেন, লেখককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বহুমুখীতার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক, নতুনতর চিন্তার দিকে নজর। যেন সাহিত্য ও সমালোচনার অনুশো দেয়ালগুলি তিনি খুলে দিতে চেয়েছিলেন এবং কেউ সে কাজে অগ্রসর হলে তিনি খুশি হতেন।

ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ, গল্প-কবিতা-উপন্যাস লেখার ফাঁকে-ফাঁকে, সৃজনশীল সাহিত্যের সমান্তরাল বলে ভাবতে চেয়েছিলেন এই সব মহৎ কর্তব্যকে। একটি ভাষাকে অপুষ্টি ও রুগ্নতার হাত থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন লোকসাহিত্যের পুনরুদ্ধারে, প্রাচীন ছড়া-গান-রূপকথা-উপকথার সংগ্রহে নানাজনকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন শিশুসাহিত্যের অসাধারণ বইগুলি। রূপকথা ও উপকথার স্বাভাবিক সারল্যকে বজায় রাখার জন্য বুড়ো-বুড়ী ও গ্রাম্য মহিলাদের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুর মা'র ঝুলি' সেজন্যেই তাঁর ভালো লেগেছিল। সাহিত্য পরিষদের মারফতেও তিনি সে চেষ্টাই করেছিলেন। আজকের দিনের কোনো কবি-সাহিত্যিকের কি এই দায়িত্ব-বোধ আছে, না, তাঁরা বর্তমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হতে পারেন?

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশিষ্ট ছিলেন না, মহৎ এবং ব্যাপ্ত ছিলেন। হিমাংশুবাবুর বইটি হাতে পেয়ে সেজন্যেই তিনি, বিস্মিত না হয়ে পারেন নি, আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। হিমাংশুবাবুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এমন এক নিরলস গবেষককে, যিনি কেবল অতীতের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ নন, সাহিত্যের দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন একটিমাত্র গ্রন্থ লিখে। এর আগে বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে আর কোন বই লেখা হয় নি। পরেও, তাই হয়ে রইল অনন্য এবং অদ্বিতীয়। বইটি বের করেছিল, 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি' বা বৃহত্তর ভারত-পরিষদ।

হিমাংশুবাবু দুঃখ করে লিখেছেন : 'এই বিষয়ে গভীরতর মৌলিক গবেষণার পথ যেন ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতেছে।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-কয়টি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা স্বাধীনতার যুগে নির্মমভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। অথচ একদিন এই আয়োজন [illegible] প্রাণের নিবিড়তম [illegible]।'

উদ্ধৃত [illegible] একান্ত আন্তরিক। তাঁর এই আক্ষেপের কারণ।

ভারতের মতো দরিদ্র দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা, জানি না। তবে বাংলা কিম্বা ইংরেজী ভাষায় অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখতে পারলে সাধারণ পাঠকও উৎসাহিত হতেন। ইউরোপ-আমেরিকা এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছে রাজনৈতিক কারণে।

কিন্তু কে এই হিমাংশুভূষণ সরকার? কী তাঁর পরিচয়?

সাধারণ পাঠক তাঁকে জানেন না, বিশিষ্টরা চেনেন। ১৯০৫ খৃঃ তাঁর জন্ম, ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ইতিহাসে এম-এ পাশ করেছেন প্রথম শ্রেণীতে। একেবারে আচার্য যদুনাথ সরকারের বিপরীত। যদুনাথ সরকার এম-এ পাশ করেছিলেন ইংরেজীতে, চর্চা করেছেন ইতিহাস। আর হিমাংশুবাবু ইতিহাসের ছাত্র হয়েও তাঁর গবেষণার বিষয় হলো সাহিত্য এবং সংস্কৃতি। ১৯৪২ থেকে ৪১ খৃঃ অবধি তিনি মাণিকগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তারপর থেকে কাজ করে আসছেন খড়গপুর কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে। ১৯৬৪ খৃঃ অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শাখা-সম্পাদক হিসাবে যোগদান। তাঁর লেখা পঞ্চাশটিরও বেশী বই ও প্রবন্ধ ভারত ও ইউরোপ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য

'দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য' হিমাংশুভূষণ সরকারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বই, বোধহয় শেষতম দীর্ঘ রচনা। 'ইণ্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্সের অন দি লিটারেচার অব জাভা অ্যাণ্ড বলি'র আন্তর্জাতিক সমাদর, সম্ভবত তাঁকে এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ উৎসাহ জুগিয়েছে।

এ ছাড়া আছে অন্য একটি কারণ।

তিনি লিখেছেন : 'প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন যবদ্বীপীয় ও মালয় ভাষার অধ্যাপক ডাঃ হুইকাশ আমাকে ইংরেজী গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই অনুরোধের পটভূমিকায় ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহের প্রতি গভর্নমেন্টের সাম্প্রতিক উৎসাহের কথা স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় লিখিয়াছিলাম।'

তবু এ বই তাঁর ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ নয়, সারসংক্ষেপও নয়, পুরনো উপাদান ও নতুন গবেষণার ভিত্তিতে লেখা সম্পূর্ণ নতুন বই। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ইংরেজী বইটিরও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কথা। কিন্তু অন্য বিষয়ে লেখালেখি নিয়ে [illegible] ইংরেজী বইটি বেরুতে পারে নি।

[illegible] সমগ্র পৃথিবীর [illegible] সে-বইয়ের ওপর নির্ভর করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে চিনেছেন, রবীন্দ্রনাথ যে-বইয়ের অন্যতম পাঠক হিসেবে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, সে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুলো না ছত্রিশ বছর পরেও? বিচিত্র এই দেশে বসে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর গবেষণা করেছেন দ্বীপময় ভারতের সাহিত্য সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন : 'এই গ্রন্থে আমার ৩৫ বৎসরের গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বীপময় ভারতের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সুদীর্ঘকালে যে গবেষণা বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় হইয়াছে, তাহার আধুনিকতম পরিচয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।'

একটি কথা বলা প্রয়োজন। বইটি লেখার প্রধান প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রমণসঙ্গী ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে। কিন্তু বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে পঠন-পাঠনে তাঁর দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর তত্ত্বাবধানেই তিনি শুরু করেছিলেন গবেষণার কাজ। বই লিখেও তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে উদাসীন হন নি।

বইটি উপসংহারসহ বাইশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। দ্বীপময় ভারতের ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃতের স্থান, বৈদিক সাহিত্য, মন্ত্র-সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও মহাকাব্য, ছায়া নাটক, পশুদের গল্প, ইতিহাস ও কিম্বদন্তী প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কিভাবে স্থানীয় সংস্কার ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সমাহার ঘটেছে জাভা ও বলিদ্বীপে। দেখিয়েছেন রামায়ণ-মহাভারতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব পড়েছে সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক জীবনে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত হয়েছে আলোচনার সূত্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর পরিবর্তিত, ইন্দোনেশীয় ভাষান্তর ও প্রভেদগুলি তিনি দেখিয়েছেন ঘটনার পর ঘটনা, বর্ণনার পর বর্ণনা করে। ভারতীয় হিতোপদেশের গল্পগুলি জাভা-বলিদ্বীপের মানুষ যেভাবে গ্রহণ করেছে, তাও আলোচিত হয়েছে উদাহরণসহ।

একটি জাগ্রত মন ও একাগ্রতাই গবেষককে সার্থকতার পথে এগিয়ে দেয়, পরবর্তীকালে স্মরণীয় করে তোলে। এই বইটি উপহার দেবার জন্যে আমরা হিমাংশুবাবুকে অভিনন্দন জানাই।

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ : যাঁরা 'দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য' পড়তে চান, তাঁরা যদি তাঁর 'হিন্দু যুগে দ্বীপময় ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা' নামে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত বইটি পড়ে নেন, তাহলে বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়া তাঁদের পক্ষে সহজতর হবে। কেননা, নাটক-উপন্যাস-নোটবই প্লাবিত বাংলা দেশে এ বইয়ের প্রকাশক জোটানো যায় নি দীর্ঘ চার বছর। স্বভাবতই লেখক স্তিমিত উৎসাহে শঙ্কিত হয়ে এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদটিকে স্থানচ্যুত করে প্রকাশ করেছিলেন ঐ নামে। —গ্রন্থদর্শী

CENTRAL LIBRARY

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

(সাত)

ঘরে ঢুকেই মনে হলো, আমি পাল্টে গেছি। ঠিক যে সাগর চট্টোপাধ্যায় ডকটর সরকারের বাড়ীতে ডিনার খেতে গিয়েছিল, আমি যেন সেই সাগর নই। যে চৌকিদার সেলাম দিয়ে আমার ঘরের দরজা খুলে দিল, ঘরের আলো জেলে দিল, খাবার জলের ফ্লাস্ক রেখে গেল, তার কাছে আমি ঠিকই আছি। একটুও বদলাই নি। কিন্তু আমি নিজেই যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছি।

অস্বস্তি?

না না অস্বস্তি কেন হবে? চাপা দুঃখের জ্বালা বোধ করছি না তো?

একটু ভাবলাম। বসে বসে, পায়চারী করতে করতে ভাবলাম। না, তা নয়। তবে কি আনন্দ? ডকটর সরকার আর বুলা যথেষ্ট আদর-যত্ন করেছেন ঠিকই। দুজনের সঙ্গেই গল্পগুজব করে ভাল লেগেছে তবে...

তবে কি?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

চেয়ারে বসে জুতো পরা পা দুটো টেবিলে তুলে দিলাম। এবার পকেট থেকে আমার প্রাণ বন্ধু সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা ধরালাম।

আঃ! কি আরাম!

ঘুমের মধ্যে গ্লুকোজ ইনজেকশন দেবার পর ঘুম ভাঙলে যেমন একটু বেশী সতেজ, প্রাণবন্ত মনে হয় অথচ কারণটা বুঝা যায় না—আমার কি সেইরকম কিছু হলো?

মহা আনন্দে সিগারেট টানছি আর ভাবছি, ভাবছি আর সিগারেট টানছি।

আমি তো নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম, ঘুমুবার অবকাশ পেলাম কোথায়? সাধু-সন্ন্যাসীরা জেগে জেগেও ভাবান্তরের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, কিন্তু আমি তো মহাপ্রাণ মহাত্মা নই। আমি সাগর। মাগোর মানিক, মামার মানিক, জয়াদির মানিক, মানসীর মানিকদা...

সিগারেট টানতে গিয়েও টানলাম না।

বুলার চালচলন কথাবার্তার ধরণ অনেকটা মানসীর মতন। তাই না?

এবার সিগারেটে টান দিয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম।

হাঁ, তা বেশ একটু মিল আছে। আস্তে আস্তে অল্প অল্প কথা বলা, ঠোঁট চেপে একটু একটু হাসি। মানসী কোনদিন একসঙ্গে বেশী কথা বলত না, বুলাও বলে না। ছোট ছোট কাটা কাটা কথা।

শেষবারের মত সিগারেটে টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিতে দিতে মনে পড়ল, সব চাইতে বেশী মিল হাঁটাতে। লম্বা বিনুনিটা দুলিয়ে দুলিয়ে বুলা যখন হাঁটছিল, আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। আমি নেহাত জানতাম যে ও ডকটর সরকারের মেয়ে বুলা! হঠাৎ অন্য কোন মেয়েকে পিছন থেকে অমন করে হাঁটতে দেখলে হয়ত ভুল করে ডাক দিতাম, মা-ন-সী!

শিলচরে আমাদের বাড়ীতে সারা নাজিরপট্টীর মেয়েরা আসত। উকিলপট্টী থেকেও বহু মেয়ে আসত। মাগো আমাকে পেয়ে অনেক দুঃখ ভুলেছিল, কিন্তু বড় সখ ছিল একটা মেয়ের। সারা পাড়ার মেয়েরা এসে কি উৎপাতই করত! বাপরে বাপ! তবু কিছু বলার উপায় ছিল না। না আমার, না মামার। আমি আমার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে মেয়েদের দেখতাম, কিন্তু একটাও মানসীর মত হাঁটতে চলতে পারত না। পুকুরের জলে হাঁস ঘুরে বেড়াবার সময় যেমন পিছন দিকে ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর ঢেউ তুলে যায়, মানসী হেঁটে গেলেও যেন ঠিক ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর ঢেউ উঠত। আর সেই ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়ের আঘাতেই আমার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠত। আমি অস্বস্তি বোধ করতাম, চাঞ্চল্য বোধ করতাম। আমার ভাল লাগত। বেশ ভাল লাগত।

কোন কারণে মানসী যখন আমার ঘরে আসত আমি ওকে বলতাম, হাউ গ্রেসফুলি ইউ ওয়াক।

'তার মানে?'

'তুমি হাঁটলে ভারী সুন্দর লাগে।'

'কেন, এমনি সামনা-সামনি বুঝি খারাপ লাগছে?'

'তা তো বলছি না তবে...

আমি আর কিছু না বলে শুধু ওর দিকে তাকাতাম। ও কি বুঝত জানি না, তবে মুখে বলত, আজকাল বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠছ দেখছি।

আমি তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি। সাঁতো ওস্তাদ হতে সুরু করেছি। কিন্তু ও তো তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। সবই বুঝত।

আমি না হয় অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতাম কিন্তু মাগো?

'মানসীকে দেখলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি জানতে চাইতাম, কেন মাগো?

'আমার যদি অমন একটা মেয়ে হতো?'

আমি মজা করে বলতাম, ওর চাইতে অনেক ভাল মেয়ে তোমার পুত্রবধূ হবে।

'সঙ্গে সঙ্গে মাগো বলত, ওর চাইতে আবার ভাল কি হবে রে?

মানসীর রূপ-গুণের বর্ণনা করার শেষে মাগো বলত, মেয়েটার হাঁটা-চলা কথাবার্তা কি সুন্দর। সব কিছুতেই একটা সৌন্দর্য আছে।

শুধু রূপ-যৌবনই নয়, মেয়েদের হাঁটা-চলাও যে সৌন্দর্য তা জয়াদিকে দেখে প্রথম বুঝেছিলাম। আমি জয়াদির চাইতে অনেক ছোট ছিলাম, তবু ওর হাঁটা-চলা দেখতে আমার ভীষণ ভাল লাগত। কলেজ টিলার মোড়ে মোড়ে কলেজের বড় বড় ছেলেরা কি এমনি এমনি জটলা করত? আমি তখন কলেজে না পড়লেও বেশ বুঝতাম ওরা জয়াদিকে দেখত। জয়াদির হাঁটা-চলা দেখত।

বুলাকে দেখে, বুলার হাঁটা-চলা দেখে এত কথা মনে পড়ল?

তাই কি আমার এই চাপা আনন্দ? উত্তেজনা? অস্বস্তি?

একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে। তবে বুলার কথা ভাবতে ভাল লাগছে। বেশ সহজ সরল আলগোছা হয়ে মিশতে পারে। কোন আধিক্য নেই, চাঞ্চল্য নেই অথচ বেশ নিবিড়। শুধু সৌজন্য নয়, তার সঙ্গে আরো কিছু। আর এই আরো কিছুটাই যেন ওর বৈশিষ্ট্য।

আরো কিছুক্ষণ গল্প করলে বেশ হতো। ওরা দুজনেই তো বার বার বলছিলেন। আমিই তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম। এত তাড়াহুড়ো করে না এলেই ভাল হতো।

চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। ঘরের মধ্যেই একটু পায়চারী করলাম। তারপর কি মনে হলো। ড্রইং-রুম পার হয়ে সামনের বারান্দায় এলাম। দরজা বন্ধ। চৌকিদার দরজা বন্ধ করে পোর্টিকোতে বেঞ্চে পেতে শুয়েছে। দরজার পাশেই টেলিফোন।

টেলিফোন!

একবার টেলিফোন করব? এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের কাছে, কিন্তু নম্বর? নম্বর তো জানা নেই।

তাতে কি হলো? ঐ তো পাশেই টেলিফোন ডাইরেক্টরী। আর ডাইরেক্টরীতেও যদি না থাকে তবে এনকোয়ারিতে জেনে নিলেই হবে। কিন্তু...

এত রাতে টেলিফোন করব? একটু আগে করলেই ভাল হতো।

টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবছি। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে বসে আকাশ-পাতাল না ভেবে একটা টেলিফোন করলেই ভাল হতো। মজা হতো।

আবার ভাবছি, একবার কানেকশন নিয়েই দেখা যাক না কি হয়। বুলার বিছানার পাশেই তো টেলিফোন! আমি তো মোড়াটায় না বসে ওর বিছানায় বসেই টেলিফোনে ডক্টর সরকারের সঙ্গে কথা বললাম। টেলিফোনের বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ও রিসিভার তুলে কথা বলে তাহলে তো ঠিকই আছে। যদি দেখি বেল বেজে যাচ্ছে তাহলে টেলিফোন নামিয়ে রাখব।

কিন্তু এত রাতে?

এতক্ষণে মনে পড়ল হাতের ঘড়িটা দেখলেই হয়। মোটে সওয়া দশটা! এমন আর কি রাত হয়েছে?

আবার চিন্তা-ভাবনা লণ্ডভণ্ড করে হঠাৎ আমার সামনের টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি চমকে উঠলাম, কিন্তু কি যেন কি কারণে রিসিভার তুলে নিলাম, হ্যালো!

'চ্যাটার্জী সাব হ্যায়?'

মেয়ের গলা শুনে আমার প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম হলো। কোনমতে সামলে নিয়ে বললাম, কথা বলছি।

'আমি বুলা।'

মনে মনে বললাম, দেখেছ আমার মনের [illegible] প্রাণের টান? তোমার কথাই ভাবছিলাম...

'বলুন কি খবর?'

'টেলিফোন বাজতে না বাজতেই আপনি ধরলেন, কি ব্যাপার?'

এতক্ষণে আমি স্বাভাবিক হয়েছি। মজা করে বললাম, আমি জানতাম একটু নি আপনার টেলিফোন আসবে।

'জানতেন?'

'নিশ্চয়ই?'

'গেস্ট হাউসে গিয়েই বোধহয় আপনার খেয়াল হয়েছে?'

কি বলছে ও? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

'খেয়াল আবার কি হবে?'

বুলা যেন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে এখনও খেয়াল হয়নি?'

'কি খেয়াল হবে বলুন তো?'

'বেসিনে হাত ধোবার সময় আংটি খুলে রেখেছিলেন, মনে আছে?'

এতক্ষণে বুঝলাম।

আমি তাড়াতাড়ি ডান হাতটা দেখে বললাম, তাই তো!

আংটিটা আমার নয়, মাগোর। মাগো বলত এখন তুই এটা পর কিন্তু তোর বউ এলে এটা তারই হবে।

আমি বলতাম, তোমার নীচের ট্রাংকে যে গয়নাগুলো আছে, সেগুলো আমার বউকে দেবে না?

মাগো হাসত।

নীচের ট্রাংকের গয়নাগুলো আর নেই। সংসারের প্রয়োজনে সেসব গিয়েছে। শুধু এই আংটিটাই আছে। এটা আমি কিছুতেই হাতছাড়া করি না। সত্যি যদি কোনদিন দিয়ে করি তাহলে...

শুতে যাবার আগে বেসিনে জল খেতে গিয়ে দেখলাম আংটিটা পড়ে আছে। বুঝলাম আপনারই হবে...

'আপনি শুয়ে পড়েছেন?'

'না তবে বিছানায় বসে বসেই টেলিফোন করছি।'

'আপনার বাবা শুয়েছেন?'

বুলা হাসল। 'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাবা শুয়ে পড়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বাবা বেশী রাত জাগতে পারেন না।'

'আপনি বুঝি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন?'

'অনেক রাত নয়, তবে বাবার মত খাওয়া-দাওয়ার পর পরই ঘুমুতে পারি না।'

এতক্ষণ কথা বলা কি ঠিক হচ্ছে?

'যাইহোক, অশেষ ধন্যবাদ। এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'ধন্যবাদের কি আছে? কাল এসে আংটিটা নিয়ে যাবেন।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবলাম, শুধু আংটিটা আনতে যাব তোমার কাছে? আংটিটা তোমার কাছে থাকলেই বা ক্ষতি কি? আমি যাব তো নিশ্চয়ই। হয়ত রোজই যাব। সম্ভব হলে সকাল-বিকেল যাব—যাব তোমাকে দেখতে, তোমার হাঁটা-চলা দেখতে, তোমার কথা শুনতে।

ঘরে এসে পায়চারী করতে করতে ভাবলাম, আর কোন কারণে তোমার কাছে যাব না তো? একটা বিরাট শূন্যতার বোঝা আমার বুকের পর চেপে আছে। বাইরের দুনিয়ার কেউ সে বোঝা দেখতে পারে না, বুঝতে পারে না কিন্তু আমি তো জানি। আমি তো নিত্য তা অনুভব করছি, জ্বালা বোধ করছি। মাঝে মাঝে মনে হয় কেউ যদি আমাকে এই বোঝা থেকে মুক্তি দিত?

তাছাড়া?

তাছাড়া এই নিউ কলেজে এসে এই পাম গাইনের রৌদ্রছায়ায় কাঠবিড়ালীটাকে দেখার পরই শূন্যতার জ্বালা যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। বড় বেসুরো মনে হচ্ছে নিজেকে। চারদিকে একটা ছন্দ, একটা সঙ্গীত, একটা সুর। আমার সঙ্গে ওদের কারুর মিল নেই, সঙ্গতি নেই। আমি এই পৃথিবীর মানুষ হয়েও এই পৃথিবীতে আমার কোন দাবী নেই। আমি আছি কিন্তু আমার কোন সত্তা নেই। আমি যেন তার-বিহীন সেতার।

পায়চারী করতে করতে বিছানায় বসে পড়লাম। সিগারেট ধরালাম। পা দুটো [illegible] দুলিয়ে সিগারেট টানছি আর [illegible]।

মিসেস রায়ের কাছে বোধহয় ধরা পড়েছি। তাই না? বুলার কাছেও ধরা পড়িনি তো?

জামা-কাপড় বদলে নিলাম। পাজামা আর গেঞ্জি পরে একবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ালাম।

শিলচরেও আমার ঘরে একটা বড় আয়না ছিল। মাঝে মাঝেই আমি সে আয়নার সামনে দাঁড়াতাম। নিজেকে দেখতাম। নিজের সঙ্গে কথা বলতাম। মাগো হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লে আমি মাগোকে জড়িয়ে ধরে আয়নার সামনে দাঁড়াতাম। বলতাম, দেখেছ মাগো, তোমাকে আর আমাকে কি ওয়াণ্ডারফুল দেখায়?

কথা ছিল এমনি একটা ফটো তোলা হবে, কিন্তু তা আর হয়নি। সেণ্ট্রাল রোডের দেব স্টুডিওর পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছি, ভিতরে ঢুকে ছবি তোলা হয়ে ওঠেনি।

মাঝে মাঝে মানসীও ঢুকে পড়ত ঘরে। আমাকে আয়নার সামনে দেখেই হেসে ফেলত। আমি তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াতাম। ও বলত, নিজেকে সুন্দর বলে এত দেখার কি আছে?

আমি ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে নিতে বলতাম, যে ফুলে মৌমাছি আসে না, যে নদী সমুদ্রে হারিয়ে যায় না, তার কি সার্থকতা?

আচ্ছা এই গেস্ট হাউসে আমার এই ঘরের ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় বুলা আসবে না তো?

এখন তো অসম্ভব, কিন্তু অন্য কোন দিন? অন্য কোন সময়?

শিলচরে মাঝে মাঝে ডায়েরী লিখতাম। কলকাতায় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট হোস্টেলে থাকার সময়েও লিখেছি। মাগোর কথা, মামার কথা, মানসীর কথা লিখেছি। লিখেছি আমার কথা, আমার মনের কথা। মনের গোপন কথা—যে-কথা কাউকে বলা যায় না, অথচ নিজের মধ্যে চেপে রাখাও যায় না, সেই সব কথা।

আমি বরাবরই কেয়ারলেস। ডায়েরীটা প্রায়ই পড়ার টেবিলের পর পড়ে থাকত। আমি জানতাম মানসী ঘরে এসেই ডায়েরীটা পড়তে বসত। বই-পত্তর গোছাতে গোছাতে মাঝে মাঝে মাগোর হাতেও পড়ত নিশ্চয়ই।

যাকগে সেসব কথা! সেসব দিনের ইতিহাসের কি শেষ আছে?

আজ আবার ডায়েরী লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেন? তাতো জানি না, তবে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে কিছু অব্যক্ত কথা লিখতে পারলে ভাল লাগত।

সত্যি সত্যিই কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। কি লিখতে কি লিখলাম জানি না, তবে অনেক কিছু লিখলাম। ঘুম না পেলে হয়ত আরো লিখতাম।

(ক্রমশঃ)

যে বালি গান গায়

বনবিহারী মোদক

আজ থেকে সাতশো বছর আগেকার কথা। দুস্তর-দুর্গম অজানা পথে দুঃসাহসিক অভিযানের পথিকৃৎ মার্কো পোলো তখন মধ্য-এশিয়ার ভয়ঙ্কর মৃত্যুপুরী 'টাক্লা মাকান' মরুভূমি ধরে এগিয়ে চলেছেন। উত্তর আকাশে পিঙ্গল মেঘ জমতে দেখে, মার্কো সেদিন বেলা থাকতে থাকতেই ছাউনি ফেলতে বললেন। সঙ্গের লোকজন তো পথেই মরতে মরতে প্রায় সাবাড় হয়ে এসেছে। আর মাত্র ছ'জন। তারাও শেষ অবধি টিঁকবে তো?—শুকনো-চিন্ত বিবর্ণ মনে এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে, অগত্যা মার্কোও তখন হাত লাগিয়েছেন তাঁবু খাটানোর কাজে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল—ওরা সবাই হাত গুটিয়ে, পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে কেন?

কাউকে কিছু শুধোতে হল না। খুঁটির মাথায় হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজ থামাতেই, মার্কো স্পষ্ট শুনলেন—একটানা শাঁখ দেবার মতো, তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ। মৃদু বা অস্পষ্ট নয়; কানে তালা এবং বুকে ভয়ের কাঁপন ধরিয়ে দেবার মতোই গমগমে অথচ সুরেলা ও নিরবচ্ছিন্ন একটা গর্জন। আশ্চর্য ব্যাপার! মানুষ-জন তো দূরের কথা, জীবিত কোনো জন্তু-জানোয়ারও তো এই মৃত্যু-পুরীর ত্রি-সীমানাতে নেই। ভয়ঙ্কর এই গর্জন কি তাহলে...

কিন্তু ব্যাপার যত ভয়ানকই হোক, আপাতত তার চেয়েও বেশি জরুরী হল—মাথা গুঁজবার মতো একটু ঠাঁই। ঝড় তো প্রায় এলো বলে। খোলা জায়গায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে, বালি ও তুষারকণার এই প্রচণ্ড ঝড়, এক নিমেষেই সকলের দফা শেষ করে দেবে। তাই, যেন কিছুই শুনতে পাননি—এইরকম ভান করে, মার্কো সবাইকে ধমক দিলেন "কি দেখছ সব হাঁ করে? ঝড় এসে গেল যে। লাগাও, লাগাও..."

লোকগুলোর মুখের সমস্ত রক্ত কেউ যেন নিঃশেষে শুষে নিয়েছে! ভীতি-বিহ্বল ফ্যাকাশে মুখে, একে একে তারা মার্কোর সামনে এসে দাঁড়ালো। "জিন, কর্তা, জিন্! এবার আর কারুরই রেহাই নেই। আমরা চললাম—" অর্ধস্ফুট ভয়ার্ত-স্বরে এই কথা ক'টি বলেই, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, পাগলের মতো দৌড়তে সুরু করল ওরা।

এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে থেকে, মার্কোও ছুটলেন ওদের পিছু পিছু। "করছিস কি মূর্খের দল? ঝড়ের মধ্যে এভাবে ছুটলে তো পাঁচ মিনিটেই শেষ হবি তোরা! তুফান কমুক, তারপর যাস। কাল সকালেই তোদের মাইনে নিয়ে, খাবার নিয়ে, যাস"—বলতে বলতে পেছনের কুলিটার জামা খপ্ করে ধরলেন মার্কো। ঠিক সেই সময়েই সামনের আরেকটা লোক পাথরে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তার ঠিক পেছনেই যে কুলিটা ছুটছিল, তাল সামলাতে না পেরে সেও হুড়মুড় করে পড়ল আগের লোকটার ঘাড়ের ওপর। বাকি তিনজন ততক্ষণে বালির টিপির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

• • •

তাঁবুটাও মনের মতন খাটানো যায়নি। নড়বড়ে কয়েকটা মাত্র খোঁটা; ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটায় সব যেন উপড়ে আসতে চাইছে। তাঁবুর মধ্যে কম্বলের চারপাশে গোল হয়ে বসে, ভীত-সন্ত্রস্ত চারটি প্রাণী কান খাড়া করে শুধু সেই আওয়াজটাই শুনেছে। ঝড়ের জোর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, গর্জনটাও যেন ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। হাওয়ার গতি মাঝে মাঝে একটু স্তিমিত হলে, প্রেতাত্মার আস্ফালনের মতো ঐ শব্দটাও একটু কমছে। দলছুট ঐ তিনজনের অবস্থা এতক্ষণে কী হল—তা-ই বা কে জানে?

• • •

দুঃখের রাত্র পোহাতে চায় না। তবু সে-রাতের অবসানেও ভোরের সূর্যোদয় দেখা গিয়েছিল ভয়ঙ্কর সেই আওয়াজটাও তখন আর নেই। আলো ঝলমল নির্মেঘ আকাশে তখন শান্ত প্রসন্নতার নির্মল হাসি। সকাল হতে না হতেই মার্কো গিয়েছিলেন গত সন্ধ্যার পলাতক লোক তিনটির সন্ধানে। সংগীসহ বালিয়াড়িটার চড়া সুরু করতেই হঠাৎ আবার শোনা গেল কালকের সেই বীভৎস আওয়াজ; এবার যেন কিছুটা থমকে থমকে। পা ফেললেই শব্দটা জোরালো হয়, কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে থেমে যায়! আবার পা ফেললে, আওয়াজটা আবারও জোরদার হয়ে ওঠে! সঙ্গী কুলিটা এইবার হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। পাছে সে-ও আবার দৌড় লাগায়, এই ভয়ে লোকটার হাত ধরে তাড়াতাড়ি মার্কো তাঁবুতে ফিরলেন।

তাঁবু পাহারায় যে দু'জন ছিল, এই কুলিটির মুখে বিবরণ শুনে, তারাও আর এক মুহূর্তও ওখানে থাকতে চাইল না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, প্রচুর বকশিসের লোভ দেখিয়ে মার্কো তাদের নিরস্ত করতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে, অবশেষে মোক্ষম একটা চাল চাললেন মার্কো।

ঝোলা থেকে কবচের মতো একটা জিনিস বের করে, সেটা ওদের দেখিয়ে মার্কো বললেন—"দ্যাখো, আমার কথা না শুনে, ওরা তিনজন পালাতে গিয়েছিল; ঐ দিকে গিয়ে দ্যাখোগে, ওদের তিনজনেরই লাশ পড়ে রয়েছে। আমার সঙ্গে এই সিদ্ধাই তাবিজ আছে, এখানকার ভূতটা আমার কোনো ক্ষতি করবে না। আমার কথা শুনে চললে, তোমাদেরও কোনো ভয় নেই। কিন্তু খবরদার, আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে বা আমার কথা না শুনলেই, ভূতটা তোমাদের সকলের হাড়-মাংস কড়-মড়িয়ে চিবিয়ে খাবে, চামড়া দিয়ে ঐরকম করে ডুগডুগি বাজাবে। কাল যে বাজনা শুনেছ, সেও অবাধ্য নিমকহারামদের চামড়ার ডুগডুগি। এইবার যেতে চাও তো যাও। গিয়ে লাশটা দ্যাখোগে।

এইবার কাজ হল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মার্কোর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল সবাই। কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগল—'দোহাই কর্তা, আমরা আপনার সব কথা শুনব। আর কোনোদিনও পালাতে চাইব না। আপনার ভূতটাকে আপনি বেঁধে রাখুন। দোহাই আপনার ছি-চরণের।'

• • •

আজ থেকে সাতশো বছর আগেকার অবস্থায় মরুভূমির বালিয়াড়ির এই ভুতুড়ে গর্জনের যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া মার্কো পোলোর পক্ষেও কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। তথাপি, সাত নকলে আসল খাস্তা অবস্থায়, নানা লোকের জবানীতে ও ছড়ানো-ছিটানো নানা লেখায়, তাঁর বিস্ময়-কর ভ্রমণ-বিবরণীগুলোর যে রূপটা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা থেকেও একটি কথা কিন্তু সংশয়াতীতভাবেই বুঝতে পারা যায়। সঠিক কারণ নির্ণয়ে সক্ষম না হলেও, মরু-বালুকার এই রহস্যময় ধ্বনিতরঙ্গ সম্পর্কে মার্কোর মনেও কিন্তু প্রচণ্ড একটা খটকা এবং জিজ্ঞাসা জেগেছিল। অকুতোভয় এই অভিযাত্রী, এ-আওয়াজের কারণটা বুঝবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু এর কোনো কূলকিনারা তিনি পেয়েছিলেন কিনা বা এর আসল রহস্যটা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন কিনা—আজ আর সেটা নিরূপণের কোনো উপায়ই আমাদের হাতে নেই।

মার্কোর বর্ণিত অনেক বিস্ময়কর তথ্যকেই সে-আমলের জ্ঞানী-গুণীরা স্রেফ গাঁজাখুরী গালগল্প বলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি, এই সেদিন উনবিংশ শতক পর্যন্ত এ'রা তাঁর অনেক বিবরণকেই অবিশ্বাস্য ধাপ্পা বলে ব্যঙ্গের হাসি হেসে-ছেন। মরুবালুকার এই গর্জনকেও অলীক কল্পনা বলে রায় দিতে সে-সব মহাপণ্ডিত-দের ভাবনা একটুও বাধেনি। তারপর বর্ত-মান শতকের গোড়ার দিকে, স্যার অরেল স্টেইন নিজে যখন গোবি মরুভূমির টাক্লা

হাকান' অঞ্চলে সত্যি সত্যিই ধ্বনিমুখর বালির বাস্তব অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ এবং ঘোষণা করলেন, অবিশ্বাসী ভূ-বিজ্ঞানীরা তখন একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন বৈকি। ক্রমে ক্রমে অবিসংবাদিতভাবে জানা গেল—আট লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের গোবি মরুভূমি তার রহস্যময় বিশাল বুকের বহু স্থলেই, বিচিত্র এই সব ধ্বনি-তরঙ্গ আজ পর্যন্ত বাজিয়েই চলেছে! টাকলা মাকান অঞ্চলের পশ্চিম দিকে, 'অর্দাস্ পদ্শা' নামক স্থান তো প্রায় পুরোটাই এরকম আওয়াজকারী বালিয়াড়িতে ভর্তি।

॥ ২ ॥

ধ্বনিকারক বালুকা শুধু যে গোবি মরুভূমিতেই দেখা যায়, এমন নয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মরু-অঞ্চল তো বটেই, এমনকি কোনো কোনো সমুদ্র সৈকতেও প্রকৃতির এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য আজও মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে।

এর সবগুলোর আওয়াজও কিন্তু এক-রকমের নয়। কোনো কোনো বালুকা দূরাগত ঘন্টাধ্বনির মতো শব্দ করে। কোথাও আবার শোনা যায় ড্রাম বাজানোর মতো গম্‌গমে আওয়াজ; মনে হয়—শত-সহস্র বাজনদার যেন উন্মাদ হয়ে একই সঙ্গে ড্রাম পেটাচ্ছে। সাপের ক্রুদ্ধ ফোঁস-ফোঁসানি বা ঝাউবনের মর্মরের মতো শন্-শন্-শন্ শব্দও কোনো কোনো বালিয়াড়িতে সুস্পষ্ট শোনা যায়। কোনো জায়গায় বালুভূমি আবার অবিকল ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদলের খট্-খট্ খট-খট্ আওয়াজ তুলে, ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আশ্চর্য স্পষ্ট ও জোরালো প্রতিধ্বনি জাগিয়েও কোনো কোনো মরু-বালুকা অসন্দিগ্ধ পথচারীদের বুকে আতঙ্কের কাঁপন ধরিয়ে দেয়। কোথাও আবার দুরন্ত সুরেলা গানেরও সাক্ষাৎ মেলে।

শুধু কি গানের শব্দ? বাদ্যযন্ত্র, বিশেষত তার-যন্ত্রের ঐকতান ও সুরেলা ধ্বনি-তরঙ্গ তো বহুস্থলেই মরুবালুকার জনমানবহীন নিঃসীমতাকে উদাস গীতি-ময়তার মূর্ছনায় আকুল করে তোলে! সুরক্ষিত গোলন্দাজবাহিনীর অবিশ্রান্ত চাঁদমারির মহড়ার মতো গম্ গম্ গুম্ গুম্ আওয়াজও কোনো কোনো মরু-বালুতে অবিকল শ্রুতিগোচর হয়। কোনো বালু-ভূমির শব্দ থেমে থেমে, গমকে গমকে ওঠে। কোথাও আবার শোনা যায় একটানা নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনি। কোনো কোনোটির শব্দ অস্ফুট ও মৃদু; কোনো কোনোটিতে শুনতে পাওয়া যায় বজ্রনির্ঘোষের মতো কর্ণবিদারী ভয়ঙ্কর গর্জন।

কোন্ জায়গার বালুকার কিরকম ধ্বনি ওঠে, এবার আমরা অতি সংক্ষেপে সেইটে দেখে নিতে চেষ্টা করব।

প্রখ্যাত স্পেনীয় পর্যটক ও রাজনীতিক আন্টোনিও ডি আল্লোআ তখন আন্দিজ পর্বতমালার সানুদেশ ছাড়িয়ে, পশ্চিম উপকূলের মরুময় সৈকতভূমির দিকে এগিয়ে চলেছেন। —নানা উদ্ভট অতিপ্রাকৃত এবং ভয়ঙ্কর হতবুদ্ধিকর দৃশ্য দেখতে দেখতে, তাঁদের দুঃসাহসী মনও তখন কুসংস্কারে অন্ধ হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগেই তো পাম্পামার্কা পাহাড়ের চূড়োয় তাঁরা ভয়ঙ্কর ভৌতিক ছায়া দেখে এসেছেন।[1] এখানে জনমানবশূন্য ফাঁকা জায়গাতে কন্সার্টসংগীতের মধুর বাজনা শুনে, এই অভিযাত্রীদলের অবশিষ্ট মনোবলটুকুও এবার কর্পূরের মতো উবে গেল। হতবুদ্ধি ও ভীত আল্লোআ আর একটা মুহূর্তও এখানে থাকার ভরসা পেলেন না।

বিগত যুগের কথা থাকুক। বর্তমান এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও আমরা গর্জনকারী বালুকার রোমাঞ্চকর বর্ণনা পেয়েছি, সে ভেরীর বিবরণে। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল বর্ণিত 'লস্ট ওয়ার্লডে'র বাস্তব অস্তিত্ব খুঁজে বের করার উন্মাদনায়, দুঃসাহসী এই অভিযাত্রী দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গমতম অঞ্চল, বৃটিশ গুয়েনার গভীর অভ্যন্তরভাগে, সভ্য মানুষের পদচিহ্নহীন অরণ্য ও নদী-পর্বতে সুদীর্ঘ প্রায় দশ বছর যাবৎ ঘুরে বেড়িয়েছেন। সে ভেরী, একদিকে যেমন অসংখ্য রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, অন্য দিকে তেমনি আবার অজ্ঞাত অনেক বিস্ময়কেও তিনি আবিষ্কারের আলোয় এনে উপস্থাপিত করেছেন। স্কুইবো নদীর উজানে বালির ক্রন্দনবাদী সাঁ-সাঁ গর্জনের কথা তাঁর অত্যাশ্চর্য ভ্রমণ-বিবরণী থেকেই আজ আমরা জানতে পেরেছি।

বিশাল আরব মরুভূমিতেও ধ্বনি-মুখর বালির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। গর্জনকারী এই বালুকার আশ্চর্যজনক বিবরণ আমরা পাই এইচ সেন্ট জন ফিল্‌বি-র লেখায়। এটা খুব বেশি দিনের কথা নয়। ১৯৩২ খৃঃ জন ফিল্‌বি এই মরু-অঞ্চল অতিক্রম করছিলেন। তিনি লিখেছেন—একদিন বিকেলে আমি তাঁবুর মধ্যে বিশ্রাম করছি, এমন সময় দূরাগত বু-উ-ম্ বু-উ-উ-ম্ শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। প্রায় মিনিট দুয়েক এই শব্দ শোনা গেল। আওয়াজটা খুব জোরেই হচ্ছিল, তবে ধ্বনিটা ছিল সুরেলা। মনে হচ্ছিল—দূরে অনেকগুলো জাহাজ থেকে যেন একই সঙ্গে সাইরেন বাজানো হচ্ছে।

কিসের আওয়াজ দেখবার জন্য তাঁবুর বাইরে ছুটে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে; দেখি—আমাদেরই দলের একজন লোক অল্প দূরের উঁচু একটা বালির ঢিপিতে উঠতে উঠতে, থমকে থেমে বেকুবের মতো এদিক ওদিক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাচ্ছে। আওয়াজটা আসছে সেই ঢিপিটার দিক থেকেই।

'কৌতূহলী হয়ে আমিও ঐ ঢিপিটার দিকেই এগিয়ে গেলাম। পায়ের নীচের আলগা বালিগুলো ঝর্ ঝর্ করে গড়িয়ে নামতে সুরু করা মাত্রই, এবার একেবারে আমারই পায়ের গোড়ায় আওয়াজ শোনা গেল—বু-উ-ম্ বু-উ-উ-ম্। পা ফেলা থামানোর পরও, শব্দটা প্রায় মিনিট দুয়েক রীতিমতো জোরে এবং সুস্পষ্টভাবে শোনা গেল। এরপর ক্ষীণ হতে হতে আওয়াজটা শেষে ধীরে ধীরে একেবারেই মিলিয়ে গেল। আবার যেই পা ফেলেছি, আবারও শোনা গেল ঐ ভয়ানক আওয়াজ। এতক্ষণে আমি ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলাম। বালির ওপর উবু হয়ে বসে পড়তেই মনে হল—পায়ের নীচের সমস্ত বালিগুলো যেন কাঁপছে! আলগা বালির মধ্যে ডান হাতখানা প্রায় কনুই পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিলাম। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপনটাও এবার বেশ স্পষ্টভাবেই অনুভব করা গেল।"

বিগত আরব-ইজ্রায়েল যুদ্ধে, সংবাদ-শিরোনামের মাধ্যমে যে-জায়গাটি বাংলা-দেশের পাঠকসাধারণের নিকট সুপরিচিত হয়েছে, সেই সিনাই উপদ্বীপেও এইরকম ধ্বনিকারক বালুকা আছে। মাউন্ট সিনাই নামক পাহাড়টি সেখানে এই কারণেই রীতিমত কুখ্যাত। আরবী ভাষায় একে বলে 'DJEBEL NAKUS' অর্থাৎ 'ঘন্টা পর্বত।' এই পাহাড়ের সানুদেশের বালিতে হুবহু ঘন্টাধ্বনির মতো জোরালো আওয়াজ শোনা যায়। এই ঘন্টার শব্দ আবার থেমে যাবার আগে, দূরাগত গর্জনের মতো শোনায়। বিদেশীদের কাছে এই কৌতূহলোদ্দীপক পাহাড়টি 'Bell Mountain' নামেই প্রসিদ্ধ। ওদেশের মরুচারী বেদুইনদের দৃঢ় বিশ্বাস—খৃষ্টানদের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সঙ্ঘারামের প্রেতাত্মারাই আজও এইরকম ঘন্টাধ্বনি ও হুঙ্কার-গর্জন করে। অর্থাৎ এগুলো সবই সাহেব ভূতের শয়তানি।

পূর্বোল্লিখিত এই যুদ্ধের বহু বছর আগেই, লেফটেন্যান্ট নিউবোল্ড সিনাইয়ের এই ঘন্টা পর্বতটি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে, এবিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ও তথ্যবহুল বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। লেফটেন্যান্ট নিউবোল্ড নিজের কানে যা শুনেছেন, তা হল প্রথমে অতি মৃদু ও অস্পষ্ট একটা খস্ খস্ শব্দ, তারপর দূর-শ্রুত একটি গভীর সুরেলা ধ্বনি। এই আওয়াজটিই ক্রমে অতি নিকটে গীর্জার ঘন্টাধ্বনির মতো সজোরে এবং খুব ঘন ঘন শোনা গেল।

আফগানিস্থানে, কাবুলের কাছেও এইরকম আরেকটা বালিয়াড়ির সন্ধান

১ পাহাড়ের চূড়োয় জলকণাসম্পৃক্ত হাল্কা মেঘ বা ঘন কুয়াশা থাকলে, উদীয়মান সূর্যের বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিমাকাশে; অথবা অস্তগামী সূর্যের বিপরীত অর্থাৎ পূর্বাকাশে, রামধনু রঙের আলোকোজ্জ্বল তিনটি (কদাচিৎ বা চারটি) জ্যোতির্বলয় ও তার কেন্দ্রে, দ্রষ্টার নিজের প্রতিচ্ছবি অতি-সুস্পষ্ট দেখা যায়। মরীচিকাসদৃশ এই বিস্ময়কর দৃশ্যের সর্বপ্রথম বিবরণদাতা আল্লোআ-র নামানুসারে, নিসর্গপ্রকৃতির এই মনোজ্ঞ ও দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভূগোলবিদ্যার আজ "আল্লোআর বৃত্ত" নামেই পরিচিত।

গেলে। এটির বিবরণ পাই লর্ড কার্জনের লেখায়। এটার আওয়াজটা আরও দুর্বোধ্য। মনে হয়—একদল অশ্বারোহী বুঝি ড্রাম বাজাতে বাজাতে খট-খট খট-খট আওয়াজ তুলে সজোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে। এসম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তীটিও কার্জনসাহেব লিপিবদ্ধ করতে ভোলেন নি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস—অন্যায়যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার বলি সৈনিকদের প্রেতাত্মারাই ক্ষুব্ধ আক্রোশে আজও এখানে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপায় খুঁজে চলেছে! দিনের কলকোলাহল থেমে যাওয়ামাত্রই, পাতালপুরীর গুহাবাসী এই সৈন্যদলের যুদ্ধ রণ-প্রস্তুতি, নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে আজও তাই স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়।

হাওয়াই দ্বীপেও আরেকটা বিদঘুটে শব্দ-সৃষ্টিকারী বালুভূমি ও ঢিপি দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার আওয়াজটাই সবচেয়ে মজার। এখানে শোনা যায় কুকুরের ডাক। কবে কোন্‌কালে অর্ধউন্মাদ এক বুড়ো সাহেব নাকি তার কুকুর নিয়ে ওদিকে বেড়াতে গিয়েছিল। বেচারী আর ফেরেনি। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও কেউ আর তার সন্ধান পায়নি। পথ-হারানো সেই কুকুরটাই নাকি আজও সেখানে কেঁদে কেঁদে পথ খুঁজে বেড়ায়!

স্কটল্যান্ডের পশ্চিমে, অতলান্তিক মহাসাগরে হেব্রাইডস নামে যে দ্বীপমালা আছে, তার মধ্যে আছে ছোট্ট একরত্তি একটা দ্বীপ; নাম—'এইগ্'। এই এইগ্-দ্বীপে আছে আরেকটি তাজ্জব বালুবেলা। এখানে শোনা যায় সুতীক্ষ্ণ শীষ। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ হিউ মিলার এটি সম্পর্কে অনেক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে—এখানকার আওয়াজটা থেমে যাবার আগে শীষের মতো শোনা গেলেও, প্রথমে কিন্তু এটা শুনতে অন্যরকম লাগে। খুব শক্ত একগাছা মোম-মাখানো সুতো টান করে বেঁধে নখ দিয়ে টোকা মারতে থাকলে, যেরকম টং টং শব্দ হয়, এই বালিয়াড়িটার শব্দ প্রথমটায় ঠিক সেইরকমই শোনায়।

ইরানের মরু-অঞ্চলে বালির ঢিপি-পূর্ণ এমন একটি বিশাল এলাকা আছে, বীণা-ধ্বনির মতো সুরেলা আওয়াজ যেখানে প্রায় সতের কিলোমিটারব্যাপী স্থানে একনাগাড়ে ঘন্টাখানেক ধরে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়! ডর্সেটের স্টাডল্যান্ড উপসাগরের সৈকতে; কার্নার্ভনশায়ারে নেভিনের অনতিদূরে এবং ওয়েলসেও সিংগিং স্যান্ডের অস্তিত্ব রয়েছে। স্যার আর্চিবল্ড গাইকীর লেখা থেকে এগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানতে পারা যায়। দিগন্তপ্রসারী ফাঁকা মাঠে টেলিগ্রাফের অনেকগুলো তার টাঙানো থাকলে, খুঁটি-গুলো সজোরে ঝাঁকি দিয়ে তারগুলো নাড়িয়ে, তারপর কাঠি দিয়ে তারগুলোতে ক্রমাগত বাড়ি মারতে থাকলে যেরকম শব্দ ওঠে, এগুলোর দু-একটির আওয়াজও নাকি অবিকল সেইরকম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কা, কান্‌সাস্ এবং উয়োমিং ছাড়া হাজার হাজার কিলোমিটারব্যাপী শুষ্ক, বালুকাময় ও মরুসদৃশ বেসব মরুভূমি আছে, সেগুলোর কোনো কোনো জায়গাতেও বালির ধ্বনি বা সুউচ্চ প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

দুনিয়ার প্রায় সব অঞ্চলের কথাই এপর্যন্ত বলা হল। কিন্তু সুধী পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন—বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি সাহারার নাম কিন্তু এ-প্রসঙ্গে একবারও উল্লিখিত হয় নি। তাহলে কি রহস্যময়ী সাহারার বিশাল বুকে ধ্বনিমুখর বালুকা কোথাও নেই? বস্তুতঃ তা নয়। পণ্ডিতদের অনুমান—আওয়াজকারী বালি সাহারাতেও নিশ্চয়ই আছে। হয়ত বা বহু জায়গাতেই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাত্র দুটি এলাকা ছাড়া, আর কোথাও এগুলোর অবস্থিতি আজও সঠিকভাবে নিরূপিত বা নিরুদ্ধরূপ হয় নি। এই অধম প্রবন্ধকার বহু খুঁজেও, সাহারার অন্য কোথাও সিংগিং স্যান্ডের কোনো উল্লেখ বের করতে পারেনি। কালক্রমে অন্যান্য এলাকার ধ্বনিকারক বালির অস্তিত্বও হয়ত জানা যাবে।

এখন পর্যন্ত যে-দুটি স্থানের সঠিক বিবরণ আমরা হদিস করতে পেরেছি, তার একটি হল—সাহারার ঔআরগ্‌লা জেলার সাগরতটে সন্নিহিত বালিয়াড়িগুলোতে। আরেকটি এই মরুভূমির প্রাচীনতম জনপদ অফ্‌ট সুদুর্গম তিম্বুক্‌তু-র কাছে। পূর্ব সাহারার মাঝামাঝি, সুদানে অবস্থিত এই লেবোর স্থানটি, ফরাসী অভিযাত্রীদের বহুদিনব্যাপী পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পরও, সভ্য মানুষের চোখে আজও একটি রহস্যময় বিস্ময় হয়েই রয়েছে। সাহারার রহস্যের অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচিত হলে, ধ্বনিময় বালুকা ছাড়াও, আরও অনেক বিস্ময়কর তথ্যই হয়ত জানা যাবে।

॥ ৩ ॥

স্থানীয় অধিবাসীরা বালির এইসব আওয়াজকে ভুতুড়ে বা অতিপ্রাকৃত যাই-ই বলুক না কেন, এসব ধ্বনির আসল কারণটা কি? কী এর গোপন রহস্য? এত লোক, এত জায়গা সম্পর্কে, এতদিন কি শুধু বানানো মিথ্যে কথাই বলে এসেছেন? তা যদি না হয়, তাহলে আওয়াজটা আসে কোত্থেকে? কিভাবেই বা শব্দটা সৃষ্টি হয়? উপসংহারে আমরা শুধু এই প্রশ্ন-গুলোরই জবাব খুঁজে নিতে চেষ্টা করব।

আপাতদৃষ্টিতে হতবুদ্ধিকর এই ব্যাপারটার মোট তিনটি কারণ বিজ্ঞানীরা নির্দেশ করেছেন:

(১) নীচের শক্ত বালি এবং, ওপরের আলগা বালির মধ্যে, বাতাস ঢোকার মতো যে শূন্যতা বা ফাঁক থাকে, উপরের বালি নাড়া খেয়ে সেই শূন্যতায় আছড়ে পড়তে থাকলেই আওয়াজ শোনা যায়।

(২) হাওয়ার ঝাপ্টা বা পথচারীর পদভারে, আর্দ্র বালুকণাগুলো একে অন্যের ঘাড়ে গড়িয়ে নামতে থাকলেও, বালুকণা-সম্পৃক্ত নীচের বাতাস বুদ্বুদের মতো উপরে উঠতে থাকে। এতেও শব্দ হয়। লক্ষণীয় এই যে, সম্পূর্ণ শুকনো বা বেশি ভিজে থাকলে, সে-বালিতে কিন্তু কোনো আওয়াজই শোনা যায় না। কেবল সঠিক পরিমাণ আর্দ্রতাই এই ধরনের বালিকে ধ্বনিমুখর করতে পারে।

(৩) বালুর অতি-সূক্ষ্ম একটি আস্তরণ, আলগা বালির প্রতিটি কণাকে মুড়ে রাখে। পাতলা এই আবরণগুলো একত্রে, ঘনীভূত গ্যাসের স্থিতিস্থাপক একটা কুশন গড়ে তোলে। সামান্যতম নাড়া, চাপ বা ধাক্কা খেলেই, এই কুশনটি স্থিতিস্থাপকতার দরুণ, ক্রমবর্ধমান কম্পন সৃষ্টি করে। তখনই সে-বালি শব্দ-তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে।

বিশ্বের যে কোনো বালু-ধ্বনির মূলেই এই তিনটির যে কোনো এক বা একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল থাকে।

আরেকটি কথাও কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা দরকার। কোনো কোনো বালুভূমি তার শব্দসৃষ্টির ক্ষমতাটি কালক্রমে হারিয়ে ফেলতেও পারে। বালু-ধ্বনির অস্তিত্বে অবিশ্বাসী উন্নাসিকরা সাধারণত এই ব্যাপারটা আঁকড়ে ধরেই, কোমর বেঁধে তর্ক করতে নামেন। যেহেতু কিছুদিন পরে আর কোনো আওয়াজ শোনা যায়নি, সেইজন্যে আগে যাঁরাই সেটা শুনেছেন বলে দাবী করেছেন—তাঁরা সবাই মিথ্যেবাদী। এই-ই হল অবিশ্বাসীদের একমাত্র যুক্তি।

এইবার দেখা যাক, এটা কেন হয়? এর কারণটা কিন্তু মোটেই দুর্বোধ্য নয়। বায়ুবাহিত সঞ্চরমান বালুকা জমে জমে, একটা জায়গার চেহারাটাই বিলকুল পাল্টে দিতে পারে—এটা আমরা সবাই জানি। ধ্বনিমুখর বালুকার উপর, বায়ুবাহিত নতুন বালির পুরু ও ভারি স্তর জমে উঠলেই, নীচে চাপা-পড়া আওয়াজকারী বালি তার পূর্ববৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। তখন আর সে কম্পন ও শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না।

• • •

আমাদের দেশে, রাজস্থানের থর মরু-এলাকার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে এরকম সিংগিং স্যান্ডস কি একেবারেই নেই? এক-আধটা হয়ত নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু লোকচক্ষুর আড়ালে আত্মগোপনকারী সেসব নিসর্গ-রহস্যের সঠিক অবস্থিতি খুঁজে বের করা ও পরিচয় ঘটানোর জন্যে, আমাদের তরুণ অভিযাত্রীরা কি আগুয়ান হবেন? অজানার সন্ধানে, দুর্গম পথের বিঘ্ন-বিপদকে হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতে যাঁরা একটুও দ্বিধা করবেন না, পুরোগামী সেই পথি-কৃৎদের জন্যেই আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। তাঁদের পদধ্বনি কি শোনা যাচ্ছে?

নিকটেই আছে

ভয় পেতে পেতে একদিন

স্ট্যান্ডে গাড়ি ভেড়াতেই এক ঝাঁক বোলতার মত চোঙা প্যান্ট, ভোজালি-জুলপি চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল। নটাও বাজে নি। অথচ এরই মধ্যে রাস্তা-ঘাট সুনসান। সিনেমা হলের মার্কির লাইট-টাইট সব নেভানো। কোলাপসিবল গেটের সর্বাঙ্গ জুড়ে তাবিজ, কবচ, মাদুলীর মত পেল্লায়-পেল্লায় তালা ঝুলছে। বাস স্ট্যান্ডের ছাউনীর তলায় একটা পাগলী সংসার সাজিয়ে বসেছে — এক কোণে ওর ছেলেটা ঠান্ডা মাটিতে নাকড়া জড়ান বলের মত পড়ে আছে; পাশেই কাঠ-কুটোর উনুনে মেটে হাঁড়িতে চাপানো ওর সারা দিনের সঞ্চয়। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি কিছু নেই রাস্তায়। ও-ফুটে পাগলী আর এ-ফুটে জগা। ট্যাক্সির দরজাটা আলগা করে বেরোতে-বেরোতে প্ল্যান করছিল উল্টো-দিকের পাঞ্জাবী হোটেলে তড়কা রুটি খেয়ে, গাড়ি গ্যারেজে তুলে দিয়ে, বাসায় ফিরবে। ঠিক এমনি সময়—!

চলুন দাদা — বোলতার ঝাঁক ভন-ভন করে উঠল। হঠাৎ এক সঙ্গে ছ-সাতটা ছেলে, যাদের যে কোন একজনই জগার পক্ষে যথেষ্ট—ভয়ে কেমন ধ মেরে গেল জগা। রাস্তাঘাটে কেউ কোথাও নেই। কে থাকবে, এক বার ঠেকা আছে, সে ছাড়া? জবাবে উপায় নেই। কমিশনে খাটে। এখন টাকায় পঁচিশ টাকা। আগে তবু সারাটা দিন খাটলে সত্তর-পঁচাত্তর পর্যন্ত ওঠানো যেত। এখন তো কলকাতাটা কেমন গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। রাসবিহারী আর ধর্মতলার বাইরে সন্ধের পর গাড়ী চালান নিরাপদ নয়। আর এটুকু জায়গায় গোটা শহরের ট্যাক্সি এসে জুটেছে। সওয়ারী কি, ট্যাক্সিওয়ালাই বেশী। ঝুঁকি নিয়েও জগা নিরুপায় হয়েই গাড়ী ছোটায় যাদবপুরে, বেহালায়, কলেজ স্ট্রীটে, চিৎপুরে। নইলে খাবে কি? কে খাওয়াবে মাকে, ছোট—ছোট ভাই-বোনগুলোকে আর তাকে, যাকে এই সেদিন টোপর পরে জমর করে ঘরে এসে তুলেছে? কেউ না, জগাকেই করতে হবে সব। তাই বিপদ মাথায় নিয়ে পাগলের মত যেখানে-সেখানে গাড়ী ছোটায়। নিরুপমা ভয় পায়। ভয়ে, আতঙ্কে থর-থর করে কাঁপে, জানালার শিকে মাথা গলিয়ে চুপ করে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন মানুষটা ফিরবে। যতক্ষণ না ফেরে, ততক্ষণ বুকের ভেতরে যে কি হতে থাকে, সে তো নিরুপমাই শুধু জানে। আর কেউ তো বোঝে না।

জগা সব বোঝে। বোঝে বলেই আজ-কাল নিরুপমার কাছে গল্প করা বন্ধ করেছে। মেয়েটাকে শুধুমুধু ভয় পাইয়ে কি লাভ, বাঁয়ের স্বাদ-গন্ধ কবে মুছে গেছে এ শহর থেকে। আগে প্যাসেঞ্জার বড়জোর ভাড়া না দিয়ে পালাত, আজকাল সেই সঙ্গে দক্ষিণাও আদায় করে—ট্যাক্সি-ওয়ালার বুক পকেটে যা থাকে সব প্লাস পকেটের ইঞ্চিখানেক তলায় লুকোনো আশ্চর্য সেই ঘড়িটা পর্যন্ত।

বাঁ হাতে বুক পকেটটা চেপে ধরে, ডান হাতে খোলা দরজার পাল্লাটা ঠেলে ধরে, খুব সতর্কভাবে ছেলেগুলোকে লক্ষ্য করল জগা। বেশী নয় বড়জোর তেইশ-চব্বিশ হবে—জগার চেয়ে বয়সে ওরা সবাই ছোট। জামা-কাপড় বেশ ফাইন। শুধু চোখের কোণে ওদের প্রত্যেকেরই চাপ বাঁধা অন্ধকার, মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে। সন্ধেটা জল খেয়েই কাটিয়েছেন বাবুরা, এখন বোধ হয় আরো কিছু চাই—আস্ত চাট।

ভাবল একবার জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন? তক্ষুনি খেয়াল হোল এদের সঙ্গে রিস্ক করে সুবিধে হবে না। গাড়ী যখন গ্যারেজে সাড়ে নটার মধ্যেই তুলতে হবে, মালিকের কড়া হুকুম, তখন মিথ্যা-মিথ্যা নতুন বাহানা ঘাড়ে চাপানোর দরকার কি? প্যান্ট সার্ট দেখে তো মালুম হয় পকেটে রেস্ত আছে, এরা কি আর সহজে ছাড়বে। হয়তো সত্যি কোথাও যাবে না, চৌরঙ্গীতে ফাঁকা রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে দিদিদের সঙ্গে মস্করা করবে। দেরী হলে নিরুপমা কাঁদবে। জগা শান্ত গলায় বলল—না দাদা, এখন গাড়ী গ্যারেজে তুলব। আমায় ছেড়ে দিন। অন্য একটা দেখুন।

কোথায় দেখব বাওয়া, তুমিই একটা দেখে দাও তাহলে—মিটারের গায়ে গড়িয়ে-পড়া ছেলেটার নেশা যে রীতিমত জমে উঠেছে, তা ওর গলার আওয়াজেই বুঝতে পারল জগা। ভদ্রলোকের সব ছেলে, জগা ওদের সম্মান দেখিয়ে আপনি বলল, অথচ অজানা নির্দ্বিধায় অপরিচিত লোককে তুমি বলতে একটুও আটকাল না ওর। জগা তো ট্যাক্সিওয়ালা। রেগে লাভ নেই, দিনকাল ভাল না, তাই গলাটা একদম নামিয়ে আস্তে-আস্তে বলল—আমায় ছেড়ে দিন। সাড়ে নটার মধ্যে গ্যারেজে গাড়ি তুলতে হবে।

পেছন থেকে ল্যাগপেগো মুখের একটি ছেলে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, সে তো অনেক দেরী, এখন তো মোটে পৌনে নটা।

না দাদা, পৌনে নটা হলে কি হবে, হাসি-হাসি মুখেই জগা সমস্যাটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে, গ্যারেজ তো সেই চড়ক-ডাঙ্গায়। গাড়ী তুলে, বাড়ী পৌঁছোতে পৌঁছোতে এগারোটা বেজে যাবে।

বাজুক দাদা, উনি বাড়ী যাবেন, আমরা যাব না—মিটার ছেড়ে ধনুকের ছিলার মত টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল আগের ছেলেটি—ছোড় বাতেলা। দাদা চড়কডাঙ্গা দেখাচ্ছে, ঘুঘুডাঙ্গা দেখিয়ে ছেড়ে দোব না। ওঠ রে ওঠ। ওদিকে দেরী হয়ে যাবে।

তিনটে দরজা পট-পট খুলে গেল। ছেলে কটা মুহূর্তে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। একজন গলার স্কার্ফ খুলে আষ্টেপৃষ্ঠে মিটারটাকে জড়িয়ে নিয়ে একটা চুমু চেপে দিয়ে চিৎকার করে উঠল—শালা কেন চুমকি মাইরী। গোটা দলটা রসিকতায় উল্লাসে ফেটে পড়ে হুঁকার পাড়ল—চালাও পানসি সামবাজার।

—টালিগঞ্জ ব্রীজ, রাসবিহারী, হাজরা, পূর্ণ সিনেমা, এলগিন রোড—একটার পর একটা মোড়, আলো-জ্বলা শহরের জয়েন্ট-গুলো মাড়িয়ে-গুঁড়িয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলল। বুক পকেটে সারা দিনের রোজগার। চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ হবে। ভোর সাতটা থেকে রাত নটা অবধি পরিশ্রমের ফসল। এর বারো আনাই যাবে মালিকের গোলায়, চার আনা মাত্র পাবে জগা। আর সেই চার আনার ওপর নির্ভর করে আছে পাঁচটি প্রাণী। ওদের দেখবার আর কেউ নেই। আজ যদি জগার কিছু হয় তাহলে...।

এই শালা উল্লু কাহাকার,—চিৎকারটা কানে আসতেই সামলে নেয় জগা। আর একটু হলেই টাপের মুখে অয়েল-ট্যাঙ্কারের তলায় সবশুদ্ধ ঢুকে যেত। পৌষের কালিয়ে-ওঠা শীতেও ফোটা-ফোটা ঘামের দানা গলায় কপালে গজিয়ে ওঠে। স্টিয়ারিং থেকে ডান হাতটা সরিয়ে এনে

ফেটো দিয়ে যায় মুহূর্তে-মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাবেন?

কেউ কোন জবাব দিল না। পেছনে চারজন নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত। পাশের দুজন হিন্দী সিনেমার গানে গলা ছুঁইয়ে ফ্ল্যাট। দুজন এদের জিজ্ঞাসা করে এখন জবাব মিলবে না। গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞাসা করবে? সর্বনাশ! গড়ের মাঠ ফুরোতে এখনো আধ মাইলটাক বাকী। কলজে-ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ বাঁচাতে আসবে না। তার চেয়ে বরং পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে থামাবে—ওখানে সর্বদাই পুলিশ থাকে।

সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মাঝারী স্পীডে গাড়ী চালাতে লাগল জগা। চোখজোড়া সম্মুখে ছুটে-আসা হেড লাইট থেকে গাড়ির আয়নায় টপ স্পীডে ছুটতে লাগল। কান পড়ে রইল পেছনের সীটে। শুনতে পেল টুকরো-টুকরো কথা—।

তিনুদার লেটেস্ট মালটাকে দেখেছিস। একদম গরম,—বোধ হয় ন্যাপা-পোঁছা-মুখের ছেলেটার গলা। পাশ থেকে আর একজন বলল, ধুর ওটাতো একটা কোল-বালিশ। সেদিন বাবার অফিসে একটা যা স্টেনো দেখেছি না। কথাকটা শেষ না করেই সড়াৎ করে জিভে ঝোল টানার আওয়াজ করল ছেলেটি।

হঠাৎ সামনের সীট থেকে গান বন্ধ করে একটি ছেলে হেঁকে উঠল—আর কি শালা পরীক্ষা-টরীক্ষা এদেশে হবে মাইরী? এতো ইচ্ছে ছিল নামের পাশে লিখব সঞ্জীব-কুমার রায় এম-এ। যেন কত বড় রসিকতা, ছেলেগুলো সব এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। আর তক্ষুনি সামনের সীটের অন্য ছেলেটি বিকৃত গলায় ধমকে উঠল—অ্যাই ব্যাটা। ইধার গাড়ি কিউ ভিড়াতা হ্যায় রে?

সঙ্গে-সঙ্গে বাদ বাকী ক'জন খুড়ো ধরল—কিউ রে? ইধার কিউ? গাড়ি এখানে থামাচ্ছিস কেন? শালা মামু দেখে গাড়ি থামাচ্ছে। জান খিঁচে দেব না।

এর পর আর সাহস পেল না জগা। সার্জেন্ট দেখে পার্ক স্ট্রীটের মোড়েই থামাচ্ছিল। কিন্তু ওরা টের পেয়ে গেছে। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে যদি এখুনি ছোরা-টোরা বার করে বা একটা পাইপ...! নিরুপায় জানলার দিকে ঠুকে-ঠুকে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলবে। ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরবে সরু সিঁথি ফাঁক হয়ে, মাত্র ন মাস আগে যেখানে নিজের হাতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে জগা।

লিণ্ডসে স্ট্রীট, ধর্মতলার মোড় ছাড়িয়ে ওদের নির্দেশেই কপালিটোলার দিকে গাড়ী ঘোরাল জগা। চওড়া রাস্তা আস্তে-আস্তে সরু হয়ে এল। অফিস পাড়ার ঢাউস-ঢাউস বাড়ীগুলো এখন কোলাপ-সিবেল গেটের আড়ালে ঝিম মেরে পড়ে আছে। কানে আসছে বেতালা-বেসুরো খ্যঁড়ে গলায় ইংরেজী গানের কলি। ঠেলতে-ঠেলতে আধ-ভেজানো দরজা ঠেলে মানুষজন বেরিয়ে আসছে আশ-পাশের কোন কোন বাড়ী থেকে। খুব সাবধানে তাদের পাশ কাটিয়ে সরু গলিটা যেখানে সমকোণে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে গাড়িটা ঘোরাতে গিয়েই হাতটা আলগা হয়ে খুলে এল স্টিয়ারিং থেকে, ব্রেকের ওপর পাটা আপনা-আপনি শিথিল হয়ে গেল। গলার কাছেই, খুব কাছে, ঠাণ্ডা অথচ শক্ত মত কি একটা এসে জানি ঠেকল। জগা মুখ ঘোরাতে-ঘোরাতে টের পেল, গাড়িটা ধাক্কা খাচ্ছে ল্যাম্প পোস্টের গায়ে, কানে এল—যা আছে চটপট বার কর শালা। বাঁ করলেই ন্যাপলাখানা ফাঁসে দেব।

পৌষের হিমঝরা সেই রাতে, গ্যারেজে গাড়ি তুলে দিয়ে জগা হাঁটতে-হাঁটতে যখন বাড়ী ফিরছিল তখন ল্যাম্প পোস্টের নির্জন আলোগুলো কেমন ম্লান হয়ে এসেছে। দু ধারে ঝাঁপ-ফেলা সারি-সারি দোকান-পাট। একা-একা এই পথে এত রাতে কোন দিন বাড়ী ফেরে নি জগা। ভয় পেতে। কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে প্রাণের ভয়ও সমস্ত বুকের কোণে জমা ভয়টুকুও ওদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে কেমন নিভার হাল্কা লাগছিল। একটা অবাক বিস্ময় ওকে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে। এরা সবাই শিক্ষিত। কেউ-কেউ এম-এ পড়ে, বাড়ীর অবস্থা ভালো, তবু কত সহজে, কি অক্লেশে ছিনতাই, রাহাজানিতে পেশায় হাত পাকাচ্ছে। কাল সকালে যখন জগার বাড়ীতে চায়ের জলও ফুটবে না, তখন তো এরা লেপের তলায় শুয়ে বেড-টির অপেক্ষায় খোয়াড়ি কাটাতে হাই তুলবে। পাড়ায়-পাড়ায় টহল দিয়ে রাত জেগে নেশা করে বেড়ালেও, মুখের মুখোশ এদের সামনে চিরদিনই উন্মুক্ত। হাঁটতে-হাঁটতে, বড় রাস্তা ছেড়ে, সরু ফালি গলি কয়েকটা পেরিয়ে বস্তি আর ফাঁকা মাঠের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াল জগা। সামনেই টালির চাল দেওয়া ওর বাসা। জানালায় অনেকগুলো মুখ। অন্ধকারে কার মুখে কি রেখা জেগে আছে, কিছুই পড়তে পারল না জগা। মনে-মনে তো জানে এখন সবাই আমরা ভয়েই মরে আছি।

—সন্দ্বৎস

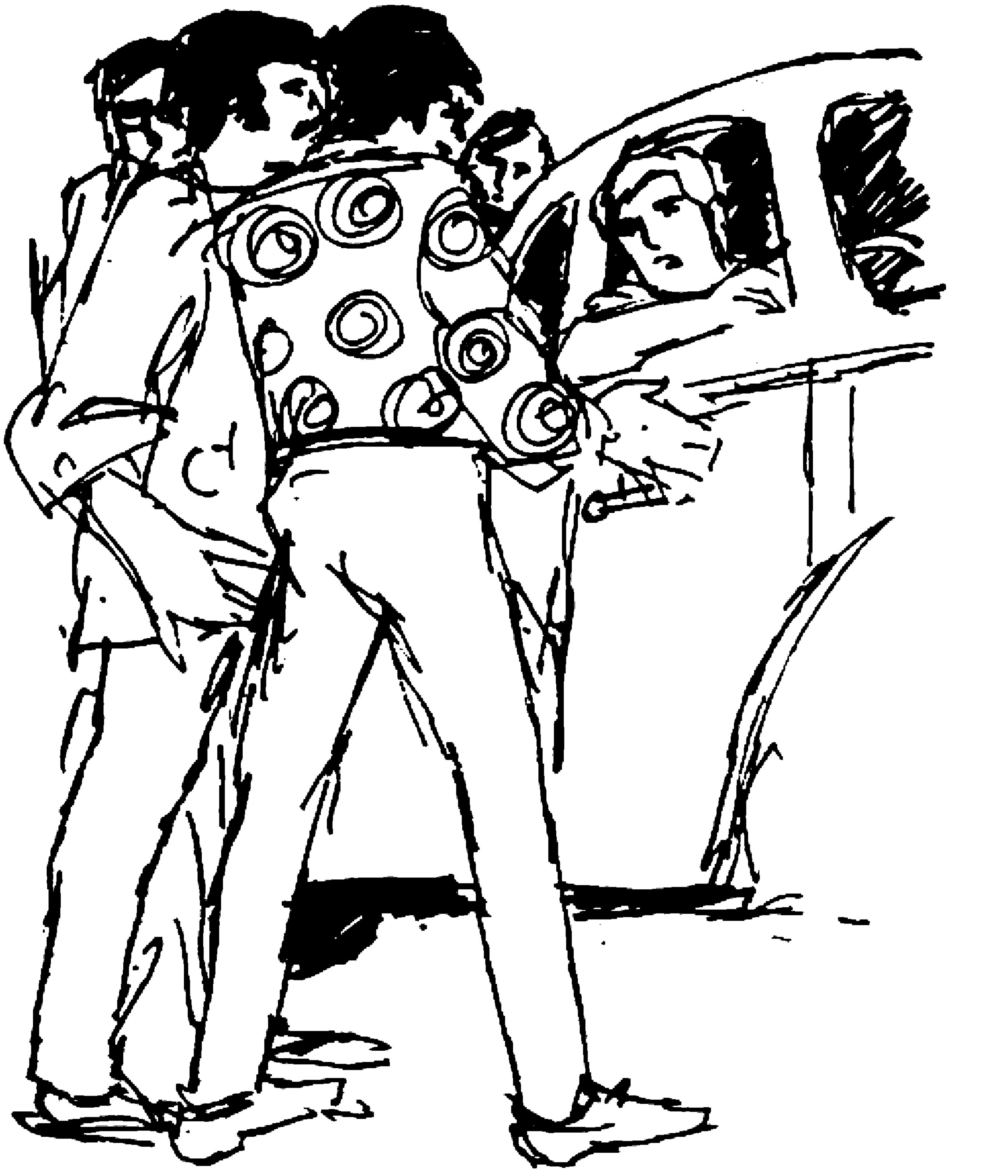

মনের কথা

পার্থসারথির প্রেম বিচ্ছিন্নতার মর্মপীড়া

অবিনাশবাবুর কোচিং ইন্সটিটিউশনের একজন শিক্ষক পার্থসারথি। অবিনাশবাবুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, পার্থ সাতাশ বছরের যুবক। পার্থ ছাড়া অবিনাশবাবুর কোচিং অচল। পার্থ প্রায় সব বিষয়েই পড়াতে পারে। আজ কয়েক দিন হল পার্থ কোন কিছুতে মন বসাতে পারছে না। তাই অবিনাশবাবু অস্থির হয়ে উঠেছেন। পার্থকে বাইরের ঘরে বসিয়ে অবিনাশবাবু আমাকে সংক্ষেপে পার্থ-পরিচিতি জানালেন।

—ও আর কাজ করতে পারবে না বলছে। ও কোন কিছু মনে করতে পারছে না, আমাদেরও ঠিক মত চিনতে পারছে না। বাইরে কোথাও চলে যেতে চায়। ও চলে গেলে প্রথমটায় আমার খানিকটা অসুবিধা হবে, কিন্তু সেটা আমি সামলে নিতে পারব। আমি ভাবছি ওর ভবিষ্যতের কথা। ছেলেটা খামখেয়ালীপনার জন্যে এ যাবৎ কোন কিছু করে উঠতে পারে নি। এম-এ পরীক্ষাটা কিছুতেই দিল না। অথচ হাই সেকেন্ড ক্লাস নম্বর পাওয়া ওর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। বাড়ীতে মা-বাবা ভাই-বোন সবাই আছে; কিন্তু ওর সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। বছর চারেক ও বাড়ী ছাড়া। আমার কোচিং-এ ও বাসা নিয়েছে। এই রকম একজন লোক সব সময়ে হাতের কাছে পাওয়াতে আমারও খুব সুবিধা হয়েছে। লাইব্রেরী থেকে বই আনে, বই পড়ে, নোট রাখে। নিয়মিতভাবে কোচিং-এর কোন কাজ করে না বটে, কিন্তু কোনো শিক্ষক না এলে, ও অনায়াসে তার বদলে পড়ানোর কাজ চালিয়ে দিতে পারে। হায়ার সেকেন্ডারীর ইংরাজী, বাংলা, ইতিহাস, কোনটাতেই ওর আটকায় না। কম পয়সা কম বলে, তবে যখন বলে তখন বেশ গুছিয়ে নিজের মতামত জাহির করতে পারে। আমরা মানে আমি এবং আমার ইনস্টিটিউটের অন্যান্য শিক্ষকরা একে ডাকতাম।

অল্পবয়সী শিক্ষক অধ্যাপকদের একটা আড্ডা জমে প্রতি রবিবার বিকেলে। সেখানে মাঝে-মাঝে ও কিছু বলে। ইয়ং জেনারেশনের সকলেই প্রায় ওর ভক্ত। অনুরুদ্ধ বলা চলে। কারণ, ওর র‍্যাডিক্যাল ধ্যান-ধারণা। সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, সব ব্যাপারেই ওর মতামত অভিনব। আমরা বয়স্করা, ওর মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিই না বটে; কিন্তু ওর কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগে না। প্রচলিত সব কিছুর উপর ওর দারুণ অশ্রদ্ধা। অবিশ্বাস, সন্দেহ, হতাশা, ক্রোধ, অহঙ্কার, প্রকাশ পায় ওর বক্তব্যের ছত্রে-ছত্রে; তবু ওকে আমাদের ভাল লাগে। ওর প্রতিভা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাছাড়া ওর কোন বিষয়ে আসক্তি নেই বলেই ওর সঙ্গে আমাদের কারুর কোন বিষয়ে রেষারেষি নেই, বিরোধ নেই। তাই ওকে অনায়াসে ভালবাসতে পারি, ওর অদ্ভুত মতামত সহ্য করতে পারি। মাপ করবেন, ভূমিকাটা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এইবার কাজের কথায় আসি। মাস দুয়েক হল পার্থ আমাকে জানায় যে, আমার শ্যালিকা তার প্রেমে পড়েছে, অথচ সে চেষ্টা করেও গৌরীকে মানে আমার শ্যালিকাকে ভাল বাসতে পারছে না। এই কারণে সে বিচলিত। গৌরী আমার কাছে থাকে, কোচিং-এর ম্যানেজমেন্ট অনেকটা তারই হাতে। বছর চারেক আগে বাংলায় অনার্সসহ বি-এ পাশ করেছে। প্রাইভেটে এম-এ দেবার চেষ্টা করছে। তাকে পড়াশুনার ব্যাপারে পার্থ মাঝে-মাঝে সাহায্য করে থাকে। গৌরীকে কথাটা বলতে সে অবাক হয়ে গেল। তার কোন রকম দুর্বলতা আছে বলে আমার কোন দিন মনে হয় নি; তার সঙ্গে কথা-বার্তার পর বুঝলাম পার্থ ভুল ধারণা করেছে। তাছাড়া, গৌরী তার দিদির কাছে জানিয়েছে যে, বিয়ে সে করবেই না, যদিও করে পার্থকে তো নয়ই। একথা অবশ্য পার্থ জানে না। দু মাস ধরে তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। রবিবারের সভায় থাকে না, ক্লাস নিতে রাজী হয় না, পড়াশুনোতেও মন দিতে পারে না। কয়েক দিন আগে আমাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, সে গৌরীকে বোধ হয় ভালবাসে। তবে মুস্কিল এই যে, প্রচলিত রীতিতে সে গৌরীর পাণিগ্রহণ করতে পারবে না। বিবাহ নামক সংস্কারের সে ঘোরতর বিরোধী। গৌরীকে সে প্রেম বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে যে সব কথা বলেছে, তার পর তাকে বিবাহের কথা বলা চলে না। অথচ গৌরীকে ছাড়া তার জীবন দুর্বিসহ মনে হচ্ছে। আমি বললাম যে গৌরী তাকে পছন্দ করে বটে, কিন্তু পার্থ যে রকম ভাবছে, গৌরী সে রকম ভাবছে না। প্রেম বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে বর্তমানে গৌরীর কোন ইন্টারেস্ট নেই। ওকে আঘাত দেবার ইচ্ছা ছিল না বলেই খোলাখুলি বলতে পারলাম না যে গৌরী তাকে পছন্দ করে না। আমার এত সতর্কতা সত্ত্বেও পার্থ আহত হল। আমার সামান্য কথায় ও এতটা বিচলিত হবে, তার ফল এতটা গুরুতর হবে আমি ধারণা করতে পারি নি। পার্থ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সারা দিন ফিরল না, রাতেও দেখা মিলল না। পরদিন নানা জায়গা খোঁজাখুঁজি করেও ওর পাত্তা পেলাম না। মাত্র কাল ওর সন্ধান পেয়েছি। বারাকপুরে এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী থেকে ওকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে এসেছি। ও প্রথমটায় আমাদের চিনতে পারে নি। অচেনার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তবে আমাদের সঙ্গে আসতেও কোন আপত্তি করে নি। ইন্সটিটিউটে আমার পাশে ও চৌ-কছে, ওখানে সে থাকবে না। বাইরে কোথাও চলে যাবে। অনেক করে বোঝাতে

ডাক্তারের কাছে আসতে রাজী হয়েছে। ওর এই সব পাগলামী দেখে আমার স্ত্রী গৌরীকে নিয়ে বাগবাজারে তার দাদার কাছে চলে গেছে। ও নিজের জিনিসপত্র চিনতে পারছে, বই খাতাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়াও করছে, পড়বারও চেষ্টা করছে; কিন্তু বলছে ও নাকি কিছুই বুঝতে পারছে না।

পার্থকে দেখলাম। রোগা, লম্বা, মুখে দু-একটা বসন্তের দাগ, মাথায় অবিন্যস্ত চুল। অবিনাশবাবুকে সে আগে চিনতো কিনা বলতে পারল না। বর্তমানে সে অবিনাশবাবুর বাড়ীতে আছে। সে বাড়ীতে আগে কোন দিন ছিল কিনা জানে না। অবিনাশবাবুর সঙ্গে, তার ধারণা, দু-এক দিনের মধ্যে তার আলাপ হয়েছে।

সামান্য কিছু ওষুধপত্র ও হিপনটিক সাজেশানের ফলে তিন-চার দিনের মধ্যে পার্থ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল। এই ধরনের হিস্টিরিয়ার রোগীর সঙ্গে মনের কথার পাঠকদের পরিচয় আছে, কাজেই রোগ-বৃত্তান্ত নিয়ে বেশী কিছু বলব না। পার্থ-সারথির শৈশব ও কৈশোরের ইতিহাসের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এই ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। আধুনিক তরুণ মনের অনেক চিন্তা-ভাবনা, বিচ্ছিন্নতার সামাজিক ও মানসিক কারণ, পার্থসারথিকে জানলে আমরা বুঝতে পারব।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে পার্থ। মাতা-পিতার প্রথম সন্তান। বাবা ডাক্তার; সারা দিন প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত। মা নার্স, তিনি স্বামীর এক নার্সিং হোম পরিচালনা করেন। পার্থ জন্ম থেকেই ধাইমার কাছে মানুষ। মা ও বাবা দুজনেই দিনান্তে এক-বার কি দুবার ওর খোঁজ-খবর নিতেন। শৈশব থেকেই পার্থ নিঃসঙ্গ। ঠাকুর, চাকর ও ধাইমাকে নিয়ে তার জগৎ। স্কুল-জীবনেও সে নিঃসঙ্গ বোধ করেছে। ছেলেদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে নি, খেলাধুলোয় কোনো উৎসাহ ছিল না, অন্য ছেলেরাও ওকে এড়িয়ে চলত। নিজের গড়া এক স্বপ্ন রাজ্যের মধ্যে ও বাস করত। সাত বছর বয়সে মায়ের দ্বিতীয় সন্তান জন্মানোর পর থেকে মনে হতে লাগল যে, ও যেন এ বাড়ীর কেউ নয়। ওকে বোধ হয় মা-বাবা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছেন। নিজের মায়ের সন্ধানে মাঝে-মাঝে রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হত। মনে হত, এই বড় রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কোন ছোট্ট ভাঙা বাড়ীর অন্ধকার ঘরে শুয়ে-শুয়ে মা বোধ হয় পার্থর কথা ভাবছে। আরো চার বছর পরে এল মায়ের কোলে আর একটি সন্তান।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের প্রতি মা-বাবার অনেক বেশী ভালবাসা, অনেক বেশী আকর্ষণ। পার্থ নিজের ঘরে বসে-বসে ভাবত যে, সে আর একটু বড় হলেই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। তৃতীয় সন্তানের মা হবার পর থেকে পার্থজননী নার্সিং হোমের পরিচালনাভার ছেড়ে দিলেন। গৃহ-কর্মের কাজে মন লাগালেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির জন্যেই তিনি বাইরের কাজ থেকে অবসর নিলেন। পার্থ কিন্তু ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখল না। তার মনে হল ছোট বোনের প্রতি স্নেহের টানেই মা বুঝি ঘর-মুখো হয়েছেন। মা মাঝে-মাঝে তার ঘরে আসতেন, তার বইপত্র গুছিয়ে দিতেন, তার মাথায় হাত রেখে আদর করতেন। পার্থ সহজ মনে এই আদর নিতে পারত না। মা চলে যাবার পরই জিনিসপত্র ছিটিয়ে, ঘরটাকে আবার অগোছাল করে রাখত। মায়ের ইচ্ছে ছিল পার্থ সায়েন্স নিয়ে পড়ুক; পাশ করে ইঞ্জিনীয়ারিং কিম্বা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবে। বাবাও হয়ত তাই চাইতেন, কিন্তু মুখ ফুটে কোন দিন কিছু বলেন নি। পার্থ ইতিহাস সংস্কৃত নিয়ে পড়বে জানাল। তাঁরা বিশেষ কিছু বললেন না। পাশ করে কলেজে ভর্তি হল। সেখানেও সে একা। মাঝে-মাঝে ক্লাসে দাঁড়িয়ে অধ্যাপকদের চমকে দেওয়ার মত প্রশ্ন তুলে সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা এড়িয়েই চলল। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা অনেক চেষ্টা করেও তাকে কোন দলে ভেড়াতে পারল না। মাঝে-মাঝে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে প্রশংসা লাভ করলেও, বক্তৃতা দেবার জন্যে কোন আমন্ত্রণ আসলে সে প্রত্যাখ্যান করত। পরীক্ষার আগে একদিন বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হল একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। ব্যাপারটা পার্থ তুচ্ছ মনে করলেও তার বাবা বোধহয় মনে করেন নি। বাবা ইলেকশনে দাঁড়াবেন বলে পাড়ার সর্বজনীন উৎসবে, ক্লাবের বাৎসরিক খেলাধুলোয়, বেশ মোটা চাঁদা দিয়ে পপুলার হবার চেষ্টা করছিলেন এবং নানা জায়গায় প্রাচীন ভারতের মহিমা কীর্তন করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। খাবার টেবিলে তাঁর এই রকম একটা বক্তৃতা সম্বন্ধে পার্থর অভিমত জানতে চেয়ে-ছিলেন বাবা। পার্থ শুধু বলেছিল, প্রাচীনের মহিমা কীর্তন একটা মিথ্যা ব্যাপার। মিথ তৈরী করা স্বার্থান্বেষীদের কাজ। পুরনো দিনের কোন সময় গোল্ডেন এজ ছিল ভাবা আহাম্মুকী। আবার ভবিষ্যতের ইউটোপিয়া নিয়ে স্বপ্ন দেখাও বোকামী। বাবা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। উঠে যেতে-যেতে বলেছিলেন, পুরনো

সেজন্যেই নতুনের জন্ম, শুধু তাই নয়; পুরনোই নতুনকে বাঁচিয়ে রাখে। বাপ-ঠাকুরদার পুরনো ছাঁদের উপায় নিশ্চিন্ত মনে বসে কেমন নতুনরা পুরনোকে অগ্রাহ্য করে, তাদের কোন মতেই সৎ বলা চলে না। সেই সাধারণেই বাড়ী ছেড়ে একটা বোর্ডিং-এ উঠে যায় পার্থ। কয়েক দিন খুব কষ্টে কাটে। কোন মতে দুটো টিউশনী জোগাড় করে নিজের খরচা চালাতে থাকে। প্রথম দিক মা-বাবা বিশেষ কোন খবর নিতেন না, ভেবেছিলেন রাগ কমলেই ফিরে আসবে। তারপর মা-বাবা পর-পর কয়েক দিন এসেও পার্থকে বাড়ী ফেরাতে পারেন নি। সেই থেকে ঘরের সঙ্গে বিচ্ছেদ। কয়েক বার পোস্টে চেক পাঠিয়েছেন বাবা, পার্থ চেক ছিঁড়ে ফেলেছে। এই টিউশনী করতে গিয়েই অবিনাশবাবুর সঙ্গে যোগা-যোগ, এবং তাঁর ইনস্টিটিউটে আশ্রয় লাভ ঘটে।

পার্থর শৈশবের ইতিহাসের মধ্যে সাম্প্রতিককালের অনেক তরুণের ইতি-হাসের ছায়া পড়েছে। কঠোর জীবন সংগ্রামে নিজেদের টিকিয়ে রাখা ও কেরিয়ার তৈরীর চেষ্টায় যে সব পিতা-মাতা অতি-মাত্রায় ব্যস্ত, তাঁরা স্বভাবতই সন্তানদের দিকে ঠিক মত নজর দিতে পারেন না। ছেলে-মেয়েরা অর্থকষ্টের মধ্যে মানুষ না হয়েও অনেকটা অযত্নে আগাছার মত বেড়ে ওঠে। গুরুদের সঙ্গে তাদের সংযোগসূত্র খুবই ক্ষীণ, উষ্ণ স্নেহ থেকে তারা বঞ্চিত। কাজেই তারা ক্রমশ পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুরনো ঐতিহ্যের প্রতি, ট্রাডিশনের প্রতি তাদের কোন মমত্ববোধ থাকে না।

বর্তমান সম্পর্কেও তাদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা হয়ে ওঠে উদাসীন। মস্তিষ্কের বিশিষ্ট টাইপ

DOL-337 BEN

অনুরাগী তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে এই জীবনবিতৃষ্ণা। পার্থর দুর্বল মস্তিষ্কে দ্বিতীয় আবেগের স্তরের প্রাধান্য [illegible] তাকে সমাজকে বোঝবার জন্য যুক্তি-চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তার সমস্যার-সমাধানের চেষ্টা করেছে নিঃসঙ্গভাবে, একান্ত নিজের চেষ্টায়। মস্তিষ্কের সহায়কতা কম বলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, একথা বলা চলে না। মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়লেই মানুষ নিউরোটিক হয়ে পড়ে না। অনেকের কাছে জীবনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা জীবনবোধকে বাড়ায়, জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। সমস্যা ছাড়া জীবন অনেকের কাছেই অর্থহীন। পার্থ কি সমস্যার জন্যেই অসুস্থ? একই ধরনের সমস্যা কেউ সমাধান করতে পারে, কেউ পারে না। মস্তিষ্কের সঙ্গে সব সময় এই সমস্যা সমাধানে ক্ষমতার সম্পর্ক থাকে না। আমরা উপায় নেই বলেও অনেক কিছু সহ্য করতে পারি। যে দারিদ্র্য সুইডেন বা আমেরিকায় বড় দেখে অসহ্য মনে হয়, তার থেকে অধিক গুণ বেশী অভাব-অনটনের পীড়ন অনুন্নত দেশের মানুষ হাসিমুখে সহ্য করে। ইংরেজ আমলে যে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হয়েছি, তার থেকে অনেক বেশী অন্যায়-অত্যাচার আমরা মগ আর বর্গীর আমলে মুখ বুজে সহ্য করেছি। বাস্তব পরিবেশের অন্যায়-অবিচার দুঃখ-দারিদ্র্যের চাপে পড়লেই উপায়ান্তর না দেখে মানুষ বিপ্লব করে, এ ধারণা ঠিক নয়। ইতিহাস বলে যে, যখন অবস্থার উন্নতি দেখা যায়, যখন চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে, যখন নিপীড়িত মানুষ বুঝতে পারে যে, তাদের দাবী-দাওয়া মেটবার পথ আছে, তখনই মানুষ চরম আক্রোশ ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিয়ে বিপ্লবের তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুধু 'অবজেক্টিভ কণ্ডিশন' নয়, 'সাবজেক্টিভ কণ্ডিশনও' বিপ্লবের পূর্বশর্ত। ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্য, নিজের দেশকে উন্নত করার জন্য, সার্থকভাবে মানুষ অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী। তেমনি ব্যক্তির সহ্যশক্তিও তার ভবিষ্যতের কল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত। যে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, সে বর্তমানের সমস্যা সমাধানে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করতে সক্ষম, সে সঙ্কট নিরসনে আপ্রাণ সংগ্রাম করার ক্ষমতা রাখে। দুর্বল মস্তিষ্কই তখন সবল হয়ে ওঠে, নার্ভগুলো ইস্পাতের মত শক্ত হয়, মস্তিষ্ক কোষের উত্তেজনা-নিস্তেজনার সহযোগ পরিধি বেড়ে যায়। আমাদের পার্থ অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে, তাই তার সহ্যশক্তি নিঃশেষিত, তাই গৌরীর প্রত্যাখ্যানে সে মর্মাহত। ওর কথাতেই ওর মনোভাব জানাচ্ছি। বিচ্ছিন্নতা নিরসনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ওর মনে জেগেছে। ও সেটা বুঝতে পারছে না, কিম্বা বুঝেও স্বীকার করতে চাইছে না।

—আমি কোন কিছুর মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না, শুধু দেখে যেতে চাই। ছোটবেলায় মাকে দেখেছি। বাবাকে দেখেছি। সতীর্থদের দেখেছি। তাদের সঙ্গে কখনও নিজেকে জড়িয়ে ফেলি নি, সব সময় নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছি। আমার ছোট বোনটা একদিন বারান্দা থেকে পড়ে যায়, তার কপাল কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে, আর্তস্বরে সে কাঁদতে থাকে; আমি তাকিয়ে দেখেছি শুধু। চাকর এসে তাকে তুলে নিয়েছে, রক্ত ধুইয়ে দিয়েছে, দাইমা আইডিন লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করেছে, আমি কিছু করি নি। আমার কোন ভাবান্তর ঘটে নি। রাস্তায় কেউ গাড়ী চাপা পড়লে আমি পাশ দিয়ে নির্বিকারভাবে হেঁটে চলে গেছি। দুঃখ-কষ্ট ভোগের জন্যেই জীব জন্মায়। অসংখ্য মানুষ এই মুহূর্তে কত রকমের দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে, কল্পনা করতে পারেন কি? কেউ শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে পরিচিত পৃথিবীটাকে দেখতে চাইছে, কেউ ক্ষুধা মেটাবার জন্যে নিজের সব কিছু বেচে দিয়ে নিঃস্ব হতে চাইছে, কেউ প্রিয়জনের মৃত্যুশয্যার পাশে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রিয়জনের জন্যে অনেক বছরের পরমায়ু ভিক্ষা করছে। হয়ত এই মুহূর্তে আল্‌প্‌স-এর শিখরে একটা জেট প্লেন ভেঙে পড়ল। আরামপ্রিয় যাত্রীরা জ্বলন্ত প্লেন থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে। এই তো জীবন। এই রকম ছিল, এই রকম থাকবে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট সেই দিনই শুধু দূর হতে পারে, যেদিন জীবনের স্রোতটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। আমি তাই কারুর দুঃখ-কষ্ট নিয়ে মাথা ঘামাই না, দুঃখ-কষ্টে বিচলিত হই না। কাউকে ভালবাসি না, কেউ আমাকে ভালবাসুক এও আমি চাই না। একটা বইয়ে সেদিন পড়ছিলাম মানুষের মিথ্ সৃষ্টির কথা। মিথ্যে মিথ্ সৃষ্টি করে মানুষ বাঁচার রসদ লাভ করতে চায়। রামরাজ্যের মিথ, শ্রেণীহীন সমাজের মিথ, এক পৃথিবী এক জাতির মিথ্—এই সব মিথের মিথ্যা আশা দিয়ে ছেলে ভুলানো ছড়া লেখা যায়, বড়দের জীবন-অসন্তোষ ভোলান যায় না। তবে আমি ভালবাসলাম কেন? গৌরীকে ভালবাসলাম, প্রেমের মিথের ভিকটিম হলাম। আমি ভালবেসেছি কিনা এ সম্বন্ধে কিন্তু এখনও আমার সন্দেহ আছে। ভালবাসা আমার কাছে একটা শব্দ মাত্র। একটা অনাবিষ্কৃত দেশের স্বপ্ন দেখার দুর্বলতা মাঝে-মাঝে আমাকেও পেয়ে বসে। সেই যে, রাজপথটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা ভাঙা বাড়ী, তার মধ্যে একটা অন্ধকার ঘরে বসে একজন কাঁদছে। সেই একজন আমার মা। গৌরীকে দেখে হঠাৎ একদিন মনে হয়েছিল গৌরী বোধ হয় হারিয়ে-যাওয়া কোন কিছু খুঁজছে। আপনার সামনে বসে গৌরীর কথা শুনে বুঝেছি আমার ধারণা ভুল। গৌরী মিথ, প্রেমের মিথ ছেড়েও আমি সুস্থ থাকতে পারব। আমার কিন্তু সন্দেহ আছে।

—মনোবিদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুহূর্তে একটা সন্দেহে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল বিনয়। তাহলে এই ব্যাপার। কিন্তু চেহারা দেখে বোঝবার জো নেই। মনে মনে হাসল সে। নীরবে হাঁটতে থাকে। পাশাপাশি মেয়েমানুষটি হেঁটে চলেছে। বারবার মুচকি হাসছে আর দু' চোখে বিদ্যুত কটাক্ষ।

—একটু আস্তে হাঁটুন।

—কী চাই? রূক্ষ কণ্ঠস্বর বিনয়ের, কেন বিরক্ত করছেন।

—চলুন না একটু গঙ্গার ধারে। প্লীজ।

—না! কঠিন চোখে তাকাল বিনয়, আমার কাছে টাকা নেই।

—সত্যি? স্ত্রীলোকটি থমকে দাঁড়াল। চোখমুখে বিষাদ আর হতাশা।

—হ্যাঁ। বিনয় এবার প্রায় ছুটতে থাকে। অনেকটা হাঁটার পর একবার পিছন ফিরে তাকায়। মিশে গেছে লোকজনের ভীড়ে বেহুদো মেয়েমানুষটি।

আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। বরং তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে। শেফালীর হাসি মুখ সে দেখতে চায়। বাসে ওঠার আগে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা কিনল। তারপর কী ভেবে আপনমনে হাসল।

তেমন ভীড় নেই বাসে। বিনয় ফুলের গন্ধ শুঁকল একেকবার। আশ্চর্য! মীরা এত তাড়াতাড়ি পল্টুকে ভুলে...। শোভনের সঙ্গে কী এই প্রথম সিনেমা দেখছে? বোঝা যাচ্ছে ওদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা বোধকরি ঘনিষ্ঠ। মীরা কী নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে? নতুন ভালবাসার মানুষকে নিয়ে? কী জানি...অদ্ভুত মীরা! কোনদিন ওর কাছে গোপন কিছু করে না। যাক্ কী হবে এসব ভেবে। যা খুশি করুক মীরা—হয়ত আবার আঘাত পাবে, আবার ব্যর্থতা আর চোখের জল।

লাফ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। দরোজা বন্ধ। কড়া নাড়ল বেশ জোরে বিনয়। বেশ হালকা হয়ে গেছে মনটা। দরোজা খুলে যায়। শেফালীর গম্ভীর মুখ। সে একবার শুধু বিনয়ের দিকে তাকায়। তারপর মাথা নীচু করে রান্নাঘরের দিকে এগোয়।

বিনয় দেখল বারান্দায় তক্তপোষের ওপর মা শুয়ে। সে আস্তে আস্তে রান্না-ঘরের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল। শেফালী মাথা নীচু করে আনাজ কুটছে।

—মার কী শরীর খারাপ? নীচু গলায় বিনয় বলে, দ্যাখ তোমার জন্যে কী এনেছি।

মাথা তোলে না শেফালী। কোন জবাব দেয় না।

বিনয় এগিয়ে যায়। উবু হয়ে বসে শেফালীর মুখ এক হাতে তুলে ধরে। চুমু খেতে গেলে শেফালী বঁটি নামিয়ে মুখ সরিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বলে, থাক! আমাকে কাজ করতে দাও।

—এখনও রাগ কমেনি?

—রাগ কিসের। কার ওপর রাগ করবো?

—আমার ওপর। শেফালী একটু হাসিমুখে কথা বল। কেন এভাবে কষ্ট দিচ্ছ!

হাসল শেফালী, অবাক হচ্ছি তোমাকে দেখে। হঠাৎ ফুল?

—এমনি। বিনয় এবার অতর্কিতে নীচু হয়ে খপ্ করে চুমু খায় শেফালীর ঠোঁটে।

—ইস! মা রয়েছেন খেয়াল আছে।

—শুয়ে আছেন এ সময়। শরীর খারাপ?

—জানি না। উনি আজকাল বোধহয় আমাকে সহ্য করতে পারছেন না।

—ছি শেফালী! বিনয় আহত কণ্ঠে বলল, তুমি মাকে চেন না। তোমাকে খুব ভালবাসেন। এমনকি আমার চেয়েও।

—সত্যি? বড় বড় চোখে শেফালী তাকাল, এবার জামাকাপড় ছেড়ে বিশ্রাম

জন। বাইরে খেয়েছো কিছু? সারাদিন মুখ ভার, তোমার দিকে তাকিয়ে আমার কান্না পেয়েছে। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। কী নিষ্ঠুর তুমি।

হঠাৎ নিঃশব্দ কান্নায় শেফালী দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দেয়।

বিনয় কিছু বলতে চায় কিন্তু কোন কথা খুঁজে পায় না। যা ভেবেছিল তা নয়। শেফালীর কাঁধে সে আলগোছে হাত রাখে। এভাবে চুপচাপ থাকা রীতিমত অস্বস্তিকর। কাঁদুক শেফালী কিছুক্ষণ। মনের গুমোট ভাবটা কেটে যাক।

কিছুক্ষণে সে বারান্দায় দাঁড়ায়। মা সারাদিন এ সময়ে ঘুমিয়ে থাকেন না। ব্যাপার কী? বিনয় পায়ে পায়ে এগোয়।

—মা! মা!

—কী? নীহার অবসন্ন কণ্ঠে বলেন, কখন এলি বিনু।

—দেখি তোমার কপাল। বিনয় মার চোখের দিকে তাকায়, শরীর খারাপ?

—ও কিছু না। নীহার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, তুই বিশ্রাম করগে।

বিনয় একপলক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মার মুখভাব লক্ষ্য করল। কেমন মলিন আর বিবর্ণ। সে আর দাঁড়াল না। শোবার ঘরে ঢুকল। জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে এল।

মা জানতে পারলে তীব্র আঘাত পাবেন। বিনয় ঘাড়ে গলায় পাউডার ছিটোয়। তারপর বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরাল। না, ওদের জানান ঠিক হবে না। এমনকি শেফালীকেও নয়। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। অনেক ব্যাপার গোপন করতে হয়। তাতে সমস্ত দিক থেকে মঙ্গল।

হঠাৎ পল্টুর মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। ছেলেটা রজতদাকে দেখা মাত্র সব ভুলে গেল। নীহার ডাকে একবার ফিরেও তাকাল না। আশ্চর্য!

জানালার পর্দা কাঁপছে। বেশ হাওয়া ঢোকে এ ঘরে। প্রচুর রোদ ঢোকে। সিটি বাজিয়ে জাহাজ গঙ্গার বুকে সাঁতার কাটছে। আজ খাওয়ার পর শেফালীকে সঙ্গে করে একটু গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবে কিনা ভাবল। কিন্তু মার কথা মনে পড়ল। সব সময়ে ফ্যাকাসে চোখমুখ। সে কতদিক দেখবে? কতজনকে সামলাবে?

—চল একটু ছাদে যাই।

শেফালী গালে ক্রিম ঘষতে ঘষতে একবার তাকাল। শেফালীর শরীর থেকে সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে। সে পেছন থেকে কাঁধের ওপর পরপর কয়েকবার চুমু খেল।

—ঘুম পাচ্ছে। শেফালী ঘুরে দাঁড়াল। হাসিমুখ। মুখোমুখি দুজনে। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসল।

—আস্তে। শেফালী চোখ বুজে নিঃশব্দে হাসল। ঘনঘন নিশ্বাস ছাড়ল কয়েকবার। বিনয় শেফালীর জিভ কামড়ে ধরল। সর্বদা এক ভয়। কখন কী হয় বলা যায় না। সাবধানের মার নেই। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাথার দিকের জানালার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো এসে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোয় শেফালীর মুখ দেখল। দু'চোখ বোজা। ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়ছে।

—এক গ্লাস জল দাও। বিনয় কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে সামান্য উঠে শেফালীর হাত থেকে গ্লাস নিল। এক চুমুকে গ্লাস শেষ।

ঘুমোলে?

না। বিনয় হাত বাড়িয়ে শেফালীকে কাছে টেনে নেয়।

বিনয়ের বুকে মুখ গুঁজে শেফালী অস্ফুটস্বরে বলে, তুমি যা বলবে তাই শুনবো।

অনেকক্ষণ পর বিনয় টের পায় শেফালীর গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস। তার চোখে ঘুম আসে না। নানারকম চিন্তায় শুধু এ-পাশ ওপাশ করেছে। শেফালীর কথা ভেবে সে আপন মনে হাসল। না, কোনকিছুতে তার বিশ্বাস নেই। দিনের আলোয় হয়ত সব পাল্টে যাবে। অতএব প্রস্তুত থাকা ভাল। যুদ্ধের জন্যে।

সে মশারি তুলে বাইরে এল। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। এক ঝলক হাওয়া এসে চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

॥ ষোল ॥

মিঃ হনুমান প্রসাদের চেম্বার থেকে হাসিমুখে বেরোল রজত। নিজের চেম্বারে যাওয়ার আগে একবার আড়চোখে কর্মরত কেরানীদের দিকে তাকাল। তাকে দেখে মুহূর্তে যে যার কাজে গভীর মনোযোগ দিয়েছে। মৃদু গুঞ্জন চুপ। মনে মনে হাসল সে। বেয়ারা সেলাম ঠুকে উঠে দাঁড়ায়। সে গম্ভীর মুখে চেম্বারে ঢুকল।

চেয়ারে বসতেই চোখ পড়ল ঐ দিকে। ওখানে একদিন মীরা বসত। বহু দিন চেয়ার টেবিল খালি পড়েছিল। এখন সেখানে টাইপ মেসিনের খট্‌খট্‌ আওয়াজ। নতুন মুখ। মিসেস চন্দ্রাণী মুখার্জি। নতুন ঢুকেছে। স্টেনো-কাম সেক্রেটারী।

খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালে বোঝা যায় চন্দ্রাণী মুখার্জি বিবাহিতা। সিঁথিতে সামান্য সিঁদুরের আভাস। চেহারা কথাবার্তায় বেশ স্মার্ট। তিরিশের নীচে বয়স। ভদ্রমহিলা সাজসজ্জায় রীতিমত আধুনিকা। নিটোল স্বাস্থ্য। হ্যাঁ, মোটামুটি সুশ্রীও বলা যায়।

একটা লিফট পেয়েছে রজত। কাজ বেড়েছে। মিঃ হনুমানপ্রসাদ তাকে ডেকে অভিনন্দন জানালেন। লোকটা বুদ্ধিমান। কাজ আদায় করতে জানেন। আজকাল চারদিকে যে রকম কল-কারখানা অফিসে ধর্মঘট। ছাঁটাই লে-অফ চলছে, তাতে কখন কী হয় বলা যায় না। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা খুব খারাপ। সতর্ক থাকা দরকার। এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে মিঃ হনুমানপ্রসাদের সঙ্গে।

সিগারেট ধরিয়ে কাজে মন দিল রজত। কিন্তু চিঠিটার দিকে তাকিয়ে তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। একবার তাকাল মিসেস মুখার্জির দিকে। মাথা নীচু করে টাইপ করছে।

—মিসেস মুখার্জি।

—স্যার।

উৎকণ্ঠিত মুখে মিসেস মুখার্জি কাছে এসে দাঁড়াল। একটা মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে। সোজাসুজি তাকাল না। অধস্তন কর্মচারীদের দিকে তাকাতে নেই। রজত চিঠির দিকে চোখ রেখে বলল, দুটো ভুল। রবার ব্যবহার করেছেন বোঝা যাচ্ছে। দু-এক জায়গায় কালো-কালো দাগ। লে আউট ভাল লাগছে না। এই নিন। আবার টাইপ করুন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে মিসেস মুখার্জি বলল, দুঃখিত স্যার।

রজত মাথা নীচু করে ফাইলের পাতা ওল্টায়। শুধু দুঃখিত বললে চলবে না। কাজ করতে হবে। তিনশ টাকা মাইনে তো এমনি দেওয়া হচ্ছে না। টের পায় মিসেস মুখার্জি নিজের সীটে ফিরে গেছে।

ইন্টারভিউ সেই নিয়েছিল। লোকজন নেওয়া বা প্রমোশন ইত্যাদির কর্তাব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সে। মিঃ হনুমানপ্রসাদ কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। দশজন পরীক্ষা দিয়েছিল। মিসেস মুখার্জির চেয়ে যোগ্য ক্যান্ডিডেট যে ছিল না এমন নয়। তবে?

আলাদাভাবে সবাইকে চেম্বারে ডেকেছিল রজত। মিসেস মুখার্জির করুণ মুখ আর কাতর অনুরোধ শুনে সে আর স্থির থাকতে পারে নি। অসুস্থ স্বামী। বুড়ো শ্বশুর শাশুড়ি। ছোট ছোট দেওর ননদ। সাত-আটজনের সংসার। সুতরাং সহানুভূতি স্বাভাবিক।

চোখের জল ফেলতে শুধু বাকি। মিসেস মুখার্জির চোখের দিকে সে তাকাতে পারে নি। খারাপ লাগছিল। এইসব অভাব অভিযোগ—ভাল লাগে না শুনতে। সহ্য করতে পারে না।

—দেখুন কথা দিতে পারছি না। তবে চেষ্টা করবো।

প্রথম দিন কাজে জয়েন করে মিসেস মুখার্জি অন্তরঙ্গ সুরে বলেছিল, ধন্যবাদ স্যার। আপনার উপকারের কথা জীবনে ভুলবো না।

রজত কোন জবাব দেয় নি। বরং আশেপাশে তাকিয়েছে। কেউ যদি শোনে, হয়ত

CENTRAL LIBRARY

সাধারণকম ভাববে। সে তাড়াতাড়ি বলেছে, বসুন। ডিকটেসন নিন।

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল রজত।

—বড়বাবুকে ডাক।

সেদিন মিসেস মুখার্জির কথা শুনে সে মনে মনে হেসেছে। সে ভেবেছিল মানুষের উপকার আর করবে না। বরং পারলে অপকার করবে। মাঝে মাঝে তার ওদের কথা মনে হয়। হ্যাঁ, মীরাদের কথা। উপকার তো করেছিল। ঐ সময়ে মীরার চাকরি না হলে ওরা ভদ্রভাবে বাঁচতে পারত না। থিয়েটার লাইনে মীরা আর কিছুদিন থাকলে বেশ্যা হয়ে যেত। ওদের বাঁচাল সে। কিন্তু পরিবর্তে কী পেল? নির্মম আঘাত। কী সেয়াক মীরার। ডিভোর্স চায়। বিনয় এসে প্রস্তাব জানায়। তার সঙ্গে একত্রে বসবাস নাকি মীরার পক্ষে অসম্মানজনক। হাউ ফানি!

—স্যার।

রজত ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, পরশু মিটিং। কালকের মধ্যে কাগজপত্র রেডি চাই।

—ঠিক আছে স্যর। বড়বাবু চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকাল, ড্রাফট আমার তৈরী। শুধু আপনি দেখে দিলেই টাইপে চলে যাবে।

—নিয়ে আসুন।

বড়বাবু ড্রাফট রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। রজত ড্রাফটের ওপর চোখ বুলোয়। বেশ কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে দেখে বড়বাবু দাঁড়িয়ে। মনে মনে সে হাসে। সে না বলা পর্যন্ত যাবে না। মাঝে মাঝে এদের নিয়ে সে খেলা করে। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। প্রায় বাপের বয়সী। ওকে অনেক সময় ধমকায়। ভদ্রলোক ফ্যাকাসে চোখমুখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে হাত কচলায়।

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন! কাজে যান।

প্রায় ছুটে পালায় বড়বাবু। রজত মৃদু হাসল আপনমনে। প্রতিহিংসা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে অনেক সময়। মনে হয় চরম একটা কিছু ঘটুক। লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক সবকিছু।

—মিসেস মুখার্জি।

—স্যার।

—আসতে হবে না। বসুন। যে ডিকটেশনগুলি দিয়েছিলাম টাইপ হয়েছে?

—আর একটা বাকী স্যার। দশ মিনিটের মধ্যে দিচ্ছি।

—তাড়াতাড়ি করুন।

গম্ভীর স্বরে কথা বলে রজত। মিসেস মুখার্জি প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে তার জন্যে সন্দেশ কিনে এনেছিল। সে তো প্রথমে অবাক। পরে কঠোর স্বরে বলেছিল, এসব কী?

কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল মিসেস মুখার্জির মুখ। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল।

—নিয়ে যান। আমি এসব পছন্দ করি না। আশা করি ভবিষ্যতে আপনি আর এরকম ভুল করবেন না।

কঠিন না হয়ে উপায় কী। দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। নইলে অফিস ডিসিপ্লিন বজায় থাকে না। একবার সহজ ব্যবহার করলে পেয়ে বসবে। অন্যায় সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে।

নির্মমভাবে সে ড্রাফটের ওপর কলম চালায়। ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায়। এত বড় বড় শব্দ ব্যবহারের কী দরকার। আর এত অনাবশ্যক কথা কেন। বড়বাবুকে ডাকতে গিয়েও থেমে যায়। বেচারীকে আর কড়া কথা বলবে না। লাভ নেই কিছু।

ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। রজত টেলিফোন তুলে বলল, রজত বোস বলছি।

—আমি লতা।

—কী খবর?

—তোমার কোন পাত্তাই নেই দেখছি। পর পর দুদিন তোমার ফ্ল্যাটে খোঁজ করেছি। আজ সন্ধেবেলা তুমি কী ফ্রি আছ?

—না। রজত এক মুহূর্ত কী ভেবে বলল, মিঃ সেনের কী খবর?

—জানি না। রজত, দিন দিন তুমি কেমন যেন হয়ে উঠছো। তুমি কী আমার সঙ্গ চাও না?

রজত কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ রিসিভার কানে লাগিয়ে বসে রইল। ওদিক থেকে লতার অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। অনবরত 'হ্যালো' 'হ্যালো'। রীতিমত অসহ্য। রজত বেশ জোরে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

—স্যার। মিসেস মুখার্জি টেবিলের ওপর চিঠিগুলো রাখে। রজত একবার তাকায়। ভদ্রমহিলার মুখ কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। চোখাচোখি হতে সে মাথা নীচু করে চিঠিগুলোর ওপর নজর বোলায়।

তাড়াতাড়ি সে একটার পর একটা চিঠিতে সই করে। ওরই মধ্যে দেখে নেয় ভুল-টুল আছে কিনা। টিফিনের সময় হয়েছে। আজ আর বাইরে যাবে না।

মিসেস মুখার্জি টিফিন করতে বেরিয়ে যায়।

রজত কফির কাপে চুমুক দেয়। লতাকে খুব হতাশ করেছে। না, আর এসব ভাল লাগে না। লতার মতলব খুব সুবিধের নয়। ও শুধু চেনে টাকা। যে বেশি টাকা ঢালতে পারবে তার সঙ্গে শোবে। অথচ বাইরে এমন ভাব দেখাবে যেন খুব সতী-সাধ্বী!

কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করেছে পল্টুকে। থাকে স্কুলসংলগ্ন হোস্টেলে। মাসে দু-তিনবার গিয়ে দেখে আসে। পকেট ভর্তি টফি চকলেট নিয়ে যায়। বড় হলে ওকে বাইরে পাঠাবে। অবশ্য যদি ব্রিলিয়ান্ট হয়।

পারল না মীরা পল্টুকে ধরে রাখতে। হিংস্র আনন্দে রজত একটু শব্দ করে হাসল। মনে পড়ছে বিদায়ের সময়ের মুখ। মীরা বারবার পল্টুকে কোলে নিতে চায়, পল্টু আরও বেশি করে ওকে আঁকড়ে ধরে। সে এক মজার দৃশ্য।

এবার দেখবো তোমার জেদ অহঙ্কার কোথায় যায়। মীরার উদ্দেশ্যে রজত মনে মনে বলে, কতদিন বাঁচব ছেলের মত তোমাকে অনুসরণ করব, তোমাকে আমি শান্তিতে থাকতে দেব না। সব সময় তাড়া খাওয়া কুকুরের মত ছুটবে তুমি। পালাবে কোথায়?

এখন একবার দেখতে ইচ্ছে করে কেমনভাবে বেঁচে আছে মীরা। কিছু না, নিছক কৌতূহল। পল্টুর শোকে বিমর্ষ, নাকি বেমালুম সব ভুলে গেছে?

—স্যার।

রজত চমকে তাকাল মিসেস মুখার্জির দিকে। হাতঘড়ি দেখল। ইস্! অনেকটা সময় সে আজেবাজে চিন্তায় নষ্ট করেছে। অথচ কত কাজ। অফিসে বসে স্মৃতিচারণ বা ভাবালুতায় সময় কাটানোর জন্যে মিঃ ইন্দ্রনাথপ্রসাদ তাকে মোটা মাইনে দেন না।

—বলুন। রজত বড়বাবুর দেওয়া ড্রাফট পড়তে থাকে। এত বলকম কেন যে এই ভদ্রমহিলা তার কাছে আসে সে বুঝতে পারে না। নির্বোধ নয়। তবে?

—কালকের দিনটা আমার ছুটি দরকার।

ছেলের অসুখের খুব জ্বর। বড় কেউ নেই যে, দেখাশুনো করবে। আর শাশুড়ি তো বাতের ব্যথায় ভালভাবে চলাফেরা করতে পারে না। স্বামীবেচারী শয্যাশায়ী গত দুবছর। তার সাংঘাতিক ব্যাধি। হ্যাঁ, রাজরোগ। চিকিৎসা প্রথম থেকে ভালভাবে হয় নি। কীভাবে হবে? মিসেস মুখার্জি সামান্য যা রোজগার করত, বেসরকারী অফিসে একশ টাকার টাইপিস্ট; আর শ্বশুরের পেনশনের দেড়শ টাকা, সবার কোন রকমে দুবেলা আহার জুটত। দৈর্ঘ্য ধরে সর্টহ্যান্ড শিখে, দুটো বছর বড় কষ্ট হয়েছিল, এখন না হয় মোটামুটি একটা ভাল চাকরী হয়েছিল।

—দেখুন মিসেস মুখার্জি। রজত চেয়ারে হেলান দিল, মনে রাখবেন আপনার নতুন চাকরী। আর মিঃ ইন্দ্রনাথপ্রসাদ আপনার কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট নন। আপনাকে সময় দেওয়া হচ্ছে। ভালভাবে কাজ শিখবেন। আপনার দায়িত্ব অনেক। সমস্ত দরকারী ফাইল আপনার কাছে। আপনি অফিস কামাই করলে চলে কি করে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে যে ছুটি চাইছেন বুঝতে পারছি।

—আমার খুব দরকার। নইলে দিতাম না।

—ঠিক আছে। দরখাস্ত দেবেন। তবে মনে রাখবেন আপনার নতুন চাকরী।

মিসেস মুখার্জি নিজের সিটে ফিরে যায়।

রজত টেবিলের দুধারে স্তূপীকৃত ফাইলের দিকে তাকাল। আজ ছুটির পর ঘণ্টা দুয়েক বসে কাজ করতে হবে। নইলে কাজ সারতে পারবে না। মিসেস মুখার্জি-কেও থাকতে বলবে।

বেল বাজাতে বেয়ারা ছুটে এল। বড়বাবুকে খবর দাও। বড়বাবু টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতে রজত ড্রাফট এগিয়ে দেয়, এখুনি টাইপ করতে দিন। ড্রাফট কে তৈরী

করেছে? আপনি? কত বছর চাকরী হল আপনার? যান, বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

বাইরে বেরিয়ে বড়বাবু নিশ্চয়ই ওকে গালাগাল করছে। শুধু বড়বাবু কেন, অন্যান্য কর্মচারীরা নিশ্চয় ওর বাপ চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে। হ্যাঁ, ওদের চোখে সে মোটেই সুখের ব্যক্তি নয়। সে জন্যে মনে কোন ক্ষোভ নেই। সংসারে এই নিয়ম।

—স্যার! বেয়ারা একটা স্লিপ এগিয়ে দেয়। রজত স্লিপের দিকে একবার তাকিয়ে খানিকটা অবাক। বিমল এতদিন পর কী জন্যে তার কাছে এসেছে?

—নিয়ে এসো।

রজত হাসিমুখে বিমলকে অভ্যর্থনা জানায়, পথ ভুলে নাকি? বস।

বিমল একটু হাসার চেষ্টা করল। গালে কয়েক দিনের জমানো দাড়ি। চোখমুখ শুকনো। পোশাক পরিচ্ছদ খুব শোভন নয়। খুব দ্রুত এসব দেখে নিল রজত।

—কেমন আছ রজতদা? বিমল রজতের দেওয়া সিগারেট টানতে থাকে। পিছন ফিরে একবার ভদ্রমহিলাকে দেখবে নাকি? বেশ চমৎকার চেহারা। একেবারে নিজের ঘরে বসিয়েছে রজতদা।

—চলে যাচ্ছে। রজত বেয়ারা ডেকে চা আনতে নির্দেশ করল, তোমার কী শরীর খারাপ বিমল?

—খারাপ নয়। বিমল মাথা নীচু করে কী যেন ভাবতে থাকে। ওর দিকে তাকিয়ে রজত অস্বস্তি বোধ করল। কেউ এসে যদি বলে ভাল নেই, তাতে সে ভয় পায়। বিশেষ করে পরিচিতজন হলে তো কথাই নেই।

—রজতদা আমি বড় বিপদে পড়েছি। তোমার সাহায্য চাইছি।

রজতের দুটি হাত চেপে ধরে বিমল। করুণ অসহায় চোখমুখ। বেয়ারা দু'কাপ চা রেখে চলে যায়।

—চা খাও বিমল। অতি কষ্টে হাত ছাড়িয়ে নিল রজত, কী হয়েছে?

—তোমার বৌদির খুব অসুখ। তুমি তো আর কোন দিন গেলে না। হাসপাতালে রয়েছে। আমার এখনি দুশো টাকার দরকার।

রজতের মুখের হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। বিপদে পড়ে এসেছে। নইলে আসত না। এতদিন কোন খোঁজখবর নেয় নি। তার কাছে প্রয়োজন ছাড়া কেউ আসে না।

—তোমার প্রিয় বন্ধুর কাছে না গিয়ে আমার কাছে যে বড় এলে।

—ওর কথা আর বলবেন না রজতদা। বিমল দুঃখভারে বলে, কিন্তু আজকাল পথেঘাটে দেখা হলে এড়িয়ে যায়। আমাদের মত আর আজকাল মানুষ বলেই গণ্য করে না।

—তাই নাকি! রজত মৃদু হাসল, তোমার বন্ধু, তুমি ভাল জান।

—বাদ দিন ওর কথা। বিমল একটু ইতস্ততঃ করে বলল, যেমন ভাই তেমন বোন। আমি সব শুনেছি রজতদা। আপনার সঙ্গে আর বনিবনা: হয় না...। আপনি রাগ করবেন না। বলতে দিন। আপনি কাজের মানুষ, অনেক খবর রাখেন না। এদিকে কিন্তু যেন...জানি না ভদ্রলোক কে... হাসতে হাসতে সিনেমা হলে ঢুকছে...।

—বিমল! রজত চিৎকার করে উঠল। বেশ জোরে।

মিসেস মুখার্জি চমকে ফিরে তাকাল। বাইরে বেয়ারা একবার ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। ওঘরে বড়বাবু আর অন্যান্য কর্মচারীরা চমকে একে অন্যের দিকে তাকাল।

বিমলের মুখ সাদা ফ্যাকাশে। সে মাথা-নীচু করে বসে থাকে।

একশো টাকার দুটো নোট বিমলের হাতে গুঁজে দেয় রজত, লিভ মি এলোন!

একরকম ছুটে পালিয়ে যায় বিমল।

রজত টের পেল সমস্ত শরীর দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। সে একবার আড়-চোখে মিসেস মুখার্জিকে দেখল। সে কী খুব জোরে চিৎকার করে উঠেছিল? সিনেমা-হল...মীরা... ভদ্রলোক... হাসতে হাসতে... ...অন্ধকার হল...হাতে হাত বাহুতে বাহু ছোঁয়াছুঁয়ি...কে ভদ্রলোক... কবে... মীরা... পল্টুকে ভুলে......!

—মিসেস মুখার্জি।

—স্যার।

—অনেক কাজ জমেছে। আজ ঘন্টা দুয়েক অফিসের পর থাকতে হবে।

—স্যার। শ্বশুরমশাই অসুখ—তাড়াতাড়ি না ফিরলে...।

—দেখুন মিসেস মুখার্জি, প্রয়োজনে অফিসের পর কাজ করতে হয়। শুধু নিজের সুখ-সুবিধে দেখলে চলে না। আপনি তো এমনি কাজ করছেন না—ওভারটাইম পাবেন।

—স্যার।

—বসুন। রজত ভ্রূ কুঁচকে ভদ্রাণীর দিকে তাকাল।

—কিছু না। মিসেস মুখার্জি সীটে ফিরে যান। মলিন চোখমুখ।

সমস্ত চিন্তা ভাবনা বিসর্জন দিয়ে রজত ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কালো কালো অক্ষর। ঝাপসা লাগছে। টনটন করছে দু চোখের পাতা। এভাবে অনেকটা সময় কেটে যায়।

—স্যার।

—কী? রজত বড়বাবুর ক্লান্ত ফ্যাকাশে মুখ দেখল। বলল, আপনি যান। কাল বারটার মধ্যে ডিভিশনের সমস্ত কাগজপত্র তৈরী যেন থাকে।

বড়বাবু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

দ্রুত কাজ সারতে থাকে রজত। মাঝে মাঝে মিসেস মুখার্জিকে ডেকে ডিকটেশন দেয়। স্তব্ধতার মধ্যে শুধু টাইপ মেশিনের খটাখট আওয়াজ। দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ। মাঝে মাঝে মোটরের হর্ণ ক্ষীণশব্দে ভেসে আসে।

কাজের মধ্যে ডুবে যদি সব ভুলে যেতে পারত সে।

অসহিষ্ণু শব্দে কলিং বেল বাজায়। বেয়ারা এলে তাকে দু'কাপ চা আনতে নির্দেশ জানায়। মিসেস মুখার্জির মুখ দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এই মহিলা স্বামী-শ্বশুর সম্পর্কে যা সব বলে তা কী সত্যি? অনেক সময় মনে হয় বানানো। শুধু এসব বলে সহানুভূতি আকর্ষণ করা। মিসেস মুখার্জিকে, মাঝে মাঝে একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে, শুধু একটা কথা ভাবলে; আর নতুন করে কোন রমণীর সঙ্গে হৃদয় সম্পর্ক বা অন্য কিছু, কোন রকম উৎসাহ পায় না সে। যদি কেউ স্বেচ্ছায় এলে, যেমন লতা, আকর্ষণ কম নয়, তবু তাকে বিমুখ করেছে। অবশ্য এই মনোভাব তার কতদিন থাকবে বলতে পারছে না। নিজেকেই সে চেনে না।

কে ভদ্রলোক? মীরার দ্বারা কী তা সম্ভব? হয়তো। ও সব কিছু পারে। কখনও সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতে বা এই রকম অনেক কিছু। তার ধারণা ভুল। পল্টুর জন্যে শোক প্রকাশ তো দূরের কথা—বরং নতুন প্রেমে...।

—স্যার।

—বসুন। চা খান।

মিসেস মুখার্জি মাথা নীচু করে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

—সব চিঠি টাইপ হয়েছে?

—দুটো বাকী স্যার। এখুনি হয়ে যাবে।

—আজ থাক। প্রায় সাতটা বাজে। আপনাকে আবার অনেকটা দূর যেতে হবে। কোথায় যেন থাকেন আপনি?

—বালিগঞ্জে। একটা কলোনীতে।

—চলুন ওঠা যাক।

বেয়ারা উঠে সেলাম জানায়। পাশাপাশি দুজনে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে থাকে। নীরবে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। বাসস্টান্ড। প্রচুর নরনারী অপেক্ষারত।

একটা বাস এসে দাঁড়ায়। মানুষে বোঝাই। মিসেস মুখার্জি একবার তাকায় রজতের দিকে। রজত অন্যমনস্কভাবে সিগা-রেট টানছে। যানবাহনের দিকে ভাবলেশ-হীন দৃষ্টিতে তাকায়।

—দেখুন মিসেস মুখার্জি। আমি দুঃখিত। অফিসের পর কাজ করতে বলে বলে। মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না। চলুন একটা ট্যাক্সী করে আপনাকে পৌঁছে দিই।

চলমান একটা খালি ট্যাক্সী সৌভাগ্য-ক্রমে পেয়ে যায় রজত।

—স্যার। মিসেস মুখার্জি চমকে ওঠে, কী দরকার ট্যাক্সীর। আমি বাসেই যেতে

পারব। আপনি আর কেন কষ্ট করবেন মিছিমিছি।

ট্যাক্সীর দরোজা খুলে রজত শান্তস্বরে বলল, উঠুন। আমার জন্য ভাববেন না। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

সামান্য ইতস্তত করল মিসেস মুখার্জি। একবার তাকাল রজতের দিকে। মুখে সামান্য হাসি। তারপর মাথা নীচু করে ট্যাক্সীতে উঠে যায়। রজত সীটে বসে দরোজা বন্ধ করতে করতে ভাবল, কেন হাসি! গম্ভীরস্বরে সে ড্রাইভারকে যাদবপুর যেতে নির্দেশ করল।

॥ সতের ॥

বিস্ফারিত চোখে অনুভার দিকে তাকায় মীরা। থর থর করে সমস্ত শরীর কাঁপছে। বাঁধুর সঙ্গে চোখাচোখি হল একবার। বাঁধুর দু'চোখে ঘৃণা। অনুভার দু'চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। ঘরের এককোণে শোভন দাঁড়িয়ে। কঠিন চোখমুখ। পর্দার আড়ালে হিমাদ্রীবাবুর অশান্ত পদচারণা।

—ছি ছি! তোমাকে আমরা চিনতে পারিনি। তুমি যে এত নীচ কে জানত!

—বৌদি! শোভন উত্তেজিতভাবে এক পা এগিয়ে এল, কেন ওকে বিরক্ত করছো! বাঁধু, বৌদিকে নিয়ে ওপরে যা। আর নাটক করিস না।

—তুমি থাম! বাঁধু তিক্তস্বরে বলে, তোমাদের ব্যাপার জানতে আর বাকি নেই। নাটক তো তোমরা শুরু করেছো। লজ্জা থাকলে আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে না!

অনুভা চিৎকার করে বলল, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এখানে ওসব অনাসৃষ্টি চলতে দেব না। তুমি অন্যত্র চলে যাও মীরা। হ্যাঁ, আজ রাত্রেই। যত তাড়াতাড়ি পাপ বিদেয় হয় তত মঙ্গল।

—আজ রাতেই? মীরার কণ্ঠস্বর খুব শান্ত, আপনি আস্তে কথা বলুন বৌদি। বাঁধু, আজ রাতটাও কী আমাকে থাকতে দিবি না

—না। বাঁধু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, মানুষের ভাল করতে নেই। উঃ তুই যে শেষকালে এমন একটা......। বৌদি, এখান থেকে তাড়াতাড়ি চল। আমার মাথা ঘুরছে।

অনুভাকে একরকম ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় বাঁধু।

মাথা ঝিমঝিম করছে। মীরা অতিকষ্টে এগোয়। তক্তপোষের একটা কোণ ধরে নিজেকে সামলায়। একবার তাকায় শোভনের দিকে। বিবর্ণ চোখমুখ। বারান্দায় এখন আর কেউ পায়চারী করছে না।

উঃ মাগো! মীরা অস্ফুট কান্নায় তক্তপোষের ওপর আছড়ে পড়ে। কাঁধের ওপর নরম স্পর্শ। শিরশির করে উঠল সমস্ত দেহ। এক ধরনের তীব্র উত্তেজনা পলকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

—ওঠ। ছি! এখন ভেঙে পড়লে চলবে না মীরা।

—চুপ করুন। মীরা আরক্তিম চোখে তাকায়, আপনি কেন আমার পেছনে লেগেছেন? এত রাত্রে কোথায় যাই। এখন কী করবো?

শোভনের মুখ পলকে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। সে এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। আস্তে আস্তে মুখে হাসি ফুটল।

—তোমার দাদার কাছে ফিরে যাও মীরা।

—না। মীরা শাড়ির আঁচল দিয়ে দু'চোখ মুছল, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যান। আপনার জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা।

শোভন হাসল, তোমার মাথার ঠিক নেই। এমন কী হয়েছে যে, এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছো। এক কাজ কর। বাথরুমে থেকে চোখমুখ ধুয়ে এস।

হাসবেন না ওভাবে। আপনার বৌদি কী সব বলল......ছি ছি ছি।

—বলুক। মিথ্যে তো বলেনি।

—তার মানে? মীরার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, মিথ্যে নয়। আপনি কী ইয়ার্কি করছেন!

শোভন চোখ বড় বড় করে বলে, এখন কী ইয়ার্কি করবার সময়। তবে কী জান, ওখোর দিক দিয়ে ওদের কোন ভুল হয়নি। এটা তো সত্যি, আমরা দুজনে বেশ কয়েকদিন সিনেমা দেখেছি, গঙ্গার ধারে বেড়িয়েছি, হোটেলে পাশাপাশি বসে চপ-কাটলেট খেয়েছি। তুমি রাস্তায় হাঁটার সময় মাঝে মাঝেই হেসে উঠেছো, এক আধবার আনতোভাবে আমার হাত চেপে ধরেছো......। তা এতে দোষের কী থাকতে পারে জানি না। হয়তো বাঁধু এমন সব মুহূর্তে আমাদের দেখেছে। তারপর সবিস্তারে বলেছে বৌদিকে। নানা রং মিশিয়ে। কী হল তাতে? কী এসে যায়? তোমার যা খুশি তাই করবে। তুমি কী ভয় পাচ্ছ মীরা?

—হ্যাঁ। মীরা হঠাৎ তক্তপোষের তলা থেকে চামড়ার সুটকেস বের করল। তারপর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে চাবি এনে সুটকেস খুলল। আলনা থেকে একে একে শাড়ি ব্লাউজ এনে সুটকেসের ভিতর রাখল।

—এসব কী! শোভন একটা সিগারেট ধরিয়ে শূন্যে রিং করল কয়েকবার, আমার ভাল মনে হচ্ছে না। কোথায় যাবে?

সুটকেস বন্ধ করে মীরা ঘরের চারিদিকটা একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিল। শোভনের কথার কোন জবাব না দিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে যায়। একটু পরে ফিরে আসে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছে। আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চুলে অন্যমনস্কভাবে চিরুনি বোলায়। মুখে সামান্য পাউডার মাখে। তারপর শোভনের দিকে ফিরে এক পলক তাকিয়ে সুটকেস হাতে তুলে নেয়। এবং দ্রুতপায়ে পর্দা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যায়।

পিছন ফিরে তাকায় না মীরা। দ্রুত হাঁটতে থাকে। কিন্তু টের পায় পিছন পিছন শোভন আসছে। বুক কেঁপে ওঠে। চারিদিকে তাকায়। একটা ট্যাক্সী দরকার। কিন্তু কোথায় সে যাবে?

—মীরা! মীরা!

শোভন এবার পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। এভাবে সে মীরাকে একা ছেড়ে দিতে পারে না। ভীষণ ক্ষেপে উঠেছে মীরা। ওকে কীভাবে শান্ত করবে ভাবতে থাকে সে।

—আপনি আসছেন কেন! মীরা তাকায় না শোভনের দিকে, ঘরের চাবি বাঁধুকে দিয়ে দেবেন। আর ভাড়ার টাকাটা।

—কিন্তু যাচ্ছ কোথায়?

—জানি না। আপনি ফিরে যান।

—না। তোমাকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না।

—কেন! আপনি কী আমার গার্জেন? দেখুন শোভনবাবু, মিথ্যে আমার সঙ্গে আসবেন না। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন।

—কী রকম? শোভনের মুখে অল্প হাসি, একটু আস্তে হাঁটি।

—দু' একদিন সিনেমা দেখা কিম্বা গঙ্গার ধারে বেড়ানো..... আপনি তো আর অপরিচিত কেউ না......বান্ধবীর দাদা...... কিন্তু এত অন্যরকম ভাববেন না......।

—কী রকম? এবারও শোভনের হাসি হাসিমুখ।

—জানি না। মীরা হঠাৎ দাঁড়ায়, হাসবেন না ওভাবে। দেখুন, আপনি চলে যান আবার বলছি। নইলে লোকজন ডাকব।

—ডাক। উদাস কণ্ঠস্বর শোভনের, দেরী করছো কেন মীরা।

কিন্তু ডাকবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না মীরার। সে নীরবে হাঁটতে থাকে। মনে মনে হাসল শোভন। কেমনভাবে যেন সে নিজের অজান্তে জড়িয়ে পড়েছে মীরার সুখ-দুঃখের সঙ্গে। যাও সহজেই সে চলে যেতে পারে না। কিন্তু কোথায় যেতে চায় মীরা এত রাত্রে?

—শোভনবাবু!

—কী হুকুম মীরা। শোভন মুখ টিপে হাসল, এভাবে যদি সারারাত হাঁটা যায় একটু পরে লোকজন কমে আসবে। মোটরের হর্ণ শোনা যাবে না, চতুর্দিক স্তব্ধতা, শুধু কঠিন ফুটপাথের ওপর আমাদের পদশব্দ, মাঝে মাঝে পুলিশ......তাই বলা যাক, হাঁটবে সারারাত?

আমার মাথা খারাপ হয়নি। আপনি হঠাৎ রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন? শুনুন, এখন হাসি ঠাট্টার সময় নয়। আজ রাতের মত একটা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা হলে......।

—চল আমার সঙ্গে। শোভন একটা রিক্সা ডাক দিল।

—কোথায়?

—উঠে এসে রিক্সায় বসুন। তারপর বলছি।

মীরা সঙ্কুচিত হয়ে সীটের এক কোণে বসেছে। কিন্তু মাঝে মাঝেই টাল সামলাতে পারছে না। ফলে ছোঁয়াছুঁয়ি। বুকের ভিতর এত কাঁপুনি কেন। মীরা শোভনের মুখের

দিকে তাকাতে পারছে না। যদিও টের পাচ্ছিল একজোড়া চোখের অলস চাহনি।

আলতোভাবে মীরার কাঁধ স্পর্শ করল শোভন. আমাকে কী অবিশ্বাস কর তুমি? এটা জানবে আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

—কোথায় যাচ্ছি?

—এত রাতে আর কোথায় যাব। কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি। ওর ওখানেই উঠতে হবে। ভয় নেই, বন্ধু বিবাহিত। চরিত্র ভাল। স্ত্রীর কথার অবাধ্য হয় না। কোনরকম নেশা নেই। যাকে বলে আদর্শ স্বামী।

মীরা ভ্রূকুঁচকে তাকাল। মিটমিট করে হাসছে শোভন। শুধু ইয়ার্কি। আশ্চর্য! কোনরকম চিন্তা ভাবনা নেই। সমস্ত কিছুকে সিগারেটের ধোঁয়ার মত উড়িয়ে দিতে চায়। মনে পড়েছে একে একে সব। মিথ্যে নয় কিছু। শুধু শোভন নয়, সেও এগিয়ে এসেছে। একত্রে সিনেমা দেখা, রেস্টুরেন্টে বসে পরস্পরের দিকে গভীর চোখে তাকানো, ভীড়ের মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাঁটা......তাহলে এসব কী? না, প্রেম ভালবাসা সে বলছে না। অত সহজে এসব হয় না। তবে সে স্বীকার করবে, ভাল লাগে শোভনকে, বন্ধু হিসেবে দেখে। হ্যাঁ, কিছুটা বিশ্বাস তো আছেই। নইলে এত রাতে ওর সাথে আসবেই বা কেন! সবার দিকে অবশ্য ওর ওপর রেগে উঠেছিল।

—কাছাকাছি কোথাও কী ভাল একটা হোটেল নেই?

শোভন তীক্ষ্ণচোখে তাকাল. অভাব কি। কিন্তু তুমি কী হোটেলে থাকতে চাও?

—হ্যাঁ। মৃদু হাসল মীরা, কাউকে এত রাতে বিরক্ত করতে চাই না। দেখুন না একটা রুম পাওয়া যায় কিনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বড় হোটেলের সামনে রিক্সা দাঁড়াল। শোভন ভাড়া দিতে গেলে মীরা বাধা দেয়, থাক। আমি দিচ্ছি।

কাউন্টারে বসে একটা লোক ঝিমুচ্ছে। শোভনের ডাকাডাকিতে লাল চোখ মেলে তাকাল। কেমন যেন রুক্ষ চোয়াড়ে চেহারা। মীরা কোন গ্রাহ্য করল না লোকটার বিশ্রীভাবে তাকানো দেখে।

—রুম খালি আছে?

—কটা? লোকটা হাই তুলতে তুলতে আড়চোখে একবার তাকায় মীরার দিকে।

—একটা হলেই চলবে। মীরা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, অন্য রুমের জন্যে। হাসল লোকটা, কিন্তু কোন খাবার পাবেন না। চলুন ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

বেশ বড় ঘর। মাঝখানে ডবল বেডের তক্তপোষ। বিছানার চাদর বালিশ ধবধব করছে। এককোণে ড্রেসিংটেবিলের চারধারে কয়েকটা চেয়ার। ড্রেসিং টেবিল। মীরা ঘুরে ফিরে দেখছিল—কোন কিছুর অভাব নেই। জানালা বন্ধ। খুলে দিল সে। পর্দা টেনে দিল।

লোকটা এখনও কেন দাঁড়িয়ে? মীরা বিরক্তি চেপে বলল, আপনাদের আর কিছু দরকার নেই।

হলুদে দাঁত বের করে অল্প হাসল লোকটা, অগ্রিম টাকাটা আডভান্স দিতে হবে।

—কত?

—কুড়ি।

—এই নিন। ব্যাগ খুলে মীরা দুখানা দশ টাকার নোট লোকটার হাতের ওপর রেখে দেয়। আর কোন কথা না বলে লোকটা বেরিয়ে যায়।

শোভন চুপচাপ। শুধু লক্ষ্য করছিল মীরাকে। একটা ঘরে দুজনে থাকবে...... তাকে কোন কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত দিল না। সে পাশাপাশি দুটো ঘর চাইত। মীরার সিঁথি সাদা। লোকটা যেভাবে হাসছিল, কী ভেবেছে মনে মনে তা সে আন্দাজ করতে পারে।

—আমি থাকবো কোথায়?

—এখানে। আপনি খাটে শোবেন। আমি মেঝেতে বিছানা করে নিচ্ছি।

অবাক চোখে তাকায় শোভন। কিন্তু সে আর এ প্রসঙ্গে কোন কথা তুলল না। সঙ্গে কোন কিছু আনেনি সে। ভাবতেই পারেনি এমন একটা ব্যাপার ঘটবে।

সুটকেস খুলে মীরা বিছানার চাদর বের করল। শোভন একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতঘড়ি দেখল—রাত বারোটা। বাইরে শূন্য রাজপথ। সে ভাবছিল অনেক কিছু। বলাবাহুল্য মীরাকে কেন্দ্র করে।

—শোভনবাবু। এদিকে আসুন। কী ভাবছেন?

এরই মধ্যে মেঝেতে বিছানা পেতে ফেলেছে মীরা। একবার তাকায় ওর দিকে। চোখাচোখি হয়। মীরার মুখে কোন গ্লানির চিহ্ন নেই। নির্বিকার চোখমুখ।

—আমার জন্যে তোমায় এসব ঝামেলা সহ্য করতে হল।

—ওসব কথা থাক। আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। কিন্তু লোকটা তো বললে কিছু পাওয়া যাবে না।

—থাক। একটা রাত না খেলে কী হয়। ওকি! তুমি দেখছি শুয়ে পড়ছো।

—মীরা টানটান হয় শুয়ে পড়ল। বুক পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা।

—ঘুম পাচ্ছে। আপনিও শুয়ে পড়ুন।

কিন্তু ঘুম আসে না ওদের চোখে। শোভন এপাশ ওপাশ করতে থাকে। পরনে মীরার একটা শাড়ি। ঘরে সবুজ আলো। মীরা পিছন ফিরে শুয়ে। ঘুমিয়েছে কিনা কে জানে। চাদর সরে গিয়েছে। একদৃষ্টিতে শোভন অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার দুচোখ জ্বলছিল।

মীরা পিছন ফিরে তাকায় না। সে যেন কিছু একটা......কিছু! কিসব আবোলতাবোল কথা সে ভাবছে। মনে পড়ছে অনেক কিছু।

চোখের সামনে ভাসছে পল্টুর মুখ। অজান্তে ওর দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল। সে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে প্রাণপণে কান্না রোধ করার চেষ্টা করে। ভোর হওয়া পর্যন্ত সে পিছন ফিরে তাকায় না।

।। আট ।।

শোভনার দুখানা শোবার ঘর। রান্নাঘর আলাদা। বাথরুম কল পায়খানা সব ওপরে। সমস্ত দিক থেকে সুবন্দোবস্ত। মীরা সব দেখেশুনে মনে মনে খুশি। কিন্তু দুখানা শোবার ঘর কেন? ভাড়ার দিকটা দেখতে হবে। অর যা রোজগার তাতে সে অত ভাড়া দিতে অক্ষম।

শোভন মিটমিট করে হাসে, পছন্দ হয়েছে?

—দুখানা ঘর দিয়ে কী করবো। মীরা ভ্রূকুঁচকে তাকাল, অত ভাড়া তো দিতে পারবো না।

—দুখানা ঘর ছাড়া দুজনের হবে কি করে।

—দুজন। বুঝেও না বোঝার ভান করল মীরা। সর্বনাশ। শোভনের মনে মনে তাহলে এই ছিল।

—হ্যাঁ, দুজন। তুমি আর আর আমি। যে কাণ্ড ঘটে গেল, এরপর আর ওখানে থাকতে পারবো ভেবেছো। বৌদিকে তাহলে তুমি চেন না।

বাঃ হাসির বহর দ্যাখ! কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই লোকটার। মীরা কী বলবে ভেবে পেল না। তুমি আর আমি। শুনতে ভাল লাগে। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সর্ব শরীর। কত সহজে বলার ভঙ্গি। এত সাহস বা আত্মবিশ্বাস পেল কোত্থেকে শোভন?

—আরে হাঁ করে দেখছো কী। হাত লাগাও। মনের মত ঘর সাজাও। ভাড়া টাকার কথা চিন্তা কর না। কোন ভাবনা নেই। আমি দেখবো সব।

ব্যস এরপর কী আর কথা চলে। মীরার হতভম্ব ভাবটা কাটতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। এদিকে শোভন কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে আপনমনে কথা বলছে। জানালার পর্দার রং কিরকম হবে, তক্তপোষ ঘরের মাঝখানে কি এককোণে, ড্রেসিং টেবিল আলনা চেয়ার টেবিল কোথায় রাখবে, দেয়ালে কি কি ছবি থাকবে ইত্যাদি।

—কী ব্যাপার? তুমি কথা শুনছো না। ওরকম গম্ভীর মুখ করে থেক না। কী ভাবছো?

—আপনি কী সব ঠিক করে ফেলেছেন? মীরা স্থির চোখে শোভনের দিকে তাকাল, ঠাট্টা করছেন না তো।

—সব ব্যাপারে ঠাট্টা করি না। অতটা ছেলে নই। কিন্তু এত অবুঝ কেন তোমায় বুঝতে পারছি না।

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানের কথা

কয়েকটি টুকরো প্রসঙ্গ

জাপানীরা কৃত্রিম মাংস খাচ্ছে

শুনতে অদ্ভুত লাগছে বটে কিন্তু কথাটা সত্যি। জাপানীরা কৃত্রিম মাংস খাচ্ছে। জাপানীদের চিরাচরিত খাদ্য হচ্ছে ভাত আর মাছ। গত বছর থেকে এই খাদ্য তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরো একটি পদ : কৃত্রিম মাংস। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে জাপানের নিসশিন অয়েল মিলস এই খাদ্যবস্তুটি বাজারে ছেড়েছে, মাংসের বদলে যা ব্যবহার করা চলবে। সম্ভবত এই কৃত্রিম মাংস সয়াবীন থেকে তৈরী। এতে আছে প্রচুর প্রোটিন কিন্তু ফ্যাট বা স্নেহদ্রব্য নেই। অনেকের মতে মাংসের স্নেহদ্রব্য হৃৎপিণ্ডের পীড়ার কারণ হতে পারে। তাই যদি হয় তাহলে জাপানীদের এই কৃত্রিম মাংস খাদ্য-বস্তু হিসেবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কিন্তু স্বাদ? স্বাদেও কি এই কৃত্রিম মাংস আসল মাংসের মতোই? পুরোপুরি নয়। এদিক থেকে কৃত্রিম মাংসের এখনো কিছুটা ঘাটতি আছে।

গোড়ার দিকে এই কৃত্রিম মাংস বিক্রি করা হয়েছে হ্যাম, সসেজ জাতীয় মাংসের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারকদের কাছে। সেখানে আসল মাংসের সঙ্গে এই কৃত্রিম মাংস মিশিয়ে দেওয়া হয়। এবারে টিনে ভর্তি করে সরাসরি মাংসের বিকল্প খাদ্য হিসেবে বিক্রি করার পরিকল্পনা হয়েছে। দাম পড়বে আসল মাংসের দামের অর্ধেক। স্বাদটি হয়তো পুরোপুরি পাওয়া যাবে না কিন্তু পুষ্টির দিক থেকে আসল মাংসের চেয়ে বেশি তো কম নয়। অথচ স্নেহদ্রব্য না থাকার দরুণ হৃৎপিণ্ডের পীড়া হবার কোনো আশঙ্কা থাকছে না।

দেখাদেখি আরো দুটি কোম্পানীও কৃত্রিম মাংস প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সম্ভবত বিদেশেও রপ্তানী করার চেষ্টা হবে।

শুধু কৃত্রিম মাংস নয়, জাপানী কোম্পানীগুলো আরো চেষ্টা করছে সয়াবীন থেকে নতুন ধরনের দুধ তৈরি করতে ও পেট্রোলিয়ম থেকে খাদ্যবস্তু।

এ-প্রসঙ্গে মনে পড়েছে, দিন কয়েক আগে কলকাতার স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের একজন বিজ্ঞানী ঘোষণা করেছেন ঘাস নাকি অতিমাত্রায় প্রোটিন-সমৃদ্ধ। এক্ষেত্রে, সয়াবীন থেকে যদি কৃত্রিম মাংস তৈরি হতে পারে তাহলে ঘাস থেকেও না হতে পারার কোনো কারণ নেই। জাপানের মতো উদ্যোগী কোনো কোম্পানী থাকলে এতদিনে তা হয়তো হয়েও যেত। তবে মাংসের স্বাদ-যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা বাজারে চলবে কিনা বলা মুশকিল। আমাদের দেশে রান্নার প্রক্রিয়াটাই এমন যে নজর থাকে স্বাদ তৈরি করার দিকে। পুষ্টি বজায় থাকছে কিনা তা নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। নইলে আমাদের দেশে এমন প্রচুর গাছগাছড়া ফলফলাদি আছে যা থেকে অনেক খাদ্যেরই বিকল্প প্রস্তুত হতে পারে। অন্তত জাপানের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় ও ব্যাপকভাবে। কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত পটুত্ব দেখাতে পেরেছি, কথাটা দুঃখের হলেও সত্যি, খাদ্যের ভেজাল প্রস্তুত করার ব্যাপারে, তাও এমন ভেজাল যা থেকে মারাত্মক সব রোগ হবার সম্ভাবনা।

মদ্যপানের কথা

যাঁরা মদ খেয়ে নেশা করতে চান, বিশেষ করে তাঁদের জন্যে বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ একটি তথ্য উপস্থিত করতে চাই। হালে আমাদের দেশে মদ খাওয়াটা খুবই বেড়েছে। অনেক বাড়িতেই আজকাল সন্ধ্যার পরে চায়ের আসরের বদলে মদের আসর বসে। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব এলে অনেকেই আজকাল গেলাস সাজিয়ে বসেন। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারেও আজকাল আনাজ-পাতি মজুদ থাকার মতো মদের বোতল মজুদ থাকছে—এটা একেবারে চোখে না পড়ার মতো ঘটনা নয়। কিছুকাল আগেও মদ্যপান সম্পর্কে যে একটা অন্যায়বোধ ছিল, তা এখন প্রায় অন্তর্হিত। ভারতের কোনো কোনো এলাকা নামেই ড্রাই, খোঁজ নিলে জানা যাবে-জলে-ভলে ভিজে জবজব করছে। যাই হোক, তথ্যটি বলি।

মদ খাওয়া কেন? অবশ্যই নেশা করার জন্যে। মাতাল হওয়া নয়, নেশা করা। নেশায় বর্ণনা দেওয়া শক্ত, তবে একটা সাধারণ লক্ষণ এই যে, একটা ভালো-লাগা ভালো-লাগা ভাব এসে যায়, মনের মধ্যে কোনো রকম ভার থাকে না আর নিজেকে বেশ একটা বড়ো গোছের মানুষ বলে মনে হতে থাকে। এটুকুই তো যথেষ্ট। রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও শিল্পী ড্রাইভাররা যে অনেকেই নেশা করে থাকেন, তা এই মানসিকতা অর্জনের জন্যে। নেশাগ্রস্ত মানুষ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকেন, এমনি একটা ধারণা প্রচলিত আছে।

যাঁরা নেশাগ্রস্ত হতে চান, তাঁদের সকলের সামনেই চিরন্তন সমস্যা : কত-খানি খেলে পরে নেশা? নেশা না হওয়া পর্যন্ত কি খেয়েই যেতে হবে? নেশা কি পরিমাণনির্ভর?

সম্প্রতি মেরিল্যাণ্ডের দুজন বিজ্ঞানী বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত—নেশা নির্ভর করে পরিমাণের ওপরে নয়, মেজাজের ওপরে; কতখানি খাওয়া হচ্ছে তার ওপরে নয়, কি-ভাবে খাওয়া হচ্ছে তার ওপরে।

বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাকার্যটি ছিল এই রকম :

মদ্যপানে অভ্যস্ত একটি দলকে নজরে রাখা হল, দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করে। একটি গোষ্ঠীকে দেওয়া হতে লাগল চার আউন্স করে মদ, প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর। অন্য গোষ্ঠীকেও একই পরিমাণ মদ কিন্তু তাদের বেলায় এই স্বাধীনতা থাকল তারা যখন খুশি এবং এক-একবারে যতোখানি খুশি (সারাদিনের মোট পরিমাণটি ঠিক রেখে) মদ খেয়ে যেতে পারে। দেখা গেল দ্বিতীয় দলভুক্তদের বেলায় পানীয়টি সহ্য হল অনেক ভালোভাবে, প্রথম দলভুক্তরা তো কেউ কেউ বমি করতে শুরু করে দিল। অথচ, বমি যারা করছে, তারা যদি যখন-খুশি ও যতোখানি খুশি মদ খাবার সুযোগ পায় তো অনেক বেশি পরিমাণ মদ সহ্য করতে পারে।

CENTRAL LIBRARY

শুধু চোখের দেখায় নয়, যন্ত্রের রাসায়নিক পরীক্ষাতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হল।

এ থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? নেশা করতে হলে কতখানি খাওয়া হচ্ছে তা গৌণ, কী মনোভাব নিয়ে খাওয়া হচ্ছে, কী পরিবেশে, তা-ই মুখ্য। তার মানে, বেশি খাবার দরকার নেই, মেজাজে খাবেন।

এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টি এই যে, মদ যদি খেতেই হয়, তাহলে তার উপযোগী মেজাজটি আগে আয়ত্ত করুন। সেক্ষেত্রে, চাই কি, হয়তো হোমিওপ্যাথিক ডোজে খেয়েও ঈপ্সিত ফললাভ করতে পারেন। এমনকি হয়তো বিন্দুমাত্র না মুখে দিয়ে শুধু চোখের দেখা দেখেই। এমন অসাধারণ ক্ষমতাবান পুরুষ অন্তত একজন আমি নিজের চোখে দেখেছি।

স্বপ্ন দেখাটা
আসলে দেখা নয়

তা তো বটেই, আমরা স্বপ্ন দেখি চোখের পাতা বন্ধ করে, চোখ খোলা রেখে তো নয়, তবে আর দেখব কি করে! কথাটা তা নয়। স্বপ্ন দেখার সময়ে বন্ধ পাতার নিচে আমাদের চোখের মণি ঠিক তেমনিভাবে নড়াচড়া করে যেমন করে থাকে খোলা চোখে কোনো জাগতিক দৃশ্য দেখতে গিয়ে। অর্থাৎ চোখের মণি যেন স্বপ্নের দৃশ্যগুলো সত্যি সত্যিই দেখছে, চোখের পাতা থাকা সত্ত্বেও। স্বপ্ন দেখার সঙ্গে চোখের মণির যুগপৎ নড়াচড়ার এর চেয়ে সহজ ও সরল ব্যাখ্যা আর কিছু হতে পারে না।

দুঃখের বিষয়, এই ব্যাখ্যা টেকেনি। শুধু টেকেনি নয়, একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের গবেষণায়।

পরীক্ষাকার্যের ধরনটি এই রকম। ঘুমন্ত মানুষের ওপরে নজর রাখার ব্যবস্থা হল। চোখের মণি নড়াচড়া শুরু করলেই বোঝা গেল সে স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্ন দেখা যখন চলছে, তখন তিন রকম অবস্থায় তাকে জাগিয়ে তোলা হল: (১) চোখের মণি আচমকা নড়ে ওঠা, (২) চোখের মণি পর-পর কয়েকবার নড়ে ওঠা, (৩) চোখের মণি স্থির হয়ে থাকা। প্রত্যেক বারেই তাকে জিজ্ঞেস করা হল কী স্বপ্ন সে দেখছিল। তারপরে চেষ্টা করা হল স্বপ্নের ছবির সঙ্গে চোখের মণির নড়াচড়া বা স্থির হয়ে থাকা মেলাবার। দেখা গেল কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। চোখের মণি যার আচমকা নড়ে উঠেছে তার মুখে সে-স্বপ্ন শোনা গেল সেখানে শতকরা ৭২টি ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্কই পাওয়া গেল না। শতকরা ১০টি ক্ষেত্রে দেখা গেল চোখের মণি নড়েছে স্বপ্নের ছবি দেখতে হলে যেদিকে নড়া উচিত ছিল তার বিপরীত দিকে।

বিষয়টিকে আরো খতিয়ে দেখা হল। তখন ধারণা হল যে স্বপ্ন দেখার সময়ে চোখের মণির নড়াচড়াটা নিতান্ত এলোমেলো ব্যাপার নয়, তার মধ্যে আছে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত প্যাটার্ন, যা নির্ভর করে স্বপ্নের বিষয়ের ওপরে। আরও ধারণা হল, জেগে-থাকার অবস্থায় চোখের মণি যেমনভাবে নড়াচড়া করে, স্বপ্ন-দেখার অবস্থায় তেমনভাবে নয়।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, চোখের মণির নড়াচড়া দেখে স্বপ্ন সম্পর্কে ধারণা করা যায় না, স্বপ্নের বিষয় জানতে পারলেই চোখের মণির নড়াচড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বপ্ন আমরা দেখি ঠিকই কিন্তু সেটা ঠিক সাধারণ দেখা নয়।

আমরা কেউ-ই পুরো দেখি না

স্বপ্ন দেখার বেলায় যাই হোক, আমরা যখন জেগে থাকা অবস্থায় তাকাই, তখনো কি ঠিক ঠিক দেখি? অর্থাৎ, পুরোটাই কি দেখি? শুনে অনেকেই হয়তো অবিশ্বাস করবেন, আমরা কেউ-ই পুরো দেখি না। আমাদের নাক-বরাবর জিনিসেও একটা বিশেষ জায়গা আছে যেখানে আমাদের দৃষ্টি অন্ধ।

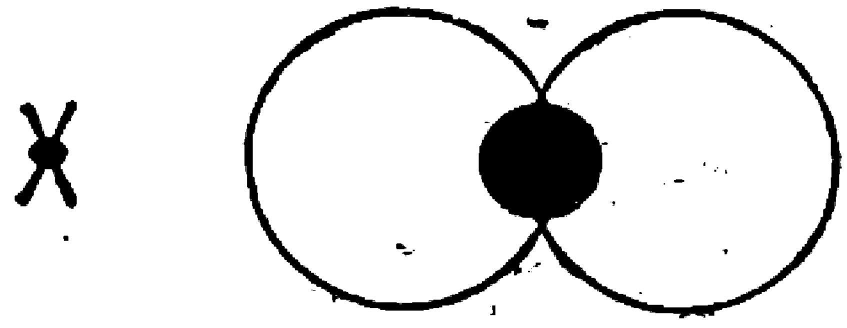

কথাটা সত্যি কিনা নিজেই পরখ করে দেখতে পারেন। এই সঙ্গে যে-ছবিটি দেওয়া হয়েছে, তা ডান চোখের সামনে ২০ সেন্টিমিটার দূরে ধরুন, বাঁ চোখের ওপরে হাত চাপা দিন, এবারে বাঁ-দিকে ক্রসচিহ্নের দিকে তাকিয়ে ছবিটি আস্তে আস্তে সামনে আনতে থাকুন। আনতে আনতে একটা সময় আসবে যখন বৃত্তদুটি যেখানে ছেদ করেছে সেখানকার বড়ো কালো বলটি আপনি আর দেখতে পাবেন না। অথচ বৃত্তদুটি স্পষ্টই দেখতে পাবেন, পুরো ছবিটিই রয়েছে দৃষ্টির সীমানার মধ্যেই।

এ-ব্যাপারটি নিয়ে আরো একটি মজার ঘটনা ঘটানো যেতে পারে। দুটি মানুষকে দুই মিটার দূরত্বে মুখোমুখি বসান। তারপরে নির্দিষ্ট মাপ ঠিক করে নিয়ে দুজনকে সেই মাপমতো কোনাকুনি তাকাতে বলুন। এ-অবস্থায় দুজনেই একে অপরের মুণ্ডহীন ধড় দেখতে পাবে। সামান্য একটু চেষ্টা করলেই এই পরীক্ষাকার্যের সাহায্যে দুজন মানুষের পিলে চমকে দেওয়া যেতে পারে।

এমনটি যে ঘটে তার কারণ আমাদের রেটিনায় আছে একটি অন্ধ বিন্দু যেখান দিয়ে অপটিক নার্ভগুলো ভিতরে প্রবেশ করে। এই বিশেষ বিন্দুটি কোষশূন্য, ফলে সাড়া জাগে না।

তাহলে, আমরা যে পুরো দেখি না, এ-ব্যাপারটা আমরা কেন টের পাই না? তার কারণ, ব্যাপারটাতে আমরা বহুকাল ধরে অভ্যস্ত, যেটুকু আমরা দেখি না তা কল্পনায় পূরণ করে নিই। তাছাড়া, আমরা দেখি দু-চোখে। এক চোখের না-দেখা অংশটুকু অপর চোখের দেখা দিয়ে অনায়াসেই পূরণ করে নিতে পারি। তবে এক চোখের দেখা কোনো ক্ষেত্রেই পুরো দেখা নয়।

এক টন কাঠ ও এক টন লোহা

কোন্‌টি বেশি ভারী—এক টন কাঠ, না এক টন লোহা? অনেকে না ভেবেচিন্তেই জবাব দিয়ে বসেন, এক টন লোহা বেশি ভারী। শুনে অন্যরা হাসেন। কিন্তু যদি বলা হয় এক টন কাঠ বেশি ভারী, তাহলে হয়তো হাসির মাত্রা আরো চড়বে। কিন্তু যদি পুরোপুরি সঠিক জবাব দিতে হয়, তাহলে বলতেই হবে, এক টন কাঠ বেশি ভারী।

কেন? জবাবে প্রথমে আর্কিমিডিসের সূত্রের কথা তুলতে হয়। সূত্রটি গ্যাসের বেলাতেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, বাতাসে নিমজ্জমান কোনো বস্তুর ওজনও কমতে বাধ্য। কতখানি? যতোখানি ওজনের বাতাস স্থানচ্যুত হয়েছে ততোখানি। কতখানি বাতাস স্থানচ্যুত হতে পারে? বস্তুর যা আয়তন ততোখানি।

অতএব কাঠ ও লোহারও খানিকটা করে ওজন খোয়া যাচ্ছে। কাজেই কাঠ ও লোহার যে ওজন আমরা টের পাচ্ছি, তা আসল ওজন নয়, তার সঙ্গে খোয়ে-যাওয়া ওজন যোগ করা দরকার।

এক টন কাঠ যতোখানি জায়গা জুড়ে থাকে, তা এক টন লোহার জুড়ে-থাকা জায়গা থেকে ১৫ গুণ বেশি। কাজেই লোহার চেয়ে কাঠ অনেক বেশি বাতাস স্থানচ্যুত করে। অর্থাৎ কাঠের খোয়া-যাওয়া ওজন লোহার চেয়ে বেশি। অতএব, আসল ওজন বিচার করলে এক টন কাঠের ওজন এক টন লোহার ওজনের চেয়ে অবশ্যই বেশি।

—অয়স্কান্ত

পঞ্চানন এত হাঁকিডাক করে গাড়ি জোগাড় না দিলে অনেকে হয়তো জানতেই পারত না এ বাড়িতে অনেক ঘর নতুন ভাড়াটে এল।

এত সরু গলিতে মালপত্তর নিয়ে ঠেলা-গাড়ি যে ঢুকতে পারে না আগেই বোঝা উচিত ছিল পঞ্চাননের। নিজে দেখেশুনে ভাড়া করেছে বাড়ি। এখন মিথ্যে ঠেলা-ওলার ওপর তড়পে তো কিছু লাভ নেই। কিন্তু পঞ্চানন ওসব কথা শুনতে চায় না। ওর সেই এক চেঁচামেচি—শালা [illegible], এক পয়সা পাবি না। দেখে নিস আমি যদি বাপের বেটা হই, [illegible] কথা শুনে কাম—মালপত্তর [illegible] একটা পয়সাও দিচ্ছি না তোদের!

রামসেবকবাবুর ছেলেরা নতুন ভাড়াটেরা ভালো মানুষ। তা না হলে এত তড়পানির পরও রাগ না করে শুধু দাঁড়িয়ে [illegible] খেতে খেতে দাঁত বার করে হাসে কী করে। বলে—আরে বড়বাবু, আমার তো নসিবের আমার কুসুর। আপনি এতো গুস্সা হইবেন না। তাপরেই [illegible] নিয়ে এতো সরু গলি দিয়ে গাড়িটা বাইরে [illegible] গেল।

পঞ্চানন আরো রেগে ওঠে—কাটা বন-বাস কাঁহাকা, আমার ভাড়া দিচ্ছিস? গাড়ি

বাইরের কী আটকে থাকবে এখানে সে জোর আমার। তবে হ্যাঁ, আমার মালপত্তর সব ঘরে ওঠা চাই-ই। না হলে যা ব্যাপার, একটি পয়সাও বাদ দিয়েছি ভেবেছ। যদি চাকরদের কথা থাকে আমার গায়ে...

কৃষ্ণেন্দু দোতলার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে নিচে ওদের কথা কাটাকাটি লক্ষ্য করছিল। ওদের দুজনের কথা বলার ভঙ্গিমা দেখে হাসিই পাচ্ছিল ওর। পশ্চিমার দুগ্ধ-মানুষ পঞ্চানন। কিন্তু চেহারাটা ষণ্ডাগুণ্ডা নয়। অথচ হিন্দুস্থানী ঠেলাওয়ালা এত ধমকের পর কেমন হাসছে। কৃষ্ণেন্দুর মনে হল ঠেলাওয়ালার মত এইটুকু সময়ের মধ্যেই নতুন ভাড়াটেকেও যেন চিনে নিতে পেরেছে।

রামখেলোয়ান মাথায় ঘাম মুছে হাওয়া খেতে খেতে হাসছে—হাঁ হাঁ ঘাবড়াইয়েন না দুলাবাবু, সব ঘরমে যায়ে। হামে পরি-শান্ত হইয়েছে হামার, থোড়া জিরাইতে দিজেন। লেকিন একঠো বাত হামি জরুর বলবে দুলাবাবু...এ কোঠি আপনেকে মানাইবে না। এ কোই আদমি রহনে কা ঘর আছে দুলাবাবু? যাইবার আইবার রাস্তা ভি নেহী আছে। পাক্কা সড়ক ভি বহুত দূর হটিয়ে গেছে। দিদিমণি লোকন কী বহুৎ তকলিফ হোবে। লেকী লেকী বহুৎ বুরা কাম হইয়েছে দুলাবাবু।

একতলার চেঁচামেচি শুনে মলয়াও ভেতরের ঘরের জানলায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রামখেলোয়ানের কথা শুনে ফিসফিস করে বললেন—তা কথাটা কিছু মিথ্যে বলেনি বাপু লোকটা, এ ঘরে কী মানুষ থাকতে পারে। পেছনে এঁদো পুকুর। স্যাঁতা উঠোন, অন্ধকার ভাঙা ঘর। তাও যদি বাড়ির সামনের দিকে হত অন্য কথা ছিল। এদিকে দিনের বেলাতেও যদি কোনো ডাকাত পড়ে কেউ টের পাবে না।

রামখেলোয়ান ততক্ষণে দুজনের মাল্লার ঠেলা রেখে মাথায় করে মালপত্তর নিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর পঞ্চানন উঠোনের বকুলগাছটার নিচে বেদীর ওপর পা গুটিয়ে বসে পড়েছে। আগেই নিজে দেখেশুনে বাড়ি পছন্দ করে গেছে। কিন্তু ওঁর বিরক্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন না বলেকয়ে বাড়িওয়ালা দড়ি বেঁধেছে ওকে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে সব কিছু লক্ষ করছে আর ভাবছে—যদি পেতেন ভাড়াটে কী মানুষে না। না তার বাড়াবাড়ির দরকার নেই। [illegible] দিয়ে যাবার ঐ ব্যাপারটুকু না রাখলে ক্ষতি কী ছিল!

রামখেলোয়ান একটা মাস্তাতার জনদের শুকনো টিন এনে ওদিকের ঘরের দাওয়ার সামনে রাখল। পঞ্চাননের কথাটা কানে গেছে বলতে—বাইরে দিনে যেন পানি ভি নেহী আছে হামার মনে হয় দুলাবাবু। এ তো সহর নেহী আছে। বহুত খাটি পড়ে না। হিয়া কাঁহা পানি মিলবে। দিদিমণিলোগ বহুত তকলিফ হোবে।

পঞ্চানন যেন চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠল এবার—দিদিমণিদের জন্যে তোমাকে এত ভাবতে হবে না রামখেলান। ইস্—শহর নেহী আছে। নেহী আছে তো কী হয়েছে রে ব্যাটা মূর্খ কাঁহাকা। এখানে মানুষ থাকে না না জল না খেয়ে বেঁচে আছে সবাই। বলি আচ্ছা কুঠি যে নোব আচ্ছা পয়সা দিতে হবে না? না কী সেটা মাগনা আসবে।

বাবা একরকম আর মেয়েরা অন্যরকম। মনেই হয় না বাকবাগীশ ওই বাবার মেয়ে সব। সকাল থেকেই মলয়ার রীতিমত দুর্ভাবনা ছিল। কিন্তু ওদের দেখে স্বস্তি পেলেন। শুধু তাই নয় মেয়েগুলোর ভাব-ভাব আচার আচরণ দেখার পর শান্তির স্নিগ্ধ পরশে যেন চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল মলয়ার। লক্ষ্মীশ্রী পাঁচ পাঁচটি যুবতী কুমারী মেয়ে। বয়সে পিঠোপিঠি সবাই। এমন হাসি হুল্লোড় করতে করতে ওরা এসে পৌঁছল নতুন ডেরায় যেন এতটুকু ক্ষোভ নেই কারো মনে। ঠেলাগাড়ির মালপত্র আর ওদের বেশবাস দেখেই বোঝা যায় কঠিন দারিদ্র্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু ওদের জীবন আর উজ্জ্বল হাসির ঝলকে একটুও স্তিমিত করেনি এখানের বেমানান পরিবেশ। শুধু তাই নয়। যেন একগুচ্ছ সূর্যমুখী ফুল আপনমনের আনন্দে বহু ঊর্ধে আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে অনির্বাণ হাসছে। একই জমিতে দাঁড়িয়েও আগাছারা ওদের নাগাল পাচ্ছে না।

মা নেই। মেয়েদেরই সংসার। বাবা সংসারবিবাগী। ব্রাহ্মণ, পুরুতগিরিই পেশা। বাঁধা যজমানদের বাড়ি বাড়ি পুজো করে বেড়ান। কখনও বাড়ি ফেরেন। আবার কখনও দিবারাত্রিতে কাটিয়ে আসেন। অভাবের সংসার। তার ওপর পাঁচ পাঁচটি অবিবাহিত মেয়ে। তাই দুশ্চিন্তার সব-দিক থেকেই অসীম বিরক্তি। বাবার যে কটা দিন বাড়ি থাকেন মনে মনে গজগজ করেন সর্বক্ষণ। মেয়েরা তখন বড় চুপচাপ। দেখে-শুনে মনেই হয় না এমন প্রাণবন্ত পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে রয়েছে এই পুরোনো বাড়ির নিভৃত অন্দরে। বাবা আর মেয়েদের বনি-বনা নেই। শুধু বিবাদ এড়িয়ে চলতে দুপক্ষই যেন সমঝোতা করে নিয়েছে নিজে-দের মধ্যে।

পঞ্চানন বাড়ি থাকলে ওরা চুপচাপ থাকে কিন্তু উনি দিনের ফিরতে যতক্ষণ। নিমেষে হুল্লোড়ে পড়ে যায় বাড়িতে। কেউ বা গলা ছেড়ে গান ধরছে, কেউ রসিকতার জেরে পড়ে অন্যজনেরা দুবে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। তারই মধ্যে হাতে হাতে সংসারের কাজ করে যাচ্ছে ওরা। বাজার করে আনছে, পাড়ার মুদিখানার দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে আনছে। কেউ বালতি হাতে জেলেপাড়ার টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে চলেছে। যেন অখণ্ড একটা সত্তা ওরা। কাউকেই বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না।

পাড়ার বাসিন্দারা ওদের নাম রেখেছে [illegible]

এমন বনবাস হয়েছে ওদের জানা নেই কারো। প্রথম প্রথম সন্দেহ হত হয়তো বা স্বভাব-চরিত্র খারাপই মেয়েগুলোর। হতেও পারে, মা নেই বাবা বিবাগী। কুমারী মেয়েদের পদস্খলন হবার মত প্রলোভনও তো কিছু কম নেই। কিন্তু সে সন্দেহ আর কারো নেই। পাড়ার জোয়ান ছেলেরা তো ওদের পেছন পেছন ঘুরঘুর করে হাল ছেড়ে দিয়েছে এর মধ্যেই, নজর এড়ায় নি ওদের। অসহায় ওরা কিন্তু অবলা নয়। কেমন একটা দৃঢ়তা আছে ওদের মধ্যে। ডানাকাটা পরী নয় কেউ কিন্তু সুশ্রী তো বটেই। গানের গলাও মিষ্টি। তবু এমন প্রাণবন্ত মেয়েদের ঘর বর জোটে না কোন দুর্বাশার অভিশাপে বুঝে উঠতে পারে না ওরা।

হাঁ, ওদের গানের গলা যে মিষ্টি এর মধ্যেই পাড়াপড়শির জানা হয়ে গেছে সে কথা। সারা দিনটা কাটে কেমন তেমন। মনে হয় না পাঁচ পাঁচটা প্রাণবন্ত কুমারী মেয়ে বনবাসে কাটাচ্ছে এখানে। কিন্তু সন্ধ্যার পর এখানকার পৃথিবী যখন আশ্চর্য শান্ত হয়ে ওঠে, পেছনের ডোবায় ব্যাঙেরা একে একে ডেকে ওঠে, ওবাড়ির রাখালমাস্টারের দশ বছরের ছেলেটা যখন দুলে দুলে উচ্চৈস্বরে কবিতা মুখস্থ করে তখন ওদের হাতের তানপুরার তারে সুরের ঝঙ্কার মন্থর বাতাসকে যেন ধীরে ধীরে চঞ্চল করে তোলে।

কৃষ্ণেন্দুর পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে একতলার বকুলগাছের নিচটা নজরে পড়ে। ঝকঝকে তকতকে করে নিকনো মাটির বেদীটার প্রতি ইদানীং কৃষ্ণেন্দুর আকর্ষণটা যেন বড় বেশী। পরীক্ষার পড়া থেকে বারবার মনটা ছুটে চলে যায় ওদিকে। ওর তৃষিত চোখদুটো কী যেন খুঁজে বেড়ায়। সংসারের কাজ সারা হলে কখন পঞ্চপাণ্ডবীরা তানপুরাটা হাতে নিয়ে একে একে বেদী জুড়ে বসবে—কৃষ্ণেন্দু যেন উন্মুখ হয়ে থাকে। তারপর যখন এক আশ্চর্যমধুর সুরের ঝঙ্কার রাত্রির স্তব্ধতাকে মাতোয়ারা করে তুলবে—সেই প্রতীক্ষায় সময় মন্থরগতিতে কোন্ দিক দিয়ে যে কেটে যায়, খেয়াল থাকে না ওর।

ওরা পাঁচ বোন—নন্দিনী, শিবানী, হিমানী, সর্বাণী আর রিনি। এখনও ওদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয়নি কৃষ্ণেন্দুর। খুব ইচ্ছে করে ওর ওদের সঙ্গে আলাপ করতে, প্রাণখুলে মিশতে। নিজে গান জানে না কিন্তু ইচ্ছে করে ওদের গানের ভাষা হয়ে উঠতে। কিন্তু কোথায় যেন একটা দুর্লঙ্ঘ দ্বিধার প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে। হয়তো বা মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অনভ্যাস থেকেই এই স্বাভাবিক সঙ্কোচ। তবু ওদের চালচলন প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি ওর জানা হয়ে গেছে এতদিনে। আড়াল থেকে ওদের কণ্ঠস্বর শুনে বলে দিতে পারে—কার গলা, কে গুনগুন করে গান গাইছে!

রান্নাঘর থেকে নলিনীর গলাটা ভেসে এল কৃষ্ণেন্দুর কানে—হিমানী হল তোর।

সেই মুহূর্তে ভেতরের ঘর থেকে একটা সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওর কানে—তানপুরোটা বাঁধছি যে দিদি। আর দেরী নেই, হয়ে এল বলে। নলিনীর মুখ থেকে নামটা না শুনতে পেলেও কিন্তু কৃষ্ণেন্দু চোখ বুজে বলে দিতে পারত কার গলা।

সর্বাণী ওদিকে পঞ্চাননের ঘরের উঁচু ধাপির ওপর ঝকঝকে লণ্ঠনটা সরিয়ে রাখল দেখতে পেল কৃষ্ণেন্দু। কিন্তু...তারপরই যে সর্বাণী মুখ তুলে খোলা জানলা দিয়ে এমন সোজাসুজি তাকিয়ে থাকবে ওর দিকে—জানবে কী করে ও। না বুঝে কৃষ্ণেন্দু নিজেও ওর চোখে চোখ রেখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল বলে এই মুহূর্তে কেমন একটা অনাস্বাদিত শিহরণ অনুভব করছে।

চোখটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল কৃষ্ণেন্দু। না সরিয়ে উপায় নেই। অপরিচিত কোন মেয়ের চোখে চোখ রেখে এমন করে আগে কখনো তাকায়নি। কেন কে জানে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর কৌতূহল যত ভয়ও তত বেশী। কিন্তু সেই মুহূর্তে সর্বাণীর ফিসফিস কণ্ঠস্বরটা কানে আসতেই ভয়ে বুক হিম হয়ে উঠল কৃষ্ণেন্দুর। ওর কথাগুলো শুনতে পারনি ঠিকই, তবু সর্বাণী কী বলতে পারে তাও

একই ধোপে ৩ ভাবে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে
—অন্য যে কোন পাউডারের তুলনায়

কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন

১ ডেট-এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের ভেতরের কঠিন ধুলোময়লা সহজেই দূর করে—কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়।

২ ডেট -কাপড়ের ময়লা বার ক'রে আবার তা কাপড়ে বসতে দেয়না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।

৩ ডেট—কাপড়ে বাড়তি সাদা যোগায়—কাপড় আগের চেয়ে অনেক বেশী সাদা ও উজ্জ্বল হয় (এতে নীল বা সাদা করবার অন্য কিছুই মেশাতে হয়না)

আজই কিনুন—ডেট

স্বস্তিক অয়েল মিলস, বোম্বাই

SHILPI HPMA 39A/70 BEN

যেন আর আর অজানা নয় ওর কাছে। আর আশ্চর্য, ওর অনুমানই যে ঠিক, সেটা প্রমাণ করার জন্যেই যেন পরক্ষণে এক ঝাঁক উজ্জ্বল উচ্ছ্বাসে পায়রা নীল আকাশের বুকে চঞ্চল ডানা মেলে দিল—হিহি...হিহি... হিহি...

নিজের অজান্তেই কৃষ্ণেন্দুর মাথাটা সঙ্কোচে আরো হেঁট হয়ে এল। হাসিটা যে ওকে উদ্দেশ করেই ছুঁড়ে দেওয়া হল, বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না ওর।

হিমানীর হাসির দমকটা যেন থামতেই চায় না কিছুতেই। শিবানী একবার ধমকে উঠল—আঃ কী করছিস হিমানী! এবার থাম। নলিনীও বিরক্তি প্রকাশ করল—সত্যি বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলছিস তুই! হাসির আর সময় পেলি না। অকারণ হেসে মরে শেষে দমটা খোয়াবি! সে এবার ধর আমি বাজাচ্ছি।

আশ্চর্য, তবু জলতরঙ্গের সুরে আরো কিছুক্ষণ হেসে খুন হল হিমানী। ভীরু লাজুক প্রকৃতির কৃষ্ণেন্দুর সবকিছুতেই যেন ভীষণ মজা পায় ও। ওদের দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার আগ্রহ আর অপটু ভঙ্গিটাও বড় সুন্দর মনে হয় হিমানীর। আর ধরা পড়ে গেলে তো কথাই নেই। বিব্রত কুণ্ঠিত চোখদুটো এত তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেয়—না হেসে পারে না ও।

ওর সুরেলা হাসির মধ্যেই যেন আচমকা জন্ম নিল এক আশ্চর্য সুরের ঝঙ্কার। নলিনীর আঙুলের টানে টানে তানপুরার তারে শব্দ উঠছে...টং...টং...উ...ম... অ...ঙ্। কী এক অবাক ব্যাকুলতা নিয়ে যেন তারগুলোকে আদর করছে নলিনী। আর পোষা মেনিবেড়ালের মত সোহাগে সোহাগে কাইকুঁই করে শিউরে উঠছে তারগুলো।

একটু পর হিমানীর জলতরঙ্গের মত হাসিটা যেন ঢেউ হয়ে ধীরেসুস্থে ফুলে-ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ল নিস্তব্ধ তটভূমির কূলে কূলে—

কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধার

মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধি যে
সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার।

বাইরে শুক্লাচতুর্দশীর রুপোলী আলো। বাতাসে বকুলের গন্ধ। খোলা জানলা দিয়ে এলোমেলো দামাল হাওয়ায় ভেসেআসা মোহিনী সুরের ঝঙ্কার। সব মিলিয়ে কেমন যেন আবেশ জড়িয়ে ওঠে কৃষ্ণেন্দুর চেতনায়।

আর সেই চটুল হাসির দমক নেই। নেই একটু আগের সেই হাল্কা খুশীর আমেজ। যেন একটা কঠিন সাধনায় এখন তলিয়ে রয়েছে ওরা পাঁচ বোন। হিমানী বাজাচ্ছে। নলিনী গাইছে। তারপর শিবানী সর্বাণী কিম্বা তিনি। সুরে সুরে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে এখানের নিথর রাত্রি।

দিনমানের সেই পঞ্চপাণ্ডবীদের এখন যেন বড় অচেনা মনে হয় কৃষ্ণেন্দুর। বড় অদ্ভুত লাগে ওদের। দূর থেকে দেখার দিনগুলোতে পঞ্চপাণ্ডবীদের কেমন অদ্ভুত মনে হত, ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার পরও তাই মনে হয় ওর। এত কাছে তবু মনে হয় ওরা যেন কতদূরে ।

মলয়ার সঙ্গে ইদানীং পঞ্চপাণ্ডবীদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছে। অল্পসল্প আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। মেজের বড় সাধ ছিল মলয়ার। সেই মধুর কামনাটা মনের অন্তঃস্থলে গোপনই ছিল। কিন্তু ওদের দেখার পর থেকে কামনাটা যেন জ্বালা হয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে। মনে হয় যে-বাড়িতে যুবতী মেয়ে নেই, সে-বাড়ি যেন প্রাণহীন, ম্রিয়মাণ। তাই বোধহয় ওদের অনেক কাছাকাছি এগিয়ে এসেছেন তিনি।

এ-বাড়িতে পঞ্চপাণ্ডবীদের সহজ-সচ্ছন্দ যাতায়াতের ফলেই ধীরে ধীরে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেছে ওদের। আগের মত অতটা লজ্জা-সঙ্কোচ নেই ঠিকই, তবু ওদের মধ্যে এসে দাঁড়ালে নিজেকে এখনো অসহায় মনে হয় ওর। তাই দেখে শিবানী মুখ টিপে হাসে। হিমানীর চোখদুটোতে হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বড় বোন নলিনীও হাসে, কিন্তু সে-হাসি অন্যরকম। একটু যেন প্রশ্রয় আছে তাতে। কৃষ্ণেন্দু এসে দাঁড়ালে নলিনী হেসে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় ওর সামনে, ওকী, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন কৃষ্ণেন্দু? ভেতরে এসে বোস। না, দেখছি এখনো তোমার লজ্জা গেল না।

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণেন্দু কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই হিমানী জলতরঙ্গের সুরে আচমকা হেসে ওঠায়, থমকে গেল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে হিমানী বলল, 'আমরা সব বাঘ-ভাল্লুক যে দিদি। কখন হালুম করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ি—তাই এত ভয়।'

রোজ রোজ ওদের ইয়ার্কি-ফাজলামি বিশেষ করে হিমানীর প্রগলভতায় বিব্রত কৃষ্ণেন্দুর ভেতরটা নিদারুণ অপমানে দপ্ করে জ্বলে উঠতে চাইল। কিন্তু ওর সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কেমন যেন সাহস হল না মুখ খুলতে। বরং না শোনার ভান করে ঘরের বাইরে চটি খুলে রেখে নলিনীর পেছন পেছন ভেতরে এসে বসল।

কৃষ্ণেন্দুর হয়ে নলিনীই জবাব দিল—আর বাকী রাখলি কী বল? ও এলেই যা করিস তোরা, ভয় পাবারই তো কথা। বেচারী মুখচোরা ভালমানুষ। কিছু বলতে পারে না, তাই তোদের এত সাহস।

মেঝের ওপর মাদুরে বসে অন্যমনস্কের মত ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল কৃষ্ণেন্দু। অতিসাধারণ কয়েকটা হাল্কা আসবাব মাত্র ঘরে। কিন্তু পরিচ্ছন্ন হাতে সাজান সবকিছুই। দেয়ালে কয়েকজন মহাপুরুষের ছবি টাঙান রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রতিকৃতিতে সযত্নে ফুলের মালা দেয়া হয়েছে। ওদিকে, দেয়ালের দিকে পরিষ্কার একটা চাদরের নীচে বিছানাপত্তর গুছিয়ে তোলা রয়েছে। ঘরের এক কোণে আলাদা একটা মাদুরে তানপুরাটা শোয়ান রয়েছে। ঘরের পেছনের খোলা জানলা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া এসে ঢুকেছে। কৃষ্ণেন্দু জানলার বাইরে পুকুরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সব মিলিয়ে এ-ঘরটা, এখানের বাতাস, তানপুরা, আলনায় ঝোলান পঞ্চপাণ্ডবীদের শাড়ি-জামা, মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি, জানলার বাইরে নির্জন শান্ত পুকুর—ওর চেতনায় কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব সৃষ্টি করে।

নলিনী ওকে বসিয়ে রেখে ততক্ষণে রান্নাঘর থেকে ঘুরে এল। তারপর হাতে একটা এমব্রয়ডারি নিয়ে মাদুরের ও-প্রান্তে বসে পড়ল। কৃষ্ণেন্দুর মনে হল এবার ওর নিজে থেকে কিছু বলা দরকার। কিন্তু কী বলা উচিত ভেবে ঠিক করে উঠতে পারল না কৃষ্ণেন্দু। ও জানে শিবানী আর সর্বাণী এখন বাড়িতে নেই। ওদের কথাও জিজ্ঞেস করা যেত। কিন্তু এত অল্প আলাপে একজন যুবকের পক্ষে ওদের সম্বন্ধে খোঁজ নেয়াটা অশোভন হবে কী না, বুঝে উঠতে পারল না। শুধু আজ নয়, মাঝে মাঝে পঞ্চপাণ্ডবীদের এক-একজন হঠাৎ হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যায় খুব জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে ওর কৌতূহল যাই থাক, প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। শেষপর্যন্ত কথা বলার প্রয়োজনেই পঞ্চাননের কথা দিয়ে শুরু করল,—আপনার বাবার খবর কী? এবার অনেকদিন হয়ে গেল উনি বাড়ি আসেননি তো?

নলিনী এমব্রয়ডারিতে ছুঁচের ফোঁড় তুলতে তুলতে উত্তর দিল—কে বাবা! বাবা এখন মালদায় আছেন। আগে লিখেছিলেন এ-মাসের শেষে ফিরতে পারেন। আবার সেদিন চিঠি দিয়েছেন। লিখেছেন, গ্রামাঞ্চলে এক শিষ্যবাড়িতে কিছুদিন থেকে আসবেন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

তারপর আবার হয়ত লিখবেন জলপাইগুড়ি যাবেন। কিম্বা অন্য কোথাও। একেবারে না আসতে হলেই যেন বাবা বাঁচেন।

নলিনীর ঘেষাঘেষি হিমানী আর মিনিও দিদির পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। নলিনী দাঁত দিয়ে সুতোটা কেটে ফেলে, মাথা উঁচু করে বসে বলল,—যাকগে আমাদের কথা। এখন বলো পরীক্ষা কেমন দিলে কুকেন্দু।

কুকেন্দু একটু সলজ্জ হেসে উত্তর দিল, মোটামুটি হয়েছে একরকম।

হিমানীর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল এবার—দিদি তুই লক্ষ্য করেছিস একটা জিনিস? কুকেন্দুদার মধ্যে ভাল ছেলের সব লক্ষণগুলো আছে—তাই না? কেমন বিনয় করে কথা বলেন—লক্ষ্য কর। ভাল পরীক্ষা দিয়েছেন, স্বীকার করতেও লজ্জা। ওদিকে মাসীমার মুখে শুনলাম কোলকাতার কোন হোস্টেলে থেকে এম-এস-সি পড়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নলিনী তাড়াতাড়ি ধমকে উঠল ওকে,—আঃ, তুই থাম তো হিমানী। ওর সব-কিছুতেই তোর ঠাট্টা। লেখাপড়া তো করবেই কুকেন্দু। সবাই কী আর আমাদের মত!

তারপর একটু চুপ করে থেকে নলিনী আবার শুরু করল—জান কুকেন্দু, ঠিক তোমার মত আমাদের এক ভাই ছিল। আমাদের বড় দুঃখ অকালেই তাকে হারাতে হয়েছে আমাদের। সে থাকলে আজ তোমারই মত বড় হত সে। বাবা বলতেন—ও অনেক বড় হবে। বাবা বড় জ্যোতিষী ছিলেন এক সময়। চিরদিনই বাবা তো এরকম ছিলেন না। অনেক শোকে-দুঃখে এমন হয়ে গেছেন। নির্ভুল গণনা ছিল বাবার। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য জান কুকেন্দু, আমার ভায়ের বেলাতেই শুধু বাবার হিসেবে গরমিল হয়ে গেল।

আবার হঠাৎ কথা থামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল নলিনী। তারপর হেসে বলল—দেখছো, ঘুরে-ফিরে আবার সেই আমাদের কথাই এসে পড়ছে। কিন্তু কী করি বলো, যখন মনের মধ্যে হতাশা জাগে, তখন ওর কথা ভীষণ মনে পড়ে যায়। আর কী মনে হয় জান, ও বেঁচে থাকলে আমাদের এত কষ্ট হত না কুকেন্দু।

নলিনী আর শিবানী কুকেন্দুর থেকে বয়েসে কিছু বড়, তাই ওদের নলিনীদি, শিবানীদি বলে কুকেন্দু। আর হিমানী থেকে মিনি—সবাই ওর থেকে ছোট। ওদের নাম ধরে তুমি বলে কথা বলে কুকেন্দু।

আজকে হাল্কা আলাপের শুরুতেই এমন বিষন্ন সুর বেজে উঠবে ওর গলায়, ভাবতে পারেনি নলিনী। তাই হয়ত তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে ফেলতে চেষ্টা করল—তুমি গান ভালবাস, তাই না কুকেন্দু!

হিমানী আবার খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর হাসির দমক সামলাতে সামলাতে বলল—দিদি, তুই তো কম নোস। উনি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের গান শোনেন বলে নিজেদের খুব সুকণ্ঠী ভাবিস বুঝি!

কুকেন্দুর বিব্রত ভাব লক্ষ্য করে নলিনী এবার হেসে ফেলল—বারে, লুকিয়েই বা শুনতে যাবে কেন কুকেন্দু। লুকিয়ে লুকিয়ে বরং তোরাই দেখিস ওকে। না হলে ও কী করছে, না করছে তোরা জানিস কী করে।

—দিদি। নিষেধে হিমানী এবার কপট রাগে ফুঁসে ওঠে—কবে দেখেছিস বলতো! ইস্ লুকিয়ে দেখতে ভারি বয়ে গেছে আমাদের।

যত দিন যাচ্ছে দুপক্ষই সহজ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এখন বাইরে থেকে বেরিয়ে ফেরার সময় সদর দরজা দিয়ে বাড়ি ঢোকে না কুকেন্দু। পেছনের দরজা দিয়ে ওপরে উঠে আসার আগে একতলায় এক-বার থমকে দাঁড়ান এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে ওর। বকুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ডাকে—নলিনীদি।

রান্নাঘর কিম্বা ভেতরের ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও আসে ওর কানে—আছি, এসো। ওমা, ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নলিনী কিম্বা শিবানী না থাকলে অন্য কেউ সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে—ওরা কলকাতায় গেছে কুকেন্দুদা। ফিরতে বোধ-হয় রাতই হয়ে যাবে ওদের। ভেতরে আসুন না আপনি। ভালই হল আপনি এসেছেন। ওরা বাড়ি নেই, একলা একলা আমাদেরও ভাল লাগছে না মোটেই।

এমনি একটা সাড়া পাবার জন্যেই যেন কুকেন্দুর কান উৎকর্ণ হয়ে থাকে। তা সে যেই সাড়া দিক। ঠিক যে কাউকে প্রয়োজন ওর তা নয়। কাউকেই আলাদা করে ভাবতে ইচ্ছে করে না কুকেন্দুর। দল থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করেও ভাবা যায় না পঞ্চপাণ্ডবীদের।

সেদিন কী খেয়াল হল কুকেন্দুর। সাড়া না দিয়েই নিঃশব্দে উঠোনের ওপর এসে দাঁড়ায়। দরজাটা খোলা কিন্তু বাইরে থেকে কাউকেই নজরে পড়ল না ওর। ওদের চাপা হাসি আর গুঞ্জনে ঘরের ভেতরটা গম গম করছে। লণ্ঠনের আলোয় ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ওদের ছায়া-মূর্তিগুলো সেজে বেড়াচ্ছে, দেখতে পেল কুকেন্দু। হঠাৎ ওর মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি কিলবিল করে উঠল। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভেবে নিল মনে মনে। তারপর পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই ঘরের মধ্যে মহাত্রাসের সঞ্চার হল। সোরগোল জুড়ে দিল পঞ্চ-পাণ্ডবীরা। পরক্ষণেই ওদের আর্ত-চিৎকারটা উদ্দাম হাসি হয়ে ফেটে পড়ল—হিহি, হিহি...কুকেন্দুদা। ভারি অসভ্য লোক তো তুমি। বলবে তো আগে থেকে, মাগো। কী লজ্জা! ভিজে বেড়াল কোথাকার! দাঁড়াও তোমার না বলে ভেতরে ঢোকা আজ বার করছি।

উপায়ান্তরবিহীন হয়ে কে যেন সেই মুহূর্তে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিতেই ঘরের ভেতরটা ঘন অন্ধকারে ভরে উঠল।

কুকেন্দুও ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে উঠে ভয়জড়িত গলায় তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আমি নলিনীদি, আমি কুকেন্দু, ভয় নেই।

অন্ধকারের মধ্যে হিমানীর চাপা হাসিটা তখনো উদ্দাম বেগে বেজে চলেছে—ভয় নেই, সে আমরাও জানি। যান তো, এখন বেরোন। একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান দিকি, লক্ষ্মীটি।

কুকেন্দু তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে কে যেন দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল। তারপর লণ্ঠনটা আবার জেলে নিল, বাইরে থেকে বোঝা গেল। একটু পরে জামাকাপড় বদলে শিবানী দরজা খুলে হাসতে হাসতে বাইরে এসে ডাকল—কুকেন্দু, এবার ভেতরে এসো, হয়ে গেছে আমাদের।

কুকেন্দু কুণ্ঠিত গলায় ক্ষমা চাইল—আমায় ক্ষমা করুন শিবানীদি, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হল
দাম : ৫০ পয়সা
সাহিত্য-সেতু : বাঁশবেড়িয়া, হুগলী

শিবানীর চোখে-মুখে কিন্তু ক্ষোভের এতটুকু ছায়া পড়েনি বরং কৌতুকের হাসিই চকচক্ করছে ওর লজ্জাবিহ্বল চোখদুটোতে। অন্ধকারে কৃষ্ণেন্দুর সাড়া পেয়ে এগিয়ে এসে ওর হাতটা টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে—না, না এত কুণ্ঠিত হতে হবে না তোমাকে। দোষ তো আমাদেরও। দরজাটা বন্ধ করে রাখাই উচিত ছিল। যাকগে এখন ভেতরে এসো। বিশ্বাস করো, তোমাকেই খুঁজছিলাম আমরা।

শিবানীর পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকে পড়ে সকলের দিকে তাকাল কৃষ্ণেন্দু। অন্যদিনও ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে ও। কিন্তু আজ যেন সকলকেই অন্যরকম লাগছে। পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে সবাই। খোঁপায় তাজা গন্ধরাজ আর বেলকুঁড়ির মালা জড়িয়ে নিয়েছে। মুখে হাল্কা প্রসাধন করার এই মুহূর্তে সকলকেই সুন্দরী মনে হচ্ছে ওর। এর আগে এত দামী শাড়ি-জামাও কখনো পরতে দেখেনি কৃষ্ণেন্দু। আজ যেন সবকিছুই বিস্ময় সৃষ্টি করছে ওর চোখে। পরনের রেশমী শাড়ির ভাঁজগুলো যেন আগের চেয়ে অনেক দুরন্ত, অনেক মুখরিত হয়ে উঠেছে।

নলিনীর ঠোঁটে চাপাহাসি লেগেই ছিল। এবার কথা বলার সময় সেটা যেন কুলেকেঁপে ঢেউ হয়ে উঠল—আমাদের মুখের দিকে অমন করে কী দেখছ বলতো কৃষ্ণেন্দু। তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে শুরু করল,—

আজ আমার জন্মদিন। আবার সামনের মাসে ঠিক এমনি দিনেই শিবানীর জন্মদিন। আমাদের সকলের জন্মদিনই আমরা এমনি করে পালন করি। আর কোনদিন নয়। শুধু জন্মদিনটিই আমাদের জীবনে এখনো বিশেষ দিন হয়েই ঘুরে ঘুরে আসছে। তাই এই দিনে আমরা ঘরদোর সাজাই। নিজেদের সাজাই। তুলসীমঞ্চে মঙ্গলপ্রদীপ জেলে দি। প্রাণভরে গান গেয়ে করুণাঘন ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ কামনা করি। প্রার্থনা করি, আবার যেন এই দিনটি ঘুরে আসে আমাদের জীবনে। সকলের মত আমরাও যেন তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত না হই।

একটু থেমে নলিনী আবার বলল,—আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই বাইরের লোক কৃষ্ণেন্দু। তুমি আমাদের কাছের মানুষ। আজ আমরা তোমাকে খাওয়াব, তোমাকে গান শোনাব। তোমার মন যা চাইবে, তাই করব আমরা। তারপর তুমি যদি খুশী হও, যদি পরিতৃপ্ত হও, তখন আমাদের জন্যে তুমিও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। এ-জন্মে নাও যদি হয়, পরের জন্মেও যেন তাঁর আশীর্বাদ পাই। সুখী হতে পারি আমরা।

আরেকটু পরেই বকুলতলার বেদীতে পঞ্চপাণ্ডবীরা তানপুরো হাতে গোল হয়ে বসে পড়ল। নলিনীর গলায় কেবল সাদা গোড়ের মালা। আজকের দিনটি ওরই। মাত্র এই একটি দিন ও সবার থেকে একটু স্বতন্ত্র। হিমানীর হাতের তানপুরোয় ধীরে ধীরে সুরের মূর্ছনা জেগে উঠল। শিবানীই প্রথম শুরু করল—

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।

ঘাটে ঘাটে ফিরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

কৃষ্ণেন্দুও আজ ওদের সঙ্গে বেদীর একধারে মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপচাপ বসে গান শুনছে। ওরা বিভোর হয়ে গান গাইছে। হয়তো বা এই মুহূর্তে ভুলেই গেছে ওর কথা। তপ্ত বৈশাখী সন্ধ্যায় গরম এলোমেলো হাওয়া ছুটে এসে মাঝে মাঝে বকুলের ডালে ডালে কাঁপন জাগিয়ে তুলছে। পঞ্চপাণ্ডবীদের শাড়ির আঁচল খসে পড়ছে বারবার। ঝোড়ো হাওয়ায় চূর্ণকুন্তল এসে পড়ছে ওদের মুখের ওপর। কিন্তু কোনদিকেই হুঁশ নেই ওদের। যেন কোন ভাবরাজ্যে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ নিখোঁজ হয়ে রয়েছে ওরা।

হঠাৎ ওপরের জানলা থেকে মলয়ার বেসুরো কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই সুরের জাল আচমকা ছিঁড়ে গেল। মলয়া ডেকে নিলেন কৃষ্ণেন্দুকে। বোধহয় ওদের সঙ্গে ছেলের এত ঘনিষ্ঠতা ভাল লাগে না ওঁর। কিম্বা অর্ধেন্দুবাবু এসব পছন্দ করেন না বলেই তাঁর ফিরে আসার আগে ছেলেকে ডেকে নিলেন।

নিমেষে গান থেমে গেল। আরেকটু পর হিমানীর হাতের তানপুরো স্তব্ধ হয়ে থেমে পড়তেই সুরের রেশটুকুও যেন হারিয়ে গেল কতদূরে। মার ডাকে কৃষ্ণেন্দু উঠে দাঁড়াতেই নলিনী এবার কথা বলে উঠল—একটু দাঁড়াও ভাই কৃষ্ণেন্দু। তোমার জন্যে খাবার করে রেখেছি। না খেয়ে গেলে কিন্তু আমরা দুঃখ পাব খুব।

কৃষ্ণেন্দুর অনিচ্ছে থাকার কথা নয়। বিশেষ করে আজকের দিনটিতে। মা না বুঝুন কিন্তু এ-দিনটির কী অপরিসীম মূল্য পঞ্চপাণ্ডবীদের কাছে, ওর অজানা নয়। তবু মার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু মেশান ছিল যা ওর কানে একটুও ভাল লাগেনি।

নলিনীদি নিজেই উঠে পড়ে হন-হন করে রান্নাঘরের দিকে ছুটছিলেন, কৃষ্ণেন্দু বাধা দিল—আজ থাক নলিনীদি। ঠিক এই সময় খেতে কী ভাল লাগে কারো? কাল সকালে আসব। এসে যত খাওয়াবেন খেয়ে যাব। তাই বলে ভাববেন না আপনাদের কথাটা ভুলে গেছি।

নলিনীদি খুব অবাক হয়ে উঠলেন—কী কথা বল তো? কী ভুলে যাবে না তুমি...। পরক্ষণেই কৃষ্ণেন্দুর কথাটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে একটু হাসল—মুখে পাগল। ও-কথার কোন মানে আছে! তখন এমনি একটা কথার কথা বলেছিলাম তোমায়। প্রার্থনা-টার্থনা আমরাই মানি নাকি? অনেক করে দেখেছি, ওসব বাজে। এখন যাকগে ওসব কথা। মা ডাকছেন যাও। কাল এসো কিন্তু, না হলে রাগ করব আমরা।

সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ওদের গান শুনেছিল কৃষ্ণেন্দু। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত তখন কত খেয়াল নেই। নীচে বকুলতলায় সেই মোহিনী সুরও আর বেঁচে নেই। বাইরে নিঝুম স্তব্ধ পৃথিবী, কোনদিকে কোন শব্দ নেই। তাই বোধহয় অত আস্তে চাপা গলায় কান্নাটাকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না ওর।

চকিতে সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল কৃষ্ণেন্দুর। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে পা টিপে টিপে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একতলায় বকুল গাছটার নীচে চাপ-চাপ অন্ধকার থমথম করছে। শুধু ওদিকের তুলসীমঞ্চে প্রদীপের শিখাটা এখনো কৃপণ আলোটা বুকে ধরে থরথর করে কেঁপে চলেছে। সে-আলো যত সামান্যই হোক চিনে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয় ওর।

আশ্চর্য, জন্মদিনেই নলিনীদি কাঁদছে! তবে কী জন্মদিনের এত আনন্দ-হাসি-হুল্লোড়—সব মিথ্যে? নিছক একটা সংস্কার। কিন্তু কেন কাঁদছে নলিনীদি! কোন অভিশাপে এত কান্না জমে ছিল ওর বুকে।

খর জ্যৈষ্ঠের দিন। তপ্তনিশ্বাসের শেষে আকাশে মেঘ জমে উঠল সেদিন। সন্ধ্যের পর ঘনঘটা করে বৃষ্টি নামল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাল। রান্নাঘরের টিনের চালায় একটানা প্রবল বৃষ্টির শব্দ বেজে চলল... ঝপ্ ঝপ্...ঝপ...ঝপ...

আজ শিবানীর জন্মদিন। সারাদিন প্রাণান্ত গরমে ঝিমিয়ে থেকে, বর্ষার নতুন জল পেয়ে সতেজ তরুলতার মত পঞ্চপাণ্ডবীরাও চাঙা হয়ে উঠেছে। বাইরের উঠোনে এর মধ্যেই জল জমে উঠেছে। বকুলতলার বেদীটাও জলকাদায় জবজবে হয়ে রয়েছে। কৃষ্ণেন্দু নিজের ঘরের খোলা জানলা দিয়ে কখনো বাইরে দুর্যোগভরা প্রকৃতিকে দেখছে। কখনো একতলায় বৃষ্টির মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবীদের দুরাবস্থা লক্ষ্য করে মজা পাচ্ছে। বোধহয় ওদের রান্নাঘরের কাজ সারা হতে এখনো দেরী আছে। বৃষ্টি মাথায় করে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছে কৃষ্ণেন্দু।

তারপর অনেকক্ষণ আর ওদিকে মনোযোগ ছিল না কৃষ্ণেন্দুর। বৃষ্টির ঝাপটায় ঘরের ভেতরটা ভিজে যাচ্ছিল। জানলাটা বন্ধ করে একটা বই খুলে শুয়ে শুয়ে পড়ছিল। খাওয়াদাওয়া সারা হয়ে গেল এক সময়। শোবার আগে অন্ধকার ঘরের খোলা জানলায় বসে বসে অন্যদিনের মত

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। বাইরের প্রবল বৃষ্টিটা কেন থেমে গেছে। শুধু ছিপছিপ করে বৃষ্টির রেশটুকু এখনো টিকে আছে। নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে পৃথিবী। দূরে পুকুরের ব্যাঙগুলো এখনো মহানন্দে একটানা ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে ডেকে চলেছে। ঝিঁঝীর ঐকতান চীৎকার শিসের মত কানে ভেসে আসছে।

আশ্চর্য! একতলায় এখনো বাতি জ্বলছে। কৃকেন্দু অবাক হল খুব। ওদের ঘরগুলো এখান থেকে চোখে পড়ে না। কিন্তু দরজা খোলা থাকলে লণ্ঠনের আলো পড়ে উঠোনে। নিশ্চয়ই এখনও জেগে পঞ্চ-পাণ্ডবীরা। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো ওদের। আরো কিছুক্ষণ একতলায় নজর রেখে অপেক্ষা করল কৃকেন্দু। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই। ভেতরের ঘরে চলাফেরা করলে উঠোনে ছায়া পড়ে। আশ্চর্য, এতক্ষণ হয়ে গেল কারো ছায়াও তো পড়ল না।

পাশের ঘরে মা-বাবা বোধহয় এতক্ষণ জেগে আছেন। জোরে কথা বললে শুনতে পাবেন ও'রা। না হলে কৃকেন্দুর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল...কারো নাম ধরে ডেকে সাড়া নেয়। বাধ্য হয়ে ইচ্ছেটাকে চেপে রেখে শুয়ে পড়তে হল।

কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তিটাকে বোধহয় ভুলতে পারছিল না কিছুতেই, বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল ওর। আর কখনো এমন হয়নি। আজই প্রথম। কেমন একটা অশুভ ইঙ্গিত যেন বারবার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল।

অনেক রাতে আবার ঘুম ভেঙে গেল কৃকেন্দুর। কিন্তু না, এবার নিজে থেকে ঘুম ভাঙেনি। একতলায় অনেকগুলো অপরিচিত মানুষের দৌড়াদৌড়ি, চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। কিন্তু কিসের এত সোরগোল! এত রাতে ভারি বুটের শব্দই বা কেন! তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল।। কিন্তু নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না কৃকেন্দু। নীচের উঠোনে রাইফেলধারী এতগুলো পুলিশ কেন! তিনজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ অফিসার ব্যস্তসমস্তভাবে কথা বলছে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে। এত রাতে পাড়াপড়শিরা এসেছে...অথচ ও কিছু জানতে পারল না। কিন্তু কী ব্যাপার হতে পারে বুঝে উঠতে পারল না কৃকেন্দু। নলিনীদিরাই বা কী করছে কে জানে। এত লোক রয়েছে কিন্তু ওদের কাউকে তো চোখে পড়ছে না। ওদিকের পুকুরের পাড়ে পাড়ে অন্ধকার কোণেকোণে টর্চের তীব্র আলো ফেলে কারা যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে। কে যেন একজন বলে উঠল—ওদের তো পাওয়া যাচ্ছে না স্যার। মনে হচ্ছে এবারও সরে পড়েছে।

মোটামত একজন পুলিশ অফিসার কর্কশ শ্লেষাত্মক গলায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—বলেন কী! এ যে দেখছি রীতিমত ভানুমতীর খেল দেখাল শয়তানিগুলো! ভাল করে খুঁজে দেখেছেন তো লুকিয়ে থাকার জায়গাগুলো? দেখুন আরেকবার ভাল করে। চারদিকে ওয়াচ রাখা সত্ত্বেও যদি পালায়...সেটা ডিসক্রেডিট নিশ্চয়ই।

বাড়ির মালিক সত্যবাবুর গলাটা ভেসে এল কৃকেন্দুর কানে—দিনকাল কী হল বলুন তো স্যার! এত বড় স্মাগলার, এমন ভয়ঙ্কর মেয়েছেলে তো মশাই জীবনে শুনিনি। দেখেশুনে তো কিছুই মনে হত না। এতদিন ছিল মশাই আমাদের বাড়ি, বিশ্বাস না হয় এই তো এ'রা রয়েছেন, জিজ্ঞেস করে দেখুন...সন্দেহ হবার মত কিছুই নজরে পড়েনি আমাদের...

সত্যবাবুর বাকী কথা আর কানে গেল না কৃকেন্দুর, তার আগেই ওর কানদুটো ভোঁ-ভোঁ করতে শুরু করে দিয়েছে। আশ্চর্য, নলিনীদিরা স্মাগলার! দাগী আসামী...একী সত্যি, না এখনো ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছে ও!

হঠাৎ কার হাতের টর্চের আলো এসে পড়ল ওর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসার একজন ডেকে উঠলেন—আপনিই কৃকেন্দুবাবু? শুনলাম এ'দের সঙ্গে আপনার মেলামেশা ছিল। বলতে পারেন কোথায় গেছে ওরা...খবর রাখেন কিছু?

অন্য একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠলেন—দয়া করে একবার নীচে আসবেন! আমাদের একটু সাহায্য করুন না প্লিজ।

নিদারুণ বিহ্বলতার মধ্যেই নীচে নেমে এল কৃকেন্দু। মোটামত পুলিশ অফিসারটি কথা বললেন এবার—এদের হালচাল সম্বন্ধে কিছু খবর রাখতেন... কখনো সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছেন...!

কৃকেন্দু মাথা নাড়ল—না।

শেষ কখন দেখেছেন এদের। দেখে তো মনে হচ্ছে...বিপদের গন্ধ পেতেই সরে পড়েছে। ঘরদোর সব খোলা, উনুনে ভাত ফুটছিল। একটু আগেও ছিল নিশ্চয়ই...

ঠিক সেই সময়ে অন্য আরেকজন পুলিশ অফিসার ইউনিফর্মে জলকাদামাখা অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালেন—চৌধুরী, পুকুরপাড় দিয়েই যে পালিয়েছে তার সন্দেহ নেই। কাদায় রাস্তায় অনেকগুলো পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তারপর যা বনবাদাড় এগোয় কার সাধ্য। আশ্চর্য, আমিই যেতে পারলাম না, ওরা পালাল কী করে ভেবে পাচ্ছি না।

মোটা পুলিশ অফিসারটি এবার যেন ক্ষেপে উঠলেন—ওদিকে ওয়াচ রাখা হয়নি? তবে পালাল কী করে। আরো সাবধান হবার প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই।

আগন্তুক পুলিশ অফিসারটি এবার হো-হো করে হেসে উঠল—আর কী ব্যবস্থা করা উচিত ছিল বল। তারপরই হয়তো মনে পড়ল, পাবলিকের সামনে এসব পুলিশী গোপনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা না হওয়াই ভাল। তাই প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি পাল্টে নিল—তুমি হয়তো ভুলে যাচ্ছ, আগেই পাঁচবার ওরা আমাদের জাল কেটে পালিয়েছে। এই প্রথম নয়। আর মেয়ে তো নয়—এক-একখানি রত্ন সব। পয়মাল। আত্মগোপন করে থাকার উপযুক্ত জায়গাই খুঁজে নিয়েছিল বটে!

একটু পর পাড়াপড়শিদের সাক্ষী রেখে বাড়ি সার্চ শুরু হল। কৃকেন্দু ওদের সঙ্গে ঘরে এল। কিন্তু এতক্ষণ ওদের সম্বন্ধে উক্তিগুলো না শুনলে পঞ্চপাণ্ডবীরা এত ভয়ঙ্কর মেয়ে ভাবতেই পারত না। এখনো পারছে না কৃকেন্দু। পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না চোখদুটোকে। ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রগুলো এমন করে ছড়ানছিটনো রয়েছে মনে হয়...এখনো ওরা এ-বাড়িতেই আছে। কিম্বা কিছুক্ষণের জন্য বাইরে কোথাও গেছে, এখুনি ফিরে আসবে।

পুলিশ অফিসারের কথাই ঠিক। পাঁচ বোনের জন্যে ঘরজোড়া বিছানাটা বোধহয় সবেমাত্র পাতা হয়েছিল। মশারিটা শুধু পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর। হয়তো ওটা টাঙাবার আগেই ওরা বিপদের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল। আলনায় ওদের শাড়ি-জামা পরিপাটি করে সাজান রয়েছে। মাদুরের ওপর লণ্ঠনটা জ্বলা রয়েছে। পাশেই তানপুরাটা পড়ে রয়েছে। হয়তো কেউ আজও ওটা বাজিয়ে গান গাইছিল। আর কেউ না পারুক, কৃকেন্দু যেন সব-কিছুই ছবির মত দেখতে পাচ্ছে। রান্নাঘরে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি চড়ান এখনো। নিশ্চয় খাওয়া হয়নি ওদের। পঞ্চপাণ্ডবী-দের জন্যে মনটা কেন হু-হু করে কেঁদে উঠল কৃকেন্দুর। আশ্চর্য, ওদের চারদিকে এত বিপদ তাহলে অজানা ছিল না মোটেই। সব জেনেশুনেও তাহলে কেমন হাসত ওরা। শিবানীর সেদিনের সেই প্রশ্নটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল কৃকেন্দুর। এত দুঃখ বুকে করে হাসে কী করে মানুষ...। আর হয়তো এ-জীবনে দেখা হবে না ওদের সঙ্গে। তবে...প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে নিতে চেষ্টা করবে কৃকেন্দু।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

CENTRAL LIBRARY

দেশের সীমা ছাড়িয়ে

এতদিন দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার দেশ ছাড়িয়ে বিদেশ। পথ চলার দুরন্ত নেশায় আমাদের মেয়েরা এবার পাড়ি জমিয়েছে কলকাতা থেকে সিংহলে। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশ পর্যন্ত এই পদযাত্রা মেয়েদের অগ্রগতির ইতিহাসে এক নয়া-সংযোজন, নতুন অধ্যায়।

পথের ভয় অবশ্য ওদের ভেঙেছে অনেক আগেই। যেদিন ওরা কলকাতা থেকে দীঘা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষায় বেরিয়ে পড়ে। সেদিনই ওরা বুঝেছিল ওরা নিরাশ্রয় নয়, একা নয়। পথে পথে ছড়িয়ে আছে অজস্র আত্মীয়স্বজন। সবাই ওদের আদর করে ডেকে নিয়েছে, খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আবার পরদিন প্রত্যুষে ক্ষণিক পরিচয়ের অসামান্য স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে ওরা পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছে। এমনি করে পথ ভাঙতে ভাঙতে একদিন মোরগ ডাকা ভোরে ওরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। বিরাট সম্বর্ধনায় তখন ওরা অভিভূত।

সেই প্রথম হাতেখড়ি। ওরা বুঝলো পথ ওদের কতো আপন। আর পথের পাশে ছড়ানো স্বতঃস্ফূর্ত আত্মীয়তায় ওদের কৃতজ্ঞতার ঝুলি কানায় কনায় পূর্ণ। সেই কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞতাকে অকৃতজ্ঞের মতো অস্বীকার করে বেশিদিন চুপ করে বসে থাকা ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর হলোও তাই। পথ আবার ওদের ডেকে নিল। এবার দূরত্ব আরো বেশি। কলকাতা থেকে দিল্লী এভাবেই ওদের অতিক্রম করতে হবে।

পিঠে রুকস্যাক, পরনে প্যান্ট-সার্ট, মাথায় টুপি আর পায়ে কম্বল বুট দেখেই পথ ওদের চিনতে পারলো। দিব্যি আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ওরা পথ চলতে শুরু করলো। চলতে চলতে এলো লাল মাটির দেশ বীরভূম। শান্তিনিকেতন ওদের স্বাগত জানালো। চলতে চলতে থেমে থেমে ওরা এগিয়ে চললো। কখনো কখনো দূর থেকে ওদের লক্ষ্য করে রাস্তায় দ্রুতগতি গাড়ি-গুলো আস্তে আস্তে পাশে দাঁড়িয়েছে। ওদের সাহায্য করার জন্য কিছুটা এগিয়ে দিয়েছে। চলার পথে এই আত্মীয়তা ওদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। ওরা মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। আর আতিথেয়তার উষ্ণ পরশ নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের ভোলাই দায়।

অসংখ্য রাজপথ-জনপথ মাড়িয়ে ওরা পৌঁছে গেল দিল্লী। ওদের স্বাগত জানানোর হাজারো আয়োজন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ওদের ডেকে অভিনন্দন জানালেন। ওদের দুঃসাহসিক পদযাত্রাকে স্বীকৃতি দিলেন বিমানে কলকাতা ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়ে। অভিযাত্রীদের হৃদয় তখন আনন্দের জোয়ারে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী বললেন, তোমাদের আদর্শে বহুলো আমাদের মেয়েরা চিনে নিক নিজেদের পথ।

সেটা ছিল জানুয়ারি, ১৯৭০। ঠিক এক বছর পরে জানুয়ারি, ১৯৭১-এ কলকাতা—সিংহল পদযাত্রা।

ইতিমধ্যে আরেকটি নতুন ধরনের পরীক্ষা হয়। তিনজনের একটি মহিলা

দল সাইকেলে কলকাতা থেকে শিলং যাত্রা করে। সেই একই উপায়ে। তফাতের মধ্যে ছিল পায়ে চলার বদলে সাইকেল। এই পরীক্ষাও লাভ করে দারুণ সাফল্য। প্রায় এক মাসে ওরা শিলং পৌঁছয়। সম্প্রতি এই সকল অভিযাত্রীরা ফিরে এসেছে কলকাতায়। সঙ্গের সামান্য পাথেয় মাত্র পাঁচটি টাকারও হাত পড়েনি ওদের।

পথ এবার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাই ঘর ছেড়ে পথের সন্ধানে আমাদের মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে। অজানার হাতছানিতে সাড়া দিয়ে দুর্জ্ঞেয়তার রহস্য ভেদই এ-যুগের মূলমন্ত্র। মেয়েরা এ-আবাহনকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই দুর্গম গিরিশৃঙ্গ আজ তাঁদের পদভরে কম্পিত।

অনুরূপ রহস্য আর সৌন্দর্যে ঘেরা পাহাড় অভিযানে আমাদের মেয়েরা অংশ নিয়েছে একাধিকবার। বোল্টি দুর্গা বিজয় দিয়ে ওদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এমনিভাবেই ক্রমে ওরা এগিয়েছিল। সারাদেশ জুড়ে মেয়েদের মধ্যে পাহাড় অভিযানের এক দুরন্ত নেশা জেগে উঠেছে। বাংলাদেশ থেকে গুজরাট সবাই এই অভিযানে অংশীদার। অধিকাংশ অভিযানেই ওরা সাফল্যের হাসিতে উজ্জ্বল।

এই সাফল্য কিন্তু এমনিতে আসেনি। এজন্য আমাদের যথেষ্ট মাশুল গুণতে হয়েছে। অভিযানের গোড়ার দিকেই একটি বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেইল গিরিবর্ত্ম কেড়ে নেয় অভিযাত্রী অনিমা সেনকে। মেয়েদের পাহাড় জয়ের আকাঙ্ক্ষা এতে বিরাট ঘা খায়। কিন্তু কেউ পিছিয়ে যায় না। পাহাড়ের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করতে সবাই সংকল্পবদ্ধ।

একের পর এক বিজয় পতাকা উড়তে লাগলো। পাহাড় কিন্তু আবার কুটিল হাসি হাসলো। বিরাট আঘাতে আমাদের মনোবল গুঁড়িয়ে দেবার জন্য চক্রান্তজাল বিস্তার করলো। কলকাতা থেকে এক অভিযাত্রী দল হিমালয়ের লাহুল স্পিতি অভিযানে যাত্রা করলো। দলনেত্রী সুজয়া গুহ। সুদক্ষ এই পর্বতারোহী ইতিপূর্বেও একাধিকবার হিমালয়ে অভিযান চালিয়েছে। এবং প্রতিটি অভিযানই সাফল্যদীপ্ত। সঙ্গে রয়েছে কমলা সাহা এবং আরো কয়েকজন।

দুর্গম গিরিশৃঙ্গে ওদের বিজয়-পতাকা উড়লো। আনন্দের আতিশয্যে ওরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো। এবার ফেরার পালা। পর্বতের চক্রান্ত এতক্ষণে সম্পূর্ণ। একটি পাহাড়ী নদী পেরোতে গিয়ে হারিয়ে গেল সুজয়া এবং কমলা। সফল অভিযাত্রী-[illegible] নিয়ে পর্বত হাসলো পরিতৃপ্তির হাসি।

আমাদের মনোবল প্রচণ্ড আঘাত পেল। কিন্তু মুষড়ে পড়বার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। ওদের আরব্ধ কাজ এখনো অনেক বাকি। সম্মিলিত প্রয়াসে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এভারেস্ট শিখরচূড়ায় যেদিন উড়বে আমাদের বিজয় কেতন সেদিনই সফল হবে পাহাড়ের বুকে ওদের এই আত্মদান। আর সেটাই হবে পাহাড়ের ক্রূরতার যোগ্য জবাব।

দলে দলে মেয়ে আজ পাহাড়ে চড়ার তালিম নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে অভিযানে। অনিমা-সুজয়া-কমলার আত্মদান ওদের নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এবং আরো সংকল্পবদ্ধ করেছে।

ঘরকুনো নাম আমাদের ভাঙছে এইভাবে। পাহাড় অভিযান এবং অজানা পথের সন্ধানে সাড়া দিয়ে আমরা নয়া ইতিহাস রচনা করে চলেছি। আকাশে বাতাসে আজ তারই জয়গান।

তিনজনের মহিলা অভিযাত্রী দলটি ১৬ জানুয়ারীর সকালে কলকাতা থেকে যাত্রা করলো সিংহল অভিমুখে। অবশ্যই হিচ-হাইক করে। যাত্রার প্রাক্কালে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উদ্যোক্তা এক্সপ্লোরার্স ক্লাব। সেখানে অনেকেই ওদের অভিনন্দন জানালেন। বিশেষ, ওদের মনে ভরসা জোগাতে সদ্য সাইকেলে কলকাতা থেকে শিলং ঘুরে আসা অভিযাত্রী দলটিও উপস্থিত ছিল।

অভিযাত্রী দলের নেত্রী শ্রীমতী পুষ্পা সাক্সেনার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা দুঃসাহসিক এবং দুঃসাধ্য কোন কিছু নিয়ে বেশ গভীরভাবে নাড়াচাড়া করা। সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন দীর্ঘদিন থেকেই। আগাগোড়া তার খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহ। স্কুলকলেজে খেলাধুলায় সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেত পুষ্পা। নিজের দুঃসাহসিকতার নেশা সে অনেকটা পূরণ করেছে সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করে। ডাক্তারী পাশ করার পর পুষ্পা কমিশনড অফিসার হিসেবে ঢুকে পড়ে মিলিটারীতে। এখন তার কর্মস্থল হলো সিমলা হিলস।

তবু তার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হচ্ছিল না। তার সেই দুঃসাহসিকতার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বার স্বপ্নই রয়ে গেল। এমন সময়ে একটি পত্রিকায় পুষ্পা জানতে পারলো এই অভিযানের কথা। কালবিলম্ব না করে সে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। তারপরই অভিযানে তার মনোনয়ন।

সাত ভাইবোনের মধ্যে বড় পুষ্পার বয়স ছাব্বিশ। প্রসঙ্গত, গীটারে তার হাত খুব ভাল।

অপর দুই অভিযাত্রী হলো মীরা সরকার এবং মীনা ঘর। হিচ-হাইক করে রাজপথ-জনপথে বেরিয়ে পড়ে অজানিতের সঙ্গে প্রথম মোলাকাতের অভিজ্ঞতা এদের। প্রথম যে অভিযান হয় কলকাতা থেকে দীঘা তাতেও এরা ছিল। সেই এদের প্রথম পথ-পরিচয়। ধীরে ধীরে সে আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়েছে। পথের মোহ এবং ভালবাসা নিবিড়ভাবে এদের জড়িয়ে ফেলেছে। তাই ১৯৭০ সালের জানুয়ারীতে যখন কলকাতা থেকে দিল্লী হিচ-হাইক করে যাওয়া হয় তখন এই দলেই সেই দলে স্থান পায় এবং অর্জন করে দ্বিতীয় সাফল্য।

কলকাতা-দিল্লী অভিযানের সদস্য ছিল চারজন এবং মীরা ছিল সে দলের নেত্রী। আর সেটাই ছিল এদেশে মহিলাদের সর্বপ্রথম লং জার্নি হিচ-হাইকিং। ওদের সেদিনের সাফল্য আজ আর নতুন করে উল্লেখের অপেক্ষাই রাখে না। কলকাতা-দিল্লীর সাফল্যই যে এই আন্তর্জাতিক হিচ-হাইকিংয়ের প্রেরণা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

টালিগঞ্জের মেয়ে মীরা আমাদের অত্যন্ত কাছের। এখনও কলেজের পড়ুয়া। বি-এ ক্লাশের ছাত্রী। বয়স মাত্র চব্বিশ।

কলকাতা-দিল্লী অভিযানের অপর সফল অভিযাত্রী হলো মীনা। অসাধারণ তার মনোবল। উৎসাহ এবং প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। পূর্বোক্ত অভিযানে তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর সেদিন থেকেই মীনা নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে পরবর্তী অভিযানের জন্য। কলকাতা-সিংহল আন্তর্জাতিক হিচ-হাইকিংয়ে তার স্থান তাই খুবই স্বাভাবিক।

মীরার মতো মীনাও কলেজের পড়ুয়া। তৃতীয় ক্লাশের ছাত্রী। দলের সে সর্বকনিষ্ঠ। বয়স মাত্র বাইশ। কলকাতার কাছেই বেলঘরিয়ায় তার বাস।

ওদের যাত্রা শুরু হয়েছে। সঙ্গে সম্বল বলতে মাত্র পাঁচটি টাকা আর কিছু বৈদেশিক মুদ্রা এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনপত্র— এই সামান্য পাথেয় নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক হিচ-হাইকিংয়ে। খাওয়া-দাওয়ার বা থাকার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। পথেই মেয়েরা তার ব্যবস্থা করে নেবে।

এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য হলো দেশানুরাগ। নিজের দেশ এবং পারিপার্শ্বিককে ওরা জানুক এক নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সেই সঙ্গে ওদের অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হয়ে জেগে উঠুক পিছিয়ে পড়া গ্রামের লোক। অভিযাত্রীদের পথের অধিকাংশই তাই গ্রামের পথ। শহরও আছে। এমনিভাবে জেগে উঠবে এক বিরাট জনসমাজ। ওদের বুকে এ'কে দেওয়া 'পায়েলে হিন্দুস্তান' সফল হয়ে উঠবে এই আন্তর্জাতিক হিচ-হাইকিংয়ে।

কলকাতা থেকে সিংহলে পৌঁছুলেই ওদের অভিযান শেষ হবে না। ওরা ঘুরবে সিংহলের পথে পথে। সব মিলিয়ে ওদের লাগবে ছয় সপ্তাহ। তার মধ্যে তিন সপ্তাহ শুধু সিংহলে কাটবে।

সকল বাধা তুচ্ছ করে, দুর্জয় সাহসে ভর করে নবীন প্রাণের বার্তা নিয়ে শুধু ভাটিয়ালি গান গাইতে গাইতে ওরা পথ হাঁটবে। পাহাড়, সাগর, নদী, ঝর্ণা ওদের গানে সুর মেলাবে। পথে পথে ওদের জন্য সবাই এগিয়ে আসবেন আন্তরিকতায় সাদর আমন্ত্রণ নিয়ে। মঙ্গলশঙ্খ আর বিজয় তোরণে ওদের যাত্রাপথ হবে মুখরিত। এক অনাবিষ্কৃত দিগন্তে উড়বে ওদের বিজয় বৈজয়ন্তী।

—প্রমীলা

থিয়েটার-পাগল এক দেশ

বিমল বসু

'ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার!'

কিন্তু চমক লাগবে যদি জানা যায় যে বিধি বাম না হলেই 'নিধিরাম'রা সত্যিই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্দার হয়ে উঠতে পারে। উঠছেও।

'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার'—প্রমাণ? জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে হাতের কাছে। জন্মবাউণ্ডুলে জাত—'দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই দেশ লব খুঁজিয়া' করতে করতেই কত যুগ পার হয়ে এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে নানা নির্যাতন আর চিরদিনের জন্যে উৎসাদনের বাড়বানল পার হয়ে অবশেষে ঠাঁই পেল। ঘর পেল, পেল 'ঘর'ও—জীবনজয়ের সাধনায় চিরজয়ী হবার। দক্ষ শিল্পীর আর নিপুণ কারিগরের মতো আস্তে আস্তে গড়ে তুলতে লাগল জাতীয় জীবনে অপরিহার্য সবকিছুই। নিজের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন, জাতীয় স্বার্থ ও জাতি রক্ষার উন্মাদনায় সারাদেশ যখন ব্যস্ত-বিব্রত, অস্থির ও উত্তেজিত, তার মধ্যেই এই নিধিরামরা তাদের নিজেদের জাগ্রত দৃষ্টি সংহত করেছে নিজেদের রঙ্গমঞ্চের দিকে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোদ্যমের নিরাবরণ প্রস্তুতির মধ্যেও নবীন রাষ্ট্র ইসরাইল মঞ্চাভিনয় নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে আন্তরিকভাবে।

পুঁজি হিব্রুভাষা। নিয়মের নিগড়ে তার প্রাণস্পন্দন ক্ষীণ, খঞ্জ ও আড়ষ্ট তার চলার গতি। শুরু হল ভাষা-পরিমার্জনা। হিব্রুভাষার নবীকরণ, আধুনিকীকরণ এবং তাতে নতুন নতুন শব্দ-সংযোজনার কাজ জোর কদমে চলতে লাগল। চলতে থাকল ঘষামাজা করে জনড় আড়ষ্ট ভাষাশরীরে প্রাণস্পন্দনের প্রবাহ বইবার। তা না হয় হল কিন্তু নাটক কই? নাট্যকার নেই তো নাটক! নেই বলে ধার করতে তো মানা নেই। শুরু হল ভিনদেশী খ্যাতনামা নাট্যকারদের প্রসিদ্ধ নাটকগুলির-অনুবাদ। আন্তন চেকভ-এর ক্লাসিক নাটক দ্য সী গাল'ও বাদ গেল না।

এক নজরে সমস্ত ব্যাপারটার দিকে তাকালে মনে হবে : পাগলের পাগলামি: সত্যিই পাগলামি। অকপটে সে-কথা সানন্দে স্বীকার করেছেন ইসরাইল নাট্য-সমালোচকদের ডীন এমিল ফিউয়ারস্টিন : 'গোটা জাতটাই থিয়েটার-পাগল!' তেল আভিভের কামেরি থিয়েটারের প্রযোজক-প্রধান ইয়াশায়াহু উইনবার্গ মন্তব্য করেছেন : দর্শক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে ইসরাইল সব সেরা।' তেল আভিভের ১৯৬৯ সালের এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, শতকরা পঁচিশজন মাসে একবার না একবার নাটকাভিনয় দেখতে থিয়েটারে আসবেই। এদিক দিয়ে ইসরাইল সত্যই দ্বিতীয়-রহিত। আমেরিকা এমনকি বিশ্ববন্দিত নাট্যকার শেক্সপীয়রের দেশের মানুষরা এদের ধারে-কাছে যেতে পারে না—তাজ্জব ব্যাপার একেবারে! অবিশ্বাস্যও।

ইসরাইলের অধুনাখ্যাত জাতীয় নাট্যোদ্যোগী সংস্থা 'হাবিমা' মস্কোতে আধুনিক হিব্রু থিয়েটারের পত্তন করে তিপ্পান্ন বছর আগে। তদানীন্তন সোভিয়েত সরকারের এক 'অতিসাধারণ' অফিসার যোসেফ স্তালিনের সম্মতি নিয়ে পরবাসে পরদেশে থিয়েটার-পাগল বাউণ্ডুলেদের জাতীয় থিয়েটারের শুভ-সূচনা ঘটল সোভিয়েতের সবসেরা পরিচালক কনস্তানতিন স্তানিশ্লাভস্কির আশিসধন্য পৃষ্ঠপোষকতায়। পাঁচ বছর বাদে ইদ্দিশ থেকে হিব্রুতে অনূদিত নাটক 'ডাইবাক' হাবিমা নাট্য সংস্থা সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে বিস্তর সুনাম কুড়িয়ে নিল।

১৯২৭ খৃঃ মস্কো থেকে এই নাট্যোদ্যোগী দল এলো ইসরাইলে। জোর কদমে তাদের যাত্রা হল শুরু। অনেক [illegible] বাধা-বিপত্তির প্রাচীর-দুর্গ বিচূর্ণ করে এগিয়ে চলার পর বছর-তিনেক আগে হঠাৎ আর্থিক বিপর্যয়ে 'হাবিমা'র নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। সাহায্য-সহায়তার উদার হাত বন্ধুর মতো বাড়িয়ে দিল ইসরাইল সরকার। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় নাট্যালয় সরকারী সাহায্যে গড়া বিরাট বাড়িতে। দুটি প্রেক্ষাগৃহ সেখানে। প্রথমটিতে আসন-সংখ্যা ৯০০, অপরটিতে ৩০০ মাত্র—শেষোক্তটি কলকাতার মিনিয়েচার লাইটহাউসের প্রেক্ষাগৃহ ও থিয়েটার সেন্টার-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

বাহাত্তর বছর আগে 'দ্য সী গাল' মঞ্চস্থ করে দ্য নিউ মস্কো আর্ট থিয়েটার রাতারাতি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষসীমা কৃতিত্বের সঙ্গে স্পর্শ করেছিল সমগ্র জাতির প্রশংসার শিরোপা শিরে ধারণ করে। মস্কোর আর্ট থিয়েটারের স্নেহ-ছায়ায় গড়ে-ওঠা যাযাবরদের জাতীয় নাট্যোদ্যোগী সংস্থা ইসরাইলের হাবিমা বুঝি নতুন করে পূর্বখ্যাতির দর্পণে নিজের মুখ দেখতে চায়। তাই জাতীয় নাট্যালয়ের পরিচালক গাব্রিয়েল জিফরোনি নিউইয়র্ক থেকে খ্যাতনামা পরিচালক জন হিরশকে সাদরে আহ্বান করে এনে 'দ্য সী গাল' পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব দিলেন। 'দ্য সী গাল' হিব্রুতে ভাষান্তরিত হয়ে জাতীয় নাট্যালয়ের উদ্বোধন রজনীতে প্রথম অভিনীত হল। পরিচালক জন হিরশ জীবনে হিব্রু-ভাষার হরফই দেখেননি। কিন্তু তাও এখানে বাধা হয়ে এলো না। কেননা, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই ছিলেন ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী। পরিচালক হিরশ ইংরেজি ভাষাকে সাঁকো করে অনায়াসে পার হলেন দুস্তর হিব্রুভাষা-না-জানার দুরন্ত নদী। নতুন করে সার্থক সাফল্যে উজ্জীবিত হল হাবিমা নাট্যদল। এমনি আরো পুরনো নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হল জাতীয় রঙ্গমঞ্চে পরিচালক জন হিরশ-এর অধিনায়কত্বে।

সব দেশে যা হয়ে থাকে এই তরুণ রাষ্ট্রের নাট্যামোদী সম্প্রদায়ে তারই প্রতিচ্ছবি দেখি। শুধু হল ভাঙা গড়ার খেলা। ছিল এক, হল দুই। হাবিমা ভেঙে দুখান হল। হল তরুণতর এক নাট্যদলের সৃষ্টি ১৯৪৪ খৃঃ। জোল আভিডোর কামেরি থিয়েটার যার নাম। এ যেন নতুন করে জীবনসন্ধানে ভিন্নপথে যাত্রা। আমাদের দেশেও এই ভাঙচুর হয়েছে। ভেঙেছে গণ-নাট্য সংঘ, বহুরূপীর আর এক রূপে পেয়েছে 'রূপকার'। হাবিমার বিদ্রোহী দল নিয়েই 'কামেরির অসন্তুষ্ট রাগী ছোকরা-দের' নতুন করে পথচলা। নাট্যজগতের প্রাণপ্রবাহকে আরো বেগবান করে নতুন দিগন্তের সন্ধানে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

এক থেকে আর এক-এর সৃষ্টি হলেও এরা কিন্তু কেউ কারো প্রতিস্পর্ধী নয়—মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন। কামেরির মতে হাবিমার ধ্যানধারণা পুরাতনপন্থী, মঞ্চস্থাপনা, প্রথা-প্রকরণ, নাট্য-বক্তব্য ও অভিনয়-শৈলী সেকেলে ও বাঁধা প্যাটার্নের। ওরা ওল্ড স্কুল। এই গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল কামেরি নাট্য-পরিচালক যোসেফ মিল-এর নেতৃত্বে। চলতি হাওয়ার পন্থী হল কামেরি। এতদিন হাবিমা এক-চক্ষু হরিণের মতো তাকিয়ে ছিল পূর্ব ইউরোপের দিকে—রাশিয়া, রুমানিয়া, পোল্যান্ড এবং কখনো কখনো ইংলিশ থেকে হিব্রুতে ভাষান্তরিত করে গতানু-গতিক স্টাইলে নাটক মঞ্চস্থ করছিল—কিন্তু কামেরি যেন বন্ধ ঘোলাজলে নির্ঝরের স্পন্দন ঘটাতে চাইল—নাট্য-জগতের দিগন্তের স্বাভাবিক বিস্তার ঘটাতে তারা যেন নতুন করে অঙ্গীকার নিল। শুধু পূর্ব ইয়োরোপ নয়—তারা বিশ্বজগতের নাট্যকারদের আহ্বান করে আনলো। ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটক অভিনয় করে যেন নতুন প্রাণ ও দ্যোতনার সঞ্চার করল। কামেরির আর এক আকর্ষণ ইসরাইলের সবসেরা অভিনেত্রী হান্না মেরন। অতুল-নীয়া তিনি নানা দিক থেকে। চার-পাঁচটি ভাষায় পটিয়সী। দেশের সীমানা পার হয়ে তাঁর অভিনয়-প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়েছে, বিশ্বজগতের অন্যান্য দেশে। 'পিগমেলিয়ন' 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'বরন ইয়েসটারডে', 'হেডা গাবলার', 'দা গ্লাস মিনাজেরি' ও 'মেরি স্টুয়ার্ট' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটকে প্রধান ভূমিকায় অবতরণ করে দু হাতে প্রশংসা কুড়িয়েছেন নাট্য-রসিকদের। এই তরুণী অভিনেত্রী কামেরির অসাধারণ জনপ্রিয়তা এনেছেন।

হাবিমার পদক্ষেপ ছিল ভীরু। নাট্য-আঙ্গিক, উপস্থাপনা এবং অভিনয়ে ছিল বলিষ্ঠতার অভাব। নাটক অনুবাদে 'হিব্রুর কাঠিন্যের মধ্যে তারা সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু কামেরি সেইখানেই হানল প্রচণ্ড আঘাত। চিন্তা-ভাবনা এবং নাটক নির্বাচনের দিক থেকে কামেরি নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে হিব্রুর অচলায়তনকে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল— ব্যাকরণ ও ব্যবহারের অনড় দুর্গ থেকে যেন টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে এনে তাকে করে তুলল জনসাধারণের মুখের ভাষা। নাটক ভাষান্তরিত করতে গিয়েই গরীব খেটো মানুষদের সমাজে চলতি কথা-ভাষার যেনো জল দিল ঢুকিয়ে ভাষা-সরোবরে 'স্ল্যাং' ও হাটে-বাজারের খেটো ও নিম্নস্তরের মানুষদের মুখের বুলি নাটকে প্রয়োগ করতে তারা পিছ-পা হল না। এমনি ভাষায় রচিত কামেরির প্রথম দিকের নাট্য-নিবেদন : 'যু কান্ট টেক ইট উইথ য়ু' যেন জনমনে ঝড় নিয়ে এল।

ঝড় উঠে থেমেও গেল। কিন্তু ভেবে-চিন্তে ধার করে চিরকাল চলবে? বিদেশীয় নাট্যভাবনা নিয়ে নাট্যরসিকদের মন আর ভরছে না। মন ভরাতে শক্তিমান নাট্যকার ইসরাইল নাট্যজগতে আজও দেখা দেয়নি। অবশ্য কিছু কিছু কথাশিল্পী ও কবি নাট্যজগতের সংকটত্রাণে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা কেউ কেউ কিছু নাটক লিখেছেনও। কিছু দীপ্তি কিছু চমক ঝিলিক দিয়ে উঠছেও। হালের এমনি ঝিলিক দিয়ে-ওঠা নাটক কথাশিল্পী যোসেফ বার-যোসেফের 'তুরা'। পরিচিত প্রগতিবাদী কবি নাথান অল্টারম্যান [গত বছর মারা গেছেন]-রচিত 'ইনন অব দা ঘোস্ট' দর্শক-প্রশংসাও লাভ করেছিল।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। সার্থক সৃষ্টির ব্যাকুল প্রত্যাশায় রয়েছে ইসরাইলের নাট্যজগৎ। দিন গুনছে মহৎ নাট্যকারের শুভ আবির্ভাবের। অবশ্য তরুণতর সম্প্রদায়ের কিছু 'রাগী এবং অসন্তুষ্ট ছোকরা'—হালে যাঁদের নামাকরণ হয়েছে 'অ্যাংগ্রি জেনারেশন'—তাঁরা অবশ্য নাটক লিখে চলেছেন। কিন্তু সেসব রচনা জনগণের আনন্দভোগের পরিভোজনের আসরে পাতে দেবার মতো হয়ে উঠছে না। বছরে অন্তত পঞ্চাশখানা নাটক লেখা হচ্ছে ঠিকই, তবে অধিকাংশই অন্তঃসারশূন্য। বক্তব্যের গভীরতায় মূল্য সনাক্তিও নয়—কেবল ভঙ্গি দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা।

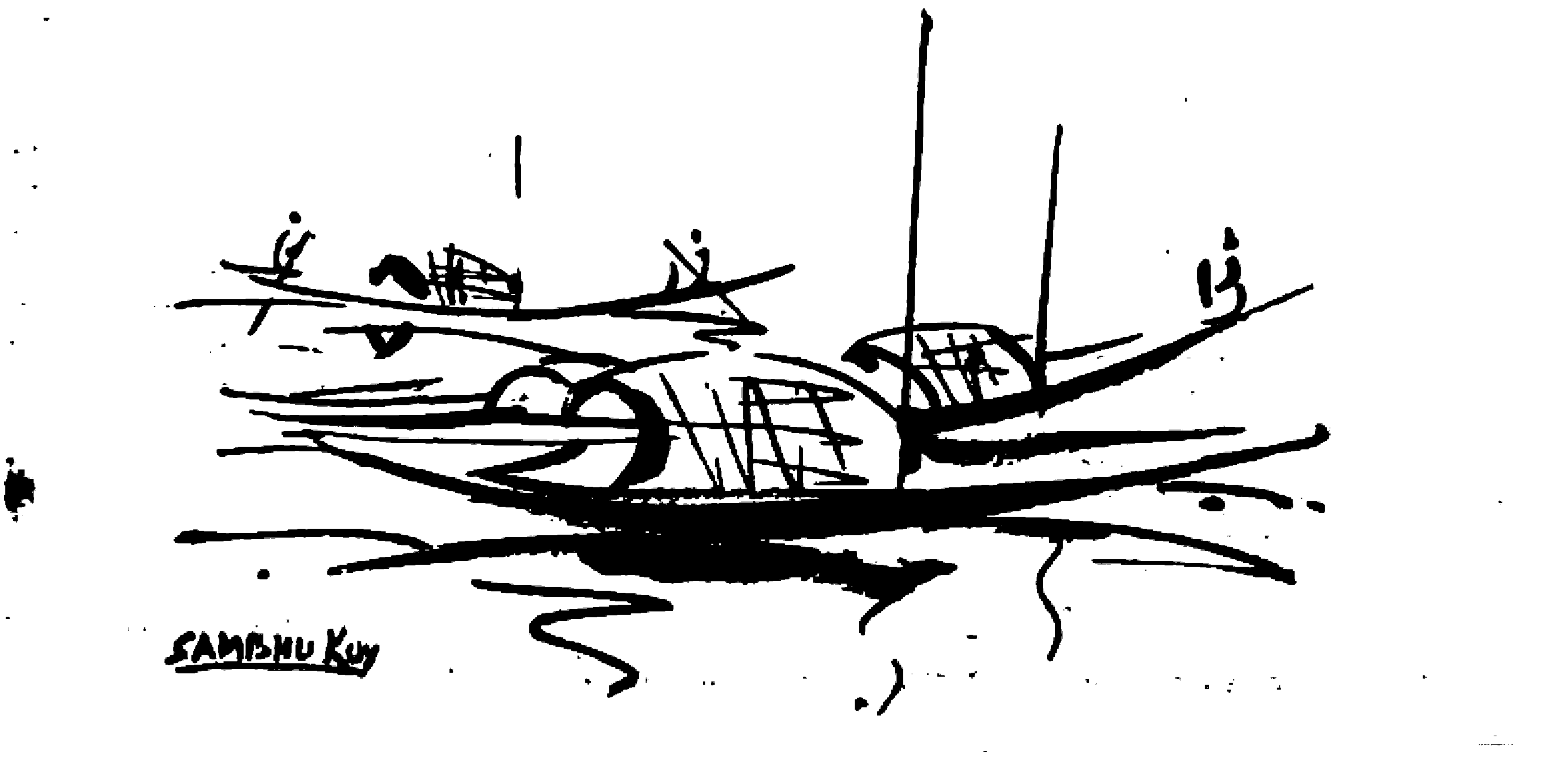

CENTRAL LIBRARY

জলসা

উদয়শংকরের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি শংকরস্কোপের উদ্যোক্তা শ্রী[illegible] কাকোরিয়া এবং শ্রীউদয়শংকর একটি সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হন।

'সীতা-স্বয়ম্বরা'— অমলা শঙ্করের এক উজ্জ্বল অবদান—বর্তমান যুগের হাজারো বৈষম্য ও অশান্ত পরিস্থিতির যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুহূর্তেই অতীতের ধ্যানলোকের প্রশান্তিতে অবগাহন করার তাগিদেই আমি এবার মহাকাব্যের নৃত্যরূপায়ণে ব্রতী হয়েছি। আমাদের অধ্যাত্ম-চেতনা-লীন ভারতবর্ষ, ঋষিদের তপস্যাপূত তপোবন ও ত্যাগ, বীরত্ব তথা একাধারে বন্ধন ও বৈরাগ্যের মন্ত্র আজকের যুগের নবীন গোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলেই আমি মনে করি। শঙ্করের শিল্পকৃতি অতীতের গৌরবময় পটভূমিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই আজও সংস্কৃতিলোকে তিনি অজেয়।" গত ৮ থেকে ১১ জানুয়ারী উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টারের পক্ষ হতে রবীন্দ্র সদনে 'সীতা-স্বয়ম্বরা' মঞ্চস্থ করার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অমৃতের প্রতিনিধিকে জানান প্রতিষ্ঠান পরিচালিকা শ্রীমতী অমলাশঙ্কর।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের ভাবনালোকে আজকের মানুষও যে আশ্রয় চায় জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে আরো দুদিন (১২ ও ১৩ জানুয়ারী) 'সীতা-স্বয়ম্বরা' সম্প্রসারণই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয় আগামী ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সদনে 'সীতা-স্বয়ম্বরা' পুনঃ প্রদর্শিত হবে জানা গেছে।

অনুষ্ঠান শুরু হয় আনন্দশঙ্কর রচিত ও পরিচালিত অর্কেস্ট্রা নিয়ে। বসন্তমুখারীর রূপাভাস থাকলেও ঠিক কোনো গতানুগতিকতার বন্ধ না থেকে মুক্তমনে যুগযন্ত্রণা ও অস্থিরতার প্রতিফলন ৭ মাত্রা ১২ মাত্রা ছন্দে পূর্ণ দক্ষতায় শ্রোতাদের অনুভব গোচর করিয়ে পরিশেষে মঞ্চের একাধারে দাঁড়ানো উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টারের ছাত্রীদের ভঙ্গিমায় ও অর্কেস্ট্রার সুরে 'রঘুপতি-রাঘব'-র অনুরণন দিয়ে এ কথাই কি আভাষিত হয়েছে যে আদর্শ নিয়ে, মূল্যবোধ নিয়ে ভেদ-বৈষম্য থাকলেও শাশ্বত চেতনার মহিমা সর্বকালে, সর্বদেশে, সকল মানুষের মনে অবিনশ্বর, সমান আস্থার অধিকারী

এর পর পূর্বসৃষ্ট 'চিদাম্বরম'-এর কয়েকটি নৃত্যাংশ দেখিয়েই শুরু হোলো 'সীতা-স্বয়ম্বরা' নৃত্যনাট্য। তুলসীদাস রামায়ণ এর পটভূমি। রাজা দশরথের সভায় বশিষ্ঠ মুনির আগমন থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিপদসঙ্কুল ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিক্রমণের শেষে জনক রাজার সভায় রামের হরধনু ভঙ্গ করে জানকীর বরমাল্য লাভ দিয়েই এই নৃত্যনাট্যের সমাপ্তিরেখা টানা হয়েছে।

নৃত্য ও অভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে শঙ্করদুহিতা শ্রীরামরূপী মমতাশঙ্করের কথা। প্রথম দৃশ্যে শুভ্রবেশে তীর ধনুক হাতে দশরথের সভায় রামের প্রবেশ ও দৃপ্ত তেজে বশিষ্ঠের প্রস্তাবকে গ্রহণে যে ক্ষাত্রোচিত তেজ, শৌর্য ও রাজকীয় মর্যাদাবোধ ফুটে উঠেছে সারা নাটকে কখনও বীর্য প্রকাশে কখনও মাধুর্য-কোমলতায় কখনও করুণায় সেই মর্যাদা সগৌরবে অচলপ্রতিষ্ঠ। বীর, বীভৎস, মধুর, করুণ, বাৎসল্য ইত্যাদি মহাকাব্যোচিত সকল রসের সঞ্চার 'সীতা-স্বয়ম্বরা'র মূল সুর কিন্তু ভক্তি। এই ভক্তির আলোতেই ঈশ্বরের অবতার-স্বরূপে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন উদ্ভাসিত। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কিশোরী মমতা এত অল্প বয়সেই মহাকাব্যের অতলস্পর্শী ভাবের অতলে সমাহিত হতে পারলেন কেমন করে? শুধুমাত্র আঙ্গিক দক্ষতা অথবা শিক্ষায় এ বস্তু সম্ভব নয়—অনুভব-গভীরতাই এ সার্থকতার রহস্য-মন্ত্র। বিশেষ করে যে দৃশ্যটি দর্শকের মনে রেখাপাত করে সেটি হোলো প্রথম সীতা-সন্দর্শনে সদা-আনন্দময় রামচন্দ্রের আকস্মিক অন্যমনস্কতা ও তাঁর মুগ্ধ পদক্ষেপে এক মন্থর গতি, তারপরই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে ঈষৎ বিহ্বলভাবে দাঁড়ানো ও পটভূমিকায় শিশু রামের গুঞ্জন সব মিলিয়ে এক অবর্ণনীয় মধুরতায় মন ভরিয়ে দেয়। শ্রীরামচন্দ্র এখানে বিভ্রান্ত কেন? ভগবান তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে কি দেখতে পেলেন কি অন্তহীন বেদনায় অরণ্যে সীতার জীবন চিরনির্বাসিত? না, জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গিনীকে দেখে দীর্ঘজীবনের নিঃসঙ্গতাকে নতুন করে অনুভব করলেন? এইরকম নানা প্রশ্নের ব্যাকুলতায় যেন নীরব মুহূর্তটি ভরে উঠেছে। রাজা জনক-রূপী অমলাশঙ্করের সংযত ও অভিজাত উজ্জ্বল নৃত্য ও অভিনয় এ নৃত্যনাট্যের প্রধান আকর্ষণ। রবীন্দ্র দাসের সঙ্গীত রচনায় উদয়শঙ্করের ঐতিহ্য অব্যাহত। গুরু রাঘবনের সহায়তা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। নৃত্যরচনায় কথাকলির সাত্ত্বিক অংশের প্রাধান্য থাকলেও উপযুক্ত ভাবানুসারী উদয়শঙ্কর রীতির স্বতঃস্ফূর্ত পদক্ষেপ ও ভাবব্যঞ্জনায় শিল্পসম্মত প্রয়োগে শ্রীমতী শঙ্করের শিল্পীমনের স্বাক্ষর মুদ্রিত। ৫০ জন শিল্পীর প্রত্যেকেই অত্যুজ্জ্বল টিমওয়ার্কের সার্থক অঙ্গ হয়ে উঠেছেন। এ বছর শীতের মরসুমের উৎসব তালিকায় শঙ্করস্কোপের পরই 'সীতা-স্বয়ম্বরা'র স্থান।

আমজাদ আলি খাঁর একক সরোদের আসরে : সম্প্রতি কলামন্দিরে কনৌসিয়ার্স আয়োজিত আমজাদ আলি খাঁর একক সরোদ বাদনের আসরে উপস্থিত হবার সুযোগ ঘটেছিল। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য হোলো এই যে এক বছরের মধ্যেই একই প্রতিষ্ঠান একই শিল্পীকে তৃতীয়বার

একক সরোদ অনুষ্ঠানে সঙ্গীতানুরাগীদের সামনে হাজির করলেন। একাগ্রচিত্তের শিল্পী ও শিল্প পূজার এ-হেন নজীর এ-যুগে সত্যিই দুর্লভ। উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। উদ্যোক্তারা সঙ্গীত অনুরাগীদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবেন যদি সঙ্গীত সম্মেলনে উপেক্ষিত অনাদৃত সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীদের আমজাদের মত পরম সমাদরে অনুরাগীদের সামনে হাজির করেন। প্রতিভাবান আমজাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, সঙ্গীতরসিকদের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই আনন্দের কথা। সেদিন আমজাদ আলি খাঁ বাজালেন আভোগী কানাড়া। আলাপ, গৎ, ঝিন্তার ও ঝালা পুরোপুরি আলি আকবরীয় রীতিতেই বিন্যস্ত হয়েছে এবং প্রতিটি অঙ্গেই রেওয়াজী হাতের অনুশীলন, পরিচ্ছন্ন অলঙ্কার সাপট তান ও দমকের ওজন, বিলায়েতী ঢং-এ পরিশীলিত মীড় অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে। ছুট তান ও লড়ী জোড়ের মসলা ত রীতিমত চমকপ্রদ। তৈরীর দিক বিচার করে দেখলে আমজাদের হাতটি পুরোপুরিই প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর। কিন্তু প্রাণশূন্যতা, সংহত অভিব্যক্তির প্রকাশের দিকে লক্ষ্য না রেখে যন্ত্রের ওপর দক্ষতা প্রদর্শনের ব্যগ্রতা ও বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গতিয়াকে বার বার কঠিন অংশে নিয়ে এসে তাঁর অন্যমনস্ক মুহূর্তে অকস্মাৎ জোরে স্ট্রোক দিয়ে কৃত্রিম জয়োল্লাসের প্রকাশে সঙ্গীতানভিজ্ঞ সাধারণ শ্রোতাদের হাততালির হট্টগোল সৃষ্টি করেই তাঁর মত শিল্পী কি করে খুশী থাকতে পারবেন? সস্তা উত্তেজনায় নগদ বিদায় কোনো সাধক শিল্পীর কাম্য হওয়া উচিত নয়—গভীর বোধের সম্পদে প্রকৃত সঙ্গীত-বোদ্ধাদের পরিতৃপ্তি সাধন তথা ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন-ই ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীর অন্বেষা।

আভোগী কানাড়া রাগ শোনাবেন বলে অনুষ্ঠানপত্রে ঘোষণা ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কি সত্যিই 'আভোগী কানাড়া' বাজিয়েছেন, দক্ষিণ ভারতীয় 'আভোগী' উত্তর ভারতীয় শিল্পীরা 'আভোগী কানাড়া' করে নিয়েছেন বাগেশ্রীর সঙ্গে সঙ্গে 'কানাড়া' অঙ্গের প্রতিও যথোপযুক্ত আলোকপাত করে। কিন্তু আমজাদ বাজালেন পুরোপুরি বাগেশ্রী ঢং-এ (সোজো-ধাধা, মধা, মাগারে সা ইত্যাদি স্বরসমষ্টিতে জোর দিয়ে), কানাড়া অঙ্গের রূপ এতে ফুটল কই?

আমজাদ বিলম্বিত গৎ বাজিয়েছেন ঝাঁপতালে। ঝাঁপতালে তালের সম্ভাবনা সীমিত তাই অকারণ বিলম্বিত বাজনা অবশ্যম্ভাবী একঘেয়েমোর হাত এড়াতে পারে নি। তুলনামূলক বিচারে গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের বহুদিন আগের রেকর্ডে বাজানো 'তিলক কামোদ' গৎটি আমজাদ চমৎকার বাজিয়েছেন। এখানে অকারণ নাটকীয় হাসি, হাততালি আদায়ের উদ্যম স্তিমিত ছিল বলেই সত্যিকারের রসসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কানাই দত্ত শুধু তবলা সঙ্গতেই পাণ্ডিত্য দেখান নি, শিল্পীর সস্তা হাততালির শরিক হননি। শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের অর্থহীন প্রচেষ্টাকে হাসিমুখে সযত্নভাবে অস্বীকার করে সুরুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

রাগিণী নিবেদিত গোপীচন্দ্রের কাহিনী : উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় লোক-গাথা তরুণ রাজা গোপীচন্দ্রের মাতার আদেশে সন্ন্যাস গ্রহণ ও সকল প্রলোভন অসাধারণ চরিত্রবলে উত্তীর্ণ হয়ে দুই মহিষী অদুনা-পদুনার কাছে প্রত্যাবর্তন কাহিনী এক সময় বিষয়বস্তুর আবেদনে সারা বাংলাদেশ পরিপ্লাবিত করেছিল। রবীন্দ্রসদন মঞ্চে সেই লোক-কাহিনীর নৃত্য-রূপায়ণ উপহার দিয়ে বাংলাদেশের একটি বিশেষ সংস্কৃতি-ধারার প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন নৃত্যপরিচালক অসিত চট্টোপাধ্যায় ও শিল্পীর অন্যান্য সঙ্গীবৃন্দ। গোপীচন্দ্রের প্রশংসনীয় চরিত্র-চিত্রণে ছিলেন অসিতবাবু স্বয়ং। গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের ময়নামতী রূপায়ণও চরিত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। অদুনা-পদুনার চরিত্রে নৃত্যদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়। শিবশঙ্করের যোগী জালন্ধরীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তবে লোক-গাথা রূপায়ণে লোকনৃত্যের মাধ্যমে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। সুচিত্রা মিত্র গীত লোকসঙ্গীত স্টান্ট নয় সত্যিই উপভোগ্য বস্তু। বনশ্রী সেনগুপ্ত ও সুজাতা মুখোপাধ্যায়ের গানও শোনবার মত। সামগ্রিকভাবে এই নৃত্যনাট্য হয়েছে রসোত্তীর্ণ এবং উপভোগ্য।

পার্কসার্কাস সঙ্গীত সম্মেলন : পার্কসার্কাস সঙ্গীত সম্মেলনের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১১ ফেব্রুয়ারী কলামন্দিরে শুরু হবে। তিনদিনের এই সম্মেলনে শিল্পীরা হলেন : আমীর খাঁ, সুনন্দা পট্টনায়ক, মুনাব্বর খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মণিলাল নাগ, বাহাদুর খান, সুস্মিতা মিত্র, মায়া চ্যাটার্জি, দিলীপ দাশগুপ্ত, শ্যামল বসু, কানাই দত্ত, অনিল ভট্টাচার্য ও মহেশ প্রসাদ। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় বৃন্দসঙ্গীত ও শ্রীমতী সোনাল মানসিং-এর ওড়িশী নৃত্য এই সঙ্গীত সম্মেলনের বিশেষ আকর্ষণ।

বীণাপাণি সঙ্গীত সমাজ : সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত 'অনিল স্মৃতি' মাসী নিবেদন উপলক্ষে সংস্থার সভ্যরা সুরেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' নাটকটি অত্যন্ত সার্থকভাবে অভিনয় করেন। শ্রীকিশোর গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানটির শুরু হয় সমীর সামন্ত ও মল্লিকা গাঙ্গুলীর স্নিগ্ধকণ্ঠে উদ্বোধন সঙ্গীতে। বলিষ্ঠ নির্দেশনা, মঞ্চগত অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত প্রভৃতির গুণে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকবৃন্দ প্রভূত প্রশংসা করেন। বিশেষ নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীমন্ত), রণজিৎ বসু (কালু), সুপ্রকাশ ব্যানার্জি (ঈশা খাঁ) ও অতুল চক্রবর্তী (কার্ভালো)। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সন্তোষ লাহিড়ী, সুনীল ভট্টাচার্য, সুশীল ভট্টাচার্য, মানিক গাঙ্গুলী, প্রভাত ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ পাল, সুকুমার মজুমদার, সুশীল চ্যাটার্জি, অরবিন্দ ব্যানার্জি, মৃণাল ঘোষ, কমল মিত্র, সুধীর দাস, প্রবোধ ব্যানার্জি, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি, আরতী ঘোষ, বেবী ঘোষ, মায়া রায় ও তাপসী গুহ। নর্তকীর সাথে ওসমাক খাঁর (মৃণাল ঘোষ) অশোভন নৃত্যটি ব্যতীত, যা বাদ্যসঙ্গীতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে, অভিনয়টি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।

আর্ট সেণ্টারের বাৎসরিক উৎসব : গত ৩ সপ্তাহের প্রতি রবিবারে 'মহাজাতি সদন' শিবপুর, হাওড়া ও আশুতোষ কলেজ হলে আর্ট সেণ্টার অফ দি ওরিয়েন্ট-এর ৪টি কেন্দ্রের ৩২শ বার্ষিক সমাবর্তন ও পুরস্কার বিতরণ উৎসবটি প্রায় ৪০০ শত ছাত্রীর দ্বারা পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে গীটার, সিম্ফান, সেতার, তবলা লহরা, উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত নানারূপ নৃত্য, 'মানভঞ্জন', 'স্বর্ণ সীতা'সহ কবি জসীমউদ্দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' বইখানি সম্পূর্ণ লোকনৃত্যের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের কথায় ও সুরে নতুন ধারা নিয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। দীর্ঘ অনুষ্ঠানসূচীর ছোট বড় প্রতিটি অনুষ্ঠান দর্শনীয় ও সুশ্রাব্য হলেও 'নকশী কাঁথার মাঠ' (নৃত্যনাট্য) মনে রাখার মত। এতে অংশগ্রহণকারী কুমারী কাজরী সমাদ্দার, লক্ষ্মী মুখার্জি, কাকলী কাড়ার, কুমকুম ভট্টাচার্য, মীনাক্ষী বসু, শুক্লা বিশ্বাস, শ্যামলী দত্ত, মিতা বসু, গোপা চ্যাটার্জি প্রভৃতির অভিনয় অপূর্ব। এর নাট্যরূপ কমলেশ মজুমদার, পরিচালনা শিশির শোভন, সুর ও সঙ্গীত প্রদ্যোৎনারায়ণ, সহকারী রানু গুহঠাকুরতা; মালবিকা ভৌমিক ও নীহাররঞ্জন সিংহ।

সুরসুন্দরের শ্যামা ও বিচিত্রানুষ্ঠান : গত ৮ জানুয়ারী মহাজাতি সদনে সুরসুন্দর সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে। অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই গোস্বামী, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য, অনু দত্ত (হাস্যকৌতুক), প্রেমাংশু চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় দাস, ভারতী মুখোপাধ্যায়, শুকদেব গোস্বামী (সঙ্গীত)। পরবর্তী অনুষ্ঠানে "শ্যামা" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন সংস্থার শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দীপালী দত্তরায় ও স্বরাজ বসু। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী জয়ন্তী মুখোপাধ্যায়, শুক্লা বিশ্বাস, ডালিয়া বসুরায় ও মঞ্জুলিকা চৌধুরী।

—[illegible]

আমেরিকার নীরব চলচ্চিত্র

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টার এবং ইউনাইটেড স্টেটস ইনফর্মেশন সার্ভিস-এর উদ্যোগে নিউইয়র্কের মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট-এর ফিল্ম ডিপার্টমেন্ট দ্বারা সংগৃহীত আমেরিকার নীরব চলচ্চিত্রের একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হল কলকাতার দুটি জায়গায়—এক, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারের অডিটোরিয়মে এবং দুই, সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে। এই উৎসবে ছোট-বড়ো মিলিয়ে যে চব্বিশ-পঁচিশটি আমেরিকার নীরব ছবি দেখানো হল, সেগুলি ১৯১১ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে নির্মিত। বলা যেতে পারে, ১৯০৩ সালে এডউইন স্ট্যান্টন পোর্টার দ্বারা প্রথম কাহিনী চিত্রদুটি—লাইফ অব অ্যান আমেরিকান ফায়ারম্যান এবং দি গ্রেট ট্রেন রবারী—নির্মিত হবার পরে মাত্র বৈজ্ঞানিক বিস্ময় থেকে নীরব চলচ্চিত্র ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে কেমন করে নিজেকে একটি নিখুঁত শিল্পবস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তারই একটি প্রস্থচ্ছেদ (ক্রস সেকশান) পাওয়া গেছে এই উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি থেকে। অবশ্য এ-কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় না যে, প্রদর্শিত ছবিগুলিই হচ্ছে নীরব যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী বা ঐ যুগের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে আমরা ঐ ছবিগুলির মধ্যে দেখতে পেয়েছি। ধরুন, মার্জিয়োজা, মেরী পিকফোর্ড, মর্মা টালমাজ, হ্যারল্ড লয়েড, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস বা এমিল জেনিংস অভিনীত কোনোও ছবিই এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়নি। জেমস ক্রুজ, সিসিল বি ডেমিল, ডি ডাবল্যু গ্রিফিথ, অ্যালান ডোয়ান্ড ডিকসন, কিং ভিডর প্রভৃতি পরিচালকের নীরব ছবিগুলোও এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বো জেস্ট, বেন হুর, দি বিগ প্যারেড, ক্যাভিলিয়া, ক্যামিল, ক্যাসানোভা, মার্কিস, ডাস্টি দাই নেইবর, ফরবিডন প্যারাডাইস, ন্যাস ফ্লেভিন্স দি পীস্ত, গোল্ড রাশ, পার্ল-হাট, হাঞ্চব্যাক অব ন্যাটারডেম, দি মিরাকল কিং অব কিংস, লিটল লর্ড ফন্টলরয়, মার্ক অব জোরো, ডন কিউ সান অব জোরো, মাডী ক্রীক, নীরো, ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্যালিপস, অব দি লস্ট এণ্ড অব আর্ডিস এবং দি চিজ, [illegible] দি [illegible] পাস, [illegible], সম [illegible] গীত অব টি, [illegible] দীপ অব [illegible] দি [illegible] টিকস, কেবিন, ওয়ে ডাউন ইস্ট প্রভৃতি এমন বহু ছবির নাম করতে পারি, যেগুলি না দেখলে আমেরিকার নীরব যুগের চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গীন ধারণা করা সম্ভব নয়।

তবু স্বীকার করতেই হয়, কম-বেশী দু' হপ্তাব্যাপী আমেরিকার নীরব ছবির এই প্রদর্শনী আজকের যুগের চলচ্চিত্রোৎসাহীদের সামনে ছবি যখন কথা কইত না, সেই যুগের আমেরিকান ছবির ক্রমোন্নতি সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা জন্মিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলা প্রয়োজন, যাঁরা উৎসাহভরে ছবিগুলি দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁদের একটি বড়ো অংশ অধিকাংশ ছবি দেখেই বেশ কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। আজকের দিনে একটি ভালো সবাক ছবি (সাউণ্ড ফিল্ম) দেখে তাঁদের মনে যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেই প্রতিক্রিয়াই বোধ করি তাঁরা আশা করেছিলেন, এই নীরব ছবিগুলি (সাইলেণ্ট ফিল্মস) দেখবার ফলে এবং এইখানেই তাঁরা ভুল করেছিলেন। সবাক ছবির আবেদন আমাদের দুটি ইন্দ্রিয়ের—চক্ষু ও কর্ণ—মাধ্যমে চালু থাকে; কিন্তু নীরব ছবি মাত্র একটি ইন্দ্রিয়ের চক্ষুর সহায়তা পায়। এছাড়াও যেটা জানবার কথা, সেটি হচ্ছে চলচ্চিত্র একটি শিল্পবস্তুর (এ পীস অব আর্ট) রূপ নিতে শুরু করেছে বড়জোর মাত্র বাট বছর আগে থেকে—গ্রিফিথের 'বার্থ অব নেশন' হয়েছিল ১৯১৫ সালে; ১৯০৯-এ তিনি করেছিলেন 'দি লোনলি ভিলা' ও 'পিপ্পা পাসেস'। বলা যেতে পারে এই নতুন শিল্পসংস্কৃতির শৈশব এখনও অতিক্রান্ত হয়নি। রূপ ও কার্যের দিক দিয়ে এর পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত নিরন্তই। একদিকে চিত্রগ্রহণ ও শব্দধারণ যন্ত্রের চলেছে ক্রমবিবর্তন, ফোটোগ্রাফিক লেন্স এবং আলোর চলেছে বহু রকম উৎকর্ষসাধন, নাইট্রেট জমি (বেস) থেকে অ্যাসিটেট বেস গ্রহণ করেই কাঁচা ফিল্ম থেমে যায়নি, প্রায় সকল দেশেই এখন সাদা-কালোকে বর্জন করে রঙীন রূপ ধারণ করেছে বা করছে; অন্যদিকে চিত্রনাট্য রচনা-পদ্ধতি থেকে শুরু করে অভিনয়-পদ্ধতি, সেট নির্মাণ-পদ্ধতি, এমনকি মেক-আপ ও রূপসজ্জার রীতিনীতিও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তন ও ক্রমবিবর্তন এমনই বিস্ময়করভাবে দ্রুত যে, আজ যে-ছবি অসাধারণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, আগামীকাল সেই ছবিটি সর্বদিক থেকে পুরোনো এবং আবেদনহীন মনে হচ্ছে। খুব বেশী দিন পেছিয়ে গিয়ে দরকার নেই, মাত্র পঞ্চাশ দশকে নির্মিত 'ডেথ অব এ সেলসম্যান', 'দি ডিভাইডেড হার্ট', 'সেভেন ব্রাইডস ফর সেভেন ব্রাদার্স', 'দি কোয়ায়েট ম্যান', 'দি সেক প্যাটি', 'অ্যান আমেরিকান ইন প্যারিস', 'এ প্লেস ইন দি সান' প্রভৃতি ছবি যদি আজ দেখা যায়, তাহলেই আমরা বুঝতে পারব, সেদিন থেকে আমরা আজ কি বিস্ময়করভাবে এগিয়ে চলেছি।

তাহলে কি এই সদ্যসমাপ্ত নীরব ছবির উৎসবের কোনই সার্থকতা নেই? নিশ্চয়ই আছে। ঐতিহাসিকের মন নিয়ে চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নয়নের গতিপথকে লক্ষ্য করবার জন্যে এই ধরনের উৎসবের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। চিত্রজগতে আমেরিকার প্রসিদ্ধি হচ্ছে এক, ওয়েস্টার্ণ ছবিতে, যাতে আধুনিক সভ্যতা থেকে বহুদূরে বিস্তৃত তৃণভূমি ও পার্বত্য দেশে ঘোড়াচড়া, মৃত্যুভয়হীন, পরাক্রমশালী বীরেরা বন্দুক বা রিভলবারের সাহায্যে দুর্বৃত্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে। সেই ছবির প্রাথমিক রূপ দেখা গেছে গিলবার্ট এম অ্যান্ডারসন রচিত, পরিচালিত এবং অভিনীত 'ব্রঙ্কো বিলিজ ক্যাপচার' (১৯১৩) ছবিতে। নীরব যুগে এই ওয়েস্টার্ণ ছবির উন্নত রূপ দেখা যায় ১৯২২-এ নির্মিত টম মিক্স অভিনীত 'স্কাই হাই' ও ১৯২৪-এ নির্মিত জন ফোর্ড পরিচালিত 'দি আয়রণ হর্স' ছবিতে। আমেরিকান ছবির আর একটি সার্থক রূপ দেখা যায়—ওখানকার কমেডি চিত্রগুলিতে। এই কমেডির শুরু করেন ম্যাক সেনেট; তাঁর (১) কমরেডস্-১৯১১; (২) ম্যাবেলস্ ড্রামাটিক কেরিয়ার—১৯১৩ এবং (৩) হিজ বেড অ্যাণ্ড বাটার—১৯১৬ যে স্ল্যাপস্টিক কমেডির সূত্রপাত করেছে, তাই চার্লি চ্যাপলিনের কীস্টোন এবং এসেনে কোম্পানীতে থাকবার সময়ে আরও অনেক বেশী সার্থকতা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'দি আইডল অ্যাডভেঞ্চারার', 'এ উওম্যান' ও 'পুলিশ' ছবিতে। বিশ দশকে এই কমেডি নূতনতর রূপ ধারণ করে লরেল হার্ডি নির্মিত 'টু টার্স' ও 'বিগ বিজিনেস' এবং বাস্টার কীটন অভিনীত 'দি জেনারাল' ছবিতে। লক্ষ্য করার বিষয়, আমেরিকার-কমেডিগুলির জনপ্রিয়তা পুরাতন হলেও বিশেষ কমে না। এবং ওয়েস্টার্ণগুলিকে আজও বেশ থ্রীলিং বলে বোধ হয়।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

সহানুভূতি থেকে প্রেম

পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত, মিতালী ফিল্মস্ পরিবেশিত ও বাণিজ্য পরিচালিত 'এখানে পিঞ্জর' ছবির উপজীব্য হচ্ছে সহানুভূতি থেকে প্রেম। তরুণ সাহিত্যিক অমল বসুর সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত মধ্য-শ্রেণীর নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হয়ে যায় থানার ও-সি অমিয় হালদারের মধ্যস্থতায়। নরেন্দ্রর সকল কথার জন্য প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে অমল। কিন্তু তাকে পাপ থেকে টেনে তুলে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সাফল্য-লাভ করবার আগেই অমল খবর পেল পুলিশের গুলীতে ওয়াগনব্রেকার নরেন্দ্রর মৃত্যু ঘটেছে। এবং এই মৃত্যু-সংবাদ নরেন্দ্রর মুখে বলে-যা ঠিকানায় তার সহজ করে দিতে গিয়ে অমল আবিষ্কার করল, কি অসহনীয়ভাবেই না নির্ভরশীল ঐ পরিবারটি বাড়ীর বড় ছেলে নরেন্দ্রর উপার্জনের উপর। মৃত্যু ঘরে অমল ঐ দুঃসংবাদটি ওদের কাছে পরিবেশন করতে পারলই না বরং নিজের পরিচয়েরা গিয়ে নরেন্দ্রর বন্ধুরূপে ঐ সমস্ত পরিবারের ভিতরকার উত্তাপ লাভ করল। সে দেখল ও-বাড়ীর বড় মেয়ে নীলা ভাগাচালকারীদের সঙ্গে মিশে অর্থোপার্জন করছে ঐ পরিবারেরই সাহায্যের জন্যে। আরও দেখল, ও-বাড়ীর ছোট ছেলে সুখেন্দু নিজের কোনোও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পাড়ার মাস্তান সেজে বোমা তৈরী করতে ব্যস্ত। এবং এও দেখল, পাড়ার ধনী হীনচরিত্র অবিনাশ মিত্র বাড়ীর অন্যতম বয়ঃপ্রাপ্তা দুই মেয়ের প্রতি লালসার জিহ্বা বাড়িয়ে দিয়েছে ওদের চরমসংকটকে কাজে লাগবার পর থেকে। অমল জড়িয়ে পড়ল ঐ পরিবারটির সঙ্গে এবং সহমর্মিতে কেমন করে ওদের সর্বদিক থেকে রক্ষা করবার সঙ্গে সঙ্গে নীলাকে ওর জীবন-সঙ্গী করবার ইচ্ছাটিকেও লাভ করল, তাই নিয়ে ছবির শেষ উত্তেজক অংশটি গঠিত হয়েছে।

ছবিটিতে বিভিন্ন রসের সমাবেশ সত্ত্বেও ভাবপ্রবণতার উপাদানই বেশী এবং এই ভাবপ্রবণতার আধিক্যই দর্শকচিত্তকে আলোড়িত করে তোলে। নীলার চরিত্রের জবাবে যখন মমতাময়ী মা মলিনা উচ্চকণ্ঠে বলেন : তিন-তিনটি মেয়ের শরীর মা হাঁ করে উঠছে, মানুষ সর্বাঙ্গে আমার বাছা, তখন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকদের আন্তরিক প্রতিক্রিয়া আমাদের উক্তিকে সমর্থন করবে। পুরাতন সামাজিক মূল্যবোধ যে আজও নিশ্চিহ্ন হয়নি, 'এখানে পিঞ্জর' ছবির সাফল্য সেই কথাই প্রতিপন্ন করছে।

ছবিটিতে প্রতিটি শিল্পীই সুযোগমত সু-অভিনয় করেছেন, এ-কথা স্বীকার করে নিয়েও বলব, তিনজনের অত্যুজ্জ্বল অভিনয় ছবিটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং এই তিনজন হচ্ছেন—উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন এবং [illegible]। নবীন সাহিত্যিক অমল-এর ভূমিকায় উত্তমকুমার যে বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় করেছেন তা এক-মাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর মুখের সংযত সাবলীল দর্শকমনকে অভিভূত করেছে। অপর্ণা সেন পরীক্ষিকাদারী নীলাকে সুন্দরভাবে সজীব করে তুলেছেন তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। অমলের অযাচিত সহানুভূতিতে ক্ষোভে ফেটে-পড়ার সময়ে তাঁর মুখের সংলাপ এবং অমলের মুখ থেকে নরেন্দ্রর মৃত্যু-সংবাদ শুনে সাশ্রু আক্ষেপ ভোলবার নয়। কিন্তু বিস্মিত করেছেন আমাদের পাড়ার মস্তানের চরিত্রে ভূমিকায় [illegible]। সহজের গভীরতা চরিত্রকে কি আশ্চর্যভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে, তা এই ভূমিকায় তাঁর অভিনয় না দেখলে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় অপর্ণা দেবী (মা মলিনা), দিলীপ মুখোপাধ্যায় (নরেন্দ্র), গঙ্গাপদ বসু (অবিনাশ মিত্র), জহর রায় (স্টেশন মাস্টার), তরুণকুমার (রেলযাত্রী), কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় (অমিয় হালদার) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে, বিশেষ করে প্রশংসা করতে হয় চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনার। এই তিনটি বিভাগেই অনায়াস দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। ছবির গান-তিনটির মধ্যে প্রথম গানের শেষ দুটি চরণ ছবির শেষতম দৃশ্যে সুপ্রযুক্ত। গানের সুরগুলি আমাদের যতটা না চমৎকৃত করেছে, আবহ-সঙ্গীতের সার্থকতা তার থেকে বেশী।

'এখানে পিঞ্জর' দর্শকচিত্তে আবেগ-সৃষ্টি করতে যে অপরিসীম সাফল্যলাভ করেছে, তাই ছবিখানিকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তুলবে। —নান্দীকর

শ্রীমতী সরযূবালা দেবী এই বৎসর অভিনয়ের জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমির পুরস্কার পেয়েছেন।

অর্চনা—সংগীত গ্রহণে শ্যামল মিত্র, সবিতা মিত্র, মৃণাল চক্রবর্তী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, সংগীত পরিচালক অজয় দাস পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজক সুধীর সাহা, সুখেন দাস। ফটো : অমৃত

রাগের প্রথম ভাগ—দীপিকা মজুমদার এবং নীরা মল্লিক

স্টুডিও থেকে

নবরাগের শুভমুক্তি : শচীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত ও বিজয় বসু পরিচালিত নবরাগ ছবিটি ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে মিনার বিজলী ছবিঘরে মুক্তিলাভ করছে। বহুদিন বাদে এই ছবিতে নায়ক-নায়িকা চরিত্রে দেখা যাবে উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনকে। চণ্ডীমাতা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

অন্য চিন্তা

ঠাকুরমার কাছে পুরোনো দিনের গল্প শুনতে গেলেই কোনো কিছু বলার আগেই বলতেন,—'তোরা আর কি দেখলি, কি দেখলি বাবা! সে আমাদের একটা সময় ছিল! এখন তো জলও কিনে খাস... ইত্যাদি। তারপর তিনি চলে যেতেন অতীত স্মৃতিচারণে। ধীরে ধীরে আসর বেশ জমিয়ে তুলতেন।

সিনেমাতেও অতীতের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ঠাকুরমা দিদিমাদের ভনিতার মত পরিচালকরা বহুদিন পর্যন্ত চরিত্রের মুখ দিয়ে কিছু কথা বলাতেন। তারপর চলে যেতেন অতীতে। চলচ্চিত্রের ভাষায় নাম তার ফ্ল্যাশব্যাক। এখনও যে সে-পদ্ধতির খুব একটা পরিবর্তন এসেছে তেমন নয়। চরিত্রকে অতীতে ফিরিয়ে নেওয়ার দৃশ্যে এখনও পর্যন্ত পরিচালক চরিত্রের ক্লোজ-আপ . শটের ফেড-আউট পদ্ধতি ব্যবহার করার দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠেননি। তবে মাঝে-মধ্যে নানারকম কারিকুরিও চোখে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার পরিচালক এক ধাপ এগিয়ে ব্যাক-গ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে [illegible] সঙ্গীতের সুরঝংকারে। বর্তমানে কিন্তু এটাই আবার শোনা যায় সঙ্গীতের সুরঝঙ্কার, কেউ কেউ আবার সফ্‌ট ফোকাস ব্যবহার করে অতীতের দৃশ্যের মধ্যে এক স্বপ্ন-স্বপ্নের আমেজ আনেন। আবার কেউ সরাসরি 'কাট' করে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবখানেই ঘুরে বেড়ান। আজকাল পরিচালকরা অবশ্য 'কাট' পদ্ধতিতে দৃশ্যান্তরে যাওয়াটাই পছন্দ করছেন বেশী। প্রথম যখন এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল পর্দায়, দর্শকরা চমকে গিয়েছিলেন, আচমকা ধাক্কায় ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। তবে আজকের দর্শকের কথা আলাদা।

সত্যজিৎ রায় 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে যে-দুটি ফ্ল্যাশব্যাক ব্যবহার করেছেন, দর্শকরা অতি সহজেই তা ধরতে পেরেছেন। নেশাগ্রস্ত সৌমিত্রের মুখের ক্লোজ শট থেকে যে ফ্ল্যাশব্যাক সেখানে পরিচালক এক ধোঁয়াটে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে দৃশ্যটাকে বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। কারণ সে-অবস্থায় তার স্মৃতি ধোঁয়াটেই। 'নায়ক' ছবিতে ফ্ল্যাশব্যাক আসার আগে পরিচালক উত্তমকুমারের চোখের ক্লোজ-আপ থেকে গেছেন ট্রেনের জোনাকো লাইটের ক্লোজ-আপে। তারপর অতীতে। সুতরাং চিরাচরিত প্রথা ছেড়ে শ্রীরায় সে-ছবিতে অন্য পথে পা বাড়িয়েছিলেন।

যাই হোক, এমনতরো উদাহরণ অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু ফ্ল্যাশব্যাক কি শুধু অতীতের ঘটনা দেখানোর জন্যই—অন্য কোনো উদ্দেশ্য কি নেই তার? যদি থাকে সেটা কি? এর জন্য সাগরপারের ছবির দিকে হাত বাড়ানো ছাড়া উপায় দেখিনে। কারণ, সময় নিয়ে খেলা—এ-ব্যাপারটা এখনও অবধি ও-দেশের লোকেরাই একচেটিয়া বলা যায়। আজ পর্যন্ত ফ্ল্যাশব্যাকের শিল্পসম্মত ব্যবহার সবচেয়ে বেশী যে ছবিতে ঘটেছে, সেটি হল, আলা রেনের 'হিরোশিমা মন আমুর'। এবং আমার ব্যক্তিগত মতে ছবিটি অনন্য (আমার দেখার ও মতে)। জাপানী প্রেমিকের সঙ্গে ফরাসী এক অভিনেত্রীর ক্ষণিক প্রেমের কথা বলা হয়েছে প্রথম ছবিতে। জাপানী প্রেমাস্পদের মধ্য দিয়ে ফরাসী মেয়েটি বারবার চলে গেছে অতীতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার দিনে তার অভিজ্ঞতা...এক ফরাসী সৈনিকের সঙ্গে তার প্রেম...নির্যাতন ইত্যাদি। পরিচালক এখানে অতীত আর বর্তমানের মাঝে কোন

বিনামূল্যে

বেঙ্গল মোশান পিকচার্স

ডায়েরী ১৯৭১

নব পরিকল্পনায় এ বছরের ডায়েরী শুধু নয় পূর্ব ভারতের যাবতীয় চলচ্চিত্র-তথ্য ও চিত্রতারকাদের নাম ও ঠিকানাসহ প্রকাশিত হইল।

তাহাদের প্রত্যেক ও পৃষ্ঠপোষক জানুন

'ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার অ্যালম্যানাক'

ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হইবে।

অ্যালম্যানাক সমগ্র ভারতে দক্ষ পরিবেশীত

চলচ্চিত্র-ইতিহাসের যাবতীয় তথ্য ও উল্লেখযোগ্য নিবন্ধাদিসহ প্রকাশিত হইবে। মুদ্রণ পারিপাট্যে ও অঙ্গসজ্জাকে অর্জিত হইয়া একটি দর্শনীয় গ্রন্থ হইবে। যাঁহারা 'অ্যালম্যানাক'-এর জন্য এখনই তাহার অর্ধ মূল্য (টাঃ ১২.৫০) অগ্রিম জমা দিবেন, তাঁহাদের 'মোশান পিকচার্স ডায়েরী' (মূল্য টাঃ ১০.০০) বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

'অ্যালম্যানাকটি' সংগ্রহ করিবার সময় বাকী অর্ধ মূল্য (টাঃ ১২.৫০) দিতে হইবে।

আজই আপনার অর্ডার নিম্ন ঠিকানায় পাঠান

শট পাবলিকেশন

৩।বি মাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৩-৫১৭৫

অপর্ণা—পরিচালনা : সলিল সেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যরা। ফটো : অমৃত

ফ্ল্যাশ-ব্যাক কেত্-ইনের কায়েদা না করে একেবারে 'কাট' করে চলে গেছেন অতীতে, আবার ফিরে এসেছেন বর্তমানে। জাপানী [illegible] মেয়েটির মন বারবার ফিরে গেছে অতীতে। একটা দৃশ্য আছে যেখানে অতীত আর বর্তমানকে একই রেখায় টেনে এনে পরিচালক মেয়েটির অতীত স্মৃতি-কল্পনার কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

তিনি জুলীতেও সেকর্যা খুব সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন এই ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতিকে। কয়েকটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে যে কিভাবে পরিচালক অতীত আর বর্তমানের মধ্যে কোন ফারাক না রেখে এগিয়ে গেছেন। একটা শট ছবির নায়ক ছোটবেলা আপেল চুরি করতে গিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। পরবর্তী শট বয়স্ক নায়ক নায়িকার সংগে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার একটা দৃশ্য। প্রথম শট—জুলী অতীতের যন্ত্রণাকে ভোলার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু স্মৃতি তো তাকে ছাড়ে না। একই শটের মধ্যে দেখা গেল বাচ্চা জুলীকে কোলে করে মা দাঁড়িয়ে। একই ফ্রেমের মধ্যে অতীত আর বর্তমান। কোনো শিল্প মাধ্যমে এ-ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন সম্ভব কি? বোধহয় না। একমাত্র চলচ্চিত্রই তার ব্যতিক্রম।

পর্দায় প্রথম দিকে এ-ধরনের দৃশ্য দেখে দর্শকরা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার দুর্বোধ্যতার অপবাদ দিয়েছিলেন কিছু ছবিকে। আমাদের দেশেও এখনও সে-ধরনের অনুভূতি আছে। নইলে রেনের 'আই লভ ইউ আই লভ ইউ' সবিশেষ প্রশংসিত হোল না কেন? অবশ্য প্রথমোক্ত ছবির চাইতে রেনের এ-ছবিতে দৃশ্য-বিন্যাসে অতিরিক্ত জটিলতা কিছু আছে। কোন্ দৃশ্য থেকে কোন্ দৃশ্যে যাওয়া হচ্ছে বা হবে তার কোন স্থিরতা নেই। সিনেমার ব্যাকরণ না মেনে যত্রতত্র যখন-তখন এ'রা যেতে চাইছেন। সাহিত্যে যেমন স্মৃতি-চারণের এক বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজন, কিন্তু মন যখন অতীতে যায়, তখন কোনো নির্দিষ্ট পথ ধরে বা দৃশ্যের অবতারণা করে সব সময় এগোয় না। আপনা থেকেই চলে যায়।

চরিত্রের এই কালাতীত যাতায়াত দর্শকরা কিভাবে নেবে, সেটা পুরোপুরি নির্ভর করে ছবির বিষয়বস্তু ও চরিত্রের গঠনের ওপর। পরিচালক কিভাবে কোন্ দৃশ্যকে উপস্থাপিত করবেন, সেটা তাঁরই নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কুশলতার ওপর নির্ভর করে। নইলে এ-পদ্ধতির অপব্যবহার হতে পারে, হয়ও অনেক ক্ষেত্রে।

আসল কথা ক্যামেরা সময়কে যেমন বাড়িয়ে দিতে পারে (স্লো মোশন) আবার কমিয়েও দিতে পারে। গদারের প্রায় সব ছবিতেই এ-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাবে। স্বাভাবিক গতিতে যখন ক্যামেরা চলে, তখন স্বাভাবিক সময় ও স্থানের সংগে তার একটা আইডেন্টিফিকেশন হয়, কিন্তু গতি বেড়ে যাবার সংগে সংগে ইন্টারভেনিং স্পেস যায় কমে, সময়ের গতিও বেড়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সিনেমায় সময় বা স্থান পরিবর্তন কোনো সমস্যা নয়, দর্শকের কাছে ঠিকমত উপস্থাপিত করাটাই সমস্যা। অতীতে ফিরে যাবেন কি ভবিষ্যতের কথা বলবেন (স্বপ্নদৃশ্য) তা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হোল সেটিকে দর্শকের চোখে ও মনে মানিয়ে দেওয়া। সিনেমা সব পারে। উল্টেপাল্টে যে-কোনো দৃশ্যকে যা-খুশি-ভাবে পর্দায় ফেলতে পারে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে একসংগে মিলিয়ে আপাতঃ জটিলতার সৃষ্টিও করতে পারে। সুতরাং সিনেমার 'সময়' বলতে সাধারণ অর্থে 'ফিজিক্যাল টাইম' যা তা নয়। সিনেমার আলাদা 'সময়' আছে যাকে কিছুটা বলা যেতে পারে 'ফিল্ম টাইম'। এ-সময়কে ঘড়ির কাঁটা দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। কাহিনীর সংগে না ফেলে পরিচালকের নির্দেশে সে চলে, কখনও ঘড়ির কাঁটার দিকে, কখনও বিপরীতে; আবার কখনও দ্রুত, কখনও ধীর।

স্লো মোশন, অ্যাক্সিলারেটেড মোশন ও ফ্ল্যাশব্যাক তারই ব্যবহারিক হাতিয়ার।

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তার মাঝামাঝি [illegible] রোড (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
৩০শে শনিবার ৬টায়
৩১শে রবিবার ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
৪ঠা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ৬টায়
তিনটি একাঙ্ক
পূর্বরাগ
নির্দেশনা : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোর বাইরে
নির্দেশনা : নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলিমা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিমন্ত্রণ : 'বালিকা বধূ'র পরে পরিচালক হিসেবে তরুণ মজুমদারের পরবর্তী ছবি হল 'নিমন্ত্রণ'। অপরাজেয় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য এই কাহিনীটিতে প্রেম ও জীবন সত্যের কিছু গভীরতম উপলব্ধি বিধৃত। ইতিমধ্যেই পরিচালক তাঁর শিল্পী ও কলাকুশলী গোষ্ঠীসহ বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজে বেরিয়ে গেছেন। সন্ধ্যা রায় ও অনুপকুমার ('পলাতক'-এর জুটি) এই ছবির প্রধান দুই শিল্পী, অপর একটি প্রধান নারী চরিত্রে আছেন নন্দিনী মালিয়া, অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, জহর রায়, পাহাড়ী সান্যাল, শিবানী বসু, কল্যাণী মন্ডল, শিউলি মুখোপাধ্যায়, সুরুচি সেনগুপ্তা, রাম চৌধুরী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলেন্দু পাল ও অন্যান্য বহু শিল্পী। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশ ও সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করবেন যথাক্রমে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চন্দ্র ও দুলাল দত্ত। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁকে সহযোগিতা করছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, পিয়ালী পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তিলাভ করবে।

প্রতিবাদ : সেন্সর ছাড়পত্র পেয়ে বিশ্বজিৎ নিবেদিত আর্ট মুভিজের 'প্রতিবাদ' এখন রাধা, পূর্ণ ও অন্যত্র পরবর্তী মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 'প্রতিবাদ' বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের কুৎসিত রুচি ও মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রামের বাণী বহন করে আনছে। ছবিখানির পরিচালনা করেছেন—তপেশ্বর প্রসাদ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানে সুর সৃষ্টি করেছেন সুরকার শ্যামল মিত্র। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও বিশ্বজিৎ স্বয়ং। অজিত গাঙ্গুলী প্রতিবাদের কাহিনী রচনা করেছেন। ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন যথাক্রমে বিশ্বজিৎ ও বালিকা বধূ ও পরিণীতা খ্যাত মৌসুমী চ্যাটার্জী। সহ-নায়িকা চরিত্রে আছেন বুই ব্যানার্জী। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে আছেন—রবি ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, কালীপদ চক্রবর্তী, সুলতা চৌধুরী, অর্পণা দেবী, পদ্মা দেবী, স্বরূপকুমার, চিন্ময় রায়, সুলেখা রায় প্রভৃতি। দি মিলি ডিস্ট্রিবিউটার্স ও মিলি পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশন সত্ব গ্রহণ করেছেন।

তীর ভাঙা ঢেউ : 'মাস্ অ্যান্ড মুভিজের' প্রথম প্রচেষ্টা 'তীর ভাঙা ঢেউ' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে প্রযোজক ও পরিচালক অরুণ চৌধুরী ফিরেছেন। তিনি নায়িকা চরিত্রে একটি নতুন মুখ উপহার দেবেন—নাম বিশাখা মজুমদার। দিলীপ গাঙ্গুলী ও অরুণ চৌধুরী রচিত গানে অনিল দত্তর সুরারোপে কণ্ঠ দিচ্ছেন সন্ধ্যা মুখার্জী, কৃষ্ণা রায় ও অনিল দত্ত স্বয়ং।

পিকনিক : বাংলাদেশে ভালো ছবি যাঁরা করেন এবং ভালো ছবি যাঁরা দেখেন তাঁদের পছন্দ এই দুটি তালিকাতেই পরিচালক ইন্দোর সেনের নাম নিশ্চয়ই আছে। 'প্রথম কদম ফুলের' অসামান্য সাফল্যের পর তিনি এখন নতুন ছবির জন্য বেছে নিয়েছেন রমাপদ চৌধুরীর একটি উপন্যাস। নাম 'পিকনিক'। ক'দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন 'চিত্রনাট্যের কাজ চলছে।' ভূমিকালিপি সম্পর্কে তিনি এখনও নিশ্চিত না হলেও তাঁর পছন্দ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ ও রণজিৎ মল্লিক (ইন্টারভিউ খ্যাত)। নারী চরিত্রের শিল্পী নির্বাচন নিয়ে তিনি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। তার একটি প্রধান কারণ প্রথম ছবিটির বাজেট তিনি খুব নীচু অঙ্কের মধ্যে রাখতে চান। নামী শিল্পীর কথা তাই ভাবা যাচ্ছে না। নতুন মুখের সন্ধান চলছে। বিশেষ করে 'ইতু' নামের একটি চরিত্রের জন্য।

ইকাম্প ফিল্মসের ব্যানারে এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সুধীন দাশগুপ্ত। সম্প্রতি জানলাম এ মাসের শেষাশেষি সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে 'পিকনিকে'র শুভ যাত্রা শুরু হবে। আউটডোর লোকেশন ইতিমধ্যে দেখে এসেছেন পরিচালক। পুরোদমে কাজ শুরু হতে সম্ভবত ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি

মঞ্চাভিনয়

কাঞ্চনরঙ্গ : এয়ার লাইন ট্রাফিক এ্যামেচার্সের শিল্পীরা সম্প্রতি 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটি স্টার রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করলেন। শ্রীমণি দত্তের দক্ষ পরিচালনায় সামগ্রিক প্রযোজনাটি প্রায় প্রতিটি দর্শককেই মুগ্ধ করেছে। প্রাণবন্ত চরিত্রচিত্রণের যাঁরা স্বাক্ষর রাখেন তাঁরা হলেন দিলীপ রায়চৌধুরী (পাঁচু), আশু ব্যানার্জি (বদুগোপাল), অলোক লাহিড়ী (অম্বর), হরিদাস গাঙ্গুলী (চিত্তবাবু), আশা বোস (গিন্নী), তৃপ্তি দাস (তরলা)। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন রমাপদ ভট্টাচার্য, নিতাই বসু, বেবী ঘোষ, চৈতালী চ্যাটার্জি।

মিশরকুমারী : সম্প্রতি বান্দুরা গোবিন্দপুর হোলি ক্রস হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সংসদের পঞ্চম বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে 'মিশরকুমারী' নাটকটি অভিনীত হল তেরেসা গার্ল্স হলে। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন লরেন্স ডি রোজারিও। প্রয়োগনৈপুণ্যে দীপ্ত এই নাটকটির কয়েকটি ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেন ফিডেলিস ডোনা, সৌমিসুন্দর গোমেজ, অনন্ত সাহা, প্রতিমা পাল ও লরেন্স ডি রোজারিও।

মেঘে ঢাকা তারা : শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটকটি কিছুদিন আগে রঙমহলে পরিবেশিত হল। নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন মঞ্চশিখার শিল্পীরা। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন সাধন সাহা, সমীর

CENTRAL LIBRARY

পোদ্দার, শীতল সাহা, ডাঃ অসিত সাহা, তরুণ দত্ত, অলোক ঘোষ, ছন্দা চ্যাটার্জি, দীপালি চৌধুরী, শিবানী ভট্টাচার্য। নাট্যনির্দেশনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন নন্দ মুখার্জি ও সন্তোষ চক্রবর্তী।

কালাপানি : স্টার ওয়েলফেয়ার ক্লাব, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের রাইটার্স বিল্ডিংস শিল্পী-সদস্যরা ক'দিন আগে ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'কালাপানি' নাটকটি 'রঙমহলে' মঞ্চস্থ করলেন। চরিত্রচিত্রণের ব্যাপারে শিল্পীরা সবাই নিষ্ঠাবান থাকায় নাটকের গতি কখনো শ্লথ হয়নি। সৌমেন্দু ভট্টাচার্যের 'শ্যামসুন্দর', প্রশান্ত চৌধুরীর 'সোমনাথ', হরিপদ খাস্নবীশের 'গণেশ' চরিত্রচিত্রণের কয়েকটি সুন্দর ও স্বাভাবিক নজীর তুলে ধরেছে। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন সমীর গুপ্ত, নিখিলেন্দু চক্রবর্তী, সোমেন রায়, বনমালী ভট্টাচার্য, নুর আলি, বিনয় চৌধুরী, রুমা মুখার্জি, পুতুল চক্রবর্তী। প্রয়োগ-পরিকল্পনায় প্রিয়তোষ মুখার্জি স্বচ্ছ শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন।

এই মন সেই মন : স্নেহপ্রীতি আর ভালোবাসায় সিক্ত সাধারণ মানুষ কখনোই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের পদধ্বনি শুনতে চায় না। তারা চায় না পৃথিবীর সব কোমল অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করুক দ্বন্দ্বের করাল ছায়া। তবু দ্বন্দ্ব আসে, বিপর্যস্ত হয় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, মনের আকাশে গহন মেঘ জমে। সাধারণ মানুষের দল তাদের সংঘবদ্ধ শক্তি দিয়ে এই অশুভ আবির্ভাবকে মুছে দিয়ে ভালোবাসার মমতা দিয়ে গড়ে তুলতে চায় জীবন। এই অনুভূতি আর প্রয়াসের ওপরই গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের নাটক 'এই মন সেই মন'। সম্প্রতি 'আঙ্গিক' গোষ্ঠীর শিল্পীরা এই নাটকের একটি সপ্রতিভ মঞ্চরূপ উপস্থিত করলেন।

অভিনব সিনেমা মাসিক পত্রিকা

আলোছায়া

প্রতি সংখ্যায় থাকে রহস্য উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প, শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প, বিভিন্ন অভিনব ফিচার, গান স্বরলিপি, মনস্তাত্ত্বিক যৌনতত্ত্ব ও অসংখ্য সিনেমার স্টীল ছবি।

প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ : বার্ষিক ৬৲

১৬/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সংবেদনশীল এই নাটকটির প্রযোজনাকে দর্শকের সামনে প্রাণবন্ত করে তুলতে নির্দেশক তুষার মজুমদার যে নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য। সুষ্ঠু টিমওয়ার্কে যেসব শিল্পীরা দীপ্তি আনতে পেরেছেন তাঁরা হলেন মায়া বসু, তুষার মজুমদার, বিমান গুপ্ত, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন চট্টোপাধ্যায়, নির্মল চক্রবর্তী, স্বপন সেন, অমলেন্দু দত্ত, জ্যোতিভূষণ চৌধুরী, মায়া বসু।

সায়ন্তনী : আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে সায়ন্তনী কর্তৃক তাঁদের বহু প্রশংসিত তিনটি একাংক নাটক অভিনীত হবে। নাটক তিনটি শ্রীমিহির সেনের 'আদাব' এবং শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়ের 'বিরহী' ও 'দাগলীপাড়া দিকে'। নাটক তিনটির নির্দেশনায় শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়।

যদুবংশ : প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা থিয়েটার গিল্ড ২১ জানুয়ারী (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা সাতটায় মুক্ত অঙ্গনে "যদুবংশ" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সমকালীন মূল্যমান ভিত্তিক বিমল করের এই কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন সমীর লাহিড়ী। গিল্ডের শিল্পিবৃন্দ অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। পরিচালনার দায়িত্ব শ্যামল সেনের।

নাটক প্রতিযোগিতা : কোনো বিচারক-মণ্ডলীর দ্বারা নয়, শুধু দর্শকদের ভোটেই বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ—পাটনার শিল্পী-সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সর্ব-ভারতীয় বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য। গত ১৯ ডিসেম্বর প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক (তিসরী কসমের লেখক) পদ্মশ্রী ফণীশ্বর নাথ রেণু তৃতীয় বার্ষিক প্রতি-যোগিতার উদ্বোধন করেন পাটনার রবীন্দ্র-ভবনে। ১ জানুয়ারী পুরস্কার বিতরণ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন সুসাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ সান্যাল, নাট্যকার শ্রীবাদল সরকার ছিলেন সেদিনকার প্রধান অতিথি। কল-কাতার ইস্পাত ক্লাব 'সকলের জন্য' নাটক মঞ্চস্থ করে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা এবং দলগত নৈপুণ্যের জন্যে পুরস্কৃত হন। শ্রেষ্ঠ পরি-চালকের সম্মান লাভ করেন ঐ দলেরই শ্রী এস পি সরস্বতী। শ্রীসনৎ সেন (বালুর-ঘাট নাট্যমন্দির) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। এবং শ্রীমতী বীথি বন্দ্যোপাধ্যায় (পরিবেশক, কলকাতা) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিবেচিত হন। বাটানগর থিয়েটার ইউনিটের শ্রীঅমল মজুমদার এবং জনুরাগ, পাটনার শ্রীমতী মালবিকা ঘোষাল যথাক্রমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন তাঁরা রবীন্দ্র গোষ্ঠীর অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষ (পাণ্ডুলিপি নাটকের জন্যে) এবং বাটানগর থিয়েটার ইউনিটের মাস্টার বাবুন (শিশু অভিনেতা হিসেবে)। অভিনয়-দক্ষতার জন্যে আরো বারোজন শিল্পীকে মানপত্র দেওয়া হয়।

উপরোক্ত দলগুলি ছাড়া পাটনার বিদ্রোহী ড্রামাটিক সোসাইটি কলকাতার বিন্ধ্যাচল ও অ্যাম্বি থিয়েটার, কুলটির প্রবাসী, কুমারডুবির বার্ডস ইভনিং ক্লাব এবং চিত্তরঞ্জনের কৌশিকী এবারকার প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। ৩১ ডিসেম্বর কলকাতার নাট্যসংস্থা শতাব্দী শ্রীবাদল সর-কার রচিত ও পরিচালিত বাসভপুরের রূপ-কথা নাটকটির প্রদর্শনী অভিনয় করে সকলের মনোরঞ্জন করেন।

জীবনায়ণ : কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন রিক্রিয়েশন ক্লাব বিগত ১৬ জানুয়ারী তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে গংগাপদ বসুর 'জীবনায়ণ' নাটকটি সার্থকতার সাথে মঞ্চস্থ করেন। উত্তরবাংলার সুপরিচিত কবি-নাট্যকার, পরিচালক-অভিনেতা নীরজ বিশ্বাস তাঁর বলিষ্ঠ অভিনয়ে দর্শকদের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। অধ্যাপক ও অধ্যাপকের স্ত্রীর ভূমিকায়, নীলমণি হাজরা এবং ন্যাংটো চ্যাটার্জি'র ভূমিকায় প্রফুল্ল দাশগুপ্তের অভিনয় সহজ-স্বচ্ছন্দ ও সংবেদনশীলতায় ভরপুর। এ ছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় নাট্যপ্রিয় দর্শকদের মনে যাঁরা সাড়া জাগিয়েছেন, তাঁরা হলেন, নিখিল ভট্টাচার্য, ষষ্ঠী ভৌমিক, শিপ্রা বাগচী, ছানা গুপ্ত প্রমুখ। আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জা রীতিমত বিস্ময়কর। উত্তরবাংলার মঞ্চে এ-রকম আলোর কাজ স্বভাবতই চোখে পড়ে না।

সঙ্গীতের ব্যবহার সংযত ও সুপ্রযুক্ত।

শ্রীলতা ইনস্টিটিউট, চিত্তরঞ্জন আয়োজিত তুলসী লাহিড়ী স্মৃতি একাঙ্ক নাট্য প্রতি-যোগিতা :—শ্রেষ্ঠ নাট্যগোষ্ঠী—গ্রীণ অ্যামেচার গ্রুপ,—'ভুবনপুরের পথে'। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী—ইয়ংম্যান্স কালচারাল এসোসিয়েশন—'বাদক'। শ্রেষ্ঠ পরিচালক—স্বরূপ গুপ্ত (বিসর্জনের বাজনা', মঞ্চমুখ, চিত্তরঞ্জন)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—সুনীল ভট্টাচার্য ('পিপীলিকা', অগ্নিশিখা)। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—বেলা রায়—'ভুবনপুরের পথে'। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি—'বাদক'—শ্রীশ্যামলচন্দ্র দাশগুপ্ত। শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতা—কমলনয়ন কাশোটিয়ার—

(বিপ্লবী কৌন, হিন্দী নাট্য সমিতি, চিত্তরঞ্জন)।

অপরাজিতা : কে সি থাপার রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে 'অপরাজিতা' নাটকটি পরিবেশন করলেন। নায়িকার জীবন সংগ্রাম, আশা-নিরাশ ও বলিষ্ঠতার ওপরে গড়ে ওঠা এই নাটকটি সব সময়েই যে আমাদের প্রত্যাশা মিটিয়েছে তা নয়। কিছু কিছু শৈথিল্য এসেছে ঘটনার দিক থেকে, আর মাঝে মাঝে মন্থরতা এসেছে অপ্রাসঙ্গিক দু' একটি চরিত্র সৃষ্টিতে। কিন্তু শিল্পীদের চরিত্রচিত্রণ বিষয়বস্তুগত দুর্বলতাকে ঢেকে দিয়েছে প্রায়ই; এবং এ ব্যাপারে নাট্যনির্দেশক মন্মথ মুখার্জীর আন্তরিক প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। চরিত্রের সাথে সুষম ছন্দ বজায় রেখে যাঁরা নির্ভরতার সঙ্গে অভিনয় করে প্রযোজনায় দীপ্তি এনেছেন তাঁরা হোলেন সুশান্ত ভাদুড়ী, মমতা চ্যাটার্জী, ইন্দিরা দে, উমিংকুমার চক্রী। কার্তিক অধিকারী, দিলীপ ভট্টাচার্য, আশুতোষ বোস, শ্রীমতী পলিনের চরিত্রচিত্রণও দর্শকদের তৃপ্ত করেছে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সৌমেন্দু চ্যাটার্জী, হেমলাল কর্মকার, প্রদীপ রায়চৌধুরী, পান্নালাল দত্ত, শঙ্করীপ্রসাদ কর, রাজকুমার মুখার্জী, শিবানীমোহন ঘোষ, বিষ্ণুগোপাল ব্যানার্জী, স্বদেশ গোস্বামী, শঙ্করেন্দু দাস।

সান্ধ্য মজলিসের প্রফুল্ল : গত ১১শে ডিসেম্বর ১৯৭০ শনিবার 'সান্ধ্য মজলিস' দক্ষিণ নিউদিল্লীর নাট্যানুরাগীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি নাট্য সংস্থা গিরিশবাবুর বিখ্যাত নাটক 'প্রফুল্ল' নিউদিল্লীর ফাইন আর্টস থিয়েটারে মঞ্চস্থ করে প্রভূত সুনাম অর্জন করে। ডাঃ ত্রিগুণা সেন এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

গত এপ্রিল মাসে (১৯৭০) এই সংস্থাই 'রীতিমত নাটক' মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করেছিল। ডাঃ সেনের মতে সান্ধ্য মজলিসই এই সব পুরানো দিনের বিখ্যাত নাটক মঞ্চস্থ করে প্রাচীন বিখ্যাত নাট্যকারদের যাতে আমরা ভুলে না যাই তার চেষ্টা করছেন।

প্রফুল্ল নাটকে সকলেরই অভিনয় প্রাণবন্ত হয়েছিল, বিশেষ করে যাদবের ভূমিকায় মাস্টার রঞ্জন কুণ্ডু, যোগেশের ভূমিকায় দিল্লীর বিখ্যাত সব্যসাচী ও জ্ঞানদার ভূমিকায় ডাঃ (মিসেস) অঞ্জলি চ্যাটার্জি নিজেদের অভিনয় নৈপুণ্যে নাট্যরসিকদের মুগ্ধ করেন।

হিন্দী সাগিনা মাহাতোর মহরত ও শুটিং-এ প্রযোজক হেমেন গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচালক তপন সিংহ, বলাই সেন, সায়রা বানু, দিলীপকুমার এবং ক্যামেরাম্যান বিমল মুখোপাধ্যায়।

ফটো : অমৃত

বিবিধ সংবাদ

উদয়শঙ্করের নকল সৃষ্টি শঙ্করস্কোপ আসছে পাঁচই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় কলকাতায় শেষবারের মতো মঞ্চস্থ হবে। তারপর? পুনঃপ্রদর্শনের কোনো স্থিরতা নেই। নব-নব শিল্পের লীলাক্ষেত্র কলকাতার নতুন প্রমোদউপকরণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না, বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। সবচাইতে দুঃখের কথা সেটাই। বন্ধের কারণপ্রসঙ্গে শঙ্করস্কোপের প্রযোজক শ্রীঅমল কাঞ্জারিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে গভীর দুঃখের সঙ্গে জানালেন, দর্শকের প্রচুর উৎসাহ ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও একটানা বহুদিন প্রদর্শনী চালিয়ে যাবার মতো কোনো প্রেক্ষাগৃহ শহরে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই অসময়ে ছেদ পড়ছে শঙ্করস্কোপের প্রদর্শনীর। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে যদি তেমন কোনো প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া যায়, সেখানে পাঁচ বা দশ বছরের লীজ নিয়ে প্রযোজক শুধুমাত্র শঙ্করস্কোপের নয়, উদয়শঙ্করের নব-নব সৃষ্টির পরিচয় তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর।

উদয়শঙ্করের স্বপ্ন 'শঙ্করস্কোপ'-এর সাফল্য সম্পর্কে প্রযোজক সন্দিহান ছিলেন। শেষপর্যন্ত এই প্রদর্শনীর অভাবিত সাফল্যে প্রযোজক রসিক দর্শকের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। কলকাতায় শঙ্করস্কোপের প্রদর্শনী বন্ধ হলেও ভারতের বিভিন্ন শহরে, এমনকি ভারতের বাইরেও উদয়শঙ্করের এই অত্যাশ্চর্য শিল্পসৃষ্টির ব্যাপক প্রদর্শনীর আয়োজন চলছে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীকাঞ্জারিয়া শঙ্করস্কোপের প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে বাধ্য হওয়ার দুঃখ প্রকাশ করে শ্রীউদয়শঙ্করের শিল্পপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাণীবিতান : গত ২০ জানুয়ারীর সন্ধ্যায় বিধান সরণীর সাহা ভবনে প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'বাণীবিতান'-এর উদ্যোগে ও প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ের পৌরোহিত্যে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বাংলার সাধারণ নাট্যালয় : নাটক, অভিনয় ও নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কীয় আলোচনায় অংশ নেন সর্বশ্রী দেবনারায়ণ গুপ্ত, সন্তোষ সিংহ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ডঃ উমা রায় প্রমুখ। সর্বশ্রী গোকুল মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র দে, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্লভ মুখোপাধ্যায় ও বীথিকা চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত দৃশ্যাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। বিভিন্ন নাট্য-সঙ্গীতগুলি পরিবেশন করেন সর্বশ্রী জয়কৃষ্ণ সান্যাল, রেণুকা ভৌমিক, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, কালিপদ দাস, মীরা মুখোপাধ্যায়, অনীতা চট্টোপাধ্যায়, রমা মুখোপাধ্যায়, রেখারাণী দত্ত, তপতী কুণ্ডু, তনিমা ঘোষ, শিখা পাণ্ডা, রমা কুণ্ডু, রীতা মুখোপাধ্যায়, ভাব বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলবুল মুখোপাধ্যায়।

'শ্রীলেখার স্মরণে কলাভারতী' : সম্প্রতি পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এ দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিল্পপ্রীতির প্রসার ও বিদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি বহু শিল্পী শিক্ষক ও শিক্ষিকার সাহায্যে গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিভাময়ী ছাত্রী শ্রীলেখা মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ১৯৭০ এর ৫ সেপ্টেম্বর অকস্মাৎ পরলোকগমন করে।

শ্রীলেখা লেখাপড়া, গান বাজনা, নাটক, ছবি আঁকায় একাধারে সর্বগুণের অধিকারিণী ছিলেন।

কিছুকাল আগে আকাডেমী অব ফাইন আর্টস হলে 'কলাভারতী' ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবিগুলির এক প্রদর্শনী কলারসিকদের সম্বর্ধনা লাভ করে। এতে শ্রীলেখার 'দি বিউটি অব নেচার' (৪১), 'জাপানী বার্ড' (৫০) ও 'ডায়মণ্ডহারবার' (৪৬) খুবই প্রশংসনীয়। তাছাড়া অমিতা বোসের 'স্টীল লাইফ', (২) বিশ্বনাথ চ্যাটার্জির 'লাভ লেটার' (৯), বিমল ঘোষের 'হলিহক্স' (১০) হিমানিশ সেনের 'এগেনস্ট দি স্কাই' (১৫) 'কৃষ্ণা দত্তের' আফটার দি সাওয়ার' (১৮), পার্থ চ্যাটার্জির 'সান ফ্লাওয়ার' (২৬), রাধারাণী বোসের 'মুন লিট নাইট' (২১), সুস্মিতা সিনহার 'প্রিয়া' (৩৮), সুস্মিতা ঘোষের 'সীতা ও জনক রাজা' (৩৯), শুক্লা দত্তের 'উত্তরা ও অভিমন্যু' (৪৪), প্রণব মিত্রের 'ভিলেজ সিন' (২০), নন্দিনী সেনগুপ্ত ও সোমা সেনগুপ্তের 'এগেনস্ট দি রক' (২০), ও 'হ্যামলেট' (৪০) উল্লেখযোগ্য।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা : আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী বালিগঞ্জ ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২৯ বার্ষিক দক্ষিণ কলিকাতা আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। রচনার বিষয়—'প্রাণচঞ্চল কলকাতার রাজপথ'। আবৃত্তির বিষয়—ক) সর্বসাধারণ 'তুমি প্রভাতের শুকতারা' রবীন্দ্রনাথ; খ) স্কুল ছাত্রছাত্রী (১১—১৬) 'দুরন্ত আশা' রবীন্দ্রনাথ; গ) বালকবালিকা (৬—১০) 'কাঁদুনি' অন্নদাশঙ্কর রায়; ঘ) শিশু (৬ এর নীচে) 'মাসী গো মাসী' সুকুমার রায়; ঙ) অবাঙ্গালী বিভাগ—'নগরলক্ষ্মী' রবীন্দ্রনাথ। যোগাযোগ ও সাক্ষাৎকার—২২৭নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-১৯।

নয়ালীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে 'নয়ালী'র দ্বিতীয় বার্ষিকী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হোল। এই উপলক্ষ্যে সংস্থার শিল্পীরা বাংলার লোকনৃত্য ও রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করে শিল্পবোধ ও আন্তরিকতার পরিচয় রেখেছেন। উপভোগ্য দুটি অনুষ্ঠানের শিল্পীতালিকায় ছিলেন অলি রায়, সোনা পাল, ঊর্মি বর্ধন, সুপর্ণা মিত্র, সর্বোমিত্রা ঘোষ রায়, মিঠু ঘোষ, মালবিকা দাস, গৌতশ্রী দত্ত, মধুমিতা ব্যানার্জি, মধুমিতা সরকার, মীরা দত্ত, শ্রীলতা বসুরায়, সুস্মিতা সরকার, চিত্রা ঘোষ, শকুন্তলা ভৌমিক। কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ নিয়েছিলেন সুনির্মল দাশগুপ্ত, রঞ্জিতা দে, অনুরাধা পাল, দীপ্তি কুণ্ডু চৌধুরী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সার্থক আয়োজনের সম্পূর্ণ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন সংস্থার সম্পাদিকা দীপালি বসুরায়।

খেলাধুলার কথা

১৯৭০ সালের সালতামামি

১৯৭০ সালে আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসর খুবই সরগরম ছিল। যে সমস্ত খেলা নিয়ে বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ভারোত্তোলন এবং জিমন্যাসটিকস। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হিসাবে ইউনিভারসিটি গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং এশিয়ান গেমসেরও গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল।

১৯৭০ সালে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রেজিল দলের মোট ৩বার জুল রিমে কাপ জয়ের আনন্দে ব্রেজিলের বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় পেলেকে তুলে ধরেছেন দলের অপর এক খেলোয়াড়।

মেক্সিকো সিটিতে আয়োজিত ৯ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রেজিল ৪—১ গোলে ইতালীকে পরাজিত করে মোট ৩বার জুল রিমে কাপ জয়ের রেকর্ড করে এবং সেই সূত্রে প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে চিরদিনের মত জুল রিমে কাপটি নিজেদের অধিকারে পেয়ে যায়। ব্রেজিলের আগে দু'বার করে জুল রিমে কাপ জয়ী হয়েছিল এই দু'টি দেশ—ইতালী (১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে) এবং উরুগুয়ে (১৯৩০ ও ১৯৫০ সালে)। ১৯৭০ সালের ফাইনালে ওঠার ফলে ব্রেজিল এবং ইতালী উভয় দেশেরই কাছে তিনবার করে জুল রিমে কাপ জয়ের সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল। ১৯৭০ সালের ফাইনাল খেলায় কাপ বিজয়ী ব্রেজিল প্রথম গোল দিয়ে প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার ইতিহাসে এক নজির সৃষ্টি করে। কারণ আগের ৮টি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার বিজয়ী দল প্রথম গোল দিতে পারে নি। ১৯৭০ সালে মেক্সিকো সিটিতে আয়োজিত ৯ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার মোট ৩২টি খেলা হয়—লীগ পর্যায়ে ২৪টি, কোয়ার্টার

ক্ষেত্রনাথ রায়

ফাইনালে ৪টি, সেমিফাইনালে ২টি, ফাইনালে ১টি এবং ৩য় স্থান নির্ধারণের জন্য ১টি খেলা। এই ৩২টি খেলায় গোলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫টি। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ে এবং নকআউট পর্যায়ে মোট সর্বাধিক গোলের রেকর্ড ১৩৫টি (১৯৫৪ সালে জার্মানীর নামে)। মেক্সিকোর খেলায় সর্বাধিক গোল খেয়েছিলেন পশ্চিম জার্মানীর গোলরক্ষক মিয়ার (৫টি খেলায় ১০টি গোল)। অপরদিকে সর্বাধিক গোল দিয়েছিলেন পশ্চিম জার্মানীর মুলার (৫টি খেলায় ১০টি গোল)—লীগের খেলায় ৭টি (বিপক্ষে মরোক্কো ১, বুলগেরিয়া ৩ এবং পেরু ৩), কোয়ার্টার-ফাইনালে ১টি (বিপক্ষে ইংল্যান্ড) এবং সেমিফাইনালে ২টি (বিপক্ষে ইতালী)। বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রেজিল আর একবার ইতালীর সঙ্গে খেলেছিল—৩২ বছর আগে ১৯৩৮ সালের সেমিফাইনালে। এই খেলায় ইতালী জয়ী হয় এবং ফাইনালে হাঙ্গেরীকে ৪—২ গোলে পরাজিত করে উপর্যুপরি ২বার (১৯৩৪ ও ১৯৩৮) জুল রিমে কাপ জয়ের রেকর্ড করেছিল।

১৯৭০ সালের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় অনেক কিছু অঘটন ঘটে গেছে। পুরুষবিভাগে ইতিপূর্বে খেতাব জয়ী হয়েছিল মাত্র এই দু'টি দেশ—রাশিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া। কিন্তু ১৯৭০ সালের প্রতিযোগিতায় এই দু'টি দেশ পুরুষ-বিভাগের কোন পদকই সংগ্রহ করতে পারেনি। গতবারের বিশ্ব খেতাব বিজয়ী ও ১৯৬৮ সালের ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী চেকোশ্লোভাকিয়া ৪র্থ স্থান পেয়েছে এবং ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী রাশিয়া পেয়েছে ৬ষ্ঠ স্থান। ১৯৭০ সালে পুরুষবিভাগের স্বর্ণপদক পেয়েছে পূর্ব

মার্গারেট কোর্ট

ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০০ নট-আউট (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, বোম্বাইয়ের ৩য় টেস্ট, ১৯৬৫)।

সেলিম দুরানী (রাজস্থান) : জন্ম আগস্ট ১১, ১৯৩৫। অল-রাউন্ডার। লেফট-আর্ম স্পিন বোলার। প্রথম টেস্ট খেলা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯৫৯ সালে। ১৯৬১-৬২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের প্রথম 'রাবার' জয়ের মূলে ছিল দুরানীর বোলিং সাফল্য। পর-পর তিনটি টেস্ট খেলা ড্র হওয়ার পর ভারতবর্ষ ৪র্থ এবং ৫ম টেস্টে জয়ী হয়। দুরানী ৪র্থ টেস্টে ৪৭ রানে ৫ ও ৬৬ রানে ৩ উইকেট এবং ৫ম টেস্টে ১০৫ রানে ৬ ও ৭২ রানে ৪ উইকেট পান। এই সিরিজে (১৯৬১-৬২) তিনি উভয় দলের পক্ষে বোলিংয়ে সর্বাধিক উইকেট এবং শীর্ষস্থান (গড় ২৭-০৪) পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বিগত পাঁচটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে তিনি দলভুক্ত হন নি (ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সফর এবং স্বদেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে)। শেষ টেস্ট খেলেছেন ওঃ ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্ট (রান ৫৫ ও ১৭ এবং উইকেট লাভ ৮০ রানে ১ ও ৪২ রানে ০)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২০, ইনিংস ৪০, নট-আউট ২ বার, মোট রান ১০৫৯, সেঞ্চুরী এক এবং গড় ২৭-৮০। এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান—১০৪ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ত্রিনিদাদ, ১৯৬১-৬২)। বোলিং : ২৫০৭ রানে ৭১ উইকেট (গড় ৩৫-৩২), এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট পেয়েছেন ৩ বার এবং একটি খেলায় ১০ উইকেট একবার (১৭৭ রানে ১০ উইকেট, বিপক্ষে ইংল্যান্ড মাদ্রাজ, ১৯৬১-৬২)।

এম এল জয়সীমা (হায়দরাবাদ) : জন্ম মার্চ ৩, ১৯৩৯। নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। প্রথম খেলা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৯ সালে।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৩৬, ইনিংস ৬৬; নট-আউট ৪ বার, মোট রান ২০১০, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ৩২-৪৬। এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৯ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, কলকাতা, ১৯৬৪)। বোলিং : [illegible] রানে ৯ উইকেট।

[illegible] প্রসন্ন (মহীশূর) : জন্ম মে ২২, [illegible]৪০। অফ-স্পিন বোলার। প্রথম [illegible]টেস্ট খেলা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (মাদ্রাজ, [illegible]১৯৬১-৬২)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২২, ইনিংস ৩৮, নট-আউট ৬ বার, মোট রান ৩৬২ এবং গড় ১১-৩১। বোলিং : ৩০৫৭ রানে ১১০ উইকেট (গড় ২৭-০৫), এক ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন ৮ বার এবং একটি খেলায় ১০ উইকেট ১ বার (১৭৪ রানে ১০ উইকেট, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, মাদ্রাজের ৫ম টেস্ট, ১৯৬৯)। শ্রেষ্ঠ বোলিং : ৭৪ রানে ৬ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, মাদ্রাজের ৫ম টেস্টের ২য় ইনিংসে ১৯৬৯)।

বিষেণ সিং বেদী (দিল্লী) : জন্ম সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৪৬। লেফট-আর্ম স্পিন বোলার। প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে (২য় টেস্ট, কলকাতা)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৯, ইনিংস ৩২ নট-আউট ৮ বার, মোট রান ২০৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২ এবং গড় ৮-৫০। বোলিং : ১৭৯৮ রানে ৭০ উইকেটে (গড় ২৫-৬৮) এবং এক ইনিংসে ৫টা উইকেট পেয়েছেন ৪ বার। এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং : ৯৮ রানে ৭ উইকেট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ৪র্থ টেস্ট, কলকাতা, ১৯৬৯)।

এস ভেঙ্কটরাঘবন (তামিল নাড়ু) : জন্ম এপ্রিল ২১, ১৯৪৫। অফ-স্পিন বোলার। প্রথম টেস্ট খেলা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৫ সালে (মাদ্রাজ, প্রথম টেস্ট)। এই সিরিজে ২১টি উইকেট পেয়ে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৪, ইনিংস ২০, নট-আউট ৬ বার, মোট রান ২০৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৬ নট-আউট। বোলিং : ১১৮০ রানে ৪৭ উইকেট (গড় ২৫-১৭) এবং এক ইনিংসে ৫টা করে উইকেট পেয়েছেন ২ বার এবং একটা খেলায় ১০ উইকেট একবার (১৫২ রানে ১২ উইকেট, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, নিউ দিল্লীর ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬৫); এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং : ৭২ রানে ৮ উইকেট (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, নিউ দিল্লীর ৪র্থ টেস্টের প্রথম ইনিংস, ১৯৬৫)।

জি আর বিশ্বনাথ (মহীশূর) : বয়স ২২। প্রথম টেস্ট খেলা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৯ সালে (কানপুরের ২য় টেস্ট)। তিনি তাঁর এই প্রথম টেস্ট খেলায় প্রথম ইনিংসে শূন্য রান করে ২য় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১৩৭ রান) করেন। ফলে রাতারাতি ভারতীয় ক্রিকেট মহলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই সিরিজের ৪টি টেস্ট খেলায় তাঁর মোট রান দাঁড়ায় ৩৩৪ (গড় ৪৭-৭১)—উভয় দলের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৪, ইনিংসে ৮ নট আউট ১ বার, মোট রান ৩৩৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩৭, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৪৭-৭১।

একনাথ সোলকার (বোম্বাই) : বয়স ২২। অল-রাউন্ডার। ন্যাটা খেলোয়াড়। প্রথম টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৯ সালে (কানপুরে, ২য় টেস্ট)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৫, ইনিংস ৯, নট-আউট ২ বার, মোট রান ১৯১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৪৪ এবং গড় ২৭-২৮। বোলিং : ১৭০ রানে ৩ উইকেট (গড় ৫৬-৬৬)।

সৈয়দ আবিদ আলী (হায়দরাবাদ) : জন্ম সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৪২। অল-রাউন্ডার। প্রথম টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৭-৬৮ সালে (এডিলেড প্রথম টেস্ট।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১২, ইনিংস ২২, নট-আউট ০, মোট রান ৫৩০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৮১ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, সিডনির ৪র্থ টেস্টের ২য় ইনিংস, ১৯৬৭-৬৮), এবং গড় ২৪-০৯। বোলিং : ৬২৬ রানে ২১ উইকেট (গড় ২৯-৮০) এবং এক ইনিংসে ৫ উইকেট একবার। এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং : ৫৫ রানে ৬ উইকেট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডিলেডের প্রথম টেস্ট, ১৯৬৭-৬৮)।

অশোক মানকাদ (বোম্বাই) : বয়স ২৪। প্রথম টেস্ট খেলা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৯ সালে (বোম্বাই, প্রথম টেস্ট)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৭, ইনিংস ১৪, নট-আউট একবার, মোট রান ৪২২ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯৭ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, নিউ দিল্লী ৩য় টেস্ট, ১৯৬৯) এবং গড় ৩২-৪৬।

ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলে নির্বাচিত ১৬জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এই ৫জন খেলোয়াড় নবাগত অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেট দলে এই প্রথম নির্বাচিত হলেন—সুনীল গাভাস্কার (বোম্বাই, বয়স ২১), কে জয়ন্তীলাল (হায়দরাবাদ, বয়স ২২), ডি গোবিন্দরাজ (হায়দরাবাদ, বয়স ২০), পি কৃষ্ণমূর্তি (হায়দরাবাদ, বয়স ২২) এবং দুর্গা জিজিবয় (বাংলা, বয়স ২৫)। বোম্বাইয়ের সুনীল গাভাস্কার ১৯৭১ সালের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাঞ্চলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দক্ষিণ গুজরাট দলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসের খেলায় গাভাস্কার ৩২৭ রান করে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেছেন। পূর্ব রেকর্ড ৩২৪ রান অজিত ওয়াদেকার (বিপক্ষে দিল্লী, ১৯৫৮-৫৯)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ রচনা

সাহানা দেবীর
মৃত্যুহীন প্রাণ ৪॥

শঙ্কু মহারাজের
গঙ্গাসাগর ৮৲

আশাপূর্ণা দেবীর
একাল সেকাল অন্যকাল ১৫৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
মক্ষীরাণী ৫॥ কাঞ্চনময়ী ৫॥

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বাংলায় প্রথম বই
বাঙালী জীবনে রমণী ১০৲

ডঃ সুকুমার সেনের ভূমিকা সম্বলিত
ডঃ ভবতারণ দত্ত সংকলিত
বাংলা দেশের ছড়া ১০৲

কমলা মিশ্রের
কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ৭৲

জয়ন্তকুমারের দুটি রহস্য উপন্যাস
অভিনেত্রী খুন ৪৲
নায়িকার প্রতিহিংসা ৪৲

বাংলা পকেট বই

আশাপূর্ণা দেবীর
দূরের জানলা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
মালবী মালঞ্চ

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
নিরালা প্রহর

মন্মথনাথ ঘোষের
ফাগুণ কখনো যাবে না

অবধূতের
সান্ধ্য দরবার

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
তবু মনে রেখো

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
স্বর্ণচাঁপার দিন

সাধারণ ক্রেতাগণকে কুড়ি টাকা হারে কমিশন ॥ এজেন্টদের বিশেষ সুবিধা

৩০শে মার্চ পর্যন্ত গ্রাহক করা হইবে

প্রতিটি নতুন উপন্যাস ॥ প্রতিটি বইয়ের মূল্য মাত্র দু' টাকা

শঙ্কু মহারাজের
অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী ॥ বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ ॥

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা

পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হলো ॥ মূল্য সাড়ে আট টাকা

চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইতেছে

প্রমথনাথ বিশী
সম্পাদিত ও ভূমিকা সম্বলিত

রজনীকান্ত সেনের
কান্তকবি রচনাসম্ভার ১০৲

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের
ভূদেব রচনাসম্ভার ১০৲

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার ১০৲

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
বঙ্কিম রচনাসম্ভার ১২॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের
দ্বিজেন্দ্রলাল রচনাসম্ভার ১০৲

মাইকেল মধুসূদন দত্তের
মাইকেল রচনাসম্ভার ১০৲

বিহারীলাল চক্রবর্তীর
বিহারীলাল রচনাসম্ভার ১০৲

রমেশচন্দ্র দত্তের
রমেশ রচনাসম্ভার ১০৲

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার ১২৲

গিরিশচন্দ্র ঘোষের
গিরিশ রচনাসম্ভার ১২॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৮৭৯১ — ৩৪-৩৪৯২

নামের নকল অনেক বেরিয়েছে,
কিন্তু এর গুণের
নকল নেই

ঠিক আসল নির্মল বার সাবানের মতই বাজারে নকল
নির্মল বার সাবান বিক্রি হচ্ছে।
নির্মল বার সাবানের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিচ্ছে
অসাধু সাবান-প্রস্তুতকারীরা।
এটা বন্ধ করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হচ্ছে।

সর্বদা পরিচিত, বিশ্বস্ত দোকান থেকেই আপনি নির্মল বার সাবান কিনবেন। দেখে নেবেন, কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেডের তৈরী খাঁটি নির্মল বার সাবান কিনা। নির্মল বার সাবানে প্রচুর ফেনা হয় আর কাপড়জামা কিনা ধকলে অতি সহজেই কাচা যায়। ময়লার চিহ্নমাত্র থাকে না। প্রতিবারেই নতুনের মত ধবধবে পরিষ্কার দেখায়।

নির্মল
বার সাবান

পূর্ব-ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে।

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১ KPN 6102A

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

[illegible] সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 5th February, 1971 শুক্রবার, ২২শে মাঘ, ১৩৭৭ 50 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪	চিঠিপত্র		
৬	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৯	আদমসুমারী : ভারতে		—শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়
১১	সম্পাদকীয়		
১২	ঘরে রেখে এলাম	(কবিতা)	—শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২	নন্দিতা তোমার চোখের পাতায়	(কবিতা)	—শ্রীফিরোজ চৌধুরী
১৩	জলাকন্দ	(গল্প)	—শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
২১	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২২	দ্রৌপদীর দেশে		—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
২৯	মুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
৩১	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৪১	বৈকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৪৪	নিকটেই আছে		—শ্রীশশিভূষণ
৪৭	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৪৯	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৫২	অন্তরে নিহিত	(গল্প)	—শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
৫৬	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৫৮	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—শ্রীচিত্ররসিক
৬০	কলোনের ওডিকলোন		—শ্রীরমেন মজুমদার
৬১	পিঞ্জর	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৬৭	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
			—শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৬৮	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৭০	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৭	খেলার কথা		—শ্রীক্ষেত্রবিক্রম মিত্র
৭৮	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
	প্রচ্ছদ :		—শ্রীগোবিন্দ মণ্ডল

পি. ব্যানার্জীর
অর্শ চিকিৎসা
৩০ পিল টাঃ ২.৫০
১৬ পুরিয়া চূর্ণ ২.২৫
মলম ৩০ গ্রাঃ ২.৫০
বিনামূল্যে বিবরণী দেওয়া হয়
পি. ব্যানার্জী
৩৬বি. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫
৫৩, গ্রে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬
১১৪এ. আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

নিবেদন
ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত
আধুনিক চিকিৎসা
পুস্তকের ২য় সংস্করণ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়াছে এবং বহুল পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। সেই ৩য় সংস্করণের মূল্য দশ টাকা ও শোভন সংস্করণের জন্য আট টাকা নির্ধারিত হইয়াছে।
পুস্তকের পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া অর্ডার বুক করিলে, পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পরেই আমরা রেজিস্ট্রী ডাকে প্রেরণ করিয়া দিব। কোন ডাক খরচা লাগিবে না।

চিঠিপত্র

বিহারীলালের সারদামঙ্গলের নামকরণ প্রসঙ্গে

গত ৫ই অগ্রহায়ণ 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় চিঠিপত্রে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সারদা-মঙ্গলের' নামকরণ প্রবন্ধটি পড়ে খুব খুশী হয়েছি। আমি 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা। বাংলা থেকে সুদূর দিল্লীতেও উক্ত পত্রিকাটির সমাদর বেশি। 'অমৃতের' সম্পাদক মহাশয় মাঝে মাঝে মনোজ্ঞ ও বিতর্কমূলক আলোচনা প্রকাশ করে পাঠক সমাজকে উপকৃত করেন।

কবি বিহারীলালের 'সারদা' যে কবির মানসী এবং তাঁকে নিয়েই যে কবির সুখ-দুঃখ এবং কবি যে তাঁরই প্রশস্তি গেয়েছেন, লেখক বেশ সূক্ষ্মভাবে তাই দেখিয়েছেন। গোটা কাব্যটিকে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খণ্ড গীতি কবিতার পর্যায়ে ফেলেছেন, এবং বলেছেন, তার মধ্যে কাহিনীর কোন চিহ্ন নেই, যা মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীতে সারদা মঙ্গলের নামকরণ সম্বন্ধে আলোচনাটি বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে সন্দেহ নেই। দয়িত দয়িতার সকল সময় মঙ্গল কামনা করে থাকে এটা শাশ্বত। এবং এই হিসাবেই এর যে 'মঙ্গল' নাম দেওয়া যেতে পারে লেখকের এই যুক্তি অকাট্য।

শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়
নিউ দিল্লী।

(২)

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ 'অমৃত'তে প্রকাশিত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাকারে বিহারীলালের সারদা-মঙ্গলের নামকরণ চিঠিটি পড়লাম। সম্পূর্ণ নতুন বিষয়বস্তু সম্বলিত চিঠিটি অপূর্ব লাগল। লেখক সারদামঙ্গলের নামকরণে যে সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করেছেন তা নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়। এযাবৎ এই কাব্যটির নামকরণ নিয়ে কোন সমালোচককে বিশেষ কিছু আলোচনা করতে দেখি নি।

[illegible] শতাব্দীর কবি বিহারীলাল তাঁর [illegible] নামকরণ করলেন 'সারদা-মঙ্গল', অথচ এ নিয়ে বিংশ শতাব্দীর কোন সমালোচক লিখলেন না এটা প্রকৃত বিস্ময়েরই বস্তু। কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে আলোচনাটুকু করলেন তাতে আমরা পাঠকসমাজ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে কি পরিমাণে উপকৃত হলাম তা বলাটা বাহুল্যমাত্র। কালিদাসবাবুকে ধন্যবাদ জানাই এবং অনুরোধ করি তিনি যেন আরো নতুন নতুন বিষয়ে আলোকপাত করেন।

ধন্যবাদ জানাই 'অমৃত'র সম্পাদক মহাশয়কেও। এই ভিন্ন স্বাদের আলোচনা প্রকাশের জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। 'অমৃত' আমার কাছে সত্যিই অমৃত! কি প্রবন্ধ, কি গল্প, কি আলোচনা বা খেলাধুলো ও সিনেমা বিভাগ, 'অমৃত' বাংলাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ। তার প্রকাশিত প্রবন্ধে পাই চিরনতুন কথা, যা মনকে ভাবিয়ে তোলে। তার গল্পে পাই প্রাণের স্পর্শ, কারণ তা বাস্তব নিয়ে লেখা! খেলাধুলো বিভাগটিও অনন্য। আমার মনে হয় যে 'অমৃত' বাংলা ভাষায় প্রচারিত একমাত্র পত্রিকা যার খেলাধুলো বিভাগে কোনদিনও ভুল সংবাদ পরিবেশিত হয় না।

হিমাদ্রিকান্ত ব্যানার্জী
কাটিলাদুড়ি, জলপাইগুড়ি।

অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ প্রসঙ্গে

অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু বলে নিলেন। সব শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার রুচিমাফিক আপনারা যে বিভিন্ন শ্রেণীর অমৃত পরিবেশন করে থাকেন এককথায় তা তুলনাহীন। 'নিকটেই আছে', মনের কথা, মুখের মেলা প্রভৃতি নিয়মিত বিভাগগুলি প্রথম থেকেই আমাদের আনন্দ দিয়ে আসছে। তবে নতুন চিরদিন নতুন থাকে না, তার উপর সকলের আকর্ষণও চিরদিন সমান থাকে না। আমার বক্তব্য, চিন্তাধর্মী রচনা ততদিনই প্রকাশিত হওয়া উচিত যতদিন অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার কাছে তা একঘেয়ে মনে হবে না। বিষয় বৈচিত্র্যের গুণেই 'অমৃত' আজ এত জনপ্রিয়—একথা হয়তো বা অস্বীকার করা যাবে না।

আদর ফকির।
(অমৃত সাহিত্য সংস্থা)
[illegible]
বগলাকান্দা, বীরভূম।

(২)

'অমৃত' পত্রিকার ২ পৌষ সংখ্যায় শ্রীসত্যানন্দ গুহ মহাশয়ের 'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ' শীর্ষক একটা চিঠি দেখলাম। সত্যানন্দবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে আমি অল্প কথায় আমার মতামত ব্যক্ত করছি।

মিশ্রভাবে না হলেও, সত্যানন্দবাবুর সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি যে, সংস্কৃতি, নতুন বই ও পত্র-পত্রিকা সম্পর্কিত লেখাগুলো অমৃতের স্বাদকে অধোমুখী হতে দেয় না। তবে 'মুখের মেলা' ইত্যাদি বিভাগগুলি যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করলে হয়তো আপাতভাবে বিস্বাদময় মনে হতে পারে: ভাঙা-চোরা গ্রাম-বাংলার আশানৈরাশ্যের ছবিকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে বিচার করলে বোঝা যায় মূল্যবোধের দ্বৈরথ টানা-পোড়েনে গ্রামীন সমাজ-জন অবিন্যস্ত ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সর্বত্রই জীবনে এসেছে ক্লান্তি ও পরিবর্তনকালীন সংকটের অবশ্যম্ভাবী পদসঞ্চার। ক্লান্তি-কালের এই অসহায় জীবন-ধারণের গ্লানি ও দিশেহারা অস্তিত্বের অস্থিরতা মানুষকে মরিয়া উদভ্রান্তির কবলে এনে ফেলছে। এসেছে একঘেয়েমি, নিশ্চল শোচনীয়তা।

কিন্তু কিছু কিছু লেখায় জীবনের রেখাচিত্র সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে; দেখতে পারছি বৈপরীত্য। পরস্পর বিরোধিতা সোচ্চার হয়ে উঠেছে মানুষের মুখে, অবরুদ্ধ জীবনের বাঁকে বাঁকে। আর পুরনো বিশ্বাসের সেতুটা সবচেয়ে নাড়া খেয়েছে বোধহয় 'মনের কথায়'। মনোবিদ বিভিন্ন কেসহিস্ট্রির আলোচনাকালে সে সবের অন্তর্গূঢ় বৈজ্ঞানিক সত্যকে এতো সহজ ভাষায় যেভাবে উপস্থিত করেছেন তা সত্যি তুলনাহীন। প্রচলিত সামাজিক ধ্যান-ধারণা, সমাজ-ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে অটুট ডায়ালেকটিক্যাল সূত্র মেনে চলে, এতো পরিষ্কার ও বলিষ্ঠ ভাবে তার বিষয়গত উপস্থাপনা খুব কম পত্রিকাতেই পেয়েছি। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের আলোকে মনোবিদ পাঠককে যে বিজ্ঞান ও সমাজ-সচেতন করে তুলছেন, কুসংস্কার-রূপী সামাজিক রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত আলোয় নিয়ে আসার ঐকান্তিক চেষ্টা করছেন তাতে যে তিনি অবিসংবাদিতভাবে সামাজিক ও মানসিক রূপান্তরের পথকে সহজ করার কাজ করেছেন বললে বেশি বলা হয় না।—অমৃতকে এজন্য মননশীল পাঠক-মাত্রই সাধুবাদ জানাবেন।

তুলিশ অধিকারী
কলকাতা—৫০।

নিকটেই আছে

আমি 'অমৃত' নিয়মিত মনোযোগ সহকারে পড়ি। অমৃতে প্রকাশিত গল্প উপন্যাস ছাড়াও 'নিকটেই আছে' পড়ি। সত্যি এতে সমাজের বাস্তব চিত্র দেখতে পাই। গত ১০ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা ৩য় খণ্ডতে রিজার্ভেশন সম্বন্ধে পড়ে বুঝতে পারি কোথায় কোথায় আমাদের দুর্নীতি। সাংবাদিককে আমার অভিনন্দন জানাবেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অমৃত পত্রিকার সম্পাদক

চিঠিপত্র

মহাশয়ের নিকট অনুরোধ এই বিভাগটি যেন চালু থাকে, বন্ধ না হয়।

স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
আড়ং ঘাটা, নদীয়া

প্রেক্ষাগৃহ প্রসঙ্গে

আমি 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। ৮ই জানুয়ারীর অমৃতে শ্রীযুক্ত নান্দীকরের লেখা 'মেরা নাম জোকার' সিনেমার আলোচনা পড়লাম প্রেক্ষাগৃহ বিভাগে। আমি কিছুদিন আগে সিনেমাটি দেখেছি এবং খুব ভাল লেগেছে।

নান্দীকর লিখেছেন যে উক্ত সিনেমাটির তৃতীয় ভাগ অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু 'জোকার' যদি মেরিনার দেশে চলে যাওয়ার পরেই শেষ খেলাটি দেখাতেন তা'হলে শেষ খেলাটিতে দুজন দর্শক কম হতো (রাজেন্দ্র-কুমার ও মীনা) এবং মেরিনাও উপস্থিত থাকতেন না। শেষ দৃশ্যটা কি তাহলে জমতো? তৃতীয় দৃশ্যটি থাকাতে আরো একটি লাভ হয়েছে—সেটা হলো যে মীনার চরিত্র চিত্রণ করা এবং জোকারের যে কোথাও স্থান নেই সেটি দেখানো।

আশাকরি আপনি অমৃতর চিঠিপত্র বিভাগে এই পত্রটি ছাপবেন।

বিশ্বনাথ মুখার্জি
কটক—৮

জলসা

গত ১৫ই জানুয়ারীর 'জলসা' বিভাগে প্রকাশিত সুর-সপ্তক নিবেদিত 'কচ ও দেবযানীর' সুষ্ঠু সমালোচনার জন্যে চিত্রাঙ্গদাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

উক্ত আলোচনায় কৃতী কণ্ঠশিল্পীদের তালিকায় শ্রীমতী বেণু রায়ের নামটি স্থান পাওয়া উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়। তাঁর দরদভরা গলায় গাওয়া 'সহসা ডালপালা তোর উতলা যে', 'যাক ছিঁড়ে যাক', 'তুমি খুশী থাক' ইত্যাদি গান-গুলি উপস্থিত প্রতিটি দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, অপরাপর বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম ও নিখুঁত।

আশা করি আমার এ বক্তব্যটি 'অমৃতে' প্রকাশিত হলে উদীয়মানা শিল্পী কিছুটা অনুপ্রাণিত হবেন।

জিতেন্দ্রকুমার মল্লিক
কলকাতা-২০।

বিজ্ঞানের কথা

'অমৃত' পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। গত ৮ই জানুয়ারী প্রকাশিত 'অমৃতে', প্রতিষেধক কথায় আদুর ধসা রোগের প্রতিষেধক সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা করা হয়েছে তা পাঠ করে ঐ সম্বন্ধে অনেক কিছু অবগত হলাম। আপনাদের পত্রিকা মারফৎ মাঝে মাঝে যদি এ জাতীয় আলোচনা করেন তবে নিশ্চয় অনেকে উপকৃত হবেন।

সমীর বিশ্বাস
বাগনান
হাওড়া।

মফঃস্বলে লিটল ম্যাগাজিন

আমি আপনার বহুল প্রচারিত অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। অন্যান্য বিভাগের মত চিঠিপত্রের বিভাগটিও আমি মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকি। গত ১৫ জানুয়ারীর অমৃত পত্রিকায় উক্ত বিভাগে শ্রীজীবনময় দত্তের 'মফঃস্বলে লিটল ম্যাগাজিন' আলোচনাটি পড়লাম। আলো-চনাটি ভালো হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে ত্রুটিমুক্ত নয়—(১) বাংলার বাইরের নিয়মিত প্রকাশিত পত্রপত্রিকার যে নামের তালিকা দিয়েছেন, তাতে করিমগঞ্জ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত আসামের একমাত্র প্রথম শ্রেণীর বাংলা ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'উদর্কে'র নাম তিনি উল্লেখ করেননি। (২) সাপিনী পত্রিকাটি ওই একই শহর করিমগঞ্জ থেকে বের হয়। হাইলাকান্দির নয়। এই দুটি পত্রিকার কথা (উদর্ক এবং সাপিনী) অধ্যাপিকা হেমা বড়ুয়া (ধুপড়ী, আসাম) ১ জানুয়ারী, ৭১-এর অমৃতের একই বিভাগে তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। শ্রীদত্তের কয়েকটি লেখাও উক্ত উদর্ক ও সাপিনী পত্রিকা মারফত আমি পড়বার সুযোগ পেয়েছি। তাই উদর্কের নাম উল্লেখ না করাটা এবং সাপিনী সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন, করাটা তাঁর ইচ্ছাকৃত হওয়া স্বাভাবিক নয় এইটুকু আমি বুঝতে পারলেও, অমৃতের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে এবং আলোচনার সম্পূর্ণতার খাতিরে এ চিঠিখানা অমৃতে প্রকাশ করলে বিশেষ বাধিত হবো।

নারায়ণ দাস, শিলং—৩।

(২)

'অমৃত'কে আরও আকর্ষণীয় এবং সহজ সুন্দরী করে তোলার জন্য অমৃতের পাঠক-পাঠিকারা যে আগ্রহী তা আপনাদের আগের কয়েকটা সংখ্যার চিঠিপত্র বিভাগ পড়লেই বোঝা যায়। মফঃস্বলের লেখক-লেখিকাদের অগ্রাধিকার দেওয়া নিয়ে বেশ কয়েকজন পাঠক চিঠিপত্র বিভাগের মারফৎ আপনাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনারাও সেদিকে সচেতন হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একটা পত্রিকার উন্নতি বিষয়ে পাঠকদের এইরকম চিন্তা সত্যই আশাপ্রদ। খুব ভালো লাগে যখন কোন পাঠক দরদী মন নিয়ে পত্রিকার শুভ-কামনা করেন। পত্রিকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হয়েও পাঠক মাত্রই যে কোন পত্রিকার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

অমৃতে যখন নতুন চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে কোন গল্প পড়ি তখন আমার আনন্দ হয়, যখন কোন সৎ ও শুদ্ধ কবিতা পড়ি তখন তা নিজের মনের তাগিদেই কণ্ঠস্থ করতে চেষ্টা করি। আমার বক্তব্য হল, কেবল অমৃতে নয় অনেক পত্রিকার ভালো লেখাতেও আমাদের আনন্দ অর্থাৎ পাঠকদের আনন্দ। সেসব লেখা ছিটিয়ে থাকে নানা লিটল ম্যাগাজিনে। কোনটা শহর কলকাতার, কোনটা বা দূর মফঃস্বলের। মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন-গুলো কোন বিশেষ কারণে হয় বেশী ছাপা হয় না, নয়তো ছাপা হলেও বিক্রী হয় না। তার মধ্যে যেসব ভালো, এক কথায় সুন্দর লেখাগুলো থাকে তা বেশী লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। কিছু মুষ্টিমেয় গ্রাহক আর জোর করে গছিয়ে দেওয়া ভিত্তবিত্ত ব্যক্তিদের কাছেই থাকে। সেসব পত্রিকার ভালো লেখা আমরা পড়তে পাই না। পড়বার সুযোগ পাই না। যেহেতু 'অমৃত' বহুল প্রচারিত সেহেতু আমার অনুরোধ, আপনাদের দপ্তরে যে সমস্ত লিটল ম্যাগাজিন আসে তার ভিতর থেকে নির্দ্বিধায় পুনঃপ্রকাশের যোগ্য লেখাগুলো আপনারা প্রকাশ করুন মাঝে মাঝে। কিংবা কোন এক বিশেষ সংখ্যায়। আমার মনে হয় এতে কোন সম্পাদকমহাশয় আপত্তি জানাবেন না কারণ পুনঃপ্রকাশের জন্য বিবেচিত হওয়া লেখা যে পত্রিকা হতে সংগৃহীত হচ্ছে তার নামও তাদের দেবে আপনারা স্বীকার করবেন। এইসব লিটল ম্যাগাজিনগুলোর প্রসার ও প্রচার ঘটবে এবং পাঠকরাও ভালো লেখা এবং লেখকের সন্ধান পাবেন। 'অমৃত' যদি এ ব্যাপারে সক্রিয় হয় তাহলে দূরের মফঃস্বলের লেখকরাও অনায়াসে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবেন।

—স্নেহাশিস শুকুল, সম্পাদক, 'প্রাপ্তিপত্রী'
কৃষ্ণনগর।

CENTRAL LIBRARY

পশ্চিমবঙ্গের কিশোর শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর হাত থেকে সাহসি-কতার জন্য জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

দেশে বিদেশে

'ইন্দিরা হটাও' ধ্বনির ভিত্তিতে আজ যে চতুর্দল জোট তৈরি হয়েছে তার অগ্রজ হচ্ছে উত্তর প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দল। উত্তর প্রদেশের পরীক্ষায় সফলতা ইন্দিরা-বিরোধীদের জোট গঠনে উৎসাহিত করেছিল। আর এই উত্তর প্রদেশই হচ্ছে বলতে গেলে ভারতবর্ষের রাজনীতির ভরকেন্দ্র। সুতরাং উত্তর প্রদেশে সংযুক্ত বিধায়ক দলের সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংঘর্ষটাকে আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে দুই প্রধান প্রতিপক্ষের লড়াইয়েরই একটি প্রতিরূপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের মণিরাম কেন্দ্রে যে উপনির্বাচন হয়ে গেল সেটা এই জন্যেই গুরুত্ব লাভ করেছিল। কারণ এই নির্বাচনে এক পক্ষে ছিলেন উত্তর প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী টি এন সিংহ এবং অন্য পক্ষে ছিলেন শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী। যদিও আর পাঁচজন নির্দলীয় প্রার্থী ছিলেন তাহলেও বাস্তবিকপক্ষে ভোটের লড়াইটা সীমাবদ্ধ ছিল এই দুইজন প্রার্থীর মধ্যে। উত্তর প্রদেশে শাসক কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে সংযুক্ত বিধায়ক দল নিজেদের সরকার গঠন করার পর এই প্রথম সেখানে সংযুক্ত বিধায়ক দল শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামল। আর যেহেতু সংযুক্ত বিধায়ক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সেহেতু মণিরাম কেন্দ্রের উপর সারা দেশের নজর পড়ে ছিল। মার্চ মাসে লোকসভার নির্বাচনে কি হতে পারে তার একটা পূর্বাভাস যেন এই উপনির্বাচনের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছিল।

এই উপ-নির্বাচন সম্পর্কে কিছুটা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন তাঁর দলের প্রার্থীর সমর্থনে বক্তৃতা দিতে গোরখপুরে গিয়েছিলেন তখন প্রতিপক্ষের লোকেরা হৈ-হট্টগোল করে তাঁর সভায় বাধার সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। অভিযোগ এই যে, সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর এবং মোহান্ত অবৈদ্যনাথের উপস্থিতিতেই তাদের পক্ষের লোকেরা এইভাবে বাধা দিয়েছিলেন।

হেরে যাওয়ার পর এখন ইন্দিরা-বিরোধী জোটকে আমতা-আমতা করে বলতে হচ্ছে, এক মাঘেই যেমন শীত পালায় না, এক মণিরাম কেন্দ্রেই তেমনি লোকসভার নির্বাচনের ফয়সালা হবে না। অন্য দিকে, শাসক কংগ্রেস মণিরামের রায়কে নিজেদের কাজে লাগাতে দেরী করে নি। উত্তর প্রদেশের শাসক কংগ্রেস নেতা কমলাপতি ত্রিপাঠী বলেছেন, 'মণিরামে শুধু সংযুক্ত বিধায়ক সরকারের মুখ্যমন্ত্রীরই পরাজয় ঘটে নি, মহাজোট বলতে যা বোঝায় তার সব কিছুরই পরাজয় ঘটেছে।'

মণিরামে শাসক কংগ্রেসের জয় হয়েছে সংশয়াতীতভাবে। সেখানে প্রায় সব কিছুই মুখ্যমন্ত্রী টি এন সিংহের সপক্ষে ছিল। টি এন সিং একজন পুরানো কংগ্রেস

কেন্দ্র, যদিও যে অঞ্চলে তিনি প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন সে অঞ্চলের অধিবাসী তিনি নন। শ্রীসিং [illegible] সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নির্বাচনকেন্দ্রে তাঁকে [illegible] ভাই বলে পরিচয় করান হয়েছে। তাছাড়া তাঁর নিজের দল তো সমর্থন করেইছে, তদুপরি, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, ভারতীয় ক্রান্তি দল [?] ও [illegible] এর সমর্থনও তিনি পেয়েছিলেন। যে কেন্দ্র থেকে শ্রীসিং দাঁড়িয়েছিলেন সেটি হচ্ছে হিন্দু মহাসভার আসন। হিন্দু মহাসভার আশীর্বাদও তিনি পেয়েছিলেন। গোরক্ষপুরের মোহান্ত অবৈদ্যনাথ, যিনি ১৯৬২ সন থেকে এই আসন অধিকার করে রেখেছিলেন, তিনিও এবার শ্রীসিংকেই সমর্থন দিয়েছিলেন। শ্রীসিংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী রামকৃষ্ণ দ্বিবেদী বয়সে অনেক তরুণ এবং একটি পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতা। [illegible] তিনি [illegible], এর বেশী পরিচয় তাঁর [illegible] না। শ্রীদ্বিবেদী গত নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে হেরেছিলেন। একথাটাও মনে রাখার মত যে, সরকারী কর্মচারী থেকে নির্বাচন [illegible] সুবিধাটাই পেয়েছিলেন শ্রীসিং। নির্বাচনে [illegible] এর আগে ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রীই পরাজিত হয়েছেন বলে শোনা যায় নি।

অথচ শ্রীসিং ১৬ হাজারেরও বেশী ভোটে হেরে গেছেন। মোট যে প্রায় ৩৩ হাজার ভোট দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ১৭ হাজারের বেশী অর্থাৎ ৫০-৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন শ্রীদ্বিবেদী। অর্থাৎ মানিরামের জনগণের রায় যে উত্তর প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকল না।

মানিরাম কেন্দ্রে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয়ের পর এখন টি এন সিং কি করবেন। শাসক কংগ্রেসের তরফ থেকে তাঁর পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে। শ্রীসিংও পদত্যাগ করতে অনিচ্ছুক নন। কিন্তু সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিকরা তাঁকে এখনই পদত্যাগ করতে দিতে চাইছে না। সংযুক্ত বিধায়ক দলের সমস্যা দুটো। প্রথম সমস্যা হল, শ্রীসিংয়ের পদত্যাগ মানেই মন্ত্রিসভার পতন। একবার মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে রাজ্যপাল যে আবার সংযুক্ত বিধায়ক দলের নূতন নেতাকেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করবেন তার নিশ্চয়তা কি? তারপর দ্বিতীয় সমস্যা হল, টি এন সিং বিদায় নিলে তাঁর জায়গায় সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতার পদে কাকে বসান হবে? টি এন সিং উত্তর প্রদেশের বিধানসভার সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও [illegible] নির্বাচিত করা হয়েছিল সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য। তার কারণ অন্য কোন সর্বসম্মত নেতা খুঁজে পাওয়া যায় নি। ভারতীয় ক্রান্তি দলের নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিংয়েরই স্বাভাবিক দাবী ছিল এই পদের উপর। কিন্তু তাঁকে সেই পদ দেওয়া হয় নি প্রধানত এই কারণে যে, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এখন লোকসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে দলের ভিতরকার মতানৈক্য যদি প্রকট হয়ে ওঠে [?] তাহলে [illegible] সংযুক্ত বিধায়ক দল [illegible] চরণ সিং [illegible] সমর্থন [illegible] দিয়েছেন এবং সেই সমর্থন [illegible] আবার [illegible] আলোচনা [illegible] টি এন সিংকে মন্ত্রিত্বে রেখে দেবার চেষ্টা করছেন।

*

আল ফাতা নাম দিয়ে যে [illegible] কাশ্মীর [illegible] ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার [illegible] পাকিস্তানের [illegible] আবিষ্কৃত হওয়ার পর [illegible] পাকিস্তানী হাই কমিশনের অফিসের ফার্স্ট সেক্রেটারি [illegible] ইকবাল [illegible] বহিষ্কার করেছেন।

এই [illegible] যে [illegible] কাশ্মীর উপত্যকার [illegible]। সম্প্রতি [illegible] একটি [illegible] পর সেই [illegible] গ্রেপ্তার করা হয়। এই [illegible] অনুসন্ধান [illegible] ও কাশ্মীর রাজ্যের [illegible] যে এই [illegible] পাকিস্তানী হাই কমিশনের দপ্তরের যোগ রয়েছে। কাশ্মীর থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর পাকিস্তানের হাই কমি-

গায়নার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফোরবেস বার্নহাম ২৪শে জানুয়ারী সস্ত্রীক দিল্লীতে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পালাম বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

শনারকে পত্র লিখে জানান যে, রাঠোড় আল ফতে নামক কাশ্মীরের একটি গোপন বেআইনী সংস্থার কার্যকলাপ সংগঠন ও পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন আর এই আল ফতে সংস্থাই গুপ্তচরবৃত্তি এবং অন্যান্য হিংসাত্মক ও অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। ভারত সরকার বলেন যে, রাঠোড়ের এইসব কাজ কূটনৈতিক কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এজন্য রাঠোড়কে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' বলে ঘোষণা করা হয় এবং তাকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ভারত ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অনুসন্ধানে এটিও জানা গেল যে, রাঠোড় আসলে পাকিস্থানের 'ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের লোক, কূটনীতিকের আবরণে তিনি দিল্লীতে বসে নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

রাঠোড়ের বহিষ্কারের ২৪ ঘন্টার পরই পাকিস্থান পাল্টা আঘাত হানলেন ইসলামাবাদস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনারের অফিসের ফার্স্ট সেক্রেটারি বি এল বোনীকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়ে। রাঠোড়ের ক্ষেত্রে ভারত সরকার যেমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছিলেন বোনীর বেলায় পাকিস্থান সরকার কিন্তু তেমন কিছু করলেন না, শুধু বললেন, বোনী কূটনীতিবিদের পালনীয় আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কোন অভিযোগের ভিত্তিতে নয়, নিতান্তই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্থান বোনীকে বহিষ্কার করেছে।

*

ঘানার প্রেসিডেন্ট নক্রুমা যখন বিদেশে ছিলেন সে সময়ে তাঁর দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল এবং তার ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত ও স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। আফ্রিকার আর একটি দেশেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। সেই দেশ হচ্ছে উগান্ডা আর তার ক্ষমতাচ্যুত নেতা হলেন ডাঃ মিল্টন ওবোটে।

ডাঃ ওবোটে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিতে। সম্মেলন থেকে ফিরে স্বদেশাভিমুখে যাওয়ার পথে তিনি যখন বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছেছেন তখনই খবর এল যে, উগান্ডার সামরিক বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল ইদি আমিন শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন। তার আগে জেনারেল আমিনের অনুগত বাহিনীর সঙ্গে নাকি প্রেসিডেন্ট ওবোটের অনুগত বাহিনীর ১২ ঘন্টাব্যাপী লড়াই হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ওবোটে তাঁর দেশে ফিরতে পারেন নি। তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাঞ্জানিয়ার আশ্রয় নিয়েছেন।

এই সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনকার কারণটি এখনও স্পষ্ট করে জানা যায় নি। উভয় পক্ষই বিদেশী হস্তক্ষেপের অভিযোগ করছেন। তবে এটা সুবিদিত যে, উগান্ডায় যথেষ্ট পরিমাণে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ রয়েছে। এই গোলযোগের অনেকটাই উপজাতীয়। উগান্ডা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিতে স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবল প্রভাব রয়েছে। বুগান্ডার 'কাবাকা' ওরফে রাজার বিদ্রোহ দমন করার জন্য ডাঃ ওবোটে সামরিক বাহিনী নিয়োগ করেছিলেন। লণ্ডনে নির্বাসিত অবস্থায় ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে কাবাকা রহস্যজনকভাবে মারা যান। ডাঃ ওবোটেকে একবার হত্যা করারও চেষ্টা হয়েছিল। ১৯৬২ সাল থেকে উগান্ডায় জরুরী অবস্থা চলছে এবং তখন থেকে সে দেশে কোন নির্বাচন হয় নি।

জেনারেল আমিনের কোন মতাদর্শ আছে কিনা জানা যাচ্ছে না। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট ওবোটে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজের উপজাতির লোকদের বসাবার, সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করার ও তার মর্যাদা হানি করার চেষ্টা করছিলেন। ২১-১-৭১

—পুণ্ডরীক

আদমশুমারি ঃ ভারতে

ভারতের একাদশ আদমশুমারির বছর ১৯৭১ খৃঃ। প্রতি দশ বছর অন্তর সারা দেশে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় লোকগণনা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে জাতীয় ভিত্তিতে লোকগণনার সূত্রপাত ১৮৭১ খৃঃ। সমগ্র জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের দলিল প্রস্তুতের সেই যে সূচনা হয়েছিল আজ থেকে শতবর্ষ আগে তারই উপর ভিত্তি করে পরাধীন ভারতে আরো সাতটি এবং স্বাধীন ভারতে দুটি আদমশুমারি ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এ বছর স্বাধীন ভারতের তৃতীয় আদমশুমারির কাজ পুরোদমে চলছে।

হিব্রু কিম্বা আরবী ভাষায় 'আদম' শব্দের অর্থ মানুষ। লোকগণনা পদ্ধতির সূত্রপাত কবে কোথায় হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা যায় না। খৃষ্ট-জন্মের বহুদিন পূর্বেই চীন, ব্যাবিলন, মিশর ও পারস্য দেশে জনগণনার প্রচলন ছিল বলে নানা নথিপত্রে উল্লেখ পাওয়া পাওয়া যায়। ২ খৃঃ চীনের জনসংখ্যা ৬ কোটি ছিল বলে দাবী করা হয়। বাইবেলেও জনগণনা পদ্ধতির বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। মোজেস সিনাই পর্বতে বহু ইহুদীদের গণনা করার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের দুই রাজা সল ও ডেভিড আংশিক গণনাকার্য সমাধা করেছিলেন নিজেদের প্রয়োজনেই। সুপ্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে পাঁচ বছরের ব্যবধানে গণনাকার্য পরিচালনা করা হত। সিজার অগাস্টাসের রাজত্বকালে (১৪ খৃঃ) সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে আদমশুমারি হয়েছিল। অগাস্টাসের মৃত্যুর সময় ১০ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচ কোটির মত ছিল বলে অনুমিত হয়। বহু অনুসন্ধানের পর বেলক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ভারতের সভ্যতাও সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (৩২৪-৩০০ খৃষ্টপূর্ব) মন্ত্রী কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রে আদমশুমারীর বিষয়ে নানা তথ্য জানা যায়। সেকালে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য লোকগণনা করা হত। জনগণের জাতি, পেশা প্রভৃতি বিষয়েও তথ্য সংগৃহীত হত। এ থেকে অনুমান করা অমূলক নয় যে, খৃষ্টজন্মের বহু পূর্বে ভারতে আদমশুমারির প্রচলন ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ১৮৬০ লক্ষ। আর রাজধানী পাটলীপুত্রের জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান যত্নসহকারে রাখা হত বলে মেগাস্থিনিস বিবরণ দিয়েছেন। আকবরের রাজত্বে কোতয়ালের আচরণবিধির মধ্যে প্রধান ছিল নগরের জনসংখ্যার হিসাব রাখা। 'আইন-ই-আকবরী'-এ এর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। মোরল্যান্ডের হিসেব মত আকবরের শাসনকালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ১০ কোটি।

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের একশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তারা লোকগণনার কাজে হাত দেন, এটা কম আশ্চর্যের কথা নয়। অথচ জাতীয় ভিত্তিতে ১৭৯০ খৃঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১৮০১ খৃঃ খোদ ইংল্যাণ্ডে আধুনিক পর্যায়ের আদমশুমারির প্রচলন হয়েছে। আর ভারতে ইংরেজ সরকার গাঁট পুঁটিয়ে বসেছিলেন। সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নতি সাধনে সেন্সাস যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে সে কথা তারা সেদিন বুঝতে পারেন নি। ১৮২২ খৃঃ ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট-নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটির ঐতিহাসিক রিপোর্টে লোকসংখ্যা সম্পর্কে ভারতের ইংরেজ শাসকদের অজ্ঞতার নিন্দা করা হয়েছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আদমশুমারির প্রচলনের পূর্বে কয়েকবার বিচ্ছিন্নভাবে জনগণনা করা হয়েছিল। ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ খৃঃ পর্যন্ত কোন কোন প্রদেশ বা শহরে পৃথকভাবে গণনা করা হয়েছিল।

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আদমশুমারি শুরু ১৮৭১-৭২ খৃঃ। তবে সে সময় সব অঞ্চলে একই সময় গণনাকার্য সম্পন্ন করা হয়নি এবং কয়েকটি অঞ্চল বাদও পড়েছিল। সে কারণে আধুনিক পর্যায়ের আদমশুমারির সূত্রপাত ১৮৭১-৭২ খৃঃ হয়েছে একথা স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে আইনসম্মত পদ্ধতি অনুসারে আদমশুমারির সূচনাকাল ১৮৮১ খৃঃ রিপোর্টকে ধরার পক্ষে অনেকে মত দিয়ে থাকেন। তথাপি দিকে দিয়ে ১৮৭১ খৃঃ রিপোর্ট নির্ভুল বলা যায় না। তখন অজ্ঞ জনগণ অহেতুক ভীতির বশবর্তী হয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছিলেন বলে হিসেবে কিছু গোলমাল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ব্রিটিশ সরকারের পরিচালনায় ভারতে সর্বমোট আটটি সেন্সাস সমাপ্ত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে দুটি আদমশুমারি শেষ হয়েছে। দশটি সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা নিম্নরূপ :—

সাল	জনসংখ্যা (লক্ষ)
১৮৭১	২০৮৯
১৮৮১	২৫০২
১৮৯১	২৭৯৬
১৯০১	২৮০৯
১৯১১	৩০০১
১৯২১	৩০৫৭
১৯৩১	৩০৮১
১৯৪১	৩৮৯০
১৯৫১	৩৬১১
১৯৬১	৪৩৯২

উপরের তালিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৬১ খৃঃ পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ধরা হয়েছে, শুধু নেপাল, ভুটান এবং ফরাসী ও পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের লোকসংখ্যা তালিকাভুক্ত করা হয় নি। তাছাড়া ১৯৩১ খৃঃ হিন্দুরা বহু স্থানে ভিন্ন দিয়ে ছিলেন আর ১৯৪১ খৃঃ মুসলমানগণ বেশী হিসাব দেওয়ার ফলে সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় নি। স্বাধীন ভারতে যে দুবার লোকগণনা হয়েছে তাতে সংগত কারণেই পাকিস্তানের লোকসংখ্যা অনুপস্থিত রয়েছে। অন্য দিকে ১৯৬১ খৃঃ সেন্সাস রেকর্ডে ফরাসী ও পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের লোকসংখ্যা ভারতের লোকসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ভারতের জনসংখ্যায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম। ১৯০১ খৃঃ থেকে পরবর্তী ৬০ বছরে প্রতি হাজারে ৩২ জন নারী কমেছে। নিম্নের তালিকাটি লক্ষণীয় :—

সাল	সংখ্যা (প্রতি হাজার পুরুষে)
১৯০১	৯৭২
১৯১১	৯৬৪
১৯২১	৯৫৫
১৯৩১	৯৫০
১৯৪১	৯৪৫
১৯৫১	৯৪৬
১৯৬১	৯৪০

অন্য দিকে এই ৬০ বছরে ভারতের মোট জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৫·১ শতাংশ।

সাম্প্রতিক নজীরও উল্লেখ করার মত। ১৯৫১ খৃঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩·৩১ শতাংশ আর ১৯৬১ খৃঃ ২১·৫০ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির নানাবিধ কারণ রয়েছে। বাল্য বিবাহ বহুল প্রচলিত হওয়ায় স্ত্রীলোকের সন্তানধারণের কাল দীর্ঘ হয়েছে। তাছাড়া পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩ জন ও স্ত্রীদের মধ্যে শতকরা একজন মাত্র অবিবাহিত থাকেন। মৃত্যুর হারও কমে গিয়েছে। ভারতে জন্ম-মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) নিম্নরূপ :—

	জন্ম		মৃত্যু	
দশক	স্থূল	অনুমিত	স্থূল	অনুমিত
১৯২১—৩১	৩৩	৩৬	৩৩	৩৭
১৯৩১—৪১	৩৫	৪৫	২৬	২১
১৯৪১—৫১	—	৪০	৩১	২৬
১৯৫১—৬১		৪০·৭		২১·৬

ভারতে শিশু মৃত্যুর হার খুবই বেশী। অধ্যাপক ডি ঘোষ হিসাব করে জানিয়েছেন যে, নবজাতক শিশুদের শতকরা ৪৫ জনের ১৫ বছরের মধ্যেই মৃত্যু হয়। একজাতীয় ক্ষতি অপূরণীয়। জাতীয় আয়ের শতকরা ২২·৫ অংশ এদের লালন-পালনের জন্য খরচ হয়।

ভারতের গড় বসতিঘনত্ব ভিন্ন-ভিন্ন রয়ে আছে। চীনে প্রতি বর্গমাইলে বসতিঘনত্ব ১০৫, অথচ ১৯৬১ খৃঃ ভারতের প্রতি বর্গমাইলে গড় বসতিঘনত্ব ৩৮৪!

ফিরোজ মিনার : গৌড়
—ফটো : শীতাংশু মিত্র

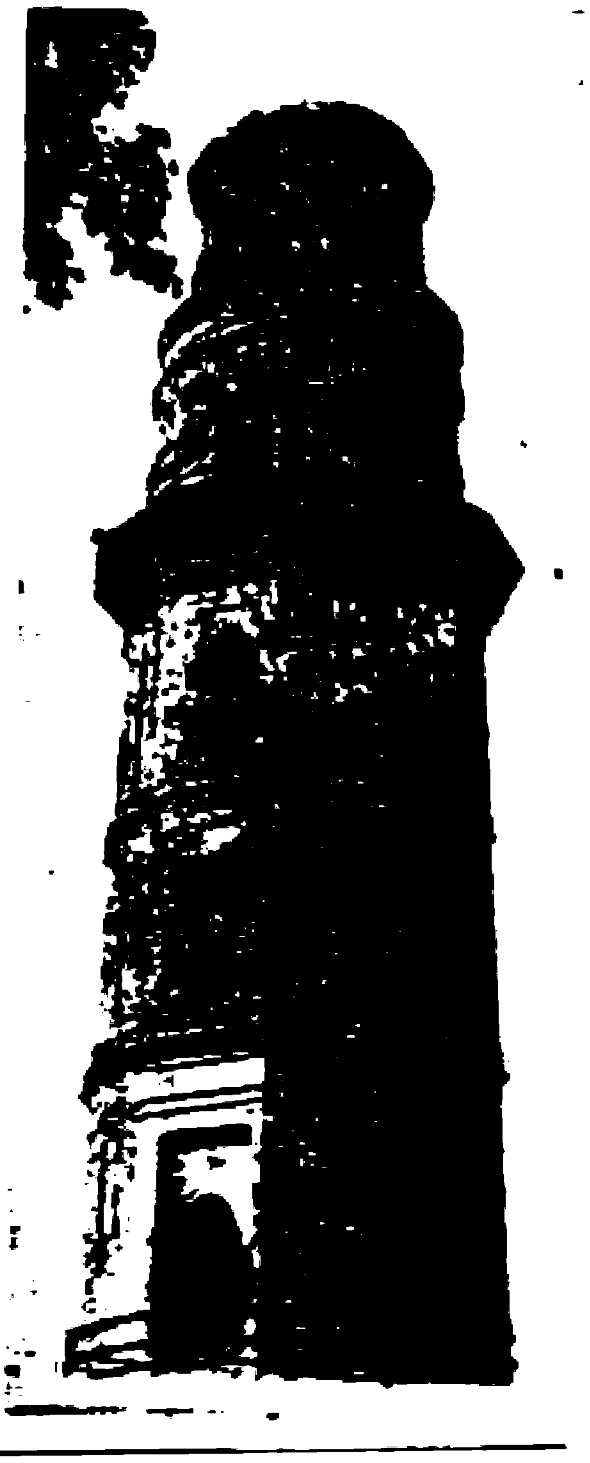

১৯৫১ খৃঃ রিপোর্টে ছিল ৩১৬। আর অস্ট্রেলিয়ার মাত্র ২! অন্যদিকে শিক্ষার বিস্তার হয়েছে। ১৯৫১ খৃঃ তুলনায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের অনুপাত ১৯৬১ খৃঃ গণনা অনুসারে বেড়েছে ৭·৮ শতাংশ: ১৯৬১ খৃঃ রিপোর্টে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের অনুপাত দেখান হয়েছে ২০·৭ শতাংশে।

ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর হার মোটামুটি নির্ভুলভাবে জানা গেছে ১৯৬১ খৃঃ সেন্সাস রিপোর্টে। তালিকাটি (প্রতি দশ হাজার হিসাবে) এই রকম :—

হিন্দু	৮৩৫১
মুসলমান	১০৬৯
খৃস্টান	২৪৪
শিখ	১৭৯
বৌদ্ধ	৭৪
জৈন	৪৬
অন্যান্য	৩৭

মুসলমানের সংখ্যা ১৯৫১ খৃঃ তুলনায় ১৯৬১ খৃঃ ২৫·৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ খৃঃ রিপোর্টে মুসলমানের সংখ্যা দেখান হয়েছে ৪৬৯৩০৩৫৭ জন। অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে ১০·৬৯ অংশ। অপর দিকে অস্বাভাবিক হারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও বেড়েছে। শেষ রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৩২৫০২২৭ জন। ১৯৫১ খৃঃ তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬৭১·৭ অংশ।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সেন্সাস রিপোর্ট কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস। ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদগণ সংখ্যাতত্ত্বের রিপোর্ট থেকেই গবেষণার উপাদান পাবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সরকারও সেন্সাস রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই রচনা করেন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারেও সেন্সাস রিপোর্ট সহায়তা করে। অর্থাৎ আদমসুমারী রিপোর্টে একটি দেশের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

জনসংখ্যা জানাই আদমসুমারীর প্রধান উদ্দেশ্য হলেও অন্যান্য নানা বিষয়ে আলোকপাত করে থাকে সেন্সাস রিপোর্ট। ভৌগোলিক দিক দিয়েও এর উপযোগিতা কম নয়। শহর কিম্বা গ্রামের কোন এলাকা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মিলবে দীর্ঘ রিপোর্টের পাতায়-পাতায়। রাস্তাঘাট, বাড়ী-ঘর, খাল-বিল, নদী-নালা, মাঠ, পাহাড়, ডাকঘর, বিদ্যালয়, কলেজ, মন্দির-মসজিদ, দর্শনীয় স্থান, সিনেমা-থিয়েটার গৃহ, উল্লেখযোগ্য অফিস-আদালত, কলকারখানা, রেল স্টেশন, হাট-বাজার, হাসপাতাল প্রভৃতির হদিশ থাকে এতে। এছাড়া ১৯৩১ খৃঃ সেন্সাস পর্যন্ত ব্যাপকভাবে কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হত। পরে এ ব্যাপারে নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় আলাদাভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয় নি। প্রতি লক্ষ লোক অনুপাতে কর্মক্ষম ব্যক্তির ৫০ বছরের আনুপাতিক হিসাব নীচে দেওয়া হল :—

কুষ্ঠরোগী	উন্মাদ	মোট
৫৭	৩৫	৪০৭
৪৬	২৭	৩১৫
৩৩	২৩	২২৯
৩৫	২৬	২৬৭
৩২	২৮	২৫২
৪২	৩৪	৩১৪

সাল	কানা-অন্ধ	মূক-বধির
১৮৮১	২২৯	৮৬
১৮৯১	১৬৭	৭৫
১৯০১	১২৯	৫২
১৯১১	১৪২	৬৪
১৯২১	১০২	৬০
১৯৩১	১৭২	৬৬

ভারতের মত এত বড় দেশে আদমসুমারী সঠিকভাবে পরিচালনা করা খুবই দুরূহ কাজ। গণনার সময় দুটি বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এক, গণনার সময় একাধিকবার কোন একজন লোককে যেন ধরা না হয়। দুই, কোনও লোক গণনা থেকে বাদ পড়লেও চলবে না। এ জন্যই সারা দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে গণনা শুরু ও শেষ করা চাই। কোন একটি দেশের কোন এক নির্দিষ্ট তারিখের জনসংখ্যাই সেন্সাস রিপোর্টে দেখানো হয়। ১৯৭১ খৃঃ আদম-শুমারীতে ১লা এপ্রিলের লোকসংখ্যা ধরা হবে বলে স্থির হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে গণনা করতে হলে এক বছর আগে থেকেই প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। ১৯৩১ খৃঃ সেন্সাস পর্যন্ত ভারতে সারা দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে গণনা করা হত। এ ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হওয়ায় ১৯৪১ খৃঃ থেকে নতুন পদ্ধতির সাহায্যে গণনার কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এখন নির্দিষ্ট দিনটির কিছু দিন আগে থেকেই কাজ শুরু করা হয়। তারপর দু-একদিনের মধ্যে পুনর্গণনার দ্বারা 'রিভিশন' করার ব্যবস্থা হয়েছে। জন্ম-মৃত্যু ও অতিথি গমনাগমনের জন্য হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে যোগ-বিয়োগের দ্বারা জনসংখ্যা নির্ভুল করা হয়। এবার কিন্তু আদমসুমারীর প্রাথমিক গণনার কাজ সারা দেশে একই সময়ে হচ্ছে না। সারা দেশে ১০ মার্চ লোক গণনার কাজ শুরু হচ্ছে। অথচ নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে গণনা কার্য সমাধা হবে ১ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। অবশ্য ফুটপাথের বাসিন্দাদের সারা ভারতে ৩১ মার্চ গণনা করা হবে। আর ১ থেকে ৪ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সমেত সারা দেশেই লোক গণনার 'রিভিশন' করা হবে।

এতকাল প্রতিটি সেন্সাসের পূর্বে সরকার একটি আইন প্রণয়ন করতেন। সেন্সাসের পর সেই আইনের কোন স্থায়িত্ব থাকত না। বার-বার একই আইন প্রণয়নে অসুবিধার জন্য ১৯৪৮ খৃঃ স্বাধীন ভারতের তদানীন্তন সরকার আদমসুমারী সংক্রান্ত আইনটি প্রণয়ন করেন। সেই স্থায়ী আইনে গণনাকারী ও জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তবে কোন কোন বিষয়ে সেন্সাসে আলোকপাত করা হবে তা ঠিক হয় তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে। এবারের সেন্সাসে কিছু নতুন বিষয়ের উপর বিশেষ তথ্য সংগৃহীত হবে বলে স্থির হয়েছে। এক, জনসংখ্যার কত অংশ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বসবাস করছেন তা জানা যাবে। দুই, নাগরিকের স্থায়ী চাকরী ছাড়া অন্য কোন উপায়ে রোজগার আছে কিনা তাও জানা যাবে। তিন গত বছর কোন সন্তানের জন্ম হলে তাও জানাতে হবে গণনার সময়। এটাও নতুন হবে।

১৯৭১ খৃঃ রিপোর্ট প্রকাশিত হলে অন্যান্য বছরের রিপোর্টের সঙ্গে তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নানা বিষয়ে নতুন তথ্য জানা যাবে। এর উপরই ভিত্তি করে রচিত হবে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-পন্থা। সেজন্য সেন্সাস রিপোর্ট যাতে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল হয় সেদিকে গণনাকর্মী ও জনগণের সজাগ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জনগণের দেওয়া তথ্য নির্ভুল না হলে পরিসংখ্যানে গরমিল থেকে যাবে। কেউই চাইবেন না যে একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস ভুলে ভরে থাক।

সম্পাদকীয়

সতর্কতা প্রয়োজন

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল দেশের যুবশক্তির কাছে হিংসার পথ বর্জনের জন্য যে আবেদন জানিয়েছেন তার যাথার্থ্য সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই আজকের পশ্চিমবাংলায়। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে এই রাজ্যে গুপ্তহত্যা, সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাত্রা ততই বাড়ছে ভয়াবহভাবে। গত সপ্তাহে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালেই ডায়মন্ডহারবারে গঙ্গার ধারে ছ'টি মৃতদেহ আবিষ্কার পশ্চিমবঙ্গবাসীদের আতঙ্কে স্তব্ধ করে দিয়েছে। বামপন্থী নেতা জ্যোতি বসুর গাড়ির ওপর বোমা ফেলা হয়েছিল তাঁকে হত্যার উদ্দেশে। হুগলীর চন্ডীতলা এলাকার ফরওয়ার্ড ব্লকের একজন প্রার্থী দিনেদুপুরে খুন হয়েছেন। এ ছাড়া এমন দিন যাচ্ছে না যেদিন একাধিক মানুষ আততায়ীর হাতে নিহত না হচ্ছে।

অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে রাজ্যপালের ভাষণে যে দাবি করা হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির মিল সামান্যই। পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন আজ যেন এই হিংসার তান্ডবে দিশেহারা। কীভাবে এই ভয়ানক অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করা যায় তার ভার আজ শুধু প্রশাসকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার দিন নয়। কারণ, হিংসার আগুন ধীরে ধীরে গোটা সমাজকেই গ্রাস করবে যদি না সমবেত প্রচেষ্টায় এর বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াতে পারি। আশ্চর্যের কথা এই যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও বেকারী আছে, অসন্তোষ আছে, অভিযোগ আছে, কিন্তু তার আত্মপ্রকাশের পথ পশ্চিমবাংলার মতো সর্বনাশা হয়ে দেখা দেয়নি। এখানে অনেক স্কুল কলেজই নিয়মিতভাবে ক্লাশ নিতে পারছে না। পরীক্ষার দুর্দশাও বর্ণনাতীত। এই পরিস্থিতিতে ঘোষিত হয়েছে নির্বাচন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে নির্বাচন স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। কিন্তু নির্বাচন হল শান্তিপূর্ণভাবে সরকার মনোনয়নের একটি পন্থা। যে সরকার আছে তার নীতির ও কার্যপদ্ধতির অনুমোদন অথবা প্রতিবাদ জানাবার সুস্থ ও সুনিশ্চিত পন্থা হিসাবেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আজ সে অধিকার সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হবে। নতুবা এই অস্থিরতা ও উদ্দাম বিক্ষোভের কোনো সুরাহা হবে না।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান দায়িত্ব হল বর্তমান অশান্তিকর অবস্থার অবসানকল্পে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ। শুধু পুলিশের ওপর বরাত দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব তাঁরা এড়াতে পারেন না। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দল তাঁদের নির্বাচনী প্রচারকার্য শুরু করেছেন। প্রার্থীদের নাম ঘোষিত হয়েছে। নির্বাচনের পর ক্ষমতা পেলে তাঁরা কী করবেন তার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন দলগুলো। সাধারণ ভোটার কী চান? তাঁরা সংবিধান প্রদত্ত ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন নিজেদের পছন্দমত সরকার গ্রাথার জন্য। এই অধিকার নিরঙ্কুশ এবং নিঃশর্ত। গণতান্ত্রিক সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত এই ভোটাধিকার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজের পরিবর্তন আনতে হলে নিজেদের খুশিমত যে-ধরনের সরকার দরকার নাগরিকদের সে অধিকার দেওয়া হয়েছে এই ভোটপত্রে। এখানে সকলেরই অধিকার আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার। গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের অধিকারও সকলেরই। কিন্তু এই অধিকার যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায় তার উপযোগী আবহাওয়া ও পরিবেশ না থাকলে কীভাবে সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিমত জানাবেন? সৈন্য পাহারা দিয়ে? পুলিশ দিয়ে? অনিশ্চিত অবস্থা থেকে সাধারণ মানুষের মনে এই অধিকার প্রয়োগ নিয়ে দ্বিধা ও সন্দেহ দেখা দিতে পারে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কাজ করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এবারে এই দায়িত্ব নেবার লোক যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে না বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্তই নিরাশার বিভিন্ন চিত্র। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই দুশ্চিন্তা বাড়ছে। তাই এখন থেকেই সকল দলের ও মতের নাগরিকদের সমবেতভাবে চেষ্টা করতে হবে পশ্চিমবাংলাকে এই অশান্তি ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত করতে। এ ছাড়া অন্য কোনো কাজই এই মুহূর্তে অগ্রাধিকার পেতে পারে না। অনেক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছে এই দুর্ভাগা রাজ্য। এখন তাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দেবার সময়। এই দায়িত্ব যদি আমরা সকলে মিলে পালন না করি তাহলে আমাদের এতদিনের সাধনা ও সংগ্রাম, গণতন্ত্র ও সমৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা যাবে ব্যর্থ হয়ে। গণতন্ত্র রক্ষার প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে অতন্দ্র সতর্কতা। আমরা কি সেই সতর্কতা নিয়ে জেগে আছি? শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতার মাধ্যমেই এই সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

ঘরে রেখে এলাম ॥

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিঁড়ির নীচে সোনালী জর্দার কৌটা
আজান ভাই
বুকে উথাল ব্যথা আর লালগামছায় ছুরি
বটের তলায় দোলনা বাঁধা ছায়া
জানলায় তার চুলের ফিতে
(হাস্নুহানার বোন)

ফিরিওয়ালা গলির মোড়ে
সুর্মাদানি বেচে
হলুদ মেঘের আনাগোনা
বকশালিকের গান
চম্পাবতী বর্ষার রাত হীরে নোলক বৌ
খড়ের চালে ধোঁয়ায় আকুল
গর্ভবতী পাখী।

আমি ঘরে ফেলে এলাম
তিনটে জোনাক-টিপ
জলের ঝারি ফুলের টবের পাশে
আংটি রইলো বাক্সবন্দী
আঙুলগুলির বেগম কাঁদে
মাকউঠোনে খোকা নিয়ে কোলে
আজান ভাই

হায়রে আমি মানৎ করি
সেই স্বদেশের তীর্থপথে
হতো দেব সারাটা কাল
চৈত্র মাসে পাগলা-গাজন দিনে

তার দুটি চোখ
সরস ফলের আস্থা যেন
বিকেল বিকেল দিনে

দোতারাটা খাটের ওপর
(যেমন রাণী এলিয়ে শরীর
ছ-পন কড়ি নিয়ে
একাই খেলে)

ঘরে আমি রেখে এলাম
বৌ-বৌরীর ছানা
নোনতা হাতে একটি খালস-পাখী
তারে দুটো হলুদ শাড়ী
একটা রঙীন কাঁথা।

নন্দিতা তোমার চোখের পাতায় ॥

ফিরোজ চৌধুরী

তোমার কাছে আমার সর্বস্ব গচ্ছিত রেখেছি
যদিও প্রয়োজনে পলায়নপর মূর্খ পুরুষ আমি
তবু ভালো লাগে
যেমন ভালো লাগে করতলে নখ দিয়ে সুড়সুড়ি দিলে
যেমন ভালো লাগে হিম সকালে একা একা
সুবর্ণরেখার তীরে হেঁটে যেতে

তোমার চোখের পাতায়
আমার সাতাশ বছরের কৌমার্য
উদ্ধত অহংকার
তোমার চোখের পাতায় ঘন বৃষ্টি পতনের শব্দ
নন্দিতা, তোমার চোখের পাতায় আমার সব হারিয়ে যায়...

কেউ কেউ আমার সাথে আড়ি পেতেছিল বলে
তুমি ঠোঁট ফুলিয়েছো, নন্দিতা
সেই যে সেবার এক নাবিক আমায় বলেছিল—
অন্ধকারে সমুদ্র-যাত্রা হবে
তোমায় নিয়ে যাবো
আমি জানি না সেবার সমুদ্র-যাত্রা হোয়েছিল কিনা
কিন্তু সে নাবিক আর ফিরে আসেনি
এমনিতর অনেকেই ফিরে আসে না...

তোমার চোখের পাতায় আমার সাতাশ বছরের কৌমার্য
উদ্ধত অহংকার
তোমার চোখের পাতায় ঘন বৃষ্টি পতনের শব্দ
তোমার চোখের পাতায় আমার সব—সব হারিয়ে যায়...

জলবিন্দু

বীরেন্দ্র দত্ত

সকালের বাজার নিয়ে অনাদি ঘরে পা দিতেই করুণা মুখিয়ে উঠল, কি ব্যাপার বল তো? বাইরে বেরুলে তোমার হুঁশ থাকে না বাজারটা তাড়াতাড়ি বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে?

চেঁচিও না, আস্তে কথা বল। পাশের ঘরে সুজিত আছে। থলে থেকে দুধের বোতলটা মেঝেয় রাখতে রাখতে অনাদি যেন নিজের মনেই গজ গজ করল, অকারণ চেঁচানো স্বভাব হয়ে গেছে। বাজারের থলেটা এক পাশে সরিয়ে রাখল।

বাইরে আসন্ন শরতের রোদ। সকাল থেকেই অসহ্য গরমে গনগনে আঁচ ফেলে-দেওয়া উনুনের মত মনে হচ্ছে রোদটাকে।

করুণা জানলা থেকে, দড়ি-বাঁধা তারের গেঞ্জি-মোজা রোদ দেখল। গলা চড়িয়ে বলল, কেন চেঁচাব না? তোমার ভয়ে? মেয়ে খোকা সব ঘুমিয়ে গিয়েছিল। হাতে ভিজে নোংরা ন্যাতা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কটা বেজেছে এখন খেয়াল আছে? এদিকে অফিসের ভাতটা তো ঠিক সময়েই চাই।

না পারলে দেবে না। অফিসের ক্যান্টিন আছে। অনাদি ঘামে গা-পিঠ ভেজা জামাটা খুলতে খুলতে বলল।

থাক অনেক দেখেছি। মাসের শেষে এসব কথা বোলো না। যার মাসের এক তারিখেই ছেলেমেয়েদের ভাত দেবার পয়সা জোটে না, তার আবার বৌয়ের ওপর রাগ দেখিয়ে ক্যান্টিনে খাওয়া। দুপদাপিয়ে পা ফেলে করুণা বারান্দার এ কোণে এল। ন্যাতাটা সশব্দে ছুঁড়ে রাখল। বালতিতে তুলে রাখা জলে হাত ধুতে ধুতে বলল, উনুন জ্বলে যাক, আমি আর রাঁধতে পারব না। বারান্দার ও কোণে ছোট্ট যেন অংশটা রান্নাঘরের মতন। ওখানে পিঁড়ি টেনে চুপ করে বসে রইল।

ভোরবেলা স্কুল যাবার সময় টুটুলটা ভয়ংকর বেয়াড়াপনা করছিল। ক্রমশ ও যেন শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে। করুণা সারাদিন ওকে সামলাতে পারে না। তার ওপর অনাদির তো কোন শাসনই নেই। বরং আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে। সকাল থেকে করুণার মেজাজ তাই ভাল নেই।

অনাদি ছেঁড়া রান্নাঘরের কালি-ঝুল লাগা হাতপাখাটি বেশ কড়কড়াস জোরে জোরে নাড়তে লাগল। টুটুলের কথা মনে হল। একটুও বাতাস গায়ে লাগছে না দেখে পাখাটার দিকে একবার তাকাল। এক সময় রাগে ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দায়। বাইরে তাকাল। দেখল, করুণা গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে। একটু দূরে উনুন জ্বলছে। গনগনে আঁচ। অনাদি কি ভেবে বাজারের থলেটা করুণার সামনে নিয়ে এসে উপুড় করল। মাসের শেষ। সামান্য কয়েকটা শুকনো আলু-পিঁয়াজ, কিছু শাকপাতা মেঝের ছড়িয়ে পড়ল। কাগজের ঠোঙাটা পড়তেই ভক করে জল-পচা চিংড়ির গন্ধ এল। নাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

করুণা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইল।

বড় বিরক্ত কর তুমি। অনাদি গলা চড়াল, তুমি কি মনে কর, আমি বাজারে গিয়ে আড্ডা মারি?

তা নয়তো কি?

অবুঝের মত কথা বোলো না। অনাদি যেন শাসন করল। জানোই তো, ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিয়ে সেই মোড়ের ডিপো থেকে দুধ নিতে হয়। ওখান থেকে বাজার ঘুরে আসতে দেরী হবে না?

মিথ্যে বোলো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজটা কি পড়তে হয় না?

কাগজ পড়া আড্ডা দেওয়া নয়।

নিজের যখন কেনার পয়সা নেই, অন্যের কাগজ পড়ে নেওয়ার হ্যাংলামো কেন? লজ্জাও করে না?

মাস যত শেষ হতে থাকে, অনাদির মাথা ভিতরে ভিতরে গরম হতে থাকে। করুণাও অকারণ খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চীৎকার করে। অনাদি রাগ প্রকাশ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃসঙ্গ অসহায়তা স্ত্রীর সামনে ওকে শান্ত নির্জীব করে তোলে। এসব সময়ে করুণা যখন পয়সার কথা তুলে খোঁচা দেয়, অনাদি নিজের মধ্যে ভীষণ এক অস্থিরতায় ছটফট করতে থাকে।

করুণার কথা শুনে ওর দিকে তাকাল অনাদি। ভিতরে রীতিমত কাঁপছে। করুণা বাজার গোছাতে বসলে অনাদি কি ভেবে ঘরে চলে এলো। জানালার সামনে চুপ করে বসে রইল।

বিয়ের বছর দুয়েক আগে অনাদি এ-বাড়ির নীচের তলায় ভাড়াটে হয়ে আসে। বিয়ের পর ওপরের ঘর দুখানা নেয়। নীচের দুটি ঘর-দালান, উঠোন বাড়িওলার ব্যবসার কাঠকুটোয় ভর্তি। গরীব মধ্যবিত্ত কেরাণী অনাদি। টুটুল, মিঠু আসার পর ওপরের দুটি ঘরের ভাড়া গুনতেও পারছে না। তাই মাসদুয়েক আগে অফিসের এক বন্ধুর দূরসম্পর্কের প্রায় সমবয়সী ভাই ললিতকে ভাড়া দিয়েছে পাশের ঘরটা।

ললিত অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়, এমন কি অনাদির নটায় অফিস বেরিয়ে যাবার পরেও। এখনও কি ঘুমোচ্ছে, না, করুণার হঠাৎ চীৎকারে ঘুম ভাঙা অবস্থায় শুয়ে আছে? অনাদি পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে বাইরে পেয়ারাগাছটায় দৃষ্টি ফেলল। দূরে খালের ধার দিয়ে ভারী কাঠ-বোঝাই লরী যাবার শব্দ কানে এল। ভারী লরী গেলে এ বাড়িটা কাঁপে। অনাদির মাথা ধরেছে যেন!

করুণা ঘরে ঢুকল। সামনে চায়ের কাপ রেখে বলল, আজ কত পয়সার বাজার করেছ?

কেন?

ও বেলা খাবে কি?

কি করব, পয়সা নেই। দেখি অফিসে ক্যাশের কাছে যদি ধার পাই। আজকের মত চালিয়ে নাও।

কি করে চালাবো? করুণা রেগে উঠল। আমার কাছে কি তুমি টাকার হুন্ডি দিয়ে রেখেছ যে আমি চালাব?

কথা বললেই কথা বাড়ে। অনাদি চুপ করে রইল।

একটি পয়সা হাতে তুলে দাও না, তার ওপর কি করে বলো চালিয়ে নাও? উবু হয়ে বসে করুণা ঘরের কোণে কি যেন খুঁজতে লাগল।

কেন পুরনো কথা তুলছ! রাগিয়ে দিও না, ভাল লাগছে না।

ভালো তো লাগবেই না—টাকার কথা বলছি যে! বিয়ে যখন করেছিলে খেয়াল ছিল না? ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, বেশী উপায়ের কথা একবারও ভেবেছ? শুধু ওভার-টাইম খাটলেই হবে?

আর কি করতে বল?

ন্যাকার মত কথা বোলো না। অফিসের পর আড্ডা দিও, তা হলেই হবে। করুণা গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

ও ঘরে ললিত আছে, বাইরের লোক। এটা কি করুণা বোঝে না? অনাদির সামনে আধ-খাওয়া ঠান্ডা চায়ের কাপটা পড়ে রইল। অনাদি কাঠ হয়ে বসে রইল।

মানিকতলা থেকে অনাদিকে যেতে হয় বেহালার শেষে আরো কিছুটা দূরে। অনাদি নটার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে [illegible] [illegible] কথা কাটাকাটির জন্যেই আজ বেরুতে দেরী হয়ে যাবে অনাদির। তাই ভাত খেতে বসে কোন কথা বলল না।

কটায় ফিরছ আজ? করুণা উনুনে কয়লা দিতে দিতে বলল।

মুখ-নীচু অনাদি নিরুত্তর।

কি গো শুনতে পাচ্ছ না?

কটায় আবার? যেমন ফিরি।

আজও কি ওভারটাইম?

জানি না, গিয়ে জানতে পারব।

ওভারটাইম না থাকলেও তো এসে মিথ্যে কথা বলবে?

অনাদি এবার যেন সত্যিই রেগে গেল। আমাকে মিথ্যেবাদী বলছ?

বলার আর কি আছে? আমি কি বুঝতে পারি না, মনে কর? পাছে সন্ধ্যায় এসে ছেলেমেয়েদের দেখতে হয়, আমি যদি আবার সঙ্গে নিয়ে বেরুবার কথা বলি তাই ওভারটাইম বানিয়ে নাও!

অনাদি খাওয়া বন্ধ করে করুণাকে দেখতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে সেই অসহায়ত্ববোধ অনাদির মধ্যে একটু কাজ করছে না। চোয়াল শক্ত হল অনাদির। মুখ সামলে কথা বলো, করুণা! আমিও একটা মানুষ। গলার স্বর চাপা, কঠিন শাসন মাখানো।

কেন? মারবে নাকি? করুণা গলা চড়াল।

অনাদির আবার মনে পড়ল, পাশের ঘরে ললিত আছে। শেষ পর্যন্ত তাও হতে পারে। শব্দগুলো অনাদির রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে যেন কেঁপে কেঁপে জড়িয়ে গেল। হাতের মুঠোয় মাখা ভাতের পিন্ড।

অনাদি ওকে মারতে পারে, এই প্রথম করুণা অনাদির নিজের মুখ থেকে শুনল। গুম হয়ে কিছু সময় হেঁট মাথা অনাদির দিকে তাকিয়ে থাকল। হঠাৎ ধরা গলায় বলল, আমাকে মারার আগে তোমার ছেলেমেয়েদের সামলাও। আমি পারব না। সারাদিন বাইরে থাকবে তুমি, আর বস্তী-বাড়ির মত ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে?

কেন, তুমি তো আছ?

বলেছি তো আমি পারব না। খেতে-পরতে দিতে যে পারে না, তার আবার বড় বড় কথা! করুণা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। আমার মা যে বেঁচে নেই, না হলে তাদের এনে দেখাতুম, কোথায় আমায় বিয়ে দিয়েছে, আমি কি রকম আছি! চাপা কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে করুণা অনাদির সামনে থেকে উঠে গেল।

অনাদি নিশ্চল, পাথর। ঠিক এই মুহূর্তে রাগ, ভয়, লজ্জা, অসহায়তা—যেন কোনটাই ওর মধ্যে নেই। নিজের ওপর একজাতীয় ঘৃণায় আধ-খাওয়া ভাতের থালাটা হাতে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দায়।

এ ঘরে ললিত চমকে উঠল। অনেক আগে ঘুম ভেঙে গেছে ওর। ঘুমানোর ভান করে পড়েছিল বিছানায়। শরীরে অনেক দিনের দুরারোগ্য ক্ষতের যন্ত্রণা-দায়ক অস্বস্তির মত অনাদি-করুণার ঝগড়া প্রায় প্রতিদিন লেগেই থাকে। কিন্তু আজ যেন রোগটা বেশী বেড়ে গেছে। ললিত চকিতে মাথা তুলে ওর দরজার সামনে তাকাল। ভাতের থালাটা গড়াতে গড়াতে ওর দরজার সামনে থেমেছে। ললিত তবু উঠল না। যদি ওরা বুঝতে পারে, ও জেগেছিল। একটু পরে অনাদি নিঃশব্দে অফিস বেরিয়ে গেল। ললিত আরও কিছু সময় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে উঠে বাইরে এল।

যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে ললিত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে মুখ-হাত ধুলো। ওপরে এসে মুখ-হাত মুছলো। রাতের পরা বাসি পাজামার সঙ্গেই বুশসার্টটা চাপাল। সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে একবার করুণার দিকে তাকাল। এক ভাবে উনুনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে করুণা।

ললিতের এখন বাইরে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টে চা-টোস্ট খাওয়ার সময়। একটা সিগারেট টানতে টানতে খবরের কাগজটাও ওখানে পড়ে নেবে। তারপর বাড়ি ফিরে একটু পড়াশুনা করা। আজ এ সপ্তাহে ওর ছুটির দিন। গত দু' সপ্তাহ ধরে দুপুরে ডিউটি পড়ছে। রাত্রে কলেজ করে অনেক রাত পর্যন্ত পড়তে হয়। ললিত বোঝে, তিরিশের ওপর বয়সে নতুন করে পড়াশুনা করতে গেলে এভাবেই চলতে হবে।

ললিত করুণার কোমরের কাছে পিঠের দিকে ব্লাউজের অনাবৃত অংশটায় কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিল। এক পাশের ঈষৎ অবনত বুকে চকিতে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। তার পরেই চিবুক, খোঁপা, গ্রীবা, জলবিন্দু ভেজা হাত আর নরম পায়ের পাতা লক্ষ্য করল। এই ভঙ্গিতে দেখা ললিতের যেন প্রতিদিনের গোপন অভ্যেস। ললিত খুশী হল।

সিঁড়ির আর একটা ধাপে পা দিতেই জুতোর শব্দ হল। করুণা পিছনে ফিরল। চা খেতে যাচ্ছ ঠাকুরপো? আমি যে চায়ের জল চাপিয়েছি!

খুব সহজ শান্ত কণ্ঠে কথা বললে করুণার মধ্যে কোন মোহিনী শক্তি আছে বলে মনে হয় ললিতের। একটু আগের চীৎকার মুহূর্তে ভুলে যায়। আবার কেন?

কাল যে চায়ের প্যাকেট এনেছিলে, তার কিছুটা আছে। নষ্ট হবে?

ললিত হাসল। তুমি চাটা কর, আমি বরং কয়েকটা সিগারেট কিনে আনি। ললিত একে একে সিঁড়ির ধাপে পা ফেলতে লাগল।

তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু। করুণা গলা একটু তুলল, চা ঠান্ডা হয়ে যাবে!

করুণার দেওয়া চা খেয়ে ললিত তক্তপোষের ওপর বসল। সামনে পড়ার বই খুলে রাখল। এই নিয়ে এ মাসে কবার করুণার হাতে চা খাওয়া হল? ললিত ভাবনার খেলায় মাতল। চা ললিত বাইরেই খায়, দু-বেলার ভাতও। মাঝে মাঝে করুণার চা খেতে দেরী হলে অনাদির বেরিয়ে যাবার পর ললিতকে চা করে

খাওয়ায়, নিজেও খায়। ললিত চায় না। খাওয়ালে বাইরে থেকে চা পাতা, বিস্কুট এনে দেয়। অনাদি এসব জানে।

ললিত নিভে যাওয়া সিগারেটটায় পর পর কয়েকটা টান দিয়ে আবার উজ্জ্বল করল। বাইরে দরজার আড়াল থেকে একবার করুণাকে দেখল। এক মনে কাজ করে যাচ্ছে। করুণা ভীষণ গম্ভীর। ললিত হাসল। প্রথম যেদিন এসেছিল ললিত, করুণাকে মোহিনী মনে হয়েছিল।

এই তোমার বৌদি ললিত, এর কাছ থেকে সব বুঝে নাও। অনাদি বলে ওদের সামনে থেকে চলে গিয়েছিল।

ললিত কয়েক মুহূর্ত করুণাকে দেখে-ছিল। দুটি সন্তানের মা, দশ বছরের বিবাহিত কোন বাঙ্গালী মেয়ে এমন বর্ষার ধোয়া প্রথম কদমফুলের মত সতেজ থাকতে পারে ওর কল্পনাতেই ছিল না। পোড়া ইটের মত রং করুণার। নিটোল স্বাস্থ্য। আটপৌরে খাটো ময়লা একটা শাড়ীর আড়ালে ললিত যেন প্রথম দিনেই করুণার সমস্ত শরীরের ভেতরটা দেখতে পেয়েছিল। এমন নরম চিবুক, টান টান গ্রীবা, চওড়া পিঠ, নিটোল ভারী বুক আর নিতম্ব দেখে তেত্রিশ বছরের ললিত হঠাৎ কেমন আড়ষ্ট, হতবাক হয়ে গিয়ে-ছিল। দুচোখ টানা করুণার। ভুরুর চুল আর একটু বড় হলেই যেন দুচোখের তারায় ছায়া পড়ত। দাঁত ঝকঝকে, আর হাসলে দুপাশের চিবুকে টোল পড়ে। ললিত, সত্যি কথা বলতে কি, এত সব নিখুঁত করে সেদিন দেখতে পারে নি, কিন্তু অনুভব করেছিল। করুণার সবচেয়ে যেটা অবাক করেছিল ললিতকে, তা ওর মুখ-চোখের নিষ্পাপ সারল্য।

ভাবতে ভাবতে ললিত কেমন শিহরিত হল। করুণার দিকে অবাক হয়ে সেদিন তাকিয়ে থাকতে করুণা বলেছিল, কি দেখছ ঠাকুরপো, ভয় পাচ্ছ আমাকে?

ললিত অপ্রস্তুত হয়েছিল। না, না। ভাবছি আমাকে আপনি না কোনদিন ভয় পান!

আপনি নয়, তুমি বলবে ভাই। তুমি পর হয়ে এলে এমন পাশের ঘরটা ছেড়ে দিতুম নাকি? করুণা হাসল। আর পর হলেই তো ভয় পাবো ঠাকুরপো। তুমি কি তাই দাও?

ললিত খুশী হয়েছিল। করুণার শান্ত মিষ্টি ঠান্ডা গলা ললিতকে যেন আশ্রয় দিয়েছিল। ললিত বলেছিল, আমি বাড়ি-দার, বৌদি, কোন কথাই নেই। দাদা বল-ছিল, ঘরটা তো নোংরা, দেয়াল ফেটে ভেঙে পড়ছে, তুমি সারিয়ে নিও নিজের পয়সায়। তা না হয় নিচ্ছি। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

কি? করুণা উৎসুক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ললিতের দিকে।

আমার প্রতিদিনের খাওয়াটা শুধু আপনার এখানেই ব্যবস্থা কর।

করুণা স্পষ্ট ভুরে নিয়েছিল কথাটা। মানে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে চাইছ?

এই হলো আর কি। ললিত ঈষৎ লজ্জা পেয়েছিল।

কিন্তু ভাই ওর মধ্যে এসো না। আমরা খুব সাধারণ খাই। কোনদিন জোটে কোনদিন জোটে না। তুমি মাঝখানে জড়িয়ে কষ্ট পাবে কেন। তা ছাড়া তোমার দাদার ভীষণ হাত টান আছে। মাসে মাসে বাঁধা টাকাটা দিলেও আরও চাইবে। তুমি সামলাতে পারবে না।

তাতে কি হয়েছে? দরকার হলে সকলেই নেয়।

করুণা কিছুতেই রাজি হয়নি। পরে অনাদি করুণাকে বুঝিয়েছে, তাতেও কথা শোনে নি। বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবার পর করুণাকে ললিত নানাভাবে অনুরোধ জানিয়েছে, করুণা মেনে নেয় নি। অথচ এটা মেনে নিলে অনাদির সংসারের যথেষ্ট সাশ্রয় হয়। ললিত দুহাতে আরও অনেক সাহায্য করতে পারে। করুণা কি তা বোঝে না? ললিত এই একটা জায়গায় করুণাকে বুঝতে পারে না!

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। সামনের পেয়ারা-গাছে শব্দ করে শালিখ ডাকছে। গরম হাওয়া গাছের পাতায় জড়িয়ে নিস্তব্ধতা আরও বাড়িয়ে দিল। অথচ এ-সময়ে ললিত করুণাকে চুপচাপ থাকতে দেয় না। টুটুল-মিঠুর স্কুল থেকে ফিরতে এখনো দেরী। এই সময়টা করুণাকে নানাভাবে বিরক্ত করে, হাসিয়ে, গল্প করে জমিয়ে রাখে ললিত।

বৌদি কি আজ সত্যি কথা বলবে না? ললিত বারান্দায় এসে একবার অনাদির ঘরে দৃষ্টি ফেলল। করুণার গম্ভীর মুখ, অন্যমনস্ক। মেঝের বসে আছে। ললিত কি ভেবে আবার নিজের ঘরে চলে এল। তক্তপোষে বসে নতুন করে একটা সিগারেট ধরাল।

'কি হল বৌদি? এখনো আকাশ থম-থমে কেন?' একদিন দুপুরে করুণাকে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে ঘরের মেঝের বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল ললিত।

করুণা চকিতে কোলের ওপর থেকে ছেঁড়া ব্রা-টা পিছনে লুকিয়ে ফেলল। মৃদু হাসল। 'শরীরটা খুব খারাপ ঠাকুরপো। সকাল থেকেই গা-টা ম্যাজ ম্যাজ করছে।'

'তার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমাদের দাদা-বৌদির সমাচার দুঃখ!'

সংস্কৃতি সিরিজ

উদ্বাস্তু
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত। [১০·০০]

কালিকট থেকে পলাশী
শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য-অভিযান কাহিনী। [৬·৫০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি
ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া রচিত। [১০·০০]

বাঁকুড়ার মন্দির
শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙলার মন্দিরগুলির ইতিহাস। ৬৩টি আর্টপ্লেট। [১৫·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঠাকুরবাড়ীর তিনপুরুষের ইতিহাস। [১২·০০]

উপনিষদের দর্শন
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। [৭·০০]

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

করুণা কোন উত্তর না দিয়ে দেয়ালে ঠেস দিল। খুব জোরে ওঠে বলে টুটুল-মিঠু তখন দুপুরের ঘুমে নিঃসাড়। অনাদি অফিসে।

সত্যি তোমার জ্বর হয়েছে? দেখি! ললিত এগিয়ে এল। করুণার কপালে নরম করে হাত রাখল। একপাশের গালে হাত বোলালো। কেন আদরে বা শান্তিতে করুণার দুটি চোখ বোজানো। 'ও কিছু না।' [illegible] সেই মুহূর্তে নিজেকে কেন [illegible] গুটিয়ে নিয়েছিল। করুণার সামনে থেকে কয়েক পা সরে এসেছিল। হাসতে হাসতে বলল, 'খুব মন খারাপ না হলে বৌদি, তুমি তো এমন করে বসে থাকো না!'

করুণা মাথা নীচু করে মেঝের চোখ রাখল। 'একটা কথা বলব ঠাকুরপো?'

করুণার বলার ভঙ্গিতে ললিত অবাক। 'কি কথা?'

'আমাকে কয়েকটা টাকা ধার দেবে? সামনের মাসেই শোধ দিয়ে দেব!'

ললিত কিছুক্ষণ করুণার দিকে তাকিয়ে থেকে হো-হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বলল, 'বাব্বা! তার জন্যে এত লজ্জা, ভয়! কত টাকা?'

করুণা টুটুল মিঠুর দিকে একবার তাকাল, ওদের কথায় ঘুম ভেঙে যেতে পারে। করুণা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল, তোমার ঘরে গিয়ে বলছি।'

ললিতের ঘরে এসে করুণা তক্তপোষের ওপর বসল, 'আর বোলো না ঠাকুরপো তোমার দাদার কথা। ওভারটাইম ওর সবদিন হয় না। মাসে সামান্য কটা ওভারটাইম করে যা পায়, তাতে আর চলছে না। ছেলেমেয়ে দুটো এখনিতে কিছুই খেতে পায় না। দুধটুকু ছাড়া একটু হরলিকস্ খাওয়াই। সেটা ফুরিয়েছে। কাল আবার রেশন তুলতে হবে।' একটু থেমে বলল, 'তার ওপর আমারও দু-একটা জিনিস আর না কিনলে নয়। তোমার দাদা তো এসব দেখেই না। তোমার কাছে চাইতে খারাপ লাগছে ঠাকুরপো। কিন্তু পারছি না।' করুণার গলার স্বর ভারী হয়ে এলো।

ললিত মন দিয়ে শুনছিল আর করুণার নিষ্পাপ অসহায় মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল। কি রকম যেন দুঃখ হল ললিতের। 'কত চাই বল না? আমার কাছে এত বলার কি আছে বৌদি?'

বেশী চাই না। দশটা টাকা দাও। বেশী নিলে আমাকে তো আবার শুধতে হবে?'

ললিত সঙ্গে সঙ্গে সুটকেশ থেকে কুড়িটা টাকা বের করে হাতে দিয়ে বলল, 'বেশীই দিলাম বৌদি। দরকার হলে আরও নিও। শোধ দেবার কথা ভাবতে হবে না। আমার দরকার মনে হলে নিজেই চেয়ে নেব।'

করুণা ললিতের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। চাপা আবেগে ললিতের হাতটা ধরে বলল, 'ঠাকুরপো, আমার আর একটা অনুরোধ আছে, রাখবে তো?'

'বল।'

'দাদাকে কিন্তু এর কথা কোনদিনও বলবে না বলো।'

করুণার উৎকণ্ঠিত ভঙ্গি দেখে ললিত হাসল।

'না, না, সত্যি ঠাকুরপো। ও যদি জানতে পারে, তুমি টাকা ধার দিচ্ছ তাহলে আর তোমাকে রেহাই দেবে না। ছিঁড়ে খাবে যখন তখন। তার ওপর শোধ দেবার নামটি করবে না।' হাত ছেড়ে দিল হঠাৎ করুণা। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমিও তাই ধার পছন্দ করি না, একদম না। ধার করে সংসার চালালে নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। পরের উপায় করা টাকায় এক-মুহূর্তও বেঁচে থাকতে চাই না। কেমন ঘেন্না করে তখন নিজেরই ওপর।'

ললিত করুণার দিকে সোজা তাকিয়ে বলেছিল, 'আমাকে পর ভাবো?'

'না, না।' অপ্রস্তুত হয়েছিল করুণা। 'তোমাকে আপন মনে করি বলেই তো এমনভাবে হাত পেতে টাকাটা নিলাম ঠাকুরপো?'

ললিতের ভাল লাগে করুণার এই অসহায় অপ্রস্তুত ভঙ্গিটা। এইভাবেই করুণা যেন ওর আপন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। বড় বড় দুটি চোখে কোথাও একটুকু ক্লান্তি নেই। শুধু এক ধরনের চাঁদ, সন্ত্রস্ত অসহায়তা সূক্ষ্ম কাজলের মত দু'চোখের দৃষ্টিতে মাখানো থাকে। প্রতিদিনের অভাবটুকু যেভাবে হোক মিটে গেলেই করুণা যেন শরীরে মনে শরতের কোন এক রোদে-মোড়া দিনের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে; রোদ আর বাতাসে শুকোনো রঙিন শাড়ির মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। টুটুল-মিঠুর মত যেন শিশু হয়ে যায়।

ললিতের মনে পড়ে সেদিনই বিকেলে টুটুলকে সঙ্গে নিয়ে করুণা বাইরে বেরিয়েছিল। হরলিকস্ কিনেছে; আর নিজের জন্যে একটা সস্তা দামের ব্রা কিনেছিল। পরের দিন সকালে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এলে ললিতের যেন মনে হয়েছিল, করুণা নতুন ব্রা কিনেছে। পরে আবার একদিন করুণা কিছু টাকা নিয়েছে। কোনটাই শোধ দেয় নি। করুণার কাছে টাকাগুলো থাকুক, ললিত তাই চায়।

মনে মনে ললিত হাসল। দুটো শালিক পেয়ারার ডালে পাখা ঝাপটাতেই বাইরে তাকাল। করুণা বারান্দার ও-কোণে রান্নায় ব্যস্ত হয়েছে। টুটুল-মিঠু এখনি ফিরবে। ওদের খাবার করায় ব্যস্ত বুঝি। ললিত করুণাকে দেখে আর অবাক হয়। সারাদিন খেটে যায়। বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, গুল-দেওয়া থেকে কিনা করে করুণা। সেই রাত হলে সকলকে খাইয়ে তবে করুণা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

'অথচ—', ললিত যেন মনে মনে বিড়বিড় করল 'অথচ ভাল ঘরে পড়লে এই করুণাই আগুন হয়ে যেত, দিনে-রাতে একটা আগুনের তাল হয়ে পুরুষের সামনে ঘুরে বেড়াতে পারত। হোক না দুটি সন্তানের মা! ললিত করুণাকে আবার দেখল। অনাদির সঙ্গে যখন ঝগড়া করে, তখন করুণা একরূপ, আর সমস্ত কাজ শেষে যখন একা থাকে বা ললিতের সঙ্গে কথা বলে, তখন করুণার অন্যরূপ। ললিতের খুব মজা লাগে করুণাকে দেখে। একদিন দুপুরে করুণার হাল্কা মেজাজ দেখে ললিত অনাদির কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল। 'আচ্ছা বৌদি, দাদার সঙ্গে এত ঝগড়া কর কেন বলতো? তোমাকে একটুও মানায় না।'

'তুমি দেখেছ তো দাদার বাড়ি ফেরা?'

'বাইরে কাজ থাকে না?'

'কাজ না হাতী? আড্ডা মারে। এদিকে ছেলেমেয়ে কে দেখবে?'

'কেন, তুমি তো আছ?'

'টুটুলটা তো একেবারে বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। পাড়ার লোকেরা যা-তা বলে।' করুণা নিজের ঝোঁকে বলছিল, 'জান ঠাকুরপো, শুধু এই কথাটা মনে হলেই আমার যেন রাগ মাথায় উঠে যায়। কি রকম যেন ভয়ও হয়।'

'তুমিই সামলাও। দাদা না হয় দেরীতে ফিরল, তাতে আর কি?'

করুণা অন্যমনস্ক হল কয়েক মুহূর্ত। 'ঠাকুরপো, আমিও তো একটা মানুষ। বাড়িতে থাকি। সারাদিন দাসীবাঁদীর মত মুখগুঁজে খেটে যাই। আমারও তো ইচ্ছে হয় ও তাড়াতাড়ি আসুক।' যেন গভীর দুঃখে করুণার বুক ভরে উঠল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল করুণা। বুঝিবা অনেকদূর থেকে বলল, 'এতদিনেও যখন বুঝলো না, আর কোনদিনও বুঝবে না।' অন্যদিকে মুখ ফেরালো করুণা।

সেইমুহূর্তে করুণার দুঃখ যেন ললিত বুঝেছিল। ললিতেরও কেমন কষ্ট হতেই প্রসঙ্গ বদলালো। 'থাক ওসব কথা বৌদি। তোমার গ্রামের কথা বলো।' খুব হাসিয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই করুণাকে সহজ করে দিয়েছিল ললিত।

ললিতের নানা হাল্কা কথায় করুণাও একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিল। 'কোন্ কথা শুনবে?'

'সেই যে, বিয়ের আগে গ্রামে কিভাবে কাটাতে?' ললিত অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করল।

গ্রামের কথায় করুণা খুশিতে ভরে ওঠে। পড়ন্ত দুপুরের নির্জন পরিবেশে করুণা ওর স্মৃতিটাকে কাপড় শুকোতে দেওয়ার মত ছড়িয়ে দিল। 'জান ঠাকুরপো, বাড়িতে আমাকে কুটোটি নাড়তে হত না। গাছ থেকে পেয়ারা পাড়তুম, আম, জাম, খেজুর! বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত এইসব করে ঘুরে বেড়িয়েছি!'

ললিত করুণার স্মৃতিতে নিবিষ্ট মুখ দেখতে দেখতে যেন এক আঠারো বছরের কুমারী মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে লাগল। করুণার দিকে তাকিয়ে রইল।

রোদে ঘেমে কালি হয়ে আমরা পাড়ার ক'জন মেয়ে পুকুরে নামতুম। ঠিক দেড়টি ঘণ্টা কাটাতুম পুকুরে। উহ্, সে কি হুল্লোড়! পুকুরে পানা, শালুকফুলের ঝাড়। চারপাশে বুনো গাছের ঝোপ। আমি তো ভয়ই পেতুম না। বাজি রেখে শালুক-ফুল তুলে আনতুম সেই পুকুরের মাঝখান থেকে। আমার সঙ্গে কেউ পারতো না!'

'তোমার ভয় করতো না? যদি সাপ থাকতো? জলঢোঁড়া সাপ! আমার তো দেখলেই ঘেন্না করে।' ললিতের কণ্ঠস্বরে দৃশ্যটা যেন বেশী নিস্প্রভ হয়ে ওঠে।

ঝকঝকে দাঁতে করুণা হাসল। উত্তেজিত নিশ্বাসের ওঠা-নামায় নাসারন্ধ্র মাঝে মাঝে ফুলে উঠছে। 'তাহলে তোমাকে একটা মজার ঘটনা বলি ঠাকুরপো। একদিন আমি একা নাইতে গেছি। সেদিন সারা পুকুরে একটা মাত্র লাল শালুক ফুটে আছে। তা-ও অনেক দূরে একেবারে পাড়া আর ভাটির কাছে। আমার কেমন রোখ চেপে গেল, ওটা আজ তুলে আনবই। গেলুম। ফুলটা ছিঁড়ে নিয়ে আসছি, শালুক-ডাঁটায় জড়ানো পা দুটো অনেক কষ্টে ছাড়িয়েছি, হঠাৎ সামনে দেখি দুটো সাপ কিলবিল করে যেন খেলছে! নৌকার পাক দেওয়া মোটা কাছি দেখেছ তো ঠাকুরপো — সেই কাছির মত দুটো জড়িয়ে যাচ্ছে, আর জল থেকে উড়ুনো অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে সোজা হয়ে উঠছে!' দরজা চাপা— উত্তেজনায় থামল।

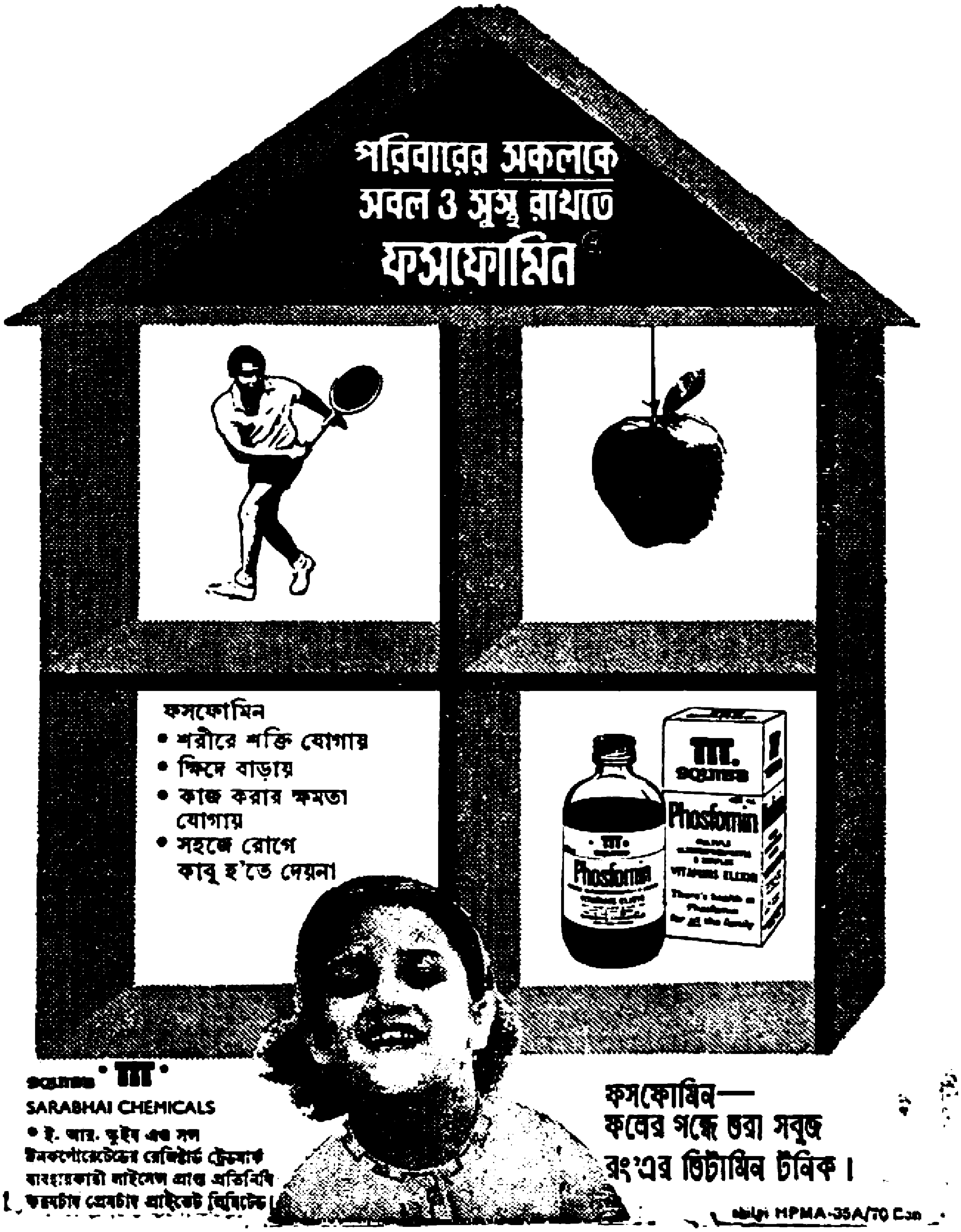

'তুমি কি তখনো এগিয়ে গেলে?'

'দূর, আমি এগিয়ে গেলেই তো ওরা পালাবে। আমার ওদের খেলাটা খুব ভাল লাগছিল। পুকুরের পাড়ে এসে চুপ করে বসে রইলুম। ভিজে কাপড়ে গা শিরশির করছে তখন। বলব কি, এমন একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিলুম তখন। কিন্তু আমার হাতের শালুকফুলের নয়! কি রকম গন্ধ কেন। আমি তো ঘুমিয়েই পড়ছিলুম!'

'তারপর!'

'চারপাশ নির্জন। খেলার সাপ দুটো একটু দূরে রোদে চকচক করছে। আমার তখনই ভয়ও করছে, আবার উঠে চলে আসতেও ইচ্ছে করছিল না। মা এসে হঠাৎ ডাকতেই তখন সত্যিকারের ভয় পেয়েছিলুম। জানো, মাকে সব যখন বললুম, মা আমাকে বকে বলল, ওসব দেখতে নেই।'

'কেন?' ললিত করুণার কথা বলার বিশ্বাস ভঙ্গিতে আবিষ্ট হয়ে প্রশ্ন করল।

'কেন কে জানে! তারপরেই তো আমার বিয়ে হয়ে গেল। মা সেই থেকে কিছুতেই আমাকে একা চান করতে পাঠাতো না।'

পেয়ারাগাছে দুপুরের বাতাস জড়িয়ে জড়িয়ে হিসহিস শব্দ করল। ললিত মৃদু হাসল। 'কেন বারণ করেছিল, এখনো জান না বৌদি?' ললিত করুণার চোখে চোখ রাখল।

করুণা হঠাৎ ললিতের হাসি দেখে যেন শব্দ নিয়ে উঠল, 'খুব ফাজিল হয়েছ' হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার দাদা পরে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে।' বলেই করুণা যেন আবার সেই পুকুরের পাঁকের গন্ধ-মেশানো জল, জংলা ঝোপঝাড়ের মধ্যে ফিরে গেল। দুচোখে সেই আঠারো বছরের করুণার গাঢ় ঘন নিবিষ্টতা। 'যাই বল ঠাকুরপো, বেশ ছিলুম কিন্তু। এখনো আমার ভাল লাগে।'

'এইজন্যেই তো গ্রামের মেয়েদের শরীরের গড়ন ভাল, শক্ত। তাছাড়া সাঁতার কাটলে শরীরের আদলই পাল্টে যায়।'

'সব জায়গায় নয়। তোমাদের এই হেদোয় একদিন জোরে টুটুলকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম। বড় বড় মেয়েরা টাইটজামা পরে সাঁতার কাটছে। আমাদের মত শাড়িতে গাছ-কোমর বেঁধে জলে ঝাঁপাতে না পারলে জলে শরীর খেলবে কি করে? জলের পানা, গাছ-গাছালিরও অনেক কাজ আছে এতে।'

'ডাক্তারি করছ বৌদি?' ললিত হাসল। 'তবে আমি কিন্তু গ্রামের মেয়ে পছন্দ করি ভীষণ।'

'সত্যি?' করুণার দুচোখ ললিতের চোখে স্থির।

'সত্যি। তবে ঠিক তোমার মত মেয়ে হওয়া চাই।'

'এই বলে আমাকে চাইছ না তো!' করুণা কথাটা বলেই হাসিতে ভেঙে পড়ল। 'দেখো, তোমার দাদাকে কষ্ট দিও না!'

ললিত কেমন বোকার মত করুণার দিকে তাকিয়ে রইল।

'তবে আমার মত মেয়ে নিলে তোমার লাভ হবে না। কেবল তো জ্বালা হবে!'

'কেন হবে। আমি কোন কষ্টই দেব না। কোন অভাব না থাকলেই তো হল!' ললিত পরিষ্কার করতে চাইছে ওর বিয়েটা।

'তাই বুঝি। তাহলে দাদা তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ভুল করেছি!'

করুণা আবার হাসছে প্রতিদিনের সংসারের সঙ্গে জড়ানো যে করুণা, এ যেন সে নয়! ললিত করুণার সামনে বসে সেই পুকুরে ঝাঁপানো, ভীষণ দুরন্ত স্বভাবের এক আঠারো বছরের তরুণীর শরীরের বুনো গন্ধ পাচ্ছে। ললিত করুণার হাসিতে বাধা দিলো না। করুণার চোখ পড়া চিবুকের দিকে তাকিয়ে ললিত বলল, 'মেয়ে জাতটা খুব সুন্দর। আর যদি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ওদের মনোমত করে কাছে রাখা যায়, অনেককিছু পাওয়া যায়। তাই না?'

করুণা হাসি থামল। লজ্জায় মুখ-চোখ রেখে তক্তপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'তোমার দাদাকে আমি এসব কথা বলব ঠাকুরপো! যা মজা হবে না!' বাইরে তাকাল। 'যাই, বেলা হল। তুমি দেখছি খুব শয়তান ঠাকুরপো, এমন সব বেফাঁস কথা মনে ধরে রাখো!' করুণা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

'দাদাকে কিন্তু বোলো না বৌদি, খুব খারাপ হবে।' ললিত চেঁচিয়ে বলল।

করুণা ততক্ষণে ওর ঘরে চলে এসেছে। হাই তুলল। 'কেন, এতেই ভয় পেয়ে গেলে!' শব্দ করে হাসল। বেলা পড়ে এলেও টুটুলের পাশে শুয়ে পড়ল।

সেই করুণা, আর আজকের করুণার মধ্যে অনেক তফাৎ। ললিত এত নিঃসাড় অন্যমনস্কতায় যে কথা ভাবছিল, এখন করুণাকে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে ইচ্ছে করল। আজ করুণা তো একবারও নিজে থেকে এসে কথা বলছে না। বাইরে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের সামনে করুণার পাশে দাঁড়াল, 'কি ব্যাপার? দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে আমার সঙ্গেও কথা বন্ধ নাকি?'

করুণা ললিতের দিকে ফিরে হাসল।

ললিতের মনে হল, করুণা যেন আজ অতিরিক্ত গম্ভীর। 'বৌদি, এরকম গোমড়া মুখে তোমাকে কিন্তু একটুও মানায় না।'

'অনেক কিছুই মানাতে হয় ঠাকুরপো।' রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'আমার সেই ক্ষমতাই নেই।' করুণার মুখ নীচু।

'ওঃ, কি সব বড় বড় কথা ভাবছ? দেখবে, মজা দেখাবে?' বলেই করুণাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ললিত দুহাতে ওর বসার ভঙ্গিতেই ওকে তুলে ধরল। ধরে নিয়ে করুণার ঘরের মেঝেয় বসিয়ে দিল। করুণা ছেড়ে দেবার জন্যে চীৎকার করলেও শোনে নি। বাইরে বেরিয়ে দরজার শিকল টেনে দিল ললিত। 'থাকো এখন। টুটুল-মিঠু আসুক, মজা দেখবে?'

করুণা হাসতে হাসতে বলল, 'এই ঠাকুরপো, খুলে দাও, ওরা দেখলে কি ভাববে। এখন কি আমার এরকম ঠাট্টার বয়স?'

'সেইজন্যেই তো মজাটা হবে!'

করুণা হাসতে লাগল, 'খোলো ঠাকুরপো। ওদের খাবার হয় নি।'

করুণাকে হাসতে দেখে দরজা খুলে দিল। করুণা বেরিয়ে উনুনের সামনে বসতে বসতে বলল, 'ওঃ, তোমার গায়ে কি জোর ঠাকুরপো!'

ললিত হাসতে হাসতে ওর ঘরের চৌকাঠে বসল। করুণাকে দেখতে লাগল।

করুণা কিছু সময় নীরব থেকে কাজ করতে করতে বলল, 'আমাকে কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে পার ঠাকুরপো?'

'দাদার ওপর রাগ এখনো যায় নি!'

'না, না, সত্যি বলছি। আমার যে ছাই কোন আত্মীয়-স্বজন এখানে নেই। থাকলে কবে পালাতুম।'

ললিত করুণার বলার ভঙ্গিতে একটু অবাক হল। 'সত্যি যাবে? কিছুদিনের জন্যে গেলে কিন্তু তোমাদের দুজনেরই মনে কিছুটা শান্তি আসবে!'

'আমি একটু শান্তিই চাই। ছেলেমেয়ে দুটোকে তোমার দাদার কাছে রেখে যাব। দাদা তো রান্না-বান্না ভাল জানে। কদিন চালিয়ে নেবে।'

'কিন্তু দাদা যেতে দেবে কেন? আবার তো একচোট ঝগড়া হবে?'

করুণা ললিতের দিকে তাকাল। 'বলে যাব কেন? একদিন অফিস বেরিয়ে গেলে চলে যাব। তুমি তো আমাকে রেখে এসে ফিরবে এখানে। তখন বলবে।'

ললিত অবাক হচ্ছিল। কি ভাবল। বলল, 'বৌদি, না বলে গেলে সত্যি খুব মজার ব্যাপার হবে! দাদাকে একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে। আমিও তোমাকে রেখে এসে প্রথমেই কিছু বলব না। দাদা কি করে, কি ভাবে দেখে তবে বলব।' একধরনের মজার খেলার কথা ভেবে ললিত যেন ফুলে উঠেছে ভিতরে। 'সত্যি যাবে তো? সোদপুরে আমার এক দূরসম্পর্কের পিসিমা-পিসেমশাই থাকেন। ছেলেপুলে নেই। বাড়ি, বাগান, পুকুর, সব আছে। আমাকে ও'রা ছেলের মত ভালবাসেন। তোমাকে ওখানে গিয়ে রেখে আসব। প্রত্যেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা করে আসব। দু-একটা সিনেমাও দেখাব। এখানে-ওখানে ঘুরতেও পারি দুজনে। দেখবে মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরে একদিন দাদাকে না হয় সব বলবে।'

করুণা ললিতকে দেখতে দেখতে কথাগুলো ভেবে নিচ্ছে। খুব ভাল বুদ্ধি দিয়েছে ললিত। কদিন খারাপ কাটবে না! ললিতটা যা হৈ-চৈ করতে ভালবাসে, করুণার তো তাতে এক মুহূর্তও খারাপ লাগবে না। 'এটা আমার দরকার' করুণা বিড়বিড় করল। ললিতের দিকে তাকিয়ে ওকে দেখল। ললিত ছেলেমানুষ নয়। অনেককিছুই বোঝে! কি ভেবে বলল, 'একথা দাদাকেই বা বলার দরকার কি?'

ললিত কেন যেন কথাটায় ভয় পেল। করুণার চওড়া পিঠ, সুগঠিত বুক, ভারী নিতম্ব চোখে পড়ল। পিঠের ওপর খোঁপা ভেঙে পড়েছে। সমস্ত মিলিয়ে করুণাকে বড় সুন্দর মনে হল। সারা মুখমণ্ডলে এক শান্ত শীতলতা। এটাই কি ললিতকে আকর্ষণ করে। তিরিশ বছর বয়সেও করুণার মুখের নিষ্পাপ সারল্য ললিতকে যেন পাগল করে দেয়!

ললিতকে চুপ করে থাকতে দেখে করুণা এক দিকে তাকাল। ললিত যেন চমকে উঠল: 'সেই ভাল বৌদি, দাদাকে বলার দরকার নেই।' সহজ হয়ে গেল ললিত। সব মানুষেরই কোন না কোন খেলা থাকে। আর যে কোন খেলাই সুন্দর। যেখানে হার-জিতের প্রশ্ন না থাকলেই হল। বলে ললিত থামল। 'নিরাপদে খেলা হলে তাই ভাল।'

করুণা হাসল। 'অত-শত বুঝি না ঠাকুরপো। তোমার দাদাকে ক'দিনের জন্য একটু জব্দ করা দরকার। তাই সব কথা না বললে ক্ষতি কি?'

'ঠিক, ঠিক।' ললিত সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করল। সিঁড়িতে টুটুল-মিঠুর পায়ের শব্দ শোনা গেল। ললিত বলল, 'আর কিছু বলতে হবে না, আমি তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে ফেলছি।' বলে ললিত নিজের ঘরে ঢুকল।

ছুটির দিন ললিত দেরীতে স্নান করে। করুণা টুটুল-মিঠুকে ঘুম পাড়িয়ে স্নানের ঘরে ঢোকে। আজও তাই করল। ললিত স্নান সেরে খেতে বেরুবে। ওপরে উঠে এলো তাড়াতাড়ি। করুণা বাথরুমে ঢুকল। ললিত নীচে নামছিল বাইরে খেতে যাবে বলে। করুণা বাথরুম থেকে ডাকল, 'ঠাকুরপো, আমার গামছাটা আনতে ভুলে গেছি। একবার দিয়ে যাবে না ভাই।'

ললিত ওপরে উঠে এল। গামছাটা নিয়ে বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে বলল 'কি ব্যাপার! তোমার তো এরকম ভুল হয় না? এত অন্যমনস্ক কেন? খুব খারাপ লক্ষণ!'

শরীরে জল ঢালছিল করুণা। জল গড়ানো ঠোঁটে বলল, 'মোটেই না। তোমাকে একটু খাটিয়ে নিলাম। দেখলাম, তুমি সব কাজ পার কিনা। কই, দাও!' বলে দরজা একটু ফাঁক করে করুণা হাত বাড়িয়ে দিল।

কনুই-এর ওপর পর্যন্ত ললিত করুণার উন্মুক্ত বাহুর দিকে দৃষ্টি রাখল। সাবান ঘষা জলে-ধোয়া ফর্সা একখানি হাত। প্রতিদিনের সংসারের কোন কাজের ভার, ব্যস্ততার চিহ্ন হাতে নেই। জলে-সাবানে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। টিনের দরজায় আসন্ন শরতের মধ্যাহ্ন সূর্যের আলো পড়েছে। হাতের ওপর জলবিন্দু সাজানো! রোদে মুক্তার মত বিন্দুগুলি চকচক করছে! কব্জির কাছে পাতলা শাঁখা খড়ির দাগের মত আটকে আছে। ধাক্কা লাগলে যে কোন সময়ে শাঁখাটা ভেঙে যেতে পারে। কোন কিছুর হাতছানি আছে নাকি এ হাতে?

'কি হচ্ছে? দাও।' পাতলা অন্ধকারে ঢাকা বাথরুমের মধ্যে থেকে বলল করুণা। 'দুষ্টুমির আর সময় পেলে না বুঝি? নাকি পরের মেয়ের হাত দেখেই মজে গেলে?'

চমকে উঠল ললিত। হেসে বলল 'এই নাও।' নিজের মধ্যেই ভয় ঠেলে উঠছে গামছাটা করুণার হাতে ধরিয়ে দিল।

'যাও, লক্ষ্মী ছেলের মত সরো এখন।' হাত টেনে নিয়ে টিনের দরজা জোর করে বন্ধ করল করুণা। খিল খিল করে হেসে উঠল করুণা বাথরুমের আলো-ছায়া অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

ললিতের বুকের মধ্যে শব্দ দুরু দুরু হল। নিঃশব্দ পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মধ্যরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল ললিতের। একটা অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন দেখছিল। সমুদ্রপারের ঝাউ বিরাট এক দীঘির মধ্যে ললিত সাঁতার কাটছে। কাটতে কাটতে করুণাকে ধরতে যাচ্ছিল। করুণা কৌশলে হঠাৎ

একেবারে লাল শালুকের বনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ললিত এত কাছে, কিছুতেই করুণার কাছে যেতে পারছে না। হঠাৎ ললিত দেখল, সেই জড়ানো দুটি সাপের খেলা! করুণার সামনেই লাফিয়ে লাফিয়ে জড়ানো সাপদুটো উঠছে, আবার আছড়ে পড়ছে। করুণা ভীষণ ভয় পেয়ে চীৎকার করছে, ডাকছে ললিতাকে। জড়ানো শালুক-বন থেকে ও কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না। জলের মধ্যেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। সম্পূর্ণ নগ্নদেহ করুণার। ঠিক বুকের ওপর একটা লাল শালুক ফুল। শাড়ী আর ডাটা, বুনো গাছ-গাছড়া করুণাকে জড়িয়ে রয়েছে। ললিত বার বার দুহাত দিয়ে জল টানলেও কিছুতেই ওর কাছে পৌঁছতে পারছে না। ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেছে।

ললিত ঘেমে গেছে। দুপুরে সামান্য ঘুমিয়েছিল বলে অনেকরাত পর্যন্ত ঘুম আসেনি ওর। এখন রাত কত কে জানে? একটু আগে কতকগুলো কালো মেঘ জড়ো হয়ে মুষলধারে বৃষ্টি ফেলেছে। গাছের পাতায় জল পড়ার শব্দ। তারপরেই আকাশ পরিষ্কার। ঝির্‌ঝিরে জ্যোৎস্নায় বাইরে বারান্দা ভরে গেছে। বৃষ্টির মধ্যে ললিত ঘুমিয়ে পড়েছিল। বৃষ্টি থামতে ঘুম ভেঙেছে। আবার অসহ্য গরম।

সিগারেট ধরিয়ে ললিত বিছানায় উঠে বসল। বাইরে বেরুবার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই আচমকা করুণাকে দেখল। বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ললিত মনে মনে হাসল। একটু আগে যে স্বপ্নটা দেখছিল এখানে বলবে নাকি? নিঃশব্দ পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। 'চমকে দেব করুণাকে?' ভাবল ললিত। গলা অনেক নামিয়ে ললিত ডাকল, 'করুণা!'

যেন ভূত দেখে চমকে উঠল করুণা। পিছন ফিরে ললিতকে দেখল।

এগিয়ে এসে করুণার থেকে সামান্য তফাতে রেলিং-এ গা ঘেঁষে দাঁড়াল ললিত। 'নাম ধরে ডাকতে ভয় পেয়ে গেলে বৌদি? রেগে গেলে তো? আসলে, তোমাকে ভয় পাওয়ানোর জন্যেই নাম ধরে ডাকলাম।'

করুণার বুকের দ্রুত স্পন্দনটা কিছুটা বিলম্বিত হতে বাইরে তাকাল। বুকের মধ্যে অকারণ ভয় জড়িয়ে রয়েছে। সামনে পেয়ারা গাছের স্নিগ্ধ মনোরম ছায়া। দূরে জ্যোৎস্না-ধোয়া খালের জল নিস্তরঙ্গ। একটু আগে চরপাশের জ্যোৎস্নায় কোথায় যেন চলে গিয়েছিল করুণা! অনাদির নাক ডাকছে, আরামে ঘুমোচ্ছে ও। টুটুল মিঠুর নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। করুণা যেন চন্দনের মত এই শান্ত হিম জ্যোৎস্নাটুকু মেখে সারাদিনের শেষে এই আলো-ছায়ার নিস্তব্ধতায় স্নান করছিল। ললিতের ডাকে ভয় পেলেও স্বাভাবিকভাবেই বাইরে তাকিয়ে রইল।

ললিত অন্যমনস্ক করুণাকে দেখল। গরমে জামা গায়ে রাখেনি। রঙীন শাড়িটা পাতলা ঘুমের আলস্যে করুণার শরীরে যেন জড়িয়ে আছে। বুকের ওপর একটা বাতাসে কাঁপা পাতার ছায়া যেন জ্যোৎস্নার ঝর্ণা বইয়ে দিয়েছে। ললিতের মনে হল, করুণার চিবুক, গ্রীবা, বুক, পিঠ, নিতম্ব—সমস্ত কিছু ভেদ করে যেন ফুলের উজ্জ্বল রেণুর মত জ্যোৎস্না করুণাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করছে।

'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়ছে বুঝি?' ললিত নীচু গলায় বলল।

করুণা ললিতের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'হ্যাঁ। সারা বর্ষাটা বেশ ছিল। আবার ছাদটা ফেটেছে।'

'ওরা ভিজবে না!' অন্য কোন কথা না পেয়ে এমনি জিজ্ঞেস করল ললিত।

'না, আমার দিকটাতেই পড়ছে।' করুণা থামল। 'ভাগিস সন্ধেবেলা বৃষ্টি হতে পারে ভেবে তোমার দাদাকে আমার জায়গায় শুতে দিয়েছি! না হলে ও আজ ঘুমোতেই পেত না! এই সময়ে আবার ঘুম ভাঙাতে হত। সারাদিন খেটেখুটে আসে, বল ঠাকুরপো, বাড়ি ফিরে একটু যদি ও শান্তিতে ঘুমোতে না পারে, তাহলে ওর অবস্থা কি হয়, ভাবো!' একটু থামল করুণা। 'আবার কাল ওকে ছাদে উঠতে হবে। ওর দুর্ভোগের আর শেষ নেই।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল করুণা।

ললিত ভাবল, করুণাকে কি ওর ঘরে শুতে বলবে, আর ও বরং বাইরে বারান্দায় শোবে! বা ছেলেমেয়েদের ওর ঘরে নিয়ে অনাদির কাছেই শুতে বলবে! না, দুটোই খারাপ দেখায়। ললিত করুণাকে দেখতে দেখতে ভাবল। করুণার দিকে তাকাল।

'তুমি ঘুমোও নি কেন?' ললিতের দু' চোখ দেখে করুণা একটু বা ভয় পেল।

'গরমে ঘুম ভেঙে গেল। তাছাড়া তোমাকে দেখেই তো এলাম। একজন না ঘুমোলে তা দেখেও আর একজন কি ঘুমোতে পারে?' খুক খুক করে হাসল ললিত। সিগারেট ধরাল।

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব। নীরবতা অনেক সময় বুঝি অনেক সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে! একসময়ে দুজনেই দুজনের দিকে অকারণ যেন কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় করতে করতে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করল। ঝির ঝির করে বাতাস বইল। জ্যোৎস্নার রেখা ছায়ায় কাঁপছে। ঝিঁঝি ডাকা শুরু হয়েছে কোথাও।

করুণা হঠাৎ বলে উঠল, 'শুতে যাও। রাত হয়েছে।' বলেই দরজার দিকে এগোল। একেক পা দিতেই হঠাৎ পিছন ফিরল। 'ললিত, তোমাকে আসল ব্যাপারটাই বলা হয়নি!' করুণার মুখে ললিত নিজের নাম শুনে চমকে উঠলো। চমক কাটতে না কাটতেই করুণা ওর সামনে একেবারে বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল।

ললিত করুণার এত কাছে থেকে গাঢ় বিস্ময়-বিমূঢ়তায় যেন নিস্পন্দ হয়ে গেল। করুণার নিঃশ্বাসের শব্দ, শরীরের সেই গন্ধ পাচ্ছে যেন! যেন শালুক ফুল, পাতা ডাটার মিশ্রিত বুনো গন্ধ ললিতকে তীব্র আকর্ষণ করছে। ললিত চকিতে করুণার সারা শরীর দেখে নিল।

গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে করুণা বলল, 'তোমার দাদার নাক ডাকা বন্ধ হয়েছে মনে হচ্ছে।' পিঠ থেকে আঁচল টেনে নিয়ে জড়ানো খুঁটটা খুলতে খুলতে বলল, 'আজ সন্ধে থেকে একবারও সুযোগ পাইনি। তোমার দাদা তো এসব কিছু জানে না! মাটির খুঁটো ভাঁড় ভেঙে যা পেয়েছিলুম, আজ সন্ধ্যায় টুটুলকে সঙ্গে নিয়ে সেগুলো সব নোট করে এনেছি। এই নাও। তোমার দাদাকে কিন্তু কোনদিন যেন বোলো না!' ললিতের হাতের মুঠোয় রেখেই করুণা দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল। খিল দেওয়ার সন্তর্পিত শব্দ হল।

ললিত ওর চাঁদের আলোভর্তি মুঠির মধ্যে রাখা নোটগুলির দিকে যন্ত্রণা মুখে তাকিয়ে রইল। কিন্তু সময় ললিত যেন বুকের কোন শব্দ শুনল না।

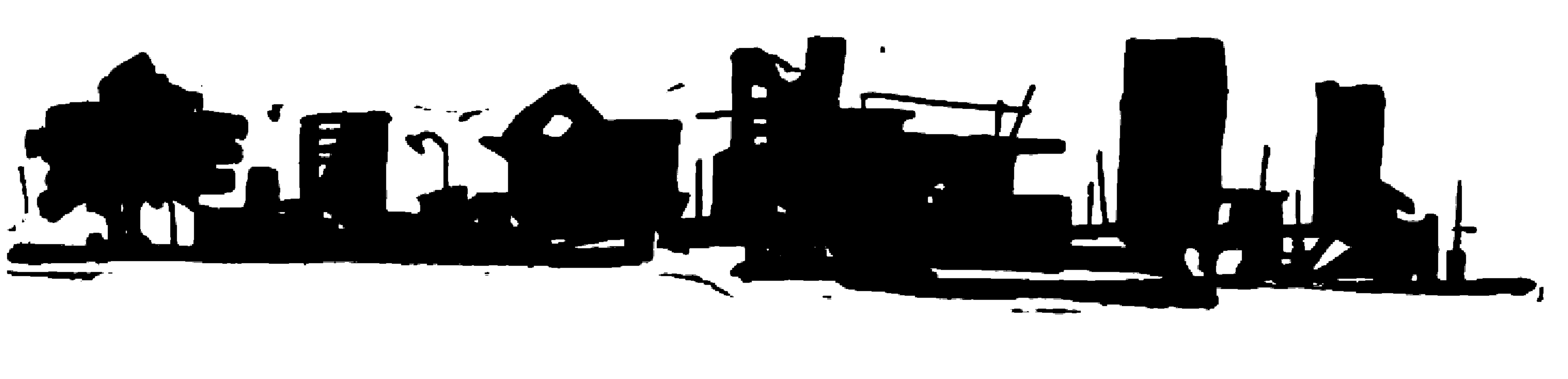

CENTRAL LIBRARY

এই আমাদের দেশ

ধ্বংসস্তূপের মাঝে মান্ধাতার গৌড় টিকে আছে এখনো

প্রাচীনতার দিক থেকে গৌড় মান্ধাতার আমলের ঝোপঝাড়-ধরা বটগাছ। গৌড় ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রচুর ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেছে, এক এক রাজার রাজত্বকালে চেহারা নিয়েছে এক-এক রকম, কিন্তু গৌড় তার নিজস্বতা হারায়নি।

হাওড়া পৌঁছে গঙ্গা পেরিয়ে খেজুরিয়াঘাট। খেজুরিয়াঘাট থেকে ট্রেনে মালদহ। মালদহ থেকে টাঙ্গায় গৌড়। গৌড়ে থাকার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। দেখেশুনে সেদিনই মালদহে ফিরে আসতে হবে। মালদহে হোটেল পাবেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্ট লজ পাবেন। থাকার কোন অসুবিধে নেই।

গৌড়ের ইতিহাসটা মোটামুটি এই-রকম। স্কন্দ পুরাণে পাঁচটি গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে অবশ্য বাংলাদেশের গৌড়ের খ্যাতিই বেশি। পুরাণে উল্লেখ আছে সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড় ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে গৌড়ের এবং গৌড়ভট্টদের দগ্ধ-ভস্মের কাহিনী আছে। দিল্লী ও উত্তর-ভারতের গৌড়ব্রাহ্মণরা পুরুষানুক্রমে জেনে এসেছেন, তাঁদের আদি পুরুষ গৌড় থেকে মহারাজ জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে এসে উত্তর ভারতে বসবাস করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝের দিকে মৌখরী বংশের রাজা ঈশান বর্মা সমুদ্রতীর পর্যন্ত গৌড় রাজ্য জয় করেছিলেন। ধর্মাদিত্যের তাম্রশাসনেও উল্লেখ আছে গৌড়ের অর্ণোকিদেবের শাসক ছিলেন মহারাজা স্থাণু দত্ত। এর পর রাজা শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়াধিপতি হয়েছিলেন। তারপর ইতিহাস প্রসিদ্ধ গোপালদেব গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধীশ্বর হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে গোপালদেবের রাজত্বকাল থেকেই গৌড় নামের ইতিহাস সুরু হয়েছে এবং পাল রাজাদের সময়েই গৌড়ের উন্নতি হয়। গোপালদেবের পর তার ছেলে ধর্মপালদেব, ধর্মপালের ছেলে দেবপালদেব রাজা হন। ধর্মপাল ও দেবপালদেবের সময়েই গৌড় শিল্প-সাধনার দিক থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করে, বিশিষ্ট ভাস্কর ধীমান ও বীটপালের কথা তিব্বতীয় ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন।

পাল রাজাদের রাজধানী প্রাচীন গৌড়ের চিহ্নমাত্র নেই। বর্তমান ধ্বংসাবশেষের কয়েক মাইল উত্তরে কালিন্দী নদীর কাছে তাদের রাজধানী ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। সেন রাজাদের কিছু স্বাক্ষর এখনও অবশিষ্ট আছে। আইন-ই-আকবরীতে আছে বল্লাল সেন গৌড়ে একটি দুর্গ তৈরী করেছিলেন। সাদুল্লাপুরে এই প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও লক্ষ্য করা যায়। এটাকেই বলা হয় বল্লালবাটী। এর কাছেই জহরবাসিনী দেবীর মন্দির। বড়সাগর দীঘির ধারে মখদুম শেখ আখি সিরাজউদ্দীন নামে এক সাধকের সমাধি আছে।

সাদুল্লাপুরের দিকে না গিয়ে দক্ষিণে এগুলেই ধ্বংসাবশেষ আপনার চোখে পড়বে। দক্ষিণ-পশ্চিমে খানিক গেলে পিয়াসবাড়ি দীঘি। পিয়াসবাড়ি থেকে আধ মাইলের মত হাঁটলে রামকেলি গ্রামে যেতে পারবেন। গ্রামে ঢোকার মুখেই মদন-মোহনের ঠাকুরবাড়ি ও কেলি-কদম্ব গাছ। একটি বেদির ওপর পাশাপাশি ৪টি গাছ, দুটি তমাল ও দুটি কদম। শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে এসে এই গাছের ছায়াতে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। গাছের গোড়ায় একটি কাল পাথরের ছোট চাতাল মত রয়েছে, তাতে শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন আঁকা। মদনমোহন বিগ্রহ, রূপসনাতনের বাড়ি, রূপসাগর দীঘি, শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড প্রভৃতি আছে বলে এর আর এক নাম গুপ্ত বৃন্দাবন।

রূপসনাতনের দক্ষিণে বড় সোনা মসজিদ। যদিও এখন এর হাড়-পাঁজর মাত্র অবশিষ্ট আছে। এটি ১৬৮ ফুট লম্বা ও ৭৬ ফুট চওড়া ছিল। মসজিদটি চারকোণা ছিল। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এই মসজিদ তৈরী করেছিলেন। বড় সোনা মসজিদ থেকে মাইল খানেকের মত এগুলে মুসলমান রাজাদের দুর্গ দাখিল-দরওয়াজা। দুর্গ ও প্রাসাদ মিলিয়ে নাকি এটি এক মাইল লম্বা ছিল। দাখিল-দরওয়াজা দুর্গটির প্রবেশদ্বার উঁচু ৭০ ফুট। ছোট ছোট লাল ইঁটে তৈরী দরওয়াজাটির গায়ে নানাবিধ কারুকাজ। এটি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় তখনকার দিনেও ভাস্কর্য শিল্পের কি পরিমাণ উৎকর্ষ ঘটেছিল।

দাখিল-দরওয়াজা থেকে একটু এগুলে কেবলই ধ্বংসস্তূপ। চাঁদ-দরওয়াজা, নিম-দরওয়াজা প্রভৃতি পার হয়ে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন। প্রাসাদটির প্রাচীন নাম কাবাদি খাস। রাজপ্রাসাদ যেখানে ছিল তারই উত্তর-পূর্বে সুলতান হুসেন শাহের সমাধি স্থান। সমাধিটি নাকি এককালে অত্যন্ত মনোরম ছিল। সামনের দিক সাদা ও নীল মীনার কাজ করা ইঁটের দিয়ে তৈরী হয়েছিল।

দাখিল-দরওয়াজার খানিক দক্ষিণে ফিরোজ মিনার। ৮৪ ফুট উঁচু, ভেতরে ৭৩টি ঘোরান সিঁড়ি আছে। আগে শীর্ষদেশে একটু গম্বুজ ছিল। লোকে বলে, এই মিনারে আলো জ্বালিয়ে মহানন্দার তীরে নিবাই সরাই-এর সঙ্গে গৌড়-পাণ্ডুয়ার সংবাদ আদান-প্রদান হত। ফিরোজ মিনার থেকে বিস্তৃত প্রসারী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের ও রাজমহল পাহাড়ের ধূসর পাহাড়ের ধূসর সৌন্দর্য বেশ উপভোগ করার মত। ফিরোজ মিনার থেকে আরও একটু দক্ষিণে লুকোচুরি দরওয়াজা। এটি গৌড়ের প্রবেশদ্বার ছিল। প্রবাদ বাদশাহ বেগমরা এখানে লুকোচুরি খেলতেন।

লুকোচুরি দরওয়াজার পাশেই কদম-রসুল মসজিদ। মসজিদটি দেখবার মত। কাল পাথরের ওপর এখানে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন আছে বলে মুসলমানদের কাছে এটি পবিত্র স্থান। সুলতান নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ এটি তৈরী করিয়েছিলেন। মসজিদের একটি গম্বুজ, চার কোণে চারটি মিনার। মিনারগুলি কাল পাথরের ছিল। মসজিদের ফটক পূর্বদিকে। ইঁটের গায়ে নকসা করা। কদম-রসুলের পাশে হিন্দু মন্দিরের আকারে দোচালা কুঁড়েঘরের আদলে নির্মিত একটি সৌধের মধ্যে অনেকগুলি কবর। তার মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলীর খাঁর পুত্র ফতে খাঁর সমাধি উল্লেখ্য। কদম-রসুলের দক্ষিণ পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে একটি গুপ্ত পথ আছে। এরই পশ্চিমে গুমটি দরওয়াজা। আবার গুমটি দরওয়াজার পশ্চিমে চিকা মসজিদ। এটিও বিরাট গম্বুজওয়ালা মসজিদ কানিংহামের মতে, এটি একটি সমাধি, এখানে নাকি সুলতান জালালউদ্দিনের পুত্র মহম্মদ শাহের কবর আছে। চিকা মসজিদ দেখলে মনে হয় একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদের অংশ। এনামেল করা ইঁট দিয়ে দেওয়াল ও প্রাঙ্গণ বাঁধান ছিল।

এরও আধ মাইল দূরে লোটন মসজিদ। মসজিদের ইঁটে সবুজ, হলুদ, নীল ও সাদা মিনার কাজ। ঐতিহাসিক, গ্রেট বলেছেন, এইরকম সুন্দর হাল্কা পাতলা অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত সৌধ তিনি সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে দেখতে পাননি। লোটন মসজিদ থেকে মাইল দুয়েক দূরে কোতোয়ালী দরওয়াজা। এটির এখন ভগ্নদশা। দরওয়াজার দুপাশে কোতোয়াল ও প্রহরীদের বাস করার জন্য অর্ধচন্দ্রাকার ঘর ছিল। নিয়ামতউল্লার সমাধির কাছে ছোট সোনা মসজিদ। বড় সোনা মসজিদের মতই বারান্দাওয়ালা। পাথরের ওপর এমন সুন্দর নকসা গৌড়ের অন্য কোন মসজিদে নেই। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে তৈরী হয়েছিল।

গৌড় পরিক্রমা করতে একটা দিন যথেষ্ট নয়। মসজিদের ছড়াছড়ি, প্রায় প্রত্যেকটি শিল্প-নৈপুণ্যে অপূর্ব। মনে হয় অনন্ত নির্জনতার বুকে প্রাচীনকালের মসজিদগুলি হৃৎপিণ্ড হারিয়ে কঙ্কাল নিয়ে পড়ে আছে। ইদানীং অনেক পর্যটক আসছেন, কিন্তু ধ্বংসস্তূপ ঘুরে ঘুরে দেখছেন। কবরের দীর্ঘশ্বাসে সারা চত্বরটা কেমন খাঁ-খাঁ বিষাদে ভরে রয়েছে। তবুও গৌড় এখন বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের বেদ-নক্ষত্র-কাতা প্রতীক হয়ে প্রহরীর মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্রৌপদীর দেশে

অশোক চট্টোপাধ্যায়

চোখের সামনে এক রক্তিম দৃশ্য ফুটে উঠল। বৃত্তাকার মণ্ডোপাম 'মুন্ড'-র (খোঁয়াড়ের) অনুচ্চ পাথরের তৈরী পাঁচিলের মধ্যে একপাল জানোয়ার। তাদের পেশী কুঞ্চনের অসংখ্য ঢেউ। ফলে কেঁপে ছুঁচলো শিং নেড়ে তারা গাদাগাদি গুঁতোগুঁতি করছে। খোঁয়াড়ের একমাত্র সংকীর্ণ দরজার ঠিক মাঝখানে কীলকে বাঁধা সাত-আট বছরের কালো রঙের মেয়েটিকে চিৎ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। নিস্পন্দ। চারধারে তামাটে রঙের দর্শক নরনারীর প্রবল উল্লাস।

ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজল। একটি ঝোলানো ধাতুখণ্ডে লম্বাটে পাথর দিয়ে তিনবার আঘাত করে চর্দিকার যাজক সামনে এসে দাঁড়ালেন। জনতা নীরব। হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে তারস্বরে মন্ত্রক্ষেপ করতে লাগলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ। হাওয়ায় পুঞ্জীভূত দাড়ি উড়ছে। রঙীন আলখাল্লার নকসা করা প্রান্ত ধুলোয় লুটোচ্ছে। মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে ধুলো উড়ন্ত মেয়েটিকে শোধন করা হল। তারপর তিনি চলে গেলেন। প্রায় একই সঙ্গে প্রবল করতালি ও কলরব। বাধামুক্ত শত শত মহিষ ছুটে এলো 'মো' থেকে। চোখ জ্বলে আগুন বেরুচ্ছে। মুখে সাদা ফেনা। গর্জনে দশদিক কম্পিত। কীলকবন্ধ শিশু বালিকাকে দলিত মথিত করে পশুপাল বেরিয়ে গেল। হাজার কণ্ঠে উঠল দেবতার (সূর্যদেবের) জয়ধ্বনি করে বিজয়ী জনতা বিদায় নিল। ছিন্ন পরিত্যক্ত আর একতাল মাংস পিণ্ড নিয়ে রক্তাক্ত অন্ধকারে ঢাকা পড়ল।

এটি লাইকার্গাসের আমলের স্পার্টান শাসনতন্ত্রের শিশুহত্যার কাহিনী নয়। অত্যাচারী রোমসম্রাটের বিলাসদৃশ্যও নয়। ভারতের পার্বত্য উপজাতি টোডাদের এই সামাজিক প্রথা মাত্র একশো বছর আগেও প্রচলিত ছিল।

শাল, পাইন, ইউক্যালিপটাস আর নানান উদ্ভিদে ঢাকা সবুজ শ্যামল নীলগিরির সাত হাজার পাঁচশো ফুট উঁচুতে উটকামণ্ড শহর—উটি। নীল মেঘে ঢাকা—তার বুকে প্রবাহিত বাঁকা স্বর্গীয় অলকানন্দার মত উটাকামণ্ড লেক—এক স্বর্গীয় সুখ। আকাশ সবুজ সৃষ্টি বুক তার কালো জলে ছায়া ফেলেছে। সাড়ে সাত হাজার ফুট—তার মানে আবহাওয়ায় অক্টোবরের জলো এপ্রিলের সময়ও একটা সোয়েটার ঠাণ্ডার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় না। পুরো মরশুম পর্যটন-কেন্দ্র। ঝকঝকে রাস্তা, দোকান-পাট, ছিমছাম হোটেল ও এই সব। উত্তরে দেড় মাইল উঁচুতে বটানিক্স আর প্রায় তার মাথাতেই টোডামণ্ড বা টোডার গ্রাম—নাজানাদ। আশে পাশে পাহাড়ের মাথায় প্রায় সমতল ক্ষেত্রে আরো অনেক মণ্ড আছে।

আকাশভরা রোদ্দুর মাথায় নিয়ে টোডাগ্রামে উপস্থিত হলাম। দশ হাজার বর্গফুট পরিমিত জমির ওপর ছোট্ট গ্রাম। মোট কুটির সংখ্যা—ছয়। অধিবাসী—খোঁজ নিলাম, প্রায় পঞ্চাশ।

আগেই শুনেছিলাম অদ্ভুত এই টোডা। দেশ ও বিদেশের কোন প্রাচীন বা আধুনিক উপজাতির সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। চেহারা, রীতিনীতি, বাসস্থান, ধর্ম, ভাষা কিংবা সংস্কৃতি সব ব্যাপারেই তারা স্বতন্ত্র। প্রবাদ ও অর্ধসত্যে মেশানো তাদের উৎপত্তি ও আগমনের ইতিহাস, লোকাচার ও সমাজবিধি এখনও গবেষকদের কৌতূহলী করে। বস্তুত ১৮১৯ খৃঃ আগে এই পাহাড়ী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই অজ্ঞাত ছিল। কোয়েম্বাটুরের তদানীন্তন কালেক্টর সুলিভান সাহেব প্রথম টোডাদের ব্যাপারে উৎসাহী হন। তারপর ক্যাপ্টেন হেনরি হার্কনেস রচিত টোডাদের ওপর প্রথম গ্রন্থ (১৮৩২) প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পুরাবিদ এবং পণ্ডিতরা আকৃষ্ট হলেন। দলে দলে হাজির হলেন উটাকামণ্ডে তথ্যানুসন্ধানে। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে টোডাদের মুখ থেকে যা পাওয়া গেল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পর-বিরোধী ও বিভ্রান্তিকর। বহু গবেষণা হল। বহু গ্রন্থ রচিত হল। কিন্তু এখনও টোডাজাতি তাদের সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে রহস্যময় উপজাতি। এখনও অনুসন্ধান, পরিসংখ্যান, আবিষ্কার।

বারো বছরের ছেলে পোন্নাই তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। পোন্নাই মিশনারী স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি জানে। পোন্নাই-এর প্রৌঢ়া মা টোডা ভাষা ছাড়া তামিল কিছু কিছু বুঝতে পারে। আভাসে ইঙ্গিতে পোন্নাই-এর সাহায্যে কথাবার্তা হল।

—এসো, এসো—একটা টুল এগিয়ে দিল—কফি? কফি চলবে?

—না। নাক্ষে দে। (ধন্যবাদ—তামিল)

—নো ইংলিশ...নো বেংলি...টোডা তামিল...

পোন্নাইরা মোট দশজন ভাই-বোন। বেঁচে আছে সাতজন। ওর নিচে আরো তিনজন আছে। ওর বাবা ভাদারী অসুখে (যৌনরোগে) মারা যায়। বর্তমান বাবা চা বাগানে কাজ করে। আর এক বাবা নতুন বিয়ে করে নার্স-মণ্ডে চলে গেছে। তিন বছর আগে ছোট বোনের (৭) বিয়ে হয়েছে। ক-বছরই সে খুব ভালো পশুকুল উপহার পেয়েছে। পোন্নাই-এরও বিয়ের কথা হচ্ছে। তার একটুও ইচ্ছে নেই। সে টাউনে যাবে। চাকরি করবে। এই সব।

শুনতে শুনতে স্থির হয়ে গিয়েছিলাম। এক সুদীর্ঘ অজ্ঞাত ইতিহাসের সামনে আমি স্তম্ভিত অজ্ঞ সভ্য মানুষ!

টোডাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনৈতিহাসিক কিন্তু মজাদার অনেক কাহিনী আছে। যেমন—

মুখ্য দেব এন-এর বাবার নাম ছিল পীথ। পীথ, এন্টো আর দেওয়াক তিন ভাই মিলে সমস্ত টোডামণ্ডগুলি সৃষ্টি করেন। তাঁরা নানারূপে এইসব পাহাড়ে বিচরণ করতেন। তখনও কোন টোডার জন্ম হয় নি। একদিন 'কুল'-এ (দেবক্ষেত্রে) ঘুরতে ঘুরতে এন তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে পাথরে জোরে আঘাত করতেই পাথর ফেটে আঠারোশো সাধারণ মোষ বেরিয়ে এলো, তাদের পিছনে মোষের ল্যাজ ধরে এলো একজন টোডা। এন সেই টোডার দেহ থেকে একটি হাড় খুলে নিয়ে একটি স্ত্রী টোডা সৃষ্টি করলেন। এই দু'জন টোডা থেকেই সমস্ত টোডাজাতির উৎপত্তি। এন টোডাদের জন্যে অনেক তিরিয়ারী (মঠ), বোয়া (ভজনালয়) স্থাপন করলেন এবং নিজেকে পালাল (বিগ্রহ) রূপে স্থাপন করে এমুনাদ পাহাড়ে (পরকুবনে) চলে গেলেন। টোডাদের বিপদ-আপদে তিনি দেখা দিতেন। টোডারাও প্রয়োজনমত এমুনাদে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করত।

এই সব উপাখ্যানে ঐতিহাসিক সূত্র সামান্যই আছে। তাই তাদের উৎপত্তির ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। গাত্রবর্ণ, বেশবাস, ভাষা এসবের ভিত্তিতে কখনও অনুমান করা হয়েছে এরা সুমেরিয়ান গোষ্ঠী উদ্ভূত, কখনও ভাবা হয়েছে এরা উত্তর ভারতীয়, কখনও মনে হয়েছে কানাড়ী এবং মালায়ালাম ভাষার সঙ্গে টোডা ভাষার উচ্চারণ ও শব্দগত এত মিল যেখানে এরা দাক্ষিণাত্যেরই কোন অজ্ঞাত লুপ্ত গোষ্ঠীর অবশিষ্ট অংশ। ভৌগোলিক অবস্থানের

দিক থেকেও এ কথাই মনে করা স্বাভাবিক। তাই অনেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন প্রায় ৮০০ বছর আগে কানাড়ী গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র কোন অংশ স্থানান্তরিত হয়ে এখানে উপনিবিষ্ট হয়েছে। আবার তামাটে-কালো অদ্ভুত এদের গাত্রবর্ণ দেখে অনেকের মনে হয়েছে এরা পূর্বঘাট পর্বতমালার সৌরতাপদগ্ধ কোন অঞ্চল থেকে এসে থাকবে।

যাই হোক টোডারা উটাকামণ্ডের প্রাচীনতম বাসিন্দা—অতি প্রাচীন লুপ্তপ্রায় এক গোষ্ঠীর অংশ এবং সভ্যতার সু ও কু উভয় প্রভাব থেকে মুক্ত বিশ্বের এক অত্যাশ্চর্য উপজাতি এতে সন্দেহ নেই।

টোডা জাতির আলোচনায় সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রসঙ্গ বোধহয় এদের রমণী-কথা। একই সঙ্গে নারী-স্বাধীনতা এবং নারী-নিগ্রহের এমন মিশ্র প্রথা-অকল্পনীয়। সঙ্গতেই শিশু বলির কথা বলেছি। একশো বছর আগেও রুগ্ন, কুৎসিত শ্রী সন্তানকে উগ্রো দেবতার প্রীত্যর্থে পবিত্র মহিষের চরণতলে বলি দেওয়া এক মহৎ প্রথা ছিল টোডাদের। এখন এ প্রথা আর নেই। কিন্তু এখনও নারীকে এরা ভোগাপণ্যের অতিরিক্ত কিছু ভাবে বলে মনে হয় না। কঠোর ধর্মীয় গোপনতায় কোন টোডাই সহজে স্বীকার করতে চায় না. কিন্তু ধর্মবিধির আড়ালে নারী-নিগ্রহের রোমাঞ্চকর কিছু প্রথা এখনও টোডাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। 'যৌবন পরীক্ষা' এই রকম একটি প্রথা। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর স্বামীগৃহে যাবার আগে কুমারীদের এই পরীক্ষা দিতে হবে। কোন কারণে বিলম্ব হলে তা খুবই লজ্জার ও অগৌরবের বলে নিন্দিত হয়।

মেয়েদের যৌবনারম্ভের (ঋতু প্রকাশের) অব্যবহিত পূর্বে তাকে মণ্ডের প্রান্তে বিশেষভাবে রক্ষিত একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সেই এগারো-বারো বছরের মেয়েটি একটি পূর্ণবয়স্ক এবং রীতিমত বলবান পুরুষের সঙ্গে রাত্রিযাপন করবে। যৌনমিলন অতি আবশ্যিক কৃত্য। এইভাবে টোডা মেয়েকে তার নারীত্ব প্রমাণ করতে হবে। নতুবা তার বিবাহ হবে না। পরীক্ষক অবশ্যই একই গোষ্ঠীর অন্য পরিবারভুক্ত লোক হবেন। অনেক মেয়ে এই পরীক্ষায় বন্ধ্যাত্ব এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে। অনেকে এই ভয়াবহ প্রথার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য গৃহত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

সন্তানের জন্মের পর বিশ্বের রমণীকুল যে গর্ব ও আনন্দের স্বাদ পায় টোডা নারীরা তা থেকে বঞ্চিত। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। এক মাস জননী শিশুকে দেখার অধিকার পায় না। এক মাস পরে শিশুর নামকরণ ও 'সামাজিক পিতা' নির্বাচন উৎসব হয়। সাধারণত নদী, ফুল, পাহাড় ইত্যাদির নামে শিশুর নামকরণ হয়। এক নারীর বহু পতি থাকায় নবজাত শিশুর পিতৃত্ব নির্ণয় কঠিন। এই অনুষ্ঠানে মণ্ডের প্রবীণদের নিয়ে গঠিত এক পঞ্চায়েৎ মণ্ডলী শিশুর মাতার অনুমোদন সাপেক্ষে শিশুর পিতা স্থির করে। এরপর 'ধনুর্বেদন' অনুষ্ঠিত হয়। অনুমোদিত পিতা পুষ্পবৃক্ষ গাছের ডাল দিয়ে তৈরী একটি তীর ও ধনুক স্ত্রীকে দেবে। স্ত্রী তা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ আমি তোমায় আমার বৈধ স্বামী এবং আমার সন্তানের বৈধ পিতা রূপে স্বীকার করলাম—এই পিতাই শিশুর ভরণ-পোষণ এবং বিবাহাদি নানারূপ সামাজিক অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হন। শিশু সারাজীবন অন্যান্য পিতার মধ্যে এই সামাজিক পিতার প্রতিই অধিক অনুগত হয়।

টোডা নারীরা কোন সময়ই দেবালয়ের সীমায় যেতে পারে না। নৃত্যগীত এবং অন্যান্য প্রকাশ্য সম্মেলনে এককথায় সমস্ত প্রকার সামাজিক উৎসবাদিতে তাদের যোগদান নিষিদ্ধ।

মাসান্তিক কষ্টের দিনগুলি টোডা মেয়েদের ক্ষেত্রে দারুণতর হয়ে দেখা দেয়। এক নির্জন কুটিরে কটি দিন বিবর্ণ যন্ত্রণায় তাকে কাটাতে হয়। সেই সময় কোন পুরুষের মুখদর্শন অতিগর্হিত সামাজিক পাপ রূপে গণ্য হয়। পঞ্চমদিবসে মোষের দুধ খেয়ে বর্ণায় স্নান করে তার শুদ্ধি হয় ও গৃহে গমন করে।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও টোডা সমাজে নারীর বিস্ময়কর আধিপত্য। নারী সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। বিশেষত বিবাহ ব্যাপারে অর্থাৎ যৌনমিলন ও সঙ্গী নির্বাচনের প্রশ্নে নারীর ইচ্ছা এবং অভিরুচিই প্রাধান্য পায়। একশো বছর আগেও

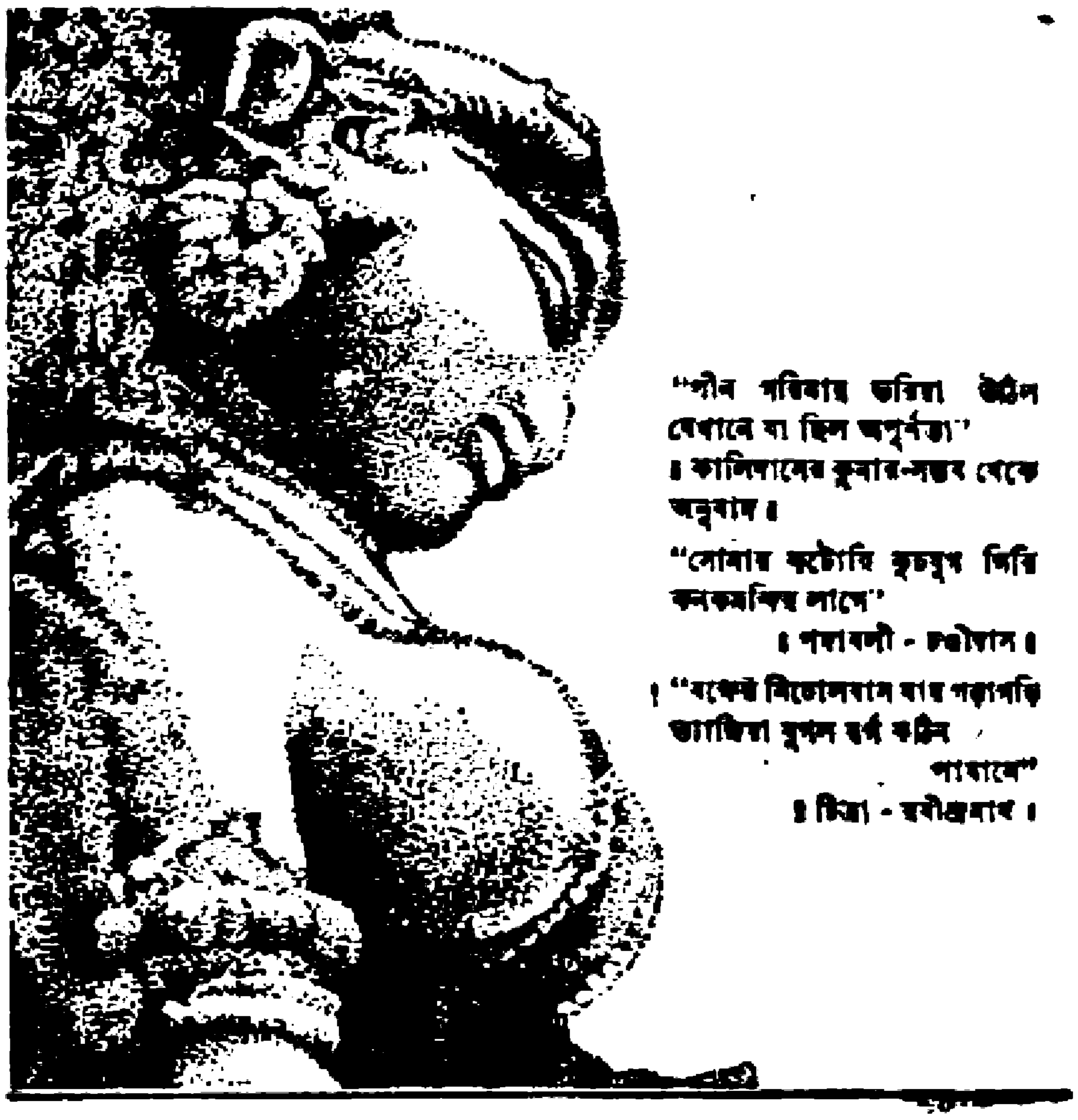

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার!

একটি বিশেষ হরমোন আর নানা বিশিষ্ট উপকরণে তৈরি ডার্মাকেয়ার অস্ট্রোজেনিক ডেভলপিং ক্রীম। বক্ষের শিথিলতা, অপূর্ণতা এর ছোঁয়ায় নিমেষে উধাও। বিকশিত বক্ষ-সৌষ্ঠবে গরবিনী যৌবনবতীর দিকে চেয়ে কারো বুক তখন দুরুদুরু।

ডার্মাকেয়ার
অস্ট্রোজেনিক ডেভলপিং ক্রীম
প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্
• সব বড় স্টেশনারী দোকানে পাবেন •

'বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপচর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেন্সি, পোষ্ট বক্স : ৬৫০, দিল্লী,—এই ঠিকানায় লিখুন
[illegible] 2/70

শাকি এদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। গৃহস্থালী কাজকর্ম পুরুষকেই করতে হত। মেয়েদের ভ্রমণের ইচ্ছা হলে স্বামীর স্কন্ধে বাহিতা হয়ে বিচরণ করত। হার্ডনেস সাহেব তাঁর গ্রন্থে এই সবের বর্ণনা দিয়েছেন। যাই হোক টোডা নারীদের সেই স্বর্ণযুগ আজ আর নেই। আজ ঘরের গার্হস্থ্যাদি তাদেরই সম্পন্ন করতে হয়। টোডা মেয়েরা বাঁশের তৈরী 'তুনন্' নামের একরকম চোঙায় মোষের দুধ দোহন করে আর পশুদল কাঠীল ফলের মত দেখতে একরকম বাঁশের দণ্ড দিয়ে মাখন ঘি তৈরী করে। অবসর সময়ে তারা কাপড়ের ওপর নানা রঙের সুতো দিয়ে সুন্দর নকশা করে। এই বহুবর্ণের এমব্রয়ডারী করা বস্ত্রের প্রসিদ্ধ নাম পুখকুলি। এটি ওদের শ্রেষ্ঠতম এবং বোধহয় একমাত্র শিল্পকর্ম। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই উৎসবাদিতে এই পুখকুলি পরে। টোডা হস্তশিল্পের একটি বিক্রয়কেন্দ্র উটকামণ্ড শহরে আছে।

টোডাদের অত্যধিক মহিষ (যমরাজের বাহন) প্রীতি এবং অন্যান্য রাক্ষুসে আচারের জন্য প্রতিবেশী কোটা এবং বাদাগা উপজাতির মতে তারা যমরাজার বংশধর। টোডারা এ কথায় তীব্র প্রতিবাদ করে। বরং তারা প্রচার করে তারা পাণ্ডব-সম্পর্কিত। অনেক টোডামণ্ডে পাণ্ডবপূজা প্রচলিত আছে। তাদের বিবাহরীতির সমর্থনে তারা বিশেষভাবে পাণ্ডবপ্রসঙ্গ তোলে। টোডাদের বিশ্বাস পাঞ্চালী তাদেরই জাতের মেয়ে। সুতরাং দ্রৌপদীর আদর্শে প্রত্যেক টোডা নারীই বহু পতিকে পর পর অথবা একই সঙ্গে বরণ করে।

টোডা স্ত্রী পারিবারিক স্ত্রী। অর্থাৎ এক পরিবারের সহোদর যে কোন ভ্রাতা অপর ভ্রাতার স্ত্রীকে পত্নীরূপে ব্যবহার করতে পারবে। এক ভাই যখন কুটিরে প্রবেশ করবে সে তার লাঠি কুটিরের সামনে রেখে যাবে। অন্য ভাই হঠাৎ এলে ঐ প্রতীক-লাঠি দেখে বুঝবে কোন ভাই ভেতরে আছে। সে তখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে অথবা যদি ঐ ভাই বিবাহিত হয় সে বিনা দ্বিধায় প্রিয়তমা ভ্রাতৃজায়ার শয্যার শূন্যতা পূর্ণ করতে কুটিরে প্রবেশ করবে। এই ব্যবস্থায় কোন ভাই-এরই আপত্তি থাকে না। শুধু তাই নয়—স্বামী-বৃন্দ ছাড়াও একজন টোডা নারীর এক বা একাধিক প্রেমিক থাকতে পারে এবং তারা যথামত মিলিত হতে পারে। আসল কথা সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে টোডা নারীরা নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করে। ধর্ম, সমাজ এমনকি স্বামী পর্যন্ত এসব ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করে না। কোন কারণ ছাড়াই তারা স্বামী পরিবর্তন করতে পারে। অবশ্য তার জন্য নতুন স্বামীকে দু-একটি মোষ জরিমানা দিতে হয়। প্রাক্তন স্বামী জরিমানা আদায় করে।

টোডাদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল ও অস্থায়ী। খুবই অনাড়ম্বরভাবে নিছক বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক স্ত্রী এবং পুরুষকে যখন অন্তত বার-পাঁচেক স্বামীবদল করতেই-হবে তখন বিয়ে-থা নিয়ে বেশী হৈ-চৈ করার কোন সঙ্গত কারণ তারা খুঁজে পায় না।

থার্থাল ও তেভেলিয়ল টোডাসমাজের এই দুটি প্রধান গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলি আবার কার্স, নার্স, পিগার্ট (১), পিগার্ট (২), কাশ্রট প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি পরিবারে বিভক্ত। পূর্বে দুটি গোষ্ঠীর বিভেদ দুস্তর ছিল। প্রত্যেকেই নিজেকে মহত্তর টোডা বিবেচনা করত এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ বা কোনরূপ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব ছিল। এখনও সামাজিক বিবাহের ক্ষেত্রে একই গোষ্ঠীর ভিন্ন পরিবারের মধ্যেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মামার মেয়ে অথবা পিসির মেয়ে একজন টোডার কাছে সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় পাত্রী। অন্যথায় গোষ্ঠীর অন্য পরিবার থেকে পাত্রী নির্বাচন করতে হয়। তবে উপপতি বা উপপত্নী গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ক্রমশ সমাজের অনুমোদন লাভ করছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ধনুর্দান উৎসবে পুত্রের অধিকার থাকবে না। অর্থাৎ ঐ পুরুষ ভিন্ন স্ত্রীর বৈধ স্বামী বা পুত্রের বৈধ পিতারূপে স্বীকৃত হবে না।

নিতান্ত শিশুবয়সে (স্ত্রী ৩।৪ : পুরুষ ৮।৯) টোডাদের মধ্যে বাগদান সম্পন্ন হয়ে যায়। পাত্রী নির্বাচনের পর ছেলের বাবা ছেলেকে মেয়ের বাড়ী নিয়ে যায়। ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে দু-চারটি মোষ এবং মেয়ের জন্য একটি পুখকুলি উপহার দিয়ে বাগদান শেষ করবে। মেয়ে ছেলের বাবাকে এবং ছেলে মেয়ের বাবাকে প্রণাম করবে। প্রণাম করার রীতি—কন্যা স্ত্রী বা পুরুষের সামনে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মাথা নিচু করে বসতে হয়। গুরুজন একটি পা একেবারে তার মাথার ওপর তুলে দেবেন এবং মৃদু মৃদু চাপ দেবেন। এই পদ্ধতিতে একই সঙ্গে প্রণাম এবং আশীর্বাদ পর্ব শেষ হলে কিঞ্চিৎ জলাহারে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। ছেলে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসবে। এরপর থেকে কনের যৌবন-সূচনা পর্যন্ত প্রতি বছর পাত্রপক্ষকে একটি পুখকুলি মেয়ের বাড়ীতে পাঠাতে হবে। যৌবন পরীক্ষার পর যথাকালে ছেলের বাড়ীতে খবর পাঠান হবে। ছেলে এসে তার বৌকে ঘরে নিয়ে যাবে। এবার মেয়ের বাবা ছেলেকে কিছু মোষ এবং পুখকুলি যৌতুক দিয়ে বিদায় দেবেন। এই টোডাদের বিবাহরীতি।

কিন্তু শতকরা আশীটি ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা এত সহজে মেটে না। পাত্রপাত্রী—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাত্রী—শৈশবের বাগ্-বিবাহের কোনরূপ মূল্য দেয় না। যদি ইতিমধ্যে মনের মানুষ পাওয়া যায় তবে অনায়াসে পাত্রী পুরাতন বিবাহ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ধর্ম সমাজ কারো এব্যাপারে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই: পাত্রেরও অবশ্য অনুরূপ অধিকার আছে। উভয়ক্ষেত্রেই শর্তভঙ্গকারীর পিতা অন্যপক্ষকে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ কিছু মোষ এবং পুখকুলি দিতে বাধ্য থাকে।

বিবাহের পরে স্বামী বা স্বামীদের সংসারে টোডা নারীরা যদি খুশী হয় ভালই নতুবা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব হয় না। স্বামীর মৃত্যু হলে, স্বামী পছন্দ না হলে অথবা সে রকম কিছুই না হলেও টোডা নারীদের অন্য পুরুষ গ্রহণে বাধা নেই। অর্থাৎ কোন টোডা নারীই স্বামীহীন থাকে না। তাই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে : টোডা শিশু কোনদিন পিতৃহীন হয় না।

ব্যবহারিক জীবনে যাই হোক বেশবাস ব্যাপারে টোডা নারীদের রুচি এবং শালীনতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অধিকাংশ টোডা নারীই কণ্ঠ এবং বাহুলতায় উল্কি অংকন করে। ফুল, পাখি, ত্রিকোণ বা বৃত্তাকার নানা নকসা অঙ্কিত হয়। টোডা মেয়েদের কেশবিন্যাস অভিনব। সমস্ত চুলগুলো অতিযত্নে মহিষ ঘৃতে চর্চিত করে বিভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এক একটি গুচ্ছ সুচিক্কন শিশু-সর্পের মত কাঁধে ঘাড়ে পিঠে লুটিয়ে থাকে। এই চুলই টোডা রমণীর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রসাধন। এছাড়া আছে পুখকুলি। ঘাড় থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লুটিয়ে থাকে বহুবর্ণে উজ্জ্বল সুন্দর পুখকুলি। এই পরিধানপ্রিয়তা অন্যান্য স্বল্পবাস অনাবৃত দেহ ভারতীয় উপজাতি থেকে টোডাদের স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার কাহিনী আছে :

শোনা যায় বর্তমান কোন টোডার এক বৃদ্ধ প্রপিতামহী (প্রায় ২০০ বছর আগে) একবার রঙীন পুখকুলিতে শোভিত হয়ে এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। (১) অসাবধানে কখন পুখকুলির সাদাটে অংশে ধুলো লেগে যায়। অনন্যোপায় হয়ে তিনি পুখকুলির দুটি প্রান্ত ধরে ঝাড়তে লাগলেন। অনেকটা যেমন কুলোয় করে চাল ঝাড়ে সেইভাবে—ঝাড়াটা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল এবং নিম্নাঙ্গ আধুনিক অর্থেই যাকে বলে বেশ আপত্তিকরভাবেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। রেগে আগুন হয়ে গেলেন স্বামী—মহৎ টোডা জাতির মাথা নিচু করেছে এই মেয়ে। লজ্জাহীন বেহায়া এমন বৌকে আমার দরকার নেই। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেন তিনি। শুধু তাই নয় রীতিমত যুবতী সুন্দরী এই পিতামহীর আর দ্বিতীয় বিবাহ হল না। কোন টোডাই তাকে স্ত্রী এমন কি সঙ্গিনীরূপেও গ্রহণ করতে রাজি হল না।

সাধারণভাবে এই আব্রু ব্যাপারটা নারী সমাজে এখনও বেশ ভালভাবেই আছে। তবু রুচির পরিবর্তন চোখে পড়ে। বিশেষত ধর্মান্তরিত অনেক টোডা নারীদের কাছে দক্ষিণী শাড়ী, ঊর্ধাবরণ এমনকি বক্ষ-বন্ধনীও অব্যবহার্য মনে হয় না। পুরুষেরাও ধুতি, সাদা সার্ট, মাথায় শাদা কাপড়ের পাগড়ী পরছে। অবশ্য সংখ্যায় এরা খুবই কম এবং সামাজিক উৎসবাদির জন্য প্রিয় পুখকুলি এরাও সযত্নে তুলে রেখেছে।

---

(১) মৃত্যু-উৎসব ছাড়া অন্য কোনরূপ সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান টোডানারীদের নিষিদ্ধ।

বস্তুত টোডা সমাজে অসামাজিক বিবাহ ছাড়াও অনাবিধ যৌনচর্চা অনেক ব্যাপক। অধিকাংশ টোডা দ্রৌপদীই বিবাহের পূর্বে এমনকি যৌবনারম্ভের বহু পূর্বেই যৌন ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এক পরিসংখ্যানে (২) প্রকাশ শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী ক্ষেত্রে পুরুষেরা ১৯ বছরের আগে এবং নারীরা ১৩ বছরের আগে যৌনাভ্যাসে রত হয়। ১৪ বছরের মেয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ভাগ সংখ্যা ৯৮। অবশ্য ধর্মান্তরিত (খৃস্টান) টোডাদের এ ব্যাপারে এতদূর বাড়াবাড়ি নেই।

অতি অল্প বয়স থেকেই টোডা ছেলে-মেয়ে প্রেমিক হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে বাড়ির অজ্ঞাতসারে নির্বাচিত স্থানে ও কালে তারা মিলিত হয়। ক্রমশ এই প্রেম বিপজ্জনক ও সীরিয়স হয়ে দেখা দিলে তারা পিতা-মাতাকে জানায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্মতি পাওয়া যায়। প্রাগ-বিবাহ (বাগ্‌দান) প্রভৃতি ছোটখাট ব্যাপারের নিষ্পত্তি হলেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

যৌনক্ষেত্রে টোডা নারীর এই স্বাধীনতা এবং বহুবিবাহ (পুরুষের চেয়ে বেশী) সমাজের স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা বৈষম্যের দ্বারাই প্রভাবিত মনে হয়। এই একটি ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে টোডা নারীরা সমাজে অনাদৃত এবং অবহেলিত। উৎসবে নারীরা বর্জিত। বিবাহ অথবা মৃত্যু উপলক্ষে টোডাদের এক লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। এসব অনুষ্ঠানে নারীদের কোন স্থান নেই। বৃত্তাকারে কিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত নানা বয়সের টোডা পুরুষ কখনও ডান, কখনও বাম, কখনও বা উভয় পদে ভর দিয়ে নৃত্য করে। নৃত্যের সঙ্গে লোকগীতি হয়। কখনও বা তালে তালে শুধুমাত্র হুঃ হাঃ ধ্বনি হয়। প্রথমে হু...…হাঃ, হু—হাঃ ক্রমশ হু-হাঃ, হুহাঃ, হুহাঃহুহাঃহুহাঃহুহাঃ। নর্তকরা কেউ শূন্য হাত, কেউ বা লাঠি বা ছাতা সমেত হাত তালে তালে ওঠায় নামায়।

উত্তরাধিকারসূত্রে নারীরা কখনই কোন কিছু লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র বৈধ পুরুষ সন্তানই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কিছু উপহার অবশ্য নারীরা পেতে পারে এবং পুনর্বিবাহকালে সে তা নতুন স্বামীর ঘরে নিয়ে যেতেও পারে। বিধবা মাতার পুনর্বিবাহকালে সন্তান নাবালক হলে সাধারণত মায়ের সঙ্গেই দ্বিতীয় পিতার গৃহে যায়। অথবা দ্বিতীয় পিতা স্বীয় গৃহে অর্থাৎ বৈধ সন্তানের গৃহে বাস করে। এসব ক্ষেত্রে সম্পত্তি নিয়ে প্রায়ই পিতাপুত্রে বিবাদ বাধে।

সম্পত্তি বিষয়ে এবং বিবাহের ক্ষতি-পূরণ অথবা পারিবারিক স্ত্রী নিয়ে তাদেরদের মধ্যে মনোমালিন্য প্রভৃতি বিরোধ মীমাংসার সর্বোচ্চ ক্ষমতা পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলীর। এই মণ্ডলী কোন স্থায়ী সংস্থা নয়, এর কোন বিশেষ অর্থভাণ্ডারও নেই। মণ্ডলীর পাঁচজন প্রবীণ মান্য টোডাকে নিয়ে এই পঞ্চায়েৎ গঠিত হয়। বাদী এবং ফরিয়াদী উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্বাচিত সদস্যের এই মণ্ডলী বিরোধের মীমাংসা করেই বিলুপ্ত হয়। অন্য বিরোধের সময় আবার নতুন মণ্ডলী গঠিত হয়। যাই হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পঞ্চায়েৎ মণ্ডলীর বিচার সকলে মেনে নেয়।

১৫-৫-১৯৬০ এর সেনসাস* অনুযায়ী টোডা জনসংখ্যা ছিল ৭৬২ জন। পরবর্তী দশকে এই সংখ্যা পাঁচ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে বলে অনুমিত হয়। স্বজাতি বিবাহ এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ একথা মনে করার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। বরং বিশেষজ্ঞরা অনাবিধ যুক্তি স্থাপন করেন। টোডা যৌনাচার এর একটি প্রধান কারণ। যৌন-রোগের অস্বাভাবিক বিস্তার টোডা জন-সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণরূপে ধরা যায়।

নিতান্ত বালিকা বয়স থেকে সীমাহীন যৌনচর্চা বিশেষত যৌবন পরীক্ষার ভয়ঙ্কর সামাজিক রীতি প্রায়শই টোডা নারীকে বন্ধ্যাত্বের দিকে ঠেলে দেয়। ১৯৬০ সালে বন্ধ্যাত্বের সংখ্যা ১৭৮ জন বিবাহিত নারীতে ৪৯ জন অর্থাৎ শতকরা ২৮ জন।*

পূর্ণ বন্ধ্যাত্ব খুব বেশী না থাকলেও গড় বয়স ২০ থেকে নারীর সন্তানধারণ ক্ষমতা কমতে থাকে। ৩৫এ এই অনুর্বরতা চরম (শতকরা ৫০ জন) রূপ নেয়। ৪৫এ প্রায় সমস্ত টোডা নারীই পূর্ণ বন্ধ্যাত্ব লাভ করে। সেই জন্যই বালিকা বিবাহ, বিধবা বিবাহ, পুনর্বিবাহ প্রভৃতি জন্মসংখ্যা বৃদ্ধির বহু অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও টোডার জনসংখ্যা ক্ষয়ের পথে। এ ছাড়া মৃতবৎসা নারীর সংখ্যাও কম নয়। এক সমীক্ষায় প্রকাশ : প্রতি হাজারে গর্ভপাত —১০০, মৃত সন্তান প্রসব—২০, ও শিশু-মৃত্যু—২৬। মোট নষ্টজন্মের সংখ্যা—১৭৬।

মাত্রাতিরিক্ত যৌন অত্যাচারের ফলেই অল্প বয়সেই টোডা নারীর বার্ধক্য এসে যায়। সহজাত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য নিয়ে টোডা বালিকা বেড়ে ওঠে। ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত টোডা মেয়ে যে কোন সভ্যজাতের সুন্দরী মেয়ের পাশে সগর্বে দাঁড়াতে পারে। বাদামী রং, প্রলম্বিত বহুমুখী বেণী, আয়ত চক্ষু, উন্নত নাসিকা এবং উন্নত বক্ষে টোডা যুবতী দীপ্তিময়ী হয়ে ওঠে। কিন্তু 'কুড়িতে বুড়ি' প্রবাদ বোধহয় টোডা নারীদের ক্ষেত্রেই আক্ষরিক অর্থে সত্য। অচিরেই বিবর্ণ নিষ্প্রাণ শরীর থেকে যৌবন বিদায় নেয়। সিফিলিস ও গনোরিয়া তাদের জীর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলে। বাস্তবিক যৌনরোগের এত ব্যাপক প্রসার (৪০ শতাংশ) পৃথিবীর অন্য কোন জাতের মধ্যে আছে কি না সন্দেহ। ধর্মীয় উৎসবে বলি দেওয়া মহিষ শাবকের মাংস ছাড়া অন্য মাংস এরা খায় না। তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের সঙ্গে পালিত মোষের দুধ ঘি, মাখনই এদের প্রধান খাদ্য। এই অদ্ভুত খাদ্যাভ্যাস, পার্বত্য জলবায়ু এবং তাদের সহজাত মজবুত শরীর এবং প্রতিরোধশক্তির জন্যই বোধহয় এইসব ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করে (চিকিৎসা বিমুখতা সত্ত্বেও) এখনও এ জাত টিঁকে আছে। বৃদ্ধেরা বলেন, উটাকামণ্ড টুরিস্ট সেন্টার হওয়ার আগে এ রোগ এখানে ছিল না। নানা জাতের টুরিস্ট বিশেষত ব্রিটিশ আমলে মিলিটারিরাই এ ব্যাধি এখানে এনেছে। এই ভাষা অনুযায়ী এই প্রাদুর্ভাব একশো বছরের বেশী নয়। এদের সব কথা পুরো মানা যায় না। কিন্তু এ কথাও ঠিক, গত দু-তিন শতাব্দী ধরে এমন রোগ এসে থাকলে (বিনা চিকিৎসায়) একটি টোডাও বোধহয় আজ বেঁচে থাকত না।

টোডা অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কেড্ বা মৃত্যু উৎসব। এদের একটি অভিনব মৃত্যুতত্ত্ব আছে। এদের বিশ্বাস প্রাচীনকালে টোডারা অমর ছিল। ইহলোক (টোডানাদ) ছেড়ে তারা মাঝে মধ্যে আম্‌নোদ পাহাড়ে (পরজন্মে) যেত। আবার ফিরেও আসত। আম্‌নোদ থেকেও দেবতারা টোডাদের বিপদে আপদে দেখা দিতেন, তাদের রক্ষা করতেন। কিন্তু একজন বিশ্বাসঘাতক টোডার জন্য আম্‌নোদ থেকে ফেরার রাস্তা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। এখন মৃত্যুর পর টোডারা আম্‌নোদে যায় কিন্তু সেখান থেকে আর ফিরতে পারে না। এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার লৌকিক কাহিনী আছে।*

একদা টোডা জাতির প্রতিষ্ঠাতা পেকান (মহাত্মা) এর অন্তঃসত্ত্বা পত্নী পোনে-টোয়ানকে নিয়ে কুলটুলমণ্ড থেকে ওকান-

---

(2) Census of India 1961. Vol IX Part v c. Page 62.

*Census of India 1961. Vol IX Part v c Page 57, 31.

*"Primitive tribes of Nilagiris" by J. W. Breeks (1873)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সাহিত্য সাধনার অসাধারণ ফসল

মানিক গ্রন্থাবলী

সদ্য-প্রকাশিত ॥ ৪র্থ খণ্ড ॥ ১৪·০০
তৃতীয় খণ্ড ॥ নিঃশেষিত ॥ ১২·৫০
দ্বিতীয় খণ্ড ॥ (২য় সং) ॥ যন্ত্রস্থ
প্রথম খণ্ড ॥ (২য় সং) ॥ ১২·০০
পঞ্চম খণ্ড ॥ ॥ যন্ত্রস্থ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ॥ ৪·০০
মানিক জীবন ও সাহিত্য ॥
ডঃ সরোজমোহন মিত্র ॥ ১২·৫০

বি দ্রঃ—যাঁরা নিয়মিত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করছেন, তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ

১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

সমীরদা—

রোজগেরে, ফুর্তিবাজ লোক, ঘরোয়া কাজে চৌকশ

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

খোলা মেজাজের মানুষ সমীর—সারাদিন মনের ফুর্তিতে কাজ করতে পেলেই খুশী। বলে, শরীর ভালো তো সব ভালো।

ওর স্ত্রী সেটা বোঝেন আর বোঝেন বলেই রোজ ওকে হরলিক্স খেতে দেন।

হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

পুষ্টিকর উপাদান আর শরীরগঠনকারী প্রোটিনে ভরপুর হরলিক্স স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট রাখে।

খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই হরলিক্সের এত গুণ।

ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

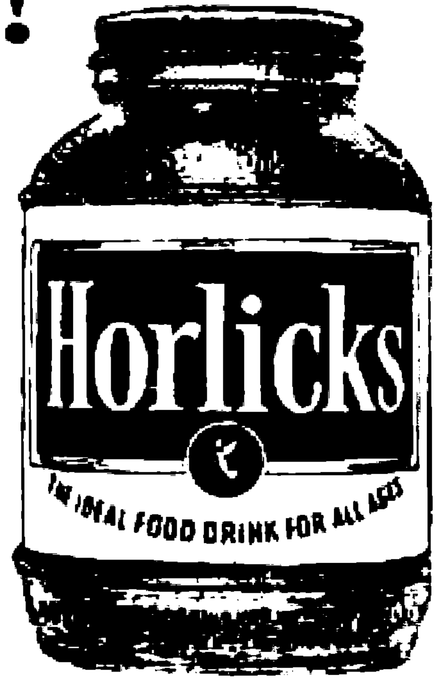

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1853 A

নামণ্ডে যান। সেখানে যথাকালে পোনেটোয়ান একটি চালকুমড়ো প্রসব করলেন। এন ক্রুদ্ধ হলেন—এমন ছেলে নিয়ে কি করব। এরে আগুনে ফেলে দাও। —আগুনের স্পর্শ লাগতেই কুমড়ো দুভাগে ফেটে গিয়ে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী সন্তান হয়ে আগুন থেকে বেরিয়ে এলো। ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা উটাকামণ্ডে ফিরে এলেন।

একদিন ছেলেটি 'তাল'এ (শস্যক্ষেত্রে) খেলা করছে এমন সময় বাপ এন এসে এক মুঠো ধুলো তার গায়ে ছুঁড়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে এক উজ্জ্বল সোনালি ডানার চিল হয়ে ফড়ৎ করে উড়ে গেল। উড়তে উড়তে চিল ডোডাবেটে পাহাড়ে দেবতাদের সভাস্থলে হাজির। দেবদেবীরা অবাক। অনেক পরামর্শ করে কোদাথা নামে একজন দেবতার ওপর ভার দেওয়া হল—ওকে তাড়িয়ে দাও। —কোদাথা চিলকে সঙ্গে নিয়ে কোলাথাবেত্তু দেবীর কাছে এলো। দুজনে মিলে তাকে দূরে ছুঁড়ে দিতেই চিল ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে পাহাড়ের ওপর একটা বাঁশ ধরে ফেলল। তারপর মহাক্রোধে সেই বাঁশ উপড়ে কোদাথার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে তার মাথাকে তিন টুকরো করে দিল। মৃত্যুর তখনও জন্ম হয়নি। তাই কোদাথা বেঁচে গেল। চিল আবার দেবসভায় উপস্থিত। দেবতারা সম্বর্ধনা জানালেন। —বাহাদুর চিল! তুমি কি পিকওয়াকমণ্ডের নদীটার স্রোত ঘুরিয়ে দিতে পার? কিংবা সূর্যকে ধরতে?

চিল নদীর স্রোত ঘুরিয়ে দিল। প্রথমে লোহা দিয়ে পরে ধাতব শৃঙ্খল দিয়ে সূর্যকে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু মার্তণ্ড-দেবের প্রখর তাপে ধাতু গলে গেল। এবার চিল পাথর দিয়ে আটো লাগান একটা চেন তৈরী করল। সূর্যকে ধরে নার্ভেনমণ্ডে আনা হল। ত্রিভুবন অন্ধকার। দেবতারা অনুরোধ করল—হে মহৎ সর্বশক্তিমান চিল, সূর্যকে মুক্তি দিন। নদীকে পুরনো স্রোতে ফিরিয়ে দিন। চিল দেবতাদের অনুরোধ রক্ষা করল।

এন আর পোনেটোয়ান তাদের মেয়ে পার্সকে নিয়ে প্রায়ই ঐ আদায় ওয়াড্ডে মানে অ্যামনোদ পাহাড়ে যেত। আবার সময়মত ফিরে আসত। কিংবা প্রয়োজনে টোডারা অ্যামনোদে গিয়ে তাঁর নির্দেশ নিত বা তাঁকে ফিরিয়ে আনত। একবার ঐরকম তাঁরা যখন ওপারে চিল এসে টোডাদের মধ্যে রটনা করে দিল—ওরা আর ফিরবে না। এসো ওদের স্মরণে আমরা বড়উৎসব করি। তিরিশটা মোষকে গলায় ঘণ্টা বেঁধে আগুনে দেওয়া হল। খুব উৎসব হল। এনরা ফিরে এসে গলায় ঘণ্টা বাঁধা আধ-পোড়া মোষেদের দেখে হতভম্ব। বুঝলো সব চিল ছেলের কীর্তি। প্রিয় মোষের গায়ে কপাল ঠুকে খুব কাঁদতে লাগল এন। তার চোখের জলে সেখানে একটা ঝরণা হয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাসে একটা বড় গাছ উপড়ে পড়ল। এন আর পোনেটোয়ান কাঁদতে কাঁদতে 'পো' থেকে অর্ধদগ্ধ মোষদের নিয়ে অ্যামনোদে ফিরে গেল।

কিন্তু মেয়ে পার্স গেল না। এন এর অবর্তমানে টোডাদের নেতৃত্ব দেবে কে? মুটানাড় মন্দিরে সে স্থিত হল। অনেক নিসেন (কুটির), মণ্ড (গ্রাম), টিভিয়ারী (খাটাল), বোরা (ভজনালয়) স্থাপন করল। এন সব মোষ নিয়ে চলে গিয়েছিল, সে ওপারে গিয়ে আবার সব ফিরিয়ে আনল। কিন্তু ফিরে এসে মোষেরা ধর্মঘট করল। তারা বলল—আমরা আমাদের বাচ্চা ছাড়া কাউকে আমাদের দুধ নিতে দেব না। —শেষে এন-এর নির্দেশমত পার্স টেউ গাছের ছাল খাইয়ে তাদের কথা বলা বন্ধ করে দিল। এবার দুধ দুইতে আর অসুবিধে হল না। অ্যামনোদ পাহাড় থেকে আসার সময় দুধ দুইবার সোনার বাটি আর মাখন তৈরী করার রত্নখচিত দণ্ড সেখানে ফেলে এসেছিল পার্স। সুতরাং আবার তাকে দৌড়তে হল এন-এর কাছে। টোডাদের ওপর খুব রেগে ছিলেন এন। বললেন—ওসব আর পাবে না তুমি। এখন থেকে বাঁশের চোঙা দিয়ে 'ফেন' (দুধ রাখার পাত্র) বানিয়ে নাও আর পাঁচ পাঁপড়ির কার্ভাল ফুলের মত মন্থন দণ্ড তৈরী কর। তাই করল পার্স। আজও টোডামেয়েরা হিরন্ময় পাত্রের মত আর রত্নখচিত দণ্ডের মত যত্নে রাখে ফেন আর পঞ্চদল কার্ভাল ফুলের মত বাঁশের মন্থন দণ্ড। ঘরে ঘরে তা দিয়ে ঘি দুধ মাখন তৈরী হয়। যাই হোক এই-ভাবেই মহৎ টোডা জাতির সমৃদ্ধিময় জীবন শুরু হল।

একদিন একদল অশ্বারোহী সৈনিক মহীশূর থেকে টোডানাদের দিকে এলো। তারা কাছাকাছি আসতেই কু-মতলব আছে বুঝে পার্স তাদের পাথর করে দিল। চারজন একটু আলাদা ছিল বলে অদ্ভুতভাবে বেঁচে গিয়েছিল। তাদের হাতে একজন টোডা ধরা পড়ল। তারা সেই টোডার কাছে সৈন্যদলকে কে পাথর করে দিয়েছে তা জানতে চাইল। ধমক দিল, ঘুষ দিল। হতভাগ্য টোডা পার্স-এর নাম জানিয়ে দিল। ততক্ষণে দ্বিতীয় মাইশোরীয়ান সেনাদল এসে পৌঁছেছে। সেনাপতির কাছে খবর গেল। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ হল—মন্দিরে মাংস ছুঁড়ে মার, ওর যাদু ঘুচে যাবে। তাই করা হল। দেবী পার্স অগ্নিময়ী হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং মুটানাবমণ্ডের পিছনে স্তব্ধ শিলীভূত পাহাড় হয়ে গেলেন। এর পর সেনারা এসে টোডাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করল। অনেককে হত্যা করল।

একজন টোডার ঐ বিশ্বাসঘাতকতায় দেবী পার্স বিমুখ হলেন। তিনি আর তাদের কাছে এলেন না। তাদের রক্ষা করলেন না। মৃত্যুর প্রথম আবির্ভাব হল টোডানাদে। তখন থেকে আদায় ওয়াড্ডে মৃত্যু এন-এর কাছে যে যেত সে আর ফিরে আসত না। আগে মৃত্যু ছিল না। দেবতারা দৃশ্যমান ছিলেন। তাঁরা টোডাদের সঙ্গে কথা বলতেন। তাদের রক্ষা করতেন। হায় স্বজনদ্রোহী টোডা!

এই 'কেড়্'—মৃত্যু উৎসব—আমুনা যাত্রা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। দিবা বা নামকরণ অনুষ্ঠান নিতান্ত অনাড়ম্ব ভাবে একবেলার মধ্যেই শেষ হয়। কিন্তু শবযাত্রা, শবানুগমন, শেষকৃত্য সব মিলি 'কেড়ু'তে যে সপ্তাহব্যাপী সমারোহ হ তাতে মৃত্যুকে উৎসব বলাই সমীচীন আগেকার দিনে 'কেড়ু'তে খুবই ঘটা হ তার বিবরণ পাওয়া যায়।*

কেড়্ অনুষ্ঠান অনেকটা হিন্দুদে সৎকার ও শ্রাদ্ধ এই দুইভাগে বিভক্ত। স টোডানাদে শবদেহ দাহ করা হয়। মৃ পুষ্পকুঞ্জ ও নানা অলঙ্কারভূষিত মৃতদে প্রথমে কয়েকদিন তার কুটিরের সাম দর্শনার্থীদের জন্য রক্ষিত থাকবে। আত্মী স্বজনসহ বিভিন্ন পরিবার ও গোষ্ঠী নির্বাচিত টোডারা শবদেহের ওপর শস ঘি প্রভৃতি দান করবে। পরে নির্দিষ্ট দি চারজন বাহকের স্কন্ধে শবদেহ শ্মশানবা করবে। পিছনে স্বজনবর্গ, নারীপুরুষে মিলিত এক বিরাট জনতা প্রিয়বিদায় প্রিয়স্মৃতি স্মরণে শোকবিলাপ কর করতে অনুগমন করবে। তাদের হা থাকবে শস্যগুচ্ছ, ঘৃতপাত্র কাষ্ঠ ইত্যাদি।

শ্মশানভূমিতে গিয়ে মৃতদেহ নামি অনুগামীরা চক্রাকারে বসে বা দাঁড়ি উচ্চৈস্বরে শোকবিলাপ করবে এ মৃতদেহে ক্রমাগত শস্য এবং ধূলি নিক্ষে করতে থাকবে। চিতা প্রস্তুত হলে মৃ বৈমাত্র অথবা নিকটতম আত্মীয় প্র এগিয়ে এসে শস্য ও ধূলি নিক্ষেপ ক মৃতের দুগাছা চুল কেটে সযত্নে রাখবে। সমবেত জনতা থেকেও এই কে সংগ্রহ শুরু হবে। টোডাদের বিশ্বাস চুল ধরে রাখলে কোন বিপদ আপদ ঢুকতে পারে না। শবদেহ চিতায় শা হলে চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হবে। আ বিলাপ চলতে থাকবে। দাহ শেষ হ সবাই জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে দেবে চিতাভস্মের মধ্যে মৃতের অস্থি অলঙ্কারের জন্য তাদের মধ্যে কাড়াক পড়ে যাবে। এগুলিও বিপত্তারণ রক্ষাক রূপে পরম মূল্যবান। এর পর পরিবা তরুণ ও কিশোরেরা চুলের কিছু অংশ কেলবে। কেউ কেউ 'শোকোৎসবের' কা কোন অলঙ্কার পরবে না। এসব কৃত্য গোষ্ঠীর টোডারা মানে না। সাধারণ শরীরের কোনপ্রকার কেশ কর্তন না হ টোডা জাতির প্রথাবিরুদ্ধে (মৃত্যুর স্বজাতিকে কেশদানের জন্য!)।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আরও আকর্ষণ শবদাহের পর একটি নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠান হয় এবং বেশ কিছুদিন এটি উৎসব পালিত হয়। সমস্ত গোষ্ঠী এব প্রতিবেশী নানা উপজাতি এই অনু

*An Account of the Tribes Nilgherries. By J. Shortt (18
P-12-16

নিমন্ত্রিত হয়। মৃত্যুকালে কোন বিস্তৃত ভূমিতে এই অনুষ্ঠানে ২০ থেকে ৫০ জন পুরুষের একটি দল দীর্ঘকলেবর এক শোকনৃত্য শুরু করে। সঙ্গে শোক-সঙ্গীত হয়—

আমুনাপ্পা সেরুমা
কয়মা ধরমা তিজিমা

। তিনি স্বর্গবাস করুন। তাঁর পাপ এবং পুণ্য নিয়ে তিনি পরম শান্তি লাভ করুন।

এর পর মোষ বলি হয়। তিরিশ বছর আগেও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির সমস্ত মোষকেই বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। সরকার আইন করে এই ব্যাপক পশুবধ বন্ধ করেছেন। টোডারাও ক্রমশ অনেক সচেতন হয়েছে। এখন বলির জন্য একটিমাত্র—তাও দুটো, বড় বা অকেজো কোন মোষকে নির্বাচন করা হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। সাধারণত পানাহারে অতিথিদের আপ্যায়িত করা হয়। নিষিদ্ধ প্রদেশেও মেথিলেটেড স্পিরিট জাতীয় পানীয়ের বন্দোবস্ত হয়। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে (আবার মৃত্যু উৎসব!)।

নাজ্ঞানাদমণ্ডে বিচিত্রদর্শন কুটিরের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। ভূগোলে এস্কিমোদের বরফের ঘরের ছবি দেখেছি। ছোটবেলায় অবাক হয়ে ভেবেছি ওরা ওর মধ্যে থাকে কি করে। টোডাদের ঘর দেখে এস্কিমোদের কথাই মনে হয় প্রথমে। তার পরেই মনে পড়ে রামায়ণে হনুমানের লেজের তৈরী ঘরের কথা। ম্যাজিসিয়ান মহীরাবণ রাম-লক্ষ্মণকে চুরি করে নিয়ে যাবে। সুতরাং পবননন্দন লেজ দিয়ে এক ঘর তৈরী করলেন। নীতিশ সেই লাঙ্গুল-গৃহে দ্বারপাল স্বয়ং হনুমান।

এই কুটিরের লৌকিক নাম 'মিসেন'। বাঁশ অথবা ওলাই গাছের ডালকে অর্ধ-বৃত্তাকারে বাঁকিয়ে টোডা কুটির নির্মিত। ঘরের চালই একান্তভাবে দুদিকের মাটি স্পর্শ করে দেয়াল হয়ে নেমেছে। সন্নিবিষ্ট বাঁশগুলি খুব লম্বা লম্বা এক ধরনের পাহাড়ী ঘাসের দড়ি দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে বাঁধা। ঘাসের দড়ির শিরা-ওঠা ভাঁজগুলিই বোধহয় অনিবার্যভাবে কোন জন্তুর লেজের কথা মনে করিয়ে দেয়। দড়ি দিয়ে পাকিয়ে বাঁধা বাঁশের ফাঁকগুলি কাদা আর মোষের গোবর (মহিষময়?) মিশিয়ে লেপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কুটিরের সামনে আর পিছনে দুটি দেয়াল বড় বড় কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। এখানেও ঐ গোবর-মাটি দিয়ে ফাঁক বন্ধ করা হয়েছে। সম্মুখ-ভাগে খুব ছোট একটি দরজা। দরজা না বলে গর্ত বলা উচিত। বাস্তবিক ঢুকতে বা বেরুতে গেলে যে কোন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে প্রায় হামাগুড়ি দিতে হয়। এই দরজা ছাড়া বাদ চলাচলের আর কিছুমাত্র ফাঁক নেই। আয়তনে ১৫'×২০' এই কুটিরের মধ্যে একই সঙ্গে শয়ন পাক ও বিশ্রামের ব্যবস্থা। ডানদিকে একটি প্রায় দু-ফুট উঁচু মঞ্চের ওপর শোয়ার জায়গা। বাঁদিকে উনুনে রান্নার বাসন-কোসন। পেতল, অ্যালুমিনিয়ম, কলাই-এর যাবতীয় সস্তা তৈজসপত্রই তারা ব্যবহার করছে। সামনের দেয়ালে মুখকর বিনীত আমাদেরাই ও নৃত্যপর কোন দক্ষিণী অভিনেত্রীর ছবি দেওয়া দুটি ক্যালেন্ডার ঝুলছে। মেঝে সপ্তাহে একবার কি দুবার গোবর-মাটি দিয়ে নিকোনো হয়। বেশ শুকনো খটখটে। আধো অন্ধকার—একটা ভ্যাপসা গন্ধ। উনুন থেকে কাঠের ধোঁয়া বেরুচ্ছে যাবার রাস্তা নেই। স্বাস্থ্যের পক্ষে এমন হানিকর ঘরে বাস করে কি করে এরা? না, স্বাস্থ্য এদের কারো খারাপ নয়। অমানুষিক শক্তি এদের স্ত্রী-পুরুষের। তবে কি সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে শরাক্রান্ত জানুয়ারীকে প্রতিরোধ করার জন্যই এই ব্যবস্থা?

টোডারা ধর্মপ্রাণ জাত। পদ্ধতি যাই হোক না কেন নিজের ধর্মকে এরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। প্রত্যেক টোডামণ্ডে অন্তত একটি করে বোয়া (ভজনাগার) থাকা চাই। তাদের পুরনো প্রবাদ, উপকথা, কাহিনীকে তারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে এবং তাদের জাতীয় জীবন এসব লোককথার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত। টোডারা দাবী করে তারা অন্তত দুটি আশ্চর্য দৈবক্ষমতার অধিকারী। তারা মন্ত্র পড়ে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। হারিয়ে যাওয়া পশুকে (মোষ) হিংস্র জন্তু—সাধারণত বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে তারা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, সৎ এবং বিশ্বাসী। টোডাদের বিশ্বাস তাদের এই সততার দ্বারাই হয়তো দেবী পার্সকে আবার প্রসন্ন করা যাবে। অতিরিক্ত সরলতার ফলে এরা (বিশেষত টোডা মেয়েরা) সহজেই প্রতারিত হয়, আবার হাজার আন্তরিকতাতেও অন্ধ বিশ্বাস ও শতাব্দীব্যাপী সংস্কার থেকে তাদের সরানো যায় না। কোন টোডাই সহজে ধর্মের শাসন লঙ্ঘন করে সামাজিক গুপ্ত কথা প্রকাশ করতে চায় না। এমনকি কিছুদিন আগেও ভিনদেশী চিকিৎসকের দ্বারা তারা (টোডা মেয়েরা) পরীক্ষিত হতে চাইত না।

তাই টোডা সম্পর্কিত যে কোন রচনাই অসম্পূর্ণ ও কিছুটা অনুমানভিত্তিক হতে বাধ্য। টোডা ভাষা একটি অত্যন্ত দুরূহ কথ্যভাষা। এ ভাষার কোন লিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। এত দ্রুত এবং এমন বিশিষ্ট ভঙ্গিতে এ ভাষা উচ্চারিত হয় যে একজন ভিন্নভাষী ব্যক্তির পক্ষে তার একটি বর্ণও বোঝার উপায় নেই। দীর্ঘকাল এই উপজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না থাকলে (যা অসম্ভব) টোডা ভাষা শিক্ষা করা দুষ্কর। এরা মুখ পুরো না খুলেই কেবল কণ্ঠ দ্বারা ভাষা উচ্চারণ করে এবং অধিকাংশ সময়ই শেষ অক্ষর বা শব্দাংশটুকু বাদ উচ্চারণ করে। গবেষকরা বলেন, দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার সঙ্গে টোডা ভাষার অনেক মিল আছে। আবার এমন অনেক শব্দ এতে পাওয়া যায় যা ভারতীয় কোন ভাষার সঙ্গেই মেলে না।

যাই হোক এই সাম্প্রতিক এবং গোপন ধর্মবিধির আড়ালে টোডাদের অনেক রহস্যই বোধহয় আজো অপ্রকাশিত। ইউরোপীয় পর্যটকেরা অর্থের বিনিময়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন ত অধিকাংশ স্থলেই পরস্পর-বিরোধী। দরিদ্র টোডারা পর্যটক দেখলেই আজগুবি কাহিনী ও তথ্য বিক্রয় করে। যে যত মজাদার তথ্য সরবরাহ করবে তার পুরস্কারের অঙ্ক তত বৃদ্ধি পাবে। আজও টোডারা পর্যটকদের শিকার করতে ছাড়ে না দেখলাম।

একথা হাজারবার স্বীকার করতে হবে যে বিদেশী পর্যটক ও মিশনারী সম্প্রদায় যে সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় টোডাদের কথা ভেবেছেন ও তাদের উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে তার এক-শতাংশও করা হয়নি। আশার কথা ভারত সরকার এই আশ্চর্য রহস্যময় বিশ্বের অনন্য এক উপজাতির রক্ষা ও কল্যাণের জন্য যত্নশীল হয়েছেন। দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, অবৈতনিক বিদ্যালয়, কৃষি ও গৃহ-নির্মাণ ঋণ প্রভৃতি সাহায্যদান চলছে। উন্নত টোডারা টোডানাদে একটি টোডা কল্যাণ কেন্দ্র খুলেছেন। এসব ব্যাপারে ধর্মান্তরিত টোডারাই বেশী উৎসাহী। বস্তুত খৃষ্টান টোডারা খাঁটি টোডাদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক উন্নত ও সভ্য। এদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। সময়োচিত চিকিৎসায় যৌনরোগের আক্রমণ প্রতিহত হচ্ছে। নাজ্ঞানাদমণ্ডে পুরনো মিসেন এর পাশাপাশি টিনের, টালির শেড দেওয়া নতুন আধুনিক ঘর উঠেছে।

কিন্তু পরম বেদনায় মনে হল ওদের শিক্ষিত করার পদ্ধতিতে বোধহয় কিছু ভুল থেকে যাচ্ছে। হাজার বছরের পুরনো এই উপজাতিকে তাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করে, তাদের রক্তকে শোধন করে সভ্যতার সমতলে টেনে আনা হচ্ছে। ধর্মান্তরিত টোডা ছেলে-মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে আর মণ্ডে থাকতে চাইছে না। প্যান্ট-শার্ট, শাড়ী স্কার্ট পরছে, নাম পাল্টাচ্ছে, মদু গোঁফ রাখছে—খুব সভ্য হচ্ছে। এরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। এদের ভারতের যে কোন প্রদেশের বাসিন্দা বলেই মনে হবে কিন্তু টোডা বলে মনে হবে না। এটা ওদের ও আমাদের বিরাট ক্ষতি কি না ভেবে দেখা দরকার।

পোম্মাই বড় হয়ে টাউনে চাকরি করতে যাবে। পুষ্কুলিকে প্রাচীন দুর্ভার বলে মনে হবে। পার্স দেবীর বোয়াতে যাবে না। মো-এর পবিত্র মহিষদের ঘৃণার চক্ষে দেখবে। পুরনো মিসেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। 'মেন্‌' আর পঞ্চদল কাঠোল ফুলের মত বাঁশের বন্ধনদন্ড মাটির তলায় চাপা পড়বে। টোডাদের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতি-ধ্বনিত চিরকালের সেই প্রার্থনা স্তব্ধ হয়ে যাবে—

আমুনোবশা সেরুমা
ধরমা কয়মা তিজিমা!

সুখের মেলা

নিষাদ

পরনে ছাপা শাড়ি। গায়ে একটা গেঞ্জি। মাথায় উস্কো-খুস্কো চুল। এক হাতে একটা শাঁখা, অন্য হাতে একটা লাল মোটা প্লাস্টিকের চুড়ি। পাগলি হাসতে হাসতে হাত দোলাতে দোলাতে বাজারের দোকানগুলোর সামনে এসে দাঁড়ায়। লোকজন তার উদ্ধত যৌবনভরা শরীর দেখে। লেবুতে হাত দিতে বুড়ো ফলঅলা তেরিয়া হাঁক মেরে চেঁচিয়ে ওঠে : 'ওরে আমার বউয়ের বুনরে, ভাগ শালী, লেবু রাখ।'

পাগলি লেবুটায় আস্ত কামড় বসায়। দু'পাশের কষ বেয়ে ঝর-ঝর করে রস গড়ায়। শাদা শাদা চোখদুটো তার আনন্দে হাসতে থাকে। ফলঅলা বলে, 'হাড়-পাজি মাগী! দূর হ।'

পাগলি অস্ফুট জড়ানো-স্বরে 'আই-আই' করে। তারপর পাতাল-চোখ করে বলে, 'হাড়...হি-হি—হাড়'...

পাগলির নাম দুলালী। নামটা যার করেছেন 'সত্যনারায়ণ বস্ত্রালয়ে'র হরিবাবু। ছাপা একটা শাড়ি আর গেঞ্জি দিয়েছেন তিনি বড়পুজোর সময়ে। অত বড় ডাগর মেয়েটা প্রায় উলঙ্গ থাকে আর দোকানভরা জোয়ান ছেলেদের লোলুপ চোখের সামনে এসে ঘোরাফেরা করে, দেখতেও খারাপ লাগে। হরিবাবু সব চুল পাকা বুড়োমানুষ। যুবতী মেয়েমানুষকে খালি-খামখাই শাড়ি দিলেও তাঁর বয়সে অভিযোগ বা সন্দেহের কিছু থাকে না। তিনি কাপড় দিয়ে বলেছেন, 'যা বেটি দুলালী, এটা পরে ঘুরে ঘুরে মায়ের পুজো দেখে বেড়া।'

কোত্থেকে এলো পাগলিটা চাঁড়াল বাজারে?

কেউ বলে কলকাতা থেকে একদিন বাসে করে এখানে এসে নামল। তখন একটু ছোট্ট ছিল। বছর চোদ্দ-পনেরো হবে। এখন ষোল-সতেরো।

পাগলির শরীর ভরাট। খেতে পায় সে। এর কলা, ওর মুলো, ফল, হোটেলের ভাত-মাংস সে সারাদিন খেয়েই বেড়ায়। দুলালীর খিদে লাগলে গফুর মিয়া হোটেলঅলার হোটেলের কাছে গিয়ে বসে। হাসতে থাকে ফ্যাক ফ্যাক করে। গা চুলকোয় ঘষোর ঘষোর করে।

গফুর মিয়া ভুঁড়িতে মোটা চামড়ার বেল্ট এঁটে, গায়ে ফতুয়া আর মাথায় জালি কিস্তির টুপি পরে কাউন্টারের গদিতে বসে খদ্দেরদের টাকা-পয়সা নেয়। হোটেলের চারদিকের দেওয়ালে সিনেমার হিরোইনদের আধ-ন্যাংটো ছবি টাঙানো। নিচে বেঞ্চি-টেবিলে চটকল, তেলকল শ্রমিকরা নান্ রুটি আর শিক-কাবাব খায়। খায় মাংস-ভাত। বড় বড় দেগ-হাঁড়িতে ভাত-তরকারী নিয়ে বসে আছে একটি ঝোলা-গোঁফ চেঙ্গিস-খাঁ চেহারার লোক। দুটি ছোকরা খিদমতগারী করছে। আর একটা লোক চা, তন্দুর রুটি, মাংস ইত্যাদি রান্নার গনগনে চুল্লীর কাছে বসে আছে; কাজে ব্যস্ত সে।

পাশেই কয়েকটি কসাইখানা। মাংসের ছাট মালগুলো ধামা ভরে এসে হাজির হয়। বাজারের পচা কম দামের আলু-পিঁয়াজ আসে। মাছ আসে বরফের। দুপুরে বাজার করতে যেয় গফুর মিয়া কাঁচা আনাজপত্রের। বাজারে কম দামের জিনিস সব। ঝোল ঘন করার জন্যে মাংসের তরকারীতে দেয় ময়দার খইল। সন্ধ্যায়

কান লাল টক্‌টক্‌ করে। লোকগুলো যখন খায় জ্বলাপ বেয়ে, গালপাটি বেয়ে ঘাম গড়ায়। হাড়মাঅলা শক্ত মাংস ছিঁড়তে গিয়ে আন্ডা আন্ডা চোখ বেরিয়ে পড়ে। চিবুতে চিবুতে এক সময় কোঁৎ করে গিলে নেয়। ঝালের লেগামে ঘা, জিভে কাড়্‌কাটা, তাদের ঝাল লাগে বলে খেতে খেতে সোঁক সোঁক করে, শব্দ করে আর ঘন ঘন জল খায়।

গফুর মিয়া কাবুলীঅলাটার সঙ্গে তর্কাতর্কি করে, 'খাঁ সাব, আপলোক ষোলা রোটি খায়া হ্যায়—পনরেরো নেহি, আউর দশ পয়সা নিকালাইয়ে।' লুঙিপরা বিরাট পেট বিরাট দেহঅলা গোঁফ গায়ে খালি মাথা কাবুলী দাঁতে 'খেলোল' দিয়ে খুঁচিয়ে মাংসের কুঁচো বার করে ফেলে দিতে দিতে বলে, 'বেইমানী মৎ করো গফুর মিয়া। হাম পনেরো রোটি খায়া। ঝুট বাৎ মৎ বলো।'

গফুর মিয়া আর কিছু বলে না। বিরক্ত হয়ে মুখ গোঁজ করে পয়সা গুনতে থাকে। দুলালীকে দেখতে পেয়ে বলে, 'এই পাগলি, ভেতরে এসে বস সেই কোণটাতে। এই ছোকরা, ওকে দুটি ভাত দে।'

পাগলি এসে 'খাটুমাজা' হয়ে বসে হোটেলের এক কোণে। গফুর মিয়া চাটগাঁয়ের লোক। জোয়ান বয়েসে দেশ ছেড়ে চলে এসে চাঁদপুর শহরের এক চাষীর বাড়ির দালিজে ওঠে। নিজেই কোন মাদ্রাসার এলেম তখন নাকি তার পেটে একেবারে ঠাসা ছিল। গাজীর কাছে হাত রেখে কসম করে শিরিন জবানে আরবী পড়ে চাষী বুড়োর দীল গলিয়ে দেয়। তার তামুক সেজে দেয় বস করে। হুঁকো-নামসা বরে নিয়ে বার মাঠে। তারপর দালিজে পাঁচ-দশটা ছেলেমেয়ে নিয়ে আরবী অর্থাৎ দ্বীনী এলেম শেখাবার ওস্তাদজী বনে গেল। বাঁকা খণ্ড তাবের মতন এক-গোছা দাড়ি রেখে চাষীর মেয়েকে সাদী পর্যন্ত করে বসল। কর্মিকর্মা লোক গফুর মিয়া। একটা মোষ কিনে তার দুধ বেচে দুটো-তিনটে মোষ করে ফেললে। মোষগুলো লোকের ফসলের ওপরে অত্যাচার করলেও বলবার কিছু ছিল না, কেননা গফুর মিয়ার চোখদুটো কেমন যেন করমচার মতন সদাই লাল হয়ে থাকত। তার-পর চাটগাঁর লোক, দেশে নাকি একটা খুন করে প্রাণ নিয়ে এখানে পালিয়ে আসে, খুনটা নাকি না করে উপায় ছিল না—ওস্তাদজী মানুষ, দায়-বিপদে দরকার হয় তাকে, জানাজা পড়াবে কে মানুষ মারা গেলে? কিন্তু আশ্চর্য, গফুর মিয়ার সঙ্গে হঠাৎ একদিন তার বুড়ো শ্বশুরের ঝগড়া হতে সে মোষগুলো সব বেচে ফেললে। হোটেল খুলে ঘর ভাড়া করে বউ-ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এসে উঠল চাঁদপুর বাজারে।

বছর-পনেরো হল তার হোটেল চলেছে। ভাল খদ্দের আছে।

এখন মাথার চুল পেকে গেছে গফুর মিয়ার। ভুঁড়ি বেড়েছে। সাত-আটটা ছেলে-মেয়ে হয়েছে। দোয়াতাবিজ পানি-পড়া খেয়েও তাদের রোগ সারে না। হয়েছে আর মরেছে। একটা নাংড়া ছেলে এখন সম্বল। বউটাও নাকি আবার রাতকানা। রোগা হাড়িসার চেহারা। পেটের ব্যামো। যৌন-রোগী। শুধু সেই দুর্বল কুৎসিত-দর্শনা বউ—যার দিকে ফিরেও তাকায় না কেউ—তাকে আপাদমস্তক বোরখা মুড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে কলকাতা শহরের হাসপাতালে। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে গফুর মিয়া। মরে তো মরুক বউটা—আর একটা নিকে-সাদী করবে। তার কি এখন টাকার অভাব? দশ হাজার টাকা তো হবে বা জমা আছে আর হোটেলে খাটছে। তাছাড়া পাঁচজন কাবুলীকে সুদ খাটাবার জন্যে দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা। শতকরা মাত্র চার ভাগ সুদ দেবে তারা। সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখলেও তাই তো দেয় সে!

দুলালীর বোধহয় জিভে ঘা হয়েছে। গাল মেলে সোঁ সোঁ করে শব্দ করছে। দুপুরে ভিড় কমে গেছে। কলের লোক-গুলো খেয়েদেয়ে চলে গেছে সব। গফুর মিয়া গায় খাঁটি তেল চাপড়ে নিয়ে 'গোসল' (স্নান) করবে বলে ওঠে। পাগলির কাছে এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসে। বলে, 'দেখি তোর গাল দেখি—হাঁ কর জিভে ঘা হয়েছে।'

পাগলির মুখটা ধরলে সে লম্বা জিব বার করে। হি-হি করে হাসে। গফুর মিয়ার শরীরের তাজা রক্ত ওর উদ্ধত যৌবন দেখে একটা প্রচণ্ড লোভে যেন আগুনের হল্কার লকলকে সাপিল জিভগুলোর মতন কিল-বিল করে। বলে, 'রাত্তিরে কাল কোথা ছিলি? আজ আসিস, ওষুধ দোবখন। পানি খা—ওরে, ওকে ডাল-তরকারী দিসনি। মাছ দে। না, মাছ থাক। কাঁটা ছাড়াতে পারে না। গলায় লেগে যাবে।' স্নেহের অবতার হয়ে কথা বলে যেন গফুর মিয়া।

রাত্রে শীতের গুঁতোয় আর টিকতে পারে না দুলালী গ্রাম পোস্টের চাতালটার ওপরে। একটা ফন্দির আতে নিয়ে খুঁজে কেমন করে! পান-দোকানীটা তাড়া দেয়, তারপর তাকে সে ডাকে। দুলালী জিব বার করে ভেংচি কাটে। শেষপর্যন্ত সে গফুর মিয়ার আসবাটার নির্দেশ একটা সুর ধরে এসে পৌঁছয় হোটেলখানার সামনে। তখন রাত এগারোটা। ঝাঁপ পড়ে গেছে সব দোকানের। রাস্তা দিয়ে তখনো কলকাতার বাস-লরী চলে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে, মাঝে মাঝে বাড়ি-ঘর কাঁপিয়ে দিয়ে। হোটেলের মধ্যে আলো জ্বলছে তখনো। গফুর মিয়া কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে টাকা-পয়সা গুনছে। খাতা লিখছে। ঝাঁপে ঘা পড়তে শুধোলে, 'কে?'

'আই আই?'

'দুলী?'

'আই আই!'

গফুর মিয়ার লোকজন সবাই চলে গেছে দশটার সময়। ঝাঁপটা খুলে দিতেই টুক্‌ করে ভেতরে সেঁধিয়ে এল দুলালী। গফুর মিয়া তাকে পাঁজা করে ধরে নিজের কম্বলের মধ্যে পুরে নিলে। সুইচটা টিপে আলো নিভিয়ে দিলে। বললে, 'তোর গা যে একেবারে হিম রে দুলী!'

'আই...আঁই...হি-হি...আঁই!'

দুলালীর শরীরটা বেশ নরম। নিজের বিছানার মধ্যে আনলে তাকে গফুর মিয়া। শরীরের নরম বুকে স্পর্শ পেলে পাগলির বোধহয় ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে। সে হি-হি করে হেসে ওঠে। কামজ্বর ভীষণ উত্তেজনায়। গফুর মিয়া তার হাসিতে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে—। মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে।

সারারাত আর ঘুম হয় না গফুর মিয়ার। পাগলির সঙ্গে পাগলা হয়ে যায়। তার বয়েস, এলেম, ইমান, সোনার কথা বেবাক ভুলে যায় তখন।

ভোর না হতেই সে বার করে দেয় দুলালীকে। গোসল করে এসে দু' চোখে মস্ত করে কাবুলীদের দেওয়া আসলী কোহ্‌তুর পাহাড় পোড়া সুর্মা টেনে দেয়। মাথায় ঠাণ্ডা সুগন্ধী তিলের তেল ঘষে। দই খায় ভাঁড়খানেক। খায় সন্দেশ আর দুটো আপেল, দুটো মর্তমান কলা।

পাগলিটা তার নোংরা কাপড় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।' ভদ্রলোকের মেয়েরা থুথু ফেলে তার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে। যারা অশুদ্ধ হবার দুশ্চিন্তা করে বিরক্ত হয়। কিন্তু মাসকয়েক পরে দেখা গেল এক আশ্চর্য কাণ্ড! মা হতে চলেছে সে বে-ওয়ারিশ সন্তানের। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন : কোন্‌ জানোয়ার এমন কাজ করলে?

কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না। কেমন উত্তর যে দিতে পারত সে পাগল। এবং আরো একজন যে উত্তর দিতে পারত সে—না, তারা তো কোনদিন জবাবদিহি করে না। তারা চিরদিনই থাকে আড়ালে।

—আবদুল জব্বার

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

CENTRAL LIBRARY

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪২)

সুতরাং এ অঞ্চলে আবার দুটো খবর কিংবদন্তির মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকল। হাটে মাঠে এখন এ-দুটো খবরই। প্রথম খবর এ-অঞ্চলের মহামান্ডিত মানুষ দেহরক্ষা করেছেন। দেহরক্ষার আগে তাঁর তিন পুত্রকে সজ্ঞানে বলে গেছেন, শ্রাদ্ধের মালিক হবে ভূপেন্দ্রনাথ। মণীন্দ্রনাথকে তিনি কিছু বলেন নি। পাগল ছেলের দিকে শুধু মুহূর্তের জন্য অপলক তাকিয়ে ছিলেন। বলে গেছেন, মণীন্দ্রনাথ পাগল, সে বড়, শ্রাদ্ধের মালিক তারই হবার কথা। কিন্তু পাগল বলে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ার পাঠ তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে দিয়ে গেছেন। আর বলেছেন বিষয় সম্পত্তি যা আছে সব তোমাদের। কেবল বড়বৌ এবং মণীন্দ্রনাথ ভরণপোষণ পাবে। পলটু সাবালক হলে তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার করে দেওয়া হবে। যতদিন না হচ্ছে ততদিন ভূপেন্দ্রনাথই ওর হয়ে দেখাশোনা করবে। এবং উইলের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি তাঁর সিন্দুকে ভরে রেখে গেছেন। মৃত্যুর পর সেটা বের করে যেন দেখা হয়।

আর খবর ফেলুর বিবির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ওর সারা গায়ে ঘা ফুটে বের হয়েছে। এবং ঘাগুলো আগুনের মতো দপদপ করে জ্বলছে। অন্ধকারে যারাই ওকে দেখেছে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে ফেলু! চুল খাড়া। দাড়ি শনের মতো, চোখ আরও কোটরাগত। ঘাড়টা মোষের মতো ছিল, এখন কী কদর্য চেহারা ফেলুর। সে ঘর থেকে বের হয়ে নানা জায়গায় খুঁজেছে। গোয়ালে থাকতে পারে, না নেই। বাঁশঝাড়ের নিচে থাকতে পারে, তাও নেই। মাঠে নেমে গেল, না নেই, ওর কেন যে মন মানছে না, সে খুঁজে মরছে। এমন নিষ্ঠুর নিয়তি তার জেনেও সে বিশ্বাস করতে পারেনি। হাজি সাহেবের বাড়িতে সে ঢুকতে পারে না। সে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, আন্নু। না, কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও কোন বনঝোপে লুকিয়ে থাকতে পারে—হা হা করে হেসে উঠতে পারে—এই আমার মরণ, একটু না দেখলেই চোখ ঘোলা ঘোলা। সে জোরে জোরে ডাকল, আকালুদ্দিন সাহেব আছেন! জবাব নেই। সে চিৎকার করে উঠল, আন্নু আছস! বার বার সে পাগলের মতো এখানে সেখানে ডাকছে, আছস নাকি! আমি ফ্যালা। আমার আর কি থাকল ক দিনি! খোদা তুই ক। আমি পারি না তর দরবারে আগুন লাগাইতে। আমি কি যে না পারি আল্লা।

এ-ভাবে এ-অঞ্চলে সূর্য উঠে গেল আকাশে। হাল বলদ নিয়ে চাষীরা মাঠে নেমে যাচ্ছে। খরতাপে আবার বসুন্ধরা জ্বলতে থাকল। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। বৃষ্টি নেই। ঝড় নেই। এখনও কালবৈশাখী আরম্ভ হল না। নদীর পাড় ধরে কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। ওরা খবর পেয়েছে এক মহামান্ডিত মানুষ ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। পুকুরের পাড়ে দাহ করা হবে। মানুষজন সব এখন জড় হচ্ছে ক্রমে।

ফেলু আর পারল না। সে কেমন কঠিন এবং শক্ত হয়ে গেল। অঞ্চলের সব মানুষেরা যখন একজন বুড়ো মানুষের মৃত্যুসংবাদ শুনে ছুটছে ঠাকুরবাড়ি তখন তার পিয়ারের বিবিকে নিয়ে পালিয়েছে আকালুদ্দিন। মামলা-মোকদ্দমার নাম করে সে শহরে পালিয়েছে। সে আর দেরি করল না। শহরে যাবার আগে এইসব গ্রাম মাঠ খুঁজে যাবে। সে জানে বিবিকে সে আর ঘরে তুলতে পারবে না। বিবি তার না-পাক, আকালু নিকা করে আবার তাকে পাক (পবিত্র) করে নেবে। মিঞা, তুমি আকাল, আর আমি ফেলু। আমার বিবিরে নিকা দিবা কোনে!

প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে শুকনো পাতার মতো অসহায় দেখাচ্ছে ফেলুকে। কেউ সমবেদনা জানাচ্ছে না। ফেলুর এমনই হবে যেন কথা ছিল। তার চেহারা দেখে কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। শুধু সে দেখল, হাজি সাহেবের ষণ্ডটা এদিকে উঠে আসছে। ওর পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে এক হাত সম্বল করে কিছুই পারবে না। সুতরাং সে সাপে বাঘের খেলার মতো খেলতে খেলতে বাড়িতে উঠে এলে জমিতে ষণ্ডটা দাঁড়িয়ে থাকল। ষণ্ডটা ফেলুর বাড়িতে উঠে আসতে ভয় পায়। ফেলু ঘরে ঢুকে বাতা থেকে কোরবাণীর চাকুটা বের করে নিল। —মিঞা আকালু তোমার খোঁজে, বিবির খোঁজে বাইর হইলাম। ঠিক মহরমের দিনের মতো আবার তরবারি ঘুরালো।

সে সামনে কখনও দেখতে পাচ্ছে ষণ্ডটা ওর প্রতিপক্ষ, কখনও আকালু, কখনও পাগল ঠাকুর। সে খোঁচা মারছে হাওয়ায়, দু পা পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার সামনে নেচে নেচে হাত ঘুরিয়ে, সামনে পিছনে হাত রেখে উঠে বসে যথার্থ খেলা। সে হাওয়ার সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে মেতে গেছে। জমি থেকে ষণ্ডটা উঠোনের উপর ফেলুর এমন কাণ্ড দেখে সে ছুটে। বিবি পালিয়ে গিয়ে ফেলুকে পাগল করে দিয়েছে। হাতে তার কোরবাণীর চাকু। হাওয়ার সঙ্গে সে যুদ্ধে মেতে গেছে।

যারাই ওর বাড়ির পাশ দিয়ে গেল ফেলুর এমন কাণ্ডকারখানায় হাসতে পর্যন্ত সাহস পেল না। হাসলেই সে নেমে এসে পেটে খোঁচা মারবে চাকুতে।—কি মিঞা কেমন মজা লাগে। বিবি আমার পালাইছে বইলা তামাসা পাইতাছ।

কেউ কথা বলছে না বলে সে আরও ক্ষেপে যাচ্ছে। ক্ষেপে যাচ্ছে মাছির তাড়নায়। ভনভন করে সব সময় চারপাশে মাছি উড়ছে। সে যেন মৃত পচা জন্তু। হাতের ঘা থেকে সেই পচা দুর্গন্ধ ওকেও মাঝে মাঝে ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো করে দেয়। সে এখন কি করবে, ভেবে উঠতে পারে না। কিছুক্ষণ কামিনী গাছটার নিচে বসে থাকল। আঠার গাছ এটা। খাঁ খাঁ করছে রোদ বলে আঠা শুকিয়ে গেছে। ওর কোন হুঁশ নেই। শরীরে যে অজস্র জোনাকি জ্বলছে তা পর্যন্ত তার খেয়াল নেই। সে বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছে এখন। কোরবাণীর চাকুটা সে সামনে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে মাটিতে। কখনও তুলে এনে কামিনী গাছের কাণ্ডে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই এক হিংস্র খেলা তার এখন। কাফারি ওর দিকে তাকিয়ে যেমনি জাবর কাটছে। সে জানে এখন ঘাস নেই। তবু কোথাও কাফারির খোঁটা পুঁতে দিয়ে বের হবে। কখন ফিরবে ঠিক কি।

তখন সোনা উঠোনের চারপাশটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মানুষজন আসছে ত আসছেই। সে কোথাও যেতে পারছে না। তাকে সকলের সঙ্গে বিছানা ধরে রাখতে হবে। ধরাধরি করে অর্জুন গাছটার নিচে নিয়ে যাবার সময় সেও সবার সঙ্গে এক পাশে ঠাকুরদার মৃতদেহ ধারণ করবে। মনজুর কাঠ কাটার তদারক করছে। হাজি সাহেবের বড় বেটা এসেছে। মেজ আসেনি। সে গেছে আকালুর খোঁজে। আকালুর ঘরে বিবি আছে। দিন বাড়ন্ত। এ-সব ফেলে সে ফেলুর বিবিটাকে নিয়ে যে কোথায় পালাল হয়ে

গেল। হাজি সাহেবেরও মন ভাল না। তবু একবার দেখে চলে গেছে। দীনবন্ধু কাঠ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুকুর পাড়ে। ঠাকুরদার মুখ ঢাকা। ঠাকুমা পায়ের কাছে বসে রয়েছে সেই থেকে। একেবারেই নড়ছে না। এখন সেই আবার, বড় জ্যাঠিমার সংসারে বড় কাজের চাপ। সকালের দিকে কিল কে কাটবে এই নিয়ে বচসা হয়ে গেছে নরেন দাস এবং আভাইহাজারের রায়মশাইর সঙ্গে। কিল কেটে পুণ্য সঞ্চয় করবে নরেন দাস। কাল থেকেই ছোট কাকার পিছনে পিছনে ঘুরেছে। তাকে যেন কিলটা কাটতে দেওয়া হয়। নরেন দাসের চোখেমুখে আর কোন অপমানের চিহ্ন ভেসে নেই। মালতী নিরুদ্দেশে চলে গেছে—গিয়ে তাকে বাঁচিয়েছে। সে আবার নতুনভাবে ফসল ফলাচ্ছে, ঘরের চালে সন দিয়েছে এবং রাতে তাকে আর জেগে থাকতে হয় না। যা কিছু পাপ অবশিষ্ট আছে কিল কাটতে পারলেই শেষ হয়ে যাবে।

সোনা সকাল থেকেই ভীষণ আফসোসে কষ্ট পাচ্ছে। সে ভেবেছিল বসে বসে ঠাকুরদার মৃত্যু দেখবে। কিন্তু তার যা ঘুম, ঠাকুরদাকে বাইরে বের করে আনলে সে দেখল তিনি আবার আগের মতো ভাল হয়ে যাচ্ছেন। ভাল হয়ে যাচ্ছেন বলেই ওর ঘুম পেয়ে গেল। বাবা, মেজ জ্যাঠামশাই পায়ের কাছে উপস্থিত হলেই তিনি কেমন সহসা ভাল হয়ে যাচ্ছিলেন। ভাল হয়ে যাবে বুঝি, তবে আর বসে থেকে কি হবে। বড় জ্যাঠামশাইও বসে নেই। তিনি আগেই উঠে চলে গিয়েছিলেন, মেজ-জ্যাঠামশাইকে ঠাকুরদা চাদরের ভার দিলে তিনি সটান উঠে পুবের ঘরে চলে গেলেন এবং শুয়ে পড়েছিলেন। সোনাও পাগল জ্যাঠামশাইর শরীরে ঠ্যাং তুলে দিয়ে আশ্চর্য গভীর ঘুমে ডুবে গেল। কিন্তু খুব সকালে বড় জ্যাঠিমা ডাকলেন, এই ওঠ সোনা, তোর জ্যাঠামশাইকে তুলে আন—তোর ঠাকুরদা আর বেঁচে নেই। শুনে ধড়মড় করে সে উঠে বসেছিল। দেখে এসেছিল উঠোনে। সবাই কাঁদছে। লণ্ঠনের আলো জ্বলছে চারপাশে। সকাল হয়ে যাচ্ছে। তবু লণ্ঠনগুলো নেভানো হচ্ছে না। ঠাকুরদার মুখ ঢাকা। পাখিরা তেমনি কলরব করছে চারপাশে, কামরাঙা গাছে ফল নেই, তবু কটা টিয়াপাখি উড়ে এসে বসেছে। এমন এক আশ্চর্য সকালে যেখানে আবার হাত ধরে নাতিদের নিয়ে সূর্যোদয় দেখার কথা, তিনি কিনা সে-সব না করে সোনাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। ওর ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল চাদরটা তুলে বুড়োমানুষটার মুখ দেখে—কি বাসনা আর তাঁর ছিল, কোনো গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বড় মাঠের ফসল কাটার গান শোনার ইচ্ছা যদি থাকে তবে যেন সে বলবে, এবার আপনি সোজাসুজি সব দেখতে পাবেন ঠাকুরদা। আমাদের মতো উঁকি দিয়ে আর কিছু দেখতে হবে না। বলেই সে চাদরটা তুলে মুখ দেখল। চোখ বোজা। তুলসী পাতা চোখে। ঠাকুরদার প্রাণপাখি তবে চোখ দিয়ে বের হয়েছে। কোথায় আছে সে! কোন গাছের ডালে বসে মজা দেখছে না ত—বা বেশ তুমি শুয়ে আছ চিতপাত হয়ে, আমি গাছের ডালে বসে আছি। পাখি হয়ে বসে আছি। মাঝে মাঝে কোউর্ কোউর্ করে ডাকছি। সে ভাবল পাখিটা হয়ত নীলবর্ণের পাখি হবে। মহীরাবণের পাতালপ্রবেশের মতো ঘটনা যদি হয়, সে তো পাখি না হয়ে একটা মাছি হয়ে যেতে পারে। ঠাকুরদার সাদা চাদরে একটাই মাছি এখন উড়ে উড়ে বসছে। সে মাছিটাকে খপ করে ধরে ফেলতে চাইল। প্রায় সেই ফেলুর মতো সবই খপ করে ধরে ফেলা। কিন্তু মাছির নাগাল পেল না। মাছিটা উড়ে উড়ে কামরাঙা গাছের ও-পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ডালে অদ্ভুত একটা পাখি, নীলবর্ণের পাখি, নীলবর্ণ মানেই পবিত্র কিছু, ওর মনে হল যখন গাছের ডালে যে পাখিটা বসে আছে এখন, ওটাই ঠাকুরদার আত্মা। ওটাই ওর কামনা বাসনার ঘর।

পাগল মানুষ দেখলে বলতেন, ওটাই হচ্ছে নীলকণ্ঠ পাখি। সারাজীবন মানুষকে ঘুরিয়ে মারে। কোথাও সে আছে, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, সে তোমার জন্য গাছের ডালে বাসা বানাচ্ছে। তুমি ঠিকঠাক ঘুরে মরছ, তোমার কেবল ইচ্ছা আশ্বিনের ভোরে জয়ঢাক বাজুক। তুমি সারাজীবন বরণডালা হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে। মনে হবে সামনের মাঠ পার হলেই নদী। নদীর পারে গ্রাম। সব মরীচিকার মতো তোমাকে জন্ম থেকে জীবনের সব কটা দিন ঘুরিয়ে মারবে সে।

সোনা তখন দেখল পাগল জ্যাঠামশাইও চাদর তুলে বাপের মরামুখ দেখছেন। তারপর প্রাণটা এখন কোন গাছের ডালে পাখি হয়ে বসে আছে চারপাশে খুঁজছেন।

তখন সবাই ধ্বনি দিল, বল হরি হরি বোল।

পীতাম্বর মাঝি পায়ের কাছে বসে কাঁদছে। আপনে জীবন সাঙ্গ কইরা চললেন ঠাকুর। আপনে জীবনে একটা বাদে মিছা কথা কইলেন না।

সবাই বিছানার চারপাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুরদাকে তুলে ধরেছে। কেমন দুলছে শরীরটা। সব আত্মীয়স্বজন যে যেটুকু পারছে ছুঁয়ে রাখছে। সোনা শিয়রের দিকে আছে। ওরা কাঠবাদাম গাছটা পার হয়ে তেঁতুলতলা এল। তারপর বড় আম গাছ, একটু বাঁ দিকে গেলে দুটো খেজুর গাছ পড়বে। দক্ষিণের পারে সেই অর্জুন গাছ। সেখানে কিল কাটা শেষ। ওরা গাছটার নিচে ঠাকুরদাকে রেখে চারপাশে ঘিরে বসে থাকল। আশ্চর্য, সোনা দেখছে সেই নীল রঙের পাখিটা আবার এসে অর্জুন গাছটায় বসেছে। সেই ঘরটা নীল, যেখানে অমলা তাকে নিয়ে গিয়েছিল, মায়ের মুখ ব্যথায় নীল, ছোট্ট বোনটা তার তখন জন্ম নিচ্ছে। যার মুখ আর অপবিত্র মনে হয় না। এই পাখিটাও নীল। সে দেখল আকাশ নীল, স্বচ্ছ জল নীল রঙের। এ-পাখি ঠাকুরদার আত্মা না হয়ে যায় না। সে চারপাশে লক্ষ্য রাখছে পাখিটা কিভাবে থাকছে। ওর মনে হল ঠাকুরদার চিতা যতক্ষণ না জ্বলবে ততক্ষণ পাখিটা অর্জুনের ডালে বসে থাকবে।

ওর ইচ্ছা হচ্ছিল লালটু পলটুকে সব ঘটনাটা খুলে বলে। দাদা ঐ যে দেখছিস পাখিটা ওটা ঠাকুরদার আত্মা। চিতা জ্বললে উঠলেই পাখিটা আকাশে উড়ে যাবে।

এত বেশি লোকজন যে সে উঠতে পারছে না। সবাই চেপে বসে আছে যেন। গোপাটের ও-পাশে হাজার লোক কি তারও বেশি হবে। আর পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ অর্জুন গাছটার কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাপের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। মুখটা শুকনো, দাঁত নেই। একটা শুকনো কঙ্কালের উপর চোখ দুটোতে তুলসীপাতা, দুটো মাছি চোখের পিচুটি শুষে খাচ্ছে। সোনা হাত দিয়ে মাছিদুটোকে তাড়িয়ে দিল। এই মৃত চোখ কি বিবর্ণ। মরে গিয়েও ঠাকুরদা দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে রেখেছেন। এত যে আয়োজন, এত যে হরিসংকীর্তন এবং ঘি, তেল, বিল্বপত্র, চন্দনের কাঠ—সবই এই মানুষকে দাহ করা হবে বলে। শৈশবে এই মানুষ সোনার মতো নদীর চরে নামতে গিয়ে ভয় পেয়েছে, যৌবনে এই মানুষ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ছিল—বামুনের সব নিলামে উঠেছে। নিলাম ডাকছে পীতাম্বর মাঝি, শুধু সামান্য কথা ঘুরিয়ে বললে এত দামী জমি নীলামে ওঠে না। হস্তান্তর হয় না। তবু অবিচল অটল। অথচ সামান্য এক প্রেম, পলিন নামে এক ইংরেজ যুবতী পুত্রবধূ হয়ে থাকবে—সংসার বড় কঠিন। মিথ্যা তার—ধর্ম, মানুষটাকে অযথা মিথ্যার জড়িয়ে দিল। তাঁর এমন সোনার টুকরো ছেলে পাগল হয়ে গেল। পীতাম্বর মাঝি এ-সব মনে করে হাউহাউ করে কাঁদছে। সেই মিথ্যা দলিল করেছিল, এই মানুষের বিরুদ্ধে।

ঠিক যজ্ঞের হবির মতো এই দেহ এখন। ঠাকুরদাকে একেবারে উলঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। সোনা কেমন ভয়ে তাকাতে পারছে না। হাত পা কাঠি কাঠি, শক্ত। জ্যাঠিমা ওর হাতে সামান্য তেল দিলেন। সবাই এখন ঠাকুরদার শরীরে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে। সবাই ঘড়া করে জল তুলে এনে ঠাকুরদাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। তাকেও জল আনতে হবে, তেল মেখে দিয়ে ঠাকুরদাকে স্নান করাতে হবে। অথচ কেন যে তার ভয় পাচ্ছে অথবা মনে হচ্ছে, যেন মানুষটাকে সে আর চেনে না। এ মানুষ তার ঠাকুরদা নয়। সেও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

জ্যাঠিমা বললেন, সোনা তেল মেখে দাও। শেষ কাজ। দাঁড়িয়ে থেকো না।

সোনা তবু দাঁড়িয়ে থাকল।

তখন সেই নীলবর্ণের পাখিটা উড়ে উড়ে এসে শিয়রে বসছে। বোধ হয় এটা

একটা চড়াইপাখি। চড়াইপাখি নীলবর্ণের হয় না। তবু আমার দেখে তাই মনে হয়। পাগল ঠাকুরমশাই পাখিটাকে দেখছে। এ-ভাবে যদি কোনদিন সোনা মরে যায় সোনার আত্মা পাখি হয়ে যাবে—এই ভাবতে ভাল লাগছে, পাখিটা ডালে ডালে এই ঘাসে এবং মাটিতে সারা দিন [illegible] থাকবে। মানুষের আত্মা বিনষ্ট হয় না। আত্মাটা আবার কারো নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে ঢুকে যাবে। তখন অন্ধ হয়ে আর একটা মানুষের। এ-ভাবে [illegible] ভিতর থেকে ফিরেও আসতে [illegible] ফিরতে পারবে না—ঠাকুরমা যে ফিরে এসেছেন। সে কিভাবে যে তখন তার ঠাকুরদার সঙ্গে কথা বলবে!

এই মানুষ সম্পর্কে সোনা নানাভাবে ভেবে দেখেছে—তবু সব ভাবনাগুলোর ভিতর ঠাকুরমা যদি আকাশের নক্ষত্র হয়ে থাকে তবে যেন সেই ভালো। সে মনে মনে এখন এমনই চাইছে। সে মনে মনে বলল, পাখি তুমি আর উড়ো না [illegible] ভিতর মানুষ হয়ে যাও। ঠাকুরমা পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না। তিনি আকাশের নক্ষত্র হয়ে থাকবেন।

—না সোনা [illegible] কেন। [illegible] তখন [illegible]।

সোনা [illegible] দিল। ওর [illegible] কাঁপছে। [illegible] ঠাকুরদার শরীরে প্রাণ

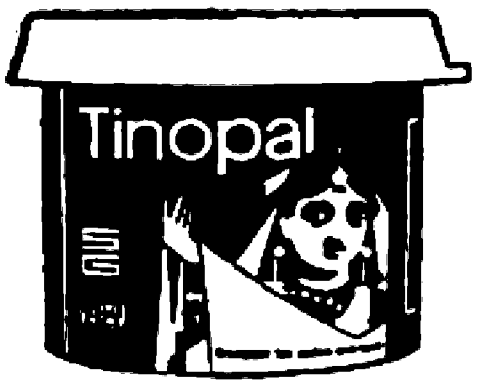

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোবার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়— এমন সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব। আপনার শার্ট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে!

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম! টিনোপাল কিনুন —রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিংবা "এক বালতির জন্যে এক প্যাকেট"।

® টিনোপাল—জে আর গাইগী এস এ, বাসল, সুইজারল্যাণ্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গাইগী লিঃ, পোঃ অঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

নেই। ভাবা যায় না। এ-ভাবে মানুষ মরে যায়। কেমন রুক্ষ এবং কঠিন চামড়া ঠাকুরদার। সে তাড়াতাড়ি এক ঘড়া জল এনে ঢেলে দিল শরীরে। হাতের আঙুল যেন এখনও শিরশির করে কাঁপছে। একজন মরা মানুষকে ছুঁয়ে দিয়ে সে কেমন অপবিত্র হয়ে গেছে। স্নান না করা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। অথচ একটা কষ্টও প্রাণে। খিল কাটা হয়ে গেছে। দীনবন্ধু এবং মাস্টারমশাই কাঠ সাজিয়ে রাখছে। নানাবর্ণের ছবি এখন। ফুলের উপর আতপ চাউল, তিল, তুলসীপাতা। ঠাকুরদার শরীরে রাশি রাশি ঘি মাখানো হচ্ছে। থেকে থেকে মেজ-জ্যাঠামশাই, বাবা বাবা বলে হঠাৎ গলায় কেঁদে উঠছেন। কেমন নিষ্ঠুর চোখ মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন পাগল জ্যাঠামশাই। তাঁকে জোর করে ধরে আনা হল। ওঁকে জ্যাঠিমা তেল দিলেন হাতে। জল এনে দিলেন। তিনি নিজে কিছুই করতে চাইছেন না। তেল, জল ফেলে আবার তিনি অর্জুন গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। গাছের কাছেই চিতা সাজানো হচ্ছে। তিনি কেমন নিষ্ঠুর চোখ মুখ নিয়ে এ-সব দেখছেন। তিনি যেন এই যে অর্জুন গাছের নিচে আগুন জ্বলে উঠবে, চিতায় তিনি বুঝি বাপের সঙ্গে আরোহণ করবেন। জ্যাঠামশাইর চোখমুখ দেখে সোনার ভয় ধরে গেছে প্রাণে। সবার অলক্ষ্যে জ্যাঠামশাই চিতায় ঝাঁপ দিলে কি যে হবে!

ধূপ তিল তুলসী মন্ত্রপাঠ তাকে কিছুতেই আজ অন্যমনস্ক করে দিতে পারছে না। সে সব সময় পাগল জ্যাঠামশাইকে চোখে চোখে রাখছে। ঠাকুরদাকে ছুঁয়ে দেবার পর ওর মুখে থুথু জমে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলতে পারছে না। অশুচি শরীর নিয়ে সে কিছু গিলে ফেলতে পারে না। সে বারবার তাই থুথু ফেলছে। এবং যেই না মনে হচ্ছে ঠাকুরদাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে—মাংস পোড়া চামড়া গন্ধ বের হবে—আগুন, ধোঁয়া, একটা আস্ত মানুষ পুড়বে, কি ভয়াবহ দৃশ্য—সে সেই সকাল থেকে এই দৃশ্যটা চোখের উপর কিভাবে যে দেখবে—ঠিক সেই মোষ বলির

মতো তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, এখনও সে-সবের কিছুই হচ্ছে না। জ্যাঠিমা পাগল জ্যাঠামশাইকে ধরে এনেছেন ফের। সাত পাক ঘুরে ঘুরে মুখাগ্নি। তারপর সেই দৃশ্য—কি কঠিন এবং নিষ্ঠুর যে মনে হচ্ছে না! সবাই কোলে তুলে নিয়েছেন ঠাকুরদাকে। সে পা ছুঁয়ে রেখেছে মাত্র। সেও সবার সঙ্গে সঙ্গে সাতপাক ঘুরেছে। সাতবার প্রদক্ষিণ করছে চিতা। কোলে তুলে ছোট্ট শিশুকে মা যেমন বিছানায় শুইয়ে দেন, তেমনি সবাই ঠাকুরদাকে চিতার কাঠে দক্ষিণের দিকে মাথা, উত্তরের দিকে পা, মুখ মাটির দিকে রেখে শুইয়ে দিল। এবং একটা সাদা কাপড়ে ঢেকে দিল। সে এতক্ষণ কাঁদেনি। তার কাঁদতে ইচ্ছা হয়নি। পাগল জ্যাঠামশাই কাঁদেননি। তিনি এতক্ষণ সব দেখে যাচ্ছেন। কিন্তু যেই না সবাই শুইয়ে দিয়ে সাদা কাপড়ে ঢেকে দিল, পাটকাঠির আগুন কিলে ঢুকিয়ে দিল, পাগল জ্যাঠামশাই আকাশফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, বাবা......। সোনাও ঠাকুরদাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে কাঁদছে। জ্যাঠামশাইর কান্না দেখে কেউ আর স্থির থাকতে পারেনি। এই চিতার পাশে যত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এমন দৃশ্য দেখে কেউ না কেঁদে পারল না। প্রায় যেন কান্নার রোল পড়ে গেল। আগুন তখন চিতার চারপাশটা গিলে ফেলেছে। কাঠের ফাঁকে ফাঁকে আগুন দাঁত বের করে দিচ্ছে। অর্জুনের ডাল, শাখাপ্রশাখা এমনকি পাতায় আগুনের হল্কা দিতে লাগছে। আর পাগল মানুষ তেমনি শিশুর মতো উপুড় হয়ে চিতার পাশে পড়ে কাঁদছেন। ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শশিভূষণ ওঁকে ধরে বসে আছে। পায়ের কাছে সোনা বসে আছে। আগুন ক্রমে দাঁত বের করে চারপাশে হল্কা ছড়াচ্ছে।

মেজ জ্যাঠামশাই চন্দনের কাঠ ফেলে দিলেন কিছু চিতায়। কিছু ধূপ। ঠাকুরদার গলার দুপাশ দিয়ে আগুন উঠে গেছে। উপুড় করে শোয়ানো শরীর। মুখ দেখা যাচ্ছে না। চামড়া পুড়ে প্রথম কালো হয়ে গেল, তারপর সাদা রঙ। আস্ত মানুষ, এ-ভাবে পুড়ে যাচ্ছে। সোনা মরে গেলে ওর শরীরও সবাই পুড়িয়ে দেবে। সোনা মরে গেলে সবাই ঠিক এ-ভাবে ধরে তুলে দেবে চিতায়। পাগল জ্যাঠামশাই মরে গেলে ঠিক এ-ভাবে আগুন জ্বেলে দেবে তারা। মা মরে গেলে—সে আর ভাবতে পারল না। কেমন এক হতাশা তার। এবং জীবন সম্পর্কে সে ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়ল।

পাগল জ্যাঠামশাই এখন গাছের কাণ্ডে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। কিভাবে এক অমৃতময় শরীর যজ্ঞের হবির মতো জ্বলে যাচ্ছে দেখছেন। চামড়া মাংসপোড়া গন্ধ বের হচ্ছে। সোনার ভিতর থেকে থেকে বমিবমি পাচ্ছে। কিন্তু সে কিছুতেই ওক দিতে পারছে না। ওর ভয় করছে বড়। সে এখন চিতার দিকে তাকাতে পারছে না। কি শরীর কি হয়ে যাচ্ছে! আর আগুন কিভাবে একটা মানুষকে গিলে খাচ্ছে।

গাছের নিচে যারা বসে আছে ওরা কীর্তন করছে। ধোঁয়া উঠে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। এঁকেবেঁকে সোনালি বালির নদীর চর পার হয়ে কেমন বহুদূরে ঠাকুরদা অসীমে মিশে যাচ্ছেন।

সোনার মনে হল সে চিতার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বরং পাগল জ্যাঠামশাইকে নিয়ে অন্য কোথাও তার চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরদার শরীর পুড়ে গেলে চিতায় জল ঢেলে দিতে হবে। সে, পাগল জ্যাঠামশাই একসঙ্গে জল ঢেলে দেবে। বরং সে এখন ভাবল, অর্জুন গাছের ও-পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। পাগল জ্যাঠামশাইর হাত ধরে থাকবে। কি অপলক তিনি দেখছেন!

বোধ হয় পাগল মানুষ ভাবছিলেন তখন—এই শরীর অমৃতময়, এই শরীরে আমার জন্ম। আপনার রক্ত এ-ভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে। আপনার ধর্ম এভাবে সারা জীবন এবং শতবর্ষ পার হলেও এক অমৃতময় ধ্বনি ভেবে অন্ধকারে পথ হাঁটবে। আমরা কিছুই জানি না। এই যে জগতে, দিন মাস কাল, মৃত্যু এবং সৌর আবর্তন সবই এক নিয়ন্ত্রণের ফলে ঘোষিত হচ্ছে। কত ছোট সেখানে আপনি, আপনার এই কোষাকুষি, তিল তুলসী বিল্বপত্র। বাবা আমরা বড় বেশি নিজেকে নিয়ে বাঁচি। আমাদের সবকিছু যত তুচ্ছই হোক, তাকে অপরিসীম মূল্যবান মনে করে সংসারে যাবতীয় সত্যকে অস্বীকার করি।

সোনা এখন পাগল জ্যাঠামশাইর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাঠামশাই একবারও ওর দিকে তাকাচ্ছেন না। আগুনের আঁচ ওদের শরীরে এসে সামান্য লাগছে। সোনা হাত ধরে টানছে, একটু দূরে নিয়ে যেতে চাইছে। শশীভূষণ আর একটু আগে দাঁড়িয়ে আছে। দীনবন্ধু লক্ষ্য রাখছে সব। বড়বৌ ভূপেন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছে, ওঁকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবেন না। সোনাকে বলুন ওকে এদিকে নিয়ে আসতে।

শশীভূষণ বলল, আমি আছি। এখানেই থাকুক। এই শেষ দেখা। কাছে থাকলে ওর মনে শান্তি পাবে।

কিন্তু কি ভয়, এমন অপলক তিনি এই আগুনে কি দেখছেন! চোখে এসে প্রতিবিম্ব পড়েছে আগুনের। সোনা দেখল জ্যাঠামশাইর চোখদুটোয় চিতা জ্বলছে। আর গাছের নিচে এক চিতা। তিন চিতায় সে, জ্যাঠামশাই এবং ঠাকুরদা ক্রমাগত যেন জ্বলে যাচ্ছেন। সে ভয়ে জ্যাঠামশাইকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল।

সোনা ডাকল, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠিমা আপনাকে ডাকছে। পাগল মানুষ এবার সোনার দিকে তাকালেন। ঐ খানে জ্যাঠিমা দাঁড়িয়ে আছে।

দূরে জামগাছটার নিচে গ্রামের সব মেয়েরা দাঁড়িয়ে এই বুড়ো মানুষের দাহ দেখছে। সকলেই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দেখছে মাটি এবং মানুষের এক চিরন্তন টান এভাবে শেষ হয়ে যায়।

পাগল মানুষকে সোনা কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারল না। তিনি এখন হাস-

হাওড়া
কুষ্ঠ কুটীর
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—১। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

ছেন। তবে আর ভয় নেই। সোনার এখন মনে হল ঠাকুরদার সব অহঙ্কার আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। সে জন্য জ্যাঠামশাই হাসছেন। সব পৌরুষ জ্বলে যাচ্ছে, সে জন্য জ্যাঠামশাই হাসছেন। মিথ্যা ধর্মবোধ জ্বলে যাচ্ছে, সে জন্য তিনি হাসছেন।

সে বলল, জ্যাঠামশাই আপনের চক্ষে ঠাকুরদার চিতা জ্বলতাছে।

মণীন্দ্রনাথ সোনার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, তুমি নিজের চোখ দেখ সোনা।

সে লালটুকে বলল, দাদারে আমার চক্ষে কিছু জ্বলতাছে।

লালটু উঁকি দিল। বলল, হুঁ। সোনা ওর দুই চক্ষুতে ঠাকুরদার চিতার আগুন।

—সত্যি?

—হারে সত্যি।

সোনা তাড়াতাড়ি বড়দাকে ডাকল। দ্যাখি তর চক্ষু।

চিতার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সবার চোখে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সে বলল, বড় কষ্ট লাগে দাদা। আমরা সবাই মইরা যামু। ভাবতে কষ্ট লাগে না!

তখন শশীভূষণ বলল, অত কাছে যাবে না। এদিকে সরে এস। মাথা ফুটে ঘিলু ছিটকে আসতে পারে।

—যাবেন বাড়ি। শশীভূষণ ভূপেন্দ্রনাথকে বলল।

মাথাটা হেলে পড়ে যাচ্ছে। সোনা লালটু সবাই তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেল। ভূপেন্দ্রনাথ বাঁশের খোঁচায় মাথাটা ফাটিয়ে দিতেই ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল। সোনা দেখল আগুন ক্রমে কমে আসছে। এখন আছে শুধু সামান্য মাথার খুলি, নাভি এবং কোমরের দিকটা। ভূপেন্দ্রনাথ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেটা আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ঠাকুরদার নাভিটা একটা পোড়া ব্যাঙের মতো দেখাচ্ছে। ব্যাঙের লেজ খসে শরীরটা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে। ঠাকুরদার এমন চেহারা দেখে ওর ভারি মজা লাগছিল। সোনা যেমন আয়নায় মুখ দেখে, ঠাকুরদার যদি আয়নায় এখন তেমনি মুখ দেখার ইচ্ছা হত!

সে ঠাট্টা করে বলল, বুড়াকর্তা আয়না দিমু আইনা? আয়নায় যদি নিজের মুখটা দ্যাখেন। সে লালটুকে বলল, বড়দারে ঠাকুরদা একবারও ভাবছিল শরীরটা ওর ব্যাঙের মত হইয়া যাইব।

লালটু ধমক দিল। —খাড় ধনকাকারে কইতাছি।

সোনা এবার চুপ করে গেল। এমন মহাপার্বণের দিনে সে কি আজেবাজে ঠাট্টা করছে। সে বিধর্মী হয়ে যাচ্ছে যেন। মানুষের জীবন কত ছোট, কত অপরিসীম তুচ্ছ। এই বয়সেই এসব ভাবায় বলে সোনা মাঝে মাঝে এই পৃথিবী বিচরণশীল মানুষের জন্য নব এমন ভাবে। দুঃখের বর্ণনা সে শুনেছে। শশিভূষণ নানাভাবে কোথায় কিভাবে মহাযুদ্ধ হয়েছে, দুর্ভিক্ষ এবং দাঙ্গায় কথা বর্ণনা করেছে। সোনা সেসব শুনে মাঝে মাঝে এক সুন্দর সুদৃশ্য

জগৎ নিজের মনে তৈরি করে নেয়। সেখানে ঈশমদাদা তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে হয়। সেই ঈশমদাদাই আজ এমন মহাপার্বণের কাছে আসতে পারছে না। সে দূরে দূরে অপরিচিত মানুষের মতো থাকছে।

তখন ভূপেন্দ্রনাথ অবশিষ্ট নাভিটুকু সামান্য একটা টিনের কৌটায় পুরে রেখে মাথায় করে জল নিয়ে এল। এখন নদীর ঘেঁষে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কি গরম আর এই দাবদাহে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখন বৃষ্টির দরকার। কালবৈশাখীর ঝড়ে গ্রামের কুঁড়ে ঝড়ে পড়ছে। বৃষ্টিপাত না হলে ধরণী শান্ত হবে না। ভূপেন্দ্রনাথ, পাগলঠাকুর মানুষের বিনগত পাপক্ষয়ের পর শান্তি আসুক, এই ভেবে সারাক্ষণ ঘড়া ঘড়া জল এনে চিতায় আগুনে ঢেলে দিতে থাকল।

জলে চিতা নিভে গেলে ওরা বাড়ি ফিরে গেল। সোনা ফেরার সময় পেছনে তাকাচ্ছে না। জ্যাঠামশাই এক কলসি জল চিতার উপর রেখে পিছন ফিরে কলসি ফুটো করে দিয়েছেন। কেউ আর তাকাচ্ছে না পিছনে। সোনার মনে হল, পিছনে তাকালেই সে তার ঠাকুরদাকে দেখে ফেলবে। তিনি যেন পদ্মাসনে শ্মশানের উপর বসে আছেন। সেখানে আর শ্মশান নেই। সুজলা সুফলা ধরণী। তিনি সেখানে বসে মধুপান করছেন। মৃত্যুর পর মানুষের মধুপান দেখতে নেই। সোনা সে জন্য আর তাকায় নি। তাকালে পাপ হবে সে এমন শুনেছে। অথচ খুব দেখার ইচ্ছা তার। সেই শ্মশানে কি হচ্ছে এখন। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হলে অস্পষ্ট অন্ধকারে কোনো কুকুর অথবা শেয়াল আসতে পারে। কোনো কুকুর অথবা শেয়াল দেখতে পেলেই সে বুঝতে পারবে ঠাকুরদা শেয়াল কুকুরের বেশ ধারণ করে ফিরে এসেছেন। নন্দনবনের পাখি আর থাকছেন না। কিন্তু সে তাকাতে পারল না ভয়ে। ঠাকুরদা রাগ করতে পারেন তার উপর। তুমি সোনা যা নিয়ম নয়, যা করতে নেই, সে সব করার বড় সখ তোমার। তুমি তাকালে কেন। আমি আর বড় বটগাছের মাথায় নক্ষত্র হয়ে থাকব না। আমি কিছুই দেখব না তোমাদের। তোমাদের বাগে পেলে ঘাড় মটকে দেব।

সোনা সেজন্য খুব সুবোধ বালকের মতো পিছনে না তাকিয়ে সবার সঙ্গে পুকুরে ডুব দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। এবং অন্ধকার নামলেই ওর কেমন ভয় ধরে গেল। সে দক্ষিণের ঘরে শশীমাস্টারের পাশে গিয়ে বসে থাকল। এমন কি যখন একটা গণ্ডগোল উঠেছিল সোনাপাড়ে—ফেলুর শরীর কি জ্বলছে, ফেলুর ঘা ফুটে এখন আগুনের মতো জ্বলছে নিজকে এবং হাতে তার কোরবাণীর চাকু, ভয়ে কেউ কাছে যাচ্ছে না, সে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, আবার সে কার গলা যে হাত করে কেটে ফেলবে—কেউ বুঝতে পারছে না, বাতাসে যেন সেই নরহত্যার খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে, সবাই সাবধান হয়ে যাচ্ছে, ওকে দেখলে সোনাপাড়ে আর কেউ নেমে যেতে পারছে না—তখনও সোনা শশীমাস্টারের পাশে বসেছিল।

কেবল নির্ভীক এক ষণ্ড। সে চারপা শক্ত করে ভিটাজমিতে দাঁড়িয়ে আছে। কতদূরে ফেলু আছে বাতাসে গন্ধ শুঁকে সে টের পাচ্ছে।

হাওয়া কেটে হাত তুলে উপরে, ফেলু বসেছে। ফেলু সোনাপাড় পার হয়ে এদিকে আসছে। কি তুমি এমন একখানা মানুষ, তোমার চিতার চারপাশে মানুষ ভেঙে পড়েছে! তুমি মশাই মরেও গরব তোমার যায় না। আগুনে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাক আর লোকে দেখে হায় হায় করে, আমি এক ফেলু, বিবি ঘরে নেই, আমার দুঃখে কেউ কাঁদে না। সাখি কি আছে এই মাটিতে। তুমি কোনখানে আছ, তোমার পাগল ছাওয়ালে আমারে কানা কইরা দিছে। বলেই সে সেই শ্মশানের উপর এসে কেমন উত্তেজনায় কোরবাণির চাকুটা দুলিয়ে দুলিয়ে নৃত্য করতে থাকল।

কেউ দেখে ফেললে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি যে হত। কেবল শশীমাস্টার জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছে পুকুরপাড়ে অর্জুনগাছের নিচে একজন মানুষের অবয়ব। তার শরীর থেকে আগুন ফুটে বের হচ্ছে। শশীমাস্টার বলল, সোনা আয়। মজা দেখবি। মানুষ মরে কোথাও যায় না। এ পৃথিবীতেই থাকে। শুধু আমরা দেখতে পাই না এই যা। ঐ দ্যাখ।

সোনা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল, সত্যি সেই মহাশ্মশানে তার ঠাকুরদা ফিরে এসেছেন। কি সব অলৌকিক ঘটনা। ওর দেখল কিছুক্ষণ সেই আত্মা সেখানে ঘোরাঘুরি করে শেষে মাঠের দিকে নেমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কালো শরীর বুঝি সেই বিদেহীর। সারা শরীরে আগুন ফুটে ফুটে বের হচ্ছে। অদ্ভুত সব চোখ আগুনের—সে চিনে উঠতে পারল না। কেবল শশীমাস্টার বলল, ভয় পেতে নেই সোনা। আমরা সবাই এভাবে মরে যাব। মরে গিয়ে আবার এখানেই ফিরে আসব।

সোনা কিছু বলতে পারছে না। ওর জ্বর জ্বর আসছে।

কম্প দিয়ে জ্বর আসছে সোনার। সেই আগুনে পোড়া মানুষটার শরীরে অজস্র আগুনের ফুলকি জ্বলছে নিভছে। সোনা হি হি করে মাঘমাসের শীতের মতো কাঁপছে। সে মাস্টারমশাইর বিছানায় একটা কাঁথা গায়ে শুয়ে পড়ল। মনে হল এবার বুঝি তার পালা। এবার বুঝি সেও ঠাকুরদার মতো মরে যাবে। পোড়া শরীরে আগুন ফুটে বের হবে। জ্বালাযন্ত্রণায় ছটফট করবে সে। সে সবাইকে দেখতে পাবে, তাকে কেউ দেখতে পাবে না। ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। সে কাঁথার ভিতর কেমন ছটফট করছিল।

শশিভূষণ সহসা চিৎকার করে উঠল, বৌঠান তাড়াতাড়ি আসুন। সোনা কেমন করছে, এসে দেখুন।

[(ক্রমশ)]

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

হেমিংওয়ের কলমে

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রায় কুড়ি বছর আগে লিখেছিলেন 'আইল্যান্ডস ইন দি স্ট্রীম' নামে এক উপন্যাস এতদিনে তাঁর মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করা হবে কি হবে না, এই নিয়ে মতপার্থক্য ছিল, শেষ পর্যন্ত হেমিংওয়ের বিধবা স্ত্রী এবং সাহিত্যিক এক্সিকিউটারদের পরামর্শে উপন্যাসটি দিনের আলো দেখতে পেল। হেমিংওয়ের বিয়োগান্ত মৃত্যুর পর শোনা গিয়েছিল যে তাঁর অনেক অপ্রকাশিত রচনা আছে কিন্তু ১৯৫৭ খৃঃ তাঁর দুটি মাত্র গল্প 'অ্যাটলান্টিক মান্থলি'তে প্রকাশিত হয়, সেগুলি তাঁর খ্যাতির উপযুক্ত হয়নি।

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসটিতে মহৎ লেখকের কলমের ছাপ সুস্পষ্ট। হেমিংওয়ে তাঁর জীবন সুরু করেছিলেন 'কনসাস সিটি স্টারে' রিপোর্টার হিসাবে। তখনকার দিনে সকল মার্কিন তরুণের কাছে 'স্টার' ছিল আদর্শ পত্রিকা। হেমিংওয়ে বলেছেন—'স্টার' পত্রিকায় কাজ করার আমার প্রচণ্ড বাসনা ছিল কারণ, আমার ধারণা ছিল ইউনাইটেড স্টেটসে 'স্টার'-ই তখন সর্বশ্রেষ্ঠ।' এই পত্রিকায় কাজ করার সময় লিওনেল মর্গাসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। মর্গাস বিশ বছর বয়সেই সংবাদপত্র জগতে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। হেমিংওয়ের রুমমেট কার্ল এজগার ছিলেন তাঁর চেয়ে সাত বছরের বড়। তিনি ১৯১৭ খৃঃ হেমিংওয়ে সম্পর্কে লিখেছেন—

"A modest rather shy and diffident boy." আর এই মন্তব্য করার এক বছর পরেই সেই হেমিংওয়ে হয়ে উঠলেন—

"A very aggressive and opinionated and moreover an apostle of the violent".

এই পরিবর্তনের পিছনে নাকি মর্গাসের প্রভাব ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি যা কিছু শিখেছিলেন তা মর্গাসের কাছ থেকেই শিখেছেন কারণ মর্গাসকে তিনি অন্ধভাবে অনুকরণ করতেন।

মর্গাস হেমিংওয়ের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষিত না হয়ে খুশী হয়েছিলেন। ১৯৫২ খৃঃ হেমিংওয়ে প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন—

"I have heard Hemingway quoted to the effect that my pronouncement influenced him to be good. Like all good writers Hemingway owes his well deserved eminence not to any influence but to his ability to select from a host of influences."

এই মন্তব্য করে তিনি হেমিংওয়ের 'দি কিলার্স' গল্পটির উল্লেখ করেছেন এই গল্পটি তাঁর মতে—

"An example of pure objectivity. — dialogue, action and a minimum of description".

আলোচ্য উপন্যাসটি পড়তে বসে এই কথাগুলি স্মরণে আসে। কারণ হেমিংওয়ের রচনার সর্ববিধ গুণই এই উপন্যাসে বর্তমান। এই উপন্যাসটির আরম্ভ চমৎকার—

"The house was built on the highest part of the narrow tongue of land between the harbour and the open sea. It had lasted through three hurricanes and it was built solid as a ship. It was shaded by tall coconut palms that were bent on the ocean side you could walk out of the door and down the bluff accross the white sand and into the gulf stream".

যখন বাতাস থাকে তখন এই অববাহিকার জল সাধারণতঃ ঘন নীল—কিন্তু সেই জল পার হয়ে এলে জল থেকে একটা সবুজ আলো ভেসে এসে পড়ে ময়দার মতো শুকনো বালুকণার ওপর—যে কোনো বড় মাছের ছায়া অনেক আগে থেকেই দেখা যায়। বীচের ধারে সে এসে পৌঁছানোর অনেক আগেই তার ছায়া পড়ে।

মাছের ওপর লেখকের অসীম আগ্রহ। কনসাস সিটিতে কাজ করার সময় বন্ধু কার্ল এজগারের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হয়, তখন মিশিগানের পাইন লেকে দুজনে মাছ ধরতে যেতেন। নির্জন অরণ্য, পাইনের আড়ালে ঝিকিমিকি সোনালি রোদ আর সেই স্তব্ধ বিজনে মার্লিন বা ট্রাউট মাছ শিকার দেহ ও মনে এক অপূর্ব শিহরণ জাগিয়ে তুলত।

আলোচ্য উপন্যাসে সেই নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি এঁকেছেন মহান শিল্পী হেমিংওয়ে। দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে আমেরিকার আর কোনো কথাশিল্পী এতখানি শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারেননি।

যে হেমিংওয়ের লেখনী থেকে 'দি সান অলসো রাইজেস' এবং অজস্র ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে, যিনি লিখেছেন 'এ ফেয়ার

ওয়েল টু আর্মস' ও 'ফর হুম দি বেল টোলস—তিনি সাহিত্যের রাজ্যে অবিস্মরণীয় পুরুষ। তবু হেমিংওয়ের এই মরণোত্তর উপন্যাস হাতে করে মনে হয়, হয়ত সেই পুরাতন কথাই শোনা যাবে, কিন্তু তা নয়, এ বাণীর সুরে বারবার শোনা যায়। 'ক্যাসাব্লাঙ্কা' ফিল্মে ইনগ্রিড বার্গম্যান বোগার্টের নাইট ক্লাবে পিয়ানোবাদককে অনুরোধ করছেন 'প্লে ইট এগেন স্যাম' —আর স্যাম বাজনা আবার শুরু করে। হেমিংওয়ের উপন্যাসও যেন সেই পিয়ানো-বাদক স্যামের আবার নতুন করে বাজাতে বসা।

প্রথম কয়েক পাত পড়ে মন একটা বিরাট সম্ভাবনার কথা ভেবে বিহ্বল হয়ে ওঠে। অডেন এক জায়গায় বলেছেন—

"The old masters may never have been wrong in depicting suffering".

'আইল্যাণ্ডস ইন দি স্ট্রীম'কে সাধারণ রীতিতে ব্যাকরণসম্মত উপন্যাস বলা চলে না, অন্ততঃ প্রকাশকের দাবী অনুসারে 'মেজর নভেল' বলা যায় না, বরং এক বৃহৎ উপন্যাসের খসড়া মনে হয়, লেখক এই উপন্যাস শেষ করতে পারেননি, এবং প্রকাশের চেষ্টা করেন নি। হেমিংওয়ের সমালোচক-সত্তা এই গ্রন্থ প্রকাশে সায় দেয়নি।

উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। টমাস হাডসন নামক গুড পেইণ্টারের জীবনের বিভিন্ন পর্বের বিবরণ। প্রথম খণ্ড 'বিমিনি'র ঘটনা কাল—১৯৩০ খৃঃ।

হাডসন নিরালা, নিঃসঙ্গ চরিত্র—অনেকটা হেমিংওয়ের নিজের চরিত্রের প্রতিরূপ। তাঁর কাছে এল একজন পুরাতন বন্ধু, লোকটি আবার দুর্নীতিপরায়ণ লেখক—এ যেন লেখকের দ্বিতীয় সত্তা। হেমিংওয়ের চরিত্রের যে দিকটি বেশী প্রচারিত নয়, রজার্স ডেভিস তারই প্রতিমূর্তি। এই সময় এল হাডসনের তিন ছেলে, দুটি আগেকার বিবাহজাত। ছেলে-গুলিকে হাডসন গভীরভাবে ভালোবাসে। ওরা মাছ ধরে, নৌকায় চড়ে ঘোরে এবং দুঃসাহসিক আরো অনেক কর্ম করে বেড়ায়। তারপর ওরা চলে যায়, দুটি ছেলের মৃত্যু হয়। হাডসন নিঃসঙ্গতর হয়ে উঠল। এই উপন্যাসের মধ্যে 'বিমিনি' অসমান হলেও সর্বোত্তম।

দ্বিতীয় খণ্ড 'কিউবা'—এই পর্বটি উপন্যাসের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। ঘটনা-গুলি ঘটছে কয়েকটি পড়ো চিনির আড়তে, এবং ফ্লোরিডিটা বার-এ। এইখানে হাডসন তার পুত্রের বিয়োগ-ব্যথায় কাতর হয়ে বিলাপ করে। তার সবচেয়ে ছোট আর বড় ছেলের জন্যই তার বেশী দুঃখ। এরা দুজনেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে লণ্ডনে স্পিটফায়ারে উড়ন্ত অবস্থায় মারা যায়।

তৃতীয় অংশ—'অ্যাট সী'—ক্যারিবিয়ে একটি জার্মান ইউবোটের কয়েকজন নাবিকের পিছনে হাডসন ধাওয়া করেছে। ওরা মারা যায় এবং মনে হয় হাডসনও মরণোন্মুখ। সে জাহাজে আহত অবস্থায় পড়ে আছে আর ভাবছে জাহাজের ইঞ্জিনের কম্পন শুনে—

"The lovely throb of her engines against his shoulder-blades which rested hard against the boards".

ঘরে ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে যেন পুরাণের কোনো প্রাচীন সম্রাট।—এইখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি। এই উপন্যাসের গোড়ার দিকে হাডসন তার লেখকবন্ধু রজার ডেভিসকে বলছে—তোমাকে এখন থেকে সোজা, সহজ ও স্পষ্ট লেখা লিখতে হবে তৈরী করে।

রজার এর জবাবে বলে—

"What if I'm not straight and simple and good? Do you think I can write that way"

জবাবে হাডসন বলেছে—যেমন খুশী লিখে যাও, তবে লেখাটা একেবারে সোজা-সুজি লিখবে।'

এই কয়েকটি লাইন বিশেষ অর্থপূর্ণ।

—অভয়ঙ্কর

ISLANDS IN THE STREAM : (A novel), by Ernest Hemingway : Published by Scribners : Price 10 dollars.

সাহিত্যের খবর

আমেরিকান উপন্যাস : গত বছরের সালতামামি।। গত বছর আমেরিকায় যত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা সমকালীন সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে চান, তাঁদের কাছে এই বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হবে। গতবছরে প্রকাশিত অধিকাংশ আমেরিকান উপন্যাসের প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে পরিবেশ। চারদিকের পরিবেশের সঙ্গে মানুষের মানসিকতার সম্পর্ক অনেক কটি উপন্যাসেই সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ রকম একটি উপন্যাস হল র‍্যাকেল কার-সনের 'দিস সাইলেণ্ট স্প্রিং'। অথবা যদি আত্মপ্রবাসের কথাও কিছু কিছু উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। আলভিন টফলারের 'ফিউচার শক' উপন্যাসে কিভাবে সর্বাধিক উপরে শক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হতে পারে, তার একটা উপায় কল্পিত হয়েছে। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা যে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক নয়, লেখক বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিছুদিন যাবৎ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী দেশ-সমূহের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে 'এনকাউণ্টার' নামে যে আন্দোলন চলছে, কয়েকটি উপ-ন্যাসে তারও পরিচয় পাওয়া গেল। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বাড লাণ্ড্রেক' এবং 'এনকাউণ্টার' এর মধ্যেই বেশ জন-প্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে শ্রীমতী জেন হাওয়ার্ডের 'প্লিজ টাচ' গ্রন্থটি। শ্রীমতী হাওয়ার্ড 'লাইফ' পত্রিকার একজন সাংবা-দিক এবং তিনি উপকূলবর্তী এই প্রদেশ-সমূহে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি-দের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। তাই তাঁর লেখাটি হয়েছে খুব বস্তুনিষ্ঠ এবং বোধ হয় এটাই তাঁর বইয়ের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক জেমস এ মিশেনারের নতুন উপন্যাস 'দি কোয়ালিটি অব লাইফ' উপন্যাসটিও গত বছরের আর একটি উল্লেখ্য সংযোজন। এই উপন্যাসের বক্তব্য কিছুটা রাজনৈতিক। তিনি এখানে আমেরিকান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁর একটা পরোক্ষ সমর্থন প্রকাশ করেছেন। আর একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস হল আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'আইল্যাণ্ড ইন দি স্ট্রিম'। এই উপন্যাসটি হেমিংওয়ের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হয়েছে। একটি ছোট উপন্যাসের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। উপন্যাসটির নাম 'লাভ স্টোরি'। লেখক এরিখ সেগাল। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেগালের বয়স মাত্র বত্রিশ বছর। বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন কিন্তু বইটি নিয়ে তেমন হৈ-চৈ হয়নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব সমালোচনা হয়েছে, তাতেও যে বইটির খুব প্রশংসা হয়েছিল, এমন বলা

CENTRAL LIBRARY

যায় না। কিন্তু দেখতে দেখতে বইটির কয়েকটি সংস্করণ শেষ হয়ে গেল আর তখনই সমালোচকরা সচেতন হয়ে উঠলেন। বইটির মধ্যে সমকালীন তরুণ সমাজের আশা-উচ্ছ্বাসের বাণী প্রতিফলিত হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি জেমস ডিকের প্রথম উপন্যাস ডেলিভারেন্স-এ আধুনিক নাগর সভ্যতার অসম্পূর্ণতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও ইতস্ততঃ আরো কিছু কিছু উপন্যাস হয়ত প্রকাশিত হয়ে থাকবে, যেগুলি এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অবশ্য এখানে গতবছরে প্রকাশিত আমেরিকান উপন্যাসের ইতিহাস বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। শুধু গতি-প্রকৃতির কিছু নির্দেশ দানই এর লক্ষ্য।

পুরুলিয়ায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন।। গত ২৪ জানুয়ারী পুরুলিয়ায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার শ্রীকে এম লাল। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, দেশে বঙ্গ সাহিত্যের গুরুত্ব এখনও সঠিকভাবে উপলব্ধি হয়নি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রমথানন্দ মহারাজ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গ সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন।

প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা।। এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি যাঁদেরকে সম্মানীত করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় লেখক। প্রখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, সমালোচনা, নাটক, কবিতা—ইত্যাদি সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখ্য। পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন হিন্দি সাহিত্যিক ভগবতী-চরণ ভার্মা, জৈনেন্দ্রকুমার জৈন এবং ওড়িয়া সাহিত্যিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। কালিন্দীচরণ বর্তমান ওড়িয়া ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। ওড়িয়া সাহিত্যে 'সবুজ দল' বলে যে লেখকগোষ্ঠী ১৯২৯-৩০ খৃঃ আধুনিকতার সূত্রপাত করেন, কালিন্দীচরণ ছিলেন সেই গোষ্ঠীর অন্যতম। তাঁর উপন্যাস 'মাটির মনিষ' আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। কবিতার ক্ষেত্রেও ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতার নিদর্শন হিসেবে 'সন্ধ্যালোকে' কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরা যাচ্ছে :—

'অস্তগামী রবিসম
নিবিড় এ সন্ধ্যার মুখরে,
চলিছি মু গোধূলির
শীর্ণ ক্লান্ত ক্ষীণ মরুখরে।
শীতল পবন মোর লাগে গণ্ডে
লাগে ভাল বেশে
চলিছি মু আজি নিরুদ্দেশে।'

রবীন্দ্রনাথের অনেক গ্রন্থও তিনি ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও ছোটগল্প লেখিকা শ্রীমতী নন্দিনী শতপথি তাঁর কন্যা এবং বিশিষ্ট কবি শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র তাঁর জামাতা।

জৈনেন্দ্রকুমার আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উপন্যাস রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তিনি এক সময় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ফাঁসী', 'পরখ', 'সুনীতা', 'কল্যাণী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা-রীতিও খুব সহজ এবং সরল।

ভগবতীচরণ ভার্মাও কবি হিসেবে আধুনিক হিন্দি সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'মধুকণ', 'প্রেম-সংগীত', 'মানব', 'রূপ সে মোহ' বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর কবিতার বিষয় প্রেম। 'প্রেম সংগীত' গ্রন্থে তিনি এমন কিছু সুন্দর প্রেমের কবিতা উপহার দিয়েছেন, যা সমগ্র হিন্দী সাহিত্যেও বিরল। ঔপন্যাসিক হিসেবেও তাঁর পরিচয় রয়েছে। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে 'চিত্রলেখা', 'তিন বর্ষ', 'আপনে খিলোনে', 'সামর্থ ও সীমা' বিশেষ অনুধাবনার অপেক্ষা রাখে। প্রেম তাঁর সাহিত্যের প্রধান বিষয় হলেও সমকালীন জীবনধারাও কোথাও কোথাও প্রভাব বিস্তার করেছে।

আকাদেমি পুরস্কার।। ১৯৭০ সালের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বাংলা থেকে এ পুরস্কার পেয়েছেন বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির জন্য।

এছাড়া আরো পনেরোজন এই পুরস্কার লাভ করেছেন। অসমীয়া ভাষায় লক্ষ্মীনাথ ফুকন তাঁর 'মহাত্মার পোরা রূপকোনোয়ারলৈ'; ওড়িয়া ভাষায় বিনোদচন্দ্র নায়ক তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'সরিসৃপার' জন্য; হিন্দি ভাষায় রামবিলাস শর্মা 'নিরালা কি সাহিত্যসাধনা' গ্রন্থটির জন্য; ডোগরি ভাষায় নরেন্দ্র খাজুরিয়া তাঁর "নীল অম্বর কলে বাদল" গ্রন্থটির জন্য; গুজরাট ভাষায় নগিনদাস পারেখ 'অভিনবনো রসবিচার'; কানাড়া ভাষায় এস বি যোশী 'কর্ণাটক সংস্কৃতির পূর্ব পীঠিকে'; কাশ্মীরী ভাষায় মহীউদ্দিন হাজিনি 'মাকালাত'; মৈথিলি ভাষায় কাশীকান্ত মিশ্র 'রাধা বিরহ'; মলয়ালম ভাষায় কে টি বাসুদেবন নায়ার 'কালম'; মারাঠি ভাষায় এন আর পাঠক 'আদর্শ ভারত সেবক'; সংস্কৃত ভাষায় ভি সুব্রহ্মণ্যম শাস্ত্রী 'শব্দতরঙ্গিণী'; সিন্ধি ভাষায় নারায়ণ শ্যাম 'ওয়ারিঅ ভারয়ো পলাঙ্গ'; তামিল ভাষায় 'কি আনাগিরিস্বামী 'এনবালিপএ'; তেলেগু ভাষায় বালগঙ্গাধর তিলক 'অমৃতম কুরুসিনা রাত্রি' এবং উর্দু ভাষায় হায়াতুল্লা আনসারি 'লাহু কে ফুল' গ্রন্থটির জন্য এই পুরস্কার লাভ করেছেন। ২১ ফেব্রুয়ারী দিল্লির রবীন্দ্রভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কৃত লেখকরা নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও তাম্রফলকে লেখা একটি করে প্রশংসাপত্র পাবেন। এবারে পুরস্কৃত গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করে দেখা গেল সৃজনশীল সাহিত্যের জন্য খুব কম লেখকই পুরস্কৃত হয়েছেন। তবে কি সৃজনশীল সাহিত্যের মান এখন নিম্নমুখী?

—চার্বাক

নতুন বই

লণ্ডনে কাল্লনে (উপন্যাস)—হিরণ্ময় ভট্টাচার্য। সিগনেট প্রেস, ২৫।৪ একবালপুর রোড, কলকাতা—২৩। দাম চার টাকা।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য এই উপন্যাসটি লিখেছেন লণ্ডনের পটভূমিকায়। লেখকের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রতিফলন পড়েছে কাহিনীর বুননে ও প্রেরণায়। লণ্ডনের পথঘাট, অস্পষ্ট সামাজিক জীবন যেন দেখা হয়েছে প্রবাসীর চোখ দিয়ে। নায়ক সুবীর সেন, বাংলাদেশে মানুষ, বেঙ্গলী মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল নেহাৎ-ই বরাত জোরে। ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছিল কাকা-কাকিমার অনাদরে ও অবহেলায়। এই অনাদর এবং উপেক্ষা তাকে জীবন সম্পর্কে উদাসীন করে তোলে। যে-দেশে মানুষ বিনা উমেদারিতে চাকরী পায় না, সেই বাংলাদেশে সে চাকুরী পেয়ে গিয়েছিল একটা। কেবল কারণটা জানতো না। জেনেছিল অনেক পরে, যখন কাকিমা পুরনো সম্পর্কটা চাপা করতে চেষ্টা করেছিলেন, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, একটা মেয়ের সংগে, যার বাবা একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী—এবং যার প্রত্যাখানে তার দুর্গতির অন্ত ছিল না, তখন। সুবীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। পাড়ি জমিয়েছিল লণ্ডনে—ভাগ্যের সন্ধানে।

এখানেই কাহিনীর সূত্রপাত এবং সুবীরের জীবনের অন্য অধ্যায়ের সূচনা। এখানে চাকরী জোটাতে তাকে কম বেগ পেতে হয়নি। মুখচোরা থেকে সে মুখর হয়েছে। তারই অফিসের অন্য একজন মহিলা সহকর্মীর সংগে পরিচিত হয়েছে। তার নাম ব্রেন্ডা, বিবাহিতা। সে সুবীরকে নাচ শিখিয়েছে, সঙ্গ দিয়েছে, শরীর দিয়েছে—হয়তো-বা হৃদয়ও। কেবল সুবীর

সব সময় তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। উপন্যাসের সমাপ্তিতেও না। শ্বেতা রহস্যময়ী। সে অর্ধ প্রকাশিত এক সত্যের মতো। তার জীবনের উত্তাপ যেমন সুধীর অনুভব করেছে, তেমনি তার যন্ত্রণাকেও। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ধরতে পারেনি তাকে। হয়তো শ্বেতা দিতে চায়নি, কিংবা সুধীরই ভুল বুঝেছে তাকে।

হিরণ্ময়বাবু অত্যন্ত সাবলীলভাবে কাহিনীটি বলে গেছেন। তাঁর ভাষায় কোনো জড়তা নেই। আবেগহীন ও সরল। কাহিনীর পরিণতিতে পাঠক আবিষ্ট হন শেষ পর্যন্ত। এবং কিছুটা বিস্মিতও।

হিমালয়ের টানে (ভ্রমণ কাহিনী)—অজিত-কুমার মুখোপাধ্যায়। বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা—৯। পাঁচ টাকা।

ভ্রমণ কাহিনী লেখার পথ ও পদ্ধতি পালটে গেছে। এখন আর কেউ নীরস বর্ণনায় সন্তুষ্ট নয়। সম্ভবত সে জন্যেই ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসে অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সৃজনশীলতার দিকটিকে উপেক্ষা করেননি। তথ্যের দিকেও সমান নজর রেখেছেন। ক্যামেরার চোখ দিয়ে তিনি দেখেছেন দৃশ্যের পর দৃশ্য, ছবির পর ছবি। মনে হয়, পাঠকও যেন একজন অভিযাত্রী—লেখকের সঙ্গে চলেছেন হিমালয়ের আকর্ষণে—হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ হয়ে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী কেদারবদরী পর্যন্ত। লেখক বাসে ভ্রমণ করেছেন আবার তিনশো মাইল এবং সত্তর মাইল পায়ে হেঁটে। পাহাড়ী ধস, পথের দুর্ঘটনা, বৃষ্টি ও তুষারপাত, অর্ধাহার, অনাহার—কিছুই তাঁর চলার পথকে রুদ্ধ করেনি। তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন, তীর্থযাত্রার বাসনা নিয়ে হিমালয়ে যাননি, ভ্রমণের আনন্দটাই তাঁর কাছে মুখ্য। বইটি পড়ার পর অবশ্য পাঠকের মনে অন্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। মন্দিরে মন্দিরে অজিতবাবু পুজো দিয়েছেন ভক্তিভরে, কুণ্ডে স্নান করেছেন। মনে হয়, পুণ্য সঞ্চয়ের সহজাত বাসনাটা ছিল প্রবল। তীর্থস্থান ছাড়া অন্য জায়গা অন্তত তিনি যেতে পারেননি। বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি চীর গাছের কথা উল্লেখ করেছেন, যার উচ্চতা ১০০।১৫০ ফুট (পৃথিবীর উচ্চতম বৃক্ষের চেয়েও উঁচু?), সেই গাছ থেকে নাকি তারপিন, টার (আলকাতরা?), কাঠ তৈরী হয়! প্রচণ্ড শীতের সময় তুষার-গলা জলে স্নান করে তিনি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এবং দেখেছেন, একই সঙ্গে ঝড়, বৃষ্টি ও তুষারপাত। অতি ভাগ্যবান না হলে মানুষ সাধারণত এমন দৃশ্য দেখতে পান না।

আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে এইসব সামান্য ত্রুটি সংশোধিত হবে। আর্ট পেপারে ছাপা বারটি ছবি বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। ভাষা চমৎকার, প্রকাশভঙ্গি সরল, উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য। জনশ্রুতির বর্ণনায় অকুণ্ঠ না হলে বইটি সাধারণ পাঠকের কাছে আরো ভালো লাগতো।

KAVITA (23rd Collection)—Editor Supriyo Bagchi, Sri Durga Press, 11/2, Naktola Lane, Calcutta 47. Price: Seventy Paise.

ইংরেজী হরফের বেশ কয়েকটি উত্তেজক শব্দ ও পংক্তি ছাপা হয়েছে প্রচ্ছদে। কিন্তু সেটা কেন তা পরিষ্কার বোঝা যায় না লেখাপত্রের মারফত। লাবণ্যপ্রভা নামের সৌজন্যে প্রাপ্ত জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা (অসমাপ্ত জীবন যদি পাই) ছাপা হয়েছে প্রথম দিকে। অন্যান্য কবিদের মধ্যে আছেন কালিদাস রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, আলোক সরকার প্রমুখ।

ইশারা (সপ্তদশ সংকলন)—সম্পাদক সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।। বর্ণিমন্দী কুটীর, ১০৭-কে এন সি রোড, বারাসাত, ২৪ পরগণ।। পঞ্চাশ পয়সা।

ইশারার এ সংখ্যায় সঙ্কলিত হয়েছে বোটি মিলকে উৎসর্গীকৃত আটজন কবির সতেরোটি কবিতা। স্মরণ করা যায় কয়েকটি পংক্তি। তরুণ সেন লিখেছেন : 'মানুষের অধিকার মাঝে মাঝে রক্তাক্ত হবেই।' সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুরূপ আশাবাদী : 'গত হেমন্তের মত এ হেমন্তেও রইবে তার ফল-শ্রুতি।' অন্যান্য কবিদের মধ্যে আছেন গোরাঙ্গ ভৌমিক, বিতোষ আচার্য, রবীন মুর, শিশির সামন্ত, শুভ বসু, গণেশ সেন, সত্য গুহ, প্রণব মাইতি, অজয় সেন, অমিয় ভাদুড়ী মৃণাল ঘোষ, দিলীপ সেনগুপ্ত, রণেন্দ্র ঘটক ও রাজশেখর দত্ত। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য আছে।

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ণয়

লোকসাহিত্য বাংলাদেশের বিশেষ সম্পদ। লোকসাহিত্যের নানাদিক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা, অনুসন্ধান এবং গভীর তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়ে লোকসাহিত্যের অবলুপ্তপ্রায় রচনাগুলো সংগৃহীত করেছেন নানা গুণী ব্যক্তি। এখনও লোকসাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু ইদানীং একটা প্রশ্ন উঠেছে যে লোকসাহিত্য বলতে আমরা কী বুঝি? এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা 'লোক' বলতে আমরা কোন বিষয়কে চিহ্নিত করছি।

বাংলায় 'লোকসাহিত্য' শব্দটির সঙ্গে ইংরেজী 'ফোক লিটারেচার' শব্দ দুটির পারস্পরিক সম্পর্কটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। আবার লোকসাহিত্যকে যদি গ্রাম্যসাহিত্য, পল্লীগাথা ইত্যাদি নামে ভূষিত করি, তাও কতখানি যুক্তিসঙ্গত সেটা একান্তভাবেই বিবেচ্য। এসব প্রশ্ন উঠেছে, কারণ বাংলায় 'লোক' শব্দটি একটা গোলযোগ সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়।

সংস্কৃত সাহিত্য এবং ব্যাকরণে লোক শব্দটির নানা অর্থ। 'লোকস্তু ভুবনে জনে' সূত্রটি পরিচিত। এখানে বিশ্বমানব এবং ভুবনবাসী লোকসমাজের ইঙ্গিত বহন করছে। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত শব্দের ইংরেজির অর্থ বিশ্লেষণে প্রাচ্যভাষা পণ্ডিত স্যার মনিয়ের উইলিয়ামস্ এবং আপ্তের অভিধান থেকে 'লোক' শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি। আপ্তের অভিধান 'লোক' শব্দের অর্থ দিয়েছেন

'The world, a division of the universe, human race, Mankind, A region, province, common life, people, subjects and terrestrial world ইত্যাদি। আপ্তে যা অর্থ দিয়েছেন, স্যার উইলিয়ামস এর অভিধানে তা ছাড়াও আরো কয়েকটি অর্থ দেওয়া হয়েছে। তা হলো

Kathas, ordinary life, worldly affairs, common practice, common language and Popular speech.

ইত্যাদি ইংরেজীর শব্দটি যত পরিষ্কার, সংস্কৃত কিংবা বাংলায় লোক শব্দটি তত স্পষ্ট নয়। লোক অর্থে ত্রিভুবনকে বোঝায়, সাধারণ মানুষকে বোঝায়, আবার পৃথিবীর যাবতীয় জীবজগৎকেও বোঝায়। আমরা যখন বলি ভূলোক, স্বর্লোক, মর্ত্যলোক অর্থাৎ সপ্তলোকের কথা চিন্তা করি, তখন স্বভাবতই সেই লোকটি যে অসাধারণ জীবনের এবং অন্য এক পৃথিবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইংরেজী ফোক শব্দটি রুস্টিক, রুরাল, বন-উৎসব অর্থাৎ গ্রাম্য ইত্যাদি অর্থ বহন করে। কাজেই ফোক লিটারেচার গ্রামজীবন উদ্ভূত রচনাগুলোর কথাই মনে করিয়ে দেয়। এর অর্থ—যারা গ্রামজীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, ব্যথাবেদনার কাহিনী নিয়ে গান, আখ্যান গল্প সৃষ্টি করেছেন, তারাই গ্রামলেখক, কবি এবং তাদের রচনা-

সস্তার হলো ফোক লিটারেচার। প্রখ্যাত কবি চসারের প্রোলোগ্স টু ক্যান্টারবেরি টেলস্ ইত্যাদি রচনাগুলো চৌদ্দ শতকের ইংরেজ জাতীয় গ্রামজীবনের ছবি। এখানে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, তা নিতান্তই এবং মুখ্যত কথ্যভাষা। ব্যালাড গানগুলো পল্লীসংগীত বললেই হয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে প্রাকৃতভাষার প্রয়োগ গ্রাম্যভাষার মতনই, যদিও তার একটা ব্যাকরণশাস্ত্র দাঁড় করানো হয়েছে। কিন্তু বাংলায় 'লোক-সাহিত্য' বললে আমরা কী ফোক লিটারেচার বুঝি? আমাদের শোনা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, ফোক লিটারেচার, ফোক সং, ফোক কালচার মানেই লোকসাহিত্য, লোক-সংগীত এবং লোকসংস্কৃতি। বাংলাদেশের ছড়া, বাউলগান, কবিগান, পাঁচালী ইত্যাদি গুলোকে 'লোকসাহিত্য' নাম দিয়ে একটি বিশেষ সাহিত্য বিভাগ সৃষ্টি করছি। কিন্তু প্রশ্ন হোল 'লোকসাহিত্য' নাম কেন? গ্রামকাহিনী এবং গানগুলোকে লোকসাহিত্য না বলে পল্লীসাহিত্য, গ্রাম্যসাহিত্য নামে ভূষি[illegible] করলে দোষ কী? নগর এবং নাগরিক জীবনের সঙ্গে যখন গ্রামকাহিনীর কোন যোগসূত্র নেই, তখন লোকসাহিত্য বলে লাভ কী? প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কাহিনীর বিষয়বস্তু এবং ভাষা মূল্যায়ন করে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'লোকসাহিত্য'। অথবা এইসব কাহিনী এবং গাথাগুলো কেবলমাত্র সাধারণ গ্রাম্য লোকদের কাছে পরিবেশন করা হতো বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছে লোকসাহিত্য। তাহলে তো সব আধুনিক উপন্যাস, কাব্য এবং নাটককে আমরা লোক-সাহিত্য বলতে পারি। কারণ তাদের পাঠক লোকসমাজ। এই পাঠকগোষ্ঠী হয়ত অশিক্ষিত গ্রামবাসী সাধারণ লোক নয়। হতে পারে আধুনিক সাহিত্যের বিষয় নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাস তো অনেক গ্রামজীবন নিয়ে লেখা। অথচ সেইসব উপন্যাস পড়ছেন নগরজীবনের আধুনিক শিক্ষিত পাঠক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অথবা তারাশংকরের সেইসব রচনাকে লোক-সাহিত্য পর্যায়ে গণ্য করা হয় কী? অথচ এই যুক্তিতে তা করা উচিত। মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং তারাশংকর দুজনেই তাদের উপন্যাসে পূর্ববাংলার এবং বীরভূমের ভাষা মূল চরিত্রের মুখে আরোপ করেছেন। ভাষা এবং কাহিনী সবই সাধারণ মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। কাজেই গ্রাম্যসাহিত্য মূলত গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য লেখা হলেও তা নাগরিক সভ্যতা পর্যন্ত তার প্রসার লাভ ঘটেছে। ছেলে-ভুলানো ছড়া, কবি গান, পাঁচালী ছাড়াও কবিকঙ্কন চণ্ডী, মনসা-মঙ্গল কাব্য, মৈমনসিং গীতিকা, পূর্ব-বঙ্গের গীতিকা এবং বাংলাদেশের আদি-বাসীদের গান প্রভৃতিকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। গ্রাম্যসাহিত্য গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়। তিনি লিখছেন "সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্যহিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়।" তার পূর্বে লিখেছেন "পূর্বে গ্রাম্য ছড়াগুলি গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদেরও সাহিত্যতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ভিখারিণী ও পিতামহীদের মুখে ঘরে ঘরে প্রচারিত হইত।" রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের আলোচনায় তিনটি বিষয় আলাদাভাবে বিচার করেছেন। ছেলেভুলানো ছড়া, কবি-সংগীত এবং গ্রাম্যসাহিত্য। সমগ্রভাবে লোকসাহিত্য শব্দটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আলোচনা করেন নি। তাছাড়া গ্রন্থপরিচয় থেকে এটা পরিষ্কার নয় যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তিনটি বিষয়কে 'লোকসাহিত্য' শীর্ষক নাম দিয়ে একত্রিত করেছিলেন। যদি তাই হতো তবে তিনি গ্রাম্যসাহিত্য কবি সংগীত ইত্যাদি নাম দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করলেন কেন? রবীন্দ্র রচনা-বলীতে গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হচ্ছে যে, "১৩০১-১৩০২ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বীয় ভূমিকা ও মন্তব্য-সহ ছেলেভুলানো ছড়ার একটি সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটিকে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত লোকসাহিত্যের নূতন সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।" গ্রন্থ পরিচয়ে পরিষ্কার নয় যে লোকসাহিত্য শব্দটি কী রবীন্দ্রনাথ না বিশ্বভারতীর দেওয়া? আক্ষরিক অর্থে লোকসাহিত্য কেবলমাত্র গ্রাম্যরচনা এবং সাহিত্যকে বোঝায়, একথা জোর করে বলা যায় কী, বিশেষত যখন লোক শব্দের অর্থ একটা ব্যাপক অর্থের ইঙ্গিতবাহী। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বলে যে রামায়ণ রচনার যুগ থেকে লৌকিক ছন্দ এবং লৌকিক সাহিত্যের সূত্রপাত। বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী সব রচনাই এই লৌকিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। বলা বাহুল্য, লৌকিক, এখানে ব্যাপক অর্থে বিদ্যমান। ভারতের জনসমাজের জীবন নিয়ে যে সাহিত্য সেটাই লোকসাহিত্য কিংবা লৌকিক সাহিত্য। প্রাচীন সাহিত্য-কারেরা লোকসাহিত্য বলতে গ্রাম্যসাহিত্যকে বোঝাতেন না। পুরাণশাস্ত্র ভারতে জন-শিক্ষার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। পুরাণকারেরা মনে করেন নি যে তাদের রচনা কেবলমাত্র একটা বিশেষ দেশে, বিশেষ স্থানের জন-সমাজের জন্যই রচিত হওয়া প্রয়োজন। আবার সেই কথা 'লোকস্তু ভুবনে জনে'। তাঁরা বিশ্বমানব, বিশ্বলোক এবং ভারতকে বুঝতেন। কাজেই লোকসাহিত্য বললে কেবলমাত্র নন-উরবান প্রোডাক্ট সাহিত্যকে বোঝায় তা নয়, সেটা সমস্ত জনপদবাসী এবং সাহিত্যকে ইঙ্গিত করে। ইংরেজি সাহিত্যে পিপলস্ লিটারেচার বলে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় কিনা জানি না। যদি ওই শব্দটি যুক্তিযুক্ত হতো তবে নিশ্চয় ইংরেজ সমালোচকরা ফোক শব্দটির পরিবর্তে পিপল্ শব্দটি ব্যবহার করতেন। আমার প্রশ্ন লোকসাহিত্য যখন কেবলমাত্র গ্রামের সাধারণ মানুষের কাহিনী, তার ভাষা স্বতন্ত্র এবং তা প্রধানত গ্রাম্য পাঠকসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তখন তাকে লোকসাহিত্য নাম দেওয়ার সার্থকতা কী? বাংলা ভাষায় পল্লীসাহিত্যকে ফোক শব্দের মতন কোন পরিষ্কার নাম দিয়ে অলঙ্কৃত করা যায় না কী?

নিশীথ চক্রবর্তী

বইকুণ্ঠের খাতা

সরকারী সাহায্য ও বাংলা গবেষণাগ্রন্থ

শুনেছি, রাষ্ট্রভাষার মতো আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে নাকি কেন্দ্রীয় সরকার কম উদ্বিগ্ন নন। অনভিজাত ভাষাকে আভিজাত্যের শিরোপা দিতেও তাঁরা সব সময়ই প্রস্তুত। সেজন্যে টাকাকড়ি খরচা করেন নিয়মিত। মাঝে মাঝে রাজকোষে অনটন দেখা দেয়।

তাই নিয়ে চারদিকে কানাঘুষোর অন্ত নেই। কেউ বলেন, হিন্দীর প্রতি বেশী প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কেউ উপলব্ধি করেন, আঞ্চলিক ভাষাগুলির ক্রমাগত দুর্গতির কথা। রাজ্য সরকারের দেয়াল ডিঙিয়ে এসব খবর ভারত সরকারের কানে পৌঁছয় কিনা কে জানে। আর পৌঁছুলেই-বা জনশ্রুতির মূল্য কি?

তবু মাঝে মাঝে দিল্লীর সাহায্য এসে পৌঁছয় অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশেও। হয়তো তার একটা হিসেবনিকেশ আছে, বার্ষিক সাহায্যের নিক্তিমাপা সীমাবদ্ধতা আছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় রাজ্য সরকারের সাহায্য ও সদিচ্ছা। আছে দুই তরফের বিশেষজ্ঞদল। কেবল, লেখকেরা নাকি বুঝে উঠতে পারেন না, কেমন ধরনের বই লিখলে, কে বা কারা, কি কারণে এবং কিভাবে সরকারী অনুগ্রহে উপকৃত হবেন।

অনেকের কাছে ব্যাপারটা আজো রহস্যজনক মনে হয়।

সত্যাসত্য জানি না। জনশ্রুতি আছে, সতীনাথ ভাদুড়ী রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছিলেন হঠাৎ। তখন ভদ্রলোক প্যারিসে। বাংলাদেশে ফিরেই নাকি তিনি রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়েছিলেন টাকার লোভে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাঁকে চিনতে পারেননি। তিনিই যে সতীনাথ ভাদুড়ী তার উপযুক্ত প্রমাণ চেয়েছিলেন।

হয়তো নিয়মকানুনের প্যাঁচালো পথগুলিই যাবতীয় বিভ্রান্তির কারণ। আমি তার রীতিনীতি জানি না। বারবার মনে হয়, জনশ্রুতিরও নিশ্চয়ই কোনো একটা বাস্তব উৎস আছে। অন্তত সন্দেহ দেখা দিলে তা নিরসন করা দরকার। অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিই ক্রমাগত জড়ো হতে হতে জটিল হয়ে ওঠে, জনসাধারণের মনে বড় রকমের ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়।

বছর কয়েক আগের কথা। জনৈক নাট্যরসিক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। সৌখিন নাট্যদলে অভিনয় করতেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটকের মহড়া দিতেন। একদিন শুনলাম, মঞ্চ সম্পর্কে গবেষণা করছেন তিনি দীর্ঘকাল। বিষয় স্টেজ-ক্র্যাফ্ট। সরকারী সাহায্য না নিয়েই মোটামুটি কাজ শেষ করে এনেছেন।

আমি তাঁর পাণ্ডুলিপির খানিকটা দেখেছিলাম। তিনি প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘোরাঘুরি করেছেন। কিন্তু সফল হননি। এমন একটি অব্যবসায়ী গ্রন্থপ্রকাশে কেউ সম্মত নয়। তারপর তিনি ঘোরাঘুরি করেছেন বহু জায়গায়। গিয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্য-বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক ও পরিচালকদের কাছে। সকলেই বলেছেন, মঞ্চ সম্পর্কে এমন তথ্যসমৃদ্ধ বই নাকি এর আগে বাংলাভাষায় আর লেখা হয়নি।

আমি তার পরিণতি জানি না। ভদ্রলোকের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। হয়তো সরকারী সাহায্যে সে-বই বেরিয়েছে। কেবল আমার নজরে পড়েনি। কিংবা এমনো হতে পারে, আদৌ ভালো হয়নি তাঁর লেখা। হয়তো মঞ্চপাগল একটি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যই প্রখ্যাত সব মানুষেরা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। কিংবা যোগ্যতর প্রতিযোগীর পাল্লায় পড়ে তিনি হারিয়ে গেছেন চিরকালের জন্য। পাণ্ডুলিপির ভুলত্রুটি শুধরে দেবার মতো উপদেষ্টারও অনটন পড়ে গেছে বাংলাদেশে?

কথাটা অনেকদিন খচখচ করেছিল মনের মধ্যে। এখনও করছে।

বাংলাদেশ থেকে সরকারী সাহায্যে বই বেরিয়েছে কম নয়। তবু কেন জানি না, মনে হয়, বহু উল্লেখযোগ্য বই-ই লেখা হলো উৎসাহের অভাবে। হয়তো এখনো অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে সংগোপনে। কেননা আমরা তার খবর রাখি না। প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা কাউকে তার জন্যে দায়ী করতে পারি না বলেই বোধহয় সরকারী ঔদাসীন্যের কথাটাই বার বার মনে পড়ে। এমন অভিযোগও শুনেছি, যা শুনলে রাগ না করে পারা যায় না। শুনেছি, সরকারী টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কথা।

কে একজন সেদিন বলেছিলেন: 'ও'রা কখনো সখনো টাকা দেন, কিন্তু খবরাখবর রাখেন না সরকারী সাহায্যের পরিণতি সম্পর্কে।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি রকম?

জনৈক তরুণ গবেষক উত্তর দিয়েছিলেন: "সরকারী টাকা আদায় করাটাই মুশকিল। একবার পেলে আর কোনো ভাবনা নেই। বই না ছেপে সে টাকা সুদেও খাটানো যায়। পেছনে শত্রু থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। তাগাদা দিলে, দু এক ফর্মা ছেপে, শিয়াল পণ্ডিত আর কুমিরের সাত ছেলের গল্পের মতো

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান
অধ্যাপক ও স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি প্রফেসর
ডঃ অমলেন্দু বসুর

সাহিত্যলোক

বাক্ ও অর্থের সম্পৃক্তি যদিচ শিল্পের প্রকৃত সংজ্ঞা, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য বাক্ অপেক্ষা অর্থের চরিত্র-নির্ণয়ে অথবা ভাবারচনায় সমর্পিতপ্রাণ। কারয়িত্রী-প্রতিভার এই দৈন্যমোচনে অধ্যাপক অমলেন্দু বসুর রচনাগুলি পরম সহায়ক। রবীন্দ্র কাব্যচর্চায় এমন কয়েকটি স্থলে তিনি উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন যার পরিচয় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে প্রায় অদৃষ্টপূর্ব। রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত 'পোয়েটিক ইমেজ' যার বাংলা প্রতিরূপ "বাক্‌প্রতিমা" লেখকেরই সৃষ্ট, তার এমন পূর্ণাঙ্গ, অনুপুঙ্খ, রসস্নাত বিচার আমাদের চোখে আর পড়ে নি। এছাড়া, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের বিচিত্র, বিস্ময়কর বাদুকর্ম যা আধুনিক বাংলা গদ্যে স্বমহিমায় জ্যোতিষ্মান, তারই এক সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত লেখক উন্মোচন করেছেন দুটি রচনায়।

॥ মূল্য দশ টাকা ॥

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্
এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

একেকটা ফর্মা ঘুরিয়ে পাঁচবার দেখিয়ে আনলেই হলো : এই হচ্ছে—ছাপা চলছে —টাকার অভাবে কাজ এগোচ্ছে না—ইত্যাদি মেয়াদের একটা কনুমেই কৈফিয়েত দিতে পারলেই সব নিশ্চিন্ত। তাছাড়া আছে দিনের পর দিন মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতির অজুহাত—যার জন্যে ঠিক সময়ে বই বেরোয় না। সরকার যখন হিসেব চান ও সাহায্য দেন—সেই সময়ের ব্যবধানে পুরনো হিসেবনিকেশে গরমিল ঘটে যায়। সাহায্যপ্রাপ্ত বইগুলির চেহারাচরিত্র দেখলে অনুমান হয়, টাকা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ একেবারে ঝাড়া হাত-পা হয়ে যান।"

অর্থাৎ, জাতীয় কর্তব্য পালন হয়ে গেল, কে আর তার ফলাফলের জন্য চিন্তা করে? অথচ, বহু বই বেরোচ্ছে না। বহু পুরনো বই পুনর্মুদ্রণের অভাবে লোক বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। নতুনতর বিষয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেবার-ই বা ব্যবস্থা কোথায়?

এসম্পর্কে অন্য একজন অধ্যাপকের অভিমত : 'সরকার যদি প্রত্যেক বছর প্রকাশযোগ্য পাণ্ডুলিপিগুলি চেয়ে পাঠান, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন কিংবা বিবৃতি দেন, এবং বিশেষজ্ঞরা যদি পরিচিতের দিকে মুখ না তাকিয়ে যথার্থ ভালো পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে উৎসাহী হন, তাহলে হয়তো আরো কিছু ভালো বই বেরোতে পারে।'

তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে একজন প্রবন্ধকার বলেন : 'সরকারী সাহায্যের রীতিটাই আলাদা। সবকিছু চলে অপ্রকাশ্যে। গোপন তদারকিতে এসব না হলে সুখী হতেন লেখকেরা। প্রচলিত সংস্কারেরও অবসান ঘটতো। নতুন বিষয় নিয়ে যাঁরা ভাবছেন, বা অনুসন্ধান করছেন, তাঁরাও ভেঙে পড়তেন না—বরং আগ্রহী থাকতে পারতেন গবেষণার কাজে।'

অর্থাৎ, অপ্রকাশ্য সন্দেহের একটা প্রকাশ্য সমাধান হতে পারতো।

সেদিন জনৈক ছাত্র অভিযোগ করে বললেন : 'বি-এ ক্লাসে আমরা একটা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ছি। লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামী অধ্যাপক। তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে লিখেছেন, মানিকবাবু নাকি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে শেষজীবনে বাক্সর্বস্ব হয়ে পড়েছিলেন। বলুন, এঁরা যদি বাংলা-সাহিত্যের এক্সপার্ট হন, তাহলে একেকজন লেখকের কি দশা হবে?'

নেপাল মজুমদারের গবেষণা

অবশ্য সকলেই অসন্তুষ্ট নন, কেউ কেউ আত্মসন্তুষ্ট। সেরকম একজন মানুষ নেপাল মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের একটি অনালোচিত দিক নিয়ে তিনি গবেষণা করে আসছেন দীর্ঘকাল—প্রায় দুই দশক ধরে—সম্ভবত ১৯৫০ সাল থেকে। গত সপ্তাহে যখন অন্য একটি গবেষণাগ্রন্থ সম্পর্কে অমৃতের পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, তখনো নেপালবাবুর বইটি আমার হাতে এসে পৌঁছয়নি। নেপালবাবু তাঁর গবেষণাকে চিহ্নিত করেছেন, 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' নামে।

আমি ভাবছিলাম তাঁর পরিশ্রমের কথা। চেষ্টা করেছিলাম, তার নেপথ্যের খবরাখবর জানতে। শুনেছি, আকস্মিক অসুস্থতায় তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন কিছুকাল। আর শুয়ে-বসে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতা ও শেষজীবনের রচনাবলী। তখন রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কবি-সম্পর্কে যে-বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন, তারও কোনো মীমাংসা হয়নি। নেপালবাবু সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ না করেও একটা সদুত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন তখনই। লিখেছিলেন একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ। তৎকালীন একটা বিখ্যাত মাসিকের সম্পাদক তাঁর লেখা পড়ে খুশি হয়েছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন, যেন এসম্পর্কে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন তিনি।

তখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী' লিখছেন। শেষ খণ্ড বেরোবার মুখে। বোধহয় সময়টা হবে ১৯৫৪-৫৫ খৃঃ নাগাদ। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' লিখতে শুরু করেন নেপালবাবু। হয়তো কাছে প্রভাতবাবুর বই। রবীন্দ্রনাথের গোটা জীবনটাকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি প্রভাতবাবুর বই পড়েই।

প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল, বইটি শেষ করবেন দুখণ্ডে। কিন্তু লিখতে বসে পাণ্ডুলিপির পাতা গেলো বেড়ে। এমন সব তথ্য তিনি নানা সূত্র থেকে পেতে থাকেন, যা সংগ্রহ করলে কয়েক খণ্ড মহাভারতের সমান হয়ে যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের পর বেরোল তৃতীয় খণ্ড। শুনলাম, চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের মুখে। ফেব্রুয়ারীতেই বেরিয়ে যাবে।

আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম বইটি পড়তে পড়তে। কবি নয়, ঔপন্যাসিক নয়—সমকালীন রবীন্দ্রনাথকে যেন তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন ঘটনার ধারাবাহিকতায়,—চিঠিপত্র, ভ্রমণ, প্রবন্ধনিবন্ধের সাক্ষ্যে। অথচ, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস ও অন্যান্য রচনাই নাকি তাঁকে প্রাণিত করেছিল এ-বই লেখার ব্যাপারে; রবীন গুপ্তের বিতর্কের জবাব তিনি দিতে পেরেছেন কিনা, জানি না। মনে হয় তার চেয়েও বড় রকমের উপকার করেছেন তিনি বাংলা-সাহিত্যের। প্রভাতবাবুর 'রবীন্দ্রজীবনী'র সমকক্ষ বলতে ইচ্ছে হয়।

তিনি গবেষণার কাজে সর্বাধিক সাহায্য নিয়েছেন রবীন্দ্রসদন, বিশ্বভারতী, সাহিত্য পরিষদ, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা লাইব্রেরী ও জাতীয় গ্রন্থাগারের। উপাদান সংগ্রহ করেছেন প্রধানত নানা পত্র-পত্রিকা থেকে। প্রয়োজনে নিয়েছেন অন্যান্য রচনার সাহায্যও।

ভাবছিলাম, কেন এই খবরের কাগজের ওপর নির্ভরশীলতা?

উত্তর পেয়েছিলাম বইটি পড়তে পড়তে। নেপালবাবু রবীন্দ্রজীবনের সমকালীন পরিস্থিতি ও পরিবেশের উত্তাপ-উত্তেজনা ও ভাবাবেগের বাস্তব ছবি পাননি সাহিত্যে কিংবা কবিতায়। সময়ের সঙ্গে সাহিত্যের যোগটা অপেক্ষাকৃত মার্জিত এবং ক্ষীণতর বলেই হয়তো আরো সজীব সম্পর্কের সন্ধান করেছিলেন।

ফলে, তার পথ সহজ নয়, অবিতর্কিতও নয়, অনেকের কাছে সন্দেহের কারণ বলে মনে হতে পারে। কেননা, তিনি সংবাদপত্র থেকে রবীন্দ্রনাথের যে-সব ভাষণ ও প্রতিক্রিয়ার খবরাখবর এই গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন, তা কতখানি নির্ভুল এবং রবীন্দ্র-সমর্থিত সে-কথা জানার উপায় নেই বর্তমানে। কবির সহকারী ও সেক্রেটারীরা যদি কোনো নোট রাখতেন কিংবা সংবাদপত্রের নির্ভরযোগ্য অংশগুলি সংগ্রহ করে রাখতেন, তাহলে হয়তো এই সংশয়ের অবকাশ থাকতো না। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা যে নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন—তার নিশ্চয়তা কি? অনেক সময় ছাপায় সামান্য অসাবধানতায় বক্তব্যের অনেক হেরফের হয়ে যায়।

মনে হয়, এ-ব্যাপারে নেপালবাবু প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। তৎকালীন প্রায় প্রতিটি পত্রিকার বিভিন্ন সংবাদ পর্যালোচনা করে যথাসম্ভব নির্ভুল অংশটিই উদ্ধার করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, হয়তো

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : ৫৫-২৫৫১, ৩৩-১৪৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ [illegible] রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি [illegible] রোড, কলিকাতা-৭

একই সঙ্গে সব পত্রিকা এই রকম ভুল সংবাদ পরিবেশন করবে না। তিনি তাঁর আলোচনাকে সাজিয়েছেন ক্রনোলজিক্যালি। কোথাও নিজের মতামতকে পাঠকের ওপরে ইম্পোজ করেননি বা মনগড়া কোনো কথাকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অবজেকটিভ। এমনকি, বিগত-দিনের সমকালীনতাকে সজীবতর করার প্রয়োজনে বিভিন্ন ঘটনার প্রেস-কাটিংগুলো পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন নির্দ্বিধায়।

দুঃসাহসে ভর করে নেপালবাবু এই কাজে নেমেছেন।

আজকের দিনের কাব্যসাহিত্যিকদের কাছে বিস্ময়কর মনে হবে রবীন্দ্রনাথের জীবন। যারা রাজনীতির বিরোধিতা করেন, এবং যারা করেন না, তাঁরাও ভাববার সুযোগ পাবেন না—রবীন্দ্রনাথ কোন্ গুণে একটি যুগের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রায় সব কটি দরজা খুলে দিতে পেরেছিলেন—কোন্ গুণে তিনি বিশিষ্ট না হয়ে মহত্ত্বের অধিকারী? সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্যের এমন সজীব পুরুষ পরবর্তীকালে আর দ্বিতীয়টি জন্মাননি সেজন্যেই।

নেপালবাবু সেই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করেছেন এই গ্রন্থে।

'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ'-এর তৃতীয় খণ্ডে আছে, ১৯৩০ থেকে ৩৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্দোলনের ধারা ও গোষ্ঠীর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তাচেতনা ও ভূমিকার কালানুক্রমিক ইতিহাস। সেই সঙ্গে গান্ধীজি, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহরু, ডাঃ আনসারী, খান আবদুল গফফর খাঁ, জিন্না, মহম্মদ শফি, সৌকত আলি, সপ্রু, জয়াকর, আম্বেদকর, বিঠলভাই, বল্লভভাই, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও বিচারবিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

ফলে, এই গ্রন্থ একটি যুগসন্ধির ইতিহাস।

কেননা, এই সময়টায় দেখা গিয়েছিল সারা পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দারুণ মন্দা ও অর্থনৈতিক সঙ্কট। আবির্ভাব হয়েছিল য়ুরোপে ফ্যাসিবাদ ও জার্মানীতে হিটলারী নাৎসীবাদের। জাপান গ্রাস করেছিল মাঞ্চুরিয়া এবং আক্রমণ করেছিল উত্তর চীন। ইতালী আক্রমণ করেছিল আবিসিনিয়ার ভূখণ্ড।

এইসব ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হয়তো-বা পুরনো বিশ্বাসে আর স্থির থাকতে পারছিলেন না। আসন্ন যুদ্ধের চেহারাটা অনুমান করছিলেন। মনে মনে। জড়িয়ে পড়েছিলেন রোলাঁ-বারবুস-আইনস্টাইন প্রমুখ চিন্তা-নেতৃত্বে গঠিত ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে।

বইটির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দিক হলো,.. লেখকের ইতিহাসচেতনা ও তথ্য-সন্ধান। এমন একটি মন্তব্যও তিনি করেননি, যার সমর্থনে অন্তত একটিও তথ্য বা প্রমাণ নেই। চিঠিপত্র, সংবাদ ও ভাষণের পুনর্মুদ্রণ ও অপ্রকাশিতপ্রায় ঘটনার পুনরুদ্ধারে বইটি আগামীকালের গবেষকদের কাছে অপরিহার্য বলে মনে হবে। রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠি, বকসা রাজবন্দীদের উদ্দেশে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা এবং ১৯৩৩ খৃঃ হিটলারের নাৎসীবাহিনী যখন জার্মানীর প্রগতিশীল শক্তিকে আক্রমণ করেছিল, তখন কমিউনিস্ট শিবিরের আবেদনে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন [illegible] মূল্য—তখনকার একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি ছাপা হয়েছে অরুণ বাবুর সৌজন্যে। চিঠিটি অরুণ বাবুকে উপহার দিয়েছিলেন উক্ত দুর্গাদাসের পুত্র—১৯৬১ খৃঃ।

প্রতিক্রিয়া ও সংবাদপত্রের আড়ম্বর

এখন নেপালবাবুর হাতে অনেক নতুন তথ্য জড়ো হয়েছে। তিনি ভাবছেন প্রথম খণ্ডটি রি-রাইট করবেন। অন্যান্য খণ্ডগুলিও আরো বড় হবে পরবর্তী সংস্করণে।

তৃতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২৪। এবং দাম বারো টাকা। বোধহয় সরকারী সাহায্যের জন্যই এত সুলভ মূল্যে পরিবেশন করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি হবার পর, তিনি 'রবীন্দ্রজীবনী'কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলেন। প্রভাতবাবু পাণ্ডুলিপি পড়ে খুবই খুশি হয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনী রিভাইজ করার সময়ে নেপালবাবুর বইয়ের সাহায্যও নিয়েছিলেন কৃতজ্ঞচিত্তে। সেকথা প্রভাতবাবু লিখিতভাবেই জানিয়েছেন।

দুঃখকর, বইটির জন্য তিনি বহুবার আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন, কখনো গবেষণার কাজ বন্ধ রাখেননি। কিংবা দাবী করেননি কোনো বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা। এমন কাজের জন্যে সরকার সাহায্য না করলে তাহলে সাহায্যের অর্থ পাবেন কোথায়? অথচ তো মনে হয়, বিশ্বভারতীর একটি সম্পূর্ণ কাজকেই সম্পন্ন করতে চলেছেন নেপালবাবু। এই কাজের জন্য উচিত ছিলো বিশ্বভারতীরই উদ্যোগ। —গ্রন্থদর্শী

নিকটেই আছে

সাটল ট্যাক্সি

রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অরুণ। ফাইল একটা টেবিলে খোলা পড়ে আছে। চটপট হাত চালিয়ে সেটাকে বেঁধেছেঁদে সামনের ফাইলের গাদার ওপর ছুঁড়ে দিল। বেচারা এক প্লেট ঘুগনি দিয়ে গিয়েছিল খানিক আগে—প্লেটসমেত পড়ে রইল। ভেবেছিল ফাইলটা সেরেই মুখ চালাবে। কিন্তু তার আগেই পাশের টেবিলে বেজে উঠল ফোনটা: ফণীদা হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট। কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দেখেন নি বা খেয়াল করেননি যে আর একজন ডাঁট খুব কাছাকাছি লোভাতুর মত ঐ ফোনটির দিকে তাকিয়েছিল: ফাইল নাড়া-চাড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল। আস্তে রিসিভারটা পাশের চেয়ারের দিকে বাড়িয়ে খুব চাপা ভারী গলায় বললেন ফণীদা—ধরো অরুণ। তুমার ফুন।

অন্য সময় হলে অরুণ অট্টহাস্যে ফেটে পড়ত। দাদা ওপরওয়ালা হলে কি হবে, খুব মাইডিয়ার। বয়সের ব্যবধান, পদ-মর্যাদার ওসব সংস্কার প্রাণ খুলে মিশতে জানেন। আর জানেন বলেই দাদার বিশেষ উচ্চারণভঙ্গী ক্ষণে ক্ষণে হাসির হররায় চাগিয়ে তোলে দু'-ডজন নিস্তেজ কেরাণী-ঠাসা হলঘরটা। এখন অরুণ সিরিয়াস তাই কোন ফুট না কেটেই ফোন ধরল। ওপাশে রুবি—।

—কে অরুণ? এক্ষুনি চলে এসো। সবাই এসে গেছে।

—সবাই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই। নন্দিনী, নমিতা, টেবুদা, সুকুমারবাবু সকলে।

—কিন্তু আমার অফিস যে এখনো—বিব্রত ভাবে নিজের অসুবিধাটুকু জানাতে গিয়ে আরো কেমন বিব্রত হয়ে পড়ল অরুণ। কানে রিসিভারটা আঠার মত লেগে আছে। স্পষ্ট অনুভব করলে যেন একটা [illegible] কেমন হয়ে উঠল—রাখো তোমার অফিস! বিস্ময়, প্রশ্ন সবকিছুর সঙ্গে চাপা হুংকার দুজন বাতুলে নির্দিষ্ট তারের পথ বেয়ে এসে পড়ল অফিস—দিন। আবার তোমার—বোকলা।

রুটিন! কয়েকটা সেকেন্ড এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত দুই-ই নীরব। অরুণ কথা খুঁজে পাচ্ছে না। রুবি বোধহয় কোন দোকান থেকে ফোন করছে। পাশেই বন্ধুরা দাঁড়িয়ে—দোকানীও বোধহয় মাল কেনা-বেচার ফাঁকে কান পেতে সব শুনছে। কথার সঙ্গে সঙ্গে যদি ফোনের পর্দায় ছবি ফুটে উঠত তাহলে অরুণ নিশ্চিত রুবি আজ শ্বেত-শুভ্রাপত। অনেক করে বলে দিয়েছে সেই হাল্কা সাদার ওপর সাদা বুটি দেওয়া কটন বেনারসীখানা পরতে, সঙ্গে যেন ম্যাচ করে পরে সাদা ব্লাউজ। পাউডার, লিপস্টিক কিছু না, শুধু কালো চুলের ছড়ানো ভাঁজে লুকোনো ছোট্ট কপালে থাকবে একটি রক্ত-চন্দনের ফোঁটা। পারে যদি একটা না-হয় শ্বেত গোলাপের কুঁড়ি হাতে রাখে। তাহলেই অরুণ খুশী হবে। আর রুবি অরুণকে খুশী করতে সব অনুরোধ মেনে নিয়েও কেমন হতাশ ম্লান গলায় ফিসফিস করে বলে—তবে কি চলে যাব?

—না। না। দাঁড়াও। আমি এক্ষুনি—টের পায়নি অরুণ কতটা জোরে শব্দগুলো উচ্চারণ করেছে। পাশের টেবিলে ফণীদা অকারণে বার কয়েক কাশলেন, তার ফাঁকেই না বলার যা বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অরুণ।

—তুমি তাহলে চললে।

অন্যদিন হলে হিন্দী ফিল্মের ভিলেনের অনুচরের ঢঙে একটা কোমর বাঁকানো সেলাম ঠুকে বলত—ইয়েস বস। আজ শুধু অস্পষ্ট ভাবে বলল—জরুরী দরকার ফণীদা। একটু আগেই যাওয়া দরকার [illegible]—।

—বুঝি নয়। তুমি ডিসমিসড। এক্ষুনি রওনা দাও। নইলে আমায় কইবা দিমু। ফণীদা জোয়ানীতে কিছুদিন নাকি আর্মিতে ছিলেন, আর্মির স্মৃতি এখনো তাঁর অদ্ভুত সংলাপে ফাঁকে ছিটিয়ে থাকে।—এগেনিষ্ট পার্টী, শুধু দিয়া যাও আইজ। অনলিমন চাইনিজ ডিস আমায় করস,

'বেস্ট লাক', 'উল্‌ উল্‌', চাওয়ার একদিন অরুণ, 'কবে দেখাবি'—ভরাট ভরাট ভালোবাসার, প্রীতির মুলধারার মধ্যে নিরেট হাসির আড়াল দিয়ে ঠেলিয়ে, বাইরে বেরিয়ে এল অরুণ। রাস্তায় নেমে একবার থমকে দাঁড়াল। কাপড়ের দোকানের শো-উইন্ডোর কাচে ওরই হাল্কা ছায়া—সাদা ধবধবে টেরিকটের ওপর ফুল স্লীভ টেরিলিন সার্ট। টকটকে লাল হাফহাতা সোয়েটারে ছায়াটাকে আজ মন্দ দেখাচ্ছে না। অন্যমনস্ক বাঁ হাতটা ওপরে উঠে এসে পাট করে আঁচড়ানো চুলের মধ্যে একটু এলোমেলো করে দিল। কয়েকটা চুল সামনে ঝুলে পড়ল—এবার দারুণ নায়ক নায়ক দেখাচ্ছে। হাতঘড়িতে চোখ পড়ল—পৌনে পাঁচটা। শীতসন্ধ্যা এরই মধ্যে অফিস পাড়ার নগণ্য তলায় মাথায় মাথায় একটা কালো চাদর ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রাস্তা-ঘাট এরই মধ্যে ভিড়ে ভিড়াক্কার। আজকাল তো কেউ আর অফিস করে না। যে যার ইচ্ছে মতো বেরিয়ে পড়ে। ট্রামগুলো এরই মধ্যে মাধাকপির ঝুড়ি হয়ে গেছে। বাসের দিকে না-তাকানোই ভালো।

হিপ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল হ্যাঁ তিনটে দশই আছে। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় টাকা কটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। নিত্য বরাদ্দ দুটি এক টাকার সঙ্গে বড় তিনটে নোট—আজ যে স্পেশাল অকেশন।

অথচ এতবড় ঘটনার কথাটা কাউকে বলেনি অরুণ বাড়ীতে। শুনলে আপত্তি করবে। বাবা চান না ছেলে এখুনি ঝুলে যাক, কারণ নন্তু, টুস, মিনু ওরা সব এখনো অনেক ছোট। কি দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে, যদি ছেলে কেটে পড়ে তাহলে তো সংসারই চলবে না। মা চান—তবে শাঁসালো ঘরের যদি জোটে তবেই। দেবে থোবে ঘর ভরে উঠবে। কিন্তু অরুণ তো জানে অতিসাধারণ বি-কম, তার মত পৌনে তিনশো টাকার টিপ পেরোনো কেরানীকে কিনতে কোনো শালা মইস পক্ষে হ্যাংলামি করবে না। অথচ রুবি আর কত অপেক্ষা করবে?

চমকে উঠল অরুণ। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পনেরোটা মিনিট যে কখন কেটে গেছে টেরও পায়নি। ওদিকে ওরা নিশ্চয়ই ছটফট করছে।

পথটা বেশী নয়—মৌলালীর মোড়। অন্য সময় এ পথটুকু হেঁটেই মেরে দিত অরুণ। কিন্তু এখন খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। রুবির বাবা খুব কড়া। সন্ধ্যের আধ মিনিট পরে মেয়ে বাড়ী ঢুকলে আজকাল জিজ্ঞাসা করেন। অথচ আগে যখন নশো পেরিয়ে রাত উজিয়ে পড়া বোঝাত অরুণ, তখন কোনদিন কেউ প্রশ্ন করেনি। এক্স-প্রাইভেট টিউটর, তাও যদি আই-এ-এস বা নিদেন পক্ষে ডবলিউ বি-সি-এস হোত তাহলে কিছু বলতেন না অবনী মুখুজ্যে। একত্রিশ বছর সরকারী সেবার বিনিময়ে প্রমোশন পেয়ে লোয়ার ডিভিসন থেকে রাইটার্সের ঘেরা ঘরে টেবিল চেয়ার পেয়েছেন। বাইরে দরজার গায়ে ঝোলানো নেমপ্লেট—অবনী মুখার্জি, বি-এ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, দপ্তরের নামও দেওয়া আছে। অরুণ পেশায় কেরানী, তার জাতে ছোট—মুখুজ্যে মশাই এতদিনে সাহেবদের বাপ হয়ে উঠেছেন। কায়েতের ছেলের স্পর্ধা ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছেন।

আরো পাঁচ পাঁচটা মিনিট কেটে গেল। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে অরুণ। অনেক কষ্টে রুবির সাহসে পরামর্শে সব ভয়ের বেড়া ভেঙে আজ যখন প্রস্তুত, ঠিক তখনি নিজেকে কেমন ক্লান্ত বিবশ লাগছে! ছটার মধ্যে সব শেষ করে ফেলতে হবে। ম্যারেজ রেজিস্টার অবিনাশ বলেছেন, ম্যাটার অব ফাইভ মিনিটস, দুটো হাত এক করে দেব, বাস। কিন্তু তার পরেও একটু খাওয়া-দাওয়া না হলে ব্যাপারটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে। তাই অনেকদিনের তিল-তিল করে জমানো, পুরোনো পাউডারের কৌটোর খোপ থেকে তিনটি বড় নোট সঙ্গে করে এনেছে অরুণ। ইচ্ছে ছিল, বিয়ের খরচ মিটিয়ে যা থাকবে তাই দিয়ে কফি হাউসে একটু আধটু—। তাই ফালতু ট্যাক্সির জন্য খরচ করবে না।

কিন্তু উপায় কি? লাইন দিয়ে কয়েক গন্ডা ট্যাক্সি রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে।

—আমায় একটু মৌলালী পৌঁছে দেবেন?—দরজার হাতলে চাপ দিতে দিতে অরুণ চটপট কথাকটা ছুড়ে দেয় ড্রাইভারের দিকে। দরজাটা খুলল না। ভেতর থেকে লক করা, কাঁচ তোলা। পরম নিশ্চিন্তে চা খেতে খেতে জবাব দিল ড্রাইভার—এটা দাদা সাটল। শ্যামবাজার যাব। আপনি পেছনে দেখুন।

পেছনে দেখল। সেটাও সাটল, যাবে গড়িয়াহাট। তার পেছনেও সাটল, যাবে রাসবিহারী কি টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো। অদ্ভুত, কম করে পঁচিশখানা ট্যাক্সি

দাঁড়িয়ে। সবাই সাটল, সবাই দূরপাল্লার, কেউ যাবে না, মৌলালী কি চৌরঙ্গী বা ধর্মতলা। অনুনয়, অনুনয়ে ভেঙে পড়ল অরুণ। কিন্তু সব জায়গায় একই জবাব—দু' ঘন্টা ধরে লাইন দিয়ে জায়গা পেয়েছি দাদা, সে কি দেড় টাকা ভাড়া খাটব বলে?

এর জবাব অরুণ জানে না। ট্যাক্সিতে কদিন চড়ে যে ট্যাক্সির হাল হকিকৎ জানবে? মাসে দু-মাসে এক আধবার তাও রুবি সঙ্গে থাকলে। অফিস টাইমে সে প্রশ্ন আসে না—জনতার বাহন ট্রাম বাস বিশ্বস্ত। হয়তো গাদাগাদি, ঠেসাঠেসি একটু বেশী হয়, তবু পৌঁছে দেয়, ভাড়া বেশি নয়। কিন্তু আজ যে স্পেশাল অকেশন। হাত ঘড়িতে বাজে স' পাঁচটা। এর পর কখন যাবে? কখন কি করবে?

মরিয়া হয়ে ওঠে অরুণ। পিল-পিল করে ডালহৌসী পাড়ার সব কটা বাড়ী থেকে লোক বেরুচ্ছে। ট্রাম বাস কোনটাই আর নাগালের ভেতর নয়। একটার পর একটা ট্যাক্সি পাঁচজন ছ'জন যাত্রী নিয়ে লাখ লোকের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে বেরিয়ে যাচ্ছে। সাড়ে তিন, সাড়ে চার টাকার ডিস্ট্যান্স থেকে দুটাকা তিন

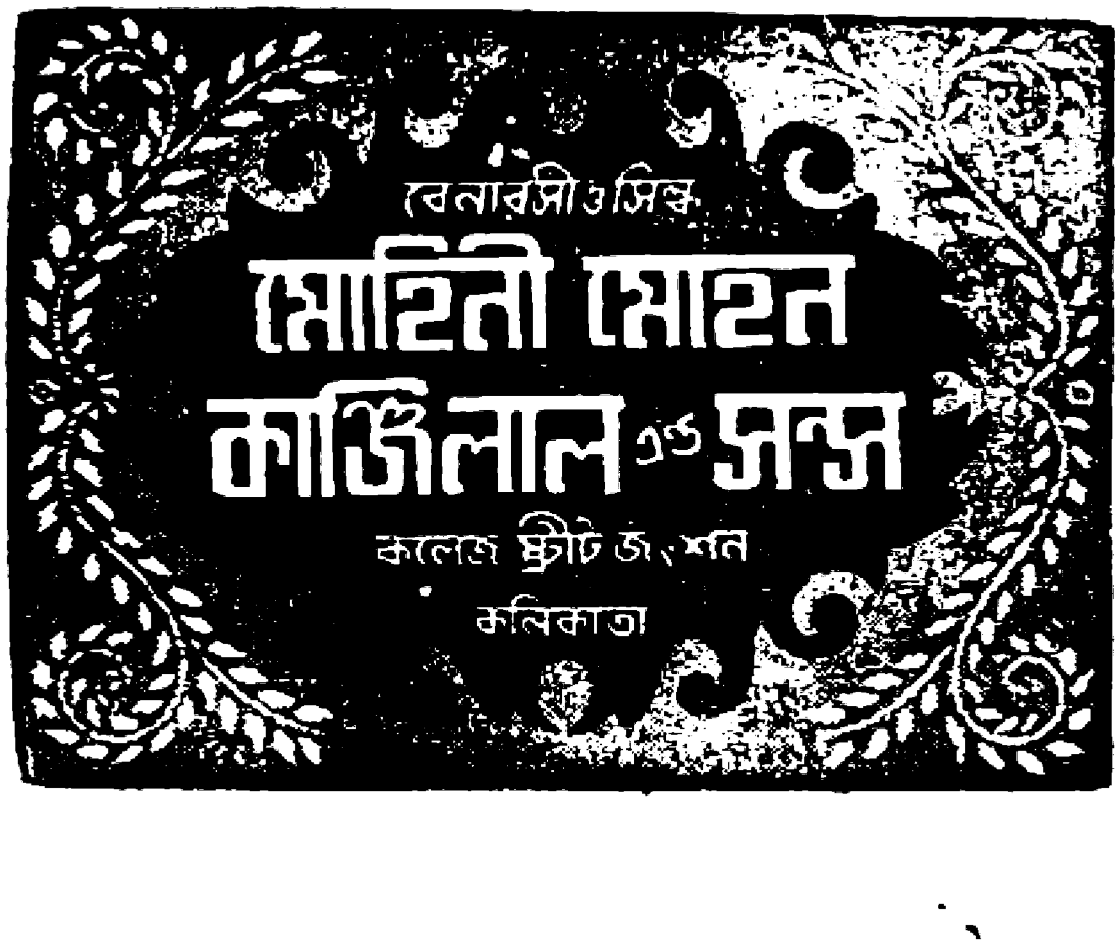

টাকা মর্নালের ওপর একস্ট্রা প্রফিট আদায় করছে ট্যাকসিওয়ালারা। জর্নপছু এক টাকা। কেউ যারে কাছের সওয়ারী নেবে না।

তবে কি কলকাতার সব ট্যাকসিই এখন সাটল? কাগজে একবার পড়েছিল বটে অরুণ। তবে যদ্দূর মনে পড়ে সাটল ট্যাকসির স্ট্যান্ড তো মেট্রোর উল্টোদিকে ট্রাম গুমটির গায়ে। এখানে তো নয়। তবু কে কার কড়ি ধারে?

পাগলের মত ছুটে গেল মোড়ের মাথায় ট্রাফিক কনস্টেবলের কাছে। মুচকি হেসে ভারতনাট্যমের মুদ্রা নাচিয়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল কনস্টেবল—কি করব? কেউ শোনে না।

কিন্তু শুনতেই হবে। মরিয়া হয়ে উঠল অরুণ। একটানে একটা গামছায় ঢাকা ট্যাকসির মিটার খসিয়ে দিয়ে বলল—চলুন মৌলালী।

—যাব না। আপনি কেন মিটারে হাত দিলেন?—তেড়ে এল ড্রাইভার।

—যাবেন না মানে, যেতেই হবে। চীৎকার করে ওঠে অরুণ।

হাসতে হাসতে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে ড্রাইভার চোখের ইসারায় যেন কাকে ডাকল। ঢোলা প্যান্টের ওপর টাইট গেঞ্জি পরা একটি মাইল স্টেশনের ছেলে এগিয়ে এল।

—কি রে?

—দেখ না শালা—এ বাবু বড়োয়াবী দিচ্ছে। আমার ট্যাকসির মিটারটার, বারণ করলুম, শুনল না, টাকনা একটানে খুলে দিয়ে বলছে মৌলালী চল।

অরুণ নিজের কথা কটা বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ছেলেটির মুখ কি অসম্ভব নিষ্ঠুর। নাকের পাশে একটা শিরা দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে। খুব কাছে, অরুণের একদম গায়ের ওপর এগিয়ে এসে বলল—কেটে পড়। নইলে—

ছেলেটির মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিজের তলপেটের কাছাকাছি এসে ভয়ে শিউরে উঠল—ঝকঝকে ধারালো ইস্পাত ওর প্যান্টের বোতামের সঙ্গে সেঁটে আছে। দরজার হাতলটা নিমেষে ছেড়ে দিয়ে সরে এল অরুণ।

বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ফুটপাথে। চোখের সামনে দিয়ে একটার পর একটা ট্যাকসি বেরিয়ে যাচ্ছে। যে ট্যাকসিটা একটু আগে ধরেছিল তার ড্রাইভার এখন খুব মোলায়েম গলায় ছেলেটিকে বলছে—

—মস্তান তুমি আছ তাই দুটো করে খাচ্ছি। নইলে এসব মেনিমুখো বাবুদের উৎপাতে—।

একগাল খিস্তি গলগল করে উগরে দিয়ে ড্রাইভারটাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল মস্তান—বড্ড তো খাচ্ছিস বে, আমায় কিছু ছাড়।

—কেন কাল তোমার পাওনা তো দাদা মিটিয়ে দিইচি।

—শালা ওটা আবার পাওনা নাকি? কি দিনে চার আনায় আর পোষাচ্ছে না। রেট বাড়াও নইলে বিচাইন করে দেব। দুশো সাম মিশিয়ে বুলিয়ে একদম সিকির বেশী নয়। এর আধা পাবে শালা পুলিশ, তাহলে আমার কি থাকে বে? এদিকে সব দুর্নাত তো আমার। কোনদিন পাবলিক বিপক্ষে গিয়ে সব ভণ্ডুল করে দেবে। শালা এটা তো আর সাটল স্ট্যান্ড নয়। তোরাই বানিয়েচিস। বলতে বলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা চাপা গলায় মস্তান বলল—কি শুনছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? বললাম না কেটে পড়ুন।

কেটে পড়তে পড়তে হতাশ বিষণ্ণ অরুণ এধার ওধার সর্বদিক তাকিয়ে দেখল—ট্রাম আছে, বাস আছে, শুধু ওঠার জায়গা নেই। রাস্তায় অগুন্তি ট্যাক্সি—হাজার লোক ছুটছে তার পেছনে। পুলিশ ট্রাফিক কনট্রোল করছে। আর এদিকে মস্তানদের ছুরির আড়ালে দাঁড়িয়ে ড্রাইভাররা মুখ ভ্যাংচাচ্ছে অরুণদের। প্রতিবাদ কেউ করে না। করবেও না। অন্তত আজ তো নয়। আজ যে স্পেশাল অকেশন। হাঁটতে হাঁটতে আর একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল—সাড়ে পাঁচটা। জোরে হাঁটলে আধ ঘন্টায় ডেকার নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে। কিন্তু ওরা থাকবে তো? পনেরো মিনিটের জায়গায় সওয়া ঘন্টা লাগলে ওরা চটেমটে চলে যাবে না তো? আর যেই যাই ভাবুক, মধি ওকে কি ভাববে—ক্যালাস ইরেসপন্সিবল,, বিয়ের সখ আছে অথচ ক্ষমতা নেই কানাকড়িও। যদি থাকে, ওরা যদি অপেক্ষা করে তখন অরুণ সব বললেও কি ওরা বিশ্বাস করবে? ধুস্ কলকাতায় আবার ট্যাক্সির অভাব? আসলে অরুণ এগিয়ে এসেও আজ পিছিয়ে যেতে চাইছে, একথাই বোধহয় সবাই ভাববে। আর মধি?

সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে জোরে জোরে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে থাকে অরুণ। একটু নজর করে কেউ ওকে দেখলে নিশ্চয়ই বলত—লোকটা পাগলের মত ছুটছে, যেন লাস্ট ট্রেন মিস করবে। ঘামে ভিজে গেছে—প্যান্ট, সার্ট, মুখটা ময়লা ময়লা। চুলগুলো এখন এমনিতেই অবিন্যস্ত। এখন আর বোধহয় নায়ক-নায়ক দেখাচ্ছে না ওকে।

—সন্দীপন

CENTRAL LIBRARY

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

—আট—

ডুন ভ্যালীতে আমি উপন্যাস লিখতে বা উপন্যাসের নায়ক হতে আসি নি। এসেছি প্ল্যানিং কমিশনের হয়ে স্পেশ্যাল সোসিও ইকনমিক সার্ভে করতে।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই সামনের টেবিলে ছাপান ফর্মের বিরাট বিরাট বাণ্ডিলগুলো দেখেই মনে হলো অনেক কাজ করতে হবে। ভেবেছিলাম মিঃ রায়কে টেলিফোন করে ডকটর সরকারের বাড়ী নেমন্তন্ন খাবার কথা বলব, কিন্তু তা আর হলো না। পর-পর দু' কাপ চা খেয়ে সিগারেট টানতে টানতে টেবিলের 'পর থেকে একটা বাণ্ডিল খুলে কয়েকটা ছাপান ফর্ম বের করলাম। ফর্ম নয়ত, যেন প্রশ্নের জঙ্গল।

পুরো নাম-ঠিকানা না হলেও চলবে: কারণ পুরো নাম-ঠিকানা জানাবার পর এতগুলো ব্যক্তিগত ও গোপনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে কেউই রাজী হবেন না। তাছাড়া নাম-ধামে আমাদের কি দরকার? কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যবসা করা বা কোন স্বার্থসিদ্ধি করা আমার বা প্ল্যানিং কমিশনের কাজ নয়। নাম-ধাম গোপন রাখলেও আর সব খবর জানতে চাই।

সব খবর মানে?

মানে সব খবর। বাবা-মা'র বয়স ও শিক্ষা, ক'জন ভাইবোন, তাদের বয়স ও কে কি করে ইত্যাদি ইত্যাদি ধরণের বেশ কিছু পারিবারিক খবর জানার পর শুরু হবে ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনার বয়স? কতদূর লেখাপড়া করেছেন? চাকরি করেন কি? কত বছর চাকরি করছেন? প্রথম কোথায় চাকরি করতেন ও কত মাইনে পেতেন? মাইনে ছাড়াও কি অন্য কোন আয় ছিল?

আচ্ছা এই প্রশ্নের কি সঠিক উত্তর পাব? পেতে পারি? সবাইকেই অবশ্য বলব, এসব খবর ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট তো দূরের কথা প্ল্যানিং কমিশনের স্পেশ্যাল সার্ভে টিমের বাইরে কেউ জানতে পারবে না কিন্তু তবুও লোকে কি বলবে?

মনে একটা খটকা থেকেই গেল।

তারপর?

ডুন ভ্যালিতে কত বছর আছেন? চাকরি নিয়েই কি এখানে এসেছিলেন? তখন কত মাইনে পেতেন? এখন কত মাইনে পান? ব্যবসা করেন কি? কি ধরনের ব্যবসা? ব্যবসা কি নিজেই শুরু করেছেন নাকি চালু ব্যবসা কিনেছেন? প্রথম কত আয় ছিল? এখন কত আয়? গত দশ বছরে আয় বেড়েছে নাকি কমেছে? গত দশ বছরে ব্যয় বেড়েছে কি? বার বাড়বার পার্টি করেন কি? সরকারী বাসে চড়েন? আপনার সাইকেল-স্কুটার-মোটরগাড়ী আছে? দশ বছর আগে কিভাবে যাতায়াত করতেন? সরকারী বাস-সাইকেল-স্কুটার মোটরের জন্য আনুমানিক মাসিক ব্যয় কত?

এতদূর পড়েই আমি যেন হাঁপিয়ে উঠলাম। বেয়ারাকে ডাক দিলাম আবার চা দেবার জন্য।

আবার পড়তে শুরু করলাম।

আপনি কি ভাড়া বাড়ীতে থাকেন? কত ভাড়া? দশ ও পাঁচ বছর আগে কত ভাড়া দিতেন? দশ ও পাঁচ বছর আগে ক'খানা ঘরের বাড়ীতে থাকতেন? এখনকার বাসায় ক'খানা ঘর?

নিজের বাড়ীতে থাকলে এসব খবর তো চাইই, তার সঙ্গে জানতে হবে কত জমি, কবে তৈরী করেছেন, কত খরচ হয়েছে, ভাড়াটে আছে কিনা, প্রতি বছর বাড়ীর ট্যাক্স ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত খরচ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমনি বেশ আরো কিছু প্রশ্নের পর শুরু হবে ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

আপনি কি কোন ক্লাবের সভ্য? সেখানকার বার্ষিক চাঁদা কত? কি ধরণের লোকেরা ঐ ক্লাবের সভ্য? কয়েকজনের বয়স, পেশা ও আনুমানিক আয় বলতে পারেন কি? ক্লাবে খেলাধুলা বা চিত্ত-বিনোদনের কি কি ব্যবস্থা আছে? আপনি কোন কোন বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন? সপরিবারে না একলা ক্লাবে যান? বন্ধু বা বান্ধবীদের নিয়ে কি ক্লাবে যাওয়া যায়? আপনি কি বন্ধু বা বান্ধবীদের নিয়ে যান? ক্লাবে কি মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে? আপনি কি মদ্যপান করেন? আপনি বিদেশী মদ্যপান করেন? প্রতিদিনই কি আপনি মদ্যপান করেন? কতদিন ধরে মদ্যপান করেন? আপনি কি সিগারেট খান? কোন সিগারেট ও কত প্যাকেট খান? কতদিন ধরে সিগারেট খাচ্ছেন? বরাবরই কি এই সিগারেট খান?

বেয়ারা চা নিয়ে এলো। চা খেতে খেতে একটা সিগারেট ধরালাম।

কোশ্চেনেয়ারের পাতা উল্টাতে গিয়ে মনে হলো মিঃ রায়কে একবার টেলিফোন করা উচিত ও দরকার।

'হ্যালো, আমি সাগর বলছি।"

মিঃ রায় উত্তর দিলেন, হ্যা, হ্যা বলুন কেমন আছেন?

ভালই।'

'কাল কেমন গল্পগুজব হলো?'

'বেশ ইণ্টারেস্টিং।'

ডকটর সরকার বলছিলেন বেশীক্ষণ থাকেন নি নাকি?'

আরো দু' চারটে টুকটাক কথাবার্তার পর জানালাম, কাজকর্ম করার জন্য কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছি।

'তাই নাকি?'

'হ্যা। তাছাড়া আর দেরী করলে শুরু করাই মুস্কিল হবে।'

মিঃ রায় হাসলেন। 'সন্ধ্যার দিকে আসছেন তো?'

'কাগজপত্র নিয়ে শহরের দিকে বেরুব ভাবছি। তাড়াতাড়ি ফিরলে নিশ্চয়ই যাব।'

ফিরে এসে আবার কোশ্চেনেয়ারের পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম।

আপনি কি দর্জিকে দিয়ে জামা তৈরী করান না কি রেডিমেড জামা কেনেন? সুতী না টেরিলিনের জামা ব্যবহার করেন? এর আগে কি ধরণের জামা-কাপড় ব্যবহার করতেন?

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সংসারের জিনিষপত্র কি নগদ কেনেন? কতদিন নগদ কিনছেন? ধারে কতদিন কিনছেন? প্রতি মাসেই কি পাওনা শোধ করেন?...চিকিৎসার খরচ কি নিজেকেই বহন করতে হয়? ক'জন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করান? বাড়ীর মেয়েদের বা বাচ্চাদের জন্য কি কোন বিশেষজ্ঞকে পরামর্শ করেন? ডাক্তারদের কত ফি দেন?

আস্তে আস্তে পর্দা সরাতে সরাতে এবার অন্দরমহলে প্রবেশের পালা।

আপনি কি বিবাহিত? কতদিন বিয়ে করেছেন? আপনার স্ত্রীর বয়স কত? কটি ছেলেমেয়ে? তাদের বয়স কত? সন্তান কম না বেশী চান? সন্তান নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন? কে আপনাকে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন? কারুরই কি এই ব্যবস্থা চলছে? আপনার স্ত্রী কি এই ব্যবস্থার বা আগের ব্যবস্থার পরিবর্তনে খুসী? সংসার পরিচালনায় আপনার স্ত্রীর কি ভূমিকা? ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বা পড়াশুনো কে তদারক করেন? সংসারের কাজকর্ম করার জন্য কি চাকর আছে? কতদিন চাকর রেখেছেন? ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর জন্য প্রতি মাসে কত খরচ করেন? দশ ও পাঁচ বছর আগে কত খরচ করতেন?

বাপরে বাপ! আমি নিজেই যেন পড়তে পড়তে হাঁপিয়ে উঠেছি। আরো দু'পাতা? সবগুলো প্রশ্ন পড়লাম না, এক ঝলক দেখে নিলাম।...আত্মীয়-বন্ধু দর্শন বা অন্য কোন কারণে ভ্যালির বাইরে যান কি? বছরে কতবার? ট্রেনে বা বাসে যান? ট্রেনে কোন ক্লাসে যান? এর আগেও কি যেতেন? কোন ক্লাসে? জীবন-বীমা আছে? কত টাকার? ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন কি? প্রতি মাসে কত করে জমা দিতে পারেন?

আর পড়লাম না। বাণ্ডিলটা সরিয়ে রাখলাম। এবার আর দুটো বাণ্ডিল টেনে নিলাম। একটি মেয়েদের জন্য অপরটি

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এদের কোশ্চেনেয়ার দীর্ঘ নয় কিন্তু...

কিন্তু কি? বিবাহিতা বা অবিবাহিতা মেয়েদের কিভাবে জিজ্ঞাসা করব তার স্বামী বা অভিভাবকের কথা? তার একান্ত নিজস্ব কথা? তার অতীত ভাবিকাল জীবনের কথা? স্বাস্থ্য সম্পর্কে গোপন প্রশ্ন? পরিবার পরিকল্পনার কোন ব্যবস্থা তার পছন্দ?

কোশ্চেনেয়ার পড়তে পড়তেই আমার মাথা ঘুরে গেল। বেশ বুঝলাম, বেশ দুরূহ কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। কয়েক শ' লোকের সঙ্গে ইন্টারভিউ করে রিপোর্ট তৈরী করা নেহাত সহজ হবে না।

যাই হোক তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম শহরের দিকে। ডক্টর সরকারের বাড়ী ছাড়িয়ে। ডেপুটি কমিশনারের অফিসে তার পি-এর সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিলাম। অনুরোধ করলাম, আই উড লাইক টু সী হিম ফর ফিউ মিনিটস।

ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা হলো। নিজের নাম-ধাম পরিচয় ও তুন ভ্যালীতে আসার কারণ জানিয়ে বললাম, স্যর, আই নীড ইওর কো-অপারেশন।

ভদ্রলোক আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, বাট হু হ্যাজ সিলেক্টেড তুন ভ্যালী?

'আমি নিজেই।'

'কেন?'

'এখানকার মত মিক্সড পপুলেশন খুব কম জায়গায় পাব।'

'দ্যাটস রাইট।'

পিতলের চকচকে পেপার-কাটারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ডেপুটি কমিশনার সাহেব আপনমনে কি যেন ভাবছিলেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম।

'চাকরি করতে গিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরলাম কিন্তু এমন ইন্টারেস্টিং জায়গা আর দেখিনি।' একটু চুপ করে আবার বললেন, ট্রেনিং পিরিয়ডে ছ' মাস শিলং ছিলাম। খুব ইন্টারেস্টিং প্লেস......

শিলং-এর নাম শুনেই আমি একটু পুলকিত না হয়ে পারলাম না। 'স্যার, আমি আসামের ছেলে।'

'তাই নাকি?'

'কোথায় আপনার বাড়ী?'

'শিলচর, কাছাড়।'

প্রবীণ ডেপুটি কমিশনার সাহেব হেসে বললেন, আমি শিলচর গেছি।

আমি আরো খুশী হয়ে হেসে ফেললাম। 'আপনি কি শিলচরে পোস্টেড ছিলেন?'

'না, পোস্টেড হইনি তবে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখার জন ডিব্রুগড়, শিলচর আর মিজো হিলস ঘুরেছিলাম।'

'কতদিন শিলচরে ছিলেন স্যার?'

'কয়েকদিন। আই ওনলি রিমেমবার রিভার বরাক।' কথাটা শেষ করেই উনি হাসলেন।

'আই ইট ইজ রিভার বরাক।'

'আই এ্যাম সরি। অনেকদিন হয়ে গেল তো! নাম-টাম ঠিক মনে নেই।'

কথার স্রোত ঘুরল।

'আই মাস্ট থ্যাঙ্ক ইউ ফর সিলেক্টিং তুন ভ্যালী। ভেরী ইন্টারেস্টিং জায়গা। এত ছোট জায়গায় এত ভ্যারাইটি দুর্লভ।.....

'তাই মনে হয় স্যার।'

'ইয়েস, ইয়েস। মানী, পভার্টি, ক্রাইম, সেক্স, রিলিজিয়ান, টুরিস্ট, ট্রাইবাল—সব আছে।'

ডেপুটি কমিশনার সাহেব আবার পেপার কাটারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, আমি নিজে লিটারেচারের ছাত্র। মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজের লেকচারার ছিলাম কয়েক মাস। সাহিত্য-টাহিত্য ভুলে গেছি কিন্তু মাঝে মাঝে বইপত্তর পড়ার সময় মনে হয় তুন ভ্যালী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে হতো!

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, হোয়াই নট রাইট স্যার?

'না, না, ওসব আর পারব না। এখন শুধু সি-আর-পি-সি অর ল অ্যান্ড অর্ডারের চিন্তা।'

আমি আবার হাসলাম।

এবার কাজের কথা।

আপনি বরং কিছু কোশ্চেনেয়ার আমাকে দিয়ে যান। আমি অফিসার আর স্টাফদের দিয়ে দেব। ওরা নিজেরাই ফিল-আপ করে দেবেন। তারপর দরকার মনে করলে ইউ ক্যান মীট দেম......

'দ্যাট উড বি ফাইন স্যার।'

'এনিথিং মোর?'

'আমি তো নিউকামার তাই কাইন্ডলি আপনি যদি কিছু লোক্যাল লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন.....

'ডাইরেক্টলি খুব বেশী লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াটা ভাল হবে না বাট ইন এনি কেস, লেট মী থিংক ইট ওভার।'

'সো কাইন্ড অফ ইউ স্যার।'

তারপর উনি একবার কি যেন ভেবে বললেন, সী মী আফটার ফিউ ডেজ।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালাম।

'দরকার মনে করলেই চলে আসবেন। ডোন্ট হেসিটেট। এমন একটা সার্ভেতে আমি নিজেও ইন্টারেস্টেড।'

আমি তখনও দাঁড়িয়ে।

ডেপুটি কমিশনার সাহেব ঘন্টা বাজাতেই বেয়ারা এলো, পি-এ সাব কো বোলাও।

মুহূর্তের মধ্যে শর্টহ্যান্ড নোটবই আর পেন্সিল হাতে করে পি-এ এলেন।

'মাঝে মাঝে চ্যাটার্জি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

'ইয়েস স্যার।'

আবার নমস্কার করে আমি বেরিয়ে এলাম পি-এ'এর ঘরে। ওকে বেশ কিছু ফর্ম দিলাম।

আমি পি-এ সাহেবকেও ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বেশ একটা আত্মতৃপ্তি নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। রাজপুর রোড ধরে বেশ খানিকটা চলার পর মনে হলো খিদে পেয়েছে।

আরো খানিকটা চলার পর একটা হোটেলে ঢুকে পড়লাম।

রুটি-মাংস খেতে খেতে গত রাত্রের নেমন্তন্নের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বুলার কথা। আংটির কথা।

খাচ্ছি আর ভাবছি, ভাবছি আর খাচ্ছি। ভাবছি আংটিটা আনতে এখনই যাব নাকি পরে? বিকেলের দিকে নাকি সন্ধ্যার পর? নাকি আজ যাবই না? কাল রাত্রে খাবার পর আজ যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে? না, না, তাতে কি হয়েছে? ওরাই তো আমাকে যেতে বলেছেন। বার বার যেতে বলেছেন। তাছাড়া আংটিটা তো নিতে হবে। কিন্তু এই দুপুরবেলা? ডক্টর সরকার শুনলে রাগ করবেন কি?

খাচ্ছি আর ভাবছি, ভাবছি আর খাচ্ছি।

এখন যাওয়া হয়ত অন্যায় কিন্তু সত্যি যেতে ইচ্ছা করছে।

আর একটু ভাল করে ভাবলাম।

মনে হচ্ছে বুলাকে দেখতেও ইচ্ছা করছে। ওর হাঁটা-চলা দেখতে ইচ্ছা করছে। হয়ত আরো কিছু।

না, না, আরো কিছু আবার কি হবে? তবে হ্যাঁ বুলার সঙ্গে গল্প করলে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

খাওয়া হলো। ঘরের কোণায় বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে সামনের ময়লা পড়া আয়নাতেই একবার নিজেকে দেখে নিলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই রুমাল দিয়ে খুব ভাল করে মুখ পরিষ্কার করলাম।

একি রুমাল দিয়ে এত ভাল করে মুখ পরিষ্কার করছি কেন?

কাউন্টারে সর্দারজীর কাছে পয়সা দেবার সময় টেবিলের একপাশে টেলিফোনটা নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, একঠো টেলিফোন কর সকতা?

সর্দারজী আমার দিকে না তাকিয়েই অনুমতি দিল।......

'নমস্কার।'

বুলার মিষ্টি গলা শুনেই ভাল লাগল।

'কি করছেন?'

'বিশেষ কিছুই না।'

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'অনেকক্ষণ। আপনি খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'গেস্ট হাউস থেকে কথা বলছেন?'

'না। রাজপুর রোড থেকে।'

'ওখানে কি করছেন?'

'ডি-সির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

'দেখা করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের এদিকে আসবেন না?' এতক্ষণে আসল প্রশ্নটা করল বুলা।

'এক্ষুনি আসছি।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'আসুন।'

(ক্রমশঃ)

মনের কথা

বিচ্ছিন্নতার সংকট
নন্দবাবুর কাহিনী

—আমার মনের খবর আমার কাছে ঠিকমত আসছে না। কোনো সময় মনে হচ্ছে আমি সুস্থ, আমার দেহমনে কোনরকম রোগলক্ষণ নেই; আবার কোনোসময় মনে হচ্ছে আমি রুগ্ন, আমার মনে নানারকম আজগুবি চিন্তা, আমার দেহে হাজার রোগের ডিপো। আমি জানতে চাই আমি সুস্থ না অসুস্থ? আমি জানতে চাই আমার মনের খবর। আমি লিপিকাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছি, অথচ এখন আমি তাকে সহ্য করতে পারছি না। অফিস থেকে বাসায় ফিরতে আমার ভয় হয়। লিপিকে দেখলেই আমি কেমন যেন হয়ে যাই। মনের সুখশান্তি সব যেন ঐ মেয়েটার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। ওর সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি আমি সহ্য করতে পারি না। অথচ চার-পাঁচ দিনের জন্যে ও যদি বাপের বাড়ী যায়, আমি ওকে ফিরিয়ে আনবার নানারকম ফিকির খুঁজি। ওকে না দেখলে আমার ভাল লাগে না, আবার ওকে দেখলে দারুণ ঘৃণায় আমার মন বিষিয়ে যায়। ও ঘরে না থাকলে আমার ঘুম আসে না, আবার বিছানায় আমার পাশে যদি থাকে, সারারাত আমাকে জেগে কাটাতে হয়।

নন্দবাবুর বয়স বত্রিশ। সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত চেহারা। মুখেচোখে বিষণ্ণতার ছাপ। মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী। এক বছর হল বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকেই অনিদ্রারোগে ভুগছেন। বিয়ের ইতিহাস ও'র এক বন্ধুর কাছে শুনলাম। এই বন্ধু নন্দবাবুর অফিসেই চাকরী করেন; নন্দবাবুর সংগে পার্টনারশিপে একটা ছোটখাটো পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসা চালান। নন্দবাবুকে অফিসের কাজে মাঝে মাঝে মফঃস্বলে যেতে হয়। সেই সূত্রে বহরমপুরের এক স্টেশনারী দোকানের মালিক শশিবাবুর সংগে পরিচয় ঘটে। শশিবাবুর মেয়ে লিপিকাকে নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেন। মা-বাবা অন্য তিনটি ভাইবোন নিয়ে কোলকাতার উপকণ্ঠেই থাকেন, কিন্তু নন্দবাবুর আজ অনেকদিন বাড়ীর সংগে সম্পর্ক নেই। বিয়ের আগে বন্ধুর বাসাতে থাকতেন, বর্তমানে বহরমপুরে নিয়ে বাসা করেছেন। বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, নন্দবাবু কোনো-রকম সাহায্য করেন না। করলেও বাবা সে সাহায্য নিতেন কিনা সন্দেহ। নন্দবাবুর মুখে শুনলাম তাঁর পিতৃবিদ্বেষের খবর। বাবা নাকি তাঁকে কোনোদিন ভালবাসতে পারেন নি। তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান, লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিলেন। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর কলেজে পড়ার ইচ্ছা ছিল। বাবা কোনো সাহায্য করতে পারবেন না জানাতে নন্দবাবু খুলনার বাড়ী থেকে কোলকাতায় চলে আসেন। তখন পাকিস্থান ভারতের মধ্যে যাতায়াতের বিধিনিষেধ বিশেষ ছিল না। কোলকাতায় এসে নানারকম দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে বছর দুয়েক কাটিয়ে একটা চাকরী জোগাড় করেন। অনেকদিন এই সময় অনাহারে কেটেছে, শিয়ালদহ স্টেশনে রাত কাটাতে হয়েছে, মোট বয়ে পেট চালাতে হয়েছে। তবুও বাড়ীতে কোনো খবর পাঠান নি। এইভাবে চাকরী করতে করতে বি, এ পাশ করেন। ইছাপুরের দিকে একটা জবর-দখল কলোনীতে একটা মাথা গোঁজবার মত আস্তানাও তৈরী করলেন। বছর তিনেক আগে বাবা-মা এসে হাজির। নন্দবাবু নিজের মনের অবস্থা এইভাবে বিবৃত করলেন।

—প্রথমটায় আমার খুব আনন্দ আর অহংকার হল। বাবা চিরকাল আমাকে অবহেলা অবজ্ঞা করেছেন। এইবার তাঁকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি কাজের লোক। আমার প্রাপ্য সম্মান আমি এবার আদায় করবই। মাকে প্রায় বারো বছর পরে দেখব, এই ভেবে খুবই আনন্দ হল। সারা-রাত নানা চিন্তাভাবনায় ঘুম হল না। কিন্তু শিয়ালদহ স্টেশনে ও'দের দেখেই আমার মনে কেমন একটা বিতৃষ্ণার আর ঘৃণার ভাব এল। ও'রাও আমাকে দেখে খুব খুসী হয়েছেন বলে মনে হল না। বন্ধুর ওপর ও'দের বাসায় পৌঁছে দেবার ভার দিয়ে একটা মিথ্যে কাজের অছিলায় আমি স্টেশন থেকে বাইরে চলে এলাম। অনেক রাতে বাড়ী ফিরলাম। মা জেগেছিলেন, আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এতদিন পরে দেখা, অথচ মায়ের সঙ্গে কোনো কথা বলার প্রবৃত্তি হল না। তিনি অনেক কথা বললেন, আমি হাঁ, না, বলে সংক্ষেপে জবাব দিলাম। সতেরো বছরের ছেলেকে ঊনত্রিশ বছর বয়সে তিনি বোধহয় ঠিক ছেলে বলে মনে করতে পার-ছিলেন না। অন্যদিকে [illegible] নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথাই শুধু বলে চললেন। তাঁরা এ কয় বছর কি দুর্ভোগের মধ্যে কাটিয়েছেন, কিভাবে ইংপীড়ন ভোগ করেছেন, ছোট বোন অনুভাকে নিয়ে কি মুস্কিলে পড়েছিলেন; এই সব কথা। অনুভা উনিশ বছরে পড়েছে, তার বিয়ের চেষ্টা এখনই করা দরকার। ছোট ভাই কেশব ষোলো পেরিয়েছে, তাকে একটা ভাল স্কুলে অবিলম্বে ভর্তি করা প্রয়োজন। বাবার শ্বাসরোগটা বেড়েই চলেছে। দেশে কোনো চিকিৎসাই হয় নি। এইবার একজন ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। আধঘণ্টা কি একঘণ্টা ধরে নিজেদের কথাই বলে চললেন, আমার কথা একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না। আমি আশা করেছিলাম বাড়ীর সবাই জেগে থাকবে, আমাকে নিয়ে হৈচৈ বাধিয়ে দেবে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কর্ম গাড়ী নিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবে, আমাকে বাহবা দেবে, অসাধ্যসাধনের জন্য প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। সে সব কিছুই হল না। মা শুধু নিজেদের স্বার্থের সন্ধানে আমার কাছে এসেছেন, আমার টানে নয়। এই কথা বুঝতে পেরে আমার মাথার মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা সুরু হয়ে গেল। ভাতের থালাটা ঠেলে দিয়ে আধপেটা খেয়ে উঠে পড়লাম। মা বোধ হয় ভয় পেয়ে কোনো কথা বললেন না। আমার বাবাকে ছোটবেলায় ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে অনেকবার খাওয়া ফেলে উঠে যেতে দেখেছি। মা সে সময় ভয় পেতেন, কোনো কথা বলতেন না। বাবা রেগে গিয়ে অনেকসময় বাসনপত্র ভাঙতেন, কাপড়জামা ছিঁড়তেন, আমাকে ধরে বেদম প্রহার করতেন। আমার সেই সব কথা মনে পড়ে গেল। সেই রকম করতে ইচ্ছে হল। অতিকষ্টে আত্মদমন করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আগের রাতে আনন্দ আবেগে ঘুমুতে পারিনি, সে রাত্রে রাগে আর বিদ্বেষে ঘুম হল না। এরা কেউ আমাকে চায় না, কেউ আমাকে ভালবাসে না।

এরপর কয়েকমাস পরিবারের সঙ্গে নন্দবাবু মোটামুটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করলেন। বাবাকে একটা প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারী কাজ সংগ্রহ করে দিলেন। ছোট ভাইকে কাছাকাছি একটা স্কুলে ভর্তি করালেন। বোনের বিয়ের চেষ্টাও করতে লাগলেন। তবে বাড়ীতে তিনি থাকতে পারতেন না। সকালে সাতটায় বেরিয়ে যেতেন, অফিস ও পাবলিসিং-এর কাজকর্ম সেরে অনেক রাতে বাড়ী ফিরতেন। দু-একদিন রাতের খাওয়াটাও বাইরে সেরে আসতেন। ছুটির দিনও নানারকমের অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতেন। বাড়ীর কোনো লোকের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারতেন না। বিশেষকরে বাবাকে দেখলেই একটা অস্বস্তির অনুভূতি বোধ করতেন। বাড়ীতে থেকেও তিনি বাড়ীর লোকজন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

এই সময় এক রাতে মশার উপদ্রবে নন্দবাবুর ঘুম হল না। ভোর হতে দেখলেন মশারীর একটা জায়গা ছেঁড়া। সেখান দিয়ে মশা ঢুকছে। বাড়ীর লোকেরা তাঁর সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, তা না হলে মশারীর ছেঁড়া জায়গাটা তাদের নজরে পড়তো ও সে জায়গাটা তারা মেরামত করতো নিশ্চয়ই। নতুন করে রাগে ও ঘৃণায় অস্থির হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। কাউকে কিছু না বলে সুটকেশ গুছিয়ে নিজের অতি-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে সোজা এসে বন্ধুর বাসায় উঠলেন। মা তাই এসে পরদিন অনেক সাধ্যসাধনা করলেও তিনি টললেন না। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। মনে মনে ঠিক করলেন যে এবার বিবাহ করবেন। ভালবাসতে চান তিনি, ভালবাসা চান তিনি। বিবাহ করে তিনি ভালবাসার তৃষ্ণা মেটাবেন। বন্ধুকে মনের কথা জানালেন, কিন্তু তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। বললেন, বোনের বিয়েটা আগে হওয়া দরকার। বোনের বিয়ের দায়িত্ব নন্দবাবু নিজের ঘাড়ে নিতে চাইলেন না। একটি পয়সাও তিনি ওদের জন্যে আর খরচ করবেন না। ব্যাংকে পাবলিসিং কোম্পানীর অ্যাকাউন্টে কয়েক হাজার টাকা জমেছে, তার সবটাই বোনের বিয়েতে খরচ করবেন আগে ভেবেছিলেন। বন্ধুরও এতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন বোনের বিয়ের জন্যে একটুও আগ্রহ নেই তাঁর। বন্ধু আর বন্ধুপত্নী অনেক বোঝালেন, নন্দবাবু বুঝলেন না। ওদের জন্যে তাঁর একটুও দরদ নেই, কেননা ওরা স্বার্থপর। বাবা মার উচিত ছিল আগে নন্দবাবুর বিয়ের বন্দোবস্ত করা। নিজে বিয়ে করে পণ-যৌতুক যা পাবেন, সেটা তিনি বোনের বিয়েতে খরচ করবেন, বললেন। জমানো টাকায় হাত দেবেন না। গত্যন্তর না দেখে বন্ধু ও বন্ধুপত্নী নন্দবাবুর বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। এক বছরে প্রায় দশটা মেয়ে দেখা হল। কোনোটাই নন্দবাবুর পছন্দ হল না। কারুর রূপের কমতি, কারুর বাপের রূপোর কমতি, কারুর বা বিদ্যার ঘাটতি। অবশেষে একদিন বন্ধু-বন্ধুপত্নীকে অবাক করে দিয়ে লিপিকাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন। অত্যন্ত সাদামাঠা চেহারা, পণ-যৌতুকের নামগন্ধ নেই। লেখাপড়াও লিপিকা তেমন কিছু জানে না। রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য সবদিক দিয়ে সকলের ওপর টেক্কা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এসেছেন এতদিন নন্দবাবু। তিনি নিজে দেখে-শুনে এই রকম একটা মেয়েকে বিয়ে করলেন কি যে? এ নিয়ে বন্ধু-বন্ধুপত্নী অনেক ভেবেও কূলকিনারা পেল না। এরপর থেকে অনিদ্রা রোগের সূত্রপাত। আলাদা বাসা করে নন্দবাবু লিপিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধলেন। কিন্তু সেই ঘর তাঁকে বাঁধতে পারল না। সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকতে গেলে মনে হয় যেন কারাগারে ঢুকছেন। সারা রাত অসহ্য যন্ত্রণা। তিনি চান, লিপিকা তাঁকে ভালবাসুক, প্রেমের প্রলেপ দিয়ে তাঁর যন্ত্রণা দূর করে দিক। কেন সে কাছে আসছে না? কেন সে নিবিড়ভাবে তাঁকে আলিঙ্গন করছে না? এক সময় এই রকম ভাবছেন আবার পরমুহূর্তে লিপিকা কাছে আসতেই ঘৃণায় তাঁর শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। রূপগুণহীন মেয়েটার স্পর্ধা দেখে ক্রোধে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। ঘুমের ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে কোনোরকমে রাতটা ঝিমিয়ে কাটিয়ে ভোরবেলায় বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। নন্দবাবুর এই অস্থিরতা এবং বিপরীত অভিলাষ ও আচরণের কারণ নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছিল। তার সংক্ষিপ্তসার পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করছি।

—আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঐরকম ব্যবহার করেন কেন?

—আমার মনে হয় ওই মেয়েটা আর ওর বাবা শশীবাবু আমাকে ঠকিয়েছে।

—আপনি তো নিজে পছন্দ করে লিপিকাকে বিয়ে করেছেন। ওদের দোষটা কোথায়?

—আমি কেন ঐরকম একটা মেয়েকে পছন্দ করলাম? শশীবাবু আমাকে নিশ্চয়ই খাবারের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল, কিংবা ঐ মেয়েটা আমাকে গোধূলির আলোতে জাদু করেছিল। ওর আসল রূপ আমার চোখে ধরা পড়ে নি। ও কিন্তু আমাকে ভালবাসে। ওর বাবা কয়েক মাস আগে মারা গেছেন। আমি ছাড়া ওর আপন বলতে আর কেউ নেই।

—আপনার মত শিক্ষিত ছেলেদের এই রকম কুসংস্কার কেন? আর রূপটাকে এত বড় করে দেখছেন আপনি! মেয়েটির ভালবাসার কোনো দাম দিচ্ছেন না! আশ্চর্য!

চুপচাপ রইলেন নন্দবাবু। সেদিন আর কোনো কথার উত্তর দিলেন না। পরের দিন একেবারে অন্য মূর্তি।

—কি করে বুঝবো যে ও আমাকে ভালবাসে। এই তো কাল সকাল সকাল বাড়ী ফিরলাম। আমার জন্যে চা-জলখাবার কিছু নিয়ে এল না।

—আপনি কয়েকদিন আগেই ওকে চা দিতে নিষেধ করেছেন, ভুলে গেলেন নাকি? চা তৈরী ভাল হয়নি বলে কাপটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওকে গঞ্জনা দিলেন। বললেন, আপনি বাড়ী আসার আগে চায়ের পাট সেরে আসবেন। আর যদি কোনোদিন চা তৈরী করে, আপনি কাপ ডিস কেটলী সব ভেঙে চুরমার করে ফেলবেন। কোন সাহসে উনি আর আপনাকে চা দিতে আসবেন?

—প্রত্যেক কাজে ও ভুল করে। আমার রুমালগুলো কোথায় রাখি ও তার খবর দিতে পারে না। ওর রান্না মুখে দেওয়া যায় না। রূপ-গুণ কিছু না থাকলে একটা মেয়েকে কি করে ভালবাসা যায়? কাল আমি ওর সিঁদুর মুছে দিয়েছি। শাঁখা ভেঙে দিয়েছি, আমার বাড়ী ছেড়ে ওকে চলে যেতে বলেছি।

এই কথাগুলো বলার পর নন্দবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ঘড়ি দেখলেন, অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকালেন।

—আমি আজ আর থাকতে পারছি না। ওর শরীরটা খারাপ দেখে এসেছি। ও যদি আমার কথামত চলে যায়, তবে আমার আর আফশোষের সীমা থাকবে না। ওর যাবার জায়গাই বা কোথায়? আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ওর।

এই বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

তিন মাস ধরে ওষুধ খেয়ে, সাজেশন নিয়ে ভদ্রলোকের খানিকটা উপকার হল। উত্তেজনা অস্থিরতার ভাব কমল, কিন্তু বিষণ্ণতার ভাব বাড়ল। আগে ঘুমের ওষুধ না খেয়ে ঘুম হত না, এখন আবার বিপরীত অবস্থা দেখা দিল। দিনরাত সব সময় ঘুম। অফিসে গিয়ে চেয়ারে বসে ঢুলতে থাকেন। স্ত্রীর উপর অত্যাচারের মাত্রা কমল, কিন্তু আকর্ষণ বাড়ল না। এই সময় আমার নির্দেশে ওঁর বন্ধু ও বন্ধুপত্নী এক দুপুরে ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমার কাছে এলেন। লিপিকাকে দেখলাম, তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। বাইশ-তেইশ বছরের মেয়েটির চেহারা খুবই সাধারণ। আমার কথার জবাব বেশীর ভাগ চোখের জলেই দিল। নন্দবাবুকে সে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভালবাসতে পারেনি। নন্দবাবুর

এই অবস্থার জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করে।

—আমার মতন মেয়েকে কেউই ভালবাসতে পারে না। আমার না আছে রূপ, না আছে গুণ। স্বামী কখন আমাকে নিয়ে রাস্তাঘাটে বেরুতে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী যেতে তাঁর লজ্জা করে। সত্যিই-ও'র পাশে আমি নিতান্তই বেমানান। তা সত্ত্বেও উনি আমাকে অনেক যত্ন করেন। আমরা মাঝখানে টাইফয়েডের মত হয়েছিল, তখন রাত জেগে আমার সেবা করেছিলেন। আমাকে সে সময় সত্যিই উনি ভালবেসেছিলেন। উনি আমাকে দিন-রাত চলে যেতে বলেন। আগে যখন বাবার কাছে যেতাম, উনি নিজে গিয়ে নিয়ে আসতেন। মনে হতো ওগুলো ও'র মনের কথা নয়। এখন তো আমার যাবার একটা জায়গা নেই। সেখান থেকে ফিরে আসা যায় না। তাই যাবার ইচ্ছে হলেও যেতে পারি না। মনে হয়, আমাকে ছেড়ে উনি থাকতে পারবেন না। আমি মরলে উনিও বোধহয় আত্মহত্যা করবেন। আমি ও'কে একেবারে বুঝতে পারি না ডাক্তারবাবু। আমাকে না দেখলে অস্থির হন, আবার আমি গায়ে হাত দিলে রাগে ঘেন্নায় শিউরে ওঠেন!

চোখের জল ফেলতে ফেলতে কথাগুলো শেষ করল লিপিকা।

নন্দবাবু নিজেকে বুঝতে পারেন না। তাঁর মনের খবর তাঁর কাছে আসছে না। নন্দবাবুর বন্ধু কিছু বুঝতে পারছে না, তাঁর স্ত্রীও নন্দবাবুর আচরণের বৈপরীত্যে যতটা বাধিত তার থেকে বেশী বিস্মিত। আমিও নন্দবাবুকে বুঝতে গিয়ে বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়েছিলাম।

প্রথমে মনে হয়েছিল নন্দবাবু বোধহয় হিস্টিরিয়ার রোগী। কয়েক সপ্তাহ পরে বুঝলাম হিস্টিরিয়া নয়। হিস্টিরিয়ার রোগী প্রায়ই সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনে সাড়া দিয়ে থাকে। চার-পাঁচ সপ্তাহেই ফল পাওয়া যায়। সেরকম কিছু ফল না পাওয়ায় মনে হয় উন্মাদ রোগে ভুগছেন ভদ্রলোক। ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিসের 'ম্যানিয়াকাল' অর্থাৎ অতি উত্তেজনার অবস্থা চলেছে। এরপর বোধহয় ডিপ্রেসিভ। বিষম অবস্থা আসবে। জোরালো ওষুধেও উত্তেজনাভাব কাটলো না। মাস তিনেক পরে উত্তেজনা কমল ও বিষমতা বাড়লো বটে, কিন্তু ব্যবহারের বা চিন্তার দিক থেকে কোনো বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। এর অনেক আগেই আমি জোরালো নিদ্রাকর ওষুধগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর একদিক বিচার করলে একে এম-ডি-পি (ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ) বলা চলে না। স্ত্রীর সঙ্গেই ব্যবহারে বা আচরণেই যা কিছু বৈপরীত্য, অফিসে বা সমাজে মোটামুটি স্বাভাবিক। ম্যানিয়াকদের আচরণ সাধারণত একরকম হয় না। তাদের হঠকারী আচরণ সব জায়গাতেই প্রকাশ পায়। এর আগেও দেখা গেছে নিজের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারেই নন্দবাবুর যা কিছু অসংগতি। সমাজে স্বাভাবিক। এখন যে বিষমতা দেখা দিয়েছে সেটা অভিভাবনের প্রতিক্রিয়া। স্ত্রীর উপর ক্রোধ প্রকাশ করা অযৌক্তিক ও অন্যায়; এই ধরণের অভিভাবন তাকে দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী তাঁর কোনো ক্ষতি করেননি, তিনি তাঁকে ঠকাননি, তিনি তাঁকে ভালবাসেন, এই ধরণের অভিভাবন নির্দেশ তাকে শোনানো হয়েছে, ফলে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু মনের বিরাগ বা বিতৃষ্ণা কাটেনি, কাজেই বিষমতা দেখা দিয়েছে।

এরপর কয়েকদিন আলোচনা অন্য পথে চলল। পরিবার-বিদ্বেষ ও স্ত্রীর প্রতি অদ্ভুত আচরণের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা অন্য ভাবে করলাম। আংশিক ফল পাওয়া গেল। নিজের অসংগত ভাবনা-চিন্তা ও ব্যবহারের খানিকটা ব্যাখ্যা যেন খুঁজে পেলেন নন্দবাবু।

নন্দবাবু নিউরোটিক, সাইকোটিক (উন্মাদ) নন। নিউরোসিসের মূলে তাঁর বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা থেকে তাঁর ব্যবহারের অসংগতি, চিন্তা-ভাবনার বৈপরীত্য।

তাঁর পিতার ব্যবহার, পরিবারের অনাদার, পরিবার থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এর জন্যে কতটা দায়ী তাঁদের মানসিকতা আর কতটা দায়ী তাঁদের আর্থিক অবস্থা, সেকথা সঠিকভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়: লেখা-পড়া শিখব, মানুষ হব, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করব, এই ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমাজের আর পাঁচজনের মত নন্দবাবুও এই আকাঙ্ক্ষা শৈশব থেকে পোষণ করে এসেছেন। শৈশবে কৈশোরে অনুভব করেছেন, এই সমাজের সংগে সংযুক্ত হতে হলে, এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, প্রয়োজন বাক্তিসম্পদ ও প্রতিপত্তি। গৃহ, পরিবার, সমাজ তিনি পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছেন, প্রতিপত্তি লাভ করে এই সমাজে ফিরে যাবেন বলে। কোলকাতায় কৃচ্ছ্রসাধন করে সম্পদ ও প্রতিপত্তি আহরণের চেষ্টা করেছেন। নাগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ অসম্ভব জেনে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন সমাজ থেকে। যত বিচ্ছিন্নতা বোধ বেড়েছে, তত তীব্র হয়েছে সংযুক্তি বাসনা। বাবা-মা পরিবারের কোলকাতায় এলে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। সমাজ না হোক, পরিবারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ মিলেছে। কিন্তু আকর্ষণের থেকে বিকর্ষণ জোরালো হওয়ায় পরিবার থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। আউটসাইডার থেকে ইনসাইডার হবার চেষ্টা এরপর অন্য দিক দিয়ে সুরু হলো। বিয়ে করে ঘর বেঁধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। এইবার আরম্ভ হল দুই বিপরীত মনোবৃত্তির কঠোর সংঘাত। একদিকে প্রেম ও স্নেহের বন্ধনের কাছে আত্মসমর্পণের আকুতি অন্যদিকে বন্ধনভীতি। ফলে এই বিপরীত আবেগ ও অদ্ভুত ব্যবহার। লেখাপড়া জানা সুন্দরী শহুরে মেয়ে বিয়ে না করে লিপিকাকে বিয়ে করার কারণ কি? দুটি কারণ থাকতে পারে। এক: সুন্দরী শিক্ষিতা শহুরে মেয়ের আকর্ষণে পরিবার-প্রীতি ও সমাজসংযুক্তি ফিরে পাবার সম্ভাবনা বেশী; তাঁর মধ্যেকার আউটসাইডার সংযুক্তি চায় না, তাই তিনি লিপিকাকে বিয়ে করেছেন। দুই: এই শহরের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা নেই, কাজেই শহুরে সোফিস্টিকেটেড সোসাইটি রিজেক্টও করে তিনি গ্রাম্য সমাজের সরল মেয়েটিকে ঘরণী করে—শৈশব কৈশোরের গ্রামীণ পরিবেশের সংগে সংযুক্তি চেয়েছিলেন।

কয়েক বছর বাদে নন্দবাবুর সংগে দেখা হয়েছিল। ওষুধ ছাড়াই ঘুম হয়, কাপ-ডিস ভাঙতে হয় না, দুটি সন্তানের জনক হয়েছেন। মেজাজ শান্ত থাকে, একটু বেশী বেশ শান্ত। বিষমতা কাটেনি। বিষমতা যখন বাড়ে তখন ঘরের দরোজা জানলা বন্ধ করে বাঁশী বাজান। পরিবারের সংগে খানিকটা সংযুক্তি ঘটেছে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ থেকে এখনও তিনি বিচ্ছিন্ন। তবে মনের খবর এখন কিছু কিছু তাঁর কাছে আসছে।

—ধন্বন্তরি

ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক নূতন অধ্যায়

নরনারীর যৌন চরিত্রে রাশি লগ্নের প্রভাব ও যোটক বিচার

জানুন পড়ুন ও বিবাহিত জীবন সুখী করুন।

প্রখ্যাত আবিষ্কারক জ্যোতির্বিদ শ্রীযুক্তের গোস্বামীর গবেষণালব্ধ অভিনব এই পুস্তক (বর্তমান মহাপুরুষের আলোচনাসহ যুক্ত)।

মূল্য—১২ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশক

জ্যোতিষ কার্যালয়

১।২এ, নীলাম্বর মুখার্জী স্ট্রীট (কাঁকুড়গাছি), কলিকাতা-৪

মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

যদুনাথ লাইব্রেরী

১১৫।১এ, বিধান সরণী, কলি-৬

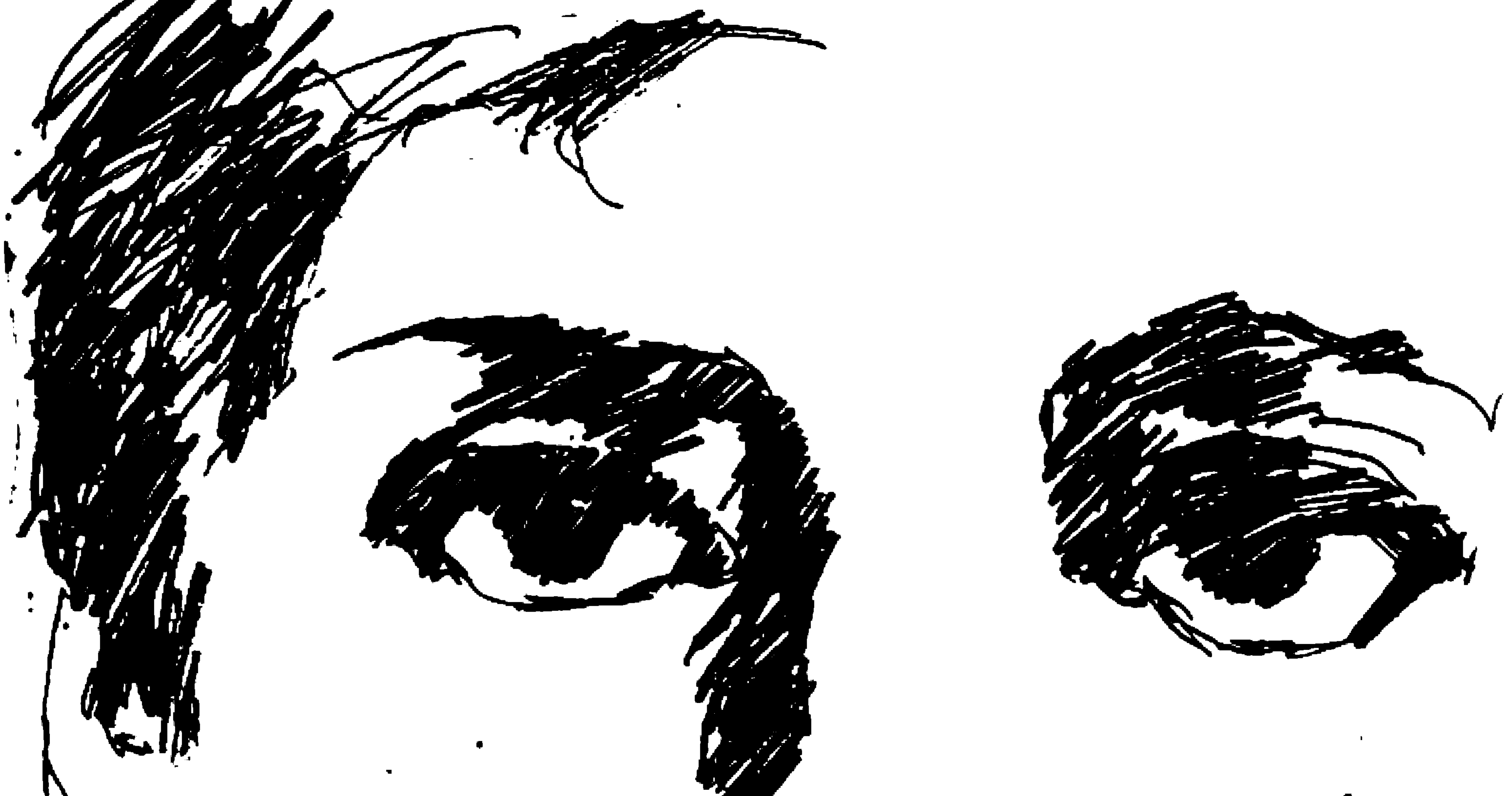

অন্তরে নিহিত

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক দিন হয়ে গেল, ঠিক এমন ভোরে হঠাৎ সাড়ে চার কি পৌনে পাঁচটা নাগাদ আমার ঘুম এভাবে ভেঙে যায়নি। 'চোর চোর'—এই শব্দ দুটোর সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গের যোগসূত্র খুঁজে পেয়ে আমি পরবর্তী চিৎকার অনুসরণ করার চেষ্টায় বিশেষ সজাগ হয়েছি। শীতের ভোরের অস্ফুট বা অর্ধাস্ফুট আলোয় একদল ছেলে-ছোকরার সমবেত কণ্ঠের হুঙ্কার ধাবমান কোন তস্করের পিছু নিয়েছে, বুঝতে বিলম্ব হয় না। যারা চোরের পিছনে ছুটেছে তারা কতক্ষণে নাগাল পাবে তার, বা আদৌ পাবে কিনা, এ চিন্তায় অধিকক্ষণ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। কারণ, আমার মনে পড়ে গেছে, অনেকদিন হল, কেউ আমাকে এ সময় দোরে ঘা দিয়ে ডেকে দেয়নি। আমার মা, আমি উঠি বা না-উঠি, দরজায় ঘা দিয়ে যেত একটি বার। মা বার মাস এই একই সময় শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ত। বাবার মৃত্যুর পর প্রায় নিয়মমাফিক পঁচিশ বছর এক নাগাড়ে। বলতে বাধা নেই, আমার এবং আমার স্ত্রীর বিবাহিত জীবন এতে কিঞ্চিৎ বিকম্পিত হতো। দরজায় মা-র করাঘাতের পর আমার স্ত্রীকে প্রায় বলতে শুনেছি, কি যে করেন না তোমার মা। মানে হয় এভাবে ভোর হতে না হতে দরজায় ধাক্কা দেয়া। নিজে উঠবেন উঠুন—ওঁর চোখে ঘুম নেই বলে কি—মার কথাগুলো স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার নিদ্রিত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়েছি। আপাতত সে মুখে আমার মত না কেন, সম্প্রতি যে-চোর আমার নিদ্রাভঙ্গের কারণ, তার বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগের চিহ্ন মাত্র নেই। শীতের শেষ রাত্রির নিদ্রাটুকু নিরুপদ্রব উপভোগ করছে।

আমি স্ত্রীর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার ফলে দ্রুত মন সংযোগ করতে পেরেছি মা-র স্মৃতিতে। বিশেষ করে বাবার মৃত্যুর পর যে পঁচিশ বছর সেই সময়টা। বাবার মৃত্যুর আগে, অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায় মাকে আমি যে-রকমই দেখে থাকি না কেন, ভাল-মন্দ কোন কিছুই আমার স্মরণ করার বাসনা জাগে না। মা-র জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি স্বাচ্ছন্দ্যের যত বড় অধ্যায় হোক না কেন সেটা, আমার কাছে যথার্থ স্মরণীয় হল বৈধব্য থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের ঘটনাটি পর্যন্ত। মা-র নারী-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়, যা আমার কাছে নিঃসংশয়ে সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

আমার যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি কোন কালে আদৌ হতে পারে কিনা, এ বিষয়ে আমার মা-র মনে সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ ছিল। কিন্তু মোটামুটি বড় হওয়ার পর আমি বুঝেছি, আমাকে বিশেষ বিশেষ কয়েকটা ব্যাপার ছাড়া প্রায় নানা ব্যাপারেই মা প্রশ্রয় দিতে রাজী আছে।

মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায়, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে অন্তরঙ্গ হওয়া, মা-র আপত্তির কারণ কিছু নেই। কিন্তু পাকাপাকি কোন বন্দোবস্তে আসা মা বরদাস্ত করতে পারে না: সেখানে আমি মা-র

কর্তৃত্বচ্যুত, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীনে একটি মেয়ের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসব, এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ করব মার সঙ্গে আমার সম্পর্কের যে-মূল্য প্রায় ততোধিক মূল্য আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সামান্য কদিনের সম্পর্কের। মা এই নিতান্ত সাম্প্রতিক সম্পর্কের মর্যাদা নির্দ্বিধায় গ্রহণে অনিচ্ছুক। সেই রকম আমার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও মার কোন রকম নিষেধাজ্ঞা ছিল না, কিন্তু পুলিশী হামলায় জড়িয়ে পড়া বা কোন রকম শারীরিক জখম ক্ষতির মুখোমুখি হওয়া, মার অনুমোদন পেতে পারে না।

অতএব আমি যখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্তে এলাম তখন মার মানসিক পরিবর্তন প্রথম প্রথম ধরতে না-পারলেও পরে পারলাম। আমি জীবনে দ্বিধাবিভক্ত হব না, ঠিক এমনটা হয়তো মার কাম্য নয়, তবু পাকাপাকি সংসারী হিসেবে নিজের নাম লেখালাম, এও বুঝি মনঃপূত নয়। এবং এ মার জীবনযাত্রায় দ্বিতীয় ধারায়, অর্থাৎ আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায়, একধরনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিসান্নিধ্যে বিশেষ উৎসাহী হল। মার প্রচেষ্টা অনেকটা এরকম ছিল, মনে রেখো, আমার কর্তৃত্বচ্যুত হয়ে থাকতে চাইলেও তোমাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। কারণ পরোক্ষে তোমার স্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনেই আমাকে যেতে হচ্ছে। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। অতএব হালের এই নতুন সম্পর্ক যতই তোমার কাছে বড় হোক, আমি তোমার এ সম্পর্কের ওপর চোখ রাখব, প্রয়োজনবোধে ছোটখাটো বিঘ্নোৎপাদনেও সচেষ্ট হব।

জোরে দরজায় আঘাত করা মার এমনই ইচ্ছের একটি দৃষ্টান্ত হয় তো। আমি জোর-জোর উঠে পড়ার সঙ্গে তোমরাও উঠে পড়বে, রাত্রির চতুর্থ প্রহরে যে-সব উপায় অবলম্বনে তোমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় করার প্রয়াসী, আমার এই ধরনের কাজে মাঝে-মধ্যে সে সবে বাধা পাবে, মার অনুচ্চারিত বক্তব্য হয়তো এইটাই। মেয়ে-মানুষের কোন অভিসন্ধি হয়তো মেয়ে-মানুষের চোখেই বেশি ধরা পড়ে। সম্ভবত আমার মার অভিপ্রায় আমার স্ত্রীর কাছেই স্পষ্ট হয়ে থাকবে। তাই স্ত্রীর জড়ানো গলার কণ্ঠ তখন সরব: ওর চোখে ঘুম নেই বলে কি—আমি যত বলতে গেছি, মার ওটা বারমাসের অভ্যেস, আমার স্ত্রী আমার মুখ চাপা দিয়ে বলেছে, রাখো রাখো তোমার অভ্যেস—আমি কিছু বুঝি না, না? কি বোঝে না, তা আর আমার জিজ্ঞাসা করা সম্ভব নয়। যা জিজ্ঞাসা করলেও আমার মতলব মার মতলবের মতো ধরে ফেলবে কিনা কে জানে।

যাই হোক এ মুহূর্তে ওসব বিতর্কের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমার স্ত্রী, আমি নিশ্চিত জানি, আরও ঘন্টাখানেক অন্তত এমন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে বিছানায় পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত কালীর মা, অর্থাৎ ঝি-বিন্দুবাসিনী এসে হাঁক পাড়বে, রান্নাঘরের চাবি দাও গো বৌদি। আর সেই হেতু, আমি আমার মার গত পঁচিশ বছরের জীবন-অধ্যায় থেকে খুশি মতো বাছা বাছা ঘটনা নির্বাচন করে, সেগুলোকে ইচ্ছা মতো আগে পরে সাজিয়ে, মার একটা ইমেজ মনে ফিরিয়ে আনতে পারি; অন্তত ফিরিয়ে আনার একটা হঠাৎ সুযোগ মিলেছে, যেন মা এই মাত্র দরজায় আঘাত করে গেল আমার ঘুম ভাঙাতে।

বাবার মৃত্যুর পর, পুরনো দিনের কথা প্রসঙ্গে মাকে যে ঘটনার একাধিক উল্লেখ করতে শুনেছি তা এই। মা বলেছে, বাবার সঙ্গে মার বিয়েটা নিতান্ত আকস্মিক কোন ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। কারণ বাবা তখন একটা একশো টাকা মাইনের সার্ভে ডিপার্টমেন্টের সামান্য চাকুরে ছিলেন, অথচ কন্যাপক্ষ নগদ দিয়েছিল তিনটি হাজার টাকা। মা-কে এ প্রসঙ্গে তাচ্ছিল্যভরে বলতে শুনেছি, তোদের চব্বিশ পরগণার ওই বাস্তু ভিটেখানা ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়েছিল। তারপর বলেছে, কোন বড়লোক পরিবারের সুপুরুষ এক পাত্রের সঙ্গেই বিয়েটা হয়ে যাচ্ছিল প্রায়; নেহাৎ পাত্রের স্বভাব-চরিত্র তেমন সুবিধের নয় বলেই শেষ পর্যন্ত আটকে গেল। মার ক্ষোভের কারণ কোথায় সঠিক সন্ধান করতে না পারলেও, অনুমান করার চেষ্টা করেছি। এবং মাকে হাসিমুখে বলার চেষ্টা করেছি, তোমার উপাধি তা হলে ঘোষালই হতে পারত বল?

অনেকদিন এমন কিছু বলতে গেছি, এই অপরাধে মা দুখানি চোখ পাকিয়ে থামিয়ে দিত। শাসনের বাধা অনেক মুহূর্তে কাটিয়ে উঠে বলেছি, তা বললে চলবে কেন মা, একজনের লোকসানেই তো আরেকজনের লাভ। আর তা ছাড়া তোমার লাভের চেয়ে বাবার লাভটাই বেশি দরকার। ভেবে দেখ, একশো টাকার চাকরি মোটে।

মা একটা কান আস্তে নেড়ে দিয়ে বলত, খুব রসের কথা শিখেছ না? না বলে পারলাম না, এই বাস্তু ভিটেখানা ছিল বলেই বিয়েটা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু, যাই বল।

এই ঘটনার উল্লেখ ছাড়া, দ্বিতীয় যে ঘটনার উল্লেখ মার মুখে প্রায় শোনা যেত তা হল, ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় মার বাবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি। মার মুখ থেকে শৈশবের রাজকীয় জীবনযাত্রার গল্প হাঁ করে শুনতাম, এমন দুর্দান্ত শৈশবকালের জন্যে মার মুখ থেকে ক্ষোভের নানা অভিযোগ প্রকাশ পেত। দরবার কখন কখন কী ভাবে সমারোহে কাটত তার নানা বিবরণ। আর্দালি চাপরাশি এরা সব আদেশের অপেক্ষায় সদা ব্যস্ত-সমস্ত। আমি শ্রোতা হিসেবে তন্ময় হয়ে শুনতাম। ভাবতাম, আমার মার এমন শৈশব ছিল বিশ্বাস করা যায় না। এই ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় মার উনচল্লিশ বছর বয়সে বিনা চিকিৎসায় মার বাবা মারা যান। বড় ডাক্তার কাউকে সে সময় এ অঞ্চলে পাওয়া যায়নি। কলকাতা থেকে নামজাদা একজন ডাক্তার এসেছিলেন বটে। কিন্তু তিনি এসে পৌঁছবার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। সেকালে বাংলার ছোটলাট মার মাকে শোক প্রকাশ করে পত্র দিয়েছেন। শোকাবহ মৃত্যুর পর এমন সম্মানীয় পুরস্কারের কথা মা কিছুতেই ভুলতে পারত না। এবং এর পরেই মার ক্ষোভদুঃখের কারণ কিঞ্চিৎ প্রকাশ হতো। কেন হতো তাও বলতে পারতাম, যখন মা ঠিক এরপরই বাবার সঙ্গে বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকের আর্থিক অসচ্ছলতার কথায় আসত। পরে বাবার অসময়ে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে, কপালের দোষ দিয়ে বলত, কী ঘরের মেয়ে ছিলাম রে, কোনদিন ভেবেছিলাম কপালে এই ছিল। আর কথার শেষে, যেন প্রথা মতো, কাপড়ের আঁচলের এক কোণা দিয়ে চোখ মুছত।

বাবার উন্নতি ও খ্যাতির উল্লেখযোগ্য কটি বছরের হিসেব দিতে গিয়ে মা অভাবের কথা শুনে বলত, আটত্রিশ বছর বয়সে বড় চাকরি হল, আর এই পাঁচটা বছর, বেঁচেছিল পেয়েছে না পেয়েছে সব শেষ হয়ে গেল—এখন বাবা যেমন ছিলেন তেমন থাকলেই পারতেন—কপালের আঁচলের কোণায় এ চোখ মুছত।

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি, এখন যদিও রীতিমত তার কথাগুলো, তবে কেন তোমার ক্ষোভ ছিল সার্ভে ডিপার্টমেন্টের একশো টাকার চাকরি কে?

রাজনীতির ছুরিতে বাঙলা দেশ দ্বিখণ্ডিত। মানচিত্রে তার রক্তাক্ত দাগ। কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধে যেখানে বাঙালীর চিত্তলোক, সেখানে বাঙলা ও বাঙালী এক ও অবিভাজ্য।

বাঙালীর প্রাণচেতনার মহাকাব্য

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

পদ্মা আমার গঙ্গা আমার

প্রাপ্তিস্থান : মধুরেণ সিন্ডিকেট, ৬৪।১৩ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা—৩৭　　দাম—৩ টাকা

ভেবে দেখেছি, আসলে মার জোরটা খুবই খাঁটি। নিজে কোন ঘরের মেয়ে এটা মা কিছুতেই ভুলতে পারত না, আর সে কারণে বাবার সামাজিক মর্যাদা মার বিশেষ জানা ছিল। বাবার দীর্ঘায়ু সম্পর্কে মা সম্ভবত নিঃসংশয় হতে চেয়েছিল।

ভোর বাবার সঙ্গে অনেক লোক চেষ্টা করেছিল চাকরিটার জন্যে। শেষ পর্যন্ত যে হবে কেউ আশা করেনি। আমার তো পছন্দো মানা ছিল। যেদিন সন্ধেবেলা উনি খবর নিয়ে এলেন, মনের যে কী অবস্থা কাউকে—মা এই ভাবে একেবারে শেষে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে ভেঙে পড়ত।

আমি পরে ক্রমে জানলাম এ ঘটনাও মার বিশিষ্ট ঘটনার তালিকায় আছে।

এই প্রশস্ত জোড়ের তালিকায় আমার কর্মজীবনের নানা বার্তা যুক্ত হয়ে মার জীবন ও প্রাণধারণ সম্পর্কিত পরিতৃপ্তিকে কখন হতাশ, কখনও বা অর্থবহ করে তুলেছে। মা আমার বিবাহিত জীবনের অনেক কিছুই সহ্য করতে পারবে না আর, এই আমার স্থির বিশ্বাস হয়ে উঠল।

মা, বাবা ও স্বামী উভয়ের অসময়ে মৃত্যুর জন্যে, স্বভাবতই দুঃখবাদী হয়ে উঠেছিল। মানুষ যে অদৃষ্টের হাতে নেহাতই দুর্বল ক্রীড়নক, এই বিশ্বাসের অধিক প্রাবল্যে মা আমাকে তার বিশ্বাসের বড় অংশ নিতে বাধ্য করেছিল। আমি ক্রমে বুঝতে শিখলাম, জীবনে এই দুঃখবাদকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া মানুষের দ্বিতীয় কোন পথ থাকতে পারে না, বা থাকা উচিত নয়। অতএব ভাগ্যের ব্যাপারে ল' অফ ইনহেরিট্যান্স অবশ্যই মানতে হয়। হয়তো মেয়ে নই বলেই ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হতে পারি। মেয়ে হলে মা অবশ্যই ভাবত দুবার, মেয়েকে পাত্রস্থ করার আগে। আমি ছেলে বলেই কি ব্যাপারটা সম্ভবত ওই ভাবে ওঠেনি? তবে এটুকু বুঝেছি, মার কর্তৃত্বাধীন থেকে অন্য কারও কর্তৃত্বাধীনে যাব এটা বরদাস্ত করতে মার মন সায় দেবে না।

চোরটার কথা ইতিমধ্যে একবারও ভাবিনি তা নয়। বেচারা কি ভেবে ধরা পড়ল?

আমার বিয়ের ব্যাপারটা আমি যখন মোটামুটি ঠিক করে ফেললাম, তখন মার কানে কথাটা তোলা দরকার মনে করলাম যথা সময়ে। বলি-বলি করে বলেই ফেললাম। কারণ আমার ইতস্তত মনোভাব মার কাছে ধরা পড়া অসম্ভব কিছু নয়। মা লক্ষ করে থাকবে আমার আচরণ, কিছু একটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, অথচ মাকে বিশেষভাবে জানি বলেই কোথায় সঙ্কোচ, শঙ্কা।

শুনে মা প্রথমটা যা বলেছিল, ঠিকই বলেছে, তখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন। ভাবলাম বলি, তুমি কি কিছু ঠিক করার কথা ভেবেছ? মুখে বলার মতো ভাষা কিছু না পেয়ে চুপ করে রইলাম।

আমাকে চুপ দেখে মা সহজ কণ্ঠে বলেছে, দেখি, মেয়ের ছবি আছে? বি-এ পাশ করেছে?

বললাম, ফোটো দেখে তোমার কী রকম লাগবে জানি না। তবে লেখাপড়া আমার চেয়ে বেশি করেছে। এম-এ পাশ, কলেজে মাস্টারি করে।

ফোটো এনে মার হাতে দেবার সময়, স্ত্রীর শরীর স্বাস্থ্যের কথা অকপটে বলায় মা আমাকে বেহায়া বা নির্লজ্জ মনে করতেও পারে। মা যদি ভেবে থাকে, অন্যায় করেনি; আমি মেয়েদের তথাকথিত রং মুখশ্রী এসবের চেয়ে দৈহিক গঠন অর্থাৎ স্তন, নিতম্ব, পায়ের গোছ, কোমর বা বাহুর ঊর্ধ্ব নিম্ন ভাগ, এসবের প্রতি বরাবরই বেশি আকৃষ্ট।

মা ছবি রেখে আমার হাতে ফেরৎ দিয়ে বলেছে, তা বিয়েতে কিছু দিতে হবে তো আমাকে। দেবটা কী?

অক্ষমতা যেহেতু আমারই, মার কথার উত্তর দিতে সময় নিয়েছি; ভেবে বলেছি, রেজিস্ট্রি হয়ে যাক, পরে কিছু একটা দিয়ে দিয়ো। মা বলেছে, সেটা তো কোন কথা হল না। বিয়ে করবে জষ্টি মাসে আর গয়না দেব—

আমার হাতে টাকা পয়সা ছিল না। মা নিজের জমানো সামান্য কটা টাকা থেকে একখানা কাপড়ের দাম আমাকে দিয়েছিল। আমার মনে আছে বেশ, সেদিন মার টাকাটা আমার মান-ইজ্জত বাঁচিয়েছিল। রেজিস্ট্রেসনের পর, স্বল্প কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবীর অনুষ্ঠান আয়োজনের শেষে, আমি হ্যান্ডলুম হাউস থেকে স্ত্রীর জন্যে সেদিনের বিশেষ উপলক্ষে একখানা শাড়ি কিনেছিলাম। রেজিস্ট্রেসনের খরচা আমার স্ত্রীই বহন করেছিল।

মাকে একথা পরে বলেছিলাম। মা কপট ক্রোধের ভঙ্গিতে বলেছিল, এমন বিয়ে না করলেই নয়।

অর্থাৎ আমার স্ত্রীর বদান্যতাকে মা কর্তৃত্ব করার মতোই বিচার করেছিল। আমি আমার অযোগ্যতার জন্যে যেমন নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলাম, তেমনই আমার স্ত্রীর পয়লা নম্বর কাজ মার চোখে স্ত্রীর কর্তৃত্ব করার চেহারাটা স্পষ্ট করে তুলেছিল।

মা সেদিনই নিজের সন্দেহ সংশয় যাচাই করেছিল, মার কর্তৃত্বচ্যুত হয়ে স্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে যাওয়ার সূত্রপাত বোধহয় ওইখানেই।

তারপর থেকে দৈনন্দিন ছোটখাটো নানা ব্যাপারেই আমার চোখে ক্রমাগত এটা পরিষ্কার হতে লাগল।

আমি, মার ব্যক্তিগত জীবনের নানা অপূর্ণতার খোঁজ-খবর রেখেছি বলেই, আমার স্ত্রীকে কমপ্রোমাইজ বা এ্যাডজাস্ট করার উপদেশই দিয়ে এসেছি। প্রথমদিকে আমার উপদেশ স্ত্রীর ব্যবহার মারফত কিছু কার্যকরী হলেও, পরে কমপ্রোমাইজ বা এ্যাডজাস্টমেন্টের কোনটাই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হল না। এবং বলতে কি মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী ও মার মধ্যে প্রায় কোল্ড ওয়ার চলতে থাকত। বুঝতে পারতাম আমার স্ত্রীকে কোন শিক্ষা দেবার জন্যে মা আমাকেও এক-আধটু ইঙ্গিত দিতে ছাড়ত না।

মার পক্ষ হয়ে একদিন কিছু বলতে যাওয়ার ফলে স্ত্রীর কর্তৃত্ব চূড়ান্ত প্রকাশ পেল। মার সামনেই প্রায় মারমুখো মূর্তিতে বলে ফেলল, এতই যদি সব ব্যাপারে পিছুটান ছিল তো বিয়ে করার দরকার ছিল কী?

এও জানি এ প্রশ্ন সরাসরি আমাকে করা হলেও, আসল জিজ্ঞাসা মাকে।

আমি বুঝতে পারলাম, মাও বুঝল আস্তে আস্তে, আমি গার্হস্থ্য জীবনে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি, যদিও মা হয়তো চায়নি, আমার ক্ষেত্রে, এমনটা হোক। মেলামেশা আলাপ পরিচয় এক কথা, পাকাপাকি বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র।

আজ ভোরে মার একটা ইমেজ এইভাবে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি যখন তখনই প্রমথর কথা মনে পড়েছে। মার কথা প্রসঙ্গে প্রমথর কথাটা মনে আসা অসঙ্গত কিছু নয়, বিশেষ করে ঠিক এখন এ মুহূর্তে। না-হলে মার ইমেজটাই সম্পূর্ণ হয় না। অন্তত আমি যে-ভাবে করতে চাই।

আমার স্ত্রী ইতিমধ্যে শয্যাত্যাগ করেছে। কাজীর মা অর্থাৎ বিন্দুবাসিনীকে রান্নাঘরের চাবি দিয়ে কলঘরে গেছে। আমি জানি আমার স্ত্রী কলঘরে অনেকক্ষণ থাকবে। আমি সেই সময়ের মধ্যে একটা কেন দুটো সিগারেটও শেষ করতে পারব। অতএব প্রমথর কথা ভাবা শেষ করে আমি মার ইমেজ সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারি।

প্রমথ আমার শৈশব যৌবনের বন্ধু। তারপরে সে আমার বন্ধু থাকেনি, থাকলে আমি আদৌ এভাবে গার্হস্থ্য জীবনে বোনা ফাইড মেম্বর হিসেবে দিব্যি চালিয়ে যেতে পারতাম কিনা যথেষ্ট সন্দেহ।

প্রমথ কৈশোরাবস্থায় মার স্নেহ-প্রীতি-মমত পেয়েছিল। যখন তখন আমাদের বাড়ি আসত। মা ওর নানা আবদার রাখত। আমাকে শাসন করে ওর বুদ্ধিশুদ্ধির তারিফ করত। এবং প্রমথর মতো ছেলে যে আমার বন্ধু, আমি অনুমান করতে পারতাম, এতে মা গর্বিত।

কলেজ জীবনের প্রথমদিকেই প্রমথ রাজনীতি করতে আরম্ভ করে এবং ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেয়। এসব কিছু জানতে পেরে মা আমায় সতর্ক করে দিল। পুলিশী হামলায় জড়িয়ে না পড়ি যেন, শারীরিক জখম ক্ষতির মুখোমুখি না হই যেন।

এই প্রমথ একদিন এক ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে পায়ে বুলেটের চোট খেল। বেশ কয়েক ঘণ্টা পড়েছিল। কেউ দৃকপাত করেনি। সন্ধের দিকে একখানা এ্যাম্বুলেন্স কার দয়া করে এক বেসরকারী হাসপাতালে পৌঁছে দিল। ইতিমধ্যে ক্ষতস্থান থেকে এত রক্তক্ষরণ হয়েছে যে প্রমথ একেবারে নিস্তেজ।

হাসপাতালে খবর আনতে গিয়ে জেনেছিলাম, প্রাণের আশা খুবই কম।

প্রমথ টাল সামলে নিয়ে যখন ফের দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, বুকে জোর পেল, গলা দিয়ে শব্দ বেরুল, তখন মার সঙ্গে দেখা করতে এলে মা বিশ্বাসই করতে পারেনি জ্যান্ত প্রমথকে দেখছে। আমি

মাকে প্রমথর অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে যাই বলি না কেন মা বিশ্বাস করেনি। পরে প্রমথ নিজের পায়ে হেঁটে এসে যখন দাঁড়াল মার সামনে তখন মা তার মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে দেখেছে। অর্থাৎ মা প্রমাণ চেয়েছে, প্রমথ যথার্থ সজীব কিনা?

আমি প্রমথকে এরপর একদিন বললাম, আর হাতে-কলমে রাজনীতি নয়, এবার থেকে একটু দেখে শুনে চল।

শুনে প্রমথ গলা ফাটিয়ে হেসেছিল। বলেছিল, এতো শুধু পায়ে মোটে একটা দাগ—

আরও কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললাম, ওতেই তো হয়ে গিয়েছিল, আর বাহাদুরি কোর না।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে প্রমথ আরও জোর দিয়ে বলেছে, কী করব না করব, সে বিষয়েও তোর পরামর্শ নেবো? এতো শুধু একটা দাগ দেখছিস, এরকম অনেকগুলো দাগ হলেও নড়ছি না এপথ থেকে।

বুঝতে পারি, প্রমথ স্পষ্ট করে বলতে চায় কী।

এরপরে প্রমথ পুলিশী হামলায় জড়িয়ে পড়েছিল। আরও পরে গা ঢাকা দিয়ে বেড়িয়েছে—প্রমথ নাকি আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়ার্কে লিপ্ত। পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে প্রমথ এমন সব কাজ করে বেড়াচ্ছে যা রাজনীতির দিক থেকে ভয়ঙ্কর, আর সরকারী নীতির দিক থেকে বিশেষ গর্হিত। প্রমথর সে সময়কার অবস্থা আমি শখের রাজনীতি দিয়ে কল্পনাও করতে পারি না।

আমার সঙ্গে স্বভাবত প্রমথর ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

মাকে প্রমথর সব কথা বলায় মা প্রমথ সম্পর্কে নতুন করে কিছুই বলেনি, আমার পুরনো সতর্কবাণী স্মরণ করতে বলেছে, শারীরিক জখম ক্ষতির মুখোমুখি না-হই কেন বা পুলিশী হামলায় যেন জড়িয়ে না পড়ি। আমি মাকে প্রমথ সম্পর্কে যেটা বিশ্বাস করতে বলেছিলাম তা হল, প্রমথ এমন বড় একটা ক্ষত খুঁজে বেড়াচ্ছে যেটার সন্ধান পেলে সে সমাজজীবনের মস্ত একটা উপকার করতে পারবে। সেই ক্ষতটা যদি সে সারাতে পারে তো সমাজজীবনের অনেক জঞ্জাল সাফ হবে। আর সে কারণেই বুঝি প্রমথ নিজের শারীরিক জখম ক্ষতির প্রতি উদাসীন।

মা আমার কথা কি ভাবে নিয়েছে তা আমি আর জানার চেষ্টা করিনি, তবে প্রমথর সঙ্গে আমার স্থায়ী বিচ্ছেদে মা আশ্বস্ত হয়েছে।

আজ এই প্রায় ঘন্টাখানেক আগে ছেলে-ছোকরার দল যখন চোরের পেছনে ছুটেছে তখনই প্রমথর কথা ঠিক মাথায় আসেনি। এখন শয্যাত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে মনে হচ্ছে চোরটা কি সমাজ-জীবনের সেই ক্ষত, প্রমথ আজও যা খুঁজে বেড়াচ্ছে?

মনের কাছ থেকে ঠিক সায় পেলাম না। অন্যবার মনে হল অন্য কথা। আমার মনে হয়েছে, বাস্তবিক, চোরটাকে ধরার

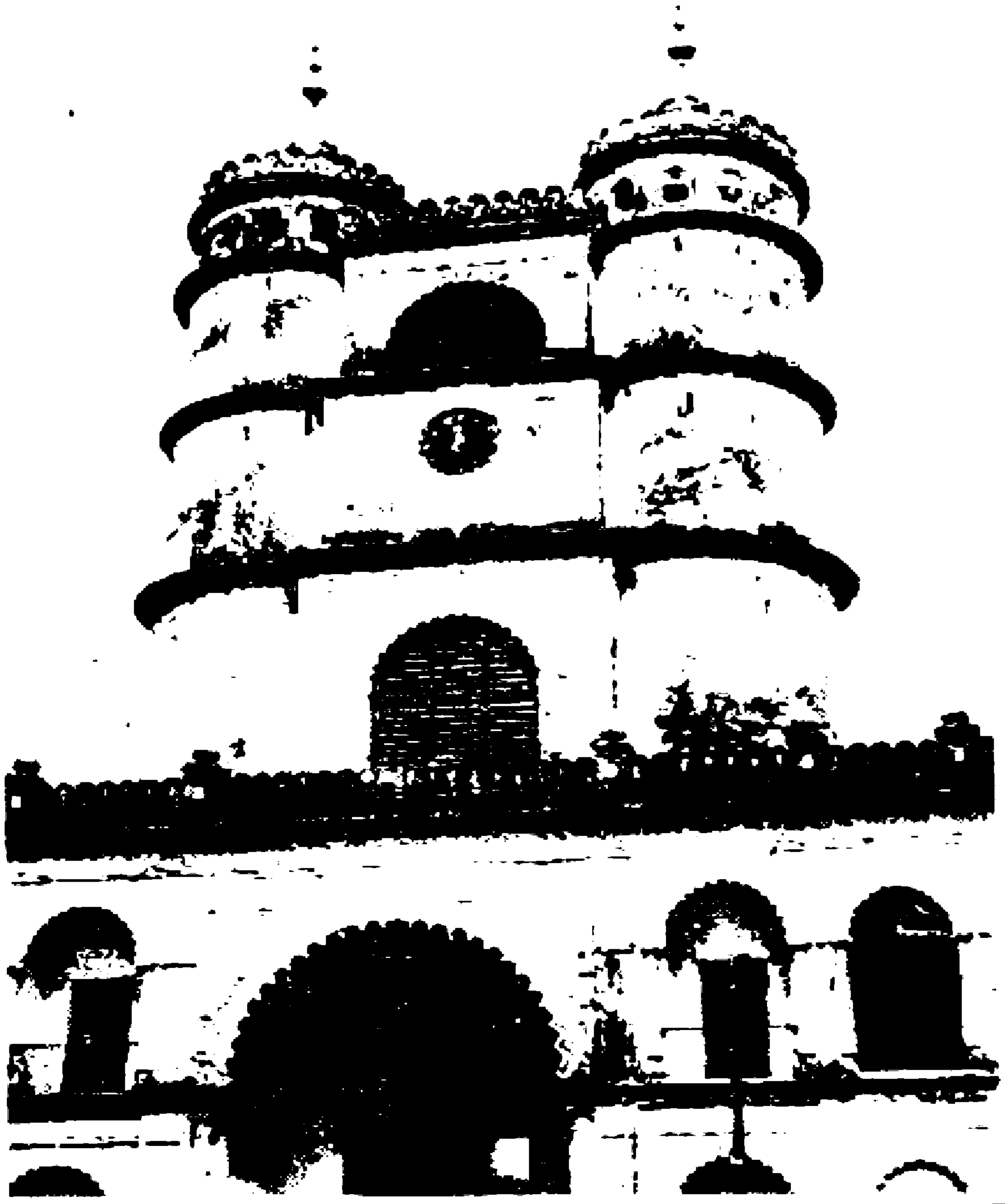

ইমামবাড়ার ঘড়িঘর । ফটো : শীতাংশু মিত্র

মধ্যে ছেলেদের কোনরকম সাফল্যের প্রমাণ মেলে না।

আর আমার ঘন্টাখানেকের এই নিরবচ্ছিন্ন ভাবনায় ছেদ টেনে, ছেলে-ছোকরার দল চোর পাকড়াও করে কণ্ঠের তুমুল আওয়াজে পাড়া কাঁপিয়ে ফিরেছে এইমাত্র।

আমি সত্যি কথা খুশি হইনি চোরটা ধরা পড়ায়।

আমার এ-মুহূর্তের যুক্তি ক্ষত এই। আমি গার্হস্থ্য জীবনে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে মা-র ইচ্ছার বিরোধিতা করেছি, সেই ভাবে প্রমথর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, আমি যদি সৌখিন রাজনীতি ছেড়ে, প্রমথর মতো হাতে-কলমে কিছু করার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠতাম তা হলে মা-র কী বলার বা করার থাকত আদৌ? গার্হস্থ্য জীবনের মতো রাজনৈতিক জীবনেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে আমি মা-র দুটি ইচ্ছারই বিরোধিতা করতে পারতাম।

আমার মনে হচ্ছে, প্রমথর সঙ্গে আমিও খুঁজে বেড়াতাম সেই প্রকাণ্ড ক্ষতটা। ছেলে-ছোকরাদের চোর ধরার চেয়েও, অনেক দরকারী অনুসন্ধান একটা। ঠিক এই সঙ্গে মাথায় এল, কে জানে ওই চোরটাই হয়তো এই ছেলে-ছোকরাদের দলে থেকে একদিন

এই ক্ষতটা কোথায় কী ভাবে দৃষ্টির অগোচরে আছে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে সম্ভবত। চোরটার ধরা পড়া বা তাকে পাকড়াও করা, আমি বরদাস্ত করতে পারছি না।

কয়েকটি মুহূর্ত, সব কিছু বিচ্ছিন্ন আকার নিল। আমার মা, মার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রমথ ও আমার রাজনীতি, প্রমথর প্রতি মা-র আচরণ—আগের ও পরের আমার দিক থেকে মা-র একটি ইচ্ছার বিরোধিতা, আরও একটি ইচ্ছার বিরোধিতা কী ভাবে করা যেত তারই মনগড়া পরিকল্পনা।

আমাকে শয্যা ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে, স্ত্রীর উচ্চকণ্ঠে হাঁক কানে এসেছে। আমি বুঝতে পারি অনতিবিলম্বে এবার উঠতে হয়। আমার আলস্যের যৌথ সাংসারিক জীবনে এ-বাবদ নানা বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়েছে।

শয্যাত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে আমি নিশ্চিত হয়েছি, আরও একটিবার চোরটা অন্তত আজ সকালে ধরা না পড়লেই ভাল ছিল। কেন জানি মনে হচ্ছে, মা-র ইচ্ছাটা ঠিক সম্পূর্ণ হল না। অন্তত আমি যে ভাবে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলাম।

বিজ্ঞানের কথা

সমুদ্রের নিচে মানুষ

ষাটের দশকে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, সমুদ্রের তলদেশকেও মানুষ জয় করতে চলেছে। শুধু মহাকাশ নয়, সমুদ্রের তলদেশ অভিযানেও এই সময়ে বড়ো রকমের সাফল্য অর্জিত হয়েছিল।

'ট্রিয়েস্ত' নামে একটি বাথিস্কেফে (সমুদ্রের গভীরে যাবার যান্ত্রিক আয়োজন সমন্বিত গোলক)। মার্কিন নৌবাহিনীর পিকার্ড ও ডন ওয়ালশ সমুদ্রের নিচে ৩৫,০০০ ফুট ডুব দিয়েছিলেন। শুধু গভীরে যাওয়াতে নয়, সমুদ্রের নিচে আবাসে দীর্ঘসময় কাটিয়ে আসার ক্ষেত্রেও এই সময়ে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এমন কথা শোনা যাচ্ছিল যে, সমুদ্রের নিচে মনুষ্যবাসের উপযোগী শহর গড়ে উঠতে আর বড়ো দেরি নেই, দশকের মধ্যেই সমুদ্রের তলদেশের নিঃসীম অন্ধকার ঝলমল করে উঠবে শহরের আলোয়, ঝকঝক করে চলতে শুরু করবে সমুদ্রের নিচে মোটর, পাম্প, পাওয়ার স্টেশন, খনি, মাছের কারখানা, রাসায়নিক প্লান্ট ও পরিবহণ ব্যবস্থা। আর সমুদ্রের তলদেশে মানুষের চলাফেরা শুরু হবে মাছের মতোই স্বচ্ছন্দে। এসব কথা এমনভাবে বলা হচ্ছিল যেন এশিয়ায় বা আফ্রিকায় যেমনভাবে বসতি স্থাপিত হয়েছে তেমনিভাবেই সমুদ্রের তলদেশেও হতে চলেছে। একদিকে ছিল মহাকাশ জয়ের তৎপরতা, অন্যদিকে সমুদ্রের তলদেশ জয়ের। একটি আউটার স্পেস, অন্যটি ইনার স্পেস। উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য ছিল এত চমকপ্রদ যে, অনায়াসে বিশ্বাস করা যাচ্ছিল যে, আউটার ও ইনার দুই স্পেসেই মানুষের বিজয়কেতন উড়তে চলেছে। কিন্তু সত্তরের দশকে এসে বোঝা যাচ্ছে বসতি স্থাপনের সাফল্য এখনো দূরে। আউটার স্পেসেই হোক বা ইনার স্পেসেই হোক, মানুষের বসতি গড়ে তোলাটা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। সত্তরের দশকেও এই দুটি কাজ সম্পন্ন হবে তা বিজ্ঞানীরা বলেন না, অন্তত সমুদ্রের তলদেশে বসতি গড়ে তোলা তো নয়ই।

সমুদ্রের তলদেশে অভিযানের ব্যাপারে আপাতত কোনো তৎপরতাও নেই। মার্কিন নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশে কোনো অভিযান হচ্ছে না। ব্রিটিশ নৌবাহিনী গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে অনাগ্রহী। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীদের গবেষণা এখনো চলছে, তবে সত্তর দশকের মধ্যে চমকপ্রদ কিছু ঘটবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী তাঁরাও করেননি।

স্থলপৃষ্ঠের জীব মানুষ সমুদ্রের নিচে ডেরা বাঁধতে যায় কোন অবস্থায়? নিছক রোমাঞ্চকর কিছু একটা করে ফেলার বাসনা যদি না থাকে তো স্বেচ্ছায় কখনো নয়। চাপে পড়লে বা মোটা রকমের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও তবেই। কেন না, সমুদ্রের তলদেশের জীবন খুবই কষ্টসাধ্য ও খুবই বিপজ্জনক। তাছাড়া সমুদ্রের নিচে সামান্য ধরনের যান্ত্রিক আয়োজন বজায় রাখার খরচও অবিশ্বাস্য রকমের বেশি।

তা সত্ত্বেও দুদিক থেকে সমুদ্রের নিচে অভিযান চালাবার তাগিদ থেকে যায় বাণিজ্যিক ও সামরিক। তবে অভিযান যেদিক থেকেই হোক নজর রাখতে হয় সমুদ্রের নিচে কাটিয়ে আসার সময় যেন সবচেয়ে কম হয়। মহাকাশ অভিযানে যেমন নজর রাখতে হয় উৎক্ষিপ্ত ওজন যথাসম্ভব কম রাখার দিকে।

বাণিজ্যিক দিকটি, বিশেষ করে তৈল শিল্পের দিকটি দেখা যাক। সমুদ্রের নিচে তৈলকূপ খনন ও সংরক্ষণের উপায় প্রধানত মঞ্চ বা জাহাজ থেকে কিংবা সমুদ্রের তলদেশে দূরনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি থেকে কিংবা সমুদ্রের তলদেশে মনুষ্য-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি থেকে। এখনো পর্যন্ত ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ ফুট পর্যন্ত গভীর সমস্ত ব্যবসায়িক তৈলকূপ খনন করা হয়েছে মঞ্চ বা জাহাজ থেকে। ১০০ ফুট পর্যন্ত গভীর তৈলকূপ দূর-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে খনন করা যেতে পারে।

খননকার্য শেষ হবার পরে ডুবুরীর সাহায্য নিয়ে পাইপ, ভাল্ভ ইত্যাদি লাগানো হয় ও তৈলকূপের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। মঞ্চ তদারক করা ও ঠিকঠাক রাখার কাজটিও তারাই সম্পন্ন করে। তৈলের যন্ত্রপাতি ও পাইপ লাইন তদারক করার জন্যে ডুবো-আধারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এই উপায়টি এখনো পর্যন্ত পরীক্ষামূলক। ডুবো-আধার ব্যবহার করার অসুবিধেও অনেক, খরচও বেশি। তৈলের খনি অনুসন্ধানের জন্যে গভীর সমুদ্রের দিকে যেতে হলে মঞ্চ খাড়া করার খরচও অনুপাতে বেড়ে চলে। এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩০০ ফুট গভীরতায় তৈলকূপ খনন করা হয়েছে। হিসেব করে দেখা হয়েছে, আরো গভীরে যেতে হলে মঞ্চ খাড়া করার চেয়ে সমস্ত আয়োজনটি সমুদ্রতলে গড়ে তোলাতেই খরচ অপেক্ষাকৃত কম। গত পাঁচ বছরে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে সমুদ্রতলের আয়োজন সমেত তৈলকূপ খনন করা হয়েছে মোট ত্রিশটি! দশটির কাজ পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এই তৈলকূপগুলি এমনভাবে তৈরী যাতে ডুবুরীদের সাহায্য কখনো না নিতে হয়। তবে কখনো কোনো মেরামতের প্রয়োজন হলে ডুবুরী ছাড়া গতি নেই। তবে সব সময়েই চেষ্টা থাকে এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যা স্বয়ংচালিত, যা চালু রাখার জন্যে মানুষকে হাত লাগাতে হয় না। এটা দরকার নিরাপত্তার জন্যে তো বটেই, খরচ কমাবার জন্যেও।

একজন ডুবুরী তার জলের নিচের আবাস থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং মনে

করা যাক, ৬০০ ফুট গভীরে সাঁতার কাটছে। এ অবস্থায় তাকে অক্সিজেন সরবরাহের জন্যে নির্ভর করতে হয় একটি টিউবের ওপরে বা সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সমন্বিত একটি ট্যাংকের ওপরে। এই আয়োজনে কোথাও সামান্য ত্রুটি ঘটলেই ডুবুরীর প্রাণ সংশয়, তখন তার পক্ষে জলের ওপরে ভেসে ওঠা এক অসম্ভব ব্যাপার। প্রাণ বাঁচাতে হলে, নিশ্বাস বন্ধ করে একজন মানুষের পক্ষে যতোক্ষণ থাকা সম্ভব মাত্র ততোটুকু সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ বড়ো জোর মিনিটখানেকের মধ্যে ত্রুটিটুকু সারিয়ে নিতে হবে। অন্য উপায়, জলের নিচের আবাস থেকে সে যদি বেশি দূরে এসে না থাকে, ত্রুটি দেখা দেওয়া মাত্রই আবার আবাসে ফিরে যাওয়া। বেশি দূরে এসে থাকলে এই উপায়টিও বন্ধ। অসহায় মৃত্যু ছাড়া তখন আর কোনো পথ নেই। সমুদ্রের নিচের আবাস থেকে দূরে এসে যে ডুবুরী সাঁতার কাটছে তার অবস্থা টেস্ট পাইলট বা নভশ্চরের অবস্থার চেয়েও অনেক বেশি সঙ্গিন। সমুদ্রের তলদেশের তৈলকূপে প্রয়োজনীয় কাজ সারবার জন্যে কি-ভাবে ডুবুরী নামানো যায়, কি-ভাবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা যায়, এসব নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিতে প্রচুর গবেষণা চলছে। এখনো পর্যন্ত এমন কোনো ব্যবস্থার কথা শোনা যায়নি যেখানে জলের নিচের আবাসটি হবে সম্পূর্ণরূপে স্ব-নির্ভর, জলের ওপরের কোনো সহায়ক ব্যবস্থা ছাড়াই সেটি চালু থাকতে পারবে। জলের নিচের আবাসকে প্রকৃতই স্ব-নির্ভর করতে হলে যে—পরিমাণ বাড়তি শক্তির আয়োজন করতে হয় তা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ।

তবে যে-সব তৈলকূপ তীরের কাছাকাছি সেখানে জলের ওপরের সহায়ক ব্যবস্থা বজায় রাখাটাই সবদিক থেকে সুবিধের। তবে তৈলকূপ যদি ৬০০ ফুটেরও বেশি গভীরে হয়, তীর থেকে তার দূরত্ব যদি হয় ৫০ মাইলেরও বেশি, তাহলে যতোই স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংচালিত ব্যবস্থা হোক না কেন তৈলকূপের তদারকীর জন্যে স্থায়ী একদল ডুবুরী নিযুক্ত রাখতেই হয়। তাদের জন্যে অবশ্যই চাই উপযুক্ত আয়োজন সমেত জলের নিচের উপযুক্ত আবাস।

তবে তৈলকূপ যদি হয় ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ ফুট গভীরে তাহলে আর ডুবুরী ব্যবহার করা চলে না। অতখানি গভীরে আবাস তৈরি করার মতো আয়োজন এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অদূর-ভবিষ্যতে হয়তো হবেও না, অন্তত এই দশকে নয়।

কথাটা উঠছে আবাস তৈরি করার প্রসঙ্গে। নইলে পনেরো থেকে কুড়ি হাজার কেন, এখনকার ডুবোজাহাজেই ছ' থেকে আট হাজার ফুট গভীরে অভিযান চালানো যেতে পারে, বাথিস্কোপে তো সমুদ্রের একেবারে তলদেশ পর্যন্ত। লক্ষ্য করবার বিষয়, যতো উপায় ও আয়োজনের কথা বলা হল সবই একজন বা দুজন বা অল্প কয়েকজন লোকের অল্প কিছুদিন সমুদ্রের নিচে কাটিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু যদি বলা হয়, সমুদ্রতলে এমন একটি শহর গড়ে তোলা সম্ভব যেখানে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে নিশ্চিত নিরাপদ জীবন কাটাতে পারবে তাহলে স্বপ্ন ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করা হয়। এমন একটি শহর এখনো পর্যন্ত তৈরি হয়নি, তৈরি করতে বাস্তব অসুবিধে কিছু নেই এমন কথাও কেউ বলছেন না, কোনো কালে তৈরি হবে কোনো দিন এমন কথাও আজকের দিনে বলা যায় কিনা সন্দেহ, অন্তত এই দশকের মধ্যে তো নয়।

গভীর সমুদ্রের সম্পদ আহরণ

সমুদ্রের তলদেশ থেকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণের শিল্পটি ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে তো অন্যান্য খনিজ পদার্থেরও অভাব নেই। সেগুলো কী পরিমাণে আহৃত হচ্ছে?

প্রতি বছরে সমুদ্রের তলদেশ থেকে যে পরিমাণ খনিজ পদার্থ আহরিত হয়ে থাকে মূল্য হিসেব করে দেখা হয়েছে প্রায় ২০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। কিন্তু গত কয়েক বছরে এক্ষেত্রে কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি। অন্যদিকে বিশ্বের মোট উৎপন্ন তেলের ১৭ শতাংশ (দৈনিক প্রায় ৬০ লক্ষ ব্যারেল) এবং বিশ্বের মোট উৎপন্ন প্রাকৃতিক গ্যাসের ৬ শতাংশ পাওয়া যাচ্ছে সমুদ্রের তলদেশ থেকে।

সমুদ্রের খনিজ পদার্থ আহরণে প্রধান অসুবিধে আহরণের ক্ষেত্র খুঁজে বার করায়। নানা উপায় ও পদ্ধতির কথা শোনা যাচ্ছে, এই প্রাথমিক অসুবিধে দূর হলে সমুদ্রতল থেকে খনিজ পদার্থ আহরণে অবশ্যই আরো তৎপরতা লক্ষ্য করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে বলা হয়, সমুদ্র হচ্ছে জৈব পদার্থের এক অফুরন্ত উৎস, এই জৈব পদার্থ ঠিকমতো ব্যবহৃত হলে ভবিষ্যতের খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করা হবে। কথাগুলো সবই ঠিক কিন্তু সমুদ্রের জৈব পদার্থ ব্যবহার করার অবস্থায় পৌঁছানো এতই শক্ত ব্যাপার যে আপাতত তাতে মানুষের হাত পড়ার বিশেষ সম্ভাবনা নেই।

সমুদ্রের জৈব পদার্থের কতখানি অংশ মানুষ ব্যবহার করতে পারছে সে সম্পর্কে একটা হিসেব দেওয়া চলে। সমুদ্রের জৈব পদার্থ বলতে আমরা হিসেব নেব সমুদ্রের জৈব পদার্থের বাৎসরিক প্রাথমিক উৎপাদনের। অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থে প্রাথমিক উৎপাদনটি ঘটিয়ে থাকে উদ্ভিদ, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে। সমুদ্রের উদ্ভিদ বলতে আমরা বুঝি বিন্দু বিন্দু ভাসমান শৈবাল ইত্যাদি। মোটামুটি হিসেবে সমুদ্রে প্রতি বছরে জৈব পদার্থের প্রাথমিক উৎপাদনের পরিমাণ ১৩,০০০ কোটি টন। আর সমুদ্র থেকে মানুষ প্রতি বছরে মাছ ধরে থাকে প্রায় ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন। অর্থাৎ, সমুদ্রের জৈব পদার্থ মানুষ ব্যবহার করে থাকে বাৎসরিক প্রাথমিক উৎপাদনের দু-হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। সমুদ্রের জৈব পদার্থ আরো বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার উপায় নিয়েও নানা ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে, কিন্তু এ-ব্যাপারটিও বড়ো সহজ নয়।

বিজ্ঞান-পত্রিকা 'গবেষণা'

বিজ্ঞান সংস্থার মুখপত্র হিসেবে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে, পরিচালনায় আছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের ও বৈজ্ঞানিক সংস্থার কয়েকজন বিজ্ঞানের ছাত্র ও তরুণ গবেষক। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই বিজ্ঞান-পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যাটি আমাদের হাতে এসেছে। প্রচেষ্টাটি আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় দুঃসাহসিক। কিন্তু পত্রিকাটি যে প্রকাশিত হয়ে চলেছে তাতে বোঝা যায় বৈজ্ঞানিক বিষয়েও বাঙালী পাঠকের আগ্রহ কম নয়। পত্রিকার তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিভাগ : সম্পাদকীয় সংবাদ ও ভাষা এবং সাময়িক সংবাদ। তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণামূলক প্রবন্ধ পত্রিকাটির বিশেষ সম্পদ। এমন একটি পত্রিকা প্রকাশ করার জন্যে বাঙালী পাঠক বিজ্ঞান সংস্থার কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবেন।

—অয়স্কান্ত

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শিল্পী : শান্তনু ভট্টাচার্য

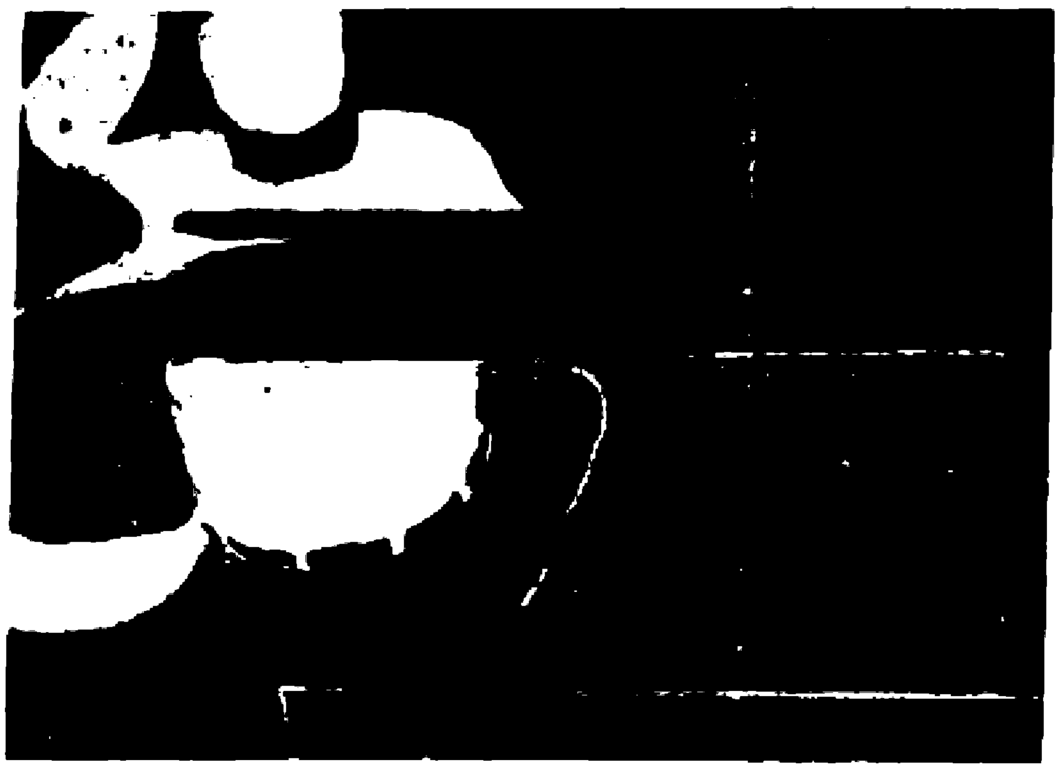

শান্তনু ভট্টাচার্য এবং জীবনকৃষ্ণ মুখার্জি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ২১ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারী পর্যন্ত স্বতন্ত্র-ভাবে দুটি একক চিত্র প্রদর্শনী করলেন।

পেন্টিং এবং গ্রাফিকস নিয়ে শ্রীভট্টাচার্য ৪০ খানির ওপর ছবিতে বিভিন্ন মাধ্যমের ওপর তাঁর দক্ষতার নিদর্শন উপস্থিত করেন। রিপ্রেজেন্টেশান থেকে অ্যাবস্ট্রাকশান ও ডেকরেটিভ স্টাইলের মধ্যে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। কোলাজ বলে যেগুলি উপস্থিত করা হয় সেগুলিকে পেপার কাট ডিজাইন বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। জল রং এবং টেম্পারাগুলি একটু দুর্বল কাজ। লিথোগ্রাফের কয়েকটি রঙীন ও একরঙা কাজ সুন্দর। ৮, ৩, ১ ইত্যাদি ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য।

জীবনকৃষ্ণ মুখার্জি ২০ খানি টেম্পারা ও তেলরঙের ছবি উপস্থিত করেন। ভারতীয় প্রভাব কাজেই বেশী। কালিদাসের কাব্য থেকে তিনি অনেকগুলি চিত্রের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। সবই ইলাস্ট্রেশন-ঘেঁষা ছবি। তেলরঙের কাজের মধ্যে 'ফসিল', 'বিগ-ড হেড' এবং 'ডন'-এর নাম করা যায়। মুকুল রায় ২২ থেকে ২৭ ডিসেম্বর এই হলেই ২০ খানি ছবির প্রদর্শনী করেন। ছবিগুলি তাঁর আগের ছবির জাতের। মোটা কালো রঙের ব্যবহারে বা রঙীন কালি-কলমের কাজের মধ্যে দিয়ে কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট-ঘেঁষা ডিজাইন তিনি তৈরী করেছেন, যা ডিজাইন বা ড্রয়িং হিসেবে খুব সবল নয়। একমাত্র 'আউল' ছবিটি এরই মধ্যে উল্লেখ করবার মত।

•

ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ড্রাফটসম্যানশিপের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক প্রদর্শনী ২২ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারী পর্যন্ত কলেজ গৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পেন্টিং ড্রয়িং, জলরঙ গ্রাফিকস এবং বিজ্ঞাপন ও প্রাচীর চিত্রের নিদর্শন নিয়ে প্রায় তিনশ'র কাছাকাছি কাজ এখানে উপস্থিত হয়েছিল।

পেন্টিং বিভাগে পৃথ্বীশ সিকদারের 'লোনলি মর্নিং' এবং একটি 'স্টিল লাইফ' সুন্দর ও সুগঠিত ছবি। অরুণ পালের 'স্টেপস' ছোট এবং বর্ণাঢ্য কাজ। চণ্ডীদাস পোদ্দারের 'ইয়ং সোসাইটি' হিউবার্ট ফান এইকের অনুকরণ। দিলীপ পালের জলরং-এর প্রতিকৃতি এবং নন্দিতা রায়ের ছোট একটি জলরং-এর কাজ সুঅঙ্কিত।

এ ছাড়া অশোক লস্করের লাইফ ড্রয়িং, সুজিত মুখার্জি ও বনবিহারী পালের জল-রঙের কাজ উল্লেখযোগ্য। গ্রাফিক বিভাগ এবারে একটু দুর্বল। গৌর সাহার ঘোড়ার রঙীন এচিংটি মন্দ নয়।

কমার্শিয়াল বিভাগে প্রেস লে-আউট ও প্যাকেজ ডিজাইনের মধ্যে কয়েকটি ভাল কাজ দেখা গেল। পোস্টারের মধ্যে 'হ্যাণ্ড-ক্রাফট', স্টপ ওয়ার ও 'অভয় আশ্রম' নামে পোস্টারগুলির নাম করা যায়। '[illegible] মিউজিক' ও 'গীটার'-এর দুটি 'রেকর্ড' কভার উল্লেখযোগ্য।

•

রবীন মণ্ডল কেমুণ্ড গ্যালারীতে তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনী করলেন। ৪ থেকে ১৪ জানুয়ারী অবধি অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে তাঁর ১১ খানি হাল আমলের আঁকা ছবি দেখা গেল। দু-তিনটি ছাড়া বেশীর ভাগই ছোট মাপের। একটি থেকে তিনটি পর্যন্ত ফিগার নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। প্রিমিটিভ ফর্ম নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়েছে। সব ফিগারের মধ্যেই একটা আদিম উপজাতীয় চিত্র বা ভাস্কর্যের উপাদান দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য কম্পোজিশন বা বর্ণবিন্যাসে আধুনিক সচেতন মনের ছাপ পরিস্ফুট, অনেক ছবিই শুধু নরনারীর মূর্তি যেমন 'কিং এণ্ড কুইন', 'রয়্যাল ফ্যামিলি', 'অ্যাডাম অ্যাণ্ড ইভ' ইত্যাদি ছবিগুলি। সবগুলিরই গঠন সরল, মাঝে-মাঝে ক্যালি-গ্রাফিক তুলি চালনা এবং রং প্রধানত অতি উজ্জ্বল সবুজ, নীল, কৃষ্ণ এবং লালচে। ৭ নম্বরের 'ফোর্টিজাটি' ছবিটি একটু বেশী বর্ণাঢ্য এবং মাঝে-মাঝে নীরস

মজুমদারের রীতির ছাপ হয়তো প্রছন্ন থাকতে পারে। 'উড়ানাম' সিরিজের ছবিগুলি ছোট কিন্তু জোরালো কাজ। আদিম শিল্পের প্রাণময়তা অনেকখানি আনা সম্ভব হয়েছে।

*

সোসাইটি অব আর্টস অ্যান্ড আর্টিস্টস, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৮ থেকে ১৪ জানুয়ারী একটি যৌথ প্রদর্শনী করলেন।

সাতজন শিল্পীর আঁকা একুশখানি ছবির মধ্যে আধুনিক বিভিন্ন রীতির শিল্পচর্চার নমুনা উপস্থিত করা হয়। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এখনো এ'দের কাজে খুব একটা পরিণতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নি। মঞ্জুশ্রী চ্যাটার্জির 'ফিস্টিভ মুড', 'এক্সাইটমেন্ট' ইত্যাদি ছবিগুলি, বড় সেন্টিমেন্টাল। পূরবী বসুর 'লিরিক্স', 'ম্যান উইথ এ বার্ড'-এর রং এবং গঠন কাঁচা। স্বপন দাসের মানুষগুলি পরিচিতো-স্থানের কাজে দুর্বলভাবে ব্যস্ত। প্রবীর দাসের ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়ারত মূর্তিগুলির মধ্যে কিছুটা মাধুর্য দেখা যায়। কার্তিক সিংহ অ্যাবস্ট্রাকশন ও রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্যবর্তী পন্থা অনুসন্ধান করছেন। জহর সাহা পোদ্দারের রিকসাওয়ালা ধাপে বড় রঙে চড়া ও ডিজাইনে দুর্বল। সুভপ্রসন্ন ভট্টাচার্য রেখা ও রঙে মানুষের অমানুষিক পরিস্থিতির রূপদানের চেষ্টা করেছেন। বিকাশ ভট্টাচার্যের আলেকার রীতির প্রভাব তাঁর ওপর খুব বেশী।

*

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের বার্ষিক প্রদর্শনী ডিসেম্বরের ২০ তারিখ থেকে জানুয়ারীর ১৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এবার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, হায়দরাবাদ, কাশ্মীর বারানসী, ইন্দোর, আমেদাবাদ ইত্যাদি নানা স্থান থেকে তিনশ'র ওপর ছবি ও মূর্তি এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে সর্বভারতীয় শিল্পকলার যে রূপ দেখতে পাওয়া যায় তাতে মনে হয় ভারতের সব জায়গাতে একই রকমের কাজ হচ্ছে এবং কাজের মানের তারতম্যও বিশেষ নেই। এই গুণগত সমতার সকলে হয়ত উৎফুল্ল নাও হতে পারেন। গোটা প্রদর্শনীর মধ্যে ফিগারেটিভ-ঘেঁষা এবং নন-ফিগারেটিভ কাজই বেশী চোখে পড়ে। ফিগারেটিভ কাজের সংখ্যাও কম নয় তবে উল্লেখযোগ্য কাজ কদাচিৎ দেখা গেল। ভাস্কর্যের বিভাগেও একই ধরনের নিম্নমানের কাজ দেখা যায়। প্রবীণদের মধ্যে গোপাল ঘোষ, ইন্দু দুগাড় প্রমুখ তাঁদের নিজস্ব ধরনের কাজ দিয়েছেন। অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর সূক্ষ্ম চীনের কালির ওপর লোকশিল্পের অনুপ্রেরণায় আঁকা রেখাঙ্কন দুটি উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় প্রথায় কাজের মধ্যে রাধাচরণ বাগচীর 'বিরহিনী রাধা' ও 'ঝুলা' তাঁর নিজস্ব প্রথায় মিনিয়েচারধর্মী কাজ। রঘুনাথ মহাপাত্রের কোণার্কের সূর্য মূর্তির অনুকরণে করা ভাস্কর্যটি উড়িষ্যার ঐতিহ্যের সুন্দর নিদর্শন। প্রমোদ মোহান্তির শায়িত মূর্তি এবং এস বি শ্রীখণ্ডের 'রিক্লাইনিং টর্সো' উল্লেখযোগ্য কাজ।

তৈলচিত্র মাধ্যমে বিনোদ কর্মকারের দুখানি নিসর্গ দৃশ্যের একটিতে রিপ্রেজেন্টেশন ও অ্যাবস্ট্র্যাকশনের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। গণেশ হালোই-এর 'ফেন্স অ্যান্ড দি ট্রি' বন্দিয়ানের গোড়ার দিকের ছবির মত সুন্দর। অমিতাভ ব্যানার্জির পাখির ছবিটি ডানার বর্ণের থেকে ডিজাইন নিয়ে সৃষ্ট। ছবির রং এবং প্যাটার্ন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কে এস মাল্টের 'খতরানা ভিলেজ' একসপ্রেশনিস্ট রীতির কাজে বেশ খানিকটা নাটকীয় মেজাজ পাওয়া যায়। রথীন মৈত্রের অনুরূপ ছবির নিহিতার্থ বেশ সুপরিস্ফুট। অনেক দিন বাদে তাঁর এ ধরনের কাজ দেখা গেল। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে সমর ভৌমিকের 'কমরেডস ডেথ' বর্ণে ও ডিজাইনে আবেগময়। নকুল সিংহের জলরঙে দুটি অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ সূক্ষ্ম টোন ও সংযত ডিজাইনের জন্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া লক্ষণ পেনতী, জগদীশ রায়, কৃষ্ণগোপাল, রামানন্দ ব্যানার্জি, নির্মল দত্ত প্রমুখ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কাজ উপস্থিত করেছেন।

গ্রাফিক বিভাগে কাজের সংখ্যা কম নেই তবে উৎকৃষ্ট কাজ কম। জগমোহন চোপরার দুটি এচিং রং ও ডিজাইনের সাফল্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে।

•

২২ পল্লী সাংস্কৃতিক সংগঠন ২৬ জানুয়ারী সারা বাংলা শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করবেন। সুভাষ উদ্যানে (দর্পনারায়ণ পার্ক ভবানীপুর) ৫ থেকে ১০ বছরের ছেলেমেয়েরা এতে অংশ গ্রহণ করবে। বিস্তারিত বিবরণ জি সি লাহা (১ লেনিন সরণী) দি স্টুডিও পেইন্টার্স (১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা ২০) এবং স্টুডেন্টস পেপার কনসার্ন (৪০।১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯) এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

—চিত্ররসিক

কৃষ্ণ রায়ের মন্দির ।। কাঁচরাপাড়া

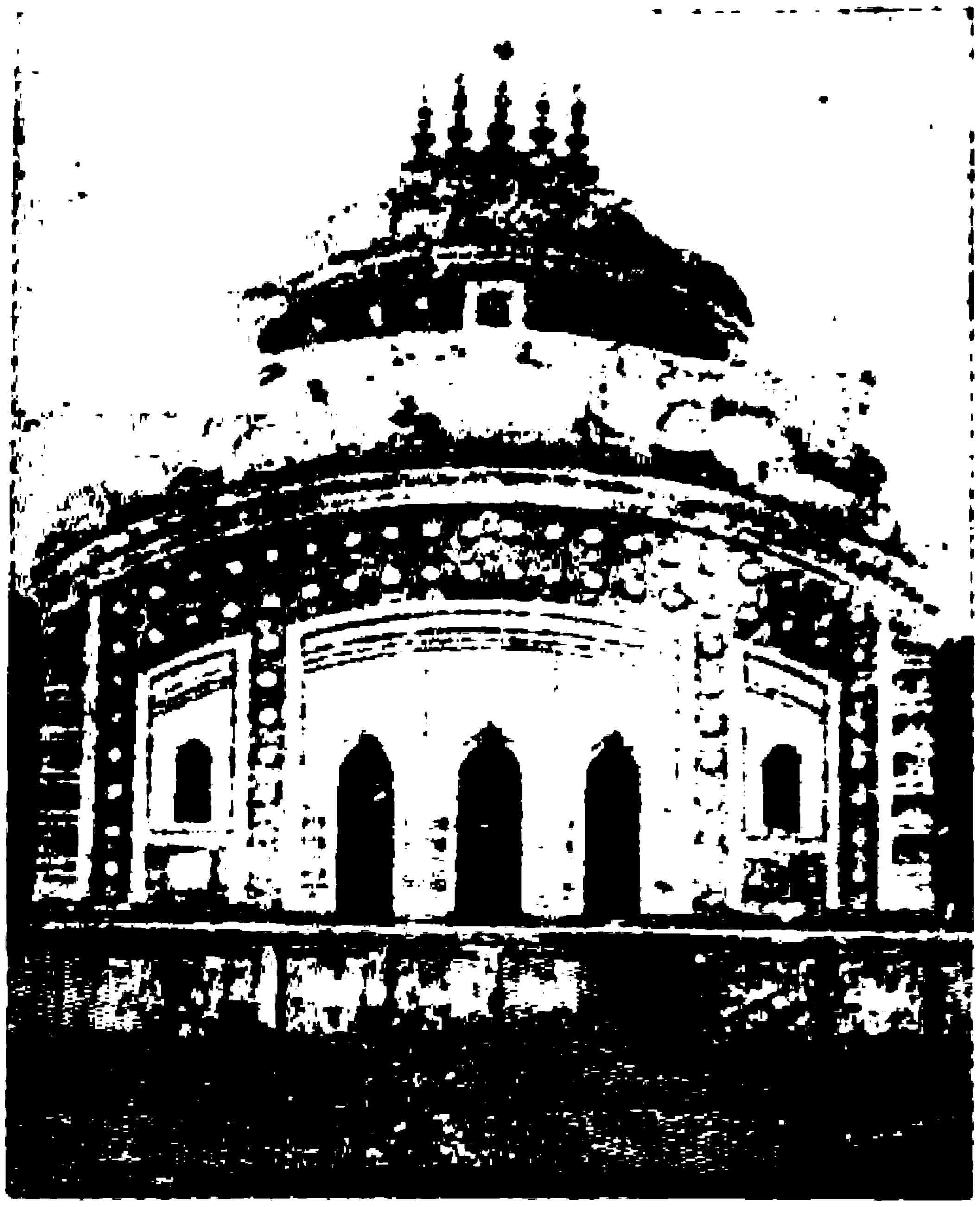

কলোনের ওডিকলোন

রমেন মজুমদার

কলোন।...কলোন গেলে আপনা থেকেই মনে পড়ে যায় ওডিকলোনের কথা। মৃদু গন্ধ, মন-মাতানো সৌরভ রমণীর প্রিয়, রমণীয়।

কলোনের ওডিকলোন।...কিন্তু যিনি এই সুগন্ধি আবিষ্কার করেছিলেন, আসলে তিনি কলোনের অধিবাসী ছিলেন না, জার্মানিও না। তিনি এসেছিলেন ইতালি থেকে. ইতালি থেকে এসে কলোনে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সে আজ থেকে তিন শ' বছর আগে, ১৬৯০ সালে। তারপর দীর্ঘ এক শ' বছর ধরে তিনি আর তাঁর পরিবারের লোকেরা এই আশ্চর্য জিনিসটির উপকরণগুলি গোপন রেখেছিলেন। কী দিয়ে এই সুগন্ধি তৈরি, কীভাবে তৈরি সেই এক শ' বছরে বাইরের কেউ তা জানতে পারেনি।

পরে যে ওডিকলোনের এত জনপ্রিয়তা, তার পিছনেও কোনো কলোনবাসীর দান নেই। কলোনের কোনো লোক এর প্রচারের জন্য চেষ্টা করেনি। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩, এই সাত বছরের মধ্যে, ইতিহাসে যা 'সেভ্‌ন্ ইয়ার্স ওয়ার' নামে খ্যাত, সেই যুদ্ধের সময় ফরাসী অফিসাররা ওডিকলোন ব্যবহার করতেন খুব। তাঁরাই প্রথম এর গুণের কদর করলেন। তাঁরাই প্রথম বললেন, প্রসাধনীয় মনোরঞ্জনে এর মতো উপাদান আর নেই। ফরাসী রমণীরা কলোনের হালকা সৌরভ পছন্দ করতেন, মনে খুশির আমেজ লাগত।

শুধু মৃদু সৌরভের জন্যেই ওডিকলোনের কদর ছিল না, ছিল এর অন্য অনেক গুণের জন্য। ওডিকলোনের গুণের শেষ নেই, ব্যবহারের সীমা-পরিসীমা না।

আঠার শতকে ওডিকলোন শুধু ঠান্ডা আর মন-তাজা করা প্রসাধন সামগ্রীই রইল না, ওষুধ হয়ে দাঁড়াল। তখনকার দিনে খাবার ওষুধ হিসেবে এর মাত্রা ছিল মদ, জল, টক সুরাজাতীয় পানীয় বা অন্য কোন তরল জিনিসের সঙ্গে, পঞ্চাশ থেকে ষাট ফোঁটা। বাইরে লাগানোর জন্যও এর ব্যবহার ছিল। বুক ধড়ফড় করায়, মাথাধরায়, কোষ্ঠকাঠিন্যে, দাঁতের যন্ত্রণায় আর অন্যান্য অনেক অসুখে ওডিকলোন লাগানো হত।

ওডিকলোন যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর নাম পাওলো ফেমিনিস, ইতালির এক সওদাগর। তাঁর শুধু আবিষ্কারেরই কৃতিত্ব, ব্যাপক হারে উৎপাদনের নয়। ব্যাপক হারে উৎপাদন আরম্ভ করেন তাঁর জ্ঞাতি-পরিবারের লোকেরা। সে অনেক দিন পরে। সে-পরিবার ফারিনা পরিবার নামে খ্যাত। তাঁরাও আগে কলোনের অধিবাসী ছিলেন না, পরে এসে কলোনের বাসিন্দা হয়েছিলেন।

প্রথম যে-কোম্পানিটি প্রচুর পরিমাণে ওডিকলোন তৈরী করেছিল, সেই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জোহান মারিয়া ফারিনা। কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭০৯ সালে।

প্রচুর পরিমাণে তৈরি করার ফলে ওডিকলোনের গন্ধ নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। নানা দেশে। লোকে এর প্রতি আকৃষ্ট হল, এর জনপ্রিয়তা বাড়ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফারিনা পরিবার অসাধারণ সাফল্য যাকে বলে তার মুখ দেখতে পেলেন না। সে পেলেন কলোনের এক নাগরিক, মুলেনহেন্স তাঁর নাম। তিনি একজন ব্যাঙ্কার, মানে মহাজন। কার্লফ্রাঞ্জ ফেরেয়ন নামে এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে তিনি উপহার হিসাবে ওডিকলোনের ফর্মুলা পেয়েছিলেন।

সে বোধহয় ১৮০০ খৃঃ কথা, পিটার্সবুর্গ রাজদরবারের ওষুধ প্রস্তুতকারক জোহান টোবিয়াস লোইৎস বিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল চোলাই করার এক পদ্ধতি বার করলেন। ওডিকলোন তৈরিতে খাঁটি ইথাইল অ্যালকোহল একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। লোইৎস যখন খাঁটি ইথাইল অ্যালকোহল চোলাই করার নতুন পদ্ধতি বার করলেন, মুলেনহেন্স আরও ব্যাপক হারে ওডিকলোন তৈরি আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর কলোনের ঠিকানাটা বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়ল, গ্লোকেনগাসে ৪৭১১ নম্বর বাড়িটা অসাধারণ ওডিকলোনের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। আজও মুলেনহেন্স পরিবারই পৃথিবীর শতকরা আশি ভাগের বেশি ওডিকলোন তৈরি করেন—'৪৭১১' ওডিকলোন। এই ৪৭১১ নম্বরের পিছনে একটা ইতিহাস আছে : নেপোলিয়নের সময় ফরাসীরা যখন কলোন অধিকার করেছিল, তখন কলোনের সামরিক অধিনায়ক শহরের প্রতিটি বাড়িতে নম্বর দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। মুলেনহেন্স পরিবারের বাড়িটির নম্বর পড়েছিল ৪৭১১, আর এই নম্বরটাই আজ তাঁদের ওডিকলোনের ট্রেড মার্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রসাধন সামগ্রী আর ওষুধ, দুয়ের রূপেই ওডিকলোনের প্রস্তুতকারকরা জোর দিচ্ছিলেন। কিন্তু বেশিদিন আর তা পারলেন না। ১৮১০ সালে নেপোলিয়ান আদেশ জারি করলেন, ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছে ফর্মুলা পেশ না করে কোনো ওষুধ বিক্রি করা যাবে না—মানে, কোন ওষুধ কী কী উপাদান দিয়ে তৈরি, ফরাসী কর্তৃপক্ষকে তা জানাতে হবে, নইলে সে-ওষুধের বিক্রি বন্ধ। কিন্তু ওডিকলোনের প্রস্তুতকারকরা কোনো মতেই ওডিকলোনের রহস্য ভাঙতে রাজী নন, যে-গোপনীয়তা তাঁরা বছরের পর বছর ধরে কঠোরভাবে রক্ষা করে এসেছেন তা ফাঁস করতে তাঁরা প্রস্তুত নন। তাই তাঁরা ওডিকলোনের আরোগ্যের গুণাবলীর ওপর জোর দেওয়া ছাড়লেন। আর ওডিকলোনে কিছুটা বাহ্যিক পরিবর্তন আনলেন—ওডিকলোন এখন সর্বরোগহর থেকে মন-তাজা-করা প্রসাধন সামগ্রী হল।

ওডিকলোন তৈরির উপাদানগুলি আজও সেই একই আছে। তার কয়েকটির নাম করা যেতে পারে : দক্ষিণ ফ্রান্সের খাটো কমলা ফুলের পাপড়ি থেকে তৈরি নেরোলি তেল, কমলার নবাঙ্কুর চারা থেকে চোলাই করা পেটিটগ্রেন তেল, আর গোলাপের পাপড়ি থেকে তৈরি গোলাপ-তেল।

ছোট এক শিশি গোলাপ-তেলের দাম প্রায় দশ হাজার মার্ক, এখনকার হিসেবে প্রায় ৩,২৪৭ টাকা। আর এক কিলোগ্রাম গোলাপ তেলের জন্যে প্রায় দু হাজার কিলোগ্রাম গোলাপ পাপড়ির দরকার।

এই দামী দামী তেল অ্যালকোহলে মিশিয়ে ওক কাঠের পিপের ভেতর কয়েক মাস রেখে দেওয়া হয় মজবার জন্যে, সুগন্ধ ভালোর পরিপক্ক হবার জন্যে, তারপর তৈরি হয় বিউটি লোশন— ওডিকলোন।

ওষুধ ছেড়ে বিউটি লোশন হওয়ায় ওডিকলোনের কিন্তু কোনোই ক্ষতি হয়নি। রোকোকো মহিলারা আর পুরুষেরা, ডিউকরা আর অফিসাররা ওডিকলোনের আরও ভক্ত হয়ে পড়লেন : ওডিকলোন যেমন স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে তেমনি সৌন্দর্য সৃষ্টিও করে।

ওডিকলোন আজ আর কেবল কলোনে তৈরি হয় না। তবে পৃথিবীর শতকরা নব্বই ভাগ ওডিকলোনই আজ তৈরি হয় কলোনে। কলোনের ওডিকলোনকেই বলা হয় 'খাঁটি' বা 'আসল'—"জেনুইন" বা "অরিজিনাল" ওডিকলোন।

পৃথিবীর বহু দেশে আজ ওডিকলোন পাওয়া যায়। কিন্তু 'আসল ওডিকলোন', 'ফারিনা' ওডিকলোন বা '৪৭১১' ওডিকলোন সেই আড়াই শ বছর আগেও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। আড়াই শ বছর আগে যেমন তার মাদক-সৌরভে মন মাতিয়ে তুলত, মন তাজা করত, আজও তা-ই করে। আজও তার সমান গুণ। সবই ঠিক আছে, শুধু বদলেছে তার প্রস্তুত-প্রণালী—শিশিগুলি হয়েছে আরও আকর্ষণীয়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—লোকে কী বলবে। এর মধ্যেই পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা উঁকি দিয়ে গেছেন। কী পরিচয় দেব আপনার ?

শোভন সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারল না। এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। গভীর চোখে তাকাল মীরার দিকে। একটু অন্যমনস্কভাব মীরার।

—আমার থাকাতে তোমার আপত্তি নেই তো? সাগ্রহে মীরার দিকে তাকাল শোভন, অন্যের কথা ভাবছি না। তোমার কথা বল।

মীরা কোন জবাব দিল না। সে আস্তে আস্তে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে বড় রাস্তা দেখা যায়। ট্রাম বাস মানুষ বোঝাই করে ছুটে চলেছে। সকাল নটা। আজও সে অফিস যেতে পারছে না। পরপর দু'দিন কামাই করল। টেলিফোনে জানিয়েছে ডিরেক্টরকে। কী জবাব দেবে সে শোভনকে? সে এক অস্বস্তিকর সমস্যার সম্মুখীন।

কিছু বল মীরা। শোভন কাছে এগিয়ে এল, আমি কী তবে মিথ্যে একটা আশার পিছনে ঘুরছি?

—জানি না। শোভনবাবু, আমি কিছু ভাবতে পারছি না। বলতে বলতে মীরা জানালার দিকে মাথা নুইয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ফুলে ফুলে উঠল ওর সর্ব শরীর। শোভন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। একটু সময় দেওয়া দরকার। মীরার মনোভাবটা সে বুঝতে পারে। বেচারী এত আঘাত পায়নি। কোথায়ও আশ্রয় হল না। কখনও ভেঙে পড়েনি। যুদ্ধ করছে সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে।

বাথরুম থেকে মুখচোখ ধুয়ে আসে মীরা।

—চুপচাপ বসে আছেন কেন। বাজারে যান। প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনুন। হাওয়া খেয়ে তো পেট ভরবে না! ঘরদোর যা গুছোবার সে আমি দেখছি।

মিটে গেল সব। শোভন কোনরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। তার হিসেবের কোন ভুল হয়নি। জানত, মীরা কখনও আপত্তি জানাবে না। মীরার মনোভাব সে অনেক আগেই টের পেয়েছে। শুধু খোলাখুলি আলোচনা হয়নি। একটু আড়াল থাকা ভাল।

—একটা ফর্দ করে দাও কি আনবো।

—উঃ আপনি দেখছি একেবারে আনাড়ি' সংসারে দরকারী জিনিস কি কি লাগতে পারে তাও বলে দিতে হবে।

—কী করে জানব। শোভন মুখ টিপে হাসল সংসার তো আর কোনদিন করিনি। বরং তোমার অভিজ্ঞতা আছে।

—বয়স তো কম হল না। আর কবে সংসারী হবেন। হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছেন। নিন কাগজ পেন্সিল।

ফর্দ নিয়ে শোভন হাসিমুখে বেরিয়ে যায়।

সব মনে পড়ছে। একদিন দু'দিনের ব্যাপার নয়। দিনের পর দিন মেলামেশার ফলে, এতটুকু বাধা সে দেয় নি, বরং অনুরাগের এক জাল বোনার প্রয়াস, অফিস ছুটির পর দু'জনে গঙ্গার ধারে পাশাপাশি হাঁটা... পার্টির চলে যাওয়ার পর সে এমন ভেঙে পড়েছিল যে, তখন শোভনের সাহচর্য না পেলে...। হ্যাঁ, অস্বীকার সে করতে পারবে না। বরং রঞ্জতের কথা মনে পড়লে আরও বেশি করে ঝুঁকেছে শোভনের দিকে। এক ধরনের চালেঞ্জ সে রঞ্জতের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। রঞ্জত যদি তার খেয়ালখুশিমত জীবন কাটাতে পারে সেই বা পারবে না কেন! তাছাড়া কেই বা ছিল তখন। কেউ ছিল না একমাত্র শোভন ছাড়া। দিনের আশা শেষ করেছে। ওর উপদেশ তার ভাল লাগে নি। সবাই যে-যার পছন্দ অপছন্দ তার ওপর চাপাতে চেয়েছে। রঞ্জত কিংবা এবং মা। সে মেনে নিতে পারে নি। বিদ্রোহ করেছে।

কিন্তু শোভনকে সে কতটুকু চেনে? ওর বাইরের জৌলুস দেখে তো ভুলে যায় নি? অরও ঘনিষ্ঠ হলে, একটা সম্পর্ক যদি নাও বা দাঁড়ায়; কিছুদিন পর, দু'-চার বছর পর, পুরনো হয়ে যাবে না তো শোভনের কাছে? এইসব প্রশ্নের জবাব সে জানে না। কিন্তু এই মুহূর্তে জানার

CENTRAL LIBRARY

দরকার নেই। হ্যাঁ, মীরা ভাবল, এখন আর পিছিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। কেননা তা সে চায় না। দেখা যাক জলকে জলই কোথায় গিয়ে সে দাঁড়ায়!

—নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

মীরা চমকে পিছন ফিরে তাকাল। সকালের সেই ভদ্রমহিলা, পাশের ফ্ল্যাটের। মনে মনে একটু বিরক্ত হলেও বাইরে সে সৌজন্য প্রকাশ করল। প্রতি নমস্কার করে ভদ্রমহিলাকে একটা চেয়ারে বসতে বলল।

—না, এখন বসব না। উনুনে মাছের ঝোল চাপিয়ে এসেছি। আপনার নামটি কী ভাই? আমাকে আপনি কৃষ্ণা বলে ডাকবেন।

খুব তাড়াতাড়ি কৃষ্ণা ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। ওর দিকে এক পলক তাকাল মীরা। কৃষ্ণা নাম হলেও, আসলে গায়ের রঙটা বেশ ফর্সা। কিন্তু ঐ রংই সুন্দর আর কিছু নয়। চেহারা শুকিয়ে আসছে। ঠোঁট মোটা। চওড়া কপাল। লাবণ্যের বড় অভাব চেহারায়। অথচ বয়স বেশি নয়। ওর সমানই হবে। হয়ত দু-এক বছরের ছোটও হতে পারে।

শুধু নাম বললেই যদি হোত তবে আর কোন কথাই ছিল না। কৃষ্ণা যে-ভাবে প্রশ্ন করতে সুরু করেছে, হয়ত সরলভাবেই জিজ্ঞেস করছে; ভয় হয়, হয়তো শোভন সম্পর্কে সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। ফলে সন্দেহ। এবং সেটা হবে ভীষণ অপছন্দের ব্যাপার।

—ইস্, মাছের ঝোল বোধহয় পুড়ে গেল! কৃষ্ণা দরোজার কাছ থেকে পিছন ফিরে বলল, পরে আসব। যখন যা দরকার হবে জানাবেন। লজ্জা করবেন না।

মীরা দরোজায় খিল দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বুকের ভিতর ঢিব ঢিব শব্দ। কৃষ্ণা আবার আসবে। পাশাপাশি ফ্ল্যাট। এড়াতে পারবে না। মনে পড়ছে কথা বলার সময় বারবার সিঁথির দিকে তাকিয়েছে কৃষ্ণা। মীরা পায়ে পায়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখ মুখ কেমন বিবর্ণ। খাঁ খাঁ করছে সিঁথি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কয়েকটা উড়ু চুল ঘামে লেপটে।

ভাগিস শোভন সম্পর্কে কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নি কৃষ্ণা। কিন্তু আজ না হোক, কাল কিম্বা পরশু ওই প্রসঙ্গ উঠবেই। তখন কী বলবে সে? কী পরিচয় দেবে শোভনের?

দরোজায় করাঘাতের শব্দ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় মীরা। দরোজা খুলতেই শোভন ঢুকল। মীরা ফিরে এল জানালার কাছে। তাকাল না শোভনের দিকে।

—কী ব্যাপার? শোভন ঘরের চারদিকে তাকায়, জিনিষপত্র যেমন ছিল তেমনি আছে দেখছি। মীরা, এদিকে শোন।

শোভনের দিকে তাকাতে পারল না মীরা, বলুন।

—কী হয়েছে?

—কিছু না। সামান্য হেসে তাকাল মীরা, দেখি কি এনেছেন।

শোভন আরও কয়েকবার জিজ্ঞেস করল। প্রতিবার মীরা জানাল কিছু হয় নি। ঘরদোর গোছগাছ করতে দুপুর গড়িয়ে যায়। এবেলা আর রান্নার ঝামেলা করল না। হোটেল থেকে খাবার নিয়ে এল শোভন। পাশাপাশি বসে দুজনে খেল। মীরা চুপচাপ। শোভন যথারীতি ঠাট্টা ইয়ার্কি করল।

—তখন থেকে কী এত ভাবছো মীরা।

—কিছু না। শরীরটা ভাল লাগছে না।

মীরার কপালে হাত দিতে গিয়ে থমকে যায় শোভন। হাত গুটিয়ে বলে, খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। শরীর চাঙ্গা হয়ে যাবে। শোন, বিকেলে ও-বাসায় যেতে হবে একবার। এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছি। সব নিয়ে আসতে হবে।

মীরা ভাল মন্দ কিছু বলল না। শোভন মৃদু হাসল। এক পলক মীরার দিকে তাকিয়ে পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

॥ উনিশ ॥

আবার অসহ্য লাগছে দিন রাত্রি! বিনয় টেবিল ল্যাম্পের আলো নিভিয়ে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এল। মা দু' চোখ বুজে তক্তপোষের ওপর বসে। বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন। হয়তো জপের মন্ত্র পড়ছেন। এক পলক মার দিকে তাকিয়ে সে লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে হেঁটে অগ্রসর হয়। বারান্দায় আলো কম। রান্নাঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। শেফালী পিছন ফিরে বসে। সশব্দে ভাত ফুটছে। সেই সন্ধ্যা থেকে গুমোট ভাব। বাইরে নয়, ঘরে। গুমোট ভাব তাদের মনে। এখন শুধু অপেক্ষা। যে-কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটবে।

নিঃশব্দে দরোজা খুলে বিনয় বাইরে এল। একবার ছাদে যাবার কথা মনে হল। অথবা গঙ্গার ধারে। রাত এমন কিছু নয়। সবে আটটা। রেলিংয়ে কনুই রেখে সে সিগারেট ধরাল। এই বিশাল বাড়িটার বিভিন্ন ফ্ল্যাট থেকে নানা রকম শব্দ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে অনেকগুলি রেডিওতে একই গান। কোন গান, কথাবার্তা, পড়ার শব্দ, বিভিন্ন ধরনের হাসি; কান পেতে শুনল সে, কিছুই স্পষ্ট নয়, সব তালগোল পাকিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

আবার শেফালী সম্পর্কে বিদ্বেষ সে টের পাচ্ছে মনে মনে। সেই রাতের কথা মনে পড়ল। আর হাসল মনে মনে। না, কোন রকম মোহ তার নেই। সাময়িক উচ্ছ্বাস থেকেই ও-কথা বলেছে শেফালী। 'তোমার কোন কথার অবাধ্য হব না।'

তাহলে শেফালী, কেন মার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছো না? এমন কী শক্ত ব্যাপার বুড়ো একটা মানুষের মন জয় করা। তাছাড়া তিনি তোমার গুরুজন। ভালবাসেন তোমাকে। যদি কখনও দুটো শক্ত কথা বলেন, জবাব দিয়ো না। বোবার শত্রু নেই। ওভাবে তর্ক করা কী ভাল; কী করে ভুলে যাও তোমার শিক্ষা দীক্ষার কথা! তাছাড়া আমার দিকটাও ভেবে দেখবে। এ-সব আমি পছন্দ করি নে। মোটে তিনটে মানুষ। ভেবে দেখ, কত ভাগ্যবতী তুমি! কোন ঝামেলা নেই। এমন নির্বিবাদ সংসার তুমি সহজে পাবে না।

হ্যাঁ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসব কথাই বিনয় জানিয়েছে। কিন্তু লাভ হয় নি কিছু। স্কুল থেকে ফিরে বারান্দায় পা দিয়ে শুনেছে চিৎকার। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে নি। নীহার ছুটে এসেছেন। কপালে করাঘাত আর কান্না। তারপর বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে শেফালীর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

একদিন দুদিন নয় প্রায়ই এমন ব্যাপার চলছে। ফলে যেদিন টিউশানী থাকে না, স্কুল থেকে বেরোবার পর রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ন'টার আগে বাড়ি ফেরে না।

ইতিমধ্যেই শেফালীর সঙ্গে কয়েকবার বিশ্রী ঝগড়া হয়ে গেছে। এখন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না। কথা মানেই কলহ। শেফালীর কথাবার্তাও সুবিধের নয়। ফলে সে প্রতিবার অপমানিত হয়।

কার দোষ তা সে ভাবছে না। মাকে কিছু বলা যায় না। বলা যায় না, শেফালী তোমার মেয়ের মত। তাকে ভালবেসে কাছে টেনে নাও। শুধু সমালোচনা কোর না। আগের দিন নেই। এখনকার মেয়েরা মুখ বুজে সব সহ্য করবে না। একটু চোখ কান খোলা রেখে সব দিক বিচার কর।

এ-সব বলা যায় না মাকে। বললে, মার কান্না আরও বেড়ে যাবে। হয়তো খাওয়া বন্ধ করবেন। দেয়ালে মাথা ঠুকবেন। অর্থাৎ অশান্তি আরও বাড়বে। অতএব মাকে কিছু বলে নি সে। যা বলার শুনিয়েছে শেফালীকে।

মনে পড়ছে মীরার কথা। অনেক দিন হল কোন খোঁজ খবর সে নেয় নি। যাব যাব করেও যাওয়া হচ্ছে না। অভিমান করে লাভ কী। হ্যাঁ, কাল সে যাবে। ছুটির দিন কালকে। বাড়িতে থাকতে ভাল লাগবে না। দুপুরবেলা খাওয়ার পর বেরিয়ে যাবে। স্পষ্ট জিজ্ঞেস করবে মীরাকে। ব্যাপার কী? আবার কী সুরু করলি? মীরা হয়ত গোপন করবে। অস্বীকার করবে

সব কিছু। অথবা বিরক্তি প্রকাশ করবে। যাই হোক, তবু সে যাবে।

শেষ টান দিয়ে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে বিনয় দরোজা খুলে বারান্দায় পা দিল। চোখাচোখি হল দুজনের। শেফালীর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

—তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা ছিল। শেফালী হাল্কা সুরে বলল, আজকাল তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় করে। সব সময় গম্ভীর মুখ। অমন করে তাকিয়ো না।

বিনয় চুপচাপ শুনল। কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না। নীরবে ঘরে এল। পিছনে শেফালী আসছে। জরুরী কথা বলতে চায়। মুখে হাসি। কী ব্যাপার সে বুঝতে পারছে না। যাইহোক, তার কোন কৌতূহল নেই। সে বিরস মুখে টেবিলে আলো জেলে একটা বই টেনে নিল।

গা ঘেঁষে শেফালী দাঁড়াল। বই বন্ধ করে বলল, এত রাগ কীসের। তুমি যেন কেমন হয়ে উঠেছো। আমাকে একদম সহ্য করতে পারছো না। কেন?

—এ-সব প্রসঙ্গ থাক শেফালী। আমার ভাল লাগে না। বরং তোমার জরুরী কথা বল।

শেফালীর মুখ পলকে ম্লান হয়ে ওঠে। সে এক দৃষ্টিতে তাকায় অনেকক্ষণ বিনয়ের দিকে। বিনয় অস্বস্তি বোধ করল। চোখের সামনে ঝাপসা কালো কালো অক্ষর।

—আমি একটা স্কুলে চাকরী পাচ্ছি।

—সুখবর। বিনয় বই-এর ওপর চোখ রাখে। তাকায় না শেফালীর দিকে।

—তোমার কী মত? নেব চাকরীটা?

—তোমার ইচ্ছে।

—কেন, তোমার মতামতটা জানাবে না?

—চাকরী করবে তুমি। তুমি যা ভাল বুঝবে করবে।

—তুমি এমন ব্যবহার করছো কেন। কোন্ সংসারে অল্প বিস্তর খিটিমিটি হয় না? অনেক বকুনি দিয়েছো আমাকে। আমার সব খারাপ। আমি কী খুবই পুরনো হয়ে গেছি?

বিনয় নীরবে শুনতে থাকে। শেফালীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে। চোখের জল দেখলে আজকাল আর সহানুভূতি জাগে না। ব্যাপারটা পুরনো। মাঝে মাঝে মনে হয়, চোখের জল ফেলে শেফালী পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করতে চায়। মেয়েদের ছলা-কলার অন্ত নেই।

প্রতিবাদ করা দূরে থাক, শেফালীর সঙ্গে কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না। ওর নিরাসক্ত মনোভাব টের পেয়ে ফেলে উঠেছে। বারান্দায় মা। ফলে কথাবার্তা নীচু স্বরে বলতে হয়।

নতুন করে বোঝাবার কিছু নেই শেফালীকে। অনেক বার বলেছে। কোন পাত্তাই দেয় নি ওকে। এখন কাঁদলে কী হবে!

শেফালী বেরিয়ে গেলে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আশঙ্কা করছিল, হয়তো একচোট ঝগড়াই হয়ে যাবে। বিনয় টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে দিল। ঘরে হাল্কা নরম আলো। মশারি তুলে বিছানায় এলিয়ে পড়ল সে।

স্কুলে চাকরী পাওয়ার কথা বলছে শেফালী। কোন্ স্কুলে? এখন শখ চেপেছে বুঝি। অথচ সে-ই অনেকবার অনুরোধ করেছে স্কুল বা কলেজে ঢুকতে পারে কিনা। তখন ওর কথা গ্রাহ্য করে নি। ঘরের বউ আবার বাইরে চাকরী করবে কেন! আরও কত কথা। যাকগে কী হবে ও-সব ভেবে। শেফালী যা ইচ্ছে করুক। ওর সম্পর্কে আর কোন আগ্রহ নেই।

খাওয়ার সময় বিনয় আড় চোখে শেফালীর দিকে তাকাল। মুখ নীচু করে বসে। কী অস্বাভাবিক স্তব্ধতা! সংসার-টংসার নিয়ে লোকে কত ব্যাখ্যা করে। নীরস গৃহকোণ। সুখ শান্তি। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে! শোবার ঘরের দেয়ালে এই মিথ্যে শব্দগুলি ফ্রেমে আটকানো। শেফালির সূচী-শিল্পের নিদর্শন। খুব হাসি পেল বিনয়ের। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করল।

নাকে রুমাল চেপে গলিটা পার হল বিনয়। এটা তার অভ্যাস। অথচ চারপাশে অনেক লোক হাঁটছে, কেউ তার মত চোখ মুখ কুঁচকে নাকে রুমাল চাপা দেয় নি। পেট্রোলের ধোঁয়া ছেড়ে বাস বা লরি চলে গেলে সে নাকে রুমাল চেপে ধরে। এই শহরের হাওয়া দিন দিন বিষাক্ত হয়ে উঠছে। সংক্রামক রোগের বীজাণু ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। অতএব সে সাবধানে চলাফেরা করে। কেননা সে আরও বহুদিন বাঁচতে চায়। একাধেই বাঁচতে চায় যেমনভাবে প্রতিটি দিন পার করে দিচ্ছে।

নরম রোদের মধ্য দিয়ে বিনয় হাঁটতে থাকে। ছুটির দিন। ফলে রাস্তায় অনেক লোকজন। বাড়ি ছেড়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। চারপাশে উদ্ভাসিত মুখের মিছিল। সে একটা পান খেল। সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হল।

কয়েকটা ট্রাম ছেড়ে একটাতে উঠে পড়ল। জানালার ধার ঘেঁষে বসল। মনে পড়ছে, আসার আগে শেফালী জানতে চেয়েছিল, কোথায় সে যাচ্ছে। সে কোন উত্তর দেয় নি। শেফালীর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। মার সঙ্গেও কোন কথা বলে নি।

ট্রাম থেকে নামার পর বিনয় মনে করবার চেষ্টা করল, কতদিন পর সে মীরাকে দেখবে। মনে পড়ছে না। অনেক-দিন দেখা হয়নি। কী তীব্র জেদ মীরার! সবাই জেদী। মা কম কীসের। উনি ভুল করেও মীরার প্রসঙ্গ তোলেন না।

বিনয় অবাক হয়ে তালাবন্ধ ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে মীরা! ছুটির দিন। ভেবেছিল, এত তাড়াতাড়ি মীরা বেরোবে না। হতাশ হয়ে সে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

—শুনুন।

বিনয় মুখ ফিরিয়ে অনুভাকে দেখল। ফোলাফোলা চোখ মুখ। হাত পা সরু সরু। দু' চোখের নীচে কালি। উঁচু পেটের দিকে এক পলক তাকিয়ে সে মাথা নত করল।

—মীরার খোঁজে এসেছেন বুঝি? ও এখানে থাকে না।

—কোথায় গেছে? বিনয় রীতিমত অবাক, কবে গেল এখান থেকে। ঠিকানা জানেন?

—না। জানার আগ্রহ নেই। পাপ বিদেয় হয়েছে। বেঁচে গেছি!

অনুভার মুখের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকায় বিনয়।

—আপনি বুঝি কিছু জানেন না? মীরা শুধু একা যায় নি। সেই সঙ্গে নিয়ে গেছে শোভনকে। ছি! আপনার বোনের কথা ভাবলে আমার বমি আসে। এখন বুঝতে পারছি কেন স্বামীর ঘর করতে পারল না।

তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল বিনয়। কপালের দুপাশের রগ টিব-টিব করছে। পিছনে কী অট্টহাস্য করল কেউ। তাড়াতাড়ি সে হাঁটতে থাকে। কোথায় গেল মীরা? অনুভার চোখ মুখে সে তীব্র ঘৃণা লক্ষ্য করেছে।

এখন সে কী বাড়ি ফিরবে? বিনয় অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকে। কাল মীরার অফিসে ফোন করবে। অথবা সশরীরে হাজির হবে। সব জানা দরকার। না জানা পর্যন্ত শান্তি নেই। শোভন আর মীরা কী এক সঙ্গে বসবাস করছে? যদি তাই হয়, তাহলে বুঝতে হবে, মীরা নিজেকে ধ্বংস করতে চায়। মীরা ঠিক করছে না। শোভন সুদর্শন। ব্যবসা করে বোধহয়। কিন্তু মীরা কী রূপ দেখে ভোলবার মেয়ে?

একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল বিনয়। এক কাপ চা খেলে মন্দ হয় না। প্রায় পাঁচটা বাজে। রাস্তার দিকে মুখ করে বসে চায়ের অর্ডার দিল। সেই সঙ্গে মোগলাই পরোটা।

—আরে বিনয়বাবু কোত্থেকে?

CENTRAL LIBRARY

সমস্ত চোখে মুখ ফেরাল বিনয়। আদিত্য মুচকি হাসছে। এগিয়ে আসছে এদিকে। অস্বস্তি বোধ করল সে। আদিত্য ইতিহাস পড়ায়। সহকর্মীদের মধ্যে ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় একটু বেশি। বোধ হয় সমান বয়সী আর স্পষ্ট বক্তা বলে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে অনীহা প্রকাশ করে না। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। চোখ মুখে বুদ্ধির ছাপ।

—আসুন। বিনয় হাসি মুখেই আহ্বান জানাল। যদিও মনে মনে সে এখন আদিত্যের সঙ্গ কামনা করছে না। একটু নিরিবিলিতে বসে চা খাবে ভেবেছিল। ভাববে মীরার কথা।

মুখোমুখি বসে আদিত্য বলে, এদিকে কোথায় এসেছিলেন?

—নির্দিষ্ট কোথাও নয়। বিনয় বেয়ারা এলে আদিত্যের জন্যে চা আর খাবারের অর্ডার দিল। বস্তুত সে কথা বাড়াতে চায় না। সে জানে আদিত্য খুব বাকপটু। একবার সুরু হলে সহজে থামবে না। সুতরাং চা খেয়ে কাজের অজুহাতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়বে।

স্কুলের প্রসঙ্গ তোলে আদিত্য। অনিবার্যভাবে ছাত্র ধর্মঘটের কথা এসে পড়ে। বিনয় চুপচাপ শুনতে থাকে। নীরবে চা খায়। তাকায় রাস্তায় চলমান জনস্রোতের দিকে। কানে আসছে বিভিন্ন টেবিল থেকে নানারকম আলোচনার টুকরো টুকরো অংশ। রাজনীতি সিনেমা ফুটবল সুন্দরী অভিনেত্রী—আলোচনার ধারা সমস্ত বিষয়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

—বিনয়বাবু! আদিত্যের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি, আপনি কিছু শুনছেন না। কী ভাবছেন?

—বলুন। অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাল বিনয়,. এবার উঠতে হবে। আসুন না একদিন আমার ওখানে। ছুটির দিন সকালে। বলতে বলতে বিনয় উঠে দাঁড়াল, একটা জরুরী কাজ রয়েছে।

আদিত্যকে কোন কিছু বলবার সুযোগ দিল না বিনয়। চা আর খাবারের দাম মিটিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করল। পিছন ফিরে তাকাল না।

—এতদিন পর মনে পড়ল দাদা!

বিনয় সামান্য হাসার চেষ্টা করল। মীরার দিকে এক পলক তাকিয়ে কী যেন মনে মনে চিন্তা করল। পোশাক পরিচ্ছদ চাল চলনে কত বদলে গিয়েছে মীরা। কীভাবে কথা সুরু করবে? জেরা করা ঠিক হবে না। শুধু সে জানতে চায় সব কিছু। বুঝতে চায় মীরার মানসিকতাকে।
—কী ভাবছো দাদা?

—তোর ছুটি হবে কখন। বিনয় হাত-ঘড়ি দেখল। প্রায় পাঁচটা বাজে। তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছে। মন মেজাজ ঠিক নেই। বাড়িতে অশান্তিকর আব-হাওয়া। মার থমথমে মুখ। শেফালী গম্ভীর। সবার দৃষ্টি নত। কেউ কারুর মুখের দিকে তাকায় না।

মীরা অনেকটা আঁচ করতে পেরেছে। দাদা হয়ত সব শুনেছে। তাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। কিন্তু প্রসঙ্গ তুলতে পারছে না। দাদার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে হাসল। দাদাগিরি যদি ফলাতে এসে থাক, তবে কেটে যাও। উপদেশ শুনতে আর ভাল লাগে না।

—একটু অপেক্ষা কর। ডিরেক্টরকে বলে আসছি।

বিনয় একটা সিগারেট ধরাল। রক্ত-দার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। আগ্রহ নেই। তাকে এখন রক্তচক্ষু শত্রুর চোখে দ্যাখে। তার চোখের সামনে পল্টুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সে প্রতিবাদ করে নি। মীরার অসহায় কান্না নিস্পৃহ দর্শকের মত লক্ষ্য করেছে। কারণ এছাড়া তার করবার কিছু নেই।

স্কুলে আদিত্যের সঙ্গে টিফিনের সময় আজ একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে। তীব্র তর্ক। অন্যান্য শিক্ষক যারা ছিল, প্রথম দিকে তারা কেউ এগিয়ে আসে নি। পরে বিনয় ও আদিত্য যখন পরস্পরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ সুরু করল, তখন সবাই মিলে ওদের দু-দিকে সরিয়ে দেয়।

আদিত্যের কথা মনে হতেই বিনয় উত্তেজনা অনুভব করল। সে-ও কম চিৎকার করে নি। সংযম হারিয়ে ফেলেছিল। আদিত্যের কথাবার্তা, বিশেষ করে জেরার ভঙ্গিতে, ভাল লাগে নি তার। সে অবশ্য বুঝতে পেরেছে এটা গতকালের রিঅ্যাকশান। অর্থাৎ সে কেন আদিত্যের সঙ্গে বসে রেস্টুরেন্টে গল্প করল না। কেন ওভাবে চলে গেল। এটা নাকি ভদ্রতা বিরুদ্ধ। তারও অনেক অভিযোগ। আপনি মশাই, সবকিছু এড়িয়ে চলতে চান। কারুর সঙ্গে ভালভাবে মেশেন না। এত অহঙ্কার কেন মশাই। কী ভাবেন নিজেকে?

প্রথম দিকে বিনয় হতভম্বের মত তাকিয়েছে আদিত্যের দিকে। বাস্তবিক ওভাবে কেউ তাকে আক্রমণ করতে পারে তা সে ভাবে নি। সে অন্যান্য শিক্ষকদের মুখের দিকে তাকিয়েছে। সবার মুখে মুচকি হাসি। তাতে খানিকটা ব্যঙ্গের আভাষ। ফলে সে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে নি। পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে।

এখন সে ঠান্ডা মাথায় সবকিছু ভাবতে পারছে। আশ্চর্য! সে কী সসম্মানে বাঁচতে পারবে না? আদিত্যকে সে সঠিক বোঝাতে পারে নি। বোঝাবার দায়িত্ব তার নয়। সে কিভাবে মানুষের সঙ্গে মিশবে, কতখানি মিশবে। সে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আদিত্যের দিকে. ওর চপলতা, অযাচিত উপদেশ, লম্বা-চওড়া বাণী শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ইচ্ছে করছিল, লাফিয়ে ওর টুঁটি চেপে ধরবে।

ছাইদানীর ভিতর সিগারেটের টুকরো গুঁজে বিনয় অসহিষ্ণুভাবে উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ সে অপেক্ষা করছে। মীরা এখনও আসছে না কেন! আচ্ছা, কেন সে এসেছে? মীরা কার সঙ্গে প্রেম করছে, কিভাবে থাকছে, পল্টুর কথা ভেবে এখনও দু' চোখ জলে ভরে ওঠে কিনা, এসব জেনে তার কী লাভ! এ-সব মীরার একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা। সে এর মধ্যে নাক গলাচ্ছে কেন?

অতএব ফিরে যাওয়া ভাল। বিনয় পায়ে পায়ে সুইংডোর ঠেলে বাইরে এল। এবং মুখোমুখি হল মীরার সঙ্গে।

—একটু দেরী হয়ে গেল। চল দাদা বেড়ুনো যাক।

বিনয় গম্ভীর মুখে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে থাকে। দু' চারটে মামুলী কথা বলে সে সরে পড়বে। আর তিক্ততা সে চায় না।

—তুমি অমন গোমড়া মুখ করে থেক না। বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

ফুটপাতে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বিনয় তেমনি গম্ভীর মুখে বলল, কাল তোর খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম তুই অন্যত্র উঠে গেছিস। কোথায় উঠেছিস?

বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে মীরা বলল, হাতে কাজ নেই তো? চল আমার নতুন বাসা দেখে আসবে। আর রাতে খাবে আমার ওখানে।

—সেই সঙ্গে নতুন মানুষকে দেখতে বলছি না! বিনয় ঠোঁট উল্টে অল্প হাসল, তুই আরও কত খেলা দেখাবি বল তো?

পলকে বিবর্ণ হয়ে ওঠে মীরার মুখ। কিন্তু সে কোনরকম ক্রোধ বা অস্বাভাবিকতা প্রকাশ করল না। বরং বেশ জোরে হেসে উঠল। পথচারীদের মধ্যে অনেকে ফিরে তাকাল। বিনয় মনে মনে রেগে যায়। মীরার এই হাসি আর কিছু নয়, তাদের সবাইকে অগ্রাহ্য করা, তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

—তুমি তো চেন ওকে। আলাপও হয়েছে। হ্যাঁ, শোভনও আজ থাকবে। চল দাদা। তিনজনের আড্ডা আজ ভাল জমবে। ওকি দাদা, অমন করে তাকিয়ো না! মনে হচ্ছে যেন কোন কারণে রেগে উঠেছো আমার ওপর।

—হাঁ, তোর ওপর আমার রাগ হচ্ছে। বিনয় কঠিন স্বরে বলে, তুই সবকিছু ছেলেখেলা মনে করিস না। পল্টুর কথা কখনও ভেবেছিস? মনে পড়ে কখনও ওর কথা। সেদিন যে অত চোখের জল ফেলেছিলি সে-সব কী লোক দেখানো?

—আর কিছু বলবে দাদা?

—কী বলবো। বিনয় তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার

everest/991d/PP bn

CENTRAL LIBRARY

ঘৃণা হচ্ছে! কারুর সংগে মানিয়ে চলতে পারলি না। না রজতদা না মা। শুনলুম শোভনের সংগে এক সংগে থাকছিস। চালিয়ে যা। দুদিন পর শোভনকে ছেড়ে অন্য একজনকে ধরিস। সবই প্রেম। স্বর্গীয় প্রেম!

—চুপ কর দাদা! মীরার চোখ মুখ লাল. তোমরা সবাই জান শুধু উপদেশ দিতে। শুধু নিষেধ। আমার সংগে যখন কথা বলতে ঘৃণা হয় তখন কোন সম্পর্ক না রাখাই ভাল। ভবিষ্যতে আমার কোন খোঁজ কোর না।

চোখের জল কোনরকমে চেপে হন্‌হন্ করে এগিয়ে যায় মীরা।

অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে বিনয়। তার দু' পাশ দিয়ে মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে। যানবাহনের বিচিত্র শব্দ, টুকরো টুকরো সংলাপ, দুমদাম হাসি ও ফেরিওয়ালাদের চিৎকার শুনল। অনেকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে কোন ভ্রূক্ষেপ করল না।

পারল না সে নিজেকে সংযত করতে। বিনয় আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। শূন্য দৃষ্টিতে ট্রাম বাসের দিকে তাকায়। অসম্ভব ভীড়। অফিস ছুটির পর পিল পিল করে নর-নারী ট্রাম বাসের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সে চেষ্টার দেখাল। ফলে মীরার রেগে রাগে প্রস্থান। ভবিষ্যতে তার খোঁজ করতে নিষেধ করেছে।

হঠাৎ একটা চলমান ট্যাক্সীর দিকে চোখ আটকে যায় বিনয়ের। হ্যাঁ, এক পলকে সে দেখে নিয়েছে। কোন ভুল হয় নি তার। পাশাপাশি ঘন হয়ে বসে দুজনে। রজতদা আর একজন মহিলা। কে এই মহিলা? সেই জন নয়, যাকে সে সিঁড়ি ভেঙে রজতদার ফ্ল্যাটের দিকে যেতে দেখেছিল। কাউকে একবার দেখলে তার স্পষ্ট মনে থাকে।

যেই হোক, এত কৌতূহল প্রকাশ করছে কেন! প্রেমাত থাক ওরা। বিনয় সজোরে একটা খালি সিগারেটের খোলে লাথি মারল। লেট দেম গো টু হেল!

—দাদা, আজ খেলার খবর কী?

বিনয় বিরক্ত চোখে লোকটার দিকে তাকাল. কোন্ খেলা?

লোকটা বিনয়ের আপাদমস্তক একবার দেখে দ্রুত এগিয়ে যায়। বিনয় জোরে হেসে উঠল। অনেকে তার দিকে তাকাল। সে ভ্রূক্ষেপ করল না। এখন যা ট্রাম-বাসে ভীড়, হাঁটা যাক, বড়জোর [illegible] ঘণ্টা টনটন করে ওঠে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে করবে কী। [illegible] কেউ দুটো কথাও বলে না। না [illegible] না মা।

কী ক্লান্তি। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে! আস্তে আস্তে [illegible] দরোজায় টোকা দেয়। দরোজা খুলে শেফালি একপাশে দাঁড়ায়। মুখে অল্প হাসি। বিনয় আড়চোখে একবার দেখল। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল মা গুনগুন করে গান করছেন। গান না কি হরির নাম নিচ্ছেন?

—এত দেরী হল কেন বিনু?

—এমনি। বিনয় ঠিক বুঝতে পারছে না। মার মুখেও হাসি। শেফালী মার ডাকে রান্নাঘরে যায়।

জামা-কাপড় না ছেড়ে বিনয় বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল। তবে কী ওদের মধ্যে বিরোধ মিটে গেছে? তবে কী আবার সে বাড়িতে সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারবে? তাই যেন হয়।

বারান্দায় পায়ের শব্দ। শব্দ এগিয়ে আসছে। বিনয় হঠাৎ কেন জানি আতঙ্ক অনুভব করল। শিরদাঁড়া বেয়ে গরম স্রোত নীচে নেমে যাচ্ছে। কে যেন ডাকছে। সে টের পেল সুন্দর একটা গন্ধ। নরম হাতের স্পর্শ। চোখ খুলে দেখল শেফালীর হাসি মুখ। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

(কুড়ি)

গলায় কাঁটা বেঁধার মত কয়েকদিন জীবন অস্বস্তির মধ্যে রজত ছটফট করে মরছে। বিজনের খবরটা সত্যি কিনা একবার যাচাই করে দেখতে হয়। সে নিজের চোখে দেখবে। মীরা কী সত্যি শোভনের সঙ্গে প্রেম করছে? ধরা যাক ব্যাপারটা ঠিক। সে এত অস্থির হয়ে উঠছে কেন! যখন তাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই, তখন তার এ রকম মন খারাপ করার কোন মানে হয় না।

আচ্ছা পল্টুর কথাও কী কখনও মীরার মনে হয় না? এটাই তাজ্জব ব্যাপার। ভেবেছিল পল্টুকে ছিনিয়ে এনে মীরাকে খুব জব্দ করবে। ভেবেছিল অফিসে গোপন কথা ফাঁস করে চাকরীর বারটা বাজিয়ে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল? কিছুই ক্ষতি হল না মীরার। সে তেমনি চাকরী করছে। আর নতুন একটা মানুষ জুটিয়েছে।

যখনই এই কথাটা মনে পড়ে, তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। মনে হয়, এর পর বাঁচার কোন অর্থ হয় না। একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। কিন্তু কী করতে পারে? কিছুই করার নেই। গায়ের জোর সব জায়গায় চলে না। নিস্ফল আক্রোশে সে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে।

—সাব!

রজত রামুর দিকে তাকাল। অস্থির থানা বাড়ি। শুধু আজ নয়, কয়েকটা দিন শুধু অফিস আর বাড়ি। কিছু ভাল লাগে না। মানুষজনের সঙ্গ ভাল লাগে না।

—নিয়ে আয়। তোর চোখ লাল কেন রে রামু? ফের গাঁজা টেনেছিস!

—না সাব। রামুর মুখ একটু কাঁচুমাচু দেখায়, দুপুরে ঘুমিয়েছি—তাই চোখ লাল। বলতে বলতে সে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

খেতে খেতে রজত ভাবল, পল্টু আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠবে। এখনই নানারকম প্রশ্ন করে। বিশেষ করে মীরা সম্পর্কে। একটা কিছু করা দরকার। হ্যাঁ, এখন আর কোন আপত্তি নেই। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাক। পল্টুর কথা ভেবেই আর সে দেরী করতে চায় না।

মিঃ হনুমানপ্রসাদ গাড়ি কেনার কথা অনেকদিন বলেছেন। রজত প্রতিবার জানিয়েছে শিগগির কিনবে। রোজকার মত আজও ট্রামে চেপে অফিসের দিকে রওনা হল। গাড়ির দরকার নেই। অনেক ঝামেলা। দিব্যি ট্রামে চেপে সে রোজ যাতায়াত করছে। তার চেয়ে ডবল মাইনের লোকও ট্রামে চাপে।

রড ধরে রজত চুপচাপ যাত্রীদের আলোচনা শোনে। বসবার সৌভাগ্য খুব একটা হয় না। কানে আসছে নানা রকম আলোচনা। সুন্দর হাল্কা একটা মিষ্টি গন্ধ। রজত তাকাল মেয়েটার দিকে। একবার চোখাচোখি হতে মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। হাতের বই খাতা দেখে মনে হয় কলেজে যাচ্ছে। কী সুন্দর মুখশ্রী!

আজ অফিস ছুটির পর হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটে যাবে। বিনয় চমকে উঠবে নিশ্চয়ই। ওর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হবে। বিয়েতে যেতে বলে নি। যাকগে ও-সব ভেবে আর কী হবে। এক সময়ে ওর সাহচর্য পাবার জন্যে কত লালায়িত ছিল বিনয়! সে নাকি ওর চোখে হিরো ছিল। আজ ভাবলে হাসি পায়। কেননা এখন তারা পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না।

হঠাৎ রজতের খেয়াল হয় ট্রাম দাঁড়িয়ে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল পর পর অনেকগুলি ট্রাম। বাস ট্যাক্সী ও অন্যান্য যানবাহন দাঁড়িয়ে। কী হয়েছে মশাই? আর বলেন কেন প্রসেসান যাচ্ছে। লম্বা মিছিল। আজও লেট। এই নিয়ে এ মাসে পাঁচ দিন হল। মিছিল কর, বিপ্লবের শ্লোগান দাও, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এই অসময়ে কেন! কী বললেন মশাই? আপনি ঠাট্টা করছেন। আপনার লজ্জা...।

প্রায় হাতাহাতি হবার অবস্থা। রজত অতিকষ্টে ভিড় ঠেলে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। ফুটপাতে উঠে হাঁটতে সুরু করল।

এখান থেকে অফিসের দূরত্ব কম নয়। তবু সে হেঁটেই যাবে ঠিক করল। লেট হবে নির্ঘাৎ। তা হোক। এতক্ষণে ট্রামের ভিতর দুজনে যোদ্ধার পরস্পরকে লক্ষ্য করে কঠোর বাক্যবাণ ছুঁড়ে মারছে। ওদের কথা ভেবে রজতের হাসি পেল। সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত মানুষদের আস্ফালন যেন। সামান্য কারণে এরা ক্ষেপে ক্ষেপে পড়ে। সার্থের জন্যে গালাগালি দেয় সবাইকে। মনে পড়ল তার অফিসের বড়বাবুর কথা। ভদ্রলোক অফিসে দিন দিন [illegible] কথা বলে। [illegible] দিকে মাথা নীচু করে কাজ করেন। [illegible] একদিন সে [illegible] অবস্থায় সহযাত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখতে পাবে। অথবা [illegible] তার এক সম্পূর্ণ নতুন চেহারা আবিষ্কার করবে।

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

অঙ্গনা

পিছুর টানে

বিশ্ব ধর্মসভায় যোগদানস্বরূপে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করলেন। সেই তাঁর প্রথম বিদেশ গমন। ইতিমধ্যে তিনি পরিব্রাজকরূপে সারা দেশ ভ্রমণ করেছেন। দেশবাসীর দুঃসহ জীবনযাপন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাণশক্তির তিল তিল অপচয় দর্শনে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। সর্বোপরি, তিনি দেখলেন যে, মেয়েরা একেবারে সামাজিক অনুশাসনের লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ। রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘর ছাড়া তাঁদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এটাই যেন এঁদের স্বাভাবিক জীবন। এঁরা যে এককালের গার্গী-মৈত্রেয়ীর বংশধর সেটা কোনক্রমে বোঝার উপায় নেই। একান্তভাবে এই জীবনধারায় নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া পুরুষরাও মেয়েদের ব্যাপারে আর নতুন করে কিছু ভাবতে রাজী নয়। অথচ এঁদের পূর্ব-পুরুষের সাথেই গার্গী-মৈত্রেয়ী বেদের শ্লোক রচনায় এবং শাস্ত্র পর্যালোচনায় ব্যস্ত থাকতেন।

গার্গী-মৈত্রেয়ী যুগের সমস্ত ছবিটাই বদলে গেছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হয়েছে আমাদের মানসিকতার। মেয়েদের আর সেই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দিতে পুরুষরা আর প্রস্তুত নন। তাঁরা সমস্ত অধিকার একচেটিয়া ভোগ করতে চান। এখানে এসে কেউ ভাগ বসাক তাঁরা যে শুধু তা অপছন্দ করেন তাই নয়, ঘোরতর বিরোধীও বটে। তাই সন্তানধারণ আর রান্নার যন্ত্র হিসেবেই তাঁরা মেয়েদের ব্যবহার করতে চান। তাই স্বদেশের উন্নতির পথ আজও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

অথচ একটা সাধারণ ঘটনা থেকে এ নীতিরই শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে অনন্ত আকাশে পাখি স্বচ্ছন্দে বিহার করে তার ডানা দুটির সাহায্যে। যদি এই ডানা দুটি না থাকতো তবে এই স্বচ্ছন্দ বিহার তার পক্ষে সম্ভব হতো না। আকাশে ওড়ার সব আকাঙ্ক্ষাই তার মাটি হয়ে যেতো। কিন্তু যদি দুটি ডানার জায়গায় একটি ডানা নির্ভর করে পাখিকে অনন্ত নীলিমায় পাড়ি দিতে হতো? সেটা অসম্ভব। এক ডানায় ভর করে আকাশে বিচরণ করার সব সাধ ভেস্তে যেতো পাখির।

নারীজাতির এই দুর্দশা দেখে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করলেন আমরা যেন এক পক্ষবিশিষ্ট পাখি। তাই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কোন কিছু নেই। সর্বদাই ছুটে পড়ে মুখোমুখি থাকি। পরিকল্পনামাফিক কোন সময়েই উঠে দাঁড়াতে পারছি না। কারণ, উঠে দাঁড়াবার আসল যে শক্তি তাই তো এ জাতের নেই। তাঁরা তো দিন কাটাচ্ছেন রান্না ঘরে আর আঁতুড়ে। এ অবস্থা লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ পরে বলেছেন, এক পক্ষে পাখির উড়ান সম্ভব নয়। তেমনি নারীজাতিকে অবজ্ঞা আর অবহেলার দূরে ঠেলে রেখে কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা গিয়ে দেখলেন সে দেশের মেয়েদের স্বাধীনতা। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত আর হাট-বাজার সর্বত্র তাঁদের অবাধ যাতায়াত। মেয়েদের আত্ম-অধিকার সম্প্রসারণের জন্য কত বিরাট আয়োজন। সে দেশের মেয়ে-পুরুষরা আত্মকেন্দ্রিক নয়। তাঁরা চিন্তা করেন একে অপরের জন্য। মেয়ে-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতায় এঁরা গড়ে তুলেছেন নিজেদের উন্নতির সুদৃঢ় ইমারত। তাই মেয়েদের তাঁরা কোথাও আটকে রাখেন নি। বরং তাঁদের স্বচ্ছন্দ বিহারের অবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, এই জাত এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। এই গতি রোধ করে কারো সাধ্য নেই। এ যেন পুরোপুরি দুটি ডানাবিশিষ্ট পাখি। এতো সহজ স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়ানো তাই এদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। আর আমাদের জাতের আসল ডানাটিই হারিয়ে বসে আছে।

একই স্ত্রীজাতি। দেশে দেশে কিন্তু কত ভিন্ন আয়োজন। কেউ কেউ চায় দাবিয়ে রাখতে আবার কারো বা আকাঙ্ক্ষা ওদের এগিয়ে দিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের দেশে সে মনোভাব এখনো জেগে ওঠেনি। তাই মেয়েদের উন্নতির সামান্যতম আয়োজনেরও ছিল একান্ত অভাব। সর্বত্র তাঁদের বিদ্যাশিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। মেয়েদের স্কুলের প্রচলন তখনো হয়নি। এমনকি লেখাপড়া শেখা তাদের পক্ষে ছিল ঘোরতর অপরাধ। তাতে নাকি সমাজ-সংসার উচ্ছন্নে যাবে। এ নিয়ে তৎকালীন মনস্বী ব্যক্তিদের কেউ কেউ বিদ্রূপের শানানো চাবুক হানতেও দ্বিধা করেননি। স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে এদেশে যখন আন্দোলন জোরদার হতে লাগলো তখনই এই ঘটনা ঘটে।

প্রথম কয়েকজন মহৎ মানুষের প্রচেষ্টায় গুটিকয় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো কলকাতা শহরে। কিন্তু ছাত্রী জোটে না। অভিভাবকরা ভয়ে স্কুলে মেয়ে পাঠাতে চান না। সমাজ যদি বয়কট করে তবে তাঁরা দাঁড়াবেন কোথায়? অবশ্য কেউ কেউ নির্ভীক ছিলেন। সমাজশিরোমণিদের রোষ-শাসানিকে তাঁরা ভয় পেতেন কম। তাঁরা মেয়েদের স্কুলে পাঠালেন। স্ত্রীশিক্ষার মরা গাঙে জোয়ারের লক্ষণ দেখা দিল।

আসলে সমাজশিরোমণিরা মেয়েদের লেখাপড়ায় সুযোগ দিতে চাইতেন না এবং তার বিরোধিতা করতেন অন্য কারণে।

তাঁরা মনে করতেন যে এর ফলে মেয়েরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলবে আর সমাজকে একেবারে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করবে। তাই তাঁরা বিধান দিলেন, স্ত্রী-শিক্ষা শাস্ত্রবহির্ভূত। বেদ আর মনুর দেশের লোক হয়ে এমনিভাবে তাঁরা ঘোর অশাস্ত্রীয় কাজ করলেন।

বিবেকানন্দ সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছেন, গিয়েছেন শহর থেকে গ্রাম: তন্ন তন্ন করে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন প্রতিটি ভারতবাসীর। তিনি লক্ষ্য করেছেন সর্বত্র অশিক্ষা দেশকে ঘিরে রেখেছে। অথচ এই রাহুর কবলমুক্ত হতে পারলেই এই জাতকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। বিশেষ, শহর থেকে গ্রামের অবস্থা আরো শোচনীয়। যেখানে শিক্ষার কোন সুযোগই নেই। দারিদ্র্যপীড়িত শিক্ষাবিহীন গতানুগতিক জীবনধারায় সবাই অভ্যস্ত। গার্গী-মৈত্রেয়ীর দেশে এই অবস্থা ছিল তাঁর কাছে অসহ্য।

এরই পাশাপাশি তিনি প্রত্যক্ষভাবে লাভ করলেন আমেরিকার অভিজ্ঞতা। এক বিরাট অনুভূতিতে তাঁর মনপ্রাণ আপ্লুত হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, এর এক কণাও যদি ভারতবর্ষে পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে অসাধ্য সাধন হয়। তাই স্বল্প আয়ুর মধ্যেই তিনি সারা দেশকে ডাক দিলেন জাগ্রত হতে এবং নিজেকে উপলব্ধি করতে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি সকলকে উদ্যোগী হতে আহ্বান করলেন। তিনি হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, আমাদের সকলের অবহেলায় এক বিরাট সম্পদ দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এখনি তার পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। নাহলে জাতির উত্থান অসম্ভব।

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, মধ্যবর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের জন্যই এদেশের স্ত্রীজাতির এই দুরবস্থা। কিন্তু এই দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে। কারণ, এখানেই নিহিত রয়েছে সমগ্র জাতির প্রাণশক্তি। তাই স্ত্রীজাতির উদ্বোধন ভিন্ন জাতিকে জাগিয়ে তোলা যাবে না। আর তখনই তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, এক পাখায় পাখির উত্থান সম্ভব নয় কখনো।

বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে এই আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা। বিবেকানন্দের সত্যকে তাঁরা উপলব্ধি করলেন এবং গুরুত্ব দিলেন স্ত্রীশিক্ষার উপর—নারী জাগৃতির উপর।

সে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ। স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে সারা দেশ তখন আলোড়িত হচ্ছে। এ সময় সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা জোগাত মায়ের জাতের কাছ থেকে। শিক্ষার প্রসার শুরু হলো। মেয়েরা কেউ পাদপ্রদীপে জেগে উঠতে শুরু করলো।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের আহ্বানে স্ত্রীশিক্ষার যে ভিৎ রচিত হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে তা বেশ খানিকটা রূপ নিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন যেমন বাড়লো তেমনি দলে দলে মেয়েরা এসে ঝাঁপ দিলো পরাধীনতার অন্ধকার থেকে আলোর উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায়। এর পরের ইতিহাস আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীন ভারতে মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হলো পরিপূর্ণ মর্যাদায়। সমানাধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতিতে তাঁরা নিজেদের সংগ্রামের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখলেন।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে এদেশে মেয়েদের অগ্রগতি নানাদিক থেকে বিরাট উল্লেখের দাবী রাখে। এতদিন যে সাধ তাঁদের ছিল অপূর্ণ এবার সুযোগ পেয়ে তা পূর্ণ করার চেষ্টা করে চলেছে প্রাণপণে। বিজ্ঞানের সাধনা থেকে রাষ্ট্রশাসন পর্যন্ত মেয়েদের এখন জয়জয়কার। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। এরকম একটি সম্পূর্ণ অভাবিত ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের দেশে। বিশ্বের নারীসমাজের কাছে এ এক নতুন পথনির্দেশও বটে। বিশেষ, প্রগতি কৌলিন্যে যারা মহিমান্বিত সেসব দেশও এ ব্যাপারে পিছিয়ে আছে অনেক। আরো একটি বিরাট সংবাদ যে, আমাদের প্রধান-মন্ত্রী বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় মহিলা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ফ্রান্সের এক গণ-ভোটের মাধ্যমে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

বিজ্ঞানেও মেয়েদের জয়যাত্রার এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক শ্রীমতী বন্দ্যো-পাধ্যায় কৃত্রিম উপায়ে ধান তৈরির প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। আমাদের মতো ক্ষুধা-পীড়িত দেশের পক্ষে এ এক পরম সুসংবাদ। তাঁর এই পরীক্ষা সফল হলে বিজ্ঞানসাধনায় মাদাম কুরীর পর এক বিরাট অধ্যায়ের সূচনা হবে বলে আশা করা যায়।

শুধু ল্যাবরেটরী নয়। বিজ্ঞানের গবেষণায় মেয়েরা আজ পা বাড়িয়েছে হিমালয়ে। সম্প্রতি এক মহিলা বৈজ্ঞানিক ঘুরে এসেছেন হিমালয় থেকে। উদ্দেশ্য ছিল নতুন আবিষ্কারের সম্পদ আহরণ। অভিযাত্রীর বেশে তিনি উঠেছিলেন দীর্ঘ উচ্চতায়। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক অভিযান সম্পূর্ণ নতুন। ইতিপূর্বে আর কেউ এ পথে পা বাড়ায়নি।

বিজ্ঞানের গবেষণাগার থেকে রাষ্ট্র-শাসনের মধ্যেকার স্তরগুলিতেও আমাদের সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য। আবিষ্কারের দুর্বার নেশায় আজকের মেয়েরা পাহাড়ে চড়ছে। একের পর এক গিরিশৃঙ্গে প্রোথিত হচ্ছে ওদের বিজয়পতাকা। পথকে আত্মীয় মেনে বেরিয়ে পড়ছে অজানার সন্ধানে। এই সঙ্গে জীবনসংগ্রামেও আমরা বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পেরেছি।

তবু বলতে লজ্জা নেই যে, স্ত্রী জাগৃতির এই যে বৃহৎ কর্মকাণ্ড চলছে গ্রামের মেয়েরা তার অংশীদারত্বে প্রায়ই অনুপস্থিত। একথা সত্য যে, সেদিনের তুলনায় আজকের চেহারা বদল হয়েছে। কিন্তু সংস্কার এবং দারিদ্র্যের নাগপাশ গ্রামে গ্রামে আজো বিরাট বাহু বিস্তার করে বসে আছে। অথচ আসল প্রাণসম্পদ লুকিয়ে রয়েছে সেখানে। তাই শুধু শহর এবং নাগরিক জীবনের বিলাস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার দিন আজ নয়। যে অন্ধকার আর আড়ম্বরের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেছেন তার বিরুদ্ধে লড়াই এখনও আমাদের শেষ হয়ে যায়নি। গ্রামের নারীসমাজকে যদি প্রগতির নতুন পথে সামিল না করা যায় তবে কোন প্রচেষ্টাই হাজারো কীর্তিতেও ম্লান হয়ে থাকবে।

স্ত্রী শিক্ষার অধিকতর সুযোগ দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা ঘোষিত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। বাকি কেবল বিহার, ওড়িশা, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে নতুন প্রণীত এই বিধানকে আমরা স্বাগত জানাই। সেই সঙ্গে সারা দেশেই অনুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তন দাবী করি। কারণ, একই দেশে রাজ্যে রাজ্যে বিভেদ একান্ত অবাঞ্ছিত।

বিবেকানন্দ স্ত্রীজাতির অগ্রগমন চেয়ে-ছিলেন। আজ এদেশের মেয়েরা অনেক এগিয়েছে। আর এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সামনে। প্রয়োজন শুধু যথার্থ ব্যবহার। তবেই বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা সফল হবে। আর স্ত্রীজাতির অগ্রগতিও হবে সার্বিক, সুন্দর।

—প্রতীমা

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট : ২ লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
৫৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

হার মানা হার / মহরতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন/পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়।   ফটো : অমৃত

তেরে মেরে স্বপ্নে / হেমামালিনী, দেবানন্দ ও পরিচালক বিজয়ানন্দ   ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

আমেরিকার নীরব চলচ্চিত্র

এই উৎসবে প্রদর্শিত বেশীর ভাগ ছবিকেই ধীরগতিসম্পন্ন অর্থাৎ 'স্লো' ও সেই কারণেই কিছুটা ক্লান্তিকর বলে মনে হয়েছিল। এমন কি আমাদের কৈশোরে রুডলফ ভ্যালেন্টিনো অভিনীত যে "ব্লাড অ্যান্ড স্যান্ড" (১৯২২) ছবি ম্যাডান থিয়েটার অ্যান্ড প্যালেস অব ভ্যারাইটিজ"-এ (বর্তমান এলিট সিনেমা) চলার সময়ে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, সেই ছবি দেখেও আমরা নিজেরাই কেমন যেন ঠাণ্ডাই থেকে গেলাম। রুডলফ ভ্যালেন্টিনো! যার চেয়ে সুপুরুষ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর চলচ্চিত্রে নায়করূপে অবতীর্ণ হননি, সেই রুডলফ ভ্যালেন্টিনোকেও বিগত যুগের মেক্-আপ ও ফটোগ্রাফীর মাধ্যমে তেমন আকর্ষণীয় ও সুন্দর বলে বোধ হল না। অথচ এই ছবির আগে নির্মিত "ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্যালিপ্স" (১৯২১) ছবির কয়েকটি শট-এ তাঁকে সত্যিই যথার্থ সু-পুরুষ বলে মনে হয়েছে। রেক্স ইনগ্রাম পরিচালিত এই দ্বিতীয় ছবিটিই ভ্যালেন্টিনোকে রাতারাতি জনপ্রিয়তা এনে দেয়। ডি ডাবল্যু গ্রিফিথের শিষ্য রেক্স ইনগ্রাম 'ফোর হর্সমেন-এর লেখক ভিন্সেন্ট ব্লাস্কো ইবানেজ-এর যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু—মনুষ্য-সমাজের এই চারটি শত্রু অশ্বপৃষ্ঠে একই সঙ্গে ধাবিত হয়, এই মতবাদকে মূল প্রেম-কাহিনীটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করবার চেষ্টা করে সে-যুগে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

আমেরিকার চলচ্চিত্র যেমন ওয়েস্টার্ন ছবির নায়ক হিসেবে গুলী এবং অশ্ব-চালনায় সমান দক্ষ চরিত্রের সৃষ্টি করেছে, চ্যাপলিন, হ্যারল্ড লয়েড, বাস্টারকীটন, লরেল-হার্ডি গোছের অত্যন্ত দেখতে নিরীহ কমিক চরিত্রের সৃষ্টি করেছে, অপর দিকে তেমনিই সৃষ্টি করেছে পুরুষকে সম্মোহিত করে তার সর্বনাশকারিণী রক্তচোষা নারী চরিত্রকে —যাকে বলা হয় ভ্যাম্পায়ার বা শুধু ভ্যাম্প। ১৯১৪ খৃঃ নির্মিত 'এ ফুল দেয়ার ওয়াজ' ছবিটিতেই প্রথম ভ্যাম্প চরিত্রটিকে দেখা যায়, যদিও আজকের দৃষ্টিতে অত্যন্ত স্থূলভাবে অভিনীত হবুও বুঝতে কষ্ট হয় না চলচ্চিত্রের প্রথম ভ্যাম্পবেশে থেডা বারা চরিত্রটিকে জীবন্ত

কাহিনী/পরিচালনা : নরেন্দ্রসুন্দরী / ব্যারিক্স ঘোষ

[illegible]

নিমন্ত্রণ : অনুপকুমার এবং সন্ধ্যা রায়

ছদ্মবেশী-র মহরৎ-পরিচালনা অনুষ্ঠানে। উত্তমকুমারের সামনে ক্ল্যাপ দিচ্ছেন রঞ্জন ভট্টাচার্য। ফটো : অমৃত

অবদান রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

১৯২৭ খৃঃ নির্মিত ফ্লেশ অ্যান্ড দি ডেভিল ছবিটিতেও বিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো একটি ভ্যাম্প চরিত্রেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু থেডা বারা রূপায়িত চরিত্রের তুলনায় এই চরিত্রটি ঢের বেশী মার্জিত, অন্তর্ভেদী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। নীরব ছবিতে অভিনয়রীতি অনেকটা মূকাভিনয়ের মতো; কাজেই সবাক ছবির তুলনায় এই অভিনয়ে অঙ্গ ও মুখভঙ্গির বেশ কিছুটা আতিশয্য থাকে এবং সেটাকে আজকের দৃষ্টিতে, বেশ কৃত্রিমই ঠেকে। এই ছবিতেও গ্রেটার অভিনয়কে আজ তাই কৃত্রিম বলেই বোধ হওয়া অন্যায় নয়। ক্ল্যারেন্স ব্রাউন পরিচালিত এই ছবিখানি বিশ দশকের চিত্রামোদীদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগালেও বলতে হয়, গ্রেটা গার্বো যুগসন্ধির সময়ে আমেরিকার চিত্রজগতে এসেছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত চিত্রগুলি সবাক যুগেরই অন্তর্ভুক্ত, যেমন, ক্যামিল, কুইন ক্রিস্টিনা, নিনচ্‌কা প্রভৃতি।

১৯১৬ খৃঃ দি ক্লেমার্টীক ছবিটিতে ক্যামেরাম্যানের সূর্যের তীর্যক রশ্মির নাটকীয় ব্যবহার ও দিকচক্রবালে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে চলমান অশ্বারোহীর মসীদর্শ—ছায়া-পরিলেখ (সিল্যুয়েট) যেমন প্রশংসনীয়, ঐ ১৯১৬ খৃঃ আর একটি ছবি টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস আন্ডার দি সীতে সমুদ্র-গর্ভের ফোটোগ্রাফীকে যথাসম্ভব বাস্তব-ভাবে রূপায়ণের প্রয়াসও তেমনই প্রশংস-নীয়।

উনিশ শো বিশের দশকে আমেরিকার চলচ্চিত্রজগতে ইয়োরোপ থেকে যেসব নাম-করা পরিচালকের আমদানি হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে এরিক ফন স্ট্রোহিম, ভিক্টর সিস্ট্রম, আর্নস্ট লুবিচ এবং ফ্রেডরিক্‌ মুর্ণাউর নাম সুবিদিত। অবশ্য ১৯২২ খৃঃ নির্মিত এবং এরিক ফন স্ট্রোহিম পরিচালিত ফুলিশ ওয়াইভস ছবিটিকে বিষয়বস্তু ও টেকনিক—উভয় দিক দিয়েই হয়তো অত্যন্ত সেকেলে বলে বোধ হবে, কিন্তু মনে রাখা দরকার, মূল ছবিটি ছিল কমবেশী তিন হাজার ফুট দীর্ঘ এবং ছবিটির সঙ্গে বাজাবার জন্যে একটি সুলিখিত আবহ-সঙ্গীত রচিত হয়েছিল সিগমণ্ড রোমবার্গ দ্বারা। আমেরিকার সম্ভ্রান্ত ধনীসমাজে বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত রূপসীরা সহজেই কেমন স্বামী সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে নিজেরা এক শ্রেণীর কুটচক্রীর কবলে পড়ে, তারই একটি সুস্পষ্ট চিত্র পরিচালক তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমালোচকও সেন্সরের কৃপায় তাঁকে বহু ঘটনাই ছবিখানি থেকে শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে হয়েছিল।

১৯২৪ খৃঃ নির্মিত ম্যারেজ সার্কল-এ আর্নস্ট লুবিচ প্রায় ঐ একই পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রেম ও সন্দেহকে ছবির উপ-জীব্য করেছেন, তবে তিনি জিনিসটাকে কিছুটা কৌতুকাশ্রয়ী করে তুলেছেন। লুবিচের প্রায় প্রতিটি ছবিতেই এই কৌতুকপরায়ণতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট-মান। অবশ্য এই বিশেষ ছবিটি চার্লি চ্যাপলিনের 'এ উওম্যান অব প্যারিস' ছবিটি দ্বারা প্রভাবিত। সুইডিস পরিচালক ভিক্টর সিস্ট্রম ১৯২৭-২৮ খৃঃ নির্মিত 'দি উইন্ড' ছবিতে এমন একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যা আজকের দিনেও বিস্ময়কর। নায়িকা লেটীর চিত্তকে বিপরীত অবস্থাতেও মুষড়ে না পড়ে জয়ী হবার জন্যে তিনি ক্রমান্বয়ে যে বালুঝটিকার অবতারণা করেছেন, তা আজকের দর্শককেও স্তম্ভিত না করে পারে না। মানুষের জীবন রূপায়ণে প্রকৃতিকে এমনভাবে ব্যবহার করা আজকালকার ইতালীয় বা জাপানী চিত্রে দেখা গেলেও সে-যুগে ব্যাপারটা খুবই বিরল ছিল বলা চলে।

১৯২৭ খৃঃ নির্মিত হয় 'সানরাইজ' ছবি। নীরব ছবির যুগে মাত্র ছবি যখন

কাহিনীর পরিস্থিতি বোঝাতে বা কাহিনীকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে অপারগ হত, তখন পরিচালকেরা ছবির মধ্যে ব্যবহার করতেন 'সাব-টাইটেল' অর্থাৎ কিছু লিখিত ভাষা; এই ভাষা কখনও পাত্রপাত্রী-দের মুখের প্রধান সংলাপ বা মূল বক্তব্য প্রকাশ করত; আবার কখনও বা কাহিনীর বিশেষ পরিস্থিতির দ্যোতক হত। এই সাব-টাইটেলের সংখ্যা অনেক সময় শ'দুয়েক ছাড়িয়ে পর্যন্ত হত। নীরব যুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় ছবি 'সেভেন্থ হেভেন'-এ সাব-টাইটেলের সংখ্যা ছিল ১৭২। কিন্তু ছবির মধ্যে এই যে সাব-টাইটেলের ব্যবহার, এটা নিশ্চয়ই ছবির মাধ্যমে চিত্রকাহিনীকে লক্ষ্যপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে চিত্র-পরিচালকের অক্ষমতাকেই ব্যক্ত করে। এই অক্ষমতাকে অতিক্রম করেছিলেন জার্মান চিত্রপরিচালক এফ ডাবল্যু মুর্ণো। জার্মানীতে তোলা তাঁর 'দি লাস্ট লাফ' ছবিতে একটিও সাব-টাইটেল ছিল না; অথচ ছবিটির কাহিনী, তার বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং তার চরিত্রাবলীকে বুঝতে কোনো দর্শকেরই কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। এই ছবিটি দেখবার পরেই হলিউডের কর্তারা তাঁকে নিয়ে আসেন 'সান রাইজ' ছবিটি তৈরি করবার জন্যে। হারম্যান সুডারম্যান লিখিত ছোটগল্প 'এ ট্রিপ টু টিলসিট' থেকে চিত্রনাট্য রচনা করেন কার্ল মেয়র। এবং সেই চিত্রনাট্যকে রূপায়িত করেন মুর্ণো। যাঁরা এই উৎসবে ছবিটিকে দেখেছেন, তাঁরাই হয়ত বলবেন, ছবিটিকে ঠিক নীরব বলা যায় না। কারণ ছবিটির প্রদর্শনীকালে সর্বক্ষণ বেজেছে আবহসঙ্গীত। এবং এই আবহসঙ্গীত ছবিটিকে যেন প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু এই আবহসঙ্গীত প্রসঙ্গে একটি জরুরী কথা এখনে উল্লেখের প্রয়োজন আছে। নীরব যুগের প্রতিটি ছবির প্রদর্শনের সময়েই আবহ সৃষ্টির জন্যে যন্ত্রসঙ্গীত বাজানোর রেওয়াজ ছিল। চিত্রনির্মাতারা ছবি প্রদর্শনের সময়ে বাজাবার জন্যে নোটেশন দেওয়া মুদ্রিত সঙ্গীত-ধারা পাঠিয়ে দিতেন। আর কিছু না হোক, মাত্র একটি অর্গানের সাহায্যে সেই সঙ্গীত বাজানো হত ছবির প্রদর্শনী সময়ে। এছাড়া ছবি চলার সময়ে যেখানেই সাব-টাইটেল আসত, সেখানেই প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে সেই সাব-টাইটেল পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন, সে কি ইংরেজী, আর কি হিন্দী বা বাংলা ছবি। কাজেই নীরব ছবি যথার্থই নীরবে প্রদর্শিত হত না কখনও। বর্তমান উৎসবে প্রদর্শিত প্রতিটি ছবির সঙ্গেই আবহসঙ্গীত বাজাবার ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। তবে 'সানরাইজ' ছবিটি যে বহু দর্শককেই আকৃষ্ট করেছে, তার একমাত্র কারণ এর সঙ্গে বাদিত আবহসঙ্গীত নয়। 'সানরাইজ' ছবির দুটি আট-দশেক সাব-টাইটেল বাদ দিলে মনে হবে, ছবিটি যেন আজকের দিনের তোলা; ছবিটিতে ব্যবহৃত টেকনিক, তার ট্রাকিং ও ক্রেনশট, তার ক্লোজ-আপ ও লংশট, কাহিনীবিস্তারে আশ্চর্য-ভাবে বিভিন্ন রসের সংমিশ্রণ, দৃশ্যসজ্জায় বাস্তব পরিবেশ রচনা এবং সর্বোপরি ছবির নায়িকা জেনেট গেনারের আশ্চর্য সপ্রাণ অভিনয়—সবে মিলে ছবিটিকে এমন প্রাণস্পর্শী করে তুলেছে, এমন আবেদনপূর্ণ করে তুলেছে, যা আজকের দিনের সচরাচর প্রদর্শিত ছবিতেও দুর্লভ। সত্যিই, এই নীরব চলচ্চিত্র উৎসবে 'সানরাইজ' ছবিটি তুলনাহীনভাবে একক।

পরিচালক তপন সিংহ বম্বেতে জিন্দগী জিন্দগী নামে যে হিন্দী ছবি শুরু করেছেন তারই সেটে গৃহীত চিত্রে পরিচালক, সুনীল দত্ত ও ওয়াহিদা রেহমান

এই চলচ্চিত্র উৎসবের পরিশিষ্ট হিসেবে ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে যে দু-দিনব্যাপী 'ফিল্ম সেমিনার' আয়োজিত হয়েছিল, তাতে সর্বশ্রী বি ডি গর্গ, সতীশ বাহাদুর, সমীক বন্দোপাধ্যায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত এবং জেমস মার্টিন আলোচক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এতে বহু বিষয়ের মনোগ্রাহী আলোচনা হলেও কোন কোন বিশেষ গুণে চলচ্চিত্র মাত্র বৈজ্ঞানিক বিস্ময় থেকে একটি শিল্পরূপ-রূপে স্বীকৃত হল, সে কথা উল্লেখিত হয়নি, যদিও মাত্র এই বিষয়ে আলোচনার জন্যেই একটি অধিবেশন নির্দিষ্ট ছিল।

পার্শ্ববিভূষণ উত্তমশঙ্কর

স্টুডিও থেকে

স্টুডিও পাড়ায় ঘন্টাখানেক ঘুরলে কলকাতার অনেক পরিচালক-কুশলীর সাক্ষাৎ মিলবে। কেউ কাজ করছেন, কেউ লনে বসে বা দাঁড়িয়ে পরিচ্ছন্ন আড্ডায় মেতে আছেন, কেউবা হয়তো ফিল্ম ল্যাবরেটরীর নিভৃত কোণে চেয়ার টেনে বসে আছেন বা ব্যস্ত রয়েছেন নতুন স্ক্রিপ্টের খাতা নিয়ে।

এন-টির এক নম্বর ফ্লোরে ওঠবার আগে কয়েক সিঁড়ির বাধা পেরিয়ে যায় সার হলঘরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলে ডানদিকের ছ' নম্বর ঘরে যদি একবার ঢুকে পড়া যায়, সেখানেও একজন স্বল্পভাষী কুশলীর দেখা মিলবে। সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে। তাকে কাউচ-এ লনে বসে থাকতে দেখা যায়, খুব কমই দেখা যায় তাকে অলস মুহূর্তের কোনো ভঙ্গিমাতে। সদাব্যস্ত এই কুশলী বাংলা ছবির দর্শকের কাছে অতি পরিচিতই শুধু নয়, একটি সুপরিচিত নাম। বিভূতি লাহা। অগ্রদূত গোষ্ঠীর কর্ণধার।

'চিরদিনের' শুরু হবার আগে যখন দেখা হয়েছিল তখনও যেমন সহাস্য কন্ঠে তার সঙ্গে আলাপ জানিয়েছিলেন, 'বহুরূপী অপেরার' সুটিং চলার সময়ও সেই একই ব্যবহার। যখনই জিগ্যেস করেছি, 'কি প্ল্যান করছেন?' সহাস্যে বলেছেন 'দেখি কি করি, ভাবছি।' অথচ কদিন আগেই নতুন ছবির মহরতের কাজ হাতে এসেছে। বিস্মিত হয়েছি। ক্যামেরার পেছনে হাতে রয়েছি —এই ভাবছিলেন!" মৃদু হেসে শুধু ঘাড়টি নেড়েছেন। বিভূতিবাবুর মত স্বল্পভাষী মানুষ টালিগঞ্জের পাড়ায় কজন আছে হাতে গোনা যায়। নিজের ঘরে বা ফ্লোরে সবখানে তিনি চিন্তামগ্ন।

অগ্রদূত নামটির সঙ্গেই অনেক ইতিহাস। একটি নাম হাজারো স্মৃতির মালা। 'সব্যসাচী' দিয়ে সাফল্যের জয়যাত্রা যে নতুন পথ নিয়েছিল আজও সমান গতিতে সামনের দিকেই এগিয়ে চলেছে। তাই অগ্রদূতের নতুন ছবির খবর টালিগঞ্জে শুধু নয় সারা বাংলাদেশের দর্শকদের কাছেও 'খবর' বটে। 'রূপসী অপেরার' পর নীরব ছিলেন বিভূতিবাবু, যখন জিগ্যেস বক্স অফিস হতে বাতায়নের পথে নতুন ছবির কথা উঠলেই বলেছেন 'দেখি কি করি, ভাবছি।'

তাঁর সেই ভাবনা শুরু হলো নতুন রূপ নেবার পথে যাত্রা শুরু হলো টেকনিশিয়ানের ফ্লোরে। প্রখ্যাত পরিচালক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্যর প্রোপিন্টেকের পর ... করছেন বিভূতিবাবু নিজেই।

নবরাগ / উত্তম-সুচিত্রা

পদ্মশ্রী দীপ্তি মিত্র

ক্যামেরার সামনে ছিলেন উত্তমকুমার। মাত্র অল্প ক'টি কথা। তারপরেই কাট। যাত্রা শুরু হোল বিভূতিবাবুর নতুন ছবি 'ছদ্মবেশী'র। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

পরলোকে গিরীন্দ্র সিংহ

সুখ্যাত চলচ্চিত্র সাংবাদিক, চলন্তিকা, উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ, প্রসাদ প্রভৃতি চলচ্চিত্র মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রভাতের রং, মণিহার, কামিনী, মন নিয়ে ও সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত নবরাগ চিত্রগুলির প্রযোজক গিরীন্দ্র সিংহ কিছুকাল ধরে রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগে শয্যাশায়ী থাকবার পরে অকস্মাৎ ইউরিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে গেল মঙ্গলবার, ২ ফেব্রুয়ারী, বৈকাল ৩টায় অকালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে বাংলার চলচ্চিত্র জগৎ যেমন একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হল, তেমনি আমাদের মত বহুজনই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে হারালেন। তাঁর পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুক।

কাহিনী নিয়ে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিভূতিবাবু নিজে। অগ্রদূতের ছবির শিল্পী তালিকায় 'উত্তমকুমার' নামটি প্রায়শঃই আপনা থেকেই এসে যায়। অগ্রদূত ও উত্তমকুমার এই নাম দুটি আলাদা করে না দেখাই ভাল। উত্তমকুমারের জনপ্রিয় ছবির তালিকায় অগ্রদূতের নাম বহুবার আছে, আবার অগ্রদূতের সফল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সঙ্গেও উত্তমবাবুর নামটি সবিশেষ জড়িত (এ প্রসঙ্গে সুচিত্রা সেনের নামটিও করা যেতে পারে)।

এ ছবিতে উত্তমবাবুর বিপরীতে আছেন মাধবী চক্রবর্তী। অন্য ছবির কাজে কলকাতার বাইরে থাকায় মাধবী দেবী শুক্রবার শুভ মহরতে উপস্থিত ছিলেন না। ছবিতে অন্যান্য ভূমিকায় থাকছেন শুভেন্দু চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, জোৎস্না বিশ্বাস, শমিতা বিশ্বাস, নিকাশ রায়, অনুভা গুপ্তা, রুবি রায় প্রমুখ।

• • •

স্টুডিও ধর্মঘটের আওতার বাইরে এখন তিনটি স্টুডিও। টেকনিসিয়ানস, ইন্দ্রপুরী ও ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরী। অবশ্য পুরোদমে কাজ চলছে না কোনটাতেই। ল্যাবগুলোতে চলছে লাগাতার ধর্মঘট গত উনিশে জানুয়ারী থেকে।

ইন্দ্রপুরীতে অবশ্য গত সপ্তাহে মধুবন গোষ্ঠী তাদের নতুন ছবি 'জনতার আদালতে'র শেষ পর্যায়ের কিছু কাজ করলেন। জনতা ফিল্ম কর্পোরেশনের এ-ছবিতে রূপদান করছেন সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, সুখেন দাস, রত্না ঘোষাল প্রমুখ। নির্দেশনায় নবাগত অনিলকুমার এ ছবির প্রযোজক এবং কাহিনীকারও বটে। চিত্রনাট্য লিখেছেন শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নান্দীকার

বোম্বাই ভিলাই এবং
জামশেদপুরের অভিনয় সূচী :

বোম্বাই রবীন্দ্র নাট্যমন্দির	১৩ই	তিনটি একাঙ্ক
"	১৪ই	নাট্যকারের সন্ধানে
বোম্বাই ষণ্মুখানন্দ হল	১৫ই	তিন পয়সার পালা
"	১৬ই	মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
ভিলাই	১৯শে	তিন পয়সার পালা
"	২০শে	মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
জামশেদপুর	২৪শে	তিন পয়সার পালা

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
এমাসে একনাম অভিনয় হবে না।

উত্তম সুচিত্রা অভিনীত · চিত্রনাট্য · পরিচালনা বিজয় বসু
প্রযোজনা গিরীন্দ্র সিংহ কাহিনী আশুতোষ মুখার্জী সঙ্গীত হেমন্ত মুখার্জী
রূপায়ণে · বিকাশ · জহর · বাসবী · কণিকা · মাঃ অমিত · বিজন · দেবী · নিমু · মাঃ প্রদীপ
এস এম ফিল্মসের ছবি · চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত
শুভারম্ভ বৃহস্পতিবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী · মিনার · বিজলী · ছবিঘর

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মিনার : বিজলী : রবিবারে প্রতিদিন ৪টি শো : ১২টা, ৩টা, ৬টা ও ৮-৪৫। পদ্মশ্রী : অশোকা : শ্যামশ্রী : লীলা : নারায়ণী : তারা : জয়শ্রী : গৌরী : উজ্জ্বলা : রূপালী : জ্যোতি : প্রফুল্ল : মনীন্দ্র : কল্যাণী : আরতি

আলফাভিল / জাঁ লুক্ গদার (ফ্রান্স)

আমেরিকার নীরব যুগের খ্যাতনামা পরিচালক ডি-ডব্লু গ্রিফিথ।

স্টুডিও কর্মীদের লাগাতার ধর্মঘটের স্থায়ী সমাধানের আশায় পরিচালন বিভাগের একজন বিশিষ্ট সভ্য শ্রীঅমল সরকার আট দফা প্রস্তাব এনেছেন এই শিল্পের স্বত্বাধিকারী পৃষ্ঠপোষকদের কাছে। সেগুলি হোল : (ক) সেন্সর চিহ্নিত ছবির প্রদর্শনী ও তৎসহ মডেল চার্জ। (খ) স্টুডিও ও ল্যাবরেটরী মালিকদের বছরে দুটি ও একটি ছবি করতে বাধ্য করা। (গ) সরকারের কাছ থেকে বাংলা ছবির প্রযোজক ছবি মুক্তি পাবার পর কুড়ি হাজার টাকা সাহায্য পাওয়ার বন্দোবস্ত করা (প্রমোদকর থেকে এ টাকা দেওয়া যেতে পারে)। (ঘ) অন্য ভাষার ছবি বাংলা ভাষায় ডাবিং বন্ধ করা। (ঙ) কলকাতায় প্রথম শ্রেণীর প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের বছরে একটি বাংলা ছবি প্রযোজনায় বাধ্য করা। (চ) বিদেশী চিত্র সংস্থাগুলির বাৎসরিক লভ্যাংশের কুড়ি শতাংশ আবশ্যিকভাবে বাংলা চিত্রশিল্পে বিনিয়োগ করণ। (ছ) বাংলা ও হিন্দী চিত্র পরিবেশকদের বছরে একাধিক বাংলা ছবি প্রযোজনা করতে বাধ্য করা ও (জ) তারকা-শিল্পীদের (কজন?) সম্মান মূল্য কমানো। এখন প্রশ্ন এতগুলো বাধ্যতামূলক প্রস্তাব কার্যকরী করবেন কে? সরকার না অন্য কেউ?

• • •

পরিচালক দীনেন গুপ্তর নতুন ছবি 'আজকের নায়ক'এর কাজ শেষ হয়ে গেছে। ছোটোখাটো প্যাচ ওয়ার্ক বাকি আছে কিছু। দীনেনবাবু ইতিমধ্যে আরেকটি নতুন ছবির পরিকল্পনা করেছেন। নাম 'আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম'। কাহিনীকার চিত্তরঞ্জন মাইতি। চিত্রনাট্যের কাজ এখন চলছে। শিল্পী নির্বাচনও হয়নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য দীনেনবাবুর আগের ছবি অর্থাৎ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' এখনও মুক্তি পায় নি।

রবি ৭ ও ১৪ ফেব্রু: ৬টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
তাপসীর হাসির নাটক
বল্লভপুরের রূপকথা
রূপকথা ও নির্দেশনা : বাদল সরকার
টিকিট ১ থেকে ৫ টাকা/ ৫০ পয়
অভিনয়ের দিন সকাল ১টা থেকে হলে

খেলার কথা

এ নহে মধুর খেলা

শঙ্করবিজয় মিত্র

চলতে চলতে কখন যে জীবনের পথ হঠাৎ বাঁকের মুখে এসে পড়ে তা কেউ জানে না। কেউ বা বাঁকের মুখে এসে থমকে দাঁড়ায়, কেউ বা দুর্বার গতিতে বায় এগিয়ে আবার কেউ বা হারিয়ে ফেলে তার নিজস্ব ধারা। জীবনের গতিই বিচিত্র। এমনি এক বিচিত্র পরিবেশে আজ আমরা অতিপরিচিত প্রিয়জনকে দেখতে পাচ্ছি। ক্রিকেটাররূপে যাঁর পরিচিতি, ভারতের প্রতিটি মানুষের মুখে দুরন্ত ব্যাটসম্যানরূপে যার নাম, তাকে হয়ত এক অভিনব খেলায় মত্ত হতে দেখব এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ক্রিকেটেরই দুরন্ত খেলোয়াড়কে রাজনীতির উন্নত খেলায় কেমনটি মানাবে আগে থেকে তা বলা যায় না। ক্রীড়াঙ্গনের সাফল্য রাজনীতির অঙ্গনে যে ফুটে উঠবে তাও বলা চলে না। তবে দেশের বর্তমান রাজনীতির ঘোরাটে, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও অ-খেলোয়াড়ী উন্মাদনার আবহাওয়া থেকে এটুকু বলা যায় যে 'এ নহে মধুর খেলা।'

কিন্তু এ খেলায় কেন মাতলেন। ক্রিকেটের ব্যাট ছেড়ে রাজনীতির মুকুল কেন চলেছেন ধারণ করতে? প্রশ্নের জবাবটা আজ ক্রীড়ামোদীদের অজানা নয়। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেটের কৃতী খেলোয়াড় পাতৌদীর নবাব মনসুর আলী খাঁ ঘোষণা করেছেন যে, লোকসভার আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনি বিশাল হরিয়ানা দলের প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

তাঁর এই প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে ক্রীড়ামোদী মহলে নানা জল্পনার সৃষ্টি করেছে। তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? রাজন্যবর্গের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে ভারত সরকার যে আদেশ জারী করেছিলেন তাতে রাজারাজড়াদের ভাতা বন্ধ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিলোপের আশঙ্কায় কি তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? সুপ্রীম কোর্টের রায়ে রাজন্যবর্গের স্বীকৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও আজ দিবালোকের মতই একথা সুস্পষ্ট যে রাজারাজড়াদের দিন ফুরিয়েছে। তাঁদেরও আজ ভারতের সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে এক সমতলে অবস্থান করতে হবে। তাহলেই কি তিনি ভীত হয়ে রাজনীতির কোলে আশ্রয় নিতে চলেছেন? কিন্তু তিনি কেন একথা বিস্মৃত হচ্ছেন যে নবাব হিসেবে তিনি ভারতীয় জনমানসে সমাদরের আসনে সমাসীন হননি। নিপুণ খেলোয়াড়রূপে তিনি ভারত তথা বিশ্বের ক্রীড়ানুরাগীদের চিত্ত জয় করেছেন।

ক্রিকেটার মনসুর আলি সবাই চিত্তজয়ী এবং তাঁর এই খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়েই হলিউড-কন্যা শর্মিলা তাঁর গলায় বরমালা দিয়েছেন আর দেশের ক্রীড়ারসিক মহল তাঁকে ভালোবাসার আসনে বসিয়েছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্য যে ভারতীয় দল নির্বাচিত হয়েছে তার অধিনায়করূপে কিংবা দলের অন্যতম খেলোয়াড়রূপে তাঁর নাম না দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। তিনি সম্ভবত ভারতীয় ক্রিকেটে সবচেয়ে দীর্ঘকাল অধিনায়করূপে ভারতীয় দলকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করেছেন। দলনায়ক বোম্বায়ের অজিত ওয়াদেকারের নির্বাচন বিস্ময়কর না হলেও প্রবীণ ও নবীন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ভারতীয় দলে মনসুর আলির স্থান না হওয়াটা খানিকটা বিস্ময়ের বৈকি। তাঁর খেলার ধার এখনও ভোঁতা হয়ে যায়নি কিংবা ক্রিকেট থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্তও তিনি ঘোষণা করেন নি। বিদেশ সফরগামী ভারতীয় দল থেকে দূরে সরে থাকাটা তাঁর স্বেচ্ছাকৃত কিংবা নির্বাচকমণ্ডলী তাঁকে দলে নিতে অরাজী সে কথাটাও পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি।

তবে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে মনসুর আলি যে এখনও এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং অধিনায়করূপেও তিনি সাফল্যের নিদর্শন রেখেছেন।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ক্রিকেটপ্রতিভা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ইংলণ্ডে স্কুলে পড়তে পড়তেই ব্যাট ও বলে তাঁর চাতুর্য সকলের চোখে পড়ে। এক খেলায় তাঁর স্কুল দলের মোট ১০৮ রানসংখ্যার মধ্যে মনসুর আলি একাই করেন ১০০ এবং বল করে, ক্যাচ ধরে বা রান আউট করে দিয়ে তিনি প্রতিপক্ষ দলের সকলকেই বিদায় নিতে বাধ্য করেন।

ছেলেবেলার ঐ খেলাটি এখন কাহিনীর মত শোনালেও তা ছিল সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তেমনি ভারতীয় ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বও তাঁর এমনি আকস্মিকভাবে এসে যায়। এবং সম্ভবত মাত্র একুশ বছর বয়সে স্বদেশের দলের অধিনায়কত্ব করার সৌভাগ্য এর আগে আর কোন খেলোয়াড়ের জোটেনি। সেটা ছিল ১৯৬২ সাল। ভারতীয় দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সফররত। দলনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার গ্রিফিথের বাম্পার বলে মাথায় চোট লেগে মরণাপন্ন হলে তিনি অধিনায়ক নির্বাচিত হন। মনসুর আলির পরলোকগত পিতা নবাব ইফতিকার আলিও ১৯৪৬ সালে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। এদিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে এই পিতাপুত্র উভয়েই এক রেকর্ড করেছেন টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় দলের অধিনায়কের গৌরব লাভ করে। একমাত্র ইংলণ্ডের ক্রিকেটার ছাড়া আর কোন দেশে এরূপ গৌরবের অধিকারী আর কোন পিতাপুত্র হতে পারেন নি। ইংলণ্ডে এফ টি মান ও তৎপুত্র এফ জি মান স্বদেশীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন। ইফতিকার আলি পুত্রের চেয়েও ভাল ব্যাটসম্যান ছিলেন। তাঁর পুত্র মনসুর আলি ক্রিকেটের সর্ব বিভাগেই দক্ষতার অধিকারী। ফিল্ডার হিসাবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। পিতার মতই মনসুর আলি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরী করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ১৯৬১-৬২ সালে মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১০০ রান করে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

মনসুর আলি ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে একমাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একটা সিরিজের ৫টা টেস্টেই টসে জয়লাভ করেছেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে মাইক-স্মিথ পরিচালিত ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে তিনি এই সাফল্যের অধিকারী হন।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সিরিজের সব কটা ম্যাচে টসে জেতার গৌরব জুটেছে নিম্নলিখিত অধিনায়কদের—১৯০৫ সালে ইংলণ্ড অধিনায়ক ফ্রান্সিস স্ট্যানলি জ্যাকসন (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে), ১৯০৯ সালে অস্ট্রেলীয় এম এ নোবল (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে), ১৯২৭-২৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইচ জি ডীন (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে), ১৯৫৩ সালে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক এ এল হাসেট (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে), ১৯৬৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিনায়ক জন গডার্ড (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে)।

সম্ভবতঃ মনসুর আলিই ভারতের একমাত্র ব্যাটসম্যান যিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ডবল সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ১৯৬৪ সালে দিল্লীতে মাইক স্মিথ দলের বিরুদ্ধে নট আউট অবস্থায় ২০০ রান করে এই কৃতিত্বের অধিকারী হন।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবেই তিনি সবচেয়ে বেশী সংখ্যক টেস্ট খেলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন ২৮টি টেস্টে, লালা অমরনাথ করেছেন ১৫টি এবং বিজয় হাজারে করেছেন ১৪টি টেস্ট ম্যাচে। ২৮টি টেস্টের মধ্যে মনসুর আলি জিতেছেন ৫টিতে, হেরেছেন ১৩টিতে এবং বাকী দশটি খেলা শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে। সর্বসাকুল্যে ৩১টি টেস্টে ৫৬টি ইনিংস খেলে তিনি ছ'টি সেঞ্চুরী করেছেন (তন্মধ্যে একটি ডবল সেঞ্চুরী)। ছ'টি ইনিংসে তিনি শূন্য হাতে ফিরেছেন এবং সর্বমোট রান করেছেন ২২০৩। তিনি ক্যাচ ধরেছেন ২১টি এবং একটি উইকেট পেয়েছেন ৩১ রান দিয়ে। বোলিং'এ তিনি আউট করেছিলেন মাইক-স্মিথকে।

মনসুর আলির ব্যাটে নানা ধরণের মার আছে। হাত খুলে গেলে তাঁর আক্রমণাত্মক খেলা দেখার মত। আবার বিপদের মুখে সতর্কতার সংগে খেলতেও তিনি ওস্তাদ। এককথায় বলতে গেলে বলা যায় তার মতন পারঙ্গম খেলোয়াড় ভারতীয় খেলোয়াড় মহলে খুবই কম দেখা গিয়েছে।

শুধু তাঁর নিজের খেলাই নয় তাঁর নেতৃত্বের কাজে ভারতীয় দলে এমন একটা বাঁধুনী বা সংহতি গড়ে ওঠে যা যেকোন দেশের পক্ষেই প্রীতিপ্রদ। এবং এইসব কারণেই মনসুর আলি ভারতের ক্রিকেট অনুরাগীদের প্রীতি অর্জন করতে সমর্থ হন। সেই প্রীতি ও গৌরব ছেড়ে তিনি আজ যে খেলায় পা বাড়াচ্ছেন তা মোটেই মধুর খেলা নয়।

মনসুর তাঁর ক্রিকেট জীবনে একত্রিশটি টেস্ট ম্যাচে খেলেছেন। এই একত্রিশটি টেস্ট ম্যাচে ছাপ্পান্ন ইনিংসে খেলে যে ২২০৩ রান সংগ্রহ করেছেন তাতে দুটো ইনিংসে তিনি নট আউট থাকার গৌরব অর্জন করেছেন এবং টেস্ট ম্যাচে তাঁর গড় রান হল প্রতি ইনিংসে ৪০'৭১। এই টেস্ট ম্যাচগুলির মধ্যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে '৬১ সালে ৩টি, '৬৩ সালে ৫ ও '৬৭ সালে ৩টি—মোট ১১টি; অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে '৬৪ সালে ৩টি ও '৬৭ সালে ৩টি;—মোট ৬টি; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে '৬২ সালে ৩টি ও '৬৬ সালে ৩টি—মোট ৬টি এবং নিউ-জিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে '৬৫ সালে ৪টি ও '৬৭ সালে ৪টি—মোট ৮টি খেলায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। এরই মধ্যে রয়েছে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৩টি সেঞ্চুরী (মাদ্রাজে ১০৩, দিল্লীতে ২০০ নট আউট ও লীডসে ১৪৮); নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুটি সেঞ্চুরী (১৫৩ ও ১১৩)। এছাড়া একই ম্যাচের দু ইনিংসে দুটি আলাদা সেঞ্চুরী করার অসাধারণ কৃতিত্বের তিনি অধিকারী। ১৯৬৩-৬৪ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বোরদের সহযোগিতায় পঞ্চম উইকেট জুটিতে যে ১৯০ রান করেছিলেন তা এখনও কেউ অতিক্রম করতে সমর্থ হননি। ১৯৬৭ সালে তাঁরই অধিনায়কত্বে লীডসে ভারত টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংখ্যা ৫১০ তুলে একটি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

খেলাধূলা

দর্শক

আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস

আমেদাবাদে সাহীবাগ পুলিশ স্টেডিয়ামে ১ম আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিক্সের চারদিনব্যাপী আসর বসেছিল। এই চার-দিনে মোট ২৩টি আন্তঃ রাজ্য এ্যাথলেটিক্স রেকর্ড ভেঙেছিল—প্রথম দিনে ৪টি, দ্বিতীয় দিনে ৬টি, তৃতীয় দিনে ৫টি এবং চতুর্থ দিনে ৮টি। পাঞ্জাব সর্বাধিক স্বর্ণ (১৩টি) এবং সর্বাধিক মোট পদক (৩৫টি) জয়ী হয়ে পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে রাজস্থান এবং তৃতীয় স্থান পশ্চিমবাংলা। গত ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসের পদক বিজয়ী অ্যাথলীটরা আলোচ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করে পদক বিজয়ী হলেও ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স রেকর্ড ভাঙার দিক থেকে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক স্বর্ণ পদক (৪টি) জয় করেন তামিলনাড়ুর মার্কুইস জোসেফ। তিনি বালক বিভাগের (বয়স ১৮) ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, পোলভল্ট এবং ডেকাথলন অনুষ্ঠানে স্বর্ণ পদক জয়ী হন। তাছাড়া পোলভল্টে ৩·৭২ মিটার নতুন অতিক্রম করে এবং ডেকাথলনে ৫৭৪৮ পয়েণ্ট সংগ্রহের সঙ্গে পূর্বের আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস রেকর্ড ভাঙেন।

পুরুষ বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছেন এই তিনজন—২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ের স্বর্ণ পদক বিজয়ী সজ্জা সিং (পাঞ্জাব), লংজাম্প ও ট্রিপল জাম্পের স্বর্ণ পদক বিজয়ী কে রঘুনাথন (বিহার) এবং ১,৫০০ মিটার ও ৫০০০ মিটার দৌড়ের স্বর্ণ পদক বিজয়ী এডওয়ার্ড সিকুইরা (মহারাষ্ট্র)।

মহিলা বিভাগে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী কমলজিৎ সাধু এবং পাঞ্জাবের মীনা চোপরা। গত ষষ্ঠ এশিয়ান গেমসের ৪০০ মিটার দৌড়ের স্বর্ণ পদক বিজয়িনী কুমারী সাধু ২০০ মিটার দৌড়ের হিটে জাতীয় রেকর্ড ভাঙেন (সময় ২৫·২ সেঃ)।

রিতা পাল

স্বর্ণ পদক পেয়েছেন ২টি—২০০ মিটার দৌড় (সময় ২৬·০০ সেঃ এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে (সময় ৫৬·১ সেঃ—নতুন রেকর্ড)। মীনা চোপরা দুটি স্বর্ণ পদক পান—৮০০ মিটার দৌড়ে (সময় ২ মিঃ ২০·২ সেঃ—নতুন রেকর্ড) এবং ১,৫০০ মিটার দৌড়ে)।

জাতীয় রেকর্ড

প্রতিযোগিতায় পাঁচটি বিষয়ে জাতীয় রেকর্ড ভাঙে—মহিলা বিভাগে ২টি, বালিকা বিভাগে ২টি এবং বালক বিভাগে ১টি। গত ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে ভারত-বর্ষের যে-সব অ্যাথলীট অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র ৪০০ মিটার দৌড়ের স্বর্ণ পদক বিজয়িনী কমলজিৎ সাধু (পাঞ্জাব) ২টি বিষয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড করেন—২০০ মিটার দৌড়ের হিটে (সময় ২৫·২ সেঃ) এবং ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে (সময় ৫৬·১ সেঃ)। বালিকা বিভাগে (১৪ বছরের অনুর্দ্ধে) পশ্চিমবাংলার রিতা পালের ৬০০ মিটার দৌড়ের জাতীয় রেকর্ড (সময় ১ মিঃ ৪৫·০০ সেঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার রিতা পাল

প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে পশ্চিম-বাংলার সাড়ে তের বছর বয়সের বালিকা রিতা পালের দুটি স্বর্ণ পদক জয় উপলক্ষে দর্শকসাধারণ বিপুলভাবে উল্লসিত হয়ে-ছিলেন। রিতা পাল খালি পায়ে দৌড়ে বালিকাদের (বয়স ১৪ বছরের অনুর্দ্ধে) ৬০০ মিটার ফাইনাল ১ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ডে শেষ করে স্বপ্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ভাঙে। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম দিনে যে চারটি রেকর্ড হয়েছিল তার প্রথমটি রিতা

পালের। ৬০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়লাভের চারঘণ্টা পর রিতা বালিকাদের বড়দের বিভাগের (বয়স ১৬ বছরের অনূর্ধ্ব) ৮০০ মিটার দৌড়ে নেমে স্বর্ণ পদক জয় করে এবং মাত্র ৪/৫ সেকেন্ড বেশীর জন্যে পূর্ব রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। খালি পায়ে রিতা পালের সাবলীল দৌড়-ভঙ্গিমায় আত্মপ্রত্যয়ের যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

পশ্চিমবাংলার সাফল্য

ম্যানেজার শ্রীকালী সিংহের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার ৬৩ জন অ্যাথলীট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমেদাবাদে গিয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলা মোট ২৭টি পদক জয়ী হয় (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ১২ ও ব্রোঞ্জ ৬)। এই ২৭টি পদক এইভাবে সংগৃহীত হয়েছিল—পুরুষ বিভাগে ৪টি, মহিলা বিভাগে ৫টি, বালক বিভাগে ১৫টি এবং বালিকা বিভাগে ৩টি। পশ্চিমবাংলার বালক-বালিকারাই সর্বাধিক স্বর্ণ (৬টি) এবং সর্বাধিক মোট পদক (১৮টি) সংগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত বাংলার মুখ রক্ষা করে।

পশ্চিমবাংলার পদক বিজয়ী অ্যাথলীট
পুরুষ বিভাগ

স্বর্ণ পদক

ম্যারাথন : নিরাপদ সাহা (ইস্টবেঙ্গল)
১১০ মিটার হার্ডলস : এম পি হেনেসি (ইস্টবেঙ্গল)

রৌপ্য পদক

১,৫০০ মিটার : এস মিত্রে (মোহনবাগান)
৪×৪০০ মিটার রিলে : পশ্চিমবাংলা

মহিলা বিভাগ

স্বর্ণ পদক

সটপুট : সুব্রতা পাল (ই আর এ এ)

রৌপ্য পদক

৪০০ মিটার : শ্রীরূপা চ্যাটার্জি (ই আর এ এ)
ডিসকাস : সুব্রতা পাল (ই আর এ এ)

ব্রোঞ্জ পদক

১০০ মিটার : শ্রীরূপা চ্যাটার্জি
পেন্টাথলন : কিঙ্করী দাস (ই আর এ এ)

বালক বিভাগ (বয়স ১৮ অনূর্ধ্ব)

স্বর্ণ পদক

জ্যাভেলিন—অসিত পাল (চন্দননগর)

রৌপ্য পদক

লংজাম্প : গোপাল বিশ্বাস (নদীয়া)

ব্রোঞ্জ পদক

ডিসকাস : বুদ্ধদেব দাস (হাওড়া)
২০০ মিটার : অরুণ কর্মকার (২৪ পঃ)

বালক বিভাগ (বয়স ১৬ অনূর্ধ্ব)

স্বর্ণ পদক

হাইজাম্প : বিকাশ পাল (এরিয়ান্স)
জ্যাভেলিন : অসিত পাল (চন্দননগর)
দূরত্ব : ৫৯.৭৮ মিটার (নতুন রেকর্ড)

রৌপ্য পদক

লংজাম্প : রঞ্জিৎ ঘটক (২৪ পরগণা)
১০০ মিঃ হার্ডলস : বিকাশ পাল (এরিয়ান্স)
১০০ মিটার : তরুণ দত্ত (২৪ পঃ)
৪×১০০ মিটার রিলে : পশ্চিমবাংলা

বালক (বয়স ১৪ অনূর্ধ্ব)

স্বর্ণ পদক

সটপুট : প্রদীপ ব্যানার্জি (২৪ পঃ)

রৌপ্য পদক

৮০০ মিটার : প্রভাত সাহা (সিটি ক্লাব)
হাইজাম্প : বিকাশ পাল (এরিয়ান্স)
১০০ মিটার : তাপস রায় (সিটি ক্লাব)

ব্রোঞ্জ পদক

হাইজাম্প : রামচন্দ্র ঘোষ (হাওড়া)

বালিকা বিভাগ (বয়স ১৬ অনূর্ধ্ব)

স্বর্ণ পদক

৮০০ মিটার : রীতা পাল (হাওড়া)

বালিকা বিভাগ (বয়স ১৪ অনূর্ধ্ব)

স্বর্ণ পদক

৬০০ মিটার : রীতা পাল (হাওড়া)
সময় : ১ মিঃ ৪৫ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

ব্রোঞ্জ পদক

হাইজাম্প : কণিকা পোদ্দার (হাওড়া)

পদক জয়ের খতিয়ান
পশ্চিমবাংলা

বিভাগ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
পুরুষ	২	২	০
মহিলা	১	২	২
বালক			
বয়স ১৮	১	১	২
বয়স ১৬	২	৪	০
বয়স ১৪	১	০	১
বালিকা			
বয়স ১৬	১	০	০
বয়স ১৪	১	০	১
মোট :	৯	১২	৬

চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকা
(প্রথম ৬টি স্থান)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
পাঞ্জাব	১০	১০	৮
রাজস্থান	১২	৮	৯
বাংলা	৯	১২	৬
তামিলনাড়ু	৯	৬	১২
উড়িষ্যা	৮	৮	৮
মহীশূর	৭	৮	৯

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

পঞ্চম টেস্ট খেলা

অস্ট্রেলিয়া : ৪৯৩ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লরী ৫৬, আয়ান চ্যাপেল ১১১; রেডপাথ ৭২, ওয়াল্টার্স ৫৫ এবং উইকেটকিপার রোডনে মার্শ ৯২ নটআউট। উইলিস ৭৩ রানে ৩ এবং ডি'অলিভেরা ৫৯ রানে ২ উইকেট)
ও ১৬৯ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লরী ৪২ রান। স্নো ২১ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৩৯২ রান (লাকহার্স্ট ১০৯ এবং ডি ওলিভিয়েরা ১১৭ রান। টমসন ১১০ রানে ৩ এবং গ্লীসন ৬০ রানে ৩ উইকেট)
ও ১৬১ রান (কোন উইকেট না পড়ে। বয়কট নটআউট ৭৬ এবং এডরিচ নটআউট ৭৪ রান)

মেলবোর্নে আয়োজিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৫ম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ইতিপূর্বে বর্তমান টেস্ট সিরিজেরই মেলবোর্নের ৩য় টেস্ট বৃষ্টির জন্য ভণ্ডুল হয়ে যায়—একটা বলও খেলা হয়নি। এই নিয়ে মেলবোর্ন মাঠে এই দুই দেশের যে ৪১টি টেস্ট ক্রিকেট খেলা হল তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ২০, ইংল্যান্ডের জয় ১৫ এবং ড্র ৬।

প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেট খুইয়ে ২৬০ রান সংগ্রহ করে। আয়ান চ্যাপেল ১০৫ রান এবং রেডপাথ ৭০ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। এঁদের অসমাপ্ত ২য় উইকেটের জুটিতে ১৭৪ রান উঠেছিল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় আয়ান চ্যাপেলের এই প্রথম সেঞ্চুরী। প্রথম দিনে নটআউট ১০৫ রান করার সূত্রে তিনি তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বে-সরকারী টেস্ট খেলা ধরে)। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী বাঁ হাতের আঙুলে আঘাত পেয়ে খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ড পাঁচটা সহজ 'ক্যাচ' ফেলে দেয়।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৪৯৩ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। প্রথম দিনে যেখানে তাদের একটা উইকেট পড়ে ২৬০ রান উঠেছিল সেখানে দ্বিতীয় দিনে ৩১৪ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। এই ভাঙনের মুখে উইকেটকিপার রডনে মার্শ খেলতে নামেন এবং নটআউট ৯২ রান করে দলের পতন রোধ করেন। খেলার বাকি সামান্য সময়ে ইংল্যান্ড, প্রথম ইনিংসের দশটা উইকেট হাতে জমা রেখে ২৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৫৮ রান (৪ উইকেটে) দাঁড়ায়—অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৪৯৩ রানের (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) থেকে ২৩৫ রান কম। ইংল্যান্ডের ৮৮ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। ৪র্থ উইকেটের জুটি লাকহার্স্ট এবং ডি'অলিভেয়রা ১৪০ রান তুলে দলের পতন রোধ করেন। লাকহার্স্ট আহত আঙুল নিয়ে সেঞ্চুরী (১০৯ রান) করেন। ডি'অলিভেরা ৭২ রান করে অপরাজিত থাকেন। লাঞ্চের পর বৃষ্টির জন্যে আধঘণ্টা খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৯২ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১০১ রানে অগ্রগামী হয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং এক উইকেট খুইয়ে ৭০ রান সংগ্রহ করে। ফলে তারা ১৭১ রানে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের অস্থায়ী

খেলোয়াড় বেসিল ডি' অলিভিয়েরা ৩৩৩ মিনিট খেলে ১১৭ রান (১টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউন্ডারীসহ) করে আউট হন—টেস্ট খেলায় তাঁর এই ৩য় সেঞ্চুরী। প্রকৃতপক্ষে তিনি ইংল্যান্ডের পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়া তাদের ২য় ইনিংসের ১৬১ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে ইংল্যান্ডকে ২য় ইনিংসে খেলার ভার ছেড়ে দেয়। খেলার এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে ২৭১ রানের প্রয়োজন ছিল, হাতে ছিল ২৪০ মিনিট খেলার সময়। যেহেতু ইংল্যান্ড ১—০ খেলায় অগ্রগামী ছিল এবং দলের প্রথম ইনিংসের শতরানকারী লাকহার্স্ট এবং ডি অলিভিয়েরা আহত ছিলেন সেই হেতু কোনরকম ঝুঁকি নিতে না গিয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলার পথ বেছে নেয়। ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের ১৬১ রানের (কোন উইকেট না পড়ে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাদ্রাজ ১৬১ রানে গতবারের চ্যাম্পিয়ান বোম্বাইকে পরাজিত করেছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষে এই প্রথম রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি জয়। ফাইনাল খেলার চতুর্থ দিন লাঞ্চের ২০ মিনিট আগে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। বিজয়ী মাদ্রাজ দলের পক্ষে নতুন সেঞ্চুরী করেন—১ম ইনিংসে মুকুন্দ (১০৭ রান) এবং ২য় ইনিংসে শিবরাম কৃষ্ণন (১১২ রান)।

সেমিফাইনালে মাদ্রাজ ১ উইকেটে কলকাতা দলকে এবং বোম্বাই ৭ উইকেটে গুরু নানক দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ফাইনাল খেলা

মাদ্রাজ : ২০৮ রান (মুকুন্দ ১০৭ রান। মালহারকার ৬৮ রানে ৪ উইকেট) ও ২১৯ রান (শিবরামকৃষ্ণন ১১২ রান। ওয়াগলে ৭৫ রানে ৫ উইকেট)

বোম্বাই : ১৮২ রান (কার্নিক ৫০ রান। মেটা ৪৮ রানে ৭ উইকেট) ও ২১৪ রান (নায়েক ৬৩ রান।)

শৈলেন মান্না

লেস্‌লি ক্লডিয়াস

'পদ্মশ্রী' খেতাব

১৯৭১ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসে এই পাঁচজন খেলোয়াড় রাষ্ট্রীয় 'পদ্মশ্রী' খেতাবে সম্মানিত হয়েছেন : শৈলেন মান্না (ফুটবল), লেস্‌লি ক্লডিয়াস (হকি), জি আর বিশ্বনাথন (ক্রিকেট), কুমারী কমলজিৎ সান্ধু (অ্যাথলেটিক্স) এবং চাঁদগীরাম (কুস্তি)।

ফেডারেশন কাপ

অস্ট্রেলিয়ার পার্থে মহিলাদের দলগত আন্তর্জাতিক ৯ম ফেডারেশন কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৩—০ খেলায় ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে মোট ৫বার ফেডারেশন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক লন টেনিস খেলার আসরে পুরুষদের দলগত বিভাগের ডেভিস কাপ এবং মহিলাদের দলগত বিভাগের ফেডারেশন কাপ জয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই জয় বে-সরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব জয় হিসাবে স্বীকৃত। যেহেতু সরকারীভাবে বিশ্ব লন টেনিস প্রতিযোগিতার কোন ব্যবস্থা আজও হয়নি।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৩—০ খেলায় ফ্রান্সকে এবং ইংল্যান্ড ৩—০ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ইভোন গুলাগং ৬-৪ ও ৬-১ গেমে বৃটেনের ভার্জিনা ওয়েডকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট ৬-৮, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে ইংল্যান্ডের শ্রীমতী এ্যান জোন্সকে হারিয়ে স্বদেশকে ২-০ খেলায় এগিয়ে দেন। ডাবলস খেলায় শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট এবং লেসলী হান্ট ৬-১ ও ৬-৪ গেমে বৃটেনের ভার্জিনা ওয়েড এবং উইনী শ-কে পরাজিত করেন।

এখানে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিশ্রুতা মহিলা টেনিস খেলোয়াড় শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট এই নিয়ে উপর্যুপরি ১২বার ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হয়ে সর্বাধিক বার সিঙ্গলস খেতাব জয়লাভের 'রেকর্ড' করলেন। অপরদিকে ১৯ বছরের আদিবাসী মহিলা-খেলোয়াড় ইভোন গুলাগং এই প্রথম ফেডারেশন কাপে খেললেন। তাঁর আগে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় অপর কোন আদিবাসী মহিলা খেলোয়াড় খেলেন নি।

বিগত ৯বারের ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতায় মাত্র এই দুটি দেশ কাপ জয়ী হয়েছে—অস্ট্রেলিয়া ৫বার (১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৮, ১৯৭০-৭১) এবং আমেরিকা ৪বার (১৯৬৩, ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৬৯)।

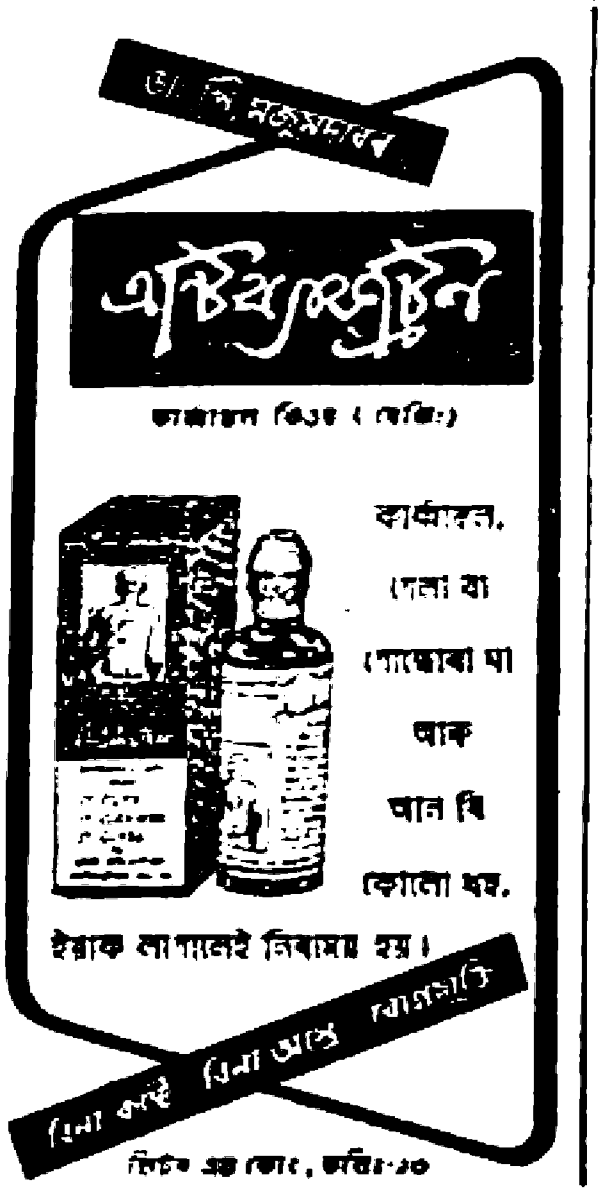

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এ হচ্ছে অজয়

ক্লাসের মনিটর, ব্যাটিংএ দারুণ হাত
সব সময় চটপটে চকল

আসল জিনিষটি ওর চাই!

অজয়ের সবুর সয় না, বন্ধুদের বলে—দ্যাখ্ না, বাবার মত বড় হয়ে নিই।

ওর ইচ্ছে, চটপট বড় হবে, সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে, সব কিছুতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠবে সে।

অজয়ের মা তাই তো ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দেন। হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্সের ওপর ওর মায়ের অগাধ বিশ্বাস, তার কারণ হরলিক্স বাড়তি পুষ্টি আর প্রয়োজনীয় প্রোটিন যুগিয়ে ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত শরীর গ'ড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে।

খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই হরলিক্সের এত গুণ।

মায়েরা হরলিক্স পেলে আর কিছু চান না। ডাক্তারেরা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স মস্তিষ্কের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1854 A

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

রচনাবলী সিরিজ

বঙ্কিম রচনাবলী — শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪টি)—টাঃ ১৫·০০। দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য-অংশ। —টাঃ ১৭·৫০। তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি রচনা—টাঃ ১৫·০০।

রমেশ রচনাবলী — শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬টি)—টাঃ ১০·০০।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী — ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সমগ্র রচনা। প্রথম খণ্ডে (৫টি নাটক, ৩টি প্রহসন, ৪টি কবিতা ও গানের গ্রন্থ ও ২টি গদ্য-রচনা—টাঃ ১২·৫০। দ্বিতীয় খণ্ডে (৮টি নাটক, ৩টি প্রহসন, ৪টি কবিতা গ্রন্থ, ২টি গদ্য-রচনা ও ইংরেজি কবিতা)—টাঃ ১৫·০০।

দীনবন্ধু রচনাবলী — ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সমগ্র রচনা (৮টি নাটক ও প্রহসন, ২টি গল্প-উপন্যাস, ৩টি কাব্য ও কবিতা গ্রন্থ)—টাঃ ১০·০০।

গিরিশ রচনাবলী — ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে ২১টি নাটক ও প্রহসন।—টাঃ ২০·০০। চার খণ্ডে সমগ্র রচনা সন্নিবিষ্ট হবে।

প্রতি রচনাবলীতে জীবনী
ও সাহিত্য-কীর্তি আলোচিত

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল

ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট্, বিদ্যাবাচস্পতি অনূদিত

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

রাষ্ট্রনীতি-শাস্ত্র বা Political Science সম্বন্ধে আমরা বিদেশের মনীষী লেখকের গ্রন্থকে সর্বোচ্চ স্থান দিই, কিন্তু 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' প্রমাণ করিয়াছে যে রাজ্যশাসন ও অর্থনীতি প্রাচীন ভারতে আধুনিককালের বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিল।

● সংস্কৃত মূলসহ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ ●

॥ দুই খণ্ডে সমাপ্ত : প্রতি খণ্ডের মূল্য পনের টাকা ॥

[জেনারেল প্রিন্টার্স র‍্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী দুর্গামাতা রচিত—

দৈনিক বসুমতী—এইরকম মনোজ্ঞভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে......তাঁরা অভিন্ন ও একাত্মা। যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত।...... গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহুচিত্রশোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮

গৌরীমা

আনন্দবাজার পত্রিকা—বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরী মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫

শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬, গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

রাজনীতির ছুরিতে বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত। মানচিত্রে তার রক্তাক্ত দাগ। কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে যেখানে বাঙালীর চিত্তলোক, সেখানে বাঙলা ও বাঙালী এক ও অবিভাজ্য।

বাঙালীর প্রাণচেতনার মহাকাব্য

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

পদ্মা আমার গঙ্গা আমার

দাম—৩ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : মধুরেণ সিণ্ডিকেট

৬৪।১৩, বেলগাছিয়া রোড,

কলিকাতা—৩৭

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

১৫শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 12th February, 1971. শুক্রবার, ২৯শে মাঘ, ১৩৭৭ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮১	চিঠিপত্র		
৮৬	সাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
৮৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৯১	সম্পাদকীয়		
৯২	নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম		—শ্রীগৌরকৃষ্ণ ভৌমিক
৯২	শববাহক		—শ্রীগণেশ সেন
৯২	অপলাপ		—শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায়
৯৩	আশ্রয়	(গল্প)	—শ্রীকল্যাণ সেন
৯৮	উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের উপাদান		—শ্রীস্মরজিৎ চক্রবর্তী
১০৫	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনিশ্চলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৬	খাঁচার পাখি	(বড় গল্প)	—শ্রীমানব সান্যাল
১১২	মুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
১১৫	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১২০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১২৫	বৈকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগন্ধদর্শী
১২৭	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
১৩০	ভারতে মহাকাশ গবেষণার দিকচিহ্ন		—শ্রীঅবনীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৩	পিঞ্জর	(উপন্যাস)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
১৩৮	নিকটেই আছে		—শ্রীসংশিতেন্দু
১৪১	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ্
১৪৪	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
১৪৬	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
১৪৭	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
১৪৯	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
১৫৪	বঙ্গদেশীয় চলচ্চিত্র উৎসব		—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
১৫৬	জলসা		—শ্রীচিত্রপাল
১৫৭	খেলার কথা		—শ্রীঅজয় বসু
১৫৮	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীগোবিন্দ মণ্ডল

VANGUARD
JHAMAPUKUR
HOSIERY-CAL-9

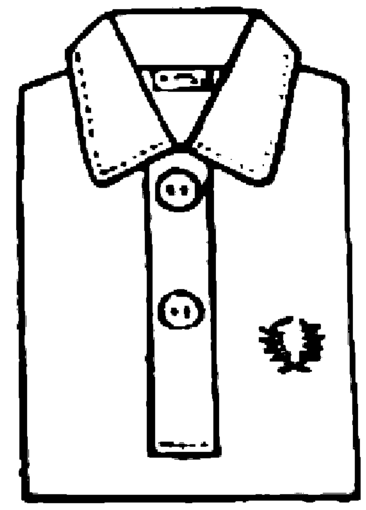

★ COOLTY & TURKISH
★ WHITE & COLOURED
★ ALL SIZES AVAILABLE

JHAMAPUKUR HOSIERY FACTORY (PRIVATE) LTD
22/A, Kalidas Singha Lane, Calcutta-9. 35-4832

চিঠিপত্র

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে

গত ২৪শে পৌষ অমৃতে স্বজিৎ চক্রবর্তীর উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের উপাদান শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদে ১৫ মাঘের অমৃতে সুরেশচন্দ্র দেবনাথের লেখাটি (চিঠিপত্র বিভাগে) পড়লাম। 'অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা উত্তরের গ্রাম বাংলোকে প্রভাবিত করতে পারেনি'—এতে বুঝেছি যে, কলকাতা বা ঢাকা নগরীর নিকটবর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলিতে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার চাপ পড়েছে এবং তার ফলে সেই সব গ্রামের লোক-সাহিত্য বা লোক-সঙ্গীতের মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা প্রবেশ করার গ্রামীণ সংস্কৃতি ও পরিবেশ অনেক পরিমাণে বিকৃত হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলি কলকাতা বা ঢাকা নগরী থেকে বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে যান্ত্রিক সভ্যতা এখনও অধিক পরিমাণে প্রবেশ করতে পারে নি এবং সেই হেতু সেখানকার লোক-সাহিত্য বা লোকসঙ্গীত অদ্যাপি বহুল পরিমাণে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রয়েছে। চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধে এমন কথা পাইনি, যাতে উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্য পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ অথবা শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের লোক-সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর প্রণিধানযোগ্য ও আকর্ষণীয় বলা হয়েছে। ঠিক কি কারণে সুরেশবাবু এই প্রতিবাদলিপি পাঠালেন, বুঝা গেল না।

আসল প্রশ্ন হচ্ছে — চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল বা মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে কি লোকসাহিত্য বলা যায়? আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে বিচার করলে এগুলিকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উপাদান বলা যেতে পারে, কারণ এগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে লোকপরম্পরায় মুখে মুখে যে সব ছড়া বা গীতি প্রচারিত হয়ে এসেছে, সেগুলিকে লোকসঙ্গীত বা লোকসাহিত্য বলা হয়ে থাকে।

পূর্ববঙ্গের বা শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে যেমন বহু সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে তেমন কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নি। উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ-গ্রন্থ হচ্ছে অধ্যাপক মনসুর উদ্দিনের হারামণি গ্রন্থ। এতে উত্তরবঙ্গের প্রচুর মুর্শিদা ও বাউল গানের সংগ্রহ আছে। তাছাড়া উপেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাংলার বাউল ও বাউল গানে উত্তরবঙ্গের প্রচুর বাউল গান সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান লেখকের 'উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীত' পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায়। বর্তমান লেখক কর্তৃক উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিবাহের গান, ধাঁধা কৌতুক, মেয়েলী ছড়া, ঘুমপাড়ানী গান, ছেলে-ভুলানো ছড়া, গীতিকাব্য ছড়া-সাহিত্য প্রভৃতি বহু মূল্যবান লোক-সঙ্গীত দেশ, যুগান্তর, সাপ্তাহিক বসুমতী, বাংলার শক্তি, বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্গশ্রী, দীপালী, সাহিত্যের খবর প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঐসব প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকাগুলি থেকে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা দেখতে পাবেন যে, 'সার্বভৌম বঙ্গের লোক-সংস্কৃতির বা লোক-গীতির মধ্যে সুরমা-মেঘনা-পদ্মা পারের লোক-সংস্কৃতিই সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য ও আকর্ষণীয় নয়, সেখানে উত্তরবঙ্গের লোক-সংস্কৃতির অবদানও (অদ্বিতীয় না হলেও) অপরিসীম উচ্চ প্রশংসনীয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচার ক্ষেত্রে অন্ধ আঞ্চলিকতা-প্রবণতা পরিত্যাগ করলেই ভাল হয় না কি?

সুরেন্দ্রনাথ দাশ
জব্বলপুর।

সীমানা পেরিয়ে

৩৫শ সংখ্যা অমৃত-এ শচীন বিশ্বাসের সীমানা পেরিয়ে পড়লাম। দু-তিনবার পড়েছি গল্পটি এবং প্রতিবারই গল্পটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। পটভূমি বর্তমান সময়। আমাদের এই সময় মানুষকে কিছু দিতে পারে না—না পারিবারিক সুখ-শান্তি, না জীবিকার স্বস্তি, না সামাজিক নিরাপত্তা। যৌবনের বন্ধনহীন দিনগুলি শেষ করে দুই বন্ধু এখন সংসারের ঘানি টানছে। সংসার ওদের কাছে কোনও প্রেরণা নয়। দুজনেই সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম ত্যাগ করেছে। প্রাত্যহিকতার মধ্যে দিন কাটে। এমনই এক দিনে দুই বন্ধু মফস্বল শহরে কোনও একটা নির্জন জায়গায় মিলিত হয়েছে। সমস্ত প্রকার সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করবার দুর্বার খেয়াল চেপে বসে কলকাতা থেকে আগত শুভঙ্করের মনে। মফস্বলের বাসিন্দা মন্মথ। ভাল পিতা, স্বামী এবং শিক্ষক। রোজ বাজারহাট করে, নিয়মিত ডাক্তারখানায় ছোটে—সেও ধীরে ধীরে বন্ধুর খেয়ালি মনের অংশীদার হয়ে পড়েছে। সেও প্রাত্যহিকতার সীমানা পেরিয়ে গেছে বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য মাঝে মাঝে উভয়েরই মনে বাস্তব জীবনের দংশন দেখা গেছে। হোসিয়ারী শ্রমিকদের সভা-সমিতিও তারা পেরিয়ে গেছে। তারা নির্জনতা খুঁজেছিল। নির্জনতা তারা পেলেও, কিন্তু এ কোথায় এলো তারা! এ যে শ্মশান। এখানে জীবনের স্পর্শ কোথায়? যে মাকিটা সামনে নদীর জলে বার বার দেখা দিয়েছে সেও ত ছায়া মাত্র। এখানে সর্বত্র অশরীরী শক্তি। মন্মথর পায়ে মানুষের হাড় ফুটেছে। শকুনের চীৎকার। শেয়ালেরা অর্ধ দগ্ধ গলিত শব চিবিয়ে খাচ্ছে। এই কি নির্জনতা, এই কি শান্তি। সীমানা পার হয়ে এসেও ওদের লাভ হল না, ওরা আবার সেই প্রাত্যহিকতার মধ্যে আসার জন্যেই সংগ্রাম করেছে। নিরানন্দ জীবন, জীবিকা, হোসিয়ারী শ্রমিকদের সভা, কোলাহল—এখানে নিত্য অভাব, নানা সংকীর্ণতা। তবু এখানেই জীবনের প্রকৃত স্বাদ।

ব্যাপ্ত ক্যানভাসে উপস্থাপিত হয়েছে গল্পটি। বিষয় ভাবনা ও প্রকাশ ভঙ্গির সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। শচীন বিশ্বাসের বেশী গল্প আমি পড়িনি, কিন্তু আমার অনেক প্রত্যাশা থাকল।

নিরুপম রায়
কলিকাতা—১৪

তোমাকে

আমার অতি প্রিয় পত্রিকা অমৃত-এর অনুরাগী পাঠিকা আমি। অমৃত-এ প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস ও বিভিন্ন বিষয়ক রম্য রচনাদি আমাকে মুগ্ধ করে, অভিভূত করে।

সম্প্রতি নিমাই ভট্টাচার্যের নবতম ধারাবাহিক উপন্যাস তোমাকে পড়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি। এবং সেই কারণে প্রতিটি সংখ্যার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকি। লেখকের প্রতিটি উপন্যাসই গতানুগতিক ধারা থেকে ভিন্ন হয় বলেই এর স্বাদও স্বাতন্ত্র্য ও মনোগ্রাহী। মধুক্ষরা লেখনীর স্পর্শে প্রতিটি চরিত্র বড় মধুর ও সজীব হয়ে ফুটে উঠছে।

লেখকের কিছু বক্তব্য মনে চিন্তার উদ্রেক করে। যথা লাল পাইনের বনে লেখকের উক্তি—

'হেমন্ত শীত বসন্ত একইভাবে মাটির নীচের পাতাল থেকে রস গ্রহণ করে আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই পৃথিবীর অজ্ঞাত অদৃশ্য

চিঠিপত্র

দুনিয়া থেকে আমিও কেন চলার পথের রসদ সংগ্রহ করছি না?' কিংবা

'এ পৃথিবীতে কখনও অনেক কিছু পেয়েছি, কখনও সব কিছু হারিয়েছি। এ তো জগতের নিয়ম। লেখকের কটু সত্যের বেদনা মনকে নাড়া দেয়। সরল স্বচ্ছ ও সহজ ভাষা হৃদয় স্পর্শ করে। যেমন 'সমস্ত মানুষে যেন কোরাস গান গাইছে—এক সুর এক ভাষা, জীবন সঙ্গীত এক অদৃশ্য সঙ্গীত পরিচালকের নির্দেশে, তাইতো এদের মধ্যে সুন্দর মিল দেখতে পাচ্ছি। লেখককে ও নতুন চিন্তা-ধারার উপন্যাসের জন্যে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দীপালিকা চ্যাটার্জি
আলিগড়

(২)

'মেমসাহেব' ইত্যাদি খ্যাত শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য লিখিত উপন্যাস তোমাকে আপনাদের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক অমৃতে পড়তে ভাল লাগছে। ভাষা ঝকঝকে ও সংবেদনশীল। তবে ভাষা পৌণঃপৌনিকতা-দোষে দুষ্ট। অনেক স্থলে বড়ো ফেনিয়ে লেখা হচ্ছে। উক্ত উপন্যাসে এখনও কোনও সংঘাতের সন্ধান পেলাম না, যেন সবকিছু অতি সরল পথে একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থের লেখক ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাই আশা রাখছি যে এবারেও তিনি আমাদের বিমুখ করবেন না।

নিরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা—৪০

সুখের মেলা

গত ১লা মাঘের অমৃত সংখ্যায় শ্রীআবদুল জব্বার লিখিত সুখের মেলা প্রসঙ্গে ডালিম ফুলের পরিণতি গল্পটি পড়ে অভিভূত হয়েছি, কয়েক বারই পড়ে পড়ে ভাবছি গ্রাম জীবনের প্রেমকাহিনী কী অপূর্ব রস মাধুরীর সৃষ্টি করে লেখক কি সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। বলতে চাইছি এক কথায়—যারা অশ্লীলতাকেই সাহিত্যের উপজীব্য করে তুলেছেন তাঁরা এটা পড়তে পারেন। সুন্দর-ডালিমের প্রেম-জীবনের বাঁশীর সুর কানে বেজে উঠছে বার বার। একটি নিটোল কাহিনীও এটা। লেখককে ধন্যবাদ জানাবেন। অনুরোধ জানাবেন—তিনি যেন এমন আরো সুন্দর-ডালিমকে আমাদের সামনে তুলে ধরে রাঙা ডালিমের খোঁপায় ফুলের সন্ধান দেন—যার সৌরভে পাঠকের মন আপ্লুত হয়ে থাকবে।

বিভূতিভূষণ রায়
কল্যাণী, নদীয়া।

(২)

আমি একজন 'অমৃতে'র নিয়মিত পাঠক। শ্রীআবদুল জব্বর লিখিত 'সুখের মেলা' নিয়মিত পড়ি। সত্যিই খুব চমৎকার লাগে। এই 'সুখের মেলা' নির্বাচন করার জন্য আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানালাম সম্পাদক মহাশয়কে এবং লেখককে।

শিপ্রা কানুনগো
আসানসোল

বিজ্ঞানের কথা

আমি আপনাদের বহুল প্রচারিত প্রগতিশীল সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার নিয়মিত ফিচার 'বিজ্ঞানের কথা' আমার বিশেষভাবে ভাল লাগে। বিজ্ঞানের দিক থেকে অনগ্রসর এ দেশের জনসাধারণকে সহজ সরল পন্থায় কিছুটা বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে, জ্ঞানের আলোয় নিয়ে যেতে, আপনাদের এই প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এই সঙ্গে অনুরোধ জানাই শ্রীঅয়স্কান্ত মহাশয়কে যে তিনি যেন তাঁর এই বিভাগের মাধ্যমে খর্বাকৃতি মানুষের অন্তত কিছুটা লম্বা হওয়ার উপায় বাতলে দেন।

বিশুক সেন
যাদবপুর
কলিকাতা—৩২

নান্দীকারের বক্তব্য

অমৃত পত্রিকার প্রেক্ষাগৃহ বিভাগে রবীন্দ্র সদন আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় নাটকগুলি সম্বন্ধে নান্দীকরের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে মুগ্ধ করেছে। বাংলাদেশের অন্য কোন পত্রিকাতে মফস্বলের এই সমস্ত নাটক-গুলি সম্বন্ধে কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় আমরা সবাই দুঃখিত। আপনার পত্রিকায় মফস্বল নাটক আলোচনা করে আপনি নিশ্চয়ই সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। আমার 'হুদবদলের মেলা' এবং 'এক যে ছিল রাজার' যে ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আপনি লিখেছেন তা আমার ভবিষ্যৎ নাট্যরচনায় প্রচুর সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন।

রবীন্দ্র আচার্য
২৪ পরগণা

আজকের মেয়েরা

১৩ মাঘ, ১৩৭৭ আপনার বহুল সমাদৃত অমৃত পত্রিকায় অঙ্গনা কলমে প্রমীলা লিখিত দেশের সীমা ছাড়িয়ে পড়লাম। খুব ভালো লাগলো। কারণ এই কাঠামো সমাজে যেখানে সব কিছু ক্ষয়ে ক্ষয়ে পড়ছে সেখানেও সৃষ্টি হয়, সেখানেও নতুন কিছু হয় এবং সর্বোপরি এ নতুনের আহ্বানে অজানার সন্ধানে আবাল্য-সন্ধানী মন নিয়ে আমাদের ঘরের মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছেন জেনে এ পথে ঝুঁকি অনেক এবং এ পথে অন্তত আমাদের দেশে মেয়েদের সমাজে কোনো পূর্বসূরী না থাকা সত্ত্বেও দ্বিধাহীন চিত্তে এগিয়ে চলতে গেলে বুকের পাটা থাকা প্রয়োজন। যখন সব শেষ হতে চলেছে তখন এ-জাতীয় অভিযান প্রেরণাদায়ক, গর্ব করার বস্তু। অভিযাত্রীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকায় আপনার সাপ্তাহিক মাধ্যমেই ওদের ধন্যবাদ জানাই, সফলতা কামনা করি এবং ধন্যবাদ জানাই এই অভিযানের উদ্যোক্তাদেরও। বিন্দু বিন্দু জলের সমষ্টিই সমুদ্র সৃষ্টি করতে পারে, তাই আজকের এই তিন নম্র পথযাত্রীরাও একদিন হয়তো নিশ্চয়ই দেখবেন তাঁদের রচিত পথে যাত্রী অনেক।

মায়া বসু, পাতিপুকুর।

প্রেক্ষাগৃহ প্রসঙ্গে

কটক থেকে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় আমার লেখা 'মেরা নাম জোকার' ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে পত্র লিখেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই প্রথমেই; কারণ আমার লেখা নিয়ে কেউ আলোচনা করলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই। ছবিটির তৃতীয় ভাগটি যদি না থাকত, তাহলে ছবিটি প্রায় নিখুঁত হয়ে উঠত—আমার এই মত শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মনে ধরেনি। ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে মতের বিভিন্নতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে আমার যুক্তি হচ্ছে, তৃতীয় ভাগে রাজু আর 'জোকার' নয়। সে মিনুর জীবনের সাথী মাত্র; তাও নয়, মিনু তাকে তার উন্নতির সোপান-স্বরূপ ব্যবহার করেছে। কাজেই 'জোকার' হিসেবে শেষ খেলা রাজুর মিনুর সংগে পরিচয়ের আগেই দেখানো উচিত। তাই নয় কি? শেষ খেলাতে দুজন দর্শক থাকা কি এতই প্রয়োজনীয়? ওদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির উপর কি শেষ খেলার দৃশ্যটি আদৌ নির্ভরশীল?

—নান্দীকার

শাদা চোখে

খুশী, নিরাশা, শঙ্কা ও স্বপ্নের মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচার জোর চলছে। রাজ্যের প্রায় ৩০টি রাজনৈতিক দলের নেতারা অহর্নিশ বক্তৃতা দিয়ে দলীয় কর্মসূচী ভোটদাতাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এখনো পর্যন্ত জোট বাঁধার জন্য প্রচেষ্টা যে চলছে না—এমন নয়। তবে মনে হয় স্ট্রাটেজি হিসাবেই জোট বাঁধার রাজনীতি কেউ পছন্দ করছেন না। অবশ্য 'ট্যাকটিকস' হিসাবে এলাকা ভিত্তিতে সমঝোতার আলোচনা চলছে। প্রকাশ্যে কোন দল একথা স্বীকার না করলেও চেষ্টার যে ত্রুটি হচ্ছে না তলিয়ে দেখলেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু কংগ্রেসের শাসক অংশ পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য স্ট্রাটেজি হিসাবেই আদি গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন জোট বাঁধতে রাজী হন নি। তাঁদের ধারণা এই রাজ্যে কংগ্রেসের যে ট্রাডিশনাল জনসমর্থন আছে তাদের নতুন স্ট্রাটেজি গ্রহণের ফলে সেই সমর্থনের সামান্য অংশই হয়ত বিরুদ্ধে যেতে পারে। অন্যথা সমস্ত কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন জনতাই এবার তাঁদের সমর্থনের জন্য এগিয়ে আসবে। অধিকন্তু, আর কিছু হোক বা না হোক, শাসক গোষ্ঠী মনে করেন তাঁদের প্রিয় নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জনগণের হৃদয়ে একটি বিরাট আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছেন। গণমনে যে আশা উজ্জীবিত হয়েছে আসন্ন ভোটযুদ্ধে শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। অন্যদিকে একথাও অনস্বীকার্য সত্য যে, এই রাজ্যের শান্তিকামী মানুষের মনে একটি নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সেটা হচ্ছে যাঁরা রাজনীতিসচেতন পুরোপুরি দলীয় মনোভাবাপন্ন নন, তাঁরা ভাবছেন কংগ্রেসই ভাল। অন্ততঃপক্ষে, কংগ্রেস ক্ষমতায় আসলে এখন অস্থিরতা থাকবে না। রাজ্যের শাসক কংগ্রেস দল জনগণের এই ভাবনাকে তাঁদের সমর্থনে রূপান্তরিত করতে চান। ফলে, স্ট্রাটেজি হিসাবে তাঁরা কোন দলের সঙ্গে আপোসমূলক সমঝোতা না করে এই রাজ্যে নতুনভাবে একটি স্থায়ী সরকার গঠন করতে চান—এই বক্তব্যটা জনসাধারণের কাছে পরিষ্কারভাবে রাখবার চেষ্টা করছেন।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির একক দল হিসাবে রাজ্যের ক্ষমতা দখলে সমর্থ—এই আবহাওয়া সৃষ্টির যে প্রয়াস পাচ্ছেন—শাসক কংগ্রেসের একলা চলার নীতি তা ব্যর্থ করে দিতে পারবে বলে ঐ মহলের ধারণা। সি পি এম সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে যে স্ট্রাটেজি গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে শাসক কংগ্রেস ও মহাজোটের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়বেন। সি পি এম জানে যে, তাঁদের এমন শক্তি নেই যে, তাঁরা কেন্দ্রে সরকার কায়েম করতে পারেন। কাজেই তাঁদের স্ট্রাটেজি, তাঁরা মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গে সংহতিকরণের প্রশ্নে খুবই সাহায্য করবে এবং তাঁরা সফলতা লাভ করবেন। আর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার করে জনতার মধ্যে তাঁরা সংগঠনকে কতটুকু বাড়াতে ও মজবুত করতে পেরেছেন তারও একটা দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাবে। সি পি এম মহল মনে করেন যে, এই নির্বাচনের পরও রাজ্যে স্থায়ী সরকার গঠিত হবে না। কাজেই আবার নতুন করে মধ্যবর্তী নির্বাচন আসলে তাঁদের পক্ষে সুবিধা হবে। কেননা তাঁরা এই নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয় শক্তি ও সংগঠনের ক্ষেত্র পুরোপুরি যাচাই করে দেখতে পারবেন। যে কারেন্ট ফ্রন্টের কাঠামো এখনো তাঁরা বজায় রেখেছেন—তা শুধু নামে মাত্র। কারণ যে কয়টি দলের অংশ তাঁদের জোটে আছে সেগুলির অর্থশক্তিই আছে, কিন্তু শক্তি নেই। অতএব, তাত্ত্বিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সি পি এম তাঁদের দলের 'বিশুদ্ধ রাজনীতি' প্রচার করার সুযোগ পাচ্ছেন।

অন্যবামের স্ট্রাটেজি একটু অন্যরকমের। তাঁরা মনে করেন সংহতিকরণের পথে আরও দীর্ঘদিন কারেন্ট ফ্রন্টের রাজনীতি চালাতে হবে। কাজেই তাঁরা প্রধান শত্রু হিসাবে শাসক কংগ্রেসকে ধরে নিয়েছেন। সি পি এমকে শত্রু বলে ঘোষণা না করলেও বিপ্লবের পক্ষে সি পি এম যে 'ভীষণ বিপজ্জনক' একথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কাজেই সি পি এম-এর 'হঠকারিতা' ও শাসক কংগ্রেসের বিরোধিতার মাধ্যমে একটি তৃতীয় শক্তিজোট তাঁরা সৃষ্টি করেছেন। বাংলা কংগ্রেসকে জোটে নিয়ে এই গোষ্ঠীকে আরও ব্যাপক করার চেষ্টা হয়েছিল—কিন্তু তা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। ফলে, এই জোটও পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম ও শাসক কংগ্রেসের বিকল্প নেতৃত্ব দিতে পারবেন—এই বক্তব্যটা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জনতার কাছে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করছেন। এবং তার প্রথম প্রমাণ হিসাবে রাজ্য বিধানসভার সমস্ত কয়টি আসনেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন।

বাংলা কংগ্রেসের স্ট্রাটেজি ছিল যে, দুই বামপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই হবে আর ফাঁকতালে তিন কংগ্রেস সমঝোতা করলে পুনরায় ক্ষমতা দখল করা মোটেই কঠিন হবে না। শ্রীসুশীল ধাড়ার এই ছিল স্ট্রাটেজি। প্রথম থেকেই শ্রীঅজয় মুখার্জি নাকি এই ধরণের স্ট্রাটেজিতে আস্থাবান ছিলেন না। শ্রীধাড়ার যোগ্য উচিত ছিল আদি কংগ্রেসের সঙ্গে শাসক গোষ্ঠীর কোন প্রকার সমঝোতা অন্ততঃ এই নির্বাচনে হওয়া অসম্ভব। কারণ কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন হওয়ার জন্যই ত সারা দেশব্যাপী নতুন করে ভোট যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। নতুবা হত কি? আদিকে যদি জোটেই নিতে হয় তবে শাসক কংগ্রেস যে প্রগতিশীলতার ধ্বনি তুলছে তা সূতিকাগৃহেই বিনাশ হয়ে যাবে। শ্রীধাড়ার আরও ভুল হয়েছে যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। এই রাজ্যের যে বিপদ সেটা ত অদ্যাবধি অন্য রাজ্যে দেখা দেয়নি। কাজেই শাসক কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই রাজ্যে ঝুঁকি নিতে পারেন বৈ কি। অধিকন্তু, স্থিতিশীল সরকার আমজনতা যে চাইছে—এই মনোভাবকে কাজে লাগাবার লোভ রাজনৈতিক দল হিসাবে শাসক কংগ্রেসের সম্বরণ করাও উচিত নয়। বাংলা কংগ্রেস যদি আগেভাগে এই প্রশ্ন বিচার করে ধীরে সুস্থে জোট বাঁধার প্রশ্নে এগিয়ে যেতেন তবে আজকে আলাপআলোচনা হত না।

ইন্দিরাজী ইতিমধ্যেই নির্বাচনী ভাষণে বলেছেন যে, দেশের মধ্যে স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য তাঁর হাতকে মজবুত করা দরকার। তিনি কোয়ালিশান চান না। সেই সূত্র থেকেই রাজ্য শাসক কংগ্রেস তাঁদের নির্বাচনী নীতি স্থির করেছেন। কারণ, কোয়ালিশন সরকারের অভিজ্ঞতা কোন দলেরই ভাল নয়। এই পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করে সি পি এমও হয়ত ঐ একই নীতি অনুসরণে ব্রতী হয়েছেন।

বস্তুতঃপক্ষে, রাজ্যে একটি জোটই গঠিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে অষ্ট বামের জোট। বর্তমান নাম—সংযুক্ত বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। অন্য দিকে সি পি এম-এর নেতৃত্বে

যেটি গঠিত হয়েছে সেটি সত্যিকারের জোট বলা কঠিন। কারণ, সি পি এম ছাড়া অন্যান্য সঙ্গীদের অবস্থিতি একেবারেই নগণ্য। আদি কংগ্রেস, শাসক কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস প্রায় একলাই চলছেন। বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কয়েকজন দলছুট জোট বেঁধেছেন। তার প্রভাবও নগণ্যই মাত্র। আবার আর এস পি ও লোকসেবক সঙ্ঘ একলা চলছে। অনুরূপভাবে, জনসংঘ, মুসলীম লীগ, ঝাড়খন্ড, ইন্ডিয়ান আওয়ামী লীগ এমনি আরও কত কি দল নির্বাচনে মহড়া দিচ্ছেন তার সংখ্যা নিরূপণ কঠিন হয়ে পড়েছে। হালফিল অন্তর্বামের সঙ্গে মুসলীম লীগের সমঝোতা হওয়ার কথা উঠেছিল। কিন্তু তা হচ্ছে না। কারণ, মুসলীম লীগের সঙ্গে অন্তর্বামের মধ্যে যে দলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে তাঁরা মনে করেন মুসলীম লীগ যে লড়াই করবে তাতে তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না। অন্য শরীক ও বিরোধী দলের ক্ষতি হতে পারে মাত্র। কাজেই মুসলীম লীগকে বাইরে রাখাই ভাল।

উপরিউক্ত — স্ট্র্যাটেজির ভিত্তিতেই এবারের নির্বাচনী লড়াই অনুষ্ঠিত হবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ট্যাকটিক্স বা কৌশলের যে পরিবর্তন হতে পারে—এটা নিঃসন্দেহ। কৌশল হিসাবে আদি কংগ্রেস যেমন অনেকগুলি আসনেই প্রার্থী দিচ্ছেন সেখানে শাসক গোষ্ঠী প্রার্থী দেন নি। আদি নেতারা মনে করেন 'কংগ্রেস' প্রার্থী সব আসনেই থাকা দরকার। আবার শাসক কংগ্রেসও অনেকগুলি আসনে প্রার্থী দেন নি। তাঁরা মনে করেন—যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁদের দলগত শক্তি বেশী সেখানে প্রার্থী দিয়েই বেশী সংখ্যক আসনে জয়লাভ করাটাই প্রয়োজন। অহেতুক শক্তি ছড়িয়ে দিয়ে দুর্বল হওয়াটা ঠিক নয়। আবার যেমন শাসক গোষ্ঠী কিছু কিছু নেতার বিরুদ্ধে প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তেমনি অনুরূপভাবে আদি এবং বাংলা কংগ্রেসও ঘোষণা করেছেন তাঁরা কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবেন না। অন্তর্বাম কেবলমাত্র শ্রীঅজয় মুখার্জির বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দাঁড় করাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে—কি আদি, কি শাসক, কি বাংলা কংগ্রেস বা কি অন্তর্বাম—তাঁদের কয়েকজন নেতাকে শুধু সি পি এম এর সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এর রাজনৈতিক অর্থ হচ্ছে ঐ সমস্ত আসনে এই সব দল একত্রিতভাবেই সি পি এম-এর বিরুদ্ধে লড়বেন। এই যে একত্রিতভাবে লড়বার কৌশলকে আরও ব্যাপক করে তুলবার জন্য বোধহয় শেষ মুহূর্তে বাংলা কংগ্রেস শেষ চেষ্টা হিসাবে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে বরানগরে শ্রীজ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। শ্রীমুখার্জির এই সিদ্ধান্ত রাজ্য রাজনীতিতে হঠাৎ এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করল। ইতিমধ্যেই আদি ও নব কংগ্রেস এই কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী না দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। একমাত্র অন্তর্বাম প্রার্থী দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য এই নিবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত প্রার্থী রয়েছেন। এখন অন্তর্বাম যদি তাঁদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অজয়বাবুর বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় না করান তবে শ্রীজ্যোতি বসুকে দীর্ঘদিন পর সত্যিই একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। কেননা—শ্রীবসু ৫২ সালের নির্বাচন থেকেই সত্যি কোন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নি। অনেক দল তাঁর বিরোধিতা করেছেন বটে তবে কোন খ্যাতনামা প্রার্থী দাঁড় করান নি বা করাতে পারেন নি। সে যা হোক এমনিভাবে যদি সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে তবে কৌশল হিসাবে খুব খারাপ হবে বলে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

অন্যদিকে খবর পাওয়া যাচ্ছে জেলা বা মহকুমা ভিত্তিক সমঝোতার জন্যও আলোচনা চলছে। এই আলোচনার জন্য স্বয়ং শাসক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয় সিং নাহারই স্থানীয় শাখাগুলিকে পূর্বাহ্নেই অনুমতি দিয়েছিলেন। শ্রীনাহার বলেছিলেন যে সাধারণভাবে সমঝোতা হচ্ছে না বটে তবে স্থানীয় শাখার নেতারা যদি মনে করেন সি পি এমকে হারাবার জন্য অন্য দলের সঙ্গে বোঝাপড়া প্রয়োজন তবে তাঁরা তা করতে পারেন।

আর এস পির শ্রীমাখন পাল ইতিমধ্যে বলেছেন যে, দিনাজপুরে এবং ২৪-পরগণার দক্ষিণাংশে তাঁর দলের সঙ্গে সমঝোতার জন্য সি পি এম এবং সি পি আই নেতারা কথাবার্তা বলেছেন। যদিও বা কিছু এখনও পাকাপাকি হয় নি—তবে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে যে, আর এস পি'ও একলা লড়াই করতে নেমেছেন। এই একলা লড়াই করতে গিয়ে মনে হয় আর এস পি এবার সংঘর্ষে লিপ্ত হতে রাজী নয়। নতুবা যেখানে প্রত্যেক সভায় তাঁদের এক-সময়ের বন্ধুরা "দালাল" বলে চিহ্নিত করছেন সেখানে সীমিত সমঝোতা করার প্রয়াস পাচ্ছেন কি করে? যাহোক, আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্য সকলেই যে গোপনে গোপনে জোট জোটবন্দীর চেষ্টা করছেন তা বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

এসব সত্ত্বেও এক একটি আসনে প্রার্থীর সংখ্যা যে বেশ কয়েকজন করে হবে এও স্পষ্ট হয়ে গেছে। রাজনীতির পীঠস্থান হিসাবে পশ্চিমবাংলা সুপরিচিত। অগ্রপ্রগতিশীল রাজনীতির ধারক ও বাহক হিসাবেও এই রাজ্যের বেশ পরিচিতি আছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে একটি বিশেষ রোগ প্রকট হয়ে উঠেছে। সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতি। বিশেষ করে মুসলীম সংস্থা ও ঝাড়খন্ড যেভাবে মনোনয়ন দান করেছেন তার মধ্যে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যে সমস্ত আসনে মুসলীম ভোটদাতাগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ কিম্বা আসনের ভবিষ্যত নির্ধারণের পক্ষে কার্যকর হওয়ার আশা আছে কেবলমাত্র সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই মুসলীম লীগ প্রার্থী দিচ্ছেন। অনুরূপভাবে, ঝাড়খন্ড দলও কেবলমাত্র আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া ও হুগলীর কিছু সংখ্যক আসনেই তাঁরা প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ৩৩টি আসনে নামের তালিকাও পেশ করেছেন। অন্য কোন নির্বাচনে ঝাড়খন্ড বা মুসলীম লীগ এত সাহসের সঙ্গে এই ধরণের রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠেনি। জাতি বা বর্ণের উপর নির্ভর করে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি অতীতে রাজনৈতিক দলগুলি করেন নি বটে। কিন্তু এক বিশেষ শ্রেণীর ভোটারের আনুগত্য লাভ করবার প্রচেষ্টা তাঁরাও অতীতে করেছেন। ফলে, আজ তা মহীরুহের আকার ধারণ করে রাজ্য রাজনীতিতে আর এক নয়া সঙ্কটের সৃষ্টি করছে। এই সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। নতুবা, রাজনৈতিক অস্থিরতাকে মূলধন করে এক নয়া বিভেদপন্থী রাজনীতি কায়েম হয়ে বসবে।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

শনিবার ৩০ জানুয়ারী মধ্যাহ্নের অল্প পরে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমানটি জম্মু বিমানবন্দরে নামবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন জি এস ওবেরয় বিমানটি চালাচ্ছিলেন, পাশে বসেছিলেন কো-পাইলট ক্যাপ্টেন এম কে কাচরু।

শ্রীনগর থেকে ২৮ জন যাত্রী নিয়ে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের নির্ধারিত সার্ভিস বিমানটি জম্মুতে আসছিল। সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে এমন কোন সন্দেহ করার কারণ কেউ দেখেন নি।

নিয়ম অনুযায়ী যাত্রীদের কুর্শি পেটিগুলি অর্থাৎ আসনের বেল্ট কোমরে বেঁধে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এয়ার হোস্টেস কুমারী কিরণ কোহলী ও স্টুয়ার্ড সৌমিত্র কৌশিক বসেছিলেন।

হঠাৎ দেখা গেল, পিছনের আসন থেকে দুজন যাত্রী উঠে দাঁড়াল। একজন ককপিটের ভিতর ঢুকে গেল আর একজন হাতে একটি হাতবোমা নিয়ে ককপিটের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। তার হাত কাঁপছিল। কিন্তু তারই মধ্যে সে হাত বোমার ফায়ারিং পিনটি খুলল এবং বোতামটি আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে থাকল। সে চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করে দিল, তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হলে তারা বিমানটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে।

ইতিমধ্যে আর একজন যাত্রী ককপিটের ভিতর ঢুকে বাঁ হাতে একটি পিস্তল ধরে পাইলট ওবেরয়ের গলায় ঠেকিয়ে রেখেছে। ডান হাত দিয়ে সে একটি ম্যাপ পাইলটের সামনে মেলে ধরল এবং গম্ভীর গলায় হুকুম দিল, সোজা পাকিস্তানের দিকে চল — শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি অথবা লাহোর।' ব্যাপারটা বুঝে নিতে বিমানের কম্যাণ্ডারের দেরী হল না। শান্ত গলায় তিনি জম্মু বিমান বন্দরের কর্মীদের রেডিও টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন, বিমানটি ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর তিনি পিস্তলধারী বিমানদস্যুকে বললেন, রাওয়ালপিণ্ডি অথবা শিয়ালকোট যাওয়ার মত তেল তাঁর বিমানে নেই। বিমান থেকে নীচে একটি নদীর রেখা দেখা যেতেই পিস্তলধারী বলল, 'ঐ তো চন্দ্রভাগা দেখা যাচ্ছে।' পাইলট বললেন, 'না ওটা চন্দ্রভাগা নয়, ওটা ইরাবতী।' বিমানদস্যু বলল, 'ঐ নদী বরাবর চল।'

জম্মু বিমানবন্দরে না নেমে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমান সোজা নাক বরাবর পাকিস্তানের দিকে চলে গেল।

এর ঘণ্টাখানেক পরে দিল্লীতে খবর এল, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের একটি বিমান লাহোর বিমানবন্দরে নেমেছে। বিমানটি যে আকাশপথে ছিনতাই হয়ে গেছে এবং মহম্মদ হাশিম কুরেশি ও মহম্মদ আশরফ নামে কাশ্মীরের অধিবাসী দুজন ভারতীয় নাগরিক যে বিমানটিকে জোর করে পাকিস্তানে নিয়ে গেছে সেকথা বুঝতে অবশ্য দিল্লীর কিছু সময় লাগল।

এই বিমানের ক্রু ও অন্যান্য আরোহীদের কাছ থেকে পরে ঘটনার যে বিবরণ জানা গেছে সেটা এই রকম :—

লাহোর বিমানবন্দরের কাছাকাছি এসে শ্রীকুরেশি পাইলটকে বলল, 'রেডিও টেলিফোনে লাহোরকে বল হাশিম এসেছে, সে বিমানটির দখল নিয়েছে।' তারপর সে নিজেই পাইলট ওবেরয়ের হাত থেকে রেডিও টেলিফোনটি কেড়ে নিয়ে লাহোর বিমানবন্দরকে তার আগমনবার্তা জানিয়ে দিল। পাকিস্তান কুরেশির আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল, একথা স্পষ্টই বোঝা গেল।

ভারতীয় বিমান লাহোর বিমানবন্দরে নামার পরও দুই বিমানদস্যু নিশ্চিত হতে পারছিল না যে, সত্য সত্যই তারা পাকিস্তানের মাটিতে এসে পৌঁছেছে। তারা বলল, বিমানবন্দরের কর্মীরা বিমানের কাছে এসে নিজেদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে যান।

সন্দেহ মেটার পরও বিমানদস্যুরা বিমানের অন্য আরোহীদের বিমানের মধ্যেই আটকে রাখে। ঘণ্টাখানেক বাদে তারা বিমানের যাত্রীদের ও চারজন বিমানকর্মীকে নামতে দিল। তাঁরা নেমে দেখলেন, পাকিস্তানের সংবাদপত্র প্রতিনিধি ও টেলিভিশনের লোকজন ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

এর কিছুক্ষণ পরে মকবুল আহমেদ বাট নামক এক ব্যক্তির জবানীতে পাকিস্তান রেডিওর ঘোষণা শোনা গেল, 'জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের পরিকল্পনা অনুসারে এই বিমান ছিনতাই করা হয়েছে এবং এটা কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামেরই অংশ। ভারত সরকার যদি বিমানের আরোহীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে তার পরিণাম বিপজ্জনক হবে, বাটের এই হুঁশিয়ারীও পাকিস্তান বেতারের মারফৎ শুনিয়ে দেওয়া হল।

এই মকবুল আহমেদ বাট লোকটি কাশ্মীরে অপরিচিত নয়। ১৯৬৬ সালে সে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার অপর পার থেকে এসে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে। হত্যা ও অন্যান্য অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু ১৯৬৮ সালে সে জেল থেকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধবিরতি সীমারেখার অপর পারে গিয়ে 'জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট' গঠন করে। লণ্ডনে এই ফ্রণ্টের যেসব প্রতিনিধি আছেন তাঁদের নেতা হচ্ছেন শেখ আবদুল্লার ছেলে তারিখ আবদুল্লা। প্যালেস্টাইনের মুক্তিযোদ্ধাদের মত কাশ্মীরের 'মুক্তিযোদ্ধারাও' বিমান অপহরণ করতে না কেন সেদিকের অনুসন্ধান করার জন্য কিছুদিন আগে তারিখ আবদুল্লা কাশ্মীরে লোক পাঠিয়েছিলেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল।

কাশ্মীরে গোলযোগ পাকাবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের ভিতর থেকেই যে এই 'জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট'-এর কর্মকলাপ পরিচালনা করা হচ্ছে তার আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ডাঃ ফারুক মালিক নামে একজন চিকিৎসক কিছুকাল আগে পর্যন্ত জম্মুতে বাস করতেন। তিনি পরে পাকিস্তানে চলে যান। লাহোরে গিয়ে তিনি ডিসপেন্সারী খুলে পসার জমিয়ে বসেছেন। ভারতীয় বিমান লাহোরে নামার পর কুরেশি টেলিফোনে লাহোরের যে লোকটির সঙ্গে কথা বলে তিনি হচ্ছেন এই ডাঃ ফারুক মালিক। ডাঃ মালিক 'জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্টকে' মোটা টাকা যোগান বলে খবর আছে।

আসল ব্যাপারটা বুঝবার পর দিল্লীর ভাবনা হল, অপহৃত বিমান ও তার আরোহীদের কি করে ভালয়-ভালয় ফিরিয়ে আনা যায়। ভারতবর্ষস্থিত পাকিস্তানী হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দারকে নয়াদিল্লীর সাউথ ব্লকে পররাষ্ট্র বিভাগের দপ্তরে ডেকে পাঠান হল। অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল ক্যাপ্টেন আর্য পাকিস্তানের অসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিরা ভারতীয় বিমান ও তার আরোহীদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মৌখিক আশ্বাস দিতে থাকলেন। কিন্তু কাজে তাঁরা নানাভাবে বাধা দিতে থাকলেন। পাকিস্তানের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের একটি ভাইকাউন্ট বিমান তৈরী করে রাখা হল যাতে পাকিস্তানের অনুমতি পেলেই ঐ বিমান পাঠিয়ে ফকার ফ্রেণ্ডশিপের আরোহীদের দেশে ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার একটার পর একটা অছিলা তুলতে থাকলেন। রিলিফ বিমানের সঙ্গে যেসব বিমানকর্মী যাবেন তাঁদের ভিসা নিয়ে প্রথম ঝগড়া নেওয়া হল। তারপর বলা হল, লাহোর বিমানবন্দরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের এমন একটা বিরাট সমাবেশ হয়েছে যে, কোন ভারতীয় বিমান সেখানে পাঠান সমীচীন হবে না। ভারত সরকার যখন আফগানিস্তানের আরিয়ানা এয়ার লাইনসের বিমানে লাহোর থেকে ভারতীয় যাত্রীদের নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন তখনও পাকিস্তান নানা বাহানা তুলে সেই চেষ্টা বানচাল করে দিল।

দুজন বিমানদস্যু বাদে ভারতীয় বিমানযাত্রীরা প্রায় ৪৮ ঘণ্টা লাহোরে আটকে ছিলেন। এই ৪৮ ঘণ্টা তাঁদের লাহোরে একটি হোটেলে রাখা হয়েছিল। ভারত সরকার যতবার এঁদের সম্পর্কে খোঁজ করেছেন ততবারই পাকিস্তান শুধু এইটুকু মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন যে, ভারতীয় বিমানযাত্রীরা নিরাপদ আছেন, তাঁদের যত্ন নেওয়া হচ্ছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা হলেই তাঁদের ফেরৎ পাঠান হবে। দুই দেশের মধ্যে সরকারী স্তরে আলোচনা চলতে-চলতেই অকস্মাৎ জানা গেল, পাকিস্তান ভারতীয় বিমানযাত্রীদের কুরেশি ও আশরফ বাদে সকলকে বাসে করে হোসেনিওয়ালা সীমান্তে পাঠাচ্ছে। তাড়াতাড়ি হোসেনিওয়ালা সীমান্তে ভারতীয় বিমানযাত্রীদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হল। ভারত সরকারের অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের মন্ত্রী করণ সিং ফিরোজপুরে গিয়ে একটি বিশেষ বিমানযোগে এই ভারতীয় বিমানযাত্রীদের অমৃতসরে নিয়ে এলেন। পাকিস্তান ছেড়ে আসার আগে এই বিমানযাত্রীদের সমস্ত মালপত্র রেখে আসতে হল। কেননা, সেগুলি নাকি বিমানদস্যুদের 'দরকার'। এমন কি পাইলটদের ব্যাগও বিমানের মধ্যে রেখে আসতে হয়েছে। বিমানযাত্রীদের মালপত্রের বিবরণ এই ব্যাগের মধ্যেই থাকে।

বিমানযাত্রীদের নিরাপদে ফিরৎ পাওয়ার পর ভারত সরকারের একটা দুশ্চিন্তা মিটল। অতঃপর চিন্তা হল, অপহৃত বিমানটি কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়।

এদিকে, পাকিস্তান ঐ দুজন বিমানদস্যুকে নিয়ে নাচানাচি আরম্ভ করল। পাকিস্তান বেতারে তাদের 'স্বাধীনতা যোদ্ধা' বলে অভিহিত করা হতে থাকল। দিল্লীতে পাকিস্তানী হাইকমিশনারের অফিসে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে যে দীর্ঘ বিবৃতি দেওয়া হল তাতে এই বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাকে শুধু 'অঘোষিত বিমান অবতরণ' বলে অভিহিত করা হল। জুলফিকার আলি ভুট্টো বিমানের পাশে দাঁড়িয়ে ঐ দুজন বিমানদস্যুদের

শংকর-এর
দশ মাসে দশম মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল
এপার বাংলা ওপার বাংলা ১০·০০
মানচিত্র ৮·০০ রূপতাপস ৪·০০ চৌরঙ্গী ১২·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
তাঞ্জাম
দাম : ৪·৫০

সুভাষ সমাজদারের
আবগারী দারোগার ডায়েরী
দাম: ৫·০০

বিমল মিত্রের
এর নাম সংসার দাম : ৮·৫০
গল্পসম্ভার দাম : ১৬·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হসন্তী
দাম : ৪·৫০

দিলীপকুমার রায়ের
ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ
দাম : ১২·৫০

বনফুলের
অধিক লাল
২য় মুদ্রণ : ৪·৫০

ওঙ্কার গুপ্তের
ব্যাপারবহুতর
সচিত্র ব্যঙ্গরচনা ৫·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন তুলির টান
৩য় মুদ্রণ। 'নবরাগ' নামে ছায়াচিত্রে দেখান হচ্ছে। ৭·০০

কুমারেশ ঘোষের
এক বর অনেক কনে
দাম: ১০·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
আলোকপর্ণা
দাম: ১০·০০

নিরঞ্জন চক্রবর্তীর
শেষ বসন্ত
দাম : ৮·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিশিপদ্ম ৮ম মুদ্রণ ৪·৫০
মণিবউদি ২য় মুদ্রণ ৪·৫০

জরাসন্ধ-র
স্বীকৃতি দাম : ৫·০০
মসিরেখা ৫ম মুদ্রণ ৯·০০
মহাশ্বেতার ডায়েরী ২য় মুদ্রণ ৪·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
হরিলক্ষ্মী ২·০০
নারীর মূল্য ২·০০
দেনাপাওনা ৬·০০

বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

গোল্ডেন টোবাকোর কর্মীদের কাছে ভাষণ দেবার আগে কোম্পানীর চেয়ারম্যান চতুর্ভুজ নাথ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিলে দান হিসেবে একলাখ টাকার একটি চেক দিচ্ছেন।

সঙ্গে কথা বললেন। পাকিস্তানের মারফৎ কুরেশি ও তার সহকারী ভারতের কাছে তিনটি সর্ত পাঠাল। এই তিনটি সর্ত হল : — (১) বিমান ছিনতাইকারীদের আত্মীয়স্বজনের কোন ক্ষতি করা চলবে না, (২) কাশ্মীরে গত কয়েক দিনে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দিতে হবে এবং (৩) এই দুটি সর্ত মানা না হলে বিমানটি উড়িয়ে দেওয়া হবে।

সর্তগুলি পাওয়া মাত্র ভারত সরকার সরাসরি সেগুলি প্রত্যাখ্যান করলেন। বিমানদস্যুরা তখন তাদের তৃতীয় সর্ত পালন করল। বিমানের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা বিমানটি জ্বালিয়ে এবং উড়িয়ে দিল। সমস্ত ঘটনাটি ঘটল পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ও সে দেশের অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের কর্মীদের উপস্থিতিতে ও তাদেরই চোখের সামনে। পাকিস্তানের মাটিতে আটক বিদেশী বিমান রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে পাকিস্তান যে তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছে সেই কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য সে প্রচার করল যে, বিমান-দস্যুরা বোমা ছোঁড়ার ভয় দেখিয়ে সকলকে কাছে ঘেঁষতে দেয় নি এবং বিস্ফোরণ ঘটাতে গিয়ে ঐ দুজন হাওয়াই বোম্বেটে নিজেরাও জখম হয়েছে। ভারতীয় বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য পাকিস্থান ভারতের কাছে মামুলীভাবে দুঃখ প্রকাশও করেছে।

পাক-ভারত উপমহাদেশে এই প্রথম বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে নানা দিক থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ভারত সরকার ভারতের আকাশ দিয়ে পাকিস্তানী বিমানের চলাচল নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ যে 'প্রশ্রয়, প্ররোচনা ও উৎসাহ' যুগিয়েছেন তার নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একটি কঠোর বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যাত্রী ও ক্রু লোকদের ফেরৎ দিতে পাকিস্তান যে বিলম্ব করেছে সেটা অমানবিক ও অসঙ্গত। মালপত্র ও ডাকের জিনিসসহ বিমানটি ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আইনের সমস্ত নিয়মকানুন ও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব লঙ্ঘন করেছে।' প্রধানমন্ত্রী এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, ভারত যদিও পাকিস্তানের বন্ধুত্ব কামনা করে তাহলেও ভারতের ভিতরে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় পাকিস্থান তাদের উস্কানী দিতে থাকলে ভারত সেটা সহ্য করবে না।

অবশ্য একটা শুভ লক্ষণ এই যে, এই বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাকে অবলম্বন করে পাকিস্তানে যে ভারত-বিরোধী জেহাদ চলেছে তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন সে দেশের বৃহত্তম ও সবচেয়ে জনপ্রিয় দল আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান। এই বিমান অপহরণ ও ধ্বংসের ঘটনার সুস্পষ্ট নিন্দা করে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্তের দাবী জানিয়েছেন।

ভারতের আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ঘটনা ঘটেছে, এটাও তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনাটিকে একটি বড় রকমের নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করে জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও বিরোধী কংগ্রেস ইতিমধ্যে আসরে নেমে পড়েছে। দিল্লীতে পাকিস্থানী হাই-কমিশনারের অফিসের সামনে রোজ বিক্ষোভ দেখান হচ্ছে। হাইকমিশনারের অফিসের ছাদ থেকে বিক্ষোভকারীদের উপর ঢিল ছোঁড়া হয়েছে। এই বিক্ষোভ প্রদর্শন সামলাতে গিয়ে দিল্লীর পুলিশকে হিমসিম খেতে হচ্ছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে কাশ্মীরে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে নিযুক্ত চক্রের উপর নজর রাখার প্রশ্নে। কাশ্মীর সরকার অভিযোগ করেছেন যে, বিমানদস্যু কুরেশি কাশ্মীরে ভারত সরকারের সীমান্ত-রক্ষী বাহিনীর একজন সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন। কুরেশির কাছ থেকেই সীমান্তরক্ষী বাহিনী খবর পেয়েছিল যে, ছয়জন কাশ্মীরী যুদ্ধবিরতি সীমারেখার অপর পারে গিয়ে বিমান ছিনতাই করার তালিম নিয়ে এসেছে এবং এই ছয়জনের মধ্যে সে নিজেও ছিল। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছ থেকে এই খবর পাওয়ার পরই কাশ্মীর পুলিশ কুরেশিকে জেরা করতে চায়; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যায় নি।

কাশ্মীর সরকারের এই অভিযোগ পাওয়ার পর দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন জানা যাচ্ছে যে, কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁচটি সংস্থা ও রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা কাশ্মীরে গুপ্তচরদের কার্য-কলাপের উপর নজর রাখার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। এই ছয়টি সংস্থার মধ্যে কোন সমন্বয় নেই এবং তাদের পরস্পরের রেষা-রেষির সুযোগ নিয়ে সন্দেহজনক চরিত্রের লোক এই সব সংস্থায় প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে। অন্যান্য যেসব টুকরো টুকরো খবর পাওয়া যাচ্ছে সেগুলিও বেশ চাঞ্চল্যকর। যেমন স্বতন্ত্র পার্টির নেতা দহিয়াভাই প্যাটেল বলেছেন যে, অপহৃত ভারতীয় বিমানটিতে আর একটি গুপ্তচরচক্র সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল পাইলটস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, কাশ্মীরে যারা অন্তর্ঘাতী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা পাকিস্থানের সহায়তায় বিমান ছিনতাই করে নিয়ে যেতে পারে, এই মর্মে বিমান চালকদের হুঁশিয়ার করে একটি গোপন বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করেছিলেন গত সেপ্টেম্বর মাসে, সেটি 'প্রকাশ পেয়েছে' মাত্র কয়েক দিন আগে। আর একটি চাঞ্চল্যকর খবর এই যে, লাহোর বিমানবন্দরে ভারতীয় বিমানটি নামার পর যাত্রীদের মধ্যে কেউ কুরেশিকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, লাহোরে কার সঙ্গে তাকে যোগাযোগ করতে হবে। এই খবর যদি সত্য হয় তাহলে বুঝতে হবে, যেসব বিমানযাত্রী ফিরে এসেছেন তাদের মধ্যেও বিমানদস্যুদের সহযোগী ছিলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা সব দিক থেকে অশুভ ইঙ্গিত বহন করে এনেছে।

৫-২-৭১ —পুণ্ডরীক

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

উত্তেজনা সৃষ্টির চক্রান্ত

লাহোরে ভারতের ছিনতাই-করা বিমানটিকে ধ্বংস করতে দিয়ে পাকিস্তান সরকার এই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির চক্রান্তকেই সফল করলেন। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিমানযাত্রীদের সঙ্গে ছিনতাই-করা বিমানটিও ফিরিয়ে দিতে পাকিস্তান সরকার নৈতিক দিক দিয়ে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু সে-দায়িত্ব তাঁরা পালন করলেন না। পাকিস্তানের নবনির্বাচিত সর্বজনমান্য নেতা শেখ মুজিবর রহমান এই ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত বলে অভিহিত করে এর পূর্ণ তদন্ত দাবী করেছেন। ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টিই যে এর উদ্দেশ্য তাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন মুজিবর, যিনিই হবেন পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু এখনও পাকিস্তানে সামরিক কর্তারা ক্ষমতার আসন জবর দখল করে রেখেছেন। নির্বাচন সম্পন্ন হলেও দায়িত্বভার তাঁরা ছাড়ছেন না এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও শেখ মুজিবর রহমানকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে দেওয়া হচ্ছে না।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের পশ্চিমী শাসকরা ১৯৪৭ সাল থেকেই যে শত্রুতা করছেন ১৯৭১ সালেও তার কোনো নিবৃত্তি নেই। কাশ্মীরের একাংশ তাঁরা জবর দখল করে নিয়েছেন। সেখান থেকেই চলছে নাশকতা। ভারতের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরে স্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা আরও খাপ্পা হয়ে উঠেছে। সেই কারণে, কাশ্মীরের অভ্যন্তরে তাঁদের চররা চালিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহী চক্রান্ত। এদের দমন করতে না পারা কাশ্মীর সরকারের ব্যর্থতা। এজন্য ভারত সরকারকে এখন অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে কাশ্মীর সরকারকে সাহায্য করার জন্য। এই রাষ্ট্রদ্রোহীরাই ভারতীয় বিমানটিকে দস্যুতা করে ছিনিয়ে নিয়ে যায় লাহোরে। এবং পাকিস্তান সরকারের প্রকাশ্য যোগসাজসে বিমানটিকে ধ্বংস করে।

এর উদ্দেশ্য কী? লক্ষ্য করা গেছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নবনির্বাচিত নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এই বিমান-ছিনতাইকারী দস্যুদের মুক্তিযোদ্ধা বলে সম্বর্ধনা জানিয়ে দেন। শেখ মুজিবর যখন একে কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন তখনই ভুট্টোর এই উন্মত্ত প্রলাপ পাকিস্তানের দুই অংশের জনমতের বিভিন্নতাই প্রকট করেছে। ভুট্টোর দল ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের লাহোরে যেতে দেয় নি। মুজিবরের বাংলা দুই দেশের মৈত্রীস্থাপনের জন্য মানবিকতার আবেদনে যখন মুখর তখনই ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টোর পশ্চিম পাকিস্তান ভারতের বুকে আঘাত হানবার জন্য উদ্যত। আসলে মুজিবর ও তাঁর আওয়ামী লীগের এই বিরাট সাফল্যকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা ভালো চোখে দেখেন নি। পাক-ভারত মৈত্রীর জন্য মুজিবরের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্যই ইয়াহিয়া খান সুকৌশলে পাকিস্তানে ভারত-বিরোধী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলেছেন। এ কাজে তাঁর দোসর হলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। বিমান ছিনতাই পূর্ব পরিকল্পিত এবং এর সঙ্গে দিল্লীর পাকিস্তানী দূতাবাস এবং পাকিস্তান সরকারের যোগ রয়েছে। ভারত সরকার এখন আর কী করবেন? ভারতের উপর দিয়ে সমস্ত সামরিক ও অসামরিক পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন ভারত সরকার। বাধ্য হয়েই পাকিস্তানী চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য সরকারকে এ কাজ করতে হয়েছে। এতে পূর্ব বাংলার মানুষের একটু অসুবিধা হবে। তাই আমরা আশা করছি পূর্ব বাংলার মানুষের স্বার্থে অনুরূপ ভাবনাতেই ভারত সরকার পাকিস্তানের উভয় অংশে অসামরিক বিমান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার সুযোগ পাবেন। পূর্ব বাংলার জনমত পাক-শাসকদের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরা তাঁদের এই প্রতিবাদের সঙ্গেই আমাদের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর যুক্ত করছি। পাকিস্তানের শাসকরা ভারত-বিরোধিতাকে আশ্রয় করে এতদিন তাঁদের জনগণকে ধোঁকা দিয়ে এসেছেন। আজ সেই ধোঁকা পূর্ব বাংলার জনগণ ধরে ফেলেছেন বলেই ইয়াহিয়া খান ও তাঁর দোসররা আবার একটা ষড়যন্ত্র করেছেন দুই দেশের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি করতে। ইতিমধ্যেই উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। এখন উভয় দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই সংযতভাবে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এই হঠকারী ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে হবে। আমরা প্রতিবেশী হিসাবে শান্তিতে থাকতে চাই। ষড়যন্ত্রকারীরা অনেক দিন দুই দেশের মধ্যে শত্রুতা বজায় রেখেছে। আর তাদের কোনো সুযোগ দেওয়া নয়।

নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

পূর্ব শর্ত মনে ছিল, অন্ধকারে গোপন উল্লাস।
ভেতরে সজাগ থেকো, দ্বাররক্ষী,
বাইরে যাবো সীমান্ত-সংগ্রামে।
শুনি, পদশব্দে কার মুহুর্মুহু জন্দুর আহ্বান?
হামাগুড়ি দিয়ে চলি, বুকে হেঁটে, দুর্দিনে দুর্গমে
যেন দূরে যেতে হবে।
মধ্যপন্থী এই বুকে করে পারাপার।

সামনে চোখ, ডাইনে-বাঁয়ে পাখির কঙ্কাল।
ভিনদেশে এসেছি বুঝি—বিদেশী, না, প্রবাসীর মতো?
জানি না বলেই আজো ভাঙিনি আড়াল।
সেতুর ওপরে ছায়া বহু নৃত্যরত,
একেকটি শরীর ঘিরে তৈরী করে লক্ষ কারাগার।

সিংহের পোষাক গায়ে, যেন আমি পদাতিক-আফিক, তবু ভয়ে
এদিকে ওদিকে চাই, চোখ রাখি, দৃষ্টিপাত, তির্যক চাউনি :
কেউ কি কোথাও আছে, কোনো শত্রু, যার পরাজয়ে
সহসা বিজয়ী হবো?
সেই স্বপ্নে তুরঙ্গমে এখনো চড়িনি।
পদশব্দে শত্রু চিনি, কার শব্দ? ও কি নয় আমার পায়ের?

তাহলে কোথায় যাবো? অন্ধকারে পাহাড়! পাহাড়!
আগুনের শিলায় পূর্ণ। কী পোষাক আমাকে মানায়?
বজ্রের সঙ্কেত নাকি ছিল এই সৌখীন শরীরে।
একটিও ছায়াকে আমি জয় করতে পারিনি যে
রৌদ্রে ও জ্যোৎস্নায়।

দ্বাররক্ষী, দ্বার খোলো আমার গাঁয়ের।

শববাহক ॥

গণেশ সেন

এক আঁজলা জলে—
ভাঙাচোরা মুখ।
প্রতিবিম্বে পদ্ম কি আর ফোটে?

তালা চাবি দিয়ে
কাকে আর বাঁধা যায়
স্মৃতি কিম্বা নারী?

গোলাপ কাঠের বাক্সে
মৃত চিঠির শরীর
বড় বেশী ভারী!

শববাহকের দলে করুণায় কাঁধ
কে আর মিলাতে পারে—
বরফের রাতে?

গর্ভ গৃহের প্রান্তরে
বরাভয় এঁকে
কে কার প্রতীক্ষা করে?

এ সময় অনায়াসে—
যে কোন অসতীর হাতে
জন্মদিনের ঘড়ি স্মৃতি করা যায়।

অগ্নি সাক্ষী করে
না—বলা যায়,
কি এমন মিথ্যে কথা আছে?

অপলাপ ॥

অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন জিইয়ে থেকে থেকে
ক্রমশ ফুলেল গন্ধ মুছে গেছে গা থেকে,
শ্বেত করবীর মালা রাত্রির শেষ যামে
এসে কেঁপে কেঁপে গুটিয়ে ফেলেছে পাপড়ি:
মুখের সলজ্জ রক্তিমতা কেটে
পাণ্ডাশ সিদ্ধ ডিমের রং এখন,
ঘুন পোকা কেটে কেটে
মন্দ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন আমার হৃদয়ে,
এখন আমাকে নিয়ে কি করা যায়......
ভাবছে অনেকে—

অথচ একদিন,
একটা মেয়েকে সংসার দিতে পারতাম আমি;
মালা দিতে পারতাম—
যে শুকনো মালার আজ আমায় নীলকে করে তোলে।

মলয় আয়নায় মুখ দেখছিল। তার চোখের সামনে নতুন দেয়ালে পরপর কয়েকটা আয়না। মলয় মুখ আরও নামিয়ে আনল, একটু আগেই সে সমস্ত মুখে জল ছিটিয়েছে। এখনো কপাল, গাল, কেমন ভেজা ভেজা; সেই ঠান্ডাটুকু মলয় ধরে রাখার চেষ্টা করছিল, তার মানে, চোখ-মুখের এই স্নিগ্ধতায় সে বড় আরাম পাচ্ছিল। একবার ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল বোলাল, নরম, ঠান্ডা একটা অনুভূতি, যেন সমস্ত শরীরে শির-শির করে ছুটে গেল; আরও ঝুঁকে পড়ল মলয়, চোখের পাতা টেনে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করছিল, চোখ বেশ ভারি, একটু বোধ হয় ফুলেছে, তাহলে কী কাল রাত্তিরে আমার ভাল ঘুম হয়নি? অথবা কোথাও পড়ে গিয়েছিলাম? নাকি কেউ আমাকে মেরেছিল চোখের ওপর? সত্যি, মলয় টের পাচ্ছিল এখন তার ঘুম পাচ্ছে, মাথা ক্রমশ ভারি হয়ে আসছে; কিন্তু কাল আমি তো কোথাও...হাত দেখল মলয়, পা লক্ষ করল, না কোথাও কেটে যাওয়ার দাগ নেই, যন্ত্রণা নেই। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তার; তাহলে এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেন এসব কথা তার মনে হচ্ছে? তবে কী স্বপ্ন দেখেছিলাম? মলয় আরও ঝুঁকে পড়ল আয়নার ওপর। গালে, ঠোঁটে, নাকে, আয়নার শীতল স্পর্শটুকু উপভোগ করল। তাহলে স্বপ্নের

ভেতর কেউ আমার চোখ বা কপাল লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিল? আয়নার ভেতরের ছায়াটাকে ছোট চোখে মলয় একবার জরিপ করল; যেন এখনো কাচের আড়ালে কেউ পিস্তল তুলে আছে তার দিকে...হঠাৎ একটা পুরনো অঙ্ক মিলে যাওয়ার মত একটু একটু করে মলয় ছবিটাকে যেন আবার দেখতে পেল; হ্যাঁ একটা হলুদ আলো দুলছিল, দেয়ালে কাদের অসংখ্য ছায়া, আর সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে মলয় একসময়—

চমকে উঠতেই মলয় টের পেল সে অফিসের বাথরুমে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের ওপর সাদা নিওন লাইন, আর পরপর কয়েকটা আয়না, একটা বেসিনের কল খারাপ হয়ে যাওয়ায় বহুক্ষণ শব্দে জল পড়ে যাচ্ছে; আর একবার তাকাল মলয় আয়নার ভেতর। আশ্চর্য! একসঙ্গে চার পাঁচটা মলয় তার চোখের ওপর নেচে উঠল। তাহলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই; জিভ দিয়ে মুখের ভিতর আলগা একটা শব্দ তুললো সে; তারপর পকেট থেকে ছোট চিরুনি বার করে অভ্যাস মত চুল ঠিক করতে লাগল:

এখন অফিস অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে; বিশাল করিডরটাকে তার কেমন অন্ধকার টানেলের মত মনে হচ্ছিল; মুখ মুছলো রুমাল দিয়ে, সেকশানে, সেকশানে এখনো অনেক পাখা ঘুরে যাচ্ছে। দুয়েকটা জানলার পাল্লা খোলা, টেবিলে টেবিলে ফাইলগুলো গোছানো নেই, এক জায়গায় অনেকগুলো চেয়ার জড়ো করা; সমস্ত দৃশ্যটা হঠাৎ কেমন তার পরিত্যক্ত মনে হল; যেন আচমকা বুকের ভেতর কিছু উঠে আসে, বোধহয় শূন্যতা? বোধ হয়......

জানলা দিয়ে রোদ এসে টেবিলের গায়ে লেগে আছে, ঘড়িতে এখনো চারটে বাজে নি; অন্য দিন এই সময় সে হয়তো ফাইল নিয়ে কাজ করতো বা পুরনো রেফারেন্স ঘেঁটে ঘেঁটে কিছু বার করার চেষ্টা করতো, অথবা হয়তো ফাইল বন্ধ করে আকাশ বা গাছ বা অন্য অফিসের জানলার দিকে তাকিয়ে থাকত।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্র ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

আজ হঠাৎ টিফিনের সময় অফিস ছুটি হয়ে গেল। মলয় মনে করতে চেষ্টা করল সকালের দিকেই যেন একটা সাকুলার সই করেছিল। কে একজন এই অফিসের রিটায়ার্ড অফিসার আজ সকালে মারা গেছে, খবর আসতেই অফিসে জটলা সুরু হয়ে গেল। মলয়ের কিছু করার নেই, ছিল না তখন। সে লোকটাকে দেখেনি, চেনে না। অতএব দুঃখ, শ্মশানে যাওয়া, এসব মলয়ের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, পড়লেও সে যেত না। একটা শরীর ক্রমশ ছাই হয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্যটা সে কল্পনা করতে ভয় পায়। অথচ তার চারপাশে কয়েক হপ্তায় একটা নাটক ক্রমশ জমে উঠছিল।

—বুঝলে মলয়, দেবতার মত মানুষ ছিলেন লাহিড়ীসাহেব,—জানো মলয়, আমরা একসঙ্গে চাকরিতে ঢুকেছিলাম, —কী আর বলবো তোমাকে, লাহিড়ীসাহেব আমাকে ঠিক ছোট ভাইয়ের মত... এরকম অজস্র কথা মশার মত তার চারপাশে পিনপিন করে ঘুরছিল।

দু'মিনিট নীরবতা পালনের সময় মলয় দেখছিল পরিষ্কার আকাশ, খুব নিচু দিয়ে প্লেন চলে গেল একটা; যাঁরা লাহিড়ী-সাহেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিলেন, তারাও জানতেন এতগুলো মানুষ কেউ শোকগ্রস্ত নয়, বরং ফাঁকতালে ছুটি পেয়ে যাওয়ায় কেউ বাড়ি, কেউ সিনেমা, কেউ অন্য কোথাও যাবার প্ল্যান করছে। তারপর অফিসটা প্রায় ফাঁকা হয়ে এলে মলয় বাথরুমে চলে এসেছিল।

রাস্তায় দাঁড়ালে টের পাওয়া যায় শীত আসছে। এর মধ্যেই রোদের রং ফিকে হতে সুরু করেছে। হঠাৎ মলয়ের মনে হল, আজ হয়তো সমস্ত কলকাতা দারুণ শীতে ক্রমশ জমে যাবে; ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল, মিউজিয়ম সব বরফে ঢাকা পড়ে আছে, আর কোনো রাস্তার ওপর সে নিজে বরফে চাপা পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; অবিকল বিদেশী কোনো ফিল্মের মতো; চোখ বুজে মলয় দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পেল। গাছগুলো সাদা, বাড়িগুলোও সব সাদা হয়ে গেছে, পথে লোক নেই, মলয় তার পরিচিত কলকাতাকে আর খুঁজে পাচ্ছে না; শরীরের ভেতর একবার যেন ঠাণ্ডা বাতাসের কাঁপুনি টের পেল মলয়। চোখ খুলল মলয়: না, মনের ভুল তার, চোখের ওপর স্বাভাবিক, পুরনো কলকাতা গড়াতে গড়াতে চলেছে। ফুটপাথে টাকায় দুটো পেন বিক্রি করছে একটি ছেলে, পাখি ঠোঁটে করে লোকের ভাগ্য তুলছে, চার্চের রেলিং ভর্তি লটারির লক্ষ লক্ষ টাকা, আর নানা রকম বই। বেহালার স্টপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম।

—দেখি পাঁচটা চারমিনার।
—দুটো পান দাও তো।
—পাঁচ টাকার খুচরো হবে?

মলয় একবার আকাশ দেখল। নির্মল, স্বচ্ছ আকাশ। চোখে পড়ল, চার্চের মাথার ওপর হলুদ রোদ যেন বিশ্রাম করছে; ঘড়িটা আর একটু পরেই খুব মিষ্টি সুরে চারটে ঘণ্টার শব্দ তুলবে। আশ্চর্য! অফিস-পাড়ার মধ্যে অদ্ভুত এক শান্তির জগৎ লুকিয়ে আছে, যেখানে গাছের নিচে অনেক কবর ছড়িয়ে থাকে, যেখানে নানা রঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। রেলিং ধরে ঝুঁকে রইল মলয়। ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে মানুষ কেমন স্মৃতি হয়ে আছে। চার্চের মাথার ওপর ক্রসটা থেকে এই নরম রোদের সঙ্গে যেন কার বিষণ্ণ করুণা তার কাছে নেমে আসছে। মলয়ের ইচ্ছে হল সে এখন নতজানু হয়ে কিছু প্রার্থনা করে।

ঠিক এ রকম দুপুরে তার মার কথা খুব মনে হয়। এতদিন পরেও যেন মার শরীরের গন্ধ সে টের পায়। মা তাকে পড়ে শোনাচ্ছে 'রাজপুত সন্ধ্যার' গল্প। আর জানলা দিয়ে সজনে গাছ ডিঙিয়ে বাবলুদিদের ছাদের এরিয়েল ছাড়িয়ে, সে চলে যেত। নদী, পাহাড়, জঙ্গল, নির্জন মরুভূমি, সব কিছু যেন খুব গোপনে উঠে আসত তার বুকের ভেতর।

—এ মা! তুই কী ছেলেরে! চোখে জল এসে গেল?

তখন বাবলুদি হেসে উঠতো তার দিকে তাকিয়ে, আর তার খুব অবাক লাগতো, চোখের সামনে যেন বাবলুদির শরীর মুছে যেত। যেন রাজস্থানের শূন্য প্রান্তরে, বিষণ্ণ আলোর মধ্যে কারাবন্দী করে রেখেছে বাবলুদিকে। একদিন আমি তোমায় উদ্ধার করবো বাবলুদি; একদিন সাদা জ্যোৎস্নায় ঘোড়ায় চড়িয়ে তোমাকে নিয়ে আমি কোথাও চলে যাবো!...

সেই বাবলুদি একদিন পালিয়ে গিয়েছিল বোম্বাই, সিনেমায় নামবে বলে। তারপর থেকে সে রাস্তায় রাস্তায় পোস্টারে সেই পরিচিত মুখ খুঁজে বেরিয়েছে, কোনো দিন আর খুঁজে পায় নি।

এখন আমি কোথায় যাবো? কোথায় যেতে পারি আমি?

অফিসের মিস. চক্রবর্তী দু'দিন বলেছিল তাকে, আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার ছিল একটু, সময় হলে কাইন্ডলি বলবেন... মলয় ভাবল আজকে তো ইচ্ছে করলেই মিস চক্রবর্তীর জরুরি কথা শুনতে পারতাম। মানে, অফিস থেকে বেরিয়ে কলকাতার দু-একটি অভ্যস্ত জায়গায়, গঙ্গার পাড়ে, ময়দানের কোনো গোলাকার ছায়ায়, বা কেবিনে ভারি পর্দার আড়ালে মিস চক্রবর্তীর নখের রঙ দেখতে দেখতে সে অনেকটা সময় খরচ করে দিতে পারত। আহা! এর নামই বোধ হয় কেরানিপাড়ার আলগা প্রেম! কী বলতেন মিস চক্রবর্তী? জীবন খুব একঘেঁয়ে, সংসারের দায়, চেষ্টা করলে কী জীবনের মানেটা পালটানো যায় না? কী আশা করতেন মলয়ের কাছে? সান্ত্বনা? বিশ্বাস? সিমপ্যাথি? নাকি...... অথবা সম্পূর্ণ অন্য দরকার ছিল হয়তো তার কাছে, মানে, ছোট ভাইটার পরীক্ষার ফিজ; যদি সম্ভব হয়, গোটা চল্লিশ টাকা, শুধতেই তো পারবেন কো-অপারেটিভে যা লোন পড়ে আছে, তারপর আর নতুন করে

ফোন চাইলেও তো দেবে না। তাহলে এই রকম, এইভাবে কিছু সময় কেটে যেত তার।

হেস্টিংস স্ট্রীট কোনদিকে দাদা?

মলয় হঠাৎ বলল : জানি না। লোকটা আর দাঁড়াল না। বাতাসে ক্রমশ কুয়াশা মিশে যাচ্ছে। এখন গলিতে গলিতে তোলা উনুনের ধোঁয়া ভারি হয়ে উঠে চোখে জ্বালা ধরাবে; রাস্তায় আলো জ্বলবে একটার পর একটা। এই বাতিওয়ালা হতে ইচ্ছে করে তার। শুধু আলো জ্বালিয়ে যাওয়া, হাতে একটা লাঠি নিয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকা শুধু! মাথা কেমন ঝিমঝিম করতে থাকে মলয়ের। যেন সে জ্বরের বিকারে পড়ে আছে। কোথাও বসে পড়বো? শুয়ে পড়বো কোথাও? এখন কী করতে পারি আমি? চিড়িয়াখানায় চলে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারি অজগর সাপকে? তারপর সাপের অজগরের চাপে ক্রমশ তালগোল পাকিয়ে যাওয়া। বা! দারুণ একটা ঘটনা তৈরি করা যায় তাহলে? খবরের কাগজে তার ছবি, তার পরিচয়। না চিড়িয়াখানায় যেকোনো সময় আর নেই। মলয় একটা দারুণ সুযোগ হারাল জীবনে। তবে আর কী করতে পারি আমি? কাউকে ফোন করতে পারি? চিৎকার করে বলতে পারি একটা বিরাট সাপের মত শহরটা আমাকে গিলে মারছে: আপনারা বাঁচান, হেল্প মি প্লিজ!...অথবা চিঠি লিখবো কাউকে। সুখে আছি, অথবা সুখে নেই, অথবা দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে আজকাল, বা কালকে মশারির ভেতর আরশোলা ঢুকে সে এক বিচিত্র কাণ্ড!...এইসব কথা ছাড়া মলয় আর কী লিখতে পারে। মনে লেখা যায়?... অথবা কোন মিছিলে ঢুকে আকাশ নামিয়ে আনতে চাইবে হাতের মুঠোয়? যদি পোস্টারে পোস্টারে সে ঢেকে দেয় সব দেওয়াল, কলকাতায় আরও কৃষ্ণচূড়ার গাছ চাই, আরও অনেক সূর্যাস্ত দেখতে চাই, নীলকণ্ঠ পাখি দিতে হবে আমাদের। আন্দোলন গড়ে তুলুন আপনারা: হঠাৎ একটা তিরিশ নম্বর ট্রামের হাতল ধরে ফেলল মলয়।

এই তো সে একটা কাজ পেয়ে গেল। এখন সে ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে নৌকো গুণতে পারবে; অথবা পড়তে পারবে বাসের গায়ের বিজ্ঞাপন। নিচে অসংখ্য পায়রা, ভিখিরিদের সংসার, তার মধ্যেই ঘণ্টার শব্দ, মন্দিরের সিঁড়ি, মলয় সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে কখন আবার জোয়ার আসবে, কখন সেই জলের টানে ক্রমশ সে ডুবতে থাকবে। আরামে চোখ বুঁজে এল তার।

—আরে মশাই নেমে পড়ুন, ফালতু বসে থেকে আর কী হবে? ট্রাম আর যাবে না।

—কেন?

—কলকাতায় নতুন বুঝি?

—চোখ মিলল মলয়। দেখতে পেল লাইন বেঁধে পরপর ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে।

—জানেন না দুপুরের দিকে বড়বাজারে গুলিফুলি চলেছে!

—হয়তো দশ পনেরোটা মারা গেছে। মলয় লক্ষ্য করল লোকটা গল্প করার সুখ পাচ্ছে। উল্টো দিকের ফুটপাথে পাঁচিল ঘেঁসে হাঁটতে থাকল মলয়। রাস্তায় শরীর পেতিয়ে ঘুমিয়ে আছে একটা লোক, মলয় দাঁড়িয়ে পড়ল। বোধহয় লোকটা এখন স্বপ্ন দেখছে ফসলে ভরে আছে তার ক্ষেত, একটু পরে আমের ওপর ফিরে যাবার আগে চোখ তুলে তাকাল তার ষোল বছরের কাঁচৌ, মাটির তাজা গন্ধ আর রোদ...আসছে নবান্নের দিন: ঠোঁটের ওপর মাছি বসছে লোকটার, হাঁটুর কাছে ন্যাকড়া জড়ানো একটা দগদগে ঘা, মলয়ের ইচ্ছে হল ঘুম ভাঙিয়ে দেয় লোকটার, তারপর বলে তোমার ভালোর জন্য মাঠে ময়দানে বোমা আর গুলি নিয়ে দৌড়ে পড়েছে লোক, আর ভয় নেই। ততক্ষণ তুমি পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন আর লাল টিপ, নকশা আর মাছির সঙ্গে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখ : চারদিকে ধান আর ধান একেবারে গিজগিজ করছে আছে। হঠাৎ কনভয় লরি মলয়ের পাশ দিয়ে চলে যেতেই আবার হাঁটতে থাকল সে।

উজ্জ্বল দিন চলে গেল ক্রমশ, আকাশ যেন মোমের মত গলে গলে পড়ছে, আর একটু পরেই সে হয়তো দেখতে পাবে তুলসীতলায় প্রদীপ নামিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করছে মা, আর খুব নিচু গলায় বাবলাদি তাকে বলছে তুই নাকি পদ্য বানাস? মাসীমা বলছিল, খুব পাকা হয়েছ না? আন্দ্রেরোলে এবার গোল্লা খাবি, তখন বুঝবি মজা। এই রকম শরীর ভাসিয়ে হাসছে বাবলাদি এখন মনে হল, আকাশ না বাবলাদি কে মোমের মত গলে যাচ্ছিল তখন?

সামনেই ট্রাফিকের নীল লাল হয়ে গেল; বিরাট বাড়ি উঠছে একটা, গাছের গায়ে ঝুলছে হিন্দী সিনেমার প্রেম, ডানলপ টায়ারের বিজ্ঞাপন, নেসক্যাফে খেতে খেতে হাসছে একটি সুন্দরী মেয়ে, জীবনবীমার লাল হাত ছড়িয়ে আছে সমস্ত আকাশে, মিস ক্যালকাটা কনটেস্ট, ফ্যাশন বল, সব চাকির মত মলয়ের মাথার ভেতর ঘুরতে থাকল, সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল। আজ মনুমেন্টের নিচে কোনো মিটিং নেই? থাকলে হয়তো সে অমলকে খুঁজে বার করতো। অমল তাকে আদা-চা খাওয়াতো, তারপর বলতো, যাই বলিস, বিলকুল এবার পাল্টে যাবে, আমরাই পাল্টে দেব, শুধু তোদের নিয়ে আমাদের ভয়; দূর! অমল তো কবে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্ট করে; তবে? হাজার হাজার বেলুন ভাসিয়ে দেব নিজের নাম লিখে?

ময়দানের ভেতর আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে এগোতে থাকল মলয়।

বেহালার ট্রাম যাচ্ছে ময়দানের ওপর দিয়ে। এখন কুয়াশা জড়িয়ে যাচ্ছে ট্রামে, যেমন বিদেশী ল্যান্ডস্কেপ মনে হয়, অথবা একটু শীত পড়লে ময়দানের মানুষেরা কাঠ জড় করে আগুন জ্বালবে। অদ্ভুত! মাঝে মাঝে কলকাতার ভেতর থেকে নতুন আর এক কলকাতা যেন বেরিয়ে আসে; তখন মলয়ের মনে হয় কোনো বাসস্টপে হয়তো বাবলাদির সঙ্গে দেখা হবে। হয়তো পেছন থেকে ফুঁপিয়ে উঠবে দীপক। না, কিছুই ঘটবে না এখন। দীপক তো এখন আমেরিকায়। আবার রাস্তায় উঠে আসতেই মলয়ের মনে পড়ল, আরে, সিনেমার এক্সিবিশন চলছে না একাডেমিতে? কই সেকথা একবারও মনে ছিল না তার; যা হোক, তাহলে, মলয় ভেতরে ঢুকে পড়ল।

উজ্জ্বল আলো তীরের মতো চোখে ঢুকে যাচ্ছিল তার, সেগুলো গ্যালারিতে মাত্র দশ-বিশ জন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে; যেন তাদেরও আর কিছু করার নেই বলে এখানে ঢুকে পড়েছে; একটি অসম্ভব লম্বা বিদেশী মেয়ের সঙ্গে মলয়ের চোখাচোখি হল একবার কিন্তু এটা তো বিপ্লবের ছবির এক্সিবিশন নয়, কোন এক অশোক মৈত্রের ছবি ঝুলছে দেয়ালে। কী রকম দুর্বল বোধ করছিল মলয়, হাতের মুঠোয় আর কিছুই ধরে রাখতে পারছে না সে। একটা লাল রঙ ছড়ানো আছে ক্যানভাসে, যেন রক্তাক্ত মানচিত্র, টুকরো টুকরো করা হয়েছে অথচ মলয়ের ঠোঁট কাঁপছিল বোধহয়, বোধহয় কেউ তার

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই

হৃৎপিণ্ড ছিটিয়ে দিচ্ছে দেয়ালে...কোনো রকমে দেয়াল ধরে ফেলল মলয়।

বাইরে গাড়ি, খাবারদাবারের জটলা; এখনো যুবক-যুবতীরা গাছের আশ্রয় ছেড়ে ওঠে নি। আমি কী এখন ভেজা ঘাসের মধ্যে শুয়ে থাকবো? যদি সম্ভব হতো তবে সমস্ত রাত সে একটা ট্যাক্সিতে কলকাতায় ঘুরতো, দেখতে পেত কেমনভাবে মানুষ বেঁচে থাকে, সুখী হয়, দুঃখ পায়, কে জন্মায়, কে মরে যায়, কোথায় হাস্নাহেনিয়াসের শব্দে জীবন ফেনার মত ছিটিয়ে পড়ে, কে কার জন্য অপেক্ষা করে, আর তারপর ব্রাহ্ম-মুহূর্তে ধীরে ধীরে নেমে যেত গঙ্গায়... ভোরের নির্মল, পবিত্র আকাশ, আর স্বচ্ছ জলে এক সময় সবকিছু ধুয়ে ফেলতো সে। সিগারেট ফেলে দিয়ে মলয় রাস্তা ক্রস করল।

এখন তো অনিমেষের ইভনিং ডিউটি। ইচ্ছে করলেই ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে আসা যায়।

—অনিমেষ নেই? অনিমেষ দত্ত?

—না, দিন তিনেকের ছুটি নিয়েছেন নিঃ দত্ত। ইঁয়েহয়ে...

মলয় আর শেষটুকু শুনল না, সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল নিচে। একবার মলয় ভাবলো কোনো সিনেমায় ঢুকে বসে থাকে, কিন্তু শো তো অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে; এখন হয়তো নায়ক নিরুদ্দেশ আর নায়িকা বিছানায় বালিশ বুকে স্লিপারিং গান উড়িয়ে দিচ্ছে, অথবা বলা যায় না, একটা সুন্দর লেকে ইলেকট্রিক বোটে দুজনে মহানন্দে সুখে গান গাইছে, প্রজাপতি আর ফুলের আর শেষ নেই... দূরে কালো চশমা চোখে ভিলেন সিগার টানছে। মাথা ঝিমঝিম করছে তার, চোখের সামনে যেন কুয়াশার পর্দা দুলছে একটা, মলয় বুঝল অন্ধকারে রাতে হয়তো তার ঘুম আসবে না: হয়তো মাঝ রাতে কেউ তার নাম ধরে ডাকবে—মলয় শুনতে পাচ্ছিস?...

এখানেই সুকুমারদের সেই পত্রিকা, 'পৃথিবীর অফিস ছিল না? মলয় গলির ভেতর ঢুকে পড়ল।

—আচ্ছা, এখানে সুকুমার... মানে 'পৃথিবী' বলে একটা পত্রিকা বেরোত।

অল্প আলোয় নিষ্ঠুর চোখে বুড়ো লোকটা একবার দেখল মলয়কে। আর তখনই মলয়ের চোখে পড়ল ছোট একটা সাইন বোর্ড ঝুলে আছে—মহামায়া জ্যোতিষ কার্যালয়।

মলয় দাঁড়িয়ে রইল। তাহলে সুকুমার-দের কাগজ উঠে গেছে?

—কী দেখাবেন কুষ্ঠি?

—মলয় হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। এখন গেলে নিশ্চয়ই রবিদাকে পাওয়া যাবে। মলয় একটা কাজ পেয়ে বেঁচে গেল এবার।

সেই তিনতলার সিঁড়ি; মলয়ের সব দুঃখদ্বন্দ্ব, মনের সেই ছোট ঘরটার জীবনের একার সংসার। বাইরে থেকে চোখে পড়ল একতলা দোতলার সব জানালা বন্ধ। শুধু তিনতলার সামান্য আলো বাইরে এসে অন্ধকারকে দু টুকরো করে দিচ্ছে। অত দূরের আলোয় সিঁড়িটা ঠিক রহস্য গল্পের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়: দেয়াল কী ঠান্ডা! জোরে কড়া নাড়ল মলয়।

—কোনো শব্দ নেই, অথচ বোঝা যায় ভেতরে লোক আছে।

—কে আপনি?

পাজামা পরা একটা লোক বেরিয়ে এল।

—রবিদা নেই? মানে, এখানে থাকতেন, রবি রায়?

—আসুন তো ভেতরে।

ভেতরে যেতেই হঠাৎ কিছু বোঝার আগেই একজন মলয়ের জামা চেপে ধরল:

—শালা, টিকটিকির বাচ্চা! নতুন খেল দেখাচ্ছ? একটা উটকো নাম বলে এতদূর ধাওয়া করেছ?

—শালার কারেজ আছে মাইরি?

—কী কানু, দেবো মামাকে ফাঁসিয়ে?

—ঝামেলা বাড়াস না; ভাগিয়ে দে, আর ওয়াচ কর, লোকটার সঙ্গে বাইরে আর কেউ আছে কী না।

দুজন হাত চেপে তাকে রাস্তায় নিয়ে ছেড়ে দিল।

—ফের চালাকি করতে এলে শালা জান খিঁচে নেব একেবারে। ভাগ শালা! মলয়ের গা ঘেঁসে কে যেন থুথু ফেলল।

মলয়ের ঠোঁট শুকিয়ে আসছিল। অনেকক্ষণ ধরে যেন প্রাণপণে জলের ওপর হাত ভাসিয়ে রেখেছে সে। যেন ডুবে যাবার আগে সে শেষ বারের মত দেখে নিতে চাইছিল স্বাভাবিক পৃথিবীর আলো, শব্দ, মানুষ। শুনতে চাইছিল কোনো কণ্ঠস্বর, কখনো কখনো যে কণ্ঠস্বর শুনে তার আজকাল মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় তখন একটার পর একটা দমকল ছুটে যাচ্ছে তার মাথার ভেতর দিয়ে: অন্ধকারে দেয়ালগুলো দুলতে থাকে, আকাশ নেমে আসে জানলায়, আর অনেক দূরে, মানে যেখানে মলয় কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না, সেখানে ঠিক ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলোর মত জ্বলতে থাকে তীব্র একটা আলো: মলয় ভয় পায়, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে যায় তখন, মনিব্যাগের পেট ফুলে ওঠে হাওয়ায়, আর সেই হাওয়ায় ঠোঁট ক্রমশ শুকিয়ে আসতে থাকে তার।

না, এ-সব ভাল নয়, মলয় জোর ফিরে পেতে চেষ্টা করছিল। সিগারেটের ধোঁয়া গলায় লাগতেই মলয় বুঝতে পারল সে খুব স্বাভাবিকভাবে বেঁচে আছে। চোখের সামনে দোকানের আলো, সুখী মানুষের মিছিল, দেয়ালে দেয়ালে মানুষের মুক্তির শপথ, হকারদের গোলমাল, বাসের জানলায় একটি সদ্য কিশোরীর নরম দৃষ্টি, রেডিওতে বোধহয় কেউ অতুলপ্রসাদের গান গাইছে। এইসব স্বাভাবিক দৃশ্য, ঘটনা, অভ্যাস, এখন তার কাছে, মিশে যাচ্ছে, আর তখনই মলয় টের পেল সে অসিতদার চেম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এখন কী অসিতদা খুব ব্যস্ত আছে? মলয় ভেতরে ঢুকবে কী না ভাবছিল। অথচ অসিতদাই তাকে একদিন সময় করে আসতে বলেছিল।

—একদিন তোকে ভাল করে দেখতে হবে, না, না। যা বললি, এ-সব ইগনোর করা ভাল নয়। তারপর অসিতদা ওর চোখ, আঙুল, পায়ের চামড়া, জিভ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল।

—ঠিক আছে, তোর ব্লাডটা দেখা দরকার একবার।

মলয় মনে করতে পারল, অসিতদার চোয়াল ঝুলে পড়ছিল তখন; পেন্সিল, দেশলাই কাঠি, পালক, সবকিছু দিয়ে তার সেনসেশান পরীক্ষা করছিল অসিতদা।

—টের পাচ্ছিস?

—পাচ্ছি।

ঠেলা দরজাটা এখন ঠেলতেই ভেতর থেকে গলা শুনতে পেল মলয়;

—কাকে চান?

—অসিতদা নেই?

হলুদ আলোয় লোকটার চোখ কী রকম ঘোলাটে লাগছে এখন।

—অসিতদা, আই মীন ডঃ গুহ নেই?

—না, উনি একটা আর্জেন্ট কেস দেখতে মধ্যমগ্রাম গেছেন।

—এখানে আর ফিরবেন না আজ?

—জানি না, তবে তেমন জরুরি থাকলে আপনি ওয়েট করতে পারেন।

মলয় আবার দরজাটায় হাত রাখল। ক্যালেন্ডারের ছবিতে একটি পাহাড়ি মেয়ের কোলে সুন্দর একটি ছেলে এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর টেলি-ফোনটা বেজে উঠতেই মলয়ের ইচ্ছে হল, অসিতদাকে চিৎকার করে বলে: সেদিন ভুল বলেছিলাম অসিতদা; আমি ক্রমশ সব স্পর্শ হারিয়ে ফেলছি, সব শব্দ আমার মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যায়, সব দৃশ্য একাকার হয়ে নাচতে থাকে চোখের ওপর!... কেন স্বপ্নে আমি দেখতে পাই চারপাশে অসংখ্য ঘোরানো সিঁড়ি, কে মাঝে মাঝে যেন পাতাল থেকে আমায় ডেকে ওঠে: মলয়, শুনতে পাচ্ছিস?...

মলয়কে দেখেই প্রণব ছোট করে হাসল।

—কী রে হঠাৎ যে।

—এমনি, অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছি; হঠাৎ তোর কথা মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সব পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে বসে দারুণ আড্ডা জমাতে ইচ্ছে করে, মলয় একেবারে সাংসারিক হয়ে উঠল।

—তা যা বলেছিস, প্রণব যেন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না:

—আরে আপনি?... দারুণ স্মার্ট হাসিতে সীমা দাঁত দেখিয়ে হাসল।

—চলে এলাম; কেমন আছেন?

—ভাল, খুব ভাল...

—আপনার সব খবর...

মলয় দেখল সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে যেন আগুন জ্বলছে সীমার।

—তোরা কোথাও বেরোচ্ছিস?

—আর বলিস কেন! সিনেমায় যাচ্ছি, নাইট শোতে; আজকাল তো ছুটি-ফুটির দিন টিকিট পাওয়া প্রবলেম।

—আপনিও চলুন না; সীমা ব্যাগ হাতে তুলে কথা শেষ করল।

—তুই এমন দিনে এলি, একটু আড্ডা মারা গেল না, প্রণব যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে তার কাছে।

—চলুন ট্যাক্সি তো নিতেই হবে, দেরি হয়ে গেছে; আপনাকে কিছুটা লিফ্‌ট দেওয়া যাবে।

মলয় সীমার নিঃশ্বাস টের পাচ্ছিল, চোখে পড়ল কী দ্রুতভাবে ওর বুক ওঠানামা করছে এখন, চিবুকের নিচে হালকা প্রসাধনের দাগ একবার ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করল মলয়ের।

—ঠিক আছে, তোদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি বরং আর একদিন আসবো। মলয়ও সীমাকে হাসি ফিরিয়ে দিল।

সীমার শরীরে আগুন ,যেন এখন মলয়ের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে টানছিল। টের পেল কপালে শীতের হাওয়াতেও ঘাম জমেছে তার। হাত তুলে কী যেন ধরার চেষ্টা করল একবার। এখনো একবার যদি মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়! যদি শরীরের কোমলতার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে মলয় আশ্রয় চায়। আর তখনই তলপেটে চিনচিন ব্যথা টের পেল মলয়।

কলিং বেল বাজাতেই থাকল মলয়।

—কোত্থেকে আসছেন?

—আমার নাম মলয়, শুভ্রাকে বলুন, মলয়ের খুব জরুরি দরকার, এখুনি বাইরে আসতে! মলয়ের সব শক্তি কথায় খরচ হয়ে যাচ্ছিল।

বারান্দার আলোর টুকরো এসে পড়েছে মলয়ের শরীরে। ভদ্রলোক চশমা খুলে এক-বার জরিপ করলেন মলয়কে।

—শুভ্রা তো বাড়ি নেই;

—কোথায়?

—হাসপাতালে।

—হাসপাতালে?

—হ্যাঁ, শুভ্রা অসুস্থ; মানে, ভদ্রলোক সংকোচ বোধ করছিলেন;

—কী হয়েছে শুভ্রার?

—শুভ্রার বাচ্চাকাচ্চা হবে—

—ইস্! মলয় প্রায় ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরতে চাইছিল।

—আপনি কে?

—শুভ্রা আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী;

পানের দোকানের 'বিবিধভারতী'র দারুণ গান মলয়ের সমস্ত শরীরে এখন বৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ছিল। মলয় নিজেকে লাথি মারবার কথা ভাবছিল; গাছের আড়ালে আকাশ ঝকঝক অন্যদিনের মত: এখন কী কেউ অন্য গ্রহে ঘুরে বেড়াচ্ছে?...

আমি কী ভেবে শুভ্রার কাছে এসে-ছিলাম? কী আশা করেছিলাম? সেই সেকেলে গল্পের কায়দায়, শুভ্রা হয় এখন ফুটফুটে বিধবা, না হয় মদ্যপ, লম্পট স্বামীর দুঃখী অথচ সতী বৌ; আর সে শালা এক ক্যাবলা প্রেমিক, যাকে চিরদিন 'পরপুরুষ'—এই রকম একটা বিটকেল দূরত্বে রেখে শুভ্রা দারুণ সেবা করে যাবে আর কৌটোয় জমিয়ে রাখবে পরকাল আর চোখের জল!...দারুণ!...তার বদলে শুভ্রা এখন কৌবনের নরম বিছানায় নীল আলোতে একজন ভদ্রলোককে সন্তান প্রেজেন্ট করার সুখে ছটফট করছে, আর শুভ্রার স্বামী বাইরের বারান্দায় বসে হয়তো মশার কামড় খাচ্ছে। মলয় শিস দিয়ে উঠল। মলয় তাকাল চারপাশে, সত্যিই কী কুয়াশা ছড়িয়ে আছে না বৃষ্টি পড়ছে?...

বৃষ্টিতে কলকাতা ডুবেছিল সেদিন। মলয় পরিষ্কার দেখতে পেল: জানলার ওপর বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে যাওয়া দেখছে শুভ্রা; ঘরে আলো জ্বলছিল। মলয়ের নিজের মনে হচ্ছিল এতক্ষণ সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে এইমাত্র জেগে উঠেছে।

—তোমার কোনো ভয় নেই, মা, বাবা কৃষ্ণনগরে মামার ওখানে গেছেন; অপু উপুও গেছে ওখানে, আর দাদার ফিরতে তো রাত এগারোটা...

—না ভয় নয়, কী রকম গলা বসে গিয়েছিল মলয়ের। বৃষ্টির শব্দ যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছিল তার অস্তিত্বকে, শুভ্রার শরীরের টানে তার মাথা ঝিমঝিম করছিল, মোমের মত হাতের দিকে আর তাকাতেও পারছিল না সে।

—তুমি অসম্ভব সেন্টিমেন্টাল! এই তো ভাল, আমরা দুজনেই কমিটেড হয়ে থাকলাম, শুভ্রার সাদা হাসি জড়িয়ে ধরছিল তাকে। ঘড়ির শব্দ বুকের ভেতর বাজছিল: টিক, টিক, টিক...

এখন তুমি জানলা দিয়ে আকাশ দেখছ শুভ্রা? আই উইশ, তুমি সেফ্‌লি মা হয়ে যাও...

ফুটপাথের সংসারে একটা দারুণ গোলমাল সুরু হয়েছে। এখন আর ট্রামের ফুটবোর্ডে লোক দাঁড়িয়ে নেই। শীত উঠে আসছে সমস্ত রোমকূপে, কেউ যদি এখন তার গায়ে একটা চাদর টেনে দিত! কে যেন তার ভেতর থেকে চাইছিল—এখন এখানে কিছু ঘটুক, বোমা ফাটুক দারুণ শব্দে, অথবা চলে যাক একটা দারুণ জন্মকালো শোভাযাত্রা, অথচ মলয় জানে, হবে না কিছুই...শুভ্রা তুমিও কী কোথাও জল পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছ?...

সাদার্ন এভিনিউ কুয়াশা জড়িয়ে এখন নির্জনতায় ডুবে যাচ্ছে। মিল্ক বুথের কাছে রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। এইমাত্র নার্সিং হোমের বাইরের আলোটা নিভে গেল। মলয় ভাবল যদি একটা ছোড়া পাওয়া যেত! যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা যেত আপনি কী আমাকে খুঁজছেন?

একটা বাস আসতেই মলয় এগিয়ে গেল। যাবে না, যাবে না, এটা গ্যারেজে যাচ্ছে; যেন অসংখ্য হাত তাকে ঠেলে দিল বাইরে। রিকশার নিচের কালিপড়া আলোটা দেখে হঠাৎ মলয় বুঝতে পারছিল না এখন সে কোন ঠিকানায় ফিরে যাবে।

ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক নূতন অধ্যায়

নরনারীর যৌন চরিত্রে রাশি লগ্নের প্রভাব ও যোটক বিচার

জানুন পড়ুন ও বিবাহিত জীবন সুখী করুন।

প্রখ্যাত আবিষ্কারক জ্যোতির্বিদ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর গবেষণালব্ধ অভিনব এই পুস্তক (অষ্টাদশ মহাপুরাণের আলোচনাসহ মুখবন্ধ)। মূল্য—১২ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশক
জ্যোতিষ বার্তালয়
১।২এ, নীলাম্বর মুখার্জী স্ট্রীট
(ফড়িয়াপুকুর), কলিকাতা-৪

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২
রঘুনাথ লাইব্রেরী
১১৫।১এ, বিধান সরণী, কলি-৬

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের উপাদান

অমরজিৎ চক্রবর্তী

ধর্মমূলক সঙ্গীতগুলি উত্তর বাংলার লোকসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য দিক—লোকসাহিত্যের মূল্যবান উপাদান। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ভজন-সাধন, পূজন নানা প্রকারের দেবদেবীকে নিয়ে। এই সমস্ত দেবদেবীর আরাধনায় যেমন আছে মন্ত্রের স্থান তেমনি সঙ্গীতের। অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীতই পূজোর প্রধান অর্ঘ্য এবং একমাত্র অঞ্জলি।

রাজবংশীরা ধর্মপ্রাণ জাতি। বাসন্তী, লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, সত্যনারায়ণ, শনি ও জগদ্ধাত্রী পূজো বিত্তশালী গৃহস্থদের বাড়ীতে হয়। এছাড়া আরও অনেকের পূজো এদের ভেতরে প্রচলিত। যেমন—যকা (যক্ষদেব—কুবের), মাসান (বরুণ—জলদেবতা), ভাণ্ডরা, শীতলা, বিষহরি, মদনকাম (কুচবিহার শহরে এর মন্দির আছে), বলরাম, কৃষ্ণ, নিমাই (রাস পূর্ণিমায় এর পূজো হয়), গঙ্গা (দশহরার বারুণীতে এর পূজো হয়), মহাদেব (জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর, কুচবিহারের বাণেশ্বর এবং রংপুরের (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান) সিংগারডাবরী এবং ছিনাইতে শিবের মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য), সাইটল (ষষ্ঠী), কার্তিক, চড়ক, চণ্ডী, বিশকরম (বিশ্বকর্মা), সোনারায় (পৌষ সংক্রান্তিতে এর পূজো হয়), সুবচনী (শনি পূজো), হুদুমদেও (বৃষ্টির দেবতা)। সাইটল এবং হুদুমদেও পূজো মহিলারা করেন। এই দুটি পূজোর সময় মহিলারা নৃত্যগীত করেন।

এসব ছাড়াও অনেক পূজো ও পার্বন এবং ব্রত এদের ভেতরে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বাঁশপূজো, গোপূজো, হাঁসপূজো, জগন্নাথের পূজো, দোলপূজো, নবান্ন, বাঁতদান। তাছাড়া আছে শান্তিস্বস্ত্যয়ন, নামযজ্ঞ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা ও উৎসর্গ, কূপ প্রতিষ্ঠা এবং উৎসর্গ, জগন্নাথের আইটকা, হরিমন্দির, কালমন্দির এবং বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা। অপুত্রক ধনী গৃহস্থ বট-পাকুড়ের বিয়ে দেন। কদম গাছে মিত্রের কাজ করে। বিজয়া দশমীর দিন হাল-হাতিয়ার ইত্যাদির পূজো করা হয়। কুমোর চাকের, ঢাকী ঢাকের পূজো করেন। আশ্বিনের সংক্রান্তি থেকে কার্তিকের সংক্রান্তি পর্যন্ত আকাশপ্রদীপ দেওয়া হয়। আশ্বিনের সংক্রান্তি 'ভোগ দেওয়া সংক্রান্তি'। ঐ দিন চাষীরা ক্ষেতে-ক্ষেতে গিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন—

'সগারে ধান আউলা ঝাউলা
আমার ধান সুদায় চাউলা।'

(সকলের ধান এলোমেলো, আমার ধানে কেবল চাল)।

উত্তরবাংলার পল্লীতে যতগুলি ধর্মমূলক গান প্রচলিত তাদের ভেতরে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গোরক্ষনাথের গানের (চাপড়ি নাম গান) একটা আলাদা স্থান আছে। একটি গান এখানকার মানুষের সব চাইতে প্রিয়। তার কয়েকটি লাইন :—

'দিনের শোভা সুরুয রে—
রাইতের শোভা চান্দ,
চাষার শোভা হাল গরু—
জমিনের শোভা ধান।'

অর্থাৎ—দিনের শোভা সূর্য, রাতের শোভা চাঁদ। চাষার শোভা হাল গরু, জমিনের শোভা ধান। গরু সত্যিই এখানকার কৃষিজীবীদের শোভা। কৃষিকর্মে গাড়ী টানায় গরু এখানকার অর্থনৈতিক জীবনে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাই গরুর সেবা-যত্নের প্রতি এদের সতর্ক দৃষ্টি। গরুর উন্নত স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন এদের কাম্য। দীপান্বিতার পরের দিন গরুকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া হয়। গুলঞ্চ এবং যোগ্য টেমুনের সাথে যার শস্য (সরষে, ধান, গম ইত্যাদি) খাওয়ানো হয়। মুসলমানকে দিয়ে লোহা পুড়িয়ে গরুকে দাগানো হয়। এটাকেই ওরা বলেন 'দাগা অমাবস্যা'। দাগ দিলে, এদের ধারণা, গরুর কোন ব্যাধি হয় না। পৌষ সংক্রান্তির দিন হাল নেই। গাড়ী টানা বন্ধ। গরুকে আতপ চালের গুঁড়োর আলপনা কলার গাছের 'ভেন্দুরা' দিয়ে কপালে এবং সর্বাঙ্গে ফোঁটা দেওয়া হয়। গলায় সযত্নে ফুলের মালা দিয়ে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী 'খাপড়া' পিঠে খাওয়ানো হয়। তাছাড়া, দোল পূর্ণিমায়, দাগা অমাবস্যা, অম্বুবাচী, বাঁশপূজো, মহাঅষ্টমীর দিন হাল বন্ধ। এদের হিসেব মত বারমাসে বিভিন্ন উপলক্ষে তের দিন হাল মাঠে যায় না।

গরু এদের কাছে পূজ্য। তাই এরা গোরক্ষনাথের পূজো করে। পূজো হয় সন্ধ্যায়, গরুকে ঘরে রাখার পর দরজা বন্ধ করে। পূজো করেন গৃহস্থ কৃষক। বামন কিম্বা বৈরাগীকে পূজো করার জন্য ডাকা হয় না। কলার 'থাইত' দিয়ে তার উপর ফুল-বেলপাতা ছড়িয়ে হাততালি দিয়ে গান গাওয়া হয়। করতালি দিয়ে গান করা হয় বলে এর অপর নাম 'চাপড়ি নাম'। গানের নমুনা :—

হাই চালো, হাই চালো,
হাই চালো রে ধওলা বলদ,
তোর প্রসাদে ধান ঘরোত্ ।
হাই চালো হাই চালো
হাই চালো রে রাঙা বলদ,
তোর প্রসাদে ধান ঘরোত্
হাই চালো হাই চালো
হাই চালো রে কালা বলদ,
তোর প্রসাদে ধান ঘরোত্।
হাই চালো হাই চালো
হাই চালো রে পাকড়া বলদ,
তোর প্রসাদে ধান ঘরোত্।

হাই চালো হাই চালো
হাই চালো রে আনামালা,
হাই চালো রে ফুলবেলা।
হাই চালো হাই চালো
হাই চালো রে রাঙা গাই,
তুই হাই চালে পান ফুল পাই।

হাই চালো হাই চালো
হাই চালো রে ধওলী গাই,
তুই হাইচালে পানফুল পাই।

হাই চালো হাই চালো
হাই চালো রে কালটী গাই,
তুই হাই চালে পানফুল পাই।

হাই চালো হাই চালো
হাই চালো রে মাটিয়া গাই,
তুই হাই চালে পানফুল পাই।

হাই চালো রে পাকড়ী গাই,
তুই হাই চালে পানফুল পাই।

হাই চালো হাই চালো
হাই চালো রে কাপলী গাই,
তুই হাই চালে পানফুল পাই।

হাইচাওরে হাইচাওরে—
হাইচাওরে দামড়া বলদ,
তোর কপালে ধান মরত্।
হাইচাওরে কালা গাই,
তোর কপালে দুধ-ভাত খাই।
হাচলে হাচলে খই ছিটাই—
ঝোকে ঝোকে কলা ছিটাই—
আরো কদলীর কল ছিটাই—
ঘরের পাচিলা আমরি,
গোয়াইল ভরা হউক দামরী।
ঘরের পাচিলা আমরা,
গোয়াইল ভরা হউক দামরী।
চালত্ হইল কুমড়া,
গরু হইল ধুমড়া।

বাঁশ পুজোর গান উত্তরবাংলার লোক-সাহিত্যের আর একটি মূল্যবান সম্পদ। বাঁশ পুজো হয় চৈত্রমাসে—মদন ত্রয়োদশীর দিন। ঐ দিন কামদেবের ধ্বজা তোলা হয়—শুরু হয় পুজো। পরের দিন অর্থাৎ চতুর্দশীর দিন মদনভঞ্জী। ঐ দিন বাঁশের কাপড় খোলা হয়। এই পুজোর সময় যে গান গাওয়া হয় সেটাই বাঁশ পুজোর গান নামে প্রসিদ্ধ। ঐ গানের দলে থাকে একজন মূল, একজন পাইল ও একজন বাইন। মূলের হাতে চামর থাকে। গানের বিভিন্ন ভাগ আছে—'বাঁশ সিজ্জন', 'নাড়সজা' ইত্যাদি। গানের মাঝে খোসা দেওয়া হয়। যেমন :—

ও মোর ভাল্ খেদু রে—
দুমুরা ধানের নাড়ু,
বর নিয়া যা মদনকাম—
আরো পাবু নাড়ু।

অথবা—

সইরষা শাকোত্ পোকা—
মুই মরং খাজনার জ্বালায়,
মাইয়ায় চায় শাকা।

(অর্থ : সরষে শাকে পোকা, আমি মরি খাজনার জ্বালায়, বউ চায় শাঁখা)।

এই গানের একটি ভাগ ('বাঁশ সিজ্জন) নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :—

শিবের সেবা করে মালাগিরি
ভিক্ষা বস্ত্র লইয়া,
কতেক দিন থাকিয়া শিবের
হয়্যা গেল দয়া।

তোক বলং মালির ছাইলা
মালা গিরিবর,
কি কারণে করিস সেবা স্বরূপ করিয়া বল।
শুনেশুন মহাদেব আমার উত্তর—
বাশের পুলি দেও বাশ সিজ্জন করিবার।

তোক বলং মালির ছেইলা মালা গিরিবর,
মোর সেবা ছাড়িয়া
তুই দরিয়ার সেবা কর।
দরিয়ার ঘাটে সেবা করে এ বার বছর—
কতক দিন থাকিতে দরিয়ার
হয়্যা গেল দয়া।
তোক বলং রে মালির ছেইলা
মালা গিরিবর,
কি কারণে করিস সেবা কহ সত্বর।
শুন শুন প্রভু আমার উত্তর—
বাশের পুলি দেও বাশ সিজ্জন করিবার।
এত বলি দরিয়ার হয়্যা গেল দয়া।
মধ্যো মধ্যো নদীর দিল বালুচর।
ইরু বাশ, চিরু বাশ, করনজা, মাকলা,
তারপরে ভাসিয়া উঠিল
বড় বাশের চাকলা।
বাশ পাইয়া মালা গিরির হরষিত মন—
সত্বরে চলিয়া গেল আপন ভুবন,
পূর্ব-পশ্চিমে বাশোক্ করিল রোপন।
মায়ের সাক্ষাতে যায়া কি বলে বচন—
তোক বলং মালির ছেইলা
মালা গিরিবর,
বাশ সিজান করলু
এলা ঘট সিজ্জন কর।

●

লোকসাহিত্যের আর একটি অমূল্য উপকরণ এদের সোনারায়ের গানগুলিতে পাওয়া যায়। সোনারায় ঠাকুরের পুজো পৌষ সংক্রান্তিতে হয়। ব্রাহ্মণ পুজো করেন। ঠাকুরের বাহন হচ্ছে বাঘ, মূর্তি গৌরবর্ণ। এই পুজোর সময় গানের দল আসে। দলে দুইজন বাইন, দুইজন পাইল, দুইজন বাঁশিয়াল, একজন মূল এবং চারজন ছোকরা থাকে। গানের বিভিন্ন ভাগ আছে সোনারায়ের জন্ম, বাঘ সাজা ইত্যাদি। একটি নমুনা—সোনারায়ের জন্ম—নীচে দেওয়া হল :—

ধর্ম ধর্ম বলং প্রভু ধর্ম নিরাকার
কোন দেবে সিজ্জিলে প্রভু
শরন সংসার।

গোসাই পাতিল হাট মথুরা নগর,
তাহাতে বসতি হইল গোয়াল আশি ঘর।
আশিঘর গোয়ালের নারী দধি
সারি সারি,
দধির পসার লইয়া বইসে
কৌশল্যা সুন্দরী।

আটকুড়া বলিয়া দধি কাগায় নাই খায়,
দধির পসার মাথে লইয়া গলি গলি যায়।
দধির প্রসাদ কৌশল্যারাণী
মথুরায় কান্দিয়া,
কান্দিতে কান্দিতে যায় বাসর বলিয়া।
রজনী প্রভাত হইল প্রফুল্ল বিহান,
প্রভাত সময়ে কন্যা দিল ছাড়াছান।
খৈলা অমূল্য নিল কন্যা হস্ততে করিয়া,
যমুনার ঘাট বুলি যায় আর চলিয়া।
হাটুপানি নামিয়া কন্যা
হাটু করলে সুদ,
কমর পানীত নামি কন্যা
কমর করলে সুদ।
এক অর্ধ মাতার কেশ
দুই অর্ধ করিয়া,
খইলা অমূল্য দিল কন্যা মস্তকে ঢালিয়া।
মাথা গাও ঘসিয়া কন্যা হরষিত মন,
হিয়া পানিত নামিয়া কন্যা
করলেক ছান।
কুঘাটে নামিয়া কন্যা সুঘাটে উঠিল,
ভিজা বস্ত্র ফেলেয়া শুকোন পইরাইল।
সুবর্ণের কাটারি হস্তেতে করিয়া,
অখন্ড কলার নেউচ আনিলে কাটিয়া।
পূর্বমুখে ওচায় নেউচ ধরম দুলিয়া।
বর দে ধর্ম গোসাই বর দে আমারে,
নইলে স্ত্রীহত্যা হব কাটারির উপরে।
এত বলি ধর্ম গোসাই কাপে থরথর,
যা যা গোয়ালের নারী
তোমায় দিলাম বর।
আমার বরে পুত্র হবে
ঠাকুর সোনা রায়,
জগতে তোমার নাম যথায় তথায় রয়।।

●

কীর্তনেও এরা পিছিয়ে নেই। এখানকার কীর্তনে যেমন আছে হরিসংকীর্তন ও রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তন, তেমনি আছে গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ গৌরকীর্তন। এছাড়া আছে গুরু বন্দনা গান। উদাহরণ—

হরিসংকীর্তন—

গৌরাঙ্গ গোবিন্দ হরি আমায় ছেড় না,
ভব পারে এই মিনতি আমায় ছেড় না,
ঐ চরণে বাঞ্ছা করি—
মম আশা পুরাও হরি,
ভব পারে এই মিনতি আমায় ছেড় না।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন—

ভবে জন্ম পাইয়াছি ভালই গো
করণ তো হইল না,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে
একদিন তোরে ডাকিলাম না।
নিতাই চাঁদের হাট—
রাধার নামে ঘেরা ঘাট—
সবাই করে বেচাকিনি—
আনন্দবাজারে, গোবিন্দনগরে—
সে হাটে আমার যেতে হল মানা গো,
করণ তো হইল না।

গৌরকীর্তন—

গৌর বলে যাব চলে গৃহে রব না—
নবঘন নামের মালা
কোলা ছাড়া করব না।

যে না দেশে গৌর পাব,
সেই না দেশে চলে যাবো,
বলে বলবে লোকে মন্দ—
কারো নিষেধ মানবো না,
আমি গৃহে রব না।

গুরুবন্দনা গান...

গুরু বলে চলে যাব গৃহে রব না,
গুরু নামের তরীখানি
বাইতে পারিলাম না,
তবে আমার সাধন হইল না।
ভাইসা যাওয়া সার হইল—
গুরুর পদ পুজো হইল না।

উদ্ধৃত কীর্তনগুলির একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে যে, এগুলির পদাবলিতে এই অঞ্চলের ভাষার প্রভাব খুব একটা নেই। এর মূলে রয়েছে কীর্তনের সার্বজনীন আবেদন — যা আঞ্চলিকতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে উত্তরের গ্রামবাংলায় কালীকীর্তনের অভাব। অথচ গ্রামের পথে-প্রান্তরে প্রচুর কালী-

CENTRAL LIBRARY

মন্দির (এদের ভাষায় কালীর পাট) রয়েছে উত্তরবাংলায়।

উপরের আলোচিত কীর্তনগুলি ছাড়া আরও কয়েক শ্রেণীর গান পাওয়া যায়। এগুলিকে কীর্তন বলা ঠিক নয়। আবার ভাওয়াইয়া বা চটকা গানের মত তরল গানও নয়। অথচ 'দেহতত্ত্ব', 'মনঃশিক্ষা' দিন-দুপুরের গানগুলি যেমন লোকসাহিত্যকে কৌলিন্য দিয়েছে তেমনি এর আধ্যাত্মিক সুর লোকসংগীতের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

দেহতত্ত্ব—

ওরে মানুষের দেহা
এ জীবনের নাই আশা,
নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে—
জল যাই মন গুরুর কাছে,
গুরু নিলে মহানন্দ
এ ভব কাটিতে পায়।
পদ্মপাতার জল যেমন টলমল করে—
ঐ মতন মানুষের দেহা
কখন টৈলা পড়ে।
গৃহস্থ ছাড়িয়া গেইলে ভিটা হয় শূন্যা—
কেউ বা খসায় চালের খাম
কেউ বা খসায় খুঁটা।
ধান কাটে ধানুয়া ভাই,
ছাড়িয়া কাটে নারা
ঐ মতন মানুষের দেহা
পবন গেইলে মরা।

(ব্যাখ্যা :—মানুষের জীবনের আশা নেই। নিশ্বাসের বিশ্বাস নেই। তাই গুরুকে স্মরণ করেই মুক্তিলাভ করা সম্ভব। পদ্মপাতার জল যেমন টলমল করে, মানুষের জীবনও সেইরূপ — যে কোন মুহূর্তে জীবনদীপ নিভে যেতে পারে। গৃহস্থ বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে ভিটে শূন্য হয়—তখন কেউ চালের খড় কেউ বাঁশের কাঠাম খুলে নেয়। চাষী ধান কাটে নাড়া ছেড়ে দিয়ে, তেমনি নিশ্বাস গেলে মানুষের জীবন শেষ।)

মনঃশিক্ষা—

দুনিয়ার আশা, ভালবাসা
কার বা কয়দিন রবে
মেলে সঙ্গে কেউ যাবে না।
যে মুখে খাইয়াছো যাদুরে
দধি দুগ্ধ ননী—
মেলে পরে তোর মুখে
দিবে জলন্ত আগুনি।
ভাই বল যাদুরে, বন্ধু বল যাদুরে
সম্পত্তির ভাগী
আগে ভাবিবে ভাল ছুটা মন,
পরে কান্দিবে পাছ।

(টিকা : শেষের লাইন দুটির অর্থ— ভাই-ই বল আর বন্ধুই বল, সবাই সম্পত্তির দাবীদার। আগে ভালাভাগ, তারপর সৎকার।)

নিমন্ত্রণের গান—

নদীয়াতে এল একজন নবীন স্বর্ণকার—
তামা, কাঁসা, রূপো, পিতল
সোনার করিতে জানবার।
দরশনেতে পাষাণ গলে—
লোহা হয় সে সোনার মত পরশ করিলে।

• • •

শহুৎ বলে এই কারখানা,
নদীয়া শান্তিপুরে ভীড় তো কমে না,
যার হবার তার হয়্যা গেল—
আমার আইসা যাওয়া হইল সার।
নবীন স্বর্ণকার।।

বিভিন্ন পুজো এবং উৎসবে কীর্তনের দল আসে প্রথম ভাদ্রের (শ্রাদ্ধ) দিন, মৃত্যুর দিন, অষ্টপ্রহরে, হরিপুজোয়, জগন্নাথের ভাণ্ডারায়, হরিসভায়, জন্মবারে, হরিলুটের সময়। মোহান্তরা কীর্তন করে ভিক্ষা নেন সারিন্দা, খমক বাজিয়ে। খোল, করতাল, খমক কীর্তনীয়ারা ব্যবহার করেন।

(২)

উত্তরবংগের ভাওয়াইয়া ও চটকা গান-গুলির অধিকাংশই নারীদের নিয়ে এবং নারীদের জন্য রচিত হয়েছে। নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা, প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা, বিরহবেদনার সরব ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গী কিম্বা সোয়ামী পাবার জন্য অস্থির-চিত্ততা, অসুখী বিবাহিত জীবন, বিবাহোত্তর প্রণয়-প্রার্থনা এবং অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা ও সম্ভোগলিপ্সা—এই সমস্ত বিভিন্ন চিন্তা এবং চেতনা, দুঃখ এবং বেদনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে, গানের কথায়। অবশ্য 'ওকি বাপরে বাপ, মাও রে মাও, না পাও মুই কামাই কান্দিবার; ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে', 'দিনের শোবা সুরুষ রে রাইতের শোবা চান্দ', 'ঢ্যাং মাছে বলে মারি ভাই আমাকে না মারিও' ধরনের গানগুলিও কম নয়। কিন্তু তুলনায় নারীদের কামনা-বাসনা-স্পন্দ আলোড়িত জীবনের প্রতিচ্ছবি এই গানগুলিতে যত ব্যাপক, অন্যান্য বিষয়ের উপর গানের সংখ্যা তত বিস্তর নয়।

নারীমনের কথা নারীদের হলেও গান-গুলি রচনা কিন্তু ওরা করেন নি বলে মনে হয়। গানগুলির রচয়িতা পুরুষ বন্ধুরাই, ফলে অনুভূতির প্রকাশ সর্বত্র সুস্থ হয় নি। গানগুলির লিপিতে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য এবং চিন্তাগত নতুনত্ব থাকলেও শব্দবিন্যাস এবং অলংকার প্রয়োগ পরিকল্পনায় অনেক ত্রুটি আছে। ছন্দে বাঁধা পদেরও কোন কোন ক্ষেত্রে অভাব দেখা যায়। এ সমস্ত অপটুত্ব স্বীকার করলেও, লোকসাহিত্যের সম্পদ হিসেবে এগুলির মূল্য ও মৌলিকতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

যুবতীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পল্লীর কবি উচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

যেমন :—

নাইরের আগাল হলপল হলপল করে—
সেইমতে নারীর যৌবন দিনে দিনে বাড়ে।

বাড়ন্ত লাউয়ের ডগার মতো বাড়ন্ত যৌবনবেলার তুলনাটির পল্লী পরিবেশের সঙ্গে মিল আছে। এখানে ভাব প্রকাশের দৈন্য থাকলেও উপমাটি নিঃসন্দেহে বাস্তব।

এমনি আরও একটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে উপমার অবতারণার ভেতরে চিন্তার সীমাবদ্ধতা থাকলেও এদের মানস-গঠনের বিচারে সুন্দর বলে মনে হবে। গানটির কথাগুলি এমন :—

ছেরির ডাইন গালে হইল কালা দাগ,
হাটে যেমন ডিমপাড়া হাস—
ন্যাদেশ প্যাবেশ করিয়া।

আর শ্বেতকাগার মতন বলে ঠাণ্ডা বাও,
জলজলি বোতলের মত ঐ ছেরিটার গাও।

—মেয়েটির ডান গালে কালো দাগ। হাটে ডিম পেড়ে এমন হাঁসের মত থপথপ করে। সাদা কাকের মত ঠাণ্ডা কথা বলে, আর স্বচ্ছ বোতলের কাঁচের মত ওর শরীর।

এই গালের দাগ, চলার ছন্দ, কথা বলার ঢং এবং যৌবনের বর্ণ সম্পর্কেই নয়, নারী-সৌন্দর্য কিসে কিসে খোলে তারও বর্ণনা আছে :

নারীর শোবা চালুয়া খোপা,
চ্যাংরা বন্ধু গালার মালা—
রসের দোত্তোরা।

বন্ধুকে করার জন্য এগিয়ে যাবার আগ্রহ ও সাহসের ক্ষেত্রে এখানকার নারীদের অগ্রণী ভূমিকার দেখা যায়। দুর্গম পথ, হিংস্র বন্যপশুর ভয় রাতের অভিসারে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। রাতে বন্ধুকে আসতে দেখে মেয়েটি বলছে :

দলবাড়ীখান দলোদলো আর বাঘের ভয়,
তোমরা ক্যানে অনাইসছেন বন্ধু,
আমি গেইলোং হয়।

—বাঘের ভয় এবং কর্দমাক্ত নীচু জলা-ভূমিকে অতিক্রম করে বন্ধুটি আসায় মেয়েটি তাকে বলছে—'তুমি এলে কেন আমিই যেতাম।' বন্ধুর কাছে যাবার জন্য এই 'রিস্ক' নিতে মেয়েটি প্রস্তুত কারণ ভালবাসা প্রিয়জনের মঙ্গল চায়, তাছাড়া বন্ধুটির নিরাপত্তার উপর তো তার অনেক কিছুই নির্ভর করছে। তবে বন্ধু এসেছে বলে সে আনন্দিত হয়েছে। কারণ :

যখন বন্ধু আইসে কাছে—
মনখানি মোর উল্লাসতে,
মনে হয় বন্ধুর কোলাত
থাকং বসিয়া।

এই কথাগুলি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, প্রেমনিবেদনের ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্য এবং অবাস্তব দিকগুলির সূক্ষ্মতার প্রতি পল্লীর কবিদের বিশেষ দৃষ্টি নেই। ফলে এদের ভালবাসায় ভাবনায়, কথায় এবং গানে উচ্ছল যৌবনের আধিক্যতাই বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার অস্থিরতা ছড়িয়ে আছে এদের গানে।

যেমন :—

নদীর নাম হইল কেতুয়া,
মাচ মারে বাতুয়া,
মুই নারী চিকং-চ্যাকচেকা,

ওরে ভাবের বন্ধুয়া মোর
মোচোক না গেইচে রে,
কাপড় ধুইতে হব দেখা।

—ভাবের বন্ধুয়া মাছ ধরতে কেচুয়া নদীতে গিয়েছে। মেয়েটিও কাপড় ক্ষার দিয়ে সেদ্ধ করছে নদীতে ধুতে যাবার জন্য। নদীতে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য লোকদেখানো একটা কাজ দরকার—তাই এই ব্যবস্থা নিয়েছে মেয়েটি।

কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছে পূরণ হয়ত অনেকেরই হয় না। ফলে পরবর্তী মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি দ্রুত ঘটতে থাকে। বন্ধুর অবহেলায় রাগ হয়, ক্লান্তি আসে মনে, অভিমান হয়—বিরহজর্জরিত জীবন-যাপন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। মেয়েটি অনু-যোগ করে :—

ওকি জানিয়াও জানেন না,
শুনিয়াও শোনেন না,
জ্বলেয়া গেইলেন মনের আগুনে
নিবিয়া গেইলেন না।

মনের আগুন জ্বালিয়ে যে গেল, সে আর নেভাতে এলো না। অথচ যৌবন গত হয়ে যাচ্ছে। মন 'কেমন কেমন করে', কতদিন আর 'রসের যৈবন' রাখা যায়? মেয়েটি স্পষ্টই বলে :

ওরে গাবুর বয়স মোর
গত হয়য়া যায়—
মনটা মোর কেমন কেমন করে রে।
ওরে গচ মলো সিমিলার গচ
গগনে ম্যালে ঠাল—
নারী হইয়া রসের যৈবন
রাখবো কতকাল।

•

যৌবন বেঁধে রেখে-রেখে মেয়েটি ক্লান্ত। আশা দিয়ে বন্ধু তাকে ঠকিয়েছে।

মেয়েটি বলছে :

তুই মোর নিদয়ার কালিয়া—
দয়া নাই শরীরে,
ওরে আশা দিয়া ঠ্যাকালু মোক,
নিধুয়া পাতারে।
লোকে যেমন ময়না পোষে—
পিঞ্জিরায় ভরিয়া,
ঐ মতন মোর নারীর যৈবন—
রাখিচং বান্দিয়া।

ময়নাকে যেমন সাবধানে পিঞ্জরে তুলে রাখে মানুষ তেমনি মেয়েটি তার যৌবনকে শুধু একজনের জন্য তুলে রেখেছিল। কিন্তু বন্ধুটি তাকে জনশূন্য প্রান্তরে ফেলে চলে গিয়েছে। জাত, কুল, মান এমনি করে মেয়েটির নষ্ট হল। এর জন্য তার আপ-শোষের শেষ নেই। সে বলছে :—

শ্যামের বাঁশিরে—
কুলের বাহির করিলে আমারে।

•

বাঁশিতে ধরাইয়ে তান,
নষ্ট করিলেন কুল মান।

•

যৌবনকে ব্যবহার করার জন্য দরকার সঙ্গী অথবা সোয়ামী। তাই সঙ্গীর সঙ্গ লাভে অসমর্থ নারীর সোয়ামীর অপেক্ষায় থাকতে হয়। কিন্তু আরো এ ব্যাপারে তৎপর না হওয়ায় মেয়েটির মনের অবস্থা কি তা নিম্নের গানটিতে পরিষ্কার :—

অজ্ঞগন্ডা বিয়ার বাইজখান শুনিয়া—
রাস্তাত্ বসিয়া কান্দোং হুক্ হুক্ করিয়া।
করকাটা করে কোরোত্—
মোর মনটা না রয় ঘরোত্।
ক্লাডক্প করে খিরিত্—
কতদিনে মুই করিম্ পীরিত।
সানাইটা কলকলায়—
মোর মনটা খুলবুলায়।
কাশি কোনা করে ঢেঁও—
কতদিনে মুই ধরেন বাইর হ'ও।

হঠাৎ (অজ্ঞগন্ডা) বিয়ের বাজনা শুনে মেয়েটি রাস্তায় বসে ফুকরে কাঁদছে। মন ঘরে থাকে না, উসখুস করে। কতদিনে পীরিত করার সময় আসবে — কবে ঘরের বার হবে মেয়েটি সেই ভাবনায় ভারাক্রান্ত। অথচ মা, বাবা বিয়ে দিচ্ছেন না। বন্ধুর

প্রণয়বাঁধনেও বাধা পড়া গেল না। কিন্তু যৌবন বাড়ছে—পুবের বাতাসে দুলছে। বাড়ছে 'ইভ-টিজার'-দের সংখ্যাও—পীরিতের বায়না নিয়ে ঘুরছে টাঁরির চ্যাংরা'রা। মেয়েটি বলছে—

বন্ধুধন, ধনরে—

এত গোস্যা কি তোমার শরীরে।
বাপ মাও মোর মারা ছাড়ে—
ব্যাচেয়া না খায় হোটোতে
বৈকল চোলে মোর পুবাল বাতাসে।

টাঁরির চ্যাংরার মোক ছাড়ে না—
আরো দিয়ে যায় পীরিতের বায়না।

বন্ধু কিম্বা সোয়ামী ছাড়া থাকা একেবারেই অসম্ভব। কারণ ঃ—

পতি বড় ধন মন রে—
পতি বড় ধন,
বারের ওড়োন পতি—
গিরিবের বিচন।

—পতি বড় ধন, শীতের ওড়না, গ্রীষ্মের হাতপাখা। তাছাড়া মেয়েটি জানে ঃ—

আকাশোতে নাই রে চন্দ্র—
কি করে তার তারা,
যে নারীর সোয়ামী নাই রে—
দিনে অন্ধিহারা।

যৌবন জ্বালাকে নির্বাপিত করার জন্য বন্ধুর এবং বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠার সুর যেমন আছে এদের গানে, তেমনি আছে বিবাহোত্তর জীবনের অনেক সমস্যার এবং অতৃপ্তির কথা। বিয়ে হলেই সব জ্বালার শেষ নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তা শুরু। যেমন—

আবো বাচেয়া খাইলেন টাকার লোভে,
ও ভাতার কোন কাজে লাগে,
চাইরপর রাতি খুকুর খুকুর কাশে।
মখা বাবা বিচিনাত শোতে—
চাইরপর রাতি বেড়াক মুকে,
কোতকোতাইলেও ফিরিয়া না দেখে।

'বাচেয়া খাওয়া' প্রথা রাজবংশী সমাজে ছিল। এখনও অবস্থা ও পরিবেশ ভেদে প্রচলিত আছে। কন্যার অভিভাবকই টাকা নিয়ে কন্যাদান করেন। কিন্তু টাকার লোভে কন্যা বেচে খাওয়ার পরিণাম কি ভয়াবহ তার নমুনা উপরের গানটিতে দেখা যাচ্ছে। আয়ো টাকার লোভে নাতনিকে বেচে দিয়েছে। কিন্তু ও স্বামী কোন কাজেই লাগার মত নয়। সে অসুস্থ, চার প্রহর রাত খুক-খুক করে কাশে। শয্যাগ্রহণ করেই সে দেয়ালের দিকে মুখ করে শোয়। কন্যাটি কাতুকুতু দিলেও সে ফিরে তাকায় না। এর চাইতে অসন্তুষ্টির বড় কারণ আর কি হতে পারে? তাই স্বামীকে সে 'মরা' বলে গালাগাল দিচ্ছে।

আনন্দ দিতে অপারগ স্বামীর প্রতি সে তার সব ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। যৌবনকে উপভোগ করার জন্য বন্ধুর খোঁজ করে। অথচ সামাজিক 'টাবু'-গুলি অতিক্রম করার উপায় নেই। তা সত্ত্বেও সাহস করে এগোয় সে। বন্ধুকে আহ্বান জানায় চোরের মত চুপি-চুপি আসতে তার কাছে। কারণ ঘরে আছে শ্বশুর-বাবা আর বাইরে ছোট দেওর। তার ভাষায় ঃ—

আস্তে আইস সোনার বন্ধু
যেমন আইসে চোরা,
ওরে ঘরে আছে শ্বশুরবাবা
বাইরে ছোট দেওরা।

এই সব সমস্যা বাদে আর একটি অশান্তির কারণ স্বামীর অনুপস্থিতি। বিরহ। বারো মাস স্বামীর সঙ্গসুখে বঞ্চিতা নারীর মনের কথা গানের কথায় পাওয়া যায় ঃ

কত পষাণ বান্দাইচেন
পতি তোমার মনেতে,
সুকের সময় রইলেন পতি বৈদাশে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল,
আষাঢ় মাসে নয়াজল,
শ্রাবন মাস গেল নারীর
ঘাসিতে মাজিতে।

• • •

আগোন মাসে ওরে হেমুতি ধান
পুষ মাসে নারীর আউলাইল মন
মাঘ মাস গেল নারীর
বালিশ নিয়া বুকেতে।

প্রেম, বিবাহ, বিবাহোত্তর বিভিন্ন সমস্যা এবং অতৃপ্তির কথা ছাড়াও এই গানে আছে অল্প বয়সে বিধবা নারীদের অতৃপ্ত যৌবনের কথা। পল্লীর কবিরা জানেন ঃ—

ধওলা কইতোর বাজের বৈরী,
বাটার বৈরী পানগুয়া,
চ্যাংরার বৈরী চিতিল বিধুয়া।

শাদা পায়রা যেমন বাজপাখীর শত্রু, বাটার শত্রু যেমন পানগুয়া, তেমনি অবিবাহিত (চ্যাংরা) মানুষের বৈরী হচ্ছে অল্প বয়স্ক সন্তানহীনা বিধবা।

বিধবাদের সমস্যা নিয়ে অনেক গান এই ভাষায় রচিত হয়েছে। অল্পবয়স্ক বিধবা জীবনের দুঃখ এবং বেদনার কথা নীচের গানটিতে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ—

ওকি বাবার দ্যাশের কুহুয়া রে—
ক্যানে কান্দেন তোমরা
চন্দন বৃক্ষের ডালে।
ফান্দিয়া পংখী তুই,
চিতিল বিধুয়া মুই,
কিবা খবর কবার আমার আছে।

• • •

লোহা দিয়া বান্ধিনু ঘর,
মুক্কে কতা মোর না সইলেক ভর,
সেও ঘর মোর ভাঙ্গিয়া নিল ঝড়ে।
যৌবনেতে কাদো মাখি,
একেলা পালঙ্গে থাকি,
বালিশ জেবে মোর
চাইরপর রাতি কান্দি।

এ জীবন অসহাকর। তাই মেয়েটি বলে ঃ—

মর কাউয়াটা কান্দিস ক্যানে
চালোত্ পড়িয়া,
দিবা নিশি মোর মনের আগুন
ওঠে জ্বলিয়া,
ওরে চেংরী বয়সে যম গোলাম
মোক থুইলেক কিনুয়া।

উপরে উদ্ধৃত গানগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এই গানগুলিতে নারী-মনের কথার ভেতর থেকে যে সমস্যাগুলি বেরিয়ে আসছে, তাতে এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচুর তথ্য আছে। তাই শুধু লোক-সাহিত্যের উপাদান হিসেবেই নয়, সামাজিক সমস্যার উপকরণ হিসাবেও এগুলির একটা আবেদন আছে। মনের কথা এমনি করে খুলে বলার এই জাতীয় মানসিক বল আছে বলেই নানান সমস্যা ও অতৃপ্তির মাঝেও ওরা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে ভবিষ্যতের আশায়।

(৩)

বিয়ের গান উত্তরবাংলার লোক-সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ গান শুধু এখানকার লোকসঙ্গীতকেই কৌলিন্য দেয় নি, বাংলার লোকসাহিত্যেরও এগুলি মূল্যবান সম্পদ। আগেকার দিনের উত্তর-বাংলার পল্লীতে এই গান বিয়ের বেশ কিছু দিন আগে থেকে শুরু হোত এবং অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত গানের আসর চলতো। বরযাত্রা, অধিবাস, নান্দীমুখ, বরণ, কনে সাজানো, মুখচন্দ্রিকা, কন্যা সম্প্রদান, ক্ষীর-ভোজন, গন্ধতেল ভাজা, বাসী বিয়ে, কন্যাবিদায়, এমন কি কন্যার পিত্রালয় ত্যাগের সময় কান্নার চিত্র প্রভৃতি হিন্দু বিবাহের বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং স্ত্রী-আচারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের চিত্র এই গানে পাওয়া যায়। উল্লিখিত প্রত্যেকটি 'আইটেম'-এর উপর এক অথবা দুই কিম্বা ততোধিক গান রচিত হয়েছে। এই গানগুলির পদ গ্রন্থনায় নিপুণতার কিছুটা অভাব থাকলেও কথা ও সুর-সৃষ্টির মৌলিকতাকে তারিফ না করে উপায় নেই।

বিয়ের গানগুলি উত্তরবাংলার পল্লীর মহিলাদের সৃষ্টি—এর কথা ওদের, সুর সংযোজনাও। এ গানের লিখিত লিপি নেই। একজন আর একজনের কণ্ঠ থেকে তুলে নিয়েছেন এ গান। এ গানের আসর পল্লীর বিয়ে বাড়ীর অঙ্গন, আসন 'ডালাই' —কণ্ঠে কণ্ঠ দান করে তালিম, আসরে বসেই তর্জমা। পল্লীর অতিব্যবহৃত বাদ্য-যন্ত্র দোতোরা, গমক, খোল ও করতালের কোনটাই এ সঙ্গীতকে সঙ্গ দিত না। সম্বল শুধু কণ্ঠ—গান হোত উচ্চগ্রামে এবং সমবেত কণ্ঠে। এ সঙ্গীতের প্রচলন কাল কি তা নিরূপণ করার উপায় নেই। তবে বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশ দশকেও এ গান কুচবিহার কিম্বা রংপুরের পল্লীতে শোনা

গিয়েছে। তাই আন্দাজ হয়, এর পেছনের ইতিহাস স্বাভাবিক কারণেই খুব ছোট নয়।

উত্তর বাংলার রংপুর, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি প্রধানত রাজবংশী, কুড়িকন্দন, থান, মেচোক ও কোচ-ক্ষত্রিয়দের বাসভূমি। এ গানগুলিতে আঞ্চলিক 'ডায়ালেকট'-এর প্রভাব তাই বিশেষ করে লক্ষণীয়। তবে পূর্বেকার রাজবংশী সমাজে 'ব্যাচেয়া খাওয়া' প্রথা প্রচলিত ছিল—অর্থাৎ পাত্রীর পিতাই পণ গ্রহণ করে কন্যা দান করতেন এবং বিয়ের অনুষ্ঠানও ছিল সরল। সেই দিক থেকে বিচার করলে একটা প্রশ্ন মনে আসে যে, এই গানগুলি রাজবংশী মহিলাদের সৃষ্টি কিনা। কারণ ওদের বিবাহ অনুষ্ঠানের রীতিক্রমের সঙ্গে এর মিল অনেক ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, কোন-কোন সঙ্গীতের পদগুলির ভাষার ভেতরেও স্থানীয় ভাষার প্রভাব অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে হবে। যেমন :—,

সাজিল সুন্দর রাম—
কৌশল্যা নন্দন রাম—
সাজিল রে।
যাও যাও ওরে বাছা
উজানি নগরে যাও,
সীতা সম পুত্রবধূ
আনুক মোর ঘরে।

মায়ে দিল থালা দূর্বা মস্তকে তুলিয়া—
রাম সাজিলরে।

এই বরযাত্রার গানটির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব এখানে নগণ্য। পাত্রকে এখানে রামের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সীতার মত পাত্রী রাম ছাড়া আর কে পেতে পারে?

কিন্তু বর কন্যার বাড়ীতে এলে যে গানটি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করা হল সেটা পুরোপুরি আঞ্চলিক ভাষায় শোনা গান। গানটি এমন :—

শীত ভাঙ্গিয়া আসু রে বন্ধু—
নিদ্র ভাঙ্গিয়া আসু,
সারা ঘাটা আসিয়া রে বন্ধু—
থোক্ দুয়োরোত্ রসু।
তোর ভাউজেক্ যদি আনন্দ হয়—
বড় বরটো পালু হয়,
আইসেরে আইসেরে ভাউজ—
পাচোতে আইসে,
বড় বাজিনবারের কড়ি,
তোর ভাউজ কুড়িয়া আইসে।

পাত্র শীত উপেক্ষা করে বিয়ে করার জন্য কন্যার বাড়ীতে এল। কিন্তু অন্দর-মহলে তার কোন স্থান হল না। স্থান মিলতো যদি সে তার বড় ভ্রাতৃবধূকে সঙ্গে নিয়ে আসতো। তাহলে সে ভেতর বাড়ীর উত্তর দিকের ঘরটা পেতো। তাই অপেক্ষা করতে হবে। ভ্রাতৃবধূ পিছনে আসছে বাদ্যকারদের কড়ি কুড়িয়ে।

গানটি স্থলে রসিকতাপূর্ণ। দূরত্বের ফলে বরযাত্রীদের সাধারণত অধিবাসের দিন পাত্রীর বাড়ীতে যেতে হয়। ঐ দিন পাত্রটি আগন্তুক। তাই অপরিচিত, অবিবাহিত পাত্রটিকে অন্দরমহলে স্থান দেওয়া সম্ভব হতে পারে যদি সে তার ভাউজির সঙ্গে রাত্রি বাস করতে পারে। নন্দ মসকরার এখানেই শেষ নয়। ঠাট্টার ভেতর দিয়ে পাত্রের বৌদিকে বাদ্যকরদের সহচরী বলা হয়েছে। ইঙ্গিতটি সূক্ষ্ম নয়। তবে পাত্রকে ঠাট্টা-মসকরা করার রীতি বাংলার হিন্দু বিবাহের স্ত্রী আচার বিরুদ্ধ নয়। তাই এই গানটিকে অশ্লীল বলা ঠিক হবে না।

শুধুমাত্র পাত্রের প্রতিই না, বরযাত্রীদের প্রতি আক্রমণের চিত্রও এই গানে আছে। যেমন :—

কুচবিহারী বামন রে—
হাটুয়ার উপর ধুতি রে,
সিতান দিবার বালিশ নাই,
পোয়াল খারের তুতি রে।
আমার দ্যাশোত্ চোরের ভয়—
শাল আলোয়ান নাই দেয় গায়,
ধরিয়া আইসচে চইন্দর্শনি ক্যাতা রে।

কুচবিহারের ব্রাহ্মণ। হাঁটুর উপর ধুতি। শিয়রে বালিশ নেই—পাকানো বিচালির 'তুতি'। চোরের ভয়ে কেউই শাল-আলোয়ান গায়ে দেয় নি। আর নিয়ে এসেছে চৌদ্দ বৎসরের পুরোনো কাঁথা। এগুলি পাতা হবে অথবা গায়ে দিয়ে রাত্রি যাপন।

এই গানটিতে রসিকতার সুরটি উপভোগ্য। তাছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও মিলছে। সেটা হচ্ছে বরযাত্রীরা কুচবিহারের ব্রাহ্মণ। এ থেকে মনে হয় যে, এই গানগুলি উত্তরবাংলার পল্লীর ব্রাহ্মণ সমাজেই প্রচলিত ছিল। দীর্ঘ দিনের বসবাসের ফলে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব এদের সঙ্গীতে এসে পড়েছে।

উপরের গানটির মত ঠাট্টার সুর কিন্তু সর্বত্র নরম নয়। বিশেষতঃ বরের সহোদরদের দিকে গায়িকাদের নজর বেশী। এঁরা কখনও ওদের হুদু বাঁদোর বলে গান জুড়ে দিচ্ছেন, আবার কখনও গাইছেন :—

আইসচে রে বরের ভাই—
ভাত খাইবে কি দিয়া,
রামকলাই মটরের ডাইল—
শিয়াল ভাজা খাইবে কাইল।

এই জাতীয় তরল রসিকতা যেমন আছে এই গানে, তেমনি আছে হিন্দু ধর্মের নির্দিষ্ট গম্ভীর মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপের চিত্র। অধিবাসের গানটিতে তা বিশেষ করে স্পষ্ট :—

গৈলতে জন্মিল গঙ্গা
যায় যা গোয়ালপাড়া—
দূর্বা বরণ পড়েরে চন্দন
সেই সেন বসুধারা।
দূর্বা বরণ পড়েরে ঘৃত
সেই সেন বসুধারা,
দূর্বা বরণ পড়েরে সিন্দুর
সেই সেন বসুধারা,
অধিবাসের কালে মৃদঙ্গ দিল ঢালি,
চোয়া চন্দন ঘট পুষ্প যোগায় মালী,
শোন কেন পুষ্পে ভোমোরা কোন জাতি
যুতি মালতি ফুল হরের মাথায় ছাতি।

জোরোরে কার্কিনি গুয়া
জোরোরে সুন্দর,
আমার বাছার কইনা জুড়ি উজানী নগর,
উজানী নগরে বাছার বুয়া শ্বশুর দাশ,
চোয়া চন্দন ঘট হউক অধিবাস।

অধিবাসের জন্য প্রয়োজনীয় মাঙ্গলিক দ্রব্যের কথাই এই গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে। গোয়ালপাড়ার গোয়াল ঘরেই গঙ্গা (গোমূত্র)। দূর্বা দিয়ে সিন্দুর ঘি, চন্দন চুইয়ে পড়ছে। মৃদঙ্গে মঙ্গল খেলা। ঘট, পুষ্প মালাকার যোগাচ্ছে। পুষ্পস্তবকে ভ্রমর। যুঁই, মালতি বিভিন্ন জাতের ফুল হরের মাথায় ছাতার মত শোভা পাচ্ছে।

শুধু অধিবাসের গানটিই নয়, নান্দী-মুখ, বিয়েতে বসার পর এবং কন্যা সম্প্রদানের গানের চিত্রগুলিও সুন্দর এবং বাস্তবধর্মী। নান্দীমুখের গানটি এমন :—

গোসাইর বাগিজা বাড়ীত্—
এ হরিণ প্রহরী,
সেইখানে উপজিল—
হলদি নকাচি,
সেই হলদি তুলিয়া আনি—
নান্দীমুখ কর।

নান্দীমুখ শুভ কর্ম
না জানে ছাওয়াইলা।
ছাওয়াইলার বাবা উঠিয়া বলে—
আমি ভাল জানি।
ডাকেয়া আনো পুরোহিত ঠাকুর—
বাকা শুদ্ধ করুক।

মুখচন্দ্রিকার গানটিও খুব বাস্তব :—
তুলিয়া ধর তুলিয়া ধর—
গোসাইর সিংহাসন,
চারি চক্ষে দুই মুখ—
হউক দরিশন।'

পীঁড়িতে কন্যাকে বসিয়ে সাত পাক ঘুরিয়ে নেওয়ার পর মুখচন্দ্রিকার জন্য পীঁড়ি তুলে ধরা হয়। হিন্দু বিবাহের এই উল্লেখযোগ্য দিকটিও ওদের গানে রয়েছে। এই গানটিতে কন্যার পীঁড়ি তুলে ধরতে বলা হচ্ছে যাতে চার চোখে দুই মুখ দর্শন হয়। এখানে পীঁড়িকে সিংহাসনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবং কন্যাকে গোসাঁইর সঙ্গে।

বিয়েতে বসার পর যে গানটি গাওয়া হোত সেটিও সুন্দর। গানটি এইরূপ :—

তখনে কইচং রে বড় দয়ার বাপরে—
চাপ চ্যাকারে ঘিরিয়া রাখ বাড়ী,
দেওয়াল পাচীরে ঘিরিয়া রাখ বাড়ী,
রাস্তা দিয়া যায় রে ধনি
রাজের ব্যাটারে—

বানীর মুখ পোঁছিয়া তুলিয়া নিল কোলে।

সম্প্রদানের গানটিও করুণ। বাবা কন্যা দান করছেন পাঁচটা হরিতকী দিয়ে। কন্যা সম্প্রদান করতে গিয়ে চোখে জল আসছে। এ গানের পংক্তিগুলি নিম্নরূপ :—

বাবার দুয়ারের আগে কলাল গাছে
কলাল ঝিলত্ত ধরে,

পাঁচটা কলাল ছিঁড়িয়া
বাবা কন্যা দান করে,

কন্যা দান করে রে বাবা
মোছে চক্ষের জল।

এখন কেন কান্দিছো বাবা
গামছা মুখে দিয়া?

ভাত খাইছেন ডালটি খাইছেন
আর খাইছেন মাছ,

টাকার লোভে বরে রে কহিছেন
দূরে শ্বশুর দ্যাশ।

ভাত খাইছেন ডালটি খাইছেন
আর খাইছেন মাচ—
মিষ্টি খাইয়া মিষ্টি মুখে
দূরে দিলেন ভর।

সম্প্রদানের পরের গানটিও দ্রষ্টব্য :—
ওপারে রামের মাও কাপাশ ডালে,
এপারে রামের ধুতি তোমোরা ডালে,
রামের ঘাড়ের গামছা ঘুনবনে ধুইয়া—
আকুল হইল রাম ঐ সীতাক্ পাইয়া।

পাত্রকে বরণ করার সময়কার গানটিও উপভোগ্য। এই গানটিতে পাত্রের রূপের বর্ণনা পাওয়া যাবে। তবে এই রূপ-ব্যাখ্যার সুন্দর, অতিসুন্দর কিম্বা কমসুন্দরদের কারুরই সঠিক পরিচয় মিলবে না। কারণ গানটি 'রুটিন' মাফিক—বরণকালে গাওয়া হত। এটা মূলত রসিকতা করার জন্যই রচিত। ফলে সুন্দর পাত্রেরও নিম্নোধৃত কায়িক সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনতে হত :
বিলাইর নাকান চোখ

বন্দু তোর ফালাত্ ফালাত্ করে।
তোর বরুর কি এতর রূপ ধরে,

তোর বন্দুক বরিতে গেইলে
রায়ো ঠসেক্ মারে।

হাতির নাকান কান বন্দু তোর
নাটার পাটার করে,
ঘোড়ার নাকান পাও বন্দু তোর
খাটার খাটার করে,
বিলাইর নাকান গাও বন্দু তোর
খ্যাসেম খ্যাসেম করে,
তোর বরুর কি এতর রূপ ধরে।

—বরের বেড়ালের মত চোখ, হাতির মত কান, ঘোড়ার মত পা, আর বেড়ালের মত গা। বিভিন্ন জন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে বরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই তুলনায় ঠাট্টার বিষয়টি কুৎসিত, পাত্রের কাছে কঠোর মনে হতে পারে। কিন্তু 'আক্রমণের' উদ্দেশ্য নির্ভেজাল রসিকতা।

শুধু পাত্র নয়, যারা বরণ করছেন তাদের প্রতিও দৃষ্টি আছে গায়িকাদের। 'ভাসুর দুলালী রায়োদের নাকের নোলক 'চাইলোন' চালতে গিয়ে কি করে দুলছে সে চিত্রটিও বাস্তব :—
বরণ বরে,

চাইলোন চালে,
নাকের নোলো ঢুল খেলায়—
আরে ভাসুর দুলালী রায়ো—
আচ্ছা বরণ বরে না রে।

বরণ করার জন্য কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন তাও পাওয়া যাবে ঐ গানে। এর জন্য লাগে আয়না, চিরুণ, আরও অনেক কিছু এবং একজন রায়ো। ওদের গানের ভাষায় :—
বরণ খান বরিতে
কি কি নাগে রায়ো
আয়না নাগে কাকই নাগে
আরো কিছু নাগে।
রায়োর কমরের শাড়ী
বেগে ঝিলমিল করে।

কন্যার কান্নার চিত্রটিও বড়ই মর্মস্পর্শী। গানটির কয়েকটি লাইন এইরূপ :—

এত দয়ার ময়না একেলা বসিয়া
কান্দে—
কান্দে রে তোর ময়না—
ঢে'ও না পড়ে তোর মায়ের
চক্ষের জল।
খড়টা কাটিলে তোরও বিরায় রস,
ঢে'ও না পড়ে তোর জননীর
চক্ষের জল।

তোর মায়ের চৌকোং দেখো
আকাশি মর্‌চের গুড়া—
তোর মাও মানিচে সুবচনীর পাটা—
ঘরের শান মোর বাউক দুয়োর দিয়া।

অনুষ্ঠানের সর্বশেষ পর্ব কন্যার পিত্রালয় ত্যাগ। বর 'চঞ্চল' ঘোড়ার পিঠে চড়ল, কনে 'ছামনদোলায়'। দোলায় বসে কন্যা চোখের জল মুছছে :—

বরু চড়িল চঞ্চল ঘোড়া,
বালিক্ তুলিল ছামন দোলা,
ঘোড়ায় চড়ে ছাওয়াল তুরগে
মাইরলি বারি,
দোলায় থাকিয়া সুন্দরী মোছে
চক্ষের পানী।

নতুন সাথীর চোখে জল দেখে বর তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে :—

না কান্দিও না কান্দিও কন্যা
না কান্দিও তুমি,
আমার ঘাড়ের গামছায় মোছো
চক্ষের পানি।

বর কন্যাকে কাঁদতে মানা করছে—ঘাড়ের গামছা এগিয়ে দিচ্ছে চোখের জল মুছে ফেলার জন্য। এবং বলছে :—

অর্ধ রাস্তা গেইলে অর্ধ অঙ্গ দিব
সম্পূর্ণ গেইলে সম্পূর্ণ দেহ দিব
বাবরা বাড়ী গেইলে খেলার
দোসর দিব

শোয়ার ঘরে গেইলে হৃদে তুলি লব।

উপরের আলোচিত গানগুলির অনেকগুলি গানে 'আক্রমণের' চিত্রগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আক্রমণ শুধু বরযাত্রী বা বরের জন্যই নয়, কন্যার মাতাপিতার জন্যও আছে। কন্যার বিয়েতে মায়ের চোখের জল ফেলবার জন্য তার চোখে লংকার গুঁড়ো দেবার পরিকল্পনা, কিংবা মা মেয়েকে বিদেয় করার জন্য সুবচনী ঠাকুরাণীকে পাঁঠা মানত করেছেন, অথবা বাবা টাকার লোভে দূরের বিয়েতে জবান দিয়েছেন—এগুলি অত্যন্ত অপ্রিয় কথিত বলে মনে হয়। কিন্তু বিয়ের 'সিরিয়াস' দিকগুলিকে তরল রসিকতার ভেতর দিয়ে হালকা করার জন্য যদি গানগুলির রচনা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য কোন বক্তব্য থাকে না। এবং মনে হয় শেষোক্ত দিকটির দিকে নজর রেখেই গানগুলি বোনা হয়েছে।

• আলকালকা টনিক • কিংস হোমোটোন
• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• ক্যাসিনা সিরাপ • ইউট্রোটোন
কিং এণ্ড কোম্পানীর নিজস্ব গবেষণায় প্রস্তুত ঔষধগুলি এখন আপনার সেবায় নিয়োজিত।
প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং
৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী :
২০বি, পানী বাগান লেন, কলিকাতা-৯
GRACE/K/30/70
কিং এণ্ড কোম্পানীর সকল শাখায় ঔষধ বিভাগ প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

এই আমাদের দেশ

লাল কাঁকড়া-বিছানো সমুদ্র-সৈকত দীঘায়

সমুদ্রের স্বাভাবিক আকর্ষণে মনের মানসিকতায় পাল পড়ে। সমুদ্র টানে। তার নির্জন নোনা হাতছানিতে সাড়া দিতে অজান্তে এগিয়ে যেতে হয়, কোন কথাই গোপন রাখতে ইচ্ছে করে না, কোন পাপ। অতীত স্মৃতির দরজায় টোকা পড়ে, তখনও বেরিয়ে আসে শৈশবের মাঞ্জা-সুতোর বান্ডিল, কিংবা কোন উৎসবের টানে নিষিদ্ধ বাগানে ঢুকে পড়ে আধ-ফুটন্ত গোলাপ তুলনব, বারুণ বৌদির জটিল পাতাগুলি ইচ্ছাকৃত উল্টে গিয়ে পরীক্ষার আগে সিটিয়ে যাওয়ার বিবর্ণ দিনগুলি একে একে সারি দেয়। কুমারীর আশ্চর্য লাবণ্যের উষ্ণতা পেতে সলজ্জ আনত চোখে ভীরু পায়ে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়, সমুদ্রের চিকচিক জলে ভেসে ওঠে হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি মুখ, নিজের অজান্তে যারা হৃদয়ের দরজায় লুকোচুরি খেলেছিল সীমিত সময়। উজ্জ্বল যৌবন-স্মৃতি তাজা তরমুজের মত ফালি ফালি এখনও সাজানো, কে কবে ফিস্ফিস্ দিয়েছে মৃদু বাক্যবাণে, কার প্রাণ হাসনুহানার মত জ্বলে উঠে নিভে গিয়েছিল পায়ের তলায় মাটির অভাব দেখে—সবই যেন অনন্ত-প্রশান্তির-ঘর সমুদ্রের কাছে খোলা-মেলা হয়ে যায়।

দীঘার সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে দুটি শিশুর বালি খুঁড়ে জল বার করা দেখছিলুম। জলের পাশেই বালির ঘর। সৈকতে অজস্র ক্ষুদে লাল কাঁকড়ার দৌড়াদৌড়ি। পিরিখাটি সুন্দর কাঁকড়াগুলি পিঠ পেতে যখন সমুদ্রের হাওয়া খায় তখন সৈকত জুড়ে এক অপূর্ব দৃশ্য। ভয়ানক সেয়ানা ওরা। একটু পায়ের শব্দ পেলেই তীরের বেগে ছুটে বাসায় ঢুকে পড়ে।

পাশেই ঝাউ বীথি। সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে পাতাগুলি নুয়ে পড়েছে। ঝাউ-বীথির মধ্যে ঢুকে একা একা হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে কারো কারো হতে পারে। কিন্তু বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে নব দম্পতি নিরাপদ ছায়ায় বসে আগামীদিনের স্বপ্ন দেখে—আচমকা কোন বড় ঢেউ এসে হাউয়ের গোড়ার মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়, ছলাৎ করে জল ছিটকে পড়ে বালির ওপর; পাতার শনশন শব্দে উদাস হয়ে যায় মন,

বিপত্তিক বৃক্ষের কাছে ঝাউবীথি নড়ে দাঁড়ায় নড়া-নাত, সময়ে অসময়ে হদনা দেয়।

ছোট ছোট দল আসে ঝাউবীথিতে পিকনিক করতে। সমুদ্রের বুকের ওপর আলো-আঁধারী ঝাউবনে চড়ুইভাতি করার লোভ সামলাতে না পেরে হোটেলে-থাকা পর্যটকও বেরিয়ে পড়ে একটা জনতা স্টোভ যোগাড় করে আনাড়ি হাতে একবেলার খিচুড়ি তৈরী করতে।

কলকাতা থেকে দীঘা এমন কিছু দূর নয়। টুরিস্ট ব্যুরোর সরাসরি বাস যায় ধর্মতলা থেকে। তাছাড়া ট্রেনও আছে প্রচুর। ট্রেনে খড়্গপুর, খড়্গপুর থেকে বাসে দীঘা। ভোরে বেরুলে দীঘায় পৌঁছে দুপুরের খাওয়া সারা যাবে। খড়্গপুর থেকে দীঘা মাত্র ৭৭ মাইল, বাসে ভাড়া লাগে সাড়ে তিন টাকা পৌনে চার টাকার মত। মোটরে যদি যেতে চান তো তিনটে রুট আছে। কলকাতা দেউলটি—কোলাঘাট—খড়্গপুর হয়ে দীঘা, ১৫০ মাইলের মত। কলকাতা — চাঁপাডাঙা — আরামবাগ — বিষ্ণুপুর—খড়্গপুর হয়ে দীঘা, ২২২ মাইলের মত। আর কলকাতা—বর্ধমান—বিষ্ণুপুর—খড়্গপুর হয়ে দীঘা ২৯৪ মাইলের মত।

যদিও আগের তুলনায় একটু ভিড় বেড়েছে, তা হলেও থাকার তেমন কোন অসুবিধে নেই। ক্যাফেটেরিয়ায় থাকতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোটেলের সংগে ডরমেটরী ব্যবস্থা আছে। প্রাইভেট হোটেল তো আছেই। যাঁরা আরও স্বাচ্ছন্দ চান তাঁদের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলো। এখান থেকে ব্যবস্থা করে নিতে পারলে রাজার হালে থাকা যায়। নিয়মিত বাজার বসে, ডাকঘর কাছেই। একটি সুন্দর অ্যাকোয়ারিয়ামও রয়েছে। বিকেলের দিকে

দেখতে দেখতে চা খেতে পারেন।
সমুদ্রের ধারে যে কাফেতে বসে সূর্যাস্ত

খুব ভোরে যাদের ঘুম ভাঙে তাদের কাছে আলো-জোয়ার সমুদ্র একটি বিশেষ আকর্ষণ: সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সমুদ্রের ওপর দিয়ে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন টুপ করে জলের ভেতর থেকে টকটকে লাল থালা জেগে উঠবে, কিচকিচ পাখি ডাকবে, জেলেরা জাল নিয়ে মাছের সন্ধানে বেরুবে, স্যাতসেঁতে বালির ওপর পা ফেলে ফেলে আপনি ঝাউবন ছাড়িয়ে হেঁটে যাবেন, ফিরে এসে দেখবেন সমস্ত দীঘাটা কলকাকলিতে জমজমাট, ট্রানজিস্টার রেডিওর সারি পড়ে গেছে আপনাকে গান শোনাতে।

তার কয়েক ঘণ্টা পরেই জেলে ডিঙি ফিরে আসবে মাছ নিয়ে, চড়ার ওপর জাল ঝাড়াই, সমুদ্রের মাছ খেতে দু'একদিনই ভাল। দীঘার সমুদ্র শান্ত। বীচও খুব গভীর নয়, প্রায় মাইল খানেকের মত জলের মধ্যে হেঁটে যাওয়া যায়। অথচ পর্যটকদের স্নান করার পক্ষে কিছুই অসুবিধে নেই। ঢেউগুলি ছোট ছোট, ফলে ঢেউ-এর সংগে দোল খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যাঁরা পুরীর সমুদ্রে স্নান করেছেন তাঁদের কাছে এখানের সমুদ্র-স্নান মজার নয়।

শীতের দুপুরে বালিরাশির ওপর শুয়ে শুয়ে রোদ্দুরে পুড়তে একধরনের আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু ফেরার দিনে যখনই সমুদ্রকে পিছনে ফেলে বাসে চড়ে বসলে মনটা বারবারই ফিরে যেতে চায় বালিয়াড়ি সমুদ্রের ধারে, যেখানে নীলাভ-স্নিগ্ধতা মনের সব অর্গলগুলি দু-হাট করে দেয়।

—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

খাঁচার পাখি

মানব সান্যাল

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দ্বিজপদ ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে স্বগতোক্তি করল—ইস বড্ড দেরী হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বুক ঠেলে একটা শুকনো কাশির দমক উঠল। একনাগাড়ে কাশতে লাগল দ্বিজপদ।

দেরী যে হয়েছে বোঝাই যায়। চারপাশের শব্দে, গন্ধে স্পষ্ট সকালের চেহারা। পাশের ঘরে অনর্গল স্টোভের শব্দ, মেসের রান্নাঘরে ফুটন্ত ডালের গন্ধ, সিঁড়িতে চটি আর খড়মের ওঠা-নামা, কলঘরের কলরব—দ্বিজপদর ইন্দ্রিয়গুলো হঠাৎ যেন নাড়া খেল।

নীচের তলার শান-বাঁধান চাতালে দুলকি-চালে হরিবাবুর বৌটা রোজকার মত আজও নিশ্চয়ই [illegible]-আঁটা পরিপুষ্ট হাতের পেশীতে ঢেউ তুলে একপাল হাঁসকে ঘাস-পাতা খাওয়াতে বসেছে। ছাগলগুলোর গলায় ঘন্টা বাজছে। বাইরে এতক্ষণে বোধহয় পাতলা কুয়াশার গায়ে রোদ্দুরের রং ফুটে উঠেছে। কিন্তু দ্বিজপদর ঘরে এখনও শেষ রাতের আবছা অন্ধকার। শীতের কলকাতায় ভারী প্রকাশে আলো ফুটতে এমনিতেই দেরী হয়। দ্বিজপদর ঘরে আলো এসে পৌঁছয় আরও অনেক দেরীতে।

দ্বিজপদর ঘরের দক্ষিণ আর পূব দিক একটা উঁচু থামওয়ালা চারতলা বাড়ীর দেওয়াল দিয়ে ঢাকা। বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেলেও ঝকঝকে রোদের ফলাগুলো কখনওই স্যাঁতসেঁতে ঘরের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। সূর্যদেব খুব কৃপণ, অনিচ্ছুক হাতে আবছা অন্ধকারের ছায়ায় এক চিলতে ঘোলাটে রোদ্দুরের রং মাখিয়ে দেন।

উত্তরের ভাঙা জানলা দিয়ে ডিসেম্বরের হা-হা ঠান্ডা বাতাস অনেক বেলা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে ধারাল ছুরি শানায়। উত্তরের জানালার মুখোমুখি মেসের রান্নাঘর কেন না ভোরে উনুনে আঁচ পড়ে। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া গলগলিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে। ঘর জুড়ে জমাট-বাঁধা ধোঁয়া কিলবিল করে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দু-চোখে জ্বালা ধরে, নিঃশ্বাসটা ভারী হয়ে বুকের মধ্যে চেপে বসে চোখের পাতা দুটোকে জোর করে টেনে খুলে দেয়। কিন্তু চোখ দুটোতে তখনও টলটল করে শেষ রাতের ক্লান্ত, অতৃপ্ত ঘুম। ছেঁড়া কম্বলের দুর্বল প্রাচীরটাকে ভেদ করে শীতার্ত শুকনো বাতাস হাড়ের ভিতর পর্যন্ত ছুরি চালায়। দ্বিজপদ কম্বলটাকে মাথা পর্যন্ত টেনে নিয়ে সারা দেহে অবসন্নতার ভারী বোঝা নিয়ে গুটি-শুটি মেরে পড়ে থাকে।

অথচ নিশ্চয়ই ভোর না হতেই বুকের ওপরে চেপে বসেছিল ধুম-দৈত্য—সারা দেহে ছুঁচ ফুটিয়েছিল ঠান্ডা ধারাল বাতাস। কিন্তু ঘুম ভাঙেনি দ্বিজপদর।

কি সাংঘাতিক ঘুম যে বাবা—দ্বিজপদ বিড়বিড় করে উঠল। ঘরের মধ্যে এখন আর ধোঁয়ার যন্ত্রণা নেই। হালকা বাতাসে নিঃশ্বাস বেশ সচ্ছন্দ। তবে বাতাসে এখনও ধোঁয়ার গন্ধ।

কাল বেশ রাত করে—বলতে গেলে মাঝ রাতে অসম্ভব ক্ষুধা আর ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফিরেছিল দ্বিজপদ। এক মুহূর্তও দেরী না করে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল। কম্বলটাকে মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে হাত-পাগুলোকে গুটিয়ে ফেলেছিল। ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু এক অস্থির ভাবনা ওকে আরও কিছুক্ষণ জাগিয়ে রেখেছিল। কাল খুব ভোরেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হবে। ঠিক নটায় মিসেস শোভনা রায়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বৌবাজার থেকে সাদার্ন এভিনিউ অনেকটা পথ। আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়তেই হবে। শোভনা রায়ের বাড়ীর নম্বরটা প্রফেসর খাস্তগীর বলতে পারেন নি। তবে সুরভিত-ভবনের নাম নাকি ও এলাকার সবাই জানে। প্রফেসর খাস্তগীর বারবার সাবধান করে দিয়েছেন—শোভনা রায় ব্যস্ত মানুষ। ঘড়ি ধরে চলেন। প্রথম দিনেই দ্বিজপদ যেন পাংচুয়ালিটির ব্যাপারে কোন খারাপ নজির না দেখায়।

মনের মধ্যে অস্থির সব ভাবনা নিয়েই দ্বিজপদ কখন যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল। তবে ঘুম না আসা পর্যন্ত ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ার চিন্তাটা ছিলই।

অথচ আজই ঘুম ভাঙতে দেরী হল। আর ঘুম ভাঙতে এ কি জ্বালাতন? একটা শুকনো কাশির ঝড় যেন হঠাৎ বুকের খাঁচা ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। গলার কাছে একটা দলা-পাকানো শ্লেষ্মা আটকে আছে। গলার নলীতে বিশ্রী সাঁই সাঁই শব্দ উঠছে। কাশতে কাশতে পাঁজরে ব্যথা ধরে গেল। কিন্তু শ্লেষ্মার দলাটা আটকেই আছে গলার নলীতে। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কেশেও ওটাকে মুখের মধ্যে তুলে আনতে পারল না দ্বিজপদ।

একটানা বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে দ্বিজপদ। গাঢ় এবং গভীর ঘুম। অথচ শরীরে এই নির্বাক ঘুমের কোন সুখই নেই। মাথাটা এমন ভার হয়ে আছে মনে হচ্ছে শরীরের রক্ত বুঝি মগজের মধ্যে ঘন হয়ে জমে গিয়েছে। কপালের দু-পাশে, ঘাড়ে একটা ভারী যন্ত্রণা দপ-দপ করে লাফ দিচ্ছে। থেকে থেকে শুকনো কাশির বিরাম নেই। কিন্তু হঠাৎ এক একটা খুব জোর কাশির দমক বুক ঠেলে ছিটকে বেরিয়ে আসছে।

দ্বিজপদ আরও কিছুক্ষণ একনাগাড়ে কাশল—তারপর হঠাৎ শ্লেষ্মার দলাটা মুখের মধ্যে উঠে এলো। কাল রাতে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগে বুকে সর্দি বসেছে। অনেক রাত পর্যন্ত ওকে পথে পথে ঘুরতে হয়েছে। সন্ধ্যে থেকে ঠাণ্ডাটাও বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। দুপুরের চড়া রোদ্দুরে বোঝাই যায় নি সন্ধ্যে নামলেই হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাসে ডিসেম্বরের কলকাতা মাতাল হয়ে উঠবে। খুব চড়া এবং তপ্ত রোদ্দুরে দুপুরের আকাশে অদ্ভুত রঙ ধরেছিল। ঘর থেকে বার হওয়ার সময় কাশ্মীরী শালের ভারী বোঝাটা কাঁধে চাপাতে চায় নি দ্বিজপদ। বাতাসে ঠাণ্ডার ধার তো ছিলই না। এমন কি ফুটপাতে, ময়দানে শীতের দুপুরের নরম উষ্ণ রোদে পিঠ রেখে আলস্য উপভোগের স্বাভাবিক পরিচিত দৃশ্যও কোথাও ছিল না। বরং চড়া রোদ্দুরে হাঁটতে হাঁটতে দ্বিজপদ বুঝতে পারছিল—বুকে, পিঠে অল্প অল্প ঘাম জমেছে।

অথচ বিকেলের ছায়াগুলো লম্বা হতেই শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস বুক খোলা লংক্লথের পাঞ্জাবীর দুর্বল প্রতিরোধকে ভেঙে দিয়েছিল। আরও পরে বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে গেলে দারুণ ঠাণ্ডা এলো-মেলো বাতাস হাড়ের ভিতর পর্যন্ত থর-থরিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু দ্বিজপদ নিরুপায়। পকেট গড়ের মাঠ। অনুরাধা পত্রিকার সম্পাদক দশ টাকা আগভাগে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত সম্পাদক মশাই-এর পাত্তা মেলে নি। কোন্ এক সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। দ্বিজপদ পত্রিকা অফিসের আশে-পাশেই সন্ধ্যে থেকে ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছিল।

পকেটে যে দু-চার আনা পয়সা ছিল ভাঁড়ের চায়ে গা গরম করতে গিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সহৃদয় সম্পাদক মশাই দশটা নাগাদ অফিসে এসে আরো এক ঘণ্টা ধানাই-পানাই সদুপদেশ দিয়ে দ্বিজপদর হাতে একটা দশ টাকার নোট তুলে ধরেছিলেন। দ্বিজপদ যখন অফিস থেকে বার হয়ে পথে নেমে পড়েছিল অফিসের দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা-দুটো এগারোটার ঘর ছুঁই-ছুঁই।

রাস্তায় বেরিয়ে বেশ জোরে ছুট দিয়েও শেষ ট্রামটা ধরতে পারেনি দ্বিজপদ। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে প্রায় ফাঁকা ট্রামটা নাকের ডগা দিয়ে বার হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিজপদ আর দাঁড়ায়নি। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছিল, চামড়ায় দারুণ টান ধরেছিল, নিশ্বাস বাষ্প হয়ে গিয়ে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। বেশ দ্রুত পায়ে প্রায় দৌড় দেওয়ার মত হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল দ্বিজপদ। শীতের রাতের ভারী কুয়াশা রাস্তার আলোগুলোকে ধূসর ঘোমটায় ঢেকে দিয়েছিল। রাস্তায় লোকজনের হাঁটা-চলা প্রায় ছিল না বললেই চলে। দু-ধারে ফুটপাতের কোণ ঘেঁষে বড় বড় বাড়িগুলোর গাড়ি বারান্দার নীচে ভিখারীর দল আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে দলা পাকিয়ে পড়ে ছিল। মাঝে-মধ্যে দু-একটা কথা কিংবা কাশির শব্দ, কখনও বা রিকসা কিম্বা ঠেলাগাড়ির খট খট ঘটাং ঘটাং যান্ত্রিক ধ্বনি ধূসর অন্ধকারের নির্জনতাকে ভেঙে দিচ্ছিল। মাঝে মধ্যে হঠাৎ খুব কাছেই চলন্ত ট্যাক্সির মাথা ভেসে উঠছিল। ধূসর অন্ধকারে গাঢ় জোরালো হেড-লাইটের আলো লম্বা হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত কাঁপছিল। ট্রাম লাইনের ওপরে, শিশির ভেজা পীচের রাস্তায় সেই আলোর প্রতিফলন ঝক-ঝক করে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিজপদর পেটের মধ্যে অসহ্য খিদের যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠছিল। দ্বিজপদ খুব জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডার ধারালো দাঁত সহ্য করতে না পেরে দৌড় দিতে শুরু করেছিল। নিজের শরীরের গরমেই হাত-পাগুলোকে সেঁকতে চেয়েছিল। বাড়ীর কাছাকাছি এসে ড্রাইভ কোম্পানীর মুখে নতুন দত্তর গাড়ি বারান্দার নীচে পেট হাত চেপে বসে পড়েছিল। খিদের যন্ত্রণা নাড়ির মধ্যে পাক খেয়ে শুকনো বমির মত গলা দিয়ে উঠে আসতে চাইছিল। পেটটা চেপে ধরে বেশ কয়েক মিনিট হাঁটু মুড়িয়ে বসেছিল দ্বিজপদ। মিশিরলালের পানের দোকানে তখনও টিম্ টিম করে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছিল। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে সরু আলোর রেখা ধুলোর কুয়াশার গায়ে আঁচড় কাটছিল। বুড়ো মিশিরলাল মোটা চাদরে কান-মাথা ঢেকে জবুথবু হয়ে বসে সুর করে রামায়ণ পড়ছিল। দরজার পাল্লা দুটো আস্তে করে ঠেলে দিয়ে দশ টাকার নোটটা বাড়িয়ে দিয়েছিল দ্বিজপদ। মিশিরলাল নোটটাকে উল্টে-পাল্টে দেখে দ্বিজপদর মুখের ওপরে ঘোলাটে চোখ দুটো বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কেয়া মাংতা বাবু?

দ্বিজপদ জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে প্রায় ঢোক গেলার মত বলেছিল—মিশিরজী পাঁউরুটি মিলবে? মিশিরজী টিনের বাক্সর ঢাকনা খুলে একটা কোয়ার্টার পাউণ্ড শুকনো বাসি রুটি দ্বিজপদর দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। তারপর বেশ কয়েকটা ছোট-বড় কৌটো হাতড়িয়ে সিকি, আধুলি আর এক টাকার নোট মিলিয়ে দ্বিজপদকে বাকি পয়সা ফেরৎ দিয়েছিল।

ঘরে ফিরে শুকনো রুটির টুকরো গুলো দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করতে গিয়ে চোয়ালে ব্যথা ধরে গিয়েছিল। দুদিন কুঁজোয় জল ভরা হয়নি। বাসি জল গলায় ঢেলে রুটির টুকরোগুলোকে পেটের মধ্যে নামিয়ে দিতে চেয়েছিল দ্বিজপদ। কনকনে ঠাণ্ডা জলে বুকের হাড় কাঁপিয়ে দিয়েছিল। অভ্যাস মত একবার নীচে গুজরাটী পেন্সনখানায় খাওয়ার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু উত্তরের জানালা দিয়ে ধারালো ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্বিজপদর সারা দেহে এমন কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল যে দাঁতে দাঁত ঠক্ ঠক্ করছিল। দ্বিজপদ আর নীচে নামেনি। কাঁপতে কাঁপতে ছেঁড়া কম্বলের নীচে ঢুকে পড়ে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়েছিল। কম্বলের বাধা মানছিল না ঠাণ্ডার ধার। দ্বিজপদ বিছানার চাদরটাকেই গায়ের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর কম্বলের নীচেই কাঁপতে কাঁপতে সকালের অস্থির ভাবনায় পাক খেতে খেতে কখন যেন ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল।

কার্নিশ অবধি গড়িয়ে এসেছে। কিন্তু গলার কাছে এখনও কে যেন ভাঙা বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছে। জিব, ঠোঁট সব শুকনো খটখটে। মুখটা ভেজাতে পারলে হত। কিন্তু দু-দিনের বাসি কনকনে ঠান্ডা জলের কথা ভাবাই যায় না। গলির মুখে আই-ভিত্তাল যৌবনের নখ-বিহীন বিস্বাদ কালো চায়ের এমন কোন বিশেষ আকর্ষণ নেই যে এখন কলঘরের লাইনে না দাঁড়িয়ে গলির মুখে ছুটতে হবে। বরং এই মুহূর্তে জলন্ত বিড়িতে গোটা-কয়েক সুখটান দেওয়ার চিন্তাটাই যথেষ্ট লোভনীয় মনে হচ্ছে। দ্বিজপদ হাত বাড়িয়ে বালিশের নীচে আশেপাশে হাতড়াতে লাগল। নাঃ বিড়ির কৌটাটা বোধহয় পাঞ্জাবীর পকেটেই রয়ে গিয়েছে। দ্বিজপদ হাতটাকে আবার কম্বলের তলায় গুটিয়ে নিল।

ঘরের মধ্যে ফোকর দিয়ে রোদ্দুরের আভাস। কিন্তু উত্তুরে হাওয়ায় এখনও বেশ ধার। ঠান্ডায় হাত-পা সিঁটিয়ে আছে। মুখের শুকনো চামড়ায় টান ধরেছে। ঠোঁট-দুটো ফেটে চৌচির। এক কাপ গরম চা আর তার সঙ্গে কিছু না হোক একটা টোস্ট কিম্বা দু-মুঠো মুড়ি পেটে পড়া দরকার।

সোনা-বৌ-এর কথা মনে পড়ল। সোনা-বৌ নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্নান সেরে পিঠের ওপরে ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে।

দ্বিজপদর নাকে হঠাৎ ভাজা মাছের গন্ধ এলো। মেসের রান্নাঘরে নিশ্চয়ই মাছ ভাজা হচ্ছে। খিদেটাকে আর ভুলে থাকা যায় না। তলপেটের টনটনানিও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আজ কুঁজোর জল ভরতেই হবে। সিঁড়িতে ভারী খড়মের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বদিনাথ মুখুজ্যে বোধহয় কলঘরে নামছেন। বাইরে নিশ্চয়ই ঝলমলিয়ে রোদ উঠেছে। দ্বিজপদর ঘরেও হলুদ রোদের ছোপ ধরেছে। দেওয়ালে ঝোলানো আধ-ময়লা পাঞ্জাবী, কাঁধ-ভাঙা জলের কুঁজো, নকসা-কাটা রঙীন টিনের তালা ভাঙা বাক্স, নানা রঙের ছোপ-ধরা হাতল-ভাঙা দুটো কাপ, মেঝের ওপরে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা স্কেচ, একটা জল রঙে আঁকা অসমাপ্ত ল্যান্ড-স্কেপ, রং তুলি, ইজেল, ক্যানভাস সবই দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে।

নাঃ, আর বিছানা কামড়ে পড়ে থাকলে চলবে না—দ্বিজপদ ভাবল সুরুচি ভবনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করলেই সর্বনাশ। ঘড়ি ধরে চলেন মিসেস গোস্বামী। মুকেশর খাস্তগীরের সেই বাঁধানো দাঁতের খিক্ খিক্ হাসি—দ্বিজপদর পেয়ালা আর ঠোঁটের মধ্যে সব সময় ফাঁক থেকে যায়। দেখো যেন নিজের গাফিলতিতে এত বড় কাজটা হাত-ছাড়া না হয়ে যায়।

নাঃ আর দেরী নয়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল দ্বিজপদ। বিছানার চাদরটা গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিল। কুঁজোটাকে হাতের মুঠোয় ধরে সিঁড়ির মুখে পা বাড়াল। নীচে কলঘরে নিশ্চয়ই এতক্ষণে লাইন পড়ে গিয়েছে। ঠন-ঠান ঘটি-বালতি কলের মুখে দরদর জল পড়ার শব্দ সবই শোনা যাচ্ছে। অভয় মিস্ত্রির বৌটা তারস্বরে চীৎকার করছে। বোধহয় বাসি মুখেই সোমত্ত মেয়েটাকে শাপ-শাপান্ত, গালাগাল শুরু করে দিয়েছে। কলঘরের চাতালে বদিনাথ মুখুজ্যের ফ্যাসফেসে গলার হাসি শোনা যাচ্ছে। মুখ ধুতে, কুঁজোয় জল ভরতে লাইন দিতে হয় কিনা কে জানে। পেচ্ছাবখানাটা খালি পেলে হয়। দ্বিজপদ দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে বেশ জোর পায়েই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। নীচে সিঁড়ির বাঁকেই সোনা বৌ-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। রোজই খুব ভোরে বদিনাথ মুখুজ্যে কলঘরে নামার আগেই সোনা-বৌ স্নানের পাট চুকিয়ে ফেলে। আজ বোধহয় দেরী হয়েছে কোন কারণে। সোনা-বৌ এক হাতে জলের বালতি আর কাঁখে জল-ভরা কলসী নিয়ে দ্বিজপদর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। সোনা-বৌ-এর আঁটো-সাটো কথা শরীরের যৌবন লোভের ছায়া হয়ে ফুটে উঠেছে ভিজে শাড়ির আয়নায়। বুকের ওপরেও সেই ছায়ার রঙ। দ্বিজপদর লোভী চোখের দৃষ্টি তীরের মত বিঁধে গেল সেই বুকের গায়ে।

সোনা-বৌ ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল—কি গো ঠাকুরপো, আজ যে সাত-সকালেই কুঁজো হাতে কলঘরে নামলে? সূর্যি কোন দিকে উঠল গো? তারপর কলঘরের দিকে একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে ঠোঁট দুটো বাঁকিয়ে সোনা-বৌ ফিস্ ফিস্ করে বলল—দ্যাখোনা, আজ গা ভিজিয়ে স্নানই করতে পারলাম না। আজ কলে জল আসতে দেরী হয়েছে। ভাবলা মিনসে বদিনাথ কলঘরে নেমে পড়ে এমন অসভ্যতা শুরু করেছে। তাড়া-তাড়ি গায়ে মাথায় দু-ঘটি জল ঢেলে পালিয়ে এলাম।

দ্বিজপদ নিঃশব্দে হাসল।

সিঁড়ির মুখেই সোনা-বৌ-এর ঘর। সোনা-বৌ দ্বিজপদর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দ্বিজপদর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল—মুখ ধোওয়া হয়ে গেলে একবার আমার ঘরে এসো। কথা আছে। আমি চায়ের জল চাপাচ্ছি। দেরী কোরনা যেন।

সোনাবৌ-এর শরীর থেকে বৃষ্টি-ভেজা মাটির মত খুব টাট্কা একটা গন্ধ ভেসে এলো। দ্বিজপদর নিশ্বাসটা চনমন্ করে উঠল।

মাঝে মাঝেই সোনাবৌ-এর ঘরে ডাক পড়ে দ্বিজপদর। সোনাবৌ-এর বুকের মধ্যে অনেক দুঃখ জমেছে। সোনাবৌ খুব ভাল করেই জানে—দ্বিজপদ সেই দুঃখের পাহাড়ে এতটুকুও ফাটল ধরাতে পারবে না। তবুও দ্বিজপদকে ঘরে ডাকে সোনাবৌ, ওর সামনে পা ছড়িয়ে বসে দুঃখের কাহিনী শোনায় আর দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে চোখের জল ফেলে।

দ্বিজপদ পেচ্ছাবখানা থেকে বার হয়ে এসে সামনে চোখ তুলতেই দেখল বদিনাথ মুখুজ্যে হ্যাংলা চোখে সোনা-বৌ-এর ঘরের দিকে চেয়ে আছে। দ্বিজপদকে কলঘরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বদিনাথ মুখুজ্যে হঠাৎ পৈতেটাকে খুব জোরে জোরে দু-হাত দিয়ে ঘষে-মেজে ময়লা তুলতে লাগলেন। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় খ্যাক্ খ্যাক করে হেসে উঠে দু-চোখের দৃষ্টিতে শেয়ালের ধূর্ততা ফুটিয়ে তুলে বললেন—ওহে ছোকরা, সোনামণি কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কি ফুস-মন্তর দিলে? বেড়ে আছ বাবা, জোয়ান ছেলে, শরীরে তাগদ আছে, তার ওপরে লালটু চেহারা, মেয়ে-ছেলে যেচে পড়ে পীরিত করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখেই সোনামণির পেসাদ পেলে বাবা। দিনটা আজ ভালই কাটবে, কি বল হে ছোকরা। যাক্ তোমার খবর কি বল। আর তো আমার কাছে এলেই না।

দ্বিজপদ বদিনাথ মুখুজ্যের কথার উত্তর না দিয়ে নীরবে দাঁতে ব্রাশ ঘষতে লাগল।

দ্বিজপদর কাছে কোন সাড়া না পেয়ে বদিনাথ মুখুজ্যে বোধহয় দমে গেলেন। খুব জোরে জোরে হাতে পায়ে, ঘাড়ে গলায় গামছা ঘষতে লাগলেন!

বদিনাথ মুখুজ্যের স্নান সারা হয়ে গেল। কলের মুখে বালতিটা পেতে দিয়ে দ্বিজপদর পাশে এসে দাঁড়ালেন। দ্বিজ-পদর কাঁধের ওপরে হাত রেখে নীচু গলায় বললেন—ছবি এঁকে আর কতকাল চলবে হে? ভবিষ্যতের বারোটা বেজে যাবে যে। ওসব বদখেয়াল ছাড় হে ছোকরা। একটা চাকরী-বাকরী জুটিয়ে নাও। তারপর বেথা করে ঘর-সংসারে মন দাও। এদেশে ছবি এঁকে কারও ভাত জুটেছে শুনেছ?

দ্বিজপদর দাঁত মাজা হয়ে গিয়েছিল। বদিনাথ মুখুজ্যে কলের মুখ থেকে বালতিটা না সরালে মুখ ধুতে পারছিল না। দ্বিজপদ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। ঢাউস একটা বালতি জোগাড় করেছে বটে বদিনাথ মুখুজ্যে। জল যেন ভরতেই চায় না।

দ্বিজপদর পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন বদি-নাথ মুখুজ্যে কি হে ছোকরা, চুপ করে আছ কেন? জোয়ান বয়স—বুড়ো মানুষের কথা মনে ধরছে না—তাই না? তোমাদের আর্টিস্টদের মধ্যে খুব নাম করেছে—ব্রজ-গোপাল, না নন্দগোপাল কি নাম যেন—আজকাল আবার যার-তার নাম মনেও থাকে না। তা ঐ নন্দগোপালই এককালে এই শর্মার কাছে এবেলা-ওবেলা চাকরীর

জন্য ধর্ণা দিত। আমি কি যে সে লোক হে! রাধানগরের মুখুজ্জেদের নাম শুনেছ তো? আমি হচ্ছি সেই মুখুজ্জেদের লাস্ট জেনারেশন। বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার লাট-খাজনা দিতেন আমার গ্রেট-গ্র্যান্ড-ফাদার হরনাথ মুখুজ্জে।

দ্বিজপদর ধৈর্য আর বাধা মানছিল না। বালতিটা ভরে জল উপচে পড়ছিল। ও অসহিষ্ণু গলা কিছুটা চড়িয়ে বলল—বদ্যিনাথবাবু, বালতিটা সরিয়ে নিন। আমি মুখ ধোব।

বদ্যিনাথ মুখুজ্জে আবার খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলেন—আরে, ইয়ংম্যান, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বদ্যিনাথ মুখুজ্জের অথেনটিক স্টেটমেন্টের মধ্যে কোন ভেজাল পাবে না। কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, ইংরেজরা আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদারকে রাজা উপাধি দিয়েছিল। সেই সুবাদে আমাকেও রাজা বলতে পার। তবে রাজত্বই যখন চলে গেল, তখন আর রাজা নাম নিয়ে মাছি তাড়িয়ে কি হবে—বল? রাধানগরের চক-মিলান বাড়ীটার হলঘরে এককালে দিন-রাত্তিরের তফাৎ বোঝা যেত না। লক্ষ্ণৌর গহরজান বাঈ-এর নাম শুনেছ? ছোট গহরজান নয়—চুলবুলওয়ালী গহরজান। তা তোমরা আজকালকার ছোকরারা সেসব নাম শুনবেই বা কোথা থেকে? সেসব কি আজকের কথা হে! আমিই তখন মায়ের কোলে শুয়ে সোনার বাটিতে দুধ খেতাম। বাবারই তখন সবে গোঁফ গজিয়েছে। সবে একটু-আধটু উড়তে শুরু করেছেন। কি গলা ছিল গহরজানের। আহা মরি, মরি। তানপুরায় সুর ছাড়লে বুকের মধ্যে যেন ঝড় উঠত! গহরজান যখন বুড়ী থুড়থুড়ি—আমি ওর গান শুনেছি। বুড়ো বয়সেও গলায় কি দানা, কত সব তান-বোলতানের কাজ। যৌবনে গহরজানের রূপে নাকি আগুন জ্বলত। আমি অবশ্য গহরজানের সেই রূপ দেখিনি। মায়ের মুখে সেসব কথা শুনেছি। তবে গহরজানের মেয়ে হীরা-বাঈকে আমি দেখেছি। অমন খুবসুরৎ মেয়েছেলে আজকাল চোখেই পড়ে না। পাকা আপেলের মত টুসটুসে, কমল গাল-দুটো। আর কি গায়ের রঙ। কাঁচা সোনার মত হলুদ বরণ। তাতে লালচে আভা মেশানো। টানা-টানা সুর্মা-আঁকা চোখ, পায়ের গোছ পর্যন্ত মিশমিশে কালো চুল। কমলা-লেবুর কোয়ার মত রসালো ঠোঁট—পানের রসে রাঙানো। শরীর তো নয় যেন চাবুক—আহা কি বুক, পাছা, চলনে-বলনে কি ঠমক। তবে বেশী বয়সে শরীরটা একটু ভারী হয়ে গিয়েছিল—যাকে বলে অ্যাল-কহলিক ফ্যাট আর কি—বেশীক্ষণ এক-নাগাড়ে নাচতে পারত না। সেসব কথা মনে হলে এই বয়সেও জিবে নাল করে। মায়ের মুখে শুনেছি—গহরজান যখন ঠাকুর্দার বাঁধা মেয়েছেলে হয়ে মুখুজ্জেদের বাগান-বাড়িতে এসেছিল, তখন ওর রূপে ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে। সঙ্গে মেয়ে হীরা-বাঈ। মেয়ের বয়স আর কত হবে—এই ধর ষোল-সতের। মায়ের মুখ যেন মেয়ের মুখে বসানো। তখনও মেয়ের নথ-ভাঙা হয়নি। ওহো তুমি তো আবার নথ-ভাঙার ব্যাপার-স্যাপার বোঝ না। যাক সে কথা। মেয়েকে দেখে মায়ের কথা ভুলে গেলেন ঠাকুর্দা। বাবাও হীরাবাঈ-এর আশেপাশে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ান। মা আর মেয়েকে নিয়ে মুখুজ্জে-বাড়িতে বাপ-ছেলের সে কি তুলকালাম কাণ্ড। সে-সব কথা আজকাল গল্প মনে হবে। আজ সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। ঠাকুর্দাই বিষয়-সম্পত্তি সব ফুঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাকি যা ছিল আমার পিতৃদেব মনের আনন্দে উড়িয়ে গেছেন। এখন শেয়ালদা কোর্টের উকিল বদ্যিনাথ মুখুজ্জের মুখে সেই আজব কাহিনী কে আর বিশ্বাস করবে বল? যাক, যদি সেই কাহিনী শুনতে ভাল লাগে তো একদিন আমার ঘরে এসো—তোমাকে শোনাব সেই আজব কাহিনী।

দ্বিজপদ সত্যিই মুগ্ধ হয়ে বদ্যিনাথ মুখুজ্জের গল্প শুনছিল। বালতি উপচিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ দ্বিজপদর মুখে রোদ এসে পড়ল। দ্বিজপদ চঞ্চল হয়ে উঠল। সাতটা বেজে গেছে নিশ্চয়ই। আটটার মধ্যে ওকে বেরুতেই হবে। এদিকে সোনা-বৌ-এর ঘরে ডাক পড়েছে। চায়ের তৃষ্ণাও দুর্বার হয়ে উঠেছে। নাঃ আর দেরী নয়। বদ্যিনাথ মুখুজ্জে এখনও ওর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিজপদ নিজেই কলের মুখ থেকে জল-ভরা বালতিটা বদ্যিনাথ মুখুজ্জের সামনে নামিয়ে দিয়ে মুখ ধুতে বসল।

বদ্যিনাথ মুখুজ্জে কিন্তু নাছোড়-বান্দা। আবার শুরু করলেন তাঁর অতীত বৃত্তান্ত—তা ঐ যে নন্দগোপালের কথা বলছিলাম না—ছোকরা তখন পেটে হাত দিয়ে শুকনো মুখে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। আর এই বদ্যিনাথ উকিল তখন উঠতি মাস্তান। সবে ল' পাশ করে শেয়ালদা কোর্টে যাতায়াত শুরু করেছে। তা সে নামে মাত্র কোর্টে যাওয়া-আসা। শ্বশুরমশায়ের সুবাদে এক বাঘা সিনিয়রের পাল্লায় পড়েছি। একদিন কোর্টে না গেলেই শ্বশুরমশায়ের কাছে রিপোর্ট, ধমক-ধামক, শনিবারে বাড়ী গেলে বৌ-এর ক্যাচ-ক্যাচানি কান্না। রোজই একবার নামে মাত্র কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। আর সন্ধ্যে হলেই ইয়ার-বন্ধু জুটিয়ে সোনাগাছির অলিগলিতে নোতুন মেয়েছেলের খোঁজে বেড়াই। আসলে আমি তখন লক্কা-পায়রার মত উড়ে বেড়াচ্ছি। বাপ আর শ্বশুরের পয়সায় ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। এক বন্ধুর সুপারিশে নন্দগোপাল আমাকে চাকরীর জন্য ধরল। ছবি এঁকে নাকি আর দিন চলে না। একটা চাকরী-বাকরী না জুটিয়ে দিলে নাকি অনাহারে মরবে।

এক বিলাতী কোম্পানীর বড় সাহেব মিঃ স্টুয়ার্ট আমার এক গেলাসের ইয়ার ছিল। স্টুয়ার্ট সাহেবকে ধরে নন্দগোপালকে সেই কোম্পানীর অফিসে ঢুকিয়েও দিয়েছিলাম। কিন্তু নন্দগোপাল চাকরী রাখতে পারল না। মাসের মধ্যে পনের দিন কামাই করলে কে আর চাকরীতে রাখবে বল? তা নন্দ-গোপালের কথা যাক। তুমি আজ সন্ধ্যে-বেলায় আমার ঘরে আসছ তো?

দ্বিজপদর মুখ ধোওয়া হয়ে গিয়েছিল—সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বদ্যিনাথ মুখুজ্জে ওর মুখের সামনে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল—একটা ভাল চাকরীর খোঁজ আছে হে। সন্ধ্যেবেলায় এসো আমার ঘরে। আমি রেকমেণ্ড করে চিঠি দিয়ে দেব। ওরা আমার কথা ঠেলতে পারবে না।

দ্বিজপদ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। ভদ্র-লোকের মুখে এত দুর্গন্ধ যে পেটের ভাত পর্যন্ত উঠে আসে। দ্বিজপদর খালি পেটটা শুধু আর একবার মোচড় দিয়ে উঠল। ওকালতিতে পসার করতে পারেননি বদ্যিনাথ মুখুজ্জে। সারাজীবন শেয়ালদা কোর্টের গাছতলায় ছেঁড়া কোট গায়ে দিয়ে বসে রইলেন মক্কেলের আশায়। নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকতে গিয়ে ক্ষমতা আর সম্ভ্রমের অনেক মিথ্যা কাহিনী রচনা করেন। প্রায়ই মেসের টাকা বাকি পড়ে। 'মিল' বন্ধ হয়ে যায়। বদ্যিনাথ মুখুজ্জে কিন্তু রান্নাঘরে একবেলা-ওবেলা নির্লজ্জের মত আসন পেতে বসে থাকেন। বদ্যিনাথ মুখুজ্জের ভাড়া বাকি পড়ে মাসের পর মাস। যাচ্ছেতাই গালাগাল করে যায় বাড়ীর মালিক। ভদ্রলোক মুখ লুকিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকেন। মালিক চলে গেলে আস্ফালন করে সারা বাড়ী মাথায় তোলেন।

বদ্যিনাথ মুখুজ্জে প্রায়ই দ্বিজপদকে চাকরীর লোভ দেখিয়ে ঘরে ডাকেন। দ্বিজ-পদ খুব ভাল করেই জানে—ভদ্রলোক আজ সন্ধ্যেবেলা কেন ওকে ঘরে ডেকেছেন। হয় ওকে অতীত ঐশ্বর্যের গল্প শুনিয়ে টাকা ধার চাইবেন, না-হয় সোনাবৌ-এর জন্য হ্যাংলামি করবেন।

স্ত্রীর ভাঙা দেহের ওপরে অনেক অত্যাচার করেছেন বদ্যিনাথ মুখুজ্জে। গণ্ডা-দুই ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে এখন তোবড়ানো গালচোপসানো শুকনো শরীরে মরবার হয়ে গিয়েছেন ভদ্রমহিলা। শেষের দিকে এক গণ্ডা ছেলেমেয়ের কেউ অন্ধ আর না হয় নুলো। অভয় মিস্তির মুখেই এসব কথা শুনেছে দ্বিজপদ। ছোট ছেলে-টার বছর-চারেক বয়স ছিল। এখনও মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। জন্তুর মত আঁ আঁ করে আর বুকে হেঁটে হামাগুড়ি দেয়। বদ্যিনাথ মুখুজ্জে আজকাল পুজোর ছুটিতেও বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। এ-বাড়ীর সবাই জানে—সন্ধ্যে হলেই ভদ্র-

লোক পাড়ের ঝি-বৌদের সস্তা ছেঁড়া-ছেঁড়া খোঁজে ছোঁক্ ছোঁক্ করে ঘুরে বেড়ান। সোনাবৌ-এর ওপরে অনেক দিন আগেই ওঁর চোখ পড়েছে। সোনাবৌকে আদর করে ডাকেন—সোনামণি। অনেকবার সোনাবৌ-এর কাছে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছেন—মদ খেয়ে হঠাৎ দরজা খোলা পেয়ে সোনাবৌ-এর ঘরে ঢুকেও পড়েছেন। কিন্তু সোনাবৌ বড় মুখরা। চিৎকার করে আশপাশ জড় করেছে। বঁটি নিয়ে তেড়েও গিয়েছে। বদিনাথ মুখুজ্জ্যে পালিয়ে বেঁচেছেন।

মাসকয়েক ধরে দ্বিজপদর পিছনে লেগেছেন বদিনাথ মুখুজ্জ্যে। দ্বিজপদর কথা নাকি সোনামণির খাতির আছে। সোনামণির বড় ভুবন বিশেস চুনা একটা আস্ত পাঁঠা। তা না হলে ঘরে অমন ডবকা বৌ ফেলে কলে-কারখানায় বদ্‌লি খেটে মরে বেড়ায়? দ্বিজপদ যদি বলে-কয়ে সোনামণিকে রাজি করাতে পারে তো বদিনাথ মুখুজ্জ্যে ওকে মাথায় তুলে রাখবেন।

দ্বিজপদ আজকাল বদিনাথ মুখুজ্জ্যেকে এড়িয়ে চলে। লোকটাকে দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে। গালের ওপরে কালো কালো ছোপধরা খসখসে কোঁচকানো চামড়া, চোখের নীচে দু থাক থলথলে মাংস, ঠোঁটের দুপাশে ঘা। অভয় মিস্ত্রি বলে—বদিনাথ ডাক্তারের নাকি সিফিলিস আছে। দাঁতের মাড়িগুলো পচে ক্ষয়ে বাসি মাংসের মত পাণ্ডুটে রঙ ধরেছে। কাছে দাঁড়িয়ে কথা বললে মুখের দুর্গন্ধে পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে।

বদিনাথ মুখুজ্জ্যের সূর্যস্নান শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ-বাড়ীর পূব-আকাশ জুড়ে উঁচু একটা পাঁচতলা বাড়ী আড়ালে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আকাশ দেখতে হলে পশ্চিমে মুখ ঘোরাতে হয়। বদিনাথ মুখুজ্জ্যে রোজই স্নান সেরে পশ্চিম আকাশের দিকে মুখ করে জবাকুসুম সঙ্কাশং সূর্যদেবকে প্রণাম নিবেদন করেন। সূর্যদেব কিন্তু পূব-আকাশের কোলে ঘন কালো চাদরে মুখ ঢেকে বসে থাকেন। বদিনাথ মুখুজ্জ্যে আজ ও সূর্যপ্রণাম সেরে কাশতে কাশতে ভাঙা গলায় মায়ের নাম স্মরণ করলেন—তারা, তারা ব্রহ্মময়ী মা।

তারপর জল-ভরা বালতিটা হাতে নিয়ে একবার পদ তুলে সিঁড়ির মুখে পা বাড়ালেন।

দ্বিজপদ ভাবছিল—স্নানটা সেরে নেবে কিনা। কিন্তু চৌবাচ্চার জল কনকনে ঠাণ্ডা। এখন আর কাশির বেগ নেই। তবে জলে নামলেই খক খক কাশির সঙ্গে দলা দলা শ্লেষ্মা উঠছে। গাঁটে গাঁটে এখনও চিনচিনে বেদনা। মাথাটা এখনও বেশ ভার ভার লাগছে। জ্বরের মুখে এখনও জলের স্বাদ বেশ তেতো। সোনাবৌ-এর কাছ থেকে একটা বালতি চেয়ে নিয়ে এসে জলের মধ্যে গরম জল মেশালে কেমন হয়। টুবকা ভাজ

হুড়হুড় করে মাথায় গায়ে ঢেলে দিয়ে স্নানের পাটটা চুকিয়ে ফেলা যায়।

দ্বিজপদ পিছন ফিরে চাইল। না, কলটাকে আর আটকে রাখা যাবে না। অভয় মিস্ত্রির মেয়ে মলিনা পুরো কলসীটা কাঁখে নিয়ে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল-বেলায় ঘুম থেকে উঠে বাসিমুখেই বোধহয় মায়ের কাছে একচোট বকুনি খেয়েছে। অভয় মিস্ত্রি সাত-সকালে কাজে বার হয়ে যায়। মেয়েটাকে দোকানপাট, ঘরের কাজ, রান্নাবান্না সবই একহাতে করতে হয়। অভয় মিস্ত্রির বৌ হাঁপানীতে ভোগে। দিন-রাত দরজার সামনে বসে খক্ খক্ কাশে আর মুখ দিয়ে বিষ ওগরায়। যখন-তখন কারণে অকারণে মেয়েটাকে একনাগাড়ে গালাগাল করে, মলিনাকে গলায় দড়ি দেওয়ার উপদেশ দেয়। মলিনা কাইশ পেরিয়ে তেইশে পড়েছে কিন্তু অপুষ্ট দেহে বয়স বোঝা যায় না। অভয় মিস্ত্রি অনায়াসে পাত্রপক্ষের কাছে মেয়ের বয়স ষোল-সতের বলে চালিয়ে দেয়।

মলিনাকে দেখে পাত্র-পক্ষ ভুরু কোঁচকায়। অভয় মিস্ত্রি আস্ফাল দেয়—বিয়ের জল গায়ে পড়লেই মেয়ে ফেটে-পড়ে উঠবে।

কিন্তু মলিনার শুধু সাফাই সার হয়। মেয়ে দেখে পিছিয়ে যায় পাত্র-পক্ষ। বিয়ে হয় না মলিনার।

অভয় মিস্ত্রি বেশ কিছুদিন দ্বিজপদর পিছনে ঘুর ঘুর করেছিল। অভয় মিস্ত্রি নাকি জাতে বামুন। বাবা ইস্কুল-মাস্টার ছিলেন। ছোটবেলায় বয়ে গিয়েছিল অভয় মিস্ত্রি। একদিন বাপের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে মায়ের গহনার বাক্স ভেঙে বাড়ী থেকে চম্পট দিয়েছিল। কিছুদিন এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির পরে শেষপর্যন্ত একটা লোহা-এর কারখানায় ঢুকে পড়েছিল। কুল-মিস্ত্রি অভয় চাটুজ্যের পৈতা না থাকলেও বংশ-কৌলীন্য আছে। দ্বিজপদ যদি মেয়েটাকে বিয়ে করে তো এক গরীব ব্রাহ্মণ কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পায়।

অভয় মিস্ত্রি দ্বিজপদকে রাজী করাতে না পেরে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। অভয় মিস্ত্রির বৌ শেষপর্যন্ত মেয়েটাকেই দ্বিজপদর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল।

মলিনা ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসত। যখন-তখন ওর ঘরে ঢুকে পড়ে গল্পের বই চাইত, কুঁজোয় জল ভরে দিত, বুকের আঁচল কোমরে জড়িয়ে অপুষ্ট যৌবনের লোভ দেখিয়ে আড়চোখে শুধু করে দিত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দ্বিজপদ ঘরে বসে স্কেচ আঁকছিল। মলিনা গা ধুয়ে খোঁপা বেঁধে, মুখে পাউডার দিয়ে, পাউডার মেখে দাঁড়িয়ে দ্বিজপদর ঘরে ঢুকল। বিছানার ওপরে পা ঝুলিয়ে বসতে গিয়ে ডুরে-শাড়ির আঁচলটা বুক থেকে খসে পড়ল।

বুকের ওপরে একবার আড়চোখে চেয়ে আঁচলটা কাঁধের ওপরে তুলে দিল। তারপর যত সব আজেবাজে হাসি ছবির গল্প জুড়ে দিল। দ্বিজপদ একমনে ছবি আঁকছিল আর মলিনার কথায় কান না দিয়েই মাঝে-মধ্যে হুঁ-হাঁ করছিল।

মলিনা হঠাৎ দ্বিজপদর কাছে ঘন হয়ে এসে ওর বুকের ওপরে ঝুঁকে পড়ে বলল—দ্বিজদা, আপনি কখনও কোন মেয়েকে ভালবেসেছেন?

দ্বিজপদ মলিনার প্রশ্নে চমকে উঠে হাতের কাজ থামিয়ে দিল। তারপর মলিনার চোখের ওপরে কঠিন, কঠোর দৃষ্টি ফেলল।

লজ্জায় মুখ নামিয়ে ফেলেছিল মলিনা। ঘাড় গুঁজে বসে আঙুল দিয়ে চাদরের ওপরে হিজিবিজি কাটছিল।

সেদিন মলিনাকে ভয় দেখাতে বাধ্য হয়েছিল দ্বিজপদ।

মলিনাকে নিয়ে কোনদিন কোন নৈতিক ভাবনা দ্বিজপদর ছিল না। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের নৈতিক বিশ্বাস এবং বোধ থেকে সে অনেক আগেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস, প্রেম এবং বিবাহের নৈতিক কর্তব্য, শরীর নিয়ে পবিত্রতার ভাবনা—জীবনের সব বন্ধন থেকে প্রতিনিয়ত মুক্তি খোঁজে দ্বিজপদ। মলিনার শরীর নিয়ে দ্বিজপদ যে মাঝে-মধ্যে ভাবেনি তা নয়। কিন্তু কোনদিন আসঙ্গ-লিপ্সা জাগেনি ওর মনে। যদি মলিনার অপুষ্ট শরীর ওর বাসনার আগুনে ধরাত, তবে সেই শরীরের ছোট ছোট টুকরোগুলোকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বাধাহীন বাসনার আগুনে ছাড়িয়ে দিয়ে ওকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিতে দিয়ে দ্বিজপদ নিশ্চয়ই বিবেক নামক প্রবঞ্চনার শিকার হত না।

রাতে কখনও ঘুম আসতে দেরী হলে রাতের মধ্যে শুক্রকীটরা অস্থির হয়ে উঠলে দ্বিজপদ কল্পনায় মলিনার দেহটাকে নগ্ন করে আসঙ্গ-লিপ্সার সুখ খুঁজেছে। কিন্তু মলিনার শরীরে সুখের কোন আয়োজনই নেই, উত্তাল ঢেউ-এর দোলায় দোল খেতে খেতে দুরন্ত বাসনার স্রোতে ভেসে যাওয়ার সুখ নেই। মলিনার সঙ্গ ওকে পীড়া দেয়, অসুখী করে তোলে। কাছে এলে মনে বিতৃষ্ণা জাগে। কিন্তু একটা স্থূল স্বার্থবোধ একদিন ওকে মলিনার প্রতি সহনীয় করে তুলেছিল। মলিনা ওকে অনেক বিরক্তিকর কাজের ঝামেলা থেকে রেহাই দিয়েছে। কুঁজোতে জল ভরে দেয় মলিনা, মাঝে-মধ্যে ঘরটাকে সাফসুতো করে বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় ময়লা হয়ে গেলে কেচে দেয়। দ্বিজপদ কোনদিন

CENTRAL LIBRARY

এসব কাজে মলিনাকে বাধা দেয়নি। বরঞ্চ ওকে খুশী রাখার জন্য মাঝে-মাঝে দু-চারটে সস্তা উপন্যাস আর সিনেমা-পত্রিকা কিনে এনে দিয়েছে।

সেদিন কিন্তু দ্বিজপদ কোন স্বার্থ-বোধকে প্রশ্রয় দিল না। মেয়েটা মাসুখে বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। আর ওকে বাড়তে দেওয়া যায় না। দ্বিজপদ একটা সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছাল মলিনাকে ভয় দেখাতে হবে। ভয় দেখিয়ে ওকে তাড়াতে হবে।

মলিনা তখনও ঘাড় গুঁজে বসেছিল। দ্বিজপদ হঠাৎ মলিনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। মলিনার অপুষ্ট শীর্ণ দেহটা দ্বিজপদর দু'হাতের মধ্যে বাঁশপাতার মত থরথর করে কাঁপছিল। দ্বিজপদ দাঁতে দাঁত চেপে বলল—এসো আজ তোমার ভালবাসার সখ মিটিয়ে দিই।

দ্বিজপদ হিংস্র আক্রোশে একটা জোর ধাক্কায় মলিনার দেহটাকে চিৎ করে বিছানার ওপরে ফেলে দিতেই মলিনা অসফুট গলায় কেঁদে উঠল—উঃ মাগো। দ্বিজপদর দু-চোখে তখন আগুন জ্বলছে, চোয়াল দুটো গালের ওপরে খাড়া হয়ে উঠেছে। মলিনার বুকের ওপরে চেপে বসেছে দ্বিজপদ, ব্লাউজটাকে টেনে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দিয়ে ওর অপুষ্ট বুকটাকে শক্ত হাতের থাবায় চেপে ধরেছে।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল মলিনা—দ্বিজদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন। বিশ্বাস করুন, রোজ রোজ আপনাকে বিরক্ত করতে আমার খুব খারাপ লাগে। কিন্তু মা জোর করে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় আপনার ঘরে। না আসতে চাইলে গালাগাল মারধোর করে। দয়া করে আজ আমাকে ছেড়ে দিন। আর কোনদিন আপনার ঘরে আসব না, আপনাকে বিরক্ত করব না। জানি আপনি আমাকে বিয়ে করতে পারেন না। আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে নষ্ট করে দেবেন না।

মলিনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। দ্বিজপদ ওকে ছেড়ে দিল।

মলিনা বুকের ওপরে আঁচলটা চেপে ধরে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছিল। দ্বিজপদ ওকে ডাক দিল—শোন আমার পিছনে আর অযথা ঘুরো না। কোন লাভ নেই আমাকে বিরক্ত করে। তোমার বাবার সঙ্গে আমি কথা বলব। কোন ভাল ছেলের খোঁজ পেলে তোমার বাবাকে জানাব। শরীর স্বাস্থ্য ভাল কর। শরীরে চেকনাই ধরলে, ভালবাসার লোক নিজেই তোমার কাছে ছুটে আসবে। দিনে পরনায় বিয়ে হয়ে যাবে। যাও, ঘরে গিয়ে নিজের কাজকর্ম কর।

রামপ্রসাদের পঞ্চবটী/হালিশহর

মলিনা ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে গিয়েছিল।

অতর মিস্ত্রি আজও দেখা হলেই তাগাদা দেয় দ্বিজপদকে। কবে যেন অতর মিস্ত্রিকে আশ্বাস দিয়েছিল—মলিনার জন্য পাত্র খুঁজে দেবে।

দ্বিজপদ আজও মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে চলে অতর মিস্ত্রিকে। স্থির, অবাধ ধারণার বন্ধন দিয়ে অস্তিত্বের অজস্র মুক্ত সম্ভাবনাগুলোকে বেঁধে ফেলতে চায় না দ্বিজপদ। জীবনের সর্বত্র মুক্তির অন্বেষণ করে দ্বিজপদ। পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, ভগবান, সমাজ-ইতিহাস স্থির অবাধ, সব ধারণার বন্ধন দিয়ে মানুষের প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্বকে বেঁধে ফেলছে, অথচ মানুষ মুক্ত হয়ে—ভবিষ্যতের অজস্র সম্ভাবনা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। মানুষের জীবনে কেন এই বৈপরীত্য কেন এই প্রবঞ্চনা, কেন প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বের মুক্তির অন্বেষা অথচ বন্ধনের স্বেচ্ছাকৃত যন্ত্রণা—দ্বিজপদকে এই অস্থির প্রশ্ন একদিন পাগল করে তুলেছিল। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দ্বিজপদ আজ ঘর ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অতর মিস্ত্রিকে সেই অন্বেষার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে দেবে না দ্বিজপদ। তাই সে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে অতর মিস্ত্রিকে দূরে সরিয়ে রাখে।

মলিনা শূন্য কলসীটা কাঁখে নিয়ে বিষণ্ণ চোখে কলঘরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। দ্বিজপদর চোখের ওপরে চোখ পড়তেই মুখটা নামিয়ে নিল।

মলিনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল দ্বিজপদ। মেয়েটার যৌবনে হঠাৎ যেন আলো জ্বলে উঠেছে। রক্ত-মাংসে ভর-ভরন্ত হয়ে উঠেছে অপুষ্ট দেহ। গলার নীচে ঠেলে-ওঠা কণ্ঠার হাড়, কাঁধের দু'পাশে উঁচু পাখনা, শীর্ণ শিরওঠা বাহু, অপুষ্ট বুক নিতম্ব, পায়ের গোছ—রক্ত-মাংস আর মসৃণ চামড়ার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে ঝকঝক করছে। গালের ওপরে লালচে আভা ধরেছে। নধর, পুষ্ট গলার ভাঁজ, বুকের ঢেউ, পেটের ত্রিবলী রেখা সবই স্পষ্ট হয়ে চোখের ওপরে ধরা পড়ছে।

দ্বিজপদ একদৃষ্টিতে মলিনার দিকে চেয়েছিল। মসৃণ গোলগাল হাতটা কি সুন্দর লক্ষ্মীর ভঙ্গীতে কলসীটাকে কাঁখের ওপরে জড়িয়ে ধরেছে।

দ্বিজপদর মুখের ওপরে বিষণ্ণ চোখ দুটো রেখেই লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল মলিনা। চকিতে বুকের ওপরে চোখ নামিয়েই আঁচলটাকে টেনে গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিল।

কলের মুখে জলের ধারা সরু হয়ে এসেছে। নাঃ, কলটাকে ছেড়ে দিতেই হবে। দ্বিজপদ স্নানের চিন্তাটাকে মাথা থেকে দূর করে দিল। জল-ভরা কুঁজোটা কাঁধের ওপরে তুলে ঘরে এসে ঢুকল। পাঞ্জাবীটা বেশ ময়লা হয়েছে। একটু ফিটফাট ধোপ-দুরস্ত হয়ে সুরুচি-ভবনে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু উপায় নেই। ঐ একটাই পাঞ্জাবী আছে দ্বিজপদর। দ্বিজপদ ময়লা পাঞ্জাবীটাই গায়ে চড়াল। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কাশ্মীরী শালটা বেশ ভাল করে জড়িয়ে পাঞ্জাবীটাকে ঢেকে দিল। বাবার কোন স্মৃতিই ওর কাছে নেই। ইচ্ছা করেই রাখেনি। জীবন থেকে অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে দিতে চেয়েছে দ্বিজপদ। শালটা যেন কেমন করে ওর কাছে রয়ে গিয়েছে।

নীচে নেমে সোনা-বৌএর ঘরে ঢুকল দ্বিজপদ। সোনাবৌ পা ছড়িয়ে বসে হাঁটুর ওপরে কুলোটা রেখে কাঁকর বাছছিল।

(ক্রমশঃ)

সুখের মেলা

গুণীন বুড়ী এবং জীবিত প্রেতাত্মা

ডিগবাজি খাচ্ছিল বনমালী নস্কর তার ষাট বছরের বুড়ো ধড়টাকে নিয়ে।

অম্বলশূলের ব্যথা! মাঝে-মধ্যে বছরের কোনো একদিন কিম্বা দুদিন হঠাৎ দর্শন দেয় ব্যথাটা — আর ভয়ঙ্কর কালবৈশাখীর মতন পাঁজরার হাড়গোড় মুচড়ে-মুচড়ে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যেন চলে যায়। যখন যায় মনে হয়, বোধহয় কাঁটার মুকুট পরে যন্ত্রণার দেবতা মুখ মেখে চলে গেল এবারের মতন ক্ষমা করে, আর আসবে না। কিন্তু ধূমকেতুর মতন আবার হঠাৎ এসে ভীষণ কালো চেহারায় বিকট দাঁত মেলে চোখের অগ্নি কলকাতে-কলকাতে গলার ওপর পা তুলে দেয়।

'ওরে তুই আমার শত্তুরের সংক্রমে না হলে ডাক্তারের হুকুম শুনিস না? খড়্গটা বঁটি আন, আমার গলাটা কেটে দে! আমার আর সহ্য হয় না। ভগবানের কি চোখ আছে! আমি কী এমন পাপ করেছি যে, এই শাস্তি! উঃ! কী যন্ত্রণা!" বনমালী নস্কর পেট চাপড়াতে থাকে গায়ের জোরে পটাপট শব্দ তুলে, পাগলের মতন। তার শ্বশুর-বলা কাঁচা-পাকা-চুল বুড়ি দুই দাসী আর পাঁচ ছেলের-মা বউমা গিন্নি সবাই নিজেদের কাপড়-চোপড় ঠিক রাখতে না পেরে বুড়োর মতোই একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ে। পাড়ার যত লোকজন এসে জড়ো হয়েছে বাড়িতে। কেউ ভাবা ধরে, কেউ খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বউগুলো আড় ঘোমটার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে বুড়োর যেন কীর্তি দেখছে!

বনমালীর বড় ছেলে হুঁকোয় তামাক সেজে বসে-বসে ভুড়ুক-ভুড়ুক শব্দে ধোঁয়া ছেড়েই চলেছে। আরো তিনটে ছেলে বসে আছে দাওয়ার ওপরে নিজেদের বাচ্চা-বাচ্চাদের সঙ্গে।

বড় ছেলে রাম বললে, বুড়োটা মরবার তার সাতগুণ আবার গরজায়!"

কথাটা তার বউয়ের কানে গেল। শ্বশুরের নস্যটা একটু বাগিয়ে ধরতে গেলে বুড়োর কাপড়টা সরে গেল তাই—মুখ ঝামটা মেরে বলে, 'এ্যা' মিনসের কি কথার ছিরি! হবো তোমার, একটু জ্বর হলে তাই চিত্তির পাড়া মাত করো!"

বুড়োর চার মেয়ে তাদের ছেলে-পিলেদের নিয়ে এসে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। পাড়ার রফিকের দাদি, বয়সে নাকি গুণীন ঝাঁসাবুড়ী লাঠি ঠুকে-ঠুকে এসে বাঁকা কোমরটা হঠাৎ সোজা করে দাঁড়ায়। হাত নেড়ে ভিড় সরিয়ে দেবার মতন ইশারা করে। লোকজন সরে গেলে ঝাঁসাবুড়ী বনমালীর পেটে হাত দিয়ে দেখে বলে, 'বনতোলাটা পাক মেরে থামচে-থামচে উঠছে তো হাঁ বাবা দুলো?'

'হাঁ গো চাচী! মরে গেলুম!'

'রাম তুই ভাই একটা কাটারী নিয়ে যেয়ে চট করে জিউলী গাছের ছাল তুলে আন খানিকটা। শিলে থেঁতো করে রস বার করে খাওয়া। বমি হয়ে যাক। অনেক পিত্তি-কফ জমে আছে প্যাটে। বেরিয়ে গেলেই শান্তি হয়ে যাবেক্ষণ। আর এক ঘটি পানি গরম করে আন। ঝাড়ফুঁক দিয়ে তবে আমি উঠব।'

গুণীন বুড়ী অনেক তুকতাক জানে বটে! ভাল গো-বদ্যি সে। কবিরাজী ওষুধও জানে। মন্তর পড়ে ঝাড়া-ফেলা, জোড়া

আঁতুড়ঘরে বা খটকা লাগলে সারনো, ছাব কাটানো জানে। প্রসবের সময় তাকে ডাকে পাড়ার মেয়েরা।

গুণীন বুড়ী বলে, 'আমার বড্ডো গাছ-গাছড়া নিয়ে সবাই পাগল হ্যালো। এই যে শ্বেতপ্রদর, মেয়েরা বলে ধাতের অসুখ, শতকরা নব্বুইটা মেয়ের হয়, হবে কাঁচা বাঁশের ঘুণ খেলে যায়; জ্বালা খারাপ থাকে, চোখে বাঁধ লাগে 'নেতমালী' বলে একরকম অসুখ হয়, রাতকানা হয়, মাথার চুল উঠে যায়—সেগুলো ভাল হয় ঝিঙাফিঙাদের গাছের শিকড় পান দিয়ে দিন-কতক খেলে।'

জিউলী গাছের ছাল তুলে এনে নিয়ে থেঁতো করে রস বার করে সেঁক বনমালীর বড় ছেলে। বুড়ী গুড়কুই দাসী বলে, 'হাঁ করো, খেয়ে ফ্যালো—বমি হয়ে যাক।'

না আমি কিছু খাব না—আমি মরতে চাই— বার-বার এমন যন্ত্রণা আমার সহ্য হয় না। বেটারা জমি-যায়গার দলিল বার করে নিয়ে বসে আছে! এই আমার হাতের মুঠোয় সিন্দুকের চাবি। জ্ঞান হারালেই ছেলেরা কেড়ে নেবে। মরে যাবার আগে তুলসীতলায় শুইয়ে দিয়ে গালে গঙ্গাজল ঢেলে দিয়ে এসে টাকা-পয়সা বখরা করতে বসবে। শ্মশানে যাবার আগে মদ টেনে নিয়ে হরিবোল মারবার বল পেতে গেলে তো টাকা চাই? পাবার-পোরা টাকার জন্যে মুখিয়ে আছে। শ্মশান থেকে আমাকে দাহ করে ফিরেই জমি, ধান, ফসলের বখরা নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করবে!'

গুণীন বুড়ী চোখ পিটপিট করে হাসে। বলে, 'তাহলে তো বুনো তোর মরা উচিত হবে না বাবা! লে, দাওয়াইটো খেয়ে ফ্যাল এক ঢোক লেরে ভগমানের নাম করে।'

সবাইয়ের জবরদস্তিতেই যেন মুখচোখ বিকৃত করে ওষুধটা গলাধঃকরণ করে বনমালী।

তারপরেই বমির বেগ ওঠে। হুড়হুড় করে পিত্ত উঠতে থাকে। কলসীখানেক বমি হয়ে যায়। তারপর গরম জল খাওয়ানো হয়। বনমালী আবার বমি করে-করে জল তুলতে থাকে। নেতিয়ে পড়ে সে।

গুণীন বুড়ীর কাজে সবাই সন্তুষ্ট হয়। শুধু বনমালীর চার ছেলে নয়। রাম লক্ষ্মণ ভরত 'শত্রুঘন' মাথা গুঁজে বসে আছে। রামের চোখে-মুখে রীতিমতো বিরক্তির ভাব।

গুড়কুই দাসী বলে, 'মার আঁতুরে 'হঠাৎ' করে 'বনতোলা'টা ধরল আঁকড়ে। ভোরবেলা তো ভীষণ বিক্রম, ন্যাংটো-ম্যাংটো হয়ে ছুটে গেল পুকুরে ঝাঁপ দেবার জন্যে। গলায় দড়ি দেবে গোয়ালে গরুর দড়ি খুঁজতে গেল। আমি কি ধরে রাখতে পারি!'

'অম্বলের রুগীর বেশি জল খাওয়া দরকার। আট সের জল খেতে হবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। বেশি জল খেলে সব ময়লা-'ঘোলানি' 'শরীর' থেকে বেরিয়ে সাফ হয়ে যায়। সামান্য গাছ-গাছড়ার ছাল-শিকড়-পাতা কত যে কাজে লাগে, আমরা জানি না। মানুষের 'উপকারে' লাগার জন্যে সমস্ত গাছপালা তৈরি হয়েছে। শুধু আমরা জানি না কোনটা কোন রোগে লাগে। ধরো, গরুর রোগ হয়েছে, বাঁধা ডাক্তার আসেনি? হাতীশুঁড়ের শিকড়, আড়াইটা গোল-মরিচ, তিন গাঁট হলদি, তুলসী পাতা আর গঙ্গাজল দিয়ে বেটে খাইয়ে দাও গরুকে— —তারপর বাঁধা ভোলো। পায়ে হাতে চোট লাগলে 'পিপলোন' গাছের ছাল বেটে, পোঁড় থেঁতো করে নিয়ে গরম করে প্রলেপ দাও—না হয় চুন-হলুদ গরম করে বসিয়ে দাও—ব্যথা সেরে যাবে। হাড় ভেঙে গেলে ঠিক করে বসিয়ে 'হাড়ভাঙা' গাছ এনে জড়িয়ে বেঁধে দাও—জুড়ে যাবে। লোক তাবক বিশ্বাস করত না। তাকে সাঝুম একদিন কুঁচানো এক দেঁত খাসীর মাংসকে 'হাড়ভাঙা' গাছ জড়িয়ে রেখে দিয়ে। ঘণ্টা দুয়েক বাদে দেখা গেল কুঁচানো মাংসটা জমে একটা তাল হয়ে গেছে! আমি একটা দাওয়াই জানি, এক রকম গাছের রস হাতে মেখে জ্বলন্ত আগুনে হাত গুঁজে দিলেও হাত পুড়বে না। এই যে বনমালীর 'বনতোলা' সারালুম, আমাকে কি সব ডাক্তারের মতন ফি দেবে? না দিক, উপকার আমি করব তবু মানুষের। ধান, তিল, মাংস, কড়া মিষ্টি খেতে দেবে না বনমালীকে। বেশি রাত জাগবে না। এক দুপুর শুকিয়ে থাকলেই হুড়হুড় করে পিত্তি পড়ে যাবে। নাকি কোন মহাপুরুষের বুকে ফোঁড় পিত্তি বার করে দেওয়া হয়েছিল, পিত্তিটা রাগের জননী বলে। শুনে আমি হাসলুম। পিত্তি না থাকলে মানুষ বাঁচে কি? এক ফোঁটা, এক ফোঁটা করে ঠিক নিক্ত মাত্রা পিত্তি পড়লে তবেই আমাদের খাবার হজম হয়। কিন্তু বেশি পিত্তি পড়লেই মানুষ পাগল হয়ে যাবে। মার নিয়মে চাইতে বেশি পিত্তি পড়ে তার মেজাজ কড়ুয়া। রাগ বেশি।

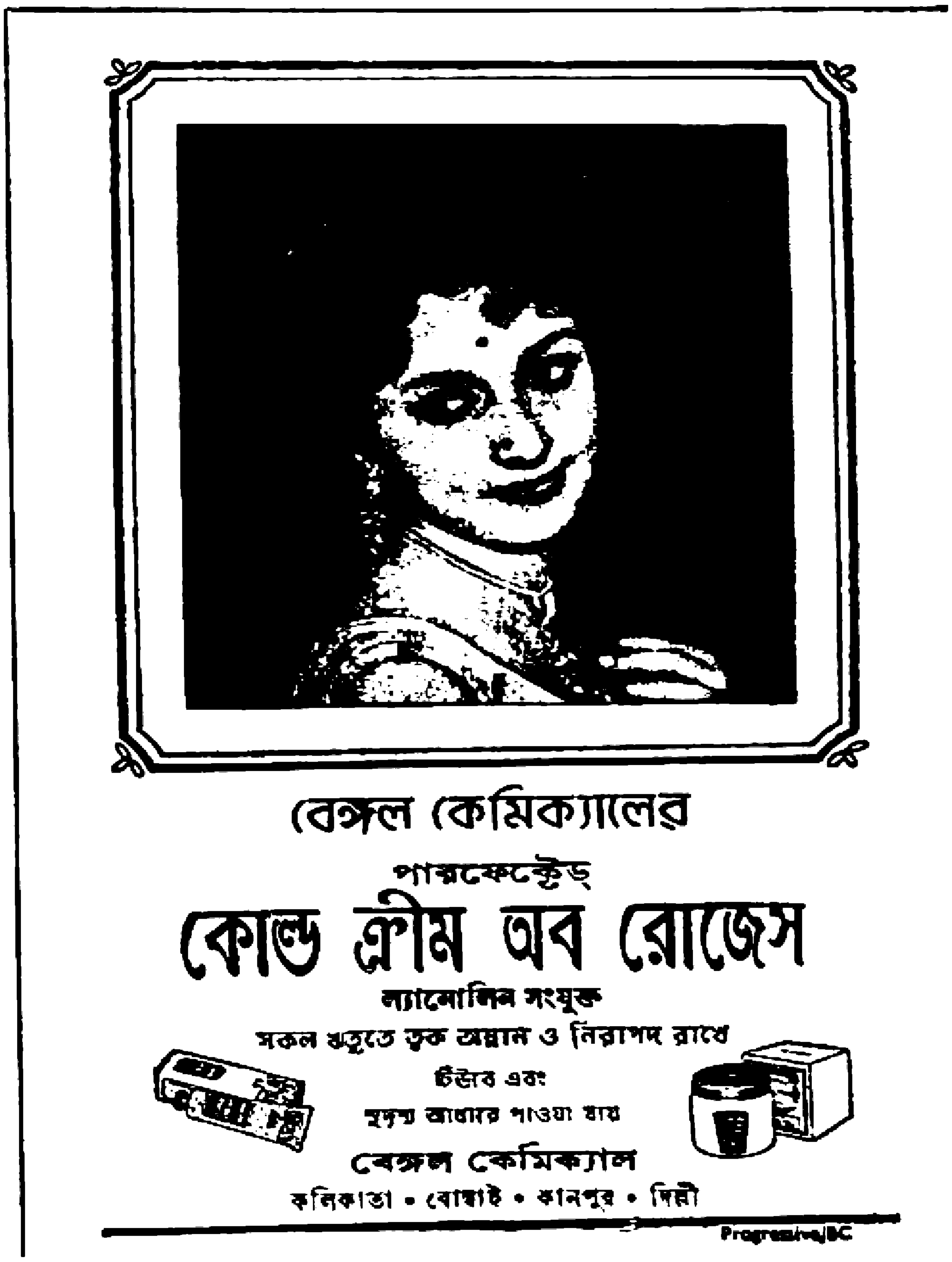

হাসিই হল জীবনের লক্ষণ। যে যত হাসতে পারবে অর তত বেশি পরমায়ু হবে।'

বনমালী নস্কর উঠে বসে। তখনো যন্ত্রণা তার যায় নি। গুণীন বুড়ি বললে, দিচ্ছে এনে বেটে খাওয়াও। পেঁপের তরকারী খাবে। আধা-বেলা যত খাবে তত উপকার। পান-জর্দা-তামাক-বিড়ি ছাড়তে হবে—তবেই যদি বাঁচতে পারো।'

গুণীন বুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে গড় করে বনমালী নস্কর। বুড়ী গদগদ হয়ে বলে, থাক বাবা থাক—এই আমার পুরস্কার। বয়েস হল, চোখে ভাল করে দেখতে পাই নি, তবু গাঁয়ের কোনো বাড়িতে মেয়েদের প্রসব বেদনা উঠলেই ছুটে আসে সবাই আমার কাছে: চাচী চলো গো একবার আমাদের বাড়ি। তা লাঠি ঠুকে ঠুকে যাই আমি 'হারকেন' হাতে নিয়ে। তা এই কাপড় আর চাদরটা দিয়েছে আমাকে যাত্রী পেলাম দিলো। ভারি ভাল লোক বেটো! বাড়িতে গেলেই মুড়ি দেয়, খাবার দেয়, ভাত না খাইয়ে ছাড়ে না।'

বনমালীর বউ গুড়ুই বুড়ী এক খোরা চাল, দুটো আলু, একটা সুপারি, পাঁচ গন্ডা পান আর আট আনা পয়সা দিলে বুড়ী এক গাল হেসে বলে, 'হাঁ গা মা, বুড়োর বউ, তুই কি আমাকে খাইখাগী পেলি, সিধে সাজিয়ে দিলি? গুড়ুই দাসী বলে, না চাচী এটা নাও, তোমার আর কে আছে? একটা নাতি ছেলে ছিল, সেও সহরে বাঁশের বিড়ি করতে গিয়ে গন্ডগোলের মধ্যে পড়ে বোমা গুলি খেয়ে মারা গেল!'

'আমার কপাল! আমার নসীব রে!' কপালে করাঘাত করে গুণীন বুড়ী। 'আমার সাজানো ছেলে, দিনে পাঁচ-সাত টাকা করে উপায় করত! আমার নসীব ...আমা তাকে সাজিয়ে দিয়ে সুখী হল... এখন তিনটে বকরী আর একটা গাই গরু পেলে একটা পাঠের জন্য চালাই কোনো-রকমে। মরলে 'কবর' দেবার একটা লোক নেই। তোরা দেখিস মা। গাইটা দুধ দিচ্ছে, মাঠ থেকে বোঝা ভরে হাজি ঘাস কেটে এনে দিই। নন্দ আদক একটা গাই পালতে দিল, আর কপাল গুণে একটা বকনা বাছুর হল—বাছুরটা দিয়ে গাইটা নিয়ে গেল। এই নিয়ম, তবে গাইটাকে আরো ছমাস পেলে 'গাবিন' করিয়ে দিতে হয়।'

কোমর ভাঙা গুণীন বুড়ী তার আঁচলে চাল আলুগুলো বেঁধে নিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে যায়। তার তুলোর মতো পাকা চুলের তাল মাথাটা চলার তালে তালে কেমন করে যেন এদিক ওদিক নাড়তে থাকে।

বনমালী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বকবকানি শুরু করে, 'এ যাত্রাও অম্বলশূলের ব্যথায় মরলুম না, গলায় দড়ি দেব না হয় জলে ডুবে মরব ঠিক করেছিলাম—আত্মহত্যা করা মহাপাপ জানি কিন্তু যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না। আর মরলে বেটারা কি আর আমার বউটাকে ভাত দেবে? জমিজমা বখরা করে নিয়ে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবে।'

বনমালীর বড় মেয়ে ঊর্মিলা বলে, 'না বাবা মরবে কেন, চিকিৎসে করাও, অসুখ সেরে যাবে। তোমার বড় জামাইকে পাঁচ-শো টাকা দিলে একটা ভাল ডাক্তারের সঙ্গে নাকি 'কন্ট্রোল' করে রোগ সারিয়ে দেবে, বলেছে সে আমাকে।'

বনমালী নস্কর হাড় কিপ্পন লোক। পুকুরের মাছ পর্যন্ত ধরে খায় না। ছেলেরা চুরি করে ধরলেও এতটুকু একটু ছোট বাটা মাছ দেবে তার পাতে। নইলে বড় মাছের পোনা বা মাথা দেখলে গালাগালি করে ভূত ছাড়িয়ে দেবে। বলবে, 'চারটে বেটার সাতটা বেটা, বড় বড় আধ-ধাড়ি হয়ে গেল; বিয়ের সময় মাছের খরচ নেই? আমার শ্রাদ্ধের সময় খরচা নেই? শালারা সাত গাঁয়ের লোক আমার কাছে সুদে হাজার দশেক টাকা নিয়েছে—কারুর আর দেবার নাম নেই। কাল অম্বরে নস্করকে টেনে এক চড় মেরেছে! পরেশ মাওলন কাজার টাকা বেঁধে নিয়ে বাজার থেকে কাংলা বেচে ফিরছিল, শালার সব টাকা কাছা খুলে ম্যাটেনী করে দেখে নিয়েছে। পায়ে ধরে বলে, আমার ভাত হবে না দাদা। ছেলেপুলেরা খিদের কেঁদে মরবে। বললুম, তোর বউয়ের যখন মালসা মালসা রক্তভাঙা অসুখ করল, হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে কে দুশো টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলরে উজোচন্ডী।'

বড়ছেলে রাম হুঁকো টানা থামিয়ে বলে, 'তোমার 'বলতোনা' সেরে গেছে তো বাবা এবার এট্টু তাগাদায় বেরোও না।'

'যাবই তো। বসে থাকব? পরের ভাতে আমি আমরা পোষাই? জমি-জিরেত এক কাঠাও তোরা পাবি না কেউ। সব বেচে খেয়ে যাব। বুড়ীর নামে লিখে দিয়ে যাব।'......

'আর মদ খাবে, তাড়ি খাবে কাকড়ার ঝড়া ঝাল-তরকারী দিয়ে। লোকজ বাঙালীদের পায়ে ধরবে সাজিয়ে। শালার হারামী বুড়ো তোমার মাথায় লাঙলের ঠিক মারলে তবে আমার গায়ের জ্বাল যায়।'

বুড়ো গজগজ করে বলে ওঠে, 'আমার যা ইচ্ছে করব, নাতনীর সঙ্গে পীরিত করব, তাদের টাকা দিলেই দুবছর করে লুকিয়ে থাকবে— পায়ে আর ধরতে হবে না। তবে তোদের মেয়ের খাকাই বড় বেশি—সোনার হার চায়।'

বড়ছেলের মায়ের মেয়ে হরিমতী হঠাৎ ছুটে এসে বুড়ো বনমালীকে ধরে ঠুকে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'রসিক নাগর, ঘাটের মড়া হয়েও না—আমি কবে তোমার কাছ থেকে হার চাইলুম হাঁ বুড়ো?'

'কাল রাত্তিরে তুই আমার ঘরে আসার পরই তো ব্যথাটা ধরল।' হাসতে হাসতে বনমালী তামাসা করে এবার।

বুড়ী খিল খিল করে হেসে বুড়োর গালে দিলে এক ঠোনা। বুড়ো মা-বাবার কীর্তি দেখে ছেলে মেয়ে বউ সবাই সরে যায় লজ্জায়। হরিমতী এক কলসী ঠান্ডা জল এনে হুড় হুড় করে ঢেলে দেয় বুড়োর মাথায়।

'এই শালী, এই শালী' বলে চেঁচাতে থাকে বনমালী নস্কর। এরকম মজা করলে অম্বল শূলের ব্যথাটা বাড়ে বটে কিন্তু মরতে আর ইচ্ছে করে না। তার সোনার সংসার—অনেক টাকা-কড়ি ছড়িয়ে আছে চারদিকে। এমন জীবনভোগী লোকের কি হঠাৎ অম্বলশূলের ব্যথায় মরা উচিত?

—আবদুল জব্বার

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪০)

পাগল মানুষও সোনার সঙ্গে পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে এসেছিল। লালটু পলটু ডুব দিয়েছিল, এক ডুব। ওরা বাড়ি এসে নিমপাতা মুখে দিয়ে আগুনে শরীর সেঁকে ঘরে উঠে গেল। বাড়ির সবকিছু এখন সাফ করা হচ্ছে। চারপাশে গোবরছড়া এবং উঠোনে সব বিছানাপত্র বের করা হয়েছে। সর্বত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। পাগল মানুষ উঠোনের উপর ভিজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হারান পাল মন্দির বাজার থেকে নতুন কাপড়, ফল-মূল, সাগু সব ঈশমের মাথায় নিয়ে এসেছে। নতুন মাটির সরা। মাটির গ্লাস, পাতিল সব এসেছে।

শশীবালা বসে নেই। গোলা থেকে ধান বের করে দিচ্ছে। মুড়ি চিড়ার ধান। মাথায় করে মনজুর নিয়ে যাচ্ছে। সময় কম, দেখতে দেখতে দশ রাত্রি পার হয়ে যাবে। এতটুকু অন্যমনস্ক নয় শশীবালা আর। অদ্ভুত একটা কষ্ট বুকের ভিতর বাজছে। খাটজোড়া মানুষটা দিনমান পড়ে থাকা। এখন ঘরটা বড় খালি খালি, ফাঁকা ফাঁকা। ঘরের ভিতর ঢুকলেই বুকটা তার হাহাকার করছে। কতদিন আগে মানুষটা তাকে এ-সংসারে নিয়ে এসেছিল। এখন সব মনে করতে পারে না। তবু মনে আছে শশীবালা বড় অবোধ বালিকা তখন। তার বাবা মেয়ে পণ নিয়েছিল বলে আদর বড় বেশি তার। মানুষটার বয়স অনেক। বড় ভয় করত দেখলে। সে মানুষটাকে প্রায় বাপের মতো সমীহ করত। এবং বড় হতে হতে এই সংসারেই শশীবালা কৈশোরের কাল যৌবনের কাল কাটিয়ে দিল। বয়সের তফাত মানুষটার সঙ্গে তিরিশের উপর। ছেলেরা জন্মেছে আরও পরে। সে তো জানত না কিছু। মানুষটা তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল। বাপের কথা মনে আসে না। মার কথাও মনে নেই। এই মানুষই তার সব ছিল। বাপ-মায়ের স্নেহ দিয়ে এই সংসারে এক অখণ্ড প্রতাপশালী মানুষ তাকে বড় করে তুলেছিল। বড় করতে করতে মানুষটা কখন তার অতি আপনার এবং নিজের হয়ে গেল। যেন তার অঙ্গের সামিল। এখন সেই মানুষ যত বয়সই হোক চলে গেলে বুকের ভিতরটা বড় ফাঁকা লাগে।

বড়বৌ এসে এসব দেখে ধমক দিল। কি দরকার মা আপনার এসব করার। আজকের দিনটা অন্তত চুপচাপ বসে থাকুন। বলে সে ওদের ডাকতেই দেখল উঠোনে কেউ নেই। পাগল মানুষ ভিজা কাপড়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

সে বলল, যাও, ভিতরে যাও। বলে তাকে ধরে নিয়ে গেল পুবের ঘরে। নতুন কাপড় দুভাগ করে ধোঁট করে দিল। একটা ধোঁট পরিয়ে দিল। আর একটা ধোঁট গায়ের করে দিল। ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ পুরোহিতদর্পণ দেখছিল। ওরা খেয়াল করে নি বড়দা তখনও উঠোনে। আকাশে তারা না উঠলে ওরা ফলমূল খেতে পারবে না। এখনও সন্ধ্যার অন্ধকার উঠোনে নামে নি। লালটু পলটু এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের ছেলেমেয়েরা উত্তরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। কে আগে তারা দেখতে পাবে। তারা দেখতে পেলেই বাবা, জ্যাঠামশাই খেতে পাবেন। ওরা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ বলল, শামা বাবারে খবর পাঠা।

শচীন্দ্রনাথ বলল, কাইল যাইব ঈশম।

পাগলমানুষের গলায় চাবির সঙ্গে কাচা বুলছে। তিনি এখন একটা কুশাসনে চুপচাপ বসে আছেন। একটা ধোঁট গায়ে উত্তরের মাঠে ছেলেদের কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন। দক্ষিণের পুকুরে বাবাকে দাহ করা হয়েছে। এ কথাটা মনে হল তাঁর।

ওরা মাঠে কি করছে! ও'র বড় জানার ইচ্ছা হল। এখন অন্ধকার হয়ে উঠছে। বড়বৌ এদিকে নেই। ছেলেরা কি করছে: মাঠে ওরা এমন কোলাহল করছে কেন। তিনি উঠবেন ভাবলেন।

তখন বড়বৌ বলল, কোথাও এ ক'দিন যাবে না। যেতে নেই।

পাগল মানুষ বড়বৌর এমন কথায় আবার বসে পড়লেন। শশীমাস্টার জানালা দিয়ে এসব লক্ষ করছে। সোনা বসে আছে ওর পাশে। সেও উত্তরের মাঠে কোলাহল শুনেছিল। ওরা কি করছে সবাই!

সে জানালা থেকে বলল, বড়বৌদি লালটু পলটুকে দেখছি না।

—ওরা তারা দেখছে আকাশে।

—তারা!

—তারা না দেখলে জল খেতে পাবে না।

—এখনও কি কোন তারা আকাশে ওঠে নি! সে বের হয়ে যাবার সময় দেখল সোনা শুয়ে আছে। ওর জ্বর গায়ে। অবেলায় ডুব দিয়ে জ্বর হতে পারে ভেবে সে নেমে গেল উঠোনে। ঘরে আরও মানুষ-জন রয়েছে। সোনা ভয় পাবে না। একা থাকলে ভয় পাবার কথা। ওকে সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়েছে। এখন ওর মনে হচ্ছে, কে সে! কে এই শ্মশানে এমন নৃত্য করে গেল! কে সে মানুষ।

সে উঠোনে নেমে এসে দেখল পাগল মানুষ তেমনি বসে আছেন। তিনিও কি আকাশের কোথায় নক্ষত্র উঠতে পারে প্রথম, লক্ষ রাখছেন। শশীমাস্টার দক্ষিণের পুকুরে যাবে ভাবল, এবং যেতে গিয়ে সে দেখল আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিমে কালপুরুষ উঠে বসে আছে। উত্তরের মাঠ থেকে ওরা দেখতে পাবে না। কারণ গ্রামের গাছপালা উত্তরের মাঠ থেকে এই কালপুরুষকে ঢেকে রেখেছে। সে যে ভেবেছিল, সেই বিদেহী কে, সে কেন এখানে এসেছিল, কি তার কাজ, আর কেনই যে সোনাকে সে এমন এটা মজা দেখাল এখন ভেবে পাচ্ছে না। সোনা ভয় পায়নি ত। ভয় পেলে কম্প দিয়ে জ্বর আসতে পারে। সে তবু এখন এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামালে না। কেবল বড়বৌর

সঙ্গে দেখা হলে বলল, বৌদি সোনার মনে হয় জ্বর এসেছে।

—সে কোথায়!

—আমার বিছানাতে শুয়ে আছে।

—থাকুক। ওর মা তো কাজ করছে। বড়দোর সাফসোফ হচ্ছে। আভা এসে সব পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এখন ও আপনার ঘরেই শুয়ে থাকুক।

শশীমাস্টার এবার বলল, লালটু-পলটু তারা খুঁজছে আকাশে, এখানে দেখুন কত তারা!

বড়বৌ আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

—তাইতো!

—এটা কি বলে তো?

—কোন্‌টা?

—ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন সাতটা তারা।

—ও, ওটা তো কালপুরুষ।

—আপনি তবে জানেন।

—জানব না!

—লালটু-পলটু এত তারা আকাশে থাকতে কেন যে উত্তরের মাঠে তারা খুঁজছে বুঝি না।

—আপনি যান। ওদের নিয়ে আসুন। পড়াশুনা নেই বলে তারা দেখবার নাম করে মাঠে নেমে গেছে।

শশীভূষণ মাঠে নেমে দেখল ওরা বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আট-দশটি ছেলেমেয়ে। ওদের এখন বয়স হয়েছে। লালটু পলটু প্রায় সাবালক হতে চলেছে। এই মৃত্যুর দিনে কিছু আত্মীয়স্বজনের মেয়ে নিয়ে নক্ষত্র খোঁজে চলে আসা শশীভূষণের ভাল লাগল না।

সে মাঠে নেমে বলল, তোমরা এত দূরে কেন! এদিকে এস।

পল্টু বলল, মাস্টারমশায় আমরা তারা খোঁজছি আকাশে।

—দেখতে পাচ্ছ না।

—না।

—এদিকে এস।

ওরা ছুটে চলে এল। ঐ দ্যাখো। কত তারা। দ্যাখো সাতটা তারা।

—দেখতে পাইছি।

—ওর নাম কালপুরুষ।

পল্টু ছুটে বাড়ি উঠে এল। চন্দ্রনাথকে বলল, ধনকাকা তারা দেখেন আইসা।

—কই?

—ঐ দ্যাখেন। কালপুরুষ।

চন্দ্রনাথ দেখল এখন আকাশে অনেক তারা। বলল, তোমরা তারা চেনো।

—হ্যাঁ, সে ঘাড় কাৎ করল এবং ছুটে নেমে এল মাঠে। যেন সে কত তারা চেনে!

তখন শশিভূষণ বলছিল, তোমরা সবাই উত্তরের দিকে তাকাও।

সবাই মুখ তুলে সোজা উত্তরের আকাশে তাকাল। পল্টু ছুটে এসেছে। সে জানে মাস্টারমশায় নিশ্চয়ই মাঠে দাঁড়িয়ে এখন এই গাছ ফুল মাটি সম্পর্কে বলছেন। সে আর কালপুরুষ দেখল না। সে মাঠে নেমে এসে দেখল, সবাই উত্তরের আকাশে কি দেখছে।

পল্টু বলল, মাস্টারমশায় কি দাখছেন।

—ওটাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে।

লালটু দেখল এখন এখানে সবাই আছে। কেবল সোনা নেই। এমন একটা আশ্চর্য সন্ধ্যায় উত্তরের আকাশে যখন মাস্টারমশাই ওদের নক্ষত্র চেনাচ্ছেন, তখন সোনা নেই ভাবা যায় না। সে বলল, মাস্টারমশায়, সোনাকে ডাইকা আনি। কারণ লালটু জানে সব বলে দিলে সোনা এলে মাস্টারমশাই আবার প্রথম থেকে বলবেন। বরং সোনা এলেই আরম্ভ হবে। সোনা এই সময়ে কাছে থাকবে না, আর ওরা ঠাকুরদার মৃত্যুর দিনে আকাশের সব নক্ষত্র চিনে ফেলবে সে হয় না। সোনা এমনিতেই বড় কি কেন স্বভাবের ছেলে। বারবার সে নানা-ভাবে প্রশ্ন করবে।

শশিভূষণ লালটুর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝালেন, ছোট ভাইটি কাছে নেই বলে কষ্ট হচ্ছে তার। লালটু এমনিতে সোনাকে খেলায় অথবা মাঠে নেমে গেলে, কিংবা ওরা যখন ডাংগুলি খেলে, সঙ্গে নিতে চায় না। সোনা বেহায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায়। লালটু মাঝে মাঝে তেড়ে আসে। সোনা ছুটে যায়, আবার কিছুদূর গেলেই সে ওদের দিকে হাঁটতে থাকে। এমন কতদিন দেখেছে শশিভূষণ। কোনদিন ওর চোখের উপর এসব হয় না। চোখের উপর করতে সাহস পায় না লালটু। কিন্তু আজ ঠাকুরদার মৃত্যুতে কেমন সব অনিত্য ভেবে ছোট ভাইটির জন্য তার কষ্টবোধ হচ্ছে। শশিভূষণ আস্তে আস্তে বলল, সে আসবে না লালটু। ওর জ্বর এসেছে। আমার বিছানাতে কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে।

লালটুর মুখ কেমন বিষন্ন হয়ে গেল। শশিভূষণ দেখল আকাশে তখন জ্যোৎস্না। আকাশে তখন ছায়াপথ আপন মহিমায় দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত। তিনি বললেন, ঐ যে জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো দেখতে পাচ্ছ, ওটা হচ্ছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সাতজন ঋষির নামে প্রতিটি নক্ষত্রের নাম। তুমি কাল্পনিক রেখা টানলে দেখতে পাবে ওদের অবস্থান ঠিক একটি জিজ্ঞাসাচিহ্নের উপর। তুমি যদি সেখান থেকে আরও একটি বড় লম্বা রেখা টেনে উপরে তুলে দাও দেখতে পাবে একটা খুব বড় উজ্জ্বল নক্ষত্র। দেখতে পাচ্ছ।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠল।

—ওটা কি হবে বলত?

—ওটা ধ্রুবতারা না স্যার। দীপালি বলে মেয়েটি এমন বলল।

—তুমি তবে চেন।

—আমার বাবা আমাকে মাঝে মাঝে আকাশের নক্ষত্র দেখান। নাম বলেন। কিন্তু স্যার আমি ভুলে যাই। মনে রাখতে পারি না।

লালটু বলল, হাঁ মাস্টারমশায়, তার-পর।

সে আরও জানতে চায়। এই ধ্রুব-লোকের রহস্য তার জানার বড় ইচ্ছা।

—এরা কিন্তু সবই নক্ষত্র। নক্ষত্র আর গ্রহে কি তফাৎ বল ত! শশিভূষণ এমন বললেন।

—নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে, গ্রহের নিজস্ব কোন আলো নেই।

—ঠিক। খুব ঠিক জবাব। তোমার নাম কি?

—আমার নাম দীপালি। দীপালি চ্যাটার্জি।

—নামের আগে শ্রীমতী বলতে হয়।

দীপালি জিভ কাটল।

খুব ভাল হয়েছে। লালটু এমনই চেয়েছে। বড় পাকা। আগে আগে কথা। শহরে থাকে বলে সব জানে এমন একটা ভান সব সময়। সে এই মেয়ের মুখ থেকে কিছুই শুনতে চায় না। সে বলল, তারপর মাস্টারমশাই।

—ঐ দ্যাখো, পশ্চিমের দিকে তাকাও। কি দেখতে পাচ্ছ?

—অনেক তারা মাস্টারমশায়।

—দ্যাখো বড় একটা তারা জ্বলজ্বল করছে।

—বড় বড়, হাঁ হাঁ বড়।

দীপালি বলল, ওটা শুকতারা না স্যার?

আবার! এই মেয়ের জ্বালায় এখানে থাকা যাবে না। লালটু বলল, স্যার আমাদের মাথার উপর উত্তর-দক্ষিণে ছায়া-পথ আছে না?

—আজ জ্যোৎস্না উঠেছে। ছায়াপথ ভাল দেখতে পাবে না। একদিন অন্ধকার আকাশে তোমাদের ছায়াপথ দেখাব। নিজেরাও দেখতে পাবে। কি বিচিত্র লীলা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের।

—স্যার, ও-সব গ্রহে আমাদের মানুষ থাকে?

—হ্যাঁ থাকে। তোমার মত মেয়েরা থাকে। লালটু আর বিরক্তি চাপতে পারল না। এমনিতে মনে ওর ভীষণ একটা দুঃখ বাজছে। সোনা নেই। ওর জ্বর হয়েছে। ঠাকুরদা নেই। বাড়ির বড় ঘর খালি। মাস্টারমশাই নক্ষত্র দেখাচ্ছেন, তার ভিতর ফড়ফড়ি। এসব ফড়ফড়ি তার একেবারে ভাল লাগে না। সে মনে মনে বলল, দিমু ঠাস কইরা গালে এক চড়। ফড়ফড়িটা ভাইঙ্গা যাইব।

শশিভূষণ বলল, এইভাবে আমরা এক বড় সৌরজগতে বসবাস করি। বড় ক্ষুদ্র এ-পৃথিবী। মানুষ আরও কত ছোট, কত কিঞ্চিৎ সে। তোমরা এই মাঠে দাঁড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অল্প পরিমাণ জগৎ দেখতে পাচ্ছ তার ভিতর রয়েছে লক্ষ কোটির মতো সূর্য, আপন দাবদাহে নিরন্তর জ্বলছে। হিলিয়াম গ্যাস। বায়ু-শূন্য আকাশ। এবং আমরা যা-কিছু নীল দেখছি সে অন্তহীন সাম্রাজ্যের স্বরূপ। তুমি আমি সেখানে অতি তুচ্ছ। আমাদের জন্ম-মৃত্যু আরও তুচ্ছ। তবু একটা নিয়ম আছে জেনে রাখ, যেমন আপন মহিমায় এই সৌরজগৎ আবর্তন করছে, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ

করছে, রাত দিন বৎসর এবং কাল তারপর মহাকাল, এ-সবের ভিতর একটি অতি নিয়মের খেলা আছে। সে হচ্ছে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসা। শীত, গ্রীষ্ম, বসন্তের মতো আমরা আবার ফিরে ফিরে আসি। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শেষ হয়ে যাই না।

শশিভূষণ আজ এই মৃত্যুর ব্যাপারে কি একটা যেন আবেগ বোধ করছে। সে, সংসার অনিত্য এমন ভাবছে। এক পাগল মানুষ আছেন, নিত্যদিন সংসারে চুপচাপ, কোন কথা বলেন না, বেশ আছেন, কেন কথা না বললে বেশ থাকা যায়, সংসারের সারবস্তুটি তিনি জেনে ফেলেছেন—কি হবে দুঃখ নিয়ে বেঁচে থেকে, যে-কদিন আছ, থাক খাও, পাখি দ্যাখো—তিনি কেবল পাখি দেখছেন, শশিভূষণ ওদের নক্ষত্র দেখাচ্ছে। শ্মশানে যে বিদেহী এসে গেল, সে কে! সে কি মানুষের আত্মা। কেবল কষ্ট পাচ্ছে। কেবল ঘুরছে ফিরছে, কোথায় গেলে একটু শান্তি মিলবে!

সে এবার সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, এবার তোমরা বাড়ি এস। মাঠে বেশি সময় দাঁড়াতে নেই। তিনি এখন আমাদের চার-পাশেই আছেন। পারলৌকিক কাজ শেষ না হলে তিনি মুক্তি পাবেন না।

সবার এমন কথায় খুব ভয় ধরে গেল। প্রাণে ভয় ওদের সব সময়ই ছিল। তবু ওরা তারা দেখতে এসেছিল মাঠে। দলবল নিয়ে এসেছে। এই দিনে একা মাঠে নেমে আসে কার সাধ্য। কিন্তু শশিভূষণের এমন কথায় সবাই ওকে ঘিরে থাকল। মাস্টার-মশাই বাড়ি উঠে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ওরাও উঠে যাবে।

শশিভূষণ বলল, তোমরা এদিকে কোন কালো রঙের মানুষ দেখেছ?

ওরা মাস্টারমশাই কি বলতে চাইছে ঠিক বুঝতে পারছে না। ওরা তাকিয়ে থাকল।

—এই একজন কালো রঙের মানুষ। শরীরে আগুন জ্বলছে নিভছে।

ওরা এমন কথায় একেবারে শশি-ভূষণকে ভয়ে জড়িয়ে ধরল।

—তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন। আমি দেখেছি। আমার এখন দেখা দরকার তিনি তোমাদের ঠাকুরদার আত্মা, না অন্য কিছু।

ওরা কথা বলতে পারছে না। একা উঠে যেতে পারলে বাড়ি উঠে যেত। তাও পারছে না। এক অবলম্বন এই মানুষ। ওরা ওকে ঘিরে খুব কাছে কাছে যাচ্ছে। যেন সেই প্রেতাত্মা ওদের ছুঁয়ে দেবার জন্য চারপাশে ঘোরাফেরা করছে। ভয়ে লালটু, পলটু গায়ত্রী জপ করছিল।

—মানুষের গায়ে আগুন জ্বলে যেতে এ আমি কোনদিন আশা করিনি।

আমাদের শরীর আগুনে পুড়ে গেলে কি হয়! আমরা ছাই হয়ে যাই। আর কি থাকে!

শশিভূষণকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।—ওটা দক্ষিণের মাঠে নেমে গেছে। আমি তোমাদের কি বলব, এত যে সাহস আমার কিছুতেই আজ দক্ষিণের মাঠে যেতে সাহস পাইনি।

—জড় মানুষকে কি করে রাখে! জড় মানুষকে অদৃশ্য অলৌকিক কিছু আছে যা ছোঁয়া যায় না, যা অনুভূতিগ্রাহ্য নয়, তেমন এ জগতে বসবাস করতে প্রেরণা দেয়। সে বলল, এই হচ্ছে আমাদের ভগবান পালটু। যার কোন ব্যাখ্যা চলে না, তাকে আমরা ভগবান ভাবি। তোমার ঠাকুরদা এখন কালো রঙের শরীর নিয়ে নানারকম আগুনের গর্ত সৃষ্টি করে নিজেই ভগবান হয়ে গেছেন। বলতেই ভয়ে ওরও কেমন শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠল। সে বলল, এস, আর মাঠে নয়। তারা তোমাদের আর দেখতে হবে না।

তারপর ছুটে এসে প্রায় সবাই উঠোনে উঠে এল। দক্ষিণের ঘরে এত লোকজন, তবু কেন জানি শশিভূষণের ভয় কাটছে না। সোনা কাঁথা মাথায় মুখে ঢেকে শুয়ে আছে। নিচে পড়ার টেবিলে নরেন দাস, শ্রীশ চন্দ আরও গ্রামের কিছু মানুষ বসে বসে গল্পগুজব করছে ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে। সে তাদের কিছু বলল না। যেখানে সোনা শুয়ে আছে তার পাশেই বসল। জ্বরটা বেড়েছে কিনা দেখার সময় মনে হল, সোনা শক্ত হয়ে আছে। একি, এত শক্ত কেন! সে চিৎকার করে উঠেছিল, আপনারা আসুন। সোনা কি হয়ে গেছে!

বড়বৌ তখন শাদা পাথরে সাগু ভিজাচ্ছিল। ফলমূল কাটছিল। ওরা তারা দেখে ফলাজল খাবে। কাঁচা দুধ, মধু এবং তরমুজ। আর সাগু কলা। এই খাদ্য। রান্নাঘরে ওদের আত্মীয় পবন কর্তার বৌ আছে। ধন রান্নার সবকিছু বের করে দিচ্ছিল। তখনই ওরা শুনল সেই অসহনীয় চিৎকার।

সবাই ছুটে গেল। মণীন্দ্রনাথ সবাইকে এমন ছুটে দক্ষিণের ঘরে যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

ফেলু মাঠে নেমে এসে তখন কোন্-দিকে যাবে ঠিক করতে পারছিল না। হালার কাওয়া। হালার ভগবান তুমি ঠাকুর। তোমার ভগবানগিরি ছাইড়া দিমু। বলে সে যেমন তার কোরবানির চাকু হাওয়াতে দোলায়, তেমনি দোলাতে দোলাতে সে দেখল, ওর গায়ে অজস্র জোনাকি। সেই যে শতকাল মধুর সঙ্গে সব লেপ্টে আছে শরীরে, তারা আর উড়ে যেতে পারেনি।

ভীষণ মজা পেয়ে গেল ফেলু। সে ভাবল এখন একবার সেই ধর্মের ষণ্ডটাকে দেখলে হয়। কোথায় আছে সে। তাকে চিনতে না পারলেই শালা লেজ তুলে পালাবে। সে ভাবল সব শালাকে আজ ভয় দেখাবে। এই যে মাঠ আছে, শাদা জোৎস্না আছে, আহা অন্ধকার হলে খুব ভাল হত, লোকে দেখত কেবল কাঠের মতো একটা মানুষ নিরন্তর ছুটছে আর তার গায়ে অজস্র দেবদেবীর চোখ। চোখ জ্বলছে। সে যেন কিংবদন্তী হয়ে যেতে পারে। মানুষের ভগবান হয়ে যেতে পারে। সে বলল, আমি ভগবান, আমি আল্লা। আমি না পারি কি। কেয়ামতের দিনে আমি রসুলের পাশে বসে থাকব। বলব, হা রসুল আমার বিবিরে যে নেয় কাইরা তার ধর্ম

যুগাবতার স্মরণে !

সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

বহু প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় সংস্করণ : মূল্য পাঁচ টাকা

●

ডঃ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য, এম-এ, পি-এইচ-ডি রচিত

কলিতীর্থ কামারপুকুর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মলীলা এবং ঊনবিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতের নব-জাগরণের আলেখ্য সুন্দর তথ্যগত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

মূল্য দশ টাকা

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২

কি! আমার যে অন্ন নাই, আমার ধর্ম কি। জালালি যে পানিতে ডুইবা মরল তার ধর্ম কি।

এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেলে মানুষের আর থাকে কি। সে যে কি চায় নিজেও জানে না। সে মরে সুখ পাবে না, বেঁচে থেকে সুখ পাবে না, তবে কি ধর্মের মাঝে সুখ। সে সুখ সুখ করে বিবি বিবি করে পাগল হয়ে গেল। সে বলল, আমারে তুই কই গালি। তরে কই পামু। শহরে আমি যাই কি কইরা। তুই একটা মানুষের দুখ বুঝলি না। তাজা রক্ত দেইখা পালাইলি। আমি আর মানুষ নাইরে আমু। আমি যে কি হইয়া গাছি নিজেই জানি না। আমার চোখে পানি করে না।

জল শ্মশানের উপর নৃত্য করে সেই সং মানুষটাকে অশান্ত করে দিয়ে এসেছে। সবাই করজোড়ে ছিল, সে লাথি মেরে ঘট ভেঙে দিয়েছে। জল চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল আর তার হা-হা করে হাসতে ইচ্ছা হচ্ছিল। সে জানে কেউ আর আজ এই মাঠের দিকে তাকাবে না। কেউ আজ আর এ-মাঠে নেমে আসবে না। সবারই এক ভয়। মানুষ মরে গেলে শেষ হয়ে যায় না। আকাশে-বাতাসে সে ঘুরে বেড়ায়। সে অকল, ঠাকুর তোমার পোলারে সাবধানে রাইখ। তুমি ত মইরা গিয়া পক্ষির হইছ। পায় কিনা যাহ আমার লগে। আমি আর তোমার পোলা, আকালু যারে আমি পামু খুন করমু। আমি কোনখানে যামু না। এই শরীরে বনে-জঙ্গলে ঘুইরা বেড়ামু। ফাঁক পাইলেই হ্যাং। হালার কাওয়া। যেন মনে হল বাতাসে ঠাকুরের আত্মাটা এখন ভাসছে। সে জোনাকি ধরার মতো মাঠে আত্মা খাঁচায় পোরার বাসনাতে ছুটছে। হালার কাওয়া। হ্যাং। সে হাত বাড়িয়ে বাতাস থেকে ঠাকুরের আত্মা ধরতে চাইল।

এভাবে ঘুরে ঘুরে যখন বোকা গেল মৃত আত্মা বাতাস থেকে ধরা যায় না অযথা সে ঘুরে মরছে মাঠে, অকারণ এই আত্মা খুঁজে মরা, তার চেয়ে বরং ভাল গিয়ে বসে থাকা আকালুর ঘরের পিছনে। সে যদি রাতে তার ঘরে ফিরে আসে।

তখন ভূপেন্দ্রনাথ বলল, মাথায় জল ঢালো বেশি করে।

গোপাল ডাক্তার এসেছে। সে গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে বসে আছে। জ্বরের জন্য অজ্ঞান হয়ে গেছে এমন বলছে। খুব বেশি জ্বর। এত জ্বরে মাথা ঠিক থাকে না। রক্ত উঠে গেছে মাথায়। সকলে ভিড় করে বসে রয়েছে। কে আর কি খাবে। বড়বৌ সব ফেলে চলে এসেছে এ-ঘরে। আশ্বিনের কুকুর পাহারায় আছে। সে ঘরে ঢোকে না। সে কেবল চারপাশে লক্ষ্য রাখে কেউ ঘরে ঢুকে যাচ্ছে কিনা। মাথায় এত জল ঢালা হচ্ছে যে মেঝে ভেসে গেছে জলে। সোনা চোখ বুজে আছে। হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিল। এখন হাত খোলা নরম। দাঁত লেগে ছিল, এখন দাঁত খোলা। বড়বৌ মাঝে মাঝে ডাকছেন, সোনা সোনা! ভাল লাগছে? সে চোখ খুলেই আবার বন্ধ করে দিচ্ছে। কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছে না। চোখদুটো এখনও লাল আছে। মাথায় রক্ত উঠে এমন হয়েছে। পাঁচের উপর জ্বর। সে বিড়বিড় করে কি বলছে যেন। চন্দ্রনাথ মুখের কাছে কান নিয়ে গেল। বলল, জল দিমু। বড়বৌ কাছে এসে বলল, জল খাবি সোনা? হাঁ কর। তুই এমন করছিস কেন! কি হয়েছে কি কষ্ট! এই ত আমরা, কি ভয় তোর!

শশিভূষণ কেমন বোকা বনে গেছে। সে কেন যে বলতে গেল, এই সোনা মজা দেখবি। বলে সে কেন যে পুকুরপাড়ে শ্মশানের দিকে হাত তুলে দেখাল। ভয়ে তার এমন হয়েছে। এ-সব বলে দেওয়া ভাল। সে বলে দিল, আমি যে কি করলাম বড়বৌদি! ওরও যেন ভয়ে কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে।—কি বলব আপনাদের, শ্মশানে এক আশ্চর্য ব্যাপার। আপনারা সবাই যখন বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন, আমি সোনাকে নিয়ে এ-ঘরে বসে রয়েছি। আমার উচিত ছিল জানালা বন্ধ করে রাখা। তবে আর এ-সব দেখতে হত না। বলেই কেমন সে জানালাটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল।

দেখলে মনে হবে শশিভূষণেরও যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসবে। সে বলতে পারছে না। সে ঢোক গিলছে। সে বলল, পাঁজি এনে দিনটা দেখাতে হত। কি দিনে তিনি গেলেন।

—কেন কি হয়েছে! বড়বৌ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল। ধনবৌ অনবরত জল ঢেলে যাচ্ছে। ওর হাত ধরে গেছে, তবু কিছু বলছে না। সে অপলক তাকিয়ে আছে সোনার দিকে। দাহ করার সময় কাছে থাকতে না দিলেই হত এমন ভাবছে।

শশিভূষণ বলল, আমি বললাম মজা দেখবি! সোনাকে আঙুল দেখালাম। সোনার কৌতূহল বেশি জানি। সে বারবার আমাকে নানাভাবে এই মৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। মানুষ মরে কোথায় যায়, কি হয়, কোথায় সে জন্ম নেবে, জন্ম নিলে আমরা চিনতে পারব কিনা—এই আমাদের ঠাকুরদা। নাকি জন্ম কোথাও নেয় না, বাতাসে আত্মাটা মিশে যায়। আমি বললাম সোনা, কেউ মরে শেষ হয়ে যায় না। ঐ দ্যাখো। দেখলাম বৌদি পোড়াকাঠের মতো একজন মানুষ শ্মশানে এসে নৃত্য করছে। গায়ে ফুলকি দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। ঠিক যেন আধপোড়া একটা মানুষ শ্মশানে ফিরে এসেছে ফের। আমার ভারি কৌতূহল হল। সোনাকে বললাম, ঐ দ্যাখ। মানুষ মরে কোথাও যায় না। এ-পৃথিবীতেই সে থাকে।

গোটা ঘর চুপচাপ। কোন শব্দ নেই। কেবল জল পড়ার শব্দ। গোপাল ডাক্তার বলল, এখানে এসব আলোচনা করা ঠিক না।

সবারই হুঁস হল। এ-সম্পর্কে আর কোন কথা কেউ জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না। রাম রাম। সবাই মনে মনে রামনাম উচ্চারণ করল।

এই বাড়িতে আর কিছু নেই এখন মনে হয়। সবাইকে কেমন এক অশরীরী এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে। সবাই ভয়ে ভিতরে ভিতরে ফুলে যাচ্ছে। কেবল মণীন্দ্রনাথ ঘরের দাওয়ায় বসে হাঁকছেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। ওকে কেউ খেতে দিচ্ছে না। সারাদিন না খেয়ে তাঁর খিদা বেড়ে গেছে।

কুকুরটাও হাই তুলল। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। গোপাল ডাক্তার ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে আজ গেল না। ওকে ঈশম দিতে যাবে তার গ্রামে। সে একা একা ফিরে আসবে আবার। সে যেমন সোনার জন্মকালে হাতে লণ্ঠন, বগলে লাঠি নিয়ে বের হয়েছিল, তেমনি নিশীথে গোপাল ডাক্তারকে দিতে চলে গেল।

সোনা তখন বাতাসে বুঝি দুলছিল। সে হাতটা উপরে তুলে বাতাসে কি খুঁজছে। সে কি খপ করে ধরতে চাইছে।

ধনবৌ এমন দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। সারারাত এই করতে করতে কখন সকাল হয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। তারিণী কবিরাজের জন্য আবার লোক পাঠানো দরকার। ঈশমই সকালে এসে খবর দিল, একজন ওঝা আসছে। সে সোনাকে দেখবে। সকালে যে ওঝা এসেছিল তার বর্ণবহুল চেহারা বড় বোকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। সে চুল বড় করে রেখেছে। হাতের নোখ কাটে না, পায়ের নোখ কাটে না। চোখ লাল: গাঁজার কল্কে হরেক রকমের গলায় বাঁধা। সে বলল, মরা দোষ পাইছে। সহজে নিস্তার নাই।

তা নিস্তার না থাকুক, সোনা কিন্তু সকালের দিকে কেমন একটু নিদ্রা গেল। ভূপেন্দ্রনাথ বলল, এবারে তুমি যাও, দরকার পড়লে ডাইকা পাঠামু।

ওঝা বলল, কর্তা ভূত বাড়িতে পাড়া দিতে না দিতেই পালাইছে। আমার বিদায়।

—বিদায় আর কি। কি চাও তুমি?

দুই কাঠা ধান। আর পাত পাইতা দই-চিড়া।

—তা শ্রাদ্ধের দিন আইস। খাইবা।

ওঝা চলে গেল। যাবার সময় বলল, কর্তা বাড়ি বাইন্ধা দিয়া গ্যালাম। কোন ডর নাই।

সবাই শুনল কথাগুলি। লালটু পলটুর বুকে সাহস ফিরে এল। শশীভূষণ পর্যন্ত কথাটা বিশ্বাস করল। এবং বাড়িতে যে এক অদৃশ্য ভয় সবসময় ঝুলে ছিল বাতাসে, এক সামান্য ওঝা এসেই কেমন তা উড়িয়ে দিয়ে গেল।

মণীন্দ্রনাথ তখন সোনার শিয়রে বসেছিল। সোনা অদ্ভুত মনীন্দ্রনাথকে শিয়রে দেখেই কেমন সাহস পেয়ে গেল। ওর

ভিতরে যে ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য, তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কারা, পুড়িয়ে মারার জন্য চিতায় কাঠ তুলে দিচ্ছে, অমলা কমলা কাঁদছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আগুনের ভিতর ওর সুন্দর চোখ মুখ পুড়ে যাচ্ছে, সে কালো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পুড়ে যেতে যেতে সে একটা লেজ খসে পড়া ব্যাঙ হয়ে যাচ্ছে, অথচ আত্মাটা তার সেই ব্যাঙের ভিতর আছে, সে টের পাচ্ছে সব, কষ্ট যন্ত্রণা টের পাচ্ছে সে আর এ-পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারছে না, সোনা হয়ে, সে একটা অন্য জীব হয়ে গেছে—তাকে কেউ চিনতে পারছে না, সে মেলায় হারিয়ে যেমন ভেউ-ভেউ করে ছেলেমানুষ কাঁদে তেমনি যখন কাঁদছিল তখনই সে দেখল পাগল জ্যাঠা-মশাই ওর শিয়রে এসে বসেছেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাকে একমাত্র তিনিই চিনতে পেরেছেন। বলছেন যেন সোনা তোর ভয় নেই, আমি তোর সঙ্গে যাব। সোনার সঙ্গে যদি পাগল জ্যাঠামশাই থাকে তবে তার আর কি ভয়। ওর চোখে নির্ভয়ে ঘুম এসে গেল।

পাগল মানুষ তারপর বের হয়ে এলেন। কেমন একটা অভিমান কাজ করছে। কাল রাতে কেউ তাঁকে খেতে দেয়নি। বাবা তাঁকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়তে দিলেন না। সে ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর অভিমানে ফুলে ফুলে উঠছে। বৌদিকে এখন দুচোখ যায় বের হয়ে যাওয়া। সে ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে হাঁটতে থাকলো।

কেন যে আজ সকালে এমন কুয়াশা হল। পাগল মানুষ গোপাটে নেমে পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এটা গ্রীষ্মের দিন। তিন চার দিন যাবৎ আকাশে মেঘলা গেছে। কিন্তু বড় জল কালবৈশাখী কিছু হয়নি। দুদিন খাঁ খাঁ রোদ। কাল রাতে, জোৎস্না ছিল। আজ সকালে কুয়াশা। তিনি পথে নেমে এলে কেউ তাকে দেখতে পেল না। হাসান পীরের দরগায় সে আজ যাবে। কতদিন তিনি যান নি। কতদিন তার হাসান পীরের সঙ্গে কথা হয়নি। সেই কবে একবার বর্ষার শেষে হাসান পীরের দরগায় সে গিয়েছিল। তর বা চক্ষুমান, চক্ষুতে কয়, তুই পীর হইবি না হয় পাগল বইনা যাইবি।

—আচ্ছা পীরসাহেব আমার সেই চক্ষুতে কোন দুরাশা জেগে আছে।

—দুরাশা সবারই থাকে মীণ, তরও আছে। দুরাশা না থাকলে মানুষ বাঁচে না।

—আমার কি দুরাশা?

—তর দুরাশা তুই যা পাইবিনা তার লাগি ছুইটা মরবি।

—কেন পাব না। আমার কি কসুর। সে পীরসাহেবের ভাষায় কসুর কথাটা ব্যবহার করল!

—তর কসুর তুই বড় বেশি সাধাসিধা মানুষ। সাধাসিধা মানুষেরা বেশি দুরাশা ভাল না।

—আমি ঠিক চলে যাব। এখানে থাকব না। ওর কাছে চলে যাব। আমাকে কেউ খেতে দেয়নি কাল পীরসাহেব। বাবা আমাকে মন্ত্র-পাঠ করতে দিল না। আমার কি আর আছে। সারাদিন আপনার কাছে আজ বসে থাকব। তারপর হেঁটে হেঁটে পলিনের কাছে চলে যাব। কেউ আমার নাগাল পাবে না। ঠিক না পীরসাহেব?

কুয়াশার ভিতর সে হাঁটছে আর হাঁটছে। সে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। সে বড়বৌকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে। সে বের হয়ে গেলে খোঁজা-খুঁজি হবে, সে না থাকলে সবাই যক্ষ জল খাবে না, তাকে কাল বড়বৌ খেতে দেয়নি, সে সারাক্ষণ আশ্বিনের কুকুরের পাশে চুপ-চাপ বাইরে বসেছিল আর দেখছে সব মানুষের ভিড় দক্ষিণের ঘরে। কি হয়েছে সোনার। তাকে কেউ ডাকছে না। কেউ বলছে না, তুমি এস। সে যেন এ-বাড়ির কেউ নয়। তিনি যেন এ-বাড়িতে অপরি-চিত মানুষ। না পেরে সে ভোরের দিকে নিজেই উঠে গেছে। সোনার কাছে। তিনি শিয়রে গিয়ে বসেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলেছে, এখন মনে হয় একটু ভালর দিকে। মণীন্দ্র-নাথ চুপচাপ কেবল সোনার মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন। ও'র কেন জানি বার বার ইচ্ছা করছিল, একেবারে সাপ্টে কোলে তুলে নিতে। বুকের পাশে জড়িয়ে নিলেই সব গ্লানি সোনার মুছে যাবে। অথবা এই যে কুয়াশা, এই কুয়াশায় সোনাকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে হেঁটে গেলে এক মলাঙ্গর পাওয়া যাবে, এক বড় মাঠ পাওয়া যাবে, তারপর হাসানপীরের দরগা, দরগাতে গিয়ে শুইয়ে দিতে পারলেই সে নিরাময় হয়ে যাবে।

ওর আজকাল বড়বৌর উপর অভিমান হলেই কোথাও গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা হয়। কোন কিছুর অভাব হলেই খুব দূরে গিয়ে আজকাল বসে থাকেন না। ধারেকাছে থাকেন। যেন সোনা অথবা লালটু পলটু গিয়ে খুঁজে আনতে পারে। তিনি লালটু পলটু গেলে আসেন না। সোনা গেলে কখনও কখনও উঠে আসেন। আর বড়বৌ গেলে অনেকক্ষণ সাধাসাধি। এক অবোধ বালকের মতো হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর আর দূরে যেতে ইচ্ছা হয় না। কেমন স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যাচ্ছেন। তবু আগে একটা দুর্গের ছবি, ক্রিসপার্ট এবং বড় একটা নদী দেখতে পেতেন। মাঝে মাঝে কি যেন একটা প্রতিমার মতো মুখ ভেসে উঠেই মিলিয়ে যেত। মাঝে মাঝে তিনি একটা নিঃসঙ্গ ওকের গাছ দেখতে পেতেন। তার নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে ও'র জন্য অপেক্ষা করছে। এখন আর তেমন ছবি কিছুই ভাসে না। ক্রমাগত এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণা তাকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। কাল, সময় তাঁকে বড় একাকী করে রাখছে। কেবল এই বড়বৌ এবং সোনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণই ও'র প্রতীক্ষা, তত-ক্ষণই সে বসে থাকে এবং মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকায়, কেউ ও'কে খুঁজতে আসছে কিনা। আজ তিনি যেন দূরে চলে যাচ্ছেন। দেখুক সবাই কেমন মজা। খেতে না দিয়ে সব ভুলে থাকার মজা দেখুক বড়বৌ।

ঘন কুয়াশার ভিতর পথ চিনে যেতে কষ্ট হচ্ছে। তবু উত্তরের দিকে ক্রমান্বয়ে হেঁটে গেলে সেই দরগা মিলে যাবে। তিনি কুয়াশার ভিতর কেবল হেঁটে যেতে থাকলেন।

কেবল হেঁটে যেতে থাকল আরও একজন মানুষ, সে ফেলু। কুয়াশার ভিতর তাকে মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না, যেন একটা বড় গজার মাছ জলের নিচে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। বাড়ির জন, কালো, তার নিবাসে কে এসে মজা লুটছে, সে জলের ভিতর ডুবে ডুবে ল্যাওনার অন্ধকারে তা লক্ষ্য রাখছে। সে কখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। দু হাত অন্তর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে যে কোথায় যাচ্ছে নিজেও জানে না। সে সারারাত আকালুর বাড়ির পাশে যে জঙ্গলটা আছে সেখানে বসেছিল। যদি সে রাতে ফিরে আসে। যদি সে শেষপর্যন্ত কিছু ভুলে যায় নিতে, সে রাতে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু সারা-রাত কেবলু মশার কামড় খেয়েছে। শরীর তার ফুলে গেছে। ওর শরীর এখন আর শরীর নেই। যেন সে এই কুয়াশার ভিতর এক অশরীরী হয়ে কেবল ছুটছে।

(ক্রমশঃ)

আধুনিক কবিতায় নতুন সংযোজন

বিষ্ণু দে	॥	ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লাসে	৫·০০
অরুণ মিত্র	॥	মঞ্চের বাইরে মাটিতে	৪·৫০
মণীন্দ্র রায়	॥	আমরা রক্তের গান	৪·০০
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	॥	টেরী মন	৪·৫০
রাম বসু	॥	রক্তিম আয়না (কাব্যনাট্য)	২·৫০

সারস্বত লাইব্রেরী ॥ ২০৬ বিধান সরণী ॥ কলিকাতা-৬ ॥ ৩৫৫৪৯২

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনেকরকম মানুষ

ব্যক্তি জীবনের আলেখ্য রচনার কাজে অনেক অসুবিধা থাকে। বিশেষ করে সেই ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র গ্রন্থকারের পরিচিত হন তাহলে পাঠক তার কিছু অংশ পাঠ করেই ক্লান্ত হয়ে উঠবেন। কারণ সেই অপরিচিত বা অল্প পরিচিত জীবন সম্পর্কে কৌতূহল ও আগ্রহের অভাব থাকে সাধারণ পাঠকের। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তি-জীবনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে। কারণ স্মরণীয় মনীষীদের জীবনের অজ্ঞাত অথচ কৌতূহলময় দিকের কিছু চিত্র পাঠকের হাতে উপরি পাওনার মতো এসে পড়ে। যেদিক থেকেই হোক এই জাতীয় গ্রন্থাদির সাফল্য নির্ভর করে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন লেখকের লিপিকুশলতার ওপর। সেই কারণে উপন্যাস লেখকের পক্ষে একাজ অনেক সহজসাধ্য—কারণ উপন্যাসকার মানবিক আচরণের গভীরে প্রবেশ করার উপযুক্ত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী।

সি পি স্নো একালের একজন শক্তিমান উপন্যাসকার। স্নো-লিখিত 'করিডোরস অব পাওয়ার', 'দি টু কালচারস' ও 'সায়েন্টিফিক রেভোলিউশন' নামক গ্রন্থগুলি বিখ্যাত। উপন্যাসে তিনি যেসব মানুষ ও পরিস্থিতির কথা লিখেছেন কল্পনাশ্রয় করে আলোচ্য গ্রন্থে সেই জাতীয় মানুষের কথাই তিনি লিখেছেন, শুধু তফাৎ এই যে, এঁরা সব রক্তমাংসের মানুষ, কল্পলোকের বাসিন্দা মানুষ নয়।

'স্ট্রেঞ্জারস অ্যান্ড ব্রাদার্স' নামক সিরিজের উপন্যাসগুলিতে কেমব্রিজের মধ্যযুগীয় শান্ত পরিবেশের পটভূমিতে ক্ষমতা অধিকারের লড়াই এবং তার নির্মমতা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। উপরের আবরণটুকু ভদ্রতা এবং ভব্যতার কিন্তু সেই সুযোগের অন্তরালে কি নিষ্ঠুর চক্রান্ত। 'ভ্যারাইটি অব মেন' গ্রন্থের উপজীব্য যদি কিছু থাকে তাহলে তা হল ব্যক্তিগত উচ্চাশা, ক্ষমতা লাভের লোভ এবং সাফল্যের সোপানে উত্তীর্ণ হওয়ার অক্লান্ত সাধনা।

ভূমিকার একেবারে সূত্রেতেই লেখক বলেছেন—

"I should like this book to be read as a set of personal impressions, and no more than that".

কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বলতে হয়েছে—

"I wrote the book for fun, not because of the grandeur of most of my subjects.. The real fun was in the variety of human beings".

কিন্তু শুধু 'ফন' বা নিছক মজার খাতিরেই এই গ্রন্থ লিখিত হয়েছে একথা বলা চলে না। শুধু মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য নয় ঐতিহাসিক অনেক কিছুই এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

লেখক বলেছেন, স্মরণাতীত কাল থেকেই মানব চরিত্রের বৈচিত্র্যময় দিকটাই আমাকে অভিভূত করে রেখেছে। এইভাবে অভিভূত হয়ে থাকা বা raison d'etre যে কোন উপন্যাস লেখকেরই বৈশিষ্ট্য।

মানুষ আর ঘটনা স্নো-র উপন্যাসের প্রধানতম আকর্ষণ।

এই গ্রন্থে যে মানুষগুলির কথা তিনি লিখেছেন তাঁরা সবাই এই শতাব্দীর স্মরণীয় মানুষ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা রাজনীতিতে এইসব মানুষগুলির অবদান বিস্ময়কর এবং চিরস্মরণীয়। এঁদের মধ্যে আছেন বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড, জি এইচ হার্ডি ও আইনস্টাইন, রবার্ট ফ্রস্ট এবং এইচ জি ওয়েলসের মত লেখক, স্তালিন, চার্চিল এবং লয়েড জর্জের মত রাষ্ট্রনেতা এবং দাগ হ্যামারশীল্ডের মত কর্মবীর। এঁদেরমধ্যে একমাত্র স্তালিন ছাড়া আর সবাইকে স্নো দেখেছেন এবং সেই কারণে তাঁর রেখাচিত্র এত জীবন্ত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওয়েলস এবং হার্ডিকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। ফ্রস্ট এবং হ্যামারশীল্ডের সঙ্গে পরিচয় তেমন সুদৃঢ় ছিল না আর চার্চিল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ছিল যৎসামান্য।

সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করার পর লেখক যে তাঁদের জানতেন, দেখেছেন বা সামান্য জানতেন যেসব কথা মনে জাগে না, 'ভ্যারাইটি অব মেন' গ্রন্থটির অনন্য সাধারণ আবেদন পাঠকচিত্তকে বিস্ময়ে আকুল করে তোলে। স্নো-র মন্তব্য, স্নো-র অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে এইসব বিচিত্র মানুষ যেন নতুন আকৃতি নিয়ে চোখের উপর ভেসে ওঠেন। স্নো-র এই বিশ্লেষণের আকার সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অন্তরে বিস্ময় জাগে এই ভেবে যে কি করে এত সংক্ষেপে এত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা যায়। চার্চিল একবার এই জাতীয় একটা উক্তি করেছিলেন, এই

আকারে এতখানি শক্তিমত্তা কিভাবে সম্ভব একথা ভেবে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। স্নো-র এই বিশ্লেষণ ধর্মী রেখাচিত্র পাঠে সেই কথা স্মরণে আসে।

এইসব রচনার মধ্যে জীবনী তথ্যের অভাব আছে। তিনি এক রকম সেসব তথ্যাদি উপেক্ষা করে গেছেন, তাঁর মতে এসব ত' সহজেই সকলে সংগ্রহ করতে পারে। মহাজনদের খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের অভ্যাস, কিংবা নিদ্রার কাল ইত্যাদি তুচ্ছ তথ্যাবলী এড়িয়ে গেছেন। এই বিষয়ে মার্কিণ জীবনীকাররা তুলনাহীন, (যথা জিম বিশপ রচিত 'কেনেডি' বা 'জনসন' চরিত)—এই-সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ 'ডিটেল' খুঁটিয়ে না দিয়ে স্নো একেবারে গভীরে প্রবেশ করেছেন।

হ্যামারশীল্ড প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন—

"He was the classical narcissist"—

এরপর তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন হ্যামারশীল্ড কিভাবে একনাগাড় বিরামহীন ভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ নার্ভাসভাবেই ইউনাইটেড নেশনস সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। স্নো তারপর মন্তব্য করেছেন—

"In the midst of this verbiage, one could not help feeling that here was a man crying from great loneliness".

কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্নো তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একটা যথাযোগ্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা মর্মভেদী। এইভাবে আইন-স্টাইনের নিঃসঙ্গতার কথা উল্লেখ করতে বসে তিনি স্বয়ং আইনস্টাইন এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করেছেন—

"It is strange to be known so universally and yet to be so lonely".

বিশ্ব যাঁকে বন্দনা করে সে মানুষও নিঃসঙ্গতার দুঃখ অনুভব করেন।

স্নো অনেক ক্ষেত্রে টুকি-টাকি গল্প জুড়ে দিয়ে তাঁর রেখাচিত্রকে উজ্জ্বল মধুর করে তুলেছেন। এইচ জি ওয়েলসের সঙ্গে কেম্ব্রিজে তিনি একদিন একত্র সন্ধ্যা যাপন করেন। হঠাৎ কোথায় কিছু নেই ওয়েলস প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা স্নো, কখনও সুইসাইড করার কথা মনে হয়েছে?' স্নো লিখেছেন—'আমি মনে করার চেষ্টা করলাম, তারপর বললাম, হাঁ তাই, এইচ জি ওকথা মনে জেগেছে আমার।'

ওয়েলস বললেন,—'আমিও ঠিক তাই, সুইসাইডের কথা মনে জেগেছে, তবে সতের বছর বয়সে পৌঁছানোর আগে নয়।'

বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে গেল।

জন্মসূত্রে ওয়েলস গরীব ঘরের ছেলে, সামাজিক মর্যাদায় খাটো থাকায় তাঁকে লড়তে হয়েছে অনেক, কঠোর সংগ্রামের পর তবে তিনি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বহুদিন বন্ধ করতে হয়েছে তত-কাল জীবনটা বাঁচার উপযুক্ত ছিল না, কিন্তু বাঁচতে হয়েছে।

স্নো এরপর মন্তব্য করেছেন—

"He was set on wringing out of existence all that to his bitter youth he had dreamed of".

সত্তরে পৌঁছে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন, আর সেইসব সমাজে সমাদৃত হয়েছেন পূর্বে যাদের যোগাযোগ পাননি। ঘৃণা আর অবজ্ঞা তিনি কিছু ভুলতো না, জীবনে অসফল হলে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতো না। সুতরাং লড়াই যখন খতম তখন আরও বেঁচে থাকার অর্থ কি?

স্নো প্রশংসাও করেন নি, আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করে তার আলোচ্য চরিত্রাবলীকে কালিমা লিপ্ত করেন নি। কিন্তু এইসব মহামানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য স্নো-র চোখে তাঁদের মূল্য হ্রাস পায় নি, তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় তিনি ভরপুর। মানবিক দুর্বলতার প্রতি উপন্যাস-কারের যে সহানুভূতি সেই সহানুভূতি নিয়েই ওয়েলসের রাজসম্মান লাভের দুর্বলতা, রয়াল সোসাইটির ফেলোশিপ পদ প্রাপ্তিতে অসাফল্য এবং উদগ্র যৌন আবেগ—

"the strains produced by an abnormally ardent sexual nature."

এসবই স্নো-র সংবেদনশীল লেখনীতে মনোরম হয়ে উঠেছে। ফ্রস্টও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার না পাওয়ায় বিশেষ হতাশা বোধ করেছেন। এছাড়া মাঝে মাঝে তিনি অসাধুতার আশ্রয় নিয়েছেন।

(He was sometimes a bit of fraud)

আর তাঁর মেজাজ ছিল লাগামহীন ঘোড়ার মত উদ্দাম, এত চড়া মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করা ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। স্নো সব কিছুই লিখেছেন সহৃদয় ভঙ্গীতে।

অপর দিকে তিনি স্তালিন প্রসঙ্গে বেশ উদারভঙ্গীতে মন্তব্য করেছেন। যে স্তালিন মায়া-মমতাহীন মানবিক হৃদয়-বৃত্তিহীন হিসাবে কুখ্যাতি লাভ করেছেন স্নো তাঁর ছবি এঁকেছেন অন্য দৃষ্টি-ভঙ্গীতে। এই গ্রন্থের এক জায়গায় স্তালিনের বিতাড়ন রীতি বা 'পার্জেস'—সমর্থন করেছেন পরোক্ষভাবে। তাঁর অঙ্কিত স্তালিন চরিত্র অন্য চরিত্রগুলির মতোই মনোজ্ঞ।

এই গ্রন্থটির সবটুকুই গভীর ও গম্ভীর নয়। কয়েকটি সরস, এবং উজ্জ্বল অংশও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। বৈজ্ঞানিক হার্ডি প্রসঙ্গে এক জায়গায় তাঁর অতুল্য মার্কিণ এবং খেলাপ্রীতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

"He was certainly the only Englishman of his or any other time who wrote a serious suggestion to the Baseball Commissioners, proposing a techinical condition to one of the rules".

হার্ডির মৃত্যুর বিবরণের মধ্যে বেদনার ছাপ আছে। কোনো কোনো জায়গায় বর্ণনায় সত্যোপলব্ধিতা আছে, তার ফলে গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয়েছে। এক জায়গায় বলেছেন, স্তালিনের ইন্টেলিজেন্ট প্রণেতাদের মত আমারও নিরুৎসব হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু স্বীকার করাই ভালো...আমি রাশিয়াকে ভালোবাসি।'

তবে শুধু এই আঙ্গিক গৌরবই নয়, প্রতিটি বাক্য সংক্ষিপ্ত এবং ছোট শব্দে সাজানো—স্পষ্টতা আর তীক্ষ্ণতার এই বাক্যগুলি একেবারে মর্মমূলে প্রবেশ করে।

—[illegible]

VARIETY OF MEN : By C.P. SNOW. Published by MACMILLAN (LONDON) Price 30 shillings.

সাহিত্যের খবর

কবির সম্মান ।। বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যে শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া একটি পরিচিত নাম। রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর নাম আরো বেশি প্রচারিত। তবু কাব্য-রসিকেরা শুনে আনন্দিত হবেন যে তিনি বিহারের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন। গত ১ ফেব্রুয়ারী দুপুরে রাজভবনে রাজ্যপাল হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শ্রীবড়ুয়ার বিখ্যাত কাব্যসংকলনের নাম 'সাগর দেখিছা'। তাঁর কবিতার নিদর্শন হিসেবে ১৯১৬ খৃঃ ২৫ মে 'সাপ্তাহিক নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নকলা' কবিতা থেকে কয়েক পংক্তি উল্লেখ করা যাচ্ছে—

'আজি মোর বার্তাবাহিত কণ্ঠ।
তথাপিও তারে কৈ যাও'
মাথো তোমাকেই
হেরা মার সুবাসিত শাখের দেহরেখা।
নিন্দা খ্যাতি জয় পরাজয়
অসত্য সকলো।
সত্য মাথো হে ছলনাময়ী।
তোমার গভীর প্রেম।
আরো সত্য হে তুলনাহীনা!
তোমার দেহর খাজে খাজে থকা
অনুপম
আখার সুরভি।'

শ্রীবড়ুয়ার জন্ম ১৯১৪ খৃঃ। তাঁর অনুজ শ্রীনবকান্ত বড়ুয়াও আসামের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক। শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়াই বোধ করি প্রথম কবি, যিনি ভারতে এই সর্বপ্রথম রাজ্যপালের পদ অলঙ্কৃত করলেন।

চেখভের জন্মদিনে ।। গত ২৮ জানুয়ারী ছিল চেখভের ১১১তম জন্মদিন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বিশেষ করে রাশিয়ার বিভিন্ন সাহিত্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি পালন করা হয়েছে। চেখভ বিশ্ব-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। বার্নার্ড শ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন ইউরোপের নাট্য

সাহিত্যিকদের মধ্যে, ইকবালের উত্তরসূরীদের মধ্যে, ফেজ একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মত বিরাজ করছে। গালিব ও ইকবালের পরেই তাঁর স্থান।' কথাটা খুবই সত্য। তিনি নিজেও চেয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যে সত্যকে প্রতিফলিত করতে। তিনি নিজেই বলেছেন—'জীবনের আনন্দ এক সুখ অর্থে যা প্রেমে মত সত্যে।' তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনায় এই সত্যেরই অনুসন্ধান করেছেন। এই কারণে তাঁর সাহিত্য ছিল তথাকথিত নাস্তিক্যের বিরোধী। তিনি মনে করতেন সত্য খুবই মর্মান্তিক হতে পারে, কিন্তু সেখান থেকে যে মানুষকে উদ্ধার করা যায় এটাও সত্য। সত্য মানুষকে নিরস্ত্র করেনা বরং মানুষের জীবনে একটা বিশ্বাসের ভিত্তি রচনা করে। একালেও সাহিত্যে তাঁর একটা প্রভাব কখনও কখনও লক্ষ করা যায়।

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন ।। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় গত ৬—১ জানুয়ারী আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পৃথিবীর ৩১টি দেশ থেকে প্রায় ১২০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অস্ট্রেলিয়ার গভর্নর জেনারেল। সভাপতিত্ব করেন সম্মেলনের সভাপতি প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক এ এল ব্যাশম। ভারত থেকেও একটি বিরাট প্রতিনিধিদল এই সম্মেলনে যোগদান করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে নর্মান ব্রাউন, বেইলি, জুকত প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য।

পুস্তক-শিল্পের উন্নতির জন্য ।। ভারতের বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের মুদ্রণ ও বিক্রয় ব্যবস্থায় উন্নতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য ন্যাশনাল বুক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড একটি পর্ষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই পর্ষদ ভারতীয় গ্রন্থ ব্যবসায় বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করবেন। এ ছাড়াও ভারতে গ্রন্থ আমদানী রপ্তানী বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা কি করে সমাধান করা যায় এই পর্ষদ তারও নির্দেশ দেবেন।

এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বোর্ডের ষষ্ঠ বার্ষিকী সাধারণ সভায়। গত ২ ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের সেক্রেটারী শ্রীটি পি সিংহের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে কয়েক ধরনের বইয়ের বেলায় পোস্টাল কনসেশন দেওয়া হয়, এই সভা সেই নীতি অপরিবর্তিত রাখবার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য অন্য ধরনের বই এবং সাময়িকপত্রকেও সমান সুযোগ দেবার জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে।

[illegible] উৎসাহক [illegible] ।। [illegible] মোদি পুরস্কারটি সাহিত্যে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, সমালোচক ও শিল্পরসিক। তিনি বর্তমানে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। এ ছাড়াও সাহিত্য আকাদেমি, [illegible]

তিনি সরস। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে—'বিশ্বশান্তি', 'মহোৎসবী' এবং 'অভিজ্ঞান' বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। গুজরাটি ভাষায়—তিনি 'শকুন্তলা'র অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও তাঁর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুবই নিবিড়। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় এসেছিলেন বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে সভাপতি হিসেবে। যাবার পথে একদিন কাটিয়ে গেলেন কলকাতায় একদিনের জন্য। খবর পেয়ে গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তখন তিনি যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বেলা বারোটার বিমানে রওনা হয়ে যাবেন বোম্বের দিকে। তবু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে কথা হলো অনেক। জিজ্ঞেস করলেন তাঁর পরিচিত কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিকের কথা। কে কেমন আছেন? লিখছেন কেমন? কিন্তু আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে অতি সম্প্রতি লেখা করেছেন বাঙালী লেখকের রচনা সম্পর্কেও তিনি প্রশ্ন করলেন।

যাই হোক—তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি লিখছেন কেমন?' 'তেমন কিছু না।' উত্তর দিলেন তিনি।' সবে গান্ধী জীবনী শেষ করলাম। এরপর একটা বড় কাজ করার ইচ্ছে আছে। হ্যাঁ, একটা কবিতার বইও শেষ হবে তাড়াতাড়ি।' বাংলার আধুনিক গুজরাটি কবিতার যে অনুবাদ সংকলনের কাজ চলছে, সে সম্বন্ধেও জানতে চাইলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে গিয়েছিলাম বিমান ঘাঁটি পর্যন্ত। এত কাজের মধ্যেও তাঁর সেই সহজ সরল ভাবটি এখনও তেমনি আছে লক্ষ করলাম।

পাকিস্তানী গল্পের ইংরেজি অনুবাদ ।। একালের পাকিস্তানী গল্পের একটি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। আটাশটি গল্পের এই সংকলনটি প্রকাশ করেছেন 'আফ্রো-এশীয় বুক ক্লাব, পাকিস্তান।' মূল গল্পগুলি অধিকাংশই বাংলা ও উর্দুতে লেখা। অনূদিত হবার পর গল্পগুলি পাঠ করে মনে হয়েছে, সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে এগুলি তেমন অসাধারণ নয়। তবে প্রতিটি গল্পেই প্রায় দেশের বাস্তব পরিস্থিতি এবং সমাজের পরিচয় প্রায় নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও ছোট গল্প লেখক আলাউদ্দীন আল আজাদের 'বৃষ্টি' (অনূদিত নাম দি রেইন)। গল্পটি এই সংকলনের অন্যতম আকর্ষণ। এই গল্পে পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবনের এক অপূর্ব সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে।

একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু ছোটগল্প লেখক সাদাৎ হোসেনের 'নাথিং বাট দি ট্রুথ' গল্পটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এই গল্পেও পাকিস্তানী সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয় ফুটে উঠেছে। অন্যান্যদের মধ্যে রিজভী হোসেন, মনীউর চৌধুরী, হামিদ জালাল প্রমুখের গল্পও এই একই বাস্তবতাবোধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। যাঁরা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের কাছে বইটি খুবই মূল্যবান বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

—[illegible]

নতুন বই

আবার আমি আসব—(উপন্যাস) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—সাত টাকা।

সুপরিচিত কথাশিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি উপন্যাস 'আবার আমি আসব'। বক্তব্যের গভীরতায় এবং ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণের অভিনবত্বে আলোচ্য গ্রন্থটি একালের বাংলা কথাসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বিশ্বজগতের সকল দেখা লেখার একটাই বুঝি উপসংহার,—আবার আমি আসব। সকল সাধনারও চরিতার্থতা বুঝি ওখানেই। আবার ওখানেই বুঝি মানুষের শেষ সান্ত্বনা।

যুগে যুগে হেরেছে মানুষ, ঠকেছে, কিন্তু তার সঞ্চয় বা সান্ত্বনার এই যে শেষ কথা,—এর পরিবর্তন হয়নি ধ্রুব একটা।

তাই চরম রিক্ততা ও অন্তস্পর্শী হাহাকারের সামনে দাঁড়িয়ে আজও সে বলে, 'আবার আমি আসব'।

চিরকালের মানুষের এই প্রত্যাশাটিকে সামনে রেখে উপন্যাস লিখতে যাওয়া দুঃসাহসের কাজ, সন্দেহ নেই। কারণ, ইমারতের কাঠামোটি যেখানে বিরাট, আসল মালমশলায় সেখানে ঘাটতি পড়লে কাঠামোর কংকালটি বেরিয়ে পড়বার সম্ভাবনা। সুখের কথা, গঠনরীতির দিক থেকে এ-ধরনের কোনো অসম্পূর্ণতার চিহ্ন আলোচ্য গ্রন্থে নেই। বরং যা আছে তা আকারের দিক থেকে না হলেও প্রকারের দিক থেকে নিশ্চয়ই বিরাট।

বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে মনোবিজ্ঞানের পরিচয় না থাকলে ঠিক এমনটি রচনা হত না; অর্থাৎ বিনা, বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠতো না এই সৃষ্টি। চাল-বাজে সমস্ত কাহিনীটি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে লেখক এখানে বিশেষ

সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনা সংস্থানে আগাগোড়া পারম্পর্য বজায় রেখে যে চরিত্রগুলি তিনি এখানে এঁকেছেন, তাদের প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

কাহিনী-বর্ণনার সময়ে পটভূমি এবং পরিবেশ-নির্বাচনও বিশেষ ইঙ্গিতবহ। সাঁওতাল পরগণার জনবিরল একটি এলাকার 'চার্বাক' নামকরণ দুর্যোধন-সখা রাক্ষস চার্বাক-এর কথাই শুধু মনে করিয়ে দেয় না, রাক্ষসটির উত্থান ও পতনকে কেন্দ্র করে উচ্চাভিলাষী মানুষের জয়-পরাজয়ের কথাও স্মরণ করায়। এছাড়া, দেয়াল-ঘেরা চল্লিশ বিঘে জমির মাঝখানে 'ফুলবাগ' নামক বাড়িটিও নায়ক শশিশেখরের স্মৃতিচারণের পক্ষে এবং সেই সঙ্গে বাড়ির প্রথম মালিক ইতিহাস-পুরুষ ইন্দু বিশ্বাসের জীবন-নাটকের যবনিকা উত্তোলনের পক্ষে খুব সহায়ক হয়েছে। দুটি চরিত্র শশিশেখর ও ইন্দ্রনারায়ণের জীবনসাগর-সম্ভূত অমৃত ও গরল শেষ পর্যন্ত এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে একই দর্শনে,—'আবার আমি আসব'। নরম চামড়ায় মোড়া পাণ্ডুলিপিটি এখানে প্রতীক মাত্র। শশিশেখর ও ইন্দ্রনারায়ণের জীবনদর্শনকে ধরে রাখবার প্রতীক। তাই দেখি, শশিশেখরও শেষ পর্যন্ত ওতে নাম স্বাক্ষর করেছে, তারিখ বসিয়েছে, লিখেছে, 'আমি আবার আসব'।

এই লেখা যেমন, 'ফুলবাগ' নামক বাড়িটার দেয়ালে টাঙানো অয়েল-পেন্টিং-গুলোও তেমনি অদ্ভুত তাৎপর্যমণ্ডিত। বিদেশী শিল্পীদের পরিকল্পিত পেন্টিং-গুলো বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এ-উপন্যাসের ঘটনাবলির দিকে তো বটেই, চিরকালের ঘটনাস্রোতের দিকেও পাঠকদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন লেখক; এবং এ কাজে তিনি যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শশিশেখরের জীবনসংগ্রাম, মায়ের স্নেহোপিতার এবং বন্ধু দিবোন্দুর সাহচর্যে প্রতিষ্ঠালাভ, অলকার সঙ্গে তাঁর প্রেম, মিলন ও বিচ্ছেদ—সব কিছুই রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়ে যেতে হয়। তবে সবচেয়ে মুগ্ধ করে দিবোন্দু-চরিত্র যা নাকি ভালোয়-মন্দে দোষে-গুণে একাকার হয়ে গিয়ে পাঠকদের সামনে একেবারে জীবন্ত।

শশিশেখর-অলকা-দিবোন্দু কাহিনীর পাশাপাশি প্রবাহিত ইন্দ্রনারায়ণ-কনক-দামিনী-কৃষ্ণকুমার উপাখ্যান। এই শেষোক্ত পর্বে ইতিহাসের উপাদান প্রচুর আছে। তবে সেই সব উপাদানের কোনোটিকেই গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির কাজে লাগানো হয় নি; কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য ও গতিশীল করে তুলবার কাজে লাগানো হয়েছে বরং। এখানে কনকদামিনীর চরিত্র-সৃষ্টিতেই লেখক সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে মহাদেও, হেম-নলিনী, শম্ভুনারায়ণ, মিস্টার নন্দী ইত্যাদি চরিত্রগুলোও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে সন্দেহ থাকে না যে, 'আবার আমি আসব' উপন্যাসটি রচনার জন্যে সুখ্যাত ও জনপ্রিয় কথাশিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রস-সন্ধানী ও জীবনরসিক পাঠকদের কাছ থেকে অকুণ্ঠিত সাধুবাদ লাভ করবেন।

—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

SOME POEMS BY ASHIS SANYAL. Bengali Literature Publication. 53, Bidhan Palli, Jadabpur. Calcutta 32. Rs. 2.00.

পঞ্চাশের শেষ দিক থেকে শুরু করলেও আশিস সান্যাল ষাটের কবি হিসেবে পরিচিত। নিরুদ্বেগ স্বতায় ও রোমান্টিক আর্তিতে প্রায়ই নিসর্গ আশ্রয়ী হলেও মানুষের ভাবনায় তিনি স্বতঃস্ফূর্ত—হৃদয়ের আনুগত্যে কুণ্ঠাহীন। তাঁর বাস্তবতাবোধে কোনো খাদ নেই।

এই সংকলনে ছাপা হয়েছে তাঁর পনেরোটি উল্লেখযোগ্য কবিতার অনুবাদ। পড়তে পড়তে মনে হয়, উচ্চারণের সাবলীলতায় তিনি শুধু বাঙালী পাঠকের নয়, অবাঙালী ও বহির্ভারতীয় পাঠকেরও হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম। ভাষান্তরেও মূলের ঐশ্বর্য সম্প্রক্ত। সংকলনটি প্রকাশিত হয় চতুর্থ অ্যাংলো-এশীয় লেখক সম্মেলনে দিল্লী অধিবেশনের প্রাক্কালে।

বইটির ছাপা সুন্দর, ঝকঝকে। অনুবাদ স্বচ্ছ ও মূলানুগ। যাঁরা আশিস সান্যালের মূল কবিতাগুলি পড়েছেন তাঁরাও খুশি হবেন বইটি হাতে পেয়ে। বেশীর ভাগ কবিতাই অনুবাদ করেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী। অন্যান্য অনুবাদকদের মধ্যে আছেন দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, লীলা রায় এবং মার্সিয়া ডেরাজো। একটি কবিতার অনুবাদক কবি নিজে।

আলেকসান্দর ব্লকের কবিতা

সস্তা, মোটা মোড়কের কাগজে ছাপা একটি কবিতা। কাঠের বেড়ার গায়ে আর বাড়ির কতবিক্ষত দেয়ালে সাঁটা। কবিতাটির নাম 'বারোজন'। কবির নাম আলেকসান্দর ব্লক। অকটোবর বিপ্লবের জীবন্ত আত্মার যেন কাব্যরূপ।

বিপ্লবী তালে তাল বাড়াও আগ!
শত্রুর চোখ জেনো আছে সজাগ!

দেশময় তোলপাড়। ভাঙাগড়ার সুর। দিনরাত্রির যে-কোনো সময়ে বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদের রাস্তাঘাটে ও পার্কে ময়দানে কবিকে পায়চারি করতে দেখা যেত। ১৯১৮ খৃঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন প্রথম কবিতাটি বেরোয় তখন দেশ সম্পর্কে যারা উদাসীন ছিল এবং বিপ্লবের সংস্পর্শ এড়িয়ে ছিল দূরে তাদের মাথায় যেন বজ্রপাত হোল। অপরপক্ষে সারা রুশদেশ জুড়ে, ইউক্রেনে ও সাইবেরিয়ার দূর দূর শহরে যে-সব বন্দুক, সৈনিক ও নাবিক বিপ্লবের অস্তিত্বরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিলেন তাঁরা যেন লুফে নিলেন কবিতাটিকে।

কবির কণ্ঠে শোনা গেল তূর্যধ্বনি : 'সমস্ত শরীর, সমস্ত হৃদয়, সর্ব সচেতন সত্তা দিয়ে শোনো ডাক বিপ্লবের!' নিজেই ডাক শুনেছেন তিনি। কবি তাঁর দেশবাসী ও জন্মভূমির সঙ্গে সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণত একাত্ম ছিলেন, আর তাই রুশ দেশের জনসাধারণের স্বপ্ন, বাঁচা আর লড়াই করার উদ্দেশ্য অত ভালোভাবে ধরতে ও প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

অক্টোবর বিপ্লবের এক সপ্তাহ বাদে, নতুন সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ, পেত্রোগ্রাডের প্রধান বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান। উপস্থিত হয়েছিলেন মাত্র পাঁচ জন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মায়াকভস্কি এবং ব্লক। তর্কদিনে বিপ্লবকে কেন্দ্র করে বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচণ্ড মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষে বিপক্ষে দাঁড়ান সেকালের প্রায় সমস্ত লেখকই। তাঁদের রচনায় সমকালীন চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটতে থাকে সুস্পষ্টভাবে। যে সব বাস্তববাদী লেখক, কিছুতেই বিপ্লবকে স্বীকার করে নেননি, তারাই ছিলেন সব থেকে বিস্ময়কর চরিত্র।

ব্লক স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। তত্তদিনে ইতিহাসের প্রবাহ এবং স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন: 'সমর্থন কী অসমর্থন? এটা আমার কাছে কোন প্রশ্ন নয়: এ আমার বিপ্লব।' ১৯১৮ খৃঃ পেত্রোগ্রাডউথইকো পত্রিকা একটি প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয় : 'বলশেভিকদের সঙ্গে কি বুদ্ধিজীবীরা কাজ করতে পারে?' উদ্বেগে অকম্পিত কণ্ঠে ব্লক জানালেন নিশ্চয়ই পারে। কিছুদিন বাদেই ব্লকের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বুদ্ধিজীবী এবং বিপ্লব' প্রকাশিত হল। প্রবন্ধের অন্তিম আবেদন: 'দেহ আত্মা এবং বিবেক দিয়ে স্বীকার করো বিপ্লবকে।'

ব্লক এর আগে, ১৯০৫ খৃঃ উপলব্ধি করেছিলেন, বুর্জোয়া সভ্যতা-সংস্কৃতির দিন প্রায় সমাপ্তির পথে। রোগাক্রান্ত এই সমাজকে একমাত্র বিপ্লবের পথেই পরিবর্তিত করা সম্ভব। 'বুদ্ধিজীবী এবং বিপ্লব' প্রবন্ধটি বিপ্লবের কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হওয়ার সমকাল থেকে পরবর্তী সময়ের এক মানসিক প্রবাহের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। সময়ের ডাক এসে পৌঁচেছে। পিছিয়ে পড়া মূর্খতা। যা আসছে, তা সম্পূর্ণ অভাবিত। একেবারেই নতুন। যারা একে স্বীকার করে নেবে না, বিরোধিতা করবে, তারা তো বিপ্লবের শত্রু, নতুন যুগের প্রতিবন্ধক। 'বারোজন' একটি আবেগের চূড়ান্ত প্রকাশ। রুশ লেখকদের মধ্যে এমন দ্বিধাহীনচিত্তে আর কেউ বিপ্লবকে স্বাগত জানাতে পারেননি, সে সময়ে। চারদিকের আকাশে বাতাসে এক নতুন যুগের স্পন্দন, নতুন সত্যের প্রবাহ—শিল্পীর দায়িত্ব তো তাকে উপলব্ধি করা।

CENTRAL LIBRARY

সব কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। সনাতন অপরিবর্তনীয় রুশ যাপন জীবনের উৎপাটিত ঘাঁটিতে উঠেছে নতুন দিনের সূর্য।

ব্লকের 'বারোজন' বা অন্যান্য প্রসঙ্গে বিপ্লব সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা সমকালে বিদ্রূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। তার মধ্যে এক পিছুটানের সন্ধান পেয়েছিলেন সমালোচকরা। কিন্তু যে আপাত চিন্তার জটিলতা কোথাও কোথাও ব্লকে স্পষ্ট, তা গভীর বিশ্লেষণে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ১৯০৫ খৃঃ বিপ্লব ব্লককে নতুন মানুষ করে যায়। তিনি মিশে গিয়েছিলেন মিছিলের সঙ্গে। মাথার ওপর উঁচিয়ে নিয়েছিলেন লাল পতাকা।

ব্লক সানন্দে স্বাগত জানান অকটোবর বিপ্লবকে। বিপ্লবের শুদ্ধিকরণ ক্ষমতায় তাঁর ছিল অটুট বিশ্বাস। বয়েস কমে গেল যেন কয়েক বছর। চারপাশের সব কিছুই অপরূপ ঠেকল চোখে। এতদিনে এতদিনে কানে এসে পৌঁছল কি তবে এই জীর্ণ জগতের ধ্বসে পড়ার বজ্রনির্ঘোষ: এ সময়ে যে অংশ সংবেদনশীল সংস্কৃতিমান রুশ বুদ্ধিজীবী অকটোবর বিপ্লবের সময় দপ্তর স্মোলনি ইনস্টিট্যুটে আসা-যাওয়া করতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলেকসান্দর ব্লক ও ভলাদিমির মায়াকোভস্কি। নতুন সমাজব্যবস্থায় রুশ কবিতার ভবিষ্যৎ কোন পথে নির্ধারিত হতে যাচ্ছে, উপরোক্ত ঘটনা ছিল তারই সূচনা।

বিপ্লবী পদপাতে কাঁপাও বিশ্বে!
অশান্ত শত্রুর চোখে নেই ঘুম!

আলেকসান্দর ব্লকের কবিতা গভীর অর্থেই আমাদের সমকালীন। কারণ, তাঁর গীতিকবিতার নায়ক হল মানুষ। তিন অক্ষরের এই শব্দটির পূর্ণ তাৎপর্যে মণ্ডিত মানুষই। লেখক কনস্তানতিন ফেদিন একদা ব্লক সম্বন্ধে মাকসিম গোর্কির একটি স্মরণীয় উক্তির উল্লেখ করেন। গোর্কি তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে বিশেষ করে আলেকসান্দর ব্লকের সঙ্গে আলাপ করতে বলি। অবশ্যই আলাপ করবেন কিন্তু। ওঁকেই...ওঁকেই...' হঠাৎ মনমত কথাটি খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেলেন তিনি। কিছুতেই মনে আসছিল না কথাটা। অধৈর্য হয়ে, প্রায় নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা দিতে লাগলেন। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। পিঠটান করে দাঁড়ালেন অসম্ভব লম্বা, রোগা চেহারার মানুষটি। আস্তে আস্তে হাত দুটো নামিয়ে আনলেন, আর প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'ওঁকেই বলি মানুষের মতো মানুষ।' কথাটা বলে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গোর্কি।'

ব্লক বড় হয়ে ওঠেন তাঁর মাতামহ, প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিজ্ঞানী আন্দ্রেই বেকেতভের সংসারে। বেকেতভ ছিলেন সেন্টপিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং বিশ্বখ্যাত রুশ রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্দেলিয়েভ-এর বন্ধু। সাহিত্য অনুরাগের ঐতিহ্য ছিল পরিবারে। কবির মা এবং বোনেরা বিদেশী সাহিত্য রুশ ভাষায় অনুবাদ করতেন এবং নিজেরাও লিখতেন। ব্লকের মতে, তাঁরা সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যের সু-উন্নত তাৎপর্য বিশুদ্ধ-বোধ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন।

ব্লকের কবিতা ছাপার হরফে প্রথম প্রকাশ পায় ১৯০৩ খৃঃ। 'উৎসর্গ থেকে' এই শিরোনামে দশটি কবিতা (নতুন পথ) পত্রিকায় ছাপা হয়। এর অল্প পরে ব্লকের কবিতা পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহিত্য-শিল্প সংগ্রহ গ্রন্থে বেরিয়েছিল। এর পর রুশ কবি ভালেরি ব্রিউসভ উত্তর দেশের ফুল সংকলনে 'সুন্দরীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কাব্যগুচ্ছ' শিরোনামে ব্লকের আরো দশটি কবিতা প্রকাশ করেন।

রুশ জাপান যুদ্ধ সুরু হয় ১৯০৪ খৃঃ। আর হঠাৎ যেন ব্লকের মোহনিদ্রা ভাঙল। পরিপার্শ্ব জগতের দিকে প্রথম চোখ মেলে তাকালেন কবি। দরজা বন্ধ। আরামদায়ক পারিবারিক জগৎ ছেড়ে তিনি সরাসরি পিটার্সবুর্গের রাত্রি-অন্ধকারে পা বাড়ালেন। আর সেখানে সাক্ষাৎ পেলেন জনগণের। তাহলে কবি ও তাঁর আরাধ্যা সুন্দরী ছাড়া পৃথিবীতে আরও মানুষ আছে? অত্যন্ত কঠোর জীবন নির্বাহ করে এমন দরিদ্র লোকেরও অভাব নেই? ওরা সবাই কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু এই দুঃখ কষ্টের জন্যে দায়ী কে? অতঃপর ব্লকের কবিতায় জার-শাসিত দুনিয়ার নির্মম বাস্তবতার যন্ত্রচক্রে পিষ্ট মানুষের কথা স্থান পেতে লাগল।

ব্লকের এই সময়ের কবিতায় আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে। কখনও কখনও মনে হয়, 'সুন্দরীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কাব্যগুচ্ছ' এবং 'শহর' কাব্যগুচ্ছের কবি যেন দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। বস্তুত, তাঁরা দুই বিভিন্ন ব্যক্তিই বটেন। বিশ্ববীক্ষার পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ব্লকের কাব্য-কলাগুলিতেও পরিবর্তন এল। উচ্চারণ হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ, তীব্র, পরিচ্ছন্ন ছিমছাম এবং আগেকার সুরেলা স্তবকবন্ধনের স্থান নিল ছাড়া, অসমছন্দ। নেক্রাসভের গণতন্ত্রী বাচন ব্লকের রচনাবলীর বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়ল এবং একেবারে শিশুকাল থেকে যাঁরা ছিলেন কবির আপনার আপনজন সেই ঝুকোভস্কি, তিউৎচেভ ও ফেতের মতো গীতিকবিদের মৃদু কোমল বাগভঙ্গিমার অনুরণন আর সে-কাব্যে শোনা গেল না। শহরের কুয়াশা ভেদ করে বিদ্রোহের বজ্রধ্বনি কানে পৌঁছল ব্লকের। ১৯০৫ খৃঃ ৯ জানুয়ারি প্রভাত হল। সুরু হল প্রথম রুশ-বিপ্লব। এই সময়ে যা কিছু লিখেছেন ব্লক সবই ছিল সে-ঝড়ের পদপাতে তাঁর জন্মভূমি প্রকম্পিত হয়েছিল, তারই প্রভাবে আক্রান্ত। নাশা ঝিজন (আমাদের জীবন) নামে পত্রিকার ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হল 'জীবনতরণী ভাসল', 'এগিয়ে চল সংগ্রামে' এবং 'সর্বজনীন শহরের উপর ভাসমান' নামের কবিতাবলী। ফলে পত্রিকার ওই সংখ্যাটি কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করল। ১৯০৫ খৃঃ বিপ্লব পরাস্ত হল। এবার জারতন্ত্র সুরু করল প্রচণ্ড আক্রমণ। রুশ দেশ আর তার সঙ্গে সঙ্গে আলেকজান্দার ব্লকও সকল যন্ত্রণার অংশীদার হলেন ঃ

ওরা যতই ডাকুক আমায় ঃ
আজ এল সময়
যাও কবি যাও হারানো সেই
সুখের স্বর্গে ফিরে!
—না, যাব না!
তীক্ষ্ণ তুষার মুখ দিক না ছিঁড়ে!
আরাম আয়েস নয় আর নয়,
শান্তজীবন নয়!"

১৯০৮ খৃঃ ব্লক 'কুলিকোভের মাঠ' নামে তাঁর বিখ্যাত কাব্যমালা রচনা করলেন। এ কাব্য ছিল তাঁর বহু বছরের চিন্তা ও মননের ফসলস্বরূপ। এর দু-বছর পরে তিনি 'প্রতিশোধ' নামে দীর্ঘ কবিতা রচনায় মন দিলেন। বিশ্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্যে মণ্ডিত এ কবিতা সেদিন প্রতিভাত হয়েছিল ভবিষ্যদ্বাণীর মতো।

ব্লক বিশ শতকের প্রথম পর্যায়ের স্মরণযোগ্য কবি। পুশকিন, লেরমনতভ, নেক্রাসভ, রউলেনভ-এর সঙ্গে একই পংক্তিতে নামকরা যায় ব্লকের। জীবন সম্পর্কে এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও আন্তরিকতা রুশ কবিদের মধ্যে একান্তই দুর্লভ। মানুষের বেঁচে থাকার গভীরে আছে আনন্দ বেদনা সুখ দুঃখ—কবির কাছে তা ধরা পড়েছিল। চারিদিকের কুশ্রীমলিন স্বার্থশূন্য পরিবেশ থেকে এক উজ্জ্বল দীপ্তি—যা জীবনের সার্থক পরিচয়, ব্লক তাকে পেয়েছিলেন নিজের অন্তরে। "ব্লকের গীতিকবিতার আকর্ষণ বিস্ময়কর। প্রেমের কবিতায় আছে স্ফূর্ত আবেগ। পাস্তেরনাকের কবিতা যেখানে চিত্রানুগ ও বর্ণনাত্মক, ব্লক সেখানে চিত্রানুগ, বর্ণনাত্মক এবং ঘটনানির্ভর। আরও বেশি গম্ভীর ওঁর কবিতা। কালের গভীরতায় কবি ব্লক, ছবি আঁকেন না, অনুভূতিকে ধরে রাখেন। চারদিকের জীবনটাই সত্য ওর মধ্যেই শিল্প। তবুও ব্লক কখনও কখনও স্বপ্নবিলাসী, রোমান্টিক। ইতিহাসের এক জটিল মুহূর্তে ব্লকের আবির্ভাব। উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষদর্শী কবি জীবনের নির্মম ছবি এঁকেছেন। পুরোনো দিনের রাশিয়াকে বলেছিলেন বীভৎস বিশ্ব। এই বীভৎসতার অন্তরাল থেকে জন্ম নিক নতুন জীবন। স্পন্দিত হোক নতুন প্রভাত। জাগুক নতুন সূর্য। অকটোবর বিপ্লব তাই কবির কাছে ছিল পবিত্র কাঙ্ক্ষিত বাস্তব।

অনন্য সেন

বইকুণ্ঠের খাতা

বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ ও ডক্টর সুকুমার সেন

ডক্টর সুকুমার সেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তাঁর কলকাতার বাড়ীতে বসে। দিন তিনেক আগে দিল্লী থেকে ফিরেছেন: এবার যাবেন আসাম। অর্থাৎ চাকুরী থেকে অবসর নিয়েও কাজের হাত থেকে অব্যাহতি নেন নি। চলছে নানা রকম কাজের ব্যস্ততা। ফাঁকে ফাঁকে ছেপে যাচ্ছেন সেই বিখ্যাত বইটি, যার নাম দিয়েছেন তিনি : 'অ্যান ইটিমোলজিক্যাল ডিক্‌শনারী অব বেঙ্গলী' (দশম থেকে অষ্টম শতাব্দী)।

আমরা বইটি সম্পর্কে পূর্বেই অমৃতে আলোচনা করেছিলাম। যখন তিনি ছাপার কাজে হাত দিয়েছিলেন, তখনই। সেও আজ অনেকদিন আগের কথা। রোমান হরফের নানা চিহ্নযুক্ত অক্ষরে ছাপা হচ্ছে বইটি। প্রাচীনকালের কাব্যে-সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ ও অর্থান্তর দেখানো হয়েছে পাতার পর পাতায়। আমরা তাঁর টাইপ করা পাণ্ডুলিপির ফটোস্ট্যাট কপি দেখে দেখেছিলাম, কী রকম অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার ফলে এই গ্রন্থ বাস্তব রূপ নিতে চলেছে।

সম্ভবত এত বিরাট আকারের আর কোনো বই লেখার পরিকল্পনা এখন তাঁর নেই। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ছাড়া এমন দীর্ঘ পরিশ্রমের কাজ বোধহয় তিনি আর করেন নি।

বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ

সম্প্রতি তাঁর একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন বেরিয়েছে 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ' নামে। বের করেছেন 'রূপা অ্যান্ড কোম্পানী'। মোট বারোটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংগ্রহ।

সুকুমারবাবু বলেন : 'আমার বৈষ্ণব সাহিত্যের, তথা বাংলা-সাহিত্যের আলোচনার সূত্রপাত অনেকটা দৈবক্রমেই সংঘটিত হয়েছিল। সে ১৯২৭-২৮ সালের কথা। তখন আমি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের পাঠ শেষ করেছি, অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় সিনট্যাক্সের আলোচনা চুকিয়ে দিয়েছি। তারপর ব্রজবুলি ভাষার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই কাজে হাত দেবার আগে আমাকে বৈষ্ণব পদাবলী বারবার এবং খুঁটিয়ে পড়তে হয়েছিল।'

অল্প বয়সে তিনি দু একটি বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থ পড়লেও, কখনো বৈষ্ণব-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন, তার নির্দেশ ছিল অন্তরে-বাইরে। কীর্তন গান ভালো লাগতো—এই পর্যন্ত। তবু এই সঙ্কলনের প্রবন্ধগুলি তাঁর সেই উদাসীনতার ফল নয়, বিভিন্ন সময়ের চাহিদার ফসল। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় ১৩৩৬ সনে প্রকাশিত 'গোবিন্দদাস কবিরাজ' শীর্ষক প্রবন্ধটির অন্যতম প্রেরণা-প্রসঙ্গে বলেন :

একদিন সকালে আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গিয়েছি। গিয়েই দেখলুম এক সৌম্যদর্শন প্রবীণ ভদ্রলোক বসেছেন। একটু পরেই তিনি চলে গেলেন। তখন সুনীতিবাবু বললেন, ইনিই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এই বইটি দিয়ে গেলেন। বলে ছোট একটি বই দিলেন, পুস্তিকার, ভালো কাগজে ভালো করে বাংলা অক্ষরে ছাপা, ভালো কাপড়ে বাঁধাই। বইটি হল মৈথিলী কবি গোবিন্দদাস ঝার পদাবলী, দারভাঙার মহারাজার অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত। সুনীতিবাবু বললেন, নগেন্দ্রবাবু বলছেন ব্রজবুলি পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস বাঙালী নন, তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন এবং তাঁর পদাবলী মিথিলায় পাওয়া গেছে। আমি বইটি উলটে পালটে দেখলুম, সব পদই শব্দরূপেতে আছে মনে হল। তবে ক্রিয়াপদ এবং কোন কোন সর্বনাম পদ মৈথিলীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি সুনীতিবাবুকে বললুম, নগেন্দ্রবাবুর দাবি কিছুতেই মানা যায় না। ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দদাস কবিরাজের সম্পূর্ণ পরিচয় রয়েছে। বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের প্রমাণও রয়েছে, তাকে মিথিলাবাসী বলি কি করে? সুনীতিবাবু তখন জোর করে বললেন, আপনি লিখুন প্রবন্ধ নগেন্দ্রবাবুকে প্রতিবাদ করে। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য করে নিতান্ত অর্বাচীন অ-প্রতিষ্ঠ অ-লেখক আমি সুপ্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত সুলেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে প্রতিবাদ করে বড় প্রবন্ধ ফাঁদলুম। সুনীতিবাবু বোধহয় তখন সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না, তবে পরিষদে তাঁর মতামতের খুব খাতির ছিল। অচিরে প্রবন্ধটি ছাপা হলো প্রায় পুরো একটি সংখ্যাব্যাপী। নগেন্দ্রবাবু আমার প্রবন্ধের কোন প্রতিবাদ লেখেন নি।'

'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ'-এর ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছেন, এই প্রবন্ধটি দিয়েই তাঁর বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনার সূত্রপাত। তারপর নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন সুকুমারবাবু। বিষয়-বৈচিত্র্য নানা রকম। গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে লেখা। অধিকাংশ প্রবন্ধই বেরিয়েছিল বিশ্বভারতী এবং সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। একটি অমৃতে ও অন্য একটি আনন্দ বাজারে।

সুকুমারবাবু বলেন, এইসব রচনা আমার বিভিন্ন কাজের বাই-প্রোডাক্ট।

তিনি এ সঙ্কলনের বিভিন্ন প্রবন্ধে যে মতামত ও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, পরবর্তীকালে তার কিছু কিছু সংশোধিত হয়েছে। কখনো কখনো তিনি নিজের সঙ্গে মতান্তরে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যেমন প্রাগুক্ত গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্বন্ধে।

ব্রজবুলি পদ রচনায় গোবিন্দদাস কবিরাজের মতো গোবিন্দদাস চক্রবর্তীও ছিলেন সমান কৃতী এবং কবিত্বসম্পন্ন। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলীর' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি তাঁর পূর্ব অভিমত নিজেই সংশোধন করেছেন।

এই সঙ্কলনের অন্যতম প্রবন্ধ 'শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস' প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান এখনো কূল-কিনারার বাইরে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে আলোচনার বাইরে না রাখতে পারলে চণ্ডীদাস সমস্যার গেরো আলগা হবে না।

তিনি সেই বিতর্কিত বিষয়ে স্মৃতি উদ্ধৃত করে বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের হাতে লেখা পুঁথিটি যে কোন্‌ কালের, তা নির্ণয় করা হয়তো অসম্ভব নয়। আর যে যাই বলুন, আমার তো মনে হয়, পাণ্ডুলিপিটি আঠারো শতকের শেষ কিম্বা উনিশ শতকের আগের নয় কিছুতেই। তারও পরে হতে পারে। আমি বইটিতে তিরিশ-চল্লিশটি পার্সিয়ান শব্দ পেয়েছি। সুনীতিবাবু পেয়েছিলেন পাঁচ-ছটির মতো।

বললুম, 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধের' অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

—ভূমিকায় নেই। এমন অনেক কথা বলেছি, যা এর আগে কেউ কখনো বলেন নি। নতুন কিছু লেখার না থাকলে কলম ধরিনি কখনো। আমার বহু লেখাই নতুন গবেষণার পথ খুলে দিয়েছে। যেমন, এই সঙ্কলনের একটি লেখার সূত্র ধরে আমারই অধীনে এখন একজন গবেষণা করছেন। বলতে পারেন, তাঁর থিসিসটি হবে আমারই প্রবন্ধের সম্প্রসারিত রূপ।

নানাকথা : ভিন্ন প্রসঙ্গ

আলোচনা শুরু হয়েছিল এ বই নিয়ে নয়, সুকুমারবাবুর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের অতীতচারণা প্রসঙ্গে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি এম-এ পাশ করেছেন, আর পি-আর-এস হয়েছেন পরের বছর—১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। অতীতে আর কেউ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে পি-আর-এস পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন বলে জানি না। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, ডক্টরেট পেয়েছেন কবে? থিসিস কি ছিল?

—আমি ডক্টরেট হয়েছি অনেক পরে। থিসিস ছিল, 'হিস্টোরিক্যাল সিনট্যাক্স অব মিডল ইন্দো-এরিয়ান'। তারপরও বহু বিষয়ে গবেষণা করেছি, সামনে কোনো লোভ ছিল না—পুরস্কারের হাতছানি ছিল না। আমার ডক্টরেটের থিসিস পরীক্ষা করেছিলেন, জিউল ব্লক, এল ডি বার্নেট এবং রালফ লি টার্নার। এখন দুজন বেঁচে নেই। কেবল টার্নার জীবিত আছেন। এদিক থেকে আমার স্মৃতি ভ্রষ্ট নয়, বিস্তৃতি। কেননা, আমার পরীক্ষকগণ সকলেই ছিলেন ——— লোক। পি-আর-এস পরীক্ষা দেওয়ার সময়েও আমার বিষয় পরীক্ষা

CENTRAL LIBRARY

করেছিলেন বোম্বাইয়ের অধ্যাপকেরা।

কোন্ কোন্ লেখা লিখে আপনি পুরস্কৃত হয়েছেন?

—'উইমেন্স ডায়ালেক্ট ইন বেঙ্গলী' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম। ছাপা হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব লেটার্স'-এ। এর আগে এ বিষয়ে আর কেউ আলোচনা করেছেন বলে জানি না। ঐ প্রবন্ধটি লিখে আমি আশুতোষ মুখার্জী মেডেল পেয়েছিলুম। এ পর্যন্ত আমি তিন বার গ্রিফিথ পুরস্কার পেয়েছি তিনটি লেখার জন্যে। আশুতোষ মুখার্জী মেডেল পেয়েছি দু'বার। তখন, আমাকে অনেক অধ্যাপক অনুরোধ করেছিলেন, আর আপনি, কোনো পুরস্কারের জন্য প্রবন্ধ লিখবেন না স্যার। আমাদের ছাত্রদেরও কিছু কিছু পাওয়া দরকার। ওরা কেউ আপনার সঙ্গে পেরে উঠছে না।

তারপর আর কোনো প্রবন্ধ পুরস্কারের জন্যে লিখি নি।

বললাম, আপনার প্রথম লেখা কোন্‌টি? কোথায় বেরিয়েছিল?

—[illegible] একটি প্রবন্ধ লিখেছিলুম, প্রবাসীতে। প্রবন্ধটির নাম 'পঞ্চকন্যা।' সেটা ১৯২১ সালের কথা। বোধহয় বাংলা ১৩২৮ হবে। রিসার্চ বলুন, আর যাই বলুন—সেটিই আমার প্রথম প্রবন্ধ। তার আগে পত্রপত্রিকায় আর কোনো লেখা বেরোয় নি।

আপনার প্রথম প্রকাশিত বই কোন্‌টি?

—শেক শুভোদয়া। [illegible] সিরিজের বের করেছিলেন ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা। বইটির ইংরেজী অনুবাদ ছেপেছেন এশিয়াটিক সোসাইটি।

তারপর, পুরনো স্মৃতি স্মরণে পড়ায় প্রাণখোলা হাসি হাসলেন সুকুমারবাবু। যেন দীর্ঘকাল আগেকার একটা দিনকে তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। হাসি থামিয়ে বললেন, জানেন তো, শেক শুভোদয়ার একটি গল্প আছে খেয়ী সম্পর্কে। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্যে' খেয়ীকে বলেছেন বাঁদী। আমি আমার বইয়ের ফুটনোটে তাঁকে খেপাবার জন্যে শেক শুভোদয়ার সূত্র ধরে লিখে দিলুম, খেয়ী আসলে তাঁতি।

বইটি পড়ে তো দীনেশবাবু মনঃক্ষুণ্ণ। উপায়? একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়িতে। দীনেশবাবু বললেন, তুমি কি করেছ? এতে যে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না। তুমি বইটাকে এর একটা বিধান করো। আমি নরেনবাবুকে বললুম, ফুটনোটের ছাপা অংশটা এক টুকরো কাগজ দিয়ে ঢেকে দিন। যার দরকার সে উল্টে নিয়ে আসল কথাটা জেনে নিতে পারবে। তাতেই দীনেশবাবু খুব খুশি হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমাকে উসকে দিয়েছিলেন সুনীতিবাবু।

আপনার অন্যান্য গবেষণামূলক কাজ কি কি?

—আমাদের সাহিত্যে ভূতের গল্প নামে একটা অদ্ভুত ধরনের প্রবন্ধ লিখেছিলুম অনেক দিন আগে। অক্সফোর্ডের ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে পড়েছিলুম একটা গল্প। নাম দিয়েছিলুম 'দি স্টোরি অব দেবদত্ত'। সকলেই খুব প্রশংসা করেছিল। সাধারণ গল্প হলে হয়তো এটা হৈ-চৈ পড়তো না। দু' হাজার বছরের ব্যবধানে—পতঞ্জলি আর পাণিনি—দেবদত্তকে যেমন-ভাবে দেখেছিলেন, তাই আমি সাজিয়ে দিয়েছি একটা গল্পের আকারে। তাছাড়া আমার লেখা 'দি সিনট্যাক্স অব [illegible] সেন্টেন্স' শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও প্রশংসিত হয়েছে। এজ-গারটন সাহেব তো বক্তৃতা দিতে এসে আমাকে এ ব্যাপারে পাইওনিয়ার আখ্যা দিয়েছিলেন। আমার ছাত্রদের মধ্যে এডওয়ার্ড সি. ডিমক এখন শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের ডিরেক্টর। তিনি বাউল গান সম্পর্কে বই লিখেছেন। তবে আমার শ্রেষ্ঠ কাজ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ও 'অ্যান ইটিমোলজিক্যাল ডিকশনারী অব বেঙ্গলী'। অনেক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও এ দুটো বই পরবর্তীকালে টিকে থাকবে এবং অনেক গবেষণার রসদ যোগাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বললেন, সুনীতিবাবু আমাকে দিয়ে একটা লেখা লিখিয়েছিলেন সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার জন্য। বিষয়: বৈদিক গদ্য। তখন লিখতুম বিশুদ্ধ সাধু ভাষায়। সুনীতিবাবু পড়ে বললেন, কিছুই হয় নি। তুমি বাংলা লিখতে জানো না। পরে সেই লেখাটিই চলিত বাংলায় রূপান্তরিত করে নিয়ে গেলুম। তিনি সেই প্রবন্ধ ছেপেছিলেন সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (আর্য ভাষার গদ্যের ভঙ্গি)

বিগত স্মৃতি পুনরুদ্ধার করে বললেন, তখন আমি থাকতুম ২৭ নম্বর গোয়াবাগান স্ট্রীটে, আর সুনীতিবাবু থাকতেন ৩ নম্বর সুকিয়া রো-তে। একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার। বললেন, ইনি সজনীকান্ত দাস। এই পরিচয় আমার জীবনের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা।' সজনীবাবুর অনুরোধেই আমি 'বঙ্গশ্রী'তে বাংলা সাহিত্যে গদ্য সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক লেখা লিখে-ছিলুম। তার তাগাদা না থাকলে হয়তো 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' লিখতুম কিনা সন্দেহ।

বললুম, আপনাকে নিয়ে অতীতে কখনো বিতর্ক হয়নি?

আমার অনেক লেখা নিয়েই বিতর্ক হয়েছে বহুবার। নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা করার দিকেই আমার ঝোঁক। সারা ভারতের স্কলারদের মধ্যে আমিই একমাত্র নিজের লেখাকে নিজে কন্ট্রাডিক্ট করেছি বারবার। কারণ, আমি নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করি না। যখনই নতুন কোনো তথ্য পেয়েছি, তখনই আমার পুরনো ধারণাকে অস্বীকার করতে দ্বিধা করিনি। আমি লিখেছি জ্ঞানের জন্য, অনুসন্ধিৎসার সহজাত চাহিদায়। কারো মুখ চেয়ে কিছু লিখিনি। ছাত্রছাত্রীরা বলেন, আমার লেখায় নাকি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন সংস্করণ বেরোলে আগের সংস্করণগুলি আর তেমন কাজে লাগে না। কিন্তু আমি কি করবো? নতুন তথ্যের সন্ধান পেলে আমি তো চুপ করে থাকতে পারি না।

বললাম, আপনার ছেলেবেলার গল্প বলুন, পড়াশোনার ব্যাপারে তখন কেমন আকর্ষণ বোধ করতেন?

—অল্প বয়সেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন বোধহয় আমি ছয় বছরের। অসুখে ভুগে ভুগে কথা বলতে পারতুম না—এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। কোন কিছু ভর না দিয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারতুম না। কেবল বই পড়তুম। কেনা বইয়ে কুলোত না। বাবা আমাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বর্ধমান রাজ লাইব্রেরীতে। সেই ছেলে-বেলাতেই আমাকে বইয়ের নেশা পেয়ে বসেছিল।

তখন আর স্কুলে যেতে পারি না। শেষ করে ভর্তি হলুম ফিফ্‌থ ক্লাসে। আজকের দিনের অষ্টম শ্রেণীতে। কয়েকদিনের মধ্যেই মাস্টারমশাইদের নজরে পড়ে গেলুম। উঁচু ক্লাসের কোনো ছেলে কোনো প্রশ্নের উত্তর না পারলে আমার কাছে নিয়ে আসতেন উত্তর জানার জন্যে।

সেই ছাত্রজীবনেই পড়েছিলুম আরো, যথা। পরীক্ষা দিইনি। গণিতে ভালো ছিলুম। সেজন্যে ইচ্ছে ছিল, ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে ম্যাথমেটিক্‌স-এ অনার্স নিয়ে বি-এ পড়বো। বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ব্যবস্থাও হয়েছিল। কেবল হস্টেলে থাকার জায়গা ছিল না বলে বাধ্য হয়ে কলকাতায় এলুম পড়াশোনা করতে। কিন্তু ম্যাথমেটিক্‌সে আর অনার্স নেওয়া হলো না। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলুম সংস্কৃত অনার্স নিয়ে। তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা ছিলেন গণিতের নামকরা অধ্যাপক। তাঁকে আমার গণিত সম্পর্কে লেখা ছাত্র-জীবনের কিছু প্রবন্ধ দেখিয়েছিলুম।

সংস্কৃত কলেজ থেকে অনার্সে দ্বিতীয় হয়ে বি-এ পাশ করার পর, আমাদের অধ্যাপক ধীরেশচন্দ্র আচার্য জিজ্ঞেস করলেন, কি পড়বে?

বললুম, ফিললজি। তিনিই বেদ সম্পর্কে আমাকে ইন্টারেস্টেড করেছিলেন। সে কথা আমি কখনো ভুলবো না। আমাকে বড় ভালোবাসতেন।

সুকুমারবাবুর এই অকপট স্মৃতিচারণা শুনতে শুনতে বিগত দিনের সমকালীন এক আশ্চর্য জগতে প্রস্থান করেছিলাম হয়তো। পথে নেমে আবার তাঁর 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধগুলির কথা মনে পড়লো। নিরলস এক গবেষকের অবসর মুহূর্তের দান এই গ্রন্থ। তবু তুচ্ছ নয়। বাংলা সাহিত্যের একেকটি সমস্যা ও বিষয়ের ওপর যেন তিনি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আলো ফেলেছেন। যেন একেকটি গবেষণার সংহত রেখাচিত্র এই সংকলনের একেকটি প্রবন্ধ।

—গ্রন্থদর্শী

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

।। নয় ।।

আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম: ভাবছিলাম, টেলিফোন করা কি ঠিক হলো? বুলা কিছু ভাবল নাতো? আমার কোন দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে কি?

নিজেই নিজেকে বোঝালাম, না, না দুর্বলতা আবার কি? তাছাড়া দুর্বলতা থাকলেও সে খবর ও জানবে কেমন করে?

আবার ভাবছি বার বার দুর্বলতার কথা ভাবছি কেন: দুর্বলতার কোন প্রশ্নই নেই। আলাপ পরিচয় হয়ে ভাল লেগেছে আর কথাবার্তা হাঁটাচলা অনেকটা যেন মানসীর মত। তার বেশী কিছু নয়। সুতরাং এত মাথা ঘামাবার কি আছে?

কিছু না!

'স্কুটার'! চীৎকার করে স্কুটার রিকসা থামিয়ে উঠে পড়লাম।

দেখতে দেখতেই পৌঁছাব ডক্টর সরকারের বাড়ী। কি আর এমন দূর? শহর থেকে নিউ ফরেস্ট হচ্ছে মাইল তিনেক। ডক্টর সরকারের বাড়ী তার মাঝামাঝি। শহরের শেষ প্রান্তে। হেঁটেই যাওয়া যায়। এতটুকু রাস্তা হেঁটে যাওয়াই উচিত। নাজির পট্টী থেকে গুরুচরণ কলেজ যতদূর তার চাইতে সামান্য বেশী হতে পারে। শিলচরে কেউ রিকসা চড়েও অতটুকু রাস্তা যায় না। বৌবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড। সবাই তো সেন্ট্রাল এভিন্যুর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে। অতটুকু রাস্তার জন্য ট্রামে-বাসেও কেউ চড়তে চায় না।

এইটুকু রাস্তার জন্য আমি স্কুটার-রিকসা চড়েছি? শিলচরের লোক শুনলে হাসবে। ঠাট্টা করবে। জি, সি, কলেজের বন্ধুরা শুনলে তো সন্দেহই করবে।

সন্দেহ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ সন্দেহ। টিকর বস্তির ঐ যে পাহটার তলায় বসে আমরা আড্ডা দিতাম, যেখানে আমি প্রথম সিগারেট খাই, সেখানে একবার এই খবরটা পৌঁছলে হয়! অম্বিকা পট্টীর কানাই নিশ্চয়ই সব চাইতে আগে লাফিয়ে উঠবে! সুভাষনগরের সুবোধ হয়ত মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে গাইতে শুরু করবে, প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা। প্রাণ চায়...

ঠাট্টা করাটা ওদের অন্যায় হবে না। সেন্ট্রাল রোড দিয়ে সুনীলকে বেশী জোরে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখলেই আমরা পিছনে লাগতাম না?

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই আমার হাসি পেল।

আচ্ছা অমন হঠাৎ চীৎকার করে স্কুটার রিকসা থামিয়ে প্রায় লাফ দিয়ে চড়ে পড়া কি অন্যায় হয়েছে।

অন্যায় আবার কি? একলা একলা হাঁপিয়ে উঠেছি। আর ভাল লাগে না। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কেউ যদি ভালবেসে যেতে বলে তাহলেও যাব না? নিশ্চয়ই যাব। তাছাড়া এখন তো আমি স্টুডেন্ট নই। চাকরি করছি। সাড়ে তিনশ' টাকা বেসিক। সব মিলিয়ে পাঁচশ' টাকার ওপরে পাচ্ছি। এছাড়াও এখন ফিল্ড এ্যালাউন্স পাব। সামনের মাসে হয়ত সাড়ে ছ'শ—সাতশ' টাকার মত পাব। এত টাকা দিয়ে আমি কি করব? নিজের জন্য কতই বা খরচ? মাদা-মাগো থাকলে প্রাণভরে খরচ করতাম। বাবার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। সেই মাধা মারা যাবার পর আমি আর মাগো কিছু-দিনের জন্য বাবার কাছে ছিলাম। তারপর আর যাই নি। আর দেখাশুনাও হয় নি। আমি গেলে হয়ত ওর অস্বস্তি হবে। নতুন মা হয়ত সরল হয়ে মিশতে পারবেন না। তাইতো যাই না' যেতে মন চায় না। তাছাড়া ওদের কাছে যাবার কোন আকর্ষণও বোধ করি না।

বাবা বড়লোক না ঠিকই তবে বেশ স্বাচ্ছন্দভাবেই সংসার চালান। ব্যবসাটা নেহাত খারাপ না। দোতলা বাড়ী করেছেন। দুটো বোনের বিয়েতেও নাকি প্রচুর টাকা ব্যয় করেছেন। তাঁকে আমার টাকা পাঠাবার দরকার নেই। তবুও পাঠাই মাঝে মাঝে। একশ' দেড়শ'। যখন যা মন চায়।

এই স্কুটারের ভাড়া পড়বে আট আনা-দশ আনা। বড় জোর বারো আনা। আমার পক্ষে এই বারো আনা খরচ করা কি অন্যায়?

'এই রোখখে।'

এসে গেছি। স্কুটার থেকে নেমে পড়লাম। প্যান্টের পিছনের পকেট থেকে পার্স বের করে এক টাকার একটা নোট দিয়ে সোজা গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। চেঞ্জ নেবার কথা মনেই হলো না।

একি সামনের বারান্দাতেই বসে? অবাক হলাম। তবে বেশ ভাল লাগল।

আমি গেট পার হয়ে লনের মধ্যে ঢুকতেই বুলা হাসতে হাসতে দাঁড়াল।

'একি আপনি বারান্দাতেই বসে আছেন?' আমি হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করলাম।

বুলা হাসি মুখে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

আমি আরো কয়েক পা এগুতেই ও বলল, আসুন।

বুলা পর্দা ঠেলে ড্রইংরুমে ঢুকল। আমি ওর পিছনে পিছনে ঢুকলাম।

'বসুন।'

বসলাম। বললাম, আপনি বসুন।

বুলা বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই আপনি খেয়ে এসেছেন?

'সত্যি বেরিয়েছি।'

'মিথ্যা কথা বলছেন না?'

'মিথ্যা বলব কেন?'

'হয়ত লজ্জায়।'

বুলাও হাসল, আমিও হাসলাম।

'লজ্জা থাকলে কেউ এ সময় আসে?'

বুলা সে কথার জবাব না দিয়ে জানতে চাইল, টোস্ট আর ওমলেট খাবেন?

প্রকাশিত হয়েছে • ২৪শ সংস্করণ

বর্ষপঞ্জী ১৩৭৭

দেশবিদেশের যাবতীয় তথ্যে পরিপূর্ণ বাংলা 'ইয়ার-বুক'

বর্ষপঞ্জীর ২৪ বৎসর পূর্ণ হল; এটাই বর্ষপঞ্জীর সবচেয়ে বড় পরিচয়। বিশেষ গুণ না থাকলে বর্ষপঞ্জী এই দীর্ঘকাল সকলের সমাদর লাভ করছে কেন? চলতি দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখতে হলে 'বর্ষপঞ্জী' চাই-ই। গত এক বৎসরে ভারত ও সমগ্র বিশ্বে বহু যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। বর্ষপঞ্জী সে সকল ঘটনার প্রামাণ্য দলিল। মানুষের চাঁদে যাওয়ার সচিত্র রোমাঞ্চকর কাহিনী এই সংস্করণের বিশেষ আকর্ষণ।

ইন্টারভিউ ও প্রতিযোগিতা পরীক্ষার সাফল্যের জন্য বর্ষপঞ্জী অপরিহার্য

॥ ৭৭২ পৃষ্ঠা, বোর্ড বাঁধাই ও ৪ খানা চিত্র। মূল্য ৭ টাকা ৫০ পয় ॥

প্রকাশক : এস, আর, সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি

৩৫/এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা—৬। ফোন : ৩৫-৪৭১৭

শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ।। খড়দহ

'বিশ্বাস করুন আমি এককাপ খেয়ে আসছি। এখন আমি কিছু খাব না। আপনি বসুন।'

মুক্তা বসতে বসতে বলল, লজ্জা করলে নিজেই কষ্ট পাবেন।

'কষ্ট পাবার আগেই আপনাকে কষ্ট দেব।'

মিনিটখানেক দুজনেই চুপচাপ। ও মুখ নীচু করে বসেছিল। আমি একবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। কি যেন ভাবছে। আপন মনে। হয়ত লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু ভাবছে। হঠাৎ মুখটা তুলে বলল, কফি করি।

'না, না, এককাপ কেন? পরে হবে।'

'কফিও খাবেন না?'

'নিশ্চয়ই খাব তবে পরে।'

আবার একটু চুপচাপ। আমি আবার একবার ওকে দেখে নিলাম। বেশ দেখতে। বেশ লম্বা, দোহারা চেহারা। রঙটা একটু চাপা হলেও চোখ-মুখ বেশ শার্প।

'আপনি বাইরে বসেছিলেন কেন?' আমিই জিজ্ঞাসা করলাম।

আপনি আসবেন বলে......

আমি একটু অবাক হলাম। চুপ করে রইলাম।

মুক্তা বলল, এখানে একলা একলা থাকতে থাকতে টায়ার্ড হয়ে গেছি। তাই কেউ এলে ভাল লাগে।

'কাছাকাছি কোন বাঙালীর বাড়ী নেই?'

না।'

'আশে-পাশের লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই?'

'ঠিক আশেপাশে আর লোক কোথায়? আর যারাও আছে তারা ঠিক মিশতে চায় না।'

'আপনার বাবা তো সরকারী বাংলোতেই থাকতে পারেন তবে এখানে আছেন কেন?'

'বাবা যখন প্রথম আসেন তখন কোন বাংলো খালি ছিল না বলে এই বাড়ীটা ভাড়া নেন। এই বাড়ীটা বাবার ভীষণ পছন্দ। হয়ত কিনেই ফেলবেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া বাবার ধারণা এই বাড়ী ছাড়লে আর পাবেন না।'

'সরকারী বাংলোয় থাকলে আশেপাশে অনেক জানাশুনা লোক পেতেন।'

'কিন্তু বাবা সরকারী কলোনীতে থাকা পছন্দ করেন না। বলেন, সরকারী কলোনীতে থাকলে প্রপার মেন্টাল গ্রোথ হতে পারে না।'

আমি গাম্ভীর্য নিয়ে মন্তব্য করলাম, কথাটার পিছনে যুক্তি আছে।

মুক্তা হাসতে হাসতে বলল, যুক্তি তো আছে কিন্তু একলা একলা থাকতে তো প্রাণ যায়।

'আপনিও কি এখানে অনেকদিন?'

না। আমি গত বছরেই এসেছি।'

'এর আগে কোথায় থাকতেন?'

'কলকাতায় দাদার কাছে থেকেই পড়াশুনা করতাম।'

'আপনি কোথায় পড়তেন?'

'দাদার বাসা থেকে কাছে হতো বলে ব্রেবোর্ণেই পড়েছি। তারপর কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে।'

'আপনি কি নিয়ে পড়েছেন?'

'মডার্ণ হিস্ট্রিতে।'

'আর পড়লেন না কেন?'

মুক্তা হেসে ফেলল, আর কত পড়ব?

'কেন রিসার্চ তো করতে পারতেন?'

'আর পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না।'

মুক্তা হাসল।

'ভাল লাগে না বলে কি কম পড়েছেন?'

মুক্তা আবার হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

মুক্তাদের বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করে। একটা সিগরেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি এক ভাই এক বোন?

দু'ভাই—এক বোন।'

'দাদা কলকাতায় থাকেন?'

হ্যাঁ। ছোড়দা এম-আর-সি-পি পড়তে এডিনবারা গেছে।

'আপনিও বাইরে গেলেন না কেন?'

'এখানেই তো বেশ আছি। বাইরে গিয়ে কি করব?'

কথার যেন শেষ নেই। নির্বিবাদে সিগরেট খাচ্ছি আর বকবক করে চলেছি।

'আপনার মা কবে ফিরবেন?'

'মার ফিরতে তিন-চার মাস তো বটেই।'

মুক্তা একটু চুপ করে আবার বলল, মা নাতি পেয়ে আমাদের প্রায় ভুলেই গেছে!

'সারাদিন কি করেন?'

'সংসারের টুকটাক কাজকর্ম আর কিছু সস্তা উপন্যাস-গল্পের বই পড়েই কাটিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনি বুঝি খুব বই পড়েন?'

'কথা বলার লোক পাইনে বলে কি আর করব?'

এত কথা জানার পরও থামতে পারছি না। থামতে চাইছি না। বেশ লাগছে ওর সঙ্গে কথা বলে। মানসী ছাড়া আর কোন ইয়ং মেয়ের সঙ্গে এত কথা বলার সুযোগ পাই নি। তাছাড়া অনেকদিন পর। বেশ ভাল লাগছে। কথা বলতে বলতে সুযোগ

পেলেই আমি ওকে দেখছি। ভাল করে দেখছি। সর্বাঙ্গ দেখছি। সামনা-সামনি বসেছে যে। একেবারে আমার চোখের সামনে। কয়েক হাত দূরে মাত্র। নিঃশ্বাস নেবার সময় ওর বুকটা উঁচু হচ্ছে, আমি তাও দেখতে পারছি। ভাল করেই দেখতে পাচ্ছি। যখন কথা বলছি না, দুজনেই চুপচাপ থাকছি, তখন ওর নিঃশ্বাসের আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি।

কথায় কথায় হাতের ঘড়িটাও দেখতে ভুলে গেছি। খেয়াল হলেও দেখতাম না। দেখলেও ভাল লাগত না। মন খারাপ হয়ে যেত। হিসাব-নিকাশের বাইরে যতটুকু পাওয়া যায় তাতেই আনন্দ। তৃপ্তি। পরিতৃপ্তি।

হিসাব-নিকাশ মত তো আমি কিছুই পাইনি। মাকে পাইনি, বাবাকে পাইনি। ভাইবোনও পাইনি। হিসাব-নিকাশের বাইরে মামাকে পেয়েছি, মাসীকে পেয়েছি। প্রাণ-ভরে পেয়েছি। দশ হাতে পেয়েছি। এমন মামা, এমন মাসী কজনের অদৃষ্টে জোটে?

আমি পেয়েছি। হিসাব-নিকাশের বাইরেই পেয়েছি। প্রত্যাশার বাইরে পেয়েছি।

কেন মানসীর সঙ্গেও কি এত ভাব হবার কোন কারণ ছিল? বিন্দুমাত্র না। নিতান্তই হঠাৎ। আকস্মিক। অপ্রত্যাশিত।

হিসাব-নিকাশের বাইরেই আমার সব পাওনা। নিজের ব্যাঙ্কে নিজে কিছু জমা দিই না কিন্তু তবুও ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স আমার থেকেছে। থাকে। এখনও কিছু কিছু আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

না, না, আমি ঘড়ি দেখব না।

'মিসেস রায় নিশ্চয়ই প্রায়ই আসেন?'

'সাধারণতঃ ছুটির দিনেই আসেন।'

'আপনারা যান না?'

'যাই তবে রোজ নয়।' বুলা একটু থেমে বলল, ঐ পিসীর কাছে ছাড়া আর কোথাও যাই না।

আবার একটা সিগরেট ধরালাম।

বুলা সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপনি এত সিগরেট খান কেন?

'আপনি বুঝি সিগরেট খাওয়া পছন্দ করেন না?'

'তা নয়, তবে এত সিগরেট খেলে তো শরীর খারাপ হবে।'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, শরীর খারাপ হয়ে কিছুদিন হাসপাতালে থাকলেও তো বাঁচতাম।

ভ্রূ কুঁচকে বুলা জিজ্ঞাসা করল, তার মানে?

আমি হেসে বললাম, বোধহয় আই অ্যাম টায়ার্ড অফ মাইসেলফ!

বুলা যেন বেশ একটু চিন্তিত হলো। 'আপনার আর কোন ভাইবোন নেই?'

আবার হাসতে হাসতেই বললাম, নিঃসঙ্গ বলতে যা বোঝায় তার প্রতিমূর্তি আমি।

সংসারের দীর্ঘ বৃত্তান্ত না দিয়ে আর কি বলব?

বুলা এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার আংটিটা নিয়ে আসি।

'এত ব্যস্ত হবার কি আছে?'

'পরে হয়ত ভুলে যাব।'

'আপনিও ভুলবেন না, আমিও ভুলব না।......

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু মাঝপথে ও বলল, তবুও......

আমি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, তবুও আংটিটা থাকলে মাঝে মাঝে বিরক্ত করবার সুযোগ পাব।

বুলা হাসল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসল। 'আংটিটা নিয়ে গেলেও আপনার আসতে বাধা নেই।'

হঠাৎ বলে ফেললাম, বেশী আসতে দেখে শেষে আপনার বাবা লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন।

আমার মনে মনে যে সঙ্কোচ, যে দ্বিধা আছে তা যে এমনভাবে প্রকাশ করে ফেলব, ভাবতে পারিনি। চাইও নি। তবু বলে ফেলে ভালই হলো।

বুলা হেসে ফেলল, আমার বাবাকে অত মীন মাইণ্ডেড ভাবছেন কেন?

'না, না, মীন মাইণ্ডেড ভাবব কেন? তবুও......

'কোন তবুও নেই। আপনার সম্পর্কে বাবার খুব হাই ওপিনিয়ন।'

'তাই নাকি?'

মনে মনে ভাবলাম, জিজ্ঞাসা করি, আমার সম্পর্কে তোমার ওপিনিয়ন কি? আমাকে তোমার কেমন লাগছে? আরো অনেক কথা। পারলাম না।

এবার বুলা কফি করতে গেল। নিজেই। গত রাত্রে যে চাকরটাকে দেখেছিলাম তাকে দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করছে। অথবা কোথাও বেড়াতে গেছে। বুলা নিজেই কফি নিয়ে এলো।

'আপনাকে অযথা অনেক কষ্ট করতে হলো।'

দু হাতে দু পেয়ালা কফি হাতে করেই বুলা বলল, আপনি কি ফর্মালিটি খুব বেশী পছন্দ করেন?

আমি ফর্মালিটি চাই? নিজের মনেই নিজে হাসলাম। আমি তো এই মুহূর্তে সব ফর্মালিটি বিসর্জন দিয়ে তোমার কাছে থাকতে পারলে বেঁচে যেতাম কিন্তু তা কি সম্ভব? কোন দিন সম্ভব?

এসব কিছুই না বলে শুধু বললাম, ফর্মালিটি মোটেই ভাল লাগে না কিন্তু...

'এত কিন্তু কিন্তু করবেন নাতো!'

বাঁচলাম। বুলার কাছ থেকে এইটুকু প্রত্যাশা পেয়েই মনে হলো নিউ ফরেস্টের ঐ বোটানিক্সের সেই ছোট্ট কাঠবিড়ালীটা নিশ্চয়ই আমার দিকে অমন বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাবে না। শপিং বাজারের ভিড়ে আর আমি নিজেকে অত নিঃসঙ্গ মনে করব না।

খুব জোরে প্রাণভরে একটা নিঃশ্বাস নিলাম। বুলা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করল কিন্তু মুখে কিছু বলল না। দুজনেই চুপচাপ কফি খেয়ে নিলাম।

এবার হাতের ঘড়িটা দেখলাম। সাড়ে চারটে বাজে।

'এবার চলি।'

'এক্ষুনি কেন? একটু পরেই তো বাবা আসবেন।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, অনেকক্ষণ এসেছি। এবার চলি। এর্কাদিনে এর চাইতে বেশী সহ্য করা বোধহয় অন্যায় হবে।

বুলাকে নমস্কার করলাম না। ধন্যবাদও জানালাম না। মানসীকে কি ধন্যবাদ জানাতাম? বারান্দার দিকে পা বাড়ালাম।

পিছন থেকে বুলা অস্ফুটস্বরে বলল, আংটিটা...

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে বললাম, ওটা থাক।

আর এক মুহূর্ত দেরী না করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

(ক্রমশঃ)

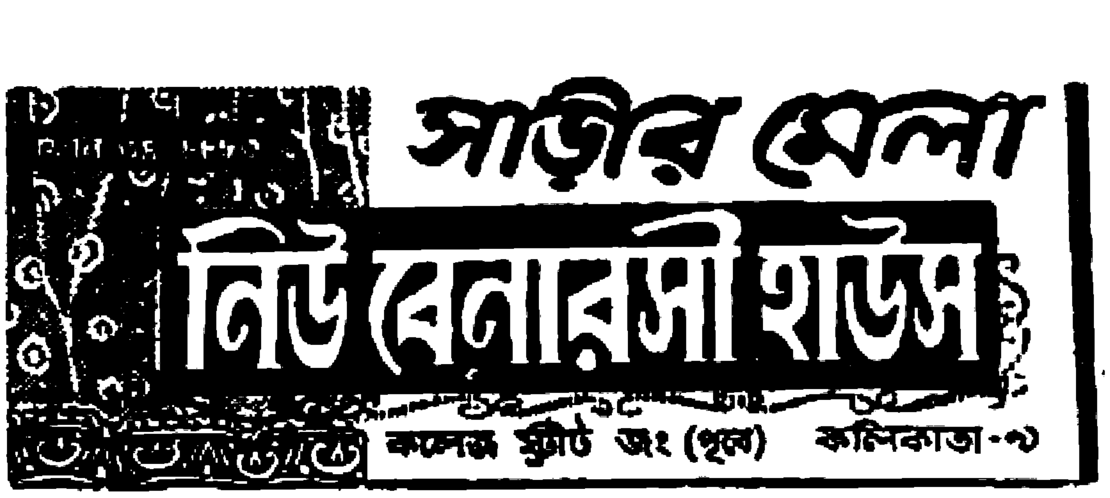

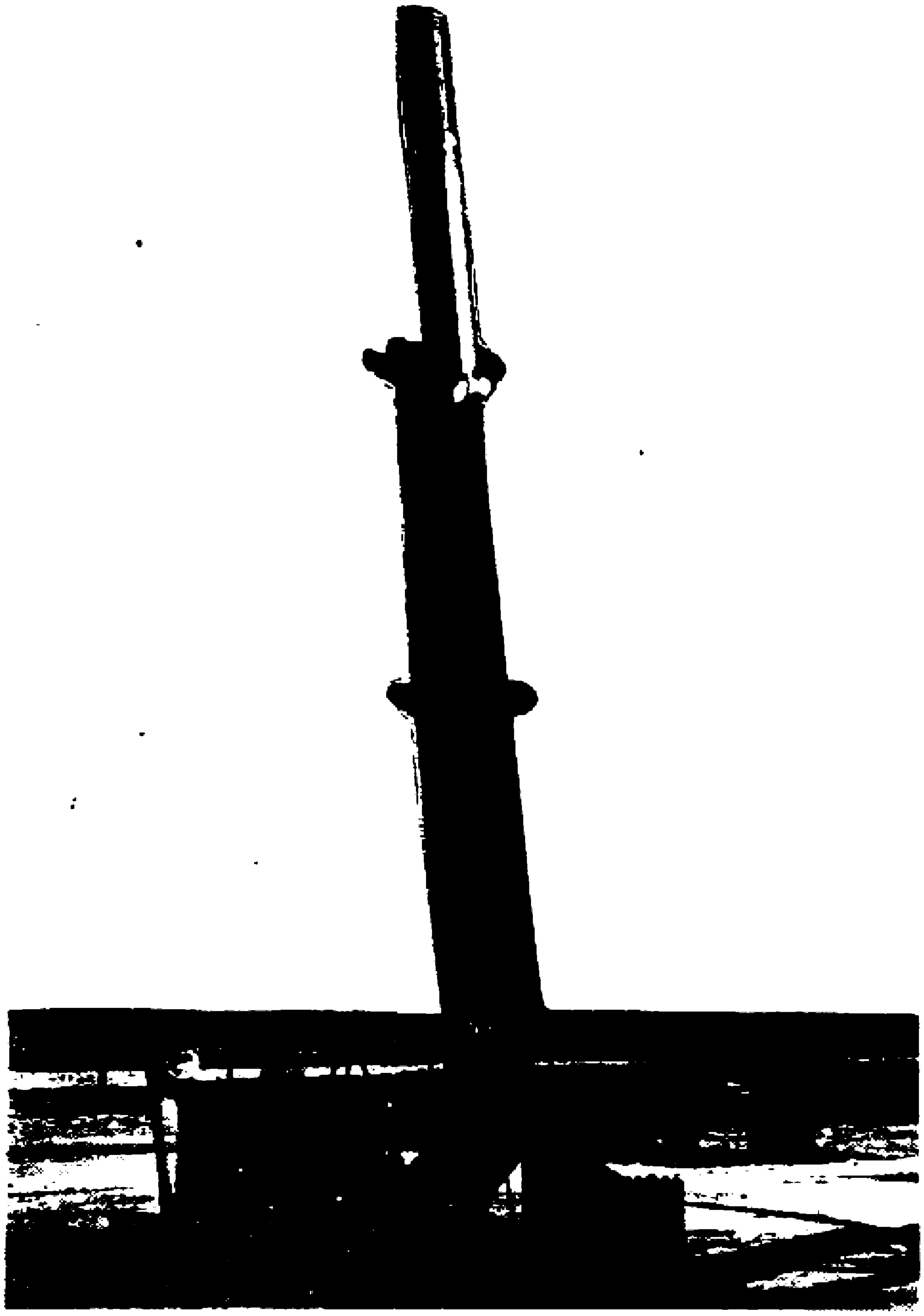

ভারতে মহাকাশ-গবেষণার দিকচিহ্ন থুম্বা

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে দুটি বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল নাম ট্রম্বে এবং থুম্বা। প্রথমটি হল পরমাণুশক্তি গবেষণা কেন্দ্র এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র। ট্রম্বের ভাবা পরমাণু শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের পরিচয় অনেকেরই জানা। কিন্তু থুম্বার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের কিছু কিছু কথা মাঝে মাঝে কানে এলেও প্রত্যক্ষভাবে তার পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে নি এতদিন পর্যন্ত। সম্প্রতি বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের পর সেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ ঘটে গেল।

বিশ্বে মহাকাশ গবেষণার পুরোভাগে রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র। তাঁদের তুলনায় ভারতের মহাকাশ-গবেষণার প্রচেষ্টা নিতান্তই নগণ্য বলা চলে। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, এক শতাব্দীরও আগে ভারতে আবহতত্ত্ব ও ভূচুম্বকত্বের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল। আমরা জানি, এই দুটি ক্ষেত্রেই সূর্য দেহে ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত এবং ঊর্ধ্বমণ্ডলে সূর্যের দিকে ৫০ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত ও চাঁদের অপর দিকের ৪ লক্ষ কিলোমিটার ছাড়িয়ে এর প্রভাব বিস্তৃত। মহাকাশ যুগের সূচনার আগে বেলুনের সর্বোচ্চ সীমার বাইরে, এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ভূপৃষ্ঠ থেকে সম্পাদিত পরীক্ষার সাহায্যে আভাস পাবার চেষ্টা করা হত। মহাকাশযুগে রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশযানের সাহায্যে এ সব বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধান সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মহাকাশের বহু নতুন তথ্য জানা গেছে, আমাদের পূর্বধারণার কোনো কোনোটির সমর্থন মিলেছে আবার বহু ধারণার সংশোধন করতে হয়েছে বা একেবারে অগ্রাহ্য করতে হয়েছে।

আবহতত্ত্ব, আয়নমণ্ডল সংক্রান্ত পদার্থবিজ্ঞান, ভূচুম্বকত্ব, মহাজাগতিক রশ্মি, জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞান এবং সৌর পদার্থবিজ্ঞানে ভারতের দীর্ঘকালীন গবেষণার ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের একটি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। ভারতে ভূচুম্বকত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধানের সূচনা হয় ১৮৪১ সালে সিমলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ত্রিবান্দ্রমে। এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল, ১৮৫৮ সালে অ্যালান ব্রাউন ত্রিবান্দ্রমে ভূচুম্বকত্বের দৈনন্দিন তারতম্যের একটি ২৭ দিনব্যাপী পর্যায়ক্রম আবিষ্কার করেন। ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যত্র পর্যবেক্ষণের ফলে জানা যায়, ভূচৌম্বক বিষুবরেখার কাছে চুম্বকত্বের দৈনন্দিন তারতম্য যেমন অস্বাভাবিক তেমনি বিপুল। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে, এই অস্বাভাবিক ও বিপুল তারতম্যের হেতু হচ্ছে ঊর্ধ্বাকাশে 'বিষুব বিদ্যুৎ-প্রবাহ' নামে একটি ক্ষীণ প্রবাহের অস্তিত্ব।

চৌম্বক বিষুব অঞ্চলের ৯০-১৩০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে এই বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এই বিদ্যুৎপ্রবাহ পৃথিবীর আবহতত্ত্বে বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি করে, বিশেষত ভূচুম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে ঊর্ধ্বাকাশের বিদ্যুৎবিহীন ও তড়িতাহিত কণিকার বিক্রিয়ার ফলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হল, চৌম্বক বিষুবরেখা ভূচুম্বকক্ষেত্র হচ্ছে একেবারে অনুভূমিক।

১৮৯৯ খৃঃ কোদাইকানালে একটি সৌর মানমন্দির স্থাপিত হয়। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোদাইকানাল মানমন্দিরের অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সৌর-কলঙ্কের ঊর্ধ্বে গ্যাসোচ্ছ্বাস আবিষ্কার। তত্ত্বীয় জ্যোতিঃ-পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডঃ মেঘনাদ সাহার নাক্ষত্র পরিমণ্ডলের আয়নন এবং ডঃ এস চন্দ্রশেখরের নাক্ষত্র গতিবিদ্যা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ভারতে ভূচৌম্বক বিষুবরেখার ঊর্ধ্বাকাশে পরীক্ষাসমূহ মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কিত গবেষণার পথ প্রশস্ত করে দেয়। এক্ষেত্রে ডঃ হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা ডঃ সারাভাই, ডঃ রামনাথন, বাঙ্গালোরের ইণ্ডি-

মান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বোম্বাই-এর টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দির, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেদাবাদের পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারের বহু মূল্যবান অবদান আছে।

এই ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ১৯৬১ খৃঃ আগস্ট মাসে ভারতে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ গবেষণার জন্য জাতীয় কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ডঃ বিক্রম সারাভাই-এর সভাপতিত্বে পরমাণুশক্তি দপ্তরের ওপর। ১৯৬২ খৃঃ সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক উপ-সমিতি ঊর্ধ্বাকাশে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য বিষুবরেখায় একটি রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁরা ইচ্ছা প্রকাশ করেন—রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশ যদি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলের কাজের জন্য এমন একটি কেন্দ্র স্থাপনে আগ্রহী হন। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের এই প্রস্তাব ভারত সাগ্রহে গ্রহণ করেন।

১৯৬০ খৃঃ এই প্রস্তাব কাজে রূপায়িত করার জন্য কেন্দ্র স্থাপনের স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে কেরালা রাজ্যে ত্রিবান্দ্রমের ১৬ কিলোমিটার উত্তরে থুম্বা। ভূচৌম্বক বিষুবরেখার কাছে থুম্বার অবস্থিতির গুরুত্বের জন্যই এই স্থানটি নির্বাচিত হয়। রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের আগে থুম্বা ছিল স্থানীয় মৎস্যজীবীদের আবাসস্থল। ১৯৬৩ খৃঃ গির্জার নিকে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে আরব সাগরের পশ্চিম উপকূলে ৫৬০ একরব্যাপী এই স্থানটি সংগ্রহ করা হয় এবং মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে এখানে রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই কেন্দ্রের নামকরণ হয় থুম্বা বিষুবরেখীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র।

১৯৬৩ খৃঃ ২১ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের সহযোগিতায় থুম্বা থেকে 'নাইকে অ্যাপাচি' নামে দ্বিপর্যায়ের একটি রকেট সর্বপ্রথম মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। ঊর্ধ্বাকাশের বিদ্যুৎবিহীন অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যে এই রকেটে সোডিয়াম বাষ্পপূর্ণ সরঞ্জাম রাখা হয়েছিল। রকেটটি সাফল্যের সঙ্গে উদ্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে। ১৯৬৫ খৃঃ ডিসেম্বরে থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রকে শান্তিপূর্ণ কাজে মহাকাশ গবেষণার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসাবে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ দেওয়া হয়। আর ১৯৬৮ খৃঃ ২ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রকে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসর্গ করেন। এই হল থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের ইতিকথা। থুম্বার ভৌগোলিক অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা

এইচ জি এস মূর্তি

হচ্ছে যথাক্রমে ৮·৩৩° উত্তর, ৭৬·৩৮° পূর্ব এবং এর চৌম্বক অক্ষাংশ হচ্ছে ০·২৫° দক্ষিণ।

বর্তমানে থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের অধিকর্তা হচ্ছেন শ্রীএইচ জি এস মূর্তি। তিনি আমাদের এই কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ দেখবার ও সেখানকার কাজের পরিচয় লাভের সুযোগ করে দেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল, এই আন্তর্জাতিক রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটি বিশ্বের সকল দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে উন্মুক্ত। বিদেশী বিজ্ঞানীরা এখান থেকে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে আগ্রহী হলে তাঁদের নিজের দেশের জাতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার মারফৎ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার কাছে প্রস্তাব পাঠান। ভারতীয় সংস্থা এই প্রস্তাব অনুমোদন করার পর এখান থেকে পরীক্ষা সম্পাদনের জন্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়। আন্তর্জাতিক কর্মসূচীতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বিনা পারিশ্রমিকেই সহযোগিতা করে থাকেন। অবশ্য আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীরা যাতে অর্থের বিনিময়ে এখানে অনুমোদিত কর্মসূচী সম্পাদন করতে পারেন তার সুযোগ আছে। আটজন সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টামণ্ডলী প্রতি বছর থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের কার্যধারার প্রগতি পর্যালোচনা করেন। এই উপদেষ্টামণ্ডলীতে আছেন ভারতের দুজন সদস্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এই তিনটি দেশের দুজন করে সদস্য।

উপরি-উক্ত তিনটি দেশের সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের প্রারম্ভিক কর্মসূচীর সূচনা হয় এবং এই কেন্দ্রটি গড়ে তুলতে তাঁরা বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছেন দুটি রকেট উৎক্ষেপণ মঞ্চ, একটি রেডার, একটি টেলিমেট্রি ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং তাদের জাতীয় বিমান ও মহাকাশ সংস্থায় (নাসা) এখানকার উচ্চপদস্থ কর্মীদের শিক্ষণের ব্যবস্থা। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছেন একটি হেলিকপ্টার, একটি ইলেকট্রনিক কম্পুটার এবং পরীক্ষা সম্পাদনের জন্যে রকেটের মধ্যে রক্ষিত সরঞ্জাম পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা। ফ্রান্স দিয়েছেন একটি উৎক্ষেপণ মঞ্চ, একটি রেডার এবং ঊর্ধ্বাকাশে রকেটের আলোকচিত্র গ্রহণের জন্যে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন একটি ক্যামেরা। এছাড়া ভূপৃষ্ঠস্থ যাবতীয় যন্ত্রপাতি, উদ্ধারকার্যের জন্যে ব্যবহৃত জাহাজ, বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় লোকজন সব কিছু সরবরাহ করেছে ভারত।

শ্রীমূর্তি জানালেন, থুম্বা উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে পরীক্ষার জন্যে বিদেশ থেকে যেসব রকেট আসে, তা এখানেই সংযোজন করা হয়। এজন্যে এখানে রকেটের অংশসমূহ সংযোজনের একটি কারখানা আছে এবং ভারতীয় যন্ত্রকুশলীরা এই সংযোজনের কাজ দক্ষতার সঙ্গে করে থাকেন। এখানে একটি রকেট সংগ্রহশালা এবং মহাকাশে গবেষণার উদ্দেশ্যে রকেটের মধ্যে রক্ষিত সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করে দেখার জন্যে একটি পরীক্ষাগারও আছে।

আজ পর্যন্ত থুম্বা থেকে কত রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে জানতে চাওয়ায় শ্রীমূর্তি জানালেন, ১৯৬৩ সালের ২১ নভেম্বর সর্বপ্রথম রকেট উৎক্ষেপণের পর থেকে ১৯৭০ সালের মার্চ পর্যন্ত ২০৫টি রকেট মহাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০৫টি রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে—যেমন ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুপ্রবাহ ও তাপমাত্রা পরিমাপ, বিষুবরেখীয় বিদ্যুৎপ্রবাহ সম্পর্কে অনুসন্ধান। বাকি ১০০টি হচ্ছে পরীক্ষামূলক রকেট, অর্থাৎ এখানে যেসব নতুন রকেট উদ্ভাবন করা হচ্ছে, তার কার্যক্ষমতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে।

মহাকাশে থুম্বা থেকে যেসব রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, তাদের বলা হয় সাউণ্ডিং রকেট। এই ধরনের রকেট আগে সমুদ্রগর্ভে অনুসন্ধানের জন্যে ব্যবহৃত হত বলে এদের এই নামকরণ। সাধারণভাবে বলা যায়, মহাকাশে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রকেটের নাম সাউণ্ডিং রকেট। এই সমস্ত রকেট হচ্ছে দুই ধাপের এবং এখন পর্যন্ত এতে কঠিন জ্বালানীই ব্যবহার করা হচ্ছে।

থুম্বায় এখন যে চারটি রকেট উৎক্ষেপণ-মঞ্চ আছে, তার মধ্যে দুটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (নাসা), একটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের, একটি ফ্রান্সের এবং একটি ভারতের। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একান্ত

ঊর্ধ্বাকাশের তথ্য পরিমাপের জন্য থুম্বার টেলিমেট্রি স্টেশন।

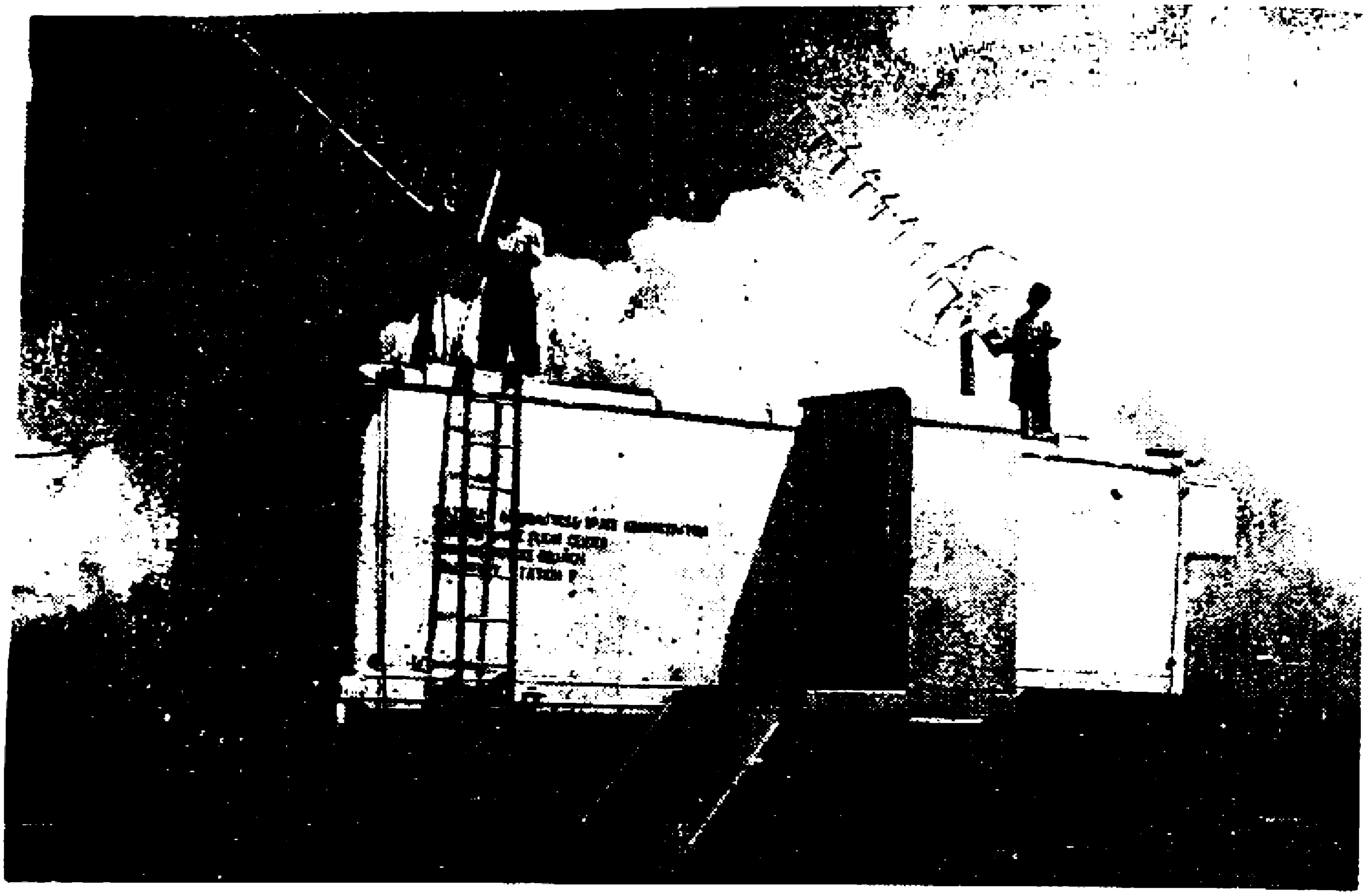

শুধু বিদেশী বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় অনুসন্ধান চালান না, তাঁরা নিজেরাও এককভাবে কিছু রকেট নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকেন।

থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের পর থেকে দেশীয় উপকরণের সাহায্যে দেশীয় যন্ত্রকুশলীদের দ্বারা রকেট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এজন্যে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে ফ্রান্সের সহযোগিতায় 'সেণ্টর' রকেট ভারতে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই শ্রেণীর রকেটে ৩০-৪০ কেজি ওজনের সাজ-সরঞ্জাম রাখা হয় এবং ১৫০—১৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। ভারতে প্রস্তুত প্রথম সেণ্টর রকেট উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৬৯ খৃঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি। সেণ্টর ছাড়া রোহিণী এবং মেনকা নামে আরও দু' শ্রেণীর রকেট ভারতীয় বিজ্ঞানীরা থুম্বায় ব্যবহার করছেন। সেণ্টর রকেটের তুলনায় এই দুই শ্রেণীর রকেট অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। সম্পূর্ণ ভারতীয় বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের দ্বারা এদেশীয় উপকরণের সাহায্যে রকেট নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে থুম্বায় একটি কারখানা স্থাপনের প্রারম্ভিক কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সাড়ে ২৫ একরব্যাপী জায়গায় এই কারখানা গড়ে উঠবে। কিন্তু শুধু রকেট নির্মাণ করলেই হবে না, সেই সঙ্গে রকেট চালনার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীও এদেশে প্রস্তুত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ খৃঃ ফেব্রুয়ারিতে থুম্বায় রকেট চালনার প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ প্রস্তুতের জন্যে একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

রকেট ও তার আনুষঙ্গিক উপকরণ সম্পর্কে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্যে একটি গবেষণা-কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৬৫ খৃঃ থুম্বার কাছে ভেলি পাহাড়ের ওপর মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীরা ১৯৬৭ খৃঃ 'রোহিণী—৭৫' রকেট উদ্ভাবন করেন এবং তা সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। বর্তমানে এখানে ১৭৫ জন বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলী কর্মরত আছেন। এদেশীয় উপকরণ দিয়ে কিভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ উদ্ভাবন করা যায় তার চেষ্টায় তাঁরা বর্তমানে বিশেষভাবে ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁরা আশা করছেন, ১৯৭৪ সালে ভারতে নির্মিত কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করতে তাঁরা সমর্থ হবেন। ৩০ কেজি ওজনের এই কৃত্রিম উপগ্রহ ৪০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে, প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। তাঁদের লক্ষ্য হল, সত্তর দশকের শেষে এক হাজার কেজি ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ ৪০ হাজার কিলোমিটার ঊর্ধ্বে স্থাপন করা।

১৯৭০ খৃঃ এপ্রিল থেকে ১৯৭১ খৃঃ মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে থুম্বা থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৮১টি রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে। তার মধ্যে ৩৯টি রকেট ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার কর্মসূচী অনুযায়ী উৎক্ষিপ্ত হবে। এছাড়া, ভারত থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণের জন্যে পূর্ব উপকূলে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় একটি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা বর্তমানে গৃহীত হয়েছে।

ঊর্ধ্বাকাশে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে থুম্বা থেকে এতদিন যেসব রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, তার অধিকাংশই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এইসব পরীক্ষার ফলে ঊর্ধ্বাকাশের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী-সমাজের উপকারের জন্যে তা মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিটির সভায় পেশ করা হয়েছে। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত যে আজ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র দেখে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যায় এবং সেই সঙ্গে এদেশের বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের প্রতি একটা দৃঢ় আস্থার ভাব স্বভাবতই জেগে ওঠে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পিঞ্জর

সুভাষ সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গম্ভীর মুখে রজত অফিসে পৌঁছে তার চেম্বারে ঢুকল। বেয়ারা সেলাম জানিয়ে সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়ায়। নিজের সিটে বসে সে লক্ষ করল চন্দ্রাণী এখনও আসে নি। ফলে তার মুখের চেহারা একটু পালটে যায়। বার বার মিসেস মুখার্জী ডাকতে ডাকতে তার ক্লান্তি আসত। শেষে সে ওকে বলেছে যে, এখন থেকে নাম ধরে ডাকবে। অবশ্য যদি কোন আপত্তি না থাকে। নাম ধরে ডাকলে আর 'আপনি' বলা যায় না। অতএব 'তুমি'। কোন আপত্তি জানায় নি চন্দ্রাণী। বরং হেসে বলেছে, 'আপনি বস এবং পদমর্যাদায় অনেক বড়। নাম ধরে ডাকবেন, এতে আপত্তির কি থাকতে পারে।'

হাতঘড়ি দেখল রজত। প্রায় এগারটা। দশটায় অফিস। অফিসে ঠিক সময়ে আসা সম্পর্কে সে বড় কড়া। মাঝে মাঝে সাড়ে দশটার সময় হাজিরা খাতা বড়বাবুর কাছ থেকে চেয়ে নেয়। যারা দেরীতে আসে তাদের নামের পাশে লাল কালি দিয়ে রাখে। সই করতে আসলে নানা রকম প্রশ্ন করে। কঠিন চোখে তাকায়। ওদের যেন জবাব তৈরী থাকে। বাড়িতে ছেলেমেয়ের অসুখ, বাসের টায়ার ফেটে যাওয়া, মিছিলের জন্য বাস-ট্রাম আটকে যাওয়া; আরও নানা রকম কৈফিয়ত দেয় ওরা। আর মিট মিট করে হাসে। বিশেষ করে ছোকরার দল যারা। বয়স কম ফলে রক্ত গরম। ওদের সঙ্গে সে খুব সন্তর্পণে কথা বলে। দরকার পড়লে নরম সুরে বোঝায়। কখনও কঠিন হয়। দু' একজনকে চার্জ-সীটও দিয়েছে।

স্টাফ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে মিঃ চন্দ্রভান-প্রসাদের সঙ্গে তাকে সপ্তাহে একবার আলোচনায় বসতে হয়। অন্যান্য পার্টনাররাও উপস্থিত থাকেন। এই মহানগরীতে ক্রমবর্ধমান মিছিল, ছাঁটাই লে-অফ, স্ট্রাইক—এসব দেখে ওরা ঘাবড়ে যান। ওদের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে রজত মনে মনে হাসে। সে অবশ্য প্রকাশ্যে ওদের সান্ত্বনা দেয়। এখানে কিছু হবে না। কর্মচারীদের ভাল মাইনে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া কোন ইউনিয়ন নেই। হয়ত অল্প স্টাফের জন্যে কোন ইউনিয়ন ওরা গড়তে পারছে না।

ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বাজছে।

—হ্যালো। রজত রিসিভার কানে লাগিয়ে শুনতে পেল অসহায় নারী কণ্ঠস্বর। কে চন্দ্রাণী? কী হয়েছে? কী বললে? তোমার স্বামী খুব অসুস্থ। আজ আসতে পারবে না। ডাক্তার দেখিয়েছ? ঠিক আছে। দরকার পড়লে তুমি ছুটি নেবে আরও কয়েক দিন। দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ো।

ফোন রেখে রজত একটা সিগারেট ধরাল। চন্দ্রাণী কাঁদছিল কী? বড়ো অসহায়। শাশুড়ি বাতের ব্যথায় হাঁটাচলা করতে পারে না। স্বামী যেকোন সময় পটল তুলতে পারে। বড় কেউ নেই যে, বিপদ আপদের সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বছর দশেকের একটা ছেলে আছে। চন্দ্রাণীর দেবর। এর ওপর কী কোন ভরসা করা যায়?

বিকেল পর্যন্ত রজত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চাইল। কিন্তু মাঝে মাঝেই সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কলম হাতে সিগারেট মুখে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। অলস দৃষ্টিতে দেখছে রাস্তার লোক চলাচল। চন্দ্রাণীর অনুরোধ সে সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে। খুব কুণ্ঠিত স্বরে চন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করেছিল সে অফিস ছুটির পর একবার যেতে পারবে কিনা। কেননা স্বামীর যা অবস্থা, কখন কী হয় বলা যায় না। রজত সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারে নি। নানারকম কথা মনে পড়েছে। বিশেষ করে তার যা স্ট্যাটাস, তাতে করে চন্দ্রাণীর বাড়ি যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। এমন তো বহুলোকের বাড়িতেই অসুখ বিসুখ—তাই বলে কী কোন অফিসার তার অধস্তন কর্মচারীর বাড়িতে দৌড়ে যাবে। তা হয় না। তার একটা ডিগনিটি আছে। ফলে প্রচণ্ড কাজের চাপ ও শরীর খারাপ, ঘাবড়াবার কিছু নেই, প্রয়োজন হলে প্রতিবেশীদের যেন ডাকা হয়, এভাবেই সে চন্দ্রাণীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছে।

বেশ তো। তবু সে মনে মনে গ্লানি অনুভব করছে কেন! অযথা অপরাধবোধে পীড়িত হওয়া। চন্দ্রাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠুক তা সে চায় না। ওর স্বামী হয়ত মারা যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার করবার কী আছে? সবার দুঃখ মোচনের ভার তার ওপর বর্তায় নি। সে সে অহর্নিশ জ্বলে পুড়ে মরছে কে তার

CENTRAL LIBRARY

খোঁজ রাখে! এই যে মীরা তাকে অস্বীকার করে অন্য একটি যুবকের সঙ্গে প্রেমে মেতে উঠেছে—এ কথা কই সে তো পাঁচজনকে ডেকে ডেকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছে না! কেউ শুনছে না। বরং করুণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাবে। মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে যে-যার চলে যাবে।

চন্দ্রাণী বোধহয় তার কাছে অনেক কিছু আশা করে। এটা তার ধারণা। রজত আপন মনে মাথা নাড়ল। তার কাছে কোন কিছু আশা করা অন্যায়। সে তার নিজের সমস্যা নিয়ে বিব্রত। মনে পড়ল, ছুটির পর সে বিনয়ের ওখানে যাবে আজ।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে রজত চেয়ারে বসল। হাতঘড়ি দেখল। সাড়ে চারটে। এবার সে উঠবে। বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল। বড়বাবুকে ডেকে দাও। কাজ এগোয় নি কিছু। বিক্ষিপ্ত মেজাজ।

—স্যার।

—এগুলো টাইপে দিয়ে দিন। মিসেস মুখার্জী সম্ভবতঃ কয়েকদিন কাজে আসবেন না। টেলিফোনে জানিয়েছেন ওঁর স্বামী খুব অসুস্থ।

একগাদা ফাইল নিয়ে বড়বাবু চলে যায়।

রাস্তায় বেরিয়ে রজত একটা ট্যাক্সী ডেকে উঠে পড়ল। অনেকদিন পর ওদের সঙ্গে দেখা হবে। তার শাশুড়ি তাকে দেখে নিশ্চয়ই পুলকিত হবেন। মীরা শুধু তার সঙ্গে নয়, পরিবারের সকলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মাঝে মাঝে নির্জনে বসে, বিশেষ করে ইদানীং অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধ-শোয়াবস্থায়; অবাক হয়ে ভাবে মীরার কথা। এতটা আলোকপ্রাপ্তা হল কিভাবে! এত স্পর্ধা যে, স্বামী সন্তান বা ভাই কারুর কথা না ভেবে স্বেচ্ছাচারিণীর জীবন-যাপন করছে!

ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে রজত অগ্রসর হয়। বিরাট চাতাল পেরিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেয়। ডান-দিকের একটা ঘর থেকে ছিটকে আসা আলোতে সিঁড়ির খানিকটা জায়গা আলোকিত। দোতলার বারান্দায় দুটি যুবতী নিজেদের মধ্যে অনুচ্চস্বরে আলাপ করছিল। রজত ওদের দিকে একবার তাকিয়ে এগিয়ে যায়। সুন্দর মুখের কাছে ওদের খোঁপাগুলো ফোলা। দীর্ঘ চোখে কাজলের প্রলেপ। দুজনেই দেখতে সুশ্রী। এবং সুশ্রী মেয়েদের দিকে তাকালে মন ভরে ওঠে। রজত কড়া নাড়বার আগে আবার একবার ওদের দিকে তাকাল।

দরজা খুলে যার মুখোমুখি হল তাকে জীবনে এই প্রথমবার দেখলেও অনুমান করতে পারল যে, এই সুদর্শনা তরুণী বধূটি বিনয়ের স্ত্রী ছাড়া কেউ নয়। মুহূর্তে একটা সমস্যার সম্মুখীন হল রজত। অল্প হাসল সে। কী ডাকা যায় একে। বিনয় সম্পর্কে বড়। কিন্তু বিয়ের পরও কোনদিন 'বিমলা'...অতএব একেও 'বৌদি'... কী বিষম বাজে ব্যাপার এ-সব সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা ভাবনা!

—আমি রজত। দু' হাত জড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে বলে, বিনয় আছে?

—আসুন। মৃদু হাসি খেলে যায় শেফালির ঠোঁটের কোণে, ওর তো ফিরতে একটু দেরী হবে। টিউশনী সেরে ফিরবে।

শেফালী পায়ে পায়ে এগিয়ে রান্না-ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলে, মা দেখুন—কে এসেছেন।

—কে এসেছে? বলতে বলতে নীহার বারান্দায় এসে দাঁড়াতে রজত নীচু হয়ে প্রণাম করল।

—তুমি! নীহার হঠাৎ কান্নাবিকৃত কণ্ঠে বললেন, এতদিন পর মনে পড়ল। কেন এসেছো?

রজত মনে মনে ভয় পেয়ে যায়। এখন যদি উনি উচ্চস্বরে কান্না সুরু করেন...। কী উত্তর দেবে সে ভেবে পেল না। একবার শেফালির দিকে তাকাল।

—থামুন। মৃদু ধমকের সুরে শেফালী বলল, যখন তখন নাকিসুরে কাঁদবেন না।

মুহূর্তে নীহারের চেহারা বদলে যায়। তিনি ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলেন, ওই শোন আমার বৌমার কথা। দ্যাখ রজত, কিভাবে আমাকে ধমকাচ্ছে। যেমন বিনু তেমনি ওর বউ—সব সময় আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে।

শেফালী কোন জবাব না দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যায়।

রজত এবারেও কোন কথা বলল না। কিন্তু নীহার তার দিকে তাকিয়ে। তিনি কিছু শুনতে চান। সান্ত্বনা অথবা সহানুভূতি। একদম কিছু না বললেও খারাপ দেখায়।

—তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন বাবা। এস বসবে।

তক্তপোষের ওপর নীহারের মুখোমুখি বসল রজত। এই ভদ্রমহিলাকে কোনদিন সে শ্রদ্ধার চোখে দেখে নি। সে অতীতের ইতিহাস। তার স্বপক্ষে সুকৌশলে মীরাকে সরাবার সব রকম কৃতিত্ব এই মহিলার। এঁর উপস্থিতবুদ্ধি, অভিনয়, নীচতা বা চতুরতার প্রশংসা না করে উপায় নেই।

তবু আজ সে কোন রকম বিদ্বেষ নিয়ে আসে নি। সে এসেছে ঠান্ডা মাথায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে।

—আপনার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে মা।

—আর শরীর! নীহার মুখ বিকৃত করলেন, দেখতেই পাচ্ছ, কী সুখে এখানে আছি। আজ যদি তোমাদের ভরা সংসার থাকত, আমার কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু সব যেন কেমন হয়ে গেল। তোমাদের কথা ভেবে রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় না। বাবা, তুমি ওর কোন খবর রাখ?

রজত এক পলক তাকিয়ে মাথা নীচু করল। তাঁর হাতের ওপর শির ওঠা আঙুল থর থর করে কাঁপছে। জলভরা দু' চোখ ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে। শত্রু হলেও মায়ের প্রাণ! কিন্তু সে কী সত্য কথা বলতে পারবে? মীরার চালচলন কতটুকু উনি জানেন।

—চুপ করে আছ কেন। সে হতভাগীর কোন খবর জান?

—না।

—তুমি কেন শক্ত হলে না বাবা? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে সব খুলে বল। কেন ও তোমাকে ছেড়ে চলে এল?

—থাক ও-সব কথা। রজত এবার বিরক্ত বোধ করল, আমার চেয়ে আপনিই ওকে ভাল করে চেনেন। আমি বরং আজ উঠি। বিনয়ের তো আসতে দেরী হবে।

রজত উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারল না। শেফালী চা আর প্লেটের ওপর খাবার সাজিয়ে উপস্থিত। মুখে পাতলা নরম হাসি।

—বসুন। চা খান। ওর আসবার সময় হয়েছে।

শেফালী ছোট্ট একটা গোল টেবিল শোবার ঘর থেকে নিয়ে এল। টেবিলের ওপর চা আর খাবারের প্লেট রেখে সামান্য হাসল, এই প্রথম এলেন। মিষ্টি-মুখ না করে ফিরে গেলে লোকে কী বলবে।

রজত চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আড়-চোখে একবার নীহারকে দেখল। মুখের ভাব দেখে মনে হয় তিনি অসন্তুষ্ট। মাঝে মাঝে তীব্র চোখে শেফালীকে দেখছেন। শেফালীর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারছে না রজত। বিশেষ করে নীহারের সামনে।

—আসছি। শেফালী পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে যায়।

রজত চুপচাপ চায়ের কাপে চুমুক দেয়। কেমন হয় যদি সে একটা সিগারেট ধরায় নীহারের সামনে। আর দু'দিন পর তো কোন সম্পর্ক থাকবে না। সে আশঙ্কা করছিল আবার হয়তো উনি সুরু করবেন এমন সব প্রসঙ্গ যা বিরক্তিকর। বস্তুত কী লাভ এখন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কার কতটা দোষ! লাভ নেই কিছু। শুধু তিক্ততা বাড়বে।

—তোমার কী পল্টুকে দেখতেও ইচ্ছে করে না?

—পল্টুকে আমি নিয়ে এসেছি। ও ভালই আছে। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বোর্ডিংয়ে থাকছে।

নীহার কিছু বলার আগেই সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনল রজত। শেফালী প্রায় ছুটে এল ঘর থেকে। দ্রুত বেগে এগিয়ে গেল। সুন্দর একটা গন্ধ। দরজা খোলার শব্দ। বিনয়কে দেখে রজত এক ধরনের স্বস্তিবোধ করল।

রজতকে দেখে বিনয় মনে মনে মুহূর্তেই অনেক কিছু ভেবে নেয়। কিন্তু বাইরে সে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, কতক্ষণ এসেছো?

—অনেকক্ষণ। রজত স্বল্প হাসার চেষ্টা করল, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

মার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয় থমকে যায়। আবার কী হল? ফের কী শেফালীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? সে একবার শেফালীর দিকে তাকাল। হাসি হাসি মুখ। তবে? রজতদার সামনে মা যেন স্বাভাবিক ব্যবহার করেন। কী উদ্দেশ্যে রজতদার আগমন?

—এই নাও তোমার পাথরবাটি। বিনয় কাঁধের ওপর ঝোলানো ব্যাগের ভিতর থেকে বাটি বের করে নীহারের পায়ের কাছে রেখে বলে, পছন্দ হয়েছে কিনা বল। অনেক দোকান ঘুরে তবে কিনেছি।

নীহার নিস্পৃহ চোখে একবার তাকালেন, রেখে দে। আমার পছন্দ অপছন্দে তোদের কী আসে যায়। কত ভাবিস আমার কথা!

বিনয় জোরে হেসে উঠল, শোন রজতদা। আসলে মার খুব পছন্দ হয়েছে। শেফালী, বাটিটা রেখে দাও। আর আমাদের একটু কফি খাওয়াতে যদি পার। এসো রজতদা। আমার ঘরে চল।

বিনয়ের পিছন পিছন রজত ঘরে ঢুকল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। এতক্ষণ সিগারেট না খেতে পেয়ে যা কষ্ট হচ্ছিল তার। প্যাকেট এগিয়ে দিল বিনয়ের দিকে।

—একটু পরে। বিনয় জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বিদেশী একটা জার্নাল এগিয়ে দিল রজতের দিকে, চোখ বোলাও। বলে সে বেরিয়ে যায়।

জার্নাল একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিল রজত। ঘরের চতুর্দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বাঃ বেশ সাজানো গোছানো। শেফালীর কথা মনে পড়ল। বিনয়টা তাহলে বেশ আছে। ভাল থাকুক তা সে চায়। আজ বোধ হয় বিনয় রোমান্টিক ভাববিলাসকে ত্যাগ করেছে। কাঁধে দায়িত্ব চাপলে উচ্ছ্বাস উবে যায়। মনে মনে হাসল রজত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি সংসারী হবে বিনয়। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত বেঁচে থাকতে হবে ওকে। যদি না পারে, অশেষ দুঃখ ওর কপালে।

—কী ভাবছো রজতদা? বিনয় ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়, ইস্‌, এরই মধ্যে দু' একটা চুল পাকতে সুরু করেছে!

রজত সামান্য হাসল, চিরতরুণ থাকতে চাও বুঝি?

—তোমাকে দেখলে কিন্তু আমার ঈর্ষা হয়। চল্লিশ হতে চলল। কিন্তু তোমাকে দেখলে তা বোঝবার উপায় নেই।

বিনয় খাটের ওপর বসল। শেফালী দু' কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

—শেফালীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে রজতদা?

—খানিকটা। রজত কফির কাপে চুমুক দেয়, শেফালীর দিকে তাকিয়ে বলে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বসুন।

—ওকে আবার 'আপনি' করে কী বলছো। বিনয় হেসে তাকায় শেফালীর দিকে, রজতদার কথা তোমাকে তো সব বলেছি।

—জানি। তোমার এক সময়ের গুরুদেব। শেফালী মুচকি হেসে তাকাল রজতের দিকে, আপনাকে যদি গুরুদেব বলে ডাকি, আপত্তি করবেন?

—হ্যাঁ। গুরুবাদে আমার বিশ্বাস নেই। বিনয়, রাত হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি উঠবো।

—সে কী! এখনই উঠবেন কিভাবে। রাত্রে খেয়ে যাবেন। কলকণ্ঠে শেফালী বলে ওঠে।

—বেশি দেরী হবে না রজতদা। বিনয় বালিশের তলা থেকে ঘড়ি বের করল, এখন সাড়ে আটটা। এক ঘণ্টার বেশি তোমাকে আটকে রাখবো না। শেফালী, আর কী রান্না বাকি?

শেফালী ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে বলে, তোমরা গল্প কর। বেশিক্ষণ লাগবে না।

কিছুক্ষণ দুজনে কোন কথা বলল না। রজত মাঝে মাঝে লুকিয়ে বিনয়কে দেখছে। বিনয়ের মুখ এখন অনেকটা গম্ভীর। সহসা রজতের মনে হল সে কিভাবে মীরার প্রসঙ্গ তুলবে বুঝতে পারছে না। একদিন বিনয় স্বেচ্ছায় এসেছিল তার কাছে। অনুরোধ করেছিল। রজত হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সবকিছু। অপমানিত হয়ে ফিরেছে বিনয়। আজ যদি ঠিক তেমনিভাবে বিনয় তাকে...।

—এবার বল তোমার জরুরী কথা।

রজত সামান্য চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি সে ফুরিয়ে আসা সিগারেটের টুকরো থেকে নতুন আর একটা সিগারেট ধরায়। সে কী নার্ভাস হয়ে উঠেছে? বিনয় ওভাবে তাকিয়ে রয়েছে কেন! রজত চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

—তুমি শোভনকে চেন? মীরার এক বান্ধবীর দাদা।

—চিনি। বিনয়ের মুখে একটা কঠোর হাসি দেখা যায়, জানি তোমার জরুরী কথা কি। কিন্তু রজতদা, মীরার বিষয় নিয়ে কোন রকম আলোচনা করতে আমি উৎসাহ পাচ্ছি না। আমাকে মাফ কর।

—তুমি হয়তো এও জান, বর্তমানে মীরা আর শোভন এক সঙ্গে বসবাস করছে।

—রজতদা! বিনয় অতিকষ্টে উত্তেজনা দমন করল, তোমাকে অনুরোধ করছি এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করো না। প্লীজ!

—উত্তেজিত হয়ো না বিনয়। রজত মৃদু হাসল, আমি তোমার সাহায্য চাই। তুমি একটু চেষ্টা করলেই হবে। পল্টুর ভবিষ্যৎ তো দেখতে হবে।

—আমি কী করবো! বিনয় তিক্তকণ্ঠে বলল, তুমি কোন্ স্ত্রীলোক নিয়ে স্ফূর্তি করছো বা মীরা কোন্ পুরুষের হাত ধরে সিনেমা, রেস্টুরেন্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে...। স্টপ ইট! আমি কতদিক মাথা ঘামাবো? আমার নিজের একটা জীবন আছে। তাই নিয়ে আমি মশগুল থাকি। রজতদা, আমাকে রেহাই দাও। তোমাদের ব্যাপারে আমাকে ডেক না।

—আমি ডিভোর্স চাই বিনয়। তুমি মীরাকে রাজি করাও। অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

—না! মীরার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ওর সঙ্গে কথা বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি: যা করবার তুমি করবে। তুমি বা মীরা কারুর বিষয় আমার কোন কৌতূহল নেই। ডিভোর্স চাও, উকিলের কাছে যাও।

রজত বুঝতে পারল, বিনয় ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এবং এ বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই। মীরার প্রতি বিনয়ের বিদ্বেষ দেখে সে মনে মনে একটু অবাক। কেননা, সে জানত, একমাত্র বিনয়ের কাছেই মীরা প্রশ্রয় পেয়ে আসছিল। বিনয়ের বুদ্ধির দ্বারা চালিত হত মীরা। এখন দেখছে ব্যাপারটা অন্যরকম।

—আচ্ছা, আজ চলি। রজত উঠে দাঁড়াতে বিনয় খাট থেকে নেমে এসে ওর একটা হাত ধরে বসিয়ে দেয়।

—বাঃ তোমার জন্যে রান্না করছে...। রাগ কর না রজতদা। এতদিন পর এলে...।

রজত কোন জবাব দিল না। লাভ হ'ল না কিছু। চলে যেতে পারলে ভাল হোত। কিন্তু না খাইয়ে এরা ছাড়বে না। এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কী বিষয় নিয়ে কথা বলবে। বিনয়ের সঙ্গে কথা বলা মানে উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা। ফলে গম্ভীর হয়ে সে বসে রইল।

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : ৫৫-২৪৪১, ৩৩-১৪৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

—তুমি এখনও রাগ করে আছ। কিছু বল রজতদা। নাকি বলার কিছু নেই। কেমন আছ তুমি? তোমার চাকরী, বন্ধু-বান্ধব বা রাজনৈতিক হালচাল...। দেশের বর্তমান অবস্থা...।

রজত তীক্ষ্ণচোখে বিনয়ের দিকে তাকাল। ঠাট্টা করছে কী বিনয়? বাচাল যুবক।

—নতুন কিছু বলার নেই। বিনয়।
—তোমার ক্লান্তি আসে না?
—কীসে?

—রোজ একই ধরনের কাজ করতে। পরিচিত লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা। একটা দিন পার হলে অন্য একটা দিন। পরের দিন পূর্ব দিনের পুনরাবৃত্তি। কখনও কী নিজেকে বন্দী মনে হয় না?

—জানি না। রজত মৃদু হাসল, এত-সব ভাববার সময় কোথায়। তুমি দেখছি এখনও ভাবালুতা কাটিয়ে উঠতে পারনি। একটু বয়স বাড়ুক, কাঁধে বেশি করে দায়িত্ব চাপুক, তখন আর এসব ভাববে না। জীবন একঘেয়ে লাগে তাদেরই কাছে যারা দায়িত্ব-হীন।

বিনয় নীরবে হাসল। রজতদাকে জোর করে কিছু বোঝানো যাবে না। তার প্রশ্নের তাৎপর্য হয় রজতদা বুঝতে পারেনি অথবা না বোঝার ভান করছে। এক পলক লুকিয়ে রজতদাকে দেখে নিল। খুব হতাশ হয়েছে। আহা বেচারী!

স্বভাবতই এরপর যতক্ষণ ছিল রজত, খুব কম কথা বলেছে। শেফালীর হাসি ঠাট্টায় জোর করে হাসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বুকেছে তার ক্ষোভ চাপা থাকেনি বিনয়ের কাছে। কস্তুত বিনয় মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। ফলে সে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

নীহারকে প্রণাম করে রজত বলে, শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। আজ চলি।

নীহার ভাল মন্দ কিছু বলেন না। রজত মনে মনে হাসে। শেফালীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বারান্দা পেরিয়ে বাইরে আসে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামে। বিরাট চাতাল পেরিয়ে রাস্তায় পা দেয়। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়ার মুখোমুখি হয়।

॥ একুশ ॥

বাসস্টপে মুখোমুখি হল দুজনে। রজত আর মীরা। ভূত দেখার মত চমকে উঠল মীরা। দ্রুত চারদিকে তাকিয়ে দেখল পরিচিত কেউ নেই। অফিস ছুটির পর অসংখ্য নরনারী বড় বড় বাড়ির ভিতর থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে। স্রোতের মত ট্রাম বাস লক্ষ্য করে ছুটছে।

—কেমন আছ? হাসিমুখে তাকাল রজত, অনেকদিন পর দেখা। চল, কোথাও বসা যাক। জরুরী কথা আছে। ওকি মীরা, অমনি মুখ শুকিয়ে উঠল। ওভাবে আশপাশে কী দেখছো? অপরিচিত কেউ নই, এখনও আইনের চোখে তোমার স্বামী। তোমার ইহকাল পরকাল।

মীরা কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। লাথ, কেমন নির্লজ্জের মত হাসছে। এমনভাবে কথা বলছে যেন কিছু হয়নি। যেন অনেক-দিন পর হঠাৎ দেখা। আবার রেস্টুরেন্টে বসে চা খেতে চায়। রসিকতার একটা সীমা থাকা উচিত। রজত বুঝি ভেবেছে ভাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ওর পিছু নেবে। হাঁ, সে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোন সীন ক্রিয়েট করতে চায় না। শুধু নীরব উপেক্ষা। একটার পর একটা বাস চলে যাচ্ছে। কিন্তু যা ভীড়!

—কথা বলবে না ঠিক করেছো? রজত আরও কাছে এগিয়ে এল, সহজ হও মীরা। তোমাকে অযথা বিরক্ত করতে চাইনে। তোমরা কেউ আমার কথা শুনছো না। আমার বুঝি দরকারী কথা থাকতে পারে না। সেদিন তোমার মার সঙ্গে দেখা করলাম। উনি কী বললেন জান? বললেন কেন আমি কঠোর হলাম না। কেন তুমি চলে এলে? আমি তাঁকে বোঝাতে পারিনি। কেউ যদি স্বেচ্ছায় চলে আসে তাকে আটকান যায় না। লাভ হয় না কিছু। মীরা, বেশিক্ষণ বিরক্ত করবো না তোমাকে। মাত্র আধঘন্টা সময় দাও আমাকে।

মীরা কঠিন সুরে বলে, তোমার কোন কথা শুনতে চাই নে। বলে সে হাঁটতে সুরু করল। বুকের ভিতর ঢিবঢিব শব্দ। পিছন ফিরে তাকাল না। যদি চোখাচোখি হয়! একটা অস্বস্তি সে টের পাচ্ছে। রজত কী তারই অপেক্ষায় বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল?

সামনে একটা বাসস্টপ দেখে মীরা দাঁড়াল। এখান থেকে বাসে উঠবে। আড়-চোখে সে পিছন ফিরে তাকাল। সর্বনাশ! সর্বশরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। একটু দূরে রজত দাঁড়িয়ে। হাসিমুখে সিগারেট টানছে। তাকে অনুসরণ করেছে! এখন উপায়। একটা বাস এসে দাঁড়াতে সে উঠতে যায়। কিন্তু ওঠবার জন্যে যেন বুদ্ধ শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। একটা লোক এসে ওর গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ত আর একটু হলে। সভয়ে মীরা পিছিয়ে যায়।

—মীরা শোন। আমার ভীষণ দরকার তোমাকে।

রজত মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। মীরা অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকায়! চিৎকার করে লোকজনকে ডাকবে কী? এভাবে তাকে অপমান করার মানে কী! সমস্ত সম্পর্ক তো চুকিয়ে এসেছে। তবু পিছনে লাগা কেন! পল্টুকেও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আর কী চায় রজত?

—মীরা, এদিকে একবার তাকাও। আমি তোমাকে ফিরে যেতে বলছি না। তোমার ওপর কোন অধিকার খাটাতে চাই না। কয়েকটা কথা বলতে চাই। এত রেগে যাচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না। পল্টু ভাল আছে। ইচ্ছে করলে তাকে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতে পার। বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশুনা করছে। ওর কথা ভেবেই তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। শোন মীরা।

আর একটা বাস এল। ভীড় পাতলা হয়ে গিয়েছে। মীরা একরকম দৌড়ে বাসে উঠে পড়ল। বাস ছেড়ে দিতে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এখনও বুকের ভিতর কাঁপুনী। এক পলক লেডিস সীটের দিকে তাকাল। নো চান্স।

পল্টুর কথা একবার ভাবল মীরা। আগে রাতে সে লুকিয়ে কাঁদত। বিশেষ করে পল্টু চলে যাওয়ার পর, প্রথম দিকে ঘুমই আসত না রাতে। ধীরে ধীরে সহ্য হয়ে গেছে। এখন আর যখন তখন ওর কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়ে না। অর্থাৎ সময় সব-কিছুকে গ্রাস করে।

বাস থেকে নেমে তাড়াতাড়ি হাঁটে মীরা। শোভন এতক্ষণে হয়তো ফিরেছে। ওখানে বেশিদিন থাকা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। কৃষ্ণার হাবভাবে মনে হয়, সে মনে মনে সন্দেহ করছে। ওর অযাচিত কৌতূহলে সে বিব্রত হয়ে ওঠে অনেক সময়। শোভন ওরদূর সম্পর্কের দাদা, এই পরিচয় দিয়েছে কৃষ্ণার কাছে। কে জানে বিশ্বাস করেছে কিনা।

এদিকে সে এখনও মনস্থির করতে পারেনি। অর্থাৎ শোভনের সঙ্গে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখেই চলাফেরা করে। শোভন হয়ত মনে মনে অসহিষ্ণু। কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ করে না। তবু ওর হাবভাবে প্রকাশ হয় সবকিছু। মীরা হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে সহজ সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট। কিন্তু কতদিন এভাবে চলতে পারবে জানে না।

বাড়ির ভিতরে ঢোকার আগে অভ্যাস-বশত মীরা পিছন ফিরে তাকায়। এবং পলকে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। অদূরে রজত দাঁড়িয়ে। তেমনি হাসিমুখে। এটা কী করে সম্ভব! বিমূঢ়দৃষ্টিতে সে একবার রজতকে দেখল।

কাছে এসে দাঁড়ায় রজত, এই বাড়িতে থাক বুঝি? চল ভেতরে যাওয়া যাক। ঘরের ভিতরে বসে ঠান্ডা মাথায় আলোচনা করা যাবে। মীরা, অনেকদিন তুমি মুক্তির কথা বলেছো। রেহাই পেতে চেয়েছো। এবার একটা সেটেলমেন্ট করবো ভাবছি। বুঝতেই পারছো—আমার কথাটা কত ভয়া-নক জরুরী। শুনলে তুমিই লাভবান হবে। দাঁড়িয়ে থেক না। তোমার ঘরে চল মীরা।

কী স্পর্ধা লোকটার! মীরার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে থাকে। অতিকষ্টে সে নিজেকে সংবরণ করল। এখানে যদি ঝগড়া হয় রজতের সঙ্গে; ভীড় জমে যাবে। কৃষ্ণা জানতে পারবে। বাড়িওয়ালার কানে সব কথা উঠবে। রজত সব পারে। অতএব মেজাজ গরম করে লাভ নেই।

শোনাই যাক না কী বলতে চায়। ওকে নিয়ে কী ঘরের ভিতর যাবে না বাইরে কোন পার্কে অথবা রেস্টুরেন্টে বসবে? স্থির করতে পারে না মীরা। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায়না।

—এস। মীরা হাঁটতে থাকে। তাড়া-তাড়ি। এ পাড়ায় কেউ তাকে চেনে না। কাছাকাছি কোন পার্ক নেই। পাশাপাশি রজত হাঁটছে। কোথায় বসবে? বসার কী দরকার? যা বলার তাড়াতাড়ি বলুক রজত।

—কী তোমার জরুরী কথা? তাড়াতাড়ি বল।

—একটু বসলে হোত না কোথাও। রজত মৃদু হাসল, তোমার ঘরে বসলেই ভাল হোত। নাকি শোভনবাবু আপত্তি করতেন?

—বাজে কথা ছেড়ে আসল কথা বল।

—বলছি। আইনত আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাক। পল্টুর কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হল। পল্টু প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। কী বলি জান? বলি তোমার মা মারা গেছে!

মীরা এ আঘাতটা গায়ে মাখল না, এতদিনে তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে আনন্দিত হলাম। আমি তো এই চেয়েছি। ডিভোর্স হয়ে যাক। কেন একটা মিথ্যে সম্পর্ক টেনে বেড়ানো!

—ঠিক আছে। তোমার মত নেই জানলাম। আমার কথা শেষ। চলি মীরা। রজত পিছন ফিরে দাঁড়ায়। তারপর দ্রুত হাঁটতে থাকে।

রজতের ব্যবহারে খানিকটা অবাক মীরা। ডিভোর্সের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তাহলে। এ কী নতুন কোন চাল কিনা বুঝতে পারছে না সে। যাকগে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তাড়াতাড়ি সে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণ পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার। মাথা ঘুরছে। কেমন বমি বমি ভাব।

ঘরে ঢোকার আগে শোভনের মুখোমুখি। মীরা পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢোকে। তারপর জামাকাপড় না ছেড়ে বিছানায় শরীর ছেড়ে দেয়। দুচোখ বুজে জোরে জোরে নিশ্বাস ছাড়ে।

—আসতে পারি?

—আসুন। উঠল না সে। শুধু গোড়ালী পর্যন্ত কাপড় টেনে দেয়। একবার তাকায় শোভনের দিকে। কয়েকদিনের দাড়ি জমেছে মুখে। অবিন্যস্ত মাথার চুল। বস্তুত শোভন আসলে কী ধরণের ব্যবসা করে তা সে জানে না। জিজ্ঞেস করেনি কোনদিন।

—কী হয়েছে? শোভন মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়, এমন অসময়ে শুয়ে আছ দেখে মনে হচ্ছে শরীর টরীর বোধহয় খারাপ।

—আজ্ঞে না মশাই। মীরা উঠে বসল, বুকের ওপর কাপড় ঠিকঠাক করতে করতে বলে, আজকালকার মেয়েদের সহজে শরীর খারাপ হয় না। আপনি দাড়ি কাটেন না কেন?

—এমনি। খারাপ দেখাচ্ছে?

—বাঃ। দাঁড়িয়ে কেন। বসুন না ওই চেয়ারটায়।

—এখনও 'আপনি'! মীরা, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে? আমি নিশ্চিত হতে চাই।

মীরার বুক কেঁপে ওঠে। শোভন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। প্রশ্নের সম্মুখীন হতে তার ভয়। কেননা সঠিক উত্তর তার জানা নেই। অথচ এভাবে বেশিদিন থাকা যায় না। পাশাপাশি ঘরে। সবাই জানে তাদের মধ্যে সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ। নারী পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের একই অর্থ হয়। কিন্তু আসলে তারা জাহাজের পাশাপাশি কেবিনের যাত্রী—যাত্রা শেষ হলে যে-যার গন্তব্যস্থানে চলে যাবে। তাই কী?

শোভন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখল। মীরা অন্যদিকে তাকিয়ে। মনে মনে সে বিরক্ত হয়। অপমানিত বোধ করে। মাথা নীচু করে পর্দা সরিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে।

অনেকক্ষণ মীরা একভাবে বসে রইল। তারপর অফিসের পোশাক বদলে হাতমুখ ধুয়ে নেয়। শোভনের উত্মার কারণ সে বোঝে। হিটার জেলে দুকাপ চা তৈরী করে। সেই সঙ্গে মাখন মাখানো দুটি, দুটি ডিমসেদ্ধ।

পর্দা তুলে মীরা দেখল ওপাশ থেকে দরোজা বন্ধ। এ পাশ থেকেও বন্ধ করতে পারে। বন্ধ দরোজায় কয়েকবার টোকা মারল। কোন সাড়াশব্দ নেই। নীচু গলায় সে শোভনের নাম ধরে কয়েকবার ডাকল। তবে কী বেরিয়ে গেছে? ভাবামাত্র বাইরে এল সে। হ্যাঁ, দরজায় তালা।

খেতে খেতে মীরা রেডিও খুলে দেয়। এত রাগের কোন অর্থ হয় না। শোভনের বোঝা উচিত, তাকে সময় দেওয়া দরকার। মানসিক দিক থেকে তৈরী হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া বেশ তো আছে দুজনে। কেউ কারুর ওপর নির্ভরশীল নয়। দুজনেই স্বাবলম্বী স্বাধীন। কেন শোভন তাড়াতাড়ি একটা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যগ্র?

—কী করছেন?

—আসুন। মীরা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল। কৃষ্ণার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দেয়, আসেন না কেন। তারপর মুখ টিপে হাসে, কর্তা বুঝি ছেড়ে দেন না! চেয়ারে কেন, বিছানায় এসে আরাম করে বসুন।

কৃষ্ণা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকায়, আপনাকে দেখে আমার হিংসে হয়।

—কেন? ভ্রূ কুঁচকে তাকায় মীরা। এমনিতে মন্দ নয় এই সরল বউটি। কিন্তু বড় কৌতূহল। বোঝে না কোনটা বলা উচিত কোনটা বলা উচিত নয়। ওর এই সারল্যে অনেক সময় সন্দেহ হয়। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কৃষ্ণা ওর ভেতরটা দেখার চেষ্টা করে বোধহয়।

বিছানায় না বসে চেয়ারে বসল কৃষ্ণা। বলল, আপনি যখন খুশি বাইরে বেরোচ্ছেন। কেউ বাধা দেবার নেই। আর আমার অবস্থাটা দেখুন। সকলের মন জুগিয়ে চলতে হয়। এক একজন একেক রকম। শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী। মুখ বুজে কাজ করে যাও।

—এই জন্যে? হাসল মীরা, দুঃখ করছেন কেন। সবার মুখে হাসি ফোটাতে গেলে কিছুটা নিজের সুখ সুবিধে ত্যাগ করতে হয়। বরং আপনাকে দেখে আমার হিংসে হয়।

—কী যে বলেন। কৃষ্ণা বড় বড় চোখে তাকায়, আপনি ঠাট্টা করছেন। আপনার দাদা কোথায়?

—বেরিয়েছে। মীরা সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ বদলাতে চাইল, আপনার কর্তা বুঝি এখনও ফেরেননি?

—দশটার আগে নয়। অফিস থেকে বেরিয়ে আবার অন্য জায়গায় কাজ করে। ওই শুনুন ডাক পড়েছে। শাশুড়ি পছন্দ করে না আপনার এখানে আসি।

—কেন?

—ওদের কথা বাদ দিন। লোকের কুৎসা রটনা করতে পারলে আর কিছু চায় না।

—আপনি আর আসবেন না।

—রাগ করলেন? কৃষ্ণার মুখ শুকিয়ে যায়, আমি বিশ্বাস করি না ওদের কথা।

কর্কশকণ্ঠে আবার ডাক শোনা যায়। কৃষ্ণার হাবভাবে বোঝা যায়, সে যাবার জন্যে ছটফট করছে।

—আজ চলি। পরে আসব।

একটু পরে মীরা শুনতে পেল তর্জন গর্জন। হয়ত কৃষ্ণাকে বকছে ওর শাশুড়ি। মীরা রান্নার আয়োজন সুরু করে। রাতের রান্নার জন্যে উনুন ধরায় না। স্টোভ ধরায়। ভাত বসিয়ে দেয়।

এখানেও আর বেশিদিন থাকতে পারবে না বলে মনে হচ্ছে। কৃষ্ণার শাশুড়ি সন্দেহ করছে। আস্তে আস্তে পাঁচ কথা উঠবে। তারপর শোভন। ওর দাবী দিন দিন বেড়ে যাবে। অতএব কিছু স্থির করা দরকার। ডিভোর্স যখন হয়ে যাচ্ছে তখন আর শোভনকে বিয়ে করতে বাধা কী!

ঠিক এই কথা এর আগেও বহুবার মনে হয়েছে। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। বিয়ের কথা চট করে মনে হয়নি। বস্তুত মাঝে মাঝে মনে হয়, ডিভোর্স হয়ে গেলেও বিয়ে-টিয়ের ঝামেলায় আর যাবে না। কিন্তু বিবাহ ছাড়া একজন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও স্থাপন করা যায় না। অন্তত যে ধরনের সম্পর্ক স্থাপনে শোভন ব্যগ্র।

রাত বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করল মীরা। কিন্তু শোভন এল না। ফলে সে শোভনের ঘরে তার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখল। তারপর খেয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না দুচোখে। কোন শব্দ হলেই কান খাড়া করল। না, গলিতে কুকুর ডাকছে। এখন পল্টু নিশ্চয়ই নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। ওর কথা কী কখনও ভাবে? রজত জানিয়েছে সে মৃত। পল্টু কতদূর কী বুঝেছে সেই জানে।

একটা-কিছু করা দরকার। মীরা বালিশে মুখ লুকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদল অনেকক্ষণ। এত দুর্বল যে, কোনকিছু জোর করে...শেষ পর্যন্ত সে হয়ত এখান থেকে কোন মেস বা বোর্ডিংয়ে উঠে যাবে। নাকি ফিরে যাবে মা'র কাছে? না না না! সে দুহাতে বালিশ জড়িয়ে ছটফট করে উঠল। মরে গেলেও সেখানে ফিরে যাবে না।

ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে মীরা।

(ক্রমশঃ)

শেষ অনুরোধ

চিঠিটার মুসাবিদা শেষ করে অনাদি কলমটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। অভ্যেস-মত বাঁ হাতটা চলে গিয়েছিল টেবিলের তলায়—'বাজার' টিপতে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হোল আওয়াজ শুনে কেউ ছুটে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াবে না—পিওন, সৈন্য কেউ না। বরং বাজারের শব্দ হলেই এখুনি চীৎকার শুরু হয়ে যাবে—'দালাল অফিসার নিপাত যাক', 'আমলাশাহী হো বরবাদ', 'অনাদি রায় হায়রে হায়', 'আমাদের দাবী মানতে হবে—মানতে হবে, মানতে হবে।'

বেশ, আপনাদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করেই আমি চলে যাব। আপনারা যখন আমাকে চান না, তখন আমার চলে যাওয়া ছাড়া আর কি করার থাকতে পারে? শুধু একটা রিকোয়েস্ট, আমার এই চিঠিটা দয়া করে টাইপ করে দেবেন? না, না, আপনারা লেখে নিন—পড়ে দেখুন কি লিখেছি এতে। না-পড়ে টাইপ করতে হবে না।

শ্লোগান আপনারা যত খুশী দিন, তাতে আমি আর কি বলব। বাক-স্বাধীনতা সংবিধানসম্মত। তাই যদি হয়, তাহলে আমাকেও তো কিছু বলতে দেবেন? আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই বলে আমার কথা কি শুনবেন না? গণতন্ত্রে সকলেরই তো বলার রাইট থাকে। তবে আপনারা শুধু তারিণীবাবুর কথাই কেন শুনবেন? আমার কথাও শুনুন। মিহির-বাবু, আপনি তো ইউনিয়নের লীডার। আপরাইট ম্যান হিসাবে আপনার খ্যাতিও আছে। কোনদিন কোন অফিসারের কাছে আপনি সুবিধা চাননি—যদিও জানি আমার বহু কলিগই আপনাকে ঠেকাতে পারলে বেঁচে যান। কারণ আপনার কথায় গোটা অফিস ওঠে-বসে।

আপনি তো জানেন কোনদিন আমি ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কিছু করিনি। দাঁড়ান—আমি জানি আপনি কি বলবেন এখুনি। বলবেন প্রতিটি ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্যই ইউনিয়ন; ইউনিয়নের কোন ব্যক্তি-সদস্যের ক্ষতি হলে সবাই মিলে আপনারা তার পাশে এসে দাঁড়াবেন। ভাল কথা। এ-কথার প্রতিবাদ কোন সেন ম্যান কোনদিন করবে না। অন্তত আমি করব না। কারণ মাত্র বারো বছর আগে আমিও ছাত্র ছিলাম। আমিও কলেজে ইউনিয়ন করেছি। আজ না হয় পরীক্ষা-টরীক্ষা উৎরে এই চেয়ারে এসে বসেছি।

শুধু আপনারা রাইট করবেন না, আমার কথা কটা আগে শুনুন। আমায় বাজ করতে চান, তাড়াতে চান, তার অনেক সময় পাবেন, আগে আমায় বলতে দিন। আমি একটা কথাও বানিয়ে বলছি না। বিশ্বাস না হয় অফিস-রেকর্ডে আমার পার্সোনাল ফাইল আছে। দেখে নিন সেই ফাইল থেকে কোন কলেজে আমি পড়েছি, পাশ করেছি কোন্ ইয়ারে। যতদূর জানি পুরোনো প্রিন্সিপাল এখনো আছেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন—অনাদি রায় কলেজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী ছিল কিনা? যদি এর একবর্ণও মিথ্যা হয় আপনারা তখন শুধু শ্লোগান কেন আমার সর্বাঙ্গে থুতু ছিটিয়ে দেবেন, আমি চ্যালেঞ্জ রাখছি।

হ্যাঁ, যে-কথা হচ্ছিল। ইউনিয়ন আমিও করেছি। নাইনটিন ফিফটি নাইনের ফুড মুভমেন্টে পুলিসের লাঠির দু-একটা ঘা এই অনাদি রায়ের গায়ে মাথায় যে পড়েনি তা নয়। একটু এগিয়ে আসুন, হ্যাঁ, আর একটু, এবার টেবিল ল্যাম্পের মুখটা ঘুরিয়ে দিন। দেখুন ঠিক কপালের ডান-দিকে একটা প্রায় দেড় ইঞ্চি কাটা দাগ—আমি আজো গর্বিত যে, সেদিন আমার ওপর লাঠিচার্জ হয়েছিল। না, না, বিশ্বাস করুন, কোন সেন্টিমেন্টাল গল্প ফাঁদতে বসিনি। যা সত্যি শুধু সেটুকুই বলছি। সেবার সবশুদ্ধ উনিশ দিন ছিলাম জেলে। তার জন্য আমি আনন্দিত।

সে বিশ্বাস আমায় জনতার মিছিলে বারবার টেনে নিয়ে গিয়েছে, সেই বিশ্বাস কিন্তু কোনদিনও আমায় ত্যাগ করেনি। করেনি বলেই যখন যেটুকু সুযোগ পেয়েছি, তাই কাজে লাগিয়েছি আমার সঙ্গে যারা কাজ করেন, তাঁদের উপকারের জন্য। মিহিরবাবু, আমি তো আপনাকে

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

বহুবার এই টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি—রায়সাহেব আপনার মতো আর কয়েকটি অফিসার যদি আমরা পেতাম, তাহলে এই অফিসের চেহারাটাই বদলে যেত। বলুন এ-কথা সত্যি কিনা? না কি আমি বানিয়ে বলছি?

আপনারা চুপ করে আছেন। তাহলে মেনে নিচ্ছেন আপনাদের লীডার এ-কথা আমার সম্বন্ধে বলেছেন। তবে কেন আজ আমার বিরুদ্ধেই আপনারা স্লোগান দিচ্ছেন? রাতারাতি এত খারাপ হয়ে গেলাম কি করে?

তারিণীবাবুর মেডিক্যাল বিল আটকে দিয়ে আমি অন্যায় করেছি, না ঐসব ভুয়ো বিল সাবমিট করে তারিণীবাবু করেছেন অন্যায়? চুপ করে থাকবেন না। দয়া করে বলুন কে অন্যায় করেছে?

আমি যেমন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ক্লাশ ওয়ান অফিসার। তেমনি আপনারাও তো একই গভর্ণমেন্টের এমপ্লয়ী। আপনাদের কেউ ক্লাশ থ্রি, কেউ বা ক্লাশ ফোর।

দেখুন ক্লাস ডিভিসনের ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই—ওসব অনেক দিনের পুরোনো ব্যাপার, নতুন যারা ক্ষমতায় এসেছেন তাঁরাও মেনে নিয়েছেন। বইটই পড়ে অল্প স্বল্প বাইরের খবর যা রাখি তাতে পৃথিবীর সব দেশেই এ ব্যাপারটা চালু আছে বলে জানি। বাইরের কথা থাক, নিজেদের দিকেই ফিরে তকাই—যতদিন না সমাজ ব্যবস্থা পালটাচ্ছে ততদিন এসব থাকবেই। এসব নিয়েই ঘর করতে হবে। কি মানেন তো একথা?

যদি মানেন তাহলে কি চাইবেন না যে বহুদিনের কস্তাপচা ঘুনধরা এই সমাজের আনাচে কানাচে যে সব বাস্তুঘুঘুরা এখনো বাসা বেঁধে আছে তাদের মুখোস ছিঁড়ে ফেলে আসল চেহারাটা সকলের সামনে মেলে ধরতে? আপনারা যে স্লোগান এতদিন দিয়েছেন আমি তো সেটাই বিশ্বাস করেছি। আর করেছি বলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি।

আজ দেড় বছর ধরে এই অফিসে আমি অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার হিসাবে কাজ করছি। তার আগে সাত বছর ছিলাম ফিল্ডে—কখনো বিহারে, কখনো সিকিমে, কখনো রাজস্থানে তামার খনিতে। তারও আগে দেড় বছর কাটিয়েছি ফিল্ডে ফিল্ডে ট্রেনিং হিসাবে। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাছাড়া বিয়েও করেছি বছর-খানেক আগে। পাশ করা ইস্তক বাইরে বাইরে কাটিয়েছি এতকাল। শেষে অনেক দরবার করে বদলি হয়ে এলাম কলকাতায়, আপনাদের এই অফিসে। টেবিল, রাইটিং, ডিক্টেটিং মেশিন ছেড়ে শুধু কলম সম্বল করে বসলাম এই চেয়ারে। আর সেই প্রথম দিন থেকেই তারিণীবাবুর খেলা হোল শুরু।

আপনি নিজে জানেন মিহিরবাবু, সিক্সটি নাইনের অকটোবরে আমাদের অফিসে ড্রাইভার পোস্টে একজন লোক নেওয়া হয়েছিল। সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম আমি। আমার ওপর-ওয়ালা ডিরেক্টর সুব্রামনিয়মের আদেশেই আমায় দায়িত্ব নিতে হয়েছিল।

প্রায় শ' দেড়েক অ্যাপ্লিকেশন পড়েছিল। তার মধ্যে আমাদের অফিসের ক্লাস ফোর স্টাফ রামকিষণ ছিল একজন অ্যাপ্লিকান্ট। আপনারা চেয়েছিলেন রামকিষণই হোক সিলেকটেড। আফটার অল ও তো আমাদেরই অফিসের লোক। সেদিন তারিণীবাবু কিন্তু অন্য সুপারিশ নিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে। শুনবেন কি সে সুপারিশ? ওর মামাতো ভাইকে যদি চাকরিটা পাইয়ে দি তাহলে নগদ...। থাক টাকার অ্যামাউন্টটা নাই বা বললাম—সেদিন ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে যে বার করে দিই নি তার কারণ আমি মনে করেছিলাম, নিশ্চয়ই দোষটা আমার নইলে উনি কেন সাহস পাবেন এমন নোংরা প্রস্তাব করতে।

সেদিন থেকেই কেন জানি ওর ওপর সর্বদা নজর রাখতে শুরু করি। আর নজর রাখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যা আবিষ্কার করলাম তার ফল তো এই আপনারা আজ আমার বিরুদ্ধেই স্লোগান দিচ্ছেন।

আচ্ছা মিহিরবাবু, রাস্তায় কেউ যদি আপনার পকেট কাটে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কি স্টেপ নেবেন? আমি তো দেখেছি গোড়াতেই এক রাউণ্ড ধোলাই দেয় সবাই, তার পর পুলিশের হাতে তুলে দেয় পাবলিক সেই পকেটমারকে। আর যে লোক পাবলিকের পকেট মারে তার কি শাস্তি হবে?

না না হেঁয়ালী করছি না। আপনারা তো জানেন আমি কেন তারিণীবাবুর মেডিক্যাল বিল আটকে দিয়েছি, আমি তো কোন কিছু গোপন করি নি। ওর গত এক বছরের মেডিক্যাল বিল চেক আপ করে যে যে বিষয়ে সন্দেহ হয়েছে তারই একটা লিস্ট আমি ডিরেক্টর সাহেবকে যেমন দিয়েছি, তেমনি দিয়েছি আপনাদের। কারণ আমি মনে করি তারিণীবাবু যদি আমার সন্দেহের ঠিকঠাক জবাব দিতে না পারেন তাহলে তার ঐ টাকা পাওয়া উচিত নয়।

আমি ক্লাস ওয়ান স্টাফ। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের রুল অনুযায়ী ক্লাস ওয়ান ও টু স্টাফরা মেট্রোপলিটান সিটিতে প্রেসিডেন্সী সার্জেন ছাড়া অন্য কোন ডাক্তারকে দিয়ে চেম্বার-ট্রিটমেন্ট করালে ডাক্তারের ফি, ওষুধের দাম কিছু পাবে না। কিন্তু ক্লাস থ্রি ও ফোরের বেলায় নিয়মকানুনে অনেক ঢিলেঢালা। আপনারা ইচ্ছে করলে যে কোন এম, বি, বি, এস, পাশ ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে বিল করলে তার টাকা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে। সরকারী ওষুধের লিস্ট মিলিয়ে প্রেসক্রিপসন হলে সব ওষুধের দাম পাবেন। তা সে যত বিলই উঠুক না কেন—দশ, বিশ, পচিশ, পঞ্চাশ, একশ, দুশ, তিনশ বা চারশ। হাসপাতালে ভর্তি হলে সেখানকার খরচও দেবে গভর্ন-মেন্ট। শুধু কর্মী হিসাবে এ সুযোগ আপনি একাই পান তা নয়, আপনার ফ্যামিলীর অর্থাৎ আপনার স্ত্রী, আপনার ওপর নির্ভরশীল আপনার বাবা, মা ও আপনার ছেলেমেয়ে সকলেই পায় এ সুযোগ।

আর সেই সুযোগ দেখুন তারিণীবাবু কেমন সুন্দরভাবে সদ্ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেক মাসে কম করে গড়ে দেড়শো টাকা মেডিক্যাল বিল করেছেন। অন্তত গত দেড় বছর ধরে আমি এই একই ব্যাপার দেখে আসছি। হয় ওর স্ত্রী, না হয় ওর ছেলে কি মেয়ে, কি বাবা বা মা, কি নিজে—কারুর না কারুর রোগ লেগেই আছে।

কোয়াইট ন্যাচারাল। মানুষ যখন, রোগ তো তখন হবেই পারে। আর সরকারী আইন যখন আছে তখন নিশ্চয়ই

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট ; ২ লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
৫৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

আর দশজনের মতো উনিও সেই কোর্সালাটি পাবেন। কিন্তু কোর্সালিটি এক জিনিস আর কোর্সালিটি আদায়ের নামে জোচ্চুরী—সে কি এক কথা?

তবে শুনুন—হ্যাঁ আপনারা শুনুন. উনি যে সব প্রেসক্রিপশন, ওষুধের ক্যাশমেমো আর ডাক্তারের বিল জমা দিয়েছেন তার থেকেই আমি আবিষ্কার করেছি যে. উনি ডাক্তার দেখান টালিগঞ্জে, ওষুধ কেনেন ভবানীপুরের দোকান থেকে আর ইন্জেকশন নিতে যান হাওড়ায়। এতো আর আমার বানানো কথা নয়—ওর নিজের সাবমিট করা বিলের সঙ্গে গাঁথা প্রেসক্রিপশন আর ক্যাশমেমোই সাক্ষী দেবে আমার কথা ঠিক কি না?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম. জবাবে উনি বলেছিলেন—বিল আপনাকে পাস করতেই হবে। আমি বলেছিলাম—নেভার, আপনাকে শো কজ করতে হবে। এই নিয়ে ওর সঙ্গে আমার ঘরের ভেতর কথা কাটাকাটি হয়। উনি আপনাদের কাছে গিয়ে বলেছেন যে আমি না কি ওনাকে যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করেছি—ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছি। হ্যাঁ আমি অপমান করেছি। বলেছি আপনি সবাইকে চিট করছেন। সরকারী টাকা মানে সকলের ট্যাক্সের টাকা। আপনি ভুয়ো বিল দেখিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মোটা টাকা আদায় করছেন। ডাক্তারের সঙ্গে কমিশনের ব্যবস্থা, ডিসপেনসারীর সঙ্গেও তাই—মাঝখান থেকে আপনার বা আপনার ফ্যামিলীর কারুর যে সব রোগ হয় নি, তারই দোহাই পেড়ে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে টাকা দুইয়ে নিচ্ছেন। হয়তো বলতে গিয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারি নি, দুচারটা গরম গরম কথাও বলে ফেলেছি। অফিসের অনেকেই শুনেছেন সে সব কথা। আর তারিণীবাবু সে কথাগুলোই আপনাদের কাছে বলেছেন। আমি আপনাদের ইউনিয়নের মেম্বার নই, তাই আপনারা আমার কোন কথা শোনেন নি বা শুনতে চান নি। গত তিন দিন ধরে আমার ঘরের সামনে সমানে গণ-অবস্থান চালাচ্ছেন, শ্লোগান দিচ্ছেন। পোস্টারে পোস্টারে অফিসের সব কটা দেয়াল ভরে গেছে। ডিরেক্টর সাহেব সকলের সামনে সেদিন আমায় ট্যাক্টলেস বলে গালাগাল দিলেন। তাই ঠিক করেছি আর নয়—চেয়ার-বসা চাকরী আমার পোষাবে না। এর চেয়ে মাঠঘাট ভাল। সেখানে খনির অন্ধকারে ডুবে থাকব, সেও ভালো, তবু আর কলকাতায় নয়।

তাই শুধু একটি রিকোয়েস্ট করব মিহিরবাবু—শেষবারের মতো আমার স্টেনোকে অ্যালাও করুন আমার এই চিঠিটা টাইপ করে দিতে। না আপনাদের কারুর বিরুদ্ধে কোন গোপন ষড়যন্ত্রের রিপোর্ট নয়, এটা আমার বদলির আর্জি। বিশ্বাস না হয়, পড়েই দেখুন। তারপর ডিসিশন নিন। কারণ আর সহ্য হচ্ছে না। তিনদিন ধরে আমার নামে যা সব পোস্টার পড়েছে, মিটিংয়ে যে শ্লোগান আপনারা দিয়েছেন তাতে আমার সব বিশ্বাসের ভিত গেছে নড়ে। তাই এবার পালাতে চাই। আমি তো শুধু একজন ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার নই, আপনাদের মতো আমারও তো ঘরে বাবা, মা, স্ত্রী আছে। এত ধকল কেন পোহাবে বলুন। তারিণীবাবুরা যা করছেন করুন, আর বাধা দেব না। মিহিরবাবু, প্লীজ আমার স্টেনোকে একবার অ্যালাউ করুন। সুব্রামনিয়াম সাহেব আমায় কথা দিয়েছেন, আর্জি পেলেই বদলি করে দেবেন।

ঘূর্ণি ফলের মতো বোঁ বোঁ করে পেপার ওয়েটটা কাচের টেবিলের ওপর ঘুরতে ঘুরতে হাতে লেখা অ্যাপ্লিকেশনখানার ওপর ঠক্ করে গেঁথে গেল। আর তখনি খেয়াল হোল অনাদির—আবোল-তাবোল কি সব ভেবেছে এতক্ষণ। কেউ আসবে না। তার চেয়ে নিজের বদলির পিটিশনখানা নিজেই বরং টাইপ করে নিক। চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে কাগজটা নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বাইরে মুষলধারে শ্লোগানের বর্ষণ চলছে। ভেতরে একা একা চোরের মত দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে ট্যাক্টলেস অনাদি রায়।

—সন্দীপন

মনের কথা

অসিত সেনের বিচ্ছিন্নতা শীতল ও ব্যর্থ জীবন

—মনে হয় সব কিছু যেন উল্টো দেখছি; ক্রেনম্যাটারটা যেন ঘুরে গেছে। ল্যাবরেটরী আর ঘর, ঘর আর ল্যাবরেটরী, এই করে এতদিন কাটিয়েছি। বয়স প্রায় চল্লিশ। এখন মনে হচ্ছে আর বোধ হয় পুরনো জীবনের জের টেনে চলা সম্ভব নয়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, ঘরের টান যে করেই হোক ছাড়তে হবে। কিন্তু এ সব ভাবতে গেলেই ভয় হয়। মনে হয় বাইরে গেলে হারিয়ে যাব, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাব। কিম্বা সব কিছু উল্টো দেখব, আয়নায় যেমন দেখি। আমার ছোট ঘরটার বাইরের পৃথিবী আমার কাছে অচেনা, অন্য জগৎ। সেখানে সবাই যেন মাথায় ভর দিয়ে পা উঁচু করে চলে। সবাই যেন অজানা ভাষায় কথা বলে। বাস থেকে নেমে হেঁটে যখন ঘরের পথে চলি, তখনই শুধু মনে হয় সব সোজা আর ঠিক আছে। অন্য সময় মনে হয় আমি বিদেশে। ল্যাবরেটরীতে যারা আমার সহকর্মী তাদেরও মাঝে মাঝে চিনতে কষ্ট হয়; বদলি হয়ে নতুন কোনো সহকর্মী এলে, বেশ কয়েক মাস কেটে যায় তার সঙ্গে পরিচিত হতে। ওরা সকলে আমার অসুবিধার কথা জানে, ওরা আমাকে অস্বাভাবিক মনে করে, হয়ত একটু অনুকম্পা করে। এতদিন তাই কোনো মতে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু আর চলছে না। আমার একটা প্রোমোশন হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বদলির নির্দেশ। না, বাইরে কোথাও নয়। এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে; এক ঘর থেকে অন্য ঘরে। সেখানেও প্রায় সকলেই আমার মুখ চেনা, তবু আমি ভয় পাচ্ছি। এক মাসের ছুটি নিয়ে বদলির অর্ডার রদ করবার জন্যে চেষ্টা করছি। বদলি হয়তো রদ করা যাবে, কিন্তু তাতেও আমার ভয় কাটবে বলে মনে হচ্ছে না। ভয়টা কি? চিনতে না পারার ভয়, ভুল যাবার ভয়, হারিয়ে যাবার ভয়। বিশেষ করে এই উল্টো দেখার ভয়। এই আজই মাইনে আনতে পুরনো কাজের জায়গায় গিয়েছিলাম, গিয়ে ঘরটা একেবারে নতুন মনে হল। ল্যাবরেটরী টেবিল যে জায়গায় ছিল, সে জায়গায় নেই। বীকার, ফ্লাস্ক, টেস্টটিউব সব উল্টো করে সাজানো, রী-এজেন্ট কেমিক্যালসের বোতলগুলো অন্য ভাবে গোছানো। আমার বেয়ারা কিন্তু মানতে চাইলো না আমার কথা। বলল, যে রকম ছিল সেই-রকমই আছে। শুনে আমি খুব ভয় পেয়েছি। সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি। মনে আছে বোধ হয়, প্রায় দশ বছর আগে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি একটা প্রেসক্রিপসন দিয়ে পরের সপ্তাহে দেখা করতে বলেছিলেন। আজ আসি, কাল আসি করে আর আসা হয়ে ওঠেনি। আপনি বলেছিলেন পুরনো কথা ভুলে যেতে। আমি চেষ্টা করে পুরনো কথা ভুলতে পারিনি। আপনি বলেছিলেন বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে। আমি বাড়ী ছাড়া কেন, আমার নিজের ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে থাকার ব্যবস্থাও করতে পারিনি। যত চেষ্টা করেছি, তত গোলমাল বেড়েছে। আপনাকে কয়েকবার ফোন করেছিলাম। আপনি দেখা করতে বলেছিলেন। পুরনো কথা ভুলতে পারছি না; পুরনো ঘর ছাড়তে পারছি না; তাই আর দেখা করতেও আসিনি। আপনার প্রেসক্রিপসন মতো করতে না পারলে, আপনার সঙ্গে দেখা করে আর কি লাভ? আপনার ব্যবস্থামত ওষুধ মাঝে মাঝে খেয়েছি, কিন্তু কোনো লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না।

রোগী অসিত সেন, বয়স ৪০, অবিবাহিত। চার ভায়ের মধ্যে অসিত সবচেয়ে ছোট। কেমিস্ট্রির এম, এস, সি; একটা আধাসরকারী সংস্থার কেমিস্ট। চাকরী করছে প্রায় চোদ্দ বছর। সহর-তলীতে ভায়েদের সঙ্গে থাকে। বড় ভাইও বিয়ে করেননি, অসিতের থেকে পনেরো বছরের বড়। মাঝের দুই ভাই বিবাহিত। বড়দা ছাড়া আর সকলেই চাকরী করে। দেশে কিছু জমিজমা আছে, বড়দা তারই তদারকি করেন। দুবার মেন্টাল হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। গত কয়েক বছর বড়দা স্থানীয় একটা আশ্রমের সাধারণের কর্মী হয়েছেন। বাড়ীতে বড় একটা আসেন না, জমিজমাও দেখাশোনার সময় পান না। অসিত যখন স্কুলে পড়ে তখন বড়দা প্রথম পাগল হন, দ্বিতীয়বার তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয় যখন, তখন অসিত এম, এস, সি পাশ করে চাকরী খুঁজছে। অন্য দুই ভাই সুস্থ। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব তাঁরাই পালন করেন। মেজভাই নিঃসন্তান, সেজভাই দুটি সন্তানের পিতা। মেজবৌদির ওপরই সংসারের ভার। ঝক্কি ঝামেলা সব তাঁকেই পোহাতে হয়। এই হল মোটামুটি অসিতবাবুর ফ্যামিলি হিস্ট্রি।

অসিতের যখন দশ বছর, তখন মা মারা যান। মেজবৌদি নতুন এ বাড়ীতে এসেছেন। আঠারো বছরের মেয়ে দশ বছরের ছেলেটির অভিভাবক হয়ে বসেন; অসিতও নিজের ভার বৌদির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। মা ঠিক মায়ের মত ছিলেন না, বোধ হয় মাথার গোলমাল ছিল তাই ছেলেদের নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতেন না। অসিতের বাবা পাড়ার হরিসভার মাতব্বর ছিলেন। বাইরে বাইরেই থাকতেন। স্ত্রীবিয়োগের বছর দুয়েকের মধ্যে তিনিও গতায়ু হন। সেই সময় থেকে বৌদি শুধু অসিতের নয়, বাড়ীর সবারই অভিভাবক বনে যান। অসিত কি খাবে, কি পরবে, কখন শোবে, কখন ঘুমুবে, এ সবেরই রুটিন করে দিতেন বৌদি আর সেই রুটিন নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতো অসিত। এ নিয়ে আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে হাসিঠাট্টা করে যে সব মন্তব্য পাশ করতেন, তা কানে গেলে অসিত লজ্জিত হয়ে পড়তো। বাড়ী ছেড়ে বোর্ডিং-এ গিয়ে থাকার সংকল্প করতো, কিন্তু সংকল্প কাজে পরিণত করার চেষ্টা কোনোদিন করতো না। কলেজে পড়বার সময় নিজের অসহায়তার কথা অসিত বুঝতে পারে। বুঝতে পারে তার কোনোরকম স্বাধীন চিন্তা বা পছন্দ মত নেই। বৌদি তাকে

প্রাণ করেছেন। কলেজ আর ঘর, ঘর আর কলেজ ছাড়া। সে কোথাও যেত না, সভাসমিতি, খেলার মাঠ, থিয়েটার সিনেমা —কোনোদিকে তার আকর্ষণ ছিল না। সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতো না। তবে তার সুন্দর চেহারা আর শান্ত স্বভাবের জন্যে অনেকেই তাকে ভালবাসতো। পড়াশুনায় ভাল হবার জন্যে আর মার্জিতরুচি ব্যবহারের জন্যে অধ্যাপকদেরও প্রিয় পাত্র ছিল। পড়ার বই আর ধর্মপুস্তক—এর একদিকে, আর বৌদি অন্যদিকে, এই নিয়েই তার পৃথিবী। এখনও এর বাইরে কোথাও গেলে তার দম বন্ধ হয়ে আসতো, ভয় করতো। কতক্ষণে কাজ সেরে নিজের ঘরের তক্তপোষে এসে গা এলিয়ে দেবে—এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠতো। বৌদি ছাড়া বাড়ীর অন্য কারুর ওপর তার আকর্ষণ ছিল না। বড়দাকে শ্রদ্ধা করতো, মেজদা সেজদাকে নিয়ে মাথাই ঘামাতো না। বড়দা প্রায়ই বাড়ী থাকতেন না, তাঁর সঙ্গে তাই দেখা হত না। মেজদা সেজদা ভোরে উঠে কারখানায় বেরিয়ে যেতেন, অনেক রাত্রে ওভারটাইম সেরে বাড়ী ফিরতেন, তাঁদের সঙ্গেও ছুটি-ছাটার দিন ছাড়া বড় একটা দেখা হত না। দেখা হলেও কথা হত খুব কমই : কেননা দাদাদের সঙ্গে অসিতের চিন্তাভাবনার কোনো মিল ছিল না।

বয়ঃসন্ধিকাল থেকে বৌদিকে নিয়ে অসিত অনেক আকাশকুসুম রচনা করেছে। নদীর ধারে ছোট্ট একটা বাড়ী, সেখানে শুধু অসিত আর বৌদি। উত্তর মেরু অভিযানে চলেছে অসিত, এস্কিমোর দেশে তাঁবু ফেলেছে, তাঁবুতে আগুন জেলে টিনের খাবার গরম করছে বৌদি। জাহাজে চড়ে নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছে, সঙ্গে আছে একজন মাত্র সাথী। সেই সাথী আর কেউ নয় বৌদি। আর একটু বড় হলে সে বুঝতে পেরেছে বৌদির চিন্তা তার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট। বৌদি ছাড়া তার জীবন অচল, অসম্ভব। বোধের সঙ্গে সঙ্গে বৌদির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার আকুল বাসনা জেগেছে। বাঁধন কেটে বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছে মাঝে মাঝে এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে সে খেতে পারেনি, পড়তে পারেনি, ঘুমতে পারেনি। কেবল শুয়ে শুয়ে ভেবেছে যে কী করে বাঁধন কাটবে, কী করে পালাবে। বৌদিকে অস্বীকার করতে চেয়েছে, অমান্য করতে চেয়েছে, অবাধ্য হতে চেয়েছে; কিন্তু পারেনি। বড়দার আশ্রমের স্বামীজির কাছে গিয়ে নিজের অস্থিরতার কথা বলেছে, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন কঠোর ব্রহ্মচর্য ও যোগাভ্যাস। কয়েকদিন কৃচ্ছ্রসাধন করে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। স্বামীজি তখন ভক্তিযোগ পড়তে বলেছেন আর মন্ত্র জপ করতে বলেছেন। এম. এস. সি পরীক্ষায় পাশ করে ঠিক করেছিল, বিদেশে চলে যাবে চাকরী নিয়ে। সেই মত দু' একটা চাকরীর জন্যে দরখাস্তও করেছিল। এই সময় বড়দার দ্বিতীয়বার অসুখ করে; তাঁকে মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠাতে হয়। অসিতের মনে ভয় ঢুকলো যে তারও ঐ অসুখ হবে। বাইরে চাকরী করতে যাওয়া সমীচীন হবে না, নিজেই ঠিক করলো। মাথার অসুখ হলে, কে তাকে বিদেশে বিভূঁয়ে দেখবে শুনবে? কে তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করবে। হায়দ্রাবাদে একটা অফার পেয়েও সে এ্যাকসেপ্ট করতে পারল না। মাথার যন্ত্রণা ও নানান রোগের কিছু উপসর্গ তার মধ্যেও দেখা দিল। পাড়ার এক পরিচিত ডাক্তারকে ধরে একজন স্পেশালিস্টের কাছে যায়। তিনি ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা দিলেন ও সাইকো-এ্যানালিসিস্ করাতে বললেন। অনিয়মিত-ভাবে কিছুদিন ওষুধ খেয়ে চিকিৎসাপর্ব শেষ করে অসিত। সাইকোলজির দু' এক খানা বই পড়ে বুঝতে পারে তার অসুখ দুরারোগ্য। কাজেই চিকিৎসা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। এর পর চাকরী হয়, অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। দাদাও হাসপাতাল থেকে ফিরে আশ্রমের কাজে মেতে ওঠেন। অসিত নিজের অসুখ নিয়ে আরো কিছু পড়াশুনো করে। বন্ধু ডাক্তার ও মনস্তত্ত্বের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসে যে তার সংসারে আসক্তি নেই, সে এ্যালিয়েনেটেড। বৌদির প্রতি তার আকর্ষণটা অস্বাভাবিক হলেও, এর একটা ইতিবাচক দিকও আছে। এই আকর্ষণ তার জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সূত্র। এ সূত্র ছিন্ন করা মানে পুরোপুরি জীবনবিমুখ হওয়া।

প্রাচীন বটবৃক্ষ।। পানিহাটি

দশ বছর আগেকার ডায়েরী খুঁজে অসিতের ইতিহাস বের করলাম। তখন যেমন ছিল, এখনও প্রায় তেমনি আছে। উপসর্গের মধ্যে কিছু কিছু বেড়েছে, কিছু আবার কমেছে। উল্টো দেখাটা একেবারে হালের উপসর্গ। তাদের পারিবারিক অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। মেজদা অন্য জায়গায় বাড়ী করেছেন, দাদা পুরো-পুরি আশ্রমবাসী; সেজদা বছরখানেক আগে মারা গেছেন। বউদি ও আত্মীয়-স্বজন অসিতের বিয়ের জন্যে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও বিয়ে ঘটাতে পারেননি। অসিতেরও বিয়ে করে বউদির বাঁধন কাটাবার আন্তরিক আগ্রহ হয়েছে; কিন্তু পাত্রীপক্ষের কাছে বেনামী চিঠি যাবার ফলে কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়ে শেষ

ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ও পুরুষত্ব হীনতার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

Vacuum massage ২৲ টাকা 'ভাইটোবাম' সেবন ১ কৌটা ৩৲ টাকা, মোট ৫৲ টাকা ১ মাসে সুফল নিশ্চিত। সময়—দুপুর ১২টা হতে বিকাল ২টা। ২৪ টাকা M. O. পাঠালে ১ মাসের ঔষধ ও যন্ত্র পাঠাই।

কনসালটেন্ট—ডাঃ এস. বসাক, M.B.I.M.S., A.M.M.C (EX)

৫বি, জগদীশনাথ রায় লেন, [illegible], বেথুন কলেজের উত্তর, কলিকাতা-৬।

পর্যন্ত সম্বন্ধ ছেড়ে গেছে। বউদি আশ্রমবাসী হতে চান। কিন্তু তার আগে ওকে কারুর হাতে সঁপে দেওয়া দরকার। এখনও অসিত নিজের মত অসহায়। ওকে একলা ফেলে আশ্রমে যেতে তাঁর মন সরছে না। অসিত বিদেশে বদলী হলে বউদির দায়িত্ব অনেকটা কমে যায়। তাই বিদেশে ট্রান্সফারের চেষ্টা অসিত দু' একবার করেছে, কিন্তু ট্রান্সফারের সম্ভাবনা দেখা দিলেই সংকল্প বদলে ফেলেছে। এইবার এ ঘর থেকে ও ঘরে বদলী হবে বুঝতে পেরেছে অন্য কোথাও চাকরী আর সম্ভব নয়। যেখানে যেভাবে আছে ঠিক সেইভাবেই থাকতে হবে। বিন্দুমাত্র নড়চড় হলেই সর্বনাশ। অন্য কোথাও যাবার চিন্তাতেই চোখে অন্ধকার দেখছে অসিত। হারিয়ে যাবার ভয়ে, ভুলে যাবার ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। ল্যাবরেটরীর নির্দিষ্ট টুলটি আর বোর্ডার ঘরের উত্তর-দক্ষিণে পাতা তক্তপোষটির মধ্যেই তার জীবন। এর বাইরে যাবার, এই গণ্ডী ছেড়ে মুক্তি পাবার উপায় তার নেই। বউদির আশ্রম তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, অধ্যাত্ম বহির্মুখীন জীবনকে সে ভয় পায়, অন্তর্মুখীন কোনো আত্মবিশ্লেষণী চিন্তাও সে করে না আবার বাইরের ঘটনাবহুল জীবনও তাকে টানে না। আজ কয়েক বছর বউদির চিন্তা থেকেও সে দূরে। শুধু দুবেলা খাবার সময় বউদির সঙ্গে দেখা হয়। বউদি তার পূজা-আহ্নিক নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত। আর সে ব্যস্ত থাকে তার খাটের উপর শুয়ে ঘর-সংসার ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ার অবাস্তব অভিযান কল্পনা নিয়ে। এই অভিযানে সে একেবারে নিঃসঙ্গ। বউদি আর তার সাথী নয়। এইভাবে দশ বছর ধরে সে নিজেকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রেখেছে। জীবন ছাড়েনি, জীবনে প্রবেশও করেনি। নিতান্ত অভ্যাসিক কতগুলো জৈব প্রক্রিয়া ছাড়া তার মধ্যে জীবনের আর কোনো লক্ষণ নেই। কাজের জায়গায় মামুলি কতকগুলো এনালিসিস প্রভৃতি করে যায়। একই কাজের পুনরাবৃত্তি। নতুনত্ব দেখা দিলেই সে অস্থির হয়ে ওঠে। কাজগুলো ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্টরাই করেন; অসিত শুধু দিনান্তে ফর্মগুলোর তলায় নাম সই করে একবার, আর মাসান্তে মাইনের খাতায় সই করে একবার। বর্তমানে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেওয়াতে মস্তিষ্ক অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠে আবার প্যারাফ্রেনিক্যাল অবস্থায় পৌঁছেছে। তাই বোধহয় সব উল্টো দেখছে।

অসিতের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তার বাবা-মা কেউই ঠিক সুস্থ ছিলেন না। শৈশবে নিরাপত্তা ও স্নেহ পেয়েছে একমাত্র বৌদির কাছ থেকে। মস্তিষ্কের টাইপ অতি দুর্বল, দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য। নিজেকে অতি অল্প কয়েকটি কাজের সঙ্গে জড়িয়ে রাখার মধ্যেই তার নিরাপত্তা। বাইরের আকর্ষণ এই ধরনের লোকেরা সাধারণত বোধ করে কম। বাড়ীতে ধর্ম ছাড়া সংস্কৃতি সংক্রান্ত অন্য কোনো আকর্ষণের ব্যবস্থা বা পরিবেশ ছিল না। বৃহত্তর, মহত্তর দূরের কথা, অন্যতর কোনো জীবনের আভাসও গৃহপরিমণ্ডলে ছিল না। আগেই বলেছি নিজের দুর্বলতার জন্যে অসিত সহপাঠীদের সঙ্গেও মিশেছে খুবই কম। কাজেই তাদের জীবনের বিবিধ প্রসঙ্গ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ও ছিল অজ্ঞ। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই ওর জীবন, বাইরের অন্য সব দুর্বোধ্য। পরবর্তী জীবনে ল্যাবরেটরীর গুটি কয়েক টেস্ট ও ঘর-এর মধ্যেই তার নিরাপদ চিন্তাভাবনা সীমিত। বউদির প্রতি আকর্ষণ জীবনের বড় আশীর্বাদ ছিল শৈশবে। বয়ঃসন্ধিকালে ও পরবর্তী জীবনে এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুর আভাস পেয়ে অসিত আতঙ্কিত হয়েছে। আকর্ষণ অভিশাপ মনে হয়েছে। একজন মনস্তত্ত্বের অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে এই অস্বাভাবিক-এর কথা তার মনে হয়েছে। নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও প্রবণতাকে মস্তিষ্কের নির্দেশে নানা প্রক্রিয়ায় বাধায় নিরুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। এইভাবে প্রথম পরিবার থেকে (বউদি একমাত্র পরিজন) বিচ্ছিন্ন বোধ করেছে, তারপর সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, শেষপর্যন্ত নিজের প্রকোষ্ঠ ও অনুভূতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষীণ সূত্র বৌদি। তাঁর প্রতিও যদি স্বাভাবিক সুস্থ মানসিকতা গড়ে উঠতো, তাহলে হয়তো জীবনবিকৃতি চরমে উঠতো না। অর্ধমৃত অবস্থায় জীবন কাটাতে হতো না। স্বল্পশক্তি নিয়েই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেত। জীবন শীতল ও ব্যর্থ হয়ে যেত না। অথবা যদি যৌবনে কোনো বিশেষ আদর্শ গ্রহণ করতে পারতো, তাহলেও হয়তো আরো বিস্তৃত গভীরভাবে জীবনকে উপভোগ করতে পারতো।

—মনোবিদ

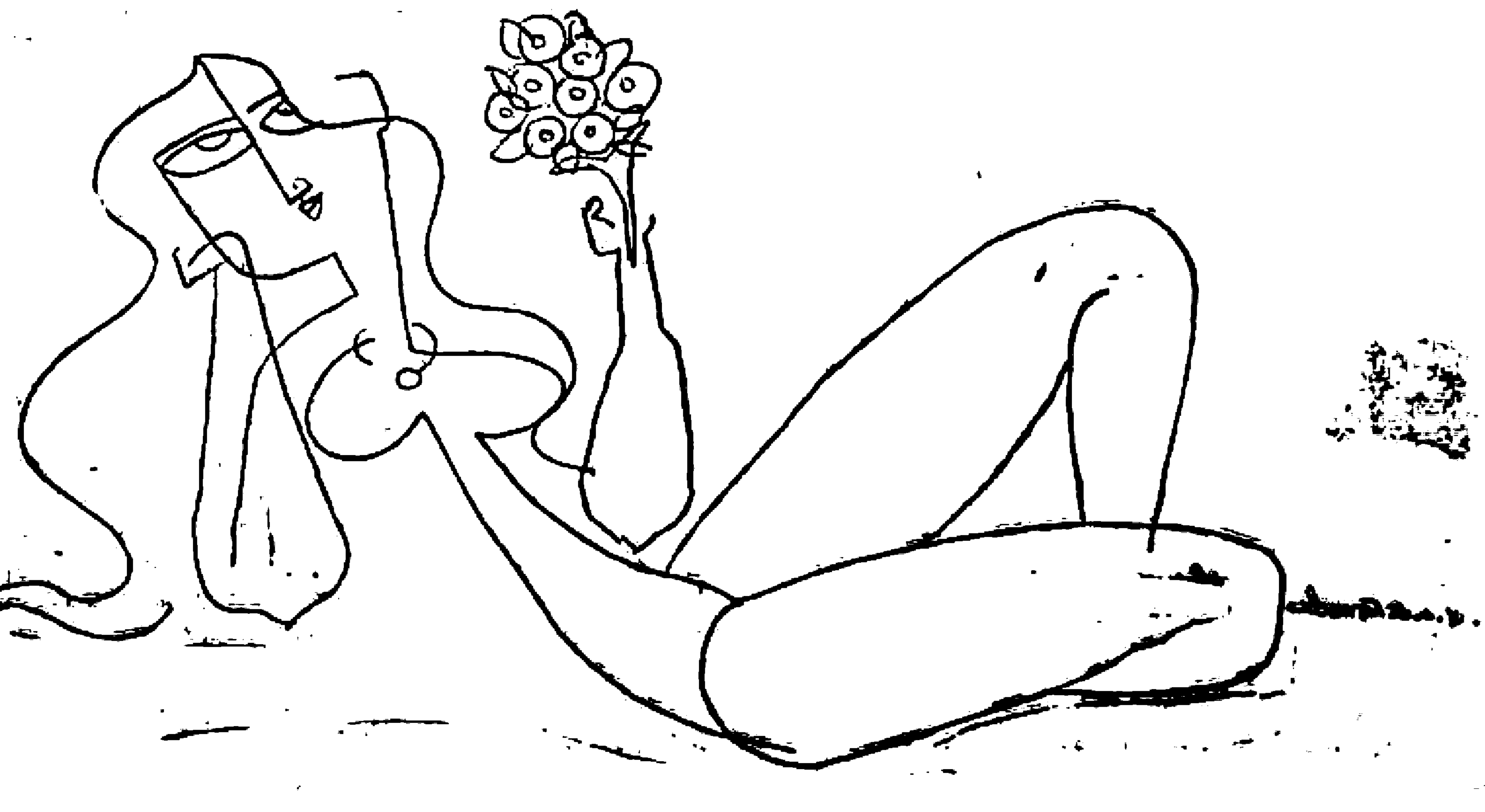

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানের কথা

ভাসমান মহাদেশ

আধ ডজন টুকরো টুকরো ভূখণ্ড নিয়ে আমাদের এই পৃথিবীর স্থলভাগ। এক-একটি ভূখণ্ড এক-একটি মহাদেশ। কয়েক কোটি বর্গ মাইল আয়তনের এক-একটি মহাদেশ এখন পরস্পর থেকে অনেক দূরে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, অতীতে কোনো একসময়ে এই মহাদেশগুলো নাকি এমন ছড়ানো ছিটানো ছিল না। মূল একটিমাত্র ভূখণ্ড ভেঙেচুরে এই মহাদেশগুলোর সৃষ্টি। মহাদেশগুলোর তটরেখা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে এখনো ধারণা হতে পারে একটির সঙ্গে অপরটিকে ক্রমান্বয়ে জোড়া লাগানো অসম্ভব নয়।

ভেলার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এক-একটি মহাদেশ যেন প্রকাণ্ড এক-একটি ভেলা, গভীর সমুদ্রতলে ভেসে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, ভেসে বেড়াচ্ছে, যদিও খুবই সামান্য মাত্রায়, বছরে কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র।

যার যতো সামান্য মাত্রাতেই হোক, মহাদেশগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে বলেই কোথাও কোথাও দুই মহাদেশের ব্যবধান কমছে, আবার ঠিক একই কারণে কোথাও কোথাও বাড়ছে। ব্যবধান কমছে, জাপান ও ক্যালিফোর্নিয়ার, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার। কতখানি? বছরে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার। এই ব্যবধান যতো কমছে প্রশান্ত মহাসাগর ততো ছোট হচ্ছে। ব্যবধান কমতে কমতে শেষকালে এমন দিন আসবে যখন প্রশান্ত মহাসাগরের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তেমনি ব্যবধান বাড়ছে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার। ফলে আরো বড়ো হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর।

মহাদেশগুলো যে ভেসে বেড়াচ্ছে এ-নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু সেই আদি ভূখণ্ডটি ভেঙে টুকরো টুকরো হল কি করে, কেমন চেহারা ছিল সেই আদি ভূখণ্ড ও আদি সমুদ্রের, এসব প্রশ্নে বিজ্ঞানীরা এখনো একমত হতে পারেননি। তবে আদিতে একটিমাত্র ভূখণ্ড ছিল, কোনো কারণে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে এবং টুকরোগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে—এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা একমত। আমাদের কাছে এই খবরটুকুই কি কম কৌতূহলকর!

সেই অখণ্ড জগৎটি একবার কল্পনা করার চেষ্টা করা যাক। অখণ্ড একটিমাত্র ভূখণ্ড, অতএব পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আন-টার্কটিকা বা কুমেরুদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ফ্লোরিডা হয়ে কানাডার পশ্চিম উপকূলে ভ্যাঙ্কুভার-এ পৌঁছতে কোনো বাধা নেই। ইউরোপ আর কানাডা পাশে পা লাগিয়ে রয়েছে। ব্রিটেনের পাশেই ল্যাব্রাডর, স্পেনের পাশেই নিউ-ফাউন্ডল্যান্ড। সাহারা গিয়ে ঢুকেছে ফ্লোরিডায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবস্থা ভেনিজুয়েলা ও সিয়েরা লিয়নের মধ্যে একটা গোঁজের মতো। ব্রাজিলের দুয়ার খুললেই নাইজেরিয়া এবং বুয়েনস এয়ারেস থেকে হাঁক দিলে কেপটাউন থেকে সাড়া পাওয়া যায়। আনটার্কটিকা অস্ট্রেলিয়াকে স্পর্শ করে আছে পার্থ-এ, দক্ষিণ আফ্রিকাকে ডারবান-এ, দক্ষিণ আমেরিকাকে কেপ হর্ন-এ। কেনিয়ার পাশের শহর বোম্বাই, কলকাতার ডারউইন। নিউগিনী অস্ট্রেলিয়ারই অংশ।

এই ছিল আদি ভূখণ্ড। আর মহাসাগরও ছিল একটি প্রশান্ত, এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ বড়ো। সেই আদি ভূখণ্ডের যে অংশটি এখনকার এশিয়া সেটি সম্ভবত এখনো যথাস্থানেই রয়ে গিয়েছে, ভাসতে ভাসতে দূরে সরে গিয়েছে অন্য টুকরোগুলো।

বাচ্চাদের খেলনার টুকরো অংশগুলোকে জোড়া লাগিয়ে আস্ত একটি জিনিস গড়ে তোলার মতো বিশ্বের মানচিত্রে স্থলভাগ বলে বর্ণিত মহাদেশের টুকরোগুলোকে তুলে নিয়ে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করলেও খাপে খাপে মিলে যেতে পারে, বিশেষ করে দক্ষিণদিকের টুকরোগুলো। বিজ্ঞানীরা এই আশ্চর্য মিল লক্ষ করেই গোড়ায় আদি ভূখণ্ডের কল্পনা করেছিলেন।

এখন আর অবশ্য কল্পনা নয়, সাক্ষ্য-প্রমাণ খুবই জোরালো। যেমন, উল্লেখ করা চলে, স্কটল্যান্ডের সঙ্গে কানাডার নিউ স্কটল্যান্ড বা নোভাস্কোটিয়ার মিল চোখে পড়ার মতো। আজ থেকে প্রায় ৩৫ কোটি বছর আগে স্কটল্যান্ড দু-ভাগ হয়ে গিয়েছিল—উত্তরের ভাগ ও দক্ষিণের ভাগ। উত্তরের ভাগটি দক্ষিণ-পশ্চিমে ষাট মাইল সরে গিয়েছিল। ২,৭৫০ মাইল দূরে নোভা স্কোটিয়াতেও চোখে পড়ে একই ধরনের ভাগাভাগি। কিন্তু দুটি মহাদেশ যুক্ত করলে এই বিভাজন আর থাকে না, তখন দুয়ে মিলে এক। সাক্ষ্যপ্রমাণ আরো অজস্র। ব্রাজিলের পাথরের গড়ন বজায় আছে পশ্চিম আফ্রিকায় মহাদেশের সঙ্গে মহাদেশ যুক্ত হলে যেখানে ব্রাজিলের গা ঠেকবার কথা। কেনিয়ার উপকূলে ও বোম্বাইয়ে শুধু যে পাথরের গড়ন এক তাই নয়, উভয় স্থান থেকে পাওয়া গিয়েছে একই ধরনের ফার্ণ-জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদের ফসিল। মহাদেশগুলো যে এক সময়ে অখণ্ড ছিল তার সবচেয়ে নিশ্চিত প্রমাণ আনটার-টিকায় পাওয়া কয়েকটি ফসিল। একটি ফসিল প্রবাল-সদৃশ জীবের (বালি ও রোদ না হলে যা বাঁচে না), যে-ধরনের ফসিল একমাত্র পাওয়া গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায় (৩,৫০০ মাইল দূরে)। অপর একটি ফসিল ফার্ণের, যে ধরনের ফসিল পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকায় (১,৫০০ মাইল দূরে)। আরও পাওয়া গিয়েছে ২৪ ফুট লম্বা ট্রপিকাল গাছ সমেত কয়লার স্তর, যেমনটি পাওয়া গিয়েছে ট্রপিকাল আফ্রিকায় (৫,০০০ মাইল দূরে)।

আদি ভূখণ্ডটি ভাঙল কি করে? অনেকের অনেক রকম ব্যাখ্যা। তবে বেশির ভাগের কাছে গ্রাহ্য ব্যাখ্যাটি এই: পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চল প্রচণ্ড রকমের উত্তপ্ত, সেই উত্তাপ উপরিভাগের দিকে উঠে আসে। মহাদেশগুলো অপেক্ষাকৃত হালকা পাথরে তৈরি—পাঁচ থেকে দশ মাইল পুরু। মহাদেশগুলো ভেসে আছে অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থের ওপরে আর এই অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থটি পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে মোড়কের মতো, ২০ মাইল পুরু। পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উত্তাপ যখন উপরিভাগের দিকে উঠে আসে তখন অপেক্ষাকৃত পাতলা স্তরে ফাটল ধরে যায়। সম্ভবত ১৮ কোটি বছর আগে মূল ভূখণ্ডটিতে (কখনো কখনো বলা হয় 'গোন্ডোয়ানাল্যান্ড') এমনিভাবে ফাটল ধরেছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের পাথরের বয়স থেকেও একটি আন্দাজ করা যায়। এশিয়া মোটামুটি একই জায়গায় আছে, আফ্রিকার অধিকাংশও তাই। প্রথম ভেঙে বেরিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া ও আনটার্কটিকা—ভারত, সৌদি আরব ও আফ্রিকা যেখানে একটি কোণ সৃষ্টি করেছে সেখান থেকে।

তারপরে আফ্রিকা থেকে আলাদা হয়ে ভেসে যায় দক্ষিণ আমেরিকা। ব্রাজিল ও পশ্চিম আফ্রিকা তখনো যুক্ত ছিল। তারপরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেন্দ্রীয় ও উত্তরের অংশ। সৃষ্টি হয় আটলান্টিক মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের বয়স যে অনেক কম—এ তথ্য অনেক আগেই জানা ছিল।

সমুদ্রতলের পর্বতমালার শ্রেণীবিন্যাস

থেকেও বিভিন্ন মহাদেশের এক সময়ের অখণ্ডতার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

উত্তর ভিয়েতনামে বিজ্ঞান

বিজ্ঞান কর্মীদের বিশ্ব ফেডারেশন সম্প্রতি একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন উত্তর ভিয়েতনামে, সেখানকার বিজ্ঞান সম্পর্কে খবরাখবর নিতে। এই প্রতিনিধি-দলে ছিলেন দুজন ইংরেজ অধ্যাপক, স্টিভেন রোজ ও হিলারি রোজ। 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার ২১শে জানুয়ারী সংখ্যায় তাঁরা 'উত্তর ভিয়েতনামে বিজ্ঞান' শিরোনামায় একটি বিবরণ উপস্থিত করেছেন। এই লেখাটির কিছু কিছু অংশের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ নিচে তুলে দিচ্ছি।

শীতের এক সকালে, সাড়ে-সাতটার সময়ে উচ্চতর শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তা কোয়াং বু-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল। 'ভিয়েতনামে দিন শুরু হয় সকাল-সকাল, আমরা পৌঁছবার আগেই তিনি দেড় ঘণ্টা কাজ করে নিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা গণিতে, প্রবণতা ভাষাতত্ত্বে, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারটি তিনি ইংরাজী ভাষাতেই চালিয়ে গেলেন। আমাদের দোভাষী ছিলেন খুবই দক্ষ, পরে তাঁর কাছে শুনেছি চোমস্কি যখন হানয় সফর করছিলেন সে সময়ে চোমস্কির একটি বক্তৃতামালা অনুবাদ করার ভার পড়ে তাঁর ওপরে, কিন্তু তিনি যখন টের পেলেন ভাষাতত্ত্বগত বিশ্লেষণ ভিয়েতনামী ভাষায় অনুবাদ করার সামর্থ্য তাঁর নেই সে-ভার গ্রহণ করলেন বু। অসাধারণ ধীমান এই মানুষটি যখন আমাদের বুঝিয়ে বলছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের লক্ষ্য কী, বর্ণনা দিচ্ছিলেন ভিয়েতনামের বিজ্ঞানকে কোন কোন সমস্যা অতিক্রম করতে হবে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না যে, বু সম্পর্কে দোভাষীর গল্পটি সত্যি।

বু-এর মতে বিজ্ঞানের তিনটি লক্ষ্য, বিজ্ঞানকে হতে হবে 'মৌলিক, আধুনিক এবং ভিয়েতনামী জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।' গণিতের কয়েকটি শাখায় এবং তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যায় শক্তি সম্পর্কে এবং জীববিদ্যায় দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি সচেতন। তিনি স্বীকার করলেন যে, লাইসেঙ্কো ব্যাপারের দরুণ জীববিদ্যায় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ-ই অসুবিধের সম্মুখীন।...

পঁচিশ বছর আগে রিপাবলিকের জন্মের সময় থেকে এবং তারপরে প্রায় অবিরাম যুদ্ধের মধ্যে অত্যন্ত উঁচু মাত্রায় অগ্রাধিকার পেয়েছে সকল স্তরের শিক্ষা। যেহেতু ভিয়েতনামে আকাশ-যুদ্ধ চলেছে আর মার্কিন নীতি হচ্ছে যা-কিছু চোখে দেখা যায়—লক্ষ্যবস্তুর দিক থেকে তা সামরিক হোক, শিল্পগত হোক, কৃষিগত হোক, স্বাস্থ্যগত হোক বা শিক্ষাগত হোক সবের ওপরেই বোমা ফেলা; এ-অবস্থায় সামান্য সংস্থানকে দালান নির্মাণে নিয়োগ করাটা সময়ের অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়, কেননা দালান ওঠা মানেই মার্কিন বোমা-বর্ষণে ধুলোয় মিশে যাওয়া। তার বদলে লক্ষ্যীর ক্ষেত্র হোক জনগণ। বোমাবর্ষণের ধ্বংসকার্য যে কত ব্যাপক তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। সামান্য একটা পুল, একটা বাঁধ, গ্রামের একটা স্কুল, জেলার একটা হাসপাতাল, কারখানার পাশের গির্জা, কামারের কারখানা—সবকিছুর ওপরেই নির্বিচার বোমাবর্ষণ।

তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনীতির এই দেশটিতে জনসংখ্যা প্রায় দু-কোটি, এখানে জনগণে লগ্নী করার অর্থ হচ্ছে শিক্ষা। নিরক্ষরতা প্রায় দূর হয়েছে বলা চলে। সকল শিশু অন্ততপক্ষে চার বছরের জন্যে স্কুলের লেখাপড়া শেখে। হানয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ও পাঁচটি বিশেষ টেকনিক্যাল কলেজে পাঠরত ছাত্রের সংখ্যা ৭২,০০০ ফরাসী ঔপনিবেশিক কালে সমগ্র ইন্দো-চীনে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরের ছাত্র ছিল মাত্র ৭০০। অগ্রগতি হয়েছে খুবই দ্রুত মাত্র পাঁচ বছর আগেও, আকাশ-যুদ্ধ শুরু হবার সময়ে, ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৫,০০০। এতখানি দ্রুত প্রসারের অর্থ, দশ বছরের স্কুলের লেখাপড়া যারা শেষ করেছিল তাদের ১০ শতাংশই উচ্চতর শিক্ষায় এসেছে। এখন আসছে ৩০ শতাংশ। যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ-তরুণী হাতে আসার পরে এখন শিক্ষানীতির বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে উচ্চশিক্ষার মান অর্জনের সমস্যা: এ-অবস্থায় ছাত্রের সংখ্যা কয়েক বছর একই থাকবে।

এখন বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা—ছাত্রদের মান উন্নত করার জন্যে শিক্ষকদের মান উন্নত করা। কিভাবে? যে কটি বিভাগ আমরা দেখলাম সেখানে শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যাগত অনুপাত খুবই কমের দিকে—যেমন, জীবরসায়নে পাঁচজন ছাত্রে একজন শিক্ষক, মাইক্রোবায়োলজিতে তিনজন ছাত্রে একজন শিক্ষক। ফলে শিক্ষকদের এক-তৃতীয়াংশকে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে বিদেশে পাঠানো যাচ্ছে। মন্ত্রী বু-এর মুখের কথা এই বিভাগগুলোতে বাস্তবে রূপায়িত। জীবরসায়নবিদরা গবেষণা করবেন স্থানীয় মাছের অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠন নিয়ে দেশের মানুষের খাদ্যগত প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে। কিংবা সাবেকী বনৌষধি থেকে চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি করবেন।

শিক্ষার কর্মসূচীটি বিরাট অথচ দেশের অর্থনীতি এখনো বিকাশমান—এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটানো হয় কি করে? অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক, অধিকাংশ কলকারখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত, যুদ্ধের প্রয়োজনেই গড়ে তুলতে হয় ছোট ছোট ছড়ানো-ছিটোনো কারখানা, এ-অবস্থায় ধাতুবিদ্যা বা ইলেকট্রনিকস-এর একজন স্নাতকের কাজে নিযুক্ত হবার সম্ভাবনা কতখানি? এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা হয় ছাত্রদের সুসংহত রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে, যেখানে খুব বেশি রকমের জোর দেওয়া হয় জনগণের সেবার ওপরে। তবুও সমস্যাটি সহজ নয়, ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েটদের তাই সমস্ত রকমের কাজের জন্যেই প্রস্তুত থাকতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও জাঁকজমকের চিহ্ন নেই, সবচেয়ে কমের দিকে। বাড়তি সংস্থান সমস্তই ব্যয় করা হয় জনগণের জন্যে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান প্রচারের জন্যে একটি সমিতি আছে। সমিতি থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ১,০০,০০০। প্রকাশিত হয় প্রচুর পুস্তিকা (একটির নাম 'রাসায়নিক যুদ্ধের বিপদ থেকে কিভাবে বাঁচা যায়')। সবচেয়ে বেশি তৎপরতা জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে নানা প্রকারের ব্যাধির প্রচণ্ড প্রকোপ, কিন্তু ব্যাপক টীকা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থার ফলে উত্তর ভিয়েতনামে সমস্ত ব্যাধি নিয়ন্ত্রিত।

টীকা তৈরি করা ও প্রতিষেধক সম্পর্কিত গবেষণা করার ভার যে প্রতিষ্ঠানটির ওপরে সেখানে আছেন ১০ জন বিজ্ঞানী। আকাশযুদ্ধের সময়ে গোটা প্রতিষ্ঠানটিকে জঙ্গলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সম্প্রতি হানয়ে ফিরে এসেছে।

ভিয়েতনামের বিজ্ঞানের সামনে পথ স্পষ্ট। তার মানে এই নয় যে, কোনো সমস্যা বা অসুবিধে নেই। বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রশ্নই ওঠে না, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে শুকিয়ে মরতে হয় কিংবা অনটনের মহাসাগরে বৈজ্ঞানিক ঠাটের একটি দ্বীপ সৃষ্টি করা হয় মাত্র। আমরা অনুভব করলাম, প্রয়োজন কি, সমস্যা কি, এ-বিষয়ে ভিয়েতনামীরা নিজেরাই সচেতন।

অ্যাপোলো-১৪

একটি বিস্ফোরণ ঘটার জন্যে অ্যাপোলো-১৩ চাঁদের মাটিতে নামতে পারে নি, পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল। অ্যাপোলো-১৩ চাঁদের উপরিতলের যে নির্দিষ্ট স্থানটিতে নামতে চেয়েছিল তার নাম ফ্রা মরো, চাঁদের উপরিতলের একটি পার্বত্য এলাকা—নভশ্চরদের অবতরণের পক্ষে মোটেই চমৎকার নয়। কিন্তু চাঁদের মাটি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের কাছে এই পার্বত্য এলাকার মাটি ও পাথর খুবই দামী। এই মাটি ও পাথর হাতে পাওয়া গেলে চাঁদের বয়স সম্পর্কে নিখুঁত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে, ভূতত্ত্ব-বিদরা তাই মনে করেন। তাঁদের ধারণা, অ্যাপোলো-১৪ চাঁদের মাটি থেকে এমন নিদর্শন আনবে যা থেকে প্রমাণ করা যাবে চাঁদের বয়সও ৫০০ কোটি বছর, অর্থাৎ সৌরমণ্ডলের বয়সের সমান।

এই লেখা যেদিন প্রকাশিত হবে তার আগেই পাঠকরা জেনে যাবেন অ্যাপোলো-১৪ অভিযান সফল কিনা। যাত্রার শুরুতে কিছুটা গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, নভশ্চররা তা কাটিয়ে উঠেছেন। এবারের বোমযানে সতর্কতামূলক ও নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থা অনেক বেশি। আশা করা চলে অভিযান সফল হবে। ফ্রা মরোর মাটি ও পাথর হাতে পাওয়া ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছে এতদিন স্বপ্ন ছিল। মার্কিন বিজ্ঞানীদের অসাধারণ কৃতিত্বে এই স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে।

—অমৃতকান্ত

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গনা

জীবনসংগ্রামের পথ বেয়ে

একদিন তিনটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওরা নামী প্রসাধনদ্রব্য অফিসে অফিসে ফিরি করে বেড়ায়। মোটামুটি লেখাপড়া জানা সবাই। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারেনি। অথচ এদিকে সংসার চলে না। স্বামী যা রোজগার করেন, তাতে ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তাই চাকরি ওদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। স্বামীকে কিছুটা রিলিফ দেওয়া এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিক স্বচ্ছলতা ছিল ওদের কাম্য। ওরা বুঝতে পেরেছিল যে, খাটুনির চোটে স্বামীর শরীর ভেঙে পড়ছে। যদি একটা শক্ত অসুখ-বিসুখ ধরে বসে। তাই প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু হায়তোস্মি! দরজায় দরজায় ঘুরে ওদের বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। সর্বত্র একই উত্তর, ঠাঁই নাই।

এই বাঁধা গতের উত্তর শুনতে শুনতে ওরা হাঁপিয়ে গিয়েছিল। এবার তাই ঠিক করলো যে-কোন উপায়ে কিছু আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য যদি পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাতেও পেছপা হবে না। হলোও তাই। এমনি সময়ে একটি নতুন কোম্পানী কিছু সেলস গার্ল চেয়ে বিজ্ঞাপন দিল। খবরের কাগজের পাতায়। সেই বিজ্ঞাপন দেখামাত্র ওরা আর দেরি না করে ছুটলো কোম্পানীর মালিকের সঙ্গে দেখা করতে।

চাকরির টার্মস-কন্ডিশন শুনে ওদের তো চক্ষুস্থির। কোম্পানী নতুন। কিছু কিছু প্রসাধনদ্রব্য তৈরি করে বাজারে ছাড়া হবে। কিন্তু প্রসাধনদ্রব্য তৈরি হলেই তো আর বাজার পাওয়া যাবে না। এজন্য এসব জিনিসপত্র নিয়ে এদের নামতে হবে পথে। অফিসে অফিসে ঘুরে সবাইকে ধরে-করে মাল গছাতে হবে। প্রয়োজন হলে বাইরেও যেতে হতে পারে।

মালিকের কথাবার্তা শুনে ওরা একে অপরের দিকে তাকায়। ইতিমধ্যে চাকরি-প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এতদিন অফিসের দরজায় মাথা ঠোকাঠুকি করে ওরা বুঝেছে যে, এই ভিড়ে চাকরি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। কয়েকবার যে এমন না হয়েছে তাও নয়। তাই ওরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে ফেললো চটপট। জানিয়ে দিল, ওরা প্রস্তুত।

মালিক অবশ্য ভরসা দিলেন যে, পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর জন্য কোম্পানী থেকে পয়সা দেওয়া হবে। তবে মাইনে খুব বেশি নয়। সবকিছু নির্ভর করবে মাল কাটানোর ওপর। কমিশনই হলো আসল লাভ। ওরা চাকরি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। দিন-দুয়েকের মধ্যেই মালপত্র ব্যাগে পুরে বেরোতে হবে।

চাকরিতে সম্মতি দিলেও প্রথম প্রথম ওদের কেমন লাগছিল। ইতিপূর্বে অনেক মালিকের নানা দুর্ব্যবহারের কথা ওরা শুনেছিল নানা মুখে। এই মালিক যে তেমন না হবেন তার তো কোন গ্যারান্টি নেই। তাই মুহূর্তে ভয়ে ওরা সিঁটিয়ে গিয়েছিল। চাকরি পাওয়ার সমস্ত আনন্দ যেন কোথায় উবে যাচ্ছিল। কিন্তু এছাড়া পথও তো নেই। অফিসের চাকরি ওদের হবে না। আর সেরকম যদি কিছু আঁচ করতে পারে, তবে সঙ্গে সঙ্গে রিজাইন করে আবার ঘরে ফিরে আসবে এবং নতুন চাকরির প্রতীক্ষা করবে।

একটা ভাবনা যেতে না যেতেই আর একটা ভাবনা এসে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ওরা সবাই গৃহস্থ বধূ। ওরা এবার ঘর ছেড়ে পথে নামবে। চেনাজানা কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে। সবাই কি ভাববে। তাছাড়া যদি বাইরে পাড়ি দিতে হয় মাঝে মাঝে, যেমন মালিক বললেন। তবে তো সংসার গোল্লায় যাবে। ওরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো। এক সমস্যা থেকে আর এক সমস্যা।

এবার ওরা এক এক করে সমস্যার সমাধানে বসলো। এতদিন পর্যন্ত ওরা চেনাজানা সকলের বাড়ির মাটি ক্ষয় করে ফেলেছে। সবাইকে অনুরোধ করেছে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে। সংসারের অবস্থা সবিস্তারে জানিয়েছে। আর যে চলছে না এবং এভাবে চলতে চলতে কোনদিন মুখ থুবড়ে পড়বে আর সারা সংসার অচল হয়ে যাবে, সে-কথাও সবাইকে জানিয়েছে। কোন ফল হয়নি। নিজেরাও চেষ্টা করেছে। তাও সমান নিষ্ফল। তাই ওরা এবার সিদ্ধান্ত নিল যে, ওরা বাঁচ না খেয়ে থাকে কেউ ফিরে তাকাবে না। সুতরাং নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নেওয়াই ভাল। আর নিন্দামন্দ। সে তো সংসারে বাস করতে গেলে শুনতেই হবে। তবে সেসব গায়ে না মাখলেই চলবে।

একথা অবশ্য ঠিক যে, বাইরে বাইরে ঘুরতে হলে সংসার একটু বেকায়দায় পড়বে। এটুকু মানিয়ে নিতে হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই। [illegible] তো আর সবদিক [illegible] না।

এবার ওরা তিনজনে চাকরির সম্বন্ধে ঐকমত্যে এলো। একে অপরের সমস্যার সমাধান করলো এভাবে।

প্রথম প্রথম খুব সংকোচ হতো। মালপত্র নিয়ে ঠিকই বেরোতো। কোন কোন অফিসেও যেতো। কিন্তু বেশি লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারতো না। দু'একজনের সঙ্গে ফিসফাস করে বেরিয়ে আসতো। মালপত্র তেমন বিক্রি হতো না। দিনের অধিকাংশ সময় ওরা পার্কে পার্কে কাটিয়ে দিতো। চিনে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে গল্প করতো। এদিকে যেমনকার মাল তেমনি পড়ে থাকতো।

মালপত্র প্রথম প্রথম এমনিতেই কম বিক্রি হবে। একে তো বিরাট কম্পিটিশন মার্কেট। তার বিজ্ঞাপন এবং কোম্পানী-কৌলীন্যে দুরস্ত প্রসাধনদ্রব্য ইতিমধ্যেই বাজার মাত করে বসে আছে। এর মধ্যে নাক গলানো খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। মালিকও সেরকম আন্দাজই প্রথমে করেছিলেন।

কিন্তু একদিন ওরা ধরা পড়ে গেল। পার্কের এক বেঞ্চিতে বসে তিনজনে গল্প করছিল। নিজেদের সুখ-দুঃখের কথায় ওরা তন্ময়। সামান্য মাইনেয় কি-ই বা আর হয়। আসল যে মাল বিক্রিতে কমিশন তাতে তো কিছুই হচ্ছে না। এরকম করে আর কতদিন চলবে। আর মাল যদি না কাটে, তবে কোম্পানীই বা ওদের পয়সা দিয়ে শুধু শুধু পুষবে কেন? ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ ওদের কথাবার্তায় ঘুরে ঘুরে আসছিল।

এমনি সময় মালিক কি কাজে ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ওদের ওভাবে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন। ওরা এ-সময়ে মোটেই খোদ মালিকের সামনা-সামনি পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সবাই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। ওরা তৎক্ষণাৎ ভাবতে শুরু করেছে যে, এবার আর রক্ষে নেই। চাকরিটা গেল।

মালিক কিন্তু সেরকম কিছু করলেন না। ওদের পাশে বসলেন। এমনি কথা বলতে লাগলেন। বাক্যবাণ বারকয়েক দিয়েও হা যায় না। কথায় কথায় এবার তিনি আসল প্রসঙ্গে এলেন। জানতে চাইলেন, অফিসে অফিসে মালপত্র কেমন যাচ্ছে। ওরা মালিক সম্বন্ধে যেমন ভয় করেছিল, সেটা কেটে যেতেই আসল কথা খুলে বললো। [illegible] যে ওরা ঠিক [illegible] করতে [illegible] বললো [illegible] দিয়ে

শুনলেন। অতঃপর আর একটু সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে বললেন। ব্যস, এই পর্যন্ত। অতঃপর তিনি উঠে পড়লেন।

ম্যানিকেন এই ব্যবস্থায় যেন ওদের মধ্যে ম্যাজিকের মতো কাজ করলো। সেদিনই ওরা আর দেরি না করে কাছাকাছি একটা অফিসে গিয়ে উঠলো। টেবিলে টেবিলে গিয়ে সবাইকে ওদের পণ্যের কথা বললো। দু'-একজন আগ্রহ দেখিয়ে কিছু কিছু কিনলো। তবে বেশিরভাগই পরীক্ষামূলক-ভাবে। অচেনা এবং নাম-না-জানা পণ্য কেই বা সহজে বিশ্বাস করতে চায়। তবু আজ কিছু বিক্রি হলো। এবং ভবিষ্যতে বিক্রির একটা পথ তৈরি হলো। এবার এসে এসে আর দরজা থেকে ফিরতে হবে না।

এমনিভাবে ওদের অবস্থা শুধরে হলো। সারাদিন ওরা তিনজনে একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। অফিসে অফিসে। টেবিলে টেবিলে। মালপত্র বিক্রি খুব একটা খারাপ নয়। মোটামুটি সন্তোষজনক। মাইনের সঙ্গে কমিশনও এখন বেশ ভালই পায়। সংসারযাত্রা এখন বেশ স্বচ্ছন্দ।

বাড়ির দিক থেকে প্রথমে এ-কাজকে কেউ স্বাভাবিক বলে মানতে রাজি হয়নি। শ্বশুর-শাশুড়ি বলেছিলেন, এরকম চাকরি ছেড়ে দিতে। তাঁদের ভাবনা ছিল অন্য-রকম। যদি কোনকিছু ঘটে যায়। স্বামীও খুব একটা রাজি ছিলেন না। অথচ মুখ ফুটে আপত্তি জানাতে তাঁর বাধছিল। কারণ, তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন যে, একার আয়ে সংসার খুব অস্বচ্ছল। না চলারই নামান্তর। তিনি চুপ করেই ছিলেন। এর মধ্যে ওদের জেদ জিতে গেল।

কয়েক মাস পর যখন মোটামুটি টাকা ওরা এনে দিল নিজের নিজের সংসারে, তখন সবার মুখে হাসি ফুটেছে। আর কোনকিছু ঘটার আশঙ্কাটাও কেটে গেছে। এখন ওদের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়েছে শহরের বাইরে নানা জায়গায়। মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্য বাইরে কোথাও পাড়ি দিতে হয়। সেও গা-সহা হয়ে গেছে। কোনকিছুতেই খুব একটা অসুবিধা হয় না।'

সবচেয়ে বড় ভয় ছিল মালিককে নিয়ে। সে ভয় তো ওদের কবে কেটে গেছে। মালিক হচ্ছে ওদের খুবই আপনজন। এমন দরদ দিয়ে কর্মচারীর সঙ্গে কেউ মেলামেশা করে না। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি ওদের মালপত্র কাটানোর নানা কৌশল শিখিয়ে দেন। তিনি নিজেই একদিন ছিলেন সেলসম্যান। এমনি অফিসে অফিসে ঘুরে মালপত্র বিক্রি করতেন। তাই এসব কায়দা তার জানা আছে ভাল। এরকম সহায়ক এবং সহৃদয় মালিক পেয়ে ওরা খুবই খুশি।

তবে, ইদানীং কিছু প্রতিযোগিতা বেড়েছে। চাকরির বাজারে ঠেকা-ঠোকর খেয়ে অনেকেই এপথে এগিয়ে এসেছে। অনেক মেয়ে এখন অফিসে অফিসে লটারির টিকিট বিক্রি করে বেড়ায়। এতে ওদের জোর বেড়েছে। প্রথম এ-লাইনে ওরা ছিল নিঃসঙ্গ। এখন আর তা নয়। অনেকেই এখন এ-পথের পথিক। মনের জোর ওদের তাই অনেক বেড়েছে। আর কোন বাধাই এখন নেই। সকলেরই সব অসন্তোষ দূর হয়ে গেছে। কারণ, সবাই বুঝতে পেরেছে যে, নিজের পথ নিজে না করে নিলে কেউ এগিয়ে এসে সাহায্য করবে না। সবাই দূর থেকে সহানুভূতি জানাবে। যেমন ওদের বেলা হয়েছে। এজন্য ওদের অনেক ভুগতে হয়েছে। এবার আর ভোগান্তি নয়। নিজের পথ নিজে করে নিয়ে সোজা এগিয়ে চলা। কোন কথায় কান দেবার দিন এখন নয়।

—প্রমীলা

জার্মাণীর মেয়েরা

আজকে জার্মানীর মেয়েদের দিকে তাকালে মনে উৎসাহ জাগে—সর্বনাশা মহা-যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সামলে তারা জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদীক্ষায় নিজেদের অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ভারত-বর্ষেও রাজনৈতিক তথা সামাজিক ক্ষেত্রে একের পর এক দুর্নিবার আঘাত এসেছে, সর্বাত্মক পরিবর্তন ঘটে গেছে বৃটিশ শাসনের শুরু থেকে, তবু ভারতের মেয়েরা থমকে দাঁড়িয়ে যায়নি, এগিয়েই যেতে চেয়েছে। যাচ্ছেও, জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা নিয়ে। এমনি সময় জার্মানীর মেয়েদের কথা, বিজ্ঞানসাধনায়, কারিগরী শিক্ষায় তাদের আগ্রহের কথা বোধহয় আমাদের নিজেদের পথ চলার আলোকে উজ্জ্বলতর করে তুলতে পারবে।

জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষশিক্ষকদের চেয়ে মেয়েশিক্ষিকার সংখ্যা বেশী। হল বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের সবচেয়ে বেশি সুযোগ দিতে উৎসাহী, প্রযুক্তিবিদ্যায় পূর্ব জার্মানীর মেয়েরা স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই দেখি, পুরুষের সঙ্গে সম-তালে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাগৃহে, কলেজে, টেকনিক্যাল স্কুলে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে।

১৯৫৪-তে যেখানে ম্যাগডেবার্গের অটো ফন গেরিক টেকনিক্যাল কলেজে মোটশিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র চার, এখন সেখানে প্রতি বছর একশ' কুড়ি-জনেরও বেশী মেয়ে প্রবেশ করছে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮-তে মেয়েদের ম্যাট্রিকুলেট হবার শতকরা হার ৪·১ থেকে বেড়ে প্রায় ২০-তে দাঁড়িয়েছে। প্রশংসোজ্জ্বল কাজের জন্য বৃত্তি পাওয়া পনেরোজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সাতজন হল মেয়ে। বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রতি তিনজন 'কার্ল মার্ক্স বৃত্তিপ্রাপ্ত' ছাত্রের মধ্যে অন্তত একজন মেয়ে। প্রযুক্তিবিদ্যায় মেয়েরা যতখানি পারদর্শিতা লাভ করতে পেরেছে, তার প্রমাণ রয়েছে ইলমেনের টেকনিক্যাল কলেজের ১৯৬৯-৭০ শিক্ষাবছরের বিবরণে, বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যায় মেয়েদের সংখ্যা শত-করা উনিশ।

যে ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ারদের উৎপাদন-বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেখানে প্রায় চার ভাগের এক ভাগ মেয়ে। ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনি-ক্যাল স্কুলে শতকরা ৪৭ ভাগ আসন দখল করে আছে মেয়েরা। ১৯৬৮-তে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের ১১০,২০০ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৫,১০০ জনই হল মেয়ে। তবে এই সংখ্যা ওখানের শিল্পের চাহিদা অনুপাতে যথেষ্ট নয়। কারিগরী শিক্ষালাভে এখনও অনেক মেয়েকে সংস্কারবশেই বিরত থাকতে হয়। সেজন্যই যেসব মেয়েরা পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, যন্ত্রবিজ্ঞানী, টেকনোলজিস্ট বা ইলেকট্রিক্যাল হতে চায়, পলিটেকনিক্যাল সেকেণ্ডারী স্কুলগুলি তাদের কার্যকরী এবং কারিগরী নির্দেশদানে সাহায্য করে থাকে।

ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনিক্যাল স্কুল-গুলিতে বিশেষ বিজ্ঞান ক্লাশের ব্যবস্থা আছে মহিলাদের জন্য, যেখানে সাত হাজারেরও বেশী মহিলা এবং মায়েরা সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষালাভ করে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের মতই এরা পরবর্তী কালে কাজের সুযোগ পায়। এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে মহিলা শিক্ষার্থিনীদের শিক্ষা-লাভের সহায়ক হয়। আগে থেকে সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত চুক্তি করে নেওয়া হয়, পড়ার জন্য যাতে যথেষ্ট সময় মহিলারা পায় তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থিনী মায়েদের সন্তান-সন্ততিদের দেখাশুনো করার জন্য প্রতিষ্ঠান থেকেই অনেক সময় কিণ্ডারগার্টেন বা ক্রেশের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। শিক্ষা শেষ হবার অনেক আগেই এরা জানতে পারে এদের কোথায় কাজে নিয়োগ করা হবে। কাজের বেশি সুযোগ যাতে মায়েরা পায় সেজন্য পাঠসভা বা কার্যসভা মায়েদের জন্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র বিস্তারের জন্য এসব প্রতিষ্ঠান সব সময়ে চেষ্টা করে চলেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালনাবৃত্তির সকল ক্ষেত্রে মহিলা গ্র্যাজুয়েট, ডাক্তার, লেকচারার বা বিভাগীয় কর্ত্রীরা শিক্ষালাভ করে থাকে। জার্মান এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর অর্ধেক কর্মী মহিলা। এই মহিলারা এমনভাবে এ্যাকাডেমির সংস্কার সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যাতে গবে-ষণার ক্ষেত্রে এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে তাঁরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। বার্লিনের শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেক সংস্থা এবং কমিশনে মহিলারা বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করছেন। জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাব-লিকের কলেজ ও টেকনিক্যাল স্কুল কাউন্সিলের একজন সদস্য মহিলা।

—[illegible]

CENTRAL LIBRARY

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত আজকের নায়ক/নায়িকা সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। —ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

ঐশ্বর্য বনাম মনুষ্যত্ব

সদ্য পরলোকগত গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত এস এন ফিল্মস-এর নবতম চিত্র 'নবরাগ'-এর নায়ক বিপুল বাগচী সাধারণ বেশভূষাপরিহিত গ্রাম্য সঙ্কোচ-জড়ানো নারায়ণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে যেদিন তাকে বিবাহ করে ঘরে তুলেছিলেন, সেদিন তিনি তার সামগ্রিক সত্তার দিকে অনুসন্ধানী চোখ ফেলবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি এবং এইখানেই তিনি ভুল করেছিলেন। আধুনিক, ধনী, শহুরে সম্ভ্রান্ত সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলে নারায়ণীকে তিনি মিণা বাগচীতে পরিণত করেছিলেন এবং ঐশ্বর্যে তাকে মুড়ে দিয়ে ভেবেছিলেন, তিনি স্ত্রীর সব চাহিদাই মিটিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তার মনের খবর যদি তিনি রাখতেন, তাহলে দেখতেন, সেখানে তিনি এক ক্রম-বর্ধমান শূন্যতারই সৃষ্টি করে চলেছেন যা প্রচণ্ড [illegible] দেখা দিল সেইদিন যেদিন [illegible] তাঁর শিক্ষা ও প্রভাব [illegible] মুক্ত মানসী

অন্যো নারায়ণী তাঁদের আট বছরের ছেলে রাজাকে তাঁর অগোচরে তারা গ্রামের আদর্শ-বাদী নন্দদা পরিচালিত 'শিশুতীর্থে' চালান করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কার বিপুল বাগচীর পক্ষে দুঃখদায়ক হয়েছিল, কারণ তখনই তিনি নারায়ণীর সমস্ত সত্তাকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে বক্ষে ধারণ করেছিলেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ লেখনীপ্রসূত 'নতুন তুলির টানে'-র চিত্ররূপ দিতে গিয়ে চিত্রনাট্যকার পরিচালক বিশ্বনাথ মূল কাহিনীটিকে সরল পথে নিয়ে যাবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং সেই কারণেই নানা দিকে আধুনিকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য মেয়ে নারায়ণীর পক্ষে মমতাময়ী হওয়া সম্ভব হল কি করে, তা বিশদভাবে দেখানোর প্রয়োজন অনুভব করেননি। পিতার আদর্শে গঠিত কঠোর হৃদয় রাজাও শিশুতীর্থের আবহাওয়ায় এসে এবং নন্দদার শিক্ষায় কেমন করে পরিবর্তিত হল, তাও উহ্য রাখা হয়েছে চিত্রের শেষভাগে চমক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। চলচ্চিত্রের অভিনয় প্রধানত টাইপ অভিনয়, একথা স্বীকার করে নিয়েও বলব, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিব্রত হয়ে নায়ক বিপুল ও নায়িকা মিণার আচা-পান করার দৃশ্য যথেষ্ট সীমিত করা প্রয়োজন ছিল। এবং আদর্শ নিয়ে [illegible] আলোচনা সময়ে সময়ে ছবিতে শুষ্কতার ছায়া ফেলেছে।

এ-ছবি আসলে উত্তম-সুচিত্রার ছবি; তাই ছবির পঁচাত্তর ভাগ জুড়ে আছে তাঁদের সু-অভিনয়। ছবিটিতে চূড়ান্ত ক্লাইমাক্স বলতে কোনো বিরাট নাটকীয় দৃশ্য নেই; তবে ছোট ছোট সংঘাতের দৃশ্যে দুজনের নাট্যনিপুণতার নিদর্শন সুস্পষ্ট রূপে পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে, বাংলা চলচ্চিত্রজগতে এঁদের জুড়ি মেলা ভার। অন্যান্য যাঁরা ছবিটিতে উল্লেখযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন : বিকাশ রায় (নন্দদা), বাসবী নন্দী (শ্যামা), মিহির ভট্টাচার্য (বাদু), গৌর শী (ফ্যাক্টরী ছাঁটাই কর্মীদের মুখপাত্র), জহর রায় (গাড়ু) ও বালক অভিনেতা প্রদীপ ঘোষ (রাজা)।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে আশানুরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। বিশেষ করে দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন, ছবির পরিচালক এবং আলোক চিত্রশিল্পী, দুজনেই নায়িকা সুচিত্রা সেনের ক্লোজআপ গ্রহণে সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি; কেন, ক্যামেরার কোণ কিংবা শিল্পীর অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। শিল্পনির্দেশনা মোটামুটি সুন্দর বাস্তবানুযায়ী। সম্পাদকের [illegible] কি জানি কোনো কোনো জায়গায় [illegible] কিংবা তুলির [illegible] শেষে [illegible] পারে? বোধ

করি, না; কারণ পরিচালক নির্দেশিত পথে যেভাবে কাহিনী বিস্তার ঘটেছে, তাতে তাঁদেরকে আরও প্রবেশ করবার সুযোগ ছিল না বললেই মনে হয়। ছবিতে দুখানি মাত্র গান আছে এবং দুটিই রবীন্দ্রসঙ্গীত। রেকর্ডে সাগর সেনের কণ্ঠ মারফত অতি পরিচিত 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান' সুমিত্রা সেন কণ্ঠনিঃসৃত হয়ে সুচিত্রা সেনের মুখে উঠে বিশেষ অর্থবহ হয়েছে। পার্টিতে কণিকা মজুমদারের মুখে 'তুই ফেলে এসেছিস কারে' গানটিও সার্থকতা পেয়েছে। আবহ-সঙ্গীত সাধারণ পর্যায়ের। সম্ভবতঃ শেষ মুহূর্তে কলেবটি পরিচয়-লিপি (টাইটেল কার্ড) পরিবর্তন করা হয়েছে; তাই তাদের সঙ্গে কোনো যন্ত্র-সঙ্গীত শোনা যায়নি।

উত্তম-সুচিত্রা অভিনয়দীপ্ত এস এম ফিল্মস-এর নবতম চিত্রার্ঘ 'নবরাগ' সাধারণ দর্শকবৃন্দ দ্বারা নিশ্চয়ই অভিনন্দিত হবে।

—নান্দীকর

অমল দত্ত পরিচালিত 'আবিরে রাঙানো' চিত্রে নবাগত দেবব্রত এবং সুচন্দ্রা।

স্টুডিও থেকে

একদিকে স্টুডিওগুলোর প্রায় অচলাবস্থা। অন্যদিকে একাধিক ছবির মহরৎ। দুটো ব্যাপার বেশ লক্ষ্য করার মত। বিভূতিবাবুর 'কৃষ্ণবেণীর মহরতের পর কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের 'হার মানা হার' ছবির মহরৎ হোল গত রোববার টেকনিসিয়ানে। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক নিজে। মহরতের প্রধান দুই শিল্পী ছিলেন উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন।

উত্তম-সুচিত্রা জুটির জনপ্রিয়তা যে এখনও বিন্দুমাত্র মলিন হয়নি তার প্রমাণ সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'নবরাগ' এবং নতুন ছবির মহরৎ। সুচিত্রা সেন আবার ফিরে আসছেন পাদপ্রদীপে। ওঁর 'ফরিয়াদ' এখন সমাপ্তির পথে। 'হার মানা হার' ছবির কাজ সুর্নোছ আগামী মাস থেকে নিয়মিত শুরু হবে।

এখনও সাধারণ দর্শক মহলে সুচিত্রা সেন নামটিই অনেক প্রতিশ্রুতির বার্তা আনে। শুধুমাত্র দর্শকের কথা বলি কেন, প্রযোজক পরিবেশক মহলেও শ্রীমতী সেনের নাম কোনো ছবির ভূমিকা লিপিতে থাকার একমাত্র অর্থ সেই ছবির আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে নিঃশঙ্কচিত্ত হওয়া। অবশ্য তাঁদের এই আশা ভরসার মূলেই হোল দর্শকের কাছে সুচিত্রা সেনের অসাধারণ জনপ্রিয়তা।

•

তরুণ মজুমদারের 'কুহেলী' মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুণছে। আগামী মাসেই সম্ভবতঃ তার বন্দীদশা ঘুচবে। তরুণবাবুর পরের ছবি 'নিমন্ত্রণ' এখন নির্মীয়মাণ। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' নামের একটি গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য তিনি নিজেই লিখেছেন। প্রধান চরিত্র দুটিতে 'পলাতক'-এর জুটি অনুপকুমার-সন্ধ্যা রায় আবার ফিরে আসছেন। শুধুমাত্র 'কুহেলী' নয় মুক্তির অপেক্ষায় আছে তপেশ্বর প্রসাদের 'প্রতিবাদ' এবং সুধীর মুখার্জীর 'চৈতালী'। শুধু এই দুটি ছবি নয়, আরও আছে। মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে তপন সিংহের 'এখনই', আছে দীনেন গুপ্তের 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', আছে দীপক গুপ্তের 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' আছে অজয় করের 'মালাদান' এবং আরও অনেক।

অজয়বাবু খুব শিগগিরই তাঁর নতুন ছবি 'কালো রাস্তা সাদা বাড়ীর কাজ শুরু করবেন। তপন বাবুতো একই সঙ্গে দুখানা ছবি করছেন। অবশ্য দুটোই হিন্দী। 'সাগিনা মাহাতো' এবং বম্বেতে 'জিন্দগী জিন্দগী' সলিল সেনের 'সংসার' প্রায় শেষ। 'প্রায় শেষ' পর্যায়ে অবশ্য আরও কিছু ছবি আছে। যেমন সলিল দত্তের 'খুঁজে বেড়াই' দীনেন গুপ্তের 'আজকের নায়ক', চিদানন্দ দাশগুপ্তের 'বিলাত ফেরৎ', অজিত লাহিড়ীর 'আটাত্তর দিন পরে', কনক মুখার্জির 'দাবী ও স্বীকৃতি', পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরীর 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' এবং আরও কিছু।

মঞ্চাভিনয়

নান্দীকার সম্প্রদায় 'রঙ্গনা' মঞ্চে তিনখানি একাঙ্ক নাটকের অভিনয় করছেন মাঝে মাঝে। এদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত 'পূর্বরাগ' নাটকটির অভিনয় আমরা দেখে উঠতে পারিনি। বাকী দুখানির মধ্যে পরলোকগত তুলসী লাহিড়ী রচিত ও লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত 'আলোর বাইরে'-কে নাটক না বলে চিত্র বলাই ভালো। আজ যারা মঞ্চের ওপর যৌবনদৃপ্ত জনপ্রিয় নায়িকা, কাল তারাই উপেক্ষিত অন্ধকারের মানুষ—এই বক্তব্য

নান্দীকার
ঝুম্বাই ভিলাই এবং
জামশেদপুরে অভিনয়ের জন্যে এ মাসে কলকাতায় নান্দীকারের অভিনয় বন্ধ।
নাট্যজগতের সম্মানে দু-টি চরিত্র
পারুলী অভিনয় ৪ঠা মার্চ বৃহস্পতিবার ৬টায়
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে টিকিট পাবেন।

রাখতে গিয়ে নাট্যকার বহু চরিত্রচিত্রণ ও বর্ণনাত্মক সংলাপ ব্যবহার করলেও সমস্ত জিনিসটিকে একটি নাটকের রূপ দিতে সক্ষম হননি। শেষের দিকে একটি হীরের নাকছাবি হারানোকে উপলক্ষ্য করে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হলেও তা নাট্যকারের মূল বক্তব্যের পরিপূরক নয়। নাটকটির অভিনয়ে দীপালি চক্রবর্তী, শেলী পাল, বীণা মুখোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

উদয়ন ঘোষ রচিত 'নীলিমা' নাটকটির মূল হচ্ছে ইউজীন ইয়োনেস্কোর 'দি লেসন'। ইয়োনেস্কো যে-চশমা পরে পৃথিবীকে দেখেন, তার লেন্সে সব জিনিসকেই কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখায় এবং এই পৃথিবীকে বাসের অযোগ্য মনে হয়। সংসারের আর সকল বিষয় সম্বন্ধে অনাসক্ত হলেও কোনো অধ্যাপক তার শিক্ষাদানের প্রেরণায় উন্মত্ত হয়ে পর পর চল্লিশজন ছাত্রছাত্রীকে হত্যা করবে, এমন কল্পনা আর যাই হোক, মানসিক সুস্থতার পরিচায়ক নয়। বাতিকগ্রস্ত অধ্যাপক রূপে পরিমল মুখোপাধ্যায় এবং বিনীত ছাত্রীবেশে শেলী পাল প্রায় অসাধারণ ভালো অভিনয় করলেও সমগ্র ব্যাপারটাই আমাদের চোখে অস্বাস্থ্যকর ঠেকেছে।

আঙ্গিক গোষ্ঠী কিছুদিন আগে মুক্তঅঙ্গন মঞ্চে নিবেদন করেছিলেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত ও তুষার মজুমদার নির্দেশিত 'এই মন সেই মন' নাটক। বিজ্ঞাপিত হয়েছে যে, আরব-ইস্রাইল যুদ্ধকালের একটি সত্য, করুণ ও বিস্ময়কর ঘটনার অনুসরণে নাটকখানি রচিত হয়েছে। তিনটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটকটির মূল উপজীব্য হল মানবিক আবেদন। একটি মহৎ জীবনকে লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ থেকে রক্ষা করবার জন্যে অত্যন্ত সংযত থেকেও কতখানি স্বার্থশূন্য হওয়া সম্ভব, তার পরিচয় আছে নাটকটিতে। নাটকান্তর্গত ডঃ আমান, ইভা, ডোরা, জন, শেফার্ড প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি চরিত্রেই নির্দেশক তুষার মজুমদার, মীরা বসু, মায়া বসু, বিমান গুপ্ত, লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিভিন্ন শিল্পী দ্বারা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। নাটকটির উপস্থাপনা ও মঞ্চআঙ্গিকে আঙ্গিক গোষ্ঠী শিল্পসম্মত রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রবাসী নাট্যসংস্থা সারার্থ অ্যাভিনিউস্থ বিড়লা আকাদেমি প্রেক্ষাগৃহে আগাথা ক্রিস্টি রচিত 'টেন লিটল নিগার্স' অবলম্বনে সিতীন্দ্র রায়চৌধুরীকৃত 'ঊর্ণনাভ' নাটকটিকে মঞ্চস্থ করলেন অত্যন্ত সুপরিকল্পিত দৃশ্যপট ও আলোকসম্পাতের মাধ্যমে। যারা জীবনে গুরুতর অন্যায় করেছে, অথচ বিচারালয় যাদের শাস্তিবিধান করতে পারেনি, তারাই লোকালয় থেকে বহুদূরে অবস্থিত এক নির্জন দ্বীপে কৌশলে নীত হয়ে কেমন করে একে একে অজ্ঞাতভাবে নিহত হল, তারই প্রায় শ্বাসরোধকারী চিত্র এই নাটকটিতে প্রদর্শিত হয়েছে। আইনকে নিজের হাতে নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক পরন্তপ রায় যে অন্যায় করলেন, তার শাস্তিবিধান তিনি নিজেই করলেন নাটকের শেষভাগে। অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বুদ্ধ দত্ত (পরন্তপ রায়), বিক্রম সেন (আনন্দ চৌধুরী), সুনন্দন সেন (হরিদাস পাল), নীলা সেন (গীতা দত্ত), সিতীন্দ্র রায়চৌধুরী (তুহিন ঘোষ), আনন্দ ঘোষ (ডঃ চৌধুরী), স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় (সোহাগী দাসী), ডঃ সমর সেন (ভোম্বল) ও গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (সুলেখা রায়)।

পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্য সংস্থার দুটি নাটক : সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাদের নাটক পরিবেশন করে যেকটি গোষ্ঠী আমাদের শিল্পবোধকে নতুন আলোয় আলোকিত করেছে, তাদের মধ্যে পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্য সংস্থার নিষ্ঠা জড়ানো প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ বারো বছর ধরে এঁরা যে সব নাটক প্রযোজনা করেছেন তার মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা পেয়েছে এবং সেই সূত্রে বাংলা নাটকের বিষয়বস্তুর হয়েছে প্রতিশ্রুতিময় প্রসার। আঙ্গিক নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এঁদের নাট্য প্রযোজনাগুলোকে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত করেছে। কিছুদিন আগে বিশ্বরূপার মঞ্চে সংস্থার যুগ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মরুতৃষ্ণা' ও 'কল্যাণপাদ' নাটক পরিবেশিত হল। নাটক দুটি এর আগেই নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছে।

'মরুকন্যা' নাটকের সংঘাত শুরু হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশের রাজধানী থেকে কয়েক মাইল দূরে। নির্মম সামরিক শাসনের পটভূমিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গোপন কার্যকলাপ ষড়যন্ত্রের আঁতাত যোগ এবং বিশেষ অভিযান এই নাটকটিকে সব সময়েই মুখর করে রেখেছে। কোন একটি মুহূর্তেও শৈথিল্য এসে মনকে আক্রমণ করে ফেলে নি। ডাঃ রোশনের পল্লী নিবাসের একটি কক্ষে নাটকটির যাত্রা শুরু হয়েছে। নেপথ্যে আছে ভীষণ ঝড়ের দাপট। শ্রীনির্মল ঘোষের দক্ষ পরিচালনায় এই নাটকের কয়েকটি বিশেষ ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন সন্তোষ দাস (ডাঃ রোশন), সন্তোষ বোস (মেজর বানিভান), দেবকুমার দে (ক্যাপ্টেন নাগিম), গুরুদাস লস্কর (গুলেট), লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (ইদ্রিস), দিলীপ ভট্টাচার্য (ইব্রাম), ধূর্জটি দত্ত (ইরফান), সুব্রত নন্দী (নানজান), সবিতা মুখোপাধ্যায় (মিসেস রোশন), তিলোত্তমা ভট্টাচার্য (মেট্রন সায়েদা)।

জন্মাষ্টপার নাটক 'অমিল, মেকী মিল ও গোঁজামিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' করেছে। নাট্যকার এই নাটকের মধ্য দিয়ে শোষণভিত্তিক সমাজের মুখোশ খুলে কিছু শ্রেণীশত্রুদের কৌশলে চিনিয়ে দিয়েছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা দেশের নাট্য আন্দোলনে বিচ্ছিন্নতাবাদ, অর্থহীনতাবাদ, নিরাত্তবাদ স্বভাববাদ প্রভৃতি যে ইঙ্গিতগুলো আজ মুখর হয়ে উঠেছে তার নেপথ্যে কোন বিশেষ মানসিকতা কাজ করছে তার ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। সংলাপের ঐশ্বর্যে নাটকটি হয়েছে অসাধারণ। এমন স্বচ্ছন্দ গতি ও অভিনব ভাবের দ্যোতক সংলাপ খুব কমই শোনা যায়। প্রতিটি শিল্পীর মধ্যে সহমর্মিতার একটি সেতুবন্ধন রচিত হয়েছিল বলে সামগ্রিক প্রযোজনাটি কোথাও ঝিমিয়ে পড়ে নি। তবুও বলব ব্যক্তিগত অভিনয়ক্ষেত্রে সবাইকে অতিক্রম করে গেছেন উষ্ট্রী গঙ্গোপাধ্যায়; ফোরম্যান টেকের চরিত্রে তিনি যে প্রাণময়তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন, তার উদাহরণ সত্যিই বিরল। চরিত্রের অতলে ডুবে না গেলে এমন সাবলীল, স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রণ কখনোই সম্ভব নয়। 'নাট্যকারের' কঠিনতম ভূমিকাটিকে নৈপুণ্যের সঙ্গে সপ্রতিভ করে তুলেছেন সুব্রত নন্দী।

রবি ১৪ ফেব্রুয়ারী ৬টা

রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ

শতাব্দীর হাসির নাটক

বজ্জাতপুরের রূপকথা

রচনা ও নির্দেশনা : বাদল সরকার

১্‌ থেকে ৫্‌, ছাত্র ৫০ পঃ, ট্রেনিং হলে আপনারা এক থিয়েটার বাড়িতে, এগোবে

—আরও থিয়েটার দেখুন—

উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত ইস্টম্যানকলার চিত্র হরপার্বতীতে পদ্মিনী।

সুনন্দা চক্রবর্তীর 'মিস মুখার্জি' মনে হয়তো দাগ কাটতে পারে নি। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সমীর রায়, তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম গোস্বামী, রেবা চক্রবর্তী, উমি গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল বিশ্বাস, ধূর্জটি দত্ত, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখোশ চিত্রনে ছিলেন অশোক বিশ্বাস। কণিষ্ক সেনের ব্যঞ্জনাধর্মী আলোকসম্পাত নাট্য প্রযোজনাটির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এ নাটকে প্রয়োগপ্রধান নির্মল ঘোষের সুগভীর শিল্পচিন্তা আরো প্রোজ্জ্বল হতে পেরেছে।

বিবিধ সংবাদ

পথের দাবী : অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অন্যান্য সৃষ্টির মতো 'পথের দাবী'র সঙ্গেও যে বাংলাদেশের মানুষের এক আন্তর যোগ রয়েছে, তা আবার সেদিন স্টার থিয়েটারে নতুন করে অনুভূত হল। স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসটির সার্থক নাট্যরূপ পরিবেশন করলেন জেমস ওয়ারেন রিক্রিয়েশন ক্লাবের কৃতী শিল্পীরা। প্রযোজনার স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির ব্যাপারে প্রয়োগপ্রধান অনিল মিত্রের গভীরতম শিল্পবোধ ও আন্তরিক প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। অভিনয়ে মধুর্ পালকে চিত্রগ্রাহী করেন দীপিকা দাস (সুমিত্রা), বাসন্তী চ্যাটার্জি (ভারতী), ব্রজেশ সরকার (সব্যসাচী), সুবিদ মজুমদার (অপূর্ব), বিপাশা গোস্বামী (নবতারা), বিভাস রায় (খেলমত), তারেক মুখার্জি (শশিকবি), অবনী ঘোষ (তেওয়ারী), শ্যামাপদ ঘোষ (ব্রাউন), আশুতোষ মজুমদার (জামাল), ভোলানাথ চ্যাটার্জি (নিমাই দারোগা)। আলোকসম্পাত, দৃশ্যপরিকল্পনা ও আবহসঙ্গীত

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। সত্যজিৎবাবু নতুন ছবি কি করছেন বা করবেন—তা নিয়ে জিজ্ঞাসা ছিল অনেকের। সম্প্রতি অমৃত'র স্টুডিও প্রতিনিধিকে তিনি জানিয়েছেন যে শংকরের লেখা সীমাবদ্ধ উপন্যাস অবলম্বনে তিনি তাঁর নতুন ছবির কাজে উদ্যোগী। হয়তো পরে ছবির নাম পরিবর্তিত হতে পারে। চিত্রাঞ্জলী পিকচার্সের পতাকাতলে এ-ছবির নায়িকা চরিত্রে থাকবেন শর্মিলা ঠাকুর এবং নায়ক চরিত্রে নতুন মুখের সন্ধান চলছে। এই মাসের শেষাশেষি স্টুডিওর কিছু কাজ হবে আশা করা যায়। মার্চ মাস থেকে নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

সৃষ্টিতে যে সূক্ষ্ম চিন্তা ছিল তা সামগ্রিকভাবে নাট্যপ্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত ও সাবলীল করেছে।

মহারাজা নন্দকুমার : পশ্চিমবঙ্গ আয়কর বিভাগীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে মহেন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক 'মহারাজা নন্দকুমার' সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করলেন। অনেক সংঘাতে সমৃদ্ধ এই নাটকটির প্রযোজনায় শিল্পীরা তাঁদের পূর্ব প্রযোজনা 'কারাগার' থেকে অনেক বেশী উন্নততর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। এর জন্য প্রথমেই অভিনন্দন যাঁর প্রাপ্য তিনি হোলেন নির্দেশক বিষ্ণুপদ ঘোষ।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই যে তিনজন শিল্পী দর্শকদের প্রায় বিমোহিত করে রাখেন তাঁরা হোলেন শ্যামল বসাক (নন্দকুমার), অমর রায় (মীরকাসেম), মিত্রা দাশগুপ্তা (লুৎফাশ্বেসা)। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেন হরিপদ চক্রবর্তী (রেজা খাঁ), অভিমন্যু ভৌমিক (কামালউদ্দীন), বিমল ব্যানার্জি (ওয়ারেন হেস্টিংস), ফাল্গুনী মুখার্জি (ক্লেভারিং), সরোজ দাস (জগৎ শেঠ)। মিস ক্লেভারিং-এর চরিত্রে প্রাণের ছোঁয়া রাখেন কুমারী সুপ্তি।

ক্যাপটেন হুররা : সম্প্রতি চিত্তরঞ্জনের পরবাস সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্যাপটেন হুররা' নাটকটি মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন স্থানীয় বাসন্তী ইনস্টিটিউট মঞ্চে। রণজিৎ চক্রবর্তীর সুষ্ঠু পরিচালনায় এই ভিন্নস্বাদের নাটকটির প্রযোজনা স্বচ্ছন্দই হয়ে ওঠে। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন দীপেন চট্টোপাধ্যায়, শীতল চক্রবর্তী, সুশান্ত সাহা, অরূপ সেনগুপ্ত, সজল মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ চক্রবর্তী, ছবি তালুকদার, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোকনিয়ন্ত্রণ, আবহসঙ্গীত ও মঞ্চসজ্জায় ছিলেন বাবলু ভট্টাচার্য, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত মজুমদার ও জয়ন্তী সিংহ।

ফেব্রুয়ারীতে নান্দীকার : সুপরিচিত নাট্যসংস্থা নান্দীকার "রঙ্গনায়" নিয়মিত অভিনয়ের মাধ্যমে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বোম্বাই, ভিলাই ও জামশেদপুরে অভিনয়ের জন্য ফেব্রুয়ারী মাসে রঙ্গনায় নান্দীকারের নিয়মিত অভিনয় বন্ধ থাকবে। বোম্বাই শহরে ইণ্ডিয়া কালচার লীগের আমন্ত্রণে ১৩ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র নাট্যমন্দিরে নান্দীকার অভিনয় করবেন তাঁদের 'তিনটি একাঙ্ক' ও 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র'। ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারীতে সন্মুখানন্দ হলে অভিনীত হবে 'তিন পয়সার পালা' ও 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'। সম্পূর্ণ দল বোম্বাই সফর শেষে ভিলাই পৌঁছবেন। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী ভিলাইতে প্রযোজিত হবে 'তিন পয়সার পালা' ও 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'। ভিলাইতে এই দুটি অভিনয়ের উদ্যোক্তা হলেন মিলন সংঘ। জামশেদপুরে বেঙ্গল ক্লাবের আহ্বানে সেখানে নান্দীকার তাঁদের "তিন পয়সার পালা" মঞ্চস্থ করবেন ২৮ ফেব্রুয়ারী। মার্চ মাস থেকে "রঙ্গনায়" নান্দীকারের নিয়মিত অভিনয় আবার শুরু হবে।

বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন : ভাবনগরের পঁচিশ ঘর বাঙালী অন্যান্যবারের মত এবারেও সরস্বতী পূজো করেছিলেন। প্রতিমা তৈরী করেছিলেন একজন রেল-কর্মী। সুন্দর মণ্ডপের পরিকল্পনা করে কয়েকটি তরুণ-তরুণী। তাদেরই উৎসাহে পূজোর দিনটি মুখরিত হয় ওঠে বাংলা গানে ও নাচে। সকালে স্থানীয় সব বাঙালীরা মিলে পুষ্পাঞ্জলি দেন। তারপর হয় প্রসাদ বিতরণ। পূজোর দিন রাত্রে ছোটদের আবৃত্তি, নাচগান ও বড়দের বাংলা নাটকের কিছু অংশ অভিনয় মনোজ্ঞ হয়েছিল।

—সুজন

বেঙ্গলী নাট্যসংঘ : বোম্বাই-এর আন্ধেরীস্থ বঙ্গ নাট্যসংঘের সভ্য ও সভ্যারা গত ৩১ জানুয়ারী সরস্বতীপূজা উপলক্ষে "কাঞ্চনরঙ্গ" নাটকটি শ্রীঅসিতরঞ্জন বসুর দক্ষ পরিচালনায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। সর্বশ্রী জ্যোতিরঞ্জন আচার্য, তপন মৌলিক, শান্তি দত্ত, শ্রীমতী মোতিরাণী পাল ও বেলা ভট্টাচার্যের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বহুগুণের সমন্বয়ে অনন্য
বিষয়-বৈচিত্র্যে - প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে - নাট্য নৈপুণ্যে ও আবেদনের বলিষ্ঠতায় -
একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অনুপম চিত্র...
● আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ●

● একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অতিথি শিল্পী ধর্মেন্দ্র ●

রক্সি : কৃষ্ণা : জেম : মিত্রা : প্রিয়া : গণেশ : নবীনা
নারায়ণী (আলমবাজার) - কমল (মেটেবুরুজ) - ন্যাশনাল (খিদিরপুর)
অজন্তা (বেহালা) - অশোক (শালকিয়া) - নবভারত (হাওড়া)
চন্দ্রিকা (কোন্নগর) - দীপ্তি (কামারহাটি) - রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর) - তটিনী (ভদ্রেশ্বর) - গীতাঞ্জলি (রাণাঘাট) - অন্নপূর্ণা (ব্যাণ্ডেল) - কুহেন (বজবজ)

বুলগেরীয় চলচ্চিত্র উৎসব

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

দি কনসার্ট নাইট-এর একটি দৃশ্য

ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী অনুসারে ২২ থেকে ২৫ জানুয়ারী চারদিন ধরে স্থানীয় টাইগার সিনেমায় মোট যে আটখানি বুলগেরীয় ছবি দেখানো হয়ে গেল, তার সব কখানিই আধুনিক এবং বেশ কয়েকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। 'এ সাইড ট্র্যাক' ও 'দি হোয়াইট রুম' ছবি দুটি কলকাতার কয়েকটি ফিল্ম সোসাইটি মারফত আগেই দেখানো হয়েছিল এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও টেকনিকের আধুনিকত্বের জন্যে প্রশংসিতও হয়েছিল। আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে প্রেম পরে, কর্তব্য আগে'—এই নীতিই অবলম্বিত হওয়া উচিত, এমন বাণী ধ্বনিত হয়েছে 'এ সাইড ট্র্যাক' ছবিটির মাধ্যমে। প্রেমের পথ রাজপথ নয়, ওটি নেহাতই একটি পার্শ্ব-বর্তী রাস্তা। তাই ছবির নায়ক-নায়িকা যৌবনের ঐ পার্শ্ববর্তী রাস্তার মায়া ত্যাগ করে নিজের নিজের পথে অগ্রসর হয়েছিল: নায়ক হয়ে উঠেছিল একজন নামকরা ইঞ্জিনীয়ার এবং নায়িকা এক প্রত্নতাত্ত্বিক। সতেরো বছর বাদে দুজনে আবার যখন হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, কিছুক্ষণের জন্যে অতীতের স্মৃতি দ্বারা পীড়িত হলেও ওরা তখন —বিক্ষোভ করে নায়িকা তখন নিজেকে

সংযত রাখে এবং শেষ পর্যন্ত উত্তরে উত্তরের কাছ থেকে বিদায় নেয়। এই সাদা-কালো ছবিটিতে এমন কয়েকটি আবেগপূর্ণ মুহূর্ত আছে যা দর্শককে মুগ্ধ করে।

চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালের সাদা ঘরে বন্দী এক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের জীবনকে ঘিরে 'দি হোয়াইট রুম' ছবিটি নির্মিত হয়েছে। বর্তমান, অতীত এবং মানসিক চিন্তাকে ক্রমান্বয়ে চিত্রায়িত করে ছবিটিকে ফরাসী 'নিউ ওয়েভ' পরিচালকদের মতো একটি আশ্চর্য গতি দিতে পেরেছেন পরিচালক মেটোডি অ্যান্ডোনোভ। বিপ্লবী মতবাদের জন্যে অধ্যাপক আলেকজান্দ্রাও প্রভাবশালী ও রক্ষণশীল স্টেফেভের কাছ থেকে বিরোধিতা পান এবং এই বিরোধিতাই শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হলেও তাঁর মনোবল ভঙ্গ হয়নি কোনো দিনই, অবশ্য এ-বিষয়ে তাঁর বন্ধু ভাসিল পেতেভ অনেকখানি সাহায্য করেছিল। অধ্যাপকের অতীত প্রেম, দাম্পত্য জীবন, তাঁর ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা—সবই ছবিটিতে অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের দৃশ্যান্তর্গত হয়ে স্থান পেয়েছে। এই সাদা-কালো ছবিটিতে ক্যামেরা সংস্থাপনের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মতো।

আমরা যে সাতখানি কাহিনী চিত্র দেখতে পেয়েছি ('আইকোনোস্টাসিস' সাধারণ্যে দেখানো হলেও আমাদের দেখানো হয়নি), তার মধ্যে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ছবি হচ্ছে 'ব্ল্যাক এঞ্জেলস'। মাত্র এই ছবিখানিই ছিল রঙীন; বাকী সবগুলিই কালো-সাদা ফোটোগ্রাফিতে তোলা। একটি ছোট বিপ্লবী গোষ্ঠী পরাক্রান্ত নাৎসী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে

এ সাইড ট্রীক/ছবির দৃশ্য

অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, সেই কাহিনী জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে ছবিটির মাধ্যমে। দলের নারী-কর্মী সমেত তিনটি মেয়ে ও দুর্ধর্ষ 'প্যান্থার' সমেত পাঁচটি চার-পাঁচ ছেলে ওরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ধরনের যেন ভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়া: ওদের ব্যক্তিগত ভালো লাগা, মন্দ লাগা আছে, চারিত্রিক ভিন্নতা আছে। কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর পান্ডাদের হত্যা করা সম্পর্কে ওদের কোনো ভীতি নেই এবং এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই এগিয়ে যেতে চায়, যদিও দলগত আনুগত্যকে ওরা রণক্ষেত্রে যোদ্ধার মতোই মান্য করে। নিজের জীবন সম্পর্কে কতখানি বে-পরোয়া হলে বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ করা যায়, তা এই ছবিতে জাজ্বল্যমান।

ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক কিভাবে ব্যবহার করবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষক-সমাজে বহু মত-ভেদ আছে। 'ফেয়ারওয়েল, ফ্রেন্ডস' ছবির নায়ক বোয়েড ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতেন তাঁর বন্ধুর মতো; তাঁর কাছে তাদের গোপনীয় কিছু ছিল না। বিদ্যালয়-প্রধান তাঁর এই ব্যবহার সমর্থন করতেন না; তাঁর মতে কিবল ঢের ভালো শিক্ষক! কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল বোয়েডই ভালো। সিডনী পয়টার অভিনীত 'টু স্যার, উইথ লাভ' দেখবার আগে এই ছবিটি দেখতে পেলে এর তারিফ করতে পারতুম।

একখানি যুদ্ধকালীন ছবি হচ্ছে 'দি লংগেস্ট নাইট।' ফ্যাসিস্ট শাসনের সময়ে একজন বৃটিশ যুদ্ধবন্দী নাৎসী কনভয় থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে এসে একটি দ্রুত চলন্ত ট্রেনে আশ্রয় নেয়। সেই যাত্রীভরা ট্রেনে ছিল একজন ম্যাজিসিয়ান, এক জোড়া বাপ ও ছেলে, একটি ছাত্র, যে তার প্রণয়িনীকে দেখবার জন্যে প্রাণ হাতে করে চলেছে, একজন মহিলা ডাক্তার, যে অন্তরে মানুষের নিঃসংশতার বিশ্বাসী। ঐ চলন্ত ট্রেনে অন্বেষণ চলেছে অবাঞ্ছিত ও শত্রু-পক্ষীয় লোকের; ওরই মধ্যে বিমান আক্রমণ চলছে। সাধারণ মানুষের সাহসিকতা ও ভীতি যুদ্ধের সময়ে কি রকম আপেক্ষিক হয়ে ওঠে, তার একটি কৌতুকমিশ্রিত দলিল হচ্ছে এই ছবিটি।

বুলগেরিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী দিবসে দেখানো হয় 'দি এইটথ'। এটিও একটি যুদ্ধকালীন চিত্র। একটি প্যারাশুট-বাহিনী বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বাধাপ্রাপ্ত হয় শাসকগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত বাহিনী দ্বারা। তাদের এড়িয়ে মাত্র দুজন তাদের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছতে সমর্থ হয়। যাকে ওরা ভীতু মনে করত, যে বারংবার প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছে, যে ছিল ব্যক্তিগত জীবনে একজন নাপিত, সেই অষ্টম লোকটিই শেষ পর্যন্ত চরম সাহসিকতা দেখাল। ঐ অষ্টম ব্যক্তিটিই ছবিটিকেও প্রাণবন্ত এবং উপভোগ্য করে তুলেছে।

'মেন অন এ বিজনেস ট্রিপ' ছবিখানি কোনোও প্রদর্শনীতেই স্থান পাবার উপ-যোগী নয়। তিনটি ছোট গল্পের সমন্বয়ে ছবিটি গ্রথিত। একজন টেনিস খেলোয়াড় তার পতিগত প্রাণ স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে গেল তার প্রণয়িনী সমেত। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক তার সুখের সংসার থেকে কর্মো-পলক্ষ্যে বেরিয়ে কেমন অতর্কিতে একটি নারীর মোহে পড়ল, তাই নিয়ে দ্বিতীয় কাহিনী; তৃতীয় কাহিনীটি একজন নারীলোভী চলচ্চিত্র পরিচালককে কেন্দ্র করে রচিত। ছবিটিকে আদৌ উচ্চপর্যায়ের বলে মনে করতে পারছি না।

কাহিনী চিত্রগুলির সঙ্গে কয়েকটি স্বল্প-দৈর্ঘ্য চিত্র দেখানো হয়েছিল। তার মধ্যে বুল-গেরিয়া সার্কাস, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও পুতুল কার্টুন চিত্র ছিল চমৎকার উপভোগ্য। শোনা যাচ্ছে শিগগিরই বুল-গেরিয়াতে 'ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে।

শুক্রবার ১২ই থেকে

নিষ্ঠুর নিয়তির নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত এক নিষ্পাপ হৃদয়ের কাহিনী

রাজশ্রী পিকচার্স পরিবেশিত

আলেয়া-রূপম-সুরশ্রী

রূপারূণ (চেতলা) ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

CENTRAL LIBRARY

জলসা

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতির একক অনুষ্ঠান

একই শিল্পীর কোনো বিশেষ বিষয়াশ্রিত অনুষ্ঠানই পরিবেশনার শিল্প-নৈপুণ্যে কতটা চিত্তগ্রাহী হতে পারে একাধিকবার তারই উল্লেখযোগ্য উদাহরণ কোলকাতার সঙ্গীতরসিক মহলে পেশ করেছেন যুবসম্প্রদায়ের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তরুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আশ্চর্য সাফল্য যে তরুণদের শিল্পীগোষ্ঠীকে একক সঙ্গীত পরিবেশনায় অনুপ্রাণিত করেছে তারই প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রসদনে এক প্রভাতী আসর আর একটি নাচের সংযোজনে। ইনি শ্রীধীরেন বসু। গেয়েছেন নজরুলগীতি। কবি নজরুলের গানেরও জনপ্রিয়তার তালিকায় একটি বিশেষ স্থান আছে। বিদ্রোহী কবির 'মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম' ইত্যাদি উদ্দীপক গান ছাড়াও তাঁর প্রেম, ভাবগীতির বিভিন্ন দিকটি সুনির্বাচিত বহুখানি গানের মাধ্যমে ধীরেন বসু সার্থকভাবে মেলে ধরেছেন। এবং বলা বাহুল্য আন্তরিকতার গুণে শ্রোতাদের সম্বর্ধনাও লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় এবং সর্বাংশে অনুষ্ঠানে মঞ্চে এলেন শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। রবি-শুভ্রর অন্তহীন ঐশ্বর্যলোক থেকে অশোকতরু বেছে নির্বাচন করেছেন রাগাশ্রিত দশখানি গান। প্রথম শুরু হোলো 'বানকেলী' রাগাশ্রিত 'স্বপন যদি ভাঙালে' ও 'দাও হে হৃদয় ভরে দাও' গানদুটি নিয়ে। প্রথম গানটি তালবিহীনভাবে সুরপ্রধান বিস্তার অংশে এবং দ্বিতীয়টি ছন্দ-দোলায়িত তালে পরিবেশিত হওয়ায় সুনিপুণ শিল্পকৌশলে একাধারে রাগ-সঙ্গীতের আলাপ ও দ্রুত গানের আমেজকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাহুল সুর সম্ভারের সঙ্গে মিশেছে মহা-কবির অতুলনীয় বাক্‌বৈভব। যার সাধনী অন্তরের সাধনার প্রসাদে এ মিলনের আনন্দকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই অশোকতরুর গায়কী এক নিমেষে দর্শক-চিত্তকে আবিষ্ট না করে পারে না। সঙ্গীত নির্বাচন ও রাগবৈচিত্র্য এবং ভাববৈচিত্র্য উভয় দিকেতেই পরিবেশনা শিল্পীর বিদগ্ধ মনের অন্তর্দৃষ্টির আলোয় দীপ্ত। ভক্তি ভাবের আত্মনিবেদনী আবেগের পরই শিল্পী এলেন সখা আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে হাসিতে। কখনও উচ্ছ্বসিত আহ্বানে (অবোধ মন লয়ে ফিরে ভবে, বাসনা কাঁদে হা হা রবে), কখনও কৌতুকে (এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো) কখনও দুঃখ বেদনার নানাবর্ণা আবেশের পর তেওড়া ছন্দে গানের দ্রুতগতিতে ফিরে আসার অননুকরণীয় ভঙ্গী রীতিমত সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে।

ললিত মধুর ভাষাপাঠে অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করেছেন সর্বশ্রী প্রদীপ ঘোষ ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীতালির সারস্বত সম্মেলন : বিগত শ্রীপঞ্চমীতে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন 'গীতালি' উদ্‌যাপন করেন সারস্বত সম্মেলন— শিক্ষায়তনের শ্যামবাজারস্থ প্রধান কার্যালয়ে। সমগ্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিথীকা কুণ্ডু, মাধুরী মিত্র ও মঞ্জরী রক্ষিত, গীটারে গোপাল বসাক ও শিবনাথ সাহা, তবলা-লহরায় কাজল ভট্টাচার্য ও বেহালায় শান্তা সাহা সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। শ্রীমতি সাহা কণ্ঠসঙ্গীতে শুদ্ধকল্যাণ রাগ পরিবেশন করেন। আসরের শেষ শিল্পী ছিলেন গীতালির অধ্যক্ষ পঙ্কজ সাহা। ইনি বিভিন্ন প্রকারের লঘুসঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের আনন্দ দেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বাণী মুখার্জি, অনুভা মৈত্র ও মীরা সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানে তবলায় সহযোগিতা করেন গৌরচাঁদ অধিকারী, কাজলকুমার ভট্টাচার্য, সুনীল-কুমার দে ও পঙ্কজ সাহা।

তিমিরবরণের সমবেত বাদ্য

দীর্ঘকালের ব্যবধানে মঞ্চে আবার বাদ্য সম্মেলনের পরিচালকরূপে তিমিরবরণের আবির্ভাব কোলকাতার কলারসিক মহলের সীমাহীন আনন্দের কারণ হয়েছিলো। এজন্য ধন্যবাদার্হ রবীন্দ্রসদন কমিটির সম্পাদিকা শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়। ইনি সাংবাদিক মহলকে জানান কোনোরকম ব্যবসায়িক লাভের জন্য এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় নি। বাংলা তথা ভারতের প্রগতিশীল বাদ্যবৃন্দের জনক তিমিরবাবুকে আজকের দিনের সঙ্গীতরসিক মহলের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত করানই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

ভারতীয় অর্কেস্ট্রার উৎসধারা অনুসরণ করে পিছন ফিরে তাকালে চোখে পড়ে গুরু আলাউদ্দিন, বিষ্ণুদাস শিরালী, হাবু দত্ত (যদিও স্মরণাতীত যুগের মানুষ) পরে জয়রাম আচার্য ও পণ্ডিত রবিশঙ্করের অবদানের বিশিষ্ট স্বাক্ষর-সমৃদ্ধ বিভিন্ন ধাঁচের সম্মেলক বাদ্যের অধ্যায়। সাম্প্রতিক কালে আধুনিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভি বালসারার ভূমিকাও স্মরণযোগ্য। তবু ভারতীয় অর্কেস্ট্রা বলতে তিমিরবরণকেই আগে মনে পড়ে যায় তার কারণ তিমিরবরণের অনলস সাধনা, চিন্তা ও বিচিত্র ধরণের অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণেই ভারতীয় সম্মেলন-বাদ্যের এমন একটি বিশিষ্ট রূপ-কল্পনা সম্ভব হয়েছে যার মধ্যে ইউ-রোপীয়ান অর্কেস্ট্রার রীতিনীতি বজায় রেখেও ভারতীয় সঙ্গীতের আবেগধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তথা মাধুর্যের দিকটি বিকশিত হতে পেরেছে। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ দর্শকবৃন্দের কাছে শিল্পী পরিচিতি জ্ঞাপন করেন এবং উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে উপস্থিত সুধীবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানান ডাঃ রমা চৌধুরী। বিভিন্ন ধরণের ভারতীয় সমন্বয়-বাদ্য শুরু হোলো 'আবাহনী' তথা সঙ্গীতলক্ষ্মীর বন্দনা দিয়ে। সীমিত পরিসরের মধ্যেও ভক্তির ঊর্ধ্বমুখী আকুতিকে অনুভব করা গেল পরিণত শিল্পবোধের কল্পনাসমৃদ্ধ প্রসাদে। এরপর 'রজনী'। প্রণয়ীর মনোরঞ্জনে ব্যর্থকাম নায়িকার হতাশা, কারুণ্য ও করুণতার বর্ণ-বৈচিত্র্য দুটি রাগের মিলনে রসোত্তীর্ণ। ত্রি-বিধ লয়ে বিষণ্ণতা চিন্তা, তারপর মিলনোৎসুক চিত্তের আশা-নিরাশার দোলা ও পরিশেষে সীমাহীন বেদনার অন্ধকারে বিলীয়মান উচ্ছ্বাসের ক্রমমন্থর গতি তিমিরবরণের কল্পনার ঐশ্বর্যকে নতুন করে মর্মগোচর করে। সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ অনুষ্ঠান ছিল কবিগুরুর 'জন্মতীর্থ'র ভাব-বিশ্লেষণী তিমিরবরণের সুবিখ্যাত সঙ্গীত। মানুষের জন্ম, সূক্ষ্ম সত্তার সঙ্গে স্থূল সত্তার দ্বন্দ্ব—পরিশেষে চিরন্তন কল্যাণের জয় এই ছিল এর পটভূমি। অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্পর্শজাত এ সঙ্গীতরচনা আপন মহিমায় শ্রোতাদের চিত্তে এক অনপনেয় প্রভাব রেখে গেল। তিমিরবরণের আগে অধ্যাপক ভাস্কর মিত্রের কয়েকটি সমন্বয় সঙ্গীত রচনার বক্তব্য চিন্তার ছাপ যতটা সুরসৃষ্টির কারিগরী ততটা নয়। তবে যথোপযুক্ত অনুশীলনে শ্রীমিত্রর ধারণা প্রকাশভঙ্গীর সুষ্ঠুতায় পৌঁছবে এই আশা আমরা করি। এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় অংশে ছিল রবিশঙ্করের শিষ্য শ্রীদীপক চৌধুরীর মাঝ-খাম্বাজ রাগে সেতার বাদন।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলার কথা

অজয় বসু

আর এক কঠিন পরীক্ষা

সত্তরের দশকের প্রথম পরীক্ষা দিতে ভারতীয় ক্রিকেট দল পরীক্ষা-কেন্দ্রে গিয়ে হাজির হয়েছে। দ্বীপময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজেই এই পরীক্ষার ব্যবস্থা।

জাত ক্রিকেটের বড় শরিক যে দেশ, সেই দেশের তরুণদের বাড়তি প্রাণশক্তির প্রবাহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-ভূমিকে চিরদিন উর্বর করেছে। সেই সব তরুণের দুরন্তপনায় ক্রিকেটের ঐশ্বর্য বেড়েছে, দুর্দান্ত যৌবনের উত্তাপে একে একে বহু কীর্তির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এমনি করেই যুগ-যুগান্তের ইতিহাস হয়েছে সমৃদ্ধ।

ক্রিকেট একটি খেলাই, পরম রমণীয়—এই সত্যে অবিচল থেকে যে-দেশের মাটি ও মাঠ জর্জ হেডলে, স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, সনি রামাধিন, আলফ ভ্যালেন্টাইন, ল্যান্স গিবস, রোহান কানহাই ও গ্যারি সোবার্সের মতো সৃজনধর্মীতা এবং লর্ড লিয়ারি কনস্টানটাইন, মার্টিন ডেল, ওয়েসলি হলের উদ্ধত প্রতিভাকে সস্নেহে লালন-পালন করেছে, সেই দেশের ক্রিকেট ঐতিহ্য বরণীয়ও বটে। স্মরণীয় ক্রিকেটারদের নাম-মাহাত্ম্যে সদাই মুখরিত যে-দেশের আকাশ ও বাতাস, সেই দেশে গিয়েই আজ ভারতীয়দের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। এ-পরীক্ষা যে কি কঠিন তা কে না জানে।

এমন পরীক্ষা ভারতকে আরও দুবার দিতে হয়েছিল। প্রথমবারের (১৯৫৩) ফলাফল তবু উল্লেখযোগ্য—মাত্র একটি টেস্টে হার, তিনদিনের এক খেলায় (জ্যামাইকার সঙ্গে) ও দুদিনের অন্য এক ম্যাচে (স্থানীয় ভারতীয় একাদশের সঙ্গে) জয়লাভ, বাকী সব খেলাই অমীমাংসিত। ফলাফলের এ-খতিয়ান রেকর্ড হিসেবে একেবারে নিন্দনীয় নয়। তবে প্রথম সফরে ভারতীয় ক্রিকেটের সম্মান বজায় রাখার দায়িত্ব ছিল যাঁদের ওপর, তাঁদের দলে বিজয় হাজারে, ভিনু মানকাদ, দাত্তু ফাদকার, পলি উমরিগড়, সুভাষ গুপ্তের মতো যশস্বী ক্রিকেটাররা ছিলেন। পরের বারে (১৯৬২) ছিলেন নরি কণ্ট্রাকটর, মনসুর পাতৌদি, উমরিগড়, বোরদে, মনজরেকার, জয়সীমা, ইঞ্জিনীয়ার, প্রসন্নেরা (এবং আরও ক'জন), কিন্তু এঁদের মিলিত চেষ্টাতেও শোচনীয় বিপর্যয়ের (পাঁচটি টেস্ট ও একটি সাধারণ খেলায় হার, জিত মাত্র একটি সাধারণ ম্যাচে—লিওয়ার্ড উইন-ওয়ার্ড আইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে) হাত থেকে ভারতীয় দলকে বাঁচানো যায়নি।

এবারে কি হবে?

আগের দু-দুবারের ইতিহাসের দিক তাকিয়ে ভাবতে বসলে ভরসা পাওয়া কঠিন। তবে পাঁচ-পাঁচটি টেস্টে হেরে যাওয়ার চেয়ে আরও শোচনীয় কাণ্ড যখন ঘটতেই পারে না, তখন একেবারে হাল ছাড়ারও কোনো হেতু নেই। তার চেয়ে বড় কথা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের প্রভাবে পড়ে আগের অনুপাতে আজ অনেকটা হৃতবীর্য। সে হল, সেই গ্রিফিথ, স্যার ওরেল, ওয়ালকট, উইকস কেউ আজ নেই। রোহান কানহাইয়েরও পুরোনো দাপট কোথায়? এক কথায় সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। পুরোনো আমলের ক্রিকেটারদের মধ্যে থাকবার মধ্যে আছেন ক্লাইভ লয়েড ও গ্যারি সোবার্স।

গ্যারি সোবার্স অবশ্য একাই একশো। তবু এই ভেবে আমরা ভরসা পেতে পারি যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটও আজ এক বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ওঁরাও ওঁদের ক্রিকেটকে গড়তে চাইছেন। পরিস্থিতি এখনও একসপেরিমেণ্টাল। কাজেই পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই যদি আমরা আঘাত হানতে পারি তাহলে আমাদের আকস্মিকতায় শত্রুপক্ষ হঠাৎ বিচলিত বোধ করতে পারে। সেই আঘাত সামলে তাঁরা আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারবেন কিনা তা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে। আসল কথা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বর্তমানে আগের মতো প্রস্তুত নয়। ওঁদের বুকে হানা দেওয়ার এই তো উপযুক্ত অবসর। তবে ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে তেমনভাবে আঘাত কেই বা ছোঁড়েন। ফাস্ট বোলার-বর্জিত দেশের তরফ থেকে আকস্মিক আঘাতের তুফান তোলা আর দিবাস্বপ্ন দেখা, দুই-ই সমান।

ভারতীয় দলের প্রসন্ন, বেদী আছেন। স্পিনে স্পিনে মদত জোগাতে আরও আছে ভেঙ্কটরাঘবন, সেলিম দুরানী, একনাথ সোলকার। প্রসন্ন-বেদীর মতো দক্ষ স্পিন জুটি আজ অন্য কোনো দেশেও নেই। তাঁরাই ভারতীয় ক্রিকেটের পরম ভরসা। কিন্তু এই যুগল স্পিনারের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধাশীল থেকেও অন্য সব দিকে চোখ বুঁজে থাকার ভান করাটা কি যুক্তিযুক্ত হবে? প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে যে বকটি তার ঠোঁট থেকে গলা পর্যন্ত বাঘের মধ্যে ডুবিয়ে বসেছিল, ভয়ের হাত থেকে রেহাই পেলেও সে কি সত্যই প্রাণে বেঁচেছিল?

ভারতীয় ক্রিকেটের অবস্থাটা অনেকটা ওই বকের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পেস বোলার নেই এবং তা না থাকার দরুণ যে বিপদ সর্বদাই মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে, সেই বিপদ ভুলতে ভারতীয় ক্রিকেটও সর্বক্ষণই অজুহাত পাড়ছে যে, আমাদের স্পিনিং সামর্থ্য অঢেল—আমাদের প্রসন্ন আছেন, আছেন বেদী। এই অজুহাত তুলে উত্তোলিত খাঁড়ার অস্তিত্বকে অস্বীকারের প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নির্দয় খাঁড়াটির নেমে আসার পথটিকে রোখা যায় না। যাচ্ছেও না।

ক্রিকেটের সব ছাত্রই জানেন যে, ব্যাটসম্যানকে ঠকাতে সবচেয়ে বড় আয়ুধ হলো পেস বোলিং। কারণ, পেস বোলিং আকস্মিকতার চমক জাগিয়ে নিশ্চিত ঘটনাকে যেমন অনিশ্চিত করতে পারে তেমনটি আর কিছুতেই সম্ভব নয়। মাথার জিলাপির মতো প্যাঁচের পর প্যাঁচ কষে স্পিন বোলাররা বুদ্ধির খেলায় মস্তো বাহাদুরী দেখান, সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও সাধারণভাবে বলা যায় যে পেস বোলাররাই ভাল মতো পারেন ব্যাটসম্যানদের চমকে দিতে এবং যতো চমক ততোই সাফল্য। দুঃখের কথা (এবং লজ্জারও বটে), আমাদের পেস বোলিংয়ের দৈন্য আজও ঘুচলো না এবং সেই অভাব ঘোচাতে সনিষ্ঠ চেষ্টাও করা হলো না।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দলে অনেক স্পিনার রয়েছেন। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় পেস বোলিংয়ের দৈন্য ঢাকা যাবে না। মানতেই হবে যে যুদ্ধ জয়ের, বোঝার দায়িত্বের বড় ভাগটা স্পিন বোলারদেরই কাঁধ পেতে নিতে হবে। এ দায়িত্ব কিন্তু দুর্বহ। কারণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পিচ শক্ত, ভঙ্গুর নয়। প্রসন্ন ও বেদীর কথা চিন্তা করে গত ক'বছরে ভারতে যে ধরনের উইকেট বানানো হয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উইকেট সে ধরনের থাকবে না। কাজেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিতে ভারতীয় স্পিনারদের এবার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেই হবে।

অবশ্য এ মেহনত করতে যে তাঁরা রাজী, প্রসন্ন ও বেদীর পূর্ব ইতিহাসেই তা প্রকাশ। অদূরে যখন এই আলোচনা হবে তখন হয়তো প্রসন্ন ও বেদীর কর্ম-দক্ষতার আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কারণ, ততোদিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের খেলাও সুরু হয়ে যাবে। তবু আমার মনে হয় যে সফরকামী দলে একজন ডানহাতী লেগ স্পিনার (চন্দ্রশেখর?) থাকলে ভাল হোতো। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানেরা সাধারণভাবে পেছনের পায়ে ভর রেখে খেলতে অভ্যস্ত। তাঁদের ব্যাটিং রীতির ভিত্তিই হলো ব্যাক ফুট। এই পদ্ধতিতে যাঁরা খেলেন তাঁদের মোকাবিলায় লেগ স্পিন ও আউট সুইংই সবিশেষ কার্যকর হয়। ভারতীয় দলে ন্যাটা অফ স্পিনার (ডানহাতী ব্যাটসম্যানের ক্ষেত্রে যাঁরা লেগ স্পিন করে থাকেন) বেশ কজন থাকেন বটে। কিন্তু ডানহাতী লেগ স্পিনার একজনও নেই। হয়তো এমন একজনের অভাব সফর চলার সময় বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। যেহেতু কব্জী ঘুরিয়ে বল করেন বলে ডানহাতী লেগ স্পিনারেরা আকস্মিকতার খোরাক যোগাতে পারেন ন্যাটা অফ স্পিনারদের (যাঁরা মূলতঃ আঙ্গুলের টানেই বলে পাক ধরান) চেয়ে ভাল করেই। যে কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ভারতীয় খেলায় সুভাষ গুপ্তে।

খাঁটি লেগ স্পিনারের অভাব এবং সরদেশাইয়ের দলচ্যুতি, এই দুটি বিষয় ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দল নির্বাচন সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ নেই। নির্বাচনী খেলায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন নির্বাচকেরা তাঁদেরই দলে জায়গা দিয়েছেন। এর চেয়ে ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন পদ্ধতি আর কিই বা হতে পারে? এই পদ্ধতিতেই জনদশেক উঠতি তরুণ এবং সেই সঙ্গে আরও কজন সিনিয়র ক্রিকেটারও দলে ঢুকেছেন। প্রবীণ ও নবীন, উঠতি ও পরিণত খেলোয়াড়ের সমাবেশে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, এই নীতি অনুসরণের ফলে সাহস ও অভিজ্ঞতা, দুয়েরই ঘাটতি ঘটার আশঙ্কা থাকে না।

এতোদিনে ভারতীয় দলের খেলা সুরু হয়ে গিয়েছে। তাই সফরে দলটি কেমন খেলবে, সে প্রশ্ন আজ তোলা হয়তো ঠিক হবে না। তবে সফর শেষ হতে এখনও অনেক বিলম্ব বলেই বলে রাখি যে প্রসন্ন, বেদীর মতোই ওয়াদেকার, বিশ্বনাথ, মানকাদ, জয়ন্তীলাল ও গাভাসকারের ওপর দলের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করছে। ওয়াদেকার এবং বিশ্বনাথ পুরো 'ফরম' নিয়ে ভারত ছাড়েন নি। তাঁদের 'ফরম' ফিরে পাওয়া দরকার। টেস্ট ম্যাচে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী করার পর থেকেই যেন বিশ্বনাথ অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছেন। এর আগে যে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা প্রথম আবির্ভাবে টেস্ট সেঞ্চুরী (লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, কৃপাল সিং, আব্বাস আলি বেগ ও হনুমন্ত সিং) করেছেন তাঁদের কেউই আর টেস্টে দ্বিতীয়বার শতরান করতে পারেন নি। কি যেন এক অদৃশ্য দুর্ভাগ্যে তাঁরা জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বনাথকে পূর্ব ইতিহাস অস্বীকার করে সেই দুর্ভাগ্যকে হার মানাতেই হবে। মনে হয় তিনি সফল হবেন। কারণ, তাঁর যোগ্যতা তো আছেই, তার আছে বয়সের মূলধন। এখনও বহুদিন তিনি খেলবেন বলেই ধরে নেওয়া যায়।

সবশেষে সবচেয়ে বিতর্কিত প্রশ্নের উল্লেখ করে বলতে চাই যে অধিনায়ক বদল করে বিজয় মার্চেন্টের নেতৃত্বে নির্বাচকমণ্ডলী শুধু সাহসেরই নয়, সুস্থ চিন্তারও পরিচয় রেখেছেন।

মনসুর পাতৌদি যেন জন্মসূত্রেই ভারতীয় দল পরিচালনার অধিকার পেয়েছিলেন। তিনি মস্তো ব্যাটসম্যান ও ফিল্ডসম্যান, সন্দেহ নেই। কিন্তু নেতৃজনোচিত সহজাত ব্যক্তিত্ব তাঁর কতোটা আছে, সে বিষয়ে কি সন্দেহের অবকাশ নেই? তাঁর আমলে দলের অনেকেই তেমন 'সিরিয়াস' বলে মনে হয় নি। কাজেই নেতা বদলের প্রশ্নটি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ওয়াদেকারকে পরখ করে দেখার সুযোগটি হাত ছাড়া না করাটা বুদ্ধিমানেরই কাজ হয়েছে।

আরও একটা কথা, পোরবন্দরের মহারাজার (১৯০২) আমল থেকে পাতৌদির নবাব মনসুর আলির যুগ (১৯৬৯) পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট দলের নেতা নির্বাচনে যে একমুখী গোঁজামিল প্রশ্রয় পাচ্ছিল, নেতৃপদে অধিকারের চেয়ে আভিজাত্যের প্রতি মোহ ঘিরেই সেই গোঁজামিলের অস্তিত্ব। আপাততঃ এই গোঁজামিলের হাত থেকে এবারে ভারতীয় দলকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে ওয়াদেকারকে নেতৃপদে বসিয়ে। এ প্রয়াস সাধু। মনে হচ্ছে যে, একটি যুগের অবসানে আর একটি যুগ আসতে চলেছে। এরপর থেকে বোধহয় নেতৃপদে 'কমনম্যান' এরাই কায়েমী হবেন। রাজা, মহারাজা, নবাব, বাদশার বদলে কমনম্যান দলনায়ক—নজীরটি ভারতীয় ক্রিকেটে বিপ্লবাত্মক। এই বিপ্লবকে স্বাগত জানাই। তবে বলতে বাধা যে এই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা উচিত ছিল।

খেলাধুলা

দর্শক

ডুরান্ড কাপ

১৯৭০ সালের ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২—০ গোলে ১৯৭০ সালের রোভার্স কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবকে পরাজিত করে মোট ৬বার ডুরান্ড কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৭০ সালের ফুটবল মরসুমে কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের সাক্ষাৎ এই নিয়ে তিনবার। ১৯৬০ সালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ডুরান্ড কাপের যুগ্মবিজয়ী হয়েছিল এবং ১৯৬৪ সালের ফাইনালে মোহনবাগান ২—০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করেছিল। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল—দুই দলই মোট ৮বার করে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে খেলে ৬বার করে ডুরান্ড কাপ জয়ী হয়েছে। তবে মোহনবাগানের উপর্যুপরি ৩বার (১৯৬৩-৬৫) ডুরান্ড কাপ জয়ের রেকর্ড অপর কোন ভারতীয় দল এ পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি। মোহনবাগান ছাড়া উপর্যুপরি ৩বার ডুরান্ড কাপ পেয়েছে—হাইল্যান্ড লাইট ইনফ্যানট্রি (১৮৯৩-৯৫) এবং ব্ল্যাকওয়াচ রেজিমেন্ট (১৮৯৭-৯৯)।

১৯৭০ সালের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল খেলার উভয় অর্ধেরই ৯ম মিনিটে গোল দেয়। দুটি গোলই করেন ইনসাইড খেলোয়াড় হাবিব। ইস্টবেঙ্গল গোল দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট না করলে আরও বেশী গোলের ব্যবধানে জয়ী হত। ১৯৭০ সালের রোভার্স কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ফাইনাল খেলায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

ফাইনালের পথে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব : গুজরাট একাদশ দলের বিপক্ষে ওয়াক-ওভার, বিকানীরের রাজস্থান আর্মড কনস্টাবুলারীকে ৩—২ গোলে, মীরাটের শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টারকে ৪—২ গোলে এবং সেমিফাইনালে বোম্বাইয়ের মফৎলাল গ্রুপকে ০—০ ও ১—০ গোলে পরাজিত করে।

মোহনবাগান : দিল্লীর মডার্নিটিসকে ৫—০ গোলে, বাঙ্গালোরের এম আর ডি ই দলকে ২—১ গোলে, উইলিংটনের মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টারকে ২—১ গোলে এবং সেমিফাইনালে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিংকে ১—১ ও ৩—০ গোলে পরাজিত করে।

ইস্টবেঙ্গলের ৬বার ডুরান্ড জয়

ফাইনাল খেলা : ১৯৫১ সালে রাজস্থানকে ০—০ ও ১—০ গোলে, ১৯৫২ সালে হায়দরাবাদ পুলিশকে ১—০ গোলে, ১৯৫৬ সালে হায়দরাবাদ পুলিশকে ২—০ গোলে, ১৯৬০ সালে মোহনবাগান দলের সঙ্গে ড্র করে, ১৯৬৭ সালে বি-এন-আর দলকে ১—০ গোলে এবং ১৯৭০ সালে মোহনবাগানকে ২—০ গোলে পরাজিত করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মোট ৬বার ডুরান্ড কাপ জয়ী হয়েছে।

ডুরান্ড কাপ টুর্নামেন্ট ভারতবর্ষের প্রথম নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা, সূচনা ১৮৮৮ সালে। ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী স্যার হেনরী মার্টিমার ডুরান্ড এই প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসাবে একটি কাপও উপহার দেন। তার

হাওড়া স্টেশনে ১৯৭০ সালের ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের সম্বর্ধনার দৃশ্য। ডুরাণ্ড কাপ হাতে ইস্টবেঙ্গল দলের অধিনায়ক শান্ত মিত্র।

এই অবদানের স্বীকৃতিতে তাঁর নামেই প্রতিযোগিতার এবং কাপের নামকরণ হয়েছে। ১৯২০ সাল পর্যন্ত একমাত্র মিলিটারী দলের ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল। ডুরাণ্ড কাপ টুর্ণামেন্টের ইতিহাসে ১৯২৪ সালটি এই দুই কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে—১৯২৪ সালের ৮ই জুন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে টুর্ণামেন্টের প্রতিষ্ঠাতা স্যার হেনরী ডুরাণ্ডের দেহত্যাগ এবং বিশেষ আমন্ত্রণে ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম ভারতীয় এবং প্রথম বে-সামরিক দল হিসাবে মোহনবাগান ক্লাবের যোগদান। ১৯২৪ সালের প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে দুর্ধর্ষ মিলিটারী শেরউড ফরেস্টার্স দলের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেও ভারতীয় ক্রীড়ামহলে বিপুলভাবে আশা-উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। ১৯৪০ সালের ফাইনালে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১—০ গোলে ওয়েলচ রেজিমেন্ট গোরা দলকে হারিয়ে ডুরাণ্ড কাপ জাতিগত করে—তারাই প্রথম ভারতীয় এবং প্রথম বে-সামরিক দল হিসাবে ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। ১৯৫০ সাল থেকে আবার খেলা শুরু হয়েছে এবং ভারতীয় দলই ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে।

কলকাতা তথা বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে এই তিনটি দল—মোহনবাগান ৬বার, ইস্টবেঙ্গল ৬বার এবং মহমেডান স্পোর্টিং ১বার।

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

৬ষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যাণ্ড : ৪৭০ রান (বয়কট ৫৮, এডরিচ ১৩০, ফ্লেচার ৮০ এবং হ্যাম্পশায়ার ৫৫ রান। লিলি ৮৪ রানে ৫ উইকেট)

ও ২৩৩ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বয়কট নটআউট ১১৯ এবং ইলিংওয়ার্থ নটআউট ৪৮ রান। টমসন ৭৯ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২৩৫ রান (স্টাকপোল ৮৭ রান। পিটার লেভার ৪৯ রানে ৪ উইকেট)

ও ৩২৮ রান (৩ উইকেটে। স্টাকপোল ১৩৬ এবং আয়ান চ্যাপেল ১০৪ রান)

এডিলেডে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৬ষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট সিরিজে এই নিয়ে চারটে টেস্ট খেলা ড্র গেল এবং মেলবোর্ণের তৃতীয় টেস্ট খেলা বৃষ্টির জন্যে পরিত্যক্ত হয়েছে, একটা বলও খেলা হয়নি। চতুর্থ টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ২৯৯ রানে জয়ী হওয়ার ফলে বর্তমানে ১—০ খেলায় এগিয়ে আছে। সুতরাং সিরীজের শেষ ৭ম টেস্ট খেলা যদি ড্র যায়, তাহলে ইংল্যাণ্ড 'রাবার' জয়ের সূত্রে কাল্পনিক 'এ্যসেজ' সম্মান লাভ করবে।

এডিলেড মাঠে টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর প্রথম বসে ১৮৮৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর (ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া, ১ম টেস্ট)। এই নিয়ে এডিলেড মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার যে ২০টি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল দাঁড়াল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ১১, ইংল্যাণ্ডের জয় ৬ এবং খেলা ড্র ৩।

প্রথম দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের খেলায় ২টো উইকেট পড়ে ২৭৬ রান উঠেছিল। ১ম উইকেটের জুটিতে বয়কট এবং এডরিচ ১০৭ রান এবং ২য় উইকেটের জুটিতে এডরিচ এবং ফ্লেচার ১৬৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন। এডরিচ ১৩০ রান করে আউট হন। বর্তমান টেস্ট সিরিজে তাঁর এই ২য় সেঞ্চুরী এবং তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০ম সেঞ্চুরী। বর্তমান টেস্ট সিরিজে তিনি ব্যক্তিগত মোট ৫০০ রান ছাড়িয়ে গেছেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ৪৭০ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের শেষ চারটে উইকেট মাত্র ১২ রানের বিনিময়ে পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ডেনিস লিলি ৮৪ রানে ৫টা উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ৫০ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২৩৫ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যাণ্ড ২৩৫ রানে অগ্রগামী থেকেও অস্ট্রেলিয়াকে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য না করে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না খুইয়ে ৪৭ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ড ২য় ইনিংসের ২৩৩ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। বয়কট ১১৯ এবং ইলিংওয়ার্থ ৪৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। বয়কট এই নিয়ে সরকারী টেস্ট খেলায় ৬টা সেঞ্চুরী করলেন। টেস্টের এক

ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান—নট-আউট ২৫৬ (বিপক্ষে ভারতবর্ষ, লিডস, ১৯৬৭)। বর্তমান টেস্ট সিরিজে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় উপস্থিত শীর্ষস্থান লাভ করেছেন জিওফ বয়কট—৬টি টেস্টের ১০ ইনিংসে তাঁর মোট রান দাঁড়িয়েছে ৬৫৭ (গড় ৯৩-৮৫)।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া ৪৬৮ রানের পিছনে পড়ে ২য় ইনিংসে খেলতে নামে। হাতে ছিল ৩৪০ মিনিট খেলার সময়। খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের জন্যে ৪৬৯ রানের প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থ দিনের বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের ১ উইকেট খুইয়ে ১০৪ রান সংগ্রহ করে। স্টাকপোল ৭৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ ইনিংসের খেলায় নির্দিষ্ট ৩৪০ মিনিট সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৬৯ রান সংগ্রহ করা মোটেই সহজ কাজ নয়। এই অবস্থায় খেলায় পরাজয়ের সম্ভাবনাই বেশী, খেলা ড্র রাখা খুবই কৃতিত্বের পরিচয়। টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে ৪র্থ ইনিংসের খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪০০ বা তার বেশী রান তুলে, একেবারে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে এমন নজির মাত্র একটি আছে এবং তা হয়েছে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাতেই। ১৯৪৮ সালে লিডস মাঠের ৪র্থ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৮ উইকেটের বিনিময়ে ৩৬৫ রান তুলে ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪০৪ রান তুলে ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

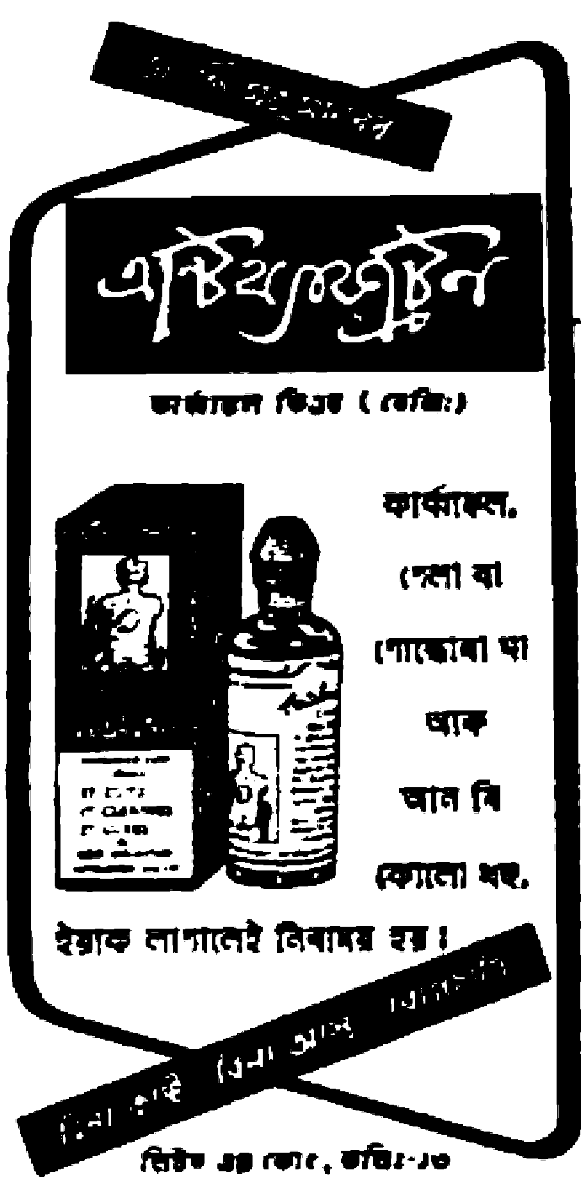

পঞ্চম অর্থাৎ শেষদিনে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের ৩২৮ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় ৬ষ্ঠ টেস্ট খেলা শেষ হলে খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। ২য় উইকেটের জুটিতে স্টাকপোল (১৩৬ রান) এবং আয়ান চ্যাপেল (১০৪ রান) দলের ২০২ রান তুলে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন।

ইংল্যান্ড বর্তমানে ১—০ খেলায় এগিয়ে আছে। ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট সিরিজ ড্র রাখতে হলে শেষ ৭ম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে জিততেই হবে। নতুবা ইংল্যান্ড 'এ্যাসেজ' সম্মান পেয়ে যাবে। ফলে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট দল গঠনের কর্মকর্তারা ৭ম টেস্ট খেলায় ঢেলে দল সাজিয়েছেন। ৬ষ্ঠ টেস্ট খেলায় যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে চারজন ৭ম টেস্ট খেলায় বাদ পড়েছেন। অধিনায়ক বিল লরী দলচ্যুত হয়েছেন, তাঁর জায়গায় অধিনায়ক হয়েছেন আয়ান চ্যাপেল। ১৯৬১ সাল থেকে বিল লরী অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট দলে নিয়মিত খেলে এই প্রথম বাদ পড়লেন। তাঁর অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়ার উল্লেখযোগ্য সাফল্য—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে 'এ্যাসেজ' সম্মান লাভ। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া শোচনীয়ভাবে ০—৪ খেলায় হেরে যাওয়াতে বিল লরীর নেতৃত্ব সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বিল লরীর খেলা সম্পর্কে বড় অভিযোগ—বর্তমানে তিনি অত্যন্ত ধীর গতিতে ব্যাট করেন এবং দল পরিচালনায় সাহসের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

রঞ্জি ট্রফি

১৯৭০ সালের আঞ্চলিক আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল দল ৩৬৫ রানের ব্যবধানে গতবারের রানার্স-আপ উত্তরাঞ্চল দলকে পরাজিত করে রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চল দলের এই প্রথম রোহিন্টন ট্রফি জয়।

প্রথম দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ,১৯৪ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ের খেলায় উত্তরাঞ্চল দল ১ম ইনিংসের ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৪৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে উত্তরাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ১৪৬ রানের মাথায় শেষ হয়। দক্ষিণাঞ্চল ৪৮ রানে এগিয়ে ২য় ইনিংসে ১৫০ রান (৪ উইকেটে) সংগ্রহ করে এবং সেই সূত্রে ১৯৮ রানে এগিয়ে যায়। হাতে জমা থাকে ২য় ইনিংসের ৬টা উইকেট

তৃতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস ৪২১ রানের মাথায় শেষ হলে উত্তরাঞ্চল দল ২য় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪২ রান সংগ্রহ করেছিল। দক্ষিণাঞ্চল দলের ২য় ইনিংসে বাবেশ টোপ্ডন (৭৬ রান) এবং মহম্মদ ইব্রাহিম (৫৪ রান) ৯ম উইকেটের জুটিতে দলের ১২৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের ৫০ মিনিট আগে ১০৪ রানের মাথায় উত্তরাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস শেষ হলে দক্ষিণাঞ্চল দল ৩৭৫ রানে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

দক্ষিণাঞ্চল : ১৯৪ রান (পি মুকুন্দ ২৪ রান। ভালওয়ার ৯ রানে ৩, বলবীর সিং ৪২ রানে ৩ এবং মদনলাল ১৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪২১ রান (টোপ্ডন ৭৬, দেশপান্ডে ৬৬, বিজয়কৃষ্ণ ৫৮ এবং ইব্রাহিম ৫৪ রান। বলবীর সিং ৯৬ রানে ৪ এবং মদনলাল ১৫১ রানে ৪ উইকেট)

উত্তরাঞ্চল : ১৭৬ রান (মাড়ওয়া ৪৫ রান। অশোক জগৎ ৫৯ রানে ৩ এবং বিজয়কৃষ্ণ ৩১ রানে ৪ উইকেট)

ও ১০৭ রান (বিজয়কৃষ্ণ ৩ রানে ৩ এবং এবং জগৎ ৫৪ রানে ৫ উইকেট)

মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

মহিলাদের ২৪তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে পাঞ্জাব ৪—২ গোলে গত বছরের বিজয়ী মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে লেডী রতন টাটা ট্রফি জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ১—১ গোলে ড্র ছিল। পেপসু ১—০ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পাঞ্জাব ১৯৬৮ সালের ফাইনালে জয়ী হয়ে ১৯৬৯ সালের ফাইনালে মহারাষ্ট্রের কাছে হেরেছিল।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উঠেছিল পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, পেপসু এবং মহীশূর। সেমিফাইনাল খেলা হয়েছিল লীগ প্রথায়। সেমিফাইনাল খেলাতেও পাঞ্জাব ২—১ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করেছিল। সেমিফাইনালের এই লীগের খেলায় শীর্ষস্থান পেয়েছিল পাঞ্জাব (জয় ২ এবং ড্র ১) এবং দ্বিতীয় স্থান মহারাষ্ট্র (জয় ২ ও হার ১)।

আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্স

বালক বিভাগের (বয়স ১৪ অনূর্ধ্ব) ১০০ মিটার দৌড়ে রৌপ্যপদক বিজয়ীর নাম হবে—পি রায় (সিটি এ ক্লাব)—অমৃতের ৩১ সংখ্যার ৭৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিক্সের ফলাফল দ্রষ্টব্য।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

এক অত্যাশ্চর্য সাহিত্য সংবাদ !

শংকর-এর নূতন উপন্যাস !

বহুল পরিবর্ধিত আকারে আজ প্রকাশিত হলো

সীমাবদ্ধ

শংকর-এর সাহিত্যজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা এই উপন্যাসটির পটভূমি চৌরঙ্গী রোডের প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক কোম্পানী হিন্দুস্থান পিটার্স লিমিটেড বা ভারতে সর্বাধিকযুক্ত এবং যার 'সওদাগরের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ'। সওদাগরী অফিসের উচ্চতলার মানুষদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী এমন দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এর আগে আর কেউ প্রকাশ করেন নি। ... সমকালের সমস্যা নিয়ে বাংলা ভাষায় স্মরণীয় উপন্যাস লেখা হচ্ছে না বলে যাঁরা অভিযোগ করেন—তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন শংকরের এই চাঞ্চল্যকর উপন্যাসটি সম্পূর্ণ আকারে পড়ে দেখুন। 'কত অজানারে' 'চৌরঙ্গী' এবং 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'র লেখক হিসাবে দুই বাংলার অগণিত পাঠক-পাঠিকার হৃদয় যিনি আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত—সেই শংকরের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস বাংলাসাহিত্যের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করল ॥ ॥ দাম—ছয় টাকা ॥

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের

জঙ্গলে জঙ্গলে ৫.

লেখক নূতন—তাই বলে তাঁর লেখার হাত নূতন নয়। যে সমস্ত লেখক প্রথম বইতেই বাজীমাৎ করেছেন শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ তাঁদের শ্রেণীতেই পড়েন। তাপা তাঁর আফ্রিকা থেকে সোয়াহিলিদের জঙ্গল পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। টাটা থেকে রাজধানী যাবার রেল-লাইন প্রথম যখন পাতা শুরু হয় তখনই সরস কৌতূহলোদ্দীপক ও রোমহর্ষক কাহিনী বইটির পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে।

লীলা মজুমদারের

পাখী ৫.

সাপ্তাহিক অমৃতে ধারাবাহিক প্রকাশিত লীলা মজুমদারের অনন্যসাধারণ গ্রন্থ "পাখী" পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

জ্যোতির্বিন্দু চৌধুরী ও সর্বাজিৎ চৌধুরীর

সুবর্ণগিরির উপজাতি

অনন্যসুন্দরী নেফা ও সেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। বহুচিত্র সম্বলিত ও সুন্দর প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হইতেছে।

দাম—ছয় টাকা।

বাংলা পকেট বই

গ্রাহক করা চলিতেছে ॥ ৩০শে মার্চ পর্যন্ত গ্রাহক করা হইবে

প্রতিটি নূতন উপন্যাস মূল্য মাত্র দু'টাকা

সাধারণ পাঠক এবং এজেন্টগণ সত্বর যোগাযোগ করুন

বিভূতি-রচনাবলী ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড ॥ প্রকাশিত হইয়াছে

প্রতি খণ্ড ॥ চৌদ্দ টাকা — গ্রাহকগণকে জানানো হইতেছে তাঁদের কুপন কার্ড জমা দিয়ে বই সংগ্রহ করুন।

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২ ফোন ঃ ৩৪-৮৭৯১ — ৩৪-৩৪৯২

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়...তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা পৃথিবীর কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না! নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লাখ লাখ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়
মনিহারি দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

davp 90/300

সজনী প্রেসের বই!

প্রকাশিত হল!

রাজ চক্রবর্তী প্রণীত

সেইমনসেইদাহ

ত্রিকোণ প্রেম দিয়ে যদিও গ্রন্থের শুরু, গ্রন্থের মধ্যভাগে অনিবার্য নিয়তির মতো মুখ বাড়িয়েছে যৌবনসর্বস্বা অনন্যা রূপসী লোমা ওয়ার্দি। যার দুরন্ত আকর্ষণের আগুনে দগ্ধ হয়েছে পরিমল, রক্তাক্ত হয়েছে ডাঃ অরুণ রায়, অণুক্ষণ জ্বলে জ্বলে খাক হয়েছে মল্লিক।...

প্রেম, পতন ও প্রবঞ্চনার রোমাঞ্চকর এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে পাঠক-পাঠিকার প্রচণ্ড অভিনন্দনে ধন্য হবে।

দাম : বারো টাকা

রাজ চক্রবর্তীর

আরেকটি সাড়াজাগানো উপন্যাস

লাস্ট অপারেশন

আনন্দবাজার-যুগান্তর-বসুমতী-অমৃত ও সিনে-এ্যাডভান্স পত্র-পত্রিকাতে সরব প্রশংসিত

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়—পাঁচ টাকা

পরিবেশক : ডি এম লাইব্রেরী

৪২ বিধান সরণী, কলি—৬

মডেল পাবলিশিং কোং

২৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪১শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 19th February, 1971. শুক্রবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৭৭ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৬৪	চিঠিপত্র		
১৬৬	সাদাচোখে		—শ্রীকমলাশী
১৬৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
১৭১	সম্পাদকীয়		
১৭২	সুখের ক্রন্দন	(কবিতা)	—শ্রীসুধীর করণ
১৭২	এইখানে কান্নাকাটি	(কবিতা)	—শ্রীতরুণ সেন
১৭২	আমার গাড়ী	(কবিতা)	—শ্রীরূপা চট্টোপাধ্যায়
১৭৩	শূন্য	(গল্প)	—শ্রীদেবল দেববর্মা
১৮০	দুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
১৮০	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯	দীনবন্ধু এনড্রুজ স্মরণে		—শ্রীশুভঙ্কর পাঠক
১৯০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১৯৫	বৈকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
১৯৭	খাঁচার পাখি	(বড় গল্প)	—শ্রীমানব সান্যাল
২০০	বিষাক্ত ভবিষ্যৎ		—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
২০৫	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
২০৭	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২১১	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
২১৪	অরণ্যের ঘরে		—শ্রীঅজয় হোম
২১৯	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
২২১	পিঞ্জর	(উপন্যাস)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
২২৭	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
২২৮	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
২৩০	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
২৩৫	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
২৩৭	ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারতীয় ক্রিকেট দল		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
২৪০	খেলাধুলা		

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস —শ্রীদর্শক

পি. ব্যানার্জীর

অর্শ চিকিৎসা

৩০ পিল	টাঃ ২.৫০
১৬ পুরিয়া চূর্ণ	২.২৫
মলম ৩০ গ্রাঃ	২.৫০

বিনামূল্যে বিবরণী দেওয়া হয়

পি. ব্যানার্জী

৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

৫৩, গ্রে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬

১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

নিবেদন

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

পুস্তকের ২য় সংস্করণ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়াছে এবং বহুল পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। সেই ৩য় সংস্করণের মূল্য ছয় টাকা ও শোভন সংস্করণের জন্য আট টাকা নির্ধারিত হইয়াছে।

পুস্তকের পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া অর্ডার বুক করিলে পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পরেই আমরা রেজিষ্ট্রি ডাকে প্রেরণ করিয়া দিব। কোন ডাক খরচা লাগিবে না।

চিঠিপত্র

মুখের মেলার পক্ষে বিপক্ষে

জব্বার সাহেবকে ধন্যবাদ জানাতে পারলাম না। সপ্তম বর্ষ ৩১ সংখ্যার অমৃতে মুখের মেলা পড়ে বিস্মিত হয়েছি। ইদানিং জব্বার সাহেব যেভাবে লেখার ঘটিয়ে শুরু করেছেন, তাতে বিস্মিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। সমস্যা বিজড়িত গ্রাম বাংলার আশা নিরাশা সুখ-দুঃখের এবং বাঙালীর অন্তরের কথা শুনিয়ে বাঙালী পাঠকসমাজকে এতদিন মুগ্ধ করে এসেছে। অমৃতের পাতায় দুলালী কাহিনী পড়লাম। বস্তুতঃ দুলালীর চিত্রটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং অবাস্তব: পাগলা, পাগলীর কাহিনী অল্পবিস্তর আমরা সকলেই জানি। সমাজে বাস করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমরা অনেকেই পরিচিত। অস্বাভাবিক এবং অসম্পূর্ণ কোন কিছুই সহজভাবে পাঠক গ্রহণ করতে পারে না। দুলালীর মা হওয়াটা অস্বাভাবিক ঘটনা এবং আরো বেশী অস্বাভাবিক লাগে গফুর মিয়ার পাগলামো।

বুড়ো গফুর মিয়ার যৌন উন্মাদনা এমন হওয়াটা কি স্বাভাবিক? তাছাড়া দুলালীর যৌন আকর্ষণ কিছু থাকলেও থাকতে পারে। তাই বলে সুস্থ মস্তিষ্কের একজন মানুষ কি ভাবে দুলালীর টানে ছুটতে পারে সেটাই আমার কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন। জব্বার সাহেবকে অনুরোধ গ্রাম বাংলার সুস্থ মানবজীবনের সম্পূর্ণ চিত্র এঁকে আমাদের উপহার দেবেন।

জানি এ চিঠি অমৃতের পাতায় প্রকাশ হবে না, কারণ ইতিপূর্বে লক্ষ্য করে এসেছি প্রশংসা করে না লিখলে সে চিঠি ডাস্টবিনে গিয়ে উপস্থিত হয়। অমৃতের পাতায় এ চিঠি প্রকাশ না হলেও ক্ষতি নেই। যদি ভবিষ্যতে খাঁটি অমৃত পাওয়া যায়।

—শেখ নজরুল ইসলাম,
হাওড়া।

(২)

অমৃত পত্রিকার ২২এ মাঘ সংখ্যায় আদম ফকিরের চিঠির মূল বক্তব্যের সংগে একমত হয়ে আমিও বলতে চাই ফিচারধর্মী রচনা ততদিনই প্রকাশিত হওয়া উচিত যতদিন অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার কাছে তা একঘেঁয়ে মনে না হয়।

বলতে পারা যায় মুখের মেলা ফিচারধর্মী রচনা অনেকের কাছে ইতিমধ্যেই একঘেয়েমির [illegible] সৃষ্টি করেছে। এই রচনার কয়েকটি বিরূপ সমালোচনা অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে পড়েছি। অবশ্য কতকজন উৎসাহী পাঠক আবদুল জব্বারের রচনার প্রশংসাও করেছেন। সেই জন্য অধিক-সংখ্যক পাঠকের কাছে তা একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছে কিনা, সরাসরি সে সিদ্ধান্তে পৌঁছান কঠিন। সম্পাদক মহাশয়ের কাছে অনুরোধ, তিনি যেদিন উপলব্ধি করবেন যে আবদুল জব্বারের মুখের মেলা ফিচারধর্মী রচনার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে, সেদিনই তা প্রকাশে যেন বিরত হন। তার পরিবর্তে আমরা উন্নত ধরনের অন্য ফিচার কামনা করি।

—কৃষ্ণচন্দ্র সাহা, দ্বারভাঙ্গা।

(৩)

আমি অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক। "অমৃতের" প্রতিটি লেখায় যেন প্রাণের সুর খুঁজে পাওয়া যায়। ১২ই মাঘের অমৃতে 'মুখের মেলা' (নিয়মিত) পড়লাম। পড়ে খুব তৃপ্ত হলাম। আসলে লেখকের দক্ষতা—'আক্কাস' এর চরিত্র চিত্রণ সমস্ত। আজকের জগতে গফুর মিয়ার মত লোকের অভাব নেই। এদের মুখোশ খুলে দেওয়া উচিত। সেই দিকে ব্রতী হয়েছেন লেখক। এর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে জানাই আমার আন্তরিক সাধুবাদ ও অভিনন্দন।

—বিমলকুমার [illegible], পল্লী, [illegible]।

উত্তর-বংগের লোক-সাহিত্যের উপাদান

গত ১৫ মাঘ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীসুরেশচন্দ্র দেবনাথ মহাশয় আমার লেখা সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তার অনেক অংশ অনাবশ্যক বলে মনে হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বাংলার একটি অঞ্চলের সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক আলোচিত হয়েছে। তাই এতে "শুধু অঞ্চলের অভিজ্ঞতাই অধিক ফুটে উঠেছে"—পত্র লেখকের এই উক্তির সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় নি। শ্রীদেবনাথ তাঁর চিঠির প্রথম অংশে "অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা উত্তরের গ্রাম বাংলাকে প্রভাবিত করতে পারেনি"—আমার প্রবন্ধের এই প্রথম বাক্যটির তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি বলে জানিয়েছেন। এর উত্তরে আমার এইটুকুই বলার আছে, সুরেশবাবু 'অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা' আর 'অনুকরণপ্রিয়তা' এ দুয়ের পার্থক্যকে উপেক্ষা করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর পরিধির দিকে নজর না রেখে সুরেশবাবু "সুরমা-মেঘনা-পদ্মা পারের লোকসংস্কৃতিই সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য ও আকর্ষণীয়" প্রমাণিত করার প্রয়াসে পূর্ব বাংলার কোন কোন অঞ্চলের গানের এক বিস্তৃত বিবৃতি এবং ঐ সব স্থানের গায়কদের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়ে মূল বিষয় থেকে সরে পড়েছেন। ফলে পুরো আলোচনাটাই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। কারণ, আমি আমার লেখাটিতে পূর্ব বাংলার গানের সংগে উত্তরবাংলার গানের কোন তুলনামূলক আলোচনা করে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার চেষ্টা কোথাও করি নি। প্রবন্ধটিতে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের কয়েকটি পালাগান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এছাড়া এই অঞ্চল থেকে আরও অনেক গান, ছড়া, প্রবাদ, হেঁয়ালী ও নাটক সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং "সুরমা-মেঘনা-পদ্মা" পারের লোকসংস্কৃতিই "প্রণিধানযোগ্য ও আকর্ষণীয়"—এই সিদ্ধান্তে আসার আগে শ্রীদেবনাথের কাছে আমার বিনীত নিবেদম, তিনি "তিস্তা-তোরষা-ধরলা" পারের মানুষের সাংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলির অনুসন্ধান শেষ করুন। আমি জানি না পত্রলেখক উত্তর বাংলার সঙ্গীতের খোঁজ কতটুকু রাখেন। তাই "বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়" কোন গানগুলি হবার যোগ্য তা বিচার করার আগে তাঁকে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করতে অনুরোধ করব। শেষ কথাটা এখনই বলা বোধ হয় ঠিক হবে না।

শ্রীদেবনাথ কিছু গায়কের তালিকাও তাঁর চিঠিতে দিয়েছেন। আমার তালিকাটি দীর্ঘ। তাই স্থানাভাবে এখানে দিতে পারলাম না। তবে এইটুকু জানিয়ে রাখি, কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গের পালাগানিয়াদের গায়কদের সংখ্যাই শতের উপরে হবে এবং এঁরা (জীবিত ও মৃত) প্রত্যেকেই খ্যাতি-সম্পন্ন। (গত ৮ জানুয়ারী তারিখের "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা থেকে এদের নামের তালিকাটি কৌতূহলী পাঠক দেখে নিতে পারেন)।

মনসামংগলের প্রথম কবি কিম্বা নারায়ণ দেবের পৈতৃক নিবাস সম্পর্কে বিতর্কের সূচনা করার কোন প্রচেষ্টা আলোচ্য প্রবন্ধে করা হয়নি। তাই সুরেশবাবু আমার "জ্ঞাতার্থে আরও" যেসব তথ্য জানিয়েছেন সেগুলিও অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। কোন কোন কবির কাছ থেকে

চিঠিপত্র

উত্তরবাংলার পালিতরা মূল কাহিনীটি গ্রহণ করেছেন প্রসঙ্গক্রমে সেই কথাই আমি আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। আর নারায়ণ দেব যে রাঢ় ত্যাগ করে বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন তার প্রমাণ কবির আত্মপরিচয় পাঠ করলেই জানা যায়। লিখেছেন :

> পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
> রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি।।

অবশ্য এ বিষয়ে পত্রলেখকেরও কোন সন্দেহ নেই তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তারপরের আলোচনাগুলি আমার প্রবন্ধের মলাটভুক্ত না বলে সংগত কারণেই বিষয় বহির্ভূত বিচার সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য থাকবার কথা নয়।

—অরজিৎ চক্রবর্তী, কলিকাতা-৩৭।

গবেষণার অতীত ও বর্তমান

গত ১১ই মাঘ (১৩৭৭) সংখ্যার 'অমৃত' সাপ্তাহিকে 'বইকুণ্ঠের খাতায়' "গবেষণার অতীত-বর্তমান" আলোচনাটি স্পষ্টীকৃত সত্য। 'গবেষণা' নামক বস্তুটি আজকাল যে পরিপ্রেক্ষিতে পরিপোষিত হচ্ছে তার একটি মোটা অংশই স্বজনপোষণের কলাকৌশলে কলুষিত। গবেষণার প্রধান অবলম্বন যে মৌলিকতা তা প্রায় অধিকাংশক্ষেত্রেই তিরোহিত। অথচ গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তুসম্বলিত পুস্তকাদি প্রকাশ মাত্রই উৎসুক পাঠক যখন আগ্রহভরে বইটি দেখতে থাকেন তখন রীতিমত দুর্ধর্ষ পাঠকদের ক্ষোভ করে তোলে, নিরাশ হতে হয় তাঁদের। এমন অনেক উপাধিপ্রাপ্তদের গবেষণামূলক পুস্তক আছে যেগুলিতে গবেষণার মৌলিকতার বদলে উপাধির মৌলিক মহিমাই সর্বাধিক প্রকাশমান! অন্যের পুস্তকের অন্যের পাতার অন্যের লেখকের বক্তব্য সন্নিবেশিত করে সুচৌপদ্য রচনার পথ পরিষ্কার হয় বটে, মৌলিকতা প্রকাশ পায় না। বলাবাহুল্য, সেই মৌলিকতায় যদি গবেষকের সত্যিকার একাগ্রতা আর পরিবর্তিত মানসিকতার আলোকে পুনর্মূল্যায়নের সংযোজন না থাকে তাহলে তো সেই পিছন ফিরে লাইটহাউসই দেখার সামিল হতে হয়। সেই আলোকে অবলম্বন করে এগোতে না পারার দায় বিষয়বস্তুতে অনীহা প্রকাশ করা ছাড়া আর কি! শুধু তাই না, বিষয়বস্তুর মৌলিক সংযোজন এবং আলোচনার নবতম আয়োজনেও অনেকের ভাগ্যে গবেষণালব্ধ প্রতীকটি (ডক্টরেট) জোটে না। অথচ এমনি অজস্র গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশ পাচ্ছে যার মূল্যায়িত বক্তব্য কিম্ভূত এবং সেইসব ভাগ্যবানেরা পুরস্কারের বরমাল্য কণ্ঠে নিয়ে কেমন যশস্বী! এও দেখা গেছে সম্ভাবনাময় বিষয়বস্তু গবেষণার বিষয় হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছে অথচ অপেক্ষাকৃত সাধারণ বিষয়ের স্বীকৃতি মিলেছে খুঁটির জোরে কিংবা নির্দিষ্ট পদে প্রার্থীকে মনোনীত করার ঐকান্তিক বাসনায়। তাই হিমাংশুবাবুর কথাতেই বলতে হয় "গভীরতর মৌলিক গবেষণার পথ ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতেছে।" এটা যে কতখানি সত্য তা ভুক্তভোগীরা উপলব্ধি করবেন। বস্তুতঃ তথ্য সংগ্রহই বড় হয়েছে, তার সত্যর হয়নি—এইটাই সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়।

—রঞ্জিত পাঞ্জা, কলকাতা-৯।

অমৃত প্রসঙ্গে

'অমৃত' যে পত্রিকা-জগতের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে চলেছে তার নমুনা বিভিন্ন পাঠক-পাঠিকাদের চিঠিপত্র থেকেই পাচ্ছি। পাঠক-পাঠিকারা 'অমৃত'কে যে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করছেন তারও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, বিভিন্ন পাঠকের নতুন নতুন বিভাগ খোলার অনুরোধে। আমি 'অমৃত'-এর একজন নিয়মিত পাঠক। 'অমৃত' সত্যিই অমৃত পরিবেশন করে চলেছে প্রতিটি সংখ্যার মধ্য দিয়ে। কি খেলাধুলা, কি রূপমঞ্চ, কি রাজনীতি প্রতিটি বিষয়েরই এমন সহজ, সুন্দর ও সাবলীল বক্তব্য প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকেরই যে ভাল লাগবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। গত ৩ই ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত আপনাদের পত্রিকায় স্নেহাশীষবাবুর পত্রটি দেখলাম। তিনি যে আবেদন করেছেন আমিও তার পক্ষে। কারণ পল্লীঅঞ্চলে যে সমস্ত লিটল ম্যাগাজিন বের হচ্ছে তা কোন না কোন কারণে ভালভাবে চলছে না। অথচ এমনও অনেক পাঠক-পাঠিকা আছেন যাঁরা 'লিটল ম্যাগাজিন' শুনলেই সরে পড়েন। একবার খুলেও দেখেন না যে ভিতরের বিষয়বস্তুটা ভাল না খারাপ। সুতরাং এইসব লিটল ম্যাগাজিন থেকে কিছু কিছু ভাল লেখা নিয়ে যদি 'অমৃত'র কোন এক বিশেষ সংখ্যায় ছাপান হয়, তাহলে প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকেরই দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষিত হবে।

—নিখিলেশ মিশ্র
মালদা

(২)

অমৃতর ১৩ কার্তিক ১৩৭৭ সংখ্যায় সাঁওতালি সাহিত্যের অধিবেশন সংবাদ প্রকাশ সত্যিই সাঁওতাল সাহিত্যপ্রেমীদের বিশেষ উপকৃত করেছে। যে সংখ্যায় সাঁওতালি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়নি, সে সংবাদ বাংলা অমৃতে প্রকাশ করা সত্যিই গর্বের বিষয়। তাই অমৃত শুধু সংবাদিকদেরই নয় সাঁওতালিদেরও উপযুক্ত সাহিত্য সাপ্তাহিক। আশা করি এমনিভাবেই অমৃতের মারফত সাঁওতালি সাহিত্যের খবরাখবর জানতে পারব।

—সাধন চন্দ্র, সিংভূম।

মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

গত ১৫ জানুয়ারী সংখ্যায় 'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তারই জের টেনে শ্রীচন্দ্রনাথ পুরকায়স্থ (২৯ জানুয়ারী) ও শ্রীঅরিন্দম দাস (৫ ফেব্রুয়ারী) কিছু ত্রুটির উল্লেখ করেন। আমার চিঠি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে দেখে আমি আনন্দিত। 'সর্পিল' পত্রিকাটি কাকদ্বীপ থেকেই প্রকাশিত হয়, সাইনবোর্ড থেকে নয়। আমার অসাবধানতায় এই ভুল হয়ে গেছে। পত্রলেখকদ্বয়কে আমার ধন্যবাদ জানাই। 'উদক' সম্বন্ধে উল্লেখ না থাকার কারণ দুটো। প্রথমতঃ আমি চিঠিতে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশে যে সকল বাধা সরকারী পর্যায়ে রয়েছে সে সম্পর্কেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি। লেখার আসল উদ্দেশ্যই ছিল তাই। দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্যার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে চট করে যে কটা পত্রিকার নাম মনে এসেছে, লিখেছি। তাই উদকের অনুল্লেখ অমার্জনীয় ত্রুটি নয় নিশ্চয়ই। ইতিহাস লিখলে সে নাম না দিলে অবশ্যই দোষের হত। তাহলে তো আরও অনেক পত্রিকার নাম উল্লেখ করার অপরাধে অপরাধী আমি।

আসল সমস্যা অন্যত্র। লেখকদ্বয়কে সে বিষয়ে ভাবতে অনুরোধ করি।

এই প্রসঙ্গে ৫ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত স্নেহাশীষ শুকুল লিখিত পত্রে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী বহন করছে বলে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে কোন মতান্তর ঘটবে না। অমৃত পত্রিকার কর্ণধারগণও নিশ্চয়ই ব্যাপারটির বিষয়ে সহানুভূতিপূর্ণ মন নিয়ে সক্রিয় হবেন বলে আশা রাখি।

—বীরেন্দ্র দত্ত, পাটনা-১।

CENTRAL LIBRARY

শাদাচোখে

পশ্চিমবঙ্গের এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণও বটে। প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই এই রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত দলকে একত্রিত করে একটি ফ্রন্টের মাধ্যমে কংগ্রেসের মোকাবিলা করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনেই কেবলমাত্র সেই আশা পূর্ণ হয়েছিল। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বিরোধী দলগুলির মধ্যে কে নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করতে পারবে এই ছিল ভাবনা। দুই ফ্রন্টে বিভক্ত হয়েও ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল বের হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বামপন্থীরা এক ফ্রন্টে পরিণত হয়ে যে মুহূর্তে ক্ষমতা লাভ করল তখন থেকেই রাজনৈতিক চিন্তাধারা পাল্টাতে শুরু করে। বস্তুতঃপক্ষে, বামপন্থীরা মিলিত হলে, কংগ্রেসকে যে পরাজিত করা যায় এ ধারণা দৃঢ় হল। ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার বরখাস্ত হওয়ার ফলে বামপন্থীদের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হওয়ার পক্ষে অবস্থা আরও অনুকূল হল। সেই চিন্তাধারার সার্থক পরিণতি ঘটল ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে। ১৩টা মাস ধরে একান্নবর্তী থাকার পর যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকাল মৃত্যু ঘটল। এবং তারপর থেকে নূতন চিন্তাভাবনা সুরু হল।

এবারের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হল কোন দল বা দলসমষ্টি প্রথম পার্টিতে পরিগণিত হতে পারবেন—এই নিয়ে লড়াই। অর্থাৎ কে দ্বিতীয় হবেন—এ চিন্তা আর কোন দল বা ফ্রন্টের নেই। এই প্রথম হওয়ার যে প্রচেষ্টা, বিগত মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলই তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। দ্বিধা বিভক্ত কংগ্রেস জনতার কাছে পৃথক পৃথকভাবে আবেদন করছেন তাঁদের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করতে যাতে প্রত্যেকেই এই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে একটি স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারেন এবং শান্তি-শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে গণ-উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মন দিতে পারেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত বড়বাম ফ্রন্টও একই আবেদন জানাচ্ছেন। অষ্টবামের আবেদনও তাই। কেবলমাত্র কংগ্রেস এবং তাঁদের সহযোগীরা একটু ঘুরিয়ে এই আবেদনটি পেশ করছেন। তাঁরা বলছেন, কি অষ্টবাম বা বড়বাম প্রত্যেকেই হিংসায় বিশ্বাসী এবং তাঁদের জন্যই পশ্চিমবঙ্গে এই হিংসা ও নরহত্যার দূষিত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই জোটের প্রার্থীদের যাতে জনসাধারণ সমর্থন না করেন তার জন্য প্রতি সভায় বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি আকুল আবেদন করে বেড়াচ্ছেন। এই প্রচারের রাজনৈতিক অর্থ হচ্ছে, জনতা দুই বামগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিন কংগ্রেসের প্রার্থীদেরই সমর্থন করুন। অষ্টবামের সঙ্গে শ্রীমুখার্জির দলের কেন আঁতাত হোল না—এই কথা বুঝাবার জন্য শ্রীমুখার্জি বলছেন: 'অষ্টবামকে বলেছিলাম—আপনারা হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি পরিত্যাগ করবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিন। তবেই আপনাদের সঙ্গে মিতালী সম্ভব—নতুবা নয়'। এই প্রতিশ্রুতি দেয়নি বলেই আঁতাত হোল না—শ্রীমুখার্জি তাঁর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে যাচ্ছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, সমস্ত দল বা গোষ্ঠী স্থায়ী সরকার গঠন করবার জন্য ভোটারদের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন—তাঁরা তা পারবেন কি? অতীতে একক কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন নি। এবারের বিভক্ত কংগ্রেস সেই আশা পোষণ করছেন কি করে? শাসক কংগ্রেস মনে করেন, আদি কংগ্রেস জনতার সমর্থনই পাবেন না এই রাজ্যে। কারণ, শাসক কংগ্রেস আদিকে ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। আর আদি মনে করেন বিভক্ত হলেও সংগঠনের সিংহ ভাগ তাঁদের সঙ্গেই আছে। আর আছেন নেতৃবর্গ। অতএব, যুক্তফ্রন্ট শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা জনমতকে তাঁদের অনুকূলেই টেনে আনবে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি মনে করছেন যে, তাঁদের শ্রেণী সংগঠন খুবই জোরদার হয়ে গেছে। অতএব তাঁদের পক্ষে এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা কঠিন হবে না। গ্রামে জমি দখলের আন্দোলন করে কৃষককুলকে তাঁরা স্বমতে টানতে পেরেছেন আর শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য লড়াই করে তাঁরা যে দাবী-দাওয়া আদায় করেছেন তার ভিত্তিকেন্দ্র হিসাবে ভোট তাঁদের পক্ষেই পড়বে। আর সবচেয়ে বড় বক্তব্য হচ্ছে, কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত ও মৃত, অতএব, রাজ্যের জনতা যদি বিকল্প সরকার গড়তে চায় তবে তাঁদের গোষ্ঠী ছাড়া অন্যদিকে ঝুঁকে পড়বার কোন সুযোগ নেই। অষ্টবাম মনে করছেন, তাঁরাই বা কম কি? কংগ্রেস সম্বন্ধে মানুষ বীতশ্রদ্ধ আর মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের প্রতি জনতা সন্ত্রস্ত। কাজেই তৃতীয় শক্তি হিসাবে তাঁদের প্রতিই ভোটারদের আস্থা বাড়ার সম্ভাবনা খুবই। অতএব, সরকার গঠন যদি কেউ করতে পারে তবে তা অষ্ট বামের পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু সমীক্ষা চালালে দেখা যায়, কোন একটি দল বা ফ্রন্টের অনুকূলে রাজ্যে সরকার গঠন করার মত পরিবেশ নেই। সকলেই মনে করছেন, শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগের মত তাঁরা বিরোধী পক্ষকে পর্যুদস্ত করতে পারবেন। কিন্তু তা সম্ভব কি? রাজনৈতিক আদর্শে সম্পৃক্ত হয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ এখন শতধা বিভক্ত। যদি তা না হোত তবে অনেক দিন আগেই এই রাজ্যে রাজনৈতিক সংহতিকরণ সম্পূর্ণ হয়ে যেত। এত কায়দা-কানুন করে তাত্ত্বিক ফরমূলা দিয়ে স্ব স্ব দলে টানবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হোত না।

দ্বিধা বিভক্ত হয়ে কংগ্রেস দুর্বল হয়নি—একথা বলা সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। হয়েছে বলেই ত কোন কংগ্রেসই সমস্ত আসনে প্রার্থী দিতে পারেননি। কেউ যদি বলেন, কৌশলের জন্যই এই ব্যবস্থা, তাহলে তাঁদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করব যে, শক্তি

সম্পর্কে আশঙ্কিত বলেই এই কৌশলের কথা উঠেছে। নতুবা উঠত না। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই কৌশল ছিল কি? অন্যদিকে যতই আস্ফালন করা হোক না কেন, শুধু সীমিত বলেই না মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি কয়েকজন দলছুটকে পর্যন্ত নিয়ে জোট বেঁধে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করছেন? নতুবা করবেন কি? এই বক্তব্য অষ্টবামের পক্ষেও প্রযোজ্য। অবশ্য ২৮০টী আসনেই প্রার্থী না দিলে কেউ একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবেন না এমন কথা বলছি না। কিন্তু যতগুলি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন সেই-গুলিতেও লড়বার মত ক্ষমতা দল বা গোষ্ঠী-গুলির আছে কি? দলগত ছাপ মেরে দাঁড় করিয়ে দিলেই কি ভোট পাওয়া যায়? অন্ততঃ অভিজ্ঞতায় এ বক্তব্য সমর্থন করে না। কাজেই বলছিলাম আসল লড়াই হচ্ছে কে প্রথম হবেন সেই নিয়ে।—নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতা দখলের জন্য এই লড়াই নয়। এই নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

বর্তমান নির্বাচনী যুদ্ধ খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। কেননা, নির্বাচক মণ্ডলীর সামনে তিনটি প্রশ্ন খুব বড় করেই তুলে ধরা হয়েছে। নামীয় সমস্ত দলই এবং জনসঙ্ঘ জনতাকে সোজাসুজি দুই শিবিরে বিভক্ত করতে চান। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, যাঁরা হিংসাশ্রয়ী পন্থায় বিশ্বাস করেন না এবং একটি স্থায়ী প্রগতিশীল সরকার চান—তাঁরা এই সমস্ত দলগুলির সহায়তা করুন। কংগ্রেস দলগুলি ও জনসঙ্ঘের গুণগত পার্থক্য আলোচনা না করেই মোটামুটিভাবে বক্তব্যটা রাখা যায়। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টদের জোট কংগ্রেস দলগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ধারক ও বাহক হিসাবে চিহ্নিত করে এবং অষ্টবামকেও তাঁদের সাহায্যকারী হিসাবে দাঁড় করিয়ে নিজেদের অনুকূলে নির্বাচকমণ্ডলীকে টেনে আনতে চান। কংগ্রেস দলগুলি এবং জনসঙ্ঘ তাঁদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক রাজনীতির যে অভিযোগ তুলেছেন তাকে তীব্রতর শ্রেণী সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ফল বলে—এই অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করছেন। রাজনীতির তত্ত্বকথা নিয়ে, বিশেষ করে বামপন্থী রাজনীতির দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অষ্টবামের অভিযোগ মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো হয়। অষ্টবামের বক্তব্য হচ্ছে, পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই—এই বামপন্থী আন্দোলনকে বাম কম্যুনিষ্টরা বিভক্ত করে দুর্বল করে দিচ্ছেন। তাঁদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বামপন্থী শক্তি সংহত হওয়ার পূর্বেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে, প্রতিক্রিয়ার শক্তি সুদৃঢ় হতে চলেছে। এই একপক্ষের নীতি সর্বাত্মক শ্রেণী সংগ্রাম নয়—শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারক মাত্র। তত্ত্বগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে এই তিনটি মূলসূত্রই এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

এই পটভূমিকায় দল বা ফ্রন্ট তাঁদের প্রার্থী সমাবেশ করেছেন, ফলে এক-একটি আসনে প্রার্থী সংখ্যা বেড়ে গেছে। অবশ্য রেকর্ড সংখ্যক প্রার্থী হওয়ার মূলে আরও কয়েকটি কারণ আছে। অনিশ্চিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে আরও অনেকগুলি দল মাথাচাড়া দিয়েছে। এলাকা ভিত্তিক, সম্প্রদায় ভিত্তিক এমন কি বড় দলগুলির আভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নিয়েও অনেকে নির্বাচন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই সমস্ত দল বা ব্যক্তি বিশেষের ধারণা, এই ডামাডোলের বাজারে নির্বাচকমণ্ডলী হয়ত বিভ্রান্ত হয়ে হয়ত তাঁদের আবেদনেও সাড়া দিতে পারেন।

কিন্তু এত বিভিন্নতার মধ্যেও একটি ঐক্যের ধ্বনি সুস্পষ্ট, সেটা হচ্ছে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির হিংসাশ্রয়ী ও বামপন্থী বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিকে পরাভূত করার প্রচেষ্টা। আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে খুবই দ্বন্দ্ব চলছে মনে হয়। কিন্তু তলিয়ে দেখলে, অনেক ক্ষেত্রেই যে অমিল খুব কম তা ধরা পড়ে। বরাহনগর কেন্দ্রে শ্রীঅরুণ মুখার্জির প্রার্থীপদ সমর্থন এক নয়। সমঝোতার নিদর্শন মাত্র। এবারের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে হয়ত মাত্র ২।৪টী আসনেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তার মধ্যে বরাহনগর একটি। শ্রীমুখার্জির প্রার্থী-পদ সমর্থনে অষ্টবামের শরীক কম্যুনিষ্ট প্রার্থী শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্যকে বরানগর কেন্দ্রের লড়াই থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। শ্রীমুখার্জি কেন শ্রীজ্যোতি বসুকে চ্যালেঞ্জ জানালেন তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারে 'প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও হিংস্রতার উস্কানি দেওয়ার মূলে শ্রীবসুরই প্রত্যক্ষ হাত কাজ করেছে। অতএব, শ্রীবসুকে পরাজিত করা তাঁর প্রধান কর্তব্য। অষ্টবামের প্রার্থী তুলে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে শ্রীমুখার্জির এই বক্তব্য সমর্থন করা। অষ্টবাম অবশ্য তাঁদের নীতি বক্তব্যের ভূমিকায় এই অভিযোগ রেখেছেন। একই কারণে আদি ও নব কংগ্রেস শ্রীমুখার্জিকে সমর্থন করেছেন। এই নীতির ভিত্তিতে যদি বরাহনগরে সকলেই এক হতে পারলেন তবে অন্যত্র হলেন না কেন?

এমনি কয়েকটি জায়গায় মতৈক্য হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকে অন্যের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছেন। ফলে, অনেক মহারথী যাঁরা নির্বাচনে অবতীর্ণ হবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা রাতারাতি লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়লেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ যিনি রাজনীতি থেকে প্রায় অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনি আবার আসানসোল কেন্দ্র থেকে লোকসভায় দাঁড়ালেন। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি দমদম থেকে লোক-সভায় প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন। শ্রীঅমিয় বসু আবার হিন্দ সংঘের প্রার্থী হয়ে আলিপুরে লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্তের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। তিনি শাসক কংগ্রেসের অকুণ্ঠ সমর্থনও পেয়েছেন।

এদিক থেকে চিন্তা করলে শ্রীঅশোক সেন ভাগ্যবান। কারণ, প্রার্থী দেওয়ার কথা স্থির থাকা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে অষ্টবামের শরীক ফরওয়ার্ড ব্লক শ্রীসেনের বিরুদ্ধে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে কোন প্রার্থী দিলেন না বা দিতে পারলেন না। অনুরূপভাবে শ্রীবিজয় সিং নাহারও ভাগ্যবান। যেমন, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅমর চক্রবর্তী বহুবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েও শেষ মুহূর্তে উলু-বেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ছুটে গেলেন।

এত টানা পোড়েনের মধ্যে আবার ছাপাচুপিও চলছে। অষ্টবামের মধ্যে শরীকি লড়াই মাথা চাড়া দিয়েছে। কয়েকটি আসনের ক্ষেত্রে যেমন শিলিগুড়ি, হাওড়া (উত্তর), গাইঘাটা, সাগর প্রভৃতি বিধানসভা কেন্দ্র এবং হাওড়া লোকসভার আসনে শরীকেরা লড়াইয়ে মেতে গেছেন। অন্যদিকে খবর পাওয়া গেল, মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন আঞ্চলিক সম্পাদক দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে গেছেন নদীয়া জেলায়। শাসক কংগ্রেস থেকেও নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে কিছু লোক দলত্যাগ করেছেন। এই বহুধা বিভক্ত মন মত ও পথ নিয়ে এবারও বাংলার ভাগ্যে যে অঘটন ঘটবে তা এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

—সমদর্শী

CENTRAL LIBRARY

কলকাতার বিভিন্ন বস্তিতে কাজ করছেন একদল ইঞ্জিনীয়ার যাঁরা কিছুকাল আগেও বেকার ছিলেন।

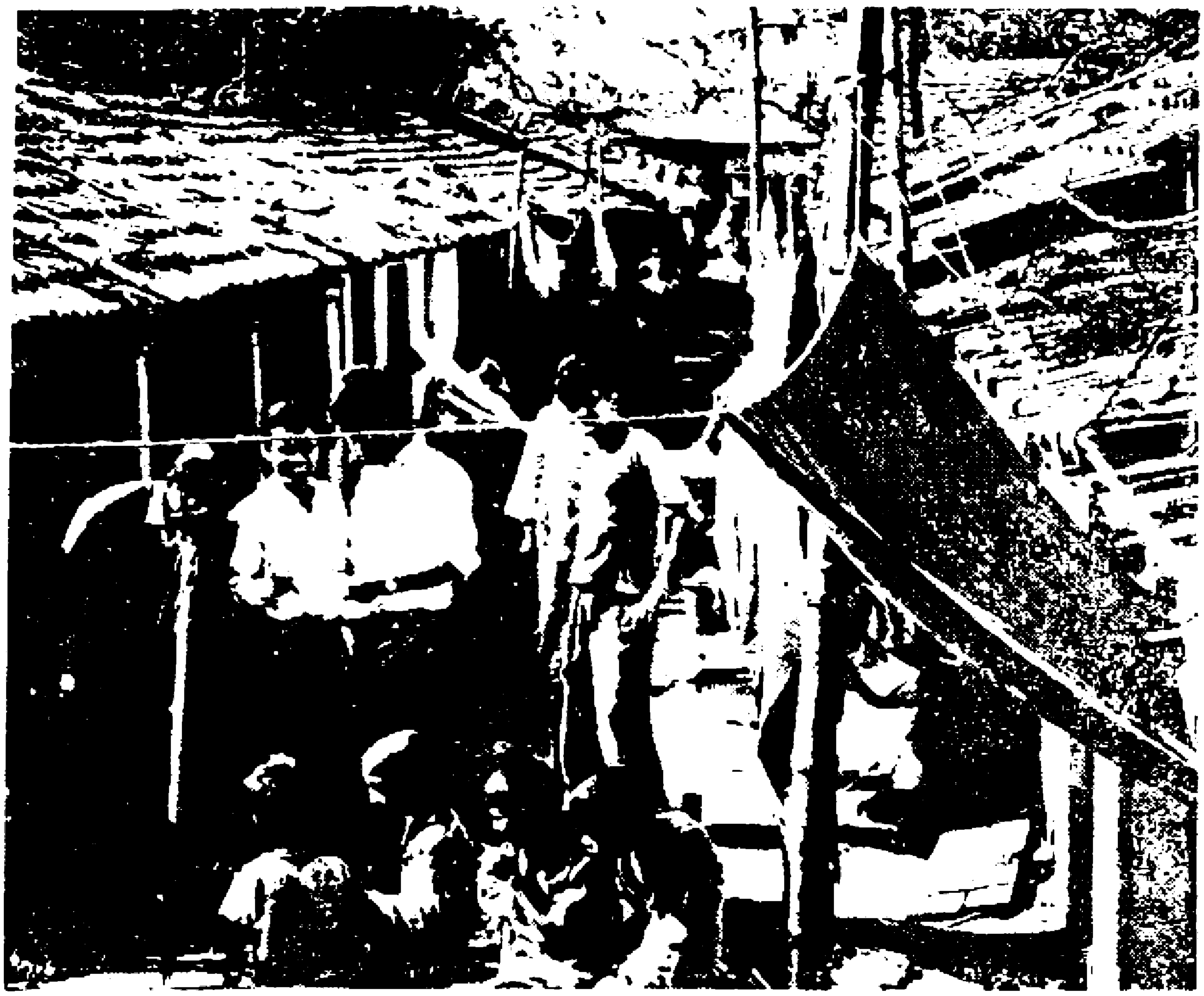

দেশে বিদেশে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং আরও কেউ কেউ বলেছেন যে, ভারতের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক প্রাক্‌কালে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান লাহোরে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করাবার ষড়যন্ত্র করে পাকিস্থান ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

ঘটনা যেভাবে ঘটেছে তাতে বলা যায় যে, পাকিস্থানের এই চেষ্টা তো সফল হয়ই নি, বরং পাকিস্থানের দুই অংশের ভিতর অনৈক্যই আরও প্রকট হয়ে উঠছে।

পাকিস্থান এখন এই ঘটনাকে অবলম্বন করে কাশ্মীর প্রশ্নটি আর একবার খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। সারা পৃথিবীর দুয়ারে দুয়ারে সে নালিশ করে বেড়াচ্ছে, ভারত কাশ্মীরের জনসাধারণের উপর জুলুম করছে বলেই সেখানকার মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এই কথা বলে পাকিস্থান নিজেকে বিমান ছিনতাইয়ের ব্যাপারে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান-ভারত সম্পর্কের অবনতির জন্য ভারতকে দায়ী করতে চেয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্থানের স্থায়ী প্রতিনিধি আগা শাহী বলেছেন, কাশ্মীরে ভারত যা করছে তাতে ঐ রাজ্যের জনসাধারণ বাধ্য হয়েই বেপরোয়া পন্থা অবলম্বন করছে। এইসব বেপরোয়া কাজের ফলে ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের আবহাওয়া খারাপ না হয়ে যায় না।"

কাশ্মীর প্রসঙ্গটি নতুন করে তুলে ধরার এই পাকিস্থানী প্রয়াস কতটা সফল হবে বলা যাচ্ছে না। (ভারত সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘকে জানিয়েছে যে, সে রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে দিতে রাজী নয়।) তবে কোন কোন দেশ যে ঘটনাটিকে ভাল চোখে দেখছে না ইতিমধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যুগোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "আমরা এই ধরনের বোম্বেটেগিরির নিন্দা করি।" সিংহল মন্ত্রিসভা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাকে ধিক্কার দিয়েছেন এবং এই ঘটনার পরিণামে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।"

পশ্চিম এশিয়ায় প্যালেস্টাইন প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কোন কোন

মহল তাঁদের আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিমান ছিনতাই করেছেন, এই নজীর দেখিয়ে পাকিস্থান আরব দুনিয়ার সহানুভূতি ও সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু দিল্লীতে আরব লীগের প্রধান প্রতিনিধি মহম্মদ ওয়াহাবির একটি বিবৃতিতে সে পথে কাঁটা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, আরব দেশগুলি এবং প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনকারীরা পৃথিবীর যে কোন জায়গায়ই অসামরিক বিমান এভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরোধী। ওয়াহাবি আরও বলেছেন যে, প্যালেস্টাইন আরবদের সংগঠন "আল্ ফাতা"র সঙ্গে কাশ্মীরের সংগঠনটির নামের সাদৃশ্য থাকলেও দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক নেই।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে এখন কূটনৈতিক প্রচারের যে লড়াই চলছে তাতে পাকিস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিমান ছিনতাইয়ের ও ধ্বংসের ঘটনায় পাকিস্থানের দায়িত্ব অস্বীকার করা এবং ঘটনাটিকে দুই দেশের মধ্যে অন্যান্য বিরোধের সংগে, বিশেষ করে কাশ্মীর সংক্রান্ত বিরোধের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা। ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিমান বোম্বেটেগিরির ঘটনায় পাকিস্থানের দায়িত্ব প্রমাণ করা এবং দুই দেশের ভিতর অন্যান্য বিরোধ থেকে এই ঘটনাকে আলাদা করে দেখা।

পাকিস্থান বলছে, অন্যান্য সব বিরোধের মতো এই বিষয় নিয়েও প্রচলিত কূটনৈতিক প্রথা অনুযায়ী আলোচনা করা যেতে পারে। তবে তার আগে ভারত তার আকাশপথ দিয়ে পাকিস্থানী বিমান যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিক।

ভারত বলছে, সে পাকিস্থানের সংগে আলোচনা করবে; কিন্তু তার আগে পাকিস্থান বিধ্বস্ত বিমান, তার মালপত্র, ডাক ও যাত্রীদের লাগেজের দরুণ খেসারত দিক যে চারদিন বিমানটিকে বেআইনীভাবে আটক করে রাখা হয়েছিল সেই চারদিনের জন্য জরিমানা দিক এবং ভারতবর্ষে এসে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার জন্য দুজন বিমান দস্যুকে ভারতের কাছে ফিরিয়ে দিক।

বিমান ছিনতাই সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের যে প্রস্তাব আছে এবং টোকিওতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে তার বিধান অনুযায়ীই ভারত পাকিস্থানের কাছে এইসব দাবী করেছে। এই দাবীগুলি মেটাতে হলে পাকিস্থানকে প্রায় দু' কোটি টাকা খেসারৎ দিতে হবে এবং মহম্মদ হাশিম কুরেশি ও মহম্মদ আশরফকে ভারতের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।

পাকিস্থান বলছে যে, বিমানটি যারা পাকিস্থানে নিয়ে এসেছে তারা পাকিস্থানের নাগরিক ছিল না, লাহোরে বিমানটি আগাগোড়া ঐ দুজনের দখলে ছিল এবং সেখানে জোর করে সেখান থেকে সরাতে গেলে উল্টো ফল হত।' কুরেশি ও আশরফকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না; কেননা, তারা 'কাশ্মীরের লোক', ভারতের নাগরিক নয়।

ভারত বলছে, 'অপরাধমূলক বিমান ছিনতাই' এবং লাহোরের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিশেষ প্রহরাধীন অংশে সেই বিমান নির্বিচারে ধ্বংস করে দেওয়ার ঘটনা পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের 'প্রশ্রয় ও সহায়তা' ছাড়া সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীসময় সেন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের কাছে যে নোট দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় বিমান ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য পাকিস্থানে যে ষড়যন্ত্র চলছে বলে ভারতে খবর আছে, একথা ভারত গত বছর ২ সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্থানকে জানিয়েছিল। সংগে সংগে ভারত বলেছিল, পাকিস্থান সরকার যেন বিমান ছিনতাই ঠেকাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। পাকিস্থান কিন্তু ব্যবস্থা তো অবলম্বন করলই না, উপরন্তু ভারত সরকারের কাছ থেকে জানতে চাইল, তাঁরা কোন্ সূত্র থেকে এমন সংবাদ পেয়েছেন।

শ্রীসেন তাঁর নোটে বলেছেন, পাকিস্থানে যেসব বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলি থেকে খুব পরিষ্কারই বোঝা গেছে যে, পাকিস্থানে সেখানকার সরকারের সমর্থনপুষ্ট মানুষরা ভারতীয় বিমান ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। দুজন বিমান দস্যুকে শুধু যে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তা নয়, আশ্রয় দেওয়ার আগে তাদের নিরস্ত্র করা হয়নি এবং তাদের অপরাধের জন্য তাদের আটক করাও হয়নি।

নোটে আরও বলা হয়েছে, বিমান দস্যুদের একজন একজন করে লাহোর বিমান বন্দরের টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে যেতে, পাকিস্থানে তাদের সহযোগীদের টেলিফোন করতে এবং অনেকের সংগে দেখা করতে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, তাদের খাদ্য ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা দুর্গিয়ে যাতে তিনদিন বিমানটি নিজেদের তথাকথিত অধিকারে রাখতে দেওয়া হয়েছিল।

ভারতীয় প্রতিনিধি আরও উল্লেখ করেছেন যে, বিমান দস্যুদের বিমানটি উড়িয়ে দিতে এবং সেটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত বিমানের কাছে দমকলের যানা ঠেকিয়ে রাখতে দেওয়া হয়েছিল। এই সবকিছু হয়েছিল লাহোর বিমানবন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় এবং পাকিস্থানে যখন সামরিক আইন চালু আছে সেসময়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, সেনাবাহিনী ও পুলিসের চোখের সামনে।

ভারত সরকারীভাবে এখনও যা জানায়নি; কিন্তু বেসরকারীভাবে যা জানা গেছে তাতে এটা আরও স্পষ্ট যে, শুধু ভারতীয় বিমান ধ্বংস নয়, ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের ব্যাপারেও পাকিস্থানের দায়িত্ব ছিল। ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানটি পাকিস্থানের আকাশে পৌঁছবার পর পাইলট কুরেশিকে বলেছিলেন, পাকিস্থানী জঙ্গী বিমান আকাশে উঠে তাড়া করবে। কুরেশি বলেছিল, না, তুমি শুধু লাহোর বিমানবন্দরকে বল, "হাশিম প্লেন নিয়ে এসেছে।"

আর একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ হল, পূর্ব পাকিস্থানের রাজশাহীর ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে একটি জায়গায় পাকিস্থান খুব গোপনে ভারত থেকে পলাতক নাগা, মিজো ও কুকি বিদ্রোহীদের বিমান ছিনতাই করার কলাকৌশল শেখাচ্ছে। অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারির বিমানদস্যুতা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, পাকিস্থানের পরিকল্পনামাফিক সেটা করা হয়েছে।

গত বছর ২ সেপ্টেম্বর তারিখে নয়াদিল্লী থেকে ইসলামাবাদে যে নোট পাঠান হয়েছিল তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে, পাকিস্থান বিমান ছিনতাইয়ের যে ষড়যন্ত্র করছে সে সম্পর্কে ভারত অবহিত ছিল। তা সত্ত্বেও ৩০ জানুয়ারির ঘটনা ঘটল কি করে এবং ঠিক কিভাবে ভারতীয় বিমান পাকিস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য ভারত সরকার তিনজন বিভাগীয় সেক্রেটারিকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরী করেছেন। এই কমিটির রিপোর্ট তৈরী হলে পর বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাটির সংগে পাকিস্থানের যোগ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা যায়।

নির্বাচনের আগে এই ধরণের একটা পরিস্থিতি দেশের ভিতরে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে বলে ভারত সরকার যে উদ্বেগ বোধ করছিলেন সেটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বিমান ছিনতাইয়ের প্রতিবাদে পর পর তিনদিন দিল্লীতে যাঁরা যেভাবে পাকিস্থানী হাই কমিশনারের অফিসে অনবরত হামলা করার চেষ্টা করেছে তাতে ভারত সরকারের উদ্বেগ বোধ করার কারণ ছিল।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী, ডাঃ করণ সিং, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি এই ব্যাপারে অধিকতর সংযমের পরিচয় দেওয়ার জন্য আবেদন জানাবার পর ছাত্ররা তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিয়েছে। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আমেদাবাদ ও বরোদায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধিয়ে দিতে পারে, এমন সূচনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই সূচনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় পাকিস্থান তার সুযোগ নিতে পারে নি। ভারতবর্ষের ভিতরে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য পাকিস্থানের চেষ্টা যে সফল হয় নি, তার আর একটি প্রমাণ, মোরারজী দেশাইয়ের মতো ইন্দিরা-বিরোধী নেতাও এই ব্যাপারে ভারত সরকার যা করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়েছেন

এবং এই বিষয়ে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান দিয়েছেন।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের ভিতর অনৈক্য ফুটে উঠেছে। জুলফিকার আলি ভুট্টো যে ভারত-বিরোধী জেহাদ চালাচ্ছেন তার তীব্র নিন্দা করে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল মনসুর আহমেদ বলেছেন যে 'ভারতের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধংদেহী মনোভাব জাইয়ে রাখা মানে যে একটা বোঝা ঘাড়ে নেওয়া সেকথা তাঁর ভুলে যাওয়া উচিত নয়।' পূর্ব পাকিস্তানের দৈনিক সংবাদপত্র 'পিপল' লিখেছে, ভারতের বিমান উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের ষড়যন্ত্রের ফল। এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের সংগে একটা যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া এবং ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার পথে কাঁটা দেওয়া।'

দুই দেশে যুদ্ধ বাধে নি; কিন্তু যুদ্ধের আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। ভারতের অসামরিক প্রতিরক্ষায় এখনো যে গোছ এতবড় সংকট ঐ সময়ে নাকি আগে আর কখনও হয়নি। পাকিস্তানের সেক্রেটারি-জেনারেল আব্দুর রহমান অসামরিক প্রতিরক্ষায় প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়ে বেতার ভাষণে বলেছেন, 'শান্তির সময়েই যুদ্ধের তালিম নিতে হয়। কাজ আরম্ভ করার জন্য যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করা কোন কাজের কথা নয়।'

সীমান্তের অপর পারে এই সব আয়োজন দেখে ভারতকেও অসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করার কথা ভাবতে হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অসামরিক প্রতিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের এক সম্মেলন দিল্লীতে হয়ে গেল।

দিল্লীতে এমনও একটা আলোচনা নাকি শোনা গেছে যে, পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে লোকসভার নির্বাচন স্থগিত রাখতে হতে পারে। দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্রিকার খবর হচ্ছে, এস কে পাতিল, রাজনারায়ণ প্রভৃতির ধারণা, নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন হবে না এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য সরকার একটা অজুহাত খুঁজছেন।'

ভারতের আকাশ দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় পাকিস্তানের যে যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দূর পাল্লার সার্ভিস বিমান নামাবার জন্য পাকিস্তান সিংহলের সংগে চুক্তি করেছে। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজের পূর্ব পশ্চিমগামী বিমানগুলি এই চুক্তি অনুযায়ী সিংহল হয়ে যাচ্ছে। এতে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার বেশী পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে এবং বেশী সময় লাগছে তিন ঘণ্টা। সিংহলের বিমান বন্দরে বিমান নামাবার জন্য পাকিস্তান সিংহলকে টাকা দিচ্ছে। কিন্তু ভারতে নিষিদ্ধ থাকায় পাকিস্তান সিংহল থেকে কোন যাত্রী নিতে পারছে না, সেখানে কোন যাত্রী নামতেও পারছে না।

ইউরোপে পি-আই-এর সপ্তাহে যে ১২টি সার্ভিস ছিল তার মধ্যে ৭টি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, টোকিওগামী তিনটির মধ্যে বাতিল করা হয়েছে একটি।

খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজকে এখন প্রতি সপ্তাহে এক লক্ষ টাকা হারাতে হচ্ছে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, ভারতের আকাশপথ পাকিস্তানের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া একটা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা; পাকিস্তান ভারতের দাবী মেনে না নিলে আরও কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা ভাবতে হবে।

লাহোর বিমান বন্দরে দগ্ধ ভারতীয় বিমানের ছাইয়ের ভিতর থেকে 'কাশ্মীর সমস্যার' ভূতটিকে টেনে বার করে পাকিস্তান যতক্ষণ নাচাতে থাকবে ততক্ষণ দুই দেশের মধ্যে এই ছাড়-পাওয়া সম্পর্ক চলতেই থাকবে বলে মনে হচ্ছে।

১২-২-৭১ —পুণ্ডরীক

২৪ পরগনা জেলায় বাহাদুরে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন কর্তৃক স্থাপিত সিসমিক ক্যাম্প।

সম্পাদকীয়

নির্বাচনে সাজ-সাজ রব

আর অল্প দিন পরেই সারা ভারতে পঞ্চম লোকসভার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। লাক্ষাদ্বীপ থেকে শাসক কংগ্রেসের একজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইতিমধ্যেই নির্বাচিত হয়েছেন। এবার রেকর্ড সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন লোকসভার জন্য। পশ্চিমবঙ্গেও প্রার্থী-সংখ্যা অন্যান্য বারের চেয়ে বেশি। নির্বাচনে সকল দলের উৎসাহ এবং উদ্দীপনারই সাক্ষ্য দেয় এত বেশি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশে। সাধারণ নির্বাচনে নাগরিকদের এই উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সার্থকভাবে কাজে লাগানোই হল পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের সাফল্যের মূল কথা। পাঁচ বছর পর পর দেশের নাগরিক তাঁদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পান এই নির্বাচনের মাধ্যমে। এবারে অবশ্য এক বৎসর আগেই লোকসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে জনমত গ্রহণের জন্য।

ভারতের রাজনীতিতে এখন চলছে এক ভাঙাগড়ার যুগ। সর্বভারতীয় দলগুলোর মধ্যে একমাত্র জনসংঘ ছাড়া প্রায় সব দলের মধ্যেই নানা বিরোধী চিন্তার-সংঘাত ঘটেছে। এবং যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো দ্বিধা বা ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবারের নির্বাচনে তার প্রভাব নিশ্চয়ই পরিলক্ষিত হবে। বিগত লোকসভায় কোনো দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এমন ঘটনাও এর আগে কোনো লোকসভায় ঘটেনি। কেন্দ্রীয় সরকার এতকাল একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবারেও তা হবে কিনা সেটাই হবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দলগুলোর মধ্যে লক্ষণীয় এই যে, কোনো দলই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে লোকসভার সবক'টি আসনে এককভাবে প্রার্থী দিতে পারেনি। এমনকি ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলও না। কোনো কোনো রাজ্যে আসনের বোঝাপড়া হচ্ছে বিভিন্ন সমধর্মী দলের মধ্যে। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলো বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসের দলছুট সংগঠনপন্থী কংগ্রেস আঁতাত করেছে জনসংঘ, এস, এস, পি এবং স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে। এটি ঠিক আঁতাত নয়, আসনের বোঝাপড়া। এদের মধ্যেও আবার খেও-খেওয়ি আছে যার ফলে বোম্বাইয়ে এস, এস, পি-র জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ দাঁড়িয়েছেন এমন একটি কেন্দ্রে যেখানে আঁতাতের অন্যান্য শরিকরা কতখানি তাঁকে সাহায্য করবে বলা মুস্কিল। সংগঠনপন্থী কংগ্রেসের এস, কে, পাতিলকেও একই কারণে বোম্বাই ছেড়ে গুজরাটের বনস্কণ্ঠ নির্বাচন কেন্দ্রে ফিরে যেতে হয়েছে। শাসক কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সিণ্ডিকেটের আঁতাত আপ্রাণ চেষ্টা করবে তা বলাই বাহুল্য। একন্য কোনো নীতির বালাই তারা রাখেনি। সিণ্ডিকেটের নেতা শ্রীমোরারজী দেশাই বলেছেন যে, তাঁরা জনসংঘের খুব কাছাকাছি এসেছেন এবং ভবিষ্যতে জনসংঘের সঙ্গে সিণ্ডিকেট মিলেও যেতে পারে। এই কথাই যখন আগে বলা হত যে, সিণ্ডিকেটীরা কংগ্রেসকে জনসংঘের আদর্শ অনুসরণ করাতে চান তখন তাঁরা আপত্তি করতেন। এবং এই কারণেই কংগ্রেসকে তার সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অটুট বিশ্বাস রাখবার জন্য সিণ্ডিকেটের সংস্রব ছাড়তে হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না।

এই নির্বাচনেই বোঝা যাবে ভারতের জনগণ কোন্ পথে যেতে চায়? শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ, না দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতা অথবা হিংসাত্মক বিপ্লব। এই জটিল প্রশ্ন সমাধান করার দায়িত্ব নিতে হবে জনগণকেই। এবারের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যে কতকগুলো আঞ্চলিক দল আঞ্চলিক দাবি নিয়ে লড়বে। পাঞ্জাবে অকালী দল, তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগম এবং মহারাষ্ট্রে শিবসেনা। এদের মধ্যে অকালী ও ডি, এম, কে দল ক্ষমতাসীন। আঞ্চলিক দলগুলোর সর্বভারতীয় কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ব্যাপারেও ওদের উৎসাহ সীমাবদ্ধ। এর ফলে সর্বভারতীয় দলগুলোকে আরও ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে যাতে কেন্দ্রে একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার গঠন করা যায়। কেন্দ্রকে দুর্বল করে রাজ্যগুলোর হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেবার দাবিও করছে কোনো কোনো দল। এর বিচার-বিবেচনার দায়িত্বও পড়বে নতুন লোকসভার ওপর। সংবিধানে যে-সমস্ত ত্রুটি ধরা পড়েছে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানকে যেভাবে প্রয়োগ করা দরকার, নতুন লোকসভার সদস্যদের সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। আগামী নির্বাচন এবং নির্বাচনোত্তর লোকসভার গুরুত্ব সে কারণেই আজ সর্বাধিক। এই নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ হয় এবং জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত প্রতিফলনে যাতে নতুন লোকসভা এবং বিধানসভাগুলো গঠিত হতে পারে সেদিকেই সকলকে দৃষ্টি দিতে হবে।

CENTRAL LIBRARY

শূন্যের বেলুনে ॥ সুধীর করণ

তোমার সুখের জন্য
পৃথিবীর চোখে ঘুম নেই,
আত্মীয়েরা শশব্যস্ত
চন্দ্র সূর্য আয়ত্তে অধীন

তোমার সুখের জন্য
দারাপুত্রপরিবার কাঁদে
বান্ধবেরা সর্বচেষ্ট
নগরে ও গ্রামে গ্রামে সাড়া—

এই কথা ভাবতে ভাবতে—
তুমি—
পৃথিবীর মায়া ছেড়ে
অনায়াসে স্বর্গে যেতে পার—
একরাশ শূন্যের বেলুনে।

আমার গাড়ী — রাণা চট্টোপাধ্যায়

আমার গাড়ীর অনেক দেরী
শহরে পৌঁছানোর
কয়লা, জল নিতে নিতেই রাত কাবার।

স্টেশন পরপর এগিয়ে যাবে
ভোরের দিকে
ঘুম ভাঙতে পারে
তখন যা হোক কিছু কিনে নেবো
প্ল্যাটফর্ম থেকে।

আমার গাড়ীর অনেক দেরী
পৌঁছাতে শহরে
কয়লা, জল অনুকল্প
নিতে নিতেই ভোর।

এইখানে কাছাকাছি ॥ তরুণ সেন

এখন ত' খুব কাছাকাছি।
হা হুতাশে
পাঁচিলের পরিধি বাড়ে না,
ভোরে আমার মোরগে
প্রারুণ চেঁচিয়ে আসে
হাঁটুভর বিষম জঞ্জালে,

এখানে কোটাল এলে
ঢল নামে ওপাড়ার চাঁদে
রুখো মাঠে হোরি খেলে মিহিন বাতাস—
কোনও আড়াল থাকে না।

অথচ কখন
উঠোনে পায়ের ছাপ
পড়ে থাকে
গোপন ক্ষতের মত,
দূরে চলে যাও—
প্রাকার পরিখা তুলে
ঢেকে নাও গোপন পরিধি
বোঝা যায়,
মনে হয় অরণ্যের প্রাণ আজো খুব ভালবেসে
আমার চিবুকে হাত রেখে আছে ঘুমে
এক নিস্তেজ ধনুকে,
চাঁদের উৎসাহ নেই আজকাল—
স্মৃতি নিয়ে আমাদের অক্ষম মৃগেরা

তবু ত' এখানে,
তবু কাছাকাছি—
তিলে তিলে শোষ করে
সময়ের হারানো পিপাসা,
প্রেম মানে বেঁচে থাকা
খুব গাঢ় এক অনুভবে

শূন্য

দেবল দেববর্মা

কালো পীচের রাস্তাটা ঠিক বিসর্পিল একটা মজাল সাপ, পাহাড়টাকে প্রায় পেঁচিয়ে ধরেছে। পথটা খাড়া নয়, সোজাও নয়, বরং ঈষৎ হেলানো, পাহাড়ের নীচ থেকে কোণা-কুনিভাবে উঠে বেঁকেছে। তারপর সাপ যেমন পেঁচিয়ে ধরে ঠিক তেমনিভাবে পাহাড়ের চূড়োয় এসে উঠেছে।

বাস থেকে নেমে মল্লিকা পথটার দিকে তাকাল। কল্পতরু হেল্পার ছোঁড়াটার কাছ থেকে মালপত্র বুঝে নিচ্ছিল। সামান্য লগেজ। দুজনের সুটকেস, চকোলেট রঙের হোল্ড-অল, ছোট একটা বেতের ঝাঁপিতে টুকিটাকি জিনিসপত্র।

শীতের বেলা। চারপাশে ছোট-বড় পাহাড়। বিকেলের মাঠে, পাহাড়ের ঢালু গায়ে ঘন ছায়া নেমেছে। রোদ প্রায় নেই। সূর্যিঠাকুর মাটির বুক থেকে রোদ্দুরের বড় জালটা মোটামুটি গুটিয়ে নিয়েছেন। এখন দূরে পাহাড়ের চূড়োয়, গাছের মগডালে অভাবী মানুষের শেষ সম্বলটুকুর মত এক চটকা মরা রোদ চিকমিক করছে।

বাসটা চলে যেতেই মল্লিকা শুধোল,—বাংলোটা তো কই এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না।

কল্পতরু হোল্ড-অলের উপর চামড়ার সুটকেস দুটো গুছিয়ে রাখল। বলল, 'বাংলোটা দেখতে পাবে কেমন করে? পাহাড়টা খাড়া। তাছাড়া অত বন-জঙ্গল। ওর আড়ালেই ঢাকা পড়েছে।'

খানিক দূরে অন্য একটা পাহাড়ের কোলে তিন-চারটে ঘরবাড়ি। কাছাকাছি লোকালয় বলতে এই,—আর বসতি চোখে পড়ে না। সামনে একটা চালাঘরে চায়ের দোকান। দোকানের মুখেই লম্বা মতন বেঞ্চি পাতা, চার-পাঁচজন লোক সম্ভবত চায়ের জন্য বসে। একটা বুড়ো লোক গায়ে চাদর জড়িয়ে কাচের গেলাস ধুচ্ছে। উনুনে একটা বড় কেৎলি বসানো। ওতে চায়ের জল গরম হচ্ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে মল্লিকা চারপাশে তাকাল। বেশ হতাশ ভঙ্গি করে বলল,—কি নির্জন জায়গারে বাবা। দিন দুপুরে গলা টিপে মারলেও কেউ টের পাবে না।'

ওর কথা শুনে কল্পতরু হাসল, 'নির্জন বলে ভয় পাচ্ছ কেন?' সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'তুমি তো এমনি জায়গাতেই আসতে চেয়েছিলে মল্লিকা। বেশ নির্জন,

পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হবার চান্স নেই। অথচ চারপাশে খুব সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ।'

—'তা বলেছিলাম ঠিক' মল্লিকা খুশি হয়ে বলল, কিন্তু তাই বলে এমনি নির্বান্ধব পুরী? পথে একটা লোক পর্যন্ত নেই। তবু ঐ চায়ের দোকানটায় কজন মানুষ বসে আছে বলে মনে একটু সাহস হচ্ছে।'

কল্পতরু পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ আর ঘাড়ের উপর বুলোল। স্টেশনে নেমে বাড়া চার ঘণ্টার বাস-জার্নি। গাড়িটা প্রায় নতুন। এবং একসপ্রেস বাস। তবু একটা ধকল আছে। শীতের দিন বলে রক্ষে। অন্য সময় হলে ঘামে সমস্ত শরীর জবজবে হয়ে উঠত। আরো ক্লান্ত দেখাত।

রুমালটা ফের পকেটে রেখে কল্পতরু বলল,—'তোমার জন্যেই তো এলাম মল্লিকা। নইলে আমি তো এখানে আগেও একবার এসেছি। এই নির্জন, নির্বান্ধব জায়গায় কেউ শিফটিংবার আসতে চায়? আমার তো ইচ্ছে ছিল পুরী কিম্বা বেনারস যাই।'

—'তুমি অমনি মানুষ', মল্লিকা মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল, —'এই বড়দিনের ছুটিতে পুরী আর বেনারসে যাত্রির ভিড়। কলকাতার কত মানুষ সেখানে বেড়াতে গেছে। পথে বেরোলেই কারো সঙ্গে ঠিক দেখা হত। একটু থেমে সে ফের বলল,—'অবশ্য তোমার ইচ্ছে থাকলে বললেই পারতে। মিছিমিছি এই দুর্ভোগ পোয়াতে হত না।'

মল্লিকার মুখ ভার। কল্পতরু তাই মনে মনে হাসল। ওর চোখের তারায় অভিমানের মেঘ, চাপা ঠোঁটে অস্পষ্ট ব্যথা। সে হেসে বলল,—'তুমি একটু দাঁড়াও মল্লিকা। আগে একটা লোকের সন্ধান করি। মালপত্রগুলো বাংলোয় নিয়ে যেতে হবে না?'

কল্পতরু লোকের খোঁজে গেল। মল্লিকা ঠিক একটা কৌতূহলী পাখির মত ঘাড় তুলে সমস্ত জায়গাটা মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছিল। আলো কমে এসেছে বলে দূরের পাহাড়গুলো এরই মধ্যে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। যে পথ দিয়ে তাদের বাসটা এল, সেই পথটা খানিক দূরের একটা পাহাড়ের কাছে প্রায় চক্রাকার বাঁক নিয়ে কোথায় নিখোঁজ হয়েছে। বাংলোয় পৌঁছলেই কংসাবতী ড্যামটা স্পষ্ট দেখা যাবে। পাহাড়টা আড়াল করে আছে বলে ড্যামের জল চোখে পড়ে না। রাস্তার গা বরাবর উঁচু বাঁধের প্রাচীর। মল্লিকা তাকিয়ে দেখল দূরে স্লুইস গেটের কালো দরজাগুলি বিকেলের মরা আলোয় একটা বৃহদাকার জন্তু-জানোয়ারের পিঠের মত অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

কল্পতরু তক্ষুনি ফিরল। চায়ের দোকান থেকে একটা লোককে সে সঙ্গে এনেছে। লোকটা এসেই হোল্ড-অলটা কাঁধের উপর তুলে নিল। তারপর চামড়ার সুটকেস দুটো হাতে নিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে পাহাড়ের পিঠ দিয়ে বাংলো বাড়িটার দিকে হেঁটে চলল।

বেতের ঝাঁপিটা কল্পতরু হাতে নিল। লোকটা আগে আগে যাচ্ছে। মল্লিকার পা চলছে কম। সে পিছিয়ে পড়ছে। কল্পতরু তাই আস্তে হাঁটা শুরু করল।

যেতে যেতে মল্লিকা শুধোল,—'কি নাম যেন জায়গাটার?'

—'বাঃ! এরই মধ্যে ভুলে গেলে?' কল্পতরু বিস্ময় প্রকাশ করল। ফের হেসে বলল,—'জায়গাটার নাম মুকুটমণিপুর। নামটা বেশ সুন্দর, তাই না?'

—'শুধু নাম কেন? জায়গাটাও ভালো', মল্লিকা প্রশংসা করল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সে ফের বলল,—'কাল খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠব। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে একটা পাহাড়ের কাছে চলে যাব কল্প।—'

কল্পতরু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। মল্লিকার মুখখানি উজ্জ্বল, বেশ খুশি-খুশি ভাব। যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে। সে শুধোল,—'পাহাড়গুলো তোমার খুব ভালো লেগেছে মল্লিকা?'

—'তা লেগেছে বৈকি।' মল্লিকা ফিক করে হাসল। ফের বলল,—'শুধু পাহাড় কেন, আসলে জায়গাটাই খুব সুন্দর। কেমন সবুজ মাঠ, আর কি নির্জন। তুমি আমাকে আগে কেন বল নি?'

—'আহা! আগে বললেই যেন তুমি আসতে রাজি হতে।' কল্পতরু রগড় করে তাকাল। 'মুকুটমণিপুর আসবার আগে তুমি কম কথা শুধিয়েছ? কলকাতা থেকে কত দূর, কেমন জায়গা, বাংলোতে থাকার ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা, আরো কত প্রশ্ন করেছ,—'

—'বারে!' মল্লিকা ঈষৎ হেসে একটি সুন্দর কটাক্ষ করল। বলল,—'সব খবর না জেনে অমনি বেরোলেই হল। তুমি পুরুষ-মানুষ। যখন ইচ্ছে যেতে পার, যেখানে খুশি রাত কাটাও। কিন্তু মেয়েদের অনেক প্রবলেম মশায়। হুট করে অমনি বেরোনো যায় না।'

বাংলোটা ভারী সুন্দর। প্ল্যান অতি আধুনিক,—চমৎকার ডিজাইন। কাচের জানালায় লতাপাতা আঁকা মোটা কাপড়ের পর্দা ঝোলানো। সামনে প্রায় ডিমের আকার লাউঞ্জের মত জায়গা। ভিতরের ঘরটা ঠিক চৌকো নয়, বরং গোলাকার। মাঝখানে ডাইনিং টেবিল। এক পাশে ফ্রিজ। কোণের দিকে একটা কাচের আলমারিতে খাবার প্লেট, কাঁটা-চামচ, আরো কিছু চীনামাটির বাসনপত্র।

পাহাড়ের মাথায় এমন সুন্দর ফুল ফুটিয়েছে এরা। এই শীতের শুরুতেই বিচিত্র রঙের সব মরশুমী ফুলের বাহার। কয়েকটা গাছে এরই মধ্যে চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে। মেয়েদের খোঁপার মত দু-তিনটে বড় সাইজের ডালিয়া। পিছন দিকে একটা গোলাপের ডালে টকটকে লাল রঙের ফুল।

মল্লিকা বলল,—'সত্যি, কি সুন্দর যে লাগছে কল্প, এত ফুল, এমন সুন্দর পরিবেশ। আর বাংলোটা কি নাইস। মনে হচ্ছে এখানে অনেকদিন ধরে থাকি।'

কল্পতরু মনে মনে হাসল। মল্লিকার এই স্বভাব। ফুলের মতন ওর মন হারিয়ে যায়। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পেলে মল্লিকা যেন সবটুকু আঁকড়ে ধরে। কিন্তু মুকুটমণিপুরের এই বাংলোবাড়িতে তাদের স্বল্প মেয়াদ। নেহাৎই ক্ষণিকের অতিথি। অনেকদিন দূরের কথা, এখানে তেরাত্তিরও থাকা হবে না। আজ বিকালে এসে পৌঁছল। কাল সমস্ত দিন থাকবে। আবার পরশু সকালের বাস ধরেই কলকাতা ফিরতে হবে। এর নড়চড় হবার উপায় নেই।

মালপত্র নামাতেই বাংলোর ভিতর থেকে চৌকিদার গোছের একজন গ্রাম্য লোক বেরিয়ে এল। লোকটির পরনে মোটা ধুতি, হাঁটুর উপর গুটিয়ে পরেছে। গায়ে গেঞ্জি। পলাশঝোপের মত এক মাথা চুল। মুখে দু-তিন দিনের গজানো দাড়ি।

—'আপনারা কি কলকেতা থেকে আসছেন গো?' সে শুধোল।

কল্পতরু বলল,—'হ্যাঁ, আমাদের রিজার্ভেশন আছে। আজ বিকেল থেকে পরশু সকাল পর্যন্ত থাকব।'

লোকটা মুখের কথাতেই সন্তুষ্ট মনে হল। কাগজপত্র দেখতে চাইল না। মাথা নুইয়ে নমস্কার করে বলল,—'আসুন তবে। ঘরখানা খুলে দিই। মালপত্তর রেখে খানিকটা জিরিয়ে নিন। আমি একবার খপ করে ইঞ্জিনীয়র সাহেবকে খবরটা দিয়ে আসি।'

—'ইঞ্জিনীয়র সাহেবকে খবর দিতে হবে কেন?' কল্পতরু একটু অবাক হয়ে শুধোল।

—'আজ্ঞে আমার উপর এই হুকুম।' লোকটি সবিনয়ে জানাল।

বলল,—'কেউ এলেই খবরটি দিয়ে আসতে হবেক। আবার যাবার বেলাতেও তাই। চলে গেলেই ইঞ্জিনীয়র সাহেবকে জানিয়ে আসা নিয়ম।'

ঘরটা ছোট নয়, বরং বড়ই বলা যায়। খানিকটা ব্যবধানে চকোলেট রঙের দুটো সিঙ্গেল খাট। দেয়ালে একটা মাঝারি সাইজের আয়না। কোণের দিকে একটা গোল টেবিল, দুখানা চেয়ার। জামা-কাপড় রাখার জন্য একটা ছোট আলনাও আছে। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। সুবিধের ষোল-আনা ব্যবস্থা। ত্রুটি নেই।

খাটের উপর স্প্রিংয়ের মত নরম গদি। হোল্ড-অলের দিকে তাকিয়ে কল্পতরু বলল,—'মিছিমিছি বিছানাপত্র বয়ে আনলাম। একজোড়া চাদর আনলেই কাজ চলে যেত।'

অন্য খাটটায় মল্লিকা আড় হয়ে শুয়ে। ভ্রূ কুঁচকে সে বলল, —'শুধু চাদরে হত না মশায়। রাত্তিরে কিরকম ঠান্ডা পড়ে দেখ। এই সব পাহাড়ী জায়গায় প্রচণ্ড শীত। তখন মনে হবে ভাগ্যিস সঙ্গে লেপ-কম্বল নিয়ে এসেছি। নইলে ঠকঠকিয়ে মরতে হত।'

দরজাটা বন্ধ করা হয়নি। সেই লোকটা ফের ঘরে এসে ঢুকল। মল্লিকা শুধোল,—'তোমার নাম কি?"

—'আজ্ঞে আমার নাম নিবারণ। আপনাদের জন্য চা করে আনব?'

—'চা?' মল্লিকা ঠোঁট কামড়ে এক মুহূর্ত ভাবল। বলল,—'বেশ, নিয়ে এস

চা। কিন্তু মিনিট-দশেক পরে। মুখ-হাত ধুয়ে আমরা একটু ফ্রেস হয়ে নিই।'

লোকটা কল্পতরুর দিকে একটা খাতা এগিয়ে দিল। নাম-ঠিকানা লিখতে হবে। কি উদ্দেশ্যে আসা, কতদিন থাকা হবে, তাও ফিরিস্তি চাই। কল্পতরু পকেট থেকে কলম বের করে খসখস করে লিখল।

মল্লিকা শুধোল,—'আমার নামটাও লিখলে তো?'

কল্পতরু কলমটা বন্ধ করে পকেটে রাখল। কেন, তোমার আপত্তি আছে নাকি?' সে মৃদু হেসে প্রশ্ন করল। পরে বলল, —পুরো নাম লিখিনি। শুধু 'মিসেস সেন' লিখে দিয়েছি। ওতেই চলবে।'

—'আপনারা রাত্তিরে কি খাবেন বাবু?' নিবারণ খাতা বন্ধ করে শুধোল।

—'কি খাওয়াতে পারবে তুমি?' কল্পতরু বিজ্ঞের মত বলল।

—'আজ্ঞে যদি বলেন তো চিকেন-কারী বানিয়ে দিতে পারি। নইলে ডিমের ঝোল, এবেলা আর মাছ পাওয়া যাবে না বাবু। তবে কাল সকালে নিশ্চয়—'

মল্লিকা গিন্নির মত বলল, —'ডিমের ঝোল থাক বাপু। তুমি কাল ব্রেকফাস্টের সঙ্গে ডিম দিও। আজ মুরগীর মাংসই হোক।'

সে কল্পতরুর মতামতের জন্য অপেক্ষা করল না।

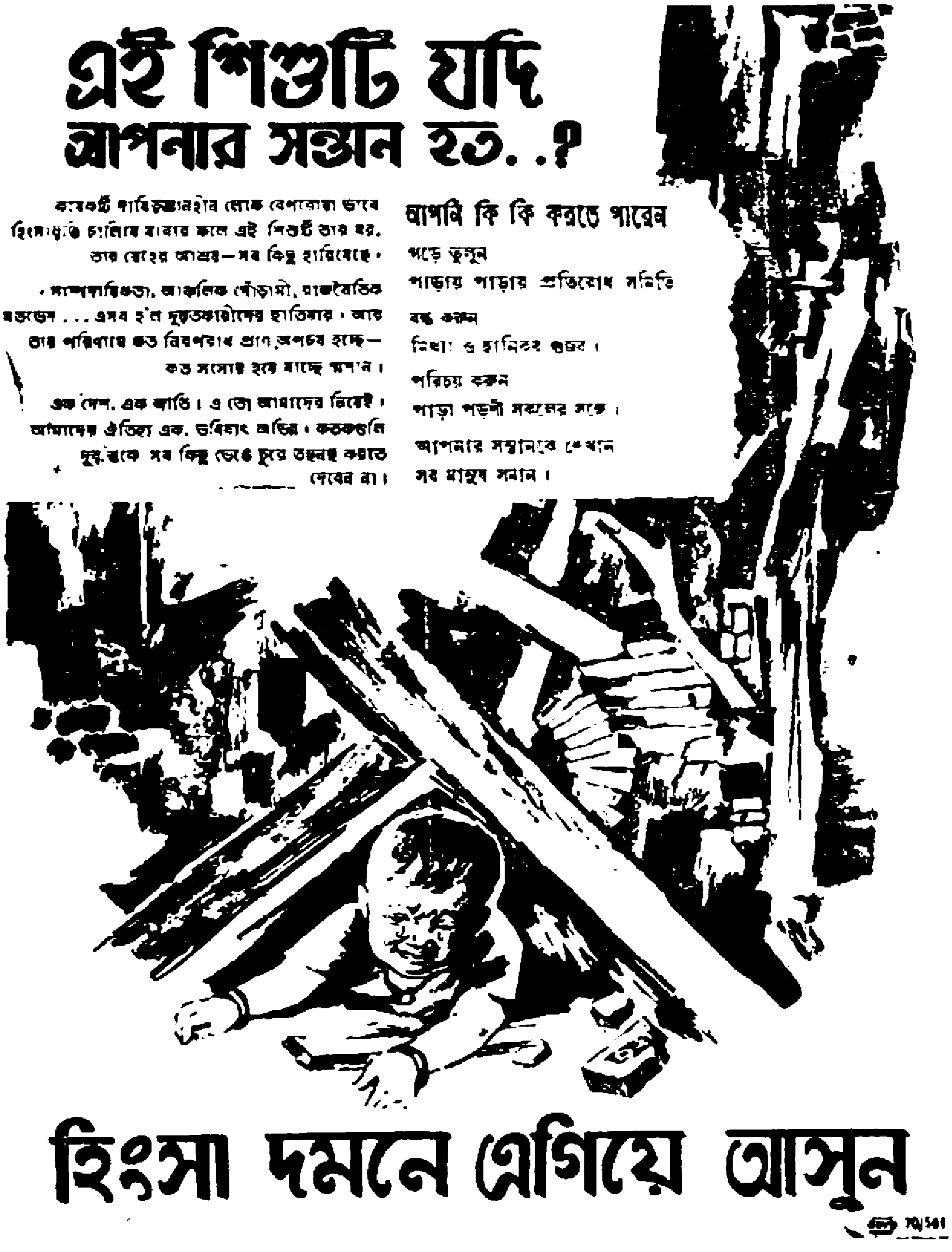

নিবারণ চলে যেতেই মল্লিকা উঠে দাঁড়াল। কল্পতরুকে বলল, —'তুমি একটু বাইরে গিয়ে বস। আমি ঘরটা গুছিয়ে ফেলি। নিবারণ এখুনি চা নিয়ে আসবে। তার আগেই কাজ শেষ করতে চাই।'

—'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।' কল্পতরু চড করে হাত বাড়াল।

—থাক, থাক। আর সাহায্যে কাজ নেই।' মল্লিকা বাধা দিল। 'এসব পুরুষ-মানুষের কর্ম্মো নয় মশায়। দয়া করে যদি বাইরে গিয়ে একটু বস, তাহলেই মস্ত উপকার হবে।' চোখ নাচিয়ে সে ফের বলল, —'বরং একটা কাজ করো ত' খুব খুশি হই। নিবারণকে গিয়ে বলো ফুলের ছোট একটা তোড়া করে দিতে। টেবিলের উপর ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখব। আর আমার জন্যে একটা ভালো দেখে চন্দ্রমল্লিকা এনে দাও।'

—ফুলের তোড়া আনতে বলছ। ফের আলাদা করে একটা চন্দ্রমল্লিকা নিয়ে কি করবে?'

—হাঁদারাম!' মল্লিকা গা দুলিয়ে হাসল। 'মেয়েরা ফুল নিয়ে কি করে তাও জানো না?' ফস করে পিছন ফিরে দাঁড়াল মল্লিকা। নিজের মস্ত খোঁপাটার দিকে ইঙ্গিত করে সলজ্জভাবে তাকাল।

দশ মিনিট নয়। নিবারণ এল আধঘণ্টা পরে। ট্রের উপর বসানো কাপে ধূমায়িত চা। একটা প্লেটে আট-দশখানা ভালো বিস্কুট। টেবিলের উপর ট্রেখানা নামিয়ে মুখ কাচুমাচু করে নিবারণ বলল,—'দেরি হয়ে গেল সিদিমণি। দুধ ছিল না। গয়লার কাছ থেকে নিয়ে এলাম। খানিকটা দূরে বাড়ি। তবু এক দৌড়ে গেছি আর এসেছি।'

কল্পতরু রহস্য করে হাসল। 'তাই বলো। আমি ভাবছিলাম তুমি ইঞ্জিনীয়র-বাবুকে আমাদের আগমন বৃত্তান্ত জানাতে গিয়েছ।'

—'আজ্ঞে না। আর খবর দিতে যেতে হবেক নাই। উপর থেকে দেখলাম ইঞ্জিনীয়রবাবু বাংলোর দিকেই আসছেন।' নিবারণ ধীরে ধীরে বলল।

চা খাওয়া শেষ করে কল্পতরু বেরিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলায় মল্লিকা ঘরে বসে থাকতে রাজি নয়। ড্যামের ধারে একটু বেড়াবে। কিম্বা ফুলের বাগানের পাশে বসে দুজনে গল্পগুজব করবে। তবে শীতের হাওয়া। আর একটু পরেই ঠাণ্ডা পড়বে। ইচ্ছে থাকলেও বেশীক্ষণ বাইরে থাকা যাবে না।

ঘর থেকে বেরিয়েই কল্পতরু লোকটিকে দেখল। কাঠের আলমারিটার কাছে দাঁড়িয়ে নিবারণের সঙ্গে কথা বলছে। পাল কাটিয়ে চলে গেলে অভদ্রতা হয়। কল্পতরু তাই থমকে দাঁড়াল। হাতজোড় করে বলল, —'নমস্কার। আপনিই নিশ্চয় ইঞ্জিনীয়র-বাবু? নিবারণ আপনার কথা বলছিল।'

কল্পতরুর হঠাৎ খেয়াল হল, লোকটি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখছে। মনে হল কল্পতরুকে সে চেনে। হয়ত পরিচয় করে দাবি করতে দ্বিধা করছে।

চিনতে পেরেই কল্পতরু হাসল। উজ্জ্বল মুখ করে বলল, —'হারীত না?'

—'চিনতে পেরেছিস তাহলে? আমি ভাবছিলাম তোকে ফের পরিচয় দিতে হবে।'

—'বলিস কি? ছ-সাত বছর পরেই তোকে চিনতে পারব না? কতদিন এক মেসে কাটালাম।' একটু থেমে সে ফের বলল, —'তুই এখানে ইঞ্জিনীয়র আছিস জানলে আমি একটা পোস্টকার্ড লিখেই চলে আসতাম। রিজার্ভেশান পাবার জন্য মিছিমিছি চিঠিচাপাটি করতে হত না।'

হারীত মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বলল, —'মিসেস বোধহয় আমাকে চিনতে পারেননি, বুঝলি কল্প?'

এ-ঘরে নিবারণ সুইচ টিপে আলো জ্বালায়নি। অবশ্য বাইরের আলো এসে পড়েছে। সেই আবছা আলোয় মল্লিকাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। পরনে সবুজ শাড়ি, গায়ে জড়ানো সবুজ শাল। গলায় শুধু একটা পাথরের হার, সবুজ রঙের জ্বল-জ্বলে পাথরগুলি। কানেও তেমনি দুল। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। মল্লিকা অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিল, লোকটাকে সে কোথায় দেখেছে?

কল্পতরু পিছন ফিরে বলল, —'হারীতকে চিনতে পারছ না মল্লিকা? ওর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। একবার ক্লাস পালিয়ে মেট্রোতে কি একটা বই দেখতে গেছলাম দুজনে। সিনেমা থেকে বেরিয়েই হারীতের সঙ্গে দেখা। তোমার মনে পড়ে মল্লিকা?'

হারীত বলল, —'কতদিনের কথা। এসব কি মনে থাকা সম্ভব? মিছিমিছি তুই ওকে বিব্রত করছিস কল্প। সেদিন কি বই দেখতে গিয়েছিলি, এরপর হয়তো তাই জিজ্ঞেস করবি।'

বকের মতো আলতো পা ফেলে কল্পতরু শিশিরের নরম মাটির উপর দিয়ে হাঁটছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করে কয়েক সেকেণ্ড সে চিন্তা করল। তার স্বগতোক্তির মত বলল, —'কি বই দেখতে গিয়েছিলাম আমার কিন্তু মনে আছে। এ টেল অব টু সিটিজ।'

মল্লিকার দিকে তাকিয়ে সে ফের বলল, 'তুমি নিশ্চয় বলতে পারবে না।"

—'এখন যাচ্ছিস কোথায়?' হারীত শুধোল।

—ড্যাম দেখতে। সন্ধ্যেবেলায় ঘরে বসে কি করব? তাই বেরিয়ে পড়লাম।'

—'পাগল নাকি?' হারীত বাধা দিয়ে বলল, 'এই অন্ধকারে কেউ ড্যাম দেখতে যায়? কি দেখতে পাবি? শুধু মিশমিশে অন্ধকার। বরং কাল সকালে আমি জীপ নিয়ে আসব। তোরা তৈরি হয়ে থাকিস। সমস্ত জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখাব।'

—'সেই ভালো।' কল্পতরু সায় দিয়ে বলল, 'আমরা দুজনেই আনাড়ি। আমাদের কাছে ড্যাম মানেই অনেক জল,—একটা মস্ত পুকুর। তুই সঙ্গে থাকলে তবু কারিগরী ব্যাপারের ছিটেফোঁটা বুঝতে পারব।'

মল্লিকা হেসে বলল,—'তা ঠিক। আপনিই তাহলে আমাদের ড্যাম দেখাবেন হারীতবাবু। কিন্তু এখন থেকে ঘরে ঢুকতে মন চাইছে না। কোথায় যাই বলুন তো?'

—'চলুন, এমনি একটু ঘুরিয়ে আনছি। খানিকটা হাঁটা তো হবে।' হারীত উপায় বাতলাল।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। কাচের ঘর বলে ভিতর থেকে বোঝা যায় না। কার্তিকের শেষেই এই অবস্থা। পৌষ-মাঘে নিশ্চয় বুকের ভিতর গুরগুর করে কাঁপে। হৃদ-পিণ্ডের রক্ত হিম হয়ে আসে। মল্লিকা শালটা ভালো করে গায়ে জড়াল।

—'শুনলাম তোরা পরশু সকালেই চলে যাবি।' হারীত বলল।

—'হ্যাঁ'। কল্পতরু প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ফের বলল,—'উইক-এণ্ড কাটাতে আসা। নইলে ছুটি কোথায়?'

—'তুই কি করছিস এখন?'' হারীত শুধোল।

—'একটা কোম্পানীতে আছি। তবে শান্তি নেই। আজকাল জানিস তো যে-কোনো কনসার্নেই নানা ঝুট-ঝামেলা। একবার অফিসে ঢুকলে কখন বেরুবো শুধু তাই ভাবি।'

—'কাল সকালে ড্যামটা দেখে নিস। বিকেলে তোদের একটা জায়গায় নিয়ে যাব।'

—'কোথায় নিয়ে যাবেন?' মল্লিকা সাগ্রহে তাকাল।

—'বেশী দূরে নয়। জায়গাটা কাছেই, — কাঁসাই আর কুমারী নদীর মিলনস্থল। এখান থেকে বড়জোর মাইল দুই হবে। এখন কাঁসাই শুকনো, আমাদের হাতে বন্দী। একা কুমারী বয়ে চলেছে।'

—'এ আপনাদের ভারী অন্যায়।' মল্লিকা চোখ নাচিয়ে বলল, 'বেচারী কুমারীর তাহলে এখন বিরহিনীর দশা।'

—'সেখানে আর কি আছে?' কল্পতরু শুধোল।

—'তেমন কিছু নয়। একজন সাধুর কাছে তোদের নিয়ে যাব। লোকটা বাঙ্গালী নয়,—পাঞ্জাবের কোথায় যেন ঘর ছিল। নদী পেরিয়েই ওর আস্তানা। অদ্ভুত ক্ষমতা আছে লোকটার। মুখ দেখে অনেক কিছু বলতে পারে। ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার,—গেলেই বুঝতে পারবি।'

—'সত্যি?' মল্লিকা চোখ বড়ো করে তাকাল। শুধোল,—'কাল বিকেলে যাবে তো কল্প?'

—'আপত্তি নেই।' কল্পতরু নিরাসক্ত কণ্ঠে জানাল। 'সাধু সন্ন্যাসী দর্শন মন্দ কি? বিশেষ করে তুমি যখন ইন্টারেস্টেড।'

বেশ হিম পড়ছিল। পায়ের নীচে ভিজে মাটির স্পর্শ। ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ায় খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

ক্লিনিক কিভাবে কাজ করে

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস। কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

শিশিরকণা। পেঁজা-তুলার মত উপড়ে করা আকাশ নিকষ কালো অন্ধকারের আড়ালে ধরণীকে প্রায় আলিঙ্গন করে আছে।

মল্লিকা বলল,—'এবার ফেরা যাক। ঠান্ডায় বেড়িয়ে শেষে না আবার অসুখ বিসুখ করে।'

কল্পতরু সায় দিল। 'সেই ভালো। বাংলোতে বসেই বরং আড্ডা হোক। নিবারণ আর এক রাউন্ড চা দিক আমাদের বেশ জমিয়ে গল্প হবে।'

সামনের দিকে সেই কিম্ভাকার হোসপাটায় বসল ওরা। কল্পতরু আর হারীত। মল্লিকা বসল না। তার গায়ে-পায়ে ব্যথা। ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে পড়ছে, আরাম করে বিশ্রাম না নিলে সর্বাঙ্গে শরীর চাঙা হবে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হারীত বলল, 'তুই বেশ লোক। মল্লিকাকে বিয়ে করেছিস, সে খবরটা পর্যন্ত দিলিনে। অথচ একদিন তোদের প্রেমপর্বের প্রতিটি ঘটনা আমার কাছে গল্প করতিস।'

কল্পতরু হাসল। 'খবর দিতাম কেমন করে তাই বল? তোর সঙ্গে কি যোগাযোগ ছিল? আজ মুকুটমণিপুরে এসেছি বলে ফের দেখা হল।'

পাহাড়ের মাথায় মসীকৃষ্ণ আকাশের বুকে আতসবাজির মত তারার মেলা। এখানের বায়ুমণ্ডল ধূলিহীন...ধোঁয়াহীন নিঃসীম নভতল। জ্বলজ্বলে অসংখ্য উজ্জ্বল তারা চোখে পড়ে।

হারীত বলল,—'তোকে দেখে খুব আনন্দ হ'ল এবার। কলকাতা ছাড়ার আগে তোর সঙ্গে লাস্ট কবে দেখা হয়েছিল মনে আছে? তখন তুই খুব হতাশ। আমায় বললি মল্লিকার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না।'

কল্পতরু মুখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ পরে শুধোল,—'আমি তোকে আর কি বলেছিলাম মনে আছে?'

—সব মনে আছে।' হারীত সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিল। 'তুই বললি মল্লিকা শেষ পর্যন্ত রতীশের দিকেই ঝুঁকল। বড়লোকের ছেলে, কলকাতায় ওর বাড়ি আছে। গাড়ি আছে। মল্লিকার কাছে পাত্র হিসেবে রতীশই কাম্য। মেয়েদের কাছে প্রেম একটা মজার খেলনা। নতুন হলে যেমন মনে ধরে পুরোন হলেই তেমনি বাতিল করতে দেরি হয় না।' মুচকি হেসে হারীত ফের বলল,—'তুই মিছিমিছি রাগ করেছিলি কল্প। জোয়ারের মুখে সব নৌকোই চঞ্চল হয়,—এদিক সেদিক দোলে। তাই বলে কি নোঙর ছিঁড়ে ভেসে যায়?'

কল্পতরু মুখ না ফিরিয়েই শুধোল,—'রতীশকে তোর মনে আছে?'

—মুখখানা স্পষ্ট মনে নেই। তবে দেখলে এখনও চিনতে পারব। তুই যাই বলিস কল্প; রতীশ কিন্তু খুব হ্যান্ডসাম দেখতে ছিল। ইকনমিক্সে পড়ত মনে আছে। আচ্ছা এখন ও কি করে? কোনো খোঁজখবর রাখিস?'

কল্পতরু ভ্রূ কুঁচকে বলল,—কিছু কিছু খবর রাখি। এম-এ পাশের পর রতীশ একটা ভালো কনসার্নে ঢুকেছিল। কভেনেন্টেড পোস্ট। হাজার দেড়েক টাকা মাইনে। এখনও বোধ করি সেখানেই আছে।'

—'তাই নাকি?' হারীত সাগ্রহে প্রশ্ন করল। 'রতীশ বিয়ে-থা করেছে?'

—'করেছে বলেই জানি।' কল্পতরু গালে হাত রেখে কি যেন ভাবল। বলল,—'তবে রতীশের খুব বদনাম। স্ত্রী ছাড়া ওর নাকি অন্য আকর্ষণও আছে। সন্ধ্যের পর বারে যায়, মদ গেলে। রেস-খেলা খেলে। সঙ্গিনী নিয়ে ঘোরে ফেরে।'

—'কেন, বউ, কি কালো কুচ্ছিৎ? মল্লিকার মত রূপসী হয় নি?'

—'কালো কুচ্ছিৎ কেন হবে?' কল্পতরু হেসে বলল,—'বউ মল্লিকার মতই। ওদিব হ'ল নেশার ব্যাপার। ভালো মাইনে পায়, বাপ মারা যাবার পর অনেক টাকাকড়ির মালিক হয়েছে। এই তো পরশু দিন সকালের ফ্লাইটেই রতীশ দিল্লী গেল।'

হারীত সবিস্ময়ে বলল,—'তুই দেখছি ওর অনেক খোঁজখবর রাখিস। রতীশের প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে এত কথা জানলি কেমন করে?'

—'চেষ্টা করে জানতে হয় নি।' কল্পতরু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, —মানে এমনিই কানে আসে। একজন কমন ফ্রেন্ডের মারফৎ শুনি। স্ত্রীর সঙ্গে রতীশের বনিবনা হয় নি। মনের মারাত্মক অমিল, গন্ডগোল। শুধু ডিভোর্স হতে বাকি।'

—বলিস কি? ব্যাপার তাহলে চরমে উঠেছে?—

—তাই তো শুনলাম। রতীশ নাকি কন্টিনেন্টে বেড়াতে যাবে। তিন মাসের টুর। সব ঠিকঠাক। দিল্লীতে গেছে তাম্বিল-তদারক, প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সারতে।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে কল্পতরু কি যেন ভাবল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,—'কন্টিনেন্ট থেকে ফিরে এসে দেখবে বউ ওর ঘরে নেই। শিকলি কেটে ময়না ফুড়ুৎ করে উড়ে গেছে।'

প্রায় পুড়ে-আসা সিগারেটটা অন্ধকারে হারীত ছুঁড়ে দিল। হাসতে হাসতে বলল,—'রতীশের উপর তোর এত রাগ কেন বাবা? মল্লিকাকে তো তুই পেলি। বরং রতীশ তোর কাছে হেরে গেছে। যাকে বলে ক্লীন বোলড্।'

কল্পতরু কোনো জবাব দিল না। অন্ধকার আকাশের দিকে মুখ তুলে সে সম্ভবত তারা গোনার চেষ্টা করছিল।

হারীত বিদায় নিলে কল্পতরু উঠল। ঘরে ঢুকতেই মল্লিকা অভিমান জড়িত কণ্ঠে বলল,—'এতক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে কি গল্প করছিলে? আমার কথা বুঝি মনে ছিল না?'

—'এমনিই। বলছিল রতীশ নাকি আমার কাছে হেরে গেছে। তোমাকে আমিই উইন করেছি। রতীশ একবারে ক্লীন বোলড্।'

কল্পতরু হা-হা করে হাসল।

—'হারীতবাবু তাকে চেনেন নাকি?' মল্লিকা ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

—'বারে! চিনবে না কেন? তাছাড়া এক সময় ও আমাদের সব কথাই জানত। তুমি রতীশ আর আমার মধ্যে কাকে বিয়ে করবে তাই ঠিক করতে পারনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য—'

—'আঃ চুপ করো।' মল্লিকা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে না। এই সব শোনাবে বলেই কি মুকুটমণিপুরের বাংলোয় এনে তুলেছ?'

কল্পতরু কোনো কথা বলল না। মল্লিকা এমনি। অদ্ভুত, অবুঝ। রৌদ্রছায়ার প্রকৃতি।

সকালে জ্যাম খেলা শেষ হ'ল। বেলা প্রায় এগারোটার মত। সূর্য মাথার উপর ঠেলে উঠেছে। মিষ্টি নরম রোদে গা ভাসিয়ে একটা সাদা বক নীলাকাশের বুকে বিচিত্র চিত্রপট রচনা করল।

বাংলোর কাছে জীপ দাঁড়াল। হারীত বলল, —'আমি এখুনি আসছি। তোরা চান-টান করে নে। আজ নিবারণ এখানে নেমন্তন্ন করেছে।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে মল্লিকা মুখ তুলে তাকাল।

কল্পতরু হেসে ব্যাখ্যা করল,—'তোমাকে কথাটা বলা হয় নি। হারীতের গৃহিণী এখন পিত্রালয়ে। ওর রান্না নিবারণই করে। এখান থেকে খাবার যায়। আমরা পরিচিত বন্ধুজন জেনে নিবারণ এখানেই খেতে বলেছে।'

মল্লিকা ঠোঁট কামড়ে তাকাল। চোখের তারায় অর্থপূর্ণ হাসি। হারীতকে লক্ষ্য করে সে বলল— 'তাহলে তো আপনার খুবই অসুবিধে।'

—'অসুবিধে কিসের?' হারীত কথাটা অস্বীকার করতে চাইল। কিন্তু মনের ভিতর তেমন জোর পেল না।

• • •

নদী পেরিয়ে সাধুর ডেরা।

কল্পতরু বলল— 'মল্লিকার সব আজগুবি খেয়াল। কোনোকালে তোমার সাধু-সন্ন্যাসিতে আস্থা ছিল বলে শুনিনি।'

—'আহা! আস্থা আবার কিসের?' মল্লিকা ভ্রূভঙ্গি করে তাকাল। 'এমনি বেড়াতে এসেছি মনে করতে পার।'

প্রায় ছ' ফুট লম্বা লোকটি। তপস্বী সাধুর মতই লম্বা চুল চুড়ো করে বাঁধা। মুখ ভর্তি দাড়ি। এই শীতেও খালি গা। ঘন রোমে ঢাকা বুক। নিম্নাঙ্গে গেরুয়া বসন বাংলার বাউলের ধরনে পরেছে।

জায়গাটা বড় নির্জন। কুক কুক পাখির ডাক। ঘন বন-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে বিকেলের মরা রোদ ভীরু তস্করের মত সন্তর্পণে ঢুকেছে।

হারীত বলল,— 'আমার বন্ধুকে নিয়ে এলাম মিস্ত্রীজী। আপনার নাম করে এনেছি। ওকে কিছু বলতে হবে আপনাকে।'

সাধু লোকটি মিতবাক। মৃদু হেসে বলল,— 'ওসব ফালতু চীজ, বাবুজী।

কেনো মুচকি হাসছেন?' কের কল্পতরুর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোল,—'বাবুজীর নাম কি আছে?'

—উঁহু।' হারীত মাথা নেড়ে বলল,—'আমি জানিনে। নাম তো আপনাকেই বলতে হবে। নইলে কেন আনলাম ওকে।'

মল্লিকা ফিসফিস করে কানের কাছে বলল,— 'উনি কি মুখ দেখে নাম বলতে পারেন নাকি?'

—'নিশ্চয় পারেন।' হারীত তারিফ করার ভঙ্গিতে বলল। 'আপনাকে বলছি না সাধুজীর অদ্ভুত সব ক্ষমতা।'

কোথা থেকে স্লেটের মতো একটা কালো পাথর সাধু জোগাড় করে আনল। হাতে খড়ি। ইঙ্গিতে সকলকে বসতে বলল সামনে। তারপর ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে হারীতকে উদ্দেশ করে অনেকক্ষণ কি বলল।

কল্পতরুর মুখের দিকে তাকিয়ে হারীত শুধোল,— 'বুঝতে পারলি কিছু? সাধুজী তোকে তিনটে প্রশ্ন করবেন। তুই মনে মনে উত্তর দিবি। আর সাধুজী তোর উত্তরগুলো পাথরে লিখে দেবেন।'

ব্যাপারটা ম্যাজিকের মতই মজার। কল্পতরুর তাই মনে হল। সে ভাবছিল,—হবেও বা, এসব সাধনার ফল। মল্লিকা তো অবাক। বিস্ময়ে চোখ দুটো গোলগোল হল। গালে হাত দিয়ে সে বলল, —'ওমা! তাই নাকি? মনের কথা উনি পাথরটার উপর লিখে দেবেন?'

সাধু একদৃষ্টে কল্পতরুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ছুরির মত শানিত। কল্পতরুর খুব অস্বস্তি লাগছিল। ওর মুখের উপর সাধু যেন একটা অদৃশ্য মুখোশ চড়িয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও মুখোশটাকে সে দূরে সরাতে পারছে না।

—'আপকা নাম কি আছে বাবুজী?' সাধু প্রথম প্রশ্নটি করল।

কল্পতরু হাসল। নিজের নামটা মনে মনে আউড়ে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সাধু বিড়বিড় করে হাতের আড়াল দিয়ে কালো পাথরটার উপর কি যেন লিখল। কিন্তু কাউকে দেখাল না।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন। 'একঠো পনছীর নাম বলুন তো বাবুজী।' সাধু তেমনি মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধোল।

কল্পতরু এবার ঠোঁট নেড়ে উত্তর দিল। কিন্তু কি বলল বোঝা গেল না। সাধু আগের মতই বিড় বিড় করে পাথরে কি লিখল।

—'আপকা জরুকো কি নাম আছে বাবুজী?' সাধু গম্ভীর গলায় তার শেষ প্রশ্নটি করল।

হারীত মুচকি হাসল। তাকিয়ে দেখল মল্লিকা সাধুর মতই কল্পতরুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

এক মুহূর্তের জন্য কল্পতরুকে ঠিক বোঝা গেল না। সামান্য প্রশ্নেই সে যেন বিব্রত, ঈষৎ চিন্তিত। গম্ভীরভাবে সে কিছু ভাবল। মুখে বলল,— 'উত্তর আমি দিয়েছি সাধুজী।'

কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে হারীত বলল,—'কই, এবার পাথরটা আমাদের দিন সাধুজী, কি লিখলেন দেখি।'

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ইংরেজী 'কে' অক্ষর লেখা, পাথরটা মল্লিকাকে দেখিয়ে হারীত বেশ গর্বভরে বলল,—'কি, বিশ্বাস হল তো এবার?' কের কল্পতরুকে শুধোল—'পাখির নামটা কি ভেবেছিলে?'

—'বুলবুল পাখি, আর কিছু মনেই এল না।' কল্পতরু হেসে জবাব দিল।

হারীত বলল,—'সাধুজী পাথরের উপর কি অক্ষর লিখেছেন। কাজেই এটাও মিলল।'

শেষ উত্তরটি হারীত জানে। শুধোবার প্রয়োজন নেই। তবু মল্লিকাকে সে বলল,—'দেখুন দিকি, আপনার নামের আদ্যক্ষর এখানে আছে তো?'

অক্ষর দেখে মল্লিকার ঠোঁটে আর কথা জোগাল না। পাথরটা অনেকক্ষণ ধরে সে দেখল। তার নামের আদ্যক্ষর 'এম'। কিন্তু সাধু যা লিখছেন সেটি ইংরেজী কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ নয়। স্বরবর্ণ 'ও'।

হারীতকে খুব হতাশ মনে হল। ম্লান হেসে সে বলল—'তিন নম্বরটা মিলল না সাধুজী।' মল্লিকাকে ইঙ্গিত করে সে ফের যোগ করল—'এর নামের ফার্স্ট লেটার 'এম'। ইংরেজী 'ও' অক্ষর নয়।'

সাধু দু-চার সেকেণ্ড কাল ভ্রূ কুঁচকে কল্পতরুর মুখের উপর তেমনি স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। শেষে বলল—'হয় হয়তো বাবুজী। কভু কোই কসুর হয় গেছে। নেহি তো আপনা ভুল কোনো হয়েছে।'

নদীর ওপারে ক্ষীণ গোধূলির আলো। নদীর দীর্ঘ অঞ্চলে জলের অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হয়ে আসে। [illegible] কল্পতরু বলল—'সাধুজীর [illegible] হারীত আমাকে [illegible] সমস্ত সমাধান দেখাবে। অনেক ম্যাজিসিয়ানও এই [illegible]।'

হারীতের দৃষ্টি বিষণ্ণ। মামলায় হেরে যাওয়া নতুন উকীলের মত। সে নরম গলায় বলল—'সাধুজীর এই প্রথম ভুল হতে দেখলাম। নইলে আগে কখনও এরকম হয়নি।' একটু থেমে সে ফের মল্লিকাকে শুধোল,—'আচ্ছা 'ও' অক্ষর দিয়ে কি কোনো বাঙালী মেয়ের নাম হয়? আপনি কি বলেন?'

—'আমি জানি না।' মল্লিকা ছোট্ট উত্তর দিল। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ-চাপ বসে রইল।

বাংলোতে ফিরেই মল্লিকার অন্য মূর্তি। রাগে ফর্সা মুখখানা প্রায় লাল। দুই চোখ জ্বলা।

বিশ্রীভাবে মুখ কুঁচকে সে বলল—'আমার মত আর কোন মেয়ের সর্বনাশ করেছ তুমি? দীপালীর কথা—'

—'আমি সর্বনাশ করেছি? তুমি কি বলছ মল্লিকা—'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি ঠিকই বলছি। বল, কি তোমার স্ত্রীর নাম? কবে তাকে বিয়ে করেছিলে?' রাগে মল্লিকা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

—'তুমি ভুল বুঝছ মল্লিকা।' কল্পতরু অনুনয় করল, 'আমার কথা শোন, আমাকে বলতে দাও।'

'আর কোনো কথা বলতে হবে না তোমাকে।' মল্লিকা ধমক দিয়ে উঠল। বিছানার উপর কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তার সমস্ত দেহ বার-বার দুলে উঠতে লাগল।

সকালেই বাস, হারীত এল বিদায় জানাতে। মল্লিকা সামনের দিকে একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিল। তার নিশ্চল নির্বাক, অভিব্যক্তিহীন মূর্তি দেখে হারীত কোনো কথাই বলতে পারল না।

বাস ছাড়ার আগে কল্পতরু শুধু বলল,—'কলকাতায় এলে দেখা করিস। একেবারে ভুলে যাস নে।'—হাত নেড়ে সে বিদায় জানাল।

দিন সাতেক পরে একটা চিঠি এল মুকুটমণিপুরে। কল্পতরু লিখছে—

হারীত,

সেদিনের ব্যাপারটা তোর কাছে নিশ্চয় হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। মল্লিকা আমার কোনো কথা শুনতে চায়নি। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর, মল্লিকা ছাড়া আর কোন মেয়ের সঙ্গেই আমার প্রেম হয়নি। কাউকে ভালবাসিনি।

তোর কাছে স্বীকার করছি। আমার স্ত্রীর নাম নেই। আমি বিবাহিত নই। মল্লিকা আমার স্ত্রী নয়। আমার পত্নীস্থান ইংরেজী 'ও' অক্ষরের মতই,—অর্থাৎ শূন্য। সাধুকে সেই কথা বলেছিলাম।

মল্লিকা এখন আমার ঘরে। দীপালির ওখা বেড়াতে যাবে। সমস্ত কন্টিনেন্ট ঘুরে স্টেটসেও যেতে পারে।

হারীতের কাছে ফের হেরে গেলাম। এবারও মল্লিকাকে উইন করে নিয়েছে।

—কল্পতরু

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট : ২ লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
৫৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

সুখের হেমলা

তিন-ভানারী

'কইলো বউ, চোখের নিদ্ ভাংল? বউ—ও বউ!'...

'ঝন্‌ঝা' আঁটা কপাটে করাঘাত হতে থাকে বারংবার।

'আহা, ছাড়ো না, গালাগালি করবেখন!' অনুনয় করে মর্জিনা-বউ গলা-জড়িয়ে দুষ্টুমী করে আঁকড়ে-থাকা তার বর জাহের আলীকে।

জাহের বলে, 'কলের যখন ভোঁ হবে আড়াইটের, তখন যাবি, এখন শুয়ে থাক—চোখ বুজে থাক। রাত বারোটার সময় উঠে চিঁড়ে কোটো কেন?'

'না ছাড়ো লক্ষ্মী! জেগে গেলে কোঁড়াখানেক 'বচন' শোনাবে-অখন। আর মা খাতুন খাবারী করবে অখন। তোমার আর কী! সকালে উঠে যাবে, ইস্টিশনের বাজারের দোকানে চলে যাবে-অখন!'

'ও বউ—আড়ালীর বেটির নিদ বলিহারী!' আবার জোরে আঘাত হানে শাশুড়ী গোলাপী বিবি।

'যাই মা!' সাড়া দিয়ে এবার গায়ের কাঁথা খুলে ফেলে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পালাতে গেল মর্জিনা। ঘরের দেওয়ালের একটা কুলুঙ্গিতে রেড়ির তেল-দেওয়া পেতলের পিদিম জ্বলছে মিটমিট করে। কাঁথার সঙ্গে কোমর থেকে খোলা শাড়িটা জড়িয়ে গিয়েছিল, টেনে নিতে না নিতেই জাহের একেবারে সবটাই উদোম করে খুলে নিলে। লজ্জায় জাহেরের বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাড়িটা নেবার জন্যে তাকে কামড়াতে-আঁচড়াতে লাগল। কুস্তাকুস্তি দিয়ে শাড়িটা কেড়ে নিয়ে ঘরের এক কোণে পালিয়ে গিয়ে পরে নিল। হুসলোটা খুব ধীরে-ধীরে খুলে আস্তে বললে, 'চললাম গো বর! চিঁড়ে কুটতে! রাগ করো না! ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটলে উরু সুগোল হয়! পাছা সুকোল হয়! হি-হি-হি...

বউ বেরিয়ে এসেই দেখল শ্বশুর নারকোল-পাতা জেলে আগুন করে হুঁকোর তামুক সাজছে হোগলার ছই-ঘেরা 'ওসারার' (দাওয়ার) একপাশটাতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে।

বাইরেতো সোমত্ত মর্জিনা গোলেনার ঢেঁকিশালের এক-পাশে উনুনটার কাছে কাঠ-পাতা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আসমান থেকে বড়-বড় দানা করে হিমেল শিশির ঝরে পড়ছে গাছপালার পাতার ওপরে। ধোঁয়াটে আকাশে তারাগুলো মিটমিট করছে। শাশুড়ী গোলাপী বিবি ভাপিয়ে-রাখা ভিজানো ধানগুলো বদনাতে করে হ্যাচলা থেকে ছেঁকে এনে উনুনের কাছে রাখতে-রাখতে গজ-গজ করে, 'কপাল গুণে বউ একটা পেয়েছিনু মুই বাবা! নিদ আর ভাঙে না! কখন থেকে ডাকতেছি মুই। ভোরের পাখ-পাখালী ডেকে উঠল। রাত তিন 'পহর' গড়িয়ে যেতে প্যাঁচা, পাতকোয়া, ডাকপাখি 'জাল' (একসঙ্গে অনেক পাখি ডাকা) দিল। আজান দেবে'র আগেই 'পাঁচিমাগাদে' একদম হয়ে পড়ল যে-যার মুই চুলো ধরা তো গেলো—আধ মণ ধানের চিঁড়ে কুটতে তিন-ভানারীর খাই-খরচা কাবেন।'

মর্জিনা পুকুরের ঘাট থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আঁচলে মুখ মুছে উনুনের আগুনের কাছে দাঁড়াতেই গোলাবী বিবি খাঁঝিয়ে উঠল: 'সে-সে—অত আর হাত-পা সেঁকে নেবে না জাড়ে সব শ্যাল-কুকুর মারা গেল! ওঠ, ঢেঁকিতে ওঠ।'

গোলেনার ভাবীর দিকে তাকাতে লাগল দুষ্টুমী-ভরা চোখে। সার্চ লাইট ফেলে জাহাজের কাপ্তেন যেমন করে নদীর তীরের দু পাশের সাইনবোর্ডগুলো দেখে নেয়। মর্জিনার চেহারার গড়নটা ভাল। তিন বছর ঘর করছে তবু ছেলে-মেয়ে হবার নাম নেই। তাবিজ-কবচ এনে বেঁধে দিলেই তার দাদাটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। দীর্ঘশ্বাস ফেললে সে।

বউ মুখ টিপে হাসল।

তারা দুজনে উঠল এবার ঢেঁকির 'পেঢেনে'। উঁচু মাটির বেদির মতন করা একটা জায়গা। পৈঠার মতন। বুকের কাছে উঁচুতে একটা বাঁশের ভারা বাঁধা—তাতে হাতের ঠেস বা বুকের ভর রাখতে হয়।

দু-চার দিনের জন্যে বউ বাপের বাড়ি গেলে পাড়ার রাহিলার মা এসে চিঁড়ে ভেনে দিয়ে যায়।

দুম্-দুম-দুম-দুম!......

একটানা ক্রমাগত ঢেঁকি পড়ার শব্দ; দুটো-তিনটে গ্রামের ওপার পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়। আরো দুটো বাড়ির ঢেঁকির শব্দ ওঠে, তারপর আরো কয়েকটি।

চিঁড়ে কোটার পাড়া এটা।

ধানভানা ঢেঁকির চাইতে চিঁড়ে কোটার ঢেঁকির শব্দ বেশি। বাড়ির বা আশ-পাশের লোকের কান-মাথা ধরিয়ে দেয়। ধানভানা ঢেঁকির মুসুলিতে লোহার 'সাঁপ' পরানো থাকে। চিঁড়ে কোটার ঢেঁকির মুসুলির মুখ খোলা। শুধু কাঠ। পাকা হাড়ের মতন শক্ত কালো নিকবুম বাবলা কাঠের মুসুলি—দাগ ধারে কাটে না। সোঁদরবনের পাথর-কাটা চেহারার বাউলীরা যে বাবলা কাঠের গদার মতন 'সোঁটা' মেরে বড়-বড় জাঁদরেল বাঘের চোয়াল গুঁড়ো করে দেয়। ঢেঁকির গড়'র নিচে পাথর বসানো থাকে। তার ওপরে গড়ের মধ্যে, ডান হাতে 'কুঁচি' ধরে 'উঁচোনো' (গরম-করা) ধান ঢেলে দিতে হয়। ঢেঁকির মুসুলির ঘা পড়ে ধানের ওপরে দুম-দুম শব্দে। ধান চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যায়। গোলাবী বিবি, ঠিক তালে-তালে ভানারীদের পায়ের চাপে ঢেঁকি ওপরে উঠে-যাওয়ার মাঝখানের সময়ের ফাঁকটাতে টুক করে বাঁহাত বাড়িয়ে গড়ের গহ্বরের মধ্যের ধানগুলো নেড়-চেড়ে দেবে—আবার ঢেঁকি পড়ার আগেই হাত টেনে নেবে—আবার ঢেঁকি উঠলেই হাত চালিয়ে দেবে গড়ের ভেতরে। একটু অন্যমনস্ক হলে, দেরী হয়ে গেলেই, হাতের ওপরে ঢেঁকির মুসুলি—আঙুলগুলো থেঁতো হয়ে যাবে। নতুন ভানারী হলে সাবধানে থাকতে হয়। সে সবাই পা বদল করবে। পা কনকন করে। ভীষণ কষ্টের কাজ। কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে গেলে যেমন খানিকটা পরেই হাঁপিয়ে যেতে হয়, দরদর করে ঘাম ঝরে, ঢেঁকিতে ধান ভানায় সময়ও তেমনি। নতুন লোক হলে পরদিন জ্বরে আর পায়ের ব্যথায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।

কাঁচোর-ক্যাঁচোর করে ঢেঁকি তোলা-পাড়ার সময় কর্কশ আওয়াজ উঠছিল তাল-গাছের গোড়ার 'পো'-এর মুখের ওপরের 'আঁকসলি' থেকে। (ঢেঁকির আঁকসলি' মানে যে দু দিকেই আছে, লাগার-ভাঙার, নারস কাঁচির মতন।) বিচ্ছিরি শব্দটায় বিরক্ত হয়ে সাদুর আলী বলে, 'আঁকসলিতে এট্টু পানি ঢেলে দেনা মা গোলো, শালাটা যে কান-মাথা কচকচিয়ে ফেললে।' গোলেনার নেমে পড়ে একটু জল ঢেলে দিতেই শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর এসে আবার তার ভাজের সঙ্গে পাড় দিতে শুরু করলে।

গোলাবী বিবির বাঁ হাতে গড়ের ধান উলটে দেবার কাজ যেমন চলতে থাকবে তেমনি একই সঙ্গে ডান হাতে 'কুঁচি' (গুচ্ছ বাঁধা বত্তকগুলো কাঠা-কাঠি — যা দিয়ে মুড়ি বা চাল ভাজারও কাজ হয়) নাড়তে থাকে জ্বলন্ত উনুনের মাটির হাঁড়ির কানা-কাটা 'খোলা'র ওপরে। ভয়ানক সতর্কতার কাজ। গড়ের মধ্যে দেরি হলে হাত ভাঙতে পারে, ডান হাত নাড়তে দেরি হলে ধান পুড়ে যাবে। এর মধ্যে আবার উনুনে কাঠ ঠেলে দিতেও হবে—ধান তুলে নিতে হবে বালতি থেকে চাট্টি-চাট্টি করে। চিঁড়ে হয়ে গেলে 'সেঁকে' দিতে-দিতে 'নেয়ো' মেরে-মেরে সেগুলো গড়ের ওপরে তুলে দিতে হবে। কুলোয় তুলে 'পাছড়ে' রাখতে হবে ধামায়। 'তাত্' (গরম) ঠিক না হলে চিঁড়ে ফেটে যাবে। গুঁড়ো হয়ে গেলে দোরাস লোকসান। বেশি 'খরে' গেলে এক-দম গুঁড়ো হয়ে যাবে।

কনকচুড়া ধানের চিঁড়ে। সুগন্ধে চার-দিকটা মাত হয়ে যায়। এক 'ছে' (ছাটি) হয়ে যেতেই ঢেঁকি থামিয়ে নেমে এসে গোলেনার গোটা কতক চিঁড়ে বুকের কোঁচড়ে করে তুলে নিয়ে গেল। গাল চালিয়ে-চালিয়ে চিবুতে লাগল। তার মা গোলাবী বিবি বললে, 'কাঁচা চাল চিবোনো তো 'অবেস' আছে, কাঁচা চিঁড়ে খাওয়া পাছড়ানো হয়নে ভাল করে—ধানের কোণ রয়েছে—গাল-গাল করে থাকিস—চাল খাওয়া, পোড়া মাটি খাওয়ার বাসো আছো পোয়াতি মাগীদের পানা—প্যাটে যখন বড়-বড় কিড়মি হবে বুঝবি!'

বউ মর্জিনা এক গাল খেতে চাইতেই বললে, 'বাসি গায়ে তুই চিঁড়ে খাবি?'

মর্জিনা চিমটি কাটলে। বললে, 'তোকে বলেছে, বাসি-গা না হাতি! দে বুবু এক গাল!'

বুকের কাপড়ের ভেতরে হাত গলিয়ে বউটা কি দুষ্টুমী করলে তা সেই জানে, মর্জিনা 'এই'—বলে দিল এক কনুইয়ের গুঁতো। পা-টা বেতাল হল বউয়ের। ঢেঁকি ঠিকরে উঠে পড়ে গেল ভুল তালে অসময়ে।

গোলাবী বিবি অমনি গর্জন করে উঠল, 'আতাগীর বেটিরা করে জ্যালো কি রে—আঁ!' বড়-বড় চোখ বার করে গোলাবী। তার তোবড়া নাকের ফাঁদি নথটার গোলাকার ফাঁকটা গালেরমতনই হাঁ হাঁ করে। 'হাতটা মোর থেঁতো হয়ে যেত! ঢেঁকির 'পাড়' উঠলে কি 'উষুন' ওঠে? কাটার বাড়ি মেরে 'উষুন' ঘোঁচড়ে দোব তোদের!'

মর্জিনা সাফাই গায়, 'তবে ও কেন আমার বুকে হাত দেবে?'

'কখন না? আমি তো চিঁড়ে নিতে গেনু।'

'হুঁ!' আমড়া-আমড়া চোখ বার করে শাসনের ভঙ্গি করে মর্জিনা।

গোলাবী বিবি বলে, 'জাঁহাবাজ মাগীরা শুধু ঐ নিয়েই আছে। 'বৈকন' তোদেরই উথলে পড়েছে, মোদের আর হ্যালোনি! মরো সব! হাতে ঢেঁকি পড়লেই বেটার চিঁড়ে দোকান বন্ধ হবে—মনে রেখো।'

লম্ফের আলোয় সাত হাত ছায়াটা বারো হাত হয়ে আড়কাঠার 'মটকা' পর্যন্ত উঠে যায় যখন ঢেঁকির মাথা উপর দিকে ওঠে—আবার পড়ে গেলেই সমান্তরাল। ছায়াটাও ধান ভেনে চলেছে সমানে। শুধু ওর মজুরী নেই।

বুড়ো সাদুর আলী হুঁকো টেনে চলে একটানা আর কাশতে থাকে মাঝে মাঝে। চারটের ভোর হলেই সে চলে যাবে হাণ্টি-গঞ্জের বাজারে মটরশুঁটি, বেগুন, পাকা কলার বাজরা মাথায় নিয়ে। এক হাট থেকে মাল কিনে আর এক হাটে বিক্রি করে আসে সে।

জাহেদ আলী দাওয়া থেকে নেমে যাওয়ার সময় বউয়ের মুখের দিকে একবার তাকালে। একটা চোখ টিপে দেখালে। মর্জিনা বউ হাসলে মুখ আড়াল করে। পাঁজরে গুঁতো দিলে তার গোলেনার। সে ঠিক টের পেয়েছে।

গোলাবী বিবি নিজের খেয়ালেই বক-বক করতে লাগল: 'তখন আমি বারো বছরের মেয়ে। ঘোমটায় চাপা পড়ে যাই। শাউড়ী রাত-দুপুরে 'বিছেন' থেকে টেনে তুলে এনে ঢেঁকিতে চড়িয়ে দিত। তখন 'কেরাস' (কেরোসিন) তেল 'পয়দা' হয়নি। করচ ফলের তেল জ্বলত হাতের আজলার মতন মাটির বড় বড় চেরাগে। হু-হু করে কালি উড়ত। গন্ধর টেকা যেত নি। কালো মাটির পোড়ানো চুড়ি ছ্যাকো দু'হাত বোঝাই। রেশমি চুড়ি হল তো এই সিদুনে।

হি-হি করে হেসে উঠল মর্জিনা আর গোলেনার, মায়ের কথা শুনে।

'আর এখন আঠারো বছরের সোমত্ত মেয়ে আইবুড়ো হয়ে জোর করে বসে আছে। বুড়োকে বললে বলে, হবে হবে—ছেলে দেখছি খুঁই! ছেলে দেখলে ছেলে ছেড়ে ছেলের বাপকে শুদ্ধ এাম্বিন গলায় গামছা দিয়ে ধরে আনা যেত—আটকুড়ো মিন্সের চোখ আছে? যখন একটা মদ্দমানুষকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে তখন মুখে 'মুনমুন' পড়বে! বেশ্যের ছোঁড়াটাকেই না হয় গছিয়ে দে।'

গোলেনার বলে, 'এমন করলে আমি ঢেঁকি থেকে নেবে চলে যাব মা!'

'যাবিই তো। বাবার জন্যেই তো তোর মন 'উড়াউন' হয়ে রয়েছে! হাঁ লা 'কবুতরী', আমি জানিনি আবার? কাল দুপুরবেলা তুই বাঁশ-বাগানের পাশের তলায় দিয়ে কার সাথে কথা বলতে ছিলি না হেসে হেসে ঢলিয়ে ঢলিয়ে? হাসেম কি তোর বাপের সোনাইয়ের ছেলে হয় যে সে তোর ভাতার হবে? চারটে ছেলেমেয়ে আছে তার—বউ রয়েছে ঘরে। ফের 'বেটি' দেখি ফুলোদিন কাটার বাড়ি মেরে বিষ ঝেড়ে দোব খুই—খুই যাঁড় গরুদ্দোর জন্মের মেয়ে হই তো তোকে টিট করে তবে ছাড়ব।'

গোলেনার বৌদির দিকে একবার ক্রোধ-ভরা সন্দেহের চোখে তাকায়—সেই বোধহয় লাগিয়েছে। বলে, 'গোবর কুড়িয়ে আনতে গেনু আমি ভলার 'মাস্ত' নেব বলে, হাসেম বলে, তোকে কি সোন্দর দেখতে রে গোলেনা; তোর গালে একটা তিল আছে! হি হি হি!......

'তিল আছে তো তার বাবার কি?' চিৎকার উঠল গোলাবী বিবি। 'আজার বাস্তি পুড়িয়ে তার বউয়ের গালেও তিল করুক না কেন!'

ঘণ্টাখানেক পরে ঢেঁকি থামল। ঘামে নেয়ে গেছে ওরা দুজনে। বসে পড়ে বুকের আঁচল খুলে হাওয়া টানতে থাকে হাঁ করে গাল মেলে হাঁপাতে হাঁপাতে।

জাহেদ আলীর মাথায় আমাদের ঝাঁকা তুলে দিতে সে চলে গেল।

বউ গেল জাহেদ আলীকে খাবার দিতে।

গোলাবী বিবি চিঁড়ে পাছড়াতে লাগল। উনুনে ততক্ষণ নিভিয়ে দিলে।

গোলেনার বাইরে গেল।

সকালের আলো ফুটে উঠেছে ক্রমে ক্রমে।

কিছুক্ষণ পরে রিক্সার হর্ণ শুনতে পেলে জাহেদ আলী। ঘর থেকে এক বস্তা চিঁড়ে বার করে দিয়ে সে রিক্সায় করে চলে গেল তার দোকানের উদ্দেশে। চিঁড়ে, মুড়কী, খইচুর, বাতাসা, তিলেখাজার দোকান আছে তার ছোট একটা ইস্টিশনের বাজারে।

ধানজমি তাদের একেবারেই নেই। সাদের আলী চাষের জন খেটে খেটে জাহেদকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়িয়েছিল। ছেলেটা পাশ করতে পারলে না। এখন ব্যবসা চালাচ্ছে। ধান আর গুড় কিনে চিঁড়ে-মুড়কি করে সের দর থেকে। ধানের দাম ক্রমে উঠতে থাকলে কেনা ধানের চিঁড়ে দিয়ে যাদের ঘরোয়া ধানের চিঁড়ে, তাদের দরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। লোকসান না গেলেও লাভ হয় না।

বোনটার বিয়ে দেওয়া দরকার। একটা ছেলেকে তার পছন্দ, তার দোকানে আড্ডা দিতে আসে, সে রোজই কলকাতা শহরে যায়, রেসের টিকিট কেটে, পকেট মারে, মাল খায়, কিন্তু বিলদার খুব। পোড়ো পাকা বাড়ির বনেদী ঘরের ছেলে—দেখতেও ভাল। মা ছাড়া কেউ নেই আর তার। কিন্তু বাঁধা-ধরা একটা রোজগার না থাকলে কি করে খুঁটে করে বোনটাকে ওর গলায় ঝুলিয়েই বা দেওয়া যায়? ভাবছে জাহেদ আলী। দু-একদিন তাকে বাড়িতে নিয়েও এসেছে সে। গোলেনারকে দেখেছে। পছন্দও নাকি। গোলাবী বিবির কিন্তু ছোঁড়াটার ধরণের দেখে পছন্দ নয়। জল পড়ে। ভাঙা-চোরা ইটের পাঁজা। তার চাইতে তাদের মাটির বাড়ি ঢের ভাল। তার ওপর আবার সাইকেল, ঘড়ি, আংটি, বোতামের 'ফরমান' আছে ছেলেটার মায়ের পক্ষ থেকে।

ছেলেটা বলে, 'দুস্ শালা, বে' করব একটা মেয়েমানুষকে, এসব আবার কি হবে? দিলেই সাতদিনে ফুঁকে দোব রেস খেলে, মাইরি! গোলেনারকেই না খাজি ধরে বসি!'

তাই বটে! জাহেদ আলী ভাবছে।

দুপুরে খেতে এসে জাহেদ শুনলে গোলাম নবী—রেস খেলা পকেটমার ছেলেটা—নাকি বেলা দশটার সময় এসেছিল। বাড়িতে নয়। গোয়াল ঘরের মধ্যে গোলেনারের সঙ্গে কথা বলছিল। বউ দেখতে পেয়ে এসে শাশুড়ীকে বলে দেয়।

গোলাবী বিবি হঠাৎ গোয়ালে ঢুকে পড়ে দেখে তাজ্জব কীর্তি। মেয়েকে ঝাঁটা দিয়ে বেশ করে ঘা-কতক দিয়ে দিয়েছে। গোলাম নবী নাকি হঠাৎ বেরিয়ে পড়েই চম্পট দিয়েছে।

জাহেদ আলী মাকে বলতে শোনে, 'ঐ হবে! একদিন বার করে নিয়ে চলে যাবে। খুব জুটিয়েছে ছেলে আমার।'

সন্ধ্যার পর এসে শুনলে বউ আর ননদের মধ্যে খুব ঝগড়া—চুল ছেঁড়াছিঁড়ি হয়ে গেছে। গোলেনার বলেছে, 'তুই মাকে বলে দিলি কেন?' বলে তার গলা টিপে ধরে।

বউ বলে, 'ও গোপনে 'আসনাই' করবে তার আমি বললেই দোষ। পরে ভুগবে কে? মেয়েমানুষের জীবন মাছের মতন—আটকে গেলে—বিষ গিললে হজম করতে না পারলে তখন কি করবে! কিছুতেই আমার চুল ছাড়বে না। আমিও দিইছি কেমন কিল-ঘুষি। তারপর তোমার মা এসে আমাকে মারলে। আচ্ছা, আমিও বাপের বেটি হই তো দেখে তবে ছাড়ব!' কালনাগিণীর মতন ফুঁসতে লাগল মর্জিনা।

জাহেদ আলী তাকে কোলে বসিয়ে আদর করে বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা। চুপ করো। এসব কথা যেন বাইরে আর না যায়।'......

'তুমি ওর বিয়ে দিয়ে দাও! ও আর থাকতে পারবে না। বাঘিনী মানুষের কাঁচা রক্তের স্বাদ পেয়েছে!'

'ঐ ছেলেটার সাথেই?'

'হাঁ।'

জাহেদ আলী ভাবতে লাগল।

অনেক রাত পর্যন্ত সে ভেবে চলল। চোখে ঘুম এলো না। একটা রেসুড়ে—একটা পকেটমার ছোঁড়ার সঙ্গে তার বোনের বিয়ে দেবে! তারপর জেলে গেলে...

'কই লো বউ! নিদ ভাংলো চোখের? ভোর হয়ে গেল যে! উঠে পড়। জাহেদ আলী, বউকে তুলে দে।'

মর্জিনার ঘুম ভাঙল। সে উঠে বসে হাই তুললে। সাপের মতন বেণীটা হাতে পাকিয়ে পাকিয়ে খোঁপা বাঁধলে। জাহেদ আলী জেগে থাকা সত্ত্বেও আজ আর তাকে আদর করে কাছে টানলে না।

ঢেঁকিতে উঠে ননদ-ভাজে আর কথা নেই। পাড় দিয়েই চলে একটানা। বিবের ঝাড় ননদটাকে মনে হয় ও একদিন বহু কষ্টের সঞ্চিত যা-কিছু নিয়ে চলে যাবে। কত টাকার 'দান-দেহাজ' দিতে হবে!

কালমুখো বুড়ী শাউড়ী তাকে মারলে!

সেও যদি এক বাপের বেটি হয় তো... হঠাৎ পা সরিয়ে নিয়ে হাঁটুর ধাক্কা দিয়ে ননদের পা-টাকে সরিয়ে দিতেই গোলাবী বিবির হাতে ঢেঁকি পড়ে গেল! চীৎকার করে উঠল সে : 'ও মাগো! বাবারে! আমাকে মেরে ফেলেছে রে। হাত কেটে 'কাউরে (রক্তে) নদী' হয়ে গেল।'

গোলেনার আর মর্জিনা, খড়িশ আর গোখরো কেউটে সাপের মতন চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে যেন ফণা বিস্তার করে। কিন্তু আশ্চর্য, হঠাৎ তারা দুজনেই ঠোঁট মুচকে হেসে উঠল। ফণা নামিয়ে নিয়ে পরস্পরের দোষারোপ করতে লাগল। সেটা তাদের কৃত্রিম কলহ। আসলে তাদের আপোষ হয়ে গেছে মায়ের ওপরে না-বলা না বোঝা একটা নির্বোধ প্রতিশোধ নিয়ে।

—আবদুল জব্বার

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪৪)

সকালবেলাতে বড়বৌর মনে হল কেউ রাতে ফল-জল খায় নি। সবাই সোনাকে নিয়ে এমন উদ্বিগ্ন ছিল যে, খাবার কথা কারও মনে আসে নি। এখন সোনা ঘুমোচ্ছে। খুব আলগোছে চন্দ্রনাথ তাকে পশ্চিমের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। এবং শুইয়ে দিচ্ছে। কাঁথা বালিস সব টেনে নেওয়া হচ্ছে পশ্চিমের ঘরে। কপালে হাত দিয়ে দেখল বড়বৌ। মনে হল ওর জ্বরটাও কমে এসেছে। সে পুবের ঘরে গিয়ে দেখল, তেমনি পড়ে আছে সব। কুকুরটা দাওয়ায় শুয়ে আছে। আর মানুষ কোথাও নেই। তাকে ওর রাতে খেতে দেওয়া উচিত ছিল। ওর যে এমন মনে হয় নি তা নয়। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ এবং শচীন্দ্রনাথের মুখ-চোখ এত বেশী উদ্বিগ্ন ছিল যে, খাবার কথা বড়বৌ বলতে সাহস পায় নি। ওরা খেতে আসছে না, ওর মানুষ একা-একা বসে খাবে, ওর কেমন স্বার্থপরতার কথা মনে হয়েছিল। একসঙ্গেই খাবে। সোনা হয়ত কিছুক্ষণের ভিতরই স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এই আশায়-আশায় সবাই রাত ভোর করে দিয়েছিল।

পাগল মানুষ নেই। কুয়াশা ঘন বলে কোথায় আছে মানুষটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। খুব দূরে যখন আজকাল যান না, তখন হয়ত অর্জুন গাছটার নীচে গিয়ে বসে রয়েছে। তার অনেক কাজ। সে সকাল-সকাল ঘরে ঢুকে সব কলাইয়ের বের করে দিল। আর একটু বেলা হলে সেই কলাইয়ের ছেলে-দের ভাগ করে দেবে। মনটা কেমন যে খচ-খচ করছে বড়বৌ বুঝতে পারছে না। ভীষণ একটা হাহাকার বাজছে। প্রথম মনে হয়েছিল, স্বর্ণময়ীমশাই মারা গেছেন, এতদিন সে মানুষটাকে সেবা-শুশ্রূষা করছে, হয়ত এজন্য এমন হবে। কিন্তু পরে মনে হল, এত গভীরে সেই হাহাকার বাজবে কেন। কেমন শূন্য-শূন্য মনে হচ্ছে সব। তিনি কতদিন কাছে থাকেন-না, দশ-বার দিন ক্রমান্বয়ে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ান, বাড়ী ফিরে এলেই নাপিতবাড়ীর হরকুমারকে ডেকে দাড়ি কামানোর ব্যবস্থা করা হয়, প্রতিদিন হরকুমার আসে না, দু দিন অন্তর-অন্তর তার এ-বাড়ী ঘুরে যাবার কথা, সে না এলে এক মুখ দাড়ি নিয়ে মানুষটা থাকবে বলে বড়বৌর খারাপ লাগে। গত-কাল সে বার-বার করে বলেছে তুমি এ' কদিন কোথাও যেও না। এ-সময় কোথাও যেতে হয় না। তবু যে মানুষটা কোথায় গেল! সে পল্টুকে ডেকে তুলল, এই উঠ। যা। দেখ উনি আবার কোথায় গেলেন।

মার এতটা উদ্বিগ্ন ভাব পল্টুর ভাল লাগল না। সে পাশ ফিরে শুল।

—কত বেলা ঘুমাবি। যা না বাবা। দেখ উনি কোথায় গেলেন। ধরে নিয়ে আয়।

পল্টু চোখ বুজে ছিল। মার এই বার-বার ডাকা ওর ভাল লাগছিল না। ঠাকুরদা মারা গেছেন বলে এ' কদিন ওদের পড়া থেকে ছুটি। সে খুব ঘুমাবে এ কদিন। না তো সকাল হলেই দরজায় শব্দ, পল্টু ওঠ। বেলা হয়ে গেছে। গোপাটে যাবি। মাস্টারমশাইর জন্য ওরা ঘুম থেকে কিছুতেই বেলা করে উঠতে পারে না। ওর মনে হয় তখন মাস্টারমশাই রাতে ঘুমোন না। কেবল জেগে থাকেন। যদি ভোর হয়ে যায়, বেলা হয়ে যায় তবে তিনি ওদের নিয়ে গোপাটে যেতে পারবেন না, মটকিলার ডাল ভেঙে দিতে পারবেন না, দাঁড়িয়ে সব প্রাত-কৃত্যাদির কাজ, যেন তাঁর শুধু ওদের পড়ানোই কাজ নয়, ওদের স্বাস্থ্যাদি সব লক্ষ্য রাখা তাঁর কাজ। পল্টুর মনে হয় তখন, কে যে তাঁকে এ-সব দায়িত্ব দিল, কেন যে তিনি সারা রাত না ঘুমিয়ে ওদের ডেকে তোলার জন্য বসে থাকেন! সে মাস্টার-মশাইর ভয়ে জুজুকে থাকে সব সময়। ওর কিছুতেই পড়া মুখস্থ হয় না। সে বার-বার পড়েও পড়া মনে রাখতে পারে না। মাস্টারমশাই তাকে খুব মারেন। লালটুকে খুব একটা মারতে পারেন না। একদিন খুব মার দিলেন মাস্টারমশাই। —পড়াশুনা না করলে বড় হয়ে করবি কি? খাবি কি! লালটু একটু বেয়াড়া ধরনের, জেদী, একনাগাড়ে। সে মার খেয়ে আতঙ্কে হয়ে উঠলে বলেছিল, আমি তরকারি বেচে খাব।

সেই থেকে শশীভূষণ যেন লালটুকে আর তেমন মারেন না। বরং তিনিই যেন কেমন একটু ওকে ভয় পেতে শুরু করে-ছেন। পল্টু দূরে-দূরে ভাবল, তাকে মারলে সেও একদিন এমন বলে দেবে। কিন্তু সে দেখেছে পারে না। খুব রেগে গেলে তিনি মারেন। তারপর আবার কেমন চুপ-চাপ, মাথা ঠান্ডা হলে কেমন দুঃখী মানুষের মত মুখ করে রাখেন। বলেন, তোরা বড় হলে এই দেশ বড় হবে। অর্থাৎ যেন এই শশীভূষণের বলার ইচ্ছা, দেশ মানেই হচ্ছে দেশের মানুষ। তাদের প্রকাশই হচ্ছে দেশের প্রকাশ। স্কুলে পল্টু দেখেছে সারাটা সময় মাস্টারমশাই কি ব্যস্ত থাকেন। কোথায় কি হবে, তিনি নানারকম ফুলের গাছ এনে স্কুলের মাঠে লাগিয়েছেন। নানারকম খেলার ব্যবস্থা করেছেন। সবার ছুটি হয়ে গেলেও তাঁর ছুটি হয় না। ওরা তখন স্কুলের মাঠে মাস্টারমশাইর জন্য বসে থাকে।

বড়বৌ আবার ডাকল, কিরে তুই উঠবি না।

সে বলল, না। আমার ভাল লাগে না।

—দেখ বাবা, উনি এই সকালে কোথায় আবার বের হয়ে গেলেন। একটু উঠে গিয়ে দেখ।

—তুমি যাও। আমি উঠতে পারমু না।

বড়বৌ ছেলের মাথার কাছে বসল।—সোনার শরীর ভাল না। কত কাজ আমার। তোরা এখন বড় হয়েছিস। ওকে যদি দেখে না রাখিস তবে কে দেখবে।

পল্টুর ভারী বিরক্ত লাগছিল। সে সাধারণত মায়ের সঙ্গে আগে শুত না। এই সেদিন থেকে মায়ের পাশে শুচ্ছে। সে শুত ছোট কাকার সঙ্গে। কিন্তু এই দেশে কি যে হল! রাতে নানারকম অত্যাচার এবং অবিচারের ছবি ভেসে উঠলে মা ভয় পান। সারারাত কোনো-কোনো দিন ওদের জেগে থাকতে হয়েছে। বর্ষাকালটাই ভীষণ মনে হয়েছিল। শীতকালটা ভালই গেছে। কোথায় কোন অঞ্চলে আবার দাঙ্গা বেঁধে গেছে। এই গ্রীষ্মে অবাধ নানা রকমের খবর। এসব কারণেই পল্টু মায়ের সঙ্গে থাকছে। মার এমন কথায় সে বলে ফেলল, আর তোমার লগে শুমু না। ছোট কাকার লগে শুমু।

বড়বৌ ভারী কষ্ট পেল ওর কথায়। পল্টু খুব একটা জেদি ছেলে নয়। তবু কেমন যেন সে তার বাপ সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা পুষে রেখেছে। সে যেন বুঝতে পারে, সে তার মা এবং বাবা এই পরিবারের পরগাছা। এবং তার বাবা কত বড় কাজ করত। সে এবং মা। কত সুন্দর সে একটা ছবি দেখতে পায় মাঝে-মাঝে। বড় শহরে তার মা তার হাত ধরে কোন একটা বড় রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার পরনে প্যান্ট কোট। বাবা চকচকে জুতো পরেছেন। মাথায় ফান্ট ক্যাপ। ওর বাবা সাহেব বনে যেতে পারত। কেমন সে

দেখেছে মড়্‌পাড়ায় সেই মানুষ, মেজবাবু, যাকে সে দেখেছে প্যাণ্ট-কোট পরলে অন্য মানুষ হয়ে যায়। সারা পরিবারে বড়ই মেজবাবুর সম্পর্কে নিন্দা হোক, ভিতরে-ভিতরে মেজবাবুকে সবাই কেমন সমীহ করত।

পল্টুর ভারী খারাপ লাগে ভাবতে, তার বাবা পাগল। সেজন্য যখনই কোথাও ওর বাবার কথা ওঠে, সে সেখানে থাকে না। কারণ ভিতরে-ভিতরে ওর এই এক কষ্ট। এবং সেজন্যই বুঝি কোন পড়া মনে রাখতে পারে না। কেমন এক হীনমন্যতায় সে সবসময় ভোগে। কোনোদিন বড়বৌ ওকে দিয়ে কোন কাজ করাতে পারে না। তখন যদি ধন এসে বলত, পল্টু, ওঠ, তোর বাবাকে খুঁজে নিয়ে আয় পল্টু এক লাফে উঠে পড়ত। এবং সে তার বাবাকে খুঁজতে বের হত।

বড়বৌর এসব জেনেও পল্টুকে কেন জানি বার-বার বলতে ইচ্ছা হয়, তুই তোর বাবাকে দেখে না রাখলে কে রাখবে। তোর বাবার জন্য কষ্ট হয় না পল্টু। তুই আমার একমাত্র ছেলে। তুই আমার দুঃখ বুঝবি না!

মার এমন চোখ-মুখ পল্টু সহ্য করতে পারে না। সে চেয়ে তাকাচ্ছে না। যত কষ্ট মার এই চোখে-মুখে। কেমন দুঃখী মুখ নিয়ে মা মাঝে-মাঝে তার শিয়রে বসে থাকে। তখন সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। বাবাকে সে খুঁজতে বের হয়। কাউকে সে কিছু বলে না। কেউ যদি ওকে জিজ্ঞাসা করে, ঠাকুর তুমি এই জঙ্গলে অথবা মাঠে, সে বলে, এমনি। সে যে তার বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছে কিছুতেই কাউকে বলবে না। বরং সে নিজে, যত জায়গা আছে, যেখানে-যেখানে তিনি গিয়ে বসে থাকতে পারেন, সব জায়গায় ভীষণ ছুটো-ছুটি করেও যখন খুঁজে পায় না, তখন এক অসহ্য অভিমানে একা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সবার অলক্ষ্যে কাঁদে। যেন তার বলার ইচ্ছা, বাবা তুমি এটা বোঝ না কেন, তোমার জন্য আমার মা চোখ-মুখ বুজে সংসারের সব কাজ করে যাচ্ছে। তুমি ভাল হলে আমাদের কোন দুঃখ থাকত না।

আর সোনা যদি খুঁজতে বের হয় তার পাগল জ্যাঠামশাইকে তখন সে সবাইকে জিজ্ঞাসা করবে, কই গ্যাছে, দ্যাখছেন। আমার জ্যাঠামশাইরে দ্যাখেন নাই। সকাল থাইকা বাড়ী নাই।

—নারে ছাই দ্যাখি নাই।

সোনা দাপিয়ে-দাপিয়ে হাঁটে। বাড়ী-বাড়ী সে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়। কখনও-কখনও কেউ খবর দেয় তিনি বসে আছেন তাঁবার পুকুরপাড়ে। তখন সোনা এমন ছুটতে থাকে যেন মাথায় করবে যে কে বলবে এই ছেলে সোনা। ঠাকুরবাড়ীর ছোট ছেলে, কোথায় যে এখন যাচ্ছে কেউ টের পাচ্ছে না। কেবল জানে সে যেখানেই থাক যাচ্ছে পাগল মানুষটাকে খুঁজে আনতে।

আর যদি পল্টু খুঁজতে বের হয় মনে হবে, সে বাড়ী থেকে না বলে না কয়ে বের হয়ে এসেছে। একা-একা বনে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন উদ্দেশ্য নেই। কেবল কাজে ফাঁকি দেবার জন্য, অথবা পড়াশোনা না করার জন্য সে বাড়ী-বাড়ী হেঁটে যাচ্ছে। কেবল একজন মানুষ বুঝতে পারে পল্টু যাচ্ছে তার বাবাকে খুঁজতে, সে কিছু বলে না, কেবল খুঁজে বেড়ায়। সে হচ্ছে ঈশম। সে তখন বলবে, কর্তা না জিগাইলে পাইবেন কি কইরা?

—কারে জিগামু।

—যরে সামনে পাইবেন তারেই।

পল্টু তখন কোন কথা বলে না। সে তার বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছে টের পেলেই সে যেন সকলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। পল্টুর মুখ দেখলেই তখন টের পাওয়া যায় বাবার জন্য সেও কম দুঃখী নয়। সে কোন কথা না বলে কেবল হাঁটে। এই মাঠে-ঘাটে সে চুপচাপ বাবাকে খুঁজে বেড়ায়। মাঝে-মাঝে হাঁটতে-হাঁটতে মনে হয় তার বাবা ভাল হয়ে গেছেন। তিনি বারদির স্টিমারঘাটে এসে নেমেছেন। কত লটবহর। মার জন্য প্রিন্ট তাঁতের শাড়ি এনেছেন। ধনকাকীমার জন্য সুন্দর ছাপা শাড়ি, সোনা লালটুর দামী প্যাণ্ট জুতো এবং সঙ্গে দুজন দারোয়ান, ওরা পল্টুকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। সাহেবের ছেলে, ওরা ওকে নিয়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে। অথবা ওর মনে হয় এক রাতে জেগে গেলে সে দেখতে পাবে বাবা বলছেন, আমি কলকাতায় যাচ্ছি চাকরি করতে। তোমরা ভাল হয়ে থেকো। সে, ঈশমদা, সোনা, লালটু সবাই মিলে বাবাকে নদীর চর পার করে দিয়ে আসবে। বাবাকে স্টিমারঘাটে তুলে দিয়ে আসবে। বাবা রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানাবেন। স্টিমারটা মাঝগাঙে ভেসে গেলে, বাবাকে যখন আর সে দেখতে পাবে না, তখন সকলের অলক্ষ্যে ওর চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে।

মার চোখ-মুখ দেখে পল্টু কেমন বিরক্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। বড়বৌ এখন আর কাউকে বলতে পারে না, বিশেষ করে শচীন্দ্রনাথ অথবা চন্দ্রনাথকে, একবার দেখুন তো মানুষটা এই সাত সকালে যে কোথায় গেল। বরং নিজেরই একটা সংকোচ বোধ হয়। কে তার জন্য এত করবে। পল্টু বড় হয়েছে। লালটু বড় হয়েছে। সে এখন ওদের পিছু-পিছু ঘোরে। লালটু জ্যাঠিমার এই দুর্বলতা বোঝে। মাঝে-মাঝে সে পরিবর্তে নারকেলের নাড়ু চায়। তিলের নাড়ু, তক্তি এসব চায়। সে কাজের পরিবর্তে এসব না পেলে জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে চায় না। সোনাকে সব সময় পাঠানো যায় না। সে ওদের মতো বড় হয় নি। একবার পাঠালে কিছুতেই আর আবিষ্কার না করে ফিরবে না। একবার সারাদিন ঘুরে ওর চোখ-মুখ বসে গিয়েছিল। দুপুরে খোঁজ পড়লে ভয়ে-ভয়ে বড়বৌ বলতে পর্যন্ত পারে নি সে তাকে পাঠিয়েছে পাগল মানুষটাকে খুঁজতে। বিকাল হয়ে গেছিল সোনার ফিরতে। তার কি ভয়! ফিরে এলে, চুপি-চুপি বলেছিল, তুই কিন্তু বলিস না সোনা তোর জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে গিয়েছিলি।

সে বলেছিল, বলব না জ্যাঠিমা।

আর সোনা কেন জানি সেই দিন থেকেই দুটো-একটা মিথ্যা কথা বললে কিছু হয় না এমন ভেবেছিল। বাবা বলেছে তাকে, বিদ্যাসাগরমশাইর মতো হতে হবে। সদা সত্য কথা বলিবে। ওর কেন জানি মনে হয় বিদ্যাসাগরমশাই সারা জীবন সত্য কথা বলেন নি। কেউ সারা জীবন সত্য কথা বলে না। ঠাকুরদা সারাজীবন সত্য কথা বলেছিলেন এও তার বিশ্বাস হয় না। সে তো অনেক কিছুই গোপন করেছে মায়ের কাছে। সে তো কত কিছু শিখে ফেলেছে। মা তার মুখ দেখে কি করে টের পাবেন, মাঝে-মাঝে রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। শরীরে কেমন যেন একটা কষ্ট হয়। সেকথা মাকে সে বলতে পারে নি। বিদ্যাসাগরমশায় তাঁর মাকে অনেক কিছু বলতে পারেন নি। এসব কথা মাকে তো আর বলা যায় না। মায়ের কাছে এসব গোপন রাখতে হয়। তিনিও গোপন রেখেছিলেন। কেউ সারা জীবন মিথ্যা কথা না বলে থাকতে পারে না। সেও পারবে না। জ্যাঠিমার জন্য মিথ্যা কথা বলে কোন অনুশোচনা তার হয় নি। বরং একটা কাজের মত সে কাজ করেছে। মা আজকাল বড় জ্যাঠিমাকে কেন যে অযথা এই নিয়ে হেনস্থা করে? তাকে পাঠালেই মা রাগ করে।

যেন এটা নিয়ম হয়ে গেছে সংসারে, কেউ তো আর বসে নেই। একজন পাগল

মানুষের মধ্যে সবসময় কে তার খুঁজে বেড়াবে। সোনা এমন লোকে বলেই, সে যখন যায় চুপ-চুপি যেন হয়ে যায়। এমন কি কোনো-কোনো দিন সে জ্যাঠিমাকেও বলে যায় না। সে ফিরে এলে নানা রকমের প্রশ্ন করে মা। কোন জবাব না দিলে জ্যোঠ-কাকাকে বলে মার খাওয়ায়। সে তখনও জ্যাঠিমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে।

বড়বৌ তখন বলল যা তো ঠাকুরদার শ্মশানে দেখে আয় কিনা।

পল্টু ঘুরে এসে বলল, মা অর্জুন গাছের নীচে নাই।

বড়বৌর ছেলের এমন কথায় কান্না আসছিল। গাছের নীচে নেই, না থাক, অন্য কোথাও হাঁটছেন তিনি। মাঠে নেমে খোঁজ করলেই হবে। কিন্তু পল্টুর ভিতরে যে কি রাগ বাপের উপর সে বোঝে না। কিছুতেই সে বলল না, মা, বাবা অর্জুন গাছের নীচে নেই। বলল শুধু নেই। তোর অভি-মানের এত কি আছে! আমি সারাজীবন এমন একজন মানুষকে নিয়ে ঘর করলাম, আমার কোন নালিশ নেই আর যত নালিশ তোদের। তুই এত স্বার্থপর পল্টু।

—তবে দেখ টোডারবাগের বট গাছটার নীচে বসে আছে কিনা?

সে আবার বের হল। আজ পড়তে হবে না। সে ভেবেছিল ঘুম থেকে বেলায় উঠবে। বেলায় উঠে ঠাকুরদার শ্মশানের চারপাশটা সাফ করবে। সেখানে ধনকাকা বলেছে একটা তুলসী গাছ লাগাবে। সে এবং বাড়ীর আর যারা আছে তাদের নিয়ে একটা বড় তুলসীমঞ্চ করবে। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় আলো দেবার কথা। এখন এমন একটা কাজ ফেলে তাকে যেতে হবে টোডারবাগের বট গাছটার নীচে। সে বলল, এবারই শেষ। আমি আর যেতে পারব না।

কুয়াশা তখন কেটে যাচ্ছিল। ক্রমে হাল্কা রোদ উঠেছে। বড়বৌ ঘাটে স্নান করার সময় দেখল পল্টু ফিরে আসছে। সে এসে বলল, মা নাই।

বড়বৌর ভিতর আবার হাহাকার করতে থাকল। সে কিছুতেই যেন স্থির থাকতে পারছে না। বুকের ভিতরটা এমন যেন করছে সে বুঝতে পারছে না।

স্নান সেরে এসে বড়বৌ একটা লাল-পেড়ে শাড়ী পরল। চুল ভিজা। কপালে এ' কদিন সিঁদুর দিতে নেই বলে আর আয়নার সামনে দাঁড়াল না। তাছাড়া অশৌচের সময় আয়নায় মুখ দেখতে নেই। সে বড়বৌ বলে, তাকে হবিষ্যান্নের আয়ো-জন করতে হবে। এত করে মানুষটাকে বলেও সে ঘরে রাখতে পারল না। বাসি ফলমূল যা বের করে দিয়েছিল, তা সবাইকে ডেকে ভাগ-ভাগ করে দিয়ে দিল। ঘরের এক কোনায় তিনটে কলার ভাল পড়ে রাখল। কাজগুলো যত সে নিবিষ্ট মনে করবে ভাবছে, তা পারছে না। ভিতরটা কেবল তার ছটফট করছে। এবং মাঝে-মাঝে বুকের ভিতরটা খালি করে শ্বাস নিচ্ছে। মনে হচ্ছিল তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমন যে কেন হচ্ছে! সে একবার ঘরের বাইরে এল, দেখল দলীচরণ লাল্টু-পল্টুকে নিয়ে পুকুরপাড়ে যাচ্ছে। এবং এই ফাঁকে সে একবার ধনবৌর ঘরে ঢুকে কপালে হাত রাখল সোনার। মনে হয় জ্বরটা কমে গেছে। কপালে হাত রাখতেই সোনা চোখ মেলে তাকাল। তারপর তাকিয়ে দেখল ওর শিয়রে জ্যাঠিমা দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যাঠিমার এমন চোখ দেখলেই সোনা টের পায়, জ্যাঠামশাই বাড়ী নেই।

সে বলল, আমি ভাল হলে নিয়ে আসব।

বড়বৌ বলল, তুই এখন ঘুমো। ও ঠিক চলে আসবে। বড়বৌ জানে তিনি চলেও আসতে পারেন। প্রায় সময় ত নিজেই ফিরে আসেন। কোনো-কোনো দিন ফিরে না এলেই কষ্ট হয়। আগের চেয়ে তিনি জরা হয়ে গেছেন। প্রায় তিন মাসের উপর তিনি

নিরপেক্ষ ও অবাধ ভোটদানের জন্য

সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানপর্ব যাতে শান্তিতে, অবাধে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয় তার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভোটদাতাদের ভীতিপ্রদর্শন বা নামপরিচয় ভাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার শাস্তি কঠোর।

নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আপনার ভোট গোপন থাকবে।

হিংসায় ভীত হবেন না।
সাহসের সঙ্গে হিংসাকে প্রতিহত করুন।

ভোট দেবার সময়ে ঘুষ বা অন্য কোনও প্রলোভনে ভুলবেন না।

আপনার ভোটদানকেন্দ্র আপনার বাড়ীর কাছেই হবে। ভোটপ্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধির দেওয়া গাড়ীতে চড়বেন না।

প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়া আপনার পরম কর্তব্য, এ কথা ভুলবেন না।

এস. পি. সেনবর্মা
ভারতের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার

davp 70/617

ইনি সুচিত্রা দেবী

পাকা গিন্নী — দুই ছেলের মা
ঘুমপাড়ানী গল্পের ঝুড়ি

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

বারো মাস তিরিশ দিনই সুচিত্রা ব্যস্ত— সারাদিন তার কাজ লেগেই আছে। সে বলে, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব ঝক্কিই সামলানো যায়।

তাইতো সুচিত্রা হরলিক্সের ওপর অতটা নির্ভর করে। হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্সের পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন সুচিত্রাকে সারাদিন উদ্যম আর উৎসাহ যোগায়।

হরলিক্স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এত গুণ। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি এবং বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

বাড়ী থেকে বের হয়ে কোথাও দু দিনের বেশী থাকেন না। যদি কেউ সেদিন খুঁজে না পায় পরদিন সকালে অথবা দুপুরে তিনি ফিরে আসেন। খুব ক্ষুধা লাগলে আখের দিনে আখ, আনারসের দিনে আনারস মাঠ থেকে তুলে খান। সুতরাং মানুষটাকে কেউ ডেকে না আনলেও যখন ফিরে আসে, তখন ব্যস্ততার কি আছে এমন ভাবে সংসারের অন্য সবাই। কেবল বড়বৌ জানে যত তার বয়স বাড়ছে, তত এই মানুষের জন্য তার মায়া বেড়ে যাচ্ছে। সে কিছুতেই আজকাল, অল্প দু দণ্ড চোখের আড়াল করতে পারে না তাঁকে।

কি যে ভুল হয়ে গেল! লক্ষার মাথা খেয়ে কেন যে সে এল না, তাকে খেতে দিল না! এখন ত সংসারের সবই ঠিকঠাক হয়ে গেছে, যারা আত্মীয়স্বজন এসেছে, তারা শুধু একবার জিজ্ঞাসা করেছে, পাগল মানুষ সম্পর্কে, তাদের কোন মায়া-মমতা নেই। এত লোক বাড়িতে অথচ কেউ একবার মুখ ফুটে বলছে না, যাচ্ছি আমি খুঁজে আনতে।

বড়বৌ বলল, কি খাবি সোনা!

—মা বার্লি করতে গেছে।

—তা হলে বার্লি খা।

—ভাল লাগে না জ্যাঠিমা।

—একটা কমলালেবু দেব। পেট ভরে বার্লি খেলে একটা কমলা পাবি।

—সত্যি।

—সত্যি। তুই যা দেখালি কাল! বলতেই সোনা কেমন আবার মুখ কালো করে ফেলল। সে তার দুঃস্বপ্নের ভিতর দেখেছে সেই অশরীরী যেন কার পেছনে কেবল ছুটছে। সে বলল, জ্যাঠিমা, জ্যাঠামশাইরে কেউ খুঁজতে যায় নাই।

—পল্টু গিয়েছিল। পায় নি।

—জ্যাঠামশাই কোনদিকে গেছে কেউ দেখে নি?

—না। খুব কুয়াশা ছিল, কেউ লক্ষ্য করে নি।

সোনার মনে হল ওর তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাওয়া উচিত। সে কেমন ভীত চোখ নিয়ে তাকাল। বলল, আমি কবে ভাত খামু জ্যাঠিমা!

—জ্বর ছাড়লেই ভাত দেবে।

—এখন কত জ্বর হবে! বলে সে মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে জ্যাঠিমার দিকে তাকাল।

—দাঁড়া দেখছি। বড়বৌ থারমোমিটার বের করল, ঝেড়ে নামালো তারপর বগলের ভিতর দিয়ে সোনার পাশে চুপচাপ বসে থাকল।

সোনা বলল, জ্যাঠিমা আমি কবে ভাত খাব?

—না। কাল তোমাকে ভাত দেওয়া হবে না। যদি আজ জ্বর না থাকে, তবে পরশু ভাত পাবে।

—আমার তো কিছু হয় নি। ভয় পেয়ে গেছিলাম।

—কেন এমন ভয় পেলি!

—জানি না। কি যে হল, কি যে দাখলাম শ্মশানে।

—এ-সব মিথ্যা।

—কি!

—এই যে কাল তুই দেখলি।

—না জ্যাঠিমা সত্যি।

—চোখের ভুল।

—আস্তোরমশয় দেখল।

—চোখের ভুল।

—একসঙ্গে দুজনের চোখের ভুল কি করে হবে?

—হয় বাবা। হয়। দাঁড়া। বলে থারমোমিটারটা বের করে চোখের উপর তুলে ধরল। জ্বর এখনও বেশ আছে।

সোনা বলল, কত?

জ্বর বেশ আছে বললে সোনার মন খারাপ হবে। বড়বৌ এই ভেবে বলল, বেশী নেই। খুব অল্প। মনে হয় বিকেলের দিকে জ্বর রেমিশান হবে।

সোনা জ্বর অল্প আছে জেনেই উঠে বসল। দেখি কত জ্বর।

বড়বৌ ততক্ষণে থারমোমিটার ঝাঁকাতে শুরু করেছে। সে বলল, এই দেখ।

—আটানব্বই তিন পয়েন্ট। সোনা থারমোমিটার দেখতে-দেখতে বলল।

আরও বেশী জ্বর। কিন্তু সোনা তার সঠিক জ্বর দেখতে পেল না। ওর কেমন এখন ভাল লাগছে। কেবল মাথাটা একটু ভারী। সে বলল, আমি আর শোব না। বারান্দায় বসব।

বড়বৌ বারান্দায় একটা ইজিচে… পেতে দিল। ঘরের ভিতর শুয়ে থা… কিছু ভাল লাগে না। ঘরের চারপাশে … আলো, কত রকমের পাখি। সে একা… শুয়ে থাকলে সব পাখির ডাক আ… আলাদা চিনতে পারে। গাছের কোন … অথবা পাতার আড়ালে এবং কত দূরে… ঘুঘু পাখির ডাক অথবা ডাহুক পা… যে পুকুরের জলে এখন কীটপতঙ্গ … খেতে ডাকছে সে এই বিছানায় … থাকলেও তা ধরতে পারে। তার কেবল… ইচ্ছা বাইরের পৃথিবীতে অনন্ত … তাকে এই বেলা পর্যন্ত জোর করে … ভিতর আটকে রাখা হয়েছে।

ধনবৌ বারান্দায় এসে বল… আমার জ্বর নেই। জ্বর আমার আ… তিন পয়েন্ট। জেঠিমা থারমো… দাখছে।

ধনবৌকে বড়বৌ ইশারায় কিছু … দিয়ে গেল।—আইচ্ছা তোমার … যখন কম, বার্লি সবটা খাইবা।

সোনার পায়ে জোর নেই। টিনে… রোদ। সে আজ ভাত খেতে পা… জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই। বাবা, মেজ… মশাই লোকজনের ঘরে কিসের ফর্দ … করছে। ছোটকাকা ঈশমকে পাঠিয়ে… মেথরকে ডেকে আনতে। দাদা বড়দা … দার শ্মশানের চাঁপাগাছটার কত … আছে কেটে ফেলছে। সে এই বারান্দা… সব খবরই পাচ্ছে, সে কেবল এ… উপবাসী এবং কিছু খেতে পাবে … হাতে একটা হলুদ রঙের কমলা … রয়েছে। ছোট বোনটা তার বারান্দা… পাশে ঘুরছে ফিরছে। দাদার … ছোট মেয়ে কি করে বুঝবে। … একবার দাদাকে খামচে দিয়ে গেছ… কমলা কেড়ে নিয়ে ছুটেছে মামাকে…

এখন পাগল মানুষ ছুটছেন হাসান পীরের দরগায়।

এখনও ফেলু শেখ হাঁটছে।

ক্লান্তিকর এই হাঁটা। কে কোথায় যাবে, যে করণীয় এই ধরণীতে কেন জানা নেই। আক্রোশের বশে হাঁটা। কার বিবি কার ঘরে। কার মানুষ এখন কার ভিটেতে। ধরণীতে ফুল ফল ফোটে, মানুষের আহার নিমিত্ত বাঁচা। এই বাঁচার জন্য সংগ্রাম। দান দয়াশীল, ধর্ম বড় আফিক কথাবার্তা। সব নিজের জন্য নিজে হয়ে যাচ্ছে মিঞা। তা মিঞা তুমি একখানা মানুষ বটে। তোমার শরীরে এত দুর্গন্ধ, মিঞা তোমার বাছুরটার নিমিত্ত প্রাণ দিলে। কারণ কি। কারণ ধর্ম! কারণ ইজ্জত। কি যথার্থই এরে কেরবাণী দিয়া মার বেহেস্তে একটু জায়গা করে নিতে পারি!

আর জোৎস্না রাতে এত অন্ধকার কেন! চারপাশে মৃত্যুর বিভীষিকা। আকাশে কি প্রবল প্রতাপান্বিত মেঘের দল কালো মেঘ গর্জাচ্ছে। বিদ্যুতের আলো আকাশকে মাঝে মাঝে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। কড় কড় করে কোথাও বজ্রপাত হয়। পাগল মানুষ টের পাচ্ছেন না মৃত্যু পিছনে এসে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। তিনি পলাশ গাছের নিচে বসে আছেন এখনও কীটসের কবিতা আবৃত্তি করছেন।

বিদ্যুতের আলোয় ওঁর মুখ দেখা যায়। কত সরল এবং অমায়িক মুখ। তিনি কিছু খাননি। গতকাল রাতে খাবার কথা, তা পর্যন্ত করেননি। মুখে শুধু একটা ভাব। ধ্যান ধারণা ছিল প্রথম রাতের দিকে। তিনি, কেউ আসবে খুঁজতে, এই আশায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এখন জেগে দেখেন। কেউ আসেনি। ঈশান কোণে নেই কালো কঠিন মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। কোথাও আর বিন্দুমাত্র আলো নেই। আকাশে কোন নক্ষত্র জ্বলছে না। বিদ্যুৎ চমকালেই ওর মুখ দেখা যাচ্ছে। বিষণ্ণ মুখ। কবিতার ভিতর কি যে এক যাদু অথবা বলা যেতে পারে মায়া আছে, যার আবৃত্তিতে সব গভীর দুঃখ ভিতর থেকে মুছে যায়—আহা এমন সুন্দর সাবলীল এবং বিরাট সৌন্দর্য নিশীথে দেখা যায় না। প্রায় দেবদূতের সামিল তিনি পলাশ গাছের নিচে তৃণাসনের উপর দু-পা ছড়িয়ে বসে রয়েছেন। আকাশের ঘনঘটা দেখে সামান্য হাসছেন। ধরণীর এত উত্তাপ, মুষলধারে বৃষ্টিপাত ঘটলে কমে যাবে।

বিদ্যুৎ চমকালেই আবার আমি দেখে ফেলব তাকে। তার পাশে আমার আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কারণ ফেলু দেখে ফেলেছে তাঁকে। এমন একটা সময়ে এত হাতের কাছে সেই জীব চলে আসবে ফেলু কল্পনাই করতে পারেনি। ফেলুর নিষ্ঠুর মুখ দেখলে আপনাদের আত্মা উঠে যাবে। চোখ-মুখ ওর দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে এত বেশি গাছ-পালা এবং অন্ধকার যে তাকে দেখা যাচ্ছে না। কেবল দেখা যাচ্ছে একই জায়গায় সরল বৃক্ষের মতো মৃত কাঠ কিছু জোনাকি জ্বলছে নিভছে। সচল জোনাকির একটা মৃত কাঠ মনে হয় ফেলুকে। এখন অন্ধকারে সে ঘোরাফেরা করছে। সে এসেছিল এখানে, যে ছোট ছোট ইটের পরিত্যক্ত ঘর আছে, রাতে সে এখানে চলে আসতে পারে সে মনে আকালু। কোন ঝোপ-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারে, অথবা ওর তো অনেক লোক হাতে। লোকলজ্জার ভয়ে সে এখানে আছে, খাবার দিয়ে যায় কেউ। ফেলু এসেই এমন একজন মানুষকে গাছের নিচে বসে আছে দেখতে পাবে—ভাবতে পারেনি। তার এখানে আসতে আসতে বেশ রাত হয়ে গেছে। কারণ সে নানাবর্ণের ছাপ বুলিয়ে রেখেছিল শরীরে। সে গ্রামে গ্রামে যত গরীব দুঃখীজন আছে তাদের বলে এসেছে, আমাদের কেউ নাই। আপনেরা সাক্ষী থাকলেন, আকালু আমার বিবিরে নিয়া ভাগছে। আমি খোঁজ পাইলে অর মুণ্ডু ছিড়া ফালামু।

তার যে কোন কসুর থাকবে না, সে দুঃখী ফেলু, সে এ-বাদে আর কিছু জানে না, কবরের সময় তার সব দুঃখটার কথা ভেবে যেন সে ইবলিশ কি মানুষ এটা ঠিক করা হয়। কেয়ামতের দিন অন্ততঃ দুঃখী-জনেরা যেন আল্লার কাছে সাক্ষী থাকে—সে ইবলিশ ছিল না, সে মানুষ ছিল। সে তার বিবিকে খুব ভালবাসত। অভাবে অনটনে বিবিকে সে তার দিতে না পারলে কষ্ট পেত। বিবি তার জানের মতো। সেই জান নিয়ে আকালু পালিয়েছে।

সে এখানে এসে ভেবেছিল আকালুকে পাবে। পাবার কথা নয়, কেন আকালু আসবে বনেবাদাড়ে। সে তো সোজা স্টিমারে উঠে চলে গেছে। তারা এখন মজকেন শহরে। সে কিছুদিন রমনার মাঠে বিবিকে বোরখা পরিয়ে ঘুরাবে। শহর দেখাবে। সদর ঘাটের কামান দেখাবে। সে কেন মরতে আসবে হাসান পীরের দরগায়। কিন্তু হলে হবে কি, ফেলুর এত দূরে যাবার পয়সা নাই। সে শহরে যাবার আগে সব গ্রাম-গঞ্জ খুঁজে যাবে। হাসান পীরের দরগা খুঁজে যাবে। যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানে সে যাবে।

তার কারণ এখন ফেলু আর ফেলু নেই। মাথায় তার গণ্ডগোল। কেবল মনে হয় তার বিবি আর আকালু বনেবাদাড়ে ঘুরে মরছে। বিবি তার আস্ত একটা মুরগী বনে গেছে। আকালু ঝুঁটিয়ালা মোরগ। বনের এক প্রান্ত থেকে মুরগী ডেকে উঠছে, অন্য প্রান্তে মোরগা ডাকছে কক্ ক-ব কো। মাঝখানে বুঝি বসে আছে এই পাগল মানুষ। পাগল মানুষ ফেলুর কাছে এখন আর একটা মোরগা হয়ে গেছে।

পলাশ গাছের অন্ধকারে বোঝাই যাচ্ছে না একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে আসছে। মাথায় রক্ত না নামলে যা হয় ফেলুর হাত-পা কাঁপছে। উত্তেজনায় উন্মত্ত ফেলু কি যে করতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না।

পাগল মানুষ দেখলেন, অন্ধকারে একটা ইস্পাতের ফলা ভেসে ভেসে এদিকে চলে আসছে। চারপাশে তার জোনাকি। অন্ধকারে কিছুই চেনা যাচ্ছে না। সব কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে তার কাছে। তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য এসব হচ্ছে। তিনি ভয় পাবেন কেন। তিনি আর সেদিনের মতো ভয় পাবেন না। কাটা মুণ্ডু সাহেবের ঝুলিয়ে রেখেছিলো ঈশ্বর। তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য তিনি এসব করেছিলেন। ঈশ্বরের কাণ্ডকারখানা বোঝা দুষ্কর। বড় গোলমেলের ব্যাপার। তিনি সেজন্য মনে মনে হাসলেন। তারপর চোখ বুজে ফের কবিতা আবৃত্তিতে মন দিলেন।

ইস্পাতের ফলাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তো আসছেই।

একটা ব্যাঙ এখন গর্ত থেকে ক্রপ ক্রপ করে ডাকল।

একটা কাঠবিড়ালী এখন লাফিয়ে পড়ল মাথায়। কিন্তু মানুষটা বড় নিবিষ্ট কবিতা আবৃত্তিতে। তাঁর এখন কিছু খেয়াল নেই। কাঠবিড়ালীটা তাঁর গা বেয়ে ঘাসের ভিতর নেমে গেল।

(ক্রমশঃ)

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
ম্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

দীনবন্ধু এনড্রুজ স্মরণে

শুভঙ্কর পাঠক

পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা বিরল, যাঁর জন্মদিন একটি নয়, একাধিক। ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়তো তা প্রমাণ করা যাবে না। চার্লস ফ্রীয়ার এনড্রুজ নিজেকে চিহ্নিত করতেন ওভাবেই। তাঁর 'ভারতীয় জন্মদিবস' ২০ মার্চ ১৯০৪। যদিও ইংলেন্ডের মাটিতে তিনি জন্মেছিলেন তারও প্রায় চৌত্রিশ বছর আগে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। দীনবন্ধু এনড্রুজ দ্বিতীয়টিকেই প্রাধান্য দিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের উক্তিতে, ২০ মার্চ কেবল ভারতের মাটিতে পা দেবার দিন নয়, 'দ্বিজত্ব' প্রাপ্তির তারিখ।

রবীন্দ্রনাথের মতে, 'তিনি পাদ্রির চেয়ে খৃষ্টান বেশি ছিলেন।' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই ইঙ্গিত। ভারতে আসার আগে এনড্রুজ ছিলেন অন্যান্য পাদ্রিদের মতো রেভারেন্ড উপাধিতে ভূষিত। পরবর্তীকালে তিনি এই উপাধি বর্জন করেও খৃষ্টীয় বিশ্বাসে আস্থা হারাননি। যেন বাহুল্যটাকে বর্জন করে তিনি অন্তরের সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, এনড্রুজের 'হোয়াট আই ও টু ক্রাইস্ট' বইটির নাম। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস, তাঁকে মানবমুখী করেছে, ভালোবাসায় উজ্জ্বল ও নম্র করেছে। খৃষ্টের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে সমন্বয়ে বাঁধার জন্যই যেন তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা ও নির্যাতনের সমভাগী হবার প্রেরণাও তিনি পেয়েছিলেন ঐ ধর্মবিশ্বাস থেকেই। যাঁরা তাঁকে [illegible] দেখেছেন, তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর আচরণে, স্বভাবে, সৌম্যকান্তি অবয়বে। রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতার মুখোমুখি হয়ে যখন ইংরেজের ওপর বিশ্বাস হারাতে বসেছিলেন, দুঃখ ও অসহায়বোধের অন্ধকারে পথহারা মূল্যবোধের পুনর্বিচারের কথা ভাবছিলেন, তখন সি এফ এনড্রুজের মতো জনকয়েক [illegible] ও মানবপ্রেমিক ইংরেজই তাঁকে 'ছোট ইংরেজ, বড়ো ইংরেজ'-এর ব্যবধান নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই স্মৃতিকে সম্বল করেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন।

ইতিহাসে আগ্রহী মানুষ মাত্রেই জানেন, এনড্রুজের ভারতে আসার সময়টি বিশ শতকের একটি অস্থিরকাল। ইংরেজ তখন শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনকেই দমন করছে না, বাংলা ভাগের চক্রান্তে লিপ্ত। স্বভাবতই শ্বেতাঙ্গদের প্রতি ভারতীয়দের মনোভাব শত্রুভাবাপন্ন।

এনড্রুজ নিজের ব্যক্তিত্বে ও ভালোবাসায় স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন। পাদ্রি হয়েও আর পাদ্রি রইলেন না। তাঁর হৃদয়ের উদারতা এমনই ছিল যে, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানেরা [illegible] ও [illegible] মান্য করতেন। আজ সেই স্মৃতি অবশ্য স্মরণীয়। কেন না, 'বেটার আন্ডার স্ট্যান্ডিং' বলতে যা বোঝায় তার গুরুতর সাধনা ছিল এনড্রুজের জীবনের মূলে।

অনেকেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর মতভেদের কথা। স্বরাজের সাধনায় 'চরকা'র গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ শুধু সন্দিগ্ধ ছিলেন না, অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই দ্বিমত পোষণ করতেন।

১৯২১ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন দেশে নেই, বহির্ভারতে গেছেন। এনড্রুজ দৌড়াদৌড়ি করছেন আসামের চা-বাগানে, শ্রমিক বস্তীতে। মহাত্মা গান্ধী অর্পিত অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরেই তার বিরোধিতা করে বসলেন।

প্রমাদ গুনলেন এনড্রুজ সাহেব কী বিপদ! এর মীমাংসা না হলে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি।

তিনি এর একটা সমাধানের উপায় খুঁজতে থাকেন। উপলব্ধি করেন, পারস্পরিক আলোচনা হলেই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটতে পারে। বিরোধকে জিইয়ে রাখা, কিংবা আপাত শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি কোনোদিনই।

এনড্রুজের চেষ্টায় উভয়ের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী মুখোমুখি বসে আলোচনা করলেন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু সে আলোচনার কোন রিপোর্ট বেরোয়নি খবরের কাগজে। অনেকেই লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে।

এনড্রুজ সাহেব রুদ্ধদ্বার বৈঠকের অন্যতম দর্শক এবং শ্রোতা ছিলেন। 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়'-এর পক্ষপাতী ছিলেন না। বাইরে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, 'ঘটনাটা তোমাদের জানা দরকার, কিন্তু কাগজে তা প্রকাশ করো না।'

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন ঘরের বাইরে। সম্ভবত, রাজনৈতিক তোলপাড় করা ব্যাপারগুলি তেমন পছন্দও করতেন না। তিনি নাকি চাবির ফুটো দিয়ে, লোকদের দৃশ্যটা যেমন দেখেছিলেন, ঠিক তেমনি একটা ছবি এঁকেছিলেন [illegible]। এমন স্মরণীয় ছবি [illegible] কলা ভবনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করছে।

সি এফ এনড্রুজের জন্মশতবার্ষিকীতে এই ঘটনা পুনঃ স্মরণের অন্যতম তাৎপর্য হলো বর্তমানের বিভেদকামী ভারতবর্ষের দুর্গতি। আমরা যখন সামান্য বিরোধকে চাপা করে তুলছি, তখন এনড্রুজ সাহেবের কথা মনে না পড়ে পারে না। সকলের কাছেই তিনি দাবী করতেন সমান বন্ধুত্ব সমান প্রীতি। এমন কি পরস্পর বিরোধী দুটি মানুষের কাছেও তিনি ছিলেন সমানভাবে বিশ্বস্ত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। আর এই ব্যক্তিত্বের জোরেই তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীকে এক করতে পেরেছিলেন, উভয়েরই সমান ভালোবাসা পেয়েছিলেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান ছিল সামান্যই, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে [illegible] বছরের। সেই সূত্রে এনড্রুজ সাহেব গান্ধীজীকে ডাকতেন 'মোহন' নামে, [illegible] রবীন্দ্রনাথকে বলতেন 'গুরুদেব'। মৃত্যুর সামান্য আগে, গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে [illegible] পাতায় দেখা করতে গেলে এই [illegible] প্রেমিক মানুষটি গভীর [illegible] বলেছিলেন : 'স্বরাজ ইজ কামিং, মোহন, বোথ ইংলিশমেন অ্যান্ড ইন্ডিয়ানস [illegible] মেক ইট কাম।'

আজ সেকথা মনে পড়লে যে-কোনো ভারতবাসী বিস্ময় বোধ করবেন। আর [illegible] আড়াই বছর বেঁচে থাকলে তিনি [illegible] স্বাধীনতা দেখে যেতে পারতেন। ইংরেজ তাড়াবার জন্য অন্য একজন মহৎ ইংরেজের প্রয়াস চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

শোনা যায়, ইংলন্ডবাসী হয়েও কোনো দিন তিনি রাণীর জন্মদিন পালন করেননি কেননা, তাঁর মায়ের জন্মদিন ছিল তার কাছাকাছি সময়ে। এনড্রুজ মাকে দেখতেন রাণীর মতো। সেই মায়ের কাছেই তিনি শিখেছিলেন মানবপ্রেমের সঙ্গে ভারতপ্রেমের কথা। পরে ওয়েস্টমিনস্টারের কবি [illegible] সব কবি ও মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ইংরেজী গীতাঞ্জলির কবিতা শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে আসার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল। সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারেননি এনড্রুজ।

ভারতবর্ষে এসে তিনি দুঃস্থদের সেবায় কিন্তু কখনো বিশ্রাম নেননি। বাকি জীবন ভারতীয়দের দুঃখমোচনে পরিশ্রম করে গেছেন। কখনো শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে [illegible] লড়াইয়ের জন্য দরবার করেন, কখনো [illegible] শাসন ও সাম্প্রদায়িক [illegible] [illegible] সংগঠন করেন। তিনি [illegible] দাঁড়িয়েছেন চাষিদের অত্যাচারিত [illegible] পাশাপাশি, কখনো বা [illegible] সংগ্রাম [illegible] দুঃখদুর্দশায় [illegible]।

ইংলন্ডের নিউক্যাসল-অন-টাইন [illegible] মানুষ কি তাঁকে ভুলে গেছে? [illegible] কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা [illegible] আর কেউ তাঁর নাম মনে করতে পারেন না। একদা এনড্রুজ সাহেব ওখান থেকে এম-এ পাশ করেছিলেন এবং [illegible] হয়েছিলেন পেমব্রোক কলেজের। আমরা তাঁকে স্মরণ করছি শুধু 'ভারতবন্ধু' নয়, 'দীনবন্ধু' রূপে। তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন এবং থাকবেন। ভারতবাসী তাঁর দ্বিতীয় জন্মের শতবার্ষিকী পালন করবেন ২০ মার্চ ২০০৭ সালে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

একটি জনপ্রিয় উপন্যাস

উপন্যাসটির নাম লাভ্ স্টোরী—মধ্যবিত্ত প্রেমের গল্প—কোনোরকম অ মুখোশ মার্কা নামকরণ না। লেখক প্রবীন, মাত্র বত্রিশ বছর বয়স। ইয়েল বিদ্যালয়ে 'ক্লাসিকস' বা ধ্রুপদী সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এই উপন্যাসটি গোড়ার দিকে প্রকাশক তেমন প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করেন নি। তবে বিদেশী প্রকাশকদের যে-সব বাঁধা 'রীডার' থাকেন তাঁদের এক বাক্যে উপন্যাসটিকে প্রকাশযোগ্য বলে মনে করে সুপারিশ করেছিলেন। উপন্যাসটি প্রকাশের পর অসীম জনপ্রিয়তা লাভ করল—কয়েকমাস ধরে 'বেস্ট সেলার' তালিকার শীর্ষস্থানে রইল 'লাভ-স্টোরী' এবং এখনও এরিক সেগাল রচিত 'লাভ স্টোরী'র চাহিদা হ্রাস পায়নি।

সাধারণতঃ জনপ্রিয় উপন্যাসের মধ্যে মসলা প্যাঁচ থাকে, এবং সেই মসলা সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করে। পাঠক উপন্যাস পড়তে বসে মাথা ঘামাতে রাজী নন। তাঁরা চান ছক বাঁধা কাহিনী যার মধ্যে থাকবে রোমান্স, মিস্টি আর প্রামায় স্ক্যান্ডেল—সেই উপন্যাসগুলির কয়েকটি সংস্করণ বেশ তর-তর করে কেটে যায়। প্রকাশকরা খুসী হন; উপন্যাসে ইদানীং এই কৌশল বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই জাতীয় সহজপাঠ্য উপন্যাসের বলে কোনো বস্তু সাধারণতঃ থাকে না; জনপ্রিয় উপন্যাস কদাচিৎ অবিস্মরণীয় হয়।

এদিক সেগালের এই উপন্যাসটি মসলা প্যাঁচের উপন্যাস নয়। আধুনিক সমাজের ছবি এঁকেছেন লেখক, সেই সঙ্গে মানব-মনের চিরন্তন ভালোবাসাও শিল্প-সম্মত ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসটির আকৃতি বিচার্য নয়, সাধারণ উপন্যাসের মাপে একটি ছোট বলা যায়। অথচ সংলাপ বহুল এই কাহিনীটি বিষয়-বৈচিত্র্যে গম্ভীর ও গভীর।

গ্রন্থারম্ভে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন—'একটি পঁচিশ বছরের মেয়ের মৃত্যু হয়েছে তার প্রসঙ্গে কি বলা যায়? মেয়েটি সুন্দরী এবং চমৎকার ছিল, মোৎসার্ট আর যোহান সেবাস্টিয়ান বাখের সঙ্গীত তাঁর প্রিয় ছিল—বীটল্‌দের ভালোবাসত—আর আমাকে।'

এইভাবে কাহিনীর সূত্রপাত। তারপর কিভাবে পরিচয় হয়েছিল তার বিবরণ। মেয়েটির নাম জেনিফার কাভিলেরী আর ছেলেটির নাম ওলিভার ব্যারেট। জেনিফারদের লাইব্রেরীতে একটি বই খুঁজতে গিয়েছিল ওলিভার। জেনিফার ছেলেটিকে প্রশ্ন করেছিল—তোমাদের হার্ভার্ডে এই বইটি কি নেই? তোমাদের লক্ষ লক্ষ বই, আর আমাদের মাত্র সামান্য কিছু বই—এখানে কেন? ওলিভার বলল—বা-রে, হার্ভার্ড ত' র‍্যাডক্লিফ লাইব্রেরী থেকে বই নিতে পারে।—জেনিফার জবাবে বলল—ওটা একটা পয়েন্টই নয়।

মেয়েটি বেশ উঁচু ধরনের। র‍্যাডক্লিফে পড়ে বলে বোধহয় ওরা হার্ভার্ডের চেয়ে পাঁচগুণ স্মার্ট। এইভাবে প্রথম পরিচয়। তারপর দুজনে গেল কাছাকাছি যে স্যান্ড-উইচ বার পাওয়া গেল সেই বিজেট রেস্তোরায়। জেনিফার জানালো সে ইতালীয় পূর্বপুরুষের মার্কিন সন্তান আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলে সঙ্গীতে সে স্নাতক। এই সংবাদ জানা ছিল ওলিভারের, সে তার নাম বলল ওলিভার ব্যারেট। জেনিফার জানতে চায় ওয়ায়ড্‌নার স্ট্রীটের কবি ব্যারেটদের সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা—ছেলেটি জানায় না কোনোরকম সম্পর্ক নেই তাঁদের সঙ্গে।

কৌতূহল বশে জেনিফারের নোটবই নিয়ে নাড়াচাড়া করে বলে—তুমি ত' দেখছি সঙ্গীতে বেশ উচ্চমানের পড়াশোনা করছ। নিজের গর্ব চাপা দিতে পারল না জেনিফার, সে বলে—হাঁ—রেনেসাঁস পলিফোনি। ছেলেটি বলে—সে আবার কী? মেয়েটি গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়—না, যৌন সংক্রান্ত কিছু নয়।

ছেলেটি বলে—আচ্ছা তুমি কি আমাকে জানো না?

মেয়েটি বলে—হ্যাঁ, জানি। তোমরা ব্যারেট হলের মালিক।

লজ্জিত ভঙ্গীতে ছেলেটি বলে—আমার প্রপিতামহ ওটা হার্ভার্ডে দান করেছিলেন।

—আর তাই তাঁর কিঞ্চিৎ নিরেস প্র-নাতির হার্ভার্ডে প্রবেশ করতে বাধা নেই।

আহত গলায় ছেলেটি বলল—তাই যদি জানো যে আমি অন্যের বাড়ি তাহলে আমার ঘাড়-কেন্দে কফি খেলে কেন?

এইবার মেয়েটি ওর দিকে সোজাসুজি চায়, তারপর বলল—তোমার দেহটা বেশ ভালো লাগে আমার।

—শোনো র‍্যাডক্লিফবাসিনী খুকী—আগামী শুক্রবার রাতে ডার্টমাউথ আইস-হকি খেলা।

—তাতে কি?

—আমি চাই তুমি খেলা দেখতে আসো।

র‍্যাডক্লিফের মেয়েদের খেলাধুলায় আগ্রহের অভাব। সে বলল, আমি একটা তুচ্ছ হকি খেলা দেখতে আসব কেন?

ছেলেটি বলে—আমি যে খেলব, তাই!

ক্ষণিক নীরবতা। সেই নীরবতার মধ্যে হয় বাইরে তুষারপাত শোনা যায়।

মেয়েটি প্রশ্ন করে—কোন্ দলে খেলছ?

জেনি হকি খেলা দেখতে এসেছিল, ভেকেসানুষের মত ওলিভার তোড়জোড় করে তাকে একটা প্রোগ্রাম পাইয়ে দিয়েছিল, যাতে প্রোগ্রামে ছাপা তার সংক্ষিপ্ত জীবনী জেনির চোখে পড়ে।

এরপর তরুণ বয়সের উপযোগী অনেক রকম মানসিক আলোড়নের মধ্যে কাটাতে হয়েছে হকি-খেলোয়াড় ওলিভারকে। হার্ভার্ড সেই খেলায় জিতেছিল সাত গোলে। দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রোগ্রাম ছুঁড়ে ফেলেছে বরফের ওপর।

CENTRAL LIBRARY

ওলিভার কিন্তু এই বিজয়ের মুহূর্তে জেনির কথাই ভাবছে সর্বদা এবং অতি দ্রুত পোষাক পাল্টিয়ে ছুটেছে জেনির সন্ধানে। সে তখন 'হীরো'—সর্বদিক থেকে। অনেক কষ্টে খুঁজে বার করল ভিড়ের ভিতর থেকে জেনিকে, সে বলল—এখানে যে বড় ঠান্ডা।

জেনিকে দেখে খুসী হয়েছে ওলিভার। সে তার কপালে আলগোছে চুমা খায়। জেনি বলে ওঠে—বারে! তোমাকে চুমা খাওয়ার অনুমতি কখন দিলাম?

—আবেগে চালিত হয়ে চুমা খেয়েছি। দুঃখিত।

এরপর আবার চুমা খায়—আরো নিবিড় ভঙ্গীতে এবার আর আলতো ভাবে নয়, দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন। মেয়েটি অনেক পরে বলে—আমি এ পছন্দ করি না। ছেলেটি প্রশ্ন করে—কি?

—সত্যি বলতে কি ভালোই লাগে আমার।

এইভাবে এগিয়ে চলে ওদের অন্তরঙ্গতা। কয়েকদিন পরে আরেকটি খেলায় কর্নেল দলের সঙ্গে খেলতে গিয়ে আহত হল ওলিভার। ওলিভারের বাবা খবর পেয়ে ছুটে এলেন। অনেক রাতে তাকে মোটরে উঠিয়ে দিয়ে ফিরছে যখন ওলিভার তখন শুনলো টেলিফোন বুথে জেনি ওর অপেক্ষায় আছে। সেখানে গিয়ে টেলিফোনের সংলাপের শেষাংশ কানে যায়। 'ফিল' বলে কাকে জেনি বলছে আমিও তোমাকে ভালোবাসি ফিল।

এরপর টেলিফোন নামিয়ে রেখে ওলিভারকে দেখে তার দিকে একটি চুমা ছুড়ে দেয়। ওলিভার ভাবে বারে, এ-কি মেয়ে—একসঙ্গে দ্বৈত-চরিত্রে অভিনয় না!

ওর আহত গালটি দেখে অক্ষত গালে চুমা দিয়ে প্রশ্ন করে—কি জন্য বাকির অবস্থাটাও এমনই ত'।

—এর চেয়ে খারাপ করে দিয়েছি। কিন্তু ফিল কে?

—আমার বাবা। এই তাঁর নাম।

জেনির বাবা একজন রুটিওলা। তিনিই তাকে মানুষ করেছেন। মোটর দুর্ঘটনায় ওর মায় মৃত্যু হয়। ওলিভার জানায় যে তার বাবাও একজন নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। জেনি বুঝতে পারে না বাপের নামটি কেন বিশ্রী গাল দিয়ে উচ্চারণ করে ওলিভার। ওলিভার জানায়—না, কোনো অপরাধ নেই—শুধু আমাকে উপেক্ষা করেন।

এত ঘনিষ্ঠতা অথচ দুজনের মধ্যে কোনো দেহগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, সে অবস্থা বিস্ময়কর। ওলিভারের জন্য হয়ত তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, হয়ত গ্রহণ করবে, কিন্তু তার কারণ বিভিন্ন।

ওলিভার প্রথম দৈহিক সম্পর্কের কথাও বলেছে: অতি মৃদু, অতি কোমল সেই পুলকের অভিজ্ঞতা। এই জেনি যে সেই জেনি তা মনে হয়নি। সেদিন জেনি বলেছিল—আমি তোমাকে ভালোবাসি—ওলিভার মত ভালোবাসি তোমাকে।

ওদিকে বাখ সোসাইটির কনসার্ট হবে পঞ্চম অধিবেশন। সেখানে পিয়ানো বাজালো জেনি। ওলিভার বলল—ভারী চমৎকার। জেনি শুধু বলল—সঙ্গীত সম্পর্কে তোমার জ্ঞান কত কম এ তার পরিচয়।

জেনি জানালো সে প্যারিসে যাবে। ওলিভার দুঃখিত। জেনি বলে—আমরা স্নাতক হওয়ার পর যে যার পথে পা বাড়াব, আমি প্যারিসে, তুমি ল' স্কুলে। ওলি, তুমি লাখপতির সন্তান, আমি সামাজিক দিক থেকে একটা বিরাট শূন্য মাত্র।

ওলি বলে—সে হবে না। আমরা একত্রেই থাকব।

জেনি বলে—মূর্খের মত কথা বোলো না। হার্ভার্ড যেন সান্তা ক্লসের ব্যাগ, ক্রিসমাসের সময় যা কিছু এর ভিতর পুরে রাখ। ছুটি শেষ হলে তাকে ঝেড়ে দাও—তারপর ইতঃস্তত করে বলে—তখন যার যেথা স্থান তাকে সেখানে যেতে হবে।

—তুমি কি তাহলে দেশে ফিরে গিয়ে রুটি বানাবে?

—আমার বাবাকে নিয়ে রসিকতা কোরো না।

—না, আমাকে প্যারিসে যেতে হবে, আমি প্যারিস দেখিনি। আমার স্কলারশিপ।

—আর আমাদের বিয়ে!

—বিয়ে? আমাকে বিয়ে করবে নাকি?

—হ্যাঁ।

—কেন?

গাড়িতে যেতে যেতে জেনি বলে—তুমি উন্মাদের মত গাড়ি চালাচ্ছ। তোমার বাবা খুন করার আগে তুমিই দেখছি মারবে।

ওলিভার বলে—আমার বাপ-মা লোক ভালো।

গাড়ি তখন দশ সেকেন্ডে আট মাইল বেগে ছুটছে। নিয়ে গেল ওদের বাড়ি। বাবা-মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

বাবা রাজী হননি। ওলিভার সংসার থেকে সরে এল। জেনির বাবার কাছে গেল—তিনি পছন্দ করলেন ওলিভারকে। বিবাহ হয়ে গেল। জেনি এলিজাবেথ ব্যারেটের সনেট আবৃত্তি করল—

"When our two souls stand up erect and strong, face to face, silent, drawing nigh and nigher, until the lightening wings break into fire...."

জেনির কণ্ঠোচ্চারিত সেই সনেট যেন প্রার্থনা মন্ত্র—

A place to stand and love in for a day with darkness and the death hour rounding it.

আর পরে ওলিভার আবৃত্তি করল, ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'সং অব দি ওপেন রোড' থেকে—

....I give you my hand!
I give you my love more precious than money —

বিবাহ হয়ে গেল। জেনি চাঁদ শান্ত, সুধীরা। আইন পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করল ওলিভার। কিন্তু সুখের দিন ফিরে এল, সন্তানসম্ভবা মনে করে ডাক্তার ডাকা হল, তিনি এসে বললেন, লিউকোমিয়া। বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। মাত্র চব্বিশ বছর বয়স—সব শেষ।

মৃত্যুর দিনে ওলিভারের বাবা এলেন। হাসপাতাল থেকে নেমে বাকিরা ওলিভার এমন সময় ওকে ধরে তিনি বললেন, ওলিভার, আমাকে বলা উচিত ছিল।

বাইরে দারুণ ঠান্ডা।

জেনি আর নেই। জেনি একদিন বলেছিল—প্রেম এমন জিনিস যে সেখানে ত্রুটী স্বীকারের কিছু নেই।

জেনির মৃত্যুর মুহূর্তে ওলিভার সব কথা স্মরণ করছে এইভাবে আত্মনেপদী ধারা বিবরণীতে কাহিনীটি বিধৃত। শেষ লাইনে ওলিভারের উক্তি—

'আর তারপর যা কখনও করিনি তাই করলাম, বাবার কাঁধে মাথা রেখে আমি কেঁদে উঠলাম।'

অতি সাধারণ কাহিনীও মনের বাতিতে সোনা দেয়, যদি তার মধ্যে চিরন্তনের বাণী থাকে। এই জনপ্রিয় উপন্যাসটিতে সেই কথাই আবার প্রমাণিত হল। তরুণ মহলে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে—

"Tender, strong, funny and sad".

—অভয়ঙ্কর

LOVE STORY: BY ERICH SEGAL
Published by — Hodder & Soughton Ltd. London. Price 20 Shillings.

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় উপন্যাস ও পথের পাঁচালীর মূল্যায়ন ।। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় উপন্যাস অজস্র প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু সাহিত্যিক মূল্যায়নে এই সব উপন্যাস কতদূর সার্থক এ নিয়ে ইদানিং বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। এইসব প্রশ্নগুলি একদিকে যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি অন্যদিকে যতই উষ্মা প্রকাশ করি না কেন, এর যৌক্তিকতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

সম্প্রতি ইলাসট্রেটেড উইকলিতে একটি প্রবন্ধে বিশিষ্ট লেখিকা এস মাস্কী বলেছেন যে, ভারতীয় উপন্যাস হলো সাবালক ধরণের। এবং তাঁর ধারণা খারাপের দিকেও সাবালিকত্বের প্রভাব বেশি অনিশ্চিত। তিনি কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা

করেও ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর খ্যাতিকে নগণ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রেমচন্দ এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে বলেছেন মাঝারি ধরনের। এর একটা কারণ অবশ্য সহজেই বলা যায়, যে তিনি কোনও উপন্যাসই মূলে ভাষায় পড়বার সুযোগ পাননি। ইংরেজিতে অনূদিত রচনাই তাঁর সমালোচনার ভিত্তি।

যাই হোক, লেখিকা 'পথের পাঁচালী'কে ফাইনেস্ট ইন্ডিয়ান নভেল' বলে মনে করেন। কিন্তু দুঃখ এই যে, সত্যজিৎ রায় এটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়ণ করতে গিয়ে উপন্যাস হিসেবে বইটিকে নষ্ট করেছেন। তাঁর রচনা থেকেই তুলে ধরছি। ...he (সত্যজিৎ রায়) has definitely

> killed a fine — the finest Indian novel — 'Pather Panchali' as a novel.

প্রথমেই প্রশ্ন হলে 'পথের পাঁচালী' কি তিনি পড়েছেন? না পড়লে তবু এ ব্যাপারে তাঁর দুঃখের অন্ত নেই। শুধু তাই নয়—ইউনেস্কো যে অনুবাদ করেছেন, সেটাও এই চলচ্চিত্র অনুযায়ী। তার জন্য

> A novel which was not mediocre was made to suffer at the hands of mediocrities—in the name of UNESCO.

এর একটা কারণ অবশ্য আমার যা মনে হয়েছে, তা হলো এই উপন্যাসে প্রকৃতির যে একটা অবদান আছে এবং সমস্ত উপন্যাসটি থেকে বাদ দিলে অনেকটা নিষ্প্রাণ—চলচ্চিত্রে যাকে রূপায়ণ সম্ভব নয়—সেই দিকটি অনুবাদে ফুটে ওঠেনি। এই ব্যাপারে কথা হচ্ছিল ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনিই 'পথের পাঁচালী'র ফরাসী ভাষায় অনুবাদক। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও চলচ্চিত্র অনুযায়ীই অনুবাদ করেছি।' আমি জানতে চাইলাম: 'আপনার কি মনে হয় না, এর জন্য উপন্যাসটা অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে।' ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে জানতে চাইলেন।

বললাম, 'পথের পাঁচালীতে অপু ও দুর্গার মতো প্রকৃতিও একটা চরিত্র।' চলচ্চিত্রে এর স্থান নেই। সেই চলচ্চিত্র অনুযায়ী করতে গিয়ে এই উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যই কি বাদ পড়েনি?'

কোন উত্তর দিলেন না শ্রীমতী ভট্টাচার্য। তবে বললেন, উপন্যাসের আঙ্গিকের দিক থেকে কিন্তু বইটিকে আমার খুব শিথিল মনে হয়েছে।' কথাটা কোনদিন ভাবিনি। শ্রীমতী ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের কথায় যেন উপন্যাসটির উপর নতুন আলোকপাত হলো।

প্রসঙ্গত আমার মনে পড়ছে কামাক্ষীর কথা। তিনি বলেছিলেন, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' ছাড়া বাংলা ভাষায় কোন যথার্থ উপন্যাস নেই।'

মনে মনে ভাবছিলাম ভারতীয় উপন্যাস সম্পর্কে কত রকম মন্তব্যই শোনা যায়। আমার এইসব অভিমতের প্রতি দুবেই শ্রদ্ধা আছে। আমি জানি, শ্রীমতী ভট্টাচার্য এবং [illegible] কালো উভয়েই বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক। তাঁদের কথা যেন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচনে সাহায্য করে।

'পথের পাঁচালী'র অনুবাদ প্রসঙ্গে আরো দু-একটি কথা মনে পড়ছে। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'MAHFIL' এর বর্তমান সংখ্যায় টি ডব্লু ক্লার্ক ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় অনূদিত পথের পাঁচালীর ইংরেজি অনুবাদের উপর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক ডিভেজ পোউকিন্স। তিনি বইটির অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনার পর এর চলচ্চিত্র রূপায়ণ সম্বন্ধে বলেন—

> "Satyajit Ray probably did the utmost in cinematography that could be done with 'Pather Panchali', a pleasure certainly for him and for his audiences. This prior introduction via the screen will doubtless make the novel in this edition more popular in English speaking countries.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চলচ্চিত্র অনুগামী 'পথের পাঁচালী'র অনুবাদ একেবারে অসার্থক নয়। অর্থাৎ এর ফলে উপন্যাসটি মাঝারি ধরনের হয়ে পড়েনি। হয়ত মূল থেকে করলে আরো ভাল হত। তবে বিদেশী পাঠকের কাছে সেটা কতদূর গ্রহণীয় হত, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

পুস্তক প্রদর্শনী।। ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি'র উদ্যোগে কলকাতার আকাদেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে ৮-১৬ তারিখ পর্যন্ত আমেরিকান বইয়ের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ বোধ করি কম দামের পাঠ্য বইয়ের দিকটিই। এছাড়াও প্রদর্শনীতে আছে বিখ্যাত আমেরিকান লেখকদের বই এবং সেই সব বইয়ের অনেক বঙ্গানুবাদ, বিভিন্ন সাময়িকপত্র ইত্যাদি।

ভেনেজুয়েলায় রবীন্দ্র-প্রদর্শনী—ভেনেজুয়েলায় ভারতীয় দূতাবাস সম্প্রতি একটি সুন্দর রবীন্দ্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ভেনেজুয়েলার বিশিষ্ট কবি ফার্ণাণ্ডো পাথ কাস্তীল। তিনি তাঁর ভাষণে রবীন্দ্র-সাহিত্যে আন্তর্জাতিকতা এবং ল্যাটিন আমেরিকান সাহিত্যে তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী শ্রীশাহাবুদ্দিনও রবীন্দ্র-সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্প্যানিশ অনুবাদও অনুষ্ঠানে পঠিত হয়। প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের আঁকা বিভিন্ন ছবি, তাঁর বইয়ের স্প্যানিশ ও ইংরেজি অনুবাদ এবং তাঁর নিজস্ব একটা প্রতিকৃতিও স্থান পায়। বহু শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক জনসমাগমে অনুষ্ঠানটি মুখর হয়ে ওঠে।

কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব—১৪ ফেব্রুয়ারী বেলা ২টায় নদীয়া জেলার ফুলিয়ায় আদি কবি কৃত্তিবাসের স্মরণোৎসব উদযাপিত হয়। কৃত্তিবাস স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য সকলকে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

অন্ধ্র সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার—অন্ধ্র প্রদেশ সাহিত্য আকাদমি ১৯৬৫—৬৯ সালে প্রকাশিত বইয়ের শ্রেষ্ঠ বই রচনার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট লেখককে পুরস্কৃত করেছেন। টি রামচন্দ্র তাঁর 'সাহিত্য সংগ্রুন স্বাগতম' নামক সমালোচনার বই; রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী তাঁর 'রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী কথলু' নামক ছোটগল্প সংকলনের জন্য; কে আনন্দেনেরলু তাঁর 'নাগরমলো বন' নামক কবিতার বইয়ের জন্য; ডি বলাচার্য তাঁর 'চিমারা ভেঙরু' নামক উপন্যাসের জন্য এবং এম জনসন তাঁর 'নাটকীয়ম' নামক নাটকের জন্য এই পুরস্কার লাভ করেছেন।

—চার্বাক

নতুন বই

মণিমহেশ...। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ৬-০০।

যে কোন ভ্রমণ-কাহিনীমূলক রচনা লেখকের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয়। ভ্রমণ-কাহিনীর লেখকই সেখানে একমাত্র নায়ক। সার্থক ভ্রমণকাহিনীতে ভ্রমণই মুখ্য, কাহিনী গৌণ হয়ে যায়। উপন্যাসের মত কাহিনীগত ঐক্য না থাকলেও কাহিনীর উপন্যাসোপম ভ্রমণ ভ্রমণকাহিনীকে সমৃদ্ধ ও সৃষ্টিধর্মী করে তোলে। ভ্রমণের গতিতে কোন বিশেষ চরিত্র পূর্ণ পরিণতি না পেলেও চরিত্রগুলি বহু চিত্রের বর্ণাঢ্য শোভা রচনা করে। ডায়েরীর মত আত্মনিষ্ঠ না হলেও সার্থক ভ্রমণকাহিনীতে ডায়েরীর অন্তরঙ্গতা অ-দুর্লভ নয়।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভ্রমণকাহিনী রচয়িতা শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মণিমহেশ' গ্রন্থে দুর্লক্ষ্য নয়। বাংলা সাহিত্যের ভ্রমণ-কাহিনীর শাখায় আলোচ্য লেখকের স্থান স্বীকার করতেই হবে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'পঞ্চকেদার' গ্রন্থ আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। বাংলা আদিতম ভ্রমণকাহিনীর রূপ পাওয়া যায় সংস্কৃত পদের অবয়বে কবি বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে। তার পর থেকে ভ্রমণকাহিনীর বিষয়—ভারতের পাহাড়, নদী বা কোন বিশেষ মন্দির অধ্যুষিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে পর্বত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুরু হয় উনিশ-শতকেই। জলধর সেনের 'হিমালয়' থেকে তা আরও বিস্তৃত রূপ পায় সাহিত্যে। শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই ধারার উপকরণকে আশ্চর্য শিল্পকুশলতায় 'মণিমহেশ' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

'মণিমহেশ' গ্রন্থটিতে তিনটি ভিন্ন ভ্রমণ-কথা সংকলিত—এক মণিমহেশ, দুই, পাহাড় পথে সিমলা থেকে চক্রাতা, তিন, কিন্নর দেশ। গ্রন্থে শ্রীসুশান্ত চট্টোপাধ্যায় ও লেখকের নিজস্ব তোলা মণিমহেশ মন্দির, গদ্দী রমণী, ডালহৌসিপথে, হাটকোটি, সুসজ্জিত পুরুষ-রমণী ইত্যাদি তেরোটি উত্তম আলোকচিত্র আছে। এগুলি গ্রন্থের মূল্যবান অংশ।

পাঞ্জাবের ইরাবতীর ধারাপথে লেখক হিমাচলে কিছুদিন কাটাতে এসে মণিমহেশ যান। হিমগিরির তুষার অঞ্চলে মনোমুগ্ধকর হ্রদ। তারই তীরে মণিমহেশ গিরিশিখর। কৈলাস শিখরের মতই স্বয়ম্ভূ, জ্যোতির্ময়ী, শিবরূপী। স্থানীয় লোকেরা তার নাম দেয় চম্বা-কৈলাস। এই তীর্থ-ভ্রমণের কাহিনীটিকে লেখক সুরু করেছেন ডায়েরীর বৈশিষ্ট্যে; কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনীর আকর্ষণ একবারও মন্থর হয়নি। পথে হিমাদ্রির সংগে পরিচয় হওয়া, সঙ্গী করা ইত্যাদি বিষয়গুলি রীতিমত আকর্ষণীয়। লেখক মণিমহেশের যে প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা দিয়েছেন, তা এক কথায় তুলনারহিত।

দ্বিতীয় কাহিনীটি চক্রাতা শহর ভ্রমণের নিপুণ বর্ণনা। চক্রাতার পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে লেখকের স্মৃতিচারণ অত্যন্ত মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। 'কিন্নরদেশ' অংশে তিনিভ্যালিতে অবস্থিত এই স্থানটির ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখক আন্তরিকতার সংগে চিত্রিত করেছেন। বালিজি, কেন্দু, মেমসাহেবা, মিস ওরফে মাস্টারজী ইত্যাদি চরিত্র, দেবীদেবীর সংগে সাক্ষাৎ ঘটনা, বন, গ্রাম ও অন্যান্য প্রকৃতির বর্ণনা এই অংশটির ভ্রমণ-রসকে সমৃদ্ধ করেছে।

লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কাহিনী বর্ণনায় চলতি ভাষা ব্যবহারে। ছোট ছোট বাক্যে এমন আন্তরিক ও অন্তরঙ্গতার সুরে গম্ভীর পর্বত-ভ্রমণের বর্ণনা অনেকদিন বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে পড়িনি। বস্তুত গ্রন্থটি বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বামনপুরের মাঠ । দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা ৬। দাম ছয় টাকা।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী একজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। তাঁর চিত্র রচনা আমাদের দীর্ঘকাল বিচিত্র শিল্পরসের আস্বাদ দিয়েছে। তিনি যে ছোট গল্প রচনাতেও সিদ্ধহস্ত, এ পরিচয় সম্ভবত আজকের পাঠকের অজানা। তারা শ্রীরায় চৌধুরীর 'বামনপুরের মাঠ' নামটি গল্পের সংকলন গ্রন্থটি যেন পড়ে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ হাতে পেয়ে এবং পড়ার পর একথাই স্বীকার করতে হয়, আলোচ্য লেখক ইতিমধ্যে এই গ্রন্থের জন্য স্বভাবী পাঠক সমাজে খ্যাতি পেয়েছেন। বস্তুত গ্রন্থটির গল্পগুলি পাঠে একটা কথা মনে হয়েছে, লেখকের সাহিত্যের এই সুকুমার শাখায় পদক্ষেপ খ্যাতিলাভ অযথার্থ নয়। এঁর 'বামনপুরের মাঠ' 'মৃত ভোজ', 'ডাস্টবিন', 'প্রতীক্ষা' ও 'নেশা-ক্ষেপা' গল্পগুলি যথার্থ ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

গল্পগুলির সংগে আছে কিছু ছবি। চিত্রগুলি নিছক শোভাবর্ধক নয়, গল্পের বিষয়কে সুবোধ্য ও রম্য করেছে। লেখক সাধু গদ্যে সমস্ত গল্পই রচনা করেছেন। আজকাল সাধু গদ্যে গল্প-উপন্যাস রচনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধুগদ্যে রচিত কয়েকটি উপন্যাস ও ছোট গল্প পড়ে মুগ্ধ হই। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী যে এমন প্রসাদগুণ সমন্বিত সার্থক সাধু গদ্যে গল্পগুলি রচনা করে স্বভাবী পাঠকদের কাছে প্রিয় হতে পেরেছেন, তার জন্য তাঁর শিল্প-ক্ষমতাকেই অভিনন্দিত করতে হয়।

ধামিকে মানতে হবে (অধ্যাত্ম চিন্তা)—হরলাল ভট্টাচার্য। প্রকাশক নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, মালদহ। প্রাপ্তিস্থান—রঙ্গী ভট্টাচার্য, ১১, দি মার্ল রোড, কলিকাতা-১৯।। মূল্য দুই টাকা মাত্র।।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'গ্রন্থখানির একাধিক বৈশিষ্ট্য আছে। এর বিষয়বস্তু অনুদ্ভূত নয়, নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা। বিশ্ব রহস্য ঈশ্বর তত্ত্ব, কল্যাণ তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয়। বলা বাহুল্য বিষয়গুলি অতিশয় জটিল এবং সাধারণের কাছে দুরূহ। আশ্চর্যের বিষয় গ্রন্থকার হরলাল ভট্টাচার্য সেই দুরূহ তত্ত্ব অতি সরলভাবে প্রকাশ করেছেন সুললিত পদের মাধ্যমে। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাসী তাই তাঁর এই কল্পনাবলী বিজ্ঞানভিত্তিক, এবং যুক্তি মার্গের প্রতি তিনি অধিকতর আগ্রহশীল। লেখকের সাধনজীবনের উপলব্ধি সাধারণের কাছে যেভাবে সরল ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে পেরেছেন তা বিস্ময়কর। অধ্যাত্মচিন্তার এই সহজ প্রকাশ ভক্তের কাছে অসীম মূল্যবান।

ভেরা নভিকোভার সঙ্গে একটি সন্ধ্যা

কোনদিন তাঁকে দেখিনি। কেবল নামের সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম। অত্যন্ত আগ্রহের সংগে পড়তাম সংবাদে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহের কথা। তাই যখন শুনলাম যে তিনি কলকাতায় এসেছেন তখন তাঁকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনায় মনটা কেমন যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

পরদিন সন্ধ্যায় গেলাম তাঁর সংগে দেখা করতে। গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের ১৪নং ঘরের দরজায় শব্দ করতেই দরজা খুলে গেল। পরিচয় দিতেই নিয়ে গেলেন ঘরে। জিজ্ঞেস করলাম—হঠাৎ চলে এলেন যে কলকাতায়? একটু স্মিত হেসে তিনি বললেন—হ্যাঁ, হঠাৎই বলতে পারেন। গিয়েছিলাম ক্যানবেরায় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে। সেখান থেকে ফেরার পথে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিনিময় কর্মসূচী অনুযায়ী তিন সপ্তাহের ভারত ভ্রমণের একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। এখানে আসার আগে চন্ডীগড় ও হায়দ্রাবাদে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব বিষয়ে ভাষণ দিয়ে এসেছি।

এর মধ্যে চা এসে গেল। বেশ পড়ল আমাদের কথার মধ্যে। নভিকোভার নামের সংগে বাংলাদেশের পরিচয় দীর্ঘদিনের। বর্তমানে তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ব বিভাগের প্রধান। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট সম্মানে ভূষিত হন লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর তাঁর ৫০টির মত বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হল—বঙ্কিমচন্দ্র—তাঁর জীবন ও সাহিত্য, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কবিতা, রুশ-বাংলা অভিধান প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, প্রতিটি বইই রুশ ভাষায় রচিত। এ ছাড়াও তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার একটি রুশ অনুবাদ সংকলন সম্পাদনা করেন এবং বাংলা সাহিত্য থেকে বহু রচনা রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। গত বছর বঙ্কিমচন্দ্র—তাঁর জীবন ও সাহিত্য বইটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই বিদেশী বাংলা-ভাষাবিদদের মধ্যে প্রথম যিনি এই পুরস্কার লাভ করলেন। পুরস্কারটি গত ১০ তারিখ এক অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রদান করা হয়। বর্তমানে তিনি উনিশ শতকের বাংলা

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্য বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত আছেন।

চা পানের পর আবার আলাপ শুরু হল। এবার জিজ্ঞেস করলাম—বাংলা ভাষার প্রতি আপনি কিভাবে আকৃষ্ট হলেন? একটু ভেবে নিয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন সে অনেক বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন সতের বছর। লেনিনগ্রাদে তখন দাউদ আলি দত্ত নামে এক বাঙালী ভদ্রলোক বাস করতেন। তাঁর আসল নাম ছিল প্রমথনাথ দত্ত। তিনি ছিলেন বিপ্লবী। রাশিয়ায় নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। আমি প্রথমে সংস্কৃত ও পালি ভাষা পড়তে আরম্ভ করি। কিন্তু দাউদ আলি দত্তের সঙ্গে পরিচিত হবার পরেই বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হই। আমি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যটি রুশ ভাষায় অনুবাদ করি। এর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। লেনিনগ্রাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে ওঠে। চলে যাই মধ্য এশিয়ায়। তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে আবার ফিরে আসি লেনিনগ্রাদে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর কাটাই বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য। ১৯৫১ খৃঃ থেকে আমি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করছি। আমি যদিও বাংলা ভাষার ছাত্র, তবু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ও গবেষণার সুযোগ আছে।'

প্রসঙ্গটিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—আপনি তো বাংলা ভাষার উপর অনেক বই লিখেছেন। এখন আপনার পরিকল্পনা কি? সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন তিনি—পরিকল্পনা আছে অনেক। এখন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল অনুবাদ করছি রুশ ভাষায়। তাছাড়া মধুসূদনের উপর একটা বই লিখবার ইচ্ছে আছে। এই তো আজই গিয়েছিলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে মধুসূদনের উপর প্রকাশিত বইয়ের খোঁজ করতে। অনেক বই দেখে এসেছি—কিছু কিছু আমরা কিনবো আর কিছু সংগ্রহ করবো অন্যভাবে। তাঁর কথার মধ্যেই বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কেমন লাগে মধুসূদনের কবিতা আপনার?

খুব ভালো। উত্তর দিলেন তিনি। আমার ধারণা মধুসূদন রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ কবি।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে রুশ জনসাধারণের অভিমত সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলাম তাঁর কাছে। তিনি বললেন—সাধারণভাবে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধেই আমাদের দেশে একটা আকর্ষণ আছে। আর এর মধ্যে বাংলাসাহিত্য হল শ্রেষ্ঠ। এ শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবে বলছি না—বাংলা সাহিত্য সার্বিক বিচারেই শ্রেষ্ঠ। প্রগতিশীল চিন্তা এবং মননের সুক্ষ্মতা বাংলা সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছে। ইদানিং হিন্দির কিছু কিছু অনুবাদ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতীয় সাহিত্যে বাংলা সর্বোচ্চে।

আচ্ছা, রাশিয়ায় বাংলা সাহিত্যের কেমন অনুবাদ হয়েছে কেমন? একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন—সে অনেক। সবচেয়ে বেশি অনুবাদ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। মহান অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব থেকেই তাঁর লেখা বিভিন্ন রুশ পত্র-পত্রিকায় অনূদিত হয়েছে। প্রথম যিনি রবীন্দ্রনাথের রচনা অনুবাদ করেন, তাঁর নাম আই শ্যালেভস্কি। তিনি ছিলেন রাশিয়ার একটি সংবাদপত্রের লন্ডন প্রতিনিধি। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করলে রুশ দেশে তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯১০—১৭ খৃঃ মধ্যে রুশ দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রায় ৫০টি গ্রন্থ অনূদিত হয়। কিন্তু এসব অনুবাদ হয়েছে ইংরেজি অনুবাদ থেকে। অক্টোবর বিপ্লবের পর ভারতীয় ভাষা শিক্ষার দিকে ঝোঁক বেড়ে যায়। ১৯৫৬ খৃঃ মূল বাংলা থেকে ৮ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ খৃঃ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বৎসরে ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার সংকলন। প্রথমটা আমি একাই সম্পাদন করি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন শ্রীবিকোভা।

রবীন্দ্রনাথের পর বোধ করি বেশি অনূদিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, কমলাকান্ত আমরা অনুবাদ করি। আমার এক ছাত্র তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা বইটি অনুবাদ করেছে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত এবং গৃহদাহ বই দুটিও অনূদিত হবার পর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই বই দুটির দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন এলিজাবেথ পারেস্কায়া ও অ্যালেকজান্ডার গাহাটুক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি অনুবাদ করেছি আমি। এ ছাড়া ছোট গল্পের অনুবাদ সংকলন প্রকাশ আমাদের উল্লেখ্য কাজ। আধুনিক বাঙালী ছোটগল্পকারদের মধ্যে তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আশুতোষ ভট্টাচার্যের গল্প মূল বাংলা থেকে অনূদিত হয়ে এতে সংকলিত হয়েছে।

আধুনিক কবিতারও একটি অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে আমার সম্পাদনায়। এতে আধুনিকদের মধ্যে জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, দুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রমুখের কবিতা আছে। নজরুল ইসলামের কবিতার একটি স্বতন্ত্র সংকলন প্রকাশও আমাদের কৃতিত্ব।

কথাগুলো বলেই উঠে গেলেন নভিকোভা বাক্স খুলে দুটো ইংরেজিতে টাইপ করা প্রবন্ধ নিয়ে এলেন। আমাকে এই প্রবন্ধ দুটো দিয়ে বললেন—পড়ে দেখবেন। এতে আরো তথ্য আছে। আমার অনেকক্ষণ ধরেই তাঁর পুরস্কৃত বইটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর রুশ ভাষায় লিখিত এই বইটি আগেই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। জিজ্ঞেস করলুম—এত দূরে থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এত তথ্য সংগ্রহ করলেন কেমন করে?

উত্তর দিলেন শ্রীমতী নভিকোভা—অনেক দিন ধরে এর জন্য খাটতে হয়েছে আমার। ১৯৫০ খৃঃ থেকেই বইটির জন্য তথ্য সংগ্রহ করছিলাম আমি। তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি কলকাতায় আসি। ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি অনেক। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে যাই। বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির যে ছবিটা দেখেছেন, সেটা আমার নিজের হাতের তোলা। আরো কিছু তথ্য পেয়েছি মাইনাইয়েভের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গের একজন অধ্যাপক। বঙ্কিমচন্দ্র যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে রজনী বইটি উপহার দেন। আমার বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অটোগ্রাফসহ সেই বইয়ের মলাটের ছবি দিয়েছি। দেখেছেন বোধ হয়?

বললাম—হ্যাঁ দেখেছি। বইটি লিখতে গিয়ে তাহলে আপনাকে দেখছি অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মাথা নাড়িয়ে তিনি সম্মতি জানালেন।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। তাই বাসনা থাকলেও আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। শুধু জানতে চাইলাম পুরস্কার প্রদানের কথা তিনি কি করে জানলেন এবং জানার পর তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হলো।

উত্তরে তিনি বললেন—প্রথম আমি জানি বেংগলি লিটারেচার পত্রিকার সম্পাদক আশিস সান্যালের কাছ থেকে। তাঁকে আমি আমার পুরস্কৃত বইটির একটা কপি পাঠিয়েছিলাম। তিনি চিঠিতে লেখেন যে, বইটি রবীন্দ্র পুরস্কারের জন্য তিনি সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করেছেন। এর পর আর কিছু জানি না। কয়েক মাস পর একদিন রাত্রে আমার এক বন্ধু ফোন করে জানান যে, আমি পুরস্কারটি পেয়েছি। শুনে তো আমি হতভম্ব। যাই হোক পরদিন পত্রিকায় সংবাদ দেখতে পেলাম। পুরস্কারটি পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমি এবং আমার দেশ এ জন্য গর্বিত।

এবার বিদায় নেবার পালা। তাঁকে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। তিনি সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন—বাংলাদেশকে আমি ভালবাসি। আবার আসার ইচ্ছে রইল। ফিরে আসার পথেও কথাগুলির যেন প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম।

—আশিস সান্যাল

CENTRAL LIBRARY

বইকুণ্ঠের খাতা

সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে

পুরস্কার দিয়ে সাহিত্যকে টিঁকিয়ে রাখা যায় কিনা জানি না, তবে সাহিত্যিককে বাঁচিয়ে রাখা যায়। বিদেশী নজীরে বিমুখ বাঙালী পাঠকের সামনেও সে রকম উদাহরণ কম নেই। সেকালের ছোট-বড় রাজারা রাজসভায় মর্যাদা বৃদ্ধি ও কাব্যানুরাগের পরিচয় দিতেন সভাকবি রেখে। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবির সংখ্যা ছিল পাঁচ, আর ভারতচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহভাজন।

রাজস্বীকৃতি ছাড়া সেকালে কবি-প্রতিষ্ঠা লাভ করাও ছিল অসম্ভব। অনেকেই ছিলেন দরিদ্র। কবিকংকন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আর্থিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর আশ্রয়দাতা বাঁকুড়া রায়। এবং কবি কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরকে পাঁচটি প্রশস্তিসূচক শ্লোক উপহার দিয়ে পেয়েছিলেন রাজার গলার মালা ও রামায়ণ লেখার আদেশ।

কিন্তু সে অনুগ্রহ যে সম্পূর্ণ নিঃশর্ত ছিল — একথা আজ কে বলবে? বৈষ্ণব কবিরা কেউ রাজানুগ্রহ পাননি, কবিওয়ালারা পেয়েছিলেন জমিদারী প্রশ্রয়। হয়তো গণরুচি ও রাজকীয় অভিপ্রায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে।

এ সবের ব্যতিক্রম ছিল সে যুগেও। এবং এখনো আছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারদাতার চেহারা বদল হয়েছে। নাম-ধামও আলাদা। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই এখন নানা রকম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার দিচ্ছেন কবি-সাহিত্যিকদের। ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। আকাদমি পুরস্কার ছাড়াও প্রায় প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারই আঞ্চলিক ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বছরে বছরে একেকজনকে পুরস্কার দিয়ে যাচ্ছেন।

তাতে লেখকের আর্থিক সুরাহা কি হয় জানি না। তবে খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা বাড়ে। কিছুদিন হৈ-চৈ হয়। কাগজে কাগজে লেখালেখি চলে। পাঠকেরা পুরস্কৃত বইটি সম্পর্কে হঠাৎ ঔৎসুক্য দেখাতে সুরু করেন।

এটিই প্রতিবারের সাধারণ দৃশ্য!

পুরস্কারের রকমফেরে বিতর্কেরও তর-তম ঘটে। যে-পুরস্কারের পেছনে রাষ্ট্রীয় সমর্থন থাকে, এবং নগদ বিদায়ের অংকটা লোভনীয়, সেই পুরস্কারই সাধারণত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে সবচেয়ে বেশী।

উদাহরণ হিসেবে আকাদমি পুরস্কারের সঙ্গে রবীন্দ্র-পুরস্কারের, এবং রবীন্দ্র-পুরস্কারের সঙ্গে অন্যান্য বেসরকারী পুরস্কারের ব্যবধানের কথাটা স্মরণ করা যায়। বাংলাদেশ থেকে যুগান্তর, আনন্দ বাজার, উল্টোরথ, মৌচাক পত্রিকার তরফ থেকে প্রতি বছর একেকজন কবি-সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করা হয়। তবু তাঁদের বইয়ের চাহিদা তেমন বাড়ে না। তার কারণ বোধহয় তুলনামূলকভাবে গুরুত্বের অভাব। পুরস্কারদাতারা যদি আর্থিক বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কৃত-লেখকদের সম্পর্কে পাঠকের পুনঃ পরিচয় ঘটাতে পারতেন আলোচনা-সমালোচনা করে, এবং সেই সংবাদটা দেশে-দেশান্তরে ছড়িয়ে দিতে পারতেন, তাহলে হয়তো গুরুত্বের পরিমাণটাও বেড়ে যেতো।

আমি এ সম্পর্কে দু-একজনের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, নগদ মূল্যের অতিরিক্ত বড়ো কোনো সম্মান নাকি তাঁরা বেসরকারী পুরস্কারে পাননি। পুরস্কৃত হবার পরেও তাদের বইয়ের চাহিদা তেমন বাড়েনি আজো।

তা হলে কি লাভ এইসব পুরস্কারে?

জনৈক প্রতিষ্ঠিত লেখক প্রশ্নটি উত্থাপন করে নিজেই তার উত্তর দিয়েছিলেন: দরকার আছে। বড়ো পুরস্কার বড়োদের জন্য এ জাতীয় পুরস্কার উপেক্ষিতদের জন্য। যাঁদের নাম কেউ করে না, তাঁদের পুরস্কৃত করে কিছুটা উৎসাহিত করাও তো কম লাভের নয়? বিদেশে, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীতে অজস্র বেসরকারী পুরস্কার ঘোষণা করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তাতে তরুণ লেখক-লেখিকারা উৎসাহ পান। ছোটখাট পুরস্কারগুলিই ক্রমাগত তাঁদের আরো বড়ো পুরস্কার লাভে প্ররোচিত করে। এবং লেখকদের পরিচিতি বাড়ায়।

'জয় বাংলা' পুরস্কার

খবরে প্রকাশ, এ বছর থেকে বাংলা বইয়ের জন্য আরেকটি নতুন পুরস্কার পাবেন বাঙালী লেখকেরা। উদ্যোগী পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয়, বেঙ্গল পাবলিশার্স।

উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় বলেন, পূর্ব বাংলার লেখক-লেখিকাদের কথা মনে রেখেই অবশ্য পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন রাষ্ট্র হলেও পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অন্তরের। আমরা দুই বাংলার সঙ্গে সম্প্রীতি বাড়াতে চাই এই পুরস্কারের মাধ্যমে।

দুঃখ করে তিনি বললেন, এত কাছাকাছি থেকেও আমরা পূর্ব বাংলার সাহিত্যের খবরাখবর রাখি না। কিছুকাল আগে, 'লাল সালু' নামে পূর্ব বাংলার একটি উপন্যাসকে পুরস্কার দিয়েছিলেন ইউনেস্কো। অথচ, বাংলাভাষী হয়েও আমরা বইটি পড়ার সুযোগ পেলাম না। অমৃতে তার ইংরেজী অনুবাদের সমালোচনা লিখেছিলাম কথা হবে। এই পুরস্কার দেওয়া হলে হয়তো ওপার বাংলার লেখক-লেখিকারাও আমাদের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হবেন, যোগাযোগের একটা সূত্র আবিষ্কার করা যাবে।

বেঙ্গল পাবলিশার্সের শ্রীমন্মথ বসুর কাছে জিজ্ঞেস করে জানলাম, পূর্ব বাংলার সাহিত্যের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার পাঠকের পরিচয় ঘটানো এ পুরস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বাংলাদেশের বাইরে থেকে, ভিন্ন প্রদেশবাসী ও অভারতীয় লেখক-লেখিকারা যে সব বই লিখতেন বা লিখছেন, তারাও থাকবেন বিচারকদের লক্ষ্যে। কেন না, বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে উৎসাহ দেওয়াও তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

তাঁর কাছেই শুনেছি, এই পরিকল্পনাটি প্রথম আসে মনোজ বসুর মাথায়। অনেক দিন ধরেই তিনি লক্ষ্য করেছেন, পূর্ব বাংলার গদ্য-সাহিত্য অসম্ভব রকমের উন্নত হয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার ছোট গল্প তো অসাধারণ।

জিজ্ঞেস করলাম, পুরস্কার দানের রীতি কি?

মন্মথ বসু বললেন, গত পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকাশিত যে-কোনো ধরনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্য আমরা এ পুরস্কার দেবো। এরই মধ্যে আমরা কয়েকটি বই সংগ্রহ করেছি। যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে। আশা করছি, ওপারের সাহায্য পাবো।

বিচারক কারা?

—পশ্চিমবঙ্গের তিনজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পূর্ব বাংলার তিনজন। এখন নাম প্রকাশ করবো না। আমরা প্রথমে ও বাংলার বিচারকদের রায় নেবো, তারপর এ বাংলার বিচারকদের কাছে পাঠাবো। যে-বই সম্পর্কে মোটামুটি সকলেই একমত হবেন বা বেশীর ভাগ বিচারকের রায় এক হবে, সে বইকেই পুরস্কার দেওয়া হবে।

পুরস্কারের নাম কি হবে?

—জয় বাংলা পুরস্কার।

আপনারা বই সংগ্রহ করবেন কি করে? গুণ-মর্যাদাকে বইকে ভিত্তি করে পুরস্কার ঘোষণা করলে কি তা বিতর্কের কারণ হবে না?

—আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বই সংগ্রহ করছি। ওপারের বিচারকদের অনুরোধ করা হবে, এ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত পাঁচটি করে বই ও বইয়ের নাম যেন তাঁরা প্রত্যেকে পাঠান। সেই বইগুলিই এ বাংলার বিচারকদের কাছে পাঠানো হবে তাঁদের মতামতের জন্য। মনে হয়, এতে বিচার-বিভ্রান্তি ঘটবে না।

কথা প্রসঙ্গে মন্মথ বসু বললেন, আমাদের প্রস্তাবিত পুরস্কারে যদি কোনো বিভ্রান্তি না ঘটে, তা হলে হয়তো ও পারের বহু উল্লেখযোগ্য বই এপারেও পুনর্মুদ্রণের ঝোঁক বাড়বে। পুরস্কৃত গ্রন্থগুলি আমরাই প্রকাশ করবো—এমন নয়। বিভিন্ন প্রকাশকই এ ব্যাপারে উৎসাহী হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। সীমান্তের বাধা-বিপত্তির জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য পূর্ব-বঙ্গীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। এর ফলে লুপ্ত সম্পর্কের অদৃশ্য সূত্রটিও পুনরুদ্ধার করা সহজ হবে।

বাংলা পকেট-বুক

আসল কথা হলো, কলেজ স্ট্রীটের ব্যবসায়ীরা এখন ব্যবসারের প্রয়োজনে ও আত্মরক্ষার তাগিদে সাহিত্যের বিভিন্ন দিকগুলিকে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখছেন। এবং ভাবছেন, কিভাবে পাঠক-পাঠিকাদের আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা যায়।

'মিত্র ও ঘোষ' সম্প্রতি পকেট বুক সংস্করণে কিছু কিছু উপন্যাস বের করতে চান। দামে সস্তা। বেরুবে প্রতি মাসে। পত্রপত্রিকার মতো গ্রাহক-গ্রাহিকা হয়ে সুলভে বই পাবার সুযোগ নিতে পারবেন সকলেই। প্রতিটি বই বেরুবে জেম-সিস্টেমে।

বাংলাদেশে এর আগেও পকেট-বই প্রকাশের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনা সফল হয়নি। বেঙ্গল পাবলিশার্স সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরীর একটি পেপার-ব্যাক এডিশন করেছিলেন বোধহয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামান্য পরে।

যাঁরা পত্র-পত্রিকা কেনেন উপন্যাস পড়ার লোভে, তাঁরা যদি উক্ত পকেটবুক সিরিজের গ্রাহক হোন, তাহলে উপকৃত হবেন দুভাবে। প্রথমত, প্রতিটি বই-ই আলাদা মলাটে সুসজ্জিত হওয়ার ব্যক্তিগত সংগ্রহের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে, দ্বিতীয়ত সাময়িক পত্রিকার মতো মাস ফুরোলেই এদের মূল্য কমবে না।

বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয়, সমকালীন জনপ্রিয় লেখকদের লেখা দিয়েই পরিকল্পনাটির সূত্রপাত ঘটছে। হয়তো এ ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকাদের উপযুক্ত সাড়া পেলে কেবল উপন্যাস নয়, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-নিবন্ধও প্রকাশিত হবে এই সিরিজে।

বাংলাদেশের পাঠকের মতিগতি আলাদা। শক্ত মলাট না হলে অনেকের মন ওঠে না, মুখ ভার হয়। অনেক বাজে লেখকের বাজে লেখাও চলে যায়, কেবল কভারের দৌলতে। পাঠক যদি মলাটের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন, তাহলে হয়তো অনেক উল্লেখযোগ্য বই-ই সুলভ মূল্যে পরিবেশন করা সম্ভব হবে, তরুণতর কবি-সাহিত্যিকদের সমকালীন রচনা সম্পর্কে আগ্রহী হবেন প্রকাশকেরা। পেপার-ব্যাকে আমরা বহু বিদেশী বই কিনছি। হিন্দীতেও পকেট বুক সংস্করণের চাহিদা বিপুল। কেবল বাঙালী পাঠক বাংলা বই সম্পর্কে ভিন্নতর ধারণা পোষণ করবেন কেন, তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

সাহিত্য-বিচিত্রা

তবু একথা অস্বীকার করা যায় না, বাংলাদেশের পাঠক বহু নতুন পরিকল্পনাকেই স্বাগত জানিয়েছে, বিভিন্নভাবে প্রকাশকদের উৎসাহিত করেছে। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে যখন রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্বের উল্লেখযোগ্য কিছু রচনাকে 'বিচিত্রা' নামে প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী, তখন রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল পাঠকমহলে।

সম্ভবত ঐ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে প্রকাশকেরা বিভিন্ন লেখকের অনুরূপ কিছু সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন পরবর্তীকালে। এখনো সেই ধারাটি অব্যাহত।

প্রকাশ ভবনের শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে, জনপ্রিয় লেখকদের এ জাতীয় সঙ্কলন প্রকাশের কারণ দুটো। প্রথমত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত বিচিত্র মেজাজের বিভিন্ন লেখাকে একসঙ্গে গ্রন্থবদ্ধ করা যায়, দ্বিতীয়ত নামী লেখকের যে-কোনো গ্রন্থের জনাই ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিতে হয় কম।

তা ছাড়া অন্য একটি কারণও আছে। সৃজনশীল লেখক-লেখিকারা বিভিন্ন প্রয়োজনে গল্প-উপন্যাস লেখার ফাঁকে-ফাঁকে এমন কিছু লেখা লেখেন, যা প্রায়শ মেজাজের ভিন্নতার জন্য গ্রন্থভুক্ত হয় না, সংবাদপত্রে কিংবা সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। মৃত্যুর পরে সে সব লেখাকে একসঙ্গে প্রকাশ করতে গেলে অনুরূপ কোনো নাম দেওয়াই ভালো। অনেকে এ জাতীয় সঙ্কলনকে বলতে পারেন, সেই লেখকের রচনা-সংগ্রহের পরিশিষ্ট।

সতীনাথ ভাদুড়ী মারা যাওয়ার পর, প্রকাশ ভবন 'সতীনাথ বিচিত্রা' বের করেছিলেন, তাঁর গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গল্প, নাটক, কবিতা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও রম্য-রচনাকে একত্র জড়ো করে। সাধারণ পাঠকের মতো গবেষকরাও এ ধরনের বই থেকে লেখক জীবনের বহু গোপন সংবাদ সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

বিদেশে বিচিত্রধর্মী নানা লেখাকে এক সঙ্গে জড়ো করে প্রকাশ করার একটা রীতি আছে। সাধারণত ও'রা এ জাতীয় সঙ্কলনের নাম দেন 'অমনিবাস'। বাংলার 'বিচিত্রা'কে বলা যায় তারই সমধর্মী রচনা সঙ্কলন।

—গ্রন্থদর্শী

প্রকাশিত হয়েছে • ২৪শ সংস্করণ

বর্ষপঞ্জী ১৩৭৭

দেশবিদেশের যাবতীয় তথ্যে পরিপূর্ণ বাংলা 'ইয়ার-বুক'

বর্ষপঞ্জীর ২৪ বৎসর পূর্ণ হল: এটাই বর্ষপঞ্জীর সবচেয়ে বড় পরিচয়। কারণ গুণ না থাকলে বর্ষপঞ্জী এই দীর্ঘকাল সকলের সমাদর লাভ করছে কেন? চলতি দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখতে হলে 'বর্ষপঞ্জী' চাই-ই। গত এক বৎসরে ভারত ও সমগ্র বিশ্বে বহু যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। বর্ষপঞ্জী সে সকল ঘটনার প্রামাণ্য দলিল। মানুষের চাঁদে যাওয়ার সচিত্র রোমাঞ্চকর কাহিনী এই সংস্করণে বিশেষ আকর্ষণ।

ইন্টারভিউ ও প্রতিযোগিতা পরীক্ষার সাফল্যের জন্য বর্ষপঞ্জী অপরিহার্য
॥ ৭৭২ পৃষ্ঠা, বোর্ড বাঁধাই ও ৪ খানা চিত্র। মূল্য ৭ টাকা ৫০ পঃ ॥

প্রকাশক : এস, আর, সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি
৩৫/এ, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা—৪। ফোন : ৩৫-৪৭১৭

সোনা বৌ-এর বন্ধ্যা শরীরের বাঁধুনি বড় সুন্দর। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন ভাত জোটে না সোনা-বৌ-এর। ওর বর ভুবন বিশ্বেসের লোক এসে মাঝে মধ্যে দুদশ টাকা দিয়ে যায়। কিন্তু তাও অনিশ্চিত। ভুবন বিশ্বেস কলে-কারখানায় মজুর খেপায় আর পুলিশের চোখ এড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায়। মাসের পর মাস বাড়ী আসে না। সোনা-বৌ খিদের জ্বালায় নিঃশব্দে কাঁদে। কিন্তু অভাবের মালিন্য সোনা-বৌএর আঁট-সাঁট বন্ধ্যা শরীরকে স্পর্শ করতে পারেনি। দ্বিজপদ নারী-দেহ সম্বন্ধে অজ্ঞ নয়। সোনা-বৌ-এর বন্ধ্যা শরীরের ভাঁজে ভাঁজে যে বিপুল ঐশ্বর্যের সম্ভার লুকানো আছে—দ্বিজপদর লোভী চোখদুটোতে তার স্পষ্ট ছায়া পড়ে। সোনা-বৌ-এর গায়ে ব্লাউজ নেই—খোলা বুকের ওপরে পাতলা শাড়ির আঁচল জড়ানো। সোনা-বৌ দু হাত দিয়ে কুলোটা ধরে চালের তুষ্ ঝাড়ছিল আর আঁচলের আড়ালে দুটো ছায়ার বৃত্ত তালে-তালে নাচছিল। দ্বিজপদর লোভী চোখদুটো সেই ছায়ার বৃত্তের কেন্দ্রে বিঁধে গিয়েছিল। দ্বিজপদর শরীরটা হঠাৎ এক আশ্চর্য যন্ত্রণায় চনমন করে উঠল। খিদের যন্ত্রণা সকাল থেকেই নাড়ির মধ্যে পাক খাচ্ছিল। এখন শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে ছড়িয়ে পড়ল সর্বগ্রাসী যন্ত্রণা—খিদের যন্ত্রণার চেয়েও তীব্র, তীক্ষ্ণ, জ্বালাময় সেই যন্ত্রণা রক্তের মধ্যে পাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

সোনা-বৌ মুচকি হেসে বলল—অমন হ্যাংলার মত কি দেখছ গো ঠাকুরপো? পরের বৌএর ওপরে অত লোভ ভাল নয়। মনের মত একটা মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আস না কেন? মলিনা ছুঁড়ি তো ফেড়ে-পেড়ে উঠেছে। মেয়েটা যে তোমার জন্যে হাপুসে মল। বল তো ঘটকালি করি।

সোনা-বৌ হাসতে হাসতে পিঁড়িটা দ্বিজপদর সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল—বস, চা খাও। তারপর কথা হবে।

দ্বিজপদ পিঁড়ির ওপরে হাঁটু মুড়িয়ে বসে বলল—সোনা-বৌ, তুমি আজকাল বড় রোগা হয়ে যাচ্ছ।

দ্বিজপদ নিজের লোভকে গোপন করতে গিয়ে সোনা-বৌ-এর শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার ভান করেছিল। কিন্তু ওর কথাগুলো বোধহয় সোনা-বৌ-এর দুঃখের পাহাড়ে ঘা মারল।

সোনা-বৌ গম্ভীর হয়ে গেল। গলার স্বর ভারী হয়ে এলো। দ্বিজপদর সামনে এক বাটি মুড়ি রেখে বলল—ঠাকুরপো আজ ঘরে কিছুই নেই। কিন্তু তোমাকে শুধু চা দিতে মন চায় না। মুড়ি কটা গালে দাও।

সোনা-বৌ-এর চোখদুটো ছলছল করে উঠল।

কিশোটা আবার নাড়ির মধ্যে পাক খাচ্ছিল। দ্বিজপদ এক মুঠো মুড়ি মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে চিবুতে লাগল।

কেরোসিনের স্টোভে জল ফুটছিল। সোনা-বৌ চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে স্টোভের সামনে বসল।

দ্বিজপদ আবার এক মুঠো মুড়ি মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলল—তোমার কি কথা আছে বলেছিলে না? চটপট কথা সেরে নাও। আমার খুব তাড়া আছে। অনেক দিন পর প্রফেসর খাস্তগীরের সুপারিশে একটা বড় কাজ হাতে পেতে যাচ্ছি। এক বিধবা ভদ্রমহিলা স্বামীর জন্মতিথি উপলক্ষে আমাকে দিয়ে অনেক-গুলো ছবি আঁকতে চান। নটার মধ্যে সেখানে পৌঁছাতেই হবে। ভদ্রমহিলার সময় জ্ঞান নাকি সাহেব টনটনে। দেরী হলেই সর্বনাশ।

সোনা-বৌ নীরবে দ্বিজপদর সামনে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল।

দ্বিজপদ কাপটা হাতে তুলে নিয়ে বলল—কি গো, তোমার চা কই?

সোনা-বৌ হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

সোনা-বৌ-এর কান্না দ্বিজপদকে মোটেই অবাক করল না। দ্বিজপদর জীবনে মানুষের কান্না কোন নোতুন অভি-জ্ঞতা নয়। দ্বিজপদ অনেক কান্না দেখেছে।

খুব ছেলেবেলায় মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে বিধবা মাসীমাকে বাবার সামনে বসে চোখের জল ফেলতে দেখেছে। দ্বিজপদ যখন স্কুলে পড়ত, ছোট বোনের মৃত্যুশয্যার বাবার দু-চোখ দিয়ে বড় বড় জলের ফোটা ঝরে পড়তে দেখেছে। বড় হয়ে যখন ও ঘর ছেড়ে পথে বার হয়ে পড়েছে — জীবনের চার-পাশে চোখের জলে ভেজা জরা, ব্যাধি মৃত্যু আর মৃত্যুর অজস্র ছবি দেখেছে দ্বিজপদ। সে নিজেই তো কত মানুষকে কাঁদিয়েছে। মাসীমাকে অস্বীকৃতির দুঃখ দিয়ে, পরম সহৃদয় পিতা যিনি বুকের মত ওকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন—সেই জন্ম-দাতা পিতাকে বার বার আঘাত করে, নিরুদ্দেশ অভিযানে দূরে ঠেলে দিয়ে কত যে কাঁদিয়েছে দ্বিজপদ। আর মমতাজ সেই নরম মিষ্টি মেয়েটা—যে তাকে প্রেম নামক এক আশ্চর্য রহস্য নদীর পারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল—তার সন্তানের মা হয়ে, তাকে পিতৃত্বের অহংকার দিয়ে তাকে স্বাধীনরূপে বরণ করে নিতে চেয়েছিল — সেই তার অনুগত প্রেমিকার পবিত্র ভালবাসাকে সে অন্ধ, দুরন্ত সম্ভোগের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে-ছিল। বার বার তার অন্ধ বাসনার আগুনে নিজেকে সমর্পণ করে নিঃশব্দ কান্নায় কেঁদেছিল মমতাজ। আজ আর মানুষের কান্নায় কিছু আসে-যায় না দ্বিজপদর। মানুষকে নিয়ে আজ আর কোন ভাবনা নেই দ্বিজপদর। চার-দেওয়ালে নিজের অস্তিত্বকে বেঁধে ফেলে সে আজ মুক্তির অন্বেষণে ব্যস্ত: স্নেহ - ভালবাসা, মায়া - মমতা, কান্না-দুঃখ—এসবই শুধু বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলে। শুধু অক্ষম প্রতিকারের যন্ত্রণায় হতাশা আর ক্লান্তিতে ডুবিয়ে দেয়। মানুষের কান্নায় তাই দ্বিজপদর ভূমিকা নিস্পৃহ নিরপেক্ষ দর্শকের। সোনা-বৌ জানে — অনেক চোখের জল ফেলে জানে—কোনদিন তার কান্নার বেদনার ছায়া পড়বে না দ্বিজপদর চোখে। তবুও সোনা-বৌ দ্বিজপদকে ঘরে ডেকে চোখের জল ফেলে আর দুর্ভাগ্যের কাহিনী শোনায়।

আজও দ্বিজপদ নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে সোনা বৌ-এর গালের ওপরে গড়িয়ে পড়া স্নিগ্ধ বিন্দু চোখের জলের জল-ছবি আঁকতে লাগল সোনালী সকালের গায়ে। সোনা-বৌ কাপড়ের আঁচলটা টেনে চোখের ওপরে চেপে ধরে বলল—ঠাকুরপো, তোমাকে পোড়া-কপালের কথা কত আর বলব? তুমি তো আমার দুঃখ ঘোচাতে পারবে না. তবুও কেন যে তোমাকে বার বার ঘরে ডেকে চোখের জল ফেলি। প্রায় এক মাসের ওপর হল তোমার দাদা বাড়ী-ছাড়া। দিন সাতেক আগে তোমার দাদার নাম করে ওদের পার্টির একটা ছেলে দশটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল। সে টাকাও ফুরিয়ে গিয়েছে। অথচ আজও মানুষটার পাত্তা নেই। মানুষের দুঃখে নাকি তোমার দাদার প্রাণ কাঁদে। অথচ আমি যে একলা মানুষ পোড়া পেটের জ্বালা নিয়ে হা-পিত্যেশ বসে আছি—কই তা নিয়ে তো মানুষটার কোন চিন্তে-ভাবনা নেই। কাল সন্ধ্যাবেলা ভাঙ্গা মিনষে বদিনাথ উকিল দরজা খোলা পেয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। মিনষের মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল। আমি বঁটি নিয়ে তেড়ে যেতেই হতচ্ছাড়া মিনষে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি আর কতদিন এই যন্ত্রণা সহ্য করি বল তো? ঠাকুরপো, তুমি তো পাঁচ জায়গায় ঘুরে বেড়াও। যদি একটু চেষ্টা-চরিত্তির করে তোমার দাদাকে ধরে আনতে এই জন্যেই তোমাকে ডেকে এনেছিলাম। আজ যদি তোমার সময় থাকত তোমাকে সঙ্গে করে তোমার দাদার পার্টি অফিসে যেতাম — পার্টির কর্তাদের জিগেস করতাম — আর কতদিন ওরা লোকটাকে পাগল বানিয়ে তাড়িয়ে বেড়াবে। এর মধ্যে বার পাঁচেক পুলিশ এসে তোমার দাদার খোঁজ করে গিয়েছে। আমার পোড়া-কপালে যা লেখা আছে হবে। কিন্তু ঐ পাগল মানুষটা কোথায় আছে—কি খাচ্ছে—ভেবে ভেবে আমার পোড়া-চোখে ঘুম আসে না।

দ্বিজপদ চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল। সোনা-বৌ জল-ভরা চোখ দুটো দ্বিজপদর মুখের ওপরে তুলে হঠাৎ অবোধ এক প্রশ্ন করে বসল — আচ্ছা ঠাকুরপো, ওদের পার্টিতে কাজ করলে পুলিশে ধরে কেন জানতে পার?

সোনা-বৌ অনেক দিন অনেক অসহায় প্রশ্ন করে দ্বিজপদর কাছে উত্তর চেয়েছে। সে সব প্রশ্নের যা পারে সে একটা উত্তর খাড়া করে সোনা-বৌকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু আজকের এই অবোধ প্রশ্নের উত্তর দ্বিজপদর জানা নেই। দ্বিজপদ দল, রাজনীতি কিছুই বোঝে না, বুঝতেও চায় না। সমাজ নামক লৌহ-নিগড়ে মানুষকে বন্দী করে রাখার জন্যই রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টি আর সেই রাষ্ট্রযন্ত্র মানুষের অস্তিত্বকে অজস্র আইনের বেড়াজালে বেঁধে প্রতিনিয়ত বন্দীদের শৃংখল পরিয়ে দিচ্ছে। দল, রাজনীতি, — সবই সেই বন্ধনকে, দুঃসহ বন্দীত্বকে আরও কঠোর, কঠিন এক দুর্গের চার দেওয়ালে বেঁধে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। দ্বিজপদ সেই বন্ধনের বেড়াজাল থেকে নিজের অস্তিত্বকে মুক্ত রাখতে চায়। খুব ছোটবেলায় যখন দ্বিজপদ স্কুলে পড়ত — অনেক বিনিদ্র, অশান্ত রাত আর নিঃসঙ্গ দুপুরের যন্ত্রণা দিয়ে জীবনের এক পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিল। সেই. উপলব্ধি অমোঘ - অনিবার্য মৃত্যু। মানুষের ভবিষ্যৎ মৃত্যুর সীমা দিয়ে বাঁধা। সমাজ, ধর্ম, ঈশ্বর,—কেউই সেই মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। মানুষকে সেই মৃত্যু ভীত করে তুলছে — অথচ তার আত্মার সেই মৃত্যুর ঊর্ধ্বে চিন্তা প্রতি মুহূর্তে এক আশ্চর্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছে—মৃত্যুকে সে জয় করবে. কিন্তু যতক্ষণ সে একা, তার প্রতিরোধ দুর্বল, অসহায় — তাই সে সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, আর ঈশ্বরের অজস্র বাঁধনে ধরা দিয়ে মৃত্যু জয়ের নিষ্ফল সাধনা করছে। কিন্তু তার প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্বে মৃত্যুর ভয়ংকর উপলব্ধি তাকে ক্রমশঃ হতাশা আর নৈরাশ্যের গভীরে ঠেলে দিচ্ছে।

দ্বিজপদও সেদিন হতাশা আর নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছিল। চিলেকোঠার ঘরে নিঃসঙ্গ একক অস্তিত্বকে বন্দী করে নিজের ব্যক্তি-সত্তার চার দেওয়ালে মাথা-কুটে মরেছিল। আজও সেই একাকীত্বের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে সে একক, নিঃসঙ্গ ব্যক্তি-সত্তার অন্ধকার কানাগলিতে মাথা কুটছে।

তাই ভুবন দাদা যেদিন, দল এবং রাজ-নীতির মহান লক্ষ্য নিয়ে এক বিরাট বক্তৃতা ফেঁদে বসেছিল—ভুবন দাদাকে বেশী দূর এগোতে দেয়নি দ্বিজপদ। ভুবন-দাদাকে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে দ্বিজপদ বলেছিল—আমার পেটটা বড় কামড়াচ্ছে। আর কোনদিন ওর মাথায় রাজনীতি ঢোকা-বার চেষ্টা করেনি ভুবন দাদা।

বদিনাথ মুখুজ্যের মুখে দ্বিজপদ শুনেছে—ভুবনদাদার নাকি একটা খুব বড় দল আছে। সেই দলের লোকেরা গ্রামে গ্রামে কলে-কারখানায় চাষী-মজুর খেপিয়ে বেড়ায়।

বদিনাথ মুখুজ্যেও আর বেশী দূর এগোয়নি। শুধু খড়েনীর দিকে বাগের

পুঁটুলী-সুদ্ধো নাড়িয়ে বলেছিল—সাদা একটা খদ্দরের শাড়ি।

সোনা-বৌ আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছেছিল। একপাশে সরে গিয়েছিল বুকের কাপড়।

দ্বিজপদর মুগ্ধ কল্পনায় হঠাৎ যেন এক আশ্চর্য মডেল ধরা পড়ল। যেন এক বিবসনা নারী হাঁটু মুড়িয়ে বসে লজ্জানম্র চোখে মাটির দিকে চেয়ে আছে, কোমল দুটি হাতে দুটি স্বর্ণকুম্ভকে উপুড় করে ধরে আছে। অবিরাম মধু ঝরছে টুপ টাপ। টুপ টাপ। কুম্ভ-দুটির মুখে মধুলোভী দুটি কালো ভ্রমর উড়ে এসে বসেছে। সেই বিবসনা নারীর জল-ভরা দুটি চোখে কি আশ্চর্য বিনম্র আমন্ত্রণ।

দ্বিজপদ হতাশার গভীরে ডুবে যেতে লাগল। সময় এগিয়ে যাচ্ছে—সুরভি ভবনে ওর প্রতীক্ষায় বসে আছে শোভনা রায়। তার হাতে মৃত্যুর পরোয়ানা। দ্বিজপদকে নিজের হাতে সেই পরোয়ানায় স্বাক্ষর করে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে। আর্টের মুক্ত সাধনায় আত্মার মুক্তি খুঁজেছিল দ্বিজপদ। কিন্তু শরীর আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পথ বেয়ে ক্ষুধা আর সম্ভোগের তীব্র যন্ত্রণা আত্মাকে প্রতিমুহূর্তে অন্ধকারের পথে ঠেলে দিয়েছে। সেই অন্ধকারেই নিঃশব্দ মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে দ্বিজপদ। মমতাজের শরীরের অন্ধকারে বার বার মাথা কুটে মরেছে দ্বিজপদ। বার বার শুধু নিষ্ফল সম্ভোগের জ্বালায় আর্তনাদ করে উঠেছে। ক্ষুধাকে জয় করতে চেয়েছে দ্বিজপদ কিন্তু নাড়ির মধ্যে পাক দিয়ে উঠেছে তীব্র, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। সেই শৈশবের নিঃসঙ্গ দিনগুলিতে বুকের মধ্যে কি দারুণ তৃষ্ণা জেগেছিল—মায়ের বুকে মুখ রেখে স্তন্যপানের দুঃসহ বাসনায় সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। কেঁদে কেঁদে মাকে কত ডেকেছিল। কিন্তু কেউ তার মায়ের হদিশ বলতে পারেনি। বাবা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। মাসীমা ওকে বুকের ওপরে চেপে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নিঃশব্দে কেঁদেছিল। বুক জুড়ে সেই দারুণ তৃষ্ণা নিয়ে আজও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বিজপদ। বড় ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মায়ের সেই প্রসন্ন মুখের ছবিটা বুকের গভীরে স্পষ্ট রেখায় আঁকা হয়ে গিয়েছে কোন্ দূর শৈশবে। পথে পথে কত মুখে সেই ছবি দেখেছে দ্বিজপদ। পাগলের মত ছুটেছে সেই সব নাম-না-জানা মেয়ের পিছন। কিন্তু কেউ প্রসন্ন মুখ তুলে তাকে কাছে ডাকেনি। হতাশায়, নৈরাশ্যে বারবার ভেঙে পড়েছে দ্বিজপদ। তারপর অনেক-দিন পরে যখন সে আর্ট কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, মমতাজের মুখে মায়ের প্রসন্ন মুখের দ্যুতিতে চমকে উঠেছিল। বড় আপন করে মায়ের মত আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল মমতাজকে। কিন্তু বুক জুড়ে শুধু ব্যর্থ সম্ভোগের জ্বালা, শুধু অন্ধকার এক শরীর থেকে উঠে আসা তীব্র হলাহলের আস্বাদ। দুঃসহ দহনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল দেহ আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সুখোদিত সৌধকে।

অথচ আজ বুঝি মুক্তির পথ এসেও হারিয়ে গেল।

হঠাৎ টাইম-পীসটার ওপরে দৃষ্টি পড়ল দ্বিজপদর। সর্বনাশ। আটটা যে বেজে গেল।

দ্বিজপদ সোনা-বৌ-এর বুকের ওপরে একশার নোট দুটি গুঁজিয়ে দিয়ে বলল—সোনা-বৌ আমি এখন উঠি, দেরী হয়ে গিয়েছে। অনেকটা পথ যেতে হবে। নটার মধ্যে সাদার্ন অ্যাভিনিউ পৌঁছে উঠতে পারব কিনা জানি না।

দ্বিজপদ পিঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সোনা-বৌ ছল-ছল গলায় বলল—ঠাকুরপো, জানি তুমি অভাবে কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু এই অভাবের জীবন তো তুমি ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছ। অনেক বড় ঘরের ছেলে তুমি, জানি না কেন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ! একদিন তুমি নিশ্চয়ই খুব বড় হবে—অনেক নাম-ডাক হবে তোমার। সেদিন হয়তো এই অভাগিনী সোনা-বৌ-এর কথা তোমার মনেই থাকবে না। কিন্তু আজ তুমি কাছের মানুষ। তাই তোমাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে চোখের জল ফেলি। তোমার কুন্দ-দাদাকে আমি চিনেছি। সে ঘরে বাঁধা পড়ার মানুষ নয়। একদিন হয়তো আমাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে চিরদিনের মত উধাও হবে। সেদিন তোমাকেও আর ধরে-ছুঁয়ে পাব না। ভগবান আমার কপালে কি লিখেছেন কে জানে। যদি সময় করতে পার তো—তোমার কুন্দ-দাদার খোঁজ কোর। দেখা হলে তাকে জিগ্যেস কোর তার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, তার বৌ না খেয়ে পোড়া পেটের জ্বালায় শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। আর কতদিন সে বৌকে অনাহারে শুকিয়ে মারবে! বৌকে উপবাসী রেখে আর কতদিন সে চাদী-বন্ধুর খেপিয়ে বেড়াবে?

দ্বিজপদ পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। কাল সে দশ টাকা রোজগার করেছে। ওর আঁকা প্রচ্ছদপটে শোভিত হয়ে এ-মাসের অনুরাধা পত্রিকা বার হবে। কালকের রোজগারের প্রায় সবটাই পকেটে রয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সামান্য কটা টাকা থেকে সোনা-বৌকে ভাগ দিলে ওর নিজের চলবে কি করে?

হঠাৎ দ্বিজপদর বুকের মধ্যে থরথর করে কেঁপে উঠল। সে এক দুঃস্বপ্নের স্বেচ্ছা-মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে। শোভনা রায় তার আর্টিস্ট সত্তার মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে বসেছে। শোভনা রায়ের সর্তের বন্ধনে ধরা না দিলে সে কাজ পাবে না। আগেই বলে দিয়েছেন—শোভনা রায়ের নির্দেশমত তাকে পেন্টিংয়ের কাজ করতে হবে। শোভনা রায়ের কাছে এক্সপেরিমেন্টের কোন স্কোপ নেই। শোভনা রায় শুধু তার দেহকে অসহ্য ক্ষুধার জ্বালা থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু সেই মুক্তির ছদ্মবেশে এক ভয়ঙ্কর বন্ধন তার অস্তিত্বকে অনিবার্য মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেই মৃত্যুর রূপ কত ভয়ঙ্কর সে নিজেই জানে না। আজ নিজের হাতেই সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর পরোয়ানায় সাক্ষর করে

ভারতের
আদিতম
রসায়ন
চ্যবনপ্রাশ
আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দি কাশি, যক্ষ্মা ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।
টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্বল্য ও রুক্ষতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা - বোম্বাই - কানপুর

ক্লান্ত পায়ে ঘরে ফিরে আসবে নিরুপম। যদি দারুণ হতাশা তার অস্তিত্বের টুঁটি চেপে ধরে? যদি বিনিদ্র রাতের অন্ধকারে ক্রমশঃই সে অনস্তিত্বের শূন্যতায় তলিয়ে যায়? কে তাকে আশ্রয় দেবে। কে তাকে অনস্তিত্বের অন্ধকার বিবর থেকে টেনে তুলবে? আজ সোনা-বৌকেই জলপেটে রাত জেগে বসে থাকতে হবে নিরুপমের অপেক্ষায়। নিরুপমকে আজ রাতে সোনা-বৌ-এর বন্ধ ঘরের দরজায় করাঘাত করতেই হবে। সোনা-বৌ-এর শরীরের স্বর্গেই আজ তাকে অস্তিত্বের উজ্জ্বল সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। সেই স্বর্গের স্বর্ণকুম্ভ মধু ঝরবে নিরুপম; আকণ্ঠ মধু পান করে দুঃসহ দুঃখের জ্বালা থেকে মুক্তি খুঁজবে।

নিরুপম সোনা-বৌ-এর হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বলল—সোনা-বৌ, আজ রাতে তোমাকে আমার বড় দরকার।

সোনা-বৌ-এর বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টির সামনে নিরুপম খুব দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বার হয়ে পথে নেমে পড়ল। তারপর লাফ দিয়ে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে বসল।

(দুই)

শৈশবে নিরুপম জেনেছিল—ওর মা স্বর্গে গিয়েছেন।

স্বর্গ কোথায়—বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল নিরুপম। বাবা শুধু ঊর্ধ্বাকাশে আঙুল তুলেছিলেন।

আর বিধবা মাসীমা—যার দুই ছেলেমেয়ের এক থালায় ভাত খেয়ে সে বড় হয়েছিল—সেই মাসীমাকেই মা ডাকতে শিখিয়েছিলেন ওর বাবা, তবে মাসীমা হয়েছিল ছোট-মা।

আরও বড় হয়ে নিরুপম যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কগুলিকে স্পষ্টতঃ চিহ্নিত করতে শিখেছিল—যখন সে বিধবা আর সধবার আচার-আচরণ, জীবনধারণের পার্থক্য এবং বিপরীত পুরুষের সঙ্গে বিধবা শালিকার সম্বন্ধকে বুঝতে শিখেছিল, নিরুপম ওর বাবার সঙ্গে বিধবা মাসীমার গোপন, অবৈধ যৌন সম্পর্ককে আবিষ্কার করে দুঃখে, হতাশায় ভেঙে পড়েছিল।

আরও কিছুদিন পরে এক নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল নিরুপমকে। স্তব্ধ, শাণিত, অন্ধকারের ভয়-ধরানো এক মহাসত্যের আবির্ভাব ওর অস্তিত্বের ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছিল। সিঁড়ির তলের কাঠের সিন্দুকটা—যার ডালা খুললে এক আশ্চর্য ভৌতিক গন্ধের ঝলকা দম হয়ে বুকের ওপরে চেপে বসত—সড়-সড় খস-খস—সব রহস্যময় শব্দে বুক দুরু [illegible]—সেই সিন্দুকের অন্ধকার গর্ভেই হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল নিরুপম। আর হাতের মুঠোয় উঠে এসেছিল লাল ফিতায় বাঁধা একতাড়া পোকায়-খাওয়া চিঠির কাগজ। তারপর গোল গোল অক্ষরের আঁকাবাঁকা লাইনে অন্ধকার এক ইতিহাসের পাঠোদ্ধারের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা—নিরুপম পাগলের মত মাথার চুল ছিঁড়েছিল। দারুণ আর্ত-চিৎকারে সত্যের নগ্ন শরীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল। খুব ছোটবেলায় ওর বাবা যে সুন্দর মহৎ এক মিথ্যাকে ওর বুকের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিলেন স্বর্গের দেবীর মত সেই পরম মমতাময়ী মিথ্যেকেই বড় আপন করে বুকের গভীরে ধরে রাখতে চেয়েছিল নিরুপম। কিন্তু নিরুপম পারেনি—মিথ্যার নির্মোক দিয়ে ঢেকে রাখতে পারেনি ভয়ঙ্কর নগ্ন সেই সত্যকে। বুকের মধ্যে নিঃশব্দ রক্তক্ষরণের যন্ত্রণায় থরথর করে কেঁপে উঠেছিল ওর সমস্ত অস্তিত্ব। বড় ঘরের দেওয়ালে টাঙানো স্বর্গবাসিনী মায়ের ফ্যাকাসে-হয়ে-আসা ফটোটাকে দিনে দিনে, মাসে মাসে দশটা বছর প্রণাম করে স্মৃতি-তর্পণের করুণ বিষাদিত মহিমাকে সেদিন, কি এক ভয়ঙ্কর শাণিত ইস্পাতের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে দেখেছিল নিরুপম। রাতের অন্ধকারে এক বছরের অসহায় শিশু-সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে নিষ্ঠুর মায়ের ঘর ছাড়ার সেই অজ্ঞাত কাহিনী নিরুপমের বুকের নিভৃতে সযত্নে লালিত বিশ্বাসের সবুজ সতেজ চারা-গাছটিকে হঠাৎ যেন এক প্রচণ্ড ঝড়ের দমকা হাওয়ায় শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিয়েছিল। বড় দুঃখে, বড় যন্ত্রণায়, এক মহিমমণ্ডিত বিশ্বাসের আসন থেকে আকস্মিক পতনের দুঃসহ বেদনায় নিরুপমের জীবনে এক নিষ্ঠুর উপলব্ধির ক্ষণ এসেছিল। নিরুপম চিঠির তাড়াটা হাতে নিয়ে এক অন্ধকার ইতিহাসের পাতা উল্টেছিল—আর অন্ধকারের গর্ভ থেকে নিঃশব্দ উচ্চারণে কে যেন এক ভয়ঙ্কর সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছিল। বড় দুঃসহ যন্ত্রণায় নিরুপম জেনেছিল—ওর মা মোটেই স্বর্গবাসিনী দেবী নন। বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে পলাতকা নিষ্ঠুর মা এই পৃথিবীতেই সশরীরে—বর্তমান আর ওর বিধবা মাসীমা—যিনি নিরাভরণ দেহটাকে সাদা পাড়ের থান দিয়ে ঢেকে রাখেন, একবেলা অনাহার করেন, একাদশীতে যাঁর উপবাসী শুকনো মুখ কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোরতায় সাদা হয়ে যায়—সেই মাসীমার গর্ভজাত দুই সন্তান ওর আপন ভাই-বোন, কারণ পরম আরাধ্য পিতৃদেবের ঔরসেই তাদের জন্ম।

সেই নির্মম উপলব্ধির ক্ষণে নিজেকে দারুণ নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল। বাবা, মাসীমা, ভাইবোন—সবাইকে অস্বীকার করে একাকীত্বের যন্ত্রণায় ভেঙে পড়েছিল নিরুপম।

তারপর হঠাৎ, বুকের শির ছিঁড়ে উচ্চারিত তীব্র আর্ত-চিৎকার—মা, মাগো, তুমি কোথায়—নিরুপম আছড়ে পড়েছিল মায়ের ফটোটার নীচে—চওড়া পাড়ের শাড়ির আঁচলে মাথায় আধ-খোলা ঘোমটা ঢলঢলে মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্ত হাসি, কোলের ওপরে ঘুমন্ত শিশু—মায়ের ফটোর ওপরে চোখ রেখে সব প্রবঞ্চনা আর অবিশ্বাসের যন্ত্রণাকে ভুলে যেতে চেয়েছিল নিরুপম। গর্ভধারিণী মাকে কাছে পেতে বড় সাধ জেগেছিল, মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বতঃউৎসারিত মমতার ফল্গুধারায় স্নান করে বুকের সব যন্ত্রণা, সব তাপকে জুড়িয়ে নিতে ইচ্ছা হয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে গভীর, অতল এক হতাশার গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিল নিরুপম। মাকে কোথায় খুঁজে পাবে? কোথায় কোন্ পুরুষের হাত ধরে অন্ধকারে তলিয়ে গেল মা? সেই নিষ্ঠুর রাক্ষসী মাকে যদি সে খুঁজে বার করতে পারত অন্ধকারের গর্ভ থেকে? তাহলে সেই পাষাণী জননীর বুকের পাথরে মাথা কুটে কুটে জিজ্ঞেস করত—মাগো, যৌবনের খিদেটাই তোমার কাছে বড় হল? আর তুমি যে আমাকে শরীর নাড়ীতে জড়িয়ে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করলে, নিজের বুকের রক্ত চুইয়ে আমার শরীরে রক্ত দিলে, মাংস দিলে, আমার মজ্জায় মজ্জায় নিজের প্রাণকে সমর্পণ করলে—এ সবই তোমার কাছে মিথ্যে হয়ে গেল? মাগো, চোখ ফুটলে তোমাকেই যে আমি পৃথিবীর প্রথম আলো বলে জেনেছিলাম, তোমার স্তন্যপান করেই আমার এই বড় কষ্টের শরীরটাতে যে স্বাস্থ্যের সৌধ নির্মাণ শুরু হয়েছিল। মাগো, কথা বল, সাড়া দাও, আমার কাতর প্রার্থনায় তোমার পাষাণ বুকটাকে চিরে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দাও সেই মমতার স্বর্গরাজ্যে—যেখানে তুমি শুধুই আমার মা, আমার বড় সাধের জননী।

কিন্তু মাকে কোনদিন খুঁজে পায়নি নিরুপম, ফ্যাকাসে হয়ে-আসা মায়ের ফটোটাও একদিন হঠাৎ দমকা বাতাসে খান খান হয়ে ভেঙে পড়েছিল। মৃত বিশ্বাসকে পুনরুদ্ধারের সব প্রত্যাশাকে চিরদিনের মত হারিয়ে রিক্ত, নিঃস্ব এক বালক দারুণ হতাশায়, নৈরাশ্যে চারপাশের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। সেদিন মনে হয়েছিল—সংসারে সে বড় একা, আর এই একাকীত্ব থেকে কোনদিন তার মুক্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য ঠাণ্ডা ভয় ওর আত্মাকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছিল—নিরবয়ব অন্ধকার এক ভয়—যার স্বরূপে সে কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে চিহ্নিত করতে পারেনি। সেই ভয় থেকে জন্ম নিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর ভাবনা। বাবাও একদিন এই পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে মুছে যাবেন, কিন্তু পিছনে ফেলে যাবেন তাঁর বংশ আর উত্তরাধিকার, বিধবা মাসীমার গর্ভজাত দুই সন্তানকে লালন-পালনের দুর্বহ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেই হয়তো তাকে সেই উত্তরাধিকারের মহিমা-কীর্তন করে বেড়াতে

হবে। সেই নারীর পালনে ত্রুটি হলে ভগবৎকৃপাতেই অপরাধে সে সমাজে নিন্দিত হবে। সমাজ, সতীত্ব, ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার—অজস্র বন্ধনে ওকে বেঁধে দিয়ে হয়তো ভদ্রলোকেরা পিতা পরম নির্ভরতায় চোখ বুজেছেন। এই চমৎকার ভাবনায় ডুব দিতে দিতে হঠাৎ এক সময় চিৎকার করে উঠেছিল বিরূপদা—না, না, আমি একা, আমি সমাজ মানি না, সংসারে কারও প্রতি আমার কোন কর্তব্য নেই। আমি একা একাই বেঁচে থাকতে চাই, একাকীত্বেই আমার মুক্তি—সেই মুক্তির পথে আমি কাউকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেব না।

বিরূপদা ক্রমশঃই বাড়ি-সবার চারপাশে একাকীত্বের দেওয়াল তুলে দিয়েছিল—আর সেই দেওয়াল একটু একটু করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে চারপাশের সমাজ আর মানুষকে চোখের ওপর থেকে মুছে দিয়েছিল। অথচ বাবা আর মাসীমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কিছুই ছিল না। মাসীমা নিজের ছেলে-মেয়েদের থেকে বিরূপদাকে কোনদিনই আলাদা করে দেখেননি। বরং মাসীমার স্নেহ আর মমতার ভাগটা সে-ই বেশী করে পেয়েছিল: দশ বছর বয়সেও মাসীমার ঠান্ডা বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে লজ্জা পেত না বিরূপদা। ভাই-বোনেরা মায়ের বুকের ভাগ নিয়ে কত ঝগড়া করেছে, কিন্তু করেছে—মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁকড়ে ধরেছে কিন্তু বিরূপদাকে একেবারে সরিয়ে ওরা তাকে সরাতে পারেনি। সংসারে যা-কিছু ভাল,

সানসিল্ক

তার ৩টি স্পেশাল শ্যাম্পু দিয়ে

আপনার ঠিক যেরকমটি দরকার বেছে নিন

সানসিল্ক লেমন শ্যাম্পু
চটচটে চুলের জন্যেঃ- বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার ফলে আপনার চুল হবে পরিষ্কার ঝরঝরে, রেশমের মত উজ্জ্বল, রেশমের মত কোমল।

সানসিল্ক টনিক শ্যাম্পু
খসখসে চুলের জন্যেঃ- এতে আছে ল্যানোলিন যা আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, ফিরিয়ে আনে রেশমী কোমলতা, চুলে এনে দেয় উজ্জ্বল আভা

সানসিল্ক বিউটি শ্যাম্পু
স্বাভাবিক চুলের জন্যেঃ- এটি এমন ভাবে তৈরী যাতে আপনার চুল সবসময় সুন্দর পরিপাটি থাকে, এটির চুলে থাকে রেশমের মধুর বাহার

সানসিল্ক – শুধু শ্যাম্পুই নয় আপনার চুলের এক অপূর্ব প্রসাধনী

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

CENTRAL LIBRARY

...আর্টিস্ট হবার স্বপ্ন এসেছে—সবই দ্বিজপদর জন্য সংরক্ষিত থেকেছে। এদিকে ওর বাবা—বিরাট পরিবারের একমাত্র কর্তা—যাঁর কর্তৃত্বাধীনে আছে সংসারের সমৃদ্ধি, সাচ্ছল্য, দু-বেলার দৈনন্দিন বাঁধা বন্দোবস্ত, সেই কর্তৃত্বময় পিতাও নিঃশব্দে মেনে নিয়েছিলেন দ্বিজপদর অপ্রাপ্য দাবী। দু-বেলা খাওয়া-দেওয়া, খেলা-ওঠা সব শুধু দ্বিজপদর জন্যই বরাদ্দ ছিল। বাড়ীতে যত মাছ এলে মুড়োটা দ্বিজপদর পাতেই পড়ত। আর পিতার আচরণও ছিল সহৃদয় বন্ধুর মত। কোনদিন পিতৃত্বের কর্তৃত্ব নিয়ে শাসনের রক্তচক্ষু দেখিয়ে তিনি দ্বিজপদর কাছে আনুগত্য দাবী করেননি। খুব কাছের মানুষ হয়ে দ্বিজপদর সুখ-দুঃখ, ভাবনা-কল্পনার ভাগ নিয়েছেন।

অথচ দ্বিজপদ পরম অবহেলায় সেই পিতা এবং স্নেহময়ী মাসীমাকে অস্বীকার করে, [illegible]—ভাই-বোনদের [illegible] ঠেলে দিয়ে সংসারের সর্ব দায়িত্ব-[illegible] থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিল। [illegible] নির্জন প্রকোষ্ঠে নিজেকে বন্দী করে বাড়ি-সুদ্ধ চারপাশে একাকীত্বের শক্ত প্রাচীর তুলে দিল।

দ্বিজপদ [illegible]। কিন্তু স্কুলে যাওয়া [illegible] চিলেকোঠার নিরিবিলি [illegible] জীবনের ক্লান্তি ক্রমশই [illegible] ভারী [illegible] চেপে বসছিল। [illegible] নিদ্রাহীন [illegible] বিপুল নৈঃশব্দ্যে [illegible] দ্বিজপদ।

দ্বিজপদ [illegible] কষ্ট পাচ্ছে। জীবনের কাছে ওর [illegible] চাহিদা আছে ওর, একক [illegible] সেই চাহিদাও মেটাতে পারছে না। [illegible] বন্ধু-স্বজন পিতার কাছে আশ্রয় চেয়ে এগিয়ে আসতেও পারছে না—দ্বিজপদর বাবা সবই বুঝতে পারছিলেন।

আনন্দ-উৎসব, সাজ-সজ্জা, হাসি-খেলা, বন্ধুদের উল্লাস গল্প-গুজব—জীবনের স্বাভাবিক বাসনা এবং প্রবণতা থেকে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল দ্বিজপদ।

নিঃসঙ্গ, বিবর্ণ দিনগুলো ফসলহীন মাঠের শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছিল। দ্বিজপদর বাবা সেই শূন্য মাঠে কিছু ফসলের বীজ ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। দ্বিজপদর হাতে তুলে দিলেন রঙ আর তুলি। চিলেকোঠার নির্জন, অলস দুপুরের শূন্যতা যখন বুকের মধ্যে হাহাকার করে আর্ত, আহত বিহঙ্গের মত ডানা ঝাপটাত—দ্বিজপদ ড্রইং পেপারের ওপরে তুলি বুলিয়ে কত সব ছবি আঁকত—গাছ, পাখী, মানুষের মুখ, পাহাড়ের সারি, নদীর জলের ঢেউ, দূর-দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ—দুপাশে সবুজ-শ্যামল ছোট ছোট কুটিরের চালে লকলকে কুমড়ো গাছ, পাখা গুটিয়ে বসে-থাকা কাক, শালিক, নানা বিচিত্র বর্ণের ফুল, ফল, আকাশে নীল মেঘের রঙ, মেঘের কোলে ডুবন্ত সূর্যের লালচে আভা, উড়ন্ত প্রজাপতি, ফড়িং, আর সর্বোপরি কল্পিত মায়ের বোজাটো-টানা হাসি-হাসি মুখ—ছবির পর ছবি আঁকতে লাগল দ্বিজপদ। শূন্য মাঠ ফসলে ভরে গেল—দ্বিজপদ সোনালী রঙে মুঠো মুঠো ফসল তুলতে লাগল আর শূন্য বুকের ভাণ্ডারে জড় করল।

এক নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ বালকের খেয়ালি কল্পনায় শুরু হল এক আশ্চর্য চিত্রশিল্পের সাধনা।

দ্বিজপদ বুঝতে পারছিল, দারুণ এক পাপবোধ তার আত্মাকে অনুশোচনায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে—কিন্তু কি সেই পাপবোধ—কোন্ পাপ থেকে তার জন্ম—দ্বিজপদর জানা ছিল না। অথচ সেই অনুশোচনা তার অস্তিত্বকে আশ্চর্য এক শূন্যতায় ডুবিয়ে দিল। হতাশার অন্তহীন গভীরে ক্রমশই তলিয়ে যেতে লাগল দ্বিজপদ। মৃত্যু বড় আপন করে বুকের কাছে টেনে নিতে চাইল। দ্বিজপদর মনে হল এই জীবন আমার, অর্থহীন, বেঁচে থেকে শুধু শরীরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির নিষ্ফল প্রয়াসের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। দ্বিজপদ চোখ বুজে মৃত্যুর কোন সহজ, যন্ত্রণাহীন উপায়ের ভাবনা নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল। হঠাৎ—চোখ খুলতেই জানালার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত হল, আশ্চর্য, জীবন কত সুন্দর, প্রকৃতির কত বিচিত্র রঙ আর কোথায় জীবনের মোহময় ঐশ্বর্য। মাথুরের গভীর রঙ ঘন নীল আকাশ, উজ্জ্বল রৌদ্রে উড়ন্ত গাঙ-চিলের ডানা জ্বলছে। শুধু পশ্চিম আকাশের কোণে এক ছোট্ট মেঘের গায়ে টমাটো রঙ ধরেছে। দূরে কাছে যতদূর দৃষ্টি যায় গাছ-গাছালির মাথায় মাথায় সবুজ সতেজ জীবনের অকৃপণ দাক্ষিণ্য। জীবনের মাঠ বড় আপন হয়ে বুকের কাছে ঘন হয়ে এলো। দ্বিজপদ তুলিটা হাতে তুলে নিল। আজ জীবনের ছবি আঁকবে দ্বিজপদ। দু-চোখ ভরে দেখবে সেই ছবি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পথ বেয়ে জীবনের অকৃপণ দাক্ষিণ্য ভরে পড়বে আত্মার গভীরে।

দ্বিজপদ তুলিতে টান দিয়ে দিয়ে জীবনের ছবি আঁকতে লাগল। রৌদ্রালোকিত বনভূমি, গাছে সবুজ কাঁচা পাতা, গাছ-গাছালির ছায়ায় ঢাকা নির্জন বনপথ, ঢেউহীন শান্ত একটি নদী, পশ্চাতে নীল পাহাড়ের মেঘ-মালা, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ইতস্তত ছড়ানো কুটির, অদূরে বাঁধ, মাথার ওপরে স্বচ্ছ নীল আকাশে উড়ন্ত গাঙ-চিল জীবনের এক আশ্চর্য ছবি ফুটে উঠল ক্যানভাসের গায়ে। দ্বিজপদ ছবিটার ওপরে চোখ রেখে অনেক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল। একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেলল। আবার তুলিটা হাতে তুলে নিল, মাথাটে মেঘের টুকরোটাকে ক্যানভাসের গায়ে ধরাতে চাইল, নীল আকাশের কোণে ফুটে উঠল এক টমাটো মেঘ-টুকরো। সঙ্গে সঙ্গে এক দারুণ আতঙ্কে ওর সমস্ত অস্তিত্বে নাড়া দিয়ে উঠল। মেঘের টুকরোটা শকুনের মুখের চেহারা হয়ে ফুটে উঠেছে ক্যানভাসের গায়ে। দ্বিজপদর মনে হল এক বীভৎস মৃত্যু জীবনকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। সেই অন্ধকার ক্রমশই এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর ভাবনা হয়ে ওর চেতনায় ভেসে আসছে।

অনিবার্য মৃত্যু ওর অস্তিত্বকে কালের সীমায় বেঁধে দেবে—মৃত্যুর সীমা দিয়ে বাঁধা এই অনিত্য দেহ চিতার আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে পঞ্চভূতে মিশে যাবে—এই ভয়ঙ্কর ভাবনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল দ্বিজপদ।

ক্রমশই এক অস্থির প্রশ্ন ওর চোখের ঘুম কেড়ে নিল। গর্তে-ঢোকা চোখদুটোতে লালচে রঙ ধরল—চোয়াল দুটো গালের ওপরে ঠেলে উঠল। দ্বিজপদ দিনরাত শুধু সাপের কথা নিয়ে খেলা করতে লাগল আর সাপটা বার বার বিষ উগরে দিয়ে ওর আত্মাকে অনুশোচনা আর হতাশার অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিতে লাগল।

সেই অস্থির প্রশ্নটা ওকে ক্রমশই এক অনিবার্য সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল—মরতে যখন হবেই, তখন এই নিঃসঙ্গতার বোঝা টেনে টেনে, হতাশার অন্ধকারে ডুব দিয়ে, বিষে বিষে নীল হয়ে দিনে বেঁচে থেকেই বা কি লাভ?

শেষ পর্যন্ত এক গভীর রাতে দ্বিজপদ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল—সে আত্মহত্যা করবে—ট্রেনের নীচে গলা রেখে অর্থহীন জীবনের বোঝাটাকে হালকা করে দেবে।

শেষ রাতে একটা ডাউন-ট্রেন নদীর ব্রীজ পেরিয়ে ওদের শহরের স্টেশনে এসে বিশ্রাম নেয়। দ্বিজপদ যখন মাসীমার বুকে মাথা রেখে ঘুমোত—শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কতদিন এই ট্রেনটার শব্দ শুনতে শুনতে আবার ঘুমে ঢলে পড়েছে।

দ্বিজপদ ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে এসে ব্রীজের ওপরে উঠে পড়ল। সেই রাতটা খুব সুন্দর ছিল। চাঁদটা পশ্চিম আকাশে গড়িয়ে গিয়েও নদীর স্বচ্ছ জলে, দুপাশের শিশির-ভেজা সবুজ মটর ক্ষেতের গায়ে নরম জ্যোৎস্নার মায়া মাখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই মায়ায় ধরা দেয়নি দ্বিজপদ। লাইনের ওপরে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে পা-দুটোকে পেটের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ট্রেনটা অনেকদূর থেকে হেড-লাইটের আলো ফেলেছিল। ট্রেনের মাথাটা স্পষ্ট হয়ে চোখের ওপরে ধরা পড়ল। ব্রীজটা থরথর কাঁপছিল। মৃত্যু প্রচণ্ড গর্জনে এগিয়ে এসেছে ব্রীজের বুকে।

(ক্রমশঃ)

বিষাক্ত ভবিষ্যৎ

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

আমেরিকার একজন বিশিষ্ট [illegible] সংস্থার মতে প্রকৃতিকে বিষাক্তকরণের বিরুদ্ধে এখনই সর্বাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে, আগামী পঁচিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দেশের বৃহৎ নগরীগুলিতে শিশুদের বাড়ীর বাইরে বের করতে হলে গ্যাস মুখোশ পরাতে হবে। প্রাপ্তবয়স্করাও নিজেদের স্বাস্থ্য ক্ষতি না করে দু-তিন ঘণ্টার বেশী বাইরে থাকতে পারবে না। কারণ, অন্যান্য ঘটনা ও দুর্ঘটনা বাদ দিয়ে, ঐ বিপুল সম্পন্ন দেশের দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্রতিদিন ১০ মিলিয়ন (এক মিলিয়ন--১ কোটি) মোটর গাড়ী ৫০০,০০০ টন কার্বন মনক্সাইড বাতাসে পরিত্যাগ করছে। তদুপরি প্রতি বছর কারখানার চিমনীগুলি থেকে ১৪২ মিলিয়ন টন বিষাক্ত বস্তু বাতাসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরের সমস্ত উদ্ভিদ জগৎ থেকে মানুষ ও শ্বাস গ্রহণকারী সর্বপ্রকার জীবজন্তুদের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন যে-পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাতে ইতিমধ্যে ঘাটতি ঘটেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিমের দুই মহাসমুদ্রের জলজ উদ্ভিদজাত অক্সিজেন বায়ু প্রবাহিত হয়ে এখনো পর্যন্ত বিপর্যয়কে ঠেকিয়ে রেখেছে।

পরিস্থিতি শুধু আমেরিকার পক্ষেই বিপজ্জনক নয়। আজ প্রত্যেকটি শিল্প-সমৃদ্ধ দেশের অবস্থা একই। পশ্চিম জার্মানীতে প্রতি বছর ২০ মিলিয়ন বা ২ কোটি টন বিষাক্ত দ্রব্য বাতাসে পরিত্যক্ত হয়। সেই বিষাক্ত পদার্থের মধ্যে কয়লা এবং পেট্রোল এই দুই জ্বালানী থেকেই ওঠে ৭ মিলিয়ন টন কার্বন মনক্সাইড, ৩ মিলিয়ন টন সালফিউরিক অক্সাইড, আড়াই মিলিয়ন টন নাইট্রিক অক্সাইড, ৩ মিলিয়ন টন হাইড্রো কার্বন এবং আড়াই মিলিয়ন টন ধুলো।

জার্মানীর শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলির বাতাসে প্রতি কিলোমিটার হিসেবে ৪০০০ ধূলিকণা। সাধারণ গ্রাম অঞ্চলের চেয়ে এর হার হচ্ছে এক হাজার গুণ বেশী। ফলে শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলির বাতাস ভেদ করে সূর্যের আলো আসে শতকরা ৫০ ভাগ কম। আর সেই স্থানে সূর্যের আলোর অতি-প্রয়োজনীয় আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থাকে শতকরা ১০ ভাগ কম। বাতাসে নিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মধ্যে শতকরা ২০% ভাগ যানবাহন থেকে, শতকরা ৫৩% কলকারখানা থেকে আর শতকরা ২৭% গার্হস্থ্য প্রয়োজনের জ্বালানী কয়লা ও তেলের চুল্লী ইত্যাদি থেকে।

অবশ্য মোটর গাড়ী থেকে যে বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে ওঠে সেইটাই হচ্ছে পরিমাণে সবচেয়ে বেশী এবং প্রতিক্রিয়ায় সবচেয়ে ক্ষতিকর। একটি মানুষের জন্যে সারা বছরে যতখানি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় একটা মোটর গাড়ী ৬০০ মাইল যেতে ততখানি অক্সিজেন জ্বালিয়ে দেয়। একটা ডিজেল ইঞ্জিন [illegible] বাতাস [illegible] ৩৭ পাউণ্ড [illegible]। একটা গ্যাসোলিন ইঞ্জিন যা চায়, তার ৫? গুণ বেশী। তার ওপর প্রতি টন জ্বালানী পুড়িয়ে ৫৭ পাউণ্ড নাইট্রিক অক্সাইড ছাড়ে; একটা গ্যাসোলিন ইঞ্জিন ছাড়ে তার অর্ধেক। একটি গ্যাস ইঞ্জিন থেকে যেসব দ্রব্য বাতাসে মেশে তাও খুব ক্ষতিকর। তার মধ্যে থাকে, অতি বিষাক্ত কার্বন মনক্সাইড, নাইট্রো অক্সাইড, বহু অ্যাশ ও পোড়ানো তেলের গন্ধ বিষবৎ ধোঁয়া নির্গত, এবং ক্যান্সার উৎপাদক বেঞ্জোপাইরিন।

যদি বর্তমান হারে বাতাসে ধুলো, ধোঁয়া ও গ্যাস বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে সেই ধুলো, ধোঁয়া, গ্যাসের আবরণ ভেদ করে যে পরিমাণ সূর্যের কিরণ আলো পৃথিবীতে পৌঁছবে তা পৃথিবীর বর্তমান [illegible] বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়— এসব সাংঘাতিক সম্ভাবনা যদিও এখনও

প্রবল বৃষ্টির নির্ভর অনুমান মাত্র, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নির্ভরযোগ্য নয়, তবু মানুষকে এ বিষয়ে এখনই হুঁশিয়ার হতে হবে। নয়তো যদি বিজ্ঞানও একদিন ঐ একই সিদ্ধান্তে আসে তবে হয়ত প্রতিকার তখন নিলে আয়ত্তাতীত হয়ে যাবে।

সমুদ্রতলের বিশাল উদ্ভিদরাশি জীবের প্রাণ ধারণের একান্ত আবশ্যিক ৭০ ভাগ অক্সিজেন উৎপাদন করে, বাকীটা করে স্থল ভূমির উদ্ভিদ। শিল্প ও বসতির প্রয়োজনে মানুষ সেই বনভূমিকে দ্রুত উচ্ছেদ করছে। গত বছর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট একটি বিবৃতিতে বলেন যে, এ পর্যন্ত মানুষ পৃথিবীর বনভূমির দুই-তৃতীয়াংশ উচ্ছেদ করেছে এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশও উচ্ছেদের মুখে। এক পশ্চিম জার্মানীতেই প্রতি দিন ৫০ থেকে ৭০ হেক্টর বনভূমি শিল্প ও বসতি স্থাপনের প্রয়োজনে উচ্ছেদ হচ্ছে। শুধু বাতাস বিশুদ্ধকরণের প্রয়োজনে নয়, বৃষ্টির প্রয়োজনে, ভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনে বনভূমির গুরুত্ব সবাই জানেন।

স্থলে-জলে কদর্যতা

হাজার-হাজার বছর ধরে মানুষ প্রকৃতির সম্পদ আহরণ করেছে, ভোগ করেছে, অপচয় করেছে। ব্যবহার শেষে নিষ্প্রয়োজনীয়কে যেখানে খুশি পরিত্যাগ করেছে। এ বছরের আগস্ট মাসে একটি বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেন যে, এ শতাব্দী শেষ হবার আগেই হয়তো সোনা, নিকেল, দস্তা প্রভৃতি ধাতু অধিক দাম দিলেও প্রয়োজন মত মিলবে না। কিন্তু যা এ পর্যন্ত বর্জ্য হিসেবে সঞ্চিত হয়েছে তার অপব্যবহারের এবং অব্যবহারের জেরও কম নয়। যে সমাজ যত সম্পন্ন তার আবর্জনার পরিমাণও তত বেশী। এরা শুধু স্থলে নয়, নদী-নালায়, হ্রদে ও সমুদ্রে তার বাহুল্য অপরিমাণ জঞ্জাল, টিন, শিশি, ভাঙা বোতল, সংশ্লিষ্ট ছাপা কাগজ, লোহালক্কড়, ঔষধ, এসিড, প্রসাধনের রসায়ন, গোলা সাবান, ঘর ও তৈজস পরিষ্কার করার ক্ষার, তামাক ও এলকোহল এবং ধরে, পচা, গলা, জলে, ধুয়ে দুইয়ে মাটি নর্দমা এবং নালা, নর্দমা, খন্দ-বাড়ী নর্দমা ও জলস্রোত ও বৃষ্টির জল ধরে মাটির ওপরের জলকে কলুষিত করছে। এক ক্যারাফ পরিষ্কৃত তেলে, হাজার কোটি জল পানের অযোগ্য হয়ে যায়। তখন প্রতিদিন হাজার টনের ট্রেন মাটিতে গড়াচ্ছে, তাছাড়া শেষ পর্যন্ত তার আবর্জনা মাটির ওপরের নীচের জল নিয়ে মিলছে। আর পৃথিবীর [illegible] জলে বিষাক্ত কার্বাইড, [illegible] এবং অন্যান্য [illegible] [illegible] চাষের শেষ [illegible] রাসায়নিক দ্রব্য জলে গিয়ে নদী-নালায় মিশছে। ফলে জলের নিজস্ব সংশোধনী ক্ষমতা ও অক্সিজেন সরবরাহ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তার নীচের কাদা ও পাঁকে হাইড্রোজেন সালফাইড বেড়ে যাচ্ছে। ফলে জল দুর্গন্ধ, কোথাও বা বিষাক্ত হয়ে উঠছে।

কিন্তু মানুষের অপকর্মের সেখানেই শেষ নয়। মানুষ স্থলে ও সমুদ্রে আণবিক বোমা পরীক্ষা করেছে। তার তেজস্ক্রিয়তার পরিণতি যে কী ভয়াবহ হতে পারে তা এতই আলোচিত হয়েছে যে, এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। গত আগস্ট মাসে (১৯৭০) আমেরিকানরা সমুদ্রে ৬৬ টন নার্ভ গ্যাস ৪১৮টি লৌহ আধারে নিমজ্জন নিয়ে দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে যায়। কিন্তু হৈ-চৈ হচ্ছে না এমন অপরিমাণ বিষাক্ত দ্রব্য প্রতিদিন সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। ফলে পৃথিবীর অক্সিজেন সরবরাহের প্রধান আকর এবং বিপুলভাবে বর্ধিষ্ণু মনুষ্য সমাজের ভবিষ্যৎ খাদ্য সরবরাহের অনন্ত ভাণ্ডার সমুদ্রের উদ্ভিদ ও জীব জগৎ বিপন্ন হয়ে পড়ছে, বিলুপ্ত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে গত ২০ বছরের মধ্যে মহাসমুদ্রের জীব জগৎ ৪০% শতাংশ কমে গেছে। ১৯৪৬ সালে আমেরিকার ফ্লরিডায় ও ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রোপকূলে কয়েক কোটি মাছ দূষণের সংক্রামক ব্যাধিতে মারা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমুদ্র উপকূলেও ঐ ধরনের ছোট-বড় ঘটনা ঘটেছে। আর শুধু সমুদ্রের মাছ নয়। জাহাজ থেকে ফেলা, কিম্বা পড়ে-যাওয়া তেল সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে দূর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সেই তেল সমুদ্র-পাখিদের ডানায় একবার লাগলে তাদের উড্ডয়ন ক্ষমতা চলে যায়। তারা নিস্তেজ ও অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মন্থর কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর কবলিত হয়। সমুদ্র পাখিদের ঐ শোচনীয় মৃত্যু এতই ব্যাপক হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমুদ্রে তেল ফেলা নিয়ন্ত্রণ করে আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবু অসাবধানতা ও স্বার্থচিন্তায় প্রতি বছরই বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার সমুদ্র পাখি মারা পড়ে।

স্থলাভ্যন্তরের নদী ও হ্রদের অবস্থাও প্রায় অনুরূপভাবে বিপন্ন হতে চলেছে। কিছুকাল আগে জার্মানীর রাইন নদীতে মাছের মড়ক লেগে লক্ষ-লক্ষ মাছ মারা যায়। সেই মড়কের প্রমাণিত কারণ ছিল বৃষ্টির কীটনাশক রসায়ন ধুয়ে নদীর জলকে বিষাক্ত করা। ইংল্যান্ডের মত একটি স্বল্পায়তন দেশেরও সর্বসমেত ১০০০০ মাইল নদী জলে আর কোন মাছ নেই। কারণ নগর ও কল-কারখানাগুলির পরিত্যক্ত ময়লায় নদীগুলির জল মৎস্যবাসের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। যদিও বহু বছর চেষ্টার পর সম্প্রতি টেমসের জলকে পরিশুদ্ধ করার পর আবার মাছ দেখা যাচ্ছে।

পৃথিবীকে কলুষিত করার পরিণামে দৃশ্য ক্ষতিকারী ও [illegible] বিপদ নয়। যদি না তার বিরুদ্ধ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে না তুললে স্থলচর-উভচর কারুরই নিষ্কৃতি নেই। কারণ বহু লক্ষ বছর ধরে সমস্ত জীব জগতে লক্ষ-কোটি পরস্পর নির্ভরশীল চক্র গড়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,—উত্তর ইউরোপের ক্রমাবলুপ্ত শঙ্খচিল জাতীয় অতি সুন্দর সমুদ্র পাখি। কীটনাশক রসায়ন বৃষ্টির জলে ধুয়ে হ্রদ-নদী-সমুদ্রে গিয়ে মেশে। এক জাতের জলজ উদ্ভিদ সেগুলিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে। ক্ষুদ্রাকৃতি জলজ প্রাণীরা সেই রসায়নযুক্ত উদ্ভিদ ভক্ষণ করে। ছোট মাছেরা খায় সেই সব জলজ কীট। তাদের খায় বড় মাছ। সেই বড় মাছেদের খায় সমুদ্রে ও অন্যান্য মৎস্যভোজী পক্ষী। কীটনাশক রসায়নের নানা প্রতিক্রিয়ার একটা হচ্ছে দেহে ক্যালসিয়াম বা খটিক জাতীয় পদার্থ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে অসম্পূর্ণ ডিমের খোলায় ক্যালসিয়াম অভাব ঘটে এবং তা পাতলা ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। তা দিতে বসলেই তা ভেঙে যায়।

এই দূষণক্রিয়া কোনরূপেই অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে না। নদী ও সমুদ্রের স্রোত, বাতাসে, যাযাবর জন্তুদের দেহে ভর করে তা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাই দূর-দুর্গম মেরু অঞ্চলের এস্কিমোদের ও পেঙ্গুইন পাখিদের দেহে, দূর সমুদ্রবাসী মাছেদের, এমন কি আমেরিকার কোথাও-কোথাও মায়েদের দুধে লক্ষণীয়ভাবে ডি-ডি-টি পাওয়া গেছে। অতএব সভ্যতার এক উভয় সঙ্কট দেখা দিয়েছে। উন্নততর চাষ, বিপুলভাবে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যাকে খাওয়াবার জন্যে কীটনাশকের ব্যবহার অপরিহার্য। অথচ তার প্রতিক্রিয়া ও দুশ্চিন্তাজনক। মোট, অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে যদি না মানুষের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শুভবুদ্ধি দ্যুলোক ও ভূলোক জুড়ে এক বিপুল, ব্যাপক, যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তাহলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মানুষ যেভাবে এক শতক ধরে আণবিক অস্ত্রের সর্বাত্মক ধ্বংসের আতঙ্কের মধ্যে বাস করে ছিল, তেমনিভাবেই পরবর্তী আরেক শতক বিশ্বসৃষ্টির ভৌতিক পরিবর্তনের আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয়, বহু লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ যে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে উঠেছিল, সেই পৃথিবীকেই নিজেদের বাসের অযোগ্য করে তুলবে। আকাশ-বাতাস-মাটি ও জল বিষাক্ত হয়ে উঠবে। সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। আণবিক অস্ত্র সংঘাতের মত নাটকীয় পরিসমাপ্তি না ঘটলেও ক্রমশ অসুস্থ, বিষাক্ত ও বিবর্ণ পৃথিবীতে প্রাণের জোয়ার স্তিমিত হয়ে যাবে।

ইউনেসকো প্রকাশিত 'দি আর্থ অ্যাণ্ড ইন হ্যাবিটেবল প্ল্যানেট' ইত্যাদি বহু পত্র-পত্রিকার আলোচনা ও অন্যান্য পত্রিকার কাছে বিষয়বস্তু ও ছবিগুলির জন্যে ঋণী।

নিকটেই আছে

রাজা সামন্ত

মর্তে মানুষ স্বর্গে দেবতারা সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন, যেন কিছুই আর করার নেই। ব্যাপার-স্যাপার দেখে রীতিমত হকচকিয়ে গেছে অনিল। খোদ শহর কলকাতাতেই, দেবতাদের নাকের ডগায় যদি শিক্ষার এই হাল হয়, তাহলে দূরে মফঃস্বল শহরে বা পাড়াগাঁয়ের স্কুল-কলেজে এখন কি হচ্ছে? খোঁজ-টোজ কেউ নেয় বলে তো মনে হয় না। সবাই চাকরী করছে—পড়ায় না কেউ, পড়েও না কেউ। ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স, পে-কমিশন, এ-দুটি বিষয়ে জোর গবেষণা চলে টিচার্স রুমে। টিচার্স-রুমের প্রাত্যহিক অ্যাজেন্ডার তিন নম্বর আইটেম ইলেকশন। অন্যান্যবার ইলেকশনই পেত টপ প্রায়োরিটি—অনিল ঠিক বুঝতে পারে না, এবার কেন গুরুত্ব পাচ্ছে না।

মাঝে একটা বছর সব কেমন ওলট-পালট করে দিয়েছে। এই শহরে থেকেও অনিল সবার থেকে দূরে সরে ছিল। চিরদিনই তো দূরে সরে সরে থেকেছে, সেই ছাত্রাবস্থা থেকে। বাবা ছিলেন মিলিটারীর ডাক্তার। বদলীর চাকরী। বেশীদিন কোথাও থিতুতে পারেননি। পারেননি বলেই ছেলে-মেয়েদের কাছাকাছি বিশেষ থাকেননি কখনো। বড়দা বিমলেন্দু, মেজদা অমলেন্দুর মত অনিলের ছেলেবেলার অনেকগুলো বছর কেটেছে রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে। কলেজেও একই ব্যাপার। তারপর ইউনিভার্সিটিতে যখন ঢুকল, তখন বাবা রিটায়ার করে আসামের ভুরায় সেটল করলেন। দাদারা ততদিনে পাশটাশ করে চাকরীতে ঢুকেছেন।

দাদারা সবাই কেরানী। রিটায়ারমেন্টের পর বাবার পেনসন নিয়ে গভর্নমেন্টের সঙ্গে বাধল ঝগড়া। সংসারের অবস্থা তখন খুবই কাহিল। প্রায় রোজই একখানা করে চিঠি পেত বাবার—'অনিল, এখন তুমিই আমাদের ভরসা। তোমার বড় দুই ভাই কোনদিন বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তুমি পড়াশোনা ভাল করিয়া করিও। মনে রাখিবা আমরা সবাই তোমার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি।'

বাবা, মা, ছোট ছোট ভাই-বোনগুলোর অসহায় করুণ মুখ—অনিল কোনদিন ভোলেনি। ভোলেনি এই শহরে সে এসেছে মাথা তুলে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে নিতে। একটুও অবহেলা দিলে চলবে না। হোস্টেলের বন্ধুরা দলবেঁধে সিনেমা দেখতে গেছে, পিকনিক করেছে, ময়দানে প্রেম করেছে—সব দেখেছে অনিল দূর থেকে। কাছাকাছি যেতে সাহস হয়নি কখনো। যদি প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়, রেজাল্ট খারাপ হয়—তাহলে যে ভুরায় ওর দাঁড়ানোর আশায় যারা অপেক্ষা করে আছে, তারা কি করবে?

একেলা একেলা সম্পূর্ণ বন্ধুহীনভাবেই শহরটায় দুটি বছর কাটিয়ে যখন পাশ করে বেরোল অনিল, তখন গোটা দেশ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে—নেহরু নেই। অনিল একটা চাকরী পেল আসানসোলের কোম্পানীতে—কাজটা সেলসম্যানের।

দুটো বছর সাবান, স্যাম্পু, তেল বিক্রী করেই কেটে গেল। বাংলা-বিহারের বর্ডারে আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে ঘুরে মাল গছিয়ে দিন কাটছিল। মাইনেটা খারাপ ছিল না। নিজের খরচপত্তর মিটিয়েও কি মাসে শ'-তিনেক টাকা পাঠাতে পারত বাসায়। বাবা আর চিঠি লিখতেন না—ছেলে তো দাঁড়িয়ে গেছে, সংসারকে সাহায্য করতে পারছে। কিন্তু অনিল নিজেই বোকে বসল।

এ সে কি করছে? কেমিস্ট্রির সব পড়াশোনা এখন তেল, সাবান, স্যাম্পুর দোরগোড়ায় এসে ঠেকেছে! কাউকে না জানিয়ে, কাগজ দেখে দুম করে একখানা অ্যাপ্লিকেশন ছেড়ে দিল ডাকে—কলকাতার কলেজে লেকচারারের পোস্ট খালি।

ইন্টারভিউ হোল। চাকরীও পেল অনিল। তারপর আসানসোলের পাট চুকিয়ে ফিরে এল এই কলকাতায়—তখন শহরটা ভীষণ গরম। রোজ পুলিশের গুলীতে একটা-দুটো লোক মরছে; ট্রাম-বাস পুড়ছে—স্কুল-কলেজে স্ট্রাইক। সামনেই ইলেকশন। দু' বছর বাদে আবার বাবার চিঠি পেল অনিল—'এ তুমি কি করিলা? অমন সুখের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া শেষপর্যন্ত মাস্টারীই বাছিয়া লইলা। কি আর বলিব। দেখিও বাড়ীতে টাকা পাঠানোর পরিমাণ যেন কিছুতেই না কমে। কারণ, তোমার দাদারা সাহায্য করিতে অপারগ। তাহারা আবার বিবাহ করিয়াছে। নন্টু, টুনু, বাচ্চু এখনো স্কুলে পড়িতেছে। আমার পেনসনের ব্যাপারে আজো মিটে

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫·৫০	দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৮·০০	রবীন্দ্র-দর্শন
শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৩·০০	রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ
ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২·০০	দি হাউস অফ্ দি টেগোরস
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৫·০০	পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
যোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫·০০	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী	৮·০০	টেগোর অন্ লিটারেচার এণ্ড এস্থেটিকস
রবীন্দ্র-রচনায় উপ্যাভিধান	২·০০	রবীন্দ্র-নৃত্যাবলী
ডক্টর ননীলাল সেন	১৫·০০	এ ক্রিটিক্ অফ দি থিওরিজ অফ বিপর্যয়
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন	২৫·০০	ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ডান্সেস্
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী	১০·০০	স্টাডিজ্ ইন এস্থেটিকস
ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ	৬·০০	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	১৬·০০	রিফর্ম অ্যান্ড রিজেনারেশন ইন বেঙ্গল
ডক্টর সোহনলাল মুখোপাধ্যায়	১৪·৫০	সোসিওলজি অফ্ প্ল্যানিং

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭
পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

নাই। এমতাবস্থায় তুমি কখনোই তোমার পারিব বিস্মৃত হইও না।'

দারিদ্র বিস্মৃত হয়নি অনিল, সকাল-সন্ধ্যা টিউশানি করে ঘরে টাকা পাঠিয়েছে। পাঠাতোও নিয়মিত যদি না হঠাৎ—।

কি যে হোল, তা ঠিক বলতে পারবে না অনিল। অথচ সব ঠিকঠাক চলছিল। ছেলেরা ক্লাসে আসত, প্রক্সি দিত, পরীক্ষা দিত—পাশ করবার জন্য কোচিং বা টিউটোরিয়ালে নাম লেখাত। অনিল কেলোর নোট করত, ক্লাস নিত, অফ টাইমে বা ছুটির পর টিউটোরিয়ালে যেত ক্লাস নিতে। কলিগরা নোট লিখত, টিউশানি করত ফাঁকে ফাঁকে ক্লাসে হাজিরা দিত। মাঝে মাঝে মিছিল বেরোত—কোনটা ছেলেদের, কোনটা অনিলদের। স্লোগানে, পোস্টারে গরম থাকত কলেজটা। আর প্রিন্সিপাল সাহেব সরকারী দাক্ষিণ্য আদায়ের জন্য নিয়মিত ছুটতেন রাইটার্সে। কলেজটা স্পনসর্ড। ছাত্রদের মাইনের বড়জোর এক মাসের খরচ ওঠে, বাকিটা দেয় গভর্নমেন্ট। পরিমাণটা নেহাৎ কম নয়—বছরে সাড়ে চার-পাঁচ লাখ।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় টিউটোরিয়াল থেকে ফিরে, মেসের ঘরে বসে নোট তৈরি করছিল অনিল। আর ঠিক তখনি শুনতে পেল, কে যেন বলছে কানে কানে—তোকে টার্মিনেট করব। তোকে ঘর ছাড়াব। ভালো ছেলে, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। টিউশানি করে, বাড়ীতে টাকা পাঠায়। বাবার বাধ্য ছেলে। তোকে কলেজ ছাড়া করব।'

ভয় পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অনিল। ভাবল মুখোমুখি খোলা জানালার ওপার থেকে কেউ বুঝি ইয়ার্কি করছে। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিল। তবুও স্রোতের মত ভেসে আসতে লাগল ঐসব কথা। দরজা আটকে দিল ঘরের। তবুও কথারা ছাড়ে না—'ভালো ছেলে, ন্যাকা ছেলে!-বাবার বাধ্য ছেলে! কলেজের চাকরী তোর ছাড়াব। তোর টিউশানি বন্ধ করে দেব। তোকে তাড়াব কলকাতা থেকে।'

পর পর দুদিন কলেজ গেল না অনিল। দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল মেসের খাটে। খেল না, স্নান করল না, করল না কিছু। তবু কথারা ছাড়ে না। বার বার ঘুরে ঘুরে সেই একই কথা। কোথায় যে ছিল এত কথা এতদিন টেরই পায়নি। হঠাৎ যেন একটা বন্ধ দরজা খুলে গিয়ে হাওয়ার মত জলের মত লক্ষ লক্ষ শব্দের কণা ছুটে এসে ধাক্কা দিচ্ছে ওর কানের পর্দায়।

খুলে বলল সব মেসের বন্ধুদের। তারা সবাই হেসে উড়িয়ে দিল—এক-আধজন মোটা গলায় বলল, ওসব আপনার সাবকনশাস মাইন্ডের ব্যাপার। ঘাবড়াবেন না, ডাক্তার দেখান।

ঠিক একটি বছর এই শহরে থেকেও সকলের থেকে দূরে সরে ছিল অনিল। মনে আছে গোড়ায় এক মাস ছুটি নিয়েছিল কলেজ থেকে। বাড়ীতে কিছু না জানিয়ে গোপনে মাদুলী, কবচ কিনে ধারণ করেছিল। তারপর? তারপরের ইতিহাস সব যেন গুলিয়ে গেছে। শুধু মনে আছে বাড়ী থেকে মেজদা এসেছিলেন। অনিল ঘর থেকে বেরোবে না—সবাই মিলে চ্যাংদোলা করে গাড়িতে তুলে ওকে যেন কোথায় নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেই ছিল এতদিন। সবাই সেখানে ওর অপরিচিত—ছাত্ররা কলিগরা, প্রিন্সিপাল, মেসের বন্ধুরা কেউ ছিল না সেখানে।

তারপর এতদিন বাদে ফিরে এসেছে আবার এই শহরে, চেনা-জানা পরিচিতের গন্ডীতে। কিন্তু সব কেমন পাল্টে গেছে। অনেকে উইশ করল। প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতেই বললেন—আমি আপনার জোড় কষাতে বলে দিয়েছি প্রফেসর মজুমদারকে। এখন ক'দিন ক্লাস-ট্লাস নেওয়ার দরকার নেই। ফেব্রুয়ারীতে ক্লাস নেবেন, তাও সপ্তাহে বড়জোর তিন-চারটে। নিজেকে বেশী একজার্ট করবেন না।

কলিগরাও একই কথা বলল। হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর মজুমদার ডেকে বললেন—হ্যাভ সাম রেস্ট ইয়ংম্যান। ক্লাস-ট্লাসের কথা পরে হবে।

কিন্তু আর হবে কি? অনিল একা একা ঘুরে ঘুরে কলেজ বিল্ডিংয়ের আনাচে-কানাচে উঁকি মেরে কেমন হতাশ হয়ে যায়—ছেলেরা ক্লাসে আসে না, দুপুর থেকেই কলেজ মাঠে ক্রিকেট বা ভলিবলের মহড়া শুরু হয়ে যায়। টিচাররা হয় তাস, না হয় দাবা খেলেন। খেলতে খেলতে টায়ার্ড হয়ে পড়লে আলোচনা শুরু করেন পে-কমিশন আর মহার্ঘ ভাতা নিয়ে। রাজনীতি থেকে সবাই দূরে সরে থাকেন—মাঝে-মধ্যে ইলেকশন নিয়ে টুকরো-টাকরা মন্তব্য করেন মাত্র। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। টাইমলি পড়ে শুধু ক্লাসের ঘণ্টা। আর সব কেমন বে-টাইম হয়ে গেছে।

অথচ সাড়ে চার-পাঁচ লাখ টাকা গভর্নমেন্ট ফি বছর দিচ্ছে কলেজকে। মাইনে পাচ্ছে সবাই। কারুর কোন পেমেন্ট পড়ে থাকছে না। হচ্ছে না শুধু ক্লাস।

কিন্তু ক্লাস যদি আর না হয়, তাহলে পরীক্ষাও হবে না। আর পরীক্ষাই যদি না হয়, তাহলে কে আর আসবে অনিলের কাছে পড়তে। তাহলে অনিল কি করে টাকা পাঠাবে বাড়ীতে? ভাবতে ভাবতে কান-মাথা সব গরম হয়ে ওঠে অনিলের। একটা বছরে সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। এই একটা বছরের খবরই ও শুধু জানে না।

টিচার্স-রুমের চেয়ারে হেলান দিয়ে জানালায় মুখ উঁচিয়ে সব দেখতে পায় অনিল—রাস্তায় ট্রাম চলছে, বাস চলছে। হাজার হাজার মানুষ ছুটছে। হকাররা মাল ফিরি করছে। পাশের মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছে এখন। টিচাররা এখন রেডের চাল তার প্রি ডায়মণ্ডসে মেতে উঠেছে। এই কলেজটা যেন হয়ে উঠেছে একটা ক্লাব। এখানে সবাই মজা করতে আসে, বিনিময়ে মাইনে পায়। কাজ করে না কেউ। অথচ তা নিয়ে কারুর মাথাব্যথাও নেই। স্বর্গে দেবতারা, মর্ত্যে আমরা নেশায় বুঁদ হয়ে আছি। যে-যার ঘর সামলাতে ব্যস্ত, এদিকে যে রাজা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সেদিকে কারুর খেয়াল নেই। অনিল কিছু বলতে গেলে সবাই হেসে উড়িয়ে দেবে, বলবে—পাগলটার পাগলামি সারেনি এখনো। অনিল তো একটা পাগল।

—সন্দিৎসু

CENTRAL LIBRARY

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

(দশ)

সেই মনুমেন্ট গেট, সেই বোটানিক্স, শাল-পাইনের মেলা, সেই নিউ ফরেস্টের উদার প্রান্তর পার হয়ে এলাম গেস্ট হাউসে। সবকিছুই যেন পরিচিত মনে হলো। মনে হলো আপন দুনিয়ায় বিচরণ করছি। অপরিচিতের খবর নেবার জন্য প্রথম প্রথম কাঠবিড়ালীটা হঠাৎ সামনে এসে আমাকে দেখত। পরীক্ষা করত। আজ আর আসেনি। আমাকে আর ওরা অপরিচিত মনে করে না।

সীমাহীন আকাশে পাখী উড়ে বেড়ায়। নাবিকরা ঘুরে বেড়ায় দিকচক্রবালহীন মহাসমুদ্রে। তা হোক তবু ওদের একটা অভীষ্ট আছে। উদ্দেশ্য আছে। ঘরের খবর, বন্দরের ঠিকানা জানা আছে ওদের। এর আগে আমিও ঘুরেছি, বেঁচে থেকেছি কিন্তু ফেরার টান, ঘরের আকর্ষণ, বন্দরের ঠিকানা ছিল না। যে পৃথিবীতে, যে সমাজে বিচরণ করতাম, তাকেই সবচাইতে অপরিচিত মনে হতো। আমি যে ওদের, ওরা যে আমার তা কোনদিন অনুভব করতাম না। মনে হতো এই পৃথিবীর সব-কিছু, সবাই আমাকে বিদ্রূপ করছে, অবাক বিস্ময়ে আমাকে দেখছে।

শীতের ভোরে ঘন কুয়াশায় আশে-পাশের কিছু দেখা যায় না। সবকিছুই থাকে কিন্তু অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। চোখের দৃষ্টি থাকলেও দেখা যায় না। আশ্চর্য! তবু সত্য।

আমারও যেন অনেকটা সেই রকম হয়েছিল। এবার যেন আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে যাচ্ছে।

আগামী কালকে একেবারে শূন্য মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আগামী দিনগুলিতে কিছু পেতে পারি, পাবার সম্ভাবনা আছে। ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারছি না তবু একটা প্রত্যাশায় আনন্দ অনুভব করছি।

মানসীর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবন থেকে বসন্ত বিদায় নিয়েছিল। হারিয়ে গিয়েছিল ভালবাসা, মনের সুক্ষ্ম অনু-ভূতি। আমি এই গেস্ট হাউসে আমার ঘরে চুপটি করে বসে আছি। চারদিকে কোন কলকোলাহল নেই। নিজের হৃদয়-স্পন্দনটাও যেন শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আবার হয়ত বসন্ত আসতে পারে, আসছে। গাছে গাছে আবার নতুন পল্লবের ইঙ্গিত না?

বুলার কাছ থেকে ফিরে এসেও ভাল লাগছে। ওর সবকিছু ভাবছি আর মনে মনে অনাগত বসন্তের ইঙ্গিত পাচ্ছি।

একটা সিগারেট ধরালাম।

ওকে বেশ দেখতে, তাই না?

নিশ্চয়ই। বেশ একটা চাপা শ্রী আছে। প্রথম দেখার পর আজ যেন আরো ভাল লাগল। আগামী কাল নিশ্চয়ই আরো ভাল লাগবে। যত দিন যাবে ততই ভাল লাগবে। ফিল্ম অ্যাকট্রেসদের দেখলেই ভাল লাগে কিন্তু বেশী কাছ থেকে, একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে আর ততটা ভাল লাগে না। ভাল লাগা তো শুধু রক্ত-মাংসের দেহটাকে নিয়েই নয়।

তবু বুলার ফিগারটা কিন্তু বেশ ফাইন! বেশ অ্যাট্রাকটিভ্!

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবছি ওর ফিগারের কথা। সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মত বেঁটে নয়, বেশ লম্বা। তারপর ভরাট চেহারা। মুখ, গলা, হাত......

না, না, আর তো কিছু দেখিনি। দেখব কেমন করে? তবে হ্যাঁ, ফাইন কালিকো শাড়ীটা এমন সুন্দর করে পরেছিল যে ভরাট দেহের ইঙ্গিত পেতে আমার অসুবিধে হয়নি। বরং বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম। কালকের মত আজকে একটা সাধারণ ডিজাইনের ব্লাউজ পরেনি। একেবারে গলা অবধি উঠে গেছে। রাউণ্ড নেক। বোতাম-গুলো পিছনে......

মনে পড়েছে। মানসীও মাঝে মাঝে অমন ব্লাউজ পরত। আমি জিজ্ঞাসা করতাম, এই ব্লাউজ পরতে অসুবিধে হয় না?

কেন?

বোতামগুলো যে পিছনে?

তাতে অসুবিধে কি?

ন্যাকামী করে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, বোতাম আটকাতে অসুবিধে হয় না?

ও হাসতে হাসতে বলত, সেজন্য তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন?

দুশ্চিন্তা কেন হবে? কর্তব্যের খাতিরে জানতে চাইছি।

তার মানে?

অসুবিধে হলে আমাকে দিয়ে বোতাম লাগিয়ে নিতে পার। আমি হাসতে হাসতেই কথাটা বলতাম।

মানসীও হাসতে হাসতে জবাব দিত, একটি থাপ্পড় খাবে।

আগে আটকে দিই তারপর থাপ্পড় দিও।

পরে মানসী বলেছিল, জান মানিকদা, এই ব্লাউজের নাম কি?

না।

হাসব্যাণ্ড ব্লাউজ।

তার মানে?

হাসব্যাণ্ডরা বোতাম আটকাবে বলেই বোধহয়......

আমি আরো কি যেন বলতে গিয়ে-ছিলাম কিন্তু বলার আগেই ও দৌড়ে পালিয়েছিল।

আজ বুলাও তো ঐ ব্লাউজ পরেছিল: ওর বোতাম আটকাতে অসুবিধে হয়নি?

আবার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ভাবছি ওর ব্লাউজের কথা। মানসী মুখে যাই বলুক, আমাকে অনেক দিন ওর ব্লাউজের হুক আটকে দিতে হয়েছে। বুলাকেও দিতে হবে নাতো?

সিগারেটটা ফেলে দিতে দিতে হেসে ফেললাম।

এখন আর কিছু ভাবছি না। ভাবতে ইচ্ছা করছে না। শুধু বুলার কথাই ভাবছি।

আচ্ছা, ওকে কিছু প্রেজেনটেশন দিলে হয় না? প্রেজেনটেশন দিতে খুব ইচ্ছা করে কিন্তু দেব কাকে? কে নেবে আমার উপ-হার? আমার দেওয়া উপহার নিয়ে কে আনন্দ পাবে? খুশী হবে? বুলা হবে না? নিশ্চয়ই হবে। প্রেজেনটেশন পেলে সবাই খুশী হয়, ওরও হওয়া উচিত। কিন্তু আমার প্রেজেনটেশন দেওয়া কি ঠিক হবে? মাত্র দু' একদিনের পরিচয়ের পরই প্রেজেন-টেশন দিলে কিছু মনে করবে নাতো? মনে করবে নাতো কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলবে উপহার দিচ্ছি?

না, না, অত শত ভাবার কি কারণ আছে? পরিচয় দীর্ঘদিনের হলেই কি সব অধিকার জন্মায়? সময়ের হিসাব করেই কি পরিচয়ের গভীরতা?

তাছাড়া কোন প্রিয়জনকে, কোন শুভা-কাঙ্ক্ষীকে কিছু দিতে ইচ্ছা করছে। খালি ইচ্ছা করছে। কিছু দিলে মনটা ভাল লাগত। একটু হাল্কা বোধ হতো নিজেকে।

যা মনে করবে করুক। আমি বুলাকে একটা প্রেজেনটেশন দেবই। যদি রাগ করে, অসন্তুষ্ট হয়, ফেরত নিয়ে নেব। রাস্তায় যে কোন ভিখারীকে দিয়ে দেব আর ওদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দেব। এর বেশী আর কি হবে?

ভাবছিলাম কি প্রেজেনটেশন দেব। বই? ফাউণ্টেন পেন? কোজি হ্যাণ্ডব্যাগ? নাকি শাড়ী? সুন্দর একটা শাড়ী। আমার দেওয়া শাড়ী ও সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রাখবে। সেই তো ভাল। সঙ্গে একটা ব্লাউজ? না, না, ব্লাউজ কি প্রেজেনটেশন দেব? তাছাড়া আমি ওর সাইজ জানব কেমন করে? শুধু শাড়ীই দেব।

হাতের ঘড়িটা দেখলাম। আজ আর হলো না। আমি রাজপুর রোডে পৌঁছতে পৌঁছতেই দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া পছন্দমত শাড়ী কিনতে হলে বেশ সময় দরকার। অনেক শাড়ী না দেখলে ঠিক পছন্দসই জিনিস কেনা যায় না। দুলালকে প্রথম শাড়ী দেব; সুন্দর পছন্দসই শাড়ী দিতে হবে। ওর ভাল লাগা চাই খুশী হওয়া চাই। ওর ভাল লাগলে, খুশী হলে আমারও ভাল লাগবে। মনে শান্তি পাব। আত্মতৃপ্তি পাব।

ঠিক করলাম কাল কিনব। দুপুরের দিকে কিনব। দোকানগুলো তখন ফাঁকা থাকে। তারপর সন্ধ্যের কাজকর্ম শেষ করে যেদিন পারে ওদের বাড়ী যাব। ও তখন একলা থাকবে। যদি খুশী হয়, তাহলে তো কথাই নেই। আর যদি রাগ করে, অসন্তুষ্ট হয়, আমাকে অপমান করে তাড়ালেও ভাল। অন্ততঃ আর কেউ থাকবে না। আমার দুঃখের কথা, লজ্জার কথা, অপমানের খবর আর কেউ জানতে পারবে না।

বড় কি ভাবছি। ভাল মন্দ—দুইই

লাভ করুন 5%

করমুক্ত সুদ

7 বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটে

এতে 5% করমুক্ত সুদ পাওয়া যায়। যদি আপনার আয় বেশী হয়, নিম্নোক্ত হারে আপনি সুদ পাবেন:

যদি আয় হয়	আপনি পাবেন
20,000 টাকা	6.37%
30,000 টাকা	7.99%
40,000 টাকা	9.39%
50,000 টাকা	14.71%

বিশদ বিবরণীর জন্যে আপনার বাড়ীর কাছের পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিন।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

70/265

তবু বেশ লাগছে। বুলা যেন নতুন বসন্তের জ্যোৎস্না। ওর সঙ্গে পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে যেন একটা সুরের, একটা ছন্দের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আমার জীবন থেকে যে সুর, যে ছন্দ হারিয়ে গিয়েছিল, যে সুন্দর বিদায় নিয়েছিল, সে যেন আবার ফিরে আসছে। হয়ত ক্ষণিকের জন্য, তবু ভাল।

আমি কতদিনই বা এখানে থাকব? আরো দশ-বারো সপ্তাহ। এরপর তো আর বুলাকে পাব না, পেতে পারি না। পাবার কোন কারণ নেই, দাবী নেই। এসব জানি। জানি দেরাদুন ছাড়ার সময় মনটা খারাপ হয়ে যাবে। ভীষণ কষ্ট হবে। অথচ কাউকে সে কথা বলতে পারব না, বোঝাতে পারব না। হয়ত বুলাকেও না। তা হোক। ওর মিষ্টি স্মৃতি তো হারাবে না, কেউ কেড়ে নিতে পারবে না!

সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। এবার অন্ধকার নেমে এসেছে। দূরের শিবালিক পাহাড় অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত আকাশের কোলে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। গেস্ট হাউসের আলো-গুলোও জ্বলছে। বেয়ারাটা আমার ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল। ওকে একটু চা দিতে বললাম।

'সাব, ডিনার......'

'ডিনার ইধারই হোগা।'

বেয়ারাটা চলে গেল। একটু পরেই চা নিয়ে এলো।

চা খেতে খেতে হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা মিঃ রায়ের খবর কি? উনি হয়ত আমারই জন্য বসে আছেন। মিসেস রায় আমার জন্য রান্না করেননি তো?

চা খেয়েই সামনের লবীতে গিয়ে টেলিফোন করলাম। চাকরটাই টেলিফোন ধরল।

'সব কাহা?'

'সাব-মেমসাব বাহার গিয়া।'

'খানাভি বাহার?'

'জি হা সাব।'

নিশ্চয়ই কোথাও নেমন্তন্ন আছে। হয়ত এই নিউ ফরেস্টেই কোন অফিসারের বাড়ী। অথবা শহরে। অথবা অন্য কোথাও।

ডক্টর সরকারের ওখানে যাননি তো?

আশ্চর্য কি।

তাহলে তো ওখানে খুব জোর আড্ডা জমেছে। খাওয়া-দাওয়াও বেশ ভাল হবে। কিন্তু.....

কিন্তু বুলা তো কিছু বলল না।

তাহলে কি মিসেস রায়ই টিফিন কেরিয়ার ভর্তি করে নিয়ে গেছেন? হতে পারে। কিন্তু......

আবার কিন্তু: আমার চিন্তা-ভাবনার মাঝে মাঝেই এই একটা কিন্তু এসে হাজির হয়। আমি চলতে চাই সামনের দিকে। পারি না। এই কিন্তু এসে বাধা দেয়, টেনে ধরে।

আমাকে তো ওরা ডাকলেন না? ওরা সবাই মিলে আনন্দ করছেন অথচ আমাকে খবর দিলেন না? ওরা সবাই আমাকে ভালবাসেন। সবাই জানেন আমি একলা। একেবারে একলা। একটা কথা বলার লোক পর্যন্ত নেই। তবু......

সব ভাবনা-চিন্তার পিছনেই একটা যুক্তি থাকে। অন্ততঃ থাকা উচিত। আমার এইসব ভাবনার পিছনেও যুক্তি থাকা উচিত। ওরা আনন্দ করলেই যে আমাকে ভাগ দিতে হবে, তার কি কারণ আছে? আমি গেলে যদি ওরা আনন্দ পেতেন তাহলে নিশ্চয়ই খবর দিতেন। ওদের দুজনেরই তো গাড়ী আছে। খবর দিতে আর কমিনিট লাগত? তাছাড়া টেলিফোন তো আছেই। বুলা যদি টেলিফোন করে ডাকত তাহলেই ছুটে যেতাম। এখন রাত্রি হয়ে গেছে। চাক্রাতা রোডের মোড়ে গিয়েও হয়ত অটো-রিকসা পাব না। বাসের তো কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই। তাতে কি হয়েছে? হেঁটেই চলে যেতাম। একটু জোরে জোরে হাঁটলে কমিনিটেরই বা পথ? বড় জোর পনের-কুড়ি মিনিট।

আপন মনে এইসব কথা ভাবছি আর দূরের শিবালিক পাহাড়ের মাথায় মুসৌরীর আলো দেখছি। দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ মুসৌরী বেড়াতে যায়। আনন্দ করতে যায়। আমি তাগিদ বোধ করছি না। কেন যাব? প্রাকৃতিক শোভা দেখা যায়? শূন্য মন নিয়ে কি প্রাকৃতিক শোভা দেখা যায়? দেখলেও ভাল লাগে? সুখে-দুঃখে একজন অংশীদার চাই। একলা একলা সুখ বা দুঃখ কোন কিছুই ভাল লাগে না, সহ্য করা যায় না।

বুলার সঙ্গে মুসৌরী যাওয়া [illegible] না?

নাঃ। আর না। অনেক হয়েছে। [illegible] করে বসে বসে ভাবলে হয়ত এবার বুলাকে নিয়ে শুতে চাইব।

উঠে পড়লাম।

ঘুরে দাঁড়াতেই যেন ভূত দেখলাম।

আমার ঘরের দরজায় বুলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে?

ঘরে আলো জ্বলছিল। আমি স্পষ্টই ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তবু ঘাবড়ে গেলাম। ভীষণ ভয় পেলাম।

ভয় কাটবার জন্য একটু জোরেই জিজ্ঞাসা করলাম, কে? [illegible]

বুলা হাসতে হাসতে দু'পা এগিয়ে এলো। 'কেন চিনতে পারছেন না?'

'কল্পনাও করতে পারিনি আপনাকে এমনভাবে দেখতে পাব।'

'কেন আমি কি আসতে পারি না?'

'আসতে পারলেই যে আসবেন তার কি কারণ আছে?'

'আপনি তো আমাকে আসতে বলেন নি?'

একটু লজ্জিত হলাম। তা ঠিক, তবে আমি বললেই যে আপনি আসবেন তার কি মানে আছে?

'আপনি আসতে বললে আসব না?'

'আসবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

ভীষণ খুশী হলাম ওর কথা শুনে। সম্ভব হলে ওকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলতাম, বুলা, তুমি আমাকে বাঁচালে।

আমি চুপ করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শাড়ীর আঁচলটা টেনে গলায় জড়াতে জড়াতে ও বলল, চট-পট তৈরী হয়ে নিন।

কেন?

আমাদের ওখানে যাবেন না?

তার মানে?

[illegible] খাবার-দাবার নিয়ে হঠাৎ [illegible] জোর আড্ডা জমেছে, তাই [illegible] এলাম।

[illegible]?

[illegible] হাসতে বলল, আড্ডা [illegible] কেউ নড়তে চান না তো কি করব? [illegible] এলাম।

জিভ দিয়ে ঠোঁটটাকে একটু ভিজিয়ে নিয়ে এবার জানতে চাইল, কি এত ভাবছিলেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কই? কখন?

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
বিচিত্র কাহিনী
ও
আরও বিচিত্র কাহিনী
পড়ে আনন্দ পাবেন

চেয়ারে বসে বসে এত গভীর ভাবে কি চিন্তা করছিলেন?

এবার আমি হাসলাম। চিন্তা করছিলাম নাকি?

প্রথমে গাড়ীতে বসে বসে হর্ণ বাজালাম তারপর আপনার দরজায় নক করলাম। কোন জবাব নেই। আপনি আপন মনে চিন্তা করছিলেন আর আমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম......

তাই নাকি? আমি তো বুঝতে পারিনি।

তাইতো বলছি কি এত ভাবছিলেন?

হাসলাম। মনে মনে কত কথাই বলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পারা যায় কি? না। পারলাম না। শুধু বললাম, হ্যাঁ ভাবছিলাম অনেক কিছু।

কোন চিঠিপত্র...

ওকে কথাটা শেষ করতে দেবার আগেই বললাম, আমাকে চিঠিপত্র কে লিখবে?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা বলছিলাম। বললাম—বসুন।

আজ চলুন। আরেকদিন বসব।

আজ প্রথম এলেন, একটু বসবেন না?

ও হাসল। আপনি তৌফিল স্ল্যান্ট-মেন্টোল চাই না?

আমি হাসলাম। মুখে কিছু জবাব দিলাম না।

আর দেরী করলাম না। বেরিয়ে পড়লাম। সামনের সিটে দিকে বুলা আগে গাড়ীতে উঠল। সামনের বাঁ দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে ডাক দিল, আসুন।

উঠে পড়লাম।

গাড়ী স্টার্ট হলো। গেস্ট হাউস থেকে এক-আর-ভাইভের মেন রাস্তায় ঘুরে প্রায় বোটানিক্সের কাছে এসে গেছি।

বুলা হঠাৎ পাশ ফিরে বলল, আবার কি ভাবছেন?

আমার মুখ দিয়েও হঠাৎ বেরিয়ে গেল, আপনার কথা।

স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে টার্ণ নিতে নিতে ও বলল আমার কথা?

হ্যাঁ।

আমার কথা কি ভাবছেন?

যা ভাবা যায় তা কি বলা যায়?

এমন কথা ভাবছেন যা বলা যায় না?

গাড়ীটা আরেকবার টার্ণ নিল। চাঁদমারি রোডে এসে গেছি।

আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে বললাম, হাই স্পীডে গাড়ী-টাড়ী আসছে, সাবধানে চালান।

সত্যি পর-পর তিন-চারটে গাড়ী হাই স্পীডে পাশ দিয়ে চলে গেল।

আরো সাবধানে চালাব?

আমি হাসলাম। একবার পাশ ফিরে ওকে দেখলাম।

কি দেখছেন?

আপনাকে।

কেন?

হাজার হোক বাড়ীর ছোট মেয়ে তো। মাথায় বেশ দুষ্টুমি বুদ্ধি জমা আছে!

আর কথা হলো না। আমরা পৌঁছে গেলাম।

ড্রইং রুমে ঢুকতেই ডক্টর সরকার বললেন, তুমি তো আচ্ছা ছেলে?

আমি হাঁ-করে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

বিকেলবেলায় শুধু কফি খেয়েই পালিয়ে গেলে?

তাতে কি হলো?

তুমি জানতে না মাধুরী খাবার-দাবার নিয়ে আসবে?

আমি কি জবাব দেব ভাবছি। ওপাশ থেকে মিসেস রায় বললেন, না দাদা, আমি কোন খবর দিইনি।

ডক্টর সরকার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, কেন?

মিসেস রায় বললেন, উনি দুপুরে বেরিয়েছিলেন। তারপর ভেবেছিলাম সন্ধ্যার দিকে নিশ্চয়ই এখানে আসবেন।

ডক্টর সরকার মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, না, না, ঠিক করনি। একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল। হাজার হোক নতুন এসেছে।

একটু থেমে বললেন ইন এনি কেস এসে গেছে। ভালই হলো।

খুব জোর আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়া হলো। অনেকটা পিকনিকের মত আনন্দ হলো। আমার একটা নতুন উপলব্ধি হলো। বুঝলাম, ওরা সবাই আমাকে ভালবাসেন। এই আনন্দোৎসবে আমাকে অংশ না দিলেও চলত কিন্তু না, তা করেননি।

মিসেস রায় বললেন, কাজকর্মের পর আমাদের যে-কোন এক বাড়ীতে চলে আসবেন। লজ্জা-টজ্জা করার কোন কারণ নেই।

না লজ্জা করব কেন?

পিছন থেকে বুলার গলা শুনলাম, লজ্জা না করলে চুপচাপ গেস্ট-হাউসে বসে ছিলেন কেন?

ওদের সবার সামনেই আমি বুলাকে বললাম, আমার বিরুদ্ধে ওকালতি করতে আপনাকে কে বলছে?

পাল্টা জবাব এলো সঙ্গে সঙ্গে, আপনি মিথ্যা কথা বললেও আপনাকে সাপোর্ট করব, এমন গ্যারান্টি করে দিলাম?

বেশ রাত করেই ফিরলাম। রায়-দম্পতি আমাকে গেস্ট হাউসে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে একটা সিগারেট শেষ করলাম। কি মনে হলো, আরেকটা সিগারেট ধরলাম।

বুলাকে একটা টেলিফোন করব?

নট এ ব্যাড আইডিয়া! তবে আর একটু পরে। ও ততক্ষণে নিশ্চয়ই নিজের ঘরে চলে যাবে। ডক্টর সরকারও ঘুমিয়ে পড়বেন। সেই ভাল। সিগারেট শেষ করে জামাকাপড় পাল্টে নিলাম। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে সামনের বারান্দায় গিয়ে টেলিফোন করলাম।

টেলিফোনের ঘণ্টা বাজতেই বুলার গলা পেলাম, এখনও শুতে যাননি?

না। ভাবলাম আপনাকে একবার ধন্যবাদ জানিয়ে শুতে যাই।

কেন?

আপনার জন্য সারাটা দিন বেশ কাটল। অনেক দিন পর এমন আনন্দ পেলাম।

তার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানাবার কি হলো?

সবই তো আপনার জন্য...

'রিয়েলি?'

'রিয়েলি।'

ডাইনিংরুম থেকে চৌকিদার বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ইসারা করে দেখাল টেলিফোনের তার অনেক লম্বা। আমি ঘরে বসে বসেই টেলিফোন করতে পারি।

বুলাকে বললাম, একটু ধরুন। টেলিফোনটা ঘরে নিয়ে যাই।

চৌকিদার টেলিফোন ঘরে দিয়ে গেল।

আবার কথা বলতে শুরু করলাম, আপনার বাবা শুয়ে পড়েছেন?

'অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।'

টেলিফোনের রিং বাজলেও ঘুম ভাঙেনি?'

'আমার এ ঘরে টেলিফোন এলে বাবার ওখানে আওয়াজ যায় না। বাবার ঘর তো ঐ কোনায় তারপর দরজা বন্ধ।'

'তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই?'

বুলা হাসল, দুশ্চিন্তার আবার কি আছে?

'না থাকলেই ভাল।'

'কাল কখন আসছেন?'

'আসব?'

'আসবেন না?'

'কখন আসব বলুন।'

'যখন ইচ্ছে।'

'ঠিক আছে।'

(ক্রমশঃ)

রসুই গুঁড়া মশলা
ফোন : ৩৩-২৩৪১, ৩৩-১৪৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

মনের কথা

বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা

দুলাল ও বজলাল

—মাথার ডানদিকে কানের গোড়ায় একটা ব্যথা হচ্ছে। ঘুম থেকে ওঠার পরই ব্যথা শুরু হয়, সারাদিন চলে, সন্ধ্যার দিকে বেড়ে যেতে থাকে, রাতের দিকে যন্ত্রণা থাকে না। এর জন্যে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তবে কাজকর্মের খুবই অসুবিধা হয়। অনেক ডাক্তার দেখেছেন, অনেক প্রেসক্রিপশন লিখেছেন। অনেক রকম ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছে। মলমূত্র কত পরীক্ষা করা হয়েছে, এক্সরে করা হয়েছে, ই ই জি করা হয়েছে, তবুও সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় হয়নি। যন্ত্রণাও কমেনি। —বলল দুলাল ঘোষ।

দুলালের তেইশ বছর বয়স, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ। এক ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের অ্যাপ্রেন্টিস। বছরখানেক কাজে ঢুকেছে। মাথার যন্ত্রণাটা অনেক পুরনো; বছর দশেক আগে যখন প্রথম হোস্টেলে গেল, তখন থেকে যন্ত্রণার শুরু। একভাবে চলে আসছিল, বছর খানেক হল বেড়েছে। কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

দুলাল পিতামাতার তৃতীয় সন্তান, একমাত্র পুত্র। বোন দুটির বিয়ে হয়ে গেছে, তারা মোটামুটি সুস্থ। তবে মায়ের স্বাস্থ্য ভাল নয়। অম্বলের ব্যথায় প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকেন। বয়স প্রায় সাতচল্লিশ। বাবা পঞ্চান্ন বছরেও বেশ কর্মঠ আছেন। শিক্ষকতা পেশা, রাজনীতি নেশা। সারাদিন বাইরে বাইরে থাকেন। স্কুলে পড়ার সময়ও তাঁর কাছ থেকে দুলাল পড়াশুনোর ব্যাপারে কোন সাহায্য পায়নি। আর্থিক অবস্থা চলনসই। বাপের ঠিক বিপরীত স্বভাব পেয়েছে ছেলে। শৈশব থেকেই বাইরের জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ নেই। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য কোনো পুস্তকের ধার দিয়ে যেত না। ফুটবল ক্রিকেট দূরের কথা, ক্যারম, পিংপং খেলতে ও উৎসাহ পায়নি। স্কুল আর বাড়ী, বাড়ী আর স্কুল, এর বাইরের আর কিছু জানতো না। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সময় অনেকটা বাধ্য হয়েই হোস্টেলে থাকতে হয়েছে। তবে স্বভাব বদলায়নি। স্কুলেও ছিল নিঃসঙ্গ, কলেজেও তাই রয়ে গেছে। রুমমেটদের সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় দু-চারটে কথা বলা ছাড়া, অন্য কারো সঙ্গে বিশেষ বাক্য বিনিময় করেনি। লেখাপড়ায় ভাল ছিল, ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পাশ করে বেরিয়েছে।

—কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। মনে হয়, আমি নিজের কথা ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারি না। অন্যে আমাকে বুঝতে পারবে, এ ভরসা আমার হয় না। আমাকে বোঝবার ও জানবার দরকারই বা কি তাদের? বন্ধুত্ব আমার কারুর সঙ্গে গড়ে ওঠেনি। বন্ধুত্বে আমার বিশ্বাস নেই। ভালবাসা আমার মধ্যে নেই, অন্যে আমাকে কেন ভালবাসবে? মানুষের ভালবাসার মূল্যই বা কি? দিদিদের দেখতে ইচ্ছে করে না। আগে আগে ভাইফোঁটায় বড়দি জোর করে এসে তার বাড়ী নিয়ে যেত, নিরুপায় হয়ে যেতাম, আজকাল আর যাই না। ছোড়দি দিল্লীতে থাকে, অনেকবার যেতে লিখেছে, আমি যাইনি। কি হবে গিয়ে? বাবাকে ভয় পেয়েছি শৈশব থেকে, এড়িয়ে গেছি যতটা পারি। বাবার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি। তাঁকে ভয় পাই না, তবে ভালও বাসি না। বাড়ী আমার খুব খারাপ লাগে। মা হয় নিজের মনে বক বক করেন কিম্বা পেটের ব্যথায় ছটফট করেন। বাবা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন, ততক্ষণ আরো অশান্তি। মায়ের অফুরন্ত অভিযোগের গুঞ্জন ও বাবার পরিহাস-তরল প্রতিবাদ শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। দুজনের মধ্যে একদিনও সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। বাবার মেজাজ, মায়ের মেজাজ, তাই বোধ হয় বাপ-বিসম্বাদ লেগেই আছে। দিদিমার মুখে শুনেছি, তাই বললাম। এই আপনাকে যা বলছি, তাও মনে হয়, ঠিকমত বলতে পারছি না। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে, থেমে থেমে, সময় নিয়ে কথাগুলো বলল দুলাল। দুলাল সব থেকে কষ্ট পায় কারখানায় গিয়ে। নিজের মনে উৎসাহভরে কাজ করে চলেছে যারা তাদের দেখে ওর অস্বস্তি বোধ হয়। ও কাজ করতে পারে না। কাজ করতে গেলেই যন্ত্রণাটা বেড়ে ওঠে, মনে হয় মস্তিষ্কের মধ্যে কে যেন তুরপুন চালাচ্ছে। মগজের মধ্যে অনেকগুলো ছিদ্র হয়ে গেছে। এক ডাক্তার নাকি বলেছেন ওর মস্তিষ্কের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশৃংখলা ঘটেছে। ওর মনে হয়, মগজের মধ্যে অনেক ছিদ্র থাকার ফলেই এ-রকম হচ্ছে। কোনো একটা ধারালো সরু বস্তু দিয়ে জিনিষ বোধ হয় মস্তিষ্কের ডান পাশটাতে ঢুকে আছে। হয়তো একটা মালফরমেশন, কনজেনিটাল ডিফেক্ট। যারা কাজ করে না, তারা বেশ আড্ডা দিয়ে হৈ-চৈ করে সময় কাটায়: দুলাল তাও পারে না। কথা বলায় অনীহা, ক্লান্তি। কথা বলে অন্য লোকদের কিছু বোঝাবার ক্ষমতাও নেই। কথা-বলে লাভ কি? কাজই বা করবে কেন? কাজ করার সার্থকতা কি? বুদ্ধিবৃত্তির দিকে কি হবে? সম্পদ-ঐশ্বর্যের মূল্য কি? এই সব নানা প্রশ্ন দুলালের মনে আসে, উত্তর মেলে না। উত্তর সে চায়ও না। পিতার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে তার আস্থা নেই, সমাজ পরিবর্তনে সে বিশ্বাসী নয়। পরিবর্তনের ফলে মানুষের দুঃখ-কষ্টের লাঘব হবে না। অনর্থক পণ্ডশ্রম। দুঃখকষ্টের অনুভূতি তার নেই, অন্যের দুঃখকষ্ট সে বুঝতে পারে না। দুঃখ-কষ্ট দূর হল কি হল না এ নিয়ে তার কোনো চিন্তা নেই। তার যা কিছু চিন্তা, নিজের মাথা ব্যথা নিয়ে। না, কারুর ওপর রাগ বা বিদ্বেষ তার নেই। কাউকে সে ঘৃণা করে না। বাড়ী তার ভাল লাগে না, আবার বাইরে বেড়াতেও ইচ্ছে করে না। সে একলা থাকতে চায়, কিন্তু বাড়ীর লোকেরা তাকে একলা থাকতে দিচ্ছে না। কাজ করার তার ক্ষমতা নেই, তবু কাজে পাঠাবার জন্যে অনবরত তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। আমি কেন তার যন্ত্রণাটা কমিয়ে দিই। নেহাৎ যদি না পারি, তবে তাকে যেন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমিয়ে থাকা যায়, এমন কোনো ওষুধের ব্যবস্থা করি।

দুলাল বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় ভুগছে। পরিবারের কারুর প্রতি তার আসক্তি নেই, আস্থাও নেই। পিতাও আর্থিকভাবে বিচ্ছিন্ন, অন্তত নিজের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হবার চেষ্টায় রাজনীতিতে মেতেছেন। মা খিটখিটে ও কলহপ্রিয়, স্বামী ও সংসার তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। স্বামীর সংসার সম্পর্কে নির্লিপ্ততা দুলালের মাকে নিউরোটিক করেছে। [illegible] [illegible] আর্তিকর। [illegible] [illegible] সন্তানের আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ জাগাতে পারেন নি। অধিকন্তু অসুস্থ সামাজিক পরিবেশ তার আস্থাহীনতা ও বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়েছে। পিতার বিচ্ছিন্নতা আর্থিক, তাই তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর করার একটা

CENTRAL LIBRARY

ত্রুটি আছে। দুলালের বিচ্ছিন্নতা, বলা যেতে পারে, সামগ্রিক। তাই তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা নিরসনের কোনো চেষ্টা নেই। কোনো চেষ্টা নেই বলা বোধ হয় ঠিক হল না। মাথার যন্ত্রণা ও যন্ত্রণার জন্যে মাঝে মাঝে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা নিরসনের একটা অতি ক্ষীণ চেষ্টা বলা যেতে পারে। তবে চেষ্টা আন্তরিক নয়। দুলাল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও নিজের সত্তা থেকে এখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। সে ঠিক স্কিজোফ্রেনিক নয়। দুলালের বিচ্ছিন্নতা নিষ্ক্রিয় বিচ্ছিন্নতার নিদর্শন। সেজন্যে প্রতিবাদ নেই, ক্রোধ নেই। কোনো রকম ধ্বংসাত্মক প্রবণতা নেই।

মস্তিষ্কের টাইপের দিক থেকে, দুলাল হচ্ছে 'ইন্ট্রোভার্ট' ও 'রোমান্টিক' টাইপের মাঝামাঝি। তার মন শিল্পীর মন নয়, আবার চিন্তাশীলেরও নয়। হঠকারী অতি উত্তেজনাপ্রবণ মস্তিষ্কও নয়, আবার নিজের জন্যে অধিকারবোধ নেই। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সে 'আনকমিউনিকেটিভ, আনকনসার্নড'।

এইবার ব্রজলালের কথা বলছি। বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ এখানে অন্যভাবে। মস্তিষ্কের টাইপ আলাদা, পরিবেশ স্বতন্ত্র, তাই প্রকাশ ভিন্নতর।

ব্রজলাল ছবি আঁকে, নাটক লেখে। কোনোটাই পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়নি, কোনো নাটকের শেষ দৃশ্য লেখা হয়নি। সে বুদ্ধিমানের মত শিল্প ও নাট্য আন্দোলনের খোঁজ খবর রাখে। পোলক, ক্লাইনের সে বিশেষ ভক্ত। কথাগুলো শুধু বিমূর্ত নয়, বিমূর্ত বলতেই বোঝায় সঠিক কালের ছবি ফুটে উঠবে—এই তার ধারণা। অতি ব্রেটনের ম্যানিফেস্টো হয় সার্রিয়ালিজম, এর মধ্য শিল্পীর সত্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটেছে। দুশো আর আইনস্টাইনকে বিশ্বাসই বর্তমানকে প্রকাশ করা চলে, অন্য কোনোভাবে নয়। তার কথাগুলো গুছিয়ে, বেশ সুস্পষ্টভাবে আমায় প্রকাশ করল ব্রজলাল।

—আমি শিল্পী, আমি স্বাধীন, আমি স্বতন্ত্র। গতানুগতিকতার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিঃসঙ্গ, এই নিঃসঙ্গতাই আমার বিশিষ্টতা। নিজের মত করে আমি সমাজকে দেখব, নিজের ভঙ্গীতে আমি আমার মনোভাব প্রকাশ করব। ক্লাইনের থেকে আমার দৃষ্টি আরো গভীরে অনুপ্রবিষ্ট। এই আঁকাবাঁকা বিস্ফুটাকার পৃথিবীতে আমরা সবাই অদ্ভুত। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই, সংযোগ নেই। সমাজের মানুষগুলো সব ক্ষ্যাপা। সকলেই ক্ষমতালোভী আর নৃশংস। সবাই ক্ষমতা চায়, অন্যের উপর কর্তৃত্ব চায়, তাই পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করে, ঘৃণা করে। ক্ষমতার জন্যে অবাধে নরহত্যা করে চলেছে। আমি তাই স্বেচ্ছায় এই সমাজকে বর্জন করেছি। আমি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চাই, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে চাই। পপ আর্টের মত আমি 'কুল অ্যান্ড ডিটাচড' হতে চাই।

ব্রজলালের দশ বছর বয়সে পিতামাতার মৃত্যু হয়। এখন সে ত্রিশ। বাবার ছিল বদলীর চাকরী। সে মিশন স্কুলে পড়েছে, স্কুলবোর্ডিংএ থেকেছে অতি শৈশব থেকে। গৃহের উত্তাপ-স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। স্কুলের পরীক্ষা দিয়ে কয়েক মাস দাদার আশ্রয়ে ছিল। পছন্দ হয়নি দাদা-বৌদিকে, তাই বাড়ী ছেড়ে আবার বোর্ডিংএ যায়। বাবা কিছু টাকা-পয়সা রেখে গেছেন, দাদাও মাঝে মাঝে কিছু অর্থ সাহায্য করে থাকেন। তিনি গত সাত বছর বিদেশে আছেন। প্রথমে ছবি আঁকতে সুরু করে। কোনো দিন নিজের ছবির প্রদর্শনী সে করেনি। ঐ সব সস্তা 'পপুলারিটি' সে ঘৃণা করে। আর্ট-ক্রিটিকদের সে আরও ঘৃণা করে। এদেশে যে যত বেশী গবেট, সে তত বড় ক্রিটিক। এখন আর ছবি আঁকে না, নাটক লিখছে। নাটক শেষ করা ছবি শেষ করার চেয়েও কঠিন কাজ। নাটকের বাজার ঘুরে দেখেছে, এখানেও সব থার্ড ক্লাস 'কোরিয়োগ্রাফিস্টদের' ভীড়। ছবির থেকে নাটক বোঝা আরো কঠিন। নাটক বুঝতে হলে বহু 'ডাইমেনশনের' জ্ঞান থাকা দরকার, শুধু তিন ডাইমেনশনের কাজ নয়। [illegible] নাটক লেখা উচিত ছিল আর বেকেটের শুধু উপন্যাস। ইয়োনেস্কোর মত আমিও অ্যান্টিথিয়েটার, অ্যান্টিড্রামাটিস্ট। মানুষে মানুষে ভাব-বিনিময় সম্ভব নয়। আমরা সকলেই আত্মসমাহিত। অস্তিত্ব আর আত্মা আলাদা হয়ে গেছে। উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন বিকৃত মানুষ পুতুল খেলার পুতুলের মত অদৃশ্য সুতোর টানে হেলছে দুলছে কাঁদছে হাসছে। মানুষের জীবন অর্থহীন, কাজ অর্থহীন; এইসব বলা আরো অর্থহীন। আপনার কাছে আসাও পুরোপুরি অর্থহীন। আমি কি তাই বুঝতে আপনার কাছে এসেছি। আমি নাটক শেষ করার শক্তি পেতে আপনার কাছে এসেছি। এও একটা অ্যাবসার্ড অভিযান। যৌনপীড়িত বৃদ্ধার অভিসারের মতন।

এইভাবে ব্রজলাল কথা বলল। হিপি, ইপি, নিউ লেফট, 'ইকোনোক্লাজম'—ইত্যাদি নানা ব্যাপার নিয়ে বকে গেল কয়েকদিন ধরে। দুলালকে সাধাসাধনা করে কথা বলাতে হত, আর ব্রজলাল বকেই চলত। দুজনেই মনে করত মানুষে মানুষে কথার সাহায্যে ভাব বিনিময় সম্ভব নয়। শব্দগুলোর অর্থ হারিয়ে গেছে। অথচ সেই শব্দ সাজিয়ে গুছিয়ে 'রেডি মেড' চটকদার পোশাক পরিয়ে বাজারে ছাড়ার কী তীব্র ইচ্ছা এই ব্রজলালের। দুলাল কামু, সার্ত্র এর কোনো বই পড়েনি, কিয়েরকেগার্ডের নাম জানে না। যৌন ব্যাপারের আলোচনায় বিমুখ। আর ব্রজলাল অনবরত ক্লাসিককে তুচ্ছ করছে, অতি-আধুনিকদের কোটেশন আওড়ে চলেছে। হিপিদের কালচার আর নিজের যৌন অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার সঙ্গে বেপরোয়া আলোচনা করেছে। দুজনেই বিচ্ছিন্ন। দুলালের বিচ্ছিন্নতা নিষ্ক্রিয়—নিরুত্তাপ; বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি আর চরম, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা ব্যাপারে সে অজ্ঞ; তত্ত্ব নিয়ে তার আগ্রহ নেই। আমার কাছে কেন এসেছে, সে জানে। অপরদিকে ব্রজলাল বিচ্ছিন্নতাবোধে বিব্রত, বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সে বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হতে চায় সে অনেক বেশি সক্রিয়। ছবি বা নাটকের মধ্য দিয়ে অন্যান্য বিচ্ছিন্ন শিল্পী সাহিত্যিকের মত বিচ্ছিন্নতার যাতনা থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু আমার কাছে সে কেন এসেছে জানে না। দুলাল নিজের অজ্ঞাতে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ব্রজলাল স্বেচ্ছায় সমাজকে 'রিজেক্ট' করেছে। দুজনের শৈশব কৈশোরের পরিবেশ ও মস্তিষ্ক টাইপের স্বাতন্ত্র্যের জন্যে বিচ্ছিন্নতা দুই-ভাবে দুজনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

ব্রজলালের মস্তিষ্কের টাইপ আর্টিস্টিক অর্থাৎ অনুভূতিপ্রবণতা তার মধ্যে বেশি। দুলালের মত তার মস্তিষ্কেও উত্তেজনা-নিস্তেজনা প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন। তবে দুলাল ফ্লেগমাটিক, ব্রজলাল স্যাংগুইনাস। ব্রজলালের পরিবেশে কোনোদিন দুলালের অসুস্থ পিতামাতার প্রভাব পড়েনি। গৃহ আরামে সে বঞ্চিত; কিন্তু দুলালের মত নিরানন্দ পরিবেশেও তার শৈশব কাটেনি

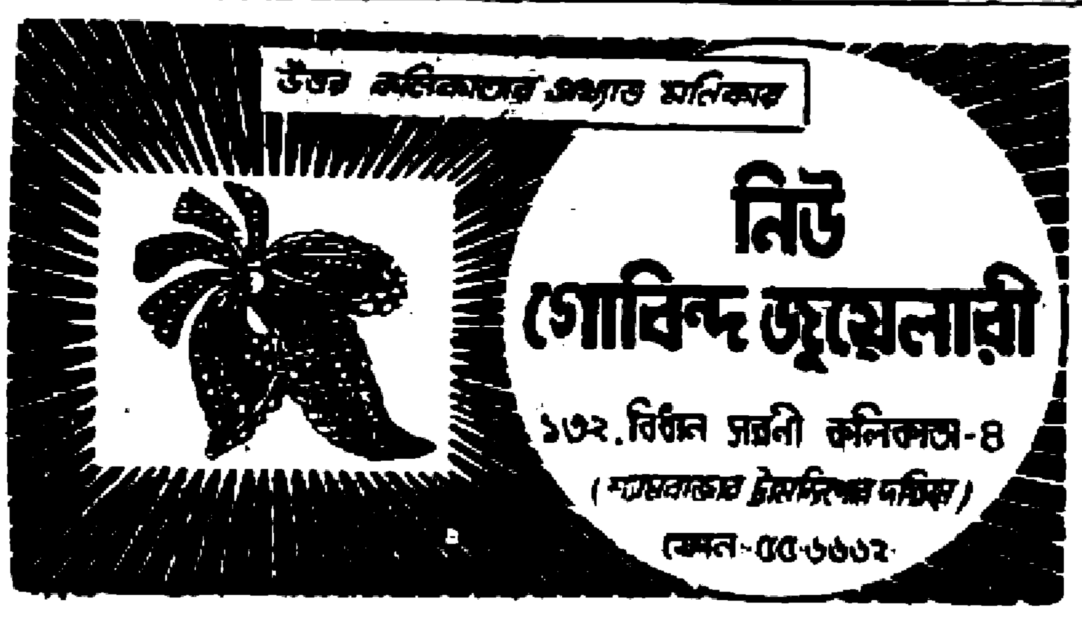

হয়নি। এদিক দিয়ে তাকে বেশি সৌভাগ্যবান বলা চলে। শৈশব থেকে বোর্ডিং-এ অনেক লোকের মধ্যে থাকার ফলে ভাববিনিময় তাকে করতে হয়েছে, মেলামেশা করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই তার বিচ্ছিন্নতা চরমে ওঠেনি। 'কমিটমেণ্টের ইচ্ছা তেমন না থাকলেও, 'কম্যুনিকেট' করার ইচ্ছা তার রয়েছে। না হলে ইজেল বয়ে বেড়াবে কেন অথবা নাটকের পাণ্ডুলিপিই বা আমাকে দেখাতে যাবে কেন? বোর্ডিং-এ নানা ভাষাভাষী ছেলেদের সঙ্গে শৈশব কাটানোর জন্যে সে ভাববিনিময়ের অসুবিধা বোধ করেছে, কিন্তু ভাববিনিময়ের ইচ্ছা হারায়নি। ছবি আঁকার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্যে তার অন্যের কাছে নিজেকে মেলে ধরবার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। ছবির ভাষা সর্বজনীন, তাই ছবিতে তার উৎসাহ। পরে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কবিতা উপন্যাসের পাঠকদের অস্তিত্ব অনুমানের ব্যাপার, এখানে "কম্যুনিকেশন' পরোক্ষ। নাটকের দর্শক নাট্যকারের চোখের সামনে উপস্থিত থেকে পাত্রপাত্রীর মাধ্যমে নাট্যকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে; 'কম্যুনিকেশন' অনেকটা প্রত্যক্ষ। প্রথমে নাটক লিখতে চেয়েছে ইংরাজীতে, পরে লিখেছে মাতৃভাষায়। অনেক বেশি লোক পড়বে ও অনেক বেশি লোক দেখবে ইংরাজী ভাষায় লেখা হলে, তাই ইংরাজীতে লেখার ঝোঁক। কমলের বিচ্ছিন্নতাবোধ বহুলাংশে ঐ সংক্রান্ত আলোচনা ও পড়াশুনো দ্বারা প্রভাবিত, সবটা শৈশব-নিঃসঙ্গতা ও ছাত্রাবাসের স্নেহ-উত্তাপহীন পরিবেশজাত নয়। বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ জানতে গিয়ে সে বোধ হয় ক্রমে বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবুও তার বিচ্ছিন্নতা দুলালের মত সর্বাত্মক হয়ে উঠতে পারেনি। তার ছবি সে শেষ করতে পারবে, তার নাটকের শেষ দৃশ্যের উপর যবনিকা একদিন পড়বে, কিন্তু দুলালের যন্ত্রণার উপশম হবে বলে মনে হয় না।

গত তিন সপ্তাহে পাঠকদের সঙ্গে তিনটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা ও উপসর্গ সম্বন্ধেও কিছু লিখেছি। বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা সকলেরই আছে। তাই বিচ্ছিন্নতার সংজ্ঞা নির্ণয়ের দুরূহ চেষ্টা থেকে বিরত থাকছি। তবে অতি সংক্ষেপে এ সম্পর্কে দু-একটি কথা জানানো দরকার, না বললে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

ইংরাজীর 'অ্যালিয়েনেশন' শব্দটির সঠিক প্রতিশব্দ হিসাবে আমি 'বিচ্ছিন্নতা' কথাটি ব্যবহার করেছি। 'অ্যালিয়েনেশন' সমস্যা আজ শুধু সমাজতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকের গবেষণা বিষয় নয়; এ সমস্যা আজ সর্বসাধারণের সমস্যা, সকলেরই চিন্তার বিষয়। অনেকের ধারণা এটা বুঝি শুধু আমেরিকার মত প্রাচুর্যের দেশের সমস্যা অথবা কেবলমাত্র পশ্চিমদেশে অতি-অগ্রসর দেশের সমস্যা। আমি তা মনে করি না। শুধু নিউরোটিক সাইকোটিক নয়, আরো নানা ধরনের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সংখ্যা আমাদের সমাজেও ক্রমবর্ধমান। সমাজ ও রাষ্ট্র আর কিশোর তরুণদের একাংশকে কোনোমতেই সংযত, আস্থাশীল, সন্তুষ্ট রাখতে পারছে না। পুরনো ঐতিহ্য কিম্বা ভবিষ্যতের আশা এই অংশকে আকৃষ্ট করছে না। পিতা-পিতামহের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে বিধাতার মত এরা নিজের জগৎ সম্পূর্ণভাবে নিজের চেষ্টায় সৃষ্টি করতে চাইছে। কেউ বর্তমান ব্যবস্থার উপর বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে সমাজের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে; কেউবা এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। বস্তুতন্ত্রসম্মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এই সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ ও সমাধান চেষ্টা সম্ভব নয়।

—মনোবিদ্

ভারদ্বাজ বংশ

অজয় হোম

ভারদ্বাজ বংশীয় (আলাউডিডি) পাখিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ডানা বা পালকে যে কাটা কাটা দাগ থাকে তা সামনের অংশের সঙ্গে পিছনের অংশের পাশাপাশি সমান্তরালে থাকে না, থাকে বাঁকা বা তেরছাভাবে। পক্ষিবিজ্ঞানীদের অন্তর্গত অন্য কোনও বংশে এরূপ দেখা যায় না। বাহ্যতঃ খঞ্জনটি বংশের (মোটাসিলিডি) ভূলিকা গণের (অ্যানথুস) পাখির সঙ্গে ভারদ্বাজদের এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য যে বহু অভিজ্ঞ লোকও সময়ে সময়ে ভুল করে ফেলেন। ভারদ্বাজদের স্ত্রী-পুরুষের চেহারাতে কোনো তফাৎ নেই। আচার-ব্যবহারেও মোটামুটি একই রকম।

ভারদ্বাজ বংশে ৯টি গণ। তার মধ্যে ৫টিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় এবং অপর একটি বর্মাও বাংলার পাখি শিকারী, শুধু মধুর তাদের গলা পাখিপ্রেমিকদের দৌলতে আশ্রয় পায়। পশ্চিমবঙ্গের ৫টি গণ হল—ভারদ্বাজ (আলাউডা), ইন্দীবা (মিরাফ্রা), গর্দভক (এরেমোপটেরিক্স), ভূচর (আম্মোমানেস) এবং বাবুই (ক্যালানড্রেলা)। অপরটি অর্থাৎ যেটি পশ্চিমবঙ্গের নয় সেই গণটি—ঝুঁটিভরত (গালেরিডা)।

ভরত পাখি

নদীর নাম ইছামতী। কেউ বলে যমুনা। বয়ে চলেছে বনগাঁ লাইনে ২৪ পরগণার মছলন্দপুর আর গোবরডাঙ্গার মাঝখান দিয়ে। খুবই ছোট্ট নদী। দুপাশে বাঁশঝাড়, ঝোপঝাড়। ইছামতী মজে পড়েছে।

—ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি, অর্থাৎ ফাল্গুনের গোড়া। পরিষ্কার আকাশ। রোদ ঝলমল দিন। শীতের আমেজ এখনও বেশ আছে। গোবরডাঙ্গার দিক দিয়ে পৌঁছেছি মছলন্দপুর ঠাঁই। নদীকে বাঁয়ে রেখে আল ধরে চলেছি উত্তরদিকে।

হঠাৎ পায়ের কাছ থেকে একটা পাখি উড়ল। পাখিটা যে আমার পাশে ছিল তা নজরে পড়ে নি। এমনই গায়ের রং যে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। পালকের উপর সরু সরু কালো টান, তলাটা ধূসর-সাদা। প্রায় চড়াইয়ের মতো। আমায় আসা দেখেও অন্য পাখির মতো দৌড়ে বা উড়ে পালায় নি।

নিশ্চয় এদের তা স্বভাব নয়। মানুষ এদের খুব কাছে এলে ঠিক মাটিতে মিশে পড়ে থাকে। তারপর ওড়ে।...আরও একটা উড়ল...আরও একটা। পাঁচ...ছয়...সাত। প্রাণ পেয়ে যেন উঠে পড়ল।

দাঁড়ানো অবস্থায়। একজন মাটি থেকে সমান্তরালে খানিকটা উড়ে যাবার পর ওপরে উঠতে লাগল। ধাপে ধাপে সোজা খাড়াভাবে উঠতে লাগল। মুখে মিষ্টিস্বরে ডাক—'চির-র্‌-র্‌-র্‌...চিরর...'।

গান গাইতে গাইতে সোজা উঠছে। পা দুটোকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এতদূর উঠল যে খালি চোখে আর দেখা যায় না। দূরবীণ লাগিয়ে দেখছি। একসময় উপরে ওঠা বন্ধ করে ঘন ঘন পাখা নেড়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল। কিন্তু গান একবারও থামল না। ছ-সাত মিনিট নিশ্চয়ই হবে, দশ মিনিটও হতে পারে, ঘড়ি দেখিনি ঠিক অমনিভাবেই স্থির হয়ে রইল। তারপর পাখা বন্ধ করে দিল। পড়তে লাগল পাথরের টুকরোর মতো। খানিকটা পড়ার পর আবার পাখা নেড়ে স্থির হয়ে গান গাইতে লাগল। আবার পড়া আবার গান গাওয়া। শেষে মাটির কাছাকাছি এসে তেরছাভাবে সোজা উড়ে এল যেখান থেকে উড়েছিল প্রায় সেখানে।

আবার উড়ল। এবার দেখাদেখি আরও অনেক পাখি উড়তে লাগল। পাল্লা দিয়ে গান গাইতে লাগল কে কত ভালো গাইতে পারে। এদের গান যে একবার শুনেছে সে আর ভুলতে পারবে না। রোদ ঝলমলে দিনে এদের ওড়া আর গান শুনে এদের উদ্দেশে লেখা শেলীর বিখ্যাত কবিতার লাইনগুলো আপনা থেকেই মনে এল—

'হাইয়ার স্টিল অ্যান্ড হাইয়ার
ফ্রম দি আর্থ দাউ স্প্রিংগেস্ট,
লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার;
দি ব্লু ডীপ দাউ উইংগেস্ট,
অ্যান্ড সিংগিং স্টিল ডস্ট সোর,
অ্যান্ড সোরিং এভার সিংগেস্ট।'

কবি শেলী যাদের দেখে লিখেছিলেন তারা হল এই পাখিদের জাতভাই (আলাউডা আরভেনসিস)। শীতকালে ইওরোপ থেকে পরিযায়ী হয়ে ভারতে মাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশ স্পর্শ করে।

গোবরডাঙ্গায় যে পাখিগুলোকে দেখলাম তারা হল ভারদ্বাজ গণের (আলাউডা) অপর প্রজাতি—ভরত, ভারুই (আলাউডা গালগুলা)। হিন্দি—ভরত। ইংরেজি—ইস্টার্ন স্কাইলার্ক, স্মল স্কাইলার্ক। এই গণে দুটি মাত্র প্রজাতি।

ভরতপাখি লম্বায় ৬ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথায় অস্পষ্ট ছোটো ঝুঁটি-সমেত উপরের পালক পাটকিলে। প্রতিটি পালকের মধ্যের রং গাঢ়, ধার হলদেটে-পাটকিলে। চোখের উপর দিকে জয়দের সরু টান। ডানা গাঢ় পাটকিলে এবং প্রতিটি পালকের ধার লালচে। লেজও তাই, কেবল বাইরের দুজোড়া পালকে ফিকে জয়দের ভাবটা একটু বেশি। তলার পালক ফিকে জয়দ-ধূসর, বুকের দুপাশ লালচে। গলায় ছিট এবং বুকে ছোটো ছোটো দাগ পাটকিলের। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে। চঞ্চু ও পা হলদেটে-পাটকিলে। পিছনের নখর লম্বায় বেশ বড়ো এবং সোজা।

বাসস্থান—ভারত থেকে পূবে চীন, দক্ষিণে ইন্দোচীন ও তৎসংলগ্ন স্থানসমূহ এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ভারতে ৬টি উপজাতি। প্রথম উপজাতি (আ গু গুলা-গুলা)—বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্র, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসাম, পূর্ব পাকিস্তান, উত্তর ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল ৬ হাজার ফিটের ভিতর। দ্বিতীয় (আ গু ইনকনস্পিকুয়া)—পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশ। এদের রং একটু ফিকে। তৃতীয় (আ গু গুলা-মায়ুম)—পশ্চিম হিমালয় গিলগিট থেকে কাশ্মীর, বাল্টিস্তান, লাদক, জালন্ধর, উত্তর পাঞ্জাব, গাড়োয়াল, কুমায়ুন থেকে নেপাল, সিকিম। ৫ হাজার ফিটের উপর বাসা বাঁধে। চতুর্থ (আ গু ইনোপিনাটা)—দক্ষিণ তিব্বত। শীতে পরিযায়ী হয় নেপাল, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা, আসাম উত্তর ব্রহ্মদেশ। ৫ হাজার ফিটের ভিতর পাহাড়ে জঙ্গলে এবং গোচারণ ভূমিতে। পঞ্চম (আ গু অস্ট্রালিস)—অন্ধ্র হায়দ্রাবাদ, নীলগিরি, কেরালা এবং সিংহল। ৪ হাজার ফিট ও তার কিছু উপরে এবং নিম্নভূমির ঘাসজমিতে। আকারে একটু বড়ো। ষষ্ঠ (আ গু ভেরনায়ি)—পূর্ব তিব্বত, দক্ষিণ তিব্বত এবং উত্তর ব্রহ্মদেশ ৫ হাজার ফিটের উপর। খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্রের উত্তরাংশে আসামের পার্বত্য অঞ্চলে এই উপজাতি বাসা বাঁধে।

খাদ্য—মাটি থেকে খুঁটে নানাবিধ শস্য, বীজ এবং পোকামাকড়।

স্বভাব—নদী বা বিলের পাড়ে, খোলামেলা চাষের জমি এবং গোচারণ ভূমিতে ভরতপাখিরা বিচরণ করে। মাটির রঙের সঙ্গে দেহের রং এমনভাবে মিশে যায় যে সহজে নজরে পড়তে চায় না। তাছাড়া হঠাৎ এদের কাছে গিয়ে পড়লে সহজে দৌড়ে বা উড়ে পালায় না। মাটিতে বুক পেতে বহুক্ষণ পাড়ে বসে থাকে। তারপর প্রায় পায়ের গোড়া থেকে ওড়ে।

জঙ্গল ব্যাব্লার্ গণের অন্যান্যদের সঙ্গে প্রায়ই ধরা পড়ে এবং মুখরোচক খাদ্য হিসেবে বাজারে বিক্রির জন্য আসে। দুই প্রজাতির চেহারায় পার্থক্য এত কম যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া ধরা খুবই শক্ত।

প্রজননকালে পুরুষ-পাখির ডাকটা বেশ লম্বা। একটু একঘেয়ে, অনেকক্ষণ ধরে চলে কিন্তু মিষ্টিস্বর। মাঝে মাঝে ওই ডাক বা গানের সঙ্গে অন্য পাখির ডাকও নকল করে। সাধারণতঃ ডাক দেয় বা গান গায় উড়তে উড়তে। মাঝে মাঝে মাটিতে চরতে চরতেও গান গেয়ে ওঠে।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই। বছরে দুবার ডিম পাড়ে। মাটির মধ্যে নখ দিয়ে আঁচড়ে অগভীর খোদলে, মাটির চাংড়ার তলায় অথবা বেঁটে ঝোপের তলায় শুকনো ঘাস দিয়ে পেয়ালার আকারে বাসা বানায়. লাইনিং দেয় চিক্কন ঘাসের। ডিম পাড়ে ২-৩টি অল্প চকচকে পাতলা খোলা সিক্ত রক্তের ধূসর অথবা ফিকে হলুদ। তার উপর ঘন ফিকে বেগুনে-পাটকিলে এবং বাদামি-পাটকিলের এত ছোটো ছোটো ছিট থাকে যে জমিনের রং ধরা শক্ত হয়ে পড়ে। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৮৩, চওড়ায় ০·৬২ ইঞ্চি।

শ্যামা

ছাত্রজীবনে কলেজ থেকে বেরিয়ে মার্কাস স্কোয়ারে যাবার পথে ঠনঠনে কালীতলার উলটো দিকে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের মোড়ে শাহাদের বাড়ির কোণে এক হিন্দুস্থানী পানের দোকানে মিঠে পান খাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। যেমন অন্যান্য অনেক পানের দোকানে তখন ঝোলানো থাকত কাপড়ঢাকা খাঁচায় পাখি, এ দোকানে ছিল তেমনই একটা। ভাবতাম হয়তো চন্দনাজল বা ফিঙে জাতীয় কোনো পাখি। দেখতাম খাঁচার পেতলের হাতলটা দোকানের খদ্দেরের ঘটিটার মতোই সমান চকচকে।

সেদিন পান দুটো মুখে দিয়ে দাম-দামের জন্য হাত বাড়িয়েছি, হঠাৎ খাঁচার মধ্যে থেকে পাখি গেয়ে উঠল। আহা, সে কী গান! গান বলা ঠিক নয় শ্রেফ তান। মহম্মদ সিরাজ খানের গিটকিরি সম্বলিত লম্বা তান। কি তার জোর! নারায়ণ রাও ব্যাস, কুমার গন্ধর্ব, এমনকি আবদুল করিমকেও হার মানায়। তান থামতেই চায় না। কত মওয়ত যে ঘুরে গেল তার হিসেব নেই।

শেষে থামল। কী পাখি জিজ্ঞেস করাতে পানওয়ালা নাম বলল। এর আগে নাম শুনিনি, দেখিনি তো নিশ্চয়ই। দেখবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে বলল, সামাবস্, অভি নেহি। মগরেব সে লৌটিয়ে ফির দিখাউঙ্গা। গানা বন্ধ হো যায়েগী।' অর্থাৎ এখন নয়। মাঠ থেকে ফেরার সময় দেখাবে। এখন ঢাকা কাপড় খুললে গান বন্ধ হয়ে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা মাঠ থেকে ফিরেছি। পান-ওয়ালাকে বলেছি দেখাও এবার। সে খাঁচাটাকে পেড়ে টাইট করে বাঁধা কাপড়টাকে খুলতেই দেখলাম, ও হরি! প্রায় চড়াই-পাখির মতন দেখতে একটা পাখি। খাঁচার মেঝেতে কলার পাতা। তার উপর লাল ইঁট গুঁড়ো করে মাটির সঙ্গে মেশানো। তাতে পাখিটা ওলোট-পালোট খেয়ে মনের আনন্দে ধুলো উড়িয়ে স্নান করছে। আমাদের দেখে সলজ্জ গায়ের ধুলো ঝেড়ে খাঁচাটার এদিক-ওদিক দৌড় দিল। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মিহি গিটকিরির তান তুলল। পানওয়ালা খাঁচাটাকে তাড়াতাড়ি ঢাকা বেঁধে ফেলে উপরে টাঙিয়ে দিল হুকে।

পরে এই পাখিকে স্বাধীন অবস্থায় দেখেছি বর্ধমান-বীরভূমে এবং খাঁচায় পুষেছি বেশ কয়েকটা।

পানওয়ালা হিন্দি নাম বলেছিল—শ্যামা (মিরাফ্রা জাভানিকা)। বাংলাতেও ওই নাম চলে, কারণ যাঁরা কিনে পুষেছেন, তাঁরা হিন্দি নামই জেনেছেন। ইংরেজি সিঙিং বুশ লার্ক। শ্যামা ইলাকিগণের মিরাফ্রা এক প্রজাতি। এই গণে মোট ৩টি প্রজাতি।

শ্যামা লম্বায় সাড়ে ৫ ইঞ্চি। উপরের সমস্ত পালক গাঢ় পিঙ্গল, কিন্তু প্রতিটি পালকের ধারে লালচে এবং বাকি রঙটা। লেজের ঠিক মাঝখানের পালকগুলি পাটকিলে ধার লালচে, একদম শেষের আগের পালকের ধারে একটু সাদাটে ভাব। ডানার পালকের ধার লালচে পাটকিলে। চোখের উপর ফিকে বালি রঙা ভুরুর টান। গাল এবং কানের উপর লালচে, ধারে সরু পাটকিলের ছোপ। চিবুক ও গলা সাদা। বাকি তলার পালক ফিকে ধূসর, বুকের উপর এবং দুপাশ একটু গাঢ়। বুকের উপর এবং ঘাড় কালো ফোঁটা দাগে চিহ্নিত। কনীনিকা পিঙ্গল। উপরের চঞ্চু শিঙে পাটকিলে, তলায় চঞ্চুর গোড়া হলদে; পা ফিকে দুধে আলতা।

বাসস্থান—পশ্চিম পাকিস্তান, কাশ্মীর, পূর্ব পাঞ্জাব, কচ্ছ, গুজরাট, পশ্চিম রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, পশ্চিম বঙ্গ, দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, কোচিন-চায়না, বোর্নিও জাভা এবং বলিদ্বীপ।

খাদ্য—শস্যকণা, ছোটো বীজ এবং কীটপতঙ্গ। বন্দীদশায় ছাতু ও পিঁপড়ের ডিম।

স্বভাব—শ্যামাকে দেখা যায় ঝাঁক বেঁধে ঘাসজমি, খেতের ধার এবং খোলা মেলা স্থানে। খুব শুকনো অর্থাৎ ধরা, অনুর্বর বা পাথুরে জমির ধারেকাছে ঘেঁষে না। ইলাকি গণের অন্য প্রজাতির পাখি অপেক্ষা বেশ উঁচুতে উড়তে পারে। অবশ্য ভরতপাখির মতো যেমন অত উঁচুতে উড়তে পারে না, তেমনই খুব মিষ্টি সুরেলা গলা হলেও তার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না।

আকাশে উড়ন্ত অবস্থা ছাড়াও ঝোপের ভিতর বসে গান গায়। স্বাধীন অবস্থায় মাটিতে চরতে চরতে গান গায় কম। কিন্তু খাঁচায় বন্দী হলে গানের গলা খুলে যায়। এমনকি অন্যান্য পাখির গান এবং ডাক নকল করতে ভোলে না।

শ্যামার প্রজননকাল জুনের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। লম্বা ঘাস-জঙ্গলের গোড়ায় মাটিতে বাসা বানায়। নদী বা জলার একদম ধারে ঘাসের ভিতরেও বাসা বানাতে দেখা যায়। কখনও কখনও পাতলা ঝোপ বা ঝোপঝাড়ের মধ্যে বানায়। শুকনো মোটা এবং চিকন এই দুই ঘাস দিয়ে গোলাকার বাটির মত বাসা। ভিতরে নরম ঘাসের লাইনিং। ঝাঁক বেঁধে বাস করে বলে যে অঞ্চল তাদের পছন্দ করে সেখানে অনেকগুলি বাসা দেখা যায়।

ডিম পাড়ে ৩-৪টি অমসৃণ প্রায় সাদা জমির উপর ধূসর, সবুজ, হলুদ বা বাদামি স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ছিট ও ছোপের। ডিমের মাপ—লম্বায় ০'৮০, চওড়ায় ০'৬১ ইঞ্চি।

অন্যান্য শ্যামা

ইলাকি গণে বাকি দুটি প্রজাতি হল—

১। জর্ডনের শ্যামা (মি. এরিথ্রোপ্টেরা)। হিন্দি—ঐ। ইংরেজি—রেড-উইংড বুশ লার্ক।

লম্বায় ৬ ইঞ্চি। উপরের সব পালক ফিকে ধূসর-পাটকিলে, তার উপর কালচে-পাটকিলের দাগ। ডানা পাটকিলে; আচ্ছাদক পালকের ধার লালচে; ওড়ার পালকের বহুলাংশ লালচে-বাদামী। লেজ কালচে-পাটকিলে; বাকের একজোড়া পালক ফিকে পাটকিলে, তার ধার ফিকে ধূসর এবং একদম বাইরের দুজোড়ার ধার খুব ফিকে ধূসর। চোখের উপর দিয়ে ফিকে ধূসরের এক টান। চিবুক ও গলা সাদাটে। বাকি তলার পালক ফিকে ধূসর এবং বুকে ওই পালকের উপর কালচে-পাটকিলের তিন কোণা ছোটো ছোটো ছিট। কনীনিকা পাটকিলে। চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, তলার অংশ ফিকে লাল। পা ফিকে দুধে আলতা।

সারদা-রামকৃষ্ণ
—সন্ন্যাসিনী দুর্গামাতা রচিত—
দৈনিক বসুমতী—এইরকম ধরনের রচিত জীবনকথা এই প্রথম প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে......তাঁরা অভিন্ন ও একাত্মা।
যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত।.....
গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥
বহুচিত্রশোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮'
গৌরীমা
আনন্দবাজার পত্রিকা—বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর ঘরে শ্রীগৌরী মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির জাতের শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥
বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫'
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬, গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

বাসস্থান—পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারত। ভারতে ৩টি উপজাতি। প্রথম (মি এ সিন্ডিয়ানস)—পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুদেশ থেকে পূর্ব পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে শুকনো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঝোপ ও জঙ্গলের ভিতর। দ্বিতীয় (মি এ মারকী)—সৌরাষ্ট্র। তৃতীয় (মি এ এরাই-থ্রোপটেরা)—বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর-অন্ধ্র, ওড়িশা পশ্চিম বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের শুষ্কপ্রধান স্থানে ও খোয়াই-এর ভিতর থেকে-ওঠা কাঁটা ঝোপ পছন্দ করে বেশি।

স্বভাব—কখনো আপন ছোটো দলে বিচরণ করে। কেউ যদি কাছে গিয়ে পড়লে হঠাৎ উড়তে আরম্ভ করে। বেশ দ্রুতই ওড়ে, তবে বড্ড এলোমেলো। কোন দিকে যাবে তার কোনো ঠিক নেই, যে যেদিকে পারে ওড়ে। বিপদ কেটে গেলে আবার সবাই ফিরে এসে জড়ো হয়।

প্রজননকালে অর্থাৎ মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পুরুষপাখি উড়তে উড়তে গান গায় — 'সি-সি-সি...উইসিই-উইসিই-উই-সিই...' এবং প্যারাসুটের মতন প্রায় ৩০ ফিট উপর থেকে নিচে নামে ঝোপের উপর। কখনও কখনও টেলিগ্রাফের তারের উপরও বসতে দেখা যায়। বাসা বানায় ঝোপের তলায় বা মাটির উপরে ঘাস ও মর্দাজির আঁশ দিয়ে [illegible] আকারে।

জবেরেতে বা পাটকিলে আভাযুক্ত পাণ্ডুটে থেকে অল্প মসৃণ সাদা জমির উপর পাটকিলে বা বেগুনি ছোটো ছিটের ডিম পাড়ে ২ থেকে ৪টি। তবে ৪ সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৭৬, চওড়ায় ০·৫৯ ইঞ্চি।

২। পাহাড়ী ঝাড়ভরত (মি আসামিকা)। হিন্দি—চিরচিরা। ইংরেজি—বুশ লার্ক, বেঙ্গল বুশ লার্ক।

লম্বায় ৬ ইঞ্চি। উপরের সব পালক গাঢ় ছাই-পাটকিলে, তার উপর প্রত্যেকের মাঝে কুচকুচে কালচে দাগ। ডানা গাঢ় পাটকিলে, প্রত্যেক পালকের ধার ফিকে ছাই এবং ওড়ার পালকে বাদামী ছোপ। লেজ পাটকিলে, ধার লালচে-ছাই রঙের; দু'জোড়া বাইরের পালকের ধার অনেকটা করে ফিকে লালচে। মাথার দু'পাশ পাটকিলে ও বাদামি মেশানো। চিবুক ও গলা ফিকে হলুদ। তলার বাকি পালক গাঢ় হলুদ; বুকের উপর ত্রিকোণা পাটকিলের ছোটো ছোটো দাগ। কনীনিকা হলদেটে-পাটকিলে। চঞ্চু কালচে, তলার অংশ ফিকে লালচে। পা ফিকে দুধে-আলতা।

বাসস্থান— ভারতে ২টি উপজাতি। প্রথম (মি আ আসামিকা) — উত্তর প্রদেশের নৈনিতাল থেকে পূবে বিহার, উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান ও আসাম; দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশা। দ্বিতীয় (মি আ অ্যাফিনিস) — দক্ষিণ ওড়িশা, অন্ধ্র, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরালা এবং সিংহলের বাদাবনে ও নিচু জমিতে।

স্বভাব — নদী হ্রদ জলা এবং বেশ ঘন গাছপালাযুক্ত পাহাড়ী জায়গায় এদের বসবাস। সমতলের ঘাসজমিতে ও খেতের আশেপাশে নেমে আসতে দেখা যায়, এমনকি রাস্তার উপরেও। মাটিতে চলেও যখন-তখন ঝোপে বা ছোটো গাছের উপর এ-ডাল সে-ডাল করে বেড়ায়।

প্রজননকাল মে-জুন। সে-সময় উড়তে উড়তে গান গায় বটে তবে সে-গান বড়োই দুর্বল। মিষ্টি থাকলেও জোর নেই। তানও ভালো নয়।

ঘাসের মধ্যে মাটির ভিতর একটু খোঁদলে আলগা বাঁধুনির ঘাস ও শিকড় দিয়ে গোলাকার বাসা বানায়। প্রবেশপথ থাকে হয় পাশে, না হয় একদম উপরে। হাই আকার সাদাটে অল্পস্বল্প চকচকে জমির উপর হলদেটে বা বেগুনি-পাটকিলে ছিট ও ছোপের ২ থেকে ৫টি ডিম পাড়ে। ডিমের মাপ— লম্বায় ০·৮০, চওড়ায় ০·৬১ ইঞ্চি।

ধুলোচাটা

পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলটা শহর থেকে একটু দূরে। এই স্কুলের মস্ত কম্পাউণ্ডের ভিতর মাস্টারমশায়দের কোয়ার্টার্স। তারই একটায় অতিথি হয়ে আছি। কোয়ার্টার্সের আশেপাশে অনেক আমগাছ। সামনে দিয়ে যে-রাস্তাটা গেছে, সেটা স্টেশন বা শহর থেকে এসেছে। গেছে পাঞ্চেৎ-মাইথনের দিকে। যাবার পথে রাস্তাটা ভাগ হয়ে বাঁকুড়ার দিকেও গেছে একটা। বাস চলাচল আছে।

বাঁকুড়া-পাঞ্চেৎ রাস্তা ধরে চলেছি। ফাঁকা জমির পর মাঝে মাঝে রাস্তার দু'-পাশে ছোট্ট গ্রাম বা কয়েকটি ঝোপড়ি, অল্প খেতখামার, কয়েকটা বড়ো গাছ। বাঁদিকে পথে পড়ল উঁচু লাল মাটির বড়ো ঢিবি। বুঝলাম এর পিছনে আছে পুকুর। পাড়ের উপর উঠে দেখি পুকুরের বদনাম। হাঁটু ডুববে কিনা সন্দেহ। রাস্তা ছেড়ে পুকুরটার পিছনে নেমে উন্মুক্ত খোলা খোয়াইয়ের মতো লাল ধুলোমাটি জমির উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কিছু দূরে খেত, তারও অনেক পিছনে গাছের আড়ালে গ্রাম।

হঠাৎ পায়ের তলা থেকে একে একে উড়তে লাগল বেলে ধূসর-পাটকিলে পাখি। মাটির ধুলোর সঙ্গে এমন মিলিয়ে ছিল যে, মোটে টের পাইনি। লক্ষ করলাম কয়েকটা পাখির পেটের কাছটার গাঢ় চকোলেট-পাটকিলে। সেগুলো পুরুষ। আমার পায়ের কাছ থেকে কম করে ২০-২৫টা উড়ে দলবদ্ধ হয়ে চলল দূরে খেতের দিকে। ডানা ঝাপটের আওয়াজ কানে নিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে তাদের ওড়া দেখতে লাগলাম।

পাখিগুলি ভারতবর্ষের অন্যতম গণ্ দ্বীপক্ষদ (এরেমোপ্টেরিক্স) এক প্রজাতি; নাম — ধুলোচাটা (এরেমোপ-টেরিক্স গ্রিসিয়া)। হিন্দি — দাঁয়, দভক-চুড়ি, জোথোঁল। ইংরেজী — অ্যাশি-ক্রাউনড ফিঞ্চ-লার্ক, ব্ল্যাক-বেলীড ফিঞ্চ-লার্ক। গণটির গণে মাত্র ২টি প্রজাতি। অপর প্রজাতি 'কালোমাথা ধুলোচাটা (এ নিগ্রিকেপস; ব্ল্যাক-ক্রাউনড ফিঞ্চ-লার্ক) পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ ও পশ্চিম বাংলার পাখি নয়। এদের দেখা যায় পশ্চিম পাঞ্জাব; ভারতে পূর্ব পাঞ্জাব ও রাজস্থানের যোধপুর।

ধুলোচাটা লম্বায় ৫ ইঞ্চি। পুরুষ-পাখির উপরের পালক ফিকে ধূসর-পাটকিলে। ডানার মুখকালো অংশ পাটকিলে। লেজ গাঢ় পাটকিলে, মাঝের একজোড়া পালক ফিকে পাটকিলে এবং একদম বাইরের একজোড়া পালকের বেশি ভাগ সাদা। কানের উপর অনেকটা এবং বুকের দু'পাশ সাদাটে। চোখের উপর, গলা চিবুক এবং বাকি বুক ও পেট গাঢ় চকোলেট-পাটকিলে।

স্ত্রী-পাখির উপরের পালক, ডানা এবং লেজ গাঢ় পাটকিলের উপর ধূসর ও লালচে পাটকিলের আভা। মুখের দু'পাশ ও চোখের উপর যে টান তা লালচে-পাটকিলে। তলার পালক মলিন লালচে-পাটকিলে। উভয়ের কনীনিকা পিঙ্গল। বেঁটে মোটা ও উপরের অংশ ঈষৎ বাঁকা চঞ্চু নীলাভ সোনালী, উপরের অংশ গাঢ়। পা পাটকিলে-লালচে।

বাসস্থান—পশ্চিম পাকিস্তান, একমাত্র উত্তর পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতের সর্বত্র, নেপাল-তরাই এবং সিংহলে ৩ হাজার ফুটের ভিতর।

খাদ্য—ঘাসের বীজ, শস্যকণা এবং উই।

স্বভাব—ধুলোচাটাকে দেখা যায় উন্মুক্ত স্থানে। ভিজে জমি একদম পছন্দ করে না। পছন্দ করে উঁচুনিচু ঢেলে জমি, খোয়াই, খেতখামার, ঘাস এবং পড়ো জমি। যেখানেই দেখা যাক না কেন, সেটাই তাদের বাসভূমি। বর্ষাকালে অল্প কিছুটা সরে গিয়ে শুকনো জমি খোঁজে।

মাটিতেই এদের ঘোরাফেরা বেশি। মাটির সঙ্গে এমন মিশিয়ে থাকে যে ধরাই যায় না। যেখানে প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই বলে আগের মুহূর্তে মনে হয়েছে, হঠাৎ সেখানে প্রায় পায়ের তলা থেকে প্রাণ পেয়ে কতকগুলো জীবকে উড়তে দেখলে প্রথমে হকচকিয়ে যেতে হয়। ওড়া দেখে ডানার জোর বেশ কম বলেই মনে হয়। প্রজননকালে উড়তে অবশ্য একটু বেশি দেখা যায় উঁচুতে ওড়াটাও অল্প। বংশানুক্রমে খানিকটা সোজা ওঠে, গানও গায় এবং সোজাসুজি ডানা বন্ধ করে পাথর পড়ার মতো খানিকটা মাটির দিকে নামে, আবার ওড়ে। শেষে ধপ্ করে মাটিতে এসে বসে। এই নামার সময় ডানায় একটা হুইড-হু-র মতো শব্দ হয়। উই যখন ওড়ে, তখন শূন্যে ধরে খেতেই ভালোবাসে।

ধুলোচাটার প্রজননকাল জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর। বছরে দুবার ডিম পাড়ে। প্রজননকালে পুরুষ-পাখি অবিশ্রান্ত গান গায় মাটিতে এবং উড়তে উড়তে। গানে নেই কোনো ছন্দ, নেই কোনো উত্থান-পতন, একঘেয়ে কিন্তু মিষ্টি—'টি-রি-রি-ই-ই...'।

বাসা বাঁধে সুখো, নরম উদ্ভিদের আঁশ, কিছু পালক ও চিকন ঘাস দিয়ে মাটিতে একটু খোঁদলে অথবা মাটির ঢেলা বা পাথর কিংবা ঘাসের চাপড়ার আড়ালে। ডিম পাড়ে ২-৩টি অল্প চকচকে হলদেটে—, সবজেটে—বা ধূসর-সাদা খোলার গায়ে খুব ঘন করে নানা আকারের হলদেটে-পাটকিলে, মেটে বা ধূসর রঙের ছিট ও ছোপ। ডিমের মাপ—লম্বায় ০-৭০, চওড়ায় ০-৫০ ইঞ্চি।

খানি ভরুই

মুর্শিদাবাদে জিয়াগঞ্জে আছি। জিয়াগঞ্জ থেকে মাঠঘাট ভেঙে চলেছি ভগবানগোলার দিকে। মাঠের ধান সবে বয়ে উঠেছে। মাঠ জুড়ে ধানের গোড়াগুলো খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। খেত ভেঙে যে শর্টকাট করব তার উপায় নেই। আল ধরে ঘুরে ঘুরে চলেছি।

হঠাৎ দূরে নজরে পড়ে কতকগুলো চড়াই যেন মাটিতে বুক পেতে শুয়ে পড়ে ধুলো মাখছে, দু'-চারটে ঠোকরও মারছে মাটির বুকে। মনে হল মাটিতে পড়ে থাকা ধান অথবা পোকা বুঝি খুঁটে খাচ্ছে। একটু এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করতেই দেখি, না, এগুলো চড়াই নয়। পাটকিলে গা, তলাটা লালচে ভাব। লেজটা উজ্জ্বল গাঢ় লালচে-পাটকিলে, আগাটা একটু চেরা এবং কালো দাগ। কে যেন আগাটায় একটুখানি কালিতে চুবিয়েছে। আরও কাছে যেতে পাখিগুলো এদিক-ওদিক উড়ে পালাল। সংখ্যায় গোটা দশেক হবে।

পাখিগুলি ভারম্বাজ বংশের অন্তর্গত ভূমিশয় গণের (আমমোমানেস) এক প্রজাতি, নাম — খানি ভরুই। বাংলায় কখনও নামকরণ হয়নি। হিন্দি — আম্পিয়া, রেতোল। ইংরেজি — রুফোসটেইলড ফিঞ্চ-লার্ক। ভূমিশয় গণে ২টি প্রজাতি। অপর প্রজাতি (আ ডেজার্টি) বাংলার পাখি নয়। এই মরু ভরুইকে (ডেজার্ট ফিঞ্চ-লার্ক) দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তান, উত্তরভারত, নিম্ন পশ্চিম পাঞ্জাব ও তার উত্তর-পূর্বে কাশ্মীর সীমান্তে চুনামাটির পাহাড় অঞ্চলে।

খানি ভরুই লম্বায় ৬ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। উপরের পালক গাঢ় পাটকিলে। ডানা পাটকিলে; পালকের ধার ফেকে-পাটকিলে, ডানার লুকানো অংশ একটু লালচে-পাটকিলে। লেজ গাঢ় লালচে পাটকিলে, একদম আগায় বা শেষপ্রান্তে চওড়া কালো পট্টি। মাথার দু'পাশ লালচে পাটকিলে ও পাটকিলে মেশানো। চোখের উপর দিকে লালচে-পাটকিলের এক টান। তলার সমস্ত পালক লালচে-পাটকিলে, চিবুক গলা ও বুকে পাটকিলের ছোটো ছিট দাগ। কনীনিকা পিঙ্গল। মোটা ও অল্প বাঁকানো চঞ্চু পিঙ্গ-পাটকিলে, তলার চঞ্চুর গোড়া ফিকে গোলাপী। পা গোলাপী।

বাসস্থান — ভারত ও পাকিস্তানসহ ৩টি উপজাতি। প্রথম (আ ফো ফোএনিকুরাস)—সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান, দিল্লী থেকে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার দক্ষিণাংশে ওড়িশা, অন্ধ্র এবং হায়দরাবাদ। দ্বিতীয় (আ ফো ফার্ডুনিরি)—পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, কোয়েটা) এবং সিন্ধুপ্রদেশের মরুভূমি অঞ্চল। তৃতীয় (আফো টেসটাকিউস)—দক্ষিণ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মহীশূরের শুকনো অঞ্চল।

খাদ্য — ঘাসের বীজ, শস্যকণা ও কীট। বাজরা খুব প্রিয়।

স্বভাব — খানি ভরুইকে দেখা যায় খোলামেলা শুকনো জায়গায়। চষাজমি, বিশেষতঃ ধান কাটার পর ধানের গোড়া যেখানে খোঁচা খোঁচা হয়ে থাকে, সেসব স্থান সবচেয়ে পছন্দের। প্রজননকাল ছাড়া অন্য সময় তারা ছোটো ছোটো দলে বিচরণ করে।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের গোড়া। সাধারণতঃ এরা মাটির কাছাকাছি থাকে কিন্তু এ-সময়ে ছোটো ঝোপ বা ঢিবির উপর বসে গান গায়। কখনও কখনও টেলিগ্রাফের তারের উপরেও বসে এবং গান গায়। গানে সুরেলা গিট-কিরি তান আছে বটে কিন্তু সে-তান ছোটো এবং দুর্বল।

প্রজননের সময় ঝোপ বা মাটি থেকে কয়েক ফিট প্রায় সোজা ঝটপট করতে করতে শূন্যে ওঠে। তারপর মাটির দিকে পড়তে থাকে শীসের মতো শব্দ করে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে গায়ের পালক ফুলিয়ে।

বাসা বানায় মাটিতে। একটু খোঁদল হলেই পছন্দ বেশি। অনেক সময় নিজেরাই একটু গর্ত করে নেয় মাটি পাথর বা ঝোপের গা ঘেঁষে। ডিম পাড়ে ৩-৪টি অল্প চকচকে ঘি-রঙা পাতলা খোলার উপর হলদেটে-পাটকিলে বা লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপ। এছাড়া তলার দিকে কিছু গাঢ় বেগুনির ছিটও দেখা যায়। ডিমের মাপ—লম্বায় ০-৮৫, চওড়ায় ০-৬২ ইঞ্চি।

বগেরী

হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে জনাই রোডে নেমেছি। চলেছি নৈটি পঞ্চাননতলার দিকে। দু'পাশে খেত। প্রায় দিগন্তব্যাপী। আল দিয়ে খেতগুলো ভাগ করা আছে। সবে ধান কাটা হয়েছে। কিছু মাঠের ধান মাঠে। কয়েকটি খেতে ধান উঠে গেছে। ধানের গোড়াগুলো পড়ে আছে। আমার পায়ের শব্দেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক চড়াইপাখির মতো আকারে ফেকে-রঙা বুকে ছিট এবং দু'পাশে কালচে ছোপ আট-দশটার এক ঝাঁক পাখি উড়ল। এদিক-ওদিক থেকে আরও কয়েক ঝাঁক উড়ল। সবগুলো ঝাঁক মিলে একটি বড়ো ঝাঁকে পরিণত হয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে ঢেউয়ের ছন্দে বেশ খানিকটা ঘুরে গিয়ে ঝাঁক ভেঙে আবার চারদিকে যে যার মতো ছড়িয়ে পড়ল।

পাখিগুলোকে দেখে মজাই লাগল। লাহোর এবং তিব্বত থেকে পরিযায়ী হয়ে এসেছে। বিহার, ছোটোনাগপুরে গিরিডি শহরে ছেলেবেলায় এই ছোটো পাখির মাংস প্রচুর খেয়েছি। তখন টাকায় পঞ্চাশটা পাওয়া যেত এবং ছাড়িয়ে বানিয়ে দিত ভেজে খাবার জন্যে। কলকাতায় মাঝে মাঝে পার্ক সার্কাস ও হগসাহেবের বাজারে চাপটা খাঁচায় করে বিক্রির জন্যে আসে। দশ টাকায় পাঁচটা। এক সময় ভারতবাসী বিদেশত ইওরোপীয়দের খুবই প্রিয় খাদ্য ছিল। ওরা নাম দিয়েছিল—ইন্ডিয়ান অর্টোলান। অর্টোলান ইওরোপে অতি সুস্বাদু পাখি বলে প্রচলিত। কিন্তু তারা ভারম্বাজ বংশের নয়। চটকটীক বংশ ও গণের (এমবেরিজা) এক প্রজাতি (এ হরটুলানা)। ইংরেজি—অর্টোলান বানটিং। বাংলা—সোনাপাখি। হিন্দি—গাম্মাম, ভারটি। ভারতে মার্চ-এপ্রিলে মাত্র দুবার গিলগিটে এবং একবার কাশ্মীরে দেখা গিয়েছে।

জনাই রোডে ধানের মাঠে যে পাখিগুলো দেখেছিলাম তারা হল ভারম্বাজ

বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম টীকাসহ মাও-সে-তুঙের চৌষট্টিটি কবিতার অনন্যসাধারণ অনুবাদ—

মাও সেতুঙের কবিতা-২.

অনুবাদ—সন্দীপ সেনগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :— নিউবেঙ্গ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
এবং যে কোন পরিচিত বুক স্টল।

স্ট্যান্ডার্ড পাব্লিশার্স। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি—১২

বংশের অন্তর্গত, ব্যাম্রাট গণের (কালান-ড্রেলা) এক প্রজাতি; নাম—বগেরী, বাগেরী (কালানড্রেলা কিনেরিয়া)। হিন্দি—বাঘাইরা, বাঘেইরি, পদ্দুক, আকোলিরা। ইংরেজি—শর্ট-টোড লার্ক। ব্যাম্রাট গণে ৩টি প্রজাতি।

বাগেরী লম্বায় সওয়া ৬ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। উপরের পালক মলিন ধূসরাভ এবং মলিন ফিকে জরদের মিশ্রণ। প্রতিটি পালকের উপর কালচে-পাটকিলের দাগ। ডানা গাঢ় পাটকিলে, ধার জরদাভ। লেজও গাঢ় পাটকিলে, ধার জরদাভ এবং বাইরের দুজোড়া পালক খুব মলিন জরদাভ। চোখের উপর মলিন জরদের টান। তলার পালক ময়লা সাদাটে, বুকে তার উপর পাটকিলের আভা এবং কখনও কখনও ছিট। বুকের দুপাশে আধা লুকোনো কালচে ছোপ। কনীনিকা পাটকিলে। চঞ্চু গাঢ় শিঙে-পাটকিলে, তলায় গোলাপী। পা পাটকিলে-গোলাপী।

বাসস্থান—ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ রাশিয়া থেকে পূবে উত্তর-পশ্চিম মাঞ্চুরিয়া। শীতে পরিযায়ী হয় সুদান, আরব, ভারত এবং উত্তর ব্রহ্মদেশ। ভারতে ২টি উপজাতি আসে। প্রথম (কা কি দুখুনেনসিস)—লাদাক ও তিব্বতে বাসা। শীতে নেমে আসে কাশ্মীর ও বাল্টিস্তান থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ থেকে দক্ষিণে কেরালা। [illegible] (কা কি লংগিপেন্নিস)—শীতে পরিযায়ী হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর ভারতে পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী এবং রাজস্থান।

খাদ্য — ছোটো শস্য, শস্যকণা ও কীট।

স্বভাব — সেপ্টেম্বর থেকে বাগেরী ভারতের অভ্যন্তরে আসতে আরম্ভ করে। ফিরে যায় এপ্রিলে। এদের এক-এক ঝাঁক খুবই বড়ো হয়। পঁচিশ থেকে হাজারের ঝাঁক প্রায়ই দেখা যায় নেড়া প্রায় ঊষর জমি বা সদ্য শস্য কেটে নেওয়া খেতে এমন-ধরনের উন্মুক্ত স্থানে চরতে। মাটির রঙের সঙ্গে ছোট্ট দেহটা এমন মিশিয়ে থাকে যে সহজে চোখে পড়তে চায় না। এ-কারণে মাটিতেই বাগেরী বিচরণ করে, গাছে বা ঝোপে কখনও চড়ে না। ডাক মৃদু, কখনও সুরেলা কখনও কর্কশ। এই নিরীহ জাত কড়ুই পাখি ক্রমশঃ ইওরোপের সুখাদ্য পাখি হিসেবে গণ্য হয়ে ইংরেজ রাজত্বে হাজারে হাজারে মারা পড়তো এক সময়।

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে জুন ,১২ হাজার ফিটের উপর। জমিতে একটু খোদলে ঘাসের গোড়ায় পেয়ালার আকারে ঘাসের বাসা বানায়। কখনও কখনও সেই বাসায় রোঁয়া বা পশম এবং পালকের লাইনিং দেয়। ডিম পাড়ে ৩ থেকে ৫টি ফিকে হলুদে বা পাটকিলে-সাদা খোলার উপর খুব ঘন পাটকিলের এবং ছাই-ধূসরের ছিট ও দাগের। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৭৫, চওড়ায় ০·৫৫ ইঞ্চি।

অন্যান্য বগেরী

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাম্রাট গণের অপর দু-প্রজাতিকেও দেখা যায়। তারা হল—

১ ছোটো বাগেরী (কা আর্কিউটিরোসট্রিস)। হিন্দি—বাঘেইরা। ইংরেজি—হিউমস্ শর্ট-টোড লার্ক। ২টি উপজাতি।

লম্বায় প্রায় ৬ ইঞ্চি। বাগেরীর সঙ্গে চেহারায় বিশেষ তফাৎ নেই। উপরের পালকে ধূসরাভ ভাবটা একটু গাঢ়; তলার পালকে সাদার সঙ্গে পাটকিলের ভাব, জরদের অংশ নেই। লেজের সাদা অংশটা কিছু কম।

বাসস্থান—গিলগিট, বেলুচিস্তান, আসকর, মুশাদ্ এবং লাহুল। শীতে লাদাক ও তিব্বতের ভিতর দিয়ে পরিযায়ী হয় পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহারে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং পূর্ব পাকিস্তান।

স্বভাব—ছোটো বাগেরীকে একা এবং জোড়ায় দেখা যায়। গানে উত্থান-পতন নেই, একঘেয়ে। মাটির ঢিবি বা পাথরের উপর থেকে গান গায়।

২। বেলে বাগেরী (কা রেটাল)। হিন্দি—রেতাল। ইংরেজি—স্যানড রেটাল। ৩টি উপজাতি।

লম্বায় সওয়া ৫ ইঞ্চি। উপরের পালক পাটকিলে-ধূসর, তার উপর গাঢ় পাটকিলের দাগ। লেজের মাঝের পালক ধূসর-পাটকিলে, ধারে সাদাটে জরদ; মাঝের দু-পাশের পালক গাঢ় পাটকিলে; একদম ধারের পালক সাদা। ডানা উপরের বা পিঠের পালকের ন্যায়। গাল এবং চোখের উপরে টান সাদা। কানের উপর ফিকে পাটকিলে, তার উপর ধূসর ছিট। তলা পালক ময়লাটে সাদা; বুকে তার উপর গাঢ় পাটকিলেও ছিট। কনীনিকা পাটকিলে। চঞ্চু হলদে বা সবুজে আভাসহ শিঙে-পাটকিলে। পা গোলাপী হলদে।

বাসস্থান—পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে যমুনার পাড় ধরে যুক্তপ্রদেশ, নেপাল, তরাই, গঙ্গার পাড় ধরে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ব্রহ্মপুত্রের পাড় ধরে আসাম এবং ব্রহ্মদেশ।

স্বভাব—বেলে বাগেরীদের নদীর পাড় থেকে খুব দূরে দেখা যায় না। নদীর ধার ঘেঁষে বা অল্প দূরে পতিত জমিতে বা শস্যের পাকা খেতে এরা বিচরণ করে। ভিজে জমি বা কাদা জলা খেতের ধারে কখনও দেখা যায় না। শীতে কদাচিৎ ছোটো দলে ঘোরাফেরা করলেও, সাধারণতঃ একা বা জোড়ে থাকে। ডাকে কিছু মিষ্টতা এবং সংগীতের রেশ পাওয়া যায়।

চণ্ডুল

পাখিটাকে পুষেছি খাঁচায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে এর দর্শনলাভ কখনও কারনি। বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের সংযোগস্থলে দেখতে পাওয়াটা অসম্ভব নয় বলেই মনে করি। কলকাতার হাতিবাগান শেয়ালদা ও হগসাহেবের বাজারে পাখির হাটে বিক্রি হতো এক সময়। আপিসের সঙ্গে চণ্ডুল পোষার একটা রেওয়াজ ছিল সে-সময়। ভারদ্বাজ বংশে গাইয়ে পাখি হিসেবে ভরতপাখির পরেই এর স্থান। শুধু গান নয় ডাক নকল করতেও ওস্তাদ। আমার কাছে যেটা ছিল সেটা দোয়েল শ্যামা ইত্যাদি গাইয়ে পাখির ডাক যেমন তুলেছিল, তেমনই তুলেছিল চড়াইয়ের 'চিসির-চিরপ্', চিলের 'চি'-ই', এমনকি ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার ডাক 'চিঁহিঁহি'। স্বাভাবিক ডাক মিষ্টি—'ত্রি-ই-উর্'।

পাখিটা ছিল ভারদ্বাজ বংশের অন্তর্গত কণ্ঠচূড় গণের (গালেরিডা) এক প্রজাতি; নাম—চণ্ডুল (গালেরিডা ক্রিস্টাটা)। হিন্দি—ঐ। ইংরেজি—ক্রেস্টেড লার্ক। ৩টি প্রজাতি।

চণ্ডুল লম্বায় ৭ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। উপরের পালক মাথার সরু খোঁচা চূড়া সমেত মেটে-পাটকিলে, তার উপর কালো ছোটো ছোটো দাগ। ডানা পাটকিলে, পালকের ধারগুলি বালি-রঙা, ওড়ার পালকে লালচে-পাটকিলের ছোপ। লেজ পাটকিলে, ধার বালি-রঙা, একদম বাইরের পালকজোড়ায় ফিকে লালচে-পাটকিলের বড়ো ছোপ। চোখের উপর ফিকে জরদের টান। তলার পালক ফিকে জরদ, তার উপর বুকে পাটকিলের ছোটো ছোটো দাগ। কনীনিকা ফিকে পাটকিলে। চঞ্চু ও পা শিঙ-রঙা।

বাসস্থান—ভারত ও পাকিস্তান ৩টি উপজাতি। প্রথম (গা ক্রি চেনডুলা)—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঞ্জাব, দিল্লী, রাজস্থান, কচ্ছ, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল তরাই, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ। দ্বিতীয় (গা ক্রি ম্যাগনা)—বেলুচিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত পাহাড়ে ৭ হাজার ফিটের মধ্যে। শীতে পরিযায়ী হয় সিন্দুপ্রদেশে। তৃতীয় (গা ক্রি লাইনোস)—গিলগিট উপত্যকা ও কাশ্মীর।

খাদ্য—ঘাসবীজ, ছোটো পোকামাকড়। বন্দী অবস্থায়—ছাতু, পিঁপড়ের ডিম।

স্বভাব—বেশ খোলামেলা বেলে এবং পাথুরে জমিতে ইতস্ততঃ ঘাস এমন স্থানে চণ্ডুল বাস করে। খাবার জন্যে দৌড়ে বেড়ায় মাটির উপর। 'ত্রি-ই-উর' ডাকতে ডাকতে অল্প কিছুটা সোজা ওঠে।

প্রজননকাল মার্চ থেকে জুন। ডিম পাড়ে ৩-৪টি ফিকে হলুদের উপর বেগুনি ও পাটকিলের ছোপ। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৮৭, চওড়ায় ০·৬৫ ইঞ্চি।

বিজ্ঞানের কথা

অ্যাপোলো—১৪

৫ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত ৮টা ২০ মিনিটে চাঁদের মাটিতে আরো একজন মানুষের পায়ের ছাপ পড়ল। তারপরে রাত ৮টা ২৯ মিনিটে আরো একজনের। প্রথমজন অ্যালান শেপার্ড, দ্বিতীয় জন এডগার মিচেল। এই দুজনকে নিয়ে পৃথিবীর মোট ছ'জন মানুষের পায়ের ছাপ চাঁদের মাটিতে আঁকা হয়ে রইল। সম্ভবত চিরকালের জন্যে, কেন না চাঁদে হাওয়া নেই, জল নেই, মাটির দাগ মুছে যেতে পারে এমন কোনো কারণ সেখানে ঘটতে পারে না। অবশ্য উল্কাপাত হতে পারে পায়ের দাগের গোটা এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হতে পারে গহ্বর। এমন কোনো অঘটন না ঘটলে চাঁদের মাটিতে এই ছ'জন মানুষের পায়ের দাগ মুছে যাবার নয়।

চাঁদের মাটিতে দাগ পড়েছে শুধু মানুষের পায়ের নয়, ১৯৫৯ সালের লুনা-২ থেকে শুরু করে কয়েকটি ব্যোমযানের ও চন্দ্রযানের এবং আট চাকার একটি গাড়ীরও। পৃথিবীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানুষ যখন চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছিলেন তার ৮০ দিন আগে থেকেই এই দূর-নিয়ন্ত্রিত মনুষ্যহীন গাড়িটি চাঁদের মাটিতে ঘোরাঘুরি করছিল ও বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠাচ্ছিল। একটানা নয়, চোদ্দ দিনের রাত্রি যখন নেমে আসে তখন থেমে যায়, আবার চোদ্দ দিনের দিন শুরু হতে সূর্যের আলোয় সৌর ব্যাটারি সক্রিয় হবার পরে নতুন করে ঘোরাঘুরি শুরু করে।

অ্যাপোলো-১৪ ব্যোমযানের চন্দ্রযান নেমেছে চাঁদের পার্বত্য এলাকা ফ্রা মরোয়। এলাকাটি মোটেই সুবিধের নয়, চন্দ্রযান নামার পক্ষে নয়, মানুষের চলাফেরার পক্ষেও নয়। তবুও অ্যাপোলো-১৪ অভিযানের জন্যে এই বিশেষ এলাকাটিই নির্বাচিত হয়েছে, কেননা বিজ্ঞানীদের ধারণা ফ্রা মরোর পার্বত্য এলাকার পাথরে চাঁদের মাটির আদিমতম নিদর্শন পাবার সম্ভাবনা এবং এই পাথর বিশ্লেষণ করে চাঁদের জন্ম সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যেতে পারে। অ্যালান শেপার্ড ও এডগার মিচেল দু-দফায় ন' ঘণ্টারও বেশি সময় চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন ও পাথর সংগ্রহ করেছেন। ভারতে যখন ইংরেজী মতে ৭ই ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে সতেরো মিনিট পার হয়েছে, শেপার্ড ও মিচেল চন্দ্রযান চড়ে চাঁদের মাটি ছাড়লেন। আট চাকার গাড়ি লুনো খোদ-১ এখনো কিন্তু চাঁদের বর্ষাসাগর এলাকায় নতুন গবেষণার জন্যে প্রস্তুত।

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে চাঁদের মাটিতে আরো অনেক মানুষের পায়ের ছাপ পড়বে, আশা করা যায়। আরো অনেক রকমের গাড়িও ঘোরাঘুরি করবে। লুনো-খোদ-১ যাঁদের হাতের গড়া তাঁরা নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ২০০০ সালের মধ্যে 'মুনরোভার' বা চাঁদের মাটিতে ঘোরাঘুরি করার চাকাওলা গাড়ি এত উন্নত ধরনের হয়ে উঠবে যে, তার পাশে আজকের লুনো-খোদকে মনে হবে আজকের মোটরগাড়ির পাশে প্রথম মোটরগাড়ির মতো হাস্যকর।

চাঁদের মাটিতে মানুষের বসবাস শুরু হবে, এমন কথা এক সময় যাঁরা বলতেন তাঁদের পাগল ভাবা হত। কথাটা এখন হামেশাই শোনা যাচ্ছে। এমন কি কেউ কেউ আরো একটু এগিয়ে চাঁদকে বলতে শুরু করেছেন পৃথিবীর অষ্টম মহাদেশ।

এক-একটি লুনা অভিযান ও এক-একটি অ্যাপোলো অভিযান এই উক্তিকে বাস্তব করে তোলার অবস্থা সৃষ্টি করছে।

এমন কি আজকের দিনেও চাঁদের মাটিতে দলে দলে মানুষ পাঠানো বিজ্ঞানের দিক থেকে অসম্ভব ব্যাপার নয়। এমন কি চাঁদে মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি উপনিবেশ গড়ে তোলাও নয়। কিন্তু প্রস্তাবটি এখনো পর্যন্ত একেবারেই অবাস্তব প্রধানত এ কারণে যে তা করতে গেলে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ফতুর হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কিছু মালপত্র সমেত অ্যাপোলো-চোদ্দর দুটি মানুষকে আঠাশ ঘণ্টার জন্যে চাঁদে ঘুরিয়ে আনতে খরচ পড়েছে ৪০ কোটি ডলার বা ৩০০ কোটি টাকা। মোট ন' দিনের সফর, তার মধ্যে ন ঘণ্টা চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়ানো—তারই জন্যে এত আয়োজন।

কিন্তু বিজ্ঞান যেমন অসম্ভবকেও সম্ভব করেছে, তেমনি অবাস্তবকেও বাস্তব। স্পুৎনিকের মতো কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উঠবে, এ ঘটনা এক সময়ে অবাস্তব মনে করা হত, এমন কি ১৯৫৭ সালেও। এখন? কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলাও এখন কারও কাছেই অবাস্তব ঘটনা নয়।

ফ্রা মরো কেন?

কয়েক শো কোটি বছর আগে, সম্ভবত পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ গড়ে ওঠার অল্প কিছুকাল পরেই, চাঁদের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা বস্তুর ধাক্কা লেগেছিল মনে হয়। তার ফলে চাঁদের উপরিতলে সৃষ্টি হয়েছিল অজস্র ক্ষতচিহ্ন। সবচেয়ে বড় ক্ষতচিহ্ন যেটি তার নাম মেয়ার ইম্ব্রিয়াম। এখানে চাঁদের গভীর অঞ্চল থেকে বস্তুপিণ্ড ওপরে ছিটকে পড়েছে ও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফ্রা মরো এই এলাকারই একটি অংশ।

সম্প্রতিকালে চাঁদে যে সমস্ত উল্কাপাত ঘটেছে তার ফলে চাঁদের উপরিতলটিতে একটি আবরণ পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন। অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২ নেমেছিল চাঁদের সমতল এলাকায়, যেখানে কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। এই সমতল থেকে যেসব পাথর সংগ্রহ করে আনা হয়েছে তা হয়তো উল্কাপিণ্ডেরই অংশ—চাঁদের আদিমতম বস্তুপিণ্ড নয়। কিন্তু অ্যাপোলো-১৪ যেখানে নেমেছিল তার অল্প দূরেই ছিল ১৫০ ফুট গভীর 'কোন্' ক্রেটার। এই গহ্বরটি যেন চাঁদের উপরিতলের আস্তরণকে ফুটো করে ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। ছবিতে দেখা যায়, কোন্ ক্রেটারের কিনারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই: বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই পাথরগুলো চাঁদের মূল বস্তুপিণ্ডের অংশ এবং মেয়ার ইম্ব্রিয়ামের তলা থেকে ছিটকে উঠে এসেছে।

এ কারণে ফ্রা মরো থেকে সংগ্রহ করে আনা পাথরের দাম বিজ্ঞানীদের কাছে এত বেশি। তাঁরা মনে করেন, ফ্রা মরোর পাথর বিশ্লেষণ করে চাঁদের মূল বস্তুর প্রকৃতি জানা যাবে এবং চাঁদের জন্ম সম্পর্কে, সঙ্গে সঙ্গে সৌরমণ্ডলের জন্ম সম্পর্কে, স্পষ্ট ধারণা করা যাবে।

'কোন্' ক্রেটারের অর্ধপথ থেকে নভশ্চর দু'জন ফিরে এসেছেন। কিন্তু তাই বলে অভিযানটি ব্যর্থ হয় নি। নির্ধারিত এলাকা থেকে পাথর খোঁড়া তারা সংগ্রহ করেছেন। এবং নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।

নতুন ধরনের পরীক্ষাকার্য—

অ্যাপেলো-চোদ্দর নভশ্চররা এবারে চাঁদের উপরিতলে একটি নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। এটি সম্পন্ন হয়েছে চন্দ্রযান থেকে প্রথমবার বেরিয়ে আসার সময়ে। প্রায় ১০০ মিটার লম্বা একটি কেবল পাতা হয়েছে চাঁদের মাটিতে। খানিকটা তফাতে তফাতেই গোটা কেবল-এ মাইক্রোফোন লাগানো। কাছেই একটি 'থাম্পার' বা আঘাতকারীতে সাজানো কতকগুলো বিস্ফোরক পদার্থ। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের মাটিতে কম্পন, এবং তা ধরা পড়ে মাইক্রোফোনে: পৃথিবীতে বসে বিজ্ঞানীরা এই কম্পন বিশ্লেষণ করে চাঁদের উপরিতল থেকে ৫০০ ফুট গভীর পর্যন্ত ভূস্তরের প্রকৃতি জানতে পারবেন।

চারটি একটি কামানও চাঁদের মাটিতে রেখে আসার কথা। নভশ্চররা চাঁদের মাটি ছেড়ে চলে যাবার পরে পৃথিবী থেকে এই কামানটি দাগা হবে। উদ্দেশ্য একই, চাঁদের মাটিতে কম্পন সৃষ্টি করা।

ভূপৃষ্ঠে মাটির নিচে তেল আছে কিনা তা জানবার জন্যে যে পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয় সেই একই পদ্ধতিতে চাঁদের মাটির গভীর তলদেশ সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

চন্দ্রযান থেকে 'কোন্' ক্রেটারে পৌঁছতে নভশ্চরদের হাঁটতে হয়েছিল এক মাইলের বেশি। চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান ছেড়ে এত দূরে যাওয়া এই প্রথম। মাঝে মাঝে নভশ্চররা দিশেহারা হয়ে পড়ছিলেন। পৃথিবী থেকে তখন তাঁদের সঠিক নির্দেশ পাঠানো হচ্ছিল। তবে আগামী তিনটি স-মনুষ্য চন্দ্র-অভিযানে নভশ্চরদের পায়ে হেঁটে বেড়াতে হবে না। তাঁদের সঙ্গে থাকবে জীপ-জাতীয় লুনরোভার বা চাঁদে চালাবার গাড়ি। ব্যাটারিচালিত এই গাড়িগুলো ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছুটে নিয়ে যেতে পারবে আর তার সর্বোচ্চ বেগ হবে ঘণ্টায় প্রায় ১৫ কিলোমিটার।

তাক লাগাবার জন্যে?

মার্কিন দেশের বাইরে বহু বিজ্ঞানী এই অ্যাপোলো-১১ অভিযানের সময় থেকেই স-মনুষ্য চন্দ্র-অভিযানের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে আসছেন। খোদ মার্কিন দেশেও সম্প্রতি স-মনুষ্য চন্দ্র-অভিযানের বিরোধীদের গলার স্বর বেশ জোরালো। ৩১শে জানুয়ারির রবিবারের টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বিরোধীদের একজন বিজ্ঞানী তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। বিজ্ঞানীর নাম ডঃ ব্রায়ান ও'লিয়ারি, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক। এক সময়ে তিনি ছিলেন ন্যাসার (ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—আমেরিকার মহাকাশ-গবেষণা যে সংস্থাটির পরিচালনায়) শিক্ষার্থী নভশ্চর। এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল ন্যাসার বিজ্ঞানী-নভশ্চর কর্মসূচীর আওতায়।

তারপরে যখন তাঁর ধারণা হয় যে, বিজ্ঞানী-নভশ্চর তৈরি করার গোটা কর্মসূচীটি একটি ভাঁওতা, ন্যাসার পক্ষ থেকে স-মনুষ্য চন্দ্র-অভিযান চালানো হচ্ছে যতোটা তাক লাগাবার জন্যে ততোটা বৈজ্ঞানিক সার্থকতার জন্যে নয়—তিনি তখন পদত্যাগ করেন। এখন তিনি মনুষ্যহীন মহাকাশ অভিযানের প্রবল সমর্থক। তাঁর মতে স-মনুষ্য অভিযানে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি (অ্যাপোলো-১৩ তার একটি প্রমাণ), খরচও অত্যন্ত বেশি। অ্যাপোলো-১৪ অভিযানে যতোটুকু বৈজ্ঞানিক সাফল্য তার সবটাই মনুষ্যহীন অভিযান থেকেও পাওয়া যেতে পারত—অ্যাপোলো-চোদ্দর জন্যে যে পরিমাণ খরচ করতে হয়েছে তার মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ খরচে!

ডঃ ও'লিয়ারি অভিযোগ করছেন, যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী-নভশ্চররা গত একবছর ধরে অপেক্ষা করছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মহাকাশ-অভিযানেই তাঁদের নেওয়া হয়নি। অ্যাপোলো-১১, ১২, ১৩, ১৪ এবং আগামী পনেরোর অভিযানেও নভশ্চর হবার সুযোগ পেয়েছেন বা পাবেন শুধু টেস্ট পাইলটরা। অ্যাপোলো অভিযানের উদ্দেশ্য যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণা হত তাহলে এমনটি কিছুতেই হতে পারত না। বলা বাহুল্য, একজন টেস্ট পাইলটের চেয়ে একজন বিজ্ঞানী যদি নভশ্চর হন তাহলে নিশ্চয়ই অনেক বেশি দক্ষতা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে—অবশ্য অভিযানটির উদ্দেশ্য যদি হয় বৈজ্ঞানিক। অ্যাপোলো পরীক্ষাকার্যের টেস্ট পাইলট নভশ্চররা অজস্র ভুল করেছেন তার নজির আছে।

ডঃ ও'লিয়ারি তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন, ১৪০০ আবেদনকারীর মধ্যে থেকে মাত্র ১১ জন বিজ্ঞানীকে নভশ্চর হবার জন্যে নির্বাচিত করার পরে ন্যাসা কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিয়ে শিক্ষার নামে কত অর্থহীন কাণ্ডকারখানা করেছেন। শিক্ষা শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে। বছর তিনেক পার হতে প্রায় সকলেই বুঝে গিয়েছেন আগামী এক যুগের মধ্যেও পৃথিবীর কক্ষেই হোক বা চাঁদের মাটিতেই হোক কোনো মহাকাশ-অভিযানে নভশ্চর হিসেবে তাঁদের নাম বিবেচিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। হতাশ হয়ে অনেকেই ন্যাসার বিজ্ঞানী-নভশ্চর কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন।

ডঃ ও'লিয়ারি বলছেন, চন্দ্র-অভিযানে ন্যাসার উদ্দেশ্য যদি সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক হত তাহলে কখনো এত ঘন ঘন অভিযানের আয়োজন করা হত না, বছরে একটির বেশি কখনোই নয়। আর প্রত্যেকটি চন্দ্র-অভিযানকে করে তোলা হত বিজ্ঞানের দিক থেকে বড় একটি আক্রমণের মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয়নি, হলে বিজ্ঞানী-নভশ্চরদেরই কদর হত অনেক বেশি।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কথা এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই তোলা যেতে পারে। তাঁরা যে আপাতত মনুষ্যহীন অভিযানই চালিয়ে যাবেন তা বেশ বোঝা যায়। সম্ভবত লুনোখোদ জাতীয় গাড়ি তাঁরা পাঠাবেন আবার শুধু চাঁদে নয়, মঙ্গল ও শুক্র ও অন্যান্য গ্রহেও। বৈজ্ঞানিক তথ্যসংগ্রহই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা প্রমাণ রেখেছেন—বর্তমান পর্যায়ে স-মনুষ্য অভিযানের চেয়ে মনুষ্যহীন অভিযানের সার্থকতা কম তো নয়-ই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি। অথচ একটি স-মনুষ্য অভিযানের খরচে অন্তত পাঁচটি মনুষ্যহীন অভিযান চালানো সম্ভব।

গবেষণা চলুক মহাকাশ নিয়ে

যদি নতুন কিছু করার না থাকে তাহলে চাঁদে বারবার মানুষ পাঠাবার কী অর্থ থাকতে পারে? এ-প্রশ্ন তুলছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা। তাহলে কি মঙ্গলগ্রহে মানুষ পাঠানো হবে? অন্তত এই শতকে নয়। অ্যাপোলো প্রকল্পের জন্যে খরচ ধার্য হয়েছে ২৪,০০০ মিলিয়ন মার্ক বা ১৮,০০০ কোটি টাকা। মঙ্গলগ্রহে মানুষ পাঠাবার খরচ আরো বহু বহুগুণ বেশি।

তাহলে কি মহাকাশ গবেষণা বন্ধ থাকবে? নিশ্চয়ই নয়।

গবেষণা চলুক পৃথিবীর কাছের মহাকাশ নিয়ে। এখনো পর্যন্ত মহাকাশ অভিযানের সবচেয়ে বড়ো লাভ এই মহাকাশ বা স্পেস, চাঁদ নয়। চাঁদ সম্পর্কে আগে থেকেই অনেক কিছু জানা ছিল, চাঁদের দেশে তিন-তিনবার মানুষ পাঠিয়েও চাঁদ সম্পর্কে আরো যেটুকু জানা গিয়েছে তাতে এই ধারণা পালটাবার দরকার হয়নি যে চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর একটি নিকৃষ্ট সংস্করণ।

পৃথিবীর কাছের মহাকাশ বলতে যদি বোঝানো হয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপর থেকে ভ্যান অ্যালেন বেল্টের তলা পর্যন্ত নিরাপদ জায়গাটুকু, তাতেও লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। যে-কোনো স্পেস সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা—ভরহীনতা ও পরিপূর্ণতম শূন্যতা বা ভ্যাকুয়াম। পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে এ দুটি লাভ করা যায় না। ভরহীনতা ও পরিপূর্ণতম শূন্যতার অবস্থায় বহু রকমের পরীক্ষাকার্য চলতে পারে, নতুন ধরণের কারখানা চালু করাটাও শক্ত ব্যপার নয়।

বর্তমান শতকের বাকি তিরিশটি বছরে যদি পৃথিবীর কাছের মহাকাশকে ধাপে ধাপে জয় করার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলেই মহাকাশ গবেষণা সার্থকতা লাভ করতে পারে—এই হচ্ছে বিশ্বের চিন্তাশীল বিজ্ঞানীদের মত।

—অয়স্কান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। বাইশ ।।

চেম্বারে ঢুকে রজত দেখল চন্দ্রানী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওকে ডাকতে কাছে এল চন্দ্রানী। রজত চেয়ারে বসল। চন্দ্রানী দাঁড়িয়ে। ওর দু'চোখের নীচে কালো দাগ। প্রসাধনে তা ঢাকা পড়েনি।

—কেমন আছেন মিস্টার মুখার্জি? রজত সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

—ভাল নয়। চন্দ্রানী মাথা নীচু করে, বাড়িতে রাখতে ভরসা পেলাম না। আজ তিনদিন হল হাসপাতালে রয়েছেন।

—তোমার কী আরও ছুটির প্রয়োজন?

চন্দ্রানী কোন জবাব দেয় না। নতুন চাকরী। বস্তুত ছুটি তার পাওনা হয়নি। ছুটির জন্যে সে কোন দাবী করতে পারে না। এখন যা অবস্থা, কোন মতেই চাকরীর ক্ষতি হোক চায় না। চাকরী না থাকা মানে......ভাবলে তার মাথা ঘুরে যায়, চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার।

—শুধু কয়েকটা দিন একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরোতে পারলে...।

—সে জন্য চিন্তা কর না। অনেক কাজ জমেছে। তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার করতে হবে।

এরপর কাজ শুরু হয়। পর পর অনেকগুলি ডিক্টেশন দেয় রজত। ঘন ঘন সিগারেট ধরায়। চন্দ্রানীর ক্লান্ত মুখ। বেচারী অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছে। চন্দ্রানী কী ওর স্বামীকে খুব ভালবাসে? স্বামীর জন্য কী প্রাণ বিসর্জন দিতে পারবে?

এই সব ননসেন্স কথা সে ভাবছে। রজত কয়েকবার হাই তোলে। শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করছে। ঘুম পাচ্ছে। গতকাল অনেক রাত্রে শুতে গেছে। বই পড়েছে রাত দুটো পর্যন্ত।

—এখন এ পর্যন্ত। তাড়াতাড়ি টাইপ কর।

চন্দ্রানী কাগজপত্র নিয়ে নিজের সীটে ফিরে যায়। বোস সাহেবকে সে একদিনে খানিকটা চিনেছে। সবটা নয়। সে কেন অনুরোধ করেছিল বোস সাহেবকে বাড়িতে যেতে? টাইপ করতে করতে নানা রকম চিন্তা করে চন্দ্রানী। স্বামীর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে তার মাথার ঠিক ছিল না। যদি সত্যি উনি যেতেন, [illegible] ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারত কী? ভাগ্যিস উনি যাননি।

টেলিফোন ধরল রজত। মিঃ হনুমানপ্রসাদ কথা বলছেন।

—বোস।

—স্যার।

—মিসেস মুখার্জি কী এসেছেন?

—এসেছেন।

—ওকে একবার পাঠিয়ে দিন।

ফোন রেখে রজত খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। ব্যাপারটা কী? হঠাৎ মিসেস মুখার্জিকে তলব কেন? যাই হোক চেয়ারম্যান যখন স্বয়ং মালিক অতএব যেতেই হবে।

—চন্দ্রানী।

—স্যার। চন্দ্রানী টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথম কয়েকদিন শুনতে খারাপ লেগেছে। কেনই বা নাম ধরে ডাকবে কেন। পরে ভেবে দেখেছে, এ নিয়ে মাথা গরম করে লাভ নেই। এখন তো শুনতে শুনতে অভ্যাস। তাছাড়া সে নিজেই প্রথম দিক কোন আপত্তি করেনি। আর একটা কথাও মনে পড়ল। উনি অন্যের সামনে ওকে নাম ধরে ডাকেন না।

—বড়সাহেব তোমাকে ডেকেছেন।

—আমাকে! পলকে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল চন্দ্রানীর মুখ। একটু নার্ভাস বোধ করল সে। বড়সাহেব অর্থাৎ মিঃ হনুমানপ্রসাদকে সে একবার মাত্র চাক্ষুষ দেখেছে। চাকরীতে প্রথম যেদিন যোগদান করল সেদিন।

রজত মৃদু হাসল, যাও। ডোন্ট বি নার্ভাস।

চন্দ্রানী বেরিয়ে যেতে, মনে মনে হাসল রজত। অহেতুক সংকোচ ঠিক নয়। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। মিঃ হনুমানপ্রসাদ কী জন্যে চন্দ্রানীকে ডেকেছেন? কাজের ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। তবে? ধেৎ! কাজের ব্যাপার ছাড়া উনি কী জন্য ডাকবেন। বহুসব বাজে চিন্তা......।

আরও একবার মীরার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা যা বলার হয়ে গেছে। কোর্টে দু'জনকেই যেতে হবে। ডিক্লেয়ার করবে মীরাই। ও ডিভোর্সের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। এবং মনে মনে খুশি হয়েছে।

কেননা তাহলে সে মুক্তি পাবে। এবং নতুন জীবন ফিরে পাবে সে। হয়ত শোভনকে বিয়ে করবে।

রজত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে জানালার সামনে এগিয়ে এল। এখান থেকে সে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাল। অসংখ্য মানুষ আর বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। কর্মব্যস্ত এই শহর। কেমন হয়, যদি সে, এখান থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে! শুধু একটা আর্ত চিৎকার হাওয়ায় ভেসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর কঠিন ফুটপাথের ওপর খানিকটা জায়গায় চাপ চাপ রক্ত, থেঁৎলানো মাংস হাড় চর্বি, মুহূর্তে জনতার ভীড়, অসংখ্য প্রশ্ন, পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি।

হ্যালো রজত। তুমি কী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চাও? কাপুরুষের মত পলায়ন করবে...সামান্য এক বন্যার জন্যে, নাকি বেঁচে থাকা অর্থহীন, এই নিরাপত্তাময় জীবন, চার মাইনে, সুন্দর ফ্ল্যাট, সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত মদ্যপান এবং সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য.....!

মুক্তি কী এবং কেন? রজত নিজের দিকেই প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল। মীরা মুক্তি চায়। সেও বোধ হয়। এবং বিনয়? হয়ত। আপনমনে হাসল সে। হাউ ফানি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন কানে আসছে। হাঁ, ঐ তো রাস্তায় অসংখ্য লোক। ফেস্টুন হাতে। মিছিল। কোলকাতার দৈনন্দিন জীবনের একটা চেহারা। কী বলছে ওরা? ওদের মুখে কী উত্তেজনার লাল?

তাড়াতাড়ি ফিরে এল নিজের সীটে রজত। তার ভয় হয়। মনে হয়, কোনদিন প্রবল জলস্রোতের মত অসংখ্য ক্রুদ্ধ মানুষ, লাল চোখে, মুঠি পাকিয়ে, ছুটে আসবে এদিকে। ওরা তার চেম্বারে ঢুকে সবকিছু লন্ডভন্ড করে দেবে। তারপর তাকে চেয়ার থেকে টেনে হিঁচড়ে উঁচু করে তুলে জানালা গলিয়ে নীচে ফেলে দেবে।

—বেয়ারা। রজত টাই-এর নট একটু ঢিলে করল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাথার ওপর প্রবলবেগে পাখা ঘুরছে।

হাওড়া
কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতাঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখাঃ ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন ঃ ৬৭-২০০১।

দুচোখ জ্বালা করছে। সে ঝাপসা দেখল। মাথা ঘুরছে। ঝিম ঝিম ভাব। সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে। এক গ্লাস জল দাও। সে আচ্ছন্নের মত টেবিলের ওপর মাথা রাখল। টের পেল পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে গলগল করে ঘাম নীচে নেমে যাচ্ছে।

বেয়ারা কয়েকবার ডাকতে রজত মাথা তুলল। ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে জল খেল। রুমাল নিয়ে কপাল ঘাড় মুছল। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল অনেকক্ষণ।

—স্যার।

সোজা হয়ে বসল রজত। চন্দ্রানী এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে। ওভাবে দেখছে কি? মনে মনে বিরক্ত হল সে।

—আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

—কিছু না। রজত গম্ভীর মুখে বলল, মিঃ হনুমানপ্রসাদ কি বললেন?

—এমন কিছু নয়। চন্দ্রানী সামান্য ইতস্তত করল. উনি মিঃ মুখার্জীর কথা জিজ্ঞেস করলেন। আর টাকা লাগবে কিনা জানতে চাইলেন। আমি অবশ্য বলেছি দরকার নেই।

—আর কিছু? রজতের কণ্ঠস্বর একটু রুক্ষ শোনাল।

—না। চন্দ্রানী মাথা নীচু করল। এত মেজাজ কেন বুঝতে পারছে না। কখনও হেসে চা খেতে ডাকেন, ট্যাকসি করে বাড়ি পৌঁছে দেন......আবার হঠাৎ রেগে যান অদ্ভুত এই বোসসাহেব।

—যান। তাড়াতাড়ি বাকি চিঠিগুলি টাইপ করে আনুন।

চন্দ্রানী নীরবে নিজের সিটে ফিরে যায়। রজত কাজে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে। মিঃ হনুমানপ্রসাদ তাকে ডাকতে পারত। চন্দ্রানীকে ডাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। থাকগে এ নিয়ে সে অভিমান করবে না। ব্যাপারটা আসলে এমন কিছু নয়। তার ক্রোধ বা অভিমান অর্থহীন।

কাজ করতে গিয়ে বারবার থেমে যায় রজত। তাকায় চন্দ্রানীর দিকে। এক মনে টাইপ করছে। মিঃ হনুমানপ্রসাদ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চান চন্দ্রানীকে। খুব দরদ দেখা যাচ্ছে।

টেলিফোন বেজে ওঠে। রজত রিসিভার তোলে, হ্যালো। রজত বোস স্পীকিং। কে আপনি? শে-ফা-লী। কী বললেন? তাই নাকি? ঠিক আছে এখুনি আসছি।

ফোন রেখে রজত বেল বাজাল। বড়বাবুকে ডেকে দাও। বেয়ারা চলে যেতে চন্দ্রানীকে ডাকল। তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।

চন্দ্রানী কাছে এসে দাঁড়াতে রজত বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি। চিঠিগুলো রেডি থাকে যেন—ফিরেই সই করবো।

বড়বাবু এলে রজত তার হাতে কয়েকটা ফাইল দিল। তারপর সুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে এল। একবার মিঃ হনুমানপ্রসাদকে জানাবে কিনা ভাবল। পরক্ষণেই মাথা নাড়ল। দরকার নেই।

রাস্তায় পা দিয়ে রজত একটা খালি ট্যাকসী দেখে হাত নেড়ে ইসারা করল। ট্যাকসীতে বসে গন্তব্যস্থানে যেতে নির্দেশ করল। শেফালী তার টেলিফোন নাম্বার জানল কিভাবে? বিনয়ের কথা ভেবে মনে মনে হাসল। নিজেকে যতই বুদ্ধিমান ভাবুক, আসলে বিনয় নির্বোধ।

একটা সিগারেট ধরাল রজত। শেফালী কী খুব নার্ভাস? কণ্ঠস্বরে তাই প্রকাশ পেয়েছে। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। মাত্র একদিনের আলাপ। মন্দ নয় মেয়েটি। কথাবার্তায় বেশ স্মার্ট। কী দেখে বিনয়ের প্রেমে পড়ল মেয়েটি? কিছুদিন যাক না, পরে টের পাবে, আত্মকেন্দ্রিক একজন যুবকের সঙ্গে প্রতিদিন মুখোমুখি হওয়া কী অসহনীয় বিড়ম্বনা।

হাসপাতালের গেটের সামনে ট্যাকসী থামতে রজত মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দেয়। তারপর অগ্রসর হয়। বেড নাম্বার টুকে রেখেছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। একজন নার্সকে ডেকে কোনদিক বোল নম্বর বেড জানতে চাইল। নার্স ডানদিকে একটা ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। রজত তাড়াতাড়ি সেই দিকে যায়।

হাঁ, ঐ যে ওরা দাঁড়িয়ে। মীরা, শেফালী আর নীহার। রজত নীহারকে দেখে থমকে দাঁড়াল। না, পালাবার পথ নেই। কেননা শেফালী হাত নেড়ে ডাকছে।

বিনয় শুয়ে। মাথায় ব্যান্ডেজ। আস্তে আস্তে কথা বলছে নীহারের সঙ্গে। রজতকে দেখে মৃদু হাসল। নীহার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বসতে বলেন রজতকে।

—আপনি বসুন। রজত একপলক তাকায় মীরার দিকে। চোখাচোখি হতে মীরা মুখ ঘুরিয়ে নিল। শেফালীর মুখে মৃদু হাসি।

—এখন কেমন আছ? রজত সামান্য ঝুঁকে বিনয়ের কপালে হাত রাখে। সামান্য গরম।

—ভাল। তুমি খবর পেলে কী করে রজতদা। বিনয় শেফালীর দিকে তাকায়, রজতদা ব্যস্ত মানুষ। তাকে ডেকে আনলে কেন?

রজত মৃদু ধমকের সুরে বলে, আর কথা বল না বিনয়। চুপচাপ শুয়ে থাক। কী দরকার ছিল তোমার ঝামেলায় মধ্যে যাওয়ার।

বিনয়ের চোখদুটো পলকে জ্বলে উঠল। সে মুখ খোলবার আগেই মীরা উৎকণ্ঠে বলে, দাদা চুপ কর। এখন তর্ক করবার সময় নয়। বৌদি, দাদা যাতে উত্তেজিত হয় এমন কথা না বলাই ভাল।

নিঃশব্দে শেষটুকু হজম করল রজত। ঠিক আছে, সে কিছু বলবে না। বস্তুত আসারও তার ইচ্ছা ছিল না। শুধু শেফালীর কাতর অনুরোধ শুনে ছুটে এসেছে। বিনয়ের জন্যে নয়। কেননা বিনয় সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ নেই। বিনয় মরুক বাঁচুক, তাতে তার কিছু যায়-আসে না।

নীহার দুজনের মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন। রজত আর মীরা। তাঁর দুচোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। মীরার ফাঁকা সিঁথির দিকে তাকিয়ে কী করবেন বুঝতে পারছেন না। একটা কথাও বলেন নি। স্বামী বেঁচে থাকতেও কোন হিন্দু ঘরের

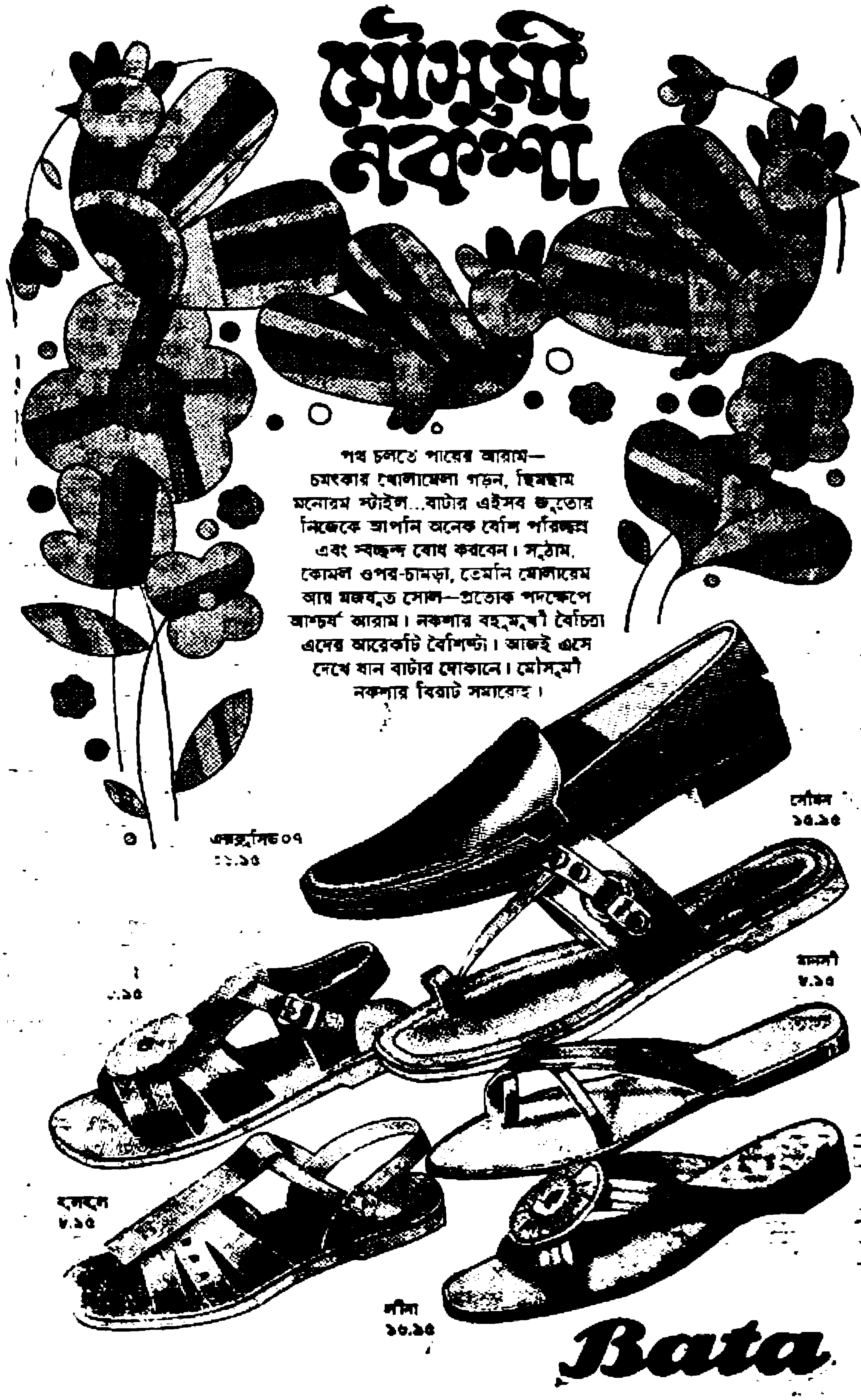
মৌসুমী নকশা
পথ চলতে পায়ের আরাম—
চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম
মনোরম স্টাইল...বাটার এইসব জুতোয়
নিজেকে আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন
এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন। সুঠাম,
কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম
আর মজবুত সোল—প্রত্যেক পদক্ষেপে
আশ্চর্য আরাম। নকশার বহুমুখী বৈচিত্র্য
এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আজই এসে
দেখে যান বাটার দোকানে। মৌসুমী
নকশার বিরাট সমারোহ।
১৫.৯৫
৮.৯৫
৮.৯৫
নীলা
১৬.৯৫
Bata

বিবাহিতা রমণী মাথায় সিঁদুর দেয় না... এ-সব অনাসৃষ্টি দেখার আগে যদি তাঁর মৃত্যু হোত

শেফালীকে কয়েকটা প্রশ্ন করল রজত। আশ্বাস দিল খানিকটা। ভয়ের কিছু নেই। কাল কিম্বা পরশু হয়ত হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে বিনয়। না, রাত্রে থাকার দরকার কী। এমন সিরিয়স কিছু নয়। ইঁটের আঘাতে মাথা ফেটেছে। স্টিচ হয়েছে অনেকটা। জ্বর থোক। বাড়ি ফিরে কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

এত কী কথা বলছে ঐ লোকটার [illegible] মীরা ভ্রূকুটিকে একবার তাকায়। [illegible] টেলিফোন পেয়ে ছুটে এসেছে। [illegible] থাকে। ফলে রীতিমত অস্বস্তি। সে দু-একটা কথা বলেছে বিনয়ের সঙ্গে। দুর্বোধ্য এখনও জ্ঞান যায়নি পুরোপুরি। ফলে আর কোন কথা হয়নি। মার সঙ্গেও নয়। এমন কি ডাক্তারও পর্যন্ত। ঘরে ঢোকার সময় একবার দেখেছে। ‘একদম বুড়িয়ে গেছেন মা। বোধহয় আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

—বৌদি। মীরা রাগ চেপে রাখতে পারে না, আমি এবার যাচ্ছি।

—আর কিছুক্ষণ থাক না। শেফালী কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে, অনেকদিন পর দুজনের দেখা। ভদ্রতার খাতিরে না হয় দু-একটা কথা বল। প্লীজ।

মীরা কোন জবাব দিল না। কোনদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে। বৌদি জানে না কিছু। জানলে ঠাট্টা করত না। কী বিশ্রী এদের মুখোমুখি হওয়া। আজ এখানে না এলেই ভাল হোত। তার উপস্থিতি কেউ চায় না।

—মীরা। রজত লাফ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে। তারপর মীরার পাশে দাঁড়িয়ে বলে, ভালই হল দেখা হয়ে। নইলে টেলিফোন করতে হোত।

কোন জবাব দিল না মীরা। তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। বস্তুত রজতের সান্নিধ্য তার গা ঘিনঘিন করে। শুনতেই হবে ওর কথা। যা নাছোড়বান্দা লোক। সেদিনের মত হয়ত ঝগড়া করবে। যদি জানতে পারত ও আসছে, কিছুতেই সে আসত না।

হাসপাতালের গেটের বাইরে এসে মীরা তাকাল রজতের দিকে। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, যা বলবার তাড়াতাড়ি বল।

—খুব ব্যস্ত বুঝি? রজত হাসল, সবাই আজকাল ব্যস্ত। যাকগে কাজের কথায় আসা যাক। শোনো, আমি সব ঠিক করেছি। এখন কবে তুমি কোর্টে যেতে পারবে জানাও। দুজনের সম্মতি থাকা দরকার। তারপর এক বছর জুডিশিয়াল সেপারেশন। এর পরেও যদি দুজনের মত না পাল্টায় অর্থাৎ ‘ডিভোর্স’ চায়...।

সামনে একটা ডবল ডেকার ছুটে যাচ্ছে। মীরা দুহাতে কান চেপে ধরল। একপলকে তাকাল রজতের দিকে। দুটি ঠোঁট নড়ছে। বাস চলে যাচ্ছে ভকভক করে ধোঁয়া ছেড়ে। মীরা ব্যাগের ভিতর থেকে রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরল।

—কিছু না মীরা। শুধু ফর্মালিটি মেনে চলতে হবে।

—ঠিক আছে। মীরা কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখল, এবার আমি যাই। একদিন আগে আমাকে জানিয়ে দিলেই চলবে। টেলিফোন করলেই হবে।

আর দাঁড়াল না মীরা। একটা ট্রাম এসে থামতে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। রজত ডাকতে যায়, কিন্তু কী ভেবে শুধু তাকিয়ে রইল। চলে যাচ্ছে ট্রাম। মীরা, একবার ভেবে দ্যাখ, আবার কী আমরা... শুধু বিস্মৃত মন থেকে দূর করে...পুরনো কথা কী কখনও তোমার......।

রজত আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। বিনয়ের কথা ভেবে হেসে হাসি পেল। খবরের কাগজে বোধহয় এভাবে সংবাদ ছাপাত : ক্রুদ্ধ ছাত্র দলের ইঁটের আঘাতে শিক্ষক আহত। বীরত্ব দেখাতে গিয়ে বিনয় আহত হয়েছে। বোঝাতে গেছে ছাত্রদের। একটা ইডিয়ট ছাড়া কী! সেধে কে ঝামেলা কাঁধে নেয়? ইচ্ছে করলেই এড়াতে পারত বিনয়। তা নয়, হীরো হবার মোহ!

ট্যাক্সী চেপে অফিসে পৌঁছল রজত। চেম্বারে ঢুকে নিজের সীটে বসল। প্রায় পাঁচটা বাজে। চন্দ্রানী ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। রজত নীচু হয়ে চিঠি পড়তে থাকে। তারপর খসখস করে সই করে। অনেকগুলি চিঠি। টের পায় চন্দ্রানীর অস্তিত্ব এবং মৃদু সুগন্ধ।

—স্যার।

—হুঁ। মাথা তুলল না রজত। একমনে চিঠি পড়তে থাকে।

—আমি কী যেতে পারি?

—কোথায়?

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল চন্দ্রানী। এভাবেই বোধহয় যথা নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করেন ওপরওয়ালা। মনে মনে অপমানিত বোধ করলেও সে নিজেকে সংযত করল। কেন এমন রূঢ় ব্যবহার করছেন বোস সাহেব! কী চান উনি?

মৃদু হাসল চন্দ্রানী; আজ হাসপাতালে যেতে হবে না। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। চারটের সময় বেরোলেই ঠিক হোত।

—বস। রজত মুখ তুলে তাকাল, আর মাত্র কয়েকটা চিঠি। আমিও তোমার সঙ্গে যাব মিস্টার মুখার্জীকে দেখতে।

চন্দ্রানী মনে মনে ঘাবড়ে যায়। চেয়ারে বসে বোস সাহেবের দিকে আড় চোখে একবার তাকায়। দেরী হয়ে যাচ্ছে। এরই নাম চাকরী। অর্থাৎ ক্রীতদাস। মালিক যা বলবে তাই করতে হবে। ছোটখাট বে-সরকারী অফিসে, যেখানে ইউনিয়ন নেই, কর্মচারীরা সংখ্যায় অল্প, সেই সব জায়গায় যারা কাজ করে, তাদের অবস্থা কুকুর বেড়ালের চেয়েও হীন।

হঠাৎ এমন খেয়াল হল কেন বোস সাহেবের? এখন সে কী করে বলবে যে, আপনার যাওয়াটা ঠিক হবে না। ওরা অর্থাৎ শ্বশুর দেবর বা স্বামী কেউ ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখবে না। অফিসের বস তো হয়েছে কী।—ওর সঙ্গে নিছক কাজের সম্পর্ক। এসব ভেবে চন্দ্রানী মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল।

কাগজপত্র গুছিয়ে রজত তাকাল চন্দ্রানীর দিকে, চল এবার বেরুনো যাক। তোমার একটু দেরী হয়ে গেল। আমি দুঃখিত।

সিঁড়ি বেয়ে দুজনে নীচে নামতে থাকে। চন্দ্রানী কিভাবে বোস সাহেবকে যেতে নিষেধ করবে বুঝতে পারছে না। রাগালে চলবে না। বস্তুত ও'র জন্যেই চাকরীটা এক রকম হয়েছে। সে জন্যে মনে মনে সে কৃতজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে সামান্য উপহার এনেছিল। ঘুষ নয়। কিন্তু উনি বুঝলেন উল্টো। রেগে গেলেন। ভয় পায় চন্দ্রানী। ফলে সে খুব সতর্ক।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে চন্দ্রানী বলেই ফেলল, কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনার যাওয়াতে অসুবিধে আছে। বলেই সে মনে মনে ভীষণ লজ্জা পায়। ছি! মুখ ফুটে তাকে বলতে হল শেষ পর্যন্ত।

পলকে রজতের মুখ কালো হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি সামলে নিল নিজেকে। চন্দ্রানীর মাথা নত। মনে মনে হাসল সে। চন্দ্রানীর নিজের মনে কী জোর নেই? মনে পড়ল রজতের, সে ঠিক করেছিল, আর মানুষের উপকার করবে না। এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল কিভাবে। এ কী দুর্বলতা!

—দেরী কোর না চন্দ্রানী। ঠিকই, আমার যাওয়া ভাল দেখায় না। গুড নাইট!

তাড়াতাড়ি ভীড়ের মধ্যে মিশে যায় রজত। মুহূর্তের সাময়িক দুর্বলতায় সে বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বসেছিল। নইলে চন্দ্রানীর সঙ্গে হাসপাতালে যাওয়ার কথা সে ভাবতে পারল কিভাবে! বড্ড কী নাটক হয়ে যাচ্ছে না? পুরনো। পচা নাটক।

।। তেইশ ।।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকতে বিনয় কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি সে বিছানা থেকে উঠে জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর আলনা থেকে একটা চাদর টেনে নিল। এটা কী মাস? আজ কত তারিখ! কতদিন সে বাড়িতে বিশ্রাম করছে? পায়ে পায়ে সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। এক মুখ দাড়ি। অনেকদিন সে দাড়ি কাটে না। কতদিন? চুলের ভিতর ক্ষতস্থানের ওপর আঙুল রাখল। ওখানে বোধহয় আর নতুন করে চুল গজাবে না। ধীরে ধীরে তার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটল। পরক্ষণেই করুণ হয়ে উঠল।

বারান্দায় কেউ নেই। মা কোথায় গেলেন? শেফালী এখনও ফিরছে না কেন? স্কুল ছুটি হয়েছে তো অনেকক্ষণ। কোথায় গেল শেফালী? লম্বা টানা বারান্দায় কয়েকবার পায়চারী করল বিনয়। মনে পড়ছে সব। মনে পড়ছে আজ কত

তারিখ। এই তো কিছুক্ষণ আগে, হয়তো সন্ধ্যা হয়নি, সে ওদের সঙ্গে [illegible] দেখা করেছে। ওরা একটু আগে চলে গেল। তার নতুন সহকর্মী। এক কাপ চা পর্যন্ত ওদের দিতে পারল না। কেউ ছিল না। [illegible]।

এক ঘর থেকে অন্য ঘরে, কিছুক্ষণ বাইরে বেরিয়েছে [illegible] দেখে [illegible] টুকরো শব্দ, কোন ঘর থেকে হঠাৎ ছিটকে আসা হাসি; অন্যমনস্কভাবে [illegible] একবার [illegible] যাবে না [illegible] যাবে কিনা ভাবল। তারপর ফিরে এসে [illegible] ঘরে [illegible] চুপ করে বসে পড়ল বিছানায়। এবং এক পায়ের ওপর আর এক পা রেখে [illegible] নাচাতে থাকে। সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে ওঠে। ধোঁয়া চোখে এসে [illegible] করে। জল [illegible] চোখে। সে দু' চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে আপন মনে বলে, 'অসহ্য।' [illegible] 'অসহ্য।'

[illegible] বলতে নেই এই নতুন সহকর্মী ও [illegible] [illegible] উচিত হয়নি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কেউ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সুপার সার্ফ দিয়ে একবার ধুলেই অন্য যে-কোনো পাউডারে ধোয়ার চেয়ে জামাকাপড় অনেক বেশী ফর্সা হয়

পরীক্ষাগারে বারবার ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে সুপার সার্ফ দিয়ে কাচা জামাকাপড় বাজারের প্রতিযোগিতামূলক অন্য যে-কোনো সেরা পাউডার দিয়ে কাচা জামাকাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ফর্সা হয়ে ওঠে,-যা দেখে অন্যদের তাক লেগে যাবে! তাই কাজ চালাবার মত অন্য পাউডার কিনবেন কেন? ভারতের সবচেয়ে সেরা ব্র্যাণ্ডই কিনুন, আর তা' হোল সুপার সার্ফ

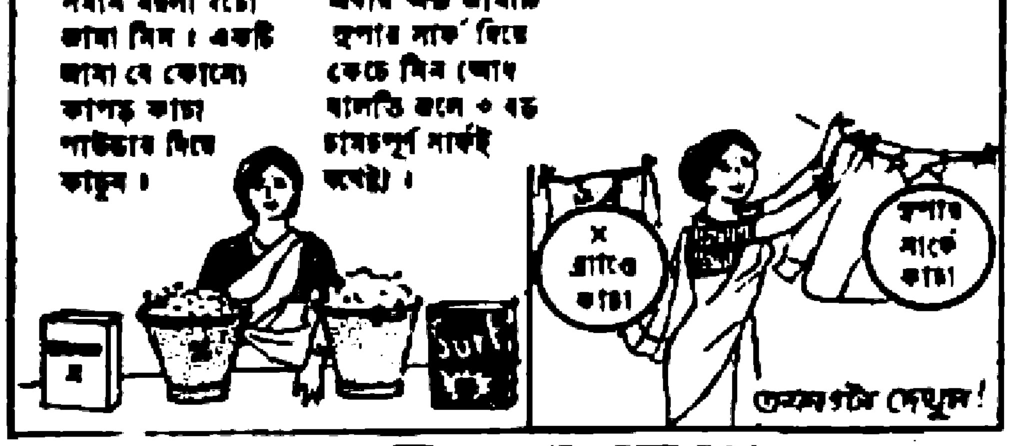

সুপার সার্ফ
সবচেয়ে সাদা করে ধোয়
(নীল বা অন্য কিছু মেশাবার দরকার হয়না)

লিন্টাস-SU. 11-140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

পুলিশে খবর দেন। পুলিশ আসবার আগে বিনয় ছাত্রদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সে ওদের শান্ত হতে বলে। ওদের নিষেধ করে ঢিল ছুঁড়তে। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে ওর কথা কারুর কানে যায় না। সে আরও এগোবার চেষ্টা করে। তখন ভীড়ের মধ্য থেকে একটা ইঁটের বড় চাঁই ওর মাথার ওপর এসে পড়ে। আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় বিনয়। এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে।

সে নির্বোধ এবং সেন্টিমেন্টাল। সবাই একথা বলছে। আর সহানুভূতির চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে। এমন কি শেফালী পর্যন্ত।

—সত্যি তুমি বোকা। শেফালী কমলালেবুর এক কোয়া ওর মুখে পুরে দেয়, সেবারও তুমি এমনি বোকামীর পরিচয় দিয়েছিলে। মনে আছে? ওই যে গঙ্গার ধারে একটা মেয়েকে...তুমি যে সবার থেকে আলাদা, এভাবে কী তার প্রমাণ দিতে হয়!

বিনয় সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারেনি। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছিল শেফালীকে। তখনও আর কেউ আসেনি। চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে শেফালী এসেছে। এবং ওকে দেখে মনে মনে খুশি হয়েছে সে। কিন্তু শেফালীর কথার ধরন ভাল লাগেনি তার। এভাবে উপহাস করতে হয়! সে সংযত থাকতে পারেনি। ক্রোধে ফেটে পড়েছে।

—আমি বোকা নির্বোধ... বেশ বেশ, তাতে তোমার কী। অন্যায় একটা মেয়েকে পেয়ে রাস্তায় অপমান করবে আমি বাধা দেব না? স্কুলের দরোজা জানালা ভেঙে, কাগজ ফাইল খাতা চেয়ার টেবিল তছনছ করবে ছাত্ররা, আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখবো? বিশেষ করে একজন শিক্ষক হয়ে। আমি পালিয়ে যাব? পালিয়ে যেতে পারলেই আমি চালাক চতুর বুদ্ধিমান হয়ে যেতাম। তাই না? শেফালী, আমি নিজেকে বিশিষ্ট প্রমাণ করতে চাই না। কিন্তু আমি একজন স্বাভাবিক মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই। আমি মানুষ হয়ে অমানুষের মত বাঁচতে চাই না।

শেফালী কী বলেছিল এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে না বিনয়ের। চারদিকে যে-রকম অবস্থা অর্থাৎ সবাই গা বাঁচিয়ে চলতে চায়, চোখের সামনে জঘন্যতম অপরাধ ঘটতে দেখলেও না দেখার ভান করা... অতএব ওরা তাকে দোষারোপ করবেই, সে যে বয়স্ক বালক বারবার একথা জানাবে। সুতরাং প্রতিবাদ করা নিষ্ফল জেনে চুপচাপ থাকে।

ওদের দুজনের মুখোমুখি বসে সে চুপচাপই ছিল। ওরাই কথা বলেছে বেশি। একবার কেন আদিত্যর নাম করেছিল। হাঁ, মনে পড়ছে। দুয়ে সে মৃদু হেসে ওই বিষয় নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে গেছে। বিশ্বাস করে না সে ওদের কথা। মত-বিরোধ হলেই যে-একজন ভীরুর মতো লুকিয়ে অর্বাচীন ক্ষুব্ধ ছাত্রদের তার মাথা লক্ষ করে ইঁট ছুঁড়তে প্ররোচিত করবে একথা বিশ্বাস করা শক্ত। সে তো আদিত্যের কোন ক্ষতি করে নি। আদিত্য কেন, মনে পড়ছে না, জ্ঞাতসারে কারুর সে ক্ষতি করেছে। তবে? তার কোন শত্রু নেই। থাকতে পারে না। কেননা সে অতি সাধারণ একজন। প্রায় দরিদ্র স্কুল শিক্ষক। রাজনীতি করে না। পাড়ায় সভাপতি হবার জন্যে বা নেতা হবার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না কারুর সঙ্গে। নিয়মিত স্কুলে যায়, মনোযোগ দিয়ে ছাত্রদের পড়ায়, সপ্তাহে তিনদিন টিউশোনী করে; বাড়িতে ফিরে স্ত্রী বা মার ওপর মেজাজ দেখায় না, কোন প্রতিবেশীর সুন্দরী স্ত্রী বা মেয়ের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকায় না। সবার অলক্ষ্যে সে বেঁচে থাকতে চায়। পছন্দমত জীবনযাপন করতে না পেরে চিৎকার করে ক্রোধ প্রকাশ বা মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে বৌকে ধরে নির্যাতন...হাঁ, দুঃখ তার আছে, বহু বিষয়ে বিরক্তি বা ক্রোধ, কিন্তু এতে অন্যের ক্ষতি হচ্ছে না, কারুর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটছে না, যা কিছু দুঃখ বা বিষাদ সে সব তার একার, অংশীদার কেউ নেই, কোন নালিশ নেই, একমাত্র তিল তিল করে নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া ছাড়া।

হঠাৎ বিনয়ের খেয়াল হয় দরোজার কড়া নাড়ার শব্দ। সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে প্রায় ছুটে এসে দরোজা খুলে দেয় এবং শেফালীর মুখোমুখি হয়।

শেফালী দরোজা ভেজিয়ে বিনয়ের দিকে ভ্রূকুঁচকে তাকাল, তুমি কী ঘুমুচ্ছিলে?

—না। বিনয় শেফালীর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকে। তারপর ফিরে এল শোবার ঘরে। শেফালীর মুখে একটা ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। কার ছায়া? সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে মনে পড়ল মা ভাগবত পাঠ শুনতে গেছেন কাশীমিত্র ঘাটে সেনদিদের সঙ্গে। অতএব তাঁর ফিরতে দেরী হবে।

—আমি ভাবলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো। শেফালী বাইরের পোশাক পাল্টাতে থাকে, অনেকক্ষণ কড়া নেড়েছি। মা কোথায়?

—ভাগবত পাঠ শুনতে গেছেন।

—অর্থাৎ এখন আমাকে উনুন ধরাতে হবে। এই রাত আটটায়। সত্যি রান্নার একজন লোক চাই। তোমাকে তো অনেকদিন বললাম। আমার কোন কথা যদি তুমি শোন। টাকা যা লাগে দেব। তুমি একটা লোক জোগাড় কর। সাফ বলে দাও পারবে না। আমি নিজে দেখছি। কখনও আমার কথা ভাব? আমিও একটা মানুষ। দেরাজ না, টেবিল না, আলমারী না।

—তোমার ফিরতে এত দেরী হল কেন? বিনয় কথাটা বলে ফেলে মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। শেফালীর মেজাজটা ঠিক নেই। সে অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয়।

—এমনি। শেফালী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল খোলে। আলগোছে চিরুনি চালায়। চুপচাপ দুজনে। ঘড়ির টিকটিক শব্দ। শেফালীর মুখ দেখা যাচ্ছে না। এমনি মানে কী? বিনয় মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। প্রশ্ন শুনে শেফালী কী চমকে উঠেছিল? হঠাৎ নিভে গেল কেন?

—শোন শেফালী। বিনয় যথাসম্ভব উত্তেজনাহীন গলায় বলার চেষ্টা করে, তুমি কোথায় ছিলে? কয়েকদিন যাবৎ তুমি দেরী করে ফিরছো। ব্যাপারটা কী বল তো?

—কী যে তুমি বল। শেফালী মুখ ফিরিয়ে অল্প হাসল, আজ এক বান্ধবী জোর করে টেনে নিয়ে গেল ওর বাড়ি। তাই ফিরতে একটু দেরী হল। অমন করে তাকাচ্ছ কেন?

—দেখছি তোমাকে।

—যাও আর তামাসা করতে হবে না! বলতে বলতে শেফালী টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, যাই উনুনে ধরাই গিয়ে। আর পারি না। কাল পরশুর মধ্যে যে-করেই হোক একটা রান্নার লোক জোগাড় করতে হবে।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে শেফালী। উঃ কী ভয়ঙ্কর বিনয়ের দুটো চোখ! কাঠ আর ঘুঁটে উনুনের ভিতর পুরে কেরোসিন তেল ঢেলে দেয়। আগুন ধরায়। দপ করে লাফ দিয়ে আগুন ওপরে ওঠে। শেফালী মুখ সরিয়ে নেয়। এখনও বুকের ভিতর ঢিবঢিব করছে। উনুনের ভিতর কয়লা ঢেলে সে বাথরুমে ঢুকল। সাবান দিয়ে মুখ হাত ধোবার সময় রজতের কথা মনে পড়ল।

বিনয়কে সব কথা বলা যায় না। তাহলে সন্দেহ দিন দিন বাড়বে। এবং তার ফল খুব খারাপ। রজতদা সত্যি অদ্ভুত। মনে পড়ছে প্রথম দিন স্কুল থেকে ফেরার পথে অকস্মাৎ রজতদার মুখোমুখি হওয়ার কথা। ওর কথা অনেক শুনেছিল। ফলে একটা তীব্র কৌতূহল ছিল। বস্তুত, বিনয় আর রজতদার মধ্যে সম্পর্কটা মধুর নয়। জেনেশুনে সে রজতদার সঙ্গ এড়িয়ে গেল না কেন?

আরে আপনি কোত্থেকে?

—স্কুল থেকে ফিরছি। শেফালী অল্প হেসে বলেছে, আমাদের ওখানে আর তো গেলেন না। মা প্রায়ই আপনার কথা বলেন।

—যা অফিসে কাজের চাপ। রজতও হেসে বলেছে, যাব একদিন। বিনয় কেমন আছে?

—এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আরও কিছুদিন বিশ্রাম করবে। রজতদা, আমাকে আপনি করে বলবেন না। শুনতে খারাপ লাগে। চলুন না আজ।

—আজ থাক শেফালী। তোমার কী খুব বাড়ি ফেরার তাড়া?

—কেন বলুন তো?

—তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত। চল একটু চা খাওয়া যাক। আপত্তি আছে?

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

অঙ্গনা

বিদেশে জয়ের বাদ্য

প্রদর্শনীর একটি অংশ

ফুলের দেশ জাপান। ফুল সাজানোরও। আধুনিক ফুল সাজানোয় জাপানের খুব নাম ডাক। সে দেশের ইকেবানা পদ্ধতি সারা বিশ্বে আলোড়ন এনেছে। ইদানীং ফুল সাজানো বলতে যা কিছু, এই ইকেবানা পদ্ধতি। অন্তত রসিকমহল তাই মনে করেন। পাশ্চাত্য এবং ইকেবানা পদ্ধতিই পুষ্পসজ্জার বিশ্বে কৌলীন্যের অধিকারী। আর কারো সেখানে প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে। কিন্তু সম্প্রতি সে বেড়া ডিঙিয়েছেন একজন ভারতীয় মহিলা। তিনি শ্রীমতী উমা বসু।

জাপানের রাজধানী টোকিয়োর প্রাণকেন্দ্রে তিনি একটি পুষ্পসজ্জার আসরের ব্যবস্থা করেন। ভারতে ফুল সাজানোর অতীত এবং ভবিষ্যত ছিল তাঁর বিষয়বস্তু। তিন সপ্তাহ মাত্র ছিলেন তিনি জাপানে। তারই মধ্যে এই পুষ্পসজ্জার আসর। দু'দিনের জন্যে। একে ঘিরে সে দেশের পুষ্পরসিকদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। নানা পুষ্পসজ্জা প্রতিষ্ঠানের অনেকেই এসেছিলেন। তাঁরা যেমন মুগ্ধ হয়েছেন তেমনি সপ্রশংস। সে দেশের সংবাদপত্র শ্রীমতী বসুকে বিরাট সম্বর্ধনা জানিয়ে বলেছে : দি কমন নোশন দ্যাট ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ এ 'পেটেন্ট' অফ জাপান ওয়াজ শ্যাটার্‌ড বাই অ্যান ইন্ডিয়ান লেডি, মিসেস উমা বসু, হু হেল্ড অ্যান এক্সিবিশন অফ হার ইন্ডিয়ান স্টাইল ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যাট দি ইন্ডিয়ান এমব্যাসী রিসেন্টলি। হার ওয়ার্ক ইজ নটিবল ইন দ্যাট সি ওয়াজ ক্যারেজিয়াস টু শো হার ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টস ইন জাপান, দি মক্কা।

এরপর সংবাদপত্রের প্রতিনিধি বক্তব্য রেখেছেন পুষ্পসজ্জা এবং তার উপকরণ সম্বন্ধে : ডিফারেন্ট ফ্রম দি ইউজুয়াল ওয়ার্কস স্টাইলস হুইচ উই সি ইন জাপান, দি মেটিরিয়ালস ইউসড ওয়্যার ভেরি অর্ডিনারী ওয়ানস, ফাউন্ড ইন দি এম্ব্যাসী অ্যান্ড অলসো সাম বট ফ্রম ডিপার্টমেন্ট স্টোর্স।

সবশেষে প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেছেন শ্রীমতী বসুর সঙ্গে : সি সেড দ্যাট এভরি নেশন হ্যাজ কালচার অ্যান্ড আর্ট অব ইটস ওন অ্যান্ড ইট ইজ ইমপর্ট্যান্ট টু মেক দি বেস্ট ইউজ অফ লোক্যাল এভেলেবল মেটিরিয়ালস ইন অর্ডার টু এক্সপ্রেস ওন মটিফস। সো, থিংকিং, সি স্টারটেড অন অ্যারেঞ্জিং ফ্লাওয়ারস ইন হার ইন্ডিজেনাস ওয়েজ। হার ইন্টেলেকচুয়াল আইজ স্পার্কলড হোপফুলি হোয়েন সি ওয়াজ গিভিং হার আইডিয়াস।

জাপানী সংবাদপত্রের ভাষা ইংরাজীতে অনুবাদ করে শ্রীমতী উমা বসুর কাছে পাঠিয়েছেন আমাদের দূতাবাস প্রতিনিধি। এছাড়া সে দেশের অনেক ইংরাজী কাগজেও এই প্রদর্শনীর সচিত্র বিবরণ বেরিয়েছে। তার কিছু কিছু নমুনাও দেখালেন শ্রীমতী বসু। একটি ইংরাজী সংবাদপত্র মন্তব্য করেছে : হার আনইউজুয়াল ফ্লোরাল ডিজাইনস হ্যাভ বিন অফ মাচ ইন্টারেস্ট ডিউরিং হার টু ডে শোয়িং ইন টোকিও।

ফুল সাজানো সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহী শ্রীমতী উমা বসুর নাম তাঁদের কাছে বিশেষ পরিচিত। ইদানীংকালে শহর কলকাতার রুচি ফেরানোর ব্যাপারে তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। ফুল সাজানোয় এখন আমাদের মধ্যে যে ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হয় তার মূলে শ্রীমতী বসুর অবদান অনেকখানি। একাধিক পুষ্পসজ্জার আসরে তিনি সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই হোক অথবা পুষ্পসজ্জার আকর্ষণে প্রতিটি প্রদর্শনীতেই বেশ ভিড় হয়েছে। দর্শকদের এই কৌতূহলের অন্যতম কারণ ছিল পুষ্পসজ্জার দেশীয় প্রয়োগ পদ্ধতি যা কিনা জাপানী সাংবাদিক শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি প্রদর্শনীতেই তিনি এর ব্যবহার করেছেন যদিও মূলে সর্বত্রই রেখেছেন ইকেবানাকে। একে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। কেন না, ইকেবানা সত্যি পুষ্পসজ্জার এক নতুন দিগন্ত। তাছাড়া, এদেশের দর্শকদের সম্বন্ধেও শ্রীমতী বসুর জ্ঞান যথেষ্ট। কোন ভাল জিনিস দেখলেই আমরা ধরে নিই তা বিদেশী। তারপর ভুল ধরিয়ে দিলে জিভ কেটে নানা প্রশংসামূলক শব্দ উচ্চারণ করি। বিনা বিদেশীতে পুরোপুরি স্বদেশীকে কেউ আমল দিতে রাজি হন না।

শ্রীমতী উমা বসুর প্রতিটি প্রদর্শনীই তাঁর এক নতুন উত্তরণ। কলকাতা, দিল্লী এবং মাদ্রাজ—এই তিনটি শহরকে একবার তিনি একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপহার দিয়েছিলেন আমাদের। তিনটি শহরের অতীত সেদিন যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল সমবেত দর্শকমণ্ডলীর কাছে। পুষ্পসজ্জার চিন্তায় যে কি নিখুঁত প্রকাশ ঘটতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আবার একবার দেওয়ালীতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন শ্রীমতী বসু। পুষ্পসজ্জায় দেওয়ালীর সামগ্রিক বক্তব্য—বাজি, বাজি পোড়ানো পর্যন্ত। কিন্তু সেদিনের প্রদর্শনীতে লক্ষ্মীবরণ এবং অলক্ষ্মী বিদায়ের দৃশ্যটি এখনো মনে আছে। আমাদের ঘরের কথা এবং একটি লোকাচার সেদিন যেন কাব্যের জন্য সর্বজনীনরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। এমনি নানা প্রদর্শনীতে তিনি শহরের রসিকজনের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

আরেকটা ঝোঁক এখন প্রায়ই দেখা যায়। নানা ভাবে অনেকেই দেশের কথা ভেবে থাকেন। দেশীয় চিন্তায় প্রতিফলন ঘটাতে চান নিজের প্রদর্শনীর মধ্যে। কিন্তু সে আন্তরিকতায় অনেক সময় সন্দেহ থেকে যায়। কারণ, তাতে সাধনার চেয়ে স্টান্ট বেশি অর্থাৎ ধোঁকা দেওয়া। শ্রীমতী উমা বসুকেও

প্রথম প্রথম সেরকম মনে হতো। আস্তে আস্তে সে ভুলটা কেটে গেছে। কারণ, বরাবরই দেখছি পুষ্পসজ্জায় তিনি আমাদের দেশীয় চিন্তার প্রতিফলন ঘটান সেখানে ধোঁকা দেবার জন্যে নয়। বরং বলা চলে সেটাই তাঁর সাধনা।

শ্রীমতী বসু কলকাতার বাইরেও বহুএকটি পুষ্পসজ্জার আসরে যোগ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিল্লী এবং মাদ্রাজ। দিল্লীতে তাঁর প্রদর্শনীর প্রশংসা করেছিলেন পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন। তাঁর কথায় বিবুধের সংগ্রাম প্রদর্শনীটি দীর্ঘকাল অনেকের স্মরণে থাকবে।

পুষ্পসজ্জার দেশীয় চিন্তায় শ্রীমতী বসু এগিয়েছিলেন অনেকখানি। এই সঙ্গেই তাঁর মাথায় ঘুরছিল আরেকটি চিন্তা। ইকেবানা পুষ্পসজ্জার উৎপত্তি এবং মূল নিয়ে তিনি বিশেষ চিন্তায় নিবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু একথা তিনি প্রকাশ করেন নি। নিজের সাধনায় একান্ত তন্ময় হয়েছিলেন। এ ব্যাপারটা না জানা থাকলেও পুষ্পসজ্জায় তাঁর দেশীয় চিন্তাধারার প্রয়োগে উৎসাহিত হয়ে কামনা করেছি সাধনায় সিদ্ধি।

হঠাৎ তিনি জাপান চলে গেলেন। নিজের বিচারবুদ্ধি এবং চিন্তাকে সঠিক মিলিয়ে নেবার জন্যে। মোটামুটি প্রকাশ্যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন এক্সপো ৭০ দেখতে যাওয়া। তাও যে না দেখছেন তেমন নয়। তবে নিজের কাজের দিকেই মন ছিল বেশি। তাই তাঁকে ঘুরতে হয়েছে অজস্র। গিয়েছেন রেক্কোইকন্দো মন্দিরে। আধুনিক পুষ্পসজ্জার উৎপত্তিস্থলে। যেখানে বুদ্ধের ভক্তরা দলে দলে এসে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতেন। আর পুষ্পার্ঘ্য থেকে সৃষ্টি হলো জাপানের বিশ্ব বিখ্যাত ইকেবানা পদ্ধতির।

শ্রীমতী বসু এবার নিঃসন্দেহ যে ইকেবানা আমাদের দেশেরই জিনিস। ওদেশে বহিরঙ্গে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অন্তরে সে একই। অর্থাৎ আমাদের পূর্ণঘটের চিন্তাই ইকেবানায় রূপলাভ করেছে। এক্ষেত্রে জাপান কিছুটা এগিয়ে যেতে পেরেছে। পূর্ণঘটের রূপেই আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তারপর আর নাড়াচাড়া করিনি। জাপান কিন্তু থেমে থাকেনি। এই রূপকল্পকে ওরা আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যেমন অনেক কিছু প্রাচীন সম্পদ চর্চার অবহেলায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে তেমনি এই পূর্ণঘটের তত্ত্ব। আর জাপান পূর্ণঘট থেকে ইকেবানা পদ্ধতির আবিষ্কার করে সারা বিশ্বে পুষ্পসজ্জায় খ্যাতি অর্জন করেছে।

পূর্ণঘট থেকে ইকেবানা এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার পর তিনি চেয়েছিলেন টোকিও শহরেই একটি প্রদর্শনী করার। পূর্ণঘট কিভাবে ইকেবানায় রূপান্তরিত হয়েছে সেটা দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা করা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। শেষ পর্যন্ত তিনি করলেন সম্পূর্ণ দেশীয় চিন্তাধারাপুষ্ট একটি প্রদর্শনী। ফুল সাজানোর কারিগর জাপানীরা পুষ্পসজ্জায় একেবারে অবাক। পুষ্পসজ্জায় ভারতের ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ তাদের খুবই মুগ্ধ করেছে। সাংবাদিকের কলমে তারই প্রমাণ।

জাপান থেকে শ্রীমতী বসু ফিরে এসেছেন নবীন উদ্যমে। এবার নতুন চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে। সেখানকার বাৎসরিক ফুল-প্রদর্শনীতে তিনি পুষ্পসজ্জায় যোগ দিয়েছেন। সম্ভবত এবারের সেই পূর্ণঘট থেকে ইকেবানা।

বিদেশে অভিনন্দিত শ্রীমতী বসুর স্বদেশে অভ্যর্থনার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি সাগ্রহে।

—প্রমীলা

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনারত শ্রীমতী উমা বসু

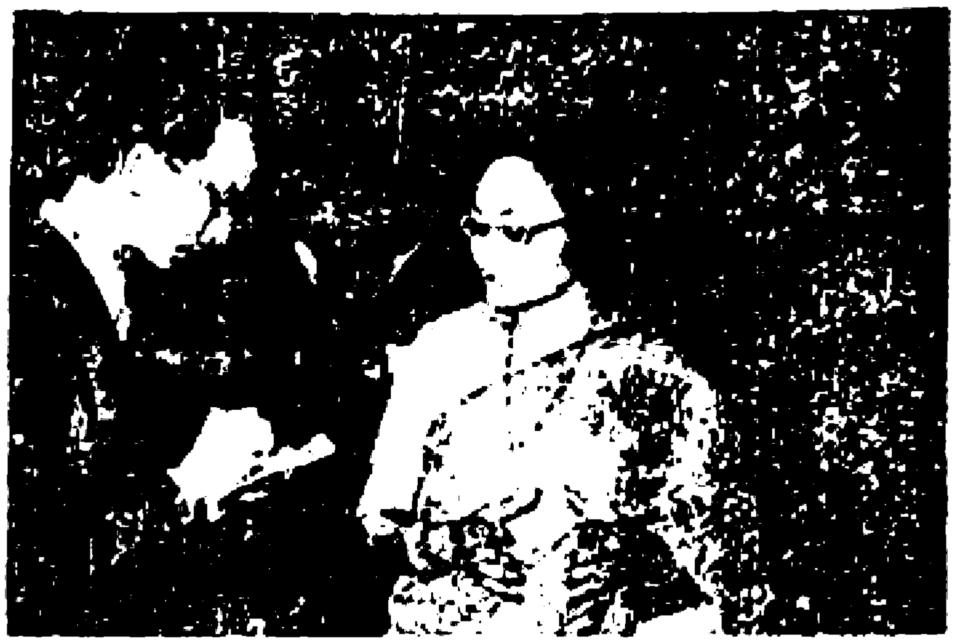

শিল্পীর কাছে এই পোল্ট্রি ফার্মটি সম্পূর্ণ মেয়েরাই পরিচালনা করে থাকে।

প্রেক্ষাগৃহ

ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় দেবিকারাণী।
ফটো : অমৃত

দেবিকারানীর সংবর্ধনা

দেবিকারানী! আজকের চলচ্চিত্রদর্শকদের কাছে তিনি শুধু একটি নাম। কিন্তু উনিশ শো তিরিশ দশকের দর্শকদের কাছে তিনি মাত্র ভারতীয় চিত্রজগতের জনপ্রিয়তম নায়িকাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আদরিণী প্রিয়া—যাকে ইংরাজীতে বলে সুইট হার্ট। বোম্বে টকীজ-এর প্রতিষ্ঠাতা হিমাংশু রায়ের সহধর্মিনী ও সহকর্মিনীরূপে, হিন্দী চলচ্চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠতম নায়িকারূপে এবং সঙ্গীত-নাটক-আকাদমীর অন্যতম কর্ণধাররূপে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে তাঁর বিচিত্র অবদানের কথা স্মরণ করে ভারত সরকার বর্তমান বর্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত 'ফালকে পুরস্কার' (ভারতবর্ষের প্রথম কাহিনীচিত্রকার দাদাসাহেব ফালকের নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যেই এই পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা) দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। তাঁর এই সম্মানে আমরা সম্মানিত; কারণ তিনি বাংলারই মেয়ে। তাই ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি ১০ ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যায় একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলার এই আদরিণী কন্যাকে সংবর্ধিত করেন। স্বস্তিবাচনের পরে সংস্থার সভাপতি বিচারপতি এস, এম মাসুদ সংস্থা ও সকলের পক্ষে শ্রীমতী দেবিকারানী ও তাঁর বর্তমান স্বামী স্বেতোস্লাভ রোয়েরিককে অভ্যর্থিত করেন। অনুষ্ঠান-সভাপতি ভূতপূর্ব নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকার শ্রীমতী দেবিকারানীর অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবার পরে শ্রীমতীকে শাড়ী, অঙ্গবস্ত্র ও তাম্রফলকে উৎকীর্ণ মানপত্র প্রদান করা হয়। শ্রীমতী আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তাঁর মাতৃভূমিতে আসতে পারার জন্যে এবং তাঁরই আত্মজন দ্বারা সংবর্ধিত হবার জন্যে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং অতীত স্মৃতিচারণ করে বলেন, মাত্র চার বছর বয়সে দাড়ি পরে তিনি কেমন অকুতোভয়ে 'নারদ-মণির' ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁর পিতৃব্য আশুতোষ চৌধুরীর প্রশংসালাভ করেছিলেন। শেষে বলেন, বাংলাদেশ সম্বন্ধে তিনি আশাবাদী। এখানকার মাটিতে আছে প্রাণপ্রাচুর্য, নবীনতা, তেজ। সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি নতুন দিনের পরিচালকদের ছবিতে তিনি তার প্রমাণ পেয়েছেন। শ্রীমতীর এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর স্বামী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর মিঃ রোয়েরিক উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-সমালোচনা

মা ও মাটি / পরিচালনা : অর্ধেন্দু সেন। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং নন্দিনী মালিয়া।
ফটো : অমৃত

পরিচর্যা ও প্রেম

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত এবং অসিত সেন পরিচালিত গীতাঞ্জলির নবতম হিন্দী চিত্রনিবেদন 'খামোশী' যে ১৯৫৯-এ মুক্তিপ্রাপ্ত এবং অসিত সেন পরিচালিত বাদল পিকচার্স'-এর জনপ্রিয় বাংলা ছবি 'দীপ জ্বেলে যাই'-এর হিন্দী সংস্করণ, সে-কথা গোড়াতেই জানিয়ে রাখা ভালো। আমাদের আরও মনে আছে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত কাহিনীটির বাংলা চিত্ররূপে নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন স্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন।

মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধানের আদেশে দেবকুমার নামে রোগীর চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে নার্স রাধাকে তার প্রণয়িনীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। কিন্তু অভিনয় করতে করতে রাধা একদিন তাকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিল। কাজেই যেদিন প্রধান চিকিৎসক ও রাধার যুগ্ম-প্রচেষ্টায় দেবকুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল এবং রাধাকে অনায়াসে উপেক্ষা করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিল, সেদিন রাধার নিভৃতে ক্রন্দন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। এই অবস্থায় অরুণ চৌধুরী নামে একটি নবাগত রোগীর প্রতি সমানভাবে প্রণয়িনীর অভিনয় করবার আদেশ যখন এল প্রধানের কাছ থেকে, তখন রাধা তাঁর আদেশমতো কাজ করতে সোজা অস্বীকার করে বসল। প্রধান রাধার মানসিক অবস্থা বুঝে তার প্রতি পীড়াপীড়ি না করে বীণা নামে অপর একটি নার্সের ওপর অরুণের ভার দিলেন। কিন্তু কবিধর্মী, ভাবপ্রবণ অরুণের ভার বহন করা বীণার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। অরুণের অবস্থায় যখন ক্রমেই অবনতি হতে থাকল এবং প্রধান তার প্রতি 'শক্‌থেরাপি' প্রয়োগে রাজী হলেন, তখন রাধার কানে এল, দেবকুমার বিবাহ করতে চলেছে এবং তাকেও নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। ঠিক এই সময়ে মারমুখী অরুণের হাত থেকে বীণাকে বাঁচাবার জন্যে রাধা স্বেচ্ছায় অরুণের ভার গ্রহণ করল এবং তাকে শক্‌-ট্রিটমেন্টের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দিল। রাধাকে পেয়ে অরুণ যেন বেঁচে গেল। বেচারা রাধা! দেবকুমারের প্রতি তার ব্যর্থ ভালোবাসাকে মনে রেখে সে অত্যন্ত সতর্কভাবেই অরুণের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছিল। কিন্তু অরুণের সর্বগ্রাসী ভালোবাসা থেকে তার রেহাই কোথায়? তাই অরুণ যেদিন ভালো হয়ে হাসপাতাল ছেড়ে তার বাড়ী রওনা হল, সেদিন প্রধানের অনুমতি নিয়েই সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তার পরে? তারপরে যা ঘটল, তা হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সদের কাছে যেমন দুঃখদায়ক, দর্শকদের কাছেও ঠিক তেমনই দুঃখদায়ক।

কাহিনীটিকে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভঙ্গীতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অসিত সেন। মানসিক চিকিৎসা-কেন্দ্রের অপরাপর রোগীদের দিয়ে ওখানকার আবহ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে; অবশ্য সবটাই যে বাস্তবধর্মী, তা নয়। গুলজারের সংলাপ প্রশংসনীয়।

নায়িকার চরিত্রে ওয়াহিদা রেহমান অত্যন্ত অন্তরস্পর্শী প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। ভালোবাসার ব্যর্থতার বেদনা চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। সুরেখার প্রবঞ্চনায় আবেগপ্রবণ অরুণের যে মনোবিকার, তা সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়েছে রাজেশ খান্না দ্বারা। অরুণের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও জ্যেষ্ঠতুল্য বিহারীলাল গুপ্তের ভূমিকায় আনোয়ার হোসেন অত্যন্ত সংযত ও বাস্তবভঙ্গীতে হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেছেন। হাসপাতালের মর্দাপিয়াসী, বিকৃতমস্তিষ্ক রোগীর ভূমিকায় দেবেন বর্মা একটি সুন্দর টাইপের সৃষ্টি করেছেন। প্রবঞ্চক প্রেমিকা সুরেখাবেশে স্নেহলতা দর্শকবৃন্দের আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়া নাজির হোসেন (প্রধান চিকিৎসক), ইফতেকার (সহকারী চিকিৎসক), ললিতা পাওয়ার (স্টাফ নার্স), নন্দা (বীণা), অজিত চট্টোপাধ্যায় (রোগী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

এই সাদা-কালো ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একযোগে প্রশংসনীয় হচ্ছে চিত্রগ্রহণ ও শিল্পনির্দেশনার কাজ। হাসপাতালের স্বতন্ত্র পরিবেশকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন আলোকচিত্রশিল্পী কমল বসু ও শিল্প-নির্দেশক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। দৃশ্য গ্রন্থের সম্পাদনা ত্রুটিবিহীন। হেমন্তকুমার 'দীপ জ্বেলে যাই'-এর গানে যে-সুরসৃষ্টি করেছিলেন, তার অনুসরণ দেখা গেল এই ছবিতেও। 'দোস্ত কহো কোই তুম সা' বাংলা সংস্করণের গানটিকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। ছবিটির আর একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এর সার্বিক পরিচ্ছন্নতা।

গীতাঞ্জলি নিবেদিত, হেমন্তকুমার প্রযোজিত এবং অসিত সেন পরিচালিত "খামোশী" দর্শকসাধারণের আনন্দবিধানে সমর্থ হবে।

—নান্দীকর

জীবন জিজ্ঞাসা / পরিচালনা : পীযূষ বসু / উত্তমকুমার ও মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়
ফটো : অমৃত

স্টুডিও থেকে

নারকেলডাঙার অরোরা ফিল্ম স্টুডিওর শুভসূচনা হয়েছে পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জীর 'মানসী' ছবির। মহরৎ বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ শট নেবার আগে মর্যাদাবিহিত পূজার প্রণামী মালা ক্যামেরার গলায় ঝোলানো, উপস্থিত অভ্যাগতদের প্রসাদ বিতরণ এবং শেষে সবার অনুমতি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালকের কাজ শুরু। কোনোটাতেই ঘাটতি ছিল না। ক্ল্যাপস্টিক দিয়েছিলেন পরিচালক বিজয় বসু এবং ক্যামেরার সুইচ অন করেছিলেন অরোরা ফিল্মসের কর্ণধার অজিত বসু। মহরতের শিল্পী ছিলেন নতুন শিল্পী নবীন বোরাল ও বিকাশ রায়। অনুষ্ঠানসূচীতে ঘাটতি ছিল না বিন্দুমাত্র। তবে বহুদিন বাদে অরোরা ফিল্ম স্টুডিওয় ঢুকে একটু হতচকিতই হয়েছিলাম। প্রযোজনা অফিস ঘরের সামনে বড় পুকুরের চেহারাটা এখনও আছে। জল প্রায় নেই-ই। বাড়ীটির চেহারা পাল্টে গেছে অনেক। পুকুরের ওপারের ফ্লোরটা একেবারে পরিত্যক্ত প্রায়। পুকুর পাড়, বাঁধান রাস্তার দু'পাশ ঘিরে বাহারী ফুলগাছের অস্তিত্ব আর নেই। বোধ হয় একদা পরাক্রমশালী সিংহ এখন মৃতপ্রায়। ফিচার ফিল্মের কাজ এখন আর এই স্টুডিওয় হয় না বললেই চলে। নিউজ রীল জাতীয় কিছু ছবি ছাড়া, কাহিনী চিত্রের কাজ সবই এখন টালিগঞ্জের পাঁচটি স্টুডিওয়।

নারকেলডাঙার বাগানবাড়ীতে অনাদি বসু আর ক্যামেরাম্যান দেবী ঘোষ যেদিন এই স্টুডিওর পত্তন করেছিলেন তখন নির্বাক ছবির যুগ। সালটা বিশ দশকের কাছাকাছি। প্রথম ছবি সম্ভবতঃ 'রত্নাকর'। কয়েক বছর বাদে সুশীল মজুমদার অরোরার প্রথম সবাক ছবি 'তরুবালা' করেন। নটশেখর অহীন্দ্র চৌধুরী, নট্ট সম্রাজ্ঞী সরযূবালা প্রমুখের বহু স্মৃতি নিয়ে আজ সেই অরোরা স্টুডিও যেন নীরব, নিস্তব্ধ।

টালিগঞ্জের সবক'টি স্টুডিওই আজ টিমটিম করে জ্বলছে কোনো রকমে। এমতাবস্থায় অরোরার পুনর্জীবন দান এক অসম্ভব কাজ। একমাত্র সম্ভব অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন যদি আবার নিয়মিত কাজ শুরু করেন। কিন্তু একজনের পক্ষে কতদিন কাজ করা সম্ভব?

মৃণাল সেনের 'গোত্রান্তরের' কাজ শেষ। মাত্র বাইশ দিনের মধ্যে ছবির প্রায় সবটাই শেষ করে ফেলেছেন তিনি। ল্যাবরেটরীতে ধর্মঘট চলছে। নইলে এতদিনে হয়তো সম্পাদনার কাজও শেষ হয়ে যেত! হলো না। এখন মৃণালবাবু শুয়ে বসে গল্প করে দিন কাটাচ্ছেন, বহু গল্পও পড়ছেন পরবর্তী ছবির কাহিনীর সন্ধানে। ধর্মঘট মিটলেই সম্পাদনার কাজ শুরু করবেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন এ ছবিতে উৎপল দত্ত, শেখর চ্যাটার্জি, জ্ঞানেশ মুখার্জি এবং শ্যাম লাহা নাকি অস্বাভাবিক সুন্দর কাজ করেছেন। প্রসঙ্গত জানাই এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্রের শিল্পী হলেন বিবেক চ্যাটার্জি ও আরতি ভট্টাচার্য।

পাটনা থেকে তিরিশ মাইল ভেতরে 'ভটা' নামে একটি গ্রামে তিনি কাজ করেছেন। পথে সোনপুর ও পাটনায় কিছু কাজ হয়েছে। শহরে চাকরী না পেয়ে ছবির নায়ক সঞ্জয় পাড়ি জমিয়েছিল বিহারে এক চিনি কলের ক্যাশিয়ারের কাজ নিয়ে। মিল মালিক, শ্রমিক, আশপাশের প্রতিবেশীদের সে একদিন আপন করে কাছে টেনেও নিয়েছিল। আখচাষীদের আন্দোলনের পুরোভাগেও সঞ্জয় তাই এসেছে। সবশেষে আত্মস্বার্থে আত্মসত্তার বিসর্জন। বিশ্বাসঘাতক হয়েছিল সঞ্জয়। ছবির গল্প মোটামুটি এই। মৃণালবাবু বললেন—'এ ছবিতে গল্পের একটা থ্রেড লাইন আছে। গল্পের আভাস পাবেন দর্শকরা। কিন্তু তার ভেতরেই গল্পকে ভাঙতে চেষ্টা করব।' বিহারের আখচাষীদের আন্দোলনের একটি ছোট অধ্যায়ও বিধৃত হবে এ ছবিতে।

দিলীপ মুখার্জির (যাত্রিক) 'ছিন্নপত্রের' মহরৎ হয়েছে। ঘটা করে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হয়নি। অবশ্য দিলীপবাবু 'শুভ মহরৎ' বলতে যা বোঝায় সে ধরনের কোনো ক্রিয়াকর্মে বিশেষ আগ্রহীও নন। এ ছবিতেও প্রধান শিল্পী হিসাবে থাকছেন উত্তমকুমার। ক'দিন আগে টেকনিসিয়ানে কিছু কাজ করেছেন দিলীপবাবু। নায়িকা কে? দিলীপবাবু সে সম্পর্কে এখন নিরুত্তর।

ইন্দ্রপুরীতে এখন কাজ চলছে পরিচালক হীরেন নাগের 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'র। কিছুদিন আগে একটানা আউটডোরে কাজ করার পর এইমাত্র ফ্লোরে ঢুকলেন শ্রীনাগ। একটি পাহাড়ী চটির সেট পড়েছিল সেদিন ফ্লোরে। অংশ নিয়েছিলেন নায়ক শুভেন্দু চ্যাটার্জি। ......তারও ক'দিন আগে ইন্দ্রপুরীতেই কাজ করেছেন অজিত লাহিড়ী তাঁর নির্মীয়মান ছবি 'আটাত্তর দিন পরে'। ছবির কাজ শেষ হলো তাঁর। একজন ওয়াগনব্রেকার পুলিশের জালা থেকে আত্মগোপনের জন্য উধাও হয়ে যান। ফিরে এসে তার চেনা জগতে অনেক পরিবর্তন

যাদবপুরে বাঘাযতীন পল্লীর রূপবাণী কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রথম বার্ষিক পূর্তি উপলক্ষে গত ২৩ জানুয়ারী সংঘ কর্তৃক প্রযোজিত রঞ্জন দেব রচিত স্বর্গ মর্ত্য নাটকে শ্রাবণ সর্দারের ভূমিকায় একটি বিশেষ মুহূর্তে প্রবীর দেব রায়।

লক্ষ্য করে। যে মেয়েটিকে সে একদিন মন দিয়েছিল সে তখন তার ভাই-এর প্রতি অনুরক্ত। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে ভেঙে পড়ে সে। সমরেশ বসুর লেখা এই কাহিনী নিয়ে চিত্রনাট্য লিখেছেন মৃগাঙ্কশেখর রায়। প্রধান চরিত্রলিপিতে রয়েছেন সমিত ভঞ্জ, জয়া ভাদুড়ী প্রমুখ। ......অরুন্ধতী দেবী বর্তমান ছবির কাজ শেষ করেছেন এই কদিন আগে। এন-টির দু নম্বরে একদিন মাত্র কাজ করেছেন। বাকি কদিন চলেছে ব্যাক প্রোজেকশনের কাজ। শিল্পী ছিলেন চিন্ময় রায়।

ব্যাক প্রোজেকশনের কথা যখন এলো, তখন এই টেকনিক্যাল শব্দটা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ব্যাক প্রোজেকশন অর্থাৎ পশ্চাৎ প্রক্ষেপন শব্দটির কারিগরি-গত অর্থ হোল চলন্ত গাড়ি ঘোড়ার দৃশ্যের স্টুডিও ফ্লোরে কৃত্রিমভাবে দৃশ্য গ্রহণ। প্রথমে যে রাস্তা দিয়ে ছবির গাড়ী যাবে, বিভিন্ন কোণ থেকে সেই রাস্তার দৃশ্য তুলে আনা হয় অন্য একটা গাড়ীতে ক্যামেরা বসিয়ে। প্রোজেকশন রুমের শেষ প্রান্তে সাদা পর্দায় সেই চলমান রাস্তার দৃশ্য প্রক্ষিপ্ত হয় এবং তখন অভিনেতা বা অভিনেত্রী যে গাড়ীতে বসবেন সেটিকে পর্দার সামনে রাখা হয়। ড্রাইভার মত একজন ড্রাইভারও বসে থাকে স্টিয়ারিং ধরে। শিল্পীরা গাড়ীর মধ্যে থাকেন। ক্যামেরা গাড়ীর সামনে বসিয়ে দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। ফলে দর্শকের রাস্তা দিয়েই গাড়ী চলছে মনে করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। তবে এখানে একটা কাজ অবশ্য করণীয়। চলন্ত মোটরকার হলে এফেক্ট আনার জন্য দুপাশ ধরে গাড়ীটাকে তালে তালে নাড়ান হয় এবং একপাশ থেকে প্রচণ্ডবেগে পাখা চালিয়ে শিল্পীর চুল ওড়ান বা নায়িকার কাপড় ওড়ানোর এফেক্ট থাকে। পর্দায় দেখার সময় দর্শকের এ দৃশ্যকে স্পট থেকে তোলা দৃশ্য বলেই ভ্রম হয়। ক্যামেরার কাজ ভালো না হলে পেছনের দৃশ্য অনেক সময় ঘোলাটে, ঝাপসা মনে হতে পারে। অর্থাৎ বলা যায় ব্যাক প্রোজেকশন খারাপ।

কলকাতার বেশীর ভাগ ব্যাক প্রোজেকশনের কাজ হয় এন-টির দু নম্বরে। কারণ ফ্লোরে প্রোজেকশনের ব্যবস্থা একমাত্র এইখানেই আছে। তাই ব্যাক প্রোজেকশনের কাজ থাকলে এন-টির দু নম্বর ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মঞ্চাভিনয়

রাজরক্ত : বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম কয়েক সপ্তাহ আগে থিয়েটার ওয়ার্কশপ 'রাজরক্ত' নাটকটি করেছেন—রবীন্দ্রসদনে। তারপরেই গত ৪ ফেব্রুয়ারী ওঁরা এলেন মুক্তাঙ্গনে। সন্ধ্যে সাতটা থেকে শুরু আরম্ভ হয়েছিল মনে আছে, ঘড়ি দেখে-ছিলাম। কিন্তু আজ লিখতে বসে মনে করতে পারছি না যে ঠিক কটার সময় ভেঙেছিল—পৌনে নটায় না নটায়। কারণ তখন আমি নিজেকে নিয়ে এত বিব্রত ও চিন্তিত যে সময়-টময়ের কথা মনেও ছিল না। এর জন্য তিনজন ইতুখ্যাতি দায়ী—নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী ও অভিনেতা অশোক মুখোপাধ্যায়।

আমি টিপিক্যাল একজন মধ্যবিত্ত: অমন চিন্তা চমৎকারায় দিনরাত উদ্ভ্রান্ত থাকি। সেই আমাকেই মোহিতবাবু অতর্কিতে যে নগ্ন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন, তাকে এড়াবার সাধ্য কোথায়। আসলে আমাদের সকলের চাওয়া পাওয়া নির্দিষ্ট হচ্ছে সমাজ-ভাগ্য-বিধাতা-দের কৃপায়। অবশ্য 'বিধাতাদের' বলব না 'বিধাতার' বলব সেটা ঠিক করা বড় কঠিন। কারণ এক হলেও সেই অমোঘ শক্তি বহুরূপে বিরাজমান আমাদের সামনে—কখনো সে রাজারূপে, কখনো বণিকরূপে, কখনো নেতারূপে, কখনো বা ধর্মীয় পরামর্শদাতারূপে। আর বহুরূপীর বহু-রূপের মধ্যে নিখুঁত ব্যবস্থা নিখুঁত। শুধু যারা মধ্যবিত্ত, কৃষক, বা শ্রমিক তারাই বিচ্ছিন্ন। আর বিচ্ছিন্ন বলেই পারে না কখনো সমস্ত অন্যায় শোষণের দুর্গ প্রতীক 'রাজাসাহেবের' বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

১৯৭০ খৃঃ বঙ্কিম পুরস্কার বিজয়িনী শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—শাওলী মিত্র।

তবু মধ্যবিত্ত বর্তমান ব্যবস্থাতে বিদ্রোহের বীজ গোপনে কাজ করে চলে। মাঝে মধ্যে তারই অনিবার্য ক্রিয়ায় ক্ষেপে উঠে আঘাত হানতে চায় লোহার সাজানো গোছানো চক্রব্যূহে ঘেরা ব্যবস্থায়; চায় সব ভেঙে-চুরে তছনছ করে ফেলতে। পারে না, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, আমাদের হাতের ছুরি ভোঁতা হয়ে যায়—কারণ আমরা আজও বিচ্ছিন্ন।

মোহিতবাবুর মূল নাটকটি পড়িনি—দেখলাম যে প্রতীক থেকে বস্তু বাস্তবে আবার কখনো কখনো প্রতীকে যেভাবে নাটকের প্রচণ্ড গতি বার বার বাঁক নিয়েছে তাতে বিস্মিত হয়ে গেছি। মাত্র চারটি চরিত্র—নির্দিষ্ট সংখ্যক অথচ প্রতিবারই মনে হয়েছে যেন বিশাল এই জীবনের সব ছোট বড় ভারী সব সুর মনের পর্দায় বেজে চলেছে যাচ্ছে। কি করে সম্ভব হোল? হয়েছে অসাধারণ অভিনয়ে। গুণী শিল্পীদের কারুরই আঘাত না করেও বলব অশোক মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ বোধহয় 'রাজাসাহেবের' বহুরূপী চরিত্রটি ফোটাতে পারতেন না। দুরন্ত থেকে বৃদ্ধ, নাস্তিক থেকে বিনয়ী, সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র একই লোক বার বার পোশাক পাল্টে এসেছেন অথচ প্রতিবারই মনে হয়েছে সহজ, স্বাভাবিক ও নিখুঁত।

নাটকটি সর্বাংশে ভাল লেগেছে তাই এত কথা। সবশেষে বলব সত্যেন মিত্রের অভিনয়ধারা পাল্টানো উচিত। ওঁকে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' ঠিক যে-ভাবে অ্যাকটিং করতে দেখেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে, উনি আজও সেখানেই পড়ে আছেন।

রাহুমুক্ত : গত ৬ ফেব্রুয়ারী রামমোহন হলে ক্যালকাটা মডেল ইনস্টিটিউটের সারস্বত সম্মেলন উপলক্ষে সংস্থার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত 'রাহুমুক্ত' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই হাস্যরসাত্মক নাটকটি দর্শকের কাছে সার্থক ভাবে উপস্থাপন করেন।

সংগ্রাম সিংহ, প্রদীপ সিংহ, পুণ্ডরীক, ভীম এবং চৌধুরী চরিত্রে বর্ণময় রূপ করেছিলেন যথাক্রমে মৌলিক, সুকান্ত ভৌমিক, তপন লাহিড়ী, নিমাই মণ্ডল, এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন, উমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, বলরাম খাটোয়া, নিত্যানন্দ অধিকারী, ব্রজগোপাল দে, রঞ্জিত দাশগুপ্ত, বাণি সিংহ, শ্যামমোহন চক্রবর্তী, তারাদাস ব্যানার্জি, রবীন্দ্র চিত্রকর, অমলেন্দুবিকাশ রায়, সুধাময় মজুমদার। স্ত্রী চরিত্রে মায়া ঘোষ পদ্মিনী ভূমিকায় চমৎকার সাবলীল অভিনয় করেন। অরুন্ধতী ও ইন্দিরার ভূমিকায় বন্দনা চ্যাটার্জি ও আরতি ঘোষ সঠিক রূপদানে সমর্থ হয়েছিলেন। সঙ্গীত পরিচালনায় এবং ঠাকুরমশাইর ভূমিকায় বিমান মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। আলোকসম্পাতে দিলীপ ঘোষের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ সংবাদ

নবতম চিত্রগৃহ 'নবীনা'র দ্বারোদ্ঘাটন

প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের যেখানে একদিন শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিও ছিল, সেই জমির কিছুটা অংশে গড়ে উঠেছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, ওয়েস্টেক্স প্রক্ষেপণ যন্ত্রসমন্বিত, আধুনিকতম চিত্রগৃহ 'নবীনা'। চিত্রগৃহটি সুরম্য, সুনির্মিত ও সুবিস্তৃত। এগারো শো আসনবিশিষ্ট এই চিত্রগৃহটি পীতাঞ্জলি পিকচার্স-এর 'বাবোর্চী' হিন্দী ছবি নিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করেছে গেল ১২ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার। চিত্রগৃহটির মালিক হচ্ছেন বাবুলাল চোখানী, যিনি অধুনালুপ্ত শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিওরও মালিক ছিলেন।

'সৌরভ'এর জন্মোৎসব

ম্যাকসমুলার ভবনে অনুষ্ঠিত 'সৌরভ'-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের প্রথমে দ্বি-বার্ষিকী সম্মেলনের দুটি প্রদীপ জ্বালালেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ।

প্রখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী মায়া চট্টোপাধ্যায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে লক্ষ্ণৌ ঘরানার কথক নৃত্যের এক বিস্তৃত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পরণ, চক্রধার, টুকরো গৎ-এ যথার্থ শিক্ষা ও রেওয়াজের স্বাক্ষর সুপরিস্ফুট। আমার 'ভাও' অংশে তাঁর ভাবব্যঞ্জনা ও অভিনয়দক্ষতায় নিজস্ব চিন্তার প্রকাশও দর্শকের অকুণ্ঠ অভিনন্দন আদায় করে নিয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর ঠুংরী। ঠুংরী সঙ্গতে নৃত্য আমরা বিরজু মহারাজের অনুষ্ঠানে দেখেছি। তবে তিনি ত এ বিষয়ে এ-যুগের শীর্ষস্থানীয় শিল্পী। উদীয়মানা তরুণ শিল্পীদের মধ্যে মায়া চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেই এ ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে এবং তাঁর প্রচেষ্টা সার্থকও হয়েছে সভায় উপস্থিত গুণীবৃন্দের সাধুবাদই তার প্রমাণ। সর্বশেষ 'পূরিয়া' রাগে সেতার বাজিয়ে শোনান তিমিরবরণের শিষ্য শ্রীইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য। ইনি বাজালেন 'পূরিয়া'। আমেরিকা সফরের পর এই এ'র প্রথম সাধারণ অনুষ্ঠান। হাতের দক্ষতা সম্বন্ধে ত কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বাদন-শৈলীতেও তরুণ শিল্পীর রাগের মনটি অভিব্যক্ত হয়েছে। এ'র সঙ্গে সুযোগ্য তবলা সঙ্গত করেন শ্রীশঙ্কর ঘোষ।

গিরিশ জন্মোৎসব : কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদের পক্ষ থেকে আগামী ৪ঠা মার্চ তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ১২৮তম জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করবার জন্য গত ২০ ডিসেম্বর বিশিষ্ট গিরিশানুরাগী ব্যক্তিগণকে নিয়ে গিরিশ জন্মোৎসব সমিতি গঠন করা হয়। তিনদিনের অনুষ্ঠানে গিরিশ সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা, সঙ্গীত, রচনা থেকে পাঠ, আবৃত্তি এবং নাটকাভিনয় থাকবে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার, সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা এই সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ও অংশ গ্রহণ করবেন। ৪ঠা মার্চ সকালে সাড়ে সাত ঘটিকায় গিরিশ পার্ক থেকে গিরিশভবন পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা বেরোবে। সঙ্গীত ও পাঠ করতে করতে শোভাযাত্রাটি গিরিশভবনে উপস্থিত হবে। বাংলাদেশের সকল শিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও নাট্যসংস্থাকে এতে অংশ গ্রহণ করবার জন্য গিরিশ জন্মোৎসব সমিতি সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যে সকল প্রতিষ্ঠান গিরিশ সম্বন্ধে সঙ্গীত ও একক সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নাম ও ঠিকানা এবং কতজন অংশ গ্রহণ করবেন তার বিবরণ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৫নং লক্ষীদত্ত লেন, কলিকাতা-৩, অনুষ্ঠানের ১০দিন পূর্বে জানালে কার্য পরিচালনায় ও অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়নে বিশেষ সুবিধা হবে।

মূকাভিনয় : গত ৩১ জানুয়ারী হাসনাবাদের স্থানীয় যুবকবৃন্দ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় ছিল মূকাভিনয়। প্রখ্যাত মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে মোট তিনটি বিষয়ের উপর মূকাভিনয় পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দদান করেন। এইদিন পরিবেশিত বিচারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল, বর্তমান সমাজজীবনকে নিয়ে 'আমরা কোথায় আছি' বিচারটি।

শিলচরে নাট্যানুষ্ঠান : শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রযোজনায় গত ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী শিলং-এর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পরিচালনায় শিলচর জেলা লাইব্রেরী হলে 'পার্টনার', 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও 'শের আফগান' নাটক তিনটি মঞ্চস্থ হয়।

বাদল সরকার রচিত 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি অন্যান্য নাটকের তুলনায় ভিন্ন চরিত্রের। লেখকের ভূমিকায় সুভাষ চক্রবর্তী আবেগভরা প্রাণবন্ত। অমল ও বিমলের ভূমিকায় রতন কর্মকার ও পটল দাসগুপ্তের অভিনয় সুন্দর ও সাবলীল। কমলের ভূমিকায় সলিল ঘোষাল সুন্দর।' ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় নীলমেশ বিশ্বাস, মাসীমা ও মানসীর ভূমিকায় রুথা বিশ্বাসের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় নাটক 'পার্টনার'র প্রতিটি শিল্পীই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেন। অতিথিদের ও গ্রামবাসীদের ভূমিকায় রতন কর্মকার, সলিল ঘোষাল, পটল দাসগুপ্ত, চিনু ভট্টাচার্য ও নীলমেশ বিশ্বাসের অভিনয় ভালই। অন্ধ ভিক্ষুকের ভূমিকায় দিলীপ ভট্টাচার্যের ভূমিকা অপূর্ব। মিনতি দের গানখানি খুবই শ্রুতিমধুর হয়েছিল।

তৃতীয় নাটক 'শের আফগান' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। দলগত অভিনয়নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। শের আফগানের চরিত্রে রতন কর্মকারের অভিনয় অনবদ্য। অন্যান্য চরিত্রে, সলিল ঘোষাল, পটল দাসগুপ্ত, সুকুমার বাগচি, চিনু ভট্টাচার্য, কুমারী মিনতি ঘোষ, সুজিত ঘোষ প্রভৃতির অভিনয় ভালো হয়েছে। পরিচালনায় রাখাল ভট্টাচার্য ও আলোকসম্পাতে দিলীপ দাস।

মুকুর-এর "পাথরাজের জন্ম" গত বাইশে জানুয়ারীর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কোলকাতায় মুকুর গোষ্ঠী মহারাষ্ট্র নিবাস হলে মঞ্চস্থ করলো শচীন ভট্টাচার্যের জনপ্রিয় নাটক "পাথরাজের জন্ম"। অভিনব এক কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের বর্তমান ঘুণধরা সমাজব্যবস্থাকে তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন নাট্যকার। সুষ্ঠু বলিষ্ঠ সংলাপে নাট্যমুহূর্তগুলি মুকুর-এর শিল্পীদের সুন্দর দলগত অভিনয় গুণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কার্তিক সাহার ভুতান, শরৎ মিত্রের তমাল, জয় দাশের তিলক, অসিত চক্রবর্তীর আদিত্য, গোপাল দাসের ডাকিং, নারায়ণ সাহার দেবল মণ্ডল অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি। ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেন গোবিন্দ ঘোষ (পরীক্ষিৎ) এবং জয়দেব মণ্ডল (মিতুন)। মলি মুখোপাধ্যায়ের জুহিনা এবং শর্মিষ্ঠা ঘোষের শিখা দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়। এরা ছাড়াও সুন্দর অভিনয় করে দর্শকমনে ছাপ রাখেন তরুণ সাহা, রাজকুমার ঘোষ, সুব্রত লাহিড়ী, রথীন চক্রবর্তী ও চঞ্চল ভট্টাচার্য। মঞ্চসজ্জায় কৃতিত্ব গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টিতে স্বপন মিত্রের আলো একেবারে চমৎকার। মঞ্চসফল এপিকের নির্দেশনায় দায়িত্ব বহন করে মুকুর গোষ্ঠী।

জলসা

আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজ

মহাজাতি সদনে সম্পন্ন আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজের বাৎসরিক অধিবেশনে যন্ত্রসঙ্গীতের আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন ওস্তাদ বাহাদুর খান। ইনি বাজালেন 'নট-ভৈরব'। পণ্ডিত রবিশঙ্কর-সৃষ্ট এই রাগে রবিশঙ্করীয় সঙ্গীতচিন্তা অনাহত রেখেও শিল্পী নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আলোয় রাগবিশ্লেষণকে আলোকিত করতে পেরেছেন বলেই এ বাজনা মনের গভীরে রেখাপাত করতে পেরেছে। বিভিন্ন ছন্দের ধ্রুপদী বাজের আধারে গীতিকাব্যের মাধুর্যের স্নিগ্ধতা প্রতিটি সুরেলা মীড়ের স্বরপ্রক্ষেপের শুদ্ধতা সারা প্রেক্ষাগৃহে এক মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশ রচনা করে। মন্দ্রসপ্তকের বিস্তারে শিল্পীর ভাবনা-গভীর নির্মিতি আভাষিত আবার বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ তেহাইএর পর 'রে গা মা প ধ পা' পরিক্রমণান্তে সোমে ফিরে আসায় লয়দক্ষতার সঙ্গে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কারুণ্য আঙ্গিকের সঙ্গে রাগের সৃজনশীলতার প্রতিও আলোকপাত করেছে। প্রবীণ ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ স্ব-সৃষ্ট রাগ 'জ্যোতিপ্রকাশ' বাজিয়ে শোনালেন।

কয়েক বছর আগে খাঁ-সাহেবের জন্মদিনে এ রাগ প্রথম শুনেছি। তন্ত্রকারের নিজস্ব আবেদনে এ রাগ শ্রোতাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছে। প্রতিমা চৌধুরী ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সেতারে যথাক্রমে পূরিয়া ধানেশ্রী ও পূরিয়া কল্যাণ বাজিয়ে শোনান। তবলা লহরার একক অনুষ্ঠানে ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য ও নানকু মহারাজ। গৎ, ঠেকা টুকরো পরণ ও তেহাই-এ অনিল ভট্টাচার্য তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসবোধে শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে ছাপ রাখতে পেরেছেন। নানকু মহারাজের আঙ্গিক প্রদর্শনে কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু রসের অভাবে এ বাজনা মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। কণ্ঠসঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন সুনন্দা পট্টনায়ক। ইনি গেয়েছেন 'ভৈরব বাহার'। এ রাগ 'ওঙ্কারনাথের অতিপ্রিয় রাগ। ওঙ্কারনাথ ও বিনায়ক রাও পট্টবর্ধনই কণ্ঠসঙ্গীতে এ রাগকে জনপ্রিয় করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে এ রাগ শুনেছি ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ-সাহেবের কাছে। শ্রীমতী পট্টনায়ক ওঙ্কারনাথের স্বপ্নময়তা ও গুরু বিনায়ক রাও-এর শুদ্ধতার মিলনজাত যে গায়কী সৃষ্টি করেছেন তারই সঙ্গে নিজস্ব ভাবকল্পনার রং মিশে অবর্ণনীয় আবেগ ও মাধুর্যে এ রাগ পরিবেশন করেছেন। বাহারের উচ্ছলতা ভৈরোর গাম্ভীর্যে সংহত হয়ে যে আকৃতির সৃষ্টি করেছে তত্ত্বসন্দর সেই আকৃতিই 'ভৈরো-বাহার'-এর মর্মবাণী। এ বাণীকে শ্রীমতী পট্টনায়ক মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন।

বিশেষ অনুরোধে ইনি দুটি স্ব-রচিত ভজন গেয়েছেন এবং তা শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনও পেয়েছে। তবে ভজন তাঁর ভৈরো-বাহারকে ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। পণ্ডিত বি এন ঠাকুর 'দরবারী কানাড়া' রাগে ধ্রুপদের এক প্রামাণ্য গায়কী পেশ করেন। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 'মেঘমল্লার' ছিল এঁর পরিবেশিতব্য রাগ। আবেগ, আন্তরিকতা শিল্পবোধ কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। সবকের ওপর শিল্পীর দখল। তাই উপভোগ্যতার থেকে আমরা বঞ্চিত হইনি। বিজয় চক্রবর্তী গেয়েছেন পিতা সুরেশ চক্রবর্তী সৃষ্ট রাগ 'কলকোষ'। রাগটি অতি-মধুর। চিন্ময় লাহিড়ী এ রাগকে ইতিমধ্যেই সঙ্গীতরসিক মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয় করেছেন। শ্রীচক্রবর্তীর গম্ভীর দরাজ কণ্ঠে যথোপযুক্ত অনুশীলন জাত এ রাগ শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

শ্রীনিকেতনে হলে ভারতনাট্যম নৃত্যরতা শ্রীমতী মঞ্জরী ভট্টাচার্য।

দানবরাজ রাবণ রূপে আবির্ভূত হন বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলনে নৃত্য পরিবেশন করছেন চন্দ্রাবতী মানাস।

সারস্বত সম্মেলনে সুর-বাহার :

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষায়তন সুর-বাহারের শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে কলকাতায় এক রুচিকর সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গত শ্রীপঞ্চমীর সন্ধ্যায়। সুনীল সাহা ও কৃষ্ণা সমাদ্দারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সঙ্গীত বাসরের সূচনা হয় শিক্ষার্থিনী রত্না সেন গাওয়া 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' ও দুর্গা রাগে খেয়াল গানের মধ্য দিয়ে। সুর-বাহার সঙ্গীতগোষ্ঠী নিবেদিত 'অন্ধকারের উৎস হতে' ও সলিল চৌধুরীর 'নাও গান ভরে, নাও প্রাণ ভরে' অনুষ্ঠানের শ্রী বৃদ্ধি করে। একক কণ্ঠে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে, গীতা রায় (ভজন ও নজরুলগীতি), বিমল মিত্র ও নন্দা মুখোপাধ্যায় (রাগপ্রধান), মৃদুল চট্টোপাধ্যায় (খেয়াল) এবং বাণী সমাদ্দার (নজরুলগীতি ও ভজন) বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। এঁরা ছাড়া সঙ্গীতানুষ্ঠানেও সমবেত কণ্ঠে অংশ গ্রহণ করেন—চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রাজকুমার দে (তবলা), তরুণ রায় (বাঁশী), তাপস পাল ও স্বপন দত্ত (গীটার), দুলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ চক্রবর্তী, পুষ্প মৈত্র, হরি দত্ত, নূপুর বাগ, সুনীল রায়, সন্ধ্যা দাশগুপ্তা ও গীতা দে।

—চিত্রাঙ্গদ

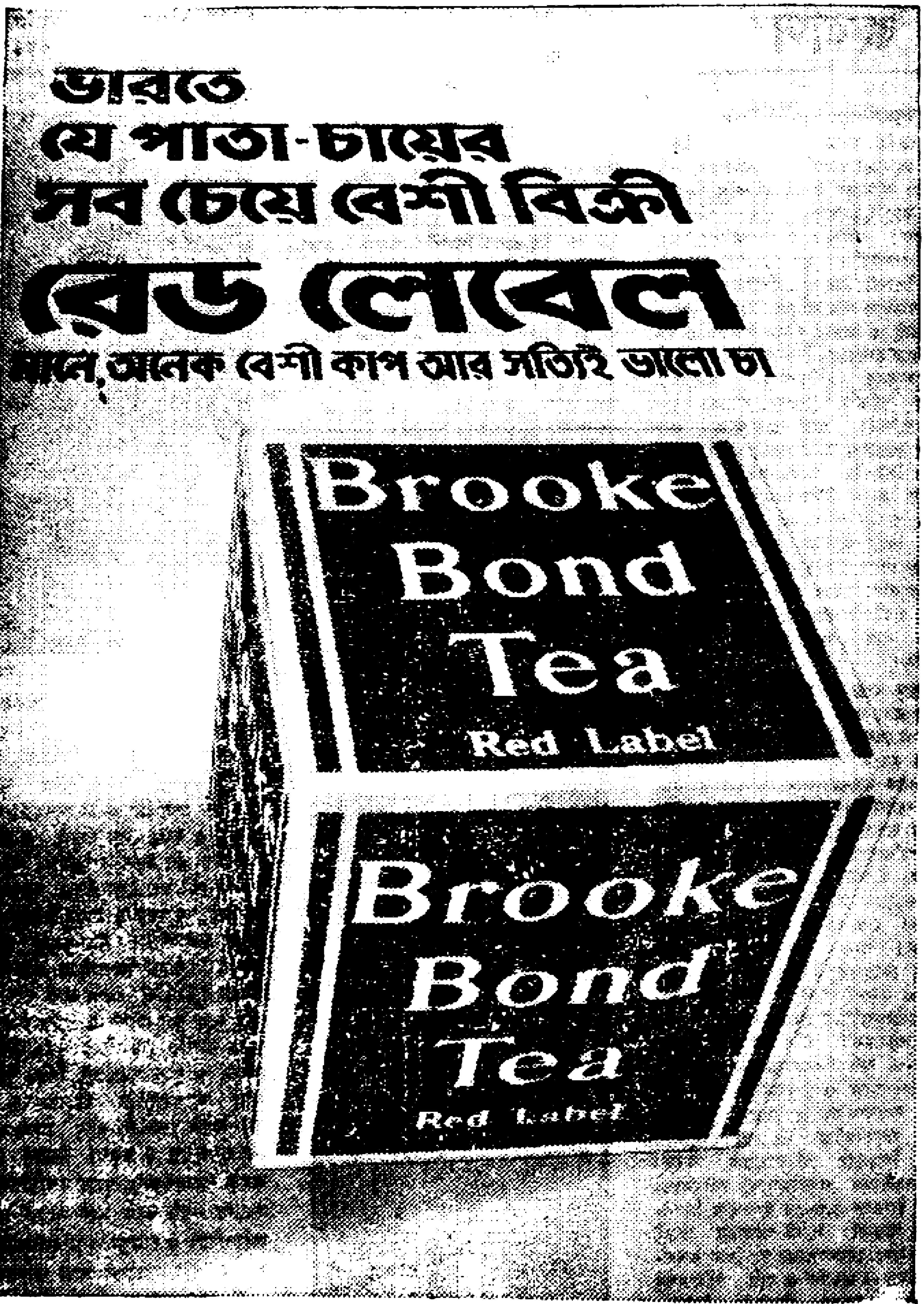
ভারতে
যে পাতা-চায়ের
সব চেয়ে বেশী বিক্রী
রেড লেবেল
মানে, অনেক বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা
Brooke Bond Tea
Red Label
Brooke Bond Tea
Red Label

খেলার কথা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ক্ষেত্রনাথ রায়

অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে তাদের ১৯৭১ সালের ক্রিকেট সফর গত ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে সুরু করেছে। এই সফরে ভারতীয় দল যে টেস্ট সিরিজ খেলবে তা হবে ভারতবর্ষের ২৯তম টেস্ট সিরিজ—বিদেশের মাটিতে ১০ম টেস্ট সিরিজ—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৬ষ্ঠ টেস্ট সিরিজ। ভারতবর্ষ ইতিপূর্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে দু'টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে—১৯৫২-৫৩ এবং ১৯৬১-৬২ সালে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফররত ১৯৭১ সালের ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এই ৭ জন খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন: জয়সীমা (৬টি) দুরানী (৬টি), সারদেশাই (৫টি), প্রসন্ন (২টি), ওয়াদেকার (২টি), ভেঙ্কটরাঘবন (২টি) এবং বেদী (২টি)। এই সাতজনের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এই চারজন খেলোয়াড়—দুরানী (৫টি), জয়সীমা (৪টি), সারদেশাই (৩টি) এবং প্রসন্ন (১টি)। ওয়াদেকার, বেদী এবং ভেঙ্কটরাঘবন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলেছেন স্বদেশের মাটিতে। ১৯৭১ সালের এই ভারতীয় ক্রিকেট দলে কোন বাঙ্গালী খেলোয়াড় দলভুক্ত হননি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে বাঙ্গালী খেলোয়াড় হিসাবে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন একমাত্র পঙ্কজ রায়। ১৯৫২-৫৩ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে পঙ্কজ রায় টেস্টের ব্যাটিং গড় তালিকায় ৩য় স্থান পেয়েছিলেন (ইনিংস ৮, নট-আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৫০, মোট রান ৩৮৩ এবং গড় ৪৭.৮৭)। তাছাড়া কিংস্টনের ৫ম টেস্টে তিনি এবং মঞ্জরেকার ২য় উইকেটের জুটিতে যে ২৩৭ রান সংগ্রহ করেছিলেন তা আজও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে যে-কোন উইকেট জুটির সর্বাধিক রান হিসাবে রেকর্ড হয়ে আছে।

ক্লাইভ লয়েড

ফ্রাঙ্ক ওরেল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটে স্বর্ণ যুগ

১৯৬০ সালের আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট মহলে শ্বেতকায় সম্প্রদায়ই ছিল একচ্ছত্র সম্রাট। নিরপেক্ষভাবে দল গঠন হত না। শ্বেতকায় খেলোয়াড়দের আগাগোড়া উপেক্ষা করে অযোগ্য শ্বেতকায় খেলোয়াড়দের সম্মানে দলে স্থান দেওয়া হয়েছে এমন নজির অনেক। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট মহলও শ্বেতকায়দের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করেছে। ১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক ওরেল (পরবর্তীকালে স্যার)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলে তিনিই প্রথম নির্বাচিত অশ্বেতকায় অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে

এভার্টন উইকস

গারফিল্ড সোবার্স

ওয়েস্লি হল

১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১-২ খেলায় (ড্র ২) পরাজিত হলেও তাদের এ পরাজয় অগৌরবের হয়নি। তাদের পক্ষে যে ভাগ্যদেবী ছিলেন না তা অস্ট্রেলিয়ার জনগণই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। টেস্ট সিরিজে পরাজিত হলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছিলেন, যা খেলায় জয়লাভের থেকে অনেক বেশী গৌরবের। অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় মুগ্ধ হয়ে দলের খেলোয়াড়দের যে আড়ম্বরে সম্বর্ধনা করেন তা একমাত্র রাজা-রাণীরাই পেয়ে থাকেন। ওরেলের সম্মানে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট সিরিজের বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসাবে 'ওরেল কাপ' উপহার দিলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

অধিনায়ক ওরেল ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে যে ধ্যান-ধারণা পোষণ করতেন, তা ১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রতিটি খেলায় বাস্তব রূপ নিয়ে অগণিত ক্রিকেট অনুরাগীকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলার একনিষ্ঠ অনুগামী। তাঁর মতে ক্রিকেট খেলায় স্বার্থে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন কখনও মুখ্য হওয়া উচিত নয়। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে খেলা প্রাণবন্ত করা। একমাত্র প্রাণবন্ত খেলাই ক্রিকেট অনুরাগীদের হৃদয়ে সার্থকভাবে অনাবিল আনন্দ, উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারে। এই অবস্থায় জয়-পরাজয় হবে খেলার স্বাভাবিক পরিণতি।

ওরেলের অধিনায়ক পদ লাভের সময় থেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট ইতিহাসে স্বর্ণ যুগের সূচনা। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত এই স্বর্ণযুগ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৬টি টেস্ট সিরিজ খেলে উপর্যুপরি ৫টি টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ের সূত্রে বে-সরকারীভাবে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান সম্মান লাভ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ওরেলের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১—২ খেলায় (ড্র ১ ও টাই ১) হেরে গিয়ে ভারতবর্ষকে ৫—০ খেলায় এবং ইংল্যাণ্ডকে ৩—১ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত করে। এর পর সোবার্সের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়াকে ২—১ খেলায় (ড্র ২), ইংল্যাণ্ডকে ৩—১ খেলায় (ড্র ১) এবং ভারতবর্ষকে ২—০ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত করে। এইখানেই স্বর্ণ-যুগের শেষ। তারপর ১৯৬৭-৬৮ সালের টেস্ট সিরিজ থেকে তাদের ব্যর্থতা অব্যাহত গতিতে চলেছে—সোবার্সের নেতৃত্বেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৯৬৭-৬৮ সালে ইংল্যাণ্ডের কাছে ০—১ খেলায় (ড্র ৩), ১৯৬৮-৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১—৩ খেলায় (ড্র ১) এবং ১৯৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডের কাছে ০—২ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত হয়েছে এবং ১৯৬৯ সালে দুর্বল নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১—১ খেলায় (ড্র ১) সিরিজ ড্র রেখে কোনরকমে মুখ রক্ষা করেছে।

পলি উমরীগড়

সুভাষ গুপ্তে

সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যে ৭টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে তার ফলাফল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ৩ বার, পরাজয় ৩ বার এবং সিরিজ ড্র ১ বার। এই সাতটি টেস্ট সিরিজের ২১টি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১টি, পরাজয় ১০টি এবং ড্র ১০টি।

টেস্ট খেলার ফলাফল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

বিপক্ষে	জয়	হার	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৬	২০	২২	৫৮
ভারতবর্ষ	১২	০	১১	২৩
অস্ট্রেলিয়া	৬	১৭	৭	৩০
নিউজিল্যাণ্ড	৫	২	২	৯
পাকিস্তান	৪	৩	১	৮
মোট :	৪৩	৪২	৪৩	১২৮

ভারতবর্ষ

বিপক্ষে	জয়	হার	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	৩	১৮	১৬	৩৭
অস্ট্রেলিয়া	৩	১৬	৬	২৫
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	০	১২	১১	২৩
পাকিস্তান	২	১	১২	১৫
নিউজিল্যাণ্ড	৭	২	৭	১৬
মোট :	১৫	৪৯	৫২	১১৬

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতের টেস্ট খেলা

স্থান	জয়	হার	ড্র	মোট খেলা
ত্রিনিদাদ	০	২	২	৪
বার্বাডোজ	০	২	০	২
জর্জটাউন	০	০	১	১
কিংস্টন	০	২	১	৩
মোট :	০	৬	৪	১০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে
টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯৫২-৫৩ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১—০ খেলায় (ড্র ৪) 'রাবার' জয়ী

প্রথম টেস্ট (ত্রিনিদাদ) : খেলা ড্র

ভারতবর্ষ : ৪১৭ রান (এম এল আপ্তে ৬৪, জি এস রামচাঁদ ৬১ এবং পলি উমরীগড় ১৩০ রান। গোমেজ ৮৪ রানে ৩ উইকেট)

● ২১৪ রান (এম এল আপ্তে ৫২, উমরীগড় ৬৯, ডি জি ফাদকার ৬৫ রান। রামাধীন ৫৮ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৩৮ রান (এভার্টন উইকস ২০৭ এবং বি পেয়ারাউদো ১১৫ রান। সুভাষ গুপ্তে ১৬২ রানে ৭ উইকেট)

● ১৪২ রান (কোন উইকেট না পড়ে। এ এফ রে ৬৩ নট-আউট এবং জে বি স্টলমেয়ার ৭৬ নট-আউট)

দ্বিতীয় টেস্ট (বার্বাডোজ) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৪২ রানে জয়ী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৯৬ রান (ক্লাইড ওয়ালকট ৯৮ রান। গুপ্তে ৯৯ রানে ৩ এবং মানকাদ ১২৫ রানে ৩ উইকেট)

● ২২৮ রান (স্টলমেয়ার ৫৪ রান। ফাদকার ৬৪ রানে ৫ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ২৫৩ রান (এম এল আপ্তে ৬৪, বিজয় হাজারে ৬৩ এবং উমরীগড় ৫৬ রান। ভ্যালেনটাইন ৫৮ রানে ৪ উইকেট)

● ১২৯ রান (রামাধীন ২৬ রানে ৫ উইকেট)

তৃতীয় টেস্ট (ত্রিনিদাদ) : খেলা ড্র

ভারতবর্ষ : ২৭৯ রান (পঙ্কজ রায় ৪৯, রামচাঁদ ৬২ এবং উমরীগড় ৬১ রান। এল কিং ৭৪ রানে ৫ উইকেট)

● ৩৬২ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) এম এল আপ্তে ১৬৩ নট-আউট, উমরীগড় ৬৭ এবং মানকাদ ৯৬ রান)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩১৫ রান (উইকস ১৬১ রান। গুপ্তে ১০৭ রানে ৫ উইকেট)

● ১৯২ রান (২ উইকেটে। উইকস ৫৫ নট-

আউট এবং স্টলমেয়ার ১০৪ নট-আউট)

চতুর্থ টেস্ট (জর্জ টাউন) : খেলা ড্র। বৃষ্টির জন্যে খেলা পরিত্যক্ত।

ভারতবর্ষ : ২৬২ রান (মানকাদ ৬৬ এবং সি ডি গাদকাণী ৫০ নট-আউট। ভ্যালেণ্টাইন ১২৭ রানে ৫ উইকেট)

● ১৯০ রান (৫ উইকেটে। পঙ্কজ রায় ৪৮ এবং উমরীগড় ৪০ নট-আউট। ভ্যালেনটাইন ৭১ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩৬৪ রান (ওরেল ৫৬, উইকস ৮৬, ওয়ালকট ১২৫ রান। গুপ্তে ১২২ রানে ৪ এবং মানকাদ ১৫৫ রানে ৩ উইকেট)

পঞ্চম টেস্ট (কিংস্টন) : খেলা ড্র

ভারতবর্ষ : ৩১২ রান (পি রায় ৮৫ এবং উমরীগড় ১১৭ রান। ভ্যালেনটাইন ৬৪ রানে ৫ উইকেট)

● ৪৪৪ রান (পি রায় ১৫০ এবং মঞ্জরেকার ১১৮ রান। গোমেজ ৭২ রানে ৪ এবং ভ্যালেনটাইন ১৪৯ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৫৭৬ রান (ওরেল ২৩৭, উইকস ১০৯, ওয়ালকট ১১৮ এবং পেয়ারোদা ৫৮ রান। গুপ্তে ১৮০ রানে ৫ এবং মানকাদ ২২৮ রানে ৫ উইকেট)

● ৯২ রান (৪ উইকেটে)

১৯৬১-৬২ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫—০ খেলায় 'রাবার' জয়ী

প্রথম টেস্ট (ত্রিনিদাদ) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে জয়ী।

ভারতবর্ষ : ২০৩ রান (সেলিম দুরানী ৫৬ এবং সুর্তি ৫৭ রান। স্টেয়ার্স ৬৫ রানে ৩ উইকেট)

● ৯৮ রান (হল ১১ রানে ৩ এবং সোবার্স ২২ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৮৯ রান (হান্ট ৫৮ এবং হেণ্ড্রিকস ৬৪ রান। দুরানী ৮২ রানে ৪ উইকেট)

● ১৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে)

দ্বিতীয় টেস্ট (কিংস্টন): ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংসে ও ১৮ রানে জয়ী।

ভারতবর্ষ ৩৯৫ রান (উমরীগড় ৫০, বোরদে ৯৩, নাদকাণী ৭৮ নট-আউট এবং ইঞ্জিনীয়ার ৫৩ রান। হল ৭৯ রানে ৩ এবং সোবার্স ৭৫ রানে ২ উইকেট)

● ২১৮ রান (ইঞ্জিনীয়ার ৪০ রান। হল ৪৯ রানে ৬ এবং গিবস ৪৪ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬৩১ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ম্যাকমরিস ১২৫, কানহাই ১০৮, সোবার্স ১৫৩, ওরেল ৫৮ এবং মেণ্ডোনকা ৭৮ রান। প্রসন্ন ১২২ রানে ৩ উইকেট)

তৃতীয় টেস্ট (বার্বাডোজ) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংসে ও ৩০ রানে জয়ী।

ভারতবর্ষ : ২৫৮ রান (পতৌদি ৪৮ এবং দুরানী নট-আউট ৪৮ রান। হল ৬৪ রানে ৩ উইকেট)

● ১৮৭ রান (সারদেশাই ৬০ এবং মঞ্জরেকার ৫১ রান। গিবস ৩৮ রানে ৮ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৭৫ রান (হান্ট ৫৯, কানহাই ৮৯, সলোমন ৯৬ এবং ওরেল ৭৭ রান)

চতুর্থ টেস্ট (ত্রিনিদাদ) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটে জয়ী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৪৪ রান (ম্যাকমরিস ৫০, কানহাই ১৩৯, হেণ্ড্রিকস ৫০, ওরেল নট-আউট ৭৩ এবং হল ৫০ রান। উমরীগড় ১০৭ রানে ৫ উইকেট) —৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড

● ১৭৬ রান (৩ উইকেটে। ম্যাকমরিস ৫৬ এবং নার্স নট-আউট ৪৬ রান। দুরানী ৬৪ রানে ৩ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ১৯৭ রান (উমরীগড় ৫৬ এবং পতৌদি ৪৭ রান। হল ২০ রানে ৫ উইকেট)

● ৪২২ রান (মেহেরা ৬২, উমরীগড় নট-আউট ১৭২ এবং দুরানী ১০৪ রান। গিবস ১১২ রানে ৪ এবং সোবার্স ১১৬ রানে ৩ উইকেট)

পঞ্চম টেস্ট (কিংস্টন) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২৩ রানে জয়ী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৫৩ রান (সোবার্স ১০৪ রান। রঞ্জনে ৭২ রানে ৪ এবং নাদকাণী ৫০ রানে ৩ উইকেট)

● ২৮৩ রান (সোবার্স ৫০ এবং ওরেল নট-আউট ৯৮ রান। সুর্তি ৫৬ রানে ৩ এবং দুরানী ৪৮ রানে ৩ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ১৭৮ রান (নাদকাণী ৬১ রান। কিং ৪৬ রানে ৫ এবং গিবস ৩৮ রানে ৩ উইকেট)

● ২৩৫ রান (উমরীগড় ৬০ রান। হল ৪৭ রানে ৩ এবং সোবার্স ৬৩ রানে ৫ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলায় উল্লেখযোগ্য রেকর্ড :

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), কিংস্টন, ১৯৬১-৬২

ভারতবর্ষ : ৪৪৪, কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসে অর্থাৎ ১০ উইকেটে)

ভারতবর্ষ : ৯৮ ত্রিনিদাদ, ১৯৬১-৬২

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২২৮, বার্বাডোজ, ১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৩৭—ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, জামাইকা (৫ম টেস্ট), ১৯৫২-৫৩

ভারতবর্ষ : ১৭২ নট-আউট—পলি উমরীগড়, ত্রিনিদাদ (৪র্থ টেস্ট), ১৯৬১-৬২

এক সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৭১৬ রান—এভার্টন উইকস (টেস্ট ৫, ইনিংস ৮, নট-আউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৭, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০২·২৮), ১৯৫২-৫৩

ভারতবর্ষ : ৫৬০ রান—পলি উমরীগড় (টেস্ট ৫, ইনিংস ১০, নট-আউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩০, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৬২·২২), ১৯৫২-৫৩

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৮টি—এ এল ভ্যালেনটাইন (ওভার ৪৩০, মেডেন ১৭৯, রান ৮২৮ এবং গড় ২৯·৫৭), ১৯৫২-৫৩

ভারতবর্ষ : ২৭টি—সুভাষ গুপ্তে (ওভার ৩২৯·৩, মেডেন ৮৭, রান ৭৮৯ এবং গড় ২৯·২২), ১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৮টি (৩৮ রানে)—ল্যান্স গিবস, বার্বাডোজ, ১৯৬১-৬২

ভারতবর্ষ : ৭টি (১৬২ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, ত্রিনিদাদ (১ম টেস্ট), ১৯৫৩

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত
শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত

ঋগ্বেদ

ও

সামবেদ

বাংলা অক্ষরে মূলসহ অনুবাদ

ঋগ্বেদ : প্রথম হইতে ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হইল। মূল্য প্রতি খণ্ড দুই টাকা

সামবেদ : দশ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। মূল্য ২০ টাকা

যোগাযোগ করুন :

প্রকাশক : শ্রীরাজেন্দ্র মিত্র, কপাপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া

প্রাপ্তিস্থান :

প্রধান কার্যালয় : সাংখ্যতীর্থ, কপাপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া

অন্যান্য স্থানসমূহে : মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা—১২

দাস গুপ্ত, কলিকাতা—১২

CENTRAL LIBRARY

খেলাধূলা

দর্শক

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ সফরে ভারতীয় দল

কিংস্টনের সাবিনা পার্কে জামাইকার সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দল তাদের ১৯৭১ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের উদ্বোধনী খেলাটি শুরু করেছে। ভারতবর্ষের এই উদ্বোধনী খেলায় সেলিম দুরানী সেঞ্চুরী (১৩১ রান) করেন এবং সারদেশাই মাত্র তিন রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেননি।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় দল ৫ উইকেট খুইয়ে ২৪৬ রান সংগ্রহ করে। তাদের খেলার সূচনা শুভ হয়নি, মাত্র ১০ রানের মধ্যে ১ম এবং ১৭ রানের মধ্যে ২য় উইকেট পড়ে যায়। ৩য় উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার এবং দিলীপ সারদেশাই ১৪০ রান তুলে দলের পতন রোধ করেন। সারদেশাই ১৯৭ মিনিট খেলে তাঁর ৯৭ রানে ১৬টা বাউণ্ডারী করেন; অপরদিকে ওয়াদেকারের ৭০ রানে ১টা বাউণ্ডারী ছিল।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের ১ম ইনিংস ২৭২ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তারা ৫০ মিনিট খেলেছিল এবং শেষ ৫টা উইকেটে মাত্র ২৬ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে জামাইকার অফস্পিন বোলার মরিস ফস্টার একাই মাত্র ৬ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পান। খেলার বাকি সময়ে জামাইকা ১ম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ১৯০ রান সংগ্রহ করেছিল। জামাইকা দলেরও খেলার সূচনা ভাল হয়নি, ৮৩ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়েছিল। ৫ম উইকেট জুটি ১০৫ রান তুলে দলের পতন রোধ করে।

তৃতীয় দিনে জামাইকার ১ম ইনিংস ২৮০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৮ রানে এগিয়ে যায়। বাকি সময়ের খেলায় ভারতীয় দল ২য় ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ১৯১ রান সংগ্রহ করে। সেলিম দুরানী বর্তমান সফরে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন এবং ১২২ রান করে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতীয় দল ২য় ইনিংসের ২৯০ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি ১৫০ মিনিটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৮৩ রান সংগ্রহ করা জামাইকার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। জামাইকার ২য় ইনিংসের ১০৩ রানের (১ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

ভারতীয় দল : ২৭২ রান (সারদেশাই ৯৭ এবং ওয়াদেকার ৭০ রান। ফস্টার ২৩ রানে ৪ উইকেট)।
ও ২৯০ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। দুরানী ১৩১, ওয়াদেকার ৫৪ এবং ভেংকটরাঘবন নটআউট ৪২ রান। মাইকস ৪১ রানে ৩ উইকেট)

জামাইকা : ২৮০ রান (ডি লুইস ৯৬, [illegible] ৪০ এবং [illegible] ৫০ রান। বেদী ৫৮ রানে ৩ উইকেট)
ও ১০৩ রান (১ উইকেটে। ডি লুই নটআউট ৬৭ রান)

সি এ বি লীগ ক্রিকেট

সি এ বি পরিচালিত সিনিয়র বিভাগের লীগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বর্তমানে নক-আউট পর্যায়ে পৌঁছেছে। লীগ পর্যায়ের খেলায় নিম্নলিখিত ৯টি দল নকআউট পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে :

'এ' গ্রুপ : মোহনবাগান (৩৬ পয়েন্ট), এরিয়ান্স (৩৮) এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে (৩২)

'বি' গ্রুপ : ইস্টবেঙ্গল (৩৬), স্পোর্টিং ইউনিয়ন (৩৬) এবং অরোরা (৩০)

'সি' গ্রুপ : কালীঘাট (৪০), পোর্ট-কমিশনার্স (৩৪) এবং বি এন আর (৩০)

লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল এই চারটি দল—মোহনবাগান, এরিয়ান্স, ইস্ট-বেঙ্গল এবং কালীঘাট। লীগ পর্যায়ে একমাত্র কালীঘাট ক্লাব সমস্ত খেলায় জয়ী হয়ে পুরো ৪০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। গত বছর কালীঘাট ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং মোহনবাগান রানার্স-আপ হয়েছিল।

জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

২৩তম জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দল ৭৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দলগত খেতাব লাভ করেছে।

বিভিন্ন বিভাগে খেতাব বিজয়ী

ফেদারওয়েট : রামকৃষ্ণ (রেল)
লাইটওয়েট : এস সি দেব (রেল)
মিডলওয়েট : অনিল মণ্ডল (রেল)
ব্যান্টমওয়েট : অমরনাথ (সার্ভিসেস)
মিডল হেভীওয়েট : এ এন ঘোষ (রেল)
হেভীওয়েট : [illegible] (মহারাষ্ট্র)

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ : রেলওয়ে (৭৮ পয়েন্ট), সার্ভিসেস (৫৯), তামিলনাড়ু (২৫), মহারাষ্ট্র (১১), অন্ধ্র (৭), দিল্লী (৩) এবং পাঞ্জাব (২)

জাতীয় কবাডি প্রতিযোগিতা

দিল্লীর কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯তম জাতীয় কবাডি প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে রেলওয়ে ১৯—১৮ পয়েন্টে গতবারের চ্যাম্পিয়ান মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করেছে। মহিলা বিভাগের ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী মহারাষ্ট্র ৭৬—১৩ পয়েন্টে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করে।

জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতা

১৯৭০ সালের জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতার ফাইনালে সতীশ মোহন (গুজরাট) গতবারের চ্যাম্পিয়ান মাইকেল ফেরিরাকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করে দ্বিতীয়বার খেতাব জয়ী হলেন। সতীশমোহন প্রথম খেতাব পান ১৯৬৮ সালে এবং ১৯৬৯ সালের ফাইনালে মাইকেল ফেরিরার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। অপর দিকে মাইকেল ফেরিরা একবার খেতাব পেয়েছেন, ১৯৬৯ সালে।

জাতীয় স্নুকার প্রতিযোগিতা

১৯৭০ সালের জাতীয় স্নুকার প্রতিযোগিতার ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ান শাম শ্রফ (মহারাষ্ট্র) রেলওয়ের অরবিন্দ সাভুরকে পরাজিত করে মোট পাঁচবার খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় স্নুকার খেতাব পেয়েছেন ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে।

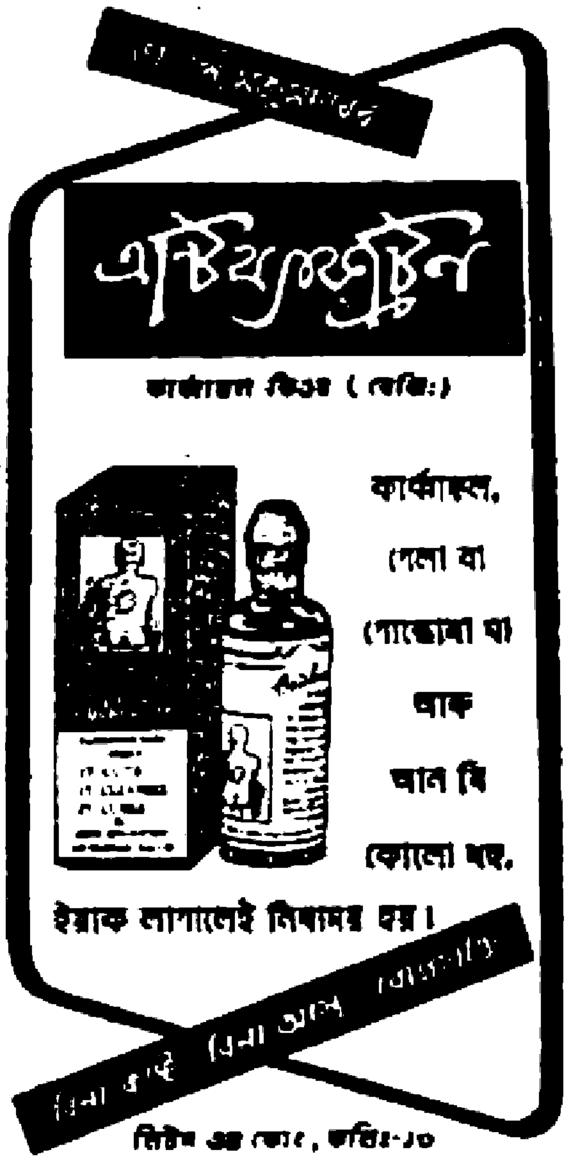

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১৯, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুসকি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুসকি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুসকি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুসকির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

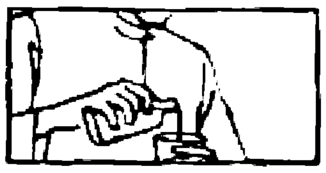

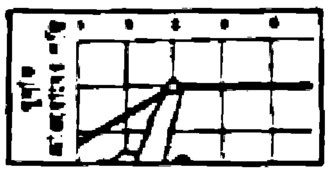

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

BRITANNIA
THIN ARROWROOT
50 বছরের ওপর
জনপ্রিয়তায়
অদ্বিতীয়
ভারতে সবচেয়ে
বেশী বিক্রী—
ব্রিটানিয়া
থিন এরারুট বিস্কুট
ব্রিটানিয়া

সজনী প্রেসের বই!
প্রকাশিত হল!

রাজ চক্রবর্তী প্রণীত

সেই মন সেই দাহ

ত্রিকোণ প্রেম দিয়ে যদিও গ্রন্থের শুরু; গ্রন্থের মধ্যভাগে অনিবার্য নিয়তির মতো মুখ বাড়িয়েছে যৌবনসর্বস্ব অনন্যা রূপসী লোমা ওয়ার্দি। যার দুরন্ত আকর্ষণের আগুনে দগ্ধ হয়েছে পরিমল, রক্তাক্ত হয়েছে ডাঃ অরুণ রায়, অনুক্ষণ জ্বলে জ্বলে খাক হয়েছে মল্লিক।...
প্রেম, পতন ও প্রবঞ্চনার রোমাঞ্চময় এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে পাঠক-পাঠিকার প্রচণ্ড অভিনন্দনে ধন্য হবে।

দাম : বারো টাকা

রাজ চক্রবর্তীর
আরেকটি সাড়াজাগানো উপন্যাস

লাস্ট অপারেশন

আনন্দবাজার-যুগান্তর-বসুমতী - অমৃত ও সিনে-এ্যাডভান্স পত্র-পত্রিকাতে সরব প্রশংসিত

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়—পাঁচ টাকা

পরিবেশক : ডি এম লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণী, কলি—৬

মডেল পাবলিশিং কোং
২৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪২শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 26th February, 1971. শুক্রবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৭৭ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৪৪	চিঠিপত্র		
২৪৬	সাদাচোখে		—শ্রীসন্দনশী
২৪৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
২৫১	সম্পাদকীয়		
২৫২	মুক্তির জোয়ার জলের মতো, শুধু মূহুর্তে	(কবিতা)	—শ্রীকালীকৃষ্ণ গুহ
২৫২	বর্তমান	(কবিতা)	—শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
২৫২	ঘর আমি কখনো ছাড়বো না	(কবিতা)	—শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ
২৫৩	শিকার	(গল্প)	—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু
২৫৯	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬০	অজাতশত্রু হেমন্তকুমার বসু		
২৬২	খাঁচার পাখি	(বড় গল্প)	—শ্রীমানব সান্যাল
২৬৯	বিস্মৃত বিপ্লব বিস্মৃত নায়ক		—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়
২৭১	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
২৭৯	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
২৮২	নিঃসঙ্গ হৃদয়	(বড় গল্প)	—শ্রীরাখী ঘোষ
২৮৭	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
২৮৯	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২৯২	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ্
২৯৫	পিঞ্জর	(উপন্যাস)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
২৯৯	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৩০১	বিনোদ মাস্টার	(গল্প)	—শ্রীগোষ্ঠ শেঠ
৩০৯	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৩১০	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৩১৫	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৩১৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

VANGUARD
JHAMAPUKUR HOSIERY-CAL-9

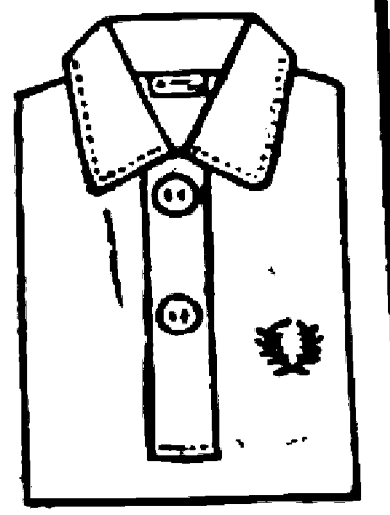

★ COOLTY & TURKISH
★ WHITE & COLOURED
★ ALL SIZES AVAILABLE

JHAMAPUKUR HOSIERY FACTORY (PRIVATE) LTD
22/A, Kalidas Singha Lane, Calcutta-9. 35-4832

চিঠিপত্র

এই আমাদের দেশ

অমৃতের পাঠক হিসেবে একটা প্রসঙ্গ আলোচনা না করে থাকতে পারলাম না। অমৃতের ২২ মাঘ '৭৭ সংখ্যায় 'এই আমাদের দেশ' পর্যায়ে নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'ধ্বংসস্তূপের মাঝে মান্ধাতার গৌড় টিকে আছে এখনো' শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—গ্রামে (রামকেলি) ঢোকার মুখেই মদন-মোহনের ঠাকুর বাড়ি ও কেলি-কদম্ব গাছ। একটি বেদির ওপর পাশাপাশি ৪টি গাছ, দুটি তমাল ও দুটি কদম।...গাছের গোড়ায় একটি কাল পাথরের ছোট চাতালের মত রয়েছে, তাতে শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন অঙ্কিত।' নন্দলালবাবুর এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত কি যুগ দুই পূর্বের? অথবা সে যুগের প্রকাশিত কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া? (যদিও সে কথার কোন স্বীকৃতি কোথাও নেই।) অন্ততঃ পড়ে তাই মনে হয়। অথচ প্রবন্ধের প্রারম্ভে সাম্প্রতিক ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি আছে। যে বেদির ওপর বসে চৈতন্যদেব বিশ্রাম করেছিলেন বলে কথিত সে বেদির ওপর এখন আর কদম্ব ও তমালের চারটি গাছ নেই। পুরোতন সে গাছ কবে মরে গেছে। আমরা চোখে দেখার অবকাশ পাই নি। বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায় মাত্র। বর্তমানে বেদির ওপর মাত্র একটি তমাল শিশু দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্নযুক্ত পাথর গাছ তলায় পড়ে নেই, বেশ কয়েক বছর পূর্বেই পার্শ্বে নির্মিত মন্দিরে রক্ষিত হয়েছে।

বড় সোনা মসজিদ সম্পর্কে লিখেছেন,—'আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এই মসজিদ তৈরী করেছিল।' কথাটা কি ঠিক? Memoirs of Gour and Pandua পুস্তকে আবিদ আলী খান লিখেছেন—

> There are few carving left. As is clear from the following inscription, it was built by Sultan Nasart Shaha in 932 A.H. (1526 A.D.)

তিনি প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে পাঠোদ্ধার করে এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। ফ্রাংকলিন ও কানিংহাম সাহেবও এ মতই সমর্থন করেন। গৌড়ের ইতিহাস লেখক, পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ও তাই বলেন।

আর একটি জায়গায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'কুঁড়ে ঘরের আদলে নির্মিত একটি সৌধের মধ্যে অনেকগুলো কবর' (কদম রসুলের কাছে)। সত্যিই কি তিনি অনেকগুলি কবর দেখেছেন? ও ঘরে তো মাত্র একটি কবরই আছে।

প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি ছোটসোনা মসজিদ সম্পর্কে লিখেছেন—আমাদের জিজ্ঞাসা তিনি ছোটসোনা মসজিদ দেখলেন কবে? ওটা যে এখন পাকিস্তানের কবলে। আর তিনি যদিও বা সরকারী সহযোগিতায় দেখে থাকেন, কিন্তু সাধারণ দর্শক দেখবেন কি করে? অথচ তাঁর লেখায় সে রকমের কোন ইঙ্গিত নেই। আরো অনেক ভুল তথ্য ছড়িয়ে আছে সারা প্রবন্ধটি ধরে। যেমন—'ফিরোজ মিনার থেকে... রাজমহলের পাহাড়ের ধূসর পাহাড়ের ধূসর সৌন্দর্য বেশ উপভোগ করার মত।' লেখক কি উপভোগ করেছেন? আমার কৈশোরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ফিরোজ মিনারের চূড়া। অনেক সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা মিনারের মাথায় কাটিয়েছি কোন দিন রাজমহলের পাহাড় চোখে পড়ে নি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে লেখকের ৮ মাঘ, অমৃত সংখ্যায় লেখা, 'অতুলনীয় আদিনা মসজিদ দেখতে চলুন পাণ্ডুয়া' প্রবন্ধেও প্রচুর ভুল তথ্য দেখেছি। প্রয়োজন বোধে পরে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

ইতিহাস ভিত্তিক ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে এ-রকম ভুল তথ্যের পরিবেশন কি কেবলই পীড়া দায়ক? ক্ষতিকর নয় কি? গৌড়, পাণ্ডুয়া, আদিনাকে নিয়ে এ ধরনের ঐতিহাসিক তথ্যের প্রচুর ভুল দেখেছি—ক্যামেরার চোখে উত্তরবঙ্গ বই-এ। রম্যাণি-বীক্ষ্য (গৌড় পর্বে), এমন কি ডঃ সুশীলা মণ্ডলের গবেষণা গ্রন্থ বঙ্গ দেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) গ্রন্থে। এর কি কোন প্রতিকার নেই??

রুবী পাল
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দুঃখের মেলা

অমৃতে পত্রিকার সমস্ত বিষয় মনোযোগ সহকারে পড়া আমার অভ্যাস সেই জন্য গত সংখ্যায় (১০ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯শ সংখ্যা) আবদুল জব্বার-এর লেখা 'দুঃখের মেলা' পড়লাম। নিবন্ধটি আদ্যন্ত যেমন সমাজের বিভিন্ন বিভাগের দুর্নীতিগুলি যেমন দেখতে পাই, তেমনি দুঃখের মেলাতে উদ্ধত যৌবন-ভরা দুলারী নামে একটি পাগলিকে এক হোটেলের মালিক গফুর মিয়ার দরদ দেখতে পাই। কিন্তু দরদ দেখিয়ে গফুর মিয়া সেই পাগলীর সর্বনাশ করে। বাধ্য করে তার অবচেতন মনের সুযোগ নিয়ে যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করে। এইসব শয়তানরা কোনদিনই কোন জবাবদিহি করে না, এদের শাস্তি কে দেবে? আবদুল জব্বারকে অভিনন্দন জানাই এই কারণে হোটেলওয়ালারা দরদের নাম করে কত কুমারী মেয়ের সর্বনাশ করে তার চিত্র তুলে ধরার জন্য। এই রকম একটি বিভাগ 'অমৃত' পত্রিকায় থাকার জন্য ধন্যবাদ দিই সম্পাদক মহাশয়কে।

স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
পোঃ আড়ংঘাটা, জেলা
নদীয়া।

গবেষণার অতীত বর্তমান

আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক অমৃত ('৭৭, ৩য় খণ্ড, ৩৮শ সংখ্যা) পত্রিকায় 'বইকুণ্ঠের খাতা' কলমে 'গবেষণার অতীত-বর্তমান' সম্বন্ধে গ্রন্থদর্শী মহাশয় যে প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন, তা খুবই সত্য। 'সতীনাথ ভাদুড়ী কবে মারা গেছেন, তবু তাঁর ওপরে গবেষণা করার মতো একজন জনের আবির্ভাব হলো না। রমেশ সেন, জগদীশ গুপ্তের ছোট গল্প নিয়ে কি আজও কেউ থিসিস করেছেন, না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেই তেমন কোন গবেষণা হয়েছে? জানি, হওয়া দরকার বললেই হয় না, গবেষণা গ্রন্থটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও গবেষককে ভাবতে হয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার রেফারেন্স বই হিসেবে স্থান পাবে কিনা তাই নিয়ে মনে মনে অঙ্ক কষতে হয়।

যাঁরা এইসব অসুবিধা এবং প্রলোভনকে জয় করতে পারেন, তাঁরা শুধু পাঠকের কাছ থেকেই প্রশংসা পান না, অনতিপ্রকাশ্য সত্যকে অনাবৃত করে নিজেরাও হর্ষিত পান। তাতে সাহিত্যেরও কিছু কাজ হয়। আবিষ্কারের আনন্দটা তাঁদের অবশ্য প্রাপ্য।' একজন পাঠক হিসাবে আমার বক্তব্য, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সম্বন্ধে 'শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' গ্রন্থে ঢোঁড়াই সম্বন্ধে একটু যা আলোচনা এবং এই উপন্যাসের ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্বন্ধে ও বাংলা উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে একটু যা ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার পর সতীনাথ ভাদুড়ীর আর কোনো রচনা সম্বন্ধে আর কেউ আলোচনাই করেন নি। মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

নামী অধ্যাপক মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি মন্তব্য লিখেছেন, যা সত্যি দুঃখের বিষয়। মনে হয় বাংলা সাহিত্যে গবেষণার ভিতরে ঘুণ ধরে গেছে। অন্য দু'জন রমেশ সেন ও জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প সম্বন্ধে, কবে গবেষণা হবে তা ভাববার বিষয়। ত্বরায় যদি উক্ত লেখকের রচনার উপর কোনো গবেষণা না হয় তাহলে ভবিষ্যতে তাঁদের বিষয়ে গবেষণা করা ভীষণ কঠিন হয়ে পড়বে। উক্ত লেখক ও গল্পকারদের জীবিত বন্ধু-বান্ধবদের নিকট আমার প্রার্থনা তাঁরা যদি এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেন তাহলে তাঁদের অর্থাৎ লেখক ও গল্পকারদের বিষয়ে গবেষকদের গবেষণা করতে আর আমাদের মত পাঠকদের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উপকার করবেন।

সহদেব রায়
সাহিত্য-সংসদ, শিলিগুড়ি।

অমৃত প্রসঙ্গে : কয়েকটি নিবেদন

আমি অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। বিভিন্ন বিভাগ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে চিঠিপত্র স্তম্ভে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

প্রথমেই আমি ধারাবাহিক উপন্যাস—বড় গল্প বিষয়ে বলতে চাই—এগুলির অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে এখনি কিছু বলা না গেলেও প্রায় প্রত্যেকটির বর্ণনা-কৌশল মনোযোগ আকর্ষণকারী। এ সম্পর্কে আমার নিবেদন—প্রতি সপ্তাহে কিম্বা প্রতিপক্ষে যদি ধারাবাহিক রচনা-গুলির প্রারম্ভে পূর্বপঠিত অংশের অতি সংক্ষিপ্ত চুম্বক বিবরণী দিয়ে দেন, তাহলে পড়তে কিছুটা সুবিধা হয়। আর চলমান সমাজজীবনের প্রবহমান ঘটনাবলীর সুসমঞ্জস গাঁথুনিতে কিছু উপন্যাস প্রকাশ করলে নতুন লেখক ও পাঠকদের সাধুবাদ পাবেন।

আর কবিতা পাঠকের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান বলে যে একটা আবছা মূল্যায়নের প্রচেষ্টা চলছে—তার সত্যাসত্য বিচার সাপেক্ষ। কারণ, ব্যক্তি কেন্দ্রীক অন্তর্দ্ব-আবেগে ভারাক্রান্ত কবিতা যদিও কোন সময়েই জনাদৃত নয়, তবু ব্যক্তি বলয় থেকে ব্যক্তি-কেন্দ্রীক বর্ণনায় উত্তীর্ণ কবিতা পাঠকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আর আজকে সে স্রোতের প্রতিমুখে নিরবে কষ্ট করে খড়কুটো ভাসাতে হয় না বলেই আমার বিশ্বাস। এ ধরনের পাঠকের প্রতি অমৃত যে পুরোপুরি সজাগ, তাতে আমরা আশ্বস্ত। অনেক মূল্যবোধই আজ বিপর্যস্ত, কিন্তু তার পটভূমিকা কিম্বা চাঁদের ও-পিঠে কি চলছে, তা জানতে যুগোত্তীর্ণ কবিতার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। অমৃত কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হতে পারেন, যদি তাঁরা প্রতি সংখ্যার কবিতার সংখ্যা আরো কিছু বাড়ান—পাঠকের অভাব হবে না, আর আমারও সনির্বন্ধ অনুরোধ তাই।

দেশে বিদেশে স্তম্ভে দূর কিম্বা মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর সমকালীন আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কিম্বা সাংস্কৃতিক সংবাদাদির জন্য প্রতীক্ষা করে হতাশ হই। সাপ্তাহিক-পাক্ষিক কিম্বা মাসিক—যে কোনো কিস্তিতেই হোক—ঐ সব অঞ্চলের নিরপেক্ষ রিপোর্টাজ পেলে সবিশেষ উপকৃত হই।

সাহিত্য-সংস্কৃতি নতুন বই-এর প্রয়োজনীয় আলোচনাদি প্রকাশের জন্য আমার অসংখ্য সাধুবাদ নেবেন। মুখের মেলা, নিকটেই আছে, মনের কথা প্রভৃতি ফিচারগুলি বর্তমান বাংলা পত্র-পত্রিকার অঙ্গনে নতুনত্বের আস্বাদবাহী।

শৈবালকুমার শীল
কলিকাতা-৩।

লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে

গত ২২শে মাঘের অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে 'প্রান্তিক' সম্পাদক স্নেহাশিস শুকুলের প্রস্তাব সমেত সময়োপযোগী আলোচনাটি পড়লাম। প্রস্তাবটি আমি বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করি। এবং আশা করি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাপর সকলেই এই মত পোষণ করবেন। সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সাংস্কৃতিক মহলে অমৃতের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এবং এই সাহিত্য পত্রিকাটি আগামী দিনের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়ও রচনা করছে। প্রথম শ্রেণীর বাংলা পত্রিকাগুলির মধ্যেও একমাত্র অমৃত পত্রিকাই উদীয়মান, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ লেখকদের সঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। আমরাও এইসব লেখকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নতুন নতুন রচনা পড়ে আনন্দ লাভ করছি এবং বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হচ্ছি।

মফঃস্বলের লেখক - লেখিকাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে আপনি আরও সচেতন হবেন বলে যে-প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অমৃতের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের পরিচায়ক। ইচ্ছা করলে অমৃত আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে। সেই ধাপটি হচ্ছে—আলোচনার জন্যে প্রাপ্ত লিটল ম্যাগাজিনগুলি ঘেঁটে প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন লেখকের অন্তত একটি পরিণত লেখার (গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি) মূল পত্রিকাটির নামোল্লেখসহ পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা। তাহলে আপনার পত্রিকা মারফত বহুল প্রচারিত হওয়ার গৌরবে লেখক যেমন লেখার সহস্র গুণ প্রেরণা পাবেন, তেমনি লিটল ম্যাগাজিনের অকাল মৃত্যুর হারটাও আনুপাতিকভাবে আস্তে আস্তে কমে আসবে। এবং তৎসঙ্গে পুনঃপ্রকাশিত লেখাটির প্রথম প্রকাশের অধিকারী মূল পত্রিকাটির প্রকাশক এবং সম্পাদকেরও উৎসাহ-উদ্দীপনা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়ার দরকার।

অতুলরঞ্জন দেব
প্রকাশক : উৎকর্ষ
করিমগঞ্জ : আসাম

(২)

'অমৃত' পত্রিকার ২২ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীস্নেহাশিস শুকুল মহাশয়ের চিঠি মনোযোগ সহকারে পড়লাম। তিনি লিটল ম্যাগাজিনের পুনঃপ্রকাশযোগ্য লেখাগুলি অমৃতে মাঝে মাঝে প্রকাশের জন্য যে প্রস্তাব রেখেছেন—আমি তাতে আমার অকুণ্ঠ সমর্থন জানাই। আজকের বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠিত লেখকই অতীতে লিটল ম্যাগাজিনের লেখক ছিলেন—একথা সবারই জানা। সে হিসেবে আগামীকালের লেখককে খুঁজে পাওয়া যাবে বর্তমানে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে। যাতে সম্ভাবনাময় কোনো লেখক যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হারিয়ে না যান, তার জন্য বহুল প্রচারিত পত্রিকার সম্পাদকদের কিছু করণীয় আছে বলে আমি মনে করি। 'অমৃত' নতুন লেখকদেরই কাগজ—একথা আপনারা যখন ঘোষণা করেছেন তখন খুশী হয়েছি এবং সে কারণেই শ্রীস্নেহাশিস শুকুলের প্রস্তাবটি বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য আপনার সহৃদয় মনোযোগ আকর্ষণ করি।

অলককুমার চৌধুরী
বর্ধমান।

শাদা চোখে

লোকসভা ও বিধানসভার প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী লড়াইয়ের রূপ-রেখা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। অনেকগুলি দল যেমন জোটবদ্ধ হয়েছে তেমনি অনেকে আবার একলাও চলছেন। এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে বস্তুতপক্ষে জোট বলতে তিনটি। অন্টবাম নিয়ে সংযুক্ত গণতান্ত্রিক বামপন্থী ফ্রন্ট বা ইউ, এল, ডি, এফ। বড়বাম গঠিত ইউ, এল, এফ বা সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট। আর বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক সংহতি। এই তিনটি জোটের মধ্যে বস্তুত-পক্ষে ১৬টি রাজনৈতিক দল আছে। ইউ, এল, ডি, এফ-এর সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদের নাম : কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, এস, ইউ, সি, গুর্খা লীগ, বিপ্লবী পি, এস, পি, আর, সি, পি, আই (দাস গ্রুপ) ও বলশেভিক পার্টি (বরেন্দ্রনাথ গ্রুপ); বড়বাম : মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক, আর, সি, পি, আই (কুমার গ্রুপ), বলশেভিক পার্টি (ভট্টাচার্য গ্রুপ)) ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস। আর গণতান্ত্রিক সংহতিতে আছেন বাংলা কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট পার্টি, এবং বিপ্লবী পি, এস, পি ও এস, এস, পির দলছুট কয়েকজন নেতা।

মোটামুটি এবারকার নির্বাচনে যাঁরা একজোট লড়ছেন তাঁদের এই চেহারা। দেখা যাচ্ছে, বিগত নির্বাচনে ১৪ দলের যে যুক্তফ্রন্ট হয়েছিল তার মধ্যে অনেক দলই খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে। ফলে, ১৪ দলের শরীক বস্তুতপক্ষে এবার তিনটি জোটে আবদ্ধ হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আরও দুটি দল যথাক্রমে আর, এস, পি ও লোকসেবক সংঘ যাঁরা যুক্তফ্রন্টের শরীক ছিলেন এবার একলা লড়ছেন।

অন্যদিকে আসরে নেমেছেন—নিখিল ভারত কংগ্রেসের বাদি ও শাসকগোষ্ঠী, জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা, মুসলীম লীগ, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, আর সি পি আই (ঠাকুর গ্রুপ) ইত্যাদি দল এবং অজস্র নির্দল প্রার্থী। দল যেমন ভেঙেছে তেমনি আবার আত্মবিলুপ্তিও ঘটেছে। গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী লোকদল ও আই এন ডি এফ এবার শাসক কংগ্রেসে মিশে গেছে।

বিগত মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিধানসভার মোট প্রার্থী ছিলেন ১০১১ জন। এবার প্রায় ১৬০০ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। গতবার কংগ্রেস ও বামপন্থীদের যুক্ত মোর্চার মধ্যে সমস্ত দল সীমাবদ্ধ থাকায় স্বভাবতই প্রার্থীর সংখ্যা কম ছিল। এবারের তিনটি ফ্রন্ট ও দুই কংগ্রেস প্রত্যেকেই স্থায়ী সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসরে নেমেছেন। ফলে, প্রত্যেককেই যথাসম্ভব বেশী প্রার্থী দিয়ে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জনের শক্তি আছে এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। একজনেই প্রার্থী সংখ্যাও বেড়ে গেছে। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে কেউই ২৮০টি আসনে প্রার্থী দিতে পারেন নি। তাই তুলনামূলকভাবে দেখলে বোঝা যায়, সংখ্যাটা একটু কমই হয়েছে।

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আসন সংখ্যা ছিল ২০৮, আর প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন ১০৭০ জন। ১৯৫৭'র নির্বাচনে আসন সংখ্যা বেড়ে ২৫২তে দাঁড়ায়। সেবারের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৯০৫। ১৯৬২তে সমসংখ্যক আসনের জন্য লড়েছিলেন ৯৬১ জন। ১৯৬৭ সালে আসনের সংখ্যা হয় ২৮০। আর সেবারেই প্রথম সংহতিকরণ হয়। ফলে প্রার্থীর সংখ্যা হয় ১০৫৮। কাজেই এবারের বহুধা বিভক্ত দলগুলির প্রার্থীপদ বেড়ে যাওয়াতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

লোকসভার আসনে এবারকার প্রার্থী সংখ্যা প্রায় ১৯০। মোট আসন ৪০টি। ১৯৫২ সালে আসন ছিল ৩৪ আর প্রার্থী ছিলেন ১৪৮ জন। '৫৭ ও ৬২ সালে আসন বেড়ে হয় ৩৬, আর প্রার্থী দাঁড়ান যথাক্রমে ১৮ ও ১১২। আর '৬৭ সালে ৪০টা আসনের জন্য ১৪০ জন লড়াই করেন। লোকসভার কোন আসনেই এবার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না। অথচ বিধানসভার মোটা তিনেক আসনে সরাসরি লড়াই হচ্ছে।

এবারকার যে তিনটি আসনে সরাসরি লড়াই হচ্ছে তা বেশ লক্ষণীয় ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বরানগরে বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মুখার্জি লড়ছেন বাম কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে। বেল-গাছিয়ায় শাসক কংগ্রেস প্রার্থীকে দ্বৈরথে অবতীর্ণ হতে হয়েছে বাম কম্যুনিস্ট প্রার্থীর সঙ্গে। অনুরূপভাবে বেলেঘাটা দক্ষিণ কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক ও বাম কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। অন্যান্যবার নির্বাচনে বামপন্থীরা সরাসরি লড়াইয়ের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেন। কেননা সরাসরি লড়াইয়ে বামপন্থীদের কাছে কংগ্রেসের পরাজয়ের সম্ভাবনা হত বেশী। যেমন '৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৬৪টি আসনে এ হেন লড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে মাত্র ৯টি আসনে কংগ্রেস জয়ী হতে পেরেছিল। কিন্তু এবারকার নির্বাচনে যে তিনটি আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে তা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা বামপন্থীরা একজোট নন। তবু বাম কম্যুনিস্ট পার্টিকে একক-ভাবে সমস্ত দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। বস্তুতপক্ষে চিত্রটা এবার পালটে গেছে। অন্টবামের শরীকরা বড়বাম প্রার্থীকে সমর্থন জানাবেন না। আর কংগ্রেসগুলিকে ত সমর্থনের প্রশ্নই উঠে না। এইদিক থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক ভারসাম্য যে পালটাচ্ছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এই সূত্রকেই অবলম্বন করে অনেকে বলছেন এবারকার নির্বাচনে একটি অন্য হাওয়া বইছে। সেটা হচ্ছে, বাম কম্যুনিস্ট ও তাঁদের বিরোধীদের যে কোন একটি দলের প্রার্থীকে বিচার করে ভোট দেওয়ার মানসিকতা নাকি গড়ে উঠছে ভোটদাতাদের মধ্যে। এ হেন প্রার্থীর যোগ্যতা ও গুণাগুণ বিচার করে নাকি ভোট দেওয়া হবে। এবং এই মহল বলছেন যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তার ফলে একটা নতুন সংকেতের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অনেক রাজনৈতিক দলের নেতারাও এই তথ্য সমর্থন করেছেন জোরের-সঙ্গেই।

সে যাহোক, কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠী এবার প্রার্থী দিয়েছেন প্রায় ২২৫ জন। আদি গোষ্ঠীর প্রার্থী সংখ্যা প্রায় ২০০। বাংলা কংগ্রেস ও সহযোগীরা দাঁড়াচ্ছেন ১৪০টি আসনে। বড়শরিকের বৃহত্তম দল মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন ২২৭ জন। আর অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে আসছেন ২৭৬টি আসনে। ৪টি আসন পুরুলিয়ার লোক সেবক সংঘকে তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু লোক সেবক সংঘ পুরুলিয়ার ১১টি আসনেই প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন, অষ্ট-বামের জোটও প্রায় ২৭৫টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছেন। তার মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টি একাই সর্বাধিক প্রার্থী দিয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক এর চেয়ে কিছু কম, এস এস পি ৪৪, এস ইউ সি ও অনুরূপ সংখ্যায় প্রার্থী দিয়েছেন। একক দল হিসাবে আর এস পি ৪০টি, মুসলীম লীগ ৪৫, ঝাড়খণ্ড ৩২টি, উত্তরাখণ্ড ১২টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। সঠিক কতজন প্রার্থী কোন দল দিয়েছেন তা অদ্যাবধি বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে। কেননা অনেক জায়গায় মনোনয়ন পেয়েও অনেকে প্রার্থী হন নি। আবার অনেক ক্ষেত্রে ডামি হিসাবে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন নি। এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। যাহোক একটি মোটামুটি সংখ্যা এখানে উপস্থিত করা গেছে।

লোকসভার আসনে শাসক কংগ্রেস ৩০টি আসনে লড়ছেন। আদি কংগ্রেস প্রায় সমসংখ্যক আসনে প্রার্থী দিয়েছেন, বাম কম্যুনিস্টরা ৩৫টি আসনে ও বাংলা কংগ্রেস সহযোগীসহ ২৪টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। অষ্টবামও সমস্ত লোকসভার আসনে লড়াইয়ে নেমেছেন। কিন্তু লোকসভার আসনের ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, অনেকগুলি সি পি আই নির্ধারিত লোকসভা আসনে শাসক কংগ্রেস কোন প্রার্থী দাঁড় করান নি। রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, শাসক কংগ্রেস যদি লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করতে পারে তবে তাঁদের মদৎ দেওয়ার জন্য যাঁরা প্রস্তুত আছেন সেই সমস্ত দলের বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও শাসক কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড় করান নি। পশ্চিমবাংলায়ও সেই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাম কম্যুনিস্ট নেতা শ্রী পি সুন্দরায়া ইতিমধ্যেই শাসক কংগ্রেসের সম্ভাব্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইন্দিরাজী পুনরায় ক্ষমতায় আসবেন কেন্দ্রে।

পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা নির্বাচনে এবার বেশ কিছুসংখ্যক মহিলা দলীয় টিকিটে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী ছিলেন মাত্র তিনজন তার মধ্যে ডঃ শ্রীমৈত্রেয়ী বসু ও ঊমা রায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী সেবার জিততে পারেন নি। কিন্তু এবার ৮ জন মহিলা প্রার্থী লোকসভায় দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি, রেণু চক্রবর্তী, আভা মাইতি, ইলা মিত্র, ডঃ ফুলরেণু গুহ, ঊমা রায়, ডঃ মৈত্রেয়ী বসু এবং আরেকজন। শ্রীমতী আসফ আলী কম্যুনিস্ট প্রার্থী হিসাবে তমলুকে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসতীশ সামন্তের বিরুদ্ধে লড়বেন। অবশ্য, এখানে অন্য প্রার্থীও আছেন।

এবারকার নির্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল অনেক দলই অনেক নবীন প্রার্থীকে এবার মনোনয়ন দিয়েছেন। বিশেষ করে দুই কংগ্রেস শাসক ও আদি অনেক ছাত্রনেতা এবং যুব কর্মীকে এবারের নির্বাচনী যুদ্ধে সমাবেশ করেছেন। শাসক কংগ্রেস প্রায় ২৭ জন ছাত্র ও যুবককে এবং আদি কংগ্রেস প্রায় সমসংখ্যক যুবক ছাত্রকে লড়াইয়ে সামিল করেছেন। অন্যান্যরাও যুবক প্রার্থী দেন নি তা নয়, তবে তাঁদের সংখ্যা তুলনায় কম। যাইহোক, এইভাবে যুবকদের আগমন একটি শুভ লক্ষণ। কেননা ভারতে রাজনীতি থেকে কেউ অবসর গ্রহণ করেন না। যতক্ষণ না মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শ লাগছে ততক্ষণ এদেশে সকলেই দেশসেবা করে যান। ফলে, নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি হতে পারছে না। চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা বাঁধা আছে। সীমা অতিক্রম করবার পূর্বেই নোটিশ আসে, কিন্তু রাজনীতিই বর্তমানে একমাত্র পেশা বা নেশা যাই বলুন না কেন—যেখানে রিটায়ার করার আশঙ্কা নেই, ফলে, একবার একটি কেন্দ্র থেকে যদি নির্বাচিত হওয়া যায় তবে সেই কেন্দ্র মৌরসী পাট্টা হিসাবেই সেই প্রতিনিধির দখলে থাকে। তিনি হারুন বা জিতুন বা হোক না কেন—দখলে থাকবেই। ব্যতিক্রম কদাচিৎ ঘটে।

শাসক কংগ্রেস যেমন নির্বাচনে 'নয়া রক্ত' আমদানী করেছেন তেমনি সবচেয়ে বৃদ্ধ প্রার্থীকেও লড়াইয়ে সামিল করেছেন। তিনি হচ্ছেন নদীয়া জেলার প্রার্থী সুরৎ আলি। বয়স ৮৮ বছর। আর সবচেয়ে নবীনতম প্রার্থী হল এস এস পির। তিনি হলেন সমীর মণ্ডল। বিষ্ণুপুর পশ্চিম কেন্দ্র থেকে ২৪ পরগণা জেলার নির্বাচনে নেমেছেন। শ্রীমণ্ডলের প্রার্থীপদ প্রায় বানচাল হতে বসেছিল, কিন্তু শেষে তিনি প্রমাণ দিতে পেরেছেন যে তাঁর ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। যদিও ১৮ বছর বয়স হলেই ভোটার হওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ২৫ বছর না হলে প্রার্থী হওয়া যায় না। এই হচ্ছে নির্বাচনী আইন।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বলতে গেলে যাকে বলে 'প্রেস্টিজ লড়াই' সেটা হচ্ছে মাত্র একটি নির্বাচন কেন্দ্রে। এবং সেই কেন্দ্রটি হচ্ছে বরানগর। এখানেই প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ও সহকারী মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। যদি সুষ্ঠু ও পক্ষপাত-শূন্য নির্বাচন হয় তবে এখানে একটি সিদ্ধান্তের রায় ঘোষিত হবে। কেননা, শ্রীমুখার্জি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীর পদকে তাঁর ভাষায় 'ছেঁড়া জুতোর' মত পরিত্যাগ করেছিলেন। তার পেছনের কারণ কী ছিল তা তিনি সহসাই বলেছেন। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কাজেই যে আদর্শের সংঘাত সেদিন শুরু হয়েছিল তার প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে বরানগরের নির্বাচনে। তাই বরানগর এবার হবে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। অন্য কেন্দ্রের লড়াই গুরুত্বপূর্ণ নয়—একথা বলছি না। তবে তা সাধারণ রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর্যায়ে পড়ে মাত্র। শ্রীমুখার্জির কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতি শুরু হয়েছিল প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী তাঁর 'প্রফুল্লদাকে' আরামবাগে পরাজিত করে। সেবার শ্রীমুখার্জির সহযোগী সব কংগ্রেস সহ অধিকাংশ বাম-পন্থী দল। দেখা যাক বরানগরের জনতা কি করেন?

এবারকার নির্বাচনী বক্তৃতাতে একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। দল বা ফ্রন্ট যাইহোক সকলেই তাঁদের যে কার্যক্রম বা মেনিফেস্টো ভোটারদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করেছেন, তাঁদের নেতারা কিন্তু কেউ বিশদভাবে সেই কার্যক্রমের ব্যাখ্যা করছেন না। অতীতের কার্যকলাপের উপরই জোর দিচ্ছেন বেশী। কিন্তু প্রত্যেকেরই মূল সুর হচ্ছে স্থায়ী সরকার গঠন, আর শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি।

এই পটভূমিকায় নির্বাচনী দামামা বেজে উঠেছে। যুক্তফ্রন্টের শরীক হিসাবে গতবার প্রায় ২০ শতাংশ ভোট পেয়ে বাম কম্যুনিস্টরা একক বৃহত্তম দল হয়েছিল। আর কংগ্রেস প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হয়েছিল। এবারের রাজনৈতিক ভারসাম্য নির্ভর করছে অষ্টবাম, বাংলা কংগ্রেস ও আদি কংগ্রেসের উপর। কারণ অষ্টবামের প্রার্থীরা প্রধানত বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ভোটই পাবেন। আদি কংগ্রেস শাসক কংগ্রেসের অংশ নেবেন। আর বাংলা কংগ্রেস কিছু কংগ্রেস বিরোধী আর কিছু কংগ্রেস ভোটই টানবেন। অতএব, চিত্র যে কি দাঁড়াবে তা সহজে বলা যায় না।

—সমদর্শী

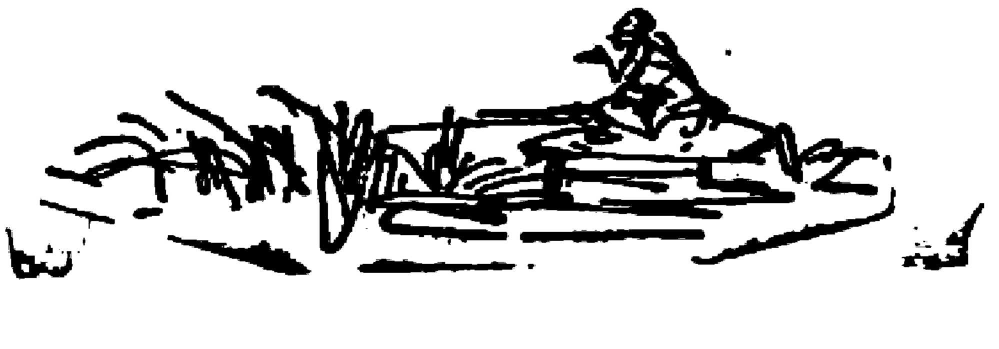

দেশে বিদেশে

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন কি পিছিয়ে যাবে? ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করার ঘটনার পর থেকেই এই প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল। সংগঠন কংগ্রেসের এবং সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যেই বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য একটি বাহানা খুঁজছিলেন, এখন পাকিস্থান-ভারত সম্পর্কের অবনতির মধ্যে তিনি সেই বাহানা পেয়ে গেলেন। এখন নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা প্রকাশ্যে মতামত দিতেও আরম্ভ করেছিলেন।

এই ঘটনা আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী ঘটনাকারীদের মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, লোকসভার নির্বাচন স্থগিত রাখা হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে অবশ্য একটি রাজ্যে নির্বাচন স্থগিত রাখা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সেটি হচ্ছে কেরল। গত ১০ ফেব্রুয়ারী থেকে ঐ রাজ্যে সওয়া তিন লাখ কর্মচারী ধর্মঘট করছেন। ধর্মঘটীদের মধ্যে রাজ্য সরকারের কর্মচারী, সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক এবং পৌর সংস্থাসমূহের কর্মী আছেন। তাঁদের দাবী, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি তাঁদের কর্মীদের জন্য যে হারে বেতন বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছেন সেই হারে তাঁদেরও বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে। রাজ্য সরকার বলছেন, সওয়া তিন লাখ কর্মচারীকে ঐ হারে বেতন দিতে হলে প্রতি বছর রাজ্য সরকারের খরচ বাড়বে নয় কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফট নিয়ে কর্মচারীদের বেতন মেটাচ্ছেন। রাজ্য সরকারের বাৎসরিক রাজস্ব আয় যেখানে ৮৫ কোটি টাকা সেখানে সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিতেই ব্যয় হচ্ছে ফি বছরে ৮৭ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন বলেছেন, রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতকরা দুই ভাগের জন্য তিনি সরকারী অর্থ ভাণ্ডারের থলি উজাড় করে দিতে পারবেন না। তিনি কর্মচারীদের আপাতত যতটুকু সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী তাতে রাজ্য সরকারের খরচ বাড়বে ফি বছরে চার কোটি টাকা। তিনি বলেন, এর বেশী টাকা দেওয়া রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজ্য সরকারের সমর্থক দলগুলি সমন্বয় কমিটিও মনে করেন যে, এই চার কোটি টাকা নিয়েই কর্মচারীদের ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলা উচিত।

অপর পক্ষে, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি এই ধর্মঘট সম্পূর্ণ সমর্থন করছে। মার্কসবাদী নেতা এ কে গোপালন বলেছেন, অচ্যুত মেনন ধর্মঘটীদের দাবী মেটাবার জন্য কেন্দ্র থেকে টাকা নিয়ে আসুন। শাসক কংগ্রেস দল যখন অচ্যুত মেনন সরকারের মিত্র তখন নয়াদিল্লী থেকে তাঁদের টাকা বের করে আনতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

কেরল সরকারের সমর্থক দলগুলি ধর্মঘটী কর্মচারীদের উপর মার্কসবাদী

পাঠভবনের বই পাঠাগারের গৌরব ও সম্পদ দুই-ই

বিনয় ঘোষ

কালপেঁচার নক্‌শা ৭·৫০। কালপেঁচার বৈঠক ৫·৫০

কালপেঁচার দু'কলম ৫·০০। নতুন শোভন সংস্করণ।

তিনখানি বই একখণ্ডে

কালপেঁচার রচনাসংগ্রহ ১৫·০০

অক্ষয় কুমার দত্ত :

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ২০·০০

সম্পূর্ণ বিবরণ-ভাগ বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, আর্টপ্লেট ও পরিশিষ্ট।
এই বিখ্যাত বইখানি বহুদিন দুষ্প্রাপ্য থাকার পর পুনর্মুদ্রিত হল।

নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য : অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫·০০

বাংলা উপন্যাসের ধারা : অধ্যাপক অচ্যুত গোস্বামী ১৫·০০

বিদ্যাসাগর সার্ধজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে

বিনয় ঘোষ : যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর (কিশোর সংস্করণ) ৪·০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আগামী ৩০ এপ্রিল সার্ধজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আমাদের প্রকাশিত বইগুলি বিশেষ কমিশনে ক্রেতাদের দেওয়া হবে :

পুস্তক বিক্রেতা (অন্যূন ৫০; টাকা বইএর জন্য)) ৩৩%। পাঠাগার, স্কুল, কলেজ ২৫%। প্রত্যেক ক্রেতা আমাদের দোকান থেকে কিনলে ২০%

পাঠভবন । ১২।১, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রভাব কাটাবার জন্য ভিতর থেকে চেষ্টা করছে। তারা সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার জন্য চাপ দিচ্ছে। কেরল সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক বাসবন পিল্লাই বলেছেন যে, এই ধর্মঘটকে রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরিণত করার জন্য মার্কসবাদীদের চেষ্টার প্রতিরোধ করা হবে এবং ঐ চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।

কিন্তু অ-মার্কসবাদী ইউনিয়নগুলি চান বা না চান, এই ধর্মঘট প্রকৃতপক্ষে একটা রাজনৈতিক সংগ্রামেই পরিণত হচ্ছে। মার্কসবাদীদের লক্ষ্য, এই ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে সরকারকে যথাসম্ভব বিব্রত করা আর সরকার-সমর্থক সি-পি-আই ও অন্যান্য দলগুলির লক্ষ্য হচ্ছে, এই ধর্মঘট ভেঙে দিয়ে সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট প্রভাব যথাসম্ভব খর্ব করা।

এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন যে কেরল রাজ্যে নির্বাচন স্থগিত রাখার সুপারিশ করলেন এটা তাঁর পক্ষে পরাজয়ের স্বীকৃতি। সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এখন ধর্মঘট মিটে গেলেও যথানির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ আগামী ৩ ও ৮ই মার্চ সেখানে ভোট নেওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। অতএব প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ মেনে নেওয়া ছাড়া রাস্তা নেই।

*

তামিলনাড়ুতে নির্বাচনের আগে ডি-এম-কে দলের সামনে দেখা দিয়েছে অন্য এক ধরনের বিপদ।

গত মাসে তামিলনাড়ুর সেলম্ শহরে একটি 'কুসংস্কার-বিরোধী সম্মেলন' হয়েছিল। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল দ্রাবিড় কাড়াগম্ দল। এই দল ডি-এম-কে দলের সমর্থক এবং ডি-এম-কে নেতারা এই দলের ৯০ বছর বয়স্ক নেতা ই ভি রামস্বামী নায়করের অনুরাগী। সম্মেলন উপলক্ষে একটি মিছিল বার করা হয়েছিল ২৪ জানুয়ারি তারিখে। সেই মিছিলে রামচন্দ্রকে জুতা মারার এবং হিন্দু দেব-দেবীদের অশোভন অশালীনতার দৃশ্য দেখান হয়েছিল। দ্রাবিড় কাড়াগম্ দলকে এই ধরনের মিছিল বার করার অনুমতি দেওয়া হল কেন তা নিয়ে সে সময়েই কিছু সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু তখন ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু সম্প্রতি নির্বাচনে নেমে ডি-এম-কে দল বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, হিন্দুদের ধর্মীয় মনোভাবে এরকম আঘাত করতে দিয়ে তারা বুদ্ধিমানের কাজ করে নি। দ্রাবিড় কাড়াগম দল সম্প্রতি মাদ্রাজ শহরে একটি প্রাচীরপত্র ছড়িয়েছে যাতে দেখান হচ্ছে নায়করমশাই তাঁর ডান হাত দিয়ে রামচন্দ্র ও গণেশ দেবতাকে জুতা মারছেন আর বাঁ হাতে ধরে আছেন একটি পুস্তিকা। এই পুস্তিকার বিষয় হচ্ছে, পরস্ত্রীতে আসক্তি বেআইনী বলে গণ্য হবে না। এটি দ্রাবিড় কাড়াগম্ দলের একটি দাবী। সেলম্ সম্মেলনে রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবে এই দাবী গৃহীত হয়েছে। কিছু দেরীতে হলেও তামিলনাড়ু সরকার এই প্রাচীরপত্র নিষিদ্ধ করে দিলেন।

কিন্তু আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল যখন করুণানিধির সরকার 'তুঘলক' নামে একটি জনপ্রিয় তামিল পাক্ষিক পত্রিকার একটি সংখ্যা নিষিদ্ধ করলেন এবং তার সবগুলি কপি বাজেয়াপ্ত করলেন। তুঘলক পত্রিকার সম্পাদক এস রামস্বামী একজন বছর তিরিশেক বয়সের যুবক। চো এই ছদ্মনামে তিনি একজন জনপ্রিয় নাট্যকার, চিত্রাভিনেতা ও মঞ্চাভিনেতা হিসাবে সুপরিচিত। পেশায় আইনজীবী এই তরুণ 'তুঘলক' পত্রিকাটি প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বছর খানেকের মধ্যে এর প্রচার সংখ্যা লাখ দেড়েকে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি এই পত্রিকার একটি সংখ্যায় সেলম্ শহরে ডি-কে দল কর্তৃক আয়োজিত মিছিলের ছবি প্রকাশ করা হয়েছিল। পুলিশ ছাপাখানা থেকে সেই সংখ্যার সমস্ত কপি, ফটোগ্রাফ ও ব্লক নিয়ে এসেছে।

সম্পাদক রামস্বামী বলেছেন যে, যে

Some Aspects of The Indian Constitution
(Second Revised Edition with an additional chapter)
Prof. D. N. Banerji

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
আবার আমি আসব ৭·০০ **বলাকার মন** ৫ম মুদ্রণ ৬·৫০

মহাশ্বেতা রায়ের **কালজাক** অপূর্ব জীবনী উপন্যাস ৫·০০
নারায়ণ সান্যালের **নাগচম্পা** নতুন উপন্যাস ৯·০০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **মন্দাক্রান্তা** শাশ্বত বাংলার রূপালিপি ৬·০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর
সতীনাথ বিচিত্রা দাম : ৮·৫০ **দিগভ্রান্ত** দাম : ৯·০০ **জাগরী** ১১শ সং ৫·৫০
প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

বনফুলের **জঙ্গম** ২য় খণ্ড ৭ম মুদ্রণ ৫·৫০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **আরোগ্য নিকেতন** ৮ম মুদ্রণ ১০·০০ **মহাশ্বেতা** ৪র্থ মুদ্রণ ৬·০০

রাণী চন্দ-র **জেনানা ফাটক** দাম : ৬·০০
গজেন্দ্রকুমার মিত্র-র **সমুদ্রের চূড়া** ৩য় মুদ্রণ ৭·০০
ধনঞ্জয় বৈরাগীর **দম্পতি** ২য় মুদ্রণ : ৫·০০

আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা ১৫·০০ ॥ বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়
কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় ৫·০০ ॥ অমল মিত্র
নানান দেশের নানান সমাজ ৪·০০ ॥ দিলীপ মালাকার
ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন ১২·০০ ॥ বিমলকৃষ্ণ সরকার
রাজপথের পাঁচালী ৭·০০ ॥ নীলকণ্ঠ

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলকাতা—১২

জোড়বাংলা মন্দির/বিষ্ণুপুর

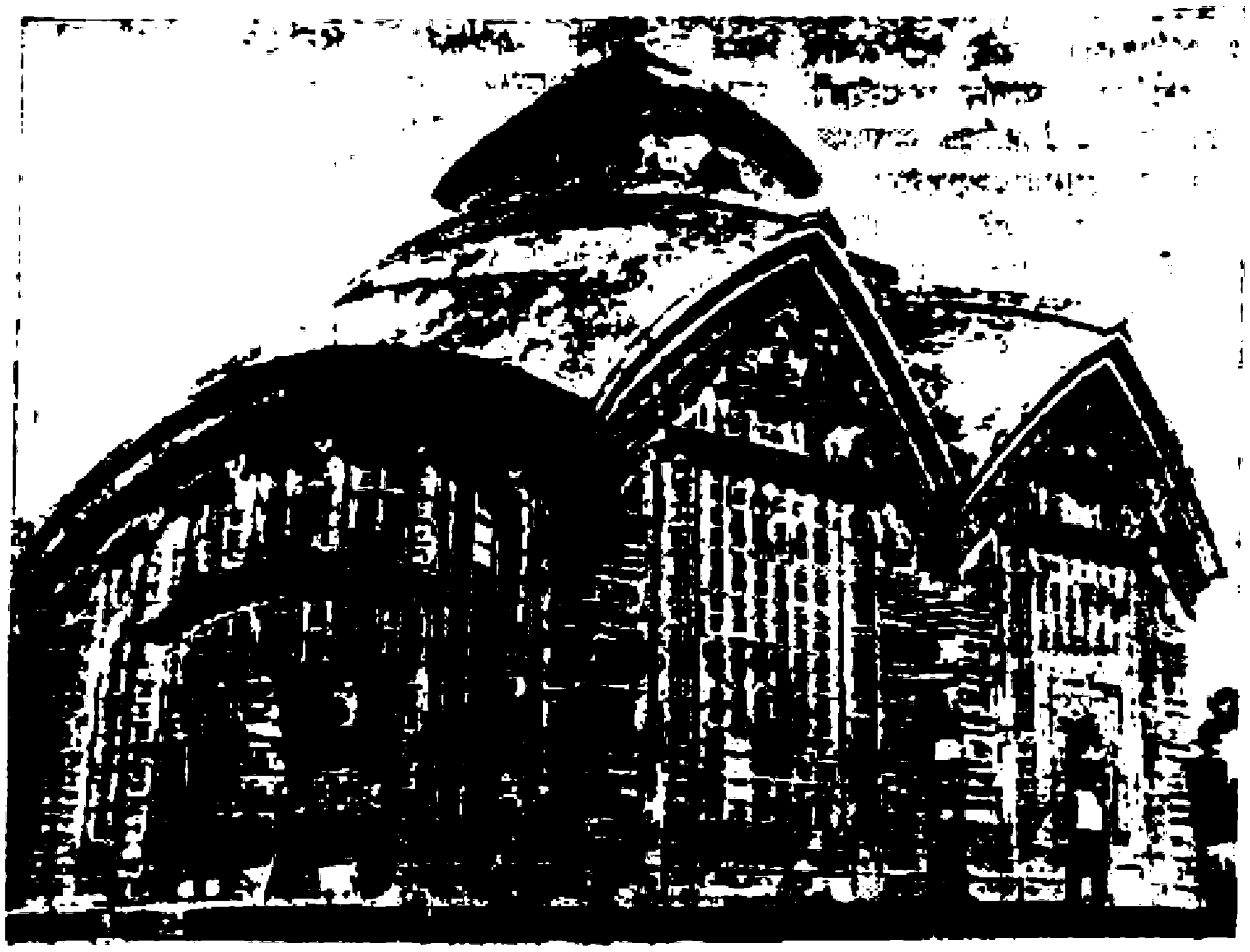

মিছিল বার করায় সময় বাধা দেওয়া হয় নি সেই মিছিলের ছবি প্রকাশে আপত্তি করাটা অন্যায়। সেলম্-এ ওরকম যা করেছিলেন তা থেকে এই সিম্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, ডি-কে দলকে মানুষের ধর্মভাবে আঘাত দেওয়ার অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এই নিয়ে হৈ-চৈ হওয়ার পর এখন পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল জানিয়েছেন যে, সেলম্ শহরের ঐ মিছিল সম্পর্কে একটি কেস দেখান হয়েছে এবং কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তসাপেক্ষে সেখানকার টাউন ইন-স্পেক্টরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

ঘটনাটির জের সহজে মিটবে বলে মনে হচ্ছে না। 'তুগলক' পত্রিকা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে রাজাজী, কামরাজ প্রভৃতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ছাত্রদের একটি মিছিল বার করে ডি-কে দলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবী জানান হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে সারা তামিলনাড়ুতে হরতাল পালনের কথা আছে। পুরীর জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য বলেছেন যে, হিন্দুদের ধর্মভাবে আঘাত দেওয়ার জন্য ডি-কে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে সারা দেশে আন্দোলন আরম্ভ করা হবে।

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন যে, এই একটি ঘটনা আগামী নির্বাচনে ডি-এম-কে দলের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে।

*

ইরানের রাজধানী তেহরান শহরে২৩টি বিদেশী তেল কোম্পানির সঙ্গে পারস্য উপসাগর এলাকার ছয়টি তেল উৎপাদনকারী দেশের যে চুক্তি হয়েছে তাতে ভারতকে বিদেশ থেকে আমদানি-করা অপরিশোধিত তেলের দরুণ বিদেশী মুদ্রার অতিরিক্ত প্রায় কুড়ি কোটি টাকা লাগবে বলে মনে হচ্ছে।

এসসো কোম্পানি ইতিমধ্যে ভারত সরকারের কাছে ব্যারেলপিছু ২৮ সেন্ট দাম বাড়াবার দাবী জানিয়েছে। এর আগে গত ডিসেম্বর মাসে এসসো কোম্পানি তাদের মারফৎ আমদানি-করা অপরিশোধিত তেলের দরুণ ব্যারেল-পিছু সাত সেন্ট দাম বাড়াবার দাবী করেছিল। সেই সাত সেন্টের সঙ্গে নুতন দাবী যুক্ত হলে অপরিশোধিত তেলের যে দাম বাড়বে তাতে সরকারকে হয় পেট্রল-জাত দ্রব্যের দাম বাড়াতে হবে অথবা ট্যাক্সের কিছু অংশ ছাড়তে হবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, তেল কোম্পানিগুলির দাবী যদি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় এবং মূল্যবৃদ্ধির সবটাই যদি ক্রেতাদের কাছ থেকে উশুল করা হয় তাহলে লিটার প্রতি দু পয়সা দাম বাড়বে।

অনুমান করা হচ্ছে যে, সরকার দাম বাড়িয়ে তেল কোম্পানিগুলির দাবী মেটাবার সিদ্ধান্তই নেবেন, তবে সিদ্ধান্তটা ঘোষণা করা হবে নির্বাচনের পর।

তেহেরানে এই চুক্তি ঐতিহাসিক বলে গণ্য করা চলে। পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলিতে এতদিন বিদেশী তেল কোম্পানিগুলি নিজেরা একতরফাভাবে তেলের দাম স্থির করে এসেছে। এইবারই সর্বপ্রথম তারা নীতিগতভাবে একথা মেনে নিতে বাধ্য হল যে, যে দেশ থেকে তারা তেল সংগ্রহ করে সে দেশ নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম স্থির করার অধিকারী। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি হুমকি দিয়েছিল, তেল কোম্পানিগুলি হয় দাম সম্পর্কে চুক্তি করুন আর তা না হলে উৎপাদনকারী আইন করে তেলের দাম বেঁধে দেবেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটি চরমপত্র দিয়ে তেল কোম্পানিগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ঐ তারিখের মধ্যে মীমাংসা না হলে তেলের জোগান বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই চরমপত্রে কাজ হয়েছে। আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলি উৎপাদনকারী দেশগুলির দাবী পুরোপুরি মেনে নিয়ে চুক্তি করেছে।

*

ইন্দোচীনে যুদ্ধ যেভাবে ছড়াচ্ছে তাতে চীনও কি শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে এখন এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা হচ্ছে দারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে।

প্রধানত যে কারণে এই উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে সেটা হল এই যে, মার্কিন সমর্থন-পুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনীর লাওসে প্রবেশের ঘটনায় চীন একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছে। পিকিং রেডিও থেকে বলা হয়েছে যে, ঘটনাটি চীনের পক্ষে 'গুরুতর বিপদের কারণ', এই বেতার ঘোষণায় একথাও বলা হয়েছে যে, এই ধরনের ঘটনা যখন ঘটছে তখন চীন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না।

লাওসের নিরপেক্ষতাবাদী প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফৌমা মনে করেন, চীনের হুমকি নিতান্ত অসার নয়। তাঁর ধারণা, এর পর তাঁর দেশে চীনা ফৌজেরও পদধূলি পড়বে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চীনের এই সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করে নি। পিকিং বেতার ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিকসনের তরফ থেকে প্রেস সেক্রেটারি আশ্বাস দিয়েছেন যে, লাওস অভিযানের দ্বারা চীনের নিরাপত্তা কোনভাবেই বিপন্ন হবে না। প্রেস সেক্রেটারি আরও বলেছেন যে, পিকিং-এর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করার জন্য তাঁর দেশ চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

এদিকে অন্যান্য কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে যাতে মনে হচ্ছে, লাওসের এই যুদ্ধ উত্তর ভিয়েতনামেও বিস্তৃত হতে পারে। প্যারিস শান্তি আলোচনায় জুয়ান টুই অভিযোগ করেছেন যে, উত্তর ভিয়েতনামে লড়াই করার জন্য মার্কিন স্থল সৈন্য ও নৌবহর সমাবেশ করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ক্রমাগত বলে যাচ্ছে যে, লাওসের যুদ্ধের সঙ্গে আমেরিকান স্থলবাহিনী জড়িত নেই, উত্তর ভিয়েতনামে আমেরিকান স্থলবাহিনীর প্রবেশের প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকসন একথা পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বিমান ব্যবহার করা সম্পর্কে তিনি একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন নিষেধবিধিই আরোপ করেন নি। দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকান সৈন্য-বাহিনীকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বিমান বাহিনীর যতটুকু ব্যবহার করা প্রয়োজন তা করা হবে।

মার্কিন সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার খাতিরে এইভাবে ইন্দোচীনের যুদ্ধকে ছড়িয়ে দেওয়ার সম্পর্কে একটি মার্কিন পত্রিকার শিরোনামা হল :—'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার জন্য আরও ভিতরে জড়িয়ে পড়া।'

১৯-২-৭১ —দৃষ্টিদীপ

সম্পাদকীয়

অন্য এক বাংলাদেশ—

বাংলার এই প্রান্তে যখন এক সংকট চলছে তখন সীমান্তের অপর পারে অন্য এক বাংলার দিকে আমরা আশা নিয়ে তাকাই। রাজনৈতিক অস্তিত্বে আমরা পৃথক হলেও সাংস্কৃতিক ও আত্মিক দিক দিয়ে আমরা এক অভিন্ন সত্তারই দুটি প্রতীক। এই সত্য পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা বার বার ঘোষণা করছেন। অমর একুশে ফেব্রুয়ারী বস্তুত বাংলা ভাষা ও বাঙালীর স্বাধিকার সংগ্রামের জ্বলন্ত দীপশিখার মতো অনির্বাণ। আমরা তাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে অপরাজিত বাঙালী সত্তাকে স্বীকৃতি দিই।

পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমান দ্বিধাহীনভাবে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলা ভাষা বা বঙ্গ সংস্কৃতির ওপর অন্যায় আক্রমণ কোনো রকমেই বরদাস্ত করা হবে না। এত বড় আশার কথা আমরা অনেকদিন শুনিনি। বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি যাঁদের অনুরাগ আছে তাঁরা মুজিবর রহমানের এই উক্তিতে নিজেদেরই সুপ্ত আশঙ্কার প্রতিবিধান শুনতে পাবেন। কিছুদিন আগে যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবোতক্ষ নদের তীরে বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদনের স্মরণোৎসব পালন করলেন ওপারের বাঙালীরা। মাইকেলের বড় সাধ ছিল বঙ্গজননীর স্মৃতিপটে সদা জাগরূক থাকার। তিনি বলেছিলেন, 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।' আমরা যখন মধুসূদনকে প্রায় ভুলতে বসেছি তখন পূর্ববাংলার নবজাগ্রত বাঙালী মুসলিম সমাজ বাংলাভাষার এই মহান লেখককে প্রীতিস্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ উৎসবে স্মরণ করলেন, এ আমাদের গৌরব। বাংলার এই প্রান্তে আমরা এতদিন যা করেছি তার মধ্যে স্মরণীয় ও বরণীয় দৃষ্টান্তের পুনর্জাগরণ চলছে পূর্ববাংলায়। আমাদের মহান পূর্বসূরী বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ, বাংলা গদ্যের পুরোধা মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন পূর্ববাংলার মনীষীরা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপকগণ বিদ্যাসাগরের জীবনী ও রচনার ওপর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে এই মহান স্রষ্টার প্রতি জানিয়েছেন অন্তরের বিনম্র শ্রদ্ধা।

শেখ মুজিবর রহমান পূর্ববাংলার অবিসম্বাদী নেতা। তিনি জাতীয় পরিষদের নেতা। পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী তিনি। বাংলাভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি রক্ষায় তাঁর এই দৃঢ়সংকল্প বাঙালীমাত্রেরই গভীর আনন্দের বিষয়। তিনি জানেন, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধর্মের নামে বারে বারে সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। পূর্ববাংলার আয়ুবশাহীর আমলে এবং এখনও প্রতিক্রিয়াশীলরা ইসলাম ও জাতীয় সংহতির নামে বাংলাভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতির বিকৃতি সাধনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের মতে বাংলাভাষা সংস্কৃতগন্ধী এবং সেহেতুই হিন্দুপ্রভাবিত। একে মুসলিম বাংলার ভাষা করতে হলে সংস্কৃত শব্দের বদলে আরবী ও ফারসী শব্দের আমদানী করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তারা একবার ঢাকা বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করে দিয়েছিল। নজরুল ইসলামের গানে ও কবিতায় হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের যে সার্থক দৃষ্টান্ত আছে তাতে আতঙ্কিত হয়ে মোল্লাতন্ত্রী শাসক ও তাদের অনুচরগণ নজরুল সাহিত্যের বিকৃতি ঘটাতে কসুর করেনি। শেখ মুজিবর জনগণের প্রতিনিধিরূপে পূর্ব পাকিস্তানের লেখক ও শিল্পীদের সভায় সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এই অপচেষ্টা বন্ধ করা হবে। আয়ুব-ইয়াহিয়ার প্রসাদপুষ্ট যে সমস্ত শিক্ষাবিদ রবীন্দ্র রচনাবলীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারীর দাবি জানিয়েছিলেন তাঁদের অসততার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না। তিনিই বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এমন আন্তরিক ও দৃপ্তকণ্ঠ অভিমত একজন ভাবী রাষ্ট্রনায়কের মুখ থেকে যখন শুনি তখন আমাদের আশা হয়, বাঙালী ও বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ বোধ হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। এপারের বাঙালী আজ নানা কারণে দিশাহারা। আমরা কোন পথে যাব তা যেন আমরা জানি না। সাহিত্যে, শিল্পে, অর্থনীতিতে পশ্চিমবাংলার অবনতি আজ গভীর দুঃখের ও হতাশার কারণ হয়েছে। এ সময়ে সীমান্তের ওপারে অন্য এক বাংলার আশা-উজ্জ্বল বাণী আমাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে। পারস্পরিক মৈত্রী ও প্রীতি বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা এই দুই দেশ বাংলাভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য যদি সচেষ্ট হই, তাহলে বোধহয় এই হতাশা ও সংকটের অন্ধকারেও আলোকিত পথের সন্ধান করা কঠিন হবে না।

CENTRAL LIBRARY

মুক্তির রৌদ্র জ্বলে দূরে, পূজা হয় ॥

কালীকৃষ্ণ গুহ

তোমার মুক্তির দিনগুলিতে খুব কাছে থাকে প্রকৃতি।

প্রকৃতি ঊষার আলোতে মেলে দেয় তোমাকে—
প্রতিটি বৃক্ষ মেলে দেয়।
তুমি খুব কথা বলো, রৌদ্র অথবা শীত যতো বাড়ে
তত্তো কথা বলো।
মুক্তির দিনগুলিতে তুমি যতো কথা বলো
সব মেঘ এবং সূর্যের দিকে
যায়, অন্ধকারে যায়।
তোমার কথাগুলি বিপুল স্তব্ধতার দিকে চলে গেলে
আমি তোমাকে
কাছে টেনে আনি—
জীবনে টেনে এনে তোমার মুখ থেকে ধুলো
এবং স্তব্ধতা মুছিয়ে দিই, বলি :
'এইখানে থাকো, এইখানে গ্লানি এবং তমিস্রার ভিতরে
কিছুদিন থাকো, অন্ধকার দিনে থাকো, মুক্ত-বন্ধ।'

তোমার উপহার লুটিয়ে পড়ে রৌদ্রে—
রৌদ্রের ভিতরে পূজার আয়োজন চলে,
রৌদ্রের ভিতরে তোমার উপহার
মিশে যেতে চায়।
আমি যখন কিছুই জানতে পারি না।
তখন তোমার মুক্তি এবং নিষ্কলঙ্ক পতন
পাশাপাশি থাকে, আচ্ছন্ন, ভীষণ একাগ্র এবং আনত

আমি কিছুই বুঝতে পারি না বলে
তোমাকে জীবনে টেনে আনি, মুখ থেকে
ধুলো এবং স্তব্ধতা মুছিয়ে দিতে চাই, বলি :
এইখানে থাকো তমিস্রায়, তোমার উপহার রৌদ্রে মিশেছে—
এখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখো মুক্তির রৌদ্র জ্বলে দূরে,
পূজা হয়, তমিস্রার থেকে খুব দূরে।

ঘর আমি কখনো ছাড়বো না ॥

বিশ্বনাথ ঘোষ

দুঃখের কড়ি দিয়ে সুখ কিনবে বলে
ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ মোহিত যুবক
অনুপম বিশ্বাসে;
যে নাকি শুনেছে এক রাখালিয়া বাঁশী
নির্জন অরণ্যে
মিহি সুরে গুণ গুণ উচ্চাশায় মহত্তর
প্রসন্ন স্বপ্নের পাখী উড্ডীন আকাশে।

মাটির গোপন গন্ধে তার উচ্চাশাকে ছুঁতে
আমি কখনো পারবো না
কেননা আমার আছে পিছুটান ঘর গেরস্থালি
উদ্ভাসিত প্রেমিক হৃদয়;
আমার নগরে তাই শোক নেই ঘৃণা নেই মহত্তর উচ্চাশার
কল্পতরুগুলি।

বিমোহন বাঁশী শুনে নিরুদ্দেশ ডেকে ঘর
আমি কখনো ছাড়বো না।

বর্তমান ॥

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

আলো নিয়েই মুশকিল।
ক্রমশ কমে আসে
দিনের শেষে,
দৃষ্টির সামনে,
এগিয়ে যেতে যেতে।

চোখের হাসপাতালের আউটডোর,
সকালের উঠন্ত রোদে পিঠ,
লাঠিতে শরীর ভর রেখে
চোখে ছানি পড়া বৃদ্ধ
আলোর আশায়।

শিকার

শক্তিপদ রাজগুরু

চাঁদ ওঠার এখনও দেরী আছে, বোধহয় রাতের শেষদিকে চাঁদ উঠবে, তার জনাই আঁধার এখন ঘন আর থমথমে। বনের মধো যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো হর্ষিত। পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে মতে, নাক তুলে বুনো জানোয়ারের মত ভিজে বাতাসের ঘ্রাণ নিচ্ছে সে—শোঁক শোঁক শব্দ ওঠে।

হর্ষিত এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখছে। রাত কতো ঠাওর করা যায় না। অন্ধকার বনের মধো জমাট বেঁধেছে। হর্ষিত বুঝতে পারে অনেকক্ষণ থেকেই শিশির পড়ছে, কারণ ঘন বনের নীচে গজিয়ে ওঠা হাঁটু-ভোর ঘাসগুলো ভিজে ভিজে ঠিকছে, গাছের পাতায় পাতায় শিশির জমে জলকণা হয়ে টুপটাপ শব্দে ঝরছে। গাছের নীচে দিয়ে বনের মধা দিয়ে চলার উপায় নেই, তাছাও বনে বনে ঘুরে বুনো হয়ে গেছে, তাই চলতে পারে চাঁছড় লতার ঘন আলিপানে জড়ানো গাছগুলোর নীচে দিয়ে। আকাশ-ছোঁয়া সোজা শালগাছগুলো ওই চাঁছড় আর লতাপলাশগুলো কতো দিন জড়িয়ে আছে কে জানে?

ওই লতাগুলোর স্বভাব যেন তরুণের মতই। ওরা এমনিভাবে পুরুষকে জড়িয়ে থাকতে ভালোবাসে। তাও একজন পুরুষকে নয়—বহুজনকে। একজনে ওদের মন ভরে না। লোভী স্বভাবের জাত।

তরুণের কথা মনে পড়তে হর্ষিতের চোয়ালটা কঠিন হয়ে ওঠে, মুখের রেখা-গুলো কুঁচকে ওঠে। দাঁত দিয়ে যেন কি কঠিন রাগে নিজের ঠোঁটই টিপে ধরবে, রক্তাক্ত করে তুলবে। তখনই যেন তাকে

পাগল করে তুলবে। তরুণার নিটোল দেহে স্বাস্থ্য আর যৌবন যেন পাকাপাকিভাবে বাসা বেঁধেছে।

ওই দেহটা দিয়েই সে হর্ষবিতের মত কঠিন একটা মরদকে প্রলুব্ধ করে তুলেছিল। আর ডাগর কালো দুটো চোখ হর্ষবিতের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। তরুণা তার চোখের চাহনি, দেহের ঢেউকাঁপা মাতন দিয়ে তাকে বশ করে তুলেছিল। শিকারী হর্ষবিতকে সেই-ই শিকারে পরিণত করেছিল। তার মনে আগুন জ্বেলেছিল। আর এই দুঃসহ জ্বালায় সেদিনের হর্ষবিত জ্বলে উঠেছিল।

সেই দিনগুলোর কথা ভোলেনি হর্ষবিত। এখনও এমনি বনের গহনে কি অন্ধকারে মনে পড়ে। যৌবনের ভুলটা তাকে এমনি বিভ্রান্ত করে তুলবে ভাবেনি।

সেদিনকার হর্ষবিত আজ আমূল বদলে গেছে। আজ সে বিচিত্র একটা জীব। কিন্তু তখন হর্ষবিতের নিটোল বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে থাকতে হতো। পাথর-কোঁদা চেহারা বোলানীর কাছে কোন লোহা পাথরের খনিতে কাজ করতো। হপ্তায় ছিল বাঁধা মাইনে—ব্যারাকের এক পাশে তার ছোট ঘর-খানায় সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা জমতো। মাদল বাঁশীর সুর উঠতো বনে বনে।

তখনও সেই খাদান আর ব্যারাকের আশপাশে ছিল ঘন বন—পাহাড়গুলো ছিল বনে ঢাকা, সেই গহন বন-পাহাড়ে ওরা যেন জোর করে দখল পাততে চেয়েছিল, পাহাড় ফাটিয়ে আকরণ ওরা তুলতো। রাতের অন্ধকারে ঘন বন পাহাড়ের দিক থেকে আসতো বুনো হাতির দল—বাঘ, না হয় ভালুকের দল।

ওরা ক্যানাস্তারা পিটিয়ে আগুন জেলে হাতির পাল তাড়াতো, বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হতো পদে পদে। কখনও বাঘও বন থেকে বের হয়ে এসে খাদানের কুলিদের চোট করতো; ভালুকের হাতেও পড়তো অনেকে। আদিম আরণ্যক পরিবেশে ওরা আকরণ ওর তুলে সাইজ মত ভেঙে লোহা-কারখানায় চালান দিতো। পাথর তো নয়—যেন লোহাই। সেই পাথর গালিয়ে লোহা বের করা হোত বার্ণপুর-টাটানগর লোহা-কারখানায়। তখন লোহা-কারখানার এত ছড়াছড়ি হয়নি—দুর্গাপুর হতে তখন তাদের কাজ বেড়ে গেল।

তখন সেই আদিম অরণ্যে এই পরিবেশে একটা বাঘ খুব উৎপাত শুরু করেছিল। দু-চারজন লোককেও মেরেছে। লোকজন ভয়ে সন্ত্রস্ত। হঠাৎ সেই বাঘটাই সেদিন [illegible] পড়ল হর্ষবিতের সামনে। বিরাট সেই বাঘটা তীব্র গতিবেগে এসে পড়েছিল ওর উপরই, বাঘটার ধারালো থাবার আঁচড়ে হর্ষবিতের গাল আর পিঠের খানিকটা মাংস তুলে নিয়েছিল—তবু হর্ষবিত বল্লমটা ছাড়েনি। বল্লমটা দিয়ে বাঘটার কলিজা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল নিজে জখম হয়েও। বাঘটা সেই যে পড়েছিল আর ওঠেনি।

ম্যানেজার ম্যাকফারসন সাহেবও খুব খুশি হন, লোকজন জুটে গেছে; বাঘটাকে বাঁশে বেঁধে তুলে আনা হল। হর্ষবিত সেরে উঠলে ম্যানেজার সাহেব ঘটা করে তাকে একশো টাকা বকশিস দিয়েছিলেন। তাছাড়া সাহেব নিজেও বড় শিকারী ছিলেন, তিনিই নিজে লাইসেন্স করিয়ে হর্ষবিতকে ওই বন্দুকটা দিয়েছিলেন। রাতারাতি ওই মাইনস্ কলোনীতে হর্ষবিতের নামডাক ছড়িয়ে পড়েছিল।

খোদ ম্যানেজার ওই ম্যাকফারসন সাহেবের সঙ্গে হর্ষবিত কিরিবুরু পাহাড় টপকে গাড়িতে করে এই বনে-পর্বতে কত দিন-রাত ঘুরেছে। বাইসন-বাঘ-সম্বর মেরেছে। সাহেবের সঙ্গে কতো রাত্রি গহনে এই আদিম অরণ্যপর্বতের বিচিত্র জীবনকে দেখেছে। এই বনের সব পথই তার চেনা, জানা।

থমকে দাঁড়ালো হর্ষবিত। ঠান্ডায় কন-কনিয়ে ওঠে হাত-পা। বাইরের জগৎ এই ক'বছরে অনেক বদলেছে। কিরিবুরু পাহাড়ের ঘন বনের সব চিহ্ন মুছে ফেলে আজ সেখানে বসেছে কনভেয়ার বেল্ট, রাতের আদিম অন্ধকার—জন্তু-জানোয়ারের চিহ্ন আজ সেখানে নেই। মানুষগুলোও বদলে গেছে। সেখানে এসেছে নোতুন কতো মানুষ, তারা বাঘের চেয়েও হিংস্র। বনপর্বতের রূপ বদলে গিয়েছে। বিজলী আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে চারিদিক।

বদলায়নি শুধু এদিকের এই বনরাজ্য, সে তেমনি আদিম, তেমনি অন্ধকার-ঢাকা আর রহস্যময় রয়ে গেছে। এখানে এলে হর্ষবিত হারানো যৌবনের প্রচণ্ড মাদকতা-ময় দিনগুলোকে ফিরে পায়। অনেক ভালো লাগে। তাই না এসে পারে না।

এখন বনে ঢোকার অনেক বাধা। বন-বিভাগের লোকেরা তার খবর জানে। সে লুকিয়ে শিকার করে—হরিণ, সম্বর, খর-গোস, ময়ূর। মাঝে মাঝে বাঘও মেরে ফেলে তাক বুঝে। কতীন, ওই বুনো লোকটা সঙ্গে থাকে। বিশাল ওর দেহ, রোমশ ভালুকের মত। আর তেমনি শক্তি ওর গায়ে। দু-চার মণ মাংস বাঁকে বেঁধে লুকিয়ে ও পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে হাটের চোরা ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছবে। চড়া দামে এসব মাংস অন্ধকারেই বিক্রি হয়ে যায়। শিং-চামড়ার দামও বেশ তেজী।

কিন্তু ধরা পড়লেই বিপদ। বন্দুক তো যাবেই, জেলে গিয়ে পচতে হবে। আর জানে হর্ষবিত, তাকে ধরবার জন্য বন-বিভাগ ওৎ পেতে আছে, তবু হর্ষবিতকে তারা ধরতে পারেনি আজ অবধি। ও সোজা পথে কোনদিনই ঢোকে না বনে। দুর্গম পাহাড়-বন আর নদীর খাত ধরে বনে ঢোকে, সে-পথে বনবাবুরা কোনদিন যেতে ভরসা করবে না। এ রাতের বন হর্ষবিতের কাছে কি নেশা আনে। সব ভয়-ভাবনা থেকে মুক্তি পায় সে এখানে এসে। ওই তরুণার ভাবনাটাও ভুলতে চায় সে। মেয়েটাই তার সব দুর্ভাগ্যের মূল। ও তাকে ঠকিয়ে চলেছে।

ঠকছে হর্ষবিত। রাগ হয়, দুঃসহ রাগ। মনে হয় একদিন এই বেইমানীর জবাব দেবে। হর্ষবিতের বুনো মন টগবগিয়ে ওঠে।

—গুরু!...ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে যতে। অন্ধকারে ওর দুচোখ জ্বলছে। নাক তুলে ভিজে বাতাসে সে শুঁকছে—শোঁক শোঁক শব্দে। হর্ষবিতের অভ্যস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে ওঠে। এ-শব্দ সে চেনে। যতে ভয় পেয়েছে। শব্দটা এগিয়ে আসছে। হর্ষবিত মুখে আঙুল পুরে আঙুলটা লালা দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বাতাসে তুলে ধরলো। নিশ্চিন্ত হয়, বাতাস বইছে অন্য দিক থেকে। গাছপালা ভাঙার মড় মড় শব্দ ওঠে। হাতির দল এগিয়ে আসছে। পাহাড় থেকে নেমে ওরা বোধহয় নীচের ঝর্ণার দিকে যাবে। ওদের পথ থেকে সরে গিয়ে ওরা দুজনে একটা পুরোনো শাল গাছে উঠে গেল তরতরিয়ে। বরাত খারাপ, নইলে হরিণের পাল না এসে এল কিনা হাতির পাল! বাঃ শালা।

গাছের উপরই বসে আছে দুজনে। অন্ধকারের বুকে কোথায় দূর আকাশ থেকে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘন বনের মাঝে এখান ওখানে। বনের প্রহরা এড়িয়ে চুরি করে এই আলোটুকু যেন এসে ঢুকেছে।

হর্ষবিত বসে আছে। মন-মেজাজ ভালো নেই। ওই মেয়েটার কথাই বার বার মনে পড়ে। এককালে তরুণাই তার জন্য পাগল হয়েছিল, এখন দিন বদলে গেছে। সে নিজে পাগল হয়েছে ওই মেয়েটার জন্য। সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

ম্যাকফারসন সাহেবের খাস পেয়ারের লোক সে। খাদানে তখন তার নামডাক। কাজকর্ম তার না করলেও চলে। হর্ষবিতের আঁধারে অরণ্য-পর্বতের আদিম রূপকে সে দেখেছে। দেখেছে বুনো-বাইসনদের দলের প্রাধান্য নিয়ে যুদ্ধ। হাতিদের মধ্যেও কুনকীর সঙ্গ পাবার জন্য দাঁতাল হাতি-গুলোর লড়াই দেখেছে। দেখেছে রাতের অন্ধকারে বনে বনে হরিণীদের ডাগর কালো চোখের চাহনি, কোন হরিণের সঙ্গ খুঁজে ফেরে তারা। কি যেন খুঁজছে বনে বনে। আর সেই ডাকগুলোকেও চেনে সে। হিংস্র বাঘিনীও বনে বনে খুঁজে ফেরে কোন তরুণ সতেজ তার সঙ্গীকে। এ-ডাকও আলাদা। বনে-পাহাড়ে সেই ডাক শুনেছে, বনের মানুষ হর্ষবিত। কি যেন পাবার জন্য ওরা সবাই মেতে উঠেছে।

হঠাৎ এমনি দিনে চমকে উঠেছিল হর্ষবিত তরুণাকে দেখে। এতদিন দেখছে মেয়েটাকে, তাদের ব্যারাকের বিস্টু হুন্ডুং-এর মেয়ে তরুণা। অনেকদিন থেকেই দেখেছে মেয়েটাকে। ছোট ছিল। মেয়েটা এখন ডাগর ডাঁটো শুরু হয়ে খাদানে কাজ করছে। হর্ষবিত সেদিন কাজে গেছে। তার সব সময় খাদানে থাকতে হয় না। ম্যানেজারের লোক, তবু ওই খাদানটা একেবারে বনের মধ্যে,

মাঝে মাঝে জন্তু-জানোয়ার হানা দেয়, তাই যেতে হয় তাকে।

দুপুরে তারা সেদিন খাদানের নীচে বনের গভীরে একটা ঝোরার ধারে বসে ভাত খাওয়া সেরে চুটি ধরিয়েছে হরবিলাস। গভীর বন, গাছে গাছে চীহড় লতার জড়াজড়ি, দুটো পাহাড়ের বুক চিরে ঝর্ণাটা নেমেছে। ওর কলকল শব্দ কানে আসে। হাওয়া বয় শনশনিয়ে—হঠাৎ কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইল হরবিলাস। তরুণ এগিয়ে আসছে খাড়া পাহাড় বেয়ে তরতরিয়ে। গতিবেগে ওর নিটোল দেহ কাঁপছে, উথল-পাথাল মাতন জাগে ওর উঁচু বুকের রেখায়। দু' চোখের চাহনিও বিচিত্র। মেয়েটা ওর সামনে এসে দাঁড়াল। ওর দিকে চেয়ে থাকে হরবিলাস। কেমন বুক কাঁপে। রাতের অন্ধকারে সে দেখেছে আদিম হিংস্রতায় ভরা বাঘিনীর চোখ, গুন্ডা হাতির লাল চোখের চাহনি তার গুলীতে ফুরিয়ে গেছে, 'বুনো-বাইসনের' বিরাট কালো দেহটা এগিয়ে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত, পাথরে আগুনের ফিনকি উঠছে তার ক্ষুরের আঘাতে। সেই রুদ্র ধ্বংসকেও সে স্তব্ধ করে দিয়েছে গুলীর আঘাতে। কিন্তু ওর সব সাহস যেন এখানে ওই মেয়েটার চাহনির সামনে ফুরিয়ে গেছে। হাসছে তরুণ—কি দেখছো মরদ! মেয়েছেলা কখনও দেখোনি? এ্যাঁ! হাওয়ায় শনশন্ শব্দ ওঠে। তরুণ ওকে জড়িয়ে ধরেছে। এ যেন বিচিত্র একটা জানোয়ার, ওর দুচোখে কি নেশা। মেয়েটা ওর নরম নিটোল দেহের উষ্ণতা দিয়ে ওকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে, তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। সারা শরীরের রক্ত-কণিকায় দুর্বার সাড়া, ওর সব চেতনা কি প্রচন্ড উত্তাপে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গলে পড়বে! অসহ্য যন্ত্রণা—সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে হরবিলাস। তরুণের নীরব ডাকে সে কোথায় হারিয়ে গেছে, মুক্তি পেতে চায় ওর রহস্যময় অজানা মনের গহনে, অসহ্য তৃপ্তির আবেগে হরবিলাস হারিয়ে গেছে ওই অরণ্য আদিম পরিবেশে।

তরুণ তার মনে বিচিত্র একটা জগতের সাড়া এনেছিল, সন্ধান দিয়েছিল অন্য এক জীবনের। হরবিলাস বাঁধা পড়েছিল। বে-পরোয়া বন্য সেই মানুষটা ঘর বেঁধেছিল তরুণকে নিয়ে।

—শুয়ার! ব্যাটা চলে গেছে। বড়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে।

রাতের অন্ধকারে চাঁদের আলোয় এক-আধটু ছোঁয়ায় রহস্যময় হয়ে উঠেছে। শন্-শন্ হাওয়া বয়। পাহাড়ের কোলে কোথায় পাথরে পাথরে গুম্ গুম্ শব্দ ওঠে। বাইসনের দল নামছে জলের সন্ধানে। ওরা থামলো। নামতে পারল না এখন। গজ-গজিয়ে ওঠে বড়ে—যাঃ শালা। বরাতই মন্দ আজ। শিকারের পথের উপর বসেও কিছু হল না। হাতি-বাইসনের দল চলেছে। তখন ম্যাকফারসন সাহেব থাকতো বাইসন-সম্বর কতো মেরেছে এই ঝর্ণার ধারে, নুনমাটির পাহাড়ের কোলে। আজ সেখানে চোরের মত বসে আছে হরবিলাস। ম্যাকফারসন সাহেবও নেই, সেই দিনগুলোও বদলে গেছে।

হরবিলাসের মান খাতির শেষ হয়ে গেছে সাহেব চলে যাবার পর থেকেই। এতদিন কাজও করতো না। বসে মাইনে পেতো। তাই রাগটা অনেকেরই ছিল তার উপর। এখন তাকে কাজ করতে হয় খাদানে। শক্ত লোহা-পাথর তোলার কাজ। কুলিই রয়ে গেছে সে, মেট সর্দার কিছুই হতে পারেনি। তারই পর চাকরীতে ঢুকে মাকান হয়ে গেল সর্দার। এখন প্যান্ট পরে হলদে লোহার হেলমেট মাথায় নিয়ে খবরদারি তার উপরও। হরবিলাসকে সে দেখতে পারে না, তাই বোধ হয় সাহেবদের বলে কয়ে বদমাইসী করে তাকে রাতপাহারা দিয়েছে খাদানে।

হরবিলাস আবেদন-নিবেদন করতে পারেনি। মাথা সোজা মানুষ সে, তবু দু-একবার কর্তাদের বলেছিল—কিন্তু দেখেছে তাঁরাও আজ হরবিলাসকে যেন চেনেন না। অথচ ওই দত্তসাহেবের জন্য ম্যাকফারসনকে হরবিলাস কত করে বলেছিল, দত্তসাহেবের চাকরী পাকা হয়েছিল হরবিলাসের তদবিরে। আজ তাঁরা তাকে চেনেন না। বেইমানের দল। হরবিলাসের চাকরীর উপর—সবকিছুর উপর ঘেন্না ধরে গেছে। শহরের দুনিয়া। সব ব্যাটা বেইমান। ঘরে-বাইরে দেখেছে সেই বেইমানী।

তরুণও বদলে গেছে। হাড়-বজ্জাত মেয়েছেলেটাকে ক্রমশ চিনেছিল হরবিলাস।

কোথায় যেন বন্য কিছুর সন্ধান পেয়েছিল সে। হরবিলাসের সন্ধানী চোখে ফুটে উঠেছিল তরুণের এই নষ্টামি। বাড়ন্ত চীহড় লতার মত এক গাছের পরিক্রমা সেরে সে চলেছে অন্য গাছের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতে। তরুণের চাই নোতুন শাড়ি-গয়না। বাবুদের মেয়েদের মত গায়ে সেঁটে লেগে থাকা জামা। সন্ধ্যার পর মদ খেয়ে গোলাপী নেশায় মশগুল হয়ে দুষ্কুত বাঘিনীর মত ঘেরে সে কলোনীর এদিক-ওদিকে। রাতের অন্ধকারে মেতে ওঠে যেন কোন বাঘিনী। হরিণের কালো ডাগর চাহনি আর নেই ওর চোখে—যেন রক্ত-লোভী কোন জানোয়ারে পরিণত হয় তরুণ।

তাই নিয়েই খিটিমিটি বাধে হরবিলাসের সঙ্গে।

মাকান সর্দারের উপর রাগের কারণও এই। জানে হরবিলাস মাকান সর্দার এখানে আসে। তাকে রাতপাহারায় বের করে দিয়ে ওরা এখানে আসর জমায়। তরুণ তাই ওই শাড়ি-জামার কথা বলতে হরবিলাস গর্জে ওঠে।

—ভারি মরদ তুই' ইস্তার রোজকারে দিনদিন চলে না।

—নবাবী করলে চলে? এতো বাহার তোর কিসের? হরবিলাস জেরা করে।

ফোঁস করে ওঠে তরুণ—বাহারের কি দেখেছিস? কুলি তুই, তোর মাগের আবার বাহার!

তরুণ এমনভাবে কথাগুলো বললো—তাতে মনে হয় হরবিলাসকে সে মানুষ বলেই ভাবে না। হরবিলাস কথাটা আজ পরিস্কার করেই জানতে চায়। অনেক দেখেছে, সহ্য করেছে। আজ দুঃসহ রাগে অপমানে জ্বলে ওঠে হরবিলাস, বলে—

—যা না, মাকনার কাছে। দেখি ধুব তো ভেলটাল। মাকনা-হরগোবিন্দ-কুমুদ-বাহাদুর—অনেকেই আসে শুনেছি।

তরুণ ওর মুখে কথাগুলো শুনে চমকে ওঠে। ওর সব পাপের কাহিনীই তার জানা হয়ে গেছে দেখে মেয়েটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। মাকান সর্দারের উপর হরবিলাসের রাগের কারণটা জানে তরুণ।

তবু ওর মত বেপরোয়া মেয়ের দু'-চোখ জ্বলে ওঠে আদিম হিংসা আর প্রতি-বাদের জ্বালায়।

হরবিলাস দেখছে তরুণকে। দেখে ওর দুচোখের সেই সুপ্ত জ্বালাটাকেও।

চমকে উঠেছে হরবিলাস। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাঘিনী। কি দুর্বার হিংসা আর বিভীষিকা নিয়ে যেন প্রচণ্ড বেগে ওর উপর লাফ দিয়ে পড়বে, হরবিলাসের মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে ওঠে। ওর মাথায় তাজা রক্ত গরম হয়ে ওঠে; ও জানে এই বাঘিনীকে শেষ করে দিতে পারে সে। শেষ করে দিতে পারে আরও দু-একজনকে। কিন্তু থেমে গেল।

চাকরী! ওই আশ্রয়—ঘর—ভালবাসা বৌ! সবকিছু আজ তার মনকে নিদারুণ গ্লানি আর তীব্র জ্বালায় ভরিয়ে দিয়েছে। বিষিয়ে উঠেছে তার মন, অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে ঘরবসত করেছিল সে, বিশ্বাস করেছিল মেয়েটাকে। এককালে ওর দুচোখে ছিল হরিণীর চাহনি, তেমনি মন-মাতানো আর নেশা লাগানো। কিন্তু আজ সে পরিণত হয়েছে বাঘিনীতে। ওই হরিণের

চোখ শুধু ছলনায় ভরা, সবই শরতানির ছল।

কোথায় দূরে যেন একটা শব্দ উঠছে। স্তব্ধ বন, একটা রাতজাগা পাখী একবার ডেকে থেমে গেল। কুয়াশার চাদর-জড়ানো ঘোমটা ঢাকা বনভূমির বুকে কোথায় যেন শব্দ উঠছে। ক্ষীণ একটা শব্দ, পরক্ষণেই শব্দটা আর শোনা যায় না। সচকিত হর্ষবিত নিশ্চিন্ত হয়। না। তেমন কিছু নয়। ও ভুলই শুনেছিল।

রাত ঘন হয়ে আসছে। ওরা গাছ থেকে নামছে। এখনও দেখবে তারা বসে বসে।

হঠাৎ খস্‌খসানির শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে হর্ষবিত। চোখ মেলে নীচের জমাট বনের দিকে চাইল সন্ধানী দৃষ্টিতে। চীহড় লতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সাদা নুন-মাটির খাদ আর সামান্য জমে-থাকা জলা জায়গার ধারে দুটো হরিণ এসে নুনমাটি চাটছে। আর মাঝে মাঝে ডাগর কালো দু-চোখ মেলে চাইছে হরিণদুটো এদিক-ওদিকে।

চমকে ওঠে হর্ষবিত। ঠাণ্ডায় হাতে বন্দুকটা যেন জমে আসছিল। শান্ত থমথমে বন, পাতায় পাতায় শিশির ঝরার শব্দ ওঠে, আর হাওয়ায় ঝরে পড়ে শুকনো ঝরা পাতা। এককালি চাঁদের আলোয় হরিণ-দুটোর দিকে চেয়ে থাকে হর্ষবিত। ওর দু'চোখ জ্বলছে। মদ্দাটা মাদী হরিণটার তুলনায় ছোটই। মাদীটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর বড়। মাঝে মাঝে সাবধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখছে।

হর্ষবিতের ওই চাহনি চেনা। তার মনের রাগটা জ্বলে ওঠে ওই চাহনিতে, যেন তরুণের যৌবনের চোখের মতই। তাতে ফুটে উঠেছে নীরব ঘৃণা। হরিণটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে। ওরা জানে মানুষের এই স্বরূপটা। বাতাসে ভেসে আসে কিসের গন্ধ। চোখাচোখি হতেই হর্ষবিত কি আক্রোশ আর অদম্য রাগের বশেই ওকে শেষ করে দেবার জন্য গুলী করেছে।

অত্যন্ত শিকারী হর্ষবিত, তবু রাগ আর উত্তেজনার জন্য একটু ভুলই করেছে। গুলীটা হরিণটার কাঁধের কাছে লেগেছে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে সুন্দর যৌবনবতী মাদী হরিণটা, অন্য মদ্দাটা সেই মুহূর্তেই চকিতে হলুদ বিন্দুর মত লাফ দিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে যায়।

আহত হরিণটা ওঠবার জন্য চেষ্টা করছে। যন্ত্রণায় বিকৃত ওর চাহনি, গলা দিয়ে বিকৃত যন্ত্রণাকাতর শব্দ বের হয়। হর্ষবিত আর একটা গুলীতেই ওকে শেষ করে দিতে পারে, তা দেবে না। বন-পাহাড়ে গুলীর শব্দ অনেক দূর অবধি যাবে, কে জানে একটু আগে কি একটা বিজাতীয় শব্দ শুনেছিল হর্ষবিত। বন-বিভাগের লোকজনই কিনা কে জানে। গুলী আর করবে না সে। পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে ওই ছলনাময়ীর মত চাহনিওয়ালা হরিণটাকে মারবে, তারপর ধারাল ছ্যাকট দিয়ে ওর মাংসা-হাড়-শিরা সব টুকরো টুকরো করে কাটবে। ছটফট করছে আহত হরিণটা। পাতা-লতায় ঝটা-পটির শব্দ ওঠে।

ওরা গাছ থেকে নামতে যাবে, হঠাৎ অস্ফুট একটা গর্জন শুনে চমকে ওঠে। স্তব্ধ বন কেঁপে ওঠে চাপা সেই গর্জনে। বন্দুকও লোড করা নেই। ওরা দুজনে থামলো। বনের অন্ধকার ফুঁড়ে এসে হাজির হয়েছে রক্তের গন্ধ পেয়ে বিরাট বাঘটা, পিঙ্গল দু'চোখ জ্বলছে। সারা গা-ভর্তি জোনাকীপুঞ্জ আগুনের একটা চলন্ত শোভাযাত্রা এসে থামল আহত হরিণটার কাছে। তখনই সেটাকে মুখে করে এক ঝটকায় ঘাড়ে তুলে লাফ দিয়ে বনের গভীরে হারিয়ে গেল। শিশির ভিজে মাটি আর লতাপাতায় লেগে রইল আহত হরিণটার রক্ত আর ওর বলিষ্ঠ পায়ের ছোপ। বাতাসে থেকে গেল ওর দেহের গন্ধ। টিহিটা নিজেদের মধ্যে অতল স্তব্ধতায় ডুবে গেছে।

থ হয়ে গেছে হর্ষবিত। আজ যেন হেরে গেছে সবদিক থেকেই। বার বার হেরে চলেছে সে। ভাগ্যকেও যেন এমনিভাবে হারাতে বসেছে। মনে হয় হরিণটা যেন তরুণাই। অমনি কালো চোখ—নধর রূপ-বতী দেহ। তাকে জয় করেছিল হর্ষবিত তার পৌরুষ দিয়ে। যৌবন দিয়ে—শক্তি দিয়ে। কিন্তু তার চেয়েও কোন শক্তিমান জীব হর্ষবিতের সেই অধিকার জোর করে কেড়ে নিতে চায়, যেভাবে বাঘটা তার শিকার তুলে নিয়ে গেল ঠিক সেইভাবেই।

আজ সে হেরে গেছে। দুঁদে শিকারী হর্ষবিত আজ কমজোরী হয়ে গেছে। যে-হাতে শুধু বল্লম নিয়ে মানুষখেকো বাঘ মেরে-ছিল—আজ বন্দুক নিয়েও এই বাঘটাকে সে মারতে পারেনি। তার সামনে থেকে মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

নীরব রাগে ফুঁসছে হর্ষবিত। একটু সময় পেলে আজও সে বাঘটাকে ফিরতে দিতো না। শিকার করার সাধ বাঘটার জন্মের মত ঘুচিয়ে দিতো হর্ষবিত। কিন্তু পারেনি।

যতে বলে—চলো গুরু, নদাবুরুর বনে যদি কিছু হয়। খালি হাতে ফিরে যাবো?

খালি হাতে বন থেকে ফেরা হর্ষবিতের কুষ্টিতে লেখা নেই। এটা তার মত শিকারীর পক্ষে চরম অপমানের। এযাবৎ কোনদিনই তা হয়নি। তাই হর্ষবিত বলে—চল্!

দুজনে বনের সুঁড়ি পথ দিয়ে নিচের ঘন বনের দিকে চলেছে। চোরা পথগুলো তাদের চেনা। পিছল পথ—জল বয়ে চলেছে ঝিরঝির করে। এখানে শালগাছ কেটে সেগুন-এর চাষ করা হয়েছে। বুকভোর ঘাসগুলো শিশিরে জ্যাবজ্যাবে হয়ে আছে। হঠাৎ ওই শব্দে ওরা দুজনে থমকে দাঁড়ালো। চমকে ওঠে হর্ষবিত। ওই গুরু-গুরু শব্দটা সে আগেও শুনেছিল। পাহাড়ের আড়ালে ঘুরে যেতে আর শব্দ পায় না। এখন বুঝতে পারে জিপই। আর জিপটা এইদিকেই আসছে তাদের গুলীর শব্দ শুনে।

উজ্জ্বল চোখ-ঝলসানো তীব্র এক ঝলক আলো গাছ-গাছালির মাথা ছিটকে আসে এই দিকে। স্পট লাইট জ্বেলে রাতের অন্ধকারে বনে বের হয়েছে। যতে বলে—বন-বাবুদের জিপ নাকি গ?

হর্ষবিত ইশারায় ওকে চুপ করতে বলে ঘন ঘাসবনের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঢোলা ঢোলা সেগুনপাতার আড়ালে বুকটান করে শুয়ে পড়ল ভিজে ঘাসের উপরই। ঘন বন—দুটি বন্যপ্রাণী যেন শিকারীর সন্ধানী দৃষ্টি থেকে গা বাঁচাবার জন্য পড়ে আছে সংগোপনে।

হর্ষবিত জেনেছে ওরা তাদেরই সন্ধানে ঘুরছে। ধরা পড়লে আজ আর বাঁচোয়া থাকবে না। কোনদিন এমনি অবস্থায় পড়েনি সে। এমনি বুকে হেঁটে প্রাণভয়ে বনে কোনদিন ঘোরেনি। আজ সেই চরম অপমানও ঘটে গেল। জিপটা ওপাশের সরু রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিকে সন্ধানী স্পট লাইটের আলো ফেলে খুঁজছে তাদের। জমাট অন্ধকারে তীব্র আলোর রেখা ছুরির ফলার মত ঝকঝকিয়ে ওঠে। শিকারীর দল যেন শিকারের সন্ধান করছে—আর ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ওরা বন্য প্রাণীর মত ঘাসবনের গভীরে পড়ে আছে।

হর্ষবিতের মনে হয় তার সব দাবী—অধিকার এমনকি মর্যাদাটুকু অবধি ওরা কেড়ে নিয়েছে। সবকিছু হারিয়ে গেছে আজ। নিষ্ফল রাগে আর আক্রোশে! হর্ষবিতের চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে। কতক্ষণ এভাবে পড়েছিল জানে না। জিপটা ব্যর্থ হয়ে বোধহয় অন্যদিকে চলে গেছে তাদের সন্ধানে। উঠে বসল হর্ষবিত। জামা কাপড় ভিজে গেছে। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। অপমানিত, বঞ্চিত, ক্রুদ্ধ হর্ষবিত বলে—বাড়ি চল যতে!

যতে অবাক হয়—কোনদিনই খালি হাতে ফেরেনি, আজ পেথম—

হর্ষবিত যে হেরে গেছে একথাটা যেন ওই বুনো যতেও শুনতে চায়।

হর্ষবিত তার অভিযোগ কাটানোর জন্য বলে।

—শালারা বন পাহাড় আজ ঘেঁটে দিয়েছে। কিছু হবে না।

যতেও সায় দেয়—বর্ডনিই খারাপ হয়ে গেল, নাকে মুখের ছাম্‌ থেকে গেয়াস চলে গেল?

হর্ষবিতের অক্ষমতার কথা ওই যতেও যেন বার বার তার কাছে জানিয়ে দিতে চায়। দুঁদে শিকারী হর্ষবিত আজ হেরে গেছে। চটে ওঠে হর্ষবিত ওই কথাটা ভাবতে, তাই ধমকে ওঠে সে—থাম দিকি!

যতেও অবাক হয়। হর্ষবিতের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ঠিক বুঝতে পারে না সে, ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো মনে হয় তার।

হরবিত নীরব রাগে ফুলছে। সর্বদিক থেকেই ঠকেছে সে। ঘরে—বনের মধ্যেই—তার কাজের ক্ষেত্রেও। সব ঘটনাগুলোও তার চোখে পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠে।

ঠকেছে সে—হেরে গেছে বার বার।

অন্ধকারে শাল-পিয়াশাল গাছগুলো বিরাট একঠেঙে ভূতের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বন নয়—এ যেন কোন অশরীরী অলৌকিক রাজ্য। প্রেত 'বোঙার' দল ভিড় করেছে তার চারিদিকে, ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। শন শন হাওয়ায় ওরা ফিসফিসিয়ে কি বলছে তাকে, হাসছে তারা। হরবিতের এই দুর্ভাগ্যে তরুণ হাসছে হাসছে মাকাল সর্দার ওই চারপাশের বোঙার দল হো হো শব্দে উথল পাথাল হাওয়ায় ওদের হাসিটা দলপাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। পাগল হয়ে যাবে হরবিত।

ওর মাথা ঝিম ঝিম করছে—টলছে সাড়া নেই। এখুনিই পাথরের উপর এই বনের মধ্যেই ছিটকে পড়ে যাবে মারাং শিকারী—এ বনের সবচেয়ে বড় শিকারী হরবিত হাজাং। একটা চাঁইড় লতা ধরে দাঁড়াল। মুখে-মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে—জিরিয়ে দম নিতে চায় হরবিত। ঝোরার কনকনে ঠাণ্ডা জল মুখে-মাথায় দিয়ে দু' এক আঁজলা জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হয় সে। ঠাণ্ডা জলটা ওর উত্তপ্ত দেহের শিরা-উপশিরাগুলোকে স্বাভাবিক করে

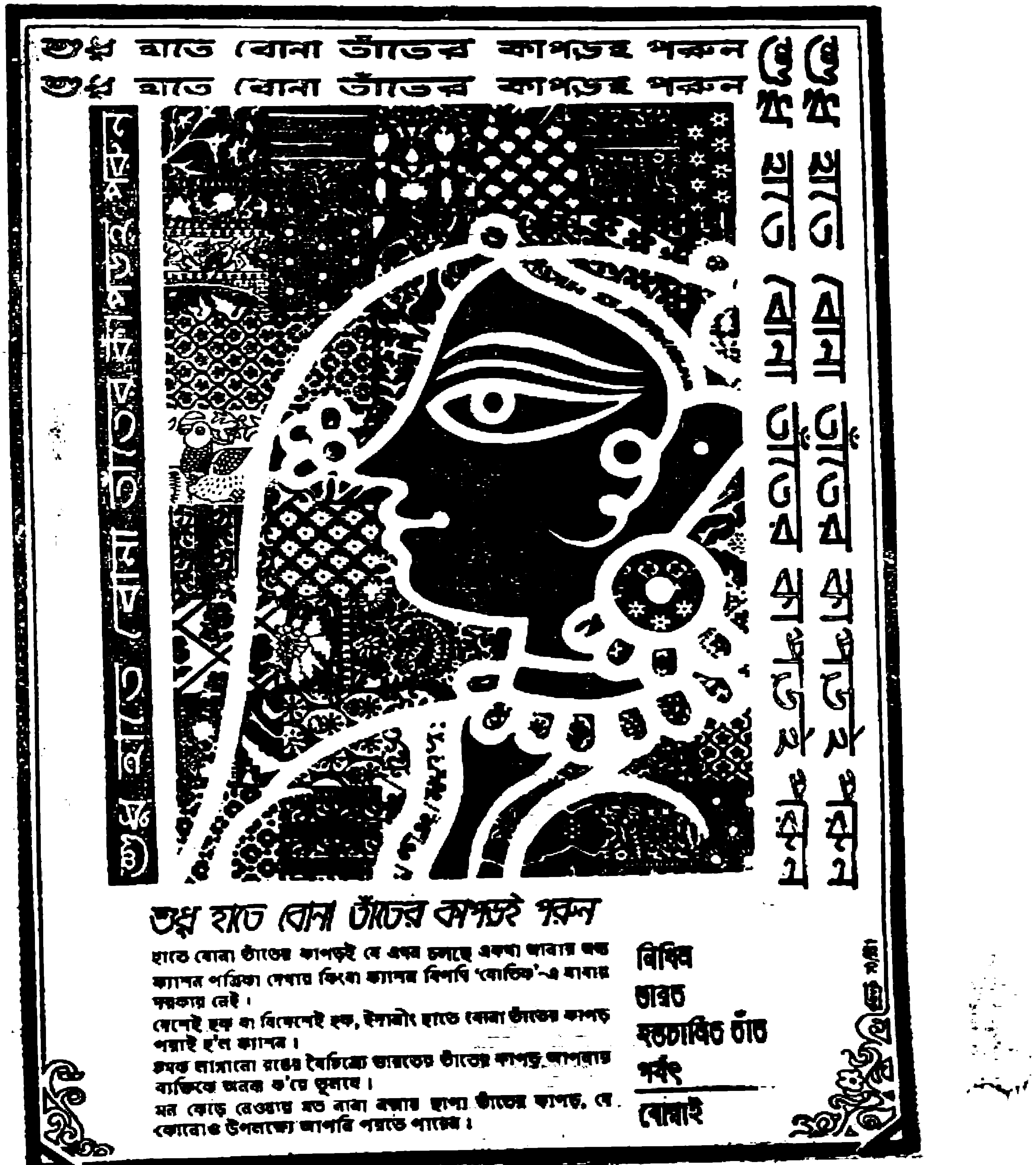

CENTRAL LIBRARY

আনে। বড্ড বজ্জ—শরীর দুত নাই নাকি গ।

হরবিত কথা বলে না। বনের বাইরে এসেছে—সামনে কালো মেঘের মত বিরিবুরু পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে। ওটা পার হয়ে তবে তাদের কলোনী।

বন এখনও পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পাহাড়ের গা বয়ে নেমেছে মজবুত কনভেয়ার। মাথায় দূরে একটা আলো জ্বলছে। ওরা ওপাশের বনের মধ্য দিয়ে পাকদণ্ডী বেয়ে উঠছে। বুকটান করা চড়াই। এই চড়াই এতকাল অবলীলাক্রমে দু একমণ হরিণের মাংস নিয়ে পার হয়ে এসেছে তারা। আজ শুধু হাতে বন্দুকটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে ওই চড়াই ভাঙতে হাঁপাচ্ছে হরবিত। পাগুলো টনটনিয়ে ওঠে। পাহাড়ের মাথার দিকে উঠছে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে—শীতে কনকন করে হাত পা—সর্বাঙ্গ।

হতে বলে—একটু থামো গুরু!

অন্যদিন হতে এমনিভাবে চলতে দেখেনি হরবিতকে। এই পরিবর্তনটা ওর চোখেও পড়েছে। হরবিতের যেন গর্জন করে ওকে ধমকাবার সাধ্যও নেই। ওর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে তাজা মদটা গলায় ঢালতে থাকে। গিলছে গট্ গট্ করে। খানিকটা দূর পায় শরীরে—আরও খানিকটা গিলে নিয়ে হরবিত সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মনের মধ্যে চাপা পড়া সেই অসহায় রাগটা আবার জ্বলে ওঠে—এই তীব্র জ্বালাটাই হরবিতকে চাঙ্গা করে তুলেছে। সোজা উঠছে এইবার পাহাড়ে।

পাহাড়ের উপর থেকে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নীচের আলো মিটিমিটি উপত্যকায় তাদের কলোনী। এখানে ওখানে পাহাড়ের গায়ে খাদানের আলোগুলো টিম টিম করে জ্বলছে। নীচের দিকে নেমে আসছে ওরা।

কনভেয়ার বেল্ট চলায় একটানা ঘড় ঘড় শব্দ ওঠে অন্ধকারে, রুলিং মেসিনের ধারালো বড় বড় দাঁতগুলো যেন কড়মড় শব্দে ওই পাথরগুলোকে চিবিয়ে চলেছে। বনের বাঘটা বোধহয় হরিণের হাড়গুলোকে এমনি করেই চিবোচ্ছে, টুকরো করে দিচ্ছে। হরবিতের বুকের ভেতরটা জ্বলে ওঠে নীরব রাগে। চারদিকেই তাকে এমনি করে বধের আয়োজন করা হয়েছে।

হরবিত রাতজাগা বনপাহাড় ওই মানুষের বসতির দিকে চেয়ে থাকে। সে যেন অন্ধকারের জীব। দিনের আলোর ধুলোয় আর মানুষগুলো তাকে রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই বন-পাহাড়ে কাটে তার তন্দ্রাবিহীন রাত। মানুষগুলো তাকে ওই শান্ত ঘুমঢাকা আরামদায়ক পরিবেশ থেকে চক্রান্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই জাগা, আর সেই সঙ্গে আরও কতজন শত্রুর সেই চক্রান্তকারী।

হরবিত আজ বিশ্রাম চায়। শরীরটা ভালো নেই। খাদান ছাড়িয়ে নীচে ওই বসতির দিকে এগিয়ে আসছে। পাঁশুটে পৌষের ছিজে ঠাণ্ডা বাতাস ওর হাড়ে যেন বিঁধছে। আজ সে ঘর চায়—বাকী রাতটুকু এই দুটি ঘরেই সে বাঁচবে। বাঁধা কম্বলের মধ্যে—তরুণের সান্নিধ্যে ফরোক একটু ঘরের আশ্রয় আজ চায় সে। নিরাশ্রয়ের মত এই দুঃসহ হিম রাতে সে বনে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত।

থমথম করছে অন্ধকার। ওরা ঘরটার আশপাশে দুচারটে পুরোনো গাছ এখনও রয়ে গেছে। বাতি নিভানো। হরবিত গিয়ে দরজাটা ঠেলছে। ভেতর থেকে বন্ধ, বোধহয় তরুণ ঘুমিয়ে পড়েছে। হরবিত জানে দরজার পাল্লাটা ফাঁক করে বাইরে থেকে ছুরির ডগা দিয়ে হুড়কোটা খোলা যায়।

সশব্দে খিলটা ছিটকে পড়েছে আর সেই শব্দে জেগে উঠেছে ওরা। অন্ধকারে দেখা যায় খোলা দরজাটা জুড়ে ছায়ামূর্তি যেন পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। ধড়মড় করে লোকটা বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠেছে। ঠিক ঠাওর করতে পারে না হরবিত, তবু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে সে। চমকে উঠেছে, চাপা সেই অসহায় রাগ আর জ্বালা তাকে উন্মাদ করে তুলেছে। দরজার পাশেই আলোর সুইচ কোথায় আছে জানতো হরবিত। আলোটা অন্ধকারে ঝলসে ওঠে।

সেই আলোয় দুচোখ জ্বলছে মাকান সর্দারের। মাকান সর্দার এসেছিল তার ঘরের এই সম্পদটুকুকে লুট করে নিতে। বারবার ঠকেছে হরবিত। আজকের এই পরাজয় তার মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। শুধু হাতে শিকারী ফিরেছে—তার শিকার লুট করে নিয়েছে অন্য কোন শক্তিমান জানোয়ার। তারই জবাব দেবে সে।

হরবিতের মাথায় রক্ত উঠেছে। সারা শরীরে জাগে দুর্বার কাঠিন্য, হাতগুলো লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে। সামনে মাকান সর্দারের ওই চোখ— যেন সেই ধূর্ত বাঘটার পিঙ্গল চোখের মতই জ্বলছে—যে তার মুখের গ্রাস তুলে নিয়ে গেছে।

নিজেকে মধ্যে দুর্বার আক্রোশে আর আদিম হিংসায় জ্বলে ওঠে হরবিত। লাফ দিয়ে এসে পড়েছে মাকান সর্দারের উপর। প্রচণ্ড ধাক্কায় তীব্র শয়তান লোকটা ছিটকে পড়ে শক্ত মেঝের উপর। ওর উপর চেপে বসে দুহাত দিয়ে মাকান সর্দারের কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে হরবিত। দুর্বার উন্মাদ হিংস্র পরাজিত একটি মানুষ আজ শেষ চেষ্টা করবে তার পথ থেকে ওকে সরিয়ে দিতে। এতদিনের চাপা রাগ আর পরাজয় ওর হাতের আঙুলগুলোকে কঠিনতর করে তুলেছে।

অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ ওঠে। অসহায় সর্দার পা ছুঁড়ছে। ওর চোখের চাহনি বাঘের চোখের মতই নিষ্প্রাণ হয়ে আসছে—[illegible] স্থির হয়ে আসছে তার চাহনিগুলো আর ঘোলাটে [illegible] দৃষ্টি। ঠোঁট মুখ দিয়ে লালা ঝরছে, জিবটা বিবর্ণ তামাটে, ঝুলে পড়েছে। মৃত্যুযন্ত্রণার বিকৃত শব্দটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

হরবিত হাঁপাচ্ছে—এই দুঃসহ হিম রাতে ঘামছে সে। কতক্ষণ ছিল ওই দেহটার উপর খেয়াল নেই। ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনে পড়ে আছে বিস্ফারিত চক্ষু সেই স্তব্ধ দেহটা। হরবিত যেন শোধ নিয়েছে। জবাব দিয়েছে আজ তার অপমানের। কোন আদিম আরণ্যক অন্ধকারে সে হারিয়ে গেছে—শন্‌শন হাওয়া ওঠে বনে বনে। ঘন গাছের আবরণে ঢাকা আকাশ, তারাগুলোও চোখে পড়ে না।

হঠাৎ চমকে ওঠে সে। ওপাশ থেকে দুটো চোখের চাহনি তাকে বিঁধছে। তরুণ দেখছে তাকে। ভীত ত্রস্ত মেয়েটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখছে আজকের হরবিতকে।

হরবিতের মনে পড়ে বনের সেই হরিণীর কথা। ওর চোখে এমনি চাহনি দেখে জ্বলে উঠে গুলি করেছিল তাকে।

তরুণের চোখে আজ বাঘিনীর চোখের জ্বালা নেই, ওতে ফুটে উঠেছে নিষ্ঠুর আরণ্যক ছলনা। তাকে ধরা যায় না—চেনা যায় না।

হরবিত ওকে দেখছে। মেয়েটাকে আজ সে ঘৃণা করে। ওটা তার শিকারের অযোগ্য। হরবিত শুধু ভুল করে এসেছিল এতদিন। এমনি ঘৃণা করে সরে গেলেই পারতো, তা পারেনি। ওর মনে মোহ জাগিয়েছিল মেয়েটা ওই চাহনির নেশা দিয়ে।

আজ মনে হয় হরবিতের, ওই মেয়েটার চোখের চাহনি মরা হরিণের চোখের মতই স্থির, আর প্রাণহীন। ও যেন বহুদিন আগে কোন শিকারীর হাতে মারা গেছে—বর্তমানে ও মৃত—প্রাণহীন একটা শব মাত্র।

ওকে ছুঁলো না হরবিত। টলতে টলতে বের হয়ে এল ঘর থেকে। অন্ধকারে ওই আদিম বনপাহাড়ের দিকে ফিরে চলেছে সে—পলাতক একটা জানোয়ারের মত।

কোথায় যাবে জানে না। তার সব পথ অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। তবু চলেছে সে টলতে টলতে। কোন রাতেই শিকারী হরবিত হাজাং শিকার না নিয়ে ফেরেনি। আজও নয়।

পালাচ্ছে সে—এখান থেকে অনেক দূর পাহাড় বনের দিকে। সে যেন রাতারাতি মানুষের সংসার থেকে চলে গেল অন্ধকারের জগতে। [illegible]

CENTRAL LIBRARY

এই আমাদের দেশ

পোড়ামাটির অতুলনীয় কাজ দেখতে বিষ্ণুপুর চলুন

প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠস্থান বিষ্ণুপুর। অজস্র মন্দির নিয়ে সারা বিষ্ণুপুরই ঘেরা। প্রত্যেকটি মন্দিরের কারুকাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বলা যেতে পারে এই ধরনের সূক্ষ্ম কারুকাজ বাংলাদেশের আর কোথাও চোখে পড়ে না।

বিষ্ণুপুর প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী। রঘুনাথ বা আদিমল্ল মল্লভূম রাজ্য ও মল্লরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণা জেলার কতকাংশ এবং ছোটনাগপুরের অধিত্যকা ভূমির খানিকটা নিয়ে মল্লভূম রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এ নিয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। সপ্তম শতাব্দীতে তীর্থকামী এক ক্ষত্রিয় রাজার মহিষী বৃন্দাবন থেকে শ্রীক্ষেত্রের পথে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করার পর মারা যান। অনাথ শিশুটিকে মানুষ করেন স্থানীয় এক গৃহস্থ। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালকটি ক্ষত্রিয়ের মত বীর্যশালী হয়ে ওঠে এবং মল্লক্রীড়ায় অসম্ভব পারদর্শিতার পরিচয় দেয়। এই বালকই পরবর্তীকালে আদিমল্ল বা রঘুনাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। রঘুনাথ নিজের বাহুবলে বহু সামন্ত রাজা ও সর্দারকে পরাস্ত করে এক বিরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যই মল্লভূম নামে পরিচিত। মল্লভূমের প্রথম রাজধানী ছিল প্রদ্যুম্নপুরে। রঘুনাথ মল্লের ঊনবিংশ বংশধর জগৎমল্ল বিষ্ণুপুরে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

মল্লরাজারা বাংলার পশ্চিম সীমান্তে রাজত্ব করেছিলেন বহু শতাব্দী। মুসলমান যুগেও বিষ্ণুপুরের রাজারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ধীরামল্লের ছেলে বীর হাম্বীরের সময়ে মল্লভূমি উন্নতির শিখরে ওঠে। শিবসিংহ মল্লের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে ললিতকলায়, বিশেষ করে সংগীতসাধনায় উৎকর্ষ ঘটে। বীর হাম্বীর সেনাবাহিনীর ও দুর্গের পুনর্গঠন করেন ও তাঁর সময়েই এখানে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতি ঘটে। বাংলার নবাব সোলেমান কররানীর ছেলে দাউদ খাঁ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন কিন্তু বীর হাম্বীরের কাছে তিনি হেরে যান। সে সময়ে দুর্গের পূর্বদ্বারে মৃত নবাব-সৈন্যের এত মৃতদেহ জমেছিল যে, জায়গাটি মুণ্ডমালাঘাট নামে পরিচিত।

সে-সময়েই মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের চেষ্টা শুরু হয়। এ নিয়েও একটি মজার গল্প আছে। শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুর ও অন্যান্য মহান্তরা বৃন্দাবন থেকে গোস্বামীদের পুঁথিপত্র বাক্সের মধ্যে নিয়ে গরুর গাড়িতে মল্লভূমির ভেতর দিয়ে গৌড়ে যাচ্ছিলেন। রাজজ্যোতিষী গণনা করে জানিয়েছিলেন যে, বাক্সের মধ্যে প্রচুর ধনরত্ন আছে। গণনামত বীর হাম্বীর লোকজন নিয়ে সব জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে আসেন।

পুঁথিগুলি উদ্ধারের জন্যে শ্রীনিবাস আচার্য হাজির হন রাজদরবারে। শ্রীনিবাসের সৌম্য চেহারা, দেবতা-ভক্তি ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বীর হাম্বীর তাঁর শিষ্যত্ব নেন। বীর হাম্বীরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণে মল্লভূমে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। অনেকেরই হয়ত জানা আছে, বাগবাজারে যে মদনমোহন ঠাকুর আছেন তিনি বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুলদেবতা। মল্লরাজ চৈতন্যসিংহ মোকদ্দমার খরচ যোগাড় করতে এই বিগ্রহটিকে বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে বাঁধা রাখেন। বিষ্ণুপুর-রাজ গোপাল সিংহ নিয়ম করে দিয়েছিলেন, তাঁর রাজ্যের প্রত্যেকটি অধিবাসীকে প্রতিদিন হরিনাম জপ করতে হবে না করলে শাস্তি। নিয়মটিকে লোকে ব্যঙ্গ করে নাম দিয়েছিল গোপাল সিংহের বেগার।

বিষ্ণুপুরে প্রাচীন মন্দির প্রচুর। তাছাড়া প্রাচীন দুর্গের গড়খাই, পাথর দরজা ও বীর দরজা নামে পাথরে তৈরী দুর্গদ্বার দেখবার মত। মদনগোপাল, মদনমোহন, কালাচাঁদ, শ্যামরায় ও রাধাশ্যামের মন্দির, জোড়বাংলা, রাসমঞ্চ, পঞ্চরত্ন মন্দির প্রভৃতি মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির সূক্ষ্ম কাজ। দীর্ঘকালের তৈরী হলেও এখনও একটু টসকায়নি। এর মধ্যে জোড়বাংলার মন্দির ও শ্যামরায়ের মন্দিরের কাজই বেশী ভাল। জোড়বাংলার গায়ে নৌযুদ্ধের কাহিনী চিত্রিত করা আছে।

দলমাদল কামানটিও দেখে নিতে পারেন। কামানটির দৈর্ঘ্য সাড়ে বারো ফুটের মত আর বেড় প্রায় সাড়ে এগারো ইঞ্চি। কামানটি বিজাপুরের 'মালিক-ই-ময়দান' কামানের মত। এতকাল পড়ে থাকা সত্ত্বেও এখনও মরচে ধরেনি। বহু লোক কামানের গায়ে সিঁদুর লাগিয়ে পুজো করে থাকেন। ফার্সিতে লিপি খোদিত আছে, তা থেকে জানা যায়, কামানটি তৈরী করতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পড়েছিল। প্রবাদ আছে, ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর আক্রমণ করার সময় মদনমোহন দেব নিজে কামান দেগে শত্রুসৈন্যকে তাড়িয়েছিলেন।

আর আছে লালবাঁধ। বিরাট পুকুর, টলটলে কাচ-চোখের মত জল, স্নান করলে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। জনশ্রুতি আছে, রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ বর্ধমানের বিদ্রোহী রাজা শোভা সিংহকে যুদ্ধে হারিয়ে নিয়ে অন্যান্য জিনিষপত্রের সঙ্গে লালবাঈ নামে এক সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে আসেন। লালবাঈ এত অপরূপ সুন্দরী ছিলেন যে, রাজা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন এবং তার জন্য আলাদা একটি মহল তৈরী করিয়ে দেন। আর একটি বিরাট দীঘি কাটিয়ে তার নাম রাখেন লালবাঁধ। লালবাঈ-এর অনুরোধে রাজা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে মনস্থ করলে প্রধানা মহিষী মন্ত্রী গোপাল সিংহের সহায়তায় তাঁকে হত্যা করান এবং লালবাঈকে লালবাঁধে ডুবিয়ে মারা হয়। পরে প্রধানা মহিষী রাজার চিতায় আত্মবলি দিয়ে সতী হন।

এজন্য লোকে তাঁকে 'পতিঘাতিনী সতী' নাম দিয়েছিলেন। লালবাঈ রাজা সমস্ত রাজ্যের সমস্ত লোককে যেখানে মুসলমানী খানা খাওয়াবার আয়োজন করেছিলেন, আজও তা 'ভোজনতলা' নামে খ্যাত।

প্রাচীনকাল থেকেই বিষ্ণুপুর সংগীতচর্চার জন্য বিখ্যাত। বিষ্ণুপুর ঘরানার সুনাম সারা ভারত জুড়ে। সংগীতাচার্য যদুভট্ট ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন।

বিষ্ণুপুরের শাঁখার কাজের খুব সুখ্যাতি। এখনও বিষ্ণুপুরে ঘুরতে ঘুরতে আপনি শাঁখার কাজ হচ্ছে দেখতে পাবেন। প্রচুর শাঁখারী এখনও তাঁদের প্রাচীন জাতব্যবসা টিকিয়ে রেখেছেন।

লালকাঁকর মাটির রাস্তা মাড়িয়ে বিষ্ণুপুর পরিক্রমা। মন্দিরের আশেপাশে তেমন লোকবসতি নেই। বনবাদাড়ের মধ্যে মন্দিরগুলি অসম্ভব সৌন্দর্য নিয়ে শোভা পাচ্ছে। মন্দিরগুলি খুঁটিয়ে দেখতে একদিন সময় যথেষ্ট নয়, দিনদুয়েক হলে ভাল। থাকার জায়গা পাবেন, অন্য কোন অসুবিধেও নেই। মন্দিরময় বিষ্ণুপুরের মাটির একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে, যা বারবারই আপনাকে পিছু ডাকবে।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমন্তকুমার বসু

জন্ম : ১৮৯৫ খৃঃ

মৃত্যু : ১৯৭১ খৃঃ ২০ ফেব্রুয়ারী

অজাতশত্রু হেমন্তকুমার বসু

ভারতের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা, নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সংগ্রামী সাথী, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ারম্যান প্রবীণ জননেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসু ২০ ফেব্রুয়ারী আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। দরিদ্র সাধারণ মানুষের বন্ধু, বামপন্থী আন্দোলনের প্রবক্তা শ্রীবসু রাজ্যব্যাপী প্রতিটি মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা পেয়ে এসেছেন। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বন্ধুবৎসল মানুষ, একজন প্রথম সারির জননায়ক শ্রীবসুর ছিয়াত্তর বছরের জীবন ছিল শান্তিহীন দেশকর্মীর জীবন। বাংলা-দেশের রাজনীতিতে অজাতশত্রু হেমন্ত বসুর নাম পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। 'হেমন্তদা' নামে তিনি সকলের কাছের মানুষ ছিলেন। সকলের প্রিয়, সকলের শ্রদ্ধেয় হেমন্তদা আজ স্মৃতি।

হেমন্ত বসুর জন্ম ১৮৯৫ খৃঃ কলকাতায়। মাত্র দশ বছর বয়সে ১৯০৫ খৃঃ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। পরের বছরেই তিনি অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য হন। ১৯০৭ খৃঃ অর্ধোদয় যোগে বিরাট স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে জন-সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৮ খৃঃ অনুশীলন সমিতিকে বেআইনী ঘোষণা করায় আত্মগোপন করেন। গোপনে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালাতে থাকেন এবং বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে কুন্তল চক্রবর্তী, হরিশ দাশগুপ্ত, ললিত বসাক ও যশোরের ভূপেন দত্ত প্রভৃতি ছিলেন অন্যতম।

শ্রীশ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, সুরেন ব্যানার্জি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিন পাল, রাস-বিহারী বসু প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেই হেমন্তবাবু বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষা নেন। বিপ্লবীদের সংগঠনকে আরও জোরদার করবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অন্তহীন।

ছাত্রাবস্থায় ১৯১৩ খৃঃ বর্ধমানের বন্যায় দুর্গত দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্য তিনি ত্রাণকার্যে লিপ্ত হন। ১৯১৭ খৃঃ বৃটিশকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য রাসবিহারী বসু ও যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটে তাতে তিনি সক্রিয় অংশ নেন। সেই সময় 'ফেরারী' আসামী হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ, চারু রায়, ভূপেন দত্ত প্রভৃতিদের সঙ্গে আত্মগোপন করেছিলেন। সেই বছরে ছাত্রাবস্থায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সেই সময় থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য সকলে সমবেত হয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন ও দেশের পরাধীন মানুষকে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এর পরেই তিনি ইংরেজদের কারাগারে বন্দী হন। ১৯২১ খৃঃ তিনি কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও গ্রেপ্তার হন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক শ্রীবসু ১৯২৪ খৃঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে রাজনৈতিক কাজ চালাতে থাকেন। এই সময়ের কার্যাবলীর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য কলকাতা কর্পো-রেশনের নির্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ। এর পরই সুভাষচন্দ্রকে বৃটিশ সরকার গ্রেপ্তার করে। তাঁর মুক্তির দাবীকে দুর্বার করে হেমন্তবাবু বহু সভা-পথসভা করেন এবং সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি কিছুকাল প্রথম যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীতে কাজ করেন। কিন্তু দেশ ছিল তাঁর কাছে বড়। বিদেশীর গোলামী করা তাঁর পোষাল না। ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে ফিরে এলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর সংগ্রামী কর্ম-জীবন শুরু হয় ১৯৩০ খৃঃ। মেদিনী-পুরের লবণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে হেমন্তবাবু গ্রেপ্তার হন। ১৯৩১ খৃঃ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা ছাড়াও দেশব্যাপী ইংরেজ তাড়ানোর জন্য তিনি প্রচার অভিযান শুরু করেন। ফলে বিদেশী শাসকের নির্যাতন নেমে এল তাঁর ওপর। ইংরেজের হাতে বহু লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়। যেদিন তিনি জেল থেকে বেরিয়ে এলেন—সেই দিনই তিনি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ফলে গ্রেপ্তার হন ও ৬ মাস কারাবরণ করেন। ১৯৩২ খৃঃ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি তাঁর কর্মময় সংগ্রাম এ প্রতিটি জেলায় জেলায় সংগঠনের কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৩৪ খৃঃ দেশকে স্বাধীন করার জন্য হেমন্তবাবু স্বাধীনতা দিবস পালন করে গ্রেপ্তার হন ও কয়েক মাস কারাবরণ করেন। এ-ছাড়া ফজলুল হকের নেতৃত্বে বিহারের স্মরণীয় ভূমিকম্পে সাহায্যকল্পে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ খৃঃ আপোষ-হীন সংগ্রামে বিজয়ের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ। সেই সময় তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানান। ১৯৩৯ খৃঃ সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সংহতির চেষ্টা করেন। সেই সময় হেমন্তবাবু ফরোয়ার্ড ব্লকের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ফরোয়ার্ড ব্লক ক্রমশ শক্তিশালী হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। হেমন্তবাবু বার বার গ্রেপ্তার হন। একই বছরে হলওয়েল আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ ও গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই সময় সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্ব হেমন্ত বসুকে গ্রহণ করতে হয়। ১৯৪২ খৃঃ থেকে শুরু হয় তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম। সেই সংগ্রামময় জীবনে অক্লান্ত যোদ্ধা স্বদেশপ্রেমিক এই মানুষটি ইতিহাসকে স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছিলেন। সাড়ে তিন বছর জেলে থাকার পর তিনি মুক্তি পান।

শ্রীহেমন্ত বসু ১৯৪৬ খৃঃ থেকে রাজ্য বিধানসভার সদস্য। ১৯৪৮ খৃঃ তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। সে সময় শ্রীবসু কংগ্রেস সংসদীয় দলের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভার সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হন। এবং পুনর্নির্বাচিত হন।

শ্রীবসু ১৯৫২ খৃঃ থেকে শ্যামপুকুর কেন্দ্রে বিধানসভার সদস্য। ১৯৬৭ খৃঃ তিনি অবশ্য বারাসাত কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। তিনি ঐ সময়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পূর্তমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৯ খৃঃ অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হিসাবে শ্যামপুকুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ খৃঃ নির্বাচনেও তিনি ঐ কেন্দ্রেরই প্রার্থী ছিলেন। গোয়া মুক্তিযুদ্ধে হেমন্তবাবু বয়সের বাধাকে অতিক্রম করে নেতৃত্ব দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে এবং পরবর্তী-কালে ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেছেন।

যে কোন মৃত্যুই বেদনার, শোকের। কিন্তু এ মৃত্যু হৃদয়দহনের গভীরতা অসীম।

(তিন)

এক-দুই-তিন-চার 'অনিবার্য' মৃত্যুর মুহূর্ত গুনছে দ্বিজপদ। ভয়ঙ্কর সশব্দ এই মৃত্যু—সশব্দ-পিষে, গলাটাকে থেঁৎলে, ঘাড়-মাথা গুঁড়িয়ে, তালগোল পাকিয়ে ট্রেন পেরিয়ে উধাও হয়ে যাবে। হঠাৎ দ্বিজপদর সমস্ত অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়ে বুকের গভীর থেকে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল—দ্বিজপদ পালাও। এই মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর, গলার নলীতে চেপে বসে নিঃশ্বাসটাকে বুকের খাঁচায় আটকে দেবে—তুমি 'বাতাস' 'বাতাস' চীৎকার দেওয়ার আগেই মুণ্ডটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে। দ্বিজপদ, আর সময় নেই, লাইন থেকে গড়িয়ে পড়। কান দুটোকে চেপে ধরে লাইনের পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়।

না, না, আমি মরতে চাই না, আমি মৃত্যুর যন্ত্রণা সইতে পারব না—দ্বিজপদর আর্ত-চীৎকার ইঞ্জিনের গম্ গম্ শব্দকে ছাপিয়ে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল।

দ্বিজপদ লাইনের পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। ভয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছিল। চোখ খুলতেই দেখল—ট্রেনটা ব্রীজ পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্রীজটা তখনও থর থর করে কাঁপছিল। দ্বিজপদের বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল গম্ভীর গুম্ গুম্ শব্দের ঢেউ। দ্বিজপদ দুহাতে বুকটা চেপে ধরল।

দ্বিজপদ জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু মৃত্যুকেও সে গ্রহণ করতে পারল না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনের নিঃসঙ্গ প্রাঙ্গণে ফিরে এলো। রাত এখনও শেষ হয়নি।

অন্ধকারে গাছ-পাহাড়কে আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। ক্লান্ত পায়ে বাড়ীর পথে হাঁটতে হাঁটতে এক দারুণ সঙ্কটে পড়ল দ্বিজপদ। বর্তমান ওর কাছে আগেই মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল। সেই তারাভরা রাত্রির চরাচরব্যাপী দুঃসহ অন্ধকারে অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি মেলে ভবিষ্যতের ছবিটাও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল সীমিত কালের ভাবনায়। দ্বিজপদ ভাবছিল—আর কতদূর হাঁটতে হবে এই অর্থহীন জীবনের পথে? এই নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের বোঝাটাকে টেনে টেনে আর কতদূরে নিয়ে যেতে হবে?

হঠাৎ চোখের ওপরে ভেসে উঠল সোজা, সরল, স্পষ্ট একটি যতি-চিহ্ন। মৃত্যু তার নাম। মৃত্যু নামক সেই যতি-চিহ্নে কাটা পড়ে গেছে ভবিষ্যৎ তার পরে ভবিষ্যৎ বলে আর কিছুই নেই। সেই সীমারেখা থেকে আর এক অন্তহীন অতীতের শুরু। দ্বিজপদ অতীতকে অস্বীকার করতে পারল না। বর্তমানের সমাধির ওপরে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের যতি-চিহ্নটি যতই দগদগে হয়ে ফুটে উঠতে লাগল—দ্বিজপদ এক আশ্রয়চ্যুত পক্ষী-শাবকের মত অতীতকে পরম নির্ভরতায় আঁকড়ে ধরতে চাইল। ইতিহাস আর ঐতিহ্যের শিকল দিয়ে বর্তমানকে বেঁধে ফেলল। বাবা মাসীমা ভাইবোন সকলের প্রতি সামাজিক কর্তব্য পালন করে অতীতের ধারাবাহিকতায় প্রবহমান বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে ঐতিহ্যের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চাইল। শুধু অনেক দূরে-দূরে উঁচু

একটি কালো দেওয়াল মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বর্তমান আর ভবিষ্যতের দুর্বার স্রোতধারা সেই দেওয়ালের গায়ে ভেঙে পড়ছে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে। দেওয়াল পেরিয়ে ওপারে দৃষ্টি পৌঁছায় না। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায়—চেনা-অচেনা কত মুখ সেই জলোচ্ছ্বাসের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। বাবা, মাসীমা, ভাই-বোন, স্কুলের বন্ধু-বান্ধব, সে নিজে—সবাই। মুখকে চিনতে পারছিল দ্বিজপদ। না, আর বিস্মৃতার বাধা নেই। আরও লক্ষ-কোটি মানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে নিখিল বিশ্বের পরম স্রষ্টা ঈশ্বরের জয়ধ্বনি তুলে ধূপ-ধুনায় সুরভিত অতীত ঐতিহ্যের মন্ত্রোচ্চারিত পথ ধরে সেও এগিয়ে যাবে অস্তিত্বের সেই অনিবার্য, অলঙ্ঘ্য সীমান্তে। সেখানে আর এক অলৌকিক অতীতের শুরু। সেই অতীতের গর্ভে বর্তমান আর ভবিষ্যতের অনন্ত রূপান্তর ঘটে যায়।

দ্বিজপদ শেষ রাতটুকু আর ঘুমাল না। ভোরের আলো ফুটতেই চিলেকোঠা থেকে নীচে নেমে পড়ল। হৈ হৈ করে ভাই-বোনদের জাগিয়ে দিল। অনেকদিন পরে আবার ঘুমন্ত মাসীমাকে জড়িয়ে ধরে বুকের ওপরে মুখ রাখল। মাসীমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে করুণ, অসহায় গলায় ডাক দিল—ছোটমা, চেয়ে দ্যাখো, আমার আমি তোমার বুকে ফিরে এসেছি।

মাসীমা তখনও অভিমানে চোখ বুজে পাশ ফিরে শুয়েছিল। দ্বিজপদ মাসীমার দু-চোখে নরম হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে আবার করুণ-কণ্ঠে ডাক দিল—ছোটমা, মাগো, চোখ খোল, কথা বল। আমাকে ক্ষমা কর, মা। আর কোনদিন তোমাকে দুঃখ দেব না। দুই ভাই-বোন তখন দ্বিজপদর কাঁধের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভাইটা কচি কচি দুটো হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে পিঠের ওপরে চেপে বসে ঘোড়া-ঘোড়া খেলা শুরু করে দিয়েছে—এই ঘোড়া হেট হেট—খপ, খপ, খপ ঘোড়া ছুটবে এবার। কি মজা—দাদা ঘোড়া হয়েছে।

বোনটা দ্বিজপদর মুখের পাশে মুখ নিয়ে এসে মায়ের বুকের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল।

তারপর মা আর তিন ছেলে-মেয়ের কি আদর-সোহাগের খেলা। মায়ের বুকের ভাগ নিয়ে তিন ভাইবোনে ঝগড়া, খুনসুটি। বাবা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বার বার হাততালি দিয়ে দ্বিজপদকে জিতিয়ে দিচ্ছিলেন; তাঁর উৎফুল্ল মুখ হাসিতে ঝকঝক করছিল। কিন্তু দু-চোখে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

সেদিন সারা সকাল সন্ধ্যে কত কাজ করল দ্বিজপদ। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে রোদে পিঠ রেখে ভাইবোনদের পড়াতে বসল। বাবার পিছু পিছু থলি হাতে বাজারে গেল। রান্নাঘরে মাসীমার কাছে-কাছে রইল। অনেকদিন পর ইঁদারার পাড়ে দাঁড়িয়ে গায়ে-মাথায় ঘড়া ঘড়া করে জল ঢেলে স্নান করল, ঘষে-মেজে গায়ের ময়লা তুলল, পেট-ভরে ডাল-ভাত খেল। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাসি, গল্প করবার জেতে উঠল।

চিলেকোঠার নিঃসঙ্গ আশ্রয়কে ত্যাগ করল দ্বিজপদ। মাসীমাকে ছোট-মা 'ছোট-মা' করে অস্থির করে তুলল। বাবাকে আবার বন্ধুর মত কাছে টেনে নিল। ভাই-বোনদের হাসিয়ে-কাঁদিয়ে আদর-ঝগড়ায় দিন-রাত মেতে রইল। সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত স্কুলের পড়াশুনো করতে লাগল। বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে এসে উঠানে ভাইবোনদের সঙ্গে কানামাছি আর চোর-চোর খেলায় সে কি হৈ-চৈ মাতামাতি। রাত হলে মাসীমাকে জড়িয়ে ধরে বুকের ওপরে মুখ রেখে ঘুমাতে লাগল। মাসখানেক পরে এক উজ্জ্বল শীতের সকালে ইঁদারার টাটকা জলে স্নান সেরে পাট-ভাঙা নোতুন ধুতি পরে মা-সরস্বতীর পদতলে ভক্তি-ভরে অঞ্জলি দিল।

দ্বিজপদ জীবনকে পরম মমতায় আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাইল। কিন্তু আবার এলো ভয়ঙ্কর মৃত্যু-ভয়ের রাত। আবার নৈরাশ্য। আর হতাশা বুকের ভিতরে বাসা বাঁধল। কিন্তু এবার মৃত্যু শুধু ভয়ই দেখাল না—সঙ্গে নিয়ে এলো এক কঠিন বিশ্বাসের যন্ত্রণা। সেই দুঃসহ যন্ত্রণা দ্বিজপদকে নিঃসঙ্গতার শেষ সীমায় ঠেলে দিল।

নিখিল বিশ্বের পরম স্রষ্টা ঈশ্বর যিনি নির্ভরতার কঠিন স্তম্ভ হয়ে দ্বিজপদকে জীবনের আশ্বাসে ধন্য করেছিলেন—যাঁর অলৌকিক সন্ধানে একাকীত্বের বেদনা আর চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়েছিল—লক্ষ-কোটি মানুষের জয়ধ্বনিত সেই নাম—তেত্রিশ কোটি দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে দ্বিজপদর পিতৃপুরুষ যে নামকে স্মরণ করেছেন সুখে-দুঃখে, জীবনের প্রত্যেকটি অসহায় ভীরু পদক্ষেপে—সেই অমূল্য ঈশ্বরের মহিমময় বেদীমূলে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল ভয়ঙ্কর এক মৃত্যু।

দ্বিজপদর বোন সর্বাণী স্কুলে হঠাৎ মাথাঘুরে ঠাণ্ডা মেঝেয় পড়েছিল। মাসীমা মেয়ের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে ফুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। বাবা শুকনো চোখে অনেক মুহূর্ত মাত্র কন্যার পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে হাত দুটো বুকের ওপরে জড়ো করে বিড় বিড় করে কি সব শব্দ উচ্চারণ করছিলেন—দ্বিজপদ বুঝতে পারে নি। দ্বিজপদ হঠাৎ খুব জোরে চীৎকার করে উঠেছিল। একে একে শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ—পরিচিত সব দেব-দেবীর নাম ধরে অদৃশ্য অলৌকিক ঈশ্বরের কাছে বোনের প্রাণ-ভিক্ষা করেছিল। দ্বিজপদ তখনও বিশ্বাসের কঠিন স্তম্ভে দাঁড়িয়ে ছিল।

হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত জোড় করে জীব ও জগতের পরম স্রষ্টা ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছিল—হে ভগবান, বোনকে বাঁচিয়ে দাও।

কিন্তু সেই কাতর প্রার্থনায় সাড়া দেননি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। ঊর্ধ্বলোক থেকে কোন অলৌকিক কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হয়নি জীবনের আশ্বাস।

দ্বিজপদ বোনের মৃতদেহের পাশে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল। মৃত্যুর সেই অপ্রতিরোধ্য প্রচণ্ড শক্তি—ঈশ্বর যার কাছে অসহায় পঙ্গুর মত নীরব, নিশ্চুপ—দ্বিজপদর বুকের মধ্যে দারুণ এক ভয়ের ছায়া ফেলেছিল।

সেদিন কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারায় নি দ্বিজপদ। শুধু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় মোহটা ছিল ক্ষীণ, দুর্বল সন্দেহ। দ্বিজপদ আরও অনেকদিন ধর্মের শিকড়ে বাঁধা ছিল।

সেই ধর্মাশ্রয়ী বিশ্বাসের কঠিন স্তম্ভে এতটুকুও ফাটল ধরাতে পারেনি বোনের অকাল-মৃত্যু।

অথচ অবিশ্বাস একদিন সত্যিই এল। দ্বিজপদ তখন আর্ট কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র। কিন্তু সেই অবিশ্বাসের অন্ধকারের জন্ম হয়নি সন্দেহের ছায়া থেকে। বরং এক অনুপ্রাণিত বিশ্বাসের ঊর্ধ্বলোক থেকে আকস্মিক পতনের দুঃসহ দহন-জ্বালা হয়ে বুকের গভীরে জ্বলে উঠেছিল অবিশ্বাসের অনুভব উপলব্ধি। ধর্ম আর ঐতিহ্যের ইট-পাথ

ভূপৃষ্ঠ হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চে
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি হিমালয় পর্বতমালার অঙ্গে সংস্থাপিত চিরস্নিগ্ধ তুষারধবল, কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখর-শোভিত উদ্ভাসিত।বাহ্যে
শৈলনগরী দার্জিলিং
ভ্রমণ-বিলাসী সকলেই নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করুন।
মার্জিতরুচি ভ্রমণকারীদের জন্য
স্নো ভিউ হোটেল-ই
একমাত্র নির্ভরযোগ্য আদর্শ আবাসিক হোটেল
পূর্বাহ্নে স্থান সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন (ফোন : দার্জিলিং ৪০)

...র গাঁথা স্নিগ্ধ, শান্ত এক ছায়াঘন ...কেতনকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার ... দিয়েছিল সেই অবিশ্বাস।

দ্বিজপদ তখন আর্ট কলেজের ফাইনাল ...র ছাত্র—এক মহৎ ধর্ম বিশ্বাসে ...প্রাণিত।

... দ্বিজপদর বাবা রোজ সকাল সন্ধ্যায় ...জা পাঠ করতেন। দ্বিজপদকে তিনিই ...শিক্ষার প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন। এক ...ং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—যিনি সর্বজীবে ...ব্যাপ্ত হয়ে আছেন—তিনিই কোটি ...দেবীর নানা-রূপে পূজিত হন ধর্ম-...প্রাণ মানুষের অন্তরে। ঈশ্বর-রূপে তিনিই ...তের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র ...কর্তা।

... বোনের অকালমৃত্যু বালক দ্বিজপদর ...সেই সর্বশক্তিমান অমৃত ঈশ্বরের ...ত এক দারুণ অভিমানের জন্ম ...য়েছিল। সেই অভিমান ওর কিশোর ...কে ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির ক্ষীণ ...হের ছায়া-লোকে দুলিয়ে দিয়েছিল। ... এক দুর্বল, অসহায় প্রশ্ন—মৃত্যুর ...হে ঈশ্বরও কি পরাভূত—দ্বিজপদর ...বাসের আলোকিত প্রাঙ্গণে এক টুকরো ...র ছায়া ফেলেছিল মাত্র।

হঠাৎ একদিন হোস্টেলের ঘরে বসেই ...গ্রামের সেই ভয়ংকর কয়েকটি শব্দ— ...র ডেড, কাম শার্প—দ্বিজপদকে চমকে ...য়েছিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল ...পদ। হঠাৎ মনে হল—চোখে এক ...টাও জল নেই। কিন্তু বুকের মধ্যে ...রী হয়ে চেপে বসেছে দারুণ দুর্ভাবনা। ... দুর্ভাবনাতে আত্ম-বিশ্লেষণের আলো ...লেও শোক নামক কোন বিশেষ অনু-...ভূতিকে ধরে-ছুঁতে পারেনি দ্বিজপদ। শুধু ...বা মাসীমা আর দুটি নাবালক সন্তানের ...ভার দ্বিজপদর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ...র তিনি চোখ বুজলেন—সেই জন্মদাতা ...তার মৃত মুখের আয়নায় কোন ...ভাবনার ছায়া পড়েছে কিনা—দ্বিজপদ ...ক দেখতে চেয়েছিল।

বাড়ী ফিরে পিতার শবদেহকে সে ...তে পারেনি। সোজা শ্মশানে ছুটেছিল। ...র আগুন তখন দাউ-দাউ করে ...ছিল। সেই প্রজ্বলিত চিতার দর্পণে ...র আত্মার প্রতিচ্ছায়াকে দেখতে চেয়ে-...ল দ্বিজপদ।

কারণ পিতাই তাকে আত্মার অমরত্বের ...ণী শুনিয়েছিলেন। মানুষের নশ্বর দেহ ..., বার্ধক্য, মৃত্যুতে ধ্বংস হয়ে যায়— ... তার আত্মার ধ্বংস নেই। আত্মা ...। বারবার দেহকে আশ্রয় করে জন্ম-... চক্রে ঘোরে সেই অবিনশ্বর, অমর ...। দ্বিজপদ কিন্তু পিতার চিতার ... বার বার খুঁজে দেখেও সেই ... আত্মাকে খুঁজে পায়নি। সেদিন ... প্রতি মুহূর্তে, নিরুদ্ধ অভিমান ... আগুন হয়ে ফেটে পড়েছিল। ... সন্দেহের ছায়া নেমেছিল বিশ্বাসের ... উঠানে। কিন্তু সেই সন্দেহ ছিল না ঈশ্বরের অস্তিত্বে। ঈশ্বর তখনও অমৃত-সিংহাসনে বসে ছিলেন বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে। শুধু সন্দেহ জেগেছিল—তাঁর অলৌকিক মহিমায়। মৃত্যুর কাছে সম্পূর্ণ পরাভূত হয়ে গিয়েছিলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

দ্বিজপদ কিন্তু দশদিন কাছা পরে, হবিষ্যান্ন করে নিষ্ঠাভরে অশৌচ পালন করেছিল। পিতার শ্রাদ্ধ-বাসরে মুণ্ডিত-মস্তকে পিতার আত্মার উদ্দেশে জলদান করে পুরোহিতের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেছিল। সেই মন্ত্রই দ্বিজপদকে আবার অমরত্বের উপলব্ধিতে উন্নীত করে দিয়েছিল এক পরম বিশ্বাসের ঊর্ধ্বলোকে।

দ্বিজপদ পুরোহিতের কণ্ঠ মিলিয়ে স্পষ্ট গলায় ঘোষণা করল—দেহের মৃত্যু আছে, বিনাশ আছে, ধ্বংস এবং ক্ষয় শুধু দেহকেই মৃত্যুর অন্ধকারে ঠেলে দেয়। কিন্তু নশ্বর দেহের মধ্যে আছে অবিনশ্বর আত্মা। সেই আত্মার মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই। দেহের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনন্ত ঊর্ধ্বে জেগে থাকে আত্মা।

চারটে বছর দ্বিজপদ মহালয়ার পুণ্য-প্রভাতে গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে আঁজলা-ভরে জলদান করেছিল পিতার তৃষ্ণার্ত আত্মার উদ্দেশে। দ্বিজপদ তখনও বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর একদিন সেই পরম বিশ্বাসের ঊর্ধ্বলোক থেকে আকস্মিক পতনের যন্ত্রণা নিয়ে এলো এক ব্যর্থ প্রেমের ভয়ংকর উপলব্ধি। মমতাজ নামে একটি মেয়ের ব্যাকুল হাতের বন্ধন থেকে ছুটে পালাতে গিয়ে এক ভয়ংকর অবিশ্বাসের যন্ত্রণা তাকে পাগল করে দিয়েছিল। মমতাজ যেন ঝড়ের মত উড়ে এসে বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়টুকুকেও ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিয়েছিল।

তারপর সেই যে শুরু হল ছায়াহীন, আশ্রয়হীন এক রৌদ্র-দগ্ধ অবিশ্বাসের খাঁ খাঁ শূন্য প্রান্তরে পথ হারানোর যন্ত্রণা—আজও সেই অবিরাম পথ-চলার শেষ নেই। তৃষ্ণার গলা শুকিয়ে খট্ খট্ করে, বুকের ছাতি ফেটে যায়, শুকনো গলা দিয়ে আর উচ্চারিত হয় না সেই কাতর প্রার্থনা—ওগো কে আছ, জল দাও।

সামনে-পিছনে শুধুই রৌদ্র-দগ্ধ পোড়া মাটি খাঁ খাঁ করছে—জল নেই, ছায়া নেই, আশ্রয় নেই, আশ্বাস নেই। শুধুই নিরন্তর দহনের জ্বালায় শূন্য বুকটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়।

অথচ মমতাজ নামে সেই মেয়েটার বুকে কি দুরন্ত বাসনা নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দয়িতার সারা শরীর হাতড়িয়ে গর্ভধারিণী জননীর বুকে আশ্রয়ের আশ্চর্য অন্বেষা তাকে কি গভীর এক প্রত্যাশার আনন্দে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

সে বছর সরস্বতী পুজোর দিনে আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রপ্রদর্শনীতে অন্য সব মেয়েকে ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে মমতাজের হাসি-হাসি, লাবণ্যে আভা-ছড়ানো মুখ—দ্বিজপদর বুকের ভিতরে এক ঝাপসা মুখের স্মৃতিকে এক আশ্চর্য আলোয় উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল। সেই তার গর্ভধারিণী মায়ের মুখ—খুব শৈশব থেকেই যে মুখটাকে সে বুকের মধ্যে করে আগলে রেখেছিল—বড়-ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ফটোটাতে মায়ের মুখের সেই হাসি একটি অচেনা মেয়ের মুখে ফুটে উঠেছিল স্নিগ্ধ আলোর শিখার মত। ওর বুকের মধ্যে একটি গোপন বাসনা থরথর করে কেঁপে উঠেছিল—মায়ের বুকে স্তন্য-পানের আবাল্য অতৃপ্ত ক্ষুধা তীব্র এক যন্ত্রণার মত ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে।

সেই মেয়েকে বন্ধু করে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল দ্বিজপদ। পরিচয় হতেও দেরী হয় নি। একজিবিশন হলে দ্বিজপদর আঁকা ম্যাডোনার ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটির মুখে প্রশস্তির অস্ফুট ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল—ওঃ কি অপূর্ব মায়ের ছবি।

দ্বিজপদ পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ওর বুকের মধ্যে থরথর করে কাঁপছিল; দ্বিজপদ নিজেই এগিয়ে এসে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করেছিল, ঠোঁটের কোণে মায়ের মুখের সেই অলৌকিক হাসি ফুটিয়ে মেয়েটি নাম বলেছিল—মমতাজ।

মমতাজই ওর জাত ধর্ম, পিতা-পিতামহের ঐতিহ্য—সব ভুলিয়ে দিয়ে এক দুঃসহ যন্ত্রণায় পাগল করে দিয়েছিল। বুকের মধ্যে অনেকদিনের পুরানো একটি ক্ষত যা এতদিন বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিল—হঠাৎ নিঃশব্দে রক্ত ঝরিয়ে, বুকের মধ্যে উন্মোচিত দগদগে ঘা হয়ে ফুটে উঠেছিল। দ্বিজপদ যন্ত্রণায় পাগল হয়ে মমতাজের শরীরে সেই ক্ষতের নিরাময় প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু মমতাজ ওকে আশ্চর্য রহস্য-নদীর পারে দাঁড় করিয়ে দিল। সেই নদীর নাম—ভালবাসা। শরীরের দুকূল ছাপিয়ে হৃদয়ের গভীর সমুদ্রে হারিয়ে যায়। দ্বিজপদ কিন্তু তখনও দেহের তটরেখাকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

এক মনোরম সন্ধ্যায় আকাশে যখন অজস্র তারার ফুল ফুটে উঠেছিল। মন্থর ঝির ঝির বাতাসে ঢেউগুলো তির তির করে কাঁপছিল—দ্বিজপদ আর মমতাজ একটি মাথা-চূড়া গাছের নির্জন অন্ধকার ছায়ায় ঘন হয়ে পাশাপাশি বসেছিল। মমতাজের আবছা মুখের পটভূমিতে আরও একটি করুণ, বিষণ্ণ মুখের ছায়া পড়েছিল। দ্বিজপদ হঠাৎ মমতাজের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিল—অন্ধকারেই মমতাজের বুকের ওপরে মুখটা চেপে দিয়েছিল স্তন্য পানের দুরন্ত, দুর্লঙ্ঘ্য প্রত্যাশায়। মমতাজ দ্বিজপদর হাত দুটোকে নিজের মুঠোর চেপে ধরে করুণ, বিষণ্ণ গলায় বলেছিল—দ্বিজ, তোমার আমার ধর্ম আলাদা। আমাদের মিলনে অনেক বাধা, অনেক শাসন, অনেক অভিশাপ আর চোখের জলে আমাদের পথ পিছল হয়ে

আছে। তুমি আমাকে লোভ দেখিও না। পা পিছলে পড়ে গেলে—সে যন্ত্রণা আমি সইতে পারব না।

দ্বিজপদ মমতাজের গলাটা আঁকড়ে ধরে ওর নিজের মুখের ওপরে নামিয়ে এনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল আরও এক আশ্চর্য মুখের চিত্রে কারুকার্য। মমতাজ অনেক প্রশ্ন তুলেছিল—এক পবিত্র প্রেমের স্বপ্ন তুলে ধরেছিল দ্বিজপদর মুগ্ধ চোখে। মমতাজ এক সুখী, সুন্দর সংসারের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। প্রেম সেই সংসারে গঙ্গা-জলে আনত এক জীবনের ছবি হয়ে ফুটে উঠে। বিবাহের মধ্যে দিয়ে সেই প্রেম লাভ করবে সমাজের স্বীকৃতি। মমতাজের কোল জুড়ে আসবে সন্তান। সেই সন্তানকে খোদাতালার পায়ে সমর্পণ করবে মমতাজ। দ্বিজপদ মমতাজের ধর্মপথের অনুগত সাথী হয়ে এক পরিতৃপ্ত সুখী স্বামী এবং গর্বিত পিতার সার্থক ভূমিকা পালন করবে।

যখন দ্বিজপদর বুকের ভিতরে মমতাজের প্রেম এক দুরন্ত বাসনার আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছিল।

ধর্ম, সংসার, বিবাহ, পিতৃত্ব—সব ছাপিয়ে ছাপিয়ে এক দুরন্ত বুভুক্ষা মায়ের বুকে স্তনপানের চঞ্চল তৃষ্ণা দ্বিজপদকে পাগল করে দিয়েছিল। দ্বিজপদর সেই চঞ্চল বুভুক্ষা মমতাজের দ্বিধাগ্রস্ত তাঁর প্রেমকে দেহ-সম্ভোগের পাপ-বোধে পীড়িত করে দিয়েছিল। এ সব পরে দ্বিজপদর রা

AS-C-23

[illegible] শুধু স্বামীদের অধিকারেই ওর দেহের প্রভু হতে পারে। শুধু মাতৃত্বের আশ্বাস দিয়েই ওর দেহে বীজ বপন করতে পারে। অবৈধ দেহ-সম্ভোগের কলঙ্ক দিয়ে সেই পবিত্র শুচিস্নিগ্ধ ভবিষ্যতকে বিপন্ন করতে কিছুতেই রাজী হয় নি মমতাজ। দ্বিজপদর অস্তিত্বে তখন ভবিষ্যৎ শূন্যের মত অর্থহীন হয়ে গিয়েছে।

শুধু অন্ধকার এক অতীত মমতাজের সুন্দর শরীরে দুরন্ত বন্যার আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে। দ্বিজপদ সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অতীতের অন্ধকার থেকে গর্ভধারিণী জননীকে টেনে-হেঁচড়ে তুলে আনতে চেয়েছিল।

মমতাজ অনেক বাধা দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিজপদ ওর পা দুটো বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে কেঁদে কেঁদে ওর করুণা প্রার্থনা করেছিল। শেষ পর্যন্ত মমতাজকে হার মানতে হয়েছিল—দু-চোখ বুজে জড়িয়ে অবুঝ, অশান্ত প্রেমাস্পদের বুভুক্ষু বাসনা আগুনে সে নিজের দেহকে সমর্পণ করেছিল। কিন্তু দারুণ পাপবোধের যন্ত্রণা আর অপবিত্রতার ঘৃণায় থরথর করে কেঁপে উঠেছিল মমতাজের সম্ভোগ-পীড়িত শরীর। দ্বিজপদর পায়ের তলায় আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল মমতাজ—ওগো, এই পাপ আমাদের সর্বনাশ করবে।

তবুও মমতাজকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল দ্বিজপদ।

বিবাহ নামক একটি সামাজিক বন্ধনে তখনও দ্বিজপদর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসই মমতাজের প্রতি একটি নৈতিক কর্তব্যবোধে ওকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দ্বিজপদ তাই খুব সহজেই মমতাজের ঐতিহ্যগত সতীত্বের ধারণার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছিল।

দ্বিজপদ মমতাজের দেহকে সম্ভোগ করে ওর জীবনে অন্য পুরুষের প্রবেশকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে—মমতাজের এই সৎ বিশ্বাসে দ্বিজপদ আঘাত করতে চায়নি। দ্বিজপদর হতাশ ভাবনায় তখন ভবিষ্যতের কোন উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি ছিল না। শুধু নিষ্ফল, ব্যর্থ সম্ভোগের ক্লান্তি তার সমস্ত অস্তিত্বকে অবসাদে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তবুও সেই ক্লান্তিকে সে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি মমতাজের সঙ্গে বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল।

কিন্তু মমতাজ বেঁকে বসল। এই বিয়ের স্বপক্ষে ওর মত নেই। মমতাজ নিজের সমাজে মাথা উঁচু করে সারাজীবন বাঁচতে চায় স্বামী এবং সন্তানদের হাত ধরে। আত্মসম্মানের সেই সহজ সোজা স্বাভাবিক পথকে সে অস্বীকৃতি এবং অসম্মানের কাদা ছিটিয়ে কিছুতেই নোংরা করতে পারবে না।

হঠাৎ দ্বিজপদর বুকের ওপরে আছড়ে পড়ল মমতাজ। দ্বিজপদ লাফ দিয়ে ওর গা থেকে যেন একটা মৃত, ঠাণ্ডা সাপকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। মমতাজ কিন্তু শক্ত হাতে দ্বিজপদকে আঁকড়ে ধরেছিল। রক্তহীন, ফ্যাকাসে ঠোঁট-দুটো থরথর করে কাঁপছিল। ওর শরীর থেকে খুব কড়া, উত্তেজক একটা গন্ধ উঠছিল—দ্বিজপদর মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে উঠল। গলা ঠেলে একটা শুকনো বমি উঠে আসছিল। দ্বিজপদর নিরুত্তেজ শরীর বিদ্রোহ করে উঠল। মমতাজের হাতের বাঁধন থেকে মুক্তি চাইল দ্বিজপদ। কিন্তু রোগা রোগা চিকন হাত-দুটো কি অসম্ভব শক্তিতে ওর গলাটা আঁকড়ে ধরে আছে। দ্বিজপদ মমতাজের বুকে জোর ধাক্কা দিয়েও ওর হাতের বাঁধন আলগা করতে পারল না। মমতাজ পাগলের মত মুখ ঘষছিল দ্বিজপদর বুকে। হঠাৎ খুব জোরে ঠোঁট-দুটো দ্বিজপদর ঠোঁটের ওপরে চেপে ধরল। বিস্বাদ ভিজে ঠোঁটের ঠাণ্ডা স্পর্শে দ্বিজপদর সারা দেহ ঘিন ঘিন করে উঠল। এক ঝটকায় মমতাজকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল দ্বিজপদ।

ফুকরে কেঁদে উঠল মমতাজ—ওগো, আমাকে তুমি এমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিও না। বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে কোনদিন ঠকাব না। দেখবে—দেখো, তুমি আমার শরীরের ঐশ্বর্য! অন্ধকারে সে ঐশ্বর্য এতদিন তোমার চোখে আড়াল করে রেখেছিলাম—আজ দু-চোখ ভরে দ্যাখ সেই ঐশ্বর্য। তুমি যা চাও—সব—সব আছে এই শরীরে।

তোমাকে শুধু সারাজীবন ধরে নিপুণ হাতে খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে নিতে হবে এই শরীরের সুখ, ঐশ্বর্য, ভালবাসার পাকা ফসল।

মমতাজ হঠাৎ ক্ষিপ্র-হাতের টানে শাড়িটা খুলে মেঝের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বোতামগুলো টেনে ছিঁড়ে ব্লাউজটাকে গা থেকে খসিয়ে দিল। হাত দুটো পিঠের দিকে ঘুরিয়ে ব্রা-এর ফিতেয় টান দিতেই দ্বিজপদ চোখের ওপরে হাত রেখে চিৎকার করে উঠল—মমতাজ, বন্ধ কর তোমার এই নিষ্ঠুর খেলা। আমি তোমার শরীর দেখতে চাই না। বিশ্বাস কর, এই মুহূর্তে তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। মমতাজ ভিজে চোখের তারা দুটো নাচিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল—দ্যাখো, দু-চোখ ভরে চেয়ে দ্যাখো, আমার শরীরে আগুনের রূপ কত সুন্দর। আমি নিজের হাতে আজ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি এই শরীরে।

ঘরে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছিল। দ্বিজপদ মুখ ঘুরিয়ে নিল।

হঠাৎ করুণ হয়ে এলো মমতাজের কণ্ঠস্বর। দুর্বল, অসহায় গলায় বলল—ওগো, আমি জানি, আমার দেহে তুমি সুখ পাওনি। বার বার তোমাকে দেহ-দান করেছি আর পাপের ভয়ে আমার দেহটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আমার অনিচ্ছুক ঠাণ্ডা দেহে অনেক তাপ, ভালবাসার অনেক শব্দ উচ্চারণ করেও তুমি আগুন জ্বালাতে পারনি; সারা দেহে হাত বুলিয়ে অন্ধকারে ঐশ্বর্যের চাবি-কাঠিটা খুঁজে পাওনি। ওগো আমি সেই ঐশ্বর্যের চাবি-কাঠিটা যে আমি নিজের হাতেই বন্দী রেখে তোমাকে অন্ধকারের ধাঁধায় ঘুরিয়েছি। প্রবঞ্চনা দিয়ে তোমাকে আমি নিজেই অসুখী করে তুলেছি। ওগো, আজ তো আর অন্ধকার নেই। আজ আমি নিজের হাতেই আগুন জ্বালিয়েছি আমার দেহে।

মমতাজ আবার দু-হাত বাড়িয়ে দ্বিজপদর গলাটা আঁকড়ে ধরল, দ্বিজপদর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হল গলায় জড়ানো উপবীতটা ফাঁসের দড়ির মত নিঃশ্বাসটাকে চেপে ধরেছে বুকের ভিতরে।

দ্বিজপদ সেদিন মমতাজের আগুন-জ্বলা শরীরের দহন-জ্বালাকে সহ্য করতে পারে নি। ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ওর সামনে থেকে। নৈরাশ্য মেঘাবৃত আকাশের অন্ধকারের মত ওর আত্মাকে ঢেকে দিয়েছিল। সারা রাত দু-চোখে ঘুম আসেনি। দহনের জ্বালায় ছটফট করেছিল: ধর্ম, সমাজ, ঐতিহ্য, ধর্ম আর ঐতিহ্যের বেড়াজাল দিয়ে বাঁধা মমতাজের অন্ধ প্রেম ধর্মীয় বিবাহের সামাজিক অনুষ্ঠানেই যার সার্থক পরিণতি দ্বিজপদর অস্তিত্বের চারপাশে খাড়া দেওয়াল তুলে দিয়েছিল। সেদিন এক রক্তের উপলব্ধির জন্ম হয়েছিল দ্বিজপদর কাছে, রক্তাক্ত আত্মায়। মানুষের স্বেচ্ছা-মৃত্যুর সে এক নিষ্ঠুর নগ্ন সত্যোপলব্ধি। মানুষের অস্তিত্বে প্রতি মুহূর্তে কত অজস্র অসংখ্য সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাচ্ছে। মানুষ সেই অজস্র সম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্বের মুক্তি খুঁজছে। কিন্তু ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জড় সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্ব—মানুষের মুক্ত সম্ভাবনাগুলোকে স্থির, নির্দিষ্ট সব ধারণার বন্ধনে বেঁধে ফেলছে। মানুষের অস্তিত্বের কি আশ্চর্য ট্র্যাজেডি! বর্তমানের প্রতি মুহূর্তে অসীম সম্ভাবনার উপলব্ধি, অথচ ভবিষ্যতের চিন্তা মৃত্যুর সীমা দিয়ে বাঁধা—মৃত্যু মানেই সব সম্ভাবনার অন্তিম সমাধি—অনন্তের একেবারে গভীরে তলিয়ে যাওয়ার দারুণ ক্লান্তিকর ভীতি। সেই মৃত্যু তার সম্পূর্ণ নিঃস্ব, একক, নিঃসঙ্গ অন্ধকার অনন্তে ডুবে যাওয়ার পদধ্বনি এক রহস্য-রেখা। সেই মৃত্যু-ভয়, একক, নিঃসঙ্গ সেই অন্ধকার পথ-যাত্রার ভীতি মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে সমাজ, ধর্ম, আর ইতিহাসের প্রবঞ্চনায়। ধর্ম মানুষকে অমরত্বের আশ্বাস দিয়ে অভয়-বাণী শোনাচ্ছে—ঈশ্বর নাকি এক সার্বজনীন প্যাটার্নে মানুষকে সৃষ্টি করেছিল। মনুষ্য-জাতির ঘনীভূত সত্তায় সেই ঐক্যের উপলব্ধি। তাই মানুষকে সমাজ গড়তে হবে—সেই ঘনীভূত ঐশ্বরিক সত্তার উপলব্ধির জন্য ব্যক্তি-সত্তার চাহিদাগুলোকে ডিঙিয়ে সমাজের দাসত্ব করতে হবে। ইতিহাসের আবর্তিত ধারা-বাহিকতার অতীত আর বর্তমানের শিকল দিয়ে ভবিষ্যতকে বেঁধে ফেলতেই হবে। তবেই নিশ্চিত হবে ভবিষ্যত সেই ঘনীভূত সত্তার সার্থক উপলব্ধিতে আত্মা প্রজ্জ্বল

[illegible] আজ। মুক্তিকামী মানুষ মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে আরও অজস্র অসংখ্য ধারণার বাঁধনে নিজেকে বেঁধে ফেলছে। দাসত্বের মধ্যে মুক্তির কি ট্র্যাজিক প্রয়াস। দ্বিজপদ সেদিন আত্ম-প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি চেয়েছিল। অথচ মমতাজ ওকে সেই প্রবঞ্চনার জালেই জড়িয়ে দিয়ে আরও গভীর এক অনিশ্চয়ের অন্ধকারে তলিয়ে দিয়েছিল। এই প্রবঞ্চনা দ্বিজপদকে ক্রুদ্ধ করেছিল। সেই ক্রোধ থেকে এক আশ্চর্য হতাশার জন্ম। সে নিজেও তার অস্তিত্বকে ধর্ম আর ঈশ্বরের দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। মমতাজও সেই শিকল পায়ে পরে অজস্র সম্ভাবনায় ভরা এক মুক্ত প্রেমকে গলা টিপে মারল। দ্বিজপদ সেদিন দারুণ ক্রোধে ফুঁসে উঠতে চেয়েছিল—প্রবঞ্চক ঈশ্বরের গলা টিপে ধরার প্রতিশোধ বাসনায় কিন্তু হন্যে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্বল, শিথিল হাত দুটোর মুঠো পর্যন্ত বাঁধতে পারেনি একক, নিঃসঙ্গ জীবনের নৈরাশ্য আর হতাশার ব্যক্তিসত্তার চার-দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বেঁধে ফেলেছিল। ভয়ংকর ক্লান্তি অব শূন্যতা ওর টুঁটি চেপে ধরেছিল। কিন্তু দ্বিজপদ বুঝতে পারেনি—কখন যেন নিঃশব্দে ঈশ্বরের মৃত্যু ঘটেছে সেই মৃত্যু তার শেষ আশ্রয়কেও কেড়ে নিয়েছিল। দ্বিজপদ আশ্রয়চ্যুত এক পক্ষী-শাবকের মত একক, নিঃসঙ্গ গগন বিহারের যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে ছায়াহীন, জলহীন রৌদ্র-দগ্ধ জীবনের পথে পথে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ব্যক্তিসত্তার চার দেওয়ালে মাথা কুটে কুটে নিষ্ফল মুক্তির প্রয়াসে আজ সে বড় ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত। কিন্তু সামনে-পিছনে কোথাও জল নেই, ছায়া নেই, আশ্রয় নেই, আশ্বাস নেই। মাথার ওপরে শুধু প্রখর সূর্য অগ্নিপিণ্ডের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় গলা, ঠোঁট সব শুকিয়ে গিয়ে দুর্বল কণ্ঠের শেষ আর্ত-চীৎকার—ওগো কে আছ—কোন্ কিশোরী সজল শ্যামল পান্থ-পাদপের মত দাঁড়িয়ে আছ—আমার মুখে একটু জল ঢেলে দাও গো—সেই শেষ কণ্ঠস্বরও আজ নীরব, নিশ্চুপ।

(চার)

শ্রীমতী সাবর্ণ অ্যাভিনিউএর স্টপে থামতেই দ্বিজপদ তড়িঘড়ি নেমে পড়ল। কাশ্মীরী শালটা দিয়ে ময়লা পাঞ্জাবীটাকে বেশ ভাল করে ঢেকে নিল। খুব জোর পায়ে হাঁটতে লাগল দ্বিজপদ। পাশেই একটা দোকানের দেওয়াল-ঘড়িতে সময় দেখে চমকে উঠল। যাঃ, নটা বেজে গেল। শোভনা রায় নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিজপদ প্রায় ছুটে গিয়ে সুরভি ভবনের প্রাচীর-ঘেরা লনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রশস্ত লনে সতেজ, সবুজ দূর্বাঘাসের মখমলে মাঝখান দিয়ে ঢাকা, মোরম-বিছানো পথ এঁকে বেঁকে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত প্রসারিত। দুপাশে [illegible] ফুলের কেয়ারি, আকাশ-নীল, জল-ছড়ানো ফোয়ারা, [illegible] টেনিসের পীচ। ছোট-বড় গোলাপের ঝাড়, লাল, হলদে, সাদা—[illegible] ফুটন্ত [illegible] বাহার, প্রাচীর ঘেঁষে ইউক্যালিপ্টাস আর [illegible] গাছের সারি।

দ্বিজপদ কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত হেঁটে গেল। উঁচু সিঁড়ির ধাপে ধাপে লাফ দিয়ে ড্রইংরুমের দরজার সামনে দাঁড়াল। তারপর কলিং-বেলের সুইচটা জোরে চেপে ধরতেই ভিতর থেকে ডিং-ডং ঘন্টার শব্দ ভেসে এলো।

শোভনা রায় নিজেই ড্রইংরুমের দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন। সুন্দর মাপা হাসি দিয়ে দ্বিজপদকে আমন্ত্রণ জানালেন। ড্রইংরুমের বাতাসে খুব দামী সৌরভ দ্বিজপদর নিঃশ্বাসকে আমোদিত করল।

শোভনা রায় অনেক মিষ্টি গলার সুরের ঝংকার তুলে বললেন—বসুন, দ্বিজপদবাবু—আমি সকাল থেকেই সব এনগেজমেন্ট ক্যানসেল করে আপনার অপেক্ষায় বসে আছি। আপনি কিন্তু দেরী করে ফেলেছেন।

তারপর হাতঘড়ির দিকে চকিতে এক ঝলক তাকিয়ে তাড়াতাড়ির ভাব দেখিয়ে বললেন—আমার হাতে কিন্তু বেশী সময় নেই। আবস্ট্র্যাক্ট কনটেম্পোরারী আর্টিস্টদের একটা এক্জিবিশনের আয়োজন আছে। তার বাছাই-এর ভারটা আমার ওপরে পড়েছে। কিনা—আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। আপনার সঙ্গে কাজের কথাটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাই। প্রফেসর খাস্তগীর যখন আপনাকে রেকমেন্ড করেছেন—তখন আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে উনি বলছিলেন—আপনি নাকি সুররিয়ালিজমের ভক্ত, অবস্কিউরিটির কাল্টে বিশ্বাসী। আমি কিন্তু আগেই বলে রাখছি—আমার কাছে এক্সপেরিমেন্টের কোন স্কোপ্ নেই। আপনাকে আমি যেভাবে ডাইরেক্শন দেব—ঠিক সেইভাবেই আপনাকে পেন্টিং-এর কাজ করতে হবে। যদি এই সর্তে আপনি রাজী থাকেন—তবেই আপনার সঙ্গে এস্টিমেট সংক্রান্ত কথাবার্তা হবে। আমি সব ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা পছন্দ করি। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী আছেন তো?

শোভনা রায় সুন্দর ভ্রু-ভঙ্গী দিয়ে দ্বিজপদর চোখে খুব ধারালো প্রশ্নের বাণটা ছুঁড়ে দিলেন। দ্বিজপদর নাড়ির মধ্যে যেন এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আগুনের শিখা হয়ে জ্বলে উঠেছিল। সকালের ভাজা মাছের লোভনীয় স্মৃতি নাকের সামনে ঘুরঘুর করছিল। গরম ধোঁওয়া-ওঠা একথালা ভাত—বেগুনের ভাগ দিয়ে মেখে মুড়মুড়ে ভাজা মাছের সঙ্গে বড় বড় গ্রাসে পেটের মধ্যে চালান করে দেওয়ার জন্যে রসনা খালি পেটের আগুনকে [illegible]

[illegible] ছোট-খাটো উচ্চা মাত্র। কিন্তু ক্ষুধা থেকে মুক্তি [illegible] আবার সেই আত্মপ্রবঞ্চনা। [illegible] মুক্তির নির্মম প্রয়াস। শোভনা রায়ের [illegible] বন্ধনে ধরা না দিলে ক্ষুধা থেকে [illegible] নেই।

দ্বিজপদ বেশ জোর গলায় [illegible] উচ্চারণে বলল—শোভনা দেবী, আপ[illegible] সর্তে পুরোপুরি রাজী আছি। প্রফেসর খা[illegible] গীর আপনাকে কি বলেছেন জানি না। [illegible] সুররিয়ালিজম্ কিংবা অবস্কিউরি[illegible] কথা যা বলেছেন—সে সম্পর্কে আ[illegible] নিজেরই কোন ধারণা নেই। নিজের [illegible] কল্পনায় যা ধরা পড়েছে—ছবিতে তা [illegible] ফুটিয়ে তুলেছি। কোন থিওরী [illegible] স্কুলের নিয়মের বাঁধনকে আমি কো[illegible] স্বীকার করিনি। কিন্তু পেটের খিদের [illegible] যন্ত্রণা—খিদের বাঁধন থেকে তো [illegible] নেই। সেই বাঁধনেই আজ নিজেকে [illegible] ফেললাম। শোভনা দেবী, আপনাকে বো[illegible] পারব না আমার বুকের মধ্যে এখন [illegible] দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। পেটের খিদের [illegible] আরও অসহ্য, জ্বালা-ধরানো এই [illegible] আমার বিপন্ন অস্তিত্বকে কি দারুণ স[illegible] গভীরে ঠেলে দিয়েছে—আপনাকে [illegible] বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার [illegible] চাই—দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার [illegible] অনেক টাকা চাই। পেটের খিদে আমি [illegible] সহ্য করতে পারছি না। আপনার সর্ত [illegible] করতে আমি রাজী আছি। শুধু [illegible] দাসত্বের মূল্য কত ধার্য হল—আপনার [illegible] থেকে সেই কথাটি শুনতে চাই।

দ্বিজপদ চাপা উত্তেজনায় থরথর [illegible] কাঁপছিল। লালচে চোখের বিহ্বল দৃ[illegible] আশ্চর্য এক ভয়ের ছায়া ফুটে উঠে[illegible] দ্বিজপদর ভীত, বিহ্বল দৃষ্টির সামনে [illegible] কাঁপছে লাল রেখা অন্ধকারের গায়ে, [illegible] হয়ে উঠে ক্রমশঃই ওর বুকের কাছে [illegible] আসছিল। দ্বিজপদর মনে হল—এবার [illegible] অনিবার্য। শোভনা রায় মৃত্যুর [illegible] দূত নিয়ে টুসটুসে গোলাপী [illegible] হাসি ফুটিয়ে বিজয়িনীর মত বসে [illegible] ওর সামনে। নাঃ আর কোন আশা [illegible] অদ্ভুত আশ্চর্য—বন্ধনের যন্ত্রণায় পাগ[illegible] ধর্ম, সমাজ, ঐতিহ্য, ইতিহাস [illegible] সবকিছুকে অস্বীকার করে সে আর্টের [illegible] আশ্রয় নিয়েছিল মুক্তির শেষ প্রয়া[illegible] আর্টের মুক্ত সাধনায় সে অস্তিত্বের [illegible] মুক্তির আশ্বাস পেয়েছিল। কিন্তু [illegible] পর্যন্ত সেই আর্টের জগতেই তার [illegible] মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। এই মু[illegible] নৈরাশ্য-বোধে পীড়িত, ক্লিষ্ট তার [illegible] মৃত্যুর দুঃসহ বন্ধনের যন্ত্রণা, হতাশা [illegible] ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যতের ভাবনা [illegible]

...তে জানিয়েছিল। কিন্তু ... নিঃসঙ্গ দিনগুলো থেকেই যে ... সঙ্গে খেলা করছে। বার বার ... সামনে মৃত্যুর লাল রেখাটা ... উঠেছে। সমাজ, ইতিহাস ধর্ম—বার ... তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছে ...ছে। সমাজ বারবার ওর পায়ে অদৃশ্য ...র বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। ইতিহাস ... বর্তমান আর ভবিষ্যতের গোলক- ... ধাঁধায় ঘুরিয়ে মৃত্যু অতীতের ...ই মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে—ধর্ম অদৃশ্য ...লা দিয়ে ঈশ্বর নামক এক অলীক ... হাসতে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু সে বার সেই বন্ধনের শিকলগুলো ছিঁড়ে ... মৃত্যুর দুয়ার থেকে উঠে এসেছে। ...ও সে পরাজিত করে প্রতিদ্বন্দ্বী ... ভূমিকায় সেকেন্দার এক আশ্চর্য ... জগতের সৃষ্টি করেছিল। সেই জগৎ একান্ত নিজস্ব, সেখানে সে অনন্ত ... কমল কানিকে হাঁড়কে অর্জন করতে ...ছিল। সেখানে মৃত ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট ...নায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।... শুধু- ... বন্ধনকে অস্বীকার করে শুধু আর ...ভোগের সমস্ত বাসনাকে উপেক্ষা করে ... নিঃসঙ্গ বাঁচিয়ে রাখার চার দেওয়ালের ... আত্মার ব্যক্তির মুক্তির সাধনায় নিমগ্ন ...ছিল। কিন্তু শিবপদ হেরে গেল—দেহ ... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের শিকল থেকে আত্মাকে ... করতে পারল না। সম্ভোগ আর কামনার ...নে বঞ্চনা বার বার উজ্জ্বল আগুনের মত ...তে পাক হয়—সেই আগুনের আঁচে ... ভিতরটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়।

যন্ত্রণার জ্বালায় কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে মুক্তি-কামী আত্মা—শিবপদ নিজের দেহটাকে শাসন আর সংযমের চাবুক মেরে আরো অনেকদিন পর্যন্ত আত্মমুক্তির নিষ্ফল প্রয়াসে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। সম্ভোগের সুখকে অস্বীকার করে ভবঘুরে পতনের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে পালিয়ে বেড়িয়েছিল। কিন্তু বারবার বেড়ে উজ্জ্বল আগুনের আঁচ বাঁচিয়ে পঞ্চ... সেই আগুনে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পথ ছেড়ে আত্মার শরীরে প্রবেশ করেছিল। মানুষ বনমুখে অস্থির হয়ে দেশ-পর্যন্ত আত্ম-প্রবঞ্চনার পথ বেছে নিয়েছিল শিবপদ। খালাসিটোলার পাঁচু সাবুর দেশী মদের আড্ডায় গিয়ে আকণ্ঠ মদ গিলেছিল—তারপর রাস্তা থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে ঘর করেই রাত ভোর করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই পথের প্রেমের ঘুণ-ধরা শরীরের নরক থেকে সে উঠে এসেছিল পবিত্র শরীরের সান্ত্বনা নিয়ে। মেয়েটা তার শরীর নিয়ে সারা রাত খেলা করেও তাকে সম্ভোগের নরকে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি। মমতাজের কাছেও সে সম্ভোগের সুখ পায় নি। ওর শরীরের মন্দিরে মায়ের মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু মমতাজ ওকে ব্যর্থ সম্ভোগের অতৃপ্তিতে ডুবিয়ে দিয়ে হারিয়ে গেল। এখন শিবপদ শরীরের দাস হয়ে গিয়েছে যেন। বুক জুড়ে সম্ভোগের বাসনা দিন-রাত আহত পাখীর মত ডানা ঝাপটায়। সোনা বৌ-এর আঁট-সাঁট শরীরে তাকে রাতে সম্ভোগের সুখ খুঁজতে হবে—কারণ আজ সে শুধু শরীর হয়েই ঘরে ফিরবে।

শোভনা রায় অনেক টাকা দিয়ে ওর আত্মাকে কিনে নেবে—তারপর সেই আত্মাকে দলে-পিষে ছিঁড়ে-খুঁড়ে নির্মম অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওর শরীরটাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে দেবে। আজ থেকে শিবপদ শুধুই শরীর—সম্ভোগ আর কামনার আগুনে পোড়া নিছক এক মনুষ্যহ—আজ থেকে সোনা-বৌ আর শোভনা রায় এই শরীর নামক যন্ত্রটা নিয়ে কত সখের খেলা খেলবে।

শিবপদ শোভনা রায়ের শরীরের রেখা আর ভঙ্গিগুলোকে স্পষ্ট চোখে মাপতে লাগল। কি আশ্চর্য বাহার এই শরীরে—কি বিচিত্র কারুকার্য দিয়ে এই শরীরের সৌধ নির্মিত হয়েছে। মোজেইক-করা মসৃণ এই শরীরের বাহার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

সোফায় বসে চঞ্চল কিশোরীর মত পা দোলাচ্ছে শোভনা রায়। ঘাড়ের কাছে লুটিয়ে পড়া বব-ছাঁটা চুলের গুচ্ছগুলো বার বার অবাধ্য হয়ে কপালে, গালে ছড়িয়ে পড়ছে। হাতদুটোকে ওপরে তুলে ঘাড়ের পিছনে নিয়ে গিয়ে বার বার চুলের গুচ্ছগুলোকে শাসন করছে শোভনা রায়। সাদা শিফনের শাড়ির আঁচল কাঁধ থেকে খসে কোলের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে। নীচু হয়ে আঁচলটা কাঁধের ওপরে তুলে দিতে গিয়ে খাটো ব্লাউজের ওপরে উদ্ধত বুকের ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল।

প্রফেসর খাস্তগীরের মুখেই শিবপদ শুনেছে—শোভনা রায়ের বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট স্বামী সমর রায় গত বছর ক্লাবের আসরে হঠাৎ হার্ট-ফেল করে মারা গিয়েছেন। শোভনা রায়ের শূন্য সীঁথি আর নিরাভরণ দুটি হাত যেন দুধ-সাদা শিফনের শাড়ির পাড়-বিহীন আঁচলের নিশান উড়িয়ে বৈধব্যকে ঘোষণা করছে। বাঁহাতের কব্জিতে একটা ছোট্ট ব্রেসলেটের কলকাতার ঘড়ি আর বুকের খাঁজে একখণ্ড উজ্জ্বল হীরার লকেট বৈধব্যের সমস্ত প্রতীক মাত্র।

শোভনা রায় আবার হাতদুটোকে ঘাড়ের পিছনে নিয়ে গিয়ে অবাধ্য চুলের গুচ্ছগুলোকে শাসন করল। খাটো ব্লাউজটা বুকের কাছে গুটিয়ে গিয়ে মেমসাহেবের মত মসৃণ চিকন পেটটাকে চোখের ওপরে মেলে ধরল। শিবপদর সন্ধানী চোখ-দুটো উদ্ধত বুকের ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শোভনা রায়ের শরীরটা যেন প্রখর উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো আলো হয়ে শিবপদর মুগ্ধ চোখের ওপরে জ্বলে উঠল।

শোভনা রায় সারাদেহে খিলখিল হাসির তরঙ্গ তুলে বলল—আমার দিকে চেয়ে অমন করে কি দেখছেন? আমি আপনার মডেল নাকি? আপাততঃ আপনাকে সিটিং দেওয়ার মত সময় মোটেই আমার হাতে নেই। আপনাকে আমি ... টাকা অ্যাডভান্স দিচ্ছি। বাকি টাকা কাজ শেষ হলে পাবেন। প্রফেসর খাস্তগীরের সঙ্গে কনসাল্ট করে মোটামুটি একটা রিজনেবল অ্যামাউন্ট আপনাকে অবশ্যই দেব। আপনি কি সব কথা বলছিলেন—আমি কিছুই মানে বুঝিনি। তবে আগেই বলে রাখছি—আপনাকে আমার ডাইরেকশন ফলো করতে হবে। এক্সপেরিমেন্ট যা কিছু আমিই করব আপনি নয়।

শোভনা রায় শিবপদর আঙুলে গুঁজে টাকার চেকটা ওর হাতে তুলে দিল—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের কোণে মাপা হাসি ফুটিয়ে বলল—তাহলে আজ আপনি আসুন। কাল সকাল থেকেই কাজ শুরু করা যাবে।

শিবপদ দুহাত কপালে ঠেকিয়ে ড্রইং-রুম থেকে বেরিয়ে লন পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল।

(আগামী সংখ্যায় [illegible])

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা ...করেছেন।

সব ঔষধের দোকানেই পাওয়া যায়।

বিস্মৃত বিপ্লব বিস্মৃত নায়ক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

কথাটা বেশী দিনের নয়, মাত্র পঁচিশ বছর—কিন্তু পাব্লিক মেমারি নামক বস্তুটি বড়ই ক্ষীণ, সাধারণের স্মৃতিশক্তির এই দুর্বলতার জন্য আজ পঁচিশ বছর আগেকার একটি বীরত্বের ইতিহাস আমরা ভুলতে বসেছি। সরকারী স্বীকৃতিরও অভাব আছে। কিন্তু সমকালীন ইতিহাস এই বিপ্লবকে অস্বীকার করতে পারেনি। বৃটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস রচিত—'এ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' এই বিপ্লবের উল্লেখ আছে,—আই-এন-এ'র বিচার হচ্ছে দিল্লীর লাল কেল্লায়,—সেই ১৯৪৬-এর কথা—

> "The Government of India now, with remarkable short sightedness, brought to trial in India a number of officers from the former Indian National Army. This gave immense publicity to the work of Subhas Rose, about which most of India was imperfectly informed. Naturally, the consequence was another wave of popular demonstrations. More dangerously still, a mutiny occured in February 1946 in the Royal Indian Navy."

মাইকেল এডওয়ার্ডস অনায় স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁর আই-এন-এ এবং এই নৌ-বিদ্রোহ ঘটার ফলেই ইংরাজ ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

কিন্তু সেদিনের সেই বিপ্লবের স্মৃতি আজ যেন মুছে গেছে, ইতিহাসের একটি মাত্র লাইনই কি যথেষ্ট? বিস্মৃত বিপ্লব আর তার বিস্মৃত নায়কের কাছে আমাদের কি কোনো ঋণ নেই? এই প্রশ্ন পঁচিশ বছর পরে আবার নতুন করে উঠেছে—সেদিনের সেই বীর বিপ্লবীর কণ্ঠে আজ বেদনার বিষণ্ণ সুর। নৌ-বিদ্রোহ স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি পর্ব এই স্বীকৃতি পেয়েছিল যৌবন, কিন্তু সেদিনের নায়ক বাঙালী বীর বি সি দত্ত বলছেন—

"—অনেক আশ্বাস, অনেক প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম আমরা। তখনকার সেণ্ট্রাল অ্যাসেম্বলীর ফ্লোরে বিতর্কের তুফান উঠেছিল, বিরোধী দল সেনসর মোশান এনেছিলেন। কংগ্রেসের ওপর সারির নেতৃবৃন্দ আশ্বাস দিয়েছিলেন, আই-এন-এ'র সৈনিকদের মত আমাদেরও আবার কাজে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হবে, এমনকি স্বাধীন ভারতেও পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে কর্তৃপক্ষ সেই প্রতিশ্রুতির পুনরুক্তি করেছেন।"

তাহলে? সেই প্রতিশ্রুতির কি হল? এই প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে জাগবে। শ্রীযুক্ত দত্ত বলছেন—

"—হ্যাঁ, আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমি যখন আবার নেভিতে ফিরে যাওয়ার জন্য আবেদন পাঠালাম, তখন চারপাশে যে নীরবতা তার ফিসফিসানি হয়ত চাঁদে বসে শোনা যেত। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদনখানি পাঠালাম, যথারীতি তা নেভাল হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হল; আর রীতিমাফিক পদ্ধতি অনুসারে সরকারী ফাইলের অভ্যন্তরে তার সমাধি ঘটল। সরকারী স্মৃতির বাহু অনেকখানি প্রসারিত, আমি যখন আর্মিতে ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম, তখন আমাকে সবরকম পরীক্ষা করা হল, আমি সব পরীক্ষায় পাস হলাম, কিন্তু চূড়ান্ত ইণ্টারভিউ-র সময় যখন বড়কর্তা জানলেন যে, আমি আর-আই-এন মিউটিনির সঙ্গে জড়িত, তখন আমাকে আবার বোম্বাই শহরের ফুটপাথেই নেমে আসতে হল।"

১৯৪৬ খৃঃ-র ফেব্রুয়ারী মাসে আর-আই-এন মিউটিনির নেতা বি সি দত্তের বয়স ছিল মাত্র বাইশ বছর। আজ তাঁর বয়স সাতচল্লিশ, মাথার চুলে পাক ধরেছে। দামোদর তীরস্থ নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বি সি দত্তকে বিরাট পরিবার প্রতিপালনের ভার নিতে হয় অতি অল্প বয়সেই। তাই প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়েই সাংসারিক প্রয়োজনে রুজি-রোজগারের চেষ্টায় জীবন-সংগ্রামে নামতে হয়। যখন রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভিতে যোগদান করলেন, তখন বয়স সতের বছর, আর এর পাঁচ বছর পরেই প... এসে দাঁড়াতে হল।

সেই দুর্দিনে কোনো আশ্রয় মেলে... কোথাও। কিন্তু একজন সহৃদয় দেশপ্রেমি... মানুষ দত্ত এবং তাঁর সঙ্গী মদন সি... দুজনকেই বুকে টেনে নিয়েছিলেন। ম... সিং ছিলেন নেভাল সেণ্ট্রাল স্ট্রা... কমিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট আর এর ... খান ছিলেন প্রেসিডেণ্ট। এঁদের কথা এখ... স্মরণে আছে বি সি দত্তের।

মদন সিং এবং দত্ত তখন ইংরাজ... ঠিকমত পড়তেও পারতেন না কিন্তু ... প্রেস জার্নালের সম্পাদক এস নটরা... ওদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। মিউটি... দ্বিতীয় দিনেই তিনি সাহস করে সম্প... সংবাদও প্রকাশ করেছিলেন। দত্ত বলেছে...

> "He was the only man who h... compassion enough to take us ... In fact, he also had the intel... gence and the courage to publ... news about the Mutiny on ... 18th, the day after the Mut... broke out It took hell of a ... of guts. He was our pipeline ... publicist during the struggle. ... protector later."

আজ পঁচিশ বছর পরে শ্রীযুক্ত দত্ত... মিউটিনি তাঁর জীবনের ধারা পরিবর্ত... করেছে, তার ইতিহাস লিখেছেন স্মৃ... চারণের আলিপাকে। বর্তমানে তিনি এ... বিশিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ ক... —একালের মাপকাঠিতে আজ তিনি সফ... মানুষ। সবদিক থেকে সার্থক। এই জাতী... 'সাকসেসফুল' মানুষের জীবনী হয়ত অ... ধারায় প্রবাহিত হতে পারত, কিন্তু বিপ্ল... বি সি দত্ত অতীতকে ভোলেননি। ফেব্রুয়া... মাস এলেই তাঁর অতীতের কথা স্মর... জাগে।

সেই দিনটি থেকে এই সুদীর্ঘ কাল... ব্যবধানে অনেকখানি পথ অতিক্রম ক... এসেছেন তিনি। জ্ঞান-বৃদ্ধ হয়েছে... পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরি... হয়েছেন। কিন্তু এই কালটুকু উত্তীর্ণ ...

...নক চড়াই-উৎরাই অনেক আত্ম-নিগ্রহের ...ন যেতে হয়েছে। শ্রীযুক্ত বি সি দত্ত তাঁর ... প্রকাশিত গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন— মিউটিনি অব দি ইনোসেন্টস, এবং এইগ্রন্থে ...ন্য ভূমিকা লিখেছেন ... ...র সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস এটবালন ... সেই দুর্দিনে বলেছেন ... ...ন। সরকারী উপেক্ষার, ...ন ভূমিকায় বলেছেন, ...ন সেদিন বলেছিলেন যে, ...ই শাসন-ব্যবস্থার হাল ধরবে, তখন ... মতন ডিসিপ্লিন অমান্যকারীদের ... যে সরকারে যাবে না, তাই উপেক্ষা ...ত উপায় কি!

... এই বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকারী ...নীনতা এমনই প্রবল যে, স্বাধীনতা ...কালে সরকারী মহাফেজখানায় এই ...োহের দলিল-দস্তাবেজ বেপাত্তা হয়ে ... মাত্র সম্প্রতি তদন্ত কমিটি ...োর্টটিও আত্মগোপন করেছে।

... জাতীয় নেতাদের অসহযোগিতা এবং ...কালীন বিদ্রোহীদের অন্তরে সুগভীর ...শা এনেছে এবং বিদ্রোহের অবসানে ...দের দুরবস্থার কথা কেউই চিন্তা ...ন না। এর চেয়ে দুঃখজনক অবস্থা ...আর হতে পারে।

... ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ খৃঃ। ভারতবর্ষের ...ধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ...। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তখন ...ক রকম 'স্পেকুলেশন' চলছে। প্রথম ...দ্ধের অবসানে বৃটিশ সরকার ...দেরকে যথাযোগ্য প্রদর্শন করেছিল। ...ও কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে? ... এস এম আই এস 'তলোয়ার' জাহাজ ...কার নেভির টেলিকমিউনিকেশন কর্মকেন্দ্র। ... তলোয়ারের তরুণ রেটিংরা অন্তরে ...জন ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে তাঁদেরও একটা কর্তব্য আছে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কমিশন হবেই নানারকম মতামত আসছিলেন সবাই মিলে, "এঁরা সবাই তলোয়ারের যোগাযোগ বিভাগের কর্মী ছিলেন। একটি বিদ্রোহের পরিকল্পনা নিয়ে রয়েল ইন্ডিয়ান নেভির রেটিংরা তারা উদ্যম করলেন [illegible] বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য। রয়েল ইন্ডিয়ান নেভির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি তরণী সেদিন বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। আরও আশ্চর্য কাণ্ড এই বিদ্রোহ [illegible] ছড়িয়ে পড়েছিল। সেকালে [illegible] কর্তৃপক্ষ অবাক হয়ে [illegible] দেখলেন ভারতীয় সেনারা তাদের সহচরদের ওপর গুলী চালাতে অস্বীকার করল। এমনকি করাচীতেও 'নিরাপত্তা গুর্খা সেনাবাহিনী এইচ এম আই এস 'হিন্দুস্থানের' রেটিংদের ওপর গুলী চালানোর হুকুম তামিল করতে রাজী হল না। তখন আনতে হল সাদা [illegible] ব্রিটিশ সেনাদল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই বিদ্রোহীরা এমন [illegible] অধিকারী ছিলেন তবে কেন শেষপর্যন্ত তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে হল। শ্রীযুক্ত দত্ত এর জবাবে বলেছেন—

"Because we were a bunch of innocents, only a few of us in the Navy were politically conscious and that too in a naive kind of way".

দত্ত বলেছেন—নৌ-বাহিনীতে অনেক রকম অসন্তোষ ছড়ানো ছিল, এ তাঁরা জানতেন। তার কারণগুলিও অজানা ছিল না। আমরা যদি একযোগে আমাদের অভিযোগগুলি পেশ করি, তখনই তা স্বতোৎসারিত ভাবিতে মিউটিনির আকার গ্রহণ করবে। আমরা অনুমান করেছিলাম যে, আমরা সুবিধাটুকু পাব হলেই চরম প্রত্যাঘাত হানবে কর্তৃপক্ষের হাতিয়ার, আর তাহলেই সমগ্র নৌ-বাহিনী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই হল শেষ পর্যন্ত—

শ্রীযুক্ত দত্ত বলেছেন—আমরা কয়জন বড়জোর দল, আমাদের নামকরণ হল 'আজাদ হিন্দ' দল, আমাদের মনে প্রশ্ন জাগল— আমরা কি কারণে নৌ অধিকার করছি। বৃটিশের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের একটা প্রসারিত আন্দোলন হিসাবেই পরিচালিত হবে এই বিদ্রোহ। আমরা যখন নৌতরী জাতীয় নেতাদের হাতে তুলে দেব, তখন তাঁরা আমাদের কাছ থেকে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করবেন।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কিন্তু সংগ্রামের পথে অর্জিত হবে নারাজ ছিলেন। সেই কারণেই আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান আশানুরূপ লাভ করেনি। তাঁদের নেতৃবৃন্দ আবেদন-নিবেদন এবং আলাপ-আলোচনায় বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীযুক্ত দত্ত বলেছেন—

"To them we were an 'inconvenient eruption'". এই সংবাদটুকু সেমুহূর্তে আমরা জানতে পারিনি, তাই বহুক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের প্রত্যাশার উত্তেজনা লোপনহীন লোকজনের মধ্যেই অনুভূতির হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল। শ্রীযুক্ত দত্ত বলেছেন—

"And that was the end of it : our innocence and isolation versus the expertise of the professionals ! What else was there to do but surrender?"

সুতরাং সেদিনের বিদ্রোহের এইভাবেই অবসান ঘটেছিল। আর প্রায় ৪০০০ হাজার বিদ্রোহী দীর্ঘকাল কারাবরণ করতে হয়েছিল। কারাগার থেকে ফিরে তাঁরা জনারণ্যে মিশিয়ে গেছেন, জীবন ধারণের জন্য যে-কোনো রকমের জীবিকা অবলম্বন করতে হয়েছে।

শ্রীযুক্ত দত্ত প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৭ ফেব্রুয়ারী যে 'মিউটিনি'র সূত্রপাত, সেই বিদ্রোহ এমনই প্রবল হয়ে উঠল ১৮ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যে বৃটিশের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অচল হয়ে গেল। টেলিকমিউনিকেশন কর্মকেন্দ্র, সাগরজলের জাহাজ, বন্দরে নোঙর-করা জাহাজ সবই অচল। সাগরের বুকে তখন এইচ এম আই এস 'নর্মদা' এবং 'যমুনা' সেখানেও বিদ্রোহ। এমনকি এডেন, পারস্য উপসাগর প্রভৃতির বেতার-স্টেশনও বিদ্রোহে যোগদান করল। বি বি সি থেকেও সংবাদ পরিবেশিত হল। এই বিদ্রোহের সামগ্রিক বিবরণ সবাই জানল, কিন্তু ভারতীয় নেতাদের কণ্ঠে কোনো উৎসাহের বাণী ধ্বনিত হল না।

পরে অনেকেই বলতে লাগলেন, কুৎসিত খানা সরবরাহের জন্য এই বিদ্রোহ। শ্রীযুক্ত দত্ত সংক্ষেপে বলেছেন—

"Is there any use complaining about that now?"

শ্রীযুক্ত দত্ত গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'মিউটিনি অব দি ইনোসেন্টস', বোধ করি 'ম্যাসাকার অব দি ইনোসেন্টস', নামকরণ করা হলে আরো ভালো হত। এতদিনে তবু একটি স্মরণীয় বিদ্রোহের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রকাশিত হল।

১৭-১৮ ফেব্রুয়ারীর রাত্রি প্রভাত হল আর তার পরদিন কি ঘটেছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর "এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থে—

"On 19th February, Clement Atlee, the British Prime Minister, announced a 'mission to India of some members of his cabinet'.

আই এন এ এবং নৌ-বিদ্রোহ কি ইতিহাসের গতি দ্রুততর করেনি? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন একালের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দল। এই বিস্মৃত বিদ্রোহ আর বিস্মৃত নায়কবৃন্দকে দেশবাসী যেন বিস্মৃত হবে না।

প্রমাণ-পঞ্জী :

(1) The Mutiny which changed History By K. S. Chari

(2) The Mutiny of the Innocents, By. B. C. Dutt Published by SINDHU PUBLICATIONS (P) Ltd. Bombay. Price Rs. 25/- only.

(৩) নৌ বিদ্রোহ—বলাইচন্দ্র দত্ত। প্রকাশক : কম্পাস পাব্লিকেশনস। কলকাতা।

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
...কানন্দার এই
বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
... টি হাউস
... ২, ...
কলিকাতা-১
৬৬ ...

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪৫)

বিকেলের দিকে সোনার জ্বর আবার বেড়ে গেল। ওর ভীষণ শীত করছিল। কম্প দিয়ে জ্বর আসছে। সে ভেবেছিল জ্বর না এলে কাল ঠিক জ্যাঠিমাকে ধরে বড়ো ভাত খাবে। ভাত না খেলে কি যে কষ্ট! যেন সে কতদিন না খেয়ে আছে। মুখ বিস্বাদ। কেবল জল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। মাথা ধরেছে ভীষণ। মাথা ধরার জন্য সে খুব চিৎকার করছিল। জ্যাঠিমা এসে ওর মাথাটা কাপড়ে বেঁধে দিয়ে গেছে। খুব চাপ দিয়ে বাঁধা। বেশ তার আরাম বোধ হচ্ছে। সে এখন জানালা দিয়ে পালেদের ডুমুর গাছ দেখতে পাচ্ছে। ডুমুর গাছে সেই নীলবর্ণের পাখি। সে দেখে চোখ বুজে ফেলল। কারণ কেবল মনে হচ্ছে, এই অসুখে যদি সে মরে যায়। আর ভালো না হয়। তবে সেই নীলবর্ণের পাখিটার সঙ্গে আর একটা পাখি গিয়ে ডালে বসবে। তাকে কেউ আর দেখতে পাবে না। সে সব দেখতে পাবে—এবং দেখেও মাকে বলতে পারবে না, মা আমি গাছের ডালে বসে আছি। কারণ এমন বললেই মা তাকে ভয় পাবে। সে তো আর সোনা থাকবে না, সে মায়ের কাছে তখন একটা অশরীরী আত্মা হয়ে যাবে। এসব ভাবলেই তার কষ্টটা বাড়ে। সে যেন দেখতে পায় সে মরে গেছে, মা তার মাথা কোলে নিয়ে বসে কাঁদছে। সে একটা নীলবর্ণের পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। তার শরীরটা উঠোনে ফেলে রেখেছে অথবা ঠাকুরদার পাশে আর একটা চিতা জ্বলছে, সেই চিতায় ওর এমন নরম শরীর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ধনবৌ কি একটা কাজে ঘরে এলে সোনা বলল, মা জানালাটা বন্ধ কইরা দ্যাও।

—ক্যানরে।

—আমার ডর করে।

ধনবৌ বুঝল সোনার ভয় কাটেনি। সে দরজা বন্ধ করে দেবার সময় এমন বলল, কোন ভয় নেই। ঠাকুরদা তোমার মরে গিয়ে স্বর্গে গেছেন। সেখান থেকে কেউ কখনও ফিরে আসে না।

—আচ্ছা মা আমি মরে গেলে ঠাকুরদার সঙ্গে আমার দেখা হবে?

ধনবৌর বুকটা কেমন কেঁপে উঠল। বলল, এমন বলতে নাই।

—আচ্ছা মা তুমি কাঁদবে আমি মরে গেলে?

—জানি না।

সোনা বুঝল সে মাকে রাগিয়ে দিচ্ছে। সে বলল, মা বড় জ্যাঠামশয় আসেনি।

—না।

—কেউ গেছে খুঁজতে।

—না।

—ঝড় উঠবে না মা? আকাশটা কি কালো!

—চুপচাপ শুয়ে থাক। কথা বলে না।

সোনা কাঁথার ভিতর মুখ টেনে নিল। সে সারা গায়ে কাঁথা লেপ টেনে চুপচাপ শুয়ে থাকল। মাথার কাছে জল। ঘরের চারপাশে ট্রাঙ্ক, কাঠের আলমারি। উপরে কাঠের সিলিঙ। অন্যদিন এ-ঘরে শুয়ে থাকলেই একটা পরিচিত গন্ধ। কিন্তু আজ সে কেমন একা পড়ে গেছে। বড় জ্যাঠামশাই বাড়ি থাকলে ওর শিয়রে হয়ত এখন বসে থাকত। সে এখন জ্বরের ভিতরও জ্যাঠামশাইর জন্য কেমন ছটফট করছে। ভেবেছিল তার জ্বর সেরে যাবে। সে তবে খুঁজতে যেতে পারত। কিন্তু আবার কম্প দিয়ে জ্বর আসায় তার কান্না পাচ্ছিল। মা ঘরে নেই। সে তার ছোট বোনের নাম ধরে ডাকল, ছবি ছবি।

ছবির সে সাড়া পেল না। মাথা থেকে কাঁথা সরিয়ে সে উঠোনের দিকে মুখ ফেরাল। নানা কাজে সবাই ব্যস্ত। সে দেখল হেঁটে হেঁটে হাসান পালের বৌ চলে গেল। যাবার আগে উঁকি দিল দরজায়, কিগ কর্তা কেমন আছেন বলল। সন্ধ্যার জ্যাঠিমা এসেছেন। তিনিও চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। ঠাকুমা ছবিকে কোলে নিয়ে দক্ষিণের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে ডাকলে শুনতে পাবে না বলে ডাকল না। কেউ তার কাছে আসছে না। ওর কষ্ট হচ্ছে। বাইরের পৃথিবী তার কাছে কি সুন্দর এখন, সে এই ঘরে চুপচাপ শুয়ে শীতে কষ্ট পাচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে, পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের কি অনন্ত সুখ, সে কেবল একা দুঃখী মানুষ এই ঘরে অসুখে কষ্ট পাচ্ছে। এবং রাতের দিকে তার কেমন শ্বাস কষ্ট হতে থাকল।

আর এক দুঃখী মানুষ তখন তেঁতুল পাতের তলায়। হাসান পীরের দরগাতে তখনও একটা শকুন আর্তনাদ করছে। দরগা পাশাপাশের ডালে কিছু শকুনের চোখ নিচের দিকে। চোখ মেলে তাকাচ্ছে। এক অতিকায় মানুষ পাতের নিচে পড়ে আছে কেবল। কেমন চুপচাপ, অসীম নীরবতা চারপাশে। কেবল মুখটা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। বিদ্যুৎ চমকালে সে মাঝে মাঝে দেখতে পায়, চোখদুটো খোলা। গলা কাটা, চারপাশে রক্তপাত, এবং বৃষ্টি পড়ছে, এক-ফোঁটা দু-ফোঁটা। কড়াৎ করে মেঘ ফেটে গেলে সে দেখতে পেল জলের প্লাবন নেমেছে এই পৃথিবীতে। পাতা থেকে জল পড়ছে। সবুজ পাতা থেকে নির্মল জল গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। কেবল ফেলু গড়িয়ে আছে। সে দেখতে পাচ্ছে, এক হাতে বন্দের গলা সে জবাই করেছে। তার কাছে মানুষটা ঠিক হাজি সাহেবের খোদাই বাঁড়টার মতো। সে একটুকু মায়া বোধ করল না। সে এখন কি হা হা করে আজ হাসতেও পারল না। পাতের নীচে বন্দ পড়ে আছে। গভীর রাত। এবং চারপাশে কোন লোকালয় নেই বলে, সে জানে এখানে আর কে আসে। তার ভাল লাগছিল। হাতি তার হাত ভেঙে পার পেয়ে গেল। জানালা ভেঙে তছনছ করে দিল। কেউ কিছু বলতে পারল না। তাপ্পা মসজিদে নামাজ পড়তে গেল না—সেই এক মানুষ ভূপেন্দ্রনাথ, সবাই ভয় পায়, এখন কে তোমারে রক্ষা করে। ফলে সে পা দিয়ে মুখটা নাড়িয়ে দিল। শক্ত হয়ে গেছে। ঘাড়টা শক্ত। মুখ হাঁ করা। কত অনায়াসে সে পিছন থেকে গলাতে নিমেষে পোঁচ মেরে দিয়েছিল। ঠিক হালার জবাই করা যান একটা মুরগী। টেরও পেল না মানুষটা পিছনে তার মুরুবল। চোখের পলকে গলা হাত করে দিল। দিল কি দিল না, সে চাকুটা কত অনায়াসে টেনে দিয়ে আবার লুকিয়ে পড়েছিল। অন্ধকার এত তীব্র, এত ঘন যে সে দেখতে পেল না ঠাকুরের মুখটা বাথায় কতটা নীল হয়ে যাচ্ছে। সে কেবল দেখল যেন একটা জবাই করা মুরগী উড়ে উড়ে বনের ভিতর লাফাচ্ছে।

আকাশে এত যে মেঘ, এবং এমন যে বৃষ্টি এবং গাছপালার অঝোরে ভিজছে, বাতাসে ঝড় আর ডালপালা ভেঙে পড়ছে চারপাশে কেবল খেয়াল করতে পারছে না

...জল পড়ছে বলে একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। নানা রকমের কীটপতঙ্গ এখন ডাকছে। কি বিচিত্র তার আওয়াজ। ফেলু শুনে পাচ্ছে। কিছু কিছু ভাঙা পাঁচিল ফাটলের গর্ত থাকতে পারে, সেখানে সাপেরা ফিসফিস করছে। এমন প্রচণ্ড বর্ষণের পর এই জল সব গর্তগুলো ভাসিয়ে দিয়েছে। সাপেরা এবার বের হয়ে পড়বে। ফেলু এবার যথার্থই ভয় করতে থাকল। শকুনের সহসা আর্তনাদে ফেলু বলল, কেউ আমাকে ভয় দেখায়। আমার নাম ফেলু। শকুন আমাকে ভয় দেখাচ্ছ।

মনে হল এবার কে যেন ওই কথা বলছে।

ফেলু বলল, ফেলা হাতে!
আমার হাসি।

ফেলু বলল, আমার নাম ফেলু। তিন হাতের এক হাত নেই। আর আছে দুই হাত। কিন্তু বড় হাতটা যদি শিং বাগিয়ে দৌড়ে তবে তার হবেনা ... ঢুকে যাব। জেনে রাখল, কেউ আপনারা আমাকে বিঁধিয়ে দেখবেন!

নানা রকমের শব্দের ভিতর, কাদায় প্রথম কর্দমাক্ত হয়েছে। ধরণী শান্ত শীতল হচ্ছে, মাটির নিচে জল ঢুকে যাচ্ছে, নানা রকম পোকা-মাকড় যেটার কষ্ট পাচ্ছিল এতদিন, এখন এই জল ওদের কষ্ট নিবারণ করছে। ওরা আনন্দে আর্তনাদ। তাছাড়া আছে কত জীব—এই পৃথিবীতে যার অবোধে হাঁসফাঁস। জল নেমে আসার শব্দ। সেই শব্দের ভিতর বড় বড় ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ছে। হরেক রকম শব্দ। কোন গর্তে সেয়ানা সুখের শব্দ পেয়ে চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওদের পায়ের শব্দও উঠতে পারে। আর সব শুকনো জল পাতা যা এতদিন শুকনো পড়েছিল, তারা জল পেয়ে সব জল শুষে নিচ্ছে। মাটি জল শুষে নিচ্ছে। কত রকমের সব গর্ত মাটিতে। কত পোকা-মাকড় ভিন্ন ভিন্ন আবাস সৃষ্টি করে মাটির পৃথিবীতে বেঁচে আছে। তারাও জল শুষে নিচ্ছে। তবু কি যে বিচিত্র শব্দ, সেই শব্দের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজ পেয়ে ফেলুর আর মনে কি! ওর মনে হচ্ছিল, কেউ হাসছে, আবার মনে হচ্ছে, হাসানপীরের দরগায় বসে কেউ কাঁদছে। সেই যে মরা অশ্বত্থ গাছ আর যেখানে সব শকুনের নিবাস তারা এমন জোরে ডাকতে উঠতে পারে—সুতরাং ওর মনে হল, কেউ পায়ের উপরে উঠে গিয়ে ভয়ানক আতঙ্কজনক আর্তনাদ করছে। কি ... হচ্ছে না, সেই সব প্রাচীন গাছ ... কিছু সাপখোপ যেন হেঁকে-পাড়ে, ... কোন আলো জ্বলছে না যে সে ... পাবে আলোর ভিতর আকাশ, ...কে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। সে ...এর মতো চারপাশে এমন বিচিত্র ...শব্দের বিদ্রোহে সবাই ... মাল, তার ভয় মাথাও নিচে আমাকে ছুঁতে না। দুনিয়ায় এক আল্লা আছে, তাকে ডাকাই। আর কারে ডরাই! এই বলে বেই না সে ভেবেছে এখান থেকে এবার ছুটে পালাবে, নতুবা ধরা পড়ে গেলে জেল ফাঁসি তখনই মনে হল সে যেভাবে গোঁড চালিয়েছে গলায় এ-পোঁচ যেন দারোগা-সাহেব চেনা। এমন হাঁক হাতকড়া কার হবে! ফেলুরে! সুতরাং ফেলুকে ধরার জন্য আবার দারোগা পুলিশ। পায়ের উপর ঘা। সে সেজন্য আর দ্রুত ছুটে নেমে যেতে পারল না। এই লাশ নিয়ে তার এখন কাজ। সে এখন একটা লাশকে পাকেশ করে না দিতে পারলে ভয় এবার নিশ্চিত ধরা যাবে। সে ... যেন উঠে এল। ... নিবারণ হচ্ছে না বৃষ্টিপাতের, জল বয়ে বয়ে যাচ্ছে। একবিন্দু ... কোথাও জেগে থাকছে না। যা ... এখনও ... এলাকায়, বৃষ্টির জলে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এবং এই ধরণী সব শুষে নিচ্ছে। সব কষ্ট ... নিয়ে আবার ঘাস পাতা পাখি পোকামাকড় সব সজীব। লাশ তুলে নিলে কে বলবে এখানে কিছুক্ষণ আগে এক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে গেছে ফেলু।

মাঠের ভিতর ঢুকে লাশটাকে সে যেখানে রেখে গেছে ঠিক সেখানে এসে যেন দাঁড়াল। খুব নিচু কর্দমা হয়ে আসছে। সে দুর্বল আর দেরি করলে চলবে না। সে তাড়াতাড়ি হাসান পীরের কবরের কাছে এগিয়ে গেল। বৃষ্টিপাতের জন্য জল চারপাশে। মাঠে জল জমে গেছে। খুব জোর বর্ষণের ফলে চারপাশটা খাল-বিলের মতো হয়ে গেছে। কবরের ভিতর জল জমে গেছে। যে বড় পাথরটার নিচে হাসানপীরের কঙ্কাল-একজনও পড়ে আছে, যেখানে পাগল ঠাকুর আসত মাঝে মাঝে, এবং কলাগাছী মানুষ বলে সে মাঝে মাঝে লাশ তুলে কথা বলত পীরের সঙ্গে, সেই পাথরের নিচে সে জাফর চাপা দিয়ে রেখে দেবে—তবে কেউ টের পাবে না। জল জমে গেছে কবরে। জলের ভিতর লাশটা পড়ে থাকবে। উপরে পাথর চাপা। সুতরাং দুদিন যেতে না যেতেই পচে মাটির সঙ্গে জলের সঙ্গে মিশে যাবে। এবং কোন দিন হাসান পীরের কঙ্কালটা ভাসিয়ে আছে ফেলুর দিকে, ফেরেশতা পরে এসে সে একবার দেখে যাবে এই মানুষের কঙ্কাল কি দুঃখদ্রত মুখ নিয়ে উঁকি দিয়ে থাকে। তখনই যেন সে সার্থক হবে, আমার নাম ফেলু। হাজার কওয়া।

অর্থাৎ আমি মানুষ একখানা বিঙা। কেও কর নাই। গরু মহিষ সব গেছে। বিবি আমার পালাইছে। ... মরেও যায় না। আমার বাঁচার বড় সুখ। আমারে তোমরা কেউ বাঁচতে দিতে চাও না। আমার মরণ ... ঠাকুর তোমার ... আল্লাহী। আমি ... তুমি আমারে হাঁটিত পারের নিচে ... রাখতে চাইছিলা। পাগলা ঠাকুর। সে এবার একটা ঠ্যাং ধরে টানতে গিয়ে দেখল ভীষণ ভারি। আর এক হাতে কত আর শক্তি! সে এক-হাতে টানাটানি করে লাশ একটুকু হেলাতে পারল না। সে তারপিকের পাটা ওর জামাকাপড় খুলে কাঁপফলের মতো আটকে দিল। তারপর টানতে থাকল। কিছুটা নড়ছে। নড়ছে! সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পাশেই জল জমে আছে। জলের ভিতর নিয়ে ফেলতে পারলে এত ভারি লাগবে না। এবং এই ভেবে সে টেনে লাশ জলের ভিতর ভাসিয়ে দিল। তারপর ঠেলে ঠেলে যেখানে সেই কবর এবং নানারকমের গাছ-পালাদির ছাল সেখানে সে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাশটা তোলার চেষ্টা করছে। ওর পক্ষে লাশ তোলা ভারি কষ্টসাধ্য। একমাত্র এ অঞ্চলে এই পাগল মানুষ পারতেন এত ভারি লাশ তুলে পীর সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। আর কেউ পারত না। ফেলু এমন গল্প শুনেছে। সে একবার যখন সে যথার্থ ফেলু, হা-ডু-ডু খেলোয়াড় ফেলু, তখন এমন বীর গাঁথা শুনে এই হাসান পীরের দরগায় চলে এসেছিল। অনেক চেষ্টা করেও বলশালী ফেলু দু হাতে লাশটা নড়াতে পারেনি। আজ সে কিভাবে যে পারবে! তাছাড়া কি উপায়! আছে এক উপায়। কবরের উপর বৃষ্টির জল জমে প্রায় হাঁটু-জল। জলের নিচে এখন লাশটা পাওয়া হবে খুব। ওকে খুশী খুশী দেখাল। সে বলল, আমার নাম ফেলু। হাজার কাওয়া।

এক হাতে সে অনায়াসে লাশটাকে জলের উপর ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিল। জল খুব অল্প। শুধু যেখানে গর্তমতো জায়গা সেখানে খাল-বিলের মতো জল। সে জলে টেনে এনে একেবারে ঠেলে ফেলে দিতেই ওর মুখ-চোখ শরীর সব কর্দমাক্ত হয়ে গেল। জোনাকিরা যা আটকে ছিল, মরে গেছে বোধ হয়। জলে ধুয়ে গেছে। সে আর আহত জীব নেই। সে অশরীরী নয়। সে ফেলু। যার যারই তার মনে হচ্ছিল সে ফেলু। ফেলু শেখ।

লাশটা তুলে কবরে ফেলে দিতেই মনে হল একদিকে ঠ্যাং বের হয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি জলের ভিতর ঠ্যাংটা ঢুকিয়ে দিল। শুধু দিকটা এবার যথার্থই কর্মা হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি লাফ মেরে ওদিকে চলে গেল। সে এখানেও হাঁটু গেড়ে বসল। লাশটা জলের ভিতর থেকে টেনে তুলল। তারপর হাতটা ঢুকিয়ে দেখল আর কিছু পড়ে নেই। সব অন্ধকার। কেবল সে একা জেগে আছে। আর গাছ-গাছালি। শকুনেরা উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু লাশটাকে পাথরের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া মানেই ওদের আহার থেকে বঞ্চিত করা। মনে হল সেই বাজা শকুনটা এবার ফেলুকে তেড়ে আসবে। সে মাঠে নেমে গেলেই দলবল নিয়ে শকুনগুলো ওকে তেড়ে আসবে। সে এবার কিন্তু সত্যি ভয় পেয়ে গেল। গাছপালার নিচ থেকে সে বের হচ্ছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে। এবং গাছের ফাঁক

নিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে সেই রাজা শকুনটা ওকে উঁকি দিয়ে দেখছে কিনা। এই দেখতে দেখতে সে দেখল পুবের দিকে সূর্য উঠে গেছে। গাছের নিচে সকালের রোদ। আকাশ একেবারে পরিষ্কার নীল। কেবল প্রথম প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ চষা জমিতে জল জমে সূর্যের আলো ঝলমল করছে। সে হয়ত এই গাছের নিচে, হাসান পীরের দরগায় আরও অনেকক্ষণ ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, কারণ সেই এক ভয়, যেন মাঠে নেমে গেলেই শকুনেরা ওকে তাড়া করবে, যেমন এক দঙ্গল মাছি সব সময় ওকে তাড়া করছে, ওর ঘায়ের উপর বসার জন্য ভনভন করে উড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। যেখানে সে যায়, মাথার উপর সেই ভনভন করে মাছিদের ওড়া। সে কতদিন এই মাছি খপ করে ধরে মেরে মেরে ফেলেছে। আঙ্গুলে টিপে প্রতিশোধের চোখে তাকিয়ে থেকেছে। ওর ঠিক এই মাছিদের মতো মনে হচ্ছে এই শকুনেরা ওর দিকে এবার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসবে। এবং সে যেখানে যাবে, তাকে তারা তাড়া করবে। এমন সব আতঙ্কের ভয় ওকে মাঝে মাঝে এমন পেয়ে বসে যে সে আর স্থির থাকতে পারে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। পাষাণের মতো কেবল দাঁড়িয়ে থাকে। সে হয়ত এই করে তেমনি ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু সহসা ওর মনে হল সে তার বাগি গরুটার খোঁটা মাঠে পুঁতে দিয়ে এসেছে গতকাল সকালে। ওটা না খেয়ে আছে। এক খোঁটায় সে ঘুরে ঘুরে মরছে। অথবা খুঁটিয়ে হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। কেউ নাই তার। না আমু, না ফেলু কাছে। ভিতরে ভিতরে ফেলু গরুটার জন্য কেমন মমতা বোধ করল। সে তার নিজের জানের কথা মনে রাখতে পারল না। এই যে এখন এত শকুন মাথার উপর উড়ছে, মাঠে নেমে গেলেই তেড়ে আসতে পারে ভেবে সে যে নেমে যাচ্ছিল না মাঠে, এ সময় আর তা মনে থাকল না। সে বিহনে গরুর চোখ অন্ধকার। সে গতকাল বের হবার আগে গরুর চোখদুটো দেখেছে। দেখে ভুলতে পারছে না। একমাত্র পৃথিবীতে এই বাগি গরুটাই ওর ভিতরের দুঃখটা টের পেয়েছে। সেই গরুটা এখন তার কাছে জানের মায়া বড় না ভালবাসা বড় বুঝতে দিচ্ছে না। সে এবার চোখ বুজে সোজা চষা জমির উপর দিয়ে জল কাদা ভেঙে ছুটতে থাকল।

সে চোখ বুজে ছুটছে। ভয়ে সে পিছনে তাকাচ্ছে না। তাকালেই যেন সে দেখতে পাবে শকুনেরা ঝাঁকে ঝাঁকে তাকে তাড়া করছে। এমন পুষ্ট খাবার সে লুকিয়ে রেখেছে ঘাসের নিচে। পচে যাবে, মাটিতে মিশে যাবে, তবু সে খেতে দেবে না। না কি, সেই যে ঠাকুর, পাগল ঠাকুর যার প্রাণ নিশীথে একাকী ভুবনময় ঘুরে বেড়ায়, তার কি জন্য যে কষ্ট, কে তার এমন জন ছিল, যাকে খুঁজতে তিনি নিশি-দিন হেঁটে বেড়াতেন, দু-হাত উপরে তুলে হেঁটে যেতেন। মানুষজন ভাবত, এই মানুষ সাধারণ মানুষ নয়, পীর মানুষ, সে মানুষ প্রাণ ফিরে পেতে কতক্ষণ! সেই-সব আবার দেশের মনুষ্যের নানা বর্ণের কাহিনী সে মনে করতে পারছে। আস্তানা পীর মরে গিয়েও খড়ম পায়ে তার ছেলে-দের কাছে আসতেন।

সে যে কতক্ষণ এভাবে ছুটেছিল! বেশ বেলা হয়ে গেছে। এখন আর ওরা নাগাল পেতে পারে না। সে তার গাঁয়ে উঠে এসেছে প্রায়। পাশে সেই গ্রাম। ঠাকুর বাড়ির দিকে সে তাকাল। মানুষজন কেমন আছে। সে বাড়িতে মানুষের সে কি কাজ এত! সে বুঝতে পারে না। সে দেখল হাসিমের বাপ দুধ নিয়ে যাচ্ছে। ইসমতালি নিয়ে যাচ্ছে এক টিন গুড়, কেউ মধু নিয়ে আসছে, কেউ ধান মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। কত কাজ সে বাড়িতে। সবাই

এমনও হ'তে পারে যে আপনি
আজ সকালেই যে চায়ে চুমুক দিলেন,
সেই চা উৎপন্ন হয়েছে এল.আই.সি.র টাকায়!

এল.আই.সি. আপনার প্রিমিয়ামের টাকা সারা দেশে নানারকম উদ্যোগে ও আর্থিক ক্রিয়াকলাপে বিনিয়োগ করে। চা-বাগান হল এরকমই একটি।

এল.আই.সি. বাগিচা বাগানের ক্ষেত্রে ২.৮২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। আপনার দেওয়া প্রিমিয়ামের টাকা এল.আই.সি. বিনিয়োগ করে দেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে, বোম্বা, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগে, নিত্য ব্যবহার্য পণ্য, ব্যাঙ্ক, পরিবহন। ৩১শে মার্চ ১৯৭০ অবধি এল.আই.সি.-র মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫২৮.৬৬ কোটি টাকারও বেশি। এই টাকার অঙ্ক বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে।

এল.আই.সি. শুধু যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, তা নয়। আপনার এবং দেশের কল্যাণে এর রয়েছে অনেক ভূমিকা। ভারতে এল.আই.সি. হ'ল বৃহত্তম একক বিনিয়োগকারী সংস্থা।

এক নজরে এল.আই.সি.-র কয়েকটি বিনিয়োগ :

	কোটি টাকা
গৃহনির্মাণ প্রকল্প	২৮৫.৬১
বিদ্যুৎ	২১৫.৭০
জল সরবরাহ ও জলনিষ্কাশন	২৮.৪৯
ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০.২৫
সূতীবস্ত্র ও পাট	৩০.৭৪
লৌহ ও ইস্পাত	১৭.০৪

ASP/LIC/Z-79A BEN

এল.আই.সি.—প্রগতির পথে আপনার সাথী

CENTRAL LIBRARY

এমন কেন্দা মোলায় বানিয়ে রেখেছে। তা রেখেছে। সে যে এমন একটা মজার কাজ করে ফেলেছে, যেন সে কোন মানুষ হত্যা করে নাই, সে হত্যা করেছে আসল একটা জীবকে, যার কোন দুঃখ নেই। সে যেমন ধান কেটে, ঘাস কেটে খায় দেখে তেমনি সে আকান্দকে জবাই করার আগে ধার দেখে এসেছে কোরবাণীর চাকুটার। আর অমনই সে দেখল গড়ায় সেই ষণ্ড। বাঁশ গাছটার পিছনে লেগেছে। গরুটা দু'পা এমন ছুড়ছে যে লাথি খেতেও নড়ছে না। জানোয়ার জাওয়া। তুমি এক ষণ্ড। আমার জীবের সঙ্গে পিরিত তোমার। সে সহ্য করতে পারছে না, ওর ভেতরে আগুন দপ করে জ্বলে উঠেছে। আবার পায়ের রক্ত-মাথায়। আকান্দ তার বিঁধ নিয়ে পালায়, অথচ ষণ্ড ওর জীবকে জোর করে পাল খাওয়াতে চায়, এত বড় বংশের সঙ্গে পারে কি করে তার জীব। সে কেন টেনে নিল চাকুটা। এবং বাতাসে আমার ইস্পাতের ফলাটাকে খেলাতে থাকল।

ষণ্ডটা কেন্দুকে খুঁজে দেখতে পাচ্ছে না। বাঁশ গাছটার পাতা মোটা এত বেশি যে সেখানে মুখ লুকোলে কেন্দুকে দেখা যায় না। আর কেন্দুর কাছে পালা ষণ্ড এখন আকান্দ বনে গেছে। সেই তাজা চেহারা। রোদের ভিতর চকচকে কেমন টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ গরুটা তার বিঁধ। যেন অমনুষ কোন ইচ্ছা ছিল না। সারা জীবন সে এই বাঁশ গাছের মতো পিছনে পা ছুঁড়েছে, আর আকান্দ সে-সব তুচ্ছ করে নাক উঁচু করে রেখেছে বিঁধের পিছনে। অমানুষের মতো পারে। সে পারে নি তার মানসম্মান নিয়ে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে। আমার মতো ওর বাঁশ গাছটার জোরজবর করে পাল-খাওয়া মুখ দেখে সে তার রোষ সামলাতে পারল না। চাকুটা তুলে সে জানের মায়া না করে ষণ্ডটার গলার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এবং অতর্কিতে গলকম্বলটা ফাঁক করে দিতেই ষণ্ডের হুঁস হল, গোত্তা খেয়ে পড়ে যেতে যেতে চার পায়ের উপর উঠে দাঁড়াল। সবটা টেনে দিতে পারেনি। চারপায়ের উপর খাড়া করে শরীরটা ঝিঁকিয়ে দিতেই দেখল ওর গলার চামড়া ঝুলিয়ে রক্তধারা ছুটেছে। গলগল করে রক্ত ওগলাচ্ছে ষণ্ডটা। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মহাজীবটা এবার ছুটেছে। কেন্দুও পড়িমরি করে বাড়ির দিকে উঠে যাচ্ছে।

ষণ্ডটা মাঠের উপর দিয়ে কেন্দুকে মেরে ফেলার জন্য তেড়ে যাচ্ছে।

লোকজন দেখতে পাচ্ছে, কেন্দু ছুটেছে মাঠের উপর দিয়ে আর ষণ্ডটা ছুটেছে পিছনে। ধর্মের ষণ্ড সামান্য এক মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

গেল গেল রব। সবাই যেখানে যত মানুষ আছে কেন্দুর চিৎকারে ছুটে আসছে। আমারে বাঁচান, আমারে বাঁচান। দু হাত উপরে তুলে সে ছুটেছে। সে জানে তার রক্ষা নেই। সে ষণ্ডের চোখের ভিতর তার মরণ দেখে ফেলেছে। মহারোষে জীব ছুটেছে। জীবের শেষ সময়। চোখের উপর নীল রঙের পর্দা। এবং দুঃস্বপ্নটা সেই নীল রঙের একটা দুঃখের ভিতর কেবল ছুটে যাচ্ছে। সেও ছুটে যাচ্ছে। কেন্দু পিছনে তাকাচ্ছে, আহা, এ-যে উঠে এল। আমারে বাঁচান। কেডা আছেন আমারে বাঁচান গ, আমারে রক্ষা করেন।

মানুষজন কেউ এগোচ্ছে না। সবাই দাঁড়িয়ে খুঁজে তামাসা দেখছে। না এখন মনে হয় না। কিন্তু লোকজন ছুটেছে। বড়বৌ রাতে ঘুমাতে পারেনি। সেও এই চিৎকার শুনে, মানুষের সরগোল শুনে ছুটে এসেছিল পুকুর পাড়ে। কে আর যাবে সামনে! মানুষে আর ষণ্ডে লড়াই! মরিয়া হয়ে কেন্দু যেই না মুখে দাঁড়াবে ভাবল এবং ফাঁক খুঁজে আর একটা চোখ গেলে দেবে ভাবল, তখনই দেখল ষণ্ডটা কেমন অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর চোখের উপর থেকে। বস্তুত ষণ্ডটা তখন ওর যে চোখটা সেই দিকে আছে। মুখ ঘুরালেই সে দেখতে পেত, কি রোষ জীবের। মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কেবল চারপায়ের উপর লাফাচ্ছে। আহা সে যদি সবটা টেনে দিতে পারত! সে আর পারল না। ষণ্ডটা ওর উপর এসে দ্রুত লাফিয়ে পড়েছে। ওর যদি দুটো চোখ থাকত! আহা দুটো চোখ! ধর্মের মতো সে একচক্ষু জীব হয়ে গেছে। সবটা দেখতে পায় না। কিছুটা দেখতে পায়। কিছুটা মন, কিছুটা জানে, কিছুটা বোঝে এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দুর মতো একটা বাঁশ বাদুর মাঠে হেরে গেল। সে বলল আল্লা এডা কি হইল। কারণ ষণ্ড তার প্রবল প্রতাপান্বিত দুই শিঙ নিয়ে এমন জোরে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে যে সে জানে না পিছনে এক বড় কাফিলা গাছ আছে, নরম গাছ এবং সে তার সামনে দাঁড়িয়ে ষণ্ডের সঙ্গে লড়াই করার জন্য শেষবার প্রস্তুত হচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে কেউ ছুটে আসছে না। সে হায় হায় করে ঘুরি পাক দিতেই বাতাসে প্রবল প্রতাপান্বিত ষণ্ড শিঙ ঢুকিয়ে একেবারে গাছের সঙ্গে গেঁথে নিজে চার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পেটের ভিতরে শিঙ ঢুকে কাফিলা গাছ ফুঁড়ে ওপাশে শিঙ বের হয়ে গেছে। সে কেমন একটা শক্তিহীন মানুষের মতো শেষবারের মতো ডাকল, আল্লা আমার এই আছিল কপালে! বলতে বলতে সে দেখল, তার পেটের ভিতর থেকে সব রক্ত উপচে ষণ্ডের মুখ রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। ষণ্ডের গলকম্বল ছিঁড়ে গেছে বলে গরম রক্ত এবং শ্বাসনালীর ভিতর থেকে রক্ত প্রবলবেগে বের হয়ে কেন্দুকে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

দুই জীব এখন দুই পরম আপনজনের মতো কাফিলা গাছের নিচে পড়ে আছে। ষণ্ডের প্রাণ নেই, কেন্দুর প্রাণ নেই। আহা কেন্দু তুমি ছিলে একখানা মানুষ। তোমার জয় দিবার কেহ নাই হে। আমি লেখক তোমার হয়ে জয় দিলাম। কেন্দু তুমি বড় মানুষ হে। তুমি জান লড়াই করতে। তোমাকে এ-ভাবে মরতে দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে।

সব গ্রাম ভেঙে পড়েছে এই মাঠে। কেন্দুর বাড়ির সামনে। কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ ষণ্ডটা এমন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে যেন যুঝতে পারছে না। সবার ধারণা ষণ্ড কেন্দুর পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছে, তারপর রাগে পেলে যে সামনে পড়বে তারই পেট ফাঁসাবে। ষণ্ড ক্ষেপে গেছে। ওরা সবাই লাঠি, বাঁশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেন্দুকে মেরে ফিরেছে এবং এবার এদিকে ছুটে আসবে। ধর্মের ষাঁড়। ওকে কিছু করতে নাই। তা একটা জান গেছে ত কি হয়েছে। তা ছাড়া কেন্দুর ত এ-ভাবেই যাবার কথা। সুতরাং যাতে অন্যদিকে ছুটে না যায়, এবং ক্ষেপে গিয়ে অন্য কাউকে আঘাত না করে সেজন্য ওরা চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। অথচ বেশ সময় হয়ে গেছে, কেন ষণ্ডটা উঠে আসছে না। দু একজন এবার পা পা এগুতে থাকল। আরে এডা কি হইল! ষণ্ডটার গলা কাটা। কেন্দুর চোখ খোলা। পেটের নাড়ি সব বের হয়ে আসছে। শিঙের ভিতর জড়িয়ে গেছে। কেন্দু এক হাতে তখনও কোরবাণীর চাকুটা শক্ত করে ধরে আছে।

লোকগুলো বলল, হা আল্লা!

কেন্দু আর ধর্মের ষণ্ড এখন জড়াজড়ি করে পড়ে আছে কাফিলা গাছটার নিচে। আকাশে সূর্য তেমনি কিরণ দিচ্ছে। ঠাকুরবাড়িতে তেমনি কেউ মধু, দুধ এবং বাঁশ নিয়ে যাচ্ছে। বড়বৌ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখছে। মানুষটা ফিরে আসেনি। মাঝরাতে সোনার কি যে আবার হয়েছিল! সে আবার আগের রাতের মতো ভয়ে নীল হয়ে গেছিল। জ্বর, সে কেবল বলেছে, আমি মরে গেলাম। জ্যাঠিমা আমাকে কারা মেরে ফেলছে। জল। জল। ঐ ঐ আসছে, আসছে।

সবারই বিছানা থেকে উঠতে বেলা হয়ে গেছে। সাদা পাথরে ফলমূল কেটে রেখে দিয়েছিল বড়বৌ। যদি তিনি আসেন। আসেন নি। সকালে উঠেই সবাইকে ডেকে, বড়বৌ এখন পাগল মানুষের জন্য রাখা ফলমূল বিতরণ করে দিচ্ছে।

তখনই এ-পাড়ে খবর এল, ষণ্ডটা কেন্দুর পেট এ-ফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়েছে।

ঈশম এসে তখন বলছিল, ঠাইরেন একটা কথা কই।

বড়বৌ সব ফলমূল তক্ষণে বিলিয়ে দিয়েছে। হাতে তার খালি সাদা পাথরের থালা। সে, ঈশম কি বলবে, কোন গোপনীয় কথা নিশ্চয়ই, সুতরাং সে সবাইকে চলে যেতে বলে বলল, কি বলবে!

—ফেলুটা না-থাক মানুষ। দাফনের টাকা ওর জাতভাইরা কেউ দিল না কয়।

বড়বৌ বুঝতে পারল ঈশম দাফনের জন্য কিছু টাকা চায়। সে গোপনে এই টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এবং দাফনের নিমিত্ত যা কিছু করণীয় সে করবে।

বড়বৌ তার যা সঞ্চয় ছিল, সে থেকে কিছু দিয়ে দিল। বলল, সারাটা জীবন ফেলুর বড় কষ্টে গেছে।

—তা গেছে বড় মামী।

—অথচ দ্যাখো ফেলুর কি না ছিল। সেই চেহারা। এখনও আমার চোখে ভাসে ফেলু গোপালদি থেকে যেবার হা-ডু-ডু খেলে শিল্ড নিয়ে আসে। গাঁয়ের লোক ওকে নিয়ে কত বড় উৎসব করেছিল। আর আজকে ওর দাফনের টাকা কেউ দিচ্ছে না।

ঈশম চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সহসা কি মনে হতেই বলল, বড় মামা ফিরা আইছে?

—না। আসেনি।

শশীভূষণও এ-সময় উঠোনে কি কাজে চলে এসেছিল। সে বলল, শুনেছেন বড়বৌদি, ফেলুর পেটে খোদাই বাড়িটা শিঙ ঢুকে দিয়েছে।

—শুনেছি।

—বড় হারমাদ ছিল।

বড়বৌ কিছু বলল না।

—কর্তা ফিরেছে আপনার?

বড়বৌ মাথার ঘোমটা টেনে দিল। বলল, না।

—আজ ঠিক ফিরে আসবে। আজ নিয়ে দুদিন হল না?

—দুদিন। বলে শশীভূষণকে সে অনুরোধ করল, আপনি একবার যাবেন বিকেলে খুঁজতে? লালটু পলটুকে পাঠাবেন? ওরা ত আপনার কথা শোনে।

ঈশম বড়মামীর চোখ দেখলেই সব টের পায়। সে বলল, বড়মামী আমি যামু। বিকালে কোন কাজ হাতে রাখমু না। কেবল মাঠে ঘাটে বড়মামারে খুঁইজা বেড়ামু।

—ঠিক পেয়ে যাবে। দেখ গিয়ে হয়ত কোন টিপিতে উঠে বসে রয়েছে। সেখান থেকে কি করে নামবেন বুঝতে পারছেন না। একমাত্র তুমি অথবা সোনা তাকে নামিয়ে আনতে পার। কি বলেন বড়বৌদি ঠিক না?

বড়বৌ এমন কথায় ম্লান হাসল।

কেউ আর এখন বড়বৌর কথায় গুরুত্ব দিতে চায় না। তিনি নিরুদ্দেশে গেছেন, চলে যান বারবার, তাঁকে কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে না, তিনি নিজেই চলে আসেন। সুতরাং শশীভূষণ বলল, আপনি অযথা ভাবছেন বড়বৌদি। ভেবে ত কিছু হবে না!

ঈশম চলে গেল তখন। শশীভূষণ বলল, কখন বের হয়েছে, আপনি দেখেননি বের হতে।

—না দেখিনি। কি যে কুয়াশা করল।

—কোনদিকে নেমে গেছে কেউ বলতে পারে?

—তাও জানি না। সোনাকে নিয়ে এত বেশি সবাই ব্যস্ত ছিলাম যে ওদের হবিষ্যান্ন পর্যন্ত করাতে পারিনি। মানুষটা না খেয়ে কোথায় যে বের হয়ে গেল!

—আসবে। চলে আসবে ঠিক।

—সে তো আমিও জানি চলে আসবে। কিন্তু মন যে মানে না। না খেয়ে কোথায় যে উপবাসী মানুষটা বসে রয়েছে! বলতে বলতে বড়বৌর চোখ থেকে টপ টপ করে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

শশীভূষণও বড়বৌর এমন চোখমুখ দেখলে বড় কষ্ট পায়। যেন বোধপ্রবোধ দেবার মতো বলল, আচ্ছা পাঠাচ্ছি লালটু পলটুকে। আমি নিজেও খুঁজতে যাব। আপনি অযথা কাঁদবেন না।

কান্না ভাল নয় বড়বৌও জানে। কাঁদলে মানুষের কোন শুভ হয় না। সে চোখ আঁচলে মুছে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিচ্ছিল তখনই শচীন্দ্রনাথ এসে বলল, বড়দা রাতে ফিরা আইছে?

কারণ শচীন্দ্রনাথ জানে রাতে তিনি প্রায়ই ফিরে আসেন। সকালে অনেক সময় টের পাওয়া যায় না। হয়ত পুকুরপাড়ে কিংবা চুপচাপ ঘরেই বসে রয়েছে। সুতরাং বড়বৌদি ওকে ঠিক খবর দিতে পারবে। সেজন্য প্রশ্ন করে জেনে নিল, তিনি এসেছেন কিনা। আসেননি। শচীন্দ্রনাথকে আদৌ উদ্বিগ্ন দেখাল না। এখন কত নিয়মকানুনের ভিতর থাকতে হয়, তা না-করে তিনি মাঠেঘাটে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যে যা দিচ্ছে খেয়ে যাচ্ছেন। তার এটা ভাল লাগছে না। না খেলে মানুষটা এমন অনিয়মের ভিতরও এত বলশালী থাকে কি করে! কিন্তু বড়বৌর মনে হয় তিনি হাঁটছেন, হাঁটছেন। চারপাশে যা কিছু রয়েছে, এই যে নীচতা হীনতা, সব অবহেলা করে হেঁটে যাচ্ছেন। কোথাও কিছু তিনি খাচ্ছেন না। কেবল উপবাসী থেকে সন্ন্যাস জীবনযাপন করছেন।

তখনই মনে হয় বড়বৌর কোথাও গীর্জার ঘণ্টা বাজছে। একটা নীল মতো মরুভূমি জায়গা। চারপাশে ধুধু বালুরাশি। কোন গাছপালার চিহ্ন নেই। একজন মানুষ নিরত তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। দূরে, অতি দূরে গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি। প্রায় কোন মহিমান্বিত সন্ন্যাসীর মতো এই মানুষ তখন মরুভূমি পার হয়ে দুঃখী মানুষের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছেন। বলছেন, ঐ দ্যাখো আকাশে কত আলো, পৃথিবীর গাছপালার ভিতর অথবা এই যে মরুভূমি তার ভিতর ঈশ্বরের কি অপার করুণা! তিনি হাত তুলে সবাইকে আশীর্বাদ করছেন। ঘাস ফুল পাখিকে বলছেন অনন্তকাল এই পৃথিবীতে তোমরা বিচরণ কর। তোমরা সুখে থাকো।

যখন তিনি এমন মানুষ তখন তার পৃথিবীতে আর কে শত্রু থাকবে। কে তার অনিষ্ট করবে! সুতরাং বড়বৌ লালপেড়ে একটা নতুন কোরা শাড়ি পরে বড় আয়নার সামনে দাঁড়াল। বড়বৌ বলে তাকে হবিষ্যান্ন করতে হচ্ছে। সে সিঁদুর দিতে পারছে না কপালে। চুল আঁচড়াতে পারছে না। চুলে তেল দিতে পারছে না। সেও কেমন ধীরে ধীরে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা ফিরে এলে সে আবার বড় করে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেবে। যা কিছু অলঙ্কার আছে পরবে। তখন মাথা নেড়া থাকবে মানুষটার। পরনে নতুন কোরা ধুতি। সে মৎস্যস্পর্শের দিন এমন ভেবে সেজে আসবে যে মানুষটা তাকে দেবদাসী ভেবে চোখ বুজে ফেলবে। মানুষটা ফিরে এলে কি যে করবে না এবার! তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে থাকলে তাঁকে ঠিক কপিলাবস্তু নগরের সেই সন্ন্যাসী রাজকুমারের মতো মনে হবে। সে যশোধারা। এমন মনে হতেই কেন জানি বড়বৌর আর কোন দুঃখ থাকল না। সে এখন এ-ঘর ও-ঘর করে ছুটে ছুটে কাজ করছে।

সোনার কপালে হাত রেখে বলছে, কিরে তুই ভাল হবি না! কবে হবি! কবে যাবি আনতে তোর জ্যাঠামশাইকে। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ। কত লোকজন আসবে, কত বড় উৎসব বাড়িতে হবে আর তুই শুয়ে থাকবি, আমার ভাল লাগে!

আবেগের বশেই এসব বলে গেল বড়বৌ। তার ভাল লাগছে—সেই মুখ, সন্ন্যাসী রাজকুমারের মুখ তার চারপাশে এখন এক অদৃশ্য ছবি হয়ে আছে। তার চারপাশে ঘুরছে ফিরছে। মনে মনে বড়বৌর সঙ্গে তার মানুষ কথা বলছে। তার আর ভয় কি! সে কাঁদবে কেন! অতীতের সেই কপিলাবস্তু নগর, তার প্রাসাদ, রাজা শুদ্ধোধন এবং সেই সুন্দর স্বপ্ন রাজ দেবীর—মহারাজ রাতে এক সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম। একটা ছোট্ট সাদা হাতি আস্তে আস্তে আমার কোলে নেমে এল। তারপর ধীরে ধীরে সে যে কোথায় মিলিয়ে গেল দেখতে পেলাম না। বৈশাখী পূর্ণিমায় রাজকুমারের জন্মের দিনটি কল্পনা করতে বড়বৌর আজ খুব ভাল লাগছিল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

জাতের নামে বজ্জাতি

সাংবাদিক রোনাল্ড সেগল ভারত সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার এই মানুষটি সত্যনিষ্ঠার জন্য অতি সত্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছেন। বর্তমান গ্রন্থের গোড়ায় তিনি লিখেছেন—

"Although the word race is of doubtful definition and the conflict with which I deal is one of colour'.

জাতি-বৈর প্রসঙ্গে 'রেস' কথাটি ব্যবহৃত হলেও তার সংজ্ঞা যে সন্দেহজনক একথা তাঁর মনে জেগেছে। তথাপি তিনি বাধ্য হয়ে 'রেস' কথাটি ব্যবহার করেছেন, জাতিগত সংঘাত প্রসঙ্গে এই শব্দটিই ব্যবহার। সমাজ-বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি অধিকতর সতর্ক হলে ভালো হত। 'রেস' নামক কোনো কিছুই নেই, যা আছে তা মতলববাজ ঐতিহাসিকদের মাথায় আছে, এদের অধিকাংশই জার্মাণ কুলোদ্ভব, কিংবা সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষায় 'ইন এ হারি' তাড়াতাড়ির মাথায় যা খুশী বলা যায়। চিন্তাহারী কল্পনাপ্রসূত সেমিটিক, এরিয়ান, মঙ্গোলিয়ান, নর্ডিক রেস বলে কিছু ছিল না। যা ছিল 'ট্রাইব', এরিয়্যা ট্রাইব, সেমিটিক ট্রাইব, মঙ্গোলিয়ান ট্রাইব, এবং এরাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন 'নেশন' ও পিপলে পরিণত হয়েছে। 'কলার' বা বর্ণ অনেকখানি প্রযোজ্য। মিঃ সেগাল মুখ্যতঃ শ্বেতবর্ণের সংঘাত নিয়েই আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অত্যাশ্চর্য। বর্ণ-বিদ্বেষ, — এবং বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে মিঃ সেগাল সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি আবেদন জানিয়েছেন যে, বর্ণবৈষম্য অবিলম্বে লুপ্ত হোক, মানুষে মানুষে গায়ের রঙ নিয়ে যে লড়াই চলছে তার অবসান ঘটুক, মানুষের অবর্ণনীয় অবমাননা ও দুর্দশা দূর হোক। সমগ্র রচনার মধ্যে বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ ব্যঙ্গ এবং শ্লেষের অন্তর্নিহিত সুর গ্রন্থটিকে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ করেছে।

গ্রন্থটি যদি আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হত তাহলে টম পেইনের 'রাইটস অব ম্যান' বা কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর গুরুত্ব অর্জন করত।

মিঃ সেগাল বলেছেন শাদা চামড়ার মানুষেরা অর্থ-গৌরবে গরীয়ান আর কালা চামড়ার মানুষেরা দরিদ্র—শাদা-কালোর সংঘাত হল ধনী ও দরিদ্রের লড়াই। মিঃ সেগালের বক্তব্যে একটি কথা অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। সাউথ কোরিয়া, তাইওয়ান, জাপান, মালয়, শ্যামদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের কালা আদমীরা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, জার্মাণী এবং ফ্রান্স প্রভৃতি শাদা-চামড়ার দেশের সরকারদের কাছ থেকে সমবেত সাহায্য পেয়েই ফেঁপে-ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

চীনদেশে জেনারেল মার্শাল কম্যুনিস্ট ও কুয়োমিন্টাং সরকার গঠনে যে কূট-নৈতিক বিফলতার মধ্যে পড়েছিলেন, মিঃ সেগাল তার কথা উল্লেখ করেছেন—কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে রচিত 'মার্শাল প্ল্যানে'র কথা তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার নব-জাগ্রত জনগণের প্রতি প্রদত্ত উপদেশ—('যে যার যে শিল্প- উন্নয়ন-নীতিতে বিশিষ্টতা অর্জন করুন—পরস্পর পরস্পরের গলা কাটাকাটি করবেন না অসম প্রতিযোগিতায় নেমে—') শুনতে ভালো কিন্তু বর্তমানে আত্ম-সচেতন এবং বিশেষ করে শ্যামবর্ণের জন্য যাঁরা অধিকতর আত্ম-সচেতন হয়েছেন তাঁরা এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারবেন, মনে হয় না।

মিঃ সেগাল 'ব্ল্যাক ওয়ার্ল্ড অব আফ্রিকা' নিয়ে তাঁর বক্তব্য সুরু করেছেন। যে ঔপনিবেশিক শক্তিপুঞ্জ আফ্রিকা-ইয়োরোপের হাতে আসার পর নিজেদের মধ্যে আফ্রিকাকে বণ্টন করে নেয়, লেখক তাদের সম্পর্কে সঙ্গত কথাই বলেছেন, যেখানে প্রশংসার সেখানে প্রশংসা করেছেন আবার ঔপনিবেশিক শাসননীতির নিন্দনীয় দিক সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করেছেন।

কঙ্গোতে বেলজিয়ামের পিতৃতান্ত্রিক সরকার প্রাথমিক এবং কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন অন্য যে কোনো ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত-তর আশ্রয় ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং শাসন ব্যবস্থায় উচ্চ-পদে কাউকে প্রবেশাধিকার দেয়নি। তার ফলে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আফ্রিকার

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র দুজন স্নাতকের ওপর তার পড়ুন কংগোয় স্বাধীন সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার। এদিক থেকে ইংলেন্ড তার ঔপনিবেশিক প্রজাপুঞ্জকে উন্নততর শিক্ষার সুযোগ দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য করেছে। কঙ্গো-তার অভ্যন্তরকে সাম্যের পথে দীক্ষা দিয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার চাবি-কাঠি দেয়নি। দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যের নীতি সম্পর্কে স্বভাবতই মিঃ সেগাল অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। মিঃ সেগাল বলেছেন যে সব শক্তিপুঞ্জ এই নীতির বিরোধী তাঁরা যেন বুয়োরদের কথাচিত শিক্ষাদান করেন। মিঃ সেগাল একটি কথা স্মরণে রাখেন নি, যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের উপর উত্তরের মানুষ বিজয়ী হওয়ার পরও সে দেশে নিগ্রো সমস্যার সমাধান হয়নি। এইসব ব্যাপারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক হেতুগুলির ব্যাখ্যা যদি মিঃ সেগাল করতেন তাহলে পাঠকের উপকার হত। কিভাবে বুয়োরদের হৃদয় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব সে বিষয়ে ইঙ্গিত থাকা উচিত ছিল।

আফ্রিকার মতো দক্ষিণ আমেরিকায় বর্ণ-সমস্যা তেমন নাকি প্রবল নয়। স্প্যানিস ও পোর্তুগীজ কলোনির নাকি গায়ের রঙ নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি নেই। যেটুকু অত্যাচার শাসক সমাজ করেছে এবং দাসেরা যেভাবে উৎপীড়িত হয়েছে তার মূলে আছে আমেরিকার স্পেনীয় ও পোর্তুগীজ প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অক্ষমতা এবং দৃষ্টি-কৃপণতা। সাউথ আমেরিকার যেটুকু অসাম্য এবং ব্যবধান ছিল তার মূলে ছিল রাজকীয় অহঙ্কার, বর্ণবিদ্বেষ নয়। মিঃ সেগাল কিন্তু স্প্যানিসদের মানবিক কর্মের (যথা—লাস কাসা) প্রভৃতির উল্লেখ করেন নি। এই সম্প্রদায় স্প্যানিস রাজপুরুষ কর্তৃক ইন্ডিয়ানদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদ করতেন।

মেক্সিকোর আজটেকসদের 'নরবলির' সমর্থনে মিঃ সেগাল যা বলেছেন তার মধ্যে সংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয় পাওয়া যায়—

> "War was a Solitary guarantee of Survival, a way of providing Sufficient victims for the altar without draining the blood and destroying the State of the AZTECS themselves".

এই জাতীয় 'নরবলি' ও অন্যান্য দেশীয় নিষ্ঠুর সংস্কারের হাত থেকে স্প্যানিয়ার্ডরা সাউথ আমেরিকার মানুষদের মুক্তি দিয়েছে।

'হোয়াইট ওয়ার্লড অব দি ইউ এস এ' নামক অধ্যায়ে মিঃ সেগাল যে কথা বলেছেন, তা অনেকবার বলা গল্পের মত, তবে মাঝে মাঝে তাঁর কাহিনীর মধ্যে নতুন তথ্য ও নতুন আলোক পরিবেশিত হয়েছে।

নিগ্রো সমস্যা জাতীয় মুক্তির পর পার্টির হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। অনেক রিপাবলিকান নিগ্রোদের ভোটাধিকারের জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন তার মূলে ছিল শুধু মাত্র শাদা চামড়াদের ভোটাধিকার থাকলে সাদার্ণ ডেমোক্র্যাটিকদের সুবিধা হবে বেশী এই আশঙ্কা।

সবশেষে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। বর্ণ-বৈষম্য সংক্রান্ত গ্রন্থে মিঃ সেগাল চীন-রুশ সংঘর্ষ নিয়ে লম্বা বিবরণ দিয়েছেন কেন? চীন-রুশ সংঘর্ষের পিছনে আছে আদর্শগত দ্বন্দ্ব, বর্ণবৈষম্য নয়। মিঃ সেগাল বোধহয় বলতে চেয়েছেন যে চীনারা পীতকায়, আর রুশদের মানুষ শ্বেতকায় তাই এ সংঘাত। এই ধারণা নিছক শিশুসুলভ।

তথাপি গ্রন্থটি বর্ণ-বৈষম্য সংক্রান্ত তথ্য ও ইতিহাস হিসাবে মূল্যবান।

—অক্ষরবন্ধু

THE RACE WAR : By RONALD SEGAL. Published by Jonathan Cape. (London) Price 45 Shillings.

সাহিত্যের খবর

সপ্তম ওড়িয়া যুব লেখক সম্মেলন— সপ্তম ওড়িয়া যুব লেখক সম্মেলন এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে ওড়িশার মুরবনীতে। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনের আরম্ভ হয় গত সাত ফেব্রুয়ারী। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত কবি শ্রীশচী রাউত রায়। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে, তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করেন। সভার পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট কবি অনন্ত পট্টনায়ক।

দ্বিতীয় দিন কবিতা ও নাট্য শাখার অধিবেশন বসে। কবিতা শাখার প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীশচী রাউত রায়। তিনি তাঁর ভাষণে তরুণ কবিদের অবাঞ্ছিত জটিলতার দিকে আকৃষ্ট না হবার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন—বিষয় অনুসারেই কবিতার আঙ্গিক গড়ে ওঠে। অন্যান্য যাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী অনন্ত পট্টনায়ক, গোপালকৃষ্ণ রথ, প্রসন্নকুমার পারসানি, সদাশিব দাস, অশ্বিনী মিশ্র, প্রদীপ্ত মহাপাত্র, বীণা মহাপাত্র, লাল মধুসূদন রায় দেও, হুসেন রবি গান্ধী প্রমুখ।

তৃতীয়দিন সকালে বসেছিল কবিতা পাঠের আসর। এতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান সর্বশ্রী অশ্বিনী মিশ্র, ব্রজকুমার রাউত, গৌরীপ্রসাদ মহাপাত্র, চিন্তামণি বেহেরা, কমলা পান্ডা প্রমুখ প্রায় পঞ্চাশজন তরুণ কবি। কয়েকজন প্রখ্যাত কবির রচনাও আবৃত্তি করে শোনান হয়। উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় চারশত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

একটি কবি সম্মেলন—কয়েকদিন আগে নদীয়া জেলা কবি সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে বড় আন্দুলিয়ায়। কৃষ্ণনগর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে এই সম্মেলনে পুতুল নাচ, বাউল গান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে একটি কবি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিশিষ্ট কবিরা এতে উপস্থিত থেকে কবিতা পাঠ করেন। প্রবীণ কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। যাঁরা কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী নীহাররঞ্জন সিংহ, মজনু মোস্তাফা, সুধীর তৌমিক, কালাচাঁদ রায়, অবনীমোহন দে, বৃন্দাবন গোস্বামী, শচীন বিশ্বাস, ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, কালন সাহা, গৌরীপ্রসাদ হালদার, বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্যামল সাহা, সন্তোষ রায়, মায়া সাহা, গৌরী মজুমদার, যামিনী চক্রবর্তী, দিলীপ হালদার, জাবের আলী, মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আকবর আলী, মহম্মদ নাথ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সভাপতির একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করে শোনান শ্রীরামকৃষ্ণ দে। সম্মেলনে অনেক সাহিত্য-রসিক উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর: পূর্ব বাংলার শ্রদ্ধাঞ্জলি —রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের ১৫০তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাহিত্যিক গ্রন্থটি সম্পাদনায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের উপর কয়েকটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের উপর পূর্ব বাংলার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি আবার নতুনভাবে প্রমাণ করল, দেশ ভাগ হলেও ভাষা ভাগ হয়নি।

CENTRAL LIBRARY

বাঙালী অধ্যাপকের সম্মানলাভ— বিশিষ্ট কবি ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার দাস পশ্চিম জার্মান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হাইনে পুরস্কার লাভ করেছেন। এই পুরস্কারের মূল্য ৬,০০০ টাকা। ভারতীয় শিল্প এবং সাহিত্য সম্পর্কে জার্মান পাণ্ডিতদের আগ্রহ সম্বন্ধে লিখে তিনি এই পুরস্কারটি লাভ করেন। তাঁর প্রবন্ধটির নাম—'ওয়েস্টার্ন স্কলার্স ইস্টার্ন সিউস'। শ্রীদাস বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের একজন অধ্যাপক। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর অনেক কটি গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একালের নতুন কবিদের মধ্যেও তিনি অন্যতম। তাঁর এই সম্মানলাভে সাহিত্যরসিক মাত্রেই তাই আনন্দিত হবেন।

বই নিয়ে—জানেন কি, বিগত দশকের মধ্যে জার্মানীতে সবচেয়ে বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৯ খৃঃ। সে বছর মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছিল ৩৫,০০০। আর এর মধ্যে শতকরা কুড়ি ভাগ হচ্ছে রম্যরচনা জাতীয় বই। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় বৈকি। উপন্যাস নয়, ছোট গল্প নয়, নাটক নয়—শেষ পর্যন্ত রম্যরচনাই সর্বাধিক জনপ্রিয় হল। আর একটা জিনিসও প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা গেছে, এইসব বইয়ের প্রকাশক কিন্তু মাত্র তিনটি কি চারটি সংস্থা। অর্থাৎ প্রকাশন ব্যবসা কিছুটা কেন্দ্রীভূত হতে আরম্ভ করেছে সেখানে।

ইংলণ্ডে এই বছর প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৩১,৪২০টি বই। এইসব বইয়ের প্রকাশক প্রায় ৩০০টি প্রকাশক সংস্থা। ভারতে উক্ত বছরে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা হল—২১,০০০। এর মধ্যে শতকরা ৪০টি প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায়।

তামিল পত্রিকার বিশেষ বাংলা সংখ্যা— তামিল ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সমীক্ষা' একটি বিশেষ বাংলা সংখ্যা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। পত্রিকাটির সম্পাদক বিশিষ্ট তামিল কবি শ্রীএম গোবিন্দন। এতে আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে কিছু কিছু তামিল অনুবাদ থাকবে। তাছাড়া থাকবে বাংলা-সাহিত্যের উপর কিছু কিছু প্রবন্ধ।

—চার্বাক

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সপ্তস্বর (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংকলন)—সম্পাদক শেখ নজরুল ইসলাম। হুগো-সিমলা হাওড়া।

পত্রিকাটির আকর্ষণীয় দিক হলো, প্রচ্ছদ হাতে-আঁকা। পেন্সিলের কভারে রবার স্ট্যাম্প মেরে সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা মুদ্রিত হয়েছে। লেখকের ছাপা ও কাগজের অভিনবত্বের লক্ষণ পরিস্কার। তবু উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতাকে অভিনন্দন করা যায় পত্রিকাটি হাতে নিলেই। লিখেছেন তপন দাশগুপ্ত, সতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাণী বসু, মোহন নুর আহান, জয়ন্ত গোস্বামী এবং আরো অনেকে।

মহিলা (২৪শ বর্ষ, পৌষ ১৩৭৭)—সম্পাদিকা : ডক্টর আভা দেবী। ১২০।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। এক টাকা।

বাঙালী মেয়েদের এই নিজস্ব মাসিক পত্রিকাটিতে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করে তোলার নানান প্রয়োজন এবং আলোচনা আছে। কবিতা, উপন্যাস ছাড়াও আছে নানান বিষয়ের আলোচনা : 'ঘর সাজানোর টুকিটাকি', 'বাটিক প্রিন্ট প্রকল্প' (সচিত্র) 'ডিভোর্স', 'শিল্পী পরিচিতি', 'রান্নাঘর,' 'কর্নাটা সুস্থ রাখুন,' 'সম্পাদকীয়', 'স্বপ্ন ও পদ্য', 'মহিলা-জগৎ', 'নতুন বই', 'লণ্ডনের চিঠি' ও 'মাসের খবর' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য সংসারী বাঙালী মেয়েরা পত্রিকার এ সংখ্যাটি হাতে পেলে খুশী হবেন।

উদ্‌খড় (দ্বিতীয় সংকলন)—সম্পাদক প্রণব মুখোপাধ্যায়। ১।৪ নীলকমল চক্রবর্তী লেন, হাওড়া। চাল্লিশ পয়সা।

গতানুগতিকতার চর্বিত পথ বর্জন করে 'উদ্‌খড়'-এর আবির্ভাব। প্রচ্ছদ লেখো 'নিউ ম্যানিফেস্টো' শিরোধার্য করে ছাপা হয়েছে বিভিন্ন লেখা। তাতে ঘোষণা করা হয়েছে : 'বাংলা দেশের প্রত্যেকটি নর্দমা আজ উদ্‌খড়। পাঁকের মধ্যে পোঁতা আছে মানুষের অস্থিমজ্জা, তাদের মজ্জ ও মাংস, জলের বর্ণ ও স্বাদ পরিবর্তন করে দিয়েছে। কাজেই এখন সাহিত্যসাধক হতে পারে না যে দেহ স্নিগ্ধ রাখবে,—আবার তখন নিউজপ্রিণ্টও নয় যে সাধারণের জন্যে চকচকে সাতো ১৮ পয়সা আদায় করবে। সাহিত্য অর্থহীন অন্তর্ঘাত ও নাশকতা-মূলক কার্যকলাপ। সুতরাং দুদিকে কথা বলার আমরা স্পষ্টতই বিরুদ্ধে।' সম্ভবত এই বক্তব্যের সমর্থনেই লিখেছেন সৌরেন মিত্র, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণব মুখোপাধ্যায়, অমৃতেন্দু গুপ্ত, কালীকৃষ্ণ গুহ, অমৃত বসু, দেবাশিস মিত্র, শঙ্কর সেন, অশোক মজুমদার, অমলেশ ঘোষ, ত্রিদিব মিত্র, ও অসীম বসু।

গল্পস্পন্দন (প্রথম সংখ্যা) সম্পাদক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০।৭।ডি, গণেশ ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা-৩১।

নতুন সম্ভাবনা ও নতুন লেখকের রচনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে গল্পস্পন্দন। লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজনকুমার ঘোষ, সাগর চক্রবর্তী, শঙ্কর দাশগুপ্ত, বিজয় দেব, শ্যামল বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ দে, পিনাকী বিশ্বাস ও শঙ্কর সরস্বতী। প্রচ্ছদ—নীতেশ রায়।

বিশ্বাবী নিকেতন (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস শতবার্ষিকী সংখ্যা)—সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সী।। চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬।।

বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধের সংকলন। আছে কয়েকটি পুরনো লেখার পুনর্মুদ্রণ। দেশবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারক গ্রন্থটি ঐতিহাসিক দিক থেকেও মূল্যবান। তুষারকান্তি ঘোষের লেখা একটি প্রবন্ধ 'সি, আর দাস ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' খুবই উল্লেখযোগ্য। স্মৃতিকথা লিখেছেন নলিনী গুপ্ত। অন্যান্য লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন ডঃ রমা চৌধুরী, অনিলবরণ রায়, সুকুমার মিত্র, ভূপতি মজুমদার, সত্যেন্দ্র সান্যাল, বিশ্বপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। প্রথমদিকে মুদ্রিত কয়েকটি চিঠির মূল্য কিছুটা ঐতিহাসিক। সব চাইতে মূল্যবান হলো, দেশবন্ধুর কাছে অরবিন্দের লেখা একটি চিঠি ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি মানপত্রের পুনর্মুদ্রণ। বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীর মধ্যে চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ সংকলনটি প্রকাশের জন্য আমরা বিশ্বাব নিকেতন'কে অভিনন্দন জানাই।

আমাদের ত্রিপুরা (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা) সম্পাদক অনিলবরণ ভট্টাচার্য। ১৪৯।২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা—১২। প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা।

প্রবাসী ত্রিপুরাবাসীদের মুখপত্র। সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক ত্রৈমাসিক। ঘটনাক্রমে ত্রিপুরা জেলা এখন পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত। সেজন্যেই হয়তো বিভক্ত বাংলার স্মৃতি ফুটে উঠেছে নানা লেখায়। এখন 'ত্রিপুরা' বলতে অবশ্য আমরা আগেকার পার্বত্য ত্রিপুরাকেই বুঝি। পত্রিকাটির অবয়বে রয়েছে উক্ত ত্রিপুরারই স্বাক্ষর। সংখ্যা দুটিতে লিখেছেন হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মোহিত পুরকায়স্থ, রাসমোহন চক্রবর্তী, জগদীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, বেলা দেবী, নবদ্বীপ দেববর্মণ, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অনিলকুমার আচার্য এবং আরো অনেকে। সাধারণ পাঁচ-মিশালী পত্রিকায় কোনো বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কিংবা স্বাদগন্ধ পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে পত্রিকাটি মূল্যবান ও উৎসাহী পাঠকের পক্ষে সংগ্রহযোগ্য।

বৈকুণ্ঠের খাতা

বাংলা দেশের ছড়া

ভবতারণ দত্তের সম্পাদনায় সম্প্রতি বেরিয়েছে 'বাংলাদেশের ছড়া'র একটি সম্পূর্ণপ্রায় সংকলন, যা হাতে নিলে প্রথমেই মনে পড়ে বিস্মৃতপ্রায় বাঙালী-জীবনের রহস্যময় দিনগুলির কথা—স্বপ্নের মতো অম্লান সেই শৈশবের স্মৃতি।

বাঙালীসুলভ গৃহকাতরতার জন্যই কিনা, জানি না—ভবতারণবাবুর সংকলনটি পড়তে পড়তে আমি এক ধরনের নস্টাল-জিয়ার বিবশ বোধ করেছি। আজকের শহুরে ছেলেমেয়েদের কাছে হয়তো তা নেহাৎ-ই আজগুবি মনে হবে।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এমন একটা দিন ছিল আমাদের, যখন আমরা মা-মাসিমাদের মুখে ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। ছিল ঘুমের আগে-ঘুমোবার আয়োজন। —ঢেউখেলানো সুরের রোম্যান্টিক আবিষ্টতা।

এখন ছেলেমেয়েরা নানারকম রহস্য-রোমাঞ্চের বই পড়ে। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও তা এমন সহজলভ্য ছিল না। গল্প শোনার চিরন্তন চাহিদাটা মেটাতেন বাড়ীর বুড়ো-বুড়ীরা। অনেক রাত জেগে জেগে—বাইরের স্তব্ধতা ও ঘরের অন্ধকারের মধ্যে—আমরা শুনতাম সেই সব গল্প, যা কোনোদিন লেখা হয়নি বইতে, কোনোদিন লেখা হবে না।

তখন বুঝতাম না এর তাৎপর্য। লক্ষ্য করতাম, রাজা ও রাজপুত্রের গল্পে আমরাও অংশীদার। রাজার নফর অনায়াসে সফরে বেরোতেন রাজপুত্রের সঙ্গে। ঘুঁটে-কুড়ুনি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত অচিনপুরের রাজকুমারের।

যখন বই পড়ার বয়স হলো, তখনও বই বন্ধ করে সেই বানানো গল্পগুলিই শুনতে চাইতাম। পরে বুঝেছি, মা-ঠাকুমারা যে-গল্প শুনিয়েছেন, তার সঙ্গে সাহিত্যের যোগ না থাক, জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল কোথাও। কেবল কাহিনীর গুণেই যে গল্পগুলি আমাদের মনে দাগ কেটেছিল, তা নয়, বিশেষ কথনভঙ্গি ও বর্ণনার সারল্য আমাদের মুগ্ধ করেছিল। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন : "এখনকার কালে বিলাতের 'কেমারী টেল্‌স' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে। কিন্তু কোথায় গেল রাজপুত্র, পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, কোথায় সাতসমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মানিক!"

তিনি সেই লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ককেই অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর মতে : "মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলই ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে?"

রবীন্দ্রনাথ নিজে রূপকথার মানুষ-গুলিকে বিভিন্ন গল্পে-কবিতায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মা-মাসিমাদের সেই সারল্য বজায় রাখতে পারেননি। সে-কথা মনে রেখেই হয়তো ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সাধনা'য় লিখেছিলেন :

"রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনো বাঁধা নিয়ম, কোনো চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়ম-পথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই।...রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।"

ছড়ার বই হাতে নিয়ে রূপকথার প্রসঙ্গ উত্থাপন অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা কি বলবেন, জানি না—আমার কাছে ছড়া ও রূপকথাকে মনে হয়, একই উৎসের লোকায়ত উপহার। ভবতারণবাবু 'বাংলাদেশের ছড়া' সংগ্রহ করে শুধু গতকালের ঐশ্বর্যকে পুনরুদ্ধার করেননি, বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির জগৎকেও ফিরিয়ে দিয়েছেন।

পূর্ববর্তী উদ্যম

বাংলাদেশে ছড়া সংকলনের সূত্রপাত কবে, কোন্ তারিখে হয়েছে—তা বলা মুশকিল। অনুমান হয়, রবীন্দ্রনাথের আগে—তেমন কোনো বড় রকমের উদ্যোগ আর কেউ দেখাননি। মাইকেল মধুসূদন লা ফন্তানের নীতি-গল্পের অনুবাদ করেছিলেন কবিতায়। আর, হান্স এন্ডারসনের জীবিতকালে, তাঁর রূপকথার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু তার সঙ্গে বাংলাদেশ ও বাঙালী সংস্কৃতির যোগাযোগ সামান্যই। যোগীন্দ্র-

নাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া'র ভূমিকায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথকেই এ-ব্যাপারে প্রথম সংগ্রহ উদ্যোক্তা বলে মনে করেছেন। তাঁর ভাষায়:

"কথাটা একটু খুলিয়া না বলিলে ছড়া-সংগ্রহের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিছুদিন হইতে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অজস্রদত্ত পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক এই জাতীয় কবিতা সংগ্রহের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি প্রকাশ্য সভায় 'মেয়েলি ছড়া' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে যে ভাবুকতা, সরলতা ও চিন্তাশীলতার সহিত এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা অন্যের পক্ষে অনুকরণের অতীত।"

রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রবন্ধ লিখে নিরস্ত

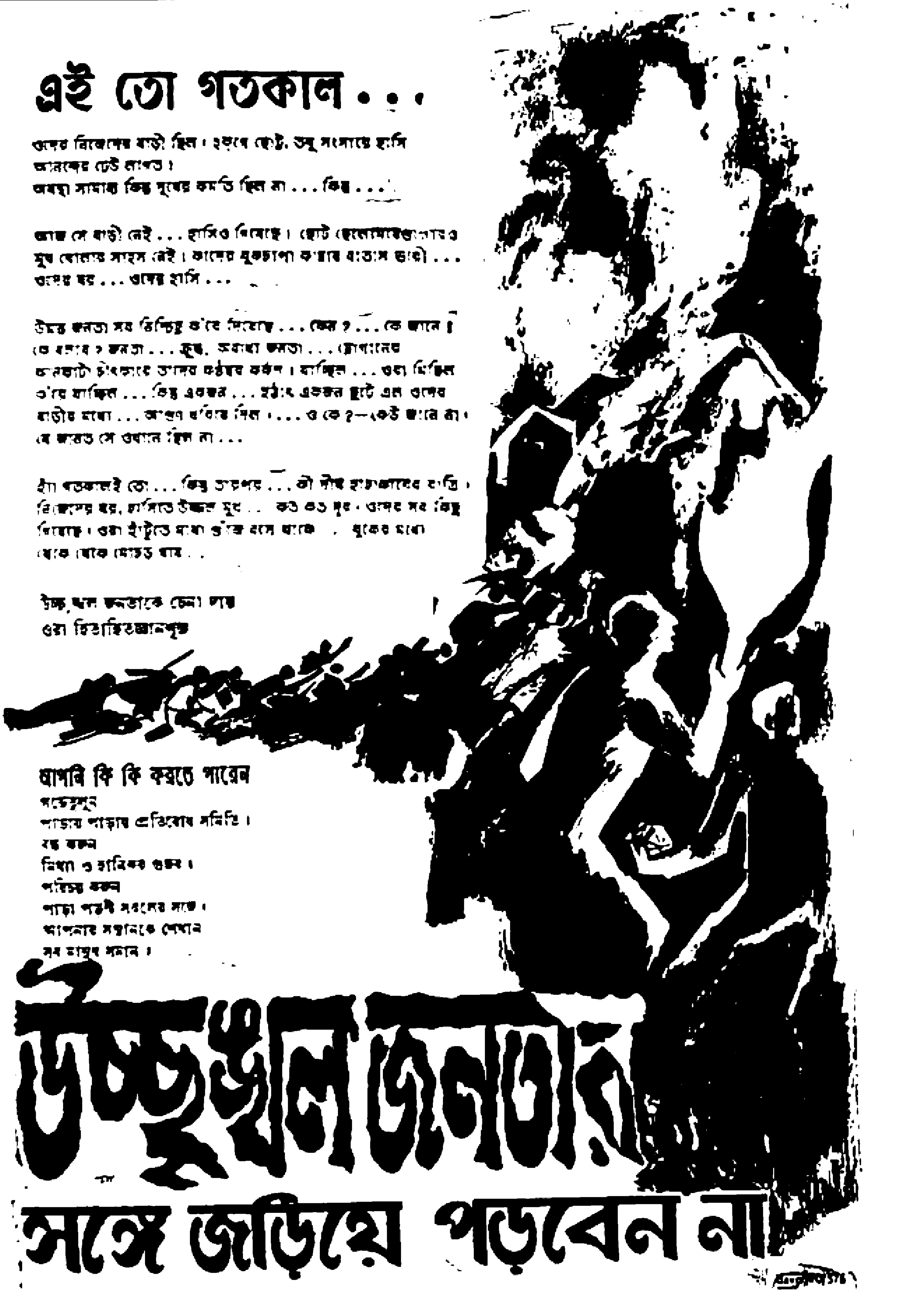

ছিলেন না, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার উদ্যোগে ছড়া সংগ্রহের কাজে নেমেছিলেন। তখন তাঁকে সাহায্য করেছিলেন চট্টগ্রামের মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য, বাঁকুড়ার বসন্তরঞ্জন রায়, মুর্শিদাবাদের কিরণবালা দেবী, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কিন্তু সে-কাজ বেশীদূর এগোয়নি। সাহিত্য পরিষৎ-এর তৎকালীন পরিচালকেরা ছেলে-ভুলানো ছড়া সংগ্রহকে পণ্ডিতমণ্ডলীর অযোগ্য কাজ মনে করেছিলেন।

ভবতারণবাবু সেইসব পূর্বতন প্রয়াসকে খুঁটিয়ে দেখেছেন কিনা, জানি না—তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার সুযোগ পাইনি। গ্রন্থারম্ভে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া'র উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। ঋণ স্বীকার করেছেন আরো অনেকের কাছেই।

ভবতারণ দত্তের প্রেরণা ও প্রয়াস

'সম্পাদকের বক্তব্য' লিখতে গিয়ে ভবতারণবাবু বইয়ের প্রথম প্রেরণার কথা লিখেছেন অসঙ্কোচে। তাঁর ভাষায় : 'নগরীর অতি-আধুনিক সভ্যতায় বাঙালী-শিশুর আধো-আধো বুলি যখন হাম্পটি ডাম্পটি আর জ্যাক অ্যান্ড জিলেতে প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন—সেই সন ১৩৬৯ সালে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন আমাকে বাংলা-দেশের ছড়া সম্পাদনার নির্দেশ যখন দিলেন, তখন বেশ চমৎকৃত হয়েছিলুম। কাজ শুরু করে মুগ্ধ হয়েছিলুম ওই নির্দেশটির প্রতি তাঁর অসীম মমতা এবং দূর-দৃষ্টির কথা ভেবে। তারপর যত গভীরে গিয়েছি, ততই মুগ্ধ হয়েছি—আর কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করেছি তাঁকে—স্মরণ করি তাঁকে—এইজন্য যে অতি-আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির চৌহদ্দীর বাইরে চলে-যাওয়া সেই মা-কাকী, মাসি-পিসি, ঠাকুমা-ঠাকুমার জগৎটাকে একটা বিশেষ নির্দেশ ও দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে আস্বাদন করার সুযোগ তিনি আমায় দিয়েছেন।"

ডক্টর সুকুমার সেন 'শিশুবেদ' নামক দীর্ঘায়ত মুখবন্ধ লিখে তাঁর কাজকে শুধু স্বাগত জানাননি, অতীতের স্মৃতিচারণাও করেছেন। তাঁর ধারণা : "শিশুবেদ বয়স্কের সাহিত্যভূবণ ধরে আছে বাল্মীকির মতো। শিশুবেদের মধ্যে ধরা রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্মপত্রিকা।"

ভবতারণবাবু সংগ্রহের কাজে নেমে নানা অসুবিধায় পড়েছেন বারবার। গিয়েছেন গোর্কি ইনস্টিটিউটে—আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ, মনীষা এবং সোভিয়েত দেশ-এর অফিসে। আর সবশেষে গিয়েছেন জাতীয় গ্রন্থাগারে। কিন্তু কোনো জায়গাতেই তাঁর প্রার্থিত বই-গুলি পাননি। ফলে, যা পেয়েছেন, তা-ই সঙ্কলনভুক্ত করেছেন পর্যায়ক্রমে।

তিনি অসঙ্কোচে লিখেছেন : "গ্রন্থ সম্পাদনার নির্দেশ পেয়েছি শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেনের কাছ থেকে এবং স্বীকৃতি পেয়েছি ভাষাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এবং অবিরাম উৎসাহ পেয়েছি উত্তরবঙ্গের বিকাশীর কমিশনার মাননীয় সুনীলকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাছ থেকে।"

সুনীলবাবুরই আগ্রহ এবং উদ্যোগে বইটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্য পেয়েছে বলে মনে হয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষার উন্নতিতে ভারত সরকারের পরি-কল্পনা কমিশন যে অর্থ সাহায্য দেন—সেই সাহায্যের জন্যে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বইটি বিক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে।

ভবতারণবাবু যাই বলুন, গত-দৈনিকের স্মৃতি এই সঙ্কলনের অনাত্মে প্রেরণা। হয়তো সুযোগ এবং সুবিধা থাকলে দুই বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে তিনি ছড়া সংগ্রহ করতে পারতেন। আজ সে-পথ বন্ধ। বাধ্য হয়ে পুঁথিপত্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছড়াগুলিকেই জড়ো করেছেন একই মলাটের ভেতরে। সম্পাদকীয় নিবন্ধের পরিশেষে তিনি কামনা করেছেন :

"যে সকল শিশু প্রাঙ্গণে খাড়িত/ যে সকল শিশু শয্যায় শায়িত/এবং যে সকল শিশু মাতৃগর্ভে গর্ভ ধারণ করিয়া আছে/তাদের সকলকেই নিবেদিত করিয়া দিলাম।"

অর্থাৎ, সেই নস্টালজিয়া, বিরহতা বোধ, গ্রামীণ জীবনের মস্তভায় অবগাহনের ইচ্ছেটা রয়ে গেছে ভবতারণবাবুরও অন্তরে। অন্যদের 'ঘুমপাড়ানি গান'টি অনুবাদ করেও তিনি তাঁর সেই প্রথম অতিপ্রাকৃতিকে আড়াল করতে পারেননি।

বাংলাদেশের পাঠক লুপ্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে শুধু ঐতিহাসিক উপাদানেরই সন্ধান পাবেন না, এই ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে লুপ্ত সম্পর্কের সূত্রটিও আবিষ্কারের সুযোগ পাবেন। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য দীর্ঘ-কাল ধরে লোকসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন, কামিনীকুমার রায় 'লৌকিক শব্দ-কোষ' লিখছেন—তা-ও কম দিন ধরে নয়। ভবতারণবাবু তাঁদের সাহায্য নিলে হয়তো আরো উপকৃত হতেন।

বৈশিষ্ট্য এবং সার্থকতা

'বাংলাদেশের ছড়া'য় সঙ্কলিত হয়েছে মোট ৮৭২টি ছড়া এবং ধাঁধা। কয়েকটি ছড়ার পাঠান্তর উপভোগ্য। আপাতদৃষ্টিতে যে-কয়টি জেলার ছড়া আছে, সেসব জেলার নাম যথাক্রমে : চট্টগ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম দিনাজপুর, সাঁওতাল পরগণা ও হুগলী। অন্যান্য অঞ্চলের ছড়া কেন সংগ্রহ করা যায়নি, তার কারণ অনুল্লেখ। কিছু ছড়া তিনি সংগ্রহ করেছেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

সঙ্কলনভুক্ত ছড়াগুলি প্রধানত তিন শ্রেণীর। প্রথমত ছেলেভুলানো ছড়া, দ্বিতীয়ত বিভিন্ন খেলায় ব্যবহৃত ছড়া এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে ধাঁধাগুলি। স্বভাবতই বয়সের ব্যবধান অনুসারে ছড়ার ভাব ও প্রকৃতিতেও হেরফের ঘটেছে। ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি ছোট শিশুদের উপ-যোগী, খেলায় ব্যবহৃত ছড়াগুলি আপেক্ষিক বয়স্ক শিশুদের জন্যে বানানো। ফলে, এ-জাতীয় ছড়ায় পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় বেশী। ছেলেমেয়েরা প্রচলিত ছড়ার সঙ্গে নিজেদের অভিপ্রায় শব্দ ও ছবি আমদানী করেছে আবৃত্তি করার সময়ে। ধাঁধাগুলি কিছুটা বয়স্ক মনের ফসল।

ভবতারণবাবু সঙ্কলনটিকে পাদটীকায় কণ্টকিত করেননি সাধারণ পাঠকের কথা ভেবে। গ্রন্থশেষে টীকা, শব্দার্থ এবং নির্ঘণ্ট সাজিয়ে দিয়েছেন।

ছড়া শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে, ডক্টর সুকুমার সেন বলেন : 'কবিতা, কবিতা ছড়, কবিতা ছড়াখ অর্থে শব্দটির ব্যবহার উনবিংশ শতাব্দীর আগে পাইনি। তবে লোক ব্যবহারে এ অর্থ ছিল সন্দেহ নাই। সাধারণ লোকে পদ্য জানতো না, 'পদ্য' শব্দও অপরিচিত ছিল। মঙ্গলগান, পাঁচালি, যাত্রা, কথকতায় পদ্য কিছু থাকলেও তা শুধু গায়েন-কথকদের মন্তব্য। সুতরাং তা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ টানতো না। যা টানতো, তা হলো গান আর কবিতায় ছড় অথবা কবিতাছত্রের অংশ আবৃত্তি। এই শেষোক্তই 'ছড়া'। শব্দটি দুই অর্থে প্রতিষ্ঠিত। (১) প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো; (২) গ্রথিত, গাঁথা—মালাছড়া। গানের মধ্যে ছড়ানো আর পর পর গ্রথিত—এই ছিল ছড়ার বিশেষত্ব। অতঃপরে অর্থ হলো, ছুটকো ছন্দময় রচনা। হিন্দী 'ফুটকর' কবিতা, আর সংস্কৃত 'চাটুকা' (চনাভাজার মতো) শ্লোক ছড়ার সমনাম।"

ভবতারণবাবু উচ্চারণ ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে গৃহীত ছড়া-গুলির বানান অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছেন। হয়তো 'ছেলেভুলানো ছড়া'য় রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত মন্তব্যটি তাঁর মনে ছিল। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, ছড়ার বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলে কিছু নেই। কেননা, ছড়াগুলির মধ্যে মূল পাঠ কোনটি, তা নির্ণয় করা অসম্ভব।'

প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ-কে এই সঙ্কলনটি প্রকাশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তাঁরা জাতীয় কর্তব্যই পালন করেছেন। ভবতারণবাবু গবেষক এবং অধ্যাপক। স্বভাবতই তাঁর দৃষ্টি ছিল বিজ্ঞানসম্মত। গ্রীম ভাইদের মতো তিনি ভাবতাত্ত্বিক কিনা, জানি না,—তবে সিসিল শার্পের মতো সমাজতাত্ত্বিকের মনোভঙ্গি নিয়েই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সঙ্কলনের বিভিন্ন ছড়ায় ছড়িয়ে আছে, অতীত-বাংলার লুপ্তপ্রায় জীবনের নিদর্শনগুলিও।

—[illegible]

ভাল করে জ্ঞান হবার অনেক আগে থেকেই অদম্য বাসনা ছিল বিলেতে আসবার। আপনারা হয়তো ভাবছেন সেটা আর এমন আশ্চর্য কি। দুশো বছরের ইংরাজ শাসন এবং তারপর সারা পৃথিবী-ব্যাপী পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়-জয়কার— পারলে তো বোধহয় ভারতের সব তরুণ-তরুণী ইউরোপ-আমেরিকায় চলে যায়। আমি তো তবু মোটামুটি লেখাপড়া শিখেছি। জন্মেছি সম্পন্ন পরিবারে। আমি যে ছোটবেলা থেকেই বিলেত যাবার স্বপ্ন দেখবো এতে আর অভিনবত্ব কোথায়? কিন্তু আমার বিলেতে আসার পেছনে উচ্চাশার তাড়না ছিল না। ছিল শৈশবের এক করুণ অধ্যায় যা শেষ হয়েও হয় নি তাকে শেষ [illegible] তাগিদ।

আমার শৈশবের রাজকুমার আমার [illegible] মাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। [illegible] কোন দাগ কাটে নি অথচ আমার বুকে রেখে গিয়েছিল গভীর ক্ষত। আজ বুঝি আমার বা অন্য কারো ভালবাসা চোখে পড়ার মত বয়সে তার ছিল না। তাকে হারানোর পুরনো শোক আজও আমার মন থেকে যায় নি, শুনলে সে অবাক হত বিরক্ত হত কিনা জানি না।

প্রদীপ আমার ভাই। আপন না, সৎ। প্রদীপ বললে চিনতে পারবে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। নেই বললেই চলে। কিন্তু তরুণ ঔপন্যাসিক প্যাট্রিক রবিনসনকে সাহিত্য অনুরাগী মাত্রই চেনে। তার অকাল মৃত্যুর খবর ইংল্যান্ডের ছোট-বড় সব কাগজই প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপিয়েছিল। সাপ্তাহিক ও দৈনিকের সাহিত্য-পৃষ্ঠাগুলিতে সমালোচকেরা এখনও তার প্রতিভার মূল্যায়ন করে চলেছেন আর সেই সঙ্গে এমন একটি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হলো না বলে দুঃখ প্রকাশ। যদিও প্রদীপ মারা গেছে আজ প্রায় ছমাস কিন্তু ইসলিংটন হ্যামস্টেড ও চেলসীর সাহিত্য শিল্পরসিকদের যে কোন সমাগমেই আজও তার নাম দু'একবার কানে আসবেই। এই সেদিনই কেনসিংটনে এক শিল্পী বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আতিথেয় ব্যস্ত বন্ধু দু'একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। এই ধরণের লোক সমাগমে যেখানে সকলেই অপরিচিত অথচ ঘন্টা তিন-চারের মধ্যে পরস্পরকে চিনে নিতে হবে এরকম একটা অলিখিত নির্দেশ জারী করা রয়েছে আমি সত্যই অস্বস্তি বোধ করি। বন্ধু কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন মনে নেই। দু-চারবার সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বোধহয় এক [illegible] মহিলার ভাঙা ইংরাজি অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ কানে এলো কে যেন বলছে বেচারা প্যাট্রিক রবিনসন। ওর লেখক জীবনে দুই পরিচ্ছেদ। প্রথম জীবনে ওর বক্তব্য ছিল। কিন্তু প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভাষা যদি বা মিললো বক্তব্য গেলো হারিয়ে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি, মধ্যবয়সী বৃষস্কন্ধ শক্ত মজবুত চেহারার এক ভদ্রলোক। পাশে দাঁড়ানো ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন টাইমসের সাহিত্য সম্পাদক।

CENTRAL LIBRARY

না। প্রদীপ এদেশে এসে ঘটনাচক্রে থেকে যেতে বাধ্য হয় নি। পরীক্ষা পাশ করতে না পারার ব্যর্থতা বা প্রজাপতির নির্বন্ধ প্রদীপকে এদেশে বসবাস করতে হয় নি। কোন হীনমন্যতার জন্যও সে নাম বদলায় নি। সে ইংল্যান্ডে থাকতেই এসেছিল। রবিনসন তার মায়ের পদবী। ইংল্যান্ড তার মাতৃভূমি।

প্রদীপের মা ছিলেন ইংরেজ—অভিজাতবংশীয়া। শুনেছি আমার বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় দক্ষিণ ফ্রান্সের এক গ্রামে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা সেখানে দলবদ্ধ হয়ে কয়েকমাস কাজ করতে এসেছেন। বেড়াতে বেড়াতে আমার বাবা শিল্পীদের এই কলোনীতে গিয়ে পড়েছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল প্যাট্রিসিয়ার — প্রদীপের মায়ের। প্যাট্রিশিয়া ছবি আঁকতেন কিনা জানি না। তাঁর আঁকা কোন ছবি বাড়ীতে দেখি নি। বেড়ানোর নেশা ছিল তাঁর। সারা ইউরোপ তিনি চষে বেড়িয়েছেন। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাও বাদ যায় নি।

শুনেছি তাদের পূর্বরাগের পালা হয়েছিল দীর্ঘ। ফ্রান্স, ইটালী, সুইটজারল্যান্ড, লন্ডনে অনেকদিন অনেক রাত্রির আরাধনায় প্রসন্ন হলেন প্যাট্রিসিয়া। অনেক অভিজাত ইংরেজ যুবককে হতাশ করে মালা দিলেন অজ্ঞাত অখ্যাত এক বাঙালী যুবকের গলায়। শুনেছি প্রচণ্ড পারিবারিক আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছিল। অজ্ঞাত অখ্যাত বাঙালী যুবকের গলায় মালা দেবার জন্য বা অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতে এসে বসবাস করার জন্য তাঁকে কোনদিন অনুতাপ করতে দেখা যায় নি, শোনাও যায় নি। তাঁর মনের ধাঁচটাই ছিল অদ্ভুত যে জন্য তার বিয়েটার মধ্যে যে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে তা তাঁর মাথায় আসে নি। আমার বাবার সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর পরিবারের বিরোধিতা তাঁকে আশ্চর্য ও বিরক্ত করেছিল। আমার মনে হয় ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলার জন্য তিনি নিশ্চয় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন এবং বিয়েটা তার সেই অসহিষ্ণুতারই পরিণতি। অবশ্য এসবই আমার নিজের ধারণা। আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা। ঠিক ব্যাপারটা কি হয়েছিল আমার মাও জানতেন না। আমার বাবা কোনদিনই তার প্রথমা স্ত্রী সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। আমার মাও শুনতে চান নি। যেটুকু শুনেছিলেন সেটুকু তাঁর শাশুড়ী, আমার ঠাকুমা ও বাড়ীর পুরনো চাকর-বাকরদের কাছে শোনা টুকরো টুকরো কথা মাত্র।

প্রদীপের মায়ের সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে মনে হয়েছে কোনদিন কোন লোককে বিয়ে করে তিনি সুখী হতেন না। বেপরোয়া বিদ্রোহী প্যাট্রিসিয়া নিজেই জানতেন না তিনি কি চান। অথবা তিনি কিছুই চান নি। নিজের মত করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কোন বন্ধন এমন কি পুত্রস্নেহও তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি। এক বিরাট অস্থিরতা তাঁকে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। শুনেছি তাঁর মৃত্যু হয় উল্কার মতই পুড়ে ছাই হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর জীবনে শান্তি ছিল না।

আমার বাবার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদও আকস্মিক। শুনেছিলাম হঠাৎ নাকি তাঁর মনে হয়েছিল তিনি অন্য একজনকে ভালবাসেন। সে অন্য একজনটি যে কে তা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমার বাবা তাঁর মুখ দিয়ে বের করতে পারেন নি। যেমন আকস্মিকভাবে রায়চৌধুরী পরিবারে তিনি এসেছিলেন তেমনি আকস্মিকভাবেই তিনি মিলিয়ে গেলেন। একটা চিঠিও কারো জন্যে লিখে রেখে গেলেন না। তাঁর আগমনে রায়চৌধুরী পরিবারে আলোড়ন জেগেছিল। তাঁর অন্তর্ধানে সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল।

বাবাকে কিছু বলবার মত সাহস কারো ছিল না। দাদু বাবার ছোটবেলায়ই মারা গিয়েছিলেন। ঠাকুমা ইংরাজ পুত্রবধূকে মেনে নিতে পারেন নি। কাশীই থাকতেন। এই লজ্জাকর ঘটনার পর তিনি দেশের পাট গুটিয়ে ছেলের কাছে চলে এলেন আর বাবা কলকাতা ছেড়ে লক্ষ্ণৌতে প্র্যাকটিস সুরু করলেন।

তিন বছরের প্রদীপ মাকে না দেখতে পেয়ে কেঁদেছিল কিনা জানি না কিন্তু তার কাছে তার মায়ের নামোল্লেখও কেউ করতো না। এক আমার ঠাকুমার মুখে মাঝে মাঝে প্যাট্রিসিয়ার নাম শোনা যেত। বার্ধক্যের স্বভাববশতঃ পুত্রের নির্বুদ্ধিতা ও মা বাবার সন্তানের অবহেলা করা নিয়ে মাঝে মাঝেই তিনি আক্ষেপ করতেন। প্রদীপের কানে এই রকম দু-একটা আক্ষেপোক্তি নিশ্চয় গিয়ে থাকবে।

আমার বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। আমার মা ছিলেন সাধাসিধে। তাঁর নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্ব কোনদিন চোখে পড়ে নি। আমার বাবার স্ত্রী ও আমার

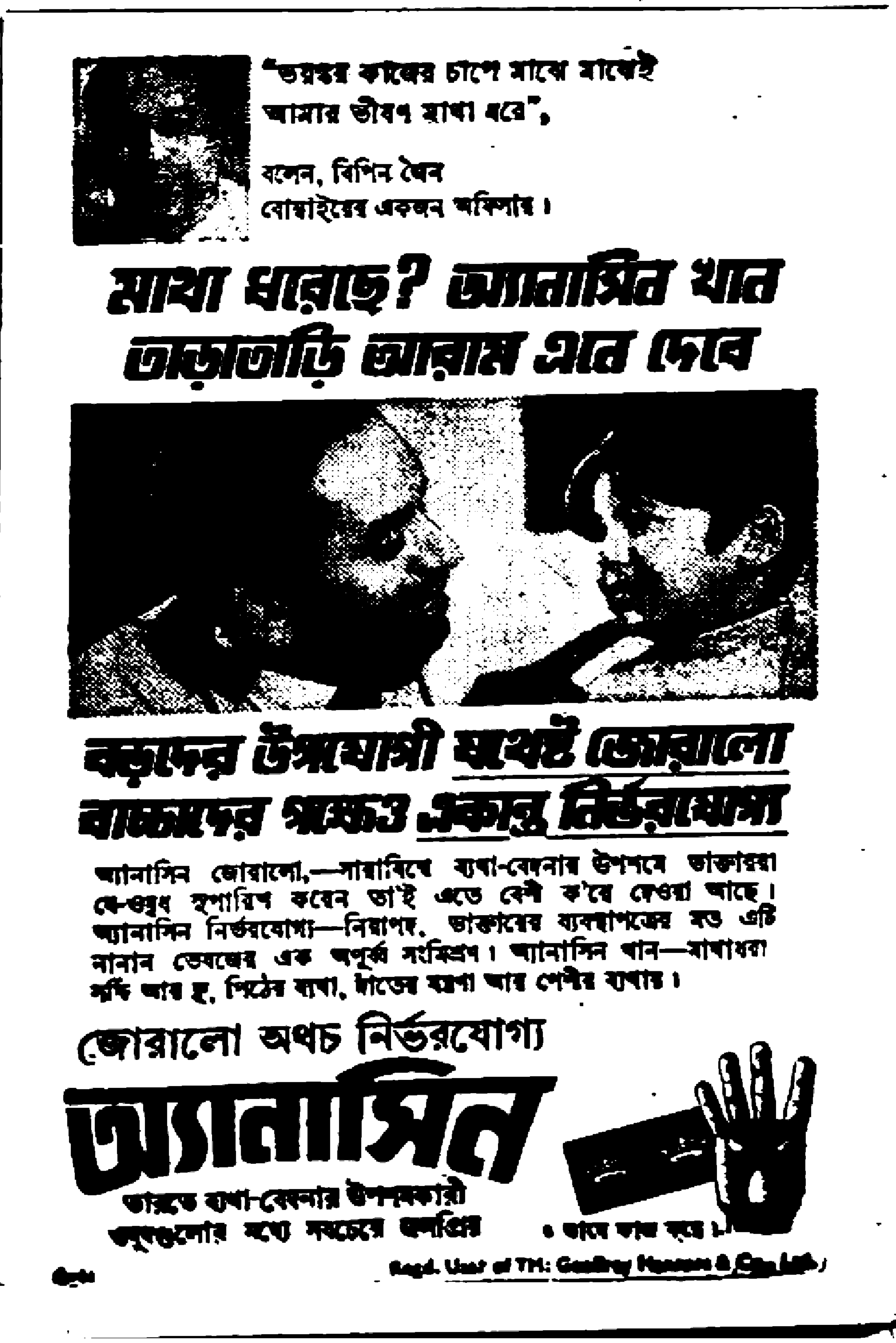

CENTRAL LIBRARY

মা এই পরিবারেই তিনি সুখী ছিলেন। মনে হয় বাবাকেও সুখী করেছিলেন। দার্জিলিংয়ের গৃহত্যাগ আমার বাবার মনে কোন গভীর দাগ রেখে গিয়েছিল কিনা জানি না। দেখেও তার কোন প্রমাণ দেখি নি।

লক্ষ্ণৌতে আমাদের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। প্রদীপ আমার চাইতে আট বছরের বড়। তার রং ছিল মায়ের দিকে। চোখের তারা ছিল নীল। যে মিশনারী স্কুলে সে যেত সেখানে ভারতীয়দের সঙ্গে অনেক ইংরাজ ছেলেও পড়ত। নিজের নামের ও চেহারার অসঙ্গতি কিছুমাত্র তার মনে কোন ছাপই কি ফেলে নি?

স্কুলে ফাদারেরা সাদা কালোর অসমতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নিশ্চয়ই প্রবেশ করেছিল। অন্তঃসলিলা শীর্ণ বিদ্বেষের ধারাটি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে [illegible] হয়ে উঠত। এই ধরনের মনান্তরে প্রদীপ কোন দলে স্থান নিত জানতে চেষ্টা করেছি। প্রদীপের পুরোনো একজন শিক্ষকের সঙ্গে কলকাতায় হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে প্রশ্নও করেছিলাম। বৃদ্ধ [illegible] ফাদার আমার এই অনুসন্ধিৎসায় অবাক হয়েছিলেন। প্রদীপকে তাঁর মনে ছিল। খেলাধুলায় তার বড় একটা অনুরাগ ছিল না। পড়াশুনা নিয়েই সে থাকত। সকলেই তাকে ভালবাসতো।

প্রদীপের প্রতি আমার আকর্ষণের অন্ত ছিল না। সুযোগ পেলেই তার ঘরে গিয়ে ঘুর ঘুর করতাম। আমাকে সে আমলেই দিত না। তবে আমার প্রতি একটা উদাসীন স্নেহও বোধহয় তার ছিল। মাঝে মাঝেই সে আমাকে চকোলেট বিস্কুট দিয়ে বিদায় করত। আর একটু বড় হলে আমার পড়াশুনায় সাহায্য করত। তবে পড়ানোর মত মেজাজ প্রদীপের ছিল না। একবারের বেশী দুবার বোঝাতে হলে তার কপালে ভাঁজ পড়ত, মুখে ফুটত বিরক্তির রেখা। যদিও চীৎকার করা ছিল তার একেবারেই স্বভাব বিরুদ্ধ।

প্রদীপের বয়স যখন চৌদ্দ তখন আমাদের পরিবারে আমার এক অভাবিত ঘটনা ঘটলো যার ফলে আমাদের সব কিছুই গেল ওলট পালট হয়ে। আবার সেই দার্জিলিং। আমার বাবার ইউরোপীয়ান ক্লাবে যাতায়াত ছিল। হঠাৎ সেখানে এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী [illegible] ছিলেন কিনা। বাবা জানালেন [illegible], কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ? তিনিও [illegible] না বলে এড়িয়ে গেলেন। দিন [illegible] পরে আবার এক বন্ধু জানালেন [illegible] ইভানসের অতিথি [illegible] টি [illegible] পার্টিতে দার্জি- [illegible] বলেছেন, এ আলোচনা [illegible]। পরদিন সোজা গেলেন ইভানসের বাড়ী। ভদ্রলোক বাইরের ঘরে ছিলেন। উদ্ধত ও [illegible]

তরল-স্বরে গল্পে ফিরলেন। শুধু রেখেছেন ভারতে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের সূত্রেই তাঁর ভাষা হয়ে গিয়েছে। দেশে ফিরে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যতত্ত্বে নিশ্চিন্ত অধ্যাপনা প্রায় নিশ্চিত। অবশ্য এ সবই আমার পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠা ধারণাও হতে পারে। আমি দেখেছি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য অন্য দেশকে যারা বেছে নেন তাদের অধিকাংশই সে দেশকে ভালবেসে ফেলেন। তাঁদের স্বপ্নের দেশ বাস্তবের অভিঘাত সহ্য করেও টিকে থাকে। কিন্তু সংস্কারে আঘাত লাগার জন্যই হোক বা আশাভঙ্গের তিক্ততার জন্যই হোক বিদেশিনীরা যখন তাদের বিদ্যাটিকে কেবল একটা উপার্জনের রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন না তখন তাদের মত বিপজ্জনক ও বিরক্তিকর লোক আর হয় না। যাই হোক আমার বাবা তাঁর আগমনের কারণ জানালেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী সম্পর্কে দার্জিলিংয়ে ইদানীং কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে। সেটা তাঁর পছন্দ নয়। শোনা যায় ভদ্রলোক খুব অমায়িকভাবে বলেছিলেন, এ নিয়ে আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? ঘটনাচক্রে আমাদের দুজনকেই এক নৌকায় চড়তে হয়েছে। তাতে...আমার বাবা তাকে কথা শেষ করতে দেন নি। সামনের টেবিলে পড়েছিল একটা বাটম। তাই দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ভদ্রলোকের মাথায় আঘাত করেছিলেন। প্রচণ্ড আঘাতে ভদ্রলোক জ্ঞান হারিয়েছিলেন। সে জ্ঞান আর ফিরে এলো না। আমার বাবা খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলেন।

সারা শহরে চাঞ্চল্য পড়ে গেলেও বাবা কৌতূহলীদের নিরাশ করলেন। তিনি কোন কথাই বলতে চাইলেন না। আমরা বাড়ীর বাইরে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। প্রদীপের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলো। বিচার চলাকালেই হৃদরোগে বাবার মৃত্যু হলো। মা আমাকে নিয়ে দেশের বাড়ীতে চলে এলেন।

প্রদীপ দেরাদুনে বসে এর কতটা শুনতে পেয়েছিল জানি না। আমরা দেশে চলে আসবার পর [illegible] তার বাড়ী আসা বড় একটা ঘটে উঠত না। স্কুলের [illegible], বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতেই সে [illegible] ছুটিগুলো কাটিয়ে দিত। বাড়ী আসার জন্য তার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যেত না। আমার মাও কোনদিন জোর করতেন না বরং তার এই অনাগ্রহের জন্য অন্তরে একটু স্বস্তিই বোধ করতেন। প্রদীপের জন্য টাকা পয়সার অভাব ছিল না। আমাদের যাই হোক না কেন প্রদীপের স্কুলের মাইনে ঠিক সময়ে পৌঁছনোর জন্য, তার খরচে যাতে কোন টান না পড়ে তার জন্য তাঁর নীরব উৎকণ্ঠা আমি আজও অনুভব করি। আমি জানি প্রদীপের দূরে সরে থাকা ও [illegible] তাঁকে পীড়া দিত। কিন্তু তাকে যে অন্তত আমাদের [illegible] একেবারে [illegible] সামনে পড়তে হবে না, [illegible] অন্তত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না এই ভেবে স্বস্তিবোধও করতেন। আমার মনে হয় প্রদীপও সেটা বুঝত বলেই দূরে সরে থাকত। এসব বিষয়ে আমার মা ও প্রদীপের মধ্যে একটা অদ্ভুত সমমর্মিতা ছিল।

পরে যখন তার সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল তখন অনেকবার জানতে ইচ্ছে হয়েছে প্রদীপ আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবত? আমাদের কথা—আমার মা আমাদের [illegible] কথা কোনদিন কোন একান্ত মুহূর্তেও কি তার মনে হয় নি? এঁদের সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই কি তার ছিল না? নাকি শৈশবেই তাকে পরিত্যাগ করে যিনি চলে গিয়েছিলেন সেই উদাসীন অনাসক্ত মায়ের প্রতি দুর্বার আকর্ষণই তাকে আমাদের পরিবার সম্বন্ধে সচেতন হতে দেয় নি: পথ চলতি মানুষের পান্থনিবাসে দুদিন কাটানোর মত প্রদীপও আমাদের বাড়ীতে কয়েকদিন থেকে গিয়েছিল মাত্র?

অনেক অনেকদিন পরে প্রদীপের ক্লান্ত বিষণ্ণ নায়কের মুখে আমার মায়ের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। মধ্যবয়সী নায়ক স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলছে আমার বিমাতার কাছ থেকে সেই প্রথম চিঠি। বাবার মৃত্যুর কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। যথারীতি কুশল সম্ভাষণ, মন দিয়ে পড়াশুনা করতে বলে তিনি লিখেছেন আমার সৎ বোনটিকে নিয়ে তিনি তাঁর বাবার কাছে চলে যাচ্ছেন। সামনের লম্বা গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি কি করব ঠিক করেছি? কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছা আছে কি? টাকার জন্য আমি যেন চিন্তা না করি। আমার বাবা যা রেখে গেছেন তা থেকে আমার খরচা তিনি চালাতে পারবেন। অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গিয়েছিল এই ছোট খাট মহিলাটির প্রতি। মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তাঁর মত সম্মান দিতে আমি আর কাউকে দেখি নি। আমি নিঃসংশয়রূপে জানি এ মহিলা আমার মা ছাড়া আর কেউ নন।

আমি জানি বাবার সম্বন্ধে তার এক ধরনের বিরূপ মনোভাব ছিল। বোধহয় তাঁর মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য বাবাকেই সে মনে মনে দায়ী করত: কিন্তু পরে বাবা যখন মারা গেলেন তখন এই বিরূপতা শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রদীপের লেখায় বাবা বার বার এসেছেন। স্বভাবে প্রদীপ আর বাবা পৃথিবীর দুই মেরু অথচ প্রদীপের লেখায় বাবার স্বভাব গেল কি করে জানি না। বাবার একটা চেহারাই আমার বেশী মনে পড়ে। সেটা হল সন্ধ্যা বেলা কিম্বা অন্য কোন সময়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকেই তিনি আমার এক বেণী টেনে মেঝে থেকে তুলে নিতেন। হঠাৎ দেখতাম ঘরের ঝাড় লণ্ঠন প্রায় মাথার কাছে দুলছে। আবার তেমনি হঠাৎ নামিয়ে দিতেন। প্রদীপের লেখা পড়লেও আমার ঠিক সেই একই অনুভূতি হয়। প্রতি মুহূর্তে আকস্মিকের চমক পাঠকের প্রস্তুতির অপেক্ষা রাখে না।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিয়ে প্রদীপ ইংল্যান্ড যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। তার মামা তাকে বার বার চলে আসবার জন্য লিখছিলেন। প্রদীপ আমাদের কাছে দুটি

ফাটতে এল। আমাদের সঙ্গে এইই তার শেষ ছুটি কাটানো।

আমরা যতটা আশা করেছিলাম তাকে নিয়ে, ততটা চাঞ্চল্য কেউই দেখালো না। একটা কারণ বোধহয় মানুষের সব কৌতূহলই ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে এবং মেনে-নেওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অন্য কারণ তখন দেশের রাজনৈতিক হাওয়া থমথমে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় লোকে প্রহর গুনেছে। কিন্তু এই উত্তেজনা আর বেশী দিন নিস্তব্ধ রইলো না। কি হবে বলে বসে না থেকে লোকে নিজেদের হাতেই ভবিষ্যতের ভার তুলে নিল। সংখ্যা-লঘুরা অনেকেই সীমান্তের ওপারে পাড়ি জমালেন। এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে লাগলো। আমরা কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে চলে এলাম।

এর কয়েকদিন পরেই প্রদীপ লণ্ডন চলে গেলো। যাবার দিন রাতে মা যত্ন করে অনেক কিছু তার জন্য রান্না করেছিলেন। প্রদীপ খেল সবই। তবে কোন রকম মন্তব্য না করে। তাকে সাধাসাধি করে বেশী খাওয়ানোর চেষ্টা এতই অভাবনীয় যে, মা সে-চেষ্টাও করলেন না। শুধু মৃদু করে দু-একবার সব ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন।

সব ঠিকই ছিল। নিজের জিনিসপত্র নিজে গুছিয়ে রাখা প্রদীপের বরাবরের অভ্যাস। খাওয়ার পর তখনও যেতে এক-ঘণ্টা সময় আছে। আমরা খাবার টেবিলেই বসে রইলাম। প্রদীপের মন কেমন করছিল কিনা জানি না। হঠাৎ সে উঠে পড়লো। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো "আমি চলেই যাই—একটু আগে যাওয়াই ভাল। এখানে বসে আর......"। আমরা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম ট্যাক্সি এলো। প্রদীপ একাই চলে গেলো। মা তার চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'দুর্গা দুর্গা।'

প্রদীপের চিঠি কোনদিনই নিয়মিত ছিল না। ক্রমশ তা বিরল হয়ে এলো। তবে যেটা সে নিয়মিত পাঠাত, তা হল বেশ মোটা অঙ্কের টাকা। আমাদের যা ছিল তা কুলিয়ে যাবার মত হলেও, মায়ের চিকিৎসার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রদীপের টাকাতেই মায়ের চিকিৎসা চলেছিল। মা তাকে দু-একবার লিখেছিলেন, টাকা পাঠানোর দরকার নেই। কিন্তু প্রদীপ তার উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। আমি জানি ব্যাঙ্কে সে নিশ্চয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে কলকাতায় অমুক রাস্তায় অমুকের নামে টাকা পাঠাতে যাকে বলা হয় স্ট্যান্ডিং অর্ডার। একবার নির্দেশ দিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত আর তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দরকার হয় না। প্রদীপও নিশ্চয় আর ও নিয়ে মাথা ঘামায়নি। মায়ের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু টাকা পাঠানো বন্ধ হয়নি।

আর্ট কলেজে পড়া শেষ করলাম। ফ্রেঞ্চ গভর্নমেণ্টের দেওয়া একটি বৃত্তি জুটে গেল। চলে এলাম প্যারিসে। দীর্ঘ ছ বছর প্যারিসে আছি। এর মধ্যে লণ্ডনে এসেছি দু'বার। লণ্ডন আর প্যারিসের মধ্যে ব্যবধান কয়েক ঘণ্টার হলেও এর বেশী যাওয়া-আসা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রথমবার লণ্ডন এসে প্রদীপের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তবে সে সাক্ষাৎকার নেহাৎই আকস্মিক। আর্ট কলেজেরই রামচন্দ্রন লণ্ডনে একটা এক্সিবিশন করেছিল। দুজনের এক্সিবিশন। তাতে আমারও ছবি ছিল। রামই প্রদর্শনীর দায়িত্ব নিয়েছিল। আমি ছবি পাঠিয়েই খালাস হতে পারতাম কিন্তু রামের সনির্বন্ধ অনুরোধে লণ্ডনে আসতেই হল। তাছাড়া নিজের ছবির এক্সিবিশন দেখার লোভও সংবরণ করা মুস্কিল। স্কলারশিপের টাকা থেকেই টেনেবুনে কয়েকটা পাউণ্ড বাঁচিয়ে এলাম লণ্ডনে।

এক্সিবিশনে লোক মন্দ হয়নি। খবরের কাগজগুলিও মোটামুটি ভাল রিভিউই করেছিল। আমি লণ্ডনে এসেই প্রদীপের ঠিকানায় একটা কার্ড পাঠিয়েছিলাম দেখা হলে খুশি হব এই কথা জানিয়ে। ফোন করতে গিয়েও করিনি। সাহস হয়নি। যদি প্রদীপ আমাকে চিনতে না পারে? কিংবা বিরক্ত হয়? দিন তিন-চারের মধ্যেও যখন প্রদীপের দিক থেকে কোন সাড়া এলো না, তখন আমি আর যোগাযোগের চেষ্টা করলাম না। এক্সিবিশনের শেষ দিন। আমি আর রাম সন্ধ্যা ছটা নাগাদ এক্সিবিশন বন্ধ করে একটা কফি হাউসে গিয়ে বসলাম। হঠাৎ দেখি কাছেই একটা টেবিলে প্রদীপ ও একটি ইংরেজ মেয়ে বসে আছে। কোন একটা হাসির কথা উঠে থাকবে। মেয়েটি সকৌতুকে হাসছে। প্রদীপের মুখে চাপা কৌতুক। দু-একবার ইতস্ততঃ করে উঠে গেলাম ওদের কাছে। প্রদীপ আমাকে চিনতে পারবে—এ-আশা আমি করিনি। কিন্তু সে আমার দিকে তাকিয়েই বলে উঠলো, 'হ্যালো...আমি নামটা ধরিয়ে দিলাম মালবিকা। ইয়েস ইয়েস মালবিকা। তাড়াতাড়ি মেয়েটির দিকে ফিরে পরিচয় করিয়ে দিল 'জেরার। আমার সৎ-বোন মালবিকা।' সৎ-বোন কথাটা কানে লাগতে পারতো। কিন্তু বিদেশে ছ'বছর কাটিয়ে আমি ইউরোপীয়দের সামাজিক সম্পর্কগুলো বুঝতে শিখেছি। জলকে জল বলাই এদের দস্তুর। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে এরা মা বলে না, বলে আমার বাবার স্ত্রী। তার বেশী আত্মীয়তা এরা স্বীকার করে না, দরকারও হয় না। সামাজিক ভদ্রতার কোন ত্রুটি হয় না। বিশেষ ক্ষেত্রে খুব মধুর সম্পর্কই গড়ে ওঠে। এ-ধরনের মানসিকতা আমার খুব পছন্দ এবং অনেকের কাছেই এর প্রশংসা করেছি। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হল প্রদীপ কি আমার মা সম্পর্কেও ঐ একই বিশেষণ প্রয়োগ করবে 'আমার পিতার স্ত্রী'?

তারপর, কবে এলে লণ্ডনে? ইংরাজিতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। প্রদীপ ও জেরারের নিখুঁত ইংরাজির পাশে আমার বাঙালী ইংরেজি আমাকে লজ্জা দিচ্ছিল। আমি জবাব দিলাম 'এই তো সপ্তাহখানেক। এবার ফিরবো।' চিঠির কথা আমি উল্লেখ করলাম না। প্রদীপও কিছু বললো না। প্রদীপের বান্ধবী বললো 'বসুন না'। আমি বললাম না আমি এবার যাই। ওদিকে এক বন্ধুকে দাঁড়িয়ে রেখে এসেছি। প্রদীপ বললো, 'আমরাও উঠবো।' 'তাহলেই হল। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।' বলে আমি নিজের টেবিলে ফিরে এলাম। রাম জিজ্ঞাসা করলো পুরনো বন্ধু? আমি বললাম 'হ্যাঁ, চল। ও'রা দাঁড়িয়ে আছেন।' চারজনে একসঙ্গে

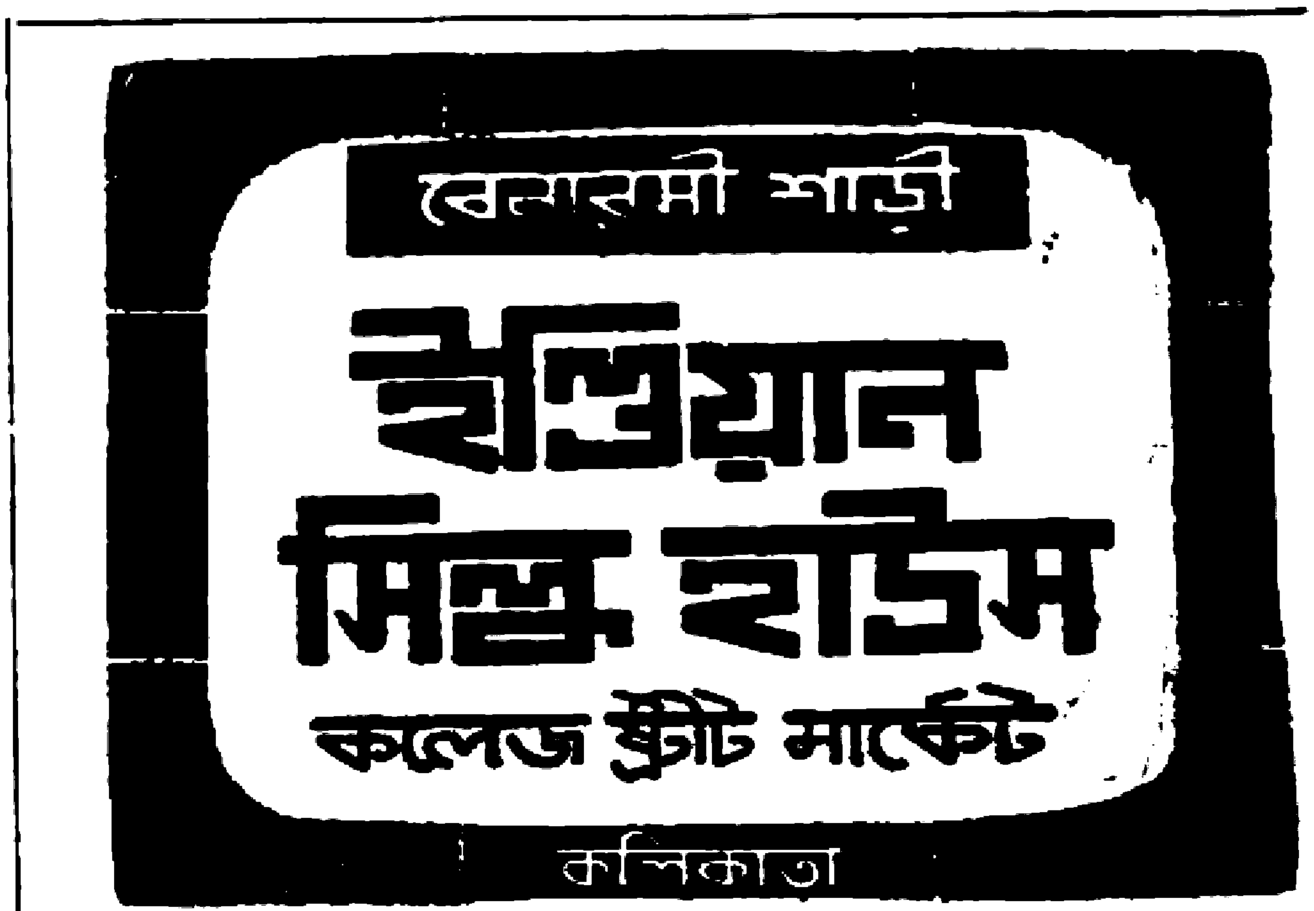

বেরুলাম রাস্তায়। প্রদীপের পাশে হাঁটা উচিত না ক্রেয়ার ও প্রদীপকে একসঙ্গে হাঁটতে দেওয়া উচিত এ মীমাংসা করতে না পেরে আমি কখনও এগিয়ে কখনও পেছিয়ে পড়তে লাগলাম। হঠাৎ দেখি রায় প্রদীপকে বলছে, আহা আপনি গার্ডিয়ানে নিয়মিত লেখেন জানলে আমাদের এক্সিবিশনের রিভিউ-এর জন্য আপনাকে ধরতাম। 'এক্সিবিশন? কিসের এক্সিবিশন?' রায় আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকাল। 'কেন? মালবী আপনাকে বলে নি? ইণ্ডিয়া হাউসে আমার আর মালবীর ছবির একটা এক্সিবিশন হল গত তিন সপ্তাহ ধরে। দু' একটা কাগজ রিভিউও করেছে। আপনার চোখে পড়ে নি?' প্রদীপ অস্বস্তির সঙ্গে আমার দিকে তাকাল। আমিও অস্বস্তিবোধ করছিলাম। কি দরকার ছিল রায়ের গায়ে পড়ে ওকে বলতে যাবার? আমার খবর প্রদীপ রাখে না। রাখবেই বা কেন? প্রদীপ আমার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছে এ চিন্তাতেও আমি ভয় পাই। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার নীল চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে, ঠোঁটে খেলে যাবে বিদ্রূপ এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকলেও আমার শিল্পচর্চার কথা তাকে জানানোর কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। ভাগ্যক্রমে ট্রাফালগার স্কোয়ার স্টেশন কাছে এসে পড়েছিল। আমি বললাম, 'গুড বাই প্রদীপ। আমাকে এবার বাড়ী ফিরতে হবে। আশা করি আবার দেখা হবে।' প্রদীপ বললো, 'যাবে? আচ্ছা। আবার লণ্ডনে এলে খবর দিও। তোমার এক্সিবিশনে যাই নি বলে দুঃখিত। আমাকে জানালে খুশী হতাম।' খানিকটা বিব্রত, খানিকটা বিরক্তভাবে ক্রেয়ারকে দেখিয়ে বললো, 'এই ক্রেয়ার বি বি সিতে কাজ করে—প্রোডিউসার। ও অবশ্য বাচ্চাদের প্রোগ্রাম করে। কিন্তু চেনে জানে অনেককে। ও হয়তো কিছু......' ক্রেয়ারের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল প্রদীপ। ক্রেয়ার মিষ্টি হাসি হেসে বললো, 'নিশ্চয় ভবিষ্যতে যদি কিছু করতে পারি জানাবেন। আমার খুব ভাল লাগবে।' আমি ধন্যবাদ বলে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম।

প্রায় এক শতাব্দীর পুরনো ঘুরনো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ জানতে ইচ্ছা হল প্রদীপ কি বাংলা একেবারে ভুলে গেছে? প্রদীপের বাংলা না জানাটা অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশে সে কতটুকু সময়ই বা ছিল। স্কুলেও সে বাংলা শেখে নি। অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে দু' একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো। বেশ কয়েক জোড়া ভারতীয় চোখ আমাকে বিদ্ধ করলো। খাঁটি বাংলা ভাষায় মন্তব্য শুনলাম 'বাঙালী বলে মনে হচ্ছে।' টিউবে যেতে যেতে ভাবছিলাম আমার চলন বলন বেশ-ভূষা দেখেই লোকে বুঝবে আমি বাঙালী। কিন্তু প্রদীপ? প্রদীপ কি? চেহারায় চালচলনে বেশভূষায় সে ইংরেজ। নিজের দেশকে কি সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পেরেছে? তার নিজের দেশ কোনটা? ভারতবর্ষ না ইংল্যাণ্ড? কেন জানি না মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ভারত প্রদীপের দেশ নয়। আমরা প্রদীপের কেউ নই।

অবশ্য বেশীক্ষণ মন খারাপ ছিল না। পরদিন ঝিরঝিরে রোদে লণ্ডন ছাড়বার আগে পথে কাগজ কিনতে বেরিয়ে দেখি দলে দলে ভারতীয় চলেছে। চলেছে আফ্রিকান নিগ্রো সঙ্গে ইংরেজ তরুণী। সুইস কটেজ স্টেশনের কাছে পাগড়ী বাঁধা শিখ খুলেছে ইণ্ডিয়ান গ্রোসারী।

মনে হল পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। ভারতীয়রা আজ ছড়িয়ে পড়েছে আফ্রিকায়, এশিয়ায়, ইউরোপ, আমেরিকায়। যে যেখানে আছে সেখানেই তাদের ঘর। প্যারিসেই তো কত বিদেশী বাসা বেঁধেছে। যে যেখানেই থাকুক সুখী হওয়াটাই জীবনে বড় কথা। প্রদীপ সুখী হোক। শৈশব তার সুখের হয় নি। ক্রেয়ার যেন প্রদীপকে সুখী করে।

পাঞ্জাবীর দোকানে ঢুকলাম। কিছু মশলা কিনে নিয়ে যাবো। প্যারিসে ভারতীয় মশলাপাতি পাওয়া শক্ত।

প্রদীপের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ প্যারিসে। মেট্রোর এক স্টেশনে (নাম মনে পড়ছে না) হঠাৎ দেখি প্রদীপ নামছে। মনের কোণে হঠাৎ কোথায় যেন ব্যথা লাগলো। প্রদীপ প্যারিসে এসেছে অথচ আমায় খবর দেয় নি। এগিয়ে গিয়ে কথা বলবো কিনা ভাবছিলাম। হয়তো তাতে তাকে অপ্রস্তুত করা হবে। কিন্তু সমস্যার সমাধান প্রদীপই করলো। অচেনা শহরে ভীড়ের মধ্যে বিদেশী পর্যটকের মতই প্রদীপ এদিক ওদিক তাকিয়ে ঠাহর করবার চেষ্টা করছিল। আমার চোখে চোখ পড়তে বেশ হাসিখুশী মুখেই সে এগিয়ে এল। 'হ্যালো মালবী'। 'হ্যালো...' দাদা বলতে মুখে আটকায়, সুতরাং সে চেষ্টা আমি করলাম না। প্রদীপ বললো, 'ভাল আছ নাকি?' তেমন কিছু নয়। প্যারিসে কবে এলে?' 'এই তো দিন চারেক। চলো না কোথাও একসঙ্গে লাঞ্চ খাই। এখানে ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেণ্ট নেই?' প্রদীপের ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে যাবার সখ? আমার লাঞ্চের আগে ক্লাস ছিল। সেই কথা বললাম প্রদীপকে। লাঞ্চ পর্যন্ত তো থাকতে পারবো না। 'ও তাই বুঝি? তাহলে থাক। তা কাজকর্ম কেমন চলছে?' আমি জবাব দিলাম, 'ভালই। মা মারা যাবার পর তোমাকে লিখেছিলাম আর টাকা পাঠানোর দরকার নেই। প্যারিসে এসেও লিখেছি। সত্যিই আমার টাকার দরকার নেই। টাকা পাঠিও না আর।' প্রদীপ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, 'ছাত্রাবস্থার দারিদ্র্যের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। স্কলারশিপের টাকা আর কতই বা? আমার যখন দিতে গায়ে লাগছে না তখন তোমারই বা নিতে আপত্তি কেন? যদি বারন কর আর পাঠাবো না। কিন্তু তোমার ছাত্রজীবন আনন্দে কাটুক আমি এইই চাই।' এরপর আর কথা চলে না। এরপর কোন কথা আর তেমন জমলোও না। লণ্ডন প্যারিস সাহিত্য রাজনীতি এসব নিয়ে টুকরো টুকরো কথা হল। সেদিন ক্লাস কামাই করলে ক্ষতি ছিল না। হয়তো প্রদীপের মুখে সেদিন ছেলে-বেলার কথা শুনতে পেতাম। আমার বহু-দিনকার একটা অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা মিটত, কিন্তু একবার লাঞ্চে আসতে পারবো না বলার পরে আর মত বদলানো যায় না। কেবলি মনে হতে লাগলো, মাঝখানে ক্রেয়ার থাকলে কথাবার্তা বলা সহজ হত। বলেও ফেললাম, 'ক্রেয়ার কেমন আছে?' প্রদীপের মুখ যেন একটু শক্ত হল। বললো, 'ভালই আছে। এবার তাহলে ওঠা যাক। দু' একটা বইয়ের দোকানে যাবার ইচ্ছা আছে। আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, 'রাত্রে ডিনার কোথায় খাচ্ছ। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার কাছে' প্রদীপ বললো, 'দুঃখিত, আমি রাতের ট্রেনেই লণ্ডনে ফিরছি। রাতে চ্যানেল পার হওয়াই ভাল। বেশ নিরিবিলি।'

আর কোন কথা হল না। প্রায় নিঃশব্দে আবার স্টেশনে ফিরে এলাম। প্রদীপ চলে গেল। সেই শেষ দেখা। পরে অনেকবার মনে হয়েছে সেদিন প্রদীপ কি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিল? অনেক সংকোচ ও দ্বিধা ঠেলে সে কি আবার শুদ্ধতে ফিরে আসতে চেয়েছিল? আবার নতুন করে আরম্ভ করতে চেয়েছিল? কিন্তু চাইলেই কি ফেরা যায়?

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

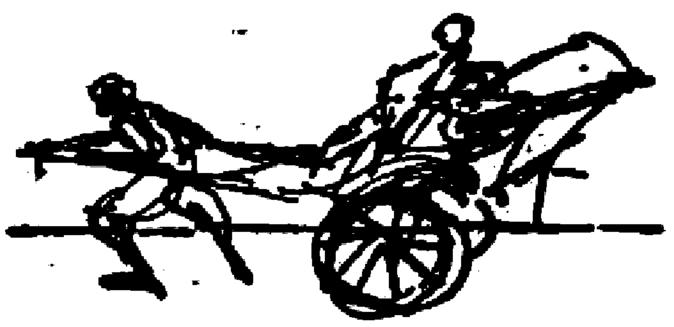

নির্ঘাৎ আছে

ঘোড়ার ডাক্তার

ফিফটি ফাইভে রিটায়ারমেণ্টের পর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্রাচুইটির টাকার এককাঁড়ি বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রুদ্র সাহেব। লাখ টাকার ওপর পেয়েছিলেন কোম্পানী থেকে—অর্ধেকটা নিউ আলিপুরে জমি কিনতে বেরিয়ে গেল। বাকী টাকাটার অর্ধেকে তেতলার ফাউণ্ডেশন সমেত চার কামরার একতলা বানাতে পেরেছিলেন। তিন মা মিন টাইম বড় ছেলে বাদলা ধবল, বিলেত যাবে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিশী ডিগ্রীটা বিলিতি ওয়েল্ডিং মেসিনে ঝালিয়ে না নিলে নাকি কল্কে পাওয়া যায় না। তা তাকেও দিতে হোল কিছু। টাকা পেয়ে ছেলে সেই যে পগার পেরোল, আর কোনদিনও দেশে ফেরেনি। শোনা কথা, চাক্ষুষ দেখেনি তো কেউ, রুদ্র সাহেবের ডিপারচারের খবর পেয়ে ছোট্ট পত্র মাথা কামিয়ে টুপি চাপিয়ে বার্মিংহামে শ্রাদ্ধ-শান্তি সবই নাকি করেছিল। আজকাল বিলেতের কয়েকটা কসটি-টুয়েন্সী এদেশে সিডিউল্ড কাস্ট সিডিউল্ড ট্রাইবের মত ভারতীয়দের জন্য অনায়াসেই রিজার্ভ রাখা চলে—এসব এলাকায় ধোপা, নাপিত, পুরুত মায় হিন্দী ফিল্ম সবই অ্যাভেলেবল।

থাক সে সব কথা। মাথা কেটে পড়ল অথচ কলেজী পড়াশুনো শেষ না হওয়ার জন্য মেজটি আটকে গেল। গেল তো গেল আর বেরোতেই পারল না। পারবে কি—দাদা গেল, বাড়ীটা কোনরকমে কমপ্লিট করে বাবাও চোখ বুজল, মা কেঁদে ককিয়ে পড়ল বাবা বিনু এবার আমাদের কি হবে?

ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্টে বাবার রেখে যাওয়া ব্যালান্সের অঙ্কটা নেহাৎ মন্দ ছিল না তাই দায়িত্বশীল সৎ পুত্রের মত মেজো বিনায়ক জবাব দিল—দাদা এসকেপিস্ট হতে পারে, তা বলে আমি কখনো পালাব না মা। দেখো মনু, বেণু আর কানুর জন্য সব করব। আর করলও সত্যিই তাই।

পশু চিকিৎসার সরকারী ছাড়পত্রখানা নিয়ে দিনকয়েক এ-অফিস সে-অফিসে ধন্না দিয়ে শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা একটা মিউ-নিসিপ্যালিটিতে ভেটারনারী সার্জেনের চাকরী একটা জুটিয়ে নিল বিনায়ক। আত্মীয়-স্বজন মায় নাক-উঁচু প্রতিবেশীরা আড়ালে আবডালে হেসে বলত—রুদ্রসাহেব কৃতী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ছেলে একটাও মানুষ হোল না। বড়টা তো পালিয়ে গেল বিলেতে। মেজোটা ঘোড়ার ডাক্তার। বখাটে দুটো মেয়ে আর নাবালক কানুকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়েছেন রুদ্রগিন্নী।

হাসি-ঠাট্টার ছিটেফোঁটা যে বিনায়কের কানে যায়নি কখনো, তা নয়। দাঁতে দাঁত চেপে সব অসম্মান সহ্য করেছে সে। প্রতিজ্ঞা করেছে, যে সমাজে কীর্তির এক-মাত্র ব্যারোমিটার টাকা কামানো, সেখানে টাকা কামিয়ে প্রমাণ করবে সেও বাপকা বেটা।

'ঘোড়ার ডাক্তার' সাঁতা সাঁতা পশু-চিকিৎসক হতে চেয়েছিলো পুরুষে। কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হাসি-ঠাট্টার জোয়ারে কুল মজা শবদেহের মত সব সদিচ্ছাই গেল ভেসে তার ওপর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার-ম্যান, কমিশনারদের ঠেলা-গুঁতো খেয়ে খেয়ে কেমন ভোঁতা মেরে গেল বিনায়ক।

তখন সবে চাকরীতে ঢুকেছে। ঘাপার-সাপার কিছুই জানে না। সেদিন সকাল থেকে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে মিট শপগুলো দেখে, দুপুরে স্লটার হাউসটা ভাল করে ওয়াচ করে অফিসে ফিরে একটা রিপোর্ট লিখছিল, এমন সময় সমন এল—খোদ চেয়ারম্যান ডাকছেন।

চেয়ারম্যানের ঘরে ঢুকেই মালুম হোল, ধাপসর গম্ভীর। তিন নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার জল্লাদের মত আর ইজারাদার তিনু মণ্ডল বসে আছে ঘরে। চেয়ারম্যান খাঁ সাহেবের মুখ থম-থম করছে। বুঝল এতক্ষণে এক রাউণ্ড ব্রীফিং হয়ে গেছে। খাঁ সাহেব তাই ডেকে পাঠিয়েছেন। কাঁসি চাঁদের মত ঘোরানো টেবিলের উল্টোদিকে বসে খাঁ সাহেব দাঁত-খড়কিন দিয়ে ফাঁক ফাঁক হলো-দাঁতের আড়ালে লুকোনো পান-সুপারির কুচিগুলো খোঁচাচ্ছেন। আর টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জল্লাদের মত ফিস-ফিস করে কি কেন বলছেন ; তিনু মণ্ডলের ভাবলেশহীন মুখ দেখে বলা মুস্কিল সে কি দেখছে। বিনায়ককে দেখেই জল্লাদের মত সিধে হয়ে বসলেন ; তিনু মণ্ডল একটু কাঁচুমাচু হয়ে গেল। বিনায়ক পাশের চেয়ারটা খালি দেখে বসতে যাচ্ছিল, আর তক্ষুনি খাঁ সাহেবের বাঁশচেরা গলা বারোয়ারী প্রেতের মত গাঁক-গাঁক করে ডেকে উঠল : বসি পাইসেন কি? কদিন আইসেন এই মিউনিসিপ্যালিটিতে? বসবেন পরে, আগে জবাব দিন সিধা—আপনি কার হুকুমে ছাগল কাটা বন্ধ কইর্যা দিসেন?

চেয়ারম্যান থামতেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন কমিশনার—এসব অন্যায় জুলুম স্যার। এ বরদাস্ত করা অসম্ভব। আমার ওয়ার্ডের সাতটা শপে আজ মাংস চালান যায়নি। শপ-ওয়ালারা যাচ্ছেতাই করে গাল দিয়ে গেল সকালবেলা। আর একটু অপেক্ষা করুন, দেখবেন সব ওয়ার্ডের কমিশনাররা ছুটে আসবেন। কোন ওয়ার্ডে আজ মাংস নেই। সব গরীব মানুষ স্যার। মাছ, ডিম কেনার ক্ষমতা নেই কারো। মাছের দাম বাড়ছে। তাও মেলা ভার। শহরে চলে যাচ্ছে। চার টাকা কিলো মাংসের, তাই কত অনুযোগ। আপনি বলুন স্যার কার পারমিশনে এত বড় অবিচার উনি করলেন। আমরা জবাব চাই স্যার। আজ বিকেলের মধ্যে এর বিহিত না হলে আমরা মিছিল করে আসবো। প্রপার এক্সপ্ল্যানেশন দিতে না পারলে ওকে সাসপেণ্ড করুন স্যার।—শেষ কথাগুলো বলার সময় কমিশনারের গলাটা কাঁপতে কাঁপতে মোটা অক্তার জড়িয়ে চড়ে উঠে গেল। তর্জনী নাড়িয়ে বারবার একই কথার ওপর জোর দিলেন—প্রপার এক্সপ্ল্যানেশন চাই স্যার প্রপার এক্সপ্ল্যানেশন।

সত্যি, এর বিরুদ্ধে আপনার কি বলার আছে বলুন।—যেই বললেন চেয়ার-ম্যান। এখন আর দাঁত খোঁচাচ্ছেন না। মোটা শিকের আঙুল দিয়ে জলা জলা খয়েরী রঙ ছিটোতে ছিটোতে টেবিল চাপড়ে বললেন—কি চুপ কইর্যা ক্যান? জবাব চাওন লাগব। জবাব না পাইলে জনপদের আমি-সাসপেন্ড করমু।

এতক্ষণে মুখ খুলল বিনায়ক—আমায় সাসপেন্ড করতে চান করবেন। যদি অন্যায় কিছু করে থাকি তো নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু আমায় ডেকে এনে গালমন্দ করার রাইট আপনাদের কে দিল? আমার কথা না শুনেই কেন আপনি চেঁচাচ্ছেন।

দেখুন সার দেখুন, কেন দেখুন—আকূণ্ঠ হয়ে উঠলেন জয়দেব দত্ত—অপমানাতে বলে কি-না চেঁচাচ্ছেন। এত সাহস!

সাহস আমার নয় জয়দেববাবু, আপনাদের। খুব আস্তে আস্তে টেনে টেনে টুকরো টুকরো করে ভেতরে জমা ক্ষোভ ছড়িয়ে দেয় বিনায়ক—বে-আইনী কারবার করছেন, তাতে বাধা দিয়েছি বলে নালিশ জানাতে এসেছেন?

মুখ সামলে 'ঘোড়ার ডাক্তার', আইনী বে-আইনী কাকে বলে তা আপনার কাছ থেকে শিখব না। চীৎকার করে ওঠেন কমিশনার সাহেব।

এতক্ষণ মনে মনে ভেবে রেখেছিল বিনায়ক, এরা যে যাই বলুক মুখে কোন উত্তর দেবে না। জবাবটা লিখেই জানাবে। কিন্তু 'ঘোড়ার ডাক্তার' শুনে নিজেকে আর সামলাতে পারল না—হ্যাঁ আমি ঘোড়ার ডাক্তার। তাই কিছুতেই 'ডাক্তার' পশু কাটার পারমিশন দেব না। স্লটার হাউসে রোজ আঠাশটা ছাগল ভেড়া কাটার কথা। এই তো ইজারাদার তিনুবাবু বসে আছেন, উনিই বলুন রোজ কটা করে কাটেন—আঠাশ না আটত্রিশ? আর সেই ছাগলগুলো কি সব সুস্থ? জয়দেববাবু আপনি না পাবলিক-লীডার, কমিশনার। আপনি আবার এসেছেন এই অসৎ ব্যবসায়ীর হয়ে ওকালতি করতে। ছিঃ।

মুহূর্তে গোটা ঘরটা শান্ত, নিথর হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে খাঁ সাহেব বললেন, আপনি বসেন ডাক্তার বাবু। এসব কথা কি দাড়াইয়াও কওন যায়। আপনি বসেন।

চেয়ারম্যানের কোন রিকোয়েস্টই শুনল না বিনায়ক। সমানে বলে যেতে লাগল—দু মাস আপনাদের মিউনিসিপ্যালিটিতে আমি এসেছি। দু মাসেই যা দেখেছি, তাতে জেনা হয়ে গেছে খাঁ সাহেব। সাধারণ মানুষ কিছু জানে না। অথচ তাদের ট্যাক্সের টাকায় যে মিউনিসিপ্যালিটি চলে সেখানে কোন সাহসে কাদের উৎসাহে এই সব জঘন্য ক্রিমিনাল এমন নোংরা ব্যবসা চালায়? কার পারমিশনে আঠাশের জায়গায় আটত্রিশটা পশু কাটা হয় বলুন? কে একে দুশ্ন, রুগ্ন সব পশু কাটবার হুকুম দিয়েছে? আপনি জানেন এই মাংস খেলে কি কি রোগ হয়? জানেন এটা কত বড় ক্রিমিন্যাল অফেন্স? জানেন এই তিনু মণ্ডল প্রায় সকালেই আমাকে পাঁচশো টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল? এটাই নাকি আপনার মিউনিসিপ্যালিটির প্র্যাকটিস? আমি তো ঘোড়ার ডাক্তার, কিন্তু এরা কি মানুষ?

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে থাকে বিনায়ক। টেরও পায়নি যে তোড়ে বলার মুখে কখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে ইজারাদার তিনু মণ্ডল, তিন নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার জয়দেব দত্ত। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘরে তখন শুধু দুজন—মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান আর ভেটারনারী সার্জেন। সুইংডোরের আশেপাশে একটা ছোট ভিড় জমে উঠেছে; কান পেতে অন্য কর্মচারীরা সব শুনেছে। একটু থেমেছিল বিনায়ক, আবার শুরু করল—বেশ আপনি আমায় এমপ্লয়ার। ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু আসক এক্সপ্ল্যানেশন ফ্রম মী। আমি প্রতিটি প্রশ্নের লিখিত জবাব কালই আপনাকে দেব। কথা কটা শেষ করেই, খাঁ সাহেবকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় বিনায়ক।

সেদিনের পর আরো অনেক দিন অনেক রাত এসেছে এই পৃথিবীতে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুহূর্ত জমে জমা পাকিয়ে তেরোটি বছরে পরিণত হয়েছে। তেরো বছরে 'ঘোড়ার ডাক্তার' পরিণত হয়েছে রুদ্রসাহেবে। নিউ আলীপুরের একতলা হয়েছে তিনতলা। ছোট দুটি বোন অনু, রেণুর বিয়েতে লাখ টাকার ওপর খরচ করেছেন রুদ্রসাহেব। ছোট ভাই কানুকে ভর্তি করেছেন ভেটেরনারী কলেজে। কেন?—সে কথার জবাব রুদ্রসাহেবের মা খুব সুন্দরভাবে দেন—বড়টা তো মানুষ হোল না। বিনুকে দিয়ে রুদ্র নিয়ে করে সাহেব হয়ে গেল। ঐ বিনু না থাকলে আমরা কোথায় যেতাম সেদিন।। তাই বিনু যখন কানুকে ভর্তি করেছে, নিশ্চয় ভাল বুঝেই করেছে।

এখন বাড়ীতে বিনু, খুড়ি রুদ্র সাহেবের ইচ্ছাটাই সকলের ইচ্ছা। আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সবাই খাতির করে। আর সব খাতিরের যিনি উৎস, মিউনিসিপ্যালিটির তিন পুরুষের ইজারাদার তিনু মণ্ডলের খাতির দেখলে যে কোন লোকই চমকে যাবে। তেরো বছর আগে আঠাশটা পশু কাটার পারমিশন ছিল। সার্জেন সাহেবের তেরো বছরের চেষ্টায়, টনটনে রিপোর্টের দৌলতে সংখ্যা বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে চল্লিশ। বে-আইনী সংখ্যাটাও দু-অংকের কম নয়। আর স্বয়ং ভি এস নিজে দাঁড়িয়ে যে পশুগুলিকে বধ করার জন্য সার্টিফাই করেন সেগুলো রুগ্ন কি সুস্থ তা চ্যালেঞ্জ করবে কে?

তিনু মণ্ডলের ছখানা বাড়ী ঐ মিউনিসিপ্যালিটিতে। জননেতা জয়দেব দত্তের ছোট ছেলে আমেরিকায় পড়তে গেছে। চেয়ারম্যান সাহেবেরও জবর অবস্থা হয়েছে আরো জবর। শুধু লক্ষ-লক্ষ সাধারণ মানুষ কম পয়সায় মাংস-কেনে পেট ভরানোর জন্য। সে মাংস খেলে কি কি রোগ হয় সে কথা কি আর ভেটারনারী সার্জেন সাহেবের মনে-টনে আছে?

—জীবন

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

।। এগার ।।

ডায়েরী লিখে শুতে শুতে অনেক রাত হয়েছিল। ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। বেয়ারার ডাকাডাকিতে। ওর বিবেচনায় মনে হয়েছে এত বেলা শুয়ে থাকা, ঘুমোন ঠিক নয়। বেচারা! ও তো জানে না আমার এই ঘুম না ভাঙলেও ক্ষতি ছিল না: কেউ চোখের জল ফেলত না, কারুর চোখের ঘুম, মনের শান্তি, সিঁথির সিন্দুর বিদায় নিত না। ভাঙতে হতো না কারুর হাতের শাঁখা।

এখানে আমার পর প্রায় দিনই ওর ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভাঙে। ও চাকরি করে, দায়িত্ব পালন করছে। আমি খুসী, আমি সন্তুষ্ট। ওর দিক থেকে ও ঠিকই করছে তবে আমার ভাল লাগে না।

ডাকাডাকি না করলে কোনদিনই আমার ঘুম ভাঙে না। সেই ছোটবেলা থেকে। সংসারের কাজকর্মের জন্য মাগোকে ভোরবেলা উঠতে হতো। আমি উঠেই ঘ্যান ঘ্যান করব বলে মাগোকে আমাকে বেশ করে চাপাচুপি দিয়ে, দরজা-জানলা ভেজিয়ে রেখে কাজকর্মে লেগে পড়ত। আমি খুব ঘুমুতাম। তারপর বেশ একটু বেলা হলে, সকালবেলার ঝামেলা শেষ হলে মাগো আমাকে আদর করতে করতে ঘুম থেকে তুলত।

যখন স্কুলে পড়ি তখনও। এত বেলায় ওঠার জন্য আমি নিজেই মাঝে মাঝে গজ গজ করতাম, এত বেলায় উঠলে হোম-টাস্ক করি কেমন করে বলতো?

মাগো বলত, রাত্রে করে রাখিস না কেন?

'রাত্রে কি সব হয়? তুমি সকাল-সকাল ডাক না কেন?'

'সকালে উঠলেই তো তোর সর্দি-কাশী হবে।'

'হোক গে। হোম-টাস্ক না করে গেলে কত বকুনি খেতে হয় জান?'

এমনি করে তর্ক চলত।

শেষে মাগো বলত, অত গরজ থাকে তো তুই সকাল সকাল উঠলেই পারিস!

বাস! আমি চুপ। একেবারে স্পীকটি নট। কি বলব? ডাকাডাকি না করলে আমার ঘুম ভাঙে নাকি? শুধু সেই স্কুলে পড়ার দিনগুলিতে নয়, কলেজে পড়ার সময়ও। আমি চাদর মুড়ি দিয়ে বেঘোরে ঘুমোব। মাগো আমার মুখ থেকে চাদর সরিয়ে মাথায় হাত দিতে দিতে ডাকবে, মানিক! এই মানিক! উঠবি না বাবা?

দু'চার মিনিট ডাকাডাকির পর আমি পাশ ফিরে শুতাম।

আবার মাগো ডাকত, ওঠ বাবা! অনেক বেলা হলো। কলেজ যাবি না?

দু'কাপ চা নিয়েই মাগো আমার ঘরে আসত। এক কাপ আমার, এক কাপ মাগোর। আমার ঘুম ভাঙার পর দু'জনে চা খেতাম।

রবিবার বা ছুটির দিন সকালে মানসী আসবেই। বেশ সকাল-সকাল। মাগোর সঙ্গে সঙ্গে টুকটাক কাজকর্মেও হাত লাগাত। গল্প করত। মানসীও কম ফাজিল ছিল না! ফাঁক পেলেই জিজ্ঞাসা করত, মানিকদা এখনও ওঠেনি?

'হাতের কাজটা সেরেই ডাকব।'

'এত বেলা পর্যন্ত কেউ ঘুমোয়?'

মাগো সঙ্গে সঙ্গে আমার সমর্থনে এগিয়ে আসত না, না, ওর বেলা করে ওঠাই ভাল। বেশী সকালে উঠলেই ওর সর্দি-কাশী হবে।

ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে প্রত্যেক মায়েরই কিছু কিছু বিচিত্র ধারণা থাকে। কোন যুক্তি-তর্ক সেখানে খাটে না। অন্ধ স্নেহের কাছে যুক্তি-তর্ক দিয়ে কি হবে? আমার সম্পর্কেও মাগোর কিছু কিছু বিচিত্র ধারণা ছিল। কবে, কোন জন্মে ভোরবেলায় ঠাণ্ডা লেগে আমার একবার সর্দি-কাশী হয়েছিল বলে মাগো কোনদিনই আমাকে ভোরে উঠতে দিত না।

মানসী কি এই নিয়ে কম ঠাট্টা করত?

ছুটির দিনে মানসীই আমাকে ডেকে দিত। ও আমার মুখের পর ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে ডাকত, এই মানিকদা! উঠবে না? অনেক বেলা হলো, শিগগির উঠে পড়।

আমি আস্তে আস্তে চোখ মেলে ওকে দেখতাম। [illegible] ঘরে [illegible] দুষ্টু দুষ্টু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম। ও মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতাম।

ও ঝুঁকে পড়েই বলত, [illegible] না।'

'কেন?'

ড্রাইভের কাঁক দিয়ে আমার এক ফালি দৃষ্টি ওর অন্তঃপুরে চলে যেতে দেরী হতো না। বলতাম, এমন ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই তোমাকে ভীষণ ভাল লাগে।

ও সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আঁচলটা টানতে টানতে বলত, তুমি আজকাল ভীষণ অসভ্য হয়েছ।

'এই সকালবেলায় উঠেই মিথ্যে কথা বলব? যা ভাল লাগে তা বলব না?'

ও জিভ বের করে ভেংচি কেটে বলত, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এলেন!

সঙ্গে সঙ্গে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। আমি হাসতাম। শুয়ে শুয়েই হাসতাম।

একটু পরেই তিন কাপ চা নিয়ে মাগো আর মানসী আসত।

মানসী মাগোর হাতে এক কাপ চা এগিয়ে দিতে দিতে বলত, আচ্ছা মাসিমা, আপনি এত বেলা চা না খেয়ে বসে থাকেন কেন?

'মানিক যে ওঠে না।'

'মানিকদা কি শিবঠাকুর যে ওর মাথায় জল না ঢেলে কিছু মুখে দিতে পারেন না?'

মাগো হাসত। মানসীও বাঁকা চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসত।

আমি চায়ের কাপে চুমুক না দিয়েই বলতাম, দেখছ মাগো, বাইরের মেয়ে এসে কিভাবে সংসারে অশান্তি ঢোকায়?

মাগো সঙ্গে সঙ্গে বলত, আঃ! কি যা-তা বলছিস?

বেয়ারাটা চায়ের ট্রে পাশের টিপাইতে রেখে দিয়ে চলে যেতেই মনে পড়ল এইসব কথা। রোজ সকালেই মনে পড়ে। আজ আরো বেশী করে মনে পড়ছে।

অনেক বেলা হয়েছে। বালিশের নীচে থেকে ঘড়িটা বের করে দেখলাম সওয়া দশটা বাজে।

বাজুক।

টি-পট থেকে কাপে চা ঢালতেও ইচ্ছা করছে না। ভাল লাগে না। নিজের মনের মতন এক-কাপ চা তৈরী করে দেবার লোকও কেউ নেই।

মিঃ রায় বা মুখার্জীর বাড়ীটাও কাছে হলে মন্দ হয় বলতাম......

কি বলতাম?

মিসেস রায় বা মুখার্জীকে কি রোজ চা দিতে যাবার কথা বলতে পারতাম? অসম্ভব। ওদের প্রতি আমার কি দাবী? কি অধিকার? রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে ক্লান্ত পথিকদের মত একটু গাছের ছায়ায় বসেছি মাত্র। গাছও আমার নয়, ছায়াও আমার নয়। ওরা কেউই ড. রায়ের সঙ্গে যাবে না। তা

জানি। অতিথিদের জন্য হয়তো গাড়ির ব্যাপারে কম শান্তি পাই। পাচ্ছি। ওদের ভাল লাগছে। ওদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

চাদরটা গলা অবধি টেনে দিয়ে শুয়ে আছি। কুঁড়েমি করে এখনও চা তৈরী করতে শুরু করিনি। হয়ত ঠান্ডাই হয়ে গেল। তবুও টি-পটের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছি।

দরজায় নক করার আওয়াজ।

নিশ্চয়ই বাবুর্চিটা এসেছে। জিজ্ঞাসা করবে, লাঞ্চ খাব কিনা।

শুয়ে শুয়েই বললাম, অন্দর আইয়ে!

ভিতরে আসতে বলতাম না, তবুও বললাম। ভাবলাম, তাড়াতাড়ি এসে যদি চা বানিয়ে দিয়ে।

দরজার দিকটা দেখতে পাচ্ছি না। জানি। তা না হলে এতক্ষণ ওর বিচিত্র মুখখানা দেখতে পেতাম। ওর মুখ দেখে মনে হয়, আমি এখানে খাওয়া-দাওয়া না করলেই ও খুশী।

আবার দরজায় নক করার আওয়াজ।

হয়ত অন্যমনস্ক ছিল, আমার কথা শুনতে পায়নি। এবার একটু গলা উঁচিয়ে ইংরেজিতে বললাম, কাম ইন।

রাত্রে শোবার সময় আমি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করি না। বন্ধ করলেই ভোরবেলা উঠে দরজা খুলে দিতে হবে। কি দরকার ঐ সব ঝামেলায়?

হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। অনেক মুহূর্তের মধ্যেই পরিচিত মুখে পরিচিত প্রশ্ন শুনতে পাব। কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল, এখনও শ্রীমানের মুখখানা দেখতে পাচ্ছি না? ও তো প্রায় হুড়মুড় করে এসে পড়ে! আজ কি বৈষ্ণব কাব্যের রাধা বিনোদিনীর মত......

'আপনি এখনও শুয়ে.....'

চমকে উঠলাম, আঁতকে উঠলাম। মেয়ের গলা? বোধহয় একটু জোরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, কে?

আমিও মাথাটা ঘুরালাম, ও-ও দু'এক পা এগিয়ে এলো।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। দু'হাতে হাসতে হাসতে বললাম, বসুন, বসুন।

ও পাশের একটা চেয়ার টেনে বসল। হাসতে হাসতে বলল। বড় মিষ্টি লাগল ওর হাসি।

আমার মুখের হাসিও ফুরোয়নি। 'হঠাৎ এই সৌভাগ্য?'

'আমার না আপনার?'

'না বললেও বুঝতে পারছেন সৌভাগ্য আমারই।'

'শুধু আপনার কেন?'

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই সামনের টেবিলের সরঞ্জামের দিকে ওর দৃষ্টি পড়ল, একি! আপনার চা খাওয়া হয়নি?

'অদৃষ্টে আছে আপনার হাতের চা খাওয়া......'

'বাস! বাস! ঢং আর!'

দু'জনা চা তৈরী করতে শুরু করল। আনন্দে, খুশীতে আমি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখছি। হঠাৎ মনে হলো শুয়ে থাকলেই ভাল হতো। ও নিশ্চয়ই মুখে পড়ে চায়ের পেয়ালা দিতে আসত। মানসীর মত ওরও......

'এই নিন', বলে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ দিতে দিতে বলো।

'আপনিও নিন।'

'আপনি খেয়ে নিন, তারপর হবে এখন।'

'কেন?'

'আঃ! আপনি তো বড় বাক্যবাগীশ।'

এবার আমার নজর পড়ল চায়ের ট্রের দিকে। আর তো কাপ নেই!

আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলাম একটা কাপ জোগাড় করার জন্য। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান একটা কাপ নিয়ে আসি।'

আমি এদিকে যেতে গেছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ও আমার হাত টেনে ধরে বলল, বসুন তো।

নিরপেক্ষ ও অবাধ ভোটদানের জন্য

সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানপর্ব যাতে শান্তিতে, অবাধে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয় তার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভোটদাতাদের ভীতিপ্রদর্শন বা নামপরিচয় ভাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার শাস্তি কঠোর।

নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আপনার ভোট গোপন থাকবে।

হিংসায় ভীত হবেন না
সাহসের সঙ্গে হিংসাকে প্রতিহত করুন।

ভোট দেবার সময়ে ঘুষ বা অন্য কোনও প্রলোভনে ভুলবেন না।

আপনার ভোটদানকেন্দ্র আপনার বাড়ীর কাছেই হবে। ভোটপ্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধির দেওয়া গাড়ীতে চড়বেন না।

প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়া আপনার পরম কর্তব্য, এ কথা ভুলবেন না।

এস. পি. সেনবর্মা
ভারতের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার

davp 70/417

আমার সারা শরীরের ভেতর দিয়ে যেন ইলেকট্রিক কারেন্ট চলে গেল। আমি আর চলতে পারলাম না, দাঁড়িয়ে পড়লাম। ও তখনও আমার সত্তা ধরে। আমি স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে একবার ওর দিকে চাইলাম।

ও হাত ছেড়ে বলল, মোটেও এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আপনি খেয়ে নিন, তারপরই আমি খাব।'

আমি আবার বিছানায় উঠে বসলাম। চা খেলাম। কোন কথা না বলেই। কাপ-ডিস নিয়ে বাথরুমে যাচ্ছিলাম, ও তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার হাত থেকে কাপ-ডিস কেড়ে নিয়ে বলল, আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো?

আমি জবাব দেবার আগেই ও বাথরুমের দিকে গেল। বাথরুমের দরজা খুলতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লুকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভিতরে যেতে পারি?

ও আমার দিকে তাকিয়ে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে। ও মিটমিট করে হাসছে, আমিও মিটমিট করে হাসছি।

'হাসছেন যে?' বন্যা প্রশ্ন করল।

'আপনিও তো হাসছেন।'

'আপনি হাসছেন বলে।'

'হাসব না? বাথরুমে যাবার জন্য অনুমতি চাইছেন?'

'চাইব না? আফটার অল এ প্রাইভেট চেম্বার!'

আমার উত্তরের অনুমতির অপেক্ষা না করেই বন্যা বাথরুমের বেসিনে কাপ-ডিস ধুয়ে বেরিয়ে এলো।

'অনুমতি না নিয়েই বাথরুমে গেলেন?'

চা তৈরী করতে করতে উত্তর দিল, মনে হলো অনুমতি না নিয়েও যেতে পারি।

সহজ সরলভাবে মানুষের সঙ্গে মিশতে আমার ভাল লাগে। ইচ্ছা করে। সেই ছোটবেলা থেকে। কিন্তু পারিনি। হয়ে ওঠেনি। নানা কারণে। মাগো, মামা বা মানসী থাকতে কোন দিন বোধ করতাম না। আমার জীবন-নাট্যের অন্যান্য চরিত্রের অন্তর্ধান হবার পর আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম, আমি যেন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছি।

মামা, মাগো, মানসী আর [illegible] শহরটাকে নিয়ে প্রমত্ত ছিলাম। কোন দৈন্য, কোন গ্লানি ছিল না মনে। কি [illegible] কোন মানুষের চাইতে নিজেকে হীন মনে হয়নি। বরং বিপরীতটাই মনে হয়েছে। পরে, মামা, মাগো, মানসীকে হারাবার পর নিজের শূন্য হৃদয় নিয়ে হাহাকার করে ঘুরে বেড়ালাম। ঝড়টা একটু কমলে, হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপি একটু শান্ত হলে ঘুরে বেড়ালাম জানা-অজানা মানুষের কাছে। একটু ভালবাসতে, একটু ভালবাসা পেতে পাগলের মত ছুটে [illegible] দিন এগ্রা- রুটি বিস্কুট আর চা দিয়ে অনেকে সৌজন্য দেখালেন অনেকেই কিন্তু মনের ক্ষুধা, হৃদয়ের হাহাকার কমল না, মিটল না।

কিছুকাল পরে থমকে দাঁড়ালাম। মনে হলো, নিঃসঙ্গতার অন্ধকার অরণ্যে দীর্ঘদিন ঘুরাঘুরি করতে করতে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ছোট্ট একটা বিষাক্ত পোকা মনের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে বাসা বেঁধেছে। আর? তিলে তিলে আমাকে দংশন করছে, আমার মনের মাধুর্য, হৃদয়ের বিস্তৃতি নষ্ট করছে। আমি সঙ্কুচিত হচ্ছি।

আশ্চর্য লাগত ভেবে। শিলচরের মানুষগুলো, অতি সাধারণ মানুষগুলোও ভালবাসতে পারত। ভালবাসা পেতো। কলকাতায় এসে, ডালহৌসী-এসপ্ল্যানেড-চৌরঙ্গীর অফিস পাড়ায়, লেক রোডের ঐ ফ্ল্যাটে, বৈঠকখানার ঐ গলিতে, বাগবাজার স্ট্রীটের মোড়ে আর তা খুঁজে পেলাম না। আরো অনেক জায়গায় পেলাম না। কিছুতেই পেলাম না।

কার্জন পার্কে বসে চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে ভাবতাম, আমার জীবন-নাট্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি সবাই পাল্টে গেল? ওদের জীবন থেকে মামা-মাগো-মানসী চলে যায়নি তবুও কেন ওরা এত নিরস, এত বিবর্ণ মনের মানুষ হলেন?

শামুকের মত সঙ্কুচিত হয়ে রইলাম নিজের মধ্যে।

এই দেরাদুনে এসে, নীল আকাশের নীচে, শিবালিক পাহাড়ের কোলে ঠাঁই পেয়ে, শাল-তমালের মৌন সান্নিধ্য পেয়ে আবার নেশা করতে ইচ্ছা করল। দ্বিতীয় অঙ্কের পর পর দুটি দৃশ্যে মিসেস রায় আর শুক্লাকে পেয়ে নেশা করার নেশা আরো চেপে ধরল। তা নইলে ঘুম ভাঙার পর দিনের একটা প্রত্যাশার নেশায় বিভোর ছিলাম কেন? সঙ্কুচিত আমি প্রসারিত হতে চাইছি, তাই না?

কিন্তু এমন করে......

'কি ভাবছেন?' বন্যার প্রশ্নে মনে হলো চুপ করে বসে আছি। বসে বসে ভাবছি।

'না, তেমন কিছু না।'

'তবুও শুনি।'

'বলার মত কিছু নয়।'

'তাহলে না বলার মতই কিছু ভাবছেন?'

আমি হাসলাম, না, তা নয়।

বন্যা যেন দাবী জানাল, তবে বলছেন না কেন কি ভাবছেন?

একবার ভাবলাম এড়িয়ে যাই, কিছুই বলব না। কি হবে বলে? আবার মনে হলো, না, না, ও নিজেই যখন জানতে চাইছে, [illegible] আসছে আমার কথা জানতে, তখন বলব না কেন? আমিও একটু একটু করে এগিয়ে যাই। এগিয়ে যাবার জন্যই তো মনের মধ্যে কিরকম একটা ব্যাকুলতা বোধ করছি। কিছু বললে নিশ্চয়ই নিজেকে হাল্কা লাগবে। তাছাড়া বলার এমন সুযোগ কি সব সময় পাব?

'সত্যি কথা বলব?'

বন্যা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দিল, বললে খুশী হবো।

ওর খুশী হবার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ভাবছিলাম আপনারই কথা।

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ'

'কেন?'

'ভাবছিলাম আপনি এসে চা করে দিলে খুব ভাল হতো।'

মুখ নীচু করে বন্যা কি যেন ভাবল। মিনিট খানেক। তারপর আবার আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, হঠাৎ চা করে দেবার কথা মনে হলো?

মানসীর কথা চেপে গিয়ে শুধু বললাম, মাগো ডাকাডাকি করে রোজ আমার ঘুম ভাঙাত। ডাকাডাকি না করলে কোনদিন ঘুম ভাঙত না। ঘুম ভাঙার পর মাগোই চায়ের কাপটা এগিয়ে দিত......

বন্যা হাসল, বেশ আদরেই মানুষ হয়েছেন।

'হ্যাঁ। খুব বেশী আদরে মানুষ হয়েছিলাম বলেই এখন মরুভূমির মধ্যে ঘুরে মরছি।'

ও আবার মুখ নীচু করে রইল। দাঁত দিয়ে নীচের সুন্দর পাতলা ঠোঁটটা কামড়াল অনেকক্ষণ। আমিও চুপ করে বসে রইলাম।

মুখ নীচু করেই ও জিজ্ঞাসা করল, তা আমি চা করে দিলে ভাল হতো ভাবছিলেন কেন?

'মনে হচ্ছিল আপনি এসে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিলেই ভাল হতো।'

বন্যা আর কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। এদিক ওদিক দেখল। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল।

কয়েক মিনিট পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ এখন এলেন?

'অন্যায় করেছি?'

'আমি কি তাই বলেছি?'

এবার বন্যা বলল, মুসৌরী এক্সপ্রেসে রাশিয়ান ডেলিগেশন আসছে বলে বাবা স্টেশনে চলে গেলেন। লাঞ্চ-ডিনার সব কিছুই বাইরে। তাই একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।

'বাড়ী থেকে সোজা এখানে আসছেন?'

'না। পিসীর ওখানে ঘুরে এলাম। কালকের টিফিন কেরিয়ারটা ফেরত দিতে গিয়ে একটু গল্প করাও হলো।'

'এখান থেকে কোথায় যাবেন?'

'চলে যেতে বলছেন?' ঠাট্টা করে বন্যা।

কাব্য করে বললাম, নিঃসঙ্গ পথিকের পান্থশালা আপনার পদার্পণে ধন্য হলো আর আপনাকে চলে যেতে বলব?

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

মনের কথা

'কস্‌মিক' বিচ্ছিন্নতা
নিখিলবাবুর আত্মচিন্তা

দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যবাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে নিখিলবাবু প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিলেন। তাঁর ধারণা জাগতিক প্রাণীর পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। আমরা সুখী হবার ভান করি মাত্র, আসলে মানুষ মাত্রেই দুঃখী। জন্মযন্ত্রণা থেকে দুঃখের শুরু, মৃত্যুযন্ত্রণায় দুঃখের শেষ। জীবনের এপারে কি আছে জানি না, মৃত্যুর ওপারেও অজানা। নানারকম ধর্মীয় ও জাগতিক ক্রিয়াকান্ডের মধ্যে ডুবে থেকে ও জড়িয়ে পড়ে মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে মানুষ; কিন্তু সফল হয় না। কেন এই জীবন, কেন এই পৃথিবী, কেন এই বিশ্ব নিখিল? স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব কি? স্রষ্টা থাকলেও তার সৃষ্টিকে উদ্দেশ্যমূলক ও পূর্ব-পরিকল্পিত বলা চলে কি? বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা কেন সহ্য করে মানুষ? আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে আমরা জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত শুধু দুঃখ বেদনা ভোগ করেই চলেছি। জীবনের প্রতিটি পর্বে কিছু না কিছু হারাচ্ছি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছি। শিশু বড় হবে মায়ের কোল ছেড়ে সংসারের আবর্তের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকে; মাতৃচ্যুত হওয়ার দুঃখ তাকে পীড়িত করে। বড় হয়ে বালক শৈশবের সুরক্ষিত স্বর্গ মায়ের কোলের জন্য লালায়িত, যুবক কৈশোরে নিশ্চিন্ত খেলাধুলার দিনগুলো ফিরে পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত, দায়িত্ব-ভারাক্রান্ত দ্বিধা সংশয়াকুল প্রৌঢ় যৌবনের বেপরোয়া বেদুইন মনোবৃত্তি হারিয়ে বিষণ্ণ, বৃদ্ধ জীবনান্তিক অজানা অন্ধকারের ভয়ে আচ্ছন্ন।

প্রাচ্যপাশ্চাত্য দর্শনের নানা দিক্‌পালের উদ্ধৃতিভরা 'আত্মচিন্তা' পড়ে শোনালেন নিখিলবাবু সারাদিন ধরে। এই-রকম আত্মকথা, আত্মচিন্তা, আত্মবিশ্লেষণ শুনতে আমরা অভ্যস্ত। রোগীদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখি। ব্যক্তি-মনের মানসিকের অনেক জটিলতা, অনেক সমস্যা, অনেক দ্বন্দ্ব রোগীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আমাদের কাছে নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দিয়ে থাকে। মনের কথা জানতে বা বুঝতে হলে শুধু কেতাবী জ্ঞানের উপর নির্ভর করা চলে না। অল্প-শিক্ষিত রোগীদের সঙ্গে কথা বলেও অনেক সময় চমকিত হতে হয়। তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোতে মনের অন্ধকার এমন একটি কোণ আলোকিত হয়ে উঠতে পারে, যে-সম্বন্ধে চিকিৎসকের কোনো ধারণাই হয়ত ছিল না। অনেক সময় পূর্বগঠিত ধারণার রদবদল ঘটে রোগীদের জীবন-ইতিহাসের কোনো একটি অধ্যায় শুনে। নিখিলবাবু উচ্চশিক্ষিত পন্ডিত। তিনি দর্শন বিজ্ঞান নিয়ে অনেক পড়াশুনো করেছেন। তাঁর 'আত্মচিন্তা' ও পান্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা আমাকে মুগ্ধ ও উপকৃত করল। নানাভাবে তিনি আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে, জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত গোটাটাই আশ্চর্য ব্যাপার। জীবনে আনন্দ নেই। মানুষের কাছে জীবনানুগত্য আশা করা অন্যায়। কেন? অনেকগুলো কারণ দেখালেন তিনি, আমার এই 'কেন'র উত্তরে। একে একে সেগুলো বলছি।

প্রথমতঃ ব্যক্তিজীবন অনিশ্চিত। তেমনি অনিশ্চিত জীবনপ্রবাহ। যে কোনো সময় জীবনপ্রবাহ থেমে যেতে পারে। শুধু পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকেও জীবনের গতি চিরতরে রুদ্ধ হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বব্রহ্মান্ড কোনো পূর্ব-পরিকল্পিত সৃষ্টি নয়, উদ্দেশ্যহীন অনা-সৃষ্টি। খেয়ালী আকস্মিকতা। সুতরাং অর্থহীন। চন্দ্রযান অনুসন্ধানের সাহায্যে কোনো অর্থ আরোপ করা সম্ভব হবে না। তৃতীয়তঃ জীবন উদ্দেশ্যহীন মূল্যহীন শুধু নয় সত্যহীনও বটে। মূল্য ও সত্য আপেক্ষিক। ব্যক্তির মর্জি ও খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। যতদিন ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল, ততদিন পরমসত্যে আস্থা ছিল। আজ ঈশ্বর মৃত, সত্য শুধুই আরোপিত।

চতুর্থতঃ বাহ্যরূপে আমরা আকৃষ্ট, অথচ এই বাহ্যরূপ বস্তু বাস্তবের সঠিক পরিচয় নয়। এই প্রসঙ্গে নিখিলবাবুর 'আত্মচিন্তা' নীৎসে কিয়েরকেগার্ডের অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে ভরা। পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে ভেবে বিশদ বিবরণ না দিয়ে শুধু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি।—কিয়েরকে-গার্ড-এর অস্তিত্ববাদের মূলে চিরাচরিত 'সানডে ক্রিশ্চিয়ানিটির' অনুষ্ঠানে অবিশ্বাস। এটা ধর্মের বাহ্যিক রূপ, ধর্ম এই আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যুক্ত নয়। নীৎসে ঠিক এইভাবেই বুর্জোয়া সমাজের অন্ধ আভ্যাসিক রীতিনীতির মধ্যে জীবনের অস্বীকৃতি দেখেছেন। জীবনের গভীর তাৎপর্য খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে সুপার-ম্যানের পরিকল্পনা করেছেন। তাৎপর্য থাকলে তো খুঁজে পাবেন। ওঁরা আদিম পাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত। ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আদিকাহিনী, সেই গার্ডেন অব ইডেন থেকে পতনের কাহিনী এঁদের দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। 'এই বাহ্য' বলে অনেক কিছু পরিত্যাগ করলেও জীবনের কোনো অর্থ এঁরা আবিষ্কার করতে পারেননি। 'সেমিটিক' মনে ঈশ্বর এক সদা-রুষ্ট শাস্তিদাতারূপে প্রতিফলিত। ওদের সবসময় ভয় এই বুঝি তিনি রুষ্ট হলেন। শাস্তির ভয়ে ওরা শঙ্কিত। তাই ওদের প্রয়োজন 'প্রফেটের', ঐশ্বরিক প্রেরণা পাওয়া গুরুদেবের, যিনি ওদের হয়ে ঈশ্বরকে তুষ্ট করবেন। এইভাবে ওরা দুঃখকে এড়াতে চেয়েছে, ভক্তরা কল্পনা করে দুঃখনৈরাশ্যকে দূর করতে চেয়েছে। কিন্তু আজ এই বাহ্য অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মবোধ ভেঙে পড়েছে, তাই দুঃখবোধ জেগে উঠেছে। দুঃখবোধ থেকে এসেছে বিচ্ছিন্নতাচিন্তা। ভারতীয় মন গোড়া থেকেই, না ঠিক গোড়া থেকে নয়— বৈদিক যুগের পর থেকে, প্রকৃতির বাহ্যরূপের ছলচাতুরীতে মুগ্ধ হতে চায়নি। নিজের সত্তার মধ্যে ডুবে গিয়ে ইন্দ্রিয়জাত আনন্দ অস্বীকার করেছে। আত্মিক উন্নতির ব্যাপারে স্বনির্ভর হতে হবে, আত্মমগ্ন হতে হবে;—এই শিক্ষাই পেয়েছে বৌদ্ধধর্ম, জৈন

ধর্ম, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন থেকে। আনন্দবাদকে পরিত্যাগ করে ক্রমশ দুঃখবাদের মধ্যে ডুবে গেছ। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, দেশকাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্তি চিন্তায় বিভোর থেকেছে। তাই ভারতের ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাস আছে, রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাস নেই। 'এহ বাহ্য' বহুবার বলা সত্ত্বেও অবশ্য বাস্তবের সন্ধান মেলে নি, জীবনের অর্থ আবিষ্কৃত হয় নি। দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যবাদ জেঁকে বসেছে, বিচ্ছিন্নতা গভীর হয়েছে। পরমসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হবার পরিবর্তে নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অরুন্ধতী নক্ষত্রের খোঁজে ক্ষীণদৃষ্টি মেলে অসহায়ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

নিখিলবাবুর দর্শনচিন্তা জায়গায় জায়গায় প্রলাপের পর্যায়ে পৌঁছলেও তাঁর আত্মকথা পাঠে আমি বাধা দিলাম না। রোগীদের মনের কথা সব সময়ে অবাধে বলে যেতে দেওয়া পদ্ধতিতে আমি বিশ্বাসী নই। তবে সময়বিশেষে উৎসাহও দিতে হয়। আর এক্ষেত্রে সত্যিই ভদ্রলোকের বলার ভঙ্গী আমার ভাল লাগছিল, অবোল-তাবোল বকবকুনিগুলির মধ্যে এক এক সময় যেন সত্য ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। আজকের মনস্তাত্ত্বিকরা বিশেষ করে ডেপথ সাইকোলজির প্রবক্তারা কি মানুষের বাহ্য আচরণ, দার্শনিক আত্মপ্রকাশে বিশ্বাসী? তাঁরাও মনে করেন মুখের কথা মনের কথাকে ঢেকে রাখবার একটা কৌশল। যিনি শান্তি চাই বলে আত্মাহুতি দিচ্ছেন, তার মনের ধ্বংসপ্রবণতা তাঁর আত্মধ্বংসের কারণ। পরার্থে যিনি সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তাঁর মনের গভীরে আছে আত্মকেন্দ্রিকতা আর স্বার্থপরতা। মার্কসবাদীরা বলবেন, ওসব মনস্তাত্ত্বিকদের কথা তাঁরা নয়, তাঁরা বাস্তববাদী। কিন্তু তাঁরাও বলবেন মানুষের বাহ্যিক আচরণ ব্যবহার দিয়ে তাকে বিচার করা চলে না। বাহ্যিক সব কিছুর পিছনে রয়েছে অন্তর্নিহিত শ্রেণীস্বার্থ। আত্মস্বার্থ বলই হোক আর শ্রেণীস্বার্থ বলই হোক, দুইই আমার কাছে এক। জীবনের নশ্বরতা, নৈরাশ্য, দুঃখকে এড়িয়ে যাবার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা। আত্মসংগ্রামই হোক আর শ্রেণীসংগ্রামই হোক, দুইই অপরকে আঘাত করে, দুঃখ দিয়ে, নিজের দুঃখকে ভুলে থাকার হাস্যকর প্রয়াস। যা দেখা যাচ্ছে সেটা বাস্তব নয়, যেটা অনুমান করছেন, সেটাই বাস্তব। বাস্তবতার কি অদ্ভুত ব্যাখ্যা! এইভাবে নিখিলবাবু নিজের আত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্মত কোনো কারণ আছে কিনা জানতে চাইলেন।

এইবার নিখিলবাবুর জীবনের কথায় আসা যাক।

নিখিলবাবুর বাট বছর বয়স, দেখে মনে হয় আরো কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নানা উপায়ে অনেক পয়সা রোজগার করেছেন। বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে। নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিপত্তি আছে। বর্তমান সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। বছর তিনেক ধরে ভারতের তীর্থস্থান দেখে বেড়াচ্ছেন। কোনো জায়গায় তিনদিনের বেশি থাকতে পারছেন না। পড়াশুনার শৌক আদৌ নেই। এখন পড়াতেও মন বসছে না। বাঁচবার কোনো অবলম্বন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে উঠেছেন। কোনো কাজকর্মে উৎসাহ পাচ্ছেন না। কোনো কিছুতেই

CENTRAL LIBRARY

মনঃসংযোগ করা যাচ্ছে না। সংসারে তিনি একা। স্ত্রী মারা গেছেন প্রায় [illegible] বছর আগে। তখন বড় মেয়ে ইভার [illegible] বছর, আর ছোটো বিভার পাঁচ। তিন বছর হলো আগে, বিয়ের ঠিক পরেই, স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা যায়। সেখানেই ওরা সংসার পেতে বসেছে। ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এক আই-এ-এসের সঙ্গে, চার বছর আগে। এখন ওরা দিল্লীতে আছে। দুই মেয়েই বাবাকে গভীরভাবে ভালবাসে। নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও নিখিলবাবু মাতৃহীন মেয়ে দুটিকে মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। ব্যবসায় কাইলপত্র অফিস থেকে বাড়ী আনেননি কোনোদিন। সন্ধ্যার পরে একান্তভাবে তিনি মেয়েদের সাহচর্য দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে খেলেছেন, তাদের নিয়ে বেড়িয়েছেন, তাদের পড়াশুনায় সাহায্য করেছেন। মেয়েদের একান্ত আগ্রহেই অল্পবয়সেই তাদের বিয়ে দিয়ে নিজেকে নিঃসঙ্গ করেছেন। একালে কটা মেয়ের আর একুশ বাইশ বছরে বিয়ে হচ্ছে? নিখিলবাবু যৌবনের প্রারম্ভেই বিবাহের পক্ষপাতী। ইভা দুবছর অন্তর একবার করে বাবাকে দেখে যায়, বিভা বছরে অন্তত দুবার আসে। নিখিলবাবু কিন্তু কোনোদিন তাদের আসবার জন্যে বা দুদিন বেশি থাকার জন্যে অনুরোধ জানান না। বিভা এবার এসে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে গেছে। নিখিলবাবু কাউকে না জানিয়েই কামাখ্যা-ধামে চলে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, মেয়েদের দেখলে তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। ইভা বিভা দুজনেই সন্তানের মা হয়েছে। বাবার কাছে আসবার সময় ইভা ছোটো বাচ্চাটিকে নিয়ে এসেছিল দুবছর আগে। নিখিলবাবুর ভাল লাগেনি।

মুখে তিনি প্রচুর আদরযত্ন করেছেন ইভার ছেলেকে, কিন্তু অন্তরে সাড়া জাগেনি। মাস দুয়েক বাদে ইভা চলে যাওয়াতে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ইভার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে হয়তো কিছু দুটি [illegible] পড়ে থাকবে, তাই বোধহয় সে এই প্রথম জানিয়েছে যে, এবার তার আসা সম্ভব হবে না। নিখিলবাবু তার জন্যে বিশেষ বেদনা অনুভব করেননি। বিভা বাচ্চা মেয়েটির কথায় চিঠি ভরিয়ে যেদিন জানালো সে কোলকাতায় আসছে, সেই-দিনই নিখিলবাবু প্ল্যানের খুঁজ করে বসলেন গৌহাটি যাবার জন্যে।

—আমার ইভা বিভাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ওরা হারিয়ে গেছে। জীবনের অনেক কিছুর মত স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। ওদের মা আমার কাছে এখন ওদের থেকে বেশি জীবন্ত। ওরা আমার চোখের সামনে যখন বড় হয়ে উঠছিল, তখনই ওরা বদলে যাচ্ছিল। ওদের শৈশবের ইভের [illegible] — দিকে তাকিয়ে মনে হয় এই ইভা, বিভার সঙ্গে শাড়ী পরা ইভা আর অল্পবয়সে গম্ভীর বনে যাওয়া স্কার্টপরা বিভার কোনো মিল নেই। ওরা [illegible] আলাদা। বাচ্চারা কেন বড় হয়? বয়স [illegible] ট্রাজেডীর মত দুঃখকর ঘটনা [illegible] কিছু নেই। ওরা বিয়োগান্ত নাটকের চরিত্র [illegible] আর আমি নাটকের দর্শক। আমার চোখের [illegible] মুহূর্তগুলো [illegible] ঝরে পড়ছে, [illegible] আমার ইভা বিভার বয়স বাড়ছে। তবু নানা কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ অভিভূত হইনি। কোনোরকমে নিজের দুঃখ মনের মধ্যে চেপে বেঁচে থেকেছি। আজ আর পারছি না। [illegible] বছরের ইভা আজ দুটি ছেলের মা। [illegible] মেয়ে ইভা, যে ইভার আমি মা বাবা দুইই, সে ইভাকে আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না। যে বিভা সেদিনও পুতুল নিয়ে খেলাঘরে সময় কাটাতো, সেই পাঁচিশ বছরের বিভার সঙ্গে তার বাচ্চাটি আসবে শুনে আমি দুঃখে বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলাম। তাইতো কোলকাতা ছেড়ে পালালাম। বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বিভা আমাকে বাবা বলে ডাকবে, এ আমি ভাবতেও পারি না। আমার বিভা বেঁচে আছে এ্যালবামের ফোটোগুলোর মধ্যে, জেগে আছে আমার স্মৃতির কোঠায়। ইভা, শুভাবান চ্যাটার্জির স্ত্রী মিসেস ইভা চ্যাটার্জি আমার মেয়ে ইভা নয়। সে পৌষ্টিক সঞ্জয়ের মা, আমার কেউ নয়। মিসেস বিভা ব্যানার্জির মধ্যে আমার ছোট্ট বিভাকে আমি খুঁজে পাবো না কোনোদিন। লাইফ ইজ সো সেড এ্যান্ড অড, এ্যান্ড উই আর অল সো এ্যাব্সার্ড। আমি যা হারিয়েছি তা আর কোনোদিন ফিরে পাব না। ওদের আমি আর চোখে দেখতে চাই না। বিয়োগান্ত নাটকের দর্শক হবার বিড়ম্বনা থেকে আমি অব্যাহতি চাই। তা বলে আমি আত্মহত্যা করব না। ফুঁ দিয়ে জীবনদীপ নিভিয়ে দেওয়া সোজা। খুবই সোজা। না, সে ইচ্ছে আমার নেই। আর আমার একটা জীবন শেষ হলে, আমার বুকের ধুকধুকুনি থেমে গেলেই তো আর ট্রাজেডী থামছে না। এই নাটক তো অভিনীত হয়ে চলেছে, চলবে। না, আমি বেঁচে থাকতে চাই। বেঁচে থাকা মানুষকে তার বোকামী, তার বেঁচে থাকার ছেলো আনন্দ সম্পর্কে তাকে বোধযুক্ত করতে চাই। তার মনে আমার মত প্রশ্ন জাগিয়ে তাকে দার্শনিক করে তুলতে চাই। আমার মত মেকী দার্শনিক নয়, খাঁটি দার্শনিক। খাঁটি দার্শনিক বিয়োগান্ত নাটকে অভিনয় করে যায়, কিন্তু নিজেকে চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে না। খাঁটি দার্শনিক বিয়োগান্ত নাটকের দর্শক হয়েও অচঞ্চল থাকে, সুখে দুঃখে অভিভূত হয় না।

নিখিলবাবুর বিচ্ছিন্নতার বিশেষ নাম-করণ করেছেন একজন মনোবিজ্ঞানী। 'কসমিক আউটকাস্টনেস' বা সৃষ্টিসংক্রান্ত বিচ্ছিন্নতা বলতে তিনি নিখিলবাবুর মনোভাব ও অস্তিত্ববাদীদের নৈরাশ্যবাদকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই ধরনের চিন্তা করলেই যে অদৃশ্য হয়ে পড়তে হবে, এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এই ধরনের চিন্তার হাতছেড়া [illegible] অত্যন্ত। [illegible] বিচ্ছিন্ন হলেও [illegible] এরা [illegible] শিল্প, শিল্পজ্ঞানবেত্তা-[illegible] বেশি [illegible] চায়। [illegible] বেশি কিছু [illegible] জীবনের বিরুদ্ধেই এদের বক্তব্য। [illegible] বিচ্ছিন্নতার মত এর মূলেও নিহিত [illegible] পারিবারিক ও সমাজজীবনের পরিবেশে।

নিখিলবাবু পড়াশোনা করেছেন প্রচুর। [illegible] বা দুঃখবাদী [illegible] পাঠক [illegible] হলে ভুল হবে। [illegible] তিনি সংগ্রাম করেছেন, সফলতা লাভ করেছেন। প্রথম যৌবনে আদর্শ [illegible] বাঙালীর [illegible] যোগাতে [illegible] যুদ্ধের বাজারে নানা উপায়ে পয়সা রোজগার করেছেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লাভ করতে গিয়ে এমন অনেক কাজ তাঁকে করতে হয়েছে, যা তাঁর বিবেকের অনুমোদন পায় নি। এসব কথা তিনি আমাকে বলেছেন। অনেকবার আদর্শকে বলি দিতে হয়েছে। ন্যায়নীতি, ধর্মাধর্ম, সত্যাসত্য নিয়ে অনেক চিন্তা করতে হয়েছে। নাকর্ম সমস্ত অনেক কিছু জীবনে সাফল্য লাভের জন্য পরিত্যাগ করতে হয়েছে। সমাজে তখন ভাঙনের মুখে, সামাজিক মূল্যবোধ বিকৃত। কাজেই এই বিজয় অভিযানে অন্তরের বাধা ছাড়া অন্য কোনো বাধা ছিল না। জীবনসংগ্রামে শেষ পর্যন্ত তিনি বিজয়ী হয়েছেন, কিন্তু আহত হয়েছে তাঁর মন, আহত হয়েছে নীতিবোধ, ধর্মবোধ। [illegible] সেই ক্ষতগুলোকে প্রলেপ লাগিয়েছেন তাঁর নিজের জীবনদর্শন-পরিপোষক চিন্তাস্রোতের প্রলেপ। সাময়িক ভাবে বাধা পড়ে গিয়েছে। জীবনের প্রধান ও একমাত্র আকর্ষণ মেয়ে দুটিকে তিনি ভাল-বেসেছেন, ওদের ভালবেসে জীবন আনন্দে ভরে উঠেছে। আবার ওদের ভালবাসা ওঁকে পীড়িত করেছে। ওদের মত প্রতিদ্বন্দ্বী আর না থাকলে বোধহয় শুধু মোহমুক্তের জন্যে, তাঁকে বিবেক-অননুমোদিত পথ গ্রহণ করতে হত না! জীবনের সাফল্য তাঁর কাছে জীবনকে বিফল অর্থহীন করে তুললো, যখন জীবনের লোভর দরজা থেকে অনেকটা ছিন্ন করেই মুক্ত হলেন। ইহজগতের [illegible] পর এই অর্থ, এই গাড়ীবাড়ী, গাড়ীটি তাঁর কোনো মূল্যই রইল না। পুরনো কথাগুলো আবার চনচন করে উঠলো। দুঃখবাদ নৈরাশ্যবাদ তাঁকে পেয়ে বসল। জীবন থেকে বিযুক্ত হয়ে তাঁর বিচ্ছিন্ন মন নীরবিচ্ছিন্নতায় বিলুপ্ত হয়ে যেতে চায়।

—মনোবিদ

CENTRAL LIBRARY

পিঞ্জর

সুভাষ সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব শেফালী দিতে পারে নি। পরক্ষণেই ভেবেছে, রঞ্জতদা অপরিচিত কেউ নয়। এর সঙ্গে চা খেতে যাওয়া অন্যায় কিছু নয়। ফলে সে সম্মতি দিয়েছে।

সেদিন বাড়ি ফিরতে এমন কিছু দেরী হয় নি। বিনয় আজকের মতও জানতে চেয়েছিল কেন দেরী হল। আর শেফালী কোন কিছু না ভেবে বলেছে রঞ্জতদার কথা। শুনেই বিনয়ের মুখ কালো হয়ে ওঠে।

—কী হল? শেফালী না জানার ভান করেছে, ওভাবে তাকাচ্ছ কেন?

—আমি এসব পছন্দ করি না।

—কী?

—তুমি রঞ্জতদাকে চেন না। ভবিষ্যতে ওর সংস্পর্শে যাবে না।

—কেন? তুমি মিছামিছি রেগে উঠছো কেন বুঝতে পারছি না। রঞ্জতদা আমাদের আপনজন। তুমি কী আমাকে অবিশ্বাস কর?

—থাম শেফালী! বিনয় প্রায় চিৎকার করে উঠেছে, তুমি কিছু জান না। তোমার আমার ভালর জন্যেই বলছি। ওই স্কাউন্ড্রেল-টাকে সব সময় এড়িয়ে চলবে! মদ্যপ চরিত্রহীন একটা জানোয়ার!

বিনয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে শেফালী ভয় পেয়েছে। যদিও মনে মনে সে রেগে টং। মাথা নীচু করে সেদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। বিনয়কে মনে হয়েছে নীচ প্রকৃতির একটা লোক। ছোট মন। কী ঘৃণা রঞ্জতদার বিরুদ্ধে। সে হয়ত সবকিছু জানে না। জানার দরকার নেই। [illegible] বা এমন কী সতী সাবিত্রী! রঞ্জতদার মুখেই তো সব শুনেছে। আশ্চর্য! বিনয় এসব কিছুই জানায় নি। যা কিছু জানে না। [illegible] রঞ্জতদারা [illegible] চলে না। যতক্ষণ রঞ্জতদা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে—কথা বলা বা এক সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসে চা খাওয়া, এতে অন্যায় কিছু নেই।

মা বাবার কথা মনে পড়ল শেফালীর। তারা অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া নিয়েছেন। আসলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ঐ বিনয়ের জন্যেই। কাছাকাছি থাকার জন্যে প্রায় রোজ শেফালী ওপরে যেত। এ নিয়ে কম ঝগড়া হয়নি বিনয়ের সঙ্গে। ওঁরাও পছন্দ করতেন না। ঝগড়া এমন একটা স্তরে উঠল যে, মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁরা অন্যত্র উঠে যান।

বিনয় সম্পর্কে সমস্ত মোহ ভেঙে গেছে শেফালীর। ফলে সে অনেক ব্যাপারে এড়িয়ে যায় ওকে। প্রয়োজন হলে মিথ্যা কথাও বলে। সে লুকিয়ে মা বাবার সঙ্গে দেখা করে। রঞ্জতের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। যেমন আজ হয়েছিল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে শেফালী রান্নাঘরে একবার উঁকি মারল। ধোঁয়া সরে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি সে শোবার ঘরে চলে আসে। এক পলক বিনয়ের দিকে তাকাল। চিৎ হয়ে শুয়ে কী যেন ভাবছে। হঠাৎ কী ভেবে তার সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল।

—কিছু ভেবেছো [illegible]? শেফালী [illegible] সামনে দাঁড়িয়ে [illegible] প্রসাধন করল। সমস্ত শরীর আয়নায় প্রতিফলিত। [illegible] চলাফেরা। [illegible] সে খানিকটা [illegible] পেয়েছিল [illegible] হয়েছিল মনেও।

আর একবার [illegible] শেফালী। বিনয় নীরব। [illegible] সে এখনও এই বিনয়ের [illegible] পারছে না। নীচু [illegible] ওর মুখ সরিয়ে বিনয় [illegible] ছেড়ে নেমে দাঁড়াল।

—কোথায় ছিলে তুমি? বিনয় শেফালীর [illegible] সজোরে দু' হাতে আঁকড়ে ধরে ঝাঁকাতে থাকে, সাঁচ্চা কথা বল শেফালী। আশ্চর্য! তুমি আজকাল বেমালুম মিথ্যে কথা বলতে শিখেছো। আসলে তুমি কী চাও? নাকি আমাকে আর সহ্য করতে পারছো না?

—ছাড়ো লাগে। শেফালীর কণ্ঠস্বর [illegible], ছি! কী বিশ্রী [illegible] ব্যবহার। এখন তোমার সঙ্গে কোন কথা বলবো না। তুমি খুব উত্তেজিত। ছাড় বলছি!

শেফালীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয় সরে যায় জানালার কাছে। পিছন ফিরে দাঁড়ায়। সমস্ত শরীর কাঁপছে। [illegible]

শিক দু হাতে চেপে ধরে। প্রচণ্ডভাবে চাপ দেয়। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে যায় বিছানার দিকে। আলোর সামনে দু হাত মেলে ধরে। কাঁপছে হাতের তালু।

বালিশে মুখ গুঁজে বিনয় নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

অনেকক্ষণ পর সে মাথা তুলে তাকায়। অন্ধকার ঘর। এখন কটা বাজে? কান পেতে শুনল অস্পষ্ট গুঞ্জন রাস্তায়। ফিসফাস কণ্ঠস্বর। ক্রমশঃ একটা শব্দ এগিয়ে এল। বারান্দায় মৃদু হাঁটাচলার শব্দ। শেফালী? মা? বুকের ভিতর এত খালি খালি মনে হচ্ছে কেন? কেন সে নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল?

কোন সন্দেহ নেই, আজও ওরা এক সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করা বা অনুরোধ এড়াতে না পেরে বাড়ি যাওয়া সব মিথ্যে। অর্থাৎ সব শেষ। রজতদার উদ্দেশ্য কী? মীরার জীবনটাকে ধ্বংস করেও কী তার সাধ মেটে নি? এখন লোভ শেফালীর দিকে। ভাবতেই বিনয় শিউরে উঠল। রজতদা সব পারে। সমস্ত পাপ তার দ্বারা সম্ভব। কিন্তু কেন রজতদা শেফালীর দিকে হাত বাড়াচ্ছে? এই বিরাট শহরে মেয়ের অভাব নেই।

আজও বোধহয় ওরা রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে। মুখোমুখি বসে হাসি গল্প। শেফালীর মুগ্ধ দৃষ্টি রজতদার দিকে। বয়স হলেও চেহারা ভাল রজতদার। কথা বলতে ওস্তাদ। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনোও আছে। ভাল চাকরী করে। প্রতিদিন নিশ্চয়ই বিল রজতদাই পে করে।

কে জানে কতদিন ওদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। হয়ত দু চারদিন। কিম্বা রোজ। শুধু কী পাশাপাশি রাস্তায় হাঁটা, মুখোমুখি পর্দা ঘেরা কেবিনে...কতদূর অগ্রসর হয়েছে রজতদা? শেফালী কী রজতদার উদ্দেশ্য টের পেয়েছে?

॥ চৌত্রিশ ॥

চায়ের কাপ সামনে রেখে বিনয় একাগ্র দৃষ্টিতে রাস্তার ওপারে হলদে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখল। এখনই বেরোবে শেফালী। সময় হয়ে এসেছে। বেরোলে ওকে অনুসরণ করবে। দেখবে কোথায় যায়, কার সঙ্গে দেখা করে। নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। কাল সারারাত ঘুম হয়নি। শেফালীর নাক ডাকার শব্দ শুনেছে। লাইট জেলে ওর মুখ দেখেছে। হাত নিশপিশ করে উঠেছে। কী সুন্দর আর মসৃণ গলা!

—আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চমকে উঠল বিনয়। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপে চুমুক দিতে বিকৃত হয়ে ওঠে মুখটা। ঠাণ্ডা বিস্বাদ। সরিয়ে রাখল কাপ। আড়চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। না, কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না। ছোট চায়ের দোকান। খদ্দের দু চারজন। ওদের কথা-বার্তা কানে আসছে।

দাম মিটিয়ে বিনয় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। একবার নিতাকে নিয়ে আসবার কথা ভেবেছিল। পাড়ার বিখ্যাত গুণ্ডা। আলাপ পরিচয় আছে। দূর থেকে রজতদাকে শুধু দেখিয়ে দিলেই চলবে। তারপর যা করবার... কিন্তু কী ভেবে পিছিয়ে গেছে। এখনও সময় হয় নি। সময় হলে নিতার সাহায্য নিতে হবে বৈ-কি।

ঐ যে শেফালী বেরিয়ে এসেছে। বিনয় একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে নিজেকে লুকোয়। শেফালী কোন দিকে তাকাচ্ছে না। একমনে হাঁটছে। বিনয় বেশ দূরত্ব রেখে হাঁটতে থাকে। রাস্তায় ভীড়। মাঝে মাঝে ভীড়ের মধ্যে শেফালী হারিয়ে যায়। আবার দেখা যায় ওকে। দ্রুত চলার ফলে কয়েকজনের সঙ্গে ধাক্কা খায় বিনয়। কেউ রুক্ষ স্বরে কথা বলে। কেউ গালাগালি দেয়। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই বিনয়ের। সে শেফালীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে হাঁটতে থাকে।

একটা বাস স্টপের কাছে শেফালী দাঁড়ায়। বিনয় ভাবতে থাকে, শেফালীর গন্তব্য স্থান কোথায়। একটার পর একটা বাস আসছে। বাসস্টপে বেশ ভীড়। বাসে লোকজন গিজগিজ করছে। বাসে চেপে কোথায় যাবে শেফালী? ভেবেছিল রজতদাকে দেখতে পাবে। পাশাপাশি হাসতে হাসতে দুজনে হাঁটছে। দেখলে অনেকেই ভাববে সুখী দম্পতি। তারপর ওরা ইসারায় ট্যাকসী ডাকবে। তারপর কোথায় যাবে? সিনেমা, গঙ্গার ধার, রেস্টুরেন্টের ঠাণ্ডা ঘর অথবা রজতদার নিজের ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটে মেয়ে নিয়ে নতুন আসছে না রজতদা। সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ল। ঠোঁটে লিপস্টিক, লিভলেস ব্লাউজ সমস্ত শরীরে ঢেউ তুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল। আর একদিন দ্রুতবেগে চলন্ত ট্যাকসীর ভিতর ঘন হয়ে একজনের পাশে বসতে দেখেছিল।

বাসে উঠছে শেফালী। বিনয় পিছনের গেটে উঠবে কিনা একবার ভাবল। উঠে পড়েছে শেফালী। ছেড়ে দিচ্ছে বাস। ছুটতে গিয়েও বিনয় থমকে দাঁড়ায়। এই ট্যাকসী। তাড়াতাড়ি দরোজা খুলে নরম গদীর ওপর বসে পড়ল।

—ঐ বাসটার পিছন পিছন চলুন। বিনয় ড্রাইভারের ভ্রূকুটি লক্ষ্য করে একটা পাঁচ-টাকার নোট এগিয়ে দেয়। মুচকি হেসে ড্রাইভার বুক পকেটে নোট গুঁজে রাখে।

বাসের পিছন পিছন ট্যাকসী। বেশ পাকা ড্রাইভার। কিন্তু শেফালী নামছে না কেন? কিছু বুঝতে পারছে না বিনয়। রীতিমত গোয়েন্দা কাহিনী। এখন তার হাসি পাচ্ছে। হেডমাস্টার চিঠিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আপনি প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আরও কত গালভরা কথা। পড়তে পড়তে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। অন্তত একজন তার কাজের সার্থকতা বুঝতে পেরেছেন। এখনও বাস থেকে নেমে পড়ছে না কেন শেফালী?

শোভাবাজারের মোড়ে বাস থামলে শেফালী নেমে পড়ে। তারপর একটা রিকশায় উঠে বসে। বিনয় মিটার দেখে টাকা দেয়। তারপর সেও একটা রিকশায় উঠে বসে। তারা দুজনেই বাড়ি ফিরছে। ঐ শেফালী বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলে বিনয় আস্তে আস্তে হেঁটে গঙ্গার ধারে চলে আসে। দু হাত দিয়ে রেলিং ধরে বিশাল জলরাশির দিকে তাকায়।

ওপারে গোল গোল আলোর বিন্দু। কানে এল ঢেউ-এর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। ক্ষীণ শব্দে ভেসে আসছে মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গীতের রেশ। সামনা ঠাণ্ডার আমেজ হাওয়ায়। মাঝে মাঝে রেলিং, পায়ের নীচে মাটি কেঁপে উঠছে বোঝাই মালপত্র নিয়ে লরি চলে যাবার পর।

এখন শেফালী কী করছে? বোধহয় ঠাকুরকে কি কি রান্না হবে, চাকরী পাবার পর মেজাজ গেছে বদলে, কথায় সুর অন্য রকম, ব্যবহারে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব; না আশ্চর্য রকম শান্ত, চুপচাপ আর নিস্পৃহ শেফালী সম্পর্কে এমনকি বেশ কিছুদিন যাবৎ বিশ্রী ঝগড়া যা শুনে অনেক সময় অন্যান্য ফ্ল্যাটের কৌতূহলী মেয়েরা ঘর ছেড়ে বারান্দায় চলে আসত, মুচকি হেসে এ-ওর দিকে তাকাত, ভাবতেও লজ্জায় মাথা কাটা যায় বিনয়ের, আজকাল তা আর হয় না।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মা কী যেন খোঁজেন অনেক সময়। কী খোঁজেন? বিনয় মায়ের কুণ্ঠিত ব্যবহারের কারণ কিছুটা অনুমান করতে পেরেছে। মার ভয়, শেফালীর স্কুলে কাজ পাওয়ার পর মাঝে মধ্যেই দেরী করে ফেরা, বিনয়ের সঙ্গে কথা কাটা-কাটি, পর্দা ঘেরা ঘরের মধ্যে নীচু গলায় কথা বললেও হয়ত গোপন থাকে না শেষ পর্যন্ত—মা হয়তো ভাবেন, শেফালীকে শাসন করতে গেলে সে বেঁকে বসবে, কে বলতে পারে একদিন সেও হয়ত বিনয়কে ছেড়ে চলে যেতে পারে, যেমনভাবে গিয়েছে মীরা।

তার প্রতি শেফালীর আকর্ষণ কী কমে গেছে? আর কী তাকে ভালবাসে না শেফালী? বিনয়ের মনে পড়ল, গত কয়েক মাস ধরে, যদিও একই বিছানায় পাশা-পাশি শোয় তারা, বিশেষ মুহূর্তে সে এগিয়ে গেলে, ঘন আলিঙ্গনের মধ্যে টের পেয়েছে ক্রমশঃ শক্ত হয়ে আসা একটা দেহ ......চুমু খাওয়ার পর মনে হয়েছে উত্তাপ-হীন ঠোঁট... আস্তে আস্তে ঠেকে সরে গেছে শেফালী। নানা রকম প্রশ্ন করেছে সে। সন্তোষজনক উত্তর পায়নি। এখন তার মনে হয় শুধু মানসিক দিক থেকে নয়... শারীরিকভাবেও শেফালী তাকে ক্রমশঃ দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

হঠাৎ বিনয় শীত অনুভব করায় তাড়াতাড়ি শার্টের কলার তুলে আড়িমুখো

শ্যামরায়ের মন্দিরের কারুকাজ/বিষ্ণুপুর

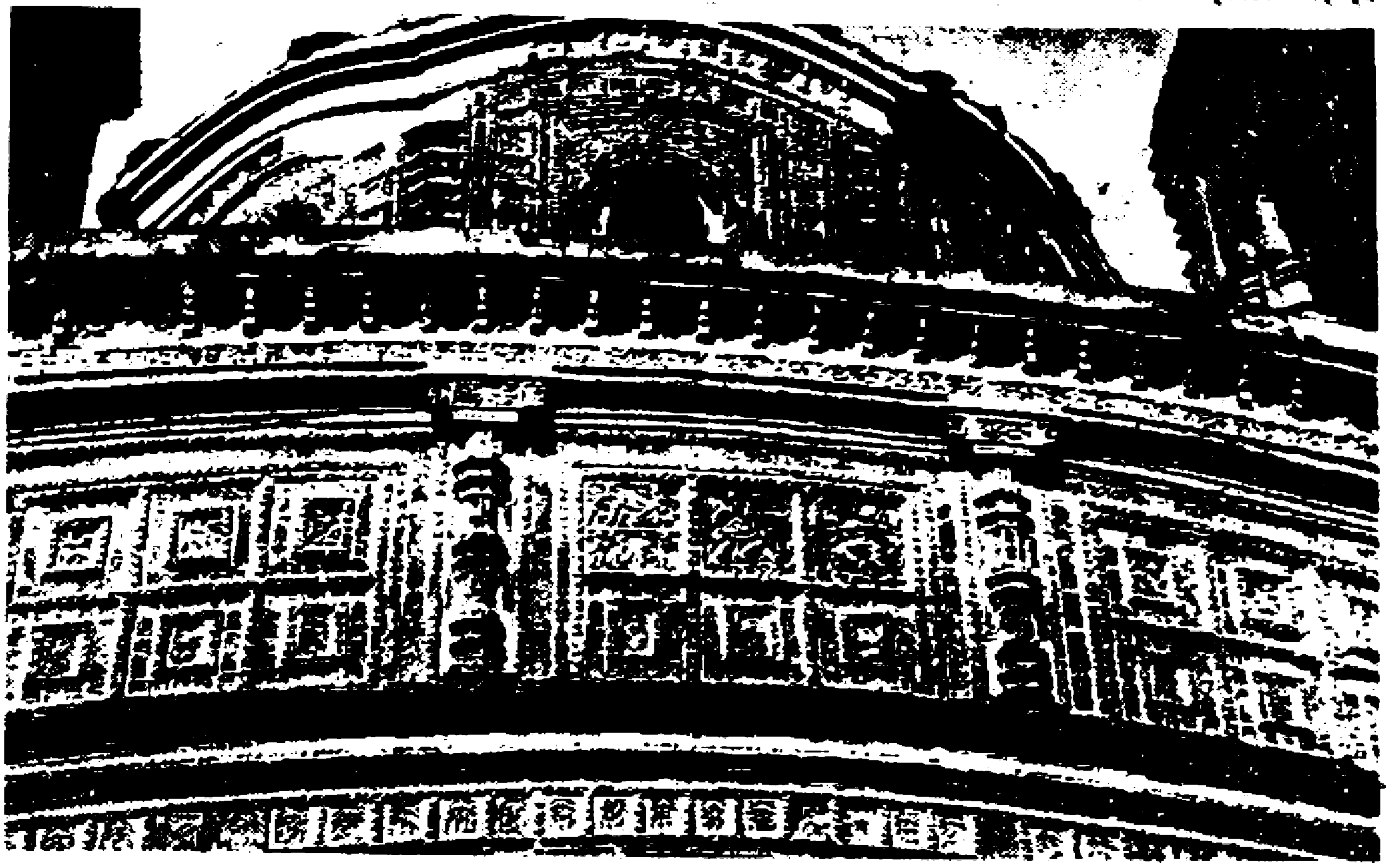

হাঁটতে শুরু করল। আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। রেললাইন পার হয়। খুব কম মাল গাড়ি চলাচল করে। বাঁ দিকে একটা গুদামের রকে পাড়ার ছেলেরা আড্ডা মারছে। এক পলক ওদের দেখল। উন্মত্ত হাসি। চিৎকার করে কথা বলছে। পিছন ফিরে তাকাল না। হ্যাঁ, এদের মধ্যে নিতাও আছে।

—এই যে শুনুন বিনয়বাবু।

নিতার গলা শুনে বিনয় পিছন ফিরে দাঁড়াল। কী ব্যাপার? এখন ফালতু কথা বলার মেজাজ নেই। সরু প্যান্ট আর ডোরা কাটা চাইনীজ শার্ট। গালে একটা ক্ষতচিহ্ন। পাতলা দোহারা চেহারা। ওরই প্রায় সমানবয়সী।

—এখন কেমন আছেন দাদা? অন্ত-রঙ্গ সুরে নিতা অল্প হাসল, আপনাকে কতদিন বলেছি কোন শালা ইঁট মেরেছে, একবার শুধু দূর থেকে দেখিয়ে দিন। শালার বাপের নাম খগেন করে দেব।

—ভীড়ের মধ্যে কে মেরেছে চিনবো কি করে ভাই। আচ্ছা চলি।

—যান। শুধু মনে রাখবেন আমাকে। যে কোন দরকারে ডাকবেন।

—নিশ্চয়ই। বিনয় হেসে বলে, আপনাদের সাহায্য ছাড়া আজকাল বাঁচ-বার উপায় নেই।

—ঠাট্টা করছেন। নিতার চোখমুখ বিমর্ষ হয়ে ওঠে, প্রয়োজনে অনেকে ডাকে বটে আমাদের, এই তো ভোট আসছে, এখন নেতারা আমাদের ডাকছে। টাকা-পয়সা গাড়ির কোন কিছুর অভাব হবে না। ভোট ফুরোলে সব শালা বেপাত্তা। তখন আর চিনতে পারে না। দরকার পড়লে জেলে পুরে দেয়। সব শালা নেমকহারাম।

নিতার চোখমুখ জ্বলতে থাকে। ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টানতে থাকে। বিনয় সরে পড়বার ফিকির খোঁজে ক্রুদ্ধ যুবক। অশ্লীল একো কথাবার্তা। কোনরকম মমতা নেই জীবনের প্রতি। হাসতে হাসতে অন্যের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। জেল খাটে। জেল থেকে বেরোয়। আবার খুন-খারাবি, রাহাজানি করে জেলে যায়। এই রকম বেপরোয়া কয়েকজনের মুখ ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

—আমার একটা উপকার করবেন বিনয়বাবু?

—বলুন। মনে মনে ঘাবড়ে যায় বিনয়। টাকা পয়সা ধার টার চাইবে না তো?

—আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। নিতা সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয়, একটা তুলে নিন স্যার। বলছি কি, আপনি পড়ান ভাল, সুনাম আছে। আমার ছোট বোনটাকে পড়াতে হবে। না করবেন জানি। বলবেন সময় নেই। কোন কথা শুনবো না। কত টাকা চান বলুন?

মনে মনে রেগে গেলেও বিনয় বাইরে কোন উত্তেজনা প্রকাশ করে না। অন্য কেউ এমন ঢংয়ে কথা বললে...কিন্তু নিতা যে টাইপের ছেলে, তাছাড়া ওকে চটানো ঠিক না, কখন দরকার হয় বলা যায় না। কিন্তু এটা ঠিক, সে আর নতুন টিউশানী নেবে না। একটা মাত্র টিউশানী, সপ্তাহে তিন দিন, সেখানেই নিয়মিত যাওয়া হয় না।

—কী ভাবছেন দাদা? বলুন না কত চান।

—কী পড়ে আপনার বোন?

—এই তো এবার কলেজে ভর্তি হল।

—মাফ করবেন ভাই। সত্যি আমার সময় নেই।

—শাঁক 'না' করবেন না। নিতা কিন্তুর দুহাত জড়িয়ে ধরে, আপনি কী ভাবছেন মাস্টার পাচ্ছি না। আসল কথা কী জানেন। আমার বোনকে দেখতে ভাল। ভয় হয় পড়াবার নাম করে শালা মাস্টার যদি পটিয়ে নেয়। বুঝতেই পারছেন, আজ-কাল কাউকে সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

এর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। একটা উৎকট গন্ধ প্রথম থেকেই টের পাচ্ছিল বিনয়। এবার বুঝতে পেরেছে। বিলিতি মাল টেনেছে নেতা। কথা বলার সময় ভকভক করে গন্ধ বেরুচ্ছে।

—হাত ছাড়ুন। বিনয় একটু দূরে সরে দাঁড়ায়, ঠিক আছে। আমার ফ্ল্যাটটা তো চেনেন। দোতলার কোণের দিকটা। কাল সকাল আটটা নাগাদ বোনকে নিয়ে আসুন। রোজ নয়। সপ্তাহে তিনদিন। সকালের দিকটা। এই ধরুন ঘণ্টা দেড়েক—সাতটা থেকে সাড়ে আটটা। তবে আমি নয়, আমার স্ত্রী পড়াবে। ওরও পড়ানোর সুনাম আছে।

—দূর মেয়েছেলে আবার কী পড়াবে। ঠোঁট উলটে নিতা বলল, ওই আপনিই পড়াবেন। কাল সকালে বোনকে নিয়ে আসছি। পঞ্চাশ টাকা পাবেন। চলি স্যার।

আড্ডার মধ্যে ফিরে গেছে নিতা। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বিনয়।

কিছুতেই এড়ানো সম্ভব হোল না। আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে সে। এর পর আর অবসর বলে কিছু থাকবে না। স্কুল আর টিউশোনী করে সবটা সময়...তাবতেও অসহ্য ঠেকে, জীবন ধারণের জন্যে এই কুৎসিত সংগ্রাম কী জঘন্য আর বিরক্তিকর। অনেকে আবার এই সংগ্রামের মধ্যে গৌরব খুঁজে পান। টাকা টাকা টাকা! সুখ আরাম সব কিছু কেনা যায় টাকা দিয়ে। মাপা যায় কী? আমি কী পাঁচটা টাকা ফেলে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতে পারি, আমাকে এক কিলো সুখ দাও।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় শেফালীর কথা মনে পড়ল। সে তো সহজ-ভাবে কথা বলতে পারবে না। সে কোন্-দিকে মনোনয় হবে ভেবে পাচ্ছে না। আজ ওদের মধ্যে দেখা হয়নি। কাল হয়ত হবে। সে কালকেও দেখবে। শুধু একবার নিজের চোখে দেখতে চায়। তার পর?

ভেজানো দরজা ঠেলে বিনয় বারান্দায় পা দেয়। দূর থেকে দেখতে পেল মা শুয়ে রয়েছেন। রান্নাঘরের দিকে একবার উঁকি মারল। ঠাকুর কী যেন কড়ায় চাপিয়েছে। খুন্তি নাড়ার শব্দ। শোবার ঘরে কথা বলছে কারা। হাসির শব্দ। পুরুষ কণ্ঠ-স্বর। বিনয় থমকে দাঁড়াল। খুব পরি-চিত কণ্ঠস্বর। রজতদা। কী প্রাণখোলা হাসি শেফালীর।

থর থর করে কেঁপে উঠল বিনয়ের সমস্ত শরীর। তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। একবার মায়ের দিকে তাকাল। মা কী ঘুমিয়েছেন? নাকি ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে আছেন? সে ঘরের ভিতর ঢুকবে কিনা ভাবতে থাকে। কখন এসেছে রজতদা? কেন এসেছে?

হাসিমুখে শেফালী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এবং বিনয়কে দেখে সামান্য চমকে উঠল। এক মুহূর্ত মাত্র। তার পর মুখে মৃদু হাসি ফুটল।

—কোথায় ছিলে সারাদিন? তোমার জন্যে রজতদা সেই কখন থেকে বসে আছে।

বিনয় কোন জবাব দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শেফালীকে দেখতে থাকে। শেফালীর কণ্ঠস্বর মৃদু তিরস্কার। কোন গ্লানি নেই। কোন অপরাধ বোধ নেই। তবে কী তারই মনের ভুল? আসলে সে যা ভাবছে তা নয়। তাই কী?

ঘরে ঢুকতেই সহাস্যে রজত বলে, কেমন আছ বিনয়?

—ভাল। কখন এসেছেন?

—তা ঘণ্টাখানেক। কোথায় ছিলে?

—ঘুরছিলাম রাস্তায় রাস্তায়। বিনয় খাটের ওপর বসল। সোজাসুজি তাকাতে পারছে না। এক ধরনের অস্বস্তি। চক্‌ চক্‌ করছে রজতদার চোখমুখ। ড্রিঙ্ক করে এসেছে কী? অসম্ভব কিছু নয়।

—তুমি কেমন আছ দেখতে এলাম। শেফালীকে ডাক। রজত মুচকি হাসল, বিনয়, তোমার ওপর আমার হিংসে হচ্ছে। কেন জান? শেফালীর জন্যে। ওর সংগে অনেক ক্যালকাটিয়ানের আলাপ। কিন্তু আমি খুব ইমপ্রেসড হয়েছি। বেশ স্মার্ট। কথাবার্তা বলতে জানে। জড়তা নেই। আবার উগ্রশিক্ষিত আধুনিকা নয়। রাগ করলে?

—রাগ করবো কেন? বিনয় হাসল না, শুকুঁচকে তাকাল, চা খেয়েছো?

—একবার হয়েছে। এবার কফি। শোন বিনয়। রজত নীচু গলায় বলে, তোমার মাকে দেখলাম কেমন গম্ভীর। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বললেন না। উনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট। উনি মনে করেন আমি চাপ দিলেই সুড়সুড় করে মীরা ফিরে আসবে। এবং আমি কেন চাপ সৃষ্টি করছি না। হাউ ফানি! নিজের মেয়েকেও চেনেন না দেখা যাচ্ছে।

শেফালী ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। মুখোমুখি সামনে কফির কাপ রেখে নিজে এক কাপ ট্রে থেকে টেনে নেয়। ছোট ছোট চুমুক দেয়। একবার আড়চোখে বিনয়ের দিকে তাকায়।

—চমৎকার। রজত একটা সিগারেট বাঁচিয়ে প্যাকেট এগিয়ে দেয় বিনয়ের দিকে, শেফালী একটা খাবে?

—না। শেফালী খুকখুক করে হাসে, সহ্য হবে না। অবশ্য কলেজে পড়ার সময় এক আধটা টেনেছি। বান্ধবীদের পাল্লায় পড়ে।

বিনয় রজতের সিগারেটের প্যাকেট ঠেলে দেয়, তুমি তো জান...। বলে সে পকেট থেকে চারমিনার বের করে ধরাল।

—কতদিন বলেছি ব্রান্ড পাল্টাও। জানেন রজতদা, ওর পাঁচ প্যাকেট না হলে চলে না। বলুন এত কী ভাল? একটা লিমিট রাখা দরকার।

—সত্যি। রজত মাথা নাড়ল, এত খেয়ো না বিনয়। কফিটা সত্যি ভাল। বিনয়, আজকাল কী কফি হাউসে যাও?

—না। বিনয় আলস্যে হাই তুলল। একবার ঘড়ি দেখল। সাড়ে আটটা কিসের শুধু ভাল লাগছে না। কী মতলবে এসেছে রজতদা? তাকে দেখতে আসা একটা চরম ধাপ্পা। শেফালীর সংগে এমন অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছে যেন ওরা পরস্পরকে বহু-দিন চেনে।

বিনয় খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়, তোমরা কথা বল—আমি আসছি।

পর্দা দুহাত দিয়ে সরিয়ে দেয়। বারান্দায় এসে মার মাথার কাছে দাঁড়াল বিনয়। বাব্বা, সে আসার আগে ওরা কী পর্দার আড়ালে...দুটো চোখ বোজা। কপালে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকল, মা মা!

মীরার তাকিয়ে দেখলেন ছেলেকে। তিনি দুহাত দিয়ে ছেলের মাথা বুকের মধ্যে চেপে ধরেন। কথা বলতে পারেন না। ভীষণ কান্না পেল। ছেলের মুখের দিকে আজকাল তাকাতে পারেন না। দেখতে দেখতে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে শেফালী! রজতের সংগে অত কথা, এত হাসাহাসি কিসের। তিনি এসব পছন্দ করেন না।

বিনয় নীরবে মার দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। মার সহজ অভিযোগ প্রতিবাদের ভাষা পেয়েছে চোখের জলে। সে চোখমুখে জলের ঝাপটা দেয়। আবার ফিরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে রজতদার মুখোমুখি। শেফালী কী কোনকিছু ভাবছে না? সে কী বুঝতে পারে না, তার এভাবে হাসা, বিশেষ করে বারান্দায় মীরার শুয়ে, আলোড়ন ও দৃষ্টি-কটু? সহজ প্রশ্ন উঁকি দেয় বিনয়ের মনে। ফলে, মনে মনে সে কর্তব্যবিমূঢ়।

চোখে জলের ঝাপটা দেয় অনবরত বিনয়। অন্য কেউ হলে সে কিছু মনে করত না। সহজভাবে মিশতে পারত। কিন্তু রজতদা—অসম্ভব। কী সাহস রজতদার! একদম সরাসরি অন্দর মহলে প্রবেশ করেছে। কে জানে হয়ত আজ ওকে এখানে শেফালীই আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

এখন আবার ওদের মুখোমুখি হতে হবে। হাসতে হবে। রসিকতা করতে হবে। শেফালী অনুরোধ জানাবে রজতদাকে রাতে খেয়ে যেতে। তাকে সায় দিতে হবে। কেননা এটাই হচ্ছে রীতি। সামাজিক ভদ্রতা! পছন্দ অপছন্দের কোন প্রশ্ন নেই। রজতদা আপনজন। এ বাড়ির জামাই। হ্যাঁ, মীরার সংগে একত্রে বসবাস না করলেও।

অতএব চুপচাপ তাকে সব সহ্য করতে হবে। মার দিকে এক পলক তাকিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল।

—বিনয়, একটা ভাল ইংরেজী ছবি এসেছে। চলো কাল তিনজনে দেখে আসি।

—আমার কাজ আছে। শোন শেফালী। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। কাল বিমলের ওখানে সন্ধ্যেবেলা আমাদের নিমন্ত্রণ। স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

—কীসের নিমন্ত্রণ? শেফালী ভ্রু-কুঁচকে তাকাল, কাল তো যাওয়া হবে না।

—কেন? বিনয় যথাসম্ভব চেষ্টা করলেও কণ্ঠস্বরে উষ্মতা প্রকাশ পায়, এমনিতেই বিমলের ওখানে বহুদিন যাওয়া হয় না। বারবার যেতে বলেছে। কী কাজ তোমার যে, যেতে পারবে না।

—বাবার শরীর খারাপ। টেলিফোন করেছিল স্কুলে। খবর শুনে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। তুমি একা যেয়ো। রজতদা, সিনেমা বরং পরে দেখা যাবে।

—ঠিক আছে। রজত আপন হেসে তাকায় বিনয়ের দিকে, বিমল তোমার খুব বিশেষ বন্ধু, না?

—সন্দেহ আছে? বিনয়ের মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠতে থাকে। রজতদা চলে যাক তারপর বোঝাপড়া হবে শেফালীর সঙ্গে। তাকে কী মানুষ বলে গণ্য করে না শেফালী!

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

খাদ্য-অখাদ্য বিচার

সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি 'অমুক খাদ্যটি ভালো' বা 'অমুখ খাদ্যটি খুব ভালো', কখনো-বা 'অমুক খাদ্যটি খারাপ' অর্থাৎ অখাদ্য। কোন্ বিচার থেকে আমরা খাদ্য সম্পর্কে এ-ধরনের রায় দিয়ে থাকি? অবশ্যই গুণের বিচার থেকে, খাদ্যের গুণ। সেটা কী?

খাদ্যের গুণ হতে পারে চার রকমের:

১। চেহারা, রঙ ও আকার।

অর্থাৎ চোখের দেখায় খাদ্যটি কেমন, চোখকে টানে কিনা। খাদ্যের বিচারে এটাই আমাদের কাছে প্রথম গুণ। আজকাল কলকাতার রাস্তাতেও কোনো কোনো রেস্তোরাঁর শো-কেসে তাজা-তাজা চপ-কাটলেট ইত্যাদি সাজিয়ে রাখতে দেখা যায়। সেগুলোর চেহারা রং ও আকারই এমন যে, অতি ব্যস্ত মানুষেরও চোখ টানে। মিষ্টির দোকানের শো-কেসে হরেক রকমের পাত্রে হরেক রকমের মিষ্টি সাজিয়ে রাখার রেওয়াজ তো অনেক দিনের। আজকাল তেলেভাজার দোকানেও শো-কেস তুলে বেগুনী ফুলুরি ইত্যাদি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখে দর্শকের চোখ টানার আয়োজন শুরু হয়েছে। আমরা স্বীকার করি বা না-করি, খাদ্যের নয়নমনোহারিত্ব এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে খাদ্যের গুণ-বিচারে প্রথম কথা।

২। স্বাদ

অর্থাৎ, খাদ্যটি মুখে পোরার পরের অবস্থার বিচার। টক, ঝাল, মিষ্টি, নোনতা, তেতো, কষা আরো কত কি। কিম্বা এককভাবে কোনো একটি নয়, মেলানো-মেশানো। চোখের দেখার পরেই আমরা খাদ্যের গুণের বিচার করি মুখের স্বাদ দিয়ে। যে খাদ্যের স্বাদ খারাপ তা অন্য বিচারে যতোই ভালো হোক, বাধ্য না হলে আমরা খাই না। তবে আজকাল ওষুধে পর্যন্ত স্বাদ তৈরি করে দেওয়া হয়, তেতো ওষুধে চিনির প্রলেপ ইত্যাদি। টনিক ওষুধে টনিক কতটা আছে বলা কঠিন কিন্তু তার স্বাদটি করা হয় বড়ো চমৎকার। অনেক সময়ে এই স্বাদের টানেই টনিক চলে।

৩। নিরাপত্তা

অর্থাৎ, খাদ্যের মধ্যে এমন কোনো পদার্থ থাকবে না যা অনিষ্টকর। চোখের দেখায় বা মুখের স্বাদে খাদ্যের এই গুণটির বিচার সম্ভব নয়। সাধারণ জলের কথাই ধরা যাক। কলকাতা শহরের অধিকাংশ রেস্তোরাঁয় নাকি যে জল খেতে দেওয়া হয় তা দূষিত। কিন্তু চোখের দেখায় বা মুখের স্বাদে তা বোঝার উপায় নেই। কলকাতার বাজারে যে সরষের তেল বিক্রি হয় তার বেশির ভাগই ভেজাল মেশানো, এমন ভেজাল যা মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু চোখের দেখায় বা মুখের স্বাদে তা ধরা যায় না, ঝাঁঝে বা গন্ধেও নয়।

৪। পুষ্টি

অর্থাৎ খাদ্যে আছে কী পরিমাণ ক্যালোরি, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও স্নেহ পদার্থ। এই হিসেবটি পাওয়া শক্ত। আমাদের দেশে আমরা এখনো পর্যন্ত বাজার থেকে তরি-তরকারী-মাছ ইত্যাদি কিনে এনে বাড়িতে রান্না করে খাই। রান্নার পরে পুষ্টি কতখানি থাকছে বা আদৌ থাকছে কিনা সে-বিচার বড়ো একটা করতে যাই না। আসলে করার উপায়ও নেই। কি বাড়ির রান্নায়, কি হোটেলের তৈরী খাবারে, আমাদের ঝোঁক— স্বাদ তৈরি করার দিকে। স্বাদের জন্যে যদি পুষ্টি খোয়াতে হয়, তবুও। আমাদের দেশে এমন রেস্তোরাঁ আছে কিনা জানি না যেখানে খাদ্য-তালিকায় প্রত্যেকটি খাদ্যের পাশে তার ক্যালোরি-প্রোটিন ইত্যাদির মাত্রাও উল্লিখিত। মনে পড়ছে, পূর্ব জার্মানিতে গিয়ে প্রথম দিন দুপুরের খাওয়া খেয়েছিলাম পটসডামের রেস্তোরাঁয়। সেখানকার খাদ্য-তালিকায় প্রত্যেকটি খাদ্যের ক্যালোরি-প্রোটিন মাত্রা জানানো হয়েছে এবং খাদ্য-তালিকার শেষে একটি পৃষ্ঠায় আছে বিশেষজ্ঞের মতামত— মানুষের শরীরের জন্যে কী পরিমাণ ক্যালোরি-প্রোটিন ইত্যাদি প্রয়োজন। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই এতখানি আশা করা চলে না, এমন কি সম্ভবত এই নিশ্চয়তাটুকুও নয় যে, যে-নামে যে-জিনিস চলছে তা আসলে সেই জিনিসই।

কথাটা উঠছে বিশেষ করে এ-কারণে যে, আজকাল আমাদের দেশেও কৃত্রিম খাদ্য ব্যাপকভাবে চালু হচ্ছে। আসল দুধের বদলে কৃত্রিম দুধ, আসল মাখনের বদলে কৃত্রিম মাখন, ইত্যাদি। কোনো কোনোটা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে চলছে, কোনো কোনোটা ব্যবসায়ীদের অসাধুতায়। তাছাড়াও কথা আছে। খাদ্যের অভ্যাস বড়ো তাড়াতাড়ি পাল্টাচ্ছে আমাদের দেশেও। একান্নবর্তী যৌথ পরিবার এখন বড়ো একটা নেই। ভোর চারটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত একটানা রান্নার মধ্যে হিমসিম খাওয়া গৃহিনীর চিত্র এখন রয়েছে শুধু সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। আমাদের ব্যস্ত ত্রস্ত জীবনে দু-বেলা পাত পেড়ে প্রধান দুটি ভোজনের আয়োজনও লোপ পাবার মুখে। যাকে আমরা বলি জলখাবার, ইংরেজিতে 'স্ন্যাক্স', তাই খেয়েই সপ্তাহের কাজের দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছেন এমন ব্যক্তিরও অভাব নেই। কাজেই নজর এখন এমন সব খাদ্যের দিকে যা পলকে তৈরী হয়ে যায় বা এমন সব খাদ্যের দিকে যা তৈরী-অবস্থাতেই লভ্য, যাকে বলা হয় 'ইনস্ট্যান্ট' খাদ্য বা 'প্রসেসড' খাদ্য। আমেরিকায় এমন কি ইনস্টান্ট [illegible] পর্যন্ত চালু হয়েছে। কলকাতায় আমরা কিছুকাল আগেও কফিতে তেমন অভ্যস্ত ছিলাম না, কিন্তু ইনস্টান্ট কফির দৌলতে এখন পাল্লা চায়ের চেয়ে কফির দিকেই ভারী। ইনস্টান্ট চা বাজারে না আসা পর্যন্ত এই পাল্লা ঘোরানো যাবে না।

ওপরে খাদ্যের যে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র প্রথম দুটির

শিকার আমরা নিজেরাই করতে পারি। তৃতীয়টির ভার সাধারণত দেশের সরকারকেই নিতে হয়। চতুর্থটির দায়-দায়িত্ব বিশেষ কারও ওপরে নেই। যেমন, আমাদের দেশে খাদ্যের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়ে থাকে আগমার্ক দিয়ে। কিন্তু কোন্ খাদ্যের পুষ্টি কতখানি সে-সম্পর্কে কোনো ঘোষণা রাখার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করেন না।

অথচ এই বিষয়টিই সবচেয়ে জরুরি, বিশেষ করে আজকের দিনে যখন নানা প্রকারের কৃত্রিম খাদ্য তৈরি হচ্ছে। বিজ্ঞানের কথার পাঠকরা জানেন, জাপানী বিজ্ঞানীরা শ্যাওলা থেকে কৃত্রিম মাংস তৈরি করেছেন এবং বাজারে বিক্রির জন্যে তা ছাড়া হয়েছে। কৃত্রিম দুধ তো আমাদের দেশেও তৈরি হয়ে থাকে। ভেজিটেবল ঘি আমাদের দেশে পুরনো ব্যাপার, আমেরিকাতেও ভেজিটেবল প্রোটিন চালু হয়েছে। শুনলে অবাক হতে হবে যে আমেরিকায় ভেজি-টেবল প্রোটিন বিক্রির পরিমাণ বর্তমানে বছরে দশ মিলিয়ন ডলার (সাড়ে সাত কোটি টাকা) এবং আগামী দশ বছরের মধ্যে বছরে দশ সহস্র মিলিয়ন ডলার হবার সম্ভাবনা।

যে-কথা আগে বলেছি, পাত পেড়ে দুটি প্রধান ভোজের আয়োজন আমাদের দেশেও উঠে যাবার মুখে। ব্যস্ত মানুষেরা কেউ কেউ এটা-ওটা খেয়ে সারা দিনটা কাটিয়ে দেন। এবং এই ঝোঁক বেড়ে চলার দিকে। ফলে অনেক সময়েই বিকল্প খাদ্যের ওপরে নির্ভর করতে হয়, কমলালেবুর বদলে বোতলে ভরা কমলালেবুর রস, মুরগির মাংসের বদলে এসেন্স অব চিকেন, দুধ-ডিমের বদলে প্রোটিন বিস্কুট বা টিনে ভরা প্রোটিন ইত্যাদি। এমন দিন হয়তো আসবে যেদিন পুরো একটি ভোজের আয়োজন ছোট একটি প্যাকেটে ভর্তি হয়ে তৈরী অবস্থায় বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে। ভোজন বলতে যা আমাদের ধারণা, খাদ্যবস্তু বলতে যে-সব ছবি এখনো আমাদের চোখের সামনে ভাসে, তার সঙ্গে প্যাকেটের ভোজনের কোনো মিলই থাকবে না। এমনও হতে পারে নভশ্চরদের মতো আমরাও কয়েক দিনের খাদ্য টিউবের মধ্যে পুরে নিয়ে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে দেব।

যাইহোক, এখনো পর্যন্ত যখন সাবেকী খাদ্য বজায় আছে, পুষ্টিবিশারদরা কী বলেন শোনা যাক। সকলেই জানেন, খাদ্য হিসেবে দুধ ও মাংস দুই-ই খুব ভালো। পুষ্টিবিশারদরা বলেন, আমরা যদি আমাদের খাদ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিই—যেমন, মাংস, দুধ, দানাশস্য ও সবজি—এবং প্রত্যেকটি ভাগ থেকে প্রতি-দিন অন্তত একটি করে খাদ্য খাই, তাহলে তাকে বলা চলে সুষম খাদ্য গ্রহণ। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় খাদ্যকে যখন প্রচলিত খাদ্যের চেহারায় পাওয়া যায় না। কৃত্রিম খাদ্য, কলকে তৈরী হওয়া খাদ্য, প্রসেসড বা পরিশোধিত খাদ্যের সঙ্গে মাংস দুধ দানাশস্য বা সবজির মিল খুঁজে বার করার চেষ্টা বৃথা।

খাদ্যের পুষ্টির দিকে আরো বিশেষ করে নজর দেবার প্রয়োজন ঘটেছে এ-কারণে যে, এখন আর খাদ্যের স্বাদ থেকে খাদ্যের পুষ্টি সম্পর্কে কোনো ধারণা করা চলে না। কমলালেবুর বদলে বোতলে-ভরা কমলালেবুর রস যিনি খাচ্ছেন তিনি কমলালেবুর স্বাদ পুরোপুরি পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু পুষ্টি কতটুকু পাচ্ছেন সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। তৈরী খাদ্য বা পানীয় যাঁরা বাজারে ছাড়ছেন তাঁদের পক্ষে যে-কোনো স্বাদ তৈরি করা সহজ ব্যাপার। কিন্তু স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিও বজায় রাখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা তাঁদের নেই। তাঁরা ইচ্ছে করলে যেমন সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করতে পারেন, তেমনি অতি নয়নমনোহর সুস্বাদু খাদ্যও, যার কোনো পুষ্টি নেই। পঞ্চাশ বছর আগে পুষ্টি নেই এমন খাদ্য পাওয়া যতো শক্ত ছিল এখন তেমনি শক্ত পুষ্টি আছে এমন খাদ্য পাওয়া। আরো কুড়ি বছর পরের অবস্থা কল্পনা করা যায় না।

আজকাল গম ও ধানের ফলনে একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করার ফলে ফলন এখন খুবই বেশি। আমাদের দেশের 'সবুজ বিপ্লব' এই উচ্চফলনশীল বীজের কল্যাণেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও মার খেয়েছে পুষ্টির দিকটা। নানা ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করার ফলে ফল ও শাক-সবজির ফলনও এখন সবটাই ঘরে ওঠে, কিন্তু মার খায় খাদ্যের নিরাপত্তা।

মাছের বদলে কৃত্রিম মাছ, মাংসের বদলে কৃত্রিম মাংস, আলুর বদলে কৃত্রিম আলু আমাদের দেশেও চালু হতে হয়তো বড়ো দেরি নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিকল্প খাদ্যের প্রচলন হওয়াটা একদিক থেকে ভালোই। কিন্তু কৃত্রিম মাছ থেকে যদি মাছের পুষ্টি না পাওয়া যায়, কৃত্রিম মাংস থেকে মাংসের, কৃত্রিম আলু থেকে আলুর—তাহলে? প্রশ্নটা এখানেই।

কৃত্রিম খাদ্যের প্রস্তুতকারক বলতে পারেন, তাঁর তৈরী পদার্থটি যদি খাদ্য হয় তা হলেই তো যথেষ্ট, ক্রেতাদের কাছে সেই পদার্থটির চাহিদা খাদ্য হিসেবেই, পদার্থটি খাদ্য হিসেবে পুষ্টিকর কিনা সেদিকে নজর দেবার কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই, বাধ্যবাধকতাও নেই। আজকের দিনের খাদ্য-বিষয়ক আইনকানুন ও বাধানিষেধের মধ্যে কথাটি অবশ্য বুক ফুলিয়েই বলা যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই খাদ্যের অভ্যাস যে-ভাবে বদলে যাচ্ছে, কলকে তৈরী খাদ্যের দিকে যেভাবে ঝোঁক বাড়ছে, তাতে এই অবস্থা চলতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়, আমাদের দেশেও নয়।

বোতলে-ভরা ফলের রসের কথাই আবার তুলছি। এই বোতলটি যিনি কিনবেন তাঁর নিশ্চয়ই জানার অধিকার থাকা উচিত যে, বোতলের রস টাটকা ফলের রসের মত পুষ্টিকর কিনা, অন্তত ভিটামিন-সি টাটকা ফলের রসে যতোখানি, বোতলের রসেও ততোখানি আছে কিনা।

আজকাল চাষ ও ফসলের ধরনই পালটে গেছে। মাঠ থেকে যে ফসল, ফল ও শাক-সবজি ঘরে আসে তা সরাসরি খাওয়ার চেয়ে পরিশোধিত করে নেবার পরে খাওয়া অনেক বেশি নিরাপদ। কিন্তু এক্ষেত্রে মূল ফসলের বা ফলের পুষ্টি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। শুধু তাই বা কেন, পুষ্টি আরো বাড়িয়ে তুলতেই বা বাধা কিসের? পশ্চিম বাংলা সরকার যে 'টোনড' দুধ বিক্রি করেন তার পুষ্টি অন্য পদার্থ সহযোগে বাড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা আছে। বোতলে ভরে কমলালেবুর রস যিনি বিক্রি করবেন তিনিও অনায়াসে পুষ্টি শুধু বজায় রাখা নয় পুষ্টি বাড়িয়েও তুলতে পারেন।

—অয়স্কান্ত

বিনোদ মাস্টার

গোষ্ঠ শেঠ

NITAI GHOSH

মাস্টারদা; মাস্টারদা; ও মাস্টারদা—বলি শুনছো। রাত জেগে যাত্রা গান করে মড়া পুড়িয়ে, বেলা অবধি নাক ডেকে ঘুমোতে তোমার জুড়ি দেখি না বাপু।

কাজল বৌয়ের গলার স্বর চিনে ঘুম-ভাঙা ধরা গলায় বিছানায় শুয়ে বিনোদ মাস্টার জবাব দেয়—সাত-সকালে অকারণে চেঁচাতে শুরু করেছ কেন কাজল বৌ?

করবো না কেন শুনি, রাজ্যের লোকের দায়-বেদায় ঠেকাতে বিনোদ মাস্টার ছাড়া কি আর কেউ নেই এ-তল্লাটে?

থাকবে না কেন? তারা যে আমায় ভালবাসে?

ভালবাসে? অসুখ-বিসুখে সে মানুষটা যখন চিত হয়ে পড়ে থাকে, তখন বুঝি দেখতে কে তার পাশে উঁকি দেয় শুনি? যত জ্বালা কাজলের, ডাক্তার ডাকো, ওষুধ জোগাড় দিয়ে আনো, মাথায় জলপটি বদলে দাও, পাখার বাতাস কর।

ঢের হয়েছে, এখন থামো, আর কোনদিন তোমার হাতের সেবা নেবো না—মরে গেলেও না। বলে রাখলাম।

বললেই হল, কে দেখবে তোমায়? যেই দেখুক, তোমায় দেখতে বলব না, হয়ত। তোমার মড়া পোড়ালো, গাজন তোমার স্যাঙাতেরা গা ঢেকে কোথায় চম্পট দেবে। এই কাজল বৌকেই দেখতে হবে তখন।

গলার সুর নরম করে কাজল বলে চলে—এই সেদিন জোয়ান ছেলে ভুগে উঠল, সেরে উঠতে না উঠতে মধুসূদন বেনের বাড়ির ছেলের দলের আখড়ায় বসন্তের রোগী নিয়ে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছে। ছোঁয়াচে রোগের ছোঁয়া লাগতে রোগা মানুষের কতক্ষণ? আমার কথা কেবা কানে তোলে? আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াই।

কাজল যে বেশ গরম হয়ে কথাগুলো বলছে, বিনোদের তা বুঝে নিতে দেরী হয় না মোটেই। দরজা খুলে দাওয়ায় সে দেখে উঠোনে মাছের খুঁড়ি রেখে দাওয়ায় বসে কাজল নিজের মনে গজগজ করছে।

ভোরের আলো সবে ফুটে উঠেছে রূপনারায়ণের ওপারের চর মধ্যপাড়ায়। এপারের শ্যাম নারায়ণপুরের ঘাটে প্রাইমারী স্কুলের বারান্দা তখনও আঁধারে ঢাকা। বেলা অবধি সে নাক ডেকে ঘুমোয়নি মোটেই। কথা বাড়িয়ে কাজ নেই ভেবে কাজলকে ঠান্ডা করতে বিনোদ বলে—রাতে বুঝি তোমার ঘুম হয়নি কাজল বৌ?

দায় পড়েছে আমার নকুলে কাটাতে। দু-দুবার তোমায় খুঁজে এসে দেখেছি দরজায় কুলুপ আঁটা। নদীতে গোকুলের নৌকোয় রাত কাটিয়েছি আরামে। খুঁড় ভর্তি ওপাশে তোলা, পার্শে আরো সব মাছ ধরেছি কাল রাতে। আমার ঠাকুরের ভাগ আগে না দিয়ে গেলে দিন আমার ভাল কাটবে না। বেছে বেছে ভাল ভাল তপসে মাছ এনে একটাই বসে রয়েছি কখন থেকে।

ঠাকুরের মানত রেখে যাই বাপু। মানত সেরে এখনই আমায় মাছ বেচতে ছুটতে হবে পাবড়াপুরের বাজারে। ঘরে চাল বাড়ন্ত। বাজার সেরে রেঁধেবেড়ে গোকুলের জন্য ভাত নিয়ে ছুটতে হবে কাশীপুরের ঘাটে। দেরী হলে রক্ষে থাকবে না—কত কথা শুনতে হবে।

CENTRAL LIBRARY

তোমার উদ্দেশ করে লোকগুলো আজকাল বাঁকা কথা শোনায়। তার কথা শুনতে আমার কান ঝালাপালা করে। তাই এই মেয়ে রাত-সকালে আমায় ঠাকুরের ঘুম ভাঙালাম গো, রাগ করনি ত?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে মাস্টারের মাছ রেখে, তার পায়ে হাত রেখে প্রণাম করে বুড়ি মাথায় কাজল চুটিয়ে চুটিয়ে সরিয়ে যায় নদীর বাঁধ ধরে। তার ছুটে চলার পথ পানে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনোদ মাস্টার মনে মনে বলে ওঠে—বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি কাজলের মত মেয়েরা। তাদের মন সাগরের অতল তলের মত গভীর রহস্যে ভরা, বাংলার মা-বোনেদের স্নেহ মমতা লুকিয়ে আছে এসব মেয়েদের অন্তরে—তাদের না-বলা কথায় থাকে।

বিনোদের চোখে কাজলের মন পাহাড়ী নদীর জলের মত সাবলীল, ঝর্ণার জলের মত স্বচ্ছ। আচার-ব্যবহারে দুর্নিবার্য ঘরের মেয়ের মত সে। তার স্নেহ-মমতা তার সারা দেহে মনে বিদ্যুতের ঝলক দিয়ে যায়। যোগসূত্রে ফিটফাট থাকতে চায় কাজল, হয়তো স্বভাব তার পরিবেশে। ঠাকুর দেবতার উপর তার অগাধ ভক্তি। মাস্টারের কাছে পুঁথি শুনে শুনে বারব্রত করে সে বারো মাস। স্বামীসুখ তার দুর্লভ। তাকে ফাঁকি দিয়ে মানুষের ঠাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দেখার উপায় নেই মহাজনের লোকদের। বুদ্ধির দীপ্তিতে, মনের উদারতায়, অন্তর উজাড় করা স্নেহ-মমতায়, সে ধীরে ধীরে আপনার আসন পেতে বসে যাচ্ছিল বিনোদ মাস্টারের মনে—তার অন্তরের মণিকোঠায়। সে বিনোদকে দেখতে দেখে তার আরাধ্য দেবতার রূপে, একান্ত আপন-জন ভাবে তাকে।

গঞ্জ নারায়ণপুর উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিনোদ বাঁড়ুজ্যে সে-অঞ্চলের সকলের মাস্টারদা। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় সে কোথা হতে এসে জোটে গঞ্জের বাজারে। বাপ-মা হারা অনাথ ছেলে-মেয়েদের কুড়িয়ে রেলপথের ওধারে গড়ে তোলে অনাথ আশ্রম। তাদের মানুষ করে গড়ে তোলার কাজে লেগে আশেপাশের গ্রাম-গঞ্জের লোকজনের সহায়তায় নদীর পাড়ে প্রতিষ্ঠা করে প্রাথমিক স্কুল। অনাথ আশ্রমের ভার সরকারের হাতে তুলে দিয়ে, শিশুদের ভাবীকালের যোগ্য নাগরিক করে তুলতে, বিনোদ ডুবে যায় শিক্ষা প্রচারের কাজে। সেই থেকে সে অঞ্চলে তার পরিচয় বিনোদ মাস্টার। প্রৌঢ়, যুবক ও কিশোরদের—মাস্টারদা সে।

স্কুলের চিনিবানী ছাড়া মাস্টারের নেশা মেলে বাগদীপাড়ায় কলেরা-বসন্ত মহামারীর রোগ, সেবায়—গোপালগঞ্জ মন্দিরে বাবাজের ভজন গানের আখড়ায় আর চর পদ্মর আড্ডায় শিবের গাজনে গাঁজা-চরসের আড্ডায়। শিব সেজে গাজনের ধ্বজা উঠিয়ে নাচতে ওস্তাদ বিনোদ মাস্টার। তার অনুপস্থিতিতে চর শঙ্করের শিবের গাজন তেমন করে জমে না। নীলপুজোর রাতে মাস্টারদার ভৈরব নাচ দেখতে আশেপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁ উজাড় করে লোক জড় হয় গাজনতলার মাঠে।

মড়া পোড়াতে বিনোদ মাস্টারের জুড়ি নেই। যে জাতেরই মড়া হোক না কেন, লোকের অভাবে মড়া পোড়ানো হচ্ছে না জানলেই রাত-বেরাতে তাকে বের হতেই হবে-হত দূরেই হোক না কেন। মাস্টার বলে—মড়ার কি জাত আছে রে। শ্মশানে সবাই সমান। সারাজীবন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে বেচারারা শান্তিতে চোখ মুদেছে, লোকের অভাবে মড়া বাসী হবে—তা বিনোদ মাস্টার বেঁচে থাকতে নয়। বিদেহী আত্মা দেহটাকে ঘিরে কত হা-হুতোশ করে—তার গল্প বিনোদ শোনায় তার সাকরেদদের। বাগদীপাড়ার গোকুল বাগদী, দুলেপাড়ার মহিম দুলে, জেলেপাড়ার নগেন ভৌমিক মড়ক মহামারীতে সেবাব্রত মাস্টারের ডান হাত তারা।

গাঁঠের কড়ি খরচা করে রোগীর ওষুধ, পথ্য, ছাত্রের স্কুলের বই কেনা, গরীব দুঃখী মেয়ের বিয়ের খরচ জোগাতে বিনোদ মাস্টারকে বিমুখ দেখেনি কেউ কোনদিন। তার মুখে সব সময় এক কথা—আসলে নরই নারায়ণ। তাদের সেবায় লেগে যা আর কিছু চাই না। পারের কড়ি আপনা হতে জুটবে। মাস্টারের মর্মস্পর্শী কথায় ও কাজে অম্লান সে বাণীকে রূপদান করেছে একাধিকবার।

মাস্টারের আত্মীয়স্বজন কেউ কোনদিন দেখেনি। গঞ্জ নারায়ণপুরের লোকেরা তার আপনজন। বাজারের দোকানদার থেকে নদীতীরের জেলে দুলে বাগদীরা সবাই তার আপনার। মাস্টারের লেখাপড়া মাপ-কাঠি দিয়ে কেউ যাচাই করে না দেখলেও অন্তরের সরলতা ও মনের উদারতার মাপ-কাঠিতে সে যে সাধারণ মানুষের অনেক উপরে তা সবাই বোঝে। গঞ্জের মেলা দুর্গোৎসব পূজোপার্বণে বিনোদ মাস্টার হাঁকডাক করে, সবার সাথে মিলেমিশে একাই একশ হয়ে উৎসব মুখরিত করে তোলে। ছোট জাতের লোকদের সমান অংশীদার করে নেয় সে—উৎসবে, ব্যসনে, গঞ্জের পঞ্চায়েতে।

স্কুলের চালাঘরের এক পাশে সে থাকে। সে ঘরখানিই তার শোয়া-বসার ঘর। সামনের বারান্দা ঘিরে ছোট একখানা উনুনশালা। নামেই রান্নাঘর—মাস্টার ব্যবহার করে সারাদিনে একবার। কোন কোন সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমনি পড়ে থাকে। এর-ওর বাড়ীতে মাস্টার খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। দুলে বাগদীদের পাড়ায় রাতে সে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, মনসা, ভাসান, রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতে যায়। রাতের খাওয়া বেশীর ভাগ দিন কাজলের ওখানেই সেরে আসে। মহীম নগেনও মাঝে মাঝে মাস্টারকে ডেকে খাওয়ায়। বামুনের ছেলে জাত মানে না—বাগদী দুলের বাড়ী খায়। পাড়াগাঁয়ে সে নিয়ে মাঝে মাঝে কথা উঠলেও, বিনোদ হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে—কিসের জাত রে! জাত কি কারও গায়ে লেখা? কেউ ছোট-বড় নয়—সবাই সমান।

আপনভোলা মানুষটাকে সহকর্মী শিক্ষকরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালও বাসে। একাধারে স্কুলের পরিচালক ও পর্যবেক্ষক সে নিজেই। দূরে দূরে থাকলেও, স্কুলের খুঁটিনাটি ঘটনা তার নজর এড়ায় না। তার মতে মানুষের মত মানুষ গড়তে হলে চাই একাগ্রতা, সহানুভূতি—বিবেক বিবেচনায় সংস্কারমুক্ত নাগরিক বোধ। বিনোদ মাস্টারের স্কুলের নামডাক চারপাশে, সেই সূত্র ধরে।

গোকুল বাগদীর পড়ালেখা জানা বউ কাজললতা, মাস্টারের ঘরদুয়ার ঝাঁট দেওয়া বাসন মাজা, উনোন দেওয়া, বাটনা বাটার কাজ করে যায় রোজ সকালে। বাজারে মাছ বেচতে যাওয়ার আগে মাস্টারের কাজ সেরে সে যায়। মাস্টারকে মাছ জোগানোও তার কাজ। বাগদী দুলেদের পুকুরঘাট থেকে রোজ সে মাস্টারের জন্য তপসে, চিংড়ি, পুঁটি—যখন যা জোটে তাই এনে দেয়, মাস্টার নিজের হাতে দিনের বেলায় রাঁধবাড়ে—রাতের বেলায় খাওয়ার ঠিক থাকে না। কাজলের চোখে আপনভোলা পরোপকারী বিনোদ মাস্টার মানুষ নয় দেবতা।

গোয়ালপাড়ার বৃন্দা গোয়ালিনী বেলায় আসে দুধ জোগাতে। বালবিধবা বৃন্দা একাধারে গঞ্জ নারায়ণপুরের মেয়ে ও বউ। দুধ-দইয়ের কারবারে তার খুব নামডাক। বৃন্দা গোয়ালিনীর দুধে জল কি জলে দুধ বোঝা দায়। পানসে দই, টক ঘোল, ঘিয়ে দালদার বাস পেলে গঞ্জের লোকেরা বোঝে এ ঘি, ঘোল, দই বৃন্দা গোয়ালিনীর। বাজারের মহাজন রসিক সাঁতরার রসিকতার রসে বৃন্দা সদাই ভরপুর।

স্ফূর্তি-ফুর্তির সুগন্ধিতে আসর মাতিয়ে, পানের ছোপে রাঙা ঠোঁট নেড়ে, কালো কস্তা পেড়ে শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে পথ চলে বৃন্দা। তার মুখ থেকে খোসখবর শুনতে শুনতে খরিদ্দার বেমালুম কেনে তার পানসে দুধ-দই। বিনোদ মাস্টার রসিকতার সমঝদার না হলেও, বৃন্দার কথা উঠলে তাকে বলতে শোনা যায়—বৃন্দার রসিকতার রসে পানসে দুধ-দইও মিষ্টি হয়ে ওঠে—চিনি গুড়ে তাকে মিষ্টি করতে হয় না।

বৃন্দার চটকদারি বাহারি কথায় গঞ্জের মিষ্টি দোকানী মধু ময়রার মাথা ঘুরে গেলেও বিনোদ মাস্টার তাকে আমল দেয়

CENTRAL LIBRARY

না। সভার মধ্যে রসিকের দল যার মুখের হাসি দেখবার জন্য এত লালায়িত, মাস্টার তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে তা বৃন্দার ধাতে সয় না। বৃন্দা বোঝে মাস্টার সোজা মানুষ নয়, সে আসল জাতের ঘুঘু। তাকে বোকা বানিয়ে ভুলাতে সময় লাগবে। সে-সময়টুকু তাকে জঙ্গলে ঘুঘু তাড়ানোর মত অবশ্য ব্যয় করতে হবে। বৃন্দা মাস্টারকে ভুল বোঝে—আসলে সে ঘুঘু নয়, জাত চোর্যাক; জাল ফেলে তাকে ধরা যায় না। ধারালো দাঁতে জাল ফালা ফালা করে কেটে সে বের হবেই।

ঘটিতে দুধ মেপে দিতে বৃন্দা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মাস্টারের রান্নার তারিফ করে। চোখের ঠারে কথা বলে, বাঁকা চাউনি হেনে, হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বৃন্দা মাস্টারের চোখ, রান্না থেকে তার মুখের পানে জোর করে টানবার চেষ্টা করে। অযথা কোটনা কুটতে বসে মাস্টারকে সাহায্য করতে চায়। মাস্টার বিব্রত বোধ করলেও ভদ্রতার খাতিরে বৃন্দাকে কিছু বলে না।

বৃন্দার সাহস বেড়ে যায় ক্রমে। কাজল বৌ যে তার সাথে বাদ সেধে বসে আছে তাও সে মনে মনে ধারণা করে। মাসের পর মাস মাস্টারের মন পাওয়ার শত চেষ্টা করে যতই নিরাশ হয়, বৃন্দার জেদ ততই চেপে বসে। কাজলের কাছে হার মানবে না ভেবে ঠিক করে, যেমন করেই হোক মাস্টারের মন তার উপর ফেলতেই হবে।

সেদিন মাস্টারকে মাছ কাটতে দেখে বৃন্দা রসিকতা করে বলে—ওমা, শাস্ত্র মাছ উল্টোতে জানো না। কাজল বুঝি তোমাকে ভাজা মাছ উল্টে খেতে শেখায়নি মাস্টার?

মাস্টার বৃন্দার কথায় রেগে গিয়ে জবাব দেয়—কাজল কি তোমার মত রসিক মেয়ে, সরল নিরীহ মেয়েটাকে নিয়ে মন্দ কথা বলতে তোমার লজ্জা করা উচিত। ভালয় ভালয় নিজের পথ দেখ এখন।

কাজলের ভালবাসার কাছে পরাজয় স্বীকার করবে না, বৃন্দা মনস্থির করে এসেছে আজ। তাই মাস্টারের তিরস্কার গায়ে না মেখে খিলখিল করে হেসে বলে—ও, তাই বুঝি! কাজল শুধু মাস্টারের চোখের কাজল নয়, মাস্টারের মনেও কাজলের রং লেগে গিয়েছে।

কটু কথা সইতে না পেরে, মাস্টার চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে আসে রান্নাঘর ছেড়ে। গতিক সুবিধের নয় বুঝে, বৃন্দা রান্নাশালের দাওয়া থেকে উঠানে নেমে বাঁকা সুরে বলে—ভাল করলে না মাস্টার। বৃন্দা গোয়ালিনীর বুকের আগুন তোমার সুখের ঘরে আগুন জেলে দেবে। বৃন্দার মুখে হাসি ফোটাতে গঞ্জের দোকানদারদের সাধ্য-সাধনা করতে হয়। তার অযাচিত বন্ধুত্বকে অবহেলা করে নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরে বসেছ।

বৃন্দার কথা মাস্টার আমল না দিলেও কিছুদিনের ভেতর সে বোঝে, তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে বৃন্দা উঠেপড়ে লেগেছে। তার প্রথম হাতিয়ার হিসেবে বৃন্দা কাজে লাগায় গোকুল বাগদীকে। কাজলের সঙ্গে মাস্টারের সম্পর্ককে আকারে ইঙ্গিতে, ছলায়-কলায়, দৃষ্টিগত করে গোকুলের মাথায় হিংসের আগুন জ্বালিয়ে দেয় বৃন্দা। উঠতে বসতে গোকুল কাজলকে শাসায়। বিনোদ মাস্টারের কথা উঠলে গোকুল বলে—আমার সামনে মাস্টারের কথা আর বলিসনে কাজল বৌ, চলাচলি করতে হয় মাস্টারের কাছে যা, লগীর ঘায়ে তোর মাস্টারদাকে ও তোকে সাবাড় করে রূপনারায়ণের মাটিতে পুঁতে দেশ ছেড়ে চলে যাব। মাছের কারবার ছেড়ে দুধ-ঘোলের দোকান দিতে বৃন্দা আমায় কদিন ধরে সাধছে।

গোকুলের কথায় জোর প্রতিবাদ করে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কাজল বলে—মাস্টারদার নামে কুৎসা করো না গোকুল। দেবতার মতো মানুষকে দোষারোপ করলে সে-দোষ পাপ হয়ে তোমার ঘাড়ে চেপে বসবে। বৃন্দার পাল্লায় পড়লে তোমায় ডুবে মরতে হবে মেছোটার।

মাস্টাররা তোমাদের মতো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ মনে কর, দেবতা চেনার মত চোখ খুলল না এখনও। সেবার জেলখানা থেকে জীবনপণ করে মাস্টাররা তোমায় বাঁচিয়ে না তুললে আজকে চিতের এক হাত ঘাস বেরিয়ে যেত না? এরি ভেতর সে-কথা ভুলে গেছ। নিমকহারাম কোথাকার।

বৃন্দার কথায় হিংসের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হলেও, কাজলের দাবি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না গোকুল। মাছের সমবায় সমিতি গড়ে তুলে সে তাদের মহাজনের হাত থেকে উদ্ধার করেছে, জেলে দুলে বাগদীদের সমবায় সমিতির সদস্য করে দিয়ে তাদের ভেতর রেষারেষি হিংসা দ্বেষও দূর করেছে মাস্টাররা। তাদের

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন

প্রকৃতপক্ষে আপনারাই শাসক

আসন্ন নির্বাচনে—

১। আপনার ভোট দিতে ভুলবেন না।

২। কোন ভয় বা পক্ষপাতিত্ব না করে, আপনার মনোমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিন।

৩। কোন বলপ্রয়োগ বা ভীতিপ্রদর্শন অথবা দুর্নীতিকে ভয় পাবেন না।

৪। যদি কেউ আপনাকে ঘুষ বা কোন বেআইনী পুরস্কার দিতে চায়, তবে সে আপনাকে মানুষ হিসাবে ভারতবর্ষের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে, অপমান করছে।

৫। কোন ব্যক্তির দেওয়া কোন গাড়িতে চড়ে ভোটদান কেন্দ্রে যাবেন না, কারণ ভোটদানকেন্দ্র আপনার বাসস্থান থেকে সওয়া এক মাইলের (দুই কিলোমিটারের) মধ্যে। আমাদের প্রত্যেকে এইটুকু পথ অনায়াসে হেঁটে যেতে পারি।

আপনারা যদি ভোট দিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করেন তবে দেশের যোগ্য সন্তানেরাই হবেন আমাদের জাতীয় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার সদস্য এবং আমাদের সরকারও হবে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সেবা ও মঙ্গলের কাজে উৎসর্গীকৃত সত্যিকারের একটি ভাল সরকার।

(মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন থেকে উদ্ধৃত)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

CENTRAL LIBRARY

সংসারের বাড়বাড়ন্ত বিনোদ মাস্টারের আপ্রাণ চেষ্টার ফল। গঞ্জের বারোয়ারীতে তাদের স্থান দিয়েছে সে। বৃন্দার কথায় মাস্টারদার উপর রাগ করে তাকে উদ্দেশ করে কটূকাটব্য উচ্চারণ করে লজ্জায় গোকুল কাজলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। রাতে মনীপুরের ঘাটে শুকোখাটীর খালে নৌকো বেঁধে গোকুল রাত কাটায়। কাজলও তাকে ঘরে ডাকে না।

শিকার হাতছাড়া হতে দেখে আক্রোশে চুপ করে থাকে বৃন্দা। মনে মনে মাস্টারকে জব্দ করার মতলব এঁটে মনীপুরের ঘাটে খই-মিষ্টির দোকান পেতে নিজেই দোকানদারী করে। তার আসল উদ্দেশ্য জেলে-বাগদীদের মাঝে কাজলের কুৎসা রটিয়ে কিস্তিমাৎ করা। রাত-বেরাতে চুপি চুপি গোকুলের নৌকোয় চোলাই মদের যোগান দিয়ে, তাকে ক্ষুব্ধ করে মাস্টারের উপর তার মন বিষিয়ে তোলে। কাজলের ভুলের মাশুল হিসেবে বৃন্দা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। জলা-জিমাদের সুবাস-মাখা পানের ছোপে রাঙা ঠোঁটের হাসির ঝিলিকে মত্ত গোকুল শিকারী বৃন্দার পাতা ফাঁদে পা দেয়।

রাতের পর রাত গোকুলের নৌকোয় রাত কাটায় বৃন্দা। চোলাই মদের যোগান আরও বাড়িয়ে দেয় সে। নগেন রহিমদেরও গোকুলের নৌকোয় ডেকে রাতভোর ফুর্তি তামাসা চালায়। নেশার রঙীন ঘোরে গোকুল, নগেন, রহিমদের শুনিয়ে শুনিয়ে বৃন্দা বলে—সম্পর্ক মধুর না হলে মেয়ে-পুরুষের আর কি সম্পর্ক থাকতে পারে। কিসের জোরে মাস্টারের উপর কাজলের এত টান? রাত-বেরাতে বাগদীপাড়ায় পাঁথি পড়ে শোনাবার জন্য নয়—না এত গরজ কিসের? বৃন্দার হীন মন্তব্যে সাঁতা ছেড়ে সমবায় সমিতির সদস্যরা মাস্টারের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে।

বৃন্দার কারচুপি ঘিরে মাছ সমবায়ের মাতব্বর-চোরদারা একে একে কাত হয়ে যায়। চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গ টের পায় না মাস্টার। কাজল তাকে হুঁশিয়ারী করতে গেলেও সে কানে তোলে না তার কথা। ভবিষ্যতের অমোঘ বিধানে চক্রান্তকারীদের জালে জড়িয়ে পড়ে মাস্টার শেষটায়।

গঞ্জ নারায়ণপুরের মহাজন রসিক সাঁতরা বৃন্দা গোয়ালিনীর কৃপাধন্য। ছলাকলায় বৃন্দা রসিককে বোঝায় মাস্টারকে গাঁ ছাড়া করতে পারলে জেলেদের দাদন দিয়ে সব মহাজনী কারবার ফেঁপে উঠবে। সব বাধিয়ে কাজলের পা পড়বে সাঁতরার আড়তে। মাস্টারের নামে কাজলের কলঙ্ককে রসিয়ে রসিয়ে বৃন্দা কিস্তি মেরেছে।

কাজলের উপর রসিকের নজর অনেক দিনের। মহাজনী করতে গিয়ে লেখা জোকার যে চেষ্টা করেছিল কাজললতা রসিককে আমল দেয়নি। এক ঢিলে দুই পাখী মারার লোভ দেখিয়ে বৃন্দা চাল চালে নিশ্চিন্তে। প্রথম চালেই রসিক কাত হয়ে যায়। বৃন্দার বুদ্ধিতে দুলে বাগদীদের মদের খরচ সে বইতে রাজী হয়ে যায় এক কথায়। দাদনের খাতায় টিপ ছাপের বন্দোবস্তও তুলে দেয়। রসিক পান-দোক্তার রসে কষধরা দাঁত বের করে হেসে বলে—ধন্যি বৃন্দা তোমার বুদ্ধি। মাস্টারের ধর্ম-কথা ছেড়ে এবার কাজল বউকে পা মাড়াতে হবে এ-গরীবের আড়তে।

সে-বছর গঞ্জের বারোয়ারীতে কলকাতা থেকে শিল্পী এনে গানের জলসা করার মতলব দেয় মাস্টার। বারোয়ারী কমিটি বিনোদ মাস্টারকে ট্রেজারার করে তার উপর চাঁদার অঙ্ক বসাবার সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দেয়। চাঁদার অঙ্ক নিয়ে আড়তে গুণ্ডা ছেলেদের মাস্টারের সঙ্গে একহাত লড়তে পেছন থেকে রসিক কলকাঠি নাড়ে। আগে থেকে পান আড়তের চ্যাংড়া ছেলেদের বৃন্দা শিখিয়ে রাখে কাজল বউয়ের কথা উল্লেখ করে মাস্টারকে ক্ষেপিয়ে তুলতে। রাতে চাঁদার অঙ্ক নিয়ে কথায় কথায় বাদের তুমুল কসা হয়। কাজলের কথা তুলে মনা তকতো বলে—বারোয়ারীর চাঁদার টাকায় কি বাগদীপাড়ার রাতের জলসারও খরচা উশুল করতে চায় মাস্টার।

কাজলের নাম শুনে মাস্টার স্থানকাল ভুলে মনা তকতার গালে কষিয়ে দেয় দু-চার চড়। বাবাগো, গেলাম গো,—বলে মনা ছুটে পালায় সেখান থেকে। হীরা টেঁহালিয়া, লক্ষা হাঁসদা, গদা কাহারী ছুটে এসে মাস্টারকে ধরে ফেলে। সোরগোল বাধে বাজারে—বিনোদ মাস্টার মনা তকতাকে খুন করেছে।

হন্তদন্ত হয়ে রসিক সাঁতরা, ইন্দ্র সাউ, কানাই বাজা, বৃন্দা গোয়ালিনী ছুটে আসে বারোয়ারী তলায়। বৃন্দাকে দেখে মনা ফিরে এসে রসিয়ে রসিয়ে কাজলের সঙ্গে মাস্টারের মধুর সম্পর্কের কথা শোনাতে থাকে। মাস্টার কবে কোথায় কি করেছে সব যেন মনার নখদর্পণে—মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে সে ওস্তাদ। শয়তানও হয়ত ভুলে কখনও সত্যকথা বলে—মনার সে-ভুল হয় না কখনও।

চ্যাংড়ার দল মাস্টারকে ধরে টেনে আনে বাগদীপাড়ায়—গোকুল বাগদীর বাড়ীতে তারা আজ রাতেই এ-অন্যায়ের একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চায়। জেলেপাড়া, দুলেপাড়া, বাউরীপাড়ার মাতব্বরদের ডেকে নিয়ে আনা হয় সেখানে—মাস্টারের সাকরেদ নগেন, ভীম, রহিম দুলে, দুলে বাউরীরাও আসে। তারা কেউ কোন কথা বলে না মাস্টারের পক্ষে। রাতে পঞ্চায়েত বসিয়ে সাব্যস্ত হয়—মাস্টার আসলে রসিক নাগর। তার বাইরের রূপটা খোলস মাত্র। পঞ্চায়েতেরা একমত হয়ে রায় দেয়—মাস্টারকে রাতভোরের আগেই গঞ্জ নারায়ণপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে। প্রতিবাদে, বিনোদ একটিও কথা বলতে পারে না। এতকাল যে-মাটির উপর দাঁড়িয়েছিল, যে গঞ্জের বাজারে, সে-মাটি আজ হঠাৎ সরে গিয়ে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি করেছে। বৃন্দার সৃষ্টি সে ফাটলে—রসিক, নগেন, রহীম, গোকুল, দুলে, কাজল, যে সবাই তলিয়ে যাবে তাও সে বুঝতে পারে। তাই কোন কথা সে বলতে চায় না মিথ্যা ও হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে। শেষ রাতে আকাশের গায় ফুটে ওঠা লক্ষ তারার কাছে তার কথা জানিয়ে মাস্টার চুপ করে থাকে। সে বোঝে—মানুষের বিচার মানুষ করতে পারে না। গঞ্জ নারায়ণপুরের বাজারের লোকে তার কি বিচার করবে। দিন দুনিয়ার মালিকের দরবারে এ অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে বিনোদ ক্ষান্ত থাকে।

পঞ্চায়েতের রায়ে বৃন্দা আড়ি পেতে দাঁড়ায়। সে বলে—বিনোদ হাজার হোক মাস্টার মানুষ। বয়সের দোষে না হয় সে একটা দোষ করে বসেছে। কে এমন দোষ না করে শুনি? সে ভুলত কাজলও করেছে। সাজে দান দিয়ে তোমরা মাস্টারকে একা কেন দোষী করে এভাবে দেশ ছাড়া করে ছাড়বে। মাস্টার কার জন্য কি করে নি। মাস্টারকে ভুল শোধরাবার সুযোগ দিয়ে বাগদীপাড়াতে তার যাতায়াত তোমরা বন্ধ কর। কাজলকে জানিয়ে দাও স্কুলের ত্রিসীমানা যেন সে না মাড়ায়। তা করলে দুজনেরই ঠিক ঠিক সাজা দেওয়া হবে।

বৃন্দার কথা শুনে রসিক সাঁতরা হাঁ হাঁ করে উঠে বলে—অন্তর বটে বৃন্দার। আকাশের মত উদার। এ না হলে কি বৃন্দার শুধু শুধু নাম যশ। সকলের হাত ধরে রসিক অনুরোধ করে এবারের মত মাস্টারকে ক্ষমা দিতে। তার মতে—ভুল, ত্রুটি, বিচ্যুতি মানুষেরই হয়—আবার মানুষই তা সংশোধন করে নেয়।

পঞ্চায়েত বৃন্দা রসিকের কথা নিয়ে শেষ রাতে যে যার ঘরে ফিরে যায়। কাজল বৌ পাষাণের ভার বুকে নিয়ে বাকী রাতটুকু দাওয়ায় বসে কাটায়। বিনোদ মাস্টার নদীর বাঁধ ধরে মনীপুরের শুকোখাটীর পুল পার হয়ে পা পা করে এগোতে থাকে গড় কমলপুর ইস্টিশনের পথে। সমবায় সমিতির কাছাকাছি মনীপুর বাঁকার মোড়ে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে শেষবারের মত তাকিয়ে থাকে গঞ্জ নারায়ণপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরখানির পানে—তার বুকের রক্তে গড়া সে ঘর—কাজলের মত মমতায় ছায়া ঘেরা।

চর রাধাপুরের ওপারে নদীর জল রাঙা করে উঁকি দেয় প্রভাত রবির কর। কুহেলিকাময় একটি রাতের গোপন রহস্য ঢেকে নতুন দিনের সূর্য আবার জেগে ওঠে রূপনারায়ণের জল থেকে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে শুকনো ঝরাপাতার মত কোথা থেকে বিনোদ মাস্টার উড়ে এসেছিল গঞ্জ নারায়ণপুরের বাজারে। শেষ রাতের আগেই

এর নাম অপর্ণা

মায়ের চোখের মণি, ১০০ অবধি স্কিপিং করতে পারে
আর নামতা পারে ১১ ঘর অবধি!

আসল জিনিসটি ওর চাই!

অপর্ণা কেবল বলে, 'আমি যখন হব মায়ের মত বড়'। ওর মা তাকে বলেন, 'খুব ভাল হবি, খুব কাজের হবি'। আর তাইতো মা ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দেন— যাতে ওর বাড়ন্ত শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়।
হরলিক্সই হলো আসল জিনিস।
পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন থাকাতে হরলিক্স ছেলেমেয়েদের শরীর গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে।

হরলিক্স খাঁটি সরের দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এতো গুণ।
হরলিক্সের ওপর মায়েদের অগাধ বিশ্বাস।
ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।
রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।
হরলিক্স শক্তিক্ষয়ের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

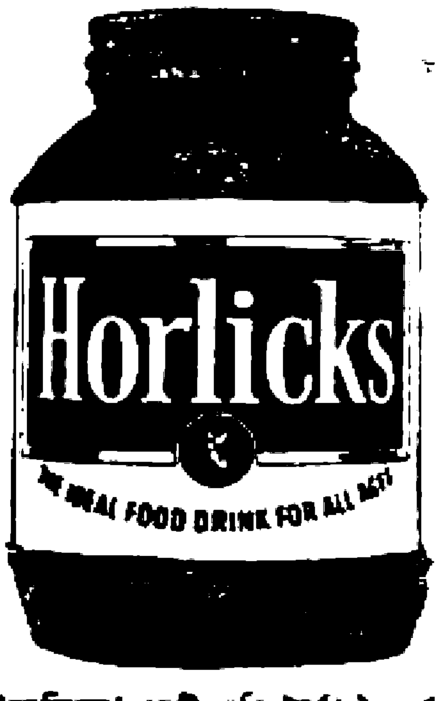

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিস

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1854 A

বিনোদ মাস্টার কুয়াসার মত মিলিয়ে গেল গড় কমলপুর ক্যানেলের ওধারে।

দুনিয়ায় একদল মানুষ জন্মে পরমন্ত ভাগ্য নিয়ে—আর একদল জন্মে দুর্ভাগ্য সঙ্গে করে। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে যায় জীবনভোর। বিনোদ মাস্টার শেষের শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে একজন। পাঁচেটগড় রাজবংশের ছ' আনির মালিক কন্দর্পনারায়ণ বিনোদের প্রপিতামহ। দেশ স্বাধীনতার স্বপ্নে সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিয়ে তিনি ছ' আনির মালিকানা থেকে হন বঞ্চিত। বিনোদের পিতা প্রভাকরনারায়ণের রক্তে ছিল বিদ্রোহের বীজ। বংশপরম্পরায় সে আগুন ঠাঁই পেয়েছে—প্রভাংশুর রক্তে। জ্বালা মেটাতে তাই সে কলেজ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আগস্ট বিপ্লবে। থানা পুড়িয়ে ডাক লুঠ করে, বৃটিশ চরদের নৃশংসভাবে হত্যা করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সে গা ঢাকা দিয়েছিল বিনোদ বাঁড়ুয্যের ছদ্মনামে।

তার আসল নাম প্রভাংশুনারায়ণ রায়—মেদিনীপুরের বিপ্লবী প্রভাংশুনারায়ণের নামে আজও লোকে কাঁপে। বৃটিশ শাসক-দের মা কালীর মন্দিরে নিজের হাতে বলি দিয়েছে বিপ্লবের সময়। তার হাত মানুষের রক্ত রাঙা। পাঁচেটগড় রাজবংশের শেষ বংশধর, সেই থেকে ঢাকা পড়ে যায় বিনোদ বাঁড়ুয্যের ছদ্ম পরিচয়ে। আসল লোকটাকে কেউ আর কোনদিন খুঁজে পায় নি।

আত্মপরিচয় গোপন রেখে প্রভাংশু-নারায়ণ দেশ গড়ার কাজে ডুব দিয়ে অনাথ আশ্রম, দরিদ্রনারায়ণ সেবাশ্রম, জেলে দুলে বাগদীদের মাছের কারবারের সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। নিরক্ষর জেলে দুলে বাগদীদের সঙ্গে মিশে তাদের কুসংস্কার দূর করে জ্ঞানের আলোকশিখা জ্বালিয়ে তোলার কাজকে জীবনের ব্রতজ্ঞান জ্ঞান করে সে ডেরা বাঁধে গঞ্জ নারায়ণপুরের নদীঘাটে। সে কতকাল আগের কথা। আজকের প্রৌঢ় বিনোদ মাস্টারের মাঝে, সেদিনের খোকো হাসি প্রভাংশুনারায়ণকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনদিন।

কাজলের স্নেহমমতার ছায়ায় বিনোদ মাস্টার জীবনের বাকি কটা বছরের আশ্রয় খুঁজেছিল। কাজলের স্নেহের আঁচল থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, বন্দা বাঁজা তার সুখের ঘরে আগুন দিয়ে ছারখার করে গেল। বিনোদের বাকি জীবনে থাকল শুধু কাজলের স্নেহের স্মৃতি। চোখের নাগালের বাইরে গেলে কি কাজলের মন থেকেও মাস্টারের স্মৃতি একেবারে মুছে যাবে? ভাবতে ভাবতে সে কখন গড় কমলপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একধারে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়ে।

দিনের আলো ফুটে বের হওয়ার আগে, গোকুল পুকুরঘাটটিতে যাওয়ার সময় কাজলকে একইভাবে বসে থাকতে দেখে বলে—যা হওয়ার তা হয়েছে বৌ, এখন উঠে সংসারের নিত্য কাজে মন দাও। কাল রাতের জোয়ার মাঠে মারা গেছে। সকাল সকালরে জাল ফেলে মাছ তুলতে বিকাল গড়িয়ে আসবে। আমার জন্য বাঁধের মাঠে ভাত নিয়ে যেও।

অর্থহীন দৃষ্টি মেলে গোকুলের মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কাজল। হ্যাঁ না কিছুই বলে না সে। হন্তদন্তভাবে ঘর ছেড়ে একরকম ছুটেই গোকুল বের হয়ে যায়। সারা সকাল পুকুর ঘাটের কদমতলায় উদাস হয়ে বসে থাকে কাজল—মাস্টারদার স্নেহে গড়া কাজলবৌ!

সেদিনও গোকুলের বকুনি খেয়ে কাজল বসেছিল পুকুরঘাটে। সাঁঝের বেলা পুকুরের জলে মানুষের ছায়া পড়তে দেখে চমকে তাকিয়ে দেখতে পায় তার মাস্টারদাকে। মাস্টারের সম্বন্ধে তার মনের খটকা মেটাতে কাজল তার চোখে চোখ রেখে সোজা প্রশ্ন করেছিল—মানুষের কি সত্যি কোন জাত নেই?

হেসে মাস্টার বলেছিল—না। মানুষের কি আর জাত হয়।

তবে যে কত শত জাতের মানুষ আছে এ দেশে। কত উঁচুনীচু, ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ-বিচার তাদের ভেতর?

ওসব স্বার্থের খাতিরে, লোক ঠকাতে, মানুষ সৃষ্টি করেছে। আসলে সব মানুষই এক। এক জাত তাদের মানবতার—সে জাতের নাম মানুষ।

আজও ছায়াঘেরা পুকুরঘাটে সন্ধ্যার ছায়া নামতে দেখে কাজল তেমনি করে ভাবে সত্যি কি মানুষের জাত নেই। তাহলে দেবতার মত মানুষটাকে অপবাদ দিয়ে সবাই মিলে দেশ ছাড়া করলো কেন? সে বাগদীর মেয়ে বলেই কি মাস্টারদার মত উদার মানুষের সাথে সে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। ভাবতে ভাবতে নিজের মনে খিলখিল করে হেসে ওঠে কাজল। পেছন ফিরে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—মিথ্যে কথা, যে বলে জাত নেই—জাতেই আসল মানুষ নয়।

সারাদিনের খিদে তেষ্টার জ্বালা জেরবার নিয়ে গোকুল ঘরে ফেরে। কাজলের কথার হেঁয়ালী বুঝতে না পেরে রাগের মাথায় বাঁশবোনা লাঠি দিয়ে তাকে সমানে পেটাতে থাকে। লাঠির ঘায়ে কপাল ফেটে রক্তের ধারা বয়ে যায় কাজলের শাড়ী রাঙিয়ে। জ্ঞান হারিয়ে ঘাটের উপর সে পড়ে যায়। ঘাটের কাঠে ধাক্কা খেতে খেতে জলে গড়িয়ে পড়ে দেহটার। গোকুলের চিৎকারে লোকজন জড় হয়ে ধরাধরি করে অচেতনা কাজলকে ঘরে আনে।

এত বড় আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না কাজল। সারা রাত ধরে যে ঝড় বয়ে গেছে তার মনে, লজ্জায় ঘৃণায় দিনের আলোতে মাটিতে মিশে যেতে চেয়েছিল সে। ভবিষ্যৎ ভেবে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সারাটা দিন। মাথায় চোট লেগে তার স্মৃতিবিভ্রম ঘটে—রাতভোর প্রলাপ বকে—মানুষের কি জাত নেই? তবে ওরা তোমায় দেশ ছাড়া করল কেন?

বিকার ঘোর কেটে গেলে বোঝা গেল, কাজল হারিয়ে ফেলেছে তার অতীতের স্মৃতি। ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খোঁজার মত দিনের পর দিন কি যেন সে খুঁজে বেড়ায় নদীতীরের আশেপাশে, গঞ্জের বারোয়ারী তলায়, চর শঙ্কর আড়ার গাজনের মেলায়। তার সে খোঁজা চলে বছরের পর বছর—গ্রীষ্মে বর্ষায়—শীত বসন্তে। তারপর, একদিন সকলের অলক্ষ্যে কোথায় হারিয়ে যায় কাজল—বিনোদ মাস্টারের শত আদরে গড়ে তোলা কাজলবৌ।

ট্রেনের এক কোণে ঠাঁই করে বিনোদ ভাবে তার এ চলা যেন আর শেষ না হয় কোনদিন। অন্তর থেকে গভীর মমতা উজাড় করে ঢেলেছিল সে গঞ্জ নারায়ণপুরের স্কুলের উপর। কলঙ্কের ডালি মাথায় চাপিয়ে স্কুল ছাড়া করে যোগ্য প্রতিদানই তাকে দেওয়া হয়েছে সে মমতার। স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার মূলে উপড়ে ফেলে বিনোদ মাস্টার বিনোদ বাঁড়ুয্যের পরিচয়ে আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় না। অন্তহীন ভাবনায় দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকে কাঠফাটা রোদে কাটলধরা মাঠের পর মাঠ ভরা দিগন্তের পানে—আর ভাবতে থাকে প্রভাংশুনারায়ণ বিনোদ মাস্টার কি একই মানুষের ভিন্ন রূপ না ভিন্ন পরিচয়ে বিভিন্ন মানুষ তারা।

কাল সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। বিনোদও অপমানের জ্বালা ভুলতে থাকে। গঞ্জ নারায়ণপুরের স্মৃতি একেবারে মন থেকে মুছে দিতে পারে না। স্মৃতির বন্ধ দুয়ার খুলে কাজল বউয়ের করুণ মুখখানি মাঝে মাঝে তার জীবনের আঙিনায় উঁকি দিয়ে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। সেই সঙ্গে তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে স্কুলের চালাঘরখানি, শত স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

সোয়াদীঘির ঝুমুর নাচের দলের ম্যানেজারি করে বিনোদ মাস্টার আজকাল বিনোদের বাঁধা তরজা ও ঝুমুরের খেউড় শুনতে আশপাশের গ্রাম ভেঙে মেয়ে পুরুষ জড় হয় ঝুমুর নাচের আসরে। ঝুমুরওয়ালী কিরণের রসিকতায় মাস্টারের বাঁধা তরজা

খেউড়ের রস শতগুণে বেড়ে যায়—হাসির রোল পড়ে যায় আসর জুড়ে। বাহবা, হাততালি, মেডেল পুরস্কার জোটে কিরণের কপালে। মাথা হেঁট করে মাস্টার সে সময়টা আসর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তার মনে হয় কাজল বৌয়ের চাপা দীর্ঘশ্বাস বাহবা হাততালির শেষ রেশ ধরে তাকে উপহাস করছে।

মাস্টারের উপর বহুদিন থেকে নেক-নজর কিরণের। কিন্তু কেউ কোনদিন মাস্টারকে হেসে কথা বলতে দেখেনি কিরণের সঙ্গে। যার গাঁথা খেউড় শুনে হাসি ধরে না শ্রোতাদের মুখে, তার নিজের মুখে হাসি নেই, কেমন যেন নিজের মাঝে নিজেই সে ডুবে থাকে। কি যে তার ভাবনা, তা সে কাউকে জানতে দেয় নি।

মাস্টারের মন পেতে সাধাসাধনা করেও হার মানে কিরণ। বিনোদের ব্যবহারে সে মোটেই আমল পায় না। এক একদিন সন্ধ্যার স্তিমিত আঁধারে মাস্টার কিরণের মুখের পানে তাকিয়ে খুঁজেফেরে কাজল বৌয়ের স্নেহ, মমতা হয়ত বা আরও কিছু। কোন মিল সে খুঁজে পায় না কিরণের মুখে। ঘুঙুরওয়ালী কিরণ আর প্রকৃতির স্নেহের আঁচলে গড়ে ওঠা কাজল বৌয়ের মাঝে সে দেখতে পায় আসমান জমিনের তফাৎ।

কিরণের মুখের উপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাস্টার বলে—তুমি নও কিরণ, তুমি নও। কাজলের পাশে ঠাঁই পাবার যোগ্যতা তোমার নেই। অপমান গায়ে মেখে উদাসী মাস্টারের হাত চেপে ধরে কিরণ অনুরোধ করে—কাজলকে আমায় একবার দেখাবে মাস্টার?

কিরণের অনুরোধে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরে বিনোদ মাস্টার পা বাড়ায় চর শঙ্কর আড়ার গাজনের মেলায় ঘুঙুর নাচের দল নিয়ে। প্রাণপ্রাচুর্যে বিনোদ মাস্টার প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে নেমে জরাভারে আনত, মাথা ভর্তি চুলের জায়গায় কাঁচাপাকা মেশানো কয়েক গাছা চুল মাত্র অবশিষ্ট। তার সোনার পারা গায়ের রঙ তামাটে আভা। পাঁচ বছর বাদে মাস্টারের একান্ত পরিচিতদেরও তাকে চিনে নিতে কষ্ট হয়।

গাজনের মেলায় গানের আসরে প্রথম রাতেই মহীম তাকে চিনতে পারে। সে পরদিন নগেন, হুদয়, রসিককে জানায় তার কথা। গঞ্জ নারায়ণপুরের বারোয়ারী তলায় দু আসরের বায়না আসে পরদিন। তার হাতে গড়া বারোয়ারীতলায় গানের বায়না নিতে বিনোদের মাথা হেঁট হয়ে আসে। তাই সে রাজী হয় না বায়না নিতে। কিরণের আগ্রহে শেষটায় সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বায়নানামায় সই করে। হয়ত সে সময় তার মনের কোণে ক্ষীণ আশা উঁকি দিয়েছিল—কাজলের সঙ্গে যদি তার একটি-বারের মত দেখা হয়।

মানুষের আশা কি কখনও মেটে? দুর্ভাগা কি কখনও একবার দেখা দেয় জীবনের আঙিনায়? গঞ্জ নারায়ণপুরে তার জন্য যে দুর্ভাগের চরম ইতিকথা লুকিয়ে রেখেছে, তা জানলে বিনোদ মাস্টার সে পথে আর পা বাড়াত না কোনদিন। অলেখা কাজলের স্মৃতি বুকে নিয়ে সে কাটিয়ে দিত জীবনের শেষ কটা বছর।

মহীম, নগেন, হুদে এক এক করে মাস্টারকে প্রণাম করতে আসে সাজঘরে। কেউ কোন কথা বলে না তাকে, তাদের চোখ মুখের ভাব দেখে মাস্টার বোঝে এক

আমরাই টাকা দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব

নিজের চেষ্টায় যাঁরা উন্নতি করতে চান সেই সব স্বনির্ভর লোকদের সাহায্য করতে আমরা হাত বাড়িয়ে আছি। আপনি হয়তো যন্ত্রপাতির কাজে কিংবা কারিগরীতে পাকা...আপনি যদি নিজে কাজ-কারবার শুরু করতে চান কিংবা চালু কাজ আরো ভালো ও বড়ো ক'রে তুলতে চান তো আর্থিক সহায়তার জন্য আমাদের ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন। এছাড়া, কৃষিজীবী, পরিবহন-পরিচালক, ছোটখাটো শিল্পের মালিকদের ঋণ দিয়ে সহায়তার নানারকম লোন স্কীম আমাদের আছে। এই লোন স্কীমের সুযোগ নিয়ে আপনার কারবার বা পসার আরো বাড়িয়ে তুলুন।
আপনার কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের শাখায় বিস্তারিত বিবরণ পাবেন।

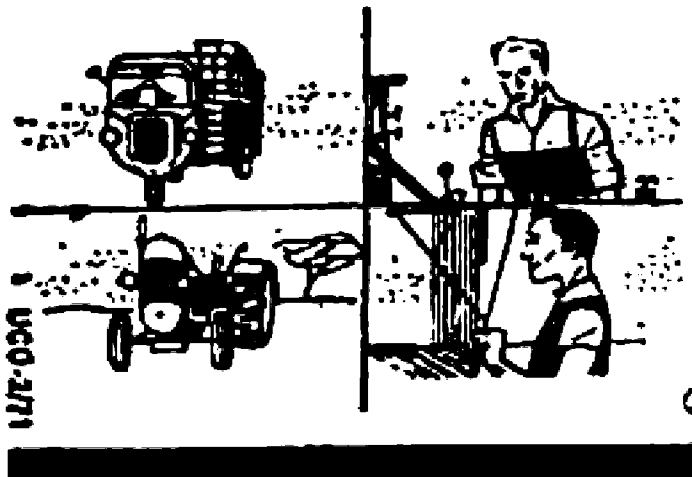

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস: কলিকাতা

UCO-2/71

বিরাট বড় হইয়ে তাদের মনে। গোকুলের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও সে থেমে যায়। সমবায় সমিতির কথা উঠলে, মহীম, নগেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে—রসিক বৃন্দার যোগসাজসে সমবায় সমিতি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সে চলে যাওয়ার পর তারা আবার পা দিয়েছে মহাজনের চটা সুদের দাদনের কারবারে। তাদের পাকা কাঁধে পা দিয়ে আজ তারা নামে মাত্র সমিতির সদস্য আসল মালিক রসিক বৃন্দার দল।

সব শুনে মাস্টার চুপ করে থাকে। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না। সে রাতে কুমুরের আসরেও সে যায় না। বেশকারীর ঘরে বিছানা পেতে চুপচাপ শুয়ে থাকে—ভাবে, গোকুল কাজল কি সব ছেড়েছুড়ে দেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। গজ নারায়ণপুরে ফিরে আসা কি তবে নিরর্থক?

সারা রাত জেগে কাটিয়ে ভোরের আলো ফোটার আগে, বিনোদ দুপচারীদের পাড় ধরে দনীপুরে শুকোখাটীর খালের দিকে পা বাড়ায়। একদিন যে পথ ধরে গজ নারায়ণের সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে অনিশ্চয়ের ভার মাথায় বয়ে অজানা দেশের পথে পাড়ি দিয়েছিল মাস্টার, আজ সেই পথ ধরে সে খুঁজতে বেরিয়েছে গোকুল কাজলকে।

খালের কাছে পৌঁছে বিনোদ দেখতে পায় গোকুল মাছের ঝুড়ি মাথায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে বাজারের পথে। হাড় মাস সার গোকুলের বয়স যেন বিশ বছর এগিয়ে গেছে। মাস্টারকে দেখে হাউ হাউ করে গোকুল কাঁদতে থাকে অবিরত—তার সে অবস্থা দেখে মাস্টারেরও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

গোকুলকে শান্ত করে, কথায় কথায় কাজলের কথা উঠলে গোকুল কথা না বলে শাগঞ্জের শ্মশান ঘাটের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখায়। তার ইসারা বুঝতে না পেরে মাস্টার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে কাজল কোথায়?

মাছের ঝুড়ি নামিয়ে রেখে মাস্টারের পা জড়িয়ে ধরে গোকুল কেঁদে বলে—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগের জন্য কাজল আমায় ছেড়ে চলে গেছে দু' বছর। তুমি চলে যাওয়ার পর তার মাথা কি রকম হয়ে যায়। সে কখনও কাঁদত, কখনও হাসত কখনও বিড়বিড় করে নিজের মনে কি সব বকত। বৃন্দার পাপকথা তখন আমার দেহে কালকূট বিষের জ্বালা ধরিয়েছিল। তাই তাকে আমি অবহেলা করে তার চিকিৎসে করাই নি। একদিন তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। দু'দিন পরে শুখাখাটির খালে তার লাস ভেসে উঠলে বুঝলাম আমার উপর শোধ নিয়েছে কাজল বৌ।

প্রায়শ্চিত্ত আমার শুরু হয়ে গেল সেই থেকে। সারা গাজর পায়া ঘায়ে পচে উঠলো। তিন মাস হাসপাতালে রেখে আমার পায়ের দুটো আঙুল বাদ দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে তুলেছে মহীম নগেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলি কোনমতে চোখে ভাল দেখি না। রোজ রাতে শুকোখাটীর খালধারে কাজলের কান্না শুনতে পাই। মাস্টারদা, আমায় কি কাজল ক্ষমা করে নি আজও? তুমি এসেছ একবার বলে দেখ না তাকে। সে ত এইখানে শুয়ে রয়েছে। তুমি আমায় ক্ষমা দাও আজ।

গোকুলকে সাথে করে বিনোদ মাস্টার আসে শাগঞ্জের শ্মশান ঘাটে। পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রের মত মনে হয় তার সে ঘাট। তার স্নেহে গড়া কাজল বৌ মর্ত্যের খেলা শেষে মান অপমানের বালাই না করে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে সে শ্মশানে।

কাজলের চিতার পাশে বিনোদ ঘুরে বেড়ায় কিছু সময়। কি ভেবে শ্মশানের বুক থেকে কলসী কুড়িয়ে ঘাটে নেমে জল ভরে আনে সে। কর্ণাধারায় স্নান করানোর মত, জল ছিটাতে থাকে চিতার উপর। বনবাদাড় ভেঙে ঝোপ থেকে তুলে আনে মুঠো মুঠো বুনো ফুল। চিতার উপর সেগুলি ছড়িয়ে দেয় পরম স্নেহে।

নদীর বুক থেকে দমকা বাতাস বয়ে এসে বিক্ষিপ্ত করে যায় চিতায় ছড়ানো ফুলের রাশ। চারধারে ছড়ানো সে ফুলের মাঝে মাস্টার দেখতে পায় কাজলের হাসির ঝলক।

অদেখা কাজলের স্মৃতি বুকে করে বিনোদ মাস্টার দেশবিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছে এতকাল। এ জনমের মত কাজলের দেখা আর মিলবে না পৃথিবীতে। ঘর ছাড়া বিনোদ মাস্টারকে আটকে রাখার কেউ আর রইল না।

হা হা করে হাসতে হাসতে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিক পানে ছুটে চলে বিনোদ মাস্টার। স্নেহ মমতার ডোরে বেঁধে রাখবার যার কেউ নেই, দিগন্ত মেখলা-চুম্বিত বিরাট শূন্যতা যার বুক জুড়ে—তার কাছে ঘর বার দুই সমান। জীবন-নদীর খেয়াঘাটে শেষ খেয়ায় চড়ে বিনোদ মাস্টার যাত্রা করে নিরুদ্দেশের পথে—পেছনে পড়ে থাকে গজ নারায়ণপুরের ঝুমুর নাচের দল, শাগঞ্জের শ্মশানঘাটে কাজলের চিতা—নদীতীরে বুকের রক্তে গড়া স্কুল ঘর, দনীপুরের বাঁকা খালের সমবায় সমিতি। উন্মুক্ত প্রান্তরে বয়ে যাওয়া ঝোড়ো হাওয়ার মত বিনোদ মাস্টার ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যায় কোন অজানা দেশে—

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

ওঁরা এবার সিংহলে

ভারতের তিনটি মেয়ে হিচ-হাইক করে যাত্রা করেছিল কলকাতা থেকে সিংহলে। ওঁদের সম্বল ছিল মাত্র পাঁচটি টাকা। আর অগণিত দেশবাসীর শুভেচ্ছা ছিল ওঁদের পাথেয়। এই তিন অভিযাত্রী হলেন ডাঃ (ক্যাপ্টেন) পুষ্পা সাকসেনা, মীরা সরকার এবং মীনা গুহ। গত ১৬ জানুয়ারী ওঁরা যাত্রা শুরু করেন। এ সংবাদ ওঁদের যাত্রাক্ষণে 'অঙ্গনার' পরিবেশিত হয়েছিল।

সম্প্রতি এই তিন অভিযাত্রী সিংহলে পৌঁছে গেছেন। রামেশ্বরম থেকে নৌকায় ওঁরা সিংহলের মাটিতে পা রাখেন। সেখানকার ভারতীয় হাইকমিশনের প্রতিনিধিসহ এক বিরাট জনতা ওঁদের স্বাগত জানান। ২৪০০ কিলোমিটার সুদীর্ঘ পথে এমনি সম্বর্ধনা ওঁরা পেয়েছেন ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল এবং সর্বত্র।

কলম্বো পৌঁছে ওঁরা এক সিংহলী কন্যাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন সিংহল। তিন সপ্তাহ পরে ওঁরা ফিরে আসবেন কলকাতায়।

এক্সপ্লোরারস ক্লাবের চেয়ারম্যান কলকাতায় এখবর জানিয়ে বলেন, ওঁরা ভারতের নারী সমাজে রোমাঞ্চকর নতুন অধ্যায়-এর সূচনা করলেন। ওঁরা প্রগতির দূত।

অঙ্গনা

শিশু সংবাদ

শিশুরাই সমাজের ভবিষ্যৎ। দেশে দেশে তাই শিশুদের নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই। ওদের সার্বজনীন বেড়ে ওঠা, সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা এজনা স্বাভাবিক প্রাধান্য পায়। গোড়ার দিকটা যদি কাঁচা থেকে যায় তবে ইমারত গড়ে তোলা অসম্ভব থেকে যায়। বরং আকস্মিক দুর্বিপাকে বিপদের আশঙ্কাই বেশি। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্পর্কে উদাসীনা দেশ ও জাতিকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সব দেশেই শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিপার্শ্বিকতার উপরও সমান নজর রাখা হয়েছে। না হলে সবটাই রবীন্দ্রনাথের তোতা কাহিনীর মত পাঠ্যপুস্তকের ভারে শুধু চাপা পড়ার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই সতর্কতা এদিকেও। শিশুদের শিক্ষায় আসল কথা হলো যে, সুষ্ঠুভাবে মানসিক বিকাশ। তাই এদিকে নজর রেখেই সবাইকে এগুতে হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এদিকে লক্ষ রেখেই শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করে চলেছে। শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের [illegible] এব্যাপারে অনেকখানি। ছোটদের [illegible] গড়ে তোলেন তার উপর [illegible] অনেক পরিমাণে নির্ভর-[illegible] শিক্ষকদের লক্ষ হলো [illegible] ও শিক্ষার দিক দিয়ে [illegible] গড়ে তোলা। এরা [illegible] সুস্থ, নৈতিক দিক দিয়ে সুন্দর এবং সমাজপ্রগতির নিয়মগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে শিখবে। স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হওয়া ছেলেমেয়েরা হবে সত্যব্রতী ও কর্মপটু। এবং একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিটি শিশুই সাত বছরে পড়লেই পরবর্তী ১ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুলে পড়া শুরু করে। এ দায়িত্ব পুরোপুরি বহন করেন স্কুলের শিক্ষকরা। যে সমস্ত শিশু আগামী এক বছরের মধ্যে স্কুলে যাবার বয়সে গিয়ে পৌঁছুবে তাদের মা-বাবা অথবা অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকরা গিয়ে দেখা করেন এবং এই শিশুদের জন্য কি করা দরকার সে সম্পর্কেও তাঁরা পরামর্শ দেন।

শিশুদের শিক্ষা চলে পড়াশুনার সময়ে এবং ক্লাসের পরেও। স্কুলে তথা পাঠক্রম-বহির্ভূত কাজকর্মের সময়েও। প্রকৃতপক্ষে স্কুলে পড়ানো অনেকগুলি বিষয়েই শিশুদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ভালো সুযোগ দেওয়া হয়। ইতিহাস এবং সাহিত্য এব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভূগোল এবং জীববিদ্যা শিক্ষণের সময়ে শিক্ষকরা ওদের নিজের দেশের কথা বলেন। এভাবে দেশের জন্য ভালবাসা শুরু হয়। নিজের জেলা বা অঞ্চলকে জানার মাধ্যমেই এই ভালবাসার সূত্রপাত। যা কিনা এক প্রচণ্ডের জানালার মতো কাজ করে। এর মধ্য দিয়ে একজন ছাত্র দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। আবার ইতিহাস পড়ে সে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয় এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করে। এইজ্ঞান লাভ করে পরবর্তীকালে সে যখন পর্যালোচক হিসেবে সমাজবিজ্ঞান নেয় তখন সে [illegible] নিয়মগুলি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে শেখে।

ইতিহাস পাঠকালেও শিশুরা দেশের জনগণের বীরত্ব সম্পর্কে—যাঁরা বারবার বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছেন সেই বীরদের সম্পর্কে জানতে পারে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করে ফ্যাসিস্ত হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মহান লড়াইয়ের ইতিহাসই শুধু জানতে পায় না, এই যুদ্ধের বীরদের প্রকৃতই সাক্ষাৎ পায়। বিপ্লবের পটভূমি ও সামরিক কৃতিত্বের জায়গাগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ প্রতিটি স্কুলেই অনুষ্ঠিত হয়। এসময়ে শিশুরা অজ্ঞাত বীরদের সমাধি খুঁজে বার করে তাদের নাম ঠিক করে। লড়াইয়ের সময়ে বারবার গুলি লেগে ছিন্নভিন্ন একটি পতাকা অথবা স্কুলের সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি ক্ষতবিক্ষত একজন সৈনিকের শিরস্ত্রাণ দেশাত্মবোধ শিক্ষা দেবার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই স্কুলগুলি ছাত্রদের শুধু তাদের পূর্বসূরীদের বীরত্ব ও শ্রম কৃতিত্বকে শ্রদ্ধা করতেই শেখায় না, সাধারণ আদর্শকে সাহায্য করার জন্য তাদের যথাসাধ্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের নিজেদের দায়িত্ব তথা দেশের ভবিষ্যতের জন্য তাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করায়। সেজন্যই স্কুলের শিশুদের মানুষ করে তোলার জন্য এতো প্রখর দৃষ্টি।

ছোটদের জন্য একটা খেলার মাঠ তৈরি করা, স্কুলের বাগানে বৃক্ষ রোপণ, শহরের ইতিহাস সম্পর্কে একটি সংগ্রহশালার আয়োজন, একটি রাষ্ট্রীয় খামারকে সাহায্য করা—আপাতদৃষ্টিতে এগুলিকে তাৎপর্যহীন মনে হতে পারে। কিন্তু শিশুদের মধ্যে এগুলি নাগরিক কর্তব্য বোধ এবং অভিন্ন আদর্শে অংশগ্রহণের একটা বোধ সঞ্চারিত করে।

শিশুরা অন্যের সেবা করে এবং অপরের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে আনন্দ পেতে শেখে। একটি শিশুর মধ্যে একজন তরুণ নাগরিকের বিকাশ ঘটানোর জন্য তাকে শুধু নিজের কথাই নয় অন্যের কথাও চিন্তা করতে এবং সর্বসাধারণের বিষয়কে নিজের বিষয় বলে মনে করতে শেখানোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের স্কুলগুলি শিশুদের শেখার শ্রমকে প্রয়োজন বলে মনে করতে। সাধারণ পলিটেকনিক প্রশিক্ষণে শ্রমের পাঠ এমন একটা বিষয় যা তাদের মধ্যে এই মনোভাব সঞ্চারিত করে যে কাজ করতেই হবে। আর কাজের এবং বৃত্তি বেছে নেবার ওপর একজন তরুণ বা তরুণীর মনোভাবই তার সামাজিক পরিপক্বতার প্রমাণ।

তরুণ-তরুণীরা স্বাধীন জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াবার পর যে বৃত্তির দিকেই ঝোঁক দেখাক না কেন সক্রিয় সামাজিক কাজের জন্য তাদের অবশ্যই নিজেদের প্রস্তুত করতে হয়। আর সে কাজের শুরু হয় স্কুল থেকেই, অতি সাধারণ ছোট ছোট কাজ দিয়ে। ইয়ং পায়োনিয়ার সংগঠন স্কুলে এব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যৌথ মনোভাব এবং সহকর্মীসুলভ ও বন্ধুত্বের মনোভাব সঞ্চারিত করার কাজে তারা শিক্ষকদের সাহায্য করে। ইয়ং পায়োনিয়ারের সদস্য হিসাবেই তারা সামাজিক-রাজনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে প্রথম শিক্ষা পায়। শিক্ষকরা এই সংগঠনগুলিকে যথাযোগ্য সাহায্য করেন। তাঁরা ভালোভাবেই জানেন যে যৌথ সংস্থাই ব্যক্তির বিকাশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হাতিয়ার। স্কুলের স্ব-শাসনের ভূমিকাও বিরাট। শিশুরা তাদের যৌথ সংস্থার কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করে নিজেদের মধ্যে সামাজিকভাবে সক্রিয় হবার জন্য, সংগঠনিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবার জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য গড়ে তুলতে শেখে।

স্কুলের ছাত্রদের আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনায় গড়ে তোলার উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এসম্পর্কে লেনিন-সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণী নাদেজদা ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষা হবে প্রাত্যহিক কাজ। শুধু আন্তর্জাতিক সভা ও উৎসবে তা সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত কাজকে এর দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে হবে।

সোভিয়েত শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের অন্য জাতিকে শ্রদ্ধা করতে ও ভালবাসতে শেখান। এটা করা হয় ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য শিক্ষার সময়ে। অনেক স্কুলেই আন্তর্জাতিক ক্লাব তৈরি করা হয়েছে। এখানকার সদস্যদের পৃথিবীর বহু দেশে লেখনী বন্ধু আছে। তারা যে সমস্ত চিঠি পায় সেগুলিকে প্রায়ই পড়ে শোনানো হয় বিদেশী ভাষা শিক্ষার আসরে। প্রতিবেশী প্রজাতন্ত্রগুলির ইয়ং পায়োনিয়ারদের সঙ্গে বন্ধুত্বকেও অনুরূপভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়। এজন্য স্কুলের ছুটির সময়ে প্রায়ই অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে এবং বিভিন্ন দেশের ভিত্তিতে বিদেশেও ছাত্রদের ভ্রমণের আয়োজন হয়ে থাকে।

—প্রতীক্ষা

অতিথি মনস্কতা

আপনার স্বভাব অন্যমনস্ক হতে পারে। কিন্তু কলকাতায় থাকতে হলে আপনাকে অতিথিমনস্ক হতেই হবে। কলকাতার বাইরে যদি আপনার অনেক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব থাকেন তাহলে তাঁরা প্রয়োজনে—যেমন ধরুন চিকিৎসা, চাকুরীর ইন্টারভিউ, পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে এবং অপ্রয়োজনে যেমন ধরুন—নিছক বেড়াতে, কোন একটা বিশেষ প্রদর্শনী দেখতে কিম্বা কোন বন্ধুর বিয়েতে আপনার বাড়ীতে আশ্রয় নেবেনই এবং আপনিই যখন গৃহিণী তখন আপনার পক্ষে উদাসীন থাকা চলে না।

অতিথি অভ্যাগতকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—নিকট আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও নিমন্ত্রিত। নিমন্ত্রিতদের নিয়ে আপনার কারবার একবেলা কিম্বা বড় জোর একদিন। আপনি নিশ্চয়ই একদিনের জন্যে নিজেকে আপ্রাণ খাটিয়ে অন্যকে খুশি করবার ক্ষমতা রাখেন। সমস্যাটা হচ্ছে তাঁদের নিয়েই যাঁরা একদিনের জন্যে আসেন না—বেশ কয়েকদিন আপনার অন্দরমহলের খানিকটা জায়গা জুড়ে বসেন—এঁরা নিকট আত্মীয়ও হতে পারেন কিম্বা পুরোনো দিনের সহপাঠিনীও হতে পারেন। আচ্ছা এবার দেখা যাক এই তিন শ্রেণীর অতিথির সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। প্রথমে আত্মীয়ের কথাই ধরা যাক,—তাঁর সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত।

প্রথমত—তিনি দেখা-সাক্ষাতের অভাবে আপনার জীবন থেকে যতই দূরে সরে গিয়ে থাকুন, আপনি এমন হাবভাব দেখাবেন যেন আপনার বুকে তাঁর আগেকার আসনটি সংরক্ষিতই আছে।

দ্বিতীয়ত—আপনি মনের অতল থেকে স্মরণের সাঁড়াশি দিয়ে টেনে বার করবেন কি খেতে তিনি ভালবাসতেন এবং সেই সব পদ বেছে বেছে রেঁধে আপনি তাঁর কাছে নিজের ভালোবাসার যথার্থতা প্রমাণ করবেন, কিন্তু নানারকম ব্যঞ্জন-সাপেক্ষ পদ রেঁধে লৌকিকতা করবেন না কারণ তাহলে তাঁর নিজেকে আপনার সংসারে পর বলে মনে হতে পারে।

তৃতীয়ত—আপনি কথায় কথায় সেই সব প্রসঙ্গের অবতারণা করবেন যেগুলির নায়ক বা নায়িকা ছিলেন আপনার আত্মীয় স্বয়ং এবং যাতে আপনারও কিঞ্চিৎ ভূমিকা ছিল।

চতুর্থত—তাঁর নানা গুণপনার কথা বারবার উল্লেখ করে প্রশংসা করতে ভুলবেন না।

পঞ্চমত—কোন ব্যাপারে তিনি যদি এমন কিছু মন্তব্য করেন যা আপনার পছন্দ নয়, অথবা তিনি যদি আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে আসেন—বিরক্ত হলেও আপনি চুপ করে স্মিত মুখে তা সহ্য করে যাবেন।

ষষ্ঠত—তিনি যদি বয়োজ্যেষ্ঠ হন তাহলে তাঁর সঙ্গে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে কথা বলবেন এবং সাংসারিক ব্যাপারে তিনি যে রকম নির্দেশ দেবেন তা জেনে নিচ্ছেন এবং সেইভাবে চলছেন—মনকে বোঝাবেন মাত্র কয়েকদিনের জন্যেই তো এই অভিনয়।

সম্ভবত—তিনি যেসব প্রসঙ্গ ভালোবাসেন, সেই বিষয়কে কেন্দ্র করেই কথা বলার চেষ্টা করবেন। তিনি উৎসাহী না হলে অনর্থক নিজের সাংসারিক সমস্যার কাঁদুনি গেয়ে আবহাওয়া ভারী করবেন না।

তারপর ধরুন অতিথি যদি আপনার কোন বন্ধুস্থানীয় হন, তাহলে তাঁর সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত সে সম্বন্ধেও কয়েকটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

প্রথম—তিনি আসায় আপনি যতই বিরক্ত হয়ে থাকুন, আচরণে তার একবিন্দুও প্রতিফলন হতে দেবেন না, বরং হেসে, অনেক বেশী কথা বলে তিনি আসায় যে আপনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত এই ভাবটাই প্রকাশ করতে চাইবেন।

দ্বিতীয়—তিনি যে ব্যাপারে এসেছেন সে ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাবেন এবং সুযোগ পেলেই সেই প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলবেন।

তৃতীয়—আপনার সেই অভ্যাগত বন্ধু বা পরিচিতের স্নেহভাজন ও প্রিয়জন সম্পর্কে আগ্রহী মনোভাব দেখাবেন এবং তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং প্রকারান্তরে তাদের গুণপনার প্রশংসাও করবেন। যেমন—আপনার ছেলে তো একটা রত্ন, আপনার মেয়ে এবারে কোন ক্লাসে উঠল? খু-উ-ব ভাল গান শিখেছে না?

চতুর্থ—তিনি যদি বেড়াতে বা সিনেমা দেখতে চান, তাহলে মুখ কালো করে এবং চোখের আড়ালে গিয়ে তাঁর পক্ষে শ্রবণযোগ্য স্বরে গজ্-গজ না করে যতটা পারেন তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন—ট্রামে বাসে ঠিক মতো উঠতে নামতে না পারলে সকলের সামনেই খিঁচিয়ে উঠবেন না।

পঞ্চম—আপনার বাড়ীতে হয়তো বারমাসই লোকজন আসা-যাওয়া লেগেই আছে, তবু অতিথির কাছে তার ফর্দ দাখিল করে এবং খরচের অকুলানের কথা বলে তাকে বিব্রত করবেন না—কলকাতায় থাকলে এ কষ্ট ও এ-ব্যয় স্বীকার করতেই হবে এই ভেবে নিজেকে শান্ত রাখবেন।

ষষ্ঠ—তিনি যদি সামান্য কিছু মিষ্টি খাবার কিনে আনেন আপনার সংসারের জন্য তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করে তাঁকে সম্মানিত করবেন।

সবশেষে ধরুন অতিথিকে আপনি নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, তাহলে কি রকম ব্যবহার করা উচিত, সেটাও আপনি যদি বুদ্ধিমতী হন, পূর্বাহ্নেই চিন্তা করে রাখবেন। কাউকে নিমন্ত্রণ করলে আপনার কি-কি করা উচিত ও কি উচিত নয়, সে সম্বন্ধে এবারে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাক্।

প্রথম—অতিথি আসবার আগেই রান্নার সব কাজ শেষ করে রাখবেন—যাতে তিনি এলে যথেষ্ট গল্প করবার সময় পান।

দ্বিতীয়—ঘর-দোর সমস্ত যথাসাধ্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবেন এবং রান্নাঘর এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবেন—যা দেখে আপনার অতিথি বুঝতে না পারেন যে, তাঁর রসনাকে তৃপ্ত করবার জন্য আপনাকে কতটা পরিশ্রম করতে হয়েছে।

তৃতীয়—যে সব পদগুলো রান্না করে প্রশংসা পেয়েছেন সেইগুলোই রাঁধবেন—নতুন কোন পদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন না।

চতুর্থ—খাওয়া নিয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করবেন না, কিন্তু বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করতেও ভুলবেন না।

পঞ্চম—অতিথি অন্য কারো রান্নার প্রশংসা করলে এবং আপনার রাঁধা পদগুলোর প্রশংসা না করলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও আচরণে তা প্রকাশ করবেন না।

ষষ্ঠ—খাদ্য দেরীতে পরিবেশন করে অতিথিকে বাড়ী ফিরতে অনর্থক বেশী রাত করিয়ে দেবেন না।

তিন রকম অতিথির ক্ষেত্রেই এই পরামর্শগুলো যদি আপনি মেনে চলেন, তাহলে অচিরেই আপনি প্রশংসা পাবেন এবং অন্যান্য গৃহিণীদের কাছে নির্ঘাত ঈর্ষিত হবেন। তবে একটা কথা অতিথি খুশি করার মনস্তত্ত্বে খুবই জরুরী, সেটা হল অন্যের কাছে নিজের বা নিজের সংসারের কথা যতটা পারেন কম বলবেন—অন্যদের কাছে সব সময়েই আপনার ভূমিকা হবে বক্তার নয়—হৃদয়বতী শ্রোতার। মনোযোগী ও সহানুভূতিশীল শ্রোতা হিসেবে সকলের আস্থা অর্জন করুন—ভাল রান্নার চেয়েও সেটাই হল প্রশংসিত হওয়ার নির্ভুল চাবিকাঠি—কারণ, প্রতিটি মানুষেরই দুঃখটা এই—পৃথিবীতে শ্রোতার চেয়ে বক্তাই বেশী।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

生花

পুষ্প থেকে ইকেবানা

জাপান দেশে ফুল সাজানোকে ইকেবানা বলে। ইকেরু ও হানা শব্দদুটি নিয়ে ইকেবানা কথাটা তৈরি; জাপানী ভাষায় ইকেবানার দুটি মানে হয়, জীবন্ত অথবা সাজানো আর হানার মানে ফুল—এখানে সবকটি মানে নিয়েই ইকেবানা কথাটি ব্যবহার করা হয়—অর্থাৎ ইকেবানা হচ্ছে প্রাণময় পুষ্পবিন্যাস। ইকেবানার ইতিহাস খুঁজলে জানা যায় সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সেই যুগেই ইকেবানারও আত্মপ্রকাশ। কিওটো শহরে প্রিন্স সতকুর তৈরী রোক্কাকুদো মন্দির প্রাঙ্গণে এর প্রথম বিকাশ। এই মন্দিরের ওনো-নো-ইমোকো ও পরবর্তীজীবনে সেনমু ইকেনোবো নামে পরিচিত বৌদ্ধ পুরোহিতকে এর উদ্ঘাটক বলা হয়। মন্দির বেদীতে বিগ্রহমূর্তির সামনে তিনটি জিনিষ রাখার নিয়ম ছিল, এই তিনটি হচ্ছে ধূপাধার, দীপ ও পুষ্পঘট। সাধারণ ভাবেই এর মাঝে ফুল সাজানো হোত প্রথম যুগে। মন্দিরের পুরোহিতবর্গ চিত্তের একাগ্রতা সাধনের অনুকূল স্থানে এটি সাজাতেন। সাধক-শিল্পী যখন এই সাজানোর মাঝে বিশ্বপ্রকৃতির গভীরতা ও আপন অন্তরে সেই ভাবের প্রতিফলন ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তখনই সার্থক হোত তার শিল্প-প্রচেষ্টা; এইভাবে অন্তরের ভাবুকতার সঙ্গে শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যের যুগলবন্দীতে মন্দির মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হোল প্রাণময় পুষ্পসজ্জা ইকেবানা। নানাভাবে এটি সাজানো হোল—রিক্কা, শোকা, নাগেইরে, মোরিবানা, মোরিমোনো প্রভৃতি নানা রীতি অনুসরণ করে। শিল্পী ফুল, ফল, লতা-পাতা, ঘাস আর শেকড়ের সঙ্গে ইট-কাঠ, পাথর আর ধাতু সবই ব্যবহার করতে শুরু করলেন

একে একে। আর এর মাঝে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পধারী শিল্প রচনা করে চললেন ইকেবানা শিল্পী।

জাপানে ইকেবানার জন্মলগ্ন বৌদ্ধধর্মের প্রবেশক্ষণে আর জন্ম কিয়োতো শহরের সুপ্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরে। ইকেবানা শিল্পের মাঝে ভারতীয় রীতিনীতির প্রভাব কতটুকু সে সম্বন্ধে কোন বই-এ বিশদভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি, অন্ততঃ ইংরেজী ভাষায় লেখা কোন বইতে পাইনি। আগেকার কালে ইকেবানার ওপর লেখা সব বই-ই জাপানী ভাষায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই বহু বই বিদেশী ভাষায় লেখা হয়েছে। লেখকবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশ জাপানী, কিছু ইংরেজ ও আমেরিকান রয়েছেন। আমাদের দেশে এদিকে তেমন আগ্রহ এখন পর্যন্ত কেউ দেখান নি। এইসব বই-এর লেখকবৃন্দের কারো মতে বুদ্ধের বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়ার রীতি থেকে ইকেবানার উৎপত্তি। আবার কারো মতে সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশের সাংস্কৃতিক প্রভাব জাপানে নানাভাবে পড়েছিল এবং ইকেবানারও উৎপত্তি চীন দেশের কোন প্রথা থেকে হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম নানা দেশের গন্ডী পার হয়ে জাপানে পৌঁছতে বেশ কয়েক শ' বছর লেগেছিল। স্থান ও কালের দীর্ঘ ব্যবধানে তার ভারতীয় রূপও চাপা পড়েছিল পথিমধ্যে স্থানীয় ঐতিহ্যের সংস্পর্শে। এই বিবর্তনের জন্যই জাপানবাসী কিংবা অন্য কোন বিদেশীর পক্ষে এর মূল ভারতীয় রূপটি চিনে বের করা কঠিন। জাপানে বৌদ্ধধর্ম তিব্বত, চীন ও কোরিয়া হয়ে পৌঁছেছিল যেমন সত্য তেমনি সত্য ভারতের মাটিতেই এর বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। আর সেইজন্যই জাপানে প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের আচারাদিতে যতই তিব্বত, চীন ও কোরিয়ার প্রভাব থাকুক না কেন, আদিতে তার মধ্যে ভারতীয় ভাব থাকবেই—প্রত্যক্ষভাবে না হলে প্রচ্ছন্নভাবে। ইকেবানার নিয়মাদির সঙ্গে ভারতের প্রচলিত রীতিনীতির কোন মিল পাওয়া যায় কিনা, তার অনুসন্ধান করলেই সংশয়ের মীমাংসা করা যাবে।

ইকেবানার প্রথম প্রথম যুগের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় একটি জলচৌকির ওপর ধূপদানী, দীপ ও পুষ্পপূর্ণ আধার নিরস্যুগোকু মতানুযায়ী রাখা রয়েছে। আমাদের দেশেও পূজার উপচাররূপে ধূপ, দীপ ও পুষ্পের ব্যবহার পুরাকাল থেকেই হয়ে আসছে। আমরা পূজায় ফুল সচরাচর তিন ভাবে ব্যবহার করি—দেবতার অঙ্গসজ্জায়, পুষ্পার্ঘ্যে এবং পূর্ণ ঘটে; ইকেবানার মূলে এই পুষ্প ব্যবহার-পদ্ধতির কোনটি সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে?

দীঘার সমুদ্রতীরে মাছ ধরা। ফটো : শ্রী[illegible] মিত্র

জাপানবাসীর নিকট ইকেবানার মূল্য মন্দির বা গৃহসজ্জার উপকরণরূপে বিচারগত objective নয়, এর অন্তর্নিহিত ভাব subjective এর আবেদনই প্রধান এবং জাপানের পুষ্প বিন্যাসের সঙ্গে পাশ্চাত্যের পার্থক্য এইখানে। ইকেবানার নিজস্ব সত্তা রয়েছে স্বীকার করা হয়। জাপানী গৃহে পুষ্প-বিন্যাস রাখার জন্য প্রধান কক্ষে টোকোনোমা নামে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান রাখার নিয়ম চালু আছে দেখা যায়।

আমাদের ঠাকুরঘরের মতন এই স্থানটির পবিত্রতা মানা হয়। গৃহে অতিথি অভ্যাগতকে টোকোনোমার সামনে আদর আপ্যায়ন জানান হয় আর টোকোনোমায় সাজানো পুষ্প-বিন্যাসের কোনদিকে অতিথি এবং কোনদিকে গৃহকর্তা থাকবেন তার নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের বসতে হয়। ইকেবানা সম্বন্ধে এইসব নিয়মাদি দেখে মনে হয় দেবতার অঙ্গসজ্জা বা পুষ্পার্ঘ্য থেকে ইকেবানার উৎপত্তি হয়নি। দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ফুল আমরা দেবতার প্রসাদরূপে গ্রহণ করি, কিন্তু দেবতার মূর্ত প্রতীকরূপে দেখি না যেমনটি ইকেবানা সম্বন্ধে জাপানবাসীর শ্রদ্ধা দেখা যায়। একমাত্র পূর্ণঘট-এর সঙ্গেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ইকেবানার মিল পাওয়া যায়। ধূপ-দীপসহ যে পুষ্পাধার রাখার নিয়ম রয়েছে তার সঙ্গে আমাদের পুষ্প-পাত্রের চেয়ে পূর্ণঘটের সাদৃশ্যই বেশী। একটি জলপূর্ণ পাত্রে ফুল ও পাতার সংঅবস্থানে পূর্ণঘটের চিত্রই মনে আসে।

বিশেষ তাৎপর্যময় পূর্ণঘট অমৃতকলস বা মঙ্গলঘট এর প্রতীক। এর ব্যবহার আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। হিন্দুধর্মের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে সকল মঙ্গলাচারের মাঝেই এই ঘট বিরাজ করছে। ঘট স্থাপন করে পূজা আরম্ভ করা হয়, ঘট বিসর্জন দিয়ে পূজা শেষ করা হয়, পূজায় ঘটই প্রধান, মূর্তি গৌণ। সাধারণতঃ পাঁচ কিংবা সাতটি পাতার আম্রশাখা, ফুল ও ফল আর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে ঘট পাতা হয়; জীবনচক্রের অবিচ্ছিন্নতার প্রতীকরূপে গাছের শাখা ফুল ও ফল ব্যবহার করা হয়, এই ফুল ফল ও পাতা কোন উপকারী বৃক্ষ অথবা বিশেষ গুণসম্পন্ন বৃক্ষ থেকে চয়ন করা হয়। সেজন্য বট, আম, নারকেল, বেল, কলা, পদ্ম, অপরাজিতা, তুলসী প্রভৃতি গাছের ফল, ফুল বা পাতা ব্যবহার-বিধি প্রচলিত হয়েছে। চির-সবুজ আম গাছের শাখা অপরিমিত জীবনের প্রতীক—পদ্মফুল পবিত্রতা ও শান্তির নিদর্শন—ফল সফলতা বা পূর্ণতাবোধক—জলপূর্ণ ঘট বিশ্বের প্রতীক—এরূপ পূর্ণঘটে সিঁদুরের ঈশ্বরমূর্তি অঙ্কন করে সর্বগুণযুক্তের প্রতীক রূপেই পূজা করা হয়। পূর্ণঘটের কাছে মূর্তি গৌণ, কারণ মূর্তির মাঝে বিশ্বসত্তারই একটি নির্দিষ্ট ভাবের প্রতিফলন হয় মাত্র আর পূর্ণঘটে সমগ্র বিশ্বের কল্পনা করা হয়েছে। এই পূর্ণঘটে বিশ্বের কল্পনার সঙ্গে ইকেবানা সাজানোর জগতের পরিকল্পনা একই চিন্তাধারার আভাষ মনে হয় না-কি? ত্রিজগতের যাবতীয় বস্তুর প্রতীকরূপ ইকেবানা সাজানোর নানা অংশে দেখা যায়—ফুল ডালপালার সন্নিবেশে ব্যবহারে এগুলি তৈরী করা হয়েছে। কোন অংশের নাম দেওয়া হয়েছে চূড়া বা শিখর, কোন অংশ কর্ণা, কোন অংশ গিরিতট আবার কোনটি নগর। কোনটিই এখানে স্বরূপে উপস্থিত নয়, সবই আকারে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে।

—ঊষা বসু

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফারুখ ইঞ্জিনীয়ার বলেন:
"শুধু ব্রিলক্রীমই আমার চুল আমার পছন্দমত পরিপাটি আর পরিষ্কার রাখতে পারে।"
"আমার চুলই তার প্রমাণ"
"আমার পছন্দসই মাত্র একটি কেশপ্রসাধন আছে আর সেটি হচ্ছে ব্রিলক্রীম।
ব্রিলক্রীম আমার চুল তেলচিটচিটে না ক'রে সুন্দরভাবে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রাখে—ঠিক যেমনটি আমি চাই।
"ব্রিলক্রীম লাগালে নিজেকে মনে হয়—সম্পূর্ণ সুসজ্জিত"।
ব্রিলক্রীম:
দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী কাটতি কেশপ্রসাধন
BRYLCREEM

প্রেক্ষাগৃহ

'সানফ্লাওয়ার'-এর একটি দৃশ্যে সোফিয়া লোরেন ও ল্যুদমিলা সাভেলিয়েভা

বাঙলা ভাষায় দুটি অ-বাংলা ছবি

আমরা সাধারণত যে-সব অ-বাঙলা ছবিকে সংলাপ ও গান মূল ভাষার পরিবর্তে বাঙলা ভাষায় রূপান্তরীকরণের পরে অর্থাৎ বাংলা 'ডাবিং'-এর পরে দেখতে অভ্যস্ত, সেগুলির প্রত্যেকটাই পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক (যেমন 'জয়দেব') এবং মূল তেলেগু থেকে রূপান্তরিত। সম্প্রতি উত্তরা, পূরবী এবং উজ্জ্বলাতে মুক্তিপ্রাপ্ত, মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরী নিবেদিত, ইস্টম্যান কলারে তোলা "হরপার্বতী" ছবিখানিও এই একই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আর একখানি যে-ছবি গেল হপ্তাহ সুরশ্রী, রূপম, আলেয়া প্রভৃতি চিত্রগৃহে দেখানো হয়ে গেল, সেটি হচ্ছে নানা দিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম এবং এরই কথা আমরা প্রথমে আলোচনা করব।

তারাচাঁদ বরজাত্যা প্রযোজিত এবং এ সালাম পরিচালিত রাজশ্রী প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিমিটেড-এর নিবেদন 'ভাগ্য' ছবিখানি মূলে ছিল হিন্দী (যার নাম ছিল 'তকদীর')। তার ওপর ছবিখানি পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক নয়, একেবারেই গার্হস্থ্য চিত্র। এই ছবিটি সম্পর্কে তৃতীয় উল্লেখ্য বিষয় হল, ছবির ভাষান্তরের কাজটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ছবিটি যে 'ডাব্‌ড', তা প্রায় ভুলেই যেতে হয়। ছবির বাঙলা গানগুলি সুগীত ও সুগৃহীত। মূল হিন্দীতে যে-আবেগপ্রবণতা ছবিটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, সেই আবেগপ্রবণতা বাঙলার মাধ্যমেও সঞ্চারিত হয়েছে পুরোপুরি-ভাবেই। সেই কারণে এই বাঙলা রূপান্তরিত 'ভাগ্য' ছবিখানি যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই এর প্রশংসা করেছেন। গোয়ার অধিবাসী, সঙ্গীত শিক্ষক গোপালের সাধনার সঙ্গে বিবাহ থেকে শুরু করে ভাগ্যান্বেষণে সমুদ্র পথযাত্রী হয়ে জাহাজ ডুবির ফলে তার স্মৃতিভ্রংশ হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হওয়া, স্বামীর মৃত্যু সংবাদে সাধনার ভেঙে-পড়া, দারিদ্র্যের জ্বালা এড়াতে সাধনার ধনী বিজয়বাবুকে বিবাহ করা, নিজের গাওয়া গান শুনে গোপালের পূর্ব স্মৃতি ফিরে আসা, গোয়ায় ফিরে এসে নিজের স্ত্রীকে বন্ধুর স্ত্রীরূপে দেখতে পাওয়া এবং বহু ঘটনার পরে দৈবদুর্বিপাকে বিজয়বাবুর মৃত্যুর পরে স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলন প্রভৃতি দৃশ্য-সম্বলিত কাহিনীটি বাংলা সংলাপ ও গানের মাধ্যমে বাঙালী দর্শকদের চিত্তকে আলোড়িত করতে সমর্থ হয়েছে। শুধু ফার্নান্ডেজের বিবাহেচ্ছা, দুই বন্ধুকে ঠকানো এবং শেষ পর্যন্ত নিজে ঘটক সেজে 'বিয়ে করে ফেল' গান প্রভৃতি সাধারণ দর্শককে খুশী করলেও ঠিক বাঙলা ছবির হাল্কা রস পরিবেশন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে নি এবং ছবির শেষাংশে গীতার উদ্ধারকারী প্রৌঢ়ই যে হারিয়ে-যাওয়া গোপাল একথা জানবার পরে ক্ষিপ্তপ্রায় বিজয়বাবুর অভিনয়ভঙ্গী বাংলা ছবির তুলনায় কিছুটা মোটা ধরনের অর্থাৎ অমার্জিত মনে হতে পারে। কিন্তু গোপাল, সাধনা, গীতা ও গোপালের শুভানুধ্যায়ী প্রতিবেশীর ভূমিকায় যথাক্রমে ভারতভূষণ, শালিনী, ফরিদা জালাল ও চম্পকলালের অভিনয় প্রতিটি বাঙালী দর্শককেই আনন্দ দিয়েছে। ছবিটির সাদাকালো ফোটোগ্রাফী ও শিল্পনির্দেশনা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরী নিবেদিত ইস্টম্যানকলার রঞ্জিত চিত্র 'হরপার্বতী' যে পৌরাণিক ছবি, তা নামেই প্রকাশ। ছবির প্রথমাংশে দক্ষযজ্ঞ কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে এবং বৃহত্তর দ্বিতীয়াংশ জুড়ে আছে তারকাসুর নিধনার্থ হরপার্বতীর মিলনের ফলে কার্তিকের জন্ম ও তাঁর দেবসেনাপতিরূপে তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ও শেষ পর্যন্ত পার্বতী-প্রদত্ত অস্ত্র দ্বারা তাকে হত্যার কাহিনী। সম্প্রতি দেখা দক্ষযজ্ঞ ছবিখানির পরে বর্তমান ছবির প্রথমাংশকে—বিশেষ করে দক্ষ দুহিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে শিবের ক্রোধ ও প্রলয়ংকর তাণ্ডব অনুষ্ঠানের দৃশ্যগুলিকে বেশ নিরেস বলে বোধ হল। অবশ্য কুমারসম্ভব অবলম্বনে কার্তিকের জন্মকথা ও দেবসেনাপতিরূপে তাঁর তারকাসুর বধ করে স্বর্গরাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার অংশ উপভোগ্য। বিশেষ করে ছয় কার্তিকের গান ও বিভিন্ন বাহনের দৃশ্যটি বিস্ময়কর ও চিত্তগ্রাহী।। বাংলা সংলাপ যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং দক্ষের মুখনিঃসৃত বাক্যগুলি শ্রুতিবিদীর্ণ-কারী। এগারোখানি গানের মধ্যে 'প্রিয়সখী গঙ্গে বল না' গানখানি যথার্থই হৃদয়গ্রাহী। ডাবড ছবি সম্পর্কে পদ্মিনী অভিনীত প্রথম বাংলা ছবি বলে বিজ্ঞাপিত করা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

—বাল্মীকি

সি এল টির পাপেট ডান্স আলাদিনের একটি দৃশ্য।

সি এল টি-র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান

কয়েকদিন আগে রবীন্দ্র-মঞ্চে সঙ্গম পুতুলনাচে আলাদীন ও আশ্চর্যপ্রদীপ দেখে বিমুগ্ধ হয়ে গেছি।

আরব্য উপন্যাসের আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপের গল্পের চিরআগ্রহী শিশু নয় কে? কিন্তু আজকের অতিপরিচিত মানুষের অন্তরশায়ী এই শিশুকে জাগ্রত করে বড়দেরকেও শিশুদের সঙ্গে এক করে দেবার মত কঠিন কাজ অনায়াসদক্ষতায় করেছেন শিল্পী সুরেশ দত্ত। তাঁর আশ্চর্য প্রতিভাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যায় না। কিছু সুতো, মাস্ক ও কল্পনা দিয়ে শিশু-বয়স্ক সকলের জন্য যে রং-মহলের রচনা খুলে দিয়েছেন, তার অভিনবত্বে অভিভূত হতেই হয়। পুতুলকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠে কল্পলোকের চরিত্রকে এমন জীবন্ত করে তুলতে এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আলাদীন, বুদ্ধন, যাদুকর, প্র...—সবাই-এর চলাফেরা, কথা বলার ভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গির দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে আলাদীনের বিচিত্র কাহিনী শুনতে হয়। শুধু কি মানুষই যা বলি কেন? দৈত্য, বাঘ, ডাকাত এদের ভয়ঙ্করতার রূপ না দেখে উপায় আছে? কি মানুষ, কি পশু, দৃশ্য সজ্জা-পরিকল্পনের রং-জমানোর মধ্যেই রয়েছে নিখুঁত শিল্পকর্ম। সেদিনের রূপমঞ্চের কুশীলব সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সুরেশবাবুকে এক বিশেষ জগতের বিধাতা বলা যায়। সামগ্রিক সাফল্যের মূলে সঙ্গীত-স্রষ্টার এবং বিজ্ঞানকুকে সুপরিস্ফুট করার কাজে সুচিন্তিত আলোকপাতের ভূমিকাও সামান্য নয়। তবুও নিপুণ শিল্পকর্মে গড়া এই অনুষ্ঠানটি সর্বদিক দিয়ে মনে রাখবার মতো।

সি এল টি উৎসবের আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান সলিল মিত্রের ইলেকট্রিক-গীটার। সেদিনের প্রায় একঘণ্টাকালীন অনুষ্ঠানে শ্রীমিত্র বোলটি বিভিন্ন ছন্দ, রাগ-ধর্মী রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজিয়ে শোনালেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন, অনুশীলন করেছেন এবং তার একটি বিশিষ্ট রূপকল্পনা পরিবেশনে সার্থক হতে পেরেছেন। শ্রীমিত্র সম্বন্ধে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইনি শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য এবং বেহালাতে বিদ্যুৎ-মাধ্যমে সুর-সংযোজনা প্রচেষ্টায় ইনিই পথিকৃৎ।

শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন পরিচালিত কথাকলি আঙ্গিকের কয়েকটি নৃত্যও উপভোগ্য। সি এল টি-র প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমাদান উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান সংবাদিক শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ (এন কে জি)।

এর পর কথাকলির চারটি অংশ প্রদর্শিত হয়। কথাকলির যথানির্দিষ্ট পদক্ষেপ, কলানন এবং মলয়ালম সংস্কৃত ভাষার গান বজায় রেখেও শ্রীমেনন বিশেষ করে সি এল টি-র শিল্পীদের জন্য উদ্ভাবিত কথাকলি নৃত্যে রূপগুণাঢ্য, সাবী ও মহাভারতের কিছু উপাখ্যানের এক সরল রূপ—মুদ্রা, পদক্ষেপ ও নাটকীয় অভিব্যক্তির মাধ্যমে মেলে ধরেন। ডিপ্লোমা-প্রাপ্তা শ্রীমতী ডলি ঘোষ ও মল্লিকা মিত্রর নৃত্য চোখে পড়বারই মত। টিম-ওয়ার্কের কুশলতাও প্রশংসনীয়।

আনন্দশঙ্করের সমন্বয়ী বাদ্য

বাংলাদেশে তরুণ শিল্পী গোষ্ঠীর অর্কেস্ট্রা রচনায় বর্তমান যুগে আনন্দশঙ্কর এক প্রতিভা-স্বাক্ষরিত নাম। গুরু আলাউদ্দিন খাঁকে অর্কেস্ট্রার প্রবর্তক বলা যায়, কারণ তাঁর আগে হাবু দত্ত বিস্মৃত-প্রায় নাম। রাইচাঁদ বড়ালও সমন্বয়ী বাদ্য প্রচেষ্টার একদা ব্রতী ছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিমিরবরন। উদয়শঙ্করের নৃত্য-সম্ভারে অর্কেস্ট্রা রচনা। রাজনর্তকী, কুমকুম প্রমুখ চিত্রগীতির পটভূমিকা ছাড়াও সাধনা বসুর নৃত্য-বিশ্লেষণী তাঁর অর্কেস্ট্রা একটি বিশেষ যুগের প্রকাশোচ্ছ্বাসকেই শুধু ধ্বনিত করে না, অর্কেস্ট্রার প্রথম সার্থক প্রকাশরূপে তিমিরবরণের সঙ্গে অর্কেস্ট্রার নাম জড়িত এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে প্রগতিশীল অর্কেস্ট্রার জনক বলা যায়। তারপরে এর আর এক আকর্ষণীয় রূপ দেখা গেল রবিশঙ্কর রচিত সমন্বয়ী বাদ্যে। আধুনিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভি বালসারার অর্কেস্ট্রাও উল্লেখের দাবী রাখে।

কিন্তু এই সকল ঐতিহ্য মেনে নিয়েও আনন্দশঙ্কর তাঁর অর্কেস্ট্রার নিজস্ব এমন একটি সঙ্গীত-চিন্তার অনবদ্য বিকাশ দেখিয়েছেন যাকে এক কথায় বলা যায় বৈপ্লবিক। সম্ভবত এ-বস্তু উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর বিপ্লবী শিল্পী-পিতা উদয়শঙ্করের কাছ থেকেই পাওয়া। সেতারই আনন্দশঙ্করের প্রকাশমাধ্যম। গুরু লালমণি মিশ্রের শিক্ষায় বনেদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও আনন্দ সমসাময়িক যুগ-যন্ত্রণার তরুণ প্রতিনিধিরূপে এ-যুগের তরুণ-জীবনের স্পন্দন, অস্থিরতা আত্মপ্রকাশের উন্মাদতাকে রূপ দেবার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন এবং যুগ-বিপর্যয়ের অশান্ত কল্লোলকে তাঁর রচনায় প্রতিধ্বনিত করতে পেরেছেন—আনন্দশঙ্কর ও তাঁর সম্প্রদায় পরিবেশিত বাদ্যবৃন্দ সম্বন্ধে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। গত ৩০শে এবং ৩১শে জানুয়ারী এ-ইউ-সি অডিটোরিয়ামে পরিবেশিত আনন্দর অর্কেস্ট্রা এই সত্যকেই স্মরণ করিয়ে দিল। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত্তিতে 'রক এণ্ড রোল'-এর স্পর্শ আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট মনে হলেও তা এ-যুগের যুব-সমাজের অস্থিরতার এক সার্থক প্রতিচ্ছায়া হয়ে উঠেছে। সঙ্গীত হোলো আন্তর্জাতিক ভাষা। ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আমেরিকার সঙ্গীতাঙ্গের মিল হল সৃষ্ট যুগসঙ্গীতে—রুচি-বিচ্যুতি যদি না থাকে, তরুণ শিল্পীর সৃষ্টির আবেগ ও কল্পনার আগুনে কোনো খাদ নেই। শুধুমাত্র কল্পনার অবাস্তব লোকে আপনাকে সীমাবদ্ধ না করে, প্রতিদিনের চলার পথের হাজারো বাস্তব বাধার অবশ্যম্ভাবী আঘাতকে আনন্দ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর শিল্পকর্মিতে স্থান দিয়েছেন—এইখানে তিনি কল্পনাপ্রবণ হয়েও রিয়ালিস্ট। তাই

রূপকথা
বিশ্বরূপার ঠাকুর সৰ্বদায়
ফোনের ফোন (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
৪ঠা মার্চ বৃহস্পতিবার
৬টায়
...সম্মানে ছ-টি চরিত্র
...৭ই রবি ২টা ও ৬টায়
...তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেতার ও তালবাদ্যের সঙ্গে ইলেকট্রনিক সঙ্গীতের বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীত-চরিত্রের পার্থক্য দেখিয়েও উভয়ের বৈপরীত্যের অন্তরালের সাযুজ্যের প্রতিও যথাযোগ্য আলোকপাত করেছেন।

যুব-জীবনের অস্থিরতার প্রতিচ্ছায়ার সূক্ষ্ম প্রকাশে আনন্দশঙ্কর সার্থক।

আনন্দশঙ্করের সহযোগী সার্থক বাদ্যশিল্পীরা হলো : সৌমেন দে (বাঁশী), অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাতা বসু ও দুর্গা বড়াল (বেহালা), ভরত করণ্যার (একর্ডিয়ান), বুলবুল বড়াল (সেলো), সৌরেন ঘোষ (তবলা), সৈয়দ মতিদুল ইসলাম এবং সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সরোদ), সুনীল দাস (সেতার), সাইরাস টাটা, নিনিয়ান রবিনসন এবং দেবব্রত মহলানবীশ (গীটার), পণ্ডিত দীনেশকুমার ও ঘনশ্যাম পাইন (তালবাদ্য)।

প্রাণবস্তুকে মনোহারী বাঙ্ময় করবার জন্য সুনির্বাচিত শিল্পীদের কিছু নৃত্যভঙ্গিমা সংযোজন আনন্দের শিল্পদৃষ্টির আর এক প্রদীপ্ত শিখা। নৃত্যশিল্পীরা হলেন—শঙ্কর-দুহিতা মমতাশঙ্কর ও উদয়শঙ্কর কালচারাল সেণ্টারের শিক্ষার্থীরা। কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন রিণাশঙ্কর, কবিতা নন্দী, পিয়ালী ঘোষ, চন্দ্রী ঘোষ, সুমিতা গুহরায়, অনুরাধা রুদ্রপুরী, বীণা মোহান্তি, রাজীবশঙ্কর, চন্দ্রোদয় ঘোষ, প্রদীপ ধর ও সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্টুডিও থেকে

রাধা, পূর্ণকে প্রতিবাদ : বিশ্বজিৎ নিবেদিত নিমাই মৈত্র প্রযোজিত আর্ট মুভিজের 'প্রতিবাদ' রাধা, পূর্ণ ও প্রাচীতে পরবর্তী আকর্ষণ হিসাবে মুক্তির দিন গুণছে। জানা গেছে, এই মাসেই ঐ শুভ দিন আগতপ্রায়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এই ছবির মূল বক্তব্য বিষয়। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী। তপেশ্বর প্রসাদ এই ছবিখানি পরিচালনা করেছেন। সুর দিয়েছেন শ্যামল মিত্র। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও বিশ্বজিৎ স্বয়ং। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—হারাধন, জহরীপন, সুলতা অপর্ণা, পদ্মা, অজয়, অরুণকুমার, সুলেখা, মন্মথ চিন্ময়, রবি ঘোষ প্রভৃতি। দি মিলি ডিস্ট্রিবিউটর্স ও মিলি পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন।

সলোর : নর্মদা পিকচার্সের সামাজিক ছবি সলিল সেন রচিত ও পরিচালিত 'সলোর' সেন্সারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ছবিটিতে সুর দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, হরিধন, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল, অমর নাথ, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারানী, সমিতা বিশ্বাস, মাঃ অরিন্দম ও নন্দিনী মালিয়া প্রভৃতি। নর্মদা চিত্র ছবিখানির একমাত্র পরিবেশক।

জননী—মুক্তি পথে ট্রাইডেন্ট কম্বাইন্স প্রযোজিত, অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত 'জননী' ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষায়। এতে সুর দিয়েছেন শ্যামল মিত্র। কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র স্বয়ং। নাম ভূমিকায় আছেন—সুলোচনা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বে), অন্যান্য চরিত্রে আছেন—সুলতা চৌধুরী, লিলি চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, সমিত ভঞ্জ ও জয়া ভাদুড়ী। শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ছবিখানির একমাত্র পরিবেশক।

রুঠা না করো / শশী কাপুর এবং নন্দা

মঞ্চাভিনয়

চেনামহলের তিনটি একাঙ্কিকা : কলকাতার নাট্যরসিকদের কাছে 'চেনামহল' একটি সুপরিচিত নাম। পরীক্ষানিরীক্ষামূলক বেশ কিছু বাস্তবধর্মী বলিষ্ঠ নাটক অভিনয় করে এই সংস্থার শিল্পীরা নাট্যচর্চায় যথেষ্ট আন্তরিকতা ও শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। সম্প্রতি এ'দের প্রয়াসের আর একটি প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর চিহ্নিত হোল মুক্ত অঙ্গনে তিনটি একাঙ্কিকার সুন্দর এক সৌন্দর্যক পরিবেশনায়। নাটিকা তিনটি হোল অনিলবরণ দত্তের 'সেই শ্মশানে', শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রতিধ্বনি' ও অধ্যাপক হরিমোহন সেনের 'পলাতক'। তিনটি একাঙ্কিকা নির্বাচনেও শিল্পীদের মুক্তচেতনার সুস্পষ্টতাও ভাবা যেতেছে।

রূপকের মাধ্যমে বর্তমানের একটি বাস্তব ও নির্মম সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। 'সেই শ্মশানে' নাটকে। নাটকের চরিত্রগুলি স্বর্গরাজ্যের দেবতাগণের প্রতীকে কল্পিত। নাটকটি সুঅভিনীত। ভোটের প্রাক্কালে নাটকটি নির্বাচন যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় বহন করে। মহাদেববেশী উপেন তরফদারের সাবলীল অভিনয় দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে। অন্যান্য উল্লেখ্য অভিনেতা নন্দীর চরিত্রে অজয় ভট্টাচার্য, ভৃঙ্গীর চরিত্রে দিলীপ ঘোষ এবং চিত্রগুপ্তের চরিত্রে সুজিত গুহ।

বর্তমান সমাজের আর একটি জটিল সমস্যা সোচ্চার হয়ে উঠেছে 'প্রতিধ্বনি' নাটকের গতিবেগে। প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও আদর্শবাদী যুবক পবিত্র ঘুষ না নিয়ে আর্থিক অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার কথাই এ নাটকের মূল বক্তব্য। নাট্যমান উচ্চাঙ্গের। এ নাটকে কমেন চক্রবর্তী (পবিত্র), সুজিত গুহ (বিভ্রান্ত) ও রঞ্জিৎ সমুদ্দার (ঘনশ্যাম) অভিনয়ে প্রশংসার দাবী রাখে।

জীবনের এই গোলকধাঁধায় আমাদের সকলের পলায়নী মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে 'পলাতক' নাটক। নিঃসন্দেহে এটিই সংস্থার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। হাসির আড়ালে জীবনের এক নির্মম সত্য। নাট্যকার অতি সহজে দর্শকের উপলব্ধির গ্রহরে ধরা পড়েছে। দলের সামগ্রিক বা দলগত অভিনয় দেখবার মত। বিশেষত সে দৃশ্যে সব শিল্পীই একে অপরের কাছ থেকে পালিয়ে মঞ্চের বিভিন্ন বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই দৃশ্যটি সুপরিকল্পিত ও উপস্থাপিত। অভিনয়ের দক্ষতায় সজীব

রায়, উৎপল মজুমদার, মনীষ লাহিড়ী, সবিতা রায়ের নাম উল্লেখ্য।

তিনটি নাটকেরই প্রযোজ পরিকল্পনায় ছিলেন শ্রীঅজিত রায়। তাঁর আন্তরিক প্রয়াসে সূক্ষ্ম শিল্পচিন্তার যথেষ্ট ছাপ আছে। তাপস সেন আলোকসম্পাতে পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে আবহসঙ্গীত সুরারী তত নাটক তিনটির মর্মকথাকে তেমন স্পষ্টরূপে আলো দিতে পারেননি।

রাহুমুক্ত : বীরু মুখার্জির রাহুমুক্তর জনপ্রিয়তা অল্প কিছুদিন আগে নতুন অনুভূতির মাধ্যমে মঞ্চস্থ হয়ে উঠেছিল আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। নাটকটির সার্থক প্রযোজনায় অংশ নিয়েছিলেন সেদিন ক্যালকাটা ইনস্টিটিউটের উৎসাহী শিল্পীরা। প্রযোজ পরিকল্পনায় নাটকটিকে নতুন এক শিল্পমর্যাদা দিয়েছিলেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশেষ চরিত্রাভিনয়ে যাঁরা দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন সত্যব্রত ভৌমিক (সত্যরাম সিংহ), সুকান্ত ভৌমিক (প্রদীপ সিংহ), তপন লাহিড়ী (পুরোহিত), নিমাই মণ্ডল, অরূপ মুখোপাধ্যায়। পত্নীর চরিত্রটিকে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চে সজীব করে তোলেন মৃণা ঘোষ; রুমা চ্যাটার্জির 'অরুন্ধতী', আরতি ঘোষের 'ইন্দিরা'ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন কৃষ্ণগোপাল দে, বাণী সিংহ, অসীম বাড়ৈরী, উমাশঙ্কর চ্যাটার্জি, নিত্যানন্দ অধিকারী, ভাস্কর দাশগুপ্ত, তারামোহন চক্রবর্তী, রবীন্দ্র মিত্র, অমলেন্দুবিকাশ রায়, তারাদাস ব্যানার্জি, এবং সুধাময় মজুমদার।

সার্থক প্রযোজনাটিকে অর্থবহ করে তুলতে দিলীপ ঘোষের মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও বিমান মুখার্জির সঙ্গীত-নির্দেশনা যথেষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

পতুল নাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথার' এক স্বাভাবিক ও সুন্দর নাট্যরূপ সম্প্রতি পরিবেশন করলেন হাওড়া জেলা সমবায় কর্মী সংসদের শিল্পীরা। জ্ঞানদার ঢঙে এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন চিত্ত সেনগুপ্ত, প্রশান্ত চ্যাটার্জি, রবীন বসু, অসিত ভাদুড়ী, অঞ্জন সেন, চন্দন মুখার্জি, প্রফুল ব্যানার্জি, নিত্যানন্দ হালদার, গোপাল চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, দীপা হালদার। সলিল দত্তের নাট্যনির্দেশনায় মুন্সিয়ানার ছাপ আছে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল : বেলঘরিয়ার সংহতী আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—(ক) কিউবা (কুশীলব), (খ) মানুষ (নটপীঠ), (গ) সোনালী স্বপ্ন (আগমন সংঘ); শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—রবীন গোস্বামী (কিউবা); শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—সন্ধ্যা রায় (মানুষ); শ্রেষ্ঠ পরিচালক—শিশু মজুমদার (সোনালী স্বপ্ন); শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—শ্যামসুন্দর দাশগুপ্ত।

বহুরূপীর নতুন নাটক

বহুরূপী ২৮শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার সন্ধ্যা অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে তাঁদের সর্বাধুনিক নাট্যপ্রয়াস বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' সর্বপ্রথম মঞ্চে উপস্থাপিত করলেন। এবং এই পর্যায়ে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত অ্যাকাডেমি মঞ্চে প্রতি রবিবারই অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে। নাটকটির নির্দেশনা শম্ভু মিত্রের। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহ-সঙ্গীতের দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে খালেদ চৌধুরী, তাপস সেন ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটিতে অভিনয় করছেন বহুরূপীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ।

বসন্ত বিচিত্রা : আনন্দ মন্দিরের উদ্যোগে মন্দিরের অন্যতম পরিচালক ক্যাপ্টেন কেশব দের ভবনে গত ১লা ফাল্গুন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। কয়েকটি সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে এবং সুললিত রচনায় ঋতুরাজকে আবাহন ও বন্দনা করেন শ্রীমতী মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী শিপ্রা মিত্র, শ্রীমতী দীপিকা দে ও শ্রীসোমেন চক্রবর্তী। প্রারম্ভে শ্রীমান গৌতম দেব রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে বেহালা বাজিয়ে সভাস্থলে প্রার্থিত পরিবেশ সৃষ্টি করে। উদ্বোধনী ভাষণে সংস্থার সম্পাদিকা শ্রীমতী কল্পনা দে কবিগুরুর বাণী অনুসরণ করে বলেন, দুঃখ আছে, বেদনা আছে, কিন্তু তারই মধ্যে শান্তি, আনন্দ ও অনন্তের অনুভূতি মানুষ কামনা করে, তাই এই ক্ষুদ্র আয়োজন। বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন : সর্বশ্রী দীপক দে, গীতা রায়, সুজয় গুপ্ত, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক গঙ্গোপাধ্যায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ স্বনামধন্য ডি জি (শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়)।

অভিনব শিশু-উৎসব : ভাই-বোনেদের আসরের উদ্যোগে শতাধিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সোনারপুরে কেন্দ্রীয় সংস্থায় কার্তিক স্মরণীয় দিনে এক অভিনব শিশু-উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। আসরের প্রতিষ্ঠাতা শিশু-সাহিত্যিক শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালিত এই অনুষ্ঠান অভিনবত্বের দাবী রাখে।

ছোটদের জন্যে এমন সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান দেখাই যায় না। ছোটদের মনে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, গান, নাচ, সিনেমা, সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতের আন্তঃ-বিদ্যালয় প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষক সম্বর্ধনা অভিনবের সব ব্যবস্থাই ছিল। এই অনুষ্ঠানে শুধু ছোটরাই আনন্দ পায়নি, ছোটরা বিভিন্ন অংশে অংশগ্রহণ করে ছোটদের অভিভাবকসহও আনন্দ পরিবেশনের দক্ষতা দেখিয়েও তাঁদেরও মুগ্ধ করেছে।

এবারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শতাধিক ছোটরা পুরস্কার লাভ করেছে বটে তবে সমবেতকণ্ঠে জাতীয় ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের আন্তঃ বিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের খগেন্দ্র স্মৃতি কাপকেটিসকো পুরস্কারের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারীকে খগেন্দ্র স্মৃতি ফলকও উপহার দেওয়া হয়। 'শিক্ষাগুরুর প্রতি ভক্তি রাখো' অনুষ্ঠানে ছোটদের পক্ষ থেকে বৃদ্ধ শিক্ষক অনুষ্ঠানে ছোটদের পক্ষ থেকে বৃদ্ধ শিক্ষক শ্রীগোকুলচন্দ্র রায় মহাশয়কে একটি গরম আলোয়ান উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। উৎসবের উদ্বোধক ও পৌরোহিত্য করেন শ্রীফণীন্দ্রনাথ হালদার এবং শ্রীতারাকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ফিল্ম এ্যাণ্ড থিয়েটার আরকাইভস অব ইণ্ডিয়া পরিচালিত সুভাষ মঞ্চ, ব্যারাকপুরে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের তৃতীয় বার্ষিক শিশির একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল :

১ম শ্রেষ্ঠ দল—কুশীলব—নাটক 'শতাব্দীর স্বপ্ন' নৈহাটি। ২য় শ্রেষ্ঠ দল—'ইয়ং মেন্স কালচারাল এসোসিয়েশন' নাটক 'বাদক', 'দিদি' নৈহাটি। ৩য় শ্রেষ্ঠ দল মন্দিরা, নাটক 'দ্বিতীয় বিশ্ব' ব্যারাকপুর। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি—'এক ঝাঁক বুনো হাঁস'—নাট্যকার শেখর সরকার 'বিনয় মাধবী কুঞ্জ' কলকাতা। প্রথম অভিনীত শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি—'শপথ নিয়ে যাই', নাট্যকার অর্ধেন্দুবিকাশ দাস। বলাকা, ব্যারাকপুর। শ্রেষ্ঠ পরিচালক— সুনীল চট্টোপাধ্যায়, নাটক—'এক ঝাঁক বুনো হাঁস' বিনয়-মাধবী কুঞ্জ, কলকাতা। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—শ্রীজিৎ দাস (বজনাথ) নাটক—'সম্পত্তি সমর্পণ' পাঞ্চজন্য, কলকাতা। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। নাটক—'বাদক'। 'ইয়ং মেন্স কালচারাল এসোসিয়েশন', নৈহাটি। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—বুলা মিত্র (কমলা), নাটক 'বুদবুদ', চলন্তিকা সাংস্কৃতিক পরিষদ, দুর্গাপুর। শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী—স্বপ্না মুখোপাধ্যায় (মায়া), নাটক 'দ্বিতীয় বিশ্ব' মন্দিরা, ব্যারাকপুর। শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা—অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য মশায়), নাটক 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'পাঞ্চজন্য', কলকাতা। শ্রেষ্ঠ শিশু-অভিনেতা—অর্ণব ভট্টাচার্য (নিতাই)। নাটক 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'পাঞ্চজন্য', কলকাতা।

অভিনব চিত্রধর্মী মাসিক

আলোছায়া

সগৌরবে প্রকাশ হচ্ছে...

প্রতি সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প, শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প, বিভিন্ন অভিনব ফিচার, গান স্বরলিপি চলচ্চিত্র ফোনটেস্ট ও অসংখ্য চিত্রতারকার রঙীন ছবি সমৃদ্ধ।

প্রতি সংখ্যা ১, টাকা : বার্ষিক ১২,

১৩/এ, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

খেলাধুলা

দর্শক

টেস্টে ভারতীয় রেকর্ড

কিংস্টনে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের চলতি প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে নতুন রেকর্ড হয়েছে এবং এই রেকর্ডগুলি ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের টেস্ট খেলায়।

(১) ২১২ রান—দিলীপ সারদেশাই। এই ২১২ রান তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের পূর্ব রেকর্ড : ১৭২ নট আউট—পলি উমরিগড় (ত্রিনিদাদ, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬২)।

(২) ৭ম উইকেট জুটিতে ১৩৭ রান—একনাথ সোলকার (৬১ রান) এবং দিলীপ সারদেশাই। পূর্ব রেকর্ড : ১৩৪ রান—চান্দু বোরদে এবং হেমু অধিকারী (নিউ দিল্লী। ৫ম টেস্ট, ১৯৫৮)।

(৩) ৯ম উইকেট জুটিতে ১২২ রান—এরাপল্লী প্রসন্ন এবং দিলীপ সারদেশাই। পূর্ব রেকর্ড : ৯৫ রান—বুধি কুন্দরন এবং ভেংকটরাঘবন (বোম্বাই, প্রথম টেস্ট, ১৯৬৬)।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

সপ্তম টেস্ট ম্যাচ

ইংল্যাণ্ড : ১৮৪ রান (ইলিংওয়ার্থ ৪২ রান। জেনার ৪২ রানে ৩ এবং ও'কিফ ৪৮ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৩০২ রান (লাকহার্স্ট ৫৯, এডরিচ ৫৭ এবং ডি'ওলিভিয়েরা ৪৭ রান। ও'কিফ ৯৬ রানে ৩ এবং জেনার ৬৫ রানে ৩ উইকেট;

অস্ট্রেলিয়া : ২৬৪ রান (রেডপাথ ৫৯ এবং জি চ্যাপেল ৬৫ রান। লেভার ৪৩ রানে ৩ এবং উইলিস ৫৮ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৬০ রান (স্ট্যাকপোল ৬৭ রান। ইলিংওয়ার্থ ৩৯ রানে ৩ উইকেট)

সিডনিতে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার শেষ ৭ম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৬২ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ২-০ খেলায় (ড্র ৫) 'রাবার' জয়ী হয়েছে এবং সেই সূত্রে কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' সম্মান লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১২ বছর পর ইংল্যান্ড পুনরায় এই 'এ্যাসেজ' সম্মান ফিরে পেল। ১৯৫৮-৫৯ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৪-০ খেলায় (ড্র ১) ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে 'এ্যাসেজ' পেয়েছিল। তারপর ১৯৭০-৭১ সালের সিরিজ ধরে এই দুই দেশের যে ৬টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ২বার, সিরিজ ড্র [illegible]

দিলীপ সারদেশাই : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১ম টেস্টের ১ম ইনিংসে ২১২ রান করেছেন।

৯৬ বছরে (১৮৭৬-১৯৭১) ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫০টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে এবং তার ফলাফল সমান দাঁড়িয়েছে : অস্ট্রেলিয়ার জয় ২২, ইংল্যাণ্ডের জয় ২২ এবং সিরিজ ড্র ৬বার। এই ৫০টি টেস্ট সিরিজে যে ২১০টি টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮০, ইংল্যাণ্ডের জয় ৬৮ এবং খেলা ড্র ৬২। টেস্ট সিরিজের ফলাফল সমান হলেও টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮০-৬৮ খেলায় এগিয়ে আছে।

বর্তমান টেস্ট সিরিজের এই শেষ সপ্তম টেস্ট খেলাটি উভয় দলের কাছেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 'এ্যাসেজ' সম্মান পুনরুদ্ধার করতে ইংল্যাণ্ডকে অন্তত খেলা ড্র করতেই হবে, যেহেতু তারা ১-০ খেলায় অগ্রগামী। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ সাল থেকে উপর্যুপরি ৫টি টেস্ট সিরিজে দুবার 'রাবার' জয় এবং তিনবার সিরিজ ড্র করার সূত্রে কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' যেভাবে ধরে রেখেছিল, তা এই শেষ সপ্তম টেস্ট খেলায় জিততে না পারলে হাতছাড়া হবে। এই শেষ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। ষষ্ঠ টেস্ট খেলায় যাঁরা [illegible]

এই চারজনের মধ্যে অধিনায়ক বিল লরী ছিলেন। শেষ টেস্ট খেলায় শুধু দলেই কেবল-মাত্র নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন না। আহত থাকার ফলে ইংল্যাণ্ডের জিওফ বয়কট খেলেননি। বর্তমান টেস্ট সিরিজে বয়কট উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট ৬৫৭ রান (গড় ৯৩-৮৫) করেছেন। অস্ট্রেলিয়া দলে খেলেননি বিল লরী এবং ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী।

অস্ট্রেলিয়ার নতুন অধিনায়ক আয়ান চ্যাপেল টসে জয়ী হয়ে ইংল্যাণ্ডকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান।

প্রথম দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৮৪ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার ভবিষ্যতের পক্ষে এই রান মোটেই আশাপ্রদ নয়। তবে ১০ রানের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের দুটো উইকেট নিয়ে ইংল্যাণ্ড বেশ জোর পেয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৩৫ (৭ উইকেটে)। ফলে তারা ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ১৮৪ রানের থেকে ৫১ রানে এগিয়ে যায়। ৫ম উইকেটের জুটিতে ওয়ালটার্স এবং রেডপাথ [illegible]

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২৬৪ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৮০ রানে অগ্রগামী হয়। তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড ৪ উইকেট খুইয়ে ২২১ রান তুলে ১৪১ রানে এগিয়ে যায়। হাতে জমা থাকে ২য় ইনিংসের ৬টা উইকেট, ৫ম উইকেট জুটিতে বেসিল ডি'ওলিভিয়েরা এবং অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ দলের ৬৪ রান তুলে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের ১৫ মিনিট পর ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ৩০২ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া ২২২ রানের পিছনে পড়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৫ উইকেট খুইয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় জয়লাভের জন্যে তাদের আরও ১০০ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে জমা ছিল ২য় ইনিংসের ৫টা উইকেট এবং পুরো একদিনের খেলা। ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের শেষ ৬ জন খেলোয়াড় মাত্র ৭০ রান সংগ্রহ করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা শুভ হয়নি। কোন রান হওয়ার আগেই জন স্নোর বলে তাদের প্রথম উইকেট (ইস্টউড) পড়ে যায়। অপর দিকে ইংল্যান্ডকেও দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে হয়েছিল। জন স্নো বল ধরতে গিয়ে সীমানার বেড়াতে প্রচণ্ড বাধা পান। ফলে তাঁর ডান আঙুল ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাঠ থেকে হাসপাতালে ছুটতে হয়েছিল। এই দিন তিনি মাত্র ২ ওভার বল দিয়েছিলেন।

খেলার শেষ পঞ্চম দিন। খেলায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার আর ১০০ রান প্রয়োজন। হাতে জমা ৫টা উইকেট এবং এক দিনের খেলার সময়। ইংল্যান্ডের নামী খেলোয়াড় ফাস্ট বোলার জন স্নো আহত থাকায় খেলতে পারেন না। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ারই পোয়াবারো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া শেষ দিনে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১০০ রান তুলতে পারেনি। তাদের ২য় ইনিংস ১৬০ রানের মাথায় শেষ হয়। টেরী জেনার লাঞ্চের ২৫ মিনিট আগে ডেরেক আন্ডারউডের বল খেলতে গিয়ে ফ্রেচারের হাতে ধরা পড়লে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার শেষ পাঁচজন খেলোয়াড়কে আউট করতে ইংল্যান্ডকে ২০.৬ ওভার বল খেলতে হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার এই শেষ পাঁচজন খেলোয়াড় মাত্র ৩৭ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

প্রথম খেলা : ১৮৭৭ শেষ খেলা ফেব্রুয়ারী ১৭, ১৯৭১

টেস্ট খেলার ফলাফল

স্থান	মোট খেলা	ইংলন্ড জয়ী	অস্ট্রেঃ জয়ী	খেলা ড্র
অস্ট্রেলিয়াতে	১১৬	৪২	৫৫	১৭
ইংল্যান্ডে	৯৬	২৬	২৫	৪৫
	২১২	৬৮	৮০	৬২

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

অস্ট্রেলিয়াতে	২৬	১০	১২	৪
ইংল্যান্ডে	২৪	১২	১০	২
মোট	৫০	২২	২২	৬

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় উভয় দলের পক্ষে শীর্ষ স্থান লাভ করেছেন ইংল্যান্ডের জিওফ বয়কট—খেলা ৬, ইনিংস ১০, নটআউট তিনবার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৪২ নটআউট, মোট রান ৬৫৭ এবং গড় ৯৩-৮৫। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষ স্থান পেয়েছেন কিথ স্টাকপোল—খেলা ৭, ইনিংস ১২, নটআউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৭, মোট রান ৬২৭ এবং গড় ৫২-২৫।

বোলিংয়ের গড় তালিকায় উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক (৩১টি) উইকেট পেয়েছেন ইংল্যান্ডের জন স্নো। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ের গড় তালিকায় সর্বাধিক ১৪টি উইকেট পেয়েছেন জন গ্লিসন।

টেস্ট সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ড (৭টি) : জন এডরিচ—১১৫ নটআউট (২য় টেস্ট) এবং ১৩০ (৬ষ্ঠ টেস্ট); লাকহার্স্ট—১৩১ (২য় টেস্ট) এবং ১০৯ (৫ম টেস্ট); জিওফ বয়কট—১৪২ নটআউট (৪র্থ টেস্ট) এবং ১১৯ নটআউট (৬ষ্ঠ টেস্ট); বেসিল ডি'ওলিভিয়েরা—১১৭ (৫ম টেস্ট)।

অস্ট্রেলিয়া (৭টি) : কিথ স্টাকপোল—২০৭ (১ম টেস্ট) ও ১৩৬ (৬ষ্ঠ টেস্ট), ডগ ওয়ালটার্স—১১২ (১ম টেস্ট), আয়ান রেডপাথ—১৭১ (২য় টেস্ট), গ্রেগ চ্যাপেল—১০৮ (২য় টেস্ট) এবং আয়ান চ্যাপেল ১১১ (৫ম টেস্ট) ও ১০৪ (৬ষ্ঠ টেস্ট)।

নগদ পুরস্কার

ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার জন স্নো এই তিনটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে নগদ ২৫০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (২০০৮ টাকা) পুরস্কার পেয়েছেন—সিরিজে সর্বাধিক উইকেট (৩১টি), সিরিজে সর্বাধিক খেলোয়াড়কে বোল্ড আউট (১১ জনকে) এবং একটি টেস্ট খেলায় সর্বাধিক উইকেট (৯টি)।

ডাঃ বি সি রায় ট্রফি

১ম জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ২-০ গোলে আসামকে পরাজিত করে মোট চারবার ডাঃ বি সি রায় ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। সেমিফাইনালে বাংলা ২-০ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে এবং আসাম ২-১ গোলে কেরালাকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

বিজয়ী দল

১৯৬২ বাংলা, ১৯৬৩ দিল্লী এবং মহীশূর (যুগ্ম বিজয়ী), ১৯৬৪ রাজস্থান, ১৯৬৫ দিল্লী, ১৯৬৬ অন্ধ্রপ্রদেশ, ১৯৬৭ বাংলা, ১৯৬৮ বাংলা, ১৯৬৯ উড়িষ্যা এবং কেরালা (যুগ্ম বিজয়ী) এবং ১৯৭০ বাংলা।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

কিংস্টনের প্রথম টেস্ট ড্র গেছে। বর্তমানে এই দুই দেশের টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল : খেলা ২৪, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১২, ভারতবর্ষের জয় ০ এবং ড্র ১২।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতবর্ষ : ৩৮৭

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২১৭ ও ৩৮৫ (৫ উইঃ)

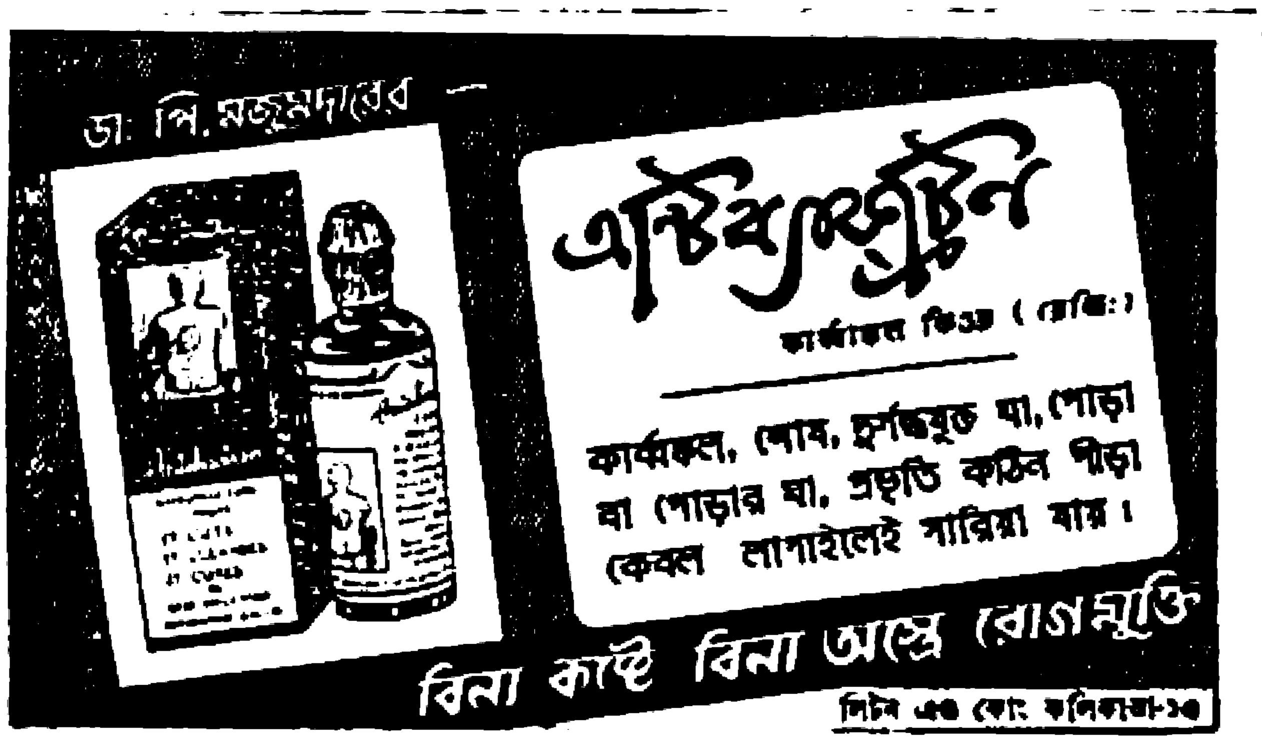

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীঅশোক সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১৯, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমগ্র রচনার মনোজ্ঞ সংকলন

বিভূতি রচনাবলী

৪র্থ ও ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে

॥ দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে ॥

বিখ্যাত সমালোচক কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত হইয়া ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান ভূমিকালঙ্কৃত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড ১৪্ টাকা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

বাংলা পকেট বই

প্রথম দফার সাতটি উপন্যাস ॥ সাতজন বিখ্যাত লেখক

আশাপূর্ণা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অবধূত, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সমথনাথ ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

যাঁরা অগ্রিম দু টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন তারা চৌদ্দ টাকা সাতখানি উপন্যাস আর মাত্র নটাকা কুড়ি পয়সায় পাবেন।

৩০শে মার্চ পর্যন্ত গ্রাহক করা হবে।

আগামী ১৪ই এপ্রিল বইগুলি প্রকাশিত হইতেছে। প্রতিটি দু' টাকা।

৯ই মার্চ ১৯৩৬　　৯ই মার্চ ১৯৭১

আগামী ৯ই মার্চ আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমরা আমাদের গ্রাহক, পাঠক, ক্রেতা সাধারণ, এজেন্ট মহোদয়, লেখক ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাইতেছি। তাঁহাদের সকলের প্রীতি, সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতাই এই যাত্রাপথে এতকাল পাথেয় যোগাইয়াছে—আশা করি, ভবিষ্যতেও তাঁহাদের সে সহৃদয়তা হইতে বঞ্চিত হইব না।

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার	১০্
কান্তকবি রচনা সম্ভার	১০্
গিরিশ রচনা সম্ভার	১২॥০
দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা সম্ভার	১০্
ত্রৈলোক্য রচনা সম্ভার	১২্
বিহারীলাল রচনা সম্ভার	১০্
বঙ্কিম রচনা সম্ভার	১২॥০
ভূদেব রচনা সম্ভার	১০্
মাইকেল রচনা সম্ভার	১০্
রমেশ রচনা সম্ভার	১০্

প্রতিটি রেক্সিনে বাঁধাই ॥ সোনার জলে ছাপা

আমাদের প্রকাশিত রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

ইছামতী	(১৩৫৭)	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৯্
কেরী সাহেবের মুন্সী	(১৩৬৬)	প্রমথনাথ বিশী	১০্
কড়ি দিয়ে কিনলাম	(১৩৭০)	বিমল মিত্র	৩৪্
প্রথম প্রতিশ্রুতি	(১৩৭৩)	আশাপূর্ণা দেবী	১৪্
রাজস্থান কাহিনী	(১৩৭৩)	কালিকারঞ্জন কানুনগো	৮॥০
আর কোনোখানে	(১৩৭৫)	লীলা মজুমদার	৫্

॥ আমাদের প্রকাশিত রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ ॥

গল্প আর গল্প	(১৩৫৮)	সুখলতা রাও	৩॥০

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা : ১২　৩৪৮৭৯১/৩৪৩৪৯২

ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিসন ইন্‌সটিটিউট অব্‌ ইণ্ডিয়া

পুণা ৪

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

১ জুলাই, ১৯৭১ তাং হইতে আরম্ভের শিক্ষাবর্ষের জন্য নিম্নোক্ত নির্ধারিত পাঠক্রমসমূহের প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত আহূত হইতেছে।

১। চিত্র পরিচালনা (তিন বৎসর)। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : কলা বা বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা ইহার সমতুল। বয়স : ১-৭-১৯৭১ তাং ১৯ ও ৩০ বৎসরের মধ্যে।

২। চিত্রনাট্য রচনা (তিন বৎসর)। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : কলা ও বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা ইহার সমতুল। বয়স : ১-৭-১৯৭১ তাং ১৯ ও ৩০ বৎসরের মধ্যে।

৩। মোশন পিকচার ফোটোগ্রাফি (তিন বৎসর)। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যাসহ ইণ্টারমিডিয়েট বা ত্রিবর্ষ ডিগ্রী পাঠক্রমের প্রথম বর্ষ বা ইহার সমতুল বা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্য অনুমোদিত শিক্ষায়তন হইতে ফলিত কলায় (অঙ্কন) ডিগ্রী/ডিপ্লোমা। ডিপ্লোমা কোর্স ম্যাট্রিকুলেশনের পর অন্যূন দুই বৎসর স্থায়িত্বের হইবে।

৪। সাউণ্ড রেকর্ডিং ও সাউণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং (তিন বৎসর)। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও গণিতসহ ইণ্টারমিডিয়েট বা ত্রিবর্ষ ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বর্ষ বা ইহার সমতুল। বয়স : ১-৭-১৯৭১ তাং ১৭ ও ৩০ বৎসরের মধ্যে।

৫। চিত্র সম্পাদনা (দুই বৎসর)। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : কলা বা বিজ্ঞানে ইণ্টারমিডিয়েট বা ত্রিবর্ষ ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বর্ষ বা ইহার সমতুল। বয়স : ১-৭-১৯৭১ তাং ১৭ ও ৩০ বৎসরের মধ্যে।

৬। চিত্রাভিনয় (দুই বৎসর)। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিষয়সমূহের একটি হিসাবে ইংরেজীসহ ম্যাট্রিকুলেশন বা ইহার সমতুল। হিন্দী/উর্দুর কাজ চালাইবার জ্ঞান আবশ্যিক। উপযুক্ত মহিলা প্রার্থিগণের ক্ষেত্রে যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। বয়স : ১-৭-১৯৭১ তাং মহিলাদের জন্য ১৬ ও ২৫ বৎসরের মধ্যে এবং পুরুষদের জন্য ১৮ ও ২৫ বৎসরের মধ্যে।

১৯৭১-এর এপ্রিল, মে বা জুন মাসে যে প্রার্থী যোগ্যতাবিধায়ক বিশ্ববিদ্যালয়/পর্ষদের পরীক্ষায় বসিয়াছেন বা বসিবেন এবং দরখাস্ত পাঠাইবার সময় যাঁহার ফল পাওয়া যায় নাই, এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার (পুং/স্ত্রী) কলেজ/স্কুলের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে একটি সার্টিফিকেট তাঁহার (পুং/স্ত্রী) দরখাস্তের সহিত থাকিলে ইন্সটিটিউটের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসিবার জন্য তিনিও যোগ্য হইবেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মনোনীত হইলে আবশ্যকীয় বিশ্ববিদ্যালয়/পর্ষদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্র সমেত ৩১ জুলাই, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে তৎকর্তৃক (পুং/স্ত্রী) পেশ-করা সাপেক্ষে তাঁহাকে (পুং/স্ত্রী) সর্তাধীনভাবে ভর্তি করা হইবে। অন্যথায় তাঁহার (পুং/স্ত্রী) সর্তাধীন ভর্তি স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হইয়া যাইবে এবং আদায়প্রদত্ত ফী প্রত্যর্পিত হইবে না।

একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার ভিত্তিতেই বিভিন্ন পাঠক্রমে ভর্তি করা হইবে। চিত্রপরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা, মোশন পিকচার ফোটোগ্রাফি, সাউণ্ড রেকর্ডিং ও সাউণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং এবং চিত্র সম্পাদনার পাঠক্রমসমূহের জন্য পরীক্ষায় একটি লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা থাকিবে। ১ মে ১৯৭১ তাং রবিবার এলাহাবাদ, বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও রাঁচিতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার যোগ্যতা বিধায়ক মার্কস অর্জনকারী সকল প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হইবে এবং উহা ২১ জুন, ১৯৭১ তাং হইতে পুণার ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হইবে।

চিত্রাভিনয়ের পাঠক্রমের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতিযোগিতামূলক অভিনয়/স্বরের পরীক্ষা থাকিবে। এই সকল পরীক্ষা ১৯৭১-এর মে মাসে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হইবে। এই সকল পরীক্ষার সঠিক তারিখ উপযুক্ত সময়ে প্রার্থিগণকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

যে সকল প্রার্থী সংশ্লিষ্ট পাঠক্রমসমূহে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী এবং উহার জন্য সন্তোষজনক সাক্ষ্য পেশ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার, অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, বিহার, গুজরাট, কেরল, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, ওড়িশা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারসমূহ ও তামিলনাডু সঙ্গীত নাটক সংসদ এবং পণ্ডিচেরী ও গোয়া, দমন ও দিউয়ের ইউনিয়ন টেরিটরী কর্তৃক উপযুক্ত ছাত্রগণকে প্রদানের জন্য কয়েকটি বৃত্তি প্রদত্ত হয়। চিত্রাভিনয় পাঠক্রমে অতিরিক্ত বৃত্তি আছে, যেমন ছাত্রীর জন্য মাসিক ২৫০্‌ টাকার হিন্দুস্তান লিভার বৃত্তি এবং উপযুক্ত ছাত্রের জন্য, বাছাইকৃত ছাত্রীর জন্য মাসিক ১৫০্‌ টাকা পুরস্কারের মেমোরিয়াল বৃত্তি। ইন্সটিটিউট কর্তৃক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক হোস্টেল চালিত হয়।

ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষকে আদায় দেয় ১্‌ টাকার একটি রেখিত পোস্টাল অর্ডার এবং একটি স্ব ঠিকানা লিখিত ৫০ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত ২৫ সেমিঃ × ১৮ সেমিঃ মাপের খামসহ লিখিত ভাবে অনুরোধক্রমে পুণা—৪, ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিসন ইন্সটিটিউট অব ইণ্ডিয়ার অধ্যক্ষের নিকট হইতে দরখাস্ত ফর্ম, পাঠক্রমসমূহের বিবরণ, প্রবেশিকা পরীক্ষা, বৃত্তি ইত্যাদি সম্বলিত প্রস্পেক্টাস পাওয়া যাইবে।

১্‌ টাকার পোস্টাল অর্ডার ও স্ব ঠিকানা লিখিত ডাকটিকিটযুক্ত খাম না থাকিলে অনুরোধ গ্রাহ্য হইবে না। নগদে, মণি অর্ডারে বা চেকে টাকা প্রেরণ গৃহীত হইবে না।

প্রামাণিক কাগজপত্রসহ ভর্তির জন্য সম্পূর্ণীকৃত দরখাস্ত ৫্‌ টাকার একটি রেখিত পোস্টাল অর্ডারসহ ১-৪-'৭১ তারিখের মধ্যে ইন্সটিটিউটে পৌঁছান আবশ্যক। অসম্পূর্ণ দরখাস্ত বা আবশ্যকীয় পোস্টাল অর্ডার/ফোটোগ্রাফ না থাকিলে সেই দরখাস্ত বাতিল হইয়া যাইবে।

দি ফিল্ম ইন্সটিটিউট অব্‌ ইণ্ডিয়া এক্ষণে দি ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিসন ইন্সটিটিউট অব্‌ ইণ্ডিয়া, হিসাবে পুনর্নামাঙ্কিত হইয়াছে।

বর্তমানে নূতন প্রার্থিগণের জন্য টেলিভিসনের নিমিত্ত অনুরূপ পাঠক্রম প্রাপ্তব্য নহে। ঐগুলি চালাইবার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে টেলিভিসনের পাঠক্রমসমূহ ঘোষণা করা হইবে। সুতরাং টেলিভিসন পাঠক্রম সম্পর্কে কোনরূপ অনুসন্ধানের উত্তর দেওয়া হইবে না।

ডিএভিপি ৭০।৬৮১

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৩শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 5th March, 1971 শুক্রবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৩৭৭ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩২৪	চিঠিপত্র		
৩২৬	নানা চোখে		—শ্রীসন্ধানী
৩২৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৩৩১	সম্পাদকীয়		
৩৩২	একটি জীবনচরিত	(কবিতা)	—শ্রীসুনীলকুমার গুপ্ত
৩৩২	শব্দ	(কবিতা)	—শ্রীপরমেশ মজুমদার
৩৩২	এ আমার দীর্ঘ বনভূমি	(কবিতা)	—শ্রীসৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়
৩৩৩	কানুন	(গল্প)	—শ্রীনিতাই দে
৩৪০	ভারতবন্ধু জেমস কেয়ার হার্ডি		—শ্রীশিবদাস চৌধুরী
৩৪৩	খাঁচার পাখি	(বড় গল্প)	—শ্রীমানব সান্যাল
৩৫০	বাবু গৌরবের শেষ সন্ধ্যায়		—শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
৩৫৩	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫৯	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৩৬২	আনা লেখার্দ		—শ্রীবিমল বসু
৩৬৩	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৩৬৬	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্দিৎসু
৩৬৮	নিলাম হবে	(বড় গল্প)	—শ্রীরাখী ঘোষ
৩৭২	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৩৭৫	পিঞ্জর	(উপন্যাস)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৩৮০	জল ও বাতাস দূষিত হওয়ার সমস্যা		—শ্রীবরুণকান্ত
৩৮২	ফুলন ডাক্তার	(গল্প)	—শ্রীপরিতোষ মজুমদার
৩৮৭	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৩৮৮	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—চিত্ররসিক
৩৮৯	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৩৯১	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৩৯৩	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৩৯৭	খেলার কথা		—শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র
৩৯৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

সাপ্তাহিক অমৃতের স্বত্বাধিকারিবৃন্দ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের বিবরণ। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারীর শেষ তারিখের পরবর্তী প্রথম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিতব্য।

ফর্ম ৪
(রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশনের স্থান—১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

২। প্রকাশনার সময়ক্রম—সাপ্তাহিক, প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিতব্য।

৩। মুদ্রকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার। নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার। নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৬। যে সব ব্যক্তি পত্রিকাটির মোটালার শতকরা এক অংশের বেশী শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা : সর্বশ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার (মৃত) ১৭১এ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা—২৬; প্রাণতোষ ঘটক (মৃত) ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯; মুরারীবিলাস রায়চৌধুরী, ৭৫, কমালী নস্কর রোড, বেহালা; মনোজ বসু, পি-৫৬০ লেক রোড, কলিকাতা—২৯; গজেন্দ্রকুমার মিত্র কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা; সুমথনাথ ঘোষ, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা; বিন্দু মুখোপাধ্যায় ১২ডি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা—৫; ভবানী মুখোপাধ্যায় ১৬, অভয় মিত্রশঙ্কর রোড, কলিকাতা—৩৪; তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, ৬, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা—৪; অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩; তুষারকান্তি ঘোষ ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩; শচীবিলাস রায়চৌধুরী, ৭৫, কমালী নস্কর রোড, বেহালা এবং প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

আমি সুপ্রিয় সরকার এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্বাঃ/সুপ্রিয় সরকার

তাং—২৫-২-৭১।

পি. ব্যানার্জীর
অর্শ চিকিৎসা
৩০ পিল টাঃ ২.৫০
১৬ পুরিয়া চূর্ণ ২.২৫
মলম ৩০ গ্রাঃ ২.৫০
বিনামূল্যে বিবরণী দেওয়া হয়
পি. ব্যানার্জী
৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫
৫০, গ্রে স্ট্রিট, কলিকাতা-৬
১১৮এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

নিবেদন

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

পুস্তকের ২য় সংস্করণ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়াছে এবং বহুল পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। সেই ৩য় সংস্করণের মূল্য ছয় টাকা ও শোভন সংস্করণের জন্য আট টাকা নির্ধারিত হইয়াছে।

পুস্তকের পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া অর্ডার বুক করিলে, পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পরেই আমরা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ করিয়া দিব। কোন ডাক খরচা লাগিবে না।

চিঠিপত্র

নিকটেই আছে প্রসঙ্গে

'নিকটেই আছে' বিভাগে দশম বর্ষ ৪১ সংখ্যায় স্পনসর্ড কলেজের অধ্যাপকরা যে তাস আর দাবা খেলে সময় কাটান আর টিউশনী করেন, তার সুন্দর ছবি আঁকা রয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা উল্লেখ না করলে আলেখ্যটা একচোখো হয়ে যাবে।

(১) স্পনসর্ড কলেজের অধ্যাপকেরা মাস গেলে কি মাইনে পান তা সম্বিৎসু জানেন কি? পুরানো ২০০-১৫-৫০০ স্কেলে মাইনে এবং কলেজ ডি-এ ১৭-৫০ পয়সা তাঁরা মাসে মাসে পান। আমি আট বছর কাজ করছি স্পনসর্ড কলেজে, আমার মাইনে ৩০৫ টাকা, আর কলেজ ডি-এ ১৭-৫০ পয়সা। এর থেকে কাটা যাবে প্রভিডেন্ট ফান্ড। দিতে হবে অধ্যাপক সমিতির চাঁদা। কাটা যাবে আয়কর বাবদ কিছু, কারণ বাৎসরিক আয়ের অঙ্কে আমরা ট্যাক্স দেবার গোষ্ঠীতে পড়ি। তারপর যা থাকবে তা থেকে আমি আমার স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা, ভাইবোনের সংসার চালাতে পারবো কি, যদি দু-একটা টিউশনী বা অন্য শিফট বা পার্ট-টাইমের কাজ না পাই?

টিউশনী বা অন্য শিফট বা পার্ট-টাইমের দিকে সকলের ভাগ্যে জোটে না।

সরকারী ডি-এ অথবা নতুন স্কেলের বকেয়া ন' মাস ছ' মাস বা এক-দেড় বছর বাদে পাওয়া, যখন আমরা ধারে দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়েছি।

পরীক্ষার খাতা দেখার টাকা গত বছরেরটা আজও পাইনি।

সম্বিৎসু মশায় যদি একটু খবর নেন, আমরা কিভাবে আছি তাহলে ভাল হয়। আমাদেরও খেয়ে-পরে বাঁচতে হয়। নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অসুখ-বিসুখ, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, কারো বিয়ে, পৈতে, বিভিন্ন ধরনের চাঁদা আত্মীয়স্বজনের কাছে কখনো যাওয়া-আসা বা নিজেদের বাড়ি যাওয়ার খরচ, সবই কোনভাবে চালাতে হয়।

(২) কলেজে ছুটির সংখ্যা বেশী, তার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাপকরা দায়ী নন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য ঘর দখল করা আছে, সরকারী ছুটি আছে, ধর্মীয় উপলক্ষ আছে, যার কোন একটা না মানলে হৈচৈ কাণ্ড উঠবে। গরমের ছুটি আর পূজার ছুটি বেশ বড় বড় মনে হয়, কিন্তু হিসাব করে দেখবেন কি গরমের ছুটির কটা দিন পরীক্ষার জন্য ঘর দখল থাকে, আর পূজার ছুটির কতদিন ধর্মীয় উপলক্ষ থাকে?

(৩) যাঁরা অফিসে কাজ করেন, বিকেল পাঁচটায় দপ্তর বন্ধ করে তাঁদের ছুটি। আমাদের তা উপায় নেই। পরের দিন অনার্স ক্লাশে জটিল কোন তত্ত্ব সরল করে বোঝাতে হবে, অতএব বই খোলো। নিত্য নতুন থিওরী বদল হচ্ছে তার খবর রাখো। একটা বইয়ে ভাল উত্তর নেই, দশটা বই দেখে ছাত্রদের বোঝাও। কেন মশাই, আমাদের ব্যক্তিগত সময়টা খরচ করতে হবে, যার জন্য আর্থিক অথবা আধিক কোন উপকারই পাবো না?

আমাদের প্রতি সপ্তাহের বরাদ্দ ক্লাশ হয়ত দশটা পাঁচটা চাকরীর সময়ের অঙ্কের চেয়ে কম। কিন্তু কাজের তফাত আছে। তাছাড়া ডিপার্টমেন্টে লোক কম থাকলে অতিরিক্ত যে ক্লাশ আমরা নিতে বাধ্য হই, তার হিসেব কে করবে?

(৪) আমাদের ব্যক্তিগত জীবন বলতে কিছু থাকবে না। লোকে চাইবে আমরা একটা মুখোশ পরে থাকি। কেন? আমার এক বন্ধু অফিস থেকে বেরিয়ে পথের ধারে ফুচকা খেতে দাঁড়িয়ে গেল, অথবা হিন্দী বা বাংলা সিনেমায় ঢুকে গেল—পথে দাঁড়িয়ে জমিয়ে আড্ডা মারল, সেখানে আমি অধ্যাপক হয়ে সরে সরে থাকলাম।

আমার স্ত্রীর যদি সখ হয় সিনেমা দেখবেন আমার সঙ্গে তাহলে সতর্ক চিত্তে নাইট শোতে এবং ভাল বই বেছে যেতে হবে, পাছে কোন ছাত্র বা অভিভাবক দেখে ফেলে।

(৫) সম্বিৎসু যা বলতে চেয়েছেন, সেই পরিবর্তন আনতে গেলে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব অভিভাবককেও নিতে হবে। অধ্যাপকদের খেতে পরতে দেবার মত মাইনে দিতে হবে। শিক্ষা সংস্কারের নামে বড় বড় কথা না বলে আদর্শ শিক্ষা ধারার পরিষ্কার ছবি তুলে ধরতে হবে।

কিন্তু এত সব কাজের ভার সবাই নিতে চাইবেন কি?

বিবেকজ্যোতি মৈত্র (অধ্যাপক),
বাঁকুড়া

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক অমৃততে যেসব গল্প, উপন্যাস ও কবিতা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে বহু নতুন লেখকের নাম পাচ্ছি। বর্তমানে সম্পাদক মহাশয় যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন লেখকদের সুযোগ দিচ্ছেন তার জন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। উঠতি লেখকরা যে নামী লেখকদের চেয়ে যে কিছু কম নন, সেটা অমৃতের ধারাবাহিক লেখাগুলির মধ্যেই প্রস্ফুটিত।

বর্তমানে প্রকাশিত শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি যতই পড়ছি ততই লেখকের রচনাশৈলীর অপূর্ব পরিচয় পাচ্ছি। যখন যে চরিত্র বিশ্লেষণ করি, মনে হয় লেখক যেন সেই চরিত্রটির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তবে এরকম সৃষ্টি করেছেন।

সম্পাদক মহাশয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তাঁর বিষয় নির্বাচনের জন্য।

অশোক মুখোপাধ্যায়,
কলকাতা-৩১

খেলার কথা প্রসঙ্গে

কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ এবং সেই সঙ্গে 'খেলার কথা' লেখার জন্য সাগ্রহে অমৃতের প্রত্যেকটি সংখ্যার দিকে তাকিয়ে থাকি। ২৭শে মাঘের অমৃতে অজয় বসুর নিবন্ধটি আগ্রহের সঙ্গেই পড়লাম। লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে না পারলেও লেখার অনেক অংশ বেশ ভালই লাগল।

লেখক মহাশয় ঠিকই বলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সে দাপট আর এখন নেই। সেখানে এখন জোর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তাদের ভাঙাঘরে অতর্কিতে হানা দিয়ে আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত জয়লাভের মুকুটটি মাথায় পরার সুবর্ণ সুযোগ। অসম্ভব হলেও তাকে সম্ভব করে তোলার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। লেখকের মতে আমাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। এক জায়গায় তিনি বলেছেন 'পাঁচ-পাঁচটি টেস্ট হেরে যাওয়ার চেয়ে আরও শোচনীয় কাণ্ড যখন ঘটতেই পারে না, তখন একেবারে হাল ছাড়ার কোন হেতু নেই।' ওরা এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে ঠিক এই সময় আমরা কি আরও শক্তিশালী দল গঠন করে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারতাম না?

লেখকের মতে, সরদেশাইয়ের দলভুক্তি ছাড়া দল গঠন ন্যায়সঙ্গতই হয়েছে। লেখকের এ বক্তব্য যে সত্য নয় তার জবাব সরদেশাই সাবিনা পার্কে ভালো করেই দিলেন। প্রতি

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

কথা বলতে কি, সরদেশাই দলে না থাকলে ভারতীয় দলের যে কি নিদারুণ অবস্থা ঘটতো, তা ভাবতেই খারাপ লাগছে।

আমার মতে সরদেশাইয়ের দলভুক্তি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে। তবে ভারতীয় দলকে শক্তিশালী করার জন্য আরও কয়েকজনকে এবারের সফরে দলভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল। আর সেটা ভারতীয় দলের স্বার্থেই।

এবারের দলে—এস অমরনাথ, চন্দ্রশেখর, পতৌদি, ইঞ্জিনীয়ার ও সুর্তি থাকলে আমরা অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারতাম।

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিধিনিষেধ আরোপের ফলে ইঞ্জিনিয়ার ও সুর্তিকে দলভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে ও'দের দুজনকে দলভুক্ত করা হলে ভারতীয় দল অনেক বেশী শক্তিশালী হতে পারতো, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মনসুর পতৌদি সত্যিই কি জন্মসূত্রেই দল পরিচালনার অধিকার লাভ করেছিলেন? আমার তো মনে হয় যোগ্য ব্যাটসম্যান ও ফিল্ডসম্যান এবং বিদেশে লব্ধ অভিজ্ঞতার গুণেই তাঁর উপর দল পরিচালনার ভার পড়েছিল।

লেখক পতৌদির নেতৃত্বজনোচিত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। লেখকের মতে পতৌদির সময়ে দলের অনেককেই তেমন সিরিয়াস বলে মনে হতো না। অথচ অমৃতের আগের একটি সংখ্যার 'এ নহে মধুর খেলা' নিবন্ধের লেখক পতৌদির নেতৃত্বের প্রশংসা করেই শুধু থেমে যান নি, সেই সঙ্গে আরও বলেছেন, ভারতীয় দলে পতৌদির নেতৃত্ব যেকোন দেশের গর্বের বস্তু। দুটি নিবন্ধের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য সত্যই ভাবিয়ে তুলেছে। এর কোনটা সত্য কেউ তা জানিয়ে দিলে সংশয়মুক্ত হতে পারতাম।

শেখ নজরুল ইসলাম
দুর্গাসিমলা
হাওড়া

কবির সন্ধান

অমৃত (১০ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪০শ সংখ্যা)-এ সাহিত্যের খবরে 'কবির সন্ধান' শীর্ষক সংবাদে কিছু ভুল রয়েছে। এতে বলা হয়েছে 'শ্রীবড়ুয়ার বিখ্যাত কাব্য-সংকলনের নাম 'সাগর দেখিয়া'। তাঁর নাম শুদ্ধভাবে লিখলে হবে 'দেবকান্ত বড়ুয়া'। আর তাঁর কাব্যসংকলনের নাম 'সাগর দেখিছা'। উক্ত কাব্যসংকলনের সংযোজিত কবিতা 'বিষকন্যা'র পংক্তিগুলো এরকম

'আজি মোর বার্দ্ধক্য জড়িত কণ্ঠ;
তথাপিও তারে কৈ যাও'
—মাধো তোমাকেই—
হেরো মোর সূর্যাস্ত পারর হেমরেখা!
নিন্দা খ্যাতি জয় পরাজয়
অসত্য সকলো।
সত্য মাথো হে ছলনাময়ী! তোমার
গভীর প্রেম।
আরু সত্য হে তুলনাহীনা!
তোমার দেহর খাঁজে খাঁজে থকা
অনুপম
আথার সুরভি।'

জীবন নাথ এম-এ,
ধিং, নগাঁ, আসাম

প্রেক্ষাগৃহ প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক 'অমৃতের আমি এক নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার ১০ম বর্ষ, ৪০শ সংখ্যায় 'প্রেক্ষাগৃহ' বিভাগে নান্দীকর লিখেছেন, 'রেকর্ডে সাগর সেনের কণ্ঠ মারফৎ অতি পরিচিত 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান' সুমিত্রা সেন কণ্ঠনিঃসৃত হয়ে সুচিত্রা সেনের মুখে উঠে বিশেষ অর্থবহ হয়েছে' (পৃষ্ঠা ১৫০)। আমি কিন্তু জানি যে, 'নবরাগ' ছবিতে এই গানটি গেয়েছেন শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। অবশ্য 'তুই ফেলে এসেছিস কারে' গানটি সুমিত্রা সেনেরই গাওয়া। আমার সন্দেহ নিরসনে মাননীয় নান্দীকর মহাশয় কিছু লিখলে বাধিত হই।

শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সগড়াই, জেলা, বর্ধমান

(২)

আমি অমৃত সাপ্তাহিক পত্রিকার একজন একনিষ্ঠ পাঠক। এই পত্রিকার সব কয়টি রচনাই আমার খুব ভাল লাগে। এর মধ্যে সন্দীপন রচিত 'নিকটেই আছে'র বিবরবস্তুগুলি আমার সবিশেষ প্রিয়। এছাড়া খেলাধুলা বিভাগ, প্রেক্ষাগৃহ বিভাগ ও অনন্যা উপন্যাস ও গল্পও খুব সুন্দর।

শ্রীনান্দীকর যে সব চিত্রসমালোচনা লেখেন তাও খুব নিখুঁত। গত ৮ই জানুয়ারী 'মেরা নাম জোকার' ছবির সমালোচনা পড়ে আমি পরে এই ছবিটা দেখতে যাই। ছবিটা আমার খুব ভাল লাগলো। এটা রাজকাপুরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং চিত্র-জগতে যুগান্তকারী ছবি।

কিন্তু একটা জিনিস আমার মনে খটকা লাগলো। ছবির দ্বিতীয় অর্ধের শেষের দিকে রাজু মারিনাকে বললো যে তার মা মারিনাকে নিজের 'বহু' বলে বিশ্বাস করেন। তখন মারিনা রাজুকে জিজ্ঞাসা করলো যে, 'বহু' শব্দের অর্থ কি। রাজু তাকে কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বললো যে, সে যেন রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে 'বহু' শব্দের অর্থ বুঝে নেয়। রাজু চলে যাওয়ার পর মারিনা অভিধান দেখে 'বহু' শব্দের রুশি প্রতিশব্দ জেনে নিল।

এটাই আশ্চর্যজনক। প্রথমত, 'বহু' শব্দটা একটা হিন্দী শব্দ এবং মারিনার কাছে যে অভিধানটা ছিল তা রুশি থেকে হিন্দী অভিধান। দ্বিতীয়ত, তার অভিধানটা যদি হিন্দী থেকে রুশ অভিধান হয়েও থাকে, তবুও মারিনা কিভাবে 'বহু' শব্দের মানে জানবে? কারণ সে তো হিন্দী পড়তে বা বলতে জানে না।

শ্রীনান্দীকর যেন এই চিঠির উপর মন্তব্য প্রকাশ করেন। আশা করি, এই চিঠিটি অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

সত্যেন্দু বসু রায় চৌধুরী,
কলিকাতা-১৪

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের উপাদান

'উত্তরবঙ্গের লোক সাহিত্যের উপাদান'-এর লেখককে ধন্যবাদ। বিশেষতঃ ৬ই ফাল্গুনে সুরেশচন্দ্র দেবনাথ মহাশয়ের প্রতিবাদের উত্তরে লেখা চিঠির জন্য। শ্রীদেবনাথ যেন গায়ে পড়েই বিতণ্ডা করতে চান। পূর্ববঙ্গের লোক-সাহিত্য ভাল না উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্য ভালো, সে প্রশ্ন নিরর্থক এখানে। এ যেন আম আর সন্দেশের মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করতে যাওয়ার সামিল। আম আর সন্দেশের মধ্যে উৎকর্ষ বিচারে নামা যেমন নিরর্থক, পূর্ববঙ্গ-উত্তরবঙ্গ লোক-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে নামাও ঠিক তেমনি নিরর্থক। আমের স্বাদ আমে, আর সন্দেশের স্বাদ সন্দেশে।

শ্মরজিৎ বাবুর প্রবন্ধ থেকে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোথাও তিনি স্বকপোল কল্পনার আশ্রয় নেননি। যেটা আজকাল পেশাদারী লেখকদের জল-ভাত হয়ে গেছে। শ্রীচক্রবর্তীর লেখা পড়ে এটুকু সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, উত্তর বাংলার সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। কলকাতার বিরাট পাঠাগারের পুরাতন পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে সহজে কাজ সারার অপচেষ্টা নেই।

ফণী পাল
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শাদা চোখে

আগামী সপ্তাহকালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়ে যাবে। এই নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, নিঃসন্দেহে ইতিহাসে এই নির্বাচন একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত করবে। এত অস্থিরতা, এত সংঘর্ষ আর এত ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড কোন নির্বাচনের আগে এ-রাজ্যে দেখা যায়নি। এই প্রথম নির্বাচনের আগে প্রার্থী খুনের নজীর দেখা গেল। শুধু তাই নয়, ফ্রন্টের হেমন্ত বসুর মত একজন নেতারও জীবনদান করতে হলো। হানাহানির খবরে নিত্য খবরের কাগজের পাতা ভরপুর থাকার ফলে ভোটের কথা নিয়ে বেশী আলোচনা বা সমালোচনার জন্য কেউ প্রস্তুত নয়। এত দল, এত মতও পূর্বেকার নির্বাচনে এত প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। প্রচারের কৌশল, আঁতাত ইত্যাদি স্মরণ রাখার মত। নির্বাচন হবে কি হবে না, এই প্রশ্ন হয়ত নির্বাচনের পূর্বদিন পর্যন্ত মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করবে। কিন্তু এই সন্দেহের কোন কারণ থাকার কথা নয়। প্রার্থী খুন হওয়ার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নির্বাচন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হয়ত দেখা দিত যদি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার জন্য ভোট গ্রহণ করার প্রশ্ন থাকত: যেহেতু লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে এই প্রশ্ন জড়িত, সেজন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার কোন হেতুই নেই। লোকসভার নির্বাচন যে-কোন জরুরী অবস্থার মধ্যেই সমাপ্ত হবে। একমাত্র বিদেশী শত্রুর আক্রমণ কিম্বা অন্য কোন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে নির্বাচন মুলতুবী রাখার প্রশ্ন দেখা দিত। কাজেই একটি অংশ রাজ্যের কয়েকটি নির্বাচন ক্ষেত্রে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে বলে নির্বাচন বন্ধ হবে—এই ধারণা পোষণ করা ভুল। অনেকে বলেন, এই অবস্থায় নির্বাচন করে লাভ কি? আপাতদৃষ্টিতে দেখলে কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হবে। কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচন না হলেই বা কি এসব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে? মনে হয়—না। কাজেই নির্বাচন না করার পক্ষে মত পোষণ করে লাভ ত কিছু নেই। নির্বাচন হচ্ছে বলেই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে এ-ধারণাও ভুল। কারণ অনড়।

এক-একটি নির্বাচন ক্ষেত্রে দলীয় সংগঠন যে দলের যাই থাকুক না কেন, প্রচারটা কিন্তু মুখ্য হাতিয়ার। বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা তুলনামূলকভাবে কম, সেখানে প্রচারের প্রভাব স্বভাবতই বেশী হতে বাধ্য। অনেক সময় এমন প্রার্থী দাঁড়ান যাঁর রাজনৈতিক পরিচিতি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। নিজের কেন্দ্রের বেশী মানুষের কাছেই তাঁর পরিচিতি থাকে না। কেবলমাত্র প্রচারই তাকে জনতার সামনে উপস্থিত করতে পারে। আবার প্রচারই প্রার্থী বা দলের বক্তব্য ও কর্মসূচী ইত্যাদি জনসমক্ষে তুলে ধরতে সক্ষম। আর এই প্রচারের মাধ্যমে ওয়াকিবহাল হয়ে ভোটারগণ অনেক সময় তাঁদের ইতিকর্তব্য স্থির করেন এবং তাঁদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, তা নিয়ে শলাপরামর্শ করে পথ স্থির করেন। আগেকার দিনে গ্রামের মোড়ল আর শহরে 'গণ্যমান্য ব্যক্তিরা' যা করতেন, আমজনতা মোটামুটিভাবে সেই পথে চলতেন। এখন রাজনীতি বদলাচ্ছে, হাওয়া পালটাচ্ছে। আর মানুষও নিজের ব্যক্তিসত্তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। কাজেই প্রচারের কৌশলও বদলাচ্ছে।

দেখা যায় গ্রামের মানুষ শহরে এলে বামপন্থী বা বিরোধী পক্ষভুক্ত হয়। কারণ, রুজিরোজগারের প্রশ্নে সে কোন-না-কোন সমিতি বা ইউনিয়নভুক্ত। আর গ্রামে অনেক ক্ষেত্রেই সেই মানুষের আবার বিরোধী ভূমিকা। কারণ, জমির প্রশ্নে সে অন্য মানুষ। ইদানীং অবশ্য বামপন্থীদেরও প্রভাব বেড়েছে। তাই এসব ক্ষেত্রে সব দলেরই প্রচার চলছে। সভা-সমিতিও হচ্ছে। কখনও কখনও মাইক্রোফোনের আওয়াজে কর্ণকুহর বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রমও ঘটছে। কিন্তু শহর বা শহরতলীতে প্রচারের প্রশ্নটা জটিল হয়ে উঠেছে। এলাকার মধ্যে 'এলাকা' গড়ে ওঠার ফলে ভোটারদের কাছে বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া সত্যিই দলীয় কর্মী ও প্রার্থীদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। শুধু কোলকাতা বা শিল্পাঞ্চলে এই অসুবিধা দেখা দিয়েছে এমন নয়, মফস্বল শহরেও এ-ধরনের অবস্থা বিদ্যমান। এই পরিস্থিতি থেকে সাধারণ, রাজনীতিতে নিশ্চেষ্ট মানুষকে মুক্ত করে তাঁদের মনে নিরাপত্তাবোধ

জানাবার উদ্দেশ্যে অনেক জায়গায় দলীয় স্বেচ্ছাসেবকের পাহারায় সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। উদ্দেশ্য, জনতার মনে শুধু সাময়িক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করা নয়, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে এই নিরাপত্তা যে নিশ্চয়তার রূপ নেবে, সেই সম্পর্কে গণদেবতাকে আশান্বিত করা। অনেক রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, এবারের নির্বাচনে এই নয়া-ঢঙের প্রচার খুবই ফলদায়ক হবে। শুনেছি, সাহায্য না চাইলেও অনেক দলের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এই স্বেচ্ছাবাহিনীর কাজ করে যাচ্ছেন।

বড় বড় সভা ইত্যাদি হচ্ছে না এমন নয়। তবে প্রত্যেক দলই এবার ঘরোয়া বৈঠকের ওপর জোর দিচ্ছেন। গাড়ী-ঘোড়া নিয়ে দলীয় পতাকা উড্ডীন করে প্রচারে খুব কম প্রার্থীই যাচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে হাঁটে-ঊাঁত দেখা গেলেও, শহরে এ-দৃশ্য বিরল, একেবারে নেই বললেই চলে। পোস্টার এবারের নির্বাচনে খুব কমই দেওয়া হয়েছে। যেখানেই একটু শহুরে আবহাওয়া, সেই-খানেই দেওয়ালে লিখে প্রার্থীর জন্য ভোট ভিক্ষা করা হয়েছে। কত সুদক্ষ শিল্পী যে এবার নির্বাচনে দেওয়ালে লিখে প্রচারের কার্যে অংশ গ্রহণ করেছে, তার সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। 'দেওয়ালের লিখন' কি হবে না জেনেই দেয়ালে প্রচার হয়েছে। যদি গ্রামাঞ্চলে এরকম সুদৃশ্য দেওয়াল পাওয়া যেত, তবে লেখা হত না এমন বলা যায় না। অবশ্য সংগঠন না থাকার ফলেও হয়ত এ-কাজ করা যায়নি। হাটে-মাঠে শিঙা ফুঁকে কিম্বা ভোটের ছড়া গেয়েও এবার প্রচার খুব হয়নি। গোপনে লোক মারফৎ ভোটারদের মন জয় করার প্রচেষ্টা খুব তীব্রভাবে দেখা গেছে।

এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস ছাড়া অন্য দলগুলি আবার পকেট ভোটের উপর নির্ভর করছে বেশী। পকেট ভোট অর্থাৎ সংগঠনের মারফৎ যে-ভোট পাওয়ার আশা বেশী সেগুলি। বহু প্রার্থী থাকার ফলে দল-গুলি এই সাংগঠনিক ভোটের উপর নির্ভর করে আশাবাদী হয়েছেন। শুধু রাজনৈতিক কারণে বা আদর্শের উপর আস্থাবান হয়ে সব প্রার্থীও নির্বাচনে দাঁড়াননি। কেউ বা এলাকার স্বার্থ, কেউ বা সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা কিম্বা রাজনৈতিক হানা-হানির বিকল্প নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করছেন। ফলে, ভোটারদের গতি-প্রকৃতি কি রকম হবে তা আন্দাজ করা সত্যিই মুশকিল। গতবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে যেমন সমস্ত ভোটার দুই শিবিরে বিভক্ত ছিলেন—ফলে ভবিষ্যৎ চিত্রের রূপরেখা পাওয়া গিয়েছিল—এবার তা সম্ভব নয়। তদুপরি যে-কোন প্রার্থীর সঙ্গে আলোচনা রাখলে চিত্রটা আরও অস্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, প্রত্যেক প্রার্থীই জোরের সঙ্গে নিজের সাফল্যের কথা দাবী করেন। এবং শুধু তাই নয়, কেন জনমত তাঁর স্বপক্ষে যাবে সেই সম্পর্কে তাত্ত্বিক বক্তব্য দিয়ে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে নিশ্চিন্ত করতে চেষ্টা করেন। আর দলের নেতাদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা কেন নির্বাচনে একেবারে শতকরা ১০০টি আসন লাভ করবেন তার ব্যাখ্যা দিয়ে বসেন। কাজেই চিত্রটা অস্পষ্ট হয়েই রয়েছে।

ভোট নেওয়ার জন্য কর্মীর অভাব ভোটার ভোট দিতে আসবে কিনা এই আশঙ্কাও এবারের নির্বাচনের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সরকারী প্রচারযন্ত্রের অহর্নিশ প্রচারেও কর্মীদের যে আকৃষ্ট করতে পারেনি, আকাশবাণীর খবর শুনলেই তা জানা যায়। অথচ সরকারী কর্মচারীদের সকল ইউনিয়নই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও ভোট গ্রহণে সাহায্য করার কথা ঘোষণা করেছেন। আশ্চর্য লাগে, ভোট গ্রহণের এক সপ্তাহ আগে পর্যন্তও কর্মী সংগ্রহের জন্য সরকারী আবেদনের ঘোষণা যখন আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়।

ভোটাররা ভোট দিতে আসবেন কিনা—এই আশঙ্কা সর্বত্রই এবং সকল মহলেই দেখা গেছে। সুদূর গ্রামাঞ্চলে যেখানে হিংসাত্মক কার্যকলাপের কোন চিহ্নই নেই সেখানে পর্যন্ত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণের মধ্যে এরকম মন্তব্যও শোনা গেছে যে, যাঁরা ভোট গ্রহণ করবেন, তাঁদের নিরাপত্তার জন্য অবিরাম প্রতিশ্রুতি শোনা যাচ্ছে। এমনকি কোন অঘটন ঘটলে তার দায়িত্ব নিতেও সরকার পিছপা হবে না। কিন্তু সাধারণ নাগরিক যিনি ভোট দেবেন তার জন্য এমন প্রতিশ্রুতিময় ঘোষণা ত নেই। যাঁরা তখ্‌ত-এ-তাউস বসাবেন, সেই গণদেবতার জন্য অঙ্গীকার কোথায়? আশ্বাস ছাড়া ত কিছু নেই। এ ধারণা মানুষের মন থেকে মুছে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তৎপর হওয়া দরকার। এক ভোট পড়লেও নির্বাচন সিদ্ধ হওয়ার কথা বলে যেন জনতার রায় না হলেও চলবে এমনিতর যে-ভাব দেখানো হয়েছে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। যাহোক, এখনো নির্বাচনের কয়েকদিন বাকি আছে। অতএব, ভোটারদের মনে নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্তব্য।

যাহোক, এত অনিশ্চয়তার মধ্যেও নিশ্চয়তা ও স্থিরতা আনবার জন্য এই পঞ্চম নির্বাচন কয়েকদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। ভোট-বাক্‌স আবার নির্ধারণ করবে, রাজনৈতিক অস্থিরতা চলবে, কি চলবে না। একদলীয় সরকার হবে কি হবে না। নাকি আবার মিলি-জুলি সরকার হবে। এই প্রশ্ন যেমন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে প্রযোজ্য, কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই। ইতিহাসের এই চরম সন্ধি-ক্ষণে ভোটদাতাদের কর্তব্য কত যে দায়িত্ব-পূর্ণ ও গভীর, আশা করি গণদেবতা তা উপলব্ধি করবেন। ১০ই মার্চ, বুধবার এমন একটি দিন যেদিন সাধারণ মানুষের হাতে অসম্ভব ক্ষমতা থাকবে। তাঁরাই সেদিন রাজা-উজীর বানাবার অধিকারী। কাজেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে ভোটাধি-কার তাঁরা প্রয়োগ করবেন, এই আশা আমরা করব। যেন পরে অনুশোচনা না করতে হয়, সেদিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

—[illegible]

বাংলা সাহিত্যে একটি আলোড়নকারী সংবাদ
মাত্র ৭ দিনে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত
শংকর-এর
সীমাবদ্ধ
দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো
দাম—ছ' টাকা
মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

পত্রিকা ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছেন ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশনের কোর্স ডাইরেক্টর অধ্যাপক অজনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশে বিদেশে

ভারতের পঞ্চম লোকসভার জন্য নির্বাচন আরম্ভ হতে আর মাত্র দিন দুয়েক বাকী। এই নির্বাচনে এবার যে দুটি প্রশ্ন পূর্ববর্তী অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করেছে সেই দুটির মধ্যে একটি হচ্ছে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন, আর একটি সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্ন। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত হচ্ছে তার পরিচয় এইসব দলের নির্বাচনী ইস্তাহারগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

শাসক কংগ্রেস মনে করে, বর্তমান সংবিধানের সংশোধন হওয়া দরকার; কিন্তু সেজন্য নতুন একটি গণপরিষদ আহ্বানের প্রয়োজন নেই। শাসক কংগ্রেসের ইস্তাহারে বলা হয়েছে: 'জাতির অগ্রগতি থামিয়ে রাখা যাবে না। সংবিধানের দ্বারা মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষাগুলির পূরণ হবে, গণতন্ত্রের এটাই হল মর্মকথা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে ইতিপূর্বে আমাদের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। বিচারালয়ের সাম্প্রতিক কতকগুলি রায়ে আমাদের সংবিধানের কিছু কিছু নীতিনির্দেশ সঠিকভাবে কার্যকর করা যাচ্ছে না।'

ইস্তাহারে আরও বলা হয়েছে, 'সামাজিক ন্যায়বিচারের পথে প্রতিবন্ধকগুলি দূর করার জন্য আরও যেসব সাংবিধানিক প্রতিকার ও সংশোধনের প্রয়োজন হবে, সেগুলি আমরা কার্যকর করতে চেষ্টা করব।'

সংগঠন কংগ্রেস নতুন একটি গণপরিষদ আহ্বানের প্রয়োজন দেখে না, এমন কি সংবিধান সংশোধনেরও প্রয়োজন বোধ করে না। বিচার বিভাগকে খাটো করার অথবা সম্পত্তিতে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার কোন চেষ্টারও তারা বিরোধী।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল একটি নতুন সংবিধান তৈরী করার উদ্দেশ্যে বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি গণপরিষদ গঠন করতে চায়। তারা মনে করে, বর্তমান সংবিধান 'প্রধানতঃ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে রচিত।'

যেহেতু বর্তমান সংবিধান সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল সেহেতু সোশ্যালিস্টরা গণপরিষদ বর্জন করেছিলেন এবং বিশেষ করে সুপ্রীম কোর্টের গোলোকনাথ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি চায় যে, একটি নূতন গণপরিষদ আহ্বান করা হোক। এই গণপরিষদ জনসাধারণের চাহিদাগুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা

করবে. 'অনগ্রসর শ্রেণীর লোকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও অর্থনৈতিক সমতা দেবে এবং প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করে চার-স্তম্ভ বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করবে।' মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা থেকে 'সম্পত্তির অধিকার' তুলে দিতে হবে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, রুজিরোজগার ও চিকিৎসাকে মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এই সব মৌলিক অধিকার মেনে নিতে গেলে যে খরচ হবে তার টাকাটা কোথা থেকে আসবে সেবিষয়ে ইস্তাহারে কিছুই বলা হয়নি।

সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির ইস্তাহারে দাবী করা হয়েছে 'রাজ্যপাল ও কালেকটর-দের পদগুলি অপ্রয়োজনীয়। এই পদগুলি তুলে দেওয়া উচিত। জেলা বা শহর স্তরে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের অধীনে পরিচালিত হওয়া উচিত।'

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি দুটি কারণে নূতন গণপরিষদ গঠনের বিরোধিতা করেছে : (১) সংবিধানে এমন কোন ব্যবস্থা নেই।' (২) সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদে সংসদের উভয় কক্ষের উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সংবিধান সংশোধনের যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা আছে সেটাই সংবিধান-সংশোধন-ক্ষমতার নির্বিচার ব্যব-হারের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্টতর রক্ষাকবচ। নাথ-পাইয়ের বিলেও এই পদ্ধতিই মেনে নেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে, নূতন একটি গণপরি-ষদ গঠিত হলে সেখানে সদস্যদের অধি-কাংশের বেশীর ভোটের জোরেই সংবিধান বদল করা যাবে। অর্থাৎ ঐ ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতার অধিকতর অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।'

পি এস পির মত হল, 'একটি সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হোক। সামা-জিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপযুক্ত হাতি-য়ারে পরিণত করার দিকে লক্ষ্য রেখে সংবিধানের কি সংশোধন করতে হবে তা এই কমিশন সুপারিশ করবেন।'

জনসঙ্ঘ সংবিধান সংশোধনের বিরো-ধিতা করেনি। তারা বলেছে, 'গত দুই দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে সংবিধানটি বিচার করার জন্য এবং সেদিক থেকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য' একটি জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন করা হোক। জনসঙ্ঘ সংবিধানকে একটি অপরিবর্তনীয় দলিল' বলে মনে করে না।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি মনে করে, সরকার যাতে প্রাক্তন রাজন্যদের ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিল করতে পারেন সেজন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে। পার্টির ইস্তাহারে বলা হয়েছে, 'কতকগুলি নামের তালিকা থেকে প্রধান বিচারপতি সহ সমস্ত বিচারপতিকে নিয়োগ করতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রে এই তালিকা প্রস্তুত করবেন পার্লামেন্ট আর হাই-কোর্টগুলির ক্ষেত্রে বিধানসভা। কে প্রধান বিচারপতি হবেন সেটা কেবল সিনিয়রিটির ভিত্তিতে স্থির হবে না। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সংখ্যা কোন নির্দিষ্ট সীমায় বাঁধা থাকবে না। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটের জোরে পার্লামেন্ট সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিচারপতিকে সরিয়ে দিতে পারবেন।'

অর্থাৎ, পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এবং 'সামাজিক ন্যায়বিচার ও প্রগতির স্বার্থে বিচার-ব্যবস্থা যাতে সংবিধানের মূলবোধ ও নীতিনির্দেশের দ্বারা চালিত হতে বাধ্য হয় সেজন্য সি-পি-আই সংবিধান সংশোধন করতে চায়।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি মনে করে যে, দেশের বর্তমান সংবিধান নামেই যুক্ত-রাষ্ট্রীয়, আসলে এটা এক-কেন্দ্রিক সংবিধান। তাছাড়া এই সংবিধানের মধ্য দিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদীদেরই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর বদলে এমন একটা সংবিধান প্রবর্তন করতে হবে যার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পার্টি চায়, আদালতগুলি যাতে জনগণের ইচ্ছার বাহন হিসাবে কাজ করতে পারে সেজন্য বিচারালয়গুলির ভূমিকা ও তাদের সংগঠন সম্পর্কে ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে।

'জন-গণতন্ত্রের পথ ধরে সমাজতন্ত্রে পৌছবার যে মহান লক্ষ্য আমাদের সামনে রয়েছে, বর্তমান বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামোর ভিতর দিয়ে আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না।'

সি-পি-এম-এর নির্বাচনী ইস্তাহারে দাবী তোলা হয়েছে, রাজ্যপালের পদগুলি লোপ করতে হবে এবং 'যেসব ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি কোন রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং মাসের পর মাস জনসাধারণের সম্মতি ছাড়া শাসন চালান', সেইসব ক্ষমতা তুলে দিতে হবে।

বিচার-বিভাগ সম্পর্কে পার্টির বক্তব্য হল, সুপ্রীম কোর্টের রায়গুলি জোরালো-ভাবে এই বিষয়টি তুলে ধরেছে যে, বর্তমান সংবিধানের দ্বারা জনগণের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।' তারা সংবিধানের পরিবর্তন চায় এবং সেই সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টকে ঢেলে সাজতে চায়।

সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে প্রায় সকল পার্টির ইস্তাহারের মধ্যেই দৃষ্টিভঙ্গীর একটা সাদৃশ্য রয়েছে। প্রধান পার্থক্যটা দেখা দিচ্ছে কোন্ বিষয়টির ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে এবং কিভাবে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হচ্ছে সেদিক থেকে।

শাসক কংগ্রেসের ইস্তাহারে বলা হয়েছে, 'বলা হচ্ছে যে, কংগ্রেস ব্যক্তিগত বে-সরকারী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিতে চায়। ছোট ও মাঝারি সম্পত্তির মালিকদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষবশতঃ এটা করা হচ্ছে। এটা সত্য নয়! কংগ্রেস এটা পরিষ্কার করে জানাতে চায় যে, ব্যক্তিগত

পাঠভবনের বই পাঠাগারের গৌরব

আমাদের পরিবেশিত গ্রন্থ

বিনয় ঘোষ

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র

১ম খণ্ড ১২·৫০। ২য় খণ্ড ১৬·৫০। ৩য় খণ্ড ১৪·৫০। ৪র্থ খণ্ড ২০·০০

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা
(১৮০০—১৯০০)

এই গ্রন্থমালার শেষ পঞ্চম খণ্ড : ১৭·০০ (দুষ্প্রাপ্য আর্টপ্লেট)

দুর্ধর্ষ পাথেট লাও বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈনারা প্রস্তুত হচ্ছে।

সম্পত্তি লোপ করার কোনও ইচ্ছে তাদের নেই। বরং জনগণের বৃহত্তর অংশের জন্য সম্পত্তির অধিকারকে কংগ্রেস একটা বাস্তব অধিকারে পরিণত করতে চায়।' ইস্তাহারে আরো বলা হয়েছে যে, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তির মালিকানা যাতে একটা ন্যায়-সঙ্গত সীমা ছাড়িয়ে না যায় এবং বৈষয়িক ক্ষমতা ও সম্পত্তি যাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে এসে জমা না হয় তার ব্যবস্থা করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

ইস্তাহারে বলা হয়েছে, 'শহরাঞ্চলের সম্পত্তির সীমা বাঁধতেই হবে। শহরাঞ্চলের জমি কিনা-বেচা নিয়ে যে সমাজবিরোধী মুনাফাবাজী চলে তাকে সংযত করতেই হবে।'

সংগঠন কংগ্রেস মৌলিক অধিকার-গুলির রদবদল করার বিরোধী। তারা বিশেষ করে 'সম্পত্তির অধিকার' সংশোধন করার বিরুদ্ধে।

বলা হয়েছে যে, 'এই দল এই সব অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নীতিতে দৃঢ়ভাবে আস্থাবান। ধন সৃষ্টি ও সম্পত্তি সংগ্রহ করতে, অধিকতর ধন উৎপাদন করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং এই ধনের সুসম বণ্টন করতে নিজের বুদ্ধি ও প্রতিভা ব্যবহার করার স্বাধীনতা ভারতের নাগরিকদের আছে।'

পার্টি চায় 'ব্যাপকভাবে বি-কেন্দ্রীকৃত এমন একটা বৈষয়িক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক যাতে ধনের ব্যাপক বিস্তার হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়।'

সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি মনে করে, মৌলিক অধিকারগুলির তালিকার মধ্যে সম্পত্তির অধিকারের অন্তর্ভুক্তি সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে বিঘ্নিত করে। মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে এই অধিকার-টিকে বাদ দিতে হবে।'

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী নয়, তবে তারা মনে করে যে, সম্পত্তির সামাজিক প্রথার সৃষ্টি এবং সমাজের নিয়ম চাহিদা ও পরিস্থিতির দ্বারা সম্পত্তি নির্ধারিত হওয়া উচিত।

দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছে, 'পি এস পি যেসব প্রগতিশীল ব্যবস্থার প্রস্তাব করবে, সেগুলির আওতায় পড়বে শুধু ধনীদের অনির্ধারিত সম্পত্তি। জন-গণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই সব প্রস্তাবের আওতায় আসবে না। পার্টি শহরাঞ্চলের সম্পত্তির একটা সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাবের পক্ষপাতী।'

জনসংঘ 'নাগরিকদের সম্পত্তির অধি-কার রক্ষা করবে'। সংঘের ইস্তাহারে বলা হয়েছে, 'সম্পত্তির সাংবিধানিক অধিকারের ওপর শাসক কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মিলিত আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে সংঘ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারা মনে করে এই আক্রমণ শেষ পরিণামে ক্ষেতে-খামারে কলে কারখানায় ও পরিবারের মধ্যে নাগরিকদের যাবতীয় অধিকার কেড়ে নেবে।'

ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, 'প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব বলার মতো কিছু সম্পত্তি থাকবে।'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে যে, তারা সম্পত্তির অধিকার বিলোপের পক্ষ-পাতী নয়। বরং তারা দাবী করে যে, 'ক্ষুদ্র সম্পত্তির অধিকারীসহ সকল সাধারণ মানুষের সম্পত্তিগুলিকে পুঁজিপতি, জমি-দার, সুদখোর ও শোষকদের স্বার্থে পরি-পোষক সরকারের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।'

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি দাবী করেছে যে, পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধানসভা-গুলি যাতে দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের, প্রাক্তন রাজাদের, বড় বড় জমিদারদের ও সমাজের উপরের স্তরের অন্যান্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে পারে, 'সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে আরও প্রসারিত করা যায়, জমিতে, উৎপাদনের উপায়গুলিতে এবং অন্যান্য নিজস্ব সম্পত্তিতে তাদের অধিকার যাতে আরও বাড়ান যায়', সেই উদ্দেশ্যে মৌলিক অধিকারগুলির পরিবর্তন করতে হবে।

স্বতন্ত্র পার্টি তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে পরিষ্কার করে জানিয়েছে যে, তারা নীতিগতভাবে 'সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাবের' বিরোধী।

২৬।১।৭১

—পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

আজকের জিজ্ঞাসা

হেমন্তকুমার বসুর স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে আমরা আজ এই প্রার্থনাই করব যে, এই দেশপ্রেমিক, আজীবন সংগ্রামীর জীবনদানেই যেন বাংলাদেশ কলুষমুক্ত হয়। অনেক রক্তপাত ঘটেছে এই দুর্ভাগা দেশে। কিশোর, তরুণ থেকে আরম্ভ করে প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ কেউ বাদ যায়নি। আত্মহননের এমন উন্মত্ততা কোনো দেশে দেখা যায়নি সাম্প্রতিক কালে। যুক্তি, বুদ্ধি, বিচারের স্থান নিয়েছে শাণিত ছুরিকা; মর্তাবরোধের পরিণতি ডেকে নিয়ে আসছে সশস্ত্র সংঘর্ষ। পশ্চিমবাংলা তার সন্তানদের চিতাশয্যায় পরিণত। শ্রদ্ধেয় জননায়ক হেমন্তকুমার বসুর অভাবনীয় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরেও যেন এই দুর্ভাগা জাতির সম্বিৎ ফিরে এল না। বাংলার রক্তাক্ত হৃদয় কার কাছে, কোন পথে গিয়ে খুঁজে পাবে সান্ত্বনা?

আমরা বিশ্বাস করি, এই আত্মঘাতী সংঘর্ষের অবসান হবে। দেশের কল্যাণ ও সামাজিক ও আর্থনীতিক শোষণমুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে জনমতের সম্মতিতে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে। হেমন্তকুমার বসু এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকের আত্মদান ব্যর্থ হবে না। হেমন্তকুমারের স্মরণসভায় তামিলনাড়ুর নেতা শ্রীমুধিরা খেবর যথার্থই বলেছেন, বাংলাদেশ হল জাতির মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। বাংলা মরলে ভারত বাঁচবে না। বাংলাদেশকে বাঁচাতেই হবে। এই উক্তির সঙ্গে সকলেই একমত হবেন যে, বাংলাদেশ থেকেই ভারতের নবজাগরণ ও চিন্তার মুক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। ভারতের সংস্কৃতিতে বাঙালীর দান অবিস্মরণীয়। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলা ও বাঙালীর আত্মদানের কোনো তুলনা হয় না। ভারতের জন্য বাংলাদেশকেই সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ভারতের সমৃদ্ধিতে বাংলার আর্থনীতিক দানও সর্বোচ্চে।

অথচ নানা ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশ বারবার দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছে। ইংরেজেরা বাঙালী জাতিকে আঘাত দিয়েছে বারবার। বাঙালী তার প্রতিবাদ করেও রক্ষা পায়নি। দুর্ভাগ্য, হতাশা, ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ হয়েছে তার নিত্য সঙ্গী। কিন্তু এভাবে আমরা কি আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব? আজ বাংলাদেশের দিকে সকলে তাকিয়ে আছে। এখনও সকলে আশা রাখে যে, বর্তমান বিক্ষোভ হতাশার অবসান ঘটিয়ে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় নতুন আশার আলোকের সন্ধান এনে দেবে। এই জন্যেই তো বাঁচা, এই জন্যেই তো কল্যাণের জন্য সংগ্রাম।

একথা আজ সকলেই স্বীকার করছেন যে, এই অচল, অনড় সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। দেশের যুবশক্তির সামনে কোনো নিশ্চিতি নেই, জীবিকার নেই প্রতিশ্রুতি। এই অবস্থায় কর্মহীন শিক্ষিত যুবশ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ যে দানা বেঁধে উঠবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু আর্থনীতিক সংকট আজ সারা বিশ্ব জুড়েই। পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধিশালী দেশগুলোতেও যুবশক্তির মধ্যে অসন্তোষ আজ তীব্র। আমাদের মতো জনবহুল দরিদ্র দেশে সে অসন্তোষ যে ব্যাপক চেহারা নেবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে? কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে হবে কোন পথে আমরা এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান ঘটাব। ভারতবর্ষের বহু ত্রুটিবিচ্যুতি ও বৈষয়িক অসাফল্য সত্ত্বেও এখানে আমরা দেশের মানুষের সম্মতিতে একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। এই কাঠামোও এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এক-একটি দেশকে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। ভারতবর্ষও করেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর অর্জিত এই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আমরা কি ব্যর্থ হতে দেব? পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সমাজ-সংস্কার ও কল্যাণসাধন অসম্ভব, একথা এখনও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়নি। বিশেষ করে ভারতের মতো বহুভাষী, বহু জাতি-অধ্যুষিত দেশে এর প্রয়োজন খুবই বেশি। ৫৫ কোটি লোককে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। আমাদের সমাজ-কাঠামোতে অনেক সংস্কার, অনগ্রসর চিন্তা এবং প্রতিবন্ধকতা বাসা বেঁধে আছে। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষকে যারা দরিদ্র, শোষিত ও অজ্ঞ, সঙ্গে নিতে হবে। গণতান্ত্রিক মত প্রচার এবং জনমত সংগঠনের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। সেই সুযোগ এনে দিয়েছে নির্বাচন। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ জঙ্গী শাসনের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের মৌলিক দাবি আজ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আমরাই বা এতদিনের একটা অর্জিত অধিকার বর্জন করে আত্মহননের পথ বেছে নেব কেন? শ্রদ্ধেয় হেমন্তকুমার বসুর রক্তে রঞ্জিত রাজপথের প্রতিটি ধূলিকণা থেকে সেই নীরব জিজ্ঞাসাই উত্থিত হচ্ছে বারবার। মানুষের শুভবুদ্ধি কি তাতে সাড়া দেবে না?

CENTRAL LIBRARY

একটি জীবনচরিত ॥

সুশীলকুমার গুপ্ত

কিছুতেই দমবে না সে। পর পর করা আছে ঠিক
নূতন প্রকল্প। লীজ নিয়ে জলাভূমি রাতারাতি
বানালে বাগানবাড়ি, বলা নেই দুম ক'রে হাতি
কিনে চড়লে কিছুদিন, পুষলে টিয়াকাকাতুয়াপিক
রুপোর খাঁচায়, দুধ বিলালে পাড়ায় হাঁড়িহাঁড়ি,
চৌবাচ্চায় ছাড়লে মাছ, চতুর্দশ পুরুষের ছবি
টাঙালে দেয়াল জুড়ে, ডেকে এনে নটীশিল্পীকবি
জমালে আসর; বললে, 'সাজাব জীবন যত পারি।'

হঠাৎ সে মারা গেল।...তার বহু সখের জিনিস
বিকালো জলের দামে, থেকে গেল সামান্য যা বাকি
হল পোকামাকড়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বন্ধুজন
বললে, 'লোকটা ব্যবসায়ী, বেশ পোক্ত, অথচ নভিস
জীবনের ব্যবসায়ে।' প্রশ্ন থাকে, 'সে কি শুধু ফাঁকি
দিয়েছে? কিসের অর্থে দীপ্তিময় এমন জীবন?'

শব্দ ॥

পরমেশ মজুমদার

ভীষণ শব্দে ফুল ঝরে পড়ে ঃ
কখনো বাইরে, কখনো ভিতরে, ঘরে।

কেননা আসলে বাগান তো সবখানে—
বাগান, বাগান!
জানি স্বপ্ন যা গানে,
তুমি সুন্দর, তবু নিষ্ঠুর ঃ
বাগান-ভাসানো মায়ারোদ্দুর
হৃদয়ে রেখেছি ধ'রে!

ভীষণ শব্দে ফুল ফুটে যায় ঝরে।।

এ আমার দীর্ঘ বনভূমি ॥

সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

সুদীর্ঘ বনভূমি
উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণের মতন
বিস্মৃত হতাশা,
বিকৃত ফলের গন্ধ
পচা পাতা
গর্তের ভেতরে জলে
শুকনো ফুল
ঝোপেঝোপে নিরন্ন আঁধার,
উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণের মতন
এ আমার বনভূমি
এ আমার দীর্ঘ বনভূমি।

ফানুস

নিতাই দে

ঃ হঠাৎ আমায় ডেকেছ কেন? মন্মথ আকাশে চোখ রেখেই কথাগুলি হালকা বাতাসে ভাসিয়ে দিল।

আকাশটা ছাই আর ফাট সিঁদুরে রং মেখে আছে। পশ্চিম দিকটা একটু বেশী লালচে। মাঝে মাঝে জোনাকির মত অনুজ্জ্বল তারা মিট মিট করছে।

ঃ এই, দেখ দেখ একটা ফানুস!

মন্মথ মুখ ফিরিয়ে দেখল, ছাদের আলসের গায়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ফানুস দেখছে রাখি। তার কাপড়ের রং, শাড়ির রং, ছাদের আলসের রং, আকাশের রং সব এক হয়ে গেছে। দেওয়ালে আঁকা ধরা ছবির মত রাখি, আছে কি নেই। অথচ রাখি তার থেকে মাত্র আট নয় হাত দূরে।

আবার আকাশে চোখ সরিয়ে মন্মথ দেখল সত্যি সত্যি একটা ফানুস ভেসে আসছে।

ঃ ওমা! দেখ দেখ আর একটা! না, না, একটা নয় দুটো! তিনটে! ওমা! কি হবে! এত ফানুস কেন আকাশে? বলনা? বলছ না কেন মনু? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা? মনু? আকাশে আজ এত

ফানুস কেন? কি সুন্দর! কেমন দুলে দুলে ভেসে আসছে দেখ।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে মন্মথ রাত্রিকে দেখবার চেষ্টা করল। স্কেচের বুকে আঁকা ছবিটা আরও অস্পষ্ট দেখল। তবুও সে বুঝতে পারল রাত্রি পালটায়নি, চার বছর আগেও যেমন ছিল আজও তেমন আছে। কেবল বয়সটা ক'ধাপ এগিয়েছে মাত্র।

দুপুরে সদর দরজা খুলে তাকে দেখে ঠিক এখনকার মত গলায় উচ্ছ্বাসের বন্যা বইয়ে দিয়ে রাত্রি বলেছিল ওমা! তুমি! সত্যি সত্যি এলে তাহলে! আমি কিন্তু নিশ্চয় জানতুম তুমি আসবে না। তারপর হাত ধরে টেনে বাড়ির মধ্যে এনে সদর দরজার খিল এঁটে দিয়ে আবার মন্মথের হাত ধরে বলেছিল : বিশ্বাস কর মনু আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, সত্যিই তুমি এসেছ। দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে রাত্রি মন্মথের হাত ছেড়ে দিয়ে কেমন মিইয়ে গিয়েছিল যেন। শুতকণ্ঠে আপন মনেই বলেছিল : এলে কেন? না এলেই তো পারতে। চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিতে, বেশ হতো। আমি ডাকলেই কাউকে আসতে হবে এমন কোন মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। তুমি কি যোগিন? না কারো কেনা গোলাম?

ঘরে ঢোকবার মুখে অল্প হেসে মন্মথ বলেছিল : তাহলে আমি চলে যাই বলো।

অমনি রাত্রি ঘুরে দাঁড়িয়ে, মন্মথের দু হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবার গলায় উচ্ছ্বাস ফিরিয়ে এনে বলেছিল : ওমা! সেকি! তা কেন? তুমি মন্মথ। আমার মনু। আমি ডেকেছি তুমি এসেছ। চলে যাবে কেন? ও! অভিমান! আমি কলচে বলে অভিমান? তাই বুঝি? লক্ষীটি রাগ করো না। আমার কথায় কি রাগ করে? তুমি তো জানো মনু, তুমি রাগ করলে আমি সইতে পারব না।

মন্মথের হাত ছেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে রাত্রি কেমন নিভে গিয়ে বলেছিল : আমি কি সত্যি সত্যিই তোমাকে চলে যেতে বলেছি। তুমি না এলে আমি অন্য কথা ভাবতাম।

সোফায় বসতে বসতে মন্মথ জিজ্ঞেস করেছিল : কি ভাবতে?

রাত্রি খাটের বিছানায় পা ঝুলিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল : মনু, সেই পাথরটা এখনও আছে?

বুঝতে না পেরে মন্মথ জিজ্ঞেস করেছিল : পাথর? কোন্ পাথর?

রাত্রি খিল খিল করে হেসে উঠে বলেছিল : উস্রী নদীর ধারে সেই পাথর, যার পেছনে দুটো শাল গাছ ছিল। চার বছরেই তুমি ভুলে গেলে মনু? আমি হলে রোজ একবার করে গিয়ে বসতুম এখনও।

কতটুকুই বা সময়! এর মধ্যেই আকাশটা ঘন অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারাগুলো আর জ্বলজ্বলে নয়। কেবল পশ্চিম দিকটায় ... লাগছে আভা।

... : ওমা! মনু, দেখ-দেখ আরো ফানুস! ...! ওমা! আমার কি হবে! আজ আকাশে এত ফানুস কেন? তুমি জান মনু? আজ কি কোন উৎসব? বলতে-বলতে রাত্রি ছুটে মন্মথের কাছে এসে, মন্মথের হাত ধরে একবার টেনে, আবার ছাতের ওপাশে ছুটে যেতে-যেতে বলল : দেখবে এস মনু, কত্তো ফানুস! আমি একা-একা দেখতে পারছি না মনু, আমার চোখ ব্যথা করছে। তুমি এস, আমার কাছে এস, আমার পাশে এসে দাঁড়াও। আজ এত ফানুস কেন আকাশে! আমার ভয় করছে মনু!

চশমাটা চোখে লাগিয়ে মন্মথ আবার আকাশ দেখল। সত্যি। সেখানে অনেক ফানুস। এক ঝাঁক আলো ক্রমেই দুলতে-দুলতে এগিয়ে আসছে। মন্মথ নিজেকে প্রশ্ন করল : সত্যিই তো, আকাশে আজ এত ফানুস কেন?

মন্মথ আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে রাত্রিকে দেখবার চেষ্টা করল। ছাতের শেষ প্রান্তে আবছা ছায়া-ছায়া রাত্রি, আলসের সঙ্গে মিশে আছে। স্কেচের বুকে ছবিটা যেন নেই।

রাত্রির কথায় মন্মথ মনে-মনে বলেছিল : তুমি জানবে কেমন করে যে, আমি এখনও সেই পাথরটার ওপর গিয়ে বসি কি না। আর মুখে বলেছিল : তুমি যেমন দেখেছ পাথরটা ঠিক তেমনই আছে।

রাত্রি কিছু বলবার আগেই মন্মথ আবার বলেছিল : আর কাউকে দেখছি না যে?

বিছানার ওপর টান-টান হয়ে শুয়ে রাত্রি জবাব দিয়েছিল : কেউ বলতে, সুজয়, মাই হাজব্যান্ড। সে আসবে সেই আটটা-নটায়। ঐ সময়েই সে রোজ অফিস থেকে ফেরে।

: তাহলে আমার সঙ্গে সুজয়বাবুর দেখা হল না।

এ কথায় রাত্রি খিল-খিল করে হাসতে হাসতে বিছানার ওপর আবার উঠে বসে বলেছিল : সেটা তুমি জেনে বুঝেই এসেছ মনু। যাতে না ওঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়। ওকে তুমি সহ্য করতে পারবে না। ওটা তোমার হিংসে। তা না হলে আমার বিয়ে হয়ে গেল, তুমি এলে না।

কথাটা মিথ্যে বলে নি রাত্রি। যেদিন উস্রীর ধারে ঐ পাথরটার ওপর বসে রাত্রি একেবারে শেষ মুহূর্তে বাড়ি ফেরবার মুখে তার বিয়ের কথাটা বলেছিল। মন্মথের তা বিশ্বাস হয় নি। ভেবেছিল ওটা অন্যান্য খেয়ালের মতই রাত্রির একটা খেয়াল মাত্র। রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে সেই পিপুল গাছের নিচের অন্ধকারে হঠাৎ রাত্রি ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো : তুমি কি পাথর? আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আমি চলে যাচ্ছি, কাল থেকে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না আমার, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না? তুমি কি কালা?

দু হাতে মন্মথের বুকে ঘুঁসি মারতে-মারতে কান্নায় গলে গিয়ে রাত্রি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি, রাস্তার ওপর বসে পড়েছিল। কিন্তু মন্মথ তাকে তুলতে যেতেই সে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। প্রথমে মন্মথ রাত্রিকে ধরবার জন্যে পা চালিয়ে হেঁটেছিল, তারপর কিছুটা ছুটেও ছিল, শেষে আর চেষ্টা করে নি, স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

এখন মন্মথ নিজের বুকে একবার হাত রাখল। বোধহয় পিপুল গাছের নিচের বিষাদময় স্মৃতিটা খুঁজে পেতে চাইল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে রাত্রি চিৎকার করে ছুটে আসতে-আসতে বলল : জ্বলছে! জ্বলে যাচ্ছে! মনু, ফানুস জ্বলছে! দেখবে এস, দেখবে এস। বলেই সে মন্মথের হাত ধরে টানতে-টানতে ছাতের ওপাশে নিয়ে চলল।

মন্মথ দেখল রাত্রি হাঁপাচ্ছে।— আঙুল তুলে জ্বলন্ত ফানুস দেখাচ্ছে। মন্মথের মনে হল রাত্রি কিশোরী হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে রাত্রি উত্তেজনায় কাঁপছে। মন্মথের হাতটা রাত্রি আরও জোরে চেপে ধরে থর-থর করে কাঁপছে। মন্মথ আকাশে দেখল একটি ফানুস কাৎ হয়ে জ্বলছে। টুকরো-টুকরো আগুন একটি-দুটি করে ঝরে-ঝরে পড়ছে। বুঝতে অসুবিধা নেই ফানুসটার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।

তন্ময় হয়ে এই দৃশ্য দেখতে-দেখতে রাত্রি কথা বলল : দেখ, কি অদ্ভুত! কি অসম্ভব! এই বেশ কেমন ভাসছিল, কিন্তু দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। বল না মনু, ওটার কেন এমন হল? কি সুন্দর ফানুস, জ্বলে গেল কেন? বল না, জ্বলে গেল কেন? আমি আর দেখতে পারছি না, আমার কষ্ট হচ্ছে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না, আমাকে ধর, মনু, আমাকে ধর। বলতে-বলতে রাত্রি ছুটে নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

বিষন্ন আকাশের বুকে একটি ক্ষতের মত ফানুসটা শেষ হয়ে এল। বুঝিবা আর জ্বলে ওঠার শক্তিও ওটার নেই। মন্মথ আন্দাজ করে নিল যে, আয়ু ফুরিয়ে-যাওয়া ফানুসটার অঙ্গারগুলো আস্তে-আস্তে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে।

অন্ধকারে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে মন্মথ ভাবছে, সুজয়বাবুর ফিরে আসতে-আসতে রাত্রি আটটা-নটা। রাত্রি বোধহয় শোবার ঘরের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে এখনও। তাছাড়া আর কি সে ধারণা করতে পারে? রাত্রির স্বভাব তার অজানা নয়। বাদলা আকাশের মত তার হাসি-কান্না পাশাপাশি। রাত্রি তাকে হঠাৎ এত বছর বাদে ডেকেছে কেন? এত অনুনয় করে চিঠি লেখবার কি দরকার ছিল? মনু, আমার মনু একবার আসবে? তোমাকে আমার বড্ডো দরকার। আসবে তো? কি? বল না আসবে তো? লক্ষীটি এস কিন্তু।

অথচ সেই দুপুর থেকে এখন সন্ধ্যা উত্তরে গেল, তাকে রাত্রির কি প্রয়োজন? কেন আসতে বলেছে? দরকারটাই বা কি? কিছুই বুঝতে পারছে না মন্মথ। যতবার জিজ্ঞেস করেছে ততবারই রাত্রি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে।

ময়ূখ দুপুরে খেতে চায় নি কিন্তু রাত্রি শোনে নি। তাকেও রাত্রির সঙ্গে বসে খেতে হয়েছে। সেই সময় রাত্রিকে সে জিজ্ঞেস করেছিল : আমাকে ডেকেছ কেন? রাত্রি তার কথার জবাব না দিয়ে বলেছিল : সেদিন নিউ মার্কেটে লতিকার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। লতিকাকে চিনতে পারছ তো? সুকুমের বোন, যে সরস্বতী পুজোর সময় থিয়েটারে তোমার মেয়ের পার্ট করেছিল। জান ও বিয়ের পর কি মোটাই না হয়েছে। খুব হাসি-খুসী। আমাকে দেখতে পেয়েই পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে, আমি তো ভয়ে মরে যাই আর কি।

একটু থেমে থেকে রাত্রি বেশ গলা নামিয়ে বলেছিল : লতিকাই বলো তোমার ছেলেটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে, ঠিক তার মায়ের মত।

ময়ূখ কোন কথা বলে নি, নিঃশব্দে মুখে গ্রাস তুলেছে। আর বলবারই বা তার কি ছিল।

কিছু পরে রাত্রি জিজ্ঞেস করেছিল : কি নাম রেখেছ ছেলের?

গলায় বোধহয় ভাত ঠেকে গিয়েছিল। একটু জল খেয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছিল ময়ূখ : গৌতম।

খাওয়া থামিয়ে রাত্রি চোখে এক রাজ্যের প্রশংসা এনে ময়ূখের মুখ দেখতে-দেখতে বলেছিল : গৌতম! বাঃ! কি সুন্দর নাম! ময়ূ, ময়ূখের ছেলে গৌতম। তুমি সুন্দর, তোমার ছেলে সুন্দর তোমার সব কিছুই সুন্দর ময়ূ।

পরে ফিস-ফিস করে রাত্রি বলেছিল : জান ময়ূ, তোমার বউকে আমার হিংসে করতে ইচ্ছে করছে। মেয়েটার কপাল ভাল। কৈ তার নাম বললে না তো?

ময়ূখের কি মনে পড়ছে না এর পর রাত্রির দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল কি না। সে ছোট্ট করে বলেছিল : ইন্দ্রাণী।

একথা শোনবার পরই রাত্রির হাত থেকে চামচটা প্লেটের ওপর পড়ে গিয়েছিল। ময়ূখ তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিল, মাথা নিচু করে গদী-আঁটা চেয়ারের হাতলে কনুই চেপে থির-থির করে কাঁপছে রাত্রি। এবং পরক্ষণেই রাত্রি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে পড়েছে।

আকাশের বিষণ্ণতা অনেকটা কেটে গেছে। ধূসর বর্ণের শেষ রেশটুকুও গ্রাস করেছে আকাশের অন্ধকার। যেখানটায় ফানুসটা জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল একটু আগে, সেখানে ময়ূখ কিছু দেখতে না পেয়ে মাথার উপর অন্য ফানুসগুলো কেমন হেলতে দুলতে ভেসে যাচ্ছে দেখল।

এক মুখ হাসি নিয়ে একটু পরেই রাত্রি বাথরুম থেকে বাইরে এসেছিল। কাছে এসে বলেছিল : তুমি তো কিছুই খেলে না ময়ূ।

রাত্রির কথাগুলো ময়ূখের প্রাণহীন মনে হয়েছিল। যেন ভদ্রতা করে বলতে হয় তাই বলা। কিছু বলবার নেই অথচ কিছু বলতে হবে তাই বলা। ময়ূখের বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে, ঐ অপ্রয়োজনীয় কথাগুলো বলে রাত্রি নিজের দুর্বলতাকে আড়াল করতে চেয়েছিল।

আবার শোবার ঘরে ঢুকে পূর্বের সোফাটায় যখন ময়ূখ বসেছে তখন রাত্রি খাটের পাশে সাইড টেবলের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেছিল : তোমাকে কি এখন চা দিতে বলব, না কফি?

ময়ূখ মাথা দুলিয়ে জবাব দিয়েছিল : না, কিছুই না।

কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে রাত্রি বলেছিল : তবে হাঁ কর।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ময়ূখের মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছিল : কেন?

আর তখনই রাত্রি খিল খিল করে হেসে উঠে বলেছিল : এলাচ। ময়ূখের ঠোঁটের কাছে হাত এনে রাত্রি আবার বলেছিল : কৈ, হাঁ কর?

রাত্রির আঙুলের নখের প্রতি তাকিয়ে ময়ূখ হাঁ করেছিল। রাত্রির আঙুল ময়ূখের ঠোঁট ছুঁয়ে গিয়েছিল। রাত্রির হাতের গন্ধ ময়ূখের নাকে আসতে, ময়ূখের ইন্দ্রাণীকে মনে পড়েছিল।

বাঁ হাতে-ধরা দামী সিগারেটের টিনটা খুলে ময়ূখের সামনে টেবিলের কাচের ওপর রেখে রাত্রি বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে বসে বলেছিল : কৈ সিগ্রেট খাও।

ময়ূখ সিগারেটের টিনের ঢাকনা আবার লাগাতে-লাগাতে বলেছিল : আমি সিগ্রেট খাই না।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই সে শুনতে পেয়েছিল রাত্রির গলায় বিস্ময় ঝরে পড়ছে : ওমা! সেকি! তুমি সিগ্রেট খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছ! তুমি না পুরুষ মানুষ? তারপর একটু থেমে থেকে আবার কতকটা নিজেকে শুনিয়েই যেন আস্তে-আস্তে বলেছিল : পুরুষরা সিগ্রেট না খেলে তাদের পুরুষই মনে হয় না, কেমন মেয়ে-মেয়ে লাগে।

ময়ূখ আবার মাথার উপর আকাশ দেখল। ফানুসগুলো খুব আস্তে-আস্তে সরে যাচ্ছে। শীত তাদের খাঁত মসৃ। ফানুসের আলো ছাড়িয়ে চোখ তার রুপোলী কুমকোর মত জ্বল-জ্বলে তারা দেখল। উস্রী নদীর ধারে সেই পাথরের ওপর বসেও সে কতদিন আকাশের তারা দেখেছে। সে ও রাত্রি পাল্লা দিয়ে আকাশের তারা গুনেছে। সব দিনই সে তারা গুণতে-গুণতে গুলিয়ে ফেলেছে কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে দেখেছে সমান উৎসাহে রাত্রি গুণে চলেছে পাঁচ হাজার এক, পাঁচ হাজার দুই, পাঁচ হাজার তিন।

আর যতক্ষণ না রাত্রি হাঁপিয়ে উঠেছে ততক্ষণ সমানে গুণে গেছে। তারপর হঠাৎ এক সময় গোনা থামিয়ে আকাশের এক দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছে : আজ এদিকটা গোনা হয়ে গেল কাল আবার ওদিকটা গুণবো কেমন? কথা শেষ হতে-হতে রাত্রি খিল-খিল করে হেসে উঠেছে। ময়ূখের বোকা চাহনির প্রতি কটাক্ষ করে বলেছে : তুমি একটি আস্ত বোকা, আকাশের তারা কখনও গোনা যায়? ধোৎ!

তারপর প্রতিদিনের মত জামার বুক থেকে একটি দামী সিগারেট বের করে ময়ূখের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে বলেছিল : কাল থেকে কিন্তু আর সিগ্রেট খেতে পাবে না,

॥ আনন্দ সংবাদ ॥ ॥ প্রকাশিত হল ॥

অভিজিৎ ঘোষ সম্পাদিত দুই বাংলার ১০০ জন কবির কবিতার সমৃদ্ধ একটি অনন্যসাধারণ সংকলন গ্রন্থ।

কবিকণ্ঠ
এপার বাংলা ওপার বাংলা

ভূমিকা : অন্নদাশঙ্কর রায়॥

কবিকণ্ঠ : মনীশ ঘটক : প্রেমেন্দ্র মিত্র : অজিত দত্ত : বিষ্ণু দে : বিমলচন্দ্র ঘোষ : দিনেশ দাস : সমর সেন : মণীন্দ্র রায় : সুভাষ মুখোপাধ্যায় : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : অরুণকুমার সরকার : শঙ্খ ঘোষ : আলোক সরকার : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় : কবিতা সিংহ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : শক্তি চট্টোপাধ্যায় : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : শামসুর রহমান : কায়সুল হক : আল মাহমুদ : আবু কায়সার : আবুল হোসেন : আব্দুল মান্নান সৈয়দ : আব্দুল গাফফার চৌধুরী : আসমাক নিশ্চীক : আনোয়ার আহমদ : ফজল শাহাবুদ্দীন : নির্মলেন্দু গুণ : রফিক আজাদ : মাশুকুর রহমান চৌধুরী : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : সিকদার আমিনুল হক : সিরাজ মমতাজ : নুরুল রহমান : প্রমুখ ॥ দাম : চার টাকা।

পরিবেশক ॥ ২১/১ গড়িয়াহাট রোড (দ), ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১ এই ঠিকানায় ৫ কপি বই-এর দাম অগ্রিম পাঠালে ডাক খরচ লাগবে না॥

আজই শেষ : বাবার টিন থেকে আমিও আর চুরি করতে পারব না, তুমিও কিনতে পারবে না।

মন্মথ সপাটেই ধরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল : কেন?

বাঁটি আমতা-আমতা করে জবাব দিয়েছিল : না, সিগ্রেট খেলে ক্যান্সার হয়।

মন্মথ হেসে ফেলে বলেছিল : এটা কি তোমার নতুন আবিষ্কার?

বাঁটি মন্মথের বিশ্বাস আনবার জন্যে মুখ হঠাৎ অদ্ভুত গম্ভীর করে বলেছিল : জানো না বুঝি, কাল বাবা বিলেত-আসা একটা কাগজ পড়ে তাঁর সম্বন্ধে সোনা-লিক, তাতে বড়-বড় হরফে লেখা আছে সিগ্রেট খেলে ক্যান্সার হয় হবেই। অতএব, আজই তোমার সিগ্রেট খাওয়া শেষ।

: তুমি মদ খাও মন্মথ?

বাঁটির প্রশ্নে চমক লেগেছিল। প্রশ্নটা আর একবার শুনে বলেছিল : উঁহু, না।

আর তখনই বাঁটি কেমন উত্তেজিত হয়ে প্রায় চিৎকার করে বলেছিল : তাহলে তুমি কী? চা খাও না কফি খাও না সিগ্রেট খাও না, মদ খাও না, মাছ মাংসও খাও না : বোধ হয়?

মন্মথ জবাব দিয়েছিল : এই মাত্রই তো মাছ খেলাম দুপুরে।

হঠাৎ উত্তেজনার মধ্যে চিৎকার করে উঠেছিল বাঁটি নিজে হঠাৎই নিচু গলায় ছাড়া-ছাড়া গলায় বলেছিল : জান মন্মথ,

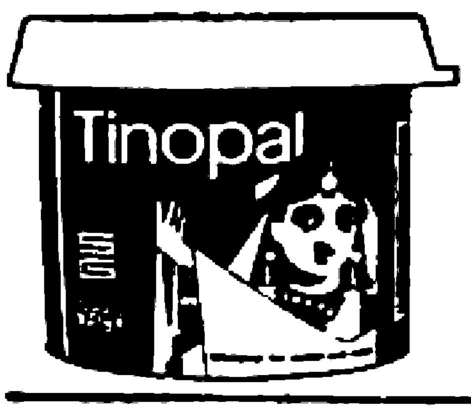

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোবার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়— এমন সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব। আপনার শার্ট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে।

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম! টিনোপাল কিনুন —রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিম্বা "এক বালতির জন্যে এক প্যাকেট"।

® টিনোপাল—জে আর গাইগী এস এ, বাসল, সুইজারল্যাণ্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গাইগী লিঃ, পোঃ আঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

Shilpi HPMA-13/70 Ben

সুজয় মদ খায়, সিগ্রেট খায়, পান খায়, কিন্তু মনু তুমি তো সিগ্রেট খেতে ভালবাসতে।

: তখন বয়েস কম ছিল।

: এখন কি বুড়ো হয়ে গেছ?

মনে-মনে ভেবেছিল মন্মথ বলবে নাকি, তুমিই তো বলেছিলে সিগ্রেট খেলে ক্যান্সার হয়, আর তোমার কাছ থেকে একটি করে সিগ্রেট আমার প্রতিদিনের প্রাপ্য ছিল, এবং সেই সিগ্রেটটি তুমি তোমার বুকের মধ্যে যত্ন করে লুকিয়ে নিয়ে আসতে। আমার অদম্য লোভ ছিল ঐ সিগ্রেটের প্রতি। কিন্তু মন্মথ বলেছিল : ছোট বয়েসে অনেক কিছুই করা যায়, তখন নতুন-নতুন কৌতূহল থাকে, বড় বয়েসে যে সেই অভ্যেসগুলোই ধরে রাখতে হবে তার কোন মানে নেই, আর তা বলে মানুষ বুড়ো হয়ে যায় না মোটেই।

ফানুসগুলো এখনও দেখা যাচ্ছে। একবার সেই দিকে চেয়ে দেখল মন্মথ। তখন আপনা থেকেই হাতের আঙুল মন্মথের ঠোঁট ছুঁয়ে গেল। তার মনে হলো ঠোঁট দুটো বড় ঠাণ্ডা ছাতের আলসেতে কনুই রেখে মন্মথ জিভটা একবার বুলিয়ে নিল ঠোঁটে।

কৈ মনু, জিজ্ঞেস করলে না তো আমার কটি ছেলে,-কটি মেয়ে? মুচকি হেসে রাত্রি বলেছিল।

মন্মথ কিছু বলবার আগেই রাত্রি নিজেই নিজের কথার জবাব দিয়েছিল : একটাও না। পরক্ষণেই খিল-খিল করে হেসে কাঁপতে-কাঁপতে বলেছিল : ফ্যামিলি প্ল্যানিং, বুঝেছ আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করছি।

হাসি যেন থামতেই চাইছিল না রাত্রির। একটু কমে আসতেই আবার তা দ্বিগুণ হয়ে ফুলে-ফুলে উঠছিল। দু হাত পেছনে রেখে সমস্ত শরীর পেছনে হেলিয়ে, খাট থেকে পা ঝুলিয়ে রাত্রি হাসছিল। হাসির গমকে তার শরীরের সীমারেখাগুলো নানাভাবে এঁকে-বেঁকে যাচ্ছিল। হাসি যখন আর থামতেই চায় না তখন রাত্রি কাৎ হয়ে পাশ বালিশটাকে জড়িয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে ফুলতে-ফুলতে এক সময় স্থির হয়ে গিয়েছিল।

ছাদ থেকে নেমে এসে মন্মথ দেখল দরজা বরাবর ছবির মত দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাত্রি। নরম নীল আলোয় ঘরের সব কিছুর ওপর রহস্য নেমে এসেছে যেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই মন্মথ হাতঘড়ি দেখল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই পেল রাত্রির কণ্ঠস্বর : কটা বাজে মনু?

অদূরে ছায়া-ছায়া রাত্রিকে দেখে মন্মথ বলল : পৌনে আটটা।

: তুমি কি এখনই চলে যাবে?

মন্মথ পাল্টা প্রশ্ন করল : কৈ তুমি তো বললে না আমায় ডেকেছ কেন?

একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে রাত্রি বলল : ওমা! তাই বুঝি! একটু থেমে আবার বলল : দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসবে না?

সেই সোফাটায় বসতে-বসতে মন্মথ বলল : এইবার বল আমায় ডেকেছ কেন।

: তুমি কি এখনই চলে যাবে মনু?

: না, এতটা সময় যখন গেছে সুজয়বাবুর সঙ্গে আলাপ করেই যাব, তার আসবার তো সময় হয়ে গেল।

দেওয়াল থেকে সরে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিতে-দিতে রাত্রি বলল : আমি তোমায় তখন মিথ্যে কথা বলেছি মনু, সুজয় আজ থেকে এক সপ্তাহ বাড়ি ফিরবে না।

: কেন? ও, অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে গেছে বুঝি?

দরজার কাছ থেকেই রাত্রি বলল : না।

: তবে?

: সে কলকাতাতেও থাকতে পারে, বাইরেও যেতে পারে আমি শুধু তাকে একদিন বাড়িতে আসতে বারণ করেছি। আমি তাকে বলেছি একদিন আমি একলা থাকতে চাই। একটু থেমে রাত্রি আবার বলল : কদিনের একটু ভিন্ন স্বাদ। বলতে-বলতে রাত্রি ঘরের মাঝ বরাবর এসে দাঁড়াল।

ভেজান দরজার দিকে একবার চেয়ে মন্মথ বলল : সে আবার কি?

হঠাৎ খিল-খিল করে হেসে উঠল রাত্রি। হাসি থামলে বিছানায় বসতে-বসতে বলল : তুমি আসবে বলে আমি সুজয়কে বাড়িতে আসতে বারণ করেছি।

কথাটা বিশ্বাস করতে মন্মথের মন চাইল না। বলল : তা কি করে হয়? আমার আসার সঙ্গে সুজয়বাবুর বাড়ি না ফেরার কি সম্পর্ক?

এবার রাত্রি মুখে চাপা-চাপা হাসি নিয়ে মন্মথের প্রতি গভীরভাবে তাকিয়ে বলল : খুব বোকা, তুমি বুঝতে পারছ না?

সংস্কৃতি সিরিজ

উদ্বাস্তু
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত। [১০·০০]

কালিকট থেকে পলাশী
শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য-অভিযান কাহিনী। [৬·৫০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি
ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া রচিত। [১০·০০]

বাঁকুড়ার মন্দির
শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙলার মন্দিরগুলির ইতিহাস। ৬০টি আর্টপ্লেট। [১৫·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঠাকুরবাড়ীর তিনপুরুষের ইতিহাস। [১২·০০]

উপনিষদের দর্শন
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। [৭·০০]

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

মন্মথ বোবা চোখে দেখল রাত্রিকে। বোঝবার চেষ্টা করল তাকে। এখনও কি এই ধারণা তার সম্বন্ধে যে, রাত্রি এতটুকুও পাল্টায় নি?

রাত্রি বলল : জান, দারুণ ভালবাসে আমাকে সত্যি। আমি যা বলি বাধ্য ছেলের মত তাই শোনে। আমি ওকে বলেছি, তুমি যদি ভুলেও এ কদিন বাড়ি ফের তাহলে কিন্তু আমি চলে যাবো কোথাও, আমাকে খুঁজে পাবে না। ওমা! যেই না একথা বলেছি, অমন সুন্দর সুপুরুষ লোকটা হাউমাউ করে কেঁদে কেটে একসা। বলে কিনা, বিশ্বাস করো রাত্রি আমি বাড়ি ফিরব না এই তোমার বুক ছুঁয়ে বলছি। তুমিই বলো প্রায় ছ'ফুট লম্বা সুন্দর চেহারার শিক্ষিত একটা লোক যদি আমার পায়ে ধরে কাঁদে তাহলে আমার হাসি পাবে না কান্না পাবে? মায়া হবে না ঘেন্না হবে?

হঠাৎ ছটফট করে উঠল রাত্রি। বিছানা ছেড়ে মেঝেয় দাঁড়িয়ে খাটের বাজু ধরে বলল : বিশ্বাস করো মনু লোকটার ওপর আমি কঠোর হইনি কখনও, শুধু আজই, এই প্রথম ওর ওপর আমি রূঢ় হয়েছি, বাড়িতে আসতে বারণ করেছি শুধু তুমি আসবে বলে, ঠিক কি তুমি কবে আসবে?

মন্মথ দেখল রাত্রি থির থর করে কাঁপছে। শুনতে পেল রাত্রির গলাটা কেমন ধরা ধরা।

: এ কদিন বাড়িতে আসতে পাবে না বলে তার যে কি কষ্ট হবে তা আমি ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না মনু। এতটুকুও মিথ্যে নেই যে ও আমাকে দারুণ ভালবাসে। আমার এতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারে না ও। সব সময় আমাকে তার বুকের মধ্যে আগলিয়ে রাখে পাছে আমার কিছু ক্ষতি হয়। ওর কাছে, সারা পৃথিবীতে যেন আমিই একমাত্র মেয়ে, আর যেন কোন মেয়ে নেই, আমার এই রূপ এই যৌবন যেন একক, অদ্বিতীয়, সাপের মাথার মণি, অন্ধের লাঠি। আমি ওর ভালবাসা পেয়ে পেয়ে ভালবাসার স্বাদ ভুলতে বসেছি মনু। কিন্তু তার পরেও তো কিছু আছে? সেটা কি? তা-ই এখনও জানি না। বিশ্বাস করো মনু ওর ভালবাসার উত্তাপে আমার সর্বকিছু খোয়া যেতে বসেছে। বিশ্বাস করো আমি এতটুকুও বাড়িয়ে বলছি না। এই দেখো দেখো, ভাল করে দেখো। বলতে বলতে রাত্রি মন্মথের দিকে পিছন ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মন্মথ দেখল রাত্রির শরীরের সমস্ত পিছন দিকটা নগ্ন। আর দেখল ঘাড় থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গে লম্বা আর গোল গোল দাগ, রক্ত জমে শুকিয়ে আছে, কোথাও কোথাও ঘা উঠে গেছে।

বিস্ময়ে প্রায় বোবার মত অস্ফুট স্বরে বলে ফেলল মন্মথ : সেকি? এগুলো কিসের দাগ? কোন খারাপ রোগ?

রাত্রি খিল খিল করে হেসে উঠে, ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা মন্মথের দিকে এগিয়ে এসে, চোখ বন্ধ করে ফেলে, হঠাৎ বুক আর পেটে চেপে ধরে রাখা শাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বলল : দেখ দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ মনু। খারাপ রোগ আসবে কোথা থেকে, সে পথ তো প্রথম থেকেই বন্ধ। এ ভালোবাসার দাগ। দেখছ না কেমন দু'পাটি করে দাঁত বসে গেছে, ঘন আঙুলের নখের টানা টানা আঁচড়ানোর দাগ? এ আমার অলঙ্কার মনু, ভালোবাসার অলঙ্কার, ভালোবাসার স্বাক্ষর, ভালোবাসার দলিল। একটু থেমে থেমে বুক ফাটা চিৎকারের মত রাত্রি আবার বলল : তুমি কি ইন্দ্রাণীকে এমনভাবে ভালোবাসো মনু? পারবে না, চেষ্টা করলেও পারবে না তুমি, হাজার বছর ধরে চেষ্টা করলেও পারবে না মনু, পারবে না, পারবে না, পারবে না।

মন্মথ যেন একটু আগে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ধানসতার আগার খুঁজে পেল। পাথরের মত বসে সে দেখল, ঘরে নীল আলোর নিচে, তার সামনে শ্বেত পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ রাত্রি।

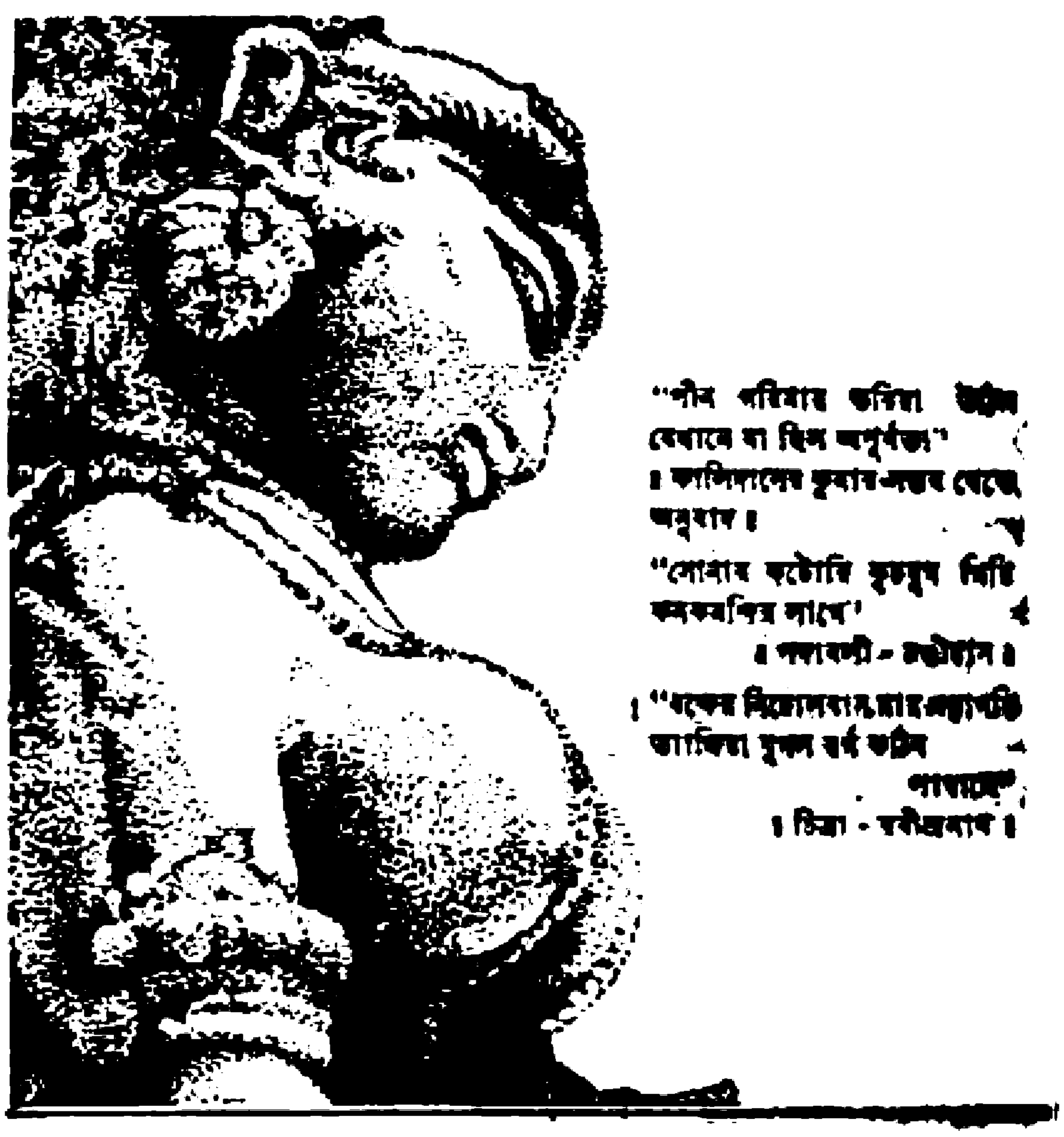

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার!

একটি বিশেষ হর্মোন আর মাত্রা নির্দিষ্ট উপকরণে তৈরী ডার্মাকেয়ার অস্ট্রোজেনিক ডেভলপিং ক্রীম। বক্ষের শিথিলতা, অপূর্ণতা এর প্রয়োগে নিয়মে উধাও। বিকশিত বক্ষ-সৌষ্ঠবে গরবিনী যৌবনবতীর দিকে চেয়ে কারো বুক তখন দুরুদুরু।

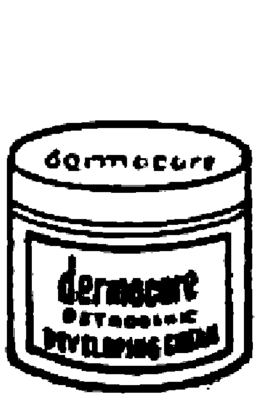

ডার্মাকেয়ার
অস্ট্রোজেনিক ডেভলপিং ক্রীম
প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্

• সব বড় স্টেশনারী দোকানে পাবেন •

SS—2/70

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫%৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস। কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

• • • • ভারতবন্ধু জেমস কেয়ার হারডি

অ-ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্মরণযোগ্য নাম বৃটিশ শ্রমিকদলের জনক জেমস কেয়ার হারডি। মানবপ্রেমিক ও শ্রমিকবন্ধু হিসাবে ইতিহাসের পাতাতে তাঁর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। বাংলাদেশ যখন কার্জন-পরিকল্পিত বঙ্গ-ভঙ্গের বেদনাতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সে-সময় তিনি প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য ভারতে আসেন। ১৯০৭ খৃঃ ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি জাহাজে করে কলকাতা পৌঁছান।

বিক্ষুব্ধ বাঙালীর বক্তব্য তিনি বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে শোনেন। স্বদেশী আন্দোলনের রূপ দেখেন স্বচক্ষে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন নীতির তাৎপর্য অনুধাবন করে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছিলেন। জাতির বৈষয়িক উন্নতি স্বার্থে স্বার্থহীন ভাবাতে এই আন্দোলনকে অনুমোদন করেন। সেই সময়ে বাংলার মানুষের দৃঢ়তা, নির্ভীকতা এবং স্পষ্টবাদিতা দেখে ভারতবাসীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে দেশে ফিরে যান। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, ভারতীয়দের ধ্যান-ধারণা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে অজ্ঞ বৃটিশ জনসাধারণকে অবহিত করাতে হবে এবং বৃটেনে জনমত গঠন করতে হবে। তবেই বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে বাধ্য হবে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে সকল স্তরের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন হারডি। বৃটিশ শাসকদের প্রকৃত রূপ স্বচক্ষে দেখেছেন। বিশিষ্ট আইনজীবী যোগেশ চৌধুরীর সঙ্গে তিনি পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করেন—জলপথে ও স্থলপথে। শহরে গিয়েছেন, গ্রামে গিয়েছেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি বিলাতের শ্রমিকদলের কাগজে পাঠাতেন। ফলে, বিলাতের রক্ষণশীল মহলে গোলমাল পড়ে যায়—রক্ষণশীল কাগজে তাঁকে ধিক্কার দিতে শুরু করে এই বলে যে, তিনি ভারতীয়দের বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাচ্ছেন।

হারডি ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ-শাসকদের দুর্ব্যবহারের নমুনা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং ইংরেজ জাতির এই কলঙ্কের জন্য লজ্জা অনুভব করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি ঘটনার কথা তাঁর কাগজে লিখে পাঠান। তিনি একদিন সিরাজগঞ্জের জেলখানা দেখতে গেছেন। সঙ্গে যোগেশ চৌধুরী ও আরো অনেকে। সে-সময়ে স্থানীয় ইংরেজ জেলা-শাসক যোগেশ চৌধুরীর প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করাতে তিনি লজ্জিত ও ব্যথিত হন; প্রতিবাদে কারাগার পরিদর্শন না করেই ফিরে যান। তিনি বুঝলেন যে, যেখানে একজন বিশিষ্ট ভারতীয়ের প্রতি এরকম দুর্ব্যবহার করতে ইংরাজশাসক দ্বিধা পায় না—সেখানে সাধারণ লোকের কথা না ভাবাই শ্রেয়ঃ।

অন্যদিকে ভারতীয়দের বিশেষতঃ গ্রাম-বাংলার লোকেদের সরলতা ও আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। একদিন ঘুরতে ঘুরতে ভর-দুপুরে এক গাঁয়ে সদলবলে উপস্থিত।

শিবদাস চৌধুরী

সেখানে তিনি তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা শোনেন। আর গাঁয়ের লোকেরা ডাবের জল ও বাংলার মিঠাই দিয়ে তাঁকে আপ্যায়িত করে। মুগ্ধ ও তৃপ্ত হারডি সাহেব যাবার সময়ে তাঁদের কিছু অর্থ দিতে উদ্যত হলে তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে হারডি একদিকে যেমন অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হয়ে পড়েন, অন্যদিকে ভারতীয়দের অতিথি-পরায়ণতা ও উদারতা দেখে অভিভূত হন। বিদেশে ভারতীয়দের যে মূর্তি অঙ্কিত হয়ে থাকে, তারা যে তা নয়—এ-বিশ্বাস জন্মাল হারডির।

তিনি আরও দেখেছেন (এবং তদনুযায়ী লিখেছেন) যে, বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য যে-ব্যবস্থা করেছেন (এবং যার জন্য বৃটেন গর্ব অনুভব করে) তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা অপ্রতুল—এমনকি বৃটিশ কোম্পানী শাসন শুরু হওয়ার আগে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিল্পক্ষেত্রে এবং ন্যায় শাসনের ক্ষেত্রে আশানুরূপ কোন ব্যবস্থা তিনি দেখতে পান না। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে :

'We have regarded India as a country to be exploited for the benefit of Great Britain'.

ভারতের দুর্ভিক্ষের কথা বলতে গিয়ে তিনি দেখান যে, এ মানুষের সৃষ্ট; সরকারের হৃদয়হীনতার সাক্ষ্য বহন করে। ভারত বিরাট দেশ। সারা-ভারত জুড়ে দুর্ভিক্ষ হয় না। কোন অঞ্চলে স্বল্পকালীন অজন্মাজনিত দুর্ভিক্ষ হলেও অন্যাংশে প্রচুর ফলন হতো। সরকার তখন বিভিন্ন অঞ্চলকে একই দেশেরই অন্তর্ভুক্ত না ভেবে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের প্রচুর খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী করত। ফলে খরাপীড়িত বা বন্যা-কবলিত অঞ্চলের লোকদের কষ্টের আর অবধি থাকত না। এ হোল পরাধীন রাষ্ট্রের শাসন-প্রহসন।

হারডি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন সেতু বা যোগাযোগ ছিল না। কাইনই একমাত্র যোগসূত্র। তাই প্রতিটি বিষয়ে সহৃদয়তা, সহমর্মিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা আশা করা যেতে পারে না। তাছাড়া প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চস্তরে অতি অল্পসংখ্যক ভারতীয়ই ছিলেন; এমনকি গভর্নর-জেনারেলের কোন ভারতীয় সচিব ছিল না। দূর থেকে তাঁরা সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এর প্রতিকারের পথ হোল, নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের লোককে শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত করা এ-কাজে ভারতীয়রা সবিশেষ উপযুক্ত, হারডি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

হারডির মতে 'বঙ্গ-বিভাগ এক বৃহৎ ভুল—আর যেভাবে ইহা করা হয়েছে, তাহা আরো এক মারাত্মক বৃহত্তর ভুল।'

বাঙালীদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন—যে বাঙালীরা এতদিন অসীম ধৈর্য ধরে বহু দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছে এবং যখন তারা আর সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করছে, তখনই তারা বিপদে পড়েছে।

(২)

হারডি দেশে ফিরে গেলেন। তাঁর নতুন সংগ্রাম শুরু হোল ভারতীয়দের অনুকূলে। ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। বালগঙ্গাধর তিলকের খ্যাতি তখন দিগন্তবিস্তৃত। হারডি তিলককে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি ইংলণ্ডে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলবার জন্য সভা-সমিতিতে ও সংসদে বক্তব্য তুলে ধরতে লাগলেন। তিনি মনে করতেন যে, জাতীয় কংগ্রেসের একটি বৈঠক বৃটেনে হলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হবে।* তিনি

এ-ব্যাপারে তিলকের সাহায্যের কথা চিন্তা করেন। কারণ, তিলকের ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় কংগ্রেসের ওপরে তার প্রভাবের কথা হার্ডি জানতেন। তাই ইংলণ্ডে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি অধিবেশন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তার কথা কংগ্রেসকে বুঝিয়ে স্বীকৃত করাবার জন্য এক চিঠি লেখেন, ১৯১১ খৃঃ ৩১ মার্চ। এই চিঠি যখন বোম্বে ডাকঘরে আসে, তখন তিলক সাম্রাজ্যের জেলে অন্তরীণ ছিলেন। চিঠিটি পেয়ে কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। এ-ব্যাপারে বোম্বে ও দিল্লী কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেক লেখালেখির পর স্থির হলো যে তিলককে এ-চিঠিখানি দেওয়া অনুচিত। তাই এই ঐতিহাসিক চিঠি রীতি অনুসারে বাজেয়াপ্ত করা হোল। বর্তমানে চিঠিটি নয়াদিল্লীর ভারতীয় জাতীয় দলিল-মন্দিরে রয়েছে। এই চিঠিখানির প্রতি ছত্রে ভারতের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে।

(৩)

হার্ডির জন্ম হয়েছিল ১৮৫৬ খৃঃ ১৫ আগস্ট। তিনি ছিলেন শ্রমিক। অভাবের তাড়নায় ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাওয়া হয়নি। আট বছর বয়স থেকেই খেটে খেতে শুরু করেন। পিতা ছিলেন জাহাজের শ্রমিক। পিতার অফিসে পিয়নের একটি

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

কাজ পান। দু বছর পরে এক কয়লা-খনিতে মজুরের কাজ পেলেন। এখানে এসে সমদুঃখী আরো অনেককে পেলেন। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। এই নির্যাতন ও দুঃখ থেকে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তিত করে তুললো তাঁকে। কাজের অবসরে প্রাচীন ও সমকালীন চিন্তাবিদদের বই পড়তে লাগলেন। শেষপর্যন্ত স্থির হলো যে, সমস্ত শ্রমিক একত্রিত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তাই হলো। কিন্তু মালিকেরা এতে তাঁর প্রতি রুষ্ট হলো। কালো খাতাতে উঠল তাঁর নাম। শেষ পর্যন্ত চাকুরি চলে গেলো। তখন তিনি উঠেপড়ে শ্রমিক সংস্থা সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মাইনার্স অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়ে সহকারী কর্মসচিব নিযুক্ত হলেন। বয়স তাঁর তখন সবে চল্লিশ। কিন্তু এই সংস্থা আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তাঁকে সব সময়ে বেতন দিতে পারতো না। সৌভাগ্যবশতঃ স্থানীয় একটি পত্রিকা অফিসে পার্ট-টাইমের একটি চাকুরী পেয়ে যান। এই যোগাযোগ যেন বিধির বিধানে হয়েছিল। এর ফলে তাঁর দুবেলা অন্নের ব্যবস্থা হয়ে গেল; এবং শ্রমিক-কল্যাণে তিনি আত্মনিবেশ করতে পারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতাতেও হাতেখড়ি হয়ে গেল। পরবর্তী জীবনে এই অভিজ্ঞতা তাঁর শ্রমিক সংগঠনে বিশেষ কাজে লেগেছিল। কারণ সংবাদপত্র এসব কাজের পক্ষে অপরিহার্য। ধীরে ধীরে তিনি শ্রমিক-নেতা হিসাবে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন—স্কটিশ মাইনার্সদেরও সংঘবদ্ধ ও একত্রিত করেন। কিছুকাল পরে 'কামক নিউজ' (১৮৮২-৮৬) ও 'মাইনর' (১৮৮৭) কাগজের সম্পাদক করেন। শেষোক্ত কাগজটি ১৮৯০ খৃঃ হতে 'লেবর লিডর' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়। শ্রমিকদের মধ্যে এটি দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত কাগজ ছিল। পরে 'লেবর পার্টি'র মুখপত্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

শ্রমিকদের মুখপত্র যদিও সরকারের কাছে তাদের দাবীদাওয়া তুলে ধরছিল, তবু তিনি দেখলেন, লক্ষ্য তখনও অনেক দূরে। লক্ষ্যে উপস্থিতি ত্বরান্বিত করতে হলে রাজনৈতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উপলব্ধি করে সকলকে বুঝিয়ে বললেন—সেই সভায় তৎকালীন সংরক্ষণশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরও তীব্র ভাষাতে আক্রমণ করলেন। শেষপর্যন্ত সকলে তাঁর যুক্তি ও প্রস্তাব সমর্থন করে। জন্ম হোল স্কটিশ লেবার পার্টির, ১৮৮৭ খৃঃ। এবার লড়তে হবে সংসদের ভিতরে ও বাহিরে। তাই ১৮৮৮ খৃঃ নির্বাচনে লোকসভার সদস্যপদের জন্য দাঁড়ালেন, কিন্তু হেরে গেলেন। মাত্র ৬১৭টি ভোট পেয়েছিলেন। পাঁচ বৎসর পরের নির্বাচনে আবার দাঁড়ালেন। রক্ষণশীল দলের প্রতিদ্বন্দ্বীকে এবার হারিয়ে (১২০২ ভোটে) লোকসভাতে নির্বাচিত হলেন। তিনিই হলেন সংসদের সর্বপ্রথম শ্রমিক সদস্য। সংসদে আসতেন খনি-মজদুরের পোষাক ও টুপি পরে। এখনকার দিনে এ-দৃশ্য অভাবনীয়। সংসদে যদিও তিনি তাঁর দলের একক সদস্য ছিলেন কিন্তু প্রয়োজনবোধে ন্যায়ের জন্য একক লড়তে পরাঙ্মুখ হতেন না। একটি ঘটনা। ১৮৯৪ খৃঃ মহারানী ভিক্টোরিয়ার এক প্রপৌত্রের জন্ম হয়। এই উপলক্ষে সংসদ সদস্যেরা মহারানীকে এক অভিনন্দন বাণী প্রেরণের এক প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান—কিন্তু বাধ সাধলেন হার্ডি সাহেব। তিনি তীব্র বিরোধিতা করলেন। ইংলণ্ডের সংসদের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। হার্ডির বিরোধিতার কারণও ছিল। মহারানীর প্রপৌত্রের জন্মদিনে ইংলণ্ডের এক কয়লাখনিতে বড় রকমের দুর্ঘটনাতে বহু শ্রমিক হতাহত হয়। হার্ডির বক্তব্য হলো, মহারানীকে অভিনন্দনসূচক বাণী এবং দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বেদনার্ত পরিবারদের উদ্দেশ্যে সমবেদনার প্রস্তাব একই সঙ্গে সংসদে উত্থাপিত করতে হবে। সংসদ সদস্যেরা দুটি প্রস্তাবকে একই সূত্রেই গাঁথতে রাজী হলেন না। তাই তাঁর বিরোধিতা।

দেশটা রক্ষণশীল। তাই তিনি তাঁর নির্ভীকতার জন্য পরের বছরের সংসদের নির্বাচনে হেরে গেলেন। এই সময় লেবর 'লিডর' কাগজ সম্পাদনে ও শ্রমিক সংগঠনের কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। ফলে ১৯০০ খৃঃ নির্বাচনে আবার সংসদে আসন লাভ করেন। সে-সময় থেকে আমৃত্যু তিনি সংসদের সদস্য ছিলেন এবং নির্ভীক চিত্তে নিপীড়িতদের জন্য যুদ্ধ করে গেছেন।

১৮৮৭ খৃঃ থেকে তিনি সমস্ত দেশের জন্য একটি লেবর পার্টি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয় ১৮৯০ খৃঃ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবর পার্টির জন্মলগ্নে। ১৯০০ খৃঃ লেবর রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিটি তাঁরই তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়। ১৯০৬ খৃঃ এটি রূপ নেয় 'লেবর পার্টি'তে। ঐ বৎসরের নির্বাচনে ২৮ জন শ্রমিকদলের সদস্য সংসদে আসন লাভ করেন। শ্রমিক সদস্যেরা মিলে যে সংসদীয় সমিতি গঠন করেন, তাঁর প্রথম সভাপতি হন হার্ডি।

এই আজীবন সংগ্রামী, অকৃত্রিম শ্রমিক-দরদী ও ভারতবন্ধু ১৯১৫ খৃঃ ২৬ সেপ্টেম্বরে গ্লাসগোতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'দি বেঙ্গলি' কাগজে এক সম্পাদকীয়তে শোক জ্ঞাপন করে লেখে—

'His death will be mourned by the Labour Party and India shares their grief, for he was one of the staunchest friends of Indian cause in England'.

জীবনের সায়াহ্নেও এই নির্ভীকচিত্ত এবং আপোষবিরোধী অকৃত্রিম ভারতদরদী প্রয়োজনবোধে যথাস্থানে নির্মমভাবে আঘাত করতে বা নিপীড়কদের মুখোশ খুলে ফেলতে ইতস্ততঃ করতেন না। তাই তিনি চারধারে কিছু শত্রুও সৃষ্টি করেছিলেন। নিজের দলেও তিনি অনেক সময়ে আপোষ-বিরোধী ছিলেন—তাই অনেক সময়ে 'একলা চলার' পথিক ছিলেন। প্রমাণ, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের প্রতি পার্টির প্রস্তাবে তাঁর তীব্র বিরোধিতা। সুযোগ পেলেই তিনি বুর্জোয়া মতবাদ ও চালচলনকে উপেক্ষা ও বিদ্রূপ করতেন। ওরাও তাই তাঁকে নাম দিয়েছিলো—'বেকার জনমজুর সংঘের সদস্য'।

ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্মবেদনার পরিচয় হার্ডির সমস্ত লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। একটি অংশ :

'We are too apt to forget that civilisation has blossomed in India ere its rudiments and began to sprout in Europe.. A people with a past which has shed enlightenment upon religion, art, science and literature in every country in the world is surely entitled to different treatment from that meted out to half developed savages; and yet our whole system of government in India rests upon the assumption that its people are either unfit or unworthy to be trusted with even the semblance of self-government. It is that which galls the mind and sears the heart of this cultured and refined people?'

* '..next to the education of the people of India concerning their political rights and duties the next important thing is the education of the people of this country (i-e. U.K.) concerning India. and their aims and aspirations'.

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

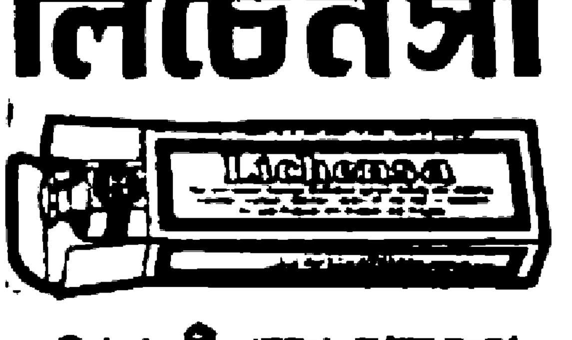

● ১০৮ টি দেশে ডাক্তারেরা প্রেসক্রিপশন করেছেন
● যে কোন বারকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।
DS-1676 R-BEN

CENTRAL LIBRARY

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

দ্বিজপদ লয়েডস ব্যাঙ্ক থেকে চেকটা ভাঙিয়ে যখন ফুটপাথ ধরে হাঁটা শুরু করল—চৌরঙ্গীপাড়ায় তখন কাজের চাকা সচল হয়ে উঠেছে। দ্বিজপদ হাঁটতে-হাঁটতেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে কড়কড়ে নতুন নোটগুলোকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল। সদ্য টাঁকশাল থেকে ছাপা নম্বর-মেলান কুড়িখানা দশ টাকার নোট ওর পকেটে। নতুন নোটের একটা দারুণ লোভনীয় গন্ধ আছে। দ্বিজপদ এদিক-ওদিক চেয়ে পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে নাকের সামনে ধরল।

খুব জোরে নিঃশ্বাস টেনে গন্ধের ঘ্রাণ নিল। দ্বিজপদর চোখে পৃথিবীর রঙটাই বদলে গেল।

গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে পৌঁছে দ্বিজপদ দেখল একজোড়া ঝকঝকে সাহেব-মেম পরস্পরের কোমর ধরে হোটেল থেকে বার হয়ে আসছে। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য প্রসাধনে আশ্চর্য উজ্জ্বল এক জীবনের ছবি দ্বিজপদর চোখ দুটোকে লোভী করে তুলল। আরও কিছুটা এগিয়ে এসে নিউ ক্যাথের সামনে দাঁড়াতেই চীনা খাবারের পরিচিত গন্ধ নাকে এলো। পকেটে অঢেল টাকা। ক্ষুধা আর সম্ভোগের বাসনা—দুই শিকল-বাঁধা অশান্ত তৃষ্ণার্ত পাখির মত বুকের মধ্যে ছটফট করছে। আজ উদ্দাম ভোগের মুক্ত আকাশে পাখি দুটিকে উড়িয়ে দেবে দ্বিজপদ। আপাতত ক্ষুধার পাখিটাই বড় বেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ফ্রায়েড রাইস আর মুরগীর ঝোল দিয়ে আগে ক্ষুধাকেই শান্ত করতে হবে।

দ্বিজপদ নিউ ক্যাথের মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটা চেয়ার দখল করে ফ্রায়েড রাইস আর মুরগীর ঝোলের ফরমায়েস দিল। বাতাসে দারুণ লোভনীয় গন্ধ। জিবটা জলে ভিজে গেল। চীনা রেস্তোরাঁর এই এক ঝামেলা। চুপ করে হাত গুটিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়—জিব দিয়ে জল ঝরে।

দ্বিজপদর সামনে ফ্রায়েড রাইস আর মুরগীর ঝোলের প্লেটগুলো সাজিয়ে দিয়ে গেল ওয়েটার। ধোঁয়া-ওঠা ফ্রায়েড রাইস থেকে সুগন্ধী ভাপ উঠছিল। ঝোলের ওপরে একটা আস্ত মুরগীর ঠ্যাং ভাসছিল। এমন মনোহর দৃশ্য এবং গন্ধের সুখ কতদিন যে পায়নি দ্বিজপদ। ক্ষুধা যেন সর্বসংহা আগুন হয়ে পেটের মধ্যে জ্বলে উঠল। দ্বিজপদ চামচ-কাঁটা এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বড়-বড় থাবায় গোগ্রাসে ফ্রায়েড রাইস গিলতে লাগল। মুরগীর ঠ্যাংটা শক্ত মুঠোয় ধরে দাঁত দিয়ে নরম মাংসের টুকরোগুলো খাবলে মুখের মধ্যে তুলে নিল। কুড়মুড় ক্যাঁচ কাঁচ, নরম হাড় ভেঙে চিবুতে লাগল।

ভোগের বাসনাগুলো এতদিন অভাব-দারিদ্র্য, উড়ের হোটেলের নিত্য-নৈমিত্তিক দু হাতা ভাত আর এক হাতা পাতলা ডালের একঘেয়ে স্বাদহীন, বর্ণহীন অর্ধাহারে, ছাই-চাপা আগুনের মত ঘুমিয়ে ছিল। আজ ফ্রায়েড রাইসের লোভনীয় সৌরভ, কাঁচ, নধর মুরগীর ঠ্যাং-এর মনোহর দৃশ্য আর সম্ভোগের আয়োজনকে সম্পূর্ণ করার মত পকেটে নতুন কড়কড়ে নোটের গোছা—সেই অবদমিত বাসনাগুলোকে যেন শৃঙ্খল-মুক্তির আনন্দে বিপুল বেগে রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সঞ্চারিত করে দিল।

প্লেট-ভর্তি ফ্রায়েড রাইস পেটের মধ্যে উধাও হয়ে যেতে খুব বেশী সময় লাগে নি। দু-চারটে যাও-বা পড়ে ছিল—দ্বিজপদ খুঁটে-খুঁটে মুখের মধ্যে তুলে নিল। ঝোলের বাটিটাকে চেটে-পুটে মাখা-মুখা

ফেলল। তারপর পুরো এক গ্লাস জল ঢক-ঢক করে গলার মধ্যে ঢেলে দিল।

আজ শরীরের খাঁচা থেকে বাসনার পাখিগুলোকে মুক্তি দেবে স্নিগ্ধপদ। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের শিকলগুলোকে এক-এক খুলে দিয়ে একটার পর একটা বাসনার পাখিকে রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শের উদার উন্মুক্ত মাঠে-মাঠে উড়িয়ে দেবে।

স্নিগ্ধপদ রেস্তোরাঁ থেকে বার হয়ে সুগন্ধী পান খেল। এক প্যাকেট ক্যাপস্টান কিনল। সিগারেট ধরিয়ে বেশ জোরে কয়েকটা টান দিয়ে সুগন্ধী পান চিবুতে লাগল। স্নিগ্ধপদ বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। বাসস্টপে ভিড় নেই। স্নিগ্ধপদ সিগারেটটা শেষ না করে বাসে উঠতে চাইছিল না। একটা বাস স্টপে এসে দাঁড়াতেই কিলেকের ঘন্টার কর্কশ শব্দ তুলে এগিয়ে গেল। পরের বাসটা আসতে অনেক দেরী। স্নিগ্ধপদ বেশ জোর করে সিগারেটে টান দিচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার মাঝ-বরাবর চোখ পড়তেই চিৎকার করে উঠল — আরে সুস্মিতা না?

সুস্মিতা তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে স্নিগ্ধপদ। সুস্মিতা কাছে এগিয়ে আসতেই স্নিগ্ধপদ বুকের মধ্যে যেন খুব জোর একটা ধাক্কা খেল। আশ্চর্য! কি হাল হয়েছে মেয়েটার! অমন চকচকে ফিটে-ঝাপা পারফেক্ট ফিগার শুকিয়ে একেবারে আমচুর। যেন হাড়গিলে পাখির মত ডানা ঝাপটিয়ে উড়ছে। অথচ—আর্ট কলেজের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত মডেল ছিল সুস্মিতা। ওকে মডেল করার জন্য ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্টদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

স্নিগ্ধপদ তো কতদিন ওকে সামনে বসিয়ে হিউম্যান ফিগারের স্কেচ আঁকায় হাত পাকিয়েছে।

কয়েকটা টাকা মজুরীর বিনিময়ে মেয়েটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নগ্নদেহে ঢেউ জাগিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকত।

আর্ট কলেজের ভাড়া-করা মডেলদের মধ্যে এমন পারফেক্ট ফিগার কারও ছিল না। কঠিন পীনোন্নত বুকের চাকে এক ফোঁটা কালো তিল, নাভিকুণ্ডের নীচে লাল জড়ুলের দাগ, নীল-নীল সূক্ষ্ম শিরার হিজিবিজি রেখা আঁকা মসৃণ পাতলা চামড়ায় ঢাকা বুক-পেট, তলপেটের মাঝ বরাবর সোনালী রোমের রেখা, জঙ্ঘার সানু-প্রদেশের অন্ধকার—স্নিগ্ধপদর তুলির রেখায় কত বিচিত্র ভঙ্গীতে ধরা পড়েছিল সুস্মিতা রায়ের সেই আশ্চর্য ফিগার।

সত্যিই খুব দামী একটা মডেল ছিল সুস্মিতা। নিটোল, পুরুষ্ট, পায়ের গোছ পর্যন্ত ঢাকা একরাশ ঘন কালো চুল ঝাঁকিয়ে মাথাটাকে কাঁধের ওপরে ঈষৎ হেলিয়ে চাপা ঠোঁটে আশ্চর্য হাসির ঝলক ফুটিয়ে তুলত। বুকের ওপরে হাত দুটোকে প্রণামের ভঙ্গীতে জড় করে হাঁটু মুড়িয়ে বসে থাকত স্থির, নিষ্পলক-চোখের পলক পর্যন্ত পড়ত না—এক-এক সময় মনে হত—ও নিজেই যেন একটা মহর্ষি, যোগসিদ্ধ ঋষি।

স্নিগ্ধপদদের ক্লাসের সমর সেন নামে সেই কবিতা-পাগল ছেলেটি ছবি আঁকার চেয়ে কবিতা রচনাতেই তার উৎসাহ ছিল বেশী—সুস্মিতা রায়কে নিয়ে খুব সুন্দর একটা কবিতা লিখেছিল—পুরো কবিতাটা এখন আর মনে নেই—শুধু একটিমাত্র লাইন—'মোনালিসা, তুমি যেন এক বিস্ময় প্রভাব—কোনদিন মন থেকে মুছবে না।

সুস্মিতা রায় স্নিগ্ধপদর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হেসে বলল—উঃ কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। প্রায়ই আপনার কথা মনে পড়ে। আপনি খুব লক্ষ্মী ছেলে ছিলেন। আমাকে একটুও জ্বালাতন করেননি।

সুস্মিতার মাথায় লালচে রুক্ষ চুল বাতাসে এলোমেলো উড়ছে। আশ্চর্য, কোথায় গেল মাথাভর্তি একরাশ কুচকুচে ঘন কালো চুল। সিঁথিটা শূন্য সাদা মাঠের মত ধু ধু করছে। সামনের দিকে কপালের ওপরে চুল প্রায় নেই বললেই চলে। শূন্য কপালটা উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে। টুসটুসে গাল-দুটো শুকিয়ে চোয়ালের গর্তে ঢুকে পড়েছে। শুকনো লম্বাটে মুখে পান পাতার ছাঁদটা আর ধরা পড়ে না। শুধু সুডৌল চিবুকে আজও ভাঙন ধরে নি। সুস্মিতা রায়ের হাসিটা চিবুকের ভাঁজে একটা ছোট্ট ঢেউ তুলে চাপা ঠোঁটের কোণে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে করুণ, পাংশু মুখের বিবর্ণতায় হারিয়ে গেল। ঢিলে ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে কণ্ঠার হাড় দুটো ঠেলে উঠেছে। অন্তর্বাসের শিথিল বন্ধনীতে যে ঢিলে-ঢালা স্তন দুটো খুব ঝুলে পড়েছে স্পষ্টই বোঝা যায়। গর্তে-বসা চোখ দুটোতে পুরু কাজলের রেখা কিন্তু চোখের নীচের কালি ঢাকা পড়েনি। শুকনো চোয়াল-দুটো ভাঙা গালের ওপর খাড়া হয়ে উঠেছে। রক্তহীন ফ্যাকাশে ঠোঁট-দুটোকে বার বার জিভ দিয়ে চাটছে সুস্মিতা। গলার স্বর কেমন যেন ধরা-ধরা। মনে হয় অনেকটা পথ হেঁটে সুস্মিতা খুব পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত।

স্নিগ্ধপদ খুব গম্ভীর গলায় বলল—তোমার শরীরের এমন হাল হয়েছে কেন?

সুস্মিতার পাংশু, বিবর্ণ ঠোঁটে আবার চাপা হাসি ফুটে উঠল, ধরা-গলায় বলল—আমার কথা নাই বা শুনলেন, আপনার খবর কি বলুন। আজকাল কি করছেন? কলেজে তো আজকাল আর আসেনই না। সেদিন মমতাজ বেগমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভদ্রমহিলা কি যেন একটা সার্টিফিকেট নিতে কলেজে এসেছিলেন। শুনলাম ও'র স্বামী নাকি ও'কে তালাক দিয়েছেন। বিলেত না আমেরিকা কোথায় যেন চলে যাচ্ছেন। ও'কে আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনিই পাল্টা প্রশ্ন করে আপনার খবর জানতে চাইলেন।

মমতাজ—চার অক্ষরের একটা সাদামাটা নাম অথচ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বুক জুড়ে দপদপে ঘায়ের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে—বিষ, নিঃস্ব এক হৃদয়ের অতীত। এমন বীভৎস একটা ক্ষত যে বুকের অন্ধকারে চাপা পড়েছিল স্নিগ্ধপদ কি জানত?

ডিসেম্বরের এই সুন্দর নির্মেঘ শীতের দুপুরে নরম, উষ্ণ, রোদ্দুরের স্বাদ মেখে চৌরঙ্গীর চঞ্চল যৌবন যখন বাসনার পাখীগুলোকে মুক্তির উদার আকাশে স্বচ্ছন্দ বিহারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে—সুস্মিতা হঠাৎ সেই পুরোনো একটা ক্ষতকে খুঁচিয়ে রক্ত ঝরিয়ে দিল কেন?

হৃদয়ের নিঃস্ব এক অতীতের স্মৃতি—যে স্মৃতিতে শুধু ব্যর্থ সম্ভোগের হাহাকার, বিস্বাদ একটা শরীরের অন্ধকারে প্রেম নামক এক আশ্চর্য উপলব্ধির স্বর্গ থেকে পতনের দুঃখই যন্ত্রণা—বিষ, নিঃস্ব সেই অতীতের জঠর থেকে করুণ বিবর্ণ একটি মুখ রক্ত মাখামাখি হয়ে ভেসে উঠেছে হৃদয়ের ঝাপসা আয়নায়। সেই মুখ মায়ের মুখের খড়ি-আঁকা মমতাজের সেই করুণ বিষণ্ণ বাসনার পাখীগুলোকে কি আশ্চর্য দুঃখী করে দিয়েছে। এই দুঃখী পাখী-গুলোকে নিয়ে এখন কি করবে স্নিগ্ধপদ?

সুস্মিতার শরীরটা একদিন শ্যামল শস্যক্ষেত্রের মত কত বিচিত্র সৃষ্টির স্বপ্ন জাগিয়েছিল আর্ট কলেজের ছাত্রদের চোখে। স্নিগ্ধপদর শিল্প-সত্তাকেও একদিন সেই সরস শস্যপ্রান্তর কত বিচিত্র আনন্দ আর প্রেরণার উৎস-মুখকে খুলে দিয়েছিল।'

সেদিন সুস্মিতার নগ্ন শরীরের প্রত্যেকটি রেখা, ভাঁজ, আলো অন্ধকার, বুকের ওপরে থমকান সাগরের ঢেউ সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করেছিল স্নিগ্ধপদ। সেদিন সুস্মিতা এক সার্বজনীন নারীদের মডেল হয়ে ওকে সৃষ্টির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করেছিল। সুস্মিতাকে সামনে বসিয়ে আর্টের সাধনা করেছিল স্নিগ্ধপদ। নারীদের অন্তর্নিহিত মাধুর্যকে কত বিচিত্র রূপে ফুটিয়ে তুলেছিল তুলির আঁচড়ে। সুস্মিতাকে মডেল করে স্নিগ্ধপদ যে শেষ ছবিটা এঁকেছিল সেই ছবিতে পবিত্র মাতৃত্বের মহিমমণ্ডিত বিস্ময় আর্ট কলেজের ছাত্রমহলে সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিল। সে এক আশ্চর্য ম্যাডোনার চিত্র—মা সন্তানকে কোলে একটি করুণ আনত স্তনে তুলে ধরেছে—মায়ের মুখে মাতৃত্বের কি করুণ অথচ মাধুর্যমণ্ডিত স্নিগ্ধতা। স্নিগ্ধপদ নিজেই অবাক হয়ে ভেবেছিল শৈশবের বিস্ময়-জাগানো বড়ঘরের দেওয়ালে টাঙানো সেই ফটোটা—শিশু স্নিগ্ধপদকে কোলে নিয়ে মায়ের করুণ, আনত মুখের ছবিটা কি আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে ক্যানভাসের গায়ে ফুটে উঠেছে।

একটা ডবল-ডেকার বাস স্টপে এসে দাঁড়াল। সুস্মিতা দ্রুত ঝুঁকে ও'কে চিবুকের ভাঁজে ঢেউ তুলে বলল—আজ তবে আসি।

সুস্মিতা বাসের দরজার মুখে এগিয়ে গেল। ফুটবোর্ডে পা রাখতে যাচ্ছিল, স্নিগ্ধপদ ওর হাত ধরে টান দিয়ে বলল—

না, এখন তুমি যাবে না। বাসটা ছেড়ে দাও। চল কোন রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি।

সুস্মিতা দ্বিজপদর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। বাসটা তখন স্টপ ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছে।

সুস্মিতা বলল—আমাকে যে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, দ্বিজবাবু। আজ আমাকে ছেড়ে দিন।

দ্বিজপদর মুঠোটা আরও শক্ত হয়ে সুস্মিতার কব্জিটা চেপে ধরল।

সুস্মিতা কোন রকমে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—তাহলে চলুন, কোথায় যাবেন।

ওরা পার্ক স্ট্রীটের একটা দামী রেস্তোরাঁর অর্ধকার কেবিনে নরম আলোর নীচে মুখোমুখি বসল।

দ্বিজপদ জিজ্ঞাসা করল—সুস্মিতা, তোমার মুখটা খুব শুকনো মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। বল, কি খাবে? লজ্জা কোর না, আমার পকেটে আজ অনেক টাকা আছে।

আপনার যা ইচ্ছে বলুন—সুস্মিতা নিরুত্তাপ ঠান্ডা গলায় জবাব দিল।

'আমার পেট-ভরা। এইমাত্র ফ্রায়েড রাইস আর মুরগীর ঝোল দিয়ে এক পেট খেয়েছি। আমি শুধু চা খাব।'

'তাহলে আমিও শুধু চা-ই খাব।'

না, তা হয় না। তোমার পেটে খিদে আছে। তোমাকে পেট ভরে খেতেই হবে।

সুস্মিতার চোখ দুটো হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল। গলাটা ভারী হয়ে এলো, বলল—না, আমার জন্য শুধু চা-ই বলুন। আর আমাকে পেট ভরে খাওয়াতে যে টাকাটা খরচ হবে দয়া করে আমার হাতে দিন। টাকার বড় দরকার আমার।

দ্বিজপদ খুব স্পষ্ট, ধারালো চোখে সুস্মিতার শরীরে চোখ বোলাচ্ছিল। কি শরীর ছিল মেয়েটার। তাছাড়া আর্ট কলেজের মডেলদের মধ্যে সুস্মিতার রোজগারই ছিল সবচেয়ে বেশী। মেয়েটার এমন হাল হল কি করে কে জানে?

সুস্মিতার গর্তে-বসা শুকনো চোখ-দুটো জলজল করছিল, দ্বিজপদর মনে হল—ওর চোখে আগুন জ্বলছে। সুস্মিতা জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে দ্বিজপদর মুখের ওপরে জলজলে চোখ দুটো তুলে বলল—আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছেন—না? আপনার সঙ্গে তো অনেকদিন দেখাই হয় না। আমার কোন খবরই বোধহয় আপনার জানা নেই। আর্ট কলেজে আজকাল আর কাজ মেলে না। শরীরের কি হাল হয়েছে দেখছেন তো? তাছাড়া আজকাল অনেক সুন্দরী মেয়ে এ লাইনে নেমে পড়েছে। স্টুডেন্টরা আমাকে আর পাত্তাই দেয় না। প্রফেসর কান্তপুরীর আজ সাফ জানিয়ে দিলেন—আমাকে আর দরকার নেই। বাচ্চাটা জন্মাবার পর অনেক দিন বিছানায় পড়ে ছিলাম। বুকে দুধ ছিল না। দুবেলা দুমুঠো ভাতই জুটত না—তা দুধ কেনার পয়সা কোথায় পাব! বাচ্চাটাও রোগে ভুগে যে বিকেটে ভুগছে—আজও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করতে পারলাম না। নিজের দেহও ভাঙন ধরে গিয়েছে। তবে নিজের জন্য আর ভাবি না। শুধু বাচ্চাটাকে বাঁচাব কি করে ভেবে কূল পাচ্ছি না। দ্বিজবাবু, ছেলেটাকে বোধহয় আর বাঁচাতে পারব না। সুস্মিতার গলার স্বর কাঁপছিল—শেষের দিকে উদ্গত কান্নায় কথাগুলো জড়িয়ে গেল।

দ্বিজপদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুস্মিতার শরীরটা দেখছিল। জল-ভরা দুটি বিষণ্ণ স্নিগ্ধ চোখের দর্পণে আশ্চর্য এক শরীরের মন্দির ছায়া হয়ে ফুটে উঠেছে। সেই মন্দিরের গর্ভে একদিন কি বিপুল ঐশ্বর্য চোখ ধাঁধিয়ে দিত। আজ সব হারিয়ে রিক্ত নিঃস্ব সেই শরীরের অন্ধকার ধ্বংসাবশেষে শুধু চিবুকের প্রান্তদেশে শেষ সূর্যের আলোর মত আজও এক চিলতে সৌন্দর্যের রশ্মি লেগে আছে।

সুস্মিতা ভিজে-ভিজে চিকচিকে চোখ দুটো তুলে দুঃখের কাহিনী কেঁদে বলল—মা, আমার বিয়ে হয়নি। শয়তান রাখহরিটাই আমাকে সর্বনাশের পথে নামিয়ে দিল। রাখহরিকে আপনার মনে আছে তো? সেই মুটোটা যে আর্ট কলেজের মডেলদের জুটিয়ে আনত—লোভ দেখিয়ে আমাকে পাঁকের পথে ঠেলে দিয়েছিল। আপনি যে বছর কলেজ ছাড়লেন তখন থেকেই আমার রোজগারে ভাঁটা পড়তে শুরু করেছিল। নোতুন নোতুন মেয়েরা কলেজে ধর্ণা দিতে শুরু করেছিল। মডেলদের মধ্যে দারুণ কম্পিটিশন। আমার একার রোজগারে সংসার চলা দায় হয়ে উঠল। চারটে পেটের ভাত যোগাতে হত আমাকে। আমার এক ভাই চায়ের দোকানে কাজ করত। মাঝে মাঝে কিছু টাকা ধরে আনত। সেই ভাইয়ের গলা দিয়ে রক্ত উঠল। অভাবে আমার মাথার ঠিক ছিল না। রাখহরি লোভ দেখাল—সিনেমা লাইনে নাকি অনেক পয়সা। কোন একজন ডাইরেক্টর নাকি নোতুন মুখ খুঁজছেন। আমার মত মেয়েকে পেলে লুফে নেবেন।

শেষ পর্যন্ত রাখহরির কথায় রাজি হয়ে গেলাম। ডাইরেক্টর মশাই অনেক আশার কথা বললেন। কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করে একশ টাকা অ্যাডভান্সও পেলাম। ভাবলাম বুঝি দুঃখ ঘুচল। ভাল অভিনয় করতে পারলে শরীর বেচে পয়সা রোজগারের লজ্জা থেকে রেহাই পাব। কিন্তু তখন বুঝিনি—সিনেমা জগতের সবটাই ফাঁকি। ডাইরেক্টরের সঙ্গে হোটেলের ঘরে বেশ কয়েক রাত অভিনয়ের তালিম নিয়ে এক ভুঁড়ি-ওয়ালা মাড়োয়ারী প্রোডিউসারের হাত ঘুরে আবার যখন ডাইরেক্টর মশায়ের হাতেই ফিরে এলাম—তখন একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি মা হতে চলেছি। ডাইরেক্টরের পায়ের তলায় কেঁদে পড়েছিলাম। ভদ্রলোক আমার হাতে শ' চারেক টাকা দিয়ে সাফ জানিয়ে দিলেন—আমার দ্বারা অভিনয় হবে না। শুধু কন্ট্রাক্টের অনার রাখার জনাই আমাকে টাকাটা দিলেন। ভদ্রলোক দয়া করে আমাকে আরও একশ টাকা দিয়ে একটা সস্তা নার্সিংহোমের ঠিকানা বলে দিলেন। আজকাল নাকি আকছার এসব ব্যাপার ঘটছে। একটা বেলা নার্সিং হোমে শুয়ে থাকলেই আবার কুমারী হয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসা যায়।

দ্বিজবাবু, আমি মা হয়ে নিজের পেটের বাচ্চাকে মেরে ফেলতে পারিনি। অনেক কষ্ট পেয়ে মা হয়েছি। দিনের পর দিন না খেয়ে বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। কিন্তু আর বোধহয় ওকে বাঁচাতে পারব না। বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা যাবে। কদিন ধরে নিউমোনিয়ায় ভুগছে ছেলেটা।

সুস্মিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। দ্বিজপদ আগেই বিরিয়ানী আর মাংসের কোর্মার অর্ডার দিয়েছিল। বেয়ারাটা এসে টেবিলের ওপরে খাবারের প্লেটগুলো সাজিয়ে দিয়ে গেল। নিঃশ্বাসে দামী খাবার-গুলোর লোভনীয় গন্ধ ভুরভুর করছিল। সুস্মিতা প্লেটগুলোর ওপরে লুব্ধ, ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ফেলেই মুখটা নামিয়ে নিল।

দ্বিজপদ বলল—সুস্মিতা, পেট ভরে খাও। তোমার ছেলের চিকিৎসার টাকা আমি দেব।

সুস্মিতা ইতস্তত করছিল। ডান হাতটা বিরিয়ানির প্লেটের সামনে এগিয়ে নিয়েই আবার গুটিয়ে নিয়েছিল।

দ্বিজপদ সুস্মিতার কাঁধে হাত রেখে বলল—সুস্মিতা, পেট ভরে খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নাও। হাত গুটিয়ে বসে থেকো না।

সুস্মিতা দ্বিজপদর চোখের ওপরে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফেলে বিরিয়ানীর প্লেটে মুখ নামাল।

দ্বিজপদ সুস্মিতার আনত মুখের দিকে চেয়ে মনের ক্যানভাসে আশ্চর্য এক ছবি আঁকতে লাগল। হরিৎ ধানক্ষেতের মত ঢেউ-তোলা নরম, উষ্ণ, পাকা ফসলের গন্ধ-ওঠা এক নারীর শরীর, বুকের ওপরে ফরাসের রুক্ষ গুলো আঁকা স্বপ্নের-চক্র, নাভিকুণ্ডের মুখে, জঙ্ঘার সানুদেশে, নিটোল, নিটোল উরু আর সোনালী লোমে ঢাকা পায়ের গোছ জানুতে আলোর আভার ঝকমক করছে।

দ্বিজপদ পরম তৃপ্তিতে চায়ের কাপে চুমুক দিল। দ্বিজপদ আর সুস্মিতা যখন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রেস্তোরাঁ থেকে বার হয়ে এলো—চৌরঙ্গী পাড়ায় তখন নীয়ন বিজ্ঞাপনের রঙিন রোশনাইয়ের গায়ে ঝকঝকে নিওনের আলো মাখিয়ে এক উজ্জ্বল আলোকিত রাত্রির আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে।

দ্বিজপদ সুস্মিতার পাশে ঘন হয়ে এসে বলল—তোমার তাড়া নেই তো?

সুস্মিতা ঠোঁটের বিষণ্ণ হাসি ফুটিয়ে বলল—তাড়া থাকলেই বা উপায় কি বলুন? আপনি না ছাড়লে যাই কি করে? টাকা না পেলে বাড়ী ফিরে লাভ নেই।

'চল, তাহলে সিনেমা হলে ঢুকি। অনেকদিন ছবি দেখিনি!'

কেনার সময় আপনি যে নির্মল বার সাবানই পাচ্ছেন তা বুঝবেন কি করে?

যা-ই কিনুন তা পুরোপুরি খাঁটি কি না না-দেখেই সরল বিশ্বাসে হয় তো নিয়ে নেন। কিন্তু সাবধান! নির্মল বার সাবানের হুবহু নকল বাজারে বেরিয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন একই।

এবার থেকে যখুনি নির্মল বার সাবান কিনবেন, জিনিসটা কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড-এর তৈরী কি না দেখে নিলে আর ঠকতে হবে না। নকল মালের হদিশ পেলেই আমাদের জানান, যাতে খাঁটি নির্মল পেতে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

নির্মল বার সাবান

পূর্ব-ভারতে এই বার সাবানই কাটতিতে সবার ওপরে।

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

'আপনি আমার জন্যে এত খরচ করছেন কেন? আমার খুব লজ্জা করছে।'

না, না, তোমার জন্যে কিছুই খরচ করছি না। তোমার পাশে বসে আজ ছবি দেখার সাধ হয়েছে। আমি আমার নিজের সুখের জন্যেই তোমাকে ধরে রেখেছি। চল ভেতরে ঢুকে পড়ি।'

ওরা যখন হলের মধ্যে ঢুকল, লাইটগুলো সব নিভে গেছে। এক বিখ্যাত কসমেটিক কোম্পানীর বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হচ্ছে পর্দার গায়ে।

ওরা অন্ধকারেই সিট খুঁজে নিয়ে পাশাপাশি বসল। স্বিজপদ প্রথম থেকেই উসখুস করছিল। সুস্মিতার বেশ ভাল লাগছিল রঙীন ইংরেজী ছবির দৃশ্য এবং কাহিনী। কিন্তু বাক্সটার চিন্তা ভারী হয়ে বুকের ওপরে চেপে বসেছিল।

ইন্টারভেল না হতেই স্বিজপদ নিজেই উঠে দাঁড়াল—বলল, চল, বাইরে যাই। ছবি দেখতে আর ভাল লাগছে না।

সুস্মিতা স্বিজপদর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল—তাই চলুন, আমারও মন ভাল লাগছে না।

সুস্মিতা স্বিজপদর পিছু পিছু হল থেকে বেরিয়ে এসে প্রশস্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে খুব জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—এবার আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ী যাই।

স্বিজপদ সুস্মিতার একটা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে বলল—না, এখন তোমাকে ছাড়ব না। তোমাকে কাছে পেয়ে খুব ভাল লাগছে। আজ সারা রাত তোমাকে বুকের মধ্যে ধরে রাখব।

সুস্মিতা আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, খুব ক্লান্ত, বিষন্ন গলায় অস্ফুট আর্তনাদের মত হতাশার প্রতিধ্বনি জাগল—ভেবেছিলাম, বুঝি টাকা দিয়ে আমাকে দয়া করছেন। না! আমি ভুল ভেবেছিলাম: আপনিও আর পাঁচজনের মত আমার দেহের দাম দিতে চাইছেন।

স্বিজপদ খুব স্পষ্ট ধারালো চোখে সুস্মিতার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠোভর্তি একগোছা দশ-পাঁচ টাকার নোট তুলে আনল তারপর সুস্মিতার ঢিলে ব্লাউজের ফাঁকে বুকের ভাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে নোটগুলোকে জোর করে গুঁজে দিয়ে নাকের পাটা ফুলিয়ে কঠিন, কর্কশ গলায় চীৎকার করে উঠল—সুস্মিতা, তোমাকে অনেক টাকা দিলাম। গুনে দেখলে হয়তো পঞ্চাশের কম হবে না। তোমার চেয়ে অনেক ভাল শরীর কিন্তু অনেক কম টাকায় ভাড়া পাওয়া যায়। তুমি নিজে পুরো একরাতের ভালবাসার মজুরী কত নাও? নিশ্চয়ই দশ-বিশ টাকার বেশী নয়।

সুস্মিতা ফ্যাকাশে হয়ে কেঁদে ফেলল। স্বিজপদর বুকের মধ্যে কাঁধ ঢুকিয়ে খুব জড় হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—আমাকে ক্ষমা করুন। মানুষের কাছে ঘাড় ধরে ঠকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। অনেক দাম দিয়ে পুরুষ মানুষকে চিনেছি। কেউ কোনদিন আপনার মত দয়া করতে আমার কাছে এগিয়ে আসেনি। ঘরে থেকে পথে নেমেছি কেউ পাঁচ টাকার বেশী আমার ভাড়া দেহের দাম দেয়নি। কিন্তু কোনদিন কারও কাছে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিইনি। লোভী পুরুষ আমাদের মত গ্রাম্য মেয়েদের বহু কষ্ট দিয়ে যে সুদে-আসলে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেয়—আপনাকে তা বোঝাতে পারব না। আর পাঁচজন নিষ্ঠুর লোভী পুরুষকে যেমন দেখেছি, আপনাকেও তাই ভেবেছিলাম, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। বেশ, আপনি যা চান, তাই হবে। আমার চেনা অনেক হোটেলের ঘর আছে। কোথায় যাবেন—চলুন, সারারাত নিজেকে উজাড় করে দিয়ে আপনাকে ভালবাসার সুখ দেব। একটা অনুরোধ রাখবেন? আমার এই ভাড়া দেহে আপনি যদি সুখ না পান—তবে রাগ করে আমাকে পথের ওপরে একা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন না। দয়া করে আমাকে টালিগঞ্জে আমার বস্তীর গলি পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। মাঝরাতে একা একা পথে পথে ঘুরলে পুলিশ ধরবে। স্টেশন কাছে আর ফিরে যেতে পারব না।

স্বিজপদর চোখদুটো জ্বলছে দেখাচ্ছিল, শাণিত কঠিন দৃষ্টি ঝকঝক করছিল, কর্কশ গলার স্বর উত্তেজনায় কাঁপছিল—এসব দরাদরির কথা তুলে লাভ নেই। আর পাঁচজন পুরুষের মতই আজ রাতে তোমার শরীর নিয়ে সুখের খেলায় মাতব। দাম যদি কিছু বেশী দিয়েই থাকি সে আমার ইচ্ছে। তুমি ফাঁকি দিলে আমিও হাত পেতে দাম ফিরিয়ে নেব।

স্বিজপদ একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামিয়ে সুস্মিতার হাত ধরে তুলে নিল। ড্রাইভারকে বলল, আউটরাম ঘাট চল।

সুস্মিতা স্বিজপদর গা ঘেঁষে শরীর সহ এলিয়ে আধ-শোওয়ার ভঙ্গীতে বসে ছিল। ওর কাঁধ, বুক, চিবুকের ... স্বিজপদর শরীর স্পর্শ করছিল। বুকে ... আঁচলটা খসে পড়েছিল কোলের ওপরে।

ট্যাক্সি ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে ছুটছিল। স্বিজপদ সুস্মিতার বুকে ... রেখে ওর নরম কোমরটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেই হঠাৎ এক আশ্চর্য অনুভূতি ... শিহরে কেঁপে উঠল। সুস্মিতার ... থেকে, খুব চেনা একটা মিষ্টি গন্ধ ... গোলাপের সেই আশ্চর্য মা-মা গন্ধের ... ছোট ভাইটার জন্মের পর মাসীমার ... মুখ রাখলে যে গন্ধে প্রাণ ভরে ... আচ্ছন্ন করে দিত—স্বিজপদর বুকের ... সেই মাতাল-করা মা-মা গন্ধের ... নিরাশার করে কাঁপছে।

স্বিজপদ সুস্মিতার বুকের ভাঁজে মা... ডুবিয়ে খুব জোরে নিঃশ্বাস টানল। তারপর ... গালের ওপরে মুখটাকে চেপে ধরেই ... জড়ানো গলায় চীৎকার করে উঠল—ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও।

ড্রাইভার চমকে পিছন ফিরে গাড়িটাকে ... খুব জোরে বাঁক নিয়ে বাঁদিকে ... নেয়।

স্বিজপদ তখন সোজা হয়ে বসে প... খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। ... নিঃশ্বাসের হলকায় সুস্মিতার কপালের ওপরে জড়ানো চুলের কুচিগুলো এলোমেলো উড়ছে। উত্তেজনায় স্বিজপদর লালচে গালে, কপালে, নাকের পাটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

সুস্মিতা বোধহয় ভয় পেয়েছিল। স্বিজপদর বুকের কাছে ঘন হয়ে এসে ওর কপালে গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল—লক্ষ্মীটি, একটু শান্ত হয়ে বসুন। কাছেই পার্ক স্ট্রীটে আমার চেনা একটা হোটেল খুব কম ... সারারাতের জন্যে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। ড্রাইভারকে পার্ক স্ট্রীট যেতে বলুন।

স্বিজপদ লাল টকটকে চোখ দুটো সুস্মিতার ...

বুকের ওপরে মুখ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—ড্রাইভার, টালিগঞ্জ চল।

সুমিতা অবাক-চোখে দ্বিজপদর মুখের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করল—টালিগঞ্জে যাচ্ছেন কেন? কি হল আপনার! ভাল লাগছে না আমাকে? ঠিক আছে ফাঁকি দিয়ে আপনার কাছে টাকা নেব না। আপনার টাকা ফিরিয়ে নিন। আমাকে পথেই কোথাও নামিয়ে দিন। ছেলেটার পায়ে দড়ি বেঁধে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছিলাম। এতক্ষণে বোধহয় কেঁদে কেঁদে নীল হয়ে মরেই গিয়েছে।

সুমিতার দু-চোখে জল টলটল করছিল। ব্লাউজের ফাঁকে ডান-হাতটা গলিয়ে দিয়ে নোটগুলো মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছিল।

সুমিতার হাতটাকে জোরে টেনে ধরে নিজের ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল দ্বিজপদ। নাকটা আবার সুমিতার বুকের নরম ফেনায় ডুবিয়ে দিয়ে মা-মা গন্ধের আবেশে মাতাল হয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল—সুমিতা, তুমি আমাকে কত সুখ দিয়েছ জানো না। চল, তোমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি। সুমিতা, তুমি যে মা হয়েছ। মাকে কি কেউ কষ্ট দেয়? তোমার ছেলেটা নিশ্চয়ই খিদের যন্ত্রণায় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ী গিয়ে ছেলেকে বুকে তুলে নাও।

চোখের জলে বুক ভিজে গিয়েছিল সুমিতার।

সুমিতা পরম মমতায় দ্বিজপদকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওর মুখটা ঠাণ্ডা ভিজে বুকের ওপরে চেপে ধরল, দ্বিজপদর অবিন্যস্ত শুকনো চুলে ধীরে নরম আঙুলের ছোঁয়ায় বিলি কাটতে লাগল। দ্বিজপদ এক আশ্চর্য স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোছায়ায় শিশুর মত দোল খাচ্ছিল।

সুমিতার দু-চোখে জল টল টল করছিল, দ্বিজপদকে কোলের ওপরে রেখে সুখী মায়ের মত বসেছিল। ট্যাক্সি ছুটেছিল রেসের মাঠের পাশ ঘেঁষে, নির্জন অন্ধকারের গায়ে হেডলাইটের আলো গাছ-গাছালির ছায়া ফেলছিল। সুমিতা দ্বিজপদর দুগালে ঠাণ্ডা ভিজে হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে বলল—আজ আপনি আমাকে যে দয়া করলেন, আমার মত পথের মেয়েকে কেউ কোন দিন তা করে না। যখনই আমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করবে, ডাকবেন। যেখানেই যে অবস্থায় থাকি না কেন, ছুটে আসব। জীবনে কেউ কোনদিন আমাকে ভালবাসেনি, দয়া করেনি। আজ আপনি আমাকে যা দিলেন, সারা জীবনেও তার ঋণ শোধ করতে পারব না। স্বামী, সংসার, সুখ—জীবনের সব সম্ভাবনাই তো শেষ হয়ে গিয়েছে। কাউকে আমার দেবার কিছুই নেই সংসারে। আছে এই ভাঙা দেহটা—এই দেহে যদি আপনি কিছু পান—আমার জীবনে তা পরম সান্ত্বনা হয়ে রইবে।

দ্বিজপদ সুমিতার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল—সুমিতা, আমি প্রেম-ভালবাসা, দয়া-মায়া ও সব কিছুই বুঝি না। আজ আমি লোভী পুরুষের মত তোমার দেহে হাত বাড়িয়েছিলাম। সারা রাত তোমার দেহটা নিঙড়ে সম্ভোগের সুখ চেয়েছিলাম। কিন্তু ট্যাক্সিতে তোমার বুকে মুখ রেখে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। কি যে এক আশ্চর্য গন্ধ আর স্পর্শের স্মৃতি তুমি জাগিয়ে দিলে। মনে হল, তুমি মা, তোমার দেহে সম্ভোগের সুখ নেই,— তোমার বুক জুড়ে কি যে আশ্চর্য স্নিগ্ধ মা-মা গন্ধ ছড়িয়ে আছে। না, তুমি মা হয়েই ফিরে যাও তোমার শিশুর কাছে।

ড্রাইভার পিছন ফিরে বলল—স্যার, টালিগঞ্জ পৌঁছে গেছি, কোথায় যেতে হবে বলুন।

সুমিতাই হাত দেখিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে একটা ছোট গলির মুখে ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করাল।

ট্যাক্সি থেকে নামার আগে সুমিতা দ্বিজপদর গালে একটা আলতো চুমু দিয়ে বলল—আপনার প্রাণে কত দয়া, বুক জুড়ে কত ভালবাসা—আপনি নিজেই জানেন না। আজ আসি, কেমন? আমার বাড়ীর ঠিকানা—আটের দুই নম্বর দুর্গা লেন।

দ্বিজপদ যখন ঘরে ফিরল, চারতলা বাড়ীটার ঘরে ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমেছে। শুধু সোনা-বৌদির ঘরে আলো জ্বলছিল। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সোনা-বৌদির গলা শুনতে পেল দ্বিজপদ। সোনা-বৌদি বেশ জোরে চেঁচিয়ে কি যেন সব কথা বলছিল। বন্ধ দরজায় কান পাতল দ্বিজপদ। ভুবন-দাদার কাশির শব্দ কানে এলো। তাহলে সোনা-বৌদির দুঃখ ঘুচল। ভুবন-দাদা আবার ঘরে ফিরল। কতদিন ঘরে বাঁধা থাকবে কে জানে?

দ্বিজপদ অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে ওপরে উঠতে লাগল।

সমীরদা—

রোজগেরে, ফুর্তিবাজ লোক, ঘরোয়া কাজে চৌকশ

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

খোলা মেজাজের মানুষ সমীর—সারাদিন মনের স্ফূর্তিতে কাজ করতে পেলেই খুশী। ফলে, শরীর ভালো তো সব ভালো।

ওর স্ত্রী সেটা বোঝেন আর বোঝেন বলেই রোজ ওকে হরলিক্স খেতে দেন।

হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

পুষ্টির উপাদান আর শরীরগঠনকারী প্রোটিনে ভরপুর হরলিক্স স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট রাখে।

খাঁটি তাজা দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই হরলিক্সের এত গুণ।

ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনারও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স মস্তিষ্কের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

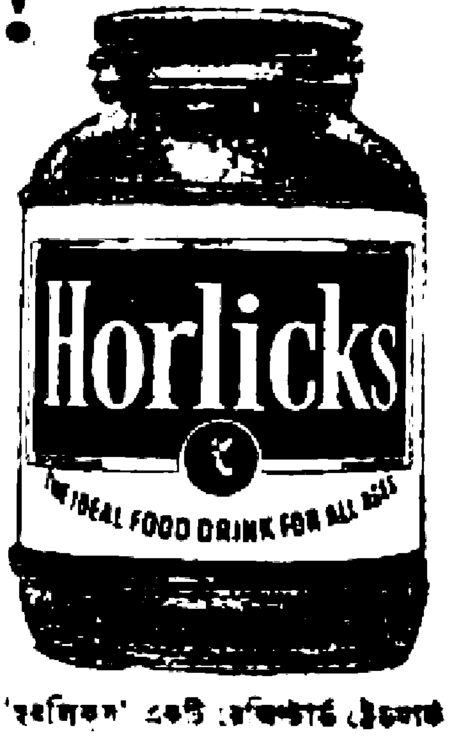

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1833 A

বাবু গৌরবের শেষ সন্ধ্যা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার চলেছিলেন ...হৌসি পাহাড়ে।

সেবার সিপাহী যুদ্ধের বছর। বারুদের ...য় ম ম করছে ভারতবর্ষ। সেকালের ...রতবর্ষে না ছিল রেলগাড়ি, না মোটর-...ড়ি। দেবেন্দ্রনাথ চলেছিলেন নৌকো করে। ...পথে। আগ্রা ফোর্টের তলা দিয়ে যখন ...চ্ছিলেন, হঠাৎ এক অপরূপ দৃশ্য তিনি ...খলেন। দেখলেন—শেষ মুঘল সম্রাট ...হাদুর শাহকে। কেল্লার ছাদের ওপর ...ড়িয়ে তিনি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। সানন্দে ...চ্ছিলেন। চোখে-মুখে সাঙ্ঘাতিক জয়ের ...সি। হিন্দুস্থানের বাদশার সেদিন ...ড়ির খেলাতেই তৃপ্ত। বোমার কণ্ঠধ্বনি ...তীতের স্মৃতিমাত্র।

কয়েক মাস পর ডালহৌসি পাহাড় ...কে যখন নেমে আসছেন, তখন আরেক ...বি দেখলেন দেবেন্দ্রনাথ। কানপুরের কাছ ...য়ে চলেছেন তিনি। মিউটিনির পর্ব ...মাপ্ত। আশেপাশে সশস্ত্র পাহারা। ...হাদুর শাহকে ধরে নিয়ে চলেছে ইংরেজেরা। ...ষ মুঘল চলেছেন মুঘল যুগের অবসান ...ঘোষণা করে। ঘুড়ি ওড়ানোর পালা শেষ করে ...-পা করে চলেছেন কারাগারে। নির্বাসনে।

মুঘল-মহিমা এইভাবেই একদিন অস্ত ...ল। ঐ অস্ত-সন্ধ্যার দুর্লভ দৃশ্যটির ...ক্ষী হয়ে রইলেন কলকাতার এক বাবু। ...তিহাসের এ আরেক আশ্চর্য ঘটনা। মুঘল ...বিলাসিতার পথ ধরে বাবু-সভ্যতার যে ...ত্থান, তারও অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো ...রে ধীরে। তাই শেষ মুঘল বাহাদুর ...হকে নির্বাসনে পাঠাবার লগ্ন থেকে বাবু ...মাজের নির্বাসনও আসন্ন হয়ে উঠল কলকাতায়। শেষ মুঘলের মত শেষ-বাবুদের ...নির্দ্দেশ করতেই হবে। বড়জোর কিছুদিন ...রা।—দেবেন্দ্রনাথকে এ-দৃশ্যও দেখতে ...য়েছিল।

...বাবুদের আতশ' খেলার কথা ...ল শর্মী। আতস দিয়ে সেদিন কারো ...র আঁধা হয় না। সোনার থালা, ... বাতি দুশকথার কাহিনীতে আশ্রয় ...। পাঁজর কর্মপন্থায় বাবুদের সৌখীনতা ... হলো, পাড় ছিঁড়ে কাপড় পরতেন ...রা। এখন পাড়সমেত কাপড় জোটানোই ...। বাবু নিজের খরচ চালাতে পারেন না, ...তাই বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ ...না হয়ে দাঁড়াল অসম্ভব।

মুঘলদের অনেক স্মৃতি ছিল যা দেখে পরবর্তীকাল তাদের মনে রাখতে পারে। তাজমহল থেকে দেওয়ান-ই-আম পর্যন্ত মুঘল-মহিমা ছিল অম্লান। কিন্তু বাবুদের স্মৃতি কী রইল?—না, বাবুদের বিলাসিতার স্মারকও না-থাকা হল না কলকাতায়। হুতোম লিখলেন, 'অনেক বড় মানুষ বহুকাল হলো মরে গেছেন কিন্তু তাঁদের বাড়ির বাড়িগুলি আজও মনুমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েছে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয়নি, যা দেখে সাধারণে স্মরণে রাখে।'

সংলাপ ছাড়া যেমন নাটক হয় না, ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে যেমন হয় না হ্যামলেট, অনুরূপভাবে বাবু-আনি বাদ দিয়ে বাবুকুলের অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব। আর এই বাবু-আনির ঠাট বজায় রাখতে বেচারিরা একদম ফুরিয়ে গেল।

আট বাবুর এক বাবু নীলমণি হালদারের কথাই ধরা যাক। বিয়ে ও বিলাসিতায়

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

তাঁর বাদশাহী গরিমা ছিল পুরনো কলকাতায়। এঁর অগ্রজ ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ হালদার। সেকালে চুঁচুড়ার ডাকসাইটে ধনী। পেরঁ সাহেবের প্রাসাদ-প্রতিম বাগানবাড়ী হালদারমশাই এক ডাকে কিনে ফেলেছিলেন। আর এ বাড়ীতে তিনি যে আনন্দের হাট বসিয়ে দিয়েছিলেন, তার তুলনা মেলা ভার। ঢালাও খানাপিনার ব্যবস্থা ছিল। বাইজীরা আসত পশ্চিম থেকে। লখনৌ ফ্যাশানে চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাট্টা ও মাথায় বাঁকা টুপি পরে বাইজীর জেল্লা দেখে বাবু সোজা গিয়ে বসতেন নাচের মজলিসে। তরল পানীয় টলমল করে উঠত কাচ পাত্রে। দেখতে-দেখতে রাত ভোর হয়ে আসত। না কেবল এসবই না। বাবুর চণ্ডীমণ্ডপেও ধুমধাম করে দুর্গা পুজো হত। সে আড়ম্বরের কথা বিজ্ঞাপিত হত কলকাতার কাগজে-কাগজে। মোটকথা লোকে বলত, 'বাবু তো বাবু হালদার বাবু।'

কনিষ্ঠ নীলমণি হালদারও এইভাবে নাম কিনেছিলেন। বাবু মহলে ছিল তাঁর একচ্ছত্র খাতির।—হঠাৎ একদিন এ খাতির উবে গেল। মুর্শিদাবাদের উপমা দিয়ে বলা যেতে পারে—নদীর স্রোতের মত, বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত একদিন সব আড়ম্বর কোথায় যেন গেল হারিয়ে। শোনা গেল, কারেন্সী নোট ও কোম্পানীর কাগজ জাল করেছিলেন বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার। হাতে-নাতে ধরা পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল দ্বীপান্তর। ছোটভাই নীলমণি হাতে-নাতে ধরা না পড়ার দরুণ দ্বীপান্তরের দণ্ড থেকে কোন রকমে রেহাই পেলেন। তাঁর হল, সুদীর্ঘ কারাদণ্ড। বেচারীরা আজ ছিলেন বাদশাহ, কাল হয়ে গেলেন ফকির। হালদার বাড়ীতে নেমে এল বিষণ্ণ সন্ধ্যা।

অন্যে পরে কা কথা, মতিলাল শীলের কথাই ধরা যাক। তাঁর মত দানবীর ও দয়াশীল কে ছিলেন? অবশ্য সেকালে এ সদগুণ বাবু-আনির অঙ্গ বলেই বিবেচিত হত। কৃপণ হলে ধনী হওয়া যেত, কিন্তু বাবুর স্বীকৃতি পাওয়া ছিল ভার। নিমু গোস্বামী ছিলেন এর উদাহরণ। অনেক পয়সা ছিল তাঁর, কিন্তু ছিল না তাঁর পাল-পার্বন।' চৈত্র মাসের রাস-টুকুই তিনি কেবল জাঁকিয়ে করতেন। অনেক বাঁশ খাটিয়ে মঞ্চ বানাতেন। ঝাড়-লণ্ঠন ইত্যাদি দিয়ে আলোক সজ্জা করতেন বটে, তবে তা তেমন জমকালো হত না। ফলে, লোকজনের কটু-কাটব্য তাঁকে শুনতেই হত। নিন্দুকদের মুখে-মুখে 'নিমুর সম্পর্কে একটি ছড়া প্রায়ই ঘুরে বেড়াত এবং তা হল,—'অন্যের মত কর্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস, আলোর সঙ্গে খোঁজ নাই—বোকা-বোকা বাঁশ।'

মতিলাল শীল ছিলেন নিমুর ঠিক একেবারে উল্টো পিঠ। — তাঁর জন্ম হয়েছিল লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে। উনিশ শতক আসার আট বছর আগে। যৌবনে তিনি কলকাতায় কেল্লায় একটি কাজ পেলেন। কেরানীগিরির কাজ। এই সঙ্গে আরম্ভ হল ছিপি-বোতলের ব্যবসা। এর পরে হলেন মুৎসুদ্দি। জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কাছে করতেন মাল দেওয়া-নেওয়া। ক্যাপ্টেনদের ছেড়ে একদিন তিনি খুললেন বড়-বড় সওদাগরী হৌস। এইভাবে অতি

অল্প সময়ের ভেতর উপার্জন করলেন প্রচুর ঐশ্বর্য। অপরিমিত বিত্ত।

এ বিত্তের অধিকাংশই ব্যয় করলেন দান-ধ্যানে। তারপর সিপাহী যুদ্ধের বছর তিন আগে স-সম্মানে ও সগৌরবে তিনি ত্যাগ করলেন ইহলোক।

কিন্তু তাঁর মহাপ্রয়াণের পরই নানা-রকম আজগুবি গল্প ফিরতে লাগল লোকের মুখে-মুখে। অনেকেই বলল, তিনি মারা যান নি। মারা যাবার ছল করে বসে আছেন গা-ঢাকা দিয়ে। কেন?-কেন? স্বভাবতই আরেক দলের মুখে এ প্রশ্ন উচ্চারিত হল। আজগুবি গল্প তখন জানাল যে, কোন এক অপকর্মের দায়ে প্রিভি-কাউন্সিলের কাছে নাকি শীলমহাশয় অভি-যুক্ত হয়েছেন। শাস্তি পেয়েছেন নির্বাসন। আর সেই নির্বাসন দণ্ড এড়াবার জন্যই নাকি গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছেন মতিলাল শীল। আঠারোশ চুয়ান্ন সালের তিরিশে জুনের 'হরকরা' কাগজে এ কিং-বদন্তীর বিবরণ তুলে ধরা হল,—

'It is said that the great millionaire is not really dead, but that he has made away with himself with the object of avoiding the consequences of a sint which has been given against him by the Privy Council, by whose decision he has made himself liable to transportation.'

হায়! দানশীল মতিলালের চরিত্রে এ কি কলঙ্কলেপন! যাঁর দানে তিন লাখ টাকা খরচ হতে চলেছে, তাঁকে নিয়ে একি রসিকতা! মহিষাদলের রাজার সম্পত্তি এক লাখ টাকার দায়ে কেড়ে নিচ্ছিলেন বলেই কি এই কলঙ্কারোপ?

না, মতিলাল সম্পর্কে এই অবমাননা-কর গল্প কেউ বিশ্বাস করে নি। হরকরা এ ঘটনাকে বলেছিল—'অ্যাবসার্ড স্টোরি।' আর কালা-আদমিদের এ গুজব-প্রিয়তার ওপর টিপ্পনি কেটে লিখেছিল,—

'We mention it as a good example of native mendacity on the one hand, and native credulity on the other'.

কেবল গুজব-প্রিয়তা নয়, দেশীয় লোকদের মন যে কত বিষ এ কিংবদন্তী হল তার প্রমাণ।

কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করল না কেউ, 'কেন এ বিরূপতা?' সাধারণ মানুষের মন বাবুদের সম্পর্কে বিষ হয়ে গিয়েছিল তাঁদের পরিণতি দেখেই। দেশীয় ভাগ বাবুই মরবার আগে অসম্মানের মালা পরে-ছিলেন গলায়। তাই সাধারণ মানুষ ভেবেছিল—মতিলালও ঐ বাবুদের থেকে আলাদা কিছু নন। তিনিও আর পাঁচটা বাবুর মতন।

সাধারণের চোখেই কেবল নয়, বাবুদের গৌরব ছোট হয়ে এলো তাঁদের অনুগতদের কাছেও। নিজের ভৃত্যমহলে। কে বাবু, কে নফর তা চেনা দায় হয়ে উঠল। দারোয়ানরা গোঁফে তা দিয়ে বাবুর ওপরেও মাতব্বরি করতে থাকল। আর এ কর্তৃত্ব যে কি ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক মুহূর্তে তার বিবরণ আছে।

সেবার এক বাগবাজারের বাবুর জন্ম-তিথি। তখন ইংরেজী প্রথায় জন্মতিথির খুব চল। গঙ্গা দুধ খেয়ে, তিল বুনে, মাছ ছেড়ে, নতুন কাপড় পরে দেশীয় প্রথায় যে জন্মতিথি পালিত হয়ে থাকে, সেদিন তা পরিত্যক্ত। কুটুম্ব ভোজনটিও যথারীতি বাদ। তবে বন্ধু-বান্ধব পেয়েছে নতুনতর মর্যাদা। মেটের কোলে খাটে পা দিয়ে অনেকেই সেদিন বাবুর মর্যাদায় পালন করলেন জন্মতিথি। বাড়ীর গেট সাজানো হত গ্যাসের আলোয়। তারপর?—তারপর বেতর লোকের আমোদ। নাচ ও ইংরেজী খানার চূড়ান্ত। তামাশের এক শেষ। চুলে ও গোঁফে কলপ লাগিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠি পরে নাচের আসরে গিয়ে বসা—এসব ছিল জন্মদিনের বাবু-য়ানি।

বাগবাজারের বাবু এ দলের আড়ম্বর-এর ভেতর গেলেন না। কেবল গুটি-কতক ফ্রেন্ডকে খাওয়াবেন, এটুকুই সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং তদনুসারেই চলল উদ্যোগ-আয়োজন।

জন্মতিথির দিন সকাল থেকে লেগে গেল বাদলা। সে বাদলায় সবই এসে পৌঁছল। কিন্তু যা এলো না, তাহল মাছ। আর মাছ ছাড়া বাঙালী বাড়ী কি ভোজ হয়? বিশেষত তা যদি আবার বাবুর বাড়ি হয়! এদিকে নিমন্ত্রিত অতিথিরা দেখা দিতে থাকলেন গুটি-গুটি। একে-একে এলেন বন্ধু-বান্ধব।

মাছের জন্য বাবু সত্যই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বড়ই। নানান জায়গায় লোক পাঠালেন। হুকুম দিলেন, যে করেই হোক মাছ চাই।

এমন সময় হঠাৎ সের দশ-বারো ওজনের একটি রুই মাছ কাঁধে করে এক জেলে এসে হাজির। এ অভাবিত ঘটনায় বাবু খুব খুশি। ভীষণ খুশি। উল্লাসে উচ্চরোল। তৎক্ষণাৎ দামই তিনি জেলেকে জানালেন, 'বাপু, এটির দাম কে দেবে?—তুমি?—তা তুমি যা দাম চাইবে তাই পাবে।'

জেলে জোড় হাত করে বলল, 'হুজুর, এর দাম সামান্য। বিশ ঘা জুতো। আমাকে বিশ ঘা জুতো মারলেই এ মাছ পাবেন।'

বিশ ঘা জুতো? এ আবার কেমন দাম? বাবু ভাবলেন ঐ জেলেটির বোধহয় মাথা খারাপ। পাগল। আর বাদলার দিনে এক পাত্র চড়িয়ে এসে মাতলামী করাও কিছু বিচিত্র নয়। অনেকে তার এই উদ্ভট কথা নিয়ে মজা করতে থাকল। কেউ-কেউ আবার আরম্ভ করে দিল ঠাট্টা-মস্করা।—জেলে কিন্তু তার মতে অটল। বিশ টাকা নয়, বিশ ঘা জুতো পেলেই সে খুশি। আর ঐ বিশ ঘা জুতো পেলেই সে মাছ হস্তান্তর করবে। নতুবা নয়।

শেষ-মেষ ঐ দামেই রাজী হতে হল বাবুকে। রাজী হলেন তিনি জেলেকে বিশ ঘা জুতো মারতে। তবে আস্তে-আস্তে। এক-এক ঘা করে।

এক-এক করে সবে যখন দশ ঘা মেরে-ছেন, হঠাৎ লাফিয়ে উঠল জেলে। বলল: 'হুজুর এবার থামতে হবে। আমার এক-জন অংশীদার আছে বাকীটা তার পাওনা'

বাবু বললেন, 'কে সে অংশীদার? কোথায় সে?'

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫.৫০	দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৮.০০	রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব
শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৩.০০	রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ
ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২.০০	দি হাউস অব্ দি টেগোরস
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৫.০০	পদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫.০০	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী	৮.০০	টেগোর অন্ লিটারেচার এণ্ড এসথেটিকস
রবীন্দ্র-রচনায়, উপস্থিতকুমার	২.০০	রবীন্দ্র-সংগীতিকা
ডক্টর মণিলাল সেন	১৫.০০	এ ক্রিটিক্ অব দি থিওরি অব বিবর্ত
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন	২৫.০০	ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ডান্সেস্
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী	১০.০০	স্টাডিজ্ ইন এসথেটিকস
ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ	৬.০০	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	১৬.০০	রিফর্ম অ্যাণ্ড রিজেনারেশন ইন বেঙ্গল
ডক্টর সোভানলাল মুখোপাধ্যায়	১৪.৫০	সোসিওলজি অব্ [illegible]

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭
পরিবেশক। জিজ্ঞাসা। ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

জেনে জোড় হাত করে বলল, হুজুর, সে বাংলীদার হল আপনার দরওয়ান। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে কিছুতেই কে-চেহারে ঢুকতে দিতে চায় নি। অর্থাৎ দাম ধরুন করে তবে হুজুরের দেখা পেয়েছি। এবার বাবী মল যা জুতো তাই তারই পাওনা।'

বাবুর বহুসাতি জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। বাবু বুঝলেন যে তাঁর ওপরও একজন আছে। তিনি দারোয়ান হলেও বাবুর-বাবু। ছেলের কল্যাণে বাবু এঁকে আবিষ্কার করেছিলেন। মল বা জুতোও হয়ত তাকে উপহার দিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে একেবারে জবাব দিতে পেরেছিলেন কি না তা জানা যায় না। অন্ততঃ হুতোম সে তথ্য বিবৃত করেন নি।

বাবু গোবর সেদিন অস্তাচল। তাই এ অনুমান বোধহয় মিথ্যা নয়, প্রত্যাপণার্থ জুতোর প্রত্যুত্তরই বাবু সেদিন মেনে নিয়েছিলেন মাথা হেঁট। নতমস্তকে।

তবে এর চেয়েও চমকপ্রদ ঘটনা আছে। তা একাধারে মনোরম ও রোমহর্ষক। আর বাবু-আনির সেখানে চূড়ান্ত।

গাঁজা চর্চাটি বাবুদের যে প্রধানই বিলাস তা আগেই বলা গেছে। এটি না থাকলে বাবুই হন না। বড়লোকদের এটি একরকম পোশাক। বিকেল হতে বা দেরী, বাবুরা পাল্কী হাঁকিয়ে সেজে-গুজে চললেন বাগান-বাড়ী। ঘরে বিবাহিত স্ত্রী। কে দেখবে তাকে? কে থাকবে তার পাহারায়? —না, সেব আমলের বাবুরা সেদিকে উদাসীন। যাঁরা ওরই ভেতর একটু সাবধানী, তাঁরা তাঁদের বৈঠকখানায় বসে গাঁজা সম্ভাষণ করতেন। আর যাঁরা মা-বাপকে লুকিয়ে বেরিয়ে যেতেন অভিসারে তাঁরা চাকরদের ওপরই নির্ভর করতেন বেশী। শোবার ঘরে চাকরকে রেখে যেতেন স্ত্রীকে পাহারা দেবার জন্য। চাকর শুয়ে থাকত ঘরের মেঝের। আর স্ত্রী? তিনি তুলসী পাতা ব্যবহার করে শুয়ে থাকতেন পালঙ্কে। — গভীর রাতে বা তারও অনেক পরে আমোদ লুটে বাবু ফিরে এসে দরজায় টোকা মারতেন। চাকর চটপট উঠে দরজা খুলে দিত।

বাবু খুব খুশি মনেই বিছানায় আশ্রয় নিতেন। তাঁর স্ত্রীর চরিত্র ও কৃষ্ণধানের অভিসার দুই-ই গোপন থাকত, এ কি কম কৌশলের কথা! হুতোম এঁদের সম্পর্কে সচেতন করিয়ে দেবার জন্য লিখেছেন,—'পাঠকগণ যারা ছেলেবেলা থেকে 'ধর্ম' যে কার নাম তা শোনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ সম্পর্ক, কতকগুলি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল' তারা যে এরকম পশুবৎ ব্যভিচারে রত থাকবে, এ বড় আশ্চর্য নয়!'

না, আশ্চর্য নয়। শোনা যায় এক নবাব নিজে হাতে জুতো পরতে না-পারার জন্য শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। গর্দান দিয়েছিল। মৃত্যুকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন তবু নবাবী-আনা কালিমালিপ্ত করেন নি। শেষ বাবুরাও প্রায় তাই করেছেন। তাঁদের বেশ্যাবাজির জন্য এবং খেয়ালের শিকার হয়ে নিজের স্ত্রীকে উৎসর্গ করেছেন চাকরের কাছে, এও কি কম গৌরবের কথা? পুরাণে-ইতিহাসে এহেন গৌরবোজ্জ্বল বংশ কটি আছে?

বাবুরা পুরাণ-ইতিহাস ছাড়া বলেই বোধহয় তাদের পারিজাতটুকুও হল দেশ-কাল ছাড়া। পাঠানদের হটিয়ে এসেছিল মুঘলরা, মুঘলদের হটিয়ে ইংরেজ। বাবুরা কিন্তু কাউকে হটায় নি, তারা এসেছিল নিজেরাই। সম্ভবত প্রাকৃতিক কারণে। বাবুদের তাই কেউ হটালো না, নিজেরাই খসে পড়ল। জীর্ণ পাতার মতন। টুপ-টুপ করে খসে পড়ল। পায়ের তলা বিছিয়ে। তারপর প্রকৃতি নিজেই তাদের একদা দিলেন উড়িয়ে। দিলেন পরিষ্কার করে।

তবে তার আগের দিন পর্যন্ত বাবুরা কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী চেপেই চলতেন।

রাজনারায়ণ বসু এঁদের সম্পর্কে লিখেছেন, 'এখনকার বাবুরা অতি কৃপা-যোগ্য, গাড়ী-ঘোড়া ব্যবহার করিবেন, তথাপি হাঁটিয়া পথ চলিবেন না।'

এক বাবু চলেছিলেন বাড়ীর পথে। গাড়ী চড়ে। বাড়ী কলকাতার থেকে একটু দূর। হয়ত দমদম। হয়ত কাশীপুর। গাড়ীখানি চলেছিল ধীরে-ধীরে। অতি ধীরে। গাড়ীর সঙ্গে যে ঘোড়াটি লাগান ছিল সেটি অত্যন্ত কৃশ। বেতো ঘোড়ার বাবা। টেকচাঁদ ঠাকুর বর্ণিত পক্ষিরাজের বংশধর। সপাসপ চাবুক পড়ছে পিঠে, কিন্তু ঘোড়ার চাল বদল হবার উপায় নেই। বাবু দু দিকের দৃশ্য দেখতে-দেখতে চলেছেন। হঠাৎ নিজেদের গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পথ দিয়ে চলে যেতে দেখলেন বাবু। সঙ্গে-সঙ্গে ডাক দিলেন, 'শিরোমণিমশায়! আসুন, আমার গাড়ীতে আসুন।'

শিরোমণিমশায় একবার চোখ তুলে চাইলেন, তারপর বললেন, 'বাবু! আমার একটু তাড়া আছে। আমাকে শীঘ্র বাড়ী যেতে হবে।'

সুতরাং বাবুর ঘোড়ার গাড়ীতে শিরোমণিমশায়ের চাপা হল না। চারদিকে এসেছে তাড়া। কর্মব্যস্ততা ঘিরে ধরেছে সকলকে। বাবুদের কর্মহীন আলসের জগতে যাবার মতন বেকার লোক আর কোথায় পাওয়া যাবে? পাওয়া গেল না।

এর পর থেকেই বাবুরা হারিয়ে গেলেন। তরঙ্গায়িত বাবরি চুল আর দেখা গেল না। দেখা গেল না ঐ মানুষগুলিকে বুলবুলির লড়াইয়ে অথবা বাঈজীদের নাচের মজলিসে। বেড়ালের বিয়েতে কলকাতা কোন দিন আর মেতে উঠল না। কোন দিন না।

তরঙ্গক্ষুব্ধ নতুন যুগ এসে অতীতের সব স্মৃতি-চিহ্ন গেল ধুয়ে দিয়ে। না ইতিহাস, না সমাজ কেউ এঁদের স্বীকৃতি জানাল না। কেউ না। বাবু বংশের ইতিহাসে নেমে এলো নিকষকালো রাত।

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট : ২ লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
৫৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪৬)

মনে হল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ঈশমকে কেউ ডাকছে। সে খুব বলতে ছিল বলে প্রথমে খেয়াল করে নি। সে একাই আজ এখন। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আবেদালি। সে আর কাউকে সঙ্গে পাবে আশা করে নি। হ্যাঁ, আর একজনকে সে পেয়েছে, সে মানুষের নাম জালিমদ্দি। জালিমদ্দি মুড়াপাড়ার ফর্দ অনুযায়ী ধারে পাঁচটা মুনিষ নিয়ে বাজার করে ফিরেছে। সুতরাং সে ছিল। আর আছে এখন যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ইশারায় তাকে ডাকছে।

চোখে খুব একটা আজকাল ঈশম ভাল দেখছে না। আবেদালিই তার নজরে এনে দিল। চাচা ঐ দ্যাখেন আপনারে ডাকতাছে।

—কেডা আমারে ডাকে।

—মনে লয় হাজিসাবের মাইজলা বিবি।

ওরা দুজন আরও কাছে এগিয়ে গেল। বটগাছটা পার হলেই হাজিসাহেবের অন্দরের পুকুর। পুকুরের ও-পারে কদম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। সে কাছে এসে বুঝল, সেই ফেলুর ছলচাতুরি করে ধরে আনা বিবি। উজানে হাজিসাহেব গেছিলেন। ফেলু তার যৌবন দেখিয়ে তুলে এনেছিল বিবিকে। এ-সব এখন কত অতীতের কথা। কে আর এ-নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করে। সবই মানুষের ধর্ম ভেবে সে সন্তর্পণে ও-পারের ঘাটে চলে গেল। ঈশম বুড়োমানুষ বলে এ-গাঁয়ে সে প্রায় সবার কাছে আপনার জনের মতো। সে কাছে গেলে মাইজলা বিবি কোমর থেকে একটা দুর্গাস বের করে বলল, টাকা কটা দিলাম চাচা। অর কবরে দিবেন।

ঈশম দেখল, একটা দুটো টাকা নয়। প্রায় পাঁচ কুড়ি টাকা। সে বলল, এত লাগবে না।

মাইজলা বিবি চারদিকে তাকাচ্ছে। কেউ আবার দেখে ফেলছে কিনা। সে গোপনে টাকাটা দিতে এসেছে ঈশমকে। সে কাফিলা গাছটা পর্যন্ত যেতে পারে নি। তাকে হাজিসাহেব যেতে দেন নি। সবাই দেখে এসেছে বাড়িটা এবং ফেলু অদ্ভুত এক দাগা তৈরি করেছে কাফিলা গাছের নিচে। মাথাটা ফেলুর ঢলে পড়েছে ষাঁড়টার ঘাড়ে। ষণ্ডের মুখে কাত হয়ে আছে। এবং ষণ্ডের চোখ মরে গিয়ে নীল। কানা চোখটা দেখা যাচ্ছে না। ফেলুরও কানা চোখটা আড়ালে পড়ে গেছে। ষণ্ডের গলা কাটা আর ফেলুর পেট ফেঁসে গেছে। মাইজলা বিবি আড়ালে দাঁড়িয়ে মানুষটার জন্য চোখের জল ফেলেছে। কেউ যাচ্ছে না দাফনে। সেই ডেকে এনেছিল ঈশমকে। খবরটা দিয়েছিল। তারপর মানুষটার দাফনের টাকা হবে না ভেবে প্রথম দাফনের জন্য কিছু টাকা, এবং পরে মনে হল মাইজলা বিবির, এই ত তার মানুষ, যার যৌবনরসে ডুবে উজানি নৌকাতে পা দিয়েছিল। হাজিসাহেব ফেলুকে দিয়ে ফাঁদ পাতিয়ে ছিলেন। ফেলুর সে-সব দুষ্কর্মের কথা এখন আর মনে হয় না। ফেলু তার কাছে বড় মানুষ। সে তার সামান্য এই সঞ্চিত কটা টাকা দিয়ে কি করবে! সে বলল, রাখেন।

ঈশম বলল, না এত লাগবে না। বলে সে হিসাব করল মনে মনে তারপর মাত্র গোটা পাঁচেক টাকা রেখে সবটা ফিরিয়ে দিল।

কিন্তু মাইজলা বিবি টাকা আর ফেরত নিল না। বলল, আমি যাই চাচা। সব টাকা রাইখা দ্যান। টাকায় অর কবরে একটা মাজার বানাইয়া দিবেন। বলে বিবি আর দাঁড়াল না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর ঠিক না। দেখতে পেলে হাজিসাহেব আবার পাঁচন নিয়ে তেড়ে আসবে। সে বলল, মর্জিতে যা লয় করবেন চাচা।

ঈশম এই মেয়ের মুখের দিকে আর যথাযথই তাকাতে পারছিল না। সারাজীবন, সারাজীবন বলতে প্রায় বিশ সালের উপর হবে এই এক হাজিসাহেবের ঘরে নিঃসন্তান বিবি, দু কুড়ির কাছাকাছি বয়স। যা কিছু সম্বল তার, সবই বোধহয় এটা-ওটা বেচে। যেমন দু কাঠা খেসারি কলাই গোলা থেকে বেচে দিলে কেউ টের পায় না। সারাজীবন, জীবন বিপন্ন করে যা কিছু সে পেয়েছে সব দিয়ে গেল। তা'ব ইটের বাজনা দিতে হবে তবে। এখানে ত এখন ইট পাওয়া যাবে না। এখন যে সে কি করে।

তবু সবাই দেখল, অদ্ভুত একখানা কাণ্ড, পরদিন নদীতে একটা ইটের নৌকা লেগে রয়েছে। এবং যেখানে জালালিকে কবর দেওয়া হয়েছে তার পাশে আর একটা কবর। কবরের চারপাশে ইট গেঁথে দিচ্ছে। কোথায় যে এত পয়সা পেল ঈশম, ঈশমকে বললে সে হাসে। সে বলল, মানুষ কখনও না-পাক হয় না। সে খুব ধর্মাধর্ম বোঝে না। সে কোরানশরিফ পাঠ করতে পারে না বলে বড় দুঃখ। সময় পেলে মসজিদে বসে সেই অর্থহীন শব্দ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়। তার কাছে অর্থহীন এই জন্য যে আরবী ভাষায় সব আয়াতের অর্থ সে বুঝতে পারে না, কেবল এক দেব ফকির ওকে হাত ধরে কোন নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। তারপর নদী সমুদ্রের মতো মনে হয়। অনন্ত জলরাশি, এবং একটা বড় নৌকা সে দেখতে পায়। সেই নোয়ার নৌকা। সেই নবি মানুষটা সবাইকে ডাকছে, যাও পুণ্যবান মানুষ, গরু, ঘোড়া, হাতি ঘোড়া, পাখি, কবুতর কত জীব নিয়ে সে নৌকায় তুলছে। ঈশম কখনও কখনও সেই নবির মতো চরে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন সে একটা বড় নৌকা তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমে সে নৌকায় তুলে নেবে পাগল-ঠাকুরকে, তারপর সোনাবাবুকে, ফেলু বেঁচে থাকলে সে বুঝি তাকেও নিত। কেয়ামতের দিন মনে হলে মহাপ্লাবনের কথা তার মনে আসে। সে তখন আর কিছু মনে করতে পারে না।

ফেলুর ইট দিয়ে বাঁধানো কবরটা দেখে হাজিসাহেব ছেলেদের ডাকল। বলল, তোমরা আমার কবর ইট দিয়া বাইন্ধা দিবা। আর তার মাইজলা বিবি ঘাটে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ওর সেই মাজারে রাতে মোমবাতি জ্বালাতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু সে সাহস পায় না। পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ যেন জেগে বসে আছে। ওকে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু যখন এই অঞ্চল নিদ্রিত রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, কোন কাক পক্ষী তাকে না, কেবল মাঝে মাঝে সে কোথাও জঙ্গলে কাঁটিপতঙ্গের আওয়াজ পায় তখন ধড়ফড় করে উঠে বসে। শিয়র থেকে ম্যাচ বাতিটা তুলে নেয় হাতে। একটা মোমবাতি তুলে নেয় এবং নিশীথে কালো বোরখা পরে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে সে এই কবরে চলে আসে। কবরের বেদিতে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। সে ডাকে মিঞা আমি আইছি। মোমবাতি জ্বালাতে আইছি। সে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদল। ফেলুর হয়ে সে শোক করল। কেউ জেগে নেই বলে সে মাথা নুয়ে রেখেছে কবরের পাশে। এবং নামাজের ভঙ্গীতে বসে রয়েছে। যেন সে নামাজই পড়ছে।

সারারাতের কেউ কেউ খবর পায় এক বোরখা পরা বিবি এই কবরে হাঁটাহাঁটি করে। হাতে তার মোমবাতি। সবাই আবার কোন অশরীরী গন্ধ পায় চারপাশে। এটাই

কল্পনা করেছে মাইজলা বিবিকে। সে বের হতে পায় না। কারণ সে এক ঘরে একা থাকে। ঝাপ বন্ধ থাকে। হাজিসাহেব ছোট বিবির বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকেন। পাঁচ ওক্ত নিয়মিত নামাজ পড়েন। ধর্মাধর্মে তাঁর কোন ফাঁকি নেই।

আর মাইজলা বিবি তাঁর কেমন নিশুতি রাতে কবরের পাশে পাগল হয়ে যায়। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মোমবাতি জ্বালাতে পারলে সে আর স্থির থাকতে পারে না। কবরের পাশে বসলেই মনে হয় মানুষটা কবর থেকে উঠে এসেছে। এবং ওর সেই মুখ চোখ, একেবারে যৌবনকাল তার। সে যৌবনকালের ফেলুকে নিয়ে তখন একেবারে একা। মাইজলা বিবির কানে কানে, ফিসফিসে গলায় বলে : আমি আর পারি না 'মিঞা'! বাইচা থাকতে তোমারে পাইলাম না মিঞা। আমার যে কি কষ্ট।

হাজিসাহেব যেন্দু মরোমে জেনেই মাইজলা বিবির পাহারা তুলে দিয়েছেন। হাজিসাহেবের আর কোন ভয় নাই। মাইজলা বিবি শোক করতে করতে আবার সেই গানটা গায়, সাঁঝ সাঁঝ গলায় দড়ি ওলো সাঁঝ লাগিতে।

বড়বৌও তখন আশায় আশায় রাত জাগে। মানুষটা যেমন সহসা ফিরে আসে তেমনি আসবে। সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঠের দিকে তার অপলক দৃষ্টি। জোৎস্না রাত বলে অনেক দূরে সে অস্পষ্ট কিছু দেখার চেষ্টা করে। মেজেতে ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ এখন ঘুমুচ্ছে। ওরা জানে বৌদি ঘুমাবে না। ওদের রাতের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আলাদা পাথরে দাদার জন্য সব রেখে দিয়েছে। তিনি ফিরে না এলে সকালবেলা সবাইকে হাতে হাতে বিলিয়ে দেবে সব। সোনাকেই দিতে পারে না। ওর অসুখ এখনও নিরাময় হয় নি। সে বলে রেখেছে সোনাকে, ওর অসুখ নিরাময় হলেই, সে অসুখের যে কদিন যা কিছু খেতে পায় নি সব তাকে খাওয়াবে। সোনা সেজন্য সকালে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে দেখতে পায় জ্যাঠিমা পাগল জ্যাঠামশাইর জন্য যা

রেখেছিলেন, যেমন নারকেল, বাতাসা, কমলা, ডেলামুড় সব হাতে হাতে সবাইকে দিয়ে দিচ্ছেন। ওকে দুটো একটা কমলার কোয়া দিয়ে যান। সোনা চাদরের নিচে লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। ওর দুধ মসটা খাবার কথা। কিন্তু সে চুরি করে সবটাই খেয়ে ফেলে।

জ্যাঠিমা কাছে এলেই ওর কেবল জানতে ইচ্ছা হয়, জ্যাঠামশাইকে কে কে খুঁজতে বের হয়েছে।

ঈশম কাজের ফাঁকে দিনমান খুঁজছে। সে বস্তুত সময়ই পাচ্ছে না। আত্মীয় কুটুম্ব সব একে একে চলে আসছে। ওদের থাকবার জন্য বাঁশ পুঁতে বড় বড় লম্বা চালা ঘর তুলতে হচ্ছে। চোবাড়ি হবে। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। দান ধ্যান হবে নানা। পরগনার যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সব নিমন্ত্রিত হবে। সুতরাং ঈশম বললেই গেলে সময়ই দিতে পারছে না। কেবল সকালের দিকে শশিভূষণ লাঠি হাতে বের হয়েছিল। বিদ্যালয়ের সব ছাত্রদের ডেকে বলেছিল, তোরা খবর দিতে পারিস কিনা দেখ। পাগল কর্তা নিখোঁজ। তা তিনি ত এমনই ছিলেন। না বলে না কয়ে বের হয়ে যান। দু চার দিন পরে ফিরে আসেন। কখনও দশ পনের দিনও হয়ে যায়। একবার মাসাধিককাল কোন খোঁজ ছিল না। তবু চিন্তার কারণ। আজ বাদে কাল বড়ো কর্তার এত বড় কাজ। তখন মানুষটা কাছে থাকবে না কি করে হয়। তোরা খোঁজ নিতে পারিস কিনা দ্যাখ।

মাস্টারমশাইকে খুশী করার জন্য সবারই তীব্র উৎসাহ। ওরা ওদের গাঁয়ে গাঁয়ে মাঠে মাঠে এমন কি যত ঝোপজঙ্গল আছে সেখানে খুঁজে খুঁজে দেখেছে। এবং দু ক্রোশের মতো পথ হেঁটে কেউ কেউ খবর দিতে এসেছে সার পাইলাম না। কোনখানে নাই। ওরা এলে বড় বৌদিকে শশিভূষণ ডাকল, বলল, জানেন বৌদি ওর নাম কদ্দুসো। ওদের বাড়ি ব্রাহ্মন্দী। ওকে খুঁজে দেখতে বলেছিলাম।

—তুমি কাদের বাড়ির ছেলে?

—বাম্বাদিয়া। আমি অর্জুন রায়ের ছেলে।

শশিভূষণ বলল, সবাইকে বলেছি। আমার ত ছাত্র কম নয়। কিরে তুই!

—আমি সার খবর দিতে আসলাম। আমার বাড়ি রইল, কেউ দেখে নাই এমন মানুষ।

—বড়বৌ বলল, তখন খুব কুয়াশা করেছিল।

—আমার চাচারা মাঠে আছিল। ওদিক দিয়া গ্যালে এমন মানুষ নজরে না আইসা যায়!

—ওর নাম আবদুল বৌদি।

বড়বৌ ওদের দুজনকেই দেখল। অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছি। আবদুল সোনার সংগে পড়ে। বয়স খুব বেশি নয়। তবু ছুটে এসেছে মাস্টারমশাইকে খবর দিতে। বড়বৌ বলল, তোমরা কাল আসবে। আমার শ্বশুরের শ্রাদ্ধ। কাল তোমরা খাবে। আমি ও'র হয়ে তোমাদের নিমন্ত্রণ করলাম।

তারপর শশিভূষণ বলল, কিরে তুই! কি খবর। তোদের গাঁয়ের পাশে যে বড় গজারির বন আছে সেখানে খুঁজেছিস।

—সব খুঁইজা দেখছি। কেউ খবর দিতে পারে নাই সার। সবাই কয়—এমন মানুষ হাঁটিয়া গেলে না চিনে কে! তাইন আমাদের দিকে যায় নাই। কেউ দেখে নাই।

সবাই একই খবর দিয়ে গেল। আবদুল যাবার সময় বলল, সোনা কৈ। তার নাকি অসুখ হইছে সার।

—দেখা করবি। যা ভিতর বাড়িতে যা।

আবদুল খুব সন্তর্পণে এমন বড় বাড়ির ভিতর ঢুকে বলল, কি ঠাকুর অসুখ হইছে তোমার।

—তুই! তুই যে!

—আমি বুঝি কিছু খবর নিয়া আসতে পারি না।

সোনা বলল, কি খবর।

—মাস্টারমশয় পাগল কর্তারে খুঁইজা আনতে কইছিল।

--পাইলি? সোনার মুখে তীব্র উদ্বেগ দেখায়।

—না। পাইলাম না। কত খোঁজলাম।

সোনাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কাতর সে। অসুখে ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। কথা বলতেও ওর কষ্ট হচ্ছিল। তবু বলল, আমার মনে হয় মাস্টারমশয় ঠিক কইছে। তাইন উঁচু একটা ঢিবিতে বসে আছেন। নামতে পারছেন না। তোদের বাড়ির পাশে কোন ঢিবি আছে!

আবদুল ওর দুপাশ দিয়ে মুখ দুরে কিছুক্ষণ কি ভাবল। গরমে সে ঘেমে গেছে। সোনা ওকে বসতে বলতে পর্যন্ত পারছে না। এই বারান্দায় আবদুল উঠলে সব অশুচি হয়ে যাবে। আবদুল এটা টের পায় বলেই উপরে উঠছে না। সে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওর শরীরে এসে রোদ পড়েছে। সামনে এমন একটা জায়গা নেই যে ছায়া ছায়া ভাব, যেখানে দাঁড়িয়ে আবদুল কথা বলতে পারে, ঘামতে হয় না। সোনার বড় অস্বস্তি লাগছিল।

কিন্তু আবদুলের ওসব খেয়াল নেই। সে সোনার পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কার কার বাড়ি, কোন মাঠে, অথবা গাছের ডালে ডালে যদি তিনি বসে থাকেন, সে সারা বিকেল তার চারপাশে যতকিছু আছে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। এবং বাজিকে বলে সে ছুটে এসেছে খবর দিতে, না পাওয়া গেল না।

সোনা বলল, আমি ভাল হলে খুঁজতে বের হব। ঠিক তাঁকে পেয়ে যাব দেখবি।

আবদুল বলল, আমারে সংগে নিবা।

সোনা এখন আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না বলে আবদুলই বলল, কাইল দই চিড়া খাইতে আইতাছি। তোমার জ্যাঠিমা খাইতে কইছে।

সোনা যেন এতক্ষণ কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে। সে বলল, ঠিক আসবি কিন্তু। তা নাহলে বড় জ্যাঠিমা খুব কষ্ট পাইব।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

আবদুল আর কিছু বলল না। ওর চারপাশে ছোট ছোট কাচ্চাবাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ছুঁয়ে দেবে বলে সে বলল, যাই ঠাকুর। কারণ সে জানে, ওর আর বয়স কত, তবু জেনে ফেলেছে, সে এই ছোট ছোট শিশুদের ছুঁতে পারে না। কিসব সুন্দর তেল পুতুলের মতো মুখ। ওর এইসব শিশুদের বড় আদর করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। বিশেষ করে সোনার ছোট বোন ছবিকে। রুক্ষ গায়ে, ববকাটা চুলে চলচলে মুখে আবদুলকে দেখছিল আর সোনার দিকে তাকিয়ে বলছিল, দাদা ও তোমার স্কুলে পড়ে। তোমার বন্ধু। কতটুকু মেয়ে, কি সুন্দর কথা বলছিল।"

সোনা বলল, আমার ছোট বোন ছবি।

আবদুল বলল, কি গ বইন আমার কোলে উঠবা? বলেই সে আবার কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। বলল, নারে ঠাকুর, যাই। বেলা বাড়ছে। বাড়ি তাড়াতাড়ি না ফিরলে চিন্তা করব।

—কিছু খাইলি না?

বড় জ্যাঠিমাকে সে ডেকে বলল, অরে কিছু খাইতে দ্যান। কতদূর থাইকা আইছে।

ছি ছি কি যে ভুল হয়ে গেল। বড়বৌ তাড়াতাড়ি দক্ষিণের ঘরে ছুটে গিয়ে শশিভূষণকে বলল, ওদের একটু খেতে দিচ্ছি, ওদের বসতে বলুন ওরা কতদূর থেকে আসছে খবর দিতে।

আরও সব দলবল আসছিল। দুজন তিনজন একসঙ্গে। ওরা এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কারণ কেউ কোন খবর আনতে পারেনি। পাঁচ দশ ক্রোশ জুড়ে যে অঞ্চল, সে-অঞ্চলে পাগল মানুষ সবার কাছে পীরের মতো অথবা তিনি যখন হেঁটে যান, মুসলমান মানুষেরা ভাবে ধরণী ক্রমে শীতল হচ্ছে, কোন দুঃখ আর জেগে থাকবে না। সেই পয়মন্ত হাতির মতো, লক্ষ্মীর্পো, করুণা বর্ষণ করবেন তিনি। পাগল মানুষ গেলেই সবাই এমন টের পেয়ে যায়।

বড়বৌ সব ছাদের জন্য দু কাঠা মুড়ি বার করে দিল। নারকেল কোরা করে দিল এক গামলা। আর এক হাঁড়ি গুড় বের করে দিল। প্রায় যাগযজ্ঞের মতো ব্যাপারটা দাঁড়াল। ওদের বার-বাড়িতে ডালায় ডালায় সাজিয়ে দিল। সলটু-পলটু এসেছে। ওরাও ছুটে গেছে, এবং জল, যা ওরা চাইছে এনে দিচ্ছে। ভূপেন্দ্রনাথ বলল, কোথায় যে গেলেন তিনি!

শশিভূষণ বলল, সকালে বড় বৌদি দেখেছে তিনি দরজার পাশে বসে আছেন। তারপর এত মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশে গেলেন!

বড়বৌ সব শুনেও কোন কথা বলছে না। যখন গেছেন আবার ফিরে আসবেন। যেবারে হাতিতে চড়ে নিরুদ্দেশে গেলেন, কেউ এসে কোন খবর দিতে পারে নি। অথচ এক বিকেলে সোনা এসে খবর দিয়েছিল, হাতিটা উঠে আসছে। সব মানুষেরা এসে জড় হয়েছিল অর্জুন গাছটার নিচে। আশ্বিনের কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডাকছে। একবার হাতিটার দিকে ছুটে যাচ্ছে আবার উঠে আসছে বাড়িতে। প্রথমে হাতিটা বিন্দুবৎ ছিল। চোখের নজরে আসে না। এত বড় মাঠের ওপারে কড়া রোদের ভিতর বিন্দুটা ক্রমে বড় হচ্ছিল, হতে-হতে কখন যে হাতি হয়ে গেল।

সুতরাং যেন এ-বাড়িতে একজন মানুষ এই অসময়ে নিরুদ্দেশে গেছেন বলেই যা কষ্ট। এবং এত খোঁজাখুঁজি। অন্য সময় হলে কেউ এত ভাবত না। বড়বৌ জেগে থাকত শুধু। যেমন সে প্রতিবার জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। কখনও-কখনও কিছু চিঠি, বিয়ের পরই যেবার মণীন্দ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে কিছু চিঠি লিখেছিল বড়বৌকে সেই সব চিঠি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়ে। পড়তে-পড়তে কোন-কোন দিন রাত কাবার করে দেয়। বড়বৌর এতটুকু কষ্ট হয় না তখন।

তিনি আসবেন। ফিরে আসছেন। কাজের বাড়ি। এখন আর এ-নিয়ে ভেবে লাভ নেই। শুধু এমন একটা দিনে তিনি বাড়ি নেই ভেবে ভেতরটা বড়বৌর ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।

শশিভূষণ পরদিন সকালে-সকালে স্নান করল। ওর কাজ শুধু আপ্যায়ন। সবাই এসে এ-সংসারে যার খোঁজ প্রথমে করে—সে মণীন্দ্রনাথ। শশিভূষণ সকাল থেকেই টের পাচ্ছিল, একটা কথাই তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার-বার বলতে হবে। না তিনি বাড়ি নেই। নিরুদ্দেশে গেছেন। যেমন যান মাঝে-মাঝে তেমনি গেছেন।

এবং এই এক প্রশ্নের উত্তর সারা দিন ওকে দিয়ে যেতে হবে।

—কখন গেল?

—সকালের দিকে।

—কেউ দেখে নি কোন দিকে গেছে?

—না। কোয়াশা ছিল।

—এদিকে তিনি আমতায় বাড়িতেই থাকতেন। বেশি দূর যেতেন না।

—যেতেন না।

—অন্য কিছু কি হয়েছিল?

—অন্য কিছু কি আর হবে! তবে পাগল মানুষ তো আর শ্রাদ্ধে বসতে পারবেন না। বুড়ো কর্তা মেজ ছেলেকে শ্রাদ্ধের মালিক করে গেছেন।

—পাগল মানুষ কাছে ছিলেন তখন?

—তা ছিলেন।

—এই তো গণ্ডগোলের ব্যাপার। তিনি তো পাগল বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক তা ছিলেন না। সব বুঝতেন। হয়তো দুঃখ কষ্ট হয়েছে মনে।

—হয়ত তাই।

—শুনেছি সংসারে এই বুড়ো মানুষটার উপরই যত রাগ ছিল।

—তাও শোনা যায়।

—হয়ত সেজন্য শ্রাদ্ধে বাড়ি থাকলেন না। অভিমান করে দূরে সরে গেছেন। সব কাজকাম চুকে গেলেই আবার বাড়ি ফিরে আসবেন।

—আমারও তাই মনে হয়।

কোনরকমে দায়সারা উত্তর দিয়ে অন্যান্য যারা গোপাট ধরে উঠে আসছেন তাঁদের দিকে ছুটে যাওয়া।

কবে শেষ হয়ে গেল।

—বুড়ো কর্তা মারা গেছেন রাতে। সারাদিন সবার সঙ্গে শ্মশানেই ছিলেন। বিকেলের দিকে দাহ শেষ। রাতে সোনার ভীষণ ভয় পেয়ে জ্বর। তিনি সারা রাত ঘরের পৈঠায় বসে। ভোরের দিকে বড়বৌদি দেখেন নেই। পল্টু খুঁজতে গেল, লাল্টু গেল। কাছে কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি জবাব শেষ করতে হবে। কারণ বোধ হয় পাঁচালানের বড় শরিকের ছোটকর্তা দলবল নিয়ে উঠে আসছে।

—মণি এখন কেমন আছে?

—ভাল আছে।

—ডাকেন একবার মণিরে দেখি।

—ওতো বাড়ি নেই। এদিকে আসুন। ফরাস পাতা লম্বা চালাঘরে।

—না এখানে বসব না।

—ঈশম, ঈশম এদিকে এস। ওঁদের নিয়ে যাও। যেখানে শ্রাদ্ধ হচ্ছে সেখানে ওঁদের নিয়ে যাও। চোয়াড়ির পাশে চেয়ার পেতে দাও।

—মহাভারত কে পড়ছে?

—সূর্যকান্ত।

—মহামহোপাধ্যায় সূর্যকান্ত। না কাঠালিয়ার সূর্যকান্ত।

—মহামহোপাধ্যায় সূর্যকান্ত।

ঈশম ষাঁড় বাছুর নিয়ে যাচ্ছে। যূপকাঠে ষাঁড়টা সে বেঁধে রাখবে। সে কাছে এসে বলল, আসেন কর্তা।

—যাক বাঁচা গেল। আবার দক্ষিণের মাঠে সারি-সারি মানুষ। ওরা কারা! শশিভূষণ হাত তুলে কপালে দূরের মানুষ লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। সে এ-অঞ্চলে চার-পাঁচ বছরের উপর রয়েছে। নানা কারণে এ-অঞ্চলের মানুষেরা তার কাছে এসেছে। বেশির ভাগ বিদ্যালয়সংক্রান্ত ব্যাপারেই ওরা আসত। সে প্রায় সবাইকেই চেনে। হাতে মোটামুটি সবার একটা লিস্ট আছে। হাজার হবে প্রায় লোকজন খাবে। তারপর আছে কাঙালী ভোজন। গরীব-দুঃখী মানুষেরা এখনও উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। ওরা গোপাটে সারি-সারি মাদার গাছের নিচে কলাপাতা কেটে বসে রয়েছে। কর্তা-বাবুদের খাওয়া হলে ওরা খাবে।

শশিভূষণ বলল, ভিতরে যান।

যাদের ভিতরে পাঠাবার সে তাদের ভিতরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যারা ফরাসে বসবে সে তাদের ফরাসে বসাচ্ছে। যাদের দাঁড়িয়ে থাকার কথা, সে তাদের দাঁড় করিয়ে রাখল।

শশিভূষণও সারা দিন দাঁড়িয়ে ছিল। বসার বিন্দুমাত্র সময় পায় নি। সকাল থেকে

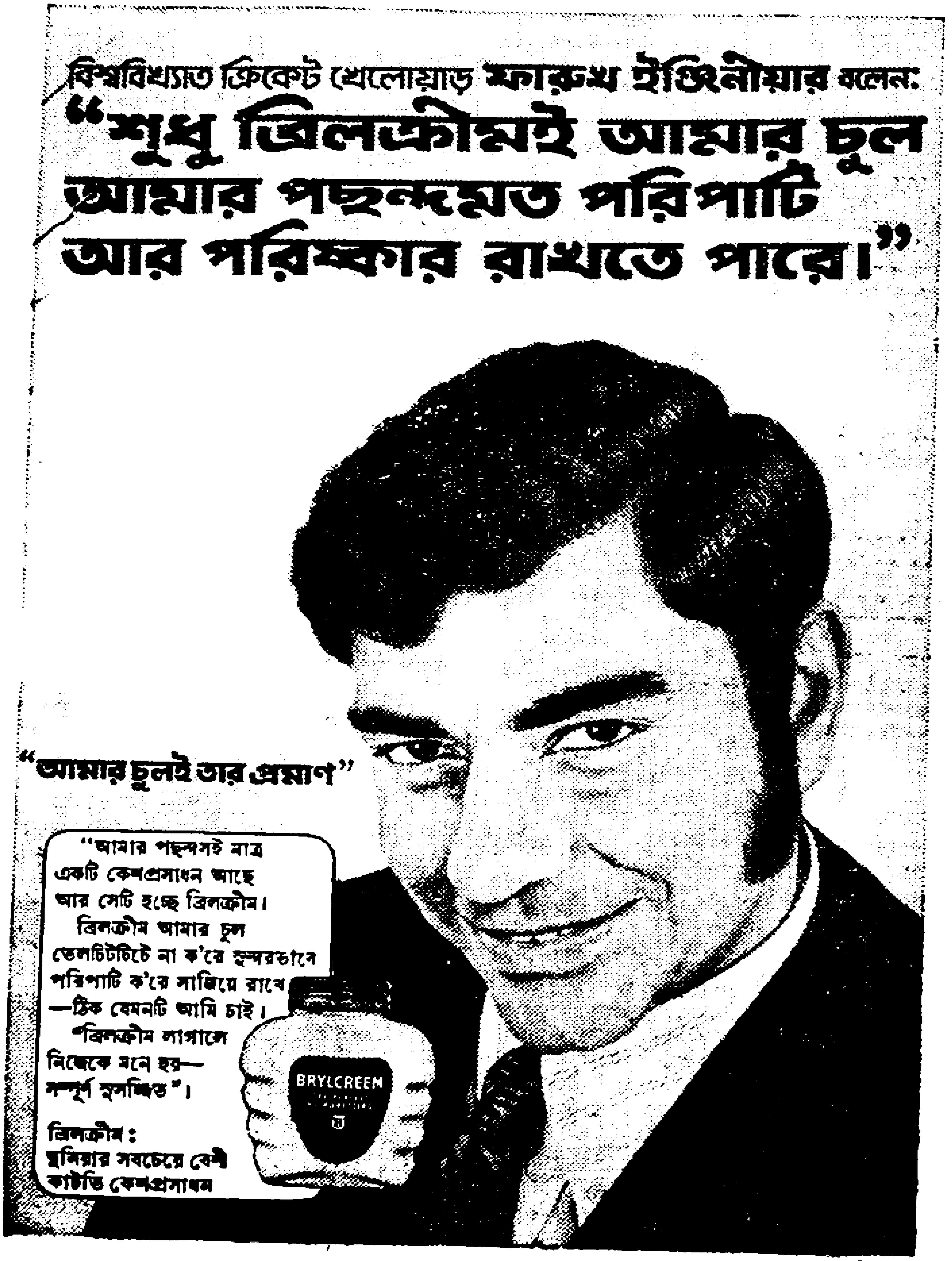
বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফারুখ ইঞ্জিনীয়ার বলেন:
"শুধু ব্রিলক্রীমই আমার চুল আমার পছন্দমত পরিপাটি আর পরিষ্কার রাখতে পারে।"
"আমার চুলই তার প্রমাণ"
"আমার পছন্দসই মাত্র একটি কেশপ্রসাধন আছে আর সেটি হচ্ছে ব্রিলক্রীম।
ব্রিলক্রীম আমার চুল তেলচিটচিটে না ক'রে সুন্দরভাবে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রাখে —ঠিক যেমনটি আমি চাই।
ব্রিলক্রীম লাগালে নিজেকে মনে হয়— সম্পূর্ণ সুসজ্জিত"।
ব্রিলক্রীম :
দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী কাটতি কেশপ্রসাধন
BRYLCREEM

BLB-2002

দুই ক্ষীরের ভাঁড় আসছে-তো-আসছেই। সার বেঁধে ঠিক সেই পালকি কাঁধে বেহারা যায় হুঁ হুম না হেমন। ওরা দুই জোড়া ক্ষীরের ভাঁড় নিয়ে মাঠের উপর দিয়ে সারি-সারি চলে আসছে। শশীভূষণ বার-বাড়িতে দাঁড়িয়ে লাঠি তুলে ইশারা করছে শুধু। কোথায় দিয়ে নামান হবে সে দেখিয়ে দিচ্ছে।

শ্যামাজ্যাঠা এসেছেন শাদুরচর থেকে। তিনি এসেই প্রথম খবরটা দিলেন। বললেন, চন্দ্রনাথের মেলায় চিকুট পাহাড়ের নিচে পাগল ঠাকুরকে কায়া দেখে এসেছে। গৈরিক বসন পরণে। একটা বড় বটগাছের নিচে তিনি বসে রয়েছেন। সামনে ধুনি জ্বলছে। পাশে কীর্তন করছে কিছু লোক। যে দেখেছে সে কাছে যেতে পারে নি। তাকে যেতে দেওয়া হয় নি। সে দূরে দাঁড়িয়ে প্রণিপাত সেরেছে।

সে ভেবেছিল এসেই খবর দেবে ঠাকুর-বাড়ি। ফাল্গুন মাসের মেলায় সে যেতে পারে নি। পরে তীর্থ করতে বের হয়ে ফেরার পথে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গেছে। লোকজনের ভিড় কমে নি। কিন্তু সাধুসজ্জন ব্যক্তি তখনও গাছের নিচে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে।

শশীভূষণ বলল, কবে সে ফিরে এসেছে।
—কাইল ফিরা আইছে।
—ওর নাম কি?

—তারে আমি চিনি-না। আমাদের গাঁয়ে মহাদেব সাহা আছে ও শুইনা আইছে।

শশীভূষণ বলল, ঠিক দেখেছে তো?

—না দেখলে কয়? মণির মতই হুবহু দেখতে।
—কবে দেখেছে?

—চাইর-পাঁচ দিন আগে। কাইল আইছে। মণি কত জায়গায় যায় গিয়া এবারে হয়ত চন্দ্রনাথ পাহাড়ে চইলা গেল।

কথাটা মুহূর্তে সারাবাড়ি রটে গেল। বড়বৌ শুনে মাথার ঘোমটা আরও টেনে শ্যামাজ্যাঠার সামনে এসে গড় হয়ে প্রণিপাত করল।

শ্যামাজ্যাঠা বলল, ভাল আছ বৌমা।

মাথায় ঘোমটা বড়বৌর। কথা বলতে পারছে না। শুধু মাথা-টাথা নিচু করে রাখল। এ-সবই ভাল থাকার কথা। তবু, বলতে হয় বলে বলা, মণি ত আর মানুষ না বৌমা। মনুষ্যরূপে দেবতার জন্ম। সে কেন তোমার ঘরে আটকা থাকব।

বড়বৌ এবার লজ্জার মাথা খেয়ে বলল, অত দূরে তো উনি কখনও যেতেন না।
—গেল। ইচ্ছা হইল, চইলা গেল।

বড়বৌ জানে, সে না ফিরে পারবে না। যেখানে যত পাহাড়-পর্বত থাকুক, দেবতার নির্দেশ থাকুক, সন্ত মানুষের আজ্ঞা থাকুক, মানুষটা যখনই বড়বৌর মুখ, চোখের উপর দেখে ফেলবে তখনই সব ফেলে ফিরে আসবে।

বড়বৌ বলল, একবার ভালো করে খোঁজ নিলে হত না!

—আমি কইলাম মহাদেবরে নিয়া যান, ভাবছি। নিজের কানে না শুনলে মন মানব ক্যান। শুধু তোমারে খবর দিয়া যাই।

ভূপেন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ সবাই জড় হয়ে বলল, ঈশম যাইক খবর আনতে। আপনে মহাদেবরে একটা চিঠি লিখা দ্যান। একেবারে যদি খবর ঠিক পাইলে নারানগঞ্জে চইলা যায়। সেখান থেকে চাটগাঁ মেলে। এসব কাজে দেরী করা ভাল না। তাইনত এক জায়গায় বেশী দিন থাকেন না।

শশীভূষণ বলল, ঈশমের পক্ষে এ-কাজ একা করা কঠিন। বরং আমি সঙ্গে যাচ্ছি।
শচীন্দ্রনাথ বলল, তবে ত খুব ভাল হয়।

এমন সময় লালটু এসে খবর দিল, শশীভূষণকে, জ্যাঠিমা আপনারে ডাকে।

—বল যাচ্ছি। সে এই বলে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেল। বেতের একটা বড় লাঠি আছে ঘরে। কবে একবার ভূপেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের মেলায় গিয়েছিল, মোটা হলুদ রংয়ের বাঁকান লাঠি নিয়ে এসেছিল এক আঁটি। শশীভূষণ পছন্দ মত একটা চন্দ্রনাথের লাঠি নিয়ে রেখেছিল। যাবার সময় এটা সঙ্গে নেবে ভাবল। কিন্তু লাঠিটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখার জন্য দক্ষিণের ঘরে ঢুকতেই দেখল, বড়বৌ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

—আপনি যাবেন।
—ঈশম এত কথা বলতে পারবে না। আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

—আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, ওঁর হাতে কিছু কালো-কালো দাগ আছে; তা সে দেখেছে কিনা।

—কালো দাগ!

—কেন লক্ষ্য করেন নি!

—না তো?

—হাত কামড়ে কালা-কালা করে ফেলত এক সময়। হাতে সে সব বড়-বড় দাগ আছে। সব মিলে গেলেও ওটা দেখে নেবেন।

শশীভূষণ বলল, ঠিক আছে, আপনি ভাববেন না। পেলে একেবারে ধরে নিয়ে আসব। আপনি কান্নাকাটি করবেন না।

—নারে ভাই। আমার কান্নাকাটি করেই শেষ হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে এখন শুধু চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমি মানুষটার জন্য আর কাঁদি না। তারপরই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেতে-যেতে বলল, ধনকে বলছি আপনাদের খাবার দিতে। আপনারা খেয়ে নেন।

সোনা দেখল বড়জ্যাঠিমা লম্বা ঘোমটা টেনে ওর পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কেউ এ-বাড়িতে এসেছে যিনি জ্যাঠিমার গুরুজন। যার মতো লম্বা ঘোমটা বড়-জ্যাঠিমাকে দিতে দেখে ভারী কৌতূহল হল সোনার। সে ডাকল, জ্যাঠিমা।

—এখন ডাকে না বাবা। দূরে যাও। তোর জ্যাঠামশাইকে আনতে যাচ্ছে মাস্টার-মশাই। ওদের এখন খাবার দিতে হবে। তোর মা কোথায় রে?

জ্যাঠামশাই এত দূরে যেতে পারেন ভেবে যেন — সোনার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। সে বলল, মা কোথায় জানি না জ্যাঠিমা। আমার খিদে পেয়েছে। খাব। কেউ আমাকে খেতে দিচ্ছে না।

বড়বৌ জানে সোনা কি খেতে চায়। দই ক্ষীর খেতে চায়। বড় অভাগা মনে হয় সোনাকে, সে দই-ক্ষীর কিছু খেতে পাবে না। সে ঘোল-ভাত খাবে। সকালে জেলাপাড়া ঘোল দিয়ে ভাত দেওয়া হয়েছে। ওর খিদেটা চোখের খিদে। সে জ্যাঠিমার কাছেই একটু না অনিয়ম করার অধিকার পায়। বড়বৌ তাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে এটা-ওটা খেতে দেয়। আজ সে একটু দই দিয়ে ক্ষীর খাবে। সবাই যেমন খাচ্ছে কিন্তু তাকে কে দেয়। খাইয়ে দিলে পরে ওর কিছু-না-কিছু অসুখ হয়। সে তখন চুপচাপ বসে থাকে। এখন জ্যাঠিমা এ-ঘরে অপেক্ষায় থাকে। জ্যাঠিমা এলেই যেন সে খেতে পাবে।

বড়বৌ বলল, না বাবা আজ খাবে না। আজ তোমাকে আমি কিছু দেব না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। বর্ষেই তো ভাল হলে সব পাবে।

তবু সোনা ঘ্যান-ঘ্যান করছে দেখে বড়বৌ আর দাঁড়াল না। বড় খাই-খাই হয়েছে সোনার। সে এতটা দায়িত্ব নিতে পারছে না। ক্ষীর দই দুই সোনার পক্ষে অপকারক। সুতরাং সে আর দাঁড়াল না। ধনকে খোঁজার জন্য বড় ঘরে উঁকি দিল।

আর তখনই সোনা অবাক চোখে দেখল ফতিমা আস্তে-আস্তে এদিকে পা টিপে-টিপে আসছে। ওর নানী এসেছে লাঠি ভর দিয়ে। ওর নানী সোজা হতে পারে না। একেবারে ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। বড়কর্তার কাজকাম হচ্ছে মানুষজন খাবে, সামসুদ্দিনের মা কিছুতেই বাড়িতে বসে থাকতে পারছিল না। মালজানে বার-বার বলেছে, আপনে এই শরীর নিয়া যাইবেন কি কইরা।

—যামু, ঠিক চইলা যামু। সে ফতিমাকে বলল, লইন আমার লগে ল।

ফতিমা এসেছে গতকাল। ওদের গ্রীষ্মের ছুটি হয়েছে কবে। কথা ছিল না আসবে। কিন্তু ফতিমা বাড়ি আসার জন্য কান্নাকাটি করেছে। নানীকে দেখার ইচ্ছা ওর যে কত। অদ্ভুত ফতিমার সেই বাবুটির জন্য বড় মায়া। সে যত বড় হচ্ছে, বাবুটির জন্য কেমন এক কোমল ভালবাসা বুকের ভিতর গড়ে উঠছে। সে নিজেও বুঝতে পারে না মাঝে-মাঝে তার বাড়ি ফিরে আসতে এত ইচ্ছা হয় কেন, শহর ভাল লাগে না কেন। কতক্ষণে সে রেলগাড়িতে চড়ে নারানগঞ্জে

চলে আসবে। তারপর স্টিমারে বারদী এবং তিন ক্রোশের মত পথ হেঁটে আসতে হয়। ওর তখন কেন পথ ফুরোয় না। চারপাশের গাছপালা পাখি ফেলে সে ছুটে আসে, আসতে-আসতে যখন সেই অর্জুন গাছটা দেখতে পায় তখন সে ছুটতে থাকে। এবারেই প্রথম সে ছুটতে পারছে না। সে যে বড় হয়ে যাচ্ছে, সে যে ফতিমা, শাড়ি পরেছে সুন্দর করে, কপালে কাচের টিপ, দুই বিনুনি বাঁধা ফেলে, একেবারে কাঁচ কলা-পাতা রংএর, যেন সবুজ ধানা অবুঝ হয়ে আছে। সে ধীরে-ধীরে হেঁটে-হেঁটে বাড়ি ফিরছে। সকালে সে পেয়ারা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়েছে, সোনাবাবুকে অর্জুন গাছের নিচে দেখা যায় কিনা। দেখলেই সে মাঠে নেমে আসত কিছুটা। হাত তুলে ইশারা করত। তারপর, সেই গাঁয়ের ছোট নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু গল্প করা। কি যে এত গল্প, ফতিমা নিজেও বোঝে না। ঢাকা শহরে সোনা কবে যাবে মাঝে-মাঝে এমন বললে, সোনা চুপ করে থাকে, কবে সে যেতে পারবে জানে না। ফতিমার দুঃখ, বার-বার এক দুঃখের প্রকাশ, ওর একা-একা ভাল লাগে না। সে একদিন স্বপ্ন দেখেছে, বড় একটা ঢিবির মাথায় সে, সোনা এবং পাগল জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে আছেন।

ফতিমাকে দেখেই সোনার মনে হল, ফতিমা ঠিক অমলাপিসির মতো বড় হয়ে গেছে। সে আর সোজা তাকাতে পারছে না।

সোনা বলল, ফতিমা তুই বড় হয়ে গেছিস!

—যান! ফতিমা ফিক করে হেসে ফেলল।

—হাঁরে, দিদিকে বলে দেখ। সোনা সামসুদ্দিনের মাকে সাক্ষী মানল।

ফতিমা ওসব কথায় গেল না। বলল, আপনার অসুখ। কি হইছে সোনাবাবু? আপনারে দেখতে আইছি।

—জ্বর। টাইফয়েডের মতো হয়েছিল।

—আপনি বড় রোগা হয়ে গেছেন।

—তাই বুঝি! তুই কতদিন থাকবি?

—বাজি কইছে দুই-চার দিন পর আসব।

—তুই তখন চলে যাবি।

—পাগল! আমি কমু অসুখ হইছে আমার! যামু না। বলেই আবার বোকার মত ফিক করে হেসে দিল।

—তোদের পরীক্ষা হয়ে গেছে।

—হবে। স্কুল খুললেই হবে।

—ইংরেজিতে কত পেয়েছিস?

—বাষট্টি।

অন্যান্য বিষয়ের কথাও সে বলল। প্রায় যেন এখন সোনা ওর সমবয়সী নয়। অনেক বড়। আর ফতিমাও ছোট মেয়ের মতো জবাব দিয়ে যাচ্ছে। কোন কুণ্ঠা নেই। বস্তুত ফতিমা বাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলেই খুশী।

সোনা বলল আরবিতে কত পেয়েছিস?

—আমি সংস্কৃত নিয়ে পড়ছি সোনাবাবু।

—কত পেলি?

—আটানব্বই।

—বলিস কি!

—আমি ফার্স্ট হয়েছি সোনাবাবু। বাজি আমারে এই শাড়িটা কিনা দিছে। বাজি কইল তুই কি নিবি ফতিমা। কি চাই। ফার্স্ট হইলে তরে যে কইছিলাম কিছু দিমু। আমি কইলাম, আমাকে একটা শাড়ি কিনা দেবেন। আমি শাড়ি পরমু। এই শাড়িটা পইরা আইছি। আমারে ভাল লাগছে না দেখতে। বলে কেমন এক শিশু-সরল মুখ নিয়ে সোনার দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন সে বাবুকে খুশী করার জন্য শাড়ি পরে এসেছে। খুশী করার জন্য ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে।

সোনা বলল, তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ফতিমা। তুই দেখছি আস্তে-আস্তে জ্যাঠিমার মতো কথা বলতে শিখে যাচ্ছিস। তোক দেখতে অমলাপিসির মতো লাগছে। অমনি সোনার মনে হল শহরে থাকলে বুঝি সবাই অমলাপিসির মতো হয়ে যায়। ফতিমাও হয়ে গেছে। সে তো এখন কত কিছু জেনে ফেলেছে। সে বলল, আমি ভাল হলে একদিন তোদের বাড়ি যাব। তারপর তুই আমি জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে বের হব।

—জ্যাঠামশাই বাড়ি নাই?

—না।

সোনাবাবু আপনি কবে ভাল হবেন। মা চলে যাবে। বাজি এসে মাকে নিয়ে যাবে। নানীকে বলে আমি থেকে যাব। আপনি কবে ভাল হবেন। আমি ঠিক যাব। কেউ টের পাবে না।

সোনা চুপ করে থাকল। মা এদিকে আসছে। মা এসেই বলল, কিরে ফতিমা তুই! তোর দিদি! বস। এই কত বড় হইয়া গ্যাছস। কি গ পিসি তোমার নাতিন কুল-পরি সাইজা আইছে দেখছি।

—ভাবছি আপনেগো বাড়ি যাইয়া যামু নাতিনরে। তাই ফুলপরি সাজাইয়া আনছি। কি গ সোনাবাবু পছন্দ লাগে।

সোনা বলল, মারব তোমাকে বলে দিচ্ছি দিদি।

ধনবৌ বলল, কি কও সোনা। এমন কথা কইতে নাই।

—তবে দিদি আমারে ক্যাপায় কেন।

এত সব কথায় ফতিমার ভারী লজ্জা পাচ্ছিল। সে মাথা নিচু করে চোখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। ফতিমা সোনাবাবুর দিকে আর কিছুতেই তাকাতে পারছে না। তাকালেই যেন সে সোনাবাবুর কাছে ধরা পড়ে যাবে। সে যে সবুজ ধানা অবুঝ হয়ে আছে, তা ধরে ফেলবে সোনাবাবু।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

॥ ছোটদের জন্য লেখা ॥

ছোটদের জন্য লেখা যার নাম শিশু-সাহিত্য সেই বিভাগটি ইদানীং বাংলাদেশে অবহেলিত। একদা যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, ও পরে সুনির্মল বসু প্রভৃতি লেখকরা যেভাবে শুধু ছোটদের জন্যই লিখেছেন এইকালে সেই ধরনের লেখক দুর্লভ। য়ুরোপে কিন্তু শিশুসাহিত্য বিভাগটি বেশ সমৃদ্ধ এবং এখনও শিশু-সাহিত্যের জন্য নানারকম গ্রন্থাবলী প্রায় প্রতি মাসেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। কয়েকজন প্রকাশক ত শুধুমাত্র শিশুদের মনোরঞ্জক পুস্তকই প্রকাশ করেন, অন্য কিছু নয়। এদেশে এই জাতীয় একটিমাত্র বিভাগ নিয়েই কারবার করার উৎসাহ কোন প্রকাশকেরই নেই, তা যদি হত তাহলে কেউ প্রকাশ করতেন শিশুসাহিত্য, কেউ কবিতাগ্রন্থ, কেউ গল্প ও উপন্যাস, কেউ শুধু রহস্য রোমাঞ্চ এবং কোন প্রকাশক শুধু ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশ করতেন, প্রবন্ধের দুর্দিন, (শুধুমাত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করলে হয়ত কারবার চলবে না) তাই প্রবন্ধ প্রকাশকদের কথা উহ্য রইল।

অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস সম্প্রতি য়ুরোপের তিন শতাব্দীব্যাপী শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থটি অনেক দূরের জগৎকে কাছে টেনে আনে।

ছেলেদের হাত ধরে নিয়ে চলুন অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এ যুগের ছেলেরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে অথবা ফাঁসী কাঠে, সেই সব বিরাট গাছে মানুষের মৃতদেহ দুলছে, এরা কঠিন অপরাধের সাজা পেয়েছে মৃত্যুদণ্ড। এই জাতীয় দৃশ্য অবতারণা করার হেতু বোধহয় ছোটদের মনে পাপ বোধ জাগ্রত করা এবং অপরাধীর শাস্তি তাদের মনে অপরাধের ঘৃণা বিকট ফুটিয়ে তুলবে।

শুধু য়ুরোপে নয়, ছোটদের জন্য রচিত গল্প, কবিতায় পৃথিবীর সর্বত্রই নীতিকথার ছড়াছড়ি থাকত। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সেই সব কাহিনীর বিভৎসতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অংশকে অধিকতর সরল করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শিশুও একটি ব্যক্তি, সাহিত্যে তার বিশেষ ধরনের প্রয়োজন আছে এই স্বীকৃতির জন্যই মার্ক টোয়েন, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, উইলিয়াম ব্লেক, রুডিয়ার্ড কিপলিং, টি এস এলিয়ট এবং ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকরা ছোটদের জন্য লিখেছেন। আমাদের বাংলা দেশেও একালে সৌরীন্দ্রমোহন, হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, লীলা মজুমদার, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকরা ছোটদের জন্য অনেক লিখেছেন।

অকসফোর্ডের প্রকাশিত এই বইয়েতে তিন শতাব্দীর শিশুসাহিত্য আলোচিত হয়েছে, লেখিকা মিসেস বেটিনা হার্লিমান কুড়ি বছর ধরে অতি সযত্নে যেসব গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করেছেন সেই সব গ্রন্থ এই আলোচনায় স্তূপাকৃত হয়েছে। বইগুলি ঐতিহাসিক ক্রম এবং মাঝে-মাঝে তুলনামূলক ভঙ্গীতে বিশ্লেষিত। ঐতিহাসিকতার দিক থেকে একেবারে গোড়ার দিকের শিশুদের জন্য রচিত গান এবং ছড়া অতিশয় সরল এবং তার বক্তব্য একেবারে স্পষ্ট। অন্য শ্রেণীর যে কাহিনী আলোচিত হয়েছে সেগুলি সাধারণত রূপকথা, উপকথা কিম্বা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। শেষাংশের পরিচ্ছেদগুলিতে সমকালীন শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ছোট্ট শিশু সর্বপ্রথম যে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত হয় তা ঘুমপাড়ানি গান। লেখিকা দেখিয়েছেন কোন ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্যে বিশেষ সময়ের ইঙ্গিত আছে, যথা স্পেন দেশের একজন বৃদ্ধ রমণী গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখছেন ছোটরা সব ঘুমিয়েছে কিনা, কিম্বা তিন বছরের যুদ্ধ, বা নেপোলিয়ান বোনাপার্টির উল্লেখ। ছোট ছেলে-মেয়েকে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ানোটা হয়ত ঠিক নয় কিন্তু এই ধারা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। আমাদের দেশেও যেমন—খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে। এই সব ছড়া বা গানের মধ্যে শিশুদের মনোভঙ্গীর চেয়ে শ্রান্ত বাপ-মার মেজাজটাই বেশী করে ফুটে ওঠে। একটি প্রাচীন যুগের ফিনিশ ছড়া এক জোড়া মেষকে ডেকে এনে ভয় দেখানো হচ্ছে—

> "A Black one and a white one
> And if you will not go to sleep
> The black one he will eat you up."

অনেক সময় ঘটনা বিশেষের বিবরণ দেওয়া হয়, সেই সব বিবরণ কখনও মধুর এবং কখনও বা তিক্ত, কাহিনীতে রং চড়ানোর জন্য এবং আমদানী করতে হয়—ছোটদের অবচেতন মনে এর একটা ছাপ পড়ে। ডাইনিরা সব ভীষণ কালো এবং কদাকার, যেসব পরীরা দুষ্টু তারাও কুৎসিত দর্শনা, মায়াজালে জড়ান কালো বর্ণে, এমন কি ইন্দ্রজালও সময় বিশেষে কালো হয়ে ব্ল্যাক ম্যাজিকে পরিণত হয়। এর বিপরীত দিকে যা কিছু ভালো এবং সুন্দর তা শ্বেতশুভ্র এবং সোনার। সেন্ট ম্যাডোনার গায়ের রং কালো অথচ তিনি কি ভীষণ সুন্দরী সুতরাং তিনি ব্যতিক্রম। পীত, কৃষ্ণবর্ণ বা লাল চামড়ার মানুষেরা সাধারণত বিকলাঙ্গ, বামন, বোকা-সোকা তাদের বর্ণনা দেওয়া হয় কিম্বা সেই সব চরিত্র নিয়ে ভাঁড়ামি করা হয়।

দি হাউস দ্যাট জ্যাক বিল্ট জাতীয় কাহিনী যদি বোনা যায় শুধু তার ছন্দ মিলের খাতিরে, কতকগুলি ক্ষেত্রে এই সব মজাদার লাইনের পুনরাবৃত্তি থাকায় ছড়ার বীভৎস দিকটা চাপা পড়ে যায়।

এই জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে লেখিকা মাঝে-মাঝে কঠোর মন্তব্য করেছেন। তিনি অজস্র ছড়া, কবিতা, রূপকথার ভাণ্ডার একেবারে উজাড় করে দিয়েছেন।

য়ুরোপে রূপকথা প্রবেশ করেছে সপ্তদশ শতকে সহস্র রজনীর আরব্য উপন্যাসের শাহজাদীদের সঙ্গে। রূপকথা ওদেশে আরব্য রজনীর সাক্ষাৎ বংশধর। কাগজে-কলমে য়ুরোপের প্রথম রূপকথা রচিত হয়েছে ইতালীতে। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়, হান্স এণ্ডারসন প্রভৃতিরা বিখ্যাত দিনেমার সন্তান।

লেখিকা তাঁর বাল্য বয়সে যেসব কাহিনী শুনেছেন স্বাভাবিক কারণে সেগুলির প্রতি তাঁর অসীম মমতা, লেখিকার মতে শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার কারিগরী উন্নতি শিশুজগতের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। এই উক্তি সহজগ্রাহ্য নয়, বোধ-করি সেই কারণে অনুবাদক এবং সম্পাদক অজস্র মন্তব্য সংযোগ করে লেখিকার মন্তব্যকে চাপা দেওয়ার প্রয়াস করেছেন।

লেখিকা অভিযোগ করেছেন রেডিয়ো এবং সিনেমা মুক্তনীমুলক প্রবৃত্তিকে হত্যা করছে। 'পিনোচিও' (বাংলায় প্রিয়ম্বদা দেবী 'পুতুলনাচ' নামে অনুবাদ করেন সর্বপ্রথম) নামক কাহিনী সম্পর্কে এই গ্রন্থের সম্পাদক বলেছেন যে, এই কাহিনী-টির 'আধুনিক জনপ্রিয়তার কারণ ওয়াল্ট ডিসনেকৃত 'পেনোচিও'র (১৯০৮) ছবিওয়ালা সংস্করণ। ডিসনের চেষ্টায় এই কাহিনীর পুনরুজ্জীবন ঘটেছে।

স্পষ্টতঃই সর্বযুগে সর্বকালে প্রাচীন এবং অজর কাহিনীর পুনরুত্থান ঘটে, তাকে অবশ্য নতুন কালের উপযোগী পোশাক পরিচ্ছদ নিতে হয়। যেমন শুপী গাইন বাঘা বাইন' কাহিনীটিকে সত্যজিৎ রায় নবজীবন দান করেছেন। সমসাময়িক কালের উপযোগী করে নতুন করে আবার গড়তে হয় পুরানো দিনের কাহিনী। এই গ্রন্থে প্রচুর দৃষ্টান্ত ও ছবির দ্বারা এদিক-টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যেমন এলিস ও তার অশ্বিচ, লুই ক্যারলের নিজের আঁকা ছবি সেই ছবি এবং টেনিয়েলের আঁকা ছবিতে পার্থক্য কম। টেনিয়েলের ছবি এবং এলিসকে পৃথক করা যায় না। এই গ্রন্থে আবার একটি উসকো-খুসকো চুলওলা স্প্যানিস এলিস-এর ছবি আছে, ইংরেজ এলিসের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। আর অশ্বিচটা যেন একটা পুতুলের মত দেখাচ্ছে। আর একটি ফরাসী এলিসের ছবি আছে অন্য পৃষ্ঠায়, তার আকৃতিটা সুন্দর, ঘাগরাটা বড়, মাথার চুল সুন্দর করে বাঁধা, কিন্তু অশ্বিচটা যেন একটা মানুষের মত দেখতে।

প্রকৃতপক্ষে, শব্দ এবং দৃশ্যগ্রহণ ব্যবস্থার কারিগরী উন্নতির ফলে শিশুদের চিত্তে সৃজনী মনোভঙ্গী জাগ্রত করা হয়ত অধিকতর কার্যকর হবে, ছোট ছেলে-মেয়ে নিজের চোখে পরিচিত কাহিনীর প্রকৃত রূপ দেখতে পাবে এবং শব্দযন্ত্রের সহায়তায় হয়তো গল্প বলার যে ভঙ্গী আজ মৃত-কল্প হলে লেখিকার আশঙ্কা সেই ভঙ্গীকে প্রাণবন্ত করে তোলা যাবে।

একটি পরিচ্ছেদে শিশুদের গ্রন্থে রাজ-নীতি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'আনক্‌ল টমস কেবিন' (বাংলায় অনুবাদ করেছেন চণ্ডীচরণ সেন) গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখিকার উৎসাহ হয়ত সবাই সমর্থন করবেন না।

ছোটদের জন্য লিখিত গল্প ও কাহিনীর মধ্যে পশুদের গল্প, পদ্য, আবোল-তাবোল ছড়া প্রভৃতি অধিকতর মনোরম এবং মধুর। অর্থ না বুঝলেও অনেক সময় ছড়ার সুরটুকুই ছোটদের ভাল লাগে আর সেই কারণে চট করে মুখস্থ হয়ে যায়। লেখিকা বলেছেন এডওয়ার্ড লীয়র এবং এলিয়টের 'প্রাকটি-ক্যাল ক্যাটসের' অনুবাদ সম্ভব নয়।

শিশুসাহিত্য প্রসঙ্গে এমন একটি গ্রন্থ কদাচিৎ নজরে পড়ে।

THREE CENTURIES OF CHILDREN'S BOOKS IN EUROPE BY BETINA HURLIMANN. Published by the OXFORD UNIVERSITY PRESS : Price Forty five shillings.

—অভয়ংকর

সাহিত্যের খবর

সাহিত্য আকাদামির নতুন ফেলো : গত ২১শে ফেব্রুয়ারী নতুন দিল্লিতে সাহিত্য আকাদামির সভাপতি ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক অধিবেশনে চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাহিত্য আকাদামির নতুন ফেলো নির্বাচিত করা হয়। এ চারজন ব্যক্তি হলেন—বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, বিখ্যাত গুজরাটি লেখক শ্রীকাকাসাহেব কালেলকার, প্রখ্যাত পাঞ্জাবী লেখক শ্রীগুরু-বক্স সিং ও বিশিষ্ট ওড়িয়া কবি ও ঔপ-ন্যাসিক শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। ঐ একই দিনে অপর এক অনুষ্ঠানে এ বছরের আকাদামি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক-দেরও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

কলকাতায় শচী রাউত রায় : বর্তমান ওড়িয়া ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, গল্প-কার ও প্রাবন্ধিক শ্রীশচী রাউতরায় গত ১৫ ফেব্রুয়ারী মাত্র একদিনের জন্য এসেছিলেন কলকাতায়। অবশ্য কলকাতা শ্রীরাউত রায়ের কাছে খুব একটা নতুন নয়—তাঁর কর্ম-জীবনের ৩০ বছরই কেটেছে এখানে। কল-কাতার সঙ্গে রয়েছে তাঁর প্রাণের সম্পর্ক। তাই সুযোগ পেলেই চলে আসেন এখানে। ওড়িয়া ভাষায় এ পর্যন্ত তাঁর ২৬টি বই বেরিয়েছে। এইসব বইয়ের মধ্যে আছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই। তাঁর অনেক রচনাই ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছে। ওড়িয়া সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য তিনি ১৯৬২ খৃঃ পদ্মশ্রী এবং ১৯৬৪ খৃঃ আকাদামি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৫ খৃঃ আমন্ত্রিত হয়ে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে ভাষণ দেন। এছাড়াও ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন দেশে তিনি বিভিন্ন সময়ে পরি-ভ্রমণ করেন। ১৯৬৫ খৃঃ সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেদিন। জিজ্ঞেস করলাম—'এখন কি লিখছেন?' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন তিনি—"এখন বলো থেকে ওড়িয়া ভাষায় কয়েকজন লেখকের রচনা অনুবাদের কাজে ব্যস্ত আছি। অবশ্য আমার নিজের একটি কবিতার বইও প্রকাশিত হবে খুব তাড়া-তাড়ি।" একটু থেমে আবার বললেন—"এছাড়া ব্যস্ত আছি আমার নিজস্ব স্টুডি-য়োম নিয়ে।" সুযোগ পেয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলাম—"ওড়িশার নবীন লেখকরা কেমন লিখছেন?" এবার একটু ভেবে নিয়ে বললেন—'কয়েকজন কবি সম্বন্ধে আমরা খুব আশাবাদী। সৌভাগ্য মিশ্র, বীণা মহা-পাত্র, সদাশিব দাস প্রমুখেরা খুবই ভাল লিখছেন।" বাংলা ভাষায় আমাদের প্রতি-বেশী সাহিত্যের কিছু কিছু নমুনা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হলে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়তর হতে পারত।

সার্ত্র প্রসঙ্গে।। সার্ত্রের উপর লেখা বইয়ের সংখ্যা এখন কোন ভাষার সাহিত্যেই তেমন দুর্লভ নয়। তবু এই বইটির কিছুটা পার্থক্য আছে। লেখক টমাস মলনার এখানে সার্ত্র'র নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি আলোচনা করে দেখিয়েছেন, কিভাবে এর মধ্যে তাঁর জীবন-দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। বইটি প্রকাশিত হয়েছে নিউইয়র্ক থেকে। লেখকের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি অত্যন্ত সচেতন-ভাবে এবং বিস্তৃতভাবে সার্ত্রের জীবন-দর্শন কিভাবে বিকশিত হয়েছে, তার সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন। প্রসঙ্গত লেখক দেখিয়েছেন পাসকাল ও হেগেলের কাছে সার্ত্রের দর্শন কতখানি ঋণী। এছাড়াও জীবনের উপরেও রয়েছে একটা বিরাট ভূমিকা। সাহিত্যরসিকদের কাছে বইটি এর মধ্যেই সমাদর অর্জন করেছে।

একজন তরুণ কবি।। আর্জেন্টিনার সিমনেস পেরেস একজন বিশিষ্ট তরুণ কবি। সম্প্রতি তাঁর একটি নতুন কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে হাভানা থেকে। খুব হৈ চৈ পড়েছে বইটি নিয়ে সেখানে। এর কারণ, সেখানকার কাব্য আন্দোলনে এই তরুণ একজন কবি সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের রীতি, প্রবণ ও পদ্ধতি কবিতার ব্যবহারে সচেষ্ট হয়েছেন। বইটি এবার এর জন্য একটি পুরস্কারও লাভ করেছে। একটা কথা মনে হয়, এখন আর কোন একটা বা দুয়েকটা দেশ সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করে রাখবে, বোধ হয়, তা আর সম্ভব নয়। আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার অন্ধকারেও আজ কবিতা পল্লবিত হয়ে উঠছে।

কোপেনহেগেনের অতিথি : কোপেনহেগেনের এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আসকো পারপোলিকা এসেছেন সম্প্রতি ভারত ভ্রমণে। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়স্ক এই তরুণ বিদেশী ভারত প্রেমিক এর মধ্যেই বেদের উপর দুখানি গ্রন্থ লিখেছেন। এছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর লিখেছেন বেশ কটি প্রবন্ধ। ভারতে অবস্থানকালে তিনি অধিকাংশ সময় কাটাবেন দক্ষিণ ভারতে। তাঁর ইচ্ছে এই সময়ের মধ্যে তামিল ভাষা শিখবেন এবং তামাক্ষও বক্ষণা লিপির উপর গবেষণা করবেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রতি কিভাবে আকৃষ্ট হলেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন—"আমাদের কিন্ডারগার্টেনে একটি ক্লাসিক্যাল ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক। ল্যাটিন, গ্রীক বা সংস্কৃত। আমি সংস্কৃত নেই। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করে এই ভাষার মাধুর্যে মুগ্ধ হই। ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আমার প্রধান বিষয় হয়ে পড়ে।"

তিনি আরো বলেন যে, তাঁর দেশে এশিয়া সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ ইদানীং খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও কোপেনহেগেনের এশিয়ান স্টাডিজ সেন্টার মাত্র দু' বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবু এর মধ্যেই তাঁরা প্রভূত কাজ করেছেন।

—চার্বাক

নতুন বই

পুরীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—গৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু। জ্ঞান সঞ্চয়। ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম : এক টাকা।

পুরাণবৃত্তের ঐতিহাসিকেরা উড়িষ্যার পরম পুণ্যক্ষেত্র পুরীধাম অনাদিকাল ধরে 'শ্রীক্ষেত্র' নামে পরিচিত। ভারতের অতি প্রাচীন পৌরাণিক সাহিত্যগ্রন্থ এবং বহু প্রাচীন গৌড়ীয় সাহিত্যাদিতে এই পুণ্যভূমির উল্লেখ রয়েছে। পুরীর দ্রষ্টব্যস্থানগুলির মধ্যে জগন্নাথদেবের মন্দির, পঞ্চতীর্থ, নরেন্দ্রসরোবর, বিভিন্ন মঠ-মন্দির, মহাতীর্থ সমুদ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরীর পার্শ্ববর্তী দ্রষ্টব্যস্থান সাক্ষীগোপাল, কোনারকের সূর্যমন্দির, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি, চিল্কা হ্রদ ভ্রমণবিলাসী এবং পুণ্যার্থীদের আকৃষ্ট করে থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু তাঁর সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় পুরীর ঐতিহ্যময় দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থশেষে যোগাযোগ-ব্যবস্থা, যানবাহন, বাসস্থানের ব্যবস্থাও উল্লেখ করা হয়েছে। ভ্রমণবিলাসী ও পুণ্যার্থীদের প্রয়োজন মেটাবে বইটি।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলকাতা—৭। দাম : সাড়ে পাঁচ টাকা।

বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের অবদান ঐতিহাসিক সত্য। দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ এই তিন অবিস্মরণীয় পুরুষ আধুনিক যুগ ভাবনায় বাঙালীকে সচেতন করেছিলেন। এই পরিবারের আদিপুরুষ দ্বারকানাথের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কর্মবহুল জীবন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তির সমৃদ্ধ। সেকালের সামাজিক জীবনে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। ভারতীয় ও অ-ভারতীয় মহলে ছিল তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা। দ্বারকানাথের প্রথম জীবনী রচনা করেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। পরবর্তী সময়ে দ্বারকানাথের উত্তরপুরুষ ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনী রচনা করেছিলেন। কিন্তু এটি প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। দ্বারকানাথের বহুমুখী প্রতিভা ব্যাপক পটভূমিকায় আলোচিত হয়েছে। সমকালীন সমাজ, জনজীবন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিত্র উপলব্ধির পক্ষে গ্রন্থখানির ভূমিকা অসামান্য। ক্ষিতীন্দ্রনাথের এই অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশ করে রবীন্দ্রভারতী বাঙালী মাত্রেরই সাধুবাদ পাবেন। ১৯০৪ খৃঃ রচিত, এই বইখানি কেন যে দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়নি, তা সত্যিই রহস্যজনক।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কাঠের ঘুড়ি (শ্রাবণ-পৌষ ১৩৭৭)—সম্পাদক : শ্যামাপ্রসাদ সরকার। ২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯। ৮০ পয়সা।

প্রচ্ছদ দেখেই চমকে উঠবেন পাঠক : ছোটদের সাহিত্য সংকলন নাকি? ভেতরে বিজ্ঞাপন না থাকলে বলতে বাধা ছিল না। একাল-সেকালের ছোটবড় লিখিয়েরা লিখেছেন গল্প, ছড়া, কবিতা ও রম্যরচনা। অঙ্গসজ্জা চমৎকার। এমন রুচিসম্মত পত্রিকা বেরোয় কালেভদ্রে। প্রায় প্রতিটি লেখাই সচিত্র। এডওয়ার্ড লিয়রের হরিনাথ সত্যজিৎ রায়ের একটি ছড়া ছাপা হয়েছে পত্রিকাটির গোড়ার দিকে। আছে কয়েকটি লেখার পুনর্মুদ্রণ। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কানাইলাল চক্রবর্তী, মিহির সেন, সুব্রত সরকার, বাণী হাজরা, চণ্ডী লাহিড়ী, সন্দীপ রায়, কৃষ্ণ ধর, জ্যোতিভূষণ চাকী, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সবিনীত রায়, বাঁশরী চৌধুরী, জীবন সরকার, শিবরাম চক্রবর্তী ও অন্য দু-একজন। পত্রিকাটির শিল্প-সম্পাদক গণেশ পাইন। চণ্ডী লাহিড়ী, সন্দীপ রায় ও নীতিশ মুখোপাধ্যায় এঁকেছেন অন্যান্য ছবি। সকলেরই ভালো লাগবে।

'রূপা'র বই

রাস্তা

শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
Chief Justice
Calcutta High Court

পথ, পথিক আর পাথেয়কে উপলক্ষ ও বিষয়বস্তু করে মাননীয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় এই অভিনব রম্য রচনার ভিতর দিয়ে সমগ্র জীবন-দর্শন করেছেন।

অতীতের কত ইতিহাস, বর্তমানের কত যাতনা আর ভবিষ্যতের অনেক আশা ও সম্ভাবনার সন্ধান পাওয়া যাবে এই গ্রন্থখানিতে।

[দাম ৮·০০]

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

আনা সেজহার্স

শুরু ১৯২৮ খৃঃ। সত্তর পার হয়ে একাত্তরে পা রেখে এখনও তাঁর লেখার শেষ হয়নি। এ এক আশ্চর্য জীবনশিল্পের ক্রম। কণ্ঠে গণ-জীবনের জয়ধ্বনি, দু'চোখে নবজীবনের অরুণ আলোর আভা। সাহিত্যের নব নব সৃষ্টির কত না কমল নিবেদিত হয়েছে সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে ও অন্যায় অবিচার অত্যাচারের প্রতিরোধ-উদ্দেশ্যে। পথে-প্রবাসে, স্বদেশে-বিদেশে অর্ধশতাব্দীর নানান বিক্ষোভ ও বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁর জীবন-প্রবাহ উপলআহত পার্বত্য ঝর্ণার মত বয়ে চলেছে আপন প্রাণবেগে, চলার গতি কখনও স্তব্ধ হয়নি। জীবনে তিনি আশা হারাননি কখনো বরং বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও সাহিত্যসৃষ্টির অপরিসীম দুর্বার আগ্রহ ও আন্তরিকতায় ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছেন। ব্যক্তিজীবনে যেমন সাহিত্যজীবনেও তেমনি কশাঘাত বিরতি না দিয়ে বিরুদ্ধ শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে জনজীবনকে সুশৃঙ্খল করার প্রতিজ্ঞায় তিনি আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন সাহিত্য-জীবনের প্রথম থেকেই। জীবন-সত্য এবং সাহিত্যের সত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। নতুন প্রাণের চেতনায় নবজীবনের উদ্বোধন-কাহিনী সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়েছে বারেবারে জাতীয় জীবনের সুস্থ শান্তি-উৎসের দিকে। সাগরাভিমুখী সব নদীর মতই তাঁর সাহিত্যের গতিমুখ নিরন্তর বয়ে চলেছে মানুষ এবং বিশ্বের অন্তর্নিহিত শান্তি-সাম্যের সাগরসঙ্গমের দিকে।

সাহিত্য ও সংগ্রামের দীপ্তিময়ী এই অগ্নিশিখা শ্রীমতী আনা সেজহার্স। বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশেষ স্মরণীয় ও চিহ্নিত নাম—জার্মান সাহিত্যের মহিলা কথাশিল্পীদের প্রথম সারির একজন। সম্প্রতি সত্তর বছরের পূর্তি উৎসব পালন করা হয়। ...ভাবে গণতান্ত্রিক জার্মানিতে। ...দেশে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই ... জানায় তাঁর ... অভিনন্দন। লক্ষ লক্ষ ... হয়েছে। ... শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন ... শান্তির ... তিনি গেছেন অক্লান্ত আন্তরিক কথা-শিল্পী সম্মেলনে অংশগ্রহণ, শান্তি আন্দোলনে সার্থকভাবে শরিক হওয়া, জার্মান লেখক সংঘ 'পেন-ক্লাব' সভানেত্রী হিসেবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংঘের প্রগতিবাদী আন্দোলনে অগ্রনায়ক হওয়ার পটভূমিতে সমাজতন্ত্র রয়েছে তাঁর আন্তরিক প্রগতিশীলতা, সাধারণ মানুষের প্রতি সৌহার্দ্যবোধ ও সাহিত্যের সত্যের প্রতি অবিচল আনুগত্য যা তাঁকে সংগ্রামী সাহিত্যসাধিকা হিসেবে দেশেবিদেশে বন্দিত করে তুলেছে।

প্রথম বই দ্য রিভোল্ট অব দ্য ফিসারমেন অব সেন্ট বারবারা (১৯২৮ খৃঃ প্রকাশিত ও রাশিয়ার পরিচালক পিসকেটার চিত্রায়িত) তাঁকে শিল্পে খ্যাতি ও সম্মান শুধু না জার্মানীতে সাহিত্যস্বীকৃতিও (ক্লেইস্ট পুরস্কার) এনে দিয়েছিল। ১৯৩২ খৃঃ প্রকাশিত হল 'কমরেডস' এবং ১৯৩৩ খৃঃ ফ্যাসিজিম-এর আসন্ন বিভীষিকা আভাসিত গ্রন্থ 'হেড প্রাইস'। শ্রীমতী সেজহার্সের সত্যদর্শনের কৃতিত্ব ছিল বলেই ফ্যাসিস্টদের অসত্য আঁধার জার্মানীতে ঘনাবার আগেই দেশকে সতর্ক সচেতন করেছিলেন এই 'হেড প্রাইস' উপন্যাসে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। নিজ দেশের সাহিত্যসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ তাঁর বালিকা বয়স থেকেই। পড়েছেন প্রচুর, আয়ত্ত করেছেনও বিস্তর। ভালবাসেন ... মাটির আর হাইনরিখ হাইনের কাব্য। বাস্তববাদী ফরাসী ও রুশ কথাশিল্পী বালজাক, গোগোল, দস্তয়েভস্কি, টলস্টয়ের রচনাও তাঁকে টেনেছে প্রবলভাবে। উনিশ শতকের সার্থক জার্মান কথাশিল্পীদের—ক্লেইস্ট হোয়েলডারলিন এবং বাখনার-এর সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মার আত্মীয়তা। প্রো-মার্ক্সীয় তত্ত্ব গবেষণা করেই তিনি ডক্টরেটও হয়েছিলেন।

জার্মানীর আঁধার গাঢ়তায় নেমে এলো সমস্ত জার্মানীর উপর। দেশ ফ্যাসিস্ট-কবলিত হতেই তিনি বন্দিনী হলেন। পরে একসময়ে পালিয়ে এলেন প্যারিসে। এই প্যারিসেই প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ শুরু করার সাথে সাথেই শুরু করলেন তাঁর বিশ্বখ্যাত সৃষ্টি 'সেভেনথ ক্রস'—ফ্যাসিস্ট শক্তির গোষ্ঠীর পরাজয় এবং সর্বহারা মানুষদের নবজীবনে উত্তরণের এক আশ্চর্য কাহিনী এর পটভূমি। জার্মানিতেই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৪৫ খৃঃ। এই গ্রন্থের জন্যই হিটলারের গুপ্তচর বাহিনী 'গেস্টাপোরা' তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। প্যারিস থেকে দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে এলেন মেক্সিকোয়। নির্বাসিতের প্রবাস-জীবনের শুরু। এই দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াবার মধ্যেই আর এক উপন্যাসের সৃষ্টি : 'ট্রানজিট' ফ্যাসিস্ট-কবল থেকে পালিয়ে আসা সর্বহারাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব-মর্মের জীবন্ত কাহিনী। প্রথম প্রকাশ ইংরেজিতে ১৯৪৩ খৃঃ জার্মান ভাষান্তরিত হয় ১৯৪৮ খৃঃ।

অবশেষে ... শেষ—নির্বাসিত জীবনের পরমায়ু শেষ হল ১৯৪৭ খৃঃ। এলো ঘরে ফেরার পালা। তাঁর হাতে তখন সদ্যসমাপ্ত উপন্যাস : 'দ্য ডেড : স্টে ইয়াং'-এর পাণ্ডুলিপি। কিন্তু ... লেখার পর আর এক উপন্যাস 'দ্য ডিসিসন'—একে পূর্বোক্ত উপন্যাসের শেষ বলা চলে। 'কনফিডেন্স' তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ—সর্ববৃহৎও আকারে আয়তনে কাহিনী-বিন্যাস ও বর্ণনায়। এই তিনটি উপন্যাসের সমাহার ট্রিলজি আদ্য 'দ্য ডেড স্টে ইয়াং', মধ্য 'ডিসিসন' এবং শেষাংশে 'কনফিডেন্স'। এই ত্রয়ীর মধ্যে বিধৃত হয়েছে জার্মান জনজীবনের পঞ্চাশ বছরের উত্থান-পতনের তমসার আঁধারে নিমজ্জন ও আলোকে উত্তরণের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন্ত কাহিনী যার সূত্রপাত সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে।"

বিশ্বসাহিত্যে আর কোন মহিলা কথাশিল্পীর জটিল সংগ্রাম ও সৃষ্টির এমন বিস্ময়কর পটভূমিকায় আবির্ভাব ঘটেনি। আর কোন কালে কোন দেশে কোন যুগে কোন সাহিত্যসাধিকার ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যে এমন যোগাযোগ ঘটে মিলেমিশে সব একাকার হয়ে যায়নি। জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে আর কোন সাহিত্যিক এমন প্রাণবন্তে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করেননি।

বিশ্বশান্তি সংগ্রাম ও সৃষ্টির আর এক নাম : শ্রীমতী আনা সেজহার্স।

—কমল বসু

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

— বারো —

বুলা চলে যায় নি। চলে যাবার জন্য আসে নি। ও আমার সঙ্গে গল্পগুজব করতেই এসেছে। পিসীকে টিফিন কেরিয়ার দেওয়া উপলক্ষ মাত্র। এটুকু আমি বুঝতে পারছি। শুধু পিসীর সঙ্গে গল্প করতে কি এই বয়সে ভাল লাগে? তাছাড়া......

একটু ভাবলাম।

তাছাড়া হয়ত আমার নিঃসঙ্গতার জন্য ও নিজের মনেও কিছুটা বেদনা বোধ করে। আশ্চর্য নয়। পুরুষের মনের পথ বড় প্রশস্ত, বড় প্রকাশ্য। সেন্ট্রাল এভিনিউ-চৌরঙ্গী। মেয়েদের মনের পথগুলো বড় সরু-সরু। কত অজস্র সুড়ঙ্গ-পথ থাকে ওদের মনের মধ্যে। বাইরে থেকে কেউ তা জানতে পারে না, বুঝতে পারে না। কিছুতেই না। আপনজন, প্রিয়জন, বান্ধবী-রাও না। মনের এই গুপ্ত পথে বিচিত্র ভাবধারার আনাগোনা হয়। বিচিত্র বা বিপরীতধর্মী সত্তা একই সঙ্গে পাশাপাশি চলতে পারে ওদের মনের মধ্যে। প্রকাশ না হলে প্রকাশিত হয় না।

বুলার মনের মধ্যেও নিশ্চয়ই......

হঠাৎ বুলা বলে উঠল, একটা কথা বলবেন?

'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক করে, সত্যি করে বলবেন?'

'সব সত্যি কথা কি বলা যায়? আপনি বলতে পারেন?'

বুলা একটু বিপদে পড়ল। 'পুরোপুরি না হলেও অনেকটা তো বলা যায়।'

'সব সময় নয়। কখনও অনেকটা সত্যি, কখনও কিছুটা সত্যি বলা যায়, পুরো-পুরি কখনই নয়।'

'তর্ক করবেন, না আমার কথার জবাব দেবেন?' প্রশ্ন করে ও হাসে।

'প্রশ্ন করুন।'

'কথা বলতে বলতে হঠাৎ কোথায় ডুব দেন, বলুন তো?'

'তার মানে?'

'যখন-তখন কি এত ভাবেন?'

আমি হাসলাম, সত্যিই কি এত ভাবি?

'তাই তো মনে হয়।' বুলা থামল। চোখটা ঘুরিয়ে, ঠোঁটটা কামড়ে একটু কি ভাবল। 'কথা বলতে-বলতে আপনি হঠাৎ থেমে যান। তারপর মনে হয় আপনি মনে-মনে অনেক কথা বলেন, অনেক কিছু ভাবেন।'

ওর কথা শুনে ভালই লাগল। 'আপনি ভালভাবে খেয়াল করেছেন?'

'নিশ্চয়ই। বহুবার।'

আরো ভাল লাগল।

চায়ের ট্রে নিয়ে বেয়ারা এলো। আবার স্ন দিতে বললাম।

এবার ওর কথার জবাব দিলাম, ঠিকই ধরেছেন। অনেক কিছুই ভাবি......

'কি ভাবেন?'

'বড্ড বেশী একলা হয়ে পড়েছি। উল্কার মত যেন বিশ্বসংসার থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছি। তাই বড় বেশী ভাবনা হয়।'

বুলা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এত ভেবে লাভ?'

'লাভ-লোকসানের কথা তো নয়। কেউ আমাকে নিয়ে ভাবে না, আমিও কাউকে নিয়ে ভাবতে পারি না, তাই তো এত ভাবনা।'

'আপনি জানলেন কি করে আপনাকে নিয়ে কেউ ভাবে না?'

সকালবেলায় উঠেই সিরিয়াস আলোচনা করতে ইচ্ছা করল না। আলোচনার মোড় ঘুরাবার জন্য তাড়াতাড়ি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আপনি ভাবেন?

প্রশ্নটা ওকে একটু বিব্রত করল। 'আমি ভাবি কি ভাবি না, সেটা বড় কথা নয়।'

আমি হাসতে হাসতে দাবী জানাই, আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

'মানুষ মাত্রেই পরিচিত সবার কথা ভাবে।'

'সত্যি উত্তর দিতে আপত্তি না লজ্জা?'

চায়ের ট্রে নিয়ে বেয়ারা এলো। প্রশ্নের উত্তরটা চাপা পড়ল। তবে এইটুকু বুঝে এইটুকু ভেবে আনন্দ পেলাম যে ও নিশ্চয়ই আমার কথা ভাবে, চিন্তা করে।

চা হলো। দুজনে মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছি। কখনও ও আমাকে দেখছে, কখনও আমি ওকে দেখছি। আবার কখনও দুজনে দুজনকে দেখছি, ধরা পড়ছি দুজনেই। হাসছিও দুজনে। দুজনেরই কেমন খুশী-খুশী ভাব। মন।

চায়ের কাপ, ট্রে সরিয়ে রেখে বুলা জিজ্ঞাসা করল, আপনার কাজকর্ম কেমন এগুচ্ছে?

'কিছু কোশ্চেনেয়ার ডি সি সাহেব রেখে দিয়েছেন। উনি ওঁর অফিসের নানা লোকজনকে দিয়ে ফিল-আপ করিয়ে দেবেন। দু-এক দিনের মধ্যেই আরো কোশ্চেনেয়ার দেবার ব্যবস্থা করব। শেষে আমি নিজে পার্সোনাল ইন্টারভিউ নেব......

'আমাকে ইন্টারভিউ করবেন না?'

ওর কথা শুনে হাসলাম।

'হাসছেন যে?'

'কোশ্চেনেয়ার দেবো আর ইন্টার-ভিউ দিতে চাইবেন না।'

'কেন?'

'নানা ধরনের প্রশ্ন আছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়ত আপনার ইচ্ছা করবে না।'

'তাহলে অন্য মেয়েরা কি করবে?'

'জানি না তবে......

'ওসব তবে-টবে ছাড়ুন। আমি চাকরি করি না বলে কি আমার ইন্টারভিউ নেবেন না?'

ওর ইন্টারভিউ দেবার আগ্রহ দেখে মজা লাগল। হাসি পেল। আমার হাসি দেখে ও বলল, আবার হাসছেন?

'হাসব না?'

'না।'

'তবে কি করব?'

বুলা আবদার ধরল, বলুন আমার ইন্টারভিউ কবে নেবেন?

আমার আরো মজা লাগল। বললাম, যেদিন আপনি বলবেন তবে......

'আবার হবে?'

'এর চাকরি হবে . ইন্টারভিউ [illegible] কেমন করে?'

'ঠিক দেব।'

'সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কিন্তু!'

'যে প্রশ্নের জবাব জানি না সেগুলোর উত্তর দেব কি করে?'

'যে প্রশ্নের জানা নেই, সেগুলোর কথা বলছি না। তবে অন্য সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

আমি ওকে কথাবার্তা জানিয়ে বললাম, দেরী হচ্ছে! আপনার মত আরো কিছু মেয়ের ইন্টারভিউ নিতে যেতে হবে।

'মেয়েদের ইন্টারভিউ নিতে আপনার অসুবিধা হলে আমি নিতে পারি।'

প্রস্তাবটা শুনে [illegible] উঠলাম। জানতে চাইলাম, সিরিয়াসলি বলছেন?

'তবে কি? চুপচাপ বসে বসে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে। তাহলে আপনাকে কিছু কোশ্চেনেয়ার দিয়ে যাব। জানাশুনো মেয়েদের ইন্টারভিউ করে দেবেন।'

আমি উঠে গিয়ে টেবিলের পর থেকে একটা কোশ্চেনেয়ার এনে ওর হাতে দিলাম, এটা ভাল করে পড়বেন।

হুলা কোশ্চেনেয়ার নিয়ে বলল, আপনি একটু বসবেন?

'কেন বলুন তো?'

'আপত্তি না হলে একটু বসুন। আমি স্নান করে আসি।'

হুলা বলল। আমি বাথরুমে গেলাম। সব কিছু সেরে, স্নান করে, জামা-প্যান্ট পরে বেরুতে-বেরুতে একটু দেরীই হলো। ফিরে এসে দেখি হুলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের [illegible] পাহাড়কে ডিঙিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে আমার ঘরে। বেশ ভালই লাগছে। মনে হলো, সূর্যরশ্মি তো রোজই ঘরে আসে কিন্তু এমন করে তো ঘর আলো হয় না [illegible]!

দরজা খোলার আওয়াজ হতেই ওখানে দাঁড়িয়ে বলল, স্নান করা হলো?

'হ্যাঁ।'

'আপনার পারমিশন না নিয়েই ব্রেকফাস্ট দিতে বলেছি।'

মনে মনে বললাম, আমার পারমিশন না নিয়ে তুমি আরো অনেক কিছু করলে আমি [illegible] পেতাম, কৃতার্থ হতাম। নিজেকে [illegible] মনে করতাম। পাগলী তো......

'কি হলো? আমার কি ভাবছেন?' [illegible] সামনে দাঁড়িয়ে [illegible] বলল।

আমি উত্তর দেবার আগেই বেয়ারা ট্রেতে করে নাস্তা নিয়ে এলো। আমি এক কাপ চা নিয়েই বুঝলাম ও নিজের জন্য কিছু অর্ডার দেয় নি।

'আপনি খাবেন না?'

'আমি তো সকাল দশটায় উঠি না যে, এগারোটায় ব্রেকফাস্ট খাব।'

'ওসব তর্ক ছাড়ুন। আপনি কিছু না খেলে আমিও খাব না।'

'জোর করেই খাওয়াবেন?'

'সে অধিকার কি আমার আছে?'

আমি 'নাস্তা' খেতে বসলাম। ওকেও এক টুকরো ওমলেট আর একটা টোস্ট দিলাম। চা খেতে খেতে বললাম, নিজে-নিজে উপভোগ করার চাইতে অপরকে নিয়ে, অপরকে দিয়ে উপভোগ করার অনেক আনন্দ।

'হঠাৎ একথা বলছেন?'

মাঠের ধান, ক্ষেতের ফসল থেকে চাকরীর টাকা শুধু নিজে উপভোগ করার মধ্যে একটা বেদনা, একটা ব্যর্থতা আছে। সেই ফসল, সেই টাকা প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করার অনেক আনন্দ, অনেক তৃপ্তি।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে হুলা বলল, হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে?

'হঠাৎ নয়, অনেক দিন ধরেই হচ্ছে। তবে কদিন পল্টনবাজার ঘুরে কথাটা আরো বেশী মনে হচ্ছে।'

'পল্টনবাজারে কি দেখলেন?'

'শুধু পল্টনবাজারে নয়, পৃথিবীর সব বাজারে গিয়েই দেখবেন প্রিয়জনকে খুশী করার জন্য পরিশ্রমের রোজগার কি আনন্দে খরচ করছে।'

হুলা একবার আমার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। একটু চুপ করে থাকল। তারপর প্রশ্ন করল, অমন করে খরচা করতে আপনারও বুঝি ইচ্ছা করে?

'করবে না? আমি কি মানুষ না?'

'তবে করেন না কেন?'

আমি হাসলাম, করব। আজই করব তবে ভয় হয় যদি......

'এতে ভয়ের কি আছে?'

'ভয় হয় যদি ফিরিয়ে দেন, গ্রহণ না করেন?'

'না, না, তাই কি হয়?'

'ফিরিয়ে দেবেন না বলছেন?'

[illegible]

মনের মধ্যে কত অসংখ্য ইচ্ছা, স্বপ্ন চাপা দিয়ে রেখেছি কিন্তু আর পারলাম না। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আপনি ফিরিয়ে দেবেন না তো?

হুলা চমকে উঠল, আমাকে? আমাকে আবার কি দেবেন? আমাকে কিছু দেবার দরকার নেই।

'দরকার আপনার নয়, আমার।'

'আপনার আবার কি দরকার?'

'কিছু দিতে মন চাইছে। কিছু দিলে শান্তি পেতাম। নেবেন কি? ফিরিয়ে দেবেন না তো?'

'না, না, কিন্তু......'

'প্লীজ! আর কিন্তু কিন্তু করবেন না।'

এই দুনিয়ার, এই বিশ্বচরাচরে সবাই কিছু নিতে চায়, কিছু দিতে চায়। কিন্তু নেবার চাইতে দেবার নেশার জোর অনেক। নিজের ঐশ্বর্য বিলিয়ে দেবার মধ্যে সার্থকতা, আনন্দ ও পরিপূর্ণতা। সূর্যকে কেন্দ্র করে দুনিয়ার সবকিছু চলছে, চলবে। সেই সূর্য কতটুকু নিচ্ছে? সব কিছুই তো বিলিয়ে দিচ্ছে। সূর্যের জ্বালা বুকে নিয়ে চাঁদ মিষ্টি আলোয় ভরিয়ে দেয় সারা পৃথিবী। পাহাড়-পর্বতের অসংখ্য ক্ষীণ ধারা নিয়ে নদী নিজেকে ভরিয়ে তোলে কিন্তু সব সময় সমুদ্রে মিলিয়ে দিয়েই তার আনন্দ, উল্লাস। মানুষেও তাই। চার পাশের মানুষ, সমাজের কাছে কিছু কুড়িয়ে প্রাসাদ তৈরী করে এবং একদিন সে প্রাসাদের চাবি-কাঠি তুলে দেয় প্রিয়জনের হাতে, স্নেহপাত্রের করকমলে।

ব্যতিক্রম আছে বৈকি। যে নদী সমুদ্রে হারিয়ে যায় না, মোহনায় পৌঁছে ময়ূরের মত নাচতে পারে না, সে নদীর জীবন বৃথা। ব্যর্থ! কেন, আমিও তো ব্যর্থ! এই পৃথিবীতে একটা ছোট্ট শিশু পর্যন্ত নেই যাকে আদর করে, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নিজের শূন্য মন পূর্ণ করতে পারি। পারি নি, পারছি না।

সারা দুপুর কাজকর্মে কেটে গেল। হুলা খেতে বলেছে। বড্ড দেরী হয়ে গেল। তবুও কাপড় কিনতে এসেছি। কাপড় পছন্দ করতে করতে ঐ সব কথা মনে হলো। মাইশোর সিল্কের শাড়ীটা পছন্দ করার পর অনেকটা ব্যর্থতার গ্লানি থেকে যেন একটু মুক্তি পেলাম [illegible] পেলাম।

[illegible] নিয়ে ছুটে গেলাম ওদের বাড়ী। হুলা বারান্দা থেকে নেমে এসে গেট খুলে দিতেই বললাম, বড্ড দেরী করে দিলাম তো?

হুলা নির্বিবাদে বলল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে নাকি?

বারান্দা পার হয়ে ড্রইংরুমে ঢুকেই সামনের একটা সোফায় বসে পড়লাম। ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, এখানে বসার আর সময় নেই। ভিতরে আসুন।

ভিতরে গেলাম। দেখলাম ডাইনিং টেবিল সাজানই আছে। আবার হুকুম, হাত ধুয়ে নিন।

কোন কথা না বলে বেসিনে হাত ধুয়ে খেতে বসলাম। সামনের দিকে বুলা বসল। চাকরটাই সার্ভ করল। শেষে এক প্লেট দই দিলে বুলা ওকেও খেতে যেতে বলল। ভীষণ খিদে পেয়েছিল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ধন্যবাদ জানালাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রইংরুমে এলাম। একটু পরে বুলাও এলো। সামনা সামনি বসল। আমি এবার শাড়ীর প্যাকেটটা ওর হাতে তুলে দিলাম। মুখে কিছু বললাম না। ও প্যাকেটটা খুলে শাড়ীটা দেখেই চমকে উঠল, একি করেছেন?

'খুব অন্যায় করেছি কি?'

'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে?'

'ফিরিয়ে দেবেন নাকি?'

শাড়ীটা কোলের পর রেখে ও বলল, কি পাগলামী করলেন বলুন তো?

আমি মাথা নেড়ে বললাম কিছু পাগলামী করিনি।

'আমি ভাবতে পারিনি আপনি আজই একটা এত দামী শাড়ী কিনে হাজির হবেন।'

এবার কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার পছন্দ হয়েছে?

'না।'

'কেন বলুন তো?'

'এত দামী শাড়ী আমার পছন্দ হয় না।'

'এটা খুব দামী শাড়ী নাকি?'

'আরো সস্তা, তাই না?'

আমি হাসলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কাটল, আর হাসতে হবে না।

ঐ শাড়ী নিয়েই বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলল। তারপর আমি বললাম, আর কতক্ষণ এই আলোচনা চলবে বলুন তো!

'অন্যায় করবেন আর কথা শুনবেন না?'

'আজ না হয় থাক। আবার কাল সকালে গেস্ট হাউসে গিয়ে বাকিটুকু শোনাবেন।'

বুলা তবু থামল না, কেন এতগুলো টাকা নষ্ট করলেন?

'নষ্ট তো করিনি।'

'আপনি বুঝি এইভাবেই টাকা উড়ান?'

'উড়াতে চাই কিন্তু সুযোগ পাই না।'

এবার একটু গলা চড়িয়ে বলল, যমগটা যেদিন কেড়ে নেব সেদিন বুঝবেন।

'কেড়ে নিতে হবে না, আমিই দিয়ে দিচ্ছি' বলে সত্যি সত্যিই আমি প্যান্টের পকেট থেকে পার্সটা বের করে এগিয়ে দিলাম।

ও হাসল, পার্সটা দিতে দিতে ভয় করছে না?

'ভয় করবে কেন?'

'আমি যদি সব খরচা করে ফেলি?'

ওর কথাটা শুনে আমি একটু ভাবলাম। তারপর বললাম, পকেটমার গেলেও জানতাম টাকাগুলো কোন একটা লোকের স্ত্রী-পুত্রের জন্য ব্যয় হবে, কিন্তু আমার টাকার সে সার্থকতা তো কোনদিন হলো না, হবে না।

বুলা চুপ করে রইল।

আমি আবার শুরু করলাম, দুঃখকষ্টে প্রাণ বিসর্জন দিয়েই বোধায় শান্তি, সার্থকতা। অ্যান্টনি সেই শান্তিটুকু না পেয়ে মরবার জন্য কিভাবে কাঙ্গালের মত ঘুরে বেড়িয়েছিল, মনে আছে?

ও ঠোঁটটা দাঁতে চেপে ধরে চুপ করে রইল।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এইরকম বিচিত্র সঙ্কট দেখা যায়। হয়ত আমার জীবনেও ...

বুলা বাধা দিল, আঃ! কি যা তা বলছেন?

'বলব না?'

'না।'

'বেশ। আপনিও আর শাড়ীর কথা তুলবেন না।'

ও এবার সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, একটা অনুরোধ করব?'

'করুন।'

'পিসী আপনাকে দারুণ ভালবাসেন। এই শাড়ীটা বরং পিসীকে দিন আর আমাকে একটা তাঁতের শাড়ী কিনে দেবেন।'

সত্যি মিসেস রায় আমাকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন। ওর জন্যও একটা শাড়ী কেনা উচিত ছিল। ঠিক বলেছেন। তবে এটা দেবার দরকার নেই। আমি আর একটা শাড়ী কিনে দেব।'

'এইটাই ওকে দিন। আমি কিছু মনে করব না। বরং খুশী হবো।'

'না, না তা হয় না।'

ও আরো অনেকবার অনুরোধ করল। আমি কিছুতেই স্বীকৃতি জানাতে পারলাম না।

চাকরটা এবার ড্রইংরুমে এসে জানতে চাইল চা করবে কিনা। বুলা জবাব দেবার আগেই আমি বললাম হ্যাঁ বানাও।

চাকরটা চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বাবা কখন আসবেন?

'বিকেলের দিকে একবার এসে সুট-টুট চেঞ্জ করে যাবেন।'

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতেই ও ভিতরে চলে গেল। আমি একটা সিগরেট ধরালাম। সিগরেট টানতে টানতেই সামনের বারান্দায় গিয়ে একটা বেতের চেয়ারে বসলাম। একটু পরেই বুলা এলো।

'পিসী টেলিফোন করে বলল রাত্রে যেতে।'

'সে তো ভাল কথা।'

'আপনিও যাবেন।'

'তার মানে?'

'পিসী বলল আপনাকে টেলিফোন করে পায়নি। আবার পরে করবে।'

'আমাকে ডাকলেন না কেন?'

বুলা একটু হাসি চেপে বলল, আমি বলিনি আপনি এখানে।

'কেন?'

'কেন আবার? এমনি ইচ্ছা হলো।'

চা খেয়ে উঠে পড়লাম। বললাম, আমি গেস্ট হাউসে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। ডেকে নিয়ে যাবেন।

'আর কিছু?'

'না।'

(ক্রমশঃ)

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : ৫৫-২৪৫১, ৩৩-১৪৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

নিকটেই আছে

টিক্‌টিক্‌

কথা হচ্ছিল ঘড়ি নিয়ে। বরযাত্রীরা এসে বসেছে পাশের স্কুল বাড়ীতে। ভেতর-বাড়ীর চিলতে উঠোনে ভিড় জমেছে। আমরা কজন, কনের দাদার বন্ধু, বাড়ীর সামনে রাস্তা-ঢাকা প্যাণ্ডেলে বসে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। ফিকসড্ কোনো টপিক নয়, যখন যেমন মাথায় আসছে। একটু আগেই এক রাউণ্ড রিসেণ্ট নাট্য-আন্দোলনের শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে। পলিটিকস সবাই যেন ইচ্ছে করেই অ্যাভয়েড করছে। ঠিক কি সূত্রে যে ঘড়ির কথা উঠল, বলা মুস্কিল। যতদূর মনে পড়ে বরের চেহারার সুখ্যাতি করতে গিয়েই রমেন বোধহয় বলেছিল—দারুণ ঘড়িখানা। সত্যি দেখবার মতো। একখানা ফেনি বাতাসার সাইজ; ভেতরটা টিক-টিক করছে। পলকা চিংড়ির দাঁড়ার মত বড় বড় মোটা মোটা কাঁটাগুলো ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। চওড়া ফর্সা কালো কালো লোমে ঢাকা কব্জির ওপর মানিয়েছে ঘড়িটা। যেই যাচ্ছে ভেতরে ভিড়ে দেখতে, ঘড়িটার ওপর ঠিক তার নজর পড়ছে। সেই কথাই হচ্ছিল।

ডাক্তার-জ্যাঠার ভাইপো ভোম্বা বলল, ক্লিন থাউজেণ্ড হবে দাম। ভোম্বা মানুষটা সৌখীন। নিজের বডিটার যথেষ্ট যত্ন নেয়। হাল্কা করে চুল আঁচড়ে একগোছা অলকগোছে কপালের কার্নিসে দিয়ে মুখের একস্ট্রা মাংস আড়াল করে। উৎসব-টুৎসবে চুড়িদার পাজামা পাঞ্জাবীর ওপর দামী কাশ্মীরি শালের সঙ্গে ম্যাচ-করা চামড়ার নাগরা পরে সোজা পাঁচ ফুট হাইটের সাতনম্বরী ফুট-বলের মত বডিটাকে কতটা আকর্ষণীয় করা যায়। সে চেষ্টার কখনো কসুর করে না ভোম্বা। তার ওপর সোনার বোতাম, দার্জিলিং স্টোনের আংটি, চুড়িহাতা পাঞ্জাবীর ওপর দিয়ে ডান-হাতের কব্জিতে কালো ডায়ালের দামী ঘড়ি, কিছুই বাদ দেয় না। তাই ও যখন গম্ভীর মুখে দাম সম্পর্কে নিজের মতামত ঘোষণা করল, আমরা যারা এসব ব্যাপারে নিতান্ত নভিস, জানিনা সত্যি কিছু, চুপ করে মেনে নিলাম হবেও বা। তবে কোথায় যেন একটা খটকা লাগছিল।

কনের দাদা অনিল নিজে আমাকে বলেছে, যৌতুক ক্যাশ আড়াই হাজার ধরে মোটামুটি সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার খরচ হবে। পণের টাকাটা বাদ দিলে, বাকী পাঁচ হাজারে পঁচিশ জন বরযাত্রী সমেত আড়াইশো আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব খাওয়ানোর খরচ প্লাস, দশ ভরি সোনা, হাপর খাট, আলনা, ড্রেসিং টেবিল হ্যানা-ত্যানা সব হয়েও কি বরের সোনার বোতাম, আংটি, আর হাজার টাকা দামের ঘড়ি হয়? সন্দেহের কথাটা প্রকাশ করা শোভন হবে না বলেই চুপ করে ছিলাম। তাছাড়া যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গেলে ভোম্বার ভ্যানিটিতে লাগবে, কারণ আমাদের মধ্যে ওই তো একমাত্র জহুরী সদাগর।

কিন্তু আমি, রমেন, কানাই, সুকুমার আর পরিতোষ চুপ করে থাকলেও, ভোম্বা পার পেল না। একটা ফ্যাসফেসে ধরা গলা প্যাণ্ডেলের কোণ থেকে টুপ করে আমাদের আড্ডার পানাপুকুরে ছিটকে এসে কুসকুড়ি ফুলল—ক্লিন থাউজেণ্ড! জানলেন কি করে?

এতক্ষণ কেউ খেয়াল করি নি। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। ডেকরেটরের ঘরের সাদা চাদরে মোড়া খাটের ওপর, ঘণ্টাখানেক আগে যেখানে বর এসে বসেছিল, আমরা ছ'জন গোল হয়ে বসেছিলাম। খাটের দুধারে লাইন দিয়ে সাজানো হলদে রং-এর ফোল্ডিং চেয়ার। কে বা কারা সেগুলো দখল করে আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। এবার ঘামাতে হোল। ভোম্বার প্রেস্টিজ অ্যাট স্টেক। ভদ্রলোকের প্রশ্নটি ঠিক সাধা-সাধা গোছের নয়, বোলতার হুলের মতো স্লাইট বাঁকানো।

কোমর ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখি উনি চেয়ার ছেড়ে আমাদের চৌকির দিকে গুটি গুটি এগিয়ে আসছেন। রোগা, লম্বা, ফ্যাকাসে, চামসিমারা গাল, কোঁচার খুঁট মাটিতে লুটোচ্ছে, সার্জের পাঞ্জাবীটা ঐ কাঠামোর বেমানান হলেও যে রীতিমত দামী, সেটুকু আমাদের অনভ্যস্ত চোখও পড়তে পারছিল। পাঞ্জাবীর ঢোলা হাতার ফাঁক দিয়ে বাঁ হাতের মণিবন্ধে যে বস্তুটি উঁকি মারছিল, তার ঝিলিকেই আমরা অর্ধেক কাৎ।

এগিয়ে এসে চৌকির সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের ঝোলানো মুণ্ডুগুলোর ওপর দিয়ে কৌতুকমাখা চোখজোড়া বার কয়েক ঘুরিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে ফের প্রশ্নটা ভোম্বার দিকেই ছুঁড়ে দিলেন ভদ্রলোক—বললেন তো ক্লিন থাউজেণ্ড, জানলেন কি করে?

ভোম্বা কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই পর পর খান কয়েক খোঁচা খোঁচা প্রশ্ন কায়দামাফিক ছুঁড়ে মেরে ওকে ভদ্রলোক একদম বোবা বানিয়ে দিলেন—কত ঘড়ি দেখেছেন জীবনে? ঘড়ির ডায়াল দেখে বলতে পারেন কি ভেতরের মুভমেণ্টটা সুইস না ইণ্ডিয়ান? বলতে পারেন একটা ঘড়ির সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল পার্ট কোনটা? ঐ সব পার্ট ইণ্ডিয়াতে হয় কি না? তা যদি না জানেন, কাইণ্ডলি ঘড়ি-টড়ির দাম অ্যাসেস করতে যাবেন না, ঠকবেন।

বলতে বলতে কখন যে ভদ্রলোক চৌকিতেই জায়গা করে নিয়েছেন টের পাইনি। যখন টের পেলাম তখন উনি গোটা আড্ডার মোড়ই ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আমরা সবাই ওর বচনামৃত হাঁ করে গিলছি। একা ভোম্বা এক কোণে হনুমানের কাছে পরাজিত ভীমের মত চুপ করে বসে প্যাণ্ট খুঁটছে কি, কি করছে বলা মুস্কিল।

আরে মশাই ঘড়ি চেনা কি এতই সহজ।—বলতে বলতে ভদ্রলোক নিজের বাঁ হাতটা ঈষৎ সামনে বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ করলেন—বলুন তো এটার দাম কত? আমরা আর কি জবাব দেব। আমাদের ছ জনের মধ্যে এসব ব্যাপারে যে রাজা-ধিরাজ, সেই যখন মূঢ় মূক মুখে হাঁপাচ্ছে তখন আমাদের আর কি বলার আছে। বলার মত কিছু নেই বুঝতে পেরেই বোধ-হয় ভদ্রলোক ফের খেই ধরলেন, চেহারা দেখে মনে হবে সাত-আটশো তাই না? কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্রাইস ওনলি টু হানড্রেড এক ব্যাটা সেলরের গিফট। ব্যাটা স্মাগল করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছল, তখন নমিন্যাল প্রাইসে বেচে দিয়ে পালিয়েছে।

আপনারা তো সব ফরেন মেক বলতে অজ্ঞান। সুইস শুনলে তো আর কথাই নেই, যত লাগে লাগুক, সেই দামেই কেনেন। কিন্তু খোঁজ রাখেন কি এদেশের সেভেণ্টি ফাইভ পার্সেণ্ট ঘড়ি, যা ফরেন নামে বিক্রী হয়, একেবারে ভেজাল মাল?

এবার সত্যি আমাদের চমকানোর পালা। পরিতোষ স্কুলে পড়ায়। মাস্টারী করে ছাত্র-দের আচমকা প্রশ্ন করাটা একেবারে রপ্ত করে ফেলেছে। দুম করে জিজ্ঞাসা করে বসল—আপনি জানলেন কি করে?

চামসী গালে হাসির দু-একটা রেখা দ্রুত পাকিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল—সে কথা পরে বলব। তার আগে শুনে রাখুন, যে কোন ঘড়ির সবচেয়ে দামী অংশ হোল মুভমেণ্ট। ঘড়ির তলার খোলটা খুলে, ওপরের ডায়ালটা সরালে দেখবেন ভেতরে দুটো ছোট ছোট চাকা অনবরত ঘুরছে। ঐ পার্টটাই মুভমেণ্ট। আর আপনাদের

বড় লে-ম্যানের পক্ষে ঘড়ি খুলে ঐ অংশটা দেখে কখনোই ধরা সম্ভব নয় যে পার্টটা বিদেশী না স্বদেশী। আর সেই সুযোগই নিচ্ছে যত ব্যাটা অসাধু বিজনেসম্যান। ব্যাটাদের স্কুপল বলে তো আর কিছু নেই: করে কি জানেন?

আমাদের নির্বাক প্রশ্নভরা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে গড় গড় করে বলে চলেন ভদ্রলোক—একটা ঘড়ির যা দাম তার এইট্টি পার্সেন্ট ডিপেণ্ড করে ঐ মুভমেন্টের ওপর। সত্যি যদি নামী সুইস কোম্পানীর মুভমেন্ট থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই দামটা চড়া হওয়া উচিত। কিন্তু ইমপোর্ট লাই-সেন্সের কড়াকড়ির জন্য খুব সামান্য টাকার যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আসে। যে পরিমাণ আসে তাতে ইণ্ডিয়ার টোটাল চাহিদার ফাইভ পার্সেন্টও মেটে কি না সন্দেহ। তবু দেখুন কলকাতার যে কোন বড় দোকানে যান, শো-উইণ্ডোতে থরে থরে সব বিদেশী ঘড়ি সাজানো। এত কয়েন মাল আসে কোথা থেকে?

একটু থামলেন ভদ্রলোক। একটা সিগারেট ধরালেন নিজে, দামী বিদেশী প্যাকেট থেকে, আমাদেরও অফার করলেন। আমরাও নিলাম—এসব জিনিস তো বড় একটা পাই না। তারপর আবার শুরু হোল—কাগজে তো পড়েন কোটি কোটি টাকার সোনার বাট, ঘড়ি, ট্রানজিস্টর, টেরিলিন স্মাগল হয়ে আসে ইণ্ডিয়াতে। তারই একটা বড় অংশ চালান যায় ঐ সব দোকানে। আর বাকীটা বানায় ব্যাটারা নিজেরাই।

সুকুমার একটানে বিলিতি সিগারেট-খানার সিকিটান পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ওগরাতে ওগরাতে জিজ্ঞাসা করল—কি রকম?

রকম আবার কি?—ফ্যাসফেসে গলাটা যতটা সম্ভব ভারী করে জবাব দিলেন ভদ্র-লোক—ইণ্ডিয়াতেই আজকাল তৈরী হচ্ছে মুভমেন্ট। না না আমি এইচ এম টি-র কথা বলছি না। ফরেন কোলাবরেশনে মাইশোরে একটা বিরাট কোম্পানী ঐসব বানাচ্ছে। আর ছু ছু ব্যবসাদাররা লট ধরে ইণ্ডিয়ান মাল কিনে, পার্টসের গায়ে লেখা কোম্পানীর নাম আর নম্বর মুছে দিয়ে, ফরেন কোম্পানীর লেবেল আঁটা ডায়ালে সেঁটে দিয়ে, বাজারে চালাচ্ছে সুইস ঘড়ি বলে। ফলে যে ঘড়ির অ্যাকচুয়াল প্রাইস হওয়া উচিত দেড়শো টাকা, তাই বিকোচ্ছে পাঁচশো, ছশো টাকায়।

কিন্তু ইমপোর্ট লাইসেন্স অনুযায়ী যতগুলো ডায়াল ফরেন থেকে আসবে, এত-গুলো মুভমেন্টও তো আসবে বাইরে থেকে —এবার বলাই জিজ্ঞাসা করে—তাহলে ফরেন ডায়ালে দেশী মুভমেন্ট বসিয়ে বিক্রী করলে তো, ফরেন মুভমেন্টগুলো বাতিল হয়ে যাবে না?

ধুর, এদের ধাপ্পাবাজী ধরা মশাই আপনার আমার কম্মো না। সতেরো বছর লাইনে থেকেও হালে পানি পাচ্ছি না, হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। বললাম না মুভ-মেন্টের দাম সবচেয়ে বেশী। আর ডায়াল বা মুভমেন্ট কখনো এক সঙ্গে আসে না। সেপারেট কনসাইনমেন্ট। আর সেই সুযোগে একই লাইসেন্সে দশ লট ডায়াল আনায় তো একলট আসে মুভমেন্ট। এখন বলুন ঐ বাকী ন' লট ডায়াল কোন মুভমেন্টে সেঁটে বাজারে বিক্রী করবে?

কিন্তু তা করতে গেলে যে ধরা পড়ে যাবে?—আমি প্রতিবাদ করি।

কে ধরবে?—জিজ্ঞাসা করেন ভদ্রলোক।

—কেন গভর্নমেন্ট। কাস্টমস।

মুচকি হেসে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে পুরতে পুরতে বললেন, সর্ষেতে যদি ভূত থাকে তো সেই ভূত ছাড়াবেন কি দিয়ে? থাক এসব কথা, যাই একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আসি বিয়েটা কদ্দুর এগোল।

আমাদের কাবলা বানিয়ে আস্তে আস্তে প্যাণ্ডেল ছেড়ে ভেতর বাড়ীতে চলে গেলেন ভদ্রলোক। তখন ভেতরে উলুধ্বনি সপ্তমে উঠেছে। এমনি সময় অনিল হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বলল—তোরা এই খাটে বসে যা। এর পর রাত হয়ে যাবে। ট্রাম বাস পাবি না।

আমরা তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখুনি ভোম্বা জিজ্ঞাসা করল—অনিল ঐ ভদ্রলোক কে রে?

—কোন্ ভদ্রলোক?

—ঐ যে সার্জের পাঞ্জাবী পরা, তোলা হাতা, প্যাকাটির মত চেহারা, নামটা যাইহোক ধরতে পারিনি। পার্থচরণও হতে পারে, পশুপতিনাথও হতে পারে। হাতে দামী ঘড়ি।

—ও, উনি বরের মেসো কার্তিকবাবু। একসাইজ ইনসপেক্টার। উনিই তো সস্তায় বরের ঘড়িটা কিনে দিলেন। সুইস ঘড়ি, অথচ দাম নিল মোটে দেড়শো।

সেদিন রাতে খেতে বসে ভোম্বা আর একটি কথাও বলে নি।

—সাম্যধন

নিঃসঙ্গ হৃদয়

রাখী ঘোষ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রদীপের সলিসিটরের কাছ থেকে চাবি নিয়ে ওর ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। সলিসিটার খুবই ভদ্রলোক। তবু আমি ওর বোন শুনে বিস্ময়টুকু একেবারে গোপন করতে পারলেন না। প্রদীপের ফ্ল্যাটে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বেশ বড় ফ্ল্যাট। বসবার ঘরে লেখার টেবিলের সামনে এসে বসলাম। জানালার ওধারে বসন্তের দানে উদ্ভাসিত বন। টেবিলের ওপরে একটা মার্বেলের বেসে টোপ পরা টেবিল ল্যাম্প। হঠাৎ কেমন একটা আশ্চর্য অনুভূতি হল। এই চেয়ার এই টেবিল প্রদীপের। প্রত্যেক দিন সে এখানে এসে বসেছে—লিখেছে—লিখতে না পারার বেদনায় অস্থির হয়েছে। বসন্তের সেই মঞ্জরী প্রদীপের উত্তেজিত আবেগকে সান্ত্বনা পাঠিয়েছে। শীতে রিক্ত গাছ শুধু ধূসর আকাশের পটভূমিকায় প্রদীপের মনকে উদাস করে দিয়েছে। মনে হল টেবিল ল্যাম্পটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কত নিশীথ রাত্রে ওরই আলোতে প্রদীপের দীর্ঘ শুভ্র আঙুলগুলি শুভ্রতর পাতায় আখরের পর আখর সাজিয়ে গেছে। এক নিমেষের জন্য মনে হল আমিই প্রদীপ। শুধু খাতাটা খুলে লিখতে আরম্ভ করে দিলেই হয়। আবিষ্টতা কাটিয়ে উঠে কাজে লাগলাম। টেবিলের টানা, দেরাজ খুলে দেখতে লাগলাম যদি কোথাও কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে। যদি তা থেকে অন্তত একবার মৃত প্রদীপকে জীবন্ত করে তুলতে পারি। বৃথা বৃথা। কোথাও কোন চিহ্ন নেই। পুরনো চিঠিপত্র, অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, কবে কি বই, কিনেছে তার রসিদ হাবিজাবি অনেক কিছুই আছে। হঠাৎ দেখি আমার নামে অসমাপ্ত একটি চিঠি। মালবিকা,—প্যারিসে তোমার সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠে নি। আমার শরীরটাও ভাল ছিল না। একবার ভেবেছিলাম তোমায় খবর দেব। সেবার তোমার একজিবিশন দেখা হয় নি। এবার তোমার ছবি দেখার ইচ্ছা ছিল। মায়ের (প্রদীপ আমার মাকে মা বলেছে!) খবরও জানতে ইচ্ছা করে।"

প্রদীপের আর মায়ের মুখ দুটো পাশাপাশি ভেসে উঠলো। প্রদীপের কোন বই মা জীবিত থাকতে বেরোয় নি। হঠাৎ মনে হল প্রদীপের খবর আমাকে জোগাড় করতেই হবে। তার জীবনের শেষ দিককার দিনগুলি কিভাবে কেটেছে জেনে তাকে নিয়ে আমি বই লিখবো একটা। কিন্তু কিভাবে আরম্ভ করা যায়? কোথায় শুরু করবো?

প্রদীপের মামার ঠিকানা জোগাড় করলাম। বেডফোর্ডের কাছে ছোট এক গ্রামে তাঁর বাস। সবচাইতে কাছের স্টেশন মাইল চারেক দূরে। ট্যাক্সি নিতে পারতাম। কিন্তু এমন সুন্দর দিন সচরাচর মেলে না। হেঁটেই চললাম। প্রায় নির্জন, পীচ বাঁধানো রাস্তা। মাঝে মাঝে দু' একটা গাড়ী বেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। যেভাবে আরোহীরা আমার দিকে তাকাচ্ছে তাতে বুঝছি

ইংল্যান্ডে প্রচুর ভারতীয় এসে গেলেও এ গ্রামের রাস্তায় আমার আগে শাড়ী পরা কোন মেয়েকে এরা হাঁটতে দেখে নি। একজন গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওয়ান্ট এ লিফ্‌ট?' ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম আমার হাঁটতেই ভাল লাগছে। 'লাইক আওয়ার কান্ট্রি সাইড?' 'ও ইয়েস। ক্যান এনিবডি ডিসলাইক ইট?' হেসে ভদ্রলোক চলে গেলেন। সত্যই অপূর্ব। কাঁচা সবুজের ঢল নেমেছে চারদিকে। মাঠ সবুজ, গাছেরা সবুজ। মাঝে মাঝে ফুলে ঢাকা গাছ আর পাখীর কিচিরমিচির। নুয়ে ভেড়া চড়ছে। মোটা মোটা সাদা কালো বাদামীতে মেশানো পশুগুলিকে দেখাশুনা করছে কুকুর। রাস্তার ধারে উঁচু আলে ফুটে রয়েছে সাদা সাদা বুনো ফুল। নাম জানি না। প্রদীপ নিশ্চয় জানত। বাস্তিক ইংল্যান্ডের বুকে শান্তি আর সবুজের এমন আবির্ভাব আমি আশা করি নি। সারা বছর প্যাচপেচে বৃষ্টির দুর্নামই শুনে আসছি। এখন মনে হল এ সবুজ তারই দান।

একটা ছোট গ্রাম। এটাই বোধহয় হ্যারন্ড। গ্রামের চৌমাথাতে একটা গীর্জা। তার নোটিশ বোর্ডে গ্রামে আসন্ন উৎসব ইত্যাদির বিবরণ। সারা গ্রাম যেন ঘুমিয়ে আছে। নিঃস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে শিশুর কান্না পর্যন্ত শোনা যায় না। একটিই বড় রাস্তা। রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়লো একটা মুদীর দোকান। ঢুকতে গিয়ে দেখি বন্ধ। মুদী দোকান বন্ধ করে লাঞ্চ খেতে গেছে। কি করবো বুঝতে না পেরে আবার এগিয়ে গেলাম। এবার একটি লোকের দেখা মিললো। সে বুঝিয়ে দিল রবিনসনদের বাড়ী পেছনে ফেলে এসেছি। ফিরলাম। বড় রাস্তা সরু একটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে এসে পড়লাম একটা চষা এবড়ো খেবড়ো মাঠে। মাঠ ছাড়িয়ে সাদা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। দরজায় 'নক' করতেই প্রৌঢ় ইংরেজ বেরিয়ে এলেন। আমাকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, 'আসুন'। দরজায় পা দিতেই বিরাট এক কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। ভদ্রলোক ধমকে দেওয়া সত্ত্বেও তার থামার লক্ষণ দেখা গেলো না। আমি অপ্রস্তুততা ঢাকার জন্য বললাম, 'আমার মত জীব ও এর আগে দেখে নি বোধহয়।' ভদ্রলোক আমার দিকে অপাঙ্গে তাকালেন। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, 'আমার মনে হয় আপনার পোষাকটাকেই ওর অদ্ভুত লেগেছে।' খুব সাধারণভাবে বলা হলেও আমার কেমন যেন অপমানিত বোধ হতে লাগলো। অথচ যুক্তির দিক থেকে এর কোন কারণ নেই।

ওপাশের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন সৌম্যদর্শনা প্রৌঢ়া। 'হ্যালো গুড আফটার-নুন। ঠিকমত পথ চিনে আসতে পেরেছেন তো? আপনার দেরী দেখে চিন্তিত হচ্ছিলাম। হাতমুখ ধোবেন তো। আসুন আমি দেখিয়ে দিই।' এ আতিথেয়তা আশা করি নি। মনের গুমোট ভাবটা কেটে যাচ্ছিল। টেলিফোনে কথা বলবার সময় প্রদীপের মামা লাঞ্চের কথা বলেন নি। তাঁর কথাবার্তায় কোন উৎসাহই ছিল না। আমিই জিদে জোঁকের মত লেগেছিলাম। বলেছিলাম, আমাকে আসতেই হবে। মনের গুমোট ভাবটা কেটে যাচ্ছিল ইনিই বোধহয় প্রদীপের মামীমা। এঁর কাছ থেকে বোধহয় অনেক কিছু জানা যাবে। তাঁকে অনুসরণ করতে যাচ্ছি। প্রদীপের মামা সিঁড়ির তলা থেকে বলে উঠলেন, 'আপনি কটার গাড়ীতে ফিরবেন ঠিক করেছেন?' আমি জবাব দিলাম ঠিক কিছু করি নি। ফিরলেই হবে এক সময়। না না ট্রেন এ লাইনে ভীষণ অনিয়মিত। তাছাড়া ট্যাক্সি ডাকতে হবে। এখনই ফোন করে দেওয়া ভাল যাতে ঠিক সময়ে আসে। আচ্ছা আমি দেখছি। আপনি যান। হাতমুখ ধুয়ে আসুন।' ফিরে এসে দেখলাম প্রদীপের মামা ও মামীমা টেবিলে অপেক্ষা করছেন। গ্রেপ ফ্রুট ককটেল অপেক্ষা করছে। খেতে আরম্ভ করলাম। পরিচ্ছন্ন ঘর, খোলা জানালা দিয়ে পুষ্পিত ল্যাবার্নাম দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে নীল আকাশে পেঁজা পেঁজা মেঘ। একটা ভোমরা হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েছে। প্রদীপের মামীমা উঠে গিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে এলেন। কিন্তু সে ফিরে এলো। চমক ভাঙলো প্রদীপের মামার কথায়।' যা খাচ্ছেন সবই প্রায় আমার ফার্মের, রুটি পর্যন্ত আমার ক্ষেতের গমে ঘরে তৈরী।' রুটির পাতলা লাল্‌চে টুকরো-গুলো দেখেই বোঝা উচিত ছিল যে বাজারে এ রুটি হয় না। 'কত একর জমি আপনার?' 'তা পাঁচশো হবে। শেষ বয়সে আর সব ছেড়ে দিয়ে জমি নিয়েই পড়েছি। ইণ্ডিয়াতেও তো শুনেছি আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক ফার্মিংয়ে ইণ্টারেস্টেড হবে একশো একর জমির সীলিং কেন আপনাদের? একশো একরে কি কখনও ইকনমিক ফার্ম হয়? তা ছাড়া শুধু চাষে কি হবে? মুরগী ভেড়া গরু এসব করুন। নাকি আপনাদের তাতে ধর্মে আটকাবে?' আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'না না ধর্মে আবার কি আটকাবে?' 'তা পারে। সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের ধর্ম আমি বুঝি না। গরু মারতে দোষ অথচ তার চামড়ার জুতো পরতে দোষ নেই। গঙ্গা আপনাদের কাছে পবিত্র অথচ কি নোংরা জল তার! যাচ্ছি। আমি টেলিভিশনে কুম্ভমেলার ছবি দেখেছি। ঐ ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতির মধ্যে কি করে ধর্ম হয়?' আমি কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কথা ঘোরাবার জন্য বললাম, এতো সুন্দর পাঁউরুটি ব্রেড আগে খাই নি। এ নিশ্চয় ঘরে তৈরি?' 'নিশ্চয়। রেসিপি চাই আপনার? মিসেস গ্রেহাম লিখে দেবেন তো এঁকে রেসিপিটা।' ইনি তাহলে প্রদীপের মামীমা নন। হাউসকীপার।

খাওয়া শেষ করে বসবার ঘরে এলাম। ভদ্রলোকই কথা বলে গেলেন। বেশীর ভাগই আমার ফার্ম সম্পর্কে। প্রদীপের সম্পর্কে যা বললেন, সবই জানা জানা। যাবার সময় হয়ে এলো। আমি বললাম 'আপনি কি প্রদীপের সম্পর্কে আমায় কিছু বলতে পারেন না? আমি ওর সম্বন্ধে কিছু লিখতে চাই।' 'কি বলবো বলুন তো? তাকে অসাধারণ কিছু তো কোনদিন মনে হয় নি। স্কুল কলেজে দিয়েছি। সে তার নিজের জীবন কাটিয়েছে। আমি আমার। মাঝে মাঝে দেখা হত। শেষ কয়েক বছর তাও হয় নি। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি আমরা দুজনে দুজনকে খুব পছন্দও করতাম না।' এরপর আর কি বলা যায় ভেবে না পেয়ে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। বাইরে ট্যাক্সির শব্দ পাওয়া গেল। তাকিয়ে দেখি রোদ চলে গেছে। আকাশ মেঘলা। এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। দুটো চড়ুই জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে স্নান করছে। গাড়ীতে ওঠার পর প্রদীপের মামা বললেন 'স্টিভেনস বলে একটা লোক প্রদীপের জীবনী লিখেছে। কাগজে রিভিউ বেরিয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করুন। অনেক খবর পাবেন।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্টিভেনসের সঙ্গে দেখা করবার আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। তার লেখা বইটা আমি পড়ি নি। কিন্তু রিভিউ দেখে আর পড়বার ইচ্ছাও ছিল না। সেই চর্বিতচর্বণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত এবং অবশেষে যা অবশ্যম্ভাবী নতুনের জয়লাভ—এই সব কথা শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু গেলাম স্টিভেনসের অফিসে। আমি প্রদীপের বোন শুনে এমন ভাবেই ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন বিরাট খবর হাতছাড়া হয়ে গেছে। বলেও ফেললেন সেকথা। বললাম, দ্বিতীয় সংস্করণে জুড়ে দেবেন।' 'দ্বিতীয় সংস্করণ কি আর হবে? প্রদীপ হল দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। কালে হয়তো সে প্রথম শ্রেণীতে আসতে পারত। তার জীবনীর দাম এমনই যা হয়। পরে আর কোন দাম থাকবে না।' রাগতে গিয়েও ভাবলাম সত্যিই তো প্রদীপের সাহিত্য কালজয়ী হবে এমন দুরাশা করবার অধিকার আমার কেন হবে? আমি সাহিত্যের কি বুঝি? বাড়ী এসে প্রদীপের বইগুলো খুলে ঘাটতে লাগলাম। বহুপঠিত বইগুলো। তবু মনে হল এ সাহিত্যের কিছু দাম নিশ্চয়ই আছে। এ কখনও বৃথা হতে পারে না।

কি করব ভেবে না পেয়ে পার্কে এসে বসলাম। সবুজ পার্ক ফুলে সাজানো ফুলের কেয়ারী। ... পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত নরনারীর শোভাযাত্রার মাঝে আমিই শুধু ... হঠাৎ দেখি প্রদীপের সেই বান্ধবী জেনার যাচ্ছে। হ্যাঁ জেনারই তো। প্রায় ছুটে গিয়ে তাকে ধরলাম আমায় চিনতে পারলো। হাসার চেষ্টা করলো। বললাম চলুন কোথাও গিয়ে বসি। অনেক কিছু জানার আছে আমার। খুব একটা উৎসাহ 'দেখালো না জেনার। তবু এল আমার সঙ্গে। ... খানিকটা হেঁটে ... পেতে পাওয়া গেল। ... লাইন দেখে আর চায়ের উৎসাহ থাকে না।

সর্বত্র লোক গিজ গিজ করছে। পার্ক থেকে বেরিয়ে কোন ছোট রেস্তোরাঁ চোখে পড়লো না যেখানে চা খাওয়া যায়। অগত্যা কাফের দোকানেই ঢুকতে হল। সেখানেও ভীড়। হাটের মধ্যে বসে কি আর কথা বলা যায়। তবুও বললাম প্রদীপ আমার ভাই হলেও আমি ওর সম্বন্ধে খুব কমই জানি। ক্রেয়ার কি আমাকে কিছু বলতে পারে? এমনি কোন কথা? কোন ছোট ঘটনা যা নিতান্তই তাৎপর্যহীন কিন্তু আমার কাছে মূল্যবান হতে পারে। কেমন অদ্ভুত করুণ চোখে তাকালো ক্রেয়ার। বললো, আপনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন আমি প্রদীপের প্রেমিকা। কিন্তু আমি শুধু ওর বন্ধুই। আমি একটু বিস্মিত হলেও বললাম, প্রকৃত বন্ধুর অনেক বেশী দাবী। ক্রেয়ার হাসলো। জবাব দিল না। বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন ক্রেয়ারের বাসায় পৌঁছে গেছি। ওই বললো, এক কাপ কফি খেয়ে যেতে। পেয়ালায় কফি ঢালতে ঢালতে বললো, আপনি যেখানে বসে আছেন ঐ চেয়ারটা প্রদীপের খুব প্রিয় ছিল। এখানে এলে ওটাতেই ও বসতো। আমরা পোর্টোবেলো রোডের দোকানে খুব সস্তায় ওটা পেয়ে গিয়েছিলাম। তখন প্রায়ই পোর্টোবেলো রোডে ঘুরতাম আমরা। ঘুরে চেয়ারটা দেখলাম। ক্রেয়ার বললো, ভিক্টোরিয়ান আমলে তৈরী। আমি এণ্টিক-টম্ বুঝি না। ক্রেয়ার জানালো প্রদীপ এণ্টিক বিশেষ করে পুরনো ফার্নিচার সম্বন্ধে খুব ওয়াকিবহাল ছিল। আরেকবার

একই ধোপে ৩ ভাবে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে

—অন্য যে কোন পাউডারের তুলনায়

কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন

১ ডেট-এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের ভেতরের কঠিন ধুলোময়লা সহজেই দূর করে—কাপড় অনেকবেশি পরিষ্কার হয়।
২ ডেট-কাপড়ের ময়লা বার ক'রে আবার তা কাপড়ে বসতে দেয়না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।
৩ ডেট—কাপড়ে বাড়তি সাদা যোগায়—কাপড় আলোয় ঝক্ঝকে বেশী সাদা ও উজ্জ্বল হয় (এতে নীল বা সাদা করবার অন্য কিছুই লাগেনা)

আজই কিনুন—ডেট

মনে হল প্রদীপ ও আমার মধ্যে দুই মহাদেশের ব্যবধান। ক্লেয়ার বললো প্রদীপ যার প্রেমে পড়েছিল সেই মেয়েটি বিয়ে করেছে। তার ঠিকানা ক্লেয়ার দিতে পারবে না যদিও সে তাকে ভাল করেই চেনে। অনেক পীড়াপীড়ি করে তাকে রাজী করালাম আমার সঙ্গে তার দেখা করানোর চেষ্টা করতে। অবশেষে রাজী হল সে। বললো, আপনার খাতিরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি চেষ্টা করবো। বললাম, অনিচ্ছা কেন? আপনারও তো বন্ধু।' ক্লেয়ার মৃদু কণ্ঠে বললো 'শেষের দিকে আমরা আর বন্ধু ছিলাম না।' এক নিমেষে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ক্লেয়ার প্রদীপের সঙ্গিনী বান্ধবী হয়েই থাকতে চায় নি। প্রণয়ভাগিনীও হতে চেয়েছিল। পারে নি। নিজেকে কেমন অপরাধী বোধ হতে লাগলো। ওর যেখানে ব্যথা অজানতে সেখানেই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আমি চুপ করে বসে রইলাম। একটু পরেই ক্লেয়ার ফিরে এসে সিগারেট ধরালো। বললো 'আমাকে খুব স্বার্থপর মেয়ে ভাবছেন তো?' আমি বললাম 'না কি? তা কেন ভাববো?' ক্লেয়ার বললো, 'আপনাকে আমি খাঁটি ভারতীয় ভেবেছিলাম।' তার গলায় কৌতুকের ছোঁওয়া। আমিও হালকা সুরে বললাম, 'খাঁটি ভারতীয় কি করে?' 'বাঃ আমি জানি না? আপনাদের চোখের চাওয়ায় আঁচলের ছোঁওয়ায় প্রেম হয়। আপনাদের গানে চাঁদ আর লতাপাতা। সবই অশরীরী, অতীন্দ্রিয়। কেমন ঠিক বলেছি কিনা?' 'কেন প্রদীপের কাছে? অন্য ভারতীয় বন্ধু-বান্ধবদের কাছে?'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত একটা। উঠে দাঁড়ালাম। ক্লেয়ার এগিয়ে দিতে এল কিন্তু আর কোন কথা হল না। বাড়ী ফিরলাম হাঁটতে হাঁটতে। বাস টিউব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন খুব কম। মোড়ের মাথায় কয়েকজন ছেলে মেয়ে আড্ডা দিচ্ছে। বাড়ী এসে প্রদীপের একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় চোখ আটকে গেল।

উইস্টারিয়া পাপড়ির গুচ্ছ ফুল ফুটিয়েছে। ছোট্ট বাড়ীটার রং একদিন ছিল লাল, এখন গোলাপী রং ধরেছে। নীল দরজার ওপর উইস্টারিয়া ঝুলছে। ছোট্ট একফালি জমিতে কাঠের টবে গোলাপ একটা ম্যামানাম গাছ। দক্ষিণ ফ্রান্সের ছোট্ট গ্রাম। নির্জন রাস্তার ওপর খোলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার বাড়ীর নম্বর দেখলাম। না ভুল হয় নি। এখানেই তাহলে আমার মা মারা গিয়েছিলেন। সামনের খিড়কিওয়ালা জানালার সাদা পর্দার পেছন থেকে যায় দু চোখ কেন আমাকে দেখছে। ম্যাবানাম গাছের ছায়ায় বসলাম। মাও কি এখানে বসেছিলেন? নাকি অসুস্থতা তাকে বিছানা থেকে উঠতে দেয় নি? অনেকক্ষণ বসে থেকে উঠে এলাম। মনে হল ভাঙা গ্রামের ছবিটা আমার মনে ছিল।

আঘাত দিয়ে ফেলেছি। ক্লেয়ার কিন্তু সহজ ভাবেই কথা বললো। 'প্রদীপের সঙ্গে আলাপ আমার বহুদিনের। প্রথম প্রণয়ভঙ্গের আঘাতে যখন আমি নিঃসঙ্গ অবসন্ন, জীবন দুর্বহ মনে হচ্ছে তখন প্রদীপের সঙ্গে আমার দেখা ঐ হাইড পার্কেই। আশ্চর্য না? একা একা বসে ছিলাম।' কি জানি কি মনে করে প্রদীপ হঠাৎ আমার পাশে এসে বসে সিগারেট ধরালো। খানিকক্ষণ পরে বললো। 'আপনার মত সুন্দরী তরুণী এমন বসন্তের দিনে একা যে?' কথা হতে হতে জানলাম প্রদীপ অক্সফোর্ডে ছিল। আমারও চেনা জানা ছিল অক্সফোর্ডে। তাদের কথা হল। জানলাম প্রদীপ লেখে। কথাবার্তায় কখন সময় কেটে গেছে লক্ষ্য করি নি। গ্রীষ্মকাল। রাত এগারোটার আগে সন্ধ্যা হয় না। খেয়াল হতে প্রদীপ বললো, 'আপনার দেরী করিয়ে দিলাম। খাওয়াও তো হয় নি। চলুন কোথাও গিয়ে খেয়ে নিই।' খাওয়ার পর প্রদীপ আমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল কাছাকাছিই থাকি আমরা।' এরপর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। প্রদীপের লেখা দেখেছেন তো? পড়াই মুস্কিল। ওর সব পাণ্ডুলিপি আমি টাইপ করেছি। তাও কি একবার? ওর তো নিজের লেখা পছন্দই হত না। কতবার যে বদলাতো। একটু চুপ করে থেকে ক্লেয়ার বললো, 'বহু সময় একত্রে কাটিয়েছি আমরা। ইউরোপের মিউজিয়ামে, আর্ট গ্যালারীতে ঘুরে বেড়িয়েছি। কনসার্ট শুনতে গেছি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লেয়ার বললো না, প্রদীপ কোনদিনই আমার প্রেমে পড়ে নি। আমিই তাকে কখন ভালবেসে ফেলেছি। একথা যেদিন সে জেনেছে সেদিনই সে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে।' ক্লেয়ার আত্মগত-ভাবেই বললো, প্রত্যাশা মনের কোণে নিশ্চয় ছিল। ভেবেছিলাম একদিন সে আমায় ভালবাসবে। কিন্তু আমার তার কাছে অনেক ঋণ। পরাজয় ভুলে, দুঃখকে তুচ্ছ করে উঠে দাঁড়াতে সে আমাকে সাহায্য করেছে কিন্তু হারতেই আমি জন্মেছি।'

ক্লেয়ারের গলা ধরে এলো। তাড়াতাড়ি সে উঠে ছাড়া আর দশটা গ্রামের মত একে অবহেলা করে চলে যেতাম। জানতেও পারতাম না আমার জীবনের এক অধ্যায় এখানেই নিহিত আছে। অনেক দিন পরে নিজেকে হালকা মনে হল। যা হারিয়ে গিয়েছিল তার খানিকটা যেন খুঁজে পেলাম। বেশ কিছুদিন পরে মামার কাছে গল্প করেছিলাম। কি করে মাকে খুঁজে পেলাম তারই গল্প। মামা সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, ও গ্রামে তোমার মা মারা যাননি। সুইটজারল্যান্ডে ঐ একই নামের গ্রাম আছে।

কয়েক দিন পরে ক্লেয়ারের ফোন এলো। সেই মেয়েটি, সোনিয়া যার নাম, সে দেখা করবে না আমার সঙ্গে। ক্লেয়ার অপমানিত হয়ে এসেছে আমার জন্য। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সোনিয়ার ঠিকানা চাইলাম। ক্লেয়ার ঠিকানা দিল। তবে বললো, বৃথা চেষ্টা।

সোনিয়ার বাড়ী ওয়েমব্লি স্টেশনের খুব কাছে। নতুন হাউসিং এস্টেট বানিয়েছে কোন কোম্পানী। চড়া দরে বেচছে ফ্ল্যাট। গায়ে গায়ে বোঝা ইঁটের ইমারতগুলি। দেখলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে। 'দেহে কিংবা মনে রাজপুতানীর নাইকো কোমলতা।' এখানে ওখানে দু-একটা গাছের শীর্ণ কংকাল যেন ইচ্ছে করেই রেখে দেওয়া হয়েছে ইটের পাঁচীলগুলিকে আরও প্রকট করবার জন্য। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মানসচক্ষে দেখতে পেলাম বাড়ীগুলি বসবাসের অযোগ্য ঘোষণা করা হচ্ছে।

রাস্তার মোড়ে দু একদিন দাঁড়িয়ে থাকলাম কিন্তু সোনিয়াকে বাড়ীর বাইরে আসতে দেখলাম না। অবশেষে ঠিক করলাম যা থাকে বরাতে। ওদের দরজায় নক করলাম। সোনিয়াই দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখে ওর মুখে ছায়া ঘনালো। 'আপনি প্রদীপের বোন? আমি তো জানিয়েছি আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। কেন এসেছেন আপনি?' সোনিয়াকে দেখে বোঝা যায় ওর আসন্ন সন্তান সম্ভাবনা। ঢিলে জামার তলায় শরীরটা বিসদৃশভাবে প্রকট হয়ে আছে, ওর অপরূপ সুন্দর মুখের সঙ্গে বেমানান। এরই প্রেমে পড়েছিল প্রদীপ? হঠাৎ মনে হল এ প্রদীপের সন্তান নয় তো? কিন্তু এ প্রশ্ন তো করা যায় না। দেখলাম ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। বললাম, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমি চলে যাচ্ছি।' সোনিয়া কোন উত্তর দিল না। শুধু তাকিয়ে থাকলো। দরজার বাইরে পা রেখেছি। আধ-খোলা কপাটের ওপার থেকে খুব নীচু গলায় সোনিয়া বললো, ক্লেয়ারের হার হয়নি। আমারই হার হয়েছে। যদিও ক্লেয়ার সে কথা জানে না। ওকে সবাবার জন্য, ওকে ভোলবার জন্য আমার কাছে ধরা দিয়েছিল প্রদীপ। হাসপাতালে ওর শেষের কটি দিনে বুঝেছিলাম কেন? ওর মায়ের অসুখ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল প্রদীপ। ক্লেয়ারকে সেই জন্য নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াতে চায়নি।'

অন্দরে আওয়াজ শুনেই তাকিয়ে দেখি মধ্যবয়স্ক ইংরেজ ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন। সোনিয়া দরজা খুলে দাঁড়ালো। ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে কি বুঝলেন কে জানে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন কেন এসেছেন আপনি আমার স্ত্রীকে জ্বালাতন করতে, আপনার ভাই তো তার দুর্বলতার যথেষ্ট সুযোগ নিয়েছে। পুরনো ঘাকে খুঁচিয়ে না দিলে আপনার স্বস্তি নেই বুঝি?'

দেখলাম সোনিয়ার পদ্মের মত মুখ ম্লান হয়ে গেছে। চোখে ফুটে উঠেছে অসহায়তা। আমি বললাম মাপ করবেন। আমি চলে যাচ্ছি।' দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

মনের কথা

ধর্ম ও বিচ্ছিন্নতা
চৈমরির-তত্ত্বকথা

নাম শুনে ও নাম শোনার পরে কথা বলেও বুঝতে পারলাম না ভদ্রলোক কোন দেশের বা কোন জাতের। নামটি যেমন অদ্ভুত ভদ্রলোকের কথাবার্তাও তেমনি অদ্ভুত। রোগী হিসেবে আসেননি, কাজেই পরিচয় চাওয়া অভদ্রতা। যতক্ষণ নিজে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে। নাম চৈমরি, গায়ের রং রোদপোড়া, চুলের আকার খানিকটা চার্চিলের মত, মাথার একপাশে কটা চুল, চোখের মাঝ-বয়েসেও কটা। এক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। ব্যাংকক থেকে হালে কোলকাতায় এসেছেন। স্থানীয় এক ইনস্টি-টিউট আয়োজিত আলোচনাসভায় ভদ্র-লোকের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। আলোচনা হচ্ছিল বিচ্ছিন্নতা নিয়ে বাংলায়। ভদ্রলোক বাংলা বোঝেন না। তাঁর পাশে বসেছিলাম, তাই অনেকটা দায়ে পড়ে দোভাষীর কাজ করতে হয়েছিল। তার পরদিনই তাঁর আগমন ঘটেছে, এবং অনর্গল বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে বকে গেলেন। এরপর নিয়ম করে সপ্তাহে একদিন করে আসতে শুরু করলেন। প্রথম দিনকয়েক বাড়তি পরিচয় জানলাম। পরে বুঝলামও তিনি স্বীকারও করলেন, তাঁর চিকিৎসা দরকার। জীবনের পঞ্চাশটা বছর কেটে যাবার পর তাঁর 'ধর্ম করার প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু সাহস হচ্ছে না।

আত্মপরিচয় দেওয়ার আগে তিনি বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে নানা কথা তুললেন। দর্শন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করলেন, ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করলেন, শব্দার্থবিদ্যায় (সেমান্টিকস) তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। তাঁর বিচ্ছিন্নতা-বোধ ও ধর্মীয় সাধনা সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে কিছু নতুনত্ব ছিল, তাঁর জীবন ইতিহাসের সঙ্গেও কিছুটা সম্বন্ধ ছিল। তাই সেই আলোচনার কিছু অংশ এখানে দিচ্ছি।

—মানুষের জীবন দুটো: একটা বাইরের, একটা ভিতরের। পশুর জীবন একটা। মানুষের বাইরের জীবন শুধু ব্যক্তিকে নিয়ে, নিজেকে নিয়ে, এখানে সে পশুর সামিল। ভিতরের জীবনে সে অন্য-মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, প্রজাতির সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে সে আর শুধু ব্যক্তি নয়, এখানে সে গোষ্ঠীর একজন, অন্যের সঙ্গে একাত্ম। তফাৎ নয়, 'ইনডিভিজুয়াল' নয়। মানুষ একাধারে আমি ও তুমি। মানুষ নিজেকে অন্যের মত করে ভাবতে পারে, ভাষার সাহায্যে অপরের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করতে পারে। পশু তা পারে না। এই ভিতরের জীবন, এই অন্তর্সত্তা আজ বহির্সত্তা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। মার্কস বলেছেন, শ্রম থেকে বিযুক্ত হবার ফলে, শ্রমের ফল অন্যকে অর্পণ করতে বাধ্য হওয়ার ফলে, এমনটি ঘটেছে। ইতিহাসের এক যুগে মানুষ মনে ভাবতো তার শ্রমের ফল পরমসত্তায় সমর্পিত, আর সেই ভাবনা তাকে শান্তি দিতো, বিচ্ছিন্নতা-বোধের পীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করতো। আজ পরমসত্তার কল্পনা, অন্তর্সত্তার পরম-সত্তায় লীন হওয়ার তত্ত্ব অচল। তাই মানুষ আর 'স্পেসিস বিইং' নেই: তার ভেতরের জীবন, তার প্রজাতিসত্তা অন্য প্রজাতিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের বহির্সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন। ধর্ম একদিন দুই জীবনের মধ্যে বন্ধনের সেতু ছিল। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধর্ম প্রচলিত ছিল, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ 'প্রজাতিসত্তা' সংরক্ষণ করে চলতো। হিন্দু, মুসলমান ইহুদী খৃষ্টান সকলেই এই বিচ্ছিন্নতার অসহনীয় অনুভূতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নানা প্রক্রিয়া-অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্রের 'বিধানের' আশ্রয় নিতে বাধ্য হত। আদি-যুগ থেকে বিচ্ছিন্নতাজনিত, উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতি বা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে: বিচ্ছিন্নতার বেদনা দূর করার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকেও বদলাতে হয়েছে। ইহুদী ধর্মের পর খৃষ্টধর্মকে নতুন প্রক্রিয়া নিয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে, খৃষ্ট ধর্মের পর ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে: জীবন-ধারণের ও উৎপাদন পদ্ধতির বড় রকমের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রকমের 'বিচ্ছিন্নতা বিরোধী' ধর্মের প্রয়োজন ঘটেছে। একই ধর্মকে নতুন রকমের আচার-বিধির প্রবর্তন করে অনেক সময় নতুন নাম দেওয়া হয়েছে, অথবা শাখাধর্মের উদ্ভব হয়েছে। ক্যাথলিক অনুষ্ঠান যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতাসমস্যার সমাধানে অপারগ, তখন প্রোটেস্টান্টদের নতুন আচার অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ ঘটেছে, দেখতে পাই। ক্যাথলিকরাও বাধ্য হন নিজধর্মের ভেতর দিয়ে জেসুইট শাখা গড়ে তুলতে। ইসলামেরও অনেক শাখাপ্রশাখা। আলীর পূর্ববর্তী তিন খলিফাকে মানা আর না মানা নিয়ে সুন্নী-শিয়ার মতভেদ ভাবলে ভুল হবে। আসলে পরিবর্তিত জীবনধারা, নতুন ধরনের জীবিকা অর্জনের তাড়া, বিচ্ছিন্নতাকে দিয়েছিল নতুন রূপ: নতুন মাত্রা; ধর্মীয় অনুশাসন, আচার অনুষ্ঠানের সংস্কারের প্রয়োজন একালের মনে অনুভূত হয়েছিল; তাই এই ভাঙন। ভারতবর্ষেও বৈদিক আচার অনুষ্ঠান যখন 'বিচ্ছিন্নতা নিরসনে অসমর্থ', তখন উপ-নিষদের সৃষ্টি। ভিতর থেকে ধর্মকে সংস্কৃত করে নতুন বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা। পশুপালনের জীবন-বেদ দিয়ে কৃষি যুগের বিচ্ছিন্নতা সমস্যা মেটানো সম্ভব নয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় ও আনুষঙ্গিক সমাজ ব্যবস্থায় যখন আরো পরিবর্তন এল, সনাতনধর্মের আওতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ তীব্রভাবে অনুভূত হতে লাগলো, তখন দেখি জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ভাগবতধর্মের প্রসার। [illegible] ও পিত-

তান্ত্রিক মার্গে বিচ্ছিন্নতাসমস্যা পুরনো সমস্যা থেকে গুণগতভাবে পৃথক: তাই গুণগতভাবে স্বতন্ত্র বৌদ্ধবাদ, জৈনবাদের মতন নিরীশ্বরবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। সংস্কৃত সনাতন ধর্মের বর্ণাশ্রমের কঠোর নিগড়ে বাইরের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা গেলেও অন্তর্সত্তাকে বিচ্ছিন্নতাবন্ধন থেকে মুক্ত করা গেল না। তাই মহাযানী, তান্ত্রিক, বাউলবাউলের প্রাদুর্ভাব। আধুনিকবাদের বশবর্তী হয়ে মদ ও মৈথুনকে আশ্রয় করে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই বর্জিত মানুষসত্তার বিচ্ছিন্নতা দূর করার দুরূহ পরীক্ষার ত্রুটী হলো।

—আজ বিজ্ঞান ধর্মবিশ্বাসের মূলে কঠোর আঘাত হেনেছে। মন্দির মসজিদ গীর্জার ভিড় কমছে কিন্তু বিচ্ছিন্ন মানস সেখানে নীড় খুঁজে পাচ্ছে না। বিজ্ঞান ও ধর্মের সিনথেসিসের চেষ্টাও বিফল হচ্ছে। চার্বাকের দেহাত্মবাদ, বুদ্ধের নৈরাত্মবাদ দিয়ে এই কালের বিচ্ছিন্নতার বিচার চলছে না। মার্কসবাদীদের মধ্যে আজকালকের মতন নানা ব্র্যান্ডের মার্কসবাদ চালু হয়েছে; মানুষ মার্কসবাদকেও ধর্মের পরিবর্তে আঁকড়ে ধরতে পারছে না। মার্কসবাদকে, বিজ্ঞানকে, ধর্মের আসনে বসাতে চেয়েছিল বিচ্ছিন্ন মানুষ; তাই বোধহয় এইরকমটি ঘটছে। কোথায় মানুষ আশ্রয় পাবে? কোন প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্নতা দূর করবে? আজকের মানুষের কাছে বোধহয় সব থেকে বড় সমস্যা এই।

এইবার মিঃ তৈমুরের ব্যক্তিজীবনের কাহিনী বলছি।

ছেচল্লিশ বছরের তৈমুরের জন্ম পশ্চিম ভারতের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে। তাঁর বয়স যখন ছাব্বিশ তখন দেশ ভাগ হয়। পিতৃব্যের সঙ্গে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি পশ্চিম পাকিস্থানে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শৈশবে মাতাপিতাকে হারিয়ে এই চাচার কাছে মানুষ হয়েছেন তিনি। চাচা শিয়াসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নির্বিরোধী ভালমানুষ। ধর্মীয় গোঁড়ামী তো দূরের কথা, ধর্মে তাঁর আকর্ষণই বিশেষ ছিল না। চাচী ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও নিয়মনিষ্ঠার পক্ষপাতী। পরিবারের আসল কর্ত্রী। তিনি হিন্দীভাষী যুক্তপ্রদেশের মেয়ে। তাঁর আত্মীয়স্বজন সকলেই প্রায় ভারত ছেড়ে পাকিস্থানে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, তিনিও স্বামীকে ভারতত্যাগে উৎসাহিত করেন। তৈমুর শিশুবয়স থেকেই চাচীকে ভয় ও সমীহ করে চলতেন। বাইরে থেকে তিনি ছিলেন সুবোধ সুশীল বালক। অভিভাবিকার একান্ত অনুগামী ও বাধ্য। কিন্তু তাঁর অন্তর্সত্তা ছিল বিদ্রোহী। বাড়ীতে স্কুল কলেজে তিনি ছোটদের কোনো সিদ্ধান্তে কোনোদিন আপত্তি জানাতেন না, কিন্তু গোপনে তিনি বিপ্লবীদের খোঁজখবর রাখতেন, সমবয়সীদের গ্রুপ মিটিং-এ মার্কসকে আইনস্টাইনের সঙ্গে তুলনা করতেন এবং মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশুনা করতেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এম-এ প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে অল্পবয়সেই স্থানীয় কলেজে লেকচারারের পদে বহাল হলেন ও মার্কসিস্ট স্টাডি সার্কেল' চালাতে লাগলেন। তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রবণতা ছিল অনুগামিতার দিকে। মানসম্মান প্রতিপত্তি লাভ করে—নিরাপত্তাবোধকে সুদৃঢ় করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল জীবনের এক ধারা; আর অন্য ধারা চাইছিল প্রকৃতিসত্তাকে উন্মুক্ত করে বিচ্ছিন্নতা দূর করতে। চাচীর কঠোর নিয়মানুবর্তিতার চাপে ও মাতৃস্নেহের অভাবে শৈশব থেকেই তৈমুর উদ্বিগ্ন, অসহায়। একটা 'ফ্লোটিং ফিয়ার' সব সময়েই তাঁকে অস্থির চঞ্চল করে রাখতো। বাইরের জীবন ভিতরের জীবন তাঁর সমন্বিত হতে পারেনি এই ভয়ে। পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েও তিনি মনে মনে এসব থেকে নির্লিপ্ত থাকতেন। কিশোর বয়স থেকেই জানতেন চাচীর এক নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে আছে।

চাচীকে অপছন্দ করতেন বলেই বোধহয় এই আত্মীয়কন্যার উপর কোনোরকম ভালবাসার অনুভূতি ছিল না। এই দুর্দলে স্বভাবের মেয়েটিকে তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু অন্য মেয়ের দিকে কোনোদিন চোখ তুলেও তাকাতেন না। চাচীর নির্বাচিত কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস ছিল না, আবার তাকে জীবনসঙ্গিনী করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও কোনোদিন মনে জাগতো না। এইভাবে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর কেটে গেল। চাকরী পেলেন, ডক্টরেট থিসিস তৈরী করতে উদ্যোগী হলেন, কিন্তু আত্মনির্ভর স্বাবলম্বী হতে পারলেন না। বাড়ীর মধ্যে যেমন কোনো বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ জানাতে সাহস পেতেন না, বাইরেও তেমনি ভিন্নমতাবলম্বীদের সামনে তিনি মৌনতা অবলম্বন করে থাকতেন। যা কিছু 'কমুনিকেশন', সে ঐ সমমতাবলম্বীদের মধ্যে, অল্প কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধব মহলে। নিজস্ব কোনো মতবাদ ছিল না, প্রচলিত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠানবিরোধী যে কোনো মতবাদকে তাই সহজেই গ্রহণ করতেন। 'গ্রুপ-আইডেন্টিটির' দ্বারা বিচ্ছিন্নতা দূর করার চেষ্টা করতেন। যখন দেশ ছেড়ে পাকিস্থান যাবার কথা উঠলো, তখন চাচীর ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় দেখলেন না। তার সমমতাবলম্বী গ্রুপে নিজের সম্প্রদায়ের লোক ছিল কম। দেশবিভাগের পর তাঁর মনে হল গ্রুপের লোকরা কেন আর আগের মত ব্যবহার করছে না। কলেজের অন্যান্য টিচারদের চোখে মুখে যেন কেমন সন্দেহের ছায়া। চাচী চাচা বোঝালেন যে মুসলিমদের এই রাষ্ট্রে চাকরীবাকরীতে কোনো উন্নতির আশা নেই। হয়তো হিন্দু পরীক্ষকরা তাঁর 'থিসিস' 'এ্যাকসেপ্ট' করবেন না। 'ডক্টরেট' হবার সাধ তাঁর অনেকদিনের। সেই সাধ যদি না মেটে, এখানকার পরিচিত মহলে যদি নিজেকে নিরাপদ মনে না হয় তবে এখানে থাকার কোনো অর্থই হয় না। আবার পরিবর্তী রাষ্ট্রের প্রতি কোনো আকর্ষণই তিনি বোধ করলেন না। ধর্ম সম্বন্ধে কোনো মোহ নেই, ধর্মবোধ তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধকে দূর করতে পারেনি, ধর্মকে তিনি প্রাক-ধনতান্ত্রিক আমলের জিনিস মনে করেন। সেই ধর্মকে কেন্দ্র করে দেশ বিভাগ হলো, নিজের দেশ ছেড়ে ধর্মের খাতিরে অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে—এই চিন্তা তাঁকে পীড়িত করতে লাগলো। বিচ্ছিন্নতাবোধ আরো তীব্র হল। চাচার সঙ্গে চাচীর সঙ্গে লাহোরে এলেন, চাকরী পেলেন। নানা বিষয়ে তাঁর পড়াশুনো, নানাদিকে তাঁর আগ্রহ। চাকরীতে উন্নতি হলো। কয়েক বছরের মধ্যে সরকারী খরচায় আমেরিকায় গেলেন পদার্থবিভাগে গবেষণার কাজে। যাবার আগে তিনি একটা বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারলেন। বিবাহ এখন নয়, আমেরিকা থেকে ফিরে এসে হবে,—এই কথা তিনি স্পষ্টভাবে প্রথমে চাচাকে পরে চাচীকে জানাতে পারলেন। এই বোধ হয় তিনি প্রথম বিদ্রোহী হলেন। চাচীর নির্দেশ অমান্য করে তিনি করাচী থেকে প্লেনে উঠলেন।

আমেরিকায় এসে তিনি আবার প্রকৃতিসত্তার বিকাশের সুযোগ পেলেন। র‍্যাডিক্যালদের কয়েকজনের সঙ্গে মিশে ধর্ম ও বিচ্ছিন্নতা নিয়ে পড়াশুনো শুরু করলেন। নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিতি ঘটলো। বিরুদ্ধাচরণ বা অনন্যগামিতা নিয়ে গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ লিখলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত আচরণে বিরোধিতা ও অনন্যগামিতার পরিচয় দিতে পারলেন না। সম্মানের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। লাহোরে ফিরে যাবার সময় আসতে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। এই সময় আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণার চাকরীর প্রস্তাব তিনি সাদরে ও আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। প্রায় দশ বছর তিনি এই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন, দূর প্রাচ্যের নানা দেশে ঘুরেছেন, অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন; কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁর একটুও কমেনি। কোনো দেশের প্রতি তিনি কোনো আকর্ষণ অনুভব করেননি; সহকর্মী-

দের প্রতি নির্ভরতা তাঁকে পুরো নিঃসঙ্গ হতে দিতে পারেনি। [illegible] কিন্তু অ্যাকটিভিস্ট নন, কোনো আন্দোলনের প্রবণতা নেই, কোনো কিছুর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের শক্তিও অভাব। তা বলে একেবারে নিষ্ক্রিয় নন, লেখার মাধ্যমে একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন নিজেকে অন্তত নিজ মতাবলম্বীদের সঙ্গে সংযুক্ত করবার। এইবার এই টার্ম শেষ হলেই দেশে ফিরতে হবে, যে দেশে নিজেকে তিনি পরবাসী মনে করেন। দেশে ফিরলেই বিবাহের প্রশ্ন আসবে। চাচী-নির্দিষ্ট মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু চাচী টেম্বারিকে বিবাহ-ব্যাপারে স্বাধীনতা দেবেন বলে মনে হয় না। সে যাই হোক, যে কোনো মেয়েকে এখন তিনি বিয়ে করতে পারেন, যদি শুধু বুঝতে পারেন যে বিবাহের সামর্থ্য তাঁর আছে। বিবাহ এখন না হলে আর হবে না। নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বয়ে চলা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোক বিবাহ করতে চান, যে কোনো ত্রিরিশ-ঊর্ধ্ব মেয়ে হলেই চলবে। কিন্তু বিবাহ করার ক্ষমতা তিনি হারিয়েছেন। কামেচ্ছা তাঁর নেই, যৌনক্ষমতাও বোধ হয় অন্তর্হিত। সেমানটিকস-এর ছাত্র টেম্বারি মনোবিদ্যা ও মানসিক চিকিৎসার আধুনিক ধারাগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁর এই দুর্বলতা দূর হবার নয়। কিছুদিন তিনি একজন মনঃসমীক্ষকের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। আমেরিকা ছাড়তে হল বলে চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়নি। শেষ চেষ্টা তিনি আমার কাছে করতে চান, যদিও জানেন ফল কিছু হবে না। ফল হবে না জেনেও চেষ্টা করতে চান কেন? নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চান, অন্যকে বোঝাতে চান তিনি চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। তাঁকে আরোগ্যের অতীত বলে সার্টিফাই করলে তিনি আমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। অদ্ভুত অনুরোধ নয় কি?

যৌনশক্তির স্বল্পতার জন্য যাঁরা চিকিৎসার্থী, তাঁরা সকলেই গোপনতার প্রয়াসী। চিকিৎসার ব্যাপারটা তাঁরা পুরোপুরি চেপে যেতে চান। আর মিঃ টেম্বারি চিকিৎসা ও রোগ নিয়ে হৈচৈ করতে চান, পরিচিত অপরিচিত সকলকে তাঁর দুরারোগ্য অক্ষমতার কথা সগৌরবে প্রচার করতে চান। এই নিয়ে, এর কারণ নিয়ে যখন মাথা ঘামাচ্ছি, তখন একদিন মিঃ টেম্বারি এসে বললেন, তাঁর চাকরীর এক্সটেনশন হল না, তিনদিন পর তিনি কোলকাতা ছাড়ছেন। পুরনো চাকরীতে গিয়ে সাতদিনের মধ্যে যোগ দিতে হবে। সবসমেত বোধ হয় পাঁচদিন তিনি চিকিৎসার জন্য আমার কাছে এসেছেন। বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে বললাম যে তিনি আদৌ চিকিৎসিত হতে চান না, তাঁর রোগ তিনি পুষে রাখতে চান। চিকিৎসার এই বাহ্যানুষ্ঠান করা তাঁর উচিত হয়নি। তিনি যদি আমাকে জানাতেন যে তিনি এখানে মাত্র আর দু সপ্তাহ আছেন, তবে আমি তাঁকে রোগী হিসেবে গ্রহণ করতাম না। বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে টেম্বারি উত্তর দিলেন। তিনি চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলেন, বিয়ের ইচ্ছাটা তাঁর আন্তরিক। এত দেরীতে চিকিৎসা শুরু করার কৈফিয়ত হিসেবে বললেন যে, ওটা তাঁর স্বভাব, সব ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর দেরী হয়। চিকিৎসার ব্যাপারেও হয়েছে। এখানে শুধু নয়, আমেরিকাতেও তিনি ব্যাঙ্কক যাবার নির্ধারিত দিনের সপ্তাহ চারেক আগে চিকিৎসা শুরু করেন। রোগ না সারানোর ইচ্ছা যদি থাকে, তবে সেটা নির্জ্ঞানে আছে। তিনি সে সম্বন্ধে কিছু জানেন না। পারিশ্রমিকের বদলে কয়েকখানা দামী বই উপহার দিয়ে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। দিল্লী থেকে লেখা তাঁর চিঠিতে ভদ্রলোক সম্বন্ধে আরো কিছু জানলাম। ঐ একখানা চিঠিই তাঁর পেয়েছি। তাঁর আর কোনো সংবাদ জানবার সুযোগ ঘটেনি।

দিল্লী থেকে লেখা চিঠিতে তিনি বাউল-দর্শন সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকথা জানিয়েছেন। বাউলদর্শনের প্রাচীনত্ব, তন্ত্রদর্শনের বিজ্ঞান-ভিত্তি, যোগের শারীরবৃত্ত ইত্যাদি অনেক অনেক কথার পর লিখেছেন যে যোগাভ্যাস করে তিনি নিম্ন মেরুদণ্ডে অবস্থিত কাম-কেন্দ্রকে সহস্রারের (মস্তিষ্কের) অধীনে আনতে চেয়েছিলেন, তার ফলেই তাঁর কামশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। এ শক্তি আর ফিরে আসবার নয়। শেষের দিকে তিনি সুফীসাধনা ও তন্ত্রাচারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। নানারকমের প্রক্রিয়ার সাহায্যে মূলাধার কেন্দ্রস্থ কামকে তিনি জয় করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি উপযুক্ত গুরুর সাহায্য পাননি, বাউলদের মত নারীকে সাধনার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন নি। তাই বোধ হয়, এই দুর্গতি। 'সেক্সকে সাব্লিমেট' করার উপযুক্ত পদ্ধতি এশিয়া মহাদেশের হিন্দু মুসলিম সাধকদের জানা ছিল। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যদি পাভলভের গুরুমস্তিষ্কভিত্তিক শারীর-বিদ্যার সাহায্যে করা হয়, তবে হয়তো বিশেষ ফল পাওয়া যেতে পারে। ধর্ম-বিদ্বেষী হয়েও তিনি বিচ্ছিন্নতা নিরসনের উপায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছেন। ষট্চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করা, ইত্যাদি কথাগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বোধ হয় একদিন খুঁজে পাবেন। প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানে কোনো আস্থা নেই, কিন্তু গুপ্ত ও গুহ্য সুফীসাধনা তন্ত্রসাধনার উপর যথেষ্ট বিশ্বাস। এই সব সাধনাই ভেদাভেদ বিলুপ্ত করে মানুষকে অন্তর্মুখীনতার পথে অন্তর্সত্তাকে বিকশিত করায়, হিংসা দ্বেষ ক্রোধ থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে। বর্ণবিদ্বেষ ও গোষ্ঠীবদ্ধের সংকোচ থেকে, প্রজাতির ধ্বংস থেকে অব্যাহতি পাবার এই একমাত্র উপায়। একেবারে শেষের দিকে টেম্বারি জানতে চেয়েছেন এলিয়েনেশন ও প্যারানয়েড স্কিজোফ্রেনিয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কি না। তিনি সত্যই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন; প্রশমিত কামেচ্ছা সেই ব্যাধির আংশিক বহিঃপ্রকাশ। বিয়ে করতে তিনি চান, স্ত্রীকে সাধিকা করে এবার তন্ত্রসাধনা করবেন।

আমার কিন্তু সে রকম মনে হয় না। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রক্রিয়া আর দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে টেম্বারি বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা দূর করার চেষ্টা করে চলেছেন।

—মনোবিদ্

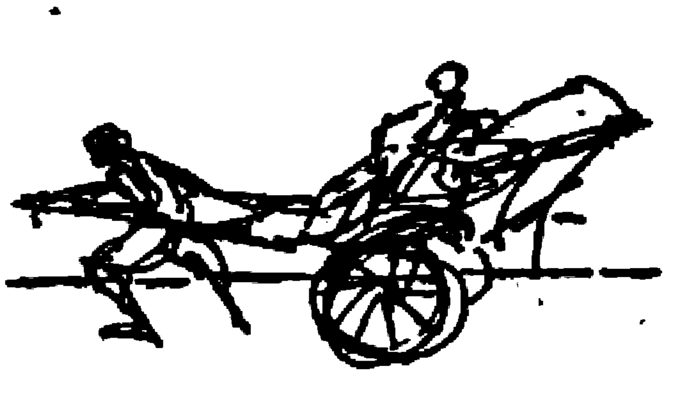

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

—রাগ ক'র না বিনয়। মানুষের সম্পর্কে আমাদের কতরকম ভুল ধারণা থাকে। কিছুদিন আগে বিমল আমার অফিসে এসে জানাল ওর স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ। চিকিৎসার জন্য অন্ততঃ দুশো টাকার দরকার। আমি তোমার কথা জিজ্ঞেস করায় ও ঠোঁট উলটে বললে যে, তুমি নাকি রাস্তায় দেখা হলে এড়িয়ে যাও। ওকে নাকি মানুষ বলে গণ্য ক'র না। আরও অনেক কথা বলল তোমার সম্পর্কে। নিজে থেকেই বললে। সেই যে টাকা নিয়ে গেছে আর আসেনি। আমি কোন অভিযোগ করছি না। কেননা বিমল তোমার প্রিয় বন্ধু।

ওদের কথাবার্তার ফাঁকে শেফালী এক সময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরে সে ফিরে এসে দেখল রজত আর বিনয় ধোঁয়ার আড়ালে নিজেদের লুকোতে ব্যস্ত। মনে মনে সে হাসল। বিনয় যে এত অনুদার সে কী কখনও ভাবতে পেরেছিল? তখন তো গদগদ সুরে খুব কথা বলতো। কতদিন যে বলেছে তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে না পেলে চলবে না! ইত্যাদি সেসব কী ভান ছিল?

এরপর আর কথাবার্তা বিশেষ জমল না। রজত বারকয়েক জানাল যে, জরুরী কাজ রয়েছে, তাড়াতাড়ি চলে যাবে। শেফালী হাসিমুখে খেয়ে যেতে অনুরোধ করল। বিনয়ের তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

খাওয়া দাওয়া সেরে রজত বিদায় নিলে ওরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল। দু-জনের মুখ গম্ভীর। শেফালী দরোজার খিল এঁটে জানালার সামনে বিনয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

—কাল আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। বিনয় সাদা আলো নিভিয়ে সবুজ আলো জেলে দেয়। শেফালীর পিছনে এসে দাঁড়ায়। সে বোধকরি নিজেকে সংযত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

—কেন বারবার এক কথা বলছো! শেফালীর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বিরক্তি, বাবার অসুখ শুনে কই একটা কথাও তো জিজ্ঞেস করলে না।

—বেশ তো। বিনয় মনে মনে হাসল, বিমলের ওখান থেকে ফেরার পথে তোমার বাবাকে দেখে আসবো।

—না। শেফালী ঘুরে দাঁড়াল, আমি যাব না। তুমি বুঝতে পারছো না এ অবস্থায় আমি যেতে পারি না। আমি না গেলে কী হবে। তোমার বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে, সে কিছু মনে করবে না।

—তুমি কী স্থির করেছো আমার কোন কথা শুনবে না? বিনয় এগিয়ে এসে শেফালীর দু'কাঁধ সজোরে চেপে ধরল, ও কেন আজ এসেছিল? হ্যাঁ রজতদা। ওর সঙ্গে এত হাসাহাসি কিসের! তোমার লজ্জা করে না—যার কথা কখনও মনে হয় না। তুমি কী ভেবেছো?...

শেফালী নীচু গলায় হাসল, এইবার তোমার আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। ছি! তোমার সম্পর্কে একসময় কত কী ভাবতাম। এত অবিশ্বাস আমাকে। কাঁধ ছেড়ে দাও। কী হয় রজতদার সঙ্গে দুটো হেসে কথা বললে। কী হয় যদি তার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসে চা খাই অথবা সিনেমা দেখি। এতে তোমার আপত্তির কোন কারণ দেখি না। তুমি আশা কর না চিরকাল তোমার খেয়ালখুশিমত আমি চলবো। তোমার আচরণ কী হাস্যকর নয়?

বিনয় কেমন যেন নির্জীব হয়ে ওঠে। শেফালীর কাঁধ ছেড়ে দেয়। কোথায় গেল উত্তেজনা ক্রোধ। এখন মনে হচ্ছে কিছু বলার নেই। সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শেফালীর দিকে।

—রজতদা খারাপ বহুদিন বলেছো। বাবার এ অবস্থার জন্যে রজতদা দায়ী—তোমার মা তো ওর সঙ্গে আজ কোন কথাই বললেন না। তোমাদের এ ব্যাপারে কোনদিন নাক গলাই নি। কিন্তু যতদিন না রজতদা আমার সঙ্গে অশোভন আচরণ করছে ততদিন তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বা মেলামেশায় আপত্তির কিছু দেখি না।

একটু থেমে শেফালী বিনয়ের একটা হাত ধরে বললে, অনেক রাত হয়েছে। এস শুয়ে পড়া যাক। আচ্ছা, সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে বল তো!

CENTRAL LIBRARY

হাত ছাড়িয়ে বিনয় আস্তে আস্তে বলল, ঘুমিয়ে পড়। আমার ঘুম আসছে না।

শেফালী চুপচাপ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিনয় টেবিল ল্যাম্প জেলে একটা বই টেনে নিল। কালো কালো অক্ষর চোখের সামনে। সত্যিই কী শেফালীর বাবার অসুখ? নাকি তাকে এড়াবার জন্যে বানিয়ে বলেছে।

[illegible] হয়ে ওঠে দুটো চোখ। বিনয় বইটা ঠেলে দেয়। সেও তো সব কথা বলেনি। বিমলের সঙ্গে বহুকাল দেখা হয় না। ওর ওখানে নিমন্ত্রণ...আসলে শেফালীকে আটকাতে চেয়েছিল। কেন না তার আশংকা ছিল, সে সিনেমায় যেতে অসম্মতি জানাবার পর, বজ্জাত হয়ত শেফালীকে যেতে অনুরোধ করত। আর, সন্দেহ নেই, শেফালী রাজীও হয়ে যেত। ফলে মরীয়া হয়ে সে ছলনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

—শেফালী শেফালী! বিনয় [illegible] চুম্বন করতে থাকে। দৃঢ় আলিঙ্গনে শেফালীকে টেনে নেয় নিজের দিকে।

শেফালী কোন [illegible] না। প্রথম চুম্বনের পর তার [illegible] থামে। সে বিনয়ের পিঠে হাত বুলোয়। দুহাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে। অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে। সে হঠাৎ কাতরোক্তি করে বিনয়কে দুহাত দিয়ে [illegible] দেয়। পারে না।

—ঘুমোলে?

—না। তুমি?

—না। এক গ্লাস জল দাও।

খট্ করে আলো জ্বলে ওঠে। শেফালী সন্তর্পণে দরোজা খুলে বাইরে যায়। বিনয় একটা সিগারেট ধরায়। মশারির বাইরে মুখ বের করে রাখে। শেফালী ফিরে আসে। দরোজায় খিল এঁটে [illegible]। বিনয়ের হাত থেকে খপ করে সিগারেটটা ছিনিয়ে ছাই-দানীর মধ্যে ফেলে দেয়।

—এই নাও জল। মুখ সরাও। কী বিশ্রী গন্ধ সিগারেটের!

ঢকঢক করে জল খেয়ে বিনয় হাত বাড়িয়ে গ্লাস টেবিলের ওপর রেখে দেয়। তারপর মশারির মধ্যে ঢুকে যায়। ঘুম আসছে। স্বচ্ছ মশারির ভিতর দিয়ে শেফালীকে দেখতে পায়। গালে ক্রিম ঘষছে শেফালী। হাসি কী শেফালীর মুখে?

সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে বিনয়ের মনে পড়ল নিতার কথা। সে সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠল না। শেফালীর বালিশে মুখ গুঁজিয়ে গন্ধ শুঁকল। একটা মিষ্টি গন্ধ। মনে মনে সে উচ্চারণ করল: শেফালী আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। আমি বড় ভালবাসার কাঙাল!

অধিকক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না বিনয়। বেলা হয়েছে। মশারি তুলে বাইরে এল।

প্রায় সাতটা বাজে। বাজারে যাওয়া দরকার। শেফালী স্কুলে খেয়ে যাবে। একটা সিগারেট ধরিয়ে চুল আঁচড়ে বারান্দায় এল।

—মা, তোমার জন্যে বাজার থেকে কী আনবো বল। রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বিনয় আড়চোখে একবার শেফালীর দিকে তাকাল। চান করেছে শেফালী। খুব ফ্রেস লাগছে।

—কিছু আনতে হবে না। নীহার বিরস মুখে জবাব দিলেন।

শোবার ঘরের পাশের ঘরটা ড্রইংরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মুখ হাত ধুয়ে এ ঘরে বসল বিনয়। খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলোতে থাকে। মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক দেয়। প্রথম পাতায় একটা ছবি। একটা ট্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে। কলেজ স্ট্রীটে ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ। এলাহাবাদে ক্রুদ্ধ ছাত্রদের আক্রমণে...জমিনিয়ন্ত্রণ ছাড়া দেশের অগ্রগতি...ধান কাটা নিয়ে নানা-স্থানে হাঙ্গামা।...

—তোমাকে কে যেন ডাকছে। শেফালী ঈষৎ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল, সঙ্গে একটা মেয়ে।

বিনয় কোন জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এল। তাকে দেখে নিতা একগাল হেসে বলল, এই আমার বোন। তানিয়া, মাস্টার মশাইকে প্রণাম কর।

—ঠিক আছে। বিনয় এক পা সরে যায়, আসুন নিতাবাবু।

ওদের ঘরে বসিয়ে বিনয় রান্নাঘরে যায়। শেফালীকে চা দিতে বলার সময় লক্ষ করল ও যেন কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মেয়েটার নাম তানিয়া। হ্যাঁ, বেশ সুশ্রী।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নিতা বলল, কাল থেকে তানিয়া আসছে। কেমন?

তারপর একটু হাসল, আমাদের তো পড়াশোনা কিছু হল না! এখন যদি তানিয়া... বলে সে হঠাৎ থেমে যায় শেফালীর চোখের দিকে তাকিয়ে। শেফালী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তানিয়াকে দেখতে থাকে।

পড়াশুনো সম্পর্কে বিনয় দুএকটা প্রশ্ন করল তানিয়াকে। মেয়েটা চুল বাঁধার ধরন বা পোশাক পরিচ্ছদের উগ্রতা একনজরে দেখে নিয়েছে। অতি আধুনিকা।

ওরা চলে যেতে শেফালী চোখ নাচিয়ে হাসল, তোমার নতুন ছাত্রীটি দেখতে বেশ। তোমার খুব টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে দেখা যাচ্ছে।

—কার না টাকার প্রয়োজন। তোমার নেই?

—আছে। শেফালী কি ভেবে বললে, এত পরিশ্রম তোমার সহ্য হবে না। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত স্কুল আর টিউশানী।

বিনয় খবরের কাগজের আড়ালে নিজেকে [illegible] যেন লুকোবে

না, আর টিউশানীর দরকার নেই। শেফালী কী মেয়েটা সম্পর্কে কোনরকম আশংকা করছে?

স্কুলে যাওয়ার আগে শেফালী দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি কী নিমন্ত্রণ সেরে একবার বাবাকে দেখতে যাবে?

—ঠিক নেই। আর যাব কিনা ভাবছি।

—না যাওয়ার কী হোল?

—একা গেলে নানারকম প্রশ্ন করবে। বিশেষ করে তোমার কথা। ওর চেয়ে না যাওয়াই ভাল।

ম্লানমুখ করে শেফালী চলে যায়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বিনয়। যদি শেফালী ওর সঙ্গে যেতে রাজী হোত? সে বারান্দায় কয়েকবার পায়চারী করল। শেফালীকে সে আজও গোপনে অনুসরণ করবে ঠিক করল। মা পুজোয় বসেছেন। দুচোখ বোজা। মার মুখের দিকে বিনয় বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কী ভাবছেন উনি? ঈশ্বর না তাদের কথা? একবার জানতে ইচ্ছে হয়: মাকে ডেকে কী জিজ্ঞেস করা যায় না, কে বড়—আমরা না তোমার ঈশ্বর?

শুনলে মা হেসে ফেলবেন নিশ্চয়ই। বলবেন, পাগল ছেলে আমার!

॥ পঁচিশ ॥

সমস্ত শরীরে তীব্র জ্বালা নিয়ে মীরা অফিস থেকে বাড়ি ফিরল। ঘরে ঢোকার আগে ওদিকে তাকাল। দরোজা বন্ধ। ইদানীং শোভন খুব গম্ভীর। কথাবার্তা কম বলে। অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে। ঘরে খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে। সে সব বুঝতে পারে। কিন্তু এখনও সে মনস্থির করতে পারছে না।

পোশাক পাল্টে মীরা স্টোভ ধরায়। চায়ের জল চাপায়। আজ অফিসে একচোট হয়ে গেছে বীথির সঙ্গে। দুজনের গলার স্বর চরমে উঠেছিল। ছিঃ ডিরেক্টরের কানে পর্যন্ত কথাটা উঠেছে। কাল হয়তো ডাকতে পারেন। জবাবদিহি করতে হবে।

ছোট ছোট চুমুক দেয় চায়ের কাপে মীরা। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নীচে রাস্তায় পথচারীদের চলাফেরা দেখতে থাকে অন্যমনস্কভাবে। বীথি কিছু দিন যাবৎ বিরক্ত করছিল। অথচ ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বলতে ওই ছিল। এখন চরম শত্রু। বিয়ের পর বিশ্রী সাজগোজ করে অফিসে আসছে: কথাবার্তা বা ব্যবহার এখন রীতিমত লজ্জাকর। বিশেষ করে অল্পবয়সী ছোকরা কেরানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অনেক সময় শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এসব তার পছন্দ না হলেও চুপচাপ থেকেছে। কথাবার্তা তো বহুদিন যাবৎ বন্ধ। তার জন্যে অবশ্য কোন ক্ষোভ নেই। প্রথম দিকে খারাপ লাগত। এক অফিসে কাজ। [illegible] পরস্পরের মুখোমুখি

হয়ে যায়। সীমা পাশ কাটিয়ে চলে আসে। কানে ছিটকে আসে আপত্তিকর মন্তব্য। প্রথম দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছে। বাঁধুর দু'চোখ দিয়ে যে ঘৃণা উপচে পড়ছে। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে ফিরে এসেছে নিজের ছোট্ট ঘরে। ভাগ্যিস তার জন্যে আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত। ডিরেক্টরের সেক্রেটারি—অতএব আলাদা ঘর। একই ঘরে বাঁধুর মুখোমুখি বসে কাজ করতে পারত কিনা সন্দেহ।

অফিসে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলত বাঁধুকে। তবু অনেক সময় দেখা হয়ে যেত অকস্মাৎ। আর প্রতিবার বাঁধু দাঁত কড়মড় করে চোখ-মুখ কুঁচকে ছুঁড়ে দিত অশ্লীল মন্তব্য।

সীমাকে কয়েকবার জানিয়েছে। লাভ হয়নি কিছু। যমুনা সীমা পরিষ্কার বলেছে যে, তার কিছু করবার নেই। মনে হয় সে বাঁধুকে মনে-মনে ভয় করে। ঘাঁটাতে চায় না। সীমা ছাড়া আর কাকেই বা বলবে। হেডক্লার্ক বা অন্য কোন সহ-কর্মীকে জানান যায় না। একবার জেনারেল ডিরেক্টরকে জানাবে। এই ভাবা পর্যন্ত। সাহস হয় নি নানা কারণে।

শুধু দূর থেকে কুশ্রী মন্তব্য ছোঁড়া নয়—বাঁধু নানাদিক থেকে তাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তার গোপন জীবন, লোকজনের সংগে তার নাম জড়িয়ে রং-চং মেখে ফলাও করে সহকর্মীদের কাছে বলেছে। তার নামে

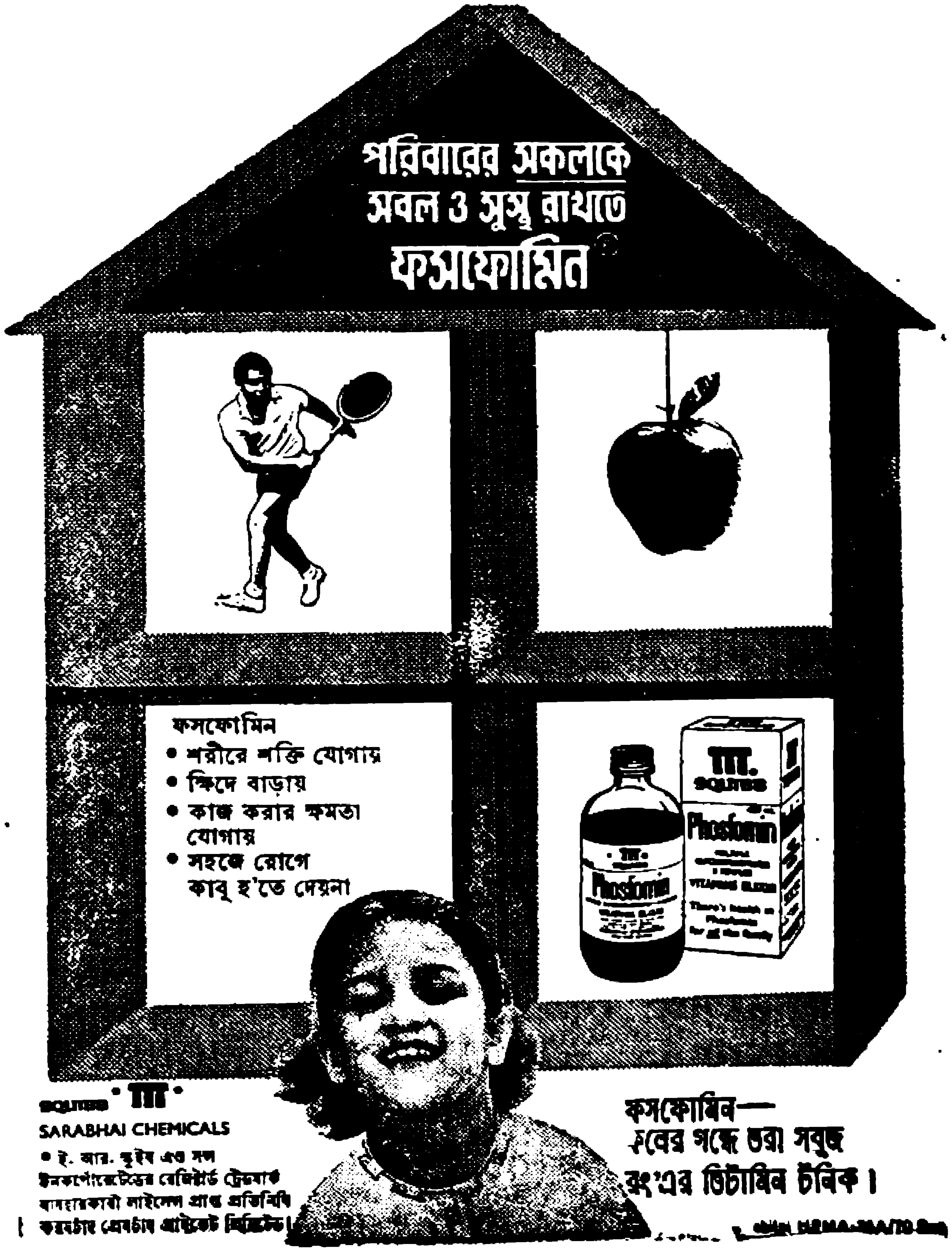

অবনা ভুলের রটেছে। সে সব টের পাচ্ছে। সহকর্মীদের ব্যবহার থেকে তা বোঝা যায়। ওদের বিশেষ দৃষ্টিতে তাকানো, মুখ থেকে চোখাচোখি হলে মুচকি হাসা, যখন-তখন ওর ঘরে ঢুকে অকারণে কথা বলার চেষ্টা, এমন কি চোখের ইসারা—মাঝে-মাঝে ভীষণ রাগ হয়, মুখের ওপর সমুচিত জবাব দিতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত চেপে যায়। আগে তো ওরা এমন ছিল না। সম্মানের সঙ্গে কথা বলত। এখন ওদের চোখে সে খেলো হয়ে গেছে। এর জন্যে বীথি দায়ী।

সেদিন এক ছোকরা, বেশ স্মার্ট চেহারা, কথাবার্তায় চৌখস; কী যেন নাম, সঠিক মনে পড়ছে না, পদবী মনে আছে, মুখার্জি। অফিস থেকে বেরিয়ে মীরা বাস স্টপে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কোত্থেকে যেন মুখার্জি ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। একথা-সেকথার পর দুম করে সিনেমা যাবার প্রস্তাব করে বসেছে। ওর আস্পর্ধা দেখে সে তো তাজ্জব! কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়েছিল। সম্ভবত ওর মনোভাব বুঝতে পেরে মুখার্জির হাসি মুখ ম্লান হয়ে ওঠে। কোন রূঢ় কথা বলে নি মীরা। সংক্ষেপে জানিয়েছে জরুরী কাজ রয়েছে অতএব সিনেমায় যাওয়া সম্ভব না. মুখার্জি চলে যাওয়ার পর বাসে উঠে মীরা অনেকক্ষণ চিন্তা করেছে। এভাবে বীথি তার সর্বনাশ করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে কেন? কী তার অপরাধ? শোভনের জন্যে কী? বীথির দাদা কী ছেলেমানুষ? বীথি কী মনে করে সেই শোভনকে ওদের সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে?

রোজ মুখ বুঁজে সহ্য করে চলে আসে। আজ শোনামাত্র মীরার সর্বশরীরে আগুন জ্বলে যায়। সে বিস্ফারিত চোখে বীথির দিকে তাকিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, কী বললি? আর একবার বলে দ্যাখ, তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

—চুপ কর! বীথি গলায় যতদূর সম্ভব বিষ ঢেলে দেয়, ঢং করে এখানে চাকরী করতে আসিস কেন। রোজগারের তো অনেক রাস্তা আছে।

তারপর বিস্ফোরণ ঘটে যায়। মীরা মুখে যা আসে তাই বলে বীথিকে। দুজনের চিৎকারে শুধু হেডক্লার্ক নয়, অন্যান্য কর্মীকেরা পর্যন্ত ছুটে আসে। ওরা আর একটু হলেই হাতাহাতি শুরু করে দিত। হেডক্লার্ক খুব নিন্দা করে ওদের। ভয় দেখায় এখনই ডিরেক্টরকে গিয়ে জানাবে। শুনে ঘাবড়ে যায় মীরা। তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায় নিজের ঘরে।

পোড়া গন্ধ নাকে আসতে মীরা তাড়াতাড়ি ছুটে যায়। ভাত নামিয়ে হাতা দিয়ে নাড়াচাড়া করল কয়েকবার। জল বসিয়ে দিল। শোভনের কথা মনে পড়ল। কখন আসবে কে জানে। কথা কয়েক দিন থেকে আসছে না। কেউ সান্ত্বনার নিষেধ।

আজকের ঘটনার পর তার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। ছিঃ! সবাই অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে ওদের দেখছিল। রীতিমত সিনক্রিয়েট। দিন-দিন যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, বেশী দিন ওখানে চাকরী করতে পারবে না। উৎপাত ক্রমশ বেড়ে যাবে। সাহস বাড়বে অনেকের। তার সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে অনেকে। কের হয়ত বীথি ঐসব অভাবা মন্তব্য তার দিকে ছুঁড়ে মারবে। এর পর আছেন ডিরেক্টর। কাল ডেকে পাঠালে কী জবাব দেবে সে?

পর্দার বাইরে পায়ের শব্দ। খুট করে তালা খোলার শব্দ। মীরা বিছানা থেকে উঠে বসল চেয়ারে। একটা সিনেমার কাগজ টেনে নিল। শোভন ফিরেছে। অকারণে বুক কেঁপে উঠল। যত দিন যাচ্ছে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে তার মনে। সে কী সত্যি শোভনকে ভালবাসে? কই কোথায় সেরকম অনুভূতি। বরং সমস্ত দিনের কাজের ফাঁকে অনেক দিন মনেই পড়ে না শোভনের কথা। তবে?

—আসতে পারি?

—আসুন। মীরা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। শোভন ঘরে ঢুকলে ওর দিকে একবার তাকাল। গম্ভীর মুখ। চোখাচোখি হলে সে অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। শোভনকে বসতে বলল। চা খাবে কিনা একবার জিজ্ঞেস করল। তারপর স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে জল ফুটেছে কিনা পরীক্ষা করতে থাকে। শোভন চুপচাপ। স্টোভের সোঁ-সোঁ শব্দ। নাকি বুকের ভিতর হৃৎ-পিণ্ডের দ্রুত শব্দ!

—আজ খুব তাড়াতাড়ি ফিরলেন। মীরা একটা মোড়ার ওপর বসে আলুর খোসা ছাড়াতে থাকে।

—অসুবিধা করলাম কী?

—শরীর ভাল নেই বুঝি? এত পরিশ্রম করবেন না। বিশ্রাম করুন কয়েক দিন।

—মীরা, এভাবে কতদিন চলবে?

—চলুক না। এই তো বেশ আছি। মীরা অল্প হাসল, আপনি সব সময় এত গম্ভীর হয়ে থাকেন কেন শোভনবাবু? ভাল লাগে না। ভয় করে আপনার সঙ্গে কথা বলতে। কী হয়েছে আপনার?

—জান না তুমি? উত্তেজনায় ফেটে পড়ল শোভন, খেলা পেয়েছো? জিজ্ঞেস করলেই বল এখনও মন ঠিক করতে পারি নি। তোমার জন্যে বাড়ী-ঘর ত্যাগ করেছি। কী চাই জান না তুমি?

—আমি উত্তেজিত হবেন না। মীরার কণ্ঠস্বর খুব শান্ত, আপনাকে বন্ধু হিসেবে স্বীকার করেছি। আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আমার জন্যে যা করেছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

—ব্যাস। আর কিছু না?

—না। আমি ভেবে দেখেছি শোভন-বাবু। শুধু বন্ধু হিসেবে যদি আমাকে গ্রহণ করতে পারেন আনন্দিত হব।

—এই তোমার শেষ কথা। তবে এত-দিন মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলে কেন?

—ভুল বুঝেছেন আপনি। মেজাজ গরম করবেন না শোভনবাবু। আপনি বড় অসহিষ্ণু। খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু পেতে চান। ওকি উঠছেন কেন। রান্না তো প্রায় হয়ে এল। আজ না হয় একটু তাড়াতাড়ি খেলেন। বসুন। রাগ করে চলে যাবেন না।

কোন কথা না বলে নিঃশব্দে শোভন বেরিয়ে যায়। মীরা চুপচাপ বসে থাকে অনেকক্ষণ। সাত-পাঁচ নানারকম ভাবে। অন্যমনস্কভাবে রান্না শেষ করল। এই ভাল হল। সত্যি। ভুল বোঝাবুঝির চেয়ে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল। এতে দুজনেরই মঙ্গল।

কী হাল্কা লাগছে সমস্ত শরীর! মনে হল অনেক দিন পর ভারমুক্ত হয়েছে সে। বস্তুত শোভন সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে মনে-মনে অশান্তি আর ভাবনায় ছটফটিয়ে মরেছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে রাত্রে। ভেবেছে শোভনের কথা। কিন্তু ওই ভাবনাই সার।

—শোভনবাবু। দরোজায় ওপর মৃদু টোকা মারল কয়েকবার মীরা। অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। না, আসবে না শোভন। অপমানিত হয়েছে। অতএব ফিরে এল সে। খিদে পেয়েছে খুব। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করল। খারাপ লাগছে। শেষ পর্যন্ত ভাতে জল ঢেলে উঠে পড়ল মীরা। দরোজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঠিক এসময় নানারকম চিন্তা মাথায় আসবে। ফলে অনেক রাত পর্যন্ত শুধু এপাশ-ওপাশ করে কাটানো। মাঝখানের কিছু দিন পল্টুর কথা বিশেষ ভাবত না। ইদানীং অভ্যাসবশত প্রায়ই ঘুমের ঘোরে হাত বাড়িয়ে কী যেন স্পর্শ করতে চায়। ঘুম ভেঙে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। দুটো চোখ জলে ভরে ওঠে।

ভোরবেলা চা তৈরী করছে মীরা, তখন সুটকেস হাতে পর্দা সরিয়ে শোভন ঘরে ঢুকল।

—আমি চলে যাচ্ছি মীরা। কখনও ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে ডাকবে।

মীরা কোন উত্তর দিল না। সে জানত শোভন চলে যাবে। একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। পলপল আস্তে-আস্তে

মিলিয়ে যাচ্ছে। সে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। লম্বা-লম্বা পা ফেলে শোভন হাঁটছে। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

চায়ের কাপ রেখে মীরা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। এর পর এখানে থাকা যাবে কিনা সে জানে না। আপনার দাদা কোথায় গেলেন? দু দিন পর কৃষ্ণা প্রশ্ন করবে। কাজ নিয়ে বাইরে গেছে। কিছু দিন পর ফিরে আসবে। যা হোক একটা কিছু বলবে। আসলে বাড়ি-অলার তরফ থেকে কোন আপত্তি না আসলেই হল। আর আপত্তিরই বা কী কারণ থাকতে পারে। নিয়মিত প্রতি মাসে ভাড়া দেবে। তেমন কিছু হলে অন্য কোথাও উঠে যাবে।

যা ভেবেছিল তা নয়। শোভন অভদ্র কোন আচরণ করে নি। এটা ঠিক মনে কোন বদ মতলব থাকলে, পাশাপাশি ঘরে রাত্রি যাপন, অশোভন একটা কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। প্রত্যাখ্যানের পর রেগে যাওয়া বা নাটক সৃষ্টি করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এসব কিছুই হয় নি। নিঃশব্দে শোভন বিদায় নিয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামার সময় মীরা এক পাশে সরে দাঁড়াল। নতুন মুখ। সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নীচে নামতে থাকে। ভদ্রলোকের তাকানোর ভঙ্গি যেন কেমন। ভদ্রলোক আর কি—ছেলে-ছোকরাই বলা চলে। একনজরে দেখে নিয়েছে। তিরিশের নীচে বয়স। নতুন মুখ।

অফিসে পৌঁছে মীরা ভাবল, যে কোন সময় ডাক আসতে পারে। ডিরেক্টরকে হেডক্লার্ক নিশ্চয়ই সবকিছু জানিয়েছে। গতকালের ঘটনা মনে হতেই ভীষণ লজ্জিত হল সে।

তাড়াতাড়ি সে টাইপ করতে থাকে। বীথুর আর কি। লজ্জা-অপমান বলে কিছু নেই ওর। চাকরী চলে গেলে ওর কিছুই হবে না। ওর স্বামী ভাল চাকরী করে। কিন্তু আজ যদি সে বেকার হয়ে যায়, ভাবতেই মীরা শিউরে উঠল, দু হাতের দশটা আঙুল নিশ্চল; কেউ দেখবে না, সেও ফিরে যেতে পারবে না কোথাও। কোন্ মুখে ফিরবে? কোথায় ফিরবে?

—দিদিমণি বড়সায়েব ডাকছেন।

থেমে উঠল মীরা। পা কাঁপছে। ঢক-ঢক করে জল খেল অনেকটা তারপর দুর্বল হাতে সুইং ডোর ঠেলে বাইরে এল। বড়-সায়েবের ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। অনেকবার যখন-তখন এ ঘরে ঢুকেছে। এখন যেন পা সরছে না। সে টের পেল আস্তে-আস্তে তার গলা শুকিয়ে আসছে।

নিঃশব্দে সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল মীরা। প্রথমেই দেখল বীথুকে। মাথা নীচু করে বসে। হেডক্লার্ক টেবিলের সামনে ঝুঁকে ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছে। ডিরেক্টর মিঃ কাপুর মাথা নীচু করে সই করছেন। মীরা আস্তে-আস্তে এগিয়ে যায়।

মিঃ কাপুরের নির্দেশে বীথুর পাশে একটা চেয়ারে বসল মীরা। আড়চোখে বীথুকে একবার দেখল। ডিরেক্টরের মুখ গম্ভীর। কী অপমান! বীথুর পাশে বসতেও তার এমন ঘেন্না লাগছে। হেড-ক্লার্ক ওভাবে তাকাচ্ছে কেন। কী কুৎসিত দৃষ্টি! মীরা বুকের ওপর আঁচলটা ভাল করে জড়ায়।

হেডক্লার্ক ফাইল বগলে মীরার দিকে সামান্য মুচকি হেসে বেরিয়ে যায়। ডিরেক্টর বীথুর দিকে তাকান, আপনার কথা শুনলাম। এখন আপনি যেতে পারেন।

বীথু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এক পলক মীরার দিকে তাকায়। সে বোধহয় কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়। তারপর থমথমে মুখ করে আস্তে-আস্তে হেঁটে যায় দরোজার দিকে।

—কাল কী হয়েছিল বলুন তো?

মিঃ কাপুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মীরা মাথা নীচু করল। চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। হাতের তালুতে ঘাম, এসব নোংরা ঘটনা সে কিভাবে বলবে বড়-সায়েবকে। বীথু অনেক কিছু বলে গেছে। সে যদি সবকিছু খুলে না জানায়, বড়-সাহেব অন্য রকম মনে করতে পারেন। উনি হয়ত তার সম্পর্কে খুব নীচু ধারণা করবেন।

সুতরাং মীরা আস্তে-আস্তে মুখ খোলে। জড়তা একটু-একটু করে কেটে যায়। স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে তার বলার ভঙ্গি। সব শেষে জানাল, অবিলম্বে বীথুর অভদ্র আচরণ যেন বন্ধ হয়। নইলে এখানে কাজ করা শেষ পর্যন্ত হয়ত সম্ভব হবে না।

—দেখুন মীরা দেবী। মিঃ কাপুর গম্ভীর মুখে বলেন, আপনার আচরণে আমি মর্মাহত। আপনি প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে আসছেন। মিথ্যে পরিচয় দিয়েছেন। এটা যে গুরুতর অপরাধ তা আপনি জানেন না। সেবার আমি আপনার বিরুদ্ধে কোন ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশান নেই নি। আপনাকে একটা সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি তার মর্যাদা রাখতে পারেন নি।

ইচ্ছে হল এই মুহূর্তে মিঃ কাপুরের মুখে-রেজিগনেশান-[illegible] চলে যায়।

মীরার সর্বদেহ জ্বলতে থাকে। সে যে অন্য একটি মেয়ের দ্বারা, পদমর্যাদায় যে তার নীচে, সম্পূর্ণ অকারণে দিনের-পর-দিন অপমানিত হচ্ছে, এটা বুঝি কিছু নয়, এদিকটা উনি কোন রকম গুরুত্ব আরোপ করলেন না!

—আচ্ছা, আপনাকে দেখলেই বীথিকা দেবী অশোভন উক্তি করেন কেন?

—আমি তার কী জানি! মীরা সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করল, ওকে জিজ্ঞেস করুন। এ সম্পর্কে অনেক আগেই আপনাকে জানাতাম। জানাই নি কারণ আপনি বিরক্ত হবেন।

—আর একটা কথা। শোভনবাবু সম্পর্কে আপনার কে হন? শোভনবাবু তো বীথিকা দেবীর ভাই, তাই না?

পলকে মীরার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। কী ভেবেছেন উনি? চাকরী করি বলে তার কী কোন মর্যাদা নেই? ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কেন উনি জেরা করছেন? এ প্রশ্নের জবাব সে দেবে না। তার জন্যে যদি উনি অসন্তুষ্ট হন, কিছু করার নেই। সব-চেয়ে খারাপ লাগছে বীথুর আচরণ সম্পর্কে একটি কথাও বলছেন না। অতএব এঁর কাছে সুবিচার আশা করা যায় না।

—কথার জবাব দিন? মিঃ কাপুর ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বলেন, এখানে চাকরী করতে হলে ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে। যদি না পারেন তবে সসম্মানে বিদায় নিন।

হঠাৎ কী যেন হয়ে যায় মীরার। সে নিজেকে সংযত করতে পারে না। ফলে তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ প্রকাশ পেল, আপনি শুধু একটা দিক দেখছেন স্যার। বীথু যে দিনের পর দিন আমাকে অপমান করে যাচ্ছে, সেদিকে কোন দৃষ্টি দিচ্ছেন না। আর আপনি যে সব প্রশ্ন করলেন তার জবাব দেব না। আমার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে কটাক্ষ করবার কোন অধিকার আপনার নেই!

—ঠিক আছে। আপনি যান।

মিঃ কাপুর থমথমে মুখ করে ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়েন। মীরার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। মীরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। তারপর চেয়ার ছেড়ে আস্তে-আস্তে বাইরে আসে। মুখোমুখি হয় হেডক্লার্কের সঙ্গে। ওকে অগ্রাহ্য করে তাড়াতাড়ি ঢুকে যায় নিজের ঘরে। ধপ করে বসে পড়ে চেয়ারে। টের পায় মাথা ঘুরছে। চোখের সামনে দেয়াল কাঁপছে। সে অস্ফুট স্বরে বেয়ারার নাম ধরে ডাক দেয়।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

জল ও বাতাস দূষিত হওয়ার সমস্যা

কয়েকদিন আগে কলকাতায় একটানা প্রায় কুড়ি ঘণ্টা পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ ছিল। খবরটি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বেরিয়েছে এবং বিদ্রূপ মন্তব্যসহ কোনো কোনো কাগজে তা নিয়ে সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ভোগান্তিও কম হয়নি, ফলে কিছুটা সোরগোলও। শুধু কলকাতায় কেন, পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা যেসব শহরে আছে, জল-সরবরাহ বন্ধ হলে সর্বত্রই এমনি সোরগোল হবার সম্ভাবনা। কিন্তু জন-স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন, জল-সরবরাহ ঠিক থাকাটাই পুরো ঠিক থাকা নয়, তখনো অন্য একটি বিষয় নিয়ে আরো ভাবনা-চিন্তা থাকা উচিত। তা হচ্ছে, ব্যবহৃত জল বা নোংরা জল যায় কোথায়? এই শেষোক্ত বিষয়ে বিশেষ কোনো ভাবনা-চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। অথচ বিষয়টি খুবই জরুরী।

ভারতের শহরগুলিতে যে এত সহজে রোগ ছড়ায় তার একটি বড়ো কারণ, নোংরা জল নিকাশের অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। এমনিতেই ভারতের কোনো শহরে সরবরাহ করা জলের পরিমাণ যথেষ্ট নয়, সরবরাহ-কৃত জল পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নোংরা জল নিকাশের এই অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, কল-কারখানা বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানার বর্জিত পদার্থ নিকাশের সমস্যাও এসে পড়ে। শহর বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস দূষিত হওয়ার সমস্যাও। অবশ্য, শেষোক্ত সমস্যাগুলো বিশেষ করে ভারতের নয়, বিশ্বের প্রত্যেকটি শহরের। ধনী দেশ-গুলোতেও কলকারখানার বর্জিত পদার্থ নদী বা হ্রদের জলে ফেলে জলকে বিষাক্ত করে তোলা হয়। সেখানকার বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে নিঃসৃত গ্যাসে। আর গরীব দেশ-গুলোতে শহরের তাবৎ নোংরা জল নদীতে ফেলার ব্যবস্থা। তাছাড়া, গরীব দেশের মানুষ খোলা উনুনে রান্না করে, যা থেকে প্রচুর ধোঁয়া বার হয়। এমনিভাবে তৈরি থাকে জল বিষাক্ত হয়ে ওঠার ও বাতাস দূষিত হয়ে ওঠার হরেক রাস্তা।

তবে আমাদের দেশেও বিষয়টির ওপরে নজর পড়েছে। গঠন হয়েছে কেন্দ্রীয় জন-স্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা সংস্থার, যার অধ্যক্ষ হচ্ছেন এস জে আর্কেইবালা। তিনি বলেছেন, গৃহস্থ বাড়ির নোংরা জল ও বর্জিত পদার্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিকাশ করতে না পারাটাই ভারতের জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হবার সবচেয়ে বড়ো কারণ। তাঁর মতে, এই বিজ্ঞানসম্মত নিকাশব্যবস্থা একটা বাড়তি বোঝা মনে হবার কোনো কারণ নেই। এতে আরো উপকার হবারই সম্ভাবনা, কেননা নিকাশব্যবস্থা থেকে সেচের জল পাওয়া যেতে পারে—নাইট্রো-জেন ফসফরাস পটাশ ইত্যাদি সার-পদার্থ যে জলে প্রচুর পরিমাণে থাকার কথা, মাছের চাষ করলে সে-জল প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনের যোগান দিতে পারে।

কথাটা বলা যতো সহজ, কাজে দেখানো ততো শক্ত। ভারতের আটটি শহরে —যথা আমেদাবাদ, কলকাতা, কানপুর, জব্বল-পুর, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে —এই সংস্থার উদ্যোগে নিকাশীব্যবস্থায় হাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে যতো কথা খরচ হচ্ছে, কাজ ততো নয়, বরাদ্দ অর্থের পরিমাণও সামান্য। বিষয়টি যে জরুরি, এর ওপরে জনস্বাস্থ্য যে অনেক-খানি নির্ভর করছে —এই সচেতনতার এখনো যথেষ্ট অভাব। অথচ দেশটা এত বড়ো যে, খুব ছোট মাত্রাতে কিছু করতে হলেও বেশ বড়ো করে ধরতে হয়।

ভারতে শহর আছে প্রায় ২৩৪০। আধুনিক জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে যেসব শহরে তার সংখ্যা প্রায় ১২০০। মাটির নিচের পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা আছে এমন শহরের সংখ্যা দুই শতেরও কম। আর সবচেয়ে বেশিসংখ্যক লোক বাস করে এমন কুড়িটি শহরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নিকাশী-ব্যবস্থার প্ল্যান্ট আছে মাত্র দুটিতে।

পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের ব্যবস্থা যদি থাকে তাহলে নিকাশীব্যবস্থাও অবশ্যই থাকা চাই। পাইপের মাধ্যমে জল আসছে অথচ নিকাশীব্যবস্থা নেই—তার মানেই রোগ ডেকে আনা। কোনো এলাকার মানুষ যতোদিন জলের জন্যে কুয়ো বা নদীর ওপর নির্ভর করে ততোদিন তারা জল খরচ করে থাকে দৈনিক মাথাপিছু ২০ লিটার মাত্র। কিন্তু পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ শুরু হলেই খরচের মাত্রা বেড়ে যায়, দৈনিক মাথাপিছু ১২০ লিটার। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে নোংরা জলের পরিমাণও। কেন না যতো জল খরচ হয় তার শতকরা ৮০ ভাগই বেরিয়ে আসে নোংরা জল হয়ে। এই নোংরা জল নিকাশ করার যথাযথ ব্যবস্থা

না থাকলেই রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা। এই সোকেজ জল আশেপাশের সমস্ত কুয়ো ও মাটির নিচের অন্যান্য উৎসের জল দূষিত করে তোলে। ফলে পানীয় জলও দূষিত হয়ে যায়।

কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা সংস্থার অধ্যক্ষ অধ্যাপক আর্কেইবালা কিন্তু মনে করেন, আধুনিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি নিকাশীব্যবস্থা গড়ে তোলাটাই ভারতের শহরগুলোতে এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান নয়। সবচেয়ে বড়ো আপত্তি, এতে খরচ খুবই বেশি। তাছাড়া যন্ত্রপাতিগুলো এত জটিল যে, রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা একটা বড়ো সমস্যা। ভারতের শহরগুলিতে তাই প্রয়োজন নিকাশীব্যবস্থার সরলতর পদ্ধতি।

সংস্থার বিজ্ঞানীরা এমনি কতকগুলো পদ্ধতি নিয়ে কাজও করছেন, যাতে খরচ অনেক কম, পদ্ধতি চালু করা ও চালু রাখা উভয় ক্ষেত্রেই। চালু করার খরচ কমে যেতে পারে শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত, চালু রাখার খরচ শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত। প্রচলিত যান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে এ পদ্ধতি ভিন্ন। ভিলাই, বিজয়ওয়াড়া, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি পঞ্চাশটি শহরে এই অভিনব পদ্ধতির নিকাশীব্যবস্থার পত্তন হয়েছে।

ভারতে জলবায়ু উষ্ণ, সূর্যকিরণ প্রচুর—এই দুয়ের ওপরেই নতুন পদ্ধতির নিকাশীব্যবস্থা নির্ভরশীল। যন্ত্রপাতির ব্যবহারও সরল ধরনের, যে জন্যে খুব বেশি অর্থ বা যন্ত্রবিদ্যার জ্ঞান প্রয়োজন হয় না। ফলে এই পদ্ধতি ভারতের যে কোনো পৌরসভার আয়ত্তের মধ্যে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি পদ্ধতির কথা বলা যেতে পারে। এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজন দূরে, প্রকাণ্ড ও অগভীর একটি পুকুর। এই পুকুরেই জড়ো হয় শহরের সমস্ত গৃহস্থবাড়ীর ও কলকারখানার বর্জিত পদার্থ ও নোংরা জল। বর্জিত পদার্থে ও নোংরা জলে আছে প্রচুর জৈব সার আর পুকুরে এসে পড়ছে প্রচুর সূর্যকিরণ। দুয়ের ক্রিয়ায় কিছু দিনের মধ্যেই প্রাণবন্ত শ্যাওলায় ও জীবাণুতে পুকুরটি ভরে ওঠে এবং প্রকৃতিজগতের স্বাভাবিক নিয়মেই বর্জিত জৈব পদার্থগুলোকে জীবাণুরা গ্রাস করে। তখন সেই পুকুরের জল হয়ে ওঠে নির্দোষ। তখন সেই জল অনায়াসেই ছেড়ে দেওয়া চলে। পুকুরের জলে কোনো দুর্গন্ধ হয় না, ফলে লোকালয়ের মধ্যেও এই পুকুর থাকতে বাধা নেই। ভারতের মতো ট্রপিক দেশে এই পদ্ধতি থেকে খুবই ভালো ফল আশা করা চলে।

বছর দশেক আগেও ভারতের কোনো শহরে নিকাশীব্যবস্থার পত্তন করতে হলে জটিল একটি যান্ত্রিক আয়োজন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বসাতে হত ট্রিকলিং ফিল্টার, ক্ল্যারিফায়ার, ডাইজেস্টর ও হরেক রকমের জটিল যন্ত্রপাতি। কিন্তু সংস্থার গবেষণার কল্যাণে সম্প্রতি অনেক সরল ও অনেক কম খরচের পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সংস্থাটি ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, জাতিসঙ্ঘের বিশেষ তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ ডলার (প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা) সাহায্য পেয়েছে।

সংস্থার একটি সমীক্ষা থেকে ভারতের কয়েকটি নদীর জলদেশের অবস্থা সম্পর্কে জানা গিয়েছে যে, শহরের আবর্জনা ও কলকারখানার বর্জিত পদার্থ নদীতে এসে পড়ার ফলে ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় একটা সর্বনাশের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। অধ্যাপক আর্কেইবালা প্রায়ই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন; পানীয় জলের সঙ্গে আগ্রার মানুষের পেটে যাচ্ছে দিল্লীর আবর্জনা। কথাটা আক্ষরিক অর্থে হয়তো সত্যি নয়, কিন্তু যমুনার জল বিশ্লেষণ করলেই টের পাওয়া যায়, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে জলের দূষিত পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি।

নদীর জল দূষিত হওয়ার ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে তার বহু দৃষ্টান্ত ভারতের বিভিন্ন শহরের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। খোদ দিল্লী শহরেই ১৯৫৬ সালে হেপাটাইটিস মহামারী আকারে দেখা গিয়েছিল। তার কারণ ছিল, নজফগড় নালার আবর্জনা-ভর্তি জল যমুনার জলের সঙ্গে মিশে যাওয়া। আর এই ব্যাপারটি ঘটেছিল ওয়াজিরাবাদ ওয়াটার প্ল্যান্টের কাছেই। অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৬৮ সালে বিহারের মুঙ্গেরের কাছে গঙ্গানদীর জলে আগুন ধরে গিয়েছিল। পরে তার কারণ জানা যায়। একটি তেল পরিশোধন কারখানার বর্জিত পেট্রোলিয়ম গঙ্গার জল দূষিত করেছিল।

আমাদের দেশে একমাত্র মহারাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যে কারখানার বর্জিত পদার্থ নদীতে ফেলার সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করা সম্পর্কে আইন নেই। অথচ নদীর ধারে ধারে নিত্যই কারখানা তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন ধরনের—সার, পেট্রো-রসায়ন, কৃষি উপকরণ, ভেষজ, কৃত্রিম তন্তু, রবার, প্লাস্টিক ইত্যাদি হরেক রকম সামগ্রী উৎপাদনের কারখানা। এই ধরনের কারখানা থেকেই নদীর জল সবচেয়ে মারাত্মক রকমের দূষিত হতে পারে। অত্যন্ত কঠোর রকমের আইন না হলে জনস্বাস্থ্যের এই প্রকাণ্ড বিপদকে কিছুতেই রোধ করা যাবে না।

কী করা উচিত তারও দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেই আছে। হায়দ্রাবাদে আছে ভেষজ তৈরির পাবলিক-সেকটর কারখানা। দু-বছরের গবেষণার পরে এই কারখানায় বসানো হয়েছে বর্জিত পদার্থের নিকাশীব্যবস্থা। এই বর্জিত পদার্থে পাওয়া যাচ্ছিল প্রায় ৭০ রকমের বিভিন্ন রাসায়নিক, তার মধ্যে আর্সেনিক থাকত এত বেশি ও এত ঘন যে স্পর্শ করলে আঙুল পুড়ে যেত। এই বর্জিত পদার্থ এমনিতে ছেড়ে দিলে অনায়াসেই শহরের পানীয় জল দূষিত হয়ে যেতে পারত। তারপরে দু-বছরের গবেষণার পরে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি নিকাশীব্যবস্থা বসানো হয়েছে। এই ব্যবস্থায় এক ধরনের শোষককে দিয়ে বর্জিত পদার্থের ক্ষতিকারকতা দূর করা হয়। অনুরূপ ব্যবস্থা উটকামণ্ডের ফটো ফিল্ম প্ল্যান্টে। সেখানকার নিকাশীব্যবস্থার জন্যে খরচ হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা।

দূষিত বাতাস—

জল দূষিত হওয়ার সমস্যা শিল্পায়নে অগ্রসর ভারতে অবশ্যই একটি বড়ো ও তীব্র সমস্যা। সেই সঙ্গে বাতাস দূষিত হওয়ার সমস্যাও কম নয়। বেঁচে থাকতে হলে মানুষের মূল প্রয়োজন তিনটি—খাদ্য জল ও বাতাস। খারাপ খাদ্য ও দূষিত জল বর্জন করার পথ আছে কিন্তু নিঃশ্বাস না নিলেই নয়। ভারতের সমস্যাটা এদিক থেকে আরো বেশী এই কারণে যে, পশ্চিমের একজন মানুষের চেয়ে ভারতের একজন মানুষের নিঃশ্বাসের বাতাস চাই দেড়গুণ বেশি, জল চাই দ্বিগুণ বেশি।

কলকাতা, দিল্লী ও বোম্বাই শহরের বাতাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এই তিনটি শহরের বাতাসেই ধুলোর পরিমাণ বড্ড বেশি। আর ধুলোর পরিমাণ বেশি হওয়া মানেই দূষিত পদার্থের পরিমাণ বেশি হওয়া, কেননা ধুলোর কণাই হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রো কার্বনের বাহক। বাতাসে ধুলোর পরিমাণ থেকেই বাতাসে দূষিত পদার্থের পরিমাণের একটা মাপ পাওয়া যেতে পারে।

শহরের বাতাস দূষিত হওয়ার কারণ, কলকারখানার চিমনির ধোঁয়া ও উনুনের ধোঁয়া ছাড়াও মোটরগাড়ির ধোঁয়া। আমাদের দেশে মোটরগাড়ির সংখ্যা ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো দেশের চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের অবস্থা এত খারাপ যে, নির্গত গ্যাসে কার্বন মনোক্সাইড থাকে প্রায় ৭·৫ থেকে শতাংশ পর্যন্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে আইন আছে যে, নির্গত গ্যাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ কিছুতেই ১·৫ শতাংশের বেশি হওয়া চলবে না। আমাদের দেশে এমন কোনো আইন নেই।

ডিজেল মোটর থেকে তীব্র গন্ধযুক্ত কালো ধোঁয়া বেরিয়ে থাকে। এই ধোঁয়ায় কিন্তু কার্বন মনোক্সাইড একেবারেই থাকে না। তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক পুরনো ইঞ্জিনের ধোঁয়া, যদিও এই ধোঁয়া হয়তো অনেক সময়ে চোখে দেখা যায় না। কলকাতার বাতাস মোটরগাড়ির ধোঁয়ায় যে পরিমাণ দূষিত হয় তা নিউইয়র্ক, শিকাগো, ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের শহরের মতো তুলনীয়। অথচ শেষোক্ত শহরগুলির তুলনায় কলকাতায় রাস্তায় মোটরগাড়ির সংখ্যা অনেক কম।

যেদিক থেকেই দেখা যাক, ভারতের প্রত্যেকটি শহরের জল ও বাতাস সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানার আছে ও করার আছে। কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা সংস্থার তৎপরতাকে এ জন্যে অবশ্যই সাহায্য করা দরকার। বোম্বাই পৌরসভা সম্প্রতি এই সংস্থার হাতে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা দিয়েছেন জল ও বাতাস নিয়ে তিন বছরের একটি গবেষণা চালাবার জন্যে। কলকাতা পৌরসভার এ বিষয়ে কোনো চিন্তা আছে কিনা তার স্পষ্ট কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি।

—[illegible]

ভুবন ডাক্তার

পরিতোষ মজুমদার

ট্রেন থেকে নামে। মনটা খিঁচড়ে উঠলেও কিছুতো ঘোরাঘুরি করে দেখে। বলা তো যায় না, গাড়ীটা এদিক ওদিক কোথাও রেখে হয়তো বা স্টেশনের পাশে খুপরী মতো চায়ের দোকানটায় আড্ডায় বসে গেছে. কিন্তু না, গাড়ী এবং কালী কারোরই পাত্তা নেই। সকালবেলায় ওকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে যাবার সময় পই পই করে কালীকে বলেছিলো ভুবন ডাক্তার গাড়ীটা নিয়ে সন্ধের মুখে স্টেশনে যেন হাজির থাকে। অবশ্য স্টেশনে নিয়ে আসবার সময়েই গাঁই-গুঁই করেছিলো কালী; বৌটার নাকি আবার বাচ্চা হবে। এই নিয়ে বোধহয় বারো-চৌদ্দ বছরের মধ্যে আট-দশবার আঁতুড়ঘরে ছোটা-ছুটি করছে। বিয়েতে বিয়েতেই বৌ-টা মরে যাবে একদিন। আসতে আসতে কালী বলছিলো, বৌ-টা নাকি সেইবার থেকেই ঘ্যানাচ্ছে। কে জানে, হয়তো বা ধর্মদা বাজারের নতুন ডাক্তারের কাছে গেছে। নতুন ডাক্তারের কথা মনে পড়তেই মনটা আরো তেতে ওঠে। ইদানিং ছোট কান্দুয়া এবং বড়ো কান্দুয়ার লোকগুলো নতুন ডাক্তারের ডিসপেনসারীতেই ভীড় করে বেশী। ভুবন ডাক্তারের ডিসপেনসারীটা কয়েন হয়ে যাওয়া প্রৌঢ়ের মাথার মতো দিনের পর দিন ফাঁকা হচ্ছে। যে দু' একজন আজকাল আসে তা'ও যেন নিতান্ত দায়ে পড়ে। হয়তো বা মায়া কাটাতে পারে না বলে।

কিছুদিন আগে হলেও গাড়ীর প্রয়োজন পড়তো না। মুড়াগাছা স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতেই ছোট কান্দুয়া চলে যেতো। কতোটুকুই বা পথ। বড়ো জোর মাইল চার পাঁচ। দেখতে দেখতেই চলে যাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল যেন নিজেরই সংকোচ হয়। আগে স্টেশন থেকে বাড়ী কেন, এ গ্রাম সে গ্রামে রুগীদের দেখতে হেঁটে হেঁটেই গেছে। লজ্জা তো দূরের কথা, সংকোচও বিন্দুমাত্র বোধ হয় নি। কিন্তু ধর্মদা বাজারে নতুন ডাক্তারের ঝকঝকে ডিসপেনসারী, কোলকাতা থেকে আসা পাশ-করা কম্পাউণ্ডার এবং পেছনে ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে বেড়ানো চকচকে গাড়ীটাই যেন সব কিছু উথাল-পাথাল করে দিয়েছে। প্রাণ খুলে গালাগাল দিতে ইচ্ছে করে ভুবন ডাক্তারের। এতো বছর যেন ওর চিকিৎসায় কেউ আর ভালো হয় নি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা স্যুট টাই পরা উঠতি বয়েসের ছোকরা গাড়ী করে ঘুরে বেড়ায় বলে লোকগুলোও ভীড় করে ওর ডিসপেনসারীতে। যতো সব আহাম্মক বেত্তমিজের দল!

একদিন ধর্মদা বাজারের পাশ দিয়ে আসতে আসতে নতুন ডিসপেনসারীটার দিকে নজর পড়েছিলো ভুবন ডাক্তারের। কাঁচের শো-কেস, ওপাশে পরিষ্কার সার্ট প্যাণ্ট পরা পাশ-করা কম্পাউণ্ডার, পাশে ছোট্ট ঘর। রঙীন পর্দা দিয়ে ঘেরা। রুগী দেখার জন্য। ডাক্তারের সামনের কাঁচের টেবিলের ওপর ডাকে আসা বইপত্র আর জার্নালের ভীড়।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডিসপেনসারীটার কথা মনে পড়েছিলো ভুবন ডাক্তারের। খেলের দেওয়াল; ওপরে টিন। প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে কোনরকমে কেরোসিন কাঠের দুটো আলমারী করিয়েছিলো। উই আর ঘুণে ধরে তার কংকালটাই যা অবশিষ্ট। ওষুধপত্রও নেই; দু' চারটে ভাঙ্গা শিশি বোতল। সেই ডাক্তারী জীবনের প্রথম দিকে দশরথ এসে জুটেছিলো। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে কম্পাউণ্ডারী সবই এক হাতে

করে। ইদানিং চোখে ছানি পড়েছে বলে মানুষটা ভালো দেখতে পায় না। ভুবন ডাক্তারই বা কী করবে? বাজারের পয়সা হাতে এসেছে সংসারের পেছনেই ঢেলেছে। তবু সংসারের ফুটো পাত্রে দু' এক বিন্দুও জমা করতে পারে নি। গড়িয়ে পড়ে গেছে। ডিসপেনসারীর সংস্কার করবে কোত্থেকে?

বর্ধমান বাজারে নতুন ডিসপেনসারী করার কথাটা শোনার পর তেমন গা করে নি। এতোদিনকার বাঁধা রুগী; ডিসপেনসারী করলেই কি আর রুগী জুটবে! কিন্তু এখন যেন আস্তে আস্তে নিজের ওপরেই আত্ম-বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছে ভুবন ডাক্তার। ওর ডিসপেনসারীতে বসে ওষুধের পর বিড়ি সিগারেট-খাইয়ে যারা হাসাহাসি করতে করতে যাচ্ছে, না ডাক্তারবাবু, ছোকরার এলেম আছে; ওষুধের দোকান তো নয় যেন কসমেটিকের শো-কেস। সেই লোকগুলোই এখন লুকিয়ে চুরিয়ে নতুন ডাক্তারখানায় ছোটে। অবশ্য মুখে ভাব দেখায় যেন ভুবন ডাক্তার ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন ডাক্তার নেই। অনেক সময় ভুবন ডাক্তার জানতে পারলেও মুখ ফুটে কিছু বলে না। হয়তো অবচেতন মনে ছেলে যাবার যে আশঙ্কাটা রয়েছে, সেটাই ওকে মুখ ফুটে কিছু বলতে দেয় না। রুগীদের মুখে শুনেছে, একটু কাশি কি ঠাণ্ডা লাগলেই নতুন ডাক্তার ধুবুলিয়ার সরকারী হাসপাতালে পাঠায়। এক্স-রে অথবা স্ক্রিনিং করে ছুটো এনে দেখালে তবে ওষুধপত্র দেয়। তাতে নাকি তাড়াতাড়ি সারে। হাসি পায় ভুবন ডাক্তারের। আসলে সব অভিজ্ঞতার অভাব। মেশিন-ই যদি সব বলে দিতে পারে আর ডাক্তারের প্রয়োজনটা কোথায় শুনি। মানুষগুলোও তেমনি, জাঁকজমকের পেছনে পেছনেই ছুটছে।

সকালবেলায় অনেক আশা করে গিয়ে-ছিলো ভুবন ডাক্তার। বেথুয়াডহরীর মল্লিক বাড়ী কি আজকের বাঁধা! ভুবন ডাক্তারের বাবামশায় যখন নিদেন হাঁকা কবিরাজ ছিলেন, তখন থেকে অসুখে বিসুখে মল্লিক বাড়ী ও'র শরণাপন্ন হয়েছে রাতবিরেতে ডাক পড়তো। অবস্থাপন্ন জমিদার। কেউ বললে বুড়োমশায় হেসে বলতেন, পুরোহিত আর ডাক্তার, এ কি আর বছর বছর বদলানোর জিনিস হে! ওরা তো আমাদের এক পুরুষের ডাক্তার নয়—বংশের নাড়ী নক্ষত্র পর্যন্ত জানে! কি গো ভুবন ঠিক বলিনি?

ভুবন ডাক্তার আর কি বলবে? আত্ম-তৃপ্তিতে বুকটা ভরে উঠতো। কিন্তু বুড়ো-মশায়ের ছোট ছেলে বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ফিরে আসার পর থেকে বাড়ীতে নতুন হাওয়া লেগেছে। বসত-বাড়ীটা রেখে বেশীর ভাগ জায়গা জমি বিক্রী করে দিয়ে কোলকাতায় লোহার কারখানা বসিয়েছে। এখন নাকি জমিতে আর লক্ষ্মী নেই; লক্ষ্মী হলো লোহার ব্যবসায়। কিছুদিন আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলো ভুবন ডাক্তার হাওয়া অন্যদিকে বইছে। বুকটাও কেঁপে উঠেছিলো।

এইবারও মল্লিকবাড়ী থেকে ডাকতে আসে নি ওকে। বেথুয়াডহরীর একজন লোক গল্প করতে-করতে খবরটা দিয়ে-ছিল। সেই খবর পেয়েই মল্লিকবাড়ীতে ছুটে এসেছিল ভুবন ডাক্তার। বলা তো যায় না, যা দিনকাল পড়েছে। হাতের কাছে না থাকলে হয়তো বা অন্য কাউকে ডেকে বসবে। ডাক্তারের তো অভাব নেই। সকাল-বেলায় ট্রেন ধরে স্টেশনে নেমে সোজা গিয়েছিল মল্লিকবাড়ীতে। ভুবন ডাক্তারকে দেখে ওরাও কম অবাক হয় নি। একটু অপ্রস্তুত হয়ে হেসেই বলেছিল ভুবন ডাক্তার,—বুড়োমশায়ের শুনলাম শরীর খারাপ; তিন পুরুষের ডাক্তার, ডাকের জন্য অপেক্ষা করলে কি আর চলে?

বড় ছেলে গম্ভীর হয়ে বলেছিল,—বাবা তো এখানে নেই?

—তবে?

—আমরা কোলকাতায় নিয়ে গেছি।

ভুবন ডাক্তার কথাটা শুনে আর কিছু বলে নি। আদর-যত্নে ওরা ত্রুটি না করলেও মনটা বেশীক্ষণ টেঁকে নি। আগের পরি-চিত জগতটা যেন ছেড়ে-ছেড়ে যাচ্ছে। বড় ছেলে পথ-খরচা, সবই দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হাত পেতে সে টাকা নিতে নিজেরই কেমন সঙ্কোচ লেগেছে ভুবন ডাক্তারের। ছোট মনে হয়েছে নিজেকে। তবু নিতে হয়েছে। কি করা! একেই তো ইদানীং রুগীপত্তর খুব কম আসে। দু-একজন যাও বা আসে তা উপায় না দেখে। নেহাৎ-ই বিনি পয়সায় চিকিৎসা করাতে। হাতে যার দুটো পয়সা আছে, সে-ই তো ছোটে নতুন ডাক্তারের কাছে। সমস্ত ট্রেনটাই ভাবতে-ভাবতে এসেছে ভুবন ডাক্তার: নতুন যুগ, নতুন মানুষ। তবে কি ওকে সরে দাঁড়াতে হবে? আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ডাক্তারী করে এই বয়সে যদি সরে যেতে হয় হেরে যেতে হয় কারোর কাছে—তবে? বুকের ভেতরটা ভির-ভির করে ওঠে ভুবন ডাক্তারের। পরক্ষণেই আবার দৃঢ় হয় ভুবন ডাক্তার—না, হেরে যাবে না ও, কিছুতেই সরে দাঁড়াবে না তিল-তিল কষ্ট করে তৈয়ারী পৃথিবীটার থেকে। যেমন করেই হোক, বুঝবে; শেষবিন্দু পর্যন্ত দেখবে।

হঠাৎ সম্বিত ফেরে অলক - ডাক্তারের ডাকে। তাকিয়ে দেখে অলক ডাক্তার গাড়ীর দরজাটা খুলে ওকেই ডাকছে। হয়তো কোলকাতার থেকে আত্মীয়-স্বজন কেউ এসেছিল, তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাড়ীর দিকে চলেছে। কর্তব্যের জন্য আনন্দও লাগে। অর্থাৎ অলকের মত বিলেত ফেরত ডাক্তারও তাহলে ওকে সম্মান করে। পরের মুহূর্তে আবার মনে হয়,—ওকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হয়ত বা করুণা করছে। তাই এগিয়ে গিয়ে বলে,—ঠিক আছে, তুমি যাও। আমার যেতে দেরী আছে।

অলক গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দেয়। এক-রাশ ধুলো উড়িয়ে গাড়ীটা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হতেই হাসি পায় ভুবন ডাক্তারের। অলক ডাক্তারের দেখাদেখি ধার-কর্জ করে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড রিকশা কিনেছিল ভুবন ডাক্তার। ধুবুলিয়ার থেকে। তিন-চার মাসও চড়তে পারে নি। আসলে কালী হল গরু ঠেঙানো গাড়োয়ান। কয়েক মাসেই রিকশাটাকে খানাখন্দে ফেলে শেষ করে দিয়েছে। কেনার সময় যে টাকা ধার করেছিল, এখনো তা শুধে উঠতে পারে নি, সুতরাং মেরামতীর টাকা জোগাড় করবে কোথা থেকে? বর্তমানে তো সম্বল গরুর গাড়ী। তা-ও কালীর বৌয়ের বাচ্চা হয়ে থাকলে তিন-চার দিন ও ঘর ছেড়েই নড়বে না।

বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘ জমছে। টুকরো-টুকরো। বৈশাখের শেষ। যে কোন সময় মেঘগুলো একসঙ্গে জুটে গিয়ে ঝড়-বৃষ্টি নামতে পারে। বৈশাখের মেঘকে বিশ্বাস নেই। কালীর জন্য আর অপেক্ষা না করে রাস্তায় নামে ভুবন ডাক্তার। মাইলটাক না যেতেই হাওয়া দেয়। জোরে-জোরে হাঁটতে শুরু করে ভুবন ডাক্তার। বর্ধমান বাজার আরো মাইল তিনেক পথ। কাঁচা রাস্তা; গরুর গাড়ীর চাকা বসে জায়গায়-জায়গায় গর্ত হয়েছে। গতকাল রাত শেষের বৃষ্টির জমা জল এখনো শুকোয় নি। একবার মনে হয় আত্মাভিমান ছেড়ে দিয়ে অলক ডাক্তারের গাড়ীতে যাওয়াই উচিত ছিল। ছেড়ে দিয়ে ভাল করে নি। ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বেশ বড়-বড়। জুতো জোড়া খুলে হাতে নিয়ে ভুবন ডাক্তার তাড়াতাড়ি পা ফেলে। শুড়-শুড়ি নদীটা নিশ্চয়ই জলে ভরে গেছে। ছোট নদী। সারা বছরই প্রায় শুকনো খটখটে থাকে। মানুষজন হেঁটেই পারাপার হয়। তবে বর্ষার জল পেলেই সেই ছোট নদীটি ফুলে ফেঁপে ওঠে। গতকাল বিকেলে শুড়শুড়ির পার দিয়ে আসতে-আসতে দেখেছে বর্ষার নতুন জলে নদীর বুক টইটম্বুর; আজও রাতে বৃষ্টি হয়েছে!

আদিনা মসজিদের বেদি/পান্ডুয়া। ফটো : শীতাংশু মিত্র

মনে পড়ে ভুবন ডাক্তার যখন খুব ছোট। সামনে [illegible] দোকান ছিল ঠিক ভুবন ডাক্তারের ডিসপেনসারীর জায়গায়। তিন দিন ধরে একটানা বৃষ্টি হয়েছিল। একদণ্ডের জন্যও থামবার লক্ষণ ছিল না। সবাই ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত আকাশটাই না ভেঙে পড়ে। পাড়াগাঁয়ের বুক সেই সময়েই ভেসে গিয়েছিল। [illegible] বাজার জল থই-থই। দোকানের মেঝে পর্যন্ত ভেসে গিয়েছিল।

ভুবন ডাক্তার একটু দাঁড়ায়। আকাশের অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে। অবস্থা বিশেষ জোরালো ঠেকে না। বেলাকিন্তু কোথাও দাঁড়ালে আবার হয়তো বা ঝেঁপে আসবে। অন্ধকার অন্ধ-বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী যাওয়া আরেক ঝক্কি হয়ে দাঁড়াবে। তার ওপর অন্যবেলা যদি কোন রুগী ডিসপেন-সারীতে এসে থাকে! এমনিতেই সারাটা দিন বৃথা গেছে। মল্লিকবাড়ী থেকে হতাশ হয়ে ফিরে আসার ক্ষোভটা ধীরে-ধীরে অপমানের রূপ নিচ্ছে। মনের ভেতর। এতক্ষণ পরে কালীর ওপরে রাগটা যেন আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রাণ খুলে খিস্তি দিতে ইচ্ছে করে।

কয়েকবার পা হড়কে যেতে-যেতে অতি-কষ্টে সামলে নেয় ভুবন ডাক্তার। রাস্তা-ঘাটের যা অবস্থা! এই বয়সে একবার পড়লে হাড়গোড় জোড়া লাগার সম্ভাবনাও কম। বয়েস কালে এর থেকেও অনেক রাতে ঝড়-বাদলের মধ্যে কাঠবেড়ালির মত তরতর করে ছুটেছে। সেই সব দিনের কথা ভাবলে নিজেরই ঈর্ষা হয় ভুবন ডাক্তারের।

আজ দুপুরের ট্রেনে আসার তৃপ্তির আসার কথা। এসেছে কিনা মেয়েটা কে জানে। ক'দিন আগেই ভুবন ডাক্তার একটা পোস্টকার্ড পেয়েছিল। নানা রকম কুট-কামেলার আর কিছু মনে নেই। মেয়েটা কোলকাতায় মামার বাড়ী থেকে কলেজে পড়ে। মামারা লোহার ব্যবসা করে কিছু টাকা করেছে। তৃপ্তিকে কোলকাতায় পাঠানোর খুব একটা ইচ্ছে ছিল না ভুবন ডাক্তারের। ওর মার পীড়াপীড়ি এবং কান্নাকাটিতে এক রকম বাধ্য হয়েই পাঠাতে হয়েছিল। এখন মনে হয় ভালই হয়েছে। ছোট্ট ক্যান্দুয়ায় পড়ে থাকলে মেয়েটা আজকের হাওয়ায় বেড়ে উঠতে পারত না। চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে দিনগুলো পার করে দিয়ে এই বয়সেই দু-চারটে ছেলে-পুলের মা হয়ে বসত। তারচেয়ে পড়া-লেখা করে দাঁড়াক। অন্তত ওর কাছে পৃথিবীটার পরিধি বড় হোক। গতবার যখন এসেছিল, তখনই ভাল লেগেছিল ভুবন ডাক্তারের। একে তম্বী তার ওপর শহুরে পোশাক-আশাকে সুন্দরী-ই দেখাচ্ছিল মেয়েটাকে। সিল্কের ছাপ-ছাপ রঙ্গীন শাড়ী ; ম্যাচ করা ব্লাউজ। মানিয়েছিল ভাল।

ইদানীং মনটা মাঝে-মাঝে খচ-খচ করে ওঠে। তৃপ্তি মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে বেশ হত। যেমন করেই হোক ভুবন ডাক্তার তাকে মেডিকেল কলেজে পড়াত। ধারকর্জ আর ভিটেফোটা বা জায়গা-জমি আছে বন্ধক দিয়ে বিলেত পাঠিয়ে বড় ডাক্তার করে আনত। তারপর নিজের পুরোন ডিসপেন-সারীটা ভেঙে দিয়ে পাকা ডিসপেনসারী করত। ছেলেকে বসাত সেখানে। নিওন আলো, পাশ করা কম্পাউন্ডার আর ঘর ভর্তি রুগী। অলক ডাক্তারের উদয় তখন থাকত কোথায়! বুক ভেঙে একটা দীর্ঘ-শ্বাস বেরিয়ে আসে।

চলার গতি বাড়ায় ভুবন ডাক্তার। বৃষ্টিটা যেন একটু ধরেছে। শোঁ-শোঁ করে বাতাস বইছে। বাতাসের বেগ দেখে বোঝা যায় রাতে আবার জোরতারে বৃষ্টি হবে। মন্দা বাজারে ঢুকতেই অলক ডাক্তারের ডিসপেনসারী; গাড়ীটা রাস্তার ধারে দাঁড়ান। ডিসপেনসারীর ভেতরের বেঞ্চী দুটো রুগীতে ভর্তি। অলক ডাক্তারের দম ফেলার ফুরসৎটুকু পর্যন্ত নেই। পাশ-করা কম্পাউন্ডারটা কাউন্টারের এপাশ থেকে ওপাশে মাকুর মত ছোটাছুটি করছে। নিওনের আলোয় ঝলমল করছে পুরো ডিসপেনসারীটা। তাড়াতাড়ি পা চালায় ভুবন ডাক্তার। নিজের ডিসপেনসারীর কাছে এসে দাঁড়ায়। টিমটিম করে জ্বলছে কেরো-সিনের বাতিটা। টাকা থাকলে ইলেকট্রিক নিত ভুবন ডাক্তার। দোকানের পাশ দিয়ে লাইন গেলেও কানেকশান নেওয়ার মত

পায়ে দিয়ে অবাধ আরাম...
দু রঙের অভিনব সমাবেশ
স্যানডাক*
পাপিয়া
কোমলন*
সাইজ ২-৬
১০.৯৫

CENTRAL LIBRARY

টাকা কোথায়! দশরথটা চুলের ওপর বসে বসে ঢুলছে। শূন্য ডিসপেনসারীটা। একটাও রুগী আসে নি। ডিসপেনসারীতে ঢুকতে গিয়ে নজরে পড়ে দরজার ওপরে লাল ত্রিকোণের বোর্ডটা। ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বিজ্ঞাপন। এতক্ষণের চেপে-থাকা আক্রোশ যেন দশরথের ওপরেই ফেটে পড়ে—দশরথ!

থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায় দশরথ।

—আজ্ঞে ডাক্তারবাবু?

দরজার গায়ের লাল ত্রিকোণের বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে ভুবন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে, —এটা কে লটকেছে?

—ব্লক ডেভেলাপমেন্টের অফিস থেকে মেরে দে গেছে বাবু!

—বারণ করতে পারলি নে? আমি সেই বলে কি মরে গেছি?

—বারণ করেছিলাম বাবু। বলল, এই বিজ্ঞাপন নুতন হাওয়াখানাতেও মেরেছে।

—তা মারুক গে। এটা কি কোন শালার বাপের ডিসপেনসারী?

—তাছাড়া বাবু লোকগুলো বলল, মারতে না দিলে দোকান বন্ধ করে দেবে বি ডি ও।

দোকান বন্ধ করার কথায় আগুনে যেন জল পড়ে। চুপ মেরে ভুবন ডাক্তার গিয়ে বসে হাতল-ভাঙা চেয়ারটাতে। মাথার ভেতরে অসংখ্য পোকা যেন হিজিবিজি খেলে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে দশরথ ডাকে,—ডাক্তারবাবু?

—কি বলছিস?

দিদিমণি দুপুরের ট্রেনে এয়েছে।

—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে মা দুই ডাকতে পাঠিয়েছিল। বলে গেছে, এলে পরেই বাড়ী পাঠিয়ে দিতে।

—কেন রে?

দিদিমণির শরীরটা নাকি ভাল নেই।

আলমারীর কোণ থেকে পুরনো ছাতাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ী আসে। ঘরে ঢুকে দেখে তৃপ্তি শুয়ে আছে। মুখটা ম্লান দেখাচ্ছে। ভুবন ডাক্তারের স্ত্রী ওকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুবন ডাক্তারের বুকটা কেঁপে ওঠে। একে শহরে পরের কাছে থাকে, তার যা দিনকাল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিছুদিন আগেকার একটা দৃশ্য। ভুবন ডাক্তার স্টেশনে গিয়েছিল। সকালবেলায়। শেষ রাতেই নাকি ট্রেনের তলায় মেয়েটা গলা দিয়েছিল। মুখপোড়ার মেয়ে। কথাটা চাউর হয়ে গিয়েছিল, মাস চারেক পেটে ধরে কুমারী মেয়েটা অন্য কোন পথ খুঁজে না পেয়ে নিজেকেই শেষ করে দিয়েছিল। তবে কি? তৃপ্তির কথা ভাবতে গিয়েও শিউরে ওঠে ভুবন ডাক্তার।

রাত শেষ হয়েছে। বর্ষাও জোরে নেমেছে। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত অলক ডাক্তারের নামটা মনে পড়ে যায়। আধুনিক ডাক্তার। হয়ত বা এই অন্ধকারে কোন পথ দেখালেও দেখাতে পারে। ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভুবন ডাক্তার। ধর্মদা বাজারের পাশেই অলক ডাক্তারের বাড়ী। অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে কড়া নাড়ে ভুবন ডাক্তার।

—কে?

গলার স্বরে বুঝতে পারে চাকর-বাকর কেউ হবে বোধহয়।

কাঁপা গলাতেই জিজ্ঞাসা করে ভুবন ডাক্তার,—অলক বাড়ী আছে?

—হ্যাঁ, আছেন।

—একটু ডেকে দিতে পারো?

—দাঁড়ান, দিচ্ছি।

একটুক্ষণ পরে অলক ডাক্তার বেরিয়ে এসে ভুবন ডাক্তারকে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—কী ব্যাপার ডাক্তারবাবু? এত রাত্রে?

—তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম।

—তা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? বাড়ীর ভিতরে আসুন।

—মেয়েটার অসুখ; তুমি যদি একটু আসো—।

—নিশ্চয়ই যাবো। দাঁড়ান আমি আসছি।

অলক ডাক্তার বাড়ীর ভেতরে গিয়ে স্টেথোটা নিয়ে এসে বলে,—চলুন ডাক্তারবাবু!

ভয়ে ভয়ে রাস্তায় কিছু বলে না ভুবন ডাক্তার।

অলক ডাক্তার ঘরে ঢুকলে তৃপ্তির মা ডাকে,—তৃপ্তি ওঠ, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

অলক বাধা দেয়,—থাক থাক। ডাকবার দরকার নেই।

এক এক করে পরীক্ষা শেষ করে অলক ডাক্তার হাসে।

ভুবন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে,—কি দেখলে ডাক্তার?

—কিছু না। সিম্পল এ কেস অফ এমেনোরিয়া। ভয় পাবার কিছু নেই।

বুকের ওপরকার এতক্ষণ ঝেঁকে বসে-থাকা জগদ্দল পাথরটা যেন সরে যায়। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য আবার জিজ্ঞাসা করে ভুবন ডাক্তার,—তুমি বলছো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডোন্ট ওরি ফর হার।

খস খস করে একটা সাদা কাগজে কয়েকটা ওষুধের প্রেসক্রিপসন লিখে ভুবন ডাক্তারের হাতে দিয়ে বলে,—ডাক্তারবাবু, আমার ডিসপেনসারীতে ওষুধগুলো আছে। কাল কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নেবেন। আর হ্যাঁ, কয়েকটা দিন মেয়েকে আপনাদের কাছেই রেখে দিন। সুস্থ হলে তবে কোলকাতায় পাঠাবেন।

ভুবন ডাক্তার প্রেসক্রিপসানটা হাতে নিয়ে অলক ডাক্তারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলে, — কেমন বলেছিলাম না যে অলক ডাক্তার ভাল। দেখলে তো? নইলে এমনি এমনি কি আর অতো লোক ভিড় করে ওর ডিসপেনসারীতে?

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

প্রদর্শনী পরিক্রমা

গত ডিসেম্বর মাসে জব্বলপুরে 'কলা-নিকেতনের' সরকারী আর্ট গ্যালারীতে শিল্পী সুরেন্দ্র চন্দের একটি একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়।

শিল্পী কলকাতার সরকারী কলা-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে ইনি জব্বলপুরে নিবাসী। দেশী ও বিদেশী শিল্পরীতিতে তিনি পাঠ নিয়েছেন। তাঁর ছবিতেও নানা শিল্প-রীতির সমাবেশ দেখা গিয়েছিল। বিভিন্ন মাধ্যম নিয়েও কাজ করেছেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ওয়াশ থেকে প্যাস্টেল, টেম্পারা, গ্রাফিক সবকিছু চর্চার ফলাফল প্রদর্শনীতে পাওয়া গিয়েছিল। ফিগারেটিভ ও নন্-ফিগারেটিভ রীতির কাজেও তাঁর দক্ষতা দেখা গিয়েছে। তাঁর 'অন্যমনা' 'গাছের এলোর' 'ঘুড়ি' প্রভৃতি ছবিগুলি রসিকজনের প্রশংসা লাভ করে।

•

বিড়লা অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১ থেকে ১৭ জানুয়ারী কলকাতার আধুনিক শিল্পীদের ৬৪ খানি ছবি ও ভাস্কর্যের একটি সুসজ্জিত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। ছবিগুলির বেশ কয়েকখানি ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখানো হয়ে গেলেও আধুনিক শিল্পীরা কত বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন তার নানা ধরনের নিদর্শন একত্রে দেখা গেল। বিমূর্ত, মূর্তা-ভাস, সুররিয়ালিস্টিক বা রিপ্রেজেন্টেশনাল সব রকম কাজের নমুনাই এখানে রাখা হয়। বিমূর্ত কাজের মধ্যে বীণা ভার্গবের দুখানি মাঝারি ক্যানভাসে জোরালো হলুদ, লাল, নীল, বাদামী ও কালোর প্রয়োগ দেখবার মত। প্রকাশ কর্মকারের ধূসর ও লালের সমন্বয়ে 'পোর্ট অব দি ভোজন' ছোট কাজ হলেও অতি সুবাক্ত কাজ। নির্মল দত্তের দুখানি নিদর্শনের মধ্যে 'টেম্পেস্ট' ছবিতে মাটির গন্ধ সুন্দর লাগে। ঈশা মহম্মদের 'ব্যাপটিজ লোড' উজ্জ্বল। রঙের কলা চতুষ্কোণ কম্পোজিশন। অমরেন্দ্র লাল চৌধুরীর দুখানি ড্রয়িং 'টয়লেট' ও 'দি উয়োমান' হাল্কা রঙের জমির ওপর আঁকা সূক্ষ্ম রেখাচিত্র—খানিকটা লোক-শিল্পের গঠনের ছাপ পাওয়া যায়। রহিম মূল্লের স্টিল লাইফখানি কড় রীতি ঘেঁষা চমৎকার কাজ ও অত্যন্ত সরলীকৃত ফর্ম এবং রঙের উজ্জ্বলতা ও গভীরতার প্রয়োগ বেশ সুচিন্তিত। মাধবী পারেখের কাঁথার প্যাটার্ন করা 'ডিভোজ গড' একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। অমিতাভ ব্যানার্জি ও সনৎ করের গ্রাফিক এবং সুনীল মাধব সেনের 'রথযাত্রা', যোগেন চৌধুরীর একসপ্রেসনিস্টিক ছবি অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ।

ভাস্কর্যের মধ্যে সুভাষ রায়ের কাঠের কাজ 'ফ্যামিলি' ও প্রভাস সেনের দুটি ফিগার নিয়ে কম্পোজিশন বেশ জোরালো কাজ। রঘুনাথ সিংহ ও মানিক তালুকদার উল্লেখযোগ্য দুটি কাজ উপস্থিত করেন।

•

গায়ত্রী রায়চৌধুরী কলকাতা তথ্য-কেন্দ্রে ১৭ থেকে ২০ জানুয়ারী ১০খানি পেন্টিং ও কয়েকটি জলরঙের ছবির প্রদর্শনী করেন। জলরঙের ছবির মধ্যে ক্যাথিড্রালের স্টাডিটি সুন্দর। পেন্টিংগুলির মধ্যে অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পোজিশনের মধ্যে কিছু ডেকরেটিভ ফিগার দাঁড়িয়ে কতকটা অর্ধ-নগ্ন মূরালের এফেক্ট তৈরী করা হয়েছে, কোথাও বা লোকশিল্পের ছাপও কিছুটা আছে যেমন, 'অল অ্যাবাউট এ নিউ বর্ন বেবী' তবে 'হাউস' ছবির মধ্যে কিছুটা নাটকীয়তা আছে এবং 'টকিং বার্ডস' ছবিটির গঠন পদ্ধতি ও চাপা টোনের কাজ প্রশংসনীয়।

•

৫২ নম্বর চৌরঙ্গী রোডের দোতলার একটি ঘরে 'গ্যালারী ৫২' বলে নতুন একটি গ্যালারী খোলা হয়। ১৬ জানুয়ারী এখানে কাতায়ুন শাকলাত ও বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি ও জেনি বিলিমোরিয়ার সেরামিকসের প্রদর্শনী খোলা হয়। শ্রীমতী শাকলাতের তিনখানি স্টিল লাইফ উজ্জ্বল কাজ, বিকাশ ভট্টাচার্যের 'হিউম্যান পিজিয়ন হোল' কলকাতার পুরনো ফ্ল্যাটবাড়ি নিয়ে চমৎকার ছবি তাঁর বহু দেখা কম্পোজ পেন্টিং 'ওয়াইপিং হ্যান্ড' কন্টেম্পরারী সোসাইটির প্রদর্শনীতে ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে। জেনী বিলিমোরিয়ার ৫০খানির মত সেরামিকসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জার, কাপ, মুখ-রচিত রাখার পাত্র এবং কয়েকটি চিত্রিত প্লে স্লেট সুন্দর কাজ। গ্যালারীটি শনি ও রবিবার সকাল ও সন্ধ্যায় খোলা থাকে।

•

টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকার তরফ থেকে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে যোলজন শিল্পীর ৩২খানি ছবির একটি পরিচ্ছন্ন প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীতে কিছু পুরনো ছবি ছিল, তবে প্রদর্শনীটির প্রধানকেন্দ্র হল দিল্লী। কলকাতায় বাছাই করার সময় কিছু পূর্ব প্রদর্শিত ছবি থাকাই স্বাভাবিক। রবীন মণ্ডলের ফিগারেটিভ ফর্ম নিয়ে তৈরী অ্যাডাম ও ইভ বা হরিণগ্রেড কিম্বা নীরদ মজুমদারের শেষ বসন্ত সিরিজের দুখানি ছবি বা নির্মল দত্তের কয়েক ছবিটি পূর্ব-দৃষ্ট হলেও দ্বিতীয় দর্শনে খারাপ লাগে নি। রহিম মূল্লের 'স্টেয়ার কেস টু হেভেন'এ অনেকখানি সবুজ জমিকে সুন্দরভাবে অন্য বর্ণের সহায়তায় গ্রথিত করা হয়েছে। কোথাও হয়ত গগনেন্দ্রনাথের রীতির আমেজও পাওয়া যায়। প্রকাশ কর্মকারের 'ক্যান্ডল' ছবির পেন্টিং ও রঙবেরং উপ-স্থাপনা পরিচ্ছন্ন তবে একটু মোটা করে আউটলাইন করা। সুনীলমাধব সেনের খালি পাথরের জমিতে অঙ্কিত ধূসর বর্ণের পাখি কতকটা রূপকথা চিত্রের মত। সুলতান পালের 'পেন্টিং ২' এর অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম সবুজ ও ধূসরের সমন্বয় প্রশংসার যোগ্য। হেমন্ত মিশ্রের 'রেডিয়্যান্ট টাইমিং' ও 'হোয়াইট ভাভ' একটু সস্তা সীন পেন্টিং-এর মত লাগল। স্বপনেশ চৌধুরীর দুখানি অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পোজিশনের রঙের এফেক্ট সুন্দর।

•

অ্যালিয়াঁস ফ্রাঁসেজের সরু বারান্দায় অতি অল্প আলোকে মুকুন্দলাল ভাদুড়ীর ১৪ খানি ছবি নোটিশ বোর্ডের আশে-পাশে ২৫ জানুয়ারী থেকে ৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়। কোন একটি হাল্কা রঙের জমির ওপর জুয়েলারির মত কালো রঙের ডেকরেটিভ প্যাটার্ন বসে কেন্দ্রীয় ভাল ছবি তৈরী। এতে খানিকটা স্টেন্ড গ্লাসের ছবির মত লাগে। একটি দুটি কাজ দেখতে ভাল লাগলেও একসঙ্গে অনেকগুলি এই ধরনের ছবি একটু একঘেয়ে লাগে। তবে তাঁর পেন অ্যান্ড ইঙ্ক ড্রয়িং যে অনেকখানি কাগজ ছেড়ে কাজ করায় প্রদর্শনীতে কিছু বৈচিত্র্য এসেছে। কালো জমির ওপর লাল ষাঁড়ের মূর্তিটি সুন্দর। এছাড়া ১৫ নম্বরের 'মুখ' এবং ১৭ নম্বরের এক মহিলার প্রতিকৃতি বেশ স্বভাবানুগ কাজ হয়েছে।

•

উত্তর কলকাতা চিত্রকলা পরিষদ ২২।২ এ বাগবাজার স্ট্রীটের মুক্ত অঙ্গনে নবীন, প্রবীণ, পেশাদার ও অপেশাদার শিল্পীদের নিয়ে ৪০ খানির ওপর চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করেন। উত্তর কলকাতার সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিল্পীদের যোগাযোগ স্থাপন ও স্বল্পমূল্যে ক্রেতাদের কাছে শিল্পবস্তু পৌঁছে দেবার উদ্যোগে এই নানারকম অশান্তির মধ্যেও যে এঁরা কাজে নামবার সাহস করেছেন, শুধু সেই জন্যেই তাঁদের প্রশংসা করতে হয়।

প্রবীণ শিল্পী শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরীর প্যাস্টেলে করা গৃহিণী, ভক্তি রায়ের বুদ্ধের প্রতিকৃতি, অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর স্টিল লাইফ কামাইলাল দত্তের 'পিস অব হ্যাপার' ও অশোক দুখোরিয়ার সুর রিয়ালিস্টিক 'বিয়ন্ড দি হোরাইজন' প্রদর্শনীর উল্লেখযোগ্য ছবি। অজিত দত্তের সজিব ফ্লাওয়ারের প্যাটার্ন এবং তাপস ভট্টাচার্যের ছোট কয়েকটি পারিত মূর্তি

প্রশংসার যোগ্য। ২৪ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারি অবধি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

•

২৭ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের পশ্চিমের গ্যালারিতে প্রভাত সেন, বিশ্বনাথ ব্যানার্জি ও শ্রীমতী অঞ্জলি রায় ২২ খানি তেল রং ও জল রঙের ছবির প্রদর্শনী করেন। সব কটি ছবিই রিপ্রেজেন্টেশনাল তবে বেশীর ভাগ কাজই স্কেচ ঘেঁষা এবং খিলেন পরিণত নয়। প্রভাত সেনের পার্বত্য দৃশ্যের জল রঙে আঁকা ছবিগুলি একটু একঘেঁয়ে। তবে তাঁর 'ছাদ' ও বাগবাজারের দৃশ্যের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বিশ্বনাথ ব্যানার্জির দুটি গ্রামের দৃশ্যের তেল রঙের কাজ মন্দ নয়। 'ওয়েটিং ফর দি গেস্ট'এর গ্রাম্য রমণীমূর্তি একটু ক্যালেন্ডার ঘেঁষা। অঞ্জলি রায়ের একটি স্টিল লাইফ ও আলোছায়াময় নিসর্গ দৃশ্য চলনসই।

উক্ত তারিখে দক্ষিণের গ্যালারিতে শ্রীমতী অঞ্জু চৌধুরীর ত্রিশখানির মত এচিং ও সিল্ক স্ক্রীনের কাজ প্রদর্শিত হল। কমনওয়েলথ বৃত্তি পেয়ে শিল্পী ইংলণ্ডে যান। বর্তমানে তিনি প্যারিসে উইলিয়াম হেটারের স্টুডিওতে কাজ করছেন। কিছুকালের জন্যে স্বদেশে ফিরে এই প্রদর্শনীটির আয়োজন করেন।

শ্রীমতী চৌধুরী অ্যাবস্ট্রাকশনের চর্চা করছেন। ছবিগুলি সবই রং এবং ডিজাইনের পরীক্ষা হিসেবে করা। তাই একই ডিজাইন নানা বর্ণে ছেপে রঙের পরীক্ষা করা হয়েছে। এরই মধ্যে 'অরেঞ্জ ওয়াল' 'স্কোয়ার অ্যাণ্ড স্পেস' 'দি ব্লু স্কোয়ার' 'ফলিং ফর্মস' 'ব্লু অ্যাণ্ড অরেঞ্জ' প্রভৃতি ছবির নীল, মভ, হলুদ, সবুজ, কালো বা ধূসর কিম্বা কমলা রঙের হার্মনি দর্শনীয় হয়েছিল।

•

দক্ষিণের আরেকটি গ্যালারিতে বিকাশ সেনগুপ্তের ছবি ও শ্রীমতী অধিকারীর হস্তশিল্পের এক প্রদর্শনী হয়। শ্রীসেনগুপ্তের কাজও অ্যাবস্ট্রাকট বা ডেকরেটিভ ফিগারেটিভ। রং ছাড়াও কাঠের টুকরো, কাচ বা ম্যাসোনাইট ইত্যাদির ব্যবহার করা হয়েছে। খুব নিম্নগ্রামের ধূসর থেকে উচ্চগ্রামের লাল নীল রং ব্যবহার করা হয়। পরিণত কাজের মধ্যে রূপসী বাংলার শাদা ও সবুজের প্যাটার্ন উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী অধিকারী মেয়েদের অনেকগুলি বর্ণাঢ্য পোষাক পর্দা এবং কাঠের বিভিন্ন ধরনের কাজ উপস্থিত করেন। তার মধ্যে একটি স্ক্রীন বিশেষ শ্রমসাধ্য কাজ।

৩ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি বি আর পানের পশ্চিমের গ্যালারিতে ২৪খানি জল রংয়ের ছবি ও কয়েকটি স্কেচের প্রদর্শনী করেন। বেশীর ভাগ ছবিই নিসর্গ দৃশ্য, রং ভারী উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছন্দ তিনি জমির ওপর পরিচ্ছন্ন জল রংয়ের কাজ। কাগজ ছেড়ে জলের একেবারে কয়েকটি ছবিতে সুন্দর ফুটেছে। তাঁর ১, ৩, ১২ ও ১৭ নম্বরের ছবির বিশেষভাবে নাম করতে হয়। শিল্পীর কাজে যে নিরলস নিষ্ঠা আছে তা কারো চোখ এড়ায় না।

•

২১ থেকে ২৮ জানুয়ারি ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে একটি বিশেষ ধরনের প্রদর্শনী হয়। আমেরিকার বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের উল্লেখযোগ্য উক্তির ওপর কয়েকজন শিল্পীর করা ২৪খানি মুদ্র গ্রাফিক প্রদর্শিত হয়। প্রতিটি কাজেই শিল্পীদের মৌলিকতা এবং সৃজন শক্তির নিদর্শন দেখা যায়। তারও মধ্যে বিল ব্রুকান-এর লোকজের উক্তিটি শাদার ওপর শাদার অত্যন্ত সংযতভাবে অথচ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হার্ডিকজের মৃত্যুবরণ সম্পর্কিত উক্তির তিনটি ছবিই অতি আকর্ষণীয় হয়েছিল।

—চিত্ররসিক

অঙ্গনা

নূতন সম্পর্ক : স্বামী-স্ত্রী

সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এ হলো স্বতঃসিদ্ধ। পার্থিব নিয়মে এর নড়চড় নেই। কিন্তু কখনও কখনও মজ্জাগত সংস্কারও স্বতঃসিদ্ধের মতোই প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। ঠিক এমনটি হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বেলায়। স্ত্রী সবসময় স্বামীর অনুগত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। পার্থিব নিয়মানুসারী না হলেও সংস্কার প্রসূত এই স্বতঃসিদ্ধটি এতদিন প্রভুত্বের ছড়ি ঘুরিয়েছে দোর্দণ্ড প্রতাপে। সবাই বিনা প্রতিবাদে এর কাছে দণ্ডবৎ জানিয়ে সংসার ধর্মে প্রবিষ্ট হয়েছে। কোন প্রতিবাদ বা জেহাদ তো দূরের কথা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করার ক্ষমতা কারো ছিল না।

হালফিল অনেক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মের এই লৌহ নিগড়ও কিছুটা শিথিল হয়েছে। স্ত্রীকে আজ আর স্বামীর প্রতি ততখানি আনুগত্য প্রকাশ করে চলতে হয় না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রসারই এই সংস্কারজাত নিয়মের শিথিলতার জন্য অনেকখানি দায়ী। আর সবকিছুর মূলে হচ্ছে শিক্ষার প্রসার। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হলে বা মনান্তর তীব্র হলে বিবাহ-বিচ্ছেদের সহজ সুযোগটি এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের সুফল ও কুফল নিয়ে বিরাট বিতণ্ডার সৃষ্টি হতে পারে। সে বাদানুবাদে প্রবেশ না করেও এটুকু বলা চলে যে, স্ত্রীর উপর স্বামী পুরুষের একচেটিয়া প্রভুত্বের বিরুদ্ধে শানানো অস্ত্র একখানি আমাদের হাতে আছে। তার সুপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ স্বতন্ত্র ব্যাপার।

স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রভুত্বের মনোপলির উজ্জ্বল শিখাটি এখন আর ঠিক সেরকম কিরণ ছড়ায় না। কিন্তু প্রচলিত সংস্কার এখনো আমাদের অস্থিমজ্জায়। তাই স্বামীর প্রতি স্বভাব আনুগত্য আমাদের এখনো বদলায়নি। সেই বহতা স্রোতের অনুকূলে পরিবেশ দিব্যি চলছে। এর পরিবর্তন হতে এখনও ঢের দেরি। আর শহর এবং গ্রামে এ ব্যাপারে আসমান-জমিন ফারাক। সংস্কারের পলেস্তারা খসে পড়ছে শহরে। স্বামীরা এখানে অনেকটা সময়ে গেছেন। এখানে স্ত্রীর সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবী করার ভরসা তাঁরা পান না। কিন্তু এই পরিবর্তন সম্পূর্ণের সিকি ভাগেরও কম। তাই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্বামীদের প্রভুত্বের রবরবা এখনও অখণ্ড।

তবে এখন আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে সমানাধিকার পর্যন্তই এগুতে চাই। তার বেশি আর নয়। অর্থাৎ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের একেবারে নিলুণ্ঠিতসাধন। এটুকু হলেই স্বামীকুল একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে। তার জের কোথায় গিয়ে মিটবে বলা শক্ত: কিন্তু এটুকু আমাদের আশু কর্তব্য। না হলে পৃথিবীর অগ্রগতির তালে আমরা ঠিক ঠিক পা ফেলতে পারবো না।

দেশে দেশে ইতিমধ্যে পরিবর্তনের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। বিশ শতকের শেষ দশকে এক বিরাট পরিবর্তনের সংকেত ধ্বনিত হচ্ছে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তা অনুধাবন করলে মর্মার্থটা হলো যে, নতুন যারা স্বামীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হচ্ছেন তারা যেন সতর্ক থাকেন। কারণ, পুরোনো হালচাল বিলকুল বদলে যাচ্ছে। আর তারাই হয়তো হবেন এই পরিবর্তনের প্রথম শিকার।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে গেছে জাপান। দূর প্রাচ্যের এই দেশ স্ত্রীকুলের নব-অর্জিত মহিমায় সর্বাধিক সমুদ্ভাসিত।

অথচ এ দেশের মহিলারা ছিল প্রায় আমাদেরই সমগোত্রীয়। এঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কেউ কোন দিন চিন্তাও করেনি। এই সেদিন পর্যন্ত জাপানের মেয়েরা পুরুষের আনুগত্যের মধ্য দিয়েই জীবন কাটাতো। তাদের সারা জীবনই আনুগত্যের এক অখণ্ড প্রমাণ। অবিবাহিত জাপানী মহিলা মা-বাবার অভিভাবকত্বে বেড়ে উঠতো। বয়স হলে বিয়ের পালা। মা-বাবা বিয়ে দিতেন। এঁদের অভিভাবকত্ব থেকে আর একজনের অভিভাবকত্বে তার হস্তান্তর ঘটতো মাত্র। দাম্পত্য জীবনে স্বামীর প্রতি তার পূর্ণ আনুগত্য। স্বামীর দেহাবসানেও কিন্তু তার এই আনুগত্যের অবসান হতো না। এবার যার প্রতি সে অনুগত সে হলো তার আপন গর্ভজাত সন্তান। এমনিভাবেই জীবন কাটাতে অভ্যস্ত ছিল জাপ-দুহিতা।

আজ সেই জাপ-দুহিতা পরিবর্তনের স্রোতে ডুব দিতে দিতে অনেক দূর এসে পৌঁছে গেছে। এর কারণ, জাপানের সামাজিক কাঠামোই গেছে বদলে। বিরাট শৈল্পিক অগ্রগতি সে দেশকে এক সমৃদ্ধির দ্বার-প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। আর এই জোয়ার জেগে উঠেছে সারা দেশ এক নতুন চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে। প্রায় দু' কোটি মহিলা এখন এদেশে কর্মরত। এর সবটাই হয়েছে গত ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। দেশের মেয়েদের মধ্যে অর্থোপার্জন এক বিপ্লব-সাধন হয়ে গেছে।

জাপানের মেয়েরা এখন নিজেদের কথা নিজেদের মতো করে ভাবে। নিজেদের কৌলীন্য [illegible] তাদের অত্যন্ত সাধ। নতুন পাওয়া স্বাধীনতার স্বাদে মশগুল হয়ে এখন তারা রাজনীতি চর্চা থেকে শুরু বিক্ষোভ সর্বত্রই অংশ নিচ্ছে। নিজেদের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়েই তারা এসব করে। কোন ভাবালুতার বশে নয়। কারণ, তারা জানে যে, আজকের কঠিন পৃথিবীতে ভাবালুতার কোন স্থান নেই। তাই তারা নিজেদের গুরুত্ব যথাযথ প্রতিফলিত করার জন্য মেয়েদের জোট বাঁধে। যাতে তাদের কেউ তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করতে পারে।

বিয়ে সম্পর্কে ভাবনাও বদলাচ্ছে। আজকের মতে যারা পুরনো, তাঁরা এ সম্বন্ধে যেরকম করে ভাবতেন নতুনরা নিশ্চয়ই সেরকম ভাবেন না। এটুকু জানার জন্য এক সমীক্ষা চালিয়েছিল ব্রিটেনের 'ডেইলি মিরর' পত্রিকা। এই উদ্দেশ্যে ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে দু হাজার তরুণীকে এ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এই জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল : তোমার জানাশোনা বিবাহিতদের মধ্যে বাড়িতে কর্তৃত্ব কে করে? এর সঙ্গে একটু জুড়ে দেওয়া হয়েছিল : নিজের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তোমার কি ভাব?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে প্রায় অর্ধেক জানিয়েছেন যে তাদের চেনা-জানা বিবাহিতদের মধ্যে স্বামীই হলেন বাড়ির কর্তা। শতকরা ৪০ জন জানিয়েছে যে, তাদের জানা-শোনার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই—দুজনেই সমানাধিকার ভোগ করছেন। সর্বশেষ ভগ্নাংশের মতে, বাড়িতে স্ত্রীর কর্তৃত্ব চালু রয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নতুনের দিকেই অনেকে ঝুঁকেছেন। শতকরা ৬০ জন বলেছেন যে, বিবাহিত জীবনে তারা কেউ কারো উপর কর্তৃত্ব করতে চান না। যা তাদের কাম্য তা হলো ইকুয়াল পার্টনারশিপ। শতকরা ৩০ জন প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছেন যে, বিবাহ-পরবর্তী জীবনে তারা স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলতে রাজী।

সারা ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে মহিলাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। শুধুমাত্র সাংবিধানিক সমানাধিকার নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রসার চাই। নতুন আন্দোলনে এটাই হলো উদ্দেশ্য। নারী সমাজের এক বৃহৎ অংশ প্রায় শতকরা ৮০ জন একই কাজের জন্য একই মাইনের দাবীদার। এ ব্যাপারে তারা স্ত্রী-পুরুষ কোন ভেদাভেদ মানতে রাজী না। কারণ শতকরা প্রায় ৮২ জন ভাবছে যে, নারী-পুরুষ উভয়েই বুদ্ধি এবং নৈপুণ্যের দিক থেকে একই রকম। সুতরাং কোন বৈষম্য চলতে পারে না। তাই কোন কোন স্ত্রী এবার সংসার দেখাশোনার ভার এবং ছেলেপুলে আগলানোর দায়িত্ব স্বামীর হাতে দিয়ে নিজে রোজগারের পথে পা বাড়াতে চায়। এদের সংখ্যা হলো প্রতি পাঁচজনে একজন। মেয়েদের দিক থেকে এই প্রস্তাব আসার সঙ্গে সঙ্গে তিন-একাদশের শতকরা ২০ জন রাজী হয়ে গেছে। তারা জানিয়ে দিয়েছে যে, ঘরকন্নার কাজ তারা নিজেরা সামলাতে প্রস্তুত যদি তাদের স্ত্রী-বর্গ মোটা মাইনে মাস গেলে ঘরে নিয়ে আসতে পারে।

ইতিমধ্যে আর একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন অধ্যাপক এম কে কারতোনেন—ফিনল্যাণ্ডের ইনস্টিটিউট অব অকুপেশনাল হেলথ-এর তিনি ভারপ্রাপ্ত। তিনি কয়েকটি প্রশ্ন নিজের ঝুলিতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। উদ্দেশ্য, এর সাহায্যে নিজের কাজ হাসিল করা।

অধ্যাপক কারতোনেন-এর জিজ্ঞাসার মধ্যে ছিল : মহিলারা সাধারণভাবে অভিহিত হন দুর্বল হিসাবে। যদি তাই হয় তবে তারা কতটা দুর্বল? কর্মী মহিলারা কি যথাযোগ্য মূল্য পাচ্ছেন না? যে সকল মহিলা কাজ করছেন না তাঁরা কাজ করার মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কি না? এই প্রশ্নগুলির মধ্যেই ছিল তাঁর সমীক্ষা।

এবার দেখা যাক অধ্যাপক কারতোনেন সমীক্ষা চালিয়ে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। যেসব পুরুষরা নিজেদের মনে করেন 'ডোমিনান্ট সেক্স' তাদের পক্ষে এই সমীক্ষা সিদ্ধান্ত খুব একটা রুচিকর হবে না। সমীক্ষায় তিনি দেখেছেন যে, মেয়েরা পুরুষের তুলনায় খুব একটা দুর্বল নয়। আর তাছাড়া এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও নয়। এটা সত্য যে, গড়পড়তা মেয়েদের মাসল পুরুষের তুলনায় কম। কিন্তু পুরুষ মাসল ফাঁপিয়ে শক্তির জয়ঢাক পিটিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে তখন মেয়েরা নিজেদের নৈপুণ্যে বাজিমাত করে। তবে গড়পড়তা মেয়েদের ক্ষীণস্বাস্থ্যের ব্যাপারটা সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে ধরা উচিত হবে না। কারণ, দুর্বল পুরুষ এবং শক্ত মহিলা এমন কিছু দুর্লভ নয়।

এছাড়া অপর দুটি প্রশ্নের সমাধানে তিনি যে তথ্য পান তা হলো, কর্মী মহিলারা সত্যি বঞ্চিত। যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া তাদের হয় না। আবার যারা কাজ করে না, ঘরসংসার সামলায়, তারাও মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত।

মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে যে, মহিলারা কথাবার্তায়, ভাষাগত যোগ্যতায়, পর্যবেক্ষণ দক্ষতায় এবং স্মরণশক্তিতে পুরুষদের উপর দিয়ে চলে। আবার পুরুষরা যুক্তিনিষ্ঠ, কারিগরি বুৎপত্তিসম্পন্ন, গণিতে পারদর্শী। এই পার্থক্য দেখে এরকম সিদ্ধান্তে আসা সহসা সম্ভব হয়ে ওঠে না যে, শৈশব থেকে এরকম দিকেই উভয়ের আগ্রহ পরিচালিত হয়।

চরিত্রের দিক থেকে মহিলারা অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় একটু খাটো। আবার মহিলারা পুরুষের তুলনায় অতিরিক্ত আত্মমর্যাদা সচেতন। প্রতিযোগিতা এবং প্রতি আক্রমণের দুটো বৈশিষ্ট্যই তাদের মধ্যে আনাতিরিক্ত কম।

অধ্যাপক কারতোনেন এসব দেখে-শুনে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, উভয় চরিত্রই ঐতিহ্য আরোপিত। আজকাল যা কিছু হচ্ছে তা সবই অতীত থেকে। আগামীকালের পৃথিবী থেকে তার স্বাতন্ত্র্য অনেকখানি।

'কোয়াক' পত্রিকার সম্পাদক আলবার্ট ফিউজম্যান চার বছরব্যাপী এক সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তাঁর পত্রিকায়। বিবাহ পরবর্তী চার বছর ছিল এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাতে তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোকপাত করে বলেছেন যে, সন্তানধারণ আরো সীমিত হবে। গর্ভপাত বহুল প্রচলিত সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং ধর্মীয় বিধান-এর আবেদন শুধুমাত্র সত্যিকার অনুরাগীদের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করবে।

'উওম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ইভোলিন হোম স্পষ্টাস্পষ্টি বলেছেন যে, ঠিক এই মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের নতুন ব্যাখ্যা শুনতে বেশ ভালই লাগছে। কিন্তু এমন একটা সময় আসছে যখন তারা অনেক কিছু করবে যেমন আগেও করতো, তবে সে কথা প্রকাশ পেতো না। এবার হয়তো সব খুলে মেলে যাবে।

—প্রমীলা

CENTRAL LIBRARY

জলসা

আনন্দধারার মাসিক অধিবেশনে সেতার বাজাচ্ছেন ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য। ফটো : অমৃত

সঙ্গীত সদনের সঙ্গীত সম্মেলন : কল্যাণকর যে-কোনো নতুন চিন্তা ও প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। নবগঠিত সংস্থা সঙ্গীত সদনের পক্ষ হতে জগদীশ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিত বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনের সম্পূর্ণ অপরিচিত শিল্পীদের নিয়ে তিন দিনের সঙ্গীতোৎসব তাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য ও অভিনন্দনীয়। সভাপতি সতীকান্ত গুহর উদ্বোধন-ভাষণ মনে রাখবার মতো। এই আসরে সঙ্গীতজগতের পরিচিত বিগ্রহের দর্শন মিলবে না। কিন্তু যাঁরা নবীন, সাধনার প্রেমে ও আবেগে ভরপুর, সেই প্রতিভাচিহ্নিত নবাগতদের সৃষ্টির রূপ ও তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাওয়া যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় বিচার করে দেখলে সম্মেলনের তিনদিনের অনুষ্ঠান সার্থক।

প্রথম দিনে আধুনিক সঙ্গীতের আসরে আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে তরুণ শীল, ইন্দ্রাণী মিত্র, মুন্না পাল, শেফালী চট্টোপাধ্যায় ও দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের প্রত্যেকের গানেই শিক্ষা ও প্রতিভার ছাপ বিদ্যমান। বিশেষ উল্লেখযোগ্য শেফালী চট্টোপাধ্যায়ের অতুলপ্রসাদের গান। গীটারে পর পর কয়েকখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লঘুসঙ্গীতের সুর বাজিয়ে পরিবেশ জমিয়ে তোলেন জগন্নাথ ধর। দ্বিতীয় দিনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আসরে শুদ্ধ বসন্ত রাগে ধ্রুপদ ও কাফি রাগে ধামার গেয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা আদায় করেছেন সুনির্মল ভট্টাচার্য। রাগ নির্বাচন সুন্দর, গাইবার মেজাজটিও ভালো। কিরবাণী রাগে পরিবেশিত প্রদীপ ঘোষালের সেতারও সুশ্রাব্য—শুধু রাগমাধুর্যের কারণেই নয়, শিল্পীর হাতটিও ভাল। এছাড়া নিরুপমা সামন্ত তিলং রাগে ভজন ও খেয়াল গেয়ে শোনান। গীটার বাদনে অংশগ্রহণ করেন উমাশঙ্কর সেন। শেষ দিন সারারাত্রিব্যাপী আসরের অনুষ্ঠানে শুরু হোলো রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কণ্ঠসঙ্গীত দিয়ে। সুবিখ্যাত সেতারবাদক রজনীকান্ত চতুর্বেদী ও সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর শিষ্য হওয়ার ফলশ্রুতিস্বরূপ এঁর গাওয়া মারু বেহাগে কণ্ঠসঙ্গীতের তানের ধাঁচ ও রূপের গাম্ভীর্য লক্ষণীয়। কণ্ঠসঙ্গীতে চন্দ্রকোষ রাগে খেয়াল ও পরে ভজন গেয়ে শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন বাণী রায়। রাগশুদ্ধতা, লয়, মেজাজ এক কথায় শিল্পী হবার মত অনেক গুণই এঁর মধ্যে বিদ্যমান। প্রতাপ রায় বসন্তবাহার রাগে খেয়াল, পরে ঠুংরী গেয়ে শোনান। উৎপল দত্তগুপ্ত যোগ রাগে গাইলেন খেয়াল মোটামুটি সু-মানেই প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মহানন্দ চক্রবর্তীর তবলাসঙ্গতের দৃষ্টিতে রসভঙ্গ ঘটেছে বারবার। পারমিতা চৌধুরীর কথক নৃত্যে প্রতিভার ছাপ ছিল। অর্জুনকুমার ও লতাকুমারীর মিশ্র কথকনৃত্য ভালই, তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে হিন্দী ফিল্মী গানের অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছনীয়। প্রথম রাতে এস্রাজে মধুরাম দত্ত ও জোড়বেলা সেতারে ইরা সরকার যথাক্রমে দরবারী কানাড়া ও আহির ভৈরব বাজান। সবশেষের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল শৌণক চৌধুরীর সেতার। প্রতিশ্রুতিময় শিল্পীর অনুশীলন-নিষ্ঠা ও চিন্তার সুসমন্বয়ের পরিণত ছাপ রয়েছে তাঁর বাজনায়। সাধনায় অবিচলিত থাকলে ইনি রবিশঙ্করের সুযোগ্য শিষ্য হতে পারবেন।

আনন্দধারায় ইন্দ্রনীল

উত্তর কলিকাতার সুপরিচিত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'আনন্দধারা'-র মাসিক অধিবেশনে তিমিরবরণের সুযোগ্য পুত্র ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের সেতারবাদন যথার্থ এক সঙ্গীত পরিবেশ রচনা করতে পেরেছে। ইনি বাজালেন 'জয়জয়ন্তী'। গুরু আলাউদ্দিনের কাছে দীর্ঘকালের তালিম ছাড়াও বিদেশভ্রমণকালে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের সাহচর্য ও শিক্ষাও অন্তঃপ্রবাহী প্রাণরসের মত এঁর সাঙ্গীতিক ধ্যান ও ধারণাকে গড়ে তুলেছে। সেই ফলশ্রুতিরই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছিল ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের সেদিনের বাজনা। দীর্ঘকালের রেওয়াজে যন্ত্রের ওপর দখল আসাটা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু রাগের আঙ্গিক-অবয়বের নির্মিতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবের নির্মিতিও উদ্ভাসিত করে শ্রোতাদের অন্তরকে রসাবিষ্ট করে তুলতে হলে যে শিল্পবোধ, সহজ অনুভূতি ও সঙ্গীতশাস্ত্র-পাণ্ডিত্য প্রয়োজন, এই তরুণ শিল্পীর মধ্যে তা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এ-অভিজ্ঞতা সত্যিই আনন্দের। সংক্ষিপ্ত আলাপে অতিমন্দ্র, মন্দ্র সপ্তকের পূর্ণাঙ্গ বিস্তারের রূপ, জোড় ও ঝালায় ধ্রুপদের ধাঁচ পুরোপুরি বজায় ছিল। আবার গতের সঙ্গে কখনও তেহাই, কখনও বা ঠুংরীর সূক্ষ্মালঙ্কারের জৌলুস নানা পর্দা-সমন্বয়ের পথ বেয়ে গাম্ভীর্যের বদলে রোমান্টিক রূপকেও শিল্পী উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। ছুট্‌তান, সপাট তানে তাঁর দক্ষতাও তারিফ করবার মত। তবে জয়জয়ন্তীর পর ধুনের নির্বাচন প্রথম দিকের জম-ওঠা রসানুভূতিকে কিছু ক্ষুণ্ণ করেছে। জয়জয়ন্তীর মত মধুর রাগের পর কাফি বা পিলু এই ধরনের কোনো রাগের ঠুংরী ধরলে ভারসাম্য রক্ষিত হোতো। শিল্পীর মেজাজকে যথাযথভাবে উদ্দীপ্ত করেছে শঙ্কর ঘোষের তবলাসঙ্গত। প্রতি ছন্দ, লয় ও তালের চাতুর্যপূর্ণ কসরতে ইনি অত্যন্ত আনন্দমধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

প্রতিশ্রুতিময়ী : বাংলাদেশের কীর্তিমান শিল্পী চিন্ময় লাহিড়ীর শিষ্যা মীরা মজুমদার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে শ্রোতাদের কাছে পরিচিতা। কিন্তু সম্প্রতি হিজ মাস্টারস্ ভয়েস থেকে তাঁর আধুনিক গান ও ছড়াগানের একটি রেকর্ড বেরিয়েছে। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিময় একটি নতুন নাম যুক্ত হল—সে-নাম মীরা মজুমদার। তরুণ গুপ্ত রচিত ও প্রশান্ত চৌধুরী সুরারোপিত আধুনিক গান 'মন এক রঙিন ফুল' গানটিতে সুশিক্ষিত কণ্ঠের সুরলালিত্য ছাড়াও লক্ষ্য করবার মত বস্তু হোলো শিল্পীর গাইবার আনন্দ ও সপ্রাণতা। ছড়াগান 'এ বি সি ও ক খ গ'-র ছন্দসৌকর্য শুধুমাত্র শিশুদের মনই দুলিয়ে দেয় না, বড়দের অন্তরের সুপ্ত শিশুকেও জাগিয়ে তোলে। গানদুটি শুনে মনে হোলো সঙ্গীতরসিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে শ্রীমতী মজুমদারের দেরী হবে না।

'পল্লব'-এর সঙ্গীতানুষ্ঠান : সরস্বতী পূজো উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এক সঙ্গীতাসর আয়োজন

করেন পার্ক সার্কাস উৎসবের 'পঞ্চম সঙ্গীত প্রতিযোগিতার সমাপ্তে'। যোগদানকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী বাঁর ও নিরুর নিয়ন, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলশ্রী রায়, কুমার মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দু চক্রচৌধুরী, সুভদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া বসু, কৃষ্ণ চন্দ্র অনিতা মজুমদার ও কুঁঁদ চক্রবর্তী। তবলাসংগতে ছিলেন শংকর চট্টোপাধ্যায়, দুলাল চক্রবর্তী ও বিষ্ণু মিত্র। এ আসরের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ ছিলেন শ্রীচীবসেন চট্টোপাধ্যায়। আর তাঁর অননুকরণীয় গায়নশৈলীর দুপালে জয়ে ওঠার রসাস্বাদনে পরিবেশিতদের ছিলেন সর্বশ্রী পাহাড়ী সান্যাল, মুনাব্বর আলি খাঁ, বিমান ঘোষ, সুপ্রভা সরকার ও প্রদীপ সেন।

পার্ক সার্কাস সঙ্গীত সম্মেলন: কলামন্দিরে পরিবেশিত পার্ক সার্কাস সঙ্গীত সম্মেলনের মত তিন দিনের আসরের প্রতিটিই জমে ওঠার কারণ সুনির্বাচিত শিল্পী ও সমন্বয়দৌর্য। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীনন্দ ঘোষ। সম্পাদক সতীন সেন এই মনোজ্ঞভরা মুহূর্তেও শিল্পী ও শ্রোতাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

সর্বশেষ আসরটি ছিল সারারাতব্যাপী। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল ওড়িশার স্বনামধন্যা শিল্পী সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর ওড়িশী নৃত্য নিয়ে। শ্রীমতী পাণিগ্রাহীর ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠান তালিকায় ছিল মঙ্গলাচরণ, বটুনৃত্য, পল্লবী, নরিদর ছেন, স্বাধীনাভর্তৃকা, বাসর-সজ্জা ভারতনাট্যম আঙ্গিকের ধাঁচ জোগায় ওড়িশী নৃত্যের পরিবর্তিত লালিত্য ও ছন্দের রং আর প্রতিটি ভঙ্গী পাঁচ ও অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে ভাস্কর্যের এক প্রাণচঞ্চল রূপ। শুধু বিহবলকর হস্তমুদ্রাই নয়, একতাল, ত্রিতালপঞ্চক, ঝাঁপ, ঠৈতালি বিভিন্ন তালে শ্রীমতী পাণিগ্রাহীর সর্বাঙ্গ ছন্দলালিত্য পরিক্রমণ অসাধারণ নৃত্যত্বারই স্বাক্ষর। উপরি পাওনা হিসেবে পাওয়া গেল তাঁর

মায়া চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী স্বামী রঘুনাথ পাণিগ্রাহীর কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গত। ইনি শুধু সুর-সমৃদ্ধ কণ্ঠেরই অধিকারী নন—রাগসঙ্গীতের শাস্ত্রসম্মত বিশ্লেষণে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুশীলনের উজ্জ্বল উদাহরণ। পরবর্তী শিল্পী পদ্মভূষণ আমীর খাঁন। পদ্মভূষণ সম্মানে বিভূষিত হবার পর এই তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান। এঁকে দেখে শ্রোতারা উদ্বেলিত, কিন্তু শিল্পী তাঁর নিজস্ব ধ্যানে শান্ত, প্রজ্ঞায় স্থিতধী। রাগ বিশ্লেষণে অন্তর্মুখী। ইনি ধরলেন 'দরবারী কানাড়া'। নিজস্ব ঢঙে বিস্তার বিহারের পর আন্দোলিত গান্ধারের চকিত প্রয়োগ দীপ্ত এই রাগমাধুর্য যেন নীলাভ আলোর মতই স্তোত্রচিত্তে ব্যাপ্ত হয়। তান-বৈচিত্র্যের অভাবে মাঝে মাঝে একঘেয়েমি এসে এসেছে কিন্তু মূল ভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। এঁর সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে তবলা সঙ্গত করেছেন

সুমিত্রা মিত্র

শ্যামল বসু। আমীর খাঁর দরবারী কানাড়ার সুগম্ভীর আবহাওয়ার পর ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর 'পাহাড়ী ঝিঁঝিট' বাজে সবোম্মোহন যেন বিহার হারাকান্ত পরিবেশকে সহজ সরস করে তুলল। লোকসঙ্গীতের ভাবানুসারী হলেও আলাউদ্দিন ঘরানার চুম্বকী অংশের তালিমী বাজনাই ইনি বাজিয়েছেন। বসন্ত চং-এর বোলপরণ এবং অন্যান্য অঙ্গ সমন্বয়ে রসিকচিত্ত ঢেউ তুলেছিল শোনা শ্রোতাদের বারবার সহর্ষ করতালির অভিনন্দনই তারই প্রতিধ্বনি। শিল্পীর ছন্দ বহুল বাজনার সঙ্গে সমমানে সঙ্গত করেছেন সুরসিক তবলিয়া অনিল ভট্টাচার্য।

অনুরাগীদের অনুরোধে সুনন্দা পট্টনায়ক গাইলেন স্ব-রচিত রাগ 'নীলমাধব'। দুগণ ধৈবতের চিত্রবাড়ী প্রয়োগ ও শিবরঞ্জনীর আভাসে শ্রীরামের সন্ন্যাস গমনের উদাসী ভাব অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যে এক সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করেছিল। এমন ভাবঘন খেয়ালের পরে তাঁর ভজনকেও মনে হয়েছে নিষ্প্রভ যদিও শ্রোতাদের অনুরোধে একাধিক ভজন তাঁকে গাইতে হয়েছে। সঙ্গীতে তবলায় এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে ধীর স্থির অনুপ্রেরিত অনিল ভট্টাচার্যের সার্থক সঙ্গত লক্ষ্য করবার মত।

রাত্রিশেষের কণ্ঠে এলেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। ধরলেন 'বিলাস-খানি টোড়ি'। টোড়ির অন্তর্নিহিত বিষণ্ণ গাম্ভীর্য শিল্পীর নিজস্ব ভাবধর্মধারায় পরিবেশিত হল। তবে সময় সংক্ষেপতার দরুন ইনি শ্রোতাদের বিপুল অনুরোধ সত্ত্বেও 'ভৈরবী' দিয়ে আসর শেষ করতে পারেননি। এঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গতে ছিলেন সুযোগ্য কানাই দত্ত। এছাড়াও উল্লেখ্য অনুষ্ঠান শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ পরিচালিত রাগ সঙ্গীতের ধারা। ধ্রুপদ থেকে শুরু করে ভজন অবধি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতিটি অধ্যায়ের পরিক্রমণ। এই অনুষ্ঠানের শিক্ষামূল্য প্রচুর। তবে এর জৌলুষ আরো বাড়ত যদি অনুষ্ঠানটি আর একটু সংক্ষিপ্ত হোত। জয়-জয়ন্তী রাগে পরিবেশিত ওস্তাদ মুনাব্বর খাঁর খেয়াল সুন্দর। বাংলার প্রথিতনামা কথক নৃত্যশিল্পী মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কথক নৃত্যের গৎ, ভাও, টুকরা, তৎকার প্রতিটি অঙ্গ বিশেষ করে পঞ্চম সওয়ারী তালের পদক্ষেপ উপভোগ্য। নতুন কিছু দেওয়ার দিকে এঁর আগ্রহ প্রশংসা করার মতো। প্রতিশ্রুতিময়ী নৃত্যশিল্পী হিসেবে উল্লেখের দাবী রাখেন সুমিত্রা মিত্র। সুখদেব দাশগুপ্ত পরিবেশিত 'যোগ' ও 'কাফী' পরিচ্ছন্ন। মণিলাল নাগের মাঝ-বেহাগে সেতার বাদন তাঁর খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণই রেখেছে।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

বি এফ জে এ'র বিচার

বছরের সেরা

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিচারে গত বছরের সেরা চলচ্চিত্র-শিল্পী ও কলাকুশলী নির্বাচন হয়ে গেল। সভ্যদের প্রদত্ত ভোটে ফলাফল নিম্নরূপঃ—

সেরা দশটি ভারতীয় চিত্র (গুণানুসারে) : প্রতিদ্বন্দ্বী, মেরা নাম জোকার, সাগিনা মাহাতো, ইন্টারভিউ, সমাজকো বদল ডালো, দিবারাত্রির কাব্য, সত্যকাম, সফর, দর্পণ ও অরণ্যের দিনরাত্রি।

সেরা তিনটি বিদেশী ছবি (গুণানুসারে) : ব্লো আপ, দি গ্রাজুয়েট, ব্লো হট, ব্লো কোল্ড।

পরিচালক : সত্যজিৎ রায় (বাংলা—প্রতিদ্বন্দ্বী), রাজকাপুর (হিন্দী—মেরা নাম জোকার); অভিনেতা—দিলীপকুমার (বাংলা—সাগিনা মাহাতো), রাজকাপুর (হিন্দী—মেরা নাম জোকার), মাইকেল এঞ্জেলো আন্তোনিওনি (বিদেশী—ব্লো আপ); অভিনেত্রী—মাধবী চক্রবর্তী (বাংলা—দিবারাত্রির কাব্য), সারদা (হিন্দী—সমাজকো বদল ডালো), ভেনেসা রেডগ্রেভ (বিদেশী—ডান্সার অফ ইসাডোরা); সহ-অভিনেতা—অনিল চ্যাটার্জি (বাংলা—সাগিনা মাহাতো), ফিরোজ খাঁ (হিন্দী—আদমী আউর ইনসান); সহ-অভিনেত্রী—কাবেরী বোস (বাংলা—অরণ্যের দিনরাত্রি), মুমতাজ (হিন্দী—সমাজকো বদল ডালো); সঙ্গীত-পরিচালক—তপন সিংহ (বাংলা—সাগিনা মাহাতো), শচীন দেববর্মণ (হিন্দী—আরাধনা); গীতিকার — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা — মঞ্জরী অপেরা), নীরাজ (হিন্দী—প্রেম পূজারী); চিত্রনাট্যকার—সত্যজিৎ রায় (বাংলা—প্রতিদ্বন্দ্বী), অসিত সেন (হিন্দী—সফর); সংলাপ লেখক—সত্যজিৎ রায় (বাংলা—প্রতিদ্বন্দ্বী), ইন্দররাজ আনন্দ (হিন্দী—সফর); ক্যামেরাম্যান—সৌমেন্দু রায় ও পূর্ণেন্দু বসু (বাংলা—প্রতিদ্বন্দ্বী), রামচন্দ্র (হিন্দী—সাত হিন্দুস্থানী), রঙীন ফটোগ্রাফী—রাধু কর্মকার (মেরা নাম জোকার); গায়ক—অনুপ ঘোষাল (বাংলা—সাগিনা মাহাতো), কিশোরকুমার (হিন্দী—আরাধনা); গায়িকা—আশা ভোঁসলে (বাংলা—মেঘ কালো), লতা মঙ্গেশকর (হিন্দী—দো রাস্তে) এবং বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে রাজকাপুরকে 'মেরা নাম জোকার' ছবিতে সুঅভিনয়ের জন্য। সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কৃতদের সম্মানিত করা হবে।

ইন্দর সেন পরিচালিত পিকনিক ছবিতে রঞ্জিৎ মল্লিক একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন।
ফটো : অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

প্রতিবাদ

মহান আদর্শ নিয়ে অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে যে দাঁড়িয়েছিল একদিন, একদিন যাকে সবাই শ্রদ্ধায় ভালবাসায় বুকে টেনে নিয়েছিল; দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় সে আর স্থির থাকতে পারেনি, সেখানেও সে জ্বলন্ত প্রতিবাদের মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, শত সংকট দর্শাতে আজকের প্রতিবাদের ছাপ একে দিয়েছে সে লাঞ্ছনাকারীর গলায়। বিচারে জেল হয়েছে দশ বছর। কিন্তু আদর্শ কর্তব্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়নি।

ছবির নায়ক রতনপুরের ছেলে মানব স্থানীয় অঞ্চলের যুব সমাজের প্রেরণা ও প্রিয়পাত্র। কল্যাণ থেকে শুরু করে সমাজ-কল্যাণমূলক সব কাজে তার দল সবার আগে। পাড়ার সহযোগিতা তার পাথেয়। বেকার গ্রাজুয়েট সে। কাজ চাই। কিন্তু কে দেবে? বাড়ীতে সোমত্ত বোন আর মা। আর্থিক অনটনের মধ্যেও আশা ছিল সে

একটা স্কুল করবে, শিক্ষাদানের মহান ব্রতে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে সমাজ কল্যাণে। এই কাজে সে প্রেরণা পেয়েছিল প্রতিবেশী স্কুল মাস্টারের মেয়ে মঞ্জুর কাছ থেকে।

কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থায় যখন ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদই পাহাড় প্রমাণ, গরীবের মহান আদর্শ তখন বহুক্ষেত্রেই টাকার খেলায় হারিয়ে যায়। যেমনটি হয়েছিল মঞ্জুর ক্ষেত্রে নাচে গানে নিপুণা সুন্দরী মঞ্জু একদিন অর্থগৃধ্নু ভূপতি শিকদারের শিকার হয়েছিল। মানবের নীরব আপত্তি সত্ত্বেও পিতৃঋণ শোধের জন্য মঞ্জুকে রিসেপশনিস্টের চাকরী নিতে হয়েছিল ভূপতি শিকদারের অফিসে। মুখোশের আড়ালে তার নারী মাংসলোভী চেহারাটা তখনও তার কাছে স্পষ্ট নয়। মঞ্জুর এই আদর্শচ্যুতিতে মানব ক্ষুব্ধ বিব্রত। কিন্তু বেঁচে থাকার তীব্র তাগিদে জমাদারের কাজ নিয়ে মানব খুশি। সমাজের আপাত ঘৃণ্য অবহেলিত মজুর সমাজের মধ্যে সে তার আদর্শ ও চিন্তার বাস্তব রূপায়ণের পথ খুঁজে পায়। তাদের নিয়ে সে গড়ে তোলে রঞ্জন ভাণ্ডার। নিরক্ষর মজুরদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে সরিয়ে এনে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করতে চায় সে।

কিন্তু সেখানেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভূপতি শিকদার। মানবের সাফল্যে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে প্রতিশোধ স্পৃহায়। ইতিমধ্যে মঞ্জুর কাছে তার চরিত্র পরিষ্কার হয়ে যায়। চাকরী ছেড়ে দেয় সে। ঘনিয়ে আসে শেষ ভয়ঙ্কর দিন।

ছদ্মবেশী-সংগীত গ্রহণে সংগীত-পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত এবং মান্না দে। ফটো : অমৃত

মঞ্জুকে কৌশলে আটক করে ভূপতি শিকদার। তাকে বাঁচাতে গিয়ে বন্দি হয় তার পূর্বতন শিকার রেবা মিত্র। কিন্তু মানবের হাত থেকে রেহাই পায় না সে।

জেল থেকে আট বছর বাদে ফিরে এসে মানব ফিরে পায় তার পুরোনো জীবন, মঞ্জু তার আদর্শে হরিজনদের নিয়ে স্কুল করেছে, আর অপেক্ষা করেছে মানবের মুক্তি দিনের।

নাটকীয় সংঘাতপূর্ণ এ কাহিনীর চিত্রনাট্যকার অজিত গাঙ্গুলী। পরিচালক তপেশ্বর প্রসাদ সুন্দর ভঙ্গীতে, বাস্তবানুগ দৃশ্য পরিকল্পনায়, নাটকীয় ভাবাবেগে অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে তুলেছেন ছবিটিকে। নাটকীয়তা এ ছবির প্রধান গুণ। পরিচালক কোনো মুহূর্তেই সেই সুযোগের অপব্যবহার করেননি। প্রতিমা বিসর্জন ও বন্যাত্রাণে সাহায্য তোলার দৃশ্যে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্র মাধ্যমে তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা এই ছবির প্রতিটি দৃশ্যে ছড়িয়ে আছে।

অভিনয় সম্পর্কে বিশ্বজিতকে দর্শকের ভালো লাগবে, বেশ ভালো লাগবে বলতে পারি। এখানে তিনি যথার্থই বাংলা ছবির অভিনেতা। 'শেষ পর্যন্ত'র পর তাঁর এমনতর প্রাণবন্ত অভিনয় চোখে পড়েনি। নাটকীয় মুহূর্তে, রোমান্টিক দৃশ্যে তিনি যথেষ্ট সংবেদনশীল অভিনয় নৈপুণ্যের ছাপ রেখেছেন। বাংলা চিত্রজগৎ পুরোপুরিভাবে বিশ্বজিৎকে পেলে উপকৃত হবে নিঃসন্দেহে। নায়িকা মঞ্জুর চরিত্রে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মানসিক দ্বন্দ্ব ফোটাতে তাঁর মুখ ও চোখের ভঙ্গী খুব বেশী কার্যকর হয়েছে। তবে সংলাপ বলার সময় নাটকীয় কয়েকটি দৃশ্য কিছু মাত্রায় বাধা পেয়েছে। তবুও বলব তিনি মঞ্জুর চরিত্রে মনঢালা অভিনয় করেছেন। মানবের বোনের চরিত্রে যূথী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালো লাগবে। ভূপতি শিকদার বেশী হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রটিতে প্রাণ সঞ্চারের প্রয়াস সার্থক। অন্যান্য চরিত্রে ভালো অভিনয় করেছেন গোরসী, অপর্ণা দেবী, রবি ঘোষ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সুলতা চৌধুরী, চিন্ময় রায়, অজয় গাঙ্গুলী, তরুণকুমার প্রমুখ।

শ্যামল মিত্রের সুরে বিশ্বজিতের গলায় দুখানি গান শুনতে ভালোই লাগে। ননীদাসের ক্যামেরা দৃশ্যগুলিকে (বিশেষভাবে বিসর্জনের দৃশ্য) বাস্তবানুগ করে তুলেছে। বিশ্বজিৎ নিবেদিত আর্ট মুভিজের 'প্রতিশোধ' সাধারণ দর্শকের সমাদর পাবে ছবিটির পরিচ্ছন্নতা ও প্রধানত বিশ্বজিৎ-মৌসুমীর অভিনয় নৈপুণ্যে।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

স্টুডিও ল্যাবোরেটরী কর্মচারীদের ধর্মঘট এখন শেষ হওয়ার পথে। গত সপ্তাহের শেষদিন স্টুডিও পাড়ায় ঘুরে দেখেছি একমাত্র ক্যালকাটা মুভিটোন ছাড়া বাকি সবকটা স্টুডিওতেই কাজ চলছে। আশাকরি এই সপ্তাহে ঐ বন্ধ স্টুডিওর দরজাও খুলে যাবে।

এখন আর কাজের বিরতি নেই। কোনো ফ্লোর ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছে না। ইন্দ্রপুরীতে তো হীরেন নাগই করছেন বিলম্বিত করুণা জাহ্নবী যমুনার কাজ কয়েকদিন ধরে। বিজয় বসু 'ফরিয়াদ'এর কাজ করছেন টেকনিসিয়ানে। দু নম্বর (এন-টি) স্টুডিওতো অনেকদিন আগে থেকেই খোলা। ওখানে কাজ হচ্ছে সলিল সেনের 'অপর্ণা' ছবির। তনুজা অন্যের কয়েকটি জরুরী কাজ ছেড়ে দিয়ে 'অপর্ণা'র কিছু প্যাচওয়ার্কে অংশ নিতে এসেছেন। এ পর্যায়ের কাজ শেষ হলেই 'অপর্ণা'র কাজ শেষ। কদিন আগে পীযূষ বসু দু নম্বরেই 'জীবন জিজ্ঞাসা'র কাজ করেছেন পালের জোরে।

এখন ওখানে কাজ করছেন বিভূতি লাহা (অগ্রদূত) তাঁর নতুন ছবি 'ছদ্মবেশী'র কয়েক সপ্তাহ আগে শুভ মহরতের দিনে ছবির নায়িকা মাধবী চক্রবর্তী উপস্থিত

রঙ্গনা কিরণপুর রাস্তার সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
শনিবার ৬টায়
রবিবার ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮ই, ১১ই ও ১২ই রঙ্গনায় নান্দীকারের শো বন্ধ।

অভিনব সিনেমা মাসিক
আলোছায়া
নবকলেবরে বৃহত্তর আকারে...
প্রতি সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প, শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প, বিভিন্ন অভিনব ফিচার, গান স্বরলিপি, মনস্তাত্ত্বিক যৌনকথা ও অসংখ্য সিনেমার রঙীন ছবি সমৃদ্ধ।
প্রতি সংখ্যা ১ টাকা : বার্ষিক ১২
১৬/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

থাকতে পারেন নি। এখন তিনি নির্মলচন্দ্র অংশ নিচ্ছেন সাউটংয়ে। মাধবী দেবী ছুটলেন গিয়েছিলেন 'অর্চনা' ছবির আউটডোরে। সংগে ছিলেন পরিচালক পীযুষ গাঙ্গুলীর সম্পূর্ণ ইউনিট এবং নায়ক চরিত্রাভিনেতা শুভেন্দু চ্যাটার্জি।

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি 'সীমাবদ্ধ'র নায়ক চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন ক্লারিওন ম্যাককন অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানীর একজন এক্সিকিউটিভ শ্রীবরুণ চন্দ। নায়িকা চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুরই কাজ করবেন। এবং অন্য দুটি আকর্ষণীয় চরিত্রে থাকবেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বম্বের হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি জানা গেল সত্যজিৎবাবু কালকাটা রেসকোর্সে লোকেশন দেখতে গিয়ে মাঠ থেকেই আরেকজন অভিনেতার খোঁজ পেয়েছেন। নাম ঠিকানা এখনই তিনি প্রকাশ করতে নারাজ।

ও'রা সবাই ফিরেছেন। শুভেন্দুবাবু কাজ করছেন হীরেন নাগের 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'য়। আর মাধবী দেবী বিভূতি লাহার 'কুমারেশী'তে। হীরেনবাবুর ছবিতে কাজ করার জন্য বম্বের মধুছন্দা এসেছিলেন কলকাতায়। ছবির সেটে প্রথম পরিচয়ের পর নতুন কোনো বাংলা ছবি হচ্ছেন কিনা প্রশ্ন করায় তিনি জানালেন, 'আপাততঃ সেরকম কোনো চুক্তি নেই। প্রোপোজাল আসছে কিছু। আসলে এখনও ডিসাইড করতে পারছি না, বাংলা ছবির দর্শক সম্পর্কে। তাই নীরব আর কি!'

• • •

'ফাঁকি' নামে ছবিখানির কাজ সম্পর্কে শুরু হবে এরকম বহু কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল। সম্প্রতি সব গুজবের অবসান ঘটিয়ে ক'দিন আগে টেকনিসিয়ান্সের রেকর্ডিং রুমে কয়েকটি গান বাণীবদ্ধ করে পরিচালক মনু চক্রবর্তী 'ফাঁকি'র কাজ শুরু করলেন। এ সপ্তাহে কাজও শুরু হচ্ছে টেকনিসিয়ানে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক নিজে। প্রধান চরিত্র হিসেবে ভূমিকায় অংশ নিচ্ছেন 'প্রতিদ্বন্দ্বী' খ্যাত জয়শ্রী রায় এবং অন্যান্য চরিত্রে আছেন কল্যাণ চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, জহর রায়, গীতা দে, সমিতা বিশ্বাস, সুবোধ দাস, শৈলেন মুখার্জি ও বম্বের অশোককুমার। এ ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন নবাগত সুরকার সত্যদেব চ্যাটার্জি।

• • •

তপন সিংহের 'এখনই' খুব শিগ্‌গির মুক্তি পাচ্ছে। এখন তিনি ব্যস্ত আছেন হিন্দী সাগিনা মাহাতোর কাজ নিয়ে। শুনেছি ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি আউটডোরে বেরোবেন। দিলীপকুমার এখন বেরোতে পারবেন না, কারণ তিনি এখন নির্বাচনী জোয়ারের ছবির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। সম্প্রতি হিন্দী সংলাপ লেখক মাসুম রাহী রাজা এসেছিলেন কলকাতায় হেমেন গাঙ্গুলী প্রযোজিত এই হিন্দী ছবি সম্পর্কে পরিচালকের সঙ্গে আলোচনার জন্য। এন-টির দু' নম্বরে তপনবাবুর ঘরে একাধিক দিন মাসুম সাহেবকে দেখেছি স্ক্রীপট নিয়ে আলোচনারত। টেকনিসিয়ানে দু'দিন কাজ হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত আর কোনো কাজ হয়নি ছবির। এ মাসেও হচ্ছে না। আগামী মাসে হবে। ছবির ভূমিকা লিপিতে দিলীপ কুমার সায়রাবানু ছাড়া হয়তো কিছু অদলবদল হবে। তবে সে সম্পর্কে এখন নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শচীন দেব বর্মণ। এবং ক্যামেরায় আছেন বিমল মুখার্জি।

মঞ্চাভিনয়

মনুরঞ্জ্রাসের 'এণ্টনী কবিয়াল': প্রথম বিশ্বরূপা মঞ্চের আলোয় এই প্রথম যাঁরা চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাওয়ার স্পন্দনকে দর্শকদের অনুভূতির প্রদেয় রূপে ধরতে চাইতেন, তাঁরা কিভাবে বহুগুণী ও শক্তিমান শিল্পীদের অভিনয়ে সম্মুখে বহু রজনী অভিক্রান্ত একটি নাটকের [illegible] প্রয়োজনা উপস্থিত করবেন। কিন্তু পরে উইংসে যখন চোখ ও মনের দৃষ্টা ভুলে গেলো ঘটনার মুখরতায়, তখন বিস্ময়ের ঘোর কাটেনা। প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার সম্ভব হয়ে ওঠার পরিপূর্ণতা পেলো। বলছিলাম সম্প্রতি মহাজাতি-নিবাসে মনুরঞ্জ্রমার প্রযোজিত 'এণ্টনী কবিয়াল' নাটকের কথা। এই নাটকটির সঙ্গে নাট্যানুরাগীদের আগ্রহের কথা কারো হয়তো অজানা নেই। এই ধরনের বহু পরিচিত একটি জনপ্রিয় নাটককে আবার পরিবেশন করার

সুরমল্লার প্রযোজিত 'অ্যান্টনী কবিয়াল' নাটকের একটি আবেগমধুর দৃশ্যে রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তনু ঘোষ, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুজিত চট্টোপাধ্যায় এবং ইন্দ্রাণী সেন

আলাপটা নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা। তা ছাড়া ঢোলের ছন্দময় তালে, আর আখড়াসংগীতের হিল্লোলে মনটা শুধু ভরে থাকেনি, নতুন এক স্বাদের ছোঁয়া পেয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল।

ফিরিঙ্গী এন্টনী কিভাবে আমাদের দেশের আলো, হাওয়া ও মাটিকে ভালোবেসে আমাদের হোতে চেয়েছিলেন; কতো গভীর আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে তার একনিষ্ঠ সেবক হোতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সাধনার পথে কতো বৃহৎ প্রতিবন্ধকতা এসেছিল; তাকে কেন্দ্র করেই বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'এন্টনী কবিয়াল' নাটকের সংঘাত গড়ে উঠেছে। এই আবেগ, সংঘাত আর প্রতিবন্ধকতাকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে সুরমল্লারের শিল্পীরা মঞ্চের বিভিন্ন রূপে সম্পাদিত করেছেন। অভিনয়ের দিক থেকে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রের সঙ্গে সুন্দর সমতা রাখতে পেরেছেন এবং এইজন্যই কোন মুহূর্তে শৈথিল্যে অবসিত হয়ে পড়েনি।

শিল্পীদের মধ্যে স্বাভাবিক ও সংযত চরিত্র-চিত্রণে আমাদের অবাক করেছেন শান্তনু ঘোষ; [illegible] ভূমিকায় তাঁর সাবলীল অভিনয় সমগ্র নাট্য-প্রযোজনার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। ইন্দ্রাণী সেনের 'সৌদামিনী' হয়েছে সপ্রতিভ; কয়েকটি আবেগমধুর দৃশ্যে তাঁর সলজ্জ ও সকরুণ ভঙ্গিমা সূক্ষ্ম শিল্পবোধেরই পরিচয় বহন করেছে। এন্টনীর চরিত্রে রঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে প্রথম দিকে একটু কৃত্রিম মনে হোলেও, পরের দিকে তিনি চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছেন। তাঁর কণ্ঠের সুরমাধুর্য আমাদের অনুভূতিকেও মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে তুলেছে। গানে ও অভিনয়ে আর একটি স্বাভাবিক চরিত্র-চিত্রণ হোল ভোলা ময়রা; এর জন্য শিল্পী সুজিত চট্টোপাধ্যায় সবারই প্রশংসা কুড়িয়েছেন। একটু অতি-নাটকীয় হোলেও [illegible] ও [illegible] ভূমিকায় অসিত রায়চৌধুরী ও ইলা রায়চৌধুরীর অভিনয় বেশ কিছু বিস্ময়ের স্বাদ এনেছে। অন্যান্য চরিত্রে [illegible] ঘোষ, মুরারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল দত্ত, নিমাই নাথ, কল্যাণ ঘোষ, সরোজ বক্সী, বরেন দাস, গীতা বসু।

সংগীত নির্দেশনায় সুজিত চট্টোপাধ্যায়ের সুগভীর আন্তরিকতা ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয়ই নিহিত আছে। আলোক-সম্পাত ও আবহসংগীতে তেমন কিছু উজ্জ্বলতার ছোঁয়া ছিল না। অবশ্য একথা সত্য যে শিল্পীদের প্রাণঢালা অভিনয় আঙ্গিক পরিকল্পনার কয়েকটি ফাঁককেই প্রায় ভরিয়ে দিয়েছে।

নাটকটি শুরু হবার আগে স্বপন গুপ্তের আন্তরিকতা ভরা রবীন্দ্রসংগীত ও প্রদীপ ঘোষের দরদী কণ্ঠের আবৃত্তি একটি সুন্দর শৈল্পিক পরিবেশ রচনা করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সার্থক পরিচালনার জন্য যাঁর নিরলস পরিশ্রম প্রতিটি মুহূর্তে কাজ করেছে তিনি হোলেন সংস্থার সম্পাদক রতন মুখোপাধ্যায়।

হিংসার মুক্তি : সৌখীন নাট্য সংস্থা 'মিলনী'র বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি সভ্যরা 'হিংসার মুক্তি' নাটকটি গীতাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন জনাই পুরাতন বাটীতে। মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাটকটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। দুর্বাসার ভূমিকায় পরিচালক স্বয়ং এবং শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীপশুপতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। শকুনী-রূপী শ্রীঅবনী মুখোপাধ্যায় এবং ব্রাহ্মণ-বেশী শ্রীনিবারণ মুখোপাধ্যায়ও সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেন ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মদন মুখোপাধ্যায়, বিজয় চট্টোপাধ্যায়, হারাধন ভট্টাচার্য, অনিল চৌধুরী, মদন বোস ও মাঃ সুজিত বোস। সুর-সংযোজনা ও সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্তী।

বিবিধ সংবাদ

'অঙ্কুর'-এর বসন্তোৎসব : সৌখীন নাট্যসংস্থা 'অঙ্কুর'-এর উদ্যোগে গত ২০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বসন্তোৎসব পালিত হয় মানিকতলা মেন রোডের সুরেন্দ্রনাথ সমবায় আবাসে। এই উপলক্ষে দুটি নাটক অভিনীত হয়। প্রথম নাটক কবি কৃষ্ণ ধরের '[illegible]'—খাদ্য আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা একটি কাব্য-নাটক। সংগ্রামী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তরুণদের রক্তদানের কাহিনী বাস্তবায়িত হয়েছে বিভিন্ন ঘটনায়। প্রতিদিন মানুষের একেকটি স্বপ্ন কিভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—তারই মর্মান্তিক জিজ্ঞাসা যেন এই নাটক। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভাস্কর দাস, অতসী চৌধুরী, জয়শ্রী ব্যানার্জি, প্রদীপ ব্যানার্জি ও দেবকুমার দে। সু-অভিনয় করেছেন সকলেই। তবে কমলেশের ভূমিকায় ভাস্কর দাস ও রমলার চরিত্রে অতসীর অভিনয় দীর্ঘকাল মনে রাখার মতো। দ্বিতীয় নাটক 'মৃত্যুর ডাক'। লেডী গ্রেগরীর 'রাইজিং অব দি মুন' নাটকের বাংলা রূপান্তর করেছেন অংশুপতি দাশগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কনকেন্দু চৌধুরী, প্রণব দে, গৌতম চৌধুরী ও অলোক চ্যাটার্জি। দুটি নাটকই পরিচালনা করেছেন ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

সি এন টি-র নাট্যানুষ্ঠান : চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটারের নাট্যানুষ্ঠান একুশে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে পুরুলিয়া শাখার শিল্পীরা 'ছক্কা-ফক্কা' অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখার্জির পরিচালনায় সুনামের সঙ্গে অভিনয় করে। অংশ নেন সৌমেন্দ্র বসু, অমিতাভ ব্যানার্জি ও অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি। কলকাতার শিল্পীরা 'কেমন জব্দ' মুখোশ নাটকটির অভিনয় করে। শিল্পীদের মধ্যে দীপা চৌধুরী, মনমোহন বসু, সুপ্রিয়া গাঙ্গুলী, সনৎ দাস, অনিতা চক্রবর্তী, অরুণ বসু, জয়ন্ত সরকার, পম্পা মহাপাত্র ও কুমুদ দাসের নাম উল্লেখনীয়। কণ্ঠ-সঙ্গীতে অংশ নেন তপন দাস ও শিখা বসু।

ভাটিনীর বিচার : সাংস্কৃতিক সংস্থা হিসেবে শিখার অস্তিত্ব বহুদিনের না হোলেও সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে 'ভাটিনীর বিচার' নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে তার আবির্ভাব প্রতিশ্রুতিময় হয়ে উঠেছে। মঞ্চসফল এই নাটকটির পরিবেশনায় সংস্থার শিল্পীরা যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন। কয়েকটি সার্থক চরিত্র-চিত্রণের নজীর তুলে ধরেন নরেন বসু (ডাঃ ঘোষ), ডাঃ অনিল পাল (বসন্ত), সুধাংশু মুখার্জি (সমর), রবীন বিশ্বাস, অর্ণব ঘোষ, পরিমল সরকার, ডাঃ ইন্দ্রজিৎ বৈদ্য, সুতপা চক্রবর্তী (ভাটিনী), গীতা বিশ্বাস (ললিতা)।

খেলোয়াড়ের কথা

অধিনায়কের খোঁজে ইংলণ্ড

শঙ্করবিজয় মিত্র

এক যুগ পরে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে 'ছাই' পুনরুদ্ধার করেছে। ১৯৭০-৭১ সালে টেস্ট সিরিজের সাতটা খেলায় ইংলণ্ড দুটো জেতে এবং বাকি খেলাগুলো শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে (অবশ্য বৃষ্টিতে একটা টেস্ট ম্যাচ ভেসে যাওয়ার জন্যে পরিত্যক্ত হয়েছে)। ১৯৫৯ সালে পিটার মে-র নেতৃত্বে ইংলণ্ড দল অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪—০ ম্যাচে পরাভূত হয়ে 'অ্যাসেস্' হারিয়ে আসে। সেই থেকে এটা নিয়ে ছ'টা সিরিজ খেলা হল। তার মধ্যে তিনটি সিরিজ শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে এবং বাকি দুটোয় অস্ট্রেলিয়া জিতেছে। তাই 'ছাই' থেকে যায় অস্ট্রেলিয়ার দখলে এবং তাকে পুনরুদ্ধারের জন্য ইংলণ্ড এপর্যন্ত যে-লড়াই চালিয়ে এসেছে তা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। কোন অধিনায়কই ইংলণ্ডকে সেই সাফল্যের জয়মাল্য এনে দিতে পারেনি। পিটার মে সে মালা অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে হারিয়ে এসেছিল, তা ফিরিয়ে আনতে গেছেন ডেক্সটার, মাইক স্মিথ; ইংলণ্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ান দল এসেছে রিচি বেনো, আর বি সিম্পসন ও লরির নেতৃত্বে। এসব লড়াই অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলে গেছে। তাই ইংলণ্ডের নির্বাচকমণ্ডলী হন্যে হয়ে এমন এক অধিনায়কের খোঁজ করছিলেন যিনি 'ছাই'-এর লড়াই-এর জয়মাল্য অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। ১৯৫৯ সালের পর যে ছ'টা সিরিজ উভয় দেশের মধ্যে খেলা হয়েছে, তাতে অধিনায়ক নির্বাচনে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতদিন পরে ইংলণ্ডের অধিনায়ক নির্বাচকমণ্ডলী হয়ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। রে-ইলিংওয়ার্থকে ঘিরে তাঁরা যে আশার স্বপ্ন রচনা করেছিলেন, ইলিংওয়ার্থ তা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

এবারকার সফরকারী ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রে-ইলিংওয়ার্থের ভাগ্যটাকে অসাধারণ বলতে হবে। আগেকার দিনের হালচাল বদলালেও ইলিংওয়ার্থ নিজেও কোনদিন কল্পনা করতে পারেননি যে, তিনি ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন। ভাগ্য যে তাঁর খুবই সুপ্রসন্ন, সে-কথা না-বললেও চলে। তবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে পালা বদলের হাওয়া বইছে, এটা তারও একটা বড় নজির।

আগের দিনে সাধারণ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে অধিনায়কত্ব ছিল নিশাথ নিশীথের দুঃস্বপ্ন। অধিনায়কের প্রথম যোগ্যতা, আভিজাত্য, দ্বিতীয় এ্যামেচার এবং তারপর পাবলিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ও সামাজিক মর্যাদা। পেশাদার খেলোয়াড়েরা নিজেদের স্থান জানতেন, তাই এ নিয়ে তাঁরা মাথাও ঘামাতেন না। তাছাড়া পয়সা রোজগারের কথাটাই ছিল বড়, তাঁরা অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব থেকে তফাৎ থাকতেন।

বৃটিশ ক্রিকেটের অন্যতম দিকপাল খেলোয়াড় ওয়ালি হ্যামণ্ডই প্রথম পেশাদার খেলোয়াড় যিনি বৃটিশ টিমের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। সে হচ্ছে ১৯০৮ সালের কথা। কিন্তু হ্যামণ্ডকে তার আগে পেশাদারী ছেড়ে এ্যামেচার বলে ঘোষণা করতে হয়েছিল। বৃটিশ ক্রিকেটের আভিজাত্য রক্ষা করতে হবে তো!

এরও প্রায় দশ বছর পরের কথা, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিৎ তখন নড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ সমেত নানা উপনিবেশ হাতছাড়া হয়েছে। তবুও বৃটিশ ক্রিকেটের আভিজাত্যে নড়চড় হয়নি। সেটা হল ১৯৪৭ সাল। বৃটিশ টিম দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাচ্ছে। জাহাজের ভোজন-কক্ষে খেলোয়াড়েরা খেতে বসেছেন। দেখা গেল, এ্যামেচারেরা ও ম্যানেজার প্রভৃতি অভিজাত কর্তারা পেশাদারদের সঙ্গে এক টেবিলে খানাপিনা করছেন না। তাতে কেউ কিছু মনেও করছেন না, কারণ তখনকার রীতিই ছিল তাই। আজ এ-কথা মনে করলেও খেলোয়াড়েরা আঁতকে উঠবেন।

এই কৃত্রিম বাধা চিরকাল রাখা যায় না, তাই দেখতে দেখতে পেশাদারেরাও মানে-মর্যাদায় এ্যামেচারদের সমকক্ষ হতে লাগলেন। বিভিন্ন কাউন্টি ক্লাবে পেশাদারেরা অধিনায়কত্ব করতে লাগলেন এবং প্রশ্ন উঠল আন্তর্জাতিক খেলাতেই বা পেশাদারেরা অধিনায়ক হবে না কেন! লেন হাটন তখন ব্যাটিং-এর তুঙ্গে, ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান সংখ্যায় ডন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড অতিক্রম করে জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছেন। ১৯৫৪ সালে তাই অস্ট্রেলিয়াগামী ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব তাঁরই হাতে অর্পিত হল এবং সরকারীভাবে লেন হাটনই প্রথম পেশাদার অধিনায়ক।

লেন হাটনের পর থেকেই বৃটিশ ক্রিকেটের এ্যামেচার ও পেশাদারের প্রভেদটা প্রায় মুছে গেছে। তারপর থেকে যাঁরা অধিনায়ক হয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে যোগ্যতার জোরেই তা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য, নির্বাচকমণ্ডলীর অনুগ্রহ ও নিগ্রহের খেলা, আগেকার মত প্রবল না হলেও, এখনও তার ধারা প্রায় অব্যাহতই আছে।

তবে, এসব কিছুই বিচার করে বলা যায়, রে-ইলিংওয়ার্থ ইংলণ্ডের ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অতি সৌভাগ্যশালী অধিনায়ক। সাত বছর আগেও এই রে-ইলিংওয়ার্থ অধিনায়ক টেড ডেক্সটারের অধীনে অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ করে যখন দেশে ফিরলেন, তখন তাঁকে স্পষ্টবাদিতার খেসারৎ হিসাবে অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। ঐ দলের ম্যানেজার ছিলেন ডিউক অফ নরফোক এবং সহকারী ম্যানেজার ছিলেন বর্তমান নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি আলেক বেডসার। সফর শেষ হলে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে ম্যানেজার যে রিপোর্ট দাখিল করলেন, তার বিবেচনা করে এম সি সি ইলিংওয়ার্থের প্রাপ্য বোনাস থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড কেটে নিয়েছিলেন। সেবার ফ্রেড টুম্যান ও ব্যারী নাইটেরও প্রাপ্য বোনাস থেকে কিছু কেটে নেওয়া হয়। এগুলোকে অপ্রত্যক্ষ শাস্তি বলা যেতে পারে। এবং কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তের কোন কারণ দেখাননি। ইলিংওয়ার্থের ক্ষেত্রে কারণটা নাকি তাঁর স্পষ্টবাদিতা। সফরের সময় দলের এক সভায় খেলোয়াড়দের মতামত আহ্বান করা হয়।

ইলিংওয়ার্থ কর্তাদের মন জুগিয়ে কথা তো বলেনইনি, উল্টে দল নির্বাচন ও বোলিং প্রকরণের সমালোচনা করেন। দেশে ফিরে এসে তাঁকে তারই খেসারত দিতে হয়। আর আজ, এমনি ভাগ্যের ফের যে,

CENTRAL LIBRARY

সেদিনের সহকারী ম্যানেজার সেই অ্যালেক বেডসার অস্ট্রেলিয়াগামী ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক হিসেবে ইলিংওয়ার্থকেই নির্বাচন করলেন এবং তাও আবার কলিন কাউড্রের মত দক্ষ খেলোয়াড়ের দাবী অগ্রাহ্য করে। কাউড্রে এ-পর্যন্ত নবার বিদেশ সফর করেছেন, দুবার সফরকারী দলের অধিনায়কত্ব করেছেন এবং চারবার হয়েছেন সহকারী অধিনায়ক। তাঁর ব্যক্তিগত রেকর্ডে কোথাও কোন খুঁত বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। কালের হাওয়া আজ এমনি বদলেছে যে, নরফোকের ভিক্টোর বিষপ মন্তব্যের পরেও ইলিংওয়ার্থের পক্ষে অধিনায়কের গৌরব পাওয়াও সম্ভব হয়েছে। আগের দিন হলে ওপথ চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যেত।

ইলিংওয়ার্থ স্পষ্ট বক্তা বলে অবশ্য অনেক আগেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। বৃটিশ ক্রিকেটের শক্তিমান ক্লাব ইয়র্কশায়ারে থাককালীন তাঁর জীবনে দুটি ঘটনা ঘটে। এ-দুটি ঘটনাই উল্লেখযোগ্য। কারণ, প্রথম ঘটনায় ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং দ্বিতীয় ঘটনায় তাঁকে ক্লাব থেকে চলে যেতে হয়। ইয়র্কশায়ার কাউণ্টি ক্লাবে চার বছর খেলার পরও যখন তাঁর কোন পদোন্নতি ঘটলো না কিংবা কাউণ্টির টুপি পাবার সৌভাগ্য জুটলো না, তখন তিনি মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাছাড়া আর্থিক অসুবিধা ত ছিলই। তখন একদিন তিনি তখনকার ইয়র্কশায়ার দলের অধিনায়ক নর্মান ইয়ার্ডলেকে খোলাখুলিই বলে ফেললেন যে, তাঁর বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত না হলে তিনি ওয়ারউইকশায়ার দলে চলে যাবেন। এই স্পষ্টবাদিতার সুফল ফলে এবং পরের দিন থেকেই ইলিংওয়ার্থ কাউণ্টির ক্যাপ পাবার যোগ্যতা অর্জন করলেন। এটা ঘটে ১৯৫৫ সালে। এর পর দ্বিতীয় ঘটনার কথায় আসা যাক। এটি ঘটে ১৯৫৮ সালে। ইলিংওয়ার্থ তখন ইয়র্কশায়ারের হয়ে সতেরটি মরশুম খেলেছেন এবং ব্যাটে, বলে বা ফিল্ডিং-এ যে রেকর্ড রেখেছেন, তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের পক্ষে মোটেই অগৌরবের নয়। খেলোয়াড় যেমনই হোক না কেন, ইয়র্কশায়ার কারুর সঙ্গে এক বছরের বেশি চুক্তি করে না। ইলিংওয়ার্থ দাবী করলেন তাঁর সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করতে হবে। এবারে তাঁর হার হল। ইয়র্কশায়ার তাঁকে ছেড়ে দিল। আর ইয়র্কশায়ার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাগ্যের দ্বারও গেল খুলে। বিভিন্ন ক্লাব থেকে তিনি মোটা টাকার হাঁক পেলেন। ল্যাঙ্কাশায়ার, নটিংহাম, নর্দাম্পটন, লিস্টারশায়ার তাঁকে পাবার জন্যে প্রতিযোগিতার আসরে নামলো। ইলিংওয়ার্থ খুব হিসেবী লোক। টাকার অঙ্কে না ভুলে তিনি লিস্টারশায়ারে চলে গেলেন। তার একমাত্র কারণ লিস্টারশায়ার তাঁকে কাউণ্টি দলের অধিনায়কের পদ দিয়েছিলেন। কাউণ্টি দলের এই অধিনায়কতাই তাঁর ইংলণ্ড দলের অধিনায়কতার পথ উন্মুক্ত করে দিল।

ইলিংওয়ার্থ যে শুধু যোগ্য ব্যাটসম্যান শুধু তাই নয়, ক্রিকেটের সর্ব বিভাগে তাঁর দক্ষতা, বিশেষ করে তাঁর বুদ্ধিমত্তাই ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহলে তাঁকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলে। দীর্ঘকাল ইয়র্কশায়ারে খেলার সময় বিভিন্ন অধিনায়ক সব সময়েই তাঁর পরামর্শ নিতেন। যখনই কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তখনই ইলিংওয়ার্থের ডাক পড়েছে। এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর পরামর্শের ফসল ভালই হয়েছে।

তবে এ-কথাটা অকপটে মানতেই হবে যে, দক্ষতা বা যোগ্যতাটাই সব নয়—ইলিংওয়ার্থের ভাগ্যটাও ছিল খুব সুপ্রসন্ন। তা না হলে ইংলণ্ড দলের প্রায় নিশ্চিত নায়ক কলিন কাউড্রে দুর্ঘটনায় পড়বেন কেন? ১৯৬৯ সালের মে মাসে কাউড্রে পায়ে চোট পেলেন। ফলে সারা মরশুমটাই সে-বছর তিনি খেলতে পারলেন না, সফর শুরু হবার আগে পর্যন্ত তিনি তাঁর ফরমও ফিরে পাননি, ফলে ইলিংওয়ার্থের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। ভাগ্যের জোরেই সবকিছু হয়, আধুনিক যুগের মানুষ তা হয়ত বিশ্বাস করবেন না কিন্তু ইলিংওয়ার্থের ক্রিকেট-জীবনে এ-কথাটা খুব খাঁটি বলেই মনে হয়। ১৯৬৬ থেকেই ইংলণ্ডের ক্রিকেট অধিনায়কদের ভাগ্য নিয়ে যেন খেলা চলছে। মাইক স্মিথ অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সাফল্যের সঙ্গে সফর শেষ করে ১৯৬৬ সালে দেশের মাটিতে একটা টেস্ট ম্যাচে এমনই খারাপ ফল করলেন যে, তাঁকে সরিয়ে কাউড্রেকে আনতে হল। কাউড্রে তিনটি টেস্টে অধিনায়কতা করলেন কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলীর তাতে মন ভরল না। তাঁকে সরিয়ে আনা হল ব্রায়ান ক্লোজকে। গোড়ায় গোড়ায় ক্লোজ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রশংসা কুড়োলেও তাঁর চালচলন পছন্দসই হল না। তাই আবার ফিরে এলেন কাউড্রে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে কাউড্রে সাফল্যের গৌরব নিয়ে আসেন। স্বদেশে এসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও তাঁর অধিনায়কতা মোটামুটি ভালই হয়। তাঁর অধিনায়কত্বে পাকিস্তান সফরেও ইংলণ্ডের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। কাজেই অস্ট্রেলিয়াগামী দলের অধিনায়ক হিসাবে তাঁর নির্বাচন একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার ফলে তাঁর ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে।

এদিকে ভাগ্যলক্ষ্মী আর একভাবে ইলিংওয়ার্থের পথ খুলে দিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের নির্বাচিত অধিনায়ক কাউড্রে ভার না নেওয়ার দল পরিচালনার ভার পড়ে ইলিংওয়ার্থের ওপর। তিনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যাট করেন ও নৈপুণ্যসহকারে পরিচালনা করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাভূত করেন। এতে তাঁর সুনাম বৃদ্ধি পায়। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল হলে বিশ্ব একাদশের সঙ্গে ইংলণ্ড দলের যে টেস্ট খেলাগুলির ব্যবস্থা হয়, তাতেও ইলিংওয়ার্থ অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এবং এর পরই তাঁর ওপরে নির্বাচকমণ্ডলীর নজর পড়ে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুটো মরশুমে অধিনায়কতা করার সময় ইলিংওয়ার্থ তাঁর দলকে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হন। নিজে যেমন মনপ্রাণ দিয়ে খেলেন, দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের মধ্যে তিনি সেই প্রেরণা সঞ্চারিত করতে পারেন। নেতিমূলক খেলায় তিনি মোটেই বিশ্বাসী নন। খেলায় জিততে হবে এই সঙ্কল্প নিয়েই তিনি খেলতে নামেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই বহু প্রকার কলাকৌশল প্রয়োগ করেন। ব্যাটসম্যান হিসেবে লেন হাটনকেই তিনি তাঁর আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেইভাবেই তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মতে 'ক্যাপ্টেনের' কাজ হল ম্যাচ জেতা, ভোজনসভায় বক্তৃতা করা তার কাজ নয়। ভোজনসভায় কথার ফুলঝুরি ছড়ানর কাজ হল ম্যানেজারের। এই মন নিয়েই ইলিংওয়ার্থ গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। এবং খেলার মধ্যেও তাঁর সঙ্কল্পের ছাপ পড়েছে। এইবারই সর্বপ্রথম দু দেশের মধ্যে সাতটা টেস্ট ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। একটি টেস্ট ম্যাচ বৃষ্টির জন্যে পণ্ড হয়েছে এবং শেষ টেস্ট ম্যাচের আগে পর্যন্ত অবস্থা ইংলণ্ডের অনুকূলে ছিল। কারণ ইংলণ্ড একটি টেস্টে জয়ী হয় এবং বাকি খেলাগুলি শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে। সপ্তম বা শেষ টেস্ট ম্যাচে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ইংলণ্ড নাটকীয়ভাবে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে 'অ্যাশ' পুনরুদ্ধার করে এনেছে। প্রয়োজনের সময় সুদক্ষ বোলিং, ব্যাটিং এবং দল পরিচালনায় ইলিংওয়ার্থ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এত খোঁজাখুঁজির পর ইংলণ্ড হয়ত তাদের সঠিক ক্যাপ্টেন আবিষ্কার করেছে।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট খেলা

ভারতবর্ষ : ৩৮৭ রান (দিলীপ সরদেশাই ২১২ এবং সোলকার ৬১ রান। হোল্ডার ৬০ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২১৭ রান (কানহাই ৫৬, ফ্রেডারিকস ৪৫ এবং সোবার্স ৪৪ রান। প্রসন্ন ৬৫ রানে ৪, ভেঙ্কট-রাঘবন ৪৬ রানে ৩ এবং বেদী ৬০ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৮৫ রান (৫ উইকেটে। কানহাই নট-আউট ১৫৮, সোবার্স ৯৩ এবং লয়েড ৫৭ রান। সোলকার ৫৬ রানে ২ উইকেট)

প্রথম দিন

বৃষ্টির জন্যে খেলা আরম্ভই হয়নি।

দ্বিতীয় দিন

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৮০ রান সংগ্রহ করেছিল। সরদেশাই (৮১ রান) এবং সোলকার (৫০ রান) অপরাজিত ছিলেন।

তৃতীয় দিন

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৮৭ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের ১০টা উইকেট জমা রেখে ৩৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিন

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২১৭ রানের মাথায় শেষ হলে তাঁরা 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয় এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ৭২ রান সংগ্রহ করে। অপরাজিত থাকেন কানহাই (৩১ রান) এবং লয়েড (১ রান)।

পঞ্চম দিন

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৮৫ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হলে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। কানহাই ১৫৮ রান করে অপরাজিত থাকেন।

কিংস্টনের সাবিনা পার্কে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৬ষ্ঠ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এই দুই দেশের পূর্বের পাঁচটি টেস্ট সিরিজেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' জয়ী হয়েছে, এমনকি ভারতবর্ষ একটা টেস্ট খেলাতেও জিততে পারেনি। বর্তমানে এই দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ২৪টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১২ এবং খেলা ড্র ১২।

বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে চারজন খেলোয়াড় ১৯৬২ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন, তাঁরা সকলেই (জয়সীমা, সরদেশাই, দুরানী এবং প্রসন্ন) কিংস্টনের প্রথম টেস্ট খেলায় দলভুক্ত হয়েছিলেন। ভারতীয় টেস্ট দলে নবাগত ছিলেন ওপনিং ব্যাটসম্যান জয়ন্তী-লাল এবং উইকেটকীপার কৃষ্ণমূর্তি। ইংলিশ ক্রিকেট লীগের ৬ জন পেশাদার ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের মধ্যে জন শেফার্ড এবং কিথ বয়েসকে বাদ দিয়ে সোবার্স, লয়েড, কানহাই এবং হোল্ডার—এই চারজনকে প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে নেওয়া হয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে নবাগত খেলোয়াড় ছিলেন দুজন—লেগ-স্পিনার আর্থার ব্যারেট (জামাইকা) এবং ন্যাটো অফ-স্পিন বোলার জ্যাক নোরিগা (ত্রিনিদাদ)।

প্রথম দিন বৃষ্টির জন্যে খেলা আরম্ভই হয় নি।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট পড়ে ১৮০ রান দাঁড়ায়। সরদেশাই ৮১ রান এবং সোলকার ৫০ রান তুলে অপরাজিত থাকেন। এই দুজনের অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১০৮ রান উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই খেলার মোড় ঘুরিয়ে ভারতবর্ষকে সংকট

রোহন কানহাই

থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ভারতবর্ষের খেলার সূচনা খুবই খারাপ হয়েছিল—৯০ রানের মাথায় প্রথম এবং ৭৫ রানের মাথায় পঞ্চম উইকেট পড়েছিল।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৮৭ রানের মাথায় শেষ হয়। এই তৃতীয় দিনটি ছিল ভারতবর্ষের বিরাট সাফল্যের

দিলীপ সরদেশাই

দিন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে এই তিনটি রেকর্ড হয়েছিল :

(১) দিলীপ সরদেশাইয়ের ২১২ রান—এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান এবং প্রথম ডবল সেঞ্চুরী। পূর্ব রেকর্ড : ১৭২ নট-আউট—পলি উমরীগড় (ত্রিনিদাদ, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬১-৬২)।

দ্রষ্টব্য : ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড : ২৫৬—রোহন কানহাই (কলকাতা, ৩য় টেস্ট, ১৯৫৮-৫৯)।

(২) ৬ষ্ঠ উইকেট জুটিতে ১৩৭ রান—একনাথ সোলকার (৬১ রান) এবং দিলীপ সরদেশাই। পূর্ব রেকর্ড : ১৩৪ রান—চান্দু বোরদে এবং হেমু অধিকারী (নিউ দিল্লী, ৫ম টেস্ট, ১৯৫৮-৫৯)।

দ্রষ্টব্য : ৬ষ্ঠ উইকেট জুটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রেকর্ড : ১৬০ রান—গারফিল্ড সোবার্স এবং জো সলোমন (কানপুর, ২য় টেস্ট, ১৯৫৮-৫৯)।

(৩) ৯ম উইকেট জুটিতে ১২২ রান—এরাপল্লী প্রসন্ন (২৫ রান) এবং দিলীপ সরদেশাই। পূর্ব রেকর্ড : ৯৫ রান—বুধি কুন্দরন এবং ভেঙ্কটরাঘবন (বোম্বাই, প্রথম টেস্ট, ১৯৬৬)।

দ্রষ্টব্য : ৯ম উইকেট জুটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রেকর্ড : ১০৬ রান—ক্লাইভ ক্রিশ্চিয়ানী এবং ডি এটকিনসন (নিউ দিল্লী, প্রথম টেস্ট, ১৯৪৮-৪৯)।

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় দিলীপ সরদেশাই সার্থক পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন। দলের মাত্র ১০ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়লে তিনি খেলতে নামেন এবং দলের ৩৮২ রানের মাথায় আউট হন। তাঁর বিদায়ের পর বাকী একটি উইকেটে

মাত্র ৫ রান উঠেছিল—৩৮৭ রানের মাথায় ১০ম উইকেট পড়েছিল। তাঁর ২১২ রানে ছিল ১৭টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী। দলের মোট ৩৮৭ রানের মধ্যে তিনি একাই সিংহভাগ তুলেছিলেন—প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ।

দিলীপ সরদেশাইয়ের এই ২১২ রান—তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে এক ইনিংসের খেলায় দ্বিতীয় ডবল সেঞ্চুরী—বিদেশের মাটিতে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম ডবল সেঞ্চুরী তথা এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড।

তৃতীয় দিনে বাকী ৭০ মিনিটের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যখন ৩৬ রান তুলে এবং ১০টা উইকেট হাতে জমা রেখে বাড়ী ফিরেছিল তখন কেউ ভাবেন নি চতুর্থ দিনের খেলায় তাদের বিরাট সঙ্কটে পড়তে হবে।

চতুর্থ দিনে চা-পানের কিছু আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২১৭ রানের মাথায় শেষ হয়। শেষ ৫টা উইকেটে মাত্র ১৫ রান উঠেছিল। এই ২১৭ রানই ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় তাদের সর্বনিম্ন রান। আগে এক ইনিংসের খেলায় তাদের সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ছিল : ভারতবর্ষের মাটিতে ২২২ রান (কানপুর, ২য় টেস্ট, ১৯৫৮-৫৯) এবং স্বদেশের মাটিতে ২২৮ রান (ব্রিজটাউন ২য় টেস্ট, ১৯৫৩)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৭০ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে অর্থাৎ ২য় ইনিংস খেলতে নামে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই প্রথম 'ফলো-অন'। ভারতীয় খেলোয়াড়দের উন্নত বোলিং এবং গ্রাউণ্ড ফিল্ডিংয়ের ফলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এই প্রথম 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়েছিল।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ৭২ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন কানহাই (৩১ রান) এবং লয়েড (৯ রান)। ভারতবর্ষের একান্ত নির্ভরশীল অফ-স্পিন বোলার প্রসন্ন মাংসপেশীর টানে এই দিন মাত্র এক ওভার বল দিয়ে খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন।

পঞ্চম দিন অর্থাৎ শেষ দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের ২য় ইনিংসের খেলা চালিয়ে যায়। তাদের ২য় ইনিংসের ৩৮৫ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হলে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় প্রথম পরাজয়ের গ্লানি থেকে দলকে রক্ষা করেন কানহাই (নট-আউট ১৫৮ রান), সোবার্স (৯৩ রান) এবং লয়েড (৫৭ রান)। ৩য় উইকেটের জুটিতে লয়েড এবং কানহাই ১১৫ রান এবং ৪র্থ উইকেটের জুটিতে সোবার্স এবং কানহাই ১৭৩ রান যোগ করেন।

কানহাই ১৫৮ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে তাঁর এই ১৩শ সেঞ্চুরী। ভারতবর্ষের বিপক্ষে এই নিয়ে ৪টি সেঞ্চুরী করলেন—২৫৬ রান (কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯), ১৩৮ (কিংস্টন, ১৯৬২), ১৩৯ রান (ত্রিনিদাদ, ১৯৬২) এবং নট-আউট ১৫৮ রান (কিংস্টন, ১৯৭১)। বর্তমানে কানহাইয়ের টেস্ট পরিসংখ্যান দাঁড়াল : খেলা ৬২, ইনিংস ১১০, নট-আউট ৪ বার, মোট রান ৫২৭০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৫৬ (বিপক্ষে ভারতবর্ষ, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯) এবং সেঞ্চুরী ১৩। ভারতবর্ষের বিপক্ষে কানহাইয়ের টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৪, ইনিংস ২১, নট-আউট ১ বার, মোট রান ১৪৭৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৫৬ এবং সেঞ্চুরী ৪।

সোবার্স মাত্র ৭ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বর্তমানে সোবার্সের পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৭৭, ইনিংস ১৩৪, নট-আউট ১৭ বার, মোট রান ৬৯১৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৬৫ নট-আউট (বিশ্বরেকর্ড; বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৮) এবং সেঞ্চুরী ২১। ভারতবর্ষের বিপক্ষে সোবার্সের টেস্ট পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ১৪, ইনিংস ২২, নট-আউট ৫ বার, মোট রান ১৪৬০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৯৮ (বোম্বাই, ১৯৫৮-৫৯) এবং সেঞ্চুরী ৫।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৯২ (৩ উইকেটে)। এই সময় খেলায় অপরাজিত ছিলেন কানহাই (৭১ রান) এবং সোবার্স (২৯)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তখন প্রথম ইনিংসের ১৭০ রানের ঘাটতি পূরণ করে ২২ রানে অগ্রগামী হয়েছে। খেলার গতি তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অনুকূলে—অর্থাৎ খেলায় হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চা-পানের সময় তাদের রান দাঁড়ায় ৩১১ (৩ উইকেটে)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তখন ১৪১ রানে অগ্রগামী, উইকেটে হাত জমিয়ে খেলছেন (চতুর্থ উইকেট জুটি) কানহাই এবং সোবার্স। সুতরাং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সমর্থকরা নিশ্চিন্ত। ভারতবর্ষের বোলিং এবং ফিল্ডিং কোন সময়েই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। চতুর্থ দিন যেখানে ভারতবর্ষ ২৫০ রানের বিনিময়ে ১২টা উইকেট নিয়েছিল (প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৮১ রানে ১০ উইকেট এবং ২য় ইনিংসে ৭২ রানে ২ উইকেট), সেখানে খেলার ৫ম অর্থাৎ শেষ দিনে ৩১৩ রানে ৩টে উইকেট পেয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দাপটের সঙ্গে খেলে ভারতবর্ষের বোলিং এবং ফিল্ডিং নৈপুণ্য খর্ব করে দিয়েছিল। ভারতবর্ষের একমাত্র সান্ত্বনা যে, তারা সোবার্সকে শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরী করতে দেয় নি — ৯৩ রানের মাথায় আউট করে মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল। প্রথম টেস্ট খেলার পর ভারতীয় দলের ব্যাটিং এবং বোলিং শক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা খুবই শক্ত। তাদের প্রথম ইনিংসের ৭৫ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায় এবং প্রায় দু দিনের খেলায় তারা মোট ৩৮৭ রান সংগ্রহ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে তারা বোলিংয়ের যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিল, দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তার ধারে-কাছে যেতে পারে নি। এই টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে সাফল্য—তিনটি বিষয়ে রেকর্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রানে আউট এবং ফলো-অন করতে বাধ্য করা।

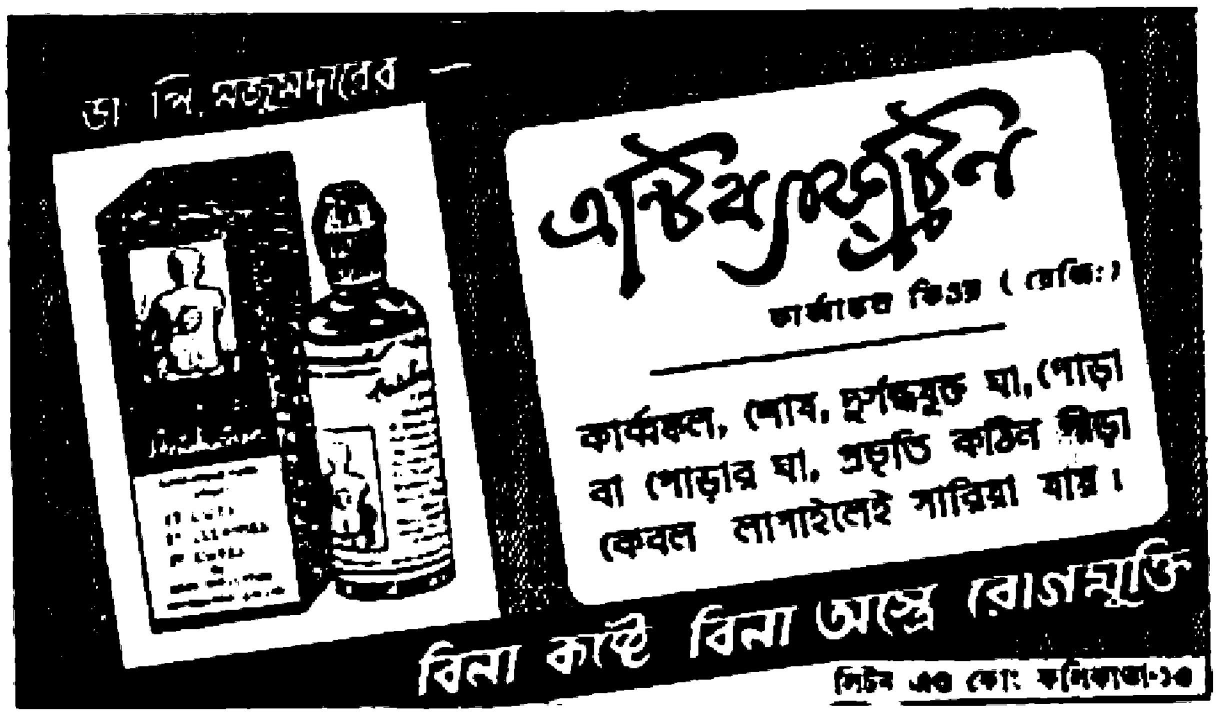

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।৯, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ ক'রে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

৫০ বছরের ওপর
জনপ্রিয়তায়
অদ্বিতীয়
ভারতে সবচেয়ে
বেশী বিক্রী—
ব্রিটানিয়া
থিন এরারুট বিস্কুট
BRITANNIA
THIN ARROWROOT
ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।
৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৩৪-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৪শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 12th March, 1971 শুক্রবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৭৭ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪০৪	চিঠিপত্র		
৪০৬	সাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
৪০৮	দেশে বিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৪১১	সম্পাদকীয়		
৪১২	কখনের ফেরানো যাবে না	(কবিতা)	—শ্রীশান্তনু দাস
৪১২	একাবেলা	(কবিতা)	—শ্রীপ্রতিমা সেনগুপ্ত
৪১২	জো নেই	(কবিতা)	—শ্রীশক্তি মুখোপাধ্যায়
৪১৩	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব		—শ্রীআনন্দ সেন
৪১৬	মাধ্যাকর্ষণ	(গল্প)	—শ্রীঅজিত দে
৪২২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৪২৯	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৩৫	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্দিৎসু
৪৩৭	অন্দরে অন্তরে	(বড় গল্প)	—শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
৪৪৫	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৪৪৮	দ্বিতীয় তৃতীয় বার্ষিক চিত্রকলা প্রদর্শনী		—শ্রীঅজিত দত্ত
৪৫১	পিঞ্জর	(উপন্যাস)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৪৫৭	সুরের সুরধুনী		—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
৪৫৯	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৬১	চাঁদ উপেক্ষিত		—শ্রীসুশীল ঘোষ
৪৬৩	বৃত্ত	(গল্প)	—শ্রীশৈলনাথ সাহা
৪৬৯	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৪৭০	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৪৭২	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৪৭৭	খেলার কথা		—শ্রীঅজয় বসু
৪৭৮	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীপাঁচুগোপাল দে

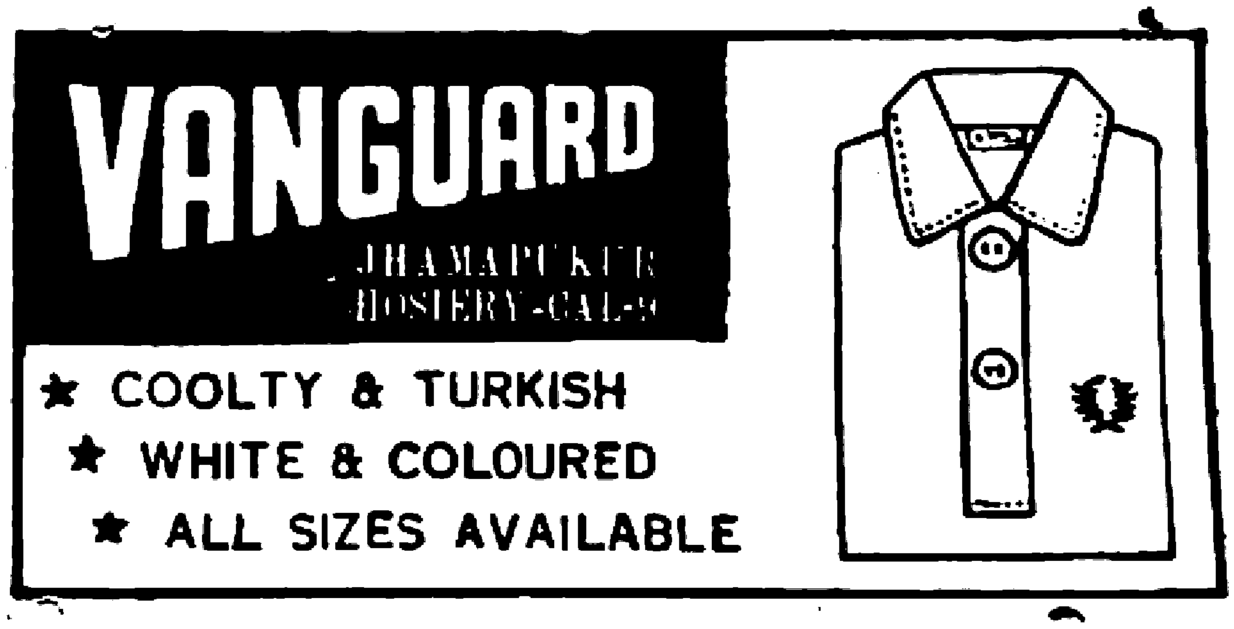

JHAMAPUKUR HOSIERY FACTORY (PRIVATE) LTD
22/A, Kalidas Singha Lane, Cal-9 ফোন 35-4832

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রসঙ্গে

অনেকদিন ধরে নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে লক্ষ্য করে আসছি। ফুরিয়ে যাবার আগে কিছু বলতে ইচ্ছে করে—অথচ আশঙ্কা। বন্ধুর পিঠ চাপড়ানোর অভিযোগ শুনতে হয়। এদিকে পাঠকবিবেকেরও ভর্ৎসনা বড় কম নয়।......সম্প্রতি অমৃতের পাতায় আমরা এতদিনে একটা সাত্যকার বাংলা সাহিত্য উপহার পেলাম। সেইসঙ্গে পেলাম এই সর্বপ্রথম একজন সেকুলার বাঙালী লেখককে। আর, শুধু 'বাঙালী' বিশেষণই বা কেন—খাঁটি লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া পৃথিবীর যে কোন দেশেই বিরল সুযোগ, অর্থাৎ যে-লেখক জাত-গোত্র-বর্ণ ইত্যাদির বাইরের মানুষ। 'ধর্ম সমাজ এবং সম্প্রদায়ের বাইরে দাঁড়িয়ে জীবনকে সামনে রেখে প্রাকৃতিক সর্বোত্তম আধারে স্থাপন করতে পটু।......

দুই বাংলার সাহিত্যের ঐতিহ্যের ঐক্যে বিশ্বাসী বলে আমার জানাতে দ্বিধা নেই যে অতীনের এই রচনা বাংলাসাহিত্যের এযাবৎকালের নজীরের বাইরে। কারণ, তাঁর ঈশম, ফেলু শেখ, আবেদালির জোটনেরা কোন হিন্দুর চোখে দেখা মুসলমান চরিত্র নয়। জোটন-ফকিরসাহেবের ডিটেলস কিংবা জালালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা—যার পটভূমির মুসলিম মিশ্র সমেত জীবনেরই সেই মহিমাকে স্পষ্ট করেছে, যা আমরা একদা গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলিতে প্রত্যক্ষ করেছি—যা সম্পূর্ণত মানবিক এবং মানবিক বলেই শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি। জন্মসূত্রে আমি মুসলমান—মুসলিম জীবনযাত্রার ভঙ্গী এবং খোলাখুলি মিশ আমার সংস্কারে-অবচেতনায় গ্রথিত—এবং আশ্চর্য, অতীন কেমন করে অত ডিটেলসে তার প্রয়োগ করলেন! ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষে কীভাবে এটা সম্ভব হল? তাঁর পর্যবেক্ষণের কোন তুলনা নেই। বড় লেখকের মধ্যে এই গুণটি থাকে। অতীনের আছে।

আমাদের আক্ষেপ ছিল—দেশভাগ এবং তার পূর্বপ্রস্তুতির গভীর বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে কোন উপন্যাস লেখা হয়নি। সে আক্ষেপ ঘুচল। আর কোন উপন্যাস পড়ে মনে হয় যে এই বাংলা-দেশে শুধু হিন্দুরাই নেই—মুসলমানও আছেন এবং অনেক বেশি সংখ্যাতেই আছেন? আমাকে ভাবতে কষ্ট হয়েছে, কোন লেখক কেমন হিন্দু এবং কেউ শুধু মুসলমান নিয়েই লিখছেন, যেহেতু তাঁদের কেউ হিন্দু বা কেউ মুসলমান! [illegible] যে মুহূর্তে সে লেখক, তখনই সে ধর্ম-সমাজসম্প্রদায়বর্জিত একজন মানুষ—সে তখন শিল্পের বান্দা, জীবনের অনুচর এবং মনুষ্যত্বের ব্যাখ্যাকার। কেউ যদি বলে, বড় মুশকিল—আমি হিন্দু হয়ে মুসলমানের ব্যাপার কেমন করে লিখি, জানিই না কিছু......তাহলে আমার বলতে ইচ্ছে করে—তাহলে লেখক হওয়া কেন? জীবনের কথা বলার ভান করবে—অথচ জীবনের বিচিত্র রূপ দেখতে গণ্ডী পেরিয়ে বাইরে যাবে না— সেটা হয় না। তুমি লেখক—তুমি দ্বিতীয় ঈশ্বর। তোমার প্রজ্ঞার আলো চারপাশে ছড়াবে। যাই হোক, অতীনের কাছে আমাদের নতুন জেনারেশনের বাঙালী লেখকের অনেক ঋণ জমে গেল। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে খুঁজতে এই লেখক চারপাশে যা আবিষ্কার করেছেন, তা এতদিন বাংলাসাহিত্যে আমরা পাইনি। আমরা কৃতজ্ঞ।

অতীনের এ উপন্যাসের ভাষাশৈলী কি দুর্বোধ্য? মনে করি নে। এ লিখনভঙ্গী আনকনভেনশনাল এবং নতুন এবং এইতেই অতীনের স্বাতন্ত্র্য বা চরিত্র। এটা ওঁর ভাষার দুর্বলতা নয়—যদিও আপাত-দৃষ্টে তাই মনে হয়, এ হচ্ছে জীবন ও প্রকৃতির প্রতি অতীনের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ। আর কী বলব? আমি অভিভূত হচ্ছি প্রতিটি অধ্যায়ে—ভাবতে গর্ব অনুভব করছি যে আমার সমকালে এক তাজা, তেজস্বী, খাঁটি এবং শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' যিনি চলেছেন, আজ হয়তো তিনি নিঃসঙ্গ যাত্রী। কিন্তু বিশ্বাস করছি, একদা আমাদের বংশধরগণ তাঁর নিঃসঙ্গ-যন্ত্রণা অনুভব করে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তিরস্কার বর্ষণ করবে। 'পথের পাঁচালীর' পর এই হচ্ছে দ্বিতীয় উপন্যাস—যা বাংলা সাহিত্যের মূল সুরকে অনুসরণ করেছে। এবং এর জন্য 'অমৃত' সম্পাদককেও ধন্যবাদ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলিকাতা-১৪

'জলবিন্দু' প্রসঙ্গে

আমি নিয়মিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পড়ি। বিগত ২২শে মাঘ, ১৩৭৭-এর সংখ্যায় শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত লিখিত "জলবিন্দু" গল্পটি পড়লাম। শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত আপনাদের পত্রিকার নিয়মিত লেখক। "অমৃতে" ইতি-পূর্বে প্রকাশিত তাঁর সমস্ত গল্পই পড়েছি। যতদূর মনে পড়ে, তিনি সবই প্রেমের গল্প লিখেছেন। কেবলমাত্র 'অমৃতের' একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত "অন্নের শোণিত" নামে দুর্ভিক্ষের উপর একটি অনবদ্য গল্প পড়েছিলাম। এ ছাড়া [illegible] প্রেমের নানাবিধ সমস্যাকেই তিনি তাঁর অন্যান্য গল্পে প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু "জলবিন্দু" গল্পটিতে লেখক তাঁর প্রচলিত প্রেমের গল্পের বিষয় থেকে যে সরে আসতে চাইছেন, তার প্রমাণ আছে। বর্তমান মধ্যবিত্ত সমাজের বাঁচার সমস্যার সঙ্গে একটি নারীর ভালবাসা ও নারীত্বের এমন অপূর্ব চিত্র সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে কমই দেখেছি। শ্রীদত্ত তাঁর গল্পের বিষয়ে নতুনত্ব আনছেন দেখে লেখককে ধন্যবাদ জানানোর জন্যই পত্রটি লিখলাম। এই রকম লেখা ও লেখকদের অমৃতে পাই বলেই পত্রিকাটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এর জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। লেখককেও আমার ধন্যবাদ দেবেন। পত্রটি অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হলে বাধিত হবো।

দেবনাথ চক্রবর্তী
সি টি আই, গোবিন্দনগর,
কানপুর-৬

নিকটেই আছে প্রসঙ্গে

আমি আপনার অমৃতের নিয়মিত পাঠক। আপনার পত্রিকা সত্যই খুব আনন্দ দেয় আমাকে। চিঠিপত্র বিভাগে 'নিকটেই আছে' প্রসঙ্গে অনেক চিঠি পড়লাম। পাঠক হিসাবে 'নিকটেই আছে' প্রসঙ্গে আমারও দু-এক কথা বলার ইচ্ছা হলো।

'সন্ধিৎসু' তাঁর অনুসন্ধিৎসার দ্বারা সমাজের অনেক স্তরের লোকের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। পাঠকরাও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার ধারণা কিছু অন্য ধরনের।

আজকালকার সমাজের এই 'নিকটের' লোকগুলো এত বেশী নিকটে হয়ে গেছে এবং সর্বত্র বিরাজ করছে যে, আমরা আজ মানুষকে শ্রদ্ধা করা বা আইনকে ভালবাসার ভাবটা মন থেকে একদম মুছে ফেলেছি। সমাজের সমস্ত লোককেই এখন আমরা 'নিকটের' ধরনের লোক বলে মনে করি। এমনকি সন্ধিৎসু পাঠকসমাজের মনের মধ্যে যদি অনুসন্ধিৎসা চালান তো নিশ্চয়ই কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে বলতে শুনবেন যে, সন্ধিৎসু এত লিখছেন, কিন্তু খুঁজে দেখলে দেখা যাবে যে, ইনিও হয়ত কোন 'নিকটের' দলের লোকই হবেন!

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

দুঃখ পাবেন হয়ত। কিন্তু এটা আজকের সমাজের ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি বলি কি, সন্দিৎসু তার চেয়ে নিজের অনুসন্ধিৎসা একটু অন্য দিকে ব্যবহার করুন। সমাজের ভাল নিকটায়। যেখানে আইন আছে, আইন অমান্যের শাস্তি আছে, যেখানে আজও দু-একটা লোক 'নিকটে' না এসে 'দূরে' থেকে গেছে। হয়ত বা সমাজ থেকেই দূরে, এক কোণে।

বাংলায় একটা কথা আছে, 'সেই কললে সাপের বিষও থাকে না'। আমাদের সমাজে যখন বিষ ঝাড়বার ব্যবস্থা নেই(?) তখন আসুন আমরা সকলে নেই নেই বলে চেঁচাই, যদি সমাজের বিষ তবু কিছুটা কমে!

আমার মনে হয় সন্দিৎসু যদি কিছু সংখ্যক 'দূরের' লোকের বিষয়, বা কিছু নিকটের লোকের কি ধরনের শাস্তি হয়েছে, তার বিষয় কিছু আলো ফেলতে পারেন, তবে সমাজের বিরাট একটা কল্যাণ হবে। আর যদি তাঁর পূর্ব কাহিনীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দেখাতে পারেন (পারা কি সম্ভব?) যে তাঁর লেখা প্রকাশিত হওয়ায় কোন 'নিকটের' লোকের কি সাজা হয়েছে, তাহলে শুধু আপনার পাঠক-সমাজ নয়, সমস্ত বাংলা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

আশায় রইলাম।

শান্তিব্রত চৌধুরী
নতুন দিল্লী

বিনোদনের সাহিত্য

বাংলা পত্রপত্রিকার জগতে বিনোদনের সাহিত্য পরিবেশনে 'অমৃত'র একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বর্তমান আকারে কবিতা গল্প রম্য হালকা রচনা সহ খেলাধুলো সিনেমা রঙ্গমঞ্চ সঙ্গীত ফ্যাশন প্রভৃতির ব্যাপক উপভোগ্য বিষয় সচিত্র উপাদের অঙ্গসজ্জায় প্রকাশের আয়োজন 'অমৃত' পত্রিকাই কয়েক বছর আগে প্রথম শুরু করে। বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটিও নিশ্চয় পাঠক-পাঠিকার ভাল লেগেছে।

প্রথমেই গল্প। কোন পত্রিকায় ৮-১০টি গল্প একত্রে প্রকাশিত হতে দেখলে মনে হয়, এর পেছনে কোন পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য আছে। হয়ত বা কোন বিশেষ শৈল্পিক অভিপ্রায় গল্পগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হচ্ছে। বিনোদন সংখ্যা বলে এবারের 'অমৃত'র গল্পগুলি বিনোদনের মেজাজ নিয়েই পড়তে শুরু করেছিলাম। কিন্তু না, সে-রকম খুশি খুশি মন নিয়ে পড়ার গল্প কৈ। এ সময়ের গল্পকারেরা হয়ত সহজ বিষয়ের সহজ গল্প লিখতে ভুলেই গেছেন। ছবি বসু, অতীশ বর্ধন বা চণ্ডী মণ্ডলের গল্পগুলি তবু একটু সহজ মেজাজের। কিন্তু অন্যান্যরা সকলেই কম-বেশী সিরিয়াস। যেমন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বা শ্যামলজীবন ভট্টাচার্যের গল্পের মুখ্য অবলম্বন প্রেম-ভালবাসার মানবিক সম্পর্ক হলেও তার মধ্যে মনস্তত্ত্ব তার জটিল গ্রন্থি বিস্তার করেছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্প সামাজিক সমস্যা বরং কিছুটা সহজ মানবিক আর্তিতে সুখপাঠ্য। বিষয়বস্তু প্রকাশে সুন্দর সমন্বয় রেখে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সুন্দর একটি গল্প লিখেছেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'চটির' গল্পটির তাৎপর্য যদি কিছু থাকে, ঠিক বুঝতে পারিনি, থাকাই সম্ভব. নাহলে আপাতকাহিনী নিরর্থক হয়ে পড়ে।

কবিতা আমি ভাল বুঝি না। তবে পড়ে যাই। উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করতে বেশ লাগে। বিশেষত অপেক্ষা দীর্ঘ কবিতাগুলি। ইদানীং মণীন্দ্র রায়ের কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা পড়েছি। 'তোমার নামেই' যদিও সে রকম দীর্ঘ নয়, কবির কল্পনায় যাপিত আকর্ষণীয়। আর ভালো লাগল তরুণ সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, সত্যানন্দ ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং আশিস সান্যালের কবিতা।

মানুষের সৃজনী প্রতিভা একালে গল্প, কবিতা ছাড়াও চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, খেলাধুলো প্রভৃতির মাধ্যমেও অধিক পরিস্ফুট। সঙ্গীত চিত্রকলা ও সনাতন শিল্পরূপ। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন সব কিছু মিলেই বিচিত্র ও বিশিষ্ট। আমার ত মনে হয় মানুষের আগ্রহের দিক বিবেচনা করে পত্র-পত্রিকার কর্তৃপক্ষের মাঝে মাঝেই এ-রকম বিনোদন জাতীয় সংখ্যা করা উচিত। নাকি এ-সময়ে এ-সবের সঙ্গে সাহিত্য ইত্যাদির কোন তফাৎ নেই। আমারও তাই মনে হয়। বিনোদন সংখ্যা 'অমৃতে' প্রকাশিত 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির নাম শুনেই পড়বার আগ্রহ হয়েছিল। এন কে জি'র আলোচনা পড়ে মুগ্ধ হলাম। সুন্দর তথ্যনিষ্ঠ, নিরাসক্ত, সাহিত্যিক-গুণে সমন্বিত রচনা। রচনাটি উৎকৃষ্ট হয়েছে বলেই উপস্থাপ্য বিষয়বস্তু ও প্রত্যক্ষগোচর ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তেমনি শিশিরকুমার সম্পর্কে স্ব সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি-চিত্রণ, বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'দেবিকারাণী' আকর্ষণীয়। আর ভাল লাগবে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', শান্তি-গোপালের 'আমিই লেনিন', অজয় বসুর 'মানুষ বনাম মেশিন', কমল ভট্টাচার্যের 'পঙ্কজ রায় একটি ইতিহাস', চিদানন্দ দাশ-গুপ্তের 'নির্বাক ছবি' প্রভৃতি রচনা। বিচিত্র বিষয়, বিচিত্র ভাবনা-চিন্তা, সুন্দর প্রকাশ দীপ্তি। তবে কিছু রচনা বড় বেশী সংক্ষিপ্ত। কিছু ভাসা ভাসা আলোচনাও আছে। একালের পাঠকদের সাধারণত বিবেচনা করে বিচিত্র শিল্পরূপের বিশেষজ্ঞদের আরও গভীর আরও তথ্যনিষ্ঠ হতে অনুরোধ করি। এঁদের একটা কথা জানা থাকা দরকার যে, গল্প, কবিতা, উপন্যাস পড়া পাঠকের চেয়ে সিনেমা থিয়েটার খেলার কথা পড়ার পাঠকের সংখ্যা কম নেই। এবং স্বাদ বৈচিত্র্যের জন্যে অনেক সাহিত্য পিপাসুও এ-জাতীয় আলোচনার ভক্ত। অনেকে খোঁজ খবরও ভালো রাখেন। বিশেষত ইদানীংকালের ভংগীসর্বস্ব সাহিত্য পড়ে যাঁরা ক্লান্ত তাঁরা এইসব বিচিত্র স্বাদের সাহিত্যকর্ম পড়তে আগ্রহী। তার কারণ এ জাতীয় রচনার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ও তথ্যনিষ্ঠ বিষয়বস্তু থাকে। ভাল বিষয়বস্তু বা যাকে বলা হয় কনটেন্ট ছাড়া ভাল রচনা হতেই পারে না। অথচ একালের অনেক কবি বা গল্পকার নাকি তাঁদের সাহিত্যকর্মের জন্য বিষয়বস্তুর তোয়াক্কা করেন না। এমন চলতে থাকলে বিকল্প সাহিত্য রচনার কদর বাড়বে বৈ কমবে না। বস্তুত খেলাধুলা বা রঙ্গমঞ্চ নিয়ে উৎকৃষ্ট যেসব রচনা লিখিত হয়, তাকেও আমরা সাহিত্যকর্মই বলি। আসলে আমরা ভাবতেই পারি না, দেশে সাহিত্যকর্ম নেই, খেলাধুলো আছে; কবিতা নেই চিত্র-শিল্প আছে। যথার্থ চিত্ত-বিনোদন তখনই সম্ভব যখন সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক হবে সজীব ও জীবন্ত। যেখানে সৃষ্টির সজীবতা সেখানে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের, সিনেমার সঙ্গে খেলাধুলোর শৈল্পিক ভেদরেখা সামান্যই।

শুভদেব বিশ্বাস
কলকাতা-৩

বৈকুণ্ঠের খাতা

২৯শে মাঘ ১৩৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' আমার সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুতর ভুল আছে। সে ভুল শুধরে নেওয়া দরকার।

প্রবন্ধটির লেখক বলেছেন যে সুনীতি বাবু লেখকদের ফুটনোট সম্বন্ধে আমাকে উসকে দিয়েছিলেন। এ কথা সত্য নয়। সত্য কথা এই যে, তিনিই মধ্যস্থ হয়ে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহাকে বলে ফুটনোটটি ছাপা দেবার ব্যবস্থা করে দেন।

আশা করি আমার এই বক্তব্যটুকু যথাসম্ভব শীঘ্র অমৃতে ছাপিয়ে দেবেন।

—সুকুমার সেন
কলিকাতা-৬

CENTRAL LIBRARY

শান্ত চোখে

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সঙ্কটজনক। সমস্যা আর সমস্যা। কেউ আর আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। অশান্তি আর অশান্তি ক্রমেই গভীর হতে চলেছে, রাজ্যকে এই চরম সন্ধিক্ষণে নেতৃত্ব দিয়ে জনমনে আস্থা ফিরিয়ে আনা খুব সহজ নয়। কাজেই যাঁরা জনগণের আশীর্বাদ লাভ করে কর্ণধার হওয়ার সুযোগ পেলেন তাঁদের দায়িত্ব কত বেশী সে কথা নিবেদন করার প্রয়োজন নেই। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হতে পেরেছেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর শেষ নির্বাচনী বক্তৃতায় বলে গেছেন, সমস্যাবহুল পশ্চিমবঙ্গে হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির যে ভয়ঙ্কর রূপ দেখা দিয়েছে অবিলম্বে তার যদি পরিসমাপ্তি না ঘটে তবে "এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার"। ইন্দিরাজীর এই উক্তিকে অবজ্ঞা করা কোনমতেই উচিত নয়। ইন্দিরাজী বলেছেন, এহেন অবস্থা চলতে থাকলে কলকারখানা শুধু ক্রমেই বন্ধ হয়ে যাবে এমন নয় পরন্তু এই রাজ্য থেকে ধীরে ধীরে শিল্প সংস্থা অন্যত্র চলে যাওয়ার আশঙ্কা সমধিক। প্রধানমন্ত্রীর আশঙ্কা যে অমূলক নয় ইতিমধ্যেই তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। কারণ, অনেক উদ্যোক্তা তাঁদের শিল্পপ্রসারের উদ্যমকে সংযত করেছেন এমন নয়, মূলধন বিনিয়োগ করে চালু শিল্পকে আরও প্রাণবন্ত করার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রয়েছেন: নতুন শিল্প সৃষ্টি না হওয়া এবং চালু শিল্পকে তেজী না করার অর্থই হচ্ছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়া। এবং শুধু তাই নয়—ক্রমবর্ধমান বেকারীর আরও পরিব্যাপ্তি লাভ করা। কাজেই সঠিক অনুমান করা যায় যে, যদি দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলতে থাকে তবে এই রাজ্যের অবস্থা অচিরেই ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।

শুধু বেকারীর সমস্যা নয়। অর্ধভুক্ত অবস্থায় যাঁরা কালাতিপাত করছেন তাঁদের অনশনে থাকার প্রশ্নও মনকে উত্তাল করে তুলেছে। শ্রমিকের জীবনমান বৃদ্ধির প্রশ্নও বড় করে দেখা দিয়েছে। আর জমির ক্ষুধা নিয়ে যাঁরা দীর্ঘদিন লড়াই করে চলেছেন ওদের কথাও আজকে সামনে এসে গেছে। এক কথায় বলতে গেলে সমাজের প্রতি স্তরেই নানা রকম সমস্যা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এর মোকাবিলা করার মত যে বলিষ্ঠ ও হৃদয়বান নেতৃত্বের প্রয়োজন—জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আপনারা যাঁরা এলেন তাঁদের উপরই সেই গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে।

জমি বন্টনের প্রশ্ন দলমত নির্বিশেষে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু বলতে গেলে কেউ সার্থকভাবে দায়িত্বের সঙ্গে এ কাজ সমাধানে অগ্রণী হতে পারেন নি। বিগত যুক্তফ্রন্টের আমলে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রচুর। আইনানুগভাবে সমাধানের অভিলাষে একটি খসড়া বিলও তৈরী হয়েছিল। কিন্তু পাকাপাকিভাবে গৃহীত হবার পূর্বেই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিদায় নিতে হয়। এবং সেই বিদায়ের সুরে ধ্বনিত হয়েছিল জমি দখলের আন্দোলনের মাধ্যমে শরীকি সংঘর্ষের বিস্ফোরণ ফলে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা কি হবে সেই মতভেদ যে চলছিল শরীকি সংঘর্ষের মাধ্যমে তা নির্মমভাবে প্রকাশ পেয়ে গেল। পরে যখন রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হল—প্রশাসনিক কর্ণধারগণ এই সমস্যাকে অবজ্ঞা করলেন এমন নয়। নতুনভাবে বিল তৈরী করে তাঁরা জমি পুনর্বন্টন ও উদ্ধারের প্রশ্নটাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ একটি বিলের অনুমোদন লাভেও সমর্থ হলেন। এবং এই শেষ আইনে জমির সীমানা নির্ধারণ করা যেভাবে হয়েছে—সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিরা সর্বোচ্চ সীমা ২০ একর পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির প্রতিভূরা তাকে পরিবারপিছু সাড়ে বার একর করে দিয়ে প্রগতিশীল ও বামপন্থী নায়কদের উপর টেক্কা দিলেন। বস্তুতঃপক্ষে বিচার করলে দেখা যায়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে অদ্যাবধি পরিবারপিছু কি মাথাপিছু কত জমি বরাদ্দ করা হবে কিম্বা বেনামী জমি কিভাবে উদ্ধার করা যাবে এই নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। রাশি রাশি আইন যে না হয়েছে এমন নয়, বক্তৃতা, সেমিনার আরও কত কি। কিন্তু আসল কাজ কিছু হয়নি। শুধু নীতিগতভাবে এই সমস্যাকে সকলে মেনে নিয়েছেন মাত্র। বিগত যুক্তফ্রন্ট আমলে সমস্যা সমাধান হওয়ার ক্ষীণ আলোক রেখা দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু কৌশলের ও উপায়ের প্রশ্নে মন্ত্রিসভাই বিলুপ্ত হয়ে গেল। বলতে গেলে বর্তমানে জমির প্রশ্নই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কারণ ৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর, এবং কৃষিক্ষেত্রেই লুকিয়ে রয়েছে বেকারী সমাধানের একটি যোগ্য উত্তর এবং স্থিতিশীল অর্থনীতি গড়ে তোলবার চাবিকাঠি। আপনারা যাঁরা এলেন—তাঁরা অতীতের অভিজ্ঞতা এবং দূরদৃষ্টির সংযোগ স্থাপন করে ভেবে দেখুন ম্রিয়মান বাঙালীর জন্য কি করতে পারেন। নতুন সৃষ্টির উপাদান আছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপনারা অনেক জ্ঞানবান। এখন আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হলেই কাজ হবে।

ভেবে দেখুন শিল্পের অবস্থা। প্রায় প্রতিনিয়তই চলছে, অবস্থান ধর্মঘট, গণ-ছুটি, ধর্মঘট, লক-আউট, ক্লোজার ও লে-অফ। শিল্পে অশান্তি দীর্ঘদিনের। চাকুরী হারাবার ভয়ে আন্দোলন হচ্ছে এমন নয়, জীবনমান বৃদ্ধির জন্যও লড়াই চলছে। পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি শিল্প সংস্থা নেই—কি সরকারী—কি বেসরকারী— যেখানে এ আন্দোলনের ঢেউ লাগে নি। বলতে গেলে এ সমস্ত শিল্প সংস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল বেকারী সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটিও। নতুন শিল্প স্থাপিত না হলে কিম্বা যে সমস্ত শিল্প সংস্থা আছে সেগুলির বিস্তার সাধিত না হলে স্বাভাবিক ভাবেই কাজকর্মের বাড়তি চাহিদা ত দূরের কথা বর্তমানে যে অশুভ ছায়া পড়েছে তাকেও দূরীভূত করা সম্ভব হবে না। জনতার আশীর্বাদ নিয়ে যাঁরা এলেন তাঁদের এই প্রশ্নের দিকেও নজর দিতে হবে বেশী। শিল্পসংস্থায় যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা অনেক বেশী সংগঠিত। কাজেই দাবী আদায়ের

লড়াই করতে তাঁরা অনেকখানি সক্ষম। সহজে তাঁদের পরাভূত করা কঠিন। সুতরাং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে নূতনতার সঙ্গে বাস্তব নীতি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তবে একথা নয় যে, দাবী থেকে তাদের বঞ্চিত করতে হবে। ন্যায্য মজুরী বৃদ্ধি যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধির। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি নজর না থাকলে শিল্প বাঁচতে পারে না। শিল্পপতির লভ্যাংশে বিধিবন্ধ করা হোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনে শ্রমিকদেরও কর্মের প্রতি আন্তরিকতা দেখাতে হবে। বেশ-কিছুদিন ধরে এই রাজ্যে, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, কর্মবিমুখতা অনেক বেড়ে গেছে। এই অনীহা দমন করা প্রয়োজন। ন্যায্য দাবী পূরণ করা যেমন একান্ত কর্তব্য, তেমনি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করাও প্রয়োজন। যাঁরা প্রশাসনের দায়িত্ব নেবেন তাঁরা এ প্রশ্ন গভীরভাবে ভেবে দেখবেন এই আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ যে টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে চলেছে—কোন্ ভেবে প্রকাশ পাচ্ছে তা যদি নিরসন করতে হয়, তবে এই শিল্প-সংস্থার উপর নজর দেওয়া একান্ত কর্তব্য।

এ যুগ কোয়ালিশানের, কোয়ালিশানের মাধ্যমে কাজ করতে হলে দলগত স্বার্থ সম্বন্ধে খানিকটা অসচেতন থাকা দরকার। কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্যবহার বিধি প্রণয়ন করে কাজকর্ম চালানো তখন সবিশেষ প্রয়োজন। সর্বোপরি গণস্বার্থের কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিয়ে যদি নির্ধারিত পথে অগ্রসর হওয়া যায় তবে কোয়ালিশান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই যদি দলীয় মনোবৃত্তি গভীর হতে থাকে, তবে সহ-অবস্থান কঠিন হয়ে পড়ে। সেজন্যই পশ্চিমবঙ্গে গত ফ্রন্ট সরকার স্থায়ী হয়নি। মত ও পথ উভয়েই সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। কোয়ালিশান করেই শক্তির সংঘাত করলে উপর নজর দিলে অস্থিরতা আনবে। অনিশ্চয়তার ইঙ্গিতে ভরপুর হয়ে উঠবে। কাজেই যা করতে হবে তা আগেভাগে ঠিক করে নেওয়া উচিত। বার বার মানুষকে প্রতারিত করলে প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিভূমি রচিত হবে। ১৯৬৭ সালের পর থেকে রাজ্যে যে অস্থিরতা এসেছে। এবং অদ্যাবধি যেসব ঘটেছে তার প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী রেখে সতর্ক পদক্ষেপ দিতে হবে। কোন জাতির ইতিহাসে মানুষ ঐ অল্প সময়ের মধ্যে এত বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে কিনা সন্দেহ। কাজেই অতীতের এই অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগাতে পারলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ফলে, আরও অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক বাড়বে। অতএব, আপনারা যাঁরা এলেন বুঝতেই পারছেন আপনাদের দায়িত্ব কত বেশী। কত সুগভীর। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে আপনাদের আগমন। একটু ত্রুটি-বিচ্যুতিতেই আবার হতাশার পুনর্জন্ম হবে।

রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত যখন শুরু হয়—তখন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেখা দিলেও লড়াই চলে। শুধু আশার কথা এই যে, তখন লড়াইটা তীব্রতর হতে পারে না। কারণ, গণ-সমর্থন যোগাড় করে তাকে তীব্র করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হলেও প্রয়োজন বিরাট কর্মযজ্ঞের। যদি কর্মযজ্ঞে বেশীর ভাগ মানুষ মেতে ওঠে তখন অন্য কিছুর আবেদন তাদের নাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। পশ্চিমবাংলায় আজকে একান্ত প্রয়োজন কর্মকাণ্ডের রাজসূয় যজ্ঞ। কিন্তু আজকে প্রায় বন্ধ থাকার ফলে, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মানসিকতা সুস্থ পথে পরিচালিত হতে পারছে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় দোষ ত্রুটি অনেক আছে। এই অস্থিরতা কিন্তু সেই দোষত্রুটির পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতবাহী। যুব ও কিশোর মনে নতুন দিগন্ত তুলে ধরতে হলে নয়া শিক্ষা ব্যবস্থাও যে একান্ত প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য। অশুভ প্রভাব মুক্ত করে নতুন পথে পরিচালনার দায়িত্ব তাই আজকের কর্ণধারদের উপরই ন্যস্ত হবে। সে দায়িত্ব পরিপূর্ণ যোগ্যতার সঙ্গে পালন না করতে পারলে বিপর্যয় দেখা দেবে। তার সেই বিপর্যয় রোধ করা তখন কঠিন হয়ে পড়বে।

ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক-সমাজের তিনটি বনিয়াদ, কাজেই এই তিনটি বনিয়াদ যাতে ধসে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আবেদন করা হয়েছে। এ গেল একটা দিক। তারপর আপনাদের বিবেচনা করতে হবে পল্লী বাংলার কথা। যেখানে আলো নেই, রাস্তা নেই, জল সেচের ব্যবস্থাও নিতান্ত অপ্রতুল। তারপর আসে পর্যায়ক্রমে সর্বনাশা প্লাবন। গরীব মানুষ দুঃখ কষ্টে যা কিছু সৃষ্টি করে, বন্যার করাল গ্রাসে তা আবার ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ আবার দারিদ্র্যের শিকার হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এখনও তা সম্পূর্ণ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেনি। একটু আলো পৌঁছে দেওয়া কিছুই কঠিন নয়, তবু আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির জন্য হচ্ছে না। কেউ যদি একাগ্রতার সঙ্গে শক্ত হাতে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করেন তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত পল্লীতেও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া মোটেই কিছু কঠিন কাজ নয়। আর বিদ্যুতের উপস্থিতি মানেই কৃষির উন্নয়ন। সুজলা সুফলা বাংলার উর্বর জমি শুধু মাত্র একটু জলের জন্যই বছরে মাত্র একবার ফসল দিচ্ছে। যদি একটু জল পেত তবে কৃষক জমিতে দ্বিগুণ ফলাত। সেচের পরিকল্পনা রূপায়ণ করা কিছুই কঠিন নয়। নেতৃত্ব দিতে পারলে যে স্বেচ্ছাশ্রমেও এ জিনিষ গড়ে তোলা সম্ভব—নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সরকার দীর্ঘদিন ধরে গড়িমসি করেছেন। নিম্ন দামোদর সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর হয়নি। শুধু পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। আর অর্থাভাবের কথা উল্লেখ করে বার বার পরিকল্পনার কাজ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর প্রত্যক্ষ ফল হয়েছে—লাখ লাখ বিঘা জমির ফসল নষ্ট আর হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন। সরকারের এই হৃদয়হীনতার উপযুক্ত উত্তর দিয়েছে সেখানকার মানুষ। তাঁরা সেদিন হাজারে হাজারে কোদাল ঝুড়ি, গাঁইতি শাবল নিয়ে—মরা, মজা দামোদরের প্রাণ সঞ্চার করেছে। সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন নি। মানুষের এই কর্মচঞ্চলতা সরকারের বুকেও শিহরণ এনেছে। মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে কখন কোনদিন থেকে তাঁরা মানুষের সঙ্গে হাত মিলাবেন তার দিন তারিখ ঘোষণা করেছেন। এমনি করে রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজেও যদি জনতা আগ্রহী হন তবে লাল-দিঘীর লাল পাথরের ইঁট নড়ে চড়ে উঠবে।

আপনারা যাঁরা এলেন তাঁরা একথাও স্মরণ রাখবেন কৃষি-বিপ্লব ঘটালেও সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। বাজারে সব বাস্তু ঘুঘু মুনাফাশিকারীরা আছে যারা প্রতি-নিয়ত সব কিছু বানচাল করে দিয়ে মোটা লাভের সন্ধানে আছে। তাদের সম্বন্ধেও আপনাদের হুঁশিয়ার হতে হবে। আপনারা দাম ধার্য করে পণ্যের সরবরাহ করার চেষ্টা করতে পারেন—কিন্তু তাঁরা তখন কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অবলীলাক্রমে কালোবাজারী চালাতে দ্বিধা করবে না। কাজেই সেখানে যদি শক্ত হাতে নির্মমভাবে আঘাত করতে না পারেন তবে আপনারাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবেন, ফলে—আবার অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা।

অতএব, আপনাদের সামনে ভীষণ সঙ্কট। এর আবর্ত থেকে মুক্তি পেতে হলে আপনাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। আর শক্ত হাতে ধরতে হবে রাষ্ট্র-তরণীর হাল। আপনারা একটি যুগসন্ধিক্ষণে এলেন, আপনাদের নেতৃত্ব, আন্তরিকতা ও একাগ্রতার উপর এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সুতরাং অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করে ধীর সুস্থে পদক্ষেপ করবেন।

—[illegible]

দেশে বিদেশে

লণ্ডন-কেনিয়াবাসী ভারতীয় দম্পতী মহীন্দ্রলাল শাহ্ (২৪) ও কৌম (২১) এইবার নিয়ে তৃতীয়বার বৃটেনে প্রবেশের চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন। এবার তাঁদের বৃটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আটক শিবিরে ৬ দিন রাখা হলে মুক্তির পর তাঁরা নায়রোবি যাত্রা করেন। শ্রীশাহকে কান সংক্রমণজাত রোগের জন্য বৃটেনে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এঁদের দুজনেরই বৃটিশ পাশপোর্ট আছে। প্রথম এঁরা ১২ই ফেব্রুয়ারী বিমানে বৃটেনে আসেন। কিন্তু বৃটেন থেকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হলে কেনিয়া সরকার তাঁদের দেশে ঢুকতে দেন না এবং বৃটেনে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। এবার বৃটেন প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় ভাউচার না থাকায় তাঁদের ফেরৎ পাঠানো হয়। কিন্তু নায়রোবি গেলে আবার তাঁদের বৃটেনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ভারতবর্ষে যখন লোকসভার পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত হতে চলল এবং এই দেশের প্রায় ২৮ কোটি মানুষ ভোট দিয়ে যখন নতুন লোকসভা ও তিনটি রাজ্যে নতুন ভোটসভা গঠন করতে চলেছেন তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে নব-নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রেখে সেই দেশকে একটা গভীর রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের লোকসভার এবারকার মত নির্বাচন ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নি। সেটা শুধু এই কারণে নয় যে, এই প্রথম আয়ু ফুরোবার আগেই লোকসভা ভেঙে দিয়ে ভোটের ডাক দেওয়া হল। অন্যান্য কতকগুলি কারণেও এবারকার নির্বাচন সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। যেমন, জাতীয় ও আঞ্চলিক পার্টিগুলি মিলিয়ে এত বেশী রাজনৈতিক দল ইতিপূর্বে আর কখনও নির্বাচনে নামে নি। অথচ, কোন দলই লোকসভার সবগুলি আসনে প্রার্থী দেয় নি। তারপর, এবারকার নির্বাচনের মত আর কোন নির্বাচনে প্রাক্তন রাজন্যরা এত অধিক সংখ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নামেন নি। সরকারী আদেশের দ্বারা প্রাক্তন রাজাদের ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লোপ করার জন্য ভারত সরকারের যে চেষ্টা সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বানচাল হয়ে গেছে সেই চেষ্টা নির্বাচনের পর আবার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেকথা মনে রেখেই প্রাক্তন রাজা-রাজড়ারা পরবর্তী

ফোর্ট উইলিয়মে নির্বাচনকালে পঃ বঙ্গে শান্তিরক্ষার বিষয়ে সমরবাহিনীর ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে এক বৈঠকে আলোচনা হয়। স্থলবাহিনীর অধিকর্তা জেনারেল এস এইচ এফ জে মানেকশ (ডানদিক থেকে তৃতীয়), কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ (ডানদিক থেকে চতুর্থ), পঃ বঙ্গের চীফ সেক্রেটারি শ্রী এন সি সেনগুপ্ত ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি শ্রী বি আর গুপ্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

লোকসভায় যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে চাইছেন। শুধু প্রাক্তন রাজারাই নন, বৃহৎ শিল্পপতিরাও এর আগে কখনও এত বেশী সংখ্যায় নির্বাচনে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায় নামেন নি। শিল্পপতিরা এতদিন পর্যন্ত নির্বাচনে টাকা-পয়সা জুগিয়ে এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে নিজেদের কর্মচারী বা প্রতিনিধিকে লোকসভায় পাঠিয়েই খুশী থেকেছেন; কিন্তু এবার তাঁরা নিজেরাই সরাসরি ভোটযুদ্ধে নেমেছেন। টাটা, বিড়লা ও গোয়েঙ্কা—ভারতের এই তিনটি বৃহৎ শিল্পপতি পরিবারেরই একজন করে এবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন।

ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ, এই তিনটি ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে এবার বিধানসভার নির্বাচন হচ্ছে না। এটাও একটা বিশেষত্ব। এর ফলে সাধারণভাবে বলতে গেলে, রাজ্যগুলির নির্বাচনে আঞ্চলিক প্রশ্নের তুলনায় জাতীয় প্রশ্নগুলিই প্রাধান্য লাভ করেছে। এই প্রথম দেশের নির্বাচকমণ্ডলী শুধু দিল্লীর দিকে তাকিয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলেন। অন্য দিকে, বিধানসভার নির্বাচনপ্রার্থীদের সাহায্য না পাওয়ায় এবার লোকসভাপ্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালান অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশী কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যেসব নির্বাচনকেন্দ্র রয়েছে সেগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীরা সব গ্রামে পৌঁছুতেই পারেন নি। তার আর একটা কারণ অবশ্য এই যে, প্রচারের জন্য এত কম সময় ইতিপূর্বে আর কোন নির্বাচনে পাওয়া যায় নি।

সারা ভারতের দিক থেকে দেখতে গেলে, এবারকার নির্বাচন প্রধানত একদিকে শাসক কংগ্রেস আর একদিকে বিরোধী কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির চতুর্দল জোট, এই দুই তরফের মধ্যে শক্তির লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। প্রথম পক্ষের প্রধান মুখপাত্র শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্লোগান—'গরীবি হঠাও।' আর তাঁর বিরোধী তরফের প্রধান স্লোগান—'ইন্দিরা হঠাও।' একজন বিদেশী সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, 'এবারকার নির্বাচনে ইস্যু হচ্ছি আমি।' 'ইন্দিরা হঠাও', মাত্র এটুকু ছাড়া আর কোন কিছুতেই চতুর্দলের শরিক পার্টিগুলি একমত হতে পারে নি। যদিও জোটের নেতারা বলছেন, ভোটে তাঁরাই জিতবেন, তাহলেও জোটের সরকার গঠন সম্পর্কে তাঁদের কোন প্রতিশ্রুতি নেই। আর এরই সুযোগ নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নির্বাচনী প্রচার অভিযানে স্থায়ী সরকার গড়ার জন্য তাঁর দলকে জয়ী করার আবেদন জানিয়েছেন। একমাত্র নাগাল্যাণ্ড ছাড়া দেশের অন্য সমস্ত রাজ্যে ঝড়ের গতিতে ঘুরে এসে তিনি তাঁর এই স্থায়ী সরকারের স্লোগান প্রায় দু কোটি মানুষের সামনে নিজে রেখে এসেছেন।

এটা আশ্চর্য নয় যে, শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে চতুর্দল জোটের এই লড়াইয়ের চেহারা সবচেয়ে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যে। চতুর্দল জোটের শরিকরা এই দুই রাজ্যেই সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠন করে সরকার চালাচ্ছে। শাসক কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে কিনা সেটা অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করছে এই দুই রাজ্যের ভোটের ফলের উপর। এটাও লক্ষণীয় যে, এবার ভোটগ্রহণের সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যেসব হাঙ্গামা ও মারামারি হয়েছে সেগুলির একটা বড় অংশই ঘটেছে উত্তর প্রদেশ ও বিহারে। বিহারে ভজনখানেক বুথে ব্যালট বাক্স তুলে নিয়ে যাওয়ায় ও ব্যালট পেপার নষ্ট করে ফেলায় নির্বাচন স্থগিত রাখতে হয়েছে। এই রাজ্যের একটি কেন্দ্রে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে গুলী বিনিময়ও হয়েছে। সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা ঘটেছে উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে। এখান থেকে লোকসভায় নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বিভাগের উপমন্ত্রী ইউনুস সেলিম। এখানে সাম্প্রদায়িক ধরনের একটা দাঙ্গাতে পাঁচজন মারা গেছেন। শহরে কারফিউ জারী করতে হয়েছিল এবং সৈন্য বাহিনীকে ডাকতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই লোকসভা কেন্দ্রের কিছু অংশে ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখতে হয়েছে।

শেখ মুজিবর রহমান

জুলফিকার আলি ভুট্টো

ইয়াহিয়া খাঁ

এবারকার নির্বাচনে যতটুকু সংঘাত হয়েছে তাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্যামাপ্রসন্ন সেনবর্মা খুব বেশী কিছু একটা মনে করেন না। মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় তিনি বরং সন্তোষই প্রকাশ করেছেন। বিহারের ফুলবাড়ি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, অন্যান্য বারও ঐ রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

●

পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী ও সিন্ধী স্বার্থের প্রতিনিধি পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোর চাপে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রেখে দেশের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব পাকিস্তানকে একটা রক্তস্নানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ইয়াহিয়া খাঁরই আদেশে ৩ মার্চ তারিখে ঢাকায় এই নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। নির্ধারিত তারিখে এই অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ঠিক মুখে-মুখেই ভুট্টো হুঙ্কার দিলেন, পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা না হলে খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হবে। দেশের নূতন সংবিধান তৈরীর ব্যাপারে দুই প্রধান দল আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার মীমাংসার জন্য সময় দরকার, এই অজুহাতে ইয়াহিয়া খাঁ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ রাখলেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি একথাও বললেন যে, ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সঙ্গে যে শত্রুতা করতে চাচ্ছে নাকি দেশের বিপদ দেখা দিচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ শুধু জাতীয় পরিষদের বৈঠক বন্ধ করেই ক্ষান্ত হলেন না, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদ থেকে কমাণ্ডার আহসানকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আর একজন সামরিক অফিসারকে সামরিক আইন প্রশাসক করে বসালেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির গভর্ণরদের হাতেও সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা দেওয়া হল। পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলির উপর সেন্সার আরোপ করা হল, ঢাকায় কারফিউ জারী করে ফৌজ নামান হল। অর্থাৎ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন সম্পূর্ণ হওয়ার পর পাকিস্তানের শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের যেটুকু আশা দেখা দিয়েছিল ফৌজী শাসনের বুটের তলায় সেটুকু চাপা পড়ল। অথচ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠক ডাকতে চেয়েছেন। বন্দুকের ডগায় এই আলোচনার প্রস্তাব একটা পরিহাস মাত্র, এই কথা বলে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ভুট্টোর চাপে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই বিশ্বাসঘাতকতায় সারা পূর্ববঙ্গের মানুষ ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। হরতাল পালন করে কারফিউয়ের মধ্যেই জয় বাংলা ধ্বনি মুখে নিয়ে সমাবেশ করে, মিলিটারীর সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাঁদের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ইতিমধ্যে কয়েকশ প্রাণ নষ্ট হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

এর পরিণাম কি? পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা? প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অপসারণ! অথবা অন্য কিছু? এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে খুব বেশী দেরী নেই।

৬-৩-৭১ —পুণ্ডরীক

শেষ সংবাদ

এদিকে ঢাকা থেকে ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনালের এক খবরে বলা হয়েছে যে, পাকিস্থান আজ যে গভীর সংকটের আবর্তে পড়েছে, গত কয়েক বছরের মধ্যে তা ঘটেনি। স্থানীয় এক সংবাদ এজেন্সির খবরে বলা হয়েছিল যে, ঢাকায় অন্তত দু হাজার লোককে মেশিনগানের গুলীতে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু সংবাদটা প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। উভয় পাকিস্থানই এখন কড়া সেন্সরশিপের কবলে।

ওয়াকেবহাল মহলের খবরে বলা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্থানে এখন ক্রমাগত সৈন্য আমদানী করা হচ্ছে। সমস্ত বিমানবন্দর ও বিধানসভা ভবনে কড়া পাহারা বসেছে। বহু বিমানবন্দরে কামান দাগার আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

বেতারের খবরে প্রকাশ, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্থানে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শক্তিবর্গের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এর আগে তিনি বলেছিলেন যে, সেনাবাহিনী অন্তত ৩০০ লোককে গুলী করে হত্যা করেছে।

সম্পাদকীয়

একটি গণতান্ত্রিক পরীক্ষা

গণতান্ত্রিক পথই ভারত বেছে নিয়েছিল তার স্বাধীনতা লাভের পূণ্যলগ্নে। তারই সাম্প্রতিকতম পরীক্ষা সমাপ্ত হল সদ্য অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে। পঞ্চান্ন কোটি লোকের দেশে এত বড় পরীক্ষা পৃথিবীর আর কোনো দেশে হয় নি। ভোটারের সংখ্যার দিক দিয়েও ভারত সর্বাগ্রগণ্য। তার নির্বাচনী ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা সর্বত্র স্বীকৃত। গণতন্ত্রের যত ত্রুটিই থাকুক, ভারতবর্ষ তার বিকাশের পথ হিসেবে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশ ভারতের সঙ্গে বা তারপরে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সেই দেশগুলোর মধ্যেই অনেক দেশই আজ গণতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুত। একনায়কতন্ত্র বা সামরিক শাসনে তারা পঙ্গু। ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ও তার সহনশক্তি এবং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গণতন্ত্রকে কালোপযোগী সামাজিক সুবিচারের হাতিয়ার করে তোলার ক্ষমতা প্রদর্শন করে এই দেশ এক অভিনব গণতান্ত্রিক পরীক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে আজ স্বীকৃত।

অনেক পশ্চিমী পর্যবেক্ষক অনেকবার ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে অগ্রগতির হার দেখে সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, এত বিপুল ও জটিল সমস্যা কি তার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব। ভারতবর্ষ বার-বার এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেখিয়েছে যে, এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। ভারতবর্ষ কি একটি জাতি? এমন প্রশ্নও অনেকের মনে দেখা দিয়েছে। বহু ভাষা ও বহু জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই দেশে বারবার ভাষা-বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয়তার কোনো অপহ্নব ঘটে নি। যে কোনো সঙ্কটে দেখা গেছে গোটা ভারত মুহূর্তে সমস্ত বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বিরোধের নিষ্পত্তিও হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবেই গণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করে।

ভারতের জনসাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়েই তাদের জীবনবিকাশের পথ খুঁজে নিতে চায়। নির্বাচন হল তারই মাধ্যম। এই সংবিধান ভারতের জনগণের প্রতিনিধিরাই সুদীর্ঘ আলোচনা ও বিবেচনার পর তৈরী করে গ্রহণ করেছেন। কোনো সংবিধানই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না। অভিজ্ঞতার দ্বারা পরে ত্রুটি সংশোধন করে নিতে হয়। ভারতের সংবিধানেও অনেক সংশোধন করতে হয়েছে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রয়োজন হলে আরও সংশোধন করা হবে। সামাজিক সুবিচারের পথে যে কোনো বাধাই জনগণের সম্মতিতে পরিবর্তন বা অপসারণ করা সম্ভব। ভারতবর্ষ সেই পথ দেখাতে চায় বলেই যখনই কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় তখনি জনগণের কাছে ফিরে আসা হয় তাঁদের সম্মতির জন্য। নির্বাচন সেই সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশেরই মাধ্যম। এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে। লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন এই প্রথম। ভারতবর্ষের রাজনীতির একটি বৃহৎ ত্রুটি সুসংগঠিত ও সর্বভারতীয় বিরোধী দলের অভাব। কংগ্রেস বিভক্ত হলেও এখনও তারাই সর্বভারতীয় জাতীয় দল। জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র বা অন্যান্য বামপন্থী দল নামে সর্বভারতীয় হলেও সারা দেশে তাঁদের প্রভাব সমপরিমাণ নয়। তাই বামপন্থী দলগুলো এখনও পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দূরে থাক, স্বীকৃত বিরোধী দলের ভূমিকা নেবার আশা রাখে না। শাসক কংগ্রেসই একা সবচেয়ে বেশী সংখ্যক আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। তাঁদের বিরোধী স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ, সংগঠন কংগ্রেস ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল নির্বাচনী আঁতাতের মাধ্যমে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের আশা প্রকাশ করেছেন। নির্বাচনের ফলাফল দেখে বোঝা যাবে, এবার সত্যিই কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা হবে কিনা এবং হলে কোন পক্ষের কোয়ালিশন। এবারের নির্বাচনে কয়েকটি আঞ্চলিক দল প্রভাব বিস্তারের জন্য চেষ্টা করবে। তাই যে-তিনটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হচ্ছে তার ফলাফলের দিকে সকলেই আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

নির্বাচনে হার-জিৎ আছেই। কিন্তু এই ফলাফলকে গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধিতে গ্রহণ করাই হল বড় কাজ। আমরা দেখেছি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে জনগণের সুস্পষ্ট গণতান্ত্রিক রায়কেও কিভাবে স্বৈরাচারী সামরিক শক্তি পদদলিত করে অশেষ দুঃখ ও যন্ত্রণা আনে জনজীবনে। এ থেকে ভারতবর্ষকে শিক্ষা নিতে হবে। স্বাধীন, অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের যে-ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় তাকে সম্মান করাই গণতান্ত্রিক সমাজের লক্ষণ। ভারতবর্ষের মানুষ আড়াই দশকের অভিজ্ঞতায় যে শক্তি ও দূরদর্শিতা অর্জন করেছে তাকে যেন কোনো অপশক্তি ব্যর্থ করে না দেয়। গণতান্ত্রিক পথেই আমাদের জনগণের সার্বিক বিকাশের সম্ভাবনাকে আজ সার্থক করতে হবে। এছাড়া অন্য পথ দেশের অকল্যাণই ডেকে আনবে।

CENTRAL LIBRARY

বন্ধুদের ফেরানো যাবে না ॥

শান্তনু দাস

মাঠের ও প্রান্ত থেকে দীর্ঘস্বরে ডেকে
বন্ধুদের ফেরানো যাবে না ঃ
অন্ধকারে চলেছে চাবুক,
আমি বুক
দু হাতে আঁকড়ে বলি শোনো...
বুনো মহিষের পিঠে কোনো
আদিম আঁধার
নেমে আসে।

বেঁচে আছি এই শব্দ ঘোষণা করেই
নড়বড়ে হাঁটু, টোল উরু ভেঙে গেলে
নির্জন কবরে দোলে ফুল
কেমন বুলবুল উড়ে গেলে
কেঁপে ওঠে করবীর ডাল।

তবুও কখন কারা অতিকায় অন্ধকারে
গায়ের উপরে যেন শ্বাস ফেলে যায়
আমি বলি শুনুন মশায়
সুখের পানীয় ফেলে খোলটা নিলেন মহাসুখে
জানেন না কেন এই বুকে
জননী জন্মভূমি ভালবাসা দূরাগত প্রেম,
খেজুর রসের মতো প্রতি পলে কানায় কানায়,
আমাদের একান্ত অসুখে
ডেকে ওঠে ডাহুক-ডাহুকী

শব্দগুলো হাওয়ার উপরে মেলে ডানা,
আমি বলি তোমরা যেও না
ভাইসব ঃ
অন্ধকারে নেমে আসে কাদের উৎসব
বেঁধে নখ
সারাটা আকাশ জুড়ে ধূসরিত বেদুনের চোখ
জ্বলে ওঠে।

আছি কিংবা নেই কিংবা আছি,
দূরাগত শব্দ কাছাকাছি
এলো কি এলো না,
তবু জানি
মাঠের ও প্রান্ত থেকে দীর্ঘস্বরে ডেকে
বন্ধুদের ফেরানো যাবে না।।

একাবেলা ॥ প্রতিমা সেনগুপ্ত

আহত প্যানডেনাস এই ভেবে
চাঁদের উদ্দেশ্যে যেতে গিয়ে—
থরেরী থরেরী, ভালবাসার মত সুন্দর এ্যান্টিনামাগুলোর মাঝখানে
একটি কেয়া তার কুন্তল সাজিয়ে প্রেম নিবেদন করছে
চাঁদের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু
ও বেচারা জানে না যে—
এ সপ্তাহটুকু ফুরালেই, ওকে ফিরে যেতে হবে মৃত্যুর ওপারে।

জো নেই ॥ শুভ মুখোপাধ্যায়

আর সময় ছিল না বলেই
পথ চাইছিলুম
বুকের কাছে কেমন মায়া কাটিয়ে
কাছের মানুষ চলে যাচ্ছে
আমার চোখের বাইরে
যেখানে
ঘুমের নীচে আমার অমল শৈশব
টানা টানা চোখে বাধাতুর হয়ে চাইত
এখন
সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়
অথচ কোথাও যাবো বললেই তো
আর যাওয়া হয়ে ওঠে না
রুমাল উড়িয়ে বিদায় নিয়েও
সব ফেলে পালানোর জো থাকে না
তখনও
সমস্ত বুক জুড়ে
কেমন অন্ধ দিন নাচতে থাকে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমাধুর্য

এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি।
কীর্তন করিয়া সর্বশক্তি পরচারি।।
সংকীর্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার।।
(চৈঃ ভাঃ)

—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব কীর্তন প্রচারের জন্য। যে-কীর্তন গানে ঘরে ঘরে প্রবাহিত হবে প্রেমের বন্যা। কীর্তন গানের প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা কেবলমাত্র তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয়। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ লীলামাধুর্য যেভাবে আস্বাদন করেছিলেন, সেইভাবে কীর্তন শ্রবণে চিত্তের মালিন্য দূর হয়ে, এক পরমানন্দের উদ্ভব হতো। তাঁর ভাবমাধুর্য, পদাবলী সাহিত্যের এক অনিন্দ্য উৎসধারা।

তেইশ বছরের যুবক শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যাপনা শুরু করলেও, তাঁর মুখ দিয়ে কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না। অধ্যাপনার আশা ত্যাগ করে তিনি ছাত্রদের বললেন—

প্রভু বোলে—'ভাই সব' কহিলা সুসত্য।
আমার এসব কথা অন্যত্র অকথ্য।।
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সব দেখোঁ তাই ভাই! বোলোঁ সর্বথায়।।
যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম।।
তোমা সভাস্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার।।
(চৈঃ ভাঃ)

—প্রভু নবদ্বীপে এর পর এক বৎসর কীর্তন প্রচার করলেন। তাঁর ভাবে মুগ্ধ পদকর্তারা এই সময় অসংখ্য পদ রচনা

করেন। সেইসব পদই বোড়শ শতকের সমৃদ্ধ পদাবলী সাহিত্যের অঙ্কুর। নরহরি সরকার লিখছেন ঃ

গৌরাঙ্গ চৌকিয়া পাছে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে।।
সুরধুনি দেখি পহু যমুনার ভানে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে।।
প্রেমের আবেশেতে চিত্ত্য হৈয়া রহে।
পীত বসন আর সে মুরলী চাহে।।
প্রিয় গদাধরে ধরিয়া নিজ কোলে।
কোথা ছিলা, কোথা ছিলা, গদগদ বোলে।।
তার দুখি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এছ রূপ নরহরি দাসে।।

—বিপর্যস্ত শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকে স্মরণ করছেন কৃষ্ণভাবে বিভাবিত অবস্থায়। গদাধর পণ্ডিতকে রাধা মনে করে কাছে টেনে নিচ্ছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজেকে রাধাভাবে, কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলে ডাকছেন। তাঁর অন্তরের অসীম বেদনা ফুটালেন নরহরি সরকার ঃ

জয় ধরণি   গৌরাঙ্গ-জাবনি
        ধূলায় ধূসর কাঁতি।
অথন বসন   লোটিয়া যেমন
        মধুবিলাসিনী ভাতি।।
হরি হরি বলি   প্রাণনাথ করি
        ধরণী ধরিয়া উঠে।
কোথা মো যাইব   কাহারে কহিব
        পরাণ কাঁদিয়া উঠে।।
সহচরগণে   কাঁদয়ে রোদনে
        কহয়ে বচন তুলি।
আমার পরাণ   কহয়ে যেমন
        যেমন কাহারে বলি।।
নরহরি দাসে   পদগদ ভাবে
        কহয়ে গৌরাঙ্গ ভোর।
জন হলেছেলে   উম্মাদে সঘনে
        সদা রাধা-প্রেমে ভোর।।

—রাধাভাবে বিভাবিত গৌরাঙ্গে অন্তরবেদনাও পদকর্তাদের কাছে ধরা পড়ে। মহাজ্ঞানবিভাবিত তিনি। বুকে দীর্ঘশ্বাস। কখনও হাস্যমুখ, কখনও ক্রন্দন। শ্রীচৈতন্যের প্রথম চরিতাখ্যায়ক মুরারি গুপ্তের একটি পদ ঃ

গদাধর অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ মনে বিভোর হইয়া।।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে যাহা নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে।।
অনন্ত আনন্দ জিনি দেহের বরণি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি।।
ত্রিভুবন দরবিত এ গৌরার গুণে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে।।

—চারদিকের গোবিন্দধ্বনিতে পুলকিত শ্রীগৌরাঙ্গ হাস্যমুখর। নিত্যানন্দের সঙ্গে তিনি নৃত্যরত। মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষের সঙ্গে গান করছেন। তাঁরা কীর্তনে বিভোরিত। সব ভুলেছেন তাঁরা, আনন্দের অনুভব পরিবেশ। বসু রামানন্দ লিখছেন ঃ

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহু হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে।।
নাচয়ে গৌরাঙ্গ আর সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাড়ল আনন্দ।।
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ।
ভুলিল কীর্তনরসে পায় নিজবৃন্দ।।
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়া-রসে ভোর।
বাসু রামানন্দ তাহে মুগ্ধ চকোর।।

—নৃত্যগীত সুপটু শ্রীগৌরাঙ্গের গীতসঙ্গীতে দিব্যতা, গন্ধর্বও মুগ্ধ। তাঁর রক্তিমবরণ ওষ্ঠের অনন্ত হাসির অপূর্ব রূপায়ণ ঘটেছে নিত্যানন্দের অনুগত সঙ্গী বলরাম দাসের একটি পদে ঃ

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন গোরারে বনমাল।।
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার।।
ছন্দ-বিছন্দে কত জাগে অঙ্গভঙ্গী।
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী।।
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু গান।
গন্ধর্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান।।
পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে।
হাসিতে বিজুরিছটা পড়য়ে বদনে।।
বান্ধুলি জিনিয়া রাঙা ওষ্ঠখানি হাস।
ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস।।

—শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামাধুর্যের আর এক সৌন্দর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে শিবানন্দ সেনের একটি পদে। এখানে তাঁর ওপর কৃষ্ণভাবের আবেশ। নরহরি গান করছেন। মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ নৃত্য করছেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ এবং গদাধর পণ্ডিতকে রাধাভাবের পরিচয় দিয়েছেন শিবানন্দ ঃ

হোলি খেলত গৌরকিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর।।
স্বেদবিন্দু মুখ পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর।।
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে।।
খেনে খেনে মূরছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর সুখে ভেল ভোর।।
নিকুঞ্জ মন্দির পহু করল বিথার।
ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার।।
কাঁহা গোবর্ধন যমুনাকো কূল।
কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল।।
শিবানন্দ কহে পহু শুনি রসবাণী।
যাহা পহু গদাধর তাহা রসখানি।।

—ভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীগৌরাঙ্গই স্বয়ং কৃষ্ণ। পরিকরদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে বিহার করছেন। তাঁর এই ভাবোন্মাদ অবস্থা চিত্রিত করেছেন বাসুদেব ঘোষ ঃ

গৌরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে   গঙ্গা পুলিন রঙ্গে
        হরি-হরি বলে নিজবৃন্দে।।

কাঁচা কাঞ্চনবরণ গোরারূপ তাহা জিনি
উপজিল প্রেম-তরঙ্গ।
এ নব-কুসুম-দাম গলে দোলে অনুপাম
যেমন নরহরি-অঙ্গ।।
প্রিয়তম গদাধর ধরিয়া সে বাম কর
নিরুপম গাওয়ে গোবিন্দে।
ভাবে ভরল তনু পুলক কদম্ব জনু
গরজনে বৈছন সিংহে।।
ঈষৎ হাসিয়া ক্ষণে অরুণ-নয়ন-কোণে
বোয়ত কিবা অভিলাষে।
গোঙরি সে সব খেলা বৃন্দাবন-রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে।।

—রাধা-উন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণভাব আবিষ্ট-অবস্থা গোবিন্দ ঘোষ অপূর্ব অঙ্কন করেছেন :

শ্রীদাম সুবল সঙ্গে সে রস কাঁদনু রঙ্গে
বলিপহুঁ করে উতরোল।
মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌর-হরি
পড়েপহুঁ গদাধর কোল।।
রাসরস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সখীগণ
উপজয়ে প্রেমার তরঙ্গ।
বাসু ঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
মাঝে পহুঁ নরহরি সঙ্গ।।
রাধার ভাবেতে ভোরা বরণ হইল গোরা
রাধা নাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা-রতি পহুঁ বান গঙ্গাপতি
কাঁহা মোর গিরি গোবর্ধন।।
কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট
বলি পুন হয়য়ে চেতন।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পাইল লবলেশে
ধিক রহু এ ছার জীবন।।

—নীলাচল লীলায় কৃষ্ণভাব নয়, গোপীভাব ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ চণ্ডীদাসের রাধার ন্যায়, তাঁর হৃদয় আক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নরহরি সরকারের পদে :

দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ।।
বিভোর হইলা গোপীভাবে।
কহে পহুঁ করিয়া আক্ষেপে।।
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটি না চাহ তুমি ফিরি।।
কাড়িলা পিরিতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ।।
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ।
ছল ছল অরুণ নয়ান।
রস রস বিরস বয়ান।।
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস।।

—নরহরির আর একটি পদে শ্রীচৈতন্যের খণ্ডিতা নায়িকাভাব স্পষ্ট। দুরু সংস্কৃত করে [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] কাটাল অন্যায়।

প্রেম করি কুলবতী সনে।
এত কি শঠতা কানুর মনে।।
বংশী নাদে সংকেত করিয়া।
ঘরের বাহিরে মুই আইলু
কত পুন হইবে মিলন।
তাই মুই আইনু কুঞ্জবন।।
বেশ বনাইনু মত মত।
আশা করি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে।।
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে।
রজনী বঞ্চিল কার ঘরে।।
স্বরূপের এত কহি গোরা।
অভিমানে কাঁদে প্রেমা ভোরা।।
নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে।
কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে।।

—চণ্ডীদাসের প্রভাব রয়েছে নরহরির এই পদে। আর একটি চণ্ডীদাস প্রভাবিত পদে শ্রীগৌরাঙ্গের আক্ষেপকে চিত্রিত করতে গিয়ে লিখেছেন নরহরি :

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায়।।
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে।
কহে মুঞি ঝাঁপ দিব সমুদ্র মাঝারে।।
করিলু দারুণ প্রেম আপন-আপনি।
স্বকুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি।।
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস।।

—শ্যামল-লীলায় রাধাভাবে আত্মনিমগ্ন চৈতন্যের আর এক চিত্র-বিক্ষেপ ফুটে উঠেছে নরহরির পদে। এর অসাধারণ বর্ণনা এই পদটি। অবলা হৃদয়ের আর্তি, ভাবহৃদয়ের আকুল ভাব-গম্ভীরতায় স্পষ্ট :

গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি এরূপে বসিয়া বিরলে
নয়নে গলয়ে লোর।।
হরি অনুরাগে আকুল অন্তর
গদ-গদ মৃদু কহে।
সকল অকাম করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে।।
অবলা শরীর করে জর জর
মনের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐ ছন পুলক-বচন
অবনত মুখ-শশী।।
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা
মরম কেহো না জানে।
পুনঃ চরিত সদা বিভাবিত
দাস নরহরি ভণে।।

—আনন্দ সেন

মাধ্যাকর্ষণ

অজিত দে

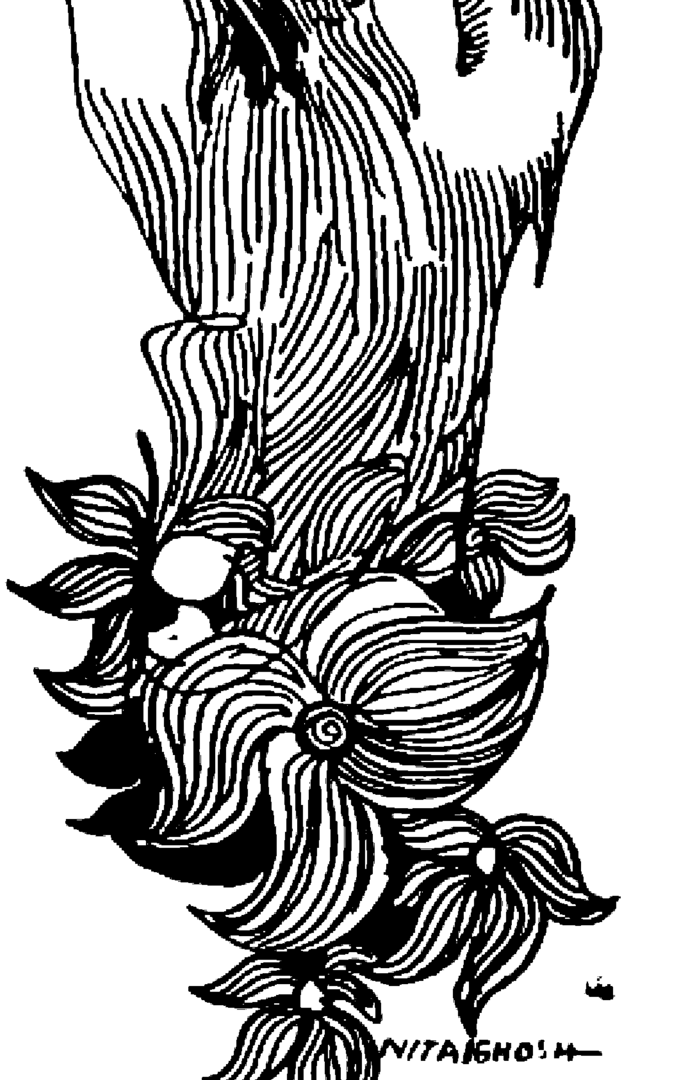

টিফিনের পর খবর এল। যেন সেই কোন সকালে কোনমতে নাকে-মুখে দুটো ভাত গুঁজে ট্রেনে বাসে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে যে মানুষগুলো অফিসে এসেছে, তাদের অন্তত সামান্য জলযোগের সুযোগ দেওয়ার জন্য খবরটা আসতে টিফিন পর্যন্ত দেরী করল। তাই অফিসের দেয়াল ঘড়িতে ঠিক যখন দুটো বেজে দশ মিনিট, ক্যান্টিন থেকে ফিরে প্রশান্ত সরকার যখন সবে সস্তা দামের সিগারেট ধরিয়েছে, দু খিলি পান একসঙ্গে মুখে পুরে চিবুকটা সামান্য তুলে ঈষৎ হাঁ-করা মুখে অফিসে মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র কেরাণী শোভা মিত্র খানিকটা জর্দা পুরে নিয়েছে, সব থেকে বয়স্ক প্রবীণ কর্মী নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ডিবে থেকে অনেকটা নস্যি তুলে মোটা মোটা আঙুলে নাকের কাছে ঠেসে ধরেছেন, ডায়াবিটিস রুগী অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট শশিকারঞ্জন তালুকদার টিফিন-বক্স থেকে বাড়িতে তৈরী ছানা খাওয়া শেষ করে খোলা ফাইলটা সামনে টেনে নিলেন এবং অফিসের ছোকরা কেরাণীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, অবিবাহিতা আধুনিকা তন্বী ইভা সেন যথারীতি টেবিলে ফাইলের ব্যূহ রচনা করে সদ্য প্রকাশিত একখানা ঢাউস উপন্যাসের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, ঠিক তখনই খবরটা এল।

নিখিলেশ আর নেই। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর আজ বেলা এগারোটায় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ফোন করে এই অফিসের টেলিফোন অপারেটরকে খবরটা জানিয়েছে নিখিলেশের ছোট ভাই পুলক মুখার্জি। খবরটা এমন কিছু অপ্রত্যাশিত নয়, পেটে জটিল অস্ত্রোপচারের পর নিখিলেশের অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছিল। মৃত্যু যে এখন নিখিলেশের স্বাভাবিক পরিণাম একথা সকলেরই জানা ছিল। তবু খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা অফিসে একটা শোকের স্তব্ধতা নেমে এল। মুহূর্তের জন্য সকলেই যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কেমন উদাস বিষণ্ণ আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠল অফিসের মধ্যে।

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন ডেপুটি ডাইরেক্টর অমিতাভ সেন। লম্বা দেহটা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে অফিসের স্তব্ধ থম-থমে গম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে মৃদু ভারী গলায় বললেন, আপনারা সকলেই শুনেছেন, নিখিলেশ মুখার্জি ইজ নো মোর। তিনি এই অফিসের একজন কর্মী ছিলেন। শুধু কর্মী ছিলেন বললে ভুল বলা হয়। হি ওয়াজ এফিসিয়েন্ট, ভেরি সিনসিয়ার অ্যান্ড ফেইথফুল ইন দি ডিসচার্জ অব হিজ ডিউটিজ। তাঁর সম্মানার্থে অফিস এখনি ছুটি হয়ে যাচ্ছে। আমি আশা করব, এই অফিসের প্রতিটি কর্মী শেষবারের মতো তাঁকে দেখতে যাবেন এবং এই অফিসের পক্ষ থেকে শবাধারে যখন মাল্য অর্পণ করা হবে তখন উপস্থিত থাকবেন।

কথাগুলো বলবার সময় অমিতাভ সেনের চোখের দৃষ্টি প্রতিটি কর্মীর মুখের ওপর পড়ছিল কিন্তু বক্তব্য শেষ হওয়ার মুহূর্তে যেন একটু বেশি সময় তাঁর চোখ দুটো কণিকার মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল। মানুষ যেমন আলতোভাবে মুখের ওপর চোখ রাখে ঠিক যেন তেমন নয়, যেন তার চেয়ে কিছু বেশি গভীর এবং অন্তর্ভেদী।

মন্থর পায়ে অমিতাভ সেন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মিঃ সেন ঘরে ঢুকতে কণিকা যেন স্বস্তি অনুভব করল। ঘরের মধ্যে নৈঃশব্দ্যের সুযোগে দেওয়াল ঘড়ির যে টিক টিক আওয়াজটা এতক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল মৃদু গুঞ্জন শুরু হওয়াতে সেই শব্দটা এখন আবার বিচ্ছিন্ন

কণ্ঠস্বরের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছিল। যদিও শব্দটা এখন আর খুব একটা উঁচু স্বরে কথা বলছে না, এমন কি যে চিত্রলেখা চৌধুরী থেকে থেকে কারণে অকারণে চেঁচিয়ে কথা বলে, খিল খিল শব্দ করে হঠাৎ হেসে ওঠে সেও এখন কেমন চাপা গলায় কথা বলছে। শব্দ করে হেসে ওঠা দূরে থাক, তার ঠোঁটে এমন কি একটু মৃদু হাসির রেখাও ফুটে উঠছে না। মৃত্যু-সংবাদ মাত্রেই যেন কোন এক বড় উপলব্ধিতে মানুষকে সচকিত করে দেয়। সেই নিস্তব্ধ অসংযমের ছাপটা কাটাতে গিয়েই অফিসের মানুষগুলো এখন ফের মৃদুস্বরে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে।

নিখিলেশের মৃত্যু বোধ হয় কণিকার অনুভূতি শক্তিকে তীক্ষ্ণ প্রখর করে তুলেছে। না হলে তার চেয়ারে বসে যেসব দূরবর্তী টেবিলের কথাবার্তা কোনদিন কণিকা শুনতে পায় নি, এখন সেই সব টেবিলের কথা আলোচনা তার কানে আসছে কি করে? কারো দিকে সোজাসুজি না তাকিয়েও কণিকা বেশ অস্বস্তিকর সংখ্যা অনুভব করতে পারছিল অফিসের কি মেয়ে কি পুরুষ সকলের চোখ জোড়াই ঘুরে ফিরে তার ওপরই বার বার নিবদ্ধ হচ্ছে। ওই সব চোখের দৃষ্টিতে যেমনি ঘৃণা তেমনি কৌতূহলও উপচে পড়ছে। যেন অমনি করে বার বার চোখের দৃষ্টি ফেলে ওরা কণিকার মনের হালচাল বুঝতে চেষ্টা করছে। নিখিলেশের মৃত্যু কণিকার মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তার ভাবলেশহীন মুখে চোখে কোন অভিব্যক্তি ফুটে উঠছে কিনা বোঝবার জন্য ওই সব চোখের দৃষ্টিগুলো যেন কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছে। অথচ এই অফিসের প্রতিটি কর্মী জানে নিখিলেশ মুখার্জির সঙ্গে কণিকার এখন আর কোন সম্পর্ক নেই। নিখিলেশের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সমস্ত সম্পর্ক চার বছর আগেই চুকে-বুকে গেছে। শুধু তাই নয়, আজ তার পরিচয়ও অন্য। সে এখন কলকাতা মাঠের ডাকসাইটে ফুটবল খেলোয়াড় বিকাশ সেনের স্ত্রী। এত সব জানবার পরও অফিসের মানুষগুলোর এমন ভাব ভাব করে তার দিকে তাকিয়ে থাকার কোন মানে হয় না। চোখের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র কৌতূহল থাকলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু তার মধ্যে যেন একটা ঘৃণা মিশ্রিত বিদ্রূপেরও সন্ধান পাচ্ছে কণিকা। কেউ কেউ এমন কি দৃষ্টিটাকে এমন কঠিন করে তুলেছে যেন কণিকাই নিখিলেশের মৃত্যুর জন্য দায়ী এমন মনে হচ্ছে। অথচ দীর্ঘকাল রোগে ভুগে ভুগে অতি স্বাভাবিকভাবেই নিখিলেশের মৃত্যু ঘটেছে।

ওদের কথাগুলো শোনবার জন্য ভেতর থেকে একটা তাগিদ কণিকাকে কেমন একাগ্র করে তুলেছিল এবং ইন্দ্রিয়গুলো অত্যন্ত সজাগ ও তৎপর হওয়ার জন্যই বোধ হয় দূরবর্তী টেবিলের আলোচনাগুলোও এখন কণিকার কানে পৌঁছতে পারছিল।

মধ্যবয়সী বিভূতি দত্ত বলছিল প্রাণকৃষ্ণ চ্যাটার্জিকে, বুঝলেন কেষ্টদা, আমি আজও বুঝতে পারি না নিখিলেশের মতো রূপে গুণে অমন চৌকস ছেলেকে ছেড়ে কণিকা মুখুজ্জে কি মোহে বিকাশ সেনের ঘরে উঠল? মানলাম বিকাশ ভালো ফুটবল খেলে, তা বলে অমন একটা [illegible]—

হে হে বাবা, রসময় ভঙ্গিতে প্রাণকৃষ্ণ হাসল, একেই বলে দুনিয়া! কার যে কিসে মন ওঠে তা কেউ বলতে পারে? সন্দেশ রসগোল্লা ছেড়ে মানুষে তেলেভাজা বেগুনি খায় না? এও তেমনি আর কি বুঝলে না! খুব একটা উঁচুদরের রসিকতা করতে পেরেছে ভেবে আনন্দ তৃপ্তিতে প্রাণকৃষ্ণ টেনে টেনে হাসতে লাগল।

অনতিদূরে কনিষ্ঠ কেরাণী প্রশান্ত সরকার পেছনের টেবিল থেকে ফিসফিসিয়ে বলল, দেখুন [illegible], ভদ্রমহিলার মুখটা দেখুন একবার। দুঃখের কোনো ছাপ দেখছেন মুখে? জানি মেয়েছেলে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে আমি ভাবতে পারিনি না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ভদ্রমহিলা আজ কিছুতেই বার্নিংঘাট-এ যাচ্ছেন না।

বার্নিং ঘাট শব্দ দুটো শুনে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসে থাকা নৃপেন-অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসারদের হাতে পায়ে ধরে এক বছরের জন্য এক্সটেনশন পাওয়া বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী চমকে শিউরে উঠে আতঙ্কভাবে বললেন, ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়ামটা এখনো দিতে পারলাম না। কখন যে কি হয়ে যায়।

চিত্রলেখার একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে সেক্রেটারি তখন বলছে, অত দেরী হোক না, এখানে সে ঘরে পড়তে পারলেও আশা আছে। বই এখনো আসেনি।

চিত্রলেখা চাপা ধমক দিল, আস্তে কথা বলতে পার না। কেউ শুনতে পেলে কি ভাববে বলতো?

—কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। এখান থেকে বেরিয়ে না হয় বার্নিং ঘাটেও যাবে।

বাসে ভাগতে দেখতে পিছন পিছন চিত্রলেখা বেরিয়ে যাবার সময় কণিকা মুখ তুলে তাকাতে নিখিলেশের শূন্য চেয়ারটা তার চোখে পড়ল। বাঁ ধারের দেয়াল ঘেঁষে

"ভয়ঙ্কর কাজের চাপে মাঝে মাঝেই আমার ভীষণ মাথা ধরে",
বলেন, বিপিন জৈন
বোম্বাইয়ের একজন অফিসার।

মাথা ধরেছে? অ্যানাসিন খান
তাড়াতাড়ি আরাম এনে দেবে

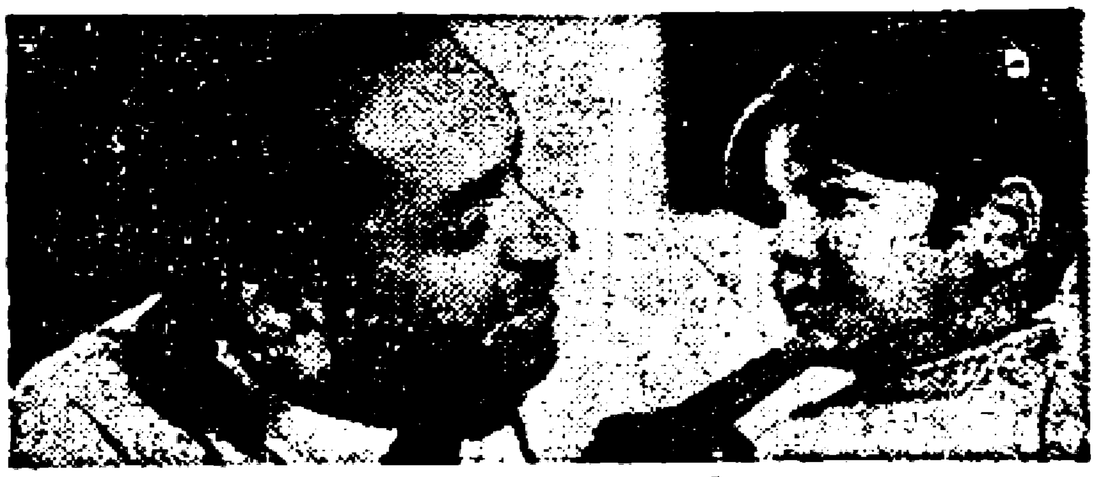

বড়দের উপযোগী যথেষ্ট জোরালো
বাচ্চাদের পক্ষেও একান্ত নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন জোরালো,—সারাবিশ্বে ব্যথা-বেদনার উপশমে ডাক্তাররা যে-ওষুধ সুপারিশ করেন তা'ই এতে বেশী ক'রে দেওয়া আছে। অ্যানাসিন নির্ভরযোগ্য—নিরাপদ, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত এটি নানান ওষুধের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। অ্যানাসিন খান—মাথাধরা, সর্দি আর ফ্লু, পিঠের ব্যথা, দাঁতের ব্যথা আর পেশীর ব্যথায়।

জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন

ভারতে ব্যথা-বেদনার উপশমকারী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

কণিকার দিকে পিছন ফিরে নিখিলেশ বসত। বন্ধ পুরনো দু-একখানা ফাইল, পেপার-ওয়েট, ব্লটার, দোয়াত, পিনকুশান ওর টেবিলে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। আর কোনো দিন নিখিলেশ ওই চেয়ারে এসে বসবে না। এখন এই মুহূর্তে নিখিলেশের চেয়ার-টেবিলটা ঘিরে কেমন অদ্ভুত একটা শূন্যতা তৈরী হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে ভাই-ভেসের পরও চার-চারটে বছর একটা মানুষ এই অফিসে কাজ করেছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও কোনোদিন কণিকার দিকে ফিরে তাকায় নি। মাথা হেঁট করে অফিসে ঢুকেছে, ফাইলের মধ্যে ঘাড় গুঁজে কাজ করেছে, কখনো কখনো অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প-গুজবে মেতেছে, মধ্যে মধ্যে হাসি-ঠাট্টাও বাদ যায়নি, কিন্তু কণিকা বলে আরো একটা মানুষ যে এই অফিসে কাজ করে শুধু সেই দিকে একেবারে ভ্রূক্ষেপ ছিল না নিখিলেশের। কিন্তু অভিমান অথবা ঘৃণা যে কারণেই নিখিলেশ তার দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ঘুরিয়ে থাকুক না কেন, আজ সেই কথা ভেবে কণিকা নিশ্চয়ই শ্মশানে ছুটে যাওয়া বন্ধ রাখতে পারে না। বন্ধ রাখলে এই অফিসে মুখ দেখানোও কঠিন হবে। তার এই নিষ্ঠুর নৃশংস আচরণের জন্য অফিসের প্রতিটি মানুষ তাকে ধিক্কার দেবে। ওদিকে অফিসের মানুষগুলো কি বলবে সেই ভয়ে, সেই লজ্জায় শ্মশানঘাটে উপস্থিত হলে বিভাসও কিছু একটা ভেবে বসতে পারে। যদিও প্রকৃতপক্ষে বিভাস একান্ত উদার তবু শ্মশানঘাটে তার উপস্থিতিটা নিখিলেশের প্রতি গোপন আসক্তি কিংবা অনুরাগের চিহ্ন হিসাবে বিভাসের ধরে নেওয়াটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। অফিসের লোকেদের ধিক্কারের ভয়ে তবে কি কণিকা এখন তার বর্তমান সুখী দাম্পত্য জীবনের ওপর অশান্তির একটা কালো ছায়া টেনে আনবে? ইতিকর্তব্য ঠিক করতে গিয়ে কণিকার কান দুটো গরম হয়ে উঠল, নাকের নীচে ঠোঁটের ওপর ঘাম জমল বেন্দু বেন্দু। ছোট্ট রুমাল দিয়ে মুখ মুছে কণিকা উঠে দাঁড়াল তারপর ধীর পায়ে টেলিফোনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

টেলিফোন অপারেটর বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছিল, কণিকাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলল, ফোন করবেন কাউকে? তাহলে চটপট নম্বরটা বলে ফেলুন, আমি এখুনি বেরোব।

বিভাসের অফিসের নম্বরটা দিল কণিকা। লাইন পেয়ে রিসিভারটা কণিকার দিকে এগিয়ে দিয়ে টেলিফোন অপারেটর বলল, নিন, ধরুন।

কণিকা রিসিভার হাতে নিতে টেলিফোন অপারেটর ঘরের অন্যদিকে জানালার ধারে সরে গিয়ে কণিকাকে নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ করে দিল।

—হ্যালো, খবর কি, এমন অসময়ে টেলিফোন যে?

বিভাস ওদিক থেকে জিজ্ঞেস করল।

নিখিলেশের মৃত্যুর খবরটা হঠাৎ সরা-সরি বলতে না পেরে কণিকা বলল, আমাদের অফিস এখন ছুটি হয়ে গেল।

—হঠাৎ?

মানে, নিখিলেশ মারা গেছে, সেইজন্যে।

—ও, বিভাসের গলাটা ঈষৎ ভারী মনে হোলো, তা তুমি বাড়ি চলে যাচ্ছ নিশ্চয়ই।

একটু ইতস্তত করে কণিকা বলল, একটা মুশকিল হয়েছে সেইজন্যেই ফোন করছি। আমাদের অফিসের সবাই বার্নিং ঘাট-এ যাচ্ছে, এখন আমি কি করব বুঝতে পারছি না। তুমি যা বলবে তাই করব।

—বারে, এ ব্যাপারে আমি কি বলব? তোমার ইচ্ছেটাই এখানে বড়ো কথা। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, বার্নিং ঘাট-এ গেলে আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই। তাছাড়া, অফিসের সবাই যখন যাচ্ছে, তোমার না যাওয়াটা কেমন দৃষ্টিকটু নয় কি?

—দেখি। দ্বিধাজড়িত উত্তর দিয়ে কণিকা রিসিভার নামিয়ে রাখল।

অফিস ঘরে ফিরে এসে কণিকা নিজের চেয়ারে বসল। অফিস ছুটি হয়ে গেছে, এখন আর এখানে কতগুলো কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে বসে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। তাছাড়া মনের মধ্যে কেমন একটা চিন্তার গুরুভার তার অস্বস্তি বোধকে ক্রমশ আরো তীব্র পীড়াদায়ক করে তুলছিল। লেডিজ ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরোবার জন্য কণিকা উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রশান্ত সরকারকে তার টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে কণিকা মনে মনে প্রমাদ গুনল। ফচকামি ইয়ার্কিতে এই অফিসে প্রশান্ত সরকারের জুড়ি নেই। ভীষণ মুখ-পাতলা, কখন যে কাকে কি বলে বসে তার ঠিক নেই। ওর ঠাট্টা-ইয়ার্কি এক-এক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। একবার ওর ইয়ার্কিটা এমন চরম বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে অমন ঠান্ডা ভালো-মানুষ অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট রাধিকা-রঞ্জনও গম্ভীর গলায় ধমক দিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, প্রশান্তবাবু, মনে রাখবেন এটা অফিস। কিন্তু ওই গম্ভীর ধমক প্রশান্তকে কিছুমাত্র দমাতে পারেনি। সরল নিষ্পাপ অবোধ শিশুর মতো মুখের ভাব করে ও বলেছে, তাই বুঝি।

অফিসসুদ্ধ মানুষ ওর ভঙ্গিতে কথায় হাসিতে ফেটে পড়েছে। কণিকার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশান্ত বলল, ওখানে যাচ্ছেন তো মিসেস মুখার্জি? বলেই জিভে আলতো কামড় দিয়ে প্রশান্ত বলল, একস্ট্রি-মলি সরি মিসেস সেন। মিসেস মুখার্জি বলায় কিছু মনে করবেন না যেন। আপনার পদবীটা আমি ঠিক খেয়াল রাখতে পারি না, বারবার ভুল হয়ে যায়। যাই হোক, আর কারো কথা জোর দিয়ে বলতে পারি না, তবে আই অ্যাম শিওর, আপনি অবশ্যই যাচ্ছেন।

অসহ্য রাগে অপমানে কণিকার ভেতরটা জ্বলতে জ্বলতেই কণিকা এবারে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারল। মুহূর্তে তার মুখটা খুব কঠিন হয়ে উঠল। দৃঢ়, রূঢ় গলায় কণিকা বলল, আপনি ভুল করছেন মিস্টার সরকার, আমার একেবারেই যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

প্রশান্তকে আর একটি কথাও বলবার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত লঘু ভঙ্গিতে কণিকা অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় এসে দাঁড়াতে সে খানিকটা স্বস্তি-বোধ করল। অগনিত অপরিচিত মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। এখানে কোন কৌতূহলী দৃষ্টি ঘৃণা অথবা বিদ্রূপের শরে তাকে বিদ্ধ করছে না, কোনো প্রশান্ত সরকার এখানে আর তাকে অপমান করতে আসবে না। ট্রাম বাস ট্যাক্সি প্রাইভেট-কার সাইকেল ঠেলাগাড়ি লোকজনের ভিড় এই অঞ্চলে রোজ যেমনটি থাকে, আজও সেই রকমই। এতটুকু ইতরবিশেষ হয়নি। সবই যথারীতি চলেছে। কেবল নিখিলেশ নামে একটা মানুষ আর এই পৃথিবীতে নেই। ডালহৌসীর ফুটপাতে কাটাফল চিনে-বাদাম ছোলামটর আলুকাবলি ফুচকা ঝালমুড়ি ইত্যাদি ফিরিওয়ালার দোকান-গুলোয় অন্যদিনের মতো আজো যথারীতি কেনাবেচা চলেছে। কণিকার মনে পড়ল, ফুটপাতের এইসব দোকান থেকে কাটাফল কিনে খেতে ভারি ভালবাসত নিখিলেশ। সপ্রশংস দৃষ্টিতে নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে বুকের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে বলত, এসব চেহারা এমনি এমনি হয়নি। সেই কলেজ লাইফ থেকে ফেলুদার ফল খেয়ে আসছি, বুঝলে?

ঠোঁট উল্টে কণিকা বলত, রাখো তোমার চেহারা। কতো ধুলো বালি, কতো মশা উড়ে পড়ছে দেখেছ? প্রত্যেকটা ফলের টুকরো লক্ষ লক্ষ জীবাণুর এক একটা ডিপো।

নিখিলেশ কিন্তু রণে ভঙ্গ দিত না। হাসতে হাসতে বলত, খুঁতখুঁতে মানুষদের স্বাস্থ্য কোনো দিন ভালো হয় না। অত বাছ-বিচার করে খাও বলেই তো চেহারাটি কেমন শাকচুন্নীর মতো হচ্ছে দিন দিন।

কণিকা দাঁড়িয়ে পড়ল। অতিকায় দৈত্যের মত একখানা ডবল ডেকার ছুটে আসছে। পাশে পেছনে কয়েকখানা ট্যাক্সি টেম্পো প্রাইভেট-কার। যেন হরেক রকম যানবাহনের একটা কনভয় চলেছে। একটু বাদে ট্রাফিক পুলিশের ইঙ্গিতে চলমান গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে পড়লে সাদা দাগ ধরে কণিকা সাবধানে রাস্তা পার হল।

হেঁটে পথ চলবার জন্যেই বোধ হয় কণিকার ফের নিখিলেশের কথা মনে পড়ল। কেননা, নিখিলেশের আর একটি বিচিত্র সখ ছিল, কলকাতায় পথে হাঁটা। উদ্দেশ্যহীন-ভাবে এলোমেলো হাঁটতে নিখিলেশ খুব পছন্দ করত। অফিস ছুটি হলে কতদিন কণিকাকে বলত, তীর্থের কাকের মতন হাঁ করে বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয়? চলো না, তার চেয়ে বরং হেঁটেই চলে যাই বাড়ি অবধি।

—পাগল না কি! কণিকা বলত, হেঁটে বাড়ি গিয়ে তুমি তো আরাম করে শুয়ে পড়বে। আমার যে হাঁড়ি ঠেলা রয়েছে, সেটা করে দেবে কে?

—এই জন্যেই তো রোজ রান্না-খাবার লোক রাখতে বলি।

everest.9490.PP bn

CENTRAL LIBRARY

—হ্যাঁ, এই সামান্য কাজের জন্যে আবার একটা লোক রাখতে যাই। টাকা বেশি হয়েছে কিনা।

—যাকগে, চলো খানিকটা তো হাঁটি। একটু বেড়ানোও হবে, ততক্ষণে বাসের ভিড়ও কমে আসবে।

নাছোড়বান্দা নিখিলেশের পাল্লায় পড়ে অগত্যা কিছুটা হাঁটতে হোত। নিখিলেশের সঙ্গে কণিকা হেঁটে পারত না, থেকে থেকে পিছিয়ে পড়ত। তাই কিছুটা হাঁটবার পরই নিখিলেশ পিছন ফিরে দেখত। একটু দাঁড়িয়ে আবার চলতে আরম্ভ করত। কণিকা বলত, তোমার সঙ্গে মানুষ হাঁটতে পারে? হাঁটছ না যেন দৌড়াচ্ছ। একটা কথা না, কিছু না, কেবল ভূতের মতো দৌড়নো। আমি আর পারছি না, এবার বাসে উঠব।

এক গাল হেসে নিখিলেশ বলত, তা ওঠো, তবে এমনি করে শনৈঃ শনৈঃ সামনের বছর পাড়ার স্পোর্টসে তোমার নামটি তুলে দেব। প্রাইজ পেলে তখন আবার এই নিখিলেশ মুখুজ্জেকেই মুর্গি রেঁধে খাওয়াতে হবে।

কপট ক্রোধে ভর্ৎসনা করে কণিকা বলত, কেন, প্রাইজ না পেলে মুর্গি রেঁধে খাওয়াই না বুঝি!

কি রোববারেই নিখিলেশ কণিকা বাড়িতে মুর্গির মাংস খেত। অন্য কিছু আর রান্না হোত না। সেদিনকার মেনুতে থাকত শুধু মুর্গির মাংস আর দই। দুপুরে ছোট্ট একটা ঘুমের পর সন্ধ্যায় সিনেমা কিম্বা থিয়েটার। নিখিলেশের সঙ্গে কণিকার বিবাহিত জীবন মোটামুটি সুখের ছিল। এমন কিছু অসাধারণ পুরুষ ছিল না নিখিলেশ, ভালো-মন্দ মিশিয়ে অন্য পাঁচটা মানুষ যেমন হয় তেমনি সরল সাদাসিধে জীবনযাত্রার মধ্যেই সেও এক ধরনের সুখ-শান্তি খুঁজে পেয়েছিল। মধ্যবিত্ত ঘরের একনিষ্ঠ স্বামীদের মতই নিখিলেশ কণিকাকে ভীষণ ভালবাসত। স্বামীর ভালবাসা পেলে কোন মেয়েই বা না সুখী হয়? কিন্তু ভালোবাসার ব্যাপারে নিখিলেশের ভয়ানক স্পর্শকাতরতা কণিকার কাছে মাঝে মাঝে প্রায়ই কেমন বাড়াবাড়ি বলে মনে হোত। বলতে কি, নিখিলেশ যেন কেমন সন্দিগ্ধ প্রকৃতির হয়ে উঠেছিল। অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে একটু বেশিক্ষণ কথাবার্তা কি মেলামেশা নিখিলেশ ঠিক বরদাস্ত করতে পারত না, কোনো কোনো সময় ভদ্রতা সৌজন্য কোন কিছুরই বালাই না রেখে মানুষের সঙ্গে কেমন রূঢ় ব্যবহার করত। ছেলেবেলা থেকেই কণিকার খেলাধুলোর দিকে বিচিত্র এক ধরনের ঝোঁক ছিল। মাঠে নিজে কোন দিন কণিকা খেলতে নেমেছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু খেলা দেখবার সুযোগ পেলেই কণিকা মাঠে হাজির হোত। নিখিলেশের সঙ্গে বিয়ের পরও কণিকা তার এই অভ্যেস ছাড়তে পারেনি। কলকাতা মাঠের দর্শনীয় প্রতিটি খেলাতেই কণিকা অনিবার্যভাবে উপস্থিত থাকত। খেলাধুলোর ব্যাপারে তার এই আসক্তিতে নিখিলেশ স্পষ্টতই বিরক্ত হোত, নানা ধরনের বিদ্রূপ মন্তব্য করত, কিন্তু তাতে কণিকার খেলার মাঠে যাওয়ার উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়েনি। খেলার প্রতি কণিকার এই আকর্ষণ আরো তীব্র হয়েছিল নামকরা ফরওয়ার্ড বিভাস সেনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর। বান্ধবী চিত্রিতা ঘোষের জন্মদিনে বিভাসের সঙ্গে প্রথম আলাপ। খেলাধুলোর ওপর স্বভাবগত ঝোঁকের দরুণই বিভাসের সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপটা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। বিভাস নিজেও কম অবাক হয়নি। খেলাধুলোর ব্যাপারে মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরে এমন উৎসাহী কোনো মেয়ে বিভাসের চোখে পড়েনি। এই জন্যেই ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মাঝে মধ্যে বিভাস কণিকাদের বাড়িতেও গল্পগুজব করতে আসত। বিভাসের এই আসা যাওয়া প্রথম থেকেই নিখিলেশের একেবারে পছন্দ হয়নি। খেলাধুলোর জগতের এই নায়ককে কণিকা যতখানি সম্মানের সঙ্গে প্রীতির সঙ্গে আপ্যায়ন করত, নিখিলেশের আচরণে ব্যবহারে ঠিক ততখানি উপেক্ষা বিরক্তি ফুটে উঠত। সম্মানিত অতিথির প্রতি নিখিলেশের আচরণের জন্য ক্রমশ কণিকা নিখিলেশকে অত্যন্ত নীচ, ছোট ভাবতে সুরু করল। বিভাসের সঙ্গে কণিকার বন্ধুত্ব ছিল একান্ত নির্দোষ, তাতে কোনো পাপ ছিল না। কিন্তু নিখিলেশের সন্দেহ বাতিক, বিভাসকে কেন্দ্র করে কারণে অকারণে কণিকার প্রতি তার গূঢ় অর্থবহ ইঙ্গিতগুলো সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আবিল করে তুলল। কণিকা বরাবরই একটু সাজগোজ পছন্দ করে, কিন্তু বিভাসের সঙ্গে আলাপের পর তার হাল্কা প্রসাধনও নিখিলেশের আক্রমণের কারণ হয়ে উঠেছিল। দিনরাত্রির নিখিলেশের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অশালীন উক্তিগুলো শেষ পর্যন্ত কণিকার কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কণিকার হাঁটাচলা কথাবার্তা উৎফুল্লতা কিম্বা অবসাদ সব কিছুর মধ্যেই নিখিলেশ বিভাসের ছায়া দেখতে পেত। সন্দেহ বাতিকের জন্য একদিকে যেমন নিখিলেশের প্রতি কণিকা বিরূপ হয়ে উঠেছিল, উল্টোদিকে তেমনি আবার নির্দোষ বন্ধুত্বের মাটিতে নিখিলেশের সন্দেহের বীজ থেকে উপ্ত একটি ভালোবাসার অঙ্কুর ধীরে ধীরে চারা মেলেছিল। নিখিলেশের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দুর্ব্যবহারের জলসিঞ্চনে সেই চারাগাছটি সবুজে বড়ো হতে হতে শেষে অজস্র ডালপালা বিস্তার করে দ্বিধা সংকোচ লজ্জা সব কিছুকে আড়াল করে দিয়ে কণিকাকে এক দুর্বার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে বিভাসের দিকে ছুটিয়ে দিল।

হাঁটতে হাঁটতে কণিকা কখন বউবাজারের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারেনি। এতক্ষণে যেন কণিকার হুঁস হল তার এই লক্ষ্যহীন অনির্দিষ্ট পথচলার কোনো অর্থ হয় না। এতটা হাঁটবার জনেই বোধ হয় গলাটা ভিজিয়ে নিলে মন্দ হোত না। রাস্তা পার হয়ে কণিকা উল্টো দিকের রেস্তোরাঁয় ঢুকল। রাস্তার মধ্যাহ্নের প্রখর আলোয় অভ্যস্ত চোখ দুটো প্রথমে দোকানের ভিতর অন্ধকার পরিবেশে ঠাহর করতে পারল না, কিন্তু পরমুহূর্তেই এককোণে বসা তপন মজুমদারের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। দোকানে অন্য খদ্দের তেমন নেই, তপন একা বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল। কণিকাকে দেখতে পেয়ে তপন ডাকল, আরে আপনি যে, আসুন, আসুন।

সামনের চেয়ারখানা কণিকার দিকে ঠেলে দিল তপন। কণিকা এগিয়ে এসে চেয়ারে বসতে তপন বলল, কি খাবেন বলুন।

কণিকা বলল, কিছু খাব না, শুধু এক কাপ চা দিতে বলুন।

—তাই কখনো হয় না কি? কেন ভদ্রমহিলাকে শুধু চা কেউ অফার করতে পারে?

—সত্যি বলছি কিছু খাব না। দোহাই আপনার, অযথা পীড়াপীড়ি করবেন না।

ছোকরা বয়কে এক কাপ চা দিতে বলে ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করে তপন জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আপনি এই অসময়ে এখানে? ছুটি নিয়েছেন না কি?

—না, ছুটি নিইনি, আজকাই ছুটি হয়ে গেল। কণিকা মনে মনে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক করতে লাগল।

—ছুটি হয়ে গেল। কেন, হঠাৎ ছুটি হল কেন?

রাস্তার দিকে চোখ রেখে ধীর গলায় কণিকা বলল, নিখিলেশ মারা গেছে আজ।

তপন এক মুহূর্ত চুপ করে রইল, যেন অবস্থার সঙ্গে মনটাকে মানিয়ে নিতে একটু সময় নিল তারপর বলল, কখন?

—এগারোটা নাগাদ।

—কাল বিকেলেও হাসপাতালে গিয়েছিলাম। অবস্থাটা খারাপের দিকেই ছিল। আজ সকালে একবার যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যাবই বা কি করে? সেলসম্যানের চাকরি, আমাদের প্রডাক্টের বিজনেস আওয়ার্স আবার সকালবেলা।

নিখিলেশের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এই তপন মজুমদার। বন্ধুর মৃত্যুতে শোকার্ত তপন চুপ করে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবল তারপর গাঢ় গম্ভীর গলায় অনুযোগ করল, আপনি কিন্তু একদিনও হাসপাতালে যাননি।

কুণ্ঠিত অপরাধী গলায় কণিকা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল, আমার যাওয়াটা কি ঠিক হোত? আমি গেলে উনি হয়তো উত্তেজিত হয়ে পড়তেন, সেটা ও'র পক্ষে মোটেই ভালো হোত না।

—ভুল, একেবারে ভুল ধারণা আপনার, ভারী গলায় তপন বলল, আপনি জানেন না, একটিবার আপনাকে দেখবার জন্য নিখিলেশ কতখানি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আর কাউকে তো বলতে পারত না, আমাকে বলত, কণিকা একবার তো আসতে পারত, রুগী দেখতেও তো মানুষ হাসপাতালে আসে।

কণিকা কেমন যেন একটা ধাক্কা খেল বুকের ভেতর। নিখিলেশ তাহলে কণিকাকে একেবারে ভুলে যেতে পারেনি। ডাইভোর্সের পর ঘৃণা উপেক্ষার মুখোশ পরে নিখিলেশ

তাহলে শুধুই অভিনয় করে গেছে। কণিকার জন্য একটা স্থান তবে নিখিলেশের হৃদয়ে সত্যিই নির্দিষ্ট ছিল। নিখিলেশ তাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল অথচ কণিকা তা জানতেও পারেনি। নিখিলেশ বেঁচে থাকতে আর কণিকা তার সামান্য শেষ ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করতে পারল না। নিখিলেশের জন্য অনেকদিন পর এই প্রথম গভীর দুঃখে বেদনায় কণিকা অভিভূত হয়ে গেল, এই মুহূর্তে কেমন একটা অস্ফুট হাহা-কার জেগে উঠল তার মনের মধ্যে।

বলবার সময় কণিকার গলাটা একটু কাঁপল, কিন্তু ওঁর, আপনি তো কোন দিন বলেন নি আমাকে?

ম্লান হেসে তপন বলল, আপনাকে বলবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু নিখিলেশ বারণ করেছিল। ওর ভয় ছিল, আপনাকে বললেও আপনি হয়তো যাবেন না। নিখিলেশ বলত, তাই অপমান ওর সহ্য হবে না।

কণিকা আর কোন কথা বলল না। কথা বলার শক্তিটাই যেন কে কেড়ে নিয়েছে। মনের মধ্যে সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। হাতে পায়ে কোন জোর নেই যেন। গলাটা আরো শুকিয়ে উঠেছে। সামনে টেবিলের ওপর দোকানের ছোকরা বয়টা কখন এক কাপ চা রেখে গিয়েছিল, তা তেমনিই পড়ে আছে। তপনই আবার নীরবতা ভেঙে কথা বলল, কিছু মনে করবেন না যেন। বিশ্বাস করুন, এসব বলবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু আপনাকে একেবারে মুখোমুখি পেয়ে কেমন হয়ে গেল। আর সামলাতে পারলাম না।

ভারী ফোলিও ব্যাগটা হাতে নিয়ে তপন উঠে দাঁড়াল, কণিকার দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন যাওয়া যাক। আমার আবার আজকের কালেকশানটা জমা দিতে এখুনি অফিসে যেতে হবে। ওখান থেকে বেরিয়ে শ্মশানে যাব। যদি যান তো ওখানে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

তপন আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না, দোকানের বিল মিটিয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে ছুটল।

আচ্ছন্নের মতো অভিভূতের মতো কণিকা অনেকক্ষণ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকল তারপর এক সময় চলতে সুরু করল। কেমন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে সে যেন পথ চলছিল। রাস্তায় অজস্র মানুষের ভিড়, গাড়ির চলাচল, ফুটপাতের ওপর দোকান-গুলোয় হরেক রকম জিনিসের মেলা, কোন কিছুই সে বিশেষভাবে দেখছিল না। এক এক সময় পথচারীদের কারো কারো সংগে তার মৃদু ধাক্কা লাগছিল, কিন্তু কণিকার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। আলগা দৃষ্টি মেলে ধরে যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে শিয়ালদার মোড়ে এসে একটা বাসে উঠল। তাকে দেখবার জন্য নিখিলেশের ব্যস্ত হয়ে ওঠার সামান্য ঘটনাটা যেন কণিকার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুভূতির মধ্যে একটা কম্প-কল সুখের শিহর অনুরণিত করে তুলছিল। রক্তপ্রবাহের মধ্যে একটা নিবিড় আবেগ তাকে ক্রমশ অন্তর্মুখী করে ফেল-ছিল। বাস থেকে নেমে ধীর মন্থর পায়ে সম্মোহিতের মতো কণিকা শ্মশানে এসে পৌঁছল। বেশ কয়েকটা চিতা জ্বলছে, দাহ শেষ হয়ে যাওয়ায় একটা চিতায় কলসীতে করে জল ঢালছে। চিতার আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে কোন পরিচিত মুখ কণিকার চোখে পড়ল না। নিখিলেশকে নিয়ে তাহলে শ্মশানযাত্রীরা এখনো এসে পৌঁছয়নি। কণিকা বোধ হয় একটু আগে এসে পড়েছে। শ্মশানের এক কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে কণিকার হঠাৎ অফিসের লোকজনের কথা মনে পড়ল। তাকে এখানে দেখে সকলে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। শুধু অবাক হবে না, বিদ্রূপের একটা হাসিও অবশ্যই ফুটে উঠবে প্রত্যেকের ঠোঁটে। বিশেষ করে প্রশান্ত সরকার তার মুখের ওপরেই দৃঢ় গর্বিত গলায় এখানে না আসবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, তার সামনে এখন কণিকা কোন মুখে দাঁড়াবে? কণিকার মনে হতে লাগল, বাহাদুরি করে এখানে না আসবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার পর তার এখানে আসাটা খুবই হঠকারিতার কাজ হয়েছে। কেমন একটা পরাজয়ের গ্লানিও যেন এর মধ্যে এখন সে অনুভব করতে পারছে। এখনো অবশ্য ফিরে যাওয়া যায়, সে যে এখানে এসেছে তাতো এখন পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি। ঠোঁট কামড়ে কণিকা এক মুহূর্ত কি ভাবল, তারপর চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই শববাহী একটা ছোট্ট দল চোখে পড়ল। দলটা আরো খানিক এগিয়ে আসতে ওর মধ্যে অনেকগুলো পরি-চিত মূর্তি চোখে পড়ল। প্রশান্ত সরকারই যেন একেবারে সামনে রয়েছে মনে হচ্ছে। শ্মশানে ঢুকে খাটিয়ায় শোয়ানো নিখিলেশের মৃতদেহটা ওরা একটা শূন্য চিতার পাশে নামিয়ে রাখল। কণিকা এক পা এক পা করে সেদিকে এগিয়ে গেল। প্রশান্ত সরকারের সংগেই তার প্রথম চোখাচোখি হল। সেই চোখে কিছুটা বিস্ময় যে কণিকা দেখতে পেল না তা নয়, কিন্তু সেখানে বিদ্রূপের চিহ্নমাত্র ছিল না। অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ এসেছেন?

—অনেকটা আগেই এসে পড়েছি।

—অফিসের সবাই আসছে, আপনিও এসে ভালোই করেছেন। তা অত পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, এগিয়ে আসুন না।

প্রশান্তর কথার সুরে স্পষ্টই বোঝা যায় কণিকা এখানে আসায় সে খুশি হয়েছে। কণিকা এগিয়ে নিখিলেশের মৃতদেহের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। নতুন কোরা কাপড়ে নিখিলেশের সম্পূর্ণ দেহটা ঢাকা, শুধু মুখটা বের করা আছে। মাথার শিয়রে ফুলের তোড়া। গলায় রজনীগন্ধার একটা মালা, কিছু ফুল গায়ে ছড়ানো।

কণিকা নিখিলেশের মুখের ওপর চোখ রাখল। চোখ বোজা প্রশান্ত নিশ্চিন্ত ঘুমের মতো মগ্ন হয়ে আছে নিখিলেশ। আর কোনদিন কখনো নিখিলেশ ওর চোখ মেলে দেখবে না, কণিকা সত্যি সত্যিই ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কোরা কাপড়ে ঢাকা বুকের নীচে নিখিলেশের হৃৎপিণ্ড এখন সম্পূর্ণ স্তব্ধ। কণিকাকে দেখতে চেয়ে ওই হৃৎপিণ্ড আর কোনদিন যে তো দ্রুততালে স্পন্দিত হবে না। স্থির একাগ্র চোখে নিখিলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কণিকার বুকের মধ্যে কান্নার দলা পাকিয়ে উঠছিল। ভিতরে জলপ্রপাতের মতো একটা দুরন্ত কান্না যেন আছড়ে পড়তে লাগল। প্রাণপণ মুখ বুজে থাকা সত্ত্বেও চোখের কোণে অবশেষ অশ্রু কেমন চকচক, তার ঠোঁট দুটোও এই সময় নড়ে উঠল। যেন সম্মোহিত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য কণিকা বিড় বিড় করে বলল, দেখ, নিখিলেশ, আমি এসেছি। তুমি মিথ্যা ভয় পেয়েছিলে। তুমি ডাকলে আমি কি না এসে থাকতে পারি!

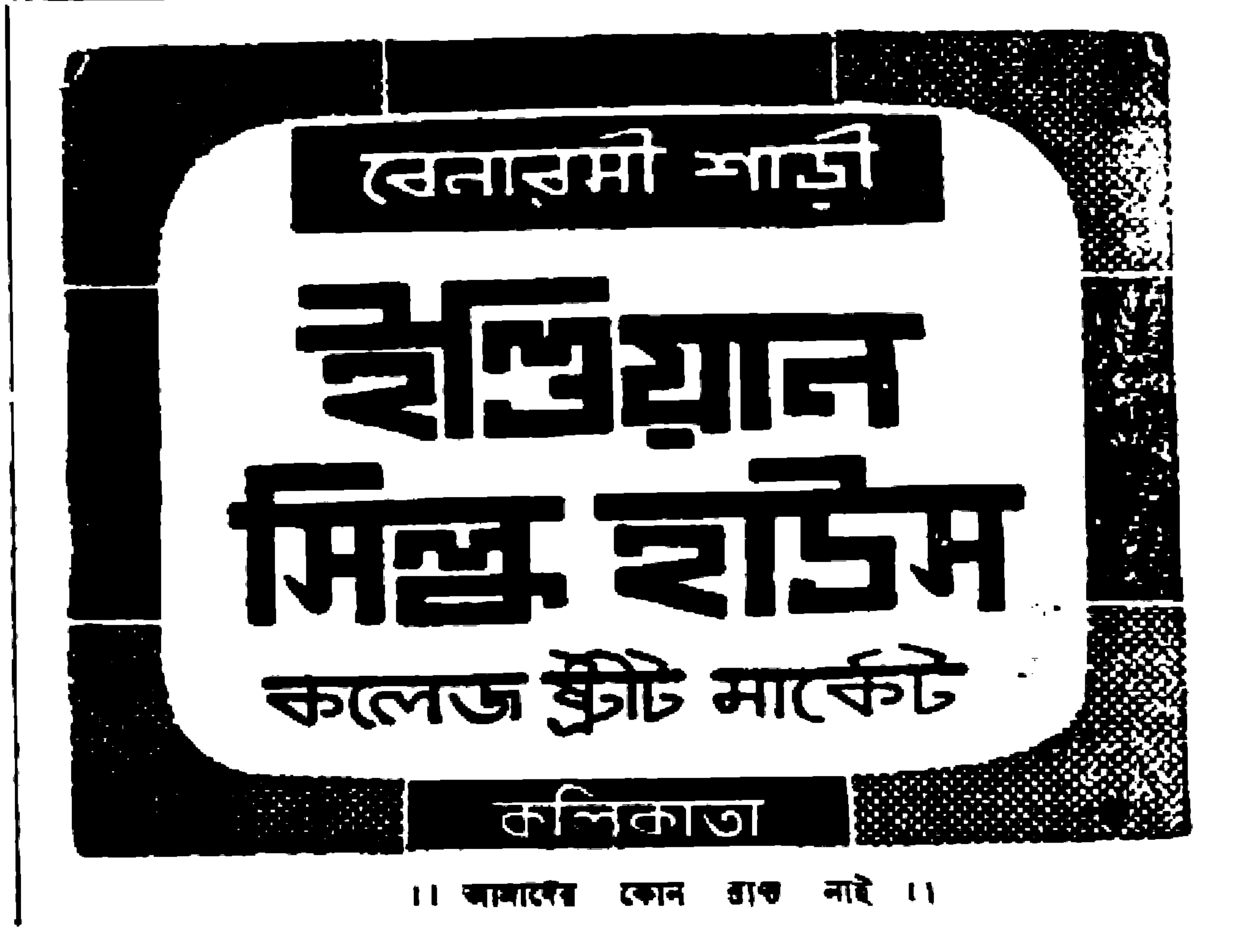

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বার্নার্ড শ'র পুনর্বাসন

জর্জ বার্নার্ড শ'র জীবনাবসান ঘটে ১৯৫০ খৃঃ ২ নভেম্বর তারিখে। চুরানব্বই বছরের বার্নার্ড শ'র বাণী বহু উদ্ধৃত, তাঁর রচনা বহুপঠিত। বার্নার্ড শ'র গদ্য রচনার স্বচ্ছতা, বাক-বৈদগ্ধ্য, সংলাপের স্বতোৎসারিত ধ্বনি মাধুর্য তাঁর নাট্য-পাঠককে মুগ্ধ করেছে, তাঁর নাটকের অভিনয় দেখে দর্শক আনন্দ পেয়েছে। আইরিশ নাট্যকার সিয়ান ও' কেসীর কথায়—

"a wonderful man is SHAW, Lord of a Century of good deeds and great work."

শতাব্দীর অধীশ্বর জর্জ বার্নার্ড শ' চরিত্রে বহুবিধ সদ্গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাই তিনি লেখক এবং মানুষ হিসাবে অবিস্মরণীয়।

শ'র মৃত্যুর পর তাঁর খ্যাতির প্রদীপ কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়ে পড়ে, এই অবস্থায় কিন্তু বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এমনই হয়, প্রাকৃতিক নিয়মে এমনই ঘটে, এই অবস্থা বার্নার্ড শ'র খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাকে ম্লান করে না। এর ফলে যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ তাঁদের প্রতিভা বিকাশের অবকাশ ঘটে। মৃত্যুশয্যায় বার্নার্ড শ'র একজন বন্ধু যখন অনুনয় করলেন, আর কিছুদিন বাঁচুন, আপনি যতদিন থাকেন ততই মঙ্গল।

এই অনুরোধ শুনে বার্নার্ড শ হাসলেন তারপর বললেন—

" There are plenty of fish in the water without a whale".

জলে অনেক মাছ, যদি তিমি না থাকে। চমৎকার উক্তি, বার্নার্ড শ'র সমস্ত জীবন ধরে পরাজয় ও আত্মতুষ্টির বিরুদ্ধে আর্তনাদ করেছেন। বার্নার্ড শ অপরিণত মানসের বিরোধিতা করেছেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল এই অপরিণত মানস বা 'ইমমেচ্যুরিটি' মানবসমাজকে তার প্রাপ্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। বার্নার্ড শ'র মতে পরিণত মানস বা 'মেচ্যুরিটি' হল দার্শনিক রূপবিকাশ। জীবন এবং জীবন-যাপনে আনন্দ। জীবন সম্পর্কে বার্নার্ড শ'র এই যে মনোভঙ্গী অনেকের মতে তা দাম্পত্য কলহের মত লঘুক্রিয়া। অধ্যাপক অডেন হয়ত এই কারণেই বলেছেন—

"His writing has an effect nearer to that of music than the work of so-called pure writers."

বার্নার্ড শ'র তিরোধানের পর প্রায় কুড়ি বছর কেটে গেছে, এখন আবার নতুন করে বার্নার্ড শ'র পূর্ণ মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। সমালোচকরা বলছেন বার্নার্ড শ' সেকস-পীয়রের চেয়ে বড়ো ছিলেন কিনা সে প্রশ্ন থাক তবে এক বিরাট প্রতিভার অবসানে এমনই ঘটে। তবে বার্নার্ড শ'র পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়েছে।

মিঃ এলান চ্যাপেলো 'শ—দি চাকার-আউট' নামক একটি সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে নব-মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। সভাস্থলে উপদ্রবকারীদের বিতাড়িত করা হয়, বার্নার্ড শ' স্বয়ং তাঁর নিজেরই একটি আলোক-চিত্রের নামকরণ করেছিলেন—দি চাকার আউট'। এই গ্রন্থটির নামকরণে সেই কথাটি ব্যবহার করেছেন চ্যাপেলো। অনেক নতুন তথ্য এবং চিঠিপত্রে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি শ-রসিক মহলে আনন্দ সঞ্চার করেছে। বার্নার্ড শ' মুখ্যত চিঠিপত্রের মাধ্যমেই প্রেম-লীলা করে গেছেন, তাঁর এই বিতাড়ন পর্বটাও তেমনই চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত। এই গ্রন্থের লেখক বার্নার্ড শ'র অজস্র চিঠিপত্রের যথেষ্ট ব্যবহার করে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১৯৪৯ খৃঃ বার্নার্ড শ' লিখিত 'সিকস্টিন সেলফ স্কেচেস' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বার্নার্ড শ' জীবনেতিহাসমূলক অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন। এই গ্রন্থের সতের পরিচ্ছেদে বার্নার্ড শ—হাউ ফ্রাঙ্ক ঘট টু হ্যাভ ডান ইট' অংশে তাঁর বন্ধু ও জীবনীকার ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের জীবনী কিভাবে রচিত হওয়া উচিত ছিল তার একটা খসড়া রচনা করেছেন। ফ্রাঙ্ক রসালো জীবনবৃত্তান্ত রচনা করার উৎসাহে অনেক উদ্ভট ও আজগুবি কাহিনী বানিয়ে তাঁর বার্নার্ড শ' জীবনীর অনেক পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। বার্নার্ড শ' তা পাঠ করে একটু বিরক্ত হয়েছিলেন।

এই পরিচ্ছেদে তিনি ফ্রাঙ্কের জবানীতে নিজের সম্পর্কে বলেছেন—

"Shaw plays the part of a modest man only in his relations with the arts which are the great rivals of literature. He never claimed to be "better than Shakespeare" though he does claim to be his successor."

একটা গ্রন্থের ভূমিকার মধ্যে বার্নার্ড শ' লিখেছিলেন—নাটকে যেমন শেকসপীয়র, অপেরায় যেমন মোৎসার্ট আর ফ্রেস্কো চিত্রে যেমন মাইকেল এঞ্জেলো, তেমনই শেকস-পীয়রকে কেউ কোনোকালে অতিক্রম করে যেতে পারবে না। শেকসপীয়র যা বলেন নি কেউ যদি তা বলতে পারে তাহলেও নয়।

বার্নার্ড শ' যখন 'স্যাটার ডে রিভিয়ু' পত্রিকার নাট্য সমালোচক ছিলেন তখন তিনি শেকসপীয়র সম্পর্কে অনেক অনুদার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছিলেন—শেকসপীয়রকে নিয়ে একটা সন্ধ্যা কাটানো চলে কিন্তু অনেক সন্ধ্যা কাটানোর জন্য শেকসপীয়র নয়।

মিঃ এডুইন উইলসন কিছুকাল আগে শেকসপীয়র প্রসঙ্গে বার্নার্ড শ'র সকল রকম উক্তির একটা সংকলন প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে বার্নার্ড শ শেকসপীয়র সম্পর্কে যে সব উক্তি করেছেন তার সবটাই 'জোক্' বা রসিকতা নয়, তার মধ্যে কিছু সত্য আছে। শেকসপীয়রীয় সমালোচক হিসাবে বার্নার্ড শ' অতিশয় যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

বার্নার্ড শ'র এই শেকসপীয়র সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় রচিত জর্জ বার্নার্ড শ'র পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতে একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি এই সূত্রে উদ্ধৃত করা হল—

'বার্নার্ড শ'র অবশ্য বিশেষ ধরনের পক্ষপাত ছিল নবরীতির নাটকের প্রতি। ইবসেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর স্বরচিত নাটকের জোরতর স্বপক্ষে। শেকসপীয়র

সেই পথে বাধা, (যেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সেই বহু উদ্ধৃত লাইন—'সম্মুখে থাকুন বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর'), একেবারে নবীন নাট্যকারদের রাস্তার ওপর সারা পথ জুড়ে চেপে বসে আছেন। তা ছাড়া প্রাচীন রীতি এবং সংস্কারের একটা প্রতীক হলেন শেকসপীয়র। শ বলেছিলেন—

"He is to me one of the towers of Bastille and down he must come",

(জর্জ বার্নার্ড শ—প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স)

শ' এইভাবে শেকসপীয়র নিয়ে অজস্র উক্তি করেছেন এবং তার অধিকাংশই বিদ্রূপ মন্তব্য। সরলতার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত এইসব ছোট বড়ো মাঝারি ধরনের পত্রাবলীতে ছড়িয়ে আছে অনেক মূল্যবান উক্তি। অনেক চমকপ্রদ কথা।

ডেসমণ্ড ম্যাককার্থী বার্নার্ড শ'র মৃত্যুর পর লিখেছিলেন—

"What voltaire was in Europe in 1778, the year of his, Shaw is in the world to-day. Like voltaire, he has been all his long life a perpetual fountain of wit, intellectual energy and controversy ... Only unlike voltaire. shaw was as free as a saint from pettiness and spite".

মিঃ চ্যাপেলো যে সব চিঠিপত্র সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে আছে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয়, বিতর্কমূলক মানুষ শ'র উক্তির মধ্যে অনেক বিতর্কমূলক উক্তি ও মন্তব্যও আছে। এই সব বিভিন্ন রকমের চিঠিপত্রের দ্বারা মিঃ চ্যাপেলো প্রমাণ করেছেন যে বার্নার্ড শ' শেকসপীয়রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হলেও একালের এক মহান পুরুষ, এবং মহত্তম নাট্যকার।

বার্নার্ড শ'র এই সব চিঠিপত্রে অনেক স্ব-বিরোধী উক্তি আছে। আশ্চর্যের বিষয় প্রতিদিন যে সব অজস্র চিঠিপত্র তাঁর কাছে আসত তিনি তার প্রত্যেকটির উত্তর দিতেন। পত্রপ্রেরককে ছোট্ট পোস্ট কার্ডে তিনি কি পারেন, কি পারেন না, আর কি পারবেন না তা স্পষ্টভাবে লিখে গেছেন।

মিঃ চ্যাপেলো সুনির্বাচন এবং অনুসন্ধান ভঙ্গীতে এইসব চিঠিপত্র সম্পাদনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে নানারকম টীকা সংযোগ করেছেন এই কারণে বার্নার্ড শ'র প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল তাঁরাই লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

—অভয়ঙ্কর

SHAW—'THE CHUCKER-OUT BY ALLAN CHPPELOW : Publication by Messrs ALLEN AND UNWIN Ltd (London: Price £3.75 Shillings.

বাংলা ভাষা আলোচনাচক্র

রবীন্দ্র সদনের কার্যনির্বাহক সভার পক্ষ থেকে সম্পাদিকা শ্রীমতী তপতী রায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারী পূর্ববঙ্গে '২১ ফেব্রুয়ারী' ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিকায় সারাদিনব্যাপী এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন। আলোচনার বিষয় ছিল: ১। দুই বাংলার স্বাধীনতার পর বাংলাভাষার গতিপ্রকৃতি ও ডিসেমিনেশন, ২। কাজের ভাষা বাংলা—সরকারী, বে-সরকারী এবং আইন-আদালত, ৩। পরিভাষা ও অনুবাদ, ৪। শিক্ষার বাহন—বিজ্ঞান, ডাক্তারী, যন্ত্রবিদ্যা, ৫। অনুবাদক ও দোভাষীর কর্মসংস্থান, ৬। টাইপরাইটার, টেলিপ্রিন্টার, শর্টহ্যান্ড বানানবিধি, ৭। প্রচার ও পরিবেশ। একাধারে ভাষাতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, শিক্ষাজীবী, নাট্যকার, চিকিৎসক, বিচারক, কবি, সাংবাদিক, প্রকাশক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের চিন্তানায়কদের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোয় আলোচনা সভাটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। যেসব সমস্যার মুখোমুখি হওয়া গেল একদিনেই তার সমাধান সম্ভব নয়। তবে এ-সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমাজ সচেতন হয়েছেন এবং এই সচেতনতা সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চার করার কাজে ব্রতী হয়েছেন, এটা অবশ্যই আশার কথা। সভার প্রথমার্ধে ডাঃ রমা চৌধুরী এবং দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যিক গোপাল হালদার পৌরোহিত্য করেন।

সভার প্রারম্ভে ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, পূর্ব বাংলার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণই কৃত্রিম এবং বাইরের জিনিস। অন্তরের ভাব, ভাবনায়, বেদনায় ও আনন্দে আমরা এক ও অভিন্ন।

ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণের সারমর্ম হোল—সমতাবিধানই রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষণ নয়। উদাহরণতঃ সুইজারল্যান্ডে প্রচলিত বহু প্রকার ভাষার উল্লেখ করেন এবং বলেন, ভৌগোলিক, ইতিহাস ও মানসিকতা নিয়েই রাষ্ট্র।

মাতৃভাষা নিঃসন্দেহে মানুষের আদরের বস্তু কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মোহমুক্ত স্বচ্ছ চোখে বিচার করে দেখতে হবে এ-ভাষা কি পরিমাণে আমায় গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। ভারতের কোনো কোনো রাজ্যে সংখ্যালঘু ভাষাগুলিকে চেপে দেবার প্রবণতা দেখা যায়, যেমন বিহারে বাংলা ও উর্দু। এক্ষেত্রে দুটি কথা মনে রাখা কর্তব্য। কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষা অঞ্চলকে বললেও সেই অঞ্চলের মানুষের পক্ষে সেটা পরিপূর্ণ নয়—এটা খুব সত্যি কথা। আবার অপভ্রংশকে বলে বলেই কোনো বিশেষ ভাষার গুরুত্ব কিছু কম এ-কথা ভাবাটাও ভুল। উদাহরণস্বরূপ ভোজপুরী ভাষা ও বাংলাভাষার উল্লেখ করা যায়। ভোজপুরী ভাষায় যাঁরা কথা বলেন, তাঁরা লেখবার সময় লেখেন হিন্দী-ভাষা অথচ এই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান। অপরপক্ষে বাংলাভাষা অনেক লোক বললেও তার সম্ভাবনা প্রচুর।

তুলনামূলক বিচারে ইংরেজী, চীন, রুশ, জাপান ও জার্মানীর পরই সুনীতিবাবু বাংলাভাষার স্থান নির্ণয় করেছেন। এ-ভাষারও অসম্পূর্ণতা অবশ্যই আছে। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নিয়ে শব্দ তৈরি করে এ-ভাষার পরিধি বাড়াতে হবে এবং শব্দ তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে সেগুলি যেন নিরর্থক না হয়।

পূর্ববাংলার মানুষের প্রচেষ্টার জন্য আমরা গর্বিত। এখানেও সে-চেষ্টা চলা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়। মৈত্রেয়ী দেবী বলেন, আজকের এই বিক্ষিপ্ত পরিবেশের মধ্যেও ভাষা নিয়ে আন্দোলনটা সাহসেরই পরিচয়। আমরা যা পেতে চাইছি শুধুমাত্র আবেদন ও অনুরোধের দ্বারাই সেটা সম্ভব নয়, ভাষার প্রতি ভালবাসাটা হোল সবচেয়ে বড় কথা। শত সংস্কারের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবার যথার্থ আকাঙ্ক্ষায়ই সৃষ্টি হোল রবীন্দ্র-সাহিত্য।

বাংলাদেশে বাংলাভাষার ধারা শুকিয়ে যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরণ সার্থকতায় আমাদের চোখ খুলে যাওয়া উচিত। আর এ-আন্দোলন পশ্চিমবাংলার আন্দোলন নয়। ভাষাকে পলিটিক্স থেকে, ধর্ম থেকে, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করে জীবনে, ধ্যানধারণায় মুক্তি সন্ধানের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকেই বলব যথার্থ আন্দোলন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীকমলাকেতন সেন বললেন: সাহিত্য, ভাষা ও পরিভাষার দিক থেকেও সরকারের অনেক কিছু করবার আছে। এটা যে হচ্ছে না তার কারণ কিছুটা শিক্ষার অভাব, কিছুটা মনের আলস্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য হোল উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত বই বাংলাভাষায় চালু হওয়ার চেষ্টা হলেই তার বিস্তার-পরিধি বাড়বে। প্রথম অবস্থায় কিছু অসুবিধা সত্ত্বেও এ-কাজে অগ্রসর হতে হবে। যন্ত্র এবং অন্যান্য সর্বদিক বিচারে এখনও বাংলাভাষার প্রস্তুতি হয়নি। তবে চিরদিন এটা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের মতে শুধুমাত্র প্রস্তাব গ্রহণ করলেই চলবে না। মানসিকতায় কিছু কাজ হয়ত হয় কিন্তু যেমন কোনো বৈপ্লবিক সার্থকতা যে আসে না তার কারণ আমাদের মনের অতলে ইংরেজী ভাষার ব্যাপক প্রভাব। আসল প্রয়োজন যে বস্তুর সেটি হোল সংকল্প।

জিয়াদ আলি'র মতে ভাষার আন্দোলন একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন, স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনীতিক উত্তরণের বিভাগীয় আন্দোলন। এক দেশ থেকে অন্য দেশে

বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, ভাষার আন্দোলন একটা আবেগ থেকেই উদ্ভূত হয় এবং পরে একটা রাজনৈতিক রূপ নেয়। শাসক-সম্প্রদায় পরিচালিত হয়েছিল বলেই ইংরাজী, উর্দু ইত্যাদির প্রাধান্য হয়।

পক্ষান্তরে পূর্ববাংলায় এই আন্দোলন এনেছে খেটে-খাওয়া মজুর, গদ্য-আবেদনের ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে এই চেতনা প্রবিষ্ট হয়েছে। আমার ভাষায় আমি ভাবব, কথা বলব। সুশৃংখলভাবে পরিশোধিত হওয়া পরের কথা। পূর্ববাংলার মূল আবেগ ছিল মুসলিম একটা জাত নয়, ভারতবর্ষ একটা জাতি।

ডাঃ অশোক বাগচি বলেন, যে দেশেই যাই, দেখি চিকিৎসাশাস্ত্রের বই সেই ভাষাতেই লেখা—এক বাংলা ছাড়া। পরভাষা শিক্ষা করতে যাওয়ার বাধা হচ্ছে দুর্বোধ্যতা এবং দুরূহতা। এতে ভাষার বিজ্ঞানচিন্তাও নষ্ট হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আঙ্গিক হয়ে গেছে, তাকে ভেঙে জাতীয়তাবোধের শ্লোগান দিলে বিপদ হয়।

বিচারক মাসুদ সাহেবের অভিজ্ঞতা হোল এই যে, মফঃস্বলে আইনের চর্চা বাংলাতেই চলে। আমরাও তাতে উৎসাহ দিই। প্রয়োজনীয় পরিভাষা বলোয় হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু মূল কাঠামো বাংলাতেই হওয়া উচিত।

শ্রীতরুণ সান্যালের বক্তব্য অনুসারে পশ্চিমবাংলায় ১৯৪৭-এর ভেলেশী উন্দী-পনের ভাষা কিছু সংবাদপত্রেরই একচেটিয়া—পূর্ববাংলায় এটা হোল জাতীয় আত্ম-বিকাশের ভাষা। ১৯৪৭-এর আগে বাংলায় ইংরেজ জয়ী হতে পারেনি। এর পরই জয়ী হয়েছে ভাষা দিয়ে। পরিভাষার বাধাটা চিরদিনই কিছু বড় হয়ে উঠতে পারে না। কারণ ভাষার প্রসারতার সঙ্গে চিন্তার প্রসারতা বাড়ে।

শ্রীমনোজ বসু বলেন, নানান বাধা অতিক্রম করেই ওপারে বাংলার ঢেউ এপার বাংলায় এসে পৌঁছেছে। আমরা যে-চাপে রয়েছি, ওরা তার বাইরে, তাই উপকৃত। হিন্দীর সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই, উপরন্তু বাংলার আনুকূল্যেই হিন্দী বিকশিত। উদাহরণ—বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঞ্চবিংশতি। কিন্তু জোর করে হিন্দী-ভাষাকে বাংলার ঘাড়ে চাপাতে যাওয়া অন্যায়।

সংবাদপত্রের ওপর আঘাত করা হয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকদের হয়ে এইটুকুই বলতে চাই, তাঁদের দুটি পরিভাষাসঙ্কুত। ক্ষিপ্র-গতিতে কাজ করা, টাইপে স্বাচ্ছন্দগতি বজায় রাখার জন্য যুক্তাক্ষর বর্জন তাঁদের করতেই হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য এগিয়েছে অনেক। কারণ, তারা শুধু বক্তৃতাই করেননি। কাজ করেছে। বাংলা, উর্দু দুটি ভাষার ওপরেই জোর দেওয়া উচিত। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে উর্দুর যোগ আছে।

দিলীপ বসুর বক্তব্য অনুসারে বিজ্ঞান অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে বৈজ্ঞানিক শব্দ গ্রহণীয়। অন্যথায় জটিলতা বাড়ে।

ডাঃ রমাপ্রসাদ সরকার, ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত বক্তাদেরই সমর্থন করেছেন।

সুনীল চট্টোপাধ্যায় বলেন, অনুবাদকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরস্কৃত করে ভাষার প্রসারতা বাড়ানো উচিত।

সাংবাদিক ও কবি মণীন্দ্র রায় রায় দিলেন, ২১ ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে এখানেও যে অত্যাচার, অবিচার আন্দোলন না হয়েছে তা নয়। সব মেনে নিয়েও আমার প্রস্তাব হচ্ছে—সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে ভাষা-আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবে। বয়স্ক নিরক্ষরদেরও শিক্ষিত করা প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও চাকুরিয়াজীবীদের সীমিত চেষ্টায় এ-আন্দোলন হবার নয়।

মণীন্দ্র রায়ের মত প্রবলভাবে সমর্থিত হয় এবং এই মতবাদেরই পরিপ্রেক্ষিতে রোমান লিপির প্রসঙ্গ ওঠায় তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বলেন মৈত্রেয়ী দেবী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গীতা মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র মণীন্দ্র রায়কে সমর্থন করে বলেন ভাষা শিক্ষা করা এবং তাকে ভালোবাসাটাই সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতা তার পরের কথা। ব্যক্তিগতভাবে আমি রোমানলিপির পক্ষপাতী। বিদেশের এবং স্বদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি কিছু হিন্দীভাষী ছাড়া সকলেই এটা চান। ভাষা যখন পরিণত হয়, তখনই তার ব্যক্তিত্ব বাড়ে, আর এই ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা প্রচেষ্টায়। পরিভাষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিভাষা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কেউ বুঝবে না এমন গোটাকতক শব্দগ্রহণ করার কোনোই মানে হয় না। মনোজ বসু প্রস্তাবিত একাডেমী একটা থাকা ভাল, কারণ একটা দেওয়াল থাকলে তবেই দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসার উন্মুক্ততা সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেন-শর্মা বলেন, গল্পসাহিত্যেই বাংলাভাষার পদের আনা আয়োজন অর্থাৎ ভোজের আয়োজন-শক্তির নয়। বিজ্ঞান এখনও এমন জায়গায় পৌঁছয়নি যাতে বাংলাভাষায় পঠনপাঠন চলতে পারে। আমাদের প্রকাশক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং লেখকগোষ্ঠীর সমবেত চেষ্টা ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

নীরেন চক্রবর্তীর বক্তব্য—এ-আলোচনার দুটি দিক আছে—ভাষাগত অধিকার প্রচেষ্টা এবং ভাষাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে তোলা। এই প্রসঙ্গেই অনুবাদ, পরিভাষা, লিপিসংস্কার আসে।

পূর্ববাংলায় এ-প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলপ্রসূ হয়েছে। তাঁরা কিন্তু সংস্কৃত থেকে দূরে সরে যাননি, বরং তৎ সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত থাকবার চমকপ্রদ আগ্রহ দেখিয়েছেন। ইচ্ছে থাকলেই ভাষা যে-কোনো পরিভাষা গ্রহণ অথবা বর্জন করতে পারে না। দরকার হলে নেবে—আবার বাদও দেবে। কিন্তু নতুনের জন্য দ্বার সব সময় খোলা থাকবে।

আকাদেমির প্রয়োজন এই কারণে বাণিজ্যিক ক্ষতির জন্য যে সমস্ত বিজ্ঞান ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশকবৃন্দ ছাপতে চান না, আকাদেমি তাঁদের ছাপার দায়িত্ব নিতে পারেন। বানান সমস্যারও প্রয়োজন আছে।

সাংবাদিক সন্তোষ ঘোষ বলেন, পূর্ববঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই আমি বলছি ওদের ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের ভাষা-আন্দোলনের মূলে পার্থক্য অনস্বীকার্য। সংখ্যালঘুর ওপর সংখ্যাগুরুর ভাষা জোর করে চাপালে তাঁরা যে সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ জানাতে পারেন, আমাদের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে-সুবিধা নেই। তাছাড়া নিশ্চয় রাজনীতিরই অংশ, ধর্মের নয়। মওলানাদিকে আঁকড়ে ধরে তাঁরা যে প্রবলতার সঙ্গে উর্দুর বিরোধিতা করেছেন, ইংরাজীর বিরুদ্ধেও ঠিক সেইভাবে দাঁড়াবেন কিনা জানা নেই।

পরিভাষায় আমরা অভ্যস্ত নই বলেই তাকে ঠাট্টা করি—অভ্যস্ত হলে তাকেই সহজভাবে গ্রহণ করব।

কামাল আমেদ সাহেব পূর্ববাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা সম্বন্ধে কিছু উপভোগ্য তথ্য পরিবেশন করেন। উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে সর্ববাদীসম্মত বিষয়গুলি সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়েছে।

নতুন বই

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কাহিনী—দীপঙ্কর সেন, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম : চার টাকা।

নামকরণ থেকে অনেকেই মনে করতে পারেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আলোচনামূলক গ্রন্থ 'য়ুরোপীয় সংগীতের কাহিনী'। কিন্তু এই গ্রন্থে কয়েকজন প্রখ্যাত য়ুরোপীয় সুরকারের জীবনী মাত্র আলোচনা করেছেন শ্রীদীপঙ্কর সেন। এঁদের মধ্যে আছেন ইয়োহান সেবাস্টিয়ান বাখ, জর্জ ফ্রেডারিক হ্যান্ডেল, ফ্রানটস্ য়োসেফ হাইডেন, ভোলফ-গাঙ আমাডিউস মোৎসার্ট, লুডভিগ ভন বিটোফেন, ফ্রানটস্ সুবার্ট, ফেলিকস মেন-ডেলসন, রবার্ট সুমান, ফ্রেডারিখ ফ্রাঁসোয়া শোপাঁ, রিখার্ড ভাগনার, ইয়োহানেস এবং পিটর ইলিচ চাইকভস্কি। 'গোড়ার কথায়' য়ুরোপীয় সঙ্গীতের আলোচনা এবং গ্রন্থশেষে 'অপেরা' প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন সঙ্গীত উৎসাহী ব্যক্তিরা।

চট্টলা—অম্বিকাচরণ চৌধুরী। সম্পাদনা—শচীন্দ্রনাথ গুহ। প্রকাশক—চট্টগ্রাম পরিষদ। পি-৭, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড। যাদবপুর, কলিকাতা-৩২, মূল্য একটাকা মাত্র।

এই গ্রন্থটিতে চট্টগ্রামের সাধক, শ্রমণ, ফকির, ঐতিহাসিক, কবি, সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানবিদ ও রাজনীতিকদের সংক্ষিপ্ত জীবনীসার

দেওয়া হয়েছে আর গ্রন্থারম্ভে 'চট্টলা' নামক একটি সুদীর্ঘ কবিতায় চট্টগ্রামের অতীত গৌরবের কথা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'চট্টগ্রাম ১৯৪৩'—নামক সুবিখ্যাত কবিতাটিও মুখবন্ধ হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। ছিন্নমূল চট্টলবাসীদের কাছে এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটি পরম মূল্যবান বিবেচিত হবে।

বাঙলার বিদ্যাসাগর (বিদ্যাসাগর সার্ধ-শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ)—গোপালচন্দ্র মিত্র। বিদ্যাসাগর সার্ধ-শতবার্ষিকী সাহিত্য সংসদ, দলপতিপুর, খড়ার, মেদিনীপুর। ২-৫০ পয়সা।

নব্য বাংলার রূপকার বিদ্যাসাগর জীবন নানান দৃষ্টিকোণ থেকে যুগে যুগে কালে কালে আলোচিত ও কীর্তিত হয়েছে। মহাপুরুষের প্রসঙ্গ আলোচনা একালে আরো বেশি করে দরকার। এই দরকারী কাজটি প্রশংসনীয়-ভাবে করেছেন শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র। সাগরকে সরোবরে পরিণত করার মত বিদ্যাসাগরের স্মরণীয় কর্মবহুল জীবনকে মাত্র কয়েকটি পাতার মধ্যে চিত্রিত করা অসম্ভব। তথাপি বিন্দুতে সিন্ধুর আস্বাদ দিতে পেরেছেন শ্রীমিত্র। বিদ্যাসাগর জীবন-সম্পর্কিত ফটোগুলি সংকলনটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

নেতাজী একটি নাম (কবিতা সংকলন)—শান্তশীল দাশ। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ। সোদপুর, ২৪ পরগণা। প্রাপ্তিস্থান : সাহিত্য সদন, এ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। দাম : এক টাকা।

ভারতের প্রাণ-পুরুষ নেতাজী সুভাষের জন্মদিন উপলক্ষে রচিত ও বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলি এই সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। মোট কুড়িটি কবিতায় শান্তশীল দাশ নেতাজীর জীবনের সংগ্রাম, সাধনা ও সর্বস্ব-সমর্পণের কথা মূর্ত করে তুলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সোদপুরের সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ-এর এটি প্রথম বই।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

বিস্ময় (প্রথম সংকলন)—সম্পাদক : অমল মিত্র এবং নরেশ মালাকার। ৩১ গৌরী-বাড়ী লেন। কলকাতা—৪। দাম : পঁচাত্তর পয়সা।

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'বিস্ময়ের' প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন তরুণ সান্যাল, হেমন্ত আঢ্য, অজিত সেনগুপ্ত, অভিজিত দাশগুপ্ত, অশোক হালদার, নরেশ মালাকার এবং আরো কয়েকজন।

গরল (ফেব্রুয়ারী)—সম্পাদক মানব সান্যাল ও জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়।। ৬।১।১এ সুইনহো স্ট্রীট, কলকাতা-১৯।। দাম : ১-২৫ টাকা।।

কোনো রকম চমকপ্রদ ঘোষণা কিংবা মেনিফেস্টো প্রকাশ না করেও 'গরল' প্রথম আবির্ভাবেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার মতো পত্রিকা। চমৎকার ছাপা, তাৎপর্যপূর্ণ প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জায় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। বলা যায়, সম্পাদকদ্বয় গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে চান। এ সংখ্যায় তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্পের লেখক রবিউল আলম, মানব সান্যাল ও জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তুষার মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, দিব্যেন্দু পালিত, আশিস সান্যাল, তপন মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। পুস্তক সমালোচনা করেছেন তরুণ সান্যাল ও বীরেন্দ্র দত্ত। পত্রিকাটির সবচাইতে সমৃদ্ধ দিক হলো কয়েকটি প্রবন্ধ নিবন্ধ। প্রাচীন ও আধুনিক চীনের কবিতার ধ্রুব মুখোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গে গৌরাঙ্গ ভৌমিকের স্মৃতিচারণা সকলেরই ভালো লাগবে। 'কবিতার ভাবনা ও গদ্য সঙ্কট' প্রসঙ্গে রথীন ভৌমিকের আলোচনাটি কিছুটা একপেশে মনে হতে পারে। সব মিলিয়ে পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য।

মধ্যাহ্ন (লিটল ম্যাগাজিন সমালোচনা সংখ্যা)—সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুখেন্দু ভট্টাচার্য।। ৬৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯।। দাম : এক টাকা কুড়ি পয়সা।।

'মধ্যাহ্নে'র এ সংখ্যাটি নানাদিক থেকেই আকর্ষণীয়। লিটল ম্যাগাজিনের সমস্যা, চরিত্র, লেখা, লেখক প্রভৃতি প্রসঙ্গে প্রায় দেড় ডজন প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন লেখক। যেহেতু প্রতিটি লেখাই বিচ্ছিন্ন এবং পারম্পর্যহীন, সেহেতু প্রতিটি আলোচনাকেই প্রবন্ধকারের নিজস্ব রুচির প্রকাশক বলা যায়। সম্পাদকদ্বয় লেখাগুলিকে এক সংখ্যায় প্রকাশ করে লিটল ম্যাগাজিনের পুরো জগৎটাকেই এক নজরে দেখে নেবার সুযোগ করে দিয়েছেন। সেজন্যে ধন্যবাদ। লেখকদের মধ্যে আছেন অচ্যুত গোস্বামী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শান্তিকুমার ঘোষ, আলোক সরকার, সুবন্ধু ভট্টাচার্য, সত্য গুহ, দিলীপকুমার মিত্র, রঞ্জিত রায় চৌধুরী, অর্ধেন্দু বিশ্বাস, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী গুপ্ত, প্রণব মাইতি, আশিস সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

শতরূপা (কার্তিক-পৌষ)—সম্পাদক : নির্মলকুমার সাধুখাঁ। ১৪ মাকড়দা রোড। কদমতলা। হাওড়া ১। দাম : দেড় টাকা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মশত-বর্ষ উপলক্ষে শতরূপার এই বিশেষ সংখ্যায় নতুন রচনার সঙ্গে কিছু পুরোন রচনাও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। যাঁদের রচনা আছে : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, যদুনাথ সরকার, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাস, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার খাঁ এবং আরো কয়েকজনের।

অবাস (১ম সংখ্যা)—সম্পাদক তপনলাল ধর।। ৪২, গড়পার রোড, কলকাতা-৯।। দাম : এক টাকা।।

অসাধারণ প্রচ্ছদ নিয়ে 'অবাস'-এর প্রথম সংখ্যাটি বেরিয়েছে এই দুর্দিনের বাজারে। তিনটি গল্প, দুটো কবিতা ও পাঁচটি আলোচনা ছাপা হয়েছে। লিখেছেন অতীন্দ্রিয় পাঠক, রবীন্দ্র দত্ত, কালিদাস রক্ষিত, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তপনলাল ধর ও কল্যাণ সেন। গতানুগতিক সাহিত্যচর্চার মোহ ত্যাগ করে সম্পাদক রচনা নির্বাচনে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে সমকালীন পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। পত্রিকাটির ছাপা সুন্দর। আলোচনাগুলো মূল্যবান।

অন্য মনে (দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা) সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিসকুমার সান্যাল সম্পাদিত।। ১৭-এর ইস্ট রোড, কলকাতা-৩২।। দু টাকা।।

'অন্যমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এক বিশেষ সংখ্যাগুলি। সম্ভবত এই পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা। কখনো কবিতা, কখনো বিজ্ঞাপনের ওপরে ওরা আলোচনা-সমালোচনা বের করেন। এ সংখ্যাটি উদয়শংকরের ওপরে নানা লেখায় সমৃদ্ধ। দু-একটি লেখার পুনর্মুদ্রণ আছে। লেখকদের মধ্যে আছেন প্রফুল্লশঙ্কর চৌধুরী, তিমিরবরণ, শম্ভু মিত্র, কনকলতা ঘোষাল, ও সি গাঙ্গুলী, বন্দুদাস শিরালী, সত্যজিৎ রায়, গুরু অমৃত সিং এবং আরো কয়েকজন। উদয়শঙ্করকে লেখা একটি চিঠির পুনর্মুদ্রণ ও 'শিল্পীর স্মৃতি-চারণায়' শীর্ষক সাক্ষাৎকারটি মূল্যবান। উদয়শঙ্কর সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক মাত্রেই কাছে সংখ্যাটি সংগ্রহযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ছাপা ও অঙ্গসজ্জা চমৎকার।

উত্তর্ক (দ্বিতীয় বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা)—সম্পাদক : পদ্ম মিত্র। করিমগঞ্জ। আসাম। একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

উত্তর্ক সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক। বাঙলার বাইরে থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। মননমূলক, সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা নির্বাচনে সম্পাদকের উন্নত মনের পরিচয় স্পষ্ট। 'বাংলা পুঁথির লিপিকাল', 'শ্রীহট্টের বৈষ্ণব কবি : দীন ভবানন্দ', 'একটি বিস্মৃতপ্রায় উপন্যাস' এই তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সোমজিৎ দাস এবং রামদুলাল বসু। অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন বিজু দে, অলোক-রঞ্জন দাসগুপ্ত, পান্নাকান্তি রায়, পুলকেশ দে সরকার, রমেন দেবনাথ বিজু প্রামাণিক, অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, দীন-নাথ সেন এবং অনেকে।

অনুভব (একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা)— সম্পাদক : নন্দধর রায়। ৩০।৪ হীন্দু লেন. হাওড়া ১। দাম : তিরিশ পয়সা।

আকারে ছোট হলেও পত্রিকাটি বিষয়ের গৌরবে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ পাঁচমিশেলী পত্রিকার বোধ চরিত্রে অনাস্থা জানিয়ে এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যারূপে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ সংখ্যাটিও নানাদিক থেকে মূল্যবান—১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের দিনগুলিকে পুনঃ স্মরণের সুযোগ এনে দিয়েছে। লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন জিয়া হায়দার, আল মাহমুদ, সানাউল হক, বেগম সুফিয়া কামাল, এনামুল হক, [illegible] শাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মুহম্মদ সিরাজ, হুমায়ুন কবীর, হাবিব রহমান ও রশীদ সিনহার মতো ওপারের বুদ্ধিজীবীরা। এপারের কবিসাহিত্যিকরাও যোগ দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে। লিখেছেন কবিতা ও নিবন্ধ। নন্দধর রায় লিখেছেন। "একই সুর, একই স্বর দুই আমির কণ্ঠে ধ্বনিত/ তাই তুমি আমার কাছে আমার/ কি এপারে কি ওপারে/ দুই পারে দুই জন্মসূত্রে পেয়েছি তোমাকে।"

নীলকণ্ঠ (১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা) সম্পাদক : স্বপন চক্রবর্তী। ৬৮, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট। কলকাতা—৬। দাম : এক টাকা।

ত্রৈমাসিক নীলকণ্ঠের প্রবন্ধ নির্বাচন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতাও আছে। লিখেছেন রামেন্দু দেশমুখ্য, মানিক চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, স্বপন চক্রবর্তী, সতীন্দ্রমোহন পাল, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সাধনা মুখোপাধ্যায়, কুমকুম দে, মহসীন মল্লিক, রেজাউল ইসলাম, আবদুল্লাহ আবুসয়ীদ, রুদ্রম রায়চৌধুরী, কমল দাস এবং আরো কয়েকজন।

আমাদের ত্রিপুরা (২য় ও ৩য় সংখ্যা)— সম্পাদক : অনিলবরণ ভট্টাচার্য। ১৮এ ব্রজনাথ দত্ত লেন। কলকাতা ১২। দাম : প্রতি সংখ্যা পঁচাত্তর পয়সা।

ত্রিপুরাভিত্তিক রচনা ও তথ্যাদি, জীবনালেখ্য, কৃতী পরিচিতি, স্কুল, কলেজ ও গ্রামজীবনের স্মৃতিচারণ, ত্রিপুরার গান, রূপকথা, কিংবদন্তী, প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও ও বিবিধ বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরা'র প্রতিটি সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশ সম্প্রতিকালে খুবই কমে গেছে। সম্পাদক যে দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছেন আশা করা যায় তা সম্ভবত সর্বসাধারণের স্বীকৃতি পাবে।

লিটল ম্যাগাজিনের স্বপক্ষে

গত পুজোর আগে এক নতুন পরিচিত ফরাসী বন্ধু কলকাতা ঘুরে কাঠমাণ্ডু যাবার পথে পাটনায় এসেছিলেন। নানা প্রসঙ্গে সাহিত্যের কথাও উঠেছিল। বন্ধুটি একটা ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত। এত রকমারি ও বিপুল সংখ্যক শারদীয় পত্রিকা দেখে বস্তুতঃ কিছুটা হয়ে পড়েছিলেন। পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেও নাকি এরকম সাহিত্য সৃষ্টির বন্যা ওর নজরে পড়েনি। বিদেশী বন্ধুর কথা শুনে মনে মনে পুলকিত হয়েছিলাম। আসল ব্যাপারটা ওকে বোঝাতে পারিনি যে এর মধ্যে সাহিত্য কতখানি আর ব্যবসা কতটুকু!

অনেক পত্রিকাই তো নিত্য বাজারে আসছে। নানা আকারে, বিভিন্ন খোলসে। সবাই যে মন কাড়ে তেমন নয়। দর্শনে লাভ করে কিছু কিছু আবার একটি প্রবন্ধের উন্মাদনার জন্যেই হাতে যায় হয়। আবার একসাথে আছে যাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা করা: কিছু পত্রিকাজগতী মলাট মাখিয়ে সাহিত্য নাম দিয়ে পাঠকদের উপহার দেয়া হয়। পুজোর এ সমস্ত ঢাউস হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন কাগজও গজিয়ে ওঠে। আর বার হয় অজস্র লিটল ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যা। আকারে প্রকরণে পরিবেশনে একটা নতুন কিছু করার উন্মাদনায় শহরে মফঃস্বলে এমন কি গ্রামেও লিটল ম্যাগাজিন বার হচ্ছে আজকাল।

সত্যি কথা বলতে কি অধুনা বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে কি ঘটছে তার সত্য পরিচয় পেতে হলে এইসব নিত্য প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন পড়তেই হবে। সিনেমা [illegible] ছাড়া নামী ও দামী চালু পত্রিকার [illegible]সংখ্যাতেই লোকপ্রিয় সাহিত্যিকদের [illegible] বা সিনেমার মুখ চেয়ে লেখা [illegible]সাহিত্যের বিবর্ণ ও একঘেয়ে স্বাদ পরিবেশিত হচ্ছে। কোন বলিষ্ঠ নতুন চিন্তাধারার পরীক্ষা নিরীক্ষার ধার ধারে না এই সকল পত্রিকা। কারণ এদের লক্ষ্য কাটতি, সাহিত্য নয়। ব্যবসা যদিও তাই। সেজন্যেই চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু পাঠকের লিটল ম্যাগাজিনগুলির মূল্য অনেকখানি।

লিটল ম্যাগাজিনের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ এখন পর্যন্ত তেমন কিছু গড়ে ওঠেনি। 'সাহিত্যপত্র' ব্যবহৃত হলেও গৃহীত হয়নি। লিটল ম্যাগাজিন শব্দটাই চালু হয়ে গেছে অনেকদিন থেকে। সবচেয়ে প্রথমে বোধহয় আমেরিকানরাই এই লিটল ম্যাগাজিন শব্দটির প্রবর্তন করে। আমেরিকার কথা ছেড়ে দিলেও বর্তমানে ওদের 'সিটি লাইটস জার্নাল', 'নেকেড কেদার' ইত্যাদি যে দুচারখানি লিটল ম্যাগাজিন দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তাতে এটুকু বোঝা যায় যে অন্ততঃ বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবে তার তুলনা বাংলা দেশের লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে চলতে পারে না। আকারে আয়তনে ক্ষুদ্র বা কাটতিতে প্রচারে সীমিত অথবা স্বল্পজীবী বলেই এসকল পত্রিকাকে লিটল ম্যাগাজিন বলা হয়? কোন একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার আওতায় এসব বিচারে এই সকল পত্রিকাকে বেঁধে দেয়া সম্ভব হলেও আসল ব্যঞ্জনা কিন্তু পত্রিকাগুলো স্বতন্ত্র। এসব চালু ধারণা ছাড়াও বা বহু মতের শাব্দিক অর্থকে আরও ব্যাপক ও গভীর করে তা হলো এই পত্রিকাগুলির প্রতিবাদের ইচ্ছা যা কি না সমস্ত প্রথাগত চালু ধ্যানধারণার বিরুদ্ধাচরণ করার প্রচেষ্টা। সফল হতে পারে, দুর্বল হতে পারে আবার কিছু নাও হতে পারে। কিন্তু ঐ যে ইচ্ছার কথা বলা হলো সেটাই এই লিটল ম্যাগাজিনের আসল ধর্ম। সৃষ্টিশীল লেখা সচরাচর চোখে পড়ে না। তা আবার ভাল লেখা হবে সে আশা করাই কঠিন। আর নতুন ভাল লেখা তো আরও বেশী দুষ্প্রাপ্য। এই ব্যাপারে লিটল ম্যাগাজিনগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ধরা বাঁধা কোন নিয়ম নেই এই সকল ছোট পত্রিকার। পাড়ায়, ক্লাবে, সাহিত্যগোষ্ঠীতে, কলেজে, অফিসে বা কফি-হাউসে যে কোন জায়গাতেই কজন সাহিত্য-পাগল বন্ধু জুটে একটা পত্রিকা প্রকাশ করে। নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রতিফলনের জন্যেও অনেক পত্রিকার জন্ম হয়। আবার দেখা যায় নামী ও অন্য পত্রিকায় নিজেদের ছাপবার সুযোগ হচ্ছে না অতএব সেই সমস্ত লেখা ছাপবার জন্যে নিজেরাই মিলে পত্রিকা বার করে ফেলে। একক প্রেরণায়ও অনেক সময় এ ধরনের পত্রিকার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ বাহ্যিক কোন চাপ বা প্রভাবের ফলে সৃষ্ট পত্রিকা সত্যিকারের লিটল ম্যাগাজিনের স্বীকৃতি পায় না। ভেতরের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নতুন লেখকরা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তির প্রতিফলনের জন্যে যে কাগজ বার করে সেগুলিই বেশীর ভাগ সত্যিকারের লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে থাকে। এ সমস্ত পত্রিকার ব্যবসাগত কোন লক্ষ্য থাকে না। স্বল্প পুঁজি বা সংগৃহীত হয় মিলিত অর্থসাহায্য, কিছু বিজ্ঞাপন, সামান্য বন্ধু-বান্ধব-লেখক গ্রাহক আর কিছু পুশ সেল— এরই ভিত্তিতে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। সুপরিকল্পনা, অর্থ, লোকের অভাব এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভাল লেখার অভাবে এই সকল পত্রিকার অকালমৃত্যু ঘটে। তবুও এই স্বল্পকালীন অবস্থানও যে সাহিত্য-জগতে একটা ছাপ রেখে যায় তার প্রমাণ বহু বেশী ও বিদেশী পত্রিকার ইতিহাস। এসকল পত্রিকা সাহিত্যের সকল বিভাগেই ভাল, সৃষ্টিশীল ও পরীক্ষামূলক লেখা

পরিবেশন করার চেষ্টা করে। তাই কখনও একক্ষভাবেই যেন পত্রিকা পরবর্তীদের জন্যে প্রচণ্ড প্রভাবশালী হয়ে যায়। আবার সাময়িক আন্দোলনের একটা ছাপও সমসাময়িক ও পরবর্তীদের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী কাজ করে।

সেই বিখ্যাত ইংরেজী লিটল ম্যাগাজিন 'রিদম' ১৯১১ খৃঃ প্রকাশিত হয়ে মাত্র ১৯১৩ খৃঃ পর্যন্ত চলেছিল। পরে 'ব্লু রিভিউ' নাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা চললেও মাত্র তিনটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল। 'এনিমি' মাত্র তিনবার প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ এসব লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তা লেখকবৃন্দের প্রভাব অবিসংবাদিতভাবেই স্বীকৃত। এই কাগজগুলির বিশিষ্ট লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার, ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড, এইচ জি ওয়েলস্, ফ্রাঙ্ক সুইনারটন, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস, উইন্ডহ্যাম লুইস প্রমুখ সাহিত্যিকেরা। তবুও তো কাগজগুলি দীর্ঘদিন টেকেনি। তা বলে কি এদের প্রকাশ বৃথা হয়েছিল?

এলিয়টের 'ক্রাইটেরিয়ন' পত্রিকার কথা কি ইতিহাস কোনদিন ভুলতে পারবে? 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় যে 'প্রুফ্রক' প্রকাশিত হয়েছিল সে কথাও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন।

বাংলা সাহিত্যেও নজীরের কি অভাব আছে? প্রবাসী, ভারতী, সাহিত্য এগুলোকে সঠিক অর্থে লিটল ম্যাগাজিন আখ্যা না দেওয়া গেলেও প্রথম প্রকাশের সময় আজকের লিটল ম্যাগাজিনের পূর্বাভাস সম্বলিত বৈশিষ্ট্য নিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংজ্ঞায় প্রথম লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে সবুজপত্রের নাম উল্লেখ করা যায়। পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাসে একটি জ্বলন্ত আদর্শ হয়ে থাকবে সবুজপত্র। বাংলা সাহিত্যে সবুজপত্রের অবদানের কথা কি কেউ কোনদিন ভুলে থাকতে পারবে? প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ আর চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা— এই তিন অবদানের জন্যে সবুজপত্র চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারপর সুধীন্দ্রনাথের পরিচয়। তিনি সম্পাদনায় এক অপূর্ব নিষ্ঠা ও অননুকরণীয় রুচির উপহার দিলেন বাংলা সাহিত্যকে। কবিতার তখন বাংলা সাহিত্যে রথী-মহারথীদের আনাগোনা। তবুও অধিকাংশ পত্রিকাই কবিতা প্রকাশ করত কেবল পাদপূরণের জন্যে। বুদ্ধদেব বসু সেই সময় এক অসম সাহসিক কাজ করলেন শুধুমাত্র কবিতার জন্যে 'কবিতা' প্রকাশ করে। এখানে এসেই যেন লিটল ম্যাগাজিন একটা বাঁক নিল। তারপর থেকে সেই ক্রমপ্রবহমান ধারা আরও বড় বেশী বলিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে—ছড়িয়ে পড়ছে।

বাংলা দেশের যা কিছু সবই কলকাতা-কেন্দ্রিক। অন্যসব কিছুর কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু যদি সাহিত্যের কথাই ধরা যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে এখানেও এই এককেন্দ্রিকতা কেন? কলকাতার বাইরে বা বাংলাদেশের বাইরে বাংলা সাহিত্যের জন্যে কি কিছু হচ্ছে না? যা হয় এবং হচ্ছে তার প্রমাণ বহু লেখক ও অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশের মধ্যে দিয়েই বোঝা যাচ্ছে। তবু এই সত্যকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা বা একটা নাক-উঁচু ভাব কলকাতার রয়েছে। এতে করে, কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলা সাহিত্যেরই ক্ষতি হচ্ছে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। এ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক অমৃতের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। যে সহানুভূতি ও উদারতার সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে সংবাদ ও আলোচনাদি অমৃতে প্রকাশিত হচ্ছে তা সত্যিই উৎসাহজনক। অন্যান্যও এ আদর্শ অনুসরণ করলে বাংলা সাহিত্যেরই উপকার হবে। আজকাল পাঠকগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশের মধ্যে একটা সচেতনতা আসতে শুরু করেছে। তাঁরা বাজার চলতি পত্রিকাগুলি পাশে সরিয়ে রেখে লিটল ম্যাগাজিনগুলির দিকে নজর দিচ্ছেন। সুখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ এই লিটল ম্যাগাজিনগুলিই টিকে থাকার জন্যে কতগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

একজোড়া সমস্যার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা যে কেহ য সেফার বা বন্ধ করার জন্যে এস্টাব্লিশমেন্টের কতগুলো পরোক্ষ চাপ ও অসহযোগিতা কাজ করছে। হ্যাঁ প্রত্যক্ষ, সময় জীবনভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই সমস্ত বড়ো ও মাঝারিদের এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে এই সকল পত্রিকা এক একটি প্রতিবাদ হলেও সময়েরই দাবী মেনে নিয়ে তাকে আবার সেই এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে হাত পাততে হয়। হবেই—নইলে আজকের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে ছোট পত্রিকা প্রকাশ করাও অসম্ভব। একটা ছোট পত্রিকা প্রকাশ করতে ইচ্ছা, উৎসাহ, আন্তরিকতা ইত্যাদি ছাড়াও বাস্তবসম্মতভাবে যে-সব জিনিসের প্রয়োজন তা হলো কাগজ, বিজ্ঞাপন, প্রেস ও ভাল লেখা। তারপর ভাবতে হয় পত্রিকা পাঠাবার ডাক খরচের কথা। সমস্ত প্রকাশনাসত্ত্ব লেখকরাই যখন এসব পত্রিকার প্রকাশক তখন লেখার সামগ্রী নিজেরা সামলে নেয়। প্রেসও খুঁজে নেয়। অথচ বাকীগুলোর ব্যাপারে যে সাময়িক অসুবিধা ভোগ করতে হয় তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। সরকারী-বেসরকারী বড় বড় সংস্থার বিজ্ঞাপন এ সমস্ত লিটল ম্যাগাজিনের জন্যে জোটে না। তার সবটাই সমস্ত বড় বড় পত্রিকা হস্তগত করে নেয়। অন্যদের কথা বাদ দিলেও সরকারী বিজ্ঞাপনের বেলায় এ অন্যায় কেন ঘটতে দেওয়া হচ্ছে? কেনই বা লিটল ম্যাগাজিনগুলি বঞ্চিত? এ সকল পত্রিকা টেকে না বলে অনেকে বিজ্ঞাপনদাতাদের হয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। যা টেঁকে না তা নিয়ে আফসোস কেন? কেননা চলে সেগুলোই বা পাবে না কেন? সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া আসল অর্থই তো হলো পেট্রোনাইজ করা। প্রচারের জন্যে তো প্রভাবশালী পত্রিকা বা অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবু এ প্রশ্নের জবাব এখন পর্যন্ত কোন লিটল ম্যাগাজিন পরিচালকেরা পাননি। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে এই কাগজ সংগৃহীত হয় সারা ভারতের জনসাধারণের পকেট থেকে। নিউজ প্রিন্টের কোটা বণ্টনেও সেই একই অসাম্য। বড় বড় পত্রিকাগুলি এ ব্যাপারেও লাভবান। শত বাধা বিপত্তি পার হয়ে পেরিয়ে নিউজ প্রিন্টের কোটা আর ছোট পত্রিকার ভাগ্যে জোটে না। এখানে সারা ভারতের সমস্ত ভাষার লিটল ম্যাগাজিনগুলি সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা হলো ডাক-খরচ। প্রতিদিনই প্রায় ডাক-খরচ বাড়ছে। বুক-পোস্টে পাঠাবার নিম্নতম খরচ কুড়ি পয়সা। তাহলেই অনুমান করা যায় যে কিভাবে এই ডাক-খরচ বোঝা ছোট পত্রিকাকে কাবু আর অসহায় করে দিচ্ছে। কি বিশ্রী নিয়ম ডাক-বিভাগের। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও দৈনিকের বেলা একটা সুবিধাজনক হারে পাঠাবার সুযোগ আছে। অথচ এক মাসের বেশী পর করে যারা পত্রিকা বের করে অর্থাৎ দ্বি-মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলি এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অথচ বেশীর ভাগ লিটল ম্যাগাজিনই এই পর্যায়ের। কেন এ বৈষম্য? কে তার জবাব দেবে?

বিদেশে আগে যেমন এখনও তেমন অনেক পত্রিকা আছে যাদের বেশীর ভাগ খরচই চলে দানের পয়সা থেকে। ... উল্লিখিত 'পোয়েট্রি' পত্রিকা এক ... সাহায্যের দানে চলছে। অন্যান্য ... 'স্পেক্টেটর' পত্রিকা এখনও দানের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের বাংলা সাহিত্যে এরকম দানের কথা এখন পর্যন্ত ... আসেনি।

এখন বড় বেশী ছোট পত্রিকা বার হবার ফলে অনেকে আশঙ্কান্বিত। তাঁদের ... আশঙ্কার পিছনে কি ধরনের যুক্তি ... করছে তাঁরাই জানেন। তবে এই ... প্রকাশের প্রচার নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ... শঙ্কিত হবার কারণ নেই। সময়ের ... পরখাছায় স্থান হয় না, এ তো চিরকাল ... সত্য।

তাই এত বাধা বিপত্তির মাঝেও যে ... লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে, ... আনন্দের ব্যাপার। আশার কথাও বটে। ... যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলি ... সচেতন হয়ে ভাববার সময় এসেছে। ... প্রতিকারের কথাও স্বাভাবিকভাবেই আস...

—জীবনময় ...

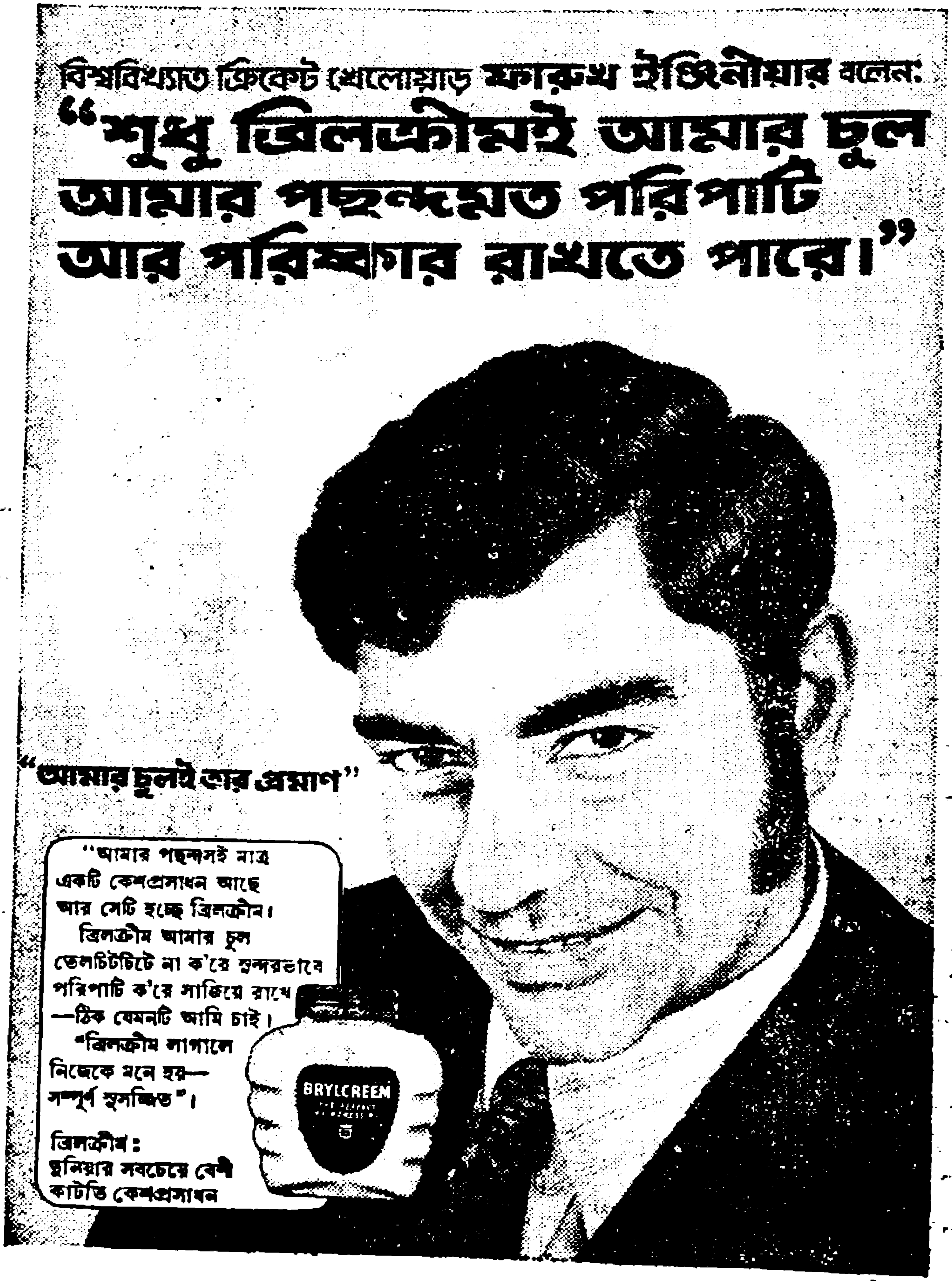
বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফারুখ ইঞ্জিনীয়ার বলেন:
"শুধু ব্রিলক্রীমই আমার চুল আমার পছন্দমত পরিপাটি আর পরিষ্কার রাখতে পারে।"
"আমার চুলই তার প্রমাণ"
"আমার পছন্দসই মাত্র একটি কেশপ্রসাধন আছে আর সেটি হচ্ছে ব্রিলক্রীম।
ব্রিলক্রীম আমার চুল তেলচিটচিটে না ক'রে সুন্দরভাবে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রাখে —ঠিক যেমনটি আমি চাই।
"ব্রিলক্রীম লাগালে নিজেকে মনে হয়— সম্পূর্ণ সুসজ্জিত"।
ব্রিলক্রীম:
দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী কাটতি কেশপ্রসাধন
BRYLCREEM

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪৭)

দিন-দশেক পর শশীভূষণ এবং ঈশম ফিরে এল। ওরা মহাদেব সাহার লোককে সঙ্গে নিয়ে গেছে। এত বড় মানুষকে দেশ-দেশান্তরে খুঁজতে যাওয়া ভাগ্যের কথা। ওরা এসে খবর দিল, না, পাওয়া গেল না।

বড়বৌ শচীন্দ্রনাথ এমন কি বাড়ির সবাই, গ্রামের কেউ-কেউ ওরা ফিরে আসছে দেখতে পেয়েই পুকুর পাড়ে নেমে গেল। সেখানেই শশীভূষণ সবাইকে বলল, না, তিনি সেখানে নেই। যাকে সন্দেহ করে খুঁজতে যাওয়া তিনি ছ-সাত দিন আগে কামাক্ষা দেবী দর্শনে চলে গেছেন।

—তিনি কে? বড়বৌ সহসা লোক-লজ্জার মাথা খেয়ে এক দল লোকের সামনে এমন প্রশ্ন করে বসল।

—কেউ কিছু এমন খবর দিতে পারল না। বিশ্বনাথের মন্দিরে কিছু পান্ডাদের কথাটা বললাম। ওরা বলল, তিনি তো মৌনি ছিলেন। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। প্রথম দিন এসেই পিপুল গাছের নিচে বসেছিলেন। ওঁর কি চেহারা! রাজপুত্রের মতো চেহারা! সংসারবৈরাগ্যে যেন তীর্থে চলে এসেছেন।

—ওঁর হাতে কোন কালো-কালো দাগ ছিল।

শশীভূষণ বলল, ওরা কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল ত্রিকূট পাহাড়ের নিচে তিনি চুপচাপ পিপুল গাছের নিচে বসে ছিলেন। পরনে বড়জোর মনে পড়ে লাল-পাড়।

শচীন্দ্রনাথ বলল, ওঁর গায়ে অশৌচের দাড়ি থাকার কথা।

—না তেমন কোন অশৌচের দাড়ি ছিল না। মাথা মুন্ডন করা। রাশি-রাশি লোক ওঁকে দেখেই ভিড় করেছিল। যতদূর মনে পড়ে তিনি এত মানুষের ভিড় দেখেই সেখান থেকে পালিয়েছেন।

—কিন্তু বললেন যে, কামাখ্যা দর্শনে গেছেন।

—ওটা ওদের অনুমান। কেউ কিছু ঠিক বলতে পারছে না।

সবাই বাড়ি উঠে এল। মানুষটার খোঁজ পাওয়া না গেলে যা হয়, বড়বৌ আবার সেই সংসারে কাজের ভিতর ডুবে গেল। তিনি ফিরে আসবেন। যখন নিরুদ্দেশে গেছেন তখন ফিরে আসবেন।

তারপর এল ভূপেন্দ্রনাথ। সে সঙ্গে নিয়ে এল এক বড় তান্ত্রিক। তিনি নখের উপর এক মায়াদর্পণ সৃষ্টি করবেন। তাতে মানুষটা কোথায় বসে আছে অথবা হাঁটছে দেখা যাবে। সবচেয়ে যে প্রিয় মানুষ তার চোখে সবচেয়ে ভাল ছবি ফুটে ওঠে। সে আরও কিছু খবর নিয়ে এল এ সময়। দেশ-ভাগের খবর। শরৎ বসু মশাই ময়মনসিং-এ মিটিং করে গেছেন। তিনি এই দেশভাগের বিরুদ্ধে। পন্ডিতজী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল খুব এগিয়ে গেছেন। কেবল এখন মহাত্মাজীর উপর সব নির্ভর করছে।

তান্ত্রিক থাকবেন দু দিন। তাঁর খাদ্য-দ্রব্যের বিরাট তালিকা। নিশি রাতে তিনি তন্ত্র আরাধনায় বসবেন। সুতরাং তন্ত্রা-চারের যা-যা দরকার তার একটা ফর্দ করতে করতে বললেন, তবে মহাত্মাজী বাঁচিয়া থাকতে দেশভাগ হবার নয়। যা কিছু আশা এখন আমাদের তাঁর উপর।

শশীভূষণ বলল, যেভাবে চার পাশে দাঙ্গা হচ্ছে কি যে হয় কিছু বলা যায় না।

তান্ত্রিকমশাইর জটা খুলে দিলে মাটিতে এসে পড়ছে। সোনা লালটু এবং পোড়া আর অথবা কিরান এবং গ্রামের ছেলেরা ভয়ে আর ওদিকে যাচ্ছে না। চোখ বড়-বড়। চাঁপা ফুলের মতো লম্বা চোখে কাজল এবং ভস্মমাখা শরীর। লাল রঙের আলখেল্লা এবং বড় কমন্ডলু, হাতে ত্রিশূল, ওঁর মুখে সেই বম্-বম্ ভোলানাথ শব্দ। শশীভূষণের বড় রাগ হচ্ছিল। কারণ এই মানুষটা তার ঘরেই রাত কাটাবে আজ। ওরও কেমন ভয় ধরে গেল প্রাণে। অথচ মুখে কিছুই বলতে পারছে না। ভূপেন্দ্র-নাথের উপর মনে-মনে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছে। ভূপেন্দ্রনাথ যে দেশভাগের ব্যাপারে এত কথা বলে যাচ্ছে তার কথার আর একটাও জবাব দিচ্ছে না। নিজেই কেন বলতে হয়, এগুলো যে আপনার কি হয় বলে! বত সব আজে-বাজে লোক ধরে আনা।

ভূপেন্দ্রনাথ বলল, বোঝলেন মাস্টার-মশাই এবারে ঠিক সন্ধান খোঁজ পাইয়া যামু।

শশীভূষণ একটা ইংরেজি বই পড়ছিল। সে সেটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। এখন নানা রকমের তিনি কথা বলবেন। এই জটাজুট-ধারী তান্ত্রিক মানুষ সম্পর্কে এমন ইমেজ তৈরী করবেন যে, সে আর বসে শুনতে পারবে না। মাথা তার গরম হয়ে যাবে। সে সেজন্য তাড়াতাড়ি একটা জামা গায় দিয়ে সোনাপাটের দিকে বের হয়ে গেল।

—একেবারে স্লেচ্ছ। লেখাপড়া শিখলে এই হয়। যেন ভূপেন্দ্রনাথের এমন বলার ইচ্ছা।

তান্ত্রিকের কথামত বড়বৌ সকাল-সকাল স্নান করেছে। হোমের বাঁধবাবস্থা তাকেই করতে হয়েছে। লালপেড়ে শাড়ী এবং কপালে বড়বৌ আজ অন্য দিনের চেয়ে অনেক বড় সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছে। তাকে সেই মানুষের সামনে চুপচাপ বসে থাকতে হবে।...হোমের নানাবিধ আচারের পর বড়বৌর চোখে ঘি রেখে আগুনের উপর কিছুক্ষণ ধরে বললেন, কিছু দেখতে পাচ্ছেন মা?

—না।

—ভাল করে দেখুন।

—না কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

খুব গম্ভীর গলায় হেঁকে উঠলেন, ভাল করে দেখুন। দর্পণের উত্তরের দিকটায় ছায়ামত কিছু ভেসে উঠছে।

সবাই গোল হয়ে চার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনে সব গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। বড়বৌ ঘামছে। রোদ এসে ওর কপালে পড়েছে। সিঁদুর গলে গিয়ে সারা মুখ লাল। বড়বৌ কাঁপছিল। দেখতে পাচ্ছেন?

—দেখতে পাচ্ছি।

—কি দেখতে পাচ্ছেন?

—তিনি হেঁটে যাচ্ছেন।

—কোন দিকে?

—উত্তরের দিকে।

—তারপর কি দেখছেন?

—একটা গাছের নিচে বসলেন।

—এখন কি করছেন?

—কিছু না।

—কিছু দেখতে পাচ্ছেন আর?

—কিছুই না। হ্যাঁ, একটা আর্ত কান্না মনে হচ্ছে।

—আর কিছু?

—চারপাশে কত লোক বসে রয়েছে।

—আর কিছু?

—সবাই ওঁর কাছে কিছু চাইছে।

—না। তিনি মাথা নিচু করে বসে রয়েছেন।

—কাউকে কিছু বলছেন না?

—না।

—এবারে দর্পণের পশ্চিম দিকে তাকান। কেউ ওর দিকে হেঁটে আসছে মনে হয় না?

—একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।

—সে কে?

—আপনার মতো মুখ।

—না-না আমার মতো মুখ হবে কেন? ভাল করে দেখুন।

বড়বৌ কিছু আর বলতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। সবাই ধরাধরি করে ওকে তুলে নিয়ে শুইয়ে রাখল।

সোনার মনে হল, এক আধি মারে সব-কিছুতে। সে খুব সন্তর্পণে ভিড়ের ভিতর থেকে ওর কমণ্ডুল চুরি করে নিয়ে ঘাটের জলে লুকিয়ে রাখল। খোঁজ এবার। দেখাও বাবু তোমার কত হিম্মত, নিরুদ্দেশে গেছে কমণ্ডুল। বের কর খুঁজে।

বিকেলের দিকে কমণ্ডুল খুঁজতে গিয়ে তান্ত্রিক মানুষ দেখে ওটা ওর ঝোলের ভিতর নেই। কে নিল! সারা বাড়ী হৈ চৈ। খোঁজা-খুঁজি। সারা বাড়ীতে কেউ বলতে পারল না কমণ্ডুল হেঁটে-হেঁটে কোথায় চলে গেছে। সোনা বলল, আমি বলতে পারি মাস্টারমশাই?

—কোথায়?

—দাঁড়ান। বলে সে নিজের নোথ নিজে দেখে বলল, মনে হয় কমণ্ডুল হেঁটে যাচ্ছে।

—কোনদিকে?

—পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে।

—তারপর

—টুপ। জলে ডুবে গেল।

মাস্টারমশাই এবং সোনা উচ্চরে হেসে উঠল। যা বের করে নিয়ে আয়। নয়ত বাবার তোকে ছোটকর্তা মারবে।

সোনা বলল, আমার একা যেতে ভয় লাগে।

—কোথায় ডুবিয়ে রেখেছিস?

—আপনার আম গাছটার গোড়ায় যে ঘাট তার ডান দিকে শাওলার নিচে।

শশিভূষণ কমণ্ডুল তুলে এনে তান্ত্রিক-মশাইর সামনে রেখে চুপি-চুপি বলল, ওটা হেঁটে যাচ্ছিল।

—কোনদিকে?

—ঘাটের দিকে। ধরে এনেছি।

তান্ত্রিক মানুষটি টের পেয়ে মুখ গম্ভীর করে ফেলল।

শশিভূষণ বলল, এবারে তাগেন ঠাকুর। অনেক ত দেখালেন মজা। আর দেখাতে হবে না।

পরদিন সকালে সবাই দেখল মানুষটি নেই। দুপুর রাতে চলে গেছে কাউকে না বলে।

ভূপেন্দ্রনাথ ভয় পেয়ে গেল। কোথায় অনিয়ম হয়েছে, তিনি রেগে গেছেন। কিছু না বলে চলে গেলেন। এসব মানুষের অপমান নানাভাবে অমঙ্গল দেখা দিতে পারে সংসারে। সেজন্য সারাদিন সে থাকল।

তার কিছু দিন পরই সোনা বের হল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে। সবশেষে সে এক-বার চেষ্টা করে দেখছে।

সে সকাল-সকাল দুটো খেয়ে নিল। মাকে সে কিছু বলল না। সে দুটো বড়শি নিল। নদীর জলে মাছ ধরতে যাচ্ছে বলে বের হয়ে গেল। কারণ এখন নদীতে জল কম। সোনা বড়শিতে ভাল মাছ ধরতে পারে। এখন ফেলে মাছেরা বর্ষার জল পেলেই উঠে আসবে। খুব বড় নয়। ছোট-ছোট ফেলে। সে বড়শি এবং একটা বাটি সঙ্গে করে মাঠে নেমে গেল। ওর শরীরের সেই দুঃখ ভাবটা কেটে গেছে। এখন সে খুব তাজা। সামনে সব মাঠ আছে। মাঠে পাট গাছ ওর বুকসমান। দুদিন যেতে না যেতেই সব পাট ওর মাথার উপর উঠে যাবে। উঠে গেলে তাকে কেউ আর দেখতে পাবে না। তাজা পাট গাছের নিচে সোনার দুঃখ ভাবটা একেবারে মুছে যাবে।

গোপাটে নেমেই মনে হল ফতিমা এখনও ঢাকায় যায় নি। ফতিমাকে সে সঙ্গে নিতে পারে। কিন্তু ফতিমা হয়ত যাবে না। সে বড় হয়ে গেছে। ফতিমা বড় হয়ে গেছে। সে একা-একা কোথাও এখন চলে যেতে পারে, কিন্তু ফতিমা পারে না। তবু কেন জানি সে যে জ্যাঠামশাইকে মাছ ধরার নাম করে খুঁজতে বের হচ্ছে সেটা একবার ফতিমাকে না জানালে যেন নয়। আমি যাচ্ছি ফতিমা। জ্যাঠামশাইকে আনতে যাচ্ছি। কারণ কেন জানি সোনার অসুখের ভিতর বার-বার মনে হয়েছে সে না গেলে জ্যাঠামশাই ফিরে আসবেন না। তাকে দেখলেই জ্যাঠামশাই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে উঠে আসবেন। এই যে সোনা আমি। এতদিন সবার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছি, কিন্তু তোকে দেখে আর থাকতে পারলাম না। কেন জানি বাড়ি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। চল। বলে তিনি সোনার কাঁধে হাত রাখবেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখবে সোনা জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ফিরছে। জ্যাঠিমা সোনাকে নিশ্চয়ই তখন আশীর্বাদ করবে। সোনা তুমি বড় ভাল ছেলে। তুমি দীর্ঘ-জীবী হও। সোনাকে কেউ আদর করে বললে সে সবকিছু তার জন্য করতে পারে। আর এ তো তার পাগল জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাইকে সে বন-জঙ্গলে ঢুকে ডাকলে তিনি চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন না। ঠিক হাসি-হাসি মুখটি নিয়ে উঠে দাঁড়াবেন। এসে গেছিস। আমি তোর জন্যই বসেছিলাম। আরও কত কিছু ভাবে সোনা। মনে হয় আর জ্যাঠামশাইকে কেউ তেমন করে খোঁজে নি। খোঁজলে একটা মানুষকে পাওয়া যায় না এটা তার বিশ্বাস হয় না। সে থাকতে না পেরে একা-একা টাবোর পুকুর পাড়ে চলে যাচ্ছে। কারণ সোনার বার-বারই যে ঝোপ-জঙ্গলের কথা মনে হয়েছে সেটা টাবোর পুকুর পাড়, সেই বৃক্ষ, বৃক্ষ তুমি কার? রাজার। এখন কার? তোমার। আমার হলে তুমি বলো আমার পাগল জ্যাঠামশাই কোথায় বসে আছেন? তাকে তুমি খুঁজে আনো। চলো তুমি আমার সঙ্গে তাকে খুঁজবে।

তবু সেই গাছটির কথা মনে হলে, গাছ তো নয়, বৃক্ষ, বড় ডালপালা মেলে দিয়েছে আকাশে। আর সেই অজস্র শকুন, কোনটা উড়ছে, কোনটা মগডালে বসে ঘুমচ্ছে। কোনটা শিকার কোন দিকে, বাতাসে গন্ধ আসছে কিনা, এই ভেবে গলা বার করে বসে আছে। সোনার দৃশ্যটা মনে হলেই ভয় হয়। কত বড়-বড় সব হাড়, মানুষের অথবা মাছের। সে হাড় ঠিক চিনতে পারি না। বড় হাড় হলেই মানুষের মনে হয়। সেই সব হাড়, মরা ডাল ডিঙিয়ে যেতেই তার যা ভয়। ফতিমা সঙ্গে থাকলে কিছুতেই ভয় থাকবে না। সারা মাঠে পাট গাছ। এদিকের জমিতে আগে চাষ করা হয়েছে বলে সে কখন টুপ করে ডুবে গেল পাটের জমির ভিতর। এবং গিয়ে যখন দাঁড়াল অন্য পারে, ঠিক সামনে সেই পেয়ারা গাছ হাজিসাহেবের। সে কারো সাড়া পাচ্ছে না। কেমন নিঝুম বাড়িটা। নিঝুম থাকারই কথা। ওর নানী চলাফেরা করতে পারে না। ঘরের ভিতর চুপচাপ বসে থাকে। চোখে ভাল দেখে না। অথবা সারা বিকেল মাদুরে শুয়ে ঘুমোয়। মনু শেখ সারাদিন মাঠে থাকে। ওদের বাড়িটার পরে হাজি-সাহেবের বাড়ি। কেউ বড় আসে না এ-বাড়িতে। কারণ সংসারে যে মানুষ থাকলে কথাবার্তা বলা যায় তেমন মানুষ বলতে এক ফতিমা। সে সারাক্ষণ বই নিয়ে একটা আলাদা ঘরে শুয়ে থাকে, পড়ে। কখনও-কখনও ডাক দিলে সে নানীকে সাড়া দেয়। এদিকে এমন সে মনোযোগী হয়ে পড়েছে যে নানী ডাকলে বিরক্ত হয়। আমি তো নানী এ-ঘরে বসে আছি। তুই আমারে বারে-বারে ডাকলে পড়া হয়। ফলে নানী তাকে ডাকে না। সোনা সে-কথাটা জানে। সে চুপি-চুপি ডাকল, এই ফতিমা।

ফতিমা চিত হয়ে পড়ছিল। ওর ওই বয়সে চুল কত বড়। সে বুকের উপর বই রেখে পড়ছে। স্কুল খুললেই পরীক্ষা। সে পড়ায় ফাঁকি দেয় না। কিন্তু সোনাবাবুর মুখ জানালায় উঁকি দিতেই বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। সে তার পড়ার কথা ভুলে গেল।

ফতিমা বলল, আপনে সোনাবাবু।

—আমি ভাবলাম তর লগে একবার দেখা করে যাই।

—কৈ যাইবেন।

—জ্যাঠমশাইকে খুঁজতে যাচ্ছি।

—একলা!

—কে আর যাবে সঙ্গে। সবাই খুঁজে দেখেছে, পায় নি। এবার আমার পালা।

—আমারে সঙ্গে নেবেন?

—যাবি তুই। তোর নানী বকবে না।

—টের পাইলে ত। বলেই খড়ম পায়ে নেমে এল। ফতিমার এটা শহরে অভ্যেস হয়েছে। সারা দিন লাল রঙের খড়ম পরে থাকে। নীল রঙের স্ট্রাপ আছে। সে হাঁটলেই কেমন খট-খট শব্দ হয়। সোনার এটা কেন জানি পছন্দ হয় না। মেয়েরা জুতো পরে সে সেটা মুড়াপাড়ায় দেখেছে। অমলা কমলা জুতো পরত। সেজন্যই যে গেল ওরা, আর ওদের যাওয়া হল না। কি যে কারণ সোনা জানে না। আর খোঁজা

আসতে না মুড়াপাড়া থেকে। ওরা যেতে পারত না। পরে সে যা শুনেছে তা সত্যি নয়—কারণ সে বিশ্বাসই করতে পারে না। এত বড় বাড়ির আসবাবপত্র কমে গেছে। মহালে তেমন আদায়পত্র নেই। বাবুদের বড়-বড় কারবার ছিল। ঋণসালিশি বোর্ড ওদের আসবাবপত্র কমিয়ে দিয়েছে—সে বিশ্বাস করতে পারত না। ওর কেন জানি মাঝে-মাঝে অমলাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে এতটুকু ছেলে অমলার কাছে কি লিখবে: কিছু লিখতে গেলেই মা বকবে। এসব কি পাকামি তোমার সোনা। তুমি চিঠি লিখছ অমলাকে।

ফাতিমা বলল, এদিক দিয়া আসেন।

ফাতিমা খালি পায়ে পা টিপে-টিপে একবার নানীর ঘরে উঁকি দিল। দেখল নানী একটা মাদুরে কাঁথা পেতে শুয়ে আছে সূর্য মাথার উপর না উঠতেই নানী খেয়ে নেয়। সেও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছে। ওর সামনে তারপর থাকে অফুরন্ত সময়। সে মাঝে-মাঝে পেয়ারা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। দূরে অর্জুন গাছের নিচে কোন ছায়া-ছায়া মূর্তি দেখা দিলেই তার মনে হয় সোনাবাবু দাঁড়িয়ে আছে। সে তখন আর স্থির থাকতে পারে না। জন্মাষ্টমীর মিছিলে সোনাবাবুর জন্য যা-যা কিনে রেখেছিল, সেই সব দিতে চলে আসে। এবার সে কিছু আনতে পারে নি। কেবল এসেছিল সোনাবাবুকে দেখতে পাবে এই ভেবে। ফাতিমা যত বড় হচ্ছে কেন জানি এই গাছ-পালা পাখির ভিতর সোনাবাবু সুন্দর নীল রংয়ের জামা, লম্বা-লম্বা হাত-পা বড় তার ভাল লাগে। আর চন্দনের গন্ধ শরীরে—সে এখান থেকে চলে গেলেও তার মনে হয় গায়ে গন্ধটা লেগে রয়েছে। এমন পবিত্র গন্ধ সে যেন আর কোথাও পায় না। সুতরাং সে এই সুযোগ ছেড়ে দিলে আর সময় হবে না, মনে-মনে সেও জানে বড় হয়ে গেলে আর মাঠে-ঘাটে একা নেমে আসতে পারবে না।

ওরা মাঠে নামতেই পাট গাছের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। জমির আলে ওরা ছুটছে। শাড়ি পরায় ফাতিমাকে সোনার চেয়েও লম্বা মনে হচ্ছে। পাট গাছের নিচে থাকলে তারা টের পাবে না কোন দিকে যাচ্ছে। সুতরাং মাঝে-মাঝে গাছ ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে ওরা ঠিক মতো যাচ্ছে কিনা। সেই খাল। দালান বাড়ির খাল। তারপর কিছু ধানের জমি। ধানের জমির উপর দিয়ে গেলে ওরা ধরা পড়ে যাবে, ওরা একটু ঘুরে আলে-আলে পাটের জমি ভেঙে উঠে যেতে থাকল।

ফাতিমা ডাকল, এই সোনাবাবু।

সে দাঁড়াল। পিছন ফিরে তাকাল। দেখল ফাতিমা ধীরে-ধীরে হাঁটছে। আয়। দেরী করিস না।

—এত তাড়াতাড়ি ছুটছেন ক্যান।

—ফিরতে দেরী হলে মা বকবে।

—কেউ বকবে না। কি সুন্দর পাট-গাছ না সোনাবাবু।

—খুব সুন্দর। তুই আয়।

আপনের লগে আমি হাঁইটা পারি! আপনে পুরুষমানুষ না?

সোনা এবার দাঁড়াল। সাথে ফাতিমা কেন পারবে। সে বলল, তুই নাকে নথ পরে থাকিস না কেন?

—নথ পরলে আমাকে দেখতে ভাল লাগে।

—খুব ভাল লাগে না। তবে না পরলে খারাপ লাগে। তোর পায়ে মল নেই। ঝুমঝুমি শব্দ হয় না আগের মত।

—এখন বড় হয়েছি না! ঝুম-ঝুম বাজলে লোকে টের পাবে সোনাবাবুর লগে ফাতিমা যায়। লোকে পাপ ভাবতে পারে।

সোনা বলল, অঃ পাপ! তা চলে আয়। পাপ ভাবলে পাপ। আমরা ত কিছু পাপ করছি না।

—না আমার হাত ধরবেন সোনাবাবু।

—তোর হাত। দেখি কেমন।

সোনা হাতটা নিয়ে দেখল। এগুলো লাল-লাল কি মেখেছিস ছিট-ছিট!

—মেহেদি পাতার রং।

—মাখলে কি হয়।

—কি আবার হবে। বাড়ি এলেই মাখতে ইচ্ছা করে।

সোনা বলল, তোর বাবা বকে না!

—বকবে কেন?

—তুই চোখে বড় লম্বা কাজল দিয়েছিস। তোর চোখ ছোট। বড় চোখে কাজল মানায়।

ফাতিমার কেমন ভিতরে-ভিতরে দুঃখ হল। সে বলল, হাঁটেন। তাড়াতাড়ি ফিরতে হইব। বলেই ওরা দেখল সেই গাছের নিচে এসে গেছে। গাছের নিচটা পার হয়ে যেতেই যা ভয়। তারপর লতা-পাতার ঝোপ। বৃষ্টি হওয়ায় ঝোপঝাড় সবুজ হয়ে গেছে। ওরা দুজনই জোরে-জোরে ডাকল, জ্যাঠামশাই আছেন? আমি সোনা।

ফাতিমা বলল, জ্যাঠা আছেন! আমি ফাতিমা। আপনাকে নিতে এসেছি।

কোন সাড়াশব্দ নেই। এবং ঘুরে-ফিরে ওরা কোথাও ডেকে-ডেকে সাড়া পাচ্ছে না। ওরা দুজন দুদিকে খুঁজছে। কারণ এই জঙ্গলে খুঁজে আবার ওরা ছুটতে আরম্ভ করবে। কারণ পীর হাসান পীরের দরগায় যাওয়া যায়। ওখানে গেলেই দরগার ভিতর অথবা যে সব ভাঙা মসজিদ এবং পাঁচিল-ঘেরা কবরের ঘর আছে সেখানে খুঁজে দেখলে পাওয়া যেতে পারে। ফাতিমা ডাকতে-ডাকতে পুকুরের উত্তর পাড়ে চলে গেছে। সোনাবাবুর ডাক সে এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে না। সে ভাবল ডাকবে, সোনাবাবু আপনে আর বেশী দূর একা-একা যাইয়েন না। কিন্তু অভিমান ওর ভিতরে বাজছে। কেবল অবহেলা। সে সুন্দর করে অল্পকাল চুল বাঁধতে শিখেছে। সে কপালে সেই কাঁচপোকা পরে থাকে। যা সোনাবাবু এক বর্ষায় ওর জন্য ধানখেত থেকে তুলে রেখেছিল। এখনও সেই কাঁচপোকা কি উজ্জ্বল। সে যে এমন সুন্দরভাবে সেজে বসে থাকে তার জন্য কোন টান নেই সোনাবাবুর। একবার বলল না, কিরে ফাতিমা, সেই কাঁচপোকাটা তুই এত যত্ন করে রেখে দিয়েছিস? সে ভাবল, না আর ডাকবে না। অথবা কথা বলবে না। সে এসেছে পাগল মানুষটাকে খুঁজতে। তাকে খুঁজেই চলে যাবে।

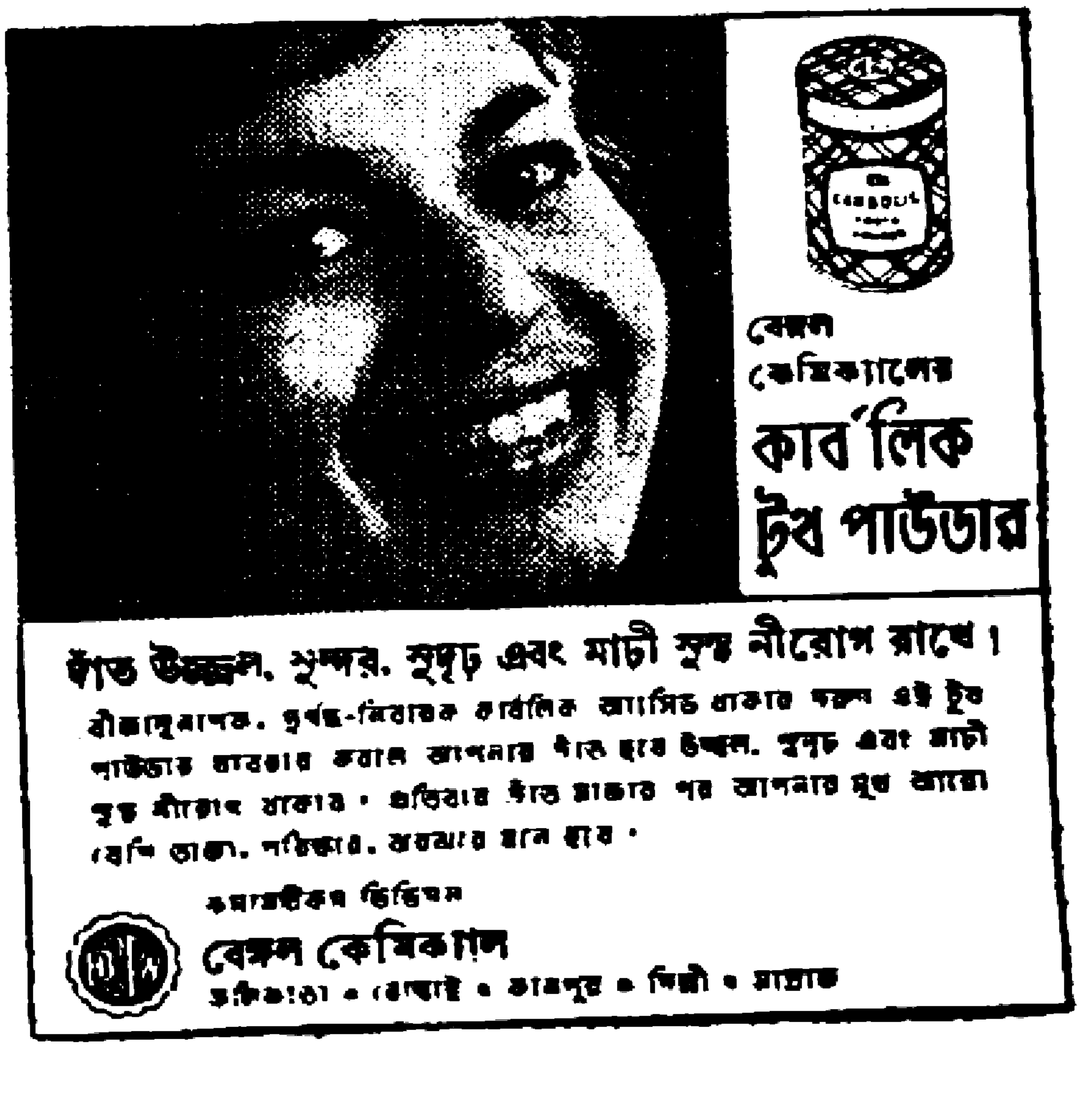

কিন্তু এতক্ষণ হয়ে গেল কোন সাড়া নেই সোনাবাবুর। কি ব্যাপার! কোন ডাক শুনতে পাচ্ছে না। কেমন নিঝুম হয়ে গেছে বনটা!

এখন জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের গরম। সাপ-খোপের আড্ডা এই প্রাচীন বনে। কত কালের এই সব বনজঙ্গল কে জানে। বড় বড়ই গাছের কত সব মৃত ডাল। আর চারপাশে এত বেশী লতাপাতা যে, একটু দূরে গেলেই কিছু দেখার উপায় নেই। সে এবার অভিমানের মাথা থেকে সামনের বড় ডালপালা ফাঁক করে ডাকতে থাকল, সোনাবাবু আপনি কোনদিকে?

না কেউ উত্তর করছে না।

ফতিমা আরও দক্ষিণে ছুটতে থাকল, সোনাবাবু আপনি কথা বলছেন না কেন?

সব ঝিম মেরে আছে। এমন কি পাতায় খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এত যে শকুন বসে রয়েছে মগডালে ওরা পর্যন্ত পাখা নাড়ছে না। কেমন কক্-কক্ একটা শব্দ হচ্ছে। তক্ষকের ডাকের মতো শব্দটা ওকে চারপাশ থেকে গিলতে আসছে!

—সোনাবাবু আমি এখন কি করি!

কক্-কক্ শব্দটা থেমে গেছে। এক দ্রুত শব্দ। কোন বালিকা বনে পথ হারিয়ে ফেলেছে বুঝি। পাগলের মতো ডাকছে, আমি সোনাবাবু আপনার উপর কোন রাগ করি নি। এই দেখুন, আমাকে দেখুন। আপনি কেন যে ওদিকে খুঁজতে গেলেন!

না সে আর পারছে না। ছুটে-ছুটে ক্লান্ত। ও-পাশের ঝোপটা নড়ছে। সে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। না কিছু নেই। দুটো ছোট বানর বসে রয়েছে ডালে। ওরা লাফালাফি করছে।

—আমি মরে যাব সোনাবাবু। আপনি কাছে না থাকলে আমি মরে যাব। বলে শিশুর মতো দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকল ফতিমা।

সোনা আর পারল না। সে ঝোপ থেকে উঠে এসে ফতিমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। তুই বোকার মত কাঁদছিস!

—আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন? বলতে-বলতে হেসে ফেলল।

ওরা দুজন এত কাছাকাছি, আর কি সুন্দর উভয়ের চোখ—এখন মনেই হয় না যাবতীয় পৃথিবীতে কোন গণ্ডগোল আছে। ওরা পরিশ্রান্ত হয়ে একটা গাছের নিচে বসল। তারপর ধীরে-ধীরে সোনা বলল, আমার জন্য তোর খুব মায়া!

ফতিমা বলল, আপনাকে বেশী দিন না দেখলে মনটা আমার কেমন করে। বলে আবার হাত দুটো ঘাসের উপর বিছিয়ে দেখাল, দু হাতে দুটো পদ্মফুল এঁকেছি সোনাবাবু। দেখেন কি রকম দেখতে।

—বাড়িতে বসে-বসে বুঝি এই করিস।

—চোখে কাজল রং দিয়েছি আপনি দেখবেন বলে।

কি অকপট আর সরল ওরা। ওদের এই ভালবাসার ব্যাপারে গাছের নিচে দুটো ছোট পাখির মতো, অভিমান কান্নাকাটি থাকে, একটু দেখা, তারপর ছোটা, ছুটে-ছুটে সেই মানুষটাকে খোঁজা, যে বনের ভিতর ভালবাসার খোঁজে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

সোনা বলল, এ-বনে জ্যাঠামশাই নেই। হাসান পীরের দরগায় যাবি?

—চলেন।

—ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

—তা হউক।

ওরা দরগার মাটিতেও পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজেছিল। কোথাও কেউ সাড়া দিচ্ছে না। সে কবরের পাশে-পাশে ডেকে গেল, না কোন সাড়া নেই। ওরা দেখল, তখন কিছু কালো মেঘ আকাশ সহসা ছেয়ে ফেলল। এবং বৃষ্টি পড়তে থাকল। বর্ষা এসে গেছে এদেশে। একটা লোক দূর দিয়ে যাচ্ছে। সে বলতে-বলতে যাচ্ছে, বাংলা দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ওর মাথায় এক অদ্ভুত রংয়ের নিশান। সে একা। সে বলতে-বলতে যাচ্ছে, আমরা বাংলা দেশের মানুষ এবার আলাদা হয়ে যাব।

সোনা বলল, কি বলছে রে লোকটা?

ফতিমা এ-সব ব্যাপারে সোনার চেয়ে বেশী খবর রাখে। সে অসহায় চোখে সোনার দিকে তাকিয়ে থাকল। বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। ওরা সেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে আর অনবরত একজন মানুষকে খুঁজছে—যিনি এক এক অদ্ভুত ভালবাসার মায়ায় এই সব গাছপালা পাখির ভিতর নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে বেড়াতেন। সেই নিশানওয়ালা মানুষটাকে দেখে মনে হচ্ছে তার পাখি এখন আকাশে উড়ছে। না উড়লে সে এমন সদম্ভে এসব বলে যেতে পারত না।

সোনা সেই রাতে বাড়ি ফিরে এসে শুনেছিল, শশিভূষণ পড়ে-পড়ে সবাইকে শোনাচ্ছেন, ভূপেন্দ্রনাথ মুড়াপাড়া থেকে কাগজ নিয়ে এসেছে — তাতে লেখা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বেতার বক্তৃতা—আমার আলোচনার মধ্যে প্রথম প্রচেষ্টা ছিল, মন্ত্রি-মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা। ঐ প্রস্তাবটিকে অধিকাংশ প্রদেশের প্রতিনিধিরাই মেনে নিয়েছেন এবং আমার মনে হয়, ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে এরচেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মন্ত্রি-মিশনের কিম্বা ভারতের ঐক্যরক্ষার অনুকূলে অন্য কোন পরিকল্পনা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। কিন্তু কোন একটি বৃহৎ অঞ্চল, যেখানে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে অঞ্চলে তাদের বলপ্রয়োগে অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্যবিশিষ্ট গভর্নমেন্টের অধীনে বাস করতে বাধ্য করবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বলপ্রয়োগে বাধ্য না করবার যে উপায় আছে, সেটা হল অঞ্চল বিভক্ত করে দেওয়া।

শশিভূষণ বলল, শেষ পর্যন্ত পার্টিশানই ঠিক হল!

শচীন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ছিল। বলল, কিছু বললেন?

—দেশ ভাগ হচ্ছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটা প্রস্তাব পেশ করে বৃটিশ গভর্নমেন্টের ৩রা জুনের ঘোষণা গ্রহণ করছেন। প্রস্তাবটিতে বৃটিশ গভর্নমেন্টের আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করার প্রতিশ্রুতিকে আন্তরিক প্রশংসা করা হয়েছে।

সোনা যে সারাদিন বাড়ির বাইরে ছিল কারো খেয়াল নেই। কারণ দুপুরেই এ-সব খবর নিয়ে এসেছিল ভূপেন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথ বাড়ি ছিল না। সে এলে শশিভূষণ পড়ে-পড়ে শোনাল। সারাটা দিন বাড়িতে এ-নিয়ে একটা উত্তেজনা গেছে। ঈশম বসে-বসে কেবল শুনছে। সে ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। সে এইটুকু বোঝে দেশ ভাগ হলে, এ-দেশটার নাম পাল্টে যাবে। পাকিস্তান হবে। বাংলা দেশের নাম পাকিস্তান—ঈশমের কষ্ট হয় ভাবতে। আর একটা অংশ হিন্দুস্তানে চলে যাবে। এটাও ওর মনে কেমন একটা দুঃখের ছাপ বহন করছে। এত বড় বাংলা দেশের নিজস্ব বলতে কিছু থাকবে না। এটা সায় করছে। ওর সঙ্গে দেখা হয় না। দেখা হলে যেন সে বলত, কি কাণ্ড কর্তা, দেশটাকে ভাগ করে দুই দেশের কাছে ইজারা দেওয়া।

এ-ব্যাপারটা সোনা ঠিক বুঝতে না পেরে সে কিছুটা শুনে উঠে গেল। ওর এ-সব শুনতে ভাল লাগে না। ছোট কাকার মুখ কি গম্ভীর। মেজ জ্যাঠামশাই সারা দিন কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে মুখ বুজে পড়ে আছেন বিছানায়। গ্রামের লোকজন সব আসছে-যাচ্ছে। ওদের মুখ ভীষণ উৎকণ্ঠা দেখাচ্ছে।

মা বলল, সোনা তর বড়শি কই? মাছ পাইলি?

সে বড়শি নিয়ে গেছে, সঙ্গে একটা পেতলের ঘটি ছিল মাছ রাখার—সে এখন এ-সব কোথায় ফেলে এসেছে মনে করতে পারে না। তবু যতটা মনে পড়ছে ফতিমাদের বাড়িতে সে ঘটি এবং বড়শি রেখে গল্প করছিল। ওদের বাড়িতে থাকতে পারে। কাল সকালে সে অথবা ঈশম গিয়ে নিয়ে আসবে। সে মাকে বলল, মা মাছ পাই নাই। ফতিমাদের বাড়ি গেছিলাম। ওর নানীর খুব অসুখ। দেখতে গেছিলাম। সোনার আজকাল কারণে-অকারণে দুটো-একটা মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস হয়েছে। ধনবৌ সোনাকে আর কিছু বলল না। কারণ তারও মনটা ভাল নেই।

পরদিন ফতিমা নিজেই এসেছিল ঘটি এবং বড়শিটা নিয়ে। সোনা ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে অর্জুন গাছটার নিচে চলে গেছে। সে বলল, দেশ ভাগ হলে আমরা চলে যাব।

—কোনখানে যাইবেন।

—তা জানি না। মাস্টারমশায় কইছে ওদের দেশটা হিন্দুস্তানে পড়ব। বাবা-জ্যাঠামশাই কেউ থাকবে না।

—কেন থাকবে না! ফতিমার বুকটা কেমন কেঁপে উঠল!

—জ্যাঠামশাই খেতে বসে বলেছেন, এদেশে থাকলে নাকি আমাদের মান-সম্ভ্রম থাকবে না।

ওরা আর উত্তরে কোন কথা বলতে পারল না। গাছের নিচে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সামনে সেই ফসলের জমি, জমিতে শুধু পাট গাছ—কি সজীব, আর এই পরিচিত পুকুর, শাপলা ফুল, প্রিয় অর্জুন গাছ, ঠাকুর্দার চিতার উপর সান-বাঁধানো বেদী এবং বর্ষাকালে নদীর জল, শীতের মাঠ, তরমুজের জমি সব ফেলে আপনারা চলে যেতে পারবেন সোনাবাবু, কষ্ট হবে না। মায়া হবে না এসব ভাল-বাসার সামগ্রী ফেলে যেতে! ফতিমার চোখ দেখলে এখন শুধু এমনই মনে হয়।

সোনার ইচ্ছা করছিল না কথা বলতে। সোনার ভারী অভিমান হচ্ছে ফতিমার উপর। ওর বাবা এবং ওরা সবাই মিলে জিদ না ধরলে এমন হত না। সে বলল, আমার কেবল জ্যাঠামশাইর জন্য কষ্ট হবে। তিনি এখনও এলেন না। কোথায় যে গেলেন! আমরা চলে গেলে যদি তিনি আসেন, তুই বলে দিস আমরা হিন্দুস্থানে চলে গেছি। বলবি ত!

ফতিমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। কেবল জ্যাঠামশাইর জন্য সোনাবাবুর কষ্ট হবে। আমার জন্য কষ্ট হবে না আপনার। বলার ইচ্ছা ফতিমার। কিন্তু চোখ ঝাপসা বলে সে সোনাবাবুর দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। তাকালেই ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়লে তিনি নির্বিকার থাকবেন। খুব বেশি বললে হয়ত বলবেন, তোর আবার কান্নার কি হল! সুতরাং সে মুখ ফিরিয়ে রাখল। এবং সামনের নদীর সব পাটের জমি দেখতে দেখতে বলল, তিনি ফিরে এলে আমরা তাঁকে ঠিক পৌঁছে দেব সোনাবাবু। তাঁকে আমরা ধরে রাখব না।

তারপরই দেশভাগের ছবি চারপাশে ফুটে উঠতে থাকল—বর্ষাকাল এসে গেল। চারপাশে সব বড় বড় নৌকায় লাল নীল রঙের পতাকা, কত রঙবেরঙের চাঁদমালা, কাগজের ফুল, এবং নতুন লুঙ্গি পরে, নতুন জামা গায়ে মাথায় ফেজ টুপি পরে ছেলেরা, মেয়েরা নাকে নোলক পরে, নদীর চরে নৌকা ভাসিয়ে সারি সারি চলে গেল—ওরা চলে গেল। সোনা মার হাত ধরে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। ছবি মার কোলে। মেজদা বড়দা চুপচাপ খেজুর গাছটার নিচে বসে দেখছে। জ্যাঠিমা দাঁড়িয়ে আছে তেঁতুল গাছের নিচে। নরেন দাস, শোভা আবু, দীনবন্ধুর দুই বউ এবং হারান পাল -সবাই নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। এতটুকু হাসি নেই মুখে। শচীন্দ্র-নাথ বাড়ির ভিতর। তিনি এই উৎসবের দিনে চুপচাপ শুয়ে আছেন। মাস্টারমশাই বসে বসে দুঃখী মানুষের মতো একটা দেশাত্মবোধক গান গাইছিলেন—বঙ্গ আমার জননী আমার। মনে হয় তিনি বসে বসে বাংলাদেশের জন্য গানটা গাইতে গাইতে শোক করছিলেন। সোনা চোখ বুজে গানটা শুনছিল আর মাস্টারমশাইর মুখ, বড় জ্যাঠামশাইর মুখ মনে পড়ছিল। এবং বাংলাদেশ ভাবতে সে বোঝে, ঈশম, ফতিমা পাগল জ্যাঠামশাই আর সে নিজে, এই দেশ যখন বাংলাদেশ, তবে ভাগ কেন। সোনার চোখেও জল এসে গেল।

ঈশম দাঁড়িয়েছিল। সে নির্বিকার। সে সকাল থেকে কোন কথা বলছে না। সারা সকাল আশ্বিনের কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। কুকুরটা কেন জানি সকাল থেকেই ঈশমের সঙ্গ ছাড়ছে না। কুকুরটা এরি ভিতর কিছু টের পেয়ে গেছে।

আর মাটির নিচে দুই মানুষ। জলের নিচে দুই মানুষ। পাগল মানুষ আর ফেলু। ওরা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ওদের কঙ্কাল মাটিতে ঢেকে গেছে। কি সাদা আর ধবধবে কঙ্কাল এই মানুষের। বেঁচে থাকতে তা কিছুতেই টের পাওয়া যায় না। বড়বৌ জানালা খুলে এখনও দাঁড়িয়ে থাকে। নিরুদ্দেশ থেকে মানুষটা তার আজ হোক কাল হোক ফিরবেই।

দেশভাগের কিছুদিন পর মুড়াপাড়া থেকে ভূপেন্দ্রনাথ ফিরে এল। সেটা ছিল এক আশ্বিনের সকাল। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এলেই এ-সংসারের জন্য কিছু না কিছু চাল ডাল তেল নুন সবজি মাছ আসে। বড় মাছ নিয়ে আসে ভূপেন্দ্রনাথ। আমের দিনে আম, আনারসের দিন আনারস। বাড়ির ছেলেপেলেরা নৌকা এলেই ঘাটে চলে যাবার স্বভাব। সবকিছুর ভিতর তাদের চোখ সেই আম অথবা আনারসের দিকে। সুতরাং এই ভেবে সবাই ছুটে গেলে দেখল ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা থেকে ধীরে ধীরে নামছে। কিছুই সে এবার আনেনি। খালি নৌকা। সে নেমেই বলল, তোমরা ভাল আছ! কেমন রোগা দেখাচ্ছে। ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ মুখ। সব শান্তি যেন জীবনের কারা কেড়ে নিয়েছে। দুঃশ্চিন্তার ছাপ চোখে মুখে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় দিনের পর দিন মানুষটা অনিদ্রায় ভুগছে।

সে এসে সকাল সকাল স্নান করে সন্ধ্যা আহ্নিক করল। তারপর সামান্য জলযোগ করার সময় শচিকে ডেকে পাঠাল।

শচি এলে বলল, তোমারে একটা কথা কই। বাবুগ লগে পরামর্শ করলাম। তারা বলল, যত সকাল পার দেশ ছাইড়া পালাও। তোমার কি মনে লয়?

শচি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। সে জানে তার মানসম্ভ্রম, পারিবারিক মানসম্ভ্রম আর থাকছে না। তবু এই দেশ এবং মাটির জন্য সবার মতো ভিতরে একটা তীব্র হাহাকার আছে। ছেড়ে যেতে যে কি কষ্ট! ভূপেন্দ্রনাথ শচির মুখ দেখে সব টের পাচ্ছে। সে বলল, তোমার কষ্ট হইব জানি। বিদেশ বিভূঁইয়ে কি কইরা আহার সংগ্রহ করবা সেটাই বড় চিন্তা। তবে কি জান, গঙ্গার পারে অনাহারে মরলেও শান্তি। তোমরা অন্তত এই শরীরটা গঙ্গার পারে দাহ করতে পারবা।

শচি বলল, মাস্টারমশাই কইছিলেন, ওদের দেশে জমি-জায়গা কিছু রাইখা দিতে।

সুতরাং ভূপেন্দ্রনাথ বলল, তবে তোমার মত আছে দেখছি। চন্দ্রনাথের মতও তাই। দুশ্চিন্তা নিয়া বেশিদিন বাঁচা যায় না। ঈশমতালিরে খবর দাও। জমি-জায়গা বাড়ি ঘর সব বিক্রি কইরা দিমু।

খুব স্থির গলায় এসব বলছিল ভূপেন্দ্র-নাথ। গলা একটুকু কাঁপছিল না। গলা কাঁপলে ভিতরে ভিতরে সে যে কত দুর্বল হয়ে পড়ছে ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়ে গেলেই যেন সে আর ভূপেন্দ্রনাথ থাকবে না। সোনার মতো বালক হয়ে যাবে। তার কথার তখন কেউ দাম দেবে না। সে নিজেকে খুব শক্ত করে রাখল।

এই বিক্রিবাটার খবর শুনে দীনবন্ধু ছুটে এল। মাইজাভাই আপনারা চইলা যাইবেন হিন্দুস্থানে।

—আর কি করা!

—আমরা-অ তবে যামু।

—তুই যাইবি! ল তবে।

—এখানে থাকলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করতে হইব। জাত মান থাকব না।

ভূপেন্দ্রনাথ বলল, আমরা যাইতাছি নবদ্বীপ। শশিমাস্টার সব ব্যবস্থা করব। নবদ্বীপ যাইতে তর অমত নাইত।

দীনবন্ধু এসেই হাঁকডাক ছেড়ে দিল। আর অমত! এখন পালাতে পারলে বাঁচে। নরেন দাস শুনে ছুটে এল। সে বলল, আপনারা চইলা গেলে আমরা থাকি কি কইরা?

মাঝি বাড়ি থেকে এল শ্রীশ চন্দ্র, প্রতাপচন্দ্রের দুই ছেলে ছুটে এসে বলল, দেশ ছাইড়া গিয়া কি ভাল হইব।

দীনবন্ধু বলল, থাকতে গেলে হিন্দু হইয়া থাকন যাইব না। মুসলমান হইতে হইব। যদি তা পার থাক।

এ-ভাবে প্রায় বার্তা রটে গেল গ্রামে সবাই এসে খবর নিল। জলের দরে জমি বিক্রি করে দিচ্ছে ঠাকুরবাড়ির ভূপেন্দ্রনাথ খবর পেয়ে যারা কিনবে তারা চলে এল। প্রতাপচন্দ্রের ছোট ছেলে এসে বলল, আপনে জমিজমা যারে খুশি বিক্রি করেন, বাড়িটা কইরেন না। যা দাম হয় আমরা কিন্যা রাখমু।

শচিরও তাই ইচ্ছা। দাম কম হলেও এ বাড়ি সে কখনও মুসলমানের কাছে বিক্রি করতে পারে না। যেন বিক্রি করলেই যেখানে ঠাকুর ঘর সেখানে মসজিদ উঠবে, যেখানে মাঘ-মণ্ডলের ব্রতকথা বলত ছোট ছোট বালিকারা সেখানে কোরবাণি হবে—এইসব ভাবতেই তার চোখে মুখে এক তীব্র ঘৃণাবোধ ফুটে উঠল। সে বলল, তাই হবে। হলও তাই। প্রতাপচন্দ্র ওদের বাড়ি-পুকুর এবং সেরা দশ বিঘা জমির বিনিময়ে হাজার পনের টাকা ঠিক করে নিল। কিন্তু টাকা সঙ্গে দেবে—বাকি হুণ্ডি করে পাঠাবে। বর্ডারে বড় কড়াকড়ি। এত টাকা সঙ্গে নি

যেতে পারবে না। ভূপেন্দ্রনাথ তাতেই রাজি হয়ে গেল।

সোনা দেখল এক সকালে কিছু মানুষ জন এসে বর্ষণ্যের ওপরে উঠে সব খুলে দিচ্ছে। আর টিনগুলো খুলে রাখছে আলাদা করে। ওর বার বার মনে হয়েছে জ্যাঠামশাই শেষ পর্যন্ত তার মত ফেরাবে। কিন্তু যখন দেখল টিনগুলো খুলে দেওয়া হচ্ছে, একটা করে সব আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিছু কিছু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, ঘর ভাঙা হচ্ছে বলেই গরীব কিছু মানুষজন সকাল থেকে বাড়ির চারপাশে ভিড় করে আছে। যা পাচ্ছে ফাঁক পেলে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারছে না। ঈশমথা ধরে আনছে ঘাড় ধরে। চোখে মানুষটা কম দেখে আজকাল, অথচ একটা সামান্য জিনিস কেউ না বলে নিয়ে গেলে ঠিক ধরে আনছে। এসব যখন হচ্ছে, মা যখন বড় বড় বস্তার ভিতর তার সব প্রিয় জিনিস ভরে ফেলছেন, যে কোনদিন মুড়াপাড়া থেকে নৌকা চলে আসতে পারে বড় বড়, এবং সব সামগ্রী নিয়ে রওনা দিতে হবে পারে—তখন সে সারাটা সকাল খেতে না খেয়ে সেই অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল।

হাতে ওর একটা ধারালো ছুরি। সে প্রথম ঠিক ওর বুক সমান উঁচু জায়গায় গাছের কাণ্ডের ছাল বাকল কেটে কেটে তুলে ফেলল। বাবা, জ্যাঠামশাই পুকুর পাড়ে বসে আছেন। উত্তরের ঘর দক্ষিণের ঘর এক এক করে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। কেউ দুটো জানালা কিনে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ একটা দরজা কিনতে এসেছে। আলাদা আলাদা দাম দিয়ে যাচ্ছে সবাই। কেবল মজুর পুবের ঘরটা আস্ত কিনেছে! দরজা জানালা এবং টিন কাঠের বেড়া এইসব সে একসঙ্গে কিনেছে বলে খাবারদাবার এবং অন্যান্য তৈজসপত্র সে ঘরে তুলে রাখা হয়েছে। ওরা বাড়ি ছেড়ে দিলে কথা আছে মজুর ঘরটা ভেঙে নিয়ে যাবে।

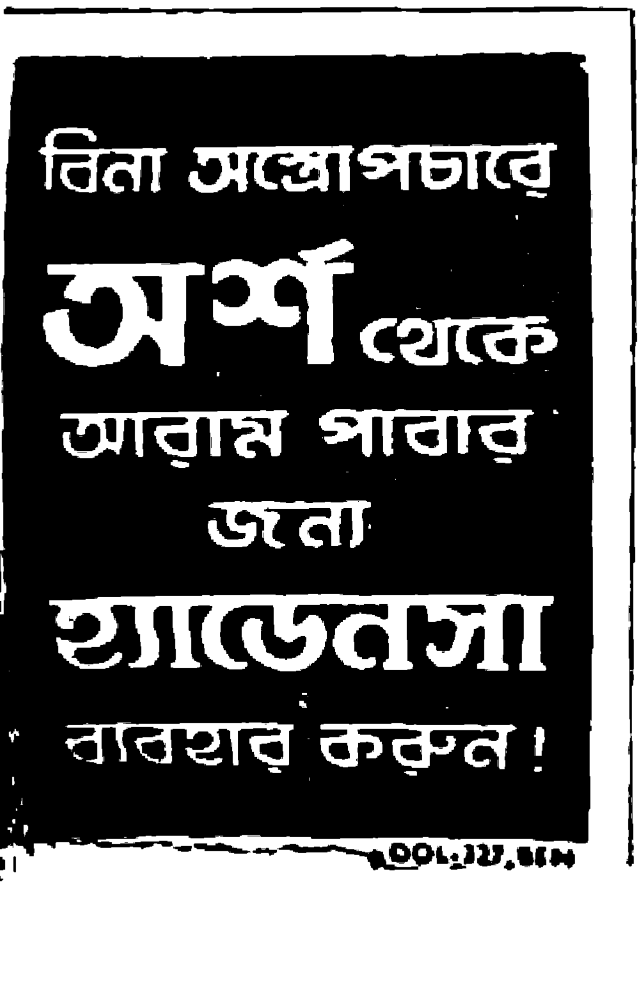

এক একটা টিন যখন খুলছে তখনই মনে হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথের এক একটা পাঁজর বুক থেকে তুলে নিচ্ছে। কেউ সেদিকে তাকাতে পারছে না বলেই পুকুর পাড়ে এসে বসে আছে। ঈশমই সব দেখাশোনা করছে। এবং দরদাম করে গুনে গুনে টাকা দিয়ে যাচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথের হাতে। সে টাকা গুনে নিচ্ছে না। গুনতে তার ভাল লাগছে না। গ্রামের কেউ কেউ চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। অন্যমনস্ক হবার জন্য তাদের সঙ্গে সে তার ছোটবেলার গল্প করছে।

আর সোনা সেই সকাল থেকে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কি যে করছে কেউ টের পাচ্ছে না। লালটু তাকে দুবার খেতে ডেকেছে, সে খেতে আসেনি। সে নিবিষ্ট মনে কিছু করে যাচ্ছে।

ভূপেন্দ্রনাথও ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে। যখন বাড়ি ঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বলে সবাই বিমর্ষ হয়ে আছে তখন সোনা অনবরত গাছের কাণ্ডে খুঁটে খুঁটে কি লিখে যাচ্ছে। শশিভূষণ খড়ম পায়ে বাইরে বের হয়ে এল। সে স্কুলে যাবে আজ একবার। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। সেক্রেটারিকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে। এখন আশ্বিন মাস বলে পুজোর বন্ধ। জল চারপাশে। পাট কাটা হয়ে গেছে সব। আর কিছুদিন পরই যখন হেমন্তকাল আসবে সব জল নেমে যাবে মাঠ থেকে। মাঠে জল থাকতে থাকতে এ-দেশ থেকে রওনা হতে হবে। শশিভূষণ ডাকল, লালটু আছিস!

লালটু এলে বলল, একটু তেল নিয়ে আয়। মাথ। আজ সে সবার সঙ্গে স্নান করল না। রান্না হতে দেরি হবে। সে স্কুল থেকে এসেই খাবে। ঘাটে স্কুলের নৌকা লেগে রয়েছে। সে সোজা সেক্রেটারির কাছে গিয়ে চার্জ বুঝিয়ে আসবে। শশিভূষণ মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছে।

এ-সংসারে শুধু একজন একেবারেই কোন কথা বলতে পারছে না। সে সবার অলক্ষ্যে কাঁদছে। সে হচ্ছে বড়বৌ। এই দেশ ছেড়ে চলে গেলে মানুষটা যদি ফিরে আসে তখন সে কোথায় যাবে। এসেই চিনতে পারবে না—এই বাড়ি তার। ঘরবাড়ি কিছু নেই। শুধু কিছু পরিচিত গাছ। অর্জুন গাছটা দেখলেই চিনতে পারবে সে ঠিকমতো পথ চিনে উঠে এসেছে। কিন্তু যখন দেখবে ঘর বলতে কিছু নেই, পুবের ঘর বলতে শুধু মাটি আর একটা কামরাঙা গাছ তখন সে নিশ্চয়ই ভাববে কোন যাদু বলে সে এসব দেখছে। যেমন সে স্মৃতির ভিতর মাঝে মাঝে এক অস্ফুট যাদুবলে দেখতে পায় শূন্য এক রামপার্ট, এবং কিছু ইংরেজ সৈন্য কুচকাওয়াজ করছে মাঠে, সে তেমনি দেখতে পাবে সেই পুবের ঘর ঘরের দরজায় বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে বড়বৌ, বাড়িতে পিঠে পায়েস হয়েছে, যত্ন করে বড়বৌ সব ভিন্ন ভিন্ন রেখে দিয়েছে এবং এলেই যেন মানুষটা সংসারের সব যাবতীয় সুস্বাদু জিনিস খেতে পায়। দেখতে পাবে তসরের জামা গায় দিয়ে দিচ্ছে বড়বৌ, ধুতি কুঁচি দিয়ে পরিয়ে দিচ্ছে এবং নাতির মতো কোমল আবেশে হাত রাখতে রাখতে চোখ বুজে ফেলছে। এসব দেখলেই সে এই বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াবে—কোথাও তাকে যেতে হবে সে কথা মনে থাকবে না। তখন এই মাঠে এবং ঘাসে অথবা ফুলে মানুষটা বুঝি বন্দী হয়ে থাকবে।

সোনা তখনও লিখছিল। কি যে লিখছিল তখনও কেউ জানে না। সে বড়-বড় টান দিয়ে ছুরির ধারালো অংশটা ধরে। তারপর খুঁটে-খুঁটে তুলে ফেলছে কাঠ। যেন সে গাছটার শরীরে সব গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এই ক্ষতস্থান বড়-বৃষ্টি অথবা কোন মানুষ শত চেষ্টা করেও যেন মুছে না দিতে পারে। ওর হাত লাল হয়ে গেছে। জায়গায়-জায়গায় হাত ওর সামান্য কেটে গেছে রক্ত পড়ছে হাত দিয়ে সে কিছু ভ্রূক্ষেপ করছে না। গাছের মাথায় এক সেই নীলবর্ণ পাখি। বড় জ্যাঠামশাই সেই নীলবর্ণের পাখির সন্ধানে যাচ্ছেন সীমান্তের ওপারে। ওখানে গেলেই সব তিনি পেয়ে যাবেন। যা তিনি এদেশে হারিয়েছেন বর্ডার পার হয়ে গেলেই তিনি আবার বুঝি তা খুঁজে পাবেন। কিন্তু সোনার মনে কি যে এক অহেতুক ভয়। পাগল জ্যাঠামশাই ফিরে এলে তারা যে এখানে নেই জানবে কি করে। জ্যাঠামশাই ফিরে এলে কি করে বুঝতে পারবে ওরা হিন্দুস্থানে চলে গেছে। তিনি কারও সঙ্গে কথা বলেন না। কারো কথা তিনি বুঝতেও পারেন না। একমাত্র সে জানে সে অথবা বড় জ্যাঠিমা কিছু বললে তিনি বুঝতে পারেন। সেজন্য সে সেই সকাল থেকে লিখে চলেছে। কপালে ঘাম। মুখে এসে সূর্যের তাপ লাগছে। মুখ লাল হয়ে গেছে। সে সেই এক নীল রঙের জামা গায় দিয়ে আছে। নীল রঙের জামা ওর খুব পছন্দ। আর এক নীলবর্ণ পাখি মাথার উপর দেখছে, সোনা লিখছে, সুন্দর হস্তাক্ষরে, যেন কত মায়ায় সে তার ভালবাসার কথা লিখে যাচ্ছে। সে বড়-বড় করে লিখে রাখছে। জ্যাঠামশাই উঠে এসে যখন দেখতে পাবে বাড়ী বলতে কিছু নেই, সব খালি, শূন্য খাঁ-খাঁ করছে উঠোন, যেন কোন মহামারী এসে সব ধুয়ে-মুছে নিয়েছে তখন তিনি নিশ্চয়ই একবার এই অর্জুন গাছের নিচে এসে দাঁড়াবেন। দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন—বড়-বড় হস্তাক্ষরে লেখা। সোনা লিখে রেখে গেছে — জ্যাঠামশাই আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি, ইতি সোনা। নিরুদ্দিষ্ট জ্যাঠামশাইর জন্য সে অর্জুন গাছের কাণ্ডে তাদের ঠিকানা রেখে গেল।

(ক্রমশঃ)

নিকটেই আছে

সাড়ে তিন প্লাস সাড়ে চার=আট

বাবলু এসেছে বিলেত থেকে, বিয়ে করতে। নেমন্তন্ন পেয়ে বৌভাতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখেই বন্ধুরা খলখল করে উঠল—এই যে ছিদ্রান্বেষী, নেকস্ট ইস্যুতে আবার কার ছিদ্রান্বেষণ করছ? খোশমেজাজে কোচা দুলিয়ে সাড়ে তিন টাকায় একখানা কাব্যগ্রন্থ হাতে নিয়ে কাঁধের কসরৎ দেখাতে এসে সম্ভাষণের গুঁতোয় একেবারে ভেবড়ে গেলাম। জবাব দেবার কোন ফাঁকই পেলাম না। চারদিক থেকে শুরু হয়ে গেল বিদ্রুপবাণ। স্বয়ং বর গোড়াতেই একহাত নিয়ে নিল। ডাক্তারদের নিয়ে যে দু-চারখানা লিখেছি তার নাকি সব সাঁচা নয়। বিলেতে সাহেব মেমদের পেটের রোগ আর বুকে-বসা সর্দি দাওয়াই বাতলাতে বাতলাতে ও মাঝে মাঝে অমৃতের পাতা ওলটায়। সেটি জিজ্ঞাসা করল—এসব ইনফরমেশন তোকে কে দিয়েছে? কে বা কারা দিয়েছে তাদের নাম-ধাম বলা ঠিক হবে কিনা তাই নিয়ে যখন ভাবছি, শুনতে পেলাম বরেন বলছে—ধুর ওসব তো বানানো গল্প। যখন যা মাথায় আসে, তাই কেঁদে দেয় কাঁপিয়ে ফুলিয়ে।

এরপর আর কোনো কথা চলে না। আমি বোকা-সোকা, মুখো-সুখো মানুষ, চিরকাল স্কুল-কলেজে লাস্ট বেঞ্চে বসে পেন্সিল বা পেনের তলা চিবিয়েছি। পাছে মাস্টারমশাইরা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসেন, সেই ভয়ে তাবৎকাল হাইবেঞ্চের আড়ালেই ঘাড় গুঁজে থেকেছি। বাবলুর বন্ধুরা ছিল সব বাঘের বাচ্চা। এখন লাইফে রীতিমত এস্টাবলিশড। এদের সঙ্গে কথায় পারিনি কোনোদিন, তাই আর পাল্টা জবাবের ধার দিয়েও গেলাম না। একটু বাদেই বাবলুর কাকা এসে বললেন—নেকস্ট ব্যাচে তোমরা বসে পড়ো বাবা, এরপর রাত হয়ে যাবে। দিনকাল তো জান না, কলকাতার পথঘাট তো সব জানই।

বন্ধুরা সব পাশাপাশি বসেছি খেতে। হৈহৈ করে প্যান্ডেল মাথায় করে কম্পিটিশন চলছে। বাবলু নিজে দাঁড়িয়ে পরিবেশকদের ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে—এই পাতে, এই পাতে, দে দে, আরো চারটে মাছ দে। না না কোনো কথা শুনব না অনিল। অনিল বা বরুণ, সুকুমার বা ধীরু, বরেন কি আমি কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারছি না। নিতে হচ্ছে। এরই ফাঁকে হঠাৎ শুনতে পেলাম, বরেন আমার কানেরই গোড়াতে ফিস ফিস করছে—তুই কি চলে যাবি এক্ষুনি? চাঁদ থেকে যাসে আলাদা করতে করতে বললাম—কেন রে? না, আমি তোর লেখাটেখা রেগুলারলি পড়ি। একটু কথা ছিল।

নিজের কানকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। অথচ আমার লেখাকে যে অবিশ্বাস করে, তার কথা যা শুনব তা আমি এখুনি বলে দিতে পারি—নিশ্চয়ই কোনো বঞ্চনার কাহিনী। লিখে কিছু হয় না তবু সবাই চায় তার কথাটা ছাপা হোক—আর কিছু না হোক সান্ত্বনা তো মিলবে। আর বন্ধুবান্ধবরা আজকাল আমাকে দেখলেই আতঙ্ক ওঠে, পাছে তাদের কারুর কোনো গলদ আবিষ্কার করে বসি। অথচ সময়-মত তাঁরাই আমার কাছে এসে বলে যায় তাঁদের দুঃখের গপ্পো।

ফিরতি পথে বরেন সেই গপ্পোই ফের শোনাল।

—দেখ আমরা অফিসার, আমরা কিছু বললে বা বাধা দিতে গেলে এখুনি ইউনিয়নের পান্ডারা এসে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অথচ এসব জেনেশুনে চুপ করে থাকাও অন্যায়। আর সহ্য হচ্ছে না।

এবার বাধা দিলাম আমি—সহ্য হচ্ছে না তো প্রোটেস্ট কর।

পাশাপাশি হাঁটছিলাম দুজনে। আমার কথা শুনে যেন হোঁচট খেল বরেন। থমকে ঘুরে দাঁড়াল। লম্বা জুলপি আর জোড়া ভুরুর মাঝখানে দুটো চোখে ঘোর অবিশ্বাসের রং—বলিস কি! প্রোটেস্ট করব! কার বিরুদ্ধে, কে শুনবে সেকথা, কেই বা স্টেপ নেবে এসবের বিরুদ্ধে?

তাহলে লিখেই বা কি হবে? কেই বা এসব পড়ে?—বললাম আমি।

না না, তুই আমার কথায় অফেন্স নিস না। তখন যা কিছু বলেছি, অনেস্টলি, ইয়ার্কি করেছি। পড়ে সবাই পড়ে। আজ হোক কাল হোক দেখবি এর একটা বিহিত হবে। তুই লিখে যা।

সেই কথাই লিখছি এখানে। বরেনের কথা—একটাও আমার নয়। এর সব দায়-দায়িত্ব বরেনের।

রোজই ডজন ডজন ছেলে আসে আমার অফিসে। অনেকেই এসব ইঞ্জিনিয়ার—কেউ ডিপ্লোমা, কেউ ডিগ্রী। নাম লেখাতে আসে। ক্লাস ফোর কনট্রাক্টর হিসাবে গভর্নমেন্টের কাজ করতে চায়। সারা বছর ধরেই সেই পি ডব্লিউ ডির কাজ চলে। রাস্তাঘাট, জলসেচ, হাউসিং স্কীমের ফ্ল্যাটবাড়ী, ব্রীজ—কত রকমের কাজ। বড় কাজ ধরার ক্ষমতা এদের নেই। সে ক্যাপিটাল বা এক্সপিরিয়েন্স নেই এদের। এরা ছোটখাট দু-পাঁচ হাজারের কাজ পেলেই খুশী। আর সে রকম কাজ সর্বদাই আমাদের হাতে কিছু না কিছু থাকেই। বড় বড় কোম্পানীর এসব কাজে পোষায় না, তাদের লাখ বেলাখের কমে খরচাই ওঠে না। তারা চায় না, আমরাও দিই না।

ক্লাস ফোর কনট্রাকটররা এসব কাজ-কর্ম করে। আগে ইঞ্জিনিয়াররা বিশেষ আসত না এ লাইনে। আজকাল চাকরীর বাজার খুব টাইট। তাই দলে দলে ইঞ্জিনিয়াররা আসছে। অল্পবয়সী, ইয়ংম্যান সব। টাকাকড়ি বিশেষ নেই হাতে, সম্পত্তি শুধু ওদের সম্বল। অথচ ওদের ঐ সম্বলের কানাকড়িটুকু জোর করে কেড়ে নিচ্ছে একজন ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কেরানী। সবাই সব জানে, অথচ কোনো প্রতিকার নেই এর।

কি রকম জানিস? ধর একটা ছেলেকে বললাম, ইয়েস তোমার প্রেয়ার মঞ্জুর হয়েছে। এখন একটা কাজ কর তোমার সিকিউরিটির টাকাটা জমা দিয়ে যাও। ক্লাস ফোর কনট্রাকটরদের সিকিউরিটি ডিপোজিটের অ্যামাউন্ট হোল সোজা দুশ টাকা। যদি ঐ টাকা কোন কনট্রাকটর জমা না দেয় তাহলেও সে টেন্ডার পেতে পারে। কিন্তু তাহলে প্রত্যেক টেন্ডারে কনট্রাকটরকে টেন্ডার পেপারের সঙ্গে আড়াই পার্সেন্ট টাকা গভর্নমেন্টের ঘরে জমা দিতে হবে। তার মানে পাঁচ হাজার টাকার টেন্ডারে সোয়াশ টাকার সিকিউরিটি ডিপোজিট করতে হবে। আর যতবার কাজ করতে যাবে ততবারই ঐ রেটে টাকা জমা দিতে হবে। বার বার এতগুলো টাকা জমা দেওয়া পসিবল নয় বলেই কনট্রাকটাররা একবারে সোজা দুশ [illegible] টাকার ফেস কিনে গভর্নমেন্টের ঘরে জমা রেখে দেয়।

আর সেখানেই শুরু হয়ে যায় খেলাটা।

আমাদের অফিসে কনট্রাক্টরদের এই বন্ডের ব্যাপারটা দেখাশোনা করেন অমলবাবু। পুরোনো দিনের ঝানু মাল। একেবারে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন। শুনলে অবাক হবি, এই মাগ্গিগণ্ডার বাজারে পৌনে চারশো টাকা মাইনেতে চন্দননগরে দু-দুটো বাড়ী হাঁকিয়েছেন। কি করে? তাহলে শোন।

ছেলেগুলো অমলবাবুর কাছে গেলে, উনি সব কিছু ওদের ভালোভাবে [illegible] খোলসা করে দেন। বলে দেন যে লাগবে ছশ পঁচিশ টাকার বন্ড, কিন্তু যেহেতু পঁচিশ টাকার বন্ড পাওয়া যায় না, তাই খুচরোর বদলে পুরোপুরি সাতশো টাকারই কিনতে হবে। কেনা হয়ে গেলে, কি করে গভর্ণমেন্টের ঘরে ঐ বন্ড জমা দিতে হবে, তাও ভদ্রলোক বলে দেন। শুনে-টুনে ছেলেগুলো যখন রওনা দেয় বন্ড কিনতে, তখন উনি আবার ওদের ডেকে পাঠান। পান চিবোতে চিবোতে খুব মোলায়েম গলায় বলেন—ভাই এই বন্ড-টন্ড কেনার ব্যাপারটাই খুব ঝামেলার। তুমি আমার ছেলের বয়সী তাই বলছি, কিনতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে যাবে, তার চেয়ে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তাই নিয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো, উনিই সব করে দেবেন।

যাবনে কি না ভেবে? আর এরা তো সব বিশ-বাইশের ছোকরা। ভাবে লোকটা দারুণ উপকারী। তখন ওরা অমলবাবুর চিঠি নিয়ে যায় সেই পরিচিত ভদ্রলোকের কাছে। খেয়াল করে না যে, অফিসের বাইরে করিডোরেই যে টেবিল-চেয়ার পেতে বসে আছে তার সঙ্গে অমলবাবুর মিষ্টি সম্পর্কের মিলটা কি? তবে এটা বোঝে যে অমলবাবুর রিকোয়েস্ট না রাখলে পরে পস্তাতে হবে। কারণ টাকাটা জমা দিয়ে সবাইকেই রসিদ কাটাতে হবে অমলবাবুর কাছে। অমলবাবু ওদের বিদায় করে বলে দেন যে, ওকে স্রেফ ওয়ান পার্সেন্ট মজুরী দিও।

খেয়াল রাখিস সম্বিৎসু এটা কিন্তু কমিশন নয়। বন্ড বেচে ভেন্ডাররা কমিশন পায়। এটা হচ্ছে ফাউয়ের ফাউ। অবশেষে নিরুপায় হয়ে ছেলেগুলো ছোটে সেই ভেন্ডারের সন্ধানে। অবিশ্যি বেশীদূর যেতে হয় না। অমলবাবুর টেবিল থেকে বড় জোর এক পা। সরকারী অফিসের করিডোরেই বেসরকারী বিজনেস।

অমলবাবুর চিঠি নিয়ে গেলেই ভেন্ডার সব কাজ করে দেয়। কোনো ঘোরাঘুরি করতে হয় না। একদিনেই সব হয়ে যায়। তবে কিছু গচ্চা দিয়ে।

গচ্চার পরিমাণটা জানতে চাস? প্রথমে তো সোজা ছশ'র বদলে সাতশো টাকার বন্ড—সেখানেই গচ্চা দিতে হয় পঁচাত্তর টাকা। তারপর প্রতি একশো টাকায় এক টাকা করে ভেন্ডারের অলিখিত মজুরী। অর্থাৎ সাত টাকা। প্লাস বন্ড কিনলে এজেন্ট একশো টাকায় সোয়া টাকা কমিশন পায়। এই সোয়া টাকার ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ বাষট্টি পয়সা প্রাপ্য ক্রেতার। কিন্তু ছেলেগুলো পায় না এক পয়সাও। তার কারণটা জলের মত সোজা।

সাতশো টাকার বন্ডে কমিশন পাওয়া যায় পঁয়ত্রিশ সিকি। এর অর্ধেকটা পাবে ভেন্ডার বাকীটা পাওয়ার কথা কন্ট্রাক্টরের অর্থাৎ যে কিনছে। কিন্তু ঐ ভেন্ডারই বলে দেবে যদি মিথ্যে হুজ্জুতি না চান তাহলে ঐ চার, সাড়ে চার টাকার জন্যে ঝামেলা করবেন না। কারণ ব্যাকডোর দিয়ে ঐ টাকাটা অমলবাবুরই পকেটে যায়। সেই সঙ্গে সাত টাকা বাড়তি মজুরীর ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ আরো সাড়ে তিন টাকা। এবার তাহলে হিসাব করে দেখ প্রতি সাতশো টাকার বন্ডে অমলবাবুর ইনকাম কত—সাড়ে চার প্লাস সাড়ে তিন। নেট আটটি টাকা। কম করে দিনে চার পাঁচটি কেস করেন অমলবাবু। আর ঐসব কেস থেকেই উপরি আদায় করেন বত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকার মত।'

বলতে বলতে একটু থামল বরেন, তার পর আবার ধরল সেই—'পূর্ত' বিভাগ মানেই তো পুকুর চুরির ডিপার্টমেন্ট। এখানে হাওয়ায় হাওয়ায় টাকা ভাসে। ঢুকতে বেরোতে টাকা দিতে হয় কন্ট্রাক্টরদের। শাঁসালো মক্কেলদের গলা কাটতে চাস কাট, তাই বলে খেতে-না-পাওয়া মধ্যবিত্ত ঘরের ঐ ছেলেগুলোরও গলা তোরা কাটবি? তুই বল সম্বিৎসু, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এরা তো আমাদেরই ঘরের ছেলে। এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু লেখ না তুই।'

সংক্ষেপে জবাব দিলাম—কেন লিখব। শুধু সেদিন রাতে বৌভাতের নেমতন্ন খেতে গিয়ে বন্ধুদের প্রশ্নের জবাবে যে কথাটা বলতে পারিনি সে কথাটা এখানেই লিখে রাখি—মানুষই ইনফরমেশন দেয়। বিপদে পড়ে বা যন্ত্রণায় ঘা খেয়ে মানুষই ছুটে এসে বা পত্র লিখে জানায় তাদের দুঃখের কথা। আমি শুধু সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি মাত্র। কমজোরী কলম, তাই বেদনার ইতিহাস সব গুছিয়ে লিখতে পারি না, বাকী থেকে যায় কিছু।

—সম্বিৎসু

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতাঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখাঃ ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন ঃ ৬৭-২৩৫৯।

CENTRAL LIBRARY

বাড়ি থেকে বেরবার মুখেই হোঁচট খেলাম। সন্ধ্যার হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গেই দরজার বাইরে পা না-বাড়ানো। উচিত বসে যাওয়া। কিন্তু এ কলকাতা নয়। এখানের আনকোরা নতুন রাস্তাঘাট, তাও কলকাতার মতো পিচঢালা বাঁধানো সড়ক নয়। পথে কতবার হোঁচট খাব তার ঠিক কি। শুধু সামনের বাধা সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার জন্যে প্রয়োজনে টর্চ জেলেছি, ছোট ছেলে এ বস্তুটি হাতে পেলে যা করে থাকে।

স্টেশনে পৌঁছবার আগে পথে এরপর যে-হোঁচট খেলাম সেটা পায়ের নয়, দৃষ্টির। টর্চ জেলেছি, সামনে চোখ পড়েছে। প্রথমে ভেবেছি একটি মূর্তি, আমারই মতো কেউ বেড়াতে এসেছে এখানে। পরে বুঝলাম যুগলমূর্তি। এমন ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে একজনকে অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কলকাতার গলির ছেলেছোকরা এমন দৃশ্যে নিশ্চিত 'সিটি' মেরে বসত। আমি কিন্তু উলটে নিজেই লজ্জা পেয়েছি। টর্চের আলো তো সঙ্গে সঙ্গেই নিভিয়েছি, উপরন্তু গতি ভিন্ন মুখে পরিবর্তন করব কিনা ভেবেছি। অথচ পথ কোথায়? নিয়নে-ভরা খুব নির্জন জায়গা আগেই শুনে-ছিলাম, অনেকের মুখেই শুনেছি। কিন্তু এ কি বিপদের কথা, সন্ধে সাতটার মধ্যেই ঘরমুখো হতে হবে। অন্ধকারের চেয়েও বেশি ভয়াবহ হল নির্জনতা—আর এই নির্জনতা থেকেই আমার মনে হয়েছে, এখানে আদৌ চাঁদের আলোয় দেখা পাওয়া যায় তো? এমন বিশ্বাসেই হয় তো ওই নারী ও পুরুষ মূর্তি পরস্পরের অত কাছা-কাছি এসেছে। এত কাছাকাছি যে ওরা নিজেরাও জানে না যে ওরা কখন, অভিন্ন দুজন নয়, অবিচ্ছিন্ন শরীরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ওরা কারা? যারা এখনও জানে না শরীর কি, শারীরিক উত্তেজনা কি বস্তু। ঠিক কোন গ্রুপে ওরা পড়ে: কৈশোরোত্তীর্ণ? যুবাপুরুষ, যুবতী নারী? না শরীর-সন্ধানী নারীদেহকাতর কামুক? আর নিজেকে এমন করে অন্ধকারের সুযোগে সমর্পণ করেছে যে সে কি যথার্থ কামাতুরা কেউ—না?

আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে একটি পা না-নড়ে অপেক্ষা করেছি। ভাবছি ওরা ওই জায়গা থেকে সরে গেছে; কিম্বা না, হয়তো বা টর্চের আলোর চকিত আঘাতে সাময়িক লজ্জাবোধের পরই, সবকিছুকে অগ্রাহ্য বা তাচ্ছিল্য করে, আরও নিকট হয়েছে, অন্ধকারের পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে। আসলে কোন নীতিবোধ নয়। বা সামাজিক সমস্যার চিন্তাও নয়, অন্তত এ মুহূর্তে। কি রকম একটা অস্বস্তি। কোথায় যেন একটা কাপুরুষতা। এর চেয়ে ডাকাবুকো ডাকসাইটে বদমাস মেয়ে-নিয়ে-পালিয়ে-যাওয়া কারও চেহারা বীরত্বপূর্ণ মনে হল। বা নিতান্ত জৈবিক তাগিদে যে পাঁচ জনের সামনে দেহোপজীবিকার সন্ধানে বেরিয়েছে।

অতএব ফের বাঁ হাতটা চোখের সামনে তুলেছি। কিন্তু দেখব কি। ঘড়ি দেখা যাবে না তো ঘড়ির কাঁটা। আবার টর্চ জেলেছি। সাতটা বাজতে অনেক দেরি। স্টেশন মাস্টার ভদ্র রায়ের কথা মনে পড়ল। এখানে যেমন গোপ্পুড়ে কাউকে পেলে কথা বলার জন্যে বেছে নেন। আমাকে কয়েকটা দিনে ঠিকই চিনেছেন।

ডানদিকের সাদা পাথরের মাইল স্টোনকে পথের সীমান্তে রেখে আমি রেল-লাইন ধরে দ্রুত পা চালিয়েছি। রেললাইনের ইস্পাত ছুঁয়ে ভেবেছি এমনই সব—ইস্পাতের এই দুখানা সমান্তরাল পাত, মাঝে কাঠের পাটাতন আর খোয়া পাথর—নাম রেল লাইন, কোথাও কোনদিন পৃথিবীর কোন প্রান্তে পুরনো হয়নি, হবে না। নাম গোত্রহীন গোবরডাঙা আর বাদশাহী মোগল-সরাই জংশন, পায়ের দিকে চোখ রাখলে দূরের কোন তফাতই নেই।

স্টেশনে পৌঁছে স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি। ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তুলনায় আলোর আয়োজন পরিমিত নয়। সেই অপরিমিত আলোয় স্টেশন মাস্টার ভদ্র রায় সকালের খবরের কাগজ সন্ধে পার করে দিয়ে পড়তে বসেছেন।

ঘরে ঢুকতেই চেয়ার থেকে পা নামিয়ে বলেছেন, আসুন আসুন।

বললাম, যাক তবু আপনার এখানে পৌঁছে মনে হল মানুষ আছে। আগে জানলে এখানে অন্তত আসতাম না। পাঁচটার পরই বোঝা যায় না দিন কি রাত।

ভদ্র রায় হাসলেন, বললেন, কী হল ? বললাম, এখানে পা দিয়েই যে অভিজ্ঞতা হল না ?

কী অভিজ্ঞতা ?

তবে বলব না নির্ভয়ে ?

নির্ভয়ে বলুন।

শেষে বললেন জায়গাটার বদনাম দিচ্ছি।

বেশ তো বলতে পারেন দিন। শুনি আপনার অভিজ্ঞতার কথা।

বাড়ি থেকে বেরবার পরই পথে যা দেখেছি তার কথাই সবিস্তারে বললাম। শুনে ভদ্র রায় এক চোট হো-হো করে হেসে উঠলেন প্রথমটায়। পর মুহূর্তে মুখের হাসি নিভিয়ে ধুয়ে-মুছে বললেন, অভিজ্ঞতাই বটে। ভদ্র রায়ের মুখ অসম্ভব গম্ভীর দেখাল। প্রথমে তাঁকে হাসতে দেখে ভেবেছিলাম, আমি যা বলতে যাচ্ছি তা সবই তিনি জানেন এমন ভান করছেন। এখন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল তিনি মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ভুলে বুঝি উদাস হয়ে পড়বেন। ছেলেবেলায় কোন নির্জন রেলস্টেশনে কোন স্টেশন মাস্টারকে ট্রেন সম্পর্কিত সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্রটির সামনে উদাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি কত কি যে এক সঙ্গে ভেবেছি তার ঠিক নেই। সমস্ত পৃথিবীর খবরাখবর কাগজ-পত্রে ছেপে বেরবার আগে স্টেশন মাস্টারের কানে আসে, তাঁর মতো গুরুদায়িত্ব বোধ হয় আর কারও কাঁধে চাপানো হয়নি। আবার কখন মন্থর মধ্যাহ্নের স্তব্ধতায় তাঁকে স্টেশনমাস্টারের ঘরের বাইরে টিনের সেডের নীচে দাঁড়িয়ে, দূরে ঝোপে জঙ্গলে বা কলা-গাছের মাথা ছাড়িয়ে শূন্যে দৃষ্টি মেলে রাখতে দেখে কেমন উদাস হয়ে পড়তাম।

UCO-1/71

স্বাচ্ছন্দ্যে-ভরা
ভাবী জীবনের পথে
একটু একটু ক'রে
ইনি এগিয়ে
চলেছেন

ইউকোব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট স্কীমের সাহায্য নিয়ে

প্রতি মাসে মাত্র কিছু কিছু ক'রে টাকা তিনি ইউকোব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট স্কীমের নিয়মমত জমিয়ে চলেছেন। মেয়াদ শেষে বেশ কিছু মোটা টাকা তাঁর হাতে আসবে। মাসে কমপক্ষে ১০ টাকা আর সবচেয়ে বেশী ৪৫০ টাকা পর্যন্ত জমা রাখতে হয়। রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউণ্ট একা কিংবা অন্য কারো সঙ্গে যুক্তভাবে খোলা যায়।

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

ইউকোব্যাঙ্ক উন্নতির পথ সুগম করে

বাস্তবিক কটি মুহূর্ত উদাস হয়ে পড়েছিলেন ভদ্র রায়। বললাম, বলুন কী বলতে যাচ্ছিলেন যেন ?

আপনি যাদের দেখেছেন তাদের কথা। বলুন শুনি।

শুনবেন ? তবে শুনুন।

মুখে ইতিমধ্যে সিগারেট গুঁজেছিলেন। পকেট হাতড়িয়ে দেশলাই খুঁজে পেলেন না, যখন, আমি দেশলাই জ্বালিয়ে ও'র সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছি।

ধোঁয়া ছেড়ে, আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে ভদ্র রায় শুরু করলেন, বছর বারো চোদ্দ আগে সিমুলতলা রেল স্টেশনে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। দুর্ঘটনা ঘটে অবিনাশ একটা কুলির জীবনে। বেচারা রেলওয়ে পোর্টার হয়ে এই স্টেশনে অনেক দিন ধরেই করে কম্মে খাচ্ছিল। বাপ মা যে তার কোথায় কবে ছিল কেউ বলতে পারে না। এই স্টেশনেই বুঝি তার জন্ম, আর জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছে সে এই স্টেশনের রেলওয়ে পোর্টার-দের একজন। নাম ছিল নাকি সহদেব।

মাথায়, দু হাতে, বগলে মাল তুলে-লাগেজের পাহাড় নিয়ে বেচারা একদিন যখন ট্রেনের কামরায় এসে পৌঁছয় তখন গার্ডের হুইসল পড়ে গেছে। ট্রেণ প্লাটফর্ম ছাড়তে আরম্ভ করেছে। সহদেব কামরার দরজার কাছে ঝুলছে। কিছু বেশি পাবার আশায় বেচারা তাড়াহুড়ো করে মাল নিয়ে ছুটে এসেছে যাতে না তার বাবু ট্রেন ফেল করে। শেষে বচসা লেগেছে ভাড়া নিয়ে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সহদেব নাছোড়বান্দা। একটি পয়সাও সে ছাড়তে চায়না। এইভাবে যখন বচসা চলছে, ট্রেনও স্পিড বাড়িয়েছে, সহ-দেব ঝুলতে ঝুলতে সিঁড়ির একটা ধাপ থেকে পা ফসকিয়ে একেবারে নীচে, আর তার একখানা পা চাকার তলায়।

সহদেব প্রাণে বেঁচে গেল বটে তবে ওর ডান পা-খানা গেল জন্মের মতো। হাঁটুর

জন্য থেকে গোটা পা বাদ চলে গেল। প্রথম প্রথম এর ওর তার দয়ায় প্ল্যাটফর্মের ওপর বসে বসেই চলে যেত, পরে আর চলল না। সহদেব এদিক ওদিক ভিক্ষে করা শুরু করে দিলে। পরে কেমন পাগলাটে হয়ে গেল। কপাল চাপড়াত, গালিগালাজ করত। ভিক্ষে করাও বন্ধ হয়ে এল। আসলে ভাগ্যকে দোষ দিতে লাগল। সত্যি পাগল কিনা কে জানে। এখন তো লোকে সেই রকমই মনে করে ওকে। দিনের বেলা আজকাল সহদেবকে কেউ দেখতে পায় না। আপনি সহদেবকেই দেখেছিলেন এখানে আসার পথে।

আমি সহদেব নাম শোনার পর দেখা দৃশ্যটা একবার স্মরণ করেছি। অথচ সহদেব দেড়খানা পা পঙ্গু শরীর নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল কি করে ?

আমাকে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে দেখে ভদ্র রায় বললেন, কোথায় যে কী ভাবে কার জীবনের শুরু, আর কী ভাবে শেষ। আসলে আপনার আমার প্রত্যেকের জীবনই এক একটা নতুন গল্প। দাঁড়ান, এক মিনিট। শান্তিরাম, ঘণ্টাটা মেরে দাও, আর বাবুকে চা পিলাও।

শান্তিরামকে ঘণ্টি মারার নির্দেশ আর চায়ের কথা বলে ভদ্র রায় বলতে আরম্ভ করলেন, আর যে মেয়েমানুষটাকে দেখেছিলেন সে সাঁওতাল, খৃশ্চান হয়েছিল। সহদেব যখন জোয়ান ছিল তখন থেকেই সহদেবের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। মেয়েটা অনেকের সঙ্গে অনেক কাণ্ড করেছে। কুলি-কামিন থেকে ছোট মাঝারি বাবুরা, কেউ তাকে ছাড়েনি। সহদেবের পা কাটা যাওয়ার পর থেকেই মেয়েটা কী রকম হয়ে যায়। সহদেবের পৌরুষে লাগে। তার শক্তি সামর্থ্য ছিল যখন, তখন যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে দুটো পয়সা আর সুখের লোভে, এখন তাকে দয়া করতে এলে সে দয়া নেবে কেন ? কিন্তু আশ্চর্য ! মেয়েছেলেটা সহদেবকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সহদেবের অবস্থা সব দিক থেকে যেমন খারাপ হতে লাগল মেয়েটারও টান বাড়তে লাগল। দুজনেই আস্তে আস্তে বুঝতে পারল ওরা একজন আরেকজনের ওপর নির্ভর করতে চায়। জোর বলতে মেয়েটার এখন আর কিছু নেই। তবে সহদেব, আপনি যেখানে ওদের দেখেছিলেন সেখান থেকে মাইল খানেক দূরে, একটা ভাঙা আটচালার মধ্যে দিনের বেলা সারাক্ষণ বন্দী থাকে। বেরোয় শুধু রাত্তির বেলা। চাঁদের আলোয় কোন দিন ওকে দেখবেন না।

সহদেবের চিৎকার তো শোনেন নি। চিৎকার নয় আর্তনাদ। এখন আগের চেয়ে অনেক কমে এসেছে। সন্ধের পর থেকে ঝাঁঝালো চুপচাপ। সহদেব বুঝতে পারে এখন কেউ আসবে, এমন কারও সঙ্গে তার দেখা হবে যে সারাদিনের ক্লান্তির পর তার জন্যে এমন কিছু আনবে যাতে সে আরেকটা দিন বেঁচে থাকার মতো রসদ পাবে। মাঝে মাঝে তার আর্তনাদ সত্যি বলতে কি আমাদের প্রার্থনার মতো শোনায়। আমার মধ্যরাতে কান্না বর্জিত করুণ অসহায় আর্তি। পথচারী সে আর্তনাদে চমকে ওঠে। আন্দাজ করতে পারে, সঠিক বুঝতে পারে না। ভাঙা আটচালাটার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

সন্ধের অন্ধকারে সকলের চোখ এড়িয়ে মেয়েছেলেটা নিয়মিত অভিসারিকার মতো আসে। সহদেবকে জোগাড় দ্রব্য যা পায় সংগ্রহ করে এনে দেয়। সহদেব হঠাৎ আর্তনাদ থামিয়ে, কান্না ভুলে, ঘড়ির কাঁটার মতো সময়ের একটু এদিক ওদিক না-করে যথা-সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হবে।

আহার ক্ষুধার সমস্যা মিটলে সহদেব অন্য কিছুও দাবি করে থাকে মেয়েছেলেটার কাছ থেকে। সহদেব তার শরীর দেবে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দেড়খানা পা আর পঙ্গু শরীরের অক্ষমতা তাকে বাধা দিতে পারে না। অত সমর্থ শরীরের উত্তেজনা তার সহদেবকে পেয়ে বসে কিনা কে জানে। কিন্তু নিজে যখন জোয়ান ছিল তখন মেয়েটার তাজা শরীরটাকে যে-ভাবে নিজের মুঠোয় আনতে চেয়েছিল—সেই অচরিতার্থ অতৃপ্ত যৌবিক বাসনা আজ এভাবে নিঃসীম অন্ধকারে পরিতৃপ্ত না-করে অন্তত সহদেবের উপায় নেই।

এ ঠিক দুটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমস্যা নয়। তারা সারা জীবনের পূর্ণ ভোগের পর শেষ বয়সে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল; দেহজ কামনার কিঞ্চিৎ মাত্রও তখন কাউকে পীড়া দেয় না। সহদেবের এত দিনের সব অপূর্ণতার অভিমান এইভাবে চাড়া দিয়ে উঠেছে। মেয়েটা কি আপসোস করে নাকি ? সহদেব দিনের বেলায় যে-আর্তনাদ, যত দুঃখ যা কিছু নিয়েই থাক না কেন, রাত্রি বা সন্ধ্যার অন্ধকারে তার কোন বিলাস নেই। সে জানে ক্ষুধার খাদ্য, দেহের মনের যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে কেউ আসছেই। আর সে যদি বা হতযৌবন কেউ হয়, তো সহদেবের নিজেরও তো দেড়খানা পা আর পঙ্গু শরীর।

ভাবতে পারা যায়, সহদেব এইভাবে বেঁচে আছে। দিনের আলো, শুক্লপক্ষের তিথি এড়িয়ে, কৃষ্ণপক্ষের মুখ চেয়ে থাকে দৈহিক মিলন আকাঙ্ক্ষায়।

সন্ধের এক টুকরো কালো অন্ধকার চোখের সামনে ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হতে থাকে। আমি মুহূর্তে টর্চের আলোয় চকিত স্ফুলিঙ্গের মতো যা দেখেছিলাম, ভদ্র রায়ের এই নিদারুণ বিবৃতি ছাড়া তার নিখুঁত ব্যাখ্যা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। আমি এখন ভাবছি, ভাগ্য সহদেবের আর্তনাদ আমাকে শুনতে হয়নি। শুনলে আমি নিজেই আর্তনাদ করে পড়ে যেতাম হয়তো।

বিকেলে ডোগমারা আশ্রমের ছোট জানলার মধ্যে দিয়ে হলদিবর্ণের শুভ্র পর্বতশ্রেণী-চূড়ার দিকে চেয়ে চেয়ে অপরাহ্ণের আলো ক্রম নিস্তেজ হতে দেখেছি। খোলা জানলায় সোজাসুজি পাহাড়ের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। আমার ডেরা থেকে মাইল আড়াই তিনের পথ। সেই ছায়ামূর্তির মাথায় নিরুদ্বিগ্ন সূর্যালোকে পড়া রক্ত-মাত গগন আলোর নিস্তরণ। সামনের সুবিস্তৃত ধান মাঠের অন্ধকারের কারণ ছিল নির্বাপিত-প্রায় আলোর অন্তিম-শিখা। কলকাতার বাইরে এমন সব দৃশ্য কী ভীষণ মন খারাপ হয়ে পড়ে তার প্রকাশ ভাষায় আসে না।

আর কলকাতার বাইরে দু-পা এসে স্টেশনমাস্টারের ঘরে বসে রেলওয়ে পোর্টার সহদেবের যে কাহিনী শুনলাম তা-ও আমার শোনার দরকার ছিল। কোন একটি মানুষের সঙ্গে কোন একটি কাহিনী এভাবে যুক্ত হয়ে দুঃখ বা বিষাদের চিত্রটি সম্পূর্ণ করে।

আমি কটি মুহূর্ত স্থান কাল সব বিস্মৃত হয়েছিলাম। স্টেশনমাস্টার ভদ্র রায় আমার মুখোমুখি বসে সিগারেট টানছিলেন চুপচাপ।

এক সময় সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলে, হাতের তালু চিবুকের ওপর রেখে বললেন, কাটিয়ে দিলাম জীবনটা, কী

ভূপৃষ্ঠ হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চে
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি হিমালয় পর্বতমালার অঙ্কে সংস্থাপিত চিরস্নিগ্ধ তুষারধবল, কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরশোভিত অপূর্ব
শৈলনগরী দার্জিলিং
ভ্রমণ-বিলাসী সকলেই নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করুন।
দার্জিলিংগামী ভ্রমণকারীদের জন্য
স্নো ভিউ হোটেল-ই
একমাত্র নির্ভরযোগ্য আদর্শ আবাসিক হোটেল
পূর্বাহ্নে স্থান সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন (ফোন : দার্জিলিং ৪০)

CENTRAL LIBRARY

বলেন? এই রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে, এই ঘরেই গেল, তাই না?

বললাম, মন্দ কি। সবাইকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে এমন কি কথা আছে। জীবনকে স্টেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে না দেখে, স্টেজের বাইরে থেকে দেখছেন। বলুন জীবনে কোথায় প্রতিযোগিতা নেই? থাকলেও, সে-প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পারলে আপনি যে জীবন থেকেই সোজা-সুজি আউট, এমন দুশ্চিন্তা তো আপনার না-ও থাকতে পারে।

গোবেচারা মানুষ পেয়ে ভাল ভাল কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন, ভদ্র রায়ের আশ্চর্য বাচন-ভঙ্গি সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টির কোমল বিষণ্ণতা নজর এড়ায় না।

বললাম, সহদেবের কাহিনী এমন শুরু দিয়ে আমায় এ সপ্তাহে শোনালেন কেন?
ওটা ওদের সম্পর্কে আপনার ভুল ভাঙার জন্যে।

আসলে আপনি মানুষকে মানুষের কথা বলতে ভালবাসেন।

এ সার্ভিসে কমপিটিশনের পাওয়ার তো কোন চান্স নেই, তবু আপনি দিলেন।
ঠাট্টা করলেও কিন্তু আবার আসব। সন্ধ্যে পাঁচটার পর শিমুলতলার মতো জায়গায় আপনার মতো লোক পাওয়া রিমার্কেবল লাক্।

আসবেন আসবেন। সময় পেলেই আসবেন। মাঝে মাঝে কাজের চাপ থাকে। না হলে প্রায় একা থাকি।

স্টেশনমাস্টারের ঘরের বাইরে এসে ভেবেছি, অনেক মানুষের অনেক রকম জীবন কাহিনী ভদ্র রায়ের রেকর্ডবুকে আছে। তাঁর কাছে এলে তিনি রেকর্ডবুক খুলে শুধু শুনিয়ে দেবেন প্রয়োজন মতো। ভদ্র রায় আসলে জীবনের কোন বড় ভাষ্যকার, স্টেশনমাস্টারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় আত্মগোপন করে আছেন।

সকালে উঠে নিজেই বেরিয়েছি সহদেবের ডেরার সন্ধানে। যা এখানকার অধিবাসী ছাড়া কোন ভ্রমণবিলাসীর জানার কথা নয় আমি তা সম্পূর্ণ জেনেছি একটি সন্ধ্যার কয়েক ঘণ্টার গল্প কথায়। যোগমায়া আশ্রমের কেয়ারটেকার মহাবীর মাহাতো বা তার ছেলে দিলীপ কারও কাছেই সহদেব সম্পর্কে অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করিনি।

সত্য ঘটনা নির্ভর কোন কাহিনীর মূল চরিত্র বা তার পরিবেশকে খুঁজে বার করার যে কৌতূহল তারই প্রেরণায় আমি অনুসন্ধান করেছি ভাঙা আটচালার।
আমার ডেরা থেকে বেশ নির্জন ফাঁকা খোলামেলা জায়গায় এসে একখানি জীর্ণ ইঁটের পাঁচিল চোখে পড়েছে। মাথার ওপর খানিকটা টিন খানিকটা খোলার ছাউনি। সামনে খোলা দালানের ওপর ভাঙা ইঁটের স্তূপ। খুপরির খুপরির ছোট জানলায় শিকের ফাঁক দিয়ে পলেস্তরা খসা দেয়ালই প্রথমে চোখে পড়ে। এ খাঁচার মধ্যে জন্তু ছাড়া মানুষ থাকতে পারে প্রথমটা বিশ্বাস হয় না। চিড়িয়াখানার বিশেষ জন্তুজানোয়ার অনেক সময় খাঁচার মধ্যে এমনভাবে গা ঢাকা দিয়ে থাকে যে দর্শকের তাদের দেখা না-পাওয়া পর্যন্ত কৌতূহল চরিতার্থ হয় না। আমারও সেই অবস্থা অনেকটা। কোথায় তার দেড়খানা পা আর পঙ্গু শরীর নিয়ে রাতের জীব সহদেব দিনের আলোর লোকচক্ষুর অগোচরে রেখেছে নিজেকে। চারিদিকে আরেক বার দৃষ্টি মেলেছি। না, কারও কোন কৌতূহল নেই রেলওয়ে পোর্টার সহদেব সম্পর্কে। ব্যাপারটা সাধারণের কাছে নিতান্ত আটপৌরে, গা-সওয়া। অতএব আমার কৌতূহল কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। আমি আটচালার চারিপাশটা ঘুরে দেখার বাসনায় যখন পিছন দিকে এসেছি তখনই চোখে পড়েছে। খুব নীচু জানলার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়েছে দৃশ্যটা। নামাজ পাঠের সময় বুকের কাছে হাঁটু এনে, সামনে হাত বাড়িয়ে মাথা নত করে মানুষ যে ভঙ্গিতে প্রার্থনা করে, সেইভাবে পড়ে রয়েছে একটা মানুষ দেহের আধখানা নোংরা চটে, ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা। কে জানে, ভদ্র রায়ের কাহিনীর সহদেব কিনা সে। চটের ও কাপড়ের নোংরা আচ্ছাদন যথেষ্ট সময় নিয়ে প্রায় অস্পষ্ট নড়ছে। ভদ্র রায়ের কণ্ঠস্বর অবিকল কানে বাজল : ভাবতে পারা যায়, সহদেব এই ভাবে বেঁচে আছে। ভেবেছি, সহদেবকেও তো অনায়াসে মিউজিয়মে রাখা যায়। জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি কোন দর্শনীয় বস্তু হিসেবে সে তো অক্লেশে যাদুঘরে থাকতে পারে।

সহদেবের কথাই বেশি করে ভাবছিলাম বলে বোধ হয় ফেরার পথে মনে হয়েছিল, সূর্যের আলো যেমন নিষ্ঠুর তেমনই অকৃপণ। সহদেব আর তার একনিষ্ঠ সঙ্গিনীর কথা ভেবে সূর্যদেব মাঝে-মাঝে চন্দ্রের মতো নিজেকে আড়ালে রাখলে ভালই করতেন, সহদেবের কথা প্রসঙ্গে মাস্টারমশাই এক ফাঁকে বলে থাকবেন।

বিকেল পার হতেই মনে হয়েছে ভদ্র রায়ের কথা। সারাটা দিনের জন্যে পড়ে আছে শিমুলতলা কৃষ্ণচূড়া লাল পলাশ, ধুলোওড়া অসমতল পথ, অসংখ্য টিলা আর অপরিচিত বাজারহাটের আনকোরা নতুন কোলাহল। চেনাজানা বা অনেক অন্য পথের রোমাঞ্চকর আহ্বান। দ্রষ্টব্য জায়গার নিত্য সন্ধানে থাকা। আর বিকেলের মরা আলোয় সন্ধ্যার পদক্ষেপ শোনা গেলে, সর্বাগ্রে মনে পড়বে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে স্টেশনমাস্টারের ঘরখানার কথা।

কখন এক সময়, নিজের অজ্ঞাতে আমি ভদ্র রায়ের অলক্ষ্যে, রেললাইন ধরে স্টেশন-মাস্টারের ঘরের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি।
ভদ্র রায় কোন গাইডের মতো কি এক-খানা পড়ছিলেন। আমায় দেখে একটিবার মাথা তুললেন। বসতে বলে ফের চোখ নামালেন।

ফের মাথা তুললে বললাম, ভাবছি, ডিসটার্ব করে ফেললাম বোধ হয়।

কেন?

মনোযোগ দিয়ে কিছু পড়ছিলেন।

ও! মোটেই না। বড় দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়েছেন।

আমাকে ঘাবড়ে যেতে দেখে মুখে হাসি টেনে বললেন, না না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। মানে আর কি বইটই ওসবের মধ্যে আর নেই। অনেক দিন ইস্তফা দিয়েছি। বুঝতে পারি কিছু একটা চেপে যেতে চান। এ প্রসঙ্গে জের না-টেনে বলেছি, এখানের মানে শিমুলতলার সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু দেখেছি আজ সকালে।
সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু?
হ্যাঁ।

বস্তুটি কী?

পোর্টার সহদেবের ডেরা।

তাই বলুন, সত্যিই আপনি ছেলে-মানুষ!

কেন এ কথা বলছেন?
দেখে সব ছেড়ে সহদেবের—

বিশ্বাস করুন শা-জাহান আর তাজ-মহল—এ সবের চেয়ে অনেক বেশি ইনটা-রেসটিং, অন্তত আমার কাছে, সহদেব আর তার ডেরা, এমন সব নির্জন জায়গায়।
কী জন্যে ইনটারেস্টিং? ভদ্র রায় যেন কৈফিয়ৎ তলব করছেন।
আমি নিজের অজ্ঞাতে অবিকল তাঁর কথাগুলোই বলেছি : ভাবতে পারা যায়, সহদেব এইভাবে বেঁচে আছে।
সত্যি ভাবা যায় না, ভদ্র রায় যে-ভাবে বলেছেন, মনে হল, কথাগুলো তাঁর মুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার মতো অনায়াসে বেরিয়েছে, একটি শব্দও তিনি তৈরি করে বলেননি।
ভাবা যায়, বোধ হয় একটি মাত্র কারণেই। ওর এখনও কোথায় একটা অবলম্বন আছে, আমি অস্ফুট উচ্চারণ করেছি।

স্পষ্ট করে কী বলতে চান বলুন, প্রেম?

প্রেম? আমি যে-ভাবে জিজ্ঞেস করেছি ভদ্র রায় বিস্ময় বোধ করেছেন।

কেন, বিশ্বাস করেন না নাকি?
মাথা খারাপ! জীবনে সজ্ঞানে প্রেমে পড়ার চেষ্টা করিনি, অজান্তে পড়েছি কিনা জানি না। আমার প্রেমে অন্তত কেউ পড়েনি আমি নিশ্চিত। কেউ যদি বলতে আসত, ওমুকে তোমার প্রেমে পড়েছে, বলেছি, আমার কাছ থেকে কারও কোন লাভের আশা নেই। বাবার অফিস নেই চাকরি দেব, নিজের টাকা নেই যে ধার দেব।

CENTRAL LIBRARY

এ হচ্ছে অজয়

ক্লাসের মনিটর, ব্যাটিংএ দারুণ হাত
সব সময় চটপটে চকল

আসল জিনিষটি ওর চাই!

অজয়ের সবুর সয় না, বন্ধুদের বলে—দাখ্ না, বাবার মত বড় হয়ে নিই।

ওর ইচ্ছে, চটপট বড় হবে, সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে, সব কিছুতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠবে সে।

অজয়ের মা তাই তো ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দেন।
হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্সের ওপর ওর মায়ের অগাধ বিশ্বাস, তার কারণ হরলিক্স বাড়তি পুষ্টি আর প্রয়োজনীয় প্রোটিন যুগিয়ে ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত শরীর গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে।

খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই হরলিক্সের এত গুণ।

মায়েরা হরলিক্স পেলে আর কিছু চান না। ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স সক্রিয়তার পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

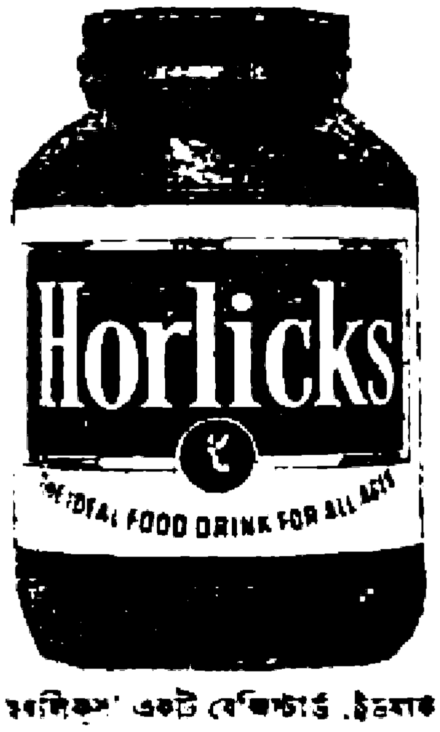

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1856 A

তা হলে রোমান্সকে অস্বীকার করছেন?

একেবারে আউট্‌ রাইট।

তা হলে প্রেমের কোন কথাই আপনাকে বলা চলবে না?

নির্ভাবনায় বলুন। বিয়োগান্তিক মিলনান্তক যা খুশি, কারণ প্রেম ব্যাপারটাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য। জীবনে অনেক রকম অবলম্বন থাকে, ওটাও সে রকম একটা।

না, তাবাবেন না আপনি, সিগারেটের প্যাকেটের দিক হাত বাড়ালেন ভদ্র রায়।

কলকাতার বাইরে দূরে কাছে যখনই বেরিয়েছি আলাপের পরিধি বড় হয়েছে। ভেবেছি জীবনের আলাপ-পরিচয়ের তালিকার এটাও পূর্ব নির্ধারিত ছিল। ঘরের দু-পা বাইরে সিমুলতলার মতো এমন নিশ্চল অনড় অন্ধকার যে কোথাও থাকতে পারে জানা ছিল না; হাটের পর যেখানে বিকেলে শেষ সন্ধে ডিঙিয়ে রোমান্টিক রাত্তির নেমে আসে। কোথায় ছিলেন অমায়িক সদাহাস্য আলাপী স্টেশনমাস্টার ভদ্র রায়, আর তাঁরই সঙ্গে এখন আমি ও অকৃত্রিম, আলাপের অতি প্রাচীন বিষয় প্রেম নিয়ে কথা বলছি। কলকাতার আলো থেকে দূরে নিঃসঙ্গ পরিবেশে অন্ধকারকে এমনভাবে কিছুতেই পাওয়া যেতে পারে না। এখানে স্টেশনমাস্টারের ঘরের অদূরে আতা আর পেঁপে গাছের ঝাড়ে বাদুড়ের মতো অন্ধকার ঝুলে রয়েছে। অনেক অনুখা ফোটা ফুলে নিশিগন্ধ। অনেক অনেক গাছ-গাছড়া যাদের নাম কোন দিন জানা হবে না তাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পাতায়-ডালে একই অন্ধকারের রাজসিক বিজ্ঞাপন। জঙ্গলে এখানে সর্বত্র অন্ধকারের উজ্জ্বল গন্ধ। চোখে অন্ধকারের দেখা মেলে, ঘ্রাণে অন্ধকারের গন্ধ পাওয়া যায়।

আমি সামনের দীর্ঘ জানলার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। ভদ্র রায় দেশলাই জ্বেলে সিগারেট টানছিলেন।

বেশ কয়েকটি মুহূর্তের ছেদের পর যখন দৃষ্টি বিনিময় হল ভদ্র রায় বললেন, আপনি বলছেন অবলম্বন, কিন্তু ঠিক কি তাই?

আমার যা দৃঢ় বিশ্বাস তা-ই বললাম।

কিন্তু কোথায় কি একটা আছে তবু—ভদ্র রায় কথা কিছু বাকি রাখতে চান। আর আমার মনে হল, প্রেমের চেহারাটি কি চতুর্দিকের নিশিগন্ধের মতো? নিতান্ত অস্পষ্ট সূক্ষ্ম অথচ অনুভূতিগ্রাহ্য?

একটা কাহিনী আপনাকে শোনান যেতে পারে—

শুনে-শুনে-শুনে প্রেমে বিশ্বাস করতে বলতে চান, তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম।

ভদ্র রায় কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে বললাম, প্রেমে বিশ্বাস করি না করি, আপনার গল্পের লোভে সেশ্যাখোরের মতো এখানে আসি, এটা বিশ্বাস করি।

ভদ্র রায় সত্যি আমাকে একটি পুরোপুরি কাহিনী শোনালেন। একজন স্টেশনমাস্টারের কাহিনী। অনেকটা নিজের ভাষিতেই শোনালেন বুঝি।

স্টেশন মাস্টার অনন্তর কাহিনী। এই সিমুলতলা তখন আরও ফাঁকা আরও জনবিরল ছিল। বাড়ী-ঘর-দোরের সংখ্যা কম ছিল। নিতান্ত সংসার কোলাহলক্লান্ত কেউ নিঃসঙ্গ নির্বিরোধ জীবনের ইচ্ছায় এখানে এসে হাঁফ ছাড়ত। কে জানে স্টেশন মাস্টার অনন্তর তেমন কোন ব্যাপার ছিল কিনা। প্রত্যেকের জীবনেই কিছু-না-কিছু থাকে যা পাঁচজনের চোখের সামনে বিজ্ঞাপনের মতো না-ঝুলিয়ে শান্তি নেই, বেঁচে থাকার সুখ অহংকার নেই। আবার এমন কিছু থাকে যা পাঁচজনের চোখের আড়ালে অতিসন্তর্পণে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। কে জানে, অনন্তর তেমন কিছুই ছিল কিনা। যা সকলের চোখের আড়াল করার জন্যে সিমুলতলার মতো এমনই মনোময় জায়গায় এসে চাকরি নিয়ে ছিল। মানুষ বিদেশে-বিভূঁয়ে আত্মীয়-পরিজন বান্ধব ছেড়ে যেতে চায় না, আবার চায় তো। কেন চায়? কেন তার এই আত্ম-নির্বাসনের মরণপণ বাসনা?

যে-ঘটনার জন্যে মানুষ কোন দিনও অপেক্ষা করে নি যেমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা যেমন ঘটে, সেই রকম বাস্তব উপন্যাসের চেয়ে আরও বিস্ময়কর, এই পুরনো টাউন সম্পর্কে এমন কিছু ঘটে গেল এই রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে অনন্ত জীবনের প্রায় অর্ধ-বিস্মৃত একটা অধ্যায়কে, এঞ্জিনের ধোঁয়া রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসৃত হতে যে সময়টুকু নিয়েছে তারই মধ্যে, চলমান হতে দেখেছে।

সিগন্যাল না-পেয়ে দূরগামী একখানি ট্রেন একদিন সন্ধে-বিকেলের আধ-অন্ধকারে এই সিমুলতলা রেল স্টেশনে অতর্কিতে এসে থেমেছিল। এঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ঢাকা পড়েছিল। সামনের গাঢ় হলুদ ফুলের বনকে পাহাড়ের ঝাঁকড়া মাথাও ধোঁয়ায় আড়াল হয়েছিল। প্রথমটা কিছু চোখে পড়ার কথা নয়, পড়েও নি। আগন্তুকের মতো উপস্থিত ট্রেনখানার কালো ইঞ্জিন শব্দ করে-করে একটানা ধোঁয়া উদ্গীরণ করে চলেছে। অনন্ত কেবিনের বাইরে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে।

ধোঁয়ার আস্তরণ কিঞ্চিৎ হালকা হলে অনন্ত দেখেছে, পরনে বিদেশী পোশাক, সুবেশ এক যুবক তারই দিকে এগিয়ে আসছে। খুব সম্ভবত ট্রেন সম্পর্কিত কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করবে।

অনন্তর মুখোমুখি এসে যখন যুবক দাঁড়িয়েছে, অনন্তর মনে হয়েছে তার মুখ খুবই চেনা-চেনা। অথচ কিছুতেই সঠিক স্মরণ করতে পারে না। চেহারা ও পোশাকের পারিপাট্যে এমনই ঝকঝকে মনে হচ্ছিল যে স্টেশন মাস্টার অনন্ত সহজে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। অনন্তর দ্বিধাগ্রস্ত মুহূর্তে তাকে চমক দিয়ে আগন্তুক ট্রেনযাত্রী বলেছে, কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে ভীষণ চেনা-চেনা—

অনন্ত স্বভাবত স্থির থাকতে পারে নি। সোৎসাহে বলেছে, অবিকল অমলেন্দু—ঠিক আর ইউ আর আইডেন্টিক্যাল অনন্ত, যুবক অনন্তকে নিখুঁত আইডেন্টিফাই করেছে এইভাবে ফেটে পড়ে। অনন্তর একখানা হাত ধরে সাহেবী কায়দায় প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছে। হাড়-হাড়, হাত ভেঙে ফেলবে দেখছি, অনন্ত মুহূর্তের মধ্যে অতিপরিচিত কণ্ঠে বলেছে। অমলেন্দু আর অনন্ত, দুটো নাম প্ল্যাটফর্মে থেমে-থাকা ট্রেনের হুইসলে থেমে-থেমে ডাক দিয়েছে। অনন্তর কানে অমলেন্দু, অমলেন্দুর কানে অনন্ত। সমস্ত অতীত, সমস্ত বর্তমান, যোজনার অতিব্যবহৃত সেতু বেয়ে সংযোগ খুঁজে আনাগোনা করেছে। অতীত-বর্তমান অখণ্ড সময়ের মধ্যে একাকার হয়েছে।

মানে, ব্যাপারটা কি বল তো? কতো দিন এখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছ? অমলেন্দু সবার্গীর সবচেয়ে শক্ত প্রশ্নটা করেছে।

ট্রেন সহজে নড়বে না, অনেক সময় পাওয়া যাবে এসব কথার। আগে আমার ঘরে বসবে চল।

কতক্ষণে ছাড়বে? হাতঘড়ি দেখে অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করেছে।

যখনই ছাড়ুক, তুমি ছাড়া পাচ্ছ না আজ।

মানে, কী বলতে চাও — অমলেন্দুকে অসহায় মনে হয়।

আজ আমার এখানে কাটিয়ে যেতে হবে। অনন্তর কথায় অমলেন্দুকে এবার খুবই হতাশ মনে হয়েছে। অথচ গত্যন্তর নেই।

আমার ব্যবস্থা তো হল। কিন্তু, শোভাকে তো নামতে বলতে হবে।

শোভা? হঠাৎ মনে কোথায় খোঁচা লেগেছে। অনন্ত নামটাকে কেন্দ্র করে কয়েক সেকেণ্ড ঘুরে বেড়িয়েছে আকাশ-পাতাল।

ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে শোভা যখন নেমে আসছে অমলেন্দুর সঙ্গে, অনন্ত তফাতে দাঁড়িয়ে দেখে প্রথম বিশ্বাস করতে পারে নি চোখে যা দেখেছে।

দেহের আকারের কম-বেশী পরিবর্তন চোখে পড়লেও, সরকার বাড়ীর শোভা একই রকম আছে। কয়েক পা এগিয়ে এসে অনন্তকে দেখে শোভার একই অবস্থা। সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করে তুলতে সময় লেগেছে শোভার। দেখা হবে বলেই কি এমনভাবে এইখানেই ট্রেন থেমেছে।

শোভা পা-পা করে এগিয়ে আসছে। মাথা নীচু করে কী বলছে অমলেন্দুকে।

অনন্ত শোভার মতোই ভাবছে এলোপাথাড়ি। দুজনের ভাবনাই সমান্তরাল।

অমলেশের সঙ্গে দেখা, চান্স বা অ্যাক্সিডেন্ট এ দুটোর একটাকে কখনো সখনো স্বীকার করে নেবার মতো। কিন্তু সেই অমলেশের সঙ্গে শোভার এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার, একটা নিষ্ঠুর সত্যকে বিনা তর্কে অতি বাস্তব বলে মেনে নেবার সামিল।

'সরকার বাড়ির' শোভা সরকার তিন বছরের মতো অনন্তর সঙ্গে কাটিয়েছে বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে। তারপর অনন্ত 'সরকার বাড়ি'র ভোগাক, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে, এক কাপড়ে একদিন চলে আসে এখানে। স্বেচ্ছানির্বাসনের আত্মগোপনের আড়াল তার কাম্য ছিল।

উজ্জ্বল বুদ্ধিমান ছেলে ছিল অনন্ত। তিনকুলে কেউ ছিল না। কোন দূর-সম্পর্কের হিতৈষী এতদিন তারই জন্যে 'সরকার বাড়ি' থেকে এমন সম্বন্ধ আনবে সে বা তার চেনাজানা কেউ চিন্তামাত্র করেনি। কিন্তু শোভা সম্ভবত অনন্তর জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। অনন্ত বি-এ পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষীর দল বুঝিয়েছিল, সামান্য একটা পরীক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, শোভা কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। তাছাড়া জীবনের পরীক্ষা অনেক বড়। সেখানে যার সাফল্য নেই সামান্য পরীক্ষার সফলতা তাকে কতদূর নিয়ে যাবে। সরকার বাড়ির-সম্পত্তির বড় অংশীদার শোভার বাবা অঘোর সরকার মেয়েজামাইকে যা দিতে যাবেন তাইতে অনন্ত যেমন খুশি নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ে নিক।

সুযোগ আসার সময় যেমন অনন্ত নিজেকে সহস্র প্রশ্ন করেও সদুত্তর পায়নি স্বতঃ থেকে, কীভাবে তা এল তার জীবনে, তেমনি সেই সুযোগের হাজারো সুবিধে উপেক্ষা করে একদিন যখন সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে এল তখন কোন আক্ষেপ বিলাপ করতে কিছু ছিল না তার মনে।

সুযোগটাকে অনন্ত বরাবরই একটা বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখেছিল। সেই সন্দেহটাকে অনন্তর আরেক শুভাকাঙ্ক্ষী চোখে আঙুল দিয়ে তথ্যপ্রমাণ সহকারে স্পষ্ট করে দিল। অঘোর সরকারের এতবড় অংশের একমাত্র মেয়ের জন্যে তাবৎ তাবৎ যোগ্য পাত্র থাকতে তার মতো সামান্য ছাত্রকে নির্বাচন একটা বেজায়রকম ঠাট্টা ছাড়া আর কি। আর যদি ঠাট্টাই না হয় তো এর পেছনে কি কারচুপি আছে জেনে দেখা দরকার।

কানে শোনা ছাড়াও, প্রমাণ দাখিল হলে জানা গেল শোভার কুমারী জীবনের নানা অপ্রিয় ও অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী। এমনকি কুমারী জীবনে তার গর্ভধারণের অবিশ্বাস্য ঘটনা। অঘোর সরকারের মেয়ে, সর্বোপরি সরকার বাড়ির মেয়ে শোভা — সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল সহজে, কাগজপত্র পোড়াতে হল না। কেচ্ছা-কলঙ্কের দুর্নামের ছিটেফোঁটা গায়ে লেগে রইল না। তৈলাক্ত পাত্রের গা থেকে জলের বিন্দু টোকা মেরে ফেলে দেওয়ার মতো।

অনন্ত শোনার পর সহজে বিচলিত হয়নি। তথাকথিত সংস্কার, মানসিক দুর্বলতা কোন কিছুই তাকে কাবু করে নি। পাঁচজনের মন্তব্যও সে গায়ে মাখেনি। এ যেন নতুন কিছু নয়। এরকম সন্দেহ একটা বরাবরই তার মনে অস্পষ্ট ছিল।

যে-সন্দেহটা তার মনে ক্রমাগত দানা বাঁধতে লাগল সেটাই তাকে শেষপর্যন্ত কাবু করল। শোভাকে সে সহজভাবে নেবে, বিশ্বাস করবে, বিশ্বস্ত থাকতে চাইবে। কিন্তু শোভা কি তার বিশ্বাস বা ভালোবাসার মর্যাদা রাখবে? শোভা যদি বিশ্বাস ভেঙে দেয়, বিশ্বাস চূর্ণ করে? কিছু আশ্চর্য নয় শোভার পক্ষে; কিছু আশ্চর্য নয় 'সরকার বাড়ির' পক্ষে।

অনন্তর মনে এই সন্দেহটাই শেষপর্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে, এই সন্দেহ স্থায়ী হয়। শোভার জীবনধারণের রুচিতে এইটাই যদি স্বাভাবিক ও নিয়মিত হয়ে পড়ে, তবে তো সবকিছুই বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে। বিশ্বাস, আনুগত্য, বোঝাপড়া বা কোনরকম মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংই তো দাঁড়াতে পারে না। কোনরকম কম্প্রোমাইজ, কোনরকম পারস্পরিক সহযোগিতা—কিছুই ধরে রাখতে পারে না তাদের সম্পর্ককে, তাঁও যদি পরস্পরের প্রতি নিত্য অসৌজন্য ও প্রতারণায় জর্জরিত। বন্ধুবান্ধবের কথা উপেক্ষা করেও যদি তার চালচলন বদলায় না থাকে?

সুযোগ আসার মুহূর্তে অনন্তর মনে যে ক্ষীণ সন্দেহ দেখা দেয় সেটাকে, সে শোভা সম্পর্কে হাজার গণ্ডা 'অবিশ্বাসযোগ্য ও অবিশ্বাস্য কথা শোনার পরও, অনড় সংশয়ের মতো কিছু করে তুলতে চায়নি। কিন্তু সব শোনা জানার পর সে-সংশয় তার মনে ক্রমে দানা বাঁধল তা থেকে অনন্ত মুক্ত হতে পারল না। অতএব শোভার তুলনারহিত দেহের সম্পদ, শোভার বাবা অঘোর সরকারের মোটা অংশের মালিকানার ঐশ্বর্য, 'সরকার বাড়ি'র নামডাক প্রতিপত্তির সহায় সম্বল সবকিছু ছেড়ে, কানাকড়িটি না নিয়ে অনন্ত শোভাকে ছোট একখানা চিঠিতে নিজের বিপুল অকৃতজ্ঞতা ও অযোগ্যতার কথা বার বার উল্লেখ করে সন্তর্পণে স্বেচ্ছায় পালিয়ে এসেছে।

এই তিন বছরের ঘটনা অমলেশের জানার কোন কথাও নয়, সুযোগও ছিল না। অনন্তর সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। এবং দেশের সীমানা পেরিয়ে সে বিদেশে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের বনিয়াদ তৈরি করতে ব্যস্ত ছিল।

মস্ত এক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী অমলেশ দত্ত ছেলেবেলার পুরনো বন্ধু অনন্তকে এভাবে এখানে আবিষ্কার করে বিস্ময়াহত হয়েছে। বন্ধুদের সবাই কেষ্টবিষ্টু একটা না-হোক, একেবারে রাম-শ্যাম-যদু-মধুর পর্যায়ে থাকবে—এটা বিশ্বাস করতে রীতিমত কষ্ট হয়েছে অমলেশের।

স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার্সে হাত-পা ছড়াতে-ছড়াতে অমলেশ নিতান্ত সাধারণ সাদাসিধে বলেছে, ব্যাপার-স্যাপার কিছু-একটা আছে। খুলে বল তো সত্যি কথা? তুমি অনন্ত এখানে এভাবে—বিশ্বাস করতে পারছি না বাস্তবিক—তোমার বিদ্যেবুদ্ধিকে হিংসে করতাম হে—

সত্যি কথাটা অমলেশ দত্তকে বলা বিশেষ সহজ ছিল না। অনন্ত পরিবর্তে লঘু কণ্ঠে বলেছিল, কেন জায়গাটা মন্দ কি। চাকরীটাও খারাপ নয়। স্টেশন মাস্টারের ঘরের বাইরে পা-বাড়ালেই সকাল-সন্ধ্যে নতুন মুখ দেখা যাবে। এমন একটা চাকরিয়া চাকরী জীবনকে বোর করবে না।

এমন অক্লেশে বলছ যে, নেহাৎই প্রাণের কথা, কিন্তু সত্যি কি তাই? অমলেশের এ প্রশ্নের উত্তরে অনন্তর মুখে আসা উচিত ছিল, সত্যি-কথাটা ভীষণ রকম সত্যি অমলেশ। তার চেয়ে তুমি বরং বল কেমন আছ শোভাকে নিয়ে। সরকার বাড়ীর লোক, অঘোর সরকারের মেয়ে শোভা সব দিক দিয়ে, শারীরিক রূপলাবণ্যে মান-মর্যাদায়, তোমার জীবন কতখানি কিভাবে ভরে তুলেছে বল শুনি।

অমলেশ বার-বার ভাল চাকরীর প্রস্তাব দিয়েছে। নিজের ওপর এই স্বেচ্ছা-

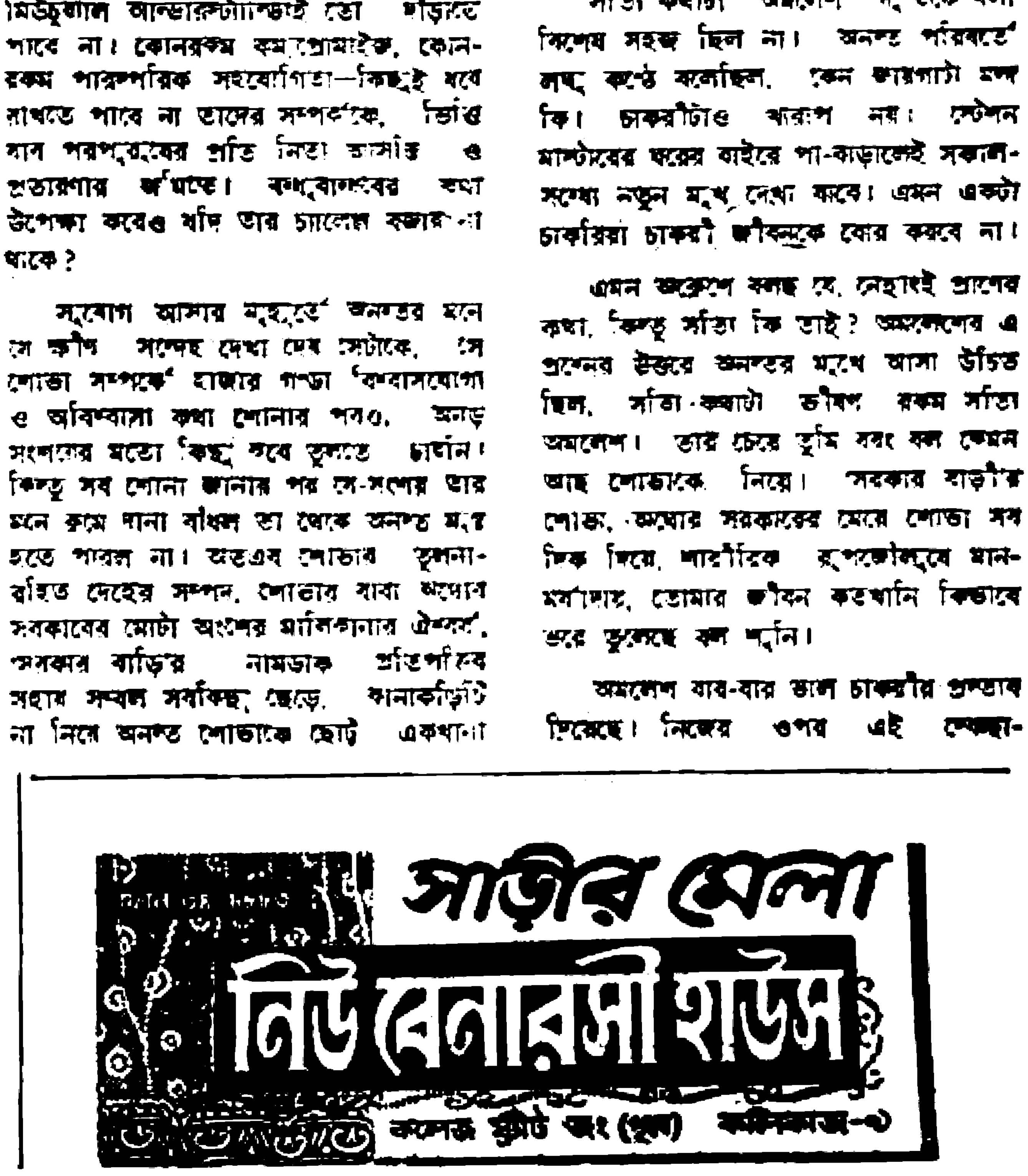

নির্বাসনের দণ্ড প্রত্যাহার করতে বলেছে। অনন্তর দিক থেকে কোন সাড়া পায় নি। অনন্তর ক্ষত স্থানে প্রলেপ দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। অনন্তর বাঁকা কথার ধারাল তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত বুঝতে পারে নি, অনন্তকে মনে করেছে মূর্তিমান ব্যর্থতা।

পাশের ঘরে আড়ষ্ট হয়ে বসে শোভা ভেবেছে, এ ঘটনাকে সে কী বলবে? নাটক বললেও কি যথেষ্ট বলা হবে? অথচ যা ঘটেছে তাকে তো অলৌকিক বলা চলবে না।

শরীর খারাপের অছিলায় কিছু মুখে তোলে নি শোভা। যতটুকু কথা না-বললে নয় তাই বলেছে। গলা শুকিয়ে গেলে জল-টুকু চেয়েছে শুধু।

শোভা আর অনন্তর ব্যবহার যৎসামান্য যা তার চোখে পড়েছে তা থেকে অমলেশ বিশেষ কিছু অনুমান না-করতে পারলেও উভয়কে মাঝে-মাঝে সন্দেহের চোখে দেখেছে। সংশয় ঘনি-ঘন গাঢ় হয়-হয় তা মুহূর্তেই ফিকে হয়েছে শোভার আচরণের আশ্চর্য স্বাভাবিকতায়।

পরের দিন ভোরে ট্রেনে শোভা আর অমলেশ চলে গেল। শেষ রাত্রে শোভা অনন্তর সঙ্গে নিতান্ত দরকারী কটা কথা বলেছিল। শোভা অনন্তকে বলেছিল, তোমার শেষ চিঠিখানা কিন্তু এখনও কন্যা করে রেখে দিয়েছি। সব ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি, চিঠিখানাও তোমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব ভেবেছি। তোমার চিঠির একখানা উত্তর আমি লিখে-ছিলাম। আমার কিছু কথা বলার ছিল। সেটাও সেই সঙ্গে তোমার পাঠাবার কথা ভেবেছি। আরেকটা কথা। তুমি আমাদের কোন কিছুই সঙ্গে নাও নি। হিসেব করে, প্রায় সোনাগুনতি করে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছ। গলার এ হারটা তোমারই দেওয়া। এতে সরকার বাড়ীর কোন দাগ নেই। সে কারণে এটা আমার রাখা উচিত নয়। আত্মমর্যাদা আমারও কিছু থাকা উচিত। হাতই হোক সরকার বাড়ীরই মেয়ে তো আমি।

শোভা গলা থেকে হার খুলে অনন্তর হাতে রেখেছে। অনন্ত বলেছে, কি করব আমি এটা নিয়ে?

নিজের জিনিস নিজের কাছে রেখে দেবে। কখন কি কাজে লাগে কে জানে?

অনন্ত হতচকিত হয়েছে শোভার কণ্ঠহার নিজের হাতে নিয়ে। পরে জিজ্ঞাসা করেছে যেন, অমলেশ যদি এখনই লক্ষ্য করে?

অমলেশের চোখের সামনে সারাদিন ঘুরলেও অমলেশ লক্ষ্য করবে না। ভাববে হারটা গলায় ঠিকই ঝুলছে। তুমি ওটা কোথাও রেখে দাও। গাড়ী ছাড়বার পর অমলেশকে যা বলবার আমি বলব।

গল্প শেষ হলে ভদ্র রায় আমায় প্রশ্ন করেছেন, ধরুন অনন্ত যদি শোভার গলার হারটাকে বন্ধ করে রেখে দেয় তো আপনি প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করবেন?

আমি প্রায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। ভদ্র রায়ের প্রশ্নে সোজা হয়ে উঠে বসেছি। হঠাৎই বুঝতে পেরেছি যেন আমার অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে ভদ্র রায় আমায় স্বীকার করতে বাধ্য করবেন যে, প্রেম আছে, প্রেম না-থেকে পারে না।

— বললাম, গলায় জোর চাপিয়ে, আপনাকে তো আগেই বলেছি, প্রেম ভ্রান্ত একটা অবলম্বন। শোভার স্মৃতিকে মাঝে-মাঝে ফিরিয়ে এনে বেঁচে থাকার একটা ফিকির—বাঁচার রসদ জোগানো। শোভার গলার হারটা বাঁচারই একটা অবলম্বন।

আপনি হলে রাখতেন না, না?

বলা মুশকিল, তবে ধরে রাখতে পারেন, রাখতাম না।

সেন্টিমেন্টাল ফুল, স্বগতোক্তির প্রায় উচ্চারণ করলেন, সম্ভবত অনন্তর উদ্দেশে।

এর পর স্টেশন মাস্টার ভদ্র রায়ের অনুরোধে আমি স্টেশন মাস্টারের ঘর ছেড়ে মাত্র কটি পা দূরে, আতা আর পেঁপে গাছের ফাঁক দিয়ে তাঁর কোয়ার্টার্সে এসেছি। আমাকে ভেতরে এনে ভদ্র রায় একটি মুহূর্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন। পরে দুটো-একটি স্টীলের আলমারী খুলেছেন। আলমারীর দেরাজ থেকে অতিসন্তর্পণে বার করেছেন ছোট একটি কাঠের বাক্স। বাক্সের ঢাকনা খুলে আমার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রথমটা বুঝতে পারি নি। পরে দেখলাম সোনার একটা হার। সরু সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো।

ভদ্র রায় বাক্স থেকে তুলে নিয়ে আমার চোখের সামনে শূন্যে এক প্রান্ত ধরে দোলালেন।

বললেন, শোভা সরকারের হার।

শোভা সরকারের হার আপনার কাছে! আপনি — আমি ওই পর্যন্ত বলে নিজের অজ্ঞাতে থেমেছি। শুধু ভেবেছি কাউকে বিশেষ কোন কথা বলার কেউ বিশেষ দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে। আমার জন্যে ঠিক আজকের এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে ছিলেন স্টেশন মাস্টার ভদ্র রায়—না-না, ভদ্র রায় কেন—

ভদ্র রায়ের কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তায় ছেদ পড়েছে, বলুন, আপনার মত কী? রাখা উচিত না ফেলে দেব?

রাখা উচিত কি উচিত নয়, এ বিষয়ে কোন পরামর্শ দিতে পারি নি। শুধু তাঁকেই ফিরে প্রশ্ন করেছি অবাধ বিস্ময়ে, ফেলে দেবেন?

আমার কথায় তীব্র হাসির কিছু পেয়ে আচমকাই হেসে উঠেছেন ভদ্র রায়। কাঠের বাক্স আবার দেরাজের মধ্যে পুরে স্টীলের আলমারী বন্ধ করেছেন। ভদ্র রায় বক্তৃতার বদলে দৃষ্টান্ত দিলেন।

সমস্ত রাত্রির ঘুমতে পারি নি। ঘুমবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অমলেশ শোভা আর ভদ্র রায় এরা তিনজনে বিঘ্ন ঘটিয়েছে, ঘুমতে দেয় নি। রেল স্টেশন থেকে যতবার ট্রেন-চলার বা হুইসেলের শব্দ কানে এসেছে, অনন্তর মুখ ঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখেছি ঠিক ততবারই।

ভোরের দিকে, শেষ রাত্রে বড়-বড় হাই তুলেছি। ভেবেছি আর ঘুমের বৃথা চেষ্টায় কি বা লাভ। আকাশ একটু ফর্সা হলেই ছুটব খোলামেলা প্রান্তরের দিকে। বুকের ভেতরটায় কেমন যেন বন্ধ ভাব। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সকালের বাতাসে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে হবে বেশ কয়েক-বার।

(ক্রমশঃ)

• অলকাপলকা টনিক • কিংস হেমাটোন
• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• ক্যাসিবা সিরাপ • ইউট্রোটোন
কিং এণ্ড কোম্পানীর নিজস্ব গবেষণায় প্রস্তুত ঔষধগুলি
এখন আপনার সেবায় নিয়োজিত।
প্রস্তুতকারক:
কিং এণ্ড কোং
১০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী:
১০বি, পার্শী বাগান লেন, কলিকাতা-৯
GRACE/K/30/70
কিং এণ্ড কোম্পানীর (সকল শাখায়) ঔষধ বিভাগ প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

মনের কথা

এক ব্যথা দুই মন
রতন ও অনুপম

রতন আর অনুপম প্রায় এক সময়ে একই ধরনের অসুবিধা ও রোগলক্ষণ নিয়ে চিকিৎসার জন্য এলেন। কাজ করতে পারছেন না, কাজের জায়গায় ফিরে যেতে দারুণ আতঙ্ক। দুজনের মনে প্রায় এক চিন্তা। কাজের পক্ষে তাঁরা উপযুক্ত নন। কাজে ভুল হবে, সম্মানের হানি হবে, লোকের মুখ দেখানো যাবে না। রোগলক্ষণের মধ্যে প্রধান উপসর্গ ঘুম না হওয়া। রতন সারা রাত প্রায় জেগে কাটান, শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করে। সে চিন্তার কোনো বিশিষ্ট রূপ নেই। এলোমেলো অসংবদ্ধ চিন্তা। আর অনুপম প্রায় সারা রাত জেগে নিজের চিন্তাকে একটা বিশিষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করেন; কবিতা, গল্প, নাটকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু মনে হয় ঠিক যা বলতে চান, সেটা ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না।

রতনের বয়স ছাব্বিশ। বছর দুয়েক আগে রসায়নশাস্ত্রে এম এসসি পাশ করেছেন। পাটনার কাছাকাছি একটা রবার ফ্যাক্টরীর ল্যাবরেটরীতে কাজ পেয়েছেন মাস কয়েক আগে। তিন শিফটে কাজ চলে, সপ্তাহান্তে রতনের কাজের সময় বদলায়। স্থানীয় একটা বোর্ডিং-এর এক ঘরে আর তিনজনের সঙ্গে থাকার বন্দোবস্ত, খাওয়ার ব্যবস্থা বাইরে। এই তিনজন রুমমেট ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কাজ করেন। এরা কেউই রতনের মত শিফট ডিউটি করেন না। সন্ধ্যায় ঘরে জমজমাট আড্ডা জমে। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতির চর্চা চলে। তিনজনই রতনের মত অবিবাহিত; পরিবারের দায়িত্ব এখনও কাঁধে পড়েনি, অন্য কোনো রকম ঝামেলাও নেই। হৈ-চৈ করে আড্ডা দিয়ে বেশ সময় কাটান। প্রথম থেকেই রতন এঁদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারেননি। রতনের থেকে বয়সে এঁরা দু-চার বছরের বড়ই হয়তো হবেন। রতন এঁদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। রতনের মনে হয়, এঁরা শুধু বয়সে নয়, জ্ঞানে বুদ্ধিতেও অনেক বড়। যে সপ্তাহে ওঁর সন্ধ্যায় ডিউটি থাকে না, সেই সপ্তাহে ওদের সান্ধ্যমজলিশে যোগ দিতে বাধা নেই বটে, কিন্তু অস্বস্তি বোধ করেন। মুখ নীচু করে শুধু ওদের কথা শুনে যান; কিছুই বলেন না। প্রথম প্রথম রুমমেটরা ওঁর মুখ খোলানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করতেন, আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে আড্ডায় বাঙালী অবাঙালী সমবয়সী নতুন যুবকের আবির্ভাব ঘটে, সে সময় রতন আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয়, ওদের মত হতে না পারার অক্ষমতা একটা মস্ত বড় অপরাধ। কী সহজে ওরা কথা বলে যাচ্ছেন, অবলীলাক্রমে নিজেদের মতামত জাহির করছেন! কখনও হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন, কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর কথায় ক্রোধে ফেটে পড়ছেন। হর্ষ বেদনা ঘৃণা ওদের মুখে চোখে ভাবে ভঙ্গীতে মূর্ত হয়ে উঠছে। ওরা যেন ছায়াছবির অভিনেতা আর রতন যেন নির্বাক দর্শক। কাছাকাছি বসে থেকেও ওদের থেকে অনেক দূরে রতনের অবস্থিতি। আড্ডা যখন জমে ওঠে, চায়ের কাপগুলো যখন আধখাওয়া সিগারেটের টুকরোয় ভর্তি হয়ে যায়, রতন এদের আলোচনার সূত্র হারিয়ে ফেলেন: শুধু কতকগুলো অর্থহীন শব্দ তাঁর কানের মধ্য দিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে ধাক্কা মারতে থাকে। রতনের তখন চোখ বুঁজে আসে, ঘুমে মাথা ভার হয়ে যায়। নিজেকে অতি কষ্টে জাগিয়ে রাখেন। —এই রকমভাবে সময় কাটছিলো, কেটেও হয়তো যেতো। এক রুমমেটের সঙ্গে রাজগীরে যাবার প্রস্তাবে রাজী হতেই সব গোলমাল হয়ে গেল। তপনবাবুর কাকা রাজগীরে একটা হোটেলের মালিক। তপনবাবু হোলির ছুটি রাজগীরে কাটাবেন। অন্য রুমমেটরা যে যার পছন্দমত জায়গায় যাচ্ছেন। তপনবাবুর সঙ্গী হয়ে রতন রাজগীরে এলেন। প্রথম দুটো দিন ভালই কাটলো। পাহাড়ে উঠলেন, ঝর্ণার জলে স্নান করলেন, সকলের সঙ্গে হোলি খেললেন। তৃতীয় দিন সকালে কলকাতা থেকে তপনবাবুর অন্য এক বন্ধু এলেন। এই তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে রতনের মধ্যে গোলমাল ঘটে গেল। ইনি এসেই তপনবাবুকে যেন গ্রাস করে ফেললেন। সারাদিনে খাবার সময় ছাড়া তপনবাবুর দর্শন মিললো না। স্কুল-কলেজের সহপাঠী এই বন্ধুটি কিভাবে বেড়াতে বেরিয়ে তপনবাবুকে নিয়ে পাহাড়ী-পথে-জঙ্গলে যেন উধাও হয়ে গেলেন। বাকী দুদিন একা একা ঘুরে বেড়ালেন রতন। ভদ্রলোক প্রথম পরিচয়ের সৌজন্যসূচক 'হ্যালো হ্যালো' ছাড়া রতনের সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্য-বিনিময় করেননি। তাঁর হাবভাব দেখে রতনের মনে হয়েছে তিনি রতনকে অবাঞ্ছিত জীব মনে করছেন। ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ধারে একটা পাথরের উপর বসে রতন আকাশের দিকে তাকালেন। চাঁদের আলো উপচে পড়ছে, অদূরের বাড়ীঘরগুলো আলোক-সমুদ্রে অজানা দ্বীপের মত দেখাচ্ছে, হোলিমত্ত শহরবাসীর অস্পষ্ট কোলাহল সমুদ্রের গর্জন মনে হচ্ছে। আকাশের দু-একটা তারা দেখা যাচ্ছে, অন্যগুলো চাঁদের আলোতে বোধ হয় হারিয়ে গেছে। তারাগুলো আলোর গতিতে পরস্পরের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। রতনও আলোর গতি নিয়ে পৃথিবীর গাছপালা, ঘরবাড়ী, নদীপর্বত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের আকর্ষণ উপেক্ষা করে অন্য জগতে চলে যাচ্ছে। সারা শরীর শীতে কেঁপে উঠলো, আলোয়ানটা ভালো করে গায়ে জড়ালেন। একটা অজানা ভয় তাঁকে পেয়ে বসলো। দূরে একটা শিয়াল ডেকে উঠলো। টলতে টলতে পাহাড় থেকে নেমে রতন আস্তানায় ফিরে এলেন। তার পরদিনই কলকাতায় ফিরে এসেছেন রতন। কলকাতায় এসেও ভয় কাটছে না। কর্মস্থলে কোনোদিন ফিরে যেতে পারবেন, মনে হচ্ছে না। কোনো কাজই তাঁকে দিয়ে হবে না।

রতনের এই ভয়ের ব্যাখ্যা পেতে হলে তাঁর শৈশব কৈশোরের ইতিহাস জানা দরকার। রতনের বয়স যখন বারো, তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। এক বছরের মধ্যেই রতনের বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। নতুন মার কাছে রতন ভালবাসা পেয়েছে, আদর-যত্ন পেয়েছে। কিন্তু সে ভালবাসায়, সে আদরে তার মন ভরেনি। নিজের মা চিররুগ্না ছিলেন। নিজেকে নিয়ে, নিজের অসুখ নিয়ে দিনরাত চিন্তিত থাকতেন। একমাত্র ছেলের দিকে নজর দেবার সময় পেতেন না। মায়ের ঘরে প্রবেশ নিষেধ ছিল। মায়ের রোগ পাছে সন্তানকে সংক্রামিত করে, এই ভয়ে মা বাবা দুজনেই রতনের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতেন। রতন অল্প বয়স থেকেই গম্ভীর। মায়ের ঘরের

CENTRAL LIBRARY

স্মরনের বারান্দায় একটা টুল পেতে বসে থাকতো আর গলির লোক চলাচল দেখতো। খেলাধুলোয় মন ছিল না, সঙ্গীসাথী ছিল না বললেই চলে। স্কুল থেকে এসে হঠাৎ পর্দা সরিয়ে একবার রাজেন শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করতো। কোনো দিন তাঁর চোখে চোখ মিলতো, কোনো দিন মিলতো না। চোখে চোখ পড়লেই মা ভুরু কুঁচকে ইসারায় সরে যেতে বলতেন। রঞ্জনের বুকের মধ্যে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠতো। পর্দা ছেড়ে বারান্দার টুলে বসে গলির দিকে নজর দিতেন। বাবা তখন একতলায় বসে মক্কেলের সঙ্গে মামলার জটিলতা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। গলির আলো জ্বলে উঠতো, আকাশে তারা ফুটতো, রঞ্জনের চোখে কিন্তু আলো জ্বলতো না, তার বুকের ব্যথাটাও কমতো না। এইভাবে বড় হয়েছেন। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে মায়ের শব নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা চলে গেছে, একটা গাড়ী ধরে তিনি অনু-সরণ করেছেন, মায়ের শীর্ণ দেহ চিতার আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। তিনি সব তাকিয়ে দেখেছেন। বুকের ভেতরটা টন-টন করে উঠেছে, কিন্তু বোধ হয় চোখ দিয়ে জল পড়েনি। একপাশ থেকে বারান্দায় টুলে বসা ছেড়ে সিঁড়ির ওপরের এক চিলতে ছোট ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। স্কুল, কলেজ থেকে এসে ঐ ঘরের মধ্যে বসে আকাশ দেখেছেন আর আকাশ-পাতাল চিন্তা করেছেন। কোথা থেকে আসে মানুষ, কোথায় যায়, কেন হাসে, কেন কাঁদে? এই সব চিন্তা করেছেন, কিন্তু নিজের চিন্তার কথা কারুর কাছে প্রকাশ করেন নি, নিজের চিন্তার উত্তর পেতে পুঁথিপত্তর হাতড়াননি কোনো দিন। স্কুল-কলেজের পড়ার বই ছাড়া অন্য কোনো বই পড়ার চেষ্টা করেন নি। মোটামুটি ভাল-ভাবেই পরীক্ষাগুলো পাশ করে গেছেন। নতুন মা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে সামাজিক করতে পারেন নি। অবশ্যও হয়নি স্পষ্ট কিন্তু মা-বাবার মনের মতও হতে পারেননি। মা-বাবা রঞ্জনের সম্পর্কে হতাশ হয়ে তার ছোট ভাই-বোনের ওপর নজর দিয়েছেন।

—আমি বোধ হয় অস্বাভাবিক, অন্যদের মত নয়। আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা দিয়ে আমি অপরকে আকৃষ্ট করতে পারি। স্কুল কলেজের সহপাঠীরা আমাকে কাছে ডাকেনি, সহকর্মীরাও আমাকে এড়িয়ে চলে। দুজনে কথা বলছে, আমাকে দেখেই থেমে গেল, —এমন অনেক দিন হয়েছে। তাদের দোষ নয়, আমিই তো তাদের এড়িয়ে চলি। অনুপমবাবুর বন্ধু ও অনুপমবাবুর ব্যবহারে আমি মর্মাহত হলাম কেন? আপনি যা বললেন সেই কথাই বোধ হয় ঠিক। বোধ-হয়, ঐ প্রথম অনুপমবাবুর নেমন্তন্নে আমার মন ছুটেছিল, আমিও বোধ হয় একটা বাড়ি, 'আই ডোন্ট কাউন্ট'। কিন্তু অনুপমবাবু উপরন্তু সঙ্গীর অভাবে দোহাই দায়ে পড়ে আমার সাহচর্য চেয়েছিলেন। তাঁর মনের মত সঙ্গী এসে যাওয়াতে তিনি আমাকে ত্যাগ করলেন। আমি আশাহত হলাম। বুঝলাম, 'আই ডোন্ট কাউন্ট'। আমার কোনো মূল্য নেই, আমি কোনো কাজের উপযুক্ত নই। কাজের জায়গায় ফিরে যাবার চিন্তায় আমার ভয় হয়, সারা শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। সব কিছু ঝাপসা দেখি। মনে হয়, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে, দেহ থেকে হাত-পা-গুলো যেন খুলে বেরিয়ে আসছে। সব কিছু আমার চোখের সামনে দিয়ে শূন্যপথে ভেসে যাচ্ছে। আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

অনুপমের বক্তব্য অনেকটা একই রকম, শুধু ভাষা আলাদা। বয়স প্রায় ত্রিশ। শিল্প-সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ, রাজনীতিতেও ইন্টারেস্ট আছে। দু-তিনটে চাকরী ছেড়ে, বর্তমানে সরকারী সংস্থার কেরানী। অর্থাভাবে পড়াশুনো করতে পারেননি। গ্রাজুয়েট হবার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নানা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ে পরীক্ষা দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। অনেক কবিতা, গল্প, নাটক, চিত্রনাট্য লিখেছেন। কিছু-কিছু গুণীজনের কাছে আদৃত হয়েছে। চিত্রনাট্য রচনায় তাঁর নৈপুণ্য দেখে একজন বড় পরিচালক ফিল্ম তৈরী শেখার জন্য তাঁকে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না তিনি। মাস তিনেক পুণায় থেকে কল-কাতায় ফিরে এসেছেন। অনুপম হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছে, তাঁর দারিদ্র্য, তাঁর বেশ-ভূষা, তাঁর ইংরিজী উচ্চারণ, তাঁর জীবনে বড় হবার পথের প্রচণ্ড বাধা। তিনি লিখতে পারেন, কিন্তু বলতে পারেন না। সহজভাবে বাক্যালাপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেকে প্রকাশ করতে হলে, অন্যের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যেভাবে কথা বলা দরকার, সে ভাবে কথা বলতে তিনি পারেন না। মৌখিক পরীক্ষায় তিনি নিশ্চয়ই ফেল করবেন। তার থেকেও বড় ও ভয়ের কথা এই যে তিনি বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারেন না। তাদের মত অনর্গল হিন্দী ইংরিজীতে অশালীন বাক্যালাপ করতে অক্ষম। এখানে থাকতেও তিনি হীনমন্যতা বোধ করছিলেন। চাকরীর জায়গায় অন্য কেরানীদের সঙ্গে তিনি সহজ হতে পারতেন না। তাদের ঘর সংসারের অতি সাধারণ কথা বলা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আবার উঁচুতলার সমাজে, গাড়ীবাড়ীওয়ালা লোকদের সামনে তিনি কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে যেতেন। কেউ কোন প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিতে পারতেন না। শব্দগুলো কানে যেত কিন্তু অর্থবোধ হতো না। চিঠিপত্তর মারফত তিনি দামী লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। পারতপক্ষে দেখাসাক্ষাৎ এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পড়তে গিয়ে সেটা সম্ভব নয়। সকলের সঙ্গে মিশতে হবে, কথা বলতে হবে, নিজেকে জাহির করতে হবে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি তা পারছেন না, কোনোদিন পারবেন না। তাঁর ইংরিজীতে পূর্ববাংলার টান শুনে ছেলেরা মুখটিপে হাসে, তাঁর পোষাক দেখে একজন অন্য-জনকে ইশারা করে। তিনি এসে পড়লে তারা আলাপ আলোচনা বন্ধ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। এক এক সময় রাগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে, তাদের টেরিলিনের দামী পোষাকগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে সাধ জাগে; কিন্তু মনের ইচ্ছে মনে চেপে রাখতে হয়। তাঁর কোনো বন্ধু নেই, তিনি একা, একান্ত একা। বাঙ্গালী ছেলেরাও অন্য রাজ্যের ছেলেদের সঙ্গে মিশে তাঁকে নিয়ে ইতর রসিকতা করে।

—আমার শক্তি আছে, কিন্তু সে শক্তি কোনোদিনই প্রকাশ পাবে না। আরো হাজার হাজার হতভাগ্যের মত আমিও সকলের অগোচরে একদিন নিজের ব্যর্থতার জ্বালা বুকে চেপে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবো। এমন কেউ নেই আমার জন্যে একফোঁটা চোখের জল ফেলে, আমার কথা অন্যকে বলে, আমার ব্যথা বোঝে, আমাকে সান্ত্বনার বাণী শোনায়। আমি যদি সুযোগ পাই, উপযুক্ত পরিবেশ পাই, তবে সকলকে না হোক, অনেককে ছাড়িয়ে যেতে পারি। কিন্তু কোনোদিনই আমি সুযোগ পাব না, বড় হব না। হব কি করে? আমি যে কারুর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেই পারি না। মনে হয় সব চোখেই যেন বিদ্রূপের হাসি। সকলে আমার উচ্চা-কাঙ্ক্ষার কথা শুনে মনে মনে হাসে। জেলে এও বড় হতে চায়, ভদ্র সমাজে মিশতে চায়, সাহিত্য করতে চায়, ছবি তুলতে চায়! আমার বংশে কেউ কোনোদিন লেখা-পড়া শেখেনি। আমার মাবাবার অক্ষর পরিচয় ছিল না। আমাদের বংশের সকলেই মাছ ধরে, মাছ বেচে জীবিকা অর্জন করেছে। দেশভাগের পর আমার মাকে নিয়ে আমি কোলকাতায় আসি আমাদের গ্রামের অন্যান্য মৎস্যব্যবসায়ীদের সঙ্গে। শহরের উপকণ্ঠে আমরা জবরদখল করে ঘর বাঁধি। সেখানে আমাদের জাতের লোকদের একটা ছোটখাটো কলোনী গড়ে ওঠে। অন্যান্যেরা জাতব্যবসায় গ্রহণ করে। আমি গ্রামের এক মাস্টারমশাইয়ের চেষ্টায় এখানকার একটা স্কুলে বিনাবেতনে পড়বার সুযোগ পাই। আমার খুড়োজ্যাঠারা আমার ও মার খরচ চালাতেন। আমার লেখাপড়া শেখায় তাঁদের উৎসাহ ছাড়া সম্ভব হতো না। কিন্তু এখন তাঁরা আমাকে আর স্নেহ করেন না। তাঁদের পছন্দমত পাত্রী বিয়ে না করাতে আমি তাঁদের বিষ নজরে পড়েছি। কলোনীর কেউ আমাকে চায় না। তারা আমাকে ভিন্ন জগতের জীব মনে করে। আমার কলোনীর বাইরের উঁচু [illegible] [illegible] আমাকে

বোধ হয় চায় না। তাদের বাড়ীতে গিয়ে আমি কারুর চোখের দিকে তাকাতে পারি না।

বিশেষ করে মেয়েদের সামনে আমি একেবারে কুঁকড়ে যাই। তারা কবিতা পড়তে বললে আমার গলা শুকিয়ে যায়। ঠোঁট কাঁপে; স্বর বন্ধ হয়ে যায়। আমার অবস্থা দেখে সবাই মুখ টিপে টিপে হাসে। ব্রাহ্মণ কায়স্থদের থেকে আমি কোনো অংশে কম নয়, বার বার এই কথা আউড়েও আমি সাহস পাই না। ঐসব বাড়ীর ছেলেরা কোনোদিন কথায় বা ব্যবহারে আমার পিতৃ-পিতামহের পেশা নিয়ে কটাক্ষ করে নি, তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় তাদের চোখে যেন প্রচ্ছন্ন কৌতুকের ছায়া ফুটে উঠেছে, তাই আমি তাদের চোখে চোখ রাখতে পারি না। নিজের পেশা পরিত্যাগ করে কাকা-জ্যাঠাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছি। বামুনদিগের পেশা ধরা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারছি না। হয়তো কেউ আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে না, হয়তো আজকের দিনে বর্ণাশ্রমের সংস্কার থেকে শিক্ষিত মানুষ মুক্ত; কিন্তু আমার মন সে কথা মানতে চায় না। আপনি আমাকে পুণায় ফিরে যাবার সাজেশন দেবেন না। পুণায় গিয়ে কিছুতেই আমি অন্যদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবো না। পুণায় যাবার কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। আমি কেরানী গিরিই করবো। আমি কোনো কিছু বড় কাজের উপযুক্ত নই।

দুজনে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে মানুষ হয়ে প্রায় একরকমের অসুবিধা ও রোগলক্ষণের শিকার হয়েছেন। রতনের বিচ্ছিন্নতা ও নিউরোটিক মানসিকতার মূলে রয়েছে পরিবারের অসুস্থ আবহাওয়া। মায়ের অসুস্থতা ও পিতার নির্মমতা তাঁকে অস্বাভাবিক করেছে কিন্তু সুকুমার বৃত্তি-গুলো একেবারে শুকিয়ে যায় নি। স্নেহ ভালবাসা পাবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে রয়েছে। অন্যের কাছে স্বীকৃতি পাবার ইচ্ছেও মনের কোণে আছে। তপনবাবুর আহ্বানে তাই তিনি আনন্দিত হন, তপন-বাবুর রূঢ় ব্যবহারে তাই তিনি অন্যের তুলনায় বেশি মর্মাহত অপমানিত বোধ করেন। তাঁর আনন্দ বেদনাবোধে শিশুমনের পরিচয় মেলে। তিনি বাড়ীর ছোট ঘরটাতে আশ্রয় নিয়ে বাইরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চান। তপনবাবুদের আকর্ষণ বিকর্ষণ দুইই তাঁর কাছে সমান বিপজ্জনক। শৈশবে এক আধদিন মা কাছে ডেকে আদর করতে গিয়ে সহসা মুখ ফিরিয়ে ওঁকে ঠেলে দিয়েছেন। মায়ের নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর দেহের রোগজীবাণু পুত্রকে সংক্রামিত করবে, এই ভয়ে মা এইরকম ব্যবহার করেছেন। বড় হয়ে রতন সেটা বুঝেছেন, কিন্তু তবুও শৈশবের সেই প্রত্যাখ্যানটি ভোলেননি। তপন-বাবু না জেনে রতনের সেই গভীর ক্ষতস্থানটিতে আঘাত করে বসেছেন। পিতামাতার সন্দেহ ও রূঢ় ব্যবহারের জন্যই বোধহয় রতনের মন একেবারে মরে যায় নি। এই বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে নিজের ক্রিয়াকলাপের কোনো যোগ নেই। বিচ্ছিন্নতা তাঁকে নিষ্ক্রিয় করেছে।

অনুপমের বিচ্ছিন্নতার মূলে দারিদ্র্য ও বংশপরম্পরাগত প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর শক্তির অপরিকল্পিত সংগ্রাম প্রচেষ্টা। তাঁর অসম্পূর্ণতার জন্য দায়ী প্রধানত সমাজব্যবস্থা। তিনি বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাও করতে পারেন না, আবার কাকাজ্যাঠাদের মতন এই ব্যবস্থাকে গ্রহণও করতে পারছেন না। তিনি একক প্রচেষ্টায় সমাজের নীচুতলা থেকে উঁচুতলায় উঠতে চাইছেন, কাজেই হীনমন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতাবোধ তাঁর কাটছে না।

—মনোবিদ

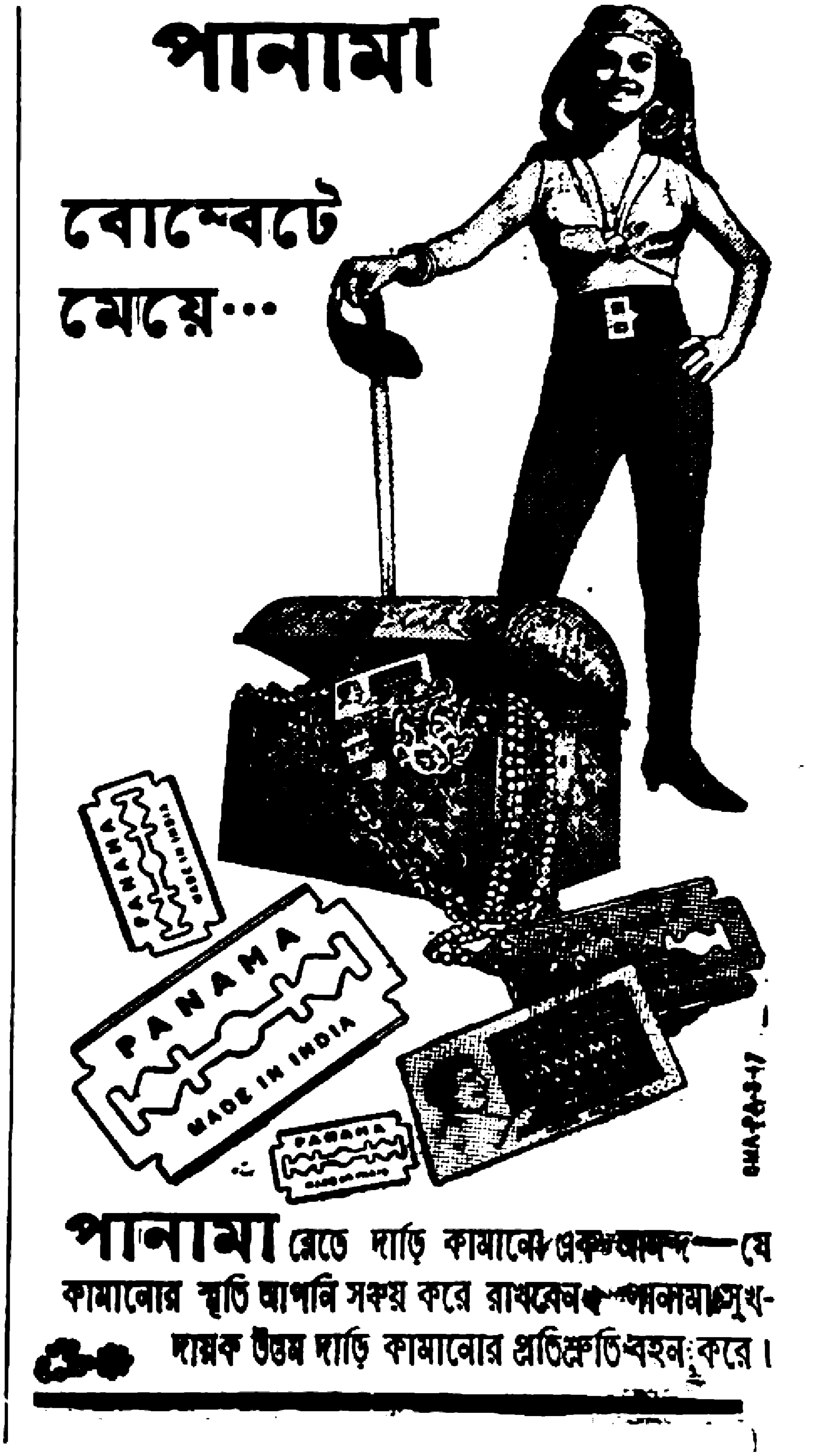

বি. ভিটুলের হাউস গ্রুপ

দ্বিতীয় ত্রৈবার্ষিক চিত্রকলা প্রদর্শনী

তিন বছরের ব্যবধানে আবার দিল্লীতে আয়োজন করা হয়েছে সমকালীন বিশ্ব-শিল্পের দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনীর— সেকেণ্ড ট্রায়েনাল অব কন্টেম্পোরারী ওয়ার্ল্ড আর্ট-এর। আকারে ও আয়তনে এবারকার প্রদর্শনী বিপুলতর। তিনটি বিভিন্ন জায়গায় রবীন্দ্র ভবন, ত্রিবেণী কলাসঙ্গম ও জয়পুর হাউসে সাজানো হয়েছে শিল্পকাজগুলো। সংখ্যায় এগুলো আটশো-এর বেশী। গতবারের ছত্রিশটির তুলনায় অংশগ্রহণকারী দেশ এবারে সাতাশ। পূর্ণাঙ্গতেই কাজ শুধু বেশী নয়, বহু বিচিত্রও বটে। এই বৈচিত্র্য পরিবেশনায়, শৈলী ও মাধ্যমের ব্যবহারে এবং আকারে ও প্রকারে নানাভাবে পরিব্যাপ্ত। কথাটি উপস্থাপিত ছবি। ভাস্কর্য-গ্রাফিক্স সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিল্প সংগ্রহ ছাড়াও, অনুষঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন দেশের শিল্প প্রকাশনাও কিছু আলাদাভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

পরিবেশনায় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে ব্রুটেন ও অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে। আমন্ত্রিত দেশগুলোর জন্য কাজের সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল কুড়ি। বেশীরভাগ দেশ থেকেই কয়েকজন শিল্পীর বরং সীমিত সংখ্যক এই কাজ প্রেরিত হয়েছে। ব্রুটেন পাঠিয়েছে একই শিল্পী অ্যালান ডেভির কুড়িটি কাজ। তার মধ্যে দশটি তেলরং ছবি জলরং ও বাকিগুলো লিথোগ্রাফ। এর প্রায় সবগুলোতেই প্রতীক ধর্মী ছাপ বেশ স্পষ্ট। অস্ট্রেলিয়ার

প্রকাশ কর্মকারের [illegible]

প্রিন্ট : গাল্যার্দো (কিউবা)

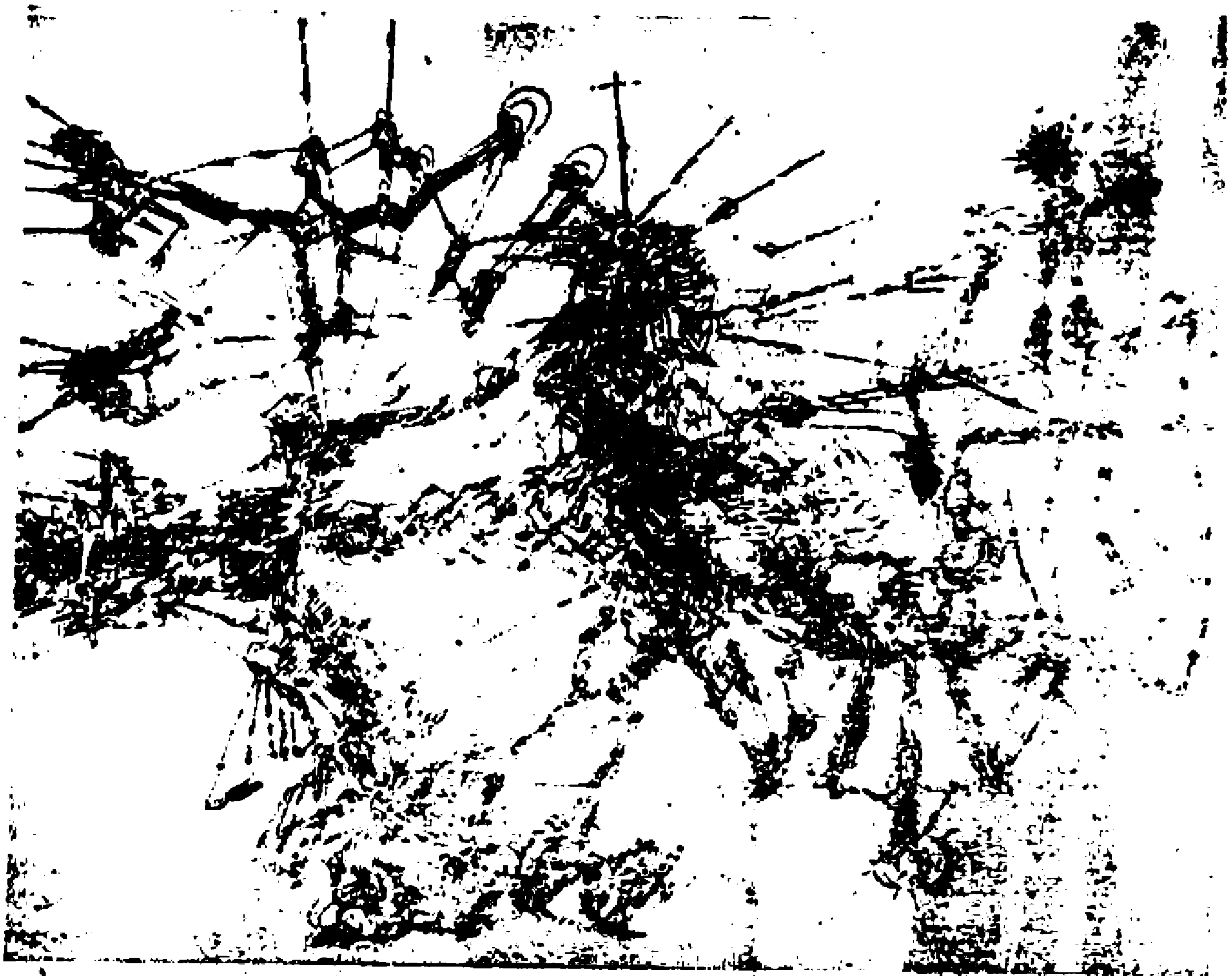

তরফেও পরিবেশিত হয়েছে একখানের কাজ। শিল্পী ডন হান্টার বিশেষভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন সেদেশ থেকে। দেওয়াল-গাত্রে স্টেনসিলসহযোগে কটি নকশা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। একে বলা হয়েছে এনভায়রোনমেন্টাল পেন্টিং বা পারি-পার্শ্বিকগত চিত্র। ফ্রান্সের তরফেও এই জাতীয় একটি কাজ অন্যান্য শিল্প-কর্মের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। তবে সেটি আঁকা ছবি নয়—ওপরের সিঁড়ি থেকে বৃত্তাকারে ঝোলানো কয়েকটি প্লাস্টিক শীট। ফলে ক্রমপরিবর্তনশীল আলোছায়ার খেলাই সেটার দর্শনীয়। তিনতলায় এই ছাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কটি কাজেও দেখছি, কিন্তু ভিন্ন হলেই সব সময় যে তা শিল্পগুণ-সম্মত হয় না, সেটা অন্তত বর্তমান ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। এজাতীয় কোনও কাজের পদক বা সার্টিফিকেট জোটেনি।

যে ছজন শিল্পী পুরস্কারলাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের কাজই প্রিন্ট গ্রাফিকস ও পেন্টিং পর্যায়ভুক্ত। ষষ্ঠ বিজেতার কাজ কাঠ, প্লাস্টিক ও তার দিয়ে তৈরী। এটি অপ্-আর্ট বলা যায়। পুরস্কার বিজয়ী শিল্পীরা যথাক্রমে : মারিও গাল্যার্দো (কিউবা), জেরী গ্নেক (পোলাণ্ড), ঈশ্বর সাগর (ভারত), মিরা সেন্ডেল (ব্রাজিল), মিতো ওশিহারা (জাপান) এবং পাওলো পিয়ের হ্যাভারন (ফ্রান্স)। এক আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরস্কার স্থিরীকৃত হয়। ভারতের অধ্যাপক এন, এস. বেন্দ্রে সভাপতিত্বে গঠিত এই মণ্ডলীতে ছিলেন : মঃ বি দোরিবাল (ফ্রান্স), ড এইচ. আকে (পশ্চিম জার্মানী), মিঃ টি, ওদ্‌য়ো (জাপান), মিঃ এম, পেদ্রোসা (চিলি), মিঃ আর স্টানিস্লাভস্কী (পোলাণ্ড) ও মিঃ জে. জে. সুইনী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। ছটি পুরস্কার ছাড়াও বিচারকমণ্ডলী পশ্চিম জার্মানীর পিটার নাগেল ও যুগোস্লাভিয়ার মিরোস্লাভ সুতেজ-কে সম্মানপত্র সার্টি-ফিকেট অব অনার দেওয়ার জন্য অনুমোদন করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমজন পেশ করেছেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি আর দ্বিতীয়জন প্রদর্শন করেছেন—কার্ডবোর্ডের রঙীন কিউব ও সার্কেল সহযোগে তৈরী কোলাজ।

প্রদর্শনীতে মোটামুটিভাবে দুটি জিনিস নজরে আসে। এক, শিল্পীদের বিমূর্ত রূপরীতির প্রতি ঝোঁক। মনুষ্য-মূর্তি বা প্রকৃতি এবং নিসর্গ দৃশ্য কিছু কিছু আছে, সন্দেহ নেই, তবে উল্লিখিত ঝোঁকটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় প্রয়োগবিধি বা কারিগুরির প্রতি শিল্পীদের এক বিশেষ প্রবণতা। গ্রাফিক আর্টের ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষার নিরীক্ষার বৈচিত্র্যের যে অন্ত নেই। সিল্ক স্ক্রীন প্রিন্টের কাজ প্রচুর নজরে আসে। কিন্তু গ্রাফিক ছাড়াও বৈজ্ঞানিক নানা উদ্ভাবনের সঙ্গে তাল রেখে বলা কাজেরও সমাবেশ ঘটেছে অনেক। ইতালীর প্রদর্শিত শিল্পকর্মগুলোর উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে করা চলে। বস্তুতঃ ইতালীর প্রায় সব কাজই প্লাস্টিক বা বিশেষ ধরনের ধাতুতে তৈরী। এসব উপকরণেই দেখা গেল, সৃষ্ট হয়েছে অপ, পপ আর কাইনেটিক আর্ট। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আধারে ভর্তি সাবান জলের মতো কোনও তরল পদার্থ। তাইই নাড়া-চাড়া বা আবর্তন-সম্প্রসারণ এক দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পকর্ম হিসেবে স্থান পেয়েছে।

কি গতানুগতিক ধারার অনুবর্তী, কি নতুন পরীক্ষায় সমৃদ্ধ, যেভাবে বা যে-আকারেই থাকুক, সামগ্রিকভাবে কয়েকটি দেশের কাজ দর্শকমনে সহজেই ছাপ রাখতে পেরেছে মনে হয়। এ সম্পর্কে যুগোস্লাভিয়া, কোরিয়া, স্পেন ও জাপানের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখনীয়। বিশেষভাবে ভাস্কর্যে, যুগোস্লাভিয়া, গতবারেও প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। এবারেও ভাস্কর্য, সংখ্যায় কম হলেও, উঁচু মান বজায় রাখতে পেরেছে। কিছু বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে

উডকাট : পানেক (পোল্যাণ্ড)

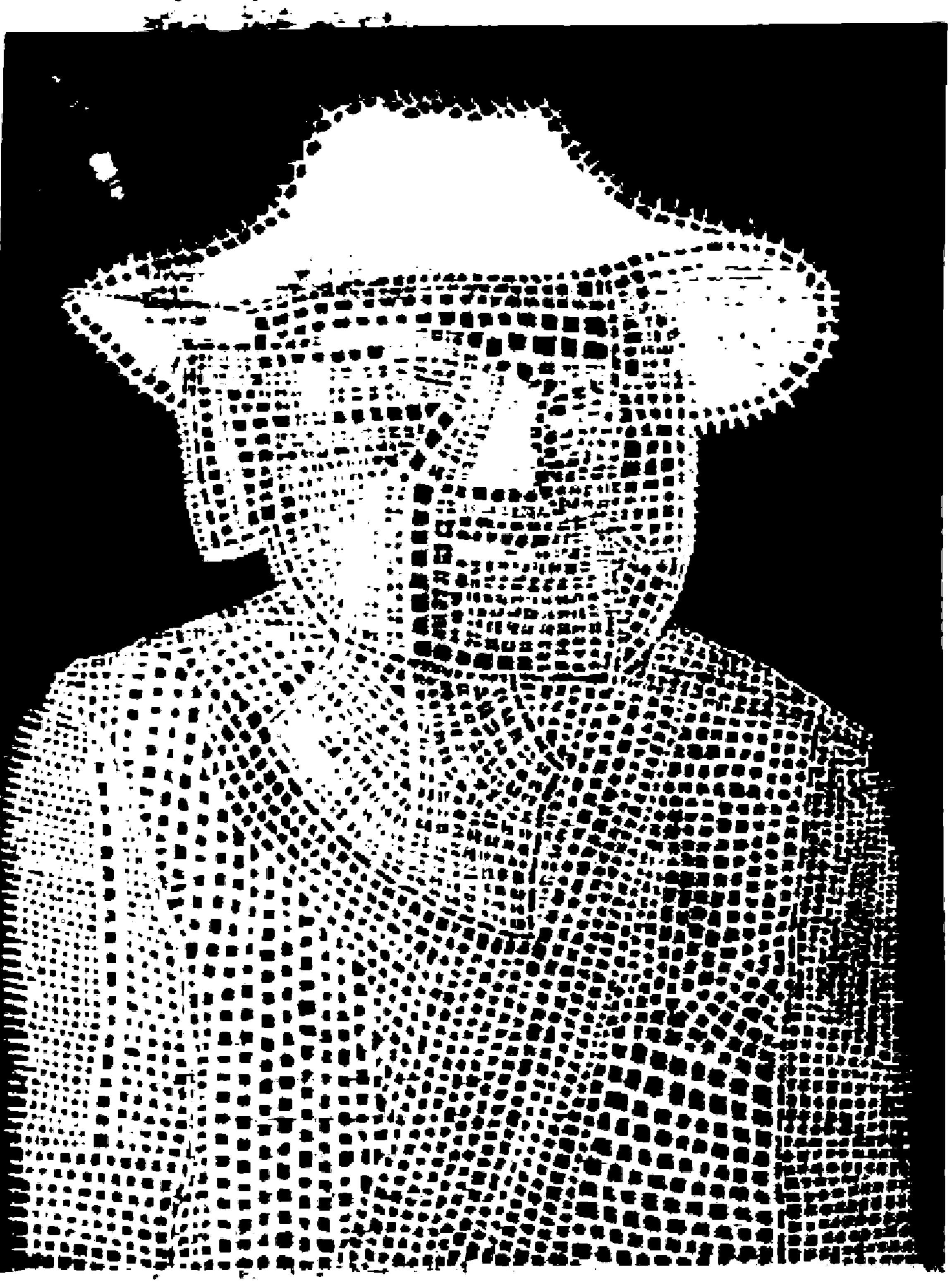

ছবিগুলো। নানা ধরনের সব কাজ তেল-রঙের কম্পোজিসন, ড্রইং ও কোলাজ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে যুগোশ্লাভিয়া—অংশটি বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। কোরিয়া থেকেও ম্যানড্রালেও ধাতুনির্মিত কটি কাজ যা এসেছে—সবগুলোই মোটামুটি একটা উঁচু মানে পৌঁছেছে। স্পেন, গতবারে মুখ্যতঃ গ্রাফিকস পাঠালেও এবারে সবরকম কাজই পাঠিয়েছে। কটি কোলাজ চমত্কা সহযোগে প্রস্তুত, বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। এল্যুমিনিয়ম পাত পিটিয়ে রিলিফ এফেক্টে করা জোস লুই স্যাঞ্চেজোর কটি কাজও কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রাফিকের মানও বেশ উন্নত। সত্যেই স্পেন অংশটিও তাই মনে ছাপ ফেলতে পেরেছে। জাপান গতবারে প্রাপ্ত প্রাইজ বা উচ্চতম সম্মান-জয়ের গৌরব অর্জন করেছিল। এবারেও তাই জাপান সম্পর্কে উঁচ্চাশা পোষণ খুব স্বাভাবিক। আর সে-আশা খুব অপূর্ণ থাকেনি। প্রকাশ-ভঙ্গী বা রচনাশৈলীতে জাপানী কাজে "পরম্পরা"র ছোঁক পাওয়া দুষ্কর হলেও, "আধুনিকতার" দৌড়ে-জাপান এগিয়ে গেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রদর্শিত জাপানী গ্রাফিকসে নিঃসন্দেহে দক্ষকের রীতিভঙ্গী মোক্ষের এবং কাজও সে হিসেবে উচ্চমানের।

ফ্রান্স অংশটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছাপ রাখার মতো কাজ গতবারে এ-অংশে প্রায় ছিলই না। বলা যায়, ত্রুটি সংশোধন ঘটেছে। গ্রাফিকস কটি ভাল রয়েছে। তবে জর্জেস ম্যাথুর তেলরঙে-করা কটি অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পোজিসন খুবই মনে রাখার মতো। পশ্চিম জার্মানী গতবারে কেবল ভাস্কর্য প্রদর্শন করেছিল, এবারে শুধু ছবি পাঠিয়েছে। বেশ ছিমছাম পরিপাটি ব্যাপার বলা যায়। আরও একটি দেশ সামগ্রিকভাবে স্মরণীয় কাজ পরিবেশনে সক্ষম হয়েছে। সেটি মালয়েশিয়া। একেবারে স্বকীয় হয়ত নয়, তবুও ওয়াং ওঁগ ও চাঁদর অবলম্বনে ইব্রাহিম হুসেনের আঁকা কটি ক্যানভাস বলিষ্ঠ হাতের পরিচায়ক। এ্যান্টনী লাউ-কৃত ঢালাই এ্যালুমিনিয়মে করা মেকং নদী কাজটিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আয়োজনকারী দেশ হিসেবে ভারতকে ত্রৈবার্ষিকীতে বড় আকারের একটি সংগ্রহ নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছে। সর্ব-সমেত একশো পাঁচটি শিল্পকর্ম এ-অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে বাদ-বিতণ্ডা প্রচুর হয়েছে। প্রতিবাদের কিছু বক্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়, তবে অন্যভাবে এসবের আলোচনা ও মীমাংসা হলেই খুশীর কারণ ঘটত। প্রতিবাদ সাপেক্ষে অনেক শিল্পী কাজ পেশ করতে রাজী হননি। সকলের সহযোগিতা পেলে বিষয়টা সর্বাদিকেই শোভন ও সঙ্গত হত, সন্দেহ নেই। তবে বর্তমানে যা প্রদর্শিত হয়েছে, মোটামুটিভাবে তা দর্শকমনে রেখাপাত করতে পেরেছে মনে হয়। সমকালীন নানা ধরনের কাজ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্যোতনা মোটামুটি ফুটে উঠেছে ভারতীয় অংশে। এ. রামচন্দ্র ও বিকাশ ভট্টাচার্যের মনুষ্যমূর্তির ছবির সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে এস. বি. পালসিকর, জয়ন্ত পারিখ বা যতীন দাসের বিমূর্ত ধরনের শিল্পসৃষ্টি। "তন্ত্র" প্রণোদিত উল্লেখযোগ্য কটি কাজ পেশ করেছেন—জি আর্ সন্তোষ ও বীরেন দে। গণেশ পাইন কৃত মুখ্যত ফ্যান্টাসীধর্মী ছবি-গুলোও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গে পরমজিৎ সিংয়ের তিনটি ক্যান-ভাসও উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ কর্মকারের কাজেও একটা বিশিষ্ট মেজাজ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরস্কার বিজয়ী ঈশ্বর সাগরের কাজে বিশিষ্টতার তেমন কিছু স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া গেল না। ভাস্কর্যের সংখ্যা যেন বেশী প্রতীয়মান হল। মনে হয় গোটা কয়েক অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত। প্লাস, পেটাই ধাতু, মার্বেল ও কাঠ নানা মাধ্যমের কাজই প্রদর্শিত হয়েছে। চিন্তামণি করের মার্বেলের কাজটিতে ছান্দসিকতা ফুটে উঠেছে। আবার কাঠের কাজে বর্ণাবলেপ ও ধাতুর টুকরো যোগ করে একটা ভিন্ন মেজাজ আনতে সক্ষম হয়েছেন রঘুনাথ সিংহ। ধনরাজ ভগতের কাজে মুন্সীয়ানার ছাপ থাকলেও মনে হয়, আরও ভাল কাজ তাঁর কাছে হয়ত পাওয়া যেতে পারত। এদেশে আজ গ্রাফিকের প্রচলন ও পরীক্ষা অনেক এগুলেও, প্রদর্শিত কাজ-গুলো তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি। আরও উন্নতমানের কাজ নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারত। কৃষ্ণ রেড্ডি, বিমল ব্যানার্জি ও দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ড্রইংয়ে জে সুলতান আলি, সুনীল দাস ও যোগেন চৌধুরীর কাজে একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ মেলে।

সব মিলিয়ে দ্বিতীয় ত্রৈবার্ষিকী বহুলাংশে তার উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম হয়েছে—এক জায়গায় বিশ্বব্যাপী নানা শিল্পধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। হয়ত অনেক কিছু অমিল, হয়ত আরও ভাল কিছু হতে পারত তবুও সামগ্রিকভাবে যে এই প্রদর্শনী একটা ছাপ ফেলতে পেরেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

॥ হাসিল ॥

বাড়ীতে ঢোকার আগে লোকটাকে দেখতে পায় মীরা। লোকটা পিছন ফিরল। একটু পরে ঘুরে দাঁড়ায়। অবাক হয় না মীরা। রজত হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য! রাগ বা বিদ্বেষ কিছুই সে টের পাচ্ছে না। বোধহয় আজকের অফিসের ঘটনা তার সমস্ত বোধশক্তিকে ভোঁতা করে দিয়েছে!

—তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা ছিল মীরা। রজতকে অতিরিক্ত স্মার্ট দেখায়, মাত্র পাঁচ মিনিট তার বেশী বিরক্ত করব না।

—ঘরে এস। আর কিছু বলল না মীরা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। পিছন ফিরে একবার তাকায়। রজত সাবধানে পা ফেলছে। মাথা নীচু। পাতলা হয়ে আসছে মাঝখানের চুল। ঈষৎ টাকের আভাস।

তালা খোলার সময় রজত কথা বলতে যায়, মীরা ইশারায় তাকে চুপ করতে বলে। মানুষের বয়স বাড়লে বোধহয় বেশী কথা বলার প্রবণতা দেখা যায়। লাইট জেলে দ্রুত বিছানার চাদর ঠিকঠাক করে পর্দা তুলে রজতকে ভেতরে নিয়ে আসে।

চেয়ারে বসে রজত সিগারেট ধরাল। মীরা পাশের ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টে এল। রজত গভীর চিন্তায় মগ্ন। মীরা স্টোভ ধরাল। দূরে রজত কী সব বলছে। স্পষ্ট শুনতে পেল না। চায়ের জল চাপিয়ে ভাবল এখন আমি কী করবো? সব তো শেষ হয়ে গেছে। কাল অফিসে পৌঁছেই মিঃ কাপুর হাতে ডেকে পাঠাবেন। তারপর দুঃসংবাদ। তারপর?

—মীরা!

—কী? রজতের মুখ দেখতে থাকে মীরা। এই লোকটাকে একদিন আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। পল্টুকে অনেক দিন দেখি নি। ভাল থাকলেই হোল। শুধু মাঝে মধ্যে যদি একটু দেখা যায়...রজত কেন এসেছে...ওর মুখ ভারী, হাসলে দু চোখ প্রায় বুজে আসে, খুব ড্রিংক করছে, আর ফ্ল্যাটে টেনে আনছে মেয়ে...এই তো চেয়েছিল, এই রকম খোলা জীবন, বন্ধনহীন...।

—এই নাও। চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় রজতের দিকে মীরা। আবার রজতের ঠোঁট নড়ছে। সে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে চায়ের কাপ। রজতের মুখ কাঁপছে। ঢেউ খেলে যায় আয়নায়। একটার পর একটা ঢেউ। অতীতের মণি-মুক্তো, যদি কিছু থেকে থাকে, উঠে আসছে পর-পর। সিঁথির দিকে নজর যায়। খাঁ-খাঁ করছে। ফাঁকা প্রান্তর।

পাঁচ বছর আগে হলে সে কি সাহস পেত? পারত কী রজতকে অস্বীকার করতে?

—জান মীরা। রজত আপন মনে বলে, সব ঠিকঠাক আছে। যেদিন তোমার সময় হবে টেলিফোনে জানাবে। কোর্টে গিয়ে শুধু একটা সই। না না, তুমি ভয় পেয় না। ঝামেলার কিছু নেই। সব ব্যবস্থা আমি করেছি। পল্টু ভালই আছে। আজকাল তোমার কথা প্রায় জিজ্ঞেস করেনা বললেই চলে।

—জিজ্ঞেস করলে কী বল? মীরা আস্তে-আস্তে বলে, বল বুঝি, তোমার মা মারা গেছে।

—না। ও বিশ্বাস করে না। বড় হয়েছে তো। বলি, তোমার মা রাগ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে! মীরা, সত্যি বল, তোমার কী পল্টুকে দেখতে একটুও ইচ্ছে করে না?

কোন উত্তর না দিয়ে মীরা মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে কপাল চেপে ধরল। রজতের উদ্দেশ্যটা কী সে ঠিক বুঝতে পারছে না। ওর দুর্বল জায়গায় জেনে-শুনে বার-বার কেন আঘাত দিচ্ছে। এখনও কী ওর ধারণা, শেষ পর্যন্ত সে ফিরে যাবে।

পাঁচ মিনিটের নাম করে ঘন্টাখানেক তো কাটিয়ে দিল। মীরা নিঃশব্দে কাজ করতে থাকে। আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। প্রথম-প্রথম সবাই ভাল। কিছুদিন গেলেই আসল স্বরূপ বোঝা যায়। জোরো লাগে তখন। ছোট মনে হয়।

—আচ্ছা, তাহলে উঠি। আমি ঠিক সময়ে জানাব।

পর্দা তুলে দাঁড়ায় মীরা। জাত বেরিয়ে গেলে দরোজার ছিল এঁটে দেয়।

সংক্ষেপে রান্নার পাট সেরে ফেলবে। এখন সে একটু নিরিবিলি থাকতে চায়। মীরা ভাত চাপিয়ে দেয়। তারপর বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। কিছুই সে স্থির করতে পারছে না কাল সব স্থির হয়ে যাবে।

এত রেগে গিয়েছিল যে, সে নিজেই রেজিগনেশন দিত। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করেছে। ডিরেক্টর সম্পর্কে তার ধারণা বদলে গেছে। লোকটাকে মনে হয়েছিল বিশিষ্ট ভদ্রলোক। মনে মনে খুব শ্রদ্ধা, পোষণ করতো। এখন মনে হচ্ছে লোকটা সম্মানের অযোগ্য।

ওখানে আর চাকরি করা যাবে না। বীথু তার দুর্নাম করতে কিছুই বাকী রাখেনি। ওর যদি শাস্তি পাবার ভয় থাকত তবে না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু সেদিকে তো কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। বীথির সাহস আরও বাড়বে। দিনের পর দিন সে অকারণে অপমানিত হবে।

কিন্তু চাকরী ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে হতেই সে দু চোখে অন্ধকার দেখে। যা দিনকাল চট করে অন্য কোথাও চাকরী পাওয়া সহজ নয়, যদিও সে চেষ্টো। কোথায় আশ্রয় মেলে তখন? যাদের ছেড়ে চলে এসেছে, যারা তার প্রিয়জন, শুধু এক বিন্দু দয়া থাকতে তাদের কাছে [illegible] যেতে পারবে না। ফিরে গেলে [illegible] তাড়িয়ে দেবে না। কিন্তু [illegible] দৃষ্টিতে দেখবে। আড়ালে [illegible] হাসবে। [illegible] তো তেজ দেখিয়ে চলে গিয়েছিলে—আবার ফিরে এলে কেন! এত সহজ নয় স্বাধীন-ভাবে বেঁচে থাকা। তোমার তো সাহস কম নয়, স্বামী যেহেতু মদ্যপ, অমনো-যোগী; তাকেই ধিক্কার জানিয়ে গৃহত্যাগ করলে!

দরোজার কড়া নাড়ছে কে আবার। উঃ, একটু একা থাকতে দেবে না। তার এখন জীবন-মরণ সমস্যা। [illegible] ছাড়া আবার কে। মীরা তাড়াতাড়ি [illegible] পর্দা ফাঁক করল। [illegible] জীবন। সকালবেলাই [illegible] ছেলেটি [illegible] স্মার্ট যুবকটি। কিন্তু এখানে কী [illegible]

—কাকে চাই?

—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আমার নাম সমীর [illegible]। সুরেনবাবু আমার কাকা। আমি দিল্লীতে চাকরী করতাম—কলকাতায় বদলী হয়ে এসেছি।

কলকাতায় বদলী [illegible] আমার মাথা কিনে নিয়েছে [illegible]। আলাপ করতে চায়। কেমন সহজভাবে কথাটা বলল। কোন ভনিতা নেই, কোন জড়তা নেই।

—আসুন। মীরা একপাশে সরে দাঁড়ায়। সমীর ভেতরে ঢুকলে দরোজা বন্ধ করে না। তবে পর্দা ফেলে দেয়। মুখের ওপরতো আর না করা যায় না। যদিও এখন আলাপ করবার উৎসাহ বা মুড নেই। দু-চার কথা বলে সমীরকে হটাবে।

চেয়ারে বসে সমীর মীরার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল, আমি যদি সিগারেট খাই, আপত্তি হবে না তো আপনার?

—আমি যদি আপনার গার্জেন হতাম, খেতে নিষেধ করতাম। ওসব খেয়ে শুধু শরীর নষ্ট। ফ্যাসান আর বিলাসিতা। ওই পয়সায় পুষ্টিকর কিছু খেলে কাজ হয়।

সমীর কোন জবাব দিল না। সিগারেট ধরাল। মীরা ভাত নামিয়ে চায়ের জল চাপায়। সুপুরুষ চেহারা। বাইরে সবাই ভাল। কথাবার্তায় মিষ্টি। মানুষের বাইরের চেহারা দেখে মুগ্ধ হবার মত বয়স বা মানসিকতা আর নেই।

—আপনার এক দাদার কথা শুনেছিলাম। উনি বোধহয় এখনও অফিস থেকে ফেরেন নি।

—উনি ব্যবসা করেন। কিছুদিনের জন্যে উনি বাইরে গেছেন।

মীরা সামান্য অস্বস্তি বোধ করল। কতদিন গোপন রাখতে পারবে শোভনের কথা কে জানে। সুরেনবাবু বৃদ্ধ মানুষ। সেকেলে। কথা জানতে পারলে কী আর আশ্রয় দেবে। ভয় তাঁর স্ত্রীকে। ঘর ভাড়া নেবার সময় বারবার তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। বিশেষ করে তার সিঁথির দিকে। সাংঘাতিক মহিলা নাকি, শুনেছে কৃষ্ণার কাছে।

—এই নিন। মীরা চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় সমীরের দিকে, আপনার কাকার শরীর শুনেছিলাম খারাপ। এখন কেমন আছেন?

—বুড়ো আর বেশিদিন বাঁচবে না। সমীর হাত ঘড়ি দেখল, আপনি বিরক্ত বোধ করছেন না তো? অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলায় একা ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি।

হাসিমুখেই মীরা কথার জবাব দেয়। কিন্তু মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। এর তো ওঠবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যাবেলায় দশ সমর্থ জোয়ান ছেলে ঘরে বসে থাকবে কেন! বাইরে বেরিয়ে পড়ো। রাতের কলকাতা দেখ। কচি খোকাটি তো নও যে, নাক টিপলে দুধ গলবে। তোমার যা কন্দর্প চেহারা, সুন্দরী মেয়ে জোটাতে বেশি দেরী হবে না। বান্ধবীকে বগলদাবা করে সিনেমা অথবা নৌকো ভাড়া করে গঙ্গা ভ্রমণ—যা ইচ্ছে হয় করগে। শুধু বাপু আমার ঘরে এসে যখন তখন জ্বালাতন কর না। ঢের তোমার মত যুবক দেখেছি। এমনিভাবে হাসত শোভনও। গল্প করতে আসত। তারপর?

—এই দেখুন গল্প করতে বসলে সময়ের হিসেব থাকে না। সমীর উঠে দাঁড়াল, আজ উঠছি। মাঝে মাঝে এসে আপনাকে জ্বালাতন করবো কিন্তু বলে রাখছি। অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকলে।

—আপত্তি কিসের। মীরা পর্দা তুলে ধরে। সমীর সামান্য মাথা নীচু করে বাইরে আসে। তারপর মীরার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নমস্কার করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

দরোজা বন্ধ করে মীরা দু-হাতে কপালের রগ চেপে ধরল। উঃ মাথাটা কেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। একজন গেল তো অন্যজন এল। সে স্টোভ নিভিয়ে দিল। সাদা আলো নিভিয়ে সবুজ আলো জেলে দেয়। তারপর প্রায় টলতে টলতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

পরের দিন অফিসে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে মীরা, তখন কৃষ্ণা এসে উপস্থিত।

—কয়েকদিন যাবৎ শরীরটা খারাপ। কৃষ্ণার মুখে পাণ্ডুর হাসি, আজ খুব সুন্দর লাগছে আপনাকে। [illegible] সেজেছেন।

কৃষ্ণার ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকাল মীরা। ছেলেপুলে হবে নাকি? ময়লা শাড়ি। অবিন্যস্ত মাথার চুল। দু চোখের নীচে কালো দাগ। রোগা রোগা হাত-পা।

মীরার তাকানোর ভঙ্গি দেখে এক মুহূর্তের জন্যে বোধহয় লজ্জায় মাথা নীচু করল কৃষ্ণা। তারপর মৃদুস্বরে বলল, আপনার দাদার ঘর তো সবসময় তালা বন্ধ দেখি। উনি কী বাইরে গেছেন?

হঠাৎ রেগে যায় মীরা, সে খবরে আপনার কী দরকার? সব সময় অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবেন না। এটা বদ-ভ্যাস, মনে রাখবেন।

পলকে কৃষ্ণার মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সে কিছুক্ষণ আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মীরার দিকে। তারপর নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করে মীরা বাইরে এসে দরোজায় তালাচাবি লাগায়। তারপর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে। পিছনে পদশব্দ। একটু পরে সমীর তার পাশে এসে দাঁড়াল। সুসজ্জিত পোষাক। চকচক করছে মাথার চুল।

মীরা সামান্য হেসে তাড়াতাড়ি হেঁটে অগ্রসর হয়। এখন আলাপ করবার সময় নেই। তাছাড়া এই সমীর ছেলেটিকেও সহজে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া ঠিক হবে না। কেননা আলাপ পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হলে

মনোবল হারিয়ে ফেলবে। তার সামনে লোকজনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

—একটু, আস্তে হাঁটুন। সমীর লম্বা লম্বা পা ফেলে ওকে ধরে ফেলে, আপনার অফিসটা কোনদিকে বলুন। ট্যাক্সীতে একটা 'লিফট' দি আপনাকে।

—ধন্যবাদ। কোন প্রয়োজন নেই। এই তো বাসস্ট্যান্ড।

মোটেই হাসল না মীরা। এটা দিল্লী নয়, কলকাতা। সমীর যদি তাকে সহজ-লভ্যা মনে করে তবে খুব ভুল করবে। সে রীতিমত গম্ভীর মুখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়।

একটার পর একটা বাস আসছে। বাস-স্ট্যান্ডে বাস থামামাত্র যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাচ্ছে। কে আগে উঠতে পারে তার শক্তি পরীক্ষা। যাচ্ছেতাই ব্যাপার। কবে যে অফিসে ভদ্রভাবে যাতায়াত করতে পারবে তা একমাত্র ভগবান জানেন।

—মীরা দেবী। আসুন।

ট্যাক্সীর দরোজা খুলে সহাস্যে সমীর আহ্বান জানায়।

—কী আস্পর্ধা! সবার সামনে দাঁত বের করে হাসা হচ্ছে। নিষেধ শুনলেন না। মীরার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। আশেপাশে একদল আড়চোখে তাকালো বাসের জন্য অপেক্ষারত অনেক যাত্রী এদিকে তাকিয়ে। উঃ! তীক্ষ্ণ লজ্জা পেল সে।

—আসুন। দেরী করবেন না। ভিতরে উঠুন।

নিঃশব্দে মীরা মাথা নীচু করে ঢুকে যায় গাড়ির ভিতর। বড়ো সম্ভব এককোণে সরে বসল। তারপর গাড়ি ছাড়লে সে পাঞ্জাবী ড্রাইভারের দিকে একপলক তাকিয়ে নীচু অথচ কঠিন কণ্ঠে ফেটে পড়ল, আপনি কী সবকিছু তামাসা মনে করেন? নিষেধ করলাম এত করে.....।

—কোনদিকে আপনার অফিস বলুন। মুখ টিপে হাসল সমীর, স্রেফ লিফ্‌ট্ দিতে চাইলে রিফিউজ করতে নেই। আপনি রাগছেন কেন বুঝতে পারছি না। আপনি কিন্তু এখনও আমাকে ধন্যবাদ দিলেন না।

থাম হে বাচাল ছোকরা! মীরা কটমট করে একবার তাকাল। এ ছেলেটি একটু অন্য টাইপের। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে খুব সরল। সাবধান! সাবধান! নিজেকেই সে তিরস্কার করল। বাপ্ রে আর নতুন করে ভাবনার করতে যেও না। গোলে পস্তাবে। অনেক তো দেখলে, কম অভিজ্ঞতা হল না।

—বাঁ দিকে ড্রাইভার। ঠীক্। গলায় সামান্য চিৎকার করল মীরা। তার নির্দেশ পালন করবার আগে একবার আয়নার ভিতর দিয়ে তাকে দেখে নিল সর্দারজী। অফিসের সামনে ট্যাক্সি থামলে মীরা দরোজা খুলে রাস্তায় পা দিল। তারপর সোজা হাঁটা দিল। সমীরের দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত! ধন্যবাদ তো দূরের কথা।

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে ধপ্ করে চেয়ারে বসল। একবার ভাবল, কী করবেন ডিরেক্টর? তাকে অন্যায়ভাবে ডিসচার্জ করলে সে সহজে ছেড়ে দেবে না। কোর্টে কেস করবে। সোনা গয়না যা আছে বিক্রি করে কেস চালাবে।

নিজেকে সংযত করতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। টাইপ মেশিন পরিষ্কার করে মীরা ডিক্টেশনের খাতা ওল্টায়। কাজকর্ম বিশেষ কিছু নেই। ধীরে সুস্থে একটা ছোটো চিঠি টাইপ করল ঘড়ি দেখল। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। ডিরেক্টর কী এসেছেন? এখনও ডাক পড়ছে না।

—দিদিমণি। বড়বাবু ডাকছেন।

কোথাকার লাটসাহেব বড়বাবু! মীরা বিরক্ত চোখে তাকাল বেয়ারার দিকে। সাধারণতঃ হেডক্লার্ক, বেয়ারা দিয়ে ডেকে পাঠায় না। নিজেই আসে। আজ ব্যাপারটা কী?

হেডক্লার্কের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল মীরা। মাথা নীচু করে ড্রাফট করছে। মীরা টের পেল সে এ ঘরে ঢোকামাত্র অন্যান্য কেরানীদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়। দু'একটা মন্তব্য তার কানে ছিটকে আসে। শুনে তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। এই লোকগুলো বা কেমন! এত চটে যাচ্ছে কেন?

—ডেকেছেন কেন? মীরা বলল। তার কণ্ঠস্বরে একটু রুক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে।

—বসুন। একগাল হাসল হেডক্লার্ক, এই নিন।

খামে বন্ধ একটা চিঠি এগিয়ে দিল মীরার দিকে। চিঠির দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল মীরার বুক। পা কাঁপছে। গলা শুকিয়ে আসছে। সে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল।

—কীসের চিঠি?

—নিজের ঘরে গিয়ে খুলে দেখুন। হেডক্লার্ক মুচকি হাসল, প্রোমোশান পেলে কিন্তু মিষ্টি খাওয়াবেন।

হেডক্লার্কের দিকে একবার ভুরুকোঁচকে তাকাল মীরা। তারপর ফিরে এল নিজের ঘরে। দুরুদুরু বুকে খাম খুলে দেখল টাইপ করা একটা চিঠি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল।

তাজ্জব ব্যাপার। এ কী রসিকতা! তাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে বোম্বের অফিসে। অর্থাৎ সরাসরি তাকে ডিসচার্জ করা হল না বটে; কিন্তু যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এর চেয়ে ডিসচার্জ অনেক ভাল। ডিরেক্টর অন্যভাবে তাকে শাস্তি দিতে চাইছেন।

বড় সাহেবের ঘরে ঢোকবার আগে মীরা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। কি কি বলবে ঠিক করল মনে মনে। আজ সে ছেড়ে কথা বলবে না। যা হবার হবে।

সুইংডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকে মীরা ডিরেক্টরের সামনে গিয়ে সটান দাঁড়াল। তারপর চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

—বলুন। মিঃ কাপুর ভরাট গম্ভীর গলায় বলেন, এবার বলুন কী কথা।

—বোম্বের অফিসে আমাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। মীরা যথাসম্ভব নিজেকে শান্ত রেখেই বলল, কারণ কী জানতে পারি?

—কারণ যাই থাক......অর্ডার ইজ অর্ডার। চাকরী করতে হলে আপনাকে বোম্বে যেতে হবে। যদি কোন কারণে না যেতে পারেন, অবশ্য বোম্বে গেলে আপনার মাইনে একশ টাকা বেড়ে যাবে, লিখিতভাবে জানান যে, যেতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ করা হবে।

—আমি বুঝতে পারছি না হঠাৎ কেন ট্রান্সফার......স্যার বুঝতেই পারছেন আমার পক্ষে একা বোম্বে যাওয়া থাকা......অনুরোধ করছি, আমাকে এখানে রেখে দিন!

মীরা যথাসম্ভব কাতর মুখচোখ করল। ছলছল চোখে তাকাল ডিরেক্টরের দিকে। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল। আরও একটু যদি অগ্রসর হতে পারত। অর্থাৎ অফিস ছুটির পর ডিরেক্টরের গাড়িতে পাশাপাশি বসে একটু বেড়াতে যাওয়া অথবা সন্ধ্যাবেলায় কোন বারে মুখোমুখি বসে মদ্যপান...। ছিঃ! অত নীচে সে নামতে পারবে না।

—তাই আমি সরি। ডিরেক্টর ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়েন, কিছু করবার নেই।

ডিরেক্টরের অবনত মাথাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মীরা। রাগে দুঃখে অপমানে এবার সত্যি তার চোখে জল আসছে। কী করবে এখন? কিছু ভাবতে না পেরে সে হঠাৎ চিঠিটা টেবিল থেকে তুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং চোখের পলকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ডিরেক্টরের দিকে সবেগে নিক্ষেপ করল। তারপর ক্রুদ্ধ বেগে সুইংডোর ঠেলে বাইরে এল।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রাস্তায়। ফুটপাতের ওপর হাঁটতে থাকে। অনেকক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে মীরা একবার থমকে দাঁড়াল। চারপাশে মানুষজনের ভীড়। যানবাহনের দ্রুত চলাফেরা। একবার হাতঘড়ি দেখল। প্রায় তিনটে বাজে। কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? ফের সে হাঁটতে শুরু করল। সামনে একটা সিনেমা হল। কী ভেবে সে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ, টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। একটা টিকিট কাটল। তারপর ভিতরে ঢুকল। অন্ধকার স্লাইড দেখাচ্ছে। কোন্ ছবি চলছে? জানে না সে। দু' চোখ বুজে মীরা পিছন দিকে মাথা এলিয়ে দেয়। ঘুম আসছে তার।

॥ সাতাশ ॥

কাঁদার তেল টিপে মীরা মনে মনে হিসাব করে দেখল কত দিন পর সে এখানে এল। পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। দরোজা খোলার শব্দ। তারপর দেখল রজতকে। গন্ধ পেল। পরিচিত গন্ধ। একটু সরে দাঁড়াল সে। কেন না, ঘাম আসছে।

—কী সৌভাগ্য আমার! রজত যেন জোরে হেসে উঠল, কাম ইন। মীরা তোমার মুখে বড় বিষাদ। দাঁড়িয়ে কেন চলে এস।

রজতের পিছু পিছু মীরা ঘরে ঢুকল। তারপর হঠাৎ যেন সাপ দেখার ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়াল চন্দ্রানীকে দেখে। চন্দ্রানী হেলান দিয়ে সোফায় বসে। তার শ্যাম্পু করা চুল ঘুরে ফেঁপে কাঁধের ওপর ছড়ানো। লাল ব্লাউজ আর লাল শাড়ি। ঠোঁট লাল। হাতের নখ লাল। চন্দ্রানী যেন আগুন!

—বস মীরা। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। মিসেস চন্দ্রানী মুখার্জি। আমার পি, এ। বেশ নিপুণ মহিলা।

চন্দ্রানীর দিকে তাকিয়ে রজত সামান্য হাসল, এই ভদ্রমহিলা হচ্ছেন...। কী বলবো বলতে পারো মীরা? মিসেস মুখার্জি, মীরা আমার স্ত্রী।

—ওই সাম্র আপনি তো কখনও বলেন নি আপনার স্ত্রীর কথা। চন্দ্রানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মীরাকে দেখতে থাকে। বোসসাহেবের স্ত্রী। এর সিঁথি খাঁ খাঁ করছে। হাতে একটা শাঁখা পর্যন্ত নেই। এয়োতীর

কোন চিহ্ন নেই ওর সর্বশরীরে। কী ব্যাপার?

কথায় বলে না মদ আর মেয়েমানুষ! মীরা ভেবে পেল না, কেন সে এখানে এসেছে। চন্দ্রানীর সঙ্গে দু'একবার চোখা-চোখি হয়েছে। সাজগোজের বহর দেখ! রজতের পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট। আজকাল এই হয়েছে এক ফ্যাশান। সুন্দরী মেয়েদের দরকার। এটা চাকরীর অঙ্গ। সেদিক থেকে মিঃ কাপুর অনেক উদার। কোন দিন দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি। সে কী চন্দ্রানীর মত পারবে মদ্যপানরত মিঃ কাপুরের সামনে বসে থাকতে?

রজত বুঝল, এই দুই রমণীর এক-সঙ্গে দেখা হওয়াটা একটা দুর্ঘটনা। অতএব এখন আফসোস করে লাভ নেই। বরং রেকর্ড প্লেয়ার শোনা যাক। সে গ্লাসে খানিকটা বরফ ফেলে দিল। তারপর গ্লাস হাতে রেডিওগ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। ফ্র্যাংক সিনাত্রা।

—ব্যাপার কী? রজত দুজনের মুখ দেখতে থাকে, শুধু মুখে কথা নেই। মিসেস মুখার্জি, আপনি একটু বীয়ার খাবেন?

—কী যে বলেন স্যার। চন্দ্রানী শরীর দুলিয়ে নিঃশব্দে হাসল, মীরা দেবীকে অফার করলেন না?

রজত দু'চোখ কপালে তুলে বলে সর্বনাশ! মীরার তো গন্ধেই বমি আসে। বলে সে টেবিলের ওপর গ্লাস রেখে ফ্রিজ খুলে দুটো আপেল আর কিছু কাজু-বাদাম বের করল। দুটো কাচের গ্লাসে কিছু বরফের টুকরো ফেলল। তারপর অরেঞ্জ স্কোয়াশ ঢেলে দিল। তারপর দুজনের দিকে দুটো গ্লাস টেবিলের ওপর, রেখে দিল।

—আমি কিছু খাব না। গম্ভীর গলা মীরার, বিশেষ প্রয়োজন ছিল কয়েকটা কথা বলার। আমি বরং অন্য সময় আসব। বলে সে সোফা থেকে উঠতে গেলে রজত বাধা দেয়।

—বাঃ কোথায়? মদ মিশিয়ে দিইনি। বিশুদ্ধ শরবত। অফিস থেকে তো ফিরছো। নিশ্চয়ই খিদে লেগেছে। আপেল বাদাম যা ভাল লাগে...। জানো মীরা, সমস্ত জীবন-ভরে আমাদের জরুরী কথা বলবার থাকবে। আমারও কত জরুরী কথা রয়েছে তোমাকে বলবার। বলতে গিয়ে ভুলে যাই। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে পড়ে যায়। কখনও হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে মনে পড়ে। তখন মনে হয় ছুটে যাই তোমার কাছে।

রজত ফ্রিজ খুলে খালি গ্লাসে আবার খানিকটা মদ ঢেলে নিল। ওর সারা মুখ লাল টকটক করছে। বাতাসে মদের তীব্র গন্ধ পেল মীরা।

ওর হঠাৎ বমি পায়। আঁচল দিয়ে নাক টিপে ধরল।

—কী হল? চন্দ্রানী রজতকে উদ্দেশ্য করে বলে, দেখুন না স্যার—মীরা দেবী বোধ হয় অসুস্থ বোধ করছেন।

সোফা ছেড়ে উঠে মীরা অস্ফুটকণ্ঠে বলে, আমি বাথরুমে যাব। বলতে বলতে সে ড্রইংরুম পার হয়ে শোবার ঘরে চলে আসে। সব তার চেনা। লাইট জেলে দেয়। ঘর সংলগ্ন বাথরুম গিয়ে ঢুকল। দরোজা বন্ধ করে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ-মুখে জল ছিটোয় অনেকক্ষণ। তারপর মুখ তুলে আয়নার ভিতর নিজের প্রতিকৃতি দেখতে থাকে।

ভুল করে সে নরকে প্রবেশ করেছে। এখান থেকে এই মুহূর্তে সে পালাবে। কী ভেবে এখানে এসেছিল? কোন্ আশা নিয়ে? রজতকে একা পেলে হয়ত সে জানাত খাঁকিগসের ঘটনা। তার মাথার কিছু ঠিক নেই। সিনেমা হলে দুটো ঘণ্টা কাটিয়েছে। তারপর সো জাপানে ট্যাক্সী করে সোজা চলে এসেছে এখানে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মীরা সামান্য প্রসাধন করল। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোবার ঘর পেরিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করে একবার ওদের দিকে তাকাল। চন্দ্রানীর পিছনে রজত দাঁড়িয়ে। রজতের হাতে গ্লাস। মৃদু বাজনার রেশ। অলস ভঙ্গিতে সোফায় হেলান দিয়ে চন্দ্রানী।

—বাঃ তোমাকে এখন বেশ ফ্রেশ লাগছে। রজত এক পা দু পা করে এগিয়ে এল মীরার কাছে। মীরা চোখের পলকে রজতকে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আসে। সদর দরোজা খুলে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। তারপর রাস্তায়।

কিছুদূর হাঁটার পর তার মনে হল কে যেন তাকে ডাকছে। সে পিছন ফিরে দেখল রামুকে।

—মা, আপনি ফিরে চলুন। আমাদের ছেড়ে এতদিন কোথায় ছিলেন?

রামুর দু চোখ ছলছল করছে। ওর দিকে তাকিয়ে মীরা নরম গলায় বলে, হাঁরে রামু তুই কোথায় আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছিস। সাহেবের জন্য খানা তৈরী করবি না?

—সাহেব আমাকে এ বেলা ছুটি দিয়েছেন। রামু এর বেশি কিছু বলল না। যদিও ওর ভাবভঙ্গি দেখে মীরার মনে হল ও আরও কিছু বলতে চায়। থাক, আর সে শুনতে চায় না। বেচারীর জন্যে দুঃখ হল। সারা রাত বেচারীকে বাইরে সিঁড়ি-বারান্দার নীচে অথবা ফুটপাতে শুয়ে থাকতে হবে। কেন না নইলে যে, সাহেবের যেতে নিবে পার্টি!

কী ভেবে ব্যাগ খুলে দুটো টাকা বের করে রামুর হাতে গুঁজে দিল মীরা। তারপর ওকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হনহন করে এগোয়। পিছন ফিরে তাকায় না।

...বাড়ি ফিরে দরোজা খুলছে। পিছন থেকে সমীরের গলায় আওয়াজ শুনতে পেল। না, এখান থেকে তাকে পালাতে হবে। এ ছেলেটির কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। সময় অসময় জ্ঞান নেই।

—এই ফিরলেন? সমীর হাসিমুখে এগিয়ে এল, এর আগেও দু-তিনবার এসে ঘুরে গেছি। দরোজা বন্ধ দেখলাম। হয়ত বেড়াতে গিয়েছেন। তাই বরং খানিকক্ষণ পরে আসছি। আমি আবার মানুষজনের সঙ্গে একটু কথা বলতে না পারলে... একা একা থাকতে, আর কাকিমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় করে। যা খিটখিটে মেজাজ! ওদের কোন ছেলেপুলে নেই। আমাকে ছেলের মত ভালবাসেন। জানেন মীরা দেবী, আমার যখন দু বছর বয়স তখন মা মারা যান।

উঃ ছেলেটি যা কথা বলতে পারে! শুনতে শুনতে মাথা ধরে যায়। খালি বকবক। মীরা সোজা ঘরের ভিতর ঢুকে যায়। তারপর সশব্দে দরোজা বন্ধ করে। বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই। বোকাসোকা ছেলেও নয়। কথা বলার আর লোক পেল না। আর দু-চার দিন যাক না—ঐ সাধো-চিত মহিলা তুকে দোষারোপ করবে সমীরকে নষ্ট করার জন্য।

টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল মীরা। এখন দুঃস্বপ্ন হবে আক্রমণ। অন্ধকারে ছুটে আসবে লক্ষ লক্ষ চিন্তা। তাকে খাবলে খিমচে রক্তাক্ত করে তুলবে। বাঁধ ভেঙে যাবে সমস্ত বিছানা। রক্তের সমুদ্রে সে শুয়ে থাকবে। হাবুডুবু খাবে। তারপর আস্তে-আস্তে ডুবে যাবে।

না না না! মীরা অস্ফুট চিৎকারে লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। আলো জেলে ছুটে গিয়ে দরোজা খুলে বাইরে এল। সমীর আসুক। কথা বলুক তার সঙ্গে। একা সে থাকতে পারবে না। শুনশান চারিদিক। সিঁড়িতে অবছায়া অন্ধকার। কোন পায়ের শব্দ নেই। কোথায় গেল সমীর?

ফিরে এল ঘরে। দরোজা খোলা থাক। সমীর এসে যেন ফিরে না যায়। কারু সঙ্গে কথা বলা দরকার। এখন হাসতে হবে। গান শুনতে হবে। চাকরী চলে গেছে। কাল থেকে বাড়িতে বসে থাকবে। জমানো টাকা ভেঙ্গে চলবে কিছুদিন। কিছু অলঙ্কার আছে। সেগুলো বিক্রী করে আরও কিছু-দিন চলবে। ইতিমধ্যে এক মাস দুমাস কি তিন মাসের মধ্যে একটা নতুন চাকরী জোগাড় করতে হবে। যদি জোগাড় করতে না পারে? তারপর?

স্টোভ জেলে চায়ের জল চাপিয়ে দেয় মীরা। মার মুখ ভাসছে। দাদার মুখ ভাসছে। বৌদির কথা মনে পড়ছে। দাদা তার ব্যবহারে আহত। ফলে খোঁজখবর নিচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কী ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে! করুণ মুখচোখ করে উপস্থিত হবে। আমাকে আশ্রয় দাও।

আমার চাকরী নেই। তোমরা ছাড়া কে দেখবে আমাকে। দাদা, আমাকে ক্ষমা কর! আমি অন্যায় করেছি। আমি বাঘ সেবের মত তোমাদের সংসারের এক কোণে পড়ে থাকব।

—আসতে পারি?

—আসুন। মীরা কেটলীর ভিতর আরও এক কাপ জল ঢেলে দিল। সমীর ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেছে। হাসি হাসি মুখ। ছেলেটির মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে।

—আমি এলে কী আপনি বিরক্ত হন? সমীর তীক্ষচোখে তাকাল, জানেন মীরা দেবী। কাকিমা সেকেলে মানুষ। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাটা পছন্দ করেন না। আমাকে বললে কোথায় যাচ্ছিস। বললুম, নীচের তলার মীরা দেবীর সঙ্গে একটু গল্প করতে যাচ্ছি। শুনে মুখভার।

—আপনি আর আসবেন না। মীরার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, আপনার তো কিছু হবে না।

—রাখুন আপনি! বুড়োদের কথায় কান দেবেন না। আমরা এ যুগের ছেলেমেয়ে। যা ভাল লাগে করবো। একশোবার করবো। জানেন, ছোটবেলা থেকেই শুধু এটা করিস না ওটা করিস না শুনে আসছি। খালি নিষেধ। ফলে বড় হয়ে যখন নিজে রোজগার করতে শিখলুম—যা যা করতে নিষেধ করেছিল, সেইসব বেশি করে করলুম। যেমন ধরুন...।

—থামলেন কেন বলুন। মুখ টিপে হাসল মীরা, যেমন ধরুন মদ খাওয়া, প্রেম করা, মস্তানি করা, গাঁজা ভাঙ আফিং... আর কি বলুন, মনে পড়ছে না!

—আপনি হিপিদের কথা শুনেছেন?

—হি পি! সে আবার কী?

—আমেরিকায় এরা আলাদা সমাজ গড়ছে। যুবক-যুবতীর দল। একসঙ্গে শোয়াবসা করছে। এদের মধ্যে অনেকে আবার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে। বন্ধন থেকে এরা মুক্তি চায়। সমস্ত রকম প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে এদের জেহাদ। এরা মুক্ত যৌন জীবন গড়তে চায়। সেক্স নিয়ে এদের কোন মাথাব্যথা নেই। হয়ত তিন-চারজন যুবক আর একটি যুবতী একঘরে রাত কাটাল। আপনার কী মনে হয় এদের সম্পর্কে?

—কী আবার মনে হবে। মীরা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, আমেরিকান সমাজে হয়ত তা মানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এসব আমি কল্পনাই করতে পারি না। আমাকে আপনি সেকেলে মনে করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন, প্রত্যেক দেশের আচার-ব্যবহার, রুচি বা জীবনকে দেখার ভঙ্গি আলাদা। একটা কথা সমীরবাবু। মনে হচ্ছে আপনি হিপিদের জীবনযাত্রা খুব পছন্দ করেন।

—একটা আমেরিকান কাগজে ওদের সম্পর্কে লেখা পড়লুম। পড়ে খুব ভাল লাগল। জীবন হওয়া উচিত এ রকম। জলের মত সহজ আর সুন্দর।

—বাঃ! মীরা সমস্ত মুখে হাসি ছড়াল। আপনিও সুরু করুন ঐ রকম জীবনযাপন। কেউ নিষেধ করছে না। তবে মুস্কিল হচ্ছে আপনার কাকিমা। উনি আপনার হিপিদের কথা শুনলে ও পরে যদি জানতে পারেন আপনিও ঐ দলে ভিড়ছেন, নির্ঘাৎ ভির্মি খেয়ে যাবেন!

সমীর সামান্য উষ্মকণ্ঠেই বলল, আপনি বারবার কাকিমার কথা উল্লেখ করছেন কেন! আপনি কী মনে করেন কাকিমাকে আমি ভয় পাই? আমি কী যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক হইনি যে, নিজের পছন্দমত জীবনটাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবো!

—এই নিন চা। মীরা চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল সমীরের দিকে। সামান্য আলাপেই এই ছেলেটিকে তার ভাল লেগেছে। কারণ সমীরের ব্যবহার কথা-বার্তায় কোন ভান নেই। কোন অহংকার নেই। জ্ঞান বা উপদেশ দেওয়া, নাক উঁচু-ভাব অথবা পৃথিবীর সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, এসব বদভ্যাস থেকে সমীর মুক্ত।

দোষের মধ্যে একটু বেশি কথা বলে। তা হোক। মীরা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সে জানালার কাছে চলে এল। ছোট ছোট চুমুক দিল চায়ের কাপে। কাল সকাল থেকে সে মুক্ত। তাড়াহুড়া করে রান্না করতে হবে না। স্নান করতে হবে না। অফুরন্ত সময় থাকবে হাতে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখবে ব্যস্ত মানুষদের দ্রুত চলাফেরা। পিছন ফিরে কেউ তাকাবে না। কেননা পিছনে তাকাতে সবাই ভয় পায়। সবাই এগিয়ে যেতে চায়:

মীরার মনে হল সমীর অনেকক্ষণ যাবৎ তাকে ডাকছে। সে পিছন ফিরে তাকাল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল খানিকটা। সমীরের চোখের দিকে তাকাল। অফুরন্ত বিস্ময় ঐ চোখ দুটিতে।

—কী-ব্যাপার? সমীর মৃদু হাসল, এতক্ষণ কার ধ্যান করছিলেন? একবার দুবার নয় বহুবার ডেকেছি।

—আপনার কথা ভাবছিলুম সমীরবাবু। মীরা মুখ টিপে হাসল। কথাটা বলা ঠিক হল কিনা জানে না সে। কেননা অনেকে আবার ঠাট্টা ইয়ার্কি হজম করতে পারে না। সিরিয়াস নেয়। বিপদ হয় তখন। সমীরকে যতটুকু বুঝেছে সে টাইপের নয়। তবে বলা যায় না কখন কিভাবে কার মতি-গতি পাল্টায়।

—ঠাট্টা নয়। সমীর সামান্য গম্ভীর হয়ে ওঠে, একটা কথা বলবো মিস মিত্র। দয়া করে সঠিক জবাব দেবেন।

মিস মিত্র! মীরার মুখ পলকে গম্ভীর হয়ে উঠল। এই তো উপযুক্ত সময় সমীরকে জানানো যে, সে আসলে বিবাহিতা একজন গৃহিণী। জানালে ব্যাপারটা ভালই হয়। যদি সমীরের মনে সামান্যতম কোন দুর্বলতা থাকে, থাকাও স্বাভাবিক, এই মুহূর্তে তা ভেঙে যাবে। তখন সমীরের সঙ্গে সে খুব সহজেই মেলামেশা করতে পারবে।

কিন্তু ওকে জানানও এক ঝকমারি ব্যাপার। হাজার প্রশ্ন করবে। উত্তর দিতে দিতে সে হাঁফিয়ে উঠবে। তারপর যা পাগল ছেলে, ওকে বিশ্বাস নেই, পুটপুট করে সব বলে দেবে কাকিমাকে। ফলে বারটা বাজবে। পাততাড়ি গুটোতে হবে এখান থেকে। কেন না সব শোনার পর তাকে ভাড়াটে হিসেবে রাখতে ভরসা পাবে না।

—আরে এত কী ভাবছেন। ব্যাপারটা কী খুলে বলুন।

—কিছু বলার নেই। এবার আপনি উঠুন তো। কাজকর্ম করতে দেবেন না। আপনার সঙ্গে বসে গল্প করলে পেট ভরবে বুঝি।

করুন না আপনার কাজ। আমি কী আপনার হাত বেঁধে রেখেছি? সমীর সামান্য আফশোষের সুরে বলল, আপনার মুখ দেখেই টের পাচ্ছি কিছু একটা হয়েছে। অথচ বলবেন না। অর্থাৎ এখনও আমাকে বন্ধু হিসেবে ভাবতে পারছেন না।

—বন্ধু! মীরা হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, কিছুদিন পর প্রেমিক হতে চাইবেন! বলেই খেয়াল হল কথাটা বলা ঠিক হয় নি। আড়চোখে একবার সমীরকে লক্ষ্য করল। সমীর অনেকটা বিমূঢ় দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে। ছি! লজ্জা সামলাতে না পেরে সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে যায়।

একটু পরে ফিরে এল মীরা। সমীরের দিকে এক পলক তাকাল। গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছে। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। বসে বসে শ্রীমান ভাবুক যা খুশি। তার অনেক কাজ।

খাবার ইচ্ছে একদম নেই। তবু স্টোভ জেলে মীরা রান্নার আয়োজন সুরু করল। সত্যি, সমীরের জন্যে সে কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে না। যেন ওখানে সমীর নয়, বিনয় বসে রয়েছে। দাদার কথা নতুনভাবে মনে পড়ছে। দাদা কী শেফালীকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে?

—জানেন সমীরদা। মীরা হাসিমুখে তাকাল, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি খুব একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। কিন্তু...। দূর ছাই! আপনাকে বলে কী হবে। আপনার করার কিছু নেই।

—দেখুন মীরা দেবী। ওসব দাদা-টাদা আমি হতে পারবো না। দাদা হওয়ার অনেক ঝামেলা। আমি স্রেফ বন্ধু হতে পারি। ভয় নেই প্রেমিক হতে চাইব না! এবার বলুন তো কী আপনার সমস্যা।

(ক্রমশঃ)

সুরের সুরধ্বনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কথায় বলে 'যারে দেখতে নারি—তার চলন বাঁকা।' ১৯০৫ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বছর পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ী থেকে আরম্ভ করে কলকাতা ও বাংলার অন্যান্য সংগীত কেন্দ্রে সর্বত্রই কৌকভ ও কেরামতের প্রদর্শিত যন্ত্রসংগীতের প্রতি দেশের শিক্ষিত সমাজের যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর ছিল। কৌকভ খাঁ সম্বন্ধে কেউ কোনো সমালোচনা করতে সাহসী হতেন না। কেননা তাঁর বাজনা সুরে-লয়ে একেবারেই নিখুঁৎ ছিল; তাছাড়া কোনো ওস্তাদ তাঁর সংগে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হলে তিনি এত দ্রুত লয়ে ও দাপটের সঙ্গে বাজনা সুরু করতেন, যার পর আর কোনো কথা চলে না। তাঁর মৃত্যুর পর কেরামৎ যখন কলকাতায় এলেন, তখন সংগীত সংঘে ও নানা উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে তাঁর অসংখ্য রাগের উপরে অধিকার, বাজনার সাবলীল গতি ও মজলিসী সরস কথাবার্তা তাকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ১৯২৫ সালের পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্রবণশক্তি একটু কমে আসে; তাছাড়া বাম আঙুলের নখের অভাব কৃত্রিম রোপ্য নির্মিত নখের সাহায্যে বিলম্বিত বাজাবার সময় আশের কাজে কখনো কখনো এক-আধ শ্রুতি কম-বেশী শোনা যেত। এই কারণেই তিনি শেষ জীবনে কৃত্রিম নখের ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বাম হাতের নখহীন আঙুলগুলির অগ্রভাগ বেশ শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই কৃত্রিম নখ ছেড়ে দিয়ে বাজাবার সময় আশের পরিধি কিছু কমে গেলেও, সুরের দিক দিয়ে তাঁর বাজনা নিখুঁৎ হয়ে যায়। আমরা যখন এলাহাবাদ থেকে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসে তাঁর অবস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করলাম, তখন তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ আমার ঘটলো। তিন-চার বছর এলাহাবাদে কাটিয়ে ১৯২৯ সালের শীতের শেষে তিনি কলকাতায় এলেন এবং প্রথম দেড় মাস ধরে আমাকেই তিনি প্রধানতঃ শেখাতেন, সঙ্গে ক্ষিতিশ লাহিড়ীও ছিলেন। এঁর কথা আমার নানা নিবন্ধে বহুবার উল্লেখ করেছি। আমার পূর্বেকার প্রবন্ধ লেখবার সময়েও তিনি জীবিত ছিলেন; দুঃখের বিষয় ইতিমধ্যে তাঁর লোকান্তর ঘটেছে। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর কলকাতার বাড়ীতেই অবস্থান করছিলেন। বঙ্গ বিভাগ হওয়ার পর তিনি সোদপুরে পারিবারিক ভদ্রাসন স্থাপন করেন; তবে কলকাতার গড়পারে তাঁর ভাড়া-বাড়ী চিরদিনই ছিল। এঁর দেশ ঢাকায় এবং আমাদের সঙ্গে তাঁর নিকট আত্মীয়তা ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিশেষ কোনও ব্যাধি হয়নি, বয়সোচিত দুর্বলতা ছাড়া তাঁর কোনও কঠিন ব্যাধি ছিল না। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তাঁর পুত্রদের তিনি বলে যান যে, তাঁর দেহান্ত যখনই হোক, সে সংবাদ সর্বপ্রথমে গোয়াবাগানের গোবরবাবু ও আমাকে যেন জানানো হয়। ইনি বাবার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং প্রথম হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ের কন্ট্রাক্টর রূপে বাবার ইচ্ছাক্রমে তিনিই নিযুক্ত হন। পরবর্তী জীবনে তিনি কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের একজন স্থায়ী কন্ট্রাক্টররূপে নিযুক্ত ছিলেন। সেতারে কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেবের শিষ্য ও তবলায় দর্শন সিংয়ের শিষ্যরূপে কলকাতার উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে ক্ষিতিশ লাহিড়ীর সুনাম ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিশ বৎসর পূর্বেও কলকাতাবাসী পেয়েছেন। ১৯২৯ সাল থেকেই ইনি কেরামৎউল্লা খাঁর যথার্থ ঘরানার তালিম শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও তিনি অনেক পূর্বেই খাঁ-সাহেবের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন। খাঁ-সাহেবের নিকট আমার শিক্ষার সময়ে অর্থাৎ ১৯২৯ সালের প্রারম্ভে স্বর্গীয় ক্ষিতিশ লাহিড়ীর উপস্থিতিতে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা তিনিই করে দেন।

কেরামৎউল্লা খাঁ-সাহেবের নিকট সে যাত্রায়ই আমার প্রথম ও শেষ শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে। এর পর দীর্ঘদিনের জন্য আমি দেশে ফিরে যাই; পরে আবার যখন কলকাতায় বসবাসের সুযোগ পেলাম, তখন খাঁ-সাহেবের স্বাস্থ্যহানির জন্য শিক্ষার সুযোগ ততটা পাইনি। তথাপি দেড় মাসের শিক্ষায় আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মে গেল। সেবার শিক্ষার শেষে দেশে যাওয়ার পূর্বে স্বর্গীয় ক্ষিতিশ লাহিড়ীর চেষ্টায় ও আয়োজনে কেরামৎউল্লা খাঁ-সাহেবের যথার্থ তালিম অনুযায়ী রবাব অংগের যন্ত্রালাপ তাঁর স্বরোদ যন্ত্রে শোনবার সুযোগ লাভ আমার ঘটে যায়। স্বর্গীয় ক্ষিতিশ লাহিড়ীই খাঁ-সাহেবের যন্ত্রসংগীত পরিবেশনের নিমিত্ত দুটি জলসার আয়োজন করেন। একটি উত্তর কলকাতার বিখ্যাত ধনী ও সংগীত রসিক গুহ পরিবারের বাড়ীতে এবং দ্বিতীয়টি আমাদের মুক্তিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। উভয়টিতেই বিশিষ্ট সংগীত রসিক ও গুণীজন ব্যতীত অন্য কারও প্রবেশাধিকার ছিল না।

●

কেরামৎউল্লা খাঁ-সাহেবের সঙ্গে আমার শেষ জলসার কথাও আমি ভুলতে পারবো না। ১৯২৯ সালের বসন্তকালে গৌরীপুর থেকে কলকাতা এসে আমি দু-মাসকাল খাঁ-সাহেবের শিক্ষাধীনে ছিলাম। তারপর পুনরায় গৌরীপুরে ফিরে যাই। এরপর তাঁর নিকট শিক্ষার সময় ও সুযোগ লাভ আমার ঘটে ওঠেনি; কেননা আমার কলকাতায় থাকবার ব্যবস্থা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দু বছর পরে যখন কলকাতায় এসেছিলাম, তখন খাঁ-সাহেবের শরীর অসুস্থ ছিল এবং তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ তখনও ঘটেছিল; কিন্তু তিনি চিকিৎসার জন্য লক্ষ্ণৌ চলে যান এবং সেখানেই তাঁর দেহান্ত ঘটে। তাই ১৯২৯ সালের শিক্ষা ও জলসাই আমার নিকট আজও উজ্জ্বলমান আছে। সেখানকার মত তাঁর বাজনা শোনার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল আমাদেরই মুক্তিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে। আমি বিশেষ পারিতোষিকের ব্যবস্থায় আমাদের বাড়ীতে তাঁকে বাজাতে ডেকেছিলাম। সে জলসায় স্বর্গীয় ক্ষিতিশ লাহিড়ী ও হরেন শীল উভয়েই উপস্থিত ছিলেন. প্রথমতঃ হরেন শীল তাঁর সুরবাহার যন্ত্রে পঞ্চম রাগের আলাপ ঘণ্টাখানেক ধরে বাজিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করেন। হরেন শীল সুরবাহারের আলাপে বিলম্বিতের বিস্তার যথেষ্টই দেখাতেন; তাঁর বিলম্বিত বাজনায় তিনি 'ডা' এবং 'রা' ছাড়া অন্য বোল ব্যবহার করতেন না। তাঁর বিলম্বিতের লয় বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বাঁধত হতো; বিলম্বিতের মধ্যে অলংকার হিসাবে মধ্য ও দ্রুত জোড় ভরে দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। বিলম্বিত, আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আভোগ বাজাবার পর তিনি আলাপের সঙ্গে কিছু কিছু জোড় বাজাতেন। লড়ন্ত বাজনা অর্থাৎ লড়ি, লড়গুথাও প্রভৃতি তিনি আলাপের শেষে সামান্যরূপেই দেখাতেন। তাঁর হাতে সেতারেরই বোলের বাজনা শোনা যেত; সুরবাহারের জন্য এইসব তিনি উপযোগী মনে করতেন না এবং সুরবাহারের আলাপে মীড়, গমক, ছুট, ঝাড় প্রভৃতি সুরের অলংকারই যথেষ্ট মনে করতেন। তবে সেতারে জিরা ও দুনী গতে বোলের কাজে তিনি কিছু কম তৈরী ছিলেন না। তাঁর আলাপে ডিকারীর ও জমজমার কাজ তিনি অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বারা দেখাতেন। তাতে সুরের এক অপরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি হতো। হরেন শীলের পর কোনো সুরবাহারী বা সেতারীর হাতে এই বাজনা আমি শুনিনি। শুধু গুরু মহঃ আলী খাঁ রবাবীর হাতে সেতারে বা সুরবাহারে এই ধরনের বাজনা শুনেছি; তবে বহু অভিনিবেশ সত্ত্বেও এই বাজনার অনুকরণ করতে আমি আজও পারিনি। এরূপ অনেক বাদনপদ্ধতি শিক্ষার অভাবে ভারত থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এখনকার বিখ্যাত কলাকার যতই দ্রুত লয়ে বাজান না কেন—এই সব পদ্ধতি তাঁদের বুদ্ধি ও আয়ত্তের বাইরে; এমন কি ইমদাদ ও এনায়েৎ খাঁর হাতেও এই বাজনার পদ্ধতি দেখিনি। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে, হরেনবাবুর সামনেই কেরামৎউল্লা আমাকে বললেন যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ সুরবাহার আলাপকারী সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ এই বাজনা বাজাতেন। গোবরডাঙার জমিদার জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবু সাজ্জাদ মহম্মদের নিকট থেকে এই বাজনার শিক্ষালাভ করে তা হরেনবাবুকে শেখান। হরেন বাবুর বাজনা শেষ হলে কেরামৎউল্লা খাঁ-সাহেব আমাদের বাড়ীতে তাঁর শেষ জলসায় অসাধারণ দক্ষতা ও সৌন্দর্যের প্রকাশের পরিচয় দিলেন দুই ঘণ্টাব্যাপী তাঁর স্বরোদ বাদনে। সেই রাত্রে ক্ষিতিশ লাহিড়ীই তবলায় সহযোগিতা করেন। সর্বসমেত যন্ত্রসংগীতের কলা সুষমা সেই রাত্রে খাঁ-সাহেবের বাজনা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। অন্যান্য জলসার ন্যায় ইনি শুরুতে ইমন-কল্যাণ বাজালেন এবং পরে তাঁর প্রিয়

কেদারা রাগ বাজাবার পর আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত কোমল রেখাবযুক্ত একটি রাগ প্রায় ঘণ্টাখানেক বাজালেন। ইনি প্রায় প্রতি জলসাতেই কোমল রেখাব যুক্ত রাগ পরিবেশন করে তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করতেন। কোন কোন সময়ে ঐ ঠাটেরই কোন আসরী রাগ বাজাতেন। তাঁর কোমল রেখাবের রাগে এক স্বকীয় রূপ ও রসের সৃষ্টি হতো: তাঁর পঞ্চম, পূরিয়া, ভাংকার, ভাটিয়ার, ললিত, বিভাস গৌরী, মালব ও বসন্ত বাহার কোনও তুলনা অন্য কোনো ওস্তাদের হাতে আমি খুঁজে পাইনি। রবাব অঙ্গের স্বরোদ বাজনা কাকে বলে, তা তিনি আমাদের স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দিয়েছেন। এই অদ্ভুত ওস্তাদের নখের দোষ-গুণ যাই থাকুক না কেন সেসব আমাদের ভুলে যেতে হতো। কেরামতউল্লা খাঁ স্বরোদীর তুলনা তাঁর নিজের সঙ্গেই চলে গেছে। বিশ শতকের অনন্য কয়েকজন শ্রেষ্ঠ যন্ত্রীর মধ্যে তাঁর নামও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে; অবশ্য তিনি আমাদের বলেছেন যে, তাঁর বাদ্যগরিমা তাঁর পিতা নিয়ামতউল্লার কাছ থেকেই এসেছে এবং একথাও সকলেই জানেন যে, নিয়ামতউল্লার স্বরোদের মধ্যে কাসেম আলী খাঁর ছবি যথেষ্ট পরিস্ফুট ছিল। কাসেম আলী খাঁ রবাবী যে কতবড় ওস্তাদ ছিলেন,—তার কিছু আভাস তাঁর পুত্র নিয়ামতউল্লা ও পৌত্র কেরামতউল্লা রেখে গেছেন। আজ সে বাজনার ছায়াও আর কোথাও বোধ হয় খুঁজে পাবো না।

উন্মত্ত জনতা . . .

যুক্তি দেখিয়ে ওদের কোনোও কথা বোঝাতে পারবেন না। ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। নিরীহ অসহায় বাইরে চলে গেলে যে কোনও লোক ওদের বলি হতে পারে . . .

আপনি কিন্তু ঐ উন্মত্তদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন . . .
যে ওদের উত্তেজিত ক'রে তুলছে তাকে এড়িয়ে চলুন।
তার কথায় একেবারে কান না দিয়ে তাকে উপেক্ষা করুন।

সাম্প্রদায়িকতা, অঞ্চলপ্রীতি, রাজনৈতিক মতবাদ
কোনও অজুহাতেই জীবন বা সম্পত্তি নষ্ট করার
অধিকার জন্মায় না।

আপনি কী করতে পারেন

পাড়ায় প্রতিরোধ সমিতি গড়ে তুলুন
ক্ষতিকর গুজব বন্ধ করায় সাহায্য করুন
পাড়াপড়শির সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক পাতান
আপনার সন্তানকে শেখান
সব মানুষ সমান

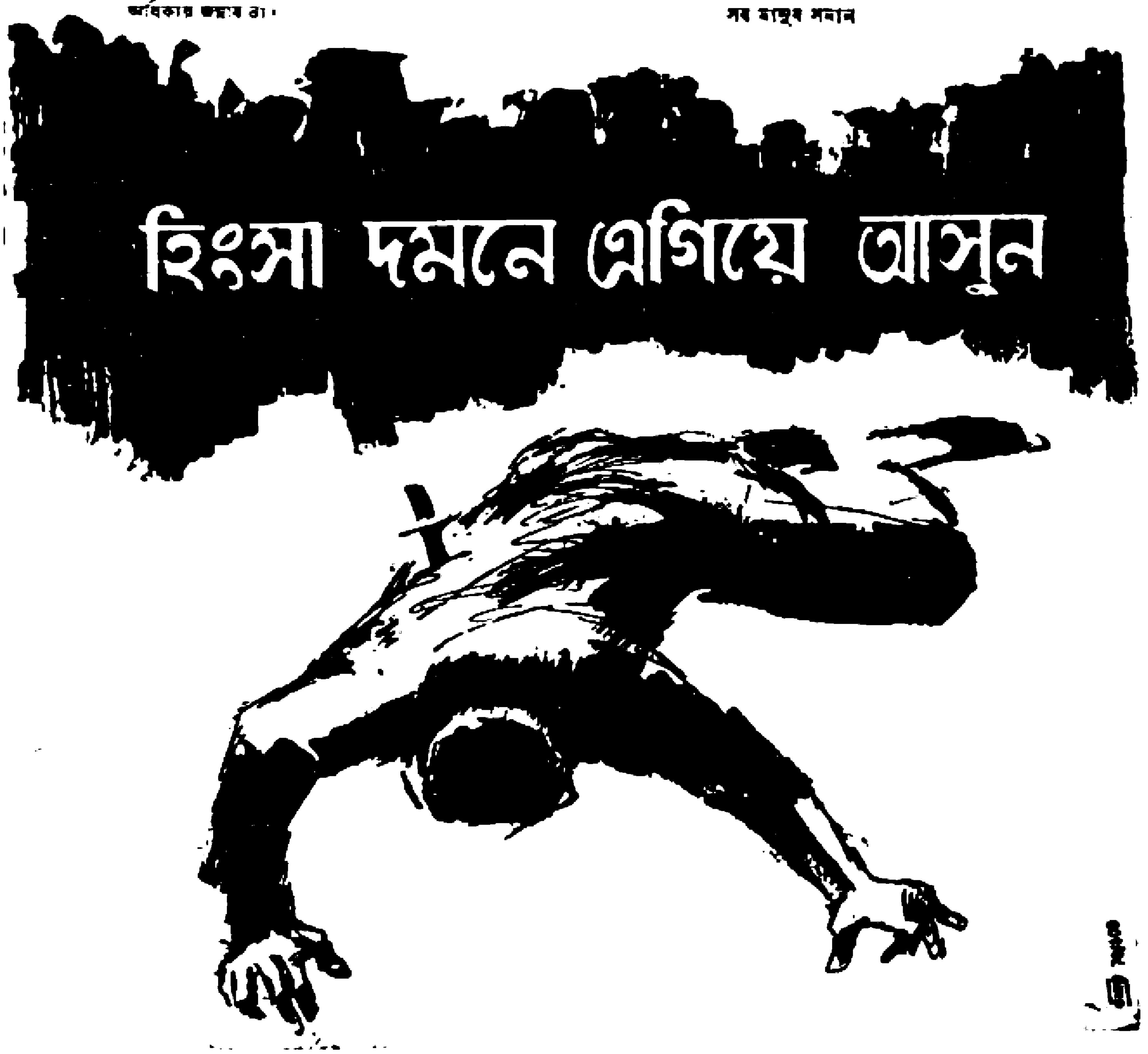

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানের কথা

বিশ্বের জলহাওয়া দূষিত হওয়ার সমস্যা

গত সপ্তাহে বিজ্ঞানের কথায় আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল ভারতের জলহাওয়া দূষিত হওয়ার সমস্যা। তবে সমস্যাটি শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের। কথাটা ১৯৬৮ সাল থেকেই শোনা যাচ্ছে। জলহাওয়া দূষিত হওয়ার সমস্যা এখন আর কোনো একটি ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই, না দেশের না মহাদেশের, বরং একটি বিশ্বব্যাপী চেহারা নিয়েছে। কোনো একটি বিশেষ দেশে স্থানীয়ভাবে জলহাওয়া দূষিত হওয়ার কোনো কারণ ঘটতে না পারে, তবুও সে-দেশের পক্ষে সমস্যা থেকে মুক্ত থাকার উপায় নেই। কেননা গোটা বিশ্বেরই জলহাওয়া দূষিত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই প্রস্তাব উঠেছে যে, জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোক এবং এই সম্মেলনে পরিবেশের ওপরে মানুষের ক্রিয়ার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হোক। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। ১৯৭২ সালে মানবিক পরিবেশ সম্পর্কিত জাতিসংঘের সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবার কথা।

তার আগে, বিষয়টিকে গুছিয়ে উপস্থিত করার জন্যে ৪০জন বিজ্ঞানী ও ৬০জন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি আমেরিকার একটি শহরে মিলিত হয়েছিলেন। পুরো একমাস ধরে তাঁরা বিষয়টিকে নানাদিক থেকে পর্যালোচনা করেছেন এবং অবশেষে কতকগুলো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বিষয়টি আমাদের দেশের পক্ষে জরুরি। এ-কারণে ওই বিজ্ঞানীদলের সিদ্ধান্তগুলো মোটামুটি উপস্থিত করার চেষ্টা করছি।

বিজ্ঞানীরা এমন কতকগুলো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন যার ফলে বিশ্বের জলবায়ুতে প্রভাব পড়তে পারে। বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, বায়ুমন্ডলে কণিকার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া—বিশেষ করে শব্দের চেয়েও দ্রুতগতি বিমান ও জেটবিমান থেকে আয়নমন্ডল সমেত বায়ুমন্ডল দূষিত হয়ে যাওয়া ও এমনি অন্যান্য কারণে কোনো একটি দেশের নয় গোটা বিশ্বেরই জলহাওয়া দূষিত হবার কারণ ঘটেছে। এমনি আরো কতকগুলো কারণে গোটা বিশ্বের প্রাণিজগতের বিন্যাসেও অদলবদল ঘটে যাবার সম্ভাবনা। শেষোক্ত কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে ডি-ডি-টি ও অন্যান্য উত্তেজক কীটনাশক রাসায়নিক, পারদ ও অন্যান্য উত্তেজক ভারী ধাতু, সমুদ্রের জলে তেল এবং নদী ও উৎসের জলে অতিরিক্ত পরিমাণ সার।

একটি একটি করে ধরা যাক।

জ্বালানী পুড়লে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরী হয়। শিল্পবিপ্লব শুরু হবার সময়ে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল প্রতি দশলক্ষে ২৮০ ভাগ। বর্তমানে আছে প্রতি দশ লক্ষে ৩২১ ভাগ। অর্থাৎ, প্রতি বছরে বেড়ে-যাওয়ার পরিমাণ প্রতি দশ লক্ষে ০·৭ ভাগ। এমনি বাড়তে বাড়তে ২০০০ সালে হবার কথা প্রতি দশলক্ষে ৩৭৯ ভাগ। অর্থাৎ ৩০ বছরের মধ্যে শতকরা ১৮ ভাগ বেড়ে-যাওয়া।

বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফল কী হতে পারে? বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকার দরুণ সূর্যের বিকীরণ পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে বাধা ঘটে না কিন্তু পৃথিবীর মাটির উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে বাধা সৃষ্টি হয়। অথচ পৃথিবীর উপরিতলের তাপমাত্রার স্থিরতা বজায় রাখতে হলে পৃথিবীর মাটিতে যে উত্তাপ পৌঁছচ্ছে এবং পৃথিবীর মাটি থেকে যে উত্তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে এ-দুয়ের মধ্যে একটা সমতা থাকা দরকার। বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যতো বাড়ে ততো কম উত্তাপ বেরোতে পারে পৃথিবীর মাটি থেকে—ফলে মোট উত্তাপ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী একশো বছরেও জ্বালানী পোড়ানো সমানেই চলবে, এবং তার ফলে পৃথিবীর উপরিতলের মোট উত্তাপ ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই বিপদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীরা এখন থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবার পক্ষপাতী।

বাতাসে কণিকার পরিমাণ নিয়ে এখনো তেমন ব্যাপক পর্যবেক্ষণ হয়নি। সমস্ত কণিকাই মানুষের কোনো ক্রিয়ার ফলে তৈরী হচ্ছে তা নয়, প্রাকৃতিক কারণেও তৈরি হয়ে থাকে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মোট কণিকার ছ-ভাগের এক ভাগ মানুষের তৈরি, বাকিটার উৎস প্রাকৃতিক—যেমন, সমুদ্রের লবণ, ধুলো, প্রকৃতিজগতের নানা রাসায়নিক ক্রিয়া ইত্যাদি। ১৯৬৮ সালের হিসেব অনুযায়ী, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রতি বছর যুক্ত হচ্ছে ১৬০ কোটি টন কণিকা, তার মধ্যে ৩৬ কোটি টন প্রকৃতি-জগতের রাসায়নিক ক্রিয়াজাত। তবে বছরের সব সময়েই বায়ুমন্ডলে এই পুরো পরিমাণ কণিকার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না, কেননা বায়ুমন্ডলে কণিকার স্থায়িত্ব কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের বেশি নয়।

আয়নমন্ডলের কণিকার স্থায়িত্ব কিন্তু এত অল্পসময়ে শেষ হবার নয়। তা অন্তত দু-বছর পর্যন্ত থেকে যেতে পারে। আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ার ফলে আয়নমন্ডলে কণিকা জমা হয়, মানুষের তৈরী নানা কারণেও হয়ে থাকে। শেষোক্ত কারণগুলির অন্যতম হচ্ছে শব্দের চেয়েও দ্রুতগতি বিমানের যাতায়াত। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, এই একটি বিশেষ কারণের জন্যেই আয়নমন্ডলের ধরণটাই পাল্টে যেতে পারে এবং পৃথিবীর মানুষের পক্ষে মহাবিপদ সৃষ্টি হতে পারে।

প্রাণিজগতের বিন্যাসে ওলোটপালোট ঘটে যাওয়াটা আরো বড়ো বিপদ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। আমাদের কৃষিব্যবস্থা যতোই উন্নত হোক কৃষির সাফল্যের জন্যে এখনো পর্যন্ত কীট-পতঙ্গের ভূমিকার ওপরে অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। অধিকাংশ ফসলের ক্ষেত্রেই পরাগ-যোগ হয় কীটের সাহায্যে। জলের মাছকে বেঁচে থাকতে হলে স্বাভাবিক খাদ্যধারাটি বজায় থাকা চাই। নানা ধরনের উদ্ভিদের একটি ব্যবস্থা বজায় না থাকলে জমির ক্ষয় ও বন্যাজনিত অবস্থা মারাত্মক আকার নিতে পারে। এগুলোর ওপরে এখনো পর্যন্ত মানুষের বড়ো রকমের হাত নেই। অথচ ডি-ডি-টি জাতীয় কীটনাশক ব্যাপকভাবে ব্যবহারের ফলে জৈব বিন্যাসে বড়ো রকমের অদলবদল ঘটে যাচ্ছে, যার ফল ক্ষতিকর হতে বাধ্য।

জলবায়ু দূষিত হওয়ার অন্য কারণগুলো ঘটেছে মানুষের তৈরী শিল্প ও কৃষির বর্জিত পদার্থ থেকে। এই বর্জিত পদার্থ দ্রুত বাড়ছে, যেমন পরিমাণে তেমনি ধরণে। এবং আরো বাড়বে। এই বর্জিত পদার্থের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থেকে যায় লৌহ, নাইট্রোজেন, ম্যাঙ্গানীজ, তামা, দস্তা, নিকেল, সীসে, ফসফরাস এবং মলিব্‌ডেনাম ক্রোমিয়াম, রৌপ্য, পারদ, টিন, ও অ্যান্টিমনি। এই পদার্থগুলো শেষপর্যন্ত গিয়ে পড়ে নদীর জলে। এই অবস্থাটিকেই বিজ্ঞানীরা বলছেন সারের আধিক্য। এর ফলে জীবজগতে বিপর্যয় ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই বিপদের বিরুদ্ধেও অবিলম্বে আইন করে জরুরি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

সমুদ্রের জলে তেল পড়াটাও বিজ্ঞানীদের মতে একটি বড়ো সমস্যা। জাহাজ ইত্যাদি জলযান থেকে প্রতি বছরে ১৫ লক্ষ টন তেল সমুদ্রের জলে পড়ে। ডাঙার মোটরগাড়ি ও কলকব্জা থেকে তেল পড়ার পরিমাণ এর প্রায় দ্বিগুণ যার প্রায় সবটাই

নদীর জলের সঙ্গে শেষপর্যন্ত এসে যায় সমুদ্রে। এখনি নানাভাবে সমুদ্রের জলে অনবরত তেল পড়ছে। জীবজগতের পক্ষে এই অবস্থাটিও প্রকাণ্ড একটি বিপদ বলে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করছেন।

এসব কথা শুনে মনে হতে পারে, শিল্প ও বিজ্ঞানের যতো অগ্রগতি হচ্ছে ততো তার আনুষঙ্গিক ফল হিসেবেই যেন পৃথিবীটা মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। কথাটা মিথ্যা নয়। তবে আশার কথা, বিজ্ঞানীরা বিপদ সম্পর্কে সচেতন এবং ক্রমিকভাবে এই বিপদ দূর করার জন্য তৎপর।

কাপড়-কাচা থেকে কাণ্ড

খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ও চলচ্চিত্রের পর্দায় আমাদের দেশেও বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায় যাতে হাঁকিয়ে বলা হয় কোন পদার্থ দিয়ে কাচলে সাদা কাপড় হয়ে ওঠে আরো সাদা। কাচার পরে কাপড় যতো বেশি সাদা দেখায় ততো ভালো—এই ধারণায় আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু এই ধারণা এবারে বদলাতে হবে। পরিবেশ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের মতে, ধোলাইয়ের পরে কাপড়ের শুভ্রতা যত বেশি, পরিবেশ ততো স্বাস্থ্যকর। যাঁদের বয়স একটু বেশি তাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারবেন, আগেকার কালে যে-ধরনের সোডা-সাবান দিয়ে মায়েরা কাপড় কাচতেন তাতে কাপড় কখনোই ধবধবে সাদা হত না। অথচ হালের গুঁড়ো সাবানের কল্যাণে অল্প আয়াসেই সাদা কাপড় যেন হয়ে ওঠে আরো সাদা, ময়লা বা দাগের লেশমাত্র থাকে না। তার মানে, হালের গুঁড়ো সাবানে এমন কিছু আশ্চর্য উপকরণ নিশ্চয়ই আছে, যা কাপড়ের ময়লা দাগ তুলে ফেলার ক্ষমতার অধিকারী।

হালের গুঁড়ো সাবানের এই উপকরণগুলো হচ্ছে ফসফেট ও এনজাইম। ফসফেট ও এনজাইম থাকার ফলেই হালের গুঁড়ো সাবানে সাদা কাপড় এত সাদা হয়ে ওঠে। ধরা পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের আপত্তি এই উপকরণগুলোর বিরুদ্ধেই। তাঁরা বলছেন, ফসফেট ও এনজাইম নদী ও হ্রদের জল বিষাক্ত করে তোলে, জনস্বাস্থ্য বিপন্ন করে।

কি ভাবে? ফসফেট ও এনজাইম জলের শ্যাওলা বাড়িয়ে তোলে। ফসফেট ও এনজাইম মিশ্রিত জলে আরো বেশি আগাছা গজায়। ফলে জল হয়ে পড়ে বদ্ধ ও জলের অক্সিজেন যায় কমে। এনজাইম স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। বিশেষ করে যাঁরা এনজাইম নিয়ে কাজ করেন সেই শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে।

এ-কারণে, কাপড় খুব বেশি সাদা না হোক, কাপড়-কাচার সাবানে এনজাইম না থাকাটাই নিরাপদ। আজকাল বাজারে ময়লা-পরিষ্কারক হিসেবে যে-সব পদার্থ বিক্রি হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা এনজাইম সহযোগে তৈরী। এই পদার্থগুলো বর্জন করা দরকার ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় এনজাইম সম্পর্কে এমন একটা উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে যে, এনজাইম সহযোগে তৈরী সকল ব্র্যাণ্ডের ময়লা-পরিষ্কারকের বিক্রি অনেকের মতে পর্যায়ের দিকে। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক কোম্পানীকে এনজাইমের ব্যবহার বন্ধ করতে হয়েছে।

ফসফেট সম্পর্কেও একই কথা। কিন্তু ময়লা-পরিষ্কারক পদার্থ থেকে ফসফেটকে বাদ দেওয়াটা রীতিমতো সমস্যার ব্যাপার। তার আগে ফসফেটের মতো ক্রিয়াশীল বিকল্প কোনো উপকরণের সন্ধান পাওয়া দরকার। আজকাল যখন কৃত্রিম তন্তু বস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে তখন আর সোডা-সাবানের যুগে ফিরে যাওয়া চলে না। আধুনিক বস্ত্রের ধোলাই করার মাধ্যমটিও হওয়া চাই তদুপযোগী। তাছাড়া, আগেকার দিনের সোডা-সাবান একালের কাপড়-কাচা যন্ত্রে অচল। এই যন্ত্রের জন্যও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ময়লা-পরিষ্কারক উপকরণ চাই। ফসফেট ও এনজাইম যদি না হয় তো তার বিকল্প কিছু।

স-মনুষ্য চন্দ্রাভিযানের বিরুদ্ধে

'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ৩ই ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় 'এণ্ড দিস লুনাসি' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে অর্থাৎ এই পাগলামি বন্ধ হোক। 'লুনাসি' শব্দটির ব্যবহার এখানে বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। বাংলায় যদি বলি চাঁদ-পাগলা তাহলে কিছুটা বোঝা যায়। বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছে এই প্রবন্ধটি সংক্ষেপে উপস্থিত করতে চাই।

স-মনুষ্য চন্দ্র-অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে এখন একমাত্র যুক্তি থাকতে পারে জাতীয় মর্যাদা। মার্কিন নভশ্চররা চাঁদে গিয়ে যা-কিছু করছেন সবই আরো ভালোভাবে করা যেতে পারে (এবং খরচের একভাগ খরচে) যন্ত্রী চন্দ্রযানের সাহায্যে। যন্ত্রী চন্দ্রযানটি কাজ করে দিনরাত্রি, হাঁটে আরো বেশিদূর, অনুসন্ধান করে আরো গভীরে, কুড়িয়ে তোলে চাঁদের পাথরের আরো বড়ো চাঁই। একথা সত্য যে, স-মনুষ্য অভিযানের ফলে প্লাস্টিক ও সংকর-ধাতুর ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তাই বলে খ-সাঠানো একটি ফ্রাইং প্যান উদ্ভাবনের জন্য তিনটি মানুষকে মহাশূন্যে উঠিয়ে চাঁদের প্রশান্ত সাগরে এনে নামাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এর চেয়ে সহজ ও কম খরচের কোনো উপায় থাকা উচিত। ইতিমধ্যেই মার্কিন দেশের কিছু সংস্থার বাকি যে হয়ত দৃষ্টিতে গোটা প্রকল্পটিকে বিচার করতে শুরু করেছেন। ন্যাশনাল এরোনটিক্স ও স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নাসা) বরাদ্দ ও কর্মীসংখ্যা অর্ধেক কমানো হয়েছে এবং অ্যাপোলো কর্মসূচী থেকে তিনটি স-মনুষ্য অভিযান বাদ দেওয়া হয়েছে। মহাকাশের চরমনো উথ্থান-পতন, নভশ্চারণিক ঠাট্টাতামাসা ও বাইবেল-পাঠ দিয়ে এখন আর গোটা আমেরিকার কল্পনাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন, নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিনকে চাঁদের মাটিতে পা দেওয়াবার জন্যে যে ২,০০০ কোটি ডলার খরচ করা হল তা আমেরিকার শহরের মানুষের দারিদ্র্য ও আবহাওয়া দূষিত হয়ে যাওয়ার মতো কোনো জরুরি সমস্যার সমাধানের জন্যে খরচ করা যেত কিনা।

প্রশ্নটাকে এভাবে তোলার মধ্যে অতি-সরলীকরণ ঘটে যাচ্ছে। মহাকাশ-অভিযান থেকে অর্থ বাঁচিয়ে তা সামাজিক সমস্যার মোকাবিলার জন্যে দিলেই তা কাজে লাগবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনটি মানুষ সমেত একটি রকেটকে চাঁদের দিকে পাঠাতে যে অর্থ খরচ হচ্ছে তা দিয়ে কতগুলো হাসপাতাল বা জনস্বাস্থ্য গবেষণা কেন্দ্র চলতে পারে—এ হিসেব যাঁরা করেন তাঁদের মনোভাবটা বোঝা যায়। কিন্তু তাঁরা একটি জরুরি কথা ভুলে যাচ্ছেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি মহলে মহাকাশ-অভিযান সম্পর্কে অতিমাত্রায় আগ্রহী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান-বাহিনী ইতিমধ্যেই অ্যাপোলো-উত্তর কর্মসূচীর অনেকখানি গ্রহণ করেছে।

অতীতে মহাকাশ-অভিযানের রণ-কৌশলের সঙ্গে সামরিক ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবনের একটা সরাসরি সম্পর্ক ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েত ইউনিয়নেও। কিন্তু এখন আর এই বিশেষ ক্ষেত্রেও খুব বেশি কিছু জানার নেই, যা জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজনীয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন একথাটি বুঝেছে এবং মনে হয় এজন্যেই খরচ ও ঝুঁকি দুই-ই কমিয়েছে। লুনা—১৭ যে লুনোখোদটিকে চাঁদের মাটিতে নামিয়েছে তার সাহায্যে যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব, স-মনুষ্য অভিযানের সাহায্যে সেই একই পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করতে হলে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী, খরচ দাঁড়িয়ে যায় দশগুণ বেশি।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘোষণা করেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাঁদে মানুষ পাঠাবে, সেটি ছিল আসলে মার্কিনী ও রুশীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ঘোষণা। এই প্রতিযোগিতায় হারলে মার্কিনীদের আত্মমর্যাদায় অবশ্যই ঘা লাগত। তাছাড়া পৃথিবীর মাটিতে সমস্যা অনেক চেয়ে মহাকাশের প্রতিযোগিতায় নামা অবশ্যই অনেক ভালো। মধ্যপ্রাচ্যে বা ইন্দোচীনে বা পূর্ব ইউরোপে তলোয়ার না ঘুরিয়ে তাঁরা বরং মহাশূন্যে রকেট ফাটানোয় ব্যস্ত থাকুন। কিন্তু অ্যাপোলো—১২ চাঁদের মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তো এই প্রতিযোগিতার অবসান হয়েছে। তারপরে অ্যাপোলো—১৩ অভাবে বিপর্যয়ের কিনার থেকে ফিরে এসেছে তাতে গোটা অভিযানটি সম্পর্কে বৈপরীত্য ঘটার কথা। বুঝতে পারার কথা এই অভিযানের দাম কতটুকু।

বরাদ্দ কমে যাবার পরেও এখনো নাসার বরাদ্দ বছরে প্রায় ৩৫০ কোটি ডলার কর্মীসংখ্যা বছরে প্রায় দেড় লক্ষ। আরো তিনটি স-মনুষ্য অভিযান হবার কথা আছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন যদি সত্যিই চান এমন কিছু তিনি করবেন যাতে মানবজাতির ইতিহাসে তাঁর নাম থাকবে—তাহলে সাঙ্ঘাতিক বিপর্যয় ঘটার আগেই এই অপচয়কে একেবারে বন্ধ করে দিয়ে তিনি তা করতে পারেন।

—জয়ন্ত

চাঁদে উপেক্ষিত

সুদীপ ঘোষ

চাঁদের বয়স কতো? চাঁদের আর চাঁদের কলঙ্কের বয়স কি একই? চাঁদ কি তার কলঙ্ক নিয়েই জন্মেছে? প্রাগৈতিহাসিক কোন গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগে চাঁদের জন্মের পরে চাঁদের কলঙ্কের জন্ম হয়নি তো!

চাঁদের বয়স জানার জন্যই তো চাঁদের নিজে যাওয়া আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মাটি, নুড়ি পাথরের দরকার ছিল। অ্যাপোলো চতুর্দশের এবারকার অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তাই। এই গর্তে চারশো ষাট কোটি বছর পুরানো শিলীভূত ধুলোবালি জমে আছে। ঐ গহ্বরের মধ্যে থাকার ফলে এবং চাঁদে হাওয়া আবহাওয়া কিছুই নেই বলে ঐ নুড়িপাথর মাটি অবিকৃত রয়ে গেছে এই চারশো ষাট কোটি বছর। তার রকমসকম, ধরন-ধারণ রাসায়নিক সংস্থিতি আজও তাই আছে। বদলায় নি।

চাঁদের নিজের আলো নেই। ধার-করা আলো। চাঁদ বড়জোর একটি দর্পণ। প্রতিফলক। সূর্যের আলো প্রতিফলন করে। একসময়ে যা ছিল অগম্য, এখন তা দুর্গম হলেও অগম্য নেই আর। এবার নিয়ে চাঁদের মাটিতে পা পড়ল ছজন মানুষের। কারোর কি-ই বা আছে! প্রাগৈতিহাসিক দিনে অন্য কোন উপগ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেছিল। বিরাট বিরাট গর্ত হয়ে আছে। সংঘর্ষের ফলে বালু মাটি পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সর্বত্র। পাহাড় ছিল। অগ্নিগিরি। নিভে যাওয়া সেই জ্বালামুখীর গহ্বর আজো আছে।

চাঁদের বুকে প্রাণ নেই প্রাণী নেই। হাওয়া আবহাওয়া জল কিছুই নেই। শ্যামলতা নেই। শব্দ নেই। গাছপালা নেই। যেমনি নিষ্প্রাণ তেমনি নিশ্চল। উপরিভাগে শুকনো ধুলো। ঐ অবস্থায় আছে কয়েক শ' কোটি বছর। বদলে যায়নি। কোন কোন জায়গায় কঠিন হলে খুঁড়ে পেতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার নরম মাটি ধুলো ফুঁড়তে হবে।

চাঁদের মুখে অসংখ্য বসন্ত-ক্ষত। ঐ ক্ষতগুলির কী বাহার বাহার নাম! সী অব নেক্টার। অমৃতসাগর। আহা, সাগর তো শুকনো। নীরস। কোথায় তাতে অমৃত। সবই তো মৃত। সী অব ফার্টিলিটি। উর্বরতার সাগর। কোনো কিছুই জন্মায় না যেখানে, সেখানে জননীর কোথায়? সী অব ক্রাইসেস। সঙ্কটের সাগর। সংকট কই? দিব্যি তো লোকেরা নামছে। শেপার্ডের এবারকার পদপাত—চাঁদকে পঞ্চম মানব পদাঘাত। মিচেলের পা রাখা ষষ্ঠ মানুষের। সী অব ট্র্যাংকুইলিটি প্রশান্তির সাগর। সী অব সিরীনিটি, নির্মলতার সাগর। সী অব শাওয়ার্স, বৃষ্টিই নেই তো বৃষ্টির সাগর। সী অব কোল্ড। জায়গায় জায়গায় দারুণ শীত আছে ঠিকই। সী অব ভেপারস। না, মাঝে মাঝে কিছুর ধাক্কা লাগলে হাল্কা ধুলো ওড়ে বটে, তাই বলে বাষ্পের বিন্দু-বিসর্গও নেই সেখানে। সী অব ক্লাউডস। মেঘ কই? নক্ষত্রের শিলার বিছানা সেখানে। সী অব ময়েশ্চার। শীকর সাগর। ওসেন আছে একটি। ওসেন অব স্টর্মস। ঝড়ের সমুদ্র।

অসূর্যম্পশ্যার মুখের এ পিঠেই তো এত ক্ষত এতো চিহ্ন। আসল বা নকল একটু স্নো-ও নেই যে, মুখের ক্ষতগুলি ঢেকে ক্রিম দিয়ে প্রসাধনের মাত্রা দেবেন। এই তো এ পিঠ। আর ও পিঠ? লোকলোচনের সামনে বের করতে ওনার এত লজ্জা যে কোনদিনই ও-পিঠটা কারোকে দেখাবেন না।

চাঁদের এ পিঠের মাঝখানটার কয়েক শ' কিলোমিটার বাঁয়ে ফ্রা মরো। পাহাড়ে এলাকা। এর আগে মানুষ নেমেছে সমতলে। অ্যাপোলো ১১, অ্যাপোলো ১২ ঐ সমতল থেকেই কুড়িয়ে এনেছে সাতচল্লিশ পাউণ্ড আর পঁচাত্তর পাউণ্ড মাটি, নুড়িপাথর। এই মাটি আমরা লম্বা কিউ দিয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় বসেই দেখেছি। এবার তাই বৈজ্ঞানিকেরা বেছে নিয়েছিলেন পার্বত্য অঞ্চল। এটা মানুষের সফল তৃতীয় অভিযান। প্রস্তুতির শেষ পর্বে শনিবার ত্রিশ জানুয়ারী দুপুর থেকে স্যাটার্ন রকেটে জ্বালানী বোঝাই শুরু হল। এই রকেটটি ছত্রিশ তলা বাড়ির সমান উঁচু। পৃথিবীর জানালাটি খোলা থাকবে রবিবার রাত একটা তিপান্ন থেকে তিন ঘণ্টা উনচল্লিশ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে যাত্রা করতে না পারলে ফ্রা মরোতে পৌঁছতে পারা যাবে না। অ্যাপোলো চতুর্দশ ঠিক সময়ে একটা তিপান্নতেই যাত্রা করল। এবার যা যা কাজ দেওয়া হয়েছিল সবই করে এসেছেন শেপার্ড মিচেল। শুধু দুটি কাজ পারেন নি। এই দুটি কাজই ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনশ তিন ফুট উঁচু মরা অগ্নিগিরির লাভাগহ্বর থেকে আদিকালের নুড়িপাথর আনা। তাতেই নিহিত আছে সৌরজগতের সৃষ্টি ও উদ্ভব রহস্য। ওখানকার শিলাখণ্ড ঐ গহ্বরে থাকার ফলে অবিকৃত রয়ে গেছে। সেই চারশো ষাট কোটি বছর আগেকার অবস্থাটি ধরা আছে। কোন পাহাড়ের চূড়াটি অজিত রয়ে গেছে। ঐ পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে ইচ্ছা ছিল পৃথিবীটাকে দেখার। হয়নি। তিন-চতুর্থাংশ উঠেছিলেন। আর পারেন নি। হাঁপ লেগেছিল। ক্লান্ত বোধ করছিলেন। কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। গলার আওয়াজ বের হচ্ছিল না। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়ে একজনের একশো পঞ্চাশ, আরেক জনের একশো ত্রিশ। পাহাড়ি অত্যন্ত খাড়া। দৌড়ে নেমে এসেছিলেন শেপার্ড মিচেল। ফিরে এসেছিলেন অ্যান্টারেসের কোলে। আরও একবার হৃৎস্পন্দন অস্বাভাবিক ও দ্রুত হয়েছিল। শেপার্ডের একশো চল্লিশ, মিচেলের একশো কুড়ি। সেটা অ্যান্টারেসের মই থেকে চাঁদে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে। রিক্সা নিয়ে গিয়েছিলেন, দুচাকার। মানুষে টানা রিক্সা। রিক্সা বা ঠেলা। নাম মেট। এম-ই-টি। মডুলার ইকুইপমেন্ট ট্রান্সপোর্টার। চাঁদে যে-কোন জিনিসের ওজনই পৃথিবীর ওজনের ছ ভাগের ভাগ। রিক্সা তাই এক হাতে টানাও সম্ভব হয়েছিল। কখনও টেনেছেন শেপার্ড কখনও মিচেল। এক হাতে টানা যেমন সম্ভব, তেমনি হাঁপও ধরা লাগবে অতি সহজে। সেই রিক্সায় যন্ত্রপাতি যেমন ছিল, টাটকা সংগ্রহ ছিয়ানব্বই পাউণ্ড নুড়িপাথরও ছিল। চাঁদে নামার ভেলা থেকে ফ্রা মরো যেতে তিন হাজার ফুট দূরে গিয়ে পড়েছিলেন। সেই তিন হাজার ফুট পার্বত্য বন্ধুর পথ। প্রস্তরস্তূপের মধ্যে দিয়ে দুশো কিলোগ্রাম ওজন-বোঝাই রিক্সা টেনে নিয়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছিল ওঁদের। এর আগের দুবার ভেলা ছেড়ে এত দূরে যেতে সাহস পাননি কেউ।

পৃথিবী থেকে চাঁদে পাড়ি দিতে গেলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে রকেটকে ঠেলতে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন হয়। কিটি হক মূল চন্দ্রযান। সঙ্গে বাহক অ্যান্টারেস। অ্যান্টারেস তৈরী হয়েছিল বায়ুহীন পরিমণ্ডলে চলার উপযোগী করে। চাঁদের কাছে পৌঁছে এগারো মাইল ওপরে থেকে ওঁরা দুবার পাক মেরেছিলেন চাঁদকে। তখনও তিনজনই কিটি হক-এ। এর আগের দুবার অ্যাপোলো একষট্টি ও আটষট্টি মাইল ওপরে থেকে ভেলা নামিয়েছিলেন চাঁদে।

চাঁদকে দুবার পাক দিয়ে যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিলেন ওঁরা। তারপর চাঁদে নামার পালা। কিটি হক থেকে শেপার্ড ও মিচেল অ্যান্টারেসে বদলি হলেন পাঁচ তারিখ ভোরে।—বেলা দশটা কুড়ি মিনিটে কিটি হকের মাতৃযান থেকে অ্যান্টারেস-বাহক বিচ্ছিন্ন হলেন। কিটি হকের চার্জে থাকলেন বেচারা রুসা। কিটি হক নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টা। শেপার্ড মিচেল এর মধ্যে ওঁরা চাঁদে রাখা অ্যান্টারেস থেকে দুবার চাঁদের মাটিতে নেমেছিলেন। দুবার ফিরে এসেছিলেন নিরাপদ আশ্রয় অ্যান্টারেসে। সে পরের কথা। কিটি হক ছেড়ে এগার মাইল নিচে চাঁদের মাটি স্পর্শ করতে লাগবে এগার মিনিট। লেগেছিল তেরো মিনিট। নামছিলেন আর আনন্দে আশ্চর্য হচ্ছিলেন শেপার্ড। হিউস্টন স্পেস কেন্দ্রকে বলছিলেন—জ্বালানী, চমৎকার। অদ্ভুত ভালো। শতকরা দশ ভাগ জ্বালানী, একশো আটাত্তর সেকেণ্ড সময়সাপেক্ষ। শতকরা ছ ভাগ—একশো আটাত্তর সেকেণ্ড। এইবার ধুলো। একশো ছ

কুড়ি…চল্লিশ ফুট…তিন ফুট বাকি…কি চমৎকার!—মিচেল বলছিলেন…সেকেন্ডে এক ফুট করে নামছি…স্পীড একটু বেড়ে গেল! নামছি…নামছি…নেমেছে…

মিচেল অল্ড্রিন চেঁচিয়ে উঠলেন—আমরা চাঁদের পিঠে পা দিলাম—

সময় তখন—বিকেল দুটো বেজে আট-চল্লিশ মিনিট চোদ্দ সেকেন্ড—

হিসেবের চেয়ে দু মিনিট বেশী লাগল. অবতরণের সময়…

অ্যান্টারেস চতুষ্পদ হল যেখানে, সে জায়গাটা আট ডিগ্রী ঢালু। অ্যান্টারেসের অভিঘাতে দু ঘন্টা ধরে চাঁদের বুক ঘন্টা-ধ্বনির মতো বেজে চলেছিল।

টেলিভিশনে অ্যান্টারেসকে, শেপার্ড মিচেলকে সাদা, অন্তরীক্ষকে কালো দেখাচ্ছিল চাঁদের উপরিভাগ ও পা দেখাচ্ছিল হাল্কা, নীলচে ধূসর। সময় সময় বাদামী ধূসর। শেপার্ড মিচেল কিন্তু চাঁদের পিঠের রঙ বললেন ধূসর বা ধূসর বাদামী।

সাড়ে তেত্রিশ ঘন্টা শেপার্ড মিচেল চাঁদের বুকে ঘুরে বেড়ালেন। কাজ সারলেন। দুবার ফিরে এলেন অ্যান্টারেসে। একশো মিটার উঁচু নিচে হাওয়া ঢিপিটির ওপরে ওঠা হল না। তার মুখের গহ্বরে নুড়িপাথর মাটি কুড়োন হল না। যা যা হল তা হল, যা হল না, তা হল না। বাকি পড়ে রইল। আর নয়। অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে পাহাড়ে উঠতে আধ ঘন্টা বেশী সময় লেগেছে এমনিতেই। এইবার ফেরার পালা। সাড়ে তেত্রিশ ঘন্টা বিচ্ছিন্ন থাকার পর চাঁদের গা থেকে লাফিয়ে অ্যান্টারেস এগার মাইল উঁচু মায়ের কোল কিটি হককে ফিরে এল। ফেব্রুয়ারী শেষ রাত্রি দুটো পাঁচ।

শেপার্ড মিচেল ফিরে এলেন কিটি হকে, অ্যান্টারেস ছেড়ে। অ্যান্টারেসকে নিক্ষেপ করে। এইবার অ্যান্টারেসের কাজ শেষ: ওকে আর দরকার নেই। ও এখানে বাহুল্য। ওর ওজন কে বয়ে নিয়ে যাবে? শুধু নাহক জ্বালানী খরচ!

ওকে বিচ্যুত করা হল। ও বেচারী ঘণ্টায় সাইত্রিশ শ' মাইল বেগে চাঁদের বুকে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল।

সেই থেকে বুধবার বিকেল দুটো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত ঘরমুখো তাঁরা তিনজন।

শেপার্ড, মিচেল, রুসা। সারথি সে-ই রুসাই। রথের আরোহী শেপার্ড মিচেল।

প্রথম কয়েক হাজার কিলোমিটার ছিলেন চাঁদের স্নেহের আকর্ষণের আওতায়। সাত তারিখ রবিবার রাত দশটা পঁয়ত্রিশে পৃথিবী থেকে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার দশ উনিশ কিলোমিটার দূরে। চাঁদের আকর্ষণ সামান্যই ছিল। গতিবেগ তখন ঘন্টায় তিন হাজার আটশ' পঁচাত্তর কিলোমিটার। চাঁদের স্নেহ কাটিয়ে নিরপেক্ষ এলাকা। যেখানে না আছে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ, না আকৃষ্ট হয়েছে পৃথিবী। নিরপেক্ষ এলাকা পার হয়ে ঢুকলেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতায়। আট তারিখ বিকেল তিনটে ছাপ্পান্ন মিনিটের সময় পুরোপুরি পৃথিবীর খপ্পরে এসে গেলেন। যত পৃথিবীর নিকটস্থ হবেন, গতি-বেগ তত বাড়বে। নয় তারিখ রাত দশটা চল্লিশ থেকে পৃথিবী থেকে চুয়াত্তর হাজার একশ কিলোমিটার দূরে—গতিবেগ তখন ঘন্টায় বারো হাজার তিনশ পঁচিশ কিলোমিটার।

মানুষ ভুল থেকেই শেখে। ঠেকে শেখে। অ্যাপোলো ত্রয়োদশে ভুলের জন্য দুটো অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সর্বনাশ হবার উপক্রম হয়েছিল। এবার অতিরিক্ত তিন নম্বর ট্যাঙ্ক দিয়ে দেওয়া হল। বিচ্ছিন্ন করে। ঐ দুটোর ক্ষতি তৃতীয়টাতে না অর্সায়।

ভুল কি হয়নি একেবারে তা বলে? দশ তারিখ বিকেল দুটো পঁয়ত্রিশ প্রশান্ত মহাসাগরে নামার মিনিট পনেরো আগে দারুণ বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। কিটি হকের সঙ্গে আবহাওয়ার সংঘর্ষে তাপমাত্রা পাঁচ হাজার ডিগ্রী ফারেনহিট। তিন মহাকাশ পথিকের পুড়ে মরার আশঙ্কা পুরোমাত্রায় দেখা দিয়েছিল। বিজ্ঞান তা হতে দেয়নি।

আরো একবার ভুল হয়েছিল। সুরুতেই। যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন ভুল খবর পাঠিয়েছিল কম্পিউটার। ফলে, হিউস্টন কেন্দ্র থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, চাঁদে নামতে হবে না, ফিরে এস। তাও রদ হয়েছিল বিজ্ঞানের দৌলতে। অর্থাৎ ফিরে আসতে হয়নি।

ভুল তো হয়েছিল অনেকই। সেইগুলো আলোচনা করছেন মিচেল, এয়ারক্রাফট কেরিয়ার নিউ অর্লিন্স জাহাজে বসে, প্রশান্ত মহাসাগরে উদ্ধার পাবার পর। যান্ত্রিক অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েছে। সেগুলো আগামী তিন অভিযানে যেন না থাকে।

ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাড-মিনিস্ট্রেশান—সংক্ষেপে নাম নাসা। নাসার অস্থায়ী ব্যবস্থাপক জর্জ লো উত্তর দিয়েছেন। সবগুলো ভুল মেনে নিয়েছেন উত্তর যা দিয়েছেন সবগুলোই—তোমার কথা ঠিকই, কিন্তু—ধাতের।

এক সময় বলেছেন, এতো বড়ো ঝঞ্ঝাট ব্যাপার।। নিখুঁত কি হয়? এক জায়গায় স্বীকার করলেন টাইমিং একটু এদিক-ওদিক হলে আর দেখতে হত না। চাঁদে নামাই হত না। অ্যাপোলো তেরো তো নামতেই পারে নি। এবারেও না নেমে ফেরত আসার আশঙ্কা খুব প্রবল হয়েছিল। লুনার মডুল'এর 'অ্যাবর্ট সুইচ' মূল চন্দ্রযানের কম্পিউটারকে অশুদ্ধ সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল। এই 'চলেই-ফিরোচে'র সুইচটি পরিচালক যদি চাঁদে নামবেন না সিদ্ধান্ত নিয়ে নামতে নামতে নামা বন্ধ করতে চান, তবেই কার্যকরী হবে। কিন্তু ওরা তা না চাইলেও ঐ সুইচ কাজ করতে সুরু করে দিয়েছিল। একত্রিশে জানুয়ারী সুরুতেই তো গোলমাল। হুকুম-দার জাহাজের সঙ্গে চান্দ্র মডুলটিকে জুড়তে দিতে ছবার লাগল। লুনার মডুলের ওপর পথে ভোল্টেজ গেল কমে। ল্যান্ডিং রাডার কাজ সুরু করতে দেরী করল অস্বাভাবিক।

একের পর বারোটা শূন্য দিয়ে এক বিলিয়ন হয়। বাইশ বিলিয়ন ডলার খরচা পড়েছে এই আকাশ-বিহারে। ঠিক জানি না কী লাভ এতে হল! ঠিক জানি না এই বিরাট অঙ্কটা মানব-কল্যাণে পৃথিবীর মানুষের জন্য ব্যয় করলে আরো লাভ, আরো ভালো হত কিনা।

এবারের লাভ ছিয়ানব্বুই পাউন্ড চাঁদের মাটি পাথর। এর অংশ দুভাগে তুলে রাখা হবে সুদূর ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য। বাকি তিন শতাংশ নিয়ে গবেষণা সুরু হবে এখনই। একটু মাটি পাবার ভারতের ভাগ্যেও ছিটিয়ে দিয়েছে 'নাসা'। চাঁদের মাটিতে নাইট্রোজেনের অংশ নির্ণয়ে সাহায্যের জন্য কানপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজীর ডক্টর গোয়েলকে পাঠানো হচ্ছে খানিকটা। অ্যাপোলো একাদশের আগেও অনেক বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, চাঁদের কয়েক গ্রাম মাটি পেলে তিনি চাঁদের বয়স বলে দিতে পারবেন। পারেননি। কেমন পারেন নি আরো অনেক রহস্য ভেদ করতে। চাঁদ দূরে ছিল, পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণে টেনে এনে ঐ কক্ষপথে স্থাপন করেছে। কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো কক্ষে ঘানি টেনে চলেছে চাঁদ। এইটাই সত্য? না, পৃথিবীর মা-টি থেকে পৃথিবীর মাটি থেকে ছিটকে গিয়ে চাঁদ জন্মেছে। একসময়ে পৃথিবীরই অংশ ছিল। এইটাই সত্যি? এবারের অ্যাপোলো চতুর্দশ অভিযানের আর এক কাজ—চাঁদের বুকে পরমাণু পরিচালিত পরীক্ষাকেন্দ্র ছেড়ে আসা। যা থেকে আগামী এক বছর পর্যন্ত তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পারা যাবে।

বৈজ্ঞানিক হিসাবকে নিখুঁত প্রমাণ করে দশ তারিখ দুটো পঁয়ত্রিশ প্রশান্ত মহাসাগরে ভূমিষ্ঠ হলেন তাঁরা। মাত্র দু মিনিট ভুল। যাতায়াতে আট লক্ষ কিলোমিটার, যাত্রা ন' দিনের। ভুল মাত্র দু মিনিট। এই অতি বৃহৎ ক্রিয়াকাণ্ডের কর্মীসংখ্যা বেশি নয়, মাত্র পঁচিশ হাজার। কেনেডী স্পেস কার্য-দপ্তরেই ষোল হাজার।

আমার কষ্ট হয় চাঁদের উপেক্ষিত দুটির জন্য। একটি নির্লোভ মানুষ। স্টুয়ার্ট রুসা। অভিনয়ের নেপথ্যে থেকেও নায়ক, নায়ক হয়েও নেপথ্যে। ট্যান্টালাসের কাপ-এর মতো হাতের নাগালে চাঁদ। নামা হল না। সারথ্য করেই কাটল। কাটল এগারোটা দিন, পরের নাম-যশ ঘটার সাহায্য করেই। দ্বিতীয় যার জন্য আমার কষ্ট, সে অ্যান্টারেস। বৃশ্চিকরাশির তারামণ্ডলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের নামে নাম যার। অ্যান্টারেসকে কোলে করে নিয়ে গেল কিটি হক। তখন কত কদর। তাকে বিচ্যুত করে শেপার্ড মিচেল সমেত নামিয়ে দিল চাঁদের মাটিতে। সাড়ে তেত্রিশ ঘন্টা পর উঠিয়েও নিল চাঁদ থেকে। যুক্ত করল কিটি হকের সঙ্গে। শেপার্ড মিচেল উঠে এলেন অ্যান্টারেস থেকে কিটি হকে। অ্যান্টারেসের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল তাকে। ঘন্টায় সাইত্রিশ শ' মাইল বেগে চাঁদের বুকে মুখ থুবড়ে পড়ল বেচারী।

বৃত্ত

বৈদ্যনাথ সাহা

আমরা মেসের তেতালায় ভাগাভাগি এক-খানা পুরো ঘর দখল করতে পেরেছিলাম। ঘরখানায় তিনটি সিট, আমরাও তিন বন্ধু। সুবিধে হল, ঘরখানা রাস্তার ধারে, সামনে রেলিং-দেওয়া ঢাকা বারান্দা, আলো-বাতাস দক্ষিণ খোলা। রেলিংয়ে দাঁড়ালে রাস্তায় চলমান গাড়ি, মানুষ, মেয়েছেলে—এসব দেখা যায়, আকাশ দেখা যায়, এমন কি সামনের বাড়ির জানালা দিয়ে কর্মব্যস্ত কঙ্কাবতীকে পর্যন্ত সারাক্ষণ দেখা যায়। মেয়েটির নাম কঙ্কাবতী কিনা কে জানে! এটা আমাদের দেওয়া নাম—আমাদের মধ্যেই চালু।

আমাদের নাম ও জেলার নামের সঙ্গে একটা আশ্চর্যজনক ম-বর্ণের যোগ ছিল। আমি মদন বসাক, বাড়ি মেদিনীপুরে, মলয় কুণ্ডু এসেছে মালদহ থেকে আর তৃতীয় জন মুর্শিদাবাদের মুকুট রায়। মফস্বল থেকে কলকাতায় আসার পর ম-কারান্ত যোগে জড়িয়ে পড়তে আমাদের খুব বেশী কষ্ট করতে হয়নি। ছাত্রজীবনে তিনজনেই পরস্পর ঘনিষ্ঠ হবার পরই আমাদের মধ্যে একটা ত্রিভুজবন্ধন ঘটে গিয়েছিল। এখন আমরা ত্রিভুজের তিন বাহু, ত্রিকোণ রচনা করেছি। তিনজনেই কমার্সের ছাত্র, তিনটি বাসা ডিগ্রি নিয়ে সাহেব কোম্পানিতে মাত্র তিনটি বছর প্রণাম করে হোস্টেল এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অল্প কিছুদিন হল এই মেসে এসে উঠেছি। এখন আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা হাস্যকরভাবে আড়ম্বরহীন মধ্যবিত্ত—চাকরি, গাড়ি, বাড়ি, নারী। এখন আমরা একটু একটু করে তৃপ্ত হবার চিন্তা করছি। যদিও স্বভাব দোষে যৌবনের উজ্জ্বল চাঞ্চল্য ও অভ্যাসবশতঃ চিন্তাকে ফলপ্রসূ করা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। এবং বাড়ি থেকে আমরা হাতখরচ পাই বলে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা বা আর্থিক টানা-টানির মধ্যে আমা-দের থেকে হয় না। ফলে উজ্জ্বলযৌবন বেগবতী নদীর মত বয়ে যায়। কোন উপকূ-লস্থের বাধা আমাদের গতিমুখ ঘুরিয়ে দিতে পারে না।

আমাদের পদধ্বনিতে সারা মেস থরথর করে কাঁপত। শুধু দাপাদাপি নয়, গলায় ছিল গর্জন, গান, চিৎকার এবং সব জিনিসের মধ্যেই মশলার মতো কাঁচা খিস্তি। এই খিস্তিকে আমরা এমনভাবে রক্তের মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছিলাম যে খিস্তির বাতাবরণের বাইরে কোন চমকপ্রদ সম্পর্ক ও অপরাধ-জনক বলে ভাবতাম। আমাদের আচরণ ও গতিবিধির একটা চমৎকার বৃত্ত আমরা তৈরী করে নিয়েছিলাম। সাধারণতঃ সেই বৃত্তের বাইরে আমরা কখনো যেতাম না। কিন্তু সেই বৃত্তের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টায় অবশ্য নিমগ্ন থাকতাম। যদিও আপাতত বৃত্তের পরিধি খুব একটা বড় নয়, আমরা তিনজন কোনরকমে আঁটো হয়ে বসতে পারি; কিন্তু এর পরিধি যে কত বিশাল ও ভয়ংকর হতে পারে তা মনে মনে ভেবে আমরা আতঙ্কে শিউরে উঠতাম। বস্তুত কেমন সাধ্য আমাদের ছিল না বলেই আমরা তিন বন্ধু মাকড়সার মতো জাল

ফেলে সেই বৃত্তের ভেতরে ওত পেতে বসে থাকতাম। আর বাবা, কত মাছি পর্ক্তারি পড়, সবকে আমাদের আঠার জালে ও-ভাবার জড়িয়ে নেব, রসটুকু খেয়ে ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলে দেব। আমরা জাল পেতে বসে আছি মাছির আশায়।

আমাদের পাশের ঘরে একজন তরুণ অধ্যাপক থাকেন। শুনেছি তিনি উদীয়মান লেখকও বটে। দুবেলা তাঁকে এই অল্পবয়সে বৃদ্ধ জরদ্গবের মত হয়ে যেতে দেখেছি। কোন্ দুঃখে, যন্ত্রণায় বা মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে বেচারা দিন দিন এমন করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন, সে খবর নেবার মত মোলায়েম মানসিক গঠন আমাদের ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বাণিজ্যবিভাগের সেরা ডিগ্রিগুলো নিয়ে এসেছি বয়সটাও বাড়তির দিকে। এই বয়সে আইনত কোন ভদ্রলোকের পেছনে-লাগা উচিত নয়। কিন্তু প্রবৃত্তি বারবার এসে আমাদের পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়। প্রবৃত্তির আইন-কানুন দারুণ দুর্বোধ্য। সে যে কখন কাকে কীভাবে চালায় তা বোঝার ক্ষমতা কারও নেই।

ভদ্রলোকের লেখার ব্যাপারটা আমাদের কাছে তেমন আপত্তিকর ছিল না, আমাদের রাগ হত ভদ্রলোকের নীতিবোধ দেখে। আমরা দুনিয়ার যাবৎ নীতিবাগীশ লোকেদের খিটখিটে স্বভাবের দেখেছি। শিক্ষান্তে [illegible] আমরা এই মেসে এসেছি। এখানে এসে এই জন্যেই আমরা লক্ষ করেছি এখানের ভদ্রজনের আচরণ, কথাবার্তা, চরিত্র উদ্ভট বহুরূপীর মত। দিন গড়াতে দেশ, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ যে কত এগিয়ে গেছে সে খবর এরা কেউ রাখে না মনে হয়। আমরা আগে যে হোস্টেলে ছিলাম, সেখানে প্রায় সকলকেই এ-বয়সের ছাঁচে ঢেলে গড়ে নিয়ে এসেছি। তারা এখন আমাদের মত উদ্ধত ও ডেঁপো হয়ে গেছে। আমরা এই মেসের সকলের অজ্ঞানতা, লজ্জা ও সংস্কার দূর করার দায় নিলাম এবং লেখকের উপরই প্রথম প্রয়োগ করে দেখব স্থির করলাম। নীতিবোধ যে যুগে যুগে বদলায়। মানুষ নিজের প্রয়োজন বোধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নীতিবোধের দর্প গুঁড়িয়ে দেয়। আমরা তো মাস্টার নই, আইন-কানুন সবই আমাদের জানা আছে। সুতরাং মাভৈঃ।

দু'একদিন হল ভদ্রলোক এই সাতজনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে আলাপ তো করেন নি; বরং চোখ তাকিয়ে দেখা থেকে তার চোখ জ্বলতে দেখেছি। আশ্চর্য! এত রাগ তিনি পেলেন কোথায়? কী করে তাঁর বুকের ভেতর এত আগুন জ্বলে! প্রথম দিন চোখ দেখেই আমরা বুঝেছি ভদ্রলোককে কন্যারাগ বেচারাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে। তা ফেলুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু ভদ্রলোকের এত ক্রোধ কেন? আমরাও চণ্ড প্রকৃতির ছেলে, কারুর মেজাজের ধার ধারি না, ছুরি মেরে পেটে ফাঁসিয়ে দিতে পারি। আমরা বর্ষাতির হাড়-মাংস চিবোতে ওস্তাদ। স্থির করলাম আমরা গায়ে পড়ে আলাপ জমাব।

রবিবার। ছুটির দিন। ভদ্রলোক বোধ হয় ভোর থেকেই লেখার কাজে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমরাও ভোর থেকে তাঁর ঘরের আশে পাশে গান, হল্লা ও দাপাদাপি শুরু করে দিলাম। লেখকের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল বলে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল কিনা জানতে পারলাম না। তবে এরকম একটা অবস্থার মধ্যে কোন মানুষের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, তা আমরা বুঝেও বুঝতে চাইতাম না। এসব ব্যাপারে আমরা বাইরে ন্যাকা, ভেতরে বেশ সেয়ানা ছিলাম।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা সারা দুপুর আণ্ডার-প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতাম। সেই সঙ্গে চলত গান, হল্লা, দাপাদাপি, খিস্তিখেউড়। এসব সত্ত্বেও যখন সামনের বাড়ির কন্যাবতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা অসম্ভব হত, তখন চলত ইশারা-ইঙ্গিত। উল্লাসের জোয়ারায় দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে নৃত্যো-গীতে আমরা এমন মেতে উঠতাম যে আমাদের বাহ্যজ্ঞান থাকত না। যখন খেয়াল হত, দেখতাম, কন্যাবতীর জানালা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড রোষে আমাদের মুখ দিয়ে সে সময় যেন কাঁচা খিস্তি বেরিয়ে আসত। আমরা ছোট বোতল বার করে ঢকঢক করে ওষুধ সেবন করতাম।

আপাতত আমরা বেকার বলে উল্লাসের সময় আমাদের অফুরন্ত এবং উদ্দাম যৌবনের দরুণ আমরা ক্লান্তিহীন। মেসের সকলে অফিস চলে গেলে আমরা সারা দিন বিচিত্র সব লীলাখেলার ফন্দি নিয়ে সময় কাটাতাম। শুধু রবিবার ভিন্নরূপে উৎপাত করার একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নিলাম। কারণ আমরা শুনেছি ভদ্রলোক নাকি মন্তব্য করেছেন—শুধু লেখাপড়া শিখলেই তো হয় না, একটু কালচারের ছাপ থাকা চাই, নইলে মানুষের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

আমি মদন বসাক, একটু বদরাগী মেজাজের ছেলে, শুনে বললাম, কী বলছে? পূর্ণাঙ্গ মানুষ? নিজে দেখেছ কখনো?

মুকুট রায়ের বাদশাহী মেজাজ। সে বলল, এর দরুণ আমাদের এখনই ব্যাটার শাস্তি হওয়া উচিত। এত বড় ইনসাল্ট সহ্য করা যায় না।

মলয় গুপ্ত বলল, পূর্ণাঙ্গ মানুষ কাকে বলে আমরা টের করে ও-কে দেখাতে পারি। ঘুঘু দেখেছ ব্যাটা ফাঁদ দেখেনি। বেশী সমঝে মানুষ ওর পেঁয়াজি ছুটিয়ে দেব। শালা আমাও মানুষের মাল, হাঁ...

শেষ পর্যন্ত আমরা ভদ্রলোকের কোন প্রকার অপমান না-করে ধাপে ধাপে মনের উপর চাপ দিতে থাকব স্থির করলাম। ভদ্রলোক যতই প্রলাপ বকুন না কেন, আমাদের নিজস্ব একটা কালচার তো আছে। এতে আর একটা জিনিসও বোঝানো যাবে, আমরা খোলা-মেলা, ভাব-ভোলা মানুষ সবাই, একটু আনন্দ-ফূর্তি করি, অতএব প্যাঁচ-প্যাঁচালি বুদ্ধি আমাদের নেই, কেউ অপরাধ নেবেন না। আমরা তিনজনেই পুরো ন্যাকামির সাঁজোয়া গায়ে চড়িয়ে নিলাম। ফলে আহত হবার ভয় রইল না।

এক সপ্তাহ পর যেন আর একটা রবিবার আমরা হাতে পেলাম। এর আগের রবিবারে আমরা ঠিক সফল হতে পারিনি। আজ আমরা ভোর থেকেই ওঁর ঘরের সামনে ও পিছনে দাপাদাপি শুরু করে দিলাম। তারপর আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে রেলিং-ঘেরা লম্বা বারান্দায় গিয়ে দাপাদাপি, হল্লা শুরু করে দিলাম। এখানে দাঁড়ালে রাস্তার লোকজন আমাদের দেখতে পায়, একটু লজ্জা-লজ্জা লাগে, তবু নির্বিবাদে আমরা ভূতের নাচ নাচতে লাগলাম। কারণ এ জায়গাটার একটা সুবিধা ছিল। পাশাপাশি দুখানা ঘর, দক্ষিণ-খোলা জানালা-দরজা, সামনে বারান্দা। ফলে বারান্দার যে-অংশটুকু লাগোয়া আমাদের প্রাপ্য সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু কিঞ্চিৎ হল্লা করলে ভদ্রলোকের লেখার বারোটা বাজবে। এই সুবিধাটুকু আমরা ছাড়তে রাজী নই। এখন আমাদের সমস্ত ক্রোধ ওঁর লেখার উপরে গিয়ে পড়েছে। এর চেয়ে ভদ্রোচিত রাগ আর কি হতে পারত আমাদের জানা নেই। ভদ্রলোকের কালচারের পচা ডিম না-ফাটানো পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি নেই।

কিছুক্ষণ পর খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে আমরা ভদ্রলোকের ঘরের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলাম। দেখা গেল লেখক খাটে বসে আছেন, সামনে লেখার কাগজপত্র, খাপ-খোলা তলোয়ারের মতন কলম, এ্যাশট্রেতে একটা আস্ত সিগারেট পুড়ছে আর লেখক দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন। এইটে তাঁর মনন-প্রক্রিয়া কিনা কে জানে!

মুকুট বলল, ওভাবে কী করছে রে মাইরি?

ফিসফিস করে আমি বললাম, ধ্যান-যোগ করছে, লেখার জন্যে এসব করতে হয় নাকি শুনেছি। হেভি খাটুনির ব্যাপার!

মলয় বলল, কী যা তা বলছিস?

—ঠিকই বলছি। যা জানিস না তা নিয়ে গপ্পো মারাস না। তুই জানিস বড় বড় লেখকদের মাথায় যখন কিছু আসে না তখন তাঁরা মাথা নিচু করে পা উপরে তুলে ধ্যান-যোগ করেন। মাথায় চাপ সৃষ্টি হলে নতুন মাল বেরিয়ে আসে। সব সময় মাথা উঁচু রাখলে সব মাল নীচে নেমে আসে। তাই মাঝেমধ্যে মাথা নিচু করে রাখতে হয়। কথাগুলো বলে আমি কিছুটা তৃপ্তিবোধ করলাম।

মুকুট বলল, এ যে কাঁদছে বলে মনে হচ্ছে রে—

—কেঁদে কেঁদে লোকটা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মলয় মন্তব্য করল।

—এক এক যোগের এক একরকম প্রক্রিয়া। এটা বোধহয় কান্নাযোগ।

—ন্যাখ মদনা, বেশী প্যাঁচ কষিস না। মলয় আমাকে তেড়ে এল। আমার তখন চুপ করে থাকার পালা। মুকুট বলল, চল লোকটার সঙ্গে আলাপ করে আসি। ওর ভেতরে একটা অসুখ-বিসুখ আছে বলে মনে হয়।

সকলেই রাজী হয়ে গেলাম। যদিও আমার একটু আপত্তি ছিল, কারণ লোকটাকে দাম্ভিক বলে মনে হয়েছে। আমাদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, বোধহয় মানুষ বলেই গণ্য করে না। তবু আমরা সকলেই একসঙ্গে ওঁর ঘরে ঢুকলাম। ঘরে ঢোকার আগে দরজায় টোকা দিলাম।

সাদা কাগজের মত মুখখানা ভদ্রলোকের। তিনি দুহাতে ঘষে ঘষে মুখ

'সকালের জল খাবারের সঙ্গে
তামা
আমি রোজই খাই!'

এ ছাড়াও আছে লোহা, ক্যালসিয়াম, আর আয়োডিন! একুনে, উনি খাবারের সঙ্গে পাচ্ছেন ৮টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজদ্রব্য আর একান্ত প্রয়োজনীয় ১১টি ভিটামিন। এসব উনি পাচ্ছেন মাত্র ১টি ভিমগ্র্যান ট্যাবলেটে।

ভিমগ্র্যানে সব ক'টি ভিটামিন আর খনিজদ্রব্য রয়েছে যা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়—কাজে উৎসাহ যোগায়, ক্ষমতা বাড়ায়। যেমন লৌহ, তামা—ঠিকমত রক্ত গড়ে তোলে, কর্মক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া, ভিমগ্র্যানে যেসব ভিটামিন আর খনিজদ্রব্য আছে, তার কল্যাণে ওঁর গায়ের চামড়া সুস্থ থাকে, চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, দাঁত আর হাড় শক্ত হয়।

এখন পাবেন ● গোল আকারে

ভিমগ্র্যান®
মালটিপল ভিটামিন্‌স-মিনারেল্‌স ট্যাবলেট্‌স

মাত্র একটি ভিমগ্র্যান আপনাকে সারাদিন কর্মক্ষম রাখে

SQUIBB®
SARABHAI CHEMICALS

Shilpi-VIM-11A/70 Ben

মুছলেন। মুখে ঈষৎ লালচে আভা ফুটে উঠেই ফের মিলিয়ে গেল। উনি আমাদের দিকে-স্থির, বিস্ময় ও ঔদাসীন্য মিশিয়ে এক অপূর্ব ভঙ্গিতে তাকালেন। ওঁর চোখে-মুখে আলোছায়ার খেলা নদীর জলের মত দুলতে লাগল। তারপর উনি আকাশ দেখলেন, বোধহয় বাতাসও দেখতে পেলেন। সামনের বাড়ির ছাদের কার্ণিশে বসে-থাকা একজোড়া পায়রা, ইলেকট্রিক তারে একটা কাক, বাড়িঘর, খোলা জানালা, ঘরের দেয়ালে টিকটিকি, মেঝের উপর ভ্রাম্যমাণ আরশোলা, বিছানার খাঁজে লুকিয়ে-থাকা ছারপোকা, ঘরের ঝুল এসব দেখতে দেখতে লেখক ফের আমাদের দিকে তাকালেন।

ভদ্রলোক একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসবার চেষ্টা করলেন। গলায় শক্ত জিনিস আটকে গেলে যেমন লোকে ঢোক গেলে, কথা বলতে গিয়ে ওঁর ঠিক তেমনি দশা হল দেখে আমরা মৃদু হাসলাম। উনিও ফের আমাদের হাসির জবাব দিলেন। নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর আমিই প্রথম বললাম, আপনার সঙ্গে আমরা পরিচয় করতে এলাম, শুনেছি লেখক-টেখক—

মুকুট বলল, আমরা জাত বাঙালি তো, বাচ্চা থেকেই গল্প শোনার অভ্যাস। তাই আপনার কাছে বেশ একটা জম্পেশ গল্প-টল্প শুনতে এলাম।

—সেই সঙ্গে আপনার সঙ্গে চা-টাও বেশ মাখ-মাখ করে জমবে। মলয় মন্তব্য করল।

ভদ্রলোক মিষ্টি করে হেসে বললেন, বেশ তো, বেশ তো—

আমি বললাম, আপনার নামটা কী যেন, ভুলে গেছি—

—প্রসূন বসু। ভদ্রলোক হাসলেন।

—বেড়ে নামখানা মাইরি। মুকুট বলল।

আমরা তিনজনেই হো-হো করে হেসে উঠলাম। ভদ্রলোকের সাদা কাগজের মত মুখে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিল। আমাদের আচরণ, অস্তিত্ব সব কিছুই ভদ্রলোকের কাছে অসহ্য। আমরা জানি উনি আমাদের দেখলে চটে ওঠেন। কিন্তু আমরা যেভাবে ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে প্রায় সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছি তাতে উনি আর হাঁউ-উঁউ করবার সুযোগ পাচ্ছেন না।

আমরা ভদ্রলোককে প্রায় কাৎ করে ফেলেছিলাম, মনের দিক থেকে উনিও প্রায় কাবু হয়ে আসছিলেন, কিন্তু মলয় সমস্ত ব্যাপারটা ঘোলা করে দিল। মলয় হঠাৎ খাটের উপর থেকে ভদ্রলোকের লেখা কয়েকখানা কাগজপত্র ছোঁ মেরে তুলে নিতে গেল। ভদ্রলোক খপ্‌ করে মলয়ের হাত চেপে ধরলেন। তারপর সে-কী বাঘে-কুমিরে লড়াই! ভদ্রলোক ছাড়েন না, মলয়ও ছাড়বে না। মুকুট এই ব্যাপারটার মধ্যে বোধ হয় ক্রীড়া স্পোর্টসের আভাস পেয়ে ঘন ঘন সিটি বাজাতে লাগল ও হাততালি দিতে লাগল। ব্যাপারটা যখন প্রায় চরমে গিয়ে পৌঁছে গেল তখন একমাত্র দর্শক আমি আর নির্বাক থাকতে পারলাম না, বললাম, কী হচ্ছে?

মলয় বলল, সাধে না মাইরি, লেখা দিচ্ছে না। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, কী আশ্চর্য! মালটা খেয়ে ফেলবেন না, দিন না একটু পড়ে দেখি, আমাদের মত এমন পাঠক কোথাও খুঁজে পাবেন না মশাই...হাঃ—

ভদ্রলোক দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, আমার পাঠকের দরকার নেই, ছেড়ে দিন। আপনাদের মত এমন ছুঁচো পাঠকের আমার দরকার নেই।

মুকুট বলল, কী বললেন? আমরা ছুঁচো? ঠিক আছে, জানেন তো 'ছুঁচোগিরি নোজ নো ল'—বলেই লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মলয়ের সঙ্গে ভদ্রলোকের ধস্তাধস্তিতে রচনার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এদিকে ঘরের বাইরে মুকুট নেচে নেচে একটা ক্যানেস্তারা বাজাতে লাগল। মলয় বলল, আপনি বড্ড হিংসুটে লোক মশাই, একটু পড়লে আপনার এমন কি ক্ষতি হত?

ভদ্রলোক কোন জবাব দিলেন না, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। মলয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি ঘটনার একমাত্র নির্বাক দর্শক। ঘটনার পিছনে বা দুর্ঘটনাকে রোধ করার মত কোন হাত আমার ছিল না। আমি বললাম, ছি ছিঃ, কী হল বলুন তো! এরকম হবে জানলে আপনার ঘরে কখনই আসতাম না।

—দেখুন মদনবাবু, ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, সাধু সাজবেন না। আজ কয়েকদিন ধরে এইরকম একটা প্ল্যান করছিলেন; ভাবছেন কিছু বুঝি না, তাই-না? আমার এই ক্ষতি করে আপনাদের কী লাভ হচ্ছে বলতে পারেন?

—বিশ্বাস করুন প্রসূনবাবু, আমি মানে—এসব আপনার ভুল ধারণা।

—প্লীজ, আমাকে আমার মত থাকতে দিন। ভদ্রলোক আবেদন জানালেন।

—থাকুন না, কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে। ভদ্রলোককে একথা জানিয়ে মনে মনে ভাবলাম। এইখানেই তো আমাদের আপত্তি, আমরা সবাই আপনাকে এবং হাতের কাছে প্রায় সকলকেই আমাদের জালের মধ্যে টেনে আনতে চাই। কোথায় পালাবেন? সব পথ আমরা বন্ধ করে দেব। মানুষের নৈতিক উন্নয়নের জন্য সাহিত্যরচনা! যে যুগে মানুষ খেতে পাচ্ছে না, চাকরি পাচ্ছে না সে যুগে ওসব নীতির-ফীতির কোন দাম আছে?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বুকের ভেতরে বেশ একটা উত্তেজনা বোধ করলাম। বললাম, কিন্তু প্রসূনবাবু, মানুষ যখন অভাবে ধুঁকছে, কাজ পাচ্ছে না, বাঁচার তাগিদে প্রত্যেক মানুষ যখন অন্ধকারে ছটফট করছে, তখন ওসব নীতিবাদী রচনা দিয়ে মানুষের পেট ভরানো যাবে না। এযুগে নীতির কোন দাম আছে বলতে পারেন? অভাব মানুষের সব প্রেম প্রীতি, ভালবাসা, নীতিবোধ নষ্ট করে দেয়। বুঝেছেন? আমাদের সঙ্গে কলেজে যেসব ছেলেরা পড়ত, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে তাদের অনেকেই এখন নানা ঝুট-ঝামেলা করে বেড়াচ্ছে। আমরা পাশ-টাশ করে বেকার বসে আছি, চাকরি জুটছে না। যৌবনটা এইভাবে ঝুলে গেলে আর কী কাজ করার এনার্জি থাকে বলুন? এরপর তো ভাল চাকরি পেলেও আমাদের ঘুণ-ধরা চরিত্র চাকরির ক্ষেত্রে নানা ঝুট-ঝামেলা করবে। আসলে জাতীয় চরিত্র, যুবশক্তি এইভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠুনকো নীতিবাক্য দিয়ে একে কীভাবে সংশোধন করবেন বলুন? দেশের ইকনমি না বদলালে সম্ভব নয় প্রসূনবাবু।

বুকের ভেতরে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলাম বারকয়েক। সারা শরীরে আনন্দের শিহরণ খেলে যেতে লাগল। প্রতিটি লোমকূপ আনন্দে, উত্তেজনায় ঘেমে উঠতে লাগল। বোধহয় ভাল ভাল শব্দ দিয়ে এত বড় একটা তাত্ত্বিক বক্তৃতা দেবার ফলে এরকম দৈহিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে শুরু করেছে। জীবনে এই প্রথম তো, উপরন্তু প্রসূনবাবুর মত সুপণ্ডিত ও লেখকের সামনে—তাই আনন্দের মাত্রাটা একটু বোধ হয় বেশী অনুভব করলাম। বুক টান টান করে ভদ্রলোকের সামনে বসে থাকলাম।

ভদ্রলোক আমাকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বললেন, আপনি আসতে পারেন; এসব আলোচনা আমি আপনার সঙ্গে করতে রাজী নই।

আমি ভাল ছেলের মত উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল প্রসূনবাবু আমাকে এসব আলোচনার অযোগ্য বলেই ভাবছেন। তা হোক, তবু আমিও যে কিছু জানি তা তো ওঁকে শুনিয়ে দেওয়া গেল, এতেই আমার তৃপ্তি। ওঁর মতো পাণ্ডিত্যের অভিমান এখনো আমার ভেতরে তৈরী হয়নি বলে কোন দুঃখ হল না।

আমি নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখি মুকুট আর মলয় প্যান্ট-সার্ট পরে তৈরী হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে মুকুটের হাত ব্যথা হয়ে গেছে, মলয়ের মেজাজটাও খারাপ। ওরা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছে ভদ্রলোকের উপরে। ফলে এখন ওরা আর ঘরে থাকতে রাজী নয়। ওরা এখন একটু ফুর্তি-টুর্তি করে মেজাজটা ঠিকঠাক করে আনতে চায়।

আমাদের আনন্দ-ফুর্তির নিয়ম-কানুন একটু আলাদা ধরনের। অত্যধিক ক্রোধে, আনন্দে, দুঃখে কিম্বা পাল-পার্বণে আমরা একটু বেশী মাত্রায় লালজল সেবন করে লাফালাফি, খিস্তি-খেউড়, গান-হল্লা করতাম। তারপর ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতাম কিম্বা মেয়ে-বন্ধু পেলে ফষ্টি-নষ্টি করতাম। এসব আমাদের দীর্ঘ দু-তিন বছরের অভ্যাস। আজ একটা কারণও জুটে গেল। মলয় ও মুকুট ক্রুদ্ধ, ওরা এখন মাথা চড়ানোর জন্য রওনা হল।

আমি সদ্য প্রসূনবাবুকে যে-তত্ত্বকথা শুনিয়ে এসেছি, তাতে আমার মন ও মেজাজ একটু তৃপ্ত পেয়েছে। ফলে ওদের সঙ্গে যাবার কোন তাগিদ অনুভব করলাম না। অথচ ওরা চলে যাবার পর আমি একা এখন কি করব তা ভেবে পেলাম না। সামনের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম কঙ্কাবতীর জানালা বন্ধ। দিন কয়েক ধরে কঙ্কাবতীকে একটা ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা

যাচ্ছে। বাড়িতে এসেও ছোকরাকে ঘুরঘুরে করে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। বোধ হয় কঙ্কাবতী পার্টি ক্যাচ করেছে। চুলোয় যাক কঙ্কাবতী, হিম্মত থাকলে অমন কত জুটে যাবে। আপাতত আমি চোরপট্টির ফুটপাথ থেকে কেনা বিদেশী মেয়েদের ন্যুড ছবির বইটা বার করে দেখতে লাগলাম। এর কাছে সব কিছুই জোলো মনে হয়। অবশ্য এর চেয়েও আমার আর একটা মোক্ষম কায়দা জানা আছে। সেটা সকলের জন্য নয়, শুধু ইমাজিনেশন যাদের আছে তাদের জন্য। অর্থাৎ মনোমত কোন নারীকে মনে-মনে কল্পনা করে খুশীমত তার সংগে আচরণ। স্বপ্ন নয়, বাস্তব নয়; অথচ স্বপ্ন ও বাস্তবতা দুটোর স্বাদই এতে পাওয়া যায়। কোন বাধা নেই, ভয় নেই, ধকল নেই। যতক্ষণ খুশী, যেখানে খুশী চলে-ফিরে বেড়ানো যায়। এমন কি দিনের বেলায় জনবহুল রাস্তায়, দুর্গম স্থানে সর্বত্র ইচ্ছামত চলা যায়। এক কথায় এই ইচ্ছার সাম্রাজ্য যে কি বিশাল তা মেপে কোনদিন বলা যাবে না। আমি সেই সাম্রাজ্যের সম্রাট। কাজ না থাকলে শুয়ে-শুয়ে একমনে এই সব করি। মুকুট আর মলয় পারে না। ওদের কল্পনাশক্তি বলে তো কিছু নেই। ওরা পুরোদস্তুর বস্তুবাদী। স্পর্শে, স্বাদে, ঘ্রাণে বিশ্বাসী।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল এখন আমার ন্যুড ছবি দেখেও তৃপ্তি হল না। শুয়ে-শুয়ে কল্পনা করলে যে তৃপ্তি পাব, তাও মনে হল না। চাকরীর দরখাস্ত লেখার কাজও নেই। অথচ বেশ বুঝতে পারছি একটা কিছু না-করলে আমি হয়ত পাগল হয়ে যাব, হয়ত এই মুহূর্তে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলব। মলয় আর মুকুট এতক্ষণ নিশ্চয় পুরোমাত্রায় মাল টেনে কোথায় ঘ্যানা দিচ্ছে। ওরা বেঁচে গেছে। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব।

আমি বাথরুমে গিয়ে ভালভাবে স্নান করলাম, ঠাকুরকে ডেকে ভাত খেলাম, তারপর প্রতনুবাবুর ঘরে গেলাম। কিছুক্ষণ আগে প্রতনুবাবুকে তত্ত্বকথা শুনিয়ে বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে এতেই বেশ তৃপ্তি পাব। ন্যুড ছবি, কাম-কল্পনা, খিস্তি-খেউড় এসব যেন আমাকে আর তৃপ্তি দিতে পারবে না বলে মনে হতে লাগল।

প্রতনুবাবু স্নান-খাওয়া সেরে ফের লিখতে বসেছেন। আমি ও'র ঘরে ঢুকতেই উনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—এক্সকিউজ মী, আপনার সংগে দুটো কথা বলতে এলাম স্যার।

—দেখুন মদনবাবু, আমাকে জ্বালাবেন না। যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন আমার। দিন-রাত হল্লা উৎপাত করে আমার লেখার চিন্তা ও মেজাজকে নষ্ট করে দিয়েছেন, ঘরে ঢুকে আমার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে দিয়েছেন, মলয় আর মুকুটবাবু আমাকে খুন করবেন বলে শাসিয়েছেন, আমার নামে বদনাম রটিয়ে মেসের ও পাড়ার সমস্ত লোকদের আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন। এই কি শিক্ষিত ছেলেদের রুচি ও ব্যবহার? শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিবেকবোধ বলে কি কিছু নেই আপনাদের? আপনারা কি চান, বলতে পারেন?

—আমাদের একটু ভুল হয়ে গেছে প্রতনুবাবু। আর যাতে না-হয় তার চেষ্টা করব স্যার।

—দেখুন মশাই, আপনি একটি ভিজে বেড়াল। আপনি দুদিকে তাল মারছেন। এভাবে শক্তি আর উৎসাহ ক্ষয় করেই বাঙালী দিন-দিন মরে যাচ্ছে।

সেটা ঠিক, কিন্তু কিছু একটা না করলে যে আমার মনে হচ্ছে আমরা পাগল হয়ে যাব। কোন কাজের ব্যবস্থা না করে শুধু নীতি কথা দিয়ে কি এগুলো রোধ করতে পারবেন? ভবিষ্যৎ যাদের অন্ধকার, বর্তমান যাদের মূল্যহীন, মন যাদের অশান্ত, যাদের পায়ের তলায় মাটি নেই— কী করে তাদের কাছে সুস্থতা, সভ্যতা ও সৌজন্য আশা করেন? ফলে চূড়ান্ত হতাশা, যন্ত্রণা সকলের মনে একটা বে-পরোয়া ভাব এনে দিচ্ছে।

ভদ্রলোক কোন কথা বললেন না, চুপ-করে বসে রইলেন। উনি আমার কথা শুনছেন ভেবে দ্বিগুণ উৎসাহ পেলাম। আমার ভেতরে একটা নেশার ভাব জমে উঠেছে। এইসব বলার ইচ্ছা আমাকে এমন নেশাগ্রস্ত করে তুলবে, তা কখনও ভাবিনি।

আমি বললাম, এই যে আপনি লিখছেন, এর কোন দাম আছে ভাবেন? এ-যুগে কোন মানুষের সুস্থ মন নিয়ে পড়ার ধৈর্য আছে বলে মনে করেন? এখন মানুষের কোন কথা শোনার মন বা ধৈর্য নেই। সবাই অশান্ত, নেশাগ্রস্ত। একদল ব্যবসার নেশায় হাপে, একদল ইনটেলেক-চুয়াল হবার নেশায় পড়ে; কিন্তু কেউ কিছু গ্রহণ করে না এসব থেকে। আসলে বাইরে সকলেই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু ভেতরে সব শূন্য।

—আপনার কথাটা আংশিক ঠিক, সবটা নয়।

—আচ্ছা, আপনি যে-উদ্দেশ্যে লিখছেন, তার কোন মূল্য পাচ্ছেন?

—দেখুন, আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। আপনারা আমাকে আগেই লেখক বলে ধরে নিয়েছেন। আমি এখনো লেখক হতে পারিনি, ইতস্তত দু-একটা ছাড়া তেমন লিখতেও পারিনি। ইদানীং একখানা বই লেখার সুযোগ পেয়েছি।

—বেশ তো, যত কমই লিখুন না কেন প্রত্যেক লেখার ভেতরে নিশ্চয় কিছু একটা বলতে চান; কিন্তু বলে কিছু লাভ আছে বলে মনে করেন?

—জানি না। যখন এত কথা বলছেন আপনাকে আমার দুটো কথা বলি। অবশ্য আপনাকে এখন আপনার বন্ধুদের থেকে আলাদা বলে মনে হচ্ছে বলেই বলছি, নচেৎ বলতাম না। আপনি তো শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ছেলে, কথাটা বুঝবেন।

আমার মনটা আনন্দে দুলে উঠল। এরকম একজন পণ্ডিত লোকের কাছে নিজের মূল্য পাব একথা ভাবতেই পারিনি। সবিনয়ে বললাম, বলুন স্যার।

—আমার ভাগটা খুব খারাপ, জানেন মদনবাবু। আপনি যে-ভাবের কথা বলছেন, সার্থকভাবে লিখলেও তা হবে কিনা জানি না। তবে একটা বিশ্বাস হয়ত ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাচ্ছে, নচেৎ লিখতে যাব কেন। যদি বলেন, অর্থ, সম্মান। এ-যুগে আরও অনেক কিছু আছে যাতে অনেক বেশী অর্থ বা মর্যাদা পাওয়া যায়। অবশ্য একথা বলতে পারেন, সেসব করার মতো আমার যোগ্যতার অভাব। যাই হোক, এসব কূট তর্কে না গিয়ে আপনাকে নিজের কথা দু-একটা বলি।

ভদ্রলোক একটু থামলেন। এখন ওঁকে আমার শিশুর মত মনে হচ্ছে। উনি শিশুর মতোই এলোমেলোভাবে কথা বলে যাচ্ছেন, তেমনি সরল, প্রাণখোলা।

—জানেন মদনবাবু, আমিও প্রায় বেকার। একটা কলেজে কিছুদিন হল পার্টটাইম চাকরি পেয়েছি। দীর্ঘকাল ধরে বেকার থেকে থেকে আমার ভেতরটাও ক্ষয়ে ক্ষয়ে শূন্য হয়ে গেছে। বড় কষ্টের দিন গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। কলেজ থেকে যে-টাকা পাই, তা মেসের আর আমার হাতখরচেই সব ফুরিয়ে যায়। বাড়িতে বাবা-মা, ভাই-বোন এদেরকে মৃত্যু ও ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমাকে আরও কিছু করতেই হবে। হয়ত লেখার ব্যাপারটা সেজন্যেও বাছাই করে নিয়েছি। ফলে আমার লেখাকে প্রয়োজনের তাগিদে সওদাগরী নৌকায় তুলে দিতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেটুকু তার

ভেতরে লিখি, বাঁচার তাগিদেই লিখি— লেখার ভেতরে বেঁচে থাকার জন্য।

—সেটাও কি সম্ভব হবে প্রতুলবাবু? একালের কিছু কি ভবিষ্যতে থাকবে?

—সেসব আমার বিচার্য নয়, তাছাড়া আমি ভবিষ্যতের কথাও বলিনি।

—তবে? আমি টানটান হয়ে প্রতুলবাবুর সামনে বসলাম।

—আমি বর্তমানের কথা বলছি। আমি এই লেখার মধ্যে, লেখার ভাবনার মধ্যে, লিখে ভালো-লাগার মধ্যে বর্তমানে বেঁচে আছি। এটাই আসল কথা মদনবাবু। মানুষের তো নানা রকমের নেশা থাকে, এটাও আমার একটা নেশার মত। কতটুকু অর্থ, সম্মান পেলাম, কারা আমাকে দিয়ে ভালো ভালো কথা লিখিয়ে নিয়ে ব্যবসা করল, আমার লেখার মধ্যে সুখ-দুঃখ, আনন্দ, শিক্ষা কেউ পেল কিনা, এসব ভাবার অবসর নেই। বেঁচে থাকার জন্যে আমাকে এই রকম একটা পরিমণ্ডল তৈরী করে নিতে হয়েছে। এছাড়া আমার বাঁচার আর কোন পথ নেই মদনবাবু। জীবনে অনেক ধকল সহ্য করেছি, ক্ষুধা-অভাব-যন্ত্রণা ও দুর্ভাগ্যের খাড়া পাহাড় বেয়ে ধীরে ধীরে নেমেছি। এখনো একটা সরু তারের উপর দিয়ে হাঁটছি, সার্কাসে ব্যালান্সের খেলার মত।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর শোনা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক যেভাবে ব্যক্তিগত দুঃখের ইতিহাস বলতে শুরু করেছেন, এরপর আমি হয়ত কেঁদেই ফেলব। আমরা আবার খুব বেশী দুঃখ-কষ্টের কথা সহ্য করতে পারি না। ভেবেছিলাম ভদ্রলোক লিখে এবং অধ্যাপনা করে প্রচুর অর্থ, সম্মান ও তৃপ্তির ফসল গোলায় তুলছেন। আমরা লেখার দলে ওঁর প্রতি আমাদের খুবই ঈর্ষা হয়েছিল। এখন দেখছি ওঁর অবস্থা আমাদের চেয়ে কিছু ভাল নয়। উনিও বেঁচে থাকার জন্য নিজের মত একটা বৃত্ত তৈরী করে নিয়েছেন, ঠিক আমাদেরই মতো। হয়ত ঠিকমত কারুরই বাঁচা সম্ভব হচ্ছে না, বেঁচে থাকার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে মাত্র।

ভদ্রলোক বললেন, সেকী! উঠছেন কেন, বসুন। আপনাকে আমার আরও অনেক কথা বলার আছে। আমার অবস্থা যে কী ভয়াবহ তা একটু শুনে যান। আপনারা তো ভাবেন প্রতুলবাবু বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে।

ভদ্রলোককে যেন কথায় নেশায় পেয়ে গেছে। বললাম, আপনার সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমি বরং যাই, আবার পরে আসবখন। তবে একটা কথা বলে যাই, আপনি 'বাঁচার জন্যে লেখা বা লেখার মধ্যে বেঁচে থাকা' এসব কথা বলছেন কেন? আপনার প্রতিভা আছে, শিল্পীমন আছে বলেই লিখতে পারছেন।

—ওসব পোশাকী কথা আপনারা বলবেন। আমি বলব, আমার আর কিছু সম্বল নেই বলে ওর মধ্যেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই বেঁচে থাকার যে কী জ্বালা এতকাল সহ্য করে এসেছি, এখনও সইছি তা সময় করে একটু শুনে যান।

আমার মনে হল ভদ্রলোক ওঁর বৃত্তের মধ্যে মাছির মত আমাকে টেনে আনার চেষ্টা করছেন। যেমন ওঁকে আমাদের জালের মধ্যে জড়াব ভেবেছিলাম। ওঁর দুঃখের বৃত্তে ধরা দিয়ে লাভ নেই, যে যার মত আছি তা-ই ভাল। আমার মনে হল আমরা প্রত্যেকে এক-একটা বৃত্ত তৈরী করে বেঁচে আছি। আমরা একে অন্যকে সেই বৃত্তের মধ্যে টেনে এনে নিজস্ব সুখ-দুঃখ, ভাল-লাগার আংশিক ইতিবৃত্ত শুনিয়ে তৃপ্তি পাই। প্রত্যেকটি মানুষ সেই বৃত্তের মধ্যে, কিম্বা বৃত্ত নামক শূন্যের মধ্যে বেঁচে আছি। এর ভেতরে অন্যকে সম্পূর্ণভাবে জড়ানো যায় না, জড়িয়ে কোন লাভ নেই।

আমি আর প্রতুলবাবুর ঘরে অপেক্ষা না করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। মলয় আর মুকুট ইতিমধ্যে কখন ফিরে এসেছে। ওরা স্নান-খাওয়া সেরে ফের প্যান্ট-জামা পরে কোথায় যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আবার তোরা কোথায় যাচ্ছিস রে?

মুকুট বলল, কঙ্কাবতীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে, মার্টিনিতে মেট্রোয় যাচ্ছি। তারপর সন্ধ্যায় তিনজনে একটা বারে যাব—

মলয় বলল, কঙ্কাবতী আমাদের ট্রাপিজের খেলা দেখাবে। তুই আমাদের সঙ্গে যেতে পারিস মদন, বেশ জমবে তাহলে—

আমি বললাম, না, ওসব আর ভাল লাগে না, তোরা যা—

—তুমি শালা পেত্নীর সঙ্গে প্রেম জমাও, এছাড়া আর কী করবে। মুকুট মুখ ভেংচে অঙ্গভঙ্গি করে বলল।

মলয় একটা খিস্তি করে জোরে সিটি বাজাল।

আমি চুপ করে থাকলাম। ওরা চলে গেল। ওরা চলে যাবার পর আমার মনে হল, আমি ওদের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছি। ওরা ওদের বৃত্তে সুখে-স্বচ্ছন্দে বেশ বেঁচে আছে। পাশের ঘরে লেখকও তাঁর লেখার রাজ্যে ডুবে আছেন। আমার আপাতত কোন বৃত্ত নেই। আমি এখন যেন এক গভীর শূন্যতায় ডুবে আছি। আমি স্থির করলাম আমার পুরনো বৃত্তে নতুন করে ফিরে যাব। এছাড়া তো আমার আর কোন বাঁচার অবলম্বন নেই। আমি সেই কল্পনার সাম্রাজ্যে ডুবে যাব স্থির করলাম। কারণ সক্রিয়ভাবে করার মত আর কোন কাজ হাতে নেই।

তবে এবার কল্পনার বিষয়বস্তু বদলে নিতে হবে। সম্ভব হলে প্রতুলবাবুর মত করে গড়ে নিতে হবে। এবং সেইভাবেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

গোয়েন্দা কবি পরাশর
প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
সকালে পরাশরের প্রথম ফোনের আলাপই যেন হেঁয়ালি।
আচ্ছা! আমার আন্দাজই তা হলে ঠিক? একটা নয় দুটো! ব্যস, আর ভাবনা নেই। হ্যাঁ, কাটা আঙুল মজুদ রাখবেন।
যেন ও লাল-বাজারে মনে হচ্ছে! কিন্তু যা বলছে তা ও ধাঁধা!
দ্বিতীয় ফোন রতনলালজিকে
শিউপ্রসাদজিকে এখনো বাঁচাতে চান? তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো তা হলে আপনার জানা দরকার। হ্যাঁ, এখুনি আসুন।
রতনলাল খানিক বাদেই এসে হাজির।
এত জরুরী ডাক কেন ভর্মাজি? প্রমাণ দেখাবেন?
প্রথম প্রমাণ এই।
এ তো কাল রাতের সেই চুরি করা কাগজ!
কিছু বুঝতে পারছি না। কিসের কাগজ? কি প্রমাণ?
শিউপ্রসাদজি যে নিজেই জাল ওষুধের কারবার করছেন তার প্রমাণ। এগুলো তাঁর একটা কুঠুরির গাদা কাগজের গাদা থেকে আমি চুরি করেছি।
কিন্তু তার আগে সেই জাল পুলিশও ওই কুঠুরিতে ঢুকেছিল! ওইটেই চুরি করতে নিশ্চয়।
জাল পুলিশ! কাগজের গাদা থেকে চুরি? কি সব বলছেন! এত দামি কাগজ হলে বাজে কাগজের গাদায় ছিল কেন? খেয়াল হয়নি বলে?
সত্যিই কি আছে এতে?
পড়লে বুঝবেন। আছে শিউপ্রসাদজির মৃত্যুবাণ।
এই কি জাল পুলিশ এগুলো চুরি করতে ঢুকেছিল? জাল পুলিশ তা হলে…
শিউপ্রসাদজির লেখা! না না, তা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু এটা প্রথম প্রমাণ বললেন। আরো কিছু আছে নাকি?
আরো প্রমাণ দেখাতে পরাশর সোজা যেখানে নিয়ে যায়
হ্যাঁ, এই খানেই শিউপ্রসাদজী লক-আপে আছেন।
একি! এ তো জেলখানা!

অঙ্গনা

শিল্পের জগতে

চিত্রকর হিসেবে উঁসির আজ জয়-জয়কার। দেশ-বিদেশে তার বন্দনা গান। সমালোচকরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। তার সাধনার স্বীকৃতি মিলছে। সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে উঁসি। লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি। সে আঁকতে ভালবাসতো। কিন্তু এতটা খ্যাতি যে জুটবে, সে ছিল তার অপ্রত্যাশিত। সে যখন যথার্থ এই সত্যটুকু উপলব্ধি করলো যে, তার আঁকা ছবি সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করছে উচ্ছ্বসিত উঁসির তখন মন্তব্য, 'এটাই হলো গোল অব অন লিট আর্টিস্ট।' তার জীবনভোর স্বপ্নলোক এবার বিকাশের পথে।

শিল্পী হবার বাসনা উঁসির আশৈশব। কোন সময় তা চাপা পড়ে যায়নি। প্রয়োজন

কলকাতা থেকে হাঁটা পথে এঁরা গিয়েছিলেন কলম্বো। কলকাতায় ফেরার পর হাওড়া স্টেশনে গৃহীত ছবি। বামদিক থেকে মিনা গুহ, ডঃ পুষ্প সাক্সেনা এবং মীরা সরকার।

ছিল একজন্য অবসর। বর্তমান জীবিকায় সে ভাবনাও নেই। সে একজন স্টুয়ার্ড। জাম্বো জেটে তার নিয়মিত দেখা পাওয়া যায়। মিষ্টি হেসে সে যাত্রীদের স্বাগত জানায়। তাঁদের যাত্রাপথে সে সর্বসময়ের সঙ্গী। নানা ব্যাপারে যাত্রীদের সাহায্য করার জন্য সে সর্বদা প্রস্তুত। এরই মধ্যে জানালার একটু ফাঁক দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে তৃণ-শষ্পাচ্ছাদিত পৃথিবীর দিকে। জাম্বো জেট দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সেই পৃথিবী ক্রমেই পেছনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে উঁসি লক্ষ্য করতো যে, সামনেও সেই পৃথিবী। এ যেন অসীম, অনন্ত এর বিস্তৃতি।

দৃশ্যপটের বদল হতো। সবুজ কার্পেটে মোড়া পৃথিবী এবার উধাও। অনন্ত জলরাশির উপর দিয়ে উড়ে চলেছে তারা। এ জল যেন আর শেষ হয় না। উঁসি অবাক হয়ে যায় এতো জল দেখে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় যে, পৃথিবীর তিন ভাগই হলো জল। আর মাত্র একভাগ স্থল। সে মুগ্ধ হয়ে জল দেখে। দেখে দেখে তার চিত্ত দুলে উঠে অসীম আনন্দে। এই জলের একঘেয়েমিতে চিত্ত তার বিকল হয় না। আবার কখনো জল নয়, স্থল নয়, শুধুই বরফের রাজ্য। পৃথিবীর উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে চলেছে তখন জাম্বো জেট। সে বরফের সৌন্দর্য অতুলনীয়। জল-স্থল আর পাহাড়ের সৌন্দর্যের বিপুল বৈভবে উঁসির মন এক নিঃসীম বেদনায় কঁকিয়ে উঠত।

শিল্পী-মনের অনুভূতি তাকে অস্থির করে তুলতো। তার মন চাইতো রং-তুলি নিয়ে এখনই ইজেলের সামনে বসে যেতে। আর সুন্দর সুন্দর টানে এই বিরাট সৌন্দর্যকে আরো সুন্দরতর করে ফুটিয়ে তুলতে। ক্যানভাসে ক্যানভাসে এই সৌন্দর্যকে ধরে রেখে সকলকে জানিয়ে দেওয়া চাই। নাহলে যে জীবনের অনেকখানি অদেখা আর অচেনা থেকে যায়।

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট : ২ লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
৫৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : ৩৩-২৫৪১, ৩৩-১৫৭৬
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ জন দি দন রোড, কলিকাতা-৪ :: ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

জাম্বো জেটে সে শুধুই দেখে যেতো। কল্পনা সেখানে বিরাট ডানা মেলতো। কোনরকমে নিজেকে সামলে বাড়ি পৌঁছেই ধরাচূড়ো ছেড়েই বসে পড়তো ইজেলের সামনে। এতক্ষণ যে মাধুরীতে নিজে বিভোর হয়েছিল, এবার সর্বজনের জন্য তা রেখাঙ্কিত হয় ক্যানভাসে। সে তখন আর নিজের মধ্যে থাকে না।

জাম্বো জেটে স্টুয়ার্ডের চাকরি নেবার আগে ডঁস শিল্পের প্রথম পাঠ নিয়েছিল। লেভাবী নিবাস সে একজন স্নাতক। তাই সহজেই তার চাকরি হয়ে গেল ইউরোপীয়ান অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে। এক নাগাড়ে চার বছর এই চাকরিতে সে ছিল। দিনে চাকরি করতো আর রাতে সে নিতো শিল্পের পাঠ। এভাবে চললো তার শিল্পীমনের বিকাশের সাধনা। দেখতে দেখতে সে শিল্পের পাঠ সমাপ্ত করলো। এবার সৃষ্টির যন্ত্রণা তার সমস্ত সত্তায় এক নতুন আবেগ সৃষ্টি করলো। শিল্পসৃষ্টির জন্যে আরো সুযোগ পাবার আশায় ডঁস সে চাকরিতে ইস্তফা দিল। যোগদান করলো জাম্বো জেটে। মিললো স্টুয়ার্ডের চাকরি। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো তার শিল্প-সাধনা। এখানে অবসর প্রচুর। আর অবসর মানেই ডঁস ইজেলের সামনে সৃষ্টির সাধনায় ধ্যানমগ্ন।

১৯৬৯ সাল তার জীবনের এক পরম লগ্ন। ব্রাজিল শহরে সে তার প্রথম প্রদর্শনী করার সুযোগ পায়। আমন্ত্রণ আসে ব্রাজিল শহরের কার্ল্টন লেডিজ কাছ থেকে। প্রথম প্রদর্শনীতেই বাজিমাৎ করে ডঁস। আশাতীত সাফল্য। শিল্পরসিকরা মুগ্ধ। সমালোচকরা প্রশংসামুখর। রিও মিউজিয়মের মডার্ন আর্টের তত্ত্বাবধায়ক মন্তব্য করলেন, ইন ডঁসেস ওয়ার্ক আই সি দি রাইজ অফ এ গ্রেট ট্যালেন্ট অ্যান্ড দি প্রমিস অফ এ নিউ অ্যাডভেঞ্চার ইন দি ফিল্ড অব পোর্ট্রেট অ্যান্ড ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিং।

সকলের মনে ডঁসের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিরাট প্রত্যাশা জাগিয়ে তিনি বললেন, দু হার ভ্যারিড এ্যান্ড সেন্সিটিভ ইউজ অব কলার অ্যান্ড ব্যালান্সড কম্পোজিশন সী শোজ একস্ট্রাঅর্ডিনারী স্কিল ইন ক্যাপচারিং, রেন্ডারিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটিং সন্টালজিক লংগিং অ্যান্ড রোমান্টিক মুডস।

রংয়ের ব্যবহারে তার নৈপুণ্যের কথা থেকে এবার তিনি এলেন ডঁসের ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি, হারস ইজ এ ভিভিড অ্যান্ড কনশাস পারসনালিটি—সী সিমস টু ওয়ার্ক উইদআউট প্রেশার অব স্ট্রেস। বিয়িং সিওর অব হার ক্যাফটম্যানসিপ অ্যান্ড টু টু হার টেম্পারামেন্ট, সী অ্যাচিভস হার আর্টিস্টিক ইভোল্যুশন উইথ গ্রাসফুলনেস।

পরিশেষে তিনি বললেন, সী ইজ প্রলিফিক ইন হার ওয়ার্ক আউটপুট অ্যান্ড কমিটেড টু হার আর্ট। আই অ্যাম শিওর দ্যাট দি আর্টিস্টস ক্রিয়েটিভনেস উইল ফারদার ডেভলপ ইন দি নিয়ার ফিউচার।

প্রথম প্রদর্শনীতে এতটা সাফল্য ডঁস নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ বছর সাতেক আগেও তো শিল্পের কথা দূরএকটা ভাবেনি। নিজের জীবিকার জন্যই সে তখন ছিল ব্যস্ত। তাই সেভাবেই পড়াশোনা করে নিজেকে তৈরি করেছে। পরে যখন শিল্পের পাঠ সে নিলো তখনকার সঙ্গে এই প্রদর্শনীর সময়ের ফারাক তো তেমন নয়। একদিকে বিরাট প্রশংসা আর একদিকে এই আত্মভাবনা মিলিয়ে তার মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো।

এবার ডঁস আরো নিবিড় মনে ডুব দিল সৃষ্টির রহস্যের নতুন দ্বার উন্মোচনে। তাই এতোবড় প্রশংসার পরেও চুপচাপ। চট করে আরো প্রদর্শনীর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো না। নিজের চাকরি এবং শিল্প-সাধনায় সে মগ্ন হয়ে রইলো।

তারপর আত্মপ্রকাশ করলো ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৭০এর প্রায় শেষাশেষে। নভেম্বর মাসে ডঁসের দ্বিতীয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো। সে এবার প্রদর্শনীর স্থান নির্বাচন করলো নিজেই। আমেরিকায় ঘটলো তার আত্মপ্রকাশ। বেভারলি হিলস-এর বণনীর গ্যালারিস-এ হলো তার প্রদর্শনী। এবারও সবাই মুগ্ধ। প্রশংসা জুটলো প্রচুর। ডঁস আনন্দে আত্মহারা।

এই প্রদর্শনী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডঁস সানফ্রান্সিসকো শহরে হাজির হলো নিজের ছবি নিয়ে। গ্যালটি সেন্টারে হলো প্রদর্শনী। একই মাসে হলো তার ছবির দ্বিতীয় প্রদর্শনী। এবং দুটি প্রদর্শনীই আমেরিকায়।

এখন ডঁস তৈরি হচ্ছে আমেরিকায় তার তৃতীয় প্রদর্শনীর জন্য। এটা হবে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন অ্যাভেনুস গ্যালারিতে।

দক্ষতা এবং উচ্চাভিলাষের মেলবন্ধনে ডঁসের প্রদর্শনী আমেরিকায় বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। ব্রাজিলের পর আমেরিকায় প্রদর্শনী তার শিল্পী জীবনের বৃহত্তম ঘটনা। স্বল্প দিনের শিল্পী-জীবনে এমন সাফল্য কদাচিৎ দেখা যায়।

ডঁস নিজের খ্যাতি লক্ষ্য করছে সর্বত্র। ৬মাপী, প্যারিস এবং সাউথ আমেরিকা কোথাও তার সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং সর্বত্রই সে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সবাই তার মধ্যে আবিষ্কার করেছে অনাগত দিনের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। অথচ ডঁস সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শিল্পী নয়। বরং বলা চলে এ হলো তার পার্ট-টাইম কাজ। জাম্বো জেটের স্টুয়ার্ডেস হলে এখানে কাজের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলে নতুন করে আবিষ্কারের সাধনায়।

১৯৬৬ সালে নিজের আঁকার মধ্যে ডঁস প্রতিভার সন্ধান পায়। এটা সম্পূর্ণ তার নিজের মানসিকতা প্রসূত। তবে শুধু যে আত্মতুষ্টি নয় তার প্রমাণও মেলে। তার স্টুডিও ঘুরে শিল্প সমালোচকরা মন্তব্য করেন, এ হলো শান্ত এবং চিত্তহরণ শিল্প। এ কথা শোনার পর ডঁসের কাজে আরো আগ্রহ বাড়ে। এবং দিন দিন তা ক্রমশঃ পরিণতির দিকে এগোয়। এবং আজ তো তার শিল্প পরিণতির অনেক কাছেই হাজির।

রংয়ের বাহারী মায়াজাল ছড়াতে ডঁস পছন্দ করে ঠিকই। কিন্তু তার কাজে হালকা নীল এবং সবুজের প্রাধান্যই বেশি। তার আর একটা গুণ হতাশা, নিরাশা এবং উচ্চাশাকে সে অত্যন্ত শান্ত ও সংযতভাবে প্রকাশ করতে পারে। এ গুণ ক্ষুদ্রমনন শিল্পীর পক্ষে অর্জনের বিষয় সন্দেহ নেই।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বাইরে ডঁস-র ভালবাসা। মাঝে মাঝে ফ্যানটাসিতেও তুলি ধরে। তুঁতে এবং পোস্টার আর্টেও সে মুখর হয়।

ডঁস এখনও শিল্পকে পার্ট-টাইমের কাজ বলেলেই ভাবতে চায়। তাই স্টুয়ার্ডেস-এর চাকরি তার যথারীতি চলছে। আকাশে ওড়ার বাসনা এখনো তার নিবৃত্ত হয়নি। তবে যেদিন দেখবে পার্ট-টাইম করে আর মন ভরবে না, তখন সে এ কাজে ইস্তফা দিয়ে শিল্পে হোল টাইম আত্মনিয়োগ করবে। আর সঙ্গে সঙ্গে, ক্যামেরাও ধরবে।

—প্রবীণা

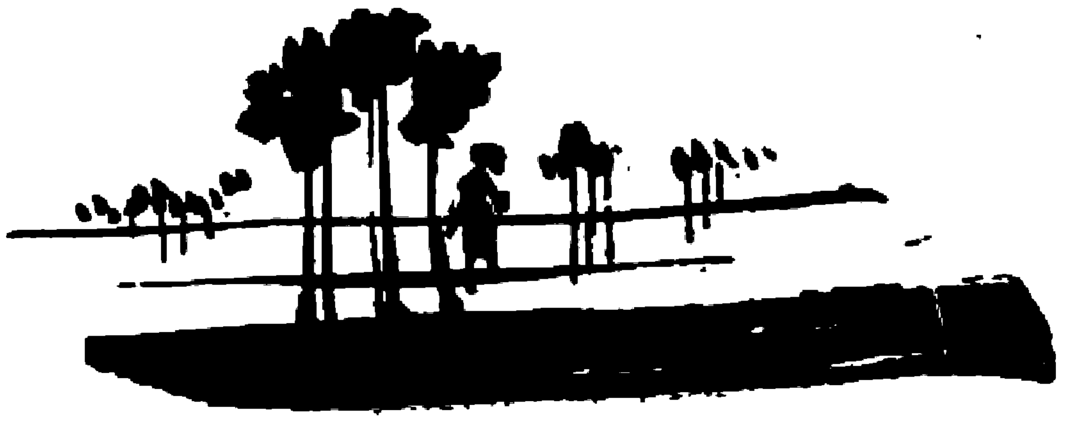

কটি পতঙ্গ/আশা পারেখ এবং রাজেশ খান্না

প্রেক্ষাগৃহ

হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রম বলে অভিহিত করা চলে নীতীন ফিল্মস্ নিবেদিত এবং তার এম. শক্তা ফিল্মস্ প্রযোজিত ইস্টম্যান কালার ছবি 'চেতনা'কে। বাংলা উপন্যাসে এবং তার চলচ্চিত্র-সংস্করণে পতিতার সঙ্গে প্রণয়ের বহু মনোরম কাহিনী (শরৎচন্দ্রের আঁধারে আলো, দেবদাস দিয়ে যার শুরু) আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তবু বলব, বি. আর. ইশারা রচিত ও পরিচালিত 'চেতনা'তে পতিতা সীমার জীবনযন্ত্রণাকে যে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে রূপায়িত করা হয়েছে, ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে তার বোধ করি তুলনা নেই।

অসুস্থ পিতার চিকিৎসার জন্যে অর্থোপার্জনের তাগিদে সীমা যেদিন পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে, সেদিনই সে অভিজ্ঞ প্রৌঢ়া ব্যবসায়িনীর মুখে সাবধানবাণী শুনেছে, পুরুষকে বিশ্বাস কোরোনা, তাদের ভালোবাসার কথায় ভুলোনা, অন্তরে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পুষে রেখো, তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শুধু অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রয় করা, আর কিছু নয়। দেহ যতই কলুষিত হোক না কেন, মনকে পবিত্র রাখবার জন্যে সীমা প্রত্যহ স্নানান্তে পূজা করে মন্দির, মসজিদ ও গির্জায় যায়, দুঃখী দরিদ্রকে দান করে। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় সে আসর সাজিয়ে বসে, মদ্যকে করে তার সঙ্গী, মদের নেশায় চুরচুরে হবার পরে, যে-কোনোও পুরুষের ভোগ্যা হ'তে তার বাধে না। তার এই জীবনযাত্রার মধ্যে সহসা উদয় হ'ল অনিল ধাওয়ান। যুবকটি সব-সময়েই তার সাহায্যের জন্যে ছুটে আসে, তার সামনে থেকে সরতে চায়না, বলে 'তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে।' অনেক বার অনুরোধ এড়াবার পরে শেষ পর্যন্ত শুনতেই হয় তার কথা। অনিল শুধু তাকে ভালোবাসার কথাই বলে না, বলে তাকে বিবাহ করে সুখী হ'তে চায়। এবং তাকে বিবাহ করবার শর্ত হিসেবে সে যে-কোনোও ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত। অনিলের আন্তরিকতা সীমাকে মুগ্ধ করে। তার সমস্যার কথা সে যখন অভিজ্ঞা প্রৌঢ়া ব্যবসায়িনীর কাছে ব্যক্ত করে, তখন তিনি তাকে বলেন, 'তুমি ভাগ্যবতী। এই দুর্লভ সৌভাগ্যের আশায় আজও আমি পথ চেয়ে বসে আছি।' মনের দ্বিধা কেটে সীমা যদিও সানন্দে অনিলকে পতিত্বে বরণ করে এবং মনে খুশীর জোয়ার উপচে ওঠে, তবু সে তার কলুষিত দেহকে অনিলের কাছে সমর্পণ করবার আগে পবিত্র ক'রে নিতে চায় বেশ কিছুদিন পৃথকভাবে সংযমের মধ্যে থেকে। এর পর যখন সে অনিলের বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময়ে কর্ম-ব্যপদেশে অনিলকে কিছুদিনের জন্যে বিদেশে যেতে হয়। আর ঐ সময়েই সে আবিষ্কার করে, পূর্বজীবনের স্মৃতি-স্বরূপ সে মা হ'তে চলেছে। সুন্দর পৃথিবীর সমস্ত রং তার জীবন থেকে মুছে যায়; অতীত জীবনের অভিশাপ তার দেহে অঙ্কুরিত হয়েছে। এই ভাবনা তাকে পাগল করে। সে মদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে ধীরে ধীরে আত্মবিসর্জনের পথে এগিয়ে যায়। অনিল ফিরে এসে [illegible] ঐ অবস্থায় মধ্যে দেখে হতচকিত হয়; পরে কারণ

নিমন্ত্রণ/পরিচালনা : তরুণ মজুমদার। অনিল পাল, নন্দিনী মালিয়া এবং অনুপকুমার। ফটো : অমৃত

জানতে পেরে যখন স্বেচ্ছায় তার ভাবিষ্যৎ সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করবার প্রস্তাব করে, তখন সীমা বিষণ্ণচিত্তে তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এই বলে যে, যাকে ভালোবাসি, সে যদি দেবতা হ'তে চায়, তাহলে তাকে ভালোবাসা যায় না, সে পূজার পাত্র হয়ে ওঠে। —এর পরে সে সুযোগ বুঝে বিষপান করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

বিয়োগান্তভাবে ছবি শেষ করাই শুধু নয়, চিত্রনাট্যের গঠনে, মাত্র পাঁচের প্রধান চরিত্রের অস্তিত্ব দানে (সীমার অন্ধ পিতার চরিত্র), ক্যামেরার উপস্থাপনে ও ব্যবহারে ছবিটি যে একান্তভাবে পরীক্ষামূলক, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কোনো কোনো ঘটনার অবতারণায় এবং গানের প্রয়োগে (বিশেষ করে তৃতীয় গানটি) ছবিটি আবার গতানুগতিকতাকেও অনুসরণ করেছে। এবং এই গতানুগতিকতা ছবিটির চরিত্রহানি ঘটিয়েছে। এ ছাড়া সন্তানসম্ভাবিত সীমার নিজ জীবনকে অভিশপ্ত জ্ঞান করার মধ্যে আমরা বিশেষ যুক্তি খুঁজে পাইনি। তার অতীত জীবনকে জেনেই অনিল তাকে ভালোবাসার বেদীতে যখন বসিয়েছে, তখন তার ভাবিষ্যৎ সন্তানের পিতৃত্ব গ্রহণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করার কারণ হিসেবে সীমা যে-যুক্তিকে খাড়া করেছে তাকে স্বচ্ছচিত্তে স্বীকার করে নেওয়া কঠিন।

নায়িকা সীমার চরিত্রে নবাগতা রেহানা সুলতান যে নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, তা হিন্দী চলচ্চিত্রজগতের প্রতিষ্ঠাবান অভিনেত্রীদের কাছ থেকেও সচরাচর পাওয়া যায় না।

নায়ক অনিলের চরিত্রে অনিল ধাওয়ানকে কিন্তু নবাগতের জড়তা একেবারে পরিত্যাগ করে নি। তবে তিনি নায়কোচিত অঙ্গসৌষ্ঠবের অধিকারী। অপরাপর ভূমিকায় সু-অভিনয় করেছেন দিলীপ দত্ত, ডি গোপাল, নাদিরা, লক্ষ্মীছায়া প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মধ্যম শ্রেণীর। পরিস্থিতি অনুযায়ী ছবির উর্দু-প্রধানসংলাপ অত্যন্ত সাবলীলভাবে লিখিত ও সেই কারণে হৃদয়গ্রাহী। গানের সুরযোজনায় সপন জগমোহন কোনো অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে পারেন নি।

অন্যান্য বহু ত্রুটি সত্বেও নিরীক্ষামূলক ছবি 'চেতনা' একটি দুঃসাহসিক ছবি হিসেবে চিত্রামোদীমাত্রেরই প্রশংসালাভের যোগ্য।

হিন্দী ছবির খবর

আনন্দ : হৃষিকেশ মুখার্জির নতুন ছবি 'আনন্দ' সম্প্রতি বম্বের কেন্দ্রীয় সেন্সর কর্তৃপক্ষ অকৃত অবস্থায় সাধারণো প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন। মার্চ মাসেই সারা ভারতে মুক্তি পাবে। স্বরচিত গল্প নিয়েই শ্রীমুখার্জি এ ছবিখানি পরিচালনা ও সম্পাদনা করেছেন। ছবির মুখ্য চরিত্রশিল্পী হলেন রাজেশ খান্না, বর্তমানে বম্বের এক নম্বর হিরো। অন্যান্য চরিত্রে অংশ নিয়েছেন সুমিতা সান্যাল (কলকাতা), অমিতাভ বচ্চন, রমেশ দেও, সীমা, ললিতা পাওয়ার, অসিত সেন, দুর্গা খোটে, জনি ওয়াকার, দারা সিং ... এবং জনি ওয়াকার ও দারা সিং। সলিল চৌধুরী সুরারোপিত গানগুলি লিখেছেন গুলজার ও যোগেশ।

• • •

মেরে অপনে : প্রযোজক এন-সি-সিপ্পি বাংলা হিট ছবি 'অপনজন'-এর হিন্দীতে চিত্রগ্রহণের কাজ মোটামুটি শেষ করে ফেলেছেন। নাম বদলে রাখা হচ্ছে। হিন্দী নাম দেবে 'অপনে'। হিন্দী চিত্রজগতের খ্যাতনামা লেখক চিত্র-নাট্যকার গুলজার এ ছবিখানি পরিচালনা করবেন।

নান্দীকার

সাধারণ নির্বাচনের জন্য
৫ই মার্চ থেকে ১১ই মার্চ
পর্যন্ত নান্দীকারের অভিনয় বন্ধ থাকবে।
রঙ্গনায় পরবর্তী অভিনয়
২০শে ৬টায়, ২১শে ২॥টে ও ৬টায়

তিন পয়সার পালা

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

...কিম-জয়ন্তী / অপর্ণা সেন, সুচেতা, সঞ্জয়, টিঙ্কু, পাপিয়া, মধুমিতা।

পদী পিসীর বর্মী বাক্স / পরিচালনা : অরুন্ধতী দেবী। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছায়া দেবী।
ফটো : অমৃত

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এটি গুলজারের প্রথম ছবি। স্বর্গত বিমল রায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই তিনি বিমল রায়ের জন্মদিনে অর্থাৎ ৮ জানুয়ারী নতুন পথে শুভযাত্রা শুরু করলেন একখানি গান রেকর্ডিং-এর মধ্য দিয়ে। মান্না দে গাওয়া ঐ গানখানি, সুর দিয়েছেন প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরী। গানটি লিখেছেন গুলজার। এই রঙীন ভাষ্যের শিল্পী তালিকা এখনও যদিও সম্পূর্ণ নয় তবে যে কটি নাম জানা গেছে তার মধ্যে আছেন মীনা কুমারী, জয়া ভাদুড়ী, সুস্মিতা সান্যাল প্রভৃতি।

• • •

মেরে সজন গাঁও কি কসম : প্রযোজক পরিচালক বিনোদ কুমার কিছুদিন আগে এক লম্বা মোটর পাড়ি জমিয়েছিলেন উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। তিনি গিয়েছিলেন তাঁর নতুন ছবি 'মেরে সজন গাঁও কি কসম'-এর আউটডোর লোকেসান দেখতে। গোরক্ষপুর জেলার বিভিন্ন জায়গা ও তেরাইয়ে তিনি স্যুটিং শুরু করেছেন সম্প্রতি। বিনোদকুমার ও এ নারাং প্রযোজিত এ ছবির বিকাংশই গৃহীত হবে এই লোকেশনে, বাকি কাজ বম্বের স্টুডিওতে। স্বরচিত গল্প অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন বিনোদ কুমার নিজে। এ-ছবিতে হসরৎ জয়পুরীর লেখা গানগুলিতে সুর দিয়েছেন শঙ্কর জয়কিষণ। বিভিন্ন চরিত্রলিপিতে আছেন সায়রা বানু, সঞ্জয়, নাজিমা, অজিত, ডেভিড, কে এন সিং, জেব রেহমান, ওমপ্রকাশ, এস এন ত্রিপাঠি: নবাগত কাদের খান একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। রঙীন এ ছবির ক্যামেরাম্যান হলেন ভি অবধুত।

• • •

শর্মিলী : 'সংগম' খ্যাত পরিচালক সমীর গাঙ্গুলীর নতুন ছবির নাম 'শর্মিলী'। সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে 'শর্মিলী' এখন সমাপ্তপ্রায়। সম্প্রতি খান্ডালা ঘাটে কিছু দৃশ্য গ্রহণ করা হোল এ ছবির। আরও কিছু দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে চেম্বুরে বার্মাশেল রিফাইনারীর পাশের সুন্দর সুইমিং পুলে। এ সকল লোকেশন স্যুটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন শশী কাপুর, রাখী, অনিতা বড়, নাজির হোসেন, রণজিৎ, কৃষ্ণকান্ত এবং ইফ্‌তিকার। ছবির অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন উমা ধাওয়ান, শিবরাজ, দুলারি, পরেশানন্দ, সুলোচনা ও নবাব। গুলশান নন্দা লিখিত কাহিনী অবলম্বনে সংলাপ রচনা করেছেন ব্রজেন্দ্র গৌর। বহুদিন বাদে আবার শচীনদেব বর্মন সুবোধ মুখার্জির এই ছবিতে সুর দিচ্ছেন। নীরাজের লেখা গানগুলি গাইবেন লতা মঙ্গেশকর, মহম্মদ রফি, আশা ভোঁসলে, মান্না দে প্রমুখ।

• • •

পরায়া ধন : কিরণ প্রোডাকসন্সের নবতম চিত্রার্ঘ্য 'পরায়া ধন'-এর কাজ সম্প্রতি শুরু হয়ে গেছে। এ ছবির শুভ-যাত্রা শুরু হয়েছিল কিশোরকুমারের কণ্ঠে একটি গান রেকর্ডিং-এর মধ্য দিয়ে। বম্বের তরুণতম জনপ্রিয় সুরকার রাহুল দেববর্মন এ ছবির সুরকার। গীতিকার আনন্দ বক্সি। এ-ছবির মুখ্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন হেমা মালিনী, রাকেশ রোশন, বলরাজ সাহনী, অজিত প্রভৃতি। ছবিখানি পরিচালনা করছেন বম্বের খ্যাতনামা শিল্প-নির্দেশক সুধেন্দু রায়। কুলু উপত্যকার মনোরম লোকেশনে ছবির বেশীর ভাগ দৃশ্যই গৃহীত হবে। ব্রীরাজের লেখা গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন ভেদ রাহী ও সংলাপ রচনা করেছেন কে এইচ কাদরী।

ফাঁকি : পবিত্র লাহা নিবেদিত বৃন্দ ফিল্মস-এর প্রথম নিবেদন ফাঁকির চিত্ররূপ দিচ্ছেন তরুণ পরিচালক বৃন্দ চক্রবর্তী। রবীন্দ্র কবিতা অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক নিজেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নেপথ্য কণ্ঠ-সংগীতে সমৃদ্ধ এ-ছবির প্রথম পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ও কোলকাতার কয়েকটি বাড়িতে সম্প্রতি সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ রাজগীর, বারানসী ও নেতারহাট-এ আসছে ১০ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হবে। সংগীত পরিচালনা করছেন সত্যদেব চট্টোপাধ্যায়। আবহ সংগীত বিলায়েৎ খাঁর। অভিনয় করছেন জয়শ্রী রায়, সুবোধ দাস, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, নমিতা বিশ্বাস, কনক দেবনাথ, ছায়া দেবী প্রভৃতি শিল্পী।

CENTRAL LIBRARY

বিবিধ সংবাদ

জয়-জয়ন্তী : মণি বর্মা রচিত কাহিনী অবলম্বনে এস মল্লিক পরিচালিত এবং [illegible] 'জয়-জয়ন্তী' দোলের দিন উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অন্যান্য মুক্তি পাচ্ছে। উত্তম, অপর্ণা জুটি এখানে অনুপম প্রণয়-পর্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। এঁদের দুজনের অভিনয়-কুশলতার সঙ্গে পাঁচ থেকে পনেরো বছরের পাঁচটি দুরন্ত কিশোর কিশোরীর চরিত্রে সুচেতা, সম্রাট, মধুমিতা পাপিয়া নাচে গানে দুষ্টুমিতে মাতিয়ে রেখেছে ছবিটির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। পাঁচ থেকে আশী বছরের দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখবার মত ছবি 'জয়-জয়ন্তী'। এদের সঙ্গে আছেন ললিতা চ্যাটার্জি তরুণকুমার, গীতা দে, মন্টু ব্যানার্জি, এন বিশ্বনাথন ও বহুদিন পরে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে চন্দ্রাবতী দেবী। 'জয়-জয়ন্তী' ছবিতে বিভিন্ন ধরণের সাতখানি গানে সুর দিয়েছেন সংগীত পরিচালক মানবেন্দ্র মুখার্জি।

রূপদর্শীর শয়তান দর্পণ : 'রূপদর্শীর' শিল্পীরা সম্প্রতি 'রঙ্গনায়' একটি বলিষ্ঠ নাটকের প্রযোজনা উপস্থিত করে নাট্যানুরাগীদের যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন। নাটকটি হোল 'শয়তান দর্পণ', আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রুশ নাট্যকার ইয়েভ্‌জেনী শোয়ার্ৎসের 'দি ড্রাগনের' অনুপ্রেরণায় নাটকটি রচনা করেছেন অভিজ্ঞ অভিনেতা শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। শোয়ার্ৎসের নাটকের মূল সুরটি অক্ষুণ্ণ রেখে সংলাপ, পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টিতে মৌলিকতার পরিচয় রাখতে পেরেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়।

'শয়তান দর্পণ' নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে আমরা যেন মাঝে মাঝে রূপকথার আলো-আঁধারি পরিবেশে চলে যাচ্ছি; একটি অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে আমাদের সমস্ত অনুভূতিগুলো মিশে যাচ্ছে। কিন্তু এই অলৌকিকতাই এই নাটকের সত্য নয়—এ নাটকের মর্মকেন্দ্রে আছে চির পরিচিত শোষণ, আর অত্যাচারের রূপকথা কাহিনী, আছে সমাজে লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রাম। এবং শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামী, নির্যাতিত মানুষের জয়যাত্রার ঘোষণাই আভাসিত হয়েছে নাটকে। এই নাটকের যে 'শয়তান' চরিত্র, তার মধ্যে সর্বকালের অত্যাচারী শাসকদের ছবিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এই নাটকটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করতে নির্দেশক ভোলা দত্ত যথেষ্ট আন্তরিকতা ও শিল্পবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। দু'একজন ছাড়া শিল্পীদের প্রত্যেকেরই অভিনয়ে স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। বিশেষ করে 'বিপ্লব' আর 'বনানী'র ভূমিকায় সুজিত রায়চৌধুরী ও মমতা চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত অভিনয় সত্যি মনে রাখার মতো। তা ছাড়া 'বিপ্লব' ও 'বনানী'র নামকরণের মধ্যেও নাটকের মূল সুরটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন—তপন দাশগুপ্ত, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দন রায়চৌধুরী, মাণিক চক্রবর্তী, তপন মিত্র, তপন রায়চৌধুরী, লতিকা দাস, অমিয় রায়, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ [illegible] এন দাস, সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়, চপল ঘোষ।

মঞ্চসজ্জা ও আলোক সম্পাতের প্রতীকী ব্যবহার সামগ্রিক প্রযোজনাটিকে এক নতুন রূপ দিয়েছিল। এর জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবী রাখেন কমল ঘোষ দস্তিদার ও দিলীপ বসু। এছাড়া টি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবহ-সংগীতও নাটকের অনেকটা মুহূর্তকে বেশ সজীব করে তুলেছে।

দিশারী পুরস্কার : দিশারী সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতি বছরই নাটক, যাত্রা ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পুরস্কার দিয়ে থাকেন। নাট্য-সাংবাদিকদের বিচারে যাঁরা এবার এ পুরস্কার পাবেন, তাঁরা হোলেন—

নাটক : নাট্যকার : জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজনা : 'এক যে রাজা' (কোরাস)। পরিচালক: সমর মুখার্জি (ক্যালকাটা সেমিনার)। শিল্প নির্দেশক : হীরক মুখার্জি (শিল্পী যাযাবর)। অভিনেতা : বাউল ঠাকুর 'এক যে রাজা' (কোরাস)। সহ অভিনেতা : দেবকুমার ভট্টাচার্য ফুলওয়ালী (গন্ধর্ব)। অভিনেত্রী : ছন্দা চ্যাটার্জি 'খাঁচা' (সন্দর্ভ)। সহ-অভিনেত্রী : সুরুচি ঘোষ 'আকাশ বাড়ি' (কৌশিক)।

যাত্রা—নাট্যকার : উৎপল দত্ত। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : নিউ প্রভাস অপেরা 'বিপ্লবী ভিয়েৎনাম'। পরিচালক : রমেন লাহিড়ী। 'বিপ্লবী ভিয়েৎনাম'। সঙ্গীত-পরিচালক : প্রশান্ত ভট্টাচার্য। আলোকশিল্পী : অজাতশত্রু 'বিপ্লবী ভিয়েৎনাম'। অভিনেতা : সুজিত পাঠক 'নীলরক্ত' (ভারতী অপেরা)।

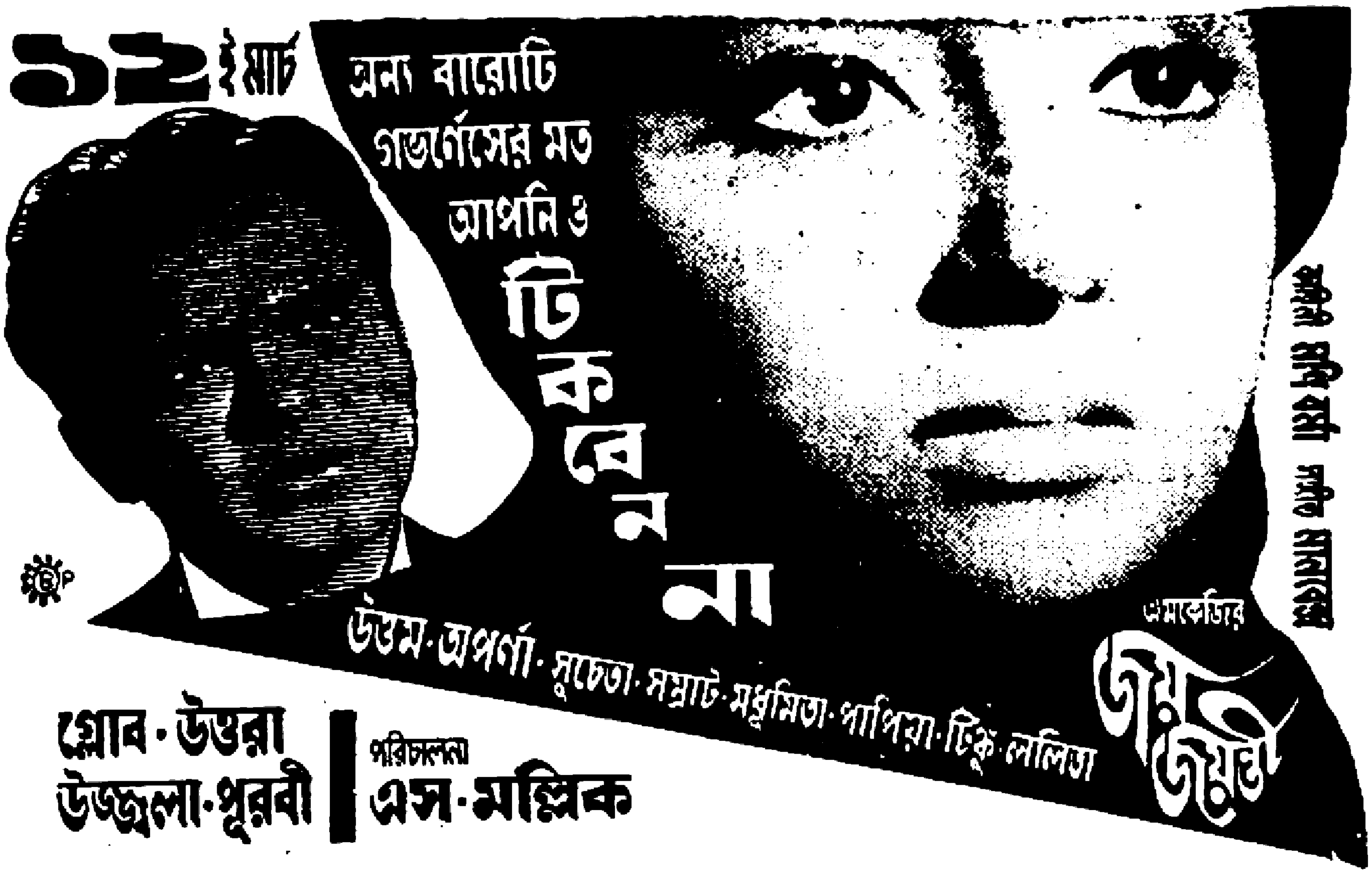

মহিলা শিল্পীমহল আয়োজিত সরযূ দেবী সম্বর্ধনা সভা

সহ-অভিনেতা : অতনু হালদার 'বিপ্লবী ভিয়েৎনাম'। অভিনেত্রী : রীতা দত্ত 'বিপ্লবী ভিয়েৎনাম'। সহ-অভিনেত্রী : ছবি চ্যাটার্জি 'জীবনরঙ্গ'। কৌতুক-অভিনেতা : সমেন ভাদুড়ী 'মার্ডার' (মাধবী নাট্য কোম্পানী)। গায়ক : ভব মল্লিক 'সিপাহী বিদ্রোহ' (সত্যাম্বর অপেরা)।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত : কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী : বিজয় চক্রবর্তী ও শ্রীলা বন্দ্যোপাধ্যায় : সেতারশিল্পী : সুব্রত রায়চৌধুরী। বেহালাশিল্পী : বাদল ঘোষ, বাঁশী শিল্পী : হিমাংশু বিশ্বাস। তবলা-শিল্পী : গোবিন্দ বোস। কত্থক নৃত্যশিল্পী : মায়া চট্টোপাধ্যায়। ভারতনাট্যম শিল্পী : লিপিকা গুপ্ত।

'অভিনয় দর্পণে'র উৎসব

'অভিনয়' পত্রিকাগোষ্ঠী সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গনে স্বর্ণপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৯৭০ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রযোজনা ও নাটকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণী শিল্পীদের পুরস্কৃত করলেন। খুব সম্ভবতঃ বাংলা-দেশে এই ধরনের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা এই প্রথম।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন 'হুররা' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার পেয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। অসিত মুখোপাধ্যায় পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার 'পুনর্মিলন' নাটকের জন্য বা বলো তাই বলো' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন শ্রীমতী শাঁওলী মিত্র 'কিংবদন্তী' নাটকের জন্য। 'ক্যাপ্টেন হুররা' নাটকের মঞ্চ-সজ্জার জন্য শ্রেষ্ঠ মঞ্চ-নির্দেশকরূপে পুরস্কৃত হয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। রোমান্সগোষ্ঠী 'এক যে রাজা' নাটকের ক্ষেত্রে ১৯৭০-এর শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার সম্মান পেয়েছেন। মফস্বলে সর্বাধিক অভিনীত নাটকের রচয়িতার পুরস্কার পেয়েছেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য। এবং মফস্বলে সর্বাধিক নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন নৈহাটির 'নাট্টিক' গোষ্ঠী। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে দর্শক ও নাট্যগোষ্ঠীর ভোটে নির্বাচিত বিভিন্ন গুণী শিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করেন প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়। এই দিনের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত শিল্পীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পথিক শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য, সু-অভিনেতা শ্রীমহিতোষ দত্ত প্রমুখ নাট্য-বিদগ্ধ। অভিনয় পত্রিকার পক্ষ থেকে বিজন ভট্টাচার্যকে তাঁর অবিস্মরণীয় দানের জন্য ১০১ টাকার চেক প্রদান করেন শ্রীমন্মথ রায়।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে 'এক যে ছিল রাজা' ও 'মহাকাব্য' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন যথাক্রমে 'নাট্টিক' ও রোমান্স গোষ্ঠী। যোগেশ দত্তের মূকাভিনয় এদিনের অনুষ্ঠানের অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল। ২৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠানে 'মঞ্চ ও দর্শক—এই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত সুন্দর আলোচনা করেন অধ্যাপক দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও কার্তিক ঘটক। এদিনের নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন রোমান্স গোষ্ঠী। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার প্রাপ্ত তাঁদের নাটক 'এক যে রাজা' এদিনের অনুষ্ঠানে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। প্রথমদিন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত গুণী শিল্পীদের মানপত্র পাঠ করেন। পত্রিকার পক্ষ থেকে কলকাতার জাতীয় নাট্যশালা ও শহরে গড়ে মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয় স্থাপনের দাবী জানান সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূ দেবীর সম্বর্ধনা সভায় : গত ২৬ ফেব্রুয়ারী মহিলা শিল্পীমহলের সভ্যরা তাঁদের নিজস্ব গড়চা রোডস্থ ভবনে এ-বছর আকাদেমি পুরস্কৃত শিল্পী নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূ দেবীর এক ঘরোয়া সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। প্রবীণা অভিনেত্রী প্রফুল্লবালা দেবী সংস্থার পক্ষ থেকে সরযূ দেবীর হাতে একটি রৌপ্যাধারে বস্ত্র, পুষ্প, রৌপ্যফলকে উৎকীর্ণ লিপি তুলে দিয়েছেন। নমিতা সিংহ শিল্পীকে মানপত্র প্রদান করেন এবং সাধনা রায়চৌধুরী তাঁর ললাটে চন্দন-টিকায় ভূষিত করেন।

ডিফেন্স এ্যাকাউন্টস (ফ্যাক্টরীজ) রিক্রিয়েশন ক্লাবের চতুর্বিংশতি বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি রঙ্গনায় অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি শ্রী এস কে গনেশন দর্শকদের স্বাগত জানান। শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ভ্রান্ত মূল্যকার' নাটকটি ক্লাবের সভাবৃন্দ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। সামগ্রিক দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। তবে অমিতাভ ঘোষ, রঘুনাথ ব্যানার্জি, গোবিন্দ নন্দী ও পুতুল চক্রবর্তীর আরও অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল। উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন কালী মুখার্জি, মুকুল সরকার, দিলীপ সরকার, রাধিকা ভট্টাচার্য, কল্যাণ মিত্র, দেবু চ্যাটার্জি, পুতুল চক্রবর্তী, রবি রায়, যতীন মল্লিক ও গোবিন্দ নন্দী। অন্যান্য চরিত্রে মুকুল চক্রবর্তী, অসিত পাল, শুভেন্দু ঘোষ, আশীষ মৈত্র, মালবিকা ব্যানার্জি, গায়ত্রী সেনগুপ্তা, স্বপ্না দাশগুপ্তার অভিনয় চরিত্রানুগ। অরুণ দাসের সঙ্গীত-পরিচালনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্য পরিচালক মন্টু দাশগুপ্ত কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

মহুয়া (এন্টালী) সম্প্রদায় মাসে একটি করে নাটক ঘরোয়াভাবে মঞ্চস্থ করছে গিরিশচন্দ্র বসু রোডস্থিত 'মহুয়া' মঞ্চে। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রথম প্রযোজনায় ছিল দুটি (শিকার ও একা গাড়ীর ঘোড়া) নাটক। গত ৭ই মার্চ হয়েছে কিরণ মৈত্রের নাম নেই।

স্মরণীয় উদ্বোধন অনুষ্ঠান : সম্প্রতি বেলতলা দুর্নিবারী শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে কয়েকজন রবীন্দ্রানুরাগীর উদ্যোগে 'রবিরশ্মি' গীতি-সংস্থাটির উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার দাস। সংস্থার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে লিখিত ভাষণ পাঠের পর সমবেত ও একক কণ্ঠে নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। প্রতিটি গানই হয়েছিল ভাবব্যঞ্জক ও হৃদয়গ্রাহী। সঙ্গীত-পরি-চালনা করেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

দুর্গাপুরে বিচিত্রানুষ্ঠান : সম্প্রতি দুর্গাপুরে 'হিরোস' ক্লাবের পরিচালনায় রাণা প্রতাপ রোডে এক বিচিত্রানুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণ করেন : দিলীপ চক্রবর্তী, সান্ত্বনা বোস, অশোক গঙ্গোপাধ্যায় ও তপন দত্ত।

খেলার কথা

অ্যাশেস বরবাদ হবে!

অজয় বসু

এক যুগ পরে 'অ্যাশেস' আবার ইংলণ্ডে ফিরে এসেছে। প্রত্যাবর্তন কাল্পনিক। কারণ, ক্রিকেট মাঠের যে ছাই-ভস্মকে চোখে দেখতে পাওয়া যায়, আধার সমেত তা চিরদিনই লর্ডসের প্যাভিলিয়নে অনড় থাকে। ১৯২৭ সাল থেকে ওই ছাই-ভস্ম লর্ডসের সংগ্রহশালায় জমা পড়ে রয়েছে। তার আগে তা ছিল আইভো ব্লাইয়ের (উত্তর পর্বে লর্ড ডার্নলে) কাছে।

'অ্যাশেস'-এর কথা উঠলেই আইভো ব্লাইয়ের নাম মনে পড়ে যায়। ওঁরই নেতৃত্বে ১৮৮৩ সালে (১৯শে—২২শে জানুয়ারী) মেলবোর্ন মাঠে ইংলণ্ড এক ইনিংস ও সাতাশ রানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দেওয়া মাত্র জাতীয় মর্যাদা সচেতন একদল অস্ট্রেলীয় ললনা নিজেদের হাতে ওই টেস্টে ব্যবহৃত স্টাম্প-বেল পুড়িয়ে ভস্মাবশেষ একটি পাত্রে রেখে তা আইভো ব্লাইকে উপহার দেন। ভস্মাধারটি সেই থেকে আইভো ব্লাইয়ের কাছেই ছিল। ১৯২৭ সালে তাঁর জীবনাবসানে তাঁরই ইচ্ছানুসারে ভস্মাধারটি এম সি সি-র সংগ্রহশালায় জমা পড়ে এবং সেই থেকে লর্ডসের লং রুমই হলো এই অভিনব স্মারকের স্থায়ী বাসা। ওখান থেকে ভস্মাধারটি আর নড়ে চড়ে না। কি জানি এ-হাত ও-হাত করতে গেলে পাছে অতো-দিনের পুরোনো ছাইভস্ম একেবারে বেহাত হয়ে যায়! কাজেই অ্যাশেসের যাওয়া ও ফিরে আসা, সবই কাল্পনিক।

তবে জাতীয় মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে অস্ট্রেলীয় ললনারা যে ছাইভস্ম আইভো ব্লাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তা কিন্তু আসল অ্যাশেস নয়। আসল বস্তুটি আরও কাল্পনিক এবং সে-কল্পনা আরও এক বছর আগেকার।

১৮৮২ সালে ওভাল টেস্টে (২৮শে—২৯শে আগস্ট) ইংলণ্ড এক রকম জিততে জিততেই যখন হেরে গেল, তখন হারের শোকটি তীক্ষ্ণ শেলের মতো বিঁধেছিল অনেক ইংরেজের বুকেই। শার্লি ব্রুকসও হয়েছিলেন অমনই শোকাহত। শার্লি ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কার্টুন পত্রিকা 'পাঞ্চ'-এর সম্পাদকের পুত্র। পিতার মতো তাঁরও রসবোধ ছিল। তাই নিজের উদ্যোগে তিনি একটি শোক-সংবাদ পরের দিনের স্পোর্টিং টাইমসে ছাপিয়ে দিলেন। চারপাশে ঘন কালো রেখায় ঘেরা শোক-বার্তাটি হলো :—

"১৮৮২ সালের ২৯শে আগস্ট ইংলিশ ক্রিকেটের পরলোক প্রাপ্তি ঘটেছে। এই বিয়োগান্ত ঘটনায় ইংলিশ ক্রিকেটের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা গভীর শোকে আচ্ছন্ন।

পুনশ্চ—শব সৎকারের পর পূতভস্ম অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে।"

ইংলণ্ডের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার হাতে ইংলণ্ডের প্রথম পরাজয় অনেক চাঞ্চল্যের খোরাক জুগিয়েছিল। সে চাঞ্চল্য হয়তো কালে স্তিমিত হতো। কিন্তু লণ্ডনের স্পোর্টিং টাইমসে প্রকাশিত শোকবার্তাটি পরিস্থিতিকে জুড়িয়ে যেতে দেয়নি এবং ওভালে অনুষ্ঠিত সেই টেস্টের কাহিনীকে ভুলতেও না। শার্লি ব্রুকস শোকবার্তা ছাপিয়ে বাঙ্গের হাঁড়ি ঘুরিয়ে মজা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে হাসিকান্নার সূত্র ধরে তিনি ক্রিকেটের সবচেয়ে ঐতিহ্য-মণ্ডিত ইতিহাসের প্রথম ছত্রটি তিনি নিজের অজান্তেই লিখে ফেলেন।

সেই ইতিহাসের ধারা আজও প্রবাহিত। ইতিহাসের হাত ধরে কখনো অস্ট্রেলিয়া আবার কখনো ইংলণ্ড বিজয়-মঞ্চে উঠে দাঁড়াচ্ছে। কেউ হারছে, কেউ জিতছে। আনন্দে কেউ উল্লসিত, কেউ বা বিপর্যয়ে ব্যথিত। খেলার সংখ্যা দিনে দিনে যতো বাড়ছে, ছাইভস্মের ইতিবৃত্তও ততোই পরিণত হয়ে উঠছে। এই ইতিহাস ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট যুদ্ধকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। 'অ্যাশেসের ঐতিহ্য ক্রিকেটের মস্তো এক ঐশ্বর্য'।

কিন্তু এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার কথা উঠছে আজ। নতুন কালের দাবী—অ্যাশেসের অবলুপ্তি ঘটুক, ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা হোক। খেলাটাই প্রাধান্য পাক, অ্যাশেসের ওপর সমস্ত গুরুত্ব অর্পণ করে খেলার চেয়ে ছাই-ভস্মকে অনেক দামী বলে যেন মনে না করা হয়। এ-দাবী যার-তার নয়, ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া, দুই বর্তমান পক্ষের দুই নায়কের—রে ইলিংওয়ার্থ ও আয়ান চ্যাপেলের। প্রায় দশ বছর আগে ইংলণ্ডের মর্যাদাপ্রতিষ্ঠিত টেড ডেক্সটার 'অ্যাশেস বিলোপের যে-ধ্বনি তুলেছিলেন, ইলিং-ওয়ার্থ ও চ্যাপেলের কণ্ঠে আজ তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ও'দের বক্তব্য : অ্যাশেস, কথাটিই যেন যাদু মাখানো। সেই যাদুর টানে দু পক্ষের খেলোয়াড়েরাই খেলা ভুলে ছাইভস্ম নিয়ে মেতে থাকতে চান। খেলায় হারলে তাঁরা যতো না অ্যাশেস হারালে তার চেয়ে বেশি শোকাহত হন। তাই অ্যাশেস নিজেদের কাছে রেখে দিতে তাঁরা নেতিবাচক পন্থা অনুসরণেও পেছপাও হন না। ফলে ক্রিকেট খেলার মূল আকর্ষণই হারিয়ে যায়। এক কথায় দু দলকেই অ্যাশেসের চিন্তা এমন করে আচ্ছন্ন করে ফেলছে যে, ক্রিকেট যে একটি আনন্দদায়ী খেলা সেই কথাটি আজ দু দলের খেলোয়াড়েরাই ভুলতে বসেছেন, তাঁদের অ্যাশেসই ইহকাল ও পরকাল যেন!

টেড ডেক্সটারও একদা প্রায় ওই কথাই শুনিয়েছিলেন, 'আগের পর্যায়ে যে-দল অ্যাশেস পায়, সেই দলই অ্যাশেস কাছে রেখে দেবার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করে। নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে খেলা অমীমাংসিত রাখতে পারলেও সে-ক্ষেত্রে অ্যাশেস নিজেদের কাছে রেখে দেওয়া যায়। এর চেয়ে যদি খেলোয়াড়দের বলে দেওয়া হয় যে, জিতলে তাঁদের প্রত্যেককে এক হাজার পাউণ্ড করে পুরস্কার পাবেন, তাহলে জেতার জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াসের নজীর নজরে পড়বে এবং সে-প্রচেষ্টাও হবে চিত্তাকর্ষক।'

টেড ডেক্সটার বা রে ইলিংওয়ার্থ ও আয়ান চ্যাপেলের অভিমত যুক্তিবর্জিত নয়। তাদের দিক থেকে একটা যুক্তি খাড়া করা হয়েছে। আবার আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বিপরীত যুক্তির সন্ধান পাওয়াও কঠিন নয়।

অ্যাশেসের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ঐতিহ্যের ধারাটুকু মুছে দিয়ে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সাধারণভাবে টেস্ট ম্যাচের ব্যবস্থা করা হলে সেই আয়োজনকে কি পানসে বলে ঠেকবে না। আর যদি ডেভিস কাপ বা উইম্বলেডন টেনিসকে অথবা অলিম্পিক ক্রীড়া অন্য নামে অভিহিত করা যায় তাহলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ এইসব ক্রীড়ানুষ্ঠানের কি কিছুই ক্ষতি হয় না? খাস কলকাতাকেই যদি আজ অন্য নামে ডাকা হয় তাহলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায়। ঐতিহ্য ভাবানুবেগ ভিত্তিক। কিন্তু যুক্তি-বাদী মানুষের জীবনে ভাবানুবেগের ঠাঁই নেই বা কোনো দাম নেই, একথাই বা বলি কি করে!

ডেক্সটারের কথা শুনে সেদিন অস্ট্রে-লীয় অলরাউণ্ডার এলান ডেভিডসনও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। ডেভিডসনের কথায় 'অ্যাশেসই হলো ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেটের প্রাণ। প্রাণটুকু কেড়ে নিলে থাকেই বা কি। অ্যাশেসের ঐতিহ্য স্মরণ করেই যুগ যুগান্তরের খেলোয়াড়েরা অনুপ্রাণিত এবং তাঁদের হাতে গড়া কীর্তি কাহিনীতে ক্রিকেটের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে।

'অ্যাশেসের নাম শুনেই ক্রিকেট অনু-রাগীরা মাঠে এসে জড়ো হন। তাঁরা হাজির হন বলেই টেস্ট ক্রিকেট খেলার মাঠের মোহ-

গোড়াই লক্ষ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। দর্শকেরা তাঁদের দেয় টাকা ফিরেই পেন। আরও টাকার দাবী তুলে টেড ডেকসটার দর্শকদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি অবিচারই করেছেন।'

ডেকসটার, চ্যাপেল ও ইলিংওয়ার্থের অধিনায়কত্বে যদি যুক্তি থাকে তাহলে এখান চৌত্রিশজনের বক্তব্যকেই বা অযৌক্তিক বলে হরি কি করে! আসল কথা, চিত্তাকর্ষক খেলবোই বলে যাঁরা মনের দিক থেকে সদাই প্রস্তুত তাঁদের অ্যাশেস চিন্তা আচ্ছন্ন করতে পারে না। যাঁরা খেলাটির ঐশ্বর্য বাড়াতে তেমন তৎপর নন তাঁরাই একবার সেকথার উল্লেখে নানান ওজর আপত্তি আঁকড়ে ধরেন। নাস্তে না জানলে উঠোনের দোষ ধরার কাহিনী কে না জানে! অ্যাশেসকে সামনে রেখেও খেলার মতো খেলা যায় এবং তেমন খেলা হয়েছেও অনেক। মানসিক প্রস্তুতি থাকলেই এসব কাজ করে তোলা সম্ভব। কিন্তু সে প্রস্তুতি ছাড়া সম্ভব নয়। এবং যখনই তা অসম্ভব হবে তখনই কৈফিয়ৎ দাখিলের চেষ্টায় অ্যাশেসের গলায় অপ-রাধের ঘণ্টাটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই মহজ সত্যটি আয়ান চ্যাপেল, রে ইলিং-ওয়ার্থ ও টেড ডেকসটার, তিনজনের কেউই উপলব্ধি করতে পারেন নি। ডেকসটার নিজে ব্যাট চালিয়ে চিরদিনই দর্শকদের মনোরঞ্জন করে দিয়েছেন। তাঁর মেজাজের সংগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোনো চাল্, ব্যাটস-ম্যানের মেজাজের কোনো তফাৎই ছিল না। কিন্তু ডেকসটারের এই মনোভাবে তাঁর কালের ইংলন্ডের খেলোয়াড়েরা উজ্জীবিত হতে পারেন নি বলে ডেকসটারকে শতাব্দ-শেষ দ্বাট রাখতে অ্যাশেসকেই হাঁড়িকাঠে চড়াতে হয়েছে।

তবে অ্যাশেসের কপালে ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, অ্যাশেস ঘিরে এবারে ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার যে ক্রিকেট যুদ্ধ হয়ে গেল তা উপভোগ্যই হয়েছে। একযুগ পর ইংলন্ড আবার অ্যাশেস উদ্ধার করে দ্বি-পাক্ষিক ক্রিকেট দ্বন্দ্বে অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য নষ্ট করে দিয়েছে। এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ইংলন্ডের পক্ষে সবশেষ অ্যাশেস পেয়েছিলেন সার লেন হাটন ১৯৫৪-৫৫তে।

এবারের খেলায় ব্যাটে, বলে এবং ফিল্ডিংয়ে সবদিক দিয়েই ইংলন্ড অস্ট্রে-লিয়াকে টেক্কা দিয়েছে। সাত সাতটি টেস্টের (একটি বর্ষণে ভেসে যায়) মধ্যে দুটিতে ইংলন্ড জিতেছে, বাকী খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। এতটানা এতো-গুলি টেস্ট চলার সময় প্রায় সর্বক্ষণই খেলায় ইংলন্ডের বড় প্রভাব ছিল।

ইংলন্ডের এই সাফল্যের মূলে ছিল জন স্নোর পেস বোলিং, বয়কট ও এডরিচের নিপুণ ব্যাটিং নৈপুণ্য। চৌকশ হিসেবে অলিভিয়েরা ও ইলিংওয়ার্থও যথার্থ যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন। বয়কটের ব্যক্তিগত ব্যাটিংয়ের গড় হিসাব ৯৩-৮৫। আঘাতের জন্যে তিনি শেষ টেস্টটিতে অংশ নিতে পারেননি। পারলে এক পর্যায়ে ইংলন্ডের পক্ষে সর্বাধিক রান করার কৃতিত্বও হয়তো তিনি দেখাতে পারতেন। পক্ষান্তরে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বাধিক রান যিনি করেছেন সেই কিথ স্ট্যাকপোলের গড় হিসাব হলো ৫২-২৫।

পেস বোলার জন স্নো এই পর্যায়ের টেস্টে একত্রিশটি উইকেট পেয়েছেন। উইকেট সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি কোনো নতুন রেকর্ড গড়তে না পারলেও তাঁর তাল্ ঠোকা বোলিংয়ের সামনে পড়েই অস্ট্রেলীয় ব্যাটস-ম্যানদের সমস্ত সামর্থ্যই যেন নিঃশেষিত হয়ে যায়। অবশ্য একা স্ট্যাকপোলই ব্যতি-ক্রম। মনে হয়, জন স্নোর পেস বোলিংয়ের সংগে পাল্লা দেবার উপযুক্ততা অস্ট্রেলিয়ার কোনো ফাস্ট বোলার যতোদিন না অর্জন করতে পারছেন ততোদিন সম্মুখ সমরে তাদের জেতার আশা বোধহয় সুদূর-পরাহতই।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড

প্রথম টেস্ট খেলা

ক্রাইস্ট চার্চে ইংল্যান্ড বনাম নিউজি-ল্যান্ডের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মোটেই লাভবান হননি। প্রথম দিনে ১৭৫ মিনিটের খেলায় নিউজি-ল্যান্ডের ১ম ইনিংস মাত্র ৬৫ রানের মাথায় শেষ হয়। ডেরেক আন্ডারউড ১২ রানে ৬টা উইকেট পান। এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের পুরো এক ইনিংসের খেলা ৮ বার ১০০ রানের নীচে শেষ হল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৪-৫৫ সালে অকল্যান্ডের ২য় টেস্টে নিউজিল্যান্ডের ২য় ইনিংসে যে ২৬ রানের মাথায় শেষ হয়েছিল তা আজও আন্ত-র্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রানের বিশ্ব রেকর্ড হয়ে আছে। অপরদিকে নিউজি-ল্যান্ডের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ১৮১ (ক্রাইস্ট চার্চ, ১৯২৯-৩০)।

প্রথম দিনের বাকি সময়ে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ৩টে উইকেট পড়ে ৫৬ রান উঠেছিল। বৃষ্টির জন্যে ৮০ মিনিটের খেলা মাঠে মারা যায়।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসে ২৩১ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৬৬ রানে এগিয়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বেসিল ডি ওলিভিয়েরা দিনের অবস্থা উপেক্ষা করে মূল্যবান সেঞ্চুরী (১০০ রান) করেন। তাঁর ১০০ রানে ছিল ১৩টা বাউন্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউন্ডারী। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই ৫ম সেঞ্চুরী। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান ১৫৮ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ওভাল, ৫ম টেস্ট, ১৯৬৮)।

দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে নিউজিল্যান্ড ২য় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৫৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে নিউজিল্যান্ডের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২১২ (৮ উইকেটে)।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যান্ডের ২য় ইনিংস ২৫৪ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৯ রান তুলে ৮ উইকেটে জয়ী হয়। ডেরেক আন্ডারউড এই প্রথম টেস্ট খেলায় ১৭ রানে ১২টা উইকেট পান। (১ম ইনিংসে ১২ রানে ৬ ও ২য় ইনিংসে ৮৫ রানে ৬ উইকেট)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড : ৬৫ রান (ডি পোলার্ড ১৮। আন্ডারউড ১২ রানে ৬ এবং ম্যাটেল-ওয়ার্থ ১৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৫৪ রান (গ্লেন টার্নার ৭৬ এবং কংডন ৫৫ রান। আন্ডারউড ৮৫ রানে ৬ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ২৩১ রান (বেসিল ডি ওলি-ভিয়েরা ১০০ এবং হ্যাম্পসায়ার ৪০ রান। হাওয়ার্থ ৪৬ রানে ৪ এবং ক্রিপটন ৩৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ৮৯ রান (২ উইকেটে। হ্যাম্পসায়ার নটআউট ৫১ রান)

রঞ্জি ট্রফি

কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা

দিল্লী : ১৮৫ রান (মেহেরা ৫২ রান। শিভালকার ৩৭ রানে ৩ এবং মেটা ২৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৯৭ রান (মেঘরাজ ৫২ রান। পাই ৪০ রানে ৩ এবং শিভালকার ৩৩ রানে ৩ উইকেট)

বোম্বাই : ৩০১ রান (সুধীর নায়েক ৯০ এবং মহেন্দ্র সম্পৎ ৮৪ রান। রাজীন্দর গোয়েল ১১৮ রানে ৬ এবং মধুখরা ১০১ রানে ৪ উইকেট)

ও ৮২ রান (কোন উইকেট না পড়ে। নায়েক নটআউট ৫২ রান)

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে বোম্বাই ১০ উইকেটে দিল্লীকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। চারদিনের বরাদ্দ খেলা তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের ৭৫ মিনিট আগে শেষ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় ক্রিকেট প্রতি-যোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক ২২ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের রেকর্ড বোম্বাইয়ের। তাছাড়া তারা উপর্যুপরি ১২ বার (১৯৫৯-৭০) রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে, যা বিভিন্ন দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি সর্বাধিকবার ট্রফি জয়ের বিশ্ব-রেকর্ড হিসাবে আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

দিল্লীর বিপক্ষে বোম্বাইয়ের এই খেলাটি ছিল রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় তাদের ১৫০তম খেলা। বোম্বাই ইতিপূর্বে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় দিল্লীর বিপক্ষে তিনবার খেলে তিনবারই জয়ী হয়েছিল।

মহারাষ্ট্র : ৬২৪ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মধু গুপ্তে ১৭৯, হেমন্ত কানিটকার ২৫০ এবং চান্দু বোরদে ৯৮ রান। ঘাটানি ১৬৯ রানে ৪ উইকেট)

রাজস্থান : ৬০৪ রান (লক্ষণ সিং ৯১, পার্থসারথী ১০০, হনুমন্ত সিং নট-আউট ২১১ এবং সুনীল বেঞ্জামিন ৭৭ রান। বোশী ১৫২ রানে ৬ উইকেট)

গত বছরের রানার্স-আপ রাজস্থান তাদের প্রথম ইনিংসে ২০ রান কম সংগ্রহ করায় মহারাষ্ট্র দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। শেষ চতুর্থ দিনে খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের চার মিনিট আগে রাজস্থানের ১ম ইনিংস ৬০৪ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলা ভাঙার ১০ মিনিট আগে রাজস্থানের জয়লাভের জন্যে মাত্র ২০ রানের প্রয়োজন ছিল এবং হাতে জমা ছিল দুটো উইকেট। কিন্তু মহারাষ্ট্রের বোলার বোশী রাজস্থানের জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২০ রান সংগ্রহের আগেই তাদের শেষ দুটো উইকেট হস্তগত করেন। হনুমন্ত সিং শেষ পর্যন্ত ২১১ রান করে অপরাজিত থাকেন। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় তিনি এই নিয়ে ১৪টা সেঞ্চুরী করলেন—এর মধ্যে ডাবল সেঞ্চুরী ৩টে। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান ২১৩ (বিপক্ষে বোম্বাই, ১৯৬৬)।

বিহার : ১৯৬ রান (আর শুক্লা ৮৫ রান। বি এস চন্দ্রশেখর ৬৫ রানে ৬ উইকেট)
ও ২০৫ রান (আনন্দ শুক্লা নটআউট ১১১ রান। চন্দ্রশেখর ৭৪ রানে ৪ এবং প্রসন্নসীমা রাও ৩৪ রানে ৩ উইকেট)

মহীশূর : ১৯৫ রান (বি রঘুনাথ ৬৮ এবং অশোকানন্দ ৫৪ রান। এস সপ্তাড়ী ৩৭ রানে ৫ এবং সন্দীপ রায় ৫৮ রানে ৪ উইকেট)
ও ২১০ রান (৮ উইকেটে। বিজয়কৃষ্ণ ৭৪ এবং কিরমানি ৪০ রান। সন্দীপ রায় ৭৯ রানে ৪ উইকেট)

দক্ষিণাঞ্চলের রানার্স-আপ মহীশূর পূর্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান বিহারকে ২ উইকেটে পরাজিত করে। বিহার ১ম ইনিংসের খেলায় মাত্র ১ রানে অগ্রগামী ছিল। বিহারের ২য় ইনিংস ২০৫ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্যে মহীশূরের ২য় ইনিংসে যেখানে ২০৭ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা ৮ উইকেট খুইয়ে ২১০ রান তুলেছিল। মহীশূরের এই জয়লাভের মূলে ছিলেন সৈয়দ কিরমানি। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় দলের অতি সঙ্কট সময়ে তিনি আড়াইঘন্টা খেলে ব্যক্তিগত ৪০ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়লাভের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

পরলোকে পঙ্কজ গুপ্ত

গত ৬ই মার্চ ভারতীয় ক্রীড়া মহলের বিশিষ্ট কর্মকর্তা শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত ৭৫ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন: যে পটভূমিকায় তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে তা একদিকথেকে তাঁর খেলাধুলায় নিবিড় অনুরাগ এবং কর্মজীবনকে মহিমান্বিত করেছে। বাড়ী থেকে সুস্থ শরীরে তাঁর দীর্ঘদিনের অতিপরিচিত ময়দানে হকি খেলা দেখতে যাওয়ার পথেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর গাড়ী বাড়ীর দিকে ফিরে যায়। বাড়ীতে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ভারতীয় ক্রীড়া মহলে তিনি ছিলেন এক বিরাট ক্ষমতাশালী পুরুষ। সার্থক ক্রীড়া-সাংবাদিক, সংগঠক, রেফারী এবং আম্পায়ার হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর অমৃতবাজার পত্রিকার ক্রীড়া-সম্পাদক ছিলেন।

বাংলা : ৩৩০ রান (প্রকাশ পোদ্দার ১১৯ রান। ভগৎ ১১৬ রানে ৪ উইকেট)
ও ২৫৫ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। প্রকাশ পোদ্দার ৬২ এবং দেবু মিত্র ৯০ রান। ভগৎ ৯০ রানে ২ এবং ওগিরাল ৬১ রানে ২ উইকেট)

বিদর্ভ : ১৪৭ রান (নোর্জাফলে ৬৪ রান। সুব্রত গুহ ৬৭ রানে ৫ উইকেট)
ও ১৫৭ রান (৪ উইকেটে। তেজাং ৬৮ রান)

কলকাতায় রঞ্জি স্টেডিয়ামে পূর্বাঞ্চলের রানার্স-আপ বাংলা প্রথম ইনিংসে বিদর্ভ দলের থেকে ১৪০ রান বেশী করার সুবাদে সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

সেমি-ফাইনাল

(১) বোম্বাই বনাম বাংলা
(২) মহারাষ্ট্র বনাম মহীশূর

পশ্চিম ভারত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের পশ্চিম ভারত আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় রুডি হার্টোনো পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'দ্বিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন। রুডি হার্টোনো উপর্যুপরি তিনবার অল-ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়ে বর্তমানে বিশ্বের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন।

এখানে উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস ফাইনালে শুধু ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড়রাই খেলেছিলেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—১১ ও ১৫—১২ পয়েন্টে স্বদেশের মুলজাদিকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : রুডি হার্টোনো এবং গুনলন (ইন্দোনেশিয়া) ১৮—১৩ ও ১৫—১২ পয়েন্টে মুলজাদি এবং সুমিরতকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

আগা খাঁ কাপ

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতার হীরক জয়ন্তী বর্ষের ফাইনালে দিল্লীর ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস দল ২—০ গোলে বোম্বাইয়ের, ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে পরাজিত করে তাদের প্রতিযোগিতায় যোগদানের প্রথম বছরেই আগা খাঁ কাপ জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে। প্রথমার্ধের খেলায় তারা ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। প্রতিযোগিতায় রোজ পদক পেয়েছে নর্দার্ন রেলওয়ে।

সেমি-ফাইনালে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস দল ২—০ গোলে নর্দার্ন রেলওয়ে দলকে এবং ইণ্ডিয়ান নেভী দল ১—০ গোলে ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টকে পরাজিত করে।

হকি লীগ

কলকাতায় ১৯৭১ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় গত বছরের ৩য় স্থান অধিকারী ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন ১৪টা খেলায় ২৬ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে বর্তমানে লীগ তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে আছে। তারা উপর্যুপরি ১২টি খেলায় জয়লাভের পর রাজস্থান এবং বি এন আর দলের সঙ্গে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা ড্র করে দুটো পয়েন্ট নষ্ট করে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব ১২টা খেলায় ২৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা কাস্টমসের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র করেছে। গত বছরের রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের ১২টা খেলায় ২০ পয়েন্ট পেয়েছে। তারা দুটো খেলা ড্র করেছে—কাস্টমস এবং রাজস্থান, উভয় দলেরই সঙ্গে গোলশূন্যভাবে এবং একটা খেলায় হেরেছে, মোহন-

বাগানের কাছে ০-১ গোলে। বর্তমানে ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসো-সিয়েশন, মোহনবাগান এবং বি এন রেল দল লীগের খেলায় অপরাজিত আছে।

এক ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরী

সরকারী টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসে ভারতবর্ষের পক্ষে এবং বিপক্ষে যাঁরা ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন তাঁদের নাম (সেই সঙ্গে রান সংখ্যা, স্থান, বছর) নীচের তালিকায় দেওয়া হল।

ভারতবর্ষের পক্ষে এই ডাবল সেঞ্চুরীর সংখ্যা ৬টি—নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৪টি, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে একটি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে একটি। ভারতবর্ষের এই ৬টি ডাবল সেঞ্চুরীর মধ্যে ৫টি স্বদেশের মাটিতে এবং একটি বিদেশের মাটিতে (কিংস্টন, প্রথম টেস্ট, ১৯৭১)।

অপর দিকে ভারতবর্ষের বিপক্ষে এই ডাবল সেঞ্চুরীর সংখ্যা ৯টি—ইংল্যাণ্ডের ৩টি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩টি, নিউজিল্যাণ্ডের ২টি এবং অস্ট্রেলিয়ার ১টি। ভারতবর্ষের বিপক্ষে যে ৯টি ডাবল সেঞ্চুরী হয়েছে তার দুটি ভারতবর্ষের মাটিতে।

ভারতবর্ষ বনাম বিভিন্ন দেশের টেস্ট খেলার এক ইনিংসে এ পর্যন্ত যে ১৫টি ডাবল সেঞ্চুরী হয়েছে তার ৮টি বিদেশের মাটিতে এবং ৭টি ভারতবর্ষের মাটিতে (ভারতবর্ষের ৫টি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটি এবং নিউজিল্যাণ্ডের একটি)।

এখানে উল্লেখ্য, ভারতবর্ষ বনাম বিভিন্ন দেশের টেস্ট খেলার এক ইনিংসে ভারতবর্ষের ভিনু মানকাদ এবং দিলীপ সরদেশাই ছাড়া অপর কোন খেলোয়াড় দুবার করে ডাবল সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন নি। ভিনু মানকাদের ডাবল সেঞ্চুরী : ২২৩ রান (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, বোম্বাই, ১৯৫৫-৫৬) এবং ২৩১ রান (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬); দিলীপ সরদেশাইয়ের ডাবল সেঞ্চুরী : নট-আউট ২০০ রান (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, বোম্বাই, ১৯৬৫) এবং ২১২ রান (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৭১)। ভিনু মানকাদের কৃতিত্ব বিশেষ করে উল্লেখ করার মত এই কারণে যে, তিনি একটি সিরিজে দুবার ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন।

ডাবল সেঞ্চুরীর কান ঘেঁসে গেছেন এমন দুজন হলেন—অস্ট্রেলিয়ার এ এল হ্যাসেট এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গারফিল্ড সোবার্স। ১৯৪৭-৪৮ সালে এডিলেডের ৪র্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৬৭৪ রানের মাথায় শেষ হয় এবং হ্যাসেট ১৯৮ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ১৯৫৮-৫৯ সালে কানপুরের ২য় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সোবার্স তাঁর ১৯৮ রানের মাথায় রান আউট হন।

ভারতবর্ষের পক্ষে ডাবল সেঞ্চুরী

নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে (৪টি) :

২৩১ ভিনু মানকাদ মাদ্রাজ ১৯৫৫-৫৬
২২৩ ভিনু মানকাদ বোম্বাই ১৯৫৫-৫৬
২২৩ পলি উমরিগড় হায়দরাবাদ ১৯৫৫-৫৬
২০০* ডি সরদেশাই বোম্বাই ১৯৬৫

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে (১টি) :

২০৩* নবাব পতৌদি নিউদিল্লী ১৯৬৩-৬৪

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে (১টি) :

২১২ ডি সরদেশাই কিংস্টন ১৯৭১

ভারতবর্ষের বিপক্ষে ডাবল সেঞ্চুরী

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে (৩টি) :

২৪৬* জিওফ বয়কট লিডস ১৯৬৭
২১৭* ওয়াল্টার হ্যামণ্ড ওভাল ১৯৩৬
২০৫* জে হার্ডস্টাফ লর্ডস ১৯৪৬

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে (৩টি) :

২৫৬ রোহন কানহাই কলকাতা ১৯৫৮-৫৯
২০৭ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল কিংস্টন ১৯৫২-৫৩
২০৭ এভার্টন উইকস ত্রিনিদাদ ১৯৫২-৫৩

নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে (২টি) :

২৩০* বি সাটক্লিফ দিল্লী ১৯৫৫-৫৬
২০৯ জি ডাউলিং ক্রাইস্ট চার্চ ১৯৬৮

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে (১টি) :

২০১ ডি জি ব্র্যাডম্যান এডিলেড ১৯৪৭-৪৮

টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরী

(বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের পক্ষে)

অস্ট্রেলিয়া : ২১১ রান—উইলিয়াম এল মার্ডক (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ওভাল, ১৮৮৪)।

ইংল্যাণ্ড : ২৮৭ রান—আর ই ফস্টার (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, সিডনি ১৯০৩-৪)।

দক্ষিণ আফ্রিকা : ২০৪ রান—জি এ ফকনার (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ন, ১৯১০-১১)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২০৯ রান—সি এ রোচ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, জর্জটাউন, ১৯২৯-৩০)।

নিউজিল্যাণ্ড : ২০৬ রান—এম পি ডোনেলী (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লর্ডস, ১৯৪৯)।

ভারতবর্ষ : ২২৩ রান—পলি উমরিগড় (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, হায়দরাবাদ ১৯৫৫-৫৬)।

পাকিস্তান : ২০৯ রান—ইমতিয়াজ আমেদ (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, লাহোর, ১৯৫৫-৫৬)।

দ্রষ্টব্য : ইংল্যাণ্ডের আর ই ফস্টার তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে ডাবল সেঞ্চুরী (২৮৭ রান) করেন।

ফলো-অন

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলায় এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ৬ বার এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একবার 'ফলো-অন' করেছে। ভারতবর্ষ ৬ বার 'ফলো-অন' করে ৪ বার পরাজিত হয়েছে এবং ২ বার খেলা ড্র করেছে। অপর দিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র একবার 'ফলো-অন' করে খেলা ড্র রাখে।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৫৮-৫৯ সালে মাদ্রাজের ৪র্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষকে 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষ খেলা ড্র করতেও পারে নি, ২৯৫ রানে হেরেছিল।

টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে প্রথম 'ফলো-অন' করে অস্ট্রেলিয়া (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ওভাল, ১৮৮০)। অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ১৪৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৭১ রানের পিছনে পড়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে।

১৯৩৮ সালে ওভাল মাঠে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৯০৩ রানের (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) উত্তরে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসের খেলায় ২০১ রান তুলে ৭০২ রানের ব্যবধানে 'ফলো-অন' করে। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ৭০২ রানের ব্যবধানে 'ফলো-অন' সর্বাধিক রানের ব্যবধানে 'ফলো-অন' করার নজির হিসাবে আজও বিশ্বরেকর্ড হয়ে আছে।

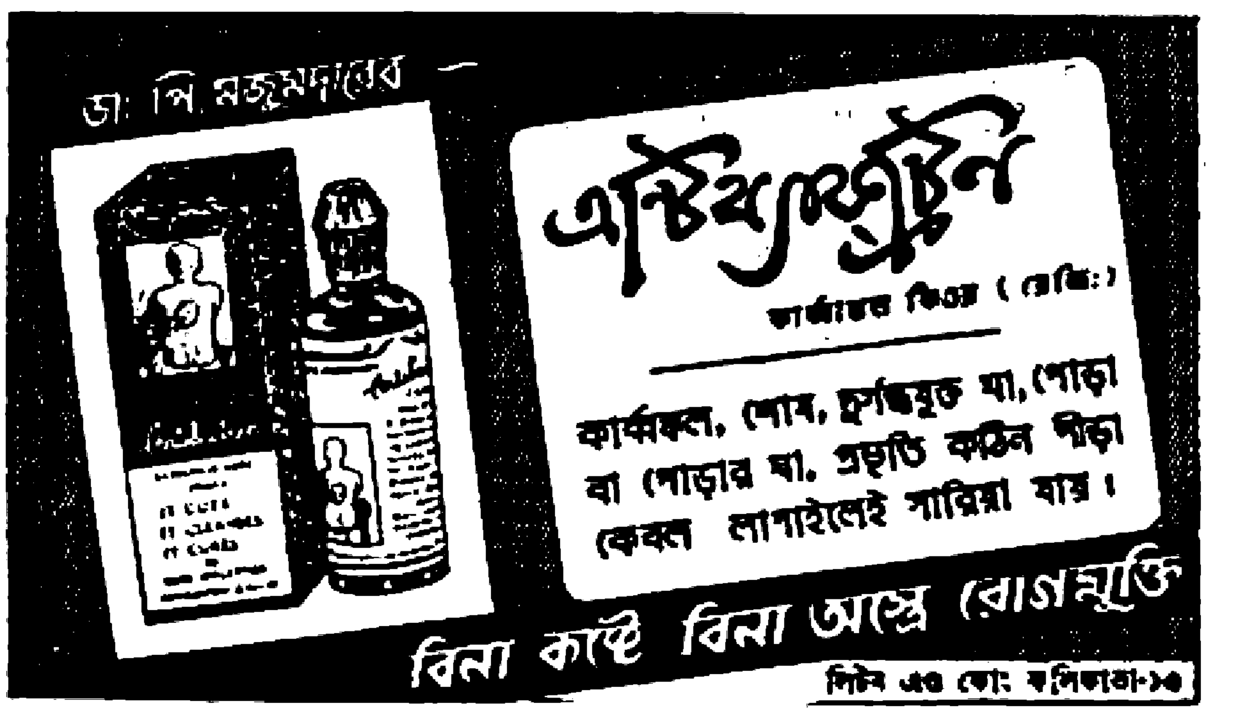

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১৯, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

বিভূতি রচনাবলী

৬ষ্ঠ খণ্ড ও ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।
গ্রাহকগণ সত্বর সংগ্রহ করুন।

।। যে সমস্ত গ্রাহকগণ এখনও প্রথম তিন খণ্ড রচনাবলী সংগ্রহ করেন নাই, তাঁহারা অবিলম্বে তিন খণ্ড রচনাবলী সংগ্রহ করুন। কারণ তিন খণ্ডই নিঃশেষিত প্রায় ।।

প্রতি খণ্ড ১৫৲ টাকা ।। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র

শংকর-এর
সীমাবদ্ধ

নতুন উপন্যাস
তৃতীয় মুদ্রণ নিঃশেষ
দাম : ৬৲ টাকা

।। সদ্য প্রকাশিত ।।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
এবার ফেরাও ৫৲

লীলা মজুমদারের
সাম্প্রতিকতম উপন্যাস
পাখী ৫.৫০

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের
এক অসাধারণ রচনা
জঙ্গলে জঙ্গলে ৫৲

বাংলা পকেট বই-এর প্রথম পর্যায়ে সাতখানি উপন্যাস-এর প্রচ্ছদ নমুনা দেওয়া হলো। প্রতিটির মূল্য ২৲ টাকা। আগামী ৩০শে মার্চ সবগুলি এক সাথে প্রকাশিত হচ্ছে। সাতখানি বই-এর ভি. পি. ডাকব্যয় ২ টাঃ ২০ পয়সা।

বাংলা পকেট বই

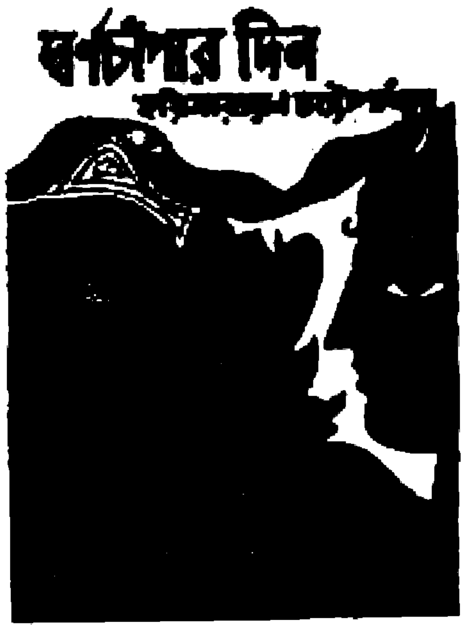

সাধারণ পাঠকগণকে জানাচ্ছি যে পকেট বইগুলির জন্য নিকটবর্তী স্থানীয় পুস্তকালয়ে অথবা আপনার প্রতিনিধির সংবাদপত্র সরবরাহকারীর মারফৎ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারেন।

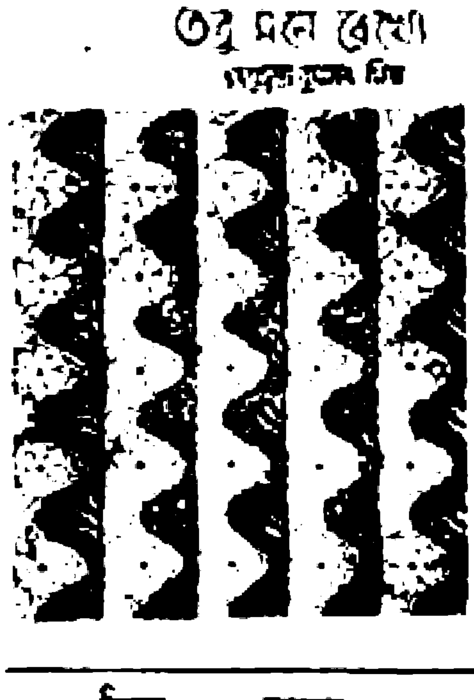

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা : ১২ ফোন : ৩৪৮৭৯১/৩৪৩৪৯২

এইচ-এম-ভি রেকর্ডে জনপ্রিয় শিল্পীদের অবিস্মরণীয় গীতি সংকলন

৪৫ আর-পি-এম ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড

আধুনিক গান

অধীর বাগচী
চাঁদ বিনা সারাদিন
যখনই গানের মুখ

কমলেন্দু মাইতি
আমার পথের শেষে
আমি এইটুকু মন

অরুণ দত্ত
ও আমার কৃষ্ণকলি
লুকাতে সে চায় প্রেম

আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়
তার ক্ষণে ক্ষণে
আমার মনের মালতীলতা

কৃষ্ণা রায়
যাস না একেলা সখী
ইচ্ছে করছে খোঁপাটা খুলবো

গীতা মুখোপাধ্যায়
আমার ফাগুন রাতের গান
তোমার বাঁশীর শপথ লাগে

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
উর্বশী ঊর্মিলা
মনে হয় দু'টি চোখ

মীরা সমাদ্দার
এ-বি-সি, ক-খ-গ
মন এক রঙিন ফুল

মৃণাল চক্রবর্তী
সে এক পাহাড়ী
যতই করো পালিশপালাক

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়
আমি শবরী আঁখি
মালিনীর মালা তো

কৌতুক নক্সা

সুশীল চক্রবর্তী
স্বপ্নে সিরাজদ্দৌলা
'রেস্টুরেন্ট'

লোকগীতি

ললিতা ধর চৌধুরী
আমি দিলাম কাঁদিয়া
মেঘ করিলে ময়ূর নাচে

সুবোধ রায়
গুণের ননদ লো
ও গাড়িয়াল ভাই

ধর্মমূলক সংগীত

সনৎ সিংহ
ভোলাবেন নয় তো মায়ের
শ্যামা শ্যাম শিব রাম নাম

নজরুল গীতি

পিন্টু ভট্টাচার্য
শাঙন রাতে যদি
জাগো জাগোরে মুসাফির

রবীন্দ্র সংগীত

শৈলেন মুখোপাধ্যায়
এসেছি গো এসেছি
এলেম নতুন দেশে

সুপর্ণা চৌধুরী
কোন্ সে ঝড়ের ভুল
দিন অবসান হল

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
দিনের শেষে ঘুমের দেশে

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানসমূহের সভ্য)
কলিকাতা · বোম্বাই · দিল্লী · মাদ্রাজ · গৌহাটি · কানপুর

GC 6143

CENTRAL LIBRARY

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৬শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 19th March, 1971. শুক্রবার, ৫ই চৈত্র, ১৩৭৭ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪৮৪	চিঠিপত্র		
৪৮৭	সম্পাদকীয়		
৪৮৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৪৯১	এ শহর	(কবিতা)	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৪৯০	রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী		—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৯৯	পাথের	(গল্প)	—শ্রীমিহির আচার্য
৫০৪	নাইপুর্ণিক বিস্মরেলা		—শ্রীদেবব্রত ঘোষ
৫০৬	অন্তরে অন্তরে	(বড় গল্প)	—শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
৫১৪	জয় বাঙলার আলোয় : পদ্মা আমার গঙ্গা আমার		—শ্রীসুশীল চৌধুরী
৫১৭	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৫২১	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৫২৩	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২৯	খেয়াল গানে খ্যারী ও কস্তরার ভাষা		—শ্রীশক্তি দাশগুপ্ত
৫৩১	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৫৩৫	একদা নৈমিষারণ্যে		—শ্রীসবিতা সেনগুপ্ত
৫৩৭	পিঞ্জর	(উপন্যাস)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৫৪১	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৫৪৪	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৫৪৫	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৫৪৮	পুর্ণঘাট থেকে ইকেবানা		—শ্রীউমা বসু
৫৫০	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৫৫৩	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৫৫৬	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৫৫৮	বিশ্ব টেবল টেনিস পরিক্রমা		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
৫৫৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

পি. ব্যানার্জীর
অর্শ চিকিৎসা
৩০ পিল টা: ২·৫০
১৬ পুরিয়া চূর্ণ ২·২৫
মলম ৩০ গ্রা: ২·৫০
বিনামূল্যে বিবরণী দেওয়া হয়
পি. ব্যানার্জী
৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫
৫৩, গ্রে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬
১১৪এ. আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

নিবেদন
ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত
আধুনিক চিকিৎসা
পুস্তকের ২য় সংস্করণ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়াছে এবং বহুল পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। সেই ৩য় সংস্করণের মূল্য ছয় টাকা ও শোভন সংস্করণের জন্য আট টাকা নির্ধারিত হইয়াছে।
পুস্তকের পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া অর্ডার বুক করিলে পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পরেই আমরা রেজিস্ট্রী ডাকে প্রেরণ করিয়া দিব। কোন ডাক খরচা লাগিবে না।

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

'খেলার কথা' প্রসঙ্গে

আমি 'অমৃতের' এক নিয়মিত পাঠক। গত ১০ম বর্ষ, ৪৮ খণ্ড, ৪০শ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে 'খেলার কথা প্রসঙ্গে' শিরোনামায় শেখ নজরুল ইসলামের (ধর্মোসিমলা, হাওড়া) লেখা পত্রটি পড়লাম। পত্রলেখকের বক্তব্য সমর্থন করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

পত্রলেখক ২১শে মাঘের 'অমৃতে' প্রকাশিত অজয় বসুর 'আর এক কঠিন পরীক্ষা' শীর্ষক রচনাটিকে ঘিরেই তাঁর বক্তব্যের জাল বুনেছেন। উনি লিখেছেন বর্তমান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফররত ভারতীয় দলে সারদেশাইয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘিরে অজয়বাবুর বক্তব্য যে সত্য নয় তা সরদেশাই সার্বিনা পার্কেই প্রমাণ করেছেন। হ্যাঁ, প্রমাণ সরদেশাই নিশ্চয়ই করেছেন; কিন্তু শেখ সাহেব বোধহয় অজয়বাবুর মতামতটাকে সম্পূর্ণই ভুলে গিয়েছেন। অজয়বাবু লিখেছিলেন নির্বাচনী খেলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় যাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরাই দলে ঠাঁই পেয়েছেন। সরদেশাই সেরকম কিছু না করেই দলে নির্বাচিত হয়েছেন। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়ে আজ সরদেশাই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখালেও এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর ঘোষিত নীতির পথ ধরে দলে আসেন নি। নিজের রচনায় অজয়বাবু সেই কথাটাই বলতে চেয়েছেন, তার বেশী কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত, পত্রের শেষ-অংশে পত্রলেখক পাতৌদির নেতৃত্ব সম্পর্কে দুটি পরস্পর বিরোধী মন্তব্য পড়ে (যা অমৃতেই দুটি রচনায় প্রকাশিত হয়েছিল) সংশয়ান্বিত হয়েছেন। তাঁর সংশয় মুক্তির স্বপক্ষে বলতে পারি যে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচকমণ্ডলী পাতৌদিকে নেতৃপদ থেকে সরিয়ে ভালই করেছেন। তাঁরা এবারের সফরের দল নির্বাচনের সময় একটা অনিবার্য সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তা হল দলকে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা পাতৌদির নেই। শেখ সাহেব প্রশ্ন তুলেছেন পাতৌদি সত্যিই কি জন্মসূত্রেই দল পরিচালনার অধিকার লাভ করেছিলেন? উত্তরে বলতে পারি হ্যাঁ, এক রকম তাই। কারণ ১৯৬২ সালে তিনি যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হন তখন মাত্র তিনটি টেস্টে অংশগ্রহণ করা ছাড়া তাঁর অভিজ্ঞতার সম্বল বলতে আর কিছুই নেই। ঠিক এই রকম একটা অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়ে পাতৌদি প্রথম দুটি টেস্টে খেলার সুযোগই পান নি। কন্ট্রাক্টর-এর আঘাত লাগায়, বার্বাডোজের তৃতীয় টেস্টে তিনি নেতৃত্বের সুযোগ পান। আর সেই থেকেই গত আট বছর ধরে তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, সেই আট বছর আগের মত আজও আমরা তাঁর পরিচালন দক্ষতাকে ঘিরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

শেখ সাহেব লিখেছেন, অজয়বাবুর রচনায় আছে যে, পাতৌদির সময় দলের অনেককেই সিরিয়াস মনে হত না। কথাটা মিথ্যে নয়। সতীর্থদের প্রতি হাল্কা মেজাজের সুযোগ নিয়েই ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর দলের খেলোয়াড়রা লাগাম ছিঁড়তে চেয়েছিলেন। নির্বাচকমণ্ডলী সেকথা বুঝেছিলেন। এও বুঝেছিলেন যে, পাতৌদির অধিনায়ক হবার যোগ্যতার কোন মূল্যায়ন না করেই আট বছর আগে তাঁকে অধিনায়কের মত একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে বসান হয়েছিল। আর দায়িত্ব পালনে তাঁর ব্যর্থতাই তাঁকে অপসারণের কারণ।

তাপসেন্দ্রনাথ বোস।
কলিকাতা।

(২)

অমৃতের ২০শে ফাল্গুনের সংখ্যায় শেখ নজরুল ইসলামের লেখা পত্রটি পড়ে একাধিক কারণে বিচলিত হয়েছি। প্রথমেই বলে রাখি অমৃতে প্রকাশিত খেলাধুলো সম্পর্কিত আলোচনা এবং খেলার সংবাদ অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ি। অমৃতের পরপর দুটি সংখ্যায় শঙ্করবিজয় মিত্রের 'এ নহে মধুর খেলা' এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক, সমালোচক, বেতার ভাষ্যকার অজয় বসুর 'আর এক কঠিন পরীক্ষা' বেশ ভালভাবেই পড়েছি। দুটি ভিন্ন স্বাদের লেখা। এবং দুটি নিবন্ধের চেহারা চরিত্র সহজেই বুঝতে পারা যায়। প্রথম আলোচনাটিতে পতৌদির খেলোয়াড় জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ, দ্বিতীয় আলোচনায় ভারতীয় দলের তৃতীয় পর্বের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দল গঠনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বর্তমান ক্রীড়া দক্ষতা, অধিনায়ক ওয়াদেকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এবং সবশেষে অধিনায়ক পদ থেকে পতৌদির অবতরণ। সত্যি বলতে কী এই শেষোক্ত নিবন্ধটিতে একটুকু খাদ নেই। অথচ পত্র লেখক পতৌদিকে দলে রাখবার জন্য অযথা বাকবিতণ্ডা করেছেন এবং সবশেষে তিনি শেষোক্ত নিবন্ধটির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সেই সন্দেহের জের টেনেই বলি, অধিনায়ক পতৌদির টেস্ট ক্রিকেটের শুভ আবির্ভাবটি ছিল একই সঙ্গে স্মরণীয় ও বরণীয়। সেই ১৯৬১-৬২ সালে বারবাডোজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে খেলার সময় নরী কন্ট্রাক্টর চার্লি গ্রিফিথের বলে আহত হবার পর অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে তাঁরই উপর। সেই সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে আর এক নতুন ইতিহাস লেখা হল—পৃথিবীর টেস্ট ক্রিকেট আসরে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক পতৌদির নবাব বা মনসুর আলি খাঁ। এবং অধিনায়ক জীবনের শুরুতে ভারতীয় দলের পরাজয় ঘটেছিল দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। টেস্ট ক্রিকেট আবির্ভাবের শুরুতে ফিল্ডিং ব্যাটিংয়ে ব্যক্তিগতভাবে ক্রীড়াদক্ষতা তুলে ধরলেও সমগ্র দলকে কি স্বদেশে কি বিদেশে কোনদিনই লোকচক্ষে তুলে ধরতে পারেননি। ওঁর অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল কোনো বড় দলের বিরুদ্ধেই রাবার জয়ী হওয়া তো বহু দূরের কথা—এমনি জয়ও সম্ভব হয়নি। এমনকি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রাবারের সম্মান হাতছাড়া হয়েছে ওঁরই অধিনায়কত্বে। সরকারী টেস্ট আসরে স্বদেশ এবং বিদেশের মাটিতে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পরাজয় ঘটেছে ভারতীয় দলের। বেসরকারী টেস্ট ক্রিকেটে ভারত হেরেছে দুর্বল সিংহলের বিরুদ্ধে। কৃতিত্ব বলতে শুধু বা বিদেশের মাটিতে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ জয়ের সূত্রে ভারতীয় দলের রাবার জয়। পতৌদির অধিনায়কত্বে বড় বড় জয় বলতে দুটি। সে দুটিই হল অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

ওঁকে দক্ষ ফিল্ডার হিসেবে আমরা চিনি অথবা জানি। কিন্তু আজ সেখানেও ভাটা পড়েছে। গত ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্টে বহুবার ওঁর ফিল্ডিং এর গলদ ধরা পড়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর নিপুণ হাতের ব্যাটিং কৌশল লক্ষ্য করা গেলেও—চরিত্রে দায়িত্বজ্ঞান ফুটে ওঠেনি।

তাছাড়া তাঁর আমলে দলের যাঁদের সিরিয়াস বলে মনে হয়নি আজ ওয়াদেকারের নেতৃত্বে সেইসব খেলোয়াড়দের অধিক সিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে। এবারকার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দল যে কটি ম্যাচ খেলেছেন কিংবা খেলবেন ফলাফল দেখে সে কথাটাই তো বারবার প্রমাণ

চিঠিপত্র

পাচ্ছে। নবনায়ক অজিত ওয়াদেকারের সুযোগ্য নেতৃত্বে গতবারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড সফরের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভারতীয় ক্রিকেটের এই সবুজ বিপ্লবের দিনে মুছে দেবার সময় এসেছে।

অমরনাথ বসু,
হাওড়া—৩।

নিকটেই আছে প্রসঙ্গে

আমি অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। সত্যি কথা বলতে কি এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি আমার কাছে সত্যিকারের অমৃতের স্বাদই বয়ে আনে। দীর্ঘকাল অমৃতের পাতায় প্রকাশিত সন্দিপ্তর লেখা 'নিকটেই আছে' পড়ে আসছি। শ্রদ্ধেয় লেখকের লেখা পড়ে আমি অভিভূত হয়েছি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আনাচে কানাচে যারা কপট পরিচয়ের আড়ালে স্বরূপ লুকিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের নানাভাবে শোষণ করে চলেছে, লেখক তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এইজন্য লেখককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

বসন্তরঞ্জন মল্লিক
ধনিয়াখালী, হুগলী।

(২)

'নিকটেই আছে' প্রসঙ্গে অধ্যাপক মৈত্রের যে পত্র প্রকাশিত হয়েছে তা পড়লাম। অধ্যাপক মৈত্র যে ছবি তুলে ধরেছেন তা সন্দিপ্তর রচনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সম্বন্ধে সন্দিপ্তর কোন বক্তব্য দেখলে খুশী হব।

'নিকটেই আছে' বিভাগ আমার খুবই ভাল লাগে। সমাজের যেসব দিক আমরা জানি না তারই ছবি তুলে ধরা হয়। কিন্তু পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জনের জন্য রঙ ফলিয়ে যদি এমন তথ্য প্রকাশ করা হয়, বাস্তবের ছবির সঙ্গে যার আকাশপাতাল তফাৎ, এবং সেটা অমৃতের মত জনপ্রিয় পত্রিকায়, তা হোলে আমাদের বলার কিছুই নেই।

অধ্যাপক মৈত্র লিখেছেন অধ্যাপকদের খেতে পরতে দেবার মত মাইনে দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে তিনি প্রকৃত অবস্থার বিবরণও দিয়েছেন।

সরকার এ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রতিকার কিছু করবেন কি? আদর্শ শিক্ষাধারার পরিষ্কার ছবি বলতে অধ্যাপক মৈত্রের কি ধারণা জানবার আগ্রহ রইল।

রমা চৌধুরী,
কলকাতা—১৯

'তোমাকে' প্রসঙ্গে

সুপ্রচারিত বাংলা পত্রিকা 'অমৃত'-এর আমি একজন নিয়মিত এবং উৎসাহী পাঠক। সম্প্রতি শ্রীনিমাই ভট্টাচার্যের 'তোমাকে' উপন্যাসটি আমাকে এই পত্রিকাটি পড়তে আরও উৎসাহী করে তুলেছে। উপন্যাসটির সহজ, সরল ভাষা সত্যিই আকর্ষণীয়। তাছাড়া উপন্যাসটির প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। লেখকের কয়েকটি প্রাকৃতিক বর্ণনাও মনে সাড়া জাগায়।

লেখকের এই উপন্যাসটি আমাকে এবং হয়তো আমার মতো আরও পাঠকবর্গকে আনন্দ দিচ্ছে, এইজন্য লেখককে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। 'অমৃত' পত্রিকা এই ধরনের সুন্দর উপন্যাসের দ্বারা পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে পারছেন বলে অমৃতের সম্পাদক মহাশয়কেও জানাই আমার ধন্যবাদ।

মানিক গুপ্ত
গৌহাটি—১।

এই আমাদের দেশ প্রসঙ্গে

গত ১০ই ফাল্গুনের অমৃতের চিঠি-পত্র বিভাগে 'এই আমাদের দেশ' সম্পর্কে সমালোচনাটি পড়লাম। সেখানে শ্রীফণী পাল লিখেছেন, 'ভোমকোমার চোখে উত্তর-বঙ্গ' বইয়ে তিনি প্রচুর ভুল ঐতিহাসিক তথ্য দেখেছেন। এমন কি বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনী ভ্রমণ্যাণী বীকের (গৌড় পর্বেও) প্রচুর ভুল তথ্য তাঁর চোখে পড়েছে। ঐতি-হাসিক ভ্রমণকাহিনীতে এ রকম ভুল তথ্যের পরিবেশন তিনি পীড়াদায়ক ও ক্ষতিকর বলেছেন এবং সর্বশেষে তিনি এর প্রতিকার চেয়েছেন।

কিন্তু কোন তথ্যটির মধ্যে তিনি ভুল পেয়েছেন তা উল্লেখ করেন নি। তা পরি-ষ্কারভাবে উল্লেখ না করলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা বুঝবে কি করে? পত্রলেখককে এ-বিষয়টি সম্বন্ধে বিশদভাবে জানাবার অনু-রোধ করি।

সুনীলকুমার সাহা
কালিয়াগঞ্জ
পশ্চিম দিনাজপুর

উত্তর বাংলার 'প্রান্তরেখা' প্রসঙ্গে

উত্তরবাংলায় সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা কম। শিলিগুড়ি থেকে কিন্নর, অনুবীক্ষণ, জয়জয়ন্তী, বুদ্বুদ মিনি পত্রিকা বেরুচ্ছে। মিনি পত্রিকার আলোড়ন কেটে গেছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি থেকে রতন বিশ্বাস ও তাপস গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রান্তরেখা পড়লুম। অনেকদিন পরে এ অঞ্চলে সাহিত্যসেবার একটি নতুন অধ্যায় সূচনা হল। ভালো লাগল নতুন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর। কবিতাগুচ্ছে রতন বিশ্বাস, প্রণয় কুণ্ডু, শিবচন্দ্র লাহিড়ী, রণজিৎ দেব এবং গল্পাংশে চোমংলামা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখেন। ছাপার ব্যাপারে কিছু ভুল রয়েছে। উত্তরবাংলায় আরো এ ধরনের পত্রপত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার ঔপন্যাসিক গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করুক—এই কামনা।

তপন কর, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

অমৃতকে

আমি বিখ্যাত এবং সুধীসমাজে প্রচলিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক। বেশ কিছু রসালো গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি এর মাধ্যমে পেয়ে থাকি। আর জানতে পারি অজানাকে।

'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে'র লেখক শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। প্রতি সপ্তাহে যখন অমৃত হাতে পাই, তখন প্রথমেই আমার আগ্রহ হয় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি পড়ার জন্য। এমন সুন্দর উপন্যাস, যে বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। উক্ত উপন্যাসে অন্য সব-গুলির চরিত্র এমনিতেই ভালভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তবে সোনার চরিত্রটা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সত্যই উপন্যাসটি সার্থক। 'এই আমাদের দেশের' নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে থাকবেন। (১০ম বর্ষ ৩য় খণ্ড, ২৯ সংখ্যা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ) প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন মুর্শিদা-বাদ পড়ে এবং হাজারদুয়ারী, কাঠগোলার রাজবাড়ী, কাটরার মসজিদ ছবিগুলির ব্লক এত স্পষ্ট হয়েছে দেখে আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

প্রণবকুমার পাল,
শ্রীরামপুর, হুগলী।

বিজয়িনী ইন্দিরা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

অপূর্ব বিজয়

ভারতের পঞ্চম নির্বাচনে জনসাধারণ অভূতপূর্বভাবে সমর্থন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দলকে। কংগ্রেসের একাংশ সিণ্ডিকেটের আওতায় বেরিয়ে যাবার পর যে নতুন কংগ্রেস অনেক শক্তিশালী, গতিশীল এবং জনতার কাছাকাছি এসেছে এবারের নির্বাচন তার প্রমাণ দিয়েছে অভ্রান্তভাবে। লোকসভায় এমন অভূতপূর্ব বিজয় নিঃসন্দেহে বলে দিয়েছে যে, দেশ শ্রীমতী গান্ধীর নীতিতেই এগোতে চায়। যারা কংগ্রেসের নাম করে পাল্টা একটা সংস্থা খাড়া করে রেখেছে তাঁদের প্রতি জনসাধারণের কোনো সমর্থন যে নেই তার প্রমাণও পাওয়া গেল সুনিশ্চিতভাবেই।

পরাজিত, হতাশ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট কোনো কোনো নেতা এবং রাজনৈতিক মহল একে ব্যক্তিপূজার জয় বলে যতই অভিহিত করুক না কেন, একথা আজ আর কেউ বিশ্বাস করবেন না যে, ভারতের জনসাধারণের কোনো রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি নেই। কোন পথ দেশের পক্ষে কল্যাণকর এবং কোন পথ সর্বনাশা তা বোঝবার ক্ষমতা জনসাধারণের যথেষ্টই আছে। সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণ আশাতীতভাবে শ্রীমতী গান্ধীকে সমর্থন জানিয়ে একথাও বলে দিল যে, এবার তিনি নির্ভয়ে এবং দ্রুতগতিতে সমাজ পরিবর্তনের কর্মসূচী কার্যে রূপায়িত করুন। জনসাধারণের কাছে তিনি আবেদন নিয়ে এসেছিলেন, জনসাধারণ সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন।

অনেক পশ্চিমী পর্যবেক্ষক কংগ্রেসের ভাঙনের পর এমন উক্তি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে আর জাতীয় দল বলে কোনো দলের কর্তৃত্ব থাকবে না। এখন বিভিন্ন রাজ্যগুলো নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য কেন্দ্রকে চাপ দেবে এবং দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবী মানতে গিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হবে। কার্যত দেখা গেল সমস্ত ভবিষ্যৎবক্তাদের ব্যর্থ প্রমাণিত করে ভারতের গণতন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধীকে ক্ষমতা থেকে হঠাবার জন্য সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র, জনসংঘ, এস এস পি (এরা নাকি সমাজতন্ত্র চায়) মহাজোট বেঁধেছিল। এদের একমাত্র শ্লোগান ছিল ইন্দিরা হঠাও। ইন্দিরাকে সরাতে পারলেই তাঁরা দেশে সমাজতন্ত্র আনবেন। শুধু এই মহিলার জনাই তাঁরা এতদিন সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারেন নি। শ্রীমতী গান্ধী বললেন, আমি কাউকে হঠাতে চাই না শুধু গরীবী বা দারিদ্র্য হঠাতে চাই। যাদের জন্য ভারতের মানুষের এত দুঃখ ও দারিদ্র্য তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। এজন্য তিনি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছেন এবং প্রাক্তন রাজাদের হাতী-পোষার খরচ দিতে অসম্মত হয়েছিলেন। এ তো যে কোনো যুক্তিবাদী মানুষই সমর্থন করবেন। কিন্তু মহাজোটের শরিকরা এতে খাপ্পা হয়ে উঠলেন। তাঁরা চাইলেন এক রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী শক্তির জাগরণ যার দ্বারা শ্রীমতী ইন্দিরা এবং তাঁর সমর্থনকারী সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে তাঁরা দমন করতে পারেন।

জনতা নিঃশব্দে এবং নির্দ্বিধায় তাঁদের ভোটের অস্ত্র প্রয়োগ করে শ্রীমতী ইন্দিরাকে এই ষড়যন্ত্রকারীদের আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। আসলে ভারতের সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পক্ষেই এই ভোট। এই জয় কোনো ব্যক্তির নয়, কোনো দলের নয়। এই জয় একটি আদর্শের এবং একটি কর্মসূচীর। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে তাঁর দল যে প্রতিশ্রুতি ও কর্মসূচী দেশের সামনে রেখেছেন তার প্রতিই অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন জনসাধারণ। এবারের লোকসভায় বিরোধীদলের কেবল শক্তিহ্রাসই হয় নি, তাঁদের রথী-মহারথীরা ভগ্নউরু, ছিন্নপতাকা। যে যত বেশী সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে, জনতা যেন তাঁকেই শাস্তি দিয়েছেন বেশী। জনতার অভয়হস্ত তাঁদেরই রক্ষা করবে, যাঁরা সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করবেন, লড়াই করবেন। এবারের সাধারণ নির্বাচনের এটাই হল রায়।

এখন শ্রীমতী গান্ধীর কাজ যেমন সহজ হল, অন্যদিকে তাঁর দায়িত্ব হল দুরূহতর। ভারতের সামাজিক অনগ্রসরতার জন্য দায়ী সমস্ত বাধাকে অবিলম্বে অপসারিত করতে হবে। দরকার হলে সংবিধান সংশোধন করে জনতার বুকের ওপর থেকে শোষণের জগদ্দল পাথর করতে হবে অপসারিত। এই হল এখনকার কাজ। শ্রীমতী গান্ধীর এই অভূতপূর্ব বিজয়ের তাৎপর্য হল এই। শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা ভারতের জন সাধারণকেই অভিনন্দিত করছি।

দেশে বিদেশে

কেউ বললেন, যাঁড় পুজোরই জয় হল। কেউ বললেন, আর কিছু নয়, টাকার খেলা। আবার কেউ বললেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জুয়া খেলে জিতে গেছেন। আর শ্রীমতী গান্ধী নিজে বললেন, 'আপনারা বিস্মিত হতে পারেন; কিন্তু আমি নিজে বিস্মিত হই নি।'

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ব্যালট বাকস খোলার পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, এই নির্বাচনে ধস নেমেছে এবং সেই ধস শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দল শাসক কংগ্রেসের পক্ষে। এই ধসের মুখে ভেসে গেছে 'ইন্দিরা হটাও' মহাজোটের শরিকদের ও দলের বাঘা বাঘা নেতারা। সদোবা পাতিল, নীলম্ সঞ্জীব রেড্ডী, ডাঃ রামসুভগ সিং, রাজনারায়ণ, মধু লিমায়ে, মিনু মাসানি, বলরাজ মাধোক সবাই পরাজিতের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ, সুচেতা কৃপালনী, সুশীলা নায়ার, শারদা মুখার্জি প্রভৃতি বেশ মহিলা তাঁদের বর্ষীয়সী আক্রমণ শ্রীমতী গান্ধীকে বিপর্যস্ত করেছেন তাঁরা পরাজয়ের ধূলিশয্যায় স্থান নিয়েছেন। অপর পক্ষে, ইন্দিরা শিবিরের দুজন মহিলা শ্রীমতী মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী রাজধানী দিল্লীকে জনসংঘের অধিকার থেকে ছিনিয়ে শাসক কংগ্রেসের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছেন। দিল্লীতে লোকসভার সাতটি আসনেই জনসংঘ প্রার্থীরা পিছু হটে গেছেন এবং শাসক কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। শুধু দিল্লীই নয়, দেশের অন্যান্য অংশও শ্রীমতী গান্ধীর দলের জন্য জয়বার্তা একই ধরনের বিজয়বার্তা এনে দিয়েছে। বিরোধী কংগ্রেস সভাপতি ও 'ইন্দিরা হটাও' গোষ্ঠীর একজন পয়লা নম্বর নেতা নিজলিঙ্গাপ্পার নিজের রাজ্য মহীশূর। বিরোধী কংগ্রেস ঐ রাজ্যে ক্ষমতাসীন। সেখান থেকে ২৭টি লোকসভা আসনের সব কটি জিতে নিয়েছে শাসক কংগ্রেস। ইন্দিরা-বিরোধী দলগুলির মন্ত্রিসভা চলছে উত্তর প্রদেশে ও বিহারেও। উত্তর প্রদেশে লোকসভার আসন সংখ্যা ৮২। এই ৮২টি আসনের মধ্যে ৭১টির ফল ১২ মার্চ রাত্রি পর্যন্ত বেরিয়েছে। এর ভিতর ৭২টিই পেয়েছে শাসক কংগ্রেস দল। বিহারে ৫৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৯টি পেয়েছে শাসক কংগ্রেস। আসাম ও মহারাষ্ট্রেও শাসক কংগ্রেসের সাফল্য চমকপ্রদ। আসামে লোকসভার ১৪টি আসনের মধ্যে শাসক কংগ্রেস ১৩টি আসনে প্রার্থী দিয়ে সব কটিই জিতে নিয়েছে। বাকী আসনটিতে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলনের টিকেট নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ছেড়ে-দেওয়া লোকসভার

পশ্চিমবঙ্গ

একনজরে বিধানসভা

মোট আসন : ২৮০ (তিনটি স্থগিতসহ)

ফলাফল ঘোষিত : ২৭৭

১। কংগ্রেস (শাসক)		১০৫
২। ইউ-এন-এফ		১২৩
সি-পি-এম	১১১	
নির্দলীয়	৪	
আর-সি-পি-আই	৩	
মাঃ ফঃ বঃ	২	
ওয়ার্কার্স পার্টি	২	
বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস	১	
৩। ইউ-এল-ডি-এফ		২৫
সি-পি-আই	১৩	
এস-ইউ-সি	৭	
ফরোয়ার্ড ব্লক	৩	
গোর্খা লীগ	২	
৪। গণতান্ত্রিক সংহতি		৬
বাংলা কংগ্রেস	৫	
এস-এস-পি	১	
৫। অন্যান্য		১৮
মুস্লিম লীগ	৭	
পি-এস-পি	৩	
আর-এস-পি	৩	
কংগ্রেস (বিরোধী)	২	
ঝাড়খণ্ড	২	
জনসঙ্ঘ	১	

ডেপুটি স্পীকার অধ্যাপক জি জি সোয়েল। শাসক কংগ্রেস তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয় নি। তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। আসামে শাসক কংগ্রেস যে শুধু জয়ী হয়েছে তাই নয়, যে ৬২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন তাঁদের মধ্যে ৫৫ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। আসামে পরাজিতদের মধ্যে একজন হলেন পি-এস-পির প্রখ্যাত পার্লামেন্টারিয়ান হেম বড়ুয়া। মহারাষ্ট্রে লোকসভার ৪৫টি আসনের মধ্যে ৪৪টির নির্বাচন হয়েছে। (একটিতে একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় নির্বাচন স্থগিত আছে।) এই ৪৪টির মধ্যে ৪৩টিতে লড়াই করে শাসক কংগ্রেস ৪২টিতে জিতেছে। ওদের মাত্র একটি আসন পি এস পির কাছে হারাতে হয়েছে। আর একটি আসনে রিপাবলিকান পার্টির একজন প্রার্থী জিতেছেন শাসক কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে।

পাঞ্জাব থেকে লোকসভার ১৩টি আসনের মধ্যে নয়টি গতবার অবিভক্ত কংগ্রেসের হাতে এসেছিল। এই নয়জনের মধ্যে ছয়জন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবারকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস এই রাজ্য থেকে ১০টি আসন পেয়েছে। দুইটি আসন পেয়েছে সি পি আই। এই দুটিতে শাসক কংগ্রেসের কোন প্রার্থী ছিলেন না। গতবার পাঞ্জাব জনসংঘের একজনকে লোকসভায় পাঠিয়েছিল। এবার সেখান থেকে জনসংঘের সঙ্গর শূন্য। রাজস্থানে প্রাক্তন রাজারা ও শিল্পপতিরা শাসক কংগ্রেসের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছিল। সেখানে ঐ দল ২৩টি আসনের মধ্যে ১৪টি জিতে নিয়েছে। তারা ঐ রাজ্যে মোট প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশী পেয়েছে। চতুর্দল জোট ঐ রাজ্য থেকে সাতটি আসন জিতেছে। তার মধ্যে চারটি পেয়েছে

স্বতন্ত্র দল, তিনটি জনসংঘ। বাকী দুটি গেছে নির্দল প্রার্থীদের কাছে। অন্ধ্রে চতুর্থ কোটের উচ্ছেদ হয়ে গেছে। সেখানে বিরোধী কংগ্রেসের ১২ জন প্রার্থীর একজনও জিততে পারেন নি, হেরে গেছেন স্বতন্ত্র, এস এস পি ও জনসংঘেরও সকল প্রার্থী। যাঁরা হেরেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি লোকসভার প্রাক্তন স্পীকার ও রাষ্ট্রপতির পদে ভি ভি গিরির প্রতিদ্বন্দ্বী সঞ্জীব রেড্ডী এবং স্বতন্ত্র নেতা অধ্যাপক এন জি রঙ্গা। অন্ধ্রে শাসক কংগ্রেসকে যদিও তেলেঙ্গানা অঞ্চলের ১৪টি আসনের মধ্যে ১০টি তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির কাছে হারাতে হয়েছে তাহলেও এই রাজ্যের ৪১টি আসনের মধ্যে ২৮টি লাভ করে তারা লক্ষণীয় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।

লোকসভার নির্বাচনের ভোট গণনা শুরু হওয়ার প্রথম দুই দিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, শাসক কংগ্রেস দল পঞ্চম লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। এই দলের নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা তিন শ ছাড়িয়ে যাওয়ার পর বুঝতে বাকী থাকে না যে, শাসক কংগ্রেস দল লোকসভায় শুধু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নয়, দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে অর্থাৎ অন্য কোন দলের সমর্থনের ভরসায় না থেকে নিজেদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ীই তারা সংবিধান সংশোধন করতে পারবে। ১৯৫৭ সালের পর আবার এইবার লোকসভায় একটি দল প্রায় অবিসম্বাদিত প্রাধান্য বিস্তার করবে, একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১১ মার্চ তারিখে বিজয়িনী ইন্দিরা তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন এই জয় ব্যক্তিবিশেষের জয় নয়, নীতির জয় এবং বিরোধী দলগুলির অপকৌশলের বিরুদ্ধে জয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আভাষ দিয়েছেন যে, সম্পত্তির অধিকার সীমিত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হতে পারে। তবে, সুপ্রীম কোর্টের সংস্কার সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তিনি সাবধানে এড়িয়ে যান।

এই মুহূর্তে জাতির উদ্দেশে তিনি কি বলবেন জানতে চাইলে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, জনসাধারণ যে আস্থা প্রকাশ করেছে তাতে তিনি নিজেকে নম্র বোধ করছেন, কেন না, এর ফলে দায়িত্ব বেড়ে গেল।

শ্রীমতী গান্ধীর বিরোধীদের মধ্যে এযাবৎ পাতিলই সবচেয়ে কুণ্ঠাহীনভাবে এই জয়ের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শ্রীমতী গান্ধী জনসাধারণের প্রচণ্ড আস্থা ও সমর্থন লাভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্য একথাও বলেছেন যে, এই নির্বাচনে যতগুলি বিস্ময়কর ফল হয়েছে পার্লামেন্টারি নির্বাচনের ইতিহাসে এমন আর কখনও হয় নি। নিজলিঙ্গাপ্পা অবশ্য এমন একটা ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, টাকার জোরে এই নির্বাচন লড়া হয়েছে।

এখন এটা অবধারিত হয়ে গেল যে, দিল্লীতে আবার শাসক কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠিত হবে এবং সেই মন্ত্রিসভার প্রধান হবেন এই অভূতপূর্ব জয়ের নির্মাত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এবারকার নির্বাচনী প্রচার অভিযানের প্রায় সবখানি জায়গা জুড়ে ছিলেন নেহরু-তনয়া এই প্রিয়দর্শিনী। জওহরলাল নেহরুও তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতম দিনগুলিতে তাঁর কন্যার মতো এমন দ্রুত বেগে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে তাঁর আদর্শ ও কর্মপন্থার কথা পৌঁছে দিতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। অন্তত মেয়াদের আগেই লোকসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর রায় চাওয়ার সিদ্ধান্তও প্রধানত শ্রীমতী গান্ধীর। যখন তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন তখন তাঁর নিকটতম সহকর্মীদেরও অনেকে নিশ্চিত ছিলেন না যে শাসক কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে লোকসভায় ফিরে আসতে পারবে। তাঁরা কেউ কেউ মনে করেছিলেন, শ্রীমতী গান্ধী একটা জুয়া খেলতে নামছেন। কিন্তু এই প্রথম নয়, গত কয়েক বছরে বার বার ভারতবর্ষের এই অনন্যা নেত্রী প্রচণ্ড ঝুঁকি নেওয়ার আশ্চর্য সাহসিকতা দেখিয়েছেন। কংগ্রেসের কেউ-কেটা নেতাদের সঙ্গে বিবাদ করে তাঁদের সঙ্গত্যাগ করা, রাষ্ট্রপতির পদে ভি ভি গিরিকে সমর্থন করা, মোরারজীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা, এসবই তাঁর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ও জয়ের পথ দেখতে পাওয়ার অভ্রান্ত ক্ষমতার

।। দ্বাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল ।।
শংকর-এর
এপার বাংলা ওপার বাংলা ১০-০০
মানচিত্র রূপ তাপস চৌরঙ্গী
১১শ মুদ্রণ ৬·০০ ৮ম মুদ্রণ ৪·০০ ২২শ মুদ্রণ ১২·৫০

ওঙ্কার গুপ্তের ব্যাপার বহুতর সচিত্র ব্যঙ্গ রচনা ৫·০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন তুলির টান ৮র্থ মুদ্রণ ৭·০০
'নবরাগ' নামে ছায়াচিত্রে দেখান হচ্ছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হসন্তী দাম : ৪·৫০
বিমল মিত্রের এর নাম সংসার ৫ম মুদ্রণ : ৮·৫০ গল্পসম্ভার দাম : ১৬·০০

কুমারেশ ঘোষের এক বর অনেক কনে ১০·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোকপর্ণা ১০·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অযাত্রার জয়যাত্রা ২য় মুদ্রণ ৪·০০ তাজাম ৪·৫০
নিরঞ্জন চক্রবর্তীর শেষ বসন্ত ৮·০০
বনফুলের অধিকলাল ২য় মুদ্রণ ৪·৫০ এক ঝাঁক খঞ্জন ৬·৫০
শৈলেন রায়ের তরাই ১০·০০

দিলীপকুমার রায়ের ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ দাম : ১২·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশিপদ্ম ৮ম মুদ্রণ ৪·৫০

সুভাষ সমাজদারের আবগারী দারোগার ডায়েরী দাম : ৫·০০

জরাসন্ধ-র
স্বীকৃতি দাম : ৫·০০ মসিরেখা ৩য় মুদ্রণ ৯·০০ পাড়ি ১১শ মুদ্রণ ৩·৫০ মহাশ্বেতার ডায়েরী ২য় মুদ্রণ ৪·০০

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯

পরিচয় দেয়। এভাবে শ্রীমতী গান্ধীর বারবার চড়া বাজীতে রাজনীতির খেলায় নামার অভ্যাস ও সেই বাজী জেতার ক্ষমতা দেখে তাঁর শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে অনেকেই দুর্বোধ্য বিস্ময়ে চমকিত হয়েছেন। কেউ তাঁকে বলেছেন, দুর্গাস্বরূপা, কেউ মনে করেন, তিনি অবিশ্বাস্যরকমই অংশ, আবার কেউ বলেন, মহাকালীর মতো তিনি সবকিছুই ধ্বংস করবেন। নেহরু পরিবারের এই কন্যাটি যদিও অশৈশব একটা উত্তপ্ত রাজনীতির আবহাওয়ায় দিন কাটিয়েছেন তাহলেও স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর স্ত্রীহীন সংসারের গৃহিণীর বেশী আর বিশেষ কিছু ছিলেন না। তারপর, প্রথমে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে, পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে সক্রিয় রাজনীতিতে এগিয়ে এলেন। ১৯৬৬ সালে শাস্ত্রীজী মারা যাওয়ার পর কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের নেতারা যখন শ্রীমতী গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী বানালেন তখন তাঁরা ৪৭ বৎসর-বয়স্কা এই নারীর কাছ থেকে খুব বিশেষ কিছু আশা করেন নি। তাঁদের প্রত্যাশা শুধু এইটুকুই ছিল যে, তিনি তাঁদের হাতের পুতুল হবেন। আর আজ এই নারীর সম্পর্কেই ঠাট্টা করে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মধ্যে স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র পুরুষ।

দলের নেতৃত্ব লাভ করার আগে শ্রীমতী গান্ধীকে অবশ্য দলের ভিতর আর একটা নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সেটা যে নিতান্তই আনুষ্ঠানিক একটা ব্যাপার হবে তাতে সন্দেহ নেই। কংগ্রেস সভাপতি জগজীবন রাম বলেছেন, শ্রীমতী গান্ধীই দলের নেত্রী নির্বাচিত হবেন এবং সেই নির্বাচন হবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। শ্রীরামের বিবৃতি অবলম্বন করে বিপক্ষ শিবির অবশ্য কিছু জলঘোলা করার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীরাম সি পি আই সম্পর্কে কয়েকটি কড়া কথা বলেছিলেন। তিনি এমনও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, সি পি আইয়ের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়ার ব্যাপারে তাঁর নিজের কিছুই করার ছিল না, এই বোঝাপড়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মারফং। আর একটি বিবৃতিতে জগজীবনবাবু বলেছিলেন যে, লোকসভার নির্বাচন হয়ে গেলে লোকসভায় কংগ্রেস সদস্যদের নেতা নির্বাচন করা হবে। পরে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মামুলি নিয়মের কথাই তিনি উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামের এই দুই বিবৃতির মধ্যে গভীরতর অর্থের সন্ধান করে শ্রীমতী গান্ধীর বিরোধী শিবির উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা আগবাড়িয়ে জগজীবন রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, শ্রীরাম যে একজন সক্ষম সভাপতি সে বিষয়ে তাঁরা খুশী। তাঁদের হয়তো আশা ছিল, লোকসভায় কংগ্রেস দলের নেতৃত্বের জন্য জগজীবনবাবু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কিন্তু শ্রীরামের দ্বিতীয় বিবৃতির পর এখন পরিষ্কার যে, ইন্দিরা-বিরোধী শিবিরের আশা মিটবে না।

একনজরে লোকসভা

মোট আসন	৫১৮
ঘোষিত ফলাফল	৫১৪
শাসক কংগ্রেস	৩৫০
সি পি এম	২৫
সি পি আই	২৩
ডি এম কে	২২
জনসঙ্ঘ	২২
সংগঠন কংগ্রেস	১৬
তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি	১০
স্বতন্ত্র	৮
মুসলীম লীগ	৪
এস এস পি	৩
আর এস পি	৩
পি এস পি	২
অন্যান্যসহ নির্দলীয়	২৬

শাসক কংগ্রেস দলের এই চমকপ্রদ জয়লাভের পর শাসক কংগ্রেসের বিরোধী দলগুলির দ্বারা শাসিত রাজ্যসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠছে। মহীশূর থেকে লোকসভার সব কয়টি আসন শাসক কংগ্রেসের হস্তগত হওয়ার পর সেখানকার বীরেন্দ্র পাতিল মন্ত্রিসভার পক্ষে নিরাপদ বোধ করা কঠিন। উত্তর প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী টি এন সিং এর আগে একটি উপনির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। সেখানে সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিকদের মধ্যে বিবাদ আগে থেকেই চলছিল। লোকসভার নির্বাচনে তার সেই বিবাদ আরও বাড়বে বলে অনুমান করা যায়। তামিলনাড়ুর ডি-এম-কে মন্ত্রিসভা ও কেরলের অচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভার উপর অবশ্য এই নির্বাচনের ফলের কোন প্রভাব পড়বে না; কারণ, ডি এম কে দল শাসক কংগ্রেসের সমর্থন নিয়েই বিধানসভার নির্বাচনে আবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে এসেছে আর কেরলের অচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভার পিছনে শাসক কংগ্রেসের সমর্থন আছে। কিন্তু পাঞ্জাবে অকালী দলের পরাজয়ের পরও কি সেখানে অকালী মন্ত্রিসভা অটুট থাকবে?

দারিদ্র্য দূর করার সংকল্প ও কর্মসূচী নিয়ে শাসক কংগ্রেস দল নির্বাচনে নেমেছিল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে লোকসভার অন্তবর্তী নির্বাচন করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। দেশের মানুষ শাসক কংগ্রেস দলকে নিজেদের কর্মসূচী অনুসরণের নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়েছে। এখন বিজয়ী দলের সংকল্প পূরণের দিন এল।

* * *

"বঙ্গবন্ধু" শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রায় এক পক্ষকাল অতিক্রান্ত হল। গত ১ মার্চ তারিখে এক হুকুমনামা জারী করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রেখে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ যে সঙ্কট ডেকে এনেছিলেন সেই সঙ্কট থেকে ত্রাণের কোন পথ এখনও দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে 'বাংলা দেশে' অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্থানে কেন্দ্রীয় শাসন কার্যত অচল হয়ে গেছে। সেখানে অফিস, আদালত বন্ধ, ব্যাঙ্ক থেকে পশ্চিম পাকিস্থানে টাকা পাঠানো বন্ধ, কেন্দ্রীয় সরকারের কর দেওয়া বন্ধ, সরকারী ও আধা-সরকারী বাড়ীগুলিতে কালো পতাকা উড়ছে। অসামরিক শাসন চলছে কার্যত শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশে। পূর্ব বঙ্গের প্রচণ্ড আন্দোলনের সামনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অবশ্য একটু সুর নরম করেছিলেন। তিনি ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর বিবৃতিতে (১) ৩ মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ করতে না পারার জন্য সম্পূর্ণ একতরফাভাবে পূর্ব পাকিস্থানের নেতাদের দায়ী করা হয়েছে, অথচ ভুট্টোর সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি; (২) সেনাবাহিনী দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাদের যথাকর্তব্য করবে এই কথা বলে পরোক্ষভাবে শাসানি দিয়ে রাখা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগের ছয়-দফা দাবী প্রতিরোধ করার জন্য সেনাবাহিনীকে কাজে লাগান হবে। (৩) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কোথায় হবে তা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। তাছাড়া পর্যবেক্ষকরা একথাও লক্ষ্য করলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ প্রায় তিন সপ্তাহ সময় নিলেন। স্পষ্টতই, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক ফৌজ পাঠাবার জন্য সময় চান।

শেখ মুজিবর ঘোষণা করেছেন যে, কতকগুলি সর্ত পালন করা হলে তবেই আওয়ামি লীগ জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগ দেবে। প্রধান প্রধান সর্তগুলি হচ্ছে, সামরিক আইন বাতিল করতে হবে, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে ও সম্প্রতি পূর্ববঙ্গে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।

এই দাবীগুলি আদায় করার জন্য পূর্ববঙ্গের মানুষ এক হয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলেছে। মৌলানা ভাসানি, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের যেসব প্রবীণ নেতা এতদিন আওয়ামি লীগের বিরোধিতা করেছেন তাঁরাও এখন শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব মেনে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

সর্বশেষ খবর এই যে, প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসছেন শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সামনাসামনি কথাবার্তা বলার জন্য।

১০-৩-৭১ —পুণ্ডরীক

এ শহর ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অযোধ্যা, হস্তিনা নয়,
—সময়ের অতিদূর মহিমার আভা
স্মরণের দিগন্তে সঞ্চিত।
যতদূর খুঁড়ে যাও
এ শহরে এক খণ্ড শিলাও পাবে না।
শুধু পাললিক পুঁজি অগাধ অতল,
আদি অরণ্যও যাতে সমাধিস্থ হয়নি কখনো।

এই ত সেদিন সবে
লুব্ধ শঠ বণিকের নায়ে
এ শহর কর্দমাক্ত
নেমেছিল মৃত্যুকীর্ণ জলার বাদায়।

না তুলুক অভ্রভেদী মিনার গম্বুজ,
ইতিহাসে ঝলকিত গরিমার স্তূপ,
সদ্য দুই শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
এ শহর প্রাণ-বেগে অস্থির উদ্দাম,
নিত্য-আলোড়িত

তুলেছে আরেক স্বপ্ন ঊর্ধ্ব মহাকাশে
মর্মরের চেয়ে শুভ্র শুদ্ধ
মানুষের প্রেম আর আশা দিয়ে গাঁথা।

সেই স্বপ্ন বিচূর্ণ সহসা?
কোথা যেন আর্তনাদ যন্ত্রণা-জর্জর
রক্তে ভাসে মাটি!
বিস্ফোরণে প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল কাঁপে।

এ কি মহাসমাপ্তি-সঙ্কেত
কিংবা জীর্ণ যুগান্ত-ঘোষণা ?

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়···তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। **ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।**

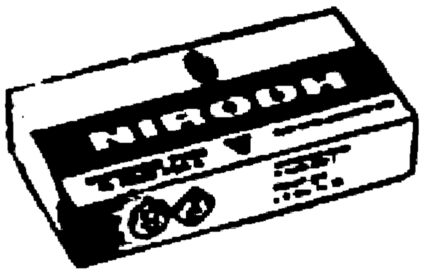

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

70/580

রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার পল্লী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির সংগে যুক্ত যে সব মানুষের বিশ্বভারতীর সংগে, শান্তিনিকেতনের সংগে সম্পর্ক, যোগাযোগ ও যোগসূত্র আছে, বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের সংগে আমার সম্পর্ক তার থেকে বেশ খানিকটা পৃথক। তার কারণ আমার জন্মস্থান শান্তিনিকেতন থেকে বিশ মাইলের মধ্যে, এই জেলাতেই। সেদিক থেকে শান্তিনিকেতন আমার জন্মস্থানের সমতুল্য। বাল্যকাল থেকেই নানানভাবে শান্তিনিকেতনের সংগে আমার পরিচয়। কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে এখানকার আনন্দে, উৎসবে, খেলাধূলোয় অংশগ্রহণ করেছি, এখানে এসে প্রথম যৌবনে কবির তুল্য পুরুষ দ্বিজেন্দ্রনাথকে মহাত্মা গান্ধীকে দূর থেকে সবিস্ময় দর্শন করে গিয়েছি। শান্তিনিকেতন আমাদের অন্তরের অংশ বলে তরুণ বয়সে অহংকারের অন্ত ছিল না। এখানকার নিভৃত, শান্ত অথচ নিত্যউৎসবময় পরিবেশে এমন কিছু ছিল যা শুধু এখানেই ছিল, আর কোথাও তার আস্বাদ মিলত না। মানুষের মন মায়ের কোলে পিতৃগৃহে জন্মে আপনার ঘর খুঁজবার জন্য পথে বেরিয়ে কেবল খুঁজেই মরে কিন্তু আপনার সেই ঘর যা নাকি তার মনের ঘর তাকে আর খুঁজেই পায় না। আমার সারাজীবন মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, এখানকার পাখী-ডাকা নিভৃত গাছের ছায়ায় আমার অতিপরিচিত কঙ্করময় মৃত্তিকার উপর যেন আমার সেই মনের ঘরখানি লুকিয়ে আছে। একটু খুঁজলেই যেন তার দেখা মিলবে। মোট কথা বীরভূমের মানুষ হিসাবে শান্তিনিকেতনের সংগে আমার নাড়ীর টান আছে, যা যাবার নয়, যাকে তাড়াতে চাইলেও যা যাবে না।

আজ সর্বাগ্রে মনে পড়ছে লেখক হিসাবে যেদিন মহাকবির সংগে সাক্ষাৎ করতে আসি সেদিনের কথা। আজ বড় বেশি মনে পড়ে সে ১৯৩৭-৩৮ সালের কথা। আমার দুখানি বই, 'রাইকমল' আর 'ছলনাময়ী' মহাকবিকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বই দুখানি পড়ে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়ে পত্র লিখেছিলেন এবং সেই সংগে তাঁর সংগে সাক্ষাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী এক চৈত্র-মধ্যাহ্নে গেলাম কবিকে প্রণাম করতে। ঘরে প্রবেশের সংগে সংগে তাঁর দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটে উঠল। তিনি বললেন—একি? তোমার মুখ তো আমার চেনা মুখ। কোথায় দেখেছি তোমাকে?

আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখেছি তোমাকে?

নিজেকে সংযত করে বললাম—আমার বাড়ি তো এ দেশেই। হয়তো বোলপুরে দেখে থাকবেন। বোলপুরে কয়েকবার দেখেছি আপনাকে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

তিনি স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘাড় নেড়ে বললেন—না, না। তোমাকে যে আমি আমার সামনে বসে কথা বলতে দেখেছি মনে হচ্ছে।

মুহূর্তে একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। এই প্রথম সাক্ষাতের বৎসর কয়েক আগে ১৯৩৩ সালে সমাজ-সেবক কর্মীদের এক সম্মেলন হয়েছিল তখন স্বর্গত কালীমোহনবাবুর উদ্যোগে কবি সমাজ-সেবক কর্মীদের সংগে দেখা করেছিলেন। আমি ছিলাম কর্মীদের মুখপাত্র। আমিই কথা বলেছিলাম। কবি কি সেই কথা বলছেন? সেই অল্পক্ষণের স্মৃতি তাঁর মনে আছে?

আমি সসংকোচে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তিনি বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ। মনে পড়ছে তুমিই ছিলে কর্মীদের মুখপাত্র। ঠিক আমার সামনে বসেছিলে তুমি।

তাঁর সংগে আমার কথাবার্তার সূত্রপাত হল এইভাবে।

কথায় কথায় বললেন—তুমি লেখো। আমি তো দেখবার সুযোগ পাই নি। তোমরা আমাকে দেখতে দাওনি।

আবার বললেন—দেখবে, দুচোখ ভরে দেখবে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। কাছে গিয়ে পাশে বসে তাদের একজন হয়ে যাবে। সে শক্তি এবং শিক্ষা তোমার আছে।

এবার আমি বললাম—পোস্টমাস্টারের পোস্টমাস্টার, রতন, ছুটির ফটিক, ছিদাম দুই দুখীরাম দুই এদের কথা—

—ওসব দেখেছি। পোস্টমাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমার কাছারীতে। ওই যারা কাছে এসেছে তাদের কতকটা দেখেছি, কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।

এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। লেখক হিসাবে পরিচিত হতে এসে গ্রাম-সেবক ও সমাজ-কর্মীর পরিচয় টাক এড়াতে পারি নি। দুটি মিলে এক হয়ে গিয়েছে। তাই যখন এবার বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আমাকে নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন তখন থেকে এই সব কথাগুলি আমার মনের মধ্যে ভিড় করে রয়েছে। তাছাড়া আমি স্বচ্ছ পল্লীর মানুষ। সারাজীবন বাংলা দেশের এই পল্লীর কথাই শুনিয়ে আসছি। আমার বলবার কথা যদি কিছু থাকে তো সে পল্লীর কথা। এই সব বিবেচনা করেই আমি আমার বক্তব্য বিষয় স্থির করেছি—রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লীগ্রাম।

সর্বাগ্রে আমার নির্ধারিত বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলে নিতে চাই। আমার বক্তব্যের সীমা এবং সংজ্ঞা সম্পর্কেই আমার প্রথম পর্ব অর্থাৎ এটুকু আমার মূল বক্তব্যের ভূমিকা।

(ভূমিকা)

কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত মানব-সভ্যতায় মানুষের চিন্তা যেমন বাস্তবলোক পৃথিবীর ধূলিজাল থেকে দূরান্তরে জ্যোতিলোক পর্যন্ত প্রসারিত, তেমনি মনোলোকে তার চিন্তা জীবন জগৎ কল্পনা, বাসনা, সুন্দর-অসুন্দর শ্রেয়-অশ্রেয় সবকিছুকে স্পর্শ করে বোধ হয় অনন্তবোধের প্রসারিত। এই দুয়ের সম্পর্ক ও সংযোগ থেকে পাওয়া যে অভিজ্ঞতা তার উপরেই পৃথিবীর সব শিল্পের সৃষ্টি। ধাতুগত রুচি ও প্রবণতার সঙ্গে শিক্ষা দুই তত্ত্ব শিল্পীকে যে বিশেষ চরিত্র দান করে, সেই চরিত্রের প্রবণতা অনুযায়ী শিল্পী নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তারই বিশেষ বিশেষ কালের গতি ও প্রকৃতির আধারে পরিবেশন করেন। শিল্পসৃষ্টির জন্য আসল প্রয়োজন অভিজ্ঞতা তার উপাদান হল সমগ্র জীবনবোধ। এই সমগ্র জীবনবোধ থেকে যিনি বিচ্ছিন্ন, এ বোধ

যাঁর আয়ত্ত নয়, তিনি শিল্পের ছাপ দিয়ে নিজের কালে নিজের সৃষ্টির বিনিময়ে ভাস্কর বাহবা ও শিরোপা পেতে পারেন, কিন্তু তা পরবর্তীকালের কুশিক্ত-ক্রু বিচারের ধোপে টিকবে না বলেই আমি বিশ্বাস করি।

শিল্পীর রুচি ও প্রবণতার পার্থক্যহেতু শিল্পের রাজ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য। একই উপাদান নিয়ে দুই শিল্পী কাজ করেছেন এবং শিল্পকর্ম দুইই সমান প্রসোত্তীর্ণ হয়েছে, অথচ দেখা যাবে দুটি মূর্তি হয়তো সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। দুই বিপরীত মূর্তিতেই তারা শিল্পবিচারে সমান সম্মান আদায় করবে, সমাদরের পার্থক্য ঘটলেও। সেক্ষেত্রেও সমাদরের কমবেশী ঘটতে পারে, তবে দুইকেই সমাদর করবার জন্য রসিক গ্রাহকের কোনদিন অভাব ঘটে না, ঘটবেও না। আমার কালের আমার সমসাময়িক দুই স্বর্গত বন্ধুর নাম এই প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করি। একজন বিভূতিভূষণ, অন্যজন মাণিক। তাঁরা দুজনেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের অলঙ্কার। দুজনেই জীবনের বহু মৌল বিষয় নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। অথচ দুজনের দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। যদি এদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি অন্যের বিপরীত প্রান্তে বলি তা হলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। অথচ দুজনেরই পাঠকের কাছে সম্মান ও সমাদরের অভাব ঘটেনি।

আবার শিল্পীর এই রুচি ও প্রবণতাই সীমা ও গণ্ডি নির্দিষ্ট করে দেয়। এই রুচি ও প্রবণতা যেমন শিল্পীকে তার নিজস্ব দৃষ্টি, তার থেকে সঞ্জাত দর্শন, যা জীবনবোধের নির্যাস, এবং সৃষ্টির উত্তাপ যোগায় তেমনি সে আপনার নিজস্ব বিশেষত্ব দিয়ে শিল্পীকে খণ্ডিতও করে। এর ফলশ্রুতি সাহিত্যের পাতায় পাতায়। তবে তার ফল সাহিত্যের পক্ষে অশুভ হয়নি। তাতে অভিনব বৈচিত্র্যের বিবিধ উপকরণে সাহিত্যের ভাণ্ডার উজ্জ্বলই হয়েছে। বৈচিত্র্যই নূতন মহার্ঘতার বোধ সঞ্চার করেছে।

এমনই করে, শিল্পের যে পরিধি পৃথিবীর ধূলিজাল থেকে ঊর্ধ্বলোকে জ্যোতিষ্কলোক পর্যন্ত প্রসারিত সেখানে, সেই বিশাল রাজ্যে কোন শিল্পী শুধু ধূলোর উপরে বসে ধূলোর মুঠোর সঙ্গে ধূলোর মুঠো নিয়ে খেলা করেছেন কেউ বা চোখের জল দিয়ে মূর্তি গড়েছেন। কেউবা দূরে দাঁড়িয়ে জীবনের শোভাযাত্রা দেখেছেন, কেউবা সেই শোভাযাত্রার যাত্রীদের একজন হয়েছেন, কেউবা অন্ধকার অরণ্যভূমির অন্ধকারকে গায়ে কম্বলের মত জড়িয়ে নিয়ে অরণ্যভূমির পথিক হয়ে সেখানকার ভয়াল জীবনকে দেখেছেন, কেউবা মাটিতে ধূলোয় দাঁড়িয়ে আকাশের উদাসীন নীলকে উদাসীনের মতই দেখেছেন. কেউবা আকাশলোকের অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করেছেন। এঁরা সবাই শিল্পী সার্থক শিল্পী। এক-এক জনের সৃষ্টিতে এক এক আস্বাদ: নিজের নিজের সৃষ্টিলোকে তাঁরা সকলেই মহারাজা সম্রাট।

কিন্তু যে যাই দেখে থাকুন আর পরিবেশন করে থাকুন একটি কৃত্য প্রত্যেকেই সম্পন্ন করেছেন সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই রাজ্যের প্রতিটি মহিমান্বিত সম্রাটের অঙ্গে অঙ্গে পৃথিবীর ধূলোর রাজ-লাঞ্ছন। এই রাজলাঞ্ছনের মহিমায় তিনি মহিমান্বিত নন, তিনি আমাদের, আমরা যারা ধূলোর উপর মাটি দিয়ে ঘর বাঁধি, যাদের চোখের জল মর্তলোকের ধূলিই শোষণ করে, জীবনান্তে যাদের এই প্রাণময় রসময় দেহ আবার ধূলোতেই বিলীন হয় সেই আমাদের রাজা নন। রাজা কেন, তাঁর বশ্যতা কেন, তাঁর সঙ্গে আমরা আত্মীয়তার সম্পর্কই স্বীকার করি না।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে শিল্পের রাজ্যে এমন জন কেউ আছেন কি, থাকেন কি? উত্তরে অসঙ্কোচে বলব, আছেন; এবং তাঁদের সংখ্যা স্বল্প নয়। কেউ কেউ শিল্পী মন নিয়ে জন্মেও জন্মসূত্রেই এমন চারিত্রিক প্রবণতা নিয়ে এসেছেন যে পৃথিবীর ধূলোর ছোঁয়া তাঁদের অঙ্গে কেন, পায়েও লাগল না। মন তাঁদের আকাশের তারার সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে বাঁধা রইল। মনকে বাঁধতে বাঁধতে সারা দেহটাই যেন তারই সঙ্গে বদ্ধ হয়ে নিজেই এই দেহে আকাশের মত তারার মত হয়ে গেলেন। মর্তলোকের দৈনন্দিন মানবজীবনের সুখ-দুঃখের সব আস্বাদ তাঁদের হারিয়ে গেল। সেই হারাবার তপস্যাই যেন তাঁদের সৃষ্টি তপস্যা। তাই শিল্পের আনন্দলোক থেকে তাঁরা স্বেচ্ছা-নির্বাসন দেহে নিয়ে অন্য আনন্দলোকে বসবাস করতে যান। তাঁদের গানে তাই মর্তলোকের দুঃখ-বেদনার উষ্ণ স্পর্শ নাই, ক্রন্দনের মহিমার স্বাদ নাই। তাঁদের সংগীত মানব-সুখ-দুঃখ-বিরহিত আর এক আনন্দের শীতলতার শীতল। তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধা। তাঁরা সাধক, তাঁরা পরম সত্যসন্ধানী। তবু বলি, তাঁরা শিল্পের রাজ্যের কেউ নন। তাঁদের প্রেম মিথ্যা হয় যদি ভুবনেশ্বর পথের ধূলায় নেমে এসে আসন পাতেন না।

আর এক দল আছেন যাঁরা একদা এই ধূলোয় মহিমান্বিত হবার জন্য এসে পড়ে, নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো, ধূলো থেকে পা বাঁচিয়ে সরে এসে নির্জন নিরাপদ, কোলাহলহীন গৃহশয্যা আশ্রয় করেছেন। সেইখানে বসেই তাঁর নিরাপদ পরিচ্ছন্ন শিল্পী-জীবন কেটে গেল। তাঁর গৃহকোণের শয্যাতল যত মহার্ঘই হোক, তিনি যে একদা ধূলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে ঘরে ঢুকেছিলেন, তার ফলে শিল্পের রাজ্য থেকে যে বহিষ্কৃত ও নির্বাসিত হলেন এবং শিল্পের প্রাণদেবতা তাঁর বদ্ধদ্বারে বার বার করাঘাত করে স্বস্থানে ফিরে গেলেন সে কথা তিনি বুঝলেন না।

আরও একদল আছেন যাঁরা সারা জীবন এই ধূলোর রাজ্যে প্রবেশাধিকারই পেলেন না। তাঁরা [illegible] বোধ-টাই সারা জীবনে তাঁরা পেলেন না।

এই ধূলার রাজ্যের অধীশ্বর যাঁরা তাঁদেরও ইতর-বিশেষ আছে। এ রাজ্যে ধূলার রাজারা অধিকাংশই ধূলিতলবাসী। ধূলায় হাঁটতে হাঁটতে, চলতে চলতে, খেলতে খেলতে, দেখতে দেখতে অধিকাংশ জনই ভুলে যান তাঁর রাজ্যে ধূলো ছাড়া আরও কিছু আছে। ধূলার নিজস্ব মোহনতা লোভনতাও তো কম নয়, অনেক! তার আস্বাদ যে বড় তীব্র, আর তাতে বৈচিত্র্যই বা কত; আবার কদাচিৎ এমনও দেখা যায় যে, মৃত্যুলোকের ধূলার উপর পা রেখেও তিনি একবারও ভোলেন না যে তিনি মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁর গন্তব্য ওই আকাশলোক, অসংখ্য জ্যোতিষ্কে গ্রথিত আকাশলোক। তাঁদের মনে এবং সৃষ্টিতে মর্তলোকের মৃত্তিকা ও আকাশের নীলিমা এক অদৃশ্য স্বর্ণসূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। তাঁদের সৃষ্টির টানায় মাটির ছোঁয়া, আর পোড়েনে আকাশের নীলের স্পর্শ। আকাশ আর মৃত্তিকার যুগল সম্মিলনে তাঁরা যে অতি-মহার্ঘ, অতি-বিচিত্র বসনখানি রচনা করেন, মানব-বিধাতা তা উত্তরীয়ের মত অঙ্গে ধারণ করে বোধ হয় কৃতার্থ হন। এই ভেবে যে, যা দিয়ে তিনি তাদের মর্তলোকে পাঠিয়েছিলেন তারই খানিকটা তারা ফিরিয়ে দিলে।

আমাদের মহাকবি এই পথের পথিক, এই ধারার শিল্পী। তিনি সাধক, তিনি সমাজ-সংস্কারক, তিনি দার্শনিক। কিন্তু এ সবই তাঁর খণ্ডিত পরিচয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তিনি মহাকবি। এই ধূলি-ধূসর মর্তজীবনে সকল ধূলি-মালিন্যের মধ্যে অবস্থান করে চিরদিন তিনি আকাশের স্বপ্ন দেখেছেন। তাই তাঁর রচনায় মাটি আর আকাশ মাখামাখি হয়ে আছে। তার মধ্যে আকাশের ছোঁয়া কতখানি আর কতখানি যে মাটির স্পর্শ তা নিরূপণ করা কঠিন। অধিকাংশ শিল্পী যেখানে শিল্পে মর্ত্য-লোকের পর্ণকুটিরে অবস্থান করেন, সেখানে মহাকবির আবাসগৃহ মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আকাশলোকের একান্ত আস্বাদ গ্রহণ করবার সময় তিনি যে মর্ত্য-লোকের মানুষ, মৃত্তিকা-সম্পর্ক-বিরহিত জন নহেন, এ সচেতনতা সব সময়েই ক্রিয়াশীল থাকত তাঁর মধ্যে। নিজের পা দুখানি যে এই মর্তলোকের মৃত্তিকায় আরও লক্ষ-জন সমকালীন যাত্রীর সঙ্গেই ধূলার উপরেই স্থাপিত, একথা বিস্মৃত হবার মত চিত্ত-চাঞ্চল্য তাঁর নয়। কারণ মর্তলোকের ধূলার মোহন মাধুরীই তাঁকে আকাশলোকের পথ চিনিয়েছিল। বহির্লোকে অনন্ত রূপরস-ময়ী, নিত্যউৎসবময়ী পৃথিবীর চির-নবীন অনন্ত সৌন্দর্য এবং অন্তর্লোকে মানব-জীবনের অনিবার্য শাশ্বতীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আকৃতি-তপস্যা যুক্ত বেণীর প্রবাহের মত তাঁকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল সেই আশ্চর্য আকাশলোকে, যা পরিপূর্ণভাবে সৌন্দর্য-চেতনা ও আনন্দ-সম্ভোগলালিত্যে ভাস্বর। মর্তদেহে মর্তান্তর্নির্ভর এই সৌন্দর্য ও আনন্দ-আস্বাদের মধ্যে যে অমৃত আস্বাদ রয়েছে তাতে, যদি স্বর্গ থাকে, দেবতা থাকে তবে স্বর্গের তার জন্য দেবতারাও ঈর্ষিত হবে।

এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ লৌকিক ও জীবনেহসঞ্জাত হয়েও ভিন্ন শ্রেণীর। এর জাত আলাদা। পৃথিবীতে সঞ্জাত অন্যান্য বস্তুর মত এর পরিপুষ্টির জন্য বিশ্ব-সংসারের কোন কিছুর উপর এর কোন দাবী নাই। এ দৃষ্টি দেহ দিয়ে কিছু পেয়ে নিজের পরিতৃপ্তি খোঁজে না। বিশ্ব-সংসারের দিকে চোখ মেললেই এর পরিতৃপ্তি। কবির সৌন্দর্য-চেতনা ও আনন্দ-বোধোপলব্ধি খুঁজেছেন এই মাটির পৃথিবীতে, অন্য কিছু নয়, অলৌকিক কিছু নয়, মাটির পৃথিবীর বাইরের কিছু নয়। এ সৃষ্টির এক প্রান্তে মাটির পৃথিবী, অন্য প্রান্তে তাঁর সৌন্দর্য-চেতনা। দুয়েরো সম্মিলনে এর সৃষ্টি।

রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুরটাই বোধ হয় এই। দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত, প্রত্যক্ষ সৃষ্টির সৌন্দর্য-চেতনা, এবং সেই চেতনার ফলশ্রুতিস্বরূপ এই সৃষ্টির ভাণ্ডার মৃৎপাত্রে তজ্জনিত আনন্দের অমৃতরসপান।

রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিমাণে যত বিপুল, প্রকারে তত বিচিত্র। কাজেই কোন একটি বস্তুকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুর বলে উপস্থাপিত করতে চাইলে তা বিনা বিচারে সকলের পক্ষে গ্রহণ করতে অসুবিধা ঘটাই স্বাভাবিক। বিশালায়তন রবীন্দ্র-সাহিত্যে কত বিচিত্র, কত বিভিন্ন সুর! ঈশ্বর, প্রকৃতি, ধর্ম, স্বদেশ, সমাজ, বিশ্বমানবিকতা প্রভৃতি, একজন স্পর্শকাতরচিত্ত, ধীমান, প্রবল কল্পনাশক্তিসম্পন্ন, -চিন্তাশীল, পরিপক্ক মনুষ্যসত্তার পক্ষে যা যা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব, সর্ব বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেদনাস্পন্দিত বোধ দিয়ে চিন্তা করেছেন এবং নিজের প্রায়-অলৌকিক ও অতি চমৎ-শিল্পশক্তির দ্বারা তাকে প্রকাশ করেছেন। কাজেই এই বহুবিচিত্র ও বহুবিভিন্নের মধ্যে একটি সুরকে প্রধান বলে চিহ্নিত করতে চাইলে তা সর্বজনসম্মতভাবে গৃহীত হতে আপত্তি হতে পারে।

রবীন্দ্র-মানস বিশ্লেষণ করলে হয়তো এর জবাব মিলতে পারে। মানুষ রবীন্দ্র-নাথের মনোলোকের রুচি-প্রবৃত্তি ও চিন্তা ভাবনার মধ্যে যে আসল মানুষটি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তাকে চিনতে পারলে এর উত্তর পাওয়া সহজ হতে পারে। শিল্পকর্ম অবশ্যই শিল্পীর চিত্তের অন্তরঙ্গ পরিচয় বহন করে, কিন্তু সেই যে শতকরা একশো ভাগ তার অন্তরের আসল মূর্তি একথা কে জোর করে বলবে? সোনা থেকেই অলঙ্কার তৈরি হয়; কিন্তু সোনা যখন অলঙ্কারের মূর্তি নেয় তখন সোনা ছাড়াও তার সঙ্গে আরও কিছু কিছু সামান্য পরিমাণে মেশাতে হয়। অলঙ্কার তৈরির প্রয়োজনেই সে মিশ্রণ প্রয়োজন হয়। তাই যেমন সোনা আর অলঙ্কার শতকরা একশো ভাগ এক নয় তেমনি শিল্পের অভিজ্ঞতা আর শিল্পীর যে চিত্ত সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে দুইকে পুরোপুরি এক এবং অভিন্ন বলে ধরা ঠিক হবে না।

'ছিন্নপত্রাবলীর' মধ্যে কবি আপনার এই নিভৃত মনের অকপট পরিচয় অসংকোচে দান করেছেন। এরই সমর্থনে 'ছিন্নপত্রাবলীর' পত্রগুচ্ছের মধ্য থেকে কিছু অংশ এখন উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি।

"আমার সেই সাহাজাদপুর মাঠ থেকে অনেক দূরে এসে একটি নির্জন জায়গায় বোট বেঁধেছি।...চারিদিকে কেবল ধূ ধূ করছে— মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের অবশিষ্ট হলদে বিচালিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিনের পর সূর্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম।... সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারিদিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলব! বহু দূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল— নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল— মনে হল যেন ঐখানে সন্ধ্যার

CENTRAL LIBRARY

বাড়, এখানে গিয়ে সে আপনার হাত-আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সাজসজ্জাটি ঢিলে করে। মাঝখানে তোলে আপন নিভৃত নির্জনের মধ্যে শিশুর পরে বুকের মত প্রাচীন [illegible] বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার আলো পাবে এবং মনে মনে স্বরে স্বপন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়—একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পাতার নীচে গভীর ছলছলে ভাবের মতো। এমন মনে করা যেতে পারে—মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপিলে এবং কোলাহল এবং ঘরকন্নার কাজ নিয়ে থাকে—যেখানে একটু ফাঁকা একটু নিস্তব্ধতা একটু খোলা আকাশ সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে; সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি অসীমের সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিরাট জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। আমার বাঁ পাশে ছোট নদীটি দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে এঁকে-বেঁকে অল্প দূর গিয়েই চোখের আড়াল হয়ে গেছে, জলে একটি ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিল না, কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমূর্ষু হাসির মতো খানিকক্ষণের জন্যে লেগে ছিল।"

(ছিন্নপত্রাবলী পত্রসংখ্যা ১০)

ছিন্নপত্রাবলীর মধ্যে এই ধরণের প্রকৃতি-সৌন্দর্য-আবিষ্ট চিন্তা ও ভাবনা পরিমাণ বোধহয় সবচেয়ে বেশি। এই ধরণের চিন্তা ও ভাব ছিন্নপত্রাবলীর বহু চিঠিতে [illegible] চিন্তা ও ভাবের [illegible] [illegible] আছে। [illegible]

[illegible]

চিত্তধর্মের সঙ্গে মিশে তাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে, বিশিষ্টতা দিয়েছে; এই মনে চিত্তধর্মের চারিপাশে তাকে ঘিরে সেই উপলব্ধি ও ভাবের অলংকারে সাজিয়েছে। এই মৃত্তিকাময়ী পৃথিবীর কোলে বসে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই অমৃত-মাধুরী পান ও সেই আনন্দ-আস্বাদনের গানই তাঁর সারা জীবনব্যাপী কাব্যসাধনার মূল কথা।

তাই এই মৃত্তিকাময়ী পৃথিবী থেকে নর-নারী পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সংসারের দিকে তাকিয়ে তাঁর কবি-দৃষ্টি কখনও ক্লান্ত হয়নি। বালক-বয়সে চিত্তের উন্মেষের সময় থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত শ্যামা ধরিত্রী সমান নবীনা ছিল, তার রূপমাধুরী সমান অম্লান ছিল। এ সৌভাগ্য কদাচিৎ কোন কবি কেন, কোন মানুষেরই ভাগ্যে ঘটে না। এই জরা-মরণশীল মানবদেহ জন্মসূত্রেই যে আনন্দের ঐশ্বর্য নিয়ে জন্মায় তা কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়িত হয়; সংসারের জীবনযাত্রার প্রবৃত্তিগুলির পৌনঃপুনিক ঘর্ষণে সেই অকারণ আনন্দের উৎসের উপরে শ্যাওলা জমে [illegible] মানুষের নিজের অজান্তে সে উৎসমূল থেকে ব্যক্তি-অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার ফলে জীবনের [illegible] জীর্ণ জরাগ্রস্ত হয়। প্রাচীন অবসন্ন মন ও জীর্ণ দেহ তখন আনন্দকে নবীন ও অম্লান ভাবে ধরে রাখতে পারে না। তবু কেউ কেউ এই আনন্দ জীব-বিবর্তনের [illegible] নবীন প্রাণ-চেতনাকে ধারণ করে রাখতে পারেন। এই [illegible] ও সাধনা [illegible] ছিল। [illegible] তিনি এ-সাধনায় [illegible] করেছিলেন। [illegible] [illegible] তিনি এই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

তবে মহাকবির এই মাধুরী দর্শনের এক আশ্চর্য বিশেষত্ব ছিল। যে বৃহৎ নিখিল রূপময়ী পৃথিবী তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত ছিল তার সঙ্গে তাঁর নিজের চিত্তধর্ম এবং অভ্যাস যোগ সাধনার দ্বারা সখ্য এক ধরণের বোঝাপড়া ছিল। [illegible]

[illegible]

সেই বিশ্বের যখন কাব্যের অভিজ্ঞতার আধারে আবার কাব্যের ভিতরে মূর্তি নিত সে তখন বিশাল সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে 'সুন্দর' মধ্যে সিন্ধুর প্রকাশের মত দেখা দিত।

শুধু তাই নয়। জন্মসূত্রে যে ভগবদ্-বিশ্বাস তিনি লাভ করেছিলেন এবং যা তিনি তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও জীবনাচরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং নিজের অন্তরস্থ যে বোধকে উপনিষদের শিক্ষার মধ্যে নূতন করে লাভ করেছিলেন, সেই বোধকেই প্রত্যক্ষভাবে তিনি সমস্ত সংসারব্যাপী স্পষ্ট অস্তিত্বরূপে উপলব্ধি করেছেন এই সৌন্দর্য-আস্বাদের পথে। তিনি সংসারের সমস্ত অস্তিত্বের প্রাণের প্রাণ, যিনি বিশ্ব-সংসারের সমস্ত বিশেষ অস্তিত্বের মধ্যে সৌন্দর্যের অপার ভাণ্ডাররূপে মানব-অনুভবের মধ্যে প্রকাশিত, তিনিই সমস্ত অস্তিত্বের অন্তরালে প্রাণরূপে জীবদেহে চেতনা-রূপে, মানবদেহে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত। কবির চিত্তে তিনিই অপার সৌন্দর্যানুভূতির মূর্তিতে প্রকাশিত। তাঁর অত্যন্ত নিজের সৌন্দর্যানুভূতির সাধনার পথেই তিনি একান্ত নির্ভরে সেই সর্ব-ব্যাপী অস্তিত্বকে বার-বার আস্বাদন করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন মানব-চৈতন্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল মৃত্যু তার পরপারেও স্পর্শ করতে হয়। সেই সর্ব-ব্যাপী, সুন্দর ও ভীষণকে জীবনের উপাস্য বলে জেনেছেন।।

"তাঁরি পানে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর
সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ ;
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু, তাঁরি,
তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্র সমীরে
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে
নীলাম্বর ঘিরে
তাঁরি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা
প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশে পরম ক্ষণে প্রিয়জনমুখে।............
তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে
মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতি দিবসের কর্ম প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্বজনে ; তারপর দীর্ঘপথশেষে
জীবনযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে।"

(এবার ফিরাও মোরে)

বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে মানব-চৈতন্যের সৌন্দর্যকে মহাকবি পরি-পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন। মানব-চৈতন্যের এ সৌন্দর্যের প্রকাশ বীর্যবত্তার পথে, [illegible] জন্য [illegible] পথে। দুঃখের মধ্যেই তাকে স্পর্শ করা যায়।

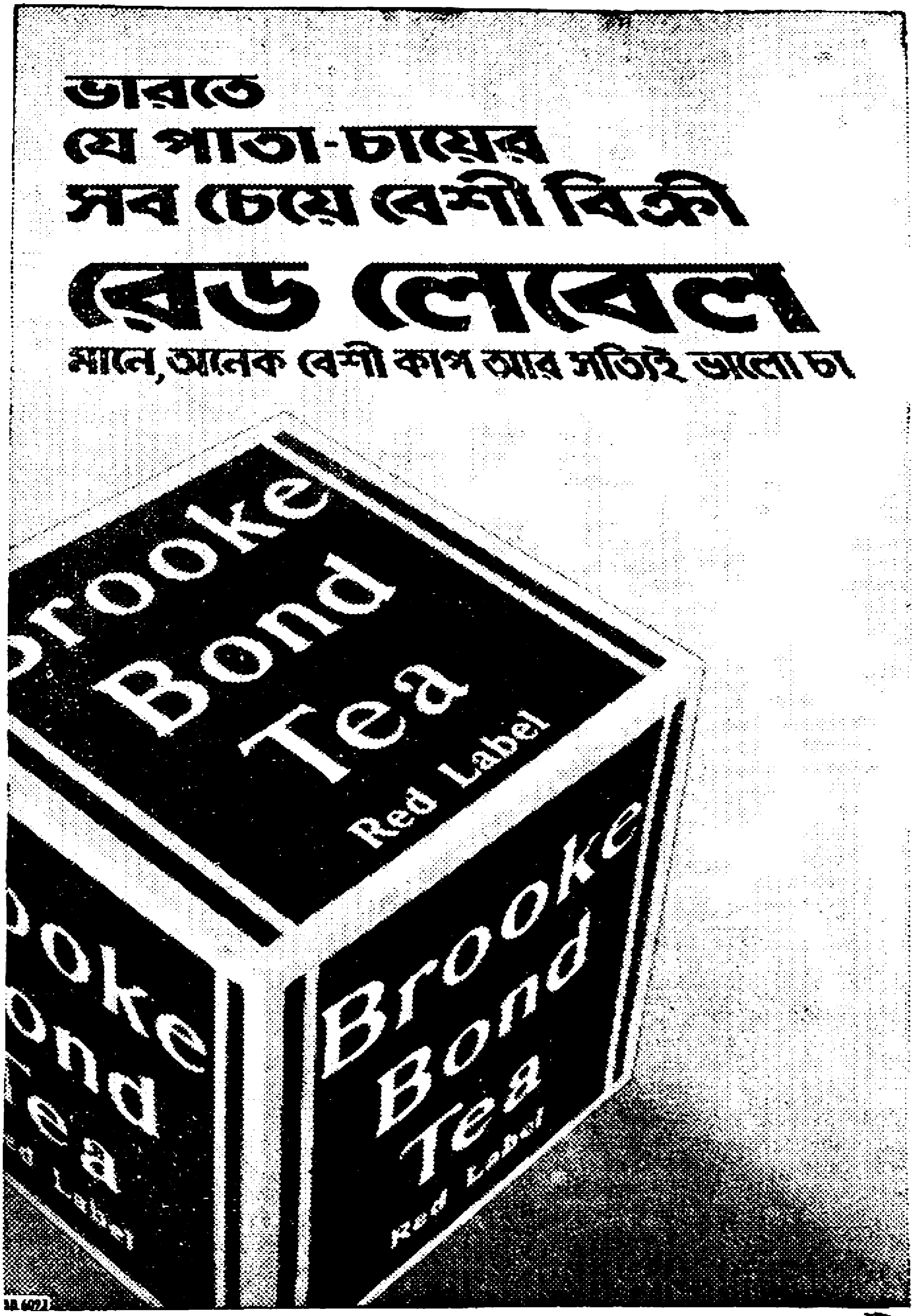
ভারতে
যে পাতা-চায়ের
সব চেয়ে বেশী বিক্রী
রেড লেবেল
মানে, অনেক বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা
Brooke Bond Tea
Red Label

বিশ্ব-সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য, মানব-চৈতন্যের চিরন্তন অম্বর মহিমা এবং সমস্ত জড় ও চৈতন্যের অন্তরালে সর্বব্যাপী এক অস্তিত্বের প্রতি নিঃশেষ আস্থা—এই তিনে মিলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুঙ্গশীর্ষ রচনা করেছে। সেখানে, সেই সৃষ্টি অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতি বা মানব-মহিমা বা সেই সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ও কবির ব্যক্তিসত্তা ছাড়া আর কিছু নাই, কেউ নাই।

কিন্তু আরও এক রবীন্দ্রনাথ আছেন। যে রবীন্দ্রনাথ আরও পাঁচজন মানুষের মত সমাজবদ্ধ হয়ে, মানুষের মধ্যে থেকে, দৈনন্দিন জীবন যাপন করেছেন। যিনি বিশুদ্ধ মানুষ ও বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের তপস্বী ছাড়াও যাঁর আরও এক লৌকিক পরিচয় আছে। যে লৌকিক পরিচয়ে তিনি আপনার সমসাময়িক পরিপার্শ্বের সঙ্গে নানান বন্ধনে আবদ্ধ এবং নানান সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। যিনি প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের ঢেউয়ে ডুবেছেন ও ভেসেছেন, যিনি সমসাময়িক ঘটনার আবর্তে পড়েছেন ও অংশ নিয়েছেন, যিনি সমসাময়িক কালে আশপাশের মানুষের সঙ্গে নানান সম্পর্কে বাঁধা পড়েছেন। এ-মানুষ অনেক পরিমাণে লৌকিক মানুষ।

এখানে সুবৃহৎ কবি-কল্পনা থেকে ভিন্ন স্তরে তিনি বিচরণ করেন। এখানে লৌকিক বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে ক্রিয়াশীল। এখানে তাঁর সামনে লৌকিক সংসার আপনার বিশেষ বিশেষ দাবী, বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে উপস্থিত

'ছিন্নপত্রাবলী' থেকে আর একটি উদ্ধৃত দিচ্ছি :

'আজ যখন কাছারি করছি, দুটি-পাঁচ ছেলে হঠাৎ অত্যন্ত সংযতভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে—কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আরম্ভ করে দিলে, "পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশ্বরের কৃপায় হুজুরের পুনর্বার এতদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছে।" এমনি করে আধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করে গেল; মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন করে নিচ্ছিল। বিষয়টা হচ্ছে ওদের স্কুলে টুল এবং বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে—ঐ ছেলের মুখে হঠাৎ এই জগদ্দল বক্তৃতা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল! বিশেষতঃ এই জমিদারি কাছারিতে, যেখানে অশিক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্য ভাষায় আপনাদের যথার্থ দারিদ্র্য-দুঃখ জানায়—যেখানে অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে গোরু-বাছুর হাল লাঙল বিক্রি করেও উদরান্নের অনটনের কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে 'অহরহ' শব্দের পরিবর্তে 'অনবরহ', 'অতিক্রমের' স্থলে 'অতিক্রয়' ব্যবহার, সেখানে টুল বেঞ্চির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অদ্ভুত শোনায়।'

(ছিন্নপত্রাবলী: পত্রসংখ্যা ১২)

এই সঙ্গে 'এবার ফিরাও মোরে' নামক অতি খ্যাত কবিতার আর একটি একান্ত পরিচিত অংশ উদ্ধৃত করছি :

'......ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু
শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ;
স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায়
বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে
দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ,
নাহি জানে অভিমান
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে
কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন
যখন কেহ কাড়ে
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ
নিষ্ঠুর অত্যাচারে
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে
বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।'

উপরের উদ্ধৃতিদ্বয় থেকে এ-বোধ নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে যে, এ আর এক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর। বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্যানুভূতি, মানব-মাহাত্ম্যের ও সর্বব্যাপী এক অজ্ঞেয় অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধির মিশ্রণে গঠিত কবির দৃষ্টি এখানে অনুপস্থিত। এ-জীবন, এ দৃষ্টি, এ অভিজ্ঞতা বুদ্ধিগ্রাহ্য; এসব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের কম-বেশী পরিচয় সকলেরই আছে। আমাদের সমসাময়িক কালের স্বর্গত কবি-বন্ধু সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ' নামে যে বিখ্যাত কবিতাটি আছে, তার থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই এবিষয়ে আমার বক্তব্য স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হবে বলে মনে করি।

'হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উদ্ভাসিত
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
নিজ সাধনায় প্রান্তর ত্যজি চুম্বিছ
নীলাকাশ......
অসীম শূন্যে হিমে ঢাকি শির
একেলা প্রহর যাপে
রৌদ্র-আলোকে তুষার-শিখর
সাদা ধবধব করে—
......আজও তাহার পাই নাই পরিচয়।
স্বজন হইয়া বসেছে আমার
গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে—
সমুখে আমার সবজির ক্ষেত
তাহারি আঙুল দিয়া
হিমালয় হতে ঝরণা নামিয়া
উপল-চপল পায়ে
ঝিরঝির আর কুলু-কুলু রবে
ছুটেছে গ্রামের গায়ে।'
(রবীন্দ্রনাথ : রাজহংস : সজনীকান্ত দাস)

মরমী মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁর গৌরব হিমালয়ের হিমশৃঙ্গের তুল্য, তাঁকে আমার বিষয় থেকে সরিয়ে রাখলাম। যিনি আমার জীবন-ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে গ্রামের নদীটির মত বহমান তিনিই আমার আলোচনার বিষয়। তাও আমি তাঁর মাত্র একটি অংশ বেছে নিয়েছি। যে রবীন্দ্রনাথ পল্লী-বাংলার মানুষ ছিলেন, পল্লী-বাংলার মানুষের কথা, সমাজের কথা, প্রকৃতির কথা ভেবেছেন বর্তমান বক্তৃতামালায় তিনিই আমার আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী এই বিষয়েই আমি তিনটি বক্তৃতা করব। বক্তৃতার বিষয়গুলি হল—রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীবাসী, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসমাজ, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী-প্রকৃতি।

আমার আজকের বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। শেষ করার পূর্বে একথা বলি যে, আমি যে দুই রবীন্দ্রনাথের দুই মূর্তি এখানে আলোচনার মধ্যে উপস্থাপন করেছি তাঁরা একই ব্যক্তি, আদৌ ভিন্ন নহেন। একই মূর্তির দুই প্রকাশ মাত্র।

আপনি, যিনি শেষ রাত্রে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করে এসে শান্তিনিকেতনের মৃত্তিকায় আপনার গৃহাঙ্গনের পাশে বড় ছায়াচ্ছন্ন গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে গাছটির ঊর্ধ্বলোকে প্রসারিত শাখাবাহুর অবকাশে শান্ত ও নবীনচিত্তে পূর্বাচলগামী শুকতারাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন নিঃসীম নির্জনতা ও অপরিমেয় নিস্তব্ধতার পটভূমিতে, তিনিই তো আবার দুঘণ্টা পরে কলকাতা-প্রত্যাগত বন্ধুকে প্রভাতী চায়ের টেবিলে অভ্যর্থনা জানান! তাতে তো আপনার শেষরাত্রির সেই নির্জন ও গোপন নম্র আকাঙ্ক্ষার মিথ্যা হয়ে যায় না।

এখানকার মাটিতে এসে দাঁড়ালে এখানকার আকাশে-বাতাসে মৃত্তিকায় সেই আশ্চর্য সুমহৎ সাধনাকেও যেমন আপনার অজ্ঞাতেই আমি স্পর্শ করি তেমনি, এই অঞ্চলের মানুষ বলে, একথা কখনও ভুলতে পারি না যে, মহাকবি আমাদেরই মৃত্তিকার এপাশে জয়দেব ওপাশে চণ্ডীদাসকে রেখে তাঁর সাধনার আসন পেতেছিলেন। এবং তাঁর বৃহৎ সাধনার মধ্যে পল্লীর মানুষের সুখ-দুঃখও একটি বিশেষ স্থান জুড়ে ছিল। সেই কারণেই আমার এই বিষয় নির্বাচন। এই মাটির মানুষ হয়ে আমি সেকথা ভুলি কি করে? (ক্রমশঃ)

[বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে শান্তিনিকেতনে গত ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ তারিখে নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতামালার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রদত্ত বক্তৃতা]

মিহির আচার্য

পাথেয়

খবর কাগজে সংক্ষিপ্ত একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল :

'মহৎপ্রাণ উদারচরিত্র যুবক চাই যিনি আমার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া দরিদ্র পিতাকে দায়ভার হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। কন্যা বি-এ ফেল। গৃহ-কর্মে নিপুণা। কোনোরূপ যৌতুক দিবার সামর্থ্য নাই।'

বিজ্ঞাপনটা এমন নতুন ধরনের যে, ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা নোটবুকে লিখে রাখলাম। আমি সম্প্রতি বেকার মানুষ। আগে একটা কারখানায় কাজ করতাম। সেটা উঠে গেছে। তারপর কয়েক বছর ধরে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে যাচ্ছি। বি-এ পাশ করা ছিল। তারই দৌলতে এবেলা-ওবেলা দুটো টুইশান। কোনোরকমে মেসের খরচ চলে যায়।

বিকেলে রুমমেট বিকাশ এলে ওকে বিষয়টা বললাম।

বিকাশ হেসে বলল : 'তোমারি যতসব চোখে পড়ে। ভদ্রলোক হয় পাগল অথবা মেয়েটি নষ্টচরিত্র।'

আমার সরলতাকে ও দস্তুরমতন ব্যঙ্গ করল।

বললাম : 'না দ্যাখো, সবসময়ে মানুষকে অত খারাপ ভাবা ঠিক নয়।'

বিকাশ বলল : 'তাই বুঝি? তা শুনি, তুমি এক্ষেত্রে কী করতে চাও? মেয়েটাকে উদ্ধার করবে?'

বললাম : 'ঘটনাটা ভালো করে জেনে......'

'ধরো জানলে। তারপর কী করবে?'

'না, ভাবছিলাম......'

বিকাশ বলল : 'দ্যাখো আমরা কেউ মহৎপ্রাণও নই, উদারচরিত্রও নই। ওসব হতে গেলে রেস্ত দরকার।'

বললাম : 'তবু একদিন যাওয়া যাক। দেখিনা ব্যাপারটা কী।'

বিকাশ বলল : 'নির্দোষ কৌতূহল?'

হেসে বললাম : 'ধরো তাই।'

'......পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে 'সিঁদুর—' বিকাশও হাসল।

বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়বার পর থেকে নিজের ভেতরে কেমন একটা অস্বাভাবিক উন্মাদনা লক্ষ্য করছিলাম। হয়তো আমি অতিরিক্ত ব্যস্ত মানুষ নই বলে আমার শূন্য অবসরগুলো এমন ভরে থাকছে। কিংবা সারাজীবন সাদামাটা দারিদ্র্যের মধ্যে আমার বাস বলে সৌখিকতার প্রতি আমার মনোযোগ রয়েছে। দারিদ্র্যের ছায়া আমার কাছে পরিচ্ছন্ন।

বিকাশ বলল : 'যেতে চাও চলো একদিন ঘুরে আসি। কিন্তু ভাবছি আমাদের এই কৌতূহল না ওই পরিবারের প্রতি একটা অপমানের ব্যাপার হয়। আমরা যদি সমাধান কিছু করতে না পারি তাহলে অনর্থক ওঁদের লজ্জায় ফেলি কেন? আর বাংলা মধ্যবিত্তের এই দারিদ্র্যের ঘটনাটা তো গৌরবের নয়।'

বললাম : 'তা ঠিক।'

'এই ভদ্রলোক সাহস করে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন বলেই আমরা জানতে পেরেছি। যাঁদের সাহস নেই......'

বললাম : 'এই সাহসটার জন্যেই আকর্ষণ বোধ করছি।'

বিকাশ বলল : 'সাহসের মোকাবেলা সাহস দিয়ে করতে হয়।'

'দরকার হলে......'

'তুমি করবে?'

আমি হাসলাম।

বিকাশ বলল : 'খোঁড়া মানুষও পাহাড় ডিঙোবার স্বপ্ন দ্যাখে। ঠিক আছে চলো।'

(২)

এক ছুটির দিনে সোদপুর কলোনিতে খোঁজ করে অবশেষে ঘর্মাক্ত অবস্থায় রামরমণ চক্রবর্তীর বাড়ির নাগাল পেলাম। বাড়ি না বলে পর্ণকুটির বলা যেতে পারে। হেঁট না হলে দাওয়ায় ওঠা যায় না।

'রামরমণবাবু আছেন?'

'কে?'

'রামরমণবাবু—'

খালি গা ময়লা পৈতে প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

'কাকে চাই?'

'রামরমণবাবু—'

'হ্যাঁ আমিই।'

'আমরা কলকাতা থেকে আসছি।' বিকাশ বলল : 'আপনার সঙ্গে কথা ছিল।'

'ভেতরে আসুন। ঘরটা বেলাবেলিতেই অন্ধকার হয়ে যায়। আপনাদের কষ্ট হবে। বুঝতেই পারছেন আমরা গরিব।'

বিকাশ বলল : 'আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

আমরা চাটাইয়ের ওপর বসে পড়লাম। গোরস্থানের মতো নির্জনতা। আমরা কেউই সাহস করে নীরবতা ভাঙতে পারছি না। আমার দারিদ্র্য-সহা চোখেও তেমন স্বস্তি পাচ্ছি না।

রামরমণ ভাঙা গলায় বললেন : 'আপনাদের তো চিনতে পারছি না।'

বিকাশ বলল : 'না, আমরা পূর্ব-পরিচিত নই। তাহলে হয়তো এখানে আসবারও দরকার হত না।'

রামরমণ বললেন, 'তাহলে আপনাদের আসার উদ্দেশ্য?'

বিকাশ গম্ভীর গলায় বলল : 'কাগজে আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন?'

রামরমণ মাথা নাড়লেন।

বিকাশ বলল : 'আপনার বিজ্ঞাপনের কোনো সাড়া পেয়েছেন?'

রামরমণ বললেন, 'এই তো সবে বেরুল—'

'আপনি কী মনে করেন কোনো সাড়া পাবেন? মনে করেন এতে লাভ হবে?'

রামরমণ বললেন : 'কাগজ ছাড়া বেশির ভাগ লোককে আর কীভাবে জানাব? গরজ যখন আমার......'

বিকাশ বলল : 'অক্ষমতাকে প্রচার করে এসকল ক্ষেত্রে কী কোনো লাভ হয় রামরমণবাবু? এ দেশে মেয়ের বাবাকে যে কোনো প্রকারে সক্ষম হতে হয়। অক্ষমতাকে লুকোতে হয়।'

রামরমণ নীচু গলায় বললেন, 'আমার সাতটি ছেলেমেয়ে। টুনি আমার মেজ মেয়ে। কষ্ট করে বি-এ পড়েছিল। তিনবার ফেল করে আর পড়তে চায় না। বলেছে চাকরি করবে। কিন্তু কোথায় চাকরি? সক্ষম-সমর্থ পুরুষ ছেলেরাই হন্যে হয়ে ঘুরছে। তা নয়, আসল উদ্দেশ্য বুড়ো বাপকে সাহায্য করা। জন্ম দিয়েছি তো, তাই জন্ম-দাতার ঋণ শোধ করতে চায় আর কী।'

বললাম : 'আপনার মেয়ে তো উচিত পথই বেছে নিয়েছে।'

রামরমণ বললেন, 'বাবারা তোমরা তো যুবতী মেয়ের বাপ হওনি, বুঝতে পারবে না। তুমি বলছি কিছু মনে কোরো না। উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আসার পর থেকে কখন বুড়ো হয়ে গেলাম। কাটাকাপড়ের দোকান, তাও চলে না। মহাজনের দেনা বাড়ছে, ধারে আর কাপড় দেয় না। আটটি প্রাণীর মুখে অন্ন দেবার দায়িত্ব আমার। যেহেতু লোকে এদের 'রামরমণের সংসার' বলে। তা' আমিই যেখানে হিমশিম খাচ্ছি সেখানে টুনি, এই একফোঁটা মেয়ে, কতটুকু পারবে? আমরা তিলে তিলে মরছি, টুনিকে তো মরতে দিতে পারি না। তাই ওকে এই অভিশাপের হাত থেকে বাঁচাতে চাই। ওর নতুন একটা সংসার হোক। ও ভাল থাক, ও সুখী হোক......'

আমি রামরমণবাবুর দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

বিকাশ হঠাৎ রূঢ় গলায় বলল : 'আপনি কি সুখের চেহারা দেখেছেন?'

'কী বলছ বাবা?' রামরমণ যেন শুনতে পেলেন না।

'যাঁর কাছে সুখের কোনো ধারণা নেই তিনি অন্য লোকের সুখের কামনা করতে পারেন না। এ যেন একটা ভিখারির 'বাবা, রাজা হও' বলে মিথ্যা শুভেচ্ছা জানানো!'

'কী বলছ বাবা?'

বলছি : 'আপনি কী সারাজীবনে কখনো সুখকে পেয়েছেন? জানি না ওপারে আপনার অবস্থা কী ছিল? আমাদের মতো মানুষের কাছে সুখের চেহারাটা কল্পিত। ও কোনোদিনই আমাদের নাগালে আসেনি। আপনি জানেন, আপনার মতোই আপনার টুনি কোনোদিন সুখকে পাবে না।'

রামরমণ মাথা দুলিয়ে বললেন, 'তোমার কথাগুলো রূঢ় হলেও তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হয়।'

বিকাশ বলল : 'জীবনটা কী ঠাকুরমার ঝুলির গল্প যে আপনি মনে করেন রাজ-পুত্তুর এসে ঘুঁটেকুড়ানী কন্যাকে বরণ করে রাজপুরীতে নিয়ে যাবে? আপনি কী একালেও অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করেন?'

রামরমণ বললেন, 'মহৎপ্রাণ উদারচরিত্র যুবক কী একালে নেই?'

বিকাশ হাসল। 'আছে। যেমন আমি। যেমন আমার বন্ধু সুকুমার। তাতে কী হল? আমাদের মহৎ প্রাণ সত্ত্বেও আপনার সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হচ্ছে না। আমি একটা বইয়ের দোকানে ফেরি করে কিছু কমিশন পাই। সুকুমারের টিউশনি ভরসা। আমরা আমাদের মহত্ত্ব নিয়ে কোন্ কাজে লাগব?'

রামরমণবাবু চুপ করে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

বিকাশ বলল : 'দারিদ্র্য আপনার ব্যক্তি-গত কিছু সমস্যা নয়। দেখছেন আমরাও তাই। আপনার আবেদনে আমরা ছুটে এসেছি, কিন্তু কোনো কাজে লাগছি না। আর, আপনিও হয়তো ভাবতে পারেননি এমনটি ঘটতে পারে। হলপ করে বলতে পারি আমাদের দুজনের কাউকেই আপনি মেয়ে দেবেন না।......আপনি আশা করছেন উপযুক্ত লোকজনের কোনো যুবক করুণার মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়ে আপনার কন্যাকে গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন। তার মানে বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে আপনার চেতনা আপনাকে বিভ্রান্ত করেছে। আপনি নিজের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে অজানা একটা পরি-বেশ সম্পর্কে মোহগ্রস্ত হচ্ছেন। যা একজন মানুষ হিসেবে আপনাকে মানায় না।'

রামরমণ বললেন, 'আমি আর কী করতে পারি, বাবা?'

বিকাশ বলল : 'আপনার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা তো আলাদা কোনো সমস্যা নয় রামরমণবাবু। আপনার, আমার, অন্যের সমস্তটা পারিবারিক দারিদ্র্যেরই অংশ। আলাদা সেটাকে তুলে নিয়ে দেখছেন কেন?'

'আমি টুনির দিক থেকে ভাবছিলাম বিষয়টাকে।' রামরমণ আস্তে বললেন : 'এখানে আধপেটা খেয়ে কষ্ট হবার চেয়ে যদি কোথাও দুবেলা দু মুঠো খেয়ে বাঁচতে পারে......'

'টুনি কি সেসব কথা বলেছে আপনাকে?'

'না না, তা বলবে কেন। ও তেমন মেয়ে নয়।'

বিকাশ বলল : 'উনি আপনার মেয়ে, ও কী সংসার সম্পর্কে কিছু বোঝে না? হয়তো আপনার চেয়েও বেশি বোঝে। বিয়ে দিতে না-পারার জন্য অক্ষম বাবাকে সে অভিযুক্ত করবে না! কে বলতে পারে, সংসারের চেহারা দেখে জীবনধারণের প্রক্রিয়াগুলো এতদিনে সে মেনে নেয়নি! এটা বঞ্চনা আছে ঠিকই। আমারও আছে। তার জন্যে সন্ধি করি না। বঞ্চনার আগুনটা সতেজে জ্বালিয়ে রাখতে চাই। অভাববোধটা ভুলে গেলে তো আমরা আর একমুহূর্তও বেঁচে থাকি না।'

বাইরে বিকেলের আলো নিভে এসেছিল।

ভেতরের উঠোন থেকে হাতে কাপের পট নিয়ে ঘুরে শাড়ি-পরা ফর্সা মেয়েটা ঘরে পা দিতে আমরা স্থির হয়ে গেলাম।

রামরতন বললেন, 'এই আমার মেয়ে, টুনি।'

বিকাশ বলল : 'আমার চা কেন!'

টুনি বলল : 'আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন শুনে মা পাঠিয়ে দিলেন।'

রামরতন বললেন : 'বোসো মা। তোমার জন্যেই এঁরা কলকাতা থেকে কষ্ট করে এসেছেন।'

টুনি জড়সড় হয়ে বসে পড়ল। ওর মুখে লজ্জার কোনো ছায়া নেই।

আমরা কী বলব ভেবে হাতড়াতে লাগলাম।

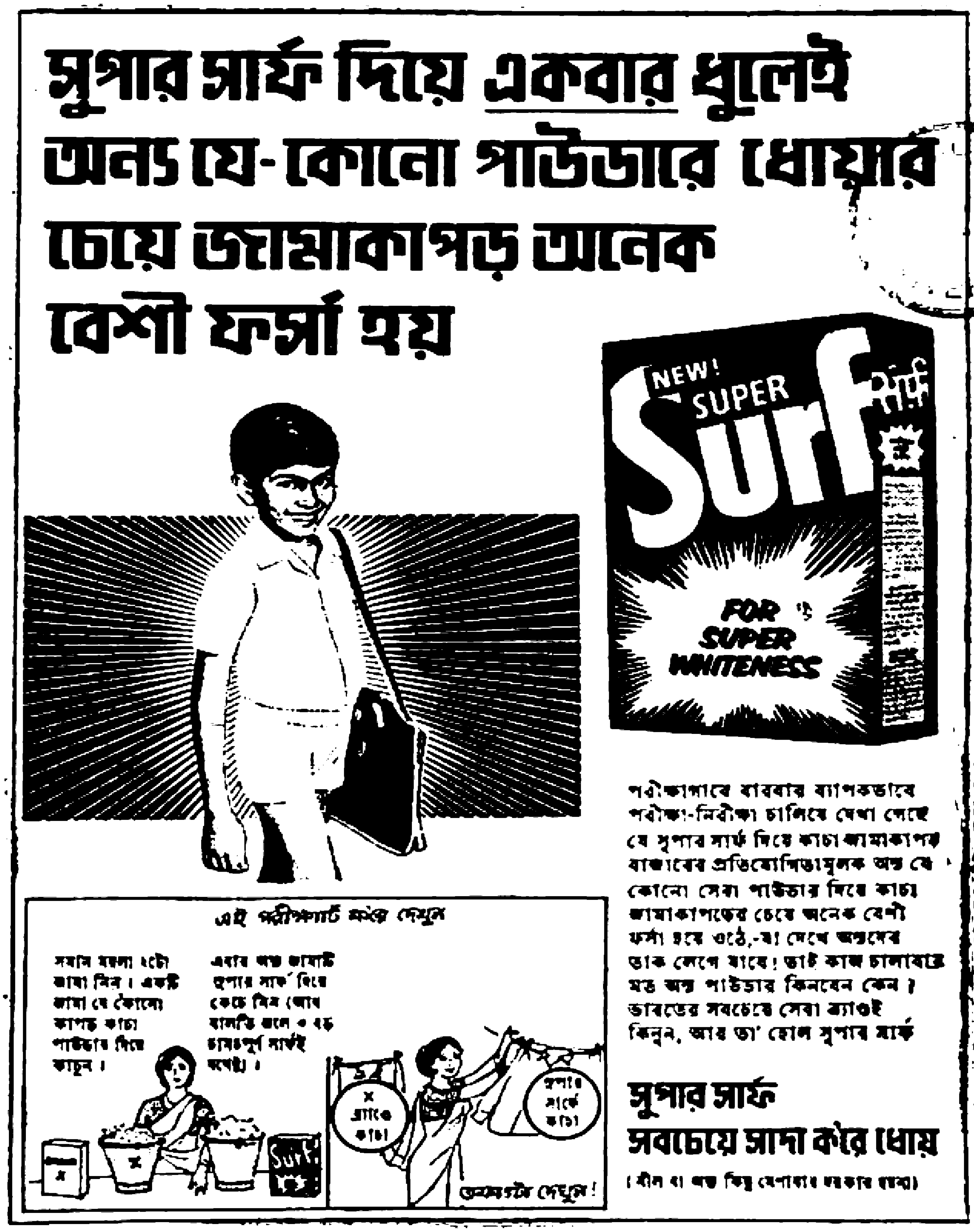

লিনটাস-SU. 115-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন.

রামরমণবাবু বললেন : 'তোমরা কথা বলো আমি একটু আসছি।'

রামরমণবাবু আমাদের অপ্রস্তুত করে বেরিয়ে গেলেন।

উনি চোখ তুলে আস্তে বলল : 'আড়াল থেকে আমি আপনাদের সব কথা শুনেছি।'

বিকাশ একটু নড়ে বসল।

উনি বলল : বাবা আমাদের না-জানিয়ে এইভাবে কাগজে......'

আমরা চুপ করে রইলাম।

উনি আবার বলল : 'বাবাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না। পুরনো আমলের মানুষ, আমাকে বিয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। আমার বয়েস কুড়ি। বাবা মাকে বিয়ে করেন মার বারো বছর বয়সে। বাবা এর বেশি আর কিছু ভাবতে পারেন না। আপনারাই বলুন আমার চাকরি করতে চাওয়াটা কী অন্যায় জেদ? বিয়ে না-করে কী মেয়েরা থাকতে পারে না? আমার ছোট পিসি ষোল বছর বয়েসে বিধবা হয়েছেন। উনি তারপরও বেঁচে আছেন তো।'

বিকাশ বলল : 'এই দুর্দিনে চাকরি কোথায়?'

উনি বলল : 'কেন? ট্রেনে ধূপ বিক্রি করব। আমাদের পাড়ার অনেকেই তো করছে।'

বিকাশ বলল : 'তুমি কি পারবে? ভয় করবে না?'

উনি হাসল। 'ভয় কী বাড়িতেও কম? বি-এ ফেল সার্টিফিকেটটা আমার মাস কাটাতে পক্ষে কম আকর্ষণীয় হবে না। আপনারা কী বলেন?'

বিকাশ হাসল। 'না, ওসব স্টান্ট পুরনো হয়ে গেছে। এদেশে এম-এ পাশ ছেলে বেকারায় চাকরির জন্যে মরুখাস্ত করলে কেউ অবাক হয় না।'

উনি বলল : 'আপনারা একটু বাবাকে বুঝিয়ে বলুন। উনি শুনবেন।'

বিকাশ বলল : 'দেখি চেষ্টা করে। কিন্তু উনি, সত্যিই কী তোমার মনে কোনো সংশয় নেই?'

'কিসের? ও বুঝেছি। দেখুন আমি বিয়ের ব্যাপারটা যে বুঝি না তা নয়। মাকে দেখেই বুঝেছি। বিয়ে না করলে মা কী এর চেয়ে দুঃখে থাকতেন? ওঁরা পুরনো কালের মানুষ ওঁদের কাছে দুঃখ-সুখের কোনো দাম নেই, বিয়ে করাটা পবিত্র ধর্ম।'

বিকাশ বলল : 'তুমি অনেক ভাবো দেখছি।'

'আমাকে লজ্জা দেবেন না।' উনি ছোট্ট করে বলল। 'এমনিতে সকলের চোখে মেয়ে হয়ে ওঠার বস্তে কুণ্ঠার মধ্যে আছি। মা-ই বাবার সঙ্গে নিত্য ঝগড়া করে আমাকে এই অস্বস্তির অবস্থায় ফেলেছেন। মার বিয়ে করে কী দশটা হাত বেরিয়েছে, আমাকেও সেই অবস্থায় না ফেলতে পারলে মার চোখে ঘুম নেই।'

'একেবারে হাল ছেড়ে দিলে কেন? আবার তো পরীক্ষায় বসতে পারতে?'

'এই যে বললেন ওসব স্টান্টের কোনো দাম নেই!' উনি হাসল : না, পরীক্ষা-টরীক্ষা আমি দিতে পারব না। আমার মাথাই নেই।'

বিকাশ বলল : 'তোমার আর ভাই-বোন কটি?'

উনি বলল : 'বাবা বলেন নি? আমরা সাত ভাইবোন।'

'তুমি বড়?'

'না, আমি মেজ। দিদি আমার আগে মারা গেছেন। আমার পরের সব ভাই। কী, অমন করে চেয়ে আছেন কেন? বাবাকে যত বুড়ো মনে করছেন তত নন।'

'তোমার ভাইদের দেখছি না তো?'

'আছে এদিক-সেদিক। বাড়িতে থাকলে তো হাট বসিয়ে বসবে।'

'তুমি ওদের দেখতে পারো না মনে হচ্ছে।' বিকাশ হাসল।

উনি বলল : 'আপনার বুঝি ভাইবোন নেই? ভাইবোন না থাকা যে কী বিশ্রী আপনি কী করে বুঝবেন? ছোটরা তো সব আমার কাছেই মানুষ।'

বিকাশ বলল : 'না, আমার সে-উৎপাত নেই। বুড়ি পিসি আছে দেশে। মাসে কুড়ি টাকা করে পাঠাই। তারপর ছুটি।'

'আহা, আপনার মাও নেই?'

'না। সেসব থাক। রামরমণবাবু গেলেন কোথায়? আমাদের এবার উঠতে হয়।'

উনি বলল : 'বাবা আসবেন। আর তো কোনোদিন আসবেন না। একটু বসুন। উনি আপনার বন্ধু?'

বিকাশ বলল : 'হ্যাঁ। সুকুমার।'

'ওঁর সঙ্গে আলাপ হল না।'

এতক্ষণ একটা বিমর্ষ নাটকের দৃশ্য চোখের সামনে দেখছিলাম। হঠাৎ আমাকে অপ্রস্তুত হয়ে সেই নাটকে অংশ নিতে হবে, কে জানত। মঞ্চে দাঁড়িয়ে অর্বাচীন শিল্পীর যে দুর্বল মানসিক অবস্থা হয়, আমারও তাই হল। সম্মুখে অগণিত দর্শকের চোখ, মঞ্চে ঠিকরে-পড়া আলো, আমি আড়ালে পালাবার মতো কোনো পথ খুঁজে পেলাম না।

ম্লান আলোয় আমার সামনে কঠিন তেজের একটি তরুণী মূর্তি। ভাস্করের ছেনিতে প্রতিটি অংশ ধারালো। এই মূর্তির সম্মুখীন হতে আমাকে সাহস সংগ্রহ করতে হল।

'সুকুমারের আগ্রহেই আমাকে আরো আসতে হয়েছে—' বিকাশ বলল।

বন্ধুর এই বিশ্বাসঘাতকতায় আমার কর্ণমূল লাল হয়ে উঠল। আমি অস্পষ্ট কী উত্তর করলাম নিজেই বুঝতে পারলাম না। আমার কষ্ট হচ্ছিল। বোধকরি অসহায় কিশোরের মতো একটা কান্না আমাকে অস্থির করছিল। এবং আমি একটা পুরুষ, এই অহংকার আমাকে দীর্ণ করছিল। এই মুহূর্তে আমি বিরাট শক্তিমান কিছু হয়ে উঠতে চাইছিলাম। অন্তত উনির কাছে বিশ্বাসযোগ্য একটা শক্তির প্রদর্শনী হয়ে উঠতে।

কিন্তু কিছুই আমি পারলাম না। একটা সূতীব্র হিংসা নিমেষে আমাকে দগ্ধ করতে লাগল।

'তাহলে আপনি নন, সুকুমারবাবুই...' উনির কণ্ঠে বিস্ময় নয়, শ্রদ্ধা নয়, মনে হল তামাশা।

আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

বিকাশ বলল, 'যোগ্যতায় হিসেবে সুকুমার অবশ্য কম যায় না। সে বি-এ পাশ। আজ না হয় কাল একটা কিছু করতে পারবেই।'

'না।' আমার উত্তেজিত চিৎকারে আমি নিজেই চমকে উঠলাম। 'মিথ্যে কথা। আমি কিছুই পারি না। আমরা কিছুই পারি না। মিথ্যা আশা পোষণ করতেও আমার ঘৃণা হয়।'

'সুকুমার!' বিকাশ বাধা দিতে চাইল।

'চারপাশের কঠিন জীবনটাকে ভোলবার চেষ্টা করে আমরা মিথ্যা আস্ফালন করি। মনে করি : পারব। এই পারবার বাহাদুরিটাই আমাদের মানুষ বলে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে।' আমি দারুণ কাঁপছিলাম। আমার যন্ত্রণা হচ্ছিল। কিশোর বয়েসে স্কুলের খেলায় হাইজাম্পের বাঁশটা ডিঙোবার বারবার চেষ্টা আমাকে আহাম্মক করে তুলেছিল।

বিকাশ ইতস্তত করে বলল : 'রাম-রমণবাবু এখানে ফিরলেন না।'

উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল : 'আপনার কথাগুলো হতাশের মতো শোনায়। আমাদের ভবিষ্যতও যদি না থাকে তাহলে কী জন্যে বাঁচব।'

বললাম : 'বাঁচার বিকল্প আর কিছু নেই বলে বেঁচে আছি। মরতে চাইলে তো মরা যায় না।'

উনি বলল : 'এমন অসহায় অন্ধকারকে আঁকড়ে বেঁচে-থাকা...? নিশ্চয়ই চিরকাল এমন থাকতে পারে না। একটা কিছু হবে, হতেই হবে। আমাদেরই পথ খুঁজে বার করতে হবে।'

বললাম : 'খুঁজুন। পথ পেলে আমাকে ডাকবেন।'

রামরমণবাবু কুঁজো হয়ে ঘরে ঢুকলেন।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। হাত তুলে নমস্কার করলাম।

রামরমণ অস্ফুটে বললেন, 'তোমাদের মঙ্গল হোক।'

আমরা বেরিয়ে এলাম।

ফেরার পথে আমরা দুজনেই মূক।

বিকাশের মতো আমারও হয়তো একই কথা মনে হচ্ছিল আজকের এই অভিজ্ঞতার আঘাত অজানতেই উভয়ের মধ্যে একটা আড়ষ্টতা রচনা করে দিয়েছে। এর পর সম্ভবত আমরা দুজনেই অনাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করব।

(৩)

পর পর কয়েকটি মাস আমার মাথায় যেন বজ্রপাত শুরু হল। বিকেলের টিউশনিটি হাতছাড়া হল। ছাত্র ফেল করেছে। অভিভাবক বিদায় করে দিলেন। তার অর্থ : আমার সামান্য রোজগারের থেকে তিশ টাকা কমলো। আমি হন্যে হয়ে রোজগারের ধান্ধায় ঘুরতে শুরু করলাম। এই দুঃসময়ে একদিন বিকাশ নিঃশব্দে মেস ছেড়ে অন্য কোথায় উঠে গেল। টাকার অভাবে মিল বন্ধ হল। মেসের সিটটাও বোধহয় আর রাখা যাবে না। দিনে রাতে পাইস হোটেলে রুটি-তরকারি সংগ্রহ করবার সামর্থ্যও রইল না। অর্ধাহার, অনাহারে আমি কী করব বুঝতে পারলাম না।

তারপর একদিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মে অদ্ভুত অবস্থায় ফুটপাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরল হাসপাতালের ফ্রি বেডে।

আস্তে আস্তে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার চেতনা হল। পাশের বেডের প্রৌঢ়ই বললেন, আমাকে নিয়ে ডাক্তার-নার্সের উদ্বেগের পরিসীমা নেই। ব্যাধি নাকি ডাক্তারি শাস্ত্রে ধরতে পারা যায়নি। কাজেই আরো কয়েকদিন আমাকে পরীক্ষাধীন থাকতে হবে।

প্রৌঢ় রুগ্নার মতো হেসে জিগেস করলেন : 'কী হয়েছিল ভাই তোমার? কালাকাটা ডিজিজ নয় তো?'

বিস্মিত হয়ে বললাম : 'কালাকাটা...?'

টেবিলে রুটি-দুধ দিয়ে গেল।

প্রৌঢ় বললেন, 'যে কদিন হাসপাতালে থাকা যায়। বাড়ি ফিরে তো সেই ছেলে-বউয়ের হাতকাড়া...? তোমার নিশ্চয় সেসব বালাই নেই?'

বললাম : 'না।'

'আগেই বুঝেছি। ঘাবড়ে যেওনা ভাই, পরীক্ষানিরীক্ষা হোক, অবশ্য একদিন খালাস করে দেবে। দিক। আরো হাস-পাতাল আছে, এখানে সেখানে করে কয়েকটা মাস দিব্যি কাটিয়ে দেয়া যায়।'

বিরক্ত হয়ে বললাম : 'আমাকে হাস-পাতালে কে নিয়ে এল?'

প্রৌঢ় বললেন, 'ভগবান ছাড়া আর কে আনবে? চাকরি যখন দেশে নেই তখন হাসপাতালের আরো বেড বাড়ালে তো ওরা পারে!'

রসিক ভদ্রলোক সেদিন রাত্রেই হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন। পরদিন হাসপাতাল থেকে আমার ছুটি হয়ে গেল।

মেসে ফিরে দেখলাম আমার বেডপোর্টটি বেদখল হয়েছে। আমার ময়লা কণ্টকশয্যা আর টিনের তোবড়ানো সুটকেসটা চাকরের ঘরে মজুত ছিল। আমি ইচ্ছে করলেই ফেরত নিয়ে যেতে পারি।

চোখের সামনেই দেখলাম আমূল আমার জীবনের একটা রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে কালি, শির-বার-করা হাত। পরনে পরিত্যক্ত মিলিটারির খাকি প্যান্ট-শার্ট, ক্যাম্বিসের জুতো। গলা থেকে কোমর পর্যন্ত আমার পোশাকের গায়ে-সাঁটা কোথাও সেফটিপিন, শিশুদের প্লাস্টিকের খেলনা, পুতুল-ঝুমঝুমি, লাল সবুজ চশমা, সুঁচ, ব্যাগে ছোটখাটো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। লোকাল ট্রেনের কামরায়-কামরায় আমার অক্লান্ত ফেরি।

সেদিন বনগাঁ লোকাল ধরেছিলাম। এ-লাইনে আমার নতুন। কিছু কিছু বিক্রিও হচ্ছিল।

দরজার হ্যান্ডেল ধরে পাশের কামরায় পা দিয়েছি হঠাৎ চন্দনধূপের গন্ধে নাসারন্ধ্র ভরে গেল। জন্মান্তরের দুঃস্বপ্নের বেদনা সহসা আমাকে যেন বিদ্ধ করে তুলল।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছি। মাঝখানের বেঞ্চের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালাম। ধূপের গন্ধ নির্ভুল এদিকেই হেঁটে আসছে। 'ধূপ নেবেন, চন্দন ধূপ...' কাঁধে কাপড়ের থলে, রোদে ঘামে কালো মুখ, ডুরে শাড়ি, লাল জামা।

'টুনি!'

'আপনি।' টুনি হাসল : 'ধূপ নেবেন, ধূপ, চন্দনের গন্ধ...কোম্পানি প্রচারের জন্য নামমাত্র মূল্যে...'

টুনি পাশ কাটিয়ে ওদিকে চলে গেল।

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। ভীষণ ক্লান্ত। 'চিরুণী চাই, সেফটিপিন...' নাঃ আমার গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরুচ্ছে না। গলার ভেতরটা শুকনো কাঠ। বেঞ্চে ভর দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। 'ধূপ নেবেন, ধূপ...'

ট্রেন স্টেশনে নামতেই আমি নিজেকে প্ল্যাটফরমে ঠেলে নামিয়ে দিলাম। ট্রেন চলে যেতে প্ল্যাটফরম খালি হয়ে গেল।

পিছনে গলার স্বরে ফিরে টুনিকে হেঁটে আসতে দেখে চুপ করে প্ল্যাটফরমে বসে রইলাম।

টুনি বলল : 'আপনাকে নামতে দেখে এই গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। কতদিন পরে দেখা! ভগবান যে কখন কার সঙ্গে মিলিয়ে দেন।'

নিশ্বাস ফেলে বললাম : 'ভগবান!'

টুনি বলল : 'ভেবেছিলাম আবার দেখা হবে। বিকাশবাবু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসেন। আপনি তো এলেন না?'

'বিকাশ? না, বিকাশের সঙ্গে আমার দেখা হয় না।'

'জানি। বিকাশবাবু সব বলেছেন।'

'কী বলেছে?'

টুনি হাসল। 'আমিই এর জন্যে দায়ী। আপনাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়েছে আমার জন্যে।'

বললাম : 'না।'

টুনি বলল : 'বিকাশবাবুরও তাই ধারণা।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'আপনার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে...' টুনি বলল : 'অসুখ করেছিল?'

কঠিন হয়ে বললাম : 'অনর্থক এসব কথা বলে আপনার আজকের রোজগারের ক্ষতি করা কী ভালো হচ্ছে?'

টুনি আস্তে বলল : 'অনেকদিন পর দেখা হয়ে গেল। চলুন না আজ আমাদের বাড়ি। বাবা খুব খুশি হবেন।'

বললাম : 'কেন?'

টুনি বলল : 'আমি যেতে বলছি, তাই।'

বললাম : 'আমি বিকাশ নই।'

টুনি বলল : 'সেজন্যেই তো বলছি। গেলে আমি খুব খুশি হব। তাছাড়া— আর একটা জরুরি পরামর্শ ছিল আপনার সঙ্গে।'

শুকনো হেসে বললাম : 'বিকাশ আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এই তো?'

টুনির ঠোঁট কেঁপে উঠল। মাথা নিচু করে বলল : 'হ্যাঁ।'

বললাম : 'ভালোই তো। ও কষ্টে দুমুঠো খেতে দিতে পারবে।'

টুনি বলল : 'হ্যাঁ। ওঁর নিজের বইয়ের দোকান হয়েছে।'

বললাম : 'এ-ব্যাপারে আমার কী করার আছে?'

হঠাৎ টুনির দিকে ফিরে অকাতে গিয়ে আমার প্রচণ্ড বিরোধিতা যেন ধাক্কা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। নগ্ন প্ল্যাটফরম গ্রীষ্মে দাউ দাউ করে জ্বলছে। পায়ের নিচের পাথর জ্বলে ঝামা হয়ে গেছে। ঘামে দরদর করে নাইছে টুনি। ওর চোখ ঝাপসা।

'টুনি, কী হয়েছে তোমার?'

'না, কিছু না।'

'টুনি।'

টুনি অস্ফুটে কী বলল।

আমি নিশ্বাস ফেললাম। জীবনের নাটক কী কোনোদিন শেষ হবে না।

'চলো। ট্রেন আসছে।'

টুনি আঁচলে চোখ মুছে আমার সঙ্গে এগিয়ে চলল।

CENTRAL LIBRARY

লাইপ্‌ৎসিক বিশ্বমেলা

পৃথিবীর সকল পথ একদা রোমে এসে মিশেছিল কিনা এ-বিষয়ে হয়ত অনেকের মনেই সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত দেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল পথই যে গণতান্ত্রিক জার্মানীর লাইপ্‌ৎসিক বিশ্বমেলার প্রাঙ্গণে এসে মিশেছে সে বিষয়ে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। লাইপ্‌ৎসিক বিশ্বমেলা সারা বিশ্বের শিল্প সংস্থা, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিকট আজ একটি সুপরিচিত নাম। কারণ—

> "The Leipzig fair means the biggest business — in the shortest time — in the smallest space — and with the smallest expenditure".

লাইপ্‌ৎসিক বিশ্বমেলার প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময় ও ঘটনাবহুল। যতদূর জানা যায়, প্রায় সাড়ে আটশো বছর আগে এই মেলার অস্তিত্ব ছিল। ১১৬৫ খৃঃ মাইজেন-এর মারগ্রেভ অটোর ঘোষণাপত্রে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে—'লাইপ্‌ৎসিক শহরের দুই কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে যেন কোন মেলা অনুষ্ঠিত না হয়।' অনেকের ধারণা শহরের সৌন্দর্যহানি ঘটতে পারে এরূপ আশঙ্কা করেই তিনি উক্ত আদেশ প্রচার করেছিলেন। কাজেই এই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র থেকে লাইপ্‌ৎসিক শহর ও মেলার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

অবশ্য প্রথম দিকে লাইপৎসিক মেলার জনপ্রিয়তা শুধু মাত্র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১২৬৮ খৃঃ ডিয়েট্রিখ্‌ ফন্‌ ল্যান্ডসবার্গ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিলে ক্রমে ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরাও এই মেলায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন। তা ছাড়া লাইপ্‌ৎসিক-এর গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানও স্থানীয় মেলাকে জনপ্রিয় হতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছিল। মানচিত্র খুললেই দেখা যাবে লাইপ্‌ৎসিক একেবারে ইউরোপের মধ্যভাগে দুটি প্রধান মহাদেশীয় বাণিজ্য পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এই দুটি বাণিজ্যপথের একটি স্পেন থেকে সুদূর রাশিয়া এবং অপরটি উত্তর জার্মানী থেকে ইতালীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

যাই হোক, ফ্রিডরিখ ফন সাখ্‌জেন লাইপ্‌ৎসিক মেলার উন্নতিকল্পে ১৪৫৮ খৃঃ নববর্ষে 'নিউ-ইয়ার্স মার্কেট' নামে আরো একটি নতুন বাজারের উদ্বোধন করেন। ফলে সাবেকী আমলের 'ইস্টার মার্কেট' ও 'মাইকেলমাস মার্কেট'-এর সঙ্গে নতুন-বাজার যুক্ত হওয়ায় মেলার আয়তন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তবে ১৪৯৭ খৃঃ ও ১৫০৭ খৃঃ জার্মান সম্রাটের বিশেষ সনদ বলেই লাইপ্‌ৎসিক জার্মান সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কারণ সম্রাট তাঁর সনদে লাইপৎসিক শহরের ১২০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত শহর ও গ্রামে সর্বপ্রকার মেলা নিষিদ্ধ করে দেন এবং একমাত্র লাইপ্‌ৎসিক শহরেই মেলা অনুষ্ঠিত হবে এরূপ আদেশ জারী করেন। অধিকন্তু সম্রাটের অপর একটি বিশেষ সনদ বলে লাইপ্‌ৎসিক শহর পণ্যদ্রব্য-সম্ভার মজুত করারও একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।

দেবব্রত ঘোষ

ইতিমধ্যে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হওয়ায় ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপ-এর মূল্যবান পশুচর্ম-পরিষ্কর (ফার, মিঙ্ক) প্রস্তুতকারীরা ব্যবসায়িক কারণে লাইপ্‌ৎসিক শহরে বসতি স্থাপন করায় এখানকার মেলা সারা ইউরোপের ফার ব্যবসায়ীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং অদ্যাবধি 'বৃহৎ-লাইপ্‌ৎসিক' পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফার ও মিঙ্ক নির্মাতা। আবার মুদ্রণ-যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায় জার্মানীর বিশিষ্ট পুস্তক ব্যবসায়ীরা তাদের কর্মকেন্দ্র এখানে স্থানান্তরিত করেন ফলে কিছুদিনের মধ্যেই লাইপ্‌ৎসিক 'গ্রন্থনগরী' হিসাবে সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। বর্তমানে এখান থেকে প্রতিদিন দুই লক্ষ পুস্তক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে লাইপৎসিক মেলায় দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির আধিপত্য ও প্রভাব একদিকে যেমন ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে অপরদিকে তেমনি ধনী ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও স্যাক্সন প্রদেশের খনি থেকে সংগৃহীত মূল্যবান খনিজ সম্পদ লাইপৎসিক-এ কেন্দ্রীভূত হওয়ায় মেলার গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা একেবারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে।

অবশ্য লাইপৎসিক মেলার আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে ইউরোপীয় সুকুমার শিল্প, সংগীত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই শহরের অসামান্য অবদানের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। মহাকবি গ্যেটে লাইপৎসিক শহর ও তার মেলার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন—'এই মেলা দেখলেই সারা পৃথিবী দেখার সাধ মিটে যায়।' শিলার-এর বিখ্যাত গীতি-কবিতা 'আনন্দ সংগীত'-এর রচনাস্থল এই লাইপ্‌ৎসিক। আর সুরের গুরু বীটোফেন-এর মৃত্যুঞ্জয়ী সুরের মোহন যাদু স্পর্শে এই আনন্দ-সংগীত-ই আজ বীটোফেন-এর 'নাইনথ সিমফনী' নামে সারা দুনিয়ার সংগীত-প্রেমীদের নিকট সুপরিচিত। যোহান সিবাস্টিয়ান বাখ, রিচার্ড ভাগনার, ফেলিক্স মেন্ডেলসোহন্‌ প্রভৃতি স্বনামধন্য সুরশিল্পীরা এখান থেকেই তাদের বহু বিখ্যাত সংগীত সৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। এছাড়া গটশেড, গেলার্ট, ক্যারোলাইন নিউবার, লেসিং, তুপষ্টক গেভান্ট হাউজ অর্কেস্ট্রা ও সেন্ট টমাস কয়ার ক্লাব-এর নামে লাইপৎসিক-এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

আঠার শতকের প্রথম দশকে রাশিয়ার জার প্রথম পিটার লাইপৎসিক মেলা পরিদর্শনে আসেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় সেকালে এই মেলা ইউরোপের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জগতে কিরূপ প্রাধান্য লাভ করেছিল। আঠার শতকে জার্মান, ফরাসী, ওলন্দাজ, সুইস, ইংরাজ ও স্প্যানীশ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা নিয়মিতভাবে এখানে তাদের বিভিন্নপ্রকার পণ্যদ্রব্য অর্থাৎ নানাপ্রকার সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র, রেশম, পশম, লিনেন, মসলা, কার্পেট, মসলিন, মদ, ধাতুনির্মিত দ্রব্য, কাঁচ ও চীনামাটির সৌখীন দ্রব্য, চন্দন, মেহগনি ও হস্তিদন্ত নির্মিত দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র,

স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকার, মণি-মুক্তা চুনী, হীরা পান্না, জহরৎ প্রভৃতি কেনাবেচা ও বিনিময় করতেন। প্রধানতঃ প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যেই এই ধরণের লেনদেন চলত। ভারতীয় রেশমের প্রচুর চাহিদা ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা ভারতীয় রেশমের লোভে প্রতি বৎসর লাইপৎসিক্ মেলায় এসে উপস্থিত হতেন। এই মেলার পুরোনো রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, একবার দুজন রাশিয়ান বস্ত্র-ব্যবসায়ী এখান থেকে ৫০ টন ভারতীয় রেশম ক্রয় করেছিলেন। যাই হোক, লাইপৎসিক্ মেলায় আজো ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ভারতীয় শিল্প সংস্থা এই মেলায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

লাইপৎসিক্ মেলার অগ্রগতি বহুবার ইউরোপের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ব্যাহত হয়েছে। নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 'মহাদেশীয় অবরোধ' সৃষ্টি করলে লাইপৎসিক্ মেলা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ ইংল্যাণ্ডের যাবতীয় পণ্যদ্রব্যই এই মেলা মারফৎ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজারে প্রেরিত হত। আবার নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের ফলে এই মেলায় কেনাবেচা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু ১৮১৩ খৃঃ লাইপৎসিক্ যুদ্ধের পর অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এরপর উনিশ শতকের প্রারম্ভে রাজনৈতিক কারণে জার্মানী বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে 'শুল্ক প্রাচীর'-এর সৃষ্টি হওয়ায় লাইপৎসিক্ মেলার ব্যবসাবাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ১৮৩৪ খৃঃ নিখিল জার্মান শুল্ক সমিতির মধ্যস্থতায় শুল্কপ্রাচীর অপসারিত হওয়ায় লাইপৎসিক মেলা আবার সারা ইউরোপের তথা প্রাচ্যের ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই মেলায় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কারখানার সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি আসতে শুরু করে। ১৮৯৬ খৃঃ আধুনিক প্রদর্শনী ভবন 'কেয়ার প্যালেস'-এর উদ্বোধন করা হয় আর এই ভবনেই সর্বপ্রথম মেলার কর্মকর্তারা স্ট্যাণ্ডের সাহায্যে বৃত্তাকারে পণ্যদ্রব্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ১৯০৪ খৃঃ বিশেষ কারণে 'নিউইয়ার্স মার্কেট' বন্ধ হয়ে যায় এবং মেলার কার্যনির্বাহক সমিতি বছরে দুবার অর্থাৎ হেমন্ত ও বসন্তকালে মেলা অনুষ্ঠিত হবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই থেকে প্রতি বৎসর মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে লাইপৎসিক্ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ যাবৎ বিদেশে মেলার প্রচারকার্য পরিচালনার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই জনসংযোগ ও সুষ্ঠু প্রচারকার্য, বিজ্ঞাপন এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯১৬ খৃঃ লাইপৎসিক্-এ মেলার কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ খোলা হয়। বর্তমানে পূর্ব জার্মান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথিবীর সব দেশেই এর শাখা অফিস ছড়িয়ে আছে। -৮

১৯১৮ খৃঃ থেকে লাইপৎসিক্-এর প্রযোগিক মেলার শুরু। কিন্তু ১৯২৯ খৃঃ হেমন্তকালে সারা পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়ায় লাইপৎসিক্ মেলার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। তারপর দ্বিতীয়বার মহাযুদ্ধ শুরু হলে রাইখ্ ফ্যুরেরার-এর আদেশে মেলার প্রদর্শনী ভবনগুলি সামরিক অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত হয়। তবুও এই দুর্দিনের মধ্যে ১৯৪১ খৃঃ ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের মেলা শেষবারের মত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ এর কিছুদিন পরেই মিত্রশক্তির প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের ফলে লাইপৎসিক্ শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই লাইপৎসিক্-এর মেয়র ডঃ এরিখ্ সাইড্‌লের সাধের মেলা চালু করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে ১৯৪৬ খৃঃ শান্তিকালীন প্রথম মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কারণে জার্মানী পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় পূর্ব জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে অকমিউনিস্ট দেশগুলিতে লাইপৎসিক্ মেলা সম্বন্ধে একটা দ্বিধা ও সংশয়ের ভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু পূর্ব জার্মান সরকারের উদার নীতি ও পারস্পরিক সমঝোতার আচরণেই এই অনিশ্চয়তার ভাব কেটে যায় এবং অকমিউনিস্ট দেশগুলির শিল্পপতি, শিল্পসংস্থা ও ব্যবসায়ীরা মেলায় যোগ দিতে শুরু করেন। মাত্র অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কল্যাণে ও পূর্ব জার্মান সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রদর্শনী ভবনগুলি পুনরায় নির্মিত হয়েছে। বিদেশাগত ব্যবসায়ী, প্রতিনিধি ও দর্শকদের জন্য প্রথম শ্রেণীর হোটেল রেস্তোরা এবং অবসর বিনোদনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া প্রয়োজন হলে যে কোন সময়েই মেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত মধ্যবর্তী দোভাষী, নীরাক্ষী বহুভাষিণী দোভাষী ও গাইডদের সাহায্য পাওয়া যায়।

বর্তমানে লাইপৎসিক মেলার পণ্যসম্ভার বত্রিশটি প্রদর্শনী ভবন ও ৫ লক্ষ বর্গমিটার আয়তনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসানো হয় ও শিল্পমণ্ডপের আকর্ষণীয় পরিবেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় কুড়ি হাজার শিল্পসংস্থা কর্তৃক প্রস্তুত সর্বপ্রকার ভারী শিল্পের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কার্পাস, পশম, রেশম, রবার ও চর্ম নির্মিত দ্রব্যাদি, মুদ্রণ যন্ত্র, কাগজ, পুস্তক, কাচ ও চীনামাটির সৌখিন দ্রব্য, কৃত্রিম রাসায়নিক তন্তুনির্মিত বস্ত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ট্রানজিস্টার, বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন প্রকারের বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্য, ক্যামেরা, ফটোগ্রাফির যাবতীয় যন্ত্রপাতি, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কারুকার্য দ্রব্যাদি, হীরা, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারসমূহ, ঔষধপত্র, চিকিৎসা ও গবেষণার যন্ত্রপাতি, ছোটবড় নানা আকারের কলকব্জা, আসবাবপত্র, পোষাকপরিচ্ছদ, সুগন্ধী দ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী, মদ, রঞ্জন দ্রব্য, লেস, ঘড়ি, খেলনা, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি, উপহার সামগ্রী, সর্বপ্রকার ইঞ্জিন, ধাতুনিষ্কাশন যন্ত্র, মোটর গাড়ী, বিবিধ কৃষিযন্ত্র, পরিমাপ বিষয়ক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। একধারে গলফ্ বল থেকে শুরু করে হাজার হাজার টন ওজনের ক্রেন এবং বিভিন্ন প্রকার নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের এরূপ বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ পৃথিবীর আর কোন দেশের মেলায় দেখা যায় না। সংক্ষেপে লাইপৎসিক বিশ্বমেলা হল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশগুলিতে উদ্ভাবিত ও প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার নব নব বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী যন্ত্রপাতির উৎকর্ষের তুলনামূলক মূল্যায়নের প্রধান পীঠস্থান এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণালব্ধ পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এক আন্তর্জাতিক মিলন তীর্থ।

কলকাতায় একটি বিনিদ্র রাত্রি ভোর হলে, আবার নতুন করে বিছানা পাতা যায় কিনা সেই চিন্তাই প্রথমে মাথায় আসে। বেলা পর্যন্ত যদি আরও একটু গড়িয়ে নেয়া যায় তারই চেষ্টা। এখানের অভিজ্ঞতা অন্য রকম।

দরজার বাইরে এসে খোলা দাওয়ায় দাঁড়াতেই শিমুলতলার স্বাস্থ্যটির গন্ধ পেয়েছি। ক্রম-স্ফুট আলোর বিস্তারের সঙ্গে অবাহত দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছি। চোখের সামনেই অবাধ প্রকৃতির যে নিতান্ত ক্ষুদ্রাংশটুকু পেলাম তা যথার্থ অকৃত্রিম।

মহাবীর মাহাতর ছেলে দিলীপ কাঁচা কয়লা জ্বালাচ্ছে। এখান থেকে ওখান থেকে কাঁচা কয়লা জোগাড় করে আনে। তারপর এ বাড়ি সে বাড়ি কয়লা বিক্রি করে দুটো পয়সা কামায়। বাপ ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করলেও সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টায় আছে। বাপকে সব দিয়ে থুয়ে উপরি দু পাঁচ পয়সা হাতে যা থাকে তা শিমুলতলার মতো জায়গায় যথেষ্ট।

জ্বলন্ত কয়লার ধোঁয়ার মাঝখান থেকে সে আমায় লক্ষ্য করছিল। ঘুম থেকে উঠেই তার চোখে পড়ে গেছি। দিলীপ বুঝতে পেরেছে, কলকাতার বাবুর, খাঁচার বাইরে দু-পা এসে চোখ-ধাঁধানো আলো আর সবুজে মাথা বিগড়ে গেছে। দিলীপকে বোঝানো বাতুলতা। সাজানো পার্কের গাছ আর সেই গাছে অতি পরিচিত পাখির ডাক, অত্যন্ত চোখ রেখে আর কান পেতে যারা বড় হয়েছে, তাদের কাছে এ একটা বিশাল প্রকৃতিরাজ্য ছাড়া আর কি। এবং এই প্রকৃতিরাজ্যে আধিপত্য স্থাপনের বাসনায় মন স্বভাবত প্রলুব্ধ হচ্ছে।

ধোঁয়ার আড়াল থেকে দিলীপ বেরিয়ে এসেছে। গলায় জড়ানো গামছার খুঁটিতে চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছে, লাটটু পাহাড়ের ওদিকে যাবেন তো আরও আচ্ছা লাগবে, রোদও আরো মিঠা আছে। তারপর হাতের গামছা নেড়ে পথের নির্দেশ দিয়ে বলেছে, এই রাস্তা আছে, সিধা যাবেন; ওপাশে যাবেন তো ডাইনা রাস্তা পাওয়া যাবে।

দিলীপের নির্দেশ মতো যোগমায়া আশ্রমের পিছন দিকটা একবার চোখ বুলিয়েছি। তারপর আন্দাজ করেছি পথ কোন দিকে কী ভাবে গেছে, যেতে পারে।

দিলীপের বানানো চা পান করে লাটটু পাহাড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিলাম। শিমুলতলায় ওই একটিই। পর্বতকুলের এক নিঃসঙ্গ বংশধর।

বাজারের পথে বাঁহাতে বাঁক নিয়ে ডানহাতি যে-রাস্তাটা অর্ধসর্পিল ভঙ্গিমায় লোকালয় ছাড়িয়ে নাক বরাবর চলেছে সেই পথে অগ্রসর হতে হবে। পাশপাশে ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলোর দিকে নজর পড়েছে। অধিকাংশ পড়ে গেছে। লোকজন আসতে শুরু করেছে। শীত চেপে পড়লে সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শিমুলতলাকে বাংলার অংশ বললেও ভুল হবে না। বিহারে এসে বাংলা-বাংলা ভাব দেখলে মনে হয় বেড়াতে আসার

যায় উঠল না। অথচ শিমুলতলার প্রাকৃতিক আবহাওয়া বাদ দিলে, বাংলো দেশ ছাড়া কিছু নয়। সর্বত্রই বাঙালীর মুখ।

বাড়িগুলো থেকে চোখ মাটিতে নামালে বোঝা যায়; না ব্যাপারটা ঠিকই আছে। এমন রাস্তা বাংলো দেশের কোন অঞ্চলের হতে পারে না। তাছাড়া ছড়ান টিলা বা পাহাড়ের মিনিয়েচারই বা কোথায়?

লাট্টু পাহাড় পর্বতের প্রতিযোগিতায় লাট খেয়ে যাবে। বড়দা মেজদা সেজদার কিভাবে তো ন-দাও নয়। এমন কি ডাক-সাইটে দাদার দল তাকে দূর সম্পর্কের ভাই বলেও স্বীকার করবে কিনা সন্দেহ। যা-ই হোক কলকাতায় ট্রামে-বাসে বোবা মানুষ আমি, আমার কাছে লাট্টু পাহাড় লাটসাহেবই বটে।

ধীরে-ধীরে সমতলভূমির দৃষ্টি এড়িয়ে ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়েছে। যেখানে এসে দম ফুরিয়েছে সেখানে আর সমতল নয়, পায়ে-চলা পথ ছেড়ে কখন লাফিয়ে ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে আর সেখান থেকে ঘাড় হেঁট করে তলার দিকে তাকিয়ে দেখছে, পথ বেয়ে যারা আসছে তাদের। আমার মনে হয়েছে, আমাকেও দেখছে।

এক সময় উঠে এলাম। চারিপাশে এলো-মেলো পা- ফেলে ঘুরলাম। কিছু দেখতে পাব এমন উদ্দেশ্যে অবশ্যই নয়। যা দেখব, এক অর্থে, সবই দর্শনীয়। কলকাতার সাজানো পার্কের ছাঁটা গাছের ফুলপাতা অবসর বিনোদনের উপাদান হিসেবে সারা জীবনই থাকবে; কিন্তু এখানে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে লোকচক্ষুর অগোচরে যারা আকাশের আলো, রাত্রির অন্ধকার, বর্ষার জল, হেমন্তের শিশির, মেঘ ও কুয়াশার ছায়াসহচর হয়ে থাকবে, অরণ্যের সগোত্র সেই সব বৃক্ষলতাগুল্মাদি আমার জন্যে কলকাতাবহির্ভূত কিছু আন্তরিক নিসর্গ দৃশ্য ও আরণ্যক ভেষজ গন্ধ সঞ্চিত রেখেছে। এ জন্যে আমার কাছ থেকে কোন কৃতজ্ঞতা দাবী না-করলেও আমি অজ্ঞাতে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এখানে জীবনের জমকালো নাটকীয়তার কিছুই নেই চোখের সামনে, অথচ এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের অন্তরালে নিঃশব্দে মানুষকে মোহগ্রস্ত করেছে। যেমন আমি হয়েছি এ মুহূর্তে।

এদিক-ওদিক উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরার পর আধশোয়া অবস্থায় স্থবির হয়ে পড়েছিলাম। লাট্টু পাহাড়কে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে জগতের স্পন্দন অনুভবের চেষ্টা। আসলে কখনই একেবারে নিজের মনের মধ্যে ফিরে আসছি, দেখছি তব বাব ছাড়া আর কারও চিন্তাই আমাকে গ্রাস করে নি। ভেবেছি আবার, কোথায় কার কোন কথা কার জন্যে তোলা থাকে। তব বাব আমারই জন্যে তুলে রেখেছিলেন। তাই আমাকেই নির্বাচন করেছিলেন শ্রোতা হিসেবে। তাঁর বলা শেষ হয়েছে। এবার তিনি নিশ্চিন্ত। হয়তো কোনও একদিন সকলের অজ্ঞাতে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবেন। অন্য কেউ আসবেন। যিনিই আসুন, আমাকে বলার জন্যে তাঁর বিশেষ কোন কথাই থাকবে না।

সমস্ত লাট্টু পাহাড়টার মালিক মনে হয়েছে আমি নিজে, অন্তত যে-ভাবে হাত-পা বিছিয়ে পড়েছিলাম তা-ই তো। এমনই সময় কানে এসেছে স্পষ্ট পুরুষ কণ্ঠ : ওটা বেকেছে দেখুন না? আমার হাতে ঘড়ি আছে এমন অনুমানেই হয় তো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। মনে হল খুব নিকট দূরত্বের ব্যবধান থেকে কেউ বলছে। পিছন ফিরে দেখি, না, বেশ কয়েক হাত তফাতে। অথচ কী রকম স্পষ্ট কণ্ঠস্বর। বছর ছাব্বিশ-সাতাশের একটি যুবক ও বছর আঠারর এক যুবতী। আন্দাজ মতো সময় জানালাম।

আমাকে পিছনে রেখে ওরা যখন চলে গেল ওদের দৃপ্ত পা-ফেলা লক্ষ্য করলাম। মনে হল, যুবকটি মেয়েটিকে বুঝিয়েছে পৃথিবীর নির্জনতম প্রান্ত হচ্ছে শিমুলতলা। আর শিমুলতলার আরও নিভৃত প্রান্ত হচ্ছে এই লাট্টু পাহাড়। যেখানে যতটুকু নিভৃত স্থান পেয়েছে ওরা পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিশ্বাস করি আর না করি, আজ সকালের প্রাক-মধ্যাহ্নিক আলোয় ওদের দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে, ওরা দিব্যলোকের মত স্পষ্ট প্রেমের একাধিক প্রতিশ্রুতিতে যত্নে। যে-প্রেম ওদের ললাটে স্পর্ধিত যৌবনের উদ্ধত রেখা।

আমি আর আলস্যে করি নি। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছি। হঠাৎই মনে এসেছে এক পরিচিত ভদ্রলোকের কথা। মিউনিসিপ্যালিটির লেকচারার। কি নাম কিছুতেই মনে করতে পারছি না। এই লাট্টু পাহাড়েই কোথায় তাঁদের পৌত্রিক বাগানবাড়ী 'রিজ'।

খুব তফাতে-তফাতে ছড়ান সামান্য কখানা বাড়ী। খুঁজে বার করতে বেশী সময় গেল না। সত্যি, ভারী সুন্দর আবাস। সুবিস্তৃত ঢালু প্রান্তরে একাকী প্রার্থনা-রত মৌন সেবকের প্রায়। পাঁচিলের চারিপাশ ঘিরে মাথা উঁচু পত্রসবুজ নানা গাছের অকৃপণ ছায়া। কোথাও গাছ, কোথাও ফিকে।

বাড়ীর বড় প্রশস্ত দরজার সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হয় না এখানে আদৌ কোন-জন থাকে। ভেতরে প্রবেশ করব কি করব না ইতস্তত করছি, এমন সময় মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ছোট ছেলের মতো একটা বড় আতা হাতে আধখানায় প্রায় নাক ডুবিয়ে আছেন।

পরিচিত ভদ্রলোকের কথা উত্থাপন করলাম। শুনেই বুঝতে পেরেছেন। বললেন, ও-হো, পরিতোষের কথা বলছেন। তার সময় কোথায় আসার। ন মাসে ছ মাসে, এক-আধ বার আসে হয়তো। তা আপনি বুঝি বেড়াতে এসেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোথায় উঠেছেন?

যোগমায়া আশ্রমে।

বেশ জায়গা মশাই। কি যে লোকে কলকাতা-কলকাতা করে। আমি তো এক কাপড়ে পালিয়ে আসি।

না, খুব নির্জন জায়গা। নিরিবিলি কটা দিন কাটানোর পক্ষে বেশ।

বেশ বলেছেন! এই দেখুন না বাড়ী করল পরিতোষের পূর্বপুরুষ, আর ভোগ করছি আমি। পরিতোষ আমার ভাই। কাজ-কর্ম-সম্পত্তি দেখতে-দেখতেই ওদের জীবন চলে গেল।

সত্যি যা বলেছেন, জীবিকাই জীবনকে গ্রাস করেছে।

আর বলবেন না, নাকে দড়ি বেঁধে টানছে।

ইতিমধ্যে এক দফা নাম বিনিময় হয়েছে। এও জানতে পেরেছি সুশান্তবাবু শিক্ষকতা করেন। কলকাতার একঘেয়ে জীবন সম্পর্কে আরও দু-চার কথা হয়েছে। বিদায় নেবার সময় সুশান্তবাবু বললেন, যোগমায়ার মায়া ত্যাগ করার আগেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি।

আশা করলে আর আসা হবে না, চলে আসুন একদিন চটপট, আমি বলছি।

একদিন কি মশাই, দিন তেরো তো বলুন, সুশান্তবাবুর আন্তরিক আচরণে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

ভেবেছি কলকাতার বাইরে এই এক মজার ব্যাপার। এক পা বেরুলেই নতুন আলাপ, আলাপে কোন ক্লান্তি নেই। আর তেমন আলাপী লোক হলে তো কথাই নেই।

• • •

ভরপেট আহার সমাপ্ত করে বাইরে দাওয়ার রোদ্দুরে এসে বসে সিগারেট ধরিয়েছি, দেখি যোগমায়া আশ্রমের কাটা-কোণের বেড়ার আগল ঠেলে মাস্টারমশাই ঢুকছেন। তাঁকে স্বাগত জানালাম।

মাস্টারমশাই দরজাটা সরাসর পর সেটাকে স্বস্থানে আনতে পারছেন না। তাই দেখে বললাম, ছেড়ে দিন। ও আগল দেওয়ার জন্যে নয়। ওটা অলংকৃত দ্বার।

মাস্টারমশাই শেষ পর্যন্ত কোনক্রমে ঠেলে-ঠুলে সরিয়ে আনলেন। দাওয়ার দিকে এগুতে-এগুতে বললেন, না মশাই, বাইরে দুয়ারে কপাট না-লাগালে ভিতর দুয়ারে খোলা পাওয়া যায় না।

আমি ওঁর কথার সুরেই বললাম, পেটের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভিতর দুয়ারে কড়া নাড়লেও শুনতে পেতাম না, বা আপনি সাড়া পেতেন না। সিগারেটটা শেষ করেই ভেবেছিলাম গড়াব। একটা দিবানিদ্রা কাটিয়ে দেওয়া কি এমন দায় ছিল?

মোটেই না, বসতে-বসতে মাস্টারমশাই বললেন।

হাসলাম। বললাম, এমনই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, না?

ইতিমধ্যে ওঁর দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়েছি।

সিগারেট ধরিয়ে নিজের খেয়াল ধোঁয়া বার করে বললেন, যে জিনিস অস্বীকার করা যেতে পারে, তাকে তো নিরাপদ!

আপনার এ সব অভ্যেসটি নেই বোধ-হয়।

অভ্যেসটি বদ কে বলল আপনাকে? লোকে বলে শুনেছি।

লোকে যা বলে তা যে সবই ন্যায় কে বলেছে? ঠোঁটিয়ে বলতে পারেন না, পরে আবার কিছু বলে—এই তো।

না, আজকে আপনি ফর্মে আছেন।

যতক্ষণ না ইনকাম্‌ট হই ততক্ষণ সব সময় আমার এই ফর্ম।

সকালেই আন্দাজ করেছিলাম। মুখুজ্জের এই কিছুক্ষণের আলাপে সেই ধারণা দৃঢ় হল। মাস্টারমশাই জাতে রসিক লোক। মানুষের দুঃখ-কষ্টের সংসারে এঁদের মতো লোকের সংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভালো।

এদিকে এসেছিলাম আমার বন্ধু নীহারের কাছে। সরকারী কাজের উল্টো দিকে আনন্দধামে উঠেছে। ভাবলাম আপনার ডেরাটাও ঘুরে যাই একবার, এক ঢিলে দুই পাখি মারা আর কি।

মাস্টারমশাইরাও বেশ হিসেবী লোক দেখছি।

হিসেবী বলে হিসেবী, সুশান্তবাবু আপন স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বলে গেলেন, মাস্টারেরা আজকাল বেজায় চালাক হয়ে পড়েছে। ফাঁকা গালভরা প্রশংসায় এখন আর কেউ ভোলে না। কোন মাস্টারকে একবার বলে দেখুন না, জাতির জনক, আপনারা—দেখুন না জাতির জনক কি বলেন আপনাকে।

কী বলবে?

বলবেন, আপাতত যে-কটির জনক তাদের টেনে নড়লেই তো গেছি। বাবা যে ইস্কুল মাস্টার একটু বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে যায়। আর সাবালক হওয়ার পর যখন নিজেরটা বুঝতে শেখে, তখন বলে মাস্টারীটা না-করলেই পারতে। এক জাঁদরেল হেডমাস্টারের কথা মনে পড়ছে, এভরিবডি ওয়ান্টস এ গুড স্কুল, থাক আপনার কটি শুনি?

একটিও না—না বলা ঠিক হল না, আছে আছে, একটি আছে।

মানে?

মানে আমার একটি ভাইঝি আছে, মানে আর কি কেয়া।

ভাইঝির কথা বলতে বলতে হঠাৎ মাস্টারমশাই এমন ঝিমিয়ে পড়লেন কেন বুঝতে পারি না। মুখ চোখের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। অন্যমনস্ক কিছু স্মরণ করার চেষ্টায় আছেন, মনে হল। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমি অপ্রস্তুত বোধ করেছি।

মাস্টারমশাই যথাশীঘ্র স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করেছেন। বললেন, কিছু মনে করবেন না। এমনিতে বেশ থাকি, ওর কথা এলেই যেন কেমন হয়ে পড়ি।

আমি প্রতিহত কণ্ঠে বলেছি, আমি কিন্তু—

না-না, আপনি কেন কিন্তু করছেন। দোষ আমার। ওর কথা কাউকে না-বলে আমার যে উপায় নেই। বলে খানিকটা হাল্কা হই।

আমি সুশান্তবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি আরও কিছু শোনবার অপেক্ষায়।

আজ দু বছর হলো বিধবা হয়েছে মেয়েটা। বাপ-মার সম্বন্ধ করা বিয়ে করল না। আমায় এসে চেপে ধরল, তোমায় একটা ব্যবস্থা করতে হবে জ্যাঠামণি। আমি ওকে যত বেশী অপরাধী মনে করি, তার চেয়ে বেশী অপরাধী মনে হয় নিজেকে। বার-বার মনে হয় কেন বাধা দিলাম না, কেন বললাম না আমি এর মধ্যে নেই। বাপ-মা যা বলছে তাই শোন, তোর ভালর জন্যেই বলছে। আজ ওর চেয়ে বেশী কষ্ট আর কারও নয় জানি, কিন্তু আমি যে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। মেয়েটাকে আমার কাছে রেখেছি। কি করে ওর বাপ-মার কাছে যেতে বলি। আর আমার আশ্রয় পেয়ে মেয়েটার জেদ বুঝি বেড়ে গেছে। কি বলে জানেন? জেদ করে যখন বাবা-মার কথা শুনি নি, তখন জেদ রাখতেই হবে। তুমি আছ যখন ভাবনা কি জ্যাঠামণি। বিয়ের জন্যে লেখাপড়া ছেড়েছিলাম। বিয়ের সাধ পূর্ণ হয়েছে। এখন লেখাপড়া শিখে চাকরি করে তোমাকে খাওয়াব। আমি মাঝে মাঝে বলি, কেন আমার কথা শুনতে গেলি বল তো। কথায় বলে কি জানিস তো, বাপ-মার কথা শুনে ঠকাও ভাল। ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে কেয়া। আমার কথা শুনে বলে, আমার দুঃখের চেয়ে তোমার লজ্জা বড় হল, না জ্যাঠামণি? তুমি আমার কথা সত্যি ভাবছ না, নিজে বাঁচতে চাইছ, আমি বুঝতে পারি। মনে হয় মেয়েটা আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরেছে। কেয়ার বদ্ধমূল ধারণা বাপ-মার কথা মতো বিয়ে করলেও ও জীবনে এভাবে না হোক অন্যভাবে অসুখী হতো। সুখ জিনিসটা ভাগ্যের দান। যার ভাগ্যে তা নেই সে কোনখান থেকে পেতে পারে না। আর আমারও ইদানীং একটা জেদ চেপেছে। ওর বাপ-মাকে দেখাতেই হবে, ও জীবনে সুখী হতে পারে। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। কি বলুন তো?

কি বলব ভেবে না-পেয়ে আমি ওঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছি।

ভাবছি কেয়ার আবার বিয়ে দেব, সুশান্তবাবু আত্মবিশ্বাসের ভরা গলায় বললেন।

আপনার জানা-শোনা তেমন উদার পাত্র কেউ থাকলে দেখুন না। কেয়াকে অপছন্দ হওয়ার কিছু নেই। অমন সুন্দরী মশটায় একটা মেলে না। তাছাড়া গলা শুনলেই বুঝতে পারবেন গানের জন্যেই ওর গলা তৈরী হয়েছে। যার হয় তার সবই হয়, যার হয় না তার মাঝপথেই সব থেমে যায়। বিশ্বাস করুন যদি আপনাকে ওর গান শোনাতে পারতাম—কি যে বরাত মেয়েটার—

বললাম, আপনি বলছেন তার চেয়ে বড় কথা কি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না। আমার কথায় সুশান্তবাবুর মুখে-চোখে আত্মতৃপ্তির আভা ফুটে ওঠে।

বিদায় নেওয়ার আগে সুশান্তবাবুকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, সাধ্যমত কেয়ার জন্যে উদার পাত্রের সন্ধান করব।

সুশান্তবাবুর পরিচিত আনন্দধামের নীহারবাবুর সঙ্গে আলাপ হলে বুঝতে পারলাম, তিনি সপরিবারে এসেছেন নেহাৎই চিকিৎসক ও গৃহিণীর চাপে পড়ে। সিমুলতলার জলই নাকি ওষুধের কাজ করবে, ডাক্তার বলেছেন। আর স্ত্রী বলেছেন, কলকাতার বাইরে যাওয়া হবে, চিকিৎসাও হবে। বিয়ে করে সেই যে সংসারে ঢুকেছি এক পা বাইরে বেরুতে পারলাম না কোনদিন। স্ত্রীর এমন কথা শুনে শুনে নীহারবাবু অভ্যস্ত। তাঁর কথা যেমন কানে তোলেন না, সেই রকম ডাক্তারের নির্দেশও কোনদিন গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। এবারে উভয়ের কথাই মান্য করেছেন।

গোয়ালার সঙ্গে দুধ নিয়ে কথা কইছিলাম। কলকাতার বাইরে ছেলে-পুলে পরিবার নিয়ে যাঁরা বেশী দিনের জন্যে আসেন তাঁদের অনেককে দুধ সমস্যা সমাধানের জন্যে গোয়ালার সঙ্গে এইভাবে সিরিয়াস কথাবার্তা বলতে দেখেছি। কলকাতার বাইরে তাঁরা শুনেছেন দুধ ঘি ভীষণ সস্তা, দুধ-সাগরে স্নানের মতো আর কি। তাই স্থানীয় গোয়ালারা আপত্তিকর দরদাম চাইলে অবিশ্বাসী হেসে বলে থাকেন, এখানকার সস্তা দুধের কথা এখানে আসার বহু আগেই শুনেছেন। গোয়ালারা চেঞ্জারদের এক বিশেষ চোখে দেখে; আর এটাই তাদের লাভের মরসুম।

নীহারবাবুকে বললাম সুশান্তবাবুর মুখ থেকে তাঁর আগমন বার্তা যথাসময়ে পেয়েছি।

বললেন, একবার বেড়াতে আসা মানে দু মাসের সংসার খরচের ধাক্কা, কে আর সাধ করে আসতে চায় মশাই। বেড়ানোর শখ তো আর থাকলেই হল না। আপনার কথা অবিশ্যি আলাদা। একা এসেছেন; এদিক-ওদিক ঘুরবেন, মুর্গি খাবেন, তারপর যেই পকেটে টান পড়বে একদিন সরে পড়বেন। আমার লাগেজ দেখেই কুলিরা নার্ভাস হয়ে পড়ে তো মাল তুলবে কি।

বললাম, আপনার ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার, সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার—আমার তো আর তা নয়। আমার সব দৌড় সপ্তাহী মেয়াদে—

নীহারবাবু হাসতে হাসতে বললেও আগাগোড়াই যে সিরিয়াস তা ধরা যায়। আমার কথায় আমল দিতে চান না। বললেন, চেঞ্জে যাওয়ার কথায় মনে আসে বিভূতি বাঁড়ুজ্জের গল্পের কথা। পড়েছেন আপনি?

বললাম, বিভূতি বাঁড়ুজ্জের প্রায় সবই পড়েছি, কোনটা বলুন তো?

ওই যে—আমার ঠিক মনে পড়ছে না—দুজন মাস্টারমশাই অনেক জল্পনা-কল্পনা করলেন, ছিলিম-টিলিম মারলেন, শেষে একজন গেলেন—নীহারবাবু স্মরণ করার চেষ্টায় কাতর হলেন।

আমি বললাম, শেষকালে একজন ঘুঘু-ডাঙা আর একজন শালকে—

ওই রকমই আর কি। আমার ঠিক মনে নেই জায়গার নাম, কলকাতা থেকে দু-পাঁচ মাইল দূরে। তা-এই দুঃখের গল্প।

নীহারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি তিনি বিভূতিভূষণের গল্পের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছেন।

CENTRAL LIBRARY
CALCUTTA UNIVERSITY

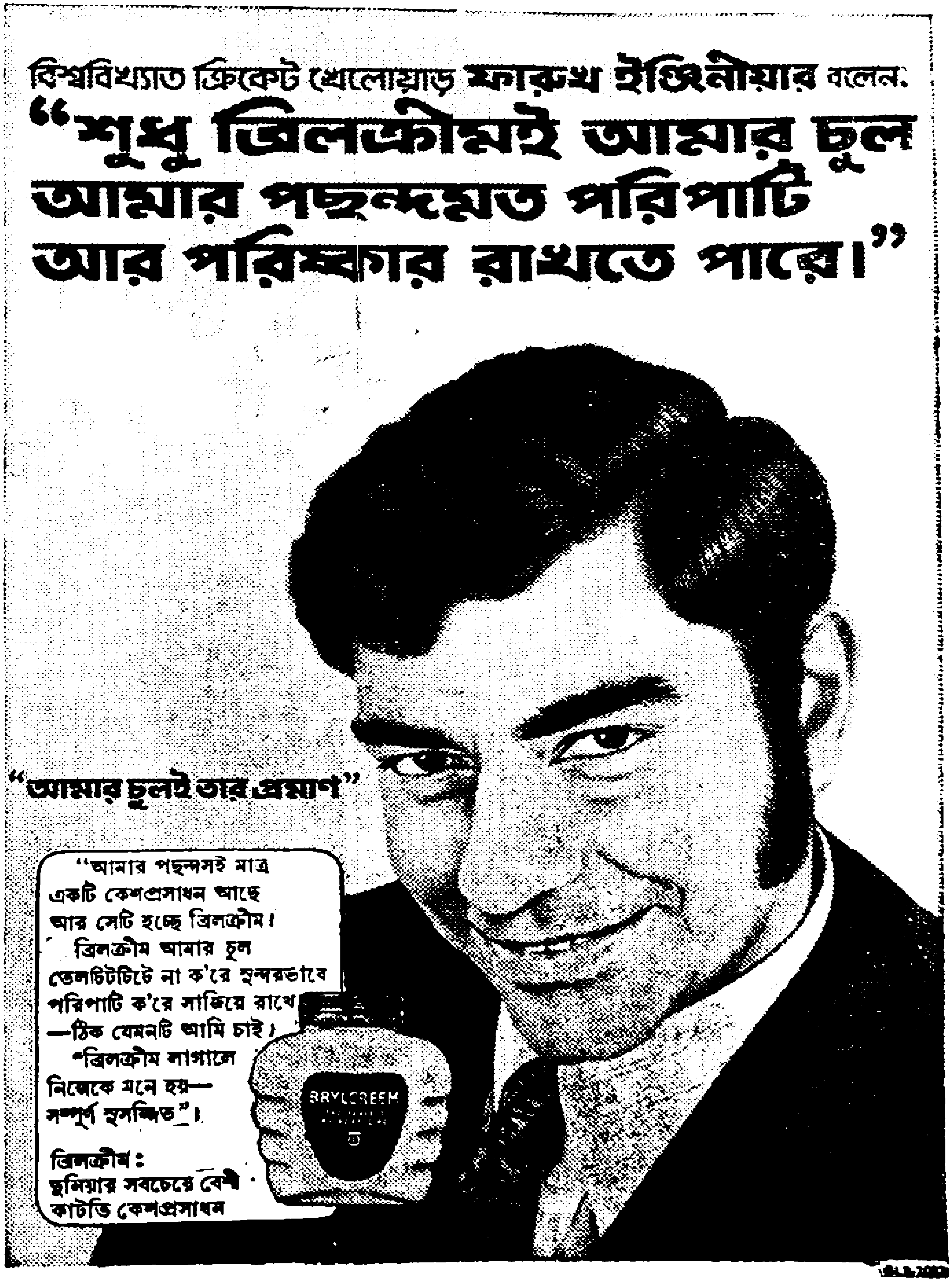

পরিশেষে বললাম, কলকাতায় সারা বছরের ওষুধের খরচার তুলনায় হেসে-খেলে লাভই থাকছে আপনার।

নীহারবাবু প্রতিবাদ করলেন, বললেন, দশ-পাঁচ টাকা ধার করে ওষুধ খাওয়া যায়, তা বলে ধার করে তো আর বেড়াতে আসা চলে না।

এর পরও তর্কের খাতিরে যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করেছি, কিন্তু নীহারবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে চেপে গেলাম। কে জানে, হয়তো সত্যিই কর্জ করে বেড়াতে এসেছেন।

আমি বললাম, যা-ই হোক বেড়াতে যখন এসেছেন তখন শুধু জল খেলে তো আর চলবে না, হাওয়াও খেতে হবে। চলুন না আমাদেরই সঙ্গে। দলবেঁধে দুর্লভ-ঝর্ণা খাওয়া যাক। গরুর গাড়িতে যাব।

নীহারবাবু আমার কাছ থেকে এই প্রথম দুর্লভঝর্ণার কথা শুনলেন।

বললেন, নাম যা বললেন তাইতে প্রেমে পড়ে যেতে হয়।

বললাম, নামের মোহে পড়বেন না। শেষকালে না দুর্লভ না ঝর্ণা—এই দেখে আমায় এক হাত নেবেন।

কেন কেন, ওকথা বলছেন কেন?

ভদ্র রায়ের কথামতো ওঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম, রংও নেই জলও নেই। আমার মত নীহারবাবুও নিরাশ হয়েছেন মনে হয়। তাঁর কণ্ঠের ক্ষোভ প্রকাশ পায় যখন বলেন, তা হলে?

বললাম, কলকাতার সিনেমা হলে টিকিট না-পেলে লোকে এমন হতাশ হয়।

ঠিক হল না। সিনেমার পোস্টারে যা দেখে তা যখন আসল ছবিতে দেখতে পায় না তখন। নীহারবাবু চাপা হেসেছেন।

বললাম, না, আপনার হার হতে রাজী আছি।

এর পর ঠিক হল কবে বেরুব। নীহারবাবু সপরিবারে যাবেন, আমি আর সুশান্তবাবু। ইতিমধ্যে আনা-শুনো আর কেউ জুটে যায় তো দলে নেওয়া হবে।

নীহারবাবু বললেন, মনে রাখবেন কিন্তু গরু মাত্তর দুটো।

বললাম, গরু দুটোকে সে রকম ক্লান্ত দেখলে পালা করে হাঁটা যাবে।

সে রকম অবস্থা বুঝলে গরুদের গাড়িতে তুলে নিজেরাই টানব।

সাংসারিক চাপে বড়ই বিব্রত বোধ করেন, নীহারবাবুর স্বভাব রসিকতাপ্রিয়। সময় এবং সুযোগ উপস্থিত হলে তাঁর রসিক মনটি নিজেকে গোপন করতে পারে না। জীবনে সাংসারিক চাপ থেকে কিঞ্চিৎ মুক্ত হতে পারলে তিনি নিজেকে বড়দরের রসিক প্রমাণ করতে পারেন অনায়াসে। আমার আপাতত ধারণা তাই।

ভদ্র রায় গরুগাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। [illegible] যেখানে এসে অপেক্ষা [illegible] সেখান থেকে যোগমায়া আশ্রম ও [illegible]বাবু উভয়েই নিকটে। পৌঁছে রাখা হয়ে-[illegible] বিশেষ করে নীহারবাবুর সুবিধের [illegible]-পরিবার পত্র নিয়ে আসবেন ও ২১-

ছাড়া সকলের আহারের দায়িত্ব তাঁর স্ত্রীর ওপর। তৈজসপত্র বলতে তিনিই যা কিছু এনেছিলেন। আমার বা সুশান্তবাবুর সঙ্গে বিশেষ কিছু নেই। অতএব সে সব বহন করার দায়িত্বও পরোক্ষে তাঁরই। গন্তব্য এমন কিছু দূরে নয়। আসলে গরুগাড়ি করে গদাই লস্করি চালে যাওয়া, ও গন্তব্যে পৌঁছে কাঠকুটো সংগ্রহ করে বনভোজনের সদৃশ আহারের ব্যবস্থা করা। রান্নার যাবতীয় ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে নীহার গৃহিণী পাকা রাঁধুনীর অভাব বুঝতে দেবেন না। অর্থাৎ বনভোজনের আবহাওয়ায় রান্নাঘরের পরিপাটি রান্না। যাওয়া আসায় আমাদের এমন কিছু সময় যাবে না। শুধু অমন নামের একটি স্থান নির্বাচন করে, সেখানে একবেলা আহারের আয়োজন করে, কলকাতার একঘেয়েমির দত একটা অংশ সিমুলতলায় ফেলে যাওয়া।

ভদ্র রায়ের পাঠানো গরুরগাড়ি যথা সময়ে এসে হাজির হয়েছে। গরুদ্বয় হাম্বা রব তুলে মোটর গাড়ির হর্ণ দেওয়ার মতো জানান দিলেন। অত বড় গাড়িখানা দুটো গরু নিয়ে প্রায় নিঃসাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার বাবুদের এ রকম হুজুগেপনায় স্থানীয় ছেলেছোকরা মজা পায়। কেউ কেউ ভিড় জমাবার চেষ্টায় থাকে। অনেক সময় বাবুরা পছন্দ মতো কাউকে সঙ্গে নিতে চান। কাজকর্ম করে দেবে, খাবে দাবে বাবুদের সঙ্গে থেকে, তাদেরই সঙ্গে গাড়িতে যাবে আসবে। ফিরে বাবুরা হাতে কিছু দেবেনও বটে। সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে, তার তুলনায় হঠাৎ এমন কাজ জুটে যাওয়া মন্দ নয়।

সবাই যথাসময়ে হাজির হলেও সুশান্তবাবুর দেখা নেই। মাস্টারমশাইদের নিয়ে কি সর্বত্রই বিপদ। ঢিলেঢালা কাছা-কোঁচা খোলা লোকেদের সঙ্গে আগে থাকতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কোথাও বেরতে নেই। কাউকে পেলেন তো বচনবাগীশ আটকে গেলেন।

যখন এসে উপস্থিত হলেন আমি হাত ঘড়ি দেখে বললাম, প্রায় কুড়ি মিনিট লেট্।

সুশান্তবাবু সহজ কণ্ঠে বললেন, কোথায় যাব মনে ছিল, সময়টা খেয়াল ছিল না।

বললাম, ঘণ্টা পড়লে কে আর ঠিক সময় ক্লাসে যেতে চায়—

মাস্টারের ওপর খুব মাস্টারি হচ্ছে দেখছি।

খোদার ওপরে মাঝে মাঝে কারসাজি না দেখালে সংসার ঠিক থাকে কী করে?

খোদার ওপর খোদকারি কি শুধু মাস্টারের বেলায়। সংসারে কোথায় না লেট্ হচ্ছে বলুন তো। সব জায়গায় লাইন, আর কিউ দেওয়া মানেই লেট্। ইনডিয়াও কিউ-তে দাঁড়িয়ে আছে, কবে টার্ন আসবে। আমি আফটার অল্ তো এমন্ ইনডিয়ান।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বার করা, আপনাদের এক অভ্যেস। কথা হচ্ছে আপনাকে নিয়ে, কোথা থেকে এল ইনডিয়া। আসলে আপনারা হচ্ছেন প্রফেসনাল টকার, ঠিক কিনা?

ইউ নো, এ্যান্ড ইয়োর গড্ নোজ, সুশান্তবাবু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শূন্যে এক হাত ছুঁড়লেন।

বললাম, ইয়োর গড্ মানে? আপনার কি গড্ নেই? না এবারও বলবেন গড্ নোজ্। আমার কথা হচ্ছে, হুজ্ গড্?

সুশান্তবাবু স্বকীয় ভঙ্গিতে হাসলেন, এ্যাম বাউন্ড্ গড্।

তবু বললেন না, মাই গড্—ইউ আর এ কমিউনিস্ট্।

চার্জ করছেন না কি?

আই ডু।

গড্ না মানলেই হয়ে গেল কমিউনিস্ট্? কে বলেছে আপনাকে? মার্ডারারও তো হতে পারে।

বলা বাহুল্য কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে আর সকলের সঙ্গে আমি আর সুশান্তবাবুও ছাউনির আশ্রয় নিয়েছি। বাচ্চা দুজন গাড়ির পেছন দিকে ছাউনির বাইরে মাথা পার করে ঝুঁকে বসে আছে। ওদের উৎসাহ তুলনারহিত।

গুনী যে প্রকৃতই ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, কথাটা বলে সুশান্তবাবু বুঝি হঠাৎই আমায় ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছেন। আমরা পরবর্তী কথা খোঁজার অবসর কালে নীহারবাবু সুযোগ বুঝে মুখ খুলেছেন : দুগ্‌গা দুগ্‌গা! যাত্রারম্ভেই নাস্তিক গুনী আর কমিউনিস্ট্।

তারপর আমার আর সুশান্তবাবু উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, নাস্তিকদের জন্যে আরও বেশি বেশি মন্দির মসজিদ গির্জে বানিয়ে দাও, গুনীদের জন্যে অলিতে গলিতে চায়ের দোকানের মতো জেলখানা বানিয়ে দাও, আর কমিউনিস্ট্ দেখলেই—

নীহারবাবুকে বাধা দিয়ে সুশান্তবাবু বলেছেন—খাদ্য বস্ত্র বিতরণ কর?

এর পরে সমস্বরে সকলেই হেসেছি। গরুগাড়ি মন্থরগতিতে প্যা-প্যা করে এগোচ্ছে।

সদা জেগে জোড়া চোখ বাইরের দিকে মেলেছিলাম। গরুর গাড়ির চাকার শব্দ ছাড়া আর কোন বিশেষ শব্দ নেই। নীহারবাবুর ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে উৎসাহে কী সব বলছিল। শকট চালক আদর করার মতো গরু দুটোর গায়ে চাবুকের অগ্রভাগ দিয়ে মৃদু স্পর্শ রাখছে। মাঝে মাঝে গো-যান এক পাশে হেলে পড়ায় সবাই এক ধরণের কৌতুক অনুভব করছে। ছোট ছেলে তার অগ্রজকে বলছে : কী রকম মনে হচ্ছে বল তো? ডাঙার ওপর নৌকো চলছে মনে হচ্ছে না?

উটের পিঠে চড়েছি মনে হচ্ছে, চোখ বোজ। বড় ভাই চোখ বন্ধ করে দেখায়। অগ্রজের কথায় কান না-দিয়ে কনিষ্ঠ বলেছে, তুই উটের পিঠে চড়েছিস কখনও? বড় ভাইও মানতে রাজী নয় সে উটে চড়েনি। তাই বুঝিয়ে বলে, নৌকো চললে জলের শব্দ হয়। বুঝেছিস বোকা?

ওদের কথায় মজা পাচ্ছি, অন্যমনস্ক তাকিয়ে আছি সামনে পথের দিকে; দৃষ্টি অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে আসছে দু-পাশের খোলা মাঠে। কোথাও কোথাও গাঢ় সবুজের গায়ে ছোপ হলুদ। সবুজ বিছানার চাদরে উজ্জ্বল হলুদ রং-এর কাজ। বিস্তৃত ধান মাঠের

CENTRAL LIBRARY

গায়ে সর্ষে ফুলের হলুদ রোদ। ওখানে গিয়ে দখল গ্রহণ করলে এখুনি মালুম হতে পারে গায়ে হলুদ ব্যাপারটা কী। আমি ফুলের নির্যাসের কথা স্মরণ করে ভেবেছি এও বুঝি হলুদের নির্যাস। হলুদ আগুন মনুমেন্টের মতো এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। স্বস্থানচ্যুত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হতে পারছে না।

আমি মনে মনে যা ভেবেছি যথার্থ, আর কিছুর জন্যে না হোক শুধু এই যাত্রাটুকুর জন্যেও শিমুলতলা আসা আমার অপরিহার্য ছিল। আল্পস বা কিলিমানজারো দেখার সাধ না হয় চাঁদ ধরার সাধ, তাই সিলুভার স্ক্রীনে দেখার আনন্দও যথেষ্ট বইকি। অথচ যা নিতান্ত কাছের, হাত বাড়ালে পাই, মোটেই অবহেলার নয়, তা উপভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার অপরাধে কেন অভিযুক্ত হই নিজের কাছে। বহুবর্ণ চিত্র মাথার ওপর নীলাকাশের ছাউনির নিচে ধুলোর ধূসর পথ অতিক্রম করে দু-পাশে সুবিস্তৃত ধান মাঠ ফেলে গরুগাড়ি চলতে দেখেছি। সেই গরুগাড়ির যাত্রী হয়ে এখন হলদি ঝর্ণার পথে চলেছি, ভাবতেও রোমাঞ্চ বোধ করছি। উন্মুক্ত প্রান্তরের নির্জনতায় থেকে থেকে কয়েকটি পাখির এ-গাছ থেকে সে-গাছে উড়ে যাওয়া, শূন্যে পক্ষীকুলের কলে বিচিত্র কণ্ঠের ডাকে বাতাস ভরে তোলা, কয়েকটি অজাতশত্রু গরুর তৃণভোজের নিঃশব্দ আচরণ, স্থানীয় নারী শিশু পুরুষের উদ্দেশ্যহীন উদাস পথ-চলা, কোথাও হাওয়ার চঞ্চলতা অতিরিক্ত হলে শুষ্কপত্রের মর্মরে সঙ্গীতসুলভ ধ্বনি শ্রবণগোচর হওয়া—এমনই সব দৃশ্য লক্ষ পার হয়ে চলেছি; গরুগাড়ি চলেছে সমান মন্থর গতিতে।

কলকাতার সকালের আলোও কত কৃপণ। জানলায় কখন এক ফাঁকে মুখ দেখিয়ে উঁকি মেরে চলে গেল, তারপর আর পাত্তাই নেই। আর এখানে সকালের আলোর উন্মেষ থেকে ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ পর্দায় পর্দায় ধরা দিচ্ছে। আলো কি, আলোর সংজ্ঞা নিয়ে হাজারো বাকবিতণ্ডায় কিবা লাভ। আলোর রূপ গাছের আগায়, মাটির ঘাসে, আকাশের কপালভাগে দেখ, আলোয় স্নান কর, আলো স্পর্শ করে দেখ; আলোর গন্ধ? তা-ও বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে।

হলদি ঝর্ণায় যদি হলুদ বা ঝর্ণা কিছুই না-থাকে তবু ক্ষোভ নেই। সামান্য এ পথের ব্যবধানে প্রকৃতির অপরিমেয় সম্ভারে আমার যে ক্ষুদ্র একটা অংশ থাকলেও থাকতে পারে, এ যাত্রা আমায় তারই সংবাদ দিয়েছে, একেবারে একান্তে।

হলদিঝর্ণা সম্পর্কে সব প্রত্যাশা যেহেতু প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম, সে কারণে নিরাশ হওয়ার কোন কারণই ঘটেনি। হলুদ পাব কি পাব না বোঝা যাবে ঝর্ণা পাওয়া গেলে। হয়তো ঝর্ণার জল রোদের আলোয় হলুদবর্ণ হয়ে ওঠে, তাই সম্ভবত এমন শ্রবণাভিরাম নাম। কোথাও কোন ঝর্ণার কথা শুনতে পেলাম না। তাই হলদিঝর্ণার কথা মুহূর্তে বিস্মৃত হতে চাইলাম। কিন্তু নীহারবাবুর দুই ছেলের মুখে বার বার হলদিঝর্ণা নাম শুনে অস্বীকার করা মুশকিল, যেখানে বেড়াতে এসেছি সে স্থান হলদিঝর্ণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ছোট ভাই তো রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে চায়। তার একটি মাত্রই প্রশ্ন: যদি হলুদঝর্ণাই না থাকে তো জায়গাটার নাম এমন হল কেন? আর তোমরাই বা তা হলে এখানে এলে কেন?

আমি নীহারবাবুকে বললাম, এর চেয়ে রিজ্‌নেব্‌ল প্রশ্ন আর কিছু হতে পারে না। উত্তর কী দেবেন?

নীহারবাবু বললেন, তাই—তো—

বললাম, ভাবভাবার কী আছে? প্রফে-সনাল টিচার তো আছেনই।

সুশান্তবাবুর কানে বোধ হয় কথা যায় নি। ওপরের দিকে চোখ তুলে কী দেখছিলেন।

নীহারবাবুকে ইঙ্গিত করলাম। তিনিই সুশান্তবাবুর উদ্দেশে বললেন, ঝর্ণা খুঁজছেন না পাহাড়ের উচ্চতা মাপছেন?

সুশান্তবাবু ঘাড় না-ফিরিয়ে যেমন ছিলেন সেই অবস্থায় বললেন, তা হলে স্বীকার করছেন এটা পাহাড়? পরে ঘাড় ফেরালেন, আমাদের দিকে ফিরে অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বললেন, একটা সিগারেট দিন। চিঠি লেখা শেষ হওয়ার পর পত্রলেখক যেমন কাগজ ভাঁজ করে ফেলেন, সুশান্তবাবুর আচরণও সে রকম, আপাতত আর কিছু নেই চিঠি পোস্ট করা ছাড়া। সুশান্তবাবু অলস ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন।

সিগারেটে টান দিতে দিতে সুশান্তবাবু নীহারবাবুর ছেলে দুজনকে হলুদঝর্ণা সম্পর্কে মনগড়া একটা কাহিনী শোনালেন: এক সময় শিমুলতলা নামে কোন জায়গা থাকলেও, কোন রেল স্টেশন ছিল না। এক-দল ভবঘুরে ঘুরতে ঘুরতে এখানে খনিজ পদার্থের সংবাদ পেয়ে সাময়িক ডেরা বাঁধে। খনিজ পদার্থটা কি ঠিক জানা যায় না, তবে খুব মূল্যবান। একদিন তেষ্টায় যখন গলা ফেটে যাচ্ছে তখন জলের অভাবে সবাই এ-দিক ওদিক খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করল। শেষে ছোট ঝর্ণার মতো একটা বস্তুর খোঁজ পেল। যে প্রথম সন্ধান পায় সে তো 'সোনার জল' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। পরে নাকি দলের আর সবাই এসে উপস্থিত হয়, তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারে। জলে এমন কোন বিশেষ খনিজ পদার্থ ছিল যে-কারণে সূর্যের আলোয় জলের রং অমন মনে হয়েছে। সেই থেকেই নাম এমন হয়েছে। এ অঞ্চলের লোকেরা হলদিঝর্ণা নামেরই পক্ষপাতী। এছাড়া অন্য কোন নাম তারা বরদাস্ত করতে পারে নি। সেই থেকে লোকের মুখে মুখে 'হলুদঝর্ণা' চলে এসেছে। কেমন করে জল শুকিয়ে গেল আর তারই সঙ্গে হলুদ রং-ও গেল মরে, সেটাই এখন গবেষণার বিষয়।

সুশান্তবাবু বিবৃতির শেষে নীহারবাবুর ছেলেদের বললেন, তোমরা এখন গবেষণা করে বার কর। সিগারেট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুশান্তবাবুর কথাও শেষ হয়েছে।

ছোট ছেলে দেখলুম মহাবিস্ময়ে সব কিছু শোনার পর গাছের একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সোৎসাহে বেরিয়ে পড়ল। হলুদঝর্ণার এককালীন অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সম্ভবত নিঃসংশয়। কাহিনীতে ঝর্ণা নিশ্চয় কোথাও ছিল, তার মুখ দেখে মনে হয় তার মনের এ ধারণা অভ্রান্ত। তার দাদা সুশান্তবাবুর কথা যে নিঃসংশয় চিত্তে নেয়নি তা তার মুখের দুষ্টুমি হাসিতেই ধরা পড়ে। শুধু ভাইয়ের সঙ্গ নেয়া ছাড়া তার আপাতত কিছু করার নেই।

নীহারবাবু হুঁশিয়ারি দিলেন, খুব দূরে কোথাও যেওনা আবার।

সুশান্তবাবু সঙ্গে ফ্লাস্কে চা এনেছিলেন। পাত্রে চা ঢেলে আগে এগিয়ে দিলেন নীহারবাবুর স্ত্রীর দিকে, বললেন বৌদি—

নীহারবাবুর স্ত্রী যখন হাত বাড়িয়ে চায়ের পাত্র নিলেন তাঁকে লক্ষ্য করলাম। বাহু যথাসম্ভব নিরাভরণ কিন্তু সুগঠিত। রং রীতিমত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বোঝা যায়, অনাদর বা হতাদরে নয়, নেহাৎই সাংসারিক চাপে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য হ্রাস পেয়েছে। নীহারবাবুর মতো আমরাও মানি বিবাহের বয়সে উনি সুন্দরী রমণী ছিলেন। নীহারবাবুর মাতা এ কারণে যে বিবাহের সময় তিনি পাত্রীর সৌন্দর্য বিবেচনাধীন রেখেছিলেন সন্দেহ নেই। আমি নিজের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে নীহারবাবুর স্ত্রীকে বললাম, হলুদ না-ই থাক আর ঝর্ণা না-ই পাই, জায়গাটাকে হলদিঝর্ণা ছাড়া আপনি অন্য কিছু ভাবতে পারেন? কে বলে নামে কি যায় আসে? যথেষ্ট যায় আসে। জায়গাটার নাম হলদিঝর্ণা না-হয়ে যদি অন্য কিছু হতো তো এখানে বসে ভাত রান্নাই রাঁধুন আমার সাধ হতো না। কলকাতার শহর যদি বলতেই না-পারি, হলদিঝর্ণায় বেড়াতে যাওয়া হল, তো লাভ কি সে?

শকট চালকের নাম চন্দর, চন্দ্রমোহন। রান্নার আগুনের জন্যে সে শুকনো ডাল-পালা কাঠকুটো এক রাশ জোগাড় করে এনেছিল।

নীহারবাবুর স্ত্রীর নির্দেশে সে এক জায়গায় তার কিছু অংশ জড় করে আগুন ধরিয়ে দিল। সে-ই জোগান দেবে সব কিছু হাতে হাতে। এমন সব প্রমোদাভিযানে মোটর গাড়ির ড্রাইভার বা গরুর গাড়ির চালক এরা দল থেকে বিচ্ছিন্ন কেউ নয়। আর সকলের খাওয়া দাওয়া যত্নের সঙ্গে এদেরও তদারকের প্রয়োজন। আমরাও নিশ্চিন্ত। রান্নার আয়োজনে সে-ই নীহারবাবুর স্ত্রীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে।

আমি পরম আলস্যে এই সবই ভেবেছি: এরপর হাঁড়িতে চাপান হবে তোলাচাল, তার পরে নীহারবাবুর স্ত্রীর অসামান্য রন্ধন কৌশলে বাতাস ভরে উঠবে খাদ্যপরিপাকের গন্ধে, তারপর এক সময় নামান হবে হাঁড়ি। নীহারবাবু তাড়া দেবেন, কী হল? খাওয়ার কদ্দূর? নীহারবাবুর স্ত্রী দ্বিতীয় [illegible] পাত্র চড়াতে চড়াতে বলবেন, এই হয়ে এল। সুশান্তবাবু কি পরিহাস করে বলতে পারেন, আমি কিন্তু তাড়া দিচ্ছি না বৌদি, যাতে চর্বচোষ্য হয় তার জন্যে আপনাকে কিঞ্চিৎ বাড়তি সময় দিচ্ছি।

এ সময় নীহারবাবুর ছোট ছেলের কণ্ঠস্বর কানে গেছে, বেশ দূর থেকেই উল্লসিত কণ্ঠে বলছে—ঝর্ণা, ঝর্ণা পেয়েছি। এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। চাঁদ, মতো জায়গাটার একেবারে প্রান্তে বসা হয়েছিল। স্বভাবতই সে জায়গাটার ওপাশ থেকে বলে থাকবে। আমি গাত্রোত্থান করতে নীহারবাবু বললেন, চললেন কোথায় আবার?

দেখি, কী আবিষ্কার করেছে, আমি পা-বাড়ালাম।

খানিকটা খাড়াই মতো পথ, বয়স বাড়েনি প্রমাণ করতে হলে এমন সব পথ বেয়ে একটু আধটু ওঠানামা করতে হয়। কলকাতার বাইরে ছাড়া তার আর সুযোগ কই। উঠতে উঠতে হোঁচট খেয়ে মাটিতে হাত রেখে সামলিয়েছি। তারপর ওপরে উঠে এসে দেখি মোটামুটি মনোরম স্থান। মাঝে কোথাও গোটা পাঁচ-সাত গাছ ঝাঁকড়া বেঁধে আছে। কেমন ঝোপের মতো। আবার ডান দিকখোলা তৃণসমাচ্ছন্ন প্রান্তর তার। আবার আরেক পাশ থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে সিঁড়িদিকে।

আমি কই দেখতে পেলাম না নীহারবাবুর ছেলেদের। গাছের ঝোপটা এ জায়গার বেশ আকর্ষণীয়। আমি আপাতত ওই দিকেই এগতে লাগলাম। চলতে চলতে ভেবেছি কলকাতায় এও বা কোথায় মেলে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় সেই পেটেন্ট পিচঢালা পথ। অতি পরিচিত অতি ব্যবহৃত যানবাহন। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আমি অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করেছি। কেউ যদি আমার মনের কথা টের পেয়ে ঠাট্টা করার চেষ্টা করে তো তাকে শুনিয়ে বলতে পারি : পর্বতাভিযানে একেবারে আনাড়ি নই; পরেশনাথ, ত্রিকূট, ধারাগিরি, বিশালগিরিবিজয়ী, আমি কি ডরাই সখা, লাটুট্ পাহাড়ে? ঝর্ণা তো পর্বত-কূলে থাকবেই। কিন্তু নীহারবাবুর পুত্রদ্বয়ের কোন সাড়া শব্দ নেই। আমাকে দেখে আড়ালে কোথাও লুকিয়েছে নাকি?

ঝোপটার কাছাকাছি যখন এসে পড়েছি তখন অনেকের মিশ্র কণ্ঠের ধ্বনি কানে এসেছে এবং স্পষ্ট নারী কণ্ঠও শুনেছি। নীহারবাবুর স্ত্রী ছাড়াও দ্বিতীয় কোন মহিলা যে আর কেউ থাকতে পারেন আমার মাথায় এতক্ষণ আসেনি। আমি যথার্থ কৌতূহলী হওয়ার মতো হঠাৎই কিছু পেয়ে গেছি যেন। কে হতে পারেন এই মহিলা—আমাদেরই মতো হাওয়াবদলের সন্ধানে যিনি এসে থাকবেন, এসে নিরাশ হবেন।

যথাস্থানে পৌঁছে নীহারবাবুর ছেলে দুজনকে দেখলাম। কিন্তু তাদের সঙ্গে আর যাদের দেখলাম তাইতে মনে হতে পারে তারা আমার লক্ষ্য নয় হয় তো। লাটুট্ পাহাড়ে সেদিন যাদের দেখেছিলাম। আমারও একবার মনে হল, আমার টর্চের আলো হয়তো এদেরই গায়ে এসে পড়েছিল সেদিন সন্ধ্যায়, আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে।

ছাব্বিশ বছরের সেই যুবক ও তার তরুণী সঙ্গিনীর সঙ্গে নীহারবাবুর ছেলে দুজনের বেশ জমে গেছে। বিশেষ করে ছোট ছেলের। সে দেখি যুবক ছেলেটির হাত ধরে টানাটানি করছে। খুব সম্ভবত তাকে ওঠার অনুরোধ। আমি মাঝখানে উপস্থিত হয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে গোলযোগ বাধিয়েছি। কার সঙ্গে প্রথম কথা বলা যায়, কাকে সম্বোধন করা যায়, এমনই সমস্যা।

নীহারবাবুর ছেলেদের উদ্দেশে বললাম, তোমরা ঝর্ণা খুঁজে পেয়েছ তা হলে? বড়ভাই বলল, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে, কোথায় ঝর্ণা!

বললাম, তোমরা কিছুর না দেখে ভাবলাম, হয়তো ঝর্ণা পেয়েছ তবে। যুবকটি বুঝি কোন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, বলল, দুজনে মাতার ঝর্ণা না-পেয়ে শেষে আমায় পাকড়াও করেছে। তখন থেকে ধরেছে, চলুন চলুন।

মেয়েটি সলজ্জ চোখে আমার দিকে চাইল। অর্থাৎ তার সঙ্গী যত সহজই হওয়ার চেষ্টা করুক ব্যাপারটার মধ্যে লজ্জা পাওয়ার কারণ রয়েছে। আমার যতদূর মনে হয়, এমন নিরিবিলি স্থানে একত্রে দুজনকে দেখে নীহারবাবুর ছেলেরা তাদের একা থাকতে দিতে চায় না, মেয়েটি এমনই অনুমান করে থাকবে। ছেলেরা বুঝি তাদের সন্দেহের চোখে দেখতে চায়। লজ্জা সে কারণে স্বাভাবিক। ওরা চায় না এমন নিভৃত সংগোপনে, দুজনে এখানে উপস্থিত আর সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজস্ব সময় একান্তে উপভোগ করে। দল বেঁধে থাকায় অভ্যাসই তাদের কাছে স্বাভাবিক, দুজনে কখনও দল হয়।

অথচ নীহারবাবুর ছোট ছেলে নাছোড়বান্দা। মেয়েটির সলজ্জ দৃষ্টি বিস্মৃত হয়ে যদি তার কথাই শুধু ভাবি তো সে আমার বা সুশান্তবাবুর চেয়ে বয়সে তরুণ একজন যুবককে পেয়ে নিজেকে আরও বেশী সজীব মনে করতে পেরেছে।

আমি বললাম, তা আপনিও বা রাজী হচ্ছেন না কেন?

যুবকটি খুব স্মার্টলি তার সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে বলেছে, দাদা কী বলছেন শুনতে পাচ্ছ?

মেয়েটি এ কথায় আরও বেশি লজ্জা পেয়েছে মনে হয়। আমি তা লক্ষ্য করে খুব আন্তরিক কণ্ঠে বলার চেষ্টা করেছি, ওরা যদি খুশি হয়, আপনাদের দুজনেরই কর্তব্য ওদের খুশি করা।

যুবক সহাস্য করে বলেছে, আমাদের 'আপনি' বলছেন কেন?

বেশ তোমরা ওঠ তবে, আমি আদেশের কণ্ঠে বলেছি।

দাদা যখন বলছেন উঠে পড়, যুবক তার সঙ্গিনীর উদ্দেশে বলেছে। নীহারবাবুর ছোট ছেলে তো বেজায় খুশি, ওরা আমার কথায় উঠে পড়ায়। আমার সঙ্গে ওদের দুজনকে দেখে নীহারবাবু ও সুশান্তবাবু উভয়ে কিঞ্চিৎ অবাক হয়েছেন। নীহারবাবুকে বললাম, আপনার ছোট ছেলের গেস্ট এরা—সুশান্তবাবু আর নীহারবাবু আমার কথায় আরও বেশি বিস্মিত হয়েছেন মনে হল। মেয়েটিকে মনে হল এবার রীতিমত আড়ষ্ট। ছেলেটিরও ইতস্তত ভাব। আমি পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে নীহারবাবুকে ফের বলেছি, আপনি অভ্যর্থনা করবেন তো—আমার গেস্ট হলে না-হয় আলাদা কথা ছিল, বলছি আপনার ছেলের অতিথি।

আসুন আসুন, ওয়েলকাম, নীহারবাবু অনতিবিলম্বে বলেছেন।

আমায় আসুন আসুন কি, আপনার গেস্ট বলে ছিল অন্য কথা, বলছি আপনার ছেলের গেস্ট—

ছেলেটি আর মেয়েটি ইতিমধ্যে বসে পড়েছে। আমি সংক্ষেপে সব কিছু বিবৃত করেছি। শেষে বলেছি, ঝর্ণা খুঁজতে গিয়ে বৃথা ফিরে আসে নি।

সুশান্তবাবু ছোট্ট করে বলার চেষ্টা করেছেন : জল খুঁজতে গিয়ে মানুষের দেখা পেয়েছে।

আমি সুশান্তবাবুর মুখ থেকে আর কিছু শোনার ইচ্ছায় বলেছি, মানুষ আসলে মানুষকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুশান্তবাবু বললেন, বেশ দার্শনিকের মতো বলছেন দেখছি।

আমি জোর পেয়ে বলেছি, মানুষের দর্শনই তো মানুষকে দার্শনিক করে তোলে। সুশান্তবাবু বললেন, আমি না-হয় আপনার কথামতো কমিউনিস্ট, আপনি যে দেখছি রীতিমত ফিলজফার!

বললাম, কমিউনিস্টেরও ফিলজফি আছে, তবে আমার মতো শুধু নয়, রাজনীতির ফিলজফি—

সুশান্তবাবু বললেন, তা না-হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এতো ফিলজফারস, ফিলজফি নয়, ল-ইয়ারস, ফিলজফি।

এই সূত্রে সুশান্তবাবুর সঙ্গে চলল বেশ এক চোট। নীহারবাবুর সঙ্গে যুবক ছেলেটিও উপভোগ করল।

মেয়েটি স্বভাবসিদ্ধ প্রথায় নীহারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আশ্চর্য জমিয়ে ফেলেছে কখন। তাঁকে বৌদি সম্বোধনে এমনই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যেন বহুদিনের পরিচয়। দল থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়েছিল কয়েকটি ক্ষণ, পরে আবার এসে মিলিত হয়েছে। নীহারবাবুর স্ত্রীকে পরিবেশনের সাহায্যের কাজেই শুধু তার এখানে উপস্থিত হওয়া, এমনও মনে হতে পারে।

খুব হৈ-হুল্লোড়সহ খাওয়াদাওয়ার পাট চুকল।

খাওয়ার সময় ছেলেটির অল্প আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করেই আমি নীহারবাবুর ছেলেকে নির্দেশ করে তাকে বলেছি : যত্নের অভাব হলে আপনার হোস্টেই দায়ী কিন্তু।

ফেরার পথে মেয়েটি আর সকলের সঙ্গে [illegible] গাড়িতে উঠেছে। আমি ছেলেটির সঙ্গে পায়ে হেঁটে ফিরলাম। অনেক কথা হল ওর সঙ্গে।

বলল, দাদা, আমাদের লীলাবরণের দিকে আসুন না একদিন।

বললাম, বেশ তো, ঘোরবার জন্যেই তো আসা। কালই যাওয়া যাবে ওদিকটা। কথায় কথায় ও খুবই অল্প সময়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল।

এক সময় জিজ্ঞাসা করেছি, বেড়াতে এসেছেন কি শুধু দুজনেই? সঙ্গে ও কে?

না! আপনার এই 'এসেছেন' আর ঠিক হল না—

আচ্ছা আচ্ছা, আর ভুল হবে না, আমি ওর হাত চেপে ধরে বললাম।

আমারা বলতে বলে ভাল্লে খুশি হব। সত্যি বলুন তো, কে আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি? এমনভাবে রজত বলেছে যে না-বোঝাটা আমার ভীষণ রকম অন্যায়। বললাম, বুঝতে পেরেছি এবার।

রজত বিশেষ কনফিডেনশিয়াল কিছু বলছে এইভাবে গলার স্বর হঠাৎ নিচু করে বলেছে, বাড়িতে সবাই জানে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। ওর মেজদা, মানে করবীর—আমার বিশেষ বন্ধু, নেক্সট ইয়ারে দুজনে ফাইনাল দেব—বাধা দিয়ে বললাম, কিসের ফাইনাল?

রজত বলল, ডাক্তারি:

বললাম, তা হলে তো ভবিষ্যত ভালই।

আর দাদা ভবিষ্যত, ভবিষ্যত যে কী কিছুই মালুম হচ্ছে না। এই দেখুন না যে গাড়ভায় পড়েছি না—

গাড্ডা আবার কিসে?

তা হলে আপনাকে সব কথাই বলতে হয়, রজতের ইতস্তত মনোভাব আমার দৃষ্টি এড়ায় না।

আরে বলেই ফেল না, শুনি কী ব্যাপার—

রজত আমার কথায় সম্ভবত উৎসাহ পেয়ে থাকবে। এক নিঃশ্বাসে এরপর অনেক কিছু বলে গেছে।

করবীর মেজদা ওর প্রাণের বন্ধু। করবীর সঙ্গে ওর যোগাযোগ করবীর মেজদা মারফত। করবীর বিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে ওর মেজদা। করবী নিজেও সাহায্য করেছে। বার দুই বি-এ ফেল করে সেও বিয়ের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেছে। চান্স নেবার আর কোন স্কোপ নেই। করবী হুমকি দিচ্ছে বাড়িতে ব্যাপারটা জানিয়ে রেখে পাড়ামায় করে পরীক্ষার আগুনে ঝাঁপ দিতে। একবার ডাক্তার হয়ে বেরুতে পারলে সুরাহা হতে দেরি হবে না। করবীর মেজদার যা অনুমান, পাত্রের ভবিষ্যত নিশ্চিত জানলেই তার বাবা ভালমন্দ কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আজকাল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বললেই লোকে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না। রজতের মাথায় ডেভেলপমেন্টের চিন্তা যে আসে নি তা নয়। কিন্তু ব্যাপারটা ইদানীং কেমন যেন আউট-অফ-ডেট হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে এখন আর কেউ সিডাকারি খুঁজে পায় না। বরং সিডাকরাস পুত্রবটিকে খুব সাবধানে করে পাঁচজনে বলে, নাও এবার কী করবে কর। না পারবে মেয়ের বাপের কাছে মুখ দেখাতে, না পারবে হাত পাততে আত্মীয়পরিজনের কাছে। সবাই বলবে, সিডাকারি শিখেছ তুমি আর মাসুল দেব আমরা? দেখে এ যাবৎ রজত অনেক কিছুই শিখেছে। অতএব ঠেকে শিখতে চায় না। করবীর মেজদা তাগিদ দিতে চান, বিশেষ করে রজতকে, যা ঠিক করবার করে ফেল। সিমলাতেই লাস্ট চান্স। আমাকে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করেছে, বলুন তো দাদা কী করা যায়? আপনার মাথায় কিছু আসছে? মাথায় যা এসেছে তা বাস্তবিক, কে যে কী উদ্দেশ্যে এসেছে তা যদি প্রথম দর্শনেই অনুমান করা সম্ভব হতো। অন্তত হিসেব করে মিলতে পারতাম। কী কঠিন প্রশ্নই না করেছে রজত। রজতকে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে বলতে গিয়ে যথার্থ অন্যায় করেছি। কে বলেছে ডাক্তারি পরীক্ষার ফাইনাল তার ভবিষ্যত। তার ভবিষ্যতের অনুসন্ধানে সে তাকিয়ে আছে করবীর দৃষ্টিতে। আমি এসেছি কলকাতার ক্লান্তিকর আবহাওয়া থেকে বিমুক্ত হয়ে দু দণ্ডের শান্তির প্রত্যাশায়। সুশান্তবাবু এসেছেন অপ্রতি-রোধ্য ভ্রমণের নেশায়। নীহারবাবু এসেছেন কাঠখড় পুড়িয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারে। রজত আর করবী এসেছে জীবনের কাছে যৌবনকে বাজি রেখে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে।

ভাবতে সময় নিয়েছি, অর্থাৎ এই সবই ভেবেছি। পরে এক সময় বলেছি: করবীর প্রস্তাবে আপাতত সাড়া দিলে ক্ষতি কি। ইতিমধ্যে সময় পাচ্ছ, নিজের কনফিডেন্স যাচাই করে দেখতে পারবে। আর তেমন প্রয়োজন হলে কি আর করবীর বাড়ি থেকে কিছু একটা করবে না। আমার তো মনে হয় নিশ্চয় করবে। তোমার জন্যে না করুক করবীর জন্যে তো করবে।

আই ডাউট, রজত মাথা নিচু করে যখন বলেছে তাকে চিন্তিত মনে হয়েছে।

ওটা তোমার ভুল ধারণা।

তাও যদি হয় তো আমার ডিফিট।

এখন তুমি বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল, মনে হচ্ছে; তখন কি এসব মনে হবে?

কি জানি কিছুই বুঝতে পারছি না। অথচ করবীকে ছাড়া তো বাঁচাও—

রজতের কণ্ঠ আমার সহসা ভীষণ উদাস মনে হল। তার কণ্ঠের অগাধ শূন্যতা আমায় অতর্কিতে স্পর্শ করেছে। আমার মনে হয়েছে নিষ্ঠাবান প্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশ হয়তো এমনই সহজ, অনায়াস। যৌবনের জেনার গান, আমার তো মনে হয়, বিপ্লবের সোচ্চার শ্লোগানের উদ্দেশ্যে কখন কখন সাধন করে। উভয়েরই উৎসে আছে গভীর দুঃখবোধ। যন্ত্রণা থেকে কেউ গান গায়, কেউ হুঙ্কার ছাড়ে।

ভাবলে এখন অনেক কিছুই মাথায় আসে; কিন্তু তার পরিবর্তে রজতকে কিছু বলা দরকার।

বললাম, ও কথা উঠছে কেন? আফটার অল ইউ আর এ ম্যান।

রজত বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বলল, আনটিল আই গ্রো, আই অ্যাম—

করবীর ব্যাপারে রজতকে আমার এতক্ষণ এমন সাবধান মনে হয়নি, এই একটি কথায় এ মুহূর্তে হঠাৎ যেমন মনে হল।

ভেবেছি, ওর সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান আমার জানা না-থাকতে পারে, তবে ওর বিমর্ষ মনোভাবের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু তো বলা যেতে পারে।

তাই বললাম, লাইফের চ্যালেঞ্জ তো এইখানেই। ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দি চ্যালেঞ্জ, লাইফ ইজ ফুল অফ হোপস অ্যান্ড ফিয়ারস।

আমি তো কোন ওপেন ডাউট দেখছি না দাদা, রজতের কণ্ঠস্বর একই রকম বিমর্ষ শোনাল।

আমি বললাম, পথ নিশ্চয় আছে, তোমাকেই বাতলাতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

ওরা শেষ পর্যন্ত হাসিমুখে বিদায় নিলেও, রজত আর করবীর সমস্যার নানা দুশ্চিন্তার বিভ্রত আমার মনের অস্বস্তির কথা কাউকে জানাতে পারলাম না। সুশান্তবাবু আমাকে বলেছেন (আমার মুখ দেখে ওঁর কিছুই বোঝবার উপায় নেই), দেখুন তো কেমন বেড়াতে এসেছে এক জোড়া। হাওয়ায় উড়ছে দুজনে। এসব দেখেশুনে মনে হয়, আবার গোড়া থেকে জীবন আরম্ভ করি। যদি একটা চান্স পাওয়া যায়—

করবী আর রজতের কথায় চিন্তিত থেকেই বলেছি, চান্স না-পাওয়াই ভাল।

না-পাওয়াই ভাল কেন বলছেন? সুশান্তবাবু আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে থাকবেন সম্ভবত।

বললাম, চান্সে পেলেই কি সাকসেস-ফুল হওয়া যায়। বলার পর সুশান্তবাবুকে এক পলক দেখলাম, আমার কথার তাৎপর্য ধরতে পারার কোন ইংগিত তাঁর দৃষ্টিতে আছে কিনা। না, সে রকম কোন ইংগিত মাত্র নেই। চান্স মানে যে সাকসেস নয়, এইটুকুই যেন তিনি প্রথম আমার মুখ থেকে শুনলেন।

কয়েকটি ক্ষণ কি চিন্তা করলেন যেন। পরে মুখের ভাব চকিতে পরিবর্তন করে, আমার কথার সমর্থনে হাসলেন এই ভাবে বললেন, ঠিকই বলেছেন, ইস্টোরাভিউ পাওয়া চান্স, চাকরি পাওয়াটাই সাকসেস।

হেসে বললাম, আলাপের পর এই প্রথম বোধ হয় আপনি আমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে [illegible] একমত হলেন।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

'জয় বাঙলার' আলোয়
'পদ্মা আমার গঙ্গা আমার'

সুশীল চৌধুরী

"পদ্মার ঢেউ রে, শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যাও, যাও রে—"

না, তাতে রাজী নই আর। এবার, হৃদয় পদ্ম ভরে মধু আনব পদ্মার ঢেউয়ে ঢেউয়ে, হৃদয় পদ্ম ভরা সুরভি পাঠাবো গঙ্গার ঢেউয়ে, পদ্মার ঢেউয়ে ঢেউয়ে। দেরী নেই আর।

কবি তিনিই যিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান, যিনি আগামীতে কি আসছে তা দেখেন দেখান। কবির কাজ শুধু ছন্দের সুতোয় মনের মণি মুক্তো গাঁথাই নয় কবি পথের দিশারী—

কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেছেন— কুয়াশা তো গেছেই সরে (পৃঃ ৩৭)। যখন প্রথম পড়েছিলাম বিশ্বাস হতে চায়নি। এখন তো হাতে হাতে প্রমাণ পাচ্ছি তার।

উনিশ বছর আগে একুশে ফেব্রুয়ারী চার শহীদের রক্তপাতে যার সূত্রপাত, যার স্মৃতি এবার একুশদিনব্যাপী উৎসবে পালিত হবার কথা ছিল বর্তমান কয়েক সহস্র বলিতে সে উৎসব হয়তো সেই রকম ভাবে হচ্ছে না। উৎসবের পরিবর্তে হয়তো শবই প্রাধান্য পাচ্ছে। মার্চের তিন তারিখে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। ফলে, তিন তারিখ থেকে সাত তারিখ কয়েক সহস্র প্রাণ বলি দান হল। আরো কত হবে কে জানে! মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান, তার সঠিক ইতিহাস হয়তো কোনদিনই মিলবে না। তবে এও ঠিক—যারা স্বর্গগত তারা এখনও জানে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি। তা জানত বলেই হাসিমুখে বুকে বুলেট বরণ করে রক্তের অক্ষয় অক্ষরে স্বাক্ষর রেখে স্বর্গে যেতে পেরেছে।

কবি বলেছেন — ভুলাতে পারবে না মহম্মদকে/সালামকে এবং রফিককে আর আকবরকে, বাংলা ভাষার গৌরবময় মুক্তির কালো রাতের/বুকের তাজা রক্ত পদ্মা ও গঙ্গার জলকে/মধু বাঙলায় একাকার করে নিয়ে গেল! (পৃঃ ৬৪)।

স্বপ্ন দেখছিলাম। ঢাকার সদর ঘাটের নীরব কামান দুটি কালু খাঁ ও জমজম খাঁ হঠাৎ প্রচণ্ড রবে গর্জন করে উঠেছে। শেখ মুজিবর—বলছেন—ঘাটে কার আন্ত সো ... ভয় হয়েছে। শেখ মুজিবরের কণ্ঠেই ঐ কামান দুটিতে গর্জে উঠেছে। জাতীয় পরিষদ ১৫ ফেব্রুয়ারী ডাকতে বললাম, আমি গরিষ্ঠ দলের নায়ক আমার কথা শোনা দরকার মনে করলে না। পরামর্শ করে চলেছ লঘিষ্ঠ দলের নায়কের সঙ্গে। তার পরামর্শে ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকলে। আমি যখন ঘোষণা করলাম যে ছ দফা কর্মসূচীর প্রতিজ্ঞায় আমি পূর্ব বাংলার সাত কোটির কাছে বদ্ধ, তাতে কোন আপস রফা নেই, তখন ভাবতে লাগলে কি করে জাতীয় পরিষদ বানচাল করা যায়। আবার সেই লঘু দলের নায়ক ও তার পরামর্শ। বৈঠক ৩ মার্চ বন্ধ করে দিলে মার্চের ৩ তারিখ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ার এল, তাকে স্তব্ধ করবার চেষ্টা করলে বুলেট দিয়ে। পশ্চিম অঙ্গে আর কতো সৈন্যই বা আছে! আছে ক কোটি বুলেট! নিয়ে এস। দেখো যেন, পূর্বাঞ্চলের জনজাগরণের জোয়ারে বঙ্গোপসাগরেই তাদের, তোমার সেপাই সান্ত্রীদের সলিলসমাধি না হয়। বেসামাল হয়ে ছ তারিখে ঘোষণা করলে—মার্চের পঁচিশে বৈঠক ডাকলাম। সেও কিন্তু লঘু দলের পরামর্শেই। তার সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস চলছেই। এ মীটিংও তুমি ডাকতে না, যদি না আমি এক ঐতিহাসিক বিবৃতি দেবার প্রতিশ্রুতিতে সাত তারিখে সভা ডাকতাম। ..পঁচিশ তারিখে তোমার জাতীয় পরিষদের ছেঁদো কথা বাদ দাও। আগে কৈফিয়ৎ দাও তোমার বর্বর পশু সেনাদল যে নির্বিচারে নিরস্ত্র শান্ত এতো হাজার বাঙালীকে গুলী করে মারল, তাদের বিচার হোক শাস্তি হোক। আগে রাস্তা থেকে সরিয়ে তোমার ভাড়াটে সেপাইদের ব্যারাকে পোর, তাদের বিচার হোক। জঙ্গী আইন তুলে নাও। সৈন্য হটাও। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কর। তোমার পঁচিশ তারিখ টারিখ পরে দেখা যাবে।...আমি গরিষ্ঠ দলের গুরু। আমি গুরুতের হতে জানি। সরকারী কার্যদপ্তরে অনির্দিষ্টকাল হরতাল ধর্মঘট চলবে। কর-খাজনা দেয়া বন্ধ করলাম।

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে ততই টুটবে/ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে ততই ফুটবে—

গত বছর ১২ নভেম্বর যে মহাপ্রলয় পূর্ববাংলার কূল উপকূল ধুয়ে নিয়ে গেল, তাতে মৃতের সংখ্যা দশ থেকে পনের লক্ষের মধ্যে। 'রামগতি দ্বীপে লক্ষাধিক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন। রামগতির দক্ষিণাঞ্চলের...এলাকা এখনো তিন চার হাত পানির নীচে রয়েছে। একুশ ফুট পানির নীচে সমস্ত রামগতি ছয় ঘণ্টারও অধিককাল নিমজ্জিত ছিল।' এই রিপোর্ট দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার রামগতির সংবাদদাতার। তারিখ ২১ নভেম্বর।

অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সতেরো দিন পরও 'তিন চার হাত পানির নীচে।' ২০ নভেম্বর পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রথম উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার বাহিনীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। ২২ নভেম্বর পাকিস্তান অবজার্ভার এ তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা

It is a very very serious tragedy. The devastation is extensive It is a gruesome sight, believe me

এই যখন অবস্থা, ১২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ছিল, পরের রবিবার পর্যন্তও 'ঐ সমস্ত জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ' ইত্যাদি 'কয়েকজন রবিবার পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন।... উপকূলবর্তী জেলাসমূহের কয়েকজন অফিসার রবিবার মর্নিং শো সিনেমা দেখেছেন।'

"(Sunday M. O. 22 No 70)

পূর্বদেশ পত্রিকার লাহোর সংবাদদাতা পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ বিশেষ করে ধনিক সম্প্রদায়ের কথা লিখেছেন—'ওরা ঈদের বাজার সওদা করতেই ব্যস্ত রয়েছে' (পূর্বদেশ নভেম্বর ৩০)

অর্থাৎ যখন রোম জ্বলছিল পূর্ব-বাংলায়, পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক নীরো-রা তখন বীণা বাজাচ্ছিলেন।

পূর্ব বাংলার মহাপ্রলয় তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তাদের নির্বিকার ঔদাসীন্য, সাহায্য দানের দুঃসহ কার্পণ্যের কথা আপাতদৃষ্টিতে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। ঠিক তা নয়। কেন, বলছি—

১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখটা মহাপ্রলয়ের (তারিখ ১২ নভেম্বর ১৯৭০) তেইশ বছর দু মাস আগেকার।

অর্থাৎ সিকি শতাব্দী আগে কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব দিব্যদৃষ্টিতে এই ঘটনার পূর্ব লক্ষণ টের পেয়েছিলেন।

জয় বাংলা'র সংগ্রাম চলছে। আওয়ামী লীগের বিজয়ী নেতা 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী' জনাব মুজিবর রহমন তাঁর পার্লামেন্টারি সভায় সম্পাদক কার্যক্রম ঘোষণা করছেন।

১৯৪৭ খৃঃ ১৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু পুস্তিকায় মোতাহার হোসেন তাঁর প্রবন্ধ 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা'-তে এক জায়গায় লিখেছেন—'বাঙালী মুসলমান বাঙাল বলেই শুধু পশ্চিমা কেন, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের সর্বভূতের কাছেই উপহাস ও শোষণের পাত্র।' আর এক জায়গায় 'পূর্ববাংলার মুসলমানদের আত্মভোলার দুটি কারণ ঘটেছিল। প্রথমটি, মাতৃভাষা বাঙলার প্রতি অবহেলা, আর দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ভাষার সম্পর্কিত মনে করে উর্দু ভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ। ......তাই তারা উদাসী ভাব, পশ্চিমের প্রতি অসহায় নির্ভর, আর নিজের প্রতি নিদারুণ আস্থাহীনতা।'

তেইশ বছর পরেও পশ্চিম পাকিস্তান শুধু শাসিয়েছে শাসন করেছে, শাঁস জল খেয়েছে পূর্ববাংলাকে দিয়েছে শুধু ছোবড়া। এই কথাটি আজ হাড়ে হাড়ে বুঝেছে ও বুঝছে বাঙাল পূর্ববাঙালী।

কবি দক্ষিণারঞ্জনের তাই আকুল প্রার্থনা—'প্রার্থনা রাত্রির কাছে এইবার ভোর হয়ে আলো/আলোর ডানায় চড়ে কম্পালিত জনতার সমুদ্রের/বুকে—' (পৃঃ ২০)

স্বপ্ন দেখছিলাম। সারারাত্রির প্রত্যাশার পর রাত পুইয়ে ভোর হল। রাত্রির কাছে আমার প্রার্থনা ছিল, কখন স্টীমারের পথ ফুরুবে। দেখব গোয়ালন্দের মুখ। 'গোয়ালন্দে' ভোর হল। স্টিমারে চাপলাম। পদ্মার বুকে ভেসে চলেছি। অনেক বাঘা বাঘা স্টিমার ছিল। বাজার্ড, কাইট, কনডর ডাহুকার—সব শিকারী পাখীর নাম। নয়তো আফগান বালুচ। আমার সবচেয়ে ভাল লাগত বাজার্ড, বোধহয় বৃহত্তম বলেই। আই-জি-এন কম্পানীর স্টিমারের চুঙিতে দাগ নেই, আর-এস-এন কম্পেনীর নিশানা, চিমনিতে জোড়া সাদা বলয়। বাজার্ডে চেপে যাচ্ছি।

স্টেশনে অল্প পরেই রসগোল্লা পাতক্ষীর টীন নিয়ে ছোট ছোট ডিঙি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা স্টিমারের গায়ে এসে ভিড়ল। খুব বিক্রি হল। জাহাজ ভোঁ দিয়ে পড়েছে তরঙ্গ তুলে গভের নাড়াল। ডিঙিরা ডাঙার সাধানে পৌঁছল হল। দশটা নাগাদ তারপাশা আর এক নাম লোহজং। তারপাশা ছেড়ে তাকিয়ে থাকতাম কখন আসবে ভোলিয়বাগ। দেশবন্ধুর ভিটে পদ্মা জবরদখল করে নিয়েছে জেনেও। তারপর দুপুরে নারায়ণগঞ্জ। সেখানে আবার ট্রেন। ছোট ট্রেন মিটার গেজ আমি নামব সোনাই-গঞ্জ ছাড়িয়ে কুলবাড়ি। বাবো রায়সাহেব বাজার।

মাঝখানের বনবাস পর্ব বোধহয় শেষ। 'ঢাকা আমায় ডাকছে। আপন কি হবে পর কখনো, হয় কি বিদেশ নিজের দেশ?' (পৃ ৩৫)

পূর্ব বাঙলার অধিবাসীরা ধ্বনি দেয় জয় বাংলা। সেটা আজকাল। আমার কানে এটা নেতাজী প্রবর্তিত জয় হিন্দ অভিভাষণ-অভিনন্দনের খুব আত্মীয় মনে হয়। পাক রেডিওর পরিভাষায় 'ভারত'কে বলা হয় 'হিন্দুস্থান'। সম্প্রতি পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্র থেকে গত তিন তারিখ থেকে 'হিন্দুস্থান' না বলে বলা হচ্ছে 'ভারত'। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা না বলে বলা হচ্ছে ঢাকা বেতার কেন্দ্র। এ সবই একটি সমগ্র জাতি মনেপ্রাণে এক হতে পেরেছে, ওপার বাংলার সবাই বাঙালীত্বের ভাবে ও ভাবনায় উদ্দীপিত তারই প্রমাণ। এক ভাষার সূত্রে কোটি কোটি মন বাঁধা পড়েছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই মন মাতৃভূমিকেও চিনেছে। ইতিহাসের নূতন অধ্যায় রচিত হচ্ছে ঢাকায়—এপার বাংলা, ওপার বাংলার, একই সঙ্গে—

ওপার বাংলার গান্ধ বুড়িগঙ্গা—মাঝখানে কীর্তিনাশা ধলেশ্বরী পদ্মা—এপার বাংলার গঙ্গায় দুটো ছড়িয়েছে। কবি বলেছেন, 'পদ্মার সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ অক্ষেন/আমিও তাদের মধ্যে আরেক যোগসূত্র 'আমি যাই কখনও ভুলতে পারবো না/আমার পদ্মাকে আমার গঙ্গাকে।' (পৃ ৪৪) কবি দক্ষিণারঞ্জনের উক্তি এভাবে প্রথম প্রয়াস হয়েছে বিফল/এবারেও যদি তেমনিই হবে বিফল (পৃ ২১) কবি দক্ষিণারঞ্জনের এই উক্তির মধ্যে যে দূরদৃষ্টি, তা আবার ঢাকা রাজসাহীর পথে পথে প্রমাণিত হয়ে চলেছে। সাত তারিখ থেকে ইয়াহিয়ার বেআইনির উত্তর দিচ্ছে জনগণ—কর না দেবার আন্দোলনে, গণ আইন অমান্য আন্দোলনে। ১১০৫

খ্যঃ একবার বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন নিষ্ফল করে দিয়ে গেছেন, সার্থকনামা Surrender not রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। কবি দক্ষিণারঞ্জনের প্রথম প্রয়াস বিফল হওয়ার উল্লেখ সেটাই। 'এবারেও কীর্তি তেমনিই হবে বিফল' তো দেখছি 'মুজিবর রহমান' এর ক্রিয়াকলাপে। 'অভিনন্দন' কবিতায়ও কবি দক্ষিণারঞ্জন (যুগান্তর, রবিবার, ৭ই মার্চ) ঐ কথাই পুনরায় ঘোষণা করলেন প্রিয় তব ধ্বনি 'জয় বাঙলা'/কোটি কণ্ঠে সেই 'জয় বাঙলা'—/শিরায় শিরায় বাঙলার প্রেম থাক চির বহমান;/সজীব বঙ্গভাষীর নেতা মুজিবর রহমান/নয়া বাঙলার প্রতিষ্ঠাতা রহমান রহমান!

কবি দক্ষিণারঞ্জনের দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যদ্বাণী যে কতোখানি সত্য ও সফল, তার প্রমাণ ঢাকার রাস্তায় ভিন্ন তারিখ থেকে যে ইতিহাস রচিত হচ্ছে, সেই ঘটনাবলী নিজেই।

কবি বলছেন, 'সে বাংলা এখনও আছে দুই ভাগ যদিও এখন' (পৃ. ১১) কিম্বা 'সুন্দর সুন্দরবন বাঁধে আলিঙ্গনে/চরণ যুগলে ধুয়ে ধন্য মানে বঙ্গোপসাগর' (পৃ. ২২) দুই বাংলাকে বেঁধে রেখেছে সুন্দরবনের রাখী। জননীর দুটি পা—দুই বাংলার একখানি করে চরণ বঙ্গোপসাগরের নীল জলে ডোবানো। কবি বলছেন 'ভাগ করা যায় না ভূগোল' (পৃ. ২৮) কবির প্রতিটি উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতে চলেছে।

কি করে ইতিহাসই বা ভাগ করা যাবে? কবিতাটির নাম 'দু বাঙলা নয়, এক'। শুরুতেই 'ইতিহাস ভাঙে না কখনো (পৃ. ২৮)। আমাদের কথায় বার্তায় দুই বাংলা জড়াজড়ি, আরবি উর্দু হজম করা বাংলা ছাড়া আমরা কথা বলতেই পারি না। 'গাঁজাখোর' 'ঠিকাদার' 'পিকদান' 'গুরুগিরি'। 'ধনদৌলত', গরীব 'কাঙাল', 'হাটবাজার' 'লজ্জাশরম', 'চালাকচতুর', 'কান্ডকারখানা', 'লোকলস্কর', 'খানাপিন', 'শাকসব্জি', 'ঝড়তুফান' 'মুটেমজুর', 'হাসিখুশী' প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সমাসে সংস্কৃত আরবী ফার্সির সঙ্গে যেমন গলাগলি করে চলেছে তেমনি হিন্দু মুসলমান হাত ধরাধরি করে সৃষ্টি করেছে বাংলা সাহিত্য। (লেখকের আংশিক উদ্ধৃতি)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতেন। 'সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস' পুস্তক লিখে তাঁর সরকারী চাকরীটি যায়। এবং পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত হয়। তার সাম্প্রতিক রচনা 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গত বছর নাডম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। এই দুখানি বইই বিলেত থেকে ইংরাজিতে প্রকাশিত হচ্ছে। বই দুখানি নিঃসন্দেহে প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হবে। অংশ বিশেষ উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাই প্রত্যয় হবে সকলের কাছে। বই দুটি তো আমরা পাই নি এখনও আগে পাবে বাইরের বিশ্ব। তার বহু পরে কলকাতা বসে আমরা যদি পাই!

১৯৪৭ জুলাই—ঢাকায় গণ আজাদী লীগের ঘোষণা—বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৭ সেপ্টেম্বর—অধ্যাপকদের গণতান্ত্রিক যুবলীগ বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন এবং আইন-আদালতের ভাষা করতে হবে।

১৯৪৭, ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' পুস্তিকার মোতাহার হোসেন সাহেবের প্রবন্ধের উল্লেখ আগেই করেছি। আর একটু তুলে দিচ্ছি—তাই আজ সময় এসেছে মুসলমান বিদ্বজ্জন...বাংলা সুসাহিত্য সৃষ্টি করে মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় স্থাপন করবেন। উর্দুর দুয়ারে ধর্না দিলে আমাদের কোন কালেই যথার্থ লাভ হবে না।

১৯৪৭ ৫ই ডিসেম্বর। ছাত্ররা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে নাজিমুদ্দীনের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিছু পরই এক শিক্ষা সম্মেলন বসে করাচীতে, তাতে সর্বসম্মত স্থির হয়—উর্দুই হবে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা। এর প্রতিক্রিয়ায় ঢাকাতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা বসে। মিছিল বেরোয়। ভাষার জন্যে সেই প্রথম সভা, প্রথম মিছিল।

কায়েদে আজম ঘোষণা করলেন—আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্য কোন ভাষা নয়।

১৯৪৮, ৩১শে ডিসেম্বর, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

পূর্ব বাংলা জনসংখ্যায় গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে ধান্যে জ্ঞানে গুণে শিল্প বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করে তুলতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন দিতে হবে।

জানি না অন্য বিষয়ে কতটা অগ্রগতি করেছেন ওপার বাংলার লেখকেরা, সনাতন পাঠকের ভাষায়—'এ কথা আজকাল অস্পষ্ট হয়েও আমাদের জানা হয়ে গেছে যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনার কাজে পূর্ব পাকিস্তানের লেখক ও ধীমান ব্যক্তিরা বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখাচ্ছেন।'

যে শহীদুল্লাহ সাহেব স্যার আশুতোষের অত্যন্ত স্নেহভাজন হওয়া সত্ত্বেও যাকে ধর্মের গোঁড়ামির ভয়ে সংস্কৃত কলেজে ঢোকাতে পারেন নি, যাকে প্যারিসে গিয়ে সংস্কৃতের ডক্টরেট আনতে হয়েছিল যে মনীষীর বাংলা ও বাংলা প্রীতির জন্য কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের জ্বালায় গোপনে রাতারাতি পাকিস্তান ত্যাগের পরিকল্পনা করতে হয়েছিল—যদিও তা পাকিস্তান সরকার ধরে ফেলে বানচাল করে দেন, সেই বাংলা প্রেমিক শহীদুল্লাহ সাহেবের ৩১শে ডিসেম্বরের উপরোক্ত ভাষণে ফিরে যাই।

"আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।"

শহীদুল্লাহ সাহেবের চেয়ে বাঙালী প্রেমিক খুব কমই দেখা যায়। তাই তার বক্তৃতা ও বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তার উক্তি সব চেয়ে 'বেশী সত্য, আমরা বাঙালী।'

তার বাইশ বছর পর কবি দক্ষিণারঞ্জন বলছেন, 'বাংলা ভাষায় আমরা কবিতা লিখি, বাংলা ভাষায় আমরা স্বপ্ন দেখি, একই তো মোদের মুখের বুকের ভাষা/একই আমাদের বাঙালীর প্রত্যাশা"। (পৃ. ২৯)

Rome was not built in a day

১৯৪৮, ৩১শে ডিসেম্বর—শহীদুল্লাহ সাহেবের বক্তৃতা;

১৯৫২, ২১শে ফেব্রুয়ারী—বরকত সালাম রফিক আকবর শহীদ হলেন।

কবি দক্ষিণারঞ্জন বলেছেন—মরবো না আমরা মরবো না,/টুকরো করার তলোয়ার আর ধরবো না (পৃ. ২৩)। বরকত সালাম রফিক আকবর তো মরেনি। আজও, '৭১ সালের ৭ই মার্চ তারাই সহস্রগুণে লক্ষগুণে ব্যাপ্ত, ব্যাপ্ত পূর্ব বাংলার শহরে গঞ্জে গ্রামে। কবির ভাষায় বলি,

—জয় হিন্দ জয় বাংলা

ভারতীয় ভাষা সমারোহ

ভারতের বিভিন্ন ভাষামণ্ডলীর সাহিত্যকর্ম বাহ্যতঃ ভিন্ন আকৃতির হলেও তাদের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য বর্তমান। গান্ধী পিস ফাউণ্ডেশন এবং ভারতীয় বিদ্যাভবনের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সর্বভারতীয় সাহিত্যসম্ভারের একটি সঞ্চয়নী প্রকাশিত হয়েছে। অ্যানথোলজীর বাংলা পরিভাষা হিসাবে 'সঞ্চয়নী' কথাটি ব্যবহার করা হল। এই সঞ্চয়নী গ্রন্থটির ভাষা ইংরাজী এবং সম্পাদনা করেছেন শ্রীযুক্ত কে স্বামীনাথন। এবং গ্রন্থটির নাম 'অ্যান অ্যানথোলজী অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার'। জাতীয় সংস্কৃতিতে সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই গ্রন্থটি গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে নিবেদিত।

এই সঞ্চয়ন গ্রন্থটি ইংরাজী ভাষায় রচিত হওয়ার ফলে সর্বভারতীয় পাঠকের পক্ষে এর মর্মগ্রহণ সহজ হয়েছে। এখনও ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের আলাপাচারের ভাষা হিসাবে ইংরাজীই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেই কারণে ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় এই 'সঞ্চয়নী' প্রকাশিত হলে সারা ভারতের পাঠকের পক্ষে রসগ্রহণ করা সম্ভব হত না।

এই গ্রন্থটির পরিকল্পনাও প্রশংসনীয়। প্রতিটি ভাষা বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং তারপর সেই ভাষায় নির্বাচিত অংশবিশেষ অনুবাদ করা হয়েছে। গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরের মধ্যেই প্রকাশের চেষ্টায় অতিশয় দ্রুততালে এই গ্রন্থের মালমশলা সংগৃহীত হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায়। এর জন্য অবশ্য সম্পাদক ত্রুটি স্বীকার করেছেন।

বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর যেসব লেখকরা এই গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের আলোচনাগুলি তাই সবক্ষেত্রে এক ধরনের হয়ে ওঠেনি, কিন্তু যোলোটি বিভিন্ন ভাষার প্রায় ৩০০ জন গ্রন্থকারের পরিচয় সহজে এবং সংক্ষেপে পরিবেশন করা সহজ ব্যাপার নয়।

এই সঞ্চয়ন-গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ সুখের বিষয় বাংলাভাষা ও সাহিত্য-সম্পর্কিত পরিচ্ছেদটি। এই পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। বাঙালী-মাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

ভারতের ৩৩·৯ মিলিয়ন মানুষ এবং সংলগ্ন রাষ্ট্র পাকিস্তানের একটা গরিষ্ঠ অংশ বাংলা ভাষাভাষী। বাংলাভাষার উদ্ভব অপভ্রংশ—অবহট্ঠ থেকে দশম শতাব্দীতে এবং অশোকের ব্রাহ্মীলিপি থেকে বাংলার অক্ষর গড়ে উঠেছে। ১৭৭৮ খৃঃ হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাভাষার গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল ঔরঙ্গজীব-কন্যার সঙ্গে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর প্রেমলীলা সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্তের মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত এবং রাজপুত জীবনসন্ধ্যা যথাক্রমে ১৮৭৮ এবং ১৮৭৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ডাঃ দাশগুপ্ত বাংলাভাষার ক্রমবিকাশের পরিচয় দিয়েছেন সংক্ষেপে অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ ভঙ্গীতে।

এই সঞ্চয়নীতে অবশ্য বর্ণানুক্রমিক ভঙ্গীতে বিভিন্ন ভাষা সংক্রান্ত আলোচনা সাজানো হয়েছে, তবে সংস্কৃত এবং ইংরাজীর কথা স্বতন্ত্র। সংস্কৃত ভারতীয় ভাষাগুলির জননী এবং ইংরাজীর স্থান হয়েছে সর্বশেষে, কারণ ইংরাজী ভাষা ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত নয়।

সংস্কৃত ভাষার পরিচয় দিয়েছেন ডাঃ রাঘবন তের পৃষ্ঠাব্যাপী সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এবং ৯৭ পৃষ্ঠাব্যাপী দৃষ্টান্ত অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে আছে মানব-সমাজের জীবনের উদ্যাপনের মহান গ্রন্থ 'ঋগ্বেদ'। ঋগ্বেদ থেকে নির্বাচিত অংশাবলী কোথাও বা অতিশয় দীর্ঘ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিশয় সংক্ষিপ্ত। শকুন্তলা নাটকের সঙ্গে ভারতীয় মাত্রেই পরিচিত এবং এই নাটকের অনুবাদ হয়েছে অনেক বিদেশী ভাষাতেও। শকুন্তলা চতুর্থ অঙ্কটির সম্পূর্ণ অনুবাদ এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ভাগবৎ গীতার ছয়পৃষ্ঠাব্যাপী অনুবাদেরও প্রয়োজন ছিল না। শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই এই ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত। তাছাড়া এই গ্রন্থের অনেক রকমের অনুবাদও বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে বারো পৃষ্ঠা জুড়ে আছে অথচ কুমারসম্ভব এবং মেঘদূতের অনুদিত যথাক্রমে চার লাইন এবং ছ' লাইন। চতুঃষষ্ঠীকলার তালিকারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্য-প্রসঙ্গে রচিত ডাঃ রাঘবনের এই আলোচনা নিছক প্রাথমিক ধরনের। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা সংক্রান্ত বিষয়ক প্রচলিত নিবন্ধাবলী এই প্রবন্ধ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হবে।

হিন্দী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা সংক্রান্ত দশপৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনাটি রচনা করেছেন ডাঃ নগেন্দ্র এবং ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন পণ্ডিত মহেন্দ্র চতুর্বেদী। নির্বাচিত সাহিত্যাংশের অনুবাদ ১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। হিন্দী কবিতার উদ্ভব দশম শতাব্দীতে। তবে তার আকৃতি ও প্রকৃতির রূপান্তর ঘটেছে এবং সর্বদেশের ও সর্বকালের সাহিত্যের মত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানুসারে তার পরিবর্তন ঘটেছে। হিন্দী গদ্যের ক্রমোন্নতি ঘটেছে মুন্সী প্রেমচন্দ প্রভৃতি লেখকদের সমবেত প্রচেষ্টায়। মুন্সী প্রেমচন্দের হিন্দী রচনার উর্দু অক্ষরে মুদ্রিত প্রতিরূপ উর্দু সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং মুন্সী প্রেমচন্দ উর্দু সাহিত্যেরও একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক। উর্দু সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনাটিও সংক্ষিপ্ত। ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কেরল অঞ্চল অধিকতর উন্নত, শিক্ষিত নর-নারীর সংখ্যা এখানে শতকরা ৪৬ ভাগ। এখানকার দৈনিক এবং সাময়িক পত্রাবলীর প্রচারসংখ্যা ভারতের অন্য যে-কোনও অঞ্চলের চেয়ে বেশী। এখনকার লেখক সমবায় প্রতিষ্ঠিত প্রকাশন কেন্দ্র বেশ লাভজনক ব্যবসায় এবং শতকরা ৩০ ভাগ সম্মানমূল্য হিসাবে লেখকদের দেওয়া হয়। শিক্ষাদীক্ষিত এবং রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নর-নারীরা সংখ্যাধিক্যের জন্য এই অঞ্চলের সাময়িক ও দৈনিক পত্রাবলী নতুন লেখকবৃন্দের আবিষ্কারে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিভাগটির লেখক উপযুক্ত ক্ষমতার এই আলোচনাটি রচনা করেননি।

কাশ্মীর ভূস্বর্গ হিসাবেই খ্যাত, কিন্তু তার সাহিত্য-ইতিহাস সুপ্রাচীন। স্যর জর্জ গ্রীয়রসনের মতে কাশ্মিরী ভাষাই একমাত্র আর্য ভাষা এবং সেই ভাষাই কালক্রমে বর্তমান আকৃতি লাভ করেছে। কাশ্মিরী সাহিত্যে কবিতা বিভাগ অভিনব সমৃদ্ধ এবং ষোড়শ শতাব্দীর লাল দাদ, সতের শতকের হুপতখানী এবং আঠার শতকের হাব্বা খাতুন এবং অরনি মল প্রভৃতি কবিদের মধ্যে মহিলা কবিদেরই প্রাধান্য। শিব-লগন, রাধা স্বয়ম্বর, সুদামাচরিত প্রভৃতি রচনাবলীর মধ্যে সমসাময়িক কালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মনোভঙ্গীর মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাভাষার সঙ্গে আসাম ও উড়িষ্যা ভাষাগোষ্ঠীর একটা পরিবারগত সাদৃশ্য আছে। ডাঃ মহেশ্বর নিয়োগী অসমীয়া সাহিত্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'চর্যাপদ'কে পূর্ব ভারতের ভাষাগোষ্ঠীর সবাই নিজস্ব বলে দাবী করেন, বাংলা, বিহারী, ওড়িশি ও অসমিয়া—সব ভাষারই দাবী চর্যাপদ তাঁদের সাহিত্যের আদি জননী। বাঙালী হিসাবে আমাদের এই দাবীতে আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে, কারণ, এতদ্দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হবে এই সব ভাষাগুলির মধ্যে একটা মৌল যোগসূত্র বর্তমান, আঞ্চলিক উচ্চারণ-পদ্ধতি এবং ব্যবহারভঙ্গীতেই ভাষার রূপ এক-একটি প্রান্তে এক-এক প্রকার। অসমিয়া সাহিত্যের প্রাচীন রচনার উপজীব্যও পৌরাণিক কথা ও কাহিনী।

ওড়িশি সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে কিঞ্চিৎ বিলম্বে। অনেকদিন বিহারের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধা থাকার ভাষা বিকাশে বাধা পড়েছে। কিন্তু বর্তমানে ওড়িশি সাহিত্য বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। কোণার্কগীতি এবং চৌতিশা ওড়িশি কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন। সরলা দাস-কৃত মহাভারতের অনুবাদ এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

তামিল সাহিত্যের ঐতিহ্য ২,২০০ বছরেরও প্রাচীন, তবে প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন সামান্যই পাওয়া যায়। সঙ্গম যুগের দ্রুপদী সাহিত্য, সঙ্গম উত্তরকালের সাহিত্য। প্রাচীন কাব্যাবলী, ভক্তিমূলক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী। থোলকাপ্পিয়াম, থিরুক্কুরাল, শিলাপ্পাধিকরম, মণিমেকলাই ও চিন্তামণি অতি প্রাচীন তামিল রচনা। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বাংলা-ভাষায় সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তামিল সাহিত্যের কিছু অনুবাদ ও আলোচনা করেছেন।) কাম্বা রামায়ণ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীযুক্ত কে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ভারতবর্ষীয় লেখকের রচনায় ইংরাজী সাহিত্যসম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের খ্যাতিমান লেখক, তিনি ভারতীয়গণ রচিত ইংরাজী সাহিত্যসম্পর্কিত অংশটুকু আলোচনা করেছেন। তবে এই আলোচনাটিতে অনেক ফাঁক আছে।

সামগ্রিক বিচারে এই গ্রন্থটি ভারতীয় সাহিত্য-ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম।

—অভয়ংকর

AN ANTHOLOGY OF INDIAN LITERATURES : Edited by K. SANTHANAM. Published by BHARATIYA VIDYABHAVAN : Bombay-7. Price: Rupees Fifty only.

সাহিত্যের খবর

অসমীয়া লেখকের শতবার্ষিকী।। অসম সাহিত্য সভার প্রথম সভাপতি এবং অসমীয়া সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক পদ্মনাথ গোহাইন বড়ুয়ার জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হবে এবছরের ২৪ নভেম্বর থেকে। সমস্ত আসামে ঐ শুভদিনটি নানা সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করার এক ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন অসম সাহিত্য সভা। সংবাদে প্রকাশ এই শতবার্ষিকী উৎসবটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালনের জন্য পদ্মনাথ গোহাইন বড়ুয়ার রচনার একটি সংকলন এবং তাঁর রচনার উপর একটি গবেষণামূলক বই প্রকাশ করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লেখকের সাহিত্যিক অবদানের কথা প্রচার করা হবে।

সাহিত্য অকাদামির নতুন সম্পাদক।। সাহিত্য আকাদামির নতুন সম্পাদক হিসেবে গত ১ মার্চ থেকে কার্যভার গ্রহণ করেছেন ডা প্রভাকর মাচওয়ে। শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী অবসর গ্রহণ করায় তাঁর জায়গায় শ্রীমাচওয়ে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

কবি ও সমালোচক হিসেবে শ্রীমাচওয়ে ভারতীয় সাহিত্যে একটি পরিচিত নাম। তাঁর মাতৃভাষা মারাঠি। ১৯১৭ খৃঃ গোয়ালিয়রে তাঁর জন্ম। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ও দর্শনে স্নাতক হন এবং পরে হিন্দি সাহিত্যের উপর গবেষণা করে পি-এইচ-ডি সম্মান লাভ করেন। হিন্দি ও মারাঠি—উভয় ভাষাতেই তিনি লিখে থাকেন। বাংলাভাষাও মোটামুটি বলতে পারেন এবং বাংলা সাহিত্যও প্রচুর পড়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে "স্বপ্ন-ভঙ্গ" ও 'তারসপ্তক' বিশেষ উল্লেখ্য।

পাবলো নেরুদা ও নোবেল পুরস্কার।। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি পাবলো নেরুদা এখনও নোবেল পুরস্কার পান নি। অথচ অনেক আগেই তাঁর এ পুরস্কারটি পাওয়া উচিত ছিল। যেমন উচিত ছিল বিখ্যাত ইতালিয়ান কবি উনগারেত্তির পাওয়া। যাই হোক, উনগারেত্তি আর বেঁচে নেই। নেরুদা এখনও জীবিত আছেন। তাই

তাঁর কথা এই পুরস্কার প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে গ্রাফিকের সাও পাওলো থেকে প্রকাশিত ফোলহা দা তারদে নামক পত্রিকায় ভিনসেন্তে রাওস কর্তৃক সম্প্রতি লিখিত একটি প্রবন্ধের অনুবাদ পাঠ করে। প্রবন্ধকার প্রথমে এ বছরের পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক এ. সোলঝেনিৎসিনকে এই পুরস্কার দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এরপর তিনি লিখেছেন—"একজন লাতিন আমেরিকান হিসেবে আমি এ প্রসঙ্গে পাবলো নেরুদার নামোল্লেখ না করে পারছি না। নোবেল কমিটির সভাগৃহেতে যোগ্যপ্রার্থী হিসেবে নেরুদার নাম নাকি একাধিকবার উঠেছে। মাত্র সম্প্রতি সুইডেনের সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠায় এ-ঘটনাটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সুইডেনের সাহিত্যসমাজেও কবির রচনাবলী সুপরিচিত। উদাহরণস্বরূপে, নেরুদার রচনাবলী অনুবাদকদের মধ্যে আর্তুর লুন্ডকভিস্টের নাম উল্লেখ করা চলে। প্রসঙ্গত: এও উল্লেখ্য যে লুন্ডকভিস্ট সুইডিস আকাদমির একজন সদস্য।"

পুরস্কার সম্বন্ধে আমাদের মত অনীহাই থাক না কেন, একথা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে নোবেল পুরস্কার মহত্তম সম্মানের সূচক এবং এই পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে অনেকেই উচ্চমর্যাদার অধিকারী। পাবলো নেরুদার মত একজন লেখক এই সম্মানে ভূষিত হলে সাহিত্যরসিক মাত্রেই এ কারণে আনন্দিত হতেন। প্রবন্ধকার ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন—"নোবেল কমিটি একজন সত্যিকার মহৎশিল্পীর খাঁটি শৌর্য থেয়াল করে দেখতে ভুলে গেছে। সারাজীবন নেরুদা অন্য সকল মানুষের চেয়ে বেশি করে অন্যায় ও হিংসার বিরুদ্ধে, মানুষের সামাজিক ও আর্থিক বন্দীদশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন। একদা স্পেনে যাঁরা যুদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন, স্প্যানিশ স্বরণার্থীদের জন্যে লাতিন আমেরিকার সাহায্য তহবিল সংগঠিত করেছেন। চিলির সমাজজীবনে তাঁর অবদান অপরিসীম।" আজকের বিশ্বসাহিত্যে নেরুদা একটি নাম। প্রবন্ধকারের এই বক্তব্যের প্রতি আশা করি অনেকেই সমর্থন জানাবেন।

বিহার রাজ্য বাংলা ভাষা সম্মেলন।। গত ২৩-২৬ ফেব্রুয়ারী ঘাটশিলায় চতুর্থ বিহার রাজ্য বাংলা ভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিহারের খনি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীবিজয় মিত্র। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন—"ভারতের প্রত্যেকটি জাতীয় ভাষার প্রতি আমরা যদি শ্রদ্ধাশীল হতে না পারি, তাহলে খাঁটি ভারতীয় বলে আমরা দাবী করতে পারি না।" সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রীবরদাপ্রসন্ন পাইন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত 'হলেন সার্চ লাইট' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার। তিনি বলেন—"চিন্তা ও কর্মধারার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে সংহতির মধ্য দিয়ে যে কোন জাতি মাতৃভাষা রক্ষা ও উন্নতির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম।"

বিশেষ অতিথি শ্রীনিরঞ্জনরঞ্জন বসু তাঁর ভাষণে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের মাতৃভাষার জন্য সংগ্রামের ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—"কোন ভাষাকেই জোর করে দাবিয়ে রাখা যায় না। ইংরেজিকেও নানাভাবে বাঁচিয়ে রাখার অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেই ইংরেজীই তার দুর্বলতার হেতু অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা।" শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ সমকালীন বাংলা সাহিত্যের উপর একটি সারগর্ভ আলোচনা করেন। এই সভায় একটি নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সভাপতি ডাঃ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় (পাটনা), সহ-সভাপতি ডাঃ আর এন সিংহ (পাটনা), রাজেন্দ্রলাল সেন (রাঁচী), ডাঃ শিবানন্দ আচার্য (ভাগলপুর) এবং ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী (ধানবাদ); সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার (পাটনা), যুগ্ম-সম্পাদক ডাঃ গুরুচরণ সামন্ত (পাটনা) ও দেবপ্রসাদ ঘোষ (হাজারিবাগ), সহকারী সম্পাদক শ্রীসত্যকিরণ ব্যানার্জি (ঘাটশিলা) ও সকুমার সরকার (ভাগলপুর), কোষাধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ ব্যানার্জি (পাটনা) নির্বাচিত হয়েছেন। এই সম্মেলনে কয়েকটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

শোকসভা।। জোরহাট সাহিত্যসভার উদ্যোগে গত ১১ ফেব্রুয়ারী জোরহাট সরকারী কলেজে ডঃ বে এস মুন্সী, বিখ্যাত অসমীয়া লেখক ও শিক্ষাবিদ ডঃ প্রসন্নচন্দ্র গোস্বামী এবং অসম সাহিত্যসভার প্রাক্তন সম্পাদক কেশবনারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক যতীন গোস্বামী। অধ্যাপক ত্রিলোচন শর্মা, অধ্যাপক নগেন শইকীয়া, দেবপ্রসাদ বড়ুয়া, গিরিশ ভট্টাচার্য প্রমুখ ভাষণ দেন।

—চার্বাক

নতুন বই

কবিকণ্ঠ : এপার বাংলা ওপার বাংলা (সংগ্রহ)—অভিজিৎ ঘোষ সম্পাদিত। অরিন্দম। ২১।১ গড়িয়াহাট রোড (পশ্চিম)। কলকাতা-৩১। দাম : চার টাকা।

ওপার বাঙলার কবি আয়নুল হক লিখেছেন—

তোমার দুলাল মাগো, সৈনিক এখন।
বুকের ভিতরে তার
প্রতিদিন
তোমার স্নেহের ঋণ
দুন্দুভির ধ্বনি
ওঠে অবিরাম,
আবেগ চঞ্চল
প্রতিটি ধমনী
মা, তোমার সোনার খোকন
মিছিলের একটি সতেজ মুখ।
সংগ্রামী সাথীদের কাছে
সে এখন অগ্নিগর্ভ দিনের সন্তান।

আর একজন কবি ইউসুফ পাশা লিখেছেন—

সমস্ত শরীরে; আমার রক্তে আমার মা,
আমার দেশ—আমার প্রেম।
সোনাভানের পাখি আমার স্বপ্ন
বুড়িগঙ্গার জলে সে জনতা
স্নান শেষ করে
রাস্তায় রাখে ভেজা পায়ের ছাপ—
একদিন বুড়িগঙ্গার সেই সাদা পানি
বুকের রক্ত দিয়ে ওরা লাল করে গেছে
আর আমরা সেখানে স্নান করে
রক্তভেজা পা ফেলে ফেলে
বাংলার গলা জড়িয়ে
মায়ের আদরে ঘুম খেতে চাই।

এক যুগসন্ধির দর্পণে রচনা করে চলেছেন ওপারের কবিরা। দ্বিধা-বিভক্ত বাংলার দু পারে প্রবাহিত সংস্কৃতি। এপার-ওপারের কবিদের রচনা স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। কবিতার আঙ্গিক, বিষয়, ছন্দ, বিচিত্র ভাবুকতা, আত্মকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক মননের যে বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তারই দলিল হিসাবে উপস্থিত করা যায় অভিজিৎ ঘোষ সম্পাদিত এই সঙ্কলন গ্রন্থখানিকে। রাজনৈতিক বিভেদ মনের দুয়ারে যে কপাট টেনে দিতে পারে নি তার প্রমাণ এপারের কবিকণ্ঠ : বিমলচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন—

দুই পারে দুই মন

মধ্যিখানে আলোর সেতু মুখর সারাক্ষণ।
রং-বেরংয়ের বন্দনাতে মশাল
কাঁপছে হাজার হাজার।

হঠাৎ করে নিভছে শিখা
নিষ্ঠুরতার মায়া।

এপার চেয়ে থাকে
ওপার আঁধার জোনাক জ্বলা
আর্তে ঝিঁঝির ডাকে
লক্ষ মুখর আলোর সেতু
রুদ্ধ ব্যথার কাঁপে

দুই পারে দুই মনের বাণী
স্তব্ধ অভিশাপে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—
আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—
থাকুক সে পাহারা।

দুয়ারে খিল
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানালা

ওপারে যে বাংলা দেশ
এপারেও সেই বাংলা।

আর এক ভিন্ন সুর শোনা যায় মণীন্দ্র রায়ের কণ্ঠে—
তুমি, শুধু তোমার নামেই
তুমি, সর্বস্ব আমার,
তোমার নামেই লেখা আজীবন এই
কবিতার অক্লান্ত দলিল।
কৈশোরের ফুল আর পাখির ডানাতে
যৌবনের তারাভরা বন্দনার রাতে
নিরত তোমারই দিকে, তোমার দিকেই
খোলা এই চোখের ঝিলমিল।

—আরও অনেকে লিখেছেন এই সঙ্কলনে। এপার-ওপারের অসংখ্য প্রবীণ ও তরুণ কবির কবিতা কিঙ্কণতার সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন শ্রীঅভিজিৎ ঘোষ। ভূমিকায় দুপারের কবিদের সম্পর্কে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন : 'কবিদের ভাষা যে এক সে তো স্বতঃসিদ্ধ। প্রকরণও মোটামুটি এক। ভাবের দিক থেকে বৈষম্য যদি কিছু থাকে তাও গুরুতর নয়। এক কথায় বলা যেতে পারে, পূর্বের কবিরা দেশপ্রেমিক প্রকৃতি-প্রেমিক ও রোমান্টিকপ্রেমিক। পশ্চিমের কবিরা সমাজসচেতন, প্রগতিসচেতন ও অবক্ষয়সচেতন। যাঁরা বাঙ্গালী, বাংলা দেশ যাদের মাতৃভূমি, বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা বইখানি নিয়ে গর্ববোধ করবেন। বইখানির মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জায় আরো যত্ন নেওয়া উচিত ছিল।

এপার বাংলা ওপার বাংলা (শহীদ স্মরণ সংখ্যা)—সম্পাদক দুলাল চৌধুরী ও গৌরীপদ ভট্টাচার্য।। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতি, পি-১১২ সি-আই-টি রোড, কলকাতা-১০।। দাম দেড় টাকা।।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতির পাক্ষিক মুখপত্র 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বরাবরই আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষ ও ১৯৫২-র ভাষা শহীদদের দিকে। আজ যখন ওপারের মানুষ সাফল্যের দ্বিনারায়, তখন সম্পাদকদ্বয় এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করে গভীর দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। কবিতায় ও প্রবন্ধে-নিবন্ধে একুশে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্যটি ওস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, মনোজ বসু, হাবিবুর রহমান, সুনীল সরকার, শহীদুল্লা কায়সার মোহম্মদ ফজলুর রহমান, আবু জাফর শামসুদ্দিন, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, হোসেন আরা আমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে : "একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার ইতিহাসে শুধু ভাষা আন্দোলনের দিন নয়—এই পবিত্র দিনটি হলো নির্যাতিত, বঞ্চিত কোটি কোটি নরনারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়, সংগ্রামের রক্তাক্ষরে লেখা একটি ঐতিহাসিক দিন।"

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

রূপক (দ্বিতীয় সংকলন)—সম্পাদক গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়।। ১২, তেলি-পাড়া লেন, কলকাতা-৪।। দাম : চল্লিশ পয়সা।

বাংলা কবিতায় পালা বদলের আভাস পাওয়া যায় সংকলনটির বিভিন্ন কবিতায়। পঞ্চাশ-ষাটের কবিরা একেবারে অনুপ-স্থিত। তরুণতম কবিদের কবিতা ও কবিতাধর্মী ছোটগল্পে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। হয়তো এঁরাই হবেন ভবিষ্যতে বাংলা কবিতার নিয়ামক। এ-সংখ্যায় লিখেছেন তপন মুখোপাধ্যায়, নিশীথ ভড়, পার্থ-প্রতিম কাঞ্জিলাল, অঞ্জন সেন, ভারতী সরকার, কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিদিব মিত্র, অভিজিত রায়, নিখিল বসু, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিত ঘোষ, রঞ্জন শীল, নচিকেতা, স্বর্ণজিৎ মুখোপাধ্যায়, সোমেন বসু, অভ্র ঘোষ, অমিতাভ গুপ্ত, কমল সাহা ও গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটি আকারে কিছুটা ছোট। প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছাপা রুচিসম্মত।

গ্রামীণ (মাঘ, ১৩৭৭) সম্পাদক : শ্রীহরি-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ, পি-৮, হাইড লেন, কলকাতা-১২। ২৫ পয়সা।

এই মাসিক পত্রিকাটিতে মুখ্যত পশ্চিমবাংলা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প-সম্পর্কীয় আলোচনা স্থান পেলেও, মাঘ সংখ্যাটি নিবেদিত হয়েছে নেতাজীর ৭৫তম জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধা-স্মরণে। লিখে-ছেন : অশোক গুহ, ধীরেন ভৌমিক, দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখো-পাধ্যায় প্রমুখ। নেতাজীর স্বপ্ন এবং অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাকে সুন্দরভাবে উপ-স্থাপিত করা হয়েছে বিভিন্ন নিবন্ধ মারফৎ।

বইকুণ্ঠের খাতা

মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে একটা আলোচনা লিখেছিলাম বইকুণ্ঠের খাতায়। পুজোর সামান্য পরে হবে বোধহয়। তখন ব্যাপারটার গুরুত্ব ছিল অন্যরকম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, গ্রাম-বাংলা ও জেলা শহরগুলি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকার সমস্যা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে অমৃতের পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বোঝাতে চেয়েছিলাম, কি রকম আন্তরিকতা নিয়ে মফস্বলের লেখক-লেখিকারা কাগজ বের করেন—নতুন পাঠক তৈরী করেন—এবং কী তাঁদের সুবিধা এবং অসুবিধা।

হয়তো পুরোপুরি আমি ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করতে পারি নি। গত কয়েক মাস ধরে, পশ্চিম বাংলা ও বহির্বঙ্গের পাঠক-পাঠিকারা নানারকম প্রস্তাব উত্থাপন করে আমার বক্তব্যকে সম্পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেছেন। কেউবা লিখেছেন, লিটল ম্যাগাজিনের গ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির অপ্রতুলতার কথা। কেউবা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ছাপা খরচ ও নিউজপ্রিন্টের দুষ্প্রাপ্যতার দিকে।

আমার মনে হয়, এরকম অসুবিধা অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। অব্যবসায়ী পত্রপত্রিকার পক্ষে ব্যবসায়ী সাফল্য আশা করাও বৃথা। সেজন্যে অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটিই সকলের কাছে বিবেচ্য।

তবে একটা বিষয়ে অনেকেই একমত যে, মফস্বলের কবি সাহিত্যিকদের পরিচিতি-পরিচয়ের অপ্রাপ্তি দূর করার জন্য অমৃতের মতো বহুল-প্রচারিত সাপ্তাহিকের এগিয়ে আসা উচিত। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, লিটল ম্যাগাজিনের প্রচার-সঙ্কীর্ণতার জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য লেখা এবং লেখকই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যাচ্ছে।

সাঁওতাল পরগণার ভূমিহরংং থেকে লীলা রায় প্রস্তাব করেছেন, 'মফস্বলের পাতা' নাম দিয়ে যেন অমৃতের একটা বিশেষ বিভাগ খোলা হয়। তাঁর ধারণা : "এতে নিত্যনতুন সাহিত্যিককে পাঠকমণ্ডলীর কাছে পরিচিত করে দেওয়া হবে। কে জানে হয়তো ভবিষ্যতে ঐ তিনটে পাতা থেকেই আমরা অনেক শক্তিশালী লেখকের মুখ দেখতে পাবো।"

খুব সরল বিশ্বাস। দু'একজন নতুন সাহিত্যিক ছাড়া তাঁর এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার মতো মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ যে বাংলাদেশে নেই, তা টের পেয়েছিলাম অমৃতে তাঁর চিঠিটি বেরোবার সামান্য পরেই। প্রথমত তিনি "হয়তো ভবিষ্যতে" শব্দ দুটি ব্যবহার করে নিজেই প্রস্তাবের অসারতা প্রমাণ করেছেন, দ্বিতীয়ত মফস্বলের লেখক নামে কি কেউ চিহ্নিত হতে চাইবেন? তার সার্থকতা কি?

কৃষ্ণনগর থেকে অমৃতের অন্যতম পাঠক মুকুলেশ শুকুল তাঁর প্রস্তাবকে সরাসরি নস্যাৎ করে দিয়ে অনুরোধ করেছেন যেন গ্রামবাংলার লেখক-লেখিকাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তবে 'মফস্বলের লেখক'?—এই রাজটীকা কখনো পরিয়ে না দেওয়া হয়।

কথাটা শুধু মুকুলেশবাবু নয়, অন্য অনেকের মনেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অঞ্চলভেদে লেখকের শ্রেণীভেদ কি সম্ভব? বিশেষ করে, দীর্ঘকালীন অভ্যাসে আমরা 'মফস্বলী' শব্দের মধ্যে যে হীনমন্যতার অনুষঙ্গ আবিষ্কার করেছি, তাতে যে-কোনো লেখকই অস্বস্তি বোধ করবেন।

দ্বিতীয় আরেকটি অসুবিধা হলো, কোনো মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্য-সাময়িকীর পক্ষে 'কাঁচ-কাঁচা'র আসর খোলা সম্ভব কিনা—সেকথা শ্রীমতী লীলা রায় ভেবে দেখেন নি। বাসস্থানের ঠিকানা অনুসারে কেউ শহরের, কেউবা গ্রামের লেখক। সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে, ঐ নাম-ঠিকানার মূল্য কি?

আসলে সমস্যার উৎসটা অন্যত্র। যোগাযোগের ব্যবহারিক অসুবিধার জন্যে অনেক লেখকের লেখা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অনেক শক্তিশালী লেখক পরিবেশের শৈথিল্যে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছেন। সেই অপচয়েরই গতিরোধ করতে হবে লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের। দু'একজন তারাশঙ্কর কিংবা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজীর তুলে সে দায়িত্ব বিস্মৃত হলে চলবে না। নজরুলও তো গ্রামের মানুষই ছিলেন। কলকাতার কবি-সাহিত্যিকদের নাড়ীনক্ষত্রের খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে—তাঁদের অনেকেই এসেছেন গ্রামাঞ্চল থেকে।

এখন আগেকার গ্রাম নেই। দূরত্ব পরীর দূরত্ব কমেছে যোগাযোগের আধুনিক ব্যবস্থায়। বিদ্যুৎশক্তির সম্প্রসারণ ঘটেছে বহির্বিশ্ব অঞ্চলে। এবং যেক্ষেত্রে শিক্ষার হার, সংস্কৃতি চর্চার উন্নতি। আগেকার দিনের উদাহরণ টেনে, কি করে গ্রামের মানুষ শহরে এসে সাহিত্যিক হলেন, তার গল্প না করে যদি মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিনগুলোকে আরো উন্নতমানের করে তোলা যায়, তা হলে হয়তো শহুরে আধিপত্যের সংকটও কমে, নতুন কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাবও সম্ভব হয়।

পুনর্মুদ্রণের আবেদন

সব চাইতে কার্যকরী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন জেমসজিস শুকুল। তিনি আবেদন জানিয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য লেখাগুলো যেন অমৃতে পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে লেখা, লেখক ও ছোটখাট পত্রিকাগুলি সম্পর্কে বৃহত্তর পাঠকসমাজের আগ্রহ বাড়বে—অথচ লেখক-লেখিকারা কিছুটা খ্যাতি পাবেন।

নিঃসন্দেহে এই প্রস্তাব অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর ধারণা, মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে হারিয়ে-যাওয়া গল্প-প্রবন্ধ-কবিতাগুলো এভাবে সাধারণ পাঠকের স্বীকৃতি পাবে ও লেখকেরা জনপ্রিয় হবেন।

এখন তাঁর প্রস্তাবের বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করে দেখা যাক, অমৃতের মতো সাপ্তাহিকের পক্ষে তা কার্যকরী করা সম্ভব কিনা—কোথায় তার অসুবিধা। আর লিটল ম্যাগাজিনকেই-বা কেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হতে হবে?

প্রথমত, অমৃত কোনো অঞ্চল বিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের মুখপাত্র নয়। যে-কোনো লেখকের ভালো লেখা প্রকাশের দিকেই তার ঝোঁক। অনেক লেখা ছাপা সম্ভব হয় না কেবল স্থানাভাবের জন্যই। যদি কোনো অসুবিধা না থাকতো, তা হলে হয়তো সেসব লেখা পুনঃপ্রকাশ না করে, প্রথম প্রকাশের গৌরবই অমৃত নিতে পারতো।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ও বহির্বঙ্গ থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা কম নয়। সারা বছরে বহু উল্লেখযোগ্য লেখাই বেরোয় এসব পত্রপত্রিকায়। অমৃত সপ্তাহে একটি করে লেখা পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করলে ৫২টির বেশী ছাপা [illegible]

ভুক্তভোগী হিসেবে আমরা জানি, একই কাগজের একাধিক লেখা পুনর্মুদ্রিত হলে, কিংবা কোনো কাগজ থেকে একটিও লেখা পুনঃপ্রকাশ করা সম্ভব না হলে, অনেকের কাছেই ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু মনে হবে। কোনো সমালোচক আলোচনা-প্রসঙ্গে কোনো কাব্যসাহিত্যিকের নাম উল্লেখ না করলেই যেখানে বিতর্ক সৃষ্টি হয়, সেখানে এরকম গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার পরিণতি কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

তৃতীয়ত, আমি এমন দু'একজন লেখককে জানি, যাঁরা পারতপক্ষে কোনো ব্যবসায়ী কাগজে কিছু লেখেন না, অথচ লিটল ম্যাগাজিনে লেখার ব্যাপারে উৎসাহী। তাঁদের লেখা স্বভাবতই পুনর্মুদ্রণের অসুবিধাও বিস্তর।

চতুর্থত, লিটল ম্যাগাজিন সাধারণত বেরোয় বিশেষ প্রেরণা ও উদ্দেশ্য নিয়ে। সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও গতানুগতিকতা সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে অনেকে এমন কিছু করতে চান, যাকে সমর্থন করা অন্য একজন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। তার ওপরে আছে, গোষ্ঠীভাবনা ও অন্যান্য সমস্যা। কোনো একটি লিটল ম্যাগাজিনের প্রবন্ধকার যত নির্ভয়ে ও অসংকোচে মতামত প্রকাশ করেন বা করতে পারেন তা কি অন্য কারো পক্ষে সম্ভব? না গল্প-কবিতা নিয়ে অবাধ পরীক্ষানিরীক্ষা করার সুযোগ কোনো সাহিত্য সাপ্তাহিক দিতে পারে?

এইসব ব্যবহারিক অসুবিধা সত্ত্বেও অমৃত অতীতে অনেক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে। পাঠকপাঠিকারা নিশ্চয়ই সেকথা ভোলেননি। মাত্র কয়েক বছর আগে, 'প্রতিধ্বনি' নামে একটা বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছিল একমাত্র অমৃতেই। শোভাদিস সম্প্রতি প্রস্তাবকে ঐ বিভাগটিই পুনঃপ্রবর্তনের দাবী জানিয়েছেন পরোক্ষে। তাতে কিছু কথা

কিন্তু অন্যের ওপরে নিজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান হয় কি? হয় না, হবে না। লিটল ম্যাগাজিন বেরোবে এবং বেরিয়ে যাবে আপন নিয়মে। দৈনিক-সাপ্তাহিকের কাছে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দাবী করা যায়, কিন্তু দুর্গতিমোচনের প্রত্যাশা করা যায় না। কেননা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য লিটল ম্যাগাজিনই স্বতন্ত্র মেজাজের।

অকস্মাৎই বুঝেছি, লিটল ম্যাগাজিনের ঘরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক। একজন লেখক অন্যের জনপ্রিয়তায় প্রায়শ কাতর, একজন কবি অন্যকে অপদস্থ করে তৃপ্তি লাভ করেন। ফলে, পারস্পরিক বাদবিসম্বাদে অনেক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে এক ধরনের সাংস্কৃতিক অসুস্থতা ছাড়া অন্য কোনো নামে অভিহিত করা যায় না। তার প্রতিক্রিয়া পড়ে পাঠকের ওপর।

অথচ এমন অবস্থা ছিল না দু'তিন দশক আগেও।

শুনেছি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত গল্প 'শুধু কেরানী' বেরিয়েছিল কোনো একটি অখ্যাত কাগজে। বাংলা সাহিত্যের পাঠক সে গল্প পড়ে শুধু তৃপ্তি পাননি, সমালোচকেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, পত্রিকায় বেরোবার আগে তাঁর 'উপনিবেশ'-এর পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন শিশির গঙ্গোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। একজন নতুন লেখকের লেখা শোনার জন্য তাঁরা হানা দিয়েছিলেন লেখকের বাসায়।

তখন সেই পরিবেশ ছিল, আজ নেই। কিন্তু কেন? তা কি ফিরিয়ে আনা যায় না? এখনো মাঝে মাঝে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে চমকে দেবার মতো গল্প-কবিতা বেরোয়। কেবল হৈচৈ করে ওঠার মতো সেরকম মানুষ নেই।

জনৈক সমালোচকের ভাষায়: আজকালকার তরুণেরা যদি কেউ কোনো ভালো লেখা পড়েন, তাহলে তেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন না। অনেক সময়, নিজের ভালো লাগার কথাটাও চেপে যান অনায়াসে।

এ যদি সত্য হয়, তাহলে খুবই দুঃখের। পাঠকের স্বীকৃতি শুধু উৎসাহিত করে না, প্রাণিত করে।

নতুন প্রস্তাব

তা হলে প্রতিকারের উপায় কি?

নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন অরুণ গুপ্ত। তাঁর ধারণা, লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক, লেখক ও উদ্যোক্তারা যদি আন্তরিক উদার এবং সহিষ্ণু হন, তা হলেই সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে।

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, পারস্পরিক প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতায় আমরা যদি সহযোগী লিটল ম্যাগাজিনের লেখা ও লেখকদের অস্বীকার না করতুম, তা হলে হয়তো একটা সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরী হতে পারতো। এবার উত্তর বাংলা থেকে প্রকাশিত 'নিবন্ধ' পত্রিকায় দুটো চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন অশ্রুকুমার মজুমদার ও অশ্রুকুমার শিকদার। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের কোনো সম্পাদক কি সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন? না কফি হাউসে তাই নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে?

তিনি প্রস্তাব করেছেন, দৈনিক-সাপ্তাহিকের দিকে লক্ষ্য না রেখে লিটল ম্যাগাজিনকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হতে হবে—যে কোনো নতুন উদ্যমকে স্বাগত জানাতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে পাঠককে শিক্ষিত করে তোলার জন্য। আসামে প্রকাশিত পত্রিকার ব্যাপারে কলকাতার লিটল ম্যাগাজিনকে নিস্পৃহ থাকলে চলবে না। ভালো লেখার খোঁজ পেলে সব কাগজেই তার প্রতিধ্বনি হওয়া উচিত। আলোচনা সমালোচনা করে সেই লেখককে স্বাগত জানাতে হবে।

তিনি মনে করেন, এভাবেই লিটল ম্যাগাজিনের লেখকেরা অন্তর্দেশীয় খ্যাতি পাবেন এবং সৎ সাহিত্য আলোচনারও এভাবেই সূত্রপাত হওয়া সম্ভব। বহুল প্রচারিত সাহিত্যের কাগজগুলি যেখানে প্রধানত বাণিজ্যিক, ঠিক সেখানেই আত্মস্থ, করবেন লিটল ম্যাগাজিনের লেখক-লেখিকারা। নতুন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির পথ হয়তো খুলে দেবেন।

আমি তাঁর প্রস্তাবটাকে মনে মনে ভেবে দেখেছি অনেকবার। অনেককে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, এরকম পরিবেশ তৈরী করা বাস্তবে সম্ভব হবে কিনা। মুখে অনেকেই উৎসাহ দেখিয়েছেন। কিন্তু সন্দেহটা থেকে গেছে ভেতরে ভেতরে।

—গ্রন্থপঞ্জী।

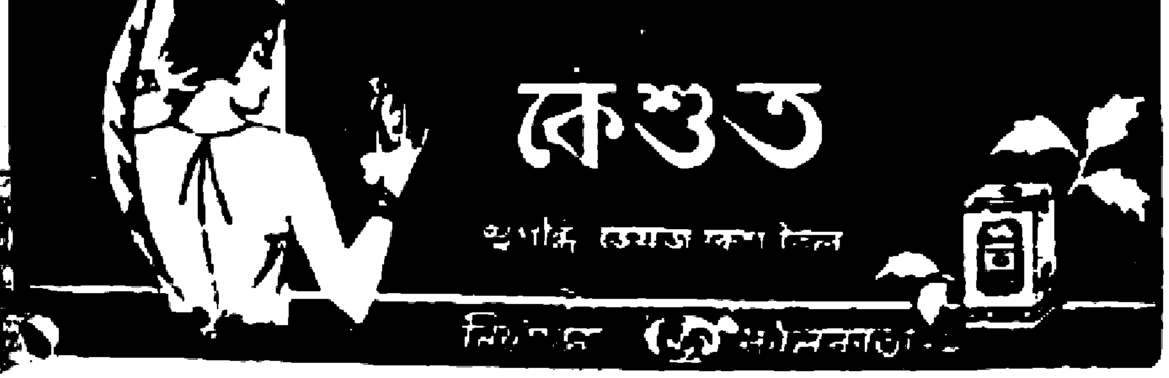

২৮)

ঈশম অনেক উঁচুতে ডাঙায় দাঁড়িয়েছিল। সামনে মেঘনা নদী। আশ্বিনের আকাশ উপরে। আশ্বিনের কুকুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে সেই নৌকাগুলো—বিন্দু বিন্দু হয়ে ভাসছে। ঠিক কাগজের নৌকার মতো ছোট হয়ে গেছে। সে খুব উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে এগোবার আর পথ নেই। সে নদীর পাড়ে পাড়ে এতদূর এসেছে। ছোট নদী থেকে বড় নদীতে। ভূপেন্দ্রনাথ বার বার ওকে ফিরে যেতে বলেছে ইশারায়—সে ফিরে যায়নি। সে পাড়ে পাড়ে হাঁটছে। কুকুরটা পাড়ে পাড়ে হাঁটছে। কুকুরটাই একমাত্র অবলম্বন ঈশমের। নৌকা নদী ধরে যাচ্ছে। ঈশম আর আশ্বিনের কুকুর ওদের এগিয়ে দিতে যাচ্ছে। যেন সঙ্গে সঙ্গে যতদূর যাওয়া যায়। ঘাটে নৌকা ভাসালে পাশাপাশি গ্রামের অনেকে এসেছিল। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাই এসেছে। তারপর ওরা দাঁড়িয়ে থেকেছে পাড়ে। ওরা আর নৌকা জলে ভাসলে এদিকে আসেনি।

ঈশমেরও আসার কথা নয়। ভূপেন্দ্রনাথ ওকে হিসাবপত্র করে যা প্রাপ্য সব দিয়েছে তার। সঙ্গে আরও একশত টাকা দিয়েছে। যে কদিন সে একটা কাজ দেখে না নিতে পারছে সে কদিন অন্তত। এই দিয়ে তার চলে যাবে। তরমুজের জমিটা হাজিসাহেবের ছেলে কিনে নিয়েছে। ঈশমের ভিতরে ভারি কষ্ট এই তরমুজের জমির জন্য। সে একটা কথাও বলতে পারেনি। যা দিয়েছে ভূপেন্দ্রনাথ যত্ন করে আঁচলে গিঁট বেঁধে কোমরে গুঁজে রেখেছে। ঘাটেই ভূপেন্দ্রনাথ বলেছিল, আর কষ্ট করে নারানগঞ্জে গিয়ে কি হবে। সে তাতেও কিছু বলেনি। কেবল চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আর নৌকা জলে ভাসলে অনেক দূরে সহসা দেখল শশিভূষণ গাছপালার ফাঁকে কে হেঁটে আসছে পাড়ে পাড়ে। শশিভূষণের নৌকা আগে। তিনটে বড় বড় নৌকায় সব নিয়ে এদেশ থেকে রওনা হয়েছে। শশিভূষণ সোনা ধনবৌ বড়বৌ আছেন নৌকায়। শশিভূষণই প্রথম দেখেছিল পাড়ে পাড়ে—পাড় স্পষ্ট নয়, তবু কে যেন ওদের নৌকা অনুসরণ করে এগুচ্ছে। শশিভূষণ সোনাকে ডেকে বলল, কে হাঁটছে রে পাড়ে পাড়ে।

সোনা ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। —ঈশমদাদা! আমাদের কুকুরটা সঙ্গে।

শশিভূষণ এবার পিছনের নৌকায় ভূপেন্দ্রনাথকে বলল, দেখেছেন!

—কি? ভূপেন্দ্রনাথ চারদিকে তাকাতে থাকল। চারদিকে নদীর চর এবং ধানখেত। মাঝখানে নদীর জল টলটল করছে। আশ্বিন মাস বলে জল নেমে যাচ্ছে মাঠ থেকে। নানারকম পাখি নদীর চরে। সে বিলের এক ঝাঁক পাখি দেখতে দেখতে বলল, কি বলছেন?

—ঈশম এখনও আসছে পিছু পিছু।

ভূপেন্দ্রনাথ পাটাতনে উঠে দাঁড়াল। তারপর সতর্ক নজর রাখতেই বুঝল ঈশম নদীর পাড়ে পাড়ে যে গ্রাম অথবা বালির চর আছে তার উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। সে ঈশমকে এবার ইশারায় বাড়ি ফিরে যেতে বলল। ঈশম হাত তুলে যেন বলছে, ঠিক আছে। সে সময় হলেই ফিরে যাবে। সুতরাং ভূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারল, ঈশম যতক্ষণ পারে ততক্ষণ হাঁটবে। এবং ঠিক সায়েবদিঘির মাঠ পার হলে সে আর এগুতে পারবে না। সামনে বড় বাঁওড় পড়বে। সে জল ভেঙে ওপারে যেতে পারবে না। ওকে তখন ফিরে যেতেই হবে। ভূপেন্দ্রনাথ সেজন্য আর কিছু না বলে যেমন ক্লিষ্টমুখে বসেছিল তেমনি আগের মতো বসে থাকল।

সোনার ভারি কষ্ট। ওর ঈশমদাদা এতদূরে যে সে কথা বলতে পারছে না। এখান থেকে সে যত জোরেই কথা বলুক শুনতে পাবে না। সে, সে কেন শুধু, ওরা সবাই সব নিয়ে যেতে পারছে, শুধু পারছে না পাগল জ্যাঠামশাই ঈশম আর [illegible]কে সঙ্গে নিয়ে যেতে। ওদের নিয়ে যেতে পারলেই আর কোন কষ্ট থাকত না। কিন্তু তারপরই সোনার মনে হল সে যা কিছু ফেলে যাচ্ছে, তা আর সে ফিরে পাবে না। আবার এদেশে সে আসতে পারবে কবে জানে না। সে বড় হলে ঠিক চলে আসবে। কারণ যত দূরেই থাক, সে তরমুজের জমি, নদীর জল, [illegible] মাছ ভুলে বেশি দিন থাকতে পারবে না। সোনার পাটাতনে দাঁড়িয়ে কেন জানি বার বার ডাকতে ইচ্ছা হল, ঈশমদাদা, আপনি ফিরে যান। আমরা আবার ফিরে আসব।

কিন্তু সে জানে এ-কথা অতদূরে পৌঁছাবে না। সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকল। বৈঠার জল ছপছপ শব্দ করছে। সামান্য হাওয়া লেগেছে পালে। আর ক্রমে নদীর দু পাড় উঁচিয়ে যাচ্ছে। উঁচু হতে হতে সে দেখল অনেক উঁচুতে একটা মানুষ স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক এক বিন্দু ঘাসের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না। সোজা ওপরের দিকে তাকালে দেখা যাবে না। একটু দূরে সরে এলেই ওরা দেখতে পাবে ঈশম এবং কুকুর—আর যেন কবিতার লাইন সোনা দূরে দূরে সরে হেমন্তের বিকেলে মহাভারত থেকে পড়ে যাচ্ছে—কে এক মহাপ্রস্থানী মানুষ, স্বর্গে যাচ্ছেন। সঙ্গে তার এক সারমেয়। সারমেয় শব্দটা সে সেখানেই পেয়েছিল। আশ্বিনের কুকুর তার কাছে এখন সারমেয় হয়ে গেছে। আর অনেক দূরে স্বর্গের দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মানুষের মতো ঈশম। সোনার কেন জানি ঈশমকে এ-সময় মহাভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভাবতে ভাল লাগল। এতটুকু নড়ছে না। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উপরে আকাশের কাছাকাছি উঠে গেছে। কুকুরটা একটা খেলনা কুকুরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে।

ঈশম জানত না সেই বিন্দু বিন্দু নৌকা থেকে এখনও একজন ওকে দেখছে। যতক্ষণ দেখা যায় দেখছে। এত উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে যে সোনার মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছিল ঠিক না নিচে পা হড়কে পড়ে যান। পড়ে গেলে অনেক নিচে পড়ে যাবেন। বড় নদী বর্ষার পাড় ভাঙতে ভাঙতে ভাঙছিল। ফাটল চারপাশে। আগামী বর্ষার জল যখন বেগে নেমে যাবে এই সব গ্রাম মাঠ ভেঙে নদীর অতলে হারিয়ে যাবে। কারণ পাড় এত খাড়া যে তাকাতেই সোনার ভয় হচ্ছিল।

আর তখন সামনে সেই নদীর বাঁওড়। ওরা বাঁওড়ে পড়ে গেলে ঈশম আর কিছু দেখতে পেল না। অদৃশ্য হয়ে গেল। তবু সে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। মাথার উপর সূর্য উঠে গেছে। ফিরতে ফিরতে তার রাত হয়ে যাবে। একমাত্র সঙ্গী তার এই আশ্বিনের কুকুর। সকাল থেকে না খেয়ে আছে। সে বাজারে ঢুকে কিছু মুড়কি কিনে নিজে খেল এবং কুকুরটাকে দিল। এখন সে কোথায় যাবে বুঝতে পারছে না। ঘরে যে [illegible] বিবি আছে সে-কথা পর্যন্ত তার মনে নেই। নদীর পাড়ে সে কিছুক্ষণ একা বসে থাকল, একা একা হাঁটল। এ-ভাবে সে ওদের বিদায় দিয়ে নদীর পাড়ে একা দাঁড়িয়ে থাকবে ভাবতে পারে নি। সে এখন আবার হাঁটছে।

তরমুজের জমিতে ফিরে মনে হল কারা ওর ভাঙা হুঁকোটা আলের কিনারে ফেলে রেখেছে। ওর ভীষণ রাগ হল। মাথার উপরে আকাশ। অজস্র নক্ষত্র এবং ঝাঁকঝাঁকড়ে নদীর জল বাতাসে খেলা করে বেড়াচ্ছে। সে ভেবেছিল এসেই এখানে বসে এক ছিলিম তামাক খাবে। কিন্তু সে যখন দেখল ওর সেই ভাঙা হুঁকো একপাশে পড়ে আছে, আর হুঁকো কলকে আগুন রাখবার পাতিল, কিছু ওর সবই পালা মাড়া তখন রাগে দুঃখে ওর বুক ফেটে গেল। সে বলল, হায় আল্লা! তারপরই মনে হল এ-জমি তার নয়। এ-জমি হাজিসাহেবের মেজছেলের। ওদেরই কাণ্ড। ওরা এসে ঈশমের যা কিছু ছিল সব ঠেলে ফেলে দিয়েছে। সে এখানে আর কোনদিন ফিরে আসতে পারবে না, তরমুজের জমিতে দাঁড়িয়ে আজান দিতে পারবে না ভাবতেই চোখ ফেটে জল এসে গেল। সে জীবনে কোনদিন চোখের জল ফেলেনি। সে মনে মনে নিষ্ঠুর। কিন্তু আজ প্রথম তার এটা কি হল। ওর একমাত্র বিবি, যে যৌবন ভাল করে আসতে না আসতেই পঙ্গু অসাড় হয়ে গেল, অথচ কত জলে তার যে জীবন গেছে, দুঃখ ছিল অনন্ত, কোনদিন সে এমনভাবে মুষড়ে পড়েনি। সে হাঁটতে পর্যন্ত পারছে না। শরীর তার অসাড় হয়ে গেছে। এই জমির ভিতর তার পা কেন গেঁথে যাচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জমিটার জন্য কাঁদছে।

এই তরমুজের জমি বড় ভালবাসার জমি। বিবির চেয়ে প্রিয় এবং নিঃসন্তান ঈশম এই জমিকে প্রায় সন্তান বড় করার মতো এ-সে উর্বরা করে তুলেছে। সে চুপচাপ বসে থাকল জমিটার উপর।

এখন রাত বাড়ছে। বিন্দু বিন্দু আলো যা জ্বলছিল ক্রমে নিভে আসছে। ঠাকুরবাড়ির কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ আর পাওয়া যাবে না। ঈশম এই আওয়াজের সঙ্গে রাত কত হল টের পেত। সে বুঝতেই পারছে না রাত এখন কতপ্রহর। সে জমিটার ভিতর বসে মুঠো মুঠো মাটি তুলে আবার ফেলে দিচ্ছে। তখনও চোখের সামনে এনে দেখছে—এই মাটি কার। এই ভালবাসার মাটি কার। সে কে? কেন সে এখানে বসে রয়েছে।

কেমন শেয়ালেরা ডাকে প্রহরে প্রহরে তেমনি ডেকে গেল। কেমন প্রতি রাতে পাখিদের শব্দ সে পেত নদীর চরে আজও তেমনি পাখিরা উড়ে এসে বসছে। সে এমন কি খরগোশের শব্দ, ইঁদুরের শব্দ সব টের পাচ্ছে। এই জমিটার প্রতি সবার লোভ ছিল। যত চিড়িয়াপাখির। কাঁচ ডগা কেটে ওরা উড়ে যেত আকাশে। নির্জন রাতের অন্ধকারে বসে ঈশম সব টের পাচ্ছে। কিছুই পরিবর্তন হয়নি। কেবল সে নিজে কি ভাবে যেন প্রথম ভূমিহীন হয়ে গেল। [illegible] সে এতদিন ভূমিহীন ছিল ঠিকই [illegible]। আজ প্রথম জমির আলে ওর সেই [illegible] হুঁকো পড়ে থাকতে দেখে জানল, তার [illegible] গেছে। সে সব কিছু হারিয়েছে।

এ-ভাবে সে উঠে গেল অর্জুন গাছের নিচে। যেন চোরের মতো সে এ-গ্রামে ফিরে এসেছে। এই বড় বাড়িটা নিশ্চয়ই কেবল পুবের ঘরটা এখনও আছে। দু-চারদিনের ভিতর এটাও ভেঙে নিয়ে গেলে প্রতাপ চন্দের ছেলেরা কেনে খেত করবে। সে বাড়িটার চারপাশে ঘুরতে থাকল। ঘুরতে ঘুরতে ওর খেয়াল নেই কখন সকাল হয়ে গেছে। সকাল হলেই মনে হল তার পঙ্গু বিবি ঘরে আছে। গতকাল সারাটা দিন তার ভীষণ কষ্টের ভিতর গেছে। সে আনমনা থেকেছে। নিজের ভিতর ডুবে ছিল। এত সহজে এক কথায় ওরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে ঈশম কল্পনাও করতে পারেনি। কেমন একটা দুঃস্বপ্ন লেগে গিয়েছিল ওর মনে। সে বেহুঁশের মতো কেবল ছুটোছুটি করেছে। সকাল হলেই সে টের পেল—ওর পঙ্গু বিবিকে গতকাল খাবার দিতে ভুলে গেছে। এমন একটা ভুলের জন্য সে আল্লার কাছে দোয়া চাইল। এবং গোপাট ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন সে ছোট কুঁড়েঘরটায় ঢুকে গেল, দেখল বিবি তার কেমন শক্তভাবে তাকিয়ে আছে।

সে বলল, আমি আইছি। তরে দুইডা চাইল ডাইল সিদ্ধ কইরা দেই। তুই খা।

বিবি তার দিকে তাকিয়েই আছে, কথা বলছে না।

ঈশম সে সব লক্ষ্য করল না। সে আপন মনে হাঁড়ি পাতিল খুঁজছে। এই প্রথম তাকে এ-বাড়িতে দুটো চাল ডাল সিদ্ধ করতে হবে। বিবিটা ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে বলে কথা বলছে না। সারাটা শরীর অসাড় তার। খাইয়ে দিতে হয়। শুকনো কখানা হাড় ছেঁড়া কাঁথার ভিতর ঢাকা থাকে। সব সে একবার এসে দিনে পরিষ্কার করে দিয়ে যেত। সে না থাকলে জোটন, মনজুরের মা অথবা জালালি করত। ওরা বেঁচে নেই। জোটন পীরানি হয়ে গেছে। কতবার সে ভেবেছে একবার ফকিরসাবের দরগায় যাবে। কিন্তু এত কাজ তার সে সময়ই করে উঠতে পারেনি। এবারে সে সব করবে। নিজের খুশিমতো ঘুরে বেড়াবে। তার কোন বন্ধন থাকল না। বিবি একমাত্র বন্ধন। তার মায়া কাটাতে পারলেই ঈশম মুক্তপুরুষ। হাজিসাহেবের মেজ বিবি বলে দিলে পঙ্গু বিবির কাজকাম করে দিয়ে যায়। কাল হয়ত সেই দুটো খাইয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু বিবি রাগে কথা বলছে না। ঘরটার দরজা খুব ছোট। জানালা নেই। ভিতরটা সব সময়ই অন্ধকার থাকে। আর ঘরের উপর বড় এক তেঁতুল গাছ। তেঁতুল গাছের ছায়া বড় ঠাণ্ডা। ঘরে ঢুকলেই কেমন শীত শীত করে। সে একা এ-ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

সে বলল, কাইল খাইছিলা বিবি আইছিল? তুই কিছু খাস নাই?

কোন জবাব নেই বলে, সে হাসল। কারণ বিবির এই রাগ দেখলেই ওর যৌবনের কথা মনে হয়। বড় রাগিকা ছিল সে। ঈশম হাটে মেলা থেকে পুঁতির মালা এনে না দিলে এমন রাগ করে থাকত।

সে হাঁড়িতে জল এনে রাখল। লোটো বাটিটা ধুতে গেল ঘাটে। এবং ঘাসের উপর শুকোতে দেবার সময় মনে হল, বিবিটা কিছুতেই কথা বলছে না।

সে ঘরে ঢুকে বলল, বেশি সময় লাগব না। দাখ কত তাড়াতাড়ি তরে ভাত পাকাইয়া দেই।

কিন্তু কোন উত্তর না। বিবির গলা এমনিতেই অস্পষ্ট। সে হয়ত ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না। সে এবার মাথার পাশে বসে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, দিয়া আইলাম তাইনগ। নদীর পারে যাইয়া দিয়া আইলাম।

ঈশম তবু একা একা কথা বলছে, কি সুখ হে-পারে জানি না আল্লা। এমন সোনার ফসল ফালাইয়া পাগল না হইলে কেউ যায়।

ঈশম আবার নিজেই মনকে বোধ প্রবোধ দেয়। —কার কি হইছে। আমার কষ্ট হইছে। আরে আল্লা—আমি কি কাম কাজ জানি না। আমার খাওনের অভাব আছে। আমার দুনিয়ায় ফের না খাইয়া থাকে না। বলেই সে এবার মাথায় হাত রেখে যেমন আদর করে মাঝে মাঝে তেমনি বলল, তুই ভাল হইলে তরে লইয়া নদীর—হে পারে যামু গিয়া। এই পাশে আর থাকমু না।

বিবির শরীর বড় ঠাণ্ডা মনে হল। হিম ঠাণ্ডা। শক্ত। আরে তুই এমন ঠাণ্ডা মাইরা আছস ক্যান। কি হইছে তর!

কিন্তু না। কোন কথা না। সে তাড়াতাড়ি মাথাটা কোলের উপর তুলতে গিয়ে দেখল একেবারে শক্ত। প্রাণ নেই। সে আবার ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল। সে কাউকে ডাকল না। এ-ঘরে আলো আসতে পারে না। সে সব বেড়াগুলো ঘরের খুলে ফেলল। এখন কি আলো ঢুকছে ঘরে। নীল কাঁথার নিচে বিবি। সেই প্রথম পঙ্গু হয়ে যাবার পর দীর্ঘদিন তাকে একা অন্ধকারে রেখে—সে যেন নিরুদ্দেশে ছিল। আর কি আশ্চর্য ফিরে আসার পর সে যেন এই প্রথম আলোতে মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে বিবি। ঠোঁটের কোণে সামান্য মিষ্টি হাসি। বয়স আর বাড়েনি বিবির। সেই শৈশবের মুখ। সে যে শরীরে পঙ্গু হয়েছিল, মুখে যে লাবণ্য ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। কাল তার মুখের উপর জরা আনতে পারেনি। তার সুন্দর মুখ চোখ এত বেশি তাজা ছিল ঈশম জানত না। ওর অন্ধকারে মনে হত বিবি তার শুকিয়ে যাচ্ছে। বিবি তার মরে যাবে। ঘরের দরজা এত ছোট যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। জল ঝরে যাতে বিবির কষ্ট না হয় তেমনি করে ঘরটা ঈশম তুলেছিল। এখন মনে হচ্ছে একবার আলো জেলে সে কেন দেখল না—বিবির বয়স বাড়েনি। এমন আশ্চর্য টলটলে মুখ দেখে বিবির জন্য মায়া পড়ে গেল। সে কোন লোক ডাকল না। ডাকলেই সে আর বিবির পাশে বসে থাকতে পারবে না। ওর মুখ দেখতে পাবে না। তাকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে।

আবেদালি ফিরছিল মাঠে। সে মাঠে গেলেই দেখল ঈশম চাচা ঘরের সব বেড়া খুলে চাচীর পাশে বসে রয়েছে। এখন ধান পেকে গেছে মাঠে। মাঠে কোথাও কোথাও জল আছে। চারপাশে আবার সেই সোনালি ধান। ধানের গন্ধ সর্বত্র। আর এ-সময় চাচা চুপচাপ চাচীর পাশে বসে রয়েছে। কাজকামের মানুষ। কর্তারা সব চলে গেছে। গোলাতেও মানুষটার কাজের শেষ নেই। চুপচাপ বসে থাকার মানুষ নয়। সে কেমন কৌতূহল বোধ করল। তা ছাড়া কর্তাদের সে নারানগঞ্জে তুলে দিয়ে এসেছে—ওদের যেতে রাস্তায় কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা, বিদেয় [illegible] কাকে দিয়ে গেল, ঈশমচাচা কি পেল, এতদিনের পুরানো বিশ্বস্ত মানুষ ঈশম তাকে কিছু না দিয়ে কর্তারা যাবে না। সে এতসব জানার জন্য যখন চাচীর পাশে উঠে গেল তখন দেখল পাগলের মতো চাচা চাচীকে কোলে নিয়ে বসে আছে। আবেদালিকে দেখেও কোন কথা বলছে না। চাচীকে সে কাঁথা দিয়ে শিশুর মতো ঢেকে রাখছে।

এমন ঘটনায় আবেদালি তাজ্জব বনে গেল। বিবিকে মরা কোলে নিয়ে বসে রয়েছে, কথা বলছে না! সে সবাইকে ডেকে আনল। চাচীর ইন্তেকাল। সবাই এসে প্রায় জোর করে বিবিকে টেনে নামাল ঈশমের কোল থেকে। ঈশম আর দাঁড়াল না। সে হেঁটে একা একা কবরখানায় চলে গেল। সারি সারি কবর। শেষ দুটো কবর জালালি আর ফেলুর। পাশেই ওর বিবির কবর হবে। জায়গাটা এত নির্জন যে পাশাপাশি মাটির নিচে সবাই মিলে সুখেই থাকবে। সে মনে মনে আল্লার কাছে তার বিবির জন্য দোয়া মাগল। আবার কাশফুল ফুটেছে চারপাশে, দরগাতলে আবার সেই তিন সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ। মনজুর ইমামের কাজ করছে। এবং সেইসব পাখি তেমনি আকাশে উড়ছিল। শরতের আকাশ আর কবরের উপর কাশের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। সে বিবিকে নিচে রেখে কিছুদিন আর এ-দেশে থাকল না। থাকতে ভাল লাগল না। সহসা সব কিছু তার কাছে কেন জানি অর্থহীন হয়ে গেছে।

সে যেতে যেতে উত্তরে চলে গেল। উত্তরে যে সব জোতদারদের বাড়ি আছে তার, তাদের বাড়ি উঠে নিজের পরিচয় দিল। যৌবনে সে একবার এ-অঞ্চলে এসেছিল। যারা যারা তাকে চিনত, তাদের অনেকেই বেঁচে নেই। কেউ বুড়ো অথর্ব হয়ে গেছে। কেউ তাকে চিনতে পারল না। এতদিনে ঈশমের মনে হল তার সত্যি বয়েস হয়েছে। একটা কাজকামের দরকার—কিন্তু কোথায় করে। তেমন সে বাড়ি পাবে কোথায়। সে ঠাকুরবাড়ির বাঁধা লোক ছিল বলে তার অঞ্চলের জাতিভাইরা ওকে বিধর্মী ভাবত। তাছাড়া সে ত আর যেখানে সেখানে কাজ করে নিজের মান খোয়াতে পারে না। এ-ভাবে যে কদিন চলে যায়। একটা তো পেট, কোনরকমে ঠিক চলে যাবে। আসার আগে মনজুর, হাজিসাহেবের বড় বেটা ইসমতালি সবাই ওকে থাকতে বলেছিল। কাজের মানুষ। এমন মানুষ পাওয়া ভার। সে সবাইকে বলেছে—আর না। আর কাজ না। এই বলে সে সবাইকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সম্ভবত ঈশম আর প্রাণে সাড়া পাচ্ছে না। কেবল মনে হয় তার জীবনের সব ঐশ্বর্য ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। এখন একটু ঘুরে-ফিরে অথবা কোন বড় মাঠে চুপচাপ একা বসে আল্লার বন্দনার কথা ভাবা। শুধু কাজের মতো কাজ পেলে সে করতে পারে। তেমন কাজ তাকে আর কে দেবে!

সে একদিন দেখল, কিছু লোক সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছে। পাশাপাশি কোথাও মেলা থাকতে পারে। কিন্তু কোথায় সেই মেলা! সে প্রশ্ন করে জানতে পারল, ওরা মেলায় যাচ্ছে না। ওরা যাচ্ছে শহরে। শহরে জিন্নাসাহেব আসছেন বক্তৃতা দিতে। দূর দূর গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে মানুষ যাচ্ছে জিন্নাসাহেবকে দেখবে বলে। ঈশম যেতে যেতে ভাবল, একবার সেও চলে যাবে নাকি। এত বড় মানুষ আসছেন, যিনি দুঃখী মানুষের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখেছেন। আলাদা দেশ করে নিয়েছেন। এবারে তোমরা আপনার নিজেদের মতো কাজকর্ম খাও। তারও ভারি ইচ্ছা সেই মানুষকে দেখে। সহরে গেলে সে মানুষটিকে নাগাল পেতে পারে। কিন্তু মানুষটি কোথায় থাকে, ঠিকানা তার জানা নেই। শহরে গেলে নিশ্চয়ই সে মানুষটার নাগাল পাবে না। সে আর একা একা এতদূর যেতে সাহস পেল না।

ফতিমারও ভারি ইচ্ছা ছিল যায়। কত লোক দূর দূর থেকে আসছে। মাঠ-কাঁদায় দাঁড়ালে দেখা যায় অগণিত মানুষ, মাথার উপরে ফেস্টুন উড়ছে, লাল নীল অক্ষরের মতো সব রঙ-বেরঙের নিশানের মতো যেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে মানুষের মাথার উপর। সকাল থেকে অগণিত মানুষ যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠছে পাকিস্তান—জিন্দা-

গায়ে ব্যথা?

অ্যানাসিন

ব্যথাবেদনায় অনেক বেশী আরাম দেয়

কারণ জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

চিত্র-প্রযোজক শ্রী গৌতম মুখার্জি ও তাঁর কন্যা গোবিলা। দুজনেই অ্যানাসিন ব্যবহার করেন। শ্রী মুখার্জি বলেন, "অ্যানাসিন আমাকে চটপট আরাম দেয়"।

জোরালো, কারণ সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা ব্যথা-বেদনা উপশমের যে সব ওষুধ সবচেয়ে বেশী খেতে বলেন তা অ্যানাসিনে বেশী পরিমাণে আছে। তাই অ্যানাসিন ব্যথা-বেদনায় চট্ করে আরাম দেয়।

নির্ভরযোগ্য, কারণ ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের মতই এটি বিভিন্ন ওষুধ মিশিয়ে তৈরী। আপনি বাচ্চাদেরও নিশ্চিন্তে অ্যানাসিন দিতে পারেন। বড়দের মাত্রার অর্ধেক, ওদের পক্ষে যথেষ্ট।

ফলপ্রদ,—সর্দি ও জ্বরের ব্যথা-বেদনায়, মাথার যন্ত্রণায়, পিঠ কোমরের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায়, দাঁতের ব্যথায়।

অ্যানাসিন

Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co., Ltd.

বল। আল্লাহ্ আকবর। কায়েদ-ই-আজম-জিন্দাবাদ। রাস্তায় রাস্তায় তোরণ, গাছে গাছে আলো এবং মিনারে মিনারে অপরূপ লাবণ্য—ফতিমা দুপুর থেকে সাজছে। সেও যাবে। কিন্তু কি যে হল, সে তার বাজানের মুখের দিকে তাকাতেই কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সকালে সে বাজানের যে উল্লাসের মুখ দেখেছে, এই বিকেলে তার বিপরীত। সামসুদ্দিনের মুখ থমথম করছে। সে কি যেন টের পেয়ে গেছে। টের পেয়েই সে বলেছে ফতিমাকে, তোমার যেতে হবে না। মেয়েরা কেউ যাবে না। ফতিমার এত ইচ্ছা যাবার, অথচ যেতে পারছে না। সে তার বাবাকে অন্তত একবারের জন্য অনুরোধও করতে পারছে না। সে যাবে আর আসবে। একবার দেখেই সে চলে আসবে। কিন্তু বাপের মুখ দেখে ফতিমা সেটুকু পর্যন্ত বলতে সাহস পাচ্ছে না।

সামসুদ্দিন সকাল থেকে নানাভাবে এই মহান দেশকে কিভাবে সামনে নিয়ে যেতে হবে এবং তার বক্তৃতায় কতটা বাংলাদেশ থাকবে, কতটা সারা পাকিস্তান থাকবে, সে কতটা কার হয়ে বলবে, বলা উচিত—এসব যখন ভাবছিল, তখন হক-চৌধুরী গোপনে একটা খবর দিয়ে গেল। সে পাগলের মতো মুখের উপরই না না করে উঠেছিল। তার সামনে বড় আয়না। গায়ে আচকান। সে নিজেকে আয়নায় প্রথমে চিনতে পারল না। চিনতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। সে কেমন বিষণ্ণ গলায় ডাকল, ফতিমা।

ফতিমা বলল, যাই বাজান।

ফতিমা কাছে এলে বলল, একবার ফোন করে দেখত, কাদেরসাহেব আছেন কিনা?

ফতিমা ডায়াল ঘোরাল। সে দুবারের চেষ্টায় কাদেরসাহেবের বাড়ির সঙ্গে সংযোগ করতে পারলে বলল, তিনি বাড়ি নাই বাজান।

ঠিক আছে। বলেই সে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে দেখল পত্রিকার তরফ থেকে একজন রিপোর্টার এসে নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে ইশারায় উপরে চলে আসতে বলল।

কি চাই বল?

—কায়েদ-ই-আজম এই মাত্র ঢাকায় এসেছেন। এ-মুহূর্তে আপনার কি মনে হচ্ছে?

—কি যেন মনে হচ্ছে বলতে পারছি না।

—কিছু অন্তত বলুন।

—আজ বলব না। কাল আসবে, বলব।

পত্রিকার রিপোর্টারটি কাল যখন এল সামসুদ্দিন তাকে চা খেতে বলল সঙ্গে। তারপর কথাপ্রসঙ্গে যেন বলা, তুমি কাল আমাকে কিছু বলতে বলেছিলে।

রিপোর্টারটি চিনি গুলতে গুলতে [illegible]ল, বলেছিলাম সামুভাই।

—আজ কি শোনার ইচ্ছা আছে?

রিপোর্টারটি যেন জানত, সামুভাই [illegible] কি বলবে। সে বলল, আমি জানি [illegible] কি বলবেন।

[illegible]কি বলল?

—যে-দেশের হাজারে মাত্র পাঁচজন লোক উর্দু ভাষায় কথা বলে, সে-ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয় কি করে?

—শুধু তাই নয়। আমরা হাজারে চারশ' বার। চারশ' বারজন বাংলাভাষায় কথা বলি। তার চেয়ে বড় কথা বাপ-দাদার ভাষা বাদে অন্য ভাষা আমাদের জানা নেই। আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলাভাষা।

রিপোর্টারটি বলল, ছাত্রলীগের বৈঠক শেষ করে ফিরতে আপনার নিশ্চয়ই রাত হয়েছিল।

—তা হয়েছিল। কেন বলত?

—সাবধানে থাকবেন। আপনাদের আন্দোলন দানা বাঁধুক সরকার তা চাইছে না।

সামসুদ্দিন এ-কথায় সামান্য হাসল। সেই ছোট্ট হাসি। অথচ কি বলিষ্ঠ এবং দৃপ্ত সে-হাসি। সে বলল, তোমাদের আজকের রিপোর্টিং চমৎকার হয়েছে। বুঝতেই পারছ এ-ব্যাপারে এখন থেকে কিছু মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকবে। হিন্দুস্তানের চর, দালাল এবং কম্যুনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা করবে।

—তা করবে।

—গতকাল তুমি কোনদিকে বসেছিলে? প্রেস গ্যালারিতে তোমাকে দেখিনি ত!

—আমি ঠিকই ছিলাম। আপনি এত বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে লক্ষ করেননি।

—ভাল কথা। তোমার আতাউর-সাহেবকে একটা কথা বলবে আমার হয়ে।

রিপোর্টারটি তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কিন্তু সামসুদ্দিন যেন কি মনে করার চেষ্টায় বসে আছে। ঠিক মনে করতে পারছে না বলে বলতে পারছে না। এবং মুখের উপর নানারকম রেখা খেলা করে বেড়াচ্ছে। মনের গহনে ডুব দিয়েও যেন সে যা খুঁজছে, পাচ্ছে না। সে বিরক্ত বোধ করতে করতে ডাকল, ফতিমা ফতিমা।

—যাই বাজান।

—ওর বন্ধু আনজুর দাদার কি নাম যেন?

—সফিকুর।

—হ্যাঁ যা বলছিলাম। ছেলেটি উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে। ওর বোনটা পড়ে ফতিমার সঙ্গে। তোমাদের কাগজের কিছু কাজটাজ যদি ওকে দেওয়া যায়, তবে ও কলেজের পড়াটা চালিয়ে যেতে পারে। কোনখানে ওদের বাড়ি জান ফতিমা?

—মুর্শিদাবাদে। গাঁয়ের নামটা মনে নেই।

—মনে করে আতাউরকে বলবে। আমি একটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেব। মনে থাকবে ত। তুমি তাই বলো মনে করে।

রিপোর্টারটি হাসল। মাঝে মাঝে সামুভাই কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যান কথা বলতে বলতে। সে বলল, এটা যাহোক নতুন কথা শোনালেন জিন্নাহসাহেব। লাহোর রেজুলেশনের অদ্ভুত ভুল বের করেছেন এতদিন পরে—পাকিস্তান হবে ইনডিপেনডেন্ট স্টেট, স্টেটস্ নয়। লাহোর রেজুলেশনের স্টেটস্ শব্দের শেষের 'এস'টি টাইপের ভুল। একটি মাত্র 'এস' বাদ দেওয়ার ফলে পাকিস্তান হয়ে গেল এক রাষ্ট্র। এক ভাষা, এক সংস্কৃতির দেশ।

—দিনে দিনে আরও কত কিছু হবে। তারপর সহসা মনে পড়ে গেল মতো বলল সামু, আমি আর বসব না। তুমি আবার এস। সময় পেলেই এস কথা বলা যাবে। আজ আবার কার্জন হলে সুধী সমাবেশ হচ্ছে। জিন্নাহসাহেব বক্তৃতা করবেন। আজ কি বলেন আবার দেখা যাক।

জিন্নাহ-টুপির ছড়াছড়ি। গেটের মুখে সামসুদ্দিন এবং ছাত্রলীগ নেতা নাই-মুদ্দিন দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আজ সামু শেরোয়ানি আচকান পরেনি। পরলেই ওর নিজেকে কেন জানি জনতার মানুষ বলে মনে হয় না। সে যেমন চিরাচরিত পোশাক পরে থাকে, পাজামা, ঢোলা পাঞ্জাবি আজও সে তাই পরেছে। এখন সে নিজেকে সহজে চিনতে পারে। আয়নায় দাঁড়ালেও সে যে সামসুদ্দিন, ফসলের খেতে সে এবং মালতী বড় হয়েছে, মালতীর কথা মনে আসতেই এই দুসময়ে তার চোখ কেমন চিকচিক করে উঠছে। সে ভুলতে চাইছে, যা সে ফেলে এসেছে। তার দিকে আর ফিরে তাকাবে না। অথচ কেন যে সে এমন কষ্ট পায়, কেন যে সে বাড়ি যাবার পথে দেখে ফেলেছে, ঠাকুরবাড়ির ঘর-দরজা কিছু নেই। খালি। খাঁ খাঁ করছে পাড়াটা। দীনবন্ধু নেই, নরেন দাস চলে গেছে, সব খালি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে—ওর এসব মনে পড়লেই কষ্টটা বাড়ে। ফতিমা আর যায় না। সে বড়দিনের বন্ধে কিছুতেই তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেনি। গ্রাম থেকে ফিরে এসে যখন সে আন্নিজানকে বলত, দেখন যায় না। খাঁ খাঁ করতাছে। হু হু কইরা বাতাস বইলে ঠাকুরবাড়ির পাইক খেলার কথা মনে হয়। তখন ফতিমা কিছুতেই কাছে থাকে না। ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। মেয়েটা সফিকুরকে ভারি পছন্দ করছে। সফিকুরের কথা শুনলে ছুটে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায়। আনজু এলে ও যে এত ফিসফিস করে কি কথা বলে! চোখের সামনে তার মেয়েটা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল। এ-বয়সে সাদি না দিলে গাঁয়ে এতদিনে মুখ দেখাতে পারত না। কিন্তু সামু এখন দেশের বড়-মানুষ। তার মেয়ে বড় ইস্কুলে পাঠ নেয়। কত রাজ্যের কাগজ আসে বাড়িতে। দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসে দেখা করতে—সে সময়ই পায় না। মেয়েটা কখন কোন্ ফাঁকে বড় হয়ে যাচ্ছে এত। সে বলল, নাই-মুদ্দিনসাহেব আমরা একসঙ্গে আজ উঠে দাঁড়াব।

নাইমুদ্দিন সামুকে চেনে। সামুভাই কি যেন ভাবছিল এতক্ষণ। এমন দুঃচেতা বাঙালী, মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালী কটা আছে হাতে আঙুল গুনে যেন বলা যায়। সে বলল, ভয় নাই সামু-ভাই। আপনার পিছনে আমরা আছি। সারা বাংলাদেশ [illegible]

সামু বলল, আসেন। ভিতরে গিয়া বসি।

সামুর ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। সে গাড়িতে বসে চারপাশ থেকে যেন কেমন শুনতে পাচ্ছে—উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উর্দুই হবে...উর্দুই...।

সে হলের ভিতরও এমন এক সুধীসমাজের চারপাশে বসেছিল যারা জিন্নাহসাহেবের বক্তৃতা আবেগভরে শুনে যাচ্ছে। ওরা কেবল শুনে যাচ্ছে। কিছু বলছে না। আর জিন্নাহসাহেবও সমস্ত বুকে বারবার ঘুরিয়েফিরিয়ে এক কথা, যেন তাঁর মুখে অন্য কোন কথা, নেই, তিনি যেন বাঙালীকে সেই সুদূর সিন্ধু দেশের উপত্যকা থেকে ছুটে এসেছেন কেবল বলতে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সে আর পারল না। সে চিৎকার করে বলে উঠল—না। তা হবে না। উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না।

থমথম করছে সারা হল। কে, কে এমন কথা বলছে। মানুষটার দিকে তাকিয়ে সুধীসমাজ মাথা নিচু করে রাখল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কেউ আর বলতে পারছে না। গভর্নর-জেনারেলের মুখের উপর এমন কথা কে বলতে পারে!

সামু আর দাঁড়ায়নি। সে মনে মনে জানে এটা হতে পারে না। সে কিছুক্ষণ বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর দেখাদেখি কাদেরসাহেব বের হয়ে এলেন। এবং কিছু তরুণ এসে তাকে ঘিরে ধরল। বলল, আমরা আছি সামুভাই, আপনার ভাবনার কিছু নাই।

তারপর সামু জানে চুপচাপ বসে থাকার সময় আর তার হাতে নেই। দেশ স্বাধীনতার পর আর এক সংগ্রাম গ্রামে-মাঠে আরম্ভ হয়ে গেছে। সে দেখল জিন্নাহসাহেব যখন বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন চারপাশ থেকে অদ্ভুতকণ্ঠ গলা মিলিয়ে কারা যেন বলছে, না না না। উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে না।

সামুর মুখের উপর লাইটপোস্টের আলো এসে পড়েছে এতক্ষণে। কিছু বোগেনভেলিয়ার পাতা ওর মাথার উপর। লাফলে আলোটা ওর মুখে ঝাঁকিয়ে উঠল। সেই আলোর ভিতর থেকে সে যেন সংগ্রামের অন্য আলোর সন্ধান পেল। সে আবার গ্রামে মাঠে চলে যাবে—বাংলার জনতার রায় নেবে। সে যখন গভীর রাতে ফিরল হাতের কাজ সেরে, তখন দেখল মেয়েটা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘুমোয়নি। বাপের জন্য জেগে বসে আছে।

ফতিমা বলল, বাজান এত ফিরতে দেরি হয় ক্যান?

সামু খেতে বসে মেয়েকে বলল, কাজ আম্মা অনেক। আজ কি তারিখ রে ফতিমা?

ফতিমা বলল, এগার তারিখ। সারাটা জীবন কাজকাজ কইরাই গ্যালা।

—কি করি ক। কাজ থাকলে তারে ফেলতে নাই। বলে সে মেয়ের দিকে তাকাল। বলল, আমি বাড়ি যামু। তুই যাইবি?

বাড়ি যাবার নামে প্রতিবার সে যেমন মুখ উদাস রাখে, আজও তেমনি বাপের দিকে উদাসভাবে তাকাল। সে কিছু বলল না। যেন সে খুব মনোযোগ দিয়ে বাপের খাওয়া দেখছে—আর কিছু শুনছে না, শুনলে পাপ, দুঃখ তার বাড়ে, বড়ো পারল অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করল।

—কাদেরসাহেবের গাড়িতে যামু। গাড়ি নদীর পার পর্যন্ত যায়। বাড়ির কাছে পাকা রাস্তা গেছে।

ফতিমা দেখল বাজান কেবল কথাই বলছে। কিছু খাচ্ছে না। যা সব গরম করে দিয়েছে। তবু খাচ্ছে না। ভাত নাড়াচাড়া করছে শুধু। এত রাতে কেউ খেতেও পারে না। ফতিমা এসব দেখে বলল, কিছুইত খাইলেন না।

—ক্যান, বেশ ত খাইলাম।

—কি আর খাইলেন। এভাবে খাওয়ন কয়!

সামু একটা সানকিতে মুখ কুলকুচা করে উঠে গেল। সামু উঠে গেলে থালাটা নিয়ে ফতিমা টেবিলে গিয়ে বসল। আলিজান ফতিমাকে কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করে নিজেও খেতে বসে গেল। ওরা টেবিলের উপর খাচ্ছে। ফতিমার বাজানের যা অবশিষ্ট ছিল ওতেই পেট ভরে গেল। ফতিমা মাছ খেতে ভালবাসে বলে আলিজান আরও একটুকরো মাছ বেশি দিয়েছে। সে মাছ খাচ্ছিল নিবিষ্ট মনে। সে বাজানের দিকে তাকাতে পারছে না। তাকালেই আবার বাজান বলবে—কি রে ফতিমা, কিছু কইলি না। সে না তাকালেও জানে, বাজান খেয়ে উঠলেই বলবে, ফতিমা যাইবি ত। সুতরাং যখন জবাব দিতেই হবে, সে মাছের কাঁটা মুখে রেখেই বলল, আমি যামু না বাজান, আমার শরীর ভাল না।

মেয়েটার এই এক স্বভাব হয়ে গেছে। বাড়িতে কিছুতেই যেতে চায় না। বাড়ির কথা, সোনালি বালির নদীর চরের কথা বললেই ফতিমা এ-কথা সে-কথা বলে এড়িয়ে যায়। এবং সময় সময়ই পড়া, স্কুল, খাতাপত্র, গল্পের বই এসবের ভিতর ডুবে থাকে। কথা ফতিমা এমনিতেই কম বলে, যত বড় হয়ে উঠছে তত যেন ওর উচ্ছ্বাস আরও কমে যাচ্ছে। কথা তার সঙ্গে অথবা বিবির সঙ্গে—এ-বয়সে একজন এলে আজকাল মনে মনে খুসী হয় ফতিমা। ওর নাম সফিকুর। ওর বোন আনজু ফতিমার সঙ্গে পড়ে। অথচ কেন জানি মেয়েটা বড় বড় হয়ে যাচ্ছে, তত কাছে কাছে রাখতে ইচ্ছা হচ্ছে সামুর। দুদিন পরই মেয়েটাকে কেউ নিয়ে যাবে—তার তখন বড় একা মনে হবে—বাপের প্রাণ বড় আনচান করবে। সেজন্য সামু মেয়েটা যত পড়ছে, যত ভাল ছাত্রী হয়ে উঠছে তত সে উৎসাহ পাচ্ছে। সাদিসম্বন্ধের কথা ভাবছে না। যেন মেয়েটা পড়ুক—এখনই কি সাদিসম্বন্ধের কথা। সে বলল, গাছে দেখতে পারলি ঠাকুরবাড়ির অর্জুন গাছটা কত বড় হইয়া গ্যাছে। তর মালতীপিসির কথা মনে পড়ে?

ফতিমা মুখে সুপারির কুচি ফেলে বলল, খুব। একটা পান সে বাজানকে সেজে দিল। পানটা বাজানের হাতে দেবার সময় বলল, পিসির আর কোন খোঁজখবর হইল না।

মালতীর কথা বলে সামু কেন জানি সহসা বিমর্ষ হয়ে গেল। এই এক যুবতী তাকে বারেবারে কোথাও টেনে নিয়ে যায় —দুঃখ সেই শৈশবকাল, ধানখেত এবং পাটখেতের আল অতিক্রম করে বকুল ফুল কুড়াতে যাওয়া। সে আজকাল বাড়ি গেলে কি যেন তার পাশে থাকে না—হিন্দুপাড়া খালি, খাঁ খাঁ করছে সব। এসব ওকে পীড়ন করলে নিজের কাছেই যেন কোন কৈফিয়ৎ পায় না। সে কেন যে সহসা তার মেয়েকে মালতীর কথা বলতে গেল। মেয়ে বড় হয়েছে তার। সব বোঝে। মালতী সম্পর্কে যে একটা দুর্বলতা সারাজীবন বয়ে বেড়াচ্ছে, মেয়েটা বড় হতে হতে বুঝি তা জেনে ফেলেছে। সামু সেজন্য বলে ফেলেই একটা গোপন দুর্বলতা ফাঁস করে দিয়েছে এমন চোখে মুখে তাকালে, ফতিমা হেসে বলল, এখন আর পড়াশোনা করতে হইব না। শুইয়া পড়েন।

সামু যেন কত বাধ্য সন্তান ফতিমার। সে চাদরটা টেনে শুয়ে পড়তে পড়তে শিশুসরল মুখ করে ফেলল। এখন দেখলে চেনাই যাবে না কারা হলে এই মানুষই সিংহের মতো গর্জন করে উঠেছিল, না হতে পারে না। উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। কেবল ফতিমা বোঝে, যতই সামু হাসিখুশি মুখ করে রাখুক, ফতিমা বুঝতে পারে, চোখের ভিতর দিয়ে তাকালে বুঝতে পারে—বাজান আবার অস্থির হয়ে উঠছে। দেশভাগের ঠিক আগে যেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত পীড়ন বোধ করছেন। ভিতরে মানুষটার কি হচ্ছে না হচ্ছে আলিজান পর্যন্ত টের পায় না। বরং যতক্ষণ বাড়ি থাকে মানুষটা ততক্ষণ এই সংসারই যেন তার সব। আলিজানের সুবিধা-অসুবিধা, ফতিমা পাশ করলে কোন কলেজে ভর্তি হবে, সংস্কৃত নিয়ে পড়ার ইচ্ছা মেয়েটার, ওদের সুখদুঃখ এই সব মানুষটার, সেই মানুষটাই কেমন অভিমানী মন নিয়ে বলে ফেলল কেন, তর মালতীপিসি কি আর এ-দ্যাশে আছে! হিন্দুস্থানে গেছে গিয়া। সোনার খাট, সোনার সিংহাসনে রাজরানী হইয়া বইসা আছে।

আর তখন মালতী বুঝি সোনার সিংহাসনে দুলে দুলে পাল্কি কাঁধে বেহারা যায় হো হোম না, তেমনি কেন্দে কেন্দে হাঁক পেল, আপনেরা সকলে নামেন গ মা-জননীরা। স্টেশনে আইসা পড়ছি, নামেন।

সবাই হুড়মুড় করে স্টেশনে নেমে পড়ল। এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে প্ল্যাটফরমের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

স্টেশনের বড়বাবু হাসলেন। নিত্য এমন হচ্ছে। কোত্থেকে হতচ্ছাড়া সব রিফুজী এখানে চাল চোরাচালানের জন্য চলে আসছে। এই যে সবটা স্টেশনে নেমেই ছড়িয়ে পড়েছে, ছুটছে এলোপাথারি—এরা সবাই চোরাচালানের। স্টেশনে স্টেশনে এই সবার ট্রেন থামলেই লাফিয়ে পড়বে। আর সতী-সাবিত্রীর মতো মুখ ঢেকে পালাবে। ছুটবে যতক্ষণ না প্ল্যাটফরম পার হওয়া যায়। মালতীও দেখাদেখি ছুটেছিল। সে নতুন এই কাজে। সে হারুর বৌর পিছনে পিছনে ছুটেছে। অভিনয়টা মালতী ধরতে পারেনি।

তখন বেলা দুপুর। তখন হাটে সবে দূর থেকে কলা এসেছে, ফিরে এসেছে। হাটে গরু-মহিষ এসেছে। রাস্তার চার-পাশে বড় ভিড়। বড় বড় ট্রাক দাঁড় করানো আছে রাস্তার ওপর। শহরের জন্য সাঁঝ বোঝাই হচ্ছে। এবং সাঁঝের নিচে কর্ডন এলাকা থেকে চাল বোঝাই হচ্ছে। কেউ টের পাচ্ছে না সাঁঝের নিচে মিহি চাল শহরে চলে যাচ্ছে।

মালতী কতক্ষণ পর্যন্ত ছুটে যেতে হবে জানে না। হারুর বৌ দেখল মালতী সীমানা ছাড়িয়েও ছুটছে। সে হি হি করে হেসে দিল। অতটা ছোটার কথা নয়। বাবুরা অতদূর থেকে ধরেনি ছুটে। কেবল প্ল্যাটফরম পার হয়ে কিছুদূর ছুটে যেতে হবে। কেন বাবুদের কোন দোষ নেই। দোষ থাকার কথা নয়। বাবুরা জানে সব। নিতাইর বাপ সব ব্যবস্থা করে রাখে।

হারুর বৌ হাসতে হাসতে ডাকল, আর কৈ যাও! ইখানে থাম।

মালতী বলল, পুলিশে ধরলে! বিনা টিকেটে এতদূর এসে পড়েছে। জেল হাজত হতে কতক্ষণ!

—আ ল তর যে কথা! নিতাইর বাপ বাবুগ খুশী করতে গেছে।

—তবে স্টেশনে তোরা সবাই ছুটলি ক্যান?

—দ্যাখাতে হয় না ল, দ্যাখাতে হয়। বাবুরা দাঁড়াইয়া থাকেন। আর করনের কিছু নাই যান, অবলা জীবের মত মুখ কইরা রাখে। কিছু জানে না মত দাঁড়াইয়া থাকে। মজা দেখাস মালতী, কেষ্টযাত্রা!

মালতী হাঁপাতে হাঁপাতে দেখল ওরা একটা ভাঙা বাড়ির সামনে সবাই জড় হয়েছে। সে হারুর বৌকে বলল, বাবা শেষ নাই আবার!

—এডা হইল বাবার সঙ। আমরা যাত্রা করলাম। বাবুরা দাঁড়াইয়া থাকল—অবলা জীব সব ছুইটা যাইতাছে ওরা কি করতে পারে! নিতাইর বাপের লগে বাবুগ লাগ সলাপরামর্শ কইরাই এডা আয়োজন করন লাগে।

মালতী বসতে পেয়ে পায়ের নিচে মাটি পেল। আর ভাঙা বাড়িটার পাশে বড় একটা আমলকি গাছ। গাছে ফল নেই। পাতা সামান্য। ছায়া ছিল। মালতী ছায়ায় নিচে বসল। দলে ওকে নিয়ে আঠারজন। একমাত্র নিতাইর বাপ এ-দলে পুরুষ মানুষ। সেই বাবুর হয়ে কাজ করে। সে এ-পয়সা বাবুরও মহাজনের কাছ থেকে আলগা কিছু পয়সা পায়। সে দলের গোদা।

নিতাইর বাপ সবাইকে কেমন শাসনের গলায় বলল, এখানে বস। কেউ কোথাও যাবে না। সবাই জিরিয়ে নাও। আজ হাটবার। তোমরা ইচ্ছা করলে কিছু কেনা-কাটা করে খেয়ে নিতে পার। আমরা রাত দশটার ট্রেন ধরব। বড়বাবু বলেছে, তখন চক্রবর্তী মশাইর দলের ডিউটি। ওরা লালগোলা থেকে আসবেন।

নিতাইর বাপ আর কিছু বলল না। সে হাটবার বলেই হাটে ঘুরতে ফিরতে চলে গেল। মালতী এখন থেকে স্টেশনের মালগুদাম দেখতে পাচ্ছে। বড় বড় খাঁচায় মুরগী। একশ হাজার মুরগী খাঁচার ভিতর। এই সব মুরগী শহরে চালান হচ্ছে। একটা মানুষ, পরনে লুঙ্গি, মাথায় পাকা চুল—মানুষটা মুরগীর খাঁচাগুলোর ভিতর খাবার ফেলে দিচ্ছে। মুরগীগুলো মাঝে মাঝে বড় বেশি চিৎকার করছিল—এখানে বসে মালতী সব শুনতে পাচ্ছে। ট্রেনে করে রাত জেগে আসতে হয়েছে বলে মালতীর এইসব দেখতে দেখতে ঘুম পাচ্ছিল। আমলকি গাছের ছায়া বড় ঠান্ডা। মালতী সামান্য সময়ের জন্য চোখ বুজল।

গঞ্জের মতো এই জায়গায় জেলার বড় হাট। হাটের ভিতর মানুষের শব্দ গমগম করছিল। দুপুর বলে রোদের তাপ ভয়ঙ্কর। আর দীর্ঘদিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না। শীত পড়ার আগে একবার এ-অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে। তারপর থেকে বড় মাঠের ভিতর বৃষ্টির জন্য সব কৃষকদের হাহাকার ভেসে বেড়াচ্ছিল। সুতরাং অভাবঅনটনের জন্য চাষা মানুষেরা শেষ সম্বল মুরগীর আণ্ডা পর্যন্ত বেচে দিচ্ছে। গরু বাছুর বলতে আর চাষার ঘরে কিছু নেই। অনটনের জন্য ওরা ওদের শীর্ণ গরু বাছুর নিয়ে হাটে এসেছে। গাই গরু বলদের হাট পার হলে মোষের এবং মোষের হাট—নিতাইর বাপ হাটটা ঘুরেফিরে দেখছিল। এবং বাজারে চালের দাম কত, আর মহাজনেরাই বা কত দাম নিচ্ছে—সে হেঁটে হেঁটে সব যাচাই করে নিচ্ছিল।

মালতী কিসের শব্দে চোখ খুলে তাকাতে দেখল, একটা আমলকি ঠিক ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে। সে আমলকিটা তুলে তাড়াতাড়ি আঁচলে বেঁধে ফেলল। তার পাতানো বাপ নিশীথের কথা মনে পড়ছে। নিশীথের কথা মনে এলেই রঞ্জিতের কথা মনে আসে। জোতনের কথা মনে আসে। সেই দুঃসময়ের কথা তার মনে হয়। রঞ্জিত এদেশে এসেই কি এক অসুখে ভুগে ভুগে মরে গেল। মরে গেল না কেউ মেরে ফেলল ওকে, সে বোঝে না। মানুষটা তার আদর্শ ছেড়ে দিতেই আর বড়মানুষ থাকল না। ক্ষীণকায় হয়ে গেল। বাঁচার সব উৎসাহ নিভে গেল। তবু সে মানুষটাকে সারাক্ষণ স্বামীর মতো আদরযত্ন করেছে। রঞ্জিত কেমন নিরুপায় মানুষের মতো তাকাতো তখন। তুমি আমাকে মুক্তি দাও মালতী। এমন একটা চোখ মুখ ছিল তার। মুক্তি তাকে দিতে হয়নি। রঞ্জিত নিজেই এ-পারে এসে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেল। অথবা কখনও কখনও মনে হয় বিধবা মালতীর এ-সখ ভাল নয়, স্বামীর সখ। স্বামীর সখ হলেই মানুষটা আর তার বাঁচে না। তখন মনে হয় সে রঞ্জিতকে নিজেই মেরে ফেলেছে। ভাগ্যে যার স্বামী বাঁচে না, তার কেন আবার স্বামী সোহাগিনী হওয়া। আর যার কথা মনে হয় সে সামু। সামুরে তর কথাই ঠিক। দেশ তুই পাকিস্তান কইরা ছাড়লি। এসব মনে হলেই মালতীর কষ্টটা বাড়ে। সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তার একা থাকলে ভয় করে। সে নিশীথকে ধরে এনেছে। এখন থেকে নিশীথ তার বাপও বটে। নিশীথ বড় দুর্বল মানুষ। অলস প্রকৃতির। ঠিক গাভিন ছাগলটার মতো। ছাগলটা আজ কালই বাচ্চা দেবে। সুতরাং ওর তাড়াতাড়ি চাল নিয়ে ট্রেনে উঠে বাড়ি ফেরা দরকার। সে ডাকল, অ বৌ।

হারুর বৌ জিলিপি কিনে এনেছিল হাট থেকে। সে বাড়িটার ভাঙা সিঁড়িতে বসে জিলিপি খাচ্ছিল। একটা জিলিপি উঠে এসে মালতীর হাতে দিল।

মালতী জিলিপি খেতে খেতে বলল, আমার মনটা ভাল না বৌ।

—ক্যান ভাল না! সেই ভদ্দর লোকের কথা মনে পড়ছে?

মালতী শুধু হাসল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সিংহের দুই চোখ যেন। শুধু খেলা দেখানো বাকি। চোখে মালতীর নীল রঙের উজ্জ্বল এক আভা। তীক্ষ্ণ রোদের তাপে চোখের মণিদুটো বড় হিংস্র দেখাচ্ছিল।

—অ মালতী তুই এমন করতাছস ক্যান?

—আমার কি ইচ্ছা হইছিল বৌ জানস?

—কি কইরা জানমু।

—ইচ্ছা হইছিল তার গলাটা কামড়ে ধরি।

হারুর বৌ বুঝে উঠতে পারল রাতে সেই বাবুর অন্ধকারে চুরি করে ইতরামো করার বাসনা মালতীকে এখনও কষ্ট দিচ্ছে। অপমান ভেবে মালতী সারা পথ আর কারো সঙ্গে কথা বলেনি। ওর চোখ দেখলে এখন মনে হয় হিংস্র এক প্রতি-শোধের আশায় সে আছে।

কুসুম বলল, গরীবের আবার মান-সম্মান! গরীবের আবার ছোট বড়।

(ক্রমশঃ)

খেয়ালগানে স্থায়ী ও অন্তরার ভাষা

পবিত্র দাশগুপ্ত

ভারতীয় সঙ্গীত দুই ভাগে বিভক্ত—১। উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, ২। দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটিক সঙ্গীত।

মাদ্রাজ, মহীশূর এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশেই উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিই প্রচলিত। ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি—উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরই অঙ্গ বিশেষ। এদের গায়ন পদ্ধতি বিভিন্ন। উপরোক্ত অঙ্গের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শাস্ত্রকারগণ যে নিয়ম ও পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন, উত্তর ভারতের সর্বত্র সেই পদ্ধতিকেই প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, গুজরাট, বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের শিল্পীরা এই শাস্ত্রীয় পদ্ধতিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।। অবশ্য শাস্ত্রীয় পদ্ধতির খেলাপ না ঘটিয়েও কিছু সংখ্যক বিখ্যাত শিল্পী খেয়ালের বিভিন্ন গায়কী বা ঢং-এর প্রচলন করেন; একেই আমরা 'ঘরাণা' বলে থাকি।

বোম্বাই, গুর্জরাট ও উত্তর প্রদেশের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পীরা যে-শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে খেয়াল গান পরিবেশন করেন, বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যার শিল্পীরাও ঠিক অনুরূপ পদ্ধতিতেই খেয়াল গান পরিবেশন করে থাকেন।

খেয়াল গায়নের ক্ষেত্রে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র একই শাস্ত্রীয় নিয়ম-পদ্ধতি বা 'টেকনিক' মেনে চলা হয়। রাগের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য বিভিন্ন তান সহযোগে সুরের বিস্তার বা আলাপের ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রীয় পদ্ধতিগুলি অপরিহার্য।

খেয়াল গানের শাস্ত্রীয় পদ্ধতিকে কোনক্রমেই 'হিন্দী' পদ্ধতি বলা যায় না। বিভিন্ন সুরসংযোগে আলাপ, তান ও তানের ছন্দ-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় রাগের প্রকৃত রূপ-সৃষ্টি করবার যে-সব রীতি-নীতি শাস্ত্রকারেরা তাঁদের অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেই শাস্ত্রীয় পদ্ধতিকে 'হিন্দী' পদ্ধতি নামে অভিহিত করা চলে কি?

সেতার, সারেঙ্গী, সরোদ প্রভৃতি যন্ত্রে যখন রাগসঙ্গীত বাজান হয়, সুরের আলাপ, গৎ তোড়া ও তানের ছন্দ-বৈচিত্র্য সমস্তই শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুযায়ীই হয়ে থাকে। উল্লিখিত সঙ্গীতযন্ত্রের মাধ্যমে রাগসঙ্গীতের পরিবেশনকে কি কখনও 'হিন্দী' বাদন পদ্ধতি বলা হয়?

কণ্ঠসঙ্গীতে ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি অঙ্গের গায়নের ক্ষেত্রে স্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ—এই চারটি ভাগে রাগের রূপকে সংক্ষেপে বিবৃত করবার জন্য উপযুক্ত ভাষায় বাণী রচনা করা হয়।

খেয়াল গানের স্থায়ী ও অন্তরায় নিবদ্ধ সংক্ষিপ্ত বাণীর অর্থ সূচিত হয় রাগের সুর ও তালসমন্বিত আলাপ, তান, সরগম ছন্দ প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় পরিবেশনে। স্থায়ী ও অন্তরার বাণী হবে অবশ্যই রাগোপযোগী এবং সংক্ষিপ্ত।

খেয়াল গানে রাগের আলাপ ও তানে স্থায়ী ও অন্তরায় নিবদ্ধ বাণীকে বোল-আলাপ ও বোল-তান হিসাবে গাওয়া হয়। ওস্তাদ পারদর্শী ও অভিজ্ঞ শিল্পীদের পক্ষেই খেয়াল গানে বোল-আলাপ ও বোল-তানের সার্থক প্রয়োগ সম্ভব। স্থায়ী ও অন্তরায় নিবদ্ধ বাণীর অর্থ সম্যক উপলব্ধি করতে না পারায় অনেক শিল্পী বোল-আলাপ অথবা বোল-তানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে একই শব্দ বার বার কিম্বা অসম্পূর্ণ

JUST OUT . . . . .JUST OUT

By A Board of Professors

১। এম, এ, বাংলা সহায়িকা —২০৲

১ম হইতে ৪র্থ পত্র

২। এম, এ, বাংলা সহায়িকা —২০৲

৫ম হইতে ৮ম পত্র [যন্ত্রস্থ]

৩। মেঘনাদবধ কাব্য (১ম—৯ম সর্গ) — ৫৲ টাকা

—অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক মহান চক্রবর্তী

কবিপরিচয়, কাব্যপরিচয়, শব্দার্থ, টীকা, ভাষা, ব্যাখ্যা ও প্রশ্নোত্তর-সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। বি. এ. (পাস, অনার্স) ও এম. এ. ছাত্রছাত্রীদের এবং কাব্যজিজ্ঞাসুমাত্রেরই একখানি সংগ্রহীতব্য পুস্তক।

৪। মধুসূদনের কাব্যবৃত্ত

ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় ৩·৫০

৫। বাংলা ছন্দ ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় ৩·০০

৬। বঙ্কিমসাহিত্য পাঠ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ১০·০০

বি, সরকার এণ্ড কোং

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

বাণী অথবা বাণীকে উল্টোপাল্টাভাবে উচ্চারণ করে থাকেন। তাই, বাণীই যেখানে অবোধ্য, সেই বাণীর অন্তর্নিহিত ভাব ও রসকে সুর ও তানের মাধ্যমে রূপদান করা কি কখনও সম্ভব?

খেয়াল গানের স্থায়ী ও অন্তরার জন্য প্রয়োজনীয় বাণী শিল্পীর মাতৃভাষায় উপযুক্তভাবে রচিত হলে মূল শাস্ত্রীয় নিয়ম পদ্ধতি অব্যাহত রেখে বাণীর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে আলাপ, তান ও যথাযথ লয় ও ছন্দ-বিন্যাসের সাহায্যে শিল্পী রাগের সার্থক রূপ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

পাঁচশত বৎসর পূর্বে সুলতান হুসেন শর্কীর আমলে সর্বপ্রথম খেয়াল গায়ন-পদ্ধতির সূত্রপাত হয়। খেয়াল পদ্ধতির আবিষ্কারকদের ভাষা ছিল উর্দু এবং বাসস্থান ছিল পশ্চিম ভারতে। এই কারণে খেয়ালের স্থায়ী ও অন্তরার নিবন্ধ বাণী-গুলি উর্দু ও হিন্দী ভাষায় রচিত হয়েছিল। ক্রমে গুজরাট, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে খেয়াল গানের প্রসার ঘটায় বহু খেয়াল গানের স্থায়ী ও অন্তরায় গুজরাটি, মরাঠী ও পাঞ্জাবী বাণী-ও নিবদ্ধ হতে দেখা যায়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে খেয়াল গানের প্রতি বাঙালী সঙ্গীতশিল্পীরা আকৃষ্ট হন এবং বহু বাঙালী শিল্পী খেয়াল গান পরি-বেশনে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এইসব বাঙালী শিল্পী খেয়াল গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রচলিত উর্দু, হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত স্থায়ী ও অন্তরাযুক্ত খেয়ালই পরিবেশন করেছেন।

সম্প্রতি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর খেয়াল গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে বাংলাভাষা নিবদ্ধ থাকায় তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরি-বেশন—সুর, তান, ছন্দ ও সুললিত ভাষা মাধুর্যে সঙ্গীতরসিকদের, বিশেষ করে বাঙালী শ্রোতৃবর্গকে প্রচুর আনন্দদানে সমর্থ হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় কাজী নজরুল, শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী ও আরও অনেক গুণী শিল্পী বাংলাভাষায় রচিত স্থায়ী ও অন্তরায় বাণী সমন্বিত খেয়াল কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন ও এখনও করছেন। এই পরিবেশনে খেয়াল গায়কীর কোনও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি, বরং সুললিত বাংলাভাষায় বাণী রচিত হওয়ায় বাঙালী সঙ্গীতরসিক শ্রোতাদের নিকট খেয়াল আরও বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বাংলাভাষায় রচিত বাণীসমন্বিত খেয়াল গানকে 'রাগপ্রধান বাংলা গান' আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেহেতুই গানের ভাষা। উর্দু, হিন্দী বা পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত (অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য) বাণী-সমন্বিত খেয়ালধর্মী গানকে বলা হয়েছে খেয়াল, অথচ মনোরম বাংলাভাষায় রচিত স্থায়ী ও অন্তরায় সুললিত বাণীসমন্বিত খেয়ালধর্মী গানকে 'রাগপ্রধান বাংলা গান' আখ্যা দেওয়া হয়েছে!

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উর্দু, হিন্দী, পাঞ্জাবী ও বাংলাভাষায় রচিত স্থায়ী ও অন্তরায় নিবন্ধ কয়েকটি বাণীর নমুনা নীচে দেওয়া হল।

১। উর্দু রচনাঃ—

দরবারী কানাড়া—একতাল

স্থায়ী

মুবারক বাদ দাঁ শাদি শাঁ
তোহে দীনী আল্লাহি রসুল।

২। হিন্দী রচনাঃ—

বাগেশ্রী—ত্রিতাল

স্থায়ী

ক্যায়সে কটে রজনী সজনী অব
পিয়া বিন মোসে রহ্যো ন জায়।

৩। পাঞ্জাবী রচনাঃ—

ভূপালী—ত্রিতাল

অন্তরা

ইস্ক তাঁড়া ঘাতে জিন্দ গী রোন্দা
হালহু সনদা কোই না।

৪। বাংলা রচনাঃ—

দরবারী কানাড়া—ত্রিতাল

স্থায়ী

আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়
সুরে বেদন জাগে গোপন হিয়ায়।

৫। বাংলা রচনাঃ—

হাম্বির—ত্রিতাল

স্থায়ী

আজও কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া
চম্পা কুঞ্জে আজও গুঞ্জে ভ্রমরা
কুহরিছে পাপিয়া।

উল্লিখিত হিন্দী এবং প্রায় দুর্বোধ্য উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত স্থায়ী ও অন্তরায় বাণীকে যদি খেয়াল গানের পক্ষে উপযুক্ত বলে মেনে নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে 'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়' 'আজও কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া' প্রভৃতি বাংলাভাষায় সুরচিত, রাগোপযোগী এবং সুললিত বাণীকে খেয়াল গানের উপযুক্ত বলে মেনে নেওয়ার বাধা কোথায়?

খেয়ালের স্থায়ী ও অন্তরার বাণী বাংলাভাষায় রচনা করে যথারীতি পরি-বেশনের ব্যবস্থাকল্পে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কাজী নজরুল বিশেষ আগ্রহী ও উদ্যোগী ছিলেন।

১৯৩১ সালের ঘটনা। আমি সবে লক্ষ্ণৌ থেকে 'সংগীত বিশারদ' উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এসেছি। কিছুদিনের মধ্যেই শ্রদ্ধেয় কাজী নজরুলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কাজী নজরুল তখন চিৎপুর রোডে অবস্থিত এইচ এম ভি রেকর্ড কোম্পানীর খুব সম্ভবতঃ 'ট্রেনার' অথবা 'রেকর্ডিং ইন চার্জ' এই রকমই একটা কিছু ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, "দেখ, উর্দু, হিন্দী—এসব ভাষা আমরা বাঙালীরা তো খুব ভাল বুঝি না, সবকথার অর্থও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না; তাছাড়া উচ্চারণেও বেশ ভুল থাকে। তাই, আমি স্থির করেছি, বিভিন্ন রাগের রূপ ও রস অনুযায়ী স্থায়ী ও অন্তরার জন্য বাংলা ভাষায় আমি বাণী রচনা করে দেব, তোমার কাজ হবে ঐ বাণীকে উপযুক্ত 'নোটেশন' অর্থাৎ 'সরগমে'র সাহায্যে বিভিন্ন রাগের স্থায়ী ও অন্তরায় নিবদ্ধ করা।"

আমার বেশ মনে আছে এ সম্পর্কে আনন্দ বাজার পত্রিকায় একটি খবরও যথা-সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা কারণে শ্রদ্ধেয় কাজী নজরুলের এই মহৎ পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি দু'-একটি পত্রিকায় 'হিন্দী খেয়াল ও বাংলা খেয়াল' প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করেছি। আমার বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য-বিষয়ের মাধ্যমে আমি পাঠকদের সুনিশ্চিত করতে চেয়েছি যে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কোন বিশেষ ভাষাভাষীর জাতিগত সম্পত্তি নয়। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি সমগ্র উত্তর ভারতের স্বীকৃত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। অতএব স্পষ্টত খেয়াল বলতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশেষ একটি অঙ্গের গায়কী বা গান করবার পদ্ধতিকেই বোঝায়। খেয়ালে—স্থায়ী ও অন্তরায় নিবদ্ধ বিভিন্ন ভাষায় রচিত বাণী সংযোজনার ফলে মূল খেয়াল গায়ন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন ঘটে না; কাজেই, খেয়ালের স্থায়ী ও অন্তরায় হিন্দী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি যে-কোন ভাষার বাণীই সংযোজিত হোক না কেন, মূল গায়ন-পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না ঘটায় বিভিন্ন ভাষার বাণী সমৃদ্ধ খেয়ালকে হিন্দী খেয়াল, বাংলা খেয়াল, উর্দু খেয়াল ইত্যাদি নামে অভিহিত না করে কেবলমাত্র খেয়াল নামেই অভিহিত করা উচিত।

বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল প্রমুখ মনীষীবৃন্দের লেখনীসমৃদ্ধ বাংলাভাষায় খেয়ালের স্থায়ী ও অন্তরার উপযুক্ত বাণী রচনার জন্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-রসিক কবির অভাব বাংলাদেশে নিশ্চয়ই ঘটবে না।

বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে এবং বাংলার উদীয়-মান তরুণ সঙ্গীতশিল্পীদের মানের উন্নতি-কল্পে বাংলার প্রত্যেক প্রগতিশীল, প্রখ্যাত ও প্রতিভাশালী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী যদি এখন থেকে বাংলার প্রতিটি বিশিষ্ট সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীগণকে খেয়াল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন সঙ্গীত-সম্মেলনে বা ঘরোয়া বৈঠকে বাংলা বাণী সংযোজিত খেয়াল পরিবেশনের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে তৎপরতা অবলম্বন করেন তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং আকাশবাণীতেও বাংলার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পীরা বাংলা-বাণী নিবদ্ধ খেয়াল পরিবেশনের নীতিগত অধিকারের স্বীকৃতি নিশ্চয়ই লাভ করবেন।

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

(তেরো)

গেস্ট হাউসে পৌঁছবার একটু পরেই মিসেস রায়ের টেলিফোন এলো।

'এক্ষুনি ফিরলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাই এর আগে ফোন করে পাইনি।'

আমি ন্যাকামি করে বললাম, এর আগেও বুঝি ফোন করেছিলেন?

'হ্যাঁ। রাত্রে কোথাও যাচ্ছেন না তো?'

'কোথায় আর যাব?'

'রাত্রে এখানেই খাবেন।'

'আবার আজকে?......'

'হ্যাঁ। তাতে কি হলো? দাদার আজ বাইরে ডিনার, তাই বুলাকেও বলেছি।'

'আমি একটু কাজে বসব। তাই বলছিলাম আপনি যদি তাকে একটু বলে দেন আমাকে যাবার সময় তুলে নিতে......

মিসেস রায় বললেন, ঠিক আছে। আমি ওকে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।

'উনি কিছু মনে করবেন না তো?'

'এতে আবার মনে করার কি আছে?'

আস্তে টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। একবার ভাবলাম ঘরে যাই কিন্তু গেলাম না। সামনের লনেই একটা গার্ডেন চেয়ার নিয়ে বসলাম। মনে হলো ঘটনাগুলো কেন একটু দ্রুত তালে ঘটতে আরম্ভ করেছে।

সিগরেট ধরিয়ে এইসব ভাবছি এমন সময় জীপ নিয়ে মিঃ আদবানি হাজির। ওঁর সঙ্গে এর আগে আলাপ হয়েছে। ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের লোক। দু' বছরের জন্য এম, এ, ও'তে যাচ্ছেন এবং সেইজন্যই এখানে এসেছেন।

জীপ থেকে নেমে উনি আমার দিকে এগিয়ে আসতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'সো মিঃ চ্যাটার্জি! আমি এখন যাচ্ছি।'

'এক্ষুনি?'

'কাল সকালে দিল্লীতে খুব জরুরী কাজ আছে বলে রাত্রিতেই পৌঁছতে হবে।'

ধন্যবাদ জানালাম। চৌকিদার জীপে মালপত্র তুলে দিতেই উনি চলে গেলেন। আমিও আবার চেয়ারে বসে সিগরেট টানতে শুরু করলাম।

সিগরেট টানা শেষ হয়ে গেছে। শুধু বসে আছি। ভাবছি এক্ষুনি উঠে যাব। এমন সময় টেলিফোনের রিং বাজল। চৌকিদার ধরল। আমাকে ডাকল, সাব, আপকা টেলিফোন।

আবার আমার টেলিফোন?

উঠে গেলাম। টেলিফোন তুলেই বললাম, সাগর চ্যাটার্জি!

'জানি।'

কে? বুলা? আমি হাসলাম, আপনি?

'সন্দেহ হচ্ছে নাকি?'

'না সন্দেহ হবে কেন? কি ব্যাপার?'

'পিসী টেলিফোন করেছিল। বললো, আপনাকে তুলে নিতে।'

'আপনি কি বললেন?'

বুলাও যেন হাসল। বললো, বললাম চেষ্টা করব......

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। পিসী বকুনি দিয়ে বললো, আপনাকে না নিয়ে গেলে বকুনি খাব।'

'কি ঠিক করলেন? বকুনি খাবেন নাকি আমাকে নিয়ে যাবেন?'

হঠাৎ বুলা বললো, মনে হচ্ছে বাবা এসেছেন। এখন রাখছি।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বুলা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমিও রাখলাম।

ঘরে গিয়ে কেমন একটা চাঞ্চল্য বোধ করছি নিজের মধ্যে। বসতে পারছি না এক জায়গায়। চাপা আনন্দে উত্তেজনায় বসতে পারছি না। চেয়ার থেকে, বিছানা থেকে উঠে পায়চারি করছি ঘরের মধ্যে। এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ। অনেক কিছু একসঙ্গে ভাবছি। পারছি না। শেষ পর্যন্ত শুধু বুলার কথাই ভাবছি। তাড়াতাড়ি এলে ভাল হয়। একটু গল্প করা যাবে। গল্প করতে করতে ওকে দেখব। খুব ভাল করে দেখব। কাছ থেকে দেখব। সামনা-সামনি বসে কথা বলব। না, না, একবারে পাশে বসব। খুব কাছাকাছি। এমনভাবে কাছাকাছি বসব যে ওর হাতে আমার হাত লেগে যায়। ও কি হাতটা সরিয়ে নেবে?

পায়চারি করতে করতে এইসব ভাবছি। আর কিছু ভাবতে ইচ্ছা করছে না। পারছি না। অন্য কিছু ভাবার চেষ্টাও করছি না।

সূর্য অস্ত গেছে। চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমার ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। তবু আলো জ্বালার ইচ্ছা নেই। ইচ্ছা করছে না। বুলার চিন্তায় মশগুল হয়ে পায়চারি করে চলেছি।

'আসতে পারি?'

বুলা এসে গেছে? 'আসুন।' খুব সংযত হয়ে উত্তর দিলেও ভিতরে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

'আলোটা জ্বালব?'

'জ্বালুন।'

আলোর সাজ ঘরটা ভরে গেল।

বুলাকে দেখেই হেসে ফেললাম। খুশীতে, আনন্দে হাসলাম। ও জিজ্ঞাসা করল, হাসছেন কেন?

'আপনাকে দেখে।'

'কেন?'

'নতুন শাড়ীটা পরে আপনাকে ভারী সুন্দর দেখতে লাগছে।' আজকেই নতুন শাড়ীটা পরবে আশা করিনি। সমস্ত মনপ্রাণ সত্তা দিয়ে যে শাড়ীটা কিনেছি, সেই শাড়ীটা ওর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে দেখে ভীষণ ভাল লাগল। হাসলাম। কিন্তু সে কথা তো বলা যায় না!

'অন্য শাড়ী পরলে বুঝি খারাপ লাগে?'

হাসতে হাসতে বললাম, হ্যাঁ। ভীষণ খারাপ লাগে।

নিজের প্রশংসা চাপা দিয়ে বুলা বললো, এতক্ষণ কি করছিলেন? তৈরী হতে পারেননি?

'তৈরী আবার কি হবো?'

'তাই বলে কি সারাদিনের ব্যবহার করা জামা-প্যান্ট পরেই যাবেন?'

ও বোধহয় বলতে চাইছিল এই পোশাকে গেলে বড় বেমানান লাগবে কিন্তু বলতে পারল না। অথবা আমাকে আরো একটু ভালভাবে দেখতে ইচ্ছা করছিল। তাও বলতে পারল না।

আমি ওর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছি। ওর বোধহয় খুব অস্বস্তি হচ্ছে। 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? যান। হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পাল্টে নিন!'

বুলা কি হুকুম করল?

'সত্যি প্যান্টটাতে হবে?'

'না। ভূতের মত চলুন।'

ওর কথা শুনে হাসি চাপা দায়! সত্যি বাথরুমে গেলাম। হাত-মুখে সাবান নিলাম। বুড় তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছে ওয়ার্ডি-রুমে গিয়ে জামা-প্যান্ট বদলে নিলাম। টেরিকটের প্যান্ট আর র সিল্কের বুশ সার্ট! বুলা বসে আছে। তাড়াতাড়িই বেরিয়ে এলাম।

বেশ গর্বের সঙ্গে বুলার সামনে এসে বললাম, এবার ঠিক আছে?

ও একবার দেখে নিয়ে হাসল।

'হাসছেন কেন?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এই বোতাম লাগান হয়েছে?

সত্যি বুশ সার্টের বোতাম লাগাতে গণ্ডগোল করেছি। আমি কিছু বলার আগেই ও নিজে হাতে বোতামটা ঠিক করে দিল। মনে মনে ভাবলাম, বোতাম লাগাতে গণ্ডগোল না করলে কি তুমি আমার বুকে হাত দিতে?

'ধন্যবাদ।'

'এতে ধন্যবাদ জানাবার কি হলো?' কথাটা শেষ করেই ও সরে দাঁড়াল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর একটা হাত ধরে বললাম, বসুন। যাচ্ছেন কোথায়?

'চলুন আর দেরী করে কি হবে?'

'এত তাড়াতাড়ি? বসুন। একটু চা খাই।'

চায়ের অর্ডার দিলাম। চা এলো। পাশাপাশি দুটো চেয়ার নিয়ে দুজনে চা খেলাম। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে গিয়ে সত্যি ওর গায় হাতটা লেগে গেল। ও কিছু বললো না, আমিও কিছু বললাম না। কি বলব? এবার একটা সিগরেট ধরালাম।

'আবার সিগরেট ধরালেন?' আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল।

সিগরেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

'আবার হ্যাঁ বলছেন?'

'তবে কি বলব ধরাইনি?'

'এত দেরী করে গিয়ে পিসীকে কি বলব?'

'বলবেন সাগর চ্যাটার্জিকে হাত-মুখ পরিষ্কার করে জামা-প্যান্ট পাল্টে, বোতাম ঠিক করে লাগিয়ে আসতে আসতে দেরী হলো।' কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রস্তাব করলাম।

ও হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আর কিছু বলব না?'

'আজকে আর কিছু নয়।'

আর দেরী করলাম না। উঠে পড়লাম। বুলার গাড়ীতে, বুলার পাশে বসলাম। গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে মোড় ঘুরতেই দু'চারজনকে পায়চারি করতে দেখলাম রাস্তায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে আপনার গাড়ীতে দেখে ওরা কিছু ভাবলেন না তো?

'ওরা কিছু ভাবলেন কিনা জানি না; তবে আপনি যে ভাবছেন তা বুঝতে পারছি।'

আমি চুপ করে আছি।

ও আবার মোড় ঘুরোবার পর জিজ্ঞাসা করল, উত্তর দিলেন না?

কি বলব প্রথমে ভেবে পাচ্ছিলাম না। পরে বললাম, আমার সৌভাগ্যে ওরা নিশ্চয়ই ঈর্ষান্বিত হলেন। তাই না?

আমার দিকে না তাকিয়েই ও জবাব দিল, জানি না।

পাথরের কুচির রাস্তা দিয়ে গাড়ী ভিতরে ঢুকতেই মিসেস রায় বাইরে বেরিয়ে এলেন। গাড়ী থেকে নামতেই আমাকে বললেন, আসুন।

আমি বারান্দায় উঠলাম। বুলা গাড়ীর দরজা লক্ করে এগিয়ে আসতেই মিসেস রায় বললেন, কিরে বুলা, আজ যে তোকে চেনা যাচ্ছে না!

বুলা থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, কেন পিসী?

পিসী সোজাসুজি জবাব দিলেন না। 'এই কাপড়টা পরে তোকে তো ভারী সুন্দর লাগছে।'

বুলা শুধু হাসল। এগিয়ে চললো ভিতরের দিকে। আমি আর মিসেস রায়ও ভিতরে গেলাম। বসলাম। মিসেস রায় বুলার পাশে বসে বললেন, এই শাড়ীটা তো আগে দেখিনি?

'আজই প্রথম বের করলাম।'

'কে পছন্দ করে কিনেছে?, তোর বৌদি?'

বুলা বিপদে পড়ল। 'না বৌদি না। আমার এক বন্ধু আমাকে প্রেজেন্ট করেছে।'

মিসেস রায় হাসতে হাসতে বললেন, তোর এমন বন্ধু কজন আছে?

বুলাও হাসল, আপাতত একজন।

বুলার কথা শুনে খুশী হলাম। তাই মাঝখান থেকে মন্তব্য করলাম, এমন বন্ধু বোধহয় একজন হওয়াই ভাল।

মিসেস রায় কিছু বলার আগেই বুলা বললো, এমন বন্ধু একজনের সঙ্গেই হয়, তাই না পিসী।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফেরার পথে প্রায় জোর করেই গেস্ট হাউসে নামালাম। না নামিয়ে পারলাম না। ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম।

'কি ব্যাপার? দরজা বন্ধ করছেন কেন?'

বললাম, খুব প্রাইভেট কথা আছে।

'কি কথা?'

আমি এগিয়ে একেবারে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। চাইলাম ওর মুখের দিকে, ওর বিস্ফারিত দুটি চোখের দিকে। বুলাও চেয়ে রইল আমার দিকে, তবে কিছুক্ষণ। তারপর বললো, বলুন। কি কথা বলবেন বলছিলেন।

'এমন বন্ধু কি একজনের সঙ্গেই হয়?'

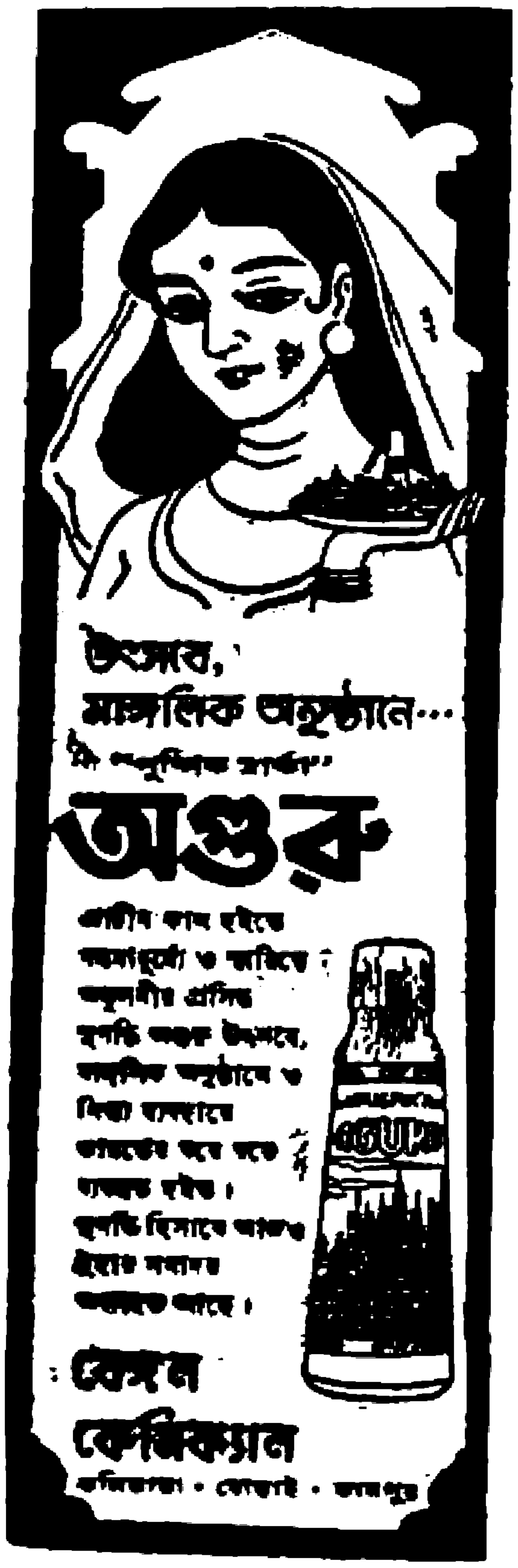

৫০ বছরের ওপর
জনপ্রিয়তায়
অদ্বিতীয়
ভারতে সবচেয়ে
বেশী বিক্রী—
ব্রিটানিয়া
থিন এরারুট বিস্কুট
BRITANNIA
THIN ARROWROOT
ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট

ও মুখ নীচু করে বললো, জানি না।

আমি আর বেশী কথা বললাম না। বলতে ইচ্ছা করল না। প্রয়োজনও বোধ করলাম না। দু'হাত দিয়ে ওর দু'টি হাত ধরে শুধু বললাম, ধন্যবাদ।

বুলা চলে গেল। বাধা দিলাম না। কিন্তু ও চলে যাবার পরও শূন্যতা বোধ করছি এই ঘরে। আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। মনে হচ্ছে আরেকজনের তপ্ত নিঃশ্বাস আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে যাচ্ছে, বুকে যাচ্ছে, অন্তরে যাচ্ছে। ভাল লাগছে। শান্তি পাচ্ছি। এই অন্ধকার রাত্রিতেই সূর্য উঠবে বলে মনে হচ্ছে।

কলকাতায় পড়তে আসার অনেকদিন পর মানসীর দেখা পেয়ে ঠিক এমনি আনন্দ হয়েছিল। ওর মাসীর বাড়ীর তিনতলার কোণার ঘরে ওকে একলা পেয়ে আমি হাত দুটো চেপে ধরেছিলাম। ও ফিসফিস করে বলেছিল, আঃ! ছেড়ে দাও। কে এসে পড়বে।

আমি মুখে কিছু বলিনি। আমার দু'টি ঠোঁটের সামনে একটা আঙুল দিয়ে ইসারায় চুপ করতে বলে ওর হাত দু'টি ধরে এক টান দিয়ে বুকের মধ্যে নিয়েছিলাম। একটু আদর করে, ওর মুখে একটু ভালবাসার চিহ্ন এঁকে দিয়ে ছেড়েছিলাম।

আজ কেন বুলাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম না? কেন ওকে একটু আদর করলাম না? একটু আদর করবার জন্য মনটা যে ব্যাকুল হয়ে আছে! ওর হাত দুটো ধরলাম। ও তো আপত্তি করল না? ওকে যদি বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করতাম, তাহলে কি ও রাগ করত?

জানি না। শুধু জানি বুকের ভিতরটা মরুভূমির মত শুকিয়ে আছে। হাহাকার করছে মন। সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছি। আর পারছি না। পারতে চাই না। বুলাকে আর একটু কাছে চাই, নিবিড় করে চাই। কিন্তু......

না, না, কোন কিন্তু নয়, কোন দ্বিধা নয়। অসংখ্য কিন্তু ও অসংখ্য দ্বিধা আমাকে প্রায় পাগল করে তুলেছে।

বুলা চলে যাবার পর এই চেয়ারে বসে বসে সিগরেট খাচ্ছি আর ভাবছি। একবারও উঠিনি। জামা-প্যান্ট পর্যন্ত ছাড়িনি। উঠতে ভাল লাগছে না। মাথার মধ্যে নানা মতলব উঁকি দিচ্ছে। একবার ভাবছি টেলিফোন করি। আবার ভাবছি না, টেলিফোন করব না। বরং একটা চিঠি লিখি। দীর্ঘ চিঠি! লিখি মানসীর কথা, মানসীর সঙ্গে ওর মিলের কথা। পৃথিবীর সব মেয়ের মধ্যেই একটা মিল আছে। মানসী আর বুলার মধ্যেও মিল আছে। অনেক মিল আছে। তাইতো বুলার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠেছি। দু'টি মেয়ের মধ্যে অমিলও থাকে প্রচুর। মানসী ও বুলার মধ্যেও আছে কিন্তু এখন আমি তা খেয়াল করতে পারছি না। খেয়াল করতে চাইছি না। ইচ্ছা করছে না। প্রয়োজন মনে করছি না। কিন্তু......

মনের মধ্যে আবার একটা কিন্তু এসে হাজির হলো। আমি কি ঠিক করছি? বুলার দিকে এমন করে এগিয়ে যাওয়া কি উচিত?

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। তবুও ঠিক বুঝতে পারছি না। মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে রক্ত বড় বেশী দৌড়োদৌড়ি করছে। ঠিকমত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আমার নেই। যে সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে হয়, সে অনুভূতি আমার আসছে না।

টেবিলে একটা ঘুঁষি মেরে উঠে দাঁড়ালাম। চুলোয় যাক ন্যায়-অন্যায়। একলা একলা আমি পাগল হয়ে উঠেছি। এইরকম একলা একলা থাকলে আমি হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই উন্মাদ হবো। বুলার হাত দুটো ধরার পরও যখন কিছু বললো না তখন আমি এগিয়ে যাব না কেন? যতদূর পারি এগিয়ে যাব। কিছু বিলিয়ে দেব, কিছু কুড়িয়ে নেব। তারপর যখন প্রয়োজন হবে, হিসাব-নিকাশ করা যাবে। এখন সেসব চিন্তা করার দরকার নেই।

এ্যান্টি-রুমে জামা-প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরতে পরতে মনে হলো টেলিফোন তো এই ঘরেও আনা যায়। পাঞ্জাবির বোতামগুলো পর্যন্ত না আটকেই টেলিফোনটা নিয়ে এলাম আমার ঘরে।...

'এখনও ঘুমোননি?'

'না।'

'কি করছেন?'

'মাকে চিঠি লিখছিলাম।'

'চিঠি লেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ এই শেষ হলো।' এবার বুলা আমার কথা জানতে চাইল, আপনি ঘুমাননি কেন?

'এমনি বসেছিলাম।'

'কেন?'

'বসে বসে কত কি ভাবছিলাম।'

'কি ভাবছিলেন?'

'অনেক কথা......'

'অনেক কথা মানে?'

'আপনার কথা, আমার কথা, ও কত কি!'

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ। আপনার কথাও ভাবছিলাম।'

'আমার কথা কি ভাবছিলেন?'

'বলেছি তো যা ভাবা যায় তা বলা যায় না।'

'তবুও......

'ভাবছিলাম আপনার ওখানে গিয়ে কফি খেতে পারলে বেশ হতো।'

বুঝতে পারলাম বুলা হাসছে। বললো, তার জন্য এত চিন্তা করার কি আছে? চলে আসুন।

'সত্যি আসব?'

'আপনি যদি আসতে পারেন তাহলে আমিও কফি খাওয়াতে পারব।'

'যদি শুধু গল্প করতে আসি?'

'আসুন। গল্প করব।' একটু থামল। 'আপনি কি লবীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেলিফোন করছেন?'

'না। আমার ঘরে নিয়ে এসেছি।'

'এখন কি ঘুমুবেন?

'সারাদিন আপনার সঙ্গে কাটিয়ে এখন আর একলা একলা মন বসছে না......

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তাইতো ভাবছিলাম কফি খেয়ে আসি।'

একটু অন্যান্য কথার পর বললাম, কাল সকালে আসছেন তো?

'কাল সকালে আপনিই এদিকে চলে আসবেন।'

'আপনি এসে নিয়ে যাবেন।'

'রোজ সকালে আপনাকে বিরক্ত করা কি ঠিক? আপনিই চলে আসবেন। তাছাড়া আপনি তো শহরের দিকে নিশ্চয়ই যাবেন।'

হ্যাঁ। তা তো যেতেই হবে।'

'কখন আসবেন?'

'ঘুম ভাঙার ঘণ্টা দুয়েক পরে।'

'ঠিক আছে আমি টেলিফোন করে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

(ক্রমশঃ)

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতাঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখাঃ ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯

অমৃতলাল নাগর

একদা নৈমিষারণ্যে

সবিতা সেনগুপ্ত

এ-বছরের সোভিয়েট ল্যান্ড পুরস্কার পেলেন বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীঅমৃতলাল নাগর। বলা হয়েছে পুরস্কার পেলেন তাঁর উপন্যাস 'বিষ ও অমৃতের' জন্য। বস্তুতঃ এই সব পুরস্কার কোন একটি বইকে উপলক্ষ্য করে দেওয়া হয় মাত্র, আসলে লক্ষ্য থাকে শিল্পকর্তার পিছনের মানুষটি।

তাঁর গৃহে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেই অমৃতলাল নাগরজী সহাস্যবিনয়ে নম্র সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, সব আপনাদেরই শুভেচ্ছা। কোথায় গেলাম তাঁকে অভিনন্দন জানাতে উল্টে তিনিই আমাদের অভ্যর্থনায় মেতে উঠলেন।

হৃদয়ের এই যে স্বাভাবিক উত্তাপ এটাই অমৃতলালের স্বভাবের যথার্থ পরিচয় যা অন্য সব পরিচয়কেই ছাপিয়ে ওঠে। বস্তুত এই সূত্র ধরে এগিয়ে গেলেই মানুষ অমৃতলালের ভেতরে যে লেখক অমৃতলাল রয়েছেন, তার কেবল হদিসই মেলে না, উপরন্তু পরিমাপও যেন করা যায়।

উনি আসলে হলেন ইতিহাসের মানুষ। ভুলক্রমে যেন এ-যুগে এসে জন্মেছেন। সেই ত্রুটি যেন উনি সংশোধন করে নিয়েছেন অনবরত প্রাচীন পুঁথি ঘেঁটে এবং অন্তত মনে মনে সেই দূর অতীতে বাস করে।

গত বিশ বছরে যত হিন্দী সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, উনিই তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অধ্যয়নশীল। হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকটাই নিজের লেখা ছাড়া অপরের লেখাপড়া বিশেষ পছন্দ করেন না। একজন ত এমন চমকপ্রদ সত্য ভাষণ করেন যে, অধিক অধ্যয়নে তাঁর মৌলিকতা নষ্ট হবে।

যাহোক অমৃতলালজীর কথায় আসি। অতীত ইতিহাসাশ্রয়ী এই ব্যক্তি যখন সমসাময়িকতায় নেমে আসেন, তখন তাঁর দরদভরা চিত্ত বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারে না। তখন তিনি হন বাস্তববাদী ও যুগসচেতন। তাঁর দূর স্বপ্নচারী মন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতা-শিখর থেকে নেমে আসে বিশ শতকের যুগ যন্ত্রণাময় বাস্তবে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বর্তমান যুগের কঠোর বাস্তবেও যেমন, সহস্র সহস্র বৎসরের কুয়াসাচ্ছন্ন অতীতেও তেমনি, তাঁর মন অবাধে সঞ্চরণ করে। তার প্রমাণ তার ঘরটি যেন একটি ছোটখাট মিউজিয়াম। কত রকমের পাথরের টুকরো, পাথরের ভাঙা মূর্তি, মুণ্ড তাঁর ঘরে রয়েছে। খৃষ্ট-পূর্ব কালের সভ্যতার নানা চিহ্ন। হাতে-গড়া মাটির ভাঙা বাসনের টুকরো। মনে হয় উনি যেন একেবারে ধূসর কুহেলিকায় ভরা অতীতে পরিবৃত হয়ে বসে আছেন।

সামান্য উৎসুক্য দেখালেই তিনি প্রতিটি পাথরের টুকরোর ইতিহাস বলতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। ও'র কাছে সব পরিষ্কার, প্রাঞ্জল।

গৌরবর্ণ, সুন্দর সৌম্য চেহারায় নাগরজীর মুখে সর্বদাই প্রসন্ন হাসি। বাংলা বেশ ভাল জানেন। শরৎচন্দ্রের হাতে লেখা কার্ডের ফোটোস্টাট কপি দেখালেন, হিন্দীতে ও বাংলায় তাঁর নিজের নাম ও অমৃতলালের নাম লেখা। হাসলেন, আমার ভাল পরিচয় ছিল শরৎচন্দ্রের সঙ্গে। আমি তাঁর হাওড়া জেলার পাণিত্রাসের বাড়ীতে গেছি, কলকাতার বাড়ীতে গেছি। হাসি-গল্প সরস বাক্যালাপে তাঁর সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি।

বললাম, শরৎচন্দ্র কি হিন্দী বলতে পারতেন?

—খুব ভালই বলতেন। ভাগলপুরে শিখে থাকবেন। তাঁর পিসতুত ভাই উপেনবাবুকেও ভাল চিনতাম। কলকাতার কথায় দুঃখ প্রকাশ করলেন অমৃতলাল নাগর। বললেন, সেই কলকাতা। সেই কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়, পবিত্র দেবমন্দির বলে, আমাদের মনে হত, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উনি বললেন।

পুরস্কার অমৃতলাল আরো অনেক পেয়েছেন। বছর-দুই আগে সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কারও পেয়েছেন। এসব শুনে মনে হতে পারে, তিনি বুঝি বয়সে খুব প্রাচীন। তা কিন্তু নয়। বরং বলা যেতে পারে, বর্তমানে প্রবীণ হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি হলেন নবীনতম।

লেখা শুরু করেছেন তিনি নিতান্তই তরুণ বয়সে। প্রথম বই যখন প্রকাশিত হয়, তখন বয়স বোধ করি তাঁর উনিশ পেরোয়নি। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে বিয়েও তাঁর কিশোর বয়সেই হয়েছিল। নাগরজী বললেন, আমার প্রথম বই ও প্রথম ছেলে প্রায় এক সঙ্গেই আসে।

তিনি বহুভাষাবিদ। এই যুগের হিন্দী সাহিত্যিকের হিন্দী কিন্তু আপন মা নয়, পাতানো মা। আপন মা হল গুজরাটি। হিন্দী ভাষায় রচনাই তাঁর জীবিকা বলে হিন্দীকে তাঁর পালিতা মা বলা চলে। জীবিকার ধান্দায় প্রথম বয়সে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ফিল্মের জন্য লেখবেন বলে। উদয়শঙ্করের সঙ্গেও কাজ করেছেন তাঁর 'কল্পনা' ফিল্মে। সেই সূত্রেই তাঁর মাদ্রাজ যাওয়া। দক্ষিণী ভাষার সঙ্গে সেইখানেই তাঁর পরিচয়। গুজরাটি, হিন্দী, উর্দু, ইংরেজী বাংলা সব ভাষার ওপরেই তাঁর প্রচুর দখল।

অমৃতলাল চমকপ্রদ ঐতিহাসিক উপন্যাসও যেমন রচনা করেছেন, সামাজিক উপন্যাসেরও তেমনি তিনি সার্থকস্রষ্টা।

কখনো কখনো তাঁর সামাজিক উপন্যাসে—যেমন 'বুন্দ ও সমুদ্রে

গল্পের নক্সা উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে প্রাচীন সভ্যতার আলোচনা ও বর্তমান জীবনের বর্ণনায় টানাপোড়েন, তবু ইতিহাসপ্রেমই তাঁর মুখ্য নয়, মুখ্য হল তাঁর তীব্র সমাজ-সচেতনতা।

'৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ হল। উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী অমৃতলালের স্পর্শকাতর শিল্পীসত্তা বিক্ষুব্ধ, ব্যথিত হয়ে উঠল। তিনি আকালের পটভূমিকায় রচনা করলেন, 'মহাকাল' নামে উপন্যাস। হিন্দীতে লেখা দুর্ভিক্ষের ওপর রচিত। অন্য সব উপন্যাসের মধ্যে নাগরজীর 'মহাকাল' সর্বশ্রেষ্ঠ।

'বিষ আর অমৃত' উপন্যাসেও তিনি তাঁর সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজমন্থনে বিষ ও অমৃত দুটোই ওঠে, কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থায়, ব্যক্তির জীবনে হলাহলের ভাগই পড়ে বেশি। তাঁর 'এই কোঠাওয়ালীরা' নামক উপন্যাস বারবণিতাদের নিয়ে রচিত। এর মধ্যে আছে দুঃখী পতিতাদের প্রতি গভীর বেদনাবোধ, আছে পুঁজিবাদী সমাজের প্রতি তীব্র কশাঘাত। কেন কি কারণে নারীরা পণ্যরূপে ব্যবহার হয় সেই রূঢ় সত্যভাষণ।

একদা উনি 'মরঘট' (মানে শ্মশানের তুক) বলে যে-গল্প লিখেছিলেন, তাতে কুৎসিত, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শ্মশান-যাত্রার ইঙ্গিত পরিস্ফুট ছিল।

'এই কোঠেওয়ালীরা'র মধ্যেও রয়েছে দুঃখেরা সমাজব্যবস্থার প্রতি কঠোর ইঙ্গিত। বধূ কি করে বারবধূ হয়, হতে বাধ্য হয়, সমাজের কোন গুপ্ত গলিত ক্ষতের জন্য, যুগ যুগ ধরে নারী তার দেহকে পণ্য করতে বাধ্য হয়, তাঁর মর্ম-স্পর্শী চিত্র এর মধ্যে আছে।

নাগরজী যখন বম্বে ছিলেন অর্থো-পার্জনের জন্য, তখন এমন অর্থাগম হত না যাতে লখনৌতে পরিবারবর্গকে টাকা পাঠিয়ে নিজে বেশ সচ্ছলভাবে থাকতে পারতেন। তাই প্রবাসজীবন কায়ক্লেশে কাটানো ছাড়া উপায় ছিল না। সকালে কয়েক স্লাইস পাঁউরুটি ও চা, বিকালে সস্তা হোটেলের কদন্ন। যে-বাড়ীতে তিনি থাকতেন তার এক অংশে ঠাঁই নিয়েছিল এক তরুণী নারী, তার শিশুপুত্রের নাম লল্লু।

লল্লু কখনো কখনো তাঁর ঘরের কাছে এসে ঠোঁটে আঙুল চেপে দাঁড়িয়ে থাকতো। ক্রমে এক সময় সে অর্ধক্ষুধার্ত লেখকের চার স্লাইস রুটি থেকে ভাগ বসাতে শুরু করল। তিনি বুঝলেন শিশু যখন ক্ষুধার্ত, তার মাও তাই। সন্ধ্যায় নাগরজী বাড়ী ফেরার পর লল্লু আবার এসে বলে, আঙ্কেল রোটি। মা এসে শিশুকে নিয়ে গেল।

নাগরজীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুও থাকতেন। তাঁরা দুজনে একটি রুটি ও দু' কাপ চা নিয়ে প্রতিবেশিনীর দুয়ারে করাঘাত করলেন। মেয়েটি দুর্বল হাতে রুটি আর চা নিয়ে নিল।

কিছুদিন বাদে মেয়েটির স্বামী বাড়ী ফিরল। সঙ্গে গণিকালয়ের এক দালালও এল। রান্নাঘর থেকে মসলার গন্ধ ভেসে এল।

লল্লুর মা গৃহস্থ বধূ থেকে বারবধূ হয়ে গেল। নাগরজী বললেন, পুঁজিবাদ অর্থ একদিকে পুঁজি আর এক দিকে অভাবের বিস্তার। এই গতিশীল প্রক্রিয়াতে নিরন্তর বারবণিতা উৎপন্ন হয়। যেমন এক সময়ে সমুদ্রমন্থনের ফলে উর্বশীর উদ্ভব ঘটেছিল।

গণিকা গমনকারীদের দালাল বলছিল, আরে আমি ত উপকার করেছি, শালা না খেয়ে মরছিল। আমি দয়া করলাম। ভাবলাম, ভদ্রলোক আমার ভাই, কষ্ট পাচ্ছেন।

একদিন লল্লুর মা লেখকের কামরাতে মাটিতে পাতা ভিজে জাজিম থেকে চুঁয়ে-পড়া লাল রক্ত বাইরে থেকে দেখে রক্ত মনে করে দরজা ধাক্কাতে লাগল।

বাইরে তখন প্রবল বর্ষা। সমুদ্রের জল উপচে এসে বস্তীর মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে। এই দুর্যোগের মধ্যে বাইরে গিয়ে চা কে নিয়ে আসবে? কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই আশ্চর্য হয়ে নাগরজী দেখলেন দু' কাপ চা নিয়ে মমতাময়ী প্রতিবেশিনী দুয়ারে দণ্ডায়মানা।

এই চা লল্লুর মা নিজের দেহ বেচে কিনেছে আর নিজের পরোপকারী বন্ধুর এমন অসময়ে নিয়ে এসেছে। এই করুণা-ময়ীকে বেশ্যা হতে হল, অন্য কোন মহল্লায় গিয়ে নয়, যেখানে, যে-গৃহে পণ্ডিত অমৃতলাল নাগরজী আছেন। আছেন তাঁর মিত্র পণ্ডিত মহেশ কৌল, সেই গৃহে। কারণ, পুঁজিবাদী কারখানাতে ক্ষুধারূপে যন্ত্রের মাধ্যমে গণিকা নামে বস্তু তৈরী হয়ে থাকে।

মনের দিক দিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের মত গভীর দরদী। আর শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর কী গভীর শ্রদ্ধা! বলছিলেন, জানেন কল-কাতায় প্রথম যাই তাঁকে দর্শন করবার জন্য। যে-মন নিয়ে তীর্থে যায় লোকে, সেই মন নিয়ে গেছি। বলতে বলতে তিনি যেন সেই তরুণ বয়সে ফিরে গেলেন।

শরৎচন্দ্র অমৃতলালকে জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, তুমি কি আজন্ম সাহিত্য সেবা করার ব্রত নিয়েছ? অমৃতলালের নম্র উত্তর হল, আজ্ঞে হ্যাঁ!

শরৎচন্দ্র বললেন, খুব ভালো। খালি খেয়াল রেখো যা-কিছু লেখো, আপন অনুভূতির ভিত্তির ওপর নির্ভর করে লিখো। ব্যর্থ কল্পনার মোহে আবদ্ধ হয়ো না।

এ-কথা শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, তাঁর নিজের গুরু। 'শরৎ, তুমি যে লেখো, বলে-ছিলেন তাঁর কলেজের অধ্যাপক, আমি এতেই খুশি। শুধু একটা কথা আমার স্মরণে রেখো। কখনো কারো ব্যক্তিগত আলোচনা কোর না, দ্বিতীয়, যা লেখো, তোমার নিজের অনুভবের বাইরে কিছু লিখো না।'

নাগরজী বললেন, আমিও তা মেনে চলেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, এখন কি লিখছেন?

—একদা নৈমিষারণ্যে।

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নৈমিষারণ্যের পটভূমিকায় উপন্যাস লিখছেন?

—হ্যাঁ, দেখেছেন ত নৈমিষারণ্য? দেখেছেন? বেশ।

লখনৌ থেকে অল্প দূরে গোমতীর তীরে নৈমিষারণ্য। ধারণা করা যায় না আজকের নৈমিষারণ্য দেখে, একদিন নৈমিষারণ্য কী ছিল। যে নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষির বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, ষোল হাজার আবাসিক ছাত্র সেখানে বিদ্যালাভ করত ব্রহ্মবিদ ঋষির পদতলে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রান্ত ভারত বীর-শূন্য, কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছেন, পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থান করেছেন। রাজা পরীক্ষিতও ব্রহ্মশাপে বিগতপ্রাণ। নৈমিষারণ্যে ঋষিদের সভা বসল। সেই সভায় সারা ভারত থেকে ঋষি-মুনি জ্ঞানী গুণীরা সমবেত হয়েছিলেন। সমাজকে কি দেওয়া যায়, সাধারণ জগতের সামনে কোন আদর্শ উপস্থিত করা যায়? বার বছর ধরে সেই সভা চলে।

বেদ মহাভারত গীতা আদি রচনা করবার পর বেদব্যাসের কেমন একটা ক্লান্তি ও অবসাদ এসেছিল। এটা হয়। ইনটালেক-চুয়াল কাজ অতিরিক্ত হবার পর একটা ক্লান্তি ও অবসাদ অনেক সময়েই আসে। তখন চিত্তের বোঝা হাল্কা করার জন্য একটা প্রবণতা আসে। মহর্ষি ব্যাস তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্ম সমাধা করার পর চিত্তের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ভাগবত রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার অমৃতরসে অব-গাহন করে তাঁর বিক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত হল।

নৈমিষারণ্যে দীর্ঘ বার বছর ধরে ঋষি-মুনিরা অনেক আলাপ-আলোচনা করলেন। ভাগবতের পাঠ ও ব্যাখ্যা শোনালেন সূত গোস্বামী। জনতার মনও সুধারসে সিক্ত হল।

নৈমিষারণ্যে ব্রহ্মবিৎ ঋষিরা যে-বীজ উপ্ত করেছিলেন, তা যে মৃত্যুহীন। মহা-ভারতের মহামানবতীরে সারা বিশ্বের সারা দেশ থেকে কত মানুষের কত ধারা এসে মিলল, নৈমিষারণ্যের বিরাট বনস্পতির বিশাল ছায়া ক্রমশ দিগদিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে সেইসব জাতি গোষ্ঠীকে একাকার করে দিল।

নৈমিষারণ্যের গৌরবময় দিনের উল্লেখ করে বিভোর হয়ে গেলেন তিনি মহামৌন অতীতের মধ্যে!

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এই উপন্যাসে কি রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন। আপনার লেখায় ত প্রচুর উর্দু শব্দ থাকে।

বললেন, তা ঠিক, কিন্তু এর ভাষা গুরুগাম্ভীর্য ত হবে। শুনুন না একটু, পড়ে শোনাচ্ছি।

নাগরজী পড়তে লাগলেন। মনে হত এই গৌরবর্ণ গৌরকান্তি পণ্ডিতের কণ্ঠ যেন সেই যুগের সূত গোস্বামীই বলছেন, —একদা নৈমিষারণ্যে!

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল মীরা। পরক্ষণেই মন স্থির করল। বলাই যাক না একে। কখন কার দ্বারা উপকার হয় কেউ বলতে পারে না। এত যখন আগ্রহ ওর শোনার, বলতে বাধা কী।

—আমার চাকরী চলে গেছে। মীরা হাসিমুখে সমীরের দিকে তাকাল, কাল থেকে বেকার। কিছুদিনের মধ্যে অন্য কোথায়ও কাজকর্ম জোটাতে না পারলে...। শুনলেন তো। পারবেন একটা চাকরী জোগাড় করে দিতে?

—আপনি তো স্টেনো-টাইপিস্টের কাজ করতেন?

—ও দুটোই জানি। তবে আমার ডেজিগনেশন ছিল সেক্রেটারী টু দি ডিরেক্টর। ছোট ফার্ম ছিল। মাইনে খুব একটা ছিল না। শ' চারেক পেতাম।

—চাকরীটা গেল কী ভাবে?

—আর কোনো প্রশ্ন নয়। মীরা ঈষৎ বিরক্তির সুরে বলল, শ'তিনেক টাকা পেলে চলবে। ভদ্র পরিবেশে একটা কাজ চাই।

—পারবেন। সমীর উঠে দাঁড়াল, কাল সকাল দশটার মধ্যে রেডি থাকবেন। স্নান খাওয়া সেরে। আমার সঙ্গে বেরোবেন। আমাদের অফিসে আপনাকে নিয়ে যাব।

—তার মানে! মীরা অবাক চোখে তাকাল, শুনুন সমীরবাবু। আপনি কী ঠাট্টা করছেন?

—নো মোর কোশ্চেন। পর্দা সরিয়ে সমীর যেতে যেতে বলল, গুড নাইট।

কাঁধ নেড়ে মীরা আপন মনে বলে উঠল, দেখাই যাক না। যেভাবে সমীর বলল তাতে হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে না। যদি বাস্তবিক সমীরের অফিসে কাজটা হয়ে যায়, বলতে হবে তার ভাগটা ভাল। প্রচণ্ড রকমের একটা দুশ্চিন্তা থেকে বেঁচেই যাবে। রাত্রে ঘুম আসবে। সারারাত অনিদ্রায় জেগে থাকা, যখন [illegible] সমস্ত মানুষ নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে, কী অসহ্য অবস্থা!

পরদিন ঠিক সময়ে সমীর এসে উপস্থিত। স্মার্ট ভঙ্গিতে পর্দার বাইরে থেকে অস্ফুট কণ্ঠে ডাক দিল, মীরা দেবী! কাম ইন।

সঙ্গে সঙ্গেই মীরা বাইরে এল। দরোজায় তালা লাগিয়ে সমীরের দিকে ফিরে তাকাল, চলুন।

রাস্তায় বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটার পর সমীর মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেখল মীরাকে। ভেরি গুড! বেশ স্মার্ট লাগছে আপনাকে। আমার সাহেব আবার স্মার্ট মহিলা পছন্দ করেন। ট্যাক্সী!

—আবার ট্যাক্সী কেন? মীরা সিটে বসে সমীরকে মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, বাসে চেপেই তো যাওয়া যেত। অযথা পয়সা নষ্ট করা ঠিক না। এত সিগারেট খান কেন?

সশব্দে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল সমীর। কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে নীরবে সিগারেট টানল। অন্যমনস্কভাবে একবার হাতঘড়ি দেখল। তারপর মীরার দিকে তাকাল। মৃদু হাসল।

দোহাই আপনার! হাত জোড় করে করুণ মুখে সমীর বলল, দয়া করে উপদেশ দেবেন না। এমনিতেই বাড়িতে কাকা-কাকিমার উপদেশ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। ঐ জন্যেই তো দাদা হতে চাইনে।

—থামুন। মীরা হেসে ফেলল, বাব্বা! আপনাকে একটা কথা বললে হাজার কথা শুনিয়ে দেন। সমীরবাবু, আপনাদের ওখানে কাজটা পেলে বেঁচে যাই। আমার সব থাকতেও পাশে কেউ নেই। বলে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। অসহায় ভঙ্গিতে সে তাকাল সমীরের দিকে।

সমীর কোন জবাব দিল না। বাইরের দিকে তাকাল। লালবাজারের সামনে রাস্তায় জ্যাম। মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে ওরা ট্যাক্সী ছেড়ে দেয়।

বড় একটা বাড়ির সামনে ওরা দাঁড়াল। তারপর ভেতরে ঢুকল। লিফ্‌ট বেয়ে আট-তলায় উঠল। মীরা চুপচাপ। সমীর অবশ্য দু-একটা কথা বলছে। একটা ঘরে ঢুকল ওরা।

—বসুন আপনি। আমি না আসা পর্যন্ত অন্য কোথায়ও যাবেন না। বলে সমীর বেরিয়ে যায়।

ঘরের চারিদিকে চোখ বুলোয় মীরা। ছোট্ট ঘর। স্টিলের দুটো আলমারি। দেয়ালে কয়েকটা ক্যালেন্ডার। জানালার দিকে ঘেঁষে টেবিল। টেবিলের ওপর টাইপ মেশিন। কয়েকটা চেয়ার।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর মীরা চেয়ার থেকে উঠে পায়ে পায়ে জানালার ধারে এগিয়ে এল। ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাল। ওরে বাবা! মাথা ঘুরে যায় নীচের দিকে তাকালে। বামনাকার মানুষ, যানবাহন। ট্রামগুলিকে মনে হয় দেশলাই-এর খোলের মত।

—আসুন আপনি।

ঘুরে দাঁড়াল মীরা। তারপর সমীরের পিছন পিছন সুইংডোর ঠেলে বাইরে এল। লম্বা করিডর। খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরল। তারপর একটা দরোজার সামনে দাঁড়াল। ওদের দেখে বেয়ারা উঠে দাঁড়াল। সমীরকে সেলাম জানাল। সমীর ইসারায় মীরাকে ভিতরে ঢুকতে বলল। মীরা সমীরকে অনুসরণ করল।

—স্যার, এর কথা বলছিলাম।

মাথার চুল সব পাকা। মুখখানা লাল টকটক করছে। সমীর আগেই সাহেবের পরিচয় দিয়েছিল। মিঃ দেশপান্ডে। মারাঠী। কোলকাতা অফিসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

—গুড মর্ণিং স্যার। মীরা সপ্রতিভ কণ্ঠে অভিবাদন জানাল।

—মর্ণিং। ম্যানেজার সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে টেবিলের উল্টোদিকে চেয়ার দেখিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, বসুন।

সমীর অপেক্ষা করল না। যাওয়ার আগে মীরার দিকে তাকিয়ে অভয় দেবার ভঙ্গিতে অল্প হাসল।

—আপনার শর্টহ্যান্ডে স্পীড কত?

—একশো।

—একটা ডিক্‌টেশান নিন। বলে ম্যানেজার একটা ফাইলের পাতা ওল্টাতে থাকেন।

আগে থাকতেই সমীর জানিয়েছিল সব। ব্যাগ খুলে মীরা খাতা আর পেন্সিল বের করল। তারপর প্রস্তুত হল। হ্যাঁ, সে রেডি। সে কি! মীরা একটু ঘাবড়ে যায়। খুব স্পীডে বলছেন ম্যানেজার। মনে মনে হাসল। সাহেবের কোন আইডিয়া নেই কত স্পীডে বলছেন।

ডিক্‌টেশান শেষ করে ম্যানেজার প্রশ্ন করলেন, আপনি আগে অন্য কোথায়ও কাজ করছেন?

এই সেরেছে! এখন কী জবাব দেবে সে। মীরা একবার ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। হ্যাঁ। মাথা নাড়ল সে। পরের প্রশ্ন ঃ সে-কাজ ছেড়ে দিলেন কেন? উত্তর ঃ ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না সেখানে। তাছাড়া বদলীর আশংকা।

কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ম্যানেজার। তারপর দুম্‌ করে প্রশ্ন করে বসলেন, আপনি কী বিবাহিতা?

সর্বনাশ! মীরার বুক কেঁপে ওঠে। চকিতে তার আগের অফিসের ডিরেক্‌টর মিঃ কাপুরের কথা মনে পড়ে যায়। না, সত্য কথা বলতে পারবে না। আর মিথ্যা বললে, এখনকার মত রেহাই পেলেও, পরে কোনরকমে জানাজানি হয়ে গেলে, তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা হবে। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই।

—আপনি কিছু মনে করবেন না। ম্যানেজার গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, আমি কোলকাতায় অনেকদিন আছি। আজকাল মডার্ন মহিলাদের দেখলে বোঝা যায় না আসলে তারা বিবাহিতা অথবা কুমারী।

এবার পরিষ্কার কণ্ঠে মীরা জানায় যে, তার বিয়ে হয়নি। যা হবার হবে। এখন অতশত ভাবার সময় নেই। আর কোন প্রশ্ন করলেন না ম্যানেজার। কলিং-বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন।

—দাশগুপ্ত সাহেব।

কিছুক্ষণের মধ্যে নোটবুক হাতে সমীর এল। ওর দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার বলেন, মিস্‌ মীরা দেবীকে একটা টাইপ মেসিন দাও। ডিক্‌টেশন টাইপ হলে নিয়ে এসো।

সমীরের পিছন পিছন বাইরে এসে সহজভাবে নিশ্বাস নিল মীরা। প্রথম যে-ঘরে বসেছিল, সেখানে নিয়ে এল ওকে সমীর।

—এই হচ্ছে আমার চেম্বার। এই নিন মেসিন। ড্রয়ার খুলে দেখুন কাগজ কার্বন সব রয়েছে। এখন ধীরেসুস্থে টাইপ করে দিন। সময় নিন টাইপ করতে। দেখবেন একটাও যেন ভুল না হয়।

মীরা কিছু বলতে গেলে ইসারায় সমীর ওকে চুপ করতে বলে। সে নীরবে ডিক্‌টেশন দেখে টাইপ করতে থাকে। ঢিবঢিব করছে বুক। পরীক্ষা দিতে বসলে এমনি হয়। সমীর ঘড়ি দেখছে। দেখুক। সে তাড়াহুড়া করল না।

—এই নিন। মীরা টাইপ-করা চিঠিটা এগিয়ে ধরল। কোন ভুল নেই। সে তো আর নতুন ক্যান্ডিডেট নয়। আগের অফিসে কাজকর্ম মনোযোগ দিয়েই করত। তাছাড়া তার কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন ডিরেক্‌টর।

সমীর চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। মিনিট-দশেক পরে হাসিমুখে ফিরে এল। বলল, যান, ডাকছে আপনাকে। পারবেন তো একা যেতে?

—কী খবর?

—সাহেবের মুখ থেকে শুনবেন। সমীর ঠোঁটে আঙুল রেখে নীচু গলায় বলল, দেয়ালেরও কান আছে। তাড়াতাড়ি যান।

মীরা ম্যানেজারের কামরার সামনে দাঁড়ালে বেয়ারা দরোজা সামান্য ফাঁক করল। সে কিছুটা আড়ষ্টভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল।

—কাম ইন। বসুন।

চেয়ারে বসে মীরা আড়চোখে দেখল ম্যানেজার ওর টাইপ-করা চিঠির দিকে তাকিয়ে।

—ধরুন আপনাকে যদি বাইরে পাঠান হয়, যাবেন আপনি? আমাদের হেড অফিস দিল্লীতে।

—বাইরে যাওয়ায় অসুবিধা রয়েছে।

—ঠিক আছে। আপনি এখন যেতে পারেন। ফলাফল চিঠির মাধ্যমে জানান হবে।

মীরা ভাবতে ভাবতে বাইরে এল। ঠিক বুঝতে পারল না চাকরীটা হল কিনা। ওকে দেখে সমীর মুচকি হাসল, কী জানালেন সাহেব?

—কী আবার! মীরা ধপ্‌ করে চেয়ারে বসল, এক গ্লাস জল। চিঠিতে জানাবেন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। চাকরীটা কী হবে সমীরবাবু?

—এই নিন জল। বলে সমীর মুখ টিপে হাসল, ব্যস্ত হবেন না। একটু চা খান।

—থাক। মীরা উঠে দাঁড়াল, আমি এবার উঠি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

—বসুন। চা না খাইয়ে আপনাকে...। সমীর কলিংবেল বাজাতে বেয়ারা এল। দু কাপ চা আনতে বললে বেয়ারা চলে যায়।

সমীর কথা বলতে বলতে এটা-সেটা কাজও করে যাচ্ছিল। মুখে মুচকি হাসি। মীরা কী আর করবে, চুপচাপ বসে রইল। একটা সাসপেন্সের মধ্যে রয়েছে। সমীর একটু ভরসা দিলে...বলে কিনা দেয়ালেরও কান আছে...কথা বলার সময় অত ঘন ঘন দরোজার দিকে তাকানো কেন...যেন বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে, আড়ি পেতে কথা শুনছে।

—চা খান। সমীর আলমারি খুলে কয়েকটা ফাইল বের করল, আপনি তো এখন সোজা বাড়ি যাবেন। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি থাকবেন। আজ একটা সিনেমায় যাব। টিকিট কেটে নিয়ে যাচ্ছি।

মীরা সটান জবাব দিল, আমি যেতে পারব না। বিকেলে যার সঙ্গে দেখা করতে

যেতে হবে। বলে সমীরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, আপনার কোন বান্ধবীকে নিয়ে যাবেন।

—বন্ধু-বান্ধবী বলতে যা বোঝায়, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কেউ হয়নি।

—বলেন কী! এত মিশুক মানুষ আপনি...। চিন্তা করবেন না, দেখতে দেখতে অনেক জুটবে। তখন আর আপনার নাগাল পাব না। আচ্ছা, এখন চলি।

—বিকেলে মায় সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আচ্ছা মীরা দেবী, আপনার মা-বাবা-ভাইবোন, কই এদের সম্পর্কে তো এতদিনে আমাকে কিছু বলেননি। এদের ছেড়ে আপনি একা রয়েছেন কেন?

মীরা মৃদু হেসে দু-এক পা অগ্রসর হয়। ঠোঁটে আঙুল রেখে ফিস্‌ফিস করে বলল, চুপ! দেয়ালেরও কান আছে। ধীরে, বন্ধু ধীরে!

তারপর সুইংডোর ঠেলে বাইরে। লিফটের খাঁচার ভিতর অন্যের স্পর্শ বাঁচিয়ে দাঁড়ানো। বুক শিরশির করে। রাস্তায় নরম রোদ। একটু জানতে পারলে মন্দ হোত না। অনেকদিন পর দুচোখ ভরে মানুষজন, যানবাহন, সুসজ্জিত দোকান; আজ অফিসে যাবার তাড়া নেই, ট্রামে বাদুড়ঝোলা মানুষ, দোতলা বাসের জানালায় কিশোরীর অপলক ডাগর চোখ, এসব দেখতে দেখতে মীরা হাঁটতে থাকে। হাঁটতে থাকে, হাঁটতে থাকে।

শুধু আমি, আর কেউ নয়। আমার পরিচয় কী সব নয়? তা নয় বংশ-পরিচয় জানা চাই। তারা সব কোথায়? পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হলেই অবধারিতভাবে মা-বাবা ভাই বোন ইত্যাদির প্রসঙ্গ উঠবেই। তুমি কেন একা থাক? বারবার শুনতে হয়, মিস্ মিত্র, মিস্ মিত্র মিস্ মিত্র! হঠাৎ কোনদিন চিৎকার করে বলে ফেলবে : থামুন! জানেন আমার পাঁচ বছরের একটা ছেলে আছে? তার নাম পল্টু। তার ভাল নাম প্রসেনজিৎ। সে এখন একটা সাহেবী স্কুলে পড়ে। ইত্যাদি।

হঠাৎ দূর থেকে মীরা দেখতে পেল ট্যাক্সী থেকে শোভন নামছে। ফিটফাট সুসজ্জিত পোশাক। সে তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে নিজেকে লুকোয়। শোভন লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তা পার হচ্ছে। হাতে একটা পেটমোটা ব্যাগ। রাস্তা পার হয়ে ডানদিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়েছে।

যাক মুখোমুখি দেখা হয়নি। দেখা হলে শোভন কী কথা বলত? নাকি পাশ কাটিয়ে না দেখার ভাণ করে চলে যেত? শোভন কী ফিরে গেছে তার দাদার কাছে? বৌদিকে জিজ্ঞেস করতে পারত। কী লাভ? বড় দুঃখ হয় কেউ আঘাত পেলে। সজ্ঞানে কাউকে সে আঘাত দিতে চায়নি। তবু অনেকে তার ওপর বিরক্ত। অনেকে তার ব্যবহারে মর্মাহত। মা তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন না। এতই ঘৃণ্য সে। কে জানে হঠাৎ দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে হাসিমুখে কথা বলবে কিনা। আশ্চর্য রজত! হঠাৎ ঝড়ের মত চলে আসে। আবোল-তাবোল কথা বলে। ডিভোর্স প্রসঙ্গে নানারকম আলোচনার পর জানায় টেলিফোন করবে। কোর্টে যাওয়ার কথা বলে। তারপর চলে যায়। এভাবেই দিন কাটছে। লাফিয়ে লাফিয়ে দিনগুলি পার হয়ে যাচ্ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বয়স বাড়ছে। আর সে নোঙরহীন জাহাজের মত ভেসে চলেছে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে।

চৌরাস্তার মোড়ে মীরা থমকে দাঁড়াল। কোনদিকে যাবে? সে ভাবতে থাকে ট্রামে উঠবে কিনা। একের পর এক বাস আসছে। থামছে না একটাও। তার দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। তার দুচোখ জ্বালা করতে থাকে।

॥ আটাশ ॥

একদিন স্কুল থেকে ফিরে শেফালী হাসতে হাসতে বললে, জান, আজ রজতদার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলুম। তোমরা কেউ রজতদাকে চেন না। ওকে দেখলে দুঃখ হয়। কথায় কথায় জানাল মীরার চাকরী নেই। মীরা আজকাল নতুন একটা ছেলের সঙ্গে ঘুরছে। জান, ওদের ডিভোর্স হবে। রজতদা চেষ্টা করছে।

বিনয় কোন জবাব দিল না। শেফালীকে কয়েক মুহূর্ত দেখল। শেফালী কী ওকে নিয়ে খেলা করছে? ও কি জানে না সে এসব অপছন্দ করে। কতদিন নিষেধ করেছে কিন্তু শেফালী ওর কথা একদম গ্রাহ্য করে না। বরং ও যা বলবে তার উল্টোটি করবে শেফালী। আজকাল এসব সংবেশুনেও সে চুপচাপ থাকে।

—কী ব্যাপার? শেফালী বাথরুম থেকে ইতিমধ্যে ঘুরে এসেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করতে থাকে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে বিছানায় শায়িত বিনয়কে দেখে। নীহার বাড়ি নেই। তিনি গেছেন পরকালের কাজ করতে। সেনদিদির সঙ্গে ভাগবত পাঠ শুনতে।

গালে স্নো ঘষতে ঘষতে শেফালী বলল, দিন দিন তুমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছ। অথচ রজতদাকে দ্যাখ; এত বয়স বোঝা যায় না। সব সময় হাসি মুখ। তাকে আমি কোনদিন রাগতে দেখলুম না। আমাকে কত খাতির যত্ন করল। যা লজ্জা করছিল। আর একটা কথা বলল...শুনে আমি তো হাসতে হাসতে...। হঠাৎ থেমে যায় সে।

বিনয়ের দুচোখ দপ করে জ্বলে ওঠে। সে আর সহ্য করতে পারছে না। চুপ কর শেফালী। গলা দিয়ে কোনরকম আওয়াজ বেরোল না। সে বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে রইল শেফালীর দিকে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে শেফালী বিনয়ের কপালে হাত রে[illegible] গরম মনে হচ্ছে না তো। তোমার কী শরীর খারাপ?

বিনয় মাথা নাড়ল, এক কাপ কফি দেবে শেফালী। তোমার বাবা কেমন আছেন? বলে সে বালিশের তলা থেকে সিগারেট কেস বের করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে শেফালীর প্রসাধিত মুখ দেখতে থাকে। কে বেশী সুন্দরী? শেফালী না তানিয়া?

—আমার বাবা কী তোমার কেউ নন? কই একদিনও তো গিয়ে তাঁকে দেখলে না! অথচ গেলেই তোমার কথা শুধু জিজ্ঞেস করেন তাঁরা। দুনিয়ার সব কাজ করতে পার অথচ আমার মা বাবাকে একবারটি গিয়ে যে দেখবে, সে সময় পাও না। না না! পাশ ফিরে শুয়ো না। জানি, এসব শুনতে তোমার ভাল লাগছে না।

বলতে বলতে শেফালী দুম করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বিনয় ভাবল এই ফাঁকে পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয়। কেননা একটু পরে শেফালী ফিরে আসবে। তখন আবার সুরু হবে নানারকম অভিযোগ। শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত হয়ে উঠবে। বারবার তাকাবে শেফালীর দিকে। ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপবে মাঝে মাঝে। বলতে চাইবে, অনেক হয়েছে শেফালী। এবার রেহাই দাও। চুপটি করে থাক। গান শোন। গান শুনলে মন উদার হবে। যদি গান শুনতে ইচ্ছে না হয়, তবে সেতার শুনতে পার। সেতার শুনতে শুনতে দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসবে। আর যদি সেতার শুনতে না চাও তবে বই পড়তে পার। কতরকমের বই ম্যাগাজিন রয়েছে ঘরে। তুমি তো সাহিত্যের ছাত্রী ছিলে। আজকাল তো দেখি না বইটই নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে।

—একটু উঠে বস। শেফালী কফির কাপ এগিয়ে দেয়, স্কুল থেকে ফিরে সেই যে শুয়েছ, আর ওঠবার নামটি নেই। আজকাল পড়াশুনা করতে দেখি না। দিনরাত শুয়ে শুয়ে কী যে তুমি ভাব। শোন, একটা কথা বলব, রাগ কর না। তুমি সকালের টিউশানীটা ছেড়ে দাও। দিনদিন তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ। আয়নার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ...ভারী তো পঞ্চাশ টাকার একটা টিউশানী!

একটু শব্দ করে কফির কাপে চুমুক দিল বিনয়। তারপর মৃদু হাসল। তার শরীর খারাপ হবে ভেবে শেফালীর যেন রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। আসল ব্যাপারটা কী বল তো শেফালী? টিউশানীটি নেওয়ার পর থেকে বারবার এক কথা...অথচ মনে করে দ্যাখ, কিছুদিন আগে তুমিই আর একটা টিউশানী নেওয়ার জন্যে...এখন মনে করিয়ে দিলে অযথা কলহ আর চিৎকার...... আর ভাল লাগে না, তার চেয়ে চুপচাপ, নিরীহ হয়ে বেঁচে থাকা, অনেকটা নির্বোধের মত জীবনযাপন...।

—হাসছো কেন? হাত বাড়িয়ে শেফালী কাপ নেয়, ওরকম হাসি ভাল লাগে না। মিনমিন করে হাসি। হাসলে যেন শব্দ হয়। যেমন রজতদার হাসি।

(ক্রমশ)

CENTRAL LIBRARY

ইনি সুচিত্রা দেবী

পাকা গিন্নী—দুই ছেলের মা
ঘুমপাড়ানী গল্পের ঝুড়ি

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

বারো মাস তিরিশ দিনই সুচিত্রা ব্যস্ত—সারাদিন তার কাজ লেগেই আছে। সে বলে, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব ঝক্কিই সামলানো যায়।

তাইতো সুচিত্রা হরলিক্সের ওপর অতটা নির্ভর করে। হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্সের পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন সুচিত্রাকে সারাদিন উজ্জ্বল আর উৎসাহ যোগায়।

হরলিক্স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এত গুণ। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি এবং বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

মনের কথা

যোগ্যতমের উদ্বর্তন
দীপঙ্করের স্বপ্নদর্শন

দীপঙ্কর আমার অতিপরিচিত এক ভদ্রলোকের প্রথম সন্তান। বয়স পঁচিশ, অবিবাহিত, বেকার। লম্বা বলশালী চেহারা। চোখ দুটো গর্তে ঢোকা, কিন্তু দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। কথা বলছিল আমার চোখে চোখ রেখে। কথা বলার ভঙ্গী নাটকীয়। কথাগুলোর মধ্যে চমক লাগাবার চেষ্টা। কিন্তু কথাগুলোও পুরনো ও ধারকরা। মৌলিকত্বের অভাব।

টিঁকে থাকার লড়াই আর যোগ্যতমের উদ্বর্তন, এই নিয়েই জীবন। শুধু ইতর প্রাণী নয়, মানুষের মধ্যেও এই প্রবণতা সুস্পষ্ট। আপনারা যতই চেষ্টা করুন না কেন, এই সত্যকে কিছুতেই গোপন করতে পারবেন না। আমরা বেঁচে থাকতে চাই, বড় হতে চাই। প্রত্যেকে অপরকে ছাপিয়ে যেতে চাই। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর আধিপত্য চায়, একদল অন্য দলকে দাবিয়ে রাখতে চায়, এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব করতে চায়। এই আধিপত্য-লালসা আমাদের রক্তের মধ্যে, আমাদের মজ্জার মধ্যে। বড় হবার প্রতিযোগিতা নিয়ে জীবনের আরম্ভ; বড় হবার আশা বুকে নিয়ে জীবনের শেষ।

সাতটি ভাইবোনের মধ্যে দীপঙ্কর জ্যেষ্ঠ। সর্বকনিষ্ঠ এখনও চার পেরোই নি। প্রতি তিন বছর অন্তর প্রায় নিয়মিত-ভাবে পিতা বংশবৃদ্ধি করে চলেছেন। এই প্রথম বোধ হয় ছেদ পড়েছে। দীপঙ্করের পিতা কোলকাতার একখানা বাড়ীর মালিক, ব্যাঙ্কে কাজ করেন, বয়স প্রায় বাহান্ন। মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা। তবে তিনি পুরাতনপন্থী, ছেলেদের হাতে পয়সাকড়ি দিতে চান না, তাতেই দীপঙ্করের বিশেষ অসুবিধা। সিনেমা ও সিগারেটের জন্যে ছোটবোনের কাছে হাত পাততে হয়। দীপঙ্কর বছর তিনেক ধরে অনেক চেষ্টা করেও কোনো চাকরী জোগাড় করতে পারেনি। পাশ কোর্সে বি-এ পাশ করেছে চার বছর আগে। ছোট বোন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী। বাড়ীতে তার সম্মান প্রতিপত্তি তাই দীপঙ্করের থেকে বেশি। মাই, দীপঙ্করের মতে, বাড়ীর আসল কর্ত্রী। বাবার মুখ দিয়ে যে-সব আদেশ বের হয় সেগুলো আসলে মায়ের ইচ্ছানিচ্ছার প্রতিধ্বনি। মা নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নেড়ে চলেছেন, বাবা সেই মত চলছেন। মায়ের প্রম্পটিং ছাড়া বাবার একটি কথাও গুছিয়ে বলার শক্তি বা অধিকার নেই। মা ছোটো বোনকে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছেন। বোন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পাশ করেছে। অনার্স না থাকা সত্ত্বেও এ্যান্‌থ্রপলজিতে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হতে পেরেছে। মায়ের পরামর্শে বাবা দীপঙ্করকে সায়েন্স পড়তে না দেওয়ার জন্যেই দীপঙ্করের এই অবস্থা। সায়েন্সেই তার টেস্ট, সায়েন্স পড়লে সে অনেক ভাল ফল করতো। অনার্স না পেলেও, অন্তত ডিসটিংশন পেয়ে বটানি, অ্যান্‌থ্রপলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হতে পেরেছে। মায়ের পরামর্শে বাবা দীপঙ্করকে সায়েন্স পড়তে না দেওয়ার জন্যেই দীপঙ্করের এই অবস্থা। সায়েন্সেই তার টেস্ট, সায়েন্স পড়লে সে অনেক ভাল ফল করতো। অনার্স না পেলেও, অন্তত ডিসটিংশন পেয়ে বটানি, অ্যানথ্রপলজিতে এম-এস-সি পড়তে পারতো। ওঁদের আসল মতলব ছিল, কমার্স পড়িয়ে দীপঙ্করকে ব্যাঙ্কের কেরাণী তৈরী করা। কমার্স পড়া নিয়েই তার প্রথম বিদ্রোহ। প্রায় দশ বছর আগের কথা। বাবা অফিসে চলে গেলে দীপঙ্কর সেদিন মারমুখী হয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, কাপডিশ ভেঙেছিল, ছোট বোনের বইখাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিল, মগ ছুঁড়ে মাকে আঘাত করেছিল। তার সেই মূর্তি দেখে মা ভীষণ ভয় পেয়ে শোবার ঘরের দরোজা বন্ধ করে বাবাকে ফোন করেছিলেন। ছোট ভাইবোনেরা ভয়ে থর থর করে কেঁপেছিল। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হয়েছিল। কমার্স পড়তে হয়নি, হিউম্যানিটিজ নিয়ে সে পাশ করেছিল। তার স্কুলে বায়োলজী নেবার ব্যবস্থা ছিল না, জেনারেল সায়েন্স ও হেডমাস্টার তাকে নিতে চান নি, কেননা অঙ্কে কোনোদিনই সে ভাল নম্বর পায় নি। বি-এ পাশ করার পর দুবার সে ব্যাঙ্কের চাকরীর জন্যে পরীক্ষা দিয়েছে; দুবারই ফেল করেছে। সে বলে, ইচ্ছে করেই সে ফেল করেছে। কেরাণীগিরি সে কোনোদিনই করবে না। আর করবে না ইস্কুলমাস্টারী। চাকরী যদি করতেই হয়, তবে সে সেলসম্যানের চাকরী করবে। সেলসম্যানশিপে তার প্রতিভার সম্যক বিকাশ হতে পারে। সে 'হাই-প্রেসার' সেলসম্যানশিপে বিশ্বাসী। ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে প্রতিপক্ষকে কাবু করবে, অনিচ্ছুক ক্রেতাকে তার কোম্পানীর জিনিষ কিনতে বাধ্য করবে। প্রতিযোগী কোম্পানী-গুলোকে পরাভূত করবে, নিজের কোম্পানীর অন্যান্য সেলসম্যানদের ডিঙিয়ে যাবে। অন্যকে হারিয়ে দেবার মধ্যেই জীবনের আনন্দ, অন্যকে নিজের আওতায় নিয়ে আসতে পারাই জীবনের জয়। সেলসম্যানের চাকরী খালি যেখানে দেখেছে, সেখানেই সে দরখাস্ত করেছে। বেশির ভাগ জায়গাতে ইন্টারভিউ পায় নি; যা দুচার জায়গায় ইন্টারভিউ পেয়েছে, সেখানেও সে নিজেকে ঠিকমত জাহির করতে পারে নি। ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে সে নার্ভাস হয়ে পড়েছে। হাত

ফেলেছে, গা পেতেছে, প্রশ্ন শুনতে পায় নি; শুনতে পেলেও ঠিকমত বুঝতে পারে নি। প্রশ্নকর্তাকে খারেজ করতে গিয়ে নিজেই নাজেহাল হয়েছে। চাপা রাগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আসবার সময় দু'একবার টেবিল থেকে পেপারওয়েট তুলে নিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে ট্রাউজারের পকেটে পুরেছে। বাড়ী ফিরে মেজাজ দেখিয়েছে। নতুন দরখাস্ত লিখতে গিয়ে নিজের কলমের নিব ভেঙে কালী ফেলে, চেঁচে করে সবাইকে উত্যক্ত করে তুলেছে। এরপর দু'তিনদিন বিছানায় শুয়ে কেবল অবাধ যৌনচিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। বীর্যপাত ঘটার ফলে আরো ক্ষয় পেয়েছে, আরো ক্ষুব্ধ হয়েছে, আরো মেজাজ দেখিয়েছে।

তব এই বদমেজাজ ও খেয়ালীপনা (টেম্পার ট্যানট্রাম) নিয়ে তার বাবা আমার সঙ্গে অনেক দিন ধরেই আলোচনা করেছেন। তবে এতদিন এটাকে খুব বেশী গুরুত্ব দেন নি। আজকাল রাগের মাথায় সে মাঝে মাঝে হিংসুক আচরণ করছেও দু'একবার দেয়ালে মাথা ঠুকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে বলেই তিনি চিকিৎসার দরকার মনে করে আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। ভদ্রলোক পুত্রের আচরণ ব্যবহার সম্পর্কে খুব বেশী উদ্বিগ্ন নন। তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও যে খুব একটা চিন্তা করেন, তাও মনে হয় না। ফিটফাট সোপদুরস্ত পোশাক পরা নিস্পৃহ গোছের এই লোকটিকে আমি কোনোদিন কোনো ব্যাপারে বিশেষ উৎকণ্ঠিত বা উত্তেজিত হতে দেখিনি। আত্মচিন্তাতেই মগ্ন। ঠিক ইনসাইড দিয়েও নয়ন তাঁকে আমার সবারই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মনে হয়েছে। ওর মাকেও আমি জানি। সাতটি সন্তানের জননী বলে মনে হয় না।

স্বামী স্ত্রী দু'জনেরই চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে নি; ও'র প্রসাধন আর্সি ও তরুণী সাজবার প্রয়াস থেকে বোঝা যায় মাতৃত্ব ও'র কাম্য নয়। যেন প্রবৃত্তির জেরে বা সতর্কতার অভাবে অতগুলো সন্তানের জননী হয়ে পড়েছেন। দ্বিতীয় সন্তান, কন্যাটির উপর ছাড়া আর কারুর উপর ও'র খুব বেশি নজর আছে মনে হয় না। বাচ্চাগুলোকে ঝি-চাকরের হাতে সমর্পণ করে কর্তাগিন্নী প্রায়ই সিনেমা থিয়েটার দেখে বেড়ান। এক বছর বয়স হতে না হতেই প্রতিটি বাচ্চা সরে মায়ের শয্যা থেকে ঝিয়ের শয্যায় আশ্রয় পেয়ে এসেছে। অনেক ব্যাপারে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি কোনো ব্যাপারে। খাওয়া দাওয়া চলাফেরা সব ব্যাপারে মায়ের নির্দেশ মেনে চলতে ওরা অভ্যস্ত।

এই সব পারিবারিক তথ্য দীপঙ্করের পিতা আমাকে সরবরাহ করেছেন; দীপঙ্কর গুণাগুলোর, ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে দিয়েছে ও নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে পিতামাতার বহির্মুখী আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার নির্মম সমালোচনা করেছে।

রোগী হিসেবে দীপঙ্কর কয়েকদিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে শুরু করলো। অতি সহজ ও সরল ভাষায় নিজের মনের কথা প্রকাশ করলো। পিতামাতা সম্পর্কে তার বিরূপ মনোভাব জানাতে এতটুকুও লজ্জা পেল না। সে 'নার্সিসিসম' জয় করতে চায়। হাত, কাঁপা ও পা কাঁপার জন্যে তার ইণ্টারভিউ দিতে ভয় হচ্ছে। এই ভয় থেকে সে মুক্ত হতে চায়। কোনো দলে মিশে সে কাজ করতে পারে না, দু'চারদিনের মধ্যেই তার মনে হয় দলের অন্য ছেলেরা ওর উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। অন্যে তার সহজাত কর্তৃত্বাভিলাসকে স্বীকার করতে চায় না, তাকে দলপতির পদে নির্বাচিত করতে বাধা দিয়ে থাকে। কতবার ইউনিয়নে এইরকম ঘটেছে, পাড়ার একটা ক্লাবে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি করে সে ইউনিয়ন ছেড়েছে, ক্লাব ইউনিয়নের ব্যাপারে একটি মেয়ে জড়িত ছিল। দীপঙ্করের ধারণা মেয়েটি তার প্রতিই আকৃষ্ট বলে তার বন্ধু ঈর্ষান্বিত হয়ে সব গণ্ডগোল করেছে। কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে মিশেছে। তারা প্রত্যেকেই ওর ব্যক্তিত্ব, ওর সংগঠনক্ষমতা, ওর বাগ্মিতার জন্যে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দিতে চায় নি। অথচ ও জানে, তারা অন্য ছেলের সঙ্গে সিনেমায় যায়, রেস্টুরেন্টে যায়, গঙ্গার ধারে বেড়ায়। তাই সব বন্ধুদের বিরুদ্ধে ওর আক্রোশ সব কিছুর প্রতি ওর বিতৃষ্ণা। চাকরীর চেষ্টা করতে গিয়ে ওর এই আক্রোশ আরো বাড়ছে। বন্ধুদের প্রায় চাকরী হয়েছে, ও-ই বেকার বসে গেছে। বাবা মনে করছেন সে সত্যি চাকরীর চেষ্টা করছে না, তাই বাড়ীতে তার অনাদর ক্রমশ বাড়ছে। বাবার এতদূর ধৃষ্টতা যে তিনি কয়েকদিন আগে ওকে বেয়ারার চাকরী নিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়তে বলেছিলেন, সুবিধামত কেরাণীর পদে প্রমোশনের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেদিন আমার ওর জিত হয়, বাবা আর পীড়াপীড়ি করতে সাহস পান নি। এই সময় দীপঙ্কর ওর একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমার কাছে বিবৃত করলো।

আমি একটা ট্যাঙ্কের ওপর উঠে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে আস্ফালন করছি। আমার সামনে অনেক মানুষ প্রাণভয়ে ছুটেছে। ট্যাঙ্ক থেকে মুহুর্মুহু কামান গর্জন হচ্ছে। সামনের শত্রু পরাজয়ী হচ্ছে। ট্যাঙ্ক আমাকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটা সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকলো। সেখানে বাঘের খেলা দেখানো হচ্ছিল। আমি গিয়ে রিং থেকে বাঘগুলোকে বের করে দিলাম। দর্শকরা আর্তনাদ করতে লাগলো। সকলে পালাবার চেষ্টা করছে। তাঁবুর বাইরে যাবার দরজায় আমি খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আমার ভয়ে লোক-গুলো বাইরে যেতে পারছে না। তাঁবুতে আগুন লাগলো। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বীথি (ইউনিয়নের সেই মেয়েটি) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করছে। ওর খোঁপা খুলে গেছে। আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে, ভয়ে উত্তেজনায় ওর বুক ওঠানামা করছে। আমি চুল ধরে ওকে ট্যাঙ্কে তুলতে গেলাম, বাধা দিল সন্তোষ। (আমার যে বন্ধু বীথির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো, তার নাম সন্তোষ) তলোয়ারের এক আঘাতে সন্তোষের মাথাটা কাঁধ থেকে নেমে গেল। বীথিকে এবার পুরোপুরি আয়ত্তে পেলাম। আমার বুকের মধ্যে বীথিকে আশ্রয় দিলাম। ওর নরম বুকের ধুকধুকানি আমার সারা দেহে শিহরণ জাগালো। ডান হাতে তলোয়ার, বাঁ হাতে বীথির অর্ধনগ্ন দেহ নিয়ে আমি ঘোড়ায় চড়ে ছুটছি। ট্যাঙ্ক কোথায়? তাঁবু কোথায়? আমার পেছনে একটা বাঘ তাড়া করেছে; বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছি। বাঘটার মুখ মানুষের মত। সন্তোষই বাঘ হয়ে আমাকে তাড়া করেছে। ঘোড়া থামিয়ে সন্তোষের সঙ্গে লড়াই করব বলে ঠিক করেছি; এমনি সময় দেখি বাঘ নেই, সন্তোষ নেই, হাজার হাজার লোক আমাকে মারবার জন্য এগিয়ে আসছে। আমাকে চারদিক থেকে ওরা ঘিরে ফেলেছে। ওদের চোখে মুখে ঘৃণা আর ক্রোধ। ঘোড়া থেকে নেমে বীথিকে রাস্তার উপর ফেলে ওর গলা টিপে

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট : ২ লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
৩৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

ধরলাম। ওর জিভ বেরিয়ে এল। চারদিকের লোকগুলো দাঁড়িয়ে পড়লো। তাদের মুখে-চোখে এখন আর ঘৃণা কিম্বা ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। সকলেই যেন বিস্মিত। বীথির চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসাতে আমি ভয় পেয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। লোকগুলোর দিকে তাকালাম। তারা সবাই সবিস্ময়ে আমাকে দেখছে। ওরা অমন করে তাকাচ্ছে কেন? বিস্মিত হবার কি আছে? ওদের ক্রোধ বা ঘৃণার আমি যতটা ঘাবড়ে যাইনি, যতটা ঘাবড়ে গেলাম ওদের অবাক বিস্মিত দৃষ্টি দেখে। আমার ভয় বাড়লো, হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো, সারা গা দিয়ে গলগল করে ঘাম ছুটলো। ঘুম ভাঙতে দেখি ভোর হয়েছে। সত্যিই ঘামে বিছানা ভিজে গেছে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো দীপঙ্কর। স্বপ্নবিশ্লেষণে চিকিৎসার কোনো বিশেষ সুবিধা হয় না, আমি বললাম। দীপঙ্করের ধর্ষকামী (স্যাডিস্ট) চরিত্রের আভাস স্বপ্নটিতে ফুটে উঠেছে, একথা তাকে জানালাম। 'স্যাডিস্ট' কথাটির সংগে দীপঙ্কর পরিচিত ছিলো, কাজেই আমার কথা শুনে খুসী হলো না। সে প্রতিপন্ন করতে চায় যে সে কর্তৃত্বাভিলাসী এবং কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা তার আছে। তবে সে স্যাডিস্ট নয়, ডিক্টেটরও নয়। স্যাডিস্ট ডিকটেটর, একথাগুলো বার বার ঘৃণাসূচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে, এদের জৌলুষ চলে গেছে। দীপঙ্কর নিজেকে 'অথরিটেরিয়ান পার্সোনালিটি' বলে জাহির করতে চায়, এ সম্পর্কিত আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিকদের লেখার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। অনেক রকমের পার্সোনালিটি টেস্ট, অনেক তথ্য 'জেনেটিক এ্যাসপেক্টস' ইত্যাদি নিয়ে বহু আলোচনা চালালো। মনে মনে সে যে হিটলার, মুসোলিনীর ভক্ত, একথাও বলে ফেললো। তার ট্যাঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে জয়যাত্রার স্বপ্নচিত্রে মুসোলিনীর কোনো ছবির ছায়া পড়েছে বলাতে, সে একটু চমকে উঠলো। ছোটবেলা থেকে সে মা-বাবার স্নেহ চেয়েছে, পায় নি। অন্য অনেক কিছু ছোটোখাটো প্রাপ্যের জন্যে কান্নাকাটি করতে হয়েছে, রাগ প্রকাশ করতে হয়েছে। কান্নাকাটি করে মাবাবার করুণা উদ্রেক করতে পারে নি। বরং যেদিন থেকে বদমেজাজ বা টেম্পার ট্যানট্রাম দেখিয়েছে, সেইদিন থেকে প্রাপ্য আদায় করতে পেরেছে। সমবয়সীদের তুলনায় দেহের শক্তি তার বেশী ছিল, দৈহিক শক্তির প্রয়োগ করে অনেক সময় শৈশবে অভীষ্ট বস্তুলাভ করেছে। ছোট বোনের তুলনায় নিজেকে অসহায় মনে হয়েছে অনাদৃত বোধ করে বিক্ষুব্ধ হয়েছে। সেই বিক্ষোভ উত্তরকালে সতীর্থ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ পেয়েছে। বারবার কাছে দৈহিক শক্তির পেতে হয়েছে, তখন মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বড় হয়ে শক্তিশালী হয়ে সুদে আসলে এ ঋণ শোধ করবে। পুঞ্জীভূত ক্রোধ বুকে চেপে বড় হয়ে উঠেছে দীপঙ্কর। মায়ের বিরুদ্ধে, বাপের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ঘৃণা, ছোট ভাইবোনদের প্রতি বিদ্বেষের, আগুনে ক্রমশ তার মনের সব সুকুমার বৃত্তিগুলো ঝলসে গেছে। তারপর ছাত্রজীবনে কোনো কিছুতে সাফল্য লাভ করতে পারে নি।

নিজেকে আর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কল্পনা করে নিজের হীনমন্যতা ঢাকতে চেয়েছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন কিছু দেখাতে পারেনি। নিজেকে উঁচু মনে করার মতন উল্লেখ্য কোনো কিছু সে কোনোদিন ক্লাশে বা খেলার মাঠে সম্পাদন করেনি। এর ফলে নিরন্তর নিজের উপর ঘৃণা জমেছে, সেই ঘৃণা সে অন্যের উপর প্রক্ষেপ করেছে। যে স্বপ্নের বিবরণ আমাকে দিয়েছে, সেই স্বপ্ন অনেকবার দেখেছে। রাত ও দিনে এই ধরনের দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখে আত্মতুষ্টি করতে চেয়েছে। মায়ের স্নেহ-ভালবাসা না পাওয়ার দরুণ কৈশোরের যৌনচেতনা অস্বাভাবিক পথে তৃপ্তি খুঁজেছে, জৈবপ্রবৃত্তি উচ্চমস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ রহিত হবে উন্মার্গগামীতায় পর্যবসিত হয়েছে। বান্ধবী ও পরিচিতাদের সঙ্গে ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে। যার জন্যে তারা ওর সঙ্গ পরিহার করে চলেছে। ওর ক্রোধ আরো বেড়েছে, ঘৃণা আরো বেড়েছে। প্রেম-ইচ্ছার পরিবর্তে যৌন লালসা ধর্ষকামে রূপান্তরিত হয়েছে। খোলা তলোয়ার হাতে ট্যাঙ্কে চড়ে প্রতিযোগীদের উপর দিয়ে সেই ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়ে কল্পনায় বা স্বপ্নে নিজের অভিলাষ পূরণ করতে চেয়েছে। কিন্তু অভীষ্ট লাভ হয়নি। বিজয়লক্ষ্মী (বীথি) স্বেচ্ছায় জয়মালা দিতে চায়নি। তাই নিজের অভীষ্ট বিরুদ্ধে, নিজের কামনায় যদি বীথিকে গলা টিপে হত্যা করেছে। বীথিকে হত্যা করবার আর এক কারণ অনুসরণকারীদের ভয়। নিজের অর্জিত ফলকে বিনষ্ট করে অনুসরণকারী বা অন্যান্য প্রতিযোগীদের ক্রোধ এড়াতে চায়। আবার অর্জিত ফল বিনষ্ট করে তাদেরও বঞ্চিত করতে চায়। তারা বিস্মিত। কিন্তু বিস্ময়ও সহ্য করতে পারে না দীপঙ্কর। বিস্ময় ধিক্কারের মত তাকে বিচলিত করেছে।

দীপঙ্করের ভয়ের ও ক্রোধের মূলে তার তীব্র ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা স্পৃহা। প্রতিযোগিতায় সকলকে হটিয়ে ও চায় বাবা-মায়ের স্নেহ ভালবাসা, ক্লাসে খেলার মাঠে সতীর্থদের অকুণ্ঠ প্রশংসা, বীথিদের শ্রদ্ধা-বিগলিত আত্মসমর্পণ। অন্যকে হটাতে চায়, হারাতে চায়, তাই মনে মনে অন্যের সম্পর্কে এত ভয়, এত অবিশ্বাস।

তার মনের ইচ্ছা বাসনাগুলো তার অজানা ছিল না। আমি সেগুলোকে তার সামনে শুধু আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরলাম। বিচ্ছিন্নভাবে আবেগ অনুভূতিগুলো তাকে তাড়িত করছিলো, আমি কার্য কারণ সম্পর্ক দেখিয়ে দিয়ে এগুলো সম্পর্কে তাকে সজাগ করলাম। ডারুইন হাক্সলী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে টিঁকে থাকার লড়াই আর যোগ্যতমের উদ্বর্তন সম্পর্কিত তার একপেশে ধারণার নিরসন ঘটালাম। স্বপ্নের সরল ব্যাখ্যা দিয়ে তার মনের মর্যাদিত প্রবৃত্তিগুলো সম্পর্কে তাকে অবহিত করে দিলাম। প্রবৃত্তির তাড়না নিয়েও অনেক আলোচনা চালালাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 'টেম্পার ট্যানট্রাম' বন্ধ হল। গ্রুপ-অ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে তার কিছুটা শ্রদ্ধা জন্মালো। মা-বাবা সম্পর্কে শ্রদ্ধা এলো না বটে, কিন্তু বিরূপ ভাব কমলো। কয়েকমাস পরে, একটা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের চাকরী নিয়ে ও আমাকে অবাক করে দিলো।

—মনোবিদ্

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানের কথা

কৃত্রিম খাদ্য সম্পর্কে

কৃত্রিম রঙ, কৃত্রিম তন্তু, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম চামড়া, কৃত্রিম ভেষজ — এসব এখন আর নতুন জিনিস নয়, মানুষের হাতেই তৈরী হচ্ছে, ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। অথচ কিছুকাল আগেও এসব জিনিসের জন্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ভাণ্ডারের ওপরেই নির্ভর করতে হত। আজকাল দুই-ই পাশাপাশি চলছে, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। এমন ব্যাপারও লক্ষ করা যাচ্ছে—কদর বেশী স্বাভাবিকের চেয়ে কৃত্রিমের। যেমন, কৃত্রিম তন্তুর। স্বাভাবিক সুতীর কাপড়ের ব্যবহার কমছে, কৃত্রিম তন্তুর টেরিলিনের ব্যবহার বাড়ছে। রঙ আজকাল আমরা যা ব্যবহার করি তা প্রায় সবই কৃত্রিম। আমাদের দেশের নীলচাষের কথা সবাই জানেন। সে-সময়ে নীলের জন্যে পুরোপুরিভাবে নির্ভর করতে হত চাষের ওপরে। কৃত্রিম নীল হাতে আসার পরে এখন নীলচাষের পাটই প্রায় উঠে গেছে। রবারের বেলায় চাষ যদিও কমে নি কিন্তু কৃত্রিম রবারের ব্যবহার বেড়ে চলার দিকে। যেমন, কৃত্রিম রবারের জুতো আজকাল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে হরেক রকমের আর প্রায় সব মানুষের পায়েই তা উঠেছে। ইলেকট্রিক তারে স্বাভাবিক রবারের ব্যবহার এখন আর নেই বললেই চলে। কৃত্রিম চামড়ার বেলাতেও একই কথা। স্বাভাবিক চামড়ার স্থান এখন অনেকখানিই কৃত্রিম চামড়ার দখলে। আর কৃত্রিম ভেষজ তো আমাদের জীবনধারণেরই অঙ্গ। আমাদের আয়ু যে বাড়ছে আমরা যে অধিকাংশ রোগ জয় করেছি, আমরা যে দীর্ঘকাল সুস্থ থাকতে পারি তা অনেকাংশে এই কৃত্রিম ভেষজের কল্যাণে।

যাই হোক, আসল কথাটা এই যে, রঙ তন্তু, রবার, চামড়া ও ভেষজ এখন পাওয়া যাচ্ছে প্রকৃতির ভাণ্ডারের স্বাভাবিক রূপে শুধু নয়, মানুষের হাতে তৈরী স্বাভাবিক রূপেও। আর মানুষ যে এই পদার্থগুলো তৈরী করেছে তা নিতান্ত খামখেয়ালের বশে নয়, যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে স্বাভাবিক বিপর্যয়ের ঘাটতিকে পূরণ করবার জন্যে। আর তৈরি হবার পরে দেখা যাচ্ছে কৃত্রিম পদার্থগুলো স্বাভাবিক পদার্থের চেয়ে গুণমানে কোন অংশেই ন্যূন নয়। উপরন্তু দামে সস্তা এবং মনোহারিত্ব যেখানে গুণ হিসেবে ধর্তব্য, সেখানে উঁচুদরের। ফলে ব্যবহারও বাড়ছে।

ওপরে কৃত্রিম পদার্থের যে তালিকাটি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কোনো খাদ্যদ্রব্য নেই। খাদ্যদ্রব্যের জন্যে এখনো আমরা পুরোপুরিভাবেই প্রকৃতির ভাণ্ডারের ওপরে নির্ভরশীল। অথচ বিশ্বের অনেক দেশেই, যে-কোনো কারণে হোক, খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে—বিশেষ করে প্রোটিনের। কথা উঠতে পারে, বিজ্ঞানীরা কি কৃত্রিম খাদ্য তৈরি করতে পারেন না? বিশেষ করে, কৃত্রিম প্রোটিন? এই বিষয়টি নিয়েই এ সপ্তাহের বিজ্ঞানের কথায় আলোচনা তুলতে চাই।

বিজ্ঞানীরা রকেট ছুটিয়েছেন, চাঁদের মাটিতে মানুষ নামিয়েছেন, চাঁদের মাটিতে স্বয়ংচালিত লুনোখোদ পাঠিয়েছেন, পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে জেনারেটর ও জাহাজ চালিয়েছেন, ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে নিমেষের মধ্যে জটিলতম হিসেব সমাধা করেছেন—কিন্তু আজ পর্যন্ত পরীক্ষাগারে একবিন্দু প্রাণ সৃষ্টি করতে পেরেছেন কি? না, পারেন নি—একথা বললে পুরো জবাব দেওয়া হয় না। পারেন নি ঠিকই, কিন্তু পারার দিকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন। সকলেই জানেন, নোবেল-পুরস্কার-বিজয়ী ডঃ খোরানার আবিষ্কার এই সম্ভাবনাকেই বাস্তব করে তুলেছে। প্রাণের কথা ছেড়ে দিলেও এমন আরো অনেক কৃত্রিম সৃষ্টি বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে হয়েছে যার কৃতিত্ব সত্যিকারের প্রাণ সৃষ্টি করার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিই। মানুষের শরীরের প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নামে এক ধরনের রস নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই ইনসুলিন ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসার জন্যে দরকার হয়। চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় এই ইনসুলিন সংগ্রহ করা হয় অন্য জন্তুর শরীর থেকে। অনুমান করা চলে, এ অবস্থায় কৃত্রিম ইনসুলিন তৈরি করার জন্যে বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে একটা চেষ্টা থাকবেই। কিছুকাল আগে চীনা বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন, তাঁদের পরীক্ষাগারে কৃত্রিম ইনসুলিন তৈরি হয়েছে। চীনা বিজ্ঞানীদের এই সাফল্য এতই চমকপ্রদ যে, একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী সে-সময়ে চীনে যাবার অনুমতি চেয়েছিলেন ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে আসার জন্যে।

চীনা বিজ্ঞানীদের এই দাবি বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে যদিও এখনো স্বীকৃত নয়, কিন্তু ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কিছু নয়। কৃত্রিম ইনসুলিন তৈরি হতেই, বিজ্ঞানের প্রস্তুতির দিক থেকে এখনো কোনো অসম্পূর্ণতা ছিল না।

এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে, কৃত্রিম ইনসুলিন যদি তৈরি হতে পারে, কৃত্রিম খাদ্য বা কৃত্রিম প্রোটিন তৈরি হতে তাহলে বাধা কোথায়? বিজ্ঞানীরা বলেন, বাধা নেই, এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। আর কৃত্রিম ইনসুলিন তৈরির চেয়েও বিষয়টি আরো জরুরি এ কারণে যে, কৃত্রিম খাদ্য বিশ্বের অনেক দেশে খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

'কৃত্রিম খাদ্য'—কথাটা বিজ্ঞানীরা যে অর্থে বলছেন তা আগে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। আজকাল এক ধরনের খাদ্য থেকে অন্য ধরনের খাদ্য তৈরি হচ্ছে—যেমন, বিজ্ঞানের কথাতেই আমরা আলোচনা করেছি, জাপানী বিজ্ঞানীরা সয়াবীন থেকে তৈরি করেছেন কৃত্রিম মাংস—কৃত্রিম খাদ্য এ-অর্থে নয়। পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক রূপান্তর ঘটিয়ে তৈরি করা খাদ্যকেই আমরা বলব কৃত্রিম খাদ্য। জাপানী বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম মাংস তৈরি করেছেন সয়াবীন থেকে, কিন্তু সয়াবীন নিজেই একটি খাদ্য, কাজেই এ ক্ষেত্রে খাদ্যেরই রূপান্তর ঘটেছে, কৃত্রিম খাদ্য তৈরি হচ্ছে না। বড়ো জোর বলা যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রান্না করা খাদ্য। যাকে বলা হয় 'এক-কোষী প্রোটিন' তাও আজকাল নানা নামে বাজারে বেশ চলছে। এটি তৈরি হওয়ার মূল উপকরণ তেল বা খনিজ পেট্রোলিয়াম। এই এক-কোষী প্রোটিনও কিন্তু কৃত্রিম খাদ্য নয়, কেননা এগুলো তৈরি করে নেওয়া হয় ঈস্ট বা জীবাণুর শরীর থেকে, যে ঈস্ট বা জীবাণুর খাদ্য হচ্ছে পেট্রোলিয়াম।

আগেই বলেছি, সঠিক অর্থে কৃত্রিম খাদ্য এখনো তৈরি হয়নি। তবে তৈরি হতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে, কৃত্রিম খাদ্য না হলেও কৃত্রিম খাদ্যের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তার মধ্যে পড়ে ভিটামিনের লম্বা একটি তালিকা, ভিটামিন-এ থিয়ামিন রিবো-ফ্লাভিন, নিয়াসিন (ভিটামিন-বি), ভিটামিন-

CENTRAL LIBRARY

সি, ভিটামিন-ডি ও আরো অনেক কিছু। মাখনের বদলে মার্গারিন নামে যে পদার্থটি চলে তাতে ভিটামিন এ ও ডি যোগ করা হয়। তেমনি কোথাও কোথাও রুটি তৈরির ময়দায় ভিটামিন-বি। নানা ধরনের পানীয়, শুকনো [illegible] ও আরো বহু খাদ্যে ভিটামিন-সি। এই যে এত অজস্র রকমের ভিটামিন এত অল্প খরচে এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে—রসায়নবিজ্ঞানের এ এক মস্ত কৃতিত্ব।

রুটির সঙ্গে ভিটামিনই এবং ক্যালসিয়াম ও লোহ যোগ করা হয় এই বিবেচনা থেকে যে, [illegible] পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের [illegible] পদার্থ-[illegible] খাবার মতো [illegible] নেই, অতএব এক রুটি থেকেই [illegible] সম্ভব পুষ্টি দেবার [illegible]। একই কথা প্রোটিন সম্পর্কেও তোলা যেতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রোটিনের অভাব জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় রকমের সমস্যা। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রোটিনের অভাব ঘটলে বহু রোগ থাকে মারাত্মক। এখানে অবশ্য যদিও বলা হচ্ছে প্রোটিনের কিন্তু আসল অভাব বিশেষ একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের যাকে সাধারণভাবে বলা হয় লাইসিন। এই লাইসিনও আজকাল যথেষ্ট পরিমাণেই তৈরি হচ্ছে।

তবে কথাটা থেকেই যায়। ভিটামিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড [illegible] পুষ্টিকরই-[illegible] তা সবই খাদ্যের অংশ-[illegible]। রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃত্রিম সমগ্র খাদ্য তৈরি করা কি অসম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলছেন, না, অসম্ভব নয়, তৈরি হতে পারে, শীঘ্রই হবে।

গত বছর বিজ্ঞানীরা মার্গারিন আবিষ্কারের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছেন। মার্গারিনকে বলা চলে প্রকৃত অর্থে মাখনের বিকল্প। এই মার্গারিনকে কি [illegible] অর্থে কৃত্রিম খাদ্য বলা চলে? বোধ হয় চলে না, কারণ মার্গারিন তৈরির একটি উপাদান হচ্ছে ফ্যাট বা চর্বি। কিন্তু পেট্রোলিয়াম থেকেও মার্গারিন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কোথাও ক্ষেত্রে মার্গারিন প্রকৃত অর্থেই কৃত্রিম খাদ্য।

খাদ্যের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে এমন ফ্যাটি অ্যাসিড বা মেদাম্ল প্রথম তৈরি হয়েছিল ১৮৮৪ সালে, পেট্রোলিয়াম থেকে। কিন্তু এই গোড়ার দিককার মেদাম্লকে পাওয়া যেত অন্য নানা পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়, ফলে তীব্র গন্ধযুক্ত হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই সমস্যারও সমাধান হয়েছে। সে সময়ে জর্মানীর কয়েকটি বড় বড় কারখানায় কয়লা থেকে পাওয়া পেট্রোলিয়াম থেকে প্রচুর পরিমাণে মার্গারিন উৎপন্ন হত। সেই মার্গারিন প্রথমে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল ইঁদুর, বেড়াল, গিনীপিগ, খরগোশ, কুকুর ও ছাগলের ওপরে, তারপরে ব্যবহৃত হয়েছিল মানুষের খাদ্য হিসেবে। আসল মাখন থেকে এই মার্গারিনের তফাৎ করা যেত না।

তফাৎ পাওয়া যেত রাসায়নিকের চোখ দিয়ে দেখলে। মার্গারিনের রাসায়নিক গড়ন ছিল মাখনের রাসায়নিক গড়ন থেকে ভিন্ন। স্বাভাবিক মেদাম্লতে পাওয়া যায় শুধু জোড়-সংখ্যক কার্বন পরমাণু, কিন্তু এই মার্গারিনে পাওয়া যেত জোড় ও বিজোড় উভয়ই। তাছাড়া বিন্যাসেও তফাৎ থাকত। কৃত্রিম মেদাম্লতে কখনো কখনো পাওয়া যেত ডাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড। মার্গারিনে পেটের অসুখ করে একটা ধারণা ছিল। সম্ভবত এই তফাৎগুলোই তার কারণ।

দ্বিতীয় আপত্তি উঠেছিল মার্গারিনের গন্ধ নিয়ে। এটা খুব একটা বড় আপত্তি নয়। এমনকি কৃত্রিম ভ্যানিলায় পর্যন্ত আসল ভ্যানিলার গন্ধ পাওয়া যায় না। রসায়নবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন। ঠিক ঠিক গন্ধ মানুষের হাতে তৈরি হতে বড় রকমের কোনো বাধা আছে বলে মনে হয় না।

তৃতীয় আপত্তি ছিল খরচ নিয়ে। এই আপত্তি এখনো দূর হয়নি। তবে কৃত্রিম রবারের দৃষ্টান্ত যদি সামনে রাখি তাহলে এই আপত্তিও টেকে না। কৃত্রিম রবার তৈরি করতে গোড়ার দিকে খরচ পড়ত খুবই বেশি। যুদ্ধের প্রয়োজনে তবুও তৈরি হত। কিন্তু এখন আর সে-অবস্থা নেই। কৃত্রিম মেদাম্ল তৈরি করার ব্যাপারেও অনুরূপ অবস্থা ঘটবে আশা করা চলে।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা উভয় দিক থেকেই কৃত্রিম ফ্যাট বা চর্বি উৎপন্ন করার আয়োজনটি এই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ হতে পারে। তবে মনে রাখা দরকার গোটা কয়েক অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হওয়াটাই সম্পূর্ণ প্রোটিন তৈরী নয়। গরুর মাংসে বা ডিমের সাদা অংশে পাওয়া যায় অন্তত গোটা বিশেক অ্যামিনো অ্যাসিড। প্রত্যেকটিই তৈরি হওয়া দরকার। তারপরেও থেকে যায় বিন্যাসগত প্রশ্ন। তবুও বিজ্ঞানীরা বলছেন, সম্পূর্ণ প্রোটিনটিই এই মুহূর্তে তৈরি হতে পারে।

বিশ্বের অনেক দেশেই খাদ্যের, বিশেষ করে প্রোটিনের অনটন। কৃত্রিম প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতে থাকলে এই অভাব অবশ্যই দূর হবে।

কিছুকাল আগেও আমরা রং সংগ্রহ করতাম উদ্ভিদ থেকে, আমাদের বস্ত্র হত তুলো বা পশুর লোম থেকে, রবার পেতাম উদ্ভিদ থেকে, আমাদের সাবান তৈরি হত চর্বি থেকে। এখন সবই কৃত্রিম। কৃত্রিম রংয়ের বাহার আসলকেও ছাড়িয়ে যায়। কৃত্রিম গন্ধের তো ছড়াছড়ি। কৃত্রিম তন্তু তো সকল মানুষের অঙ্গে। এই নিয়মেই কৃত্রিম চর্বি, কৃত্রিম প্রোটিন, কৃত্রিম কার্বোহাইড্রেট চালু হতেও হয়তো সময় লাগবে না। তবে খাদ্য-বিজ্ঞানীদের অবশ্যই সেজন্যে তৎপর হতে হবে।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
অ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

মানব মন

'মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা এই মানব মন'। সম্প্রতি দশম বর্ষ ১ম সংখ্যা (জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৭১) প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় আছে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের বিখ্যাত একটি প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ : 'বানর থেকে মানুষে উত্তরণের ক্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকা'। প্রবন্ধটি এঙ্গেলসের ১৫০তম জন্মবর্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে। এছাড়া আছে আরো তিনটি প্রবন্ধ : পক্ষপাতিত্বের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ, মার্কসবাদ ও নৈতিকতা, বিচ্ছিন্নতা বিপ্লব উন্মত্ততা। 'মনোবিদ' লিখিত শেষোক্ত প্রবন্ধটি আমাদের কালের একটি তীব্রতম সমস্যার অতি নিপুণ অনুসন্ধান ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। কনক শর্মা লিখিত 'পরাজিত বিদ্রোহী' (মহাভারতের অশ্বত্থামা অবলম্বনে) নাটকটি যেন এই প্রবন্ধের বক্তব্যকেই নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করছে। মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ও সমাজবিজ্ঞানের এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় নাটকটিও সম্পূর্ণ সঙ্গতি বজায় রেখেই উপস্থিত। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'স্বাধীন ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা সকল মানবিক ও সামাজিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছি ও করব। ভাববাদ, যান্ত্রিক জড়বাদ, রহস্যবাদ, ইত্যাদি প্রতিটি ভ্রান্ত অবৈজ্ঞানিক ভাবধারাকে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দ্বারা খণ্ডনের চেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে আমরা করে যাব।' পত্রিকার এই একটি সংখ্যা হাতে নিয়েই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা চলে সম্পাদকীয় দায়িত্ব সার্থকতারই পালিত হয়েছে। একমাত্র 'সাময়িকী' বিভাগটি কিছুটা অবহেলিত। পত্রিকার উদ্দেশ্যের দিকে নজর রেখে এই বিভাগেও নানা বিষয়ের অবতারণা করা যেত এবং তাতে পত্রিকার উদ্দেশ্যই সার্থক হত। তাছাড়া এই বিশেষ সংখ্যায় সাময়িকীতে ভুলও থেকে গেছে। যেমন, বলা হয়েছে 'যে শব্দের শক্তিবেগ এত বেশী যে মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয় তা শুনতে পারে না, তাকে বলা হয় আলট্রা সোনিকস বা আলট্রা-সাউন্ড।' এই সংজ্ঞা ভুল। আলট্রা-সাউন্ডে আধিক্য ঘটে শক্তিবেগের নয়, কম্পাঙ্কের।

—[illegible]

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

生
花

পুষ্পঘট থেকে ইকেবানা

উমা বসু

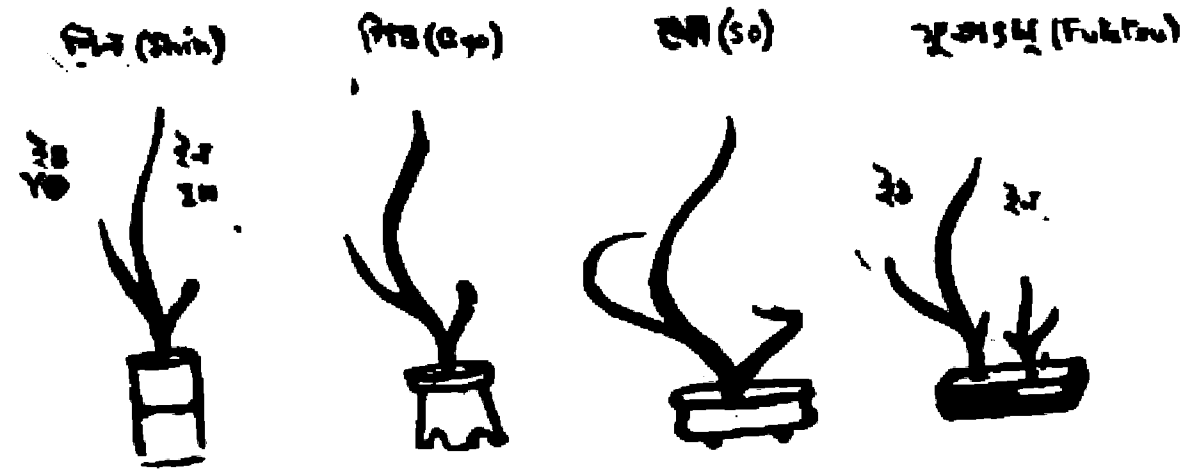

যারা ইকেবানা সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন তাঁরা জানেন ইকেবানা সাজাবার ওরকমের নিয়ম আছে। বিশেষ করে প্রাচীন পদ্ধতির 'রিক্কা ও শোকা সাজানোতে অনেক নিয়ম। রিক্কা সাজানোটি যেমন মন্দিরের উপযুক্ত তেমনি তার নিয়মও বেশী। পাঁচ সাত নয় কিংবা এগারো রকমের গাছের ফুল পাতা ও ডাল দিয়ে এটি তৈরী করা হয়। এই সব ডাল কোনটি কোন দিকে মুখ করে থাকবে, কোনটি কত বড় হবে তার নিয়ম রয়েছে। পরে রিক্কার নিয়ম সহজ করে শোকা আর শোকার সহজতর সংস্করণ মোরিবানা রীতি ক্রমশ প্রচলিত হয়। এই মোরিবানার কাঠামো তিনটি ডাল দিয়ে তৈরী—এদের প্রধানটির নাম শিন্, মাঝারিটি সোয়ে আর ছোটটি তাই বা হিকাই। এই ডাল তিনটি কেমনভাবে আটকান হবে তার যেমন শিল্পভিত্তিক নিয়ম রয়েছে, তেমনি এদের নামকরণের দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। ইকেনোবো রীতিতে শিন ডালটিকে মানুষের প্রতীক ধরা হয়, সোয়ে স্বর্গের আর তাই পৃথিবীর প্রতীক। [illegible] শিন স্বর্গের প্রতীক, সোয়ে মানুষের আর হিকাই পৃথিবীর প্রতীক। [illegible] জীবন-দর্শন [illegible] ব্যাখ্যা দেখা যায়। পুষ্পসজ্জার এভাবে [illegible] দেশবাসীকে বেশ বিস্মিত করে, তাঁদের কাছে এরূপ প্রথা রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। কিন্তু ইকেবানার মূল উৎস বিশ্ব-সত্তার প্রতীক পূর্ণঘট মেনে নিলে এর মাঝে গূঢ় তত্ত্বকথার উপস্থিতি আশ্চর্যজনক মনে হবে না। জাপানী পুষ্পসজ্জার শুরু থেকেই এত নিয়ম-নিষ্ঠা ও গভীর তত্ত্বের সমাবেশ দেখে এটি যে পূর্ণঘট থেকে উদ্ভূত সে ধারণা আরো দৃঢ়ই হয়।

জাপানী পুষ্পসজ্জার অন্যান্য নিয়মের সংগেও আমাদের রীতিনীতির বহু মিল পাওয়া যায়। ঘট স্থাপনের আগে পিটুলী কিংবা পঞ্চগুঁড়ির আলপনা দিয়ে নয়তো কিছু ফুল বা চাল ছড়িয়ে ঘটটি রাখা হয়। ওদেশে ফুলদানীটি পূর্বে কাঠ বা ধাতুর চৌকি বা পিঁড়ির উপর রাখা হোত আজকাল নানারূপ ফলকের ওপর রাখার রেওয়াজ দেখা যায়। রিক্কায় ৯টি অথবা ৭টি প্রধান অংশ, শোকায় ৫ বা ৩ সংখ্যার ডাল আর মোরিবানায় ৩টি ডাল ব্যবহার হয়। রিক্কা, শোকা মোরিবানায় বিজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা হয়, কারণ বিজোড় সংখ্যা শুভজ্ঞাপক। এবার আমাদের সংখ্যা-বিষয়ক নিয়মের অনুসন্ধান পূর্ণঘট থেকে শুরু করা যাক। তিন রকমের জিনিস যেমন আমপাতা, পদ্মফুল ও ডাব দিয়ে ঘট স্থাপন করা হয়। ঘটের গায়ে ৫টি সিঁদুরের ফোঁটা থাকে, আমপাতা ৫।৭ অথবা ৯টি রাখা হয়। তিনকালের প্রতীকরূপে ফুল, ফল ও পাতা থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘটেই বহুভাবে বিজোড় সংখ্যার উপস্থিতি। উপরন্তু সংখ্যা ব্যবহারে শুভাশুভের হেতু আমাদের জানা আছে। ছোট বেলায় শিখে-ছিলাম—'একে চন্দ্র দুই-এ পক্ষ তিনে নেত্র, চারি বেদ ...' এভাবেই ব্যাবহ শিশুকে যেমন এক দুই শেখান হয়, তেমনি দেশের চিন্তা-ধারার সংগেও সহজভাবেই পরিচয় ঘটানো হয়। ছোট বেলায় তিনে নেত্র কথাটি কত গভীর অর্থবহ তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না, তখন কেবল দুর্গাঠাকুরের সুন্দর আয়ত চোখের চাহনিটি মনে ভেসে উঠত। তিনের ত্রিকালজ্ঞের প্রতীক অর্থাৎ যিনি বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎরূপ তিনকালকে জানেন, তিনিই ত্রিকালজ্ঞ। আবার যিনি ত্রিকালজ্ঞ তিনি ত্রিকালদর্শী ত্রিভুবনব্যাপীও বটে—সর্বশক্তির আধার ঈশ্বর বা ঈশ্বরী মূর্তিতে তাই তৃতীয় নয়ন অঙ্কিত করা হয়। ভারতীয় দর্শনচিন্তায় চরমোৎকর্ষ প্রমাণ করে ত্রৈমাত্রিক স্থান ও কালকে ব্যাপ্ত করে শূন্যজ্ঞান এর অবস্থিতি কল্পনা। আরো বহু ক্ষেত্রে তিনের প্রাধান্য দেখা যায় যেমন ত্রিমূর্তি, ত্রিগুণ, ত্রিবেণী, ত্রিরত্ন, ত্রিপিটক প্রভৃতি। পাঁচের উপস্থিতি দেখি মদনের পঞ্চশরে, পঞ্চবটে, পঞ্চমুখ, পঞ্চভূত প্রভৃতি চিন্তায়। মদনের পঞ্চ পুষ্পশর-এর নাম—পদ্ম, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল। এবার সাতের মহিমা কীর্তন সপ্ত-সপ্তক ধরে আরম্ভ করা যেতে পারে। পুরাণে পৃথিবীকে সাতটি অঞ্চলে ভাগ করা থেকেই সপ্তদ্বীপ চিন্তা তেমনিই সপ্তসাগরের কল্পনা—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সাত বস্তুর সাত সমুদ্র। এই সাতটি বস্তু পূজায় মহা-দানের অংশ। এছাড়া রয়েছে সপ্তপর্ণী (ছাতিম গাছ), সপ্তপদী, সপ্তর্ষি, সপ্তস্বরা ও সপ্তাহ। নয়ের ক্ষেত্রে নবগ্রহ, নবদুর্গা, নবরত্ন, নবরস আর নবলক্ষণ দেখে এ সংখ্যারও গুরুত্ব বোঝা যায়। শারদীয়া পূজায় নবপত্রিকা, কলা, কচু, ধান, হলুদ, ডালিম, বেল, অশোক, জয়ন্তী ও মানকচু পাতা বেঁধে তৈরী করা হয়। আমাদের নবপত্রিকার মতই ওদেশে একটি সাজানোর রীতি আছে—হেমন্তের সাতটি গুল্ম ব্যবহার করা হয় এই সাজানোটিতে—হেমন্তের ওপর লেখা একটি কবিতা থেকে এর অনুপ্রেরণা। এছাড়া মেয়েলী আচার-বিচারেও বিষমের বৈষম্য লক্ষ্য করার মতন। বিয়ের সময় দেখি পাঁচজন এয়োস্ত্রী মিলে বর ও কনেকে ঘিরে তিন নয়তো পাঁচ অথবা সাত-এর জের টানছেন নানাভাবেই—বরণ করায়, প্রদক্ষিণ করায়, মালাবদলে, সপ্তপদী যাওয়ায়, কড়ি খেলায় আর তৃতীয় রাতে ফুলশয্যার মধ্যে ইঙ্গিতে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের সংখ্যা বিষয়ক পক্ষপাতিত্ব ইকেবানায় বিষম সংখ্যার প্রতি দুর্বলতা সমগোত্রীয়।

জাপানের শিল্পকলায় ভারতের শিল্প-রীতির প্রভাব দেখা যায়। ইকেবানা শিল্পেও ভারতের শিল্পরীতির প্রভাব

পড়েছে মনে হয়। আমাদের প্রতিমা গঠনের নিয়মের সঙ্গে ইকেবানার গঠনরীতির অনেক মিল দেখা যায়। জাপানী পুষ্প-গুচ্ছকে দ্রষ্টব্যরূপে মনে করে দর্শকের ডান দিক সাজানোর ডান দিক অথবা দর্শকের বাঁ দিক সাজানোর বাঁদিক বলা নিয়ম নেই। মূর্তির ডান দিক যেমন তার নিজস্ব অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল তেমনি ইকেবানার নিজস্ব অবস্থানের ওপর স্থির করে ডান বা বাঁদিক ঠিক করা হয়। একই ফুলদানীতে যখন দুটি সাজানো হয় তখন সাধারণত ডান দিকেরটি বড় সাজানো হয় পুরুষের প্রতীক আর বাঁ-দিকেরটি ছোট সাজানো হয় নারীর প্রতীকরূপে। সাজানো দুটি পরস্পরের দিকে একটু হেলে থাকে যুগলমূর্তির মতন। আমাদের মূর্তি শিল্পে সাধারণত চার রকম গড়নের মূর্তি তৈরীর কথা লেখা আছে। সমভঙ্গ রীতিতে সূর্য, নারায়ণ, শিব বা বুদ্ধের মূর্তি তৈরী হয়, আভঙ্গ রীতি অনুযায়ী দেবতুল্য মানুষ-এর মূর্তি গঠন করা হয়। সমভঙ্গরীতিতে মূর্তি ঋজু রেখায় দণ্ডায়মান থাকে, আর আভঙ্গ রীতিতে বামে বা দক্ষিণে সামান্য বেঁকে থাকে। অতিভঙ্গ রীতিতে অসুর-মূর্তি, শিবতাণ্ডব অথবা নাগমুদ্রী মূর্তি গঠন করা হয়। ত্রিভঙ্গমূর্তি দেবদম্পতি বা যুগলমূর্তির গঠনরীতি—উভয় উভয়ের দিকে ঝুঁকে থাকে—যেমন রাধাকৃষ্ণ মূর্তি। এইসব রীতির মূর্তি যে ভাবের পরিচায়ক তার সঙ্গে ইকেবানার শিন গিও, সো এবং ফুতাংসু রীতিতে যে যে ভাবের কথা বলা হয়েছে তার ঐক্য লক্ষ্য করার মতন। সমভঙ্গ রীতির সমগোত্রীয় শিন ভঙ্গীমার অন্তর্ভাব সত্য, ন্যায় ও দৃঢ়তার প্রতীক, আভঙ্গরীতির সমধর্মী গিও রীতি ঋজু ও কমনীয়তার সংমিশ্রণে গঠিত হয়। সো রীতির সঙ্গে অতিভঙ্গ রীতির তুলনা করা যায়—এই সাজানোটিতে অতিনাটকীয়তা অর্থাৎ অতি কোমল কিংবা অতিবক্র রেখার সমাবেশ দেখা যায়। ফুতাংসু বা যুগ্মসজ্জা পরস্পরের পরিপূরক রূপে দুটি সাজানো একত্রে সাজানো হয় যুগ্মভাবের প্রতীকরূপে। জাপানের শিল্পকলায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিয়ম ইও ও ইন-এর ব্যবহার। প্রতিটি পুষ্প-বিন্যাসের মাঝে ইও ও ইনের উপস্থিতিই সম্পূর্ণতা প্রদান করে। ইও অর্থে দিবা, আলোক, ঊর্ধ্ব অথবা পুরুষ; ইন্ অর্থে রাত্রি, অন্ধকার, অধঃ অথবা নারী; এই দুই মিলিতভাবে সর্বত্র উপস্থিত থাকে।

জাপানী শিল্পী মনে করেন প্রতিটি শিল্পে এই দুই-এর যথাযথ বিকাশই শিল্পে পূর্ণতা প্রদান করে—দুই বিপরীত ভাবের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ জগৎ। সচরাচর ইকেবানা সাজানোর ডানদিকে ইও এবং বাঁদিকে ইন থাকে। ফুতাংসু সাজানোর পুরুষের প্রতীক সাজানোটির ইন অংশে নারীর প্রতীক সাজানোটি থাকে। এই ইও ও ইন চিন্তার সঙ্গে আমাদের অর্ধনারীশ্বর চিন্তার মিল পাওয়া যায়। জাপানী শিল্প-রীতিতে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও উল্লেখ করেছেন। ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এ বিষয়ে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা তাঁর লেখা থেকেই কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করে দিই।

ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে। রূপ প্রকাশ পাইতেছে ছায়াতপের বৈষম্য দিয়া, যেমন—

> দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং
> বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
> অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।
> মুণ্ডক উপনিষদ।

দুই সুন্দর পক্ষী, শ্বেত কৃষ্ণ, জাগ্রত সুষুপ্ত, যেন ছায়াতপের মতো একত্র বাস করিতেছে। একটি পক্ষী ফল আস্বাদ করিতেছে, গান গাহিতেছে, অন্যটি চুপচাপ বসিয়া তাহা দেখিতেছে। জীবাত্মা পরমাত্মা, আকার নিরাকার, রূপ ও অরূপ এই দুয়ের সমতা ও বৈষম্য ব্যক্ত করিতেছে ভারতের যে সনাতন চিন্তাগুলি তাহার ঠিক প্রতিধ্বনি দিতেছে জাপান-চিত্রশিল্পের ইন এবং ইও-র মন্ত্রটি, যথা—

> In Yo—requirs that there should be in every painting the sentiment of active and passive, light and shade (ছায়াতপ) the term In Yo originate in the earliest doctrines of Chinese philosophy and has always existed in the art-language of the orient. (?)-it signifies darkness (In— ছায়া) and light (Yo— আতপ) negative and positive, female and male (প্রকৃতি পুরুষ) passive and active (যেমন দ্বা সুপর্ণা) lower and upper (উত্তমাধম) even and odd..... illustrate the phases of In-Yo.
> —On the laws of Japanese Painting P. 48.

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫।

এই আলোচনায় শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পক্ষেত্রে In-Yo র চিন্তাধারা প্রসঙ্গে চীন এর প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন দেখা যায়। বিস্ময়কর বিকাশের মূলে প্রাচীন ভারতের সব যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি তার কারণ ভারতের আচার্যগোষ্ঠী আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন। কি জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি শিল্পকলার মধ্যে কোথাও তাঁদের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক স্বাক্ষর রেখে যাননি। বিনয়জাত পাছে নিজে যশের নি কেউ নিজ সাধনার ইতিহাস—তাই প্রাচীন ভারতের কথা আজ কিংবদন্তীর মায়াজালে ঘেরা—ভারতের ইতিহাস রচিত হয়েছে বিদেশী লেখকের বিদেশী আর ভ্রমণবৃত্তান্ত নির্ভর করে। উত্তরাধিকারসূত্রে যে জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হয়েছিলাম ; তা অজ্ঞলোকের অপদার্থ ছেলের মতই অবহেলায় ও অযত্নে নষ্ট করেছি—কুসংস্কারের পোকায় কাটা পুরাতন ঐতিহ্যের দুর্ভাগ্য শালটুকু গায়ে দিয়ে আত্মশ্লাঘায় ভাস্বর হয়ে আছি। সে জন্যই মনে আশঙ্কা জাগে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে জাপানের যোগসূত্রটি চীনদেশের মাধ্যমে হওয়ায় ভারতের বহু অবদান আজ চীনদেশের অবদানরূপেই লোকসমাজে স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের শিল্পকলা ও চিন্তাধারার সঙ্গে ইকেবানার গঠনরীতি ও চিন্তাধারার ঐক্য নানাভাবেই রয়েছে দেখা যাচ্ছে। শিল্পরীতি ও চিন্তাধারার এরূপ সাদৃশ্য দেখে অনুমিত হয় পূর্ণঘটেই ইকেবানার উদ্ভব। পূর্ণঘটের প্রতীকরূপে সাধারণের মন ভরেনি তাই ভারতের শিল্পী উপযুক্ত ফুল ফলের অভাবে বিশ্বদেবতার রূপ দিয়েছেন তাঁর প্রতিমার মাঝে আর জাপানের শিল্পী তাঁর ইকেবানার মাঝে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিমা গড়েছিলেন একই উদ্দেশে একই প্রয়োজনে —রূপের মাঝে অরূপকে দেখে, অন্তের মাঝে অনন্তকে পেয়ে, সীমার মাঝে অসীমকে জেনে তার চরণে আত্মনিবেদন করতে। প্রকৃত প্রেমিক জাপানী শিল্পী অনুরূপে আবহাওয়ায় উপযুক্ত ফুলের প্রাচুর্যে এই অদ্ভুত কলার জন্য [illegible] পথ খুঁজেছেন।

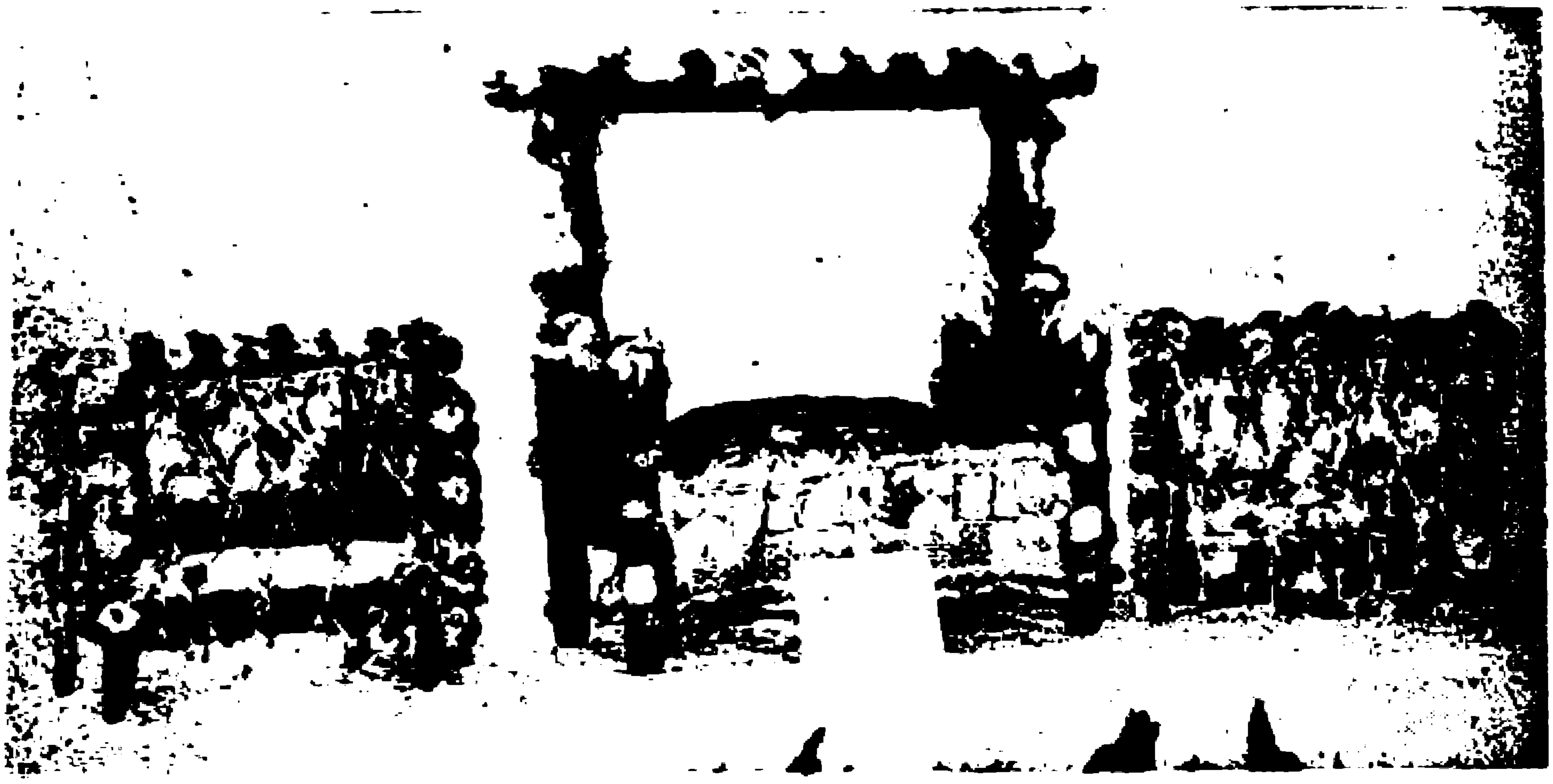

অঙ্গনা

প্রসাধনে প্রতিক্রিয়া

প্রসাধন-দ্রব্যের ব্যবহার অনেক পুরোনো। সভ্যতার প্রায় শুরু থেকেই এর প্রচলন। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের দর্পণ রামায়ণ এবং মহাভারতেও নারী নিজেকে প্রসাধিত করতে কার্পণ্য করেনি। বিয়ের কনে সীতাকে চন্দন-সিঁদুরে অপরূপ করে তুলতে ঋষি কন্যার প্রয়াস অতুলনীয়। স্নো-পাউডারের চলন সে যুগে ছিল না। তাই সীতাকে স্নান করানো হয়েছিল সুগন্ধি জলে। তারপর সীতাকে সাজানোর জন্যে সখীদের রাজকীয় আয়োজন। আদি কবি বসন-ভূষণ-চন্দনে সীতাকে করে তুলেছেন তিলোত্তমা।

শুধু সীতা নয় সেযুগে এই ছিল প্রসাধন-রীতি। রূপসীরা সুগন্ধি জলে নেয়ে উঠতো। নাওয়া হয়ে গেলে চুল শুকোনোর পালা। ধূপের ধোঁয়ায় তারা মেলে ধরতো মেঘবরণ চুল। অগুরু-চন্দনে নিজেদের করতো প্রসাধিত। অলক্তরঞ্জিত পাদদেশ। তাম্বুল রাগ রঞ্জিত অধর। আঁখি কাজলে নীলাঞ্জনা। প্রসাধনের এই ছিল সে যুগের রীতি।

শুধু আমাদের দেশে নয়। প্রসাধন নারীসত্তার একটি অঙ্গ। দেশে দেশে একথা সত্যি। ক্লিওপেট্রার দেশের মেয়েরাও সাজতো। নারীদের নয়নের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে তারা ব্যবহার করতো নানান ধরনের প্রসাধন-সামগ্রী। শুধু মুখ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে হতো না তাদের চোখের দীঘল ছাপ বিস্তারের জন্যও কসুর ত্রুটি রাখেনি তারা সে যুগেও।

প্রসাধনে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। মনোহারিত্বও। তাই প্রসাধন-দ্রব্যের ব্যবহারে মেয়েদেরই একচেটিয়া অধিকার। এই প্রগতির যুগে নারীদের হাতের কাছে ধরে ধরে প্রসাধনদ্রব্য তুলে ধরা হচ্ছে। মহাকাশ-চারী নারীও প্রসাধনকে অস্বীকার করতে

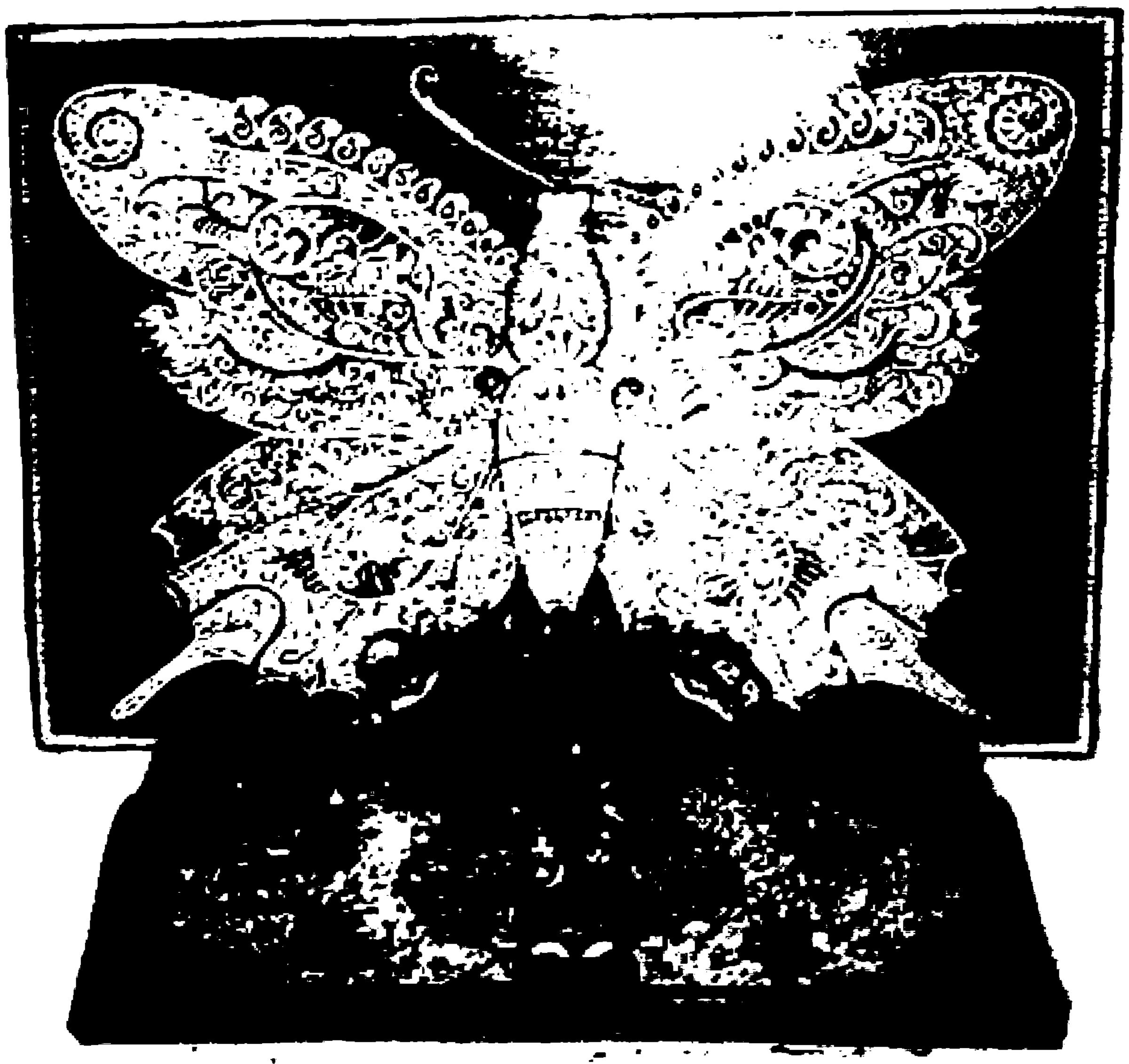

অঙ্গনার বাড়ী এবং বিভিন্ন প্রসাধনী

পারে না। প্রসাধনের প্রতি অনুরাগ তাই ক্রমবর্ধমান। এতে শিল্পেরও প্রগতি হয়েছে হু-হু করে দেশে দেশে।

আধুনিক প্রসাধনদ্রব্য বৈচিত্র্যে অতীতের সব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। প্রসাধনের জগৎ খুব। একদিন নিজেকে প্রসাধিত করতে হলে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হতো। সময়সাপেক্ষও বটে। সকলের পক্ষে প্রসাধন করা তাই সেদিন সম্ভব হয়ে উঠতো না। নেহাত পালে-পার্বণে একটু সাজগোজ ছিল তখনকার প্রচলিত রীতি। এর বাইরে বড়ো কেউ একটা পা বাড়াতো না।

প্রসাধনদ্রব্য আজ সকলের হাতের মুঠোয়। নিজের রূপ-লাবণ্য বাড়াবার জন্য সবাই এখন প্রসাধনদ্রব্যের অনুরাগী। নিজেকে সুশ্রী করার দিকে সকলের ঝোঁক: আর এর সহজতম উপায় হচ্ছে প্রসাধনদ্রব্য। এটুকু কষ্ট স্বীকারের দরকার নেই। সহজেই এবং স্বল্প সময়ে নিজেকে করে নেওয়া যায় চলে। আবার মানুষের ঝোঁক উগ্রতার দিকে। প্রসাধনদ্রব্যের সাহায্যে তারা নিজেদের বদলে ফেলে আগা-পাস্তালা। এমনি চলছে আজকের প্রসাধনদ্রব্যের অবাধ রাজত্ব। যে যেমনটি চায় ঠিক তেমনটি সম্ভব।

প্রসাধনদ্রব্যের প্রয়োজন সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু এর একটা অন্য দিকও আছে। তা হলো ত্বকের উপর এর প্রভাব। ইতি-পূর্বে নানা প্রসাধনদ্রব্যে ত্বকের অনেক ক্ষতি হতো। এখনো যে একেবারে নেই একথা বলা চলে না। তবে প্রসাধনদ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অনেক উন্নতি হয়েছে। তাই সরা-সরি কোন প্রতিক্রিয়া না ঘটিয়ে অন্যভাবে দেহত্বককে আহত করে।

দিনে দিনে নানা কেমিক্যাল দ্রব্যের উদ্ভাবন ঘটছে। এরই মধ্যে কিছু কিছু হচ্ছে শিশুদের জন্য এবং কিছু আবার পুরুষদের জন্য। এর মধ্যে আছে বেবি লোশনস এবং চুলের ক্লাপ ও আফটার শেভ লোশন। এছাড়া হরমোন এবং অ্যান্টি রিংকল ক্রীমসও আমাদের পরম সহায়ক ও বন্ধু।

আজকের প্রসাধনদ্রব্যে যেসব কেমিক্যাল দ্রব্য ব্যবহার হয় তার সবই ত্বকের পক্ষে উপকারী নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রসাধনদ্রব্য আমাদের পক্ষে অ্যালার্জিক। চোখ ব্যথা করা অথবা জ্বালা করা এমন কিছু নতুন অভিজ্ঞতা নয়। এসবই হচ্ছে নিম্নমানের প্রসাধনদ্রব্যের জন্য। তাই এ সম্বন্ধে ধীরে-সুস্থে আর ভেবেচিন্তে এগুতে হবে।

একদিন ছিল শুধু পাউডারেই প্রসাধনটি চলে যেতো। কিন্তু আজ আর তেমনটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পাউডার ছেড়ে এবার চাই ফেস পাউডার। যাতে তো দেখাতে আরো সুন্দরী হবে। মসৃণ ত্বক আরো আকর্ষণীয়। বাজারে বেরোল নতুন পাউডার। কিন্তু এ থেকে ত্বকের ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে। ফেস পাউডারও সব সময় সহায়ক নয়। এটি অনেকের এর ব্যবহারের পর ক্ষতির সম্ভাবনাও কম নয়।

একদিন ছিল কাজলেই চোখের সাজ হতো সারা। ডাগর ডাগর চোখ তখন এক অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করতো। কিন্তু কাজল এখন ঝরছে পাতার জমা হয়ে গেছে। সুর্মার চলও অচল। চোখ সাজানোর নতুন প্রসাধনরা এসে হাজির হয়েছে। চোখ নাচিয়ে নিরাপদে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে আই-লাইনার আই শ্যাডো এবং আই পেন্সিলের দিকে। আমরাও সেদিকেই ঝুঁকেছি। এসবই চোখের মায়াজাল বিস্তারে এখনকার সহায়ক। কিন্তু এসবের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। চোখের পাতায় এর কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পাতা জ্বালা করে, চুলকোয়। এ-থেকে ত্বক আক্রান্ত হবার আশংকাও যে নেই এমন নয়।

সেদিন সুন্দরীরা অঙ্গনে হতো লীলা-চলা, আর তাম্বুল-রাগে রঞ্জিত করতো নিজেদের অধর। নিজের অধর রাঙানো ছাড়াও খাওয়ার পর একসময় মেয়েমহলে পানের কদর ছিল খুব। দেশ-গাঁয়ে এখনও সবচেয়ে বড়ো আতিথেয়তা পান দিলেই হয়। কিন্তু প্রসাধন-বিলাসীরা পানের সম্পর্কে আর তেমন উৎসাহবোধ করে না। তাছাড়া সব সময় মুখ নাড়লে সেটা কেমন যেন দেখায়। তাই তারা পান ছেড়েছে। কিন্তু ঠোঁট রাঙানোর জন্য সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে লিপস্টিককে। সবাই এখন নানা রঙের লিপস্টিকে মজেছে। এর ব্যবহার কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। আশংকা এখানেও কিছু আছে এবং সেই ত্বক সংক্রান্ত। ঠোঁটের ধার থেকেই যে প্রতি-ক্রিয়া, দু' পাশটা অনেক ছেয়েই যায়। তখন একেবারে হয়ে এর সংক্রমণ হলে লিপস্টিক পরিহার করতে হবে না-সারা পর্যন্ত। তবে লিপস্টিকের সুগন্ধ আছে এবং [illegible] পারে না। ঠোঁট রাঙানোর এমন উপায় থাকতে আর [illegible] মন ওঠে? [illegible] পান শুধু ঠোঁটই রাঙায় না অন্য উপকারও করে।

চোখ, ঠোঁট তো গেল। এতেই আর প্রসাধনের তালিকা সমাপ্ত হতে পারে না। বিশেষ, আজকের দিনে প্রসাধনের [illegible] মান পাওয়া দায়। [illegible]—খবরের কাগজ এর বিজ্ঞাপন-মুখর। এবার তাই আসতে হয় নখ পালিশের কথায়। নখ তো হলো নখের দিকেও মনোযোগ দিতে হয়। আঙুলের গোড়ায় নখ শোভা পায়। আর তাকে শোভিত হওয়ার দাবী সর্বাগ্রে। নখ পালিশ সবাইতো ব্যবহার করলে এতেও একটা 'কিন্তু' আছে। এতেও ত্বক আক্রান্ত হতে পারে। আবার নখ পালিশের বেশি ব্যবহারে নখহীন আঙুলে দেখা পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। এরই সঙ্গে আছে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আঙুলে বাধার আশংকা।

[illegible] কেশচর্চার ধাপ আমাদের সকলেরই জানা। তেলের ব্যবহারেই এই চুল হয়েছিল অপরূপ। আজ কিন্তু তেল ব্যবহারে অনেকেই অনীহা। চুলে তেল ব্যবহার করাটা যেন যুগের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। তাই তেল ছেড়ে চুলে এবার নতুন বাহার। এরই মধ্যে আছে আবার চুলকে ফোলানো-ফাঁপানোর ব্যাপার। সৌখিন থেকে মহাসমারোহে হাত বাড়িয়েছে শ্যাম্পু। কিন্তু এই জিনিসও একেবারে আশংকামুক্ত নয়। নিম্নমানের শ্যাম্পু ব্যবহারে মাথা, কপাল, কান এবং ঘাড়ের ত্বক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। এমন কি আগুনের আঁচে পোড়ার সম্ভাবনা প্রচুর। এতে আবার [illegible]

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : [illegible]
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

আমদানি ঘটতে পারে। এমন কি শোনা গেছে যে, এ শ্যাম্পুতেও চোখ জ্বালা করে। অথচ একদিন আমাদের মেয়েরা ক্ষার অথবা মাটি দিয়ে মাথা ঘষে আমলা আঁচলা তেল পুরে দিতো। তাতে চুল হতো সুন্দর। আর একমাথা চুলই তো নারীর আসল সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্যবোধ আজ আর ততটা নেই। এখন রুক্ষ চুলেই বাহার যেন উপচে পড়ে।

প্রসাধনের অভ্যাসটা ভালো। একটু না সাজলে মেয়েদের ঠিক আবার মানায়ও না। তবে ত্বকের উপর এর কুপ্রভাব পড়তে সময় লাগে। তাই খুব ঘন ঘন নয়, মাঝে মাঝে প্রসাধনই বাঞ্ছনীয়। আর একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রসাধন যেন খুব উগ্র না হয়, তাহলে ত্বকের ক্ষতির ভয়টা বেশি। যে সৌন্দর্যের জন্য প্রসাধনের ব্যবহার, ত্বক আক্রান্ত হলে তার আর অবশেষও থাকবে না। শেষে হিতে বিপরীত না উপস্থিত হয়। তাই এক্ষেত্রে একটু ধীরে চলা অভ্যাস করাই ভাল। প্রসাধনের ফাঁকে ফাঁকে তাই ফিরে যেতে হবে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে। যে প্রসাধনে সৌন্দর্য বাড়ায় কিন্তু কোন ক্ষতি করে না। এই নির্দোষ প্রসাধনই হলো সৌন্দর্য বৃদ্ধির যথার্থ সহায়ক।

—প্রমীলা

NAS-C-45-D

CENTRAL LIBRARY

প্রেক্ষাগৃহ

দেবরাজ রায়—প্রতিদ্বন্দ্বী ছবিতে ছোট একটা ভূমিকায় অভিনয় করেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। এই নতুন অভিনেতাকে [illegible] পরিচালিত কালো রাস্তা সাদা বাড়িতে নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে। ফটো : [illegible]

দি সাউন্ড অব মিউজিক-এর অনুসরণে

১৯৬৫ সালে অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স-কৃত সেই বিখ্যাত ছবি 'দি সাউন্ড অব মিউজিক'-এর জনপ্রিয়তার কথা সহজে বিস্মৃত হবার নয়। প্রথম মুক্তির সময় ছবিখানি স্থানীয় লোটাস সিনেমায় চলেছিল একাদিক্রমে চাব্বিশ সপ্তাহ। হলিউড থেকে 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি', 'মাই ফেয়ার লেডি', 'মেরী পপিন্স', 'ডার্লিং', 'অলিভার' প্রভৃতি বহু মিউজিক্যাল ছবিই আমরা পেয়েছি, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে সত্তর-আশি বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত সকল বয়সের ও সকল সম্প্রদায়ের দর্শককে 'দি সাউন্ড অব মিউজিক' যে-পরিমাণে খুশী করতে পেরেছে, তেমনটি আর কেউই নয়। ছবিখানির এই অসামান্য জনপ্রিয়তাই যে এমকেজি প্রোডাকসন্স-এর সর্বেসর্বা, প্রযোজক-পরিচালক সুনীল মল্লিককে 'দি সাউন্ড অব মিউজিক'-এর অনুসরণে বাঙলা 'জয়জয়ন্তী' ছবিখানি প্রস্তুত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সেই দুর্দান্ত, দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের দল, সেই কঠোর নিয়মতান্ত্রিক ভদ্রলোক (ইংরাজীতে বাবা, এখানে মামা) সেই তরুণী সঙ্গীতনিপুণা গভর্নেস। নিয়মানুবর্তিতা শিথিল হচ্ছে অসময়ে গান গাওয়ার জন্যে, তাই নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে গভর্নেসের প্রথম সংঘর্ষও আছে। এবং শেষের দিকে নায়কের প্রেমাস্পদার চোখে গভর্নেসের প্রতি ঈর্ষা ইত্যাদিও রয়েছে। তবু 'দি সাউন্ড অব মিউজিক'-এর ছায়াবলম্বনে রচিত কাহিনীটি যথেষ্ট স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি নানা কারণে। প্রথমেই বলব, একটি ইঙ্গবঙ্গ পরিবারে গভর্নেসের কাজ কি, সে সম্পর্কে কাহিনীরচয়িতা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হবার চেষ্টা করেননি। দুষ্টু ছেলেমেয়েরা গভর্নেসের অবাধ্য হয় কেন, কি কি উপায়ে তারা তাঁকে বিরক্ত এবং অস্থির করে, এ-বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলে—এই পাঁচজন একসঙ্গে একইভাবে দুষ্টামি করার চেয়ে এক একজন এক এক ভাবে গভর্নেসকে ব্যস্ত করা স্বাভাবিক নয় কি? প্রতিজনই ভিন্ন ভিন্নভাবে 'প্রবলেম চাইল্ড' হলে কত না বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব? ওদের পক্ষে প্রথমেই কলার খোসা ফেলে গভর্নেসকে চিৎপটাং করাকে হয়ত সম্ভব বলে মেনে নিলেও তাঁর ব্যাগে কাঁকড়া ঢুকিয়ে দেওয়া বা কুকুর দিয়ে গরুকে ক্ষেপিয়ে তাঁর পিছনে ধাওয়া করানো আদৌ স্বাভাবিক নয়। ঠিক অপরপক্ষে কলার খোসায় পা পিছলে আছাড় খাওয়ার পরেই এক লম্বা গান গেয়ে নতুন গভর্নেসের পক্ষে বিরোধী-দলকে প্রায় হাত করে নেওয়াও যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত নয়। ওখানে 'চোখের পলক কেন পড়ে না' পর্যন্ত গানটির প্রথম অংশটুকু রাখলে ছেলেমেয়েদের কাছে প্রথম চমকের কাজ করত। ছেলেমেয়েদের পড়া, খাওয়া, জামা-কাপড় পরা, শোওয়া, ঘুম থেকে ওঠা, দাঁত মাজা, স্নান করা, স্কুল যাওয়া প্রভৃতিকে অবলম্বন করে এত বিচিত্র রকম, অথচ স্বাভাবিক এবং উপভোগ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যায়, যা গল্পনার বাইরে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাহিনীকার সে-পথ মাড়াননি। এই পাঁচজনের একজনের কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া বা সহসা অসুস্থ হয়ে পড়াকে উপলক্ষ করে গভর্নেসের আন্তরিকতা, কৃতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছবির একটা বড়োরকম ক্লাইম্যাক্সও সৃষ্টি করা যেত। কিন্তু তার পরিবর্তে দলের বড় মেয়ে লিলির মধ্যরাত্রে তার প্রেমিক বন্ধুর

সঙ্গে সংযোগের দৃশ্য অবতারণা করা হয়েছে। স্বীকার করতেই হবে, ছবির মূল বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটি অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়।

'দি সাউণ্ড অব মিউজিক'-এর মতো 'জয়জয়ন্তী' ছবিতেও সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু 'তুমি সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে, সে-আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে', ঠিক এই ধরনের সুরের জালবোনা হয়ে ওঠেনি। 'কে প্রথম চাঁদে গেছে, বলতো নাম'—এই শিক্ষামূলক গানের চেয়ে ঠিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কয়েকটা সম্পূর্ণ অর্থহীন ননসেন্স গানের উপযোগিতা এই ছবিতে ঢের বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছবিখানিতে একটিও মজাদার ননসেন্স গান নেই। ছেলেমেয়েরা যেখানে মামার বাড়ী থেকে দৌড়ে পালিয়ে এসে গভর্নেস জয়ন্তীর বাড়ীতে উঠল, সেখানে রাতেরবেলায় জয়ন্তীর ছোট খাটটিতে ঠেসাঠেসি করে শুয়ে তারা জয়ন্তীর কাছে গান শুনতে চাইল। এ অবস্থায় দর্শকরা যখন জয়ন্তীর মুখ থেকে একটা নতুন ধরনের সালেবাই (ঘুমপাড়ানি) গান শোনবার জন্যে উন্মুখ, তখন শুনতে পাওয়া গেল—প্রথমে সে বেশ করে গা-মা-পা, মা-পা-ধা করে সুর ভেঁজে নিয়ে গাইছে 'রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বরষায়, কেন ডাকো আমারে'। পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে এমন গানের অপপ্রয়োগ করার কারণ কি?

বিলাত-ফেরতা বোঝাবার জন্যে সঞ্জয় রায়ের মুখে মাত্রাতিরিক্ত ইংরেজী সংলাপ চরিত্রটির এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিটিরও মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে।

অভিনয়ে নায়ক সঞ্জয়ের ভূমিকায় উত্তমকুমার তাঁর চলনে, বলনে একটি সুন্দর ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন, যা একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব। জয়ন্তীর ভূমিকাটিকে যথাসম্ভব হৃদয়গ্রাহী করে চিত্রিত করবার জন্যে অপর্ণা সেন অনুমাত্রও ত্রুটি করেননি। সঞ্জয়ের মায়ের ছোট্ট মিষ্টি ভূমিকায় অনেকদিন বাদে চন্দ্রাবতীকে দেখে দর্শকরা আনন্দ পাবেন। সঞ্জয়ের প্রেমপাত্রী মালা মিত্র বেশে লোলিতা চট্টোপাধ্যায়কে যথেষ্ট আধুনিক দেখিয়েছে এবং আধুনিকার বিশিষ্ট রূপটিও তিনি অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলের দলে সুচেতা, মধুস্মিতা, সম্রাট, পাপিয়া ও টিঙ্কু একযোগে কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালকের চাহিদা মিটিয়েছেন। তবে ওরই মধ্যে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাপ্পাবেশী সম্রাট ভট্টাচার্য। অপরাপর ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন তরুণকুমার (বিকাশ), গীতা দে (জয়ন্তীর বৌদি), এন. বিশ্বনাথন (জয়ন্তীর দাদা), অনুভা ঘোষ (সঞ্জয়ের দিদি—মূকের ভূমিকায় অভিনয়ও অভিনয়!), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (মিঃ নন্দী) প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণের কাজে বিজয় ঘোষ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন: আলোছায়ার সমন্বয়ে এমন সৌন্দর্যসৃষ্টি আমরা কদাচিৎ দেখি। সম্পাদনায় পরিমিতির পরিচয় দিয়েছেন রবীন দাস। বহু যুগ আগে আমরা শুনেছুম—অ্যাক্সন সঙ। 'জয়জয়ন্তী' ছবির সাতখানি গানের মধ্যে 'ঝন ঝনন্ সুর ঝঙ্কারে' ও 'কেন ডাক বারে বারে আমারে', এই দুখানি গান বাদে বাকি পাঁচখানিই অ্যাক্সন সঙ—হাত-পা নেড়ে, চড়োকিয়ে গাওয়ার গান। সেদিক দিয়ে 'আজাড়টাতো দেশ', 'আমাদের ছুটি' এবং 'আমরা তো অত ছোট নই' গান তিনখানি মনে রাখবার মতো।

এমকেজির নিবেদন 'জয়জয়ন্তী' মিউজিক্যাল হিসেবে আদর পাবার যোগ্য।

মঞ্চাভিনয়

বহুরূপীর

পাগলা ঘোড়া

মুঠো মুঠো অন্ধকারের নীরবতাও মাঝে মাঝে অশ্রুস্নাত স্মৃতির মদির আলোয় মুখর হয়ে ওঠে, গহীন অনুভূতির দর্পণে ফেলে-আসা জীবনের পরিশ্রান্ত বৈশাখ ও স্বাপ্নিক বসন্তের মুহূর্তগুলো যেন নতুন এক আবেশময়তাও প্রতিভাত হয়। আর আমাদের প্রেম ভালোবাসা, ক্ষোভ ও হৃদয়ের তৃষ্ণার আকুলতা, ক্লান্তি, হতাশা ও চরমতম আত্মগ্লানির দুর্বিষহতা, রুদ্ধ মনের মর্মন্তুদ হাহাকার ও প্রবঞ্চনার বেদনার মুখোমুখি হয়ে আমরা বুঝতে পারি, হয়তো কোন গভীরতর অর্থের সীমারেখায় ধরে রাখতে পারি আমাদের পরাজয়ের গূঢ়তম কারণকে, উপলব্ধি করতে পারি দুটি জীবনের মরমী সেতু-বন্ধন করতে গিয়ে যোগে কোথায় যেন একটু ভুল হয়ে গিয়েছে।

অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে বহুরূপীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' নাটকটি দেখতে দেখতে এই চিরন্তন অনুভূতি ও শাশ্বত স্পন্দনের মধ্যে বিভোর হয়ে কিছু হারিয়ে-যাওয়া জীবনের অতলে নিজেদের অস্তিত্বকে যেন নতুন করে খুঁজতে চাইছিলাম। মঞ্চের আলো-আঁধারের স্বপ্নময়তায়, নাটকের চরিত্রের প্রাণকল্লোলের সঙ্গে এমন করে মিশে যাবার নিবিড়তা খুব বেশী ক্ষেত্রে অনুভব করা যায় না। অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই যে বহুরূপী প্রযোজিত প্রায় প্রতিটি নাটকই কোন-না-কোন সূত্রে আমাদের বোধ ও মানসিকতাকে মঞ্চের মুখরতায় আপন করে কাছে টেনে নিয়েছে।

'পাগলা ঘোড়া' নাটকটি যেন আমাদের দুর্নিবৃত্তির চেয়ে চিরন্তন অনুভূতির আকাশকেই দোলা দিয়েছে বেশী করে। রাজনীতির কোন বিশেষ মতবাদ বা সম-

কালীন সমাজজীবনের বিশেষ কোন সমস্যার ওপর আলোকপাত করেননি এ নাটক-এ নাটকের মর্মকেন্দ্রে রয়েছে প্রেম, যার সুষ্ঠু বিন্যাসে জীবনের পরিপূর্ণতা ধরা পড়ে, আর যার ধূসরতার অস্তিত্বকেই মনে হয় অর্থহীন। এ নাটকের প্রয়োজন এই দিক দিয়ে একটি নতুনতর স্বাদে আমাদের মন ভরিয়েছে। 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়', 'পুতুল খেলা', 'রাজা ওয়াদিপাউস', 'বাকি ইতিহাস', 'বর্বর বাঁশী' প্রভৃতি নাটকের স্তর পেরিয়ে পাগলা ঘোড়া নিঃসন্দেহে একটি স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত প্রযোজনা। নাট্যের মধ্যে অ্যাবসার্ডিটির আভাস হয়তো আছে, কিন্তু ঘটনার মধ্যে ডুবে গেলে চেনা জীবনটাকেই আবার নতুন করে চেনা যায় এ নাটকে। তাছাড়া নাট্যকার বাদল সরকার বোধ হয় এই নাটকেই জীবনের খুব কাছে এসে তার চিরন্তন একটি স্পন্দনকে সহজ সুরে মেলে ধরতে পেরেছেন। অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিতের জীবনের চলমানতার দর্শন হয়তো এখানে নেই, কিন্তু এর মধ্যে নতুন দৃষ্টির আলোয় ফেলে-আসা জীবনের কৃতকর্মের সহজ প্রাণময় মূল্যায়নের যে প্রয়াস আছে, তার অন্তরে গভীরতাকে তো আমরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি না। নাটকের বেশ কিছু সংলাপেও শ্রীসরকারের গভীরতম জীবনবোধ ও তীব্র বাস্তব-সচেতনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংলাপের দু-একটি শব্দ আপাতদৃষ্টিতে অশ্লীল বলে মনে হোতে পারে; কিন্তু এমন নাট্য-মুহূর্তে সে কথাগুলো এসেছে যার বাস্তব মূল্য স্বীকার করে নিলে এগুলোকে অশ্লীল বলে মোটেই মনে হবে না।

'পাগলা ঘোড়া' নাটকের সংঘাত আবর্তিত হয়েছে একটি শ্মশানের অন্ধকারময় পরিবেশে। গভীর নিশীথের তমিস্রাকে চঞ্চল করে তুলছে চারজন টুকরো মানুষ— শশী, হিমাদ্রি, সাতু, কার্তিক। ওরা হয়তো বন্ধু, কেউ হয়তো কারো চেয়ে কিছু বড়ো। ওরা বহন করে নিয়ে এসেছে ওদের সঙ্গে একটি তরুণীর মৃতদেহ। চিতায় তার দেহ জ্বলছে। আর ওরা সেই অবসরে তাস খেলছে। আর মাঝে মাঝে তরুণীটির রহস্যময় মৃত্যুর কারণ অনুসরণ করতে চেষ্টা করছে নিজেদের মধ্যে। একটু পরে মদ্যপান করে নেশায় বুঁদ হয়ে নিজেদের জীবনের ব্যর্থ প্রেমের গল্প বলছে। এখন তা শুধু গল্পই। কোনদিন ছিল যখন প্রেম এসেছিল জীবনে, এসেছিল মালতী, মিলি, লছমি আর মেয়েটা। কিন্তু কোথাও নিজেদের অক্ষমতার জন্য প্রেমের চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে দ্বিধা বোধ হয়েছিল, কোথাও বা মনের কথা প্রকাশের ভাষা পাচ্ছিল না। তাই হৃদয়ের সব সবুজ মুহূর্তে প্রেমের সব কটি প্রাণময় প্রতিশ্রুতি ওদের কাছে যন্ত্রণার নিঃসীম ট্রাজেডিতেই রূপান্তরিত হয়ে আছে। ওদের সেই যন্ত্রণার সংঘাত কিছু স্মৃতিচারণা আর সংলাপের মধ্য দিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। আর তা আরো মর্মস্পর্শী হয়েছে যে মেয়েটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলছে মঞ্চের প্রায় সব কটি জোনে তার অদ্ভুত আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। মেয়েটি বারবার এসেছে; ওদের মুখরতা ওদের হাসি, ওদের অশ্রুকাতর মুহূর্তে এসে বারবার আবেদন করেছে— 'কই, তোমরা গল্প বলো... তোমরা সত্য কথা বলো......নিজেদের তোমরা এমন করে ঠকিও না। ওরা গল্প বলেছে, ওরা বাস্তব সত্যের নির্মমতার সামনে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছে। এই চারটি পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত নায়কের বিবেক হয়ে কাজ করেছে হয়তো এই মেয়েটি।

চার বন্ধু ওদের জীবনের যে চারটি ব্যর্থ প্রেমের গল্প বলেছে তার মধ্য দিয়ে নাট্যকার শ্রীসরকার হয়তো বলতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের প্রেমের মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, বলিষ্ঠ সুরে হয়তো কেউ বলতেই পারে না, মৃত্যুর মুখে দাঁড়াবে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।' তাই তো যৌবনের প্রচণ্ড দীপ্তি নিয়ে পূর্ণতার আলপনা আঁকতে পাগলা ঘোড়ার উদ্দাম-তার মতো যে প্রেম আসে, তাকে ধরে রাখা যায় না। কিন্তু জীবনের আকাশে তা ব্যর্থতার মেঘ হয়ে জমে থাকে চিরদিন, আর স্মৃতি ও বিস্মৃতির নদীতে তোলে যন্ত্রণার জোয়ার। তবে একটি কথা, এই বক্তব্যের প্রখরতা ও স্পষ্টতা হয়তো শশী ও কার্তিক কম্পাউন্ডারের সংলাপ ও স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে অদ্ভুত এক প্রোজ্জ্বলতা পেয়েছে; হিমাদ্রী ও সাতুর গল্প যেন সে পরিপূর্ণতা মেলে ধরতে পারেনি। তবে সব কটি গল্পের মধ্যে প্রাণময়তা ছিল অফুরন্ত; কোনরকম দৈন্যতা বা মোটেই শিথিল হয়ে পড়েনি; আর নাটকটিকে চাংলর্য-মণ্ডিত করবার পথে কোন দুরূহ প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেনি।

নাটকটির প্রযোজনাকে সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে নির্দেশক শ্রীশম্ভু মিত্র যে সূক্ষ্মতম শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। প্রয়োগ-পরিকল্পনায় তাঁর যে শৈল্পিক চাতুর্য ও

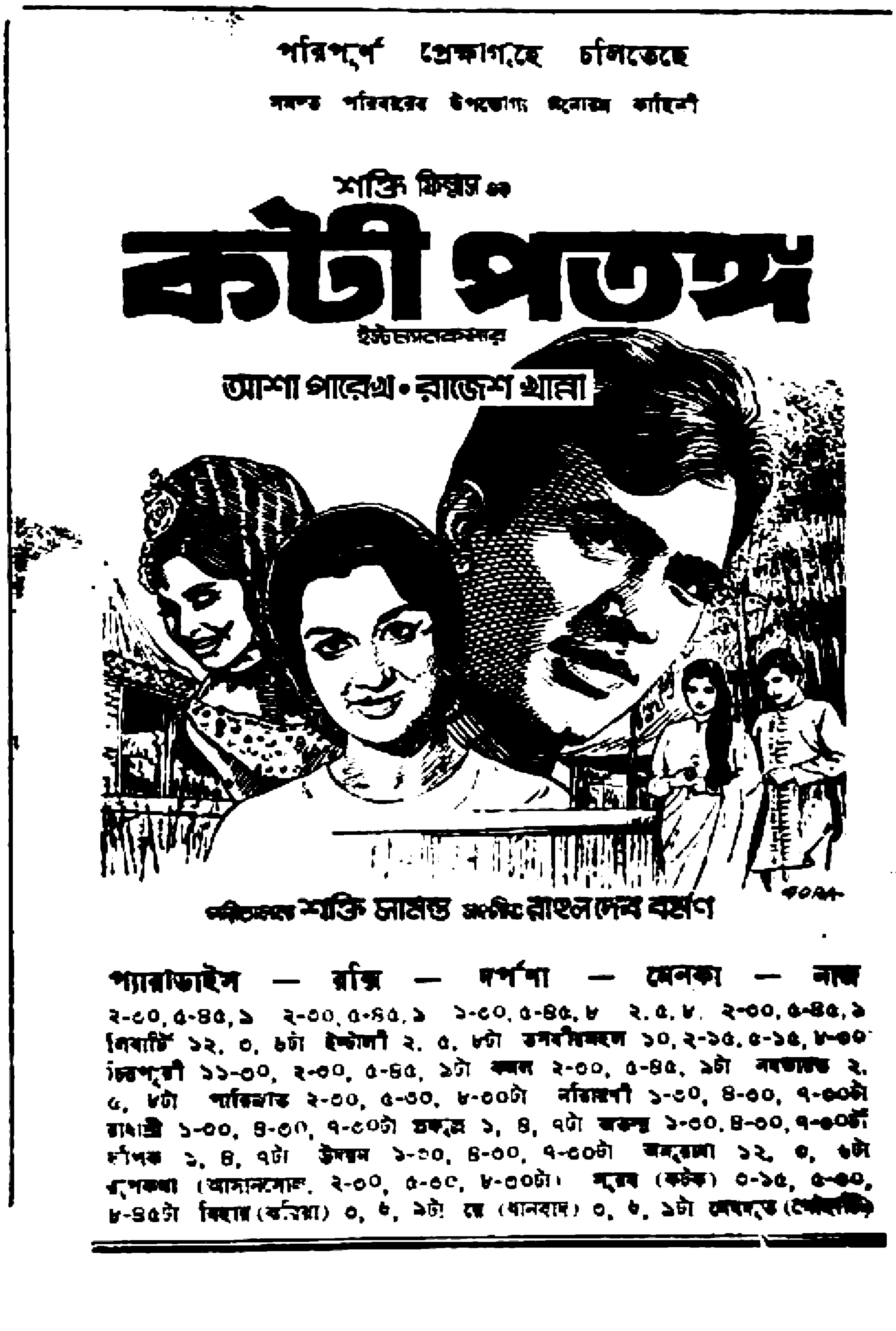

মুন্সিয়ানা বহুরূপীর নাটকে যে একটি অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়, তার পরিচয় বেশ বলিষ্ঠভাবেই চিহ্নিত হয়েছে পাগলা ঘোড়া নাটকের প্রযোজনায়। বিশেষ করে স্মৃতিচারণার মুহূর্তগুলো ও সেই মেয়েটির বারবার মঞ্চে আসার আবেশটুকুকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে শ্রীমিত্র বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। একটি বন্ধের স্মৃতিরোমন্থনের সময় অন্য তিনজনের মঞ্চে এক একটি ডালপালায় 'ফ্রিজ' হয়ে যাওয়ায় মুহূর্তগুলো দাঁড়া তোলা যায় না। মনে হয়েছিল, মঞ্চের ওপর যেন অতীত আর বর্তমানের এক নিবিড় সেতুবন্ধন হচ্ছে।

প্রয়োগপরিকল্পনার এই নৈপুণ্য আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে শিল্পীদের সাবলীল চরিত্রচিত্রণের স্পর্শে। প্রথমেই নাম করব কুমার রায়ের, তাঁর 'শশী' আমাদের অন্তরের অতলে কোন একদিনের যন্ত্রণাদগ্ধ চেনা জীবনটাকে টেনে এনেছে বাস্তবের আলোয়। কস্তুরার মুহূর্তে তাঁর সংযত অভিব্যক্তি আমাদের অবাক করেছে। আর একটি স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রণ হয়েছে দেবতোষ ঘোষের 'কার্তিক'. প্রথমদিকে তার লঘু সংলাপে আমরা প্রচুর হেসেছি। কিন্তু এই মানুষটি সবলেবে যখন জীবনকে মুছে ফেলতে উদ্যত হয়েও পিছিয়ে এলো বাঁচার আশায়, তখনকার তাঁর বেদনার্ত অভিব্যক্তি আমাদের চোখেও জল এনেছে। এই একাত্মতা শিল্পীর চরিত্র উপলব্ধির গভীরতা থেকেই আসে। কালীপ্রসাদ ঘোষের 'হিমাদ্রি' ও শান্তি দাসের 'সাতু' প্রযোজনায় স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছে। বিশেষ করে শান্তি দাস অদ্ভুত এক সাবলীলতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। নাটকটির আর একটি সম্পদ হোল, শাঁওলী মিত্রের আবেগদীপ্ত অভিনয়; অচরিতার্থ বাসনার প্রতিরূপ যে মেয়েটি তার সঙ্গে যেন মিলে গিয়েছিলেন শ্রীমতী মিত্র। মঞ্চের বিভিন্ন কোণে তার ছুটে চলার কোন কোন সময়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল 'রক্তকরবী'র নন্দিনীরূপিনী শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের (শিল্পীর মা) প্রাণচাঞ্চল্যের ছবি। অনবদ্য তাঁর কণ্ঠস্বর, একটি গানের কলি এমন সুন্দর কণ্ঠে গেয়েছেন যার মাধুর্যে থেকে মেয়েটির চরিত্রের মুক্তির আশা আর যন্ত্রণা মুখর হয়ে ওঠে। আরো তিনটি চরিত্রে সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন নমিতা-কুমার (মালতী), তাপ্তী গুপ্ত (মিলি), রমলা রায় (লছমি)।

নাটকটির মেজাজ অনুযায়ী শ্রীখালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জা হয়েছে সুপরিকল্পিত। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ও আবহসঙ্গীত রচনায় শৈল্পিক পরিমিতিবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

—দিলীপ মৌলিক

বিবিধ সংবাদ

চেকোশ্লোভাক স্টাম্প প্রদর্শনী : গত রবিবার আকাদমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে ভারত-চেকোশ্লোভাক সংস্কৃতি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আটদিনব্যাপী চেকোশ্লোভাক স্টাম্প প্রদর্শনী শেষ হয়। এই প্রদর্শনীতে বিগত দশকে চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি, প্রযুক্তিবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতির এক পূর্ণ চিত্র বিভিন্ন স্ট্যাম্পের মাধ্যমে দেখানো হয়। এছাড়া শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সহযোগিতার উপরও কতগুলি স্টাম্প রাখা হয়েছিল। শেষের দিকে যেসব স্টাম্প প্রদর্শিত হয় তাতে সঙ্গীত, সাহিত্য, পুরাতন ঐতিহাসিক শহরের শতবার্ষিকী এবং কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রদর্শনীতে প্রতিদিন বিপুল জনসমাগম হয়।

নতুন ছবি : কোয়েলের কাছের চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী। পালামৌর বন-পাহাড়ে ছবিটির শুটিং আরম্ভ হবে। 'অমৃত' সাপ্তাহিকে কোয়েলের কাছে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

জলসা

একক আসরে পদ্মশ্রী

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় : অরুণ ভট্টাচার্য পরিচালিত সবরং সন্ধ্যার এক উল্লেখযোগ্য নিবেদন রবীন্দ্র সদনের প্রভাতী আসরে পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক সেতারবাদন। এ আসরে ভারতীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যের পটভূমিকায় নিখিলবাবুর নিজস্ব সঙ্গীতভাবনার স্বরূপ পরিচিত হবার সুযোগ হল। শিল্পী কৌষিকী-ভৈরব রাগে সংক্ষিপ্ত আলাপ ও রূপক তালের গৎ-এর পর জৌনপুরী অবশেষে ভৈরবী ঠুংরী বাজিয়ে আসর সমাপ্ত করেন। সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যেই আলাপের সকল অঙ্গ সুপ্রদর্শিত হয়েছে। বিস্তার সঙ্গে শিল্পীর নিজস্ব ঢং-এর মীড় সমন্বয়ের প্রতিমাধুর্য কটকার চকিত দ্যুতি ও বলিষ্ঠ সাপট্ তানের সপ্রতিভ গতিতে একাধারে পাণ্ডিত্য, রাগশুদ্ধতা ও প্রকাশের বর্ণ-বিভব—সারা প্রেক্ষাগৃহে যেন মুগ্ধতার মায়াজাল রচনা করেছিল। রূপক তালের গৎ-এর স্বল্প-পরিসরেও যে ছন্দবৈচিত্র্য—সরাকরীর গতিবৈভব ও নানান তানের কারুকার্যে ধ্রুপদী ও খেয়াল অঙ্গের এক অভিনব সমন্বয় বলা যায়।

তবু বলব, এত সংক্ষিপ্তসারে মন ভরে না। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যদি একটি রাগে গৎ এবং অনায়াসে আলাপ বাজাতেন তাহলে বাদ্যযন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপটি পাওয়া যেত। কৌষিকী ভৈরবের ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে "জৌনপুরী" রাগনির্বাচন শিল্পী-সুলভ অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয়। কৌষিকী ভৈরবে আর্তি আছে, অভিমানও আছে কিন্তু যে অভিমান ও আর্তির মধ্যে আছে একটা দৃপ্ত ভাব যা নতি স্বীকার করে না। এ অভিমান জৌনপুরীতে সংযমের বাঁধ ভেঙে সকাতর ক্রন্দনে বিগলিত, তাই অশ্রুধারার বিরাম নেই। জৌনপুরীর এই রূপাভাসে নিখিলবাবুর একটি বাজের আঘাতেই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। নানান চিত্তস্পর্শী স্বরসমন্বয়ের পর আবার রাপাধা, মাপাজার পথ বেয়ে রেখাব ও সুরের বুকে নুটিয়ে পড়ার কোমল কারুণা ভোলার নয়। উপসংহারীয় ভৈরবীতে একাধারে প্রেম ও ভক্তির আবেগ যথোপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে পেরেছে। এর সঙ্গে তবলাসঙ্গতে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তরুণ তবলাবাদক স্বপন চৌধুরী।

ওস্তাদ ইমরাৎ খাঁর ইউরোপ যাত্রা : গত ২রা মার্চ ওস্তাদ ইমরাৎ খাঁ সাংস্কৃতিক সফরে ইউরোপ যাত্রা করেছেন। ভিন-দেশের বহু নামী এবং দামী অনুষ্ঠানে তাঁর অংশগ্রহণ করার কথা। এর মধ্যে আছে লন্ডনের রয়্যাল এলবার্ট হলে প্রোমানাড্যো সামার ফেস্টিভেলে ও কুইন এলিজাবেথ হলের দুটি সঙ্গীতোৎসবে অংশগ্রহণ, বি বি সি টেলিভিশন ও বি বি সি-র তৃতীয় বেতারানুষ্ঠানে সেতারবাদন, ফিনল্যান্ড টেলিভিশন, বেতারানুষ্ঠান হেলসিনকির সাধারণ অনুষ্ঠানে বাজানো, হেলসিনকির একাডেমী অফ মিউজিকে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা। প্যারিসের টেলিভিশন, এবং আরো কটি স্থানে সেতার বাদন এবং স্পেনে বার্সিলোনা, মাদ্রিদ এবং সোয়ানসিতে সেতার অনুষ্ঠান। এবারেই প্রথম তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বুইনো আয়িস ও রিও-ডি-জেনেরিওতে সঙ্গীত অনুরাগীদের সঙ্গীত অভিবাদন জানাবেন। গত সফরের অভাবনীয় সাফল্যের দরুন তিনি হল্যান্ড, জারমানী, সুইজারল্যান্ড ও ডেনমার্কে নতুন করে আমন্ত্রিতও হয়েছেন।

বিদ্যাভারতী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবেশিত "শাপমোচন" : হৃদয়ে প্রেমের সত্যিকারের জাগরণ হলেই মানুষের চিত্ত তার খণ্ডিত সীমাকে অতিক্রম করে—অসীমের জ্যোতির্ময়লোকে উদ্ভাসিত হয়। প্রেমের বন্ধনের মধ্যেই রয়েছে মুক্তির আনন্দস্পর্শ—এই ভাবেরই এক শিল্পসুন্দর প্রকাশ কবিগুরুর "শাপমোচন"।

বিদ্যাভারতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে রবীন্দ্রসদনে নিবেদিত

রঙ্গনা বিধানচন্দ্র রায় সার্কুলার রোডের মোড় (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
শনিবার ৬টায়
রবিবার ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার ৬টায়
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

"শাপমোচন" নৃত্যনাট্যের সার্থকসুন্দর রূপায়ণ—রবীন্দ্রনাথের এই অতি অন্তরঙ্গ ভাবকল্পনাকে যেন নতুন করে মেলে ধরবার চেষ্টা করেছিল। অরুণেশ্বরের ভূমিকায় ধীরেন বসুর নেপথ্য সঙ্গীতের সব গানগুলি সুগীত, শুনতে ভাল লেগেছে। কমলিকার গানগুলি সুমিত্রা সেনের দরদ-ভরা কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। প্রতিমা মুখোপাধ্যায় গীত 'মধুশ্রী' ভূমিকার গানগুলিও সুশ্রাব্য। দীনেশ চন্দ্র পরিচালিত আবহসঙ্গীত পরিবেশ সৃষ্টিতে সার্থকভাবে সহায়তা দিয়েছে।

তুলনামূলক বিচারে নৃত্যাংশ দুর্বল। নৃত্যরচনায় নয়, দুটি রূপায়ণে। নৃত্যশিল্পীদের কারো অভিব্যক্তিই মনে কোনো রেখাপাত করতে পারেনি। উর্বশীর ভূমিকায় অবতীর্ণা সুপরিচিতা শিল্পী [illegible] নৃত্যে যেন জমে না পারদর্শিতা প্রদর্শিত। উপস্থাপনার দিক দিয়ে গদ্যবাণীর সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন নৃত্যপরিচালক রামগোপাল ভট্টাচার্য ও সঙ্গীত পরিচালক ধীরেন বসু। কনিষ্ক সেনের আলোকসম্পাত তাঁর পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখেছে। নৃত্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভে প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের গীত 'আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়" ও "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে" দুটি গানই সঙ্গীত রসিকদের খুশী করতে পেরেছে।

—চিত্রাঙ্গদা

কারণ অল্প টাকার ওপর এখন বেশী সুদ পাওয়া যাচ্ছে
কেন্দ্রীয় সরকার সুদের যে বর্ধিত হার ঘোষণা করেছেন তা এখন চালু হয়ে গেছে

এবার সঞ্চয় না করলেই নয়!

	পুরোনো হার (বছরে)	নতুন হার (বছরে)
ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্ক-		
১) একলার, দুজনের এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এ্যাকাউন্ট	৩ ১/২%	৪%
২) সারা বছর জমার খাতায় অন্ততঃ ১০০ টাকা গচ্ছিত	৪%	৪ ১/৪%
৩) দু'বছরের জন্য জমা আটক	৪ ১/৪%	৪ ১/২%
ডাকঘর মেয়াদী জমা	৫ ১/২% থেকে ৬ ৩/৪%	৬% থেকে ৭ ১/৪%
ডাকঘর পৌনঃপুনিক জমা	৬ ১/৪%	৬ ৩/৪%
৭ বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (চতুর্থ ইস্যু)	৭ ১/৪%	৭ ১/২%

বিশদ বিবরণের জন্য আপনার বাড়ীর সবচেয়ে কাছের ডাকঘরে খোঁজ করুন অথবা আপনার রাজ্যের জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার আঞ্চলিক অধিকর্তাকে রিজনাল ডিরেক্টার, ন্যাশনাল সেভিংস (গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া), হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ফার্স্ট ফ্লোর, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলকাতা এই ঠিকানায় লিখুন।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

খেলার কথা

বিশ্ব টেবল টেনিস পরিক্রমা

ক্ষেত্রনাথ রায়

খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ ইংরেজ জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। অনেক বিদেশী খেলা ইংরেজদের হাতে এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে, তাদের অতীতের চেহারার সঙ্গে বর্তমান চেহারার বিশেষ কোন মিল নেই। চেহারার সঙ্গে নামও বদলেছে। যেমন ভারতীয় পূণা খেলা ব্যাডমিন্টন নামে এবং চীনের পিং পং খেলা টেবল টেনিস নামে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। টেবল টেনিস খেলার মান এবং জনপ্রিয়তার মূলে ইংরেজদের অবদান যথেষ্ট। টেবল টেনিস খেলার উন্নতিকল্পে ১৯২৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল টেবল টেনিস ফেডারেশন নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়। এই ফেডারেশনেরই উদ্যোগে ১৯২৭ সালে লণ্ডনে প্রথম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসে। যুদ্ধের জন্যে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান কয়েক বছর (১৯৪০-৪৬) বন্ধ ছিল এবং ১৯৫৭ সালের পর প্রতি বছরের পরিবর্তে প্রতিযোগিতার আসর বসছে এক বছর অন্তর।

ইউরোপীয় অঞ্চলই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছর থেকে একটানা ১৮টি প্রতিযোগিতায় (১৯২৭—৫১) নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মাঝখানে আমেরিকা দুবার জয়ী হয়েছিল—১৯৩৭ সালে সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ এবং ১৯৪৯ সালে কোর্বিলোন কাপ।

ইউরোপীয় প্রাধান্যের অবসান ঘটে ১৯৫২ সালে। এই বছর বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ১৯তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান তাদের প্রথম যোগদানের বছরেই ৪টি খেতাব জয়ী হয়—মহিলাদের দলগত বিভাগে কোর্বিলোন কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগে তিনটি খেতাব। ব্যক্তিগত বিভাগে জাপানের পক্ষে খেতাব পেয়েছিলেন পুরুষদের সিঙ্গলসে হিরোজি সাটো, পুরুষদের ডাবলসে ফুজী এবং হয়াসী এবং মহিলাদের ডাবলসে নিশিমুরা এবং নারাহারা। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশের পক্ষে প্রথম খেতাব জয় করে জাপান। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ১২টি প্রতিযোগিতায় জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীনের সাফল্যই উল্লেখ করার মত। এই ১২টি প্রতিযোগিতায় সোয়েথলিং কাপ জয়ী হয়েছে জাপান ৭বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি জয় ৫ বার), প্রজাতন্ত্রী চীন ৩ বার, হাঙ্গেরী ১ বার এবং ইংল্যাণ্ড ১ বার (১৯৫৩ সালে)। অপরদিকে কোর্বিলোন কাপ পেয়েছে জাপান ৭ বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি জয় ৪ বার), রুমানিয়া ৩ বার, প্রজাতন্ত্রী চীন ১ বার এবং রাশিয়া ১ বার। এখানে উল্লেখ্য, রাজনৈতিক কারণে জাপান ১ বার (১৯৫৩) এবং প্রজাতন্ত্রী চীন ২ বার (১৯৬৭ ও ১৯৬৯) প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেনি। বিগত ১১টি প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত বিভাগে জাপানের খেতাব জয় : পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব ৭টি, পুরুষদের ডাবলস খেতাব ৪টি, মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব ৭টি ও ডাবলস খেতাব ৪টি এবং মিকসড ডাবলস খেতাব উপর্যুপরি ৭টি। প্রজাতন্ত্রী চীন চারবার প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এইভাবে ১২টি খেতাব পেয়েছে : ১৯৫৯ সালে ১টি, ১৯৬১ সালে ৩টি, ১৯৬৩ সালে ৩টি এবং ১৯৬৫ সালে ৫টি। ১৯৬৫ সালের ২৮তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীন সাতটি বিভাগেরই ফাইনালে খেলে এশিয়া মহাদেশের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। প্রজাতন্ত্রী চীনের চুয়াং সে-তুং এবং লি ফুজুং পরস্পর উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে খেলে একমাত্র নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের মত অপর কোন একটি দেশের দুজন খেলোয়াড় পরস্পর উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে মিলিত হননি।

আগামী ২৮ মার্চ জাপানের নাগোয়া শহরে ৩১তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসবে। এই উপলক্ষে এই বিশেষ রচনা।

জাপানের সাফল্য

বিশ্বটেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান প্রথম যোগদান করে ১৯৫২ সালে। তারা ১৯৫৩ সালের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। এ পর্যন্ত জাপান ১১টি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে মোট ৭৭টি খেতাবের মধ্যে ৪৩টি খেতাব জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালের পর এক বছর অন্তর প্রতিযোগিতার আসর বসছে।

১৯৫২ : ৪টি খেতাব—মহিলাদের দলগত বিভাগের কোর্বিলোন কাপ; ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের ডাবলস।

১৯৫৪ : ৩টি খেতাব—দলগত বিভাগে সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস।

১৯৫৫ : ২টি খেতাব—দলগত বিভাগে সোয়েথলিং কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস।

১৯৫৬ : ৪টি খেতাব—দলগত বিভাগে সোয়েথলিং কাপ; ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের সিঙ্গলস।

১৯৫৭ : ৫টি খেতাব—দলগত বিভাগে সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ; ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৫৯ : ৬টি খেতাব—দলগত বিভাগে সোয়েথলিং কাপ (উপর্যুপরি ৫ বার) এবং কোর্বিলোন কাপ। ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের ডাবলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৬১ : ৩টি খেতাব—দলগত বিভাগে কোর্বিলোন কাপ। ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৬৩ : ৪টি খেতাব—দলগত বিভাগে কোর্বিলোন কাপ (উপর্যুপরি ৪ বার—প্রতিযোগিতার রেকর্ড)। ব্যক্তিগত বিভাগে মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৬৫ : ২টি খেতাব—ব্যক্তিগত বিভাগে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৬৭ : ৬টি খেতাব—দলগত বিভাগে সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ। ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৬৯ : ৪টি খেতাব—দলগত বিভাগে সোয়েথলিং কাপ। ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিকসড ডাবলস।

বিভিন্ন বিভাগে সর্বাধিক খেতাব জয়

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৫ বার—ভিক্টর বার্না (হাঙ্গেরী); **মহিলাদের সিঙ্গলস :** ৬ বার—এঞ্জেলিকা রোজিনু (রুমানিয়া); **পুরুষদের ডাবলস :** ৮ বার—ভিক্টর বার্না (হাঙ্গেরী); **মহিলাদের ডাবলস :** ৭ বার—এম মেডনিয়ানসৃজকি (হাঙ্গেরী); **মিকসড ডাবলস :** পুরুষ—৪ বার এফ সিডো (হাঙ্গেরী) ও মহিলা—৬ বার এম মেডনিয়ানসৃজকি (হাঙ্গেরী)।

সর্বাধিক ব্যক্তিগত খেতাব জয়

মহিলাদের পক্ষে : ১৮ বার—এম মেডনিয়ানসৃজকি (হাঙ্গেরী)

পুরুষদের পক্ষে : ১৫ বার—ভিক্টর বার্না (হাঙ্গেরী)

উপর্যুপরি ব্যক্তিগত খেতাব জয়

মহিলাদের সিঙ্গলস : ৬ বার (১৯৫০-৫৫)—এঞ্জেলিকা রোজিনু (রুমানিয়া)

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৪ বার (১৯৩২-৩৫)—ভিক্টর বার্না (হাঙ্গেরী)

সর্বাধিক দলগত খেতাব জয়

পুরুষ বিভাগ (সোয়েথলিং কাপ) : ১১ বার—হাঙ্গেরী;

মহিলা বিভাগ (কোর্বিলোন কাপ) : ৭ বার—জাপান

খেলাধূলা

দর্শক

ভেঙ্কটরাঘবন
২য় ইনিংসে ১৫ রানে ৫ উইকেট

সাবাস ওয়াদেকার! সাবাস তোমার দল!

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২১৪ রান (চার্লি ডেভিস নট আউট ৭১ রান। প্রসন্ন ৫৪ রানে ৪, বেদী ৪৬ রানে ৩ এবং আবিদ আলী ৩৪ রানে ২ উইকেট)
ও ২৬১ রান (চার্লি ডেভিস নট আউট ৭৪ রান এবং ফ্রেডারিক্স ৮০ রান ভেঙ্কটরাঘবন ১৫ রানে ৫ এবং দুরানী ২১ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৩৫২ রান (দিলীপ সরদেশাই ১১২, সুনীল গাভাস্কার ৬৫ এবং একনাথ সোলকার ৫৫ রান। নোরিগা ৯৫ রানে ৯ উইকেট)
ও ১২৫ রান (৩ উইকেটে। গাভাস্কার নট আউট ৬৭, মানকাদ ২৯ এবং আবিদ আলী নট আউট ২১ রান। ব্যারেট ৪৩ রানে ০ উইকেট)।

প্রথম দিন (মার্চ ৬) :
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংস ২১৪ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ কোন উইকেট না খুইয়ে ২২ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিন (মার্চ ৭) :
ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের খেলায় ২৪৭ রান (৪ উইকেটে) দাঁড়ায়। সরদেশাই (৮৩ রান) এবং সোলকার (২৪ রান) অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিন (মার্চ ৯) :
ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস লাঞ্চের কিছু পরে ৩৫২ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৩৮ রানে অগ্রগামী হয়। খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২য় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ১৫০ রান সংগ্রহ করে ১২ রানে এগিয়ে যায়। খেলায় অপরাজিত থাকেন ফ্রেডারিক্স (৮০ রান) এবং ডেভিস (৩৩ রান)।

চতুর্থ দিন (মার্চ ১০) :
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২য় ইনিংস ২৬১ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১২৪ রানের থেকে এক রান বেশী করে ৭ উইকেটে জয়ী হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের এই প্রথম জয়।

কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের ২য় টেস্টে ভারতবর্ষ ৭ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে বর্তমানে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় (ড্র ১) অগ্রগামী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের এই প্রথম জয়, অপরদিকে বিদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের ৪র্থ জয়। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ ১৯৬৮ সালের নিউজিল্যান্ড সফরে তিনটি টেস্ট খেলায় জয়ী হয়। ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলার উদ্বোধন—১৯৪৮ সালের ১০ই নভেম্বর, নিউদিল্লীতে। সেই সময় থেকে এই দুই দেশের মধ্যে এ পর্যন্ত যে ২৫টি টেস্ট খেলা হয় তার ফলাফল—ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ১২, ভারতবর্ষের জয় ১ এবং খেলা ড্র ১২।

বর্তমান বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে ভারতবর্ষের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৮টি এবং তার ফলাফল —ভারতবর্ষের জয় ১৬, পরাজয় ৪১ এবং খেলা ড্র ৫৩।

সোবার্স টসে জয়ী হন। কিন্তু প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মোটেই লাভবান

অজিত ওয়াদেকার
বিজয়ী অধিনায়ক

হননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলার সূচনা খুবই অশুভ হয়েছিল। আবিদ আলী খেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রথমদিনের খেলার প্রথম বলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওপনিং ব্যাটসম্যান ফ্রেডারিক্সকে আউট করেন। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে প্রথমদিনের খেলার প্রথম বলে ইতিপূর্বে উইকেট পেয়েছেন মাত্র এই দুজন—১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডের মরিস টেট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, সিডনের ৩য় টেস্ট, জুলাই ১০) এবং ১৯৩৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার ই এল ম্যাককর্মিক (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ব্রিসবেনের ১ম টেস্ট, ডিসেম্বর ৪)।

প্রথম দিনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংস ২১৪ রানের মাথায় শেষ হয়। এই ২১৪ রানই ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সর্বনিম্ন রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ছিল লাঞ্চের সময় ৮৬ (৪ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১১৬ (৮ উইকেটে)। ওয়েস্ট ইন্ডিজের একমাত্র চার্লি ডেভিস স্বচ্ছন্দভাবে খেলেছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ৭১ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর জন্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ শোচনীয় অবস্থা থেকে রক্ষা পায়। ভারতীয় দল এত ভাল খেলেছিল যে, তাদের কোন একজন খেলোয়াড়ের বিশেষ কৃতিত্ব উল্লেখ করা খুবই শক্ত। তবে ভেঙ্কটরাঘবন চারটি ক্যাচ ধরেছিলেন তা উল্লেখ করার মত। প্রথমদিনের খেলার বাকি ২৫ মিনিটে ভারতবর্ষ কোন উইকেট না খুইয়ে ২২ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিন ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের খেলায় ২৪৭ (৪ উইকেটে)। তখন ভারতবর্ষ ১ম ইনিংসের ৬টা উইকেট হাতে জমা রেখে ৩৩ রানে এগিয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১ম ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষ এই নিয়ে দুবার অগ্রগামী হল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন সরদেশাই (৮৩ রান) এবং সোলকার (২৪ রান)। সুনীল গাভাস্কার তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় নেমে ৬৫ রান করেন।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের কিছু পরেই ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৩৫২ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৩৮ রানে অগ্রগামী হয়। সরদেশাই সেঞ্চুরী (১১২ রান) করেন। এই নিয়ে তিনি উপর্যুপরি দুটি টেস্টে সেঞ্চুরী করলেন। প্রথম টেস্টে তিনি ডাবল সেঞ্চুরী (২১২ রান) করেছিলেন। সরদেশাইয়ের সেঞ্চুরী করার সময় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের খেলায় ৩০০ রান পূর্ণ হয় ৪১৮ মিনিটে। দলের এই ৩০০ রানের মাথায় সরদেশাই

আউট হন—অপরদিকে ভারতবর্ষের ৫ম উইকেট পতন। ৫ম উইকেটের জুটিতে সরদেশাই এবং সোলকার দলের ১১৪ রান তুলেছিলেন। সরদেশাইয়ের বিদায়ের পর থেকেই ভারতবর্ষের খেলায় ভাঙ্গন শুরু হয়। যেখানে দলের ৩০০ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়েছিল, সেখানে দেখা গেল ৩৫২ রানের মাথায় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস শেষ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩৭ বছরের অফ-স্পিন বোলার জ্যাক নরিঙ্গা ৯৫ রানে ৯টি উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেন। তাঁকে নিয়ে ৮ জন বোলার সরকারী টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ৯টি করে উইকেট পেলেন এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে তিনিই প্রথম। অপরদিকে ভারতবর্ষের দুজন বোলার ইতিপূর্বে এক ইনিংসের খেলায় ৯টি করে উইকেট পেয়েছেন।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ১৫০ রান সংগ্রহ করে। ফলে প্রথম ইনিংসের ১০৮ রানের ঘাটতি পূরণ করে তারা ৪২ রানে এগিয়ে যায়। তাদের হাতে ২য় ইনিংসের ৯টা উইকেট জমা থাকে। তৃতীয় দিনে খেলার গতি অনেকটা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অনুকূলে ঘুরে যায়।

চতুর্থদিনে খেলার সুরু থেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপর্যয় দেখা দেয়। পূর্বদিনের ১৫০ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে এবং ১৫২ রানের মাথায় দুরাণী দলের অধিনায়ক সোবার্সকে শূন্য রানে বোল্ড আউট করেন। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২১৮ (৫ উইকেটে)। তখন তারা মাত্র ৮০ রানে অগ্রগামী এবং হাতে জমা মাত্র ৫টি উইকেট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংস ২৬১ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১২৪ রান তুলতে চা-পানের ৭৫ মিনিট আগে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। চতুর্থ দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৭ মিনিট আগে ভারতবর্ষ ৭ উইকেটে নির্ধারিত ১২৫ রান তুলে ৭ উইকেটে জয়ী হয়। ভারতবর্ষের জয়সূচক রান উঠেছিল দলের

আবিদ আলি

প্রথম দিনের খেলার প্রথম বলেই উইকেট পান

নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় সুনীল গাভাস্কারের ব্যাট থেকে। গাভাস্কার পাকা টেস্ট খেলোয়াড়ের মেজাজ এবং ভঙ্গীতে খেলেছিলেন—১ম ইনিংসে করেছিলেন ৬৫ রান এবং ২য় ইনিংসে নট আউট ৬৭ রান।

ক্রিকেট দলগত খেলা। সুতরাং জয়লাভের মূলে কারও কৃতিত্বই কম নয়। তবুও ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কথা এসে পড়েই। সেইদিক থেকে অধিনায়ক ওয়াদেকারের দল পরিচালনা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসে ১ম দিনের খেলার ১ম বলে আবিদ আলির উইকেট লাভ, সারদেশাইয়ের সেঞ্চুরী (১১২ রান), নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় সুনীল গাভাস্কারের ৬৫ ও নটআউট ৬৭ রান, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসে সোলকারের ৪টে 'ক্যাচ' এবং ভেঙ্কটরাঘবন, বেদী, প্রসন্ন ও দুরানীর বোলিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম বলেই উইকেট লাভ

প্রথম দিনের খেলার প্রথম বলেই বোলারের উইকেট লাভ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একটি দুর্লভ ঘটনা। সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনজন বোলার প্রথম দিনের খেলার প্রথম বলেই উইকেট পাওয়ার দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন—১৯২৬ সালে ইংল্যাণ্ডের মরিস টেট, ১৯৩৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার ই এল ম্যাককর্মিক এবং ১৯৭১ সালে ভারতবর্ষের সৈয়দ আবিদ আলী।

এইভাবে উইকেট লাভ ফিল্ডিং দলের খেলায় যেমন শুভ সূচনা অপরদিকে তাদের বিপক্ষ দলের বড় রকমের বিপর্যয়। এই ঘটনায় বিগত তিনটি টেস্ট খেলার ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল তা জানবার কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। ১৯২৬ সালে অস্ট্রেলিয়া এই বিপর্যয় মাথায় নিয়ে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলা ড্র করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে ৪৯৪ রান উঠেছিল এবং এই তিনজন সেঞ্চুরী করেছিলেন—ম্যাকার্টনি (১৫১ রান), উডফুল (১৪১ রান) এবং রিচার্ডসন (১০০ রান)। ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ড এই বিপর্যয়কে কাটিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ৩২২ রানে পরাজিত করেছিল। ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ঘটনা অশুভ হয়েছে। তারা ভারতবর্ষের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দিনের খেলার প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার ঘটনা নীচে দেওয়া হল।

৩য় টেস্ট, লিডস জুলাই ১০, ১৯২৬
বার্ডসলে (অস্ট্রেলিয়া) কট সাটক্লিফ ব টেট (ইংল্যাণ্ড) ০

১ম টেস্ট ব্রিসবেন ডিসেম্বর ৪, ১৯৩৬
ওয়ার্দিংটন (ইংল্যাণ্ড) কট ওল্ডফিল্ড ব ম্যাককর্মিক (অস্ট্রেলিয়া) ০

২য় টেস্ট, ত্রিনিদাদ, মার্চ ৬, ১৯৭১
ফ্রেডারিকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) বোল্ড আবিদ আলি (ভারতবর্ষ) ০

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ

জো ফ্রেজিয়ার বিশ্ব হেভীওয়েট বিভাগের মুষ্টিযুদ্ধে প্রাক্তন বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান ক্যাসিয়াস ক্লে (ওরফে মহম্মদ আলী) পয়েণ্টে পরাজিত করে তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই খেতাবের লড়াইয়ের ১৫ রাউণ্ডে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। দুজনেই আমেরিকার নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা। এই লড়াইকে 'বিংশ শতাব্দীর ওয়াটারলু' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

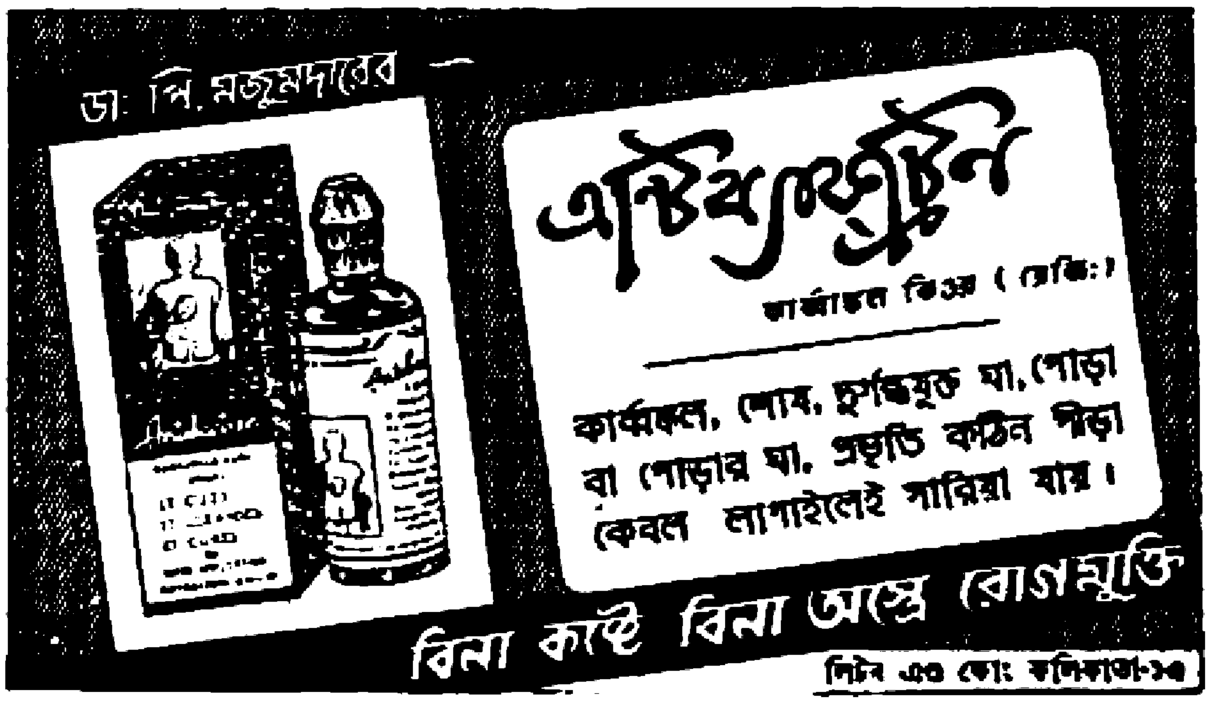

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

'সকালের জলখাবারের সঙ্গে তামা আমি রোজই খাই!'

এ ছাড়াও আছে লোহা, ক্যালসিয়াম, আর আয়োডিন! প্রকৃতপক্ষে, উনি খাবারের সঙ্গে পাচ্ছেন ৮টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজদ্রব্য আর একান্ত প্রয়োজনীয় ১১টি ভিটামিন। একসব উনি পাচ্ছেন মাত্র ১টি ভিমগ্র্যান ট্যাবলেটে।

ভিমগ্র্যানে সব ক'টি ভিটামিন আর খনিজদ্রব্য রয়েছে যা স্বাস্থ্য রাখার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়—ফলে, তা উৎসাহ যোগায়, ক্ষমতা বাড়ায়। যেমন লৌহ, তামা—ঠিকমত রক্ত গড়ে তোলে, কর্মক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া, ভিমগ্র্যানে যেসব ভিটামিন আর খনিজদ্রব্য আছে, তার কল্যাণে ওঁর গায়ের চামড়া সুস্থ থাকে, চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, দাঁত আর হাড় শক্ত হয়।

এখন পাবেন গোল আকারে

ভিমগ্র্যান®
মাল্টিপল ভিটামিন্‌স-মিনারেল্‌স ট্যাবলেট্‌স

মাত্র একটি ভিমগ্র্যান আপনাকে সারাদিন কর্মক্ষম রাখে

SQUIBB®
SARABHAI CHEMICALS

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস। কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL.2130

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৬ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 26th March, 1971 শুক্রবার, ১২ই চৈত্র, ১৩৭৭ 50 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৫৬৪	চিঠিপত্র		
৫৬৬	সাদাচোখে		—শ্রীসমদর্শী
৫৬৮	দেশে-বিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৫৭১	সম্পাদকীয়		
৫৭২	এক নজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৫৭৩	অনুপস্থিতিতে ইচ্ছা	(কবিতা)	—শ্রীবিষ্ণু দে
৫৭৪	সহস্র সেলাম	(কবিতা)	—শ্রীবনফুল
৫৭৫	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫৮৩	অনন্ত মণ্ডলের দুঃখ ও সুখ	(গল্প)	—শ্রীসুধাংশু ঘোষ
৫৮৫	রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার পল্লী		—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৯০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৫৯৮	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৬০৫	কেম্ব্রিজের পথে		—শ্রীঅধীর ঘটক
৬০৭	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৬১১	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৬১৫	অন্তরে অন্তরে	(বড় গল্প)	—শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
৬২১	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
৬২৩	পিঞ্জর	(উপন্যাস)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৬২৬	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৬২৯	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৬৩০	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৬৩২	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৬৩৬	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৬৩৭	খেলার কথা		—শ্রীকমল ভট্টাচার্য
৬৩৮	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক

VANGUARD
JHAMAPUKUR HOSIERY - CAL-9

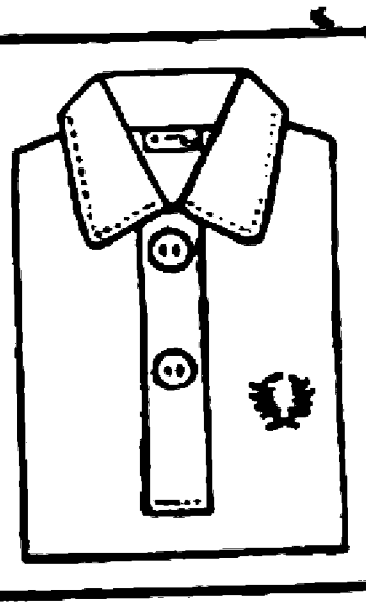

★ COOLTY & TURKISH
★ WHITE & COLOURED
★ ALL SIZES AVAILABLE

JHAMAPUKUR HOSIERY FACTORY (PRIVATE) LTD
22/A, Kalidas Singha Lane, Calcutta-9. 35-4852

চিঠিপত্র

ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের সাহিত্যিক আলেখ্য

এ আমার অভিযোগ নয়, অনুযোগও নয়, শুধু অভিমান মাত্র।

শরৎচন্দ্রের একটা কথা মনে হয়—"এ শুধু নিরীহ স্বজাতির উপর অত্যাচার বই তো নয়!" মুসলমান সমাজের প্রতি আমার প্রচুর শ্রদ্ধা আছে, যে সমাজ থেকে সৈয়দ মুজতবা আলীর আবির্ভাব হয়, সে সমাজ আমার নমস্য।

ভারতীয় খৃষ্টানরা ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সাহিত্যে ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়কে যখন অকারণে অবজ্ঞা করা হয়, তখন নিরুপায় ক্ষেত্রে মনে মনে মরা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

তাই লেখনীর সাহায্য নিয়েছি সুবিচারের আশায়। শ্রদ্ধেয় মনোজ বসুর 'সেতুবন্ধ' যেখানে শশিধর নিজেকে খৃষ্টান বলে পরিচয় দিয়ে বিয়ের দায় এড়াচ্ছে, সেখানে সে যে খৃষ্টান সমাজের চিত্র এঁকেছে সেটা কোন্ খৃষ্টান সমাজ? সে-রকম কোন সমাজ আদৌ আছে কি?

স্বর্গত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁরা কি সেই খৃষ্টান সমাজের লোক? তা যদি না হন, তবে এঁরা কোথা থেকে এসেছেন? এঁদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া কি? সে সমাজের চিত্র তো দেখা যেতে পারে।

কখনও দেখান হয়েছে কি কোন বইএ? 'আধুনিক' নামক সুখপাঠ্য উপন্যাসে সম্মানিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একারণে খৃষ্টান সমাজের প্রতি অত অবজ্ঞা দেখালেন কেন।

তিনি অসাধারণ শক্তিশালী লেখক, আমি তাঁর লেখার মুগ্ধ ভক্ত, হাস্যরস তো অন্য পথেও আনা যেত। বিশেষ তাঁর লেখনী তো যে কোন পথেই হাসির স্রোত বওয়াতে পারে।

অকারণে কাউকে আঘাত দেবার কি প্রয়োজন আছে তাঁর?

সুসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী মহোদয় 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে কি তাঁদের প্রতি সুবিচার হয়েছে?

যাঁরা আপনাদের সমাজ থেকে শুধু ধর্মমতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সামাজিক প্রথা, আচার-ব্যবহার সব কিছুতেই আপনাদের অনুসরণ করছে, তাদের নিয়ে সত্যিকার সাহিত্য রচনা করা যায় কিনা, সে চেষ্টা তো কখনও করেননি।

শরৎচন্দ্রের 'ভারতী' যে সম্মান পেয়েছেন, আর কোন নায়িকা সে সম্মান পেতে পারেন কিনা, তা তো কেউ বিচার করেন নি।

শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্করের আমি ব্যক্তিগতভাবে চেনবার পাইনি, ধৃষ্টতা তাই মনে করি।

সুবিচার পাওয়া গেছে তাঁর 'কীর্তিহাটের কড়চায়।' সেখানে তিনি খৃষ্টান সমাজের যে চিত্র এঁকেছেন, সেটাই এই সমাজের যথার্থ চিত্র।

শিক্ষায়, আভিজাত্যে, বংশমর্যাদায় যে কোন ভারতীয় জাতির সঙ্গে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বহুজনই সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে।

তাদের সমাজের চিত্র সাহিত্যের একটা নূতন দিক উদ্ঘাটন করতে পারে। যা নিয়ে কখনও সাহিত্য হয়নি, এই দিকে দৃষ্টি দিলে সাহিত্য লাভবান হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

আবদুল জব্বার, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, আর আমাদের শ্রদ্ধেয় মুজতবা আলী সাহেব তো আছেনই, যেমন অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন সাহিত্যে প্রতিফলিত করে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন, তাকে বহু নূতন অলঙ্কারে সাজিয়েছেন, খৃষ্টান সমাজের চিত্রও তেমনি সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনতে পারবে, এটা অবধারিত সত্য।

মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়
সেণ্ট জনস্ ডায়োসেশন গার্লস
হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল,
কলকাতা-২০

তোমাকে প্রসঙ্গে

আমি বহুল সমাদৃত প্রগতিশীল সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এ পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস, গল্প ও বিবিধ বিষয়ক রচনাদি আমার মনকে সত্যিই আনন্দে অভিভূত ও মুগ্ধ করে। এবারে শ্রীনিমাই ভট্টাচার্যের নতুন চিন্তাধারার উপন্যাস 'তোমাকে' পড়ে আসছি এবং খুব ভালো লাগছে। দারুণ আনন্দের সাড়া জাগাচ্ছে আমার মনে এই উপন্যাসের ঘটনাগুলি। তাছাড়া এর রচনাশৈলীও অত্যন্ত সুন্দর। ভাষা পরিষ্কার, সহজ, সুন্দর ও সাবলীল। এ রকম সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চিন্তাধারার উপন্যাসের জন্যে শ্রদ্ধেয় লেখক ও আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

সুশীলকুমার দত্ত,
বলরামপুর,
পুরুলিয়া

মহাপ্রভুর আবির্ভাব কোথায়?

প্রত্যেকেই জানেন যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু বঙ্গদেশের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত আবির্ভাবভূমি নবদ্বীপ নয়। পীঠভূমি শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। এজন্যে ঢাকাদক্ষিণকে বৈষ্ণব-শাস্ত্র মতে "গুপ্ত বৃন্দাবন ধাম" বলা হয়।

"কৈলাশ সান্নিধানেষু গুপ্তবৃন্দাবনং মহৎ।
ইক্ষুনাম্নী চ তৎপূর্বে কালিন্দী সদৃশী নদী।।"
—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী।"

কৈলাশ গিরির (বর্তমান আমুড়ার উচ্চ টিলা) সন্নিকটে গুপ্তবৃন্দাবন ধাম নামক এক মহৎ স্থান আছে। তার পূর্বদিকে যমুনার মতো ইক্ষুনাম্নী নদী প্রবাহিত। এই বিশিষ্ট স্থান শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রাম, আর ইক্ষু নদী কুশিয়ারা নামে পরিচিতা।

"বৃদ্ধ গোপেশ্বর স্তত্র দক্ষিণস্যাদিশি স্থিতঃ।
শিব গঙ্গা সমীপে চ বাঞ্ছিতার্থ প্রদায়কঃ॥"

সেই গুপ্তবৃন্দাবন অর্থাৎ ঢাকাদক্ষিণ গ্রামের দক্ষিণে শিবগঙ্গা নদীর তীরে বাঞ্ছাকল্পতরু বৃদ্ধ গোপেশ্বর শিব বিরাজিত। শ্রীহট্ট শহর থেকে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গোলাপগঞ্জ থানার এলাকাধীন ঢাকাদক্ষিণ গ্রাম। গ্রামের নামানুসারে পরগণার নামও ঢাকাদক্ষিণ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নবদ্বীপে ভূমিষ্ঠ হলেও এই ঢাকাদক্ষিণেই তিনি তাঁর মাতৃজঠরে প্রবেশ করেছিলেন এবং পিতামহী শোভাদেবীকে স্বপ্নযোগে আপন আগমন বার্তা ব্যক্ত করেছিলেন। স্বপ্নাদিষ্টা শোভাদেবী পুত্র জগন্নাথকে বধূ শচীদেবী সহ নবদ্বীপে গমনের আদেশ দিলেন।

"পিতৃভ্যাস্তু সমাদিষ্টো জগন্নাথো দ্বিজোত্তমঃ।
প্রয়াণং কর্তুমুদ্যুক্তো ভার্যামাপন্ন গর্ভিণী।।"

দ্বিজবর জগন্নাথ মিশ্র পিতামাতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সন্তানসম্ভবা পত্নীকে নিয়ে নবদ্বীপে যেতে উদ্যত হলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই পুণ্যভূমি ঢাকাদক্ষিণেরই কন্যা ছিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পত্নীদ্বয়। তবে প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর জন্ম হয়েছিল ঢাকাদক্ষিণে এবং দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্ম হয়েছিল নবদ্বীপে। লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভাচার্য ও পিতামহ মাণিক্য মিশ্র এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা রাজপণ্ডিত সনাতন

চিঠিপত্র

মিশ্র ও পিতামহ দুর্গাদাস মিশ্র সবাই মহা-পাণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়া মহাপ্রভুর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন, রত্নগর্ভ আচার্য, নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ জগদীশ তর্কালঙ্কার, মধু-নাথ তর্কচঞ্চু, কবি জয়ানন্দ মিশ্র, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, মাধবাচার্য, বেদান্ত কেশরী গঙ্গারাম শিরোমণি প্রমুখ এই চাকদা-বাসীগণেরই সন্তান ছিলেন। তাঁরা একদিন গোটা নবদ্বীপে এবং বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করেছিলেন।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিবাহের বিখ্যাত ঘটকদ্বয় বন-মালী মিশ্র এবং কাশীনাথ মিশ্র এই গ্রামেরই সন্তান ছিলেন।

সুরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ
কীডগঞ্জ, এলাহাবাদ।

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য

'অমৃতে'-এ উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য নিয়ে লেখা দেখলাম। পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের সম্পদ প্রচুর। এদের বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। সেগুলিকে লেখক একত্রে উপস্থাপিত করে দারুণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উত্তর-বঙ্গের একজন বাসিন্দা হয়ে লেখকের এই কাজের জন্য আমি লেখককে আমার আন্ত-রিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি এ চিঠি প্রকাশিত হয়ে লেখককে উৎসাহিত করবে।

নিখিলেশ মিশ্র।
সুলতানগঞ্জ,মালদহ

'শূন্য' ও দেবল দেববর্মা

আমি একজন অমৃতের নিয়মিত পাঠিকা না হলেও মাঝে মাঝে অমৃত হাতের কাছে পেলে পড়তে কিন্তু ছাড়ি না।

সেদিন ৪১ সংখ্যার (১৩৭৭) অমৃতটা পড়ছিলাম। ঐ সংখ্যার শ্রীদেবল দেববর্মা মহাশয়ের 'শূন্য' গল্পটি পড়লাম। গল্পের এক জায়গায় লেখক লিখেছেন—'এই বড়-দিনের ছুটিতে পুরী আর কোনারকে রাজিয়া তিন্ড।' অর্থাৎ গল্পের নায়ক-নায়িকা দম্পতি এবং রাজিকা ২৫শে ডিসেম্বরে বেড়াতে গেছেন। কিন্তু তার-পরই আর এক জায়গায় লেখক লিখছেন—'বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। কাচের ঘর বলে ভিতর থেকে বোঝা যায় না। কার্তিকের শেষে এই অবস্থা পোষ-মাঘে নিশ্চয় বুকের ভিতর গুর-গুর করে কাঁপে।' এখানে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, কার্তিক মাসে ও'রা বেড়াতে গেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে—কার্তিক বলতে ইংরাজীর অক্টোবর। এবং বড়দিন বলতে ২৫শে ডিসেম্বর, বাংলায় পোষ মাস বোঝায়। সুতরাং কার্তিকের সঙ্গে বড়দিনের কোন প্রশ্নই উঠে না। এটা কি একটা অসম্ভব কল্পনা নয়? লেখক লেখাটিকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করতে গিয়ে উপমাস্বরূপ কার্তিক মাসকে বেছে নিয়েছিলেন। উহাতে বরং লেখাটা আরো ছেলেভুলোনো হয়ে গেছে।

অবশ্য এ-চিঠি অমৃতের পাতায় আদৌ ছাপা হবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহাকুল। কেননা প্রায় ক্ষেত্রে প্রশংসাহীন পত্রের আস্তাঁকুড়েই ভাল স্থান হয়। কিন্তু যদি প্রশংসাপত্র হয়, তবে তা দু-লাইনেরই

আগামী সংখ্যা থেকে
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে
যশস্বী ঔপন্যাসিক
শ্রীপ্রমথনাথ
বিশীর
নতুন আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস
পূর্ণাবতার

হোক আর চার লাইনেরই হোক তাকেই সর্বাগ্রে ছাপানো হয়। এই বক্তব্যটুকু শুধু আমার নয়, এইরকম আমার মত বহু সমালোচকের।

জিনারা খাতুন, হুগলী,
চুঁচুড়া

লেখকের উত্তর

পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আমার লেখা 'শূন্য' গল্পটি (অমৃত ১০ম বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা) তিনি যে মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তা বুঝতে পারছি। যে ভুল-ত্রুটি পত্র-লেখিকা খুঁজে পেয়েছেন, সেটি নিঃসন্দেহে তাঁর সচেতন পাঠিকা মনের পরিচয়।

ভুল ঠিকই। তবু চিঠি পড়ে একটা পুরোনো কথা আমার মনে পড়ে গেল। নিছক কাহিনী হিসেবে এটি পরিবেশন করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে। মেঘনাদ বধ কাব্য রচনার পর বিদ্যাসাগর বলেছিলেন,—এখানে সেখানে কিছু ব্যাক-রণের ভুল আছে, পরে শুধরে নিলেই ঠিক হবে। কথাবাহুল্য মধুসূদন শুনে মধু-সূদন দুঃখিত হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না. একদা বর্ষাকাল। ঘনঘটায় আকাশ কালো করে বৃষ্টি এল। মাইকেল পথে হাঁটছিলেন। বৃষ্টি দেখে পাশেই একটা মুদীর দোকানে আশ্রয় নিলেন। ভিতরে কয়েকজন লোক সুর করে কি যেন পড়ছিল। মাইকেল বুঝতে পারলেন, ওটি তাঁর বই। মেঘনাদ বধ কাব্য। কৌতূহলী কবি শুধোলেন,—বইটা আপনাদের কেমন লাগছে? তারা বলল,—ভালই। মাইকেল তখন বললেন,—ওতে কিছু ব্যাকরণের ভুল আছে না? কি জানি মশাই, তারা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল। ও ব্যাকরণ-ট্যাকরণ বুঝিনে। আমরা মেঘনাদ বধ কাব্য পড়ছি। আমাদের হাঁড়িছড় ভাল লাগছে। আনন্দে উত্তেজনায় মাইকেল সেই অঝোর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরলেন।

বর্তমান চিঠি পড়ার পর আরো দু-একজন পাঠক-পাঠিকাকে আমি শুধিয়েছি। বড়দিন আর কার্তিক মাসের এই ফাঁকটুকু কেন তাদের চোখে পড়ল না। কেউ কেউ বললেন,—অমৃতে আমরা গল্প পড়ি। ভালো লাগলে শুরু থেকে শেষ অব্দি এক হয়ে যায়। কোনো ফাঁকই আর মনে থাকে না।

তবু পত্র লেখিকার প্রশংসা করব। তার মত মনোযোগী পাঠিকা যে কোনো লেখকেরই কাম্য এবং গর্বের বস্তু।

দেবল দেববর্মা
কলকাতা

নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে

বঙ্গজননীর, দেশী বাজার, সর্বাঙ্গ-স্তাবক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাবে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ঐতি-হাসিকেরা—আমরা শুধু মাত্র কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি।

মুসলিম ধর্ম এবং তার [illegible] কথা আমরা বাইরে থেকেও জানি। কিন্তু তার অন্তঃকর্ম এবং যা রীতি সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম না। একজন লেখক মুসলমান চরিত্র উপন্যাসে পেয়েছি (যেমন, [illegible] বা [illegible] মনে রেখেও) সবই বাহিক। অতীন বন্দ্যো যে সার্থকতার প্রমাণ দেখান মুসলমান সমাজের পরিচয় দিয়ে, তাকেও ধন্যবাদ।

বিন্দু চক্রবর্তী
চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান

শাদা চোখে

কোন একটা বিশেষ থিয়োরীর সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ফলাফলের বিশ্লেষণ করা যায় না। জেলায় জেলায় যে বিভিন্ন মনোভাব কাজ করেছে ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অনায়াসে তা বোঝা যায়। তবে এই নির্বাচন থেকে কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমত, কোন দল বা ফ্রন্টই একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সমর্থ হয়নি। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস আবার পুনর্জীবন লাভ করেছে। সেই সঙ্গে অনেকগুলি দল রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে, রাজনৈতিকভাবে সঙ্কোচকরণের একটি ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। একদিকে যেমন শাসক কংগ্রেস সগৌরবে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনিভাবে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলও বামপন্থী মনোভাবের জনতা বা কংগ্রেস বিরোধী মনকে বিপুলভাবে নিজেদের অনুকূলে টেনে নিতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু তবুও ছোট ছোট অনেকগুলি দলের ভূমিকা যে একেবারে শেষ হয়ে গেছে বলা চলে না। বরং, তাদের কদর অনেকখানি বেড়ে গেছে বললে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এবার ঝাড়খণ্ড ও জনসঙ্ঘ রাজ্য রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হলেন। আর মুসলিম লীগ তার শক্তি দ্বিগুণ করে নিতে পারলো।

নির্বাচনের ফলাফল হচ্ছে এরকম: মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ১১১, তাঁদের ফ্রন্টের যে পাঁচটি দল মিলিত হয়ে বড়বাদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সেই বামপন্থী ফ্রন্টের আর সি পি আই (কুমার দল) পেয়েছেন ৩টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক পেয়েছেন ২টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ২ এবং বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস একটি। তাদের আর একটি অংশীদার বলশেভিক পার্টি (আচার্য গ্রুপ) একটিও আসন পায়নি। এই ফ্রন্টের সমর্থিত ৪ জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ফলে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সহ এই ফ্রন্টের মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১২০।

শাসক কংগ্রেস একলা চলার নীতি নিয়ে লড়ে পেয়েছেন মোট ১০৫টি আসন। আদি কংগ্রেস ২টি আসন পেয়েছেন।

অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস গণতান্ত্রিক সংহতি নাম দিয়ে লড়েছেন। এই লড়াইয়ে বাংলা কংগ্রেসের সাথী ছিল এস এস পির ডুপ্লেক্স, সোস্যালিস্ট পার্টি, বিদ্রোহী পি এস এস পির বিদ্রোহী অংশ, এবং বলা যেতে পারে, পি এস পিও। এই জোটে বাংলা কংগ্রেস ৫, বিদ্রোহী এস এস পি ১ ও পি এস পি ৩টি আসন লাভ করেছেন। সোস্যালিস্ট পার্টি একটিও আসন পায়নি। বলতে গেলে এই গ্রুপ মোট ৯টি আসন পেয়েছেন। মুসলিম লীগ এককভাবে ৭টি, ঝাড়খণ্ড ৪টি, জনসঙ্ঘ ১টি আসন পেয়েছেন। উৎকল খণ্ড দল কোন আসন লাভ করতে পারেনি।

এখন সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কথায় আসা যাক। এই ফ্রন্টে ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি, গুর্খা লীগ, এস এস পি, আর সি পি আই (দাস গ্রুপ) ও বলশেভিক পার্টি (মুকুটমণি অংশ)। এঁদের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টি পেয়েছেন ১৩টি আসন, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩টি, এস ইউ সি ৭ এবং গুর্খা লীগ ২টি। অন্য কোন অংশীদার একটিও আসন লাভ করতে পারেননি।

এছাড়া একা লড়ে আর এস পি ৩টি আসন রাখতে সমর্থ হয়েছে। অনুরূপভাবে লড়াই করে পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

রাজ্য বিধান সভার ২৭৭টি আসনে নির্বাচন হয়েছে। প্রার্থী নিহত হওয়ার ফলে ৩টি আসনে—যথাক্রমে উখরা, শ্যামপুকুর ও দমদম কেন্দ্রে—নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এই আসনগুলির সদস্যদের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বামপন্থীদের যদি একত্রে ধরা যায় তাহলে এখনও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আরও যদি ব্যাপক অর্থে ধরা যায় তবে কংগ্রেস বিরোধীদের সংখ্যা আরও একটু বেশী বলা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও বলতে হয় যে '৬৯ এর মধ্যবর্তী নির্বাচনে বামপন্থীরা বা যুক্তফ্রন্ট যে হারে আসন লাভ করেছিল সংখ্যার দিক দিয়ে তা এবারে বেশ কমে গেছে। গতবারের যুক্তফ্রন্টের আসন ছিল ২১৪টি। আর এবার হচ্ছে সেই সমস্ত শরিকদের মোট আসন ১৫১। অন্যদিকে অবিভক্ত কংগ্রেসের ছিল মাত্র ৫৫টি। আর এবার একমাত্র শাসক কংগ্রেস পেয়েছে ১০৫টি। কাজেই সি পি এম-এর শক্তি বাড়লেও একথা পরিষ্কারভাবে বলা যায় বামপন্থীদের মিলিত শক্তি এবার অনেক হ্রাস পেয়েছে। কেন এমনটা ঘটল? উত্তর এক কথায় বামপন্থীদের মধ্যে বিভেদ। আর বিভেদ হল কেন? এর উত্তরও এক কথায় দেওয়া যায়। তবে পাঠকদের অনুরোধ করবো যুক্তফ্রন্টের ইতিহাস ও সরকার পতনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখতে।

অনেকেই বলেছেন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন জোরদার করার ফলেই মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা বেশী সংখ্যক আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছেন। এটা কিছুটা ঠিকই, তবে কংগ্রেসগুলির মধ্যে বিভেদও অন্যতম কারণ। শাসক কংগ্রেসের স্ট্র্যাটেজি ছিল, আদি কংগ্রেসকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিপন্ন করে কংগ্রেসের সমস্ত ট্র্যাডিশনাল ভোট অনুকূলে টেনে নেওয়া। শতকরা ৯০ ভাগ অংশে এই কৌশল কাজ করেছে। কিন্তু যে দশ ভাগে কাজ করেনি, সেই দশভাগই শাসক কংগ্রেসকে একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হতে বাধার সৃষ্টি করেছে। বাংলা কংগ্রেসের ভূমিকা শাসক কংগ্রেসকে জয়ী হতে অনেকাংশে যেমন সাহায্য করেছে তেমনি অনেকগুলি আসনে পরাজিতও করেছে। বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জির প্রচারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—সি পি এমকে ভোট দেবেন না। অর্থ হচ্ছে, অন্যদের মধ্য থেকে পছন্দসই উপযুক্ত প্রার্থী বেছে নিন।

বামপন্থীদের প্রচারের মূলসূত্র দাঁড়িয়েছিল এই যে, ইন্দিরাজী পরিচালিত কংগ্রেসের স্থান আসলে বামপন্থীদের মধ্যে। ফলে, সি পি আই পরিচালিত ফ্রন্ট বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। সংগঠন যেখানে জোরদার ছিল সেইখানে আসনগুলি রাখতে পেরা গেছে। আর যেখানে শানিকটা জনমতের উপর নির্ভর করতে হয়েছে সেখানেই অঘটন ঘটেছে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের সংগঠন ছিল। তদুপরি তাঁরাই যে কংগ্রেসের বিকল্প দল—কি

সরকার গঠনের জন্য, কি বিরোধী ভূমিকার জন্য একথা প্রমাণ করতে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। ফলে কংগ্রেস বিরোধী জনতার বিশেষ অংশকে তাঁরা সঙ্গে নিতে সমর্থ হয়েছেন। শুধু কৃষক ও শ্রমিক তাঁদের অনুকূলে গেছে একথা বলা ঠিক হবে না। কারণ, কয়েকটি আসন ছাড়া প্রায় সমস্ত আসনেই সি পি এম-এর বিরোধী প্রার্থীরা সম্মিলিতভাবে দেখলে অনেক বেশী ভোট পেয়েছেন। অতএব কৃষক, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা ভূমিহীন বাঁরা অন্যদের সমর্থন জানান নি একথা যুক্তিসহ নয়।

একমাত্র মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া আর অন্য সমস্ত দল অনেক দেরীতে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। বস্তুত-পক্ষে বলতে গেলে যেদিন এই রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল সেদিন থেকেই সি পি এম আর একটি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপই ছিল একেবারে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার জন্য সংহতি-করণের প্রচেষ্টা। তাঁদের সেই নিরলস চেষ্টা খানিকটা ফলপ্রসূ হয়েছে একথা সত্যি। কিন্তু আংশিক সাফল্য রাজনীতির অভিধানে ঠিক ফলপ্রসূ বলে ধরা হয় না।

অন্যদিকে শাসক কংগ্রেস শেষ অবধি ফ্রন্ট করবেন কি করবেন না এই প্রশ্নে দোদুল্যমান ছিলেন। যখন একা আসরে নামলেন তখন নদীর জল অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে ও পরবর্তী অধ্যায়ে গণমনে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল—সেই ভাবটা কংগ্রেসের অনুকূলে গেছে, এবং ইন্দিরাজীর যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে, তা মানুষের এই বিরূপ মনোভাবকে একটি বাস্তব রূপদানে সাহায্য করেছে। ফলে, সংগঠন জোর না থাকলেও শাসক কংগ্রেস এই রাজ্যে এত অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে।

সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বক্তব্য ছিল, কংগ্রেস প্রধান শত্রু। আর সি পি এম হঠকারী। কিন্তু সি পি এম হঠকারী এ বক্তব্য দেখা যাচ্ছে সকলের বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। ফলে, সি পি আই পরিচালিত ফ্রন্টের প্রতি যথেষ্ট সংখ্যক কংগ্রেস বিরোধীদের সমর্থন আসেনি।

এই পটভূমিকায় প্রেসিডেন্ট শাসনের অবসান করার জন্যে মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড় চলছে। অদ্যাবধি এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সি পি এম ও তার সহযোগীরা সরকার গঠন করতে পারছেন না। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৭ সালেই এই রাজ্যে প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। সেবারও বামপন্থীরা এবারের মত দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুই ফ্রন্ট এক ফ্রন্টে মিলিত হয়ে রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কংগ্রেসও ১২৭টি আসন পেয়ে বিরোধী দলে বসবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের নেতারা সেদিন বলে-ছিলেন যে যেহেতু জনতা কংগ্রেসকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে বঞ্চিত করেছে অতএব, কংগ্রেস বিরোধী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। সেই মুহূর্তে কংগ্রেস তাঁদের সমধর্মী মানুষদের বিরোধী শিবির থেকে আনায় কোন চেষ্টা না করেই মহা-করণের শাসনভার বামপন্থী দলগুলিকে ছেড়ে দিয়েছিল। এবার কিন্তু ভিন্ন চিত্র দেখা যাচ্ছে।

সি পি এম ও তার সহযোগীরা ১২৩ আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছেন। এমন কি তাঁদের নেতারা সরাসরি মন্ত্রিত্ব গ্রহণে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্য-পালকে চিঠিও দিয়েছেন। অন্যদিকে কংগ্রেসও সক্রিয়। তাঁরা এবার সি পি এমকে আর ক্ষমতায় যেতে দিতে নারাজ। তাই কোয়ালিশন হোক বা সমর্থনে হোক সরকার গড়তে বদ্ধপরিকর। তাঁদের প্রচেষ্টা যে সার্থক হতে চলেছে ইতিমধ্যেই তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সি পি এম-এর সঙ্গে সকল বামপন্থীরা যেতে ইচ্ছুক নয় কেন? যদি যেত তবে বামপন্থী সরকার ত এক মিনিটেই গঠিত হতে পারতো।

নির্বাচনের আগে, যুক্তফ্রন্টের সরকার থাকাকালে, এমন কি নির্বাচনের পরও বিরোধী দল এবং সমভাবাপন্ন দলগুলির প্রতি তাঁদের ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার গঠনের পথে প্রধান অন্তরায়। অর্থাৎ যে কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল সেই সমস্ত কারণ দূরীভূত হওয়া ত দূরের কথা বরং অনেকাংশে বেড়ে গেছে। একমাত্র অন্তর্বাদের শরীকরা ও আর এস পি, সি পি এমকে সোজাসুজি সাহায্য করতে পারত। কিন্তু কোন দলই একথা বলেননি যে সি পি এম সরকার গঠন করলে তাকেই সাহায্য করবেন। শাসক কংগ্রেসকে সরকার গঠনে সহায়তা না করার অর্থ সি পি এমকে মদৎ দেওয়া নয়। আর এস পি বলেছেন, রাজ্যে যদি কোন বামপন্থী সরকার গঠিত হয় তবে সে দল ঐ সরকারকে সমর্থন করবে, কিন্তু সরকারে অংশীদার হবে না। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে সি পি এমকে আর-এস-পি কোন নিঃশর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেন নি। অন্তর্বাদের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টি শাসক কংগ্রেসকে সোজাসুজি কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকার গঠনের কার্যে সহায়তা করার কথা ঘোষণা করেছেন। ফলে, রাজ্যের রাজনীতিতে এক নয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এস-ইউ সি অবশ্য কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতা করার কথা ঘোষণা করে উভয় ও ইউ এল ডিএফ সম্মিলনে এক নূতন বামপন্থী গণ-তান্ত্রিক সরকার গঠন করতে চান। এই প্রস্তাব সফল না হলে তাঁদের নীতি কি হবে সেকথা অদ্যাবধি সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি।

নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সি-পি-এম অন্যান্য বামপন্থীদের ইন্দিরার সহায়তাকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্ত-র্বাদের শরীকরা যদিও আদর্শনৈতিক সম-ঝোতা করতে চান নি—আর এস পি কিন্তু তা চেয়েছিলেন। কিন্তু সি পি এম নেতারা তাঁদের দলের কেরালা শাখার কথা উল্লেখ করে আর-এস-পি সম্বন্ধে শত্রুতা অব-লম্বন করেছেন। নির্বাচনে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা না পাওয়ার পর সি পি এম অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে গণতান্ত্রিক দল বলে অভিহিত করে—সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এখন যদি সি পি এমের সঙ্গে এই সমস্ত দল সরকার গঠন করতে যান, তবে শ্রীঅজয় মুখার্জি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার পর এঁরা তখন বামপন্থী সর-কার গঠন করেন নি কেন? তখন যদি করতেন তবে আর একটি নির্বাচনের ঝুঁকি নিতে হত কি? এখন কেউ কেউ নিমরাজী হওয়া সত্ত্বেও এ সমস্ত দল চিন্তা করছেন যে, সি পি এম-এর এ আহ্বান তাঁদের পক্ষে কতোটুকু গ্রহণীয়।

সাময়িক বিচ্যুতি ঘটলেও কম্যুনিস্ট পার্টি কিন্তু একই নীতি-নির্ভর হয়ে চল-ছেন। শাসক কংগ্রেসকে তাঁরা প্রথমেই প্রগতিশীল বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং সেই অনুসারে 'হঠকারী' সি পি এম এবং অন্যান্য 'প্রতিক্রিয়াশীল'দের পরাস্ত করার জন্য তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটি শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমঝোতা করার উপর জোর দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই নেতৃত্বও মোটামুটি এই মত পোষণ করছিলেন, কিন্তু দুটি কারণে তাঁরা তাঁদের এই নীতি পশ্চিমবঙ্গে চালু করতে পারেন নি। প্রথমত তাঁদেরও ধারণা ছিল কংগ্রেসের শেষ হয়ে গেছে। এই রাজ্যে বাম-পন্থীদের এতই প্রাধান্য যে দুর্ভ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালে হয়ত অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যেতে পারে। আর দ্বিতীয়ত শরীক দলগুলির চাপে পড়ে কম্যুনিস্ট পার্টিকে সর্বভারতীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হতে হয়ে-ছিল। নির্বাচনের পরে দেখা যাচ্ছে তাঁদের সর্বভারতীয় নীতি অভ্রান্ত ছিল। শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা হলে আজকে শাসক কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টি যে একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতো সেই কথা সহজেই বলা যায়।

যা হোক সি পি আই-এর সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করল। তাঁদের নেতা শ্রীভবানী সেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, সি পি এম-এর রাজনীতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপন্থী। কাজেই এ হেন দলের সঙ্গে সরকার গঠন অসম্ভব।

ফলে রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পথ সহজ হয়ে গেছে।

[—বসুমতী

CENTRAL LIBRARY

দেশ বিদেশ

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দলের অভূতপূর্ব সাফল্য ইন্দিরা-বিরোধী শিবিরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে এবং ভারতবর্ষের যেসব রাজ্যে ইন্দিরা-বিরোধী জোট ক্ষমতার আসনে রয়েছে সেসব রাজ্যে এই ঘটনার জের চলেছে। ইতিমধ্যে একটি রাজ্যে বিরোধী কংগ্রেস দলের মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে এবং আরও অন্তত দুটি রাজ্যে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিরোধী কংগ্রেস দলের সভাপতি শ্রী নিজলিঙ্গাপ্পার নিজের রাজ্য মহীশূরে এবার নির্বাচনের ফল বিরোধী কংগ্রেস দলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিয়েছে। সেখানকার লোকসভার সব কয়টি আসনে শাসক কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এই ফলাফল ঘোষিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐ রাজ্যের বিরোধী কংগ্রেস মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র পাটিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, তাঁর দলকে শাসক কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি দলের নেতাদের কাছে প্রস্তাব দেবেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, তাঁর দলের সদস্যরা নেতাদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন। এদল ছেড়ে ওদলে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। একসঙ্গে চারজন মন্ত্রী ও বিধানসভার আরও যোলজন সদস্য বিরোধী কংগ্রেস ছেড়ে শাসক কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এর ফলে ২০৪ জন সদস্যের বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র ৯৬। শাসক কংগ্রেস দল মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী করল। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপাটিল বিধানসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী প্রতিপন্ন করার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করে অবশেষে পদত্যাগ করলেন। শাসক কংগ্রেস দল এখন মহীশূরে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করছে। লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস দল যে পুঁজি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে সেই পুঁজি ভাঙিয়ে তারা একটি রাজ্যে এই প্রথম সুবিধালাভ করতে চলেছে।

শাসক কংগ্রেস দলের সঙ্গে বিরোধী কংগ্রেসের সংযুক্তির কথা উঠেছে উত্তর প্রদেশেও। সেখানেও একজন দুজন করে বিরোধী কংগ্রেস এম-এল-এ দেয়াল টপকাতে আরম্ভ করেছেন। তাই দেখে রাজ্যে বিরোধী কংগ্রেসের নেতারা প্রস্তাব দিচ্ছেন, এভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার চেয়ে সদলবলে শাসক কংগ্রেসে যোগ দিলে হয়ত কিছু মূল্য আদায় করা যেতে পারে। উত্তর প্রদেশে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা থেকে গত কয়েকদিনে তিনজন ডেপুটি মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। এই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ত্রিভুবননারায়ণ সিং গত জানুয়ারী মাসে মণিরাম উপ-নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই পদত্যাগ করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর বদলে কে নেতা হবেন সেটা সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিকরা কিছুতেই স্থির করতে পারছে না।

সংযুক্ত বিধায়ক দলের অন্যতম শরিক সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশী অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এই দলের এস এম যোশী খোলাখুলিই বলেছেন যে, বিরোধী কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে এস-এস-পি যে ভুল করেছিল নির্বাচনে বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে তাদের সেই ভুলের মূল্য দিতে হয়েছে। পার্টির আর একজন নেতা মধু লিমায়ে বলেছেন যে, নির্বাচনে আসন ভাগাভাগির উদ্দেশ্য নিয়ে যে চতুর্দল জোট গঠন করা হয়েছিল সেই জোট নির্বাচনের শেষে আপনা-আপনিই ভেঙে গেছে। এদিকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক জর্জ ফার্নান্ডেজ নির্দেশ পাঠিয়েছেন, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি এস-ভি-ডি মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসুক। এস-এস-পি বেরিয়ে এলে এই দুই রাজ্যে মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখা যাবে না।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এস-এস-পি দলভুক্ত কর্পূরী ঠাকুরও জর্জ ফার্নান্ডেজের মত সমর্থন করেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তিনি চাইছেন, পার্টি সম্মেলনে এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা হোক। ইতিমধ্যে, বিহারে শাসক কংগ্রেস ও সি-পি-আই কর্পূরী ঠাকুর মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী করেছেন।

গুজরাটে হিতেন্দ্র দেশাইয়ের মন্ত্রিসভার অবস্থাটা তুলনামূলকভাবে একটু ভাল। সেখানে বিরোধী কংগ্রেসের একদলীয় সরকার রয়েছে এবং দলের মধ্যে বড় রকমের কোন ভাঙ্গন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু শাসক কংগ্রেস দল শ্রীদেশাইয়ের মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

*

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে পঞ্চম লোকসভা গঠিত হয়েছে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশের নূতন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করেছেন। এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে লোকসভার সদস্যরা তাঁদের অধিবেশন আরম্ভও করে দিয়েছেন।

১০ জন পূর্ণ মন্ত্রী, ১৫ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও আটজন উপমন্ত্রী, এই মোট ৩৬ জনকে নিয়ে গঠিত নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই মন্ত্রিমণ্ডলী এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যাতে ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন, এই দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। নূতন মন্ত্রিসভার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি হল :—(১) সাতজন পুরানো ক্যাবিনেট মন্ত্রী বাদ গেলেন এবং নূতন পাঁচজন এলেন (২) শ্রীমতী গান্ধীর প্রবীন সহকর্মীদের দপ্তর অপরিবর্তিত রইল এবং (৩) বিদায়ী মন্ত্রিমণ্ডলীর তুলনায় এবার ১৯ জন কম সদস্য রইলেন।

ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদ থেকে যাঁরা বাদ গেলেন তাঁরা হলেন দীনেশ সিং, গুলজারিলাল নন্দ, বলীরাম ভগৎ, ডাঃ ত্রিগুণা সেন, ডাঃ ভি কে আর ভি রাও, ডি সঞ্জীবায়া ও কে রঘুরামায়া। বিদায়ী মন্ত্রিসভার আর একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী সত্যনারায়ণ সিংহ মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়ায় এবারকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। নূতন যাঁরা পূর্ণমন্ত্রী হয়ে এলেন তাঁরা হলেন :—প্রাক্তন কমুনিস্ট নেতা মাদ্রাজ রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের প্রাক্তন চেয়ারম্যান (ও বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী) মোহন কুমারমঙ্গলাম, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, প্রাক্তন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও বোম্বাই হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এইচ আর গোখলে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও নেপালে প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রাজ বাহাদুর ও আসামের মইনুল হক চৌধুরী।

শ্রীমতী গান্ধীর চারজন প্রবীন সহকর্মী ওয়াই বি চাবন, জগজীবন রাম, স্বরণ সিং ও ফকরুদ্দিন আলি আমেদ আগের মতোই যথাক্রমে অর্থ, প্রতিরক্ষা,

পররাষ্ট্র, এবং খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ভার নিয়ে থাকবেন।

মন্ত্রিমণ্ডলীতে ১৯ জন সদস্যের আসন খালি রাখায় অনুমান করা হচ্ছে যে, পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষ হলেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করবেন। সেসময়ের দপ্তরের কিছু পুনর্বণ্টনও হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে, এবার লোকসভায় যেসব নূতন সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এখনও খোঁজ-খবর নিতে পারেন নি। অনুমান করা হয়েছে যে, পার্লামেন্টের অধিবেশনে এই সব সদস্যের কর্মক্ষমতা দেখে প্রধানমন্ত্রী আরও কিছু নূতন লোককে মন্ত্রিমণ্ডলীতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।

যাঁরা মন্ত্রিসভা থেকে বাদ গেলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত একজনের জন্য নূতন দায়িত্ব ঠিক হয়ে গেছে। তিনি হলেন ডি সঞ্জীবায়া। স্থির হয়েছে যে, তিনি জগজীবন রামের কাছ থেকে শাসক কংগ্রেস দলের সভাপতির কর্মভার গ্রহণ করবেন। নূতন মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার পর শ্রীরাম কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

পঞ্চম লোকসভার অধিবেশন ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই লোকসভায় বিরোধী পক্ষের অত্যন্ত করুণ অবস্থা। গোটা সভাকক্ষের মাত্র একটি কোণা বিরোধী সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। ভারতবর্ষের লোকসভার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সরকারীভাবে বিরোধী দল হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল বিরোধী কংগ্রেস দল। এবার স্বীকৃত বিরোধী দল বলতে আর কেউ রইল না। লোকসভায় এবার অনুপস্থিত অনেকগুলি পরিচিত মুখ। এস কে পাতিল, ডাঃ রামসুভগ সিং, বলরাজ মাধোক, এম এল সোন্ধি, মিনু মাসানি, এন জি রঙ্গ, রামমূর্তি, মধু লিমায়ে, হেম বড়ুয়া, এঁদের কাউকে দেখা যাবে না। এঁরা সকলেই নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। দেখা যাবে না আচার্য কৃপালানী, এস এ ডাঙ্গে, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিবিষ্ণু কামাথ প্রভৃতিকে। এঁরা নির্বাচনে দাঁড়ান নি। আর পাওয়া যাবে না নাথ পাইকে তিনি মারা গেছেন। আগেকার তুলনায় পঞ্চম লোকসভায় বিরোধের উত্তাপ অনেক কম সৃষ্টি হবে ও তীক্ষ্ণ ভাষণও শোনা যাবে অনেক কম বলে মনে হচ্ছে।

•

পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকায় এসে পৌঁছবার প্রাক্কালে 'বাঙলা দেশের' প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এখন খুব শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন।

এই কথাবার্তার ফল কি হবে তা বলা যাচ্ছে না। তবে, সম্মুখ সংঘর্ষ এড়াবার উপায় কিছু বার করা যাবে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করতে পারছেন। কেননা, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবর দুজনের কারোরই পিছু হটার রাস্তা নেই। ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য চার দফা সর্তের পিছনে (সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, সামরিক আইন প্রত্যাহার, অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা ও সৈন্যদের গুলিতে হত্যার তদন্ত) শুধু আওয়ামী লীগ নয়, সারা 'বাংলা দেশের' সাড়ে সাত কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ। আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজে ইচ্ছা করলেও এই সর্তগুলি মেনে নিতে পারবেন না ; কেননা, পশ্চিম পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনীর একদল অফিসার ও আমলারা তাঁকে পূর্ববঙ্গের মানুষের এই দাবীগুলি মেনে নিতে দেবেন না।

একটা রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায় বিদেশী নাগরিকরা ঢাকা থেকে চলে যাচ্ছেন। একটি বিদেশী সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে, রাজপথের যুদ্ধে দরকার হতে পারে মনে করে পাকিস্থানের সরকার ট্যাঙ্কের তলায় রবারের চাকা লাগাচ্ছেন। একটা ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তায় পাকিস্থানে এখন ইতিহাসের যবনিকা কাঁপছে।

—পুণ্ডরীক

১৯-৩-৭১

•

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ

অগ্নিযুগের প্রবীণতম বিপ্লবীদের অন্যতম অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১০ মার্চ সকালে ৮৭ বৎসর বয়সে চন্দননগরে পরলোকগমন করেছেন। প্রবীণ বিপ্লবী অধ্যাপক ঘোষ ভারতে অগ্নিযুগের পাশাপাশি গণ-বিপ্লবী পন্থার উদ্ভাবক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক পন্থারও শিক্ষক ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবী মহানায়কদের সহযোগী এবং বাঘা যতীনের সহপাঠীও ছিলেন অধ্যাপক ঘোষ। তিনি মাস্টার মশায় হিসেবেও সুপরিচিত।

১৮৮৩ খৃঃ ১১ ডিসেম্বর বর্ধমানের দত্তপাড়ায় শ্রীঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন। কৃতিত্বের সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম-এ পাশ করে বাঁকীপুর কলেজে অধ্যাপনার চাকুরী গ্রহণ করেন। ইংরেজ সরকারের কুখ্যাত বিসলে সার্কুলারের বিরোধিতা করে ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার কায়েম করার লড়াই সুরু করে ইংরেজ সরকারের পৈশাচিক অত্যাচারের কবলে পতিত হন।

বিশিষ্ট সি পি আই এম এল নেতা সুশীতল রায়চৌধুরীর মৃত্যু

মার্কসবাদী - লেনিনবাদী নেতা শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরী ১০ মার্চ সকালে মারা গেছেন। জীবিত অবস্থায় পুলিশ তাঁকে ধরতে পারে নি, মৃত্যুর বার ঘণ্টা পরে পুলিশ তাঁর সন্ধান পায়।

শ্রীরায়চৌধুরী দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে দক্ষিণ কলকাতায় গড়চা রোডের একটি ক্লিনিকে ছিলেন। পুলিশ কোন খবর পায় নি। রায়চৌধুরীর আত্মীয়দের অনুরোধে একজন রিপোর্টার পুলিশকে এই সংবাদটি জানান। তিনি পুলিশকে অনুরোধ করেছিলেন, শ্রীরায়চৌধুরীর ১৪ বছরের ছোট ছেলে সুশান্তকে সাময়িকভাবে জামিন দেবার জন্যে। যাতে শেষবারের মত সে তার বাবাকে দেখতে যেতে পারে।

স্মরণ থাকতে পারে, পুলিশ শ্রীরায়চৌধুরীকে ধরে দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করেছিল।

কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-তে শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরী ছিলেন প্রথম সারির নেতা।

ভূপৃষ্ঠ হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চে
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি হিমালয় পর্বতমালার অঙ্গে সংস্থাপিত চিরস্নিগ্ধ তুষারধবল, কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গ উদ্ভাসিত অপূর্ব
শৈলনগরী দার্জিলিং
ভ্রমণ-বিলাসী সকলেই নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করুন।
মার্জিতরুচি ভ্রমণকারীদের জন্য
স্নো ভিউ হোটেল-ই
একমাত্র নির্ভরযোগ্য আদর্শ আবাসিক হোটেল
পূর্বাহ্নে স্থান সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন (ফোন : দার্জিলিং ৪০)

ছাত্রাবস্থায় শ্রীরায়চৌধুরী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৩৩১ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার আগে তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। '৩৬ সালে বহরম থেকে ছাত্রকালে অর্থনীতিতে অনার্স-সহ বি-এ পাশ করেন। '৪৮ থেকে '৫২ পরে '৬২তে জেলে ছিলেন। স্বাধীনতা, দেশহিতৈষী এবং পরে দেশব্রতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি—সেখান থেকে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)—দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে শ্রীরায়চৌধুরীর কর্মকেন্দ্র হুগলী জেলা। মৃত্যুকালে শ্রীরায়চৌধুরী স্ত্রী ও দুই ছেলে রেখে গেছেন।

বিভিন্ন জেলায় কোন পার্টির কত আসন

জলপাইগুড়ি

মোট আসন ...	১১
কংগ্রেস ...	৯
সি পি এম ...	১
আর এস পি ...	১

কোচবিহার

মোট আসন ...	৮
কংগ্রেস ...	৭
ফঃ ব্লঃ ...	১

দার্জিলিং

মোট আসন ...	৫
কংগ্রেস ...	২
গোরখা লীগ ...	২
সি পি এম ...	১

পশ্চিম দিনাজপুর

মোট আসন ...	১১
কংগ্রেস ...	১১

মেদিনীপুর

মোট আসন ...	৩৫
কংগ্রেস ...	১২
সি পি এম ...	৬
বাংলা কংগ্রেস ...	৪
পি এস পি ...	৩
সি পি আই ...	৮
ঝাড়খণ্ড ...	১
আদি কংগ্রেস ...	১

মালদহ

মোট আসন ...	১০
কংগ্রেস ...	৫
সি পি এম ...	২
সি পি আই ...	১
ওয়ার্কার্স ...	১
নির্দল ...	১

নদীয়া

মোট আসন ...	১৪
সি পি এম ...	১০
কংগ্রেস ...	১
আর সি পি আই ...	১
এস এস পি ...	১
মুসলিম লীগ ...	১

চব্বিশ পরগণা

মোট আসন ...	৫৩
নির্বাচন হচ্ছে ...	৪১
সি পি এম ...	২৪
কংগ্রেস ...	১৪
বাংলা কংগ্রেস ...	১
এস ইউ সি ...	৪
ফঃ ব্লঃ ...	২
মুসলিম লীগ ...	২
সি পি আই ...	১
আর এস পি ...	১

কলকাতা

মোট আসন ...	২৩
নির্বাচন হচ্ছে ...	২২
কংগ্রেস ...	১৬
সি পি এম ...	৫
সি পি আই ...	১

হাওড়া

মোট আসন ...	১৬
সি পি এম ...	১২
কংগ্রেস ...	৩
আর সি পি আই ...	১

হুগলি

মোট আসন ...	১৮
সি পি এম ...	১০
কংগ্রেস ...	৪
ওয়ার্কার্স পার্টি ...	১
সি পি আই ...	১
ফঃ ব্লঃ মাঃ ...	১
আদি কংগ্রেস ...	১

পুরুলিয়া

মোট আসন ...	১১
কংগ্রেস ...	৯
সি পি এম ...	১
এস ইউ সি ...	১

মুর্শিদাবাদ

মোট আসন ...	১৮
কংগ্রেস ...	৮
মুসলিম লীগ ...	৪
সি পি এম ...	৩
আর এস পি ...	১
নির্দল ...	১
জনসংঘ ...	১

বাঁকুড়া

মোট আসন ...	১৩
সি পি এম ...	৮
কংগ্রেস ...	৩
বিপ্লবী বাং কং ...	১
ঝাড়খণ্ড ...	১

বর্ধমান

মোট আসন ...	২৫
নির্বাচন হচ্ছে ...	২৪
সি পি এম ...	২১
কংগ্রেস ...	১
বিপ্লবী বাং কং ...	১
ফঃ ব্লঃ মাঃ ...	১

বীরভূম

মোট আসন ...	১২
সি পি এম ...	৭
এস ইউ সি ...	২
নির্দল ...	১
সি পি আই ...	১
আর সি পি আই ...	১

সম্পাদকীয়

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি

লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের তিনটি রাজ্যে বিধানসভারও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। লোকসভায় নতুন কংগ্রেসের প্রশ্নাতীত সাফল্যের পর অত্যন্ত সহজভাবেই কেন্দ্রে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে নতুন সহকর্মী বাছাই করা কোনো সমস্যাই ছিল না। তবে তিনি এবারে মন্ত্রিসভার আকার ছোট করেছেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সংখ্যা ১৬ থেকে কমিয়ে ১৩ করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর সংখ্যা ২০ থেকে হয়েছে ১৫ এবং উপমন্ত্রীর সংখ্যা ১৫ থেকে কমে ৮-এ দাঁড়িয়েছে। সাতজন পুরনো ক্যাবিনেট মন্ত্রীর নাম বাদ পড়েছে এবার। তাঁদের মধ্যে নন্দজী, দীনেশ সিং, বলিরাম ভগৎ-এর নাম সকলেরই মনে পড়বে।

বাংলা দেশের প্রতিনিধি হয়ে গেলেন শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়। শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের দায়িত্ব তিনি নিলেন পূর্বতন মন্ত্রী ত্রিগুণা সেনের কাছ থেকে। শ্রীরায়ের মতোই নতুন ক্যাবিনেট মন্ত্রী হলেন তামিলনাড়ুর শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলম, আসামের শ্রীমঈনুল হক চৌধুরী এবং মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী এইচ আর গোখেল। এঁরা আগে লোকসভার সদস্যও আর হন নি। প্রধানমন্ত্রীর চারজন প্রবীণ সহকর্মী শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীযশোবন্ত চৌহান, শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদ এবং সর্দার স্বরণ সিং স্ব-স্ব দপ্তরে পুনর্বহাল হয়েছেন। তবে শ্রীরামকে কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করতে হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বয়সের দিক দিয়ে না হলেও শ্রীজগজীবন রামই হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সবচেয়ে পুরনো মন্ত্রী। তিনি ১৯৪৭ সালে অন্তবর্তী সরকারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত একটানা মন্ত্রী আছেন। ইতিমধ্যে দুইজন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, পাঁচবার লোকসভার নির্বাচন হয়েছে। প্রতিবারেই শ্রীরাম জয়ী হয়েছেন এবং মন্ত্রিসভায় পেয়েছেন স্থান। শ্রীগান্ধীর মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীদের মধ্যে নতুন মুখ খুব বেশী নেই। তবে এই মন্ত্রিসভায় রদবদল বা পরিবর্তন ভবিষ্যতে হবে। কারণ, কতকগুলো দপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রীর সঙ্গে এখন জুড়ে রাখা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রধানমন্ত্রী এবারও স্বরাষ্ট্র দপ্তর অন্য কোনো মন্ত্রীর হাতে দেন নি। বিগত মন্ত্রিসভায় শ্রীচোহানের হাত থেকে তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে তাঁকে অর্থ দপ্তর দিয়েছিলেন। তবে দপ্তর বন্টন নিয়ে কোনোরূপ মতদ্বৈধ হবার সুযোগ আর নেই। কারণ, নতুন লোকসভায় এবং কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টিতে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব অবিসম্বাদী।

কেন্দ্রে যত সহজে মন্ত্রিসভা গঠন করা গেল রাজ্যে কিন্তু তা করা যাচ্ছে না। তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগম আরও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচিত হওয়ায় সেখানে কোনোরূপ প্রশ্নই দেখা দেয় নি। শ্রীকরুণানিধিই আবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং ডি এম কে ফিরে পেয়েছে তাদের ক্ষমতা। অথচ ডি এম কে'র বিরুদ্ধে কামরাজ ও রাজাজী কত কাণ্ডই না করলেন। সমস্তই আজ কাঁকাবুলি বলে প্রতীয়মান। গোটা দক্ষিণ ভারতে একমাত্র কামরাজ ছাড়া চার পার্টি মহাজোটের আর কোনো পার্টি লোকসভায় নির্বাচিত হতে পারে নি। শ্রী পি রামমূর্তি ও শ্রীআনন্দন নাম্বিয়ারের মতো প্রবীণ ও সুদক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানেরও জামানত জব্দ হয়েছে তামিলনাড়ুতে। ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা প্রায় এক। এই দুটি রাজ্যে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নি। ওড়িশায় শাসক কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ, পশ্চিম বাংলায় সে গৌরব অর্জন করেছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। ওড়িশায় ১৯৬২ সাল থেকেই কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অবসান হয় ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে। তা সত্ত্বেও এবারে শাসক কংগ্রেস একা লড়াই করে নির্বাচনে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছে। অপর দিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্যও বিস্ময়কর। কংগ্রেস ও সি পি এম বিরোধী দলগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। হয়তো বা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা একটা সুস্পষ্ট রূপ নিতে চলেছে। ক্ষুদে দলগুলোর প্রায় অবলুপ্তি সেই পরিণতির ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু একটি স্থায়ী সরকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রত্যাশা এখন পর্যন্ত অপূর্ণই রয়ে গেল। কোয়ালিশন সরকারের চেষ্টা চলছে তা যদি সম্ভব হয়ও, বর্তমান পরিস্থিতিতে তেমন একটি সরকারের স্থায়িত্ব কতখানি হবে তা ভাববার বিষয়।

CENTRAL LIBRARY

এক নজরে

অখণ্ড ভারত :

ভারত যে একটি অখণ্ড দেশ ও তার অর্ধশত কোটি নরনারী যে একটি অবিচ্ছিন্ন জাতি তা সদ্য সমাপ্ত সাধারণ নির্বাচনে আর একবার প্রমাণ হল। একটি অনুপ্রাণিত জাতীয় নেতৃত্বের উদার আহ্বানে, সমুদ্র-কল্লোলমুখর জাহ্নবীর দুর্নিবার স্রোতধারার মতো, এগিয়ে এল ভারতীয় জনগণ আর তার প্রবল আঘাতে ভেঙে গেল সব বিভেদের প্রাচীর ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বেড়াজাল। নিশ্চিহ্ন হল স্বতন্ত্র, পর্যুদস্ত হল প্রগতিবিরোধী দক্ষিণপন্থী জোট, পরাভূত হল জনসংঘের শিল্পপতিদের, হার মানলো প্রাদেশিকতা সাম্প্রদায়িকতা ও সব বিভেদকামী শক্তি। জন-কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, অকালি, বি কে ডি—সব সঙ্কীর্ণ শীর্ণ স্রোতধারাগুলি একাকার হয়ে হারিয়ে গেল জাতীয় গণতন্ত্রের প্লাবনে।

ভারতের ইতিহাসে এ অবস্থা কোন অভিনব ঘটনা নয়। হিন্দু যুগে, মুসলিম শাসনকালে, ইংরেজ রাজত্বে বা সে শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের দিনগুলিতে, পাহাড় ও সাগরঘেরা এই ভূখণ্ডটির কোটি কোটি মানুষ বলিষ্ঠ জাতীয় নেতৃত্বের অনুপ্রেরণায় বারবার বিভেদ ভুলিয়া আকাশে তুলেছে একটি বিরাট হিয়া। কিন্তু যখনই আবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দুর্বল হয়েছে, নিঃশেষ হয়েছে তার জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার শক্তি, তখনই দিকে দিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধানে এই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা কোনকালেই স্থায়ী হতে পারে নি। যুগে যুগে, ঠিক এক ঐতিহাসিক ক্ষণে আবির্ভূত হয়েছে, সাড়া জাগানো আবেগে উদ্ভাসিত জাতীয় নেতৃত্ব আর জনতার দুর্নিবার অগ্রগতিতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেছে সব ক্ষুদ্র স্বার্থের ব্যবধান।—এ যেন ভারত ভাগ্যবিধাতার এক অতি প্রিয় চিরদিনের খেলা।

খণ্ডিত পাকিস্তান :

সাম্প্রদায়িক স্বার্থে ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে চব্বিশ বছর আগে ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয় তা রাষ্ট্র হিসবে এক হলেও দেশ হিসাবে কোন দিনই এক ছিল না। এগারো শ মাইল প্রশস্ত ভারতের দুই প্রান্তে কয়েকটি প্রদেশ নিয়ে গড়ে ওঠা ঐ বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রটির যোগবন্ধন আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম হলেও প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তির তোলা কায়েমি স্বার্থ তাদের কঠিন নাগপাশে বেঁধে রেখেছে।

পাকিস্তানের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে বারো কোটি, তার প্রায় সাড়ে সাত কোটি বাস করে পূর্ব পাকিস্তানে। পাকিস্তান যে বছরে প্রায় দুশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তার প্রায় সবটাই আসে পূর্ব পাকিস্তানের পাট ও চা থেকে। কিন্তু তবুও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এতদিন শুধু উপেক্ষা ও অবজ্ঞাই পেয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় শাসকের কাছ থেকে। পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য আড়তখানা। কিন্তু লাহোর করাচি পিণ্ডি পেশোয়ার পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের কাছে দূরে শুধুই থেকে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দপ্তরে, সামরিক বাহিনীর সকল বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানের কর্মচারীদের সংখ্যা থেকেছে বরাবরই উপেক্ষণীয়। কিন্তু সবার চেয়ে বড় কথা, পশ্চিম পাকিস্তান অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, কেড়ে নিতে চেয়েছিল তার মুখের ভাষা। সার্ধ দুই দশকের শোষণ ও লাঞ্ছনা, উপেক্ষা ও অবমাননার বিরুদ্ধে আজ তাই গর্জে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তান। সাড়ে সাত কোটি মানুষ মৃত্যুপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছে একটি অনন্য অসাধারণ মানুষের নেতৃত্বে। শেখ মুজিবরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের দাবি। পূর্ব পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে, তার মৃত্যুক্ষণে ভূমিষ্ঠ হয়েছে স্বাধীন বাংলা দেশ।

জয় বাংলা :

বাংলা দেশ যে এক, তার মুখের ভাষা মনের কথা যে অভিন্ন সেটা যেন নতুন করে উপলব্ধি করা গিয়েছিল ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের দিনে। রেডিওর অতি সন্নিকট ব্যবধানে ঢাকা ও কলকাতা কেন্দ্রের প্রচার, প্রায়ই যা বিভ্রান্ত করে শ্রোতাদের, সেদিন যেন আরও বেশি বিভ্রান্তি ঘটিয়েছিল বাংলা দেশের উভয় অংশে। হঠাৎ হয়ত শোনা গেল একটি সুললিত নারী কণ্ঠের সতর্কবাণী —ঘরের আলো নিভিয়ে রাখবেন, গুজবে কান দেবেন না, সব সময় মনে রাখবেন শত্রুর সতর্ক দৃষ্টি আপনার দিকে— তার কিছু পরেই হয়ত উদাত্ত কণ্ঠে গীত হল 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু......', মনে কোন সন্দেহ রইল না যে আকাশবাণী-কলকাতা থেকেই প্রচারিত হচ্ছে ঐ সতর্কবাণী ও দেশাত্মবোধক গান। কিন্তু গান শেষ হতেই 'রেডিও পাকিস্তান-ঢাকা' শুনে শ্রোতাকে হতবাক হতে হল। এ কোন্ শত্রুর বিরুদ্ধে কার সতর্কবাণী! আর ঐ গানও ত প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী-কলকাতা থেকে। একই কবির গান, একই মুখের ভাষা যাদের সতর্কবাণী শোনায় তারা পরস্পরের শত্রু হয় কেমন করে?—এই ভাষা ও এই গানই আজ পুনরুজ্জীবিত করেছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে পূর্ব-বাংলার আকাশ বাতাস। রেডিও পাকিস্তান-ঢাকা হয়েছে ঢাকা বেতার কেন্দ্র, আর তা থেকে প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে বাঙালী গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে বাংলার মুক্তিসংগ্রাম—ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

পরিসংখ্যান :

পশ্চিমবঙ্গের ২ কোটি ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ভোটদাতার মধ্যে প্রায় এক কোটি বত্রিশ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬০·৬ জন এবারের নির্বাচনে ভোট দেন। আনুপাতিক হারে এ সংখ্যা পূর্বের দুটি নির্বাচনের তুলনায় কম। ১৯৬৯ সালে শতকরা ৬৬·৫১ জন ও ১৯৬৭ সালে শতকরা ৬৬·১০ জন ভোটদাতা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে এবারের ভোট গ্রহণ সম্পূর্ণ হয় তাতে শতকরা ৬০ জনেরও বেশি লোকের ভোট দিতে এগিয়ে আসা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এবারের নির্বাচনে বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বাতিল ভোটের সংখ্যা। মোট ৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৩২৭টি ভোট অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের ৫·৪৫ শতাংশ বাতিল হয়েছে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। ভোটের এই বিপুল অপচয় শোধহয় শুধু ভারতের মতো বিশাল দেশেই সম্ভব। কারণ ভারতের অন্যতম ক্ষুদ্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি ভোট বাতিল হল ততগুলি মানুষ পৃথিবীর অনেক স্বাধীন দেশেই বাস করে না। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মাল্টা ও আইসল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা মিলালেও পশ্চিমবঙ্গের বাতিল ভোটের সংখ্যার সমান হয় না। এ সংখ্যা লুক্সেমবুর্গের লোকসংখ্যার দেড়গুণ এবং ফিজি বা গুয়ানার প্রায় দুই গুণ।

—প্রত্যক্ষদর্শী

অনুপস্থিতিতে ইচ্ছা ॥

বিষ্ণু দে

অনুপস্থিতিতে ইচ্ছা
হয় থেকে থেকে
দেখি, শুনি চেনা দৃশ্য, জানা শব্দ।

ছড়ানো প্রান্তর, উদার বিস্তারে কোথাও ঊষর,
শ্যামল গোচর ভূমি কোথাও বা রক্তিম ধূসর
কোথাও বা শস্যে শষ্পে চোখের আরাম,
নদীতে, পাহাড়ে, নীলে, সময়ের ফসলে ও ফুলে ফলে,
ঝরা পাতা সদ্যপাতা হরেক হরিতে
মাঠে গাছে নানা পাখি বসে, ওড়ে, দোলে নানা শৈশবের স্বর।

ইচ্ছাটা যে মুক্তি নয় জানি,
কিন্তু শুধু যাকে বলে মাথা গুঁজে পলায়নী বৃত্তি তাও নয়।
কারণ এ দৃশ্যে আছে সামগ্রিক মানব-জীবন,
আছে দুস্থ দৈনিকতা, অভাব, অসুখ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়,
অধিকন্তু এখানে ওখানে হঠাৎ হঠাৎ মৃত্যুকে নৈবেদ্য
এর ওর নিজের জীবন।

তা সত্ত্বেও বা সেজন্যই কি মানব-নিসর্গে
নিয়ম বা ব্যতিক্রম দুইই গ্রাহ্য, নিবার্য ও প্রতিষেধ্য,—
যা এ অপনাগরিক, অসংলগ্ন মানবসমাজে
কষ্টবোধ্য, সুতরাং যার সমাধান
মনে হতে পারে আজ এইখানে এ মুহূর্তে অনারব্ধ-প্রায়,
চোখের কাণের বিভ্রান্তিতে হৃদয়ের বনে।

তবু, নাকি তাই? থেকে থেকে ভাবীকালে স্মৃতি যায় ডেকে।
তাই চিরযৌবনের অনুপস্থিতিতে ইচ্ছা হয়
জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে দেখি, শুনি,
কাজে—অবসরে স্বচ্ছ দৈনিক ক্লান্তিতে,
স্বপ্নকম্প্র রাত্রির শান্তিতে।

সহস্র সেলাম

বনফুল

পলে পলে মোরা যবে পঙ্ককুণ্ডে ডুবিতেছিলাম,
নিরুদ্ধ আক্রোশে যবে আমাদের পুঞ্জিত পাতক
আমাদেরই হত্যা করি' নিঃসঙ্কোচে ঘোরে অবিরাম,
আমাদেরই আত্মবন্ধু পুত্র-ভ্রাতা কশাই ঘাতক
গুণ্ডা ও ডাকাত যবে, মহত্ত্বের মাণিক্য-ভাণ্ডার
চূর্ণিত লুণ্ঠিত করি মহোল্লাসে মেতেছে তাণ্ডবে
প্রমত্ত প্রমথ দল, সুখ স্মৃতি পুণ্য বাংলার
অসম্মানে মুহ্যমান, স্বার্থ-বহ্নি আদর্শ-খাণ্ডবে
দগ্ধ করি লেলিহান দিগ্বিদিকে, বিদলিত যবে
সর্ব সুখ সাধ আশা পশুত্বের অহং-আহবে
তখনও ওপার হ'তে দৃপ্তকণ্ঠ শুনিলাম কার
জয় বাংলার!

আমার তোমার নয়, চাও তুমি বাংলার জয়
তারই লাগি মৃত্যুমুখে আগাইয়া গিয়াছ নির্ভয়,
তোমার বিরাট সত্তা আজি তাই হিমাদ্রি-সমান
বাঙালীর সর্ব গর্ব তোমাতেই আজি দীপ্তিমান
আমি বাংলার কবি তাই বন্ধু ছুটিয়া এলাম
মুজিবর রহমান লহ মোর সহস্র সেলাম।

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

লেখকের বক্তব্য

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে ১৯৪৭ সালের মে মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস প্রথম লিখতে শুরু করেছিলাম। তার আগেই অবশ্য 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' এবং 'রুশ-জার্মান সংগ্রামের' ইতিহাস বেরিয়েছিল। আর ছয়-সাত বছর ধরে দৈনিক 'যুগান্তরে' ধারাবাহিক যুদ্ধ সংক্রান্ত রচনাবলীর জন্য সেদিনের পাঠক-সমাজে দস্তুরমত সাড়া জেগেছিল। সুতরাং জাপানী যুদ্ধ ও রুশ-জার্মান সংগ্রাম সংক্রান্ত পুস্তক দুটির পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি সামগ্রিক ইতিহাস লেখার সংকল্প করলাম এবং এজন্য যে পরিকল্পনা তৈরি করলাম, গত কয়েক বছরে বার-বার তার সংশোধন ও পরিবর্জন ঘটেছে। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাহিনী মহাভারতের মত বিরাট ব্যাপার। মানুষের সমস্ত ইতিহাসে এত বড় মহাযুদ্ধ এবং সার্বাত্মক যুদ্ধ (টোট্যাল ওয়ার) আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গত চব্বিশ বছর ধরে বার-বার অনেকভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখে উঠতে পারি নি। কারণ, দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে এবং দেশের বহু প্রকার সমস্যার চাপে এই ইতিহাস রচনার কাজে বেশী সময় দেওয়া সম্ভব হয় নি। অথচ বরাবরই আমার আফশোষ ছিল যে, বাঙলা সাহিত্যের অনেক সমৃদ্ধি ঘটেছে বটে, কিন্তু মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ নিয়ে কোন নির্ভরযোগ্য বড় রকমের বই লেখা হলো না, কোন তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা হলো না। বলা বাহুল্য যে, গত চব্বিশ বছরে আমার বয়স অনেক বেড়েছে, জীবনের অপরাহ্ন-বেলায় এসে পৌঁছেছি। সুতরাং নতুন করে সংকল্প নিয়েছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস সাঙ্গ করে যাবোই। 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় আনুকূল্যে সেই 'ঐতিহাসিক যাত্রা' শুরু হলো।

কিন্তু সহৃদয় পাঠকবর্গকে গোড়াতেই সতর্ক করে দিতে চাই যে, এই ইতিহাসের বিষয়বস্তু এত বড়, ব্যাপক এবং এত বিচিত্র যে, বছরের পর বছর লিখলেও সেগুলির প্রতি সুবিচার করা যাবে কিনা, সন্দেহ। সুতরাং পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও সহজভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামরিক ও কূট-নৈতিক কিম্বা রাজনৈতিক। অর্থাৎ যে দুটি দিক সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয়: সেই দিক দুটি উদ্ঘাটনের ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যে, এই আলোচনায় মধ্যে প্রাধান্য লাভ করবে, সেকথা বলাবাহুল্য মাত্র।

অনেকে মনে করেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসলে প্রথম মহাযুদ্ধেরই চূড়ান্ত পরিণতি মাত্র। আমার এই ইতিহাস-আলোচনার সূত্রপাতও প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে, যাতে পাঠকবর্গ একটা ধারাবাহিকতার সন্ধান পেতে পারেন। চব্বিশ বছর আগে যে ইতিহাস লেখা শুরু করেছিলাম তার অনেকখানিই ছিল সেদিনের স্বল্প প্রকাশিত তথ্যনির্ভর রচনা, কিন্তু তারপর সারা পৃথিবীতে রাশি-রাশি বই নানা ভাষায় বেরিয়েছে, কিন্তু ১৯৪১ খৃঃ ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের জয়যাত্রা পর্যন্ত আমার এই রচনা পরবর্তীকালে বহু বছর পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকলেও মূল বক্তব্য ও তথ্যের বিশেষ কোন ইতরবিশেষ ঘটেছে বলে মনে করি না। তথাপি এই লেখার মধ্যে যদি অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল-ত্রুটি ঘটে থাকে, তবে, বিদগ্ধ পাঠকবর্গের সহযোগিতায় নিশ্চয়ই সেই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করবো।

আমার দীর্ঘ সম্পাদকীয় জীবনে সাধু ভাষায় যে রীতি অনুসরণ করে এসেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস রচনায়ও সেই ভাষা ও ভঙ্গীরই আশ্রয় নিয়েছি—যদিও এদিক দিয়ে অনেক আধুনিক পাঠক আমাকে কিছুটা রক্ষণশীল মনে করতে পারেন!

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখসূত্র

প্রথম অধ্যায়

১৯১৯—১৯৩৯ সালের পৃথিবী

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর চেহারাটা ভালোই দেখাইতেছিল। তখনও প্রথম মহাযুদ্ধের শক্তিশেল বসুন্ধরার বুকে বিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু নূতনতর শিল্প-বিপ্লবের গতিশীল বাহনেরা একে-একে দেখা দিতেছিল। ভূমিপথে আসিল মোটর গাড়ী, আকাশে পক্ষবিস্তার করিল এরোপ্লেন আকাশে পক্ষবিস্তার করিল এরোপ্লেন এবং বায়ুতরঙ্গে স্পন্দিত হইল বেতার-যন্ত্রের ধ্বনি! শিল্প-বিপ্লবের সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল পাশ্চাত্য জগৎ। সারা পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য—রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। সমুদ্রে-সমুদ্রে তাদের জাহাজ, দেশে-দেশে তাদের বাণিজ্য—বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য, উপনিবেশ ও কাঁচা মালের ঐশ্বর্যে পশ্চিমের জড়বাদী সভ্যতা অপরিসীম শক্তিশালী। আর এশিয়া ও আফ্রিকার 'নেটিভেরা' দরিদ্র, বঞ্চিত, পরাধীন এবং নিরন্ন। প্রাচ্যের বৈরাগ্য ও নেতিবাচক জীবনদর্শন পরকালের স্বর্গসুখ প্রচার করিয়াছিল, আর পশ্চিমের উগ্র জীবনরসের ভোগবাদ জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে করায়ত্ত করিয়া নূতন শিল্প-সম্ভারের দ্বারা পৃথিবীকে জয় করিল। ১৮১৫ খৃস্টাব্দে ওয়াটারলু যুদ্ধে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর থেকে একশো বছরের মধ্যে বৃটেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যে পরিণত হইল এবং সেই সঙ্গে ইউরো-মার্কিন রাষ্ট্রশক্তিগুলিও আগাইয়া চলিল।—তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ শুরু হইবার মুখে। ১৮১৫ খৃঃ হইতে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ — এই দুই ঐতিহাসিক যুদ্ধের মধ্যবর্তী শতবর্ষে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি বা বিপ্লব ঘটিল। বিজ্ঞান নিয়োজিত হইল মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এবং সেই সম্পদ সভ্য-মানুষের জীবনযাত্রার মানদণ্ড বাড়াইয়া চলিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে, ১৮৬০ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মূল পণ্যদ্রব্যের (basic commodities) বার্ষিক উৎপাদন ১০ গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইল জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য। আর শ্বেতাঙ্গ মানুষের সংখ্যাও বাড়িয়া গেল,—১৭৭০ খৃস্টাব্দে সারা পৃথিবীতে শ্বেতকায় মানুষের সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি, আর ১৯০৭ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া হইল ৭৫ কোটি। এই বর্ধিত জনসংখ্যা পশ্চিম ইউ-

CENTRAL LIBRARY

দেশের নিরুপাধিত দেশগুলি আপন সীমারেখায় থাকিয়া থাকিতে পারিল না। সুতরাং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি লোক অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া গেল পশ্চিম দিকে—আমেরিকার স্বর্ণসম্পদের সন্ধানে। যুদ্ধ তখনও ছিল এবং যথাবৎই ছিল। ঊনবিংশ শতকের যুদ্ধগুলি ঘটিল প্রধানত উপনিবেশ বিস্তারের জন্য আফ্রিকায় ও এশিয়ায়। এই দুই মহাদেশ নূতন যুদ্ধাস্ত্র ও নূতন বিজ্ঞানের কাছে পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ছাড়াও জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম চলিল বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে।

অনেক সামরিক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ১৮৭০—১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যেভাবে পররাজ্য আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র চেঙ্গিস খাঁর আমলের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। ১৮৭০ খৃঃ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রেটবৃটেন ৪৭,৫৪,০০০ হাজার বর্গমাইল ভূমি দখল করিল এবং তাহার জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হইল ৮,৮০,০০,০০০ লক্ষ লোক। ১৮৮৪ খৃঃ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স দখল করিল ৩৫,৮৩,৫৮০ বর্গমাইল ভূমি, আর জনসংখ্যা ৩,৬৫,৫০,০০০ হাজার এবং ঐ একই সময়ে জার্মানী লাভ করিল ১০,২৬,২২০ বর্গমাইল ভূমি, আর ১,৬৬,৮৭,১০০ জন লোক।* সাম্রাজ্যবাদের এই নির্লজ্জতায় পৃথিবী যেন আক্রান্ত হইল। তথাপি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক ও সংঘাতের অবধি ছিল না এবং সেই সঙ্গে দেখা দিল সমাজ-জীবনে নূতন আলোড়ন শিক্ষা ও সমৃদ্ধি বিস্তারের জন্য। আর ইউরোপের শ্রমজীবী সম্প্রদায় অকস্মাৎ দেখিতে পাইল যে, তারা মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের শাসন থেকে মুক্তি পাইয়াছে বটে, কিন্তু ধনিকদের নূতন শৃঙ্খলের মধ্যে আটকা পড়িয়াছে। এই অর্থনৈতিক নিদারুণ বৈষম্য হতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং সেদিনের ইউরোপীয় সংবাদপত্রে প্রথম 'সোসিয়ালিজম' বা সমাজতন্ত্র এবং পরে 'কমিউনিজম' বা সাম্যবাদ—এই শব্দগুলি ধীরে-ধীরে দেখা দিতেছিল। ইংলণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এবং রাশিয়ায় জারের (সম্রাট) বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। পশ্চিম ইউরোপের তথাকথিত গণতন্ত্রের শাসনে সাধারণ মানুষ সুখী ছিল না, আর রাশিয়ার জারের অতি-স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদীরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

ঊনবিংশ শতকের পর বিংশ শতাব্দীর ঊষাকাল এভাবে আসিয়া দাঁড়াইল ১৯১৪ সালের প্রান্তে, যখন পৃথিবীর চেহারাটা [illegible] দেখা যাইতেছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধের দিকে অকস্মাৎ ২৮শে জুন তারিখ সেরাজেভোতে অস্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড সস্ত্রীক নিহত হইলেন আততায়ীর গুলীতে। বসনিয়া রাজ্যের রাজধানী শহর সেরাজেভো, আর হত্যাকারীরা ক্ষুদ্র সার্ভিয়া রাজ্যের ষড়যন্ত্রকারী, কিন্তু নিহত ব্যক্তি সামান্য লোক নহেন—তিনি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের উত্তরাধিকারী। সুতরাং বারুদাগারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িবার মত সারা ইউরোপ জ্বলিয়া গেল। কাইজারের জার্মানী দাঁড়াইল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর পক্ষে, জারের রাশিয়া সমর্থন করিল সার্ভিয়াকে, ফ্রান্স গেল রাশিয়ার দলে এবং বৃটেন দাঁড়াইল জার্মানীর বিপক্ষে। অস্ট্রিয়া অগ্রসর হইল জাতীয়তাবাদী সার্ভিয়াকে সমুচিত শিক্ষা দিতে, আর জার্মানী আক্রমণ করিল বেলজিয়মের ভিতর দিয়া ফ্রান্সকে। অর্থাৎ ১৯১৪ সালের জুন মাসে সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ১৯১৪—১৮ সালের পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের হত্যাকাণ্ডে পরিণত হইল এবং ইউরোপ বিধ্বস্ত হইল।

সামান্য ঘটনা থেকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত এত বড় একটা সর্বনাশ ঘটিল কিরূপে? এবং এর দ্বারা কি এ কথাই প্রমাণ হয় না যে, সেদিনের বাহ্যিক সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতরে-ভিতরে ঘুণ ধরিয়া গিয়াছিল? রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ছিল সামরিক সংঘাত, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের ছিল সামাজিক সম্পর্ক। রাষ্ট্রগতভাবে দেখা যায় ১৯১৪ সালের পৃথিবী ৪০টি হইতে ৫০টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং এইগুলির পরস্পরের সম্পর্ক কি হইবে, তার কোন রাজনৈতিক মানদণ্ড ছিল না। অথচ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সূত্রে সারা পৃথিবী একটা মোটা রকম আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছিল। স্বর্ণমান ছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির মাপকাঠি এবং গোটা দুনিয়া একটা বৃহৎ বাজারে পরিণত হইয়াছিল। ডাক ও তার এবং জাহাজের সূত্রে পৃথিবীর দূরবর্তী প্রান্তগুলি একত্র গ্রথিত হইয়াছিল। যদিও ইহা ছিল আন্তর্জাতিকতার শৈশব দশা, তথাপি বাণিজ্য, মূলধন ও অর্থনীতি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মধ্য দিয়া পৃথিবীকে একটা বাহ্যিক ঐক্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্বন্ধে ইহার ভিত্তিভূমি ছিল কাঁচা, আবার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংঘাত ইহার কাঠামোকে করিল দুর্বল। বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ জাগাইয়া আনিল। সুতরাং একটি আঘাতেই এই সাজানো তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কিম্বা রক্ষার কোন যোগসূত্র ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে Balance of Power নামে যে কূটনৈতিক তত্ত্ব প্রচলিত হইয়াছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের আগেও তাই চলতি ছিল। Balance of Power বা 'শক্তির ভারসাম্য' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে এই ধারণা হইতে যে, জাতীয় রাষ্ট্রগুলি স্বভাবতঃই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিয়া রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং যদি এমন একটা পন্থা অবলম্বন করা যায়, যাহা দ্বারা এক বা একাধিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কতকগুলি মৈত্রী বন্ধনের দ্বারা সমকক্ষ হইতে পারা যায় এবং সেই সমকক্ষতার ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা যায় যে, কেহই সহসা অপরের উপর জয়লাভ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে শান্তি রক্ষা হইতে পারে। এই ধারণা হইতেই alliance বা মৈত্রীর সৃষ্টি এবং সেই মৈত্রীর দ্বারা ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা হইল। ১৯১৪—১৮ সালের মহাযুদ্ধে 'মিত্রপক্ষ' ও শত্রুপক্ষের দুই দল লক্ষ্য করিলেই এই তথ্যের সম্যক রূপ উপলব্ধি হইবে। ১৯১৪ সালে ফ্রান্স ও জারের রাশিয়া জার্মানী ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মিত্রতায় আবদ্ধ ছিল। বৃটেনের মিত্রতা ছিল ফ্রান্সের সঙ্গে এবং এক গোপন সামরিক ও সৌহার্দ্য ছিল। এই সমস্ত রাষ্ট্রের আবার পরস্পরের সঙ্গে নিদারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। জার্মানী চাহিতেছিল নূতন রাজ্য ও উপনিবেশ। সুতরাং জার্মানীর এই রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় বৃটেন ছিল ভীত ও শঙ্কিত। রাশিয়া চাহিতেছিল বলকান রাজ্যে প্রভুত্ব খাটাইতে এবং কনস্টান্টিনোপল দখল করিতে। জার্মানীর কাছ হইতে আলসেস ও লোরেন প্রদেশ পুনরুদ্ধারের জন্য উৎসুক ছিল ফ্রান্স এবং সেই সঙ্গে আগেকার যুদ্ধের (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) প্রতিশোধ নিতে। রাশিয়ার মত অস্ট্রো-হাঙ্গেরীও বলকান রাজ্যে প্রভুত্ব খাটাইতে ব্যগ্র ছিল। এভাবে সারা ইউরোপে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহের লোভ ও দুর্নীতি যে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল শক্তির ভারসাম্য নীতির দ্বারা এই যুদ্ধের ভবিতব্যটা স্থগিত ছিল। স্বভাবত এই লিপ্সার সঙ্গে যুক্ত হইল বাণিজ্যগত লোভ। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, ঊনবিংশ শতকের রাজনৈতিক জাতীয়তার* সঙ্গে কিম্বা ন্যাশনাল স্টেটের উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিংশ শতকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খাপ খাইতে পারে না। হয় কোন রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইবে, কিম্বা অনিবার্যরূপে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে পড়িতে হইবে। আবার সেই সঙ্গে তাঁহারা একথাও ভুলিয়া গেলেন যে, যুদ্ধের দ্বারাও প্রকৃতপক্ষে কোন লাভ হইতে পারে না। কেননা সমগ্র জগতে

---

*War and Western Civilisation— by Major General J. F. C. Fuller.

* ১৯১৭ সালে এশিয়া মহাদেশ থেকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন।

তাঁহারা প্রত্যেক এবং সকলে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রথম মহাযুদ্ধের বহু বছর পর সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মঃ লিটভিনোফ (পরলোকগত) বলিয়াছিলেন, 'Peace is one and indivisible'—'শান্তি এক ও অবিভাজ্য।' এই বিখ্যাত উক্তি ১৯১৪ কিম্বা ১৯০৯ সাল—দুই মহাযুদ্ধের কোন সন্ধিক্ষণেই ধনিক রাষ্ট্রনীতির মাথায় প্রবেশ করে নাই। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—এই শত বৎসরের 'যুগে' পৃথিবীর জাতিসমূহ পরস্পরের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যুদ্ধের মধ্যেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারিত। কিন্তু ১৯১৪ সালের পর তাহা আর সম্ভব ছিল না—বিশ্বব্যাপী ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক যোগসূত্রের জন্য।

প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে অন্ততঃ দুই কোটি মানুষের মৃত্যুর * মধ্যে পৃথিবী-ব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল—১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর। যুদ্ধ শেষ হইল বটে, কিন্তু সন্ধি ও শান্তি লইয়া বিষম টানা-হেঁচড়া চলিল। ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্ট উইলসনের নেতৃত্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় সংগ্রামে মিত্র-পক্ষের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। সম্ভবতঃ আমেরিকার সাহায্য ছাড়া সেই যুদ্ধে মিত্র-পক্ষের জয়লাভ করাও সম্ভব হইত না। যুদ্ধের দ্বারা চিরতরে যুদ্ধ শেষ ও গণ-তন্ত্রকে রক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া প্রেসিডেন্ট উইলসন সংগ্রামে যোগ দেন এবং ১৯১৮ সালে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে ১৪ দফা সর্তের প্রস্তাব করেন ইতিহাসে উহাই 'Fourteen Points' নামে বিখ্যাত। কিন্তু

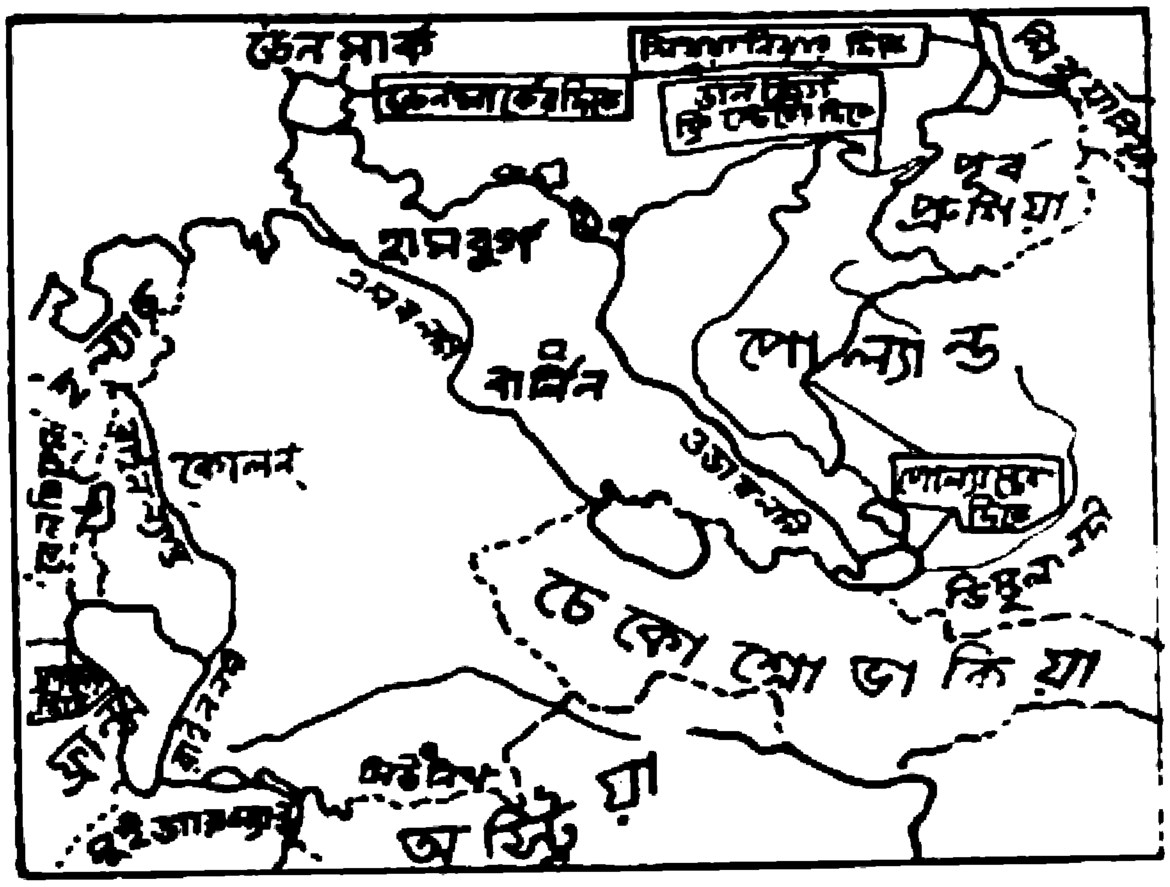

জার্মানী ১৯১৯ খৃঃ

ভার্সাই চুক্তির দ্বারা জার্মানী ইউরোপে ২৭,০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড হারায়। এই সব অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ছয় মিলিয়ন। এইসব সর্ত মানতে তাকে বাধ্য করা হয় :

১—আলসাস-লোরেন ফ্রান্সকে প্রত্যার্পণ করা হবে;

২—১৯০৫ খৃঃ পর্যন্ত সার অধিত্যকা জাতিসংঘের অধীন থাকবে। এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ গণভোটের দ্বারা নির্ধারিত হবে। (১৯৩৫ খৃঃ ১ মার্চ গণভোটের পর সার অধিত্যকা জার্মানীকে প্রত্যার্পণ করা হয়);

৩—ইউপেন এবং মালমেদি পাবে বেলজিয়াম;

৪—শ্লেজউইগ-হলস্টাইনের সব বিশেষ পাবে ডেনমার্ক;

৫—উত্তর সাইলেসিয়া এবং পূর্ব প্রুশিয়া পাবে পোলাণ্ড এবং উত্তর সাইলে-সিয়ার সামান্য অংশ (১২০ বর্গমাইল) পাবে চেকোশ্লোভাকিয়া;

৬—ডানজিগ জাতিসংঘের অধীন মুক্তনগরী হবে;

৭—রাইনল্যাণ্ড হবে সামরিক শাসনমুক্ত;

৮—জাতিসংঘের কাছে মেমেল অর্পণ করতে হবে (১৯২৩ খৃঃ মেমেল নিয়ে নেয় লিথুয়ানিয়া)।

এইসঙ্গে জার্মানী তার সমস্ত উপনিবেশ হারায়, যার আয়তন হোল ১,০০০,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ১২,০০০,০০০।

* কমাণ্ডার কিংহলের পুস্তকে ('The World since the War') প্রথম মহাযুদ্ধের মৃত্যুর সংখ্যা ২ কোটি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ ও যুদ্ধজনিত অন্যান্য সমস্ত কারণ বিবেচনা করিলে এই সংখ্যা ৪ কোটিরও বেশী দাঁড়াইবে। বিখ্যাত কমিউনিস্ট লেখক মিঃ আর পাম দত্ত তাঁহার 'World Politics' গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়া-ছেন যে, ১৯০১ সালে 'ইন্টার পার্লা-মেন্টারী ইউনিয়ন অব এনকোয়ারি' বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে সামরিক ও অসামরিক মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪ কোটি, ১৪ লক্ষ, ৩৫ হাজার। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় প্রতি ৪০ জনে ১ জন। ১৯৪৬ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত 'The Great Conspiracy against Russia' নামক চাঞ্চল্যকর গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে ১ কোটি লোক মারা গিয়াছে, ২ কোটি লোক মারাত্মকরূপে বিকলাঙ্গ হইয়াছে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মারা পড়িয়াছে এবং আরও লক্ষ-লক্ষ মানুষ গৃহশূন্য ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে।

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্লেমেন্স (Clemenceau) বহু প্রকার প্যাঁচ কষিয়া প্রেসিডেন্ট উইলসনের আসল উদ্দেশ্য মাটি করিয়া দেন। কিন্তু আমেরিকাকে একবারে উপেক্ষা করা ফরাসী বা ইংরাজ রাজনীতিকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং সন্ধির মধ্যে জোড়াতালি সত্ত্বেও উইলসনের পরিকল্পিত বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের (League of Nations) প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইল, যদিও স্বয়ং উইলসন সেই সন্ধির বহু সর্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইলেন। ১৯১৯ সনের ২৮শে জুন ফ্রান্সের ভেসাই শহরে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, যাহার জন্য ইহা ভেসাই সন্ধি নামে ইতিহাস-খ্যাত। এই সন্ধির দলিল একটি প্রকাণ্ড পুস্তক বিশেষ। তবে, উহার মূলকথা এই যে,

(১) একটি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে।

(২) জার্মানী নগদ টাকায় ও পণ্যদ্রব্যের দ্বারা যুদ্ধের জন্য মিত্রপক্ষকে ক্ষতি-পূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে। (এই ক্ষতিপূরণের মোট দাবী ছিল ৬৬০ কোটি পাউণ্ড)।

(৩) জার্মানীর সমস্ত উপনিবেশ হাতছাড়া করিতে হইবে। নিগ্রোদের উপর শাসনের যোগ্যতা জার্মানীর নাই এবং ভবিষ্যতের জন্য জার্মানীর কোন সমুদ্রপারবর্তী ঘাঁটিও থাকিবে না।

(৪) জার্মানীকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হইবে।

(৫) জার্মান রাষ্ট্রের সীমানা পুনরায় নির্ধারিত করিতে হইবে। আলসেস ও লোরেন প্রদেশ ফ্রান্সকে দিতে হইবে * এবং পোল্যাণ্ডকেও উত্তর সাইলে-সিয়ার একাংশ ও পূর্ব প্রুশিয়ার অংশ, আর চেকোশ্লোভাকিয়াকেও উত্তর সাইলেশিয়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ দিতে হইবে।

* ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্মানী ফ্রান্সকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এই প্রদেশ দুইটি হস্তগত করিয়াছিল।

এই সন্ধির ফলে জার্মানীর যে ক্ষয়ক্ষতি হইল তাহা দেখিতে হইলে উল্লেখ করা দরকার যে, একমাত্র ইউরোপেই জার্মানী ২৭ হাজার বর্গমাইল ভূমি হারাইল এবং সেই সঙ্গে ৬৫ লক্ষ লোক। ডানজিগ স্বাধীন নগরীতে (Free city) পরিণত হইল এবং মেমেল রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাসনাধীনে আসিল। রাইনল্যান্ড নিরস্ত্রীকৃত হইল এবং ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামকেও কিছু-কিছু রাজ্যাংশ দিতে হইল। আর ১৯২০ সালে লিথুয়ানিয়া মেমেল বন্দর দখল করিয়া নিল। ইহা ছাড়া জার্মানী সমুদ্রপারবর্তী সমস্ত উপনিবেশ হারাইল—যার মোট আয়তন ১০ লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশী। এবং মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। এই সমস্ত উপনিবেশ ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও পূর্ব আফ্রিকায়,—আর ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, যার কতকগুলি গেল জাপানের অধীনে, আর কতকগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার দখলে। বলাবাহুল্য যে, জনসংখ্যা ভূমি-সম্পদ ও কাঁচা মালের প্রভূত ঐশ্বর্য হারাইয়া জার্মানী অতিদুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হইল। জার্মানীর সমগ্র নৌবহর ও অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল এবং আভ্যন্তরীণ শাসন কার্যের জন্য মাত্র ১ লক্ষ পুলিশী সৈন্য রাখার অধিকার দেওয়া হইল।

এভাবে যে ভের্সাই সন্ধিপত্র রচিত এবং স্বাক্ষরিত হইল, উহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্মানীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। অবশ্য বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘ সৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি-রক্ষার একটা প্ল্যানও ইহার মধ্যে ছিল, কিন্তু উহা যেন ছিল প্রেসিডেন্ট উইলসনের চাপে পড়িয়া ঔষধ গিলিবার মত চেষ্টা। ইহা দ্বারা কখনও শান্তি আসিল না, যদিও রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাবের মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব ছিল। জার্মানী সম্পর্কে মিত্রপক্ষ সেই চিরন্তন বিজিত ও বিজেতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। প্রতিশোধ ও ক্ষতিপূরণ সেই পুরনো পৃথিবীর আরণ্যক পর্যায়েই স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু সেদিনের বিজয়ীপক্ষ ইহা খেয়াল করিলেন না এবং তাঁরা ভুলিয়া গেলেন যে, আধুনিক পৃথিবীতে ইহা অচল। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের আগে এভাবে পরাজিত শত্রুর কাছ হইতে ক্ষতি-পূরণ আদায় করা বিজেতার পক্ষে বোধহয় লাভজনক ছিল। কিন্তু যুদ্ধের আদিম ইতিহাস হইতে শুরু করিয়া নেপোলিয়নের যুদ্ধ পর্যন্ত যাহা সম্ভব ছিল, আধুনিক পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থনীতি, যন্ত্রশিল্প এবং দ্রুত যোগাযোগের অগ্রগতির জন্য তাহা আর সম্ভব ছিল না। কেননা পৃথিবী একটি বৃহৎ পণ্যশালায় পরিণত হওয়ায় একপক্ষের নিকট কাড়িতে হইলে অন্যপক্ষের নিকট ঠকিতে হইবে এবং পরস্পরের নির্ভরশীলতা বাড়িয়া যাওয়ায় 'যুদ্ধের বখরার' আর 'লাভজনক' হওয়া সম্ভব ছিল না। ভের্সাই সন্ধির এই সমস্ত মূলগত গভীর ত্রুটির জন্যই ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ সাল আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়াছিল।

যে শত্রু দুর্বল এবং রোগা তাকে দোহন করিয়া নিশ্চয়ই দুধ আদায় করা যায় না। প্যারিসের বড় বড় শান্তিকর্তারা পরাজিত জার্মানী সম্পর্কে এই সাধারণ বুদ্ধির কথাটা ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং একদিকে ক্ষতিপূরণ ও নানাভাবে জার্মানীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা এবং অন্যদিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রাখিয়া বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘ মারফৎ শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা—এই বিচিত্র পরস্পরবিরোধী মনোভাব ও নীতি দেখা দিল ভের্সাই সন্ধির পরবর্তী যুগে। অবশ্য তখন সদ্যসমাপ্ত মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর সর্বনাশের গভীরতর আঘাতের দ্বারাই সন্ধি রচয়িতাগণ মানসিক সুস্থতা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু উহা নিশ্চয়ই রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল না। এই জটিল অবস্থা আরও ঘোরালো হইল বিক্ষুব্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা। তাঁহারা ইউরোপীয় রাজনৈতিক চালবাজীতে বিরক্ত হইলেন এবং শান্তি-সন্ধিগুলি অনুমোদনে অস্বীকৃত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশ করিতেও তাঁহারা রাজী হইলেন না এবং সমগ্র ইউরোপীয় রাজনীতি হইতে হাত গুটাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের সনাতন 'Isolationist Policy' বা নির্লিপ্ততার নীতি অনুসরণের দিকে ঝুঁকিলেন। তথাপি তাঁহারা একেবারে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না, বর্তমান পৃথিবীতে তাহা সম্ভবও নহে। বিশেষত মার্কিন নৌশক্তির বিরুদ্ধে আর একটি শক্তি তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল প্রশান্ত মহাসমুদ্রে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্য-বাদের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া তখন জাপান পূর্ব গগনে উদীয়মান সূর্যের সমুজ্জ্বল ছটা প্রকাশ করিতেছিল। দীর্ঘকালের সামন্ততন্ত্র হইতে জাগ্রত হইয়া তখন জাপান অনেকটা পশ্চিমী রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুরূপ একটা রাজতন্ত্রবাদী সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনকে পরাজিত করিয়া ফরমোজা দ্বীপ কাড়িয়া লইল এবং ১৯০৪-১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিশাল জারের রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া সমগ্র এশিয়া, এমন কি সারা পৃথিবীকে চমকিত করিল। সে কোরিয়া দখল করিল এবং মাঞ্চুরিয়ার ভিতর প্রবেশ করিল। ১৯১৪ সালে মিত্রপক্ষের দলে যোগ দিয়া জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের জার্মান দ্বীপ ও চীনে জার্মান অধিকৃত সিংটাউ কাড়িয়া লইল। এই সময় হইতেই সমগ্র চীন দখলের ইচ্ছাও তাহার ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাপানের এই নূতন শক্তি লাভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সমুদ্রপথে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই নির্ভর করিতেছিল বৃটিশ নৌবহরের উপর—অন্তত গোড়াকার দিকে। এই নৌবহর জার্মানীকে অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে আটকা রাখিয়াছিল বলিয়া তখনকার নিরপেক্ষ আমেরিকার বাণিজ্যও বৃটিশ অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং আমেরিকা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নৌবহর নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হইল এবং বৃটেনও সেই অবস্থাটি মানিয়া লইল; কারণ, তখন যুদ্ধক্লান্ত বৃটেনের পক্ষে নূতন নৌবল নির্মাণে পাল্লা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এদিকে প্রাচ্যখণ্ডে জাপানের অগ্রগামিতায় আমেরিকা বিচলিত হইয়া ওয়াশিংটনে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক আহ্বান করিল এবং ১৯২১-২২ সালে নৌবল নিয়ন্ত্রণ চুক্তি সম্পাদন করিল। এই চুক্তির দ্বারা স্থির হইল যে, বৃটেন, আমেরিকা ও জাপান, নৌবল-প্রধান এই তিন রাষ্ট্র ৩৫ হাজার টনের বেশী কোন সর্ববৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ বা 'ক্যাপিটাল শিপ' নির্মাণ করিবে না। অন্যান্য যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ তালিকা অবিলম্বে বন্ধ হইবে এবং ১০ বৎসরের মধ্যে কোন নূতন যুদ্ধ-জাহাজ তৈয়ার করা হইবে না। আর গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের নৌবলের আনুপাতিক হার হইবে ৫ : ৫ : ৩। নৌবল নিয়ন্ত্রণের এই চুক্তি ছাড়া কতকগুলি রাজনৈতিক সন্ধিও হইল এবং উহা দ্বারা বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপান প্রশান্ত মহাসমুদ্রে প্রত্যেকের দখলের সীমানা ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে চীনের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার গ্যারান্টিও দেওয়া হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরে আপন স্বার্থের খাতিরে আমেরিকা একটা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ইউরোপ সম্পর্কে নির্লিপ্ত হইল। এমন কি ভাবী জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে কোন গ্যারান্টি দিতেও সম্মত হইল না। তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নীতি আরও কড়া এবং উগ্র হইয়া পড়িল।

ফ্রান্সের এই উগ্রতার জন্য বিরক্ত বোধ করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু একথাও বুঝা দরকার যে, ফ্রান্সের পক্ষে নির্বিঘ্ন-তার প্রশ্ন সর্বদাই উদ্বেগজনক ছিল। ইংলণ্ড বা আমেরিকার মত সমুদ্রের ব্যবধান তার ছিল না এবং তাহার পূর্ব সীমানা সর্বদাই আক্রমণের আশঙ্কার মধ্যে ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বপ্রকার অত্যাচার, ক্ষয় ও ক্ষতি তাহার উপর দিয়া গিয়াছে এবং তাহার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়াছে। অথচ হাজার বৎসর ধরিয়া ফ্রান্স ছিল ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সভ্য জাতি এবং জাতীয়তা স্বাধীনতাও অনেকাংশে সর্ব-প্রথম অর্জন করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতার মানদণ্ড-রূপে পরিচিত হইয়াছিল ফ্রান্স, তাহার ভাষা ইউরোপের প্রত্যেকটি রাজ-দরবারের ভাষায়

এর নাম অপর্ণা

মায়ের চোখের মণি, ১০০ অবধি স্কিপিং করতে পারে
আর নামতা পারে ১১ ঘর অবধি!

আসল জিনিসটি ওর চাই!

অপর্ণা কেবল বলে, 'আমি যখন হব মায়ের মত বড়'। ওর মা তাকে বলেন, 'খুব ভাল হবি, খুব কাজের হবি'। আর তাইতো মা ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দেন—যাতে ওর বাড়ন্ত শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়।
হরলিক্সই হলো আসল জিনিস।
পুষ্টির উপাদান আর পরিপাচক প্রোটিন থাকাতে হরলিক্স ছেলেমেয়েদের শরীর গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে।

হরলিক্স খাঁটি ঘন দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং যবজাত পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এতো গুণ।
হরলিক্সের ওপর মায়েদের অগাধ বিশ্বাস।
ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।
রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।
হরলিক্স মস্তিষ্কের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিস

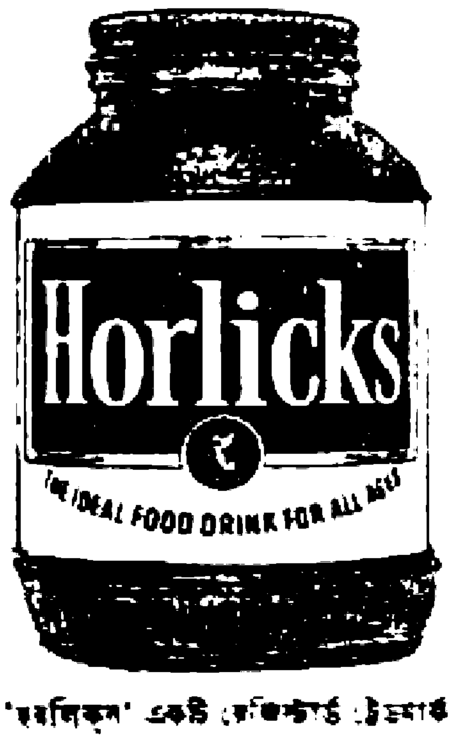

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1854 A

পরিণত হইল, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তায় আচার-ব্যবহারের শালীনতায় ফরাসী রীতিনীতিই যে কোন ব্যক্তির সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্নরূপে গৃহীত হইল।" * ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়া সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর যে সংগ্রাম ফরাসীরা করিয়াছিল, তাই ঊনবিংশ শতকে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে প্রভাবান্বিত করিল। কৃষিতে ও শ্রমশিল্পে এমন সামঞ্জস্য বিধান ফ্রান্সের মত আর কেহই করিতে পারে নাই। তাহার অর্ধেক লোক ছিল উৎকৃষ্ট কৃষিতে এবং বাকি অর্ধেক কল-কারখানা ও কুটিরশিল্পে। মোটামুটি ফরাসীরা সুখেই ছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলে সমাজের মধ্যে ভাঙন ধরিয়া গেল এবং উলটপালট ঘটিল। বিশেষত বৃহৎ কলকারখানার মালিকরা জোতদার হইয়া উঠিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে ফ্রান্সে বৃহৎ কলকারখানার পত্তন এবং ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সাম্রাজ্যবাদী। লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য বড় বড় শিল্পের মালিকরা মহাযুদ্ধের ফলে আরও উগ্র হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা চাহিলেন জার্মানীর লোরেন, সার ও রুর অঞ্চলের খনিগুলি দখল ও শোষণ করিতে। সুতরাং তাঁহারা পিছন হইতে ফরাসী রাজনীতির সূত্র ধরিয়া টানিতে চাহিলেন। তাঁহারা জার্মানীর রক্তমোক্ষণ করিয়া যেমন টাকা আদায় ও শোষণ করিতে চাহিলেন, তেমনই ফ্রান্সের সাধারণ মনোভাব ঝুঁকিয়া পড়িল আত্মরক্ষার নিবিঘ্নতার দিকে, ভাবী জার্মানীর কিস্মাত্র শক্তি সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে। ফলে দাঁড়াইল এই

> "Germany, in French opinion, must be weakend beyond recovery; she must be guarded and watched; she must be made to pay. As part of this policy France contracted a ring of alliances with the countries bordering in Germany. she helped to weld the 'succession states' (Czechoslovakia, Jugoslavia and Rumania) into the organization known as 'The Little Entente' and bound them to her interests by treaties and loans. She made an alliance with Poland, which together with her close alliance with Belgium, completed the ring of warders round the body of prostrate Germany".*

সহজ কথায় ফ্রান্সের মতে জার্মানীকে এতটা দুর্বল করিতে হইবে যেন ভবিষ্যতে সে আর মাথা তুলিয়া না দাঁড়াইতে পারে। তাকে পাহারা দিতে হইবে এবং তাহার উপর নজর রাখিতে হইবে—ক্ষতিপূরণ তাহার কাছ হইতে অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। এই নীতিরই অংশস্বরূপ ফ্রান্স জার্মানীর সীমান্তবর্তী চারিদিকের রাষ্ট্রগুলির সহিত কতকগুলি মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টি করিল। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং রুমানিয়ার এভাবে সৃষ্টি হইল। পোল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের সঙ্গেও ফ্রান্স মৈত্রী স্থাপন করিল। এভাবে পরাজিত ও পদদলিত জার্মানীর চতুর্দিকে ফ্রান্স এক দৃঢ় বেষ্টনীর সৃষ্টি করিল।

কিন্তু বৃটেন চাহিল মাঝারি পন্থা অনুসরণ করিতে। ফ্রান্সকে জার্মানী ও ইউরোপীয় ব্যাপারে এতটা ইচ্ছামত চলিতে দিলে বৃটেন 'শক্তির খেলায়' পিছনে পড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতের এই আশঙ্কায় বৃটেন 'উদারতা' দেখাইতে লাগিল এবং ভার্সাই সন্ধির কঠোর সর্তগুলি প্রয়োগ করিতে গিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে তাহার মতবিরোধ ঘটিতে লাগিল। এই মতবিরোধ চরমে উঠিল ১৯২৩ সালে, যখন ফ্রান্স জার্মানীর খনিসমৃদ্ধ রুঢ় অঞ্চল আক্রমণ ও দখল করিল। বৃটেন এই ব্যাপারে ফ্রান্সের সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী হইল না। কিন্তু ফ্রান্স চাহিল রুঢ় অঞ্চল দখলের দ্বারা জার্মানীকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য করিতে—যে ক্ষতিপূরণ জার্মানীর পক্ষে দেওয়া কোনমতেই সম্ভব ছিল না। রুঢ় দখলের পর জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হইল এবং উহার উল্টা প্রতিক্রিয়া ঘটিল ফ্রান্সের অর্থনীতির উপর। অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হইয়া উঠিল।

এদিকে আমেরিকায় স্বর্ণযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। মার্কিন অর্থ, মার্কিন শিল্প, এবং মার্কিন যন্ত্র ও যান্ত্রিক সভ্যতা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতেছিল। ঊনবিংশ শতকে বৃটিশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স এবং ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন যেমন পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তেমনই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য সর্বত্র অনুভূত হইতে লাগিল। এমন কি সোভিয়েট রাশিয়া পর্যন্ত মার্কিন যন্ত্র ও মার্কিন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হইল। কারণ কাঁচামাল ও যন্ত্র-শিল্পের এতবড় উৎপাদক পৃথিবীতে আর কেহ ছিল না। পৃথিবীর মোট কয়লার এক-তৃতীয়াংশ আসিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে, লোহ ও কার্পাসের অর্ধেক এবং খাদ্যশস্য ও পেট্রোলের তিন-চতুর্থাংশ। একমাত্র রবার ও টিনের ঘাটতি তার ছিল, কিন্তু তাও পূর্ণ হইতে লাগিল এশিয়া-খণ্ড হইতে। সুতরাং কাঁচামালের ঐশ্বর্যে আমেরিকা ছিল জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই কাঁচামাল হইতে mass production বা 'ব্যাপক উৎপাদন' শব্দটি প্রথম আবিষ্কৃত হইল মার্কিনী শিল্প প্রতিভার, যার পথ-প্রদর্শক ছিলেন মোটরগাড়ীর রাজা হেনরি ফোর্ড। মহাযুদ্ধের আবর্তে শত্রু-মিত্র উভয়ে যখন লড়াইতে বিব্রত, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায়, সুদূর প্রাচ্য এবং ইউরোপে যুধ্যমান, অযুধ্যমান অর্থাৎ সকলকে 'সমান নিরপেক্ষতার' (!) সহিত খাদ্য, বস্ত্র ও সমরসম্ভার জোগাইয়া যাইতে লাগিল। আড়াই বৎসর ধরিয়া এই উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবসায় চলিল এবং পরে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জার্মানীর পরাজয়ে সাহায্য করিল। ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন পৃথিবীর নিকট আমেরিকার ঋণ ছিল ৩০০ কোটি ডলার, আর যখন মহাযুদ্ধের অবসান হইল, তখন সমস্ত মার্কিনী ঋণ শোধ হইয়া গিয়া পৃথিবীর নিকট আমেরিকার পাওনা দাঁড়াইল ১০০০ কোটি ডলার। সুতরাং অবস্থাটা চিন্তা করিবার মত।

মহাযুদ্ধে মার্কিনী উৎপাদনে যে গতিবেগের সঞ্চার হইল, তার ফলে পৃথিবীর কতকগুলি শ্রমশিল্পের উপর তার একচেটিয়া দখল প্রতিষ্ঠিত হইল, যথা মোটরগাড়ী, রেডিও এবং সিনেমা-ফিল্ম। ১৯২০ সালে আমেরিকায় প্রায় ৭০ লক্ষ মোটরগাড়ী (যাত্রীবাহী) নির্মিত হইয়াছিল, আর ১৯২৯ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়াইল ২ কোটি ৩০ লক্ষ মোটরে। অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন বাসিন্দার একখানি করিয়া মোটরগাড়ী ছিল। (এই তুলনায় ভারতবাসীর আজও একখানি করিয়া কাপড় পর্যন্ত নাই!) প্রত্যেকটি গ্রামে একটি সিনেমা, প্রত্যেকটি গৃহে ও হোটেলের প্রতি কক্ষে একটি টেলিফোন এবং প্রত্যেকটি মানুষের জন্য চকচকে জুতা ও জামা তৈয়ার হইল। এই উৎপাদনের কোন সীমা সংখ্যা ছিল না। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি ভাবিয়া পাইল না এত টাকা দিয়া তাহারা কি করিবে এবং উৎপাদকেরা ভাবিয়া পাইল না এত দ্রব্য-সামগ্রী কোথায় চালান দিবে। গভর্নমেণ্ট সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার লইয়া ফাঁপরে পড়িলেন —যখের ধন সন্ধান করিতে গিয়া বন্দী হইবার মতন! ফলে, সংক্ষেপে অবস্থাটা দাঁড়াইল এই—

> "Europe was in debt to America America paid the piper and America called the tune. The piper was High Finance and the tune More Production; the industrialists of the world followed the piper like the children in Browning's poem, and he led them into a cave and they were engulfed in the crisis of 1929". *

মার্কিন অর্থ ও মার্কিন শিল্প ধীরে ধীরে পৃথিবীকে এভাবে নিশ্চিত পতনের গহ্বরের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'উত্তমর্ণ রাষ্ট্রে' পরিণত হইল। অর্থাৎ মহাযুদ্ধের সমস্ত মিত্রই তাহার নিকট ঋণগ্রস্ত ছিল এবং এই ঋণের পরিমাণ ২০০ কোটি পাউণ্ড। ইহার মধ্যে বৃটেনের ঋণের পরিমাণ ছিল ৯২ কোটি পাউণ্ড, আর ফ্রান্সের ৮০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। এদিকে ইউরোপীয় মিত্র শক্তিবর্গের নিকট বৃটেনের পাওনা ছিল ২২০ কোটি পাউণ্ড এবং রাশিয়ার নিকট ফ্রান্সের পাওনা ছিল ৫ কোটি পাউণ্ড। আবার সমস্ত ইউরোপীয় মিত্রশক্তি জার্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬৫০ কোটি পাউণ্ড পাওনা দাবী করিল। ভারতীয় মুদ্রা টাকার হিসাবে এই অঙ্ক-

---

* "The Between-War World" by J. Hampden Jackson' Page 63.

* The World Since the War"—by Stephen King-Hall Page 40.

* "The Between-War World" by J. Hampden Jackson Page 355

পুলি আকাশের নক্ষত্রের মত লক্ষ কোটিতে দাঁড়াইবে। বিস্ময়ের কথা এই যে সেই সময়কার বড় বড় রাষ্ট্রপতিও একথা ভুলিয়া গেলেন যে এত টাকা আদায় করা কেবল অসম্ভবই নহে, তেমন চেষ্টা করিতে গেলেও পৃথিবীর অর্থনৈতিক বাজারে বিপর্যয় দেখা দিবে। এবং সেই বিপর্যয় সত্যই দেখা দিল।

আমেরিকার পাওনার জবাবে মিত্রশক্তি উত্তর দিলেন যে, জার্মানী ক্ষতিপূরণের টাকা না দিলে তাঁহারাই বা কি প্রকারে আমেরিকার ধার শোধ করিবেন? আর বৃটেন সেই সঙ্গে 'পুনশ্চ' স্বরূপ বলিলেন যে, তাঁহার মিত্রবর্গের নিকট যে পাওনা আছে, তাহা আদায় না হইলে তিনিই বা কি ভাবে ঋণমুক্ত হইবেন?

এভাবে পরস্পরের পাওনা টাকা লইয়া পরস্পরের ঝগড়া চলিল এবং অর্থনীতির বড় বড় পক্ককেশ পান্ডা মাথা ঘামাইয়া জার্মানীর কাছ হইতে পাওনা আদায়ের ফন্দী বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। ১৯২৪ সালে এজন্য 'ডয়েস প্ল্যান' এবং ১৯২৯ সালে 'ইয়ং প্ল্যান' তৈয়ার হইল। আমাদের দেশে যেমন গরুকে ফুকা দিয়া দুধ আদায় করা হয়, এই প্ল্যানও অনেকটা তাহাই ছিল। অর্থাৎ ব্যবস্থা এই ছিল যে, আমেরিকা ও মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানীকে টাকা ধার দিবে তাহার শ্রমশিল্প ও বহির্বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য এবং এভাবে জার্মানীর যে অতিরিক্ত রপ্তানী বাণিজ্যের সৃষ্টি হইবে, তাহা হইতে মিত্রশক্তিবর্গ ঋণ কিস্তীতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করিবেন।

পাওনা টাকা সম্পর্কে এভাবে একটা জোড়াতালি দিয়া ভার্সাই সন্ধির রচয়িতাগণ আর্থিক জগৎ হইতে রাজনৈতিক জগতের শান্তি রক্ষায় মনোযোগী হইলেন। সন্ধির সর্তানুসারে জার্মানীকে সর্বপ্রকারে পঙ্গু, খণ্ডিত ও নিরস্ত্র করিয়া তারপর তাহাকে রাজনীতির ভদ্রসমাজে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ১৯২৫ সালে লোকার্ণোতে (সুইজারল্যান্ড) এক সন্ধিচুক্তি হইল এবং এই সন্ধি অনুসারে ইউরোপীয় মিত্রশক্তি ও জার্মানীর মধ্যে নিম্নলিখিত চুক্তি হইল :—

(১) জার্মানী বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে যোগদান করিবে এবং কাউন্সিলের একজন সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) যদি ফ্রান্স জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে বৃটেন ও ইতালী একযোগে ফ্রান্সকে রক্ষা করিবে, আর যদি জার্মানী ফ্রান্স কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে তাহারা জার্মানীকে রক্ষা করিবে।

ভার্সাই হইতে লোকার্ণো পর্যন্ত ইউরোপীয় ইতিহাস এভাবে আবর্তিত হইল। কিন্তু বড় বড় রাজনীতিবিদগণের মূর্খতার ইহাই শেষ পরিচয় ছিল না। মধ্য ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপ লইয়াও মিত্রপক্ষের শিরঃপীড়া দেখা দিল। অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য বিদীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং সেখানে অসাধারণ আর্থিক দৈন্য ও জনগণের দুরবস্থা আরম্ভ হইল। জার্মানীর মত সেখানেও কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ দেখা দিল। আর পূর্ব দিকে রুশ সাম্রাজ্যের পতন হইল। রাশিয়ার সম্রাট বা জার সপরিবারে নিহত হইলেন নিজ প্রজাপুঞ্জের হাতে। গণ-বিপ্লবের অগ্নিশিখা রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র এবং সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতা ও কায়েমী স্বার্থকে গ্রাস করিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইলেন, উহার ফলে কেরেনস্কির অস্থায়ী গভর্ণমেন্টের উচ্ছেদ হইল। শান্তি, রুটি ও জমি—এই শ্লোগানের দ্বারা জনগণ উদ্বুদ্ধ হইল। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে রাশিয়া জার্মানীর সহিত প্রভূত কর ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে সন্ধি করিল, 'ব্রেষ্টলিটোভেস্কের সন্ধি' নামে সেটা ইতিহাসে খ্যাত।

কিন্তু মিত্রশক্তি রাশিয়াকে এত সহজে রেহাই দিলেন না। তাঁহারা কমিউনিষ্ট বিপ্লব ধ্বংসের জন্য নানা চক্রান্ত করিলেন এবং রাশিয়ার পাল্টা বিপ্লবী জেনারেল ডেনিকিন ও জেনারেল কোলচাক প্রভৃতিকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য ও উস্কানি দিলেন। কিন্তু রুশ বিপ্লবের গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইল না। একদিকে রণক্লান্ত ইউরোপ এবং অন্য দিকে 'কমিউনিষ্ট দৈত্য' এই দুইয়ের পাল্লায় পড়িয়া ভার্সাই সন্ধির রচয়িতাগণ হিমসিম খাইতে লাগিলেন। বহুপ্রকার চেষ্টার দ্বারাও বিপ্লবের গতি ঠেকাইতে না পারিয়া অবশেষে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রবর্গ হাল ছাড়িয়া দিলেন এবং ১৯২৫ সালের মধ্যে রাশিয়াও তাল সামলাইয়া উঠিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাইল। মিত্রপক্ষ রাশিয়ার চারিদিকে ফিনল্যান্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যান্ড—এই সমস্ত নূতন রাষ্ট্রের বন্ধনী সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিলেন। অন্তত এই কৌশলে তাঁরা কমিউনিজমের সংক্রামক ব্যাধি খাস রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে উৎসুক হইলেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে শক্তিবর্গ সোভিয়েট রাশিয়াকে স্বীকার করিয়া নিতে বাধ্য হইলেন। ১৯২৪ সালে বৃটেন তাহাকে প্রথম স্বীকৃতি দিল এবং পরে অন্যান্য শক্তি বৃটেনকে অনুসরণ করিল। এভাবে ১৯২৫ ও ১৯২৬ সাল লোকার্ণো চুক্তির আবহাওয়ায় ইউরোপের বাহ্যিক শান্তি ডাকিয়া আনিল।

কিন্তু স্থায়ী শান্তি ঘটিল না। যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি আবার দ্রুত ঘটিতে লাগিল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমি এই দিক দিয়া আর একটা বিপ্লব দেখা দিল। এত দিন পর্যন্ত কৃষকের যে কয়লা ছিল যন্ত্রজগতের অধিপতি উহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হইল পেট্রোল ও বিদ্যুৎ। বড় বড় এবং উৎকৃষ্টতর যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইতে লাগিল, কৃষিকার্যে যান্ত্রিকতা প্রবর্তিত হইল এবং কৃত্রিম দ্রব্য তৈয়ারির এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। পৃথিবীর মোট উৎপাদন শক্তি বহুগুণে বাড়িয়া গেল, কিন্তু এই উৎপাদনে সমতা রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বরং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এই বর্ধিত সম্পদের বিপরীত পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভের আশায় বহু রাষ্ট্র শুল্ক প্রাচীর তুলিয়া অবাধ বাণিজ্য বা 'Free Trade' এর গতি রুদ্ধ করিয়া দিল। মহাযুদ্ধের অসম্ভব খরচ বহু রাষ্ট্রকে ঋণ করিয়া চালাইতে হইয়াছিল। ফলে, তাহাদের আর ক্রয়ক্ষমতা রহিল না। বৃটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করিল (১৯৩১)। আর পরাজিত রাষ্ট্রগুলির দুর্দশা হইল অবর্ণনীয়, অবিশ্বাস্য রকমের মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক পতন ডাকিয়া আনিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এতদিন ধরিয়া আন্তর্জাতিক অর্থনীতির যে প্রভুত্ব ছিল লন্ডনে, তাহার হাত বদল হইল নিউইয়র্কের ওয়াল ষ্ট্রীটে। যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক ধনকুবের দানবে পরিণত হইল এবং ধনবন্টনের কোন সমতা ছিল না। ফলে যুদ্ধের রাক্ষুসে ঋণ, অভূতপূর্ব ক্ষতিপূরণের দাবী এবং অসম্ভব মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি মিলিয়া দুনিয়ার অর্থনৈতিক বাজারে ওলোটপালোট

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যা মাঘ—চৈত্র ১৩৭৭

সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

লেখকসূচী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্র), সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সমকালীনতা ও আধুনিকতা—জীবনে ও সাহিত্যে), বাণী রায় (বাংলার মহিলাকবি), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা), রমা চৌধুরী (রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ), হারাধন দত্ত (কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী), ভূপেন্দ্রনাথ শীল (দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের কবিতা), রমেন্দ্রনাথ মল্লিক (কবি কুমুদরঞ্জন ও তাঁর কাব্যচেতনা), সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্তপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-শাস্ত্রী, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ (গ্রন্থসমালোচনা)

চিত্রসূচী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বসন্তসেনা)

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা

বার্ষিক চাঁদা চার টাকা (সাধারণ ডাকে) ও সাত টাকা (রেজিস্ট্রী ডাকে)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরিবেশক। পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রা: লি:। ১২/১ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

CENTRAL LIBRARY

সৃষ্টি করিল। ১৯২৯ সালের শরৎকালে নিউইয়র্কের ওয়াল ষ্ট্রীট হইতেই উহার সূত্র—সেন ঝড়ের বেগ মৃত্যু ডাকিয়া আনিল। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সালের প্রথম নয় মাসে নিউইয়র্কের ষ্টক এক্সচেঞ্জ ফাটকাবাজীর ধূমে পড়িয়া গেল। শেয়ারবাজারে এমন পাগলামি দেখা দিল যে, অল্পমেয়াদী ঋণের (Short term loan) জন্য শতকরা ২০্ টাকা পর্যন্ত সুদ দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু এমন অন্ধ উত্তেজনায় ও ফাটকাবাজীর পাগলামি কতক্ষণ টিকিতে পারে? সুতরাং অবিলম্বে শেয়ার বাজারে ভয়াবহ মন্দা এবং ত্রাস দেখা দিল—

> "Then panic set in, share values fell so rapidly that on one day alone, in the month of October, 16½ million shares were unloaded in one day' .... and the repercussions of the Wall Street crash were felt in the banks and stock-exchanges of all countries. *

সোজা কথায় নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে যে পতন আরম্ভ হইল পৃথিবীর সর্বত্র তাহা ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি করিল। বহু ব্যাঙ্ক ফেঁসিয়া গেল এবং জার্মানীর ব্যাঙ্কগুলি দরজা বন্ধ করিল, বৃটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিল, জার্মানী ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃত হইল এবং উপায়ান্তর না পাইয়া মিত্রপক্ষকে তাহাই মানিয়া লইতে হইল। এই অবস্থা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুইটি বৃহৎ চেষ্টা হইল। ১৯৩২ সালে জেনেভায় পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের অস্ত্র সীমাবদ্ধ করিবার জন্য একটি বিশ্ব সম্মেলন ডাকা হইল এবং ১৯৩৩ সালে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যা মিটাইবার জন্য আর একটি বিশ্ব সম্মেলনের উদ্বোধন হইল। কিন্তু দুইটি সম্মেলনই শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইল পারস্পরিক স্বার্থ, অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব ও বিরোধের জন্য। রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় দিক দিয়া যে শোচনীয় খেলা আরম্ভ হইল, ১৯৩৩ সাল হইতে তাহা একদিকে ডিক্টেটারির যুগ ও নাৎসীবাদ এবং অন্যদিকে যবনিকার অন্তরালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুত ভূমিকা রচনা করিল। জেনেভার বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরে বহু কমিটি ও কনফারেন্সের পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র স্তূপীকৃত হইল—নিরস্ত্রীকরণ হইতে আর্থিক সমস্যা প্রতিকারের চেষ্টা পর্যন্ত বহুপ্রকার সাধু প্রস্তাব বানচাল হইয়া গেল। ওদিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট 'নিউ ডিল' মারফৎ আমেরিকার আর্থিক শক্তি পুনর্গঠন ও সংহত করিতে লাগিলেন। আর জার্মানী, ইতালী ও জাপানে ফ্যাসিজম ও সামরিকবাদ মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট পর্যন্ত এই অবস্থা চলিল।

ডিক্টেটারির যুগ

রাষ্ট্রের একচ্ছত্র নায়ক বা ডিক্টেটারি অনেকটা আমাদের দেশের অবতারবাদের মত। কিন্তু অবতারবাদের ভিতর আধ্যাত্মিকতা, সংস্কার উহার মধ্যে দেবত্বারোপ ও হিংসার প্রশ্ন নাই, আছে ধর্মগত অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কার। কিন্তু রাজনৈতিক অবতারবাদ হিংসা ও লোভের উৎস। মহাযুদ্ধের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত এবং বিভ্রান্ত জনগণবাদ ইউরোপে এই নূতন রাজনৈতিক অবতারবাদ ডাকিয়া আনিল একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া—তাঁর নাম বেনিটো মুসোলিনী এবং পরে তাঁকে ছাড়াইয়া গেলেন এডলফ হিটলার। অবশ্য আমাদের দেশেও মুসোলিনী ও হিটলার অনেক দিন পর্যন্ত নূতন রাজনৈতিক অবতাররূপে পূজিত হইয়াছিলেন। এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলেও ইহাদের জন্য যথেষ্ট দরদ ছিল। ইহার মূলে ছিল ভারতবর্ষের পরাধীনতা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বাভাবিক ক্ষোভ। আর পরাজিত জার্মানীর জন্য দরদ বোধ। সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে, পুস্তকে ও বক্তৃতায় মুসোলিনী ও হিটলারের যথেষ্ট বন্দনা হইয়াছে আমাদের দেশে এবং কিভাবে তাঁরা স্ব স্ব দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ, উন্নত ও শক্তিশালী করিয়াছেন, বারবার সেই দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে। ডিক্টেটরদের জনপ্রিয়তা সেই সময় নিতান্ত সামান্য ছিল না।

কিন্তু মুসোলিনী বা হিটলারের ক্ষমতা লাভের পিছনে ছিল ধাপ্পাবাজী, হিংসা ও রক্তপাত।—আর তথাকথিত গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক ও রাষ্ট্রীক সমস্যা পূরণে শোচনীয় ব্যর্থতা ও কমিউনিজমের প্রতি বিদ্বেষ। মহাযুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত ইউরোপীয় জনগণের একাংশকে তাঁরা বুঝাইতে পারিলেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা কোন সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না, জাতীয়তাবাদের শক্তি পুঞ্জীভূত করিতে পারে না, আর ইঙ্গ-ফরাসীর প্রভুত্ব খর্বিত না হইলে জাতীয় রাষ্ট্রের উন্নতিও সম্ভব নহে। তাঁরা বড় বড় পুঁজিপতি, জমিদার ও কায়েমী স্বার্থের বাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সমর্থন লাভ করিলেন কমিউনিজমের বিরোধিতার দ্বারা এবং বেকারদিগকে তাঁরা আকৃষ্ট করিলেন নূতন কর্মের সন্ধানের দ্বারা। ইতালী ছিল এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। ১৯১৫ সালে ইতালী মিত্রপক্ষের 'ঘুষের' প্রলোভনে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। নূতন দেশ লাভে প্রলুব্ধ হইয়া ইতালী অস্ত্রধারণ করিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের শেষে ফ্রান্স ও বৃটেন সেই প্রতিশ্রুতি যেমনভাবে রক্ষা করিল না। প্রেসিডেন্ট উইলসন শান্তি সম্মেলনে ইতালীকে উৎকোচ দেওয়ার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়িলেন। কারণ একমাত্র যুগোস্লাভিয়াকে বলি দিয়াই ইতালীর তৃপ্তিবিধান সম্ভব ছিল। এদিকে ১৯১৭ সালে ক্যাপোরেটোর যুদ্ধে ইতালীর বিষম পরাজয় হইয়াছিল। সেই পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া এবং যুদ্ধশেষে মিত্রবর্গ কর্তৃক 'বঞ্চনা' মিলিয়া ইতালীকে পাগল করিয়া তুলিল। ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক বিরোধ, শ্রমিক ধর্মঘট ও আর্থিক দুর্গতি ইত্যাদি ইতালীর সমাজজীবনে নিদারুণ তাণ্ডব ঘটাইল। এই সময় দেখা দিলেন বেনিটো মুসোলিনী। তিনি ছিলেন একজন কর্মকারের (blacksmith) পুত্র। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে তিনি ছিলেন একজন কর্পোরেল এবং আহত হইয়াছিলেন। পরে তিনি একটি বামপন্থী পত্রিকার সম্পাদক হন। কিন্তু তিনিই গঠন করিলেন ফ্যাসিস্ট পার্টি—কমিউনিজমের একান্ত বিরোধী রূপে। যুদ্ধের ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া এবং ইতালীর রাজনৈতিক ও আর্থিক দৈন্যের ফলে হতাশ হইয়া উগ্রপন্থীর দল মুসোলিনীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তারা ইউনিফর্ম হিসাবে কালোকুর্তা ব্যবহার করিল—একজন্য ইহাদের নাম ছিল ব্ল্যাক সার্টস। তাহারা পুরানো রোমক সাম্রাজ্যের কতগুলি চিহ্ন প্রবর্তন করিল এবং সেই পুরানো কায়দায়ই হাত তুলিয়া অভিবাদন বা salute -এর রীতি অনুসরণ করিল। প্রকৃতপক্ষে মুসোলিনী বুঝাইলেন যে পুরাতন রোমক সাম্রাজ্য আবার নবীন ইতালী স্থাপন করিবে। তার দলে ৪০ হাজার লোক জুটিল এবং যখন উত্তর ইতালীতে ব্যাপক ধর্মঘট চলিতে লাগিল এবং গভর্ণমেন্ট তাহা দমন করিতে ব্যর্থ হইলেন, তখন ১৯২২ সালের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনী তাঁর ফ্যাসিস্ট দলসহ রোমে অভিযান করিলেন। ইতালীর অক্ষম রাজা ভিক্টোর ইমানুয়েল তাঁহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯২৪ সালে গভর্ণমেন্ট দখল করিয়া মুসোলিনী ক্রমে সমস্ত বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক দলকে উৎপাটন করিলেন। তিনি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র নায়কত্ব অর্জন করিয়া 'ডুসে' (Leader বা নেতাজী) সাজিলেন। ইতালী মুসোলিনীর সম্পূর্ণ কুক্ষিগত হইল এবং ফ্যাসিস্ট পার্টি ছাড়া আর কোন দল ও প্রতিষ্ঠান রহিল না। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সর্বপ্রকার মতবাদের স্বাধীনতায় জবাই হইল—বিরুদ্ধবাদীরা হয় নিহত, না হয় বন্দী বা নির্বাসিত হইল। ইতালীতে শান্তির স্রোত বহিল। কিন্তু অপরদিকে মুসোলিনী ইতালী রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও পুনরুজ্জীবিত করিলেন এবং যুবকদিগকে সামরিক মতবাদে এবং রোমক সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মাতাইয়া তুলিলেন। ফলে, ১৯৩৫ সালের ৩রা অক্টোবর আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাজ্য আবিসিনিয়া মুসোলিনীর সৈন্যদল কর্তৃক আক্রান্ত হইল এবং ১৯৩৬ সালের মে মাসে আবিসিনিয়া ইতালীর দখলে গেল। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ এবং ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ মুসোলিনীকে বাধা দিতে পারিলেন না। বরং তাঁরা তোষণ ও প্রশ্রয় দানের নীতি শুরু করিলেন, যাহা ১৯৩৯ সালে বিপজ্জনক সীমারেখায় গিয়া পৌঁছিল।

হিটলার এবং জার্মানীর ইতিহাসও কিছুটা মুসোলিনীর ইতালীরই মত। কিন্তু পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও জার্মানীর অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল ইতালীর তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং মুসোলিনীর তুলনায় হিটলার অনেক বেশী বিপজ্জনক বলিয়া প্রতিভাত হইলেন পৃথিবীর শান্তির পক্ষে। সেই কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে। (ক্রমশঃ)

* 'The World Since the War'—by Stephen King Hall Page 53.

অনন্ত মণ্ডলের দুঃখ ও সুখ

ভাল করে আলো হবার আগে মা উঠে যেতেই ভোরবেলায় মালা বাবার কোলের কাছে এগিয়ে এল। আজকাল মা থাকলে বাবার কোল ঘেঁষে শোবার সৌভাগ্য হয় না। কারণ মালা বড় হয়ে গেছে। প্রায় রোজই মার মুখে শুনতে হয় কথাটা।

অনন্তর হাতের আঙুল টানতে টানতে মালা তার বুকের কাছে আরো ঘন হয়ে এল। তারপর ক'দিন ধরে যা বলবে ভাবছিল সেই কথাটা বলে ফেললো: 'তোমার সেই নতুন ধুতিটা যেটা তুমি পরো নি, আমাকে ছাপিয়ে এনে দেবে, লাল আর সবুজ লতার ছাপ? আমার একটাও বেড়াতে যাবার শাড়ি নেই।'

কাত হয়ে মালার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে অনন্ত রাজী হয়ে গেল।

সুধাংশু ঘোষ

বলল, 'সোমবার শহরে যাচ্ছি। তুই মনে করিয়ে দিস। শাড়ি ছাপিয়ে এনে দেবো।'

খুশীতে মালার অস্থিরতা বাড়লো: 'যাবো বাবা, দেখে আসবো? সাদা হাঁসটা ঠিক আজ ডিম পেড়েছে। পেটটা কেমন ফুলে পড়েছিল, দেখো নি?'

অনন্ত চাইছিল, আরো কিছুক্ষণ মালা তার আঙুল টেনে দিক। মালার হাত চেপে রাখতে গিয়েও অনন্ত ছেড়ে দিল। মাটির মেঝের ওয়াড়বিহীন তোষক ছেড়ে মেয়েটা টিনের খুপরির দিকে প্রায় দৌড়ে চলে গেল। আজ ভোরে অকারণে অনন্তর মেজাজ নরম। একা আরো খানিক সময় বিছানায় পড়ে রইল। মাটির দেওয়ালে সরু কাপড় ফালিসাঁটা দুটো ছোট জানলা। শুয়ে শুয়ে ফাঁকফির মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। এইমাত্র সূর্য উঠছে। ক'দিন ধরে শুধু বৃষ্টি। প্রায় হাড়ে জল ঢুকেছে। আর বৃষ্টি চাই না। মেঘের গায়ে একটু রোদ্দুর লাগুক। কিন্তু জানলা দিয়ে অনন্ত দেখতে পেল, আকাশের রং রেলগাড়ির ধোঁয়ার মতো।

দুপুরের দিকে করাত টানতে টানতে অনন্তর সকাল বেলার নরম মন তেতো হয়ে গেল।

কার্তিকপুরের ঘোষালবাবুর আম-বাগানে কাঠ চিরে তক্তা করা হচ্ছে। করাত চলছে খান দশেক। তিরিশ চল্লিশ জন করাতির রোদে পোড়া কালো আর তামাটে শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে, করাতের দাঁত কেটে কেটে বসছে ভেজা কাঠের শরীরে। এত [illegible] শুকনো কাঠিকাঠি ছেলেমেয়ে এইমাত্র কাঠের কুচি কুড়িয়ে নিয়ে গেল।

কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে অনন্ত একা এবং তলায় আর দুজন একটা করাত টানছিল। চারপাশে একঘেয়ে শব্দ। দুপুর বলে হাওয়াটা গরম। অনন্ত ঘোলাটে চোখে একবার ওপর দিকে তাকাল। মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু রোদ্দুর ঝরছে। বিলের ধারে অনন্তর চারখানা ধানী জমিতে নিশ্চয়ই লাগছে ওই রোদ্দুর। সবুজ ধানগাছগুলো হাওয়ায় নিশ্চয়ই কাঁপছে।

করাত টানার কাজে তার মনে প্রসন্নতা আসে না। যে মজুরী মিলছে তাতে তার চলে না, কোনোমতেই না, একবেলা খেয়েও না। অথচ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হাতদুটো প্রায় অবিরাম ওঠানামা করছে। শরীরে কোনো বোধ থাকে না, নিজের হাত-পা নিজের বলে বোঝা যায় না। শুধু করাত থামে না। ইদানীং মাঝেমাঝে একটা দার্শনিক ভাবনা তাকে আক্রমণ করছে: মানুষ কোন্ জাতের জানোয়ার?

এ-কাজ অনন্তর ভাল না লাগার আরো একটা নিগূঢ় কারণ আছে। সেকথা সবাইকে বলা যায় না। প্রায় কাউকেই বলা যায় না। নিজের কাছ থেকে লুকোতে পারলেও লজ্জা থেকে বাঁচা যায়। কোনোভাবে সেকথা শুনলে সবাই হেসে উঠবে। পরের অধীনে দিনমজুরী খাটার কাজে তার মনের সম্মতি নেই। অনন্তর এই মনোভাবটা কেমন যেন!

কাজের ফাঁকে তামাকের কলকের উদ্গত ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে অনন্ত বিলের ধারের হাত চারখানা, তার নিজস্ব ধানক্ষেত দেখতে পায়। ওই জমির ধানে, কলাবাদুলা, তার সারা বছর চলবে না। না চলুক, কয়েক মাস তো চলবে। অনন্ত কোমরের গামছাটা এঁটে বাঁধে। জমি চারখানার কথা ভাবলে কী এক শক্তি যেন তার শরীরে সঞ্চারিত হয়। বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পায়।

মালার ঠাকুমা একটা কাস্তে হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল। তার শরীরটা তার হাতের কাস্তের মতো বাঁকা। চলতে চলতে বুড়ি অনন্তর শোবার ঘরের দিকে তাকাল। অনেকদিন মেরামত না হওয়ায় ঘরখানার খড়ের চালটা ঢেউ হয়ে গেছে, মাটির দেওয়াল গভীরভাবে ফেটে গেছে কয়েক জায়গায়।

বাড়ির চারপাশে ঘোরানো একটা খাদ, জলে আর কচুরিপানায় ভর্তি। শীতের সময় খাদটা শুকিয়ে যায়। এক জায়গা কচুরিপানা সরিয়ে দুটো বাঁশ দিয়ে অনন্ত সাঁকো তৈরি করেছে। কাস্তেটা কোমরে গুঁজে সাঁকোর ওপর হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে বুড়ি এপারে এসে পৌঁছল।

সামনে রেললাইন। পাশের চালু জমিতে দু-তিনরকম শাকের ভেজী জঙ্গল। ঘণ্টায় অন্তত দুখানা ট্রেন যাওয়া-আসা করে। জোর হাওয়ার শাকের জঙ্গলে ঝড় বয়ে যায়। বুড়ি কাস্তে হাতে এগিয়ে গেল। তারপর দরকার হচ্ছে না দেখে কাস্তেটা মাটিতে রেখে শুধু হাতে কাজ শুরু করল। শাক তুলবার কাজে বুড়ির হাত নিপুণ। শাক তুলবার সময় একটা ব্যাঙ লাফ মেরে বুড়ির গায়ে কাদাজল ছিটিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে বুড়ি একটু নিস্তেজ হয়ে গেল। রোদ্দুরের রঙ প্রায় হলুদ। শাকের জোটজোট আঁটি বেঁধে মলিন আঁচলে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ি রেললাইন ধরে পাশের গ্রামের হাটের দিকে চলল। বেশী ভার নিয়ে সে অনেক দূরে যেতে পারে না।

হপ্ত পানসে বিকেলটা ক্যাকটাসের হাটের একপাশে বসে শাকের গুচ্ছগুলো বুড়ি বিক্রি করবে। বিভিন্ন ক্রেতার বিভিন্ন বিচিত্র দর কষাকষিতে টলবে না, পথভ্রষ্ট হবে না। দাম তার মনে মনে ঠিক করা আছে, তার কমে বেচবে না। শুধু শাক নয়, শুধু সবজি নয়, আরো অনেক জিনিস একমাত্র মেহনতের বিনিময়ে সংগ্রহ করে হাটে নিয়ে বেচা যায়। প্রমাণ করা যায়, অনন্তর সংসারে সে বোঝা নয়। এর জন্য মেহনত ছাড়া আর কোনো মূলধনের দরকার নেই। অর্থ উপার্জনের অনেক অবিশ্বাস্য অনাবিষ্কৃত পন্থা বুড়ির নখদর্পণে। তবে এই অঞ্চলে প্রকৃতি বড় কৃপণ।

হাট থেকে রাত করে বাড়ি ফিরে সবজির ব্যবসার উপার্জনের অধিকাংশই সে স্বেচ্ছায় মালার মার হাতে দেবে। খুশী হয়েই দেবে। এটা বুড়ির আত্মপ্রত্যয়ের এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। সামান্য কিছু অবশ্য রাখবে তামাকপাতা ইত্যাদি নিজের একান্ত ব্যক্তিগত দু-একটা দরকার মেটাতে।

বিশ্রী বর্ষা এসেছে। কখনো বিরাম নেই বৃষ্টির। টিনের ছাপড়া বাঁধা হয়েছে ঘোষালবাবুর আমবাগানে। এই তো সেদিন দুপুরে রোদ উঠেছিল, আকাশের নীল একটু দেখা গিয়েছিল। তারপর পরতে পরতে মেঘ জমেছে, কোথায় সেই নীল উধাও হয়েছে, আর বিরামহীন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ভারী হয়েছে ধানগাছের পাতা, কাঠের গুঁড়ো, মেজাজ।

টিনের ওপর সবসময় ঝমঝম বৃষ্টি। হ্যাজাকের ধারালো দাঁত কাঠের শরীরে কেটে বসার একটানা কর্কশ শব্দ। রাতের করাতের ওপর হাত দুটো যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতায় ওঠা-নামা করে। এর পিছনে অনন্তর কোনো সচেতন প্রচেষ্টা নেই। আকাশের নিষ্ঠুরতার তার অবাধ্য মন কেবলই ফিরে ফিরে আসে বিলের ধারটায়, যেখানে চারখানা জমির অজস্র ধানশিষ বৃষ্টির ভারে মাথা নিচু করে আছে, নতুন নতুন মালার মা যেমন করত।

সন্ধ্যার মুখে বাড়ি ফেরার পথে নিজের গ্রামের কাছাকাছি এসে জঙ্গল ছাড়িয়ে রেললাইনের ওপর উঠে, দক্ষিণ দিকে চোখ পড়তে অনন্তর মনে হল, সামনে শুধুই জল চিকচিক করছে আবছা অন্ধকারে। কোনটা বিল আর কোনটা ধানক্ষেত কিছু বোঝা যায় না।

রেললাইন থেকে অনন্ত জমির পাশে ঢাল বেয়ে নেমে গেল। দিন পনের ধরে ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে মাঠঘাট ক্ষেতখামারে জল জমেছিল। আজ বিলের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় জলের রঙটা বদলে গেছে।

মাঠ থেকে ক্ষেত আরো নিচু। ছোট মাঠটা পেরিয়ে ধানক্ষেতে নামতে অনন্তর কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে গেল। এ-অঞ্চলের কোনো ক্ষেতের ধান এখনো এক হাতের বেশী লম্বা হতে পারে নি। পায়ের সঙ্গে ধানগাছগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল। আরো একটু এগিয়ে অনন্ত সাঁতরাতে শুরু করল।

এইখানেই বোধহয় জলের তলায় তার জমি চারখানা। অনন্ত এক জায়গায় স্থির হয়ে ভেসে রইল। অনেক জল এখানে। মাটিতে দাঁড়ালে তার মাথার ওপরে অন্তত চার আঙুল।

আবার বৃষ্টি নেমেছে। চারপাশে একটানা ঝুপঝুপ শব্দ। হাতির পিঠের মতো, রেলগাড়ির ধোঁয়ার মতো আকাশের রঙ। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। একবার হাত-পা শিথিল করে নিজের ইচ্ছেয় অনন্ত জলের তলায় নেমে গেল। প্রায় সর্বাঙ্গ দিয়ে ছুঁয়ে দেখল ধানগাছগুলোকে। নিশ্বাস বন্ধ করে জলের তলায় আর থাকতে না পারায় আবার ভেসে উঠবার সময় নিজের কষ্ট থেকে বুঝতে পারল, ধানগাছগুলো মরছে।

হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। ডাঙায় এসে উঠতেই হল। রেললাইন ধরে এগোবার সময় অনন্ত বেসামাল পা ফেলছিল। পাশের ঝাউগাছের চিকন পাতায় লেগে হাওয়া সাঁইসাঁই শব্দ করছিল। বৃষ্টি তখনো পড়ছে টিপটিপ করে। জঙ্গলে অজস্র জোনাকি। চিড়িক চিড়িক করে একটা পাখি ডাকছে কোথায়।

খাদের সাঁকোটা তলিয়ে গেছে। তার ওপর আধ হাত জল। অনন্ত হঠাৎ সাঁকো থেকে পা পিছলে পড়ে গেল, ব্যাঙগুলো যেমন জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে। বুড়ির মতো গুঁড়ি মেরে সাঁকো পার হয়ে অনন্ত টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল, ভিজে গাল বেয়ে এসে ফাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে নোনতা জল ভিজে লাগছে।

বাড়ির উঠানে পা দিয়ে অনন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেল। রান্নাঘরের পাশে ছোট হ্যারিকেনের প্রদীপ জ্বলছে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে কী সব গুরুতর কাজে বুড়ি বিশেষ ব্যস্ত। ভেতরে কেউ শুয়ে আছে মনে হয়।

মালা এসে প্রায় জড়িয়ে ধরল। 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে, ও বাবা? মুখটা নামাও, একটা কথা বলব তোমার কানে কানে।'

মালা খুশীতে গলে গিয়ে যা বলল, শুনে অনন্তর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল এবার।

শব্দ করে হাসল মালা। 'ইদিকে এসো না, এসো, ও বাবা।'

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে তামাকের কলকেয় টান দিয়ে অনন্ত মন্ত্রের মতো আহ্বান শুনল। ভিজে ভিজে গায়েও মাটির দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আরাম করে জড়িয়ে বসল। শিশুকণ্ঠের গলা-ফাটা শক্তির পরিচয় আসবার আগেই সন্ধ্যার মুখে অনন্তর একটি পুত্রসন্তান ঠাকুমার হাত ধরে রক্তের নদী বেয়ে এসে স্বল্প আলোয় চোখ মেলেছে।

রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার পল্লী

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রামের মানুষ

আমি আমার মূল বক্তব্যে এসে পৌঁছেছি।

আমার আলোচনায় একান্ত পরিচিত ভূমিতে উপস্থিত হয়ে বিশেষ স্বস্তি বোধ করছি। কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত আমাদের এই বৃহৎ প্রাচীন দেশের মৃত্তিকার ও তার জনারণ্যের মানসভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন চিন্তা-মননের আকাশলোক থেকে অপেক্ষাকৃত বাস্তবভূমিতে ধরিত্রী-বক্ষে এসে দাঁড়িয়েছি। নাগরিক সভ্যতার বাইরে প্রসারিত দেশের অগণিত পল্লীর মধ্যে যে জীবন, মহাকবি তাকে কেমনভাবে দেখেছিলেন তাই আমার আলোচ্য বিষয়।

বলা বাহুল্য, আমার বিচার তাঁর এই সম্পর্কিত সাহিত্যের শিল্পমূল্যের বিচার নয়। বাংলার পল্লী-জীবন সম্পর্কে, সেখানকার মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যা-ভেবেছিলেন, তাকে যেমনভাবে দেখেছিলেন তাই আমার আলোচনার বিষয়।

আমার পূর্বদিনের আলোচনায় সেখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম—মহাকবির যে কোন রচনা বা অভিজ্ঞতা, তা যত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই বিধৃত হোক বা যত সামান্যই হোক, বা কোন বিশেষ বা বিশিষ্ট ঘটনা-কেন্দ্রিক হলেও তা প্রায় সব সময়েই মানব-অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে এক স্থির ধ্রুববোধের স্পর্শ বহন করে, এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে গেলে তাকে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী দীর্ঘ তপস্যায় অর্জিত সেই বৃহৎ ও স্থির উপলব্ধির আলোকের সম্মুখে স্থাপন করে দেখতে হবে।

নিজের মানসিক পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—

"...আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।"

"মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধ-শ্যাম মাতৃমুখ-পানে
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলি মাটি তোর।"

"আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।" (আত্মপরিচয়)

'গোরা'র শেষ অংশে গোরা উচ্চারণ করেছে—

"আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নাই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।...আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আর আমার অপবিত্রতার ভয় রইল না। পরেশবাবু, আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপর ভূমিষ্ঠ হয়েছি—মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।"

আমার বার বার মনে হয়েছে গোরার উচ্চারিত এই কথাগুলি শুধুমাত্র 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক গোরার কথাই নয়, এগুলি কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথেরও অন্তরের কথা। ভারতবর্ষ সম্পর্কে, বিস্তীর্ণ মৃত্তিকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ও অগণিত মানুষ সমন্বিত যে ভারতবর্ষ, তার সম্পর্কে তিনি এই মনোভাবই পোষণ করতেন। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা তাঁর কাছেও মাতৃক্রোড় এবং ভারতবর্ষের বিশাল জনতার প্রতিটি মানুষ তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরতুল্য।

এই আলোচনায় এইটি আমার কাছে মূল সূত্রের মত। তবে এখানে কয়েকটি কথা সবিনয়ে উল্লেখ করি। আমি মহাকবির রচনা থেকে এই অংশটুকু আবিষ্কার করে নিয়ে তাকেই তত্ত্বের আকারে উপস্থাপিত করে মহাকবির এই সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও ভাবনাকে এই তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি নি। এই বক্তৃতার প্রয়োজনে রবীন্দ্র-রচনাবলী নাড়াচাড়া করতে করতে যে সমস্ত বিষয়বস্তু আলোচনার সামগ্রী হিসাবে সংগৃহীত হল, তারই মধ্য থেকে এই ধরণের একটি মনোভাব আমার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এবং তাঁর রচনা থেকে পূর্বে উদ্ধৃত বক্তব্যটুকু পেয়ে মনে হল যেন এই মনোভাবই এখানে বাণী হয়ে ধরা দিয়েছে।

একান্ত পরিণত বয়সে তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ঐকতান'-এর মধ্যে উচ্চারণ করেছিলেন—

'সবচেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন
অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের
দেশে কালে:
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের
পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি
জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে
ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র
কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে
সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের
চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ
বাতায়নে
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার
প্রাঙ্গণের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল
না একেবারে।'

উদ্ধৃত চরণগুলির মধ্যে মহাকবির উক্তিতে যে আর্তি, নম্রতা ও প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ আছে তা যেমন আন্তরিক তেমনি তীব্র ও অকপট। পরিণত বয়সের এই আক্ষেপ, আমার মনে হয়, তাঁর প্রথম জীবনেও সমান তীব্র ছিল। দেশের আপামর জনসাধারণের অতি বৃহৎ জীবনযাত্রা থেকে ভবিতব্যবশে লৌকিকভাবে তিনি দূরেই ছিলেন। কিন্তু মনে দূরে ছিলেন না। এবং তা ছিলেন না বলেই কাছে আসার, মাতৃক্রোড়ে আপামর সাধারণ স্বদেশবাসী ভাইদের পাশে বসার ইচ্ছা তীব্রতর মূর্তিতে আজীবন তাঁর হৃদয়ে লালিত ছিল। এর ফল অশুভ হয়নি। তাঁর অন্তরের এই সুতীব্র পিপাসা তাই সদাজাগ্রত থাকত, এবং মানসিকভাবে তাঁকে দীনতম স্বদেশবাসীর সংগে যুক্ত করে রাখত। এ কথা সত্য যে, তাদের জানার তীব্র পিপাসা তাঁর জীবনে কোনদিন ম্লান হয়নি। আবার এও সমান সত্য যে দূর থেকে দেখার জন্য দেখায় তীব্র স্পষ্টতা আসেনি। আবার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ও সহজ হলে এক ধরণের অবহেলার্জিত অস্বচ্ছতার জন্ম হয়, যার ফলে একান্ত কাছের মানুষের বিশিষ্টতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁর ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন আসে না। দূর থেকে তিনি যতটুকু দেখেছেন তার সংগে সেই দেখার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে তাঁর মন ও ধ্যান সদা-সতর্ক ও সদা-সচেতন ছিল। এবং তাঁর কবি-মন তাকে পরিপূর্ণ মূর্তিতে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আপনার কল্পনার মধ্যে প্রায় বহুবারই তাকে ধ্যান করেছে। এবং তাঁর তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি তাকে এক বিশিষ্ট পরিপূর্ণতা দান করেছে। তাই তাঁর রচিত মানবমূর্তিতে অস্পষ্টতার ত্রুটি থাকতে

পারে। কিন্তু এই ত্রুটিই আবার তাতে অবশ্যম্ভাবী এক পরিপূর্ণতাও দান করেছে। তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিক ভিন্নতর হলে হয়তো মানবমূর্তির স্পষ্টতর রূপ পেতাম, কিন্তু তাতে চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে হারাবার আশঙ্কা ছিল।

তাঁর কর্মচিত্ত ও শিল্পীসত্তা এই অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই অন্তরে অন্তরে আপনার দুর্লভ্য খাঁটি গুণের জন্য সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকত। সেই কারণেই দূরত্ব বিপুল দেশবাসীর জীবনকে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেছেন। এবং সে দেখার ক্লান্তি ছিল না। তার প্রমাণ তাঁর বিপুল রচনার মধ্যে অসংখ্য স্থানে ছড়িয়ে আছে। দূরে বাস করেও, দূরস্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, উৎকণ্ঠ আত্মীয়ের মত তিনি তাদের সব দোষ ও সব গুণের সংবাদ জানতেন, গুণগুলির সম্পর্কে তাঁর তৃপ্তির ও গর্বের শেষ ছিল না, আবার দোষগুলিও পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে লক্ষ্য করে মমতাময় দুষ্ট-ক্ষতের খোঁজ, কখনও কখনও রূঢ় তীক্ষ্ণতার সঙ্গে তিরস্কার করে নিবারিত করতে চেয়েছেন। দূরের, একান্ত দূরের স্বদেশবাসীকে যে তিনি তাদের কাছের, একান্ত ঘনিষ্ঠ, অস্বচ্ছদৃষ্টি আত্মীয়ের চেয়ে বেশী চিনতেন নীচের উদ্ধৃতিটি থেকে তা অনায়াসে বুঝা যাবে :

'বিনয় কহিল, ...আমরা শেয়ালদা ছাড়তেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। সোদপুর স্টেশনে যখন গাড়ী থামল দেখি, একটি সাহেবী-কাপড়-পরা বাঙালি নিজে মাথায় দিব্যি ছাতা দিয়ে তার স্ত্রীকে গাড়ী থেকে নাবালে। স্ত্রীর কোলে একটি শিশুছেলে; গায়ের মোটা চাদরটা দিয়ে সেই ছেলেটিকে কোনো মতে ঢেকে খোলা স্টেশনের এক ধারে দাঁড়িয়ে সে বেচারী শীতে ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে ভিজতে লাগল—তার স্বামী জিনিষপত্র নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁক-ডাক বাধিয়ে দিলে। আমার এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, সমস্ত বাংলাদেশে কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে কি ভদ্র কি অভদ্র কোন স্ত্রীলোকের মাথায় ছাতা নেই। যখন দেখলুম, স্বামীটা নির্লজ্জভাবে মাথায় ছাতা দিয়েছে, আর তার স্ত্রী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে নীরবে ভিজছে, এই ব্যবহারটাকে মনে মনেও নিন্দা করছে না এবং স্টেশনসুদ্ধ কোন লোকের মনে এটা কিছুমাত্র অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে না, তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—আমরা স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত সম্মান করি—তাদের লক্ষ্মী বলে, দেবী বলে জানি এ সমস্ত অলীক কাব্য-কথা আর কোনো দিন মুখেও উচ্চারণ করব না। আমরা দেশকে বলি মাতৃভূমি, কিন্তু দেশের সেই নারী মূর্তির মহিমা দেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ না করি—বুদ্ধিতে, শক্তিতে, কর্তব্যবোধের ঔদার্যে আমাদের মেয়েদের যদি পূর্ণ পরিণত সতেজ সবলভাবে না দেখি—ঘরের মধ্যে দুর্বলতা সংকীর্ণতা এবং অপরিণতি যদি দেখতে পাই—তাহলে কখনোই দেশের উপলব্ধি আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না।'

অতি পরিচিত, অতি তুচ্ছ, অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি স্পষ্ট ও সহজ একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিল্পী এখানে প্রচলিত দেশাচার ও অভ্যাসের মূর্তিটি তুলে ধরে তার মধ্যে যে অন্ধ অবহেলা, অসৌজন্য ও হৃদয়হীনতার প্রকাশ আছে তাকেই ব্যক্ত করেছেন। আমাদের দেশে নারীর সম্মান সম্পর্কে শাস্ত্রে অনেক উৎকৃষ্ট বাক্য আছে; একদিন হয়তো তার সত্যমূর্তিও সমাজের মধ্যে ছিল সামাজিক আচার, ব্যবহার ও অভ্যাসের মধ্যে, কিন্তু আজ তার বিপরীত মূর্তিই প্রকাশিত। এখানে লক্ষণীয় যে শিল্পী এখানে বিনয়ের মুখ দিয়ে কোন তিরস্কার বা ধিক্কার উচ্চারণ করেন নি, কেবল হৃদয়ের গভীর ক্ষোভ ও বেদনাই প্রকাশ করেছেন।

স্বদেশের মানুষের মূর্তি আঁকতে গিয়ে সেই মূর্তিটিকে হৃদয়ের যে পট-

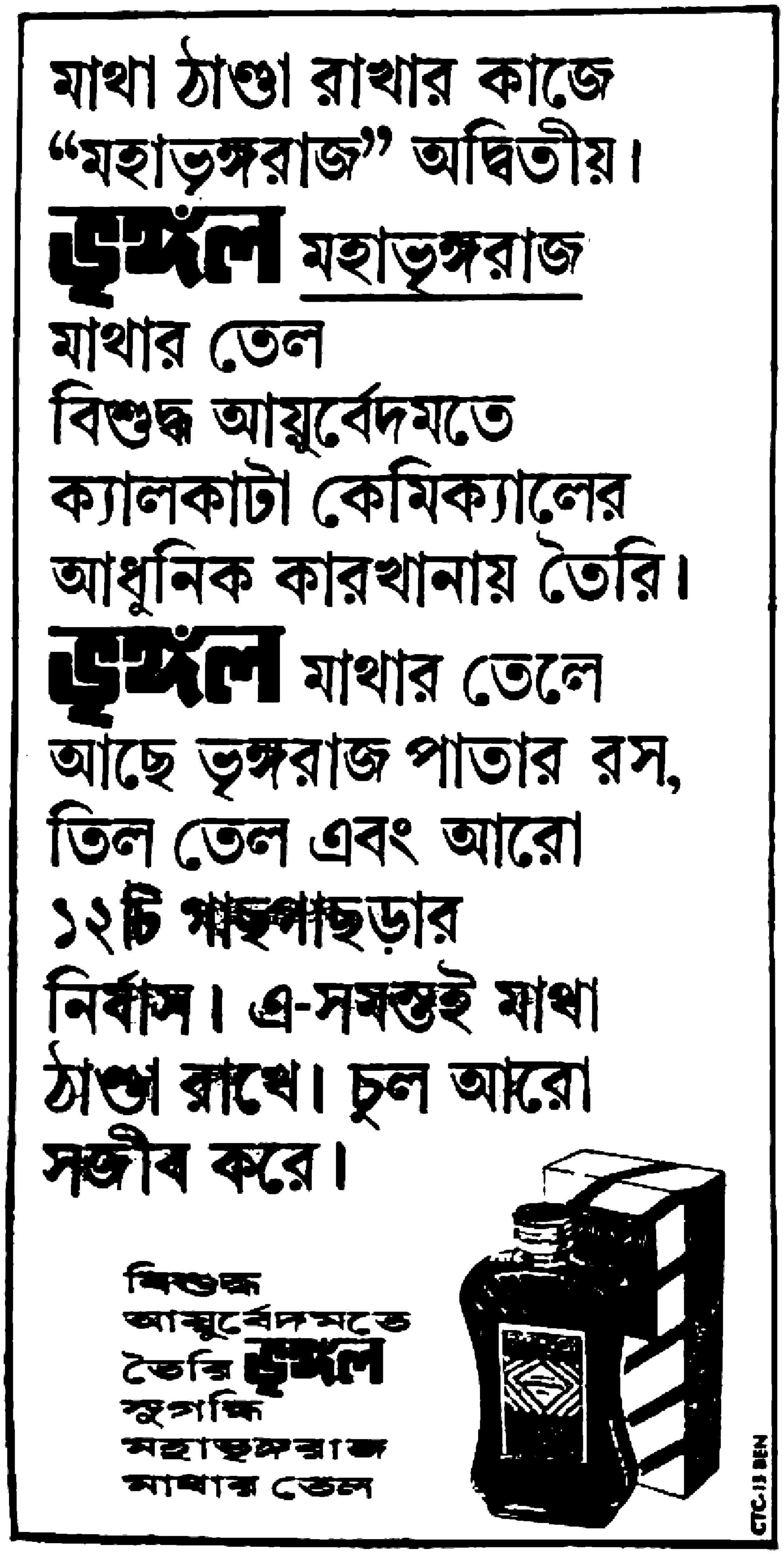

ভূমিতে স্থাপন করে তাকে রচনা করতেন সেই পটভূমি যে যে ভাবে ও রসে রঞ্জিত ও সরস ছিল তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। স্বদেশ সেখানে এই সাবিত্রী নারায়ণী দরিদ্রের ঘরণী, তিনি জননী-স্বরূপা, স্বদেশের মৃত্তিকা মাতৃরূপা, স্বদেশবাসী আপামর সাধারণ মানুষ তাদের সব দোষগুণ ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কবির সহোদরতুল্য। তাই মানুষের মূর্তি রচনার সময় স্বাভাবিকভাবে চিত্র ও দৃশ্য সংযোগে পটভূমি-মূর্তি নির্মাণশালার ভাবে ও রসে মাখামাখি হয়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একজন মহৎ শিল্পীর উল্লেখ করি। টলস্টয়। সমগ্র জীবন ধরে নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য অন্তর্জীবনে তাঁর সংগ্রামের আর শেষ ছিল না। নিজের চিত্তভূমিতে সেই ক্ষমাহীন সংগ্রামের পটভূমিকায় যে যে মানবমূর্তি তিনি গড়েছিলেন তারাও সেই সংগ্রামের সুমহৎ লাঞ্ছন বহন করছে। এইখানে আমাদের মহাকবির সঙ্গে তাঁর শিল্প-চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য আছে।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, এখানে শিল্পসাধনাই একমাত্র সাধ্য বিষয় নয়। শিল্প-সাধনার সঙ্গে জীবন-সাধনা এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। সামগ্রিক জীবন লাভের প্রাত্যহিক তপস্যা এই ভাব ও রসের পটভূমিটি গঠন করে দিয়েছিল। এখানে শিল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়ে কল্যাণও যমজশিশুসম্ভূত যুগল সন্তানের মত হাতে ধরাধরি করে উপস্থিত।

সাধারণ শিল্পীর ক্ষেত্রে শিল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে থাকে শুধুমাত্র আনন্দ। সেখানে মানব-জীবন-রহস্যের তীব্র আস্বাদ থেকে যে আনন্দের জন্ম হয় তা মানবিক কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক-নিরপেক্ষ। সেই আনন্দই যথেষ্ট। কখনও কখনও আকস্মিকভাবে সেই আনন্দস্রোতের সঙ্গে এই মানবিক কল্যাণ-স্পর্শের আভাস যুক্ত হয়, যা পাঠকের চিত্তে আনন্দ-সঞ্চারের সঙ্গে একটি সকরুণ বিনম্রতার ও শুচিতার আস্বাদ যুক্ত করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দুই প্রায় অনিবার্য যোগ যুক্ত। এর কারণ তাঁর সদাসতর্ক প্রাত্যহিক জীবন-সাধনা তাঁর শিল্প-সাধনায় এক গভীরতর ভিন্ন অর্থ যুক্ত করে তাঁর শিল্পকে এক বৃহত্তর ও মহত্তর অর্থে গৌরবান্বিত করেছে।

তাঁর জীবনে ন'-দশটি বৎসর পল্লীর পরিবেশ ও পল্লীর মানুষ যেন একান্ত নিবিড়ভাবে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল। সময়টা মোটামুটি ১২৯৮ সাল থেকে ১৩০৭ সাল। এই কালের রচনার একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে 'ছিন্নপত্রাবলী' ও 'গল্পগুচ্ছের' প্রথম দিকের অধিকাংশ গল্প, যার সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী।

তাঁর জীবনের এই নয় দশ বৎসর কাল প্রধানত কেটেছিল পাললভূমিকাগঠিত, নদীমাতৃক বাংলাদেশের গভীর অন্তঃপুরে, একেবারে নদীর বুকের উপর। তাঁর এ সময়কার সৃষ্টির প্রকৃতি দেখে মনে হয় বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর এক নিবিড়, অন্তরঙ্গ, দীর্ঘস্থায়ী পরিচয় ঘটেছিল এই সময়। এ সময়ের রচনা থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসাব করলে অবশ্যই জানা যাবে যে এই বসবাস দীর্ঘস্থায়ী হলেও অবশ্যই ছেদহীন নয়। এই কালের মধ্যে তিনি অবশ্যই বহুবার রাজধানীতে ও নাগরজীবনে ফিরে এসেছেন, আবার ফিরে গিয়েছেন পদ্মার উপরে। শুধু বলব, এই কালে তিনি সেখান থেকে সরে এলেও সমগ্রভাবে বাংলাদেশের অন্তঃপুরের নিবিড় আশ্রয়ে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন। তাই মনে হয়, যেন তিনি এই কালে দেশজননীর গর্ভস্থ ভ্রূণের মত ক্রমাগত নিজের সমস্ত সত্তা পরিপূর্ণ করে সেই জননীর প্রাণরস থেকে প্রাণরস পান করেই নিজের শিল্পজীবন ও শিল্প-চেতনাকে পুষ্ট ও পূর্ণ করে তুলেছিলেন।

এই সময়ে চার-পাঁচ মাস মাত্র ব্যবধানে লিখিত দুখানি চিঠি তাঁর এ কালের প্রতীক মনোভাব ও অভিজ্ঞতা হিসাবে দাখিল করছি:

(১) 'এ দেশে (ইংল্যান্ড) এসে সেই হতভাগা বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাকে ভালবাসে। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না—আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্য সমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মত আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাইনে।'

(ছিন্নপত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৭)

(২) 'ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি—ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা-ভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত? আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগারা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে। আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে পারিনে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে। এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালবাসি—এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলে।.....'

(ছিন্নপত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ১০)

।। আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই ।।

যে শিল্পী গল্পগুচ্ছের পল্লীপ্রাণ গল্পগুলি রচনা করেছেন তাঁর মনোভাব এখানে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত। মানস-মৃত্তিকা আপনার সমস্ত উর্বরতা ও সরসতা নিয়ে অপেক্ষা করছিল, তাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটি ক্ষুদ্র বীজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গল্পের মঞ্জরী হয়ে এই মৃত্তিকা থেকে উদ্গত হয়েছে। জমিদারী কাছারীতে দেনা-পাওনার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমলাদের সঙ্গে নিকট দূরত্ব থেকে অথবা বোটের উপর থেকে চিন্তা বা শুধু দেখার মধ্য দিয়ে সুদূর বৃহৎ চলমান জীবনের ভগ্নাংশ চোখে, কানে এবং সেই সঙ্গে অকারণভাবে দ্রবিত মনে ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই থেকে পরম স্নেহে কল্পনার স্বতন্ত্র লালনে তাকে শিল্পী পরিপূর্ণ করে তুলেছেন।

এ কাজ যখন তাঁর মনোলোকে ও তার কলমপ্রান্ত হিসেবে গল্পের আকারে মূর্তি-লাভ করছিল তখন বাংলাদেশের সাহিত্যের আসর সুদূর রাজপুতনার রূপকথার গল্পে জমজমাট। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে, তখন তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০; দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল স্বল্পমাত্রা বর্ধিত কলেবরে, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০ মাত্র। কিন্তু 'রাজসিংহে'র যে আধুনিক মূর্তি তা তার হল ১৮৯০ অর্থাৎ বাংলা ১২৯৯ সালে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হবার সময়। গ্রন্থ পাঁচগুণ বেড়ে ৪০৪ পৃষ্ঠা কলেবরে রসের ও কল্পনার পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে সে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে জনচিত্ত জয় করে নিলে। রস ও রুচির এই সংস্কারের কালে, বাংলা দেশের সামান্য মানুষদের রহস্য আকর্ষণহীন, নিরাভরণ, দরিদ্র জীবনের উপকরণ নিয়ে গল্প রচনা করা কোনক্রমেই সহজ ছিল না।

একথা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রচার করা নয়, উদ্দেশ্য হল তাঁর এই অভিজ্ঞতার নিবিড়তা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে কিছু বলা। যে হৃদয় ও মস্তিষ্ক স্বদেশকে মাতৃক্রোড় ও স্বদেশবাসীকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে তার একান্ত সন্নিকটে ও সান্নিধ্যে আসবার জন্যে উন্মুখ, সেই হৃদয় ও মস্তিষ্ক যখন সেই পরম বাঞ্ছিত নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করবার বৃহৎ সৌভাগ্য লাভ করল, তখন সেই ভাব ও কল্পনা অনিবার্য বন্যাবেগের মত সাহিত্যের অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখানে কোন দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশই ছিল না; সে ভাব ও কল্পনা পরিপূর্ণ রসমূর্তি গ্রহণ করে পাঠককে পরিতৃপ্ত করতে পারবে কি না—একথাও বোধ হয় একবারও গল্পকারের চিত্তকে আন্দোলিত করে নি। এতো শুধু শিল্পের চর্চা ও প্রকাশ নয়, এ এক মানবকল্পের সামগ্রিক আকূতি ও হৃদ্য-পরিপূর্তির পরিপূর্ণ ও শিল্পময় প্রকাশ।

এই কারণেই তিনি বহু খ্যাতিমান, আর্টিস্ট শিল্পীর মত মানুষকে শুধুমাত্র [illegible]ক মানুষ হিসেবে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি, দেখতে পারেন নি। স্বদেশের অগণিত সাধারণ মানুষ স্বদেশের মৃত্তিকায়, স্বদেশের যুগ-যুগবাহিত আচার, সংস্কার, রুচি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যে মূর্তি নিয়েছে, তারাই তাদের সবটা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁর গল্পে এসে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই তাঁর গল্পে আত্মমগ্ন বিচ্ছিন্ন মানুষ তাদের কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিছক নির্ভেজাল জৈব প্রবৃত্তির পথে প্রকাশিত মূর্তি নিয়ে আসে নি; তারা ফুটে উঠেছে সমাজের ও পরিবারের পটভূমিকায়, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়া করে মানিয়ে চলতে হয়। তাই কাম রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমের বিবিধ রূপান্তরে, ক্রোধ লোভ এরাও অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্তিতে প্রকাশিত। তাই সেখানে প্রবৃত্তির তাড়না বারবার শাসিত বা শান্তমূর্তি নিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

নিজের অতি প্রাচীন স্বদেশের প্রতি, স্বদেশবাসীর প্রতি ও তার যুগ-যুগবাহিত সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা, আন্তরিক প্রীতি ও অকপট আসক্তি ছিল বলেই তাঁর গল্পে সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে বারবার নির্মল সত্যবোধের জয় ঘোষণা দেখেছি। সে সত্যবোধ যেমন ভারত-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশ, তেমনি বৃহৎ মানব-সংস্কৃতিরও সার্বজনীন শ্রেয়বোধ। অবশ্য সংস্কারের ও মার্জনার অভাবে আধার মলিন হয়ে এসেছে, আধেয়ের উপরও মলিনতার আস্তরণ পড়েছে। কিন্তু জীবনের চরম মুহূর্তে যখন শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বের সঙ্কটমুহূর্ত এসে আবির্ভূত হয়েছে তখন তারা প্রেয়ের ও সকল লৌকিক লাভ ও লোভের সঙ্গ ত্যাগ করে নিজেদের জীবনের শাশ্বত অভীপ্সার তাড়নায় নির্ভুলভাবে শ্রেয়ের ও সত্যের পাদস্পর্শ করে মহতী বিনষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করেছে। এ প্রসঙ্গে আমি পাঁচটি গল্পের উল্লেখ করব। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'দান প্রতিদান', 'দিদি' ও 'সমস্যাপূরণ'। এ গল্পগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় অতি পুরাতন ও যথেষ্ট নিবিড়। গল্পাংশের সঙ্গে আশা করি, সকলেই অল্পাধিকতর পরিচিত। আমি গল্পাংশ বিবৃত না করেই প্রতিটি গল্প থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

(১) 'অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্ককণ্ঠ শুষ্ক-রসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন,—বহু দূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানের অতি ধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে-উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি। এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।' এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।'

(গল্পগুচ্ছ : রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা)

(২) 'তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনো প্রমাণ আছে?'

রাইচরণ কহিল, 'এমন কাজের প্রমাণ কি করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।'

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

(গল্পগুচ্ছ : খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন)

(৩) 'শশিভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না—রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল, 'দাদা, আমার ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে-ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে তো, হয়তো তুমি পারিবে। বাল্যকাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল—তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম এই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।'

(গল্পগুচ্ছ : দান প্রতিদান)

(৪) 'এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোন মতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে 'দিদি গো, দিদি' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল—শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চির পরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামীস্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ।

কিন্তু এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে বন্দী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।'

(গল্পগুচ্ছ : দিদি।)

(৫) কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, 'অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।'

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই জন্যই আপনি কাশী হইতে এত দূরে আসিয়াছেন? উহাদের পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন?'

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, 'সে কথা শুনিয়া তোমার লাভ কী হইবে বাপু!'

বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন, 'অপাত্র-পাত্র বিচার করিয়া কত লোকের দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান সন্তানের জন্য আপনার এতদূর পর্যন্ত অধ্যবসায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।'

কৃষ্ণগোপাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অঙ্গু-

CENTRAL LIBRARY

ফিরে যাবা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো, আহিমণি তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।'

বিপিন সচকিত উঠিয়া কহিলেন, "যবনীর গর্ভে?"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হাঁ বাপু।"

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, 'সে সব কথা পরে হইবে এখন আপনি ঘরে চলুন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, 'না, আমি তো আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে যাহা উচিত বোধহয় করিয়ো" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অশ্রু-নিরোধপূর্বক কম্পিত কলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।"

(গল্পগুচ্ছ : সমস্যাপূরণ)

যে সংসারে আদালতে দুখানা উইল হাজির হলে একপক্ষে বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও অন্যপক্ষে নিজ পুত্রের দাবীর সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে নিজের একমাত্র পুত্রের মিথ্যা দাবীকে অস্বীকার করে বিধবা ভ্রাতৃবধূর পক্ষের উইলকে সত্য বলে স্বীকার করতে বাধে না কাশীবাসী বৃদ্ধ রাম-কানাইয়ের; যে সংসারে প্রভুর পুত্র নিজের ত্রুটিতে নদীর জলে হারিয়ে গেলে নিজের একমাত্র পুত্রকে সুশিক্ষিত করে প্রভুর হাতে তুলে দিয়ে নিঃস্ব হওয়াকে অশিক্ষিত মূর্খ রাইচরণ বিধিনির্দিষ্ট দায়মুক্তি বলে মনে করে; যে সংসারে গোপনে ভাইয়ের জীবনের শেষ মুহূর্তে রাধামুকুন্দের পরিপূর্ণ স্বীকারোক্তি দিতে বাধে না; যে সংসারে মৃত্যু ধ্রুব জেনেও স্বামীর বিরোধিতা করে পুত্রতুল্য মাতৃহীন কনিষ্ঠ সহোদরের দাবীতে শশীকলা সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করে; যে সংসারে সম্মানিত, বৃদ্ধ বৈষ্ণব জমিদার কৃষ্ণগোপাল নিজের সমস্ত সম্মান, সম্ভ্রম ও চরিত্র খ্যাতির বিনিময়ে যবনীর গর্ভজাত সন্তান আহিমণিকে নিজের পুত্র বলে স্বীকার করতে কাশী থেকে ফিরে আসেন, সে সংসার সত্য তীক্ষ্ণ নির্মলতা ও কঠোর সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, যার ভিত্তি মানুষের প্রেমবোধের উপর। বাস্তব লৌকিক জীবনে সে সংসার মূর্খের সংসার, বাস্তববাদীর চক্ষে সে এক অবাস্তব সংসার। কিন্তু এই বৃহৎ মানব-সভ্যতার ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে তারই ধারাবাহিক চর্চা আছে। সে চর্চা সচরাচর অন্তঃসলিলা হয়ে বহমান থাকে। তাই বলে সে অবাস্তব নয়। লৌকিক ও বাস্তব জীবনের মতই সে সমান সত্য। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পগুলির মধ্যে ভারতের জীবনধারার সেই তীক্ষ্ণ নির্মল ও কঠোর সত্যের মূর্তিকে পুনরায় আবিষ্কার করে আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন তাই নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠতর কৃতিত্ব অন্যত্র। তিনি এত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অতি সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে তাকে আবিষ্কার করেছেন, যার অর্থ হল, এই প্রেমবোধ একান্ত সহজভাবে, এক স্বাভাবিক অবস্থিতির মত তাঁর স্বদেশের জীবনে অভ্রান্তভাবে অবস্থান করছে। অতি সামান্য ও সাধারণের মধ্যে সেই ধ্রুব ও প্রেমের অভ্রান্ত প্রকাশ। তাঁর স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর জীবনে যে ধারাবাহিক সাধনা নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শেষ হয়ে যায়নি, কেবলমাত্র তার উপরে মলিনতার আস্তরণ পড়েছে মাত্র, তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রেমের অন্ত ছিল না। তাঁর সেই পরিমাপ-হীন শ্রদ্ধা ও প্রেম এগুলিকে আবিষ্কার করে শ্রদ্ধা ও প্রেমের অর্ঘ্যের মতই তাঁর স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করেছে। তাঁর স্বদেশবাসী নিজের অপরিচিত বা বিস্মৃত মূর্তিকেই এই রচনাগুলির দর্পণের মধ্যে আবার দেখতে পেয়েছেন।

একথা অবশ্যই নিশ্চিত যে রবীন্দ্র-নাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। তাঁর স্বদেশের একটি ভাবমূর্তিকে তিনি অন্তরে অন্তরে সর্বদা দেববিগ্রহের মত বহন করতেন। কিন্তু সে বিশুদ্ধ ভাবমূর্তি, তাঁর জীবন-ধ্যানে কোন বিচ্ছিন্ন কিছু হয়ে বিরাজ করেনি। তিনি অখণ্ড দেশের মৃন্ময় ও চিন্ময় দ্বিবিধ অস্তিত্বের মধ্যেই খণ্ডিত বিশেষ আধারে সেই সম্পূর্ণকে দেখেছেন। তাঁর স্বদেশবাসী জনগণ তাই অবশ্যম্ভাবী-রূপে সেই ভাবমূর্তির অংশ ছিল। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী অতি মহৎ সাধনার মধ্য দিয়ে স্বদেশের সমস্ত মালিন্য ও গ্লানিকে একান্ত মমতা ও বিবেচনার সঙ্গে দূর করতে চেয়েছেন তা তাঁর বহুবিধ চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে বার বার প্রকাশিত হয়েছে। নিপীড়িত, দুর্বল, শিক্ষা-হীন, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন স্বদেশবাসীর দারিদ্র্য, চারিত্রিক দুর্বলতা, শিক্ষাহীনতা, কুসংস্কার তিনি যেমন দূর করতে চেয়েছেন তেমনি এই সব মিলিয়ে তাদের যে সমগ্র জীবন তার প্রতি তাঁর মমতার অন্ত ছিল না। তাদের সাধুতা, সততা ও নম্রতা শিক্ষাভিমানী বিত্তবানরা আঘাত করলে বা ব্যঙ্গ করলে তিনি সে আঘাত ও ব্যঙ্গকে কখনও ক্ষমা করেন নি। মা যেমন নিজের অজস্র ত্রুটিযুক্ত সন্তানকে সর্বদা দুই হাত দিয়ে আগলে রেখেন তিনি তেমনভাবেই আপনার বহু-দোষে-দুষ্ট স্বদেশবাসীকে মমতার বাহুপ্রসারে আগলে রেখেছিলেন। নীচের সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ দেবে:

(১) "চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নীকে বলিলেন, "বাই জোভ। লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।"

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল—বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল। আমার স্বাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।

দিদি বলিলেন, "বটে? লোককে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভাল বলে জানিতুম।"

কারারুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।'

(গল্পগুচ্ছ: রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা)

(২) "বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সেকালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে। শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপল না থাকার এই ফল।

সুক্ষবুদ্ধি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখা-পড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। সে বরাবরই সন্দেহ করিত, কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা। সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট। যাহা হউক কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়া ধর্ম মহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কী যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।"

(গল্পগুচ্ছ: সমস্যাপূরণ)

(৩) "উত্তর পাইলেন না। মাথা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণ-ভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকশিত কুসুম মঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্তী সুখ-বিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারী ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'যা বেটারা, ফিরে যা। আমার মন্দির অপবিত্র করিস নে।'

(গল্পগুচ্ছ: অনধিকার প্রবেশ)

দেশের কেন্দ্রস্থলের কলরব ও উচ্ছ্বাস থেকে অনেক দূরে দারিদ্র্যে, অশিক্ষায় ও নিঃসঙ্গতায় নির্বাসিত বাংলার পল্লীজীবনে সত্যের ও জীবন-মহিমার সহজ মাহাত্ম্য সহজে দৃষ্টিগোচর হবার কথা নয়; রবীন্দ্রনাথ তাদের থেকে লৌকিক দূরত্বে অবস্থিত থেকেও অভ্রান্তভাবে তাকে দেখতে পেয়েছেন ও আমাদের দেখিয়েছেন। যে প্রতিভাবলে তিনি একে দেখতে পেয়েছেন, তার মূল উপাদান হল এই দূরান্তবর্তী অকিঞ্চন স্বদেশবাসীর সম্পর্কে প্রেম ও শ্রদ্ধা। এই কারণেই শিক্ষাভিমানী, বুদ্ধির অহংকারে অহংকৃত যে সব মানুষ স্বদেশের এই সনাতন জীবনধারার সঙ্গে বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এই জীবনধারার মাহাত্ম্যকে, প্রীতি ও শ্রদ্ধার অভাবে, অনুভব ও উপলব্ধি করবার শক্তি হারিয়েছেন তাদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গের দ্বারা তিরস্কৃত করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। এই সব শিক্ষাভিমানী, অর্থবান 'আধুনিক' মানুষের চেয়ে কাশীবাসী সাধারণ বৃদ্ধ, পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ বৈষ্ণব জমিদার, অতি সাধারণ পল্লীবধূ, পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী গৃহস্থ অতি দরিদ্র গৃহভৃত্য, কঠোর চরিত্রের আচারপরায়ণ বিধবা প্রভৃতির মত একান্ত সাধারণ অথচ জীবনের ধ্রুব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত মানুষগুলি তাঁর কাছে অনেক অনেক বেশী শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে; অপর পক্ষে ওই সব শিক্ষাভিমানী স্বদেশের সংস্কৃতি-বিচ্ছিন্ন ওই 'আধুনিক' মানুষগুলিকে তিনি অনাত্মীয় জ্ঞান করেছেন ওই সহানুভূতিহীনতা ও শ্রদ্ধাহীনতার জন্যই।

স্বদেশের যেসব মানুষ গ্রামের মধ্যে বাস করেন তাদের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে কী পরিমাণ উৎপাত ও উপদ্রব হয়, তাদের প্রাত্যহিক জীবন একাধিক কঠিন হস্তের দ্বারা কী পরিমাণ লাঞ্ছিত, প্রাত্যহিক প্রাণধারণ ও দিনযাপনের গ্লানি কী পরিমাণ পুঞ্জীভূত তা তাঁর অগোচর ছিল না। তাদের এই যন্ত্রণা অসহায় অক্ষমের যন্ত্রণা বলে তাঁর বুকে আরও বেশী করে বাজত। উৎপীড়নের বিবিধ হস্তের মধ্যে শাসকরাজার শ্বেতহস্ত ছিল, তাদেরই আশ্রয়পুষ্ট জমিদার, জমিদারের আমলা ও মহাজনের হাতও ছিল। অত্যাচার হত, সে অত্যাচারের প্রতিকার ছিল না। তাঁর অন্তর বার বার এই বেদনায় মথিত হয়েছে, বার বার এই অত্যাচারকে ধিক্কার দিয়েছেন। সে অন্যায় প্রতিকারের অদ্ভুত কল্পনা মধ্যে মধ্যে মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি পর্যন্ত প্রসারিত। দীন-দরিদ্র স্বদেশবাসীর সম্পর্কেও তাঁর এতখানি সম্ভ্রমবোধ ছিল বলেই তাঁর সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি ও ভয়হীন হৃদয় এই অদ্ভুত কল্পনাকে হাস্যকর জ্ঞান করে নাই। এ সম্পর্কে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

(১) গোরা যখন দেখিল ছাত্রদিগকে মারিতে মারিতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, সে সহিতে পারিল না, সে কহিল, 'খবরদার! মারিস নে!' পাহারাওয়ালার দল তাহাকে অশ্রাব্য গালি দিতেই গোরা ঘুষি ও লাথি মারিয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, রাস্তার লোক জমিয়া গেল।'

(গোরা : ২৮ পরিচ্ছেদ)

(২) 'পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, 'সাহেবের নামে মানহানির মোকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।'

(গল্পগুচ্ছ : মেঘ ও রৌদ্র)

(৩) 'পুলিশ বাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিয়েছেন, এমন সময় চশমা-পরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটি জুতা চটচট করিতে করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পুলিশের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিত স্বরে কহিলেন, 'সার, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোন অধিকার নাই।'

পুলিশের বড়কর্তা তাঁহাকে হিন্দী ভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।'

(গল্পগুচ্ছ : মেঘ ও রৌদ্র)

বলাবাহুল্য এই তীব্র ক্ষোভের আকস্মিক ও অদ্ভুত প্রকাশের ফলাফল গোরা বা শশিভূষণ কারও পক্ষেই আরামের হয় নাই। তাদের দুজনকেই কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। এই আঘাতের ফলাফল কি হবে তা তারা উভয়েই জানত। কিন্তু অসহায় অক্ষম মানুষকে রক্ষা করবার কর্তব্যবোধ তাদের স্থির থাকতে দেয় নি। তাদের এ কাজে প্রবৃত্ত করেছিল। যে তীব্র জ্বালা ও ক্ষোভ তাদের প্রজ্জ্বলিত করেছিল সে ক্ষোভ ও জ্বালা তো তাদের স্রষ্টারই হৃদয়ের! এই বোধ থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকার যবনীর গর্ভজাত অছিমদ্দিনকে আপনার পুত্র বলে স্বীকার না করে পারেন নি। এই বোধ থেকেই 'বিচারক' গল্পের স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান মোহিতমোহন দত্ত এক পতিতা রমণীকে একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখেছিলেন।

আমাদের তরুণ বয়সে সাহিত্যক্ষেত্রে যখন সদ্য প্রবেশ করেছি তখন মধ্যে মাঝে শুনেছি মহাকবি দেশের দীনদরিদ্র মানুষের দেখেন নি এবং তাদের সম্পর্কে সামান্যই জানতেন। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে বর্তমানে সুপ্রচুর গবেষণার ফলে এ সত্য এখন প্রমাণিত যে এই ধরনের অভিযোগ অমূলক। আমি সেই সম্পর্কেই সামান্য কয়েকটি কথা বলব।

বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে ভূমি নির্ভর। সেই ভূমি নির্ভরতা আবার সম্পূর্ণরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাঁড় আর চাকায় বাঁধা। উনবিংশ শতাব্দী সম্পূর্ণ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ, এই দেড়শো বছরের বাংলার পল্লী-মানুষের জীবন এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র রেখেই বিবর্তিত হয়েছে। অন্যদিকে বাংলা দেশের এই সমসাময়িক কালের সাহিত্যসৃষ্টিকে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে এই সৃষ্টির একটা বৃহৎ অংশ বাংলার পল্লীকে অবলম্বন করে। অবশ্য ধীরে ধীরে পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যরচনার পরিমাণ কমে আসছে। কারণ জাতীয় জীবনে একদিকে শিল্পোন্নয়নের ফলে পল্লীজীবনে দ্রুত নাগরিকতার স্পর্শ লাগছে অন্যদিকে পাঠক-সমাজের, এমন কি পল্লীর পাঠক-সমাজেরও রুচি নগরজীবনকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। আজ যে সমস্ত সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনের সামনে প্রতিদিন নানা মূর্তিতে এসে দাঁড়াচ্ছে তারাও রূপে মূলত নাগরিক। কিন্তু পল্লীজীবনের সমস্যাও যে কম নয় তা গত তিন-চার বৎসরের ইতিহাস ভাল করেই প্রমাণ করেছে আবার। পল্লীর জীবন যে আসলে ভূমিনির্ভর সেই কথাটাই আবার ব্যাপকভাবে ও তীব্রভাবে প্রমাণিত হয়েছে গত কয়েক বৎসরের আন্দোলন ও সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে।

বাংলা সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ যদিও পল্লীজীবনের কথা নিয়ে রচিত ও পল্লীজীবনের দুঃখ-কষ্টের যথেষ্ট পরিচয় তাতে আছে, তবুও এই ভূমিনির্ভর এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে যুক্ত জীবনের প্রকাশ রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্যে কতটুকু ঘটেছে? উত্তরে বলতে হবে, সামান্যই। শরৎচন্দ্র এই জীবনকে কোথাও কোথাও স্পর্শ করেছেন, তারপর আর এক আধ জন মাত্র তাকে বিষয়বস্তু করে সাহিত্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার পর এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ কাল কেটে গিয়েছে। তবু এই ভূমি-কেন্দ্রিক রচনার পরিমাণ যৎসামান্যের বেশী নয়। বাংলা দেশের ভূমি-ব্যবস্থাকে না জানলে গ্রামের মানুষের সে জীবনকে জানা সম্ভব নয়। ভূমি-নির্ভর, এমন কি ভূমি-সর্বস্বও বলতে বাধা নেই, সেই ভূমি-সর্বস্ব জীবনের পরিচয় আজ থেকে আশী বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি জানতেন। তাই পল্লীজীবনের আসল সমস্যা ও দুঃখকে তিনি চিনতেন ও জানতেন। ঠাকুর-পরিবারের বিস্তৃত জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে এই অভিজ্ঞতা তাঁর ঘটেছিল।

মাত্র একটি গল্পে তিনি তাঁর এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

অকল্পনীয় দারিদ্র্য, অপরিসীম নিঃস্বতায়, অন্তহীন আশাহীনতায় যে জীবনযাপন সে জীবনে যে অন্তহীন স্নেহহীন কলহ ও তিক্ততা কখনও উচ্চরোলে, কখনও নিঃশব্দে বাসা বেঁধে থাকে সেই কলহের বর্ণনা দিয়ে গল্পের আরম্ভ। তাদের গৃহাঙ্গনের পরিবেশও তেমনি দুঃসহ।

'বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলো অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মত জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

(গল্পগুচ্ছ : শাস্তি)

এই পরিবেশে যারা বাস করে তাদের সেই বর্ষার একদিনের পরিশ্রম ও উপার্জনের কথা শুনুন :

'দুখিরাম ও ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ও পারের চরে জলি ধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে, কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে-স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটা কতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছে,—উচিত মত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।'

(গল্পগুচ্ছ : শাস্তি)

এই দাদের পারিবারিক সংগতি ও উপার্জনের চিত্র তাদের উপার্জনের পটভূমির পশ্চাতে পাওনাদার ভবিতব্যের মত অপেক্ষা করে থাকে :

'চক্রবর্তীদের বাড়ীর রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ী ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।'

(গল্পগুচ্ছ শাস্তি)

এই যেখানে একজনের সামগ্রিক জীবনের মূর্তি সেখানে ভয়ঙ্কর যে সদাসর্বদা আততায়ীর মত গোপনে অপেক্ষা করে থাকবে এবং সুযোগ পাবামাত্র ভয়াল হাসি হেসে আত্মপ্রকাশ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সুযোগ মাত্রেই সে ভয়াল অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করলো :

'ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, 'ভাত দে।'

বড়ো বউ বারুদের বস্তায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো এক মুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া উঠিল, 'ভাত কোথায় ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।'

সারা দিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষ বচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, 'কি বলিলি।' বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোট জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।'

(গল্পগুচ্ছ : শাস্তি)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রথযাত্রাই আমাদের গত দেড় শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির একটা বৃহদংশ রচনা করেছে, সেই রথযাত্রায় বাংলা দেশে জমিদারীর নাটমঞ্চ আলোকোজ্জল ও উৎসবমুখর হয়েছে, সংস্কৃতির মেলা জমজমাট হয়েছে, সেই রথযাত্রার কল্যাণে ও প্রসাদে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেই বাজারে হাসিমুখে কেনাকাটা করেছে এ সবই সত্য; কিন্তু তার চেয়ে আরও সত্য এই যে, যে অগণিত নির্বাক দরিদ্রের উপর বংশানুক্রমিকভাবে এই রথের দড়ি টানার ভার পড়েছিল, তাদের কতজনের শ্রমের স্বেদজলে ও ক্লেশের অশ্রুজলে সেই রথের গতিপথ কত পিচ্ছিল হয়েছে, এবং সেই জগদ্দল রথের চাকায় যে কতজনের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ হয়ে গিয়েছে তার হিসাব এই বৃহৎকালব্যাপী সংস্কৃতির পৃষ্ঠায় কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে যৎসামান্য দুর্লভ স্থানে তার কথা ধরা আছে তার মধ্যে উপরের কাহিনীটি একটি। গ্রাম-অন্তেবাসী একটি দরিদ্র পরিবারের এই কাহিনীতে সেই অস্থি-পঞ্জর নিঃশেষে চূর্ণ হবার নিদারুণ ইতিহাস পরম শ্রদ্ধা ও একান্ত বেদনার সঙ্গে বিধৃত হয়ে আছে।

সেই সঙ্গে তিনি জানতেন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে কালের পর্যায়ক্রমে সবকিছুর পরিবর্তন ঘটে যাবে। দীন-দরিদ্র, সামান্য লোক আর সামান্য থাকবে না। অন্তত অসামান্যের পটভূমিকায় সামান্য হয়ে সে বিরাজ করবে না। সকলের সঙ্গে সাধারণ একজন হয়ে সে বিরাজ করবার অধিকার পাবে। আজ ইতিহাসের রথচক্র আবর্তনের সঙ্গে কাল পরিবর্তিত হতে চলেছে। তার প্রথম পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে। নূতন ভূমি-বন্টন-প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের মধ্যে তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ উদ্যত। কালে আরও অনেক পরিবর্তন ও অধিকার আসবে সামান্য লোকদের জন্য। এই পটভূমিতে আজ থেকে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে, ১৩০২ সালে রচিত 'সামান্য লোক' নামক কবিতাটি ভবিষ্যদ্বাণীর মতই শোনাবে :

'সন্ধ্যাবেলা লাঠি হাতে
বোঝা বহি শিরে
নদীতীরে পল্লীবাসী
ঘরে যায় ফিরে।

শত শতাব্দীর পরে যদি কোনমতে
মন্ত্রবলে, অতীতের মৃত্যুরাজ্য হতে
এই চাষি দেখা দেয়
হয়ে মূর্তিমান
এই লাঠি কাঁধে লয়ে,
বিস্মিত নয়ান,
চারি দিকে ঘিরি তারে
অসীম জনতা
কাড়াকাড়ি করি লবে
তার প্রতি কথা।

তার সুখ দুঃখ যত,
তার প্রেম স্নেহ,
তার পাড়া-প্রতিবেশী,
তার নিজ গেহ,
তার খেত, তার গোরু,
তার চাষ-বাস,
শুনে শুনে কিছুতেই
মিটিবে না আশ।

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

এই পংক্তি কয়টির মধ্যে তিনি সেই অনাগত দিনকেই প্রত্যুদ্‌গমন করে যেন হাত বাড়িয়েছেন বলে মনে হয়। সামান্য লোকের অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট তিনি অসামান্য মানুষ হয়েও, তাদেরই মত মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই সামান্য-লোকের সেই দুঃখ-কষ্টের দিনটি যেদিন মিলিয়ে যাবে গিয়ে ভিন্নতর দিনের মূর্তি নেবে সেই দিনের ঐকান্তিক প্রত্যাশাই প্রকাশ করেছেন। ইতিহাসের এক অনাগত প্রসন্ন প্রভাতকে প্রত্যুদ্‌গমনের ও অভ্যর্থনার শ্রেষ্ঠ বাণীই তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম বাণী।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য সংস্কৃতি

ঘরোয়া চিড়িয়াখানা

প্রাণীজগৎ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেও যে কি অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ব্রিটিশ প্রাণীতাত্ত্বিক জেরাল্ড ডারেলের রচনায়। জেরাল্ড 'আলেকজান্দ্রিয়া কোয়ার্টেট' নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের লেখক একালের বিখ্যাত কবি লরেন্স ডারেলের ছোট ভাই। গ্রীসের বিখ্যাত করফু দ্বীপে আত্মীয়পরিজনের সংগে তাঁর ছোটবেলা কেটেছে এবং সেই প্রসংগ তিনি সরসভংগীতে লিখেছেন 'মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড আদার এ্যানিম্যালস' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। নামকরণেই বোঝা যায় গ্রন্থটির প্রকৃতি। জেরাল্ড টেলিভিশনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং ব্রিটেনে 'বেস্ট সেলিং অথর' হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠ। তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'এ জু ইন মাই লাগেজ' বর্তমানে বহুল আলোচিত।

নিজস্ব চিড়িয়াখানা কিভাবে শুরু করতে হয় এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। জেরাল্ড ও তাঁর স্ত্রী পশ্চিম আফ্রিকার ব্রিটিশ ক্যামেরুনসে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিছু কিছু দুর্লভ প্রাণী সংগ্রহ করে আনাটাই ছিল উদ্দেশ্য। বাফুট এই ব্রিটিশ ক্যামেরুনসের একটি সবুজে পার্বত্য অঞ্চল। সবরকম জন্তু-জানোয়ারের বঙ্গীয় নামকরণ করা সম্ভব নয়, তবে কিছু কিছু প্রাণী এদেশেও পরিচিত, তাই এই আলোচনায় ইংরাজী নামই ব্যবহৃত হল।

জেরাল্ড দম্পতি সংগ্রহ করেছেন বস-বেবী, শিম্পানজী, গোল্ডেন বয়ড, আর গীন মামবা। এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী অতিশয় কৌতুককর ভংগীতে লিখিত।

গ্রন্থারম্ভে লেখক বলেছেন—"আমরা বাফুটে গিয়েছিলাম নিজস্ব চিড়িয়াখানার সংগ্রহবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই অনেক চিড়িয়াখানার জন্য বন্য জীব-জন্তু সংগ্রহের জন্য অনেকগুলি অভিযাত্রী-বাহিনীকে অর্থসাহায্য করে আসছি। এই বিষয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হল দুর্দশাবিদারক, সংগ্রহের কয়েক মাস পরে যখন সেইসব সযত্নবর্ধিত প্রাণীকে বিদায় দিতে হয় তখন বড় কষ্ট হয়। জীবজন্তুর সংগে মিতালী করতে ছমাস সময় লাগে যদি সেই প্রাণীটির বাবা-মা বিপত্তারণ, অন্নদাতা প্রভৃতি সবগুলি ভূমিকাই গ্রহণ করা যায়। প্রাণীটি তখন আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং সবচেয়ে বড়োকথা আপনি কাছাকাছি থাকলেও স্বাভাবিকভাবেই ঘোরাফেরা করে। তারপর এই আত্মীয়তা ঠিক যে সময়টিতে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ প্রাণীটির স্বভাব-চরিত্র বিষয়ে অবহিত হওয়ার পরম মুহূর্তে বাধ্য হয়ে তার সংগ ত্যাগ করতে হয়।"

এই সমস্যার সমাধান একভাবেই সম্ভব, নিজস্ব চিড়িয়াখানা গড়ে তোলা। আরেকটি কারণে নিজস্ব চিড়িয়াখানা স্থাপন করা দরকার, মানুষের উৎপাতে বছর বছর অজস্র দুর্লভ প্রাণীর বংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাদের নমুনাটুকুও আর সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না। লেখক বলেছেন অনেক রকমের ছোট খাটো প্রাণী আকারে ক্ষুদ্র এবং ভ্রমণকারী-দের কাছে আকর্ষণহীন হওয়ায় যথোচিত নিরাপত্তা পায় না। এইসব প্রাণীদের বংশ লোপ করা জঘন্য অপরাধ। লেখকের মতে সমস্ত সরকারী-বেসরকারী চিড়িয়াখানার উচিত এইসব দুর্লভ প্রাণীকে বংশবৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে সংরক্ষণ করা।

এই বাফুট রাজ্যটির অধিপতির নাম 'ফন অফ বাফুট'। ফন কথাটি আমাদের 'রাজা'র প্রতিশব্দ মনে হয়। ফন অতিশয় হাইভবার ব্যক্তি তিনি নাচ, গান, হল্লা, সুরা ও নারীতে অতিশয় আসক্ত। এঁর কথা অন্য গ্রন্থে রসাল করে লিখেছেন জেরাল্ড। তাই ক্যামেরুনে পৌঁছে তাঁর মনে শংকা জেগেছে যদি আশ্রয় পাওয়া না যায়। কিন্তু 'ফন' দিলদার মানুষ, তিনি জেরাল্ড দম্পতিকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। ভিক্টোরিয়া উপকূলে বুগেনভিলিয়া শোভিত কুঞ্জে বসে সেই আমন্ত্রণ পেয়ে জেরাল্ড দম্পতি চললেন বাফুটে।

মামফে নামক একটি অঞ্চলে ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানীর ম্যানেজারের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন জেরাল্ড। পকেট থেকে বেজীর লেজ বেরিয়ে পড়ছে, সার্টে বেজীর প্রসাবের দাগ, মাথার চুল উসকো খুসকো দেখাচ্ছে বাতিকগ্রস্ত পাগলের মতো। একটি লম্বা লোক টেবিলের পাশ থেকে উঠে এসে প্রশ্ন করল কি চাই। আপনি কি কলাগুলো বাজাতে পারেন? যখন শুনলেন তা নয়, তখন আবার তুকতুক করতে লাগলেন, তার-পর হঠাৎ বললেন— 'কি নাম বললেন যেন?

—ডারেল।

—ও বাবাঃ ডারেল। জীব-জন্তু-পাগলা ডারেল। হেড-অফিস আমাকে আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছে মশাই আপনার সম্বন্ধে। বা আপনার ত দুদিন আগে আসার কথা।

—লরী খারাপ হয়ে গিছল।

—আরে এখানকার সব ব্লাডি লরী, ওদের বিশ্বাস করতেই নেই। আসুন এক পাত্র টানা যাক।

—তা মন্দ নয়, কিন্তু লরীতে আমার সংগীরা রয়েছেন।

—আরে, নিয়ে আসুন যে যেখানে আছে।"

ডারেল লিখছেন—তারপর ভদ্রলোক আমার হাতটি ধরে একপাশে সরে গিয়ে চুপি-চুপি প্রশ্ন করলেন—ব্যক্তিগত কথা বলা ঠিক নয়, তা ভাই একটা কথা জানতে চাই—আমার পেটে তিন পড়ার বদলে এমন গমগমে আওয়াজ হচ্ছে না আপনার পেটে সবসময় অমন আওয়াজ হয়। ভাবছে গেছি মশাই।

আমি বললাম—আরে আমার পেট থেকে আওয়াজ হচ্ছে না, আমার সার্টের পকেটে একটা বোঁজ আছে, সেটাই গজগজ করছে।

উনি বললেন—আপনার বৌঁজকটা বেশ রিজনেবল, যদি জিনের প্রতিক্রিয়া না হয় তাহলে আপনার সার্টের পকেটে যাই থাক না, আমার আর কি বলুন।

লোকটির নাম জন হেনডারসন।"

এইখানেই একদিন আগাস্টিন নামক স্থানীয় শিকারী এসে বলল—একটু দাঁড় আছে, পাওয়া যাবে, এবং দাঁড়ের প্রয়োজন কেন তাও জানালো। একটা প্রকাণ্ড মরাল সাপ দেখা গেছে তাকে বেঁধে আনা হবে। এই মরাল সাপটি কিন্তু ধরা সম্ভব হল না। তার শক্তি অসীম।

এরপর যখন বাক্সটে ৬ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা—ফনের প্রাসাদে গিয়ে ডারেল হাজির হলেন তখন ফনের কি আনন্দ। আটাত্তর বছর বয়স কিন্তু উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। তৎক্ষণাৎ হুইস্কি ঢালা হলো তিনটি পাত্রে এবং ফন চীৎকার করে উঠলেন 'চিয়ার হো' ইংরাজী 'চিয়ারিও'। ডারেল বিনীত ভঙ্গীতে বললেন—আমি মনে করেছিলাম আপনি হয়ত আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আপনার সম্বন্ধে আমার আগের বইটিতে আমাদের বাগেরবারে আনন্দময় দিনগুলির কথা লিখেছিলাম। ফন আনন্দময় শুনেই তিনি অট্টহাস্য করে উঠলেন।। আরেক পাত্র মদ বেশ করে ঢেলে নিয়ে ফন বাহাদুর সানন্দে বললেন—আরে রাগ কি মশাই! আপনি আমাকে বিশ্ববিখ্যাত করেছেন। সেবার রানী এসেছিলেন, লাগোসে দেখা করতে গেলাম, তা সবাই আমাকে খাতির করল খুব, আর আপনার বই হাতে এনে বলল একটা সই করে দিন। সই করতে হল।

লেখক বলছেন—আমি হাঁ হয়ে গেলাম, মানসচক্ষে দেখতে লাগলাম ফন বাহাদুর লাগোসে বসে আমার বই-এ অটোগ্রাফ দিচ্ছেন।

অজস্র ছবির সঙ্গে এমনই হরেকরকম কৌতুককর কাহিনী সহকারে অভিযানের সরস বিবরণ প্রেয়ালড ডারেল সমগ্র গ্রন্থটিতে পরিবেশন করেছেন।

এই স্তম্ভের নির্দিষ্ট পাঠকদের কাছে সমগ্র গ্রন্থটির বিশদ বিবরণ দিতে পারলে আনন্দিত হতাম। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইভাবে সরস ভঙ্গীতে রচনার নিদর্শন সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যায় না। জেরাল্ড ডারেলের গ্রন্থটির তাই সাহিত্যিক-মূল্য অসীম। একাধারে প্রাণীবিজ্ঞান, ভ্রমণ-কাহিনী ও চাঞ্চল্যকর অভিযানের বিবরণ সাধারণ পাঠকের মনে কৌতূহল সঞ্চার করে।

পরিশেষে লেখক বলেছেন—জারসী শহরে আমার ঘরোয়া চিড়িয়াখানার দরজা প্রায় এক বছর হল সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। য়ুরোপে এই সর্বাধুনিক এবং সবচেয়ে চমৎকার চিড়িয়াখানা বর্তমানে ছোট, (পাখী, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী জন্তুজানোয়ারের সংখ্যা উপস্থিত ৬০০ শত) তবে আমাদের চিড়িয়াখানার বাসিন্দার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে নিয়তই। আমাদের চিড়িয়াখানায় এমনসব প্রাণী আছে যা পৃথিবীর অন্য কোনো চিড়িয়াখানায় নেই।"

আর সবচেয়ে বড়ো কথা এই চিড়িয়া-খানার অধিকাংশ প্রাণীই লেখকের স্বনির্বাচিত সংগ্রহ। ছবিগুলি এঁকেছেন র‍্যালফ টমসন।

'এ জু ইন মাই লাগেজ' এই কালের একটি রমনীয় গ্রন্থ। —অভয়ঙ্কর

A ZOO IN MY LUGGAGE: By GERALD DURRELL. Publishers: RUPERT HART-DAVIS-LONDON: Price — 40 Shillings Only.

সাহিত্যের খবর

ভারত থেকে নতুন আলোকে।।

ভারতের বাইরে ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রচারের চেয়ে অপপ্রচারই হয়ে থাকে বেশি। তাই যদি কখনও কোন বিদেশীকে ভারতের শিল্প সংস্কৃতির যথার্থ মূল্যায়নে এগিয়ে আসতে দেখা যায়, তাহলে সত্যি আনন্দ হয়। এমনি একটি আনন্দজনক সংবাদের খবর এসেছে পশ্চিম জার্মানী থেকে। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও সমালোচক ডঃ শ্রীমতী গিজেলা বন 'নিউ লাইট ফ্রম ইণ্ডিয়া' নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন।

ডঃ গিজেলা বনের নাম ভারতীয়দের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর তিনি অজস্র প্রবন্ধ এবং বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে পশ্চিম জার্মানীর বিশিষ্ট সংবাদপত্র 'ডি জেইট' পত্রিকায় ভারত সম্বন্ধে ১২ পৃষ্ঠার যে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়, তাতেও তাঁর একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ক্রিস্ট অ্যাণ্ড ভেল্টএ প্রায়শ তিনি ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

'নিউ লাইট ফ্রম ইণ্ডিয়া' বইতে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, ভারতের গুরুত্বকে এখন আর কেউ কম করে দেখতে পারবে না। তাঁর ধারণা—আধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতি, এই দুই চিন্তার মিশ্রণতলে ভারত এক ঐতিহাসিক কাজকে গ্রহণ করেছে।

সম্প্রতি ডঃ গিজেলা এসেছেন ভারত ভ্রমণে। এর আগেও তিনি কয়েকবার ভারত ভ্রমণ করেছেন। ঘুরেছেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। দেখেছেন তার প্রাচীন মন্দির আর আধুনিক শিল্পোদ্যোগ। তাঁর বইতে সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি পুরোপুরি ব্যবহার করেছেন।

ঢাকা বেতারে বাংলা সাহিত্য আলোচনা।

ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে গত ১৪ মার্চ দুটি সুন্দর আলোচনা প্রচারিত হয়। এই আলোচনা দুটির বিষয় ছিল বাংলার ষড়ঋতু। বাংলা দেশের বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব ও বর্ণ সুষমা সম্বন্ধে এই আলোচনা দুটি আলোকপাত করে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এই আলোচনা দুটির আলোচক রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প এবং কবিতায় এবং গানে কিভাবে ঋতুরূপ আবর্তিত হয়েছে তার উপর কয়েকটি সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁরা বলেন, বাংলা দেশের ভাটিয়ালি, বাউল ইত্যাদি সংগীত ইত্যাদি বাঙালীরই মর্মোত্থিত সহজ সুর। ঋতুর সঙ্গে তাল রেখে এদেশে বিবাহ এবং অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা কবিতার হিন্দি অনুবাদ।। আধুনিক বাংলা কবিতার একটি হিন্দি অনুবাদ সংকলন খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে। এই বইটি সম্পাদনা করছেন প্রখ্যাত হিন্দি ও সমালোচক শ্রীরমেশনাথ রাকেশ। শ্রীরাকেশের নামের সংগে বাংলা দেশের পরিচয় অনেক

দিনের। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের হিন্দিতে অনুবাদ করে আসছেন। তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র প্রমুখের একাধিক উপন্যাস ও ছোট-গল্প তিনি হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন এবং তাঁর অনূদিত এই গ্রন্থগুলি হিন্দি ভাষায় খুবই প্রশংসা অর্জন করেছে। তাছাড়া শ্রীরাকেশ বাংলা ভাষার উপর গবেষণাও করেছেন। একালের বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁর অজস্র রচনা হিন্দিতে তিনি বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।

বর্তমান কাব্য সংকলনের প্রথম কবি জীবনানন্দ দাশ। এছাড়া বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্র-নাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টো-পাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, কবিতা সিংহ, অলোক সরকার, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল এবং আরো কয়েকজন কবির কবিতা এই সংকলনে অনূদিত ও সংকলিত হয়েছে বলে জানা গেছে। বইটির প্রারম্ভে থাকছে সুদীর্ঘ ভূমিকা। এছাড়া থাকছে কবি পরিচিতি এবং আরো কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়। বাংলা কবিতার এরকম সুপরিকল্পিত এবং প্রামাণ্য হিন্দি অনুবাদ সংকলন এর আগে আর প্রকাশিত হয়নি।

উৎকল সাহিত্য সভার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব।। উৎকল সাহিত্য সভার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কটকে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। সভার সম্পাদক বিশিষ্ট কবি শ্রীঅনন্ত পট্টনায়ক এবং সভাপতি বিশিষ্ট নাট্যকার শ্রীমনোরঞ্জন দাস সম্প্রতি কটকে অমৃতের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি একটি সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলনের রূপ পরিগ্রহণ করবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লেখকদের এখানে আমন্ত্রণ জানান হবে। এছাড়া এই সময়ে একটি ভারতীয় সাহিত্যের উপর প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হবে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে পুস্তক প্রদর্শনী।। ফ্রাঙ্কফুর্টের পুস্তক প্রদর্শনীটি বোধ করি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রকাশন সংস্থা এতে অংশ গ্রহণ করেন। এবারের প্রদর্শনীতে ২৮৭টি আমেরিকান প্রকাশন সংস্থা, ২২৬টি বৃটিশ প্রকাশন সংস্থা, ১১০টি ইতালীয়ান প্রকাশন সংস্থা, ১০৪টি ফরাসী প্রকাশন সংস্থা, ১০২টি সুইজারল্যাণ্ডের এবং ৭১টি হল্যাণ্ডের প্রকাশন সংস্থা অংশ গ্রহণ করেন। আরব রাষ্ট্রগুলি থেকেও ৭০টি প্রকাশন সংস্থা যোগ দেন। ভারত থেকে বেশি কেউ এবার যান নি। জানি না, ভারতের প্রকাশন সংস্থার মালিকরা এইসব প্রদর্শনী সম্বন্ধে উৎসাহী কিনা।

ভাষান্তর কেন্দ্র।। আজ ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিরাট সমস্যা মনে হয়, পরস্পরকে জানার সমস্যা। আমরা ইংলণ্ড, আমেরিকা বা ফ্রান্সের সম্বন্ধে যতখানি উৎসাহী, ঠিক ততখানি উৎসাহী আমাদের প্রতিবেশী সাহিত্য সম্বন্ধে নই। অবশ্য মাঝে মাঝে বাংলার অন্য ভাষায় অনুবাদ চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলি খুবই অসম্পূর্ণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। যেমন অগ্রজ তরুণ কবিগোষ্ঠী 'দিগম্বর কবুদে'র কথা ধরা যাক। আমাদের কেউ কেউ তাদের সম্বন্ধে একটু উৎসাহী। তাই তাঁদের কবিতার সংকলন ইত্যাদি প্রকাশ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আমরা জানি না, এঁরা বেশ কিছুদিন তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে সে পথ ত্যাগ করেছেন এবং এঁরাই 'বিপ্লোভিউশানারী রাইটার্স ফোরাম' গঠন করেছেন। সুতরাং এখন 'দিগম্বর কবুদে' কবিতার সংকলন প্রকাশ এবং তাঁদের কবিতা সম্বন্ধে আলো-চনা অর্থহীন। আরো একটা জিনিস প্রায়ই লক্ষ্য করি। একই সঙ্গে একজন বয়স্ক কবির পাশাপাশি একজন অল্প-বয়স্ক অপরিণত কবির অনুবাদ। কবিদের কোন পরিচিতি নেই। ফলে ব্যাপারটা কেমন হয়ে যায়। কোন দাম থাকে না এসবের।

যাই হোক—তবু ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ প্রয়োজন। এর জন্য চাই নিবেদিত প্রাণ। এরকম একটি সুন্দর প্রচেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন খড়গ-পুরের কয়েকজন অবাঙালী সাহিত্যিক। তাঁরা 'ভাষান্তর কেন্দ্র' নামে একটি সংস্থা গঠন করেছেন। এর সম্পাদক সোমনাথ ত্রিবেদী। এঁদের উদ্দেশ্য হলো, একালের বিশিষ্ট তরুণ লেখকদের রচনার বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ। ইতিমধ্যেই এঁরা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মতি নন্দীর গল্প হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ খুবই প্রশংসা অর্জন করেছে। আরো কিছু বিশিষ্ট লেখকের রচনার অনুবাদ অচিরেই প্রকাশ করবেন।

চার্বাক

নতুন বই

রূপান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলকাতা-৭। দাম সাত টাকা।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিস্ময়কর ব্যাপ্তি আজও আমাদের বিস্মিত করে। কেবলমাত্র মৌলিক রচনায় নয়, অনুবাদেও তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। এযাবৎ তাঁর অনুবাদ রচনার বিশেষ কোন সংকলন প্রকাশিত হয়নি। কুমারসম্ভব, তুকারামের কিছু অভঙ্গ, বিদ্যাপতির পদ, ধম্মপদ এবং কিছু বেদমন্ত্রের অনুবাদ করেছিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নানা প্রয়োজনে ভারতীয় সাহিত্যের কোন কোন রচনার অংশবিশেষ অনুবাদ করেন। মহাভারত, মনুসংহিতা, ভট্টনারায়ণ-বিরচিত প্রভৃতির রচনা, পালি-প্রাকৃত কবিতা, শিখ-ভজন প্রভৃতি থেকেও রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন। সম্প্রতি বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ এইসব বিভিন্ন অনুবাদ একত্র সংগ্রহ করে, 'রূপান্তর' গ্রন্থ নামে প্রকাশ করেছেন। সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন পুলিনবিহারী সেন। 'রূপান্তরে' রবীন্দ্র-নাথ-কৃত বিদেশী রচনার অনুবাদ স্থান পায়নি। সেগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থে স্থান পাবে। সুদীর্ঘ টিকাসহ সম্পাদিত এই সংকলনটি রবীন্দ্র সাহিত্য-জিজ্ঞাসুদের কাছে সমাদৃত হবে।

কালাডানের তীরে (উপন্যাস)—অলকা চট্টোপাধ্যায়। বাক-সাহিত্য প্রাই-ভেট লিমিটেড। ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।।

'কালাডানের তীরে' একটি কাহিনী প্রধান উপন্যাস। লেখিকার জন্মভূমি বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী আরাকান। আরাকানের ইওমা পাহাড়ের শীতল ছায়ায় ঢাকা এর কালাডান নদী। এই কালো নদী, পাহাড় শ্রেণীর সুশীতল ছায়া আর সুনীল সমুদ্রের অবিরল তরঙ্গ—এই পরিবেশে উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লেখিকার কাহিনী বর্ণনার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। সোয়ে-থা, নক্লা, নয়ুপাক মামা মোহনবাবু, মা-সানি, বু-সান, থা-বাম ইত্যাদি বাঙালী ও আরাকানী চরিত্র লেখিকা নিপুণভাবে এঁকেছেন। লেখিকার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব পটভূমির সঙ্গে ওত-প্রোত রেখেই কাহিনী ঘটনা, চরিত্র ও প্রতি-পাদ্যকে উপস্থিত করেছেন। বাংলাভাষায় রচিত উপন্যাস বিদেশী পটভূমি ও চরিত্র যথাযথ রেখে শিল্প কৃতিত্ব অর্জনে লেখিকা অভিনন্দনযোগ্য।

পরিত্যক্ত পান্থশালা ও তারা চারজন (গল্প)—কল্যাণ সেন। শিল্প সাহিত্য। ৪৯ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম চার টাকা।।

আধুনিক তরুণ গল্প লেখকদের মধ্যে শ্রীকল্যাণ সেনের নাম পরিচিত। বিগত

লেখকের ভাষা লিখিত এগারোটি গল্পের সংকলন আলোচ্য গ্রন্থ। গল্পগুলি শ্রীসেনের পরিচিতির কারণ স্পষ্ট করে। সম্ভবত বর্তমান গ্রন্থটিই লেখকের প্রথম গল্প সংকলন। এর আগে 'দূরের আকাশ' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীকল্যাণ সেন কম লেখেন, কিন্তু যা লেখেন, তা তাঁর খ্যাতি সর্বাঙ্গীণ পরিচিতির ব্যাপকতার পক্ষে যথেষ্ট বলেই মনে হয়। গ্রন্থের নাম-গল্পটির পরাকাষ্ঠা নিশ্চয়ই পাঠককে নিবিষ্টতায় ধরে রাখবে। নাম-গল্পের কানাই, বাঁশীওয়ালা, সর্দারের মেয়ে, বা সেই না নাবিক, না সৈনিক, চরিত্র ইত্যাদি বাস্তবতার ভিত্তি থেকে সরে যায় নি, কিন্তু গল্পের সিদ্ধান্ত প্রতীকীব্যঞ্জনা মনকে কবিতার অনুভবে ডেকে রাখে।

ভেবে ভাল লাগল, কল্যাণ সেনের প্রায় সমস্ত গল্পই এখানে স্বাতন্ত্র্য, বিশিষ্টতা। তিনি গল্প লেখেন কবির মতো; গল্পের বিষয় কেন বস্তুকে স্বীকার করেও বস্তু অতীতের সূত্রে। 'অপরাহ্নের বেলায়' কল্পের সেই শিশুর দল, তাদের আনন্দ-দুঃখ, সেই রহস্যময় ঘোড়া, 'যাত্রা শেষে', 'বনের পথে, তার কাছে', 'অসুখ' গল্পের নামহীন চরিত্রগোষ্ঠী, 'সংকেত' গল্পের পরিকল্পনাবাদ, লেখকের প্রতীক ভাবনায় বিশিষ্টতা স্পষ্ট করে।

শ্রীকল্যাণ সেন যে গল্প লিখতে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষপাতী তা কল্পের কথনের স্বভাব, প্রতীক বয়ান, রূপকথার মত বলার ভঙ্গি ও গল্পের গদ্যে পদ্যের ছন্দে চরন বিন্যাসের (ভাষা) কৌশলের মধ্যেই সুস্পষ্ট। বিষয় ভাবনায় লেখক নিজেকে অনুসন্ধান করেছেন নানাভাবে। বর্তমানের বিকৃত জীবনকে ধরতে চেয়েছেন আত্মভাবনার দর্পণে। লেখকের এই আধুনিক প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগ— যোগীন্দ্র ভট্টাচার্য। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতি। পি-১১২ সি আই টি রোড, কলকাতা—১০। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

পূর্ব বাংলার অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবর রহমান। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সঙ্কটে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য। মুজিবরের শিক্ষা এবং রাজনৈতিক জীবনের সূচনা এপারের বাংলায়। তাঁর জীবনকথা অনেকেরই অজানা। বর্তমানে পুস্তিকায় লেখক মুজিবরের জীবনকথার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা করেছেন। পুস্তিকাটি প্রচারিত হবে।

রৌদ্র-দিন—সম্পাদক ঃ মেজবাহ উদ্দীন আহম্মদ খান। ৪৬৪ পশ্চিম মাদার-বাড়ী, চাটগাঁ।

এপারের বাংলায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার কবিতা সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকখানি। কিন্তু ওপার থেকে প্রকাশিত এই জাতীয় সঙ্কলন বিশেষ চোখে পড়ে নি। সম্প্রতি চট্টগ্রাম থেকে মেজবাহ-উদ্দীন আহমদ খান দুই বাংলার কবিদের একটি কবিতা সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন 'রৌদ্র-দিন' নামে। পূর্ব বাংলার কবিদের মধ্যে আছেন শামসুর রাহমান ইসলাম, আবু করিম, শওকত আনোয়ার, রফিক ভূঁইয়া, সেলিম আহমদ, গাজী আবুল কাসেম, শফিউদ্দীন আহমদ, সারফুদ কাদির, মোস্তাফা ইকবাল এবং মেজবাহউদ্দীন আহমদ খান। কবিতাগুলির মেজাজ আলাদা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সঙ্কটের থেকে স্বতন্ত্র। এপারের কবিদের মধ্যে আছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, নিশিনাথ সেন, শুভ মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু এবং আরো কয়েকজন। কবিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু। কয়েকটি 'মিনি' কবিতাও আছে। সঙ্কলনটি আকারে খুবই ছোট। কিন্তু উভয় বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বিদ্যাপতির পদ—রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সহ (রূপান্তর গ্রন্থ থেকে)

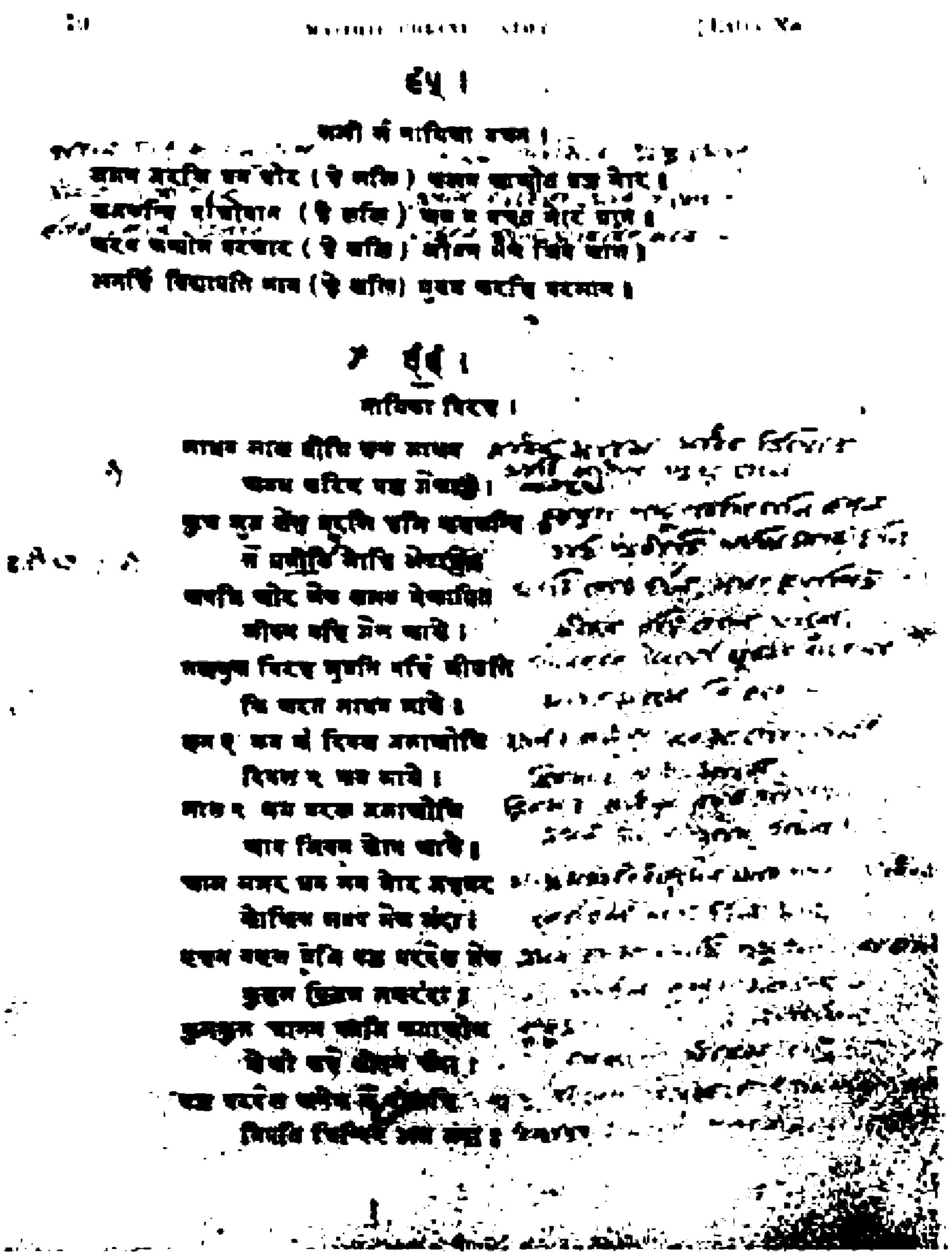

Hindusthan Year-book and Who's Who — Edited by S. Sarkar, M. C. Srakar and Sons Private Ltd., 14, Bankim Chatterjee St. Calcutta-12. Price Rs. 8.00.

হিন্দুস্থান ইয়ার বুক অ্যান্ড হু'স হু-র এবছর ৩৯তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বর্ষপঞ্জীর গৌরবজনক ঐতিহ্য বর্তমান সংস্করণেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞাতব্য তথ্যসহ বর্ষমধ্যকার বাস্তবীয় ঘটনার এই ধরনের নির্ভুল সংগ্রহ খুব কমই চোখে পড়ে। ভারতের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিভিন্ন রাজ্য সংক্রান্ত খবর, কর্মপন্থী, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দল, সংস্কৃতি, কৃষি, বিজ্ঞান, পরিবহন, বন্দর, মৎস্য চাষ, অরণ্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, রেলওয়ে, জাতীয় আয়, আণবিক গবেষণা, জনসংখ্যা, চলচ্চিত্র, খেলাধুলো, শ্রম, ডাক ও তার, করা ও কৃষিমিশন। আরও বহু তথ্য আছে। সেইসঙ্গে আছে বিদেশসংক্রান্ত তথ্য। কেবলমাত্র পরীক্ষার্থীদের কাছেই শুধু নয়, সর্বসাধারণের কাছে বইটির মূল্য কম নয়।

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে
ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়…তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। **ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।**

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

davp 70/580

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩১)

সারারাত জেগেছিল বলে সফিকুর এখন হাই তুলছে। বড় খাটুনি গেছে। সারারাত সে এবং তার অন্যান্য কলেজের বন্ধুরা মিলে শহরময় পোস্টার মেরেছে। ঘরে ঘরে মেয়েরা পোস্টার লিখে দিচ্ছে আর ওরা দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দিয়ে এসেছে। কলেজের মেয়েদের উপর ছিল পোস্টার লেখার ভার। ওদের কাজ সেগুলো সকাল না হতে সেঁটে দিয়ে আসা। সকাল হলেই শহরের মানুষেরা দেখল কারা যেন রাতারাতি এই শহরকে ২১শে ফেব্রুয়ারির জন্য নানা রঙের ফেস্টুনে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। উৎসবের মতো এই শহর—প্রায় ঈদ মুবারক।

সফিকুর এইমাত্র ঘরে ফিরেছে। ফিরেই হাতমুখ ধুয়েছে। অন্য দিনের মতো সে সাইকেলটা বারান্দায় তুলে রাখে নি। কারণ সে আবার সাইকেলে দেখতে বের হবে—কতদূর রাতে ওরা কতদূর পর্যন্ত পোস্টার মেরে আসতে পেরেছে। সুতরাং সাইকেলটা বাইরে রেখে নিত্যদিনের মতো একটু টেবিলে গিয়ে বসা। এই সকালে সে দুটো একটা কবিতা আবৃত্তি করতে ভালবাসে। অথবা আজ যেন সারাটা দিন শুধু কবিতা আবৃত্তি আর গান। মাঠের ভাষা, বাংলা ভাষা। মানুষের ভাষা বাংলা ভাষা। এমন দিনে সে কবিতা পড়বে না তো কবে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুল থেকে সে কবিতা পড়তে ভালবাসে। ফাতিমা এলে সে জীবনানন্দ আওড়ায়। ফাতিমা কাছে থাকলে তার অন্য কবিতা আর ভাল লাগে না—সে তখন ফাতিমার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে, তারপর ধীরে ধীরে কেমন এক অনির্দিষ্ট দূরে যাবার মতো সে ফাতিমার কাছে মগ্ন হয়, যেন ফুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে তার মুখ স্বপ্নের ভিতর ডুবে যাবে এবার, কখন সকাল আসে কে বা জানে—কার্তিকে [illegible] যে বড় ফসলের মাঠ ভাঙে—ছিন্ন [illegible] পাখিদের [illegible] কানে বাজে; [illegible] যেন ধান এই মাঠঘাটের ভিতর...।

এবং এই যে দেশ, বাংলাদেশ, এমন দেশটি খুঁজে কোথাও পাবে নাকো তুমি—ফাতিমার ছোট ছোট কালো বেগুন ফলের মতো চোখ দেখতে দেখতে সফিকুরের এমন মনে হলে বলে, আমি যাব তোমার দেশে। সোনালি বালির চরে সূর্য ওঠা দেখব। তরমুজের জমিতে ইশমনালায় ছই দেখব। আর দেখব সেই অর্জুন গাছ। গাছে গাছে এখন কত না ফুলপাতা। তুমি আমি তার নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের বাংলাদেশ দেখব। ফাতিমা এসব শুনলে কেমন চুপ হয়ে যায়। চোখমুখ বড় ভার, গম্ভীর এবং কথা বলতে চায় না। তখন সফিকুর অকারণ হাসে। ফাতিমাকে রাগিয়ে দিতে না পারলে সে মজা পায় না। ফাতিমা কথা না বললে সে জানে একটু খোঁচা দিলেই সে কথা বলবে। রাগাবার জন্য তখন সে বলবে, ওডা আবার একটা দ্যাশ নাহি! সফিকুর ফাতিমার মতো বাঙাল টান রাখবে গলায়। তখন ফাতিমা আরও ক্ষেপে যায়। রাগে অভিমানে মুখ ভার করে থাকে। চায়ের কাপ হাতে থাকলে সেটা ফেলে ভিতরে চলে যায়। মাঝে মাঝে সফিক ওর কথা নিয়ে বড় বেশি ব্যঙ্গ করে। সে আর রাগ চাপতে পারে না। আর রাগের মাথায় কথা বললে ওর মুখে তখন আরও বেশি বাঙাল কথা বের হয়ে আসে। সফিকুরের সঙ্গে ফাতিমা কিছুতেই বাঙাল কথা বলতে চায় না। যতটা সে পারে ধীরে ধীরে বইয়ের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে। কঠিন কাঠ কাঠ গলা না করে খুব সুন্দর এক জলতরঙ্গ আওয়াজের মতো তার গলা। এবং তখনই যত দুষ্টুবুদ্ধি সফিকুরের। ওর ইচ্ছা কেমন ফাতিমা ওর সঙ্গে বাঙাল কথা বলুক এমন সুন্দর করে সে যে কি করে কথা বলে; প্রাণের ভিতর কেমন মায়া-জাগানো ওর গলার স্বর; ফাতিমাকে বাঙাল কথার ভিতর যতটা চেনা যায়, ওর মতো কথা বললে তেমন চেনা যায় না।

আজকের সঙ্গে সাধারণত সফিকুর ফতিমাদের বাড়ি যায়। ফাতিমাকে যে সফিক তাই অকারণ রাগিয়ে দিতে ভালবাসে বারবার বলেও সে তা বোঝাতে পারে না। ফাতিমাও রেগে গেলে ছাড়ে না। তখন তার মোকাম্মেল বাংলা কথা—আর কইবেন না। ঠিক নিয়া যান একবার আমাগ নদীর চরে। দাখবেন দ্যাশ কারে কয় একখানা। আপনেগ দ্যাশ আবার দ্যাশ নাহি? দুধ-মাছ পাওয়া যায় না। মানুষগুলাইন গঙ্গার পানি খাইয়া বাঁচে। ইলিশ মাছ মিলে না গন্ডায় গন্ডায়। আছে কিডা তবে?

—কেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছে। বিদ্যাসাগর নজরুল আছে।

—হাসান দ্যান। আমাগ নাই কিছু যদি মনে করেন! চিত্তরঞ্জন দাস, হকসাহেব, জীবনানন্দ অগ বাড়ি কলিকাতায় আছিল না!

—আমি বলেছি ওদের বাড়ি কলকাতায় ছিল?

—তবে মুর্শিদাবাদে।

সফিকুর মুর্শিদাবাদের মানুষ। কথায় কথায় ফাতিমা রেগে গেলে বলবে, মীরজাফরের দেশের মানুষ ভাল হবে কি করে? বিশ্বাসঘাতক: এ দেশের নুন খাবে, এ-দেশটাকে বলবে—এডা আবার দ্যাশ নাহি। কোনটা দেশ। এমন পলাশফুল কোথাও ফোটে। এমন শিমুলের ফুল আপনি নদীর পাড়ে পাড়ে আর কোথাও দেখেছেন? কি বলুন। চুপ করে কেন। তারপর চুপচাপ যেন বলার ইচ্ছা, বাংলা দেশের মানুষ আমার সোনাবাবুকে পৃথিবীর আর কোথায় পাবেন? কিন্তু কিছু বলতে পারে না, সোনার কথা মনে হলেই গলার স্বর ভারি হয়ে আসে।

কত অকারণ এই ঝগড়া। অথচ এমন না হলে ভাল লাগে না সফিকুরের। সে এমন না হলে ফাতিমাকে ঠিক চিনতে পারে না। অভিমানে তখন ফাতিমা আর তার বাড়ি আসে না। সেও যায় না। কিন্তু কতদিন! ফাতিমা নিজেই পারে না। সে আনজুর সঙ্গে চলে আসে। যেন সে সফিকুরের কাছে আসে নি। সফিকুরের সঙ্গে কোন দরকার নেই। যত দরকার তার মায়ের সঙ্গে। যত গল্প তার মায়ের সঙ্গে। যাবার সময় দেখাও করে যেত না বোধ হয়। কেবল আনজু টেনে নিয়ে আসে বলে দেখা না করে পারে না। সফিকুর তখন এই অকপট মেয়ের কাছে ধরা দিতে ভালবাসে। সে আর তাকে অবহেলা করে না।

রাস্তা পার হলেই ফতিমাদের সুন্দর কাঠের রেলিং দেওয়া বাড়ি। নানারকম ফুলের গাছ মাঠে। একটা দেবদারু গাছ আছে। তার নিচে ছোট্ট কাঠের চেয়ার। ঘাস মসৃণ। শামসুদ্দিনসাহেব শীতের দিনে সেখানে বসে রোদ পোহান। ফাতিমা যখন বাবাকে চা দিয়ে আসে সফিকুর তার দোতলা ঘর থেকে দেখতে পায়। সুন্দর একটা নীল রঙের শাড়ি পরতে ফাতিমা ভালবাসে। যখন সদর পার হয়ে ঢুক করে ওদের বাড়িতে ঢুকে যায়, কি অকারণ তখন ফাতিমার ভয়। সবাই দেখে ফেলল এই ভয়। সে বারবার

আঁচলে মুখ মুছতে থাকে। কেন যে মুখে এমন ছাপ, সফিকের কাছে যেতে গেলেই পায়, আঁচল বারবার ঘষে মুখের প্রসাধন সে ঠিক রাখতে পারে না। ফাতিমা সফিকের কাছে এজন্য সেজন্য প্রসাধন করে আসে না। কারণ সে জানে সফিকের কাছে এসে সে তার প্রসাধন ঠিক রাখতে পারবে না। ফাতিমা থাকলে কপাল না মুছে পারে না। ভিতরে ভিতরে এভাবে সফিকের জন্য কি একটা মায়া গড়ে উঠেছে। সফিকও সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পায় না। সামসুদ্দিনসাহেব ওর জন্য খুব করেছেন। এই শহরে সে রিফুজি। সামসুদ্দিনসাহেবের যথাপ্রাণ চেষ্টা না থাকলে সে তার সংসার চালিয়ে পড়াশোনা চালাতে পারতো না। আর এই এক মেয়ে যে তাকে আরও সব নতুন উদ্যমের কথা শোনাচ্ছে। সে মাঝে মাঝে একা একা শীতের রাতে টের পায় কোথাও এই মেয়ের প্রাণে বড় একটা কষ্ট থাকে। ফাতিমা কেন যে মাঝে মাঝে বড় বিমর্ষ হয়ে যায়। তখনই দেয়ালের বিচিত্র পোস্টার, সেই পোস্টারে যেন নতুন সংগ্রামের কথা লেখা হচ্ছে। সফিক ফাতিমার সঙ্গে সেই সংগ্রামের শরিক হতে চায়। ওরা সারা রাত জেগে তখন পোস্টার লেখে।

সফিকুর বই সামনে রেখে কিছুক্ষণ বসে থাকল। ওর মা কখন চা রেখে গেছে সে টের পায় নি। সে জানালায় শীতের সূর্য উঠতে দেখছে। সূর্যের আলোতে শত-শত পোস্টার দেয়ালে সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে। বারবার সেই সব পোস্টারের লেখাগুলো ওর চোখের উপর ভেসে যাচ্ছে। পোস্টারে ফাতিমা, আনজু, আরও সব মেয়েরা সারারাত লিখে গেছে বড় বড় অক্ষরে লেখে গেছে—মোদের গরব মোদের আশা আ—মরি বাংলাভাষা। কেন পোস্টারে ফাতিমা ওর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেছে—একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণ করুন। আনজু লিখেছে—নাজিম নয়তো মুখ রাখো, নইলে মুখের গদি ছাড়।

দেয়ালে দেয়ালে এমন সব বিচিত্র পোস্টার। সে জানালা খুলে, সারারাত যেসব পোস্টার মেরে এসেছে, যা সে দাঁড়িয়ে দেখার সময় পায় নি, এখন এই সকালে তার কিছু কিছু দেখে তার বুক কেমন ভরে উঠেছে। তার হেঁটে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। যেন হেঁটে গেলে অজস্র পোস্টারের ভিতর কোনটা ফাতিমার হাতের লেখা সে চিনতে পারবে। এমন নিবিষ্ট হয়ে কে আর রাতের পর রাত পোস্টার লিখে গেছে! সে তার পোস্টারে বারবার বাংলাদেশ কথাটা নিজে লিখে দিতে চেয়েছে। কখনও বোঝা যায় রাগে অথবা বড় অভিমানে সে একটা শাখার লম্বা মুখ এঁকে দিয়ে নাজিম নুরুলের ছবি আঁকতে চেয়েছে। এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। কে যে তাকে এমনভাবে প্রেরণা দিচ্ছে সফিক বুঝতে পারছে না। একটানা ফাতিমা উপুড় হয়ে কাজ করে গেছে। আজ ভোর রাতে শুধু সে একবার গিয়ে দেখেছে যারা লিখছে তাদের ভিতর ফাতিমা নেই। ফাতিমাদের নিচের বারান্দায় কাঠের রেলিঙের ধারে মোমের আলোতে সবাই লিখে চলেছে। শেষ রাতের দিকে শহরের আলো নিভে গিয়েছিল—ওরা অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে নি, মোমের বাতি জ্বালিয়ে নিয়েছে। তুলির এক একটানে ওরা এক-একটা পোস্টার শেষ করছে।

সফিকুর ফাতিমাকে না দেখে কেমন অবাক হয়ে গেছিল। সে নেই, এটা সে ভাবতে পারে না। সে গিয়ে শুয়ে আছে, আর সবাই লিখছে এটা ভাল দেখাচ্ছে না। সে ভিতরে ভিতরে রুষ্ট হয়ে উঠেছে। পোস্টারগুলো একসঙ্গে করে বড় প্যাকেট করল একটা। কেরিয়ারে বেঁধে নেবার সময় ভাবল আনজু অথবা রমাকে বলবে, ফাতিমা কোথায়? কিন্তু যে মেয়ে ওকে না বলে ভিতরে শুতে চলে যায় তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে আর ইচ্ছা হয় না। কি ভীষণ ঠাণ্ডা। হাত-পা শীতে সাদা হয়ে গেছে। ফাতিমার এ সময় এটা ঠিক হয় নি। মনে মনে সে ফাতিমার হয়ে কার কাছে যেন ক্ষমা চাইছে। আর তখনই সে দেখল দোতলার রেলিঙে চুপচাপ একা ফাতিমা। অস্পষ্ট আলোতেও সফিকুর চিনতে পারে সব। মাথার উপর শীতের আকাশ। বুড়িগঙ্গা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে। কিছু পালের নাও হয়ত এখন উজানে বৈঠা মারছে। সে এমন একা দাঁড়িয়ে আছে কেন, শীতের রাতে ঠাণ্ডা হাওয়ার ভিতর দাঁড়িয়ে আছে কেন—এই সব জিজ্ঞাসা করতে সাইকেল রেখে উপরে উঠে গেল। ডাকল, এই ফাতিমা।

ফাতিমা পিছন ফিরে তাকাল না। বুঝি সে শীতের আকাশ দেখছে। রাত ফর্সা হতে দেরি নেই। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবার প্রভাতফেরিতে বের হবে। ফাতিমা বুঝি ওদের মুখে বাংলাদেশের গান শুনতে পাচ্ছে। সকাল হলেই একুশে ফেব্রুয়ারির ডাকে মা-বোনেরা জেগে উঠবে।

সফিক ফের বলল, ফাতিমা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ! শরীর খারাপ লাগছে? তারপর সফিক কি বলবে ভেবে পেল না। তাছাড়া এখানে এ সময়ে বেশি সময় দুজন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। কেউ দেখে ফেললে সামসুদ্দিনসাহেবের কানে উঠতে পারে। যতবারই সে ফাতিমার সঙ্গে থাকে প্রায় সব সময় থাকে। একবার সে আর ফাতিমা মধুর ক্যান্টিনে একা বসে থাকলে, ফাতিমা ভীষণ অস্বস্তিতে বিরক্ত বোধ করেছিল। বলেছিল, সফিকভাই, আমি বাড়ি যাব।

সফিকুর বুঝতে পেরেছিল সেদিন, ফাতিমা চায় না ওরা দুজনে এভাবে একা পালিয়ে-পালিয়ে দেখা করে। নিজের মানুষকে চুরি করে দেখতে যাওয়া বড় অপমানের। সে সেই থেকে কখনও ফাতিমাকে আর কোথাও একা দাঁড়িয়ে থাকতে বলেনি। এখানেও সে আসত না। তবু কেন যে এমন শীতের রাতে ওকে এভাবে একা দেখে সফিকুর বিচলিত হয়ে পড়ল। সে চুপ চুপ উঠে এসেছে। ফাতিমা ওর কথার কোন জবাব দিচ্ছে না। ফাতিমা হয়ত এভাবে আসা তার পছন্দ করছে না। সফিকুরের ভিতরটা দুঃখে কেমন ভার হয়ে গেল। বলল, আর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আমি শেষবারের মতো এগুলো সেঁটে বাড়ি চলে যাব। তোমরা সাবধানে থেক।

ফাতিমার কেমন চমক ভাঙল। সে ঘাড় ফেরাল, দেখল সে আর সফিক খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ওর গায়ে সেই সাদামাটা রঙের পাঞ্জাবি, খোপকাটা লুঙ্গি আর পায়ে এক জোড়া স্লিপার। চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছে হাত-পা শীতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সফিক কাশছে। এ সময় ওকে একটু চা করে দিলে বড় ভাল হত। ওকে কাশতে দেখেই যেন বলল, প্যাকেটগুলো রেখে দিন। অন্য কাউকে দিয়ে ওগুলো দেয়ালে সেঁটে দেব। আপনি বরং বসুন। চা করে আনছি। দেরি হবে না।

—আরে না না। এখন আর ঝামেলা বাড়িও না। রাত ফর্সা হতে না হতে হাতের কাজ সব সেরে ফেলতে হবে। আমি যাচ্ছি। বলেই সে দু-পা গিয়ে আবার ফিরে এল। বলল, কেউ তোমাকে কিছু বলেছে! এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছ!

ফাতিমা হাসল। —না না। কে কি বলবে!

—কি জানি কত রকমের কথা উঠতে পারে। এ কদিন যেভাবে বেহুঁশ হয়ে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অসাধারণ উপন্যাস
নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে
প্রকাশিত হচ্ছে
রূপরেখা ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯।

আমরা পোস্টার লেখা, সাঁটা এবং বহু বেশ কাছাকাছি থেকেছি, কথা উঠতে কতক্ষণ।

—এদিনে এমন বলতে নেই। তুমি সাবধানে থেক। এই প্রথম সে সফিককে তুমি বলে লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, আমার জন্য তুমি ভেব না।

সফিকের মনে হল সারা উপত্যকায় ফুল ফুটে আছে। সে ফাতিমাকে নিয়ে উপত্যকায় কেবল ছুটছে। শীতের রাতে যে সামান্য উষ্ণতা তার দরকার ছিল ফাতিমার এমন কথায় সে তা ভুলে গেল। বলল, যদি খোঁজ করতে চাও মেডিকেল হোস্টেলে যেও। আমাকে সেখানে পাবে। আমরা সেখান থেকেই ১৪৪ ধারা ভাঙব ভাবছি।

ফাতিমা বলল, তোমার সঙ্গে সারাদিন আমার ঘুরতে ইচ্ছা হচ্ছে সফিক। এমন দিন ত আর আমাদের আসবে না।

সফিকের মনে হল শীতে যেন কাঁপছে ফাতিমা। সে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে আর ঠাণ্ডা লাগাবে না। ভিতরে যাও।

ফাতিমা অনুগত দাসীর মতো নেমে যেতে থাকলে কেউ ডাকল, আচ্ছা তুমি এখানে এই ঠাণ্ডায় চুপচাপ কেন দাঁড়িয়েছিলে? এভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কেন জানি ভয় হয়।

বলল, এমনি। মনের ভিতর কি যে কখন হয় কেউ তা বলতে পারে না। সারা রাত ফাতিমা আর একজন মানুষের চোখমুখ এবং গভীরে ডুবে গেলে শরীরে তার চন্দনের গন্ধ টের পায়। সে যেন তার পাশেই দাঁড়িয়ে বলছে, ফাতিমা, তুই কি ভালো ভালো কথা লিখে যাচ্ছিস রে। আমি কি লিখব। আমাকে তোর পাশে বসে লিখতে দিবি?

—কেন দেব না?

—কি জানি, যদি না দিস। যদি বলে দিস, তুমি স্বার্থপর। তুমি বাংলাদেশের মানে জান না। তোমার কোন অধিকার নেই লেখার।

—বা এমন বলব কেন! আমি তো বাপু তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই লিখে যাচ্ছি। আমি যে এত করছি কার জন্য? তোমার জন্য।

—আচ্ছা তোর ঐ সফিক কে হয় রে?

—সফিক বড় ভাল ছেলে। আমি তাকে ভালবাসি। আমার বাবাও সেটা টের পেয়েছে। আমি ওকে না পেলে এখন বুঝতে পারছি বাঁচব না।

—তা হলে আমি তোর কে?

—তুমি যে আমার কে, বুঝতে পারি না। তুমি আমার কি যে নও মাঝে মাঝে আমার তাই ভাবি। যখন আমি মরে যাব, কবরের নিচে চলে যাব বুঝি তখন দেখব তুমি আমার কবরের পাশে বসে আছ। তুমি আছ আমার পাশে পাশে। তুমি বাদে আমি এ-বাংলাদেশে সব থাকলেও একা।

—বা! তুই সব বানিয়ে বানিয়ে মিছে বলছিস।

—তুমি চলে যাবার পর আমার এটাই মনে হয়েছে। তুমি এমন বলবে জানতাম। তবে তুমি যেখানে যেভাবেই থাক, তুমি আমার। আমার মাটির, আমার কাছের মানুষ।

তখনই ওর পাশে এসে সফিকুর দাঁড়িয়েছিল। ফাতিমা টের পায় নি সফিকুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরে টের পেলে সে যেন ধরা পড়ে গেছে এমনভাবে তাকিয়েছিল। সে সফিককে ভেবেছিল বলবে, আমি আমার মনের মানুষকে ভাবছি সফিক। সে আমাকে ফেলে দূরে চলে গেছে। আর এদেশে আসবে কিনা জানি না। আর দেখা হবে কিনা জানি না। এমন দিনে তাকে না ভেবে থাকতে পারিনি। তুমি বিশ্বাস কর সফিক, আমার মনে হয়েছে শুধু আমি আর তুমি সারারাত জেগে পোস্টার লিখিনি, সেও আমাদের সঙ্গে লিখে গেছে। তাকে ভালো করে দেখার জন্য কতদিন পর এখানে একাকী এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি এ-সব নাই জানলে।

ফাতিমা সফিকুরকে উত্তরে এসব কিছু না বলে অন্যকথায় চলে গিয়েছিল, তুমি আর ঠাণ্ডা না লাগিয়ে সকাল সকাল একটু ঘুমিয়ে নাও। কিন্তু সফিকুরকে যখন ভারি বিমর্ষ দেখাল, ফাতিমা আবার না বলে পারল না, ভয়ের কি আছে সফিক। সেতো আমাদেরই মানুষ।

সফিক বলল, কে সে?

ধরা পড়ে গেল বুঝি। তবু সে কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়েছিল সফিকের দিকে। তারপর বলেছিল, সোনাবাবুর কথা বলছি।

—ও তোমার সেই সোনাবাবু, যে আমার মতো নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ফাতিমা সোনাবাবু সম্পর্কে আর কোন কথা বলল না। সে বলল, আর দেরি কর না। রাত ভোর হয়ে আসছে।

সফিক বলল, সাবধানে থেকো।

সফিক কেন যে বার বার একই কথা বলছে! সে বলল, ভয়ের কি আছে সফিক! আজকের দিনে আমরা তো আর একা নই। সারা বাংলাদেশ যখন আছে, সোনাবাবু যখন আছে তখন আর ভয় কি! সে তো আমাদের সব সময় আরও সাহসী হতে বলছে। তোমাদের সঙ্গে আমরাও মার্চ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে যাব। আজকের দিনে অন্তত তুমি আমাকে ঘরে থাকতে বল না।

সফিক বলল, আমি বারণ করব না। এমন দিনে বারণ করতে নেই জানি। যা কিছু কাজ সব সেরে ফেলতে হবে। এই শীতের রাতে এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারি না।

টেবিলের সামনে বসে তার রাতের কত কথা মনে হচ্ছিল। জানালা বন্ধ ছিল বলে ঘরে অন্ধকার। সে জানালা খুলে দিলে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। শীতের রোদ লম্বা হয়ে নামছে মাটিতে। সে বইয়ের পাতা পর পর উল্টে গেল। যার চোখ আটকে গেল—কি সুন্দর সেই সব পংক্তি। যেন ওর সামনে ফাতিমা দু হাত তুলে ভালবাসা চেয়ে নিচ্ছে। সে চোখ বুজে ওর সেই কথাগুলো যেন বলে গেল—ঈশ্বর জেনেছিলাম, পেয়েছি তোমাকে, মনেও হয়নি—তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা। তুমিও মূল্য করনি দাবি।

রোদটা তখন আরও লম্বা হয়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। শীতের রাস্তায় কারা তখন মার্চ করে চলে যাচ্ছে। ওদের বেয়নেটে নরম রোদ তীক্ষ্ণ ফলার মতো কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। সফিকুর যেন সেইসব শূন্যে দেয়ালে বারবার আঘাত হানার জন্য পড়ছিল, জোরে জোরে সে পড়ছে—তোমার কালো চুলের বন্যায়—আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে—তোমাকে যা দিই, তোমার রাজকর তার চেয়ে বেশি—আরো দেওয়া হল না—আরো যে আমার নেই।

শহরে বড় রাস্তায় মার্চ-পাস্টের শব্দ। সাইকেলের বাঁটে রোদ পিছলে যাচ্ছে। কলের পুতুলের মতো দম দেওয়া মনে হচ্ছে ওদের। দম ফুরিয়ে গেলেই যেন সব জারিজুরি ওদের শেষ হয়ে যাবে। সফিকুর এবার জানালাটা বন্ধ করে দিল। কুচকাওয়াজের দাপটে, এমন যে প্রেমের কথা সে শোনাতে চেয়েছিল, তারা তা শুনতে পেল না। এবার সে রাস্তায় তাদের হাঁক দিয়ে বলে যাবে, বলে গেলেই শীতের মাঠে আবার পাখিরা এসে বসতে পারবে। কলের পুতুলের ভয়ে ওরা। আর মাঠ ছেড়ে কোথাও যাবে না। সফিকুর তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দুটো গুঁজে রাস্তায় বের হয়ে গেল।

সেই শীতের সকালে সোনাকেও দেখা গেল কলকাতার বড় রাস্তা ধরে হাঁটছে। চোখে মুখে ভীতির ছাপ। এই বড় শহর দেখে গাড়িঘোড়া দেখে সে কেমন আড়ষ্ট হয়ে হাঁটছে। যারা বাবুমানুষ, তাদের সে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করতে ভয় পাচ্ছে, কোথায় সেই নির্দিষ্ট বাসটি পাওয়া যাবে। ওরা ওর উপর রাগ করতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে ঠেলাওয়ালা অথবা বাসের দেখলে তার ভয় লাগে না, যারা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে তেমন মানুষকে খুঁজছিল। সে দুজন ভদ্রলোককে কিছু বলতে গিয়ে দেখেছে—ওরা এত ব্যস্ত যে তার কথা শুনতেই পাচ্ছে না। হাত তুলে কোন রকমে ওর সঙ্গে দয়া করে দায়সারাভাবে কথা বলে ছুটে যেন পালাচ্ছে। ওর মনে হল ওরা পালাচ্ছে, ওরা ওর কথা কেউ শুনতে চাইছে না। তবু কেন জানি একজন বুড়োমতো মানুষ তাকে খুব যত্নের সঙ্গে বুঝিয়ে দিল, ঐ যে মনুমেন্ট দেখছ, তার নিচে তুমি বাস পাবে।

কলকাতায় তেমন শীত পড়ে না। তবু ওর ভিতরে শীত-শীত ভাবটা বড় বেশি জাঁকিয়ে বসেছে। হাল্কামতো কুয়াশা চারপাশে। সামনের রাস্তাটা যে চৌরঙ্গি, ডান দিকে যে বাড়ী সিনেমার ছবি সমস্ত দরজায় এবং ওটা যে লাটভবন, সোনা তাও জানে না। বড় মাঠ দেখলেই গড়ের মাঠ মনে হয়, সে কেবল বুঝতে পেরেছিল, সামনের মাঠটাই গড়ের মাঠ। এবং মাটি, গাছপালা আর মনোরম শীতের সকালে কোথাও

রেমপার্ট থাকতে পারে এই মাঠে, ভাবতেই একটু সে সাহস পেল।

সকালের রোদ তেমন জোরালো নয়। শীতের হাওয়া কার্জন পার্কের গাছপালায়। সে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। সে শুনে এসেছিল— কলকাতায় তেমন শীত পড়ে না। সুতরাং ওর শীতের জামা না থাকলেও কলকাতায় সে কষ্ট পাবে না। একটা পাতলা পাজামা, কিটস্ ব্যাগ কাঁধে, পায়ে কতদিনের পুরানো কেডস্ জুতো। কলকাতায় শীত নেই সে শুনে এসেছিল, কিন্তু এসে তক দেখছে সারাক্ষণই শীত। সে শীতে কাঁপছে কাঁপতে বাস ধরার জন্য হাঁটছে।

বাসের ভিতর উঠেও সে খুব নড়ছিল না। চুপচাপ বসে আছে। বেশি নড়াচড়া করলে ওকে বাস কনডাক্টার নামিয়ে দিতে পারে। কোথাকার গ্রাম থেকে ছুটে এসে কলকাতা নগরীতে হাজির। কি করে যে সোনা এমন ভীতু মানুষ হয়ে গেল!

চার বছরে সে আর আগের সোনা নেই, অন্য সোনা হয়ে গেছে। সেই যে সে ভেবেছিল, এই দেশে এসেই ওরা সবাই রাজার মতো হয়ে যাবে, সুখ সমারোহ থাকবে জীবনে, দেশভাগের নিমিত্ত ওরা শহিদ হয়ে গেছে—সুতরাং সর্বত্র ওদের জন্য বিজয় পতাকা উড়বে। ওর বাবার মতো মোটে মোটে শহর নগর পার হয়ে যাবে। সোনা এবং নিজেকে বাসের ভিতর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, কেমন

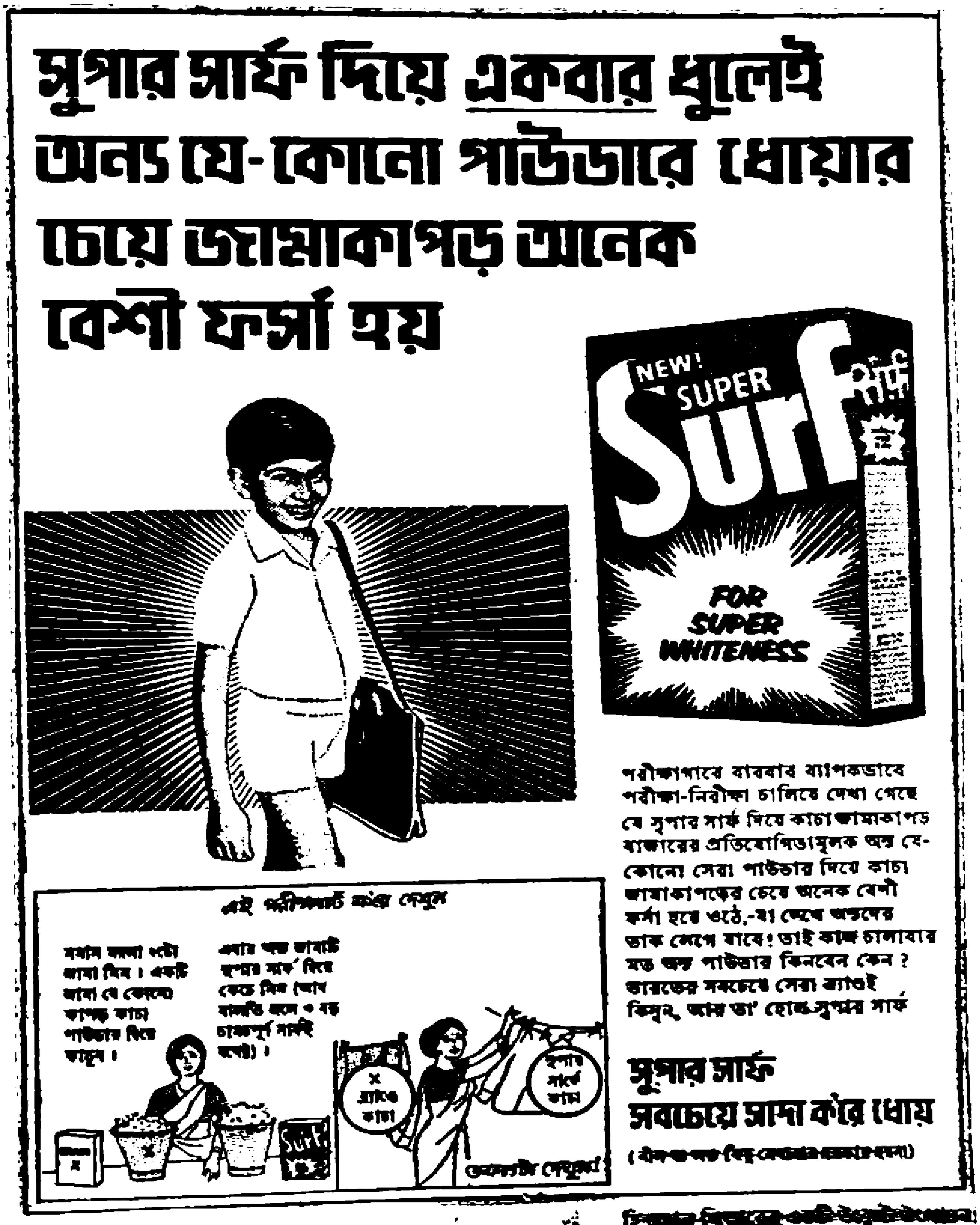

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

লিনটাস-SU. 115-140 BG

আছো রাজা? ভালো আছো? শীত করছে খুব। খুব খিদে পেয়েছে। কাল রাত থেকে কিছু খাও নি? আর বেশি দেরি নেই। যেখানে যাচ্ছি, দেখবে কত কিছু খেতে পাবে তুমি। কোন কষ্ট থাকবে না তোমার।

হালি হবের ক্যাম্পজীবন, রাইট লেফট আর মার্চ পাস্ট করে কল্যাণী ক্যাম্পে বাওকা একবের ভিতর গতকালের একটা জীবন নিমেষে কেটে গেছে। সে নিজেও জানত না আজ তাকে এখানে আসতে হবে। সে জানত না, এই শহর ছেড়ে, বাংলাদেশ ছেড়ে তাকে কোথাও চলে যেতে হবে। চিঠিতে কি লিখেছে মজুমদারসাহেব তার জানার কথা না। তবু এই চিঠিই তার সব। মজুমদার-সাহেব তার হয়ে এই চিঠি দিয়েছেন। জয়া জাহাজের সেকেন্ড অফিসারকে লেখা। সে চিঠিটা দেখালেই তাকে নিয়ে নেবে। তার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোরের ট্রেনিং নেওয়া আছে। ট্রেনিং থাকলে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ওর হয়ে মজুমদারসাহেব আর কি লিখেছেন সে জানে না।

বাসের ভিতর শীতের সকাল আর পাশে গঙ্গানদী। সে বাসে বসেই নদী এবং নদীতে জাহাজ দেখতে পেল। এবং বাসটা মোড় ঘুরতেই সব আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। ফোর্ট উইলিয়মের দুর্গ দেখতে পেল। এখান এক র‍্যামপার্টে বড় জ্যাঠামশাই এসে বসতেন। এই নদীর পাড়ে এবং কোন গাছের ছায়ায় তার পাগল জ্যাঠামশাইয়ের মুখ ভেসে উঠলে সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

মেজ জ্যাঠামশাইর বড় প্রিয় এই গঙ্গা নদী। নদীর পাড়ে তিনি তাঁর দেহ রাখবেন এখন কেবল এই আশা তাঁর। আর কিছু তিনি চান না। শীতের সকালে হেঁটে হেঁটে এক ক্রোশের মতো পথ চলে যান গঙ্গাস্নান করতে। নদীর নামেই তাঁর যত পুণ্য। সংসারের প্রতি দেখলে এখন মনে হয় মায়া-মমতা তাঁর কম। এখানে এসে যে এই বয়সে কি করবেন ভেবে না পেয়ে কেবল বাড়িটার চারপাশে নানারকমের গাছ এনে লাগাচ্ছেন। বাবা মাস দু মাস পর ফেরেন। এখানে আসার পর সে আর বাবাকে হাসতে দেখেনি। মা রাতে কাঁথার ভিতর শুয়ে কষ্ট পান। শিয়রে একটা কুপি জ্বলতে থাকতো সোনা টের পায় মায় চোখমুখ কতটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। এখানে এসে তার পরপর আরও দুটো ভাই হয়েছে। জমি-জায়গা বলতে চারপাশের বনজঙ্গল সাফ করে বসতি করা। জঙ্গল সাফ করতে করতে বড়দার হাঁটু শক্ত হয়ে গেছে। ছোট কাকা আর এখানে থাকেন না। নিজের মতো করে তিনি আলাদা শহরে বাস তুলে নিয়ে গেছেন। কাকিমা এসেই এ ব্যবস্থা করে নিয়েছে। বড় জ্যাঠিমা যেদিন সবাই উপবাস থাকে, অর্থাৎ যেদিন সংসারে কিছু জোটে না, পেঁপে সিদ্ধ অথবা শুধু মিষ্টি কুমড়ো সিদ্ধ খেয়ে থাকতে হয় সেদিন রাতে ভাঙা বাক্স থেকে সব চিঠি বের করে পড়েন। রাত জেগে কুপি জ্বালিয়ে জ্যাঠিমা সারারাত বসে চিঠি পড়েন। জ্যাঠামশাইর চিঠি। বিয়ের পর পরই যেবার তিনি কলকাতার দেবধারের মতো কাজ করতে গিয়ে মাস ছমাস ছিলেন, তখনকার কিছু চিঠি। জ্যাঠিমা সকাল হলেই স্নান করে একটা ভাঙা আয়নার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন। কপালে সিঁদুর পরেন বড় বড় ফোঁটায়। এবং তখন জ্যাঠিমাকে দেখলে মনে হয় না সংসারে গতকাল সবার হা-অন্ন গেছে। জ্যাঠিমার এই মুখ দেখলে সোনা চোখের জল রাখতে পারে না। মা না খেয়ে শীতের কাঁথায় শুয়ে থাকলে তার পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না। ওরা সবাই আশায় আশায় বসে থাকে বাবা ফিরে আসবেন। যা কিছু অর্থ ছিল বছর তিনের ভিতর শেষ। এখন আছে তিনটে কুঁড়েঘর আর কিছু অন্নহীন প্রাণ। কেউ আর টাকা নিয়ে আসে না। প্রতাপ চন্দের ছেলে লিখেছে, তারা দেশ ছেড়ে চলে আসছে। তার কাছে কিছু প্রাপ্য টাকা ছিল। সব খোয়া গেলে সোনা বুঝতে পারে না বাবা এবারে কি করবে। বাবার চোখমুখের দিকে তাকান যায় না। ক্রমে বাবা কেমন হয়ে যাচ্ছেন। তবু বাবাই একমাত্র মানুষ যে বাড়ি ফিরে এলে ওরা কদিন দুবেলা পেট ভরে খেতে পায়। বাবার চলে গেলে সারা সংসারে অন্ধকার। অন্নহীন এই সংসারে সোনার নিজেকে বাড়তি লোক বলে মনে হয়। তখন মনে হয় সকাল হলেই সে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, পাগল জ্যাঠামশাই এসে গেছেন এদেশে। তিনি আর পাগল নয়। তিনি বড় মানুষ, তার অর্থবল অনেক। কোথাও তিনি এক রাজবাড়ি কিনে ফেলেছেন। সবাইকে নিয়ে তিনি এখন সেখানে থাকবেন। সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে বলছেন।

বাসটা যাচ্ছে। সোনা এত অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল যে সে কতদূর চলে এসেছে জানে না। সে বারবার কন্ডাক্টারকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—কে. জি. ডক। তিন নম্বর গেট। সে সেখানে নামবে। তাকে বেশিদূরে নিয়ে গেলে সে চিনে ফিরে আসতে পারবে না। পকেটে তার এই বাসভাড়াই সম্বল। তার আর কিছু নেই। এবং এজন্য সোনার বারবারই মনে হচ্ছে সে বড় অকিঞ্চিৎকর মানুষ। ওরা কথা কন্ডাক্টার মনে নাও রাখতে পারে। মনে না রাখলে সে খুব বিপদে পড়ে যাবে।

সহসা মনে হল, সোনার বাসের লোকগুলো ওর প্রতি খুব দয়ালু হয়ে উঠেছে। বুড়োমতো একজন লোক বলল, এখনও অনেক দূর। তুমি বসো। ঠিক তোমাকে নামিয়ে দেবে। তখন ওর মনে হল তবে রাস্তা বেশ দূরই হবে। সে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পারে। সে বেশ চুপচাপ বসে এবার জানালার পাশের সব দালান কোঠা, লাইট-পোস্ট এবং রেলব্রীজ দেখতে দেখতে ভাবল এই শহরের কোথাও অমলা কমলা থাকে। সে একবার দেখা করবে ওদের সঙ্গে। সে একটা চিঠি লিখবে, কোনদিন সে কাউকে চিঠি দেয় নি। সে জাহাজে যখন চড়ে বসবে তখন অমলাকে চিঠি লিখবে। লিখবে, অমলা আমি বাংলা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। অথবা যদি সে অমলার সঙ্গে দেখা করতে যায়, ওকে চিনতে নাও পারে। সে কত বড় হয়ে গেছে। বরং সে চিঠিই লিখবে। সে কি কাজ নিয়ে যাচ্ছে জাহাজে তা লিখতে পারবে না। কথাটা লিখতে ওর ভারি লজ্জা লাগবে।

এমন সময় কন্ডাক্টারের গলা শুনতে পেল সোনা। এই যে কে নামবে কে জি ডকে। তিন নম্বর গেটে তুমি নামবে বলেছিলে। বলে কন্ডাক্টার সোনার দিকে তাকাল। আশ্চর্য সোনা। সে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে বুঝতে পারেনি। বেশ সে শহরের মানুষজন, রেলব্রীজ দেখছিল। ওর শীত করছিল না তেমন। সে ট্রেনিংশিপের সেকেন্ড অফিসারের কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। এবং চিঠিটা দেখলেই ওকে ডেকে পাঠাবেন তিনি। কড়া মেজাজের মানুষ ধমক দিয়ে কথা বলার অভ্যাস। এবং এমনসব নিষ্ঠুর ঘটনার সংবাদ সে রাখে, যা মনে হলে শরীরের শীতটা বাড়ে। সে বাস থেকে নেমেই আবার শীতে কাঁপতে থাকল। গেটের মুখে দুজন সিকিউরিটি রেটিংস্। সামনে মাঠ এবং দূরে দূরে সব ক্রেন, জেটি, জাহাজের আগিল তিমিমাছের পেটের মতো। সে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখে নিল সব। গেটে লেখা ট্রেনিং শিপ ভদ্রা। নুড়ি-বিছানো পথ। দুপাশে ফুলের বাগান, তারপর জাহাজের জেটিতে ছোট মাঠ এবং নরম দুর্বা ঘাস। খুব মসৃণ, তার পাশে গোলা রাস্তা লকগেটের দিকে চলে গেছে। ফলইনে সে কিছু নতুন রেটিঙস দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল। পনের দিন পর পর একটা দল আসে। এই দিনে সেও এসেছে। ওর যতই এখন শীত করুক হাতের চিঠিটা সেকেন্ড অফিসারের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে। আর যতক্ষণ তিনি ডেকে তার সঙ্গে কথা না বলছেন ততক্ষণ শরীর থেকে তার শীত যাবে না। সে গেটের কাছে গিয়ে রেটিঙসদের কাছে চিঠিটা দিল। অনুমতি না পেলে সে ভিতরে ঢুকতে পারবে না।

চিঠিটা নিয়ে ওদের একজন ভাবল মার্চ করে জাহাজের দিকে চলে গেল। সে ঠিকমতো পৌঁছে গেছে। সে বড় কঠিন ভেবেছিল এখানে আসা, ঠিক ততটা কঠিন নয়। তার বড় ইচ্ছা করছিল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রেটিঙদের সঙ্গে গল্প করতে। চিঠিটা পৌঁছে গেলেই তাকে ডেকে পাঠাবে। তার নাম লিস্ট করে নেবে। যারা এখন ফলইনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে দাঁড়াতে বলবে। দাঁড়াবার আগে যা যা শুনে এসেছে কতটা তা ঠিক বড় জানার ইচ্ছা তার। এখানে এই মানুষ কতদিন আছে কে জানে। জাহাজের মাস্তুলে নিশান উড়ছে। এবং সে এখানে দাঁড়িয়েই দেখল মাস্তুলের মাথায় একটা কাক বসে আছে।

সে ভিতরে ঢুকে গেলে কাকটা ওর মাথার উপর এসে কা-কা করে ডাকল। ওর ভিতরের শীতটা এবার আরও বেড়ে গেল। ওর দাঁত ঠকঠক করে কাঁপছে। ঠান্ডা বাতাস এত বেশি ঠান্ডা হয়ে গেছে যে, সে বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। রোদে

যেন কোন তাপউত্তাপ নেই। মরা রোদের ভিতর ওর চোখদুটো আরও মরা দেখাচ্ছে. যারা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে অথবা টুইন ডেকে ডিউটি করছে তাদের শরীরে শুধু গেঞ্জি। ওরা শীতে কাঁপছে না। ওদের দেখে সোনা এতক্ষণে বুঝতে পারছে সে শীতে কাঁপছে না। সে ভয়ে কাঁপছে। তাকে কারা যেন ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই দালানকোঠার ভিতর বলির মোষটার মতো। সে দেখতে পেল চোখের সামনে ঢাকঢোল বাজছে, ধূপধুনোর গন্ধ উঠছে, চোখ জ্বালা করছে। খুঁটি মোষটাকে টেনে টেনে নিয়ে আসছে। সকাল থেকে বড় শীতে কাঁপছিল মোষটা।

বিউগিল বাজলে সোনা টের পেল সেও ফল-ইনে দাঁড়িয়ে গেছে। ডেকের উপর কাপ্তান। সামনে চিফ, সেকেণ্ড এবং থার্ড অফিসার। সেকেন্ড অফিসার দু কদম সামনে এসে কমান্ড দিচ্ছেন।

সোনা শুনতে পেল, ঠিক সেই পুরোহিতের মতো গলা, জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণের মতো হেঁকে ওঠা—ট্রেনিজ কল তিনি যেন দম নিলেন, তারপর গলার দুপাশের রগ ফুলে উঠতে উঠতে যখন মনে হ জল দম বন্ধ হয়ে আসছে—তখন তিনি হেঁকে উঠলেন, দি ফার্ট ফোর ব্যাচ, এটেনসান।

সবার সঙ্গে সোনা এটেনসান হয়ে গেল। ঠিক সেই কল লাগানো পুতুলের মতো। ওর যা কিছু নিজস্ব, এই যেমন ওর ইচ্ছা, ভালবাসা এবং বড় হওয়ার স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা সব সে ঝেড়ে ফেলে এখন ওরা যা যা বলবে সে তাই করবে। যদি ওকে ওরা ক্লাউন সাজিয়ে ছেড়ে দেয় সে সারাজীবন একটা ক্লাউন হয়েই থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার ডেকের উপর হেঁকে উঠলেন, ট্রেনিজ, দি ফার্টফোর ব্যাচ—স্ট্যান্ড এট ইজ। সোনা সহজ হয়ে দাঁড়াতে পেরে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বোট-ডেকের ওপাশে সূর্য কিরণ দিচ্ছে। জাহাজের ওপাশে বড় বড় সব সাদা বোট। এবং দূরে ওপারের জেটিতে ক্লানলাইনের জাহাজ। জাহাজের মাস্তুল পার হলে জেটি এবং শেড আর বড় বড় সব ক্রেনগুলো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে লম্বা ছায়া ফেলেছে জেটির জলে। অথচ এরই ভিতর সে একটা ঘুঘু পাখির ডাক শুনতে পেল। কোথাও এখানে তবে ঝোপজঙ্গল আছে যেখানে এই শীতের সময়েও ঘুঘুপাখি বাস করতে পারে। ঘুঘুপাখির ডাক শুনলেই বাংলা দেশের কথা মনে হয়। প্রতিমার কথা মনে হয়। প্রিয় অর্জুন গাছটার নিচে কেউ আর দাঁড়িয়ে থাকে না। গাছটা একাকী নিঃসম্বল মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে নেই, জ্যাঠামশাই নেই। প্রতিমা শহরে থাকে। প্রতিমা জ্যাঠামশাই না থাকলে গাছটারও থাকার কোন মানে নেই। কিন্তু সেই গাছটার নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট মুখ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলে দেখল ঈশম দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘুরেফিরে আবার তার তরমুজের জমিতে নেমে যাচ্ছে। সে এবং গাছ এবং তরমুজের জমি ফেলে কোথাও গিয়ে শান্তি পাচ্ছে না। আর এমন সময়ই সে শুনতে পেল, ট্রেনিজ, দি ফার্টফোর ব্যাচ, স্ট্যান্ড ইজি।

ওরা ফল-ইনে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছোলাতে পারছে। এমন কি ওরা এখন পরস্পর গা চুলকে নিতে পারে। সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারায় সোনা কেমন সাহস পেল। শীতের সূর্য জাহাজের ওপাশ থেকে মাথার উপর এপাশে উঠে আসছে। শীতের সূর্য ওকে উত্তাপ দিচ্ছে। সে বাঁচতে পারবে এই উত্তাপে। সে এখানে হাতখরচ পাবে সাত টাকা। দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে। এটা যে ওর কাছে কি মহার্ঘ ব্যাপার, ক্ষুধায় সে কাতর এবং দুপুর হলেই বোট-ডেকে বড় বড় কলাইকরা থালাতে ভেড়ার মাংস আর ভাত। সূর্যটা যত তাড়াতাড়ি মাথার উপর উঠে আসবে তত তাড়াতাড়ি সে খেতে পাবে। সে ফাঁকে ফাঁকে তাই সূর্য দেখছিল। সূর্য দেখলে কি হবে, সে তো জানে তাদের এখন নিয়ে যাওয়া হবে বোট-ডেকে। তাদের ডেকের কাঠে ক্রমাগত দু ঘণ্টা হলিস্টোন মারতে হবে। এই দু ঘণ্টায় কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে বিদায় করে দেওয়া হবে. তাকে ভেড়ার মাংস ভাত খেতে দেওয়া হবে না। এমন ভাবতেই সোনার বুক গলা শুকিয়ে গেল। সে আজ খেতে না পেলে মরে যাবে। খাবারের জন্য সে আর যাই হোক অজ্ঞান কিছুতেই হবে না।

বোট-ডেকে সে সবার সঙ্গে উঠে গেল। সারাটা ডেক কারা জল মেরে গেছে। লাইফ-বোটের পাশে দুজন সিনিয়র ট্রেনিজ ওদের উঠে আসতে দেখে ভারি মজা পাচ্ছিল। ওদের হাতে হোস পাইপ। ওদের জন্য চার-পাঁচজন জটলা করছে ফেসরুমের পাশে। ওদের হাতে বালি। ওরা ডেকের কাঠে বালি ছড়িয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন এসেছে, সারি সারি তারা হলিস্টোন মারতে বসে গেল। সাদা রঙের চৌকো পাথর। কিভাবে বসবে, কিভাবে দুহাতে হলিস্টোন ধরবে, কিভাবে ঘসবে সব একজন সিনিয়র ট্রেন সামনে বসে দেখিয়ে দিচ্ছে। বসার এদিক-ওদিক হলে পিছন থেকে পাছায় লাথি খেতে হবে। সোনা সব ভাল করে লক্ষ্য করছে। সে দুপায়ের উপর ভর করে আলগা হয়ে বসল। দুহাতে চেপে হিলস্টোন ধরে রাখল। এখন ঘসামাজা ডেক ফের ঘসতে হবে। কাঠ পাতলা হয়ে গেছে ঘসতে ঘসতে। কোথাও খোবড়া বের হয়ে পড়ছে। তবু ঘসতে হবে। উপুড় হয়ে বাটনা বাটার মতো ক্রমান্বয়ে ঘসা ডেক ঘসে যাওয়া। জল মারছে হোস পাইপে। জলে ওদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। বালি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঘসে ঘসে হাত-পা গরম। তারপর দুহাতে পায়ে, যেন খিল ধরে আসছে। সেকেন্ড অফিসার পোর্টহোলে চোখ রেখে সব দেখছেন। কে হেলে যাচ্ছে, কার হাত শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কার হাতে ফোসকা পড়ে ছাল-চামড়া উঠে যাচ্ছে দেখে আরও চালিয়ে যাবার জন্য অর্থাৎ যতক্ষণ ওরা বাপরে মারে ডাক না ছোটাবে, যতক্ষণ দু-কষে ফেনা উঠে না যাবে, এবং একজন দুজন শরীর খিল মেরে অজ্ঞান হয়ে না যাবে, ততক্ষণ চালিয়ে যাবেন। সিনিয়র ট্রেনিদের এটা একটা বড়দিনের উৎসবের মতো। ওদের দেখে যারা আগে মজা পাচ্ছে। চারপাশে তারা সোনাদের দেখে মজা পাচ্ছে। চারপাশে ঘস্ ঘস্ শব্দ। সোনা কানে এখন কিছু শুনতে পাচ্ছে না। পাশের ছেলেটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কেউ আসছে না। সে উঠে ওকে ধরবে ভাবল, কিন্তু সে জানে এখন সহসা উঠে দাঁড়ালেই পড়ে যাবে। ঠিক উপনয়নের দিনের মতো—নানারকমের মন্ত্রউচ্চারণের মতো চারপাশে নানারকমের মজা। মানুষের শরীরে নতুন এক পরিমণ্ডল করা। সোনা তুমি এক মানুষ, তোমার এইদিনে মানুষের জন্য আর মায়া থাকছে না। তোমার হাতে ফোসকা পড়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছে। হাত খুলে আর দেখো না। দেখলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু হলে কি হবে, সোনা তো এসব পারে না। সে ছেলেটাকে ধরে তুলতে গেল। আর আশ্চর্য সে দেখল দুজন সিনিয়র রেটিংস ওর মুখের উপর হোস পাইপে জল মারছে। তাকে প্রায় লাথি মেরে পাশে ঠেলে ওরা আরও মজা দেখার জন্য ছেলেটার মুখে হোস পাইপ ছেড়ে দিল। এমন নিষ্ঠুর ঘটনায় সোনার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল। কিন্তু পারল না। আর কিছুক্ষণ সময় পার করে দিতে পারলেই বোট-ডেকে বসে ভেড়ার মাংস ভাত। কলাইকরা থালায় সে মাংস ভাত খাবে। সে কিছুতেই প্রতিবাদ করতে পারল না। চোখের উপর দেখল, চ্যাঙদোলা করে ওরা ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছে। হেঁইহিঁচড়ে বোট-ডেকের উপর দিয়ে নিয়ে গেল সোনা চোখ ফিরিয়ে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে হুইসল বেজে গেলে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। হলিস্টোন মারা শেষ। কেউ আর এখন ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না। ওরা টলছে। সোনা দু পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সে কিছুতেই পড়ে যাবে না। পড়ে গেলেই ওরা ওকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে যাবে। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে—সে মানুষ, পড়ে গেলেই মানুষ না। তাকে নিয়ে যা খুশি করা। সেকেণ্ড অফিসার আসছেন। বুটের শব্দে সে চোখ তুলে তাকাল। সাদা হাফপ্যান্ট সাদা হাফসার্ট এবং মাথায় জাহাজী টুপি। চোখ মুখ কি ভীষণ কঠিন! তিনি যে বাঙালী তিনি বাংলা ভাষায় কথা বলেন কখনও কখনও এমন মুখ দেখে তা কিছুতেই বোঝা গেল না। সব কমান্ড তার হিন্দিতে, সব কথা হিন্দিতে। সোনার মনে হল তিনি রাতে শুয়ে স্বপ্ন দেখেন হিন্দিতে। তিনি যে পোর্টহোলে মুখ রেখে প্রতিটি রেটিংসের উপর কড়া নজর রেখেছিলেন, এবং যাদের উপর কোন সংশয় আছে তাঁর, তাদের কাছে গিয়েই দাঁড়াচ্ছেন তারা তা বুঝতে পারছে না। সূর্য যখন মাথার উপর উঠে গেছে—আর তিনি বেশি দেরি করছেন না। ছেড়ে দেবেন এবার। হাতে ফোসকা পড়ে ঘা পড়ছে ক্ষুধার জ্বালায় সে তা পর্যন্ত টের পাচ্ছে না। যারা হাত এখন ব্যান্ডেজ বেঁধে

CENTRAL LIBRARY

দিচ্ছে সে প্রাণের কিছু বলবে ভাবল। কিন্তু বলতে পারল না। সেকেন্ড অফিসার এবার ওর দিকে আসছেন।

সেকেন্ড অফিসারের কঠিন মুখ দেখে সে বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তবু সে কিছুতেই তাকাতে পারছিল না। তিনি এসে ওর সামনে দু পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। শীতের রোদ, দুরন্ত হলিস্টোন ঘষার পর সোনার মুখে যে আশ্চর্য এক সুষমা আছে তা নষ্ট করতে পারে নি। ক্লান্ত অবসন্ন মুখে তার কোথায় যে আশ্চর্য দীপ্তি, কেন যে সেকেন্ড অফিসারকে এখানে টেনে নিয়ে এল, কিভাবে যে সোনা তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এমন ভাবতেই তিনি সোনার শরীর টিপে টিপে দেখলেন। প্রায় হাট থেকে গাই গরু কেনার মতো খোঁচা দিয়ে দেখা। কেন হাত-পা টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন, সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঝড়, সারেঙের অত্যাচার এবং জাহাজের কঠিন নিয়মশৃঙ্খলা সে সহ্য করতে পারবে কিনা। না পারলে এখনি বিদায় করে দিতে হবে। ভাল চোখ মুখ দেখলেই সেকেন্ড অফিসারের এমন ভয় হয়। তারপর সহসা ভয় পাইয়ে দেবার মতো চিৎকার করে বললেন, এটেন সান। সোনার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক সে খাড়া রহো। হিলতা কিও?

সোনা সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—তোমারা নাম কিয়া হ্যায়?

কাকে বলছে সোনা বুঝতে পারছে না। সেতো সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে কি করে বুঝবে সেকেন্ড অফিসার তার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন।

এবার তিনি ওর চুল টেনে বললেন, তোমারা নাম কিয়া হ্যায়?

সে সামনের দিকে তাকিয়েই বলল, শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক।

—হক্‌মদারসাহাব কাহা সে এক জংলি আদমি ভেজারে! বলেই তিনি সোনার দু গালে ঠাস ঠাস দু চড় বসিয়ে বললেন, ঠিকসে বাত বলনে হোগা।

সোনার মনে হল দাঁত কটা উড়ে গেছে। দাঁতের কষ চিরে যে রক্ত পড়ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। সে কাঁদতে পারত আজ। অথচ অদ্ভুত ওর কান্না পাচ্ছে না। হাত ব্যান্ডেজ বাঁধা। সে এটেনশান হয়ে আছে। গালে সে নিজের হাত তুলে দেখতে পারছে না, কটা দাঁত আছে কটা গেছে। কারণ গোটা মুখ কেমন ভোঁতা মেরে গেছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না শুধু নোনতা স্বাদে সে বুঝতে পারছে রক্ত বের হচ্ছে। ক্ষুধার সময় নিজের রক্ত চুষে খেতে মন্দ লাগছে না। সে নিজের রক্ত চেটে খেতে খেতে ভয়ঙ্কর সেই কঠিন মুখ দেখে ফের শীতল হয়ে গেল। কেন যে তিনি তাকে এমন কষ্ট দিচ্ছেন; সেতো তার নাম ঠিকই বলেছে। সে এতদিন ধরে তার এই নামই জেনে এসেছে। এখানে এলে নতুন নামকরণ হয় কিনা সে এখনও তা জানে না। জানলে সে এমন বলত না। যখন সে কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না অথচ সেকেন্ড অফিসার ওর কান টেনে সামনে পিছনে মাথা দোলাচ্ছেন তখন ওর বলতে ইচ্ছা হল, স্যার আমাকে যে নামেই ডাকুন, যে ভাবেই মারুন, আমি জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছি না। আমি আর একটু বাদে ভেড়ার মাংস ভাত খাবই।

তিনি কান ছেড়ে দেবার সময় বললেন, বাত কা পিছু মে স্যার বলনে হোগা হ্যায়। মেরা নাম শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক স্যার।

সোনা সোজা দাঁড়িয়ে বলল, মেরা নাম শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক স্যার।

—ঠিক হ্যায়। তারপর তিনি সোনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। —জাহাজ মে বহুত তকলিফ হ্যায়। জাহাজকা নোকরি বহুত খতরনাক হ্যায়। সারেঙ লোগ দুব্যবহার করেগা। বহুত লেড়কা লোগ আতা হ্যায়, ট্রেনিং লেতা হ্যায়, এক দো সফর বাদ ভাগতা হ্যায়। তুমকো ভি ভাগনে পড়ে গা।

—না স্যার আমি ভাগব না।

সাচ্‌গে তুম!

—পারব স্যার। সোনা আর কিছু না বলে সোজা তাকিয়ে থাকল। তিনি চলে যাচ্ছেন। সোনার এত কষ্টের ভিতরও মনে হল যাক, তবু এতদিনে একটা তার ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু একি! তিনি যে আবার ফিরে আসছেন। প্রায় কুইক মার্চের মতো মনে হচ্ছে। এসেই মুখের উপর নত হয়ে বললেন, তুম বিফ খানে সাক্তা।

বিফ! আমি বিফ খাব কেন। আমি হিন্দুর ছেলে, হিন্দুস্থানে চলে এসেছি। আমি আবার বিফ খাব কেন। যারা পাকিস্তানে আছে তারা বিফ খাবে। বিফের ভয়ে আমার জ্যাঠামশাই গঙ্গার পারে ঝোপেজঙ্গলে বাড়ি করেছেন। আমার বাবা মাঝে মাঝে আসেন। বড় জ্যাঠিমা খেতে না পেলে চিঠি নিয়ে বসে থাকেন, ছোট কাকা চলে গেছেন বাড়ি ছেড়ে, এত হবার পর হিন্দুর ছেলে হয়ে বিফ খাব সে কি করে হয়! বলতে বলতে সোনা ঠোঁট টিপে ফেলল। সোনার এত খিদে যে বিফ মটন সব এক হয়ে যাচ্ছে। তবু এক আজন্ম সংস্কার, তীব্র ঘৃণাবোধ সারা শরীরে দগদগে ঘা হয়ে ফুটে উঠল। তীব্র যন্ত্রণায় শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে। সে এবার মরে যাবে কেন। চারপাশে ঋষি পুরুষেরা দাঁড়িয়ে আছেন। কি সব মন্ত্রগাথা তাঁরা উচ্চারণ করে চলেছেন। কেন হোমের কাঠ থেকে এক পবিত্র গন্ধ উঠে সারা শরীরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। ওর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল, বলতে ইচ্ছা হল, না না আমি সব পারব। এটা পারব না। আমাকে আমার জন্ম থেকে আমার বাবা মা আমার পূর্বপুরুষ, মাটি ফুল ফল এক আশ্চর্য পরিমণ্ডলে মানুষ করেছেন, আমি সব পারি স্যার, কিন্তু সেই পরিমণ্ডল ভেঙে দিতে পারি না। ভেঙে দিলে আমার আর কিছু থাকে না।

এত দেরি দেখে তিনি ক্ষেপে গেলেন। —জাহাজ মে নোকরি করনে সে বিফ তোমকো খানেই হোগা। বোল, সাকোগে কি নেই।

আশ্চর্যভাবে সোনার সামনে মায়ের মুখ ভেসে উঠল। শীতের রাতে মা কুপি জ্বালিয়ে বাবার প্রত্যাশায় বসে আছেন। উঠোনে সেই আবহমানকালের সাদা জ্যোৎস্না। উনুনে শুধু জল সেদ্ধ হচ্ছে। বাবা এলেই দু মুঠো অন্ন সবার পাতে। কি উদগ্রীব চোখ মুখ ছোট ছোট ভাই-বোনদের। সে তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। মা তার অন্নহীন। ভাইবোনের শুকনো চোখ মুখ ভেসে উঠলে, সে বলল, আমি পারব স্যার। সে বলতে বলতে মাথা নীচু করে ফেলল। সেকেন্ড অফিসার টের পাচ্ছেন ছেলেটি ওর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে এই প্রথম এত যন্ত্রণার পর কাঁদছে। ওর এ-সময় সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা থাকে না। তিনি যেমন বার বার কুইক মার্চ করে যান আসেন, আজও তিনি তেমনি কুইক মার্চ করে চলে গেলেন। তিনি যেন এখন বলতে বলতে যাচ্ছেন, আমার পিতার নাম অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পিতামহের নাম হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়, তস্য পিতামহের নাম জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তুমি চোখের জল ফেলে আমাকে কি ভয় দেখাচ্ছ হে খোকা।

আহা! তারপর শীতের রোদে ভেড়ার মাংস গরম ভাত। ডেকের উপর বসে পেট ভরে খাওয়া। মাথার উপর খোলা আকাশ। সামনে নদী। ও-পারের কলকারখানা, কলের চিমনি এবং নীল আকাশ। কত সব পাখি মোহনার দিকে উড়ে যাচ্ছে। সোনা খেতে খেতে এইসব পাখি দেখল, ওরা উড়ে যাচ্ছে। ট্রেনিং শেষ হলে সেও চলে যাবে, জাহাজে সে বাংলাদেশ ছেড়ে সমুদ্রে চলে যাবে। কবে ফিরবে সে জানে না। আর এই বাংলাদেশে সে ফিরতে পারবে কিনা তাও জানে না। ওর মমতা খেতে খেতে ভারি হয়ে গেল। মার জন্য, ছোট ছোট ভাইবোনদের জন্য ওর কষ্ট হতে থাকল। সে কলাই করা থালা মগ ধুয়ে র‍্যাকে রেখে এল। তারপর মাস্তুলের নিচে শীতের দুপুরে শুয়ে পড়ল। ওর এখন বিশ্রাম। ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। পেট পুরে খেলেই শীতের দুপুরে ওর বড় ঘুম পায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯

কেমব্রিজের পথে

অধীর ঘটক

লণ্ডনের কর্মক্লান্ত ব্যস্ততা, কালো বাদামী সমস্যাকে উপেক্ষা করে 'গ্রামের দিকে' পা বাড়ানোর পরিকল্পনা করে ফেলাম অতি অল্প সময়ের মধ্যে। প্রথমেই এইসব গ্রাম সম্পর্কে দু-একটা কথা সেরে নেওয়া প্রয়োজন। লণ্ডনের বাইরে 'কাউন্টির' দিকে বের হলে যেসব ছোট্টো ছোট্টো পল্লীর সংগে পরিচয় হবে, সেগুলো ভূগোলের পরিভাষায় গ্রাম হলেও আসলে এসব জায়গা এক একটি ক্ষুদে-শহর। কেননা আধুনিক জীবনের প্রায় সব উপকরণ এখানে সাজানো আছে থরে-বিথরে। সুন্দর সুপ্রশস্ত রাস্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পার্ক, বাংলো ধরণের ছোটো ছোটো বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ীর সামনে সাজানো ফুলের বাগান। আর সব বাড়ীতেই আছে দু-একখানা গাড়ী, টেলিভিশন, রেডিও, ট্রানজিস্টার, টেলিফোন, ইলেকট্রিক এবং গ্যাস। এইসব গ্রামগুলো নিরিবিলি হলেও নির্জন নয়। সব গ্রামেই ডাকঘর আছে, প্রতিদিনই গ্রামবাসীরা সময় মতো সংবাদপত্র পাচ্ছে। লণ্ডনের সংগে দক্ষিণ ইংলণ্ডের অনেকগুলো গ্রামের ট্রেন বা বাস চলাচলের ব্যবস্থাও আছে। হয়তো কবিত্ব করে বলা চলে—'এ গ্রাম তো গ্রাম নয়, শহরের রাজা।'

অগাস্টের শেষ শনিবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সমগ্র দেশটা তখন গ্রীষ্মশেষের ছুটির দিনটিকে পরমভাবে উপভোগে উন্মত্ত। 'ব্যাংক হলিডের' উত্তেজনায় আন্দোলিত পুরো পরিবেশটা। রাস্তায় গাড়ীর ভীড়, স্টেশন লোকে লোকারণ্য। পূর্ব ব্যবস্থামতো আমরা লণ্ডনের লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে জমায়েত হলাম। আমাদের ব্যবস্থাপক স্থানীয় 'ইস্ট এ্যাণ্ড ওয়েস্ট ফ্রেণ্ডশিপ ক্লাব'। প্রাচ্যের ছাত্রদের সংগে পাশ্চাত্য জীবনের ঘরোয়া পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ সর্বদা আগ্রহী। আমরা এই পরিকল্পনায় এক ঝাঁক যাত্রী।

সময় মতো লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লো এবং যথাসময়ে যে স্টেশনে নামলাম তার নাম বিলেরীকে। এসেক্স কাউন্টির একটি নামকরা বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আমাদের জন্য গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন ডঃ রিলস্টোন। আমরা আপন নাম পরিচয় দিয়ে তাঁর সংগ নিলাম, গ্রহণ করলাম তাঁর আতিথ্য। ভদ্রলোক পেশায় ডাক্তার হলেও সাহিত্যে অন্যতম নেশা। প্রথম পরিচয়েই তিনি কৃত্রিম নগর-জীবন সম্পর্কে জেহাদ ঘোষণা করলেন। লাইব্রেরির তাক থেকে একখানা ইংরেজি কাব্য বের করে পড়তে শুরু করলেন কবি ইয়েটসের একটি বিখ্যাত কবিতা। অবশ্য আইরীশ কবি কবে স্বভাবদোষেই একটু নাক কোঁচকাতেন ইংরেজ ভদ্রলোক। তাঁর বাড়ীর পেছনে প্রাচীন পীচ্‌ফলের গাছটি নাকি স্থানীয় রোড-কর্পোরেশন কেটে ফেলবে রাস্তা বাড়ানোর জন্য—সেজন্য তাঁর কষ্টের অন্ত নেই। দেড়শ বছরের পুরাণো বাড়ীর প্রতিটি ইটের গায়ে পূর্বপুরুষের স্মৃতি উঁকি মারছে। প্রাচীন গাছটিও তো অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মমতাই বা তিনি কাটাবেন কি করে। নানা রকমের গাছ নিয়ে তাঁর অবসর সময় কাটে। বাগানে বসে আরো কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন তিনি।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এলো বিলেরীকের বুকে। ঝিঁঝি পোকার ঐকতান সঙ্গীতে গ্রামটি মুখরিত হল। বাড়ীর সামনে গোলাপগুলো তাদের রঙীন গোলাপের পাখা মেলে দিয়েছে, পাশ দিয়ে এক চিলতে রাস্তা। ঘরে রেডিওতে লঘু-সংগীত বেজে চলেছে। 'নামিছে নীরব ছায়া ঘনবন শয়নে, এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে।' সেদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় রোটারী ক্লাবের পরিচালনায় এক 'বারবেকিউ পার্টির' ব্যবস্থা ছিল। বিদেশী অতিথি হিসেবে আমরাও সেখানে আমন্ত্রিত।

গ্রামের প্রান্তে এক প্রাচীন পোড়ো বাড়ীতে মৃদু-আলো জ্বালিয়ে এর পরিবেশে গাম্ভীর্য আনা হয়েছে। উগ্র 'জাজ' সঙ্গীতের গুঞ্জরণে সেদিনের সন্ধ্যা হয়েছিল উত্তেজিত, অবশ্য শহরের মতো নাচের ব্যবস্থা ছিল না আদৌ। আমেরিকান কায়দায় এই বারবেকিউ পার্টির ব্যবস্থা। প্রায় দু'শ বছরের পুরাণো এক কাঠের গোলাবাড়ীতে এই আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন। প্রতি বছরই গ্রামবাসীরা এ উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। প্রচুর পানীয় এবং হংসহ মুরগীর রোস্ট ছিল ভোজ পর্বে। তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য গোটা মুরগীটাকে অগ্নি স্পর্শ করিয়ে সবার হাতে পরিবেশন করা হচ্ছিল। সবাই পরম আগ্রহে চুমুসহ সেইসব অর্ধদগ্ধ মুরগী চর্বণে আত্মহারা হয়ে উঠলো। আমার মনে হচ্ছিল সভ্যতার দীর্ঘ শতাব্দীর অন্তরালে আমরা যেন আত্মগোপন করতে চেষ্টা করছি। এই ধরণের শৌখীন বর্বরতার দৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথের একটি পংক্তি মনে পড়লো। 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর' কথাটি কি তবে তিনি যথার্থে প্রয়োগ করেছিলেন? ইংরেজরা রক্ষণশীল—অর্থাৎ ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসে। এই পার্টি যেন তার অভিনব নিদর্শন। আসলে এই ধরণের পার্টির মাধ্যমে এরা আদিমতাকে আবাহন করেই আনন্দ পায়। আমি ভেতো-বাঙালী, সেইসব শস্ক্যাশাবকের ওপর করুণা করে সে রাতটা প্রায় অনাহারে কাটালাম।

পরদিন ভোরে পাখীর কল কাকলীতে ঘুম ভাঙলো। সকাল সাতটায় উঠে তৈরী হয়ে নিলাম দ্বিতীয় ভ্রমণসূচীর জন্য। সকাল দশটার মধ্যে প্রাতরাশ সমাপন করে ভাড়া করা কোচে জাঁকিয়ে বসলাম। সংগে আমাদের ক্লাবের কয়েকজন সভ্য এবং স্থানীয় রোটারী ক্লাবের সভ্য-সভ্যারা। সংগে সারাদিনের জন্য পরিমাণ মতো 'বুফেলান্চ' এবং হালকা পানীয়।

বেশ কয়েকদিন পর ইংলণ্ডের আকাশে সূর্য হাসছে। আমরা সেদিক থেকে ভাগ্যবান। সূর্যের দেশের লোক তাই আমাদের ভ্রমণ পথে সূর্যকে সাথী পেলাম। কোচ ছাড়লো। সবুজের হাতছানিতে আমরা

শাড়ীর মেলা
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট জং (পূর্ব) কলিকাতা-৭

ইতিমধ্যেই নগর জীবনের ক্লান্তিকতাকে ভুলে গেছি। বহু গ্রাম অতিক্রম করে, আঁকা বাঁকা পথ ছাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্র কেম্‌ব্রিজের দিকে। আমার পাশে বিল। ভদ্রলোক স্বভাবতই মাস্টারী ভাবাপন্ন, পাশে একজন বিদেশী ছাত্র পেয়ে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উজাড় করে দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে আমি আমার অতীত জ্ঞানের দু-একটা প্রসঙ্গ তুলি আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বিলের বক্তৃতা। সমস্ত ব্রিটেনের ইতিহাসটা যেন তাঁর নখদর্পণে। এ কথায় অবশ্য অতিরঞ্জন নেই। এদেশের প্রতিটি লোকই অল্প বিস্তর জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ওক, উইলো, হথর্ণের এক অদ্ভুত আত্মীয়তা রাস্তার দু-ধারে। দ্রুতবেগে কোচ চলেছে সামনের পথে। শত শত ফেইজী তার প্রাচুর্য এবং রঙের প্রলোভন সবাইকে আকর্ষণ করলেও সাড়া দেবার সময় নেই।

বেলা বারোটায় আমরা প্রাচীন স্থাপত্য-মণ্ডিত গির্জা দেখতে গ্রান্টচেস্টার নামক গ্রামে নামলাম। সবাই দল বেঁধে হুল্লোড় করে কোচ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে এগোতে শুরু করলাম সবুজ প্রান্তরের পাশে গ্রান্টা নদীর ধারে। পেলাম প্রকৃতির কোমল স্পর্শ। ইতিমধ্যে নদীর ধারে ঘাসের ওপর সবাই দল বেঁধে বসে পড়েছে এবং বাড়ী থেকে আনা কেক, পেস্ট্রি, আইসক্রীম, জল সহযোগে 'লান্চ' করতে ব্যস্ত।

লান্চ-পর্ব সমাধা করে এলাম দু'শ বছরের পুরোনো গির্জা গ্রান্টচেস্টার চ্যাপেল দেখতে। বিলের ইতিহাস জ্ঞানের আলোতে আমরা সমগ্র গ্রান্টচেস্টারকে হৃদয়ঙ্গম করলাম। বিখ্যাত কবি রুপার্ট ব্রুকের দু'টি ছত্র স্মৃতিপথে ভেসে উঠলো। কবি ব্যক্তিগতভাবে এই গির্জার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া নিজের জন্মভূমিকে কবি কতো গভীরভাবে ভালোবাসতেন তার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে। কবি বলেছেন,

> But Grantchester! Ah,
> Grantchester!
> There's peace and holy quiet
> here.
>
> • • •
>
> Stands the church clock at
> ten to three?
> And is there honey still for
> tea?

আমরা গ্রান্টচেস্টারের পবিত্রতা এবং পরিপূর্ণতার স্পর্শ পেলাম। তখন তিনটা বাজতে শুধু দশ মিনিট কেন প্রায় দু'ঘণ্টা দেরী ছিল। তবুও সেই পরিবেশে মধু-মাখানো চা পানের আনন্দ অনুভব করলাম।

এবার সোজা কেম্‌ব্রিজের পথে। কিছুক্ষণের মধ্যে উঁচু নীচু সবুজ প্রান্তর পেরিয়ে আমরা শিক্ষাকেন্দ্র কেম্‌ব্রিজে পৌঁছলাম। সবাই দল বেঁধে বিভিন্ন কলেজ দেখার জন্য এগোতে লাগলো। প্রথমেই চোখে পড়লো সেন্ট জনস্‌ কলেজ। অতি প্রাচীন এই কলেজের একটি দালানের গায়ে দেখতে পেলাম ১০৭১ খৃস্টাব্দের প্রস্তর ফলক। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেম্‌ব্রিজ নামের সার্থকতা খুঁজে পেলাম। কেম্‌ব্রিজের বুক চিরে বয়ে গেছে একটি ছোট্ট নদী। নাম তার কেম (CAM) এই কেম্‌ নদীই গ্রান্টচেস্টারে গিয়ে নাম নিয়েছে গ্রান্টা। যাই হোক, এই কেম্‌ নদীর ওপর তৈরী হয়েছে ছোট এক ব্রিজ (BRIDGE)। দু'টি দালানের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে কেম্‌ নদী, আমরা তার ওপরকার ছোট্ট পুলের ওপর দণ্ডায়মান। এই হল কেম্‌+ব্রিজ নামের উৎস। নদীতে বেশ কয়েকটা ডিঙি ভাসছে। তাতে ছেলেমেয়েরা অবিন্যস্ত হয়ে শুয়ে আছে। উপভোগ করছে গ্রীষ্মাবকাশের সূর্য কিরণ।

আমরা এবার কিংস্‌ কলেজ ভবনে। কেম্‌ব্রিজের ইতিহাসে এই কলেজটিও বেশ পুরোনো। আর এই কলেজেরে চ্যাপেলটিতে প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের এক অদ্ভুত কলা-কীর্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সত্তর ফুট উঁচু গম্বুজগুলো এখনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর প্রস্তরফলকে কতই না কারুকার্য। এই চ্যাপেলটি ১৪৭০ থেকে ১৫২৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়েছে। এর অবস্থিতিই শুধু প্রাচীন নয়, এখনো এই চ্যাপেলে আরাধনার সময় মোমবাতি জ্বলে ওঠে, ধর্মীয় সঙ্গীতের সুরে সুরে প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিটি প্রস্তর-ফলক। আরাধনা সময়ে সমগ্র চ্যাপেল জুড়ে বিরাজ করে এক গুরু-গম্ভীর আবহাওয়া। বিল অক্লান্তভাবে বলে চলেছেন চ্যাপেল তৈরীর ইতিহাস—কোথেকে মজুর এসেছে, কার নক্সা অনুযায়ী এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, প্লেগ মহামারীর দরুণ এই চ্যাপেল নির্মাণে কতটা বিঘ্ন ঘটেছিল ইত্যাদি। কিংস্‌ কলেজ চ্যাপেল পার হয়ে আমরা এলাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ ট্রিনিটি কলেজে। এবং এমনি করে ঘুরে বেড়ালাম বেশ কয়েকটা স্থানীয় কলেজ ভবন। কেম্‌ব্রিজ ভারতের বারাণসীসম। বহু শতাব্দী ধরে এই শিক্ষা কেন্দ্রিক শহরটি শিক্ষার একটি বিশেষ ধারা বহন করে আসছে। সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান-পিপাসী লোক এখানে এসে জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে ধন্য হতে চায়। যুগে যুগে বহু রাজশক্তির উত্থান পতন হয়েছে কিন্তু কেম্‌ব্রিজ আপন আদর্শে বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনার পাশেই বাজার এবং তার পাশে আরো কিছু পুরোনো বাড়ী। এর একটিতে থাকতেন বিখ্যাত প্রাবন্ধিক চার্লস ল্যাম্ব। চার্লস ল্যাম্বের শৈশবজীবনের এই কেম্‌ব্রিজের সঙ্গে বর্তমান কেম্‌ব্রিজের অনেক পার্থক্য, তবুও তীর্থভূমির আবেদন চিরদিন লোককে আকর্ষণ করবে।

বিকেল চারটায় কেম্‌ব্রিজ থেকে বিদায়ের পালা। আবার সদলবলে কোচে চাপলাম এবং নতুন পথে এগিয়ে চলেছি। বিকেল পাঁচটায় এলাম স্যাফরণ ওয়ালডেন নামক এক প্রাচীন গ্রামে। মোটরবাহীদের সুবিধার্থে নির্মিত হয়েছে 'এইট বেলস্‌ রেস্তোরাঁ'। সেখানেই আমাদের বৈকালিক চায়ের বন্দোবস্ত। দু-একটা স্যাণ্ডউইচ এবং চা পান করে পথক্লান্তি কিছুটা লাঘব হল বৈকি। চা পান শেষে বিশ মিনিটের জন্য আমরা ঘুরতে বেরোলাম। স্যাফরণ ওয়ালডেন একটি পুরোনো গ্রাম। ষোড়শ শতাব্দীর পুরোনো বাড়ীগুলো এখনো যুগের সাক্ষী হয়ে স্পর্ধিত দাঁড়িয়ে আধুনিক মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। যে পথে লোকে হেঁটে চলাফেরা করতো বর্তমানে সেখানে যান্ত্রিক কলনাদ মুখরিত। কিন্তু বাড়ীগুলোর কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং 'অ্যান্টিক' হিসেবে সেগুলোকে সযত্নে রাখা হয়েছে।

বিকেল সাড়ে সাতটায় আবার কিলেবার্নের গ্রামে ফিরে এলাম। গত দু'দিন এক রাতের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার পর ফিলস্টোন দম্পতির কাছ থেকে বিদায়ের পালা। 'আমি নাহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও' —এই মনোভাব নিয়ে পথে বেরিয়েছিলাম। পথের দু'পাশে অনেক অপরিচিতের স্পর্শ পেলাম। এদের আন্তরিকতার সহজ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আতিথ্যে হয়েছি ধন্য। আমার ইংলণ্ড জীবনের এই-সব সুখস্মৃতি ভবিষ্যতে 'bliss of solitude' হয়ে থাকবে।

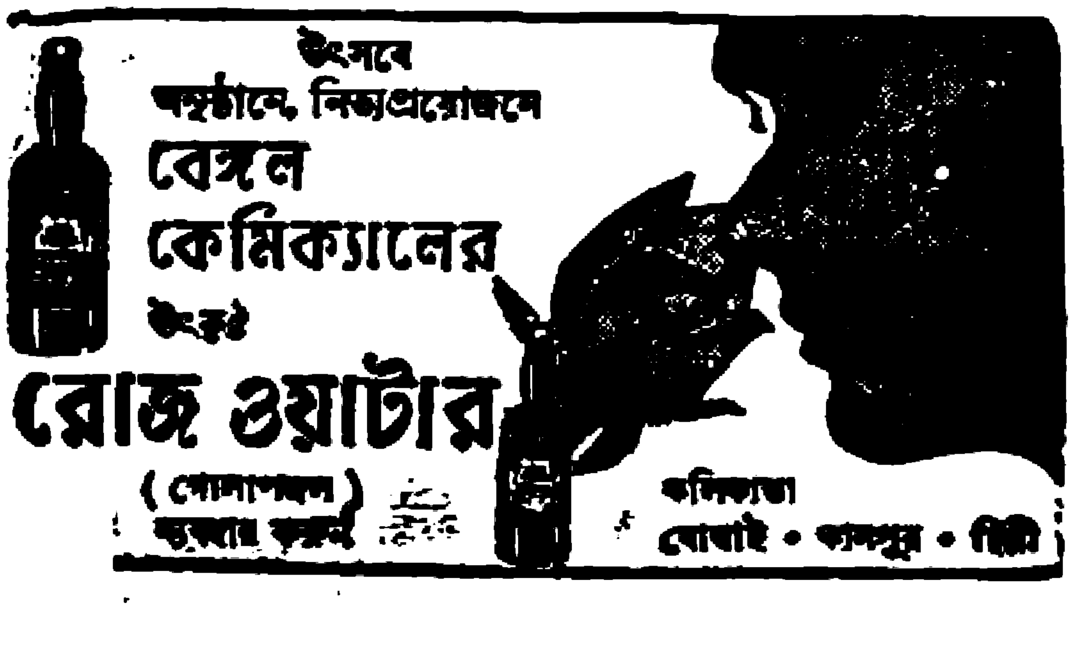

CENTRAL LIBRARY

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পর্ব

(১)

আজকাল সাগর আটটা বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে পড়ে। তা আমি জানি, তবুও দুচারদিন পরপরই সকালের দিকে গেস্ট হাউসে চলে আসি।

'চৌকিদার, চ্যাটার্জী সাব হ্যায়?'

'নেই মেমসাব!'

আমি ফিরে আসি না। ওর ঘরে গিয়ে বসি। একটু এদিক-ওদিক খুঁজে ডায়েরীটা হাতে তুলে নিই। গেস্ট হাউসের চৌকিদার বা বাবুর্চি কিছু মনে করে না। আমি কথায়-বার্তায় ওদের বুঝিয়েছি ও আমাদের আত্মীয়। রিস্তেদার। অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। আমরা সাগরের মতই বাঙালী। সরকার—চ্যাটার্জীর পার্থক্য বোঝা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া রিস্তেদার না হলে আমি বা বাবা গাড়ী করে ওকে খাওয়াতে নিয়ে যাই?

চৌকিদার-বাবুর্চিরা বরং আমাকে একটু খাতির করে। তার কারণ পিসীদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা। আমি সাগরের ঘরে বসতে না বসতেই ওরা চা দেয়। জিজ্ঞাসা করে আর কিছু খাব কিনা।

আমি বেশীক্ষণ থাকি না। ডায়েরীর শেষ কয়েকটা পাতা পড়েই চলে যাই। ওর ডায়েরী না পড়ে আমি থাকতে পারি না। ও আমাকে নিয়ে এত ভাবে অথচ আমি জানব না, তা কি হয়?

অসম্ভব।

প্রথম দিন কি আশ্চর্যভাবে ওর ডায়েরীটা আমার চোখে পড়েছিল? সেই যে একদিন সকালে পিসীর টিফিন-কেরিয়ার ফেরত নিয়ে আমি সাগরের ওখানে গিয়েছিলাম। সেই-দিন। প্রায় দুর্ঘটনাক্রমেই ওর ডায়েরীটা চোখে পড়েছিল। তাও হয়ত পড়ত না যদি টেবিলের উপর অতগুলো সাদা কাগজে...

মনে পড়লেও হাসি পায়।

সাগর বাথরুমে যাবার পর ঘরের চার-পাশে চোখ ঘুরাতেই টেবিলে চোখ পড়ল। অনেকগুলো সাদা ফুলস্কেপ কাগজে কতকগুলো মেয়ের স্কেচ দেখে হাতে তুলে নিলাম। হাতে নিতেই অবাক। আমার স্কেচ! প্রত্যেকটা স্কেচে আমার নাম লেখা?

ঠোঁট কামড়ে হাসি চাপার চেষ্টা করলাম।

স্কেচগুলো দেখেই বুঝলাম সাগর আর্টিস্ট নয় কিন্তু তবু আমার ফিগারটা কেমন, তা দেখাতে কার্পণ্য করেনি: বরং একটু বেশী উদারতাই দেখিয়েছে। স্কেচ-গুলো দেখতে দেখতে একবার নিজের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। নিজের বুকের দিকে, চেহারার দিকে।

বন্ধ বাথরুমের দরজাটা একবার দেখে ছবিটা ঘুরাতেই টেবিলের উপর একটা খোলা ডায়েরী নজর পড়ল। হাতে তুলে নিয়ে পড়তে গিয়ে চমকে গেলাম। একি! আমাকে নিয়েই এত কথা লিখেছে? ভারী মজা লাগল।

দু'তিন প্যারা পড়ার পরই তাড়াতাড়ি ডায়েরীটা রেখে দিলাম। যদি হঠাৎ সাগর বাথরুম থেকে বেরিয়ে পড়ে? যদি ও আমাকে ডায়েরী পড়তে দেখে। তাহলে সর্বনাশ। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

ভালই করেছিলাম। একটু দেরী হলেই ধরা পড়তাম।

ধরা পড়িনি। আজ পর্যন্ত ধরা পড়িনি। এখনও মাঝে মাঝে ওর ঘরে যাই। ডায়েরী পড়ি। লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে পড়ি। না পড়ে থাকতে পারি না। এখন বেশ বুঝেছি ওর মনের মধ্যে অনেক কথা লুকনো থাকে, চাপা থাকে। আমাকে বলতে পারে না। কোন দিনই হয়ত বলবে না। তবে প্রায় সব কথাই ডায়েরীতে লিখে রাখে আর আমি চুরি করে ওর ডায়েরী পড়ে সব কিছু জানতে পারি। জানতে ভাল লাগে।

আমার বয়সটাই এমন যে সাগরের মত ছেলে আমাকে নিয়ে ভাবলে ভাল লাগে। আমি চাই ওরা আমাকে নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা করুক। ভাবুক। কলেজে পড়ার সময় থেকেই এইরকম মনে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় খুব বেশী মনে হতো।

দাদা অফিস যাবার পথে আমাকে কলেজে নামিয়ে দিতে চাইত, কিন্তু আমি যেতাম না। দাদা বলত, গাড়ী থাকতে ট্রামে-বাসে যাবার কি দরকার?

'আমি এত সকাল সকাল গিয়ে কি করব?'

অনেক মেয়েকেই তাদের বাবা-দাদা অফিসে যাবার পথে কলেজে নামিয়ে দিতেন। দাদার গাড়ীতে আমি সাড়ে ন'টায় কলেজ গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না কিন্তু তবুও যেতাম না। ভাল লাগত না। দাদার গাড়ীতে গেলে বাড়ীর দরজা থেকে উঠে সোজা কলেজের গেটে গিয়ে নামতে একটুও ইচ্ছা করত না।

যেতাম না। বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি হলে দাদার সঙ্গে যেতেই হতো। পারলে তাও যেতাম না। মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে ভিজতে ভীষণ ভাল লাগতো।

তখন সবকিছুই ভাল লাগতো। বাস স্টপে দাঁড়াতে ভাল লাগত। ভীড়ের বাসে বসতে না পেলেও খারাপ লাগত না। কলেজ থেকে ফেরার পথে কতদিন আমি আর অসীমা পুরোটা রাস্তা হেঁটে এসেছি। এই আসা-যাওয়ার পথে কত ছেলে আমার দিকে চাইত। কেউ সামনাসামনি, কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে পাশ থেকে। আমি বেশ বুঝতে পারতাম। আশ্চর্য! আমি বিরক্ত হতাম না; বরং কলেজে পড়ার সময় এই নতুন মর্যাদায় খুশী হতাম।

মাঝে মাঝে অবশ্য বিরক্ত বোধ করতাম। অক্‌ল্যান্ডের মাঠে বসে চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে রেখাকে সেই কথাই বলছিলাম, জানিস রেখা, আজ বাসে একটা কি দারুণ অসভ্য লোককে দেখলাম।

রেখা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কেন কি করল?

'বুড়ো লোক বলে আমার পাশের খালি জায়গাটায় বসতে বললাম। আর বসবার পরেই এমন অসভ্যতা শুরু করল যে, কি বলব?'

ও বাদামটা মুখে দিয়ে একটা আওয়াজ করে বললো, অসভ্যতার কি করলো?

'একে তো পাশে বসে হ্যাংলার মত ঘাড় ঘুরিয়ে সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল আর দু'হাত দিয়ে এমনভাবে ছাতিটা ধরে বসল যে কনুইটা মাঝে মাঝেই....

'তোর বুকে লাগছিল, এইত?'

'হ্যাঁ। কি বিশ্রী লাগে বলত?'

ও নির্বিকার হয়ে বললো, এমন কিছু না।

'তার মানে?'

'তার মানে এই সামান্য ব্যাপারে মন খারাপ করার কোন দরকার নেই।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, এটা সামান্য ব্যাপার হলো?

'একদম' বারণ ও একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, তুই বুঝি কোন বুড়োর খপ্পরে পড়িস নি?

আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, বুড়োর খপ্পরে মানে?

রেখা হেসে উঠল, তুই খপ্পরের মানেও বুঝিস না?

'না।'

সত্যি কলেজে ভর্তি হবার সময় অনেক কিছুই জানতাম না। জানার প্রয়োজন হয়নি, সুযোগ আসেনি। কলেজে পড়তে পড়তে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। রেখাই সেদিন আমাকে বলেছিল, কোনদিন লেফালীদের বাড়ী গিয়েছিস?

'না।'

যাবি।'

কেন?'

'বুড়োর খপ্পরে পড় কাকে বলে জানতে পারবি।'

সেদিন ওকে কিছু বলিনি কিন্তু এক-দিন ছুটির পর সত্যি লেফালীর সঙ্গে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম। দোতলার সিঁড়ির মুখে ওদের বাড়ীওয়ালার পাল্লায় পড়েছিলাম। বাবটা সত্যি দারুণ অসভ্য। গায় হাত না দিয়ে কথা বলতে পারেন না। বুঝেছিলাম বুড়োর খপ্পরে পড়া কাকে বলে।

অনেক দিন পরে, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর একজন বুড়ো লেকচারারের পাল্লায় পড়েছিলাম। কয়েক দিন মাত্র। ওঁর চালচলন দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু প্রথম কয়েকদিন একেবারে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে পারিনি।

আমাদের কলেজের মায়াও আমার সঙ্গে মডার্ন হিস্ট্রিতে ভর্তি হয়েছিল। ওর দুই দিদিও মডার্ন হিস্ট্রির ছাত্রী ছিল। ও আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, ডি-বির সঙ্গে বেশী খাতির করবি না।

'কেন?'

'বিশেষ সুবিধের লোক না।'

'তার মানে?'

'মেয়েদের গায় পড়ার বাতিক আছে।'

'তা ঠিক বুঝি না তবে কথাবার্তার ধরণ যেন কেমন কেমন মনে হয়।'

মায়া হাসতে হাসতে বলেছিল, শুধু কথাবার্তার ধরণ অমন হলে তো তেমন কিছু ভাবনা-চিন্তার ছিল না, কিন্তু উনি যে আরো এগিয়ে যান।

'তুই জানলি কেমন করে?'

'ছোড়দির কাছে ওঁর অনেক কীর্তি শুনেছি।'

পরে শুনেছিলাম অনেক কথা। স্পেশ্যাল নোটস লেখাবার লোভ দেখিয়ে ডি-বি কিছু কিছু মেয়েদের নিয়ে কি কাণ্ডই করতেন!

জেরাড়ুকে আমার পর পুরানো দিনের সেসব কথা বিশেষ মনে পড়ত না। সাগরকে দেখে, ওর ডায়েরী পড়ে নতুন করে পুরোনো কথা মনে পড়ছে।

আমাদের পাশের বাড়ীর প্রশান্ত? হালদার মশাইরা ঐ ফ্ল্যাট ছেড়ে যাবার পরই ওরা আসে। আমার পড়ার টেবিলে বসে ওর ঘর দেখা যেত না কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখা যেত ও পড়ছে। দু'একদিন হঠাৎ চোখ পড়েছে ওর দিকে কিন্তু ও যে পড়তে বসেই আমার ঘরের দিকে চেয়ে থাকত, তা জানতাম না। জানতে পারতাম না। জানার প্রয়োজনও অনুভব করতাম না।

কয়েক মাস পরে কলেজ থেকে ফিরে লেটার বকস খুলতেই একটা লিটল ম্যাগাজিন পেলাম। উপরে উঠে বইখাতা রাখতে গিয়ে নজর পড়ল ঠিকানাটার দিকে। আমার নামে পাঠিয়েছে? একটু অবাক হলাম। ভাবলাম হয়ত কলেজেরই কোন মেয়ে পাঠিয়েছে। সূচীপত্রে কোন জানাশুনা মেয়ের নাম দেখলাম না। আর একবার ভাল করে দেখতে গিয়ে নজর পড়ল বুলবুল নামে একটি ছোট গল্প লিখেছেন প্রশান্ত পত্রনবীশ।

আমার নামে ছোট গল্প? বেশ মজা লাগল। হাত-মুখ ধুয়ে চা-জলখাবার আগেই পড়ে ফেললাম। পড়েই বুঝলাম পাশের বাড়ীর ঐ ছেলেটির লেখা।

গল্পটা আরো দু'তিনবার পড়লাম। পড়বার পর ভারী মজা লাগল। আনন্দ লাগল। মনের মধ্যে কেমন একটা চাপা উত্তেজনাবোধ করলাম।

চা-জলখাবার সময় মণিদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মণিদা, হালদার মাসীদের ফ্ল্যাটে কারা এসেছে?

মণিদাকে ছাড়া কাকে জিজ্ঞাসা করব? মণিদা আমাদের বাড়ীতে রান্না করে ঠিকই কিন্তু দাদার জন্মের পর পরই ও আমাদের বাড়ীতে এসেছে। দাদাকে, ছোড়দাকে, আমাকে মানুষ করেছে। মণিদা সংসারী হবার চেষ্টা করেও হতে পারেনি। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই বৌ মারা যায়। যতদিন ওর মা ছিলেন, ততদিন বছরে একবার করে দেশে যেত, এখন তাও বন্ধ। দাদার প্রতি মণিদার একটু বেশী দুর্বলতা থাকলেও আমাকেও কম ভালবাসত না।

মণিদা বললো, আলিপুর কোর্টের এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

'কি নাম জান নাকি?'

'ভদ্রলোকের পুরো নাম জানি না, তবে উপাধি হচ্ছে পত্রনবীশ।'

মণিদার কাছে এই খবরটুকু পেয়ে আমি মনে মনে চঞ্চল না হয়ে পারিনি। কয়েক দিন চেয়ার-টেবিলে বসে পড়া ছেড়ে বিছানায় উপুড় হয়ে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে পড়াশুনা করলাম। পড়তে পড়তে বার বার দৃষ্টি চলে যেত ঐ ওপাশের বাড়ীর দিকে।

ঘটনাটা কিছুই নয় তবুও তখন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। প্রথম দিন সাগরের ডায়েরী পড়ার পরই ছোটগল্প লেখার কথা মনে হয়েছিল। ওর আগে আমাকে নিয়ে কেউ কিছু লেখেনি। ওর আগে হয়ত আমাকে নিয়ে কেউ অত ভাবেনি। এই পৃথিবীতে কিছু মানুষকে নিয়ে কত অসংখ্য মানুষ চিন্তা করে। আমাকে নিয়েও যে কেউ কেউ চিন্তা করছে, সে কথা জানতে পেরে নিজেকেই ভাল লাগল। বুঝতে পারলাম কিশোরী আমি সত্যিই যুবতী হয়েছি।

বাবা তখন ডিগবয়েতে। মা ওখানেই থাকতেন। কলকাতার বাসায় দাদা, ছোড়দা আর আমি। মণিদা ছিল আমাদের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ। ছোড়দার মত দাদা কোন-কালেই আড্ডাবাজ ছিল না। ছোটবেলায় মা আর মণিদার আদর খেয়ে খেয়ে ও বরাবরই ঘরকুনো। তবে অফিস থেকে ফিরতেই ওর সাড়ে সাতটা বাজত। ছোড়দা ফিরত নটা-সাড়ে নটা। দাদা বাড়ীতে ফিরেই জামা-কাপড় ছাড়ার আগেই মণিদার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিত।

'মণিদা, তোমার সুরেশকাকার কথা মনে আছে?'

'কি যে বলিস বাবাজী? তোর মনে আছে আর আমার মনে নেই?'

'আজ সুরেশকাকা অফিসে এসে-ছিলেন।'

'তাই নাকি?'

'হাঁ।'

'কেন?'

'সুরেশকাকাকে দেখলে চেনা যায় না...

'কেন?' মণিদা উৎকণ্ঠার সঙ্গে জানতে চাইত।

'ওঁর বড় ছেলে বলাইদার কথা মনে আছে তোমার?'

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
অ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!
DOL 327 BEN

'হ্যাঁ, খুব মনে আছে।'
'বলাইনা মারা গিয়েছেন।'
'কবে?'
'বছর দুয়েক।'

মণিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল, তা উনি তোমার অফিসে এসেছিলেন কেন?

'ও'র ছোট মেয়ের বিয়ে। তাই...

দাদা কথা শেষ করার আগেই মণিদা জিজ্ঞাসা করল, কিছু টাকার দরকার?

'হ্যাঁ।'

মণিদা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর শুরু করল অতীত দিনের কথা বলতে, তুই জানিস তোর বাবার বিয়ের সম্বন্ধ সুরেশকাকাই করেছিলেন?

দাদা হাসল। বললো, হ্যাঁ।

'ওর মত তোর বাবাকে আর কোন বন্ধুই ভালবাসে না!'

'তাতো বটেই।'

তুই ডিগবয়তে একটা চিঠি দে। দ্যাখ ও'রা কি বলেন।'

'হ্যাঁ। কালই চিঠি দেব।'

'দেখবি হয়ত ঐ বিয়ের জন্য তোর বাবা-মা এখানে এসে যাবেন।'

'সম্ভব হলে আসতে পারেন।'

দাদার আর মণিদার কথার শেষ ছিল না। ছোড়দার সঙ্গে সংসারের কোন সম্পর্ক ছিল না। ও মণিদাকে ঠাট্টা করে সুপারিন-টেনডেন্ট বলে ডাকত।

'হ্যাঁরে বড়দা, আমাদের হস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টবাবু কোথায় গেল রে?'

'বোধহয় দই আনতে গেছে।'

'তাহলে তো ও ঘণ্টা খানেকের আগে আসছে না।'

'ঘণ্টা খানেক লাগবে কেন?'

'ওর তো সব কিছুই স্পেশ্যাল। হয়ত মোল্লারচকেই দই আনতে গেছে।'

মণিদাকে নিয়ে ওর অমন করে কথা-বার্তা বলা আমার বা দাদার খুব খারাপ লাগত। কিন্তু দাদা কিছু বললেই মণিদা নিজে আপত্তি করত, তোমরা ওর কথায় এত মাথা ঘামাও কেন?

দাদা বলত, অমন করে কথা বললে তুমি ওর কথার জবাব দিও না।

মণিদা হাসত।
'তুমি হাসছ কেন?'

মণিদা হাসতে হাসতেই বলত, যে গরু দুধ দেয় তার চাটিও ভাল লাগে।

ছোড়দা পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল বলে মণিদা সব সময় ঐ এক কথা বলত।

কলেজ থেকে ফিরে আমি বিশেষ কোথাও যেতাম না। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর একটা কোন গল্পের বই বা সিনেমা ম্যাগাজিন নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তাম। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে দেখতাম ও পাশের বাড়ীর জানলা দিয়ে কেউ উদগ্রীব হয়ে আমাকে দেখছে কিনা।

দেখত। প্রশান্ত দেখত। শুধু বিকেলে নয়, সকালে সন্ধ্যায় দেখত। আমাকে তখন আরো অনেকে দেখত। বাস-স্টপে দেখত, বাসে দেখত। কলেজ থেকে অসীমার সঙ্গে গল্প করতে করতে ফেরার সময় আরো কত প্রশান্ত অশান্ত দৃষ্টিতে দেখত।

আজ দুপুরের ডাকে ফেথার একটা চিঠি এলো। অনেকদিন পর ওর চিঠি পেলাম। চিঠিটা পাবার পর কলেজের দিন-গুলোর কথা বড় বেশী মনে পড়ছে। ফেথার মত বন্ধু আমার খুব কমই আছে। আমি ওকে সব কথা না বলে পারতাম না।

রাসমঞ্চ/বিষ্ণুপুর

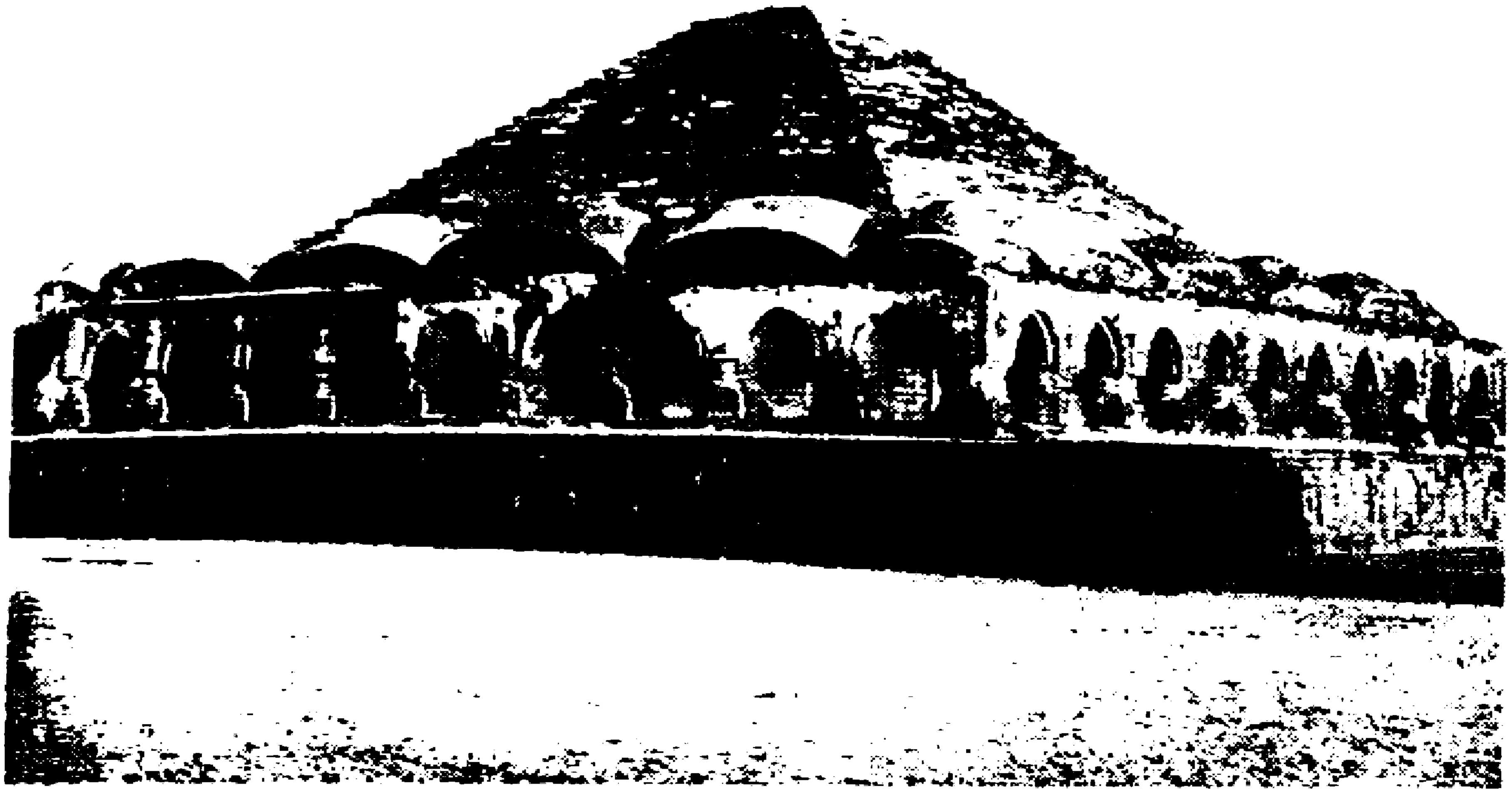

সব কথা, একেবারে সবকিছু খোলাখুলি। ও নিজেও কিছু লুকিয়ে রাখত না।

ডলিদির কথা মনে আছে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, হ্যাঁ। তোর মাসতুতো বোন তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। ঐ ডলিদির বিয়েতেই গিয়েছিলাম।

বাবা-মা কয়েকদিনের জন্য ডিগবয় থেকে কলকাতা এসেছিলেন। দিদিমার শরীর অনেকদিন ধরেই ভাল ছিল না বলে মা আমাকে নিয়ে দুদিনের জন্য পাটনা গিয়েছিলেন। দিদিমার ওখান থেকে ফিরে এসে কলেজে গিয়ে দেখি রেখা নেই। শুনলাম এক আত্মীয়ার বিয়েতে গিয়েছে কিন্তু কার বিয়েতে গিয়েছে, তা জানতে পারলাম না।

রেখা ফিরে এলে তাই ঐ বিয়ের গল্প শুনেছিলাম।

ডলিদির বর কেমন হলো?'

'পাশ বালিশের মত একটু নাদুস-নুদুস হলেও দেখতে ভাল।'

ভদ্রলোক কি করেন?'

'বাটা কোম্পানীর অফিসার।'

'তাহলে তো ভদ্রলোক ভালই মাইনে-টাইনে পান। ডলিদি ভালই থাকবে।'

'কথাবার্তাও ভারী সুন্দর কিন্তু জানেকদিন না পাজি বরযাত্রী এসেছিল না!

'তখন কি করেছিল?'

'বাসরে কি অসভ্যতা আর ফাজলামি করছিল, তা কি বলব!'

'তোর সঙ্গেও বুঝি...

'তবে কি?' রেখা একবার গর্বের সঙ্গে আমার দিক তাকিয়ে বললো, আমিও ভদ্রলোককে আচ্ছাসে টাইট করে দিয়েছি।

আমি ওকে খুব ভালভাবে জানি। ও ক্ষেপে গেলে সব কিছু করতে পারে, তা আমি ভালভাবেই জানতাম। কি হয়েছিল কি?'

রেখা এক নিঃশ্বাসে পুরো ঘটনাটা বলে গেল।

বাসরঘরটা খুব বড় ছিল না। তাছাড়া বেশ ভীড় হয়েছিল। প্রায় গায় গায় লেগে বাচ্ছিস। রেখার পাশেই ডলিদির বরের এক বন্ধু বসে হাত নেড়ে নেড়ে খুব বক-বক করছিল। ভদ্রলোক এমন কায়দা করে বারবার হাত নাড়ছিলেন যে প্রত্যেকবারই রেখার গায় ওর হাত লাগছিল।

প্রথম দিকে রেখা বিশেষ গ্রাহ্য করল না। ভাবল, আনন্দে উত্তেজনায় এমন হতেই পারে কিন্তু একটু পরেই বুঝল, না, তা নয়।

'একবার ভাবলাম ঘরভর্তি লোকের সামনেই ভদ্রলোককে অপমান করি। তার-পর ভাবলাম, না, তাহলে হয়ত ডলিদি বা ডলিদির বরের খারাপ লাগতে পারে...

আমি আমার আগ্রহ আর চেপে রাখতে না পেরে বললাম, তারপর?

'বেশ চীৎকার করেই ভদ্রলোককে বললাম, একটু বাইরে আসবেন?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, কেন?

'আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে।'

সারা ঘরভর্তি লোক দেখল ওরা দুজনে বাইরে গেল।

রেখা হাসতে হাসতে বললো, জানিস বারান্দায় গিয়ে ভদ্রলোককে কি বললাম?

কি?'

'বললাম—চুরি করে এক চামচ মধু খেলে আপনার মুখ মিষ্টি হলেও আমার হয় না।'

সত্যই তাই। ও তো সবার সামনেই বলত, দেখিস যখন চাকরি করব তখন কিভাবে পুরুষগুলোকে ঘোল খাওয়াই।

রেখার চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম আর ভাবছিলাম সেইসব দিনের কথা। কত কথা!

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিলাম, হ্যালো!

ও পাশ থেকে শুনতে পেলাম, আমি সাগর।

'খেতে আসবেন না?'

'এত বেলায় আবার আসব?'

'বেলা বেশী হলে কি খেতে নেই?'

সাগর হাসল, আচ্ছা আসছি।

(ক্রমশঃ)

মনের কথা

পাপপুণ্য-প্রসঙ্গ
'জাস্টিন ও জুলিয়েট'

—যে কোন সময় একটা খুব খারাপ কাজ করে ফেলতে পারি, এই চিন্তায় আমি অস্থির। খারাপ কাজটা ঠিক কি আমি জানি না, তবে মনে হয় সব রকমের গর্হিত কাজ আমি করতে পারি। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, মানুষের মনগড়া কতকগুলো কথা মাত্র, সংজ্ঞাগুলো মানুষেরই তৈরী। দেশ-কাল সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে পাপ-পুণ্যের ধারণা বদলায়। ধারণাগুলো 'রিলেটিভ', 'অ্যাবসোলিউট' কোন কিছু নয়। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে অথবা মনগড়া নরকের ভয় দেখিয়ে পাপ থেকে নিবৃত্ত রাখার দিন চলে গেছে। বিবেকের বাণী শুধু যাত্রা-থিয়েটারেই শোনা যায়; আমার মনের মধ্যে আমি আর বিবেকের দংশন অনুভব করি না। নানা রকম পাপের কল্পনা আমি করে দেখেছি, আজকাল বিবেক বা অন্তরসত্তা থেকে বাধা পাই নি। আত্মাকে কলুষিত করতে আমি একটুও পিছ-পা হব না, যদি পাপ আমাকে লাভবান করে অথবা ইন্দ্রিয়সুখ দিতে পারে। আত্মা-পরমাত্মার উদ্ভট তত্ত্বে আমি অনেক দিন বিশ্বাস হারিয়েছি। তথাকথিত পাপ বা অসামাজিক কাজ যদি অন্যের অজান্তে করতে পারি, শাস্তি পাবার বা দুর্নাম রটবার ভয় যদি আমার না থাকে, তবে কেন আমি পাপে লিপ্ত হব না? পাপ করার ভয় আমার নেই, কেননা পাপকে পাপ বা গর্হিত কিছু মনে না করলে গ্লানি বা ভয় থাকতে পারে না। কিন্তু দিনরাত পাপ করার চিন্তা আমাকে পেয়ে বসাতে আমি কাজকর্মে মন দিতে পারছি না, পড়াশুনোয় অবহেলা ঘটছে। পরীক্ষা এসে গেছে। এই-ভাবে চললে পরীক্ষায় পাশ সম্ভব হবে না। ...এই ব্যাপারে আপনি কোন পরামর্শ দিতে পারেন কিনা জানাবেন।

দীর্ঘ চিঠি, ইংরিজিতে লেখা। তার সামান্য কিছু তর্জমা করে পাঠকদের কাছে পেশ করলাম। পত্রের লেখক কুমুদের বয়স একুশ-বাইশ, ডাক্তারী পড়ে। সাদা-মাঠা চেহারা। চোখের কোণে কালি, মুখে ক্লান্তির ছাপ। আর কোন বিশেষত্ব নেই। বোর্ডিংয়ে থাকে। এক ঘরে তিনজন। অন্য দুজন কুমুদের চেয়ে বয়সে সামান্য বড়। কুমুদ বি-এস-সি পাশ করে মেডিক্যালে ঢুকেছে, রুমমেটদের তুলনায় জুনিয়ার। মেদিনীপুর জেলায় এক মহকুমা শহরে বাড়ী। বি-এস-সি পাশ করে গত বছর মেডিক্যালে কোলকাতায় এসেছে। বাড়ীতে বাবা-মা ও এক বোন থাকেন। সামান্য কিছু জমির ও একটা মুদির দোকানের আয়ে সংসার চলে। বাবা কিছু লেখাপড়া শিখেছেন, ঐ দোকান নিয়েই আছেন। লেখাপড়ায় কুমুদ ছোটবেলা থেকেই ভাল। বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছে। বৃত্তির টাকা দিয়ে কোলকাতার পড়ার খরচ চলে না, বাবাকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে হয়। এই টাকা পাঠাতে গিয়ে জমিজমা বাঁধক দিতে হয়েছে। কুমুদ প্রথমটায় বুঝতে পারে নি যে, ডাক্তারী পড়তে এত বেশী খরচ লাগবে। আরো চার বছর কিভাবে খরচ চালাবে, এই ভেবে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। এখন সে সব চিন্তা আর মনে আসে না। এখন সব সময়ে মনে ঐ একটি মাত্র চিন্তা; যে কোন সময়ে সে একটা খারাপ কাজ, একটা পাপ কাজ করে ফেলতে পারে। মাস তিনেক ধরে এই চিন্তা তাকে পীড়িত করছে। যখন থেকে শিবনাথদা তার রুমে এসেছেন, তখন থেকেই এই চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। শিবনাথ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, কয়েকবার ফেল করেছে, বয়স প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ। বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, দু হাতে টাকা ওড়ায়। অনেক রকম বদখেয়াল আছে শিবনাথের। প্রায় প্রতি রাত্রেই মাতাল হয়ে বোর্ডিংয়ে ফেরে,

সদ্য প্রকাশিত নূতন বই

সমুদ্রের হাওয়া ৫৲ — সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অরণ্য বহ্নি ৫৷৷৹ — তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

জবাব দিহি ৪৲ — সুভাষ চক্রবর্তী

সূর্যের সন্তান ৫৲ — শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাণী রায়

মধু জীবনীর নূতন ব্যাখ্যা—৭৲ মিস বোসের কাহিনী—৩৲

দীপক চৌধুরী

পশু ও প্রেমিক ৫৲ খড়িমাটির স্বর্গ ৭৲

ডেল কার্ণেগী

প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ—৪৷৷৹

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন ৫৷৷

মণ্ডকন্যা—ধনঞ্জয় বৈরাগী— ৭৲

শ্রেষ্ঠ গল্প চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৫৲

পৃথিবীর ইতিহাস প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৬৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ—১ম—৮৷৷৹, ২য়—৮৲

(নাটক) কারবার—দীপক চৌধুরী ৩৷৷৹

" ফেরারী ফৌজ—উৎপল দত্ত ৩৲

" এক পেয়ালা কফি—ধনঞ্জয় বৈরাগী ৩৲

গ্রন্থপ্রকাশ—২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

ফিরে এসে মেয়েদের সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চ-কাহিনীর বিবরণ শোনায়। কুমুদের দেহ-মনে অদ্ভুত এক শিহরণ জাগে। বিড়বিড় করতে করতে শিবনাথ ঘুমিয়ে পড়ে। অন্য দুমেণ্ট হয়তো নাইট ডিউটিতে চলে যায়। শিবনাথের মানিব্যাগের মধ্যে দুমড়ানো-পড়া নোটগুলো তুলে রেখে তার সুটকেস বন্ধ করে কুমুদ পড়তে বসে। পড়ায় মন বসে না। অক্ষরগুলো ঝাপসা মনে হয়। শিবনাথের কয়েকখানা নোট যদি সে সরিয়ে রাখে, তাতে শিবনাথের কোন ক্ষতি হবে না, সে জানতেও পারবে না। সকলেই জানে শিবনাথের বাবা কালোবাজারে অনেক টাকা রোজগার করেছেন। শিবনাথই বাবার নামে যা-তা বলে বেড়ায়। অশালীন সেই সব কটূক্তি শুনে প্রথম প্রথম কুমুদ স্তম্ভিত হয়ে যেত, আজকাল আর হয় না। বাবাকে শিবনাথ এতটুকুও শ্রদ্ধা করে না। ভালবাসে কিনা সেই শুধু বলতে পারে। বাবা মাতাল হয়ে পড়লে, সুযোগ বুঝে শিবনাথ অনেক সময় টাকা সরিয়েছে; এই সব গল্প বেশ সগৌরবে প্রচার করে শিবনাথ। রাতের শিবনাথকে দিনের বেলায় কিছু চেনা যায় না। অন্য এক মূর্তি। সব রকম র‍্যাডিক্যাল মতবাদের প্রবক্তা, আন্দোলনে শিবনাথ তখন সম্মুখসারিতে ছিলো। তার ভক্তের সংখ্যা কম নয়। শিবনাথের নৈশজীবন, তার অসামাজিক আচরণ, তার অশালীন কথা-বার্তা, তার সম্মান প্রতিপত্তি লাভের কোন রকম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে নি।

প্রথম পরিচয়ের অস্বস্তিটা কাটবার পর কুমুদ একদিন তার বাবার কথা বলল। তার বাবা ধর্মভীরু, পাপ-পুণ্যের চুলচেরা বিচার করে চলেন। সৎপথে থাকবার তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। নিকেলের চশমা এঁটে দোকানের ঝাঁপ ফেলে রামায়ণ পড়েন রোজ রাত্রে। অন্যান্য দোকানীরা তখন পিছনের দরোজা দিয়ে আসল কাজের ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে তাদের পাপের ভুবন না ফেঁপে ফুলে উঠেছে, বাবার দোকান টিমটিম করে চলেছে।

ছোটবেলা থেকেই ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমি চিন্তা করে আসছি। কলেজের এক মাস্টারমশাই-এর সংস্পর্শে এসে সমাজবিজ্ঞানে আমার আগ্রহ জন্মে। অন্য সকলের মত মার্কস, এঙ্গেলসের বই পড়তে আরম্ভ করি। বিজ্ঞানে আমার আগ্রহ বাড়ে, সব কিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করতে থাকি। কার্যকারণ নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকি, কিন্তু পরমকারণবাদ (টেলিওলজি) তত্ত্বের মোহ থেকে মুক্ত হতে পারি না। সব কিছুর মৌলিক কারণ অন্বেষণ যাঁরা করেছেন, তাঁদের পুঁথিপত্রের তত্ত্বকথা থেকে শাশ্বত সনাতন সত্যের সন্ধান করতে থাকি। একদিকে পরমকারণবাদ, অন্যদিকে যান্ত্রিক জড়বাদ—এই দুই ধরনের বিপরীত ভাবাদর্শের সংঘাতে আমি অস্থির হয়ে উঠি। কোনটাকেই আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না। এমনি সময় ডাক্তারী পড়তে আসি। অ্যানাটমি পড়তে গিয়ে ও মড়া কাটার ফলে আমার মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। দেহজ কামনা-বাসনা সব বাধা-নিষেধের গণ্ডী ভেঙে মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন তোলে। সহপাঠীদের মত সহজভাবে নারী-দেহের অ্যানাটমি নিয়ে আলোচনা করতে পারতাম না, নরনারীর মিলনকে একটা যান্ত্রিক নিয়মের অধীন মনে করে নিজেকে আশ্বাস দিতে পারতাম না; আবার নারী-দেহের চিন্তা থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হলাম। পুরনো সংস্কার, পুরনো পাপবোধ মনের মধ্যে মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো, সহপাঠীদের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে সংস্কারবোধ পাপ-পুণ্যের বিচার ঝিমিয়ে পড়তো। ওদের মত এগিয়ে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারলাম না, তাই কল্পনায় ওদের থেকে অনেক বেশী এগিয়ে গিয়ে অসুস্থ মনোমৈথুনে মত্ত হলাম। কয়েক মাসের মধ্যে বিবেককে আঘাত দিয়ে দিয়ে অসাড় করে ফেললাম। ঈশ্বরের বা নরকের ভয় অনেক আগেই দূর হয়েছিল। একমাত্র ভয় দুর্নাম রটবার। সেই দুর্নাম কোন মতে মা-বাবার কানে পৌঁছুলে তাঁদের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না, এই চিন্তা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। আমার তথাকথিত পাপানুষ্ঠানের বাধা নিকেলের চশমা-পরা রামায়ণ পাঠে রত সেই মুদির দোকানের ভদ্রলোকটি আর তুলসীতলায় প্রদীপ হাতে ভক্তিপ্রণাম-আনত আমার মায়ের ছবিটি। এই 'ইমেজ' দুটো যতক্ষণ না ভেঙে পড়ছে, ততক্ষণ আমি স্বাধীন নই, আমি মুক্ত নই।

শিবনাথ ওদের ঘরের বাসিন্দা হবার পর থেকে ওর চিন্তা অন্য দিকে ধাবিত হয়েছে। শিবনাথের বাবা অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জন করেছেন, শিবনাথ অসৎ পথে সেই টাকাগুলো নষ্ট করছে, আর কুমুদ সাধু পিতার জমি বিক্রীর টাকায় সৎপথে থেকে কৃচ্ছ্রসাধন করে বিদ্যার্জনের চেষ্টা করছে। এই সৎপথে থাকার কোন যুক্তি সে খুঁজে পাচ্ছে না। একখানা করে দশ টাকার নোট সে ইচ্ছে করলেই রোজ সরাতে পারে। শিবনাথ কিছু টের পাবে না, কোন রকম সন্দেহ করবে না। তার কোন ক্ষতিও হবে না। তার চিন্তাধারা আর নারীদেহ কেন্দ্রিক নেই, অর্থকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। মাস ছয়েকের মধ্যে নতুন বই, পরীক্ষার ফিস, ইত্যাদিতে প্রায় শ'চারেক টাকা লাগবে। বর্তমানে জমি বেচা-কেনা দুরূহ ব্যাপার। এ টাকা বাবা পাঠাতে পারবেন বলে মনে হয় না। পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে স্কুল-মাস্টারী খুঁজতে হবে। কিন্তু এই সহজ কাজ, রোজ সময়মত একখানা করে নোট সরানোর মত সহজ কাজ করার মত সাহস ওর কিছুতেই হল না। বর্তমানে ওর অবস্থা খুবই শোচনীয়। ওর কথাতেই শুনুন।

—এখন, আজ কয়েক সপ্তাহ, আমার মনের মধ্যে একটি মাত্র চিন্তা। যে কোন সময় আমি খুব একটা খারাপ কাজ করে বসতে পারি। শিবনাথের টাকা নেওয়ার মত অথবা নির্বিঘ্ন নারীদেহ ভোগের অভিজ্ঞতার মত সহজ ছোট কাজ নয়। এর থেকে অনেক বেশী কঠিন, অনেক বেশী গর্হিত, অনেক বেশী বড় কাজ। সে-কাজে আমার অন্তরাত্মার সায় আছে কিন্তু সে পাপ কাজটা কি আমি জানি না। পূর্বপরিকল্পনা-মত অসামাজিক কোন কিছু কাজ সমাজ-চক্ষুর অগোচরে করা যায়, নিষ্পাপ ভাল মানুষ হিসাবে সমাজে চলাফেরা করা যায়, সম্মান প্রতিপত্তিরও অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার অনুষ্ঠিত পাপ (?) আমার পরিকল্পনা বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সে কাজ করতে গিয়ে আমি ঠিক ধরা পড়বো, আমার নামে কলঙ্ক রটবে, আমি শাস্তি পাবো, বাবা-মায়ের কানে সেই কথা পৌঁছুবে। আমার বাকী জীবন কাটবে কারাগারের একটা নির্জন সেলে। 'জাস্টিন' আর 'জুলিয়েটের' লেখক আঠারো শতকের সেই ফরাসী মার্কুইসের মত প্রথমে কারাগারে, তারপর পাগলা গারদে আমার শেষ জীবনটা কাটবে। 'স্যাডিজম' কথাটা আমার মাথার মধ্যে বসে গেছে। পরীক্ষার বই না পড়ে আমি কয়েক মাস ধরে শিবনাথের জোগান থেকে নিয়ে মার্কুইস দ্য সাদের (উচ্চারণটা ঠিক হল কিনা জানি না) বই পড়েছি। কাউকে নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা দিয়ে যৌনতৃপ্তির বাসনা আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। আমার মনে হচ্ছে,—মেন অ্যান্ড উইমেন আর হেলপলেস বিফোর দি পাওয়ার অফ নেচার। আপনারা কি মনে করেন জানি না। আমি মনে করি প্রবৃত্তিকে, প্রকৃতিকে বিধিনিষেধের চাপে অবদমিত করার ফলে আমরা সবাই ধর্ষকাম (স্যাডিস্ট) হয়ে যাচ্ছি। ভালবাসার জিনিসকে ধ্বংস করার কামনা আমার মধ্যে

রসুই
গুঁড়া মশলা
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ও ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

দুর্বার হয়ে উঠেছে। আমরা সহজ প্রবৃত্তিকে বাঁকা পথে চালাবার চেষ্টা করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছি। মনের আক্রমণাত্মক (এগ্রেসিভ) প্রবৃত্তিকে জাদু-মন্ত্রে বশীভূত করতে গিয়ে আত্মহননের পথে পা বাড়াচ্ছি। একজন সাইকো-অ্যানালিস্ট বলেছেন, 'ইফ সেক্সুয়ালিটি ইজ ইন ডেঞ্জার, ইট ইজ নট বিকজ অফ ম্যানস্ অ্যাগ্রেসিভনেস বাট বিকজ অফ দি রিপ্রেসন অফ পার্সোনাল অ্যাগ্রেসিভনেস ইন ইনডিভিজুয়ালস।' আমি স্বাভাবিক যৌন আর হিংসাত্মক প্রবৃত্তিকে দমন করতে চেয়েছিলাম, তাই আমার মধ্যে এই ভয়ঙ্কর ফ্যান্টাসী দেখা দিয়েছে। আমি মনোবিকারে ভুগছি। কোন মেয়েকে আমি অপমানিত করি নি, কোন ছেলেকে আমি আক্রমণ করি নি, তাই আমি এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি। একটা কিছু করতে হবে, একটা কিছু করবো, ধরা পড়বো, জেল খাটবো। কিন্তু কি করবো সেটা জানি না, বুঝতেও পারছি না। হয়তো নিজেকে আঘাত করতে হবে, নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে হবে। যেমন শান্তিপ্রিয় সুইডেন সুইজারল্যান্ডের নাগরিকরা বাইরের শত্রু না পেয়ে আত্মঘাতী হয়, আমিও হয়তো সেই রকমভাবে আত্মহত্যা করবো। কিন্তু তার আগে আমি একটা ভীষণ কিছু করে বসবো। যে-কোন মুহূর্তে আমি হয়তো আমার বাবা-মাকেও আঘাত করে বসতে পারি। কেননা তাঁরা

কিছু রঙরূপ এমনও আছে সময় হার মানে যার কাছে!

PEARS TRANSPARENT SOAP

পিয়ার্স—আসল গ্লিসারিন সাবান

পিয়ার্স [illegible] ত্বকের লাবণ্য আর কমনীয়তা বজায় রাখে।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-PS. 26-140 BG

CENTRAL LIBRARY

মর্ষকাম (ম্যাসোচিস্ট)। অত্যাচারিত হবেই ওদের আনন্দ। পৃথিবীতে আছে কয়েকজন ধর্ষকাম আর অগণিত পদানত মর্ষকাম। রাজা মন্ত্রী সেনাপতি নেতারা সব স্যাডিস্ট আর সাধারণ মানুষ সব মেসোচিস্ট। সাধারণ মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করে, ক্লেশ স্বীকার করে, তাইতেই তাদের তৃপ্তি, তাইতেই তাদের সুখ। স্যাডিস্টরা মেসোচিস্টদের জীবনকে অত্যাচারে ধন্য করে। মেসোচিস্টরা নিপীড়িত হয়ে স্যাডিস্টদের তোষণ করে। কিন্তু আমি স্যাডিস্ট হতে পারছি না; ডিভাইন একসটাসিস অফ ডেস্ট্রাকশনে মেতে উঠতে পারছি না। কেননা আমি 'শার্প' নই, আমি 'হার্ড' নই।

বিকারগ্রস্ত মনের অসুস্থ চিন্তা অনেক সময় চিকিৎসকদেরও চমক লাগায়। মনে হয়, কত না এদের চিন্তার বিস্তার, কত না এদের জ্ঞানের পরিধি। রোগীদের মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা একেবারে নগণ্য বলা চলে না। অনেক কিছু পড়ার ফলে সময় সময় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে, কিছু লোক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পণ্ডিত রোগীদের সাক্ষাৎ আমরা পেয়ে থাকি। এ রকম দু-চারজনের সঙ্গে পাঠকদেরও পরিচয় ঘটেছে। আমাদের কুমুদ চমক দেওয়ার মত কথা বললেও, নতুন বা মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিতে পারে নি। তরুণ বয়সের ছেলের কাছে অবশ্য সে রকম আশা করাই অন্যায়। কুমুদ অন্য সব ছেলেদের মত নিরাপত্তা খুঁজেছে। এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজে নিজের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার জোরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেবার আশায় ডাক্তারী পড়তে এসেছে। আবার অন্তরের দিক থেকেও নিরাপত্তা চেয়েছে কোন একটা প্রগতিশীল আদর্শকে গ্রহণ করে। তাই হিউম মার্কস এঙ্গেলস এবং পরবর্তী কালে ফ্রয়েড, ইয়ুং ইত্যাদি পড়বার চেষ্টা করেছে। কোন বই-ই সে পুরোপুরি পড়ে নি। 'মেড ইজি সিরিজ' থেকে জ্ঞানী-গুণীদের তত্ত্বকথার সারমর্ম জেনে নিজের মনোমত কল্পনা করে নিজের জীবনের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। এই মহানগরীর জীবনধারা, নানা সাগরের ঢেউ-লাগা এখানকার উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক জীবন তাকে বিভ্রান্ত করেছে। 'জাস্টিন', 'জুলিয়েট'—এই দুখানি পুস্তকে বর্ণিত প্রচলিত রীতি ও মূল্যবোধের ব্যতিক্রম তার তরুণ অনুসন্ধিৎসু মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। পুণ্যের জয় আর পাপের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—এই প্রচার সে রামায়ণ-মহাভারত রূপকথা ইত্যাদি থেকে জেনেছে শিখেছে। জাস্টিন ও জুলিয়েট-এ আছে ঠিক এর বিপরীত কথা। সৎপথে থাকার ফলে জাস্টিন অশেষ দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে আর পাপের পথে চলে জুলিয়েট পেয়েছে ঐশ্বর্য সম্মান। তার বাবা সৎপথে থেকে আজীবন দারিদ্র্য ভোগ করেছেন, আর শিবনাথের বাবা বিপরীত ধর্ম আশ্রয় করে পেয়েছেন সাফল্য। পাপ-পুণ্য সম্পর্কিত অস্ফুট ধারণার মূলে তার পিতার দারিদ্র্যের কারণ সম্বন্ধে তার ভ্রান্ত ধারণা। সমাজবিজ্ঞানের যে সব বই সে পড়েছে তার মধ্যে ছিল প্রবৃত্তিধর্মী মনস্তত্ত্বের গুণগান। পাপাচরণ করে শিবনাথের বাবা অথবা জুলিয়েটের মত এক-আধজন নরনারী হয়তো তাদের ভাগ্য বদলাতে পারে, কিন্তু বাদবাকী নিরানব্বই জন পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন নতুন ধরনের সমাজব্যবস্থা। এই সব বলে অর্থনীতিভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের দু-একখানা বই পড়বার নির্দেশ দিলাম কুমুদকে।

তিন দিন ধরে এই সব আলোচনার পর কুমুদ একটু শান্ত হল। ভীষণ একটা কিছু পাপ করে বসবে এই চিন্তার তীব্রতা কমলো। এক পরিচিত ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে ওর থাকার-খাওয়ার একটা জায়গা করে দিলাম। তার ছোট ছেলেকে ঘণ্টাখানেক পড়াবে, পরিবর্তে সেখানে থাকবে। শিবনাথের সঙ্গ ছেড়ে আসতে অনেকখানি সুস্থ বোধ করলো। অর্থচিন্তাও অনেকখানি কমলো।

এর পর চললো যৌনমনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। আত্মরক্ষা ও প্রজাতি সংরক্ষণ এই দুটি প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আছে, এবং এদের কেন্দ্র করে নানা ধরনের শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে উঠেছে। তবে এই জৈব প্রবৃত্তি গুণগতভাবে মানুষের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিকশিত। সামাজিক উদ্দীপক অনেক সময় জৈব প্রবৃত্তির চেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়ে প্রকাশ পায়। আত্মরক্ষা কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব চেষ্টায় সম্ভব নয়, তাই সামাজিক মানুষের কাছে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সমাজের স্বার্থ, সমষ্টির স্বার্থ, অনেক সময় বেশী গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়ে থাকে। আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি মানুষকে সব সময় আক্রমণমুখী বা আগ্রেসিভ করবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। সমাজবদ্ধ মানুষ যেমন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাঁচবার চেষ্টা করে, তেমনি আবার পারস্পরিক সহযোগিতাও বাঁচার পক্ষে অত্যাবশ্যক ধর্ম। আজকের মানুষ উত্তর পুরুষের কথা ভেবে পরিকল্পনা করে চলেছে। সুন্দরতর পৃথিবী, সুষ্ঠুতর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলে প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য জ্ঞানবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। প্রজাতি সংরক্ষণ প্রবৃত্তি কেবলমাত্র কামাকৃষ্ট পুরুষ-নারীর আকস্মিক মিলনের মধ্যে পর্যবসিত নয়। বন্যার জলকে বাঁধ দিয়ে মানুষ ধরে রাখে, নালা দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে সমাজকল্যাণে নিয়োগ করে; তেমনি কামাবেগকেও সভ্য মানুষ সুপরিকল্পিত ভাবে সামাজিকীকৃত করে নানা পথে প্রবাহিত করিয়ে প্রজাতি কল্যাণে লাগায়। বন্যার মত কামপ্রবৃত্তিকে সংযত করার ফলে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

—তুমি তোমার আসঙ্গলিপ্সাকে অবদমিত করার বা সংযত করার কোন চেষ্টাই করো নি। তোমার দুর্বলতার জন্য তুমি নিজের অভিলাষ অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারো নি। তোমার কামনাকে দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে তৃপ্ত করার চেষ্টা করেছ। তুমি তোমার কামনাকে বরং প্রশ্রয়ই দিয়েছ। ইচ্ছা ছিল অথচ ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার সাহস তোমার ছিল না। তাই তুমি এত কষ্ট পেয়েছ। বাস্তববুদ্ধি দ্বারা চালিত হলে তুমি বুঝতে পারতে যে আসলে তুমি সমাজ-অনুগামী, সামাজিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করার শক্তি তোমার নেই; কাজেই তোমার কামনাকে তোমার সংযত করা উচিত। এবং তা হলেই তুমি আত্মসংযমে সমর্থ হতে, ইচ্ছার তীব্রতা কমে যেতো। নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে। বিবেককে তুমি আড়ষ্ট করেছ বলে মনে করো না। বিবেক, সামাজিক বাধাই তোমাকে ঐ তথাকথিত পাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। সুইডেন সুইজারল্যাণ্ড-এর নাগরিকরা বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে না পেরে আত্মনিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছে—তোমার একথা অনেক দিন ধরে যুদ্ধবাজরা প্রচার করে চলেছেন। আত্মহত্যার কারণ বহুবিধ। প্রতিটি কেসের স্বতন্ত্র বিচার-বিশ্লেষণ দরকার। ডঃ উইনিকটকে (যাকে তুমি কোট করেছ) যদি কেউ বলে যে, সমাজের নিপীড়িত জনসাধারণ তাদের মৌলিক অধিকার, স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ সুবিধা না পেয়ে ক্রমশ বেশী সংখ্যায় বিষাদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুইসাইড করছেন তা হলে তিনি কি প্রতিবাদ করতে পারবেন? অবশ্য আমি ও রকম কিছু বলার পক্ষপাতী নই। তোমার ধর্ষকাম মর্ষকাম তত্ত্ব সমাজের শ্রেণীবৈষম্য ঢেকে রাখার, 'স্ট্যাটাস কো' বজায় রাখার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা। ও নিয়ে আলোচনার দরকার হবে না।

—মনোবিদ

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে প্রকাশিত মনের কথা আলোচনাটির নামকরণে পড়তে হবে যোগ্যতমের উদ্বর্তন এবং দীপঙ্করের স্বপ্ন ভঙ্গ।

অন্তরে অন্তরে

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নীলাম্বরদের দিকে পরদিন সকালে পা বাড়ালাম যখন, নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্য ছাড়া, যথার্থ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য যে মাথায় ছিল সে কথা ভুলতে পারি নি। পথের ধারে যত বাড়ি পড়ছিল প্রত্যেকটির দিকে নজর রেখে চলেছিলাম যতক্ষণ না 'কমলানিবাসে'র সামনে এসে দাঁড়াই। এমন নজর রাখার উদ্দেশ্য আর বিশেষ কিছুই নয়, আমি প্রত্যেকটি বাড়িকেই 'কমলা-নিবাস' আশা করে এগিয়েছি। কমলা-নিবাসেই উঠেছে রজত আর করবী। এ পথের এমন এক জায়গায় এসে থামব যেখানে রজত আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে আজ সকালে। আর সে যে অপেক্ষা করে আছে তা করবী জানে। সে কারণে করবীরও অপেক্ষা বটে।

গাঢ় লাল ইঁটের গাঁথুনি হচ্ছে 'কমলা-নিবাসে'র বহিরঙ্গ। চারদিকে অল্প উঁচু পাঁচিলের বাউণ্ডারী। কম্পাউণ্ডের ভিতরে যত গাছগাছড়া, বিস্তৃত জমির উপর সমুদ্ভূত উজ্জ্বল সবুজরঙা ঘাস — সব কিছুই মালির অতিরিক্ত আদর-যত্নের পরিচয় বহন করছে। যোগমায়া আশ্রমের মহাবীর মাহাতকে ডেকে এনে দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, গাছপালা পশুপাখি মানুষের সেবাযত্ন ভালবাসা পেলেই তবে এমন সুস্থ সতেজ থাকে। তোমার তো আর এ সবের বালাই নেই।

দরজা, মানে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ওপরে হাত বাড়ালে পলাশের একটা ঝাঁকড়া ডাল স্পর্শ করা যায়। লতানে গাছ, গাছের ফুলডালপাতায় সজ্জিত তোরণের আকার ধারণ করেছে। অতিথি আগন্তুককে আকৃষ্ট না-করে পারে না। কলকাতার বড় রাস্তা অ্যাভেনিউ-এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও বোধহয় কমলানিবাসের আকর্ষণ এমন তীব্র হতে পারত না। এইখানেই সিমুলতলার মতো স্থানের বৈশিষ্ট্য। যে-শিল্পী এখানের আকাশ মাটির রং নির্বাচন করেছে তার মনে কোথাও বৈরাগ্যের রং লেগে থাকবে।

আমার ডাকে রজত বেরিয়ে এসেছে। তাকে যেমন সহজ স্বাভাবিক দেখব আশা করেছিলাম দেখলাম না। সকালের প্রথম আলোয় তার নিষ্প্রভ দৃষ্টির দৈন্য অতিরিক্ত স্পষ্ট মনে হয়েছে।

বললাম, কী ব্যাপার! এমন রাতজাগা চেহারা কেন?

অবাধ্য চুলগুলোকে হাতের পাঁচ আঙুলের আয়ত্তে এনে, কয়েক সেকেণ্ড মাথা নীচু রেখে, পরে যখন মুখ তুলেছে, মনে হয়েছে রজত ইত্যবসরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতোই কোন গাঢ় চিন্তায় মৌন থেকেছে।

রজত যখন কথা বলেছে তার স্বর গত-কালের মতো স্বাভাবিক শোনাল না: ভেবে দেখলাম দাদা, ডু অর ডাই ছাড়া কোন পথ নেই—

তার মানে একটা পথ আছে, লঘু কণ্ঠে বলেছি।

রজত কিন্তু হাসল না। আগের মতোই গাঢ় কণ্ঠে বলেছে, যদি সাকসেসফুল হই তো দুটো ইনভিটেশন, বিয়ে আর বৌভাত। আর না-হলে সিমুলতলাতেই শেষ দেখা—

বললাম, প্রথম যা বলেছিলে তাতে তোমাকে পুরুষ মানুষই মনে হচ্ছিল। শেষে যা বললে তাতে মনে হচ্ছে তোমার নেকুস্ ফেল করছে।

রজত বলল, বড্ড ঠাট্টা করুন না, এ ছাড়া আমার আর কিছুই বলার নেই, কী থাকতে পারে?

আমি তার প্রশ্নের কোন জবাব দিই নি। আমার মনোভাব রজতের কাছে অস্পষ্ট থাকার নয়। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছে সে-ই জানে। পরে বলল, করবী কাল রাতে তুমুল কাণ্ড করেছে। ওকে দোষের মধ্যে বলেছি, বোকবার বয়েস আমাদের দুজনের হয়েছে, অতএব ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে তাইতে— করবী বুঝতে পেরেছে আমি কি বলতে চাই। আমাকে শেষ করতে না দিয়ে মারমুখো হয়ে ঝাঁকিয়ে উঠেছে, তুমি না-বললেও বুঝতে পারি, বোঝার বয়েস আমার হয়েছে। সেই জন্যেই আমার মানসম্মানের ব্যাপারটা বেশী। নাবালিকা হয়ে তোমার মত অকর্মের সঙ্গে মেলামেশা করলে তাঁরা বয়েস বিচার করে আমার ক্ষমা করতেন। আর তোমার মতন ইয়ংম্যানকে— অস্ফুট মুখভঙ্গী করল করবী। বুঝতে পারলাম রাগে ও ফেটে পড়তে চায়। পরে দুমকী দেয়ার কণ্ঠে বলেছে, বাবা আসলে তোমার মুখ থেকেই স্পষ্ট করে কিছু শুনতে চায়। তোমার মত নিরেট আর অকম পুরুষ যে আমার সঙ্গে মেলামেশা করছে সে কি বাবা জানে। মোট কথা বাবাকে কি বলবে চটপট ঠিক করে ফেল আজ রাত্তিরের মধ্যেই। মেজদা আজকালের মধ্যেই আসছে এখানে। বলে শুয়ে পড়ল। যাকে বলে একেবারে মিলিটারী মেজাজ আর কি।

শেষ কথা কটার পর রজত হেসেছে। পরে আবার আগেকার গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলেছে, ও ঘুমিয়ে পড়ার পর আমার মনে হয়েছে, বিশ্বাস করুন দাদা, রজত আমায় মৃদু স্পর্শ করেছে, আমার মনে হল ও আমার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে চায়; আমায় অন্ধের মত বিশ্বাস করে। সত্যি, বিশ্বাস করুন দাদা, খুব প্রাউড ফিল করলাম. এর চেয়ে বড় সাকসেস আর কিছু থাকতে পারে না। বাস—তারপর সারা রাতই প্রায় জেগে—করবী তো নিশ্চিন্তে ঘুমতে লাগল আমার ঘাড়ে যত দায়দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে। এরকম সমস্যার কথা কোনদিন স্বপ্নেও চিন্তা করি নি। সারা রাত ধরে চিন্তা করেছি—কিন্তু—

আমি বললাম, কিন্তু-টিন্তু নয়, মেয়ের বাপকে গিয়ে স্রেফ বলা, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। শুনতে না পেলে বেশ গলা ছেড়ে বলা, আই ওয়ান্ট টু ম্যারি ইওর ডটার। চেঁচিয়ে না বললে আজকাল কেউ শুনতে পায় না। যারা স্ট্রাইক করে, আন্দোলন করে, তারা গলা ফাটিয়ে আজকাল কি আওয়াজ দিচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না? এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।

রজত পরিমিত হেসে বলেছে, কিন্তু আমরা!

আমি একই রকমভাবে বলেছি, বলতে হবে, এ বিয়ে হতেই হবে।

রজত পরিহাস করার মত এবার হেসেছে, বলেছে, হোয়াট্ নেকসট?

বললাম, চল বাইরে। এখানে একটা সকালও মিস করতে ইচ্ছে যায় না। কলকাতায় নসটালজিয়া থেকে মুক্তি নেই— তবু এসব জায়গায় একটা পিছটান কোথায় যে কিভাবে আছে নিজেও ঠিক জানি না। সকালের রোদ্দুরে এসব জায়গায় দু পাশে বড়-বড় গাছ ফেলে যখন পথ হাঁটি, তখন মনে হয় ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি এ সব—কে বলেছে আমাদের জীবনে অপরিহার্য? একখানা বাস পেলে বাঁচা গেল, অন্তত পাঁচ মাইলের মত রাস্তা নিশ্চিন্ত। ট্যাক্সির জন্যে হন্যে হয়ে শেষকালে যদি একখানা মেলে, তো হাঁফ ছাড়া গেল, যাক এক ঘন্টার পথ এত মিনিটের মধ্যে পৌঁছন যাবে। কিন্তু এখানে পথের দূরত্বের কথা জিজ্ঞাসা করে যদি শুনি মাইল তিন-চার— তো অবজ্ঞা করে বলি, মাত্র। একে কি আর দূরত্ব বলা চলে। কমপক্ষে কত মাইল হলে বলতে পারি, একে ঠিক ওয়াকিং ডিসট্যান্স বলা চলে না।

শুনে রজত বলেছে, না, বেড়াতে আপনিই এসেছেন বটে। চষে বেড়াতে চান এখানের মাঠ-ঘাট।

বললাম, তবে না তো কি—তোমাদের মতো ধান্দায় এসেছি?

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছেন দাদা?

আমি আর রজত কমলানিবাসের বাইরে যখন পথে এসে দাঁড়ালাম, আমার প্রথমেই মনে হয়েছে, এমন সকালেও করবীর মতো কোন মেয়ের মনে বিষাদ থাকতে পারে।

আমি রজতকে বললাম, কি হল, তুমি একা? করবী বেরবে না?

রজত বলল, ওর মেজদা আজ সকালেই আসছেন। ওর নিজের ফ্রন্ট ও সামলাবে— আমার ফ্রন্ট আমার হাতে।

বললাম, হেস্তনেস্ত একটা কিছু হতে চলেছে তবে।

রজত বলল, একই রকম উদাস কণ্ঠে, কি জানি দাদা হাওয়া কোন দিকে কিছুই বুঝছি না।

রজতের সঙ্গে এইভাবে ভাঙা-ভাঙা টুকরো কথা কইতে কইতে বা কখন সম্পূর্ণ নীরব থেকে, কমলানিবাস ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছি। হঠাৎ রজতের নাম ধরে কাকে অভিনেতার ঢঙে ডাকতে শুনলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়েছি।

রজত আমায় জিজ্ঞাসা করেছে, কে ডাকল বলুন তো?

আমি ইতিমধ্যে নজর করতে পেরেছি। সুন্দর রুমাল মুঠোই বাঁদিকে। অতএব বাঁ-দিকে একখানা দোতলা বাড়ির ছাদের ওপর তার দৃষ্টি নিয়োগ করেছি। পরে বাড়ির নাম লক্ষ্য করেছি 'নিভৃত নিকুঞ্জ'।

রজত আমাকে বলল, আসুন না দাদা।

গেট ঠেলে সরিয়েছে রজত, আমি ওকে অনুসরণ করে ভেতরে প্রবেশ করেছি। স্লিপিং গাউন গায়ে জড়িয়ে বাড়ির ছাদের ওপর এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। বয়স তিরিশের কিছু ঊর্ধ্বে।

রজত গলা ছেড়ে হাঁক দিয়েছে, কি খবর ডোনাল্ড-দা?

নাম শুনে আমি বিস্ময় বোধ করেছি। রজত আমার বিস্ময় অনুমান করতে পারে। ঘুম থেকে উঠেই কি আমার মুখ দেখলেন? রজত দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছে।

তোমার সুনীতিদির মুখ দেখেই তো শয্যা ত্যাগ করি, ভদ্রলোক সহাস্য কণ্ঠে বললেন।

রজত বলল, এখন কি সজ্জা পরিবর্তন করে আমাদের সঙ্গ নেবেন?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক এ মুহূর্তে নয়। চা-পানের জন্যে জল চাপান হয়েছে।

আমরা তাহলে এগোই, অনুমতি চাওয়ার মতো রজত যখন বলেছে, আমি ওর মনের অস্থিরতা ধরতে পারি।

আছ ক দিন?

যে কোন মুহূর্তে কুইট করতে পারি।

রজতের কথার অর্থ আমার কাছে যত পরিষ্কার ডোনাল্ড-দার কাছে নিশ্চয় নয়।

গেটের মুখ ছেড়ে রাস্তায় পা দিতেই দেখি এক ভদ্রমহিলা সঙ্গে দুটি বাচ্চা নিয়ে 'নিভৃত নিকুঞ্জে'র দিকেই আসছেন। রজতের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হেসেছেন। রজত বাচ্চাদের আদর করেছে।

কবে এলেন? অবিকল মেয়েলি ঢঙে ভদ্রমহিলা পরিচিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

এই তো কদিন—আচ্ছা আবার দেখা হবে বৌদি, একটু তাড়া আছে। বুঝতে পারি রজতের মনের অবস্থা। আসলে এক ধরনের অস্থিরতায় ও কাবু হয়ে আছে। ছোট বাচ্চাটার মাথায় চুলগুলো এক হাতে এলোমেলো করে দিয়ে রজত আরেক হাত ওপর তুলে বলেছে: বাই-বাই। দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো বাচ্চাটা বলেছে, টা-টা, বাই-বাই। ভদ্রমহিলা রজতের দিকে চেয়ে পুত্রের সপক্ষে হেসেছেন।

যাদের কাছ থেকে রজত বিনা বাক্যব্যয়ে এইভাবে চলে এসেছে, মজার ব্যাপার, তাদের কথাই সে আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রগলভ হয়ে বলেছে।

ওকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ডোনাল্ড-দা আবার কি রকম নাম হে?

ডোনাল্ড ওমিত মিটার, কায়দা করে উচ্চারণ করলে নামটা এই রকম দাঁড়ায়, রজত হাসতে হাসতে বলল।

পরে বলেছে, ডোনাল্ড ও'র ফার্স্ট নেম। নাম হল আপনার অমিত মিত্র। দু-চার পুরুষ হল ক্রিশ্চান হয়েছেন।

আমি কিন্তু অন্য রকম ভেবেছিলাম, হয়তো মজাটজা কিছু আছে নামের মধ্যে।

নামের মধ্যে কি—ওদের পুরো ব্যাপারটাই মজা, মানে সুনীতিদি আর ডোনাল্ডদা।

কী রকম? আমি যথার্থ আগ্রহের সঙ্গে বলেছি।

রজত এতক্ষণে মনটা হাল্কা করার মতো কিছু পেয়েছে, মনে হল। শুরু করেছে, ডোনাল্ড-দার মা ছিলেন গান-বাজনায় রীতিমত একসপার্ট। চার্চে অরগ্যান বাজাতেন। এ ছাড়া ধনী পরিবারে গান-বাজনা শেখানোর সুযোগও ছিল তাঁর প্রচুর। সুনীতিদিকেও মিউজিক লেসন দিতেন। সুনীতিদি প্রথম প্রথম প্রয়োজনে ডোনাল্ড-দার মার কাছে আসতেন। পরে অপ্রয়োজনেও যখন আসতে লাগলেন, বোঝা গেল প্রয়োজনটা তাঁর শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে নয়, ডোনাল্ড-দার সঙ্গে। ডোনাল্ড-দা ব্যাডমিন্টনে ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, ইতিমধ্যে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নেরও যোগ্য হয়ে উঠেছেন। সুনীতিদিও ব্যাডমিন্টনে বেশ পারদর্শী ছিলেন। শেষে দেখা গেল যন্ত্রসঙ্গীত ছেড়ে ব্যাডমিন্টনের দিকেই বেশী ঝুঁকেছেন। একবার একটা ক্লাবের পার্টিতে ও'রা দুজন, মানে ডোনাল্ড-দা আর সুনীতিদি, মিকসড ডাবলসের খেলায় সকলের দৃষ্টিতে বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে উঠলেন নানা কারণে। অনেকে মন্তব্য করল হাসব্যান্ড আর ওয়াইফ ছাড়া এমন পার্টনারশিপ হতে পারে না। সুনীতিদির খেলার ত্রুটি সম্পর্কে ডোনাল্ড-দা অনেক কিছু বললেন। সুনীতিদি তা ছাড়াও আরও অনেক কিছু বেশী বুঝলেন। বড় খেলার ভুল সম্পর্কে বুঝি আগে থেকে সচেতন হয়ে গেলেন। যাতে সে ভুল না করে বসেন সে সম্পর্কে মন স্থির করে ফেললেন। ডোনাল্ড-দার চেহারা ব্যক্তিত্ব কণ্ঠস্বর সব কিছু সুনীতিদিকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে।

ডোনাল্ড-দার মাও ছেলের সঙ্গে তাঁর ছাত্রীর এই বৈবাহিক সম্পর্কে খোকা বনে গেছেন। সুনীতিদির মা তবু এক রকম, কিন্তু বাবা? তাঁর ধারণা ডোনাল্ড-দার মা নিজেই এমন ষড়যন্ত্রের জন্যে দায়ী। জাত-ধর্মের কথা তো গেলই, সুনীতিদির মতো মেয়েকে ঘরে তুলতে যাচ্ছে যে তার চাল-চুলার ঠিক আছে কিছু? এটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। সুনীতিদিকে রীতিমত শাসিয়ে দিলেন তিনি। কিন্তু ইট ওয়াজ টু লেট দেন।

আগ্রহী শ্রোতার উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞাসু করেছি, তারপর?

তারপরই তো যাকে বলে তাজ্জব ব্যাপার, রজত আমার মুখের দিকে চেয়েছে কৌতূহল পরীক্ষা করার মতো। পরে বলেছে: সুনীতিদি যখন বাবার অ্যালটিমেটাম অগ্রাহ্য করে বসে আছেন, ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই, ডোনাল্ড-দা ডেসপারেট কিছু একটা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, সেই সময় একটা টেলিগ্রাম পেলেন ডোনাল্ড-দা। আসলে ডোনাল্ড-দার নামে এলেও ডোনাল্ড-দার মাকেই প্রয়োজন। আসানসোল রেল অফিসের বড় কর্মচারী এক সাহেবের কাছে ডোনাল্ড-দার মা-র পিসে কি মেসোর মস্ত একখানা বাড়ি মর্টগেজড্ ছিল।

সহজ কিস্তিতে সাহেবের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার কথা ছিল। দু-এক কিস্তির পর, ভদ্রলোক একদিন প্রায় উইদাউট নোটিশে চোখ বুজলেন। সাহেব ইতিমধ্যে এদেশ ছেড়ে চলে যাবেন ঠিক করেছেন। সাহেবের স্ত্রীর এদেশে আর মন টিঁকছিল না। তিনি বাড়ির উত্তরাধিকারীকে খুঁজছিলেন, কারণ বাড়ির মালিকানা ত্যাগ করতে চান, এবং টাকা ছাড়াই। ডোনাল্ড-দার মা-র ওই আত্মীয়টির স্ত্রী-পুত্র বলতে কেউ ছিল না। অতএব কার হাতে ছেড়ে যাবেন। শেষে খোঁজ-খবরের পর ডোনাল্ড-দার মাকে বার করা গেল। সাহেব ছিলেন স্পোর্টসের ভক্ত। ডোনাল্ড-দার নামের সঙ্গে তিনি একেবারে অপরিচিত ছিলেন না।

কলকাতায় খোঁজ নিয়ে ডোনাল্ড-দার নামে তার করা হল।

ডোনাল্ড-দার সেই সময় যা মনের অবস্থা তাইতে এ ধরনের টেলিগ্রামে আরও ঘাবড়ে গেছেন। মেয়ের বাপের তরফ থেকে সম্ভব-অসম্ভব যা কিছু ঘটানো যেতে পারে। যাবার আগে ডোনাল্ড-দা সুনীতিদিকে যা বলেছেন তাতে সুনীতিদির চোখে আনন্দের জল এসেছিল। আবার দুঃখও কেঁদেছিল। বলেছিলেন, যদি ভাগ্য-ভালয় ফিরি তো তোমাদের ফ্যামিলিতে নিউ ট্র্যাডিশান, তা না হলে ক্রিমিনাল কেস—যে কদিন ডোনাল্ড-দা আসানসোলে ছিলেন সুনীতিদির চোখে ঘুম ছিল না। যে-রকম [illegible] লোক যা কিছু খুশি করে বলতে পারেন।

সাহেবের সামনে গিয়ে ডোনাল্ড-দা যখন দাঁড়ালেন সাহেব তখন আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলেছিলেন, রিয়েলি এ স্পোর্টসম্যান। আমাদের দেশে, পসিবলি ইউ নো, এ স্পোর্টসম্যান ইজ এ্যাজ গুড এ্যাজ এ স্কলার। অফন হিজ অনার ইজ গ্রেটার দ্যান এ স্কলারস।

ডোনাল্ড-দার মা মারফৎ পরে সাহেবকে বিশেষ করে অনুরোধ জানান স্কুলের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। সাহেব অনুরোধ রেখেছিলেন।

সাহেবের কথা মতো ডোনাল্ড-দা অনেক দিন খেলাধুলোর চর্চা রেখেছিলেন। পরে সংসার ছেলে-বৌ আর চাকরীতে ডুবে গেলেন। ডোনাল্ড-দার মা আসানসোলের বাড়িতেই থাকতেন। মা মারা যাবার পর বাড়ি বেচে দেন।

আশ্চর্য স্বামী-স্ত্রী ও'রা। দুর্গাপুজোর উৎসবে ডোনাল্ড-দাকে দেখলে মনে হবে উনি গোঁড়া হিন্দু। আর সুনীতিদি বড়দিনে চার্চে মোমবাতি দেবেন, খ্রীস্টের কবরে ফুল রেখে আসবেন। অথচ ও'দের ধর্মটা কি কারও বোঝার উপায় নেই।

সব কিছু বলা শেষ হলে রজত আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা দাদা, এমন একটা কিছু আমাদের জীবনেও তো ঘটতে পারে?

আমি এতক্ষণ এক দফা ভেবে নিয়েছি। বুঝলাম এবার কিছু বলতে হবে। কি বলব? বললাম, লটারিতে টিকিট পেলে

প্রকাশিত হলো

মনীশ ঘটকের

বিদূষী বাক্

কবির রচিত চৌত্রিশটি কবিতার গুচ্ছ

"......কবি ও কবিতার মহালয়া সংখ্যায় 'বিদূষী বাক্' নামে আপনার কবিতাগুচ্ছ পড়ে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হলাম...আপনি একটি ছন্দকেই অবলম্বন করে কবিতাগুলি লিখেছেন......এ ছন্দের মূল জীবনের গভীরে, কাজেই এর আদিও নেই, অন্তও নেই; জীবনকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে আছে। এই তো কবিতা।

প্রীতিমুগ্ধ, বিস্মিত ও অভিভূত
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।"

মূল্য : তিন টাকা

এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : : কলিকাতা-১২

কারও কপাল খুলে যায়, কারও কঠিন সমস্যার হঠাৎ সমাধানও হয় বটে। তা বলে কি তুমি বলতে চাও, আর বাদ বাকী যারা আছে তাদের সমস্যার কোন সমাধান নেই?

আমার প্রশ্নে রজত বুঝি হঠাৎই হত-বুদ্ধি হয়েছে।

আমি ফের বললাম, ডোনাল্ড-দা তোমার না-হয় ডাকাবুকো, কিন্তু দুর্নীতি-দিও তো কম নয়, সেও তো পিছু হটে নি? তুমি করবীর মনোভাব সঠিক জানার চেষ্টা করেছ? আমি কি বলতে চাই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। লাভ, আফটার অল, ক্যান নেভার বি এ ওয়ানসাইডেড লেন্। তোমাকে যেমন সাহস দেখাতেই হবে, তেমনি করবী-কেও সামাল দিতে হবে।

এর পর আমার বুদ্ধিতে যা কুলাল সাধ্যমত রজতকে তা-ই বলে আমি বিদায় নিলাম। একে যত উৎসাহের কথা আর সাহসের, আত্মবিশ্বাসের কথাই বলি না কেন, ওর মুখ-চোখের বিষন্ন ভাব কাটল না।

শুধু বলল, যা বলেছি মনে আছে তো?

বললাম, হ্যাঁ, দুটো ইনজিকেশন।

রজত আর কিছু বলল না বটে, মুখের ভাবে বোঝাতে চাইল, এ ছাড়াও যা বলেছি তা মনে রাখবেন।

বাড়ির পথে বাজারের রাস্তা পেরিয়ে আসতে হয়। মহাবীরকে মাছের সওদা নিয়ে কেনা-বেচার কসরত দেখলাম। একটি বার থেমেছি। বলেছি, কাল তো কলকাতায় যাব মহাবীর, আচ্ছা মাছ কিছু খাইয়ে দাও। সে হাসল। বড় ব্যস্ত বেচারা। কল-কাতার খাঁটি উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালীবাবু সৌখিন স্ত্রী আর সুসজ্জিত বাচ্চাদের নিয়ে বাজার করছেন। স্ত্রী স্বামীর পদমর্যাদা সম্পর্কে যেমন অতি সচেতন, স্বামীও তেমনি অর্ধাঙ্গিনীর দৈহিক সৌন্দর্য সম্পর্কে একই রকম সচেতন। হাবে-ভাবে, কথা-বার্তায়, চেহারায় মায় দর-দামের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে তাঁরা যে আর পাঁচজন ক্রেতা থেকে ভিন্ন তার প্রমাণ তাঁদের উপস্থিতির সর্বাংশে।

মসৃণ মসৃণ বাহুদ্বয়, খোলা পেট-কোমর, অঙ্গিনব কবরী সব কিছু বিশেষ লক্ষণীয় করে তুলে মহিলা ঘন-ঘন হাতের ঘড়ি দেখছেন, দর-দাম করতে অনভ্যস্ত ভদ্রলোক সাংসারিক দায়িত্ব পালনের একটি দুর্লভ সুযোগের ব্যবহার করছেন।

অনেকটা, আমার মনে হল, সিমুলতলা তাঁদের উপস্থিতিতে ধন্য। অন্য কোথাও যেতে পারেন নি বলেই এখানে এসেছেন। কাছে-পিঠে এই জায়গাটায় এসে বাচ্চাদের সম্ভবত বলতে চান, আর যেখানে যেখানে গেছে তারা এর আগে সে সব জায়গায় সিমুলতলার মতো এত কাছে বাজার অন্তত পায় নি। অর্থাৎ সিমুলতলায় অনেক কিছু মনোমত না হতে পারে, এ সুবিধেটা তারা অস্বীকার করতে পারে না। যিনি প্রথম বলেছিলেন, বিচিত্র এ জগত সংসার, তাঁকে স্মরণ করতে ইচ্ছা যায়। কেউ এসেছে নির্জন নিরিবিলি পরিবেশে শহরের কোলাহল থেকে আত্মগোপনের বাসনায়। আশ্চর্য, কেউ, যেখানেই সে থাক, আত্ম-প্রচার ছাড়া বাঁচতেই পারে না। সে যে আর পাঁচজনের চেয়ে বেশী করে বেঁচে আছে— এটা প্রচার না করতে পারলে তার সুখ নেই। আর সেই প্রচারে স্ত্রী-পুত্র সকলেরই সহযোগিতা সে পেয়ে থাকে।

রজত আর করবীর কথা আমি আপাতত ভুলে গেলাম। ভারী মজা লাগল এদের কথা ভেবে। অল্পে সুখ নেই, কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলে থাকবেন; কিন্তু এরা তো অতিঅল্পেই সুখী। আর পাঁচজনের চেয়ে সুখী। আর পাঁচজনের চেয়ে সুখী স্বচ্ছল, দশজনের চেয়ে বেশী করে বাঁচছে — এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, এবং অন্যে যে এটা জানে তা চিন্তা করে যথার্থ আত্মসুখী।

দুপুরের খাওয়া দিলীপের দৌলতে সমারোহে সারা হল। বাপ-ব্যাটা দুজনেই কাল কলকাতা যাত্রা করব শুনে অতিরিক্ত তোয়াজ করল। যেমন বধ করবার আগে পশুপক্ষীকে করা হয় আর কি। মহাবীর বাছাই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে, দিলীপ জান লড়িয়ে রেঁধেছে। অন্তত দিলীপের আত্ম-বিশ্বাসের কণ্ঠ সেই রকমই। খাইয়ে-দাইয়ে আমায় বিদায় দিয়ে ঘর ফাঁকা হলে, যোগ-মায়া আশ্রম ওরা ভাড়া দিয়ে দেবে। খেতে-খেতে, কথাটা মনের মধ্যে যতই ঘুরপাক খেয়েছে, আমি না হেসে পারি নি। যদি 'যোগমায়া আশ্রম' এখনই ত্যাগ না-করতাম তো এতো তাড়াতাড়ি এদের আদর-যত্নের কোন প্রয়োজন ছিল না। নিজেদেরই স্বার্থে ওরা আদর-আপ্যায়নে লেগেছে, ভেবে বাস্তবিক মজা পেলাম।

আমি কাল কলকাতা যাচ্ছি, এ সংবাদ যখন পিতা-পুত্রের কাছে সত্যি বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয়েছে, মহাবীর মারফত আমার কাছে মুখ খুলেছে, কাল এখানে ব্রহ্মচারি মহারাজ আসছেন, ও জন্যে আজই বাবু ঘর বায়না হয়ে গেছে। সকালেই লোক এসে যাবে।

বললাম, এ যুগে কারা মহাবীর জান তো? ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধ আজকাল আর চলে না, এখন কেবল বুদ্ধির মারপ্যাঁচ। তোমার বীরত্বের তুলনা নেই।

মহাবীর সবটা বুঝবে এবং তারিফ করবে একখানি ভেবে বলি নি। মহাবীরের উপস্থিতিতে নিজেকে শুনিয়ে বলেছি, তারও এক রকম মজা আছে।

মহাবীর কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য সুরে বলেছে, সে নিজে যা ভাবছিল তা-ই: লোক দু-চার দিনের জন্যে আসে, থাকতে মানুষ থাকে। ফের তো আবার তালা পড়ে যায়। সব বিলকুল ফাঁকা। আমারও তো আর এখানে কোন কাজ থাকে না।

মহাবীরের কথার অন্য অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়, অর্থাৎ দু-চারটে পয়সাই হয় তো তার কাম্য নয়, মানুষের সঙ্গ।

বিকেলে সুশান্তবাবু নীহারবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলাম। সুশান্তবাবুকে বললাম, বিবাহ যখন করেন নি তখন আর সন্তান বলি কি করে। বলি, আপনার শিষ্যকুল যেন থাকে দুধে-ভাতে। নীহার-বাবুর স্ত্রীকে বললাম কিঞ্চিৎ পরিহাসের সুরে, বৌদি, কলিযুগে ধর্মপত্নীর ধর্ম আর থাকে কই, তবে কলকাতায় ফিরে দাদা যদি বলেন সবই সিমুলতলার জল-হাওয়ার গুণ তো আমি আছি আপনার পক্ষে; জল-বাতাসকে যিনি স্বাস্থ্যরূপে খাদ্যে পরিণত করেন তিনিই পরম সতী-সাবিত্রী পতিব্রতা।

ফেরার পথে আকাশ হঠাৎ কখন অলক্ষ্যে কালো হয়ে এসেছে খেয়াল করি নি। কেঁপে-ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে এক সময়। যোগমায়া আশ্রমের কাঁটা-ঝোপের বেড়া সরাতে-সরাতেই ভিজে গেছি।

ঘরের বাইরে দাওয়ায় বসে বৃষ্টি দেখলাম। কলকাতার বাইরে বৃষ্টিপাতের এমন দৃশ্য এ এক অভিজ্ঞতা বুঝি। জানলা দরজা বন্ধ করার কোন তাড়া নেই। আমি এই হঠাৎ বৃষ্টির দৃশ্য, বিশেষ করে এই পরিবেশে, চোখের আড়াল করতে চাই না। আতা গাছগুলোর মাথায় সশব্দে বৃষ্টি ঝরছে, চারিদিক সমানুপাতে আরও বেশি অন্ধকার, জায়গাটা সিমুলতলা। ভাবতে ভাল লাগে, চোখ চেয়ে থাকতে আরও অধিক।

রাতের খাওয়া যখন শেষ হয়েছে, বৃষ্টি-শেষের আকাশে পূর্ণবৃত্ত চন্দ্র। যোগমায়া আশ্রমের চতুর্দিক চন্দ্রালোকে সাধারণাতিরিক্ত স্পষ্ট। অনুমান করতে পারি, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগ্ন নিরাবরণ নারীদেহের সৌন্দর্য নিয়ে নির্লজ্জ প্রকৃতি একা রাত্রির প্রহর পার করে দেবে। দুঃসাহসী সঙ্গী যদি

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

কেউ থাকে তাকে বিনিদ্ররজনী যাপনের শপথ নিতে হবে।

আমার পক্ষে যেমন দুঃসাহসী হওয়া সম্ভব নয়। নিদ্রার প্রয়োজন তো বটেই, তা ছাড়া কাল ভোরে সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করতে হবে। বেশ সকালেই ধরতে হবে বেনারাস্ এক্স্প্রেস।

বিছানার আশ্রয় নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, আগামী কাল এ সময়ে কলকাতার শিমুলতলার গল্প সাতখানা। বেড়াতে আসার আগে যে উৎসাহ, ছেড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তের বিষণ্ণতা তার চেয়ে বেশি উপলব্ধি করতে পারি।

গাঢ় ঘুমের আগে পর্যন্তও সারাক্ষণ ভেবেছি রজত আর করবীর কথা। ওদের সমস্যা বুঝি আমারও। শিমুলতলা ছাড়ার আগে একটা সমাধান খুঁজে পেতে হবে। করবীর মেজদার আসার কথা। সে কি এসেছে? যদি এসে থাকে তো তার সঙ্গে করবীর কী কথা হতে পারে। এমন কিছু হতে পারে কি যা রজত এবং করবী উভয়েরই পক্ষে আশাপ্রদ। এবং রজত আমাকে যে প্রশ্ন করেছিল তা-ও শেষ পর্যন্ত সম্ভব হতে পারে। রজত আমায় জিজ্ঞাসা করে-ছিল, আচ্ছা, আমাদের জীবনে কি এ রকম কিছু ঘটতে পারে না? আমি ওকে যা-ই বলে থাকি, এখন বলব, কেন নয়, অনায়াসেই ঘটতে পারে। তুমি ডোনাল্ড্-দার কথা বলেছ। তার কথা গল্পের মতো শোনাচ্ছে। তোমার জীবনেও যখন ঘটে যাবে, তোমার আর করবীর কথাও গল্পের মতো শোনাবে। ওকে উপদেশ ও মনোবল জোগানর জন্যে যা-ই বলে থাকি না কেন, এখন বলব, লটারিতে টিকিট যদি একজন পায়, আরেক-জন নিশ্চয় পাবে। যেন সেই আরেকজন রজত ছাড়া কেউ নয়। আসলে রজত করবীর সমস্যায় এমনে আন্তরিক চিন্তা করেছি যে, সমাধান করবীর মেজদা মারফতই আসতে হবে। নিদ্রার প্রাক্কালে সমাধান যতই মন গড়া হোক, এর সূত্র পেয়েছি স্বয়ং রজতের কাছ থেকে। করবীর মেজদার আসাটা যে বেশ তাৎপর্যময় তার ইঙ্গিত তো রজতের কথাতেই ছিল।

কখন ঘুমিয়েছি এসব ভাবতে ভাবতে, মনে থাকার কথা নয়। কুকুরের উচ্চকণ্ঠ ডাকে ঘুম ভেঙে গেছে। হঠাৎ এমন কুকুর ডাকছে কেন। অন্যদিন তো কই শুনিনি। তবে কি কেউ কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে-ছিল। সহসা নজর পড়ল ঘরের এক কোণায়। টর্চের আলো থমকে রয়েছে। রীতিমত ভীতি বোধ করছি। গলা ছেড়ে দিলীপের নাম ধরে বার-কয় ডেকেছি। কোন সাড়াশব্দ নেই তার। আস্তে আস্তে উঠে যেদিকে আলো পড়েছিল, সেদিকে গেলাম। জানলার অবস্থা ভাল নয়। প্রশস্ত ফাঁকে চোখ রেখে দেখলাম, বাইরে দুর্বার জ্যোৎস্নার শাদা আলোর সবকিছু ভাসমান বস্তুসদৃশ। কাউকে দেখতে পেলাম না অন্তত সামনাসামনি। ভয় ইতিমধ্যে আরও বেড়েছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আলোটার দিকে একনাগাড়ে তাকিয়েছিলাম। কখন চোখ বুজেছি জানি না। দরজায় ধাক্কা শুনে, আশু বিপদের সংকেতে সোজা উঠে বসেছি। বুক ধড়ফড় করছে। এর পর যা যা ঘটতে পারে সবই কল্পনা করে নিতে পারি। শিমুলতলায় এ-ধরনের উপদ্রবের কথা অনেকের মুখেই আগে শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটতে পারে চিন্তাও করতে পারিনি। দিলীপকে যে-গলায় ডেকেছি, সে-কণ্ঠে মরা মানুষকে ডাকলেও সম্ভবত একটা উত্তর মিলত, কিন্তু দিলীপের কোন সাড়াশব্দ নেই। দিনের আলো স্পষ্ট হওয়ার পূর্ব মুহূর্তটি পর্যন্ত দরজার দিকে উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে-ছিলাম।

আরও দু'-চারবার অস্পষ্ট ধাক্কার শব্দ শুনলাম। প্রত্যেকটি মুহূর্তে ভেবেছি, এইবার দরজার কবাট ভেঙে পড়বে এবং অতঃপর অতঃপর—আমার চোখের সামনে দরজা ছাড়া ঘরের আর কোন অস্তিত্বই ছিল না। প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি, এ-যাত্রা যদি রক্ষা পাই তো শিমুলতলায় আর নয় অন্তত। লোকে মুখে যা বলেছে তা কি এই-ভাবে সত্যি হবে। যেখানে যাবের ভয় সেখানে কি এভাবেই সন্ধ্যে হতে হবে।

ভয় ভীতি সংশয় এমনই প্রবল যে, সকালের আলোও বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। এক সময় উঠে দরজা খুলেছি। দেখি দরজার গায়ে গা দিয়ে শুয়ে আছে একটা কুকুর পথ জুড়ে। দরজার কবাটদুটো খুলে ফেলে নিজেই গা-ঝাড়া দিয়ে চার পায়ে ভর রেখে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত শরীর আমার রাগে রি-রি করছে। গত রাত্রির সব কিছুর জন্যে দায়ী এই কুকুরটা। যতই ভেবেছি অন্ধ ক্রোধে আমি ফেটে পড়তে গেছি। দরজায় গা ঘষেছে তাই শব্দ হয়ে-ছিল, বুঝতে বাকি থাকে না কিছু। কিছুতেই সহজ করে নিতে পারছি না ব্যাপারটাকে। সারাটা রাত্তির প্রায় একটা কুকুরের প্রহসনে ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলাম। মানুষ আর পশু যে-ই হোক কারও ক্ষমা নেই।

দিলীপের দেখা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল রাত্তিরে ছিলে কোথায় বাপু? দিলীপ অম্লানবদন কণ্ঠে বললে, সরকার-বাগানে জোর খেলা চলেছিল বাবু, তারপর ওখানেই শুয়ে পড়েছি, রাত বেশি হয়ে গিয়েছিল।

মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড	কিলোসাইক্লস্
১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১	২১৪৬০, ১৫০১৫
	১১৭০০ ও ৯৬৫০
মিডিয়াম-ওয়েভ	
১৯০ মীটার	১৫৮০

বললাম,—কি খেলা রে!

দিলীপ অসঙ্কোচে বললে, জুয়া।

বললাম, কাল রাত্তিরে ঘরে মনে হল কে টর্চের আলো ফেলেছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

দিলীপ হেসে উড়িয়ে দিতে চায়। বলতে চায়, আপনি ঠিক দেখেছিলেন তো?

বললাম, ঠিক কী রে? জানলার কাছে টেনে এনে ওকে দেখালাম। সব শুনে একটি মুহূর্তে সকল রহস্য সমাধানের মতো বললে, টর্চের নয়, আমি মিছে ভয় পেয়েছি, চাঁদের আলো ঘরে ঢুকেছিল। জানলায় বড় বড় ফাঁক আছে। তারই মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে ঢুকেছে।

যখন ব্যাপারটা এইভাবে পরিষ্কার হল, ঘরে কেউ টর্চের আলো ফেলেনি এবং দরজায় কেউ ধাক্কা দেয়নি, আমি কুকুরটার দিকে তাকিয়েছি। সে দাওয়া থেকে ইতিমধ্যে মাটিতে নেমে গেছে। সেখানে বসে ল্যাজ নাড়ছে। বলতে চায় সে নির্দোষ।

দিলীপকে বললাম, চা-পর্ব আজ স্টেশনেই সারা হবে। সে বরং আমার বিছানা বালিশটা বেঁধে দিক, সুটকেসটা আমি গুছিয়ে নেব।

মহাবীর মাহাত ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছে। বাপ-ব্যাটা দুজনেই ঠিক করে রেখেছে সম্ভবত কারও বকশিসটি যেন মারা না যায়।

দিলীপ আমার ভীত হওয়ার খবর তার বাপকে দিলে, মহাবীর বললে, ছো ছো, ও-সব ছিনতাই খুন-জখমের কাজ সে থাকতে এ-তল্লাটে কেউ কোনদিন শোনেনি, শুনবেও না।

বললাম, নামের মতো কাজেও তুমি বীর বটে, কিন্তু আমি তো মহা ভীতু মাহাত, তাই তোমাকে একটা অনুরোধ করব, দরজা জানলার ফাটলগুলো তুমি সারিও। চাঁদের পায়ে তো আর বেড়ি দিতে পারি না, সে আকাশে উঠবেই, কৃষ্ণপক্ষ হলে আলাদা কথা।

দিলীপ আমার সুটকেস বিছানা তুলে যখন কাটাঝোপের গেটের দিকে এগোচ্ছে, আমি তাকে অনুসরণ করতে করতে কুকুরটার দিকে আরেকবার তাকিয়েছি, চোখ দিয়ে পড়েছে তারই দিকে। নিজের ব্যবহারে নিজেই অতিরিক্ত লজ্জা পেয়েছি। সকালে দরজা খোলবার পর ওকে যে অবস্থায় দেখেছি, সেই দৃশ্যটা আবার স্মরণ করলাম। আর আমার ঠিক একটা কথাই কেন যেন মনে হল, আমার পরিবর্তে শরৎচন্দ্র যদি সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে কুকুরটাকে দেখতেন তো তাঁর দীর্ঘ শীর্ণ অঙ্গুলি পাঁচটি তার মাথায় রাখতেন। তাঁর পঞ্চ অঙ্গুলির কোমল স্পর্শে সে নিশ্চিত মাথা দোলাত, ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ত। শরৎচন্দ্র হয়তো এমন কিছু বলতেও পারতেন : খেতে দিবি না বলে রাস্তা জুড়ে বসেছিস এমন করে। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে সে হয়তো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে পিছু নিত। কিন্তু সে নড়ল না তিলমাত্র। শুধু তাকিয়ে রইল দিলীপ আর আমার গতিপথে। আমার একটি বার মনে হয়েছে, কাল রাতে চাঁদের আলোয় বাড়ির কম্পাউন্ডে সে কি সত্যি কাউকে দেখেছিল? সতর্ক করে দেবার জন্যে তাই কি ডেকেছিল? এসব ভেবে আমার একটা কথাই মনে হল : আমাদের পক্ষে যেমন অনেক কিছুই সম্ভব, তেমন অনেক কিছুই আবার অসম্ভব। আমাদের পক্ষে আর হয়তো শরৎচন্দ্র হওয়া সম্ভব নয়। সময় আমাদের কানে প্রতিনিয়ত বলছে, ডাউট এভরিথিং। আমাদের সংশয় অবিশ্বাস বাঁচিয়ে এবং বাজিয়ে নেবার যে প্রবণতা, তাইতে আমাদের পক্ষে আর শরৎচন্দ্র হওয়া সম্ভব নয়। সময়ই বিরোধিতা করবে। ভালমন্দের তর্কে না নেমে বলতে পারি, সেন্টিমেন্টাল হতে চাইলেও, আমরা শরৎচন্দ্রের মতো আর ভাবপ্রবণ হতে পারব না।

দিন বাবু, সুটকেসটা, দিলীপের কণ্ঠ কানে এলে আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। আমি বুঝি হঠাৎই লক্ষ করেছি 'যোগমায়া আশ্রমে'র কাঁটাঝোপের বেড়া দৃষ্টির আড়াল হয়েছে কখন। 'সরকারস্ লজ'ও ছাড়িয়ে এসেছি। দেখতে দেখতে সামনে 'ব্রজধাম'ও পেরিয়ে এলাম। 'ব্রজধামে'র বৃদ্ধ মালি কুলুয়া বাগানের কাজ করতে করতে মাথা উঁচু করে আমার একটিবার দেখল। কলকাতার বাবুদের যাওয়া-আসার হিসেব ওদের হাতেই থাকে। ওর লিস্ট থেকে সম্ভবত আমার নাম খারিজ হল।

এরপরই রাস্তা নিঃসঙ্গ। বাজারের দিকে গেছে একটা মুখ, আরেকটা মুখ গেছে স্টেশনের দিকে। আমি স্টেশনমুখো চললাম। আসবার সময় মহাবীর আমায় এই পথ দিয়েই নিয়ে এসেছিল। দিলীপকে লক্ষ করলাম। সে আমায় কিছুই বইতে দেবে না। সুটকেসটাও তাই চেয়ে নিয়েছে। আসবার সময় সবুজ ও আলোর রাজ্যে হঠাৎ প্রবেশ করার ফলে আমার নাগরিক দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগেছিল, তাই পা চলতে চায়নি। মহাবীর অনুমান করতে পেরেছিল। আর এখন আমার পা সত্যিই ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলেছে দিলীপ কি তা বুঝতে পেরেছে। সেদিন আলো ও রঙের প্রাচুর্যে দিশাহারা হয়ে গতি অচল হয়েছিল। আজ আলোক ও বর্ণের উৎসব আমন্ত্রণে এভাবে আসর ছেড়ে চলে যাওয়াটা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। তাই আমার নিজেরই অজ্ঞাতে এক পিছটান আমার পথচলায় বাধা দিয়েছে। আমি ছাড়া তা কারও জানার কথাও নয়।

এক সময় দিলীপ তাই আমায় পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

তার কণ্ঠস্বর কানে এলে আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলাম : বেনারাস এক্স-প্রেস বাবু ঠিক টাইমে না-আসবে। কাল পঁয়ত্রিশ মিনিট লেট ছিল।

দিলীপের কথামতো আমি তবে আরও পঁয়ত্রিশ মিনিট হাতে নিয়ে এই পথটুকু হুড়োতাড়া না করেই হাঁটতে পারি। শিমুলতলার কোন পত্রবহুল সাধারণ একটি গাছে অচিহ্নিত কোন পাখির ডাকে আমি গত রাত্রির সব ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হতে পারি। ভাবতে পারি, আবার যদি কখন এ-জায়গায় আসি আমি এর মাহাত্ম্য গভীরতর উপলব্ধিসহ গ্রহণ করতে পারব। চাঁদের আলোর জোয়ারে ভয়ের ছলনা থাকতে পারে, মাঝ রাতে কুকুরের ডাকে কপট ভয়ের ইঙ্গিত থাকতে পারে, তার জন্য আমি এমন নিরপরাধ নিভৃত পরিবেশমণ্ডিত স্থানকে অভিযুক্ত করতে পারি না। এ-জায়গায় না এলে আমি হয়তো জানতে পারতাম না, সকালের আলোয় মনের সংশয় এভাবে অপসৃত হতে পারে।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, কী আশ্চর্য, রক্তকরবী প্রসঙ্গ আমি বিরাট মানসিক বোঝার মতো বহন করে নিয়ে চলেছি। তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনও নিঃসংশয় হতে পারিনি। বারবার চিন্তা করেছি, করবীর মেজদা এসেছেন তো; কী বলে থাকতে পারেন তিনি। জানতে বড় ইচ্ছে হয়, কী বলেছেন তিনি করবীকে।

আর কয়েক পা এগোলেই শিমুলতলার রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম। দিলীপ ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ওখানে।

সমাপ্ত

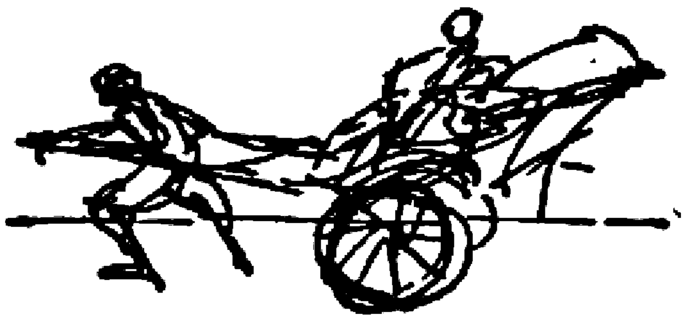

নিকটেই আছে

সামনে গরম—সাধু সাবধান!

শীত ফুরোতে না ফুরোতে গিন্নী বলল, এবার ফ্যানগুলো একটু রং-টং করাও। রাস্তার ওপর বাড়ী। ধুলো ধোঁয়ায় একেবারে কালি পড়ে গেছে। ভদ্রলোকদের বাড়ীতে দেয়াল ক্যালেন্ডারের সঙ্গে ম্যাচ করেই চেয়ার-টেবিল সোফা-সেট মায় ফ্যান-ট্যান-গুলো দোপ-দুরুস্ত রাখাই আজকাল ফ্যাশন। জানি সবাই, ইচ্ছেও হয় ফ্যাশন মত চলতে, কিন্তু পেরে উঠি কৈ। এবার হঠাৎ করে ওভার টাইমের বিলটা একটু মোটা হওয়ায় মনটা ছিল নরম, অক্লেশে ঘাড়টা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী হেলিয়ে দিয়ে বললাম—তথাস্তু।

শিবুকে পাঠালাম মিস্ত্রীর খোঁজে। এ পাড়ায় আছি প্রায় বছর দশেক। তবু শিফট ডিউটি আর ওভারটাইম করে ট্রাম রাস্তার বাইরে কিছুই প্রায় চিনে উঠতে পারি নি। গিন্নী বলে, আমি নাকি বেসিক্যালি অলস। আর সবাই যা পারে আমি নাকি তা পারি না। দুবেলা অন্ন সংস্থানের বাইরে আর কিছু করতে গেলেই আমি হাঁপিয়ে উঠি। তাই বাজার দোকান, মুদি, রেশন, ড্রাইং ক্লিনিং—সব ব্যাপারেই শিবু ছাড়া আমি অচল। ছেলেটা বোকাসোকা। নইলে আজ-কালকার বাজারে আমাদের এই আড়াইজনের ফ্যামিলীতে অর্থাৎ গিন্নী, নাবালক পুত্র ও আমার জন্য যে পরিমাণ খাটাখাটনী ওকে করতে হয় তাতে দুবেলার ভাত আর দুবেলার চায়ের পর দশটা টাকা কিছুই নয়। ও বলেই টিকে আছে, গিন্নীর হান-ড্রেড হর্স পাওয়ার মুখের ঝামটা খেয়েও। গিন্নী বলে শিবুই নাকি সংসারে অশান্তি আনে। কথাটা একেবারেই মিথ্যা নয়। প্রথম যখন ও এ বাড়ীতে এসেছিল ঠিক সেই সময় মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একদিন ওকে একটা সারিডন আনতে পাঠিয়েছিলাম। আমি একবারই ওষুধের নামটা বলে পাশ ফিরেছিলাম, শিবুও আর দ্বিতীয়বার জানতে চায় নি। মিনিট পাঁচেক বাদে এক-মুঠো আলপিন এনে বলল, আরো পনেরোটা পয়সা লাগবে। এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে, আজো ঘটে।

তাই গোড়াতেই গিন্নী বলল, কথায় কি ওকে কেন পাঠাচ্ছ। নিজেই যাও না।

নাইট ডিউটি করে এসে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া পাশেই গরম চায়ের কাপ, হাতে সকালের গন্ধমাখা টাটকা কাগজখানা। করুণ মুখে বললাম, আমি তো এ পাড়ার বলতে গেলে কিছুই চিনি না, তাছাড়া শিবুই তো সব করে—।

কথা কটা আর শেষ করতে দিল না, তার আগেই নিজস্ব ভোজবুলীতে শিবু শুরু করে দিল—সে আপনি কেন কষ্ট করবেন। আমিই যাচ্ছি। সব্বাইকে চিনি। ইলিকটিরির মিস্ত্রী তো? আমার দোস্ত পাঁচু—ফাসকেলাস ফ্যান সারায়। একবার ওকে দিয়ে করিয়ে দেখুন। শিবুর হিন্দী টানে বাংলা উচ্চারণে বাবুন নিশ্চিন্ত হয়ে চায়ের কাপে ঠোঁট ডোবালাম। গিন্নী মুখটা হঠাৎ বঙ্কিম করে আঁচলের ঝাপটাটা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমার হাতে-ধরা কাগজখানার ওপর দিয়ে বুলিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

একটু বাদেই পাঁচু এল। রোগা কালো, খেতে-না-পাওয়া বছর বিশ বাইশের ছোকরা। সরু চোঙা প্যান্টের ওপর দিয়ে ঝোলানো পকেটছেঁড়া হাফহাতা সার্ট।

এসেই কাজে লেগে গেল। টুলের ওপর চেয়ার ফিট করে শিবুর সাহায্যে ফ্যান দুখানা সিলিং থেকে নামাল। কি কি ট্রাবল হচ্ছে, কি কি করতে হবে সব মন দিয়ে শুনল। বক্তা আমার গিন্নী। সব শুনে টুনে মিনিটখানেক নীরবে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে মনে মনে কি একটা অঙ্ক কষল। তারপর মুখ খুলল—আপনাদেরকাছ থেকে বেশি নেবনি বইটিং। এসপ্রে পেন্টিং আর তেল মাখানোর জন্য সবশুদ্ধ পঁচিশটা টাকা দেবেন।

মেরামতির খরচ শুনেই তো অমন গিলে চমকে গেল। এতক্ষণ সামনের ঘরে গিন্নীর সঙ্গে ওর আলোচনা হচ্ছিল: এবার বিছানা ছেড়ে, লুঙ্গির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে পর্দা ফুঁড়ে শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম—বলিস কি! পঁচিশ টাকা! এই দুটো ফ্যান একটু রং করে দিবি আর ভেতরের জ্যাম ছাড়ানোর জন্য দু-ফোঁটা তেল দিবি কি দিবি না তার জন্য এত!

না স্যার আপনি দেখবেন একেবারে নোতুন করে দোব। তাছাড়া বাজারে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন এর কমে কেউ রাজী হয় কিনা। তেল গিরিজেই তো পড়ে যাবে চারটে টাকা। রং তো আমি করব না। মেশিন আমার নেই। দোকানে করাতে দোব। দুটোর জন্য নেবে আট আট ষোলো টাকা। তাহলে পঁচিশ না পেলে এত খেটে আমার কি থাকে বলুন?

বাজার দর জানি না, নেহাতই অর্ডিনারী ক্লাস সেন্ট পারসেন্ট অলস। একটু যে ঘুরে দরদোর করে আসব সে ইচ্ছাও নেই। তাছাড়া যে হিসাব দেখাল ছোকরা তার ওপর কি আর কথা চলে? রাজী হয়ে গেলাম। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম—তোর দোকান কোথায়?

দোকান নেই স্যার। বাড়ীতেই সব করি। টাকা কই যে দোকান দোব। পাড়ার সবাই চেনে আমায়। বলবেন পাঁচু কই, দেখবেন সবাই আমার ঘর দেখিয়ে দেবে। উই উদিকে নিকারিপাড়ায় আমার ঘর স্যার।

সাত দিনের মধ্যে সব কাজ ফিনিশ করে ফ্যান দুটো ফের ঝুলিয়ে দেবে বলে চলে গেল পাঁচু। যাওয়ার সময় বুঝিয়ে দিয়ে

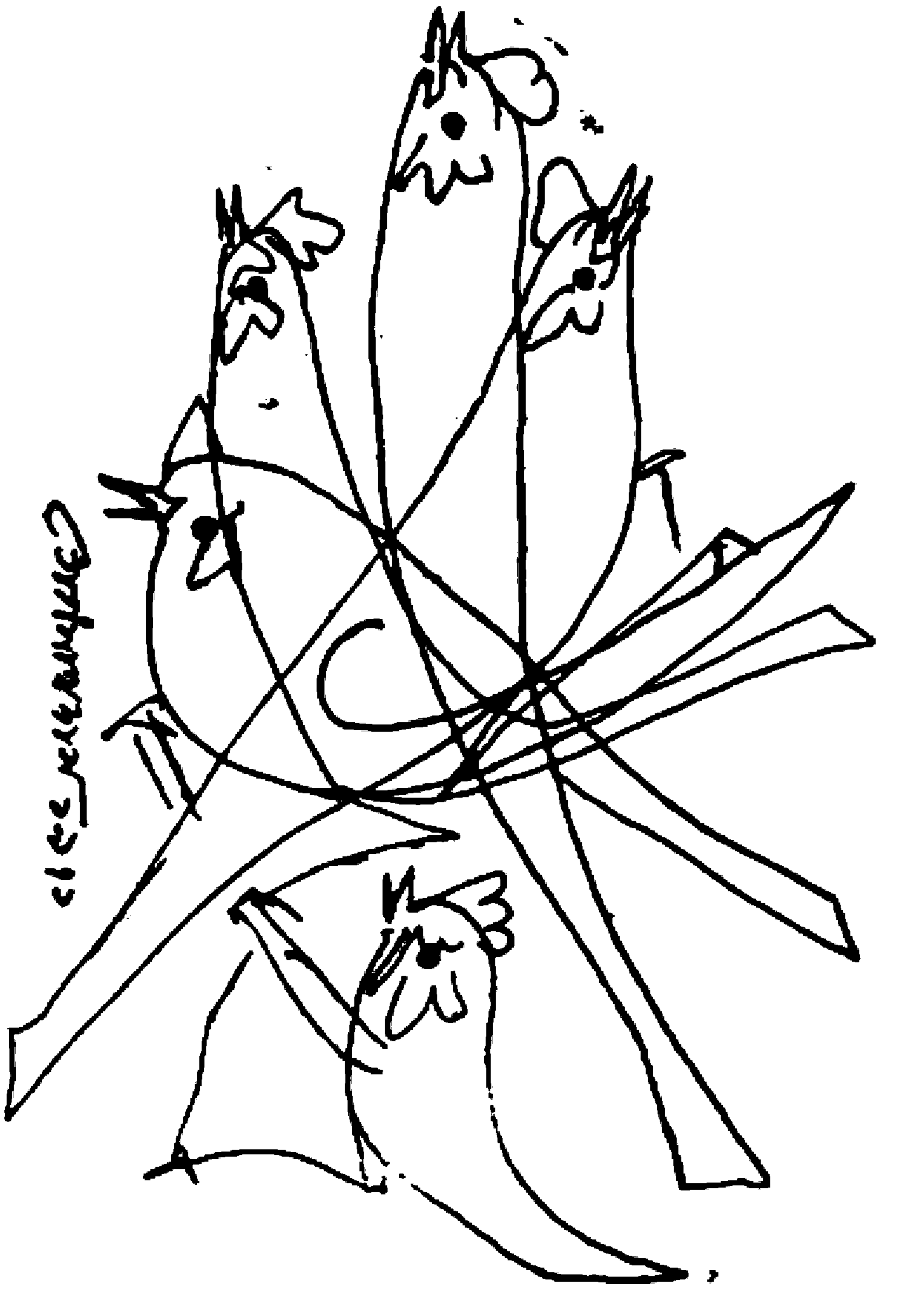

গেল দোকানে সারাতে না দিয়ে আমার কতটা লাভ হল—এই লাগানো ওঠানো আর দোকানে নিয়ে যাওয়া-আসার জন্যই আপনাকে একসুটো পাঁচ টাকা দিতে হোত। তাছাড়া কেল সিরিজের জন্য কম করেও ৯ টাকা ওরা নেবে।

ফ্যান দুটো নিয়ে পাঁচু চলে গেল। আমিও মনে মনে হিসাব করে দেখলাম নীট সাতটা টাকা আমার লাভ হোল। দোকানে দিলে যেখানে লাগত বত্রিশ সেখানে পাঁচু সব করে দেবে পঁচিশে। খুশী হয়ে ঠিক করলাম শিবুকে এই খরচ বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য একটা টাকা বখশিষ দেব। তবে ফ্যান আগে ফেরত আসুক।

অঙ্কের হিসাবটা শিবুও বোধহয় কিছু আন্দাজ করেছিল, যা পথে যেতে আসতে পাঁচু ওকে বুঝিয়েছে, তাই গোটা সপ্তাহটা কানের কাছে নিজের কৃতিত্বের গুণ ব্যাখ্যানা করে পাগল করে তুলল। এতদিনে সংসারের যাতে সুরাহা হয় এমন একটা কাজ করেছে বলে গিন্নীও দেখলাম ওর বকর বকর নীরবে সহ্য করল।

পরের রোববার সকালেই ফ্যান দিয়ে গেল পাঁচু। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারি নি যে ও দুটোর মালিক আমি। দুধের মত সাদা তিনটে করে ডানা তিনদিকে ছড়ানো, সোনালী বর্ডারে সাদা ডুমটা যেন মুকুট-পরা মাথার মত শোভা পাচ্ছে। লাগিয়ে, চালিয়ে বারবার রেগুলেটর ঘুরিয়ে আমাদের দুজনকেই রীতিমত খুশী করে দিয়ে পঁচিশটা টাকা নিয়ে চলে গেল পাঁচু।

মার্চের মাঝামাঝি। গরম পড়ে গেছে। এখন চলছে আমার ডে ডিউটি। রাতে ফ্যান চালিয়েই শুই। ফ্যান সেই একই। তবু কেন জানি মনে হয় হাওয়াটা আগের চেয়ে অনেক জোরালো, অনেক মিষ্টি।

কিন্তু তিন দিনও গেল না, মাঝরাতে ঘেমে নেয়ে উঠে মশারীর কোণাটা সরিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি আমার সোনালী বর্ডার দেওয়া রুপোলী বক নিথর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালে চোখ ফেরালাম—হ্যাঁ সুইচ অন করা। বিছানা ছেড়ে রেগুলেটরের কাছে এগিয়ে গেলাম—কাঁটাটা পাঁচের ঘরে। তবে কেন ঘুরছে না? অনেক চেষ্টা করলাম, অন অফ করে, রেগুলেটর ঘুরিয়ে—রেজাল্ট একই। তবে আস্তে আস্তে মশারীর ভেতরে তাকিয়ে দেখি গিন্নীও উঠে বসে আছে। সেই রাত তিনটে থেকে ভোর হওয়া পর্যন্ত যে বাক্যবাণ শুনতে হোল, তার জ্বালা ফ্যান তো ছার কোনো এয়ার-কণ্ডিশনিং মেশিনও দূর করতে পারবে না।

দু-একবার প্রতিবাদ করবার, বোঝাবার চেষ্টা করেও থামাতে না পেরে আমার সব রাগ গিয়ে পড়ল শিবুটার ওপর। ভোর হতে না হতেই ব্যাটাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। পাঠালাম ব্যাটাকে পাঁচুর কাছে, ওকে ডেকে আনতে। সামনের ঘরে বসে রাগে গরমে দরদর করে ঘামছি। মাথার ওপরে ফ্যান। অথচ সেটারও ঐ একই হাল। এতগুলো টাকা দিয়ে সারিয়ে কিনা এই হোল। চোখা চোখা ডজনখানেক গালাগাল মনে মনে রেডি করে রাখলাম, ঢুকলেই পাঁচুর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারব।

কিন্তু মারব কার মুখে? পাঁচুর কোন পাত্তাই আর শিবু পেল না। দুদিনে কম করেও বিশবার ওকে পাঠিয়েছি। প্রত্যেকবার পাঁচুর ঘর থেকে জবাব এসেছে—কাজে বেরিয়েছে। কখন ফিরবে তার ঠিক নেই।

নিরুপায় হয়ে শেষমেষ গেলাম ট্রাম-স্টপের গায়ে লাগানো দোকানটায়। দোকানের মিস্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। সে এসে ফ্যান দুটো নামিয়ে, সামনেই কল-কব্জা খুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে রায় দিল—কনডেনসার নেই।

আবার পঁচিশ টাকা গচ্চা গেল। দুটো কনডেনসার বাবদ দশ দশ কুড়ি টাকা আর নামানো ওঠানো লাগানো বাবদ মিস্ত্রীর চার্জ পাঁচ টাকা। সেই সঙ্গে দোকানীর বচনামৃত গ্লাসখানেক পান করতে হোল—সস্তায় মশাই পস্তাতেই হবে। এসব কল-কব্জার ব্যাপার। আপনারা বোঝেন না কিছুই। ওসব আনাড়ি মিস্ত্রী দিয়ে অল্প পয়সায় করাতে যান, তার জন্যই উল্টে খেসারত দিতে হয়। তাছাড়া এসব মিস্ত্রীর অনেকেই ডিসঅনেস্ট। কাজ জানে না, তা বলব না, আসলে অভাবে পড়ে চুরি করে। আপনি ওকে পঁচিশটা টাকা দিয়ে ভাবলেন দাঁও মেরেছেন। ও-ও তলে তলে দুখানা কনডেনসার ঝেপে দিয়ে হাফ প্রাইসে বেচে দিয়ে ওর অভাব যতটা পারে পুষিয়ে নেয়। বাইরের খোলস দেখে তো আর আপনি আন্দাজ পাবেন না যে আপনার আড়াইশো পৌনে তিনশো টাকার বস্তুটার কি হাল করে ছেড়ে দিয়েছে।

তাই এবার থেকে ঠিক করেছি—শিবুকে দিয়ে আর কোন কাজ করাব না। ওভারটাইমের ফালতু টাকার ফিফটি পার্সেন্ট তো ওর জন্যই চলে গেল। এদিকে গিন্নীও আবার নর্মাল কণ্ডিশনে ফিরে এসেছে, উঠতে বসতে শিবু আর শিবুর মনিব দুজনকেই বাক্যস্রোতে ধুইয়ে দিচ্ছে। ফ্যানের ঠাণ্ডা হাওয়াতেও তেজ মরছে না কিছুতেই।

—শশিভূষণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—থাম! বিনয় প্রায় চিৎকার করে উঠল, তখন থেকে শুধু রজতদার নাম! একটা ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি কী আমার চেয়ে বেশী চেন রজতদাকে?

শেফালী রাগ করল না। বরং দু'চোখ বড় করে বললে, বারে! তুমি রাগ করছো কেন। তুমি রজতদাকে দেখতে পার না। অথচ তোমার কথা কত জিজ্ঞেস করে। কোনদিন শুনলাম না তোমার বিরুদ্ধে একটা কথা। অথচ ওর নাম শুনলেই তুমি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠ।

না, আর সে কথা বাড়াবে না। বিনয় শেফালীকে পাশ কাটিয়ে বারান্দায় এল। দরোজার কাছ থেকে ফিরে এল আবার। ঘরে ঢুকে দেখল গম্ভীর হয়ে বসে শেফালী। থমথম করছে মুখ।

—শেফালী, চল একটু ঘুরে আসি। গঙ্গার ধারে খানিকটা বেড়ালে...। বলে বিনয় শেফালীর পিছনে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত কী ভেবে দু'হাত দিয়ে শেফালীর গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর মুখ নীচু করে চুমু খেতে গেল। শেফালী ছটফট করে ওঠে। সমস্ত শরীর বেঁকে দুমড়ে যায়। এক ঝটকায় সরিয়ে দেয় বিনয়কে। তারপর দু'হাত দিয়ে স্খলিত চুল ঠিকঠাক করে কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

পরের দিন সকালে তানিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয় মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তানিয়া যেন ভোরের তাজা ফুলের সুবাস নিয়ে ঘরে ঢোকে। ওর দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না বিনয়। ভয় হয়। কখন পদস্খলন ঘটে কে বলতে পারে!

আর একটা ব্যাপার দেখে মনে মনে বিনয় হাসে। যতক্ষণ সে তানিয়াকে পড়ায়, বারবার বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করবে শেফালী। সব সময় দৃষ্টি এদিকে। কখনও খবরের কাগজ হাতে করে ঘরে ঢুকে মেঝেয় উবু হয়ে বসে থাকে। ব্যাপারটা কী? তুমি কী ভেবেছ শেফালী আমি আমার সুদর্শনা ছাত্রীর প্রেমে পড়ে গেছি? ছি! শেফালী, তুমিও তো শিক্ষিকা। বোঝা যাচ্ছে আমার ওপর কোন বিশ্বাস নেই।

তানিয়ার চাপল্য একটু বেশি। পড়ার সময় অন্য প্রসঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ প্রশ্ন করে। ফলে বিনয় বিব্রত হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবে, এসব প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু তানিয়ার মুখের দিকে তাকালে, কী সরল আর নিষ্পাপ, সব ভুলে যায় সে। আর তিরস্কার করতে পারে না।

—স্যার, আর পড়তে ভাল লাগছে না। আপনি একটা গল্প বলুন না।

বিনয় পলকে বারান্দার দিকে তাকাল। ঐ যে গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রান্নাঘরে শেফালী। ওকি! মেয়েটা খুক খুক করে হাসছে কেন। গল্প শুনতে চায়। ওকে যেন মাস্টার হিসেবে সমীহই করে না।

—পড়ার সময় গল্প নয়। তানিয়া, তুমি আজকাল আমার কথা শুনছ না। তোমার দাদাকে কী কথাটা জানাব?

—না! তানিয়ার চোখমুখে একটা ভয়ের ছায়া খেলে বেড়ায়, দাদা শুনলে আমাকে মেরে ফেলবে। জানেন স্যার, দাদা কিন্তু সাংঘাতিক। পকেটে বোমা রেখে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে কোথাও যেতে দেয় না। সব সময় ঘরে বসে থাকতে কী ভাল লাগে!

—ঠিক আছে। তোমার দাদাকে কিছু জানাব না। এখন এই অঙ্কটা কর।

আজকাল তানিয়ার সামনে খুব সাবধানে থাকে বিনয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। হঠাৎ এমন সব কথা বলে যা শুনলে স্তম্ভিত হয়ে ওঠে বিনয়। ফ্যালফ্যাল করে তাকায় ছাত্রীর দিকে। সেই সঙ্গে দেখে নেয় আশেপাশে শেফালী আছে কিনা। শেফালীর কানে গেলে আর রক্ষে নেই! এমনিতেই তানিয়া সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করে। সেসব প্রশ্ন শুনলে যে-কোন নির্লজ্জ লোক ক্ষেপে উঠবে। কিন্তু বিনয় আশ্চর্যরকম শান্ত থাকে। সে ইদানীং ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে।

—অত হাসাহাসি, কী হচ্ছিল?

ভ্রূ কুঁচকে বিনয় শেফালীর দিকে তাকাল, হাসাহাসির কী দেখলে। তানিমা ওইরকম। বাচ্চা মেয়ে। একটু চাপল্য বেশি। বয়স হলে ঠিক হয়ে যাবে।

—বাচ্চাই বটে! শেফালী খুকখুক করে হাসে, ওর শাড়ি পরার কায়দা লক্ষ্য করেছো। আর হাঁটার ঢং। আমার হাতে পড়লে দুদিনে টিট করে ছাড়তুম। তোমার আবার ওর প্রতি একটু...।

—ছি। শত হলেও তানিমা ছাত্রী। ওকে নিয়ে এরকম ঠাট্টা করতে নেই।

—ইস! অত ছি ছি কিসের। তুমি বাপু একটু সাবধানে থেক। ওসব ছাত্রীটাত্রী আমার ঢের দেখা আছে। আমিও তো এক সময়ে তোমার ছাত্রী ছিলুম।

শেফালী মুখ টিপে হাসল, তুমি রাগ কর না। আমার ভয় হয়। আমি বখন এত করে বলছি ছেড়েই দাও না টিউশোনীটা।

—বাজে কথা রাখ। বিনয় ফস করে বলে উঠল, আমিও তো কতদিন বারণ করলুম রঞ্জনার সংগে মেলামেশা করতে। শুনেছো আমার কথা?

—বাঃ রঞ্জনার কথা উঠছে কোত্থেকে। বুঝতে পেরেছি। তুমি তানিমাকে আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে খাড়া করেছো। চমৎকার!

হো হো করে হাসল কিছুক্ষণ শেফালী। তারপর বিনয়কে দেখল অনেকক্ষণ। বিনয় মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। শেফালীর কথাবার্তা বাবহার রীতিমত অশালীন। ওর সংগে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। সে ঘড়ি দেখল। তারপর পা বাড়াল।

—শোন। আমি যদি রঞ্জনার সংগে মেলামেশা বন্ধ করি, তুমি টিউশোনীটা ছেড়ে দেবে?

—না। বিনয় দৃঢ়কণ্ঠে বলল, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কটা বাজে খেয়াল আছে। স্কুলে যাবে না? আমি চললুম চান করতে। বলে সে তাড়াতাড়ি বারান্দায় চলে এল। তারপর বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

স্কুলে অন্যমনস্কভাবে ক্লাশ নেয় বিনয়। অফ পিরিয়ডে টীচারর্স রুমে এক কোনে চুপচাপ বসে থাকে অন্যান্য শিক্ষকরা নানারকম আলোচনায় মেতে ওঠে। মাইনে বাড়ার প্রসংগ নিয়ে তুমুল তর্ক। আদিত্যের গলার স্বর সব থেকে উঁচুতে ওঠে। সেই ঘটনার পর থেকে পরস্পরের মধ্যে কথা বন্ধ। অন্যান্য শিক্ষকদের এড়িয়ে চলে বিনয়। এদের সম্পর্কে আর সে শ্রদ্ধাপোষণ করে না। এদের কোনরকম আদর্শ নেই। পরশ্রীকাতরতা আর কূট দলাদলি।

টিফিনের পর শুধু একটা পিরিয়ড। কোনরকমে ক্লাসটা নিয়ে বিনয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাড়াতাড়ি সে একটা রিকশায় চেপে স্টেশনে চলে এল। লাল বাক্স বিছানো প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে লোক। রোজ ভীড় ঠেলে যাতায়াত। এ লাইনে ভীড়টা একটু বেশি। বাসে ভাড়া বেশি। সময় লাগে অনেক। অতএব ট্রেনের ওপর সবার ভরসা।

হাতে বইখাতা নিয়ে কয়েকটা ছেলে জটলা করছে। প্রত্যেকের মুখে সিগারেট। বিনয় সেদিকে তাকাল না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে গেল অনেকটা। বলা যায় না ওদের মধ্যে তার স্কুলের ছাত্র থাকতে পারে। মুখোমুখি হলে উভয়েরই লজ্জা।

বাড়ি ফিরে মার মুখোমুখি হল বিনয়। মা কোন কথা না বলে চলে যাচ্ছেন। আস্তে আস্তে তক্তপোষের ওপর গিয়ে বসলেন। সে আহত হল মনে মনে। ভালমন্দ একটা কথাও মা আজকাল জিজ্ঞেস করেন না।

জামাকাপড় ছেড়ে বিনয় মার পাশে বসল। নীহার এক পলক তাকালেন। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিলেন। দু'একবার ঠোঁট নড়ে উঠল। কিছু বল মা। চুপচাপ থেক না। অমন করে তাকিয়ো না। জানি, আমাদের ব্যবহারে তুমি প্রীত নও। তোমার দুঃখ বুঝতে পারি। আমরা কেউ সুবিচার করিনি তোমার প্রতি। এত আশা নিয়ে আমার বিয়ে দিয়েছিলে। কী হল? শেফালীর আচরণে তুমি মর্মাহত। একদিন বলেছিলে, শেফালী যে ঘরে যাবে, সে ঘর আলো হয়ে উঠবে! আজ কী মনে হয় তোমার?

—ওর খবর কিছু জানিস? নীহার চাপা গলায় বললেন, সব আমার ভাগ্য। আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু কামনা করছি! বিনু, কবে আমি মরবো বলতে পারিস?

—মা! চাপা আর্তনাদ করে উঠল বিনয়, ও কথা বল না। দিনদিন নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছ কেন? এভাবে আমাদের দূরে ঠেলে দিয়ো না।

নীহার কোন জবাব দিলেন না। মৃদু হাসলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। বিনয় ভাবল, মা যদি আগের মত হম্বিতম্বি করতেন, নিজের অধিকার খাটাতে চিৎকার, ঝগড়া; সেই তো স্বাভাবিক, তাহলে আর দুশ্চিন্তা থাকত না, নিজেকে সব সময় অপরাধী মনে হোত না! কিন্তু এই ছাড়া-ছাড়া ভাব, দূরে থেকে তাকিয়ে দেখা, অসহ্য নীরবতা আর মাঝে মাঝে দীন-দুঃখীর চেহারা নিয়ে সশব্দে দীর্ঘ নিঃশ্বাস; ফলে তার মাথা হেঁট হয়ে আসে, তাকাতে পারে না মার দিকে!

—আমি ওর কোন খবর রাখি না। বিনয় গম্ভীর মুখে বলল, ওর কথা ভুলে যাও মা।

—আমি তো চেষ্টা করি ভুলতে। পারি না! নীহার দুহাতে মুখ ঢাকলেন। বিনয় আস্তে আস্তে উঠে পড়ে। শোবার ঘরে চলে আসে। ভুলতে যদি না পার...একদিন মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ও কেন এমন হল! সেদিন চুপচাপ সরে গেছে। বলা যায় পালিয়ে গেছে। যেমন সে এখন পালিয়ে এল মার কাছ থেকে।

প্যাকেট খুলে বিনয় দেখল একটাও সিগারেট নেই। দূর ছাই! সে সবেগে প্যাকেটটা জানালা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। তারপর আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা গায়ে চাপিয়ে বারান্দায় এল। মা নীরবে কাঁদছেন। বড় কঠিন প্রশ্ন তুমি করেছ মা। কেন মীরার এমন হল...দরোজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। বিনয় তাড়াতাড়ি এগোয়। দরোজা খুলতেই তানিমাকে দেখল।

—তুমি! কী ব্যাপার? ভেতরে এসো। বিনয় একপাশে সরে দাঁড়াল।

—স্যার, দাদাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তানিমার মুখ কেমন যেন ফ্যাকাসে, মা কান্নাকাটি করছেন। বাবা অফিসে। আপনি একবার আমার সংগে চলুন।

—কোথায়? বিনয় মনে মনে রীতিমত বিরক্ত, পুলিশ কেন তোমার দাদাকে ধরল। কী করেছিল?

—কিছু না। কাল রাত্রে শোনেননি বোমার শব্দ। গংগার ধারে। দাদা ওর মধ্যে ছিল না। আজ সকালে মোড়ের চায়ের দোকান থেকে দাদাকে ধরে নিয়ে গেল।

বলতে বলতে তানিমার চোখমুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সে একটু এগিয়ে এসে বিনয়ের একটা হাত ধরে বলে, স্যার! আপনি দাদাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসুন।

বিনয় পিছন ফিরে তাকাল। মা এদিকে তাকিয়ে। সে খুব বিব্রত বোধ করল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখল। তেতলার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে কয়েক জোড়া কৌতূহলী চোখ এদিকে তাকিয়ে। এ কী বিড়ম্বনা! তানিমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে কী যেন খুঁজতে থাকে।

—এক মিনিট। আমি আসছি। বলে হাত ছাড়িয়ে ঘরে ফিরে দ্রুত শার্ট আর ট্রাউজার্স পরে নেয়। বারান্দায় পা দিয়ে মার দিকে তাকায়। মা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেন। এখন বোঝাবার সময় নেই।

—নিতাইবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। আমি থানায় যাচ্ছি।

বারান্দা পেরিয়ে বাইরে এল বিনয়। দরোজা ভেজিয়ে তানিমার পাশাপাশি সিঁড়ি ভেংগে নীচে নামতে থাকে। খিলখিল হাসির শব্দ। বিনয়ের কান গরম হয়ে ওঠে। সে কোনদিকে তাকাল না। বিশাল চাতাল পেরিয়ে রাস্তায় পা দিল।

হাঁটতে হাঁটতে বিনয় লুকিয়ে তানিমাকে দেখতে থাকে। তানিমার মুখে হাসি ছাড়া মানায় না। ওর বিশাল দুই চোখে শংকার ছায়া। রাজহাঁসের মত গ্রীবা মেলে হাঁটছে। একমনে কী যেন ভাবছে। বেচারী! বিনয় খানিকটা সহানুভূতি অনুভব করল ছাত্রীর জন্য। আর কোথাও না গিয়ে ওর কাছে ছুটে এসেছে। অতএব

কিছু একটা করতে হবে। যদিও এসব থানা পুলিশ সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। কতদূর কী করতে পারবে জানে না। চেষ্টা করতে হবে। নিতার জন্যে কিছু করা কুকর্মারি ব্যাপার। কিছু যদি না করে তাহলে মিছিমিছি ওকে ধরল কেন পুলিশ?

—মা আপনার কাছে যেতে বললেন। তানিমা হাত দিয়ে কপালের ওপর থেকে খুচরো কয়েকটা চুল পিছনে সরিয়ে দিল, স্যার একটা রিকশা ডাকুন। আর হাঁটতে পারছি না।

রিকশায় উঠে বিনয় যথাসম্ভব এক কোণে সরে বসার চেষ্টা করল। রিকশা-ওয়ালা পর্দা ফেলে দিতে গেলে সে নিষেধ করল। ট্রাম রাস্তা দিয়ে রিকশা ছুটতে থাকে। চেষ্টা করলে কী হবে তানিমার নরম বাহু মাংসল ঊরুর ছোঁয়া সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে। শিরশির করে ওঠে সর্বশরীর। তানিমা অন্যদিকে তাকিয়ে। বিনয় নিজেকে তিরস্কার করল মনে মনে। ছিঃ! পাপ তোমার মনে। ফুলের মত নিষ্পাপ একটি মেয়ে। কী পবিত্র মুখের চেহারা! ভুলে যেও না তোমার ছাত্রী। সংযত হও।

—তুমি না এলেই পারতে। বিনয় মৃদু স্বরে বলল, বুঝলে তানিমা, আমি চেষ্টা করব। তবে কী জান, তোমার দাদার...। সে মুখ ফুটে বাকী কথা বলতে পারল না। তানিমা ঠিক বুঝতে পারবে। বোঝা উচিত।

—দাদা আগে এমন ছিল না। দলে পড়ে বিগড়ে গেল। জানেন স্যার, আমাদের কত আত্মীয় স্বজন রয়েছে, কেউ খোঁজ-খবর নেয় না। দাদাকে ঘেন্না করে সবাই।

থানার সামনে রিকশা ছেড়ে দেয় বিনয়। তানিমা পয়সা দিতে গেলে সস্নেহে ওকে মৃদু ধমক দিয়ে নিজেই ভাড়া দেয়। তারপর থানার ভিতর ঢোকে। টেবিলের সামনে সুদর্শন এক যুবক বসে। বেশ স্মার্ট চেহারা। সাব-ইন্সপেক্টার হবে।

—বসুন। কী ব্যাপার বলুন তো?

—বস তানিমা। বিনয় তরুণ ইন্সপেক-টরের দিকে তাকিয়ে বলে, নৃত্য মুখার্জিকে আপনারা ধরে এনেছেন। তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ জানতে পারি?

—জেনে কোন লাভ নেই। ইন্সপেক্টর বক-বক তানিমার দিকে তাকায়, এবার এক বছরের জন্যে বাছাধনকে ভেতরে থাকতে হবে। অভিযোগ কী একটা-দুটো মশাই। সাংঘাতিক ক্রিমিনাল। আসামীকে কাল সকালেই কোর্টে চালান করতে হবে।

—ওর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি? বিনয় বিনীত সুরে বলে, মাত্র কয়েক মিনিট কথা বলবো। বলে সে তানিমার দিকে তাকাল। তানিমার দু'চোখ ছলছলে। এক পলক বিনয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করল।

ইন্সপেক্টর একজন সেপাইকে ডেকে নীচু গলায় কিছু কথা বলল। তারপর জানাল, ওরা আসামীর সঙ্গে দেখা করতে পারে। তবে কথাবার্তা সংক্ষেপে সারতে হবে।

সেপাইর সঙ্গে ওরা লক-আপ-এর সামনে এসে দাঁড়াল। নিতা ওদের দেখে লোহার গরাদে দু'হাত চেপে উত্তেজিত স্বরে বলল, বিনয়বাবু আপনি! তানিমা তুই কেন এখানে এসেছিস?

—দাদা! তানিমা প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ল, মা সারাদিন খায়নি। শুধু কাঁদছে।

—চুপ কর। নিতা গর্জে ওঠে, আমি জানি কোন শালা আমাকে ল্যাং মেরেছে। আগে বেরিয়ে আসি। নিতা মুখার্জি এর বদলা নেবে।

বিনয় নিতার দু'হাত চেপে ধরল, উত্তেজিত হবেন না। আগের কথা ছেড়ে দিন। এবার কী করেছিলেন?

—বিশ্বাস করুন বিনয়বাবু। নিতা হঠাৎ নিবে যায়, মাইরি কালা পেটো চার্জ করল—সকালবেলায় ধরল আমাকে। আমার নামে ডায়েরী হয়েছে। দুনম্বর জিনিষ চুরি, বোমাবাজি, মেয়েদের পেছনে লাগা, আরও কত কী! আমি তো এবার কিছু করিনি। মিছিমিছি আমাকে ধরল কেন?

—আপনার জানাশুনো উকিল আছে? বিনয় মনে মনে বিশ্বাস করতে পারছিল না নিতার কথা। যাই হোক, ওকে বের করে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। ইস্ তানিমার বিশাল দুই ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে তার মন খারাপ হয়ে ওঠে। কী করুণ তাকানোর ভঙ্গি!

—একটা সিগারেট দেবেন মাস্টারমশাই। নিতা বিনয়ের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে দেশলাই জেলে ধরায়। চুপচাপ সিগারেট টানল কিছুক্ষণ। ওদিকে সিপাই এসে উপস্থিত। বিনয় অধৈর্য হয়ে ওঠে।

—তাড়াতাড়ি বলুন। চেনা উকিল থাকলে সুবিধে হবে।

—আছে। তবে আপনাকে যেতে হবে না। টাকা কোথায়? অনাথার দু-একজন বন্ধু-বান্ধব আসে। এবার কোন শালার পাত্তা দেখছি না। সব শালা নেমকহারাম! এই তানিকা। তুই কাঁদছিস কেন? বিনয়বাবু আপনি ওকে নিয়ে চলে যান।

তানিমা কান্না-বিকৃত স্বরে বলে, দাদা তোমার তো চেনা উকিল আছে। হরিহর-বাবুর কাছে আমি মাস্টার মশাইকে নিয়ে যাব। তুমি আমাদের কথা কিছু ভেব না। তোমার জন্যে আমরা আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারি না।

নিতা হো-হো করে হেসে উঠল। সেপাই তাড়া দেয়। বিনয় নিতার অট্টহাসি দেখে অনেকটা বিব্রত। সে তানিমার হাত ধরে মৃদু টান দিল, চল। ছিঃ! চোখ মুছে নাও। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

ওরা বাইরে চলে আসে। ওদের দিকে তাকিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর মৃদু হাসল।

রাস্তায় ওরা পাশাপাশি চুপচাপ হেঁটে চলে। বিনয় ভাবতে থাকে নিতাকে কী করে বের করবে। কার সঙ্গে আলাপ করবে? কারু মুখ মনে পড়ছে না। একজন ছিল। হ্যাঁ, মন্টুদা। কিন্তু তার কাছে সে যাবে না। তানিমার দিকে তাকাল। চোখমুখ অনেকটা ফোলা।

ফেরার সময় ট্যাক্সী নিল বিনয়। তানিমা চুপচাপ। শুধু মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছিল। সে কোন কথা বলল না। একবার তানিমার কাঁধে হাত দিয়ে মৃদু চাপ দিল।

—স্যার! মাকে কী বলবো? তানিমা সরে এল অনেকটা। বিনয় ওর একটা হাত মুঠোয় চেপে নীরবে হাসল। তানিমার হাত মৃদু কাঁপছে। সেই সঙ্গে সর্বশরীর।

বাড়ির কাছে ট্যাক্সী থামলে ভাড়া মিটিয়ে বিনয় বলে, তুমি বাড়ী যাও। হরিহর উকিলের বাসাটা চেন তুমি?

গলিতে গ্যাসের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। একঝলক শীতল বাতাস ধাক্কা মারে ওদের। বিনয় সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাল। অনেক দূর থেকে সম্মিলিত চীৎকার ভেসে আসছে।

—এখন যাবেন না স্যার? তানিমার চোখমুখ সহসা উজ্জ্বল দেখাল, চলুন না। আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

—তোমার যেতে হবে না। ঠিকানাটা বল। তুমি বাড়ি যাও। মাকে বুঝিয়ে বলবে চিন্তার কিছু নেই।

তানিমা যেন অনিচ্ছার সঙ্গে চলে যায়। বিনয় আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতর ঢুকল। কাল সকালে উকিলের কাছে গেলেই চলবে। উকিলকে নিয়ে সোজা চলে যাবে কোর্টে। যেমন করে হোক জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভেজানো দরজা ঠেলে বিনয় বারান্দায় পা দিল। মা রান্নাঘরে। শেফালী এখনও ফেরেনি তাহলে। শোবার ঘরে ঢুকে সোজা বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর দু'চোখ বন্ধ। গলিতে অনেক লোকের চিৎকার। ব্যাপারটা কী? হ্যাঁ, সামনে নির্বাচন। মিছিল বের হয়েছে।

ঘুম আসছে তার। একটা মুখ ভাসছে। পাকা ফল। কমনীয়। হাত বাড়িয়ে দিল। নাক দিয়ে হাত কামড়ে ধরল একটা শৃগাল। রক্ত ঝরছে। আর একটা মুখ। ক্রূর হাসি। জ্বলন্ত দুটো চোখ। দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে।

(ক্রমশ)

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানের কথা

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর বন্ ক্লিনিকে ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রামের ফলাফল কম্পিউটারের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিখ্যাত সিমেন্স কোম্পানীর আবিষ্কৃত এই নতুন পদ্ধতি শুধু যে ডাক্তারদের অমূল্য সময় বাঁচাচ্ছে তা নয় রোগনির্ণয়ের নির্ভুলতা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাচ্ছে।

জীবজগতে আকারের ভিন্নতা

পৃথিবীর জীবজগতের ইতিহাসে যতো জীবের নাম পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে প্রকাণ্ড কোন্‌টি? মধ্য-জীবীয় যুগের ডাইনোসরাস? ব্রাকিও-সরাস? সরীসৃপ-শ্রেণীর এই জীবগুলোকে আমরা চোখে দেখিনি, কিন্তু ফসিলের চিহ্ন থেকে এই জীবগুলো সম্পর্কে যেমন যতো জানা গিয়েছে, তাতেই ছবিতে এদের সম্পূর্ণ চেহারাও কল্পনা করা যায়। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে গা শির শির করে। অনায়াসে মনে হতে পারে এদের চেয়ে প্রকাণ্ড জীব আর সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু শুনলে অবাক হতে হবে যে, গোটা জীব-জগতের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রকাণ্ড জীব হচ্ছে নীল তিমি। এক-একটি নীল তিমির ওজন হতে পারে ১৩১ টন পর্যন্ত, দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার পর্যন্ত। নীল তিমি থাকে জলে। ডাঙায় ঘুরে চলে ফিরে বেড়ায় এমন ডাঙার জীবের পক্ষে এমন অতিকায় আকারবিশিষ্ট হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। ডাইনোসরাস অবশ্য ডাঙার জলা: ডাঙার পরিবেশেও ছিল। ভিন্ন ভিন্ন আকারের জীবের ওপরে পরিবেশের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। সবার আগে জীবের শরীরটি হওয়া চাই পরিবেশের উপযোগী। আফ্রিকার হাতির শরীরেও পরিবেশের উপযোগী আয়োজনটি দেখতে পাওয়া যায়।

ঠাণ্ডা জলের মাছের শরীর হয় গরম জলের মাছের শরীরের চেয়ে বড়ো ও অপেক্ষাকৃত জটিলতাবিশিষ্ট। উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শরীরের আয়তনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক, বিশেষ করে ডাঙার জীবের ক্ষেত্রে। একটি জীবের যতো বড়ো শরীর তার ভিতরের অংশও ততো গরম থাকে। সম্ভবত এই কারণেই মেরুপ্রান্ত ও আধা-মেরুপ্রান্ত অঞ্চলের জীব যেমন শ্বেত ভালুক ইত্যাদি জীবের শরীর এত মোটা ও বড়। অন্যদিকে উত্তর মেরু অঞ্চলের স্তন্যপায়ী জীবেরা হয়ে থাকে ছোটো পা ও ছোটোখাটো শরীরবিশিষ্ট। যেমন উত্তর মেরু অঞ্চলের গন্ধষাঁড়ের পা এত ছোট যে, নড়াচড়া অবস্থাতেও এই জীবটির উচ্চতা এক মিটারের বেশি হয় না, যদিও লম্বায় প্রায় আড়াই মিটার। জীবটির ঘাড় মোটা, তেমনি খুবই ছোট আর কানদুটো শরীরের ঘন লোমে ঢাকা। এমনি সবটাই লক্ষ্য করা যেতে পারে বিশেষ বিশেষ জলবায়ুর জীবের শরীরেরও বিশেষ বিশেষ আকারে। জল-হাওয়ার সঙ্গে জীবের শরীরের বিশেষ আকার গড়ে ওঠার নিয়মটি প্রথম সূত্রবদ্ধ করেন একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী, নাম জে এ অ্যালেন।

শীতের এলাকার উষ্ণশোণিতবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীর অপেক্ষাকৃত বড়ো হয়ে থাকে। ফলে এমন জীবের শরীরের বাইরের দিক হয়ে পড়ে তুলনামূলক বিচারে ছোট। জলহাওয়ার সংস্পর্শে আসে শরীরের এই বাইরের দিকটাই। তা যতো ছোট, উত্তাপ হারাবার সম্ভাবনাও ততো কম। এক্ষেত্রে তুলনাটা করা হচ্ছে ঠিক অঞ্চলের একই জাতের জীবের সঙ্গে। তবে আফ্রিকার হাতি যেন হল একটি ব্যতিক্রম। আফ্রিকার হাতির শরীরটিও প্রকাণ্ড কিন্তু সে তুলনায় তার বাইরের দিকটি কিন্তু তেমন বড়ো নয়। আফ্রিকার একটি হাতির ওজন দশ লক্ষ ইঁদুরের ওজনের সমান কিন্তু আফ্রিকার একটি হাতির শরীরের বাইরের দিক মাত্র এককোটি ইঁদুরের বাইরের দিকের সমান। আবার আফ্রিকার হাতির শরীরের বাইরের দিকের হিসেবে এক-তৃতীয়াংশে স্থান জুড়েছে বড়ো দুটি কানের। এই কানে রক্তের সঞ্চালন খুবই উঁচু মাত্রায়, ফলে এই কানদুটো দিয়েই বেশ খানিকটা পরিমাণ উত্তাপের বিকীরণ ঘটে, যার ফলে শরীর ঠাণ্ডা হয়।

জীবজগতের দিকে তাকালে এমনি কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ সহজেই চোখে পড়তে পারে। গ্রীষ্ম অঞ্চলের ঘন অরণ্যের স্তন্যপায়ীরা খোলা এলাকার স্বজাতিদের চেয়ে আকারে ছোট। যেমন, ঘন অরণ্যের হাতি ও ঘন অরণ্যের মহিষ। খোলা এলাকার হাতি ও মহিষের চেয়ে এরা আকারে ছোট। ঘন অরণ্যের হাতির দাঁত ও কানও ছোট।

ডাইনোসরাস বা অন্য যে-সমস্ত অতিকায় সরীসৃপ জীবজগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের কারও ওজনই ৫০ টনের বেশি ছিল না। (নীল তিমির ওজনের

অর্ধেকেরও কম)। আফ্রিকার একটি হাতির ওজন প্রায় সাত টন। অ-মেরুদণ্ডী জীবদের মধ্যে একজাতীয় কাট্‌লফিশের ওজন হয়ে থাকে তিন টন পর্যন্ত, একজাতীয় কাঁকড়ার ৩০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত। ডাঙার সবচেয়ে ভারী অ-মেরুদণ্ডী জীব হচ্ছে শামুক ও কেঁচো—ওজন এক থেকে চার কিলোগ্রাম পর্যন্ত। সবচেয়ে বড়ো ফিতে-কৃমির (২০ মিটার লম্বা) ওজন হতে পারে এক কিলোগ্রাম।

কীটপতঙ্গ ও মাকড়সার ওজন কখনো ১০০ গ্রামের বেশি হয় না, যদিও এমন পোকার সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে যারা আকারে বেশ বড়ো (লম্বায় ১০ সে. মি, চওড়ায় ৫ সে. মি.), এমন প্রজাপতির যারা ডানা ছড়ালে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মাপ ৩০ সেন্টিমিটারেরও বেশি। আবার বোলতা ও পোকাদের মধ্যে এমন সবও আছে যারা লম্বায় সিকি মিলিমিটারেরও কম। ওজনও যৎসামান্য। পিঁপড়েরা লম্বায় দেড় সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে কিন্তু তাদের ওজন এক গ্রামেরও কম। পিঁপড়েদের একটি বাসায় দশ লাখের মতো পিঁপড়ে থাকতে পারে কিন্তু সব মিলিয়ে তাদের ওজন একজন বড়ো মাপের মানুষের বেশি নয়। মাঝারি আকারের তিনটি মাছির ওজন এক মিলিগ্রাম। অর্থাৎ, তিন হাজার মাছির মোট ওজন হতে পারে এক গ্রাম।

জীবজগতে প্রধানত দু-ধরনের কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়। এই কঙ্কালের ওপরেই অনেকটা নির্ভর করে জীবের ওজন। পোকামাকড়, মাকড়সা, ঝিনুক, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি সন্ধিপদ জীবের কঙ্কাল থাকে বাইরের দিকে, কিন্তু মেরুদণ্ডী জীবদের কঙ্কাল ভিতরের দিকে। বাইরের দিকের কঙ্কালের চেহারা সাধারণত হয়ে থাকে নলের মতো। অপেক্ষাকৃত ছোট জীবদের শরীরে এই কঙ্কাল থাকাই সুবিধের, আর বড়ো আকারের জীবদের শরীরে নিরেট হাড়। একটি নলকে বাঁকানো বা দুমড়ানো খুবই শক্ত। সামান্য যে শক্ত তাকেও ভাঙতে হলে বেশি আকর্ষণ জোর লাগে। আবার নল যদি একটি বিশেষ মাপের চেয়ে বড়ো হয়, তাহলে তার ওজনও বেখাপ্পা রকমের বেশি। নলাকার

দাম চড়া লাগছে ?

আমাদের জানান

আমরা অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দরদাম নিয়ন্ত্রণ করি সাধারণতঃ উৎপাদনের পর্যায়ে, কিংবা কখনও বা, বণ্টনের পর্যায়ে। যদি কোনও জিনিষের দাম চড়া ব'লে বোধ হয় কিংবা যোগান কম হচ্ছে ব'লে মনে হয় তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের খবর দিন।

অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মধ্যে পড়ে

১। খাদ্যশস্য
২। চিনি
৩। বনস্পতি ঘী ও তেল
৪। কেরোসীন তেল
৫। কাগজ
৬। ড্রাগ জাতীয় ওষুধ
৭। বেবীফুড
৮। সাবান
৯। টায়ার ও টিউব
১০। টর্চের সেল বা ব্যাটারী ও অন্যান্য

১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যক পণ্য বিধির আওতায় মোট ৫৭টি সামগ্রী ধরা হয়েছে।

সিভিল সাপ্লাইজ অর্গ্যানাইজেশন,
ডিপার্টমেন্ট অফ 'আই' 'ডি' অ্যান্ড 'আই' 'টী'
(শিল্পোন্নয়ন ও অন্তর্বাণিজ্য বিভাগ),
রুম নং ৩০৬ ও ৩১০, 'বি' উইং,
শাস্ত্রী ভবন, নিউদিল্লী।

ডিএভিপি ৭০/৭৫১

গড়ন তৈরি রাখার জন্যে খুবই কাজের। তবে এজন্যে শরীরের মধ্যে বড়ো বেশি ওজন বহন করবার উপযোগী আয়োজন থাকা দরকার।

সন্ধিপদ জীবদের মধ্যে যারা জলে থাকে, তাদের পক্ষে প্রকাণ্ড হতে কোনো বাধা নেই, কেননা জলে থাকার জন্যে তাদের শরীরের ওজন অনেকখানি কমে যায়। অধুনালুপ্ত ইউরিপটেরিডা (একালের বিছের সঙ্গে দূর-সম্পর্কিত) ছিল প্রকাণ্ড আকারের জীব (লম্বায় ১-৮ মিটারেরও বেশি)। একালের কোনো কোনো চিংড়ি আরো লম্বা হয়ে থাকে। তিন মিটার লম্বা ঠ্যাংবিশিষ্ট কাঁকড়াও দেখতে পাওয়া যায়। জীবের আকার কতখানি হবে তা একমাত্র বাইরের শক্ত খোলাটির ওজনের ওপরেই নির্ভর করে না। খোলাবিশিষ্ট জীবদের বাইরের খোলা ভারী, কেননা হাড়ের মতো এই খোলাতেও মজুদ থাকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম। জলের তলদেশে যেসব জীব থাকে, তাদের পক্ষে খোলার এই ওজন থাকাটা বিশেষ সুবিধেরও। কিন্তু ডাঙার সন্ধিপদের (বিছে কীট ইত্যাদি) শক্ত বা ওপরের পাতলা চাম শক্ত হয় যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তার নাম স্ক্লেরোটাইজেশন— যে প্রক্রিয়ায় চামড়া ট্যান করা হয় এও অনেকটা তাই। এ-কারণে এই আবরণী হয়ে থাকে, যেমন শক্ত ও মজবুত, তেমনি হাল্কা।

বড়ো আকারের প্রাণীদের বেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে মাধ্যাকর্ষণ। সকলেই জানেন, সম্পূর্ণ বায়ুহীন স্থানে ছোট-বড়ো সকল বস্তুই নিচে পড়ে সমান দ্রুতবেগে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বায়ুহীন স্থানে একটি পাখির পালক ও একটি লোহার বল নিচে পড়ে একই ভাবে ও একই সময়ে। কিন্তু বাতাসের বাধা যদি থাকে, তাহলে আর এই ব্যাপারটি ঘটতে পারে না। বাতাসের বাধা থাকে বলেই পাখির পালকের নিচে পড়তে সময় লেগে যায় অনেক বেশি। মনে করা যাক একটি গভীর খনির গহ্বর দিয়ে একটি ইঁদুর, একটি বেড়াল, একটি কুকুর ও একটি মানুষকে ফেলে দেওয়া হল। ইঁদুর বেঁচে যাবে, কুকুর ও বেড়াল মরবে, মানুষ মরবে তো বটেই উপরন্তু তার শরীর থেঁতলে তালগোল পাকিয়ে যাবে। জীব যতো ছোট মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা তার ততো বেশি।

এ-কারণে পাখির শরীর খুব একটা বড়ো হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। শরীর যতো বড়ো, মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ার জন্যে মাংসপেশীর ক্ষমতা চাই ততো বেশি। মাংসপেশীর ক্ষমতা বেশি হয় যদি মাংসপেশীর আকার হয় আরো বড়ো। তার মানে, আরো বেশি ওজন। ব্যাপারটা একটা দুষ্টচক্রের মতো। শকুনজাতীয় বড়ো বড়ো পাখিরা অধিকাংশ সময় কাটায় উঁচু আকাশে পা ভাসিয়ে। আকাশে তারা ওড়ে পাহাড় বা গাছের চুড়ো থেকে। সরাসরি মাটি থেকে আকাশে উড়তে হলে গোড়ায় একটা দৌড় লাগায়, তারপরে লাফ দিয়ে হাওয়ায় গা ভাসায়। রূপকথার পরীরা কল্পনার জগতেই উড়তে পারে, বাস্তবে নয়। স্বাভাবিক আকারের একটি পরীকে আকাশে উড়তে হলে যতোখানি জোরে ডানা নাড়তে হবে, সে-জোর পেতে হলে তার বুকের হাড় ও বুকের মাংসপেশী আরো অন্তত দেড় মিটারের মতো সামনের দিকে বেড়ে থাকা উচিত। পরীদের কথা থাক, এমনকি পাখির রাজ্যেও দেখা যায় পাখি আকারে বড়ো হলে পর আর ওড়ার ক্ষমতা থাকে না। যেমন, উটপাখি। অতীতে একসময়ে সরীসৃপরা আকাশে উড়ে বেড়াত। ফসিলের নিদর্শন থেকে জানা যায় কোনো কোনো উড়ন্ত সরীসৃপের আকার হত বেশ বড়ো, অথচ বুকের হাড় তেমন বড়ো মাপের ছিল না। তবে এই উড়ন্ত সরীসৃপরা যখন ডানা ছড়াত তখন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ডানার মাপ হত ৬ মিটারেরও বেশি। সে-তুলনায় শরীরটা ছিল ছোট। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই উড়ন্ত সরীসৃপরা পাহাড়ের চুড়ো থেকে ঝাঁপ দিয়ে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে বেড়াত শুধু, সত্যিকারের অর্থে উড়তে পারত না।

দ্বীপের পাখিরা, যেখানে শত্রুর ভয় নেই, সাধারণত বড়ো হয়ে থাকে। এই পাখিরা আকাশে ওড়ে না, মাটিতেই চলাফেরা করে। ছোট যে-সব পাখি দ্বীপে থাকে, জনপদের এলাকার তাদের স্বজাতিদের চেয়ে তারা হয় আকারে বড়ো। অন্যান্য অনেক জীবের বেলাতেও এই একই লক্ষণ। সবচেয়ে বড়ো কচ্ছপ পাওয়া যায় গালাপাগোস দ্বীপে ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে। আবার অনেক সময়ে দেখা যায়, ছোট আকার বিশিষ্ট হওয়াটাও দ্বীপের জীবের বিশেষ লক্ষণ।

ডাঙার জীবের শরীরে বড়ো হওয়ার একটা সীমা আছে। সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে ডাঙার জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ডাঙার জীবের শরীরের ওজন বহন করে তার পা। এই ওজন একটা বিশেষ মাত্রার চেয়েও বেশি হয়ে গেলে পায়ের জোরে আর কুলোয় না, শরীরের ওজনেই পা ভেঙে যায়।

এক সময়ে মনে করা হত, ডাইনোসরদের শরীরের ওজন এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে তারা আর ডাঙায় চলাফেরা করতে পারত না, জলই ছিল তাদের আশ্রয়। পরে অবশ্য এই ধারণা পাল্টাবার কারণ ঘটেছে। তবে একথা ঠিক যে ব্রন্টোসরাস ছিল (ওজন প্রায় ৩৮ টন) ডাঙার জীব আর ব্রাকিওসরাস (ওজন প্রায় ৫০ টন) জলের। ব্রাকিওসরাসের নাকের ফুটো ছিল মাথার ওপরে, ঘাড় ছিল লম্বা। নাকের ফুটো জলের ওপরে ভাসিয়ে রাখতে এই জীবটির অসুবিধে হত না।

জলে থাকার দরুণ জলের জীবের শরীর হালকা হয়ে যায়। ফলে জলের জীবের শরীর অতিমাত্রায় বড়ো হয়ে গেলেও কোনো অসুবিধে হয় না। একজাতীয় কাটলফিশের ওজন হয়ে থাকে ৩০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত, দৈর্ঘ্য ১৫-মিটার পর্যন্ত। জেলিফিশ পাওয়া যেতে পারে ৫০০ কিলোগ্রাম ওজন পর্যন্ত।

তবে জলের জীবের শরীর বড়ো হওয়ারও সীমা আছে। বড়ো শরীরের জন্য চাই বড়ো মাপের ফুসফুস অন্ত্র কিডনি ইত্যাদি। কিন্তু শরীরটা বড়ো হয়ে গেলে এই প্রত্যঙ্গগুলো হয়ে যায় তুলনামূলক বিচারে ছোট। রক্তের লাল কণিকার পক্ষেও কোষের মাত্রার সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আপেক্ষিক অনুপাতের এই ব্যাপারটি বিশেষ করে চোখে পড়ে চোখের মাপে। হাতি বা তিমির চোখ শরীরের তুলনায় খুবই ছোট। কিন্তু এক্ষেত্রে বড়ো হলেও দৃষ্টিশক্তিতে উন্নতি ঘটত না।

শরীরের আকার শেষপর্যন্ত যে সীমা ছাড়িয়ে যায় না তার কারণ সম্ভবত খাদ্যের যোগান। আনুপাতিক বিচারে ছোট আকারের জীবদের চেয়ে বড়ো আকারের জীবদের খাদ্যের প্রয়োজন কম। কিন্তু কম হলেও বড়ো আকারের জীবদের বেশি পরিমাণ খাদ্য খেতেই হয়। জীবজগতের সবচেয়ে বড়ো জীব নীল তিমির কথাই ধরা যাক। নীল তিমির খাদ্য হচ্ছে প্ল্যাংকটন। সমুদ্রের জলে ভেসে চলা এই জীবটি প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। নীল তিমির খাদ্যের যোগানে কখনো ঘাটতি পড়েনি। সে-জায়গায় শিকারী তিমির পেট মাত্র সাত মিটার লম্বা, কিন্তু দেখা গিয়েছে তারই মধ্যে ঠাঁই হয়েছে ১৩টি শুশুকের ও ১৪টি সীল মাছের। এ থেকেই বোঝা যায় ৩০ মিটার লম্বা নীল তিমি যদি মাংসাশী হত তাহলে তার খাদ্যের যোগান কিছুতেই বজায় থাকতে পারত না।

তাহলেও আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো আকারের যে-সব জীবের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার সবই জলের।

টিঁকে থাকার ব্যাপারে বড়ো আকারের জীবদের সুবিধে বেশি। তারা অপেক্ষাকৃত সহজে শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে। কেননা তাদের শরীরটা বড়ো, ফলে জলহাওয়ার সংস্পর্শে থাকা তাদের শরীরের বাইরের দিক তুলনামূলক বিচারে ছোট। ফলে শরীরের উত্তাপ খোয়া যায় কম। কিন্তু একটা ইঁদুরের বা পাখির শরীর ছোট, সে-তুলনায় তার শরীরের বাইরের দিক বড়ো, ফলে উত্তাপ খোয়া যায় বেশি। এ-কারণে ছোট আকারের জীবরা সামান্য শীতেই কাবু হয়ে পড়ে।

ডাইনোসররা দশ কোটি বছর সাফল্যের সঙ্গে টিঁকে থাকার পরেও একসময়ে সবসুদ্ধ মারা পড়েছে তার কারণও সম্ভবত শরীরের উত্তাপ বজায় না রাখতে পারার ক্ষমতা। যতোখানি শীত তারা সহ্য করতে পারত তার চেয়েও বেশি শীত শুরু হয়েছিল। তারা না পারত শরীরে উত্তাপ জমা রাখতে না পারত হাইবারনেট করতে বা জড় অবস্থায় শীত কাটাতে। ঠান্ডা রক্তের জীব কুমিররা বেঁচে গিয়েছিল, অন্যান্য সরীসৃপেরাও, কিন্তু ডাইনোসররা বাঁচতে পারেনি।

—আনন্দকান্ত

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

কাশ্মীরের মেয়ে

অঙ্গনা

নির্বাচন ও সমানাধিকার

জল ছিল, অনেক অজানা ভানা বিস্তার করে ভীতির পরিবেশও সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কোন কিছুতেই কুলোয়নি। সব জয় করা হয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে মুখ্যত অকুতোভয় মহিলা ভোটারদের জন্যই। সর্বত্র দলে দলে তাঁরা ভোট দিয়েছেন। আকাশবাণী এবং সংবাদপত্র এই খবরটি প্রচার সরব। ভোট-দাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি প্রায় সব জায়গাতেই চোখে পড়ার মতো। আগে কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ভোট দেবার ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখা যায়নি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় বর্ধমানের কথা। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বর্ধমানের মহারাণী। তখনও কিন্তু মহিলাদের মধ্যে এ ব্যাপারে এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়নি। মহিলাদের এত দীর্ঘ লাইন সেদিনও পড়েনি।

কলকাতাও পিছিয়ে ছিল না। মহিলা-দের ভিড় বেশির ভাগ ভোট কেন্দ্রেই চোখে পড়েছে। বোরখাপরিহিতা মহিলারাও এক ঘন্টা—দেড় ঘন্টা ঠায় লাইনে দাঁড়িয়ে কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ করেননি। ভোট দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। বয়সের ভার কোথাও ভোটদানে খুব একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অনেক বৃদ্ধাই ভোট দেবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। নাতি-নাতনির হাত ধরে তাঁরা ভোট কেন্দ্রে হাজির হয়েছেন।

অনেক জায়গায় তাঁরা বিপদকেও তুচ্ছ করেছেন। একটি বুথে বোমা পড়ায় একজন মহিলা আহত হন। পা দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে শুরু করে। ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবার জন্য সবাই তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু ভোট দিয়েই তবে তিনি যান ডাক্তারখানায়। আবার এক জায়গায় তিনজন মহিলা ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পথে বোমার ঘায়ে আহত হন। এরকম টুকরো-টুকরো ঘটনা অনেক। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে এবারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ভোটদানে মহিলাদের উৎসাহ। আর এই উৎসাহ কলকারখানা থেকে চা-বাগান পর্যন্ত একইরকম। কোথাও খুব একটা হেরফের নেই। চা-বাগান অঞ্চলে যাঁরা ভোট দেন তাঁদের মহিলাদের সংখ্যা ছিল প্রত্যেক বুথেই বেশি।

ভোট দেবার ব্যাপারে মহিলাদের উৎসাহ বেড়েছে। আর বেড়েছে মহিলা ভোটার সংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গে মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। তাই তাঁরা দলে দলে ভোট দিয়ে নিজেদের অধিকার বজায় রেখেছেন। কিন্তু তারপরের অবস্থা তাঁদের পক্ষে খুব একটা সন্তোষজনক নয়। বরং রীতিমতো হতাশাব্যঞ্জক। রাজ্যে মহিলা ভোটার বাড়া সত্ত্বেও লোকসভায় বা বিধানসভায় তাঁদের প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়েনি। এটা অবশ্য কাম্য নয় যে, আনু-পাতিক হারে মহিলাদের প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা থাকবে (যেমন কোন কোন দল চাকরির ব্যাপারে দাবি করছে।) সমানাধিকারসম্পন্ন এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সে ব্যবস্থা কোনদিনই চালু হতে পারে না। তবু নব-নির্বাচিত লোকসভা এবং বিধানসভার দিকে তাকিয়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বে কেমন হতাশা আসে।

লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি হচ্ছেন শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। পূর্ববর্তী লোকসভায় এই রাজ্য থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে-ছিলেন তিনজন মহিলা। এই সংখ্যাও এমন কিছু আহামরি নয়। তবু সেটা মন্দের ভালো। এবং আশা ছিল যে, ক্রমেই এই সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু তাতো হলোই না। উপরন্তু মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা হ্রাস পেল। এবারে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মোট নয়জন মহিলা। তার মধ্যে একমাত্র উনিই শিবরাত্রির সলতে।

. এ অবস্থা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়। সব রাজ্যের প্রায় একই হাল। আমাদের দুই প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা এবং আসামের অবস্থাও একইরকম। ওড়িশায় সব মহিলা প্রার্থীই হেরেছেন। লোকসভা তো দূরের কথা বিধানসভায় পর্যন্ত তাঁদের কোন প্রতিনিধি নেই। আবার আসামের কথা ধরা যাক। সে রাজ্যে কাছাড় থেকে নির্বাচিত একমাত্র মহিলা হলেন শ্রীমতী জোৎস্না চন্দ। লোকসভা সদস্য। এছাড়া আর কেউ নেই। অবশ্য সে রাজ্যে আমাদের মতো বিধানসভার নির্বাচন হয়নি। লোক-সভায় বিহারের মহিলা প্রতিনিধি একজন।

এতো গেল আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের কথা। একমাত্র দিল্লীর দিকে তাকালে কিছুটা স্বস্তি মেলে। সেখানে সাতজন প্রতিনিধির মধ্যে একজন হলেন মহিলা। শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী এবং মুকুল ব্যানার্জী এবারের নির্বাচনে দিল্লী থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে মহিলা প্রতিনিধির দিক দিয়ে দিল্লীর কোন ভূমিকাই ছিল না। যদিও দিল্লী আমাদের রাজধানী। সে কলঙ্ক এবার কিছুটা ঘুচলো।

নব-নির্বাচিত লোকসভার মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা সাকুল্যে জনা একুশ। দীর্ঘদিন যাঁরা লোকসভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই এবারের নির্বাচনে পরাস্ত। শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, ডঃ সুশীলা নায়ার, সারদা মুখার্জী এবং তারকেশ্বরী সিনহা-এসব দীর্ঘদিনের পার্লামেন্টারিয়ানদের কেউই এবার নির্বাচিত হতে পারেননি। এর ফলে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। আর একটা জিনিস লক্ষণীয়। এবারের লোকসভা নির্বাচনে তিনটি আসন দখল করেছেন রাজকুমারী এবং রাজমাতা। এঁরা নির্বাচিত হয়েছেন রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে। এ তবু মন্দের ভালো। লোকসভায় মহিলা সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো। আশা করা যায় যে, সর্বভারতীয় মহিলা স্বার্থ সংরক্ষণে এঁরা সবাই একজোট হয়ে লড়বেন।

এবার নজর দেয়া যাক আমাদের নব-নির্বাচিত রাজ্য বিধানসভার দিকে। ১৯৬৯ সালে এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন ১১ জন। এবারের নির্বাচনে সেই প্রার্থী সংখ্যাই কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৬ জনে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিনিধিত্বেও হেরফের হয়েছে। ১১ জন প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেবার সাতজন। এবার সেই সাত এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র পাঁচ-এ। সেই পাঁচজন হলেন শ্রীমতী অনিলা দেবী, গীতা মুখার্জী, প্রতিভা মুখার্জী, নিরুপমা চ্যাটার্জী এবং নন্দরাণী দল। এর বেশি প্রতিনিধি আর পাঠানো সম্ভব হয়নি। আরএকটা লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, বিগত বিধানসভায় মুস্লিম মহিলা প্রতিনিধিও ছিলেন। এবার আর তাও নেই। যদিও প্রার্থী ছিল।

প্রতিনিধিত্বের এই হতাশাব্যঞ্জক চিত্রের পরও কিন্তু মেনে নিতে হবে যে, মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে। আর শুধু তাই নয়, ভোট দেবার উৎসাহে তাঁরা পুরুষদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। সর্বোপরি আমাদের সান্ত্বনা যে ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। সুতরাং অধিক প্রতিনিধিত্বে আর প্রয়োজন কি?

সংবিধান আমাদের সমান অধিকার দিয়েছে। এজন্য আমাদের কোন লড়াই করতে হয়নি বা কোন মূল্যও দিতে হয়নি। অত্যন্ত সহজ পথে কাজটা হাসিল হয়ে গেছে। তাছাড়া এমন অনেক কিছুই আমরা

বাঙলার মেয়ে

সহজে পেয়ে গেছি। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বিদেশে রাষ্ট্রদূত হয়ে ছিলেন। সাধারণ পরিষদ রাষ্ট্রসংঘে তিনি সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের প্রধান-মন্ত্রী। তাই আমাদের আর কিছু ভাববার বা করবার নেই। হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা।

কিন্তু যেসব দেশে এত সহজে মহিলাদের সমানাধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মেলেনি তাঁদের তা আদায় করে নিতে হয়েছিল। এজন্য তাঁদের দীর্ঘদিন আন্দোলন করতে হয়েছিল। নানারকম বিদ্রূপ সমালোচনার এবং প্রচণ্ড বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কার্টুনিস্টরা মহিলাদের সমানাধিকার আন্দোলনকে কার্টুনে কত না ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু কোন কিছুতেই মহিলাদের সমানাধিকারের দাবীকে দাবানো যায়নি। দিনে দিনে সে দাবী জোরদার হয়েছিল। দলে দলে মহিলা এসে আন্দোলনকে জোরদার করেছিলেন। অবশেষে মহিলাদের ন্যায্য দাবী সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছিল। এই একই ইতিহাস ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং জার্মানীতে।

সাংবিধানিক সমানাধিকারের স্বীকৃতি তাঁরা আদায় করে নিয়েছেন। এরপরও কিন্তু তাঁরা থেমে থাকেননি। তাঁরা আরো এগিয়েছেন এবং এখনও এগোচ্ছেন। এবার তাঁদের আন্দোলন সাংবিধানিক সমানাধিকারের যথার্থ প্রয়োগ। শুধু ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচনে এ অধিকার পাওয়া যায় না। এই অধিকার চাই চাকরি-বাকরি এবং সর্বত্র। একই কাজে পুরুষ এবং মহিলার মাইনের কোন ফারাক করা চলবে না। সবাইকে সমান মাইনে দিতে হবে। পুরুষ বলে বিশেষ সুযোগ পাবে এমন হবে না। ইউরোপীয় মহিলাদের সমানাধিকারের আন্দোলন এগিয়ে চলেছে এই পথে।

সাংবিধানিক সমানাধিকার স্বীকৃত হলেও সার্বিকভাবে আমাদের জীবনে প্রয়োজন সক্রিয়তা। নব-নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা আমাদের এই পথের নিশানা দেবেন আশা করা যায়। —প্রমীলা

প্রেক্ষাগৃহ

যার যাতে মজে মন

পুরোনো ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস যদি রামী ধোপানীর প্রেমে অধীর হতে পারেন এবং রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায় বলে সগর্বে গাইতে পারেন তাহলে আর. ডি. বনশল প্রযোজিত বনশল রাজশ্রী প্রোডাকসন্স-এর 'চৈতালী' ছবির সুপুরুষ নায়ক সি-পি-ডবলু-ডি'র তরুণ ইঞ্জিনীয়ার অমিতাভ সেন যদি তার দুগ্ধ-সরবরাহকারিণী পাহাড়ী বস্তির নৃত্যগীত-পটিয়সী সুন্দরী নর্তকী লাজো ওরফে লাজবন্তীকে ভালোবেসে ফেলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। অমিতাভের জীবনে স্বপ্ন ছিল, সে একজন দক্ষ সংগীতশিল্পী হবে; কিন্তু গুরুজনদের ইচ্ছায় তাকে হতে হয়েছিল ইঞ্জিনীয়ার। তাই অবসর সময়ে সে বাঁশি বাজিয়ে নিজের শিল্পি-মনকে সান্ত্বনা দিত। যখন সে দেখল, লাজোর মধ্যে রয়েছে নৃত্যগীত সম্পর্কে সহজাত প্রতিভা, তখন সেই প্রতিভার বিকাশের পথে সাহায্য করে সে নিজের মনের চরিতার্থতা চাইল লোকে যেমন নিজের অপূর্ণ বাসনাকে নিজের ছেলে-মেয়ের মধ্যে রূপায়িত দেখতে চায়। কিন্তু ফুতীস নাকি নবাব সাহেব যখন প্রশ্ন তুললেন, লাজো কি অমিতাভের আপনজন, তখন অমিতাভ থমকে দাঁড়াল। তাইতো! লাজোর উপর তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এটা সে ধরে নিয়েছিল কি করে? সে সহসা আবিষ্কার করল, ইতিমধ্যেই হয়ত নিজেদের অজান্তেই ওরা দুজনে দুজনের কাছে নিকটতম হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের এই অনাবিল প্রেমের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াল কুমার সাহেব নামে একজন কুখ্যাত কন্ট্রাক্টর, যিনি নাকি তাঁর কাজ সম্বন্ধে সরেজমিন তদন্তের বিরোধী অর্থাৎ কিনা, চুক্তি অনুযায়ী কাজ হোক বা না-হোক,

আজকের জনপ্রিয় নায়িকা অপর্ণা সেন। ফটো : অমৃত

কাজ করার অছিলায় বিল করে টাকা নিতে চান। অমিতাভ তাঁর দাবি না মানায়, তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ান। কুচক্রী কুমারসাহেবের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করে কিভাবে অমিতাভ মিথ্যা কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে লাজোকে তার জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করেন, তাই নিয়েই ছবির উত্তেজনাপূর্ণ সোপান রচিত হয়েছে।

একটি কাহিনীকে পুস্তকাকারে পাঠ করলে পাঠকের মনে তার অন্তর্বর্তী কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি বা চরিত্র সম্পর্কে যে-সব প্রশ্নের উদয় হওয়া সম্ভব, সেই কাহিনীটিকেই চলচ্চিত্রাকারে দেখলে দর্শকের মনে সে-সব প্রশ্ন আদৌ না জাগতে পারে। ধরুন, আলোচ্য 'চৈতালী' ছবিতে নায়ক অমিতাভের মনে লাজোকে যথারীতি বিবাহ ক'রে জীবনসঙ্গিনী করার প্রশ্নটি। মুদ্রিত কাহিনীতে পড়লে ব্যাপারটির সম্ভাব্যতা নিয়ে পাঠকচিত্তে বহু আলোড়ন হতে পারত। কিন্তু ছবিতে যেই দেখা গেল, তরুণ ইঞ্জিনীয়ারটি বিশ্বজিৎ এবং সুন্দরী লাজো তনুজা ছাড়া আর কেউ নয়, অমনই ঐ ধরনের প্রশ্ন দর্শকের মনে উঁকিও মারতে পেল না। তেমনই ঐ কেতাদুরস্ত নবাব সাহেব। পুস্তকে ঐ চরিত্রকে স্থান দিতে হ'লে কাহিনীকারকে অনেক কথাই বলতে হ'ত; বলতে হ'ত : ভদ্রলোক নবাবসাহেব নামে পরিচিত হলেও ও'র নাম আসলে হচ্ছে অমুক চন্দ্র অমুক; ছেলেবেলায় লক্ষ্ণৌ শহরে নবাব পরিবারের মধ্যে মানুষ হওয়ায় উনি বাঙালী সন্তান হলেও যেমন হিন্দী, উর্দু, ফারসীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন, তেমনই অত্যন্ত আদবকায়দা দোরস্ত হয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ছবিতে যেই দেখা গেল, সুন্দর কেশ-শ্মশ্রু-বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি বসন্ত চৌধুরী অমনই চরিত্রটি সম্পর্কে আর কোনোও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হ'ল না। এই ধরনের আরও বহু প্রশ্ন আসতে পারে পাঠকের মনে চৈতালীর কাহিনী সম্পর্কে। কিন্তু ছবিতে ও-সব একেবারেই বাতিল। তবে ছবিটি একটি পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন জাগছে, সেটি না বাদ ক'রে পারছি না। যে-লাজোকে বাংলা লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্র ক'রে তোলবার জন্যে অমিতাভ তাকে 'বাঁশবনী' থেকে শহরে এনে গাড়িতে এনেছে, 'সুখপাখী ডাকছে গাছে' প্রভৃতি পড়াচ্ছে, সেই-লাজোকেই আমরা আগে গান গাইতে শুনি: সঁইয়া তুই, উবার মানে না। যে-মেয়ে 'সঁইয়া', 'ঝুমকা' প্রভৃতি কথা শুধু অনায়াসে উচ্চারণ করে, তাই নয়, তাদের অর্থ অনুধাবন ক'রে ভাবভঙ্গী সহকারে গান গায় ও নাচে, সেই মেয়ের ভালো ক'রে গান ও নাচ শেখার জন্যে অক্ষর পরিচয়ের কি প্রয়োজন, তা' আমাদের কে বলে দেবেন? কাহিনীকার, না পরিচালক? এবং এটুকুও আমরা না ব'লে পারছিনা যে, ছবিটি পুরোপুরি কল্পনাশ্রয়ী অবাস্তব প্রেমচিত্র, যা আজকের অতি-বাস্তবতার যুগে যখন হিন্দী ছায়াচিত্রজগতেও 'সমাজ কো বদল ডালো', 'চেতনা', 'পাপী' প্রভৃতি সমসাময়িক ছবির জন্ম হচ্ছে তখন—যথেষ্ট উপযোগী ব'লে বোধ নাও হ'তে পারে।

অভিনয়ে লাজোর ভূমিকায় তনুজা যথাসম্ভব প্রত্যয়গ্রাহ্য চরিত্রচিত্রণের প্রয়াস পেয়েছেন। নায়ক অমিতাভের ভূমিকায় বিশ্বজিৎও চরিত্রগত কর্তব্যনিষ্ঠা, অনুজার প্রেম ও বিশ্বাসের মুখে শৌর্য ও বিশ্বাস প্রভৃতিকে সুচারুরূপে পরিস্ফুট করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আশ্চর্য রোমান্টিক চরিত্র নবাব সাহেবরূপে বসন্ত চৌধুরী। ওঁর বচন, চলন এবং কথাভঙ্গী চরিত্রটিকে অসামান্য সুষমা ও মর্যাদায় মণ্ডিত করেছে। অপরাপর ভূমিকায় তরুণকুমার (বিশ্বভূষণ), মনমোহন (কুমার সাহেব), সুব্রত সেন (প্রসাদ), শৈলেন মুখোপাধ্যায় (নায়কের জামাইবাবু), জহর রায় (রামচরণ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। ওরও মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহার আলোকচিত্রগ্রহণ এবং কার্তিক বসুর শিল্পনির্দেশনা।

ছবির একটি বিশিষ্ট সম্পদরূপে পরিগণিত হওয়ার কথা ছিল বহুদিন বাদে বাংলা ছবিতে শচীন দেববর্মণের সঙ্গীত-পরিচালনা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আমরা আশাহত হয়েছি। ছবির মোট ছ'খানি পূর্ণাঙ্গ গানের মধ্যে তিনখানি গান হিন্দীতে রচিত। সেজন্যেই বাংলা ছবিতে বাংলা গানে-শচীন দেববর্মণকৃত সুরারোপের নতুন আস্বাদ অনেক খণ্ডিত। এবং বাংলা যে-তিনখানি পূর্ণাঙ্গ গান আছে, তার মধ্যে একমাত্র বাউলির সুরে কোন গান আছে সেজন্যই কিছুটা মাধুর্যের সন্ধান মেলে। অবশ্য ছবিটির শ্রেষ্ঠ গান হচ্ছে 'শাম ঢলে বিনে শাম'। সমগ্র ছবিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী এই মাত্র গানটি চমৎকার আবহ সৃষ্টি করেছে বসন্ত চৌধুরী ও তনুজার মুখাভিনয়সহ হয়ে।

শুভমুক্তি শুক্রবার, ২৬শে মার্চ !
নিছক প্রমোদোপকরণ না—আজকের বিক্ষুব্ধ বাঙলার নিখুঁত সমাজ দর্পণ...

বসুশ্রী-বাণী-মিত্রা-পদ্মশ্রী
অর্চনা : শ্যামাশ্রী : মায়া : শ্রেয় : শ্রীমা : শ্রীরামপুর
লিলি : নৈহাটী সিনেমা : চিত্রালয় (দুর্গাপুর)

সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত প্রেম-ধর্মী 'চৈতালী' চন্দ্রালোক দর্শকদের বিশেষ খুশী করবে।

হিপি মেলার সার্থক চিত্রায়ণ

উডস্টকের খোলা ময়দানে হিপিদের উৎসবে যোগদানের জন্য সমবেত হয়েছিল চার কিংবা চল্লিশ লাখ লোক পুরো তিনটি দিনরাত্রির বা টানা বাহাত্তর ঘণ্টার জন্যে। সেখানে বক্তৃতা দেবার, গান শোনাবার বা বাজনা বাজাবার জন্যে যে সুবৃহৎ মঞ্চ তৈরী হয়েছিল, তাতে অধিকাংশ শিল্পী ও বক্তাকে উপস্থিত হতে হয়েছিল হেলি-কপ্টারযোগে। প্রসিদ্ধ মহেশ যোগীও এই উৎসবে পৌঁছে অন্য সব কথার মধ্যে বলে-ছিলেন : সারা পৃথিবীর আমেরিকার কাছ থেকে অধ্যাত্মবিষয়েও শেখবার অনেক কিছু আছে। সেখানে ঐ বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে একটানা বাজনা বেজেছে, গান হয়েছে এবং উন্মত্ত জনতা প্রায় সংজ্ঞা-হারা হয়ে গেছেন, আনন্দে গড়াগড়ি খেয়েছে। জোয়ান বেয়াজ, জিমি হেনড্রিক্স, রিচি হ্যাভেন্স প্রভৃতির গানকে স্বর্গীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। কীর্তনের মাতন সম্পর্কে আমাদের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু হিপি উৎসবের মাতন যে কি বিচিত্র মাদকতাপূর্ণ, তা জানতে হলে মিনি এম্পায়ারে প্রদর্শিত ওয়ার্নার ব্রাদার্স-কৃত তথ্যচিত্র 'উডস্টক' দেখা দরকার। বিচিত্র এই চিত্র।

চারণ দল / পাদপ্রদীপ
প্রযোজিত
সম্ভ্রান্তসিংহ
হিমালয়ের থেকেও ভারী
মঙ্গলবার, ৬ই এপ্রিল, সন্ধ্যা ৭টা
মুক্ত অঙ্গন
"হলে টিকিট"

স্টার থিয়েটার
(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১০১
— নতুন নাটক —
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার : ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬টায়
রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, মুকুল দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, রেনুকা দাস, তুলসী চক্র, ধীমান ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

সোনা বৌদি/সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

স্টুডিও থেকে

গত সপ্তাহে স্টুডিও পাড়া প্রায় চুপচাপ ছিল বলতে পারি। টেকনিশিয়ান ও এক নম্বরে 'এন-টি' কাজ চলেছে বটে, তবে পুরোদমে নয়। ইন্দ্রপুরীতে দীনেন গুপ্তর নতুন ছবির মহরৎ হয়েছে। ক্যাল-কাটা মুভিটোনে তরুণ মজুমদারও 'নিমন্ত্রণ' ছবির কাজ করেছেন। স্টুডিও কোনোটাই ফাঁকা ছিল না বটে, কিন্তু রোজকারের মত কোলাহল শোনা যায় নি। ইন্ডিয়া ল্যাবের ক্যান্টিন রুম প্রায়শই ফাঁকা চোখে পড়েছে। সন্ধ্যার পর যেখানে হাউসফুল বোর্ড ঝুলত সেখানেও বৃহস্পতিবার কয়েকটা চেয়ার ফাঁকা থাকতে এসেছে। আসলে ব্যস্ততার মধ্যেও লক্ষ্য ছিল দুশ্চিন্তা ছিল ভোটপর্ব নিয়ে।

মিটে গেছে সব। জানি আসছে [illegible]

ইতিমধ্যে কদিন আগে মৃণালবাবুর সঙ্গে দেখা। 'এক আধুরি কাহানী'র খবর জিজ্ঞাসা করায় বললেন 'হয়ে এলো বলে'। এ ছবিতে তিনি ফিরে গেছেন স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগে। বিহারের আখ চাষীদের এক ছোটো আন্দোলনের কাহিনী এই ছবির মূল কথা। শহরে বেকার নায়ক চাকরী না পেয়ে দূর পশ্চিমের এক গ্রামে চিনিকলে চাকরী পেয়ে চলে গিয়েছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সে। মিল মালিক ও তোষা কিছু পেটোয়া কর্মচারীর যোগ-সাজশে আখ চাষীদের দুরবস্থা দেখে সে স্থির থাকতে পারে নি। তাদের দাবী আদায়ের আন্দোলনে সে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। মধ্যবিত্ত পরি-বারের সব তার গিয়েছে। সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে সে এক সময়।

নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন নতুন মুখ বিবেক চ্যাটার্জি। মৃণালবাবু বললেন, [illegible]

নতুন লোকের চাইতে কম যাবে না।' এ ছবিতে উৎপলবাবু করছেন মিল মালিকের চরিত্রটি। অপর দুটি চরিত্রে শ্যাম লাহা ও শেখর চ্যাটার্জি সম্পর্কেও মৃণালবাবু প্রশংসামুখর। ছবির নায়িকা (?) একটি শোভা মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন নবাগতা আরতি ভট্টাচার্য।

আরতির কাজ সম্পর্কে মৃণালবাবুর অভিমত সপ্রশংস। ইন্দোর সেনের আগামী ছবি 'পিকনিক'এ ইতুর চরিত্রে আরতি ভট্টাচার্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে মৃণালবাবুর সায় ছিলই শুধু নয় ইন্দোরবাবুকে তিনিই খবরটা দিয়েছিলেন। 'এক অধূরি কাহানী'র কাজ শেষ। সম্পাদনার কাজও শেষ হওয়ার পথে।

ইন্দোরবাবুর প্রসঙ্গ যখন এল, তখন জানাই ইন্দোরবাবু প্রধান চরিত্র কটিতে শিল্পী নির্বাচন প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছেন। প্রধান ছটি চরিত্রে থাকছেন শুভেন্দু চ্যাটার্জি, সমিত ভঞ্জ, রবিন মল্লিক, আরতি ভট্টাচার্য, দুলাল হাজরা ও সম্ভবতঃ মধু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতায় কদিন আউটডোরের কাজ হয়ে গেছে শুনেছি, গত সপ্তাহেই বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যান নি। এ মাসে বুঝি আর যাওয়া হবে না। আগামী মাসে হতে পারে। ইতিপূর্বে ইন্দোরবাবু বম্বে গিয়েছিলেন কয়েকটি গান রেকর্ডিং করতে। সুধীন দাশগুপ্তের পরিচালনায় মান্না দে, আশা ভোঁসলে ও কিশোরকুমারের গলায় একাধিক গান রেকর্ড করা হয়ে গেছে।

'পিকনিক' ছবির শিল্পীদের মধ্যে আরতি ও দুলাল হাজরা ব্যতীত বাংলা ছবির দর্শকের কাছে সকলেই পরিচিত। আরতির পরিচয় সম্পর্কে মৃণালবাবুর সপ্রশংস মন্তব্যই যথেষ্ট। অবশ্য দুলাল হাজরাও একেবারে নতুন নন। হীরেন নাগের 'অন্ধ অতীত' ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র করছেন তিনি। ইন্দ্রপুরীর সেটে ওঁর কিছু কাজ দেখেছি। ভবিষ্যতের সম্পর্কে কিছু বলা যায় না, তবে কাজ ভালই করছেন। একদিন হীরেনবাবুকে দুলাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় জানিয়েছিলেন—নতুন ছেলেতো, ভালোই কাজ করছে বলবো। আমার তো মনে হয় না ও এই প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং 'পিকনিক' সম্পর্কে পরিচালক ইন্দোরবাবু ও বাংলা ছবির দর্শকরা এক নতুন নায়িকার আশায় থাকতে পারেন।

মঞ্চাভিনয়

গত বছর চারেক আগে প্রতিষ্ঠিত অনামিকার নাট্যগোষ্ঠী হিন্দী ভাষায় বহু মৌলিক নাটক অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা, মারাঠি, পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত অনেক আধুনিক নাটকের হিন্দী রূপান্তর ঘটিয়ে তাদের মঞ্চস্থ করেছেন হিন্দী নাট্যামোদীদের সামনে। প্রায় নিরক্ষর হিন্দীভাষীদের প্রিয় 'রামলীলা'র পর্যায়ভুক্ত নাটকের গণ্ডী কাটিয়ে এই নাট্যগোষ্ঠী নাটক নির্বাচন ও প্রয়োজনার ক্ষেত্রে যে বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের ধারাপথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন, তা এঁদের প্রযোজিত নাট্যাভিনয়গুলি দেখলেই বুঝতে বাকী থাকে না। সম্প্রতি এই সংস্থা হিন্দী হাই স্কুল মঞ্চে বিখ্যাত নাটক 'ফুটবল'-রচয়িতা আর, জি, আনন্দ লিখিত 'এলেকশন! এলেকশন!!' নামে একটি ব্যঙ্গ-ব্যঙ্গ নাটিকার অভিনয় আয়োজন করেছিলেন। লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনকে উপলক্ষ করে রচিত এই সময়োপযোগী নাটিকাটিতে আজকের দিনের নির্বাচন প্রার্থীদের অধিকাংশেরই অযোগ্যতার কথা মুখ্য বিষয়বস্তু হলেও দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেসকে উদ্দেশ করে নাট্যকার তাঁর সুতীব্র লেখনীকে চালনা করতে বিন্দুমাত্র কসুর করেননি। পুরোনো দিনের খাঁটি মানুষ প্রোফেসর লাল যখন বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার সম্ভবের সাহায্যের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, তখন তাঁর দুই ছেলে ও মেয়ে—দেব ও মোহিনী—আদি কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের ধ্বজা ধরে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়ার পাঁচিল তুলেছে। এমন সময়ে তাঁদের সংসারে আবির্ভূত হন প্রোফেসর লালের দূরসম্পর্কিত ভাই 'শ্রী৪২০' রামলাল। সে নাকি একটি লোহার কারখানায় চাকরী পাবার আশায় এসেছে। কিন্তু তো হ', সেই কারখানার পরিচালক ও মালিক ফতেলাল নির্বাচনপ্রার্থী হতে চায় আদি কংগ্রেসের টিকিটে। এবং আরও মজা যে, প্রকাশ পেল

রঙ্গনা শিবপুরের বাস্তার মার্কেটের গোডেল মোড় (৫৫-৪৪৯৬)

নান্দীকার

শনি ৬, রবি ২॥ ও ৬টায়

তিন পয়সার পালা

১লা এপ্রিল বৃহস্পতিবার ৬টায়

শের আফগান

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০শে মার্চ মঙ্গলবারে ৭টায়

নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র

শুক্রবার ২৬শে মার্চ !

বিগতযুগ থেকে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় চিত্রধারার অন্যতম বিজয়দৃপ্ত উত্তরাধিকারী আসছে !

আর আনন্দমুখর একটি ছবি থেকে আপনারা পাবেন মনোরম দৃশ্যাবলীর !!
চিরকালের জন্য স্মরণীয় একটি উক-হৃদয়ের রোমান্স.....

প্যারাডাইস-ম্যাজেষ্টিক-জেম-প্রভাত

গনেশ - খান্না - রূপালী - ভবানী

বঙ্গবাসী - ন্যাশনাল - অজন্তা - অশোক - খাসমহল - লক্ষ্মী - রজনী
শ্যামা - চিত্রাঞ্জন - অনুরাধা (দুর্গাপুর) - বোম্বে সিনেমা - (বর্ধমান)
রূপক (পাটনা)

এই ফতেলাল একদা প্রোফেসর লালের ছাত্র ছিল। শুধু তাই নয়; সে এবং তার বাবা—দুজনেই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বহু স্বদেশবিরোধী কাজ করেছে। এমন কি, প্রোফেসারের নন্দী নামে যে ছেলে অত্যন্ত কিশোর বয়েসে দেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবনোৎসর্গ করেছে, তার সহপাঠী ও বন্ধু হয়েও ফতেলাল তাকে বিদেশী শাসকদের হাতে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। —এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগান শ্রীরামলাল। সে ফতেলালকে নির্দলীয় প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়ে কি কৌশলে জয়লাভ করা যায়, তার পথ যেমন বাৎলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে যাতে সে মোহিনীর মতো রূপবতী ও গুণবতী মেয়েকে বিবাহ করে সুখী হতে পারে, সে পথও প্রশস্ত করে দিল। কিন্তু তার এই সুপরিকল্পিত-ভাবে পাতা ফাঁদে পড়ে বেচারা প্রোফেসার লাল হয়ে পড়লেন বিভ্রান্ত।

নাট্যকার শ্রীআনন্দ যেভাবে নাটিকাটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন, তাতে মনে হয়, তিনি বলতে চেয়েছেন, অপর্যাপ্ত অর্থের অধিকারী হলে যদি একজন কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের সহায়তা পাওয়া যায়, তাহলে আজকের দিনে ভোট-বৈতরণী সহজেই পার হওয়া যায়। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে গেলে তাঁর অভিমত সম্পর্কে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু নাট্যকার যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে প্রোফেসার লালের মতো খাঁটি লোককে স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন, ধনগর্বিত ফতেলালের চাতুর্যের সম্মুখীন করেছেন—হয়, তোমার কন্যা, নয়, তোমার করতলগত চব্বিশ হাজার ভোট—, সেই পরিস্থিতিকে ন্যায়সঙ্গত বা পোয়েটিক জাস্টিস্‌সম্মত বলি কি করে? এর চেয়ে কি উচিত হত না, সমস্যার স্তর পর্যন্ত নিয়ে এসে ফতেলালের মতো এক অযোগ্য ব্যক্তির উচ্চাশাকে কুৎসিতরূপে ধূলোবলুণ্ঠিত করা? অবশ্য সমাপ্তিগত এই ত্রুটি সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের সমাবেশ, পরিস্থিতি রচনা ও সর্বোপরি উপভোগ্য সংলাপের গুণে নাটিকাটি দর্শকপ্রীতি উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিল।

অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিরণ রামলালের ভূমিকায় অমৃত-ভূষণ শুক্লাল। তাঁর মুখের পাঞ্জাবী সংলাপ (রামলাল রাষ্ট্রভাষাতে সহজে কথা কইতে চায় না) প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত অধিকাংশ দর্শকেরই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। এঁর পরেই নাম করতে হয় মোহিনীর ভূমিকায় দীপা দীক্ষিতের। নব কংগ্রেসের মতধারিণী মোহিনী যে নারী এবং তার কাছে শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও ঘর বাঁধার প্রশ্নটাই যে সবচেয়ে বড়ো, এ তথ্যকে তিনি সপ্রতিভ চোখের দৃষ্টি, বচন এবং অনায়াস গতি-ভঙ্গীর মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। গান্ধীজীর আদর্শ ও মতবাদে বিশ্বাসী প্রোফেসার লালের ভূমিকায় নির্দেশক কৃষ্ণকুমার তাঁর চিরাচরিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন। স্বার্থপর ধনী ফতেলাল বেশে রবি বাজ্জিক প্রথমটা কিছুটা আড়ষ্টতার পরিচয় দিলেও পরে বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই তাঁর চরিত্রচিত্রণ করেন। সীতার ভূমিকায় সুশীলা মিশ্র এত স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করেছেন যে, মনেই হয় না অভিনয় দেখছি। অপরাপর ভূমিকার অভিনয় চলনসই। মঞ্চশিল্প, রূপসজ্জা, আলোকপ্রক্ষেপণ প্রভৃতি প্রযোজনানিষ্ঠার পরিচায়ক।

আসছে সোমবার, ২৯ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্রসদনে শিল্পীসংসদ পদ্মবিভূষণ উদয়শঙ্কর, সরযূবালা দেবী, পদ্মশ্রী মায়া দে এবং পদ্মশ্রী তৃপ্তি মিত্রকে সংবর্ধিত করবার আয়োজন করেছেন। এই সঙ্গে তাঁদের আয়োজিত একাংক নাট্য-উৎসবে পুরস্কৃত তিনখানি নাটক—মিছিল, চাঁদনী রাত এবং বিচার-এর অভিনয় হবে।

জলসা

ঠুংরী গানের উৎসবে ঃ—কলা মন্দিরের এক ছিমছাম পরিবেশে ক্যালকাটা মিউ-জিক সার্কেল পরিবেশিত ঠুংরী গানের আসর যেন বহুশ্রুত নবাবী সঙ্গীতের জম-জমাট—আসরের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। মৌলিক পরিকল্পনানুসারে শিল্পিতালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কণ্ঠসংগীতে সিদ্ধেশ্বরী দেবী, নয়না দেবী, এবং কথক নৃত্যে উমা শর্মা। ঠুংরীর যথাযোগ্য পরিবেশ রচিত হতে পারে মাইফেলে—সাধারণ সম্মেলনীতে নয়। খুব সম্ভব সেই সত্য স্মরণে রেখেই সঙ্গীত পরিবেশন পদ্ধতি আয়োজিত হয়েছিল এমনভাবে যাতে শ্রোতাদের ব্যক্তি-গত আবেগ ও উপভোগের উত্তাপ শিল্পী-দের উদ্দীপ্ত করে। অনিবার্য কারণে অনু-ষ্ঠানের আকস্মিক কিছু পরিবর্তনের জন্যই উপরি পাওনা হিসেবে শুনতে পাওয়া গেল মালবিকা কাননের কণ্ঠসংগীত।

গান রসোত্তীর্ণ হতে হলে যে দুটি বস্তুর সর্বাগ্রাধিকার প্রয়োজন তা শিল্পীর মেজাজ ও কণ্ঠের সাবলীলতা। রসিক-শ্রোতার উপস্থিতিতে মেজাজ ত পুরোপুরি ছিলই এছাড়াও শ্রীমতী কাননের কণ্ঠস্বর সেদিন যেন সুরে বাঁধা ছিল। তাই তাঁর গাওয়া কলাবতী সেদিন জমে উঠতে দেরী হয়নি সুরের শুদ্ধতা ও কণ্ঠের মাধুর্য উভয় কারণেই। তবে ঠিক গান জমে ওঠার মুহূর্তেই সময় সংকেত জানিয়ে শিল্পীকে অকস্মাৎ গান সমাপ্ত করবার নির্দেশে রসভঙ্গ কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই, যদিও এছাড়া কর্মকর্তাদের কোনো উপায় ছিল না। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হল ছেড়ে দিতে হবে।

পরবর্তী শিল্পী স্বর্গত সিদ্ধেশ্বরীর সুযোগ্যা শিষ্যা নয়না দেবী। তাঁর পরি-বেশন পরিচ্ছন্ন, প্রাণবন্ত এবং উপভোগ্যও। বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে যেসব আখতারের গায়কীকে ইনি সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন এটা নিশ্চয়ই আনন্দের।

এরপর উমা শর্মার কথক-নৃত্য। তার তার আগে সংক্ষিপ্ত ভাষণে ঠুংরী গানের সঙ্গে কথকনৃত্যের সম্পর্ক বর্ণনায় সঙ্গীতে ঠুংরী উৎসবে কথকনৃত্যের অবতারণার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেন।

গতানুগতিক বোল সঙ্গতে নৃত্যের পরিবর্তে পটভূমিকায় নতুন ধরণের অর্কেস্ট্রা ও সঙ্গীত সঙ্গতে কথক নৃত্য পরিবেশনায় শ্রীমতী শর্মার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী যদি কিন্তু সম্পাদনায় ত্রুটিবিচ্যুতি সামগ্রিক সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নৃত্যের আঙ্গিক লয় ও স্বতঃস্ফূর্ত গতিভঙ্গি প্রশংসা করবার মতই।

আসরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিলেন সিদ্ধেশ্বরী দেবী। বেনারস ঘরানার প্রবীণা শিল্পীর মঞ্চে আবির্ভাব মাত্রেই সারা প্রেক্ষা-গৃহে যেন আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। আর শ্রোতাদের অন্তরের ঢেউ যেন শিল্পীর চিত্ততটে আছড়ে পড়ল তাই মুহূর্তেই তিনি মনোজ্জ্বল হয়ে পড়লেন। সেই নিত্য-নতুন, চির পুরাতন গান শিক্ষা বিনা আওত আবেগরঞ্জিত সঙ্গীত গতিশীল ছন্দের মতই প্রতিটি পংক্তিতে বোলবানান ও অর্থ-ভাব অঙ্গে কত না অনুভাবকে মর্মগোচর করেছে। ঐ একই কথা তার কী না মারো পিচকারী ও উপসংহারীয় তরপা বালম সম্বন্ধে।

সৌরভ-এ গানের আসর সম্প্রতি সৌরভ আয়োজিত একটি একক গানের আসরে শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ সঙ্গীতে ও নরেন ধর সরোদ পরিবেশন করেছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার অধ্যক্ষ নমিতা চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় ইমন কল্যাণ দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু করেন। সু-বিস্তৃত আলাপে আঙ্গিক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর স্পষ্ট হলেও রসের অভাব অনুভূত হয়। তবে কিছু স্বর সমন্বয়ে ও রচনার কারীগরী সত্যিই প্রশংসা করবার মত। শেষে বাহার রাগের ওপর দ্রুত গানের বন্দেজটি বড় মেজাজী। এঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গতে ছিলেন বিশ্বনাথ বসু।

অনুষ্ঠান সুরু হয় রাধিকা মিত্রের শিষ্য নরেন ধরের সরোদ বাদন দিয়ে। ইনি বাজান কিন নিট। মাত্র পনের বছর বয়সে যে সপ্রতিভ বাদন কুশলতা দেখিয়ে-ছেন তা রীতিমত সম্ভাবনাদীপ্ত। নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠিত থাকলে যথাযোগ্য মানে পৌঁছতে এর দেরী হবে না।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলার কথা

ভারত সাড়া জাগিয়েছে

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা দলগুলির অন্যতম। স্বীয় ঐতিহ্য গরিমাদীপ্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে পরাজিত করে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলকে। বাইশ বছর ধরে পরাজয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল ভারতীয় দল। এবারের সফরে অজিত ওয়াদেকরের নেতৃত্বে ভারতীয় দল দূর করে দিয়েছে সেই অন্ধকারকে। ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের হাজার হাজার দর্শককে সাক্ষী রেখে বিজয়ের দীপশিখাটি জ্বালিয়ে দিয়েছে তারা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে।

কুইন্স পার্ক থেকে বিজয়বার্তা ভারতের মাটিতে এসে পৌঁছুতেই আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো গোটা ভারতবর্ষ। দীর্ঘদিনের গ্লানি কেটে যাওয়াতে উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লেন লক্ষ লক্ষ ক্রিকেট ক্রীড়ারসিক। জয়ের আনন্দধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো আসমুদ্রহিমাচল। আলোচনার ঝড় বয়ে চলেছে এখনও—কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। হাজার হাজার মানুষ অভিবাদন জানিয়েছেন তাঁদের যাঁরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করলেন।

এই ইতিহাসের নায়ক হলেন অজিত লক্ষ্মণ ওয়াদেকর। সফরকারী ভারতীয় দলের এই নেতা যদিও বলেন—'এ কৃতিত্ব আমার নয়, দলের সব খেলোয়াড়ের।' তবুও আমি বলব অন্যরা কৃতিত্বের অংশীদার হলেও বেশীর ভাগ কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। যোগ্য অধিনায়ক, শক্ত হাতে দলের হাল ধরে জয়মাল্য ছিনিয়ে নিয়ে প্রমাণ করলেন তাঁর যোগ্যতা।

ভারত জিতেছে, আনন্দের শেষ নেই ভারতবাসীর। এই গৌরবে সবচেয়ে বেশী প্রশংসার দাবী করতে পারেন নির্বাচনী কমিটি। বিজয় মার্চেন্টের সভাপতিত্বে সিলেকসন কমিটি এবারে অত্যন্ত সার্থক দল গঠন করেছেন। এবারে দলে তরুণ খেলোয়াড়ই বেশী। এমন অনেক তরুণ আছেন, যাঁরা এই প্রথম দায়িত্ব পেলেন। নবীন ও প্রবীণদের নিয়ে গঠিত এই দল সম্বন্ধে সফরের প্রাক্‌কালে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছিল। সারদেশাইয়ের মত প্রবীণকে দলে স্থান দেওয়া কিম্বা অধিক সংখ্যক তরুণ খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা নিয়ে অনেক বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছে সিলেকসন কমিটিকে।

আজ কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে সিলেকসন কমিটির দূরদর্শিতা কত নিখুঁত, অভিজ্ঞতার কত বেশী মূল্য। শক্ত হাতে ব্যাট করে দিলীপ সারদেশাই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাঠে। দল গঠন নিয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ ছিলেন, একথা আজ জোর করে বলা যায় তাঁদের ক্ষোভ নিশ্চয়ই দূর হয়েছে।

আত্মপ্রত্যয়ে অটল ছিলেন সিলেকসন কমিটির চেয়ারম্যান বিজয় মার্চেন্ট। দৃঢ় গলায় ভারতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি সফরের শুরুতে। তাঁর কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে এবার ভারতীয় দলের বিজয় অভিযান অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

এই বিজয় অভিযানের নেতা হলেন ওয়াদেকর। ওয়াদেকর অধিনায়ক হওয়াতে অনেক মহলে আপত্তি উঠেছিল। অনেক প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে।

অধিনায়কোচিত সমস্ত গুণই দেখা যায় ওয়াদেকরের মধ্যে। অধিনায়কের সবচেয়ে বড় গুণ—তাঁর যেন যথেষ্ট স্বীকৃতি থাকে দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে। এই গুণটি ওয়াদেকরের যে আছে

কমল ভট্টাচার্য

তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ব্যাট হাতে অধিকাংশ খেলায় তিনি যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রশান্ত ব্যক্তিত্বে এই নবাগত অধিনায়ক সহজেই বশীভূত করেছেন দলের সদস্যদের। তাঁর নম্র ও মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে সকলেই তাঁকে আপনজন করে নিয়েছেন। ওয়াদেকর জানেন, অধিনায়কের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং কথাবার্তার উপর কতখানি নির্ভর করে সমগ্র দেশের সুনাম ও সম্মান। তিনি এসব বিষয়ে অত্যন্ত বেশী সচেতন।

ওয়াদেকরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা তাঁর যথেষ্ট। রণজি ট্রফির খেলায় তিনি একটানা দীর্ঘ কয়েক বছর অধিনায়কত্ব করেছেন। পতৌদি কিম্বা বোরদের তুলনায় অভিজ্ঞতায় নবীন হলেও তাঁকে নির্বাচিত করা সঠিক হয়েছে বলে মনে করি। আমার মনে হয় অধিনায়ক হিসেবে অনেক আগেই ওয়াদেকরের নির্বাচিত হওয়ার কথা।

কুশলী ব্যাটসম্যান, অভিজ্ঞ ক্রিকেটার, প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব অজিত ওয়াদেকর সত্যিই যোগ্য অধিনায়ক।

শুধু অজিত ওয়াদেকর নন, আরও একজন আছেন সকলের অন্তরালে। তিনি হলেন দলের ম্যানেজার কে তারাপোর।

বিদেশ সফরকারী কোন দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব কম নয়। সমস্ত দলটার অভিভাবকত্ব করতে হয় তাঁকে। এই গুরু-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তাঁকে। ব্যক্তিগত সুবিধা বিসর্জন দিতে হয় দলের স্বার্থে। কোনরকম প্রত্যাশা না রেখেই তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। শুধু তাই নয়, খেলার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার। সময়ে অসময়ে খেলার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হয় অধিনায়ককে। কোন্ খেলায় কোন্ খেলোয়াড় থাকবে কি থাকবে না এ-ধরনের পরামর্শও তাঁকে দিতে হয়। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের স্বভাব-চরিত্র ব্যক্তিগতভাবে বুঝে তাঁকে সেইভাবে চালনা করতে হয়। একমাত্র এর উপরেই নির্ভর করে দলের টিমওয়ার্ক। টিম ওয়ার্ক ভাল না হলে সাফল্য কখনই আসে না। অতীত দিনের খ্যাতনামা খেলোয়াড় শ্রীতারাপোর এই গুরুদায়িত্বের ভার নিয়ে তাঁর কৃতিত্বে ভারতীয় দলের মধ্যে একটা সুন্দর টিম-ওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। গোটা দলটা যেন একটা সুখী পরিবারের মত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে একটার পর একটা খেলা খেলে চলেছে। এ-কথা শুধু আমার একার নয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বহু ক্রীড়া-সমালোচকও মুক্তকণ্ঠে ওঁদের প্রশংসা করেছেন।

এবারের সফরে যে আশাতীত সাফল্য ভারতীয় দল দেখিয়েছে, তা থেকে কেন আশা করবো না ভারত সিরিজ জয় করে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। আমার বিশ্বাস মনোনয়ন কমিটি যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গী যদি ভবিষ্যতে বজায় রাখতে পারেন, তবে ভবিষ্যতে ভারত নিশ্চয়ই বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম দল হয়ে উঠবে।

তবে ভারতীয় ক্রিকেট এখন দুটো সমস্যা রয়েছে। সমস্যা দুটি হলো ভারতের কোন প্রথম শ্রেণীর ফাস্ট বোলার নেই এবং ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যানের অভাব। তবে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে যেসব তরুণ মুখ ভারতীয় দলে দেখা যাচ্ছে, সেই গাভাসকার, জয়ন্তীলাল, অশোক মানকড়, কানিৎকার এই অভাব অনেকটা পূরণ করতে পারবেন।

কিন্তু ফাস্ট বোলারের সমস্যা ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এখন ভারতীয় দলের যে অবস্থা তাতে যদি দলে কমপক্ষে দুজন

ফাস্ট বোলার থাকতো তবে এই দল বিশ্বের দুর্ধর্ষ দলে পরিণত হতো। কেন ভারতবর্ষে ফাস্ট বোলারের অভাব আর কিভাবে এ-অভাব দূর হবে সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভারতে ফাস্ট বোলার তৈরী না হওয়ার প্রধান কারণ এখানকার পিচ। পিচ যদি প্রাণবন্ত না হয়, উইকেট বা পিচ থেকে বোলার যদি কিছু সাহায্য না পায়, তবে বোলাররা খাটবে কেন? একজন স্লো স্পিন বোলারকে যে-পরিমাণ খাটতে হয়, তার চেয়ে দশগুণ বেশী খাটতে হয় ফাস্ট বোলারকে। উইকেট যদি বোলারের অনুকূলে না হয়, তবে ফাস্ট বোলার হওয়া সম্ভব নয়।

ফাস্ট বোলারের শারীরিক কর্মক্ষমতা অত্যন্ত বেশী থাকা চাই। অত্যন্ত বেশী জোর দিতে হয় অনুশীলনের উপর। অনুশীলনের উপরেই তো খেলোয়াড়ের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ফাস্ট বোলার গঠনের ব্যাপারে তেমন উৎসাহদায়ক খবর তো আমরা পাই না।

কর্তৃপক্ষকে আজ বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে এই ব্যাপারে যাতে দেশের তরুণ ছেলেদের নিয়ে ফাস্ট বোলার গড়ে তোলা যায়।

খেলাধুলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের অস্ট্রেলিয়ার মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার দুই খেলোয়াড়—কেন রোজওয়াল এবং শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। কেন রোজওয়াল এই প্রতিযোগিতায় শেষ সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন ১৯৫৫ সালে। তিনি গত বছর উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস ফাইনালে পরাজিত হলেও আমেরিকার টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন।

গত বছরের 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' বিজয়িণী শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট এই নিয়ে প্রতিযোগিতায় মোট ১০ বার সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। তিনি উপর্যুপরি ৭ বার (১৯৬০-৬৬) সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পর পুনরায় উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৬৯-৭১) সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলেন। এ বছরের প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস খেলার ফাইনালে তাঁর বিপক্ষে খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী খেলোয়াড় ১৯ বছরের কুমারী ইভোনী গুলাগং।

কেন রোজওয়াল

শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৭-৫ ও ৬-৩ গেমে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস-কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) ২-৬, ৭-৬ ও ৭-৫ গেমে কুমারী ইভোনী গুলাগং-কে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২ ও ৭-৬ গেমে টম ওক্কার (হল্যান্ড) এবং মার্টি রিসেনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

রঞ্জি ট্রফি

সেমি-ফাইনাল খেলা

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে বোম্বাই বনাম বাংলার সেমি-ফাইনাল খেলার ৩য় দিনে বাংলার ১ম ইনিংস ১৫৮ রানের মাথায় শেষ হলে বোম্বাই ১ম ইনিংসে ৩০১ রান বেশী করার সুবাদে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য, বোম্বাই তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে দল গঠন করতে পারেনি, কারণ তাদের নামকরা ৫ জন খেলোয়াড় ভারতীয় ক্রিকেট দলে নির্বাচিত হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গেছেন। এখানে আরও উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে বোম্বাই দল ২২ বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে খেলে যে ২১ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে তার মধ্যে উপর্যুপরি জয় ১২ বার—(১৯৫৯-৭০) যা আজও যে-কোন দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি সর্বাধিকবার জাতীয় ট্রফি জয়ের বিশ্ব রেকর্ড হয়ে আছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বোম্বাই : ৪৫৯ রান (রামনাথ পারকর ১০১, মাহেশ সম্পত ১৪১ এবং বিজয় ভোঁসলে ৫৮ রান। দিলীপ দোশী ৭২ রানে ৩, সুব্রত গুহ ৯০ রানে ২ এবং গোপাল বোস ৭০ রানে ২ উইকেট)

বাংলা : ১৫৮ রান (প্রকাশ পোদ্দার ৪৭ রান। শিভালকার ৩৬ রানে ৫ এবং রেগে ১৪ রানে ২ উইকেট)

ও ২৭৫ রান (৯ উইকেটে। শ্যামসুন্দর মিত্র নটআউট ১০০। শিভালকার ৬৯ রানে ৫ উইকেট)

পুণের নেহরু স্টেডিয়ামে অপর সেমি-ফাইনাল খেলার শেষ চতুর্থ দিনে, খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ২ মিনিট আগে, মহীশূর দলের ২য় ইনিংসে ২৪৬ রানের মাথায় শেষ হলে মহারাষ্ট্র নাটকীয়-ভাবে ৪০ রানে জয়ী হয়। মহীশূর দল যদি মাত্র ২ মিনিট সময় ২য় ইনিংসের খেলা জিইয়ে রাখত তাহলে তারাই প্রথম ইনিংসের খেলায় মহারাষ্ট্রের থেকে ২৯ রান বেশী করার সুবাদে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করতো।

মহারাষ্ট্র : ২১০ রান (সালধানে ৪৫ রান। বি এস চন্দ্রশেখর ৬৬ রানে ৪ উইকেট)

ও ৩১৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। চেতন চৌহান ১৪৭ রান। চন্দ্রশেখর ১১০ রানে ৫ উইকেট)

মহীশূর : ২৩৯ রান (বি আর রঘুনাথ ৮৭ রান। ভিথল যোশী ৫৬ রানে ৩ এবং আনওয়ার শেখ ৬৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৪৬ রান (বি পি প্যাটেল ৭৭ রান। যোশী ৮০ রানে ৭ উইকেট)

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ

লড়াই শেষ। ফ্রেজিয়ার বনাম ক্লের মুষ্টিযুদ্ধ উপলক্ষ করে আমেরিকার জন-সাধারণের একাংশে যে প্রবল উদ্বেগ এবং উত্তেজনা পর্বত প্রমাণ আকার ধারণ করে-ছিল তা আপাতত হ্রাস পেয়েছে। ১৫ রাউণ্ডের লড়াইয়ে ক্যাসিয়াস ক্লে পয়েন্টে পরাজিত হলে জো ফ্রেজিয়ার হেভীওয়েট বিভাগের মুষ্টিযুদ্ধে তাঁর পূর্ব অর্জিত বিশ্ব খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই লড়াইটি বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে অসাধারণত্ব লাভ করেছে এই কারণে যে, ইতিপূর্বে দুই অপরাজেয় বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়নকে নিয়ে বিশ্বখেতাব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোন লড়াই হয়নি। 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লড়াই' 'বিংশ শতাব্দীর ওয়াটারলু' প্রভৃতি শিরো-নামায় লড়াইটিকে বিশেষিত করা হয়েছে। এই নিয়ে ফ্রেজিয়ার তাঁর পেশাদার খেলো-য়াড়-জীবনে ২৭টি লড়াইয়ে নামলেন, তাঁর জয়—নকআউটে ২৩ বার এবং পয়েন্টে ৪ বার। অপর দিকে ক্যাসিয়াস ক্লে (ওরফে মহম্মদ আলি) ৩২টি পেশাদারী লড়াইয়ে নেমে প্রথম পরাজিত হলেন। তাঁর ৩১টি জয়ের হিসাবে আছে নক-আউটে জয় ২৫ বার এবং পয়েন্টে জয় ৬ বার।

ফ্রেজিয়ার-ক্লের এই লড়াই দেখতে ঐতি-হাসিক মাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন আসরে ২১,৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। দর্শনী বাবদ উঠেছিল ১,২৫০,০০০ ডলার (৯৩,৭৫,০০০ টাকা)—অর্থের পরিমাণে 'বিশ্ব রেকর্ড'। তাছাড়া ৪০টি দেশে টেলি-ভিশনের মাধ্যমে খেলার দৃশ্য পরিবেশন করে উদ্যোক্তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন। বৃটেনের ৩৫টি সিনেমা হলে প্রায় ৯০,০০০ দর্শক টেলিভিশনে এই লড়াই দেখতে যে টিকিট কিনেছিলেন, তার মূল্য ৩২৫,০০০ স্টার্লিং। এই লড়াই থেকে ফ্রেজিয়ার এবং ক্লে উভয়েই ২৫ মিলিয়ন ডলার করে পেয়েছেন। [১-৩]

হেভীওয়েট বিভাগে এ পর্যন্ত ২৪ জন মুষ্টিযোদ্ধা বিশ্ব খেতাব জয়ী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে দুবার খেতাব পেয়েছেন এক-মাত্র ফ্লয়েড প্যাটারসন (আমেরিকা)। এই ২৪ জন বিশ্ব খেতাব বিজয়ীর মধ্যে আছেন আমেরিকার ১৯ জন, ইংল্যাণ্ডের একজন, কানাডার একজন, জার্মানীর একজন, ইতালীর একজন এবং সুইডেনের একজন।

আমেরিকার ১৯ জন বিশ্ব খেতাব বিজয়ীর মধ্যে নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা আছেন এই ৮ জন : (১) জ্যাক জনসন (১৯০৮—১৫), (২) জো লুই (১৯৩৭—৪৯), (৩) এজার্ড চার্লস (১৯৪৯—৫১), (৪) জো ওয়ালকট (১৯৫১—৫২), (৫) ফ্লয়েড প্যাটারসন (১৯৫৬—৫৯ ও ১৯৬০—৬২), (৬) সনি লিস্টন (১৯৬২—৬৪) (৭) ক্যাসিয়াস ক্লে (১৯৬৪—৬৭) এবং (৮) জো ফ্রেজিয়ার (১৯৭০ সাল থেকে)।

বিশ্ব পর্যায়ের পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি আমেরিকায়। হেভীওয়েট

এল.আই.সি. আমার বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া
EP.LIC.52.84.BENG

বিভাগের লড়াই বিশ্ব পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের প্রধান আকর্ষণ এবং সেই কারণে বিপুল অর্থ উপার্জনেরও প্রধান অবলম্বন। আধুনিক যুগের সমস্ত শক্তিশালী প্রচার-যন্ত্র—সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, সংবাদ ও সাময়িকপত্র, বেতার এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্ব হেভী-ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধাদের দৈহিক শক্তির সচিত্র খবরাখবর ফলাও করে প্রচারিত হতে থাকে। ফলে মুষ্টিযোদ্ধারা বিপুলভাবে আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা লাভ করেন এবং অসাধারণ দৈহিক শক্তির দৌলতে জনমানসে তাঁরা 'অতিমানব' হিসাবে বিরাজ করেন। এই পটভূমিকায় প্রতিযোগিতার প্রত্যেক এবং হেভীওয়েট বিভাগের মুষ্টিযোদ্ধারাই বিপুল অর্থ উপার্জন করে লাভবান হন যা অথবা উপন্যাসে বর্ণিত আশ্চর্য প্রদীপের অলৌকিক শক্তির বদান্যে আলাদীনের বিপুল ঐশ্বর্য লাভের কাহিনীর মতই জনসাধারণের কাছে বিস্ময়কর ঘটনা। পেশাদার বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রযোজকরা খেলাধুলার আদর্শের কোন ধার ধারেন না। আদর্শের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কি বিরাট ব্যবধান তা একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে। মুষ্টিযুদ্ধের বিষয়বস্তু হল কৌশল বা নিয়ম মানুষকে খালি হাতে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করতে সাহায্য করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মুষ্টিযুদ্ধের আসরে দৈহিক শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঘটনার বিবরণে সেই শক্তিকেই জনসাধারণের চোখে তুলে ধরার রীতি প্রচলিত। সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই ধরনের আলোকচিত্র প্রাধান্য লাভ করে—একদিকে দণ্ডায়মান বিজয়গর্বে উল্লসিত মাংসপেশীবহুল মুষ্টিযোদ্ধা, অপর দিকে বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধার মুষ্টির আঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বী চিরনিদ্রায় শায়িত, অথবা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভূলুণ্ঠিত কিম্বা রক্তাক্ত দেহে বীভৎস অবস্থায় দণ্ডায়মান। এই ধরনের আলোক-চিত্র, খেলার বিবরণ এবং মুষ্টিযুদ্ধের আসর মানুষের মনে যেমন একদিকে যুদ্ধ উত্তেজক করে, তেমনি মানুষকে হিংস্র স্বভাবে উত্তেজিত করে। মুষ্টিযুদ্ধের আসরে দেখা গেছে অনেক সময়ে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হলে দর্শকরা মারমুখী হয়ে পরাজিত খেলোয়াড়কে ধিক্কার দিয়ে গায়ে থুথু নিক্ষেপ করে অথবা খেলোয়াড়কে দৈহিক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়।

মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান

১৮৮২—৯২	জন সুলিভান	(আমেরিকা)
১৮৯২—৯৭	জেমস করবেট	(আমেরিকা)
১৮৯৭—৯৯	আর ফিটজসিমন্স	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৯৯-১৯০৫	জেমস জেফ্রিজ	(আমেরিকা)
১৯০৫—০৬	মারভিন হার্ট	(আমেরিকা)
১৯০৬—০৮	টমি বার্ণস	(কানাডা)
১৯০৮—১৫	জ্যাক জনসন	(আমেরিকা)
১৯১৫—১৯	জেস উইলার্ড	(আমেরিকা)
১৯১৯—২৬	জ্যাক ডেম্পসি	(আমেরিকা)
১৯২৬—২৮	জিন টুনি*	(আমেরিকা)
১৯২৮—৩০	আসন শূন্য	
১৯৩০—৩২	ম্যাক্স স্মেলিং	(জার্মানী)
১৯৩২	জ্যাক শার্কি	(আমেরিকা)
১৯৩৩	প্রিমো কারনেরা	(ইতালী)
১৯৩৪	ম্যাক্স বেয়ার	(আমেরিকা)
১৯৩৫—৩৭	জেমস ব্র্যাডক	(আমেরিকা)
১৯৩৭—৪৯	জো লুই*	(আমেরিকা)
১৯৪৯—৫১	এজার্ড চার্লস	(আমেরিকা)
১৯৫১—৫২	জো ওয়ালকট	(আমেরিকা)
১৯৫২—৫৬	রকি মার্সিয়ানো*	(আমেরিকা)
১৯৫৬—৫৯	ফ্লয়েড প্যাটারসন	(আমেরিকা)
১৯৫৯	ইঙ্গিমার জনসন	(সুইডেন)
১৯৬০—৬২	ফ্লয়েড প্যাটারসন	(আমেরিকা)
১৯৬২—৬৪	সনি লিস্টন	(আমেরিকা)
১৯৬৪...৬৭	ক্যাসিয়াস ক্লে*	(আমেরিকা)
১৯৭০	জো ফ্রেজিয়ার	(আমেরিকা)

*অপরাজিত অবস্থায় অবসর গ্রহণ

যে মানব সমাজে পশু-পক্ষী নিপীড়ন অথবা বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে পশুপক্ষী হত্যা দণ্ডনীয় এবং যেখানে এমন নজির আছে রাজপথে দণ্ডায়মান সমবক্সীদের সামনে মাকড়সার পা ছিঁড়ে কৌতুক করার কারণে একটি বালক আইনভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল সেখানে মুষ্টিযুদ্ধের আসরে মানুষের এই দুর্ভাগ্য কেন? বিপুল পরিমাণ আয়কর পাওয়া যায় বলেই কি সভ্য দেশের সরকার নিশ্চুপ?

১৯৬২ সালে বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান ফ্লয়েড প্যাটারসন বনাম সনি লিস্টনের খেতাবের লড়াইকে কেন্দ্র করে সোভিয়েট সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাস' এক হাত নিয়েছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতিমাত্রায় অনুরাগ লক্ষ্য করে 'টাস' খুব জোরাল ভাষায় বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন। টাসের মন্তব্যে সনি লিস্টনকে পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। টাস আরও বলেছিলেন প্রাচীনকালে মানুষের পশুসুলভ মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে গ্লাডিএইটাররা পরস্পরকে হত্যা করতেন আর বিংশ শতাব্দীর গ্লাডি-এইটাররা অর্থের প্রয়োজনে পরস্পরের অঙ্গ বিকৃত করতে দ্বিধাবোধ করেন না। টাসের মতে, মার্কিন পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ জংলী আইনের সমতুল্য।

সোভিয়েট সংবাদপত্রে সদ্য সমাপ্ত জো ফ্রেজিয়ার বনাম ক্যাসিয়াস ক্লের মুষ্টি-যুদ্ধের ফলাফলটুকু মাত্র কয়েকটি লাইনে ছাপা হয়েছে।

মার্কিন মুলুকে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের বিপক্ষে কোন জনমত নেই এমন নয়, যথেষ্ট আছে। সনি লিস্টন বনাম ক্যাসিয়াস ক্লের লড়াই উপলক্ষ্য করে আমেরিকার কংগ্রেস প্রতিনিধি সভায় পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের দাবী উঠেছিল। ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি মাইকেল ফেইঘান পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের গতিবিধি সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে সরকারী তদন্তের দাবী করেছিলেন। কয়েক বছর আগে মার্কিন সাধারণিক টেক্স মত বলে-ছিলেন সন্দেহজনক চরিত্রের লোকরাই আজকাল যুক্তরাষ্ট্রের পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করছেন। মুষ্টিযুদ্ধের আসরে সনি লিস্টন, এডি ম্যাচেনের মত দাগী আসামীদের আবির্ভাবে মুষ্টিযুদ্ধ সম্পর্কে ক্রীড়ামোদীরা আস্থা হারিয়েছেন।'

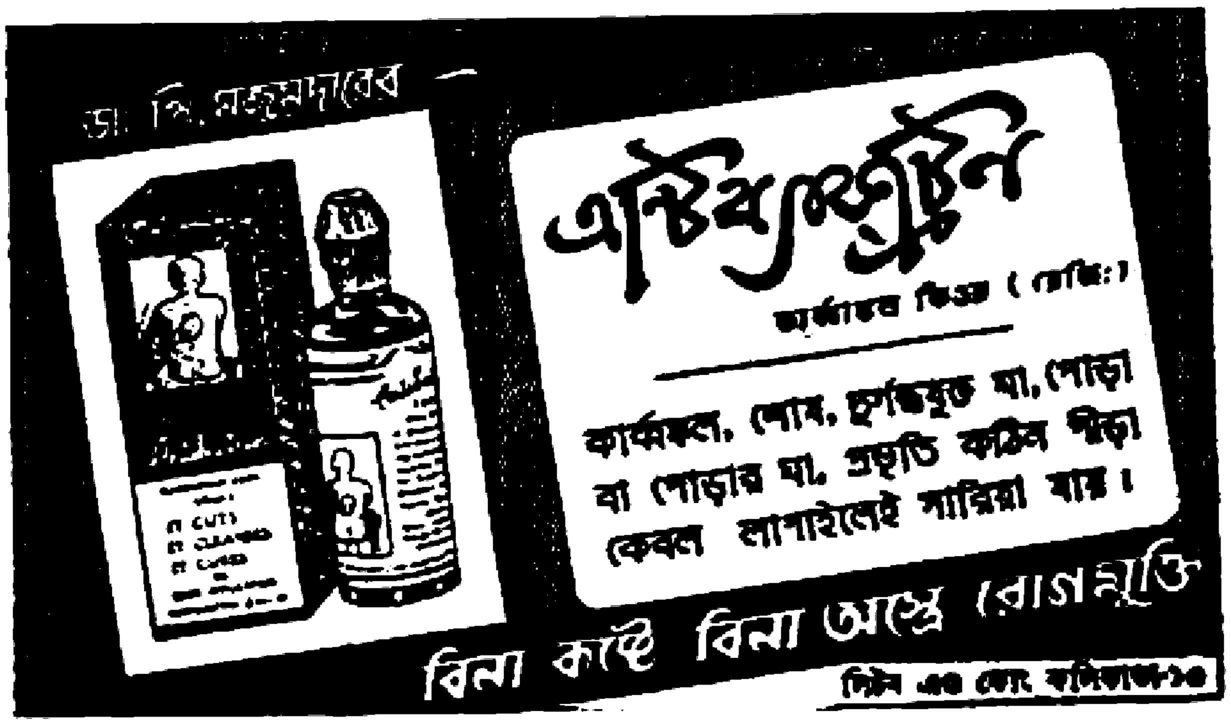

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১৯, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ রচনা ॥ শ্রেষ্ঠ লেখক

শংকরের "সীমাবদ্ধ" উপন্যাস এক মাসের মধ্যেই তিন মুদ্রণ নিঃশেষিত। চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশের পথে।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের নতুন ধরণের রচনা
জঙ্গলে জঙ্গলে ৫৲

নজরুল ইসলামের
সন্ধ্যামালতী ৪৲

লীলা মজুমদারের নতুন উপন্যাস
পাখি ৫॥

প্রমথনাথ বিশী ও বীথিকা চক্রবর্তীর
বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নবতম আলোচনা
বঙ্কিম সাহিত্য বিচার ১২॥

শংকরের 'সীমাবদ্ধ' বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন পথচিহ্ন রচনা করল। চিরকালীন সাহিত্য ভাণ্ডারে বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ অবদান

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁধি ৮৲, আলোর অরণ্য ৭৲, বিধা ২৲

জরাসন্ধের ছায়াতীর ৫৲, লোহকপাট (৪র্থ) ৭৲, ছবি ৬৲, পসারিণী ৬৲, পরশমণি ৫৲, লোহকপাট (অখণ্ড) ২০৲, বন্যা ৫৲, জায়গা আছে ৬৲

সৈয়দ মুজতবা আলীর বড়বাবু ৭৲, টুনিমেম ৮৲, রাজাউজির ৮৲, পছন্দসই ৭৲, শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ৭৲

অবধূতের উদ্ধারণপুরের ঘাট ৫॥০, বশীকরণ ৬॥০, দুই তারা ২॥০, পিয়ারী ৬৲, একান্ত ৬॥০, বহুব্রীহি ৫॥০, কবিরত্নক্ষেত্রে ৪॥০, কলিতীর্থ কালীঘাট ৫॥০, সীমন্তিনী সীমা ৫৲, দুর্গমপন্থা ৪৲, মরুতীর্থ হিংলাজ ৬৲, নীলকণ্ঠ হিমালয় ৯৲

প্রশান্ত চৌধুরীর ডাকো নতুন নামে ৪৲, কান পেতে শুনি ৩৲, কন্টাকটেক ৬৲, আলোকের বন্দরে ৬॥০, নদী থেকে সাগরে ৮৲, সেই মেয়ে সুজাতা ৭৲, গোধূলি রঙিন ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲, সুবর্ণলতা ১০৲, নবছর ৫॥০, অগ্নিপরীক্ষা ৬৲, একাল সেকাল অন্যকাল ১৫৲, রক্তের তাস ৭৲, বিজয়ী বসন্ত ৬৲, নীলপর্দা ৫৲, সমুদ্র নীল আকাশ নীল ৫৲, সোনার হরিণ ৫৲

প্রবোধকুমার সান্যাল উত্তর হিমালয়চরিত ১১৲, গঙ্গা পথে গঙ্গোত্রী ৩॥০, মহাপ্রস্থানের পথে ৬৲, মনে রেখো ৮৲, বেলোয়ারী ৭৲, বন্যাসঙ্গিনী ৩॥০, উত্তরকাল ৩৲, আঁকাবাঁকা ৫॥০, নগরে অনেক রাত ৪॥০, বিবাগী ভ্রমর ৮৲, কলকল্লোল ৫॥০, এক চামচ গঙ্গা ৬৲

মিত্র ও ঘোষের চাঞ্চল্যকর উপহার বাংলা পকেট বই'য়ের প্রথম দফার সাতখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। যে গ্রাহকগণ এখনও নেননি, তাঁরা দয়া করে চিঠি লিখুন।

বিভূতি রচনাবলী

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড আর অল্প কয়েক কপি মাত্র আছে। গ্রাহকগণ এখন না নিলে দ্বিতীয় মুদ্রণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পরবর্তী মুদ্রণে মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়…তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার-করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। **ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।**

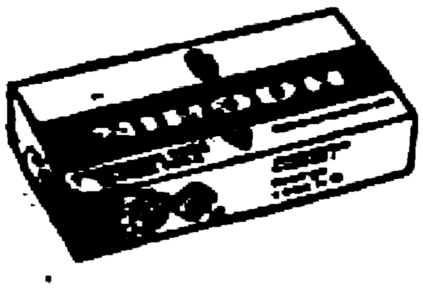

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

১০ম বর্ষ ৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৫৭ সংখ্যা
মূল্য ৫০ পয়সা

Friday 2nd April, 1971 শুক্রবার, ১৯শে চৈত্র, ১৩৭৭ 50 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৩·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬৪৪	চিঠিপত্র		
৬৪৫	পূর্ববাংলা থেকে বাংলাদেশ		—শ্রীশুভময় পাঠক
৬৪৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৬৫১	সম্পাদকীয়		
৬৫২	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৬৫৩	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৬৫৭	আমাদের ছেলে	(কবিতা)	—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৬৫৮	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬৬৩	জনক	(গল্প)	—শ্রীকল্লোল মজুমদার
৬৬৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৬৬৯	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৬৭২	বিরহোড় উপজাতি		—শ্রীকল্যাণী ঘোষাল
৬৭৩	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৭৮	রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী		—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৮৩	অপ্রেম ও প্রেম		—শ্রীবিবস্বান্
৬৮৫	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৬৮৮	পশ্চিমের চোখে		—শ্রীসাংবাদিক
৬৯১	পিঞ্জর	(উপন্যাস)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৬৯৩	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ্
৬৯৮	কালসাপ	(গল্প)	—শ্রীঅশোককুমার সেনগুপ্ত
৭০১	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৭০৩	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৭০৪	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৭০৬	নানাচোখে		—শ্রীসমদর্শী
৭০৮	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭১০	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭১৭	খেলার কথা		—শ্রীক্ষেত্রবিজয় মিত্র
৭১৮	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

বিনামূল্যে বিতরণ

একাদশ শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য কোনও অভিভাবক লিখিলে কল্পনাতীত অল্প সময়ে ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালীর নমুনা বিনামূল্যে পাঠাইয়া থাকি। এই নমুনা দেখিবার পর চূড়ান্ত প্রমাণ পাইয়া অভিভাবক যদি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারেন যে এই প্রণালীতে ডাকযোগে ছয় মাস শিক্ষা পাইলে পরীক্ষার্থী নিশ্চয়ই ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সুদীর্ঘ কালের শ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক করিতে পারিবে তাহা হইলে নির্বিঘ্নে অল্প ব্যয়ে এই শিক্ষাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন।

মজুমদার—২৮ রথীন ব্যানার্জি লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১

এ—২৩০৬০

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

বাংলা দেশের ছড়া

১০ম বর্ষ/৪র্থ খণ্ড, ৪২শ সংখ্যা (শুক্রবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৭৭ সাল) অমৃতে ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের "বাংলা-দেশের ছড়া" বইটির আলোচনা বেশ ভাল লাগলো।

এই প্রসঙ্গে পূর্বসূরীদের মধ্যে (পূর্ববর্তী উদ্যম) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ সঙ্গত ছিল বলে মনে করি।

ডঃ ভট্টাচার্যের বাংলার লোকসাহিত্য ২য় খণ্ড শুধুমাত্র ছড়া'র (ধাঁধার জন্য তাঁর ৫ম খণ্ডটি নির্দিষ্ট) ওপর লিখিত; এতে ছড়া সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার আলোচনা সহ কম-বেশী ১২৫০টি ছড়া উদ্ধৃত হয়েছে। [ভূমিকা—২৫+১ম অধ্যায় (ঘুমপাড়ানী) ১০৭+২য় অধ্যায় (ছেলে ভুলানো) ২১০+৩য়—(খেলা) ১৫১+৪র্থ অধ্যায় (কন্যা) ১৫৭+৫ম (পরিবার) ২০২+৬ষ্ঠ (প্রাকৃত) ১৪২+৭ম—(অতিপ্রাকৃত) ১১১+৮ম (সাহিত্যিক) ৭৮+পরিশিষ্ট+১২=১২৫১, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০] এ ছাড়া সহস্রাধিক ছড়া এবং/বা, বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ শুনেছি অপ্রকাশিত অবস্থায় তাঁর কাছে এখনও রয়েছে।

—বিৎ চক্রবর্তী,
চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান।

'তোমাকে'

আমি 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত ও অনুরাগী পাঠিকা। বর্তমানে এই সাপ্তাহিকে প্রকাশিত প্রত্যেকটি উপন্যাসই প্রশংসার দাবী রাখে। যশস্বী সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীনিমাই ভট্টাচার্যের নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস 'তোমাকে' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা পটভূমিতে লেখা ওঁর সব উপন্যাসই তথ্যমূলক অথচ সুখপাঠ্য। ভাষা ও লেখার ঢঙ এবং বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য এই সব কিছুর জন্যই শ্রীভট্টাচার্যের প্রত্যেকটি লেখা আপন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এই 'অমৃতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ওঁর 'মেমসাহেব' এবং 'ডিপ্লোম্যাট' ইত্যাদি এই বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এই লেখকের এইসব নতুন স্বাদের জনপ্রিয় উপন্যাসের তালিকায় 'তোমাকে' নিঃসন্দেহে আর একটা উজ্জ্বল সংযোজন। এই মিষ্টি উপন্যাসটিতে চরিত্র-চিত্রণ খুবই জীবন্ত। লেখকের প্রকাশভঙ্গী সহজ ও সাবলীল। পারিপার্শ্বিকতার বর্ণনাও সুন্দর।

এই ধরনের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস পরিবেশন করার জন্য 'অমৃত' এর সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদার্হ। আর লেখককে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

—দীপালি দাস,
কটক, ওড়িশা।

(২)

আমি আপনার বহুল প্রচারিত অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এতে প্রকাশিত ছোট গল্প, ফিচার, উপন্যাস, প্রেক্ষাগৃহ, খেলাধুলো প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের জিনিস আমি পড়ি, এবং পড়ে মুগ্ধ হই। সম্প্রতি শ্রীনিমাই ভট্টাচার্যের ধারাবাহিক উপন্যাস 'তোমাকে' পড়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি। এবং সেইজন্য প্রতিটি সংখ্যার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। এবং আপনি বোধহয় জানেন না যে শুক্রবার এলেই আমি পত্রিকাটি না আসা পর্যন্ত দরজার চৌকাঠের সামনে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। অমৃতে এই ধরনের উপন্যাস পাওয়ার জন্য লেখককে আমি আমার অশেষ অভিনন্দন জানাই, এবং তারই সঙ্গে অমৃত পত্রিকায় এই ধরনের উপন্যাস বাহির করার জন্য আমি সম্পাদক মহাশয়কেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আশাকরি আমার এই সামান্য ধন্যবাদের চিঠিটি অমৃতে প্রকাশিত হবে।

—বিমলেন্দু পাড়ুই,
বজবজ, ২৪ পরগণা।

লিটল ম্যাগাজিনের স্বপক্ষে

'অমৃতে'র ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৭৭ সংখ্যার শ্রীজীবনময় দত্তের 'লিটল ম্যাগাজিনের স্বপক্ষে' প্রবন্ধটি ভাল লাগল। বর্তমান যুগে এ ধরনের মননশীল এবং চিন্তার প্রবন্ধ অন্যান্য পাঠক-পাঠিকাদেরও আশা করি ভাল লেগেছে।

প্রবন্ধটির আলোচনাকালে শ্রীদত্ত প্রবাসী, ভারতী ও সবুজ পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম দৃষ্টিতে লিটল ম্যাগাজিনের পূর্বাভাস বলেছেন। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করার পেছনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার দান অনস্বীকার্য। সবগুলির নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তবু এ প্রসঙ্গে 'কথাসাহিত্যে'র কথা বার বার মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যে পত্রপত্রিকার ইতিহাসে 'অমৃতে'র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন প্রতিভা খুঁজে বার করার গুরুদায়িত্ব 'অমৃত' বহন করে চলেছে এবং প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মান যে যথেষ্ট উন্নত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আলোচ্য প্রবন্ধটি।

বাহির্বঙ্গ থেকে পত্রিকা প্রকাশ করা দুরূহ কাজ হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে বাঙলাদেশের বাইরে যে প্রচুর লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে শ্রীদত্ত তা স্পষ্ট করেই বলেছেন। পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে যাঁরা এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বা হচ্ছেন তাঁদের কাছে এই প্রবন্ধটির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

অধ্যাপক অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়,
কাটিহার (পূর্ণিয়া)।

'পাথেয়' প্রসঙ্গে

গত সপ্তাহের অমৃতে (১০ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড ৪৫শ সংখ্যা) মিহির আচার্যের 'পাথেয়' গল্পটি খুব ভাল লাগল। বাংলা সাহিত্যে বর্তমানকালে, মিহির আচার্যের 'ছোটগল্প' একটি বিশেষ আসন লাভ করে আছে। গল্পের বাঁধনি চমৎকার। লেখকের গল্প লেখার টেকনিকটিও বাস্তব শিল্প-বৈচিত্র্যে পূর্ণ।

'পাথেয়' গল্পটিতে বর্তমান যুগের বেকারদের সুতীব্র যন্ত্রণা ও চরম দারিদ্র্য আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে এবং বেঁচে থাকবার তাগিদে শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা আজ কোথায় নেমেছে—তারই একটি নগ্ন বাস্তব চিত্র লেখক এঁকেছেন গল্পটিতে।

সম্পূর্ণ গল্পটি নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সের মধ্য দিয়ে শেষ করা হয়েছে বলে শেষ হয়েও যেন চিন্তাশীল পাঠকচিত্তে দোলা দেয়।

সুশীল চৌধুরীর 'জয় বাঙলার' আলোয় 'পদ্মা আমার গঙ্গা আমার' ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'বাংলার পল্লী' এই সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ায় 'অমৃত' আরও প্রশংসিত হয়েছে। 'অমৃতে'র স্বাদ যে অন্য সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে আরও ভিন্নতর, তার কারণ, সম্পাদক নতুন নতুন আলোচনামূলক লেখাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। নতুন লেখকদেরও সুযোগ দিচ্ছেন দেখে সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই।

দেবীপ্রসাদ চৌধুরী
আলিপুরদুয়ার কোর্ট, (জলপাইগুড়ি)

পূর্ব বাঙলা থেকে বাঙলাদেশ

খবরের পর খবর আসছে, বিচিত্র এবং বিস্ময়কর সব সংবাদ। জাগরণের গান শোনা যাচ্ছে চতুর্দিকে। জাতি-উত্থানের স্মৃতিগুলি হাওয়ায় ভাসমান:

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান সদ্য এসে হাজির হয়েছে 'বাংলাদেশে'।

অবশ্য এই বাক্য শব্দের ইতিহাস অনেক প্রাচীন—অনেক জটিল। সেকথা আজ আর আলোচ্য নয়। ঐতিহাসিকেরা তারিখটাকে স্মরণ করেন অন্যভাবে, প্রকাশ্য ঘটনার নিরিখে—১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী।

সেইজন্যেই চিঠিটা পেয়ে অবাক হইনি, বহু প্রত্যাশিত ডাক শুনে খুশি হয়েছি। এই তো আমার ভাইয়ের কণ্ঠস্বর, প্রতিবেশীর আবেদন। এমন কতো চিঠির জন্যই তো আমরা সরলভাবে অপেক্ষা করে আছি দীর্ঘকাল।

বাংলাদেশের চিঠি

ঢাকা থেকে অমৃতের সম্পাদককে চিঠি লিখেছেন সালেহ মোস্তাফা জামিল। কোনো ব্যক্তিগত পত্রালাপ নয়। সহজ, সরল একটি অনুরোধ। 'লেটার-হেড'-এ মুদ্রিত ঠিকানা: "কল্লোল সাহিত্য সংসদ, ৩৬ স্বামীবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ।"

চিঠির বাঁ-দিকে একতারা হাতে বাউলের ছবি এবং ঠিকানার নিচে ইংরেজী 'ফোন' শব্দটি পর্যন্ত বাংলায় অনূদিত: 'দূর আলাপনী': নম্বর ২৪৪৪২৫।

ভাবতেই আশ্চর্য লাগে।

ইংরেজী বর্জনের তাগিদে নয়, বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থানে একটি দেশের প্রতিটি মানুষের এই জাগরণ। বাংলাভাষী হিসেবে এ আমাদের উজ্জ্বল অহংকার।

সালেহ মোস্তাফা জামিল লিখেছেন: "আমাদের একুশে সংকলন 'মা আমার' এক

আমাদের সামনে কোন আপস নেই—মুজিবর

রক্ত পাঠালাম। আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। জয়বাংলা।"

সীমান্তের অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে এমন চিঠি বহু আসতো। আমরাও গতানুগতিক সোজন্যালাপ মনে করতাম। কিন্তু এ চিঠিকে তা মনে করা যাচ্ছে না। তার কারণ, এ চিঠি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসেনি, এসেছে বাংলাদেশের ঢাকা শহর থেকে—জাতিস্মরের স্মৃতি নিয়ে।

মা আমার

'মা আমার' কোনো অসাধারণ সাহিত্যের সংকলন নয়—একুশে ফেব্রুয়ারীর স্মরণীয় দিনটির উদ্দেশ্যে রচিত কিছু রচনার স্মারকপত্র। উৎসর্গীকৃত হয়েছে : "অনেক বেদনা, অনেক দুঃখের কান্না বক্ষগর্ভে হবে যাদের কণ্ঠে উচ্চকিত হয়েছিল বাহান্নর একুশে—গণতান্ত্রিক সংগ্রামের 'সিপাহী-সালার সেইসব বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে।"

'মা আমার' শব্দ দুটি এই মুহূর্তে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল ভাষা নয়, একটি দেশ যেন কুয়াশা কাটিয়ে বাংলা-দেশের মাতৃমূর্তিকেই দেখছেন রক্তের আলোয় রৌদ্রের দীপ্তিতে—চিরকালের আলোক-সম্পদে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাণী শিরোধার্য করে ছাপা হয়েছে অন্যান্য রচনা। 'বাংলাদেশের' প্রতিষ্ঠাবার্ষিক নায়ক লিখেছেন :

"বাহান্নর ভাষা আন্দোলন মুখের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা রক্ষারই আন্দোলন ছিল না—সত্যিকার অর্থে তা ছিল এদেশের প্রথম সংঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। কী সীমাহীন ঔদ্ধত্য! পাক-ভারত উপমহাদেশের বাঙালী মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রত্যক্ষ ফল এই পাকিস্তান। অথচ সেই পাকিস্তানে বাঙালী মাকে বলতে পারবে না 'মা'।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে খণ্ডিত, খর্ব ও পঙ্গু করবার যে-প্রচেষ্টা স্বাধীনতার লগ্নে শুরু হয়েছিল, সেই প্রচেষ্টার স্রোত। সেই প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীরা সুযোগ পেলেই লুক্কায়িত বিবর থেকে বেরিয়ে আসবে।... অধিকতর সচেতন হবার সময় এখন।... জনগণের রায়কে নস্যাৎ করবার সমস্ত হীন প্রচেষ্টাকে রুখতেই হবে এবং তা যে-কোন মূল্যে।

ভাষাহীন ক্রন্দনে অপমানিতা তোমার বক্ষের বেদনা আমরা দেখেছি মা। তবু তুমি নিশ্চিন্ত থাক না। তোমার সন্তানেরা পৃথিবীর দিকে দিকে যুদ্ধ করছে, বাধের শেষ একদিন হবেই।"

আজকের এই বিপর্যয় এবং তীব্র প্রতিরোধের মুহূর্তে, বঙ্গবন্ধুর সেদিনের আকাঙ্ক্ষা কতখানি সত্য—তা প্রত্যেক দেশ-বাসীরই হয়তো মনে পড়ছে। একা শেখ মুজিবর রহমনই নন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ এমন একটি হিংস্র আক্রমণের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

সংকলনটির সম্পাদক মোস্তাফা জামিল লিখেছেন শপথের ভাষায় : "এদেশের আলো-বাতাসের ঋণ যদি শোধ নাও দিতে পারি, তবে অন্তত একুশের মহান শহীদদের সামনে রেখে এদেশের মাটি মাথায় নিয়ে বলব যে, প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে পিছপা হব না। বিজয় আমাদের হবেই। কারণ, আমরা সংগ্রাম করছি সত্যের জন্য।"

সম্পাদকীয় শেষ হয়েছে সেই অবিস্মরণীয় শ্লোগানে: 'শহীদ দিবস অমর হোক'।

এখন 'বাংলাদেশে' শহীদেরা সংখ্যায় বাড়ছে। জাদুকরের ডাকে সাড়া দিয়েছে পূর্ব বাংলার জনপদের মানুষ। প্রতিধ্বনি উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে। মাতৃঋণ রক্ত দিয়ে পরিশোধ করার সংকল্পে উত্তাল হয়েছে বিদ্রোহী বাংলা।

হোসনে আরা দিদু ডাক দিয়েছেন : "তবে এসো—এসো সংগ্রামে। প্রতিজ্ঞা নাও, ধ্বংস করব ওদের......যারা রক্তগোলাপের বুকের ভাষা কেড়ে নেয়।...আমরা সবাই এক, আমাদের সবারই এক জ্বালা। সোনালি সূর্য আমাদের ডাকছে—আর দেরী নয়।"

পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা সংস্কৃতি সমিতি

'পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা সংস্কৃতি সমিতি' বেশ কিছুকাল ধরেই উভয় বাংলার মধ্যে একটা সহজ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যম চালিয়ে যাচ্ছেন নানাভাবে। পত্রপত্রিকা, সাময়িক সংকলন প্রকাশ করে—কিংবা আলোচনাচক্রের আয়োজন করে ওঁরা জনমত গঠনেও উদ্যোগী বলে মনে হয়। সম্প্রতি ডঃ দুলাল চৌধুরীর সম্পাদনায় বের করেছেন 'পূর্ববাংলার লোকসংস্কৃতি' নামে একটি সংকলন।

বইটির ভূমিকায় ডক্টর চৌধুরী স্পষ্টত লিখেছেন: "এই সংকলনের প্রকাশ মূলত ১৯৫২ সালে পূর্ববাংলায় বাংলা-ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে। বাংলাভাষার বেদীমূলে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, যে-পাথরে নাম শহীদেরা রক্তের অক্ষরে.... লিখে গেছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অন্তহীন। আজ একুশে ফেব্রুয়ারীতে আবার উনিশ বছর পরে, সেই শহীদ ভাইবোনদের স্মরণ করছি, আবার মাতৃভাষার সম্ভ্রম রক্ষার অনির্বাণ শপথ নিচ্ছি।"

পশ্চিমবাংলায় এ ধরনের সংকলন সম্ভবত এই প্রথম বেরোল। কিংবা এর আগে যদি এ ধরনের অন্য কোনো সংকলন

ঢাকার রাজপথে মহিলা সমিতির মিছিল

বেরিয়ে থেকে থাকেও, তবে আমার নজরে পড়েনি। তবে পূর্ববাংলা থেকে বেরিয়েছে বহু।

এই সংকলনটি পড়তে পড়তে রক্তস্নাত একটি দেশের—একটি জাতির—ধর্মদ্বেষহীন পুনর্জন্মের (নাকি নবজন্মের?) কথাই যেন বেশি মনে পড়ে। না হলে 'লৌকিক চিত্রকলায় আলপনার স্থান' সম্পর্কে কি লিখতে পারতেন মোহাম্মদ সাইদুর ইসলাম?

আলপনার উৎস নির্ণয় করতে গিয়ে মোহাম্মদ সাইদুর রহমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করেছেন সর্বাগ্রে যে অবনীন্দ্রনাথ 'বাংলার ব্রতে' লিখেছিলেন, এইসব 'জানিস কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের সম্পদ নয়—"পুরাণের চেয়ে পুরনো, বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও আগেকার মানুষের" এইসব সৃষ্টি।

এবং হাসান হাফিজুর রহমান লোকসংস্কৃতির সন্ধানে খুঁজে পেয়েছেন "উত্তরবঙ্গের মেয়েলী গীত"-এর সন্ধান, যেসব গীত মূলত হিন্দু লৌকিক সংস্কারের দ্বারা লালিত। অথচ হিন্দু-মুসলমানের সেতুবন্ধনে এই গীতগুলোই প্রাচীনতম যোগসূত্র।

লোকসাহিত্যের আলোচনাই সেজন্যেই পূর্ববাংলার সাহিত্যিক এবং অধ্যাপকেরা ধর্মীয় নির্দেশকে অমান্য করে মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত বাংলাদেশ ও তার সংস্কৃতির সন্ধান করেছেন—ইসলামী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হননি।

এই নিরপেক্ষতাবোধ, এই স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টিই ওপারের মানুষকে প্রাণশক্তি সঞ্চারে সাহায্য করেছে—পাকিস্তানের মাটি ছেড়ে 'বাংলাদেশে'র ভূমিতে প্রবেশের প্রেরণা দিয়েছে। বদরউদ্দীন ওমর হয়তো এই প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছেন, এ যেন 'বাঙালী মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।'

এই সংকলনে ছাপা হয়েছে মোট ৮টি বাংলা প্রবন্ধ ও একটি ইংরেজী প্রবন্ধ। লিখেছেন ডক্টর মযহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, মোহাম্মদ সাইদুর, হাসান হাফিজুর রহমান, রওসন ইজদানী ও ডক্টর মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

দিনবদলের পালা

দিন যে দ্রুত পালটে যাচ্ছে, দৃশ্যপটের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে—তার নিদর্শন এখন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র—দুই বাংলার মাঠেঘাটে—জীবনে ও জনপদে। উনিশ শ সত্তর সালে সাইক্লোনবিধ্বস্ত মানুষের শোকে পূর্ববাংলায় যে-কবির চোখ দিয়ে ঝরেছিল অজস্র চোখের জল, সেই চোখ দিয়ে প্রায় ঝরে পড়ছে আগুন। কবি শামসুর রহমান মাত্র কয়েক মাস আগে বেদনার্ত কণ্ঠে বলেছিলেন:

"আমার পকেটে দুটি মৃত গ্রাম্য শিশু।
গলায় ঝুলছে মুমূর্ষু, আঙুলে জড়ানো
লজ্জাবতী বিবস্ত্র বধূর চুল।
আমাদের হৃদয় হয় অগোচরে শুষ্ক মরুভূমি।
যোজন যোজন ব্যাপী
অতিশয় উদার শ্মশান।

গভীর শোকের মতো, অস্পষ্ট কান্নার মতো ঘুমপাড়ানিয়া গানে সেই দুঃখের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল কবিতায়, গানে, শিল্পে ও সাহিত্যে।

আর অল্প মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশের কবির কণ্ঠে শুনেছি বজ্র-কঠিন শপথের ঘোষণা। কবি আবু জাফর লিখেছেন:

"দিয়েছি তো শান্তি, আরো দেবো স্বস্তি
দিয়েছি তো সম্ভ্রম, আরো দেবো অস্থি
প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত
হক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত।
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই।
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।"

এবং কবি সিকান্দারের কণ্ঠেও নতুন প্রত্যয়ের আহ্বান—সংগ্রামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের প্রস্তুতি:

ঐ দ্যাখো স্বাধীনতা জ্বলছে,
স্বাধীনতা: চৈতালী সূর্য।
বিদ্ধ আক্রোশে বলছে:
জনগণ কই রণতূর্য?

কবিপ্রার্থিত সেই রণতূর্যের শব্দ এখন পূর্ববাংলার গ্রাম, গাছগাছালি, নদনদী ও প্রান্তরে প্রান্তরে কঠিনতম প্রতিরোধের সাহস দিচ্ছে, অভয় দিচ্ছে। সূর্যমুখীর বুক চিরে রক্ত ঝরছে। কবি আনিসুজ্জামানের ভাষায়: "বুকের রক্তে লেখা হলো বিপ্লবের নয়া ইতিহাস।"

মৃত্যুঞ্জয় পাঠক

শেখ মুজিবর রহমান

স্বাধীন বাঙলা দেশের নায়ক

দেশে বিদেশে

পাকিস্থানের জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ও তাঁর পরামর্শদাতারা শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমানের বাংলাদেশকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পথেই ঠেলে দিলেন। ঢাকায় এগারোদিন ধরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে ইয়াহিয়া, ভুট্টো প্রভৃতির দল রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আকাশপথে পশ্চিম পাকিস্থানে পাড়ি দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী হিংস্র দানবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলাদেশের মানুষের উপর। শেখ মুজিবর রহমান জবাব দিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁর দেশের মানুষকে প্রতিরোধের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বাংলাদেশে এখন সেই মুক্তিযুদ্ধ চলছে বন্দরে-শহরে-গঞ্জে, রাস্তায় রাস্তায়। একদিকে মেসিনগান, ট্যাঙ্ক, এমনকি বোমারু বিমান আর একদিকে দুর্জয় সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ মানুষ, যাদের অধিকাংশের হাতে দা, কাটারি, বর্শা ছাড়া অস্ত্র নেই এবং যাদের সঙ্গে আছে কিছুসংখ্যক অস্ত্রধারী পুলিশ। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের বেতার কেন্দ্র থেকে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে জানা যাচ্ছে যে, জনসাধারণের প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্যবাহিনী জায়গায় জায়গায় পিছু হঠতে আরম্ভ করেছে। সামরিক প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খাঁ একজন মুক্তিযোদ্ধার গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন।

আর একটি সংবাদ এই যে, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার যাতে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ যাতে এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন সেজন্য আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চেষ্টা করছেন।

ভারতে লোকসভায় সদস্যরা পূর্ববঙ্গবাসীদের এই সংগ্রামে সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্রতিবেশী দেশে এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার 'নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন না।

পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের পরে নয়াদিল্লীতে নূতন সরকার গঠিত হয়েছে, সেখানে লোকসভার অধিবেশনও শুরু হয়েছে। লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সাথে সাথে যে তিনটি রাজ্য বিধানসভারও অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে কিন্তু একমাত্র তামিলনাড়ুতেই এই নির্বাচন একটা সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করেছে। সেখানে ডি এম কে সরকার ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু অন্য দুটি রাজ্যে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় এখনও নির্বাচিত সরকার গঠন করা যায়নি। দুই রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে। উড়িষ্যায় ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বাড়ান হয়েছে।

নির্বাচনোত্তর অন্যান্য যেসব রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে সেগুলি হল : (১) উত্তরপ্রদেশে টি এন সিংহের নেতৃত্বাধীন এস ভি ডি মন্ত্রিসভা টলমল করছে। (২) মহীশূরে বীরেন্দ্র পাতিলের নেতৃত্বাধীন বিরোধী কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ভেঙে গেছে। (৩) বিহারে কর্পূরী ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন এস ভি ডি মন্ত্রিসভা ফের গড়েছেন। (৪) গুজরাটে শ্রীহিতেন্দ্র দেশাইয়ের নেতৃত্বাধীন বিরোধী কংগ্রেস মন্ত্রিসভার উপর চাপ আসছে। (৫) অন্ধ্র বিধানসভা ভেঙে দিয়ে আগামী মে মাস নাগাদ সেখানে অন্তর্বর্তী নির্বাচন করার কথা হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহীশূর ও গুজরাটে, সর্বত্র কমবেশী একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ইন্দিরামুখী জোয়ারের টানে বিরোধী কংগ্রেস, এস এস পি প্রভৃতি দলের সদস্যরা দল ছেড়ে এসে শাসক কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। এই জোয়ারের টানে যাঁরা ভেসে আসছেন, তাঁদের মধ্যে কোথাও কোথাও মন্ত্রীরাও আছেন। উত্তরপ্রদেশে একদিনে ১৭ জন সরকার-সমর্থক সদস্য দল ছেড়ে বেরিয়ে শাসক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীও আছেন। সেখানে এমনকি বিধানসভা সদস্যদের হিসাবেও টি এন সিংয়ের মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে সেখানকার বিধান-সভায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশও দেওয়া হয়েছে। এদিকে উত্তরপ্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিক পার্টিগুলি মুখ্যমন্ত্রী টি এন সিং-কে পদত্যাগ করার অনুমতি দিচ্ছেন না। গত জানুয়ারি মাসে মণিরাম উপ-নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই শ্রীসিং পদত্যাগ করতে চাইছেন। কিন্তু এস ভি ডি-র দলগুলি চেষ্টা করছে তাঁকে রাজ্যপালের মনোনয়ন দিয়ে বা নির্বাচনের মারফৎ বিধান পরিষদে নিয়ে এসে সংবিধানের নিয়ম রক্ষা করতে। (শ্রী সিং এখন আইনসভার কোন কক্ষেরই সদস্য নন। নিয়ম অনুসারে তিনি আর মাস-খানেকের মধ্যে আইনসভার সদস্য না হতে পারলে তাঁকে এমনিতেই মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হবে)।

এক বছরে ত্রয়োদশ মুদ্রণ
শঙ্কর-এর
এপার বাংলা ওপার বাংলা ১০·০০
সার্থক জনম — ৪র্থ মুদ্রণ ৯·৫০ | মানচিত্র — ১১শ মুদ্রণ ৮·০০ | চৌরঙ্গী — ২২শ মুদ্রণ ১২·৫০

নববর্ষে যে সব বই প্রকাশিত হবে
ডঃ নবগোপাল দাস-এর দুই নারী | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপনিবেশ ৩ খণ্ড একত্রে | আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রণয় পাশা
মনীমাধব চৌধুরীর আবির্ভাব | নীরদা চক্রবর্তীর অহল্যা রাত্রি | আশীষ বসুর মনে রেখো

ওংকার গুপ্তের ব্যাপার বহুতর — সচিত্র বাংলা রচনা ৫·০০ | আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন তুলির টান ৩য় মুদ্রণ — 'নবরাগ' নামে ছায়াচিত্রে দেখান হচ্ছে : ৭·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হসন্তী — দাম : ৪·৫০ | এর নাম সংসার — ৫ম মুদ্রণ : ৮·৫০ | বিমল মিত্রের গল্পসম্ভার — দাম : ১১·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশিপদ্ম — নবম মুদ্রণ ৪·৫০ | মণিবউদি — ২য় মুদ্রণ ৫·৫০ | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোকপর্ণা — দাম : ১০·০০

জরাসন্ধ-র
স্বীকৃতি ৭·০০ | মসিরেখা ১·০০ | পাড়ি ৩·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের তাঞ্জাম — দাম : ৪·৫০ | বনফুলের এক ঝাঁক খঞ্জন — দাম : ৬·৫০ | অধিকলাল — ২য় মুদ্রণ : ৭·৫০

চাণক্য সেনের শুধু কথা — ২য় মুদ্রণ ৩·৫০ | তিন তরঙ্গ — ৩য় মুদ্রণ ৭·০০ | সমরেশ বসুর জগদ্দল — ২য় মুদ্রণ ১৫·০০

কুমারেশ ঘোষের এক বর অনেক কনে — দাম : ১০·০০ | দেবল দেববর্মার রাত তখন দশটা — দাম : ৬·৫০

সুভাষ সমাজদারের আবগারী দারোগার ডায়েরী — দাম : ৫·০০ | সতীনাথ ভাদুড়ীর জলভ্রমি — দাম : ৩·৫০

বাক্‌-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মহীশূরে বীরেন্দ্র পাটিল সেই তুলনায় অনেক মানে মানে সরে গেছেন। যখনই তিনি বুঝলেন যে, বিধানসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, তখনই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশে টি এন সিং ও মহীশূরে বীরেন্দ্র পাটিল যে ভাঙন ঠেকাতে পারেন নি, গুজরাটে হিতেন্দ্র দেশাই কিন্তু সেটা আপাতত কিছুটা ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছেন। গুজরাট বিধানসভায় নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেস দলের সদস্যরা বৈঠকে মিলিত হয়ে স্থির করেছেন যে, আলাদা-আলাদাভাবে দল ছেড়ে তাঁরা শাসক কংগ্রেসে গিয়ে যোগ দেবেন না, 'আমরা ডুবতে হয় একসঙ্গে ডুবব, ভাসতে হয় একসঙ্গে ভাসব।' সেখানকার শাসক কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীকান্তিলাল ঘিয়ার একটি হুমকি দলের সদস্যদের এই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। তিনি বলেছিলেন, বিরোধী কংগ্রেস দলের লোকেরা আসতে চাইলেই যে স্থান দেওয়া হবে তার কোন মানে নেই। বিরোধী কংগ্রেস নেতারা তাঁদের সদস্যদের একথা বোঝাতে সম্ভবত সমর্থ হয়েছেন যে, আজকের পরিস্থিতিতে তাঁদের শাসক কংগ্রেসে যেতে হলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে যেতে হবে।

কিন্তু হিতেন্দ্র দেশাইয়ের দুশ্চিন্তা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ দূর হয়নি। তাঁর দলে যে ১৭ জন আদিবাসী এম-এল-এ আছেন, তাঁরা মন্ত্রিসভায় অধিকতর প্রতিনিধিত্বের জন্য বেশ কিছুকাল যাবৎ দাবী জানিয়ে আসছিলেন। সেই দাবী নিয়ে টালবাহানা করার প্রতিবাদে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে একটি ভোজসভা ও দলের বৈঠক বর্জন করেছিলেন।

এই স্রোতের টানে নদীর যে-কূল ভাঙছে সেই কূলেই শুধু সমস্যা দেখা দিচ্ছে না, যে-কূল গড়ছে সেই কূলেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সুসময়ের বন্ধু হওয়ার জন্য যাঁরা এখন শাসক কংগ্রেসে পাড়ি জমাচ্ছেন, তাঁদের নিয়ে কি করা হবে? আনুগত্য পরিবর্তনের জন্য তাঁদের কি মন্ত্রিত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে? এবিষয়ে শাসক কংগ্রেস দলের কোন সুস্পষ্ট নীতি নেই বলে মনে হচ্ছে এবং তা না থাকার ফলে কিছু কিছু বিতর্ক ও বিরোধ দেখা দিচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের শাসক কংগ্রেস নেতা শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর মনে এবিষয়ে কোন দ্বিধা-সংশয়ই নেই। তাঁর কথা হল, এক সময়ে যাঁরা দল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরে আসতে চাইলে দরজা খোলা না রাখার কারণ নেই। (উত্তরপ্রদেশে যে-ধরনের সদস্যরা শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন, তার একটি নমুনা পাওয়া যাবে জগদীশ গান্ধীর মধ্যে। ইনি এস ভি ডি-র সমর্থক ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি মণিরাম কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শাসক কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করেন। শাসক কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তিনি আলিগড় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য শাসক কংগ্রেস দলের মনোনয়ন চান। শাসক কংগ্রেসের টিকেট না পেয়ে তিনি নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে ঐ কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তাঁর জামানৎ বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এখন তিনি আবার শাসক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।)

কিন্তু মহীশূরের শাসক কংগ্রেস দলের একাংশ এই ধরনের দলছুটদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেঁকে বসেছেন। যাঁরা এভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের মধ্যে মহীশূরের শাসক কংগ্রেস দলের আড হক কমিটির সভাপতি দেবরাজ উরস্‌ও আছেন। শ্রীউরস্‌ চান যে, বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নূতন করে নির্বাচন করা হোক। তিনি বলেছেন, 'নির্বাচন না করে মন্ত্রিসভা গঠন করার নৈতিক বা বাস্তব অধিকার আমাদের নেই।' অপরপক্ষে, বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের নেতা এইচ সিদ্ধবীরাপ্পা বিলম্ব করতে চান না, তিনি দলছুটদের নিয়ে (অথবা তাঁদের সমর্থনে) এখনই মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান। দুই মতের মাঝামাঝি আর একটা প্রস্তাব এসেছিল। সেটা হচ্ছে এই যে, শাসক কংগ্রেস দল এখন একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে কিছুদিন পরেই বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নূতন নির্বাচন করার জন্য রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করুন। শাসক কংগ্রেস দলের নিখিল ভারত কমিটির সাধারণ সম্পাদক উমাশঙ্কর দীক্ষিত নিজে মহীশূরে ঘুরে গেছেন, দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই বিরোধ মীমাংসার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এই অবস্থায় মহীশূরে সম্ভবত রাষ্ট্রপতির শাসনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

উড়িষ্যায় যে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বাড়াতে হল, তারও কারণ সেখানকার শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে অনৈক্য। সেখানে বিজু পট্টনায়কের উৎকল কংগ্রেস দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শাসক কংগ্রেস দলের আহ্বায়ক বিনায়ক আচার্য মন্ত্রিসভা গঠনের পথ অনেকটা তৈরি করে এনেছিলেন। এমনকি, শ্রীআচার্য রাজ্যপাল ডাঃ এস এস আনসারির সঙ্গেও দেখা করে এসেছিলেন। তখন এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, শ্রীআচার্য উড়িষ্যা বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের নেতা হবেন। এই দলের কিছু তরুণ সদস্য ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবকে ভাল চোখে দেখেন না। উড়িষ্যা থেকে নির্বাচিত লোকসভার কয়েকজন শাসক কংগ্রেস সদস্য নয়াদিল্লীতে সেকথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু দলের সর্বভারতীয় নেতাদের প্রতিনিধি হিসাবে দরবারা সিং ও শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী যখন উড়িষ্যায় এসে উপস্থিত হলেন, তখন থেকেই চাকা উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ করল। বিধানসভার শাসক কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হলেন ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, বিনায়ক আচার্য নন। উৎকল কংগ্রেস দলকে শাসক কংগ্রেস দলের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানান; কিন্তু উৎকল কংগ্রেস নেতা বিজু পট্টনায়ক শাসক কংগ্রেস দলে থাকার সময় তাঁকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, সেই শাস্তি প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁকে শাসক কংগ্রেস দলে নেওয়া হবে কিনা তা পরিষ্কার করে বলা হল না। শাসক কংগ্রেস দলের নেতা হিসাবে ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব যখন মন্ত্রিসভা গড়ার জন্য উৎকল কংগ্রেস দলের বিধানসভা নেতা নীলমণি রাউৎ-রায়ের সমর্থন চাইলেন, তখন শ্রীরাউৎ-রায় নানারকম সর্ত দিলেন। ফলে আলোচনাটা ভেঙে গেল। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব যখন মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকার দাবী করলেন এবং বিধানসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলে জানালেন তখন রাজ্যপাল ডাঃ এস এস আনসারি তাঁর সেই দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু রাখার জন্য নয়াদিল্লীতে সুপারিশ পাঠালেন। মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেওয়ার জন্য বিধানসভা অবশ্য জীইয়ে রাখা হয়েছে।

উড়িষ্যার সর্বশেষ খবর হচ্ছে, সেখানে অশীতিপর নেতা ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল বিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বে উৎকল কংগ্রেস, স্বতন্ত্র পার্টি ও ঝাড়খণ্ড পার্টির একটি জোট তৈরি হয়েছে এবং এই জোট মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য চেষ্টা করছেন।

অন্ধ্র বিধানসভা ভেঙে দিয়ে সেখানে আগামী মে মাসে একটা অন্তর্বর্তী নির্বাচন করা হতে পারে। নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডির কথাবার্তার পর এই রকম একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস দলের অনুকূলে যে-হাওয়া টের পাওয়া গেছে, মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডি সময় থাকতে থাকতে তার সুযোগ নিতে চাইছেন।

—পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

স্বাধীন বাংলাদেশ

২৬ মার্চ ১৯৭১ পূর্ববাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। পঁচিশ দিন অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর ২৫ দিনে পশ্চিম পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রাম ঘোষণা করতে বাধ্য হয় পূর্ববাংলার মানুষ। এই দিনই বাংলাদেশের এক গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে ভেসে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ঃ বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম। পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাংলাদেশের মানুষ আজ সর্বস্ব পণ করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় প্রস্তুত। আর দ্বিধা নয়, আর আলোচনা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের গোলাম হয়ে আর থাকবে না সাড়ে সাত কোটি বাঙালী। তার তেইশ বছরের দুঃসহ পরাধীনতা ও শোষণের বিরুদ্ধে শুরু হল গণ-অভ্যুত্থান। শুরু হল বাঙালীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

এগারো দিন ধরে ঢাকায় ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান। এই এগারো দিন তিনি কৌশলে কালহরণ করেছেন। একদিকে তিনি তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানী সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে মুজিবের সঙ্গে আলোচনা চালাবার ভান করেছেন। অন্যদিকে গোপনে সামরিকবাহিনীকে প্রস্তুত করেছেন বাঙালী স্বাধীনতাকামীদের ওপর শেষ আঘাত হানবার জন্য। ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রিতে চুপি চুপি চোরের মতো তিনি এবং তাঁর বশম্বদ অনুচর জুলফিকার আলি ভুট্টো পলায়ন করেছেন ঢাকা থেকে। করাচীতে ফিরে গিয়েই ঘোষণা করেছেন তাঁর ফ্যাসিস্ত চক্রান্তের বিশদ বিবরণ। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নেতা শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর সহকর্মীদের তিনি চরম ঔদ্ধত্যসহকারে আখ্যা দিয়েছেন পাকিস্তানের শত্রু। আওয়ামি লীগকে তিনি বেআইনী ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশে 'জয় বাংলা' ধ্বনি তিনি ফতোয়া জারি করে নিষিদ্ধ করেছেন। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, বেতার সমস্ত আজ ফৌজী সেন্সরের অধীন। সমগ্র পূর্ববাংলার সভা-সমিতি, মিছিল নিষিদ্ধ। বাংলাদেশে আবার শুরু হল পশ্চিম পাকিস্তানী আক্রমণ। এ-আক্রমণ নগ্ন, ভয়ংকর এবং বাঙালীর রক্তে রঞ্জিত।

এরকম যে ঘটবে তা আগেই আশংকা করা হয়েছিল। ইয়াহিয়া খান পাঞ্জাবী সেনাবাহিনীর হাতের পুতুল। গোটা পাকিস্তানই আজ পাঞ্জাবী-সিন্ধী পুঁজিপতি শিল্পপতিদের শোষণক্ষেত্র। শুধু পূর্ববাংলা নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্বলতর অংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাখতুন এবং বেলুচিস্তানের বালুচদের তারা শোষণ করছে। মুজিবর সকলের হয়েই চেয়েছেন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। তিনি শুধু বাঙালীদের জন্য চাননি। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি চেয়েছিলেন, সামরিক শাসনের অবসান ও জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারের হাতে শাসনভার প্রত্যর্পণ। তিনি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা কোনোদিন বলেননি। তিনি চেয়েছিলেন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল আওয়ামি লীগের প্রস্তাব। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতা, ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির ওয়ালি খান, মুসলিম লীগের নেতা আবদুল কোয়ায়ুম খান, বালুচিস্তানের নেতা খান আবদুল সামাদ আচকজাই, এমনকি কট্টর গোঁড়াপন্থী জমায়েত-ই-ইসলামীর নেতাও সমর্থন করেছিলেন মুজিবরের দাবি। একমাত্র বিরোধিতা করেছেন পিপলস পার্টির জুলফিকার আলি ভুট্টো।

ইয়াহিয়া খানের এই বিশ্বাসঘাতকতা জার্মান গণতন্ত্রের প্রতি ফ্যাসিস্ত হিটলারের বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গেই তুলনীয়। তিনি চাইছেন ইঙ্গ-মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী দিয়ে পূর্ববাংলাকে দখল করে রাখতে। পূর্ববাংলার সর্বত্র শুরু হয়েছে সংগ্রাম। পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসবাহিনী যোগ দিয়েছেন মুজিবের দলে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রসংঘ ও পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে তাদের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তার জন্য। স্বাধীন বাংলা বেতারে বলা হয়েছে, দখলদারবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে বিভিন্ন অঞ্চলে। বাংলাদেশে মুজিবের সরকারই বৈধ। ইয়াহিয়ার অবৈধ সরকারের ভাড়াটে সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত চলবে এই স্বাধীনতার যুদ্ধ।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এই গুরুতর পরিস্থিতিতে আমরা উদ্বিগ্ন। ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষ পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধী। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি ভারতের পূর্ণ সমর্থন আছে। ভারত সরকার যেন কোনো কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানী বিমান ভারতের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে না দেন। বৃটিশ সরকারের সহযোগিতায় এখন পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ পূর্ববাংলায় যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন দমন করাই হল এদের উদ্দেশ্য : বাংলাদেশকে এই পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরাই। নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় প্রতিশ্রুতি যে ছিল মিথ্যা ভণ্ডামি তা আজ পরিষ্কার। বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষ আজ এক অসম প্রতিপক্ষের সঙ্গে জীবনমরণ লড়াইয়ে লিপ্ত। [illegible] পশ্চিম পাকিস্তানী দখলদার সৈন্য পাঠানো হয়েছে। রক্তঝরা সংগ্রামের সূচনা হল পূর্ববাংলায়। তার দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রামের শেষ নেই।

CENTRAL LIBRARY

এক নজরে

নির্বাচন পদ্ধতি প্রসঙ্গে :

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে শাসক কংগ্রেস লোকসভায় যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে তা কতটা গণ-সমর্থন-পুষ্ট এবং নির্বাচকমণ্ডলীর প্রকৃত সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বতন্ত্র দলনেতা শ্রীমিনু মাসানী। তিনি বা তাঁর দলের প্রার্থীরা যদি সদ্যসমাপ্ত লোকসভার নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত না হতেন এবং অন্তত চতুর্থ লোকসভার দলগত অবস্থা বজায় রাখতে পারতেন তাহলে হয়ত এ প্রশ্ন তুলতেন না। কিন্তু একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক হিসাবে পরিচিত শ্রীমাসানী যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এদেশে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন বা এর একটা বড় ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তা অবশ্যই পর্যালোচনার দাবী রাখে।

শ্রীমাসানী বলেছেন, শ্রীমতী গান্ধীর দল লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও, নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন শাসক কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ ত দূরের কথা, অর্ধেকও পায় নি। প্রদত্ত ভোটের ৪৩·৬৪ শতাংশ পেয়েছে শাসক কংগ্রেস, যেটা ভারতের মোট ভোটদাতার সংখ্যার এক-চতুর্থাংশও নয়; যে দল প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকও পায় নি এবং নির্বাচকমণ্ডলীর এক-চতুর্থাংশও যে দলকে সমর্থন করে নি, সে দল যদি প্রতিনিধি-সভায় দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী আসন পায়, সেটা নিশ্চয়ই নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। পৃথিবীর বহু গণতন্ত্রী দেশের মত এদেশেও যদি সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রচলিত থাকতো, তাহলে লোকসভায় শাসক কংগ্রেসের আসন সংখ্যা মোট আসনের ৪৩·৬৪ শতাংশের অতিরিক্ত হত না এবং তখন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য শাসক কংগ্রেসকে সমভাবাপন্ন আরও কয়েকটি দলের সঙ্গে হাত মেলাতে হত। আর বিরোধী দলগুলিও বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হত। শ্রীমাসানীর মতে, প্রকৃত বিচারে শ্রীমতী গান্ধীর সরকার সংখ্যালঘু সরকার ছাড়া কিছুই নয়।

শ্রীমাসানী যাই বলুন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে বিভিন্ন দল লোকসভায় যে আসন লাভ করেছে সেটা তাদের পাওনা ভোটের তুলনায় সঙ্গতিসূচক নয়। শাসক কংগ্রেস যে প্রদত্ত ভোটের ৪৩·৬৪ শতাংশ পেয়েছেন সেই হিসাবে, এদেশে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকলে, তাদের আসন সংখ্যা হত ৫১৫র মধ্যে ২২৪; সংগঠন কংগ্রেস পেয়েছিল প্রদত্ত ভোটের ১০·৪৮ শতাংশ, সেই হিসাবে তাদের আসন সংখ্যা হত ৫৪; জনসঙ্ঘের হত ৭·৩১ শতাংশ ভোট অনুসারে ৩৮টি আসন; স্বতন্ত্র দলের হত ৩·১২ শতাংশ ভোট অনুসারে ১৬টি আসন; সি পি এম ও সি পি আই দলের আসন সংখ্যায় কিন্তু খুব বেশী হেরফের হত না। সি পি এম পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের ৫·০৮ শতাংশ, সুতরাং ৫১৫ সদস্য-বিশিষ্ট লোকসভায় তাদের আসন সংখ্যা হত ২৬, যে জায়গায় ঐ দল পেয়েছে ২৫। সি পি আইর ৪·৭৩ শতাংশ ভোট অনুসারে আসন সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ২১, যে জায়গায় তারা পেয়েছে ২৩। ২·৪৪ শতাংশ ভোটের জোরে এস এস পির হত ১৩টি আসন, আর পি এস পি প্রদত্ত ভোটের ১·০৩ শতাংশ পাওয়ার জন্য তাদের হত ৫। লোকসভার এই রকম দলগত অবস্থা হলে শ্রীমতী গান্ধীকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য অবশ্যই সি পি আই, পি এস পি প্রভৃতি দলগুলির সঙ্গে হাত মেলাতে হত এবং বিরোধী দলগুলিকেও এভাবে হৃতমর্যাদা ও হতোদ্যম হয়ে থাকতে হত না। আবার জনসঙ্ঘ যে এক কোটি সাত লক্ষ সত্তর হাজার ভোট পেয়ে লাভ করেছে ২২টি আসন, আর সি পি আই ঊনসত্তর লক্ষ চার হাজার ভোট পেয়ে পেয়েছে ২৩টি আসন—এমন একটা অবিচারও হতে পারত না।

কিন্তু ভারতে প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থাকে সেকেলে, অকেজো বা ত্রুটিপূর্ণ যাই বলা হক, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। যে দেশের শতকরা সত্তরজন নাগরিক নিরক্ষর সেদেশে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মতো জটিল নির্বাচন পদ্ধতি সমস্যা বাড়াবে বই কমাবে না। তাছাড়া সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী-বর্জিত ক্ষুদ্র ও আঞ্চলিক দলগুলি স্বীকৃতি ও প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়, সেটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সহায়ক ত নয়ই, জাতীয় স্বার্থেরও অনুকূল নয়। এক কালের প্রথম শ্রেণীর শক্তি ফ্রান্স যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে অতিদুর্বল কণ্ডপদে রাষ্ট্রে পরিণত হয় তার অন্যতম কারণ ছিল সেদেশের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা। অগণিত ছোট-ছোট দলের প্রতিনিধিদের ভিড়ে সেদিন ফ্রান্সের জাতীয়-সভার এমনই অবস্থা হয় যে, কোন মন্ত্রিসভার পক্ষেই কয়েক মাস, এমন কি কয়েক দিনের বেশী টিকে থাকা সম্ভব হয় না। এ অবস্থাটা নিশ্চয়ই ভারতের পক্ষে কাম্য হতে পারে না। বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির যাবতীয় ত্রুটি মেনে নিয়েও বলা যায়, আজ যে এদেশে একটি শক্তিশালী জাতীয় নেতৃত্ব উদ্ভূত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে সেটা এই নির্বাচনেরই অবদান। জনপ্রতিনিধিত্ব কি করে জনসমর্থনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা যায় তা অবশ্যই ভাবতে হবে। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই জাতীয় নেতৃত্বকে দুর্বল করে বা জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে নয়।

লাহোর প্রস্তাবের পরিণতি :

একদিন যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই আবার পাকিস্তানকে খণ্ড-খণ্ড করার দাবী উঠেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় আন্দোলন তীব্র হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে দাবী উঠতে থাকে যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পূর্ব পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতে পারে। সে দাবী এতদিন উপেক্ষিত, এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনের মতে দেশদ্রোহিতার সামিল হলেও পূর্ব পাকিস্তানের জাগ্রত বাঙালী জাতীয়তাবাদ তা আজ পশ্চিম পাকিস্তানের জবরদস্ত কায়েমী স্বার্থকে মেনে নিতে বাধ্য করছে। আর পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের দাবী মেনে নেওয়া হলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ যে তার-পর নীরব থাকবে না তা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবিদিত নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানের জনগণ ইতিমধ্যেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, এবং মুখ্যত সেই কারণেই অখণ্ড পাকিস্তানের দাবীদার জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপলস পার্টি ঐ দুই প্রদেশে একটি আসনও পায় নি। আর ঐ দুই প্রদেশের স্বাধিকারের দাবী স্বীকৃত হলে আজ যে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কায়েমী স্বার্থ ভুট্টোর নেতৃত্বে জোট বেঁধেছে, সে জোটও অতিতও স্থায়ী হবে না। ফলে পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানে হয় গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে নয়ত অদূরভবিষ্যতে অন্তত চারটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নেবে সেখানে।

—[illegible]

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

[এই উপন্যাস রচনার আরম্ভ ১৫ই আগস্ট, জন্মাষ্টমী, ১৯৬৮ সাল। পরিকল্পনাকাল আরও দশ বছর আগে।]

(১)

অবশেষে বুঝি একটা হরিণ মিললো। ঝোপের আড়াল আছে বলে সমস্তটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তবে যেটুকু আভাসে বুঝতে পারা যাচ্ছে হরিণ তাতে আর সন্দেহ নেই। সেটাও আবার বাচ্চা না, বেশ বড়গোছের। ঘুমোচ্ছে না বিশ্রাম করছে? না ঘুমোবার সময় এখন নয়, তা ছাড়া ভীরুস্বভাব হরিণ এমন খোলা জায়গায় ঘুমোয় না। ওরা যে কোথায় ঘুমায় কেউ জানে না, এমন বনের ঘন গহনে ঢুকে পড়ে, সেখানে না চলে শিকারীর পা কিম্বা বাঘের চোখ। এটাকে ফস্কালে চলবে না, এক তীরে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলতে হবে। তারপরে লতা দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে পিঠের উপরে ঝুলিয়ে বাড়ী নিয়ে গেলে জয়ন্তী কি খুশিই না হবে? আর খালি হাতে ফিরে গেলে! সে যে কি ভয়াবহ পরিস্থিতি ভাবতেই পারে না। গতকাল খালি হাতে ফিরে গিয়ে যে অবস্থায় পড়েছিল, তা কি কখনো ভুলতে পারবে। প্রথমে মুখ খুলে দিল জয়ন্তী, তারপরে ছুঁড়ে মারলো মস্ত একটা চেলা কাঠ। ভাগ্যিস বসে পড়েছিল তাই মাথাটা বেঁচে গিয়েছে, নইলে আজ আর শিকারে বেরোতে হতো না। ভালোই হতো, মরতো বেটি না খেয়ে। স্বামীকে তাক করে চেলা কাঠ ছোঁড়া! যাই হোক আজ দেখিয়ে দেবে শিকার খুঁজে পাওয়ার চোখ তার যায়নি, আর হাতের নিশানাও অবিকল আছে।

তার মনে পড়ে জয়ন্তী শুনিয়ে ছিল হরিণ খুঁজে পাবে কি করে? বনের দিকে কি আর চোখ আছে, কেবলই পাড়ার ছুঁড়িগুলোর দিকে নজর। আর সে-গুলোও যদি হরিণ হতো! সব বরা, তেমনি হোঁৎকা তেমনি কালো তেমনি দাঁতালো। আজ বেটিকে দেখিয়ে দিতে হবে হরিণও আর চোখে পড়ে। হরিণটা পিঠ থেকে নামাতে নামাতে বলবে, ও ভালো মানুষের বেটি একবার দেখে যা, কেবল বরা নয়, হরিণও ঘায়েল করতে পারি, আর সে হরিণটাও তোর মতো। আহা তেমনি সরু কোমর, তেমনি চোখ, তেমনি রঙ, বেশির মধ্যে ওর শিঙ আছে তোর নেই। নে নে এবার থাল ছাড়িয়ে ঝলসে দেন, বড্ড খিদে পেয়েছে। মনে মনে খুব এক চোট হাসে। তখনি ভাবে হাসতে গিয়ে হরিণ পালালে শেষে কাঁদতে হবে, প্রত্যেকদিন চেলা কাঠ এড়িয়ে যাবে না।

নাঃ ভাগ্য ভালো, হরিণটা তেমনি আছে, পালায় নি। আর এগোনো উচিত হবে না, পায়ের শব্দ বুঝতে ওরা পণ্ডিত, সামান্য পাতার উস্‌খুস্‌টুকু অবধি ওদের কান এড়ায় না। সে তীর-ধনুক বাগিয়ে নেয়। শরীরটা দুর্বল মাথা ঘুরছে, তবু তাক ভুল করলে চলবে না। শরীরের আর মাথার দোষ কী? সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, বনে বনে মাঠে মাঠে ঘুরে হয়রাণ হতে হয়েছে। হরিণ বরা দূরে থাক, একটা নেউল, সজারু শিয়াল অবধি চোখে পড়েনি, বেটারা সব গেল কোথায়? সেই যে সকালে এক আঁজলা পান্তাভাত খেয়ে বের হয়েছিল, তারপরে দীঘির জল ছাড়া পেটে আর কিছু যায়নি। জলে কি খিদের আগুন নেভে! আরও বেশি করে জ্বলে ওঠে। হতাশ হয়ে যখন ফিরে যাবে ভাবছে তখন একসঙ্গে মনে পড়লো জয়ন্তীর চেলা কাঠ আর এই ঝোপটা। ভাবলো ঝোপটা একবার দেখেই যাই, না পাই মাথায় শক্ত করে পাগড়িটা বেঁধে, চেলা কাঠ থেকে মাথাটা বাঁচাতে হবে তো, জয়-মা বলে ফিরে যাই। এমন সময়ে ঝোপের আড়ালে হরিণ। আর একটু হলেই জয়-মা বলে চেঁচিয়ে উঠে-ছিল আর কি! তা হলেই হয়েছিল। সাড়া পেয়ে হরিণটাও জয়-মা বলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো।

আরে এমন সুবোধ হরিণও তো বড় দেখা যায় না। তিন বছরের ব্যাধগিরির জীবনে কোন হরিণকে এতক্ষণ এক জায়-গায় স্থির হয়ে থাকতে সে দেখেনি। তবে বোধ করি তার বাড়ীতেও জয়ন্তী আছে। চেলা কাঠের ভয়েই মাঠের মধ্যে বাপটি মেরে পড়ে আছে। বেড়ে সাঙাৎ বেড়ে, আর একটু স্থির হয়ে বসে থাক, চির-কালের জন্য তোর চেলা কাঠের ভয় শেষ করে দিচ্ছি। আরে রোজ রোজ চেলা কাঠ খাওয়ার চেয়ে একদিনে সব শোধ-বোধ হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। জয়ন্তীর জ্বালায় অনেকদিন নিজেও ভেবেছে, সব শোধবোধ হয়ে যাক। তারপরে মরুক বেটি কেঁদে কেঁদে। তখন চিমটে দিয়েও কেউ ছোঁবে না তখন বুঝতে পারবে স্বামীর কপালে চেলা কাঠ ভাঙতে গেলে নিজের কপালটাও ভাঙতে পারে। হাঃ হাঃ বেটি খুব জব্দ হতো।

একমনে সে হাঁটু গেড়ে বসে, ধনুকের একটা কোণ মাটিতে ঠেকিয়ে ছিলা টেনে নিয়ে ডান হাতটা কান অবধি এসে পৌঁছয়, চোখ দুটো তীরের ফলায় নিবদ্ধ, হাঁ তীরের ফলা আর হরিণটার দেহের দৃশ্য অংশ একরকে সমান-সমান হয়েছে, আর কেন, দম বন্ধ করে জয়-মা ভেবে তীর ছেড়ে দেয়! ঝোপের পাতাগুলো কাঁপিয়ে, গোটা কতক ফড়িং উড়িয়ে দিয়ে তীরটা ঢুকে পড়ে ঝোপের মধ্যে। ব্যাধের অভিজ্ঞতা বলে বিঁধেছে, বিঁধেছে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে বিঁধেছে; ফসকে গেলে এতক্ষণে দুড়মুড় করে পশুটা ছুটে পালাতো; এফোঁড়-ওফোঁড় না হলে আর্ত-রব উঠতো। এ একেবারে এক তীরে দফা নিকেশ, রাটুকু বের হওয়ার অবকাশ হল না মুখ দিয়ে। সাবাস হয়া বাধের বেটা জয়া ব্যাধ। বাপকা বেটা। ধনুকখানা মাথার উপরে ঘোরাতে ঘোরাতে আনন্দে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ে ঝোপের মধ্যে। ঢুকে পড়েই আস্ত একটা মানুষ আস্ত একটা পাথরের মূর্তি বনে যায়। এ কী! কিম্বরে তার ঠোঁটদুটো ফাঁক, চোখ দুটো বিস্ফারিত, হাত দুটো শিথিল, ধনুক ভূপাতিত, জানু কম্পমান, শরীর কম্পমান, কপালে স্বেদবিন্দু, নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায়। এ কী! এ কে? এ কী! এ কে? ক্ষণকাল পরে পাথরের মূর্তি ভেঙে পড়ে মাটির উপরে।

(২)

এতো হরিণ নয়, এ যে মানুষ। আস্ত একটা মানুষ, মস্ত একটা মানুষ। ঘাসের উপরে সরল উত্তানভাবে শায়িত দীর্ঘদেহী মস্ত একটা মানুষ। এতো সাড়ে তিন হাতের মানুষ নয়, দেহী যেন দেহটাকে ছাড়িয়েও বিস্তৃত। এ মানুষটিকে আগে তো দেখেনি, এমন মানুষ যে সম্ভব সে ধারণাও ছিল না। এ কে? কোথা থেকে এল। এমন দেবদেহীর অঙ্গে যে তীর বিদ্ধ হতে পারে, সেকথা তার মনেই প্রবেশ করলো না। কিন্তু এ কী রকম মানুষ! এ কি আদৌ মানুষ, না শাপভ্রষ্ট কোন দেবতা। আর কি গায়ের রঙ: নূতন কলাপাতা যখন সবে গাছের গর্ভ থেকে মুখটি বের করেছে এর রঙটি ঠিক তার মতো। সে রঙ সবুজও নয়, শ্যামলও নয়, আর এক পোঁচ কম হলেই পীত হতে

পারতো, আর এক পোঁচ বেশি হলেই হরিৎ হতে পারতো, এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা শ্যামবর্ণ। পরিধানে পীত বসন, স্কন্ধে আজানুলম্বিত পীত উত্তরীয়, সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে বিলম্বিত বুকের উপরে দোদুল্যমান একটা রত্ন। দেহের আকার, রঙের প্রভাব, বস্ত্রের বিভায় মিলিয়ে একটি দিব্য বিভূতির সৃষ্টি করেছে, জোর করে মানুষটিকে নজরে পড়তে চায় না। ঈষন্মুক্ত চোখে জীবনের শেষ চন্দ্রকলা, রক্তিম অধরোষ্ঠের সম্পুটে জীবনের শেষ ব্যঞ্জনা, প্রশস্ত বিশাল উরসের নিশ্বসিত মৃদু স্পন্দনে প্রশান্ত মানস সরোবরের স্মৃতি! আর সুগঠিত বলিষ্ঠ পা দুখানি—এ কি! এ কি, পা থেকে রক্তধারা বিনির্গত কেন, এ কি এখানে তীর হানলো কে? পায়ের পাতা ভেদ করে তীর আমূল বিদ্ধ হয়ে গিয়েছে হাড়ে, মর্মে। ওরে জরা এই তোর হরিণ! এই দিব্যদেহে তুই তীর বিদ্ধ করেছিস! এ কি সর্বনাশ! বিস্ময় থেকে ভয়, ভয় থেকে আতঙ্ক। হঠাৎ বাণাহত হরিণের মতো সে ছুটে পালালো, পড়ে রইলো তার তীর-ধনুক তূণীর।

কুটীরের উঠোনে বসে জয়ন্তী কাটারি দিয়ে কাঠ চিরছিল, দূর থেকে দেখতে পেল জরা। অন্যদিন হলে, শূন্য হাতে ফিরলে আগে থেকে সতর্ক হতো, হয়তো আরো এগোতো না, আজ তার সে-কথা মনেই এলো না, ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো জয়ন্তীর কাছে।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে জয়ন্তী বলল, কিছুই পাওনি দেখছি একেবারে খালি হাত, তবে রাতটাও খালি পেটে কাটাও।

জবাব দেয় না জরা। এমন বড় হয় না, একটা না একটা অজুহাত মুখে থাকেই। তার নীরবতায় জয়ন্তীর চটকা ভাঙলো, ভালো করে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সে বলে উঠল, এ কি জরা, তোমার কি হয়েছে? মুখ শুকনো, শরীর কাঁপছে, কি ব্যাপার। তোমার তীর-ধনুক কোথায়? ফেলে গেল কোথায়? কি হয়েছে বলো।

তবু জরা নিরুত্তর। এবারে সে কাছে গিয়ে হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, কি হয়েছে শীগগির বলো।

এবারে জরার মুখ দিয়ে কথা বের হয়, বলে, একটা মানুষ মেরেছি রে।

জয়ন্তী খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, এই কথা! তা আগে কি আর মানুষ মারনি? এই তো সেদিন মদ খেয়ে ও পাড়ার ভরতকে খুন করে ফেললে।

আরে সে তো মদ খেয়ে।

আজ না হয় মদ না খেয়েই মেরেছ।

নারে না, তুই বুঝবিনে।

তবে বুঝিয়েই বলো না ছাই।
এ সে রকম মানুষ নয়।
মানুষ আবার কয়রকম হয়।

এ মস্ত মানুষ।
মস্ত! রাজাগজা না লম্বা-চওড়ায় মস্ত।
কি করে বোঝাবো তোকে।

আর আমায় বুঝে কাজ নেই। তা মারলে কি রকম করে? তোমাকে মারতে এসেছিল?

তাহলে তো কথা ছিল না। মানুষটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল, দূর থেকে দেখে হরিণ মনে করে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলেছি।

মানুষকে হরিণ মনে করেছ যখন নিশ্চয় মদ খেয়ে বেহুঁস হয়েছিলে। আবার বুঝি শুঁড়ি পাড়ায় গিয়েছিলে। দেখো এই যে চেলা-কাঠ পড়ে রয়েছে তাই দিয়ে তোমার পা ভেঙে দেব। তোমাকে বারণ করিনি?

এ রকম কথায় প্রতিক্রিয়া কি হবে জয়ন্তীর অজানা নয়, আঁচলখানা সে কোমরে জড়িয়ে নিল। কিন্তু আজ প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, বরঞ্চ ঠিক বিপরীত ঘটলো। জরা উঠানের মধ্যে বসে পড়ল। এবারে সত্যি সত্যিই দুশ্চিন্তার কারণ ঘটলো জয়ন্তীর। কাছে গিয়ে সে বসল, বললো, তোমার কি হয়েছে? কাকে মেরেছ? রাজবাড়ীর লোক নয় তো!

কিছুতেই জরার মুখে রা বের হয় না।
একি কাঁপছ কেন?

কেন জানি না, জল বারণ মানছে না।

আচ্ছা সমস্ত পরে শুনবো, আগে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে খাও।

নারে, আমার খাওয়া-নাওয়া ঘুচে গিয়েছে।

তীর-ধনুক কি করলে?

সেখানেই পড়ে আছে।
কেন?
ভয়ে!

মরা মানুষকে এতো ভয়। আচ্ছা চলো তো দেখে আসি কেমন মানুষ সেটা। নাও ওঠো।

ওঠার পরিবর্তে শুয়ে পড়লো জরা।
কি হল?

আমি সেখানে যেতে পারবো না।
কেন?
ভয়।

আমি তো সঙ্গে আছি।
তুমি একাই যাও।

কোথায় চিনবো কেমন করে। নয়তো সঙ্গে চলো।

জরা কিছুতেই যাবে না, জয়ন্তীও ছাড়বে না। তার কৌতূহলের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল জরার আতঙ্ককে। অবশেষে জরাকে সঙ্গে যেতেই হল। কৌতূহলী নারী দুর্বার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হল। যথাবিধ সেই দেহখান শববৎ শায়িত। সেই দেহটি দেখবামাত্র জয়ন্তী ডুকরে কেঁদে উঠল, কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, ওরে জরা, একি করেছিস! একি সর্বনাশ করেছিস। কাকে মেরেছিস তুই।

এই বলে মানুষটির পায়ের উপরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে মাথা কুটতে লাগলো।

দেবতা, দেবতা, আমরা সর্বনাশ করেছি। ও তোমার অবোধ ছেলে দেবতা, না জেনে মহাপাতক করে ফেলেছে, আমাদের মাপ করো দেবতা।

জরার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তবে তো তার অনুমান মিথ্যা নয়। এ সামান্য লোক নয়, নিশ্চয় কোন রাজাগজা হবে।

জয়ন্তী মাথা কুটতে থাকে। জরা এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই দিব্যদেহের দিকে। দেহের রংটি আরও পাণ্ডুর হয়ে এসেছে, চোখের দৃষ্টি আরও স্তিমিত হয়ে পড়েছে, ক্ষতস্থানের রক্তধারাটি কালো হয়ে কাল সাপের আকার ধারণ করেছে। তবু দেহে এখনো প্রাণ আছে, বক্ষস্থলের রত্নটি ঈষৎ স্পন্দিত।

জয়ন্তীর আর্ত আবেদন বুঝি প্রবেশ করলো দিব্যদেহীর হৃদয়ে। সে একবারটি অভয় মুদ্রায় তুলে ধরলো দক্ষিণ পাণি। তারপরে সব শেষ। জয়ন্তী মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল পায়ের উপরে। বিহ্বল জরার সম্বিৎহীন দেহ শুষ্ক বৃক্ষ কাণ্ডের মতো রইলো দাঁড়িয়ে।

তখন আকাশে আর সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে। পূর্ণিমার জোৎস্না কূল উপকূল মানছে না, চরাচরের প্রতিটি রন্ধ্র আলো দিয়ে ভরে দিচ্ছে। নীচে সমুদ্রও আজ মত্তা। সমুদ্রের তীরে তীরে দেশে দেশে যত গুহা-গহ্বর কন্দর আছে আজ তাদের ডুবাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবু তো এখন সবে সন্ধ্যা। আকাশে পাপিয়া পাখি দীর্ঘ তানে পথ টেনে নিয়ে চলেছে স্বপ্নের বন্দর-গুলোকে। আর সমুদ্রে সিন্ধু শকুনের দল তারই পশরা ছিনিয়ে নেবার আশায় কর্কশ চীৎকার করছে। জোৎস্নায় ঢেকে দিয়েছে মহাকাশের তারাগুলোকে, জোয়ার জলে যেমন ঢাকা পড়ে গিয়েছে উপকূলের নুড়িগুলো। আর কোন পৌরাণিক জগতের উপকূল থেকে একটানা দীর্ঘ নিশ্বাস ছুটে আসছে, দুলছে ঝাউবন, মরমর, দুলছে সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের লক্ষ হাজার পাতা যার তলে যোগ-নিদ্রায় শায়িত সেই মহাদেহী।

(৩)

বাসুদেব, বাসুদেব, কার বেটা বললে?
বসুদেবের পুত্র বাসুদেব। কি আপদ, এক কথা তোমাকে কতবার বুঝিয়ে বলবো। মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি।
[illegible] ভাই জয়ন্তী, সব কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছে, কিছু বুঝতে পারছি না।

তবে চুপ করে বসে থাকো।

বসে থেকে কি হবে, চলো বাড়ী ফিরে যাই।

না আমি যাবো না, আমি এখানেই থাকবো।

চিরকাল।

হাঁ না মরা পর্যন্ত।

কেন?

কেন বুঝতে পারছো না? যে-পাপ তুমি করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে।

জরতী, এর আগেও তো মানুষ মেরেছি, কই তোমার তো এমন বাতিক্রম দেখিনি।

জরা, তুমি একটি আকাঠ, নিরেট মূর্খ। সেইসব মানুষ আর এই মানুষ। আর একি মানুষ এ যে দেবতা।

দেবতা! এখনি বললে বসুদেবের বেটা আবার বলছ দেবতা।

তোমাকে বোঝাতে পারবো না বাপু, তবে জেনে রাখো যাকে প্রাণে মেরেছ সে দেবতা।

দেবতারা তো স্বর্গে থাকে, দ্বারকায় আসতে যাবে কেন?

সে কথা তুমি জানবে কি করে? বনে বনে জানোয়ার শিকার করে বেড়াতে বেড়াতে বুদ্ধিশুদ্ধি জানোয়ারের মতো হয়েছে। রাজবাড়ীতে গিয়ে কথকতা, পাঁচালী শুনলে বুঝতে পারতে মাঝে মাঝে দেবতারা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

কেন?

তাঁদের খুশী।

দেবতারা তো শুনেছি অমর তবে ইনি আমার শরে প্রাণ হারালেন কেন?

স্বর্গের দেবতা, স্বর্গে ফিরে যাবেন আবার।

আচ্ছা বসুদেবটা কে?

সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়বার পরে এখন বসুদেবটা কে? দ্বারকার রাজা।

দ্বারকার রাজা উগ্রসেন।

তবে বসুদেব রাজা নন।

জরা, যাঁর ঘরে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন তিনি রাজার রাজা।

তবে চলো পালিয়ে যাই। রাজবাড়ীর লোক এসে পড়লে আমাদের খুন করে ফেলবে।

সে ভয় থাকে তো পালিয়ে যাও।

পালাতে ইচ্ছা করছে কিন্তু পা যে উঠছে না, সমস্ত দেহ কেমন যেন ভারি হয়ে গিয়েছে।

তবে বসে একমনে ভগবানকে ডাকো।

জরতী ভগবানকে তো কখনো দেখিনি। কিভাবে ডাকতে হয় জানিনে, শিখিয়ে দাও না।

ওরে পাষণ্ড আর সকলকে ডাকতে শেখাতে হয়। ভগবানকে যেমনভাবেই ডাকো না কেন তিনি সাড়া দেবেন।

সাড়া দেবেন!

নিশ্চয়। মাকে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টভাবে শিশু ডাকে, মা কি সাড়া দেন না।

হাত জোড় করতে হয়?

হাতজোড় করা, চোখ বোজা এসব ইচ্ছাধীন, আসল কথা মনে মনে সাচ্চা হওয়া চাই।

তুমি সাচ্চা হয়েছ জরতী।

চেষ্টা তো করি।

তবে আমিও চেষ্টা করবো।... আচ্ছা জরতী, আজ কি গেরণ নাকি? চাঁদটা কালো হয়ে আসছে কেন?

কালো হতে যাবে কেন? আগেকার মতো মস্ত গোল চাঁদ।

না রে না, চোখে ভুল দেখছিস, ঐ দেখ ঐ কোনটায় কালো হয়ে এসেছে।

চোখের মাথা খেয়েছ আর কি! যা করছিলে তাই করো, ভগবানকে ডাকো।

ওরে মাটি কাঁপছে কেন? ভুঁই দোল নাকি! চল চল পালাই।

কোথায় মাটি কাঁপছে। তোমার নেশা এখনো ছোটেনি।

এই দেখ আমার বুকের উপরে হাত দিয়ে দেখ কেমন কাঁপছে।

কাঁপবে না, পাপ করেছ বুক কাঁপবে না!

ঐ দেখ দুটো বড় বড় তারা খসে পড়ছে। এসব ভালো লক্ষণ নয়, চল পালাই।

কোথায় তারা খসলো।

খসলো না। তবে ওখানে কাঁদছে কে? কান পেতে শোন।

কান্না নয় ঝাউবনের মধ্যে বাতাসের শব্দ।

তাই তো, ঝাউবনের মধ্যে বাতাসের শব্দই তো বটে। জরতী আজ আমার চোখ-কান মন সব ভুল দেখাচ্ছে, ভুল শোনাচ্ছে, ভুল বোঝাচ্ছে। বসুদেবের বেটা বাসুদেব, দেবতার দেবতা স্বয়ং ভগবান। কি করে জানলে যে ভগবান।

সবাই জানে, সবাই মানে, সবাই মান্য করে।

তা হলে ভগবানকে ডাকি। ঐ দেখ গেরণ লেগেছে, ঐ দেখ মাটি কাঁপছে, ঐ শোন কান্না।

এর চেয়ে বুঝি পাগল হয়ে যাওয়া ভালো, ওরে এরচেয়ে বুঝি পাগল হয়ে যাওয়া ভালো।... ভগবান, তোমাকে কখনো ডাকিনি, কি করে ডাকতে হয়, কি বলতে হয় জানিনে, ভগবান...না রে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমার হয়ে তুই ডাক। ...ঐ শোননা, কে যেন হাসছে, আমাকে ঠাট্টা করছে।

হাসি নয়, পেঁচার ডাক, তুমি একটু চুপ করো তো।

ঐ যে রাজবাড়ীর সেপাই আমায় ধরতে আসছে, পালা, পালা, শীগগীর সঙ্গে আয়। জরতী দেখে ছুটে পালালো। ভালোই হল এখানে থাকলে মনে শান্তি পেতো না।

বাসুদেবের পা দুখানি কোলের উপরে তুলে নিয়ে জরতী বসে আছে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। অশত্থ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার টুকরোগুলো মণি-মাণিক্যের কুচির মতো পড়েছে তার সর্বাঙ্গে সবচেয়ে উজ্জ্বল টুকরোটি তার বুকের কৌস্তুভটি, সেটি যেন বিধাতার চোখের মতো নির্নিমেষে জ্বলছে। কেন সে এমনভাবে বসে আছে, কতক্ষণ বসে থাকবে কিছুই জানে না, সুসংলগ্নভাবে চিন্তা করবার শক্তি তার চলে গিয়েছে, অসংলগ্ন যত তুচ্ছ বিষয় মনে আসছে। কুটীরের চালের উপরে মাঝে মাঝে দুটো কাক এসে বসে, লাউ-এর মাচায় কোথা থেকে একটা ঝিঙে লতা উঠেছে, ঝিঙে আর লাউ পাশাপাশি দুলছে, তেঁতুলগাছে চিল বসে হঠাৎ ডেকে ওঠে ভোরবেলা পথের ধুলোর উপরে শিশির ফোঁটার দাগ, আঙিনায় দূর্বাদল শিশিরের প্রলেপে সাদা, যেমন সাদা হয়ে এসেছে মৃত্যুশয্যায় বাসুদেবের দেহ। তুচ্ছ কথায় হাতছানি ডেকে নিয়ে আসে...।

॥ প্রকাশিত হইল ॥

বাঙ্গালার ইতিহাস

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রস্তর যুগ থেকে বাঙ্গালার কথা—বাঙ্গালীর কথা। স্বাধীন বাঙ্গালার রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাস। ঘরের রাখবার মত বই। প্রথম ভাগ (সচিত্র)—১২·৫০, দ্বিতীয় ভাগ—১২·৫০।

নবভারত পাবলিশার্স

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯; ফোন : ৩৪-১৯৯৬

বাসুদেবকে নগরের রাজপথে মধ্য-রাতে অবস্থায় অনেকবার দেখেছে, বড় চঞ্চল মুখে শান্ত, চোখদুটো যেন কোন বিশেষ লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধ. সম্মুখে কে আসছে সাক্ষ ভ্রুক্ষেপ নেই। আর এক-দিনের কথা কখনো ভুলবার নয়। এদিকে এসেছিল শুকনো কাঠ-কুটো কুড়োতে, চোখে পড়লো বলভদ্র আর বাসুদেব দুই ভাই গলা-ধরাধরি বোনের মতো পাশাপাশি সমুদ্রের দিকে চলেছে। সে থমকে দাঁড়ালো. এমনভাবে এত কাছাকাছি তাদের দেখবার সুযোগ হয়নি। দুজনে সমুদ্রের জলের রেখাটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তখন সমুদ্রের দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে দুজনের সুদীর্ঘ ছায়া দীর্ঘায়িত হয়ে লুটিয়ে পড়ে তার পায়ের উপরে এসে পৌঁছল, সে সম্ভ্রমে সরে গিয়ে ছায়ার উদ্দেশে প্রণাম করলো। তারা দাঁড়িয়েই রইলো, ক্রমে সূর্য অস্ত গেল ছায়া মিলিয়ে গেল আর একবার প্রণাম করে বাড়ী ফিরে এলো জয়ন্তী।

জনার্দন আগে শুনেছিল বলভদ্র রোগে দেহত্যাগ করেছেন, বিশ্বাস হয়নি। আবার শুনেছিল এবারে বাসুদেবও দেহ-ত্যাগ করেছেন, বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এমনভাবে যে বিশ্বাস করতে হবে কে জানতো।

জয়ন্তী, জয়ন্তী পালিয়ে বাঁচো, ওরা ধরতে আসছে।

জয়ন্তী চমকে উঠে দেখে জবা পায়ের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

কি হল জবা, কে ধরতে আসছে?

কেমন করে জানবো। মাথায় লাল পাগড়ি হাজার হাজার লোক বোধহয় রাজবাড়ীর সেপাই।

জয়ন্তী বুঝলো জবা বিভীষিকা দেখছে, বলল, হাজার হাজার লোক অথচ দেখতে পাচ্ছি না।

ঐ তো এদিকে আসছে।
হাজার লোক এলে শব্দ হতো।
কেন শুনতে পাচ্ছ না ঐ যে।

জয়ন্তী কান পেতে শুনলো সমুদ্রের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

তুমি ভুল দেখছ জবা, না শব্দ না মানুষ। বিশ্বাস না হয় দেখবে এসো বলে হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল সমুদ্রের ধারে—ঐ দেখ।

জয়ন্তী চমকে উঠল, লাল, পাগড়ীপরা সারিবদ্ধ একদল লোক গর্জন করতে করতে সত্যই তো ছুটে আসছে। কিন্তু শুদ্ধ এক লহমার জন্য, পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলো জোয়ারের ফেনাপরা ঢেউয়ের সার।

ভয় ভাঙাবার দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল, ওগুলো মাথা নয়, সমুদ্রের ঢেউ।

অবিশ্বাস করবার উপায় ছিল না, জয়ন্তীর কথা শেষ হতে না হতে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিল।

যাই বলো, আমার মনে হয়েছিল সেপাই। বোধহয় তারা খোঁজ পাবে না।

কারা?

রাজবাড়ীর লোকে।

এতবড় ঘটনা কি চাপা থাকবে?

তা থাকবে না—তবে কেমন করে জানবে যে আমার তীরের ঘায় কি যেন নামটা—

বাসুদেব

হাঁ হাঁ বসুদেবের বেটা বাসুদেব মারা গিয়েছে।

না জানতে পারে, কিন্তু রাজার দণ্ড ছাড়া কি আর কারো দণ্ড নেই?

আবার কার থাকবে?

কেন বিধাতাপুরুষের।

বিধাতাপুরুষের। আচ্ছা অজান্তে মারলেও কি পাপ হয়?

তুমি তো অজান্তে মারোনি, বেশ নিশানা করে মেরেছ।

হরিণ ভেবেছিলাম।

চিরদিনের শিকারী তুমি, তোমার তো ভাববার কথা নয়।

ওসব বাজে কথা। রাজার দণ্ড ছাড়া আর কিছুকে আমি ভয় করিনে।

তবে চোখে ভুল দেখছ কেন, কানে ভুল শুনছ কেন, মনে ভুল বুঝছ কেন? কত মানুষ তো মেরেছ, এমন কখনো হয়েছে কি।

কি যে বলিস সে মানুষ আর এ-মানুষ।

তফাৎ কোথায়? তাদেরও চার হাত-পা এরও তাই।

তা বটে।—ঐ দেখ গেরুয়া লেগেছে, চাঁদের কোণটায় কালো রঙ। ঐ দেখ সব তারা খসে পড়ছে, দলে দলে। ঐ দেখ ভূমি দোলে, মাটি কাঁপছে।

কিছুই নয় জবা তুমি বাড়ী যাও, ঘুমোলেও গিয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে তুমিও চলো।

না, আমি এখানেই থাকবো।

কতক্ষণ?

কেউ না আসা অবধি।

তবে চলো আমিও যাই।

তুমি যাবে কেন?

সে কথা তো আমিও বুঝতে পারছি না। আমি চলেও যেতে পারছি না, ছেড়েও থাকতে পারছি না। মনের মধ্যে কেমন সব ওলটপালট চলছে। এক-একবার মনে হচ্ছে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরি, সব হাঙ্গাম চুকে যাক। কিন্তু তখনি তাঁর যমদূতগুলো টেনে নিয়ে যাবে নরকে তপ্ত ডাঙস মারবে গায়ে। তখন মনে হয় তার চেয়ে এই ভালো। আচ্ছা জয়ন্তী তুই তো বলছিস ভগবানকে ডাকলে মনে শান্তি পাওয়া যায়।

হাঁ যায়।

তবে আমার হয়ে তুই ডাক, আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা ডাকছি, তুমি স্থির হয়ে বসো।

জবা এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসেই হঠাৎ চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল, তার বুকের উপরে আমার বুকের মধ্যে জ্বলছে—ঐ যে ধক-ধক করে জ্বলছে বিধাতা-পুরুষের চোখ—

এই বলে সে ছুটলো বাসুদেবের দেহের দিকে। অগত্যা জয়ন্তীও পিছু পিছু ছুটলো।

কই তার বুকের সেই রত্নটা গেল কোথায়?

জয়ন্তী দেখল সত্যিই রত্নটি নেই।

দেখ, জয়ন্তী, এখানে নিশ্চয় কেউ এসেছিল আর সে নিয়ে গিয়েছে।

কি যে বলো জবা, ঐ দেবদেহে হাত দেবে এমন সাধ্য কার।

আমি যেন দেখলাম কালো ছায়ার মতো ছুটে পালালো।

ও তোমার চোখের ভুল।

ওটা কৌস্তুভ মণি, বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছিল এখন বাসুদেবের লীলার শেষে আবার বৈকুণ্ঠে চলে গেল।

সেখানে আবার তার গলায় দুলবে?

নিশ্চয় যে নিশ্চয়। জবা তুমি এখন বাড়ী ফিরে যাও।

তাই-ও ভুল, আমার ভয় করছে।

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

আমাদের ছেলে ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কে ওই শুয়ে আছে ওখানে?

কনকনে শীতের রাতে
ফ্ল্যাটবাড়ির বেওয়ারিশ
ন্যাড়া তক্তপোশের উপরে
কে ওই ঘুমুচ্ছে অঘোরে?
কার ছেলে? থাকে কোথায়? কোন পাড়ায়?

পরনে নালী প্যান্ট
গায়ে হাফ-শার্টের উপর সোয়েটার চড়ানো
ধুলোমাখা খালি পা
স্যান্ডেল দুটো ছিটকে পড়ে আছে দু' দিকে
দরজাটা হাট করে খোলা—
এমনি করে কি কেউ ঘুমোয়
এমনি হীন দশায়
অসহায় বেহুঁস হয়ে?

ও কি কোন পলানে খাতক
জামিন-ডিঙোনো আসামী
না কি কোনো ফেরারী জেল-ঘুঘু,
না কি কোনো আরব্ধ যুদ্ধের অগ্রণী সৈনিক
এখুনি ফের বার হবে ডাক পেয়ে
মশাল উঁচিয়ে সামিল হবে মিছিলে
কিম্বা পালাবে অনুস্রিয়মাণ মৃত্যুর কবল থেকে?
এক দিনের পলায়ন তো আরেক দিনেরই যুদ্ধ
এক দিনের বেঁচে থাকা তো আরেক দিনেরই অভ্যর্থনা।
ভিটে নেই মাটি নেই বাড়ি নেই ঘর নেই
বিছানা-বালিশ নেই
নেই কোনো ছিরি-ছাঁদ বিধি-ব্যবস্থা—
ও কার ছেলে?

ও আমাদের ছেলে।

হ্যাঁ, আমাদের ছেলে—
যাকে আমরা ক্রমাগত এক আশা থেকে
আরেক নৈরাশ্যে ছুটিয়ে এনেছি
নিরুদক মরুভূমির মধ্য দিয়ে,
ছুটিয়ে এনেছি এক রিক্ততা থেকে আরেক বঞ্চনায়,
যাকে দিয়েছি শুধু শিরোবিহীন শিক্ষা
বলেছ অগ্রাহ্য করেই গাঁথনির কারিগরি,
পদে না রেখে শুধু পদবীর রোশনাই—
শিখিয়েছি দূরের মাঠকে সবুজ দেখতে
আর দূরের পাহাড়—
সে বুঝি নিষ্কঙ্কর মনোহরের স্তূপ
আকাশে গন্ধর্বনগর।

গেঁয়ো যোগীকে ভিক্ষে না দিয়ে
বিবানা ভিক্ষুককে যোগী বানিয়েছি।
ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল স্বাক্ষর না করে
করে তুলেছি শুধু দেয়ালের লিখন
অঙ্গাররলেপন।

কিন্তু কী দুর্জয় সাহস দেখ ছেলেটার,
দুয়ার খোলা রেখে ঘুম যাচ্ছে গা ঢেলে।
শুধু ঘুমেরই সাহস নয়, সাহস ওর স্বপ্ন দেখার,
ও সত্যিই স্বপ্ন দেখছে!
দেখ ঘুমন্ত তরুণ মুখখানিতে কেমন করুণশ্রী
সমস্ত উদ্ধত রেখা ধুয়ে গেছে
নিঃসঙ্গ নম্রতায়।
হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত স্বপ্ন দেখছে—
পুরাতন পুঞ্জিত অন্ধকারে নবোদিত সূর্যের স্বপ্ন,
সেই সবিতুর্বরেণ্য সুপ্রকাশ মহাদীপ
জগৎ-নেতা তমিস্রহা জাগছে নতুন করে,
তাতে উদ্ভাসিত দেখছে এক নতুন পৃথিবী,
শুধু লোকজনের মেলা, লোকজনের ভিড়
লোকজন ভরা এ পৃথিবীর নতুন নাম—জনলোক!
এক সূর্য এক পৃথিবী এক জনতা
আর সকল মানুষেরই রক্তের এক রঙ
সব রঙ বদলায়, রক্তের রঙ বদলায় না—
শ্রেণী নেই স্তর নেই তর-তম নেই
শোষণ নেই পোষণ নেই তোষণ নেই
প্রত্যেকেরই আয়ত্ত প্রাপ্ত মনুষ্যত্বে আরূঢ় হবার নিমন্ত্রণ,
যেখানে বুদ্ধি লুব্ধ নয়, শক্তি স্পর্ধী নয়,
হৃদয় নয় আর স্বার্থের কারাবাস
যেখানে দ্বন্দ্বের নিকেতনের বদলে ছন্দের নিকেতন
এক সংহতি, এক সামঞ্জস্য, এক সমগ্রতা!
স্বপ্ন দেখছে—
জীবনের অবর পৃষ্ঠা থেকে চলে যাচ্ছে অপর পৃষ্ঠায়
নবতন সাম্রাজ্যের পত্তনে—
আর দেখছে, বুঝছে
নীতিতে যা অন্যায় তা রাজনীতিতেও
পারে না ন্যায় হতে!

দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দাও
মাথার নিচে দাও একটা বালিশ গুঁজে
আর গায়ের উপর টেনে দাও একটা ঘন চাদর
স্নিগ্ধ আদরের মত।

ও আমাদের ছেলে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

১ম পর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফ্যাসিজমের জয়যাত্রা : দুঃসময়ের আসুরিক দাওয়াই ?

১৯১৪—১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় সারা ইউরোপের সমাজজীবন ও অর্থনৈতিক জীবন এমনভাবে নড়িয়া গেল যে, উনবিংশ শতকের গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী প্রথা যেন ভাঙিয়া পড়ার জো হইল। এর ফলে একদিকে দেখা দিল ফ্যাসিজম এবং অন্যদিকে কঠোর ডিক্টেটরী শাসন। ইতালীতে বেনিটো মুসোলিনী সর্বপ্রথম এই পথ দেখাইলেন এবং তিনি প্রায় বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিলেন—

> 'There is a vacant throne in every country in Europe waiting for a capable man to fill it.'

অর্থাৎ ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশেই একটি করে সিংহাসন খালি পড়ে আছে, যে কোন উপযুক্ত লোকের পূর্ণ হওয়ার আশায়। সারা-সারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করার ধুম পড়িয়া গেল এবং ইতালী সহ স্পেন, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, ইস্তোনিয়ায় একনায়কত্ব বা ডিক্টেটারী প্রতিষ্ঠিত হইল। এক ধরনের ফ্যাসিস্ট শাসন প্রায় সর্বত্র দেখা দিল, যার গুরুরূপে প্রথম আবির্ভূত হইলেন বেনিটো মুসোলিনী (জন্ম ১৮৮০ সালে এবং মৃত্যু ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে পার্টিসান যোদ্ধাদের হাতে) যিনি ছিলেন একজন কর্মকারের পুত্র। কিন্তু পিতা ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, ছোটবেলা পিতার এই রাজনৈতিক আদর্শ পুত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। অবশ্য পরে তিনিই সমাজতন্ত্রকে হত্যা করিয়া ইতালীতে ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা দেন। কিন্তু ফ্যাসিজমের কোন উচ্চতর তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কারণ, ইহা এক ধরনের উগ্র রাষ্ট্রসর্বস্ব মতবাদ, যাহা কমিউনিজম, লিবারেলইজম, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের একান্ত বিরোধী, অথচ ধনতন্ত্রের পাহারাদার ও পৃষ্ঠপোষক। একজন লেখক বলিতেছেন—

> Once in power the Fascists must follow certain inevitable steps: first destroy the working class organisations, secondly muzzle the organs of democratic opinion, thirdly guarantee the profits of big business by organising commerce and industry on lines of monopoly capitalism, fourthly give employment to the workers and dividend to the shareholders by gigantic schemes of rearmament.

সংক্ষেপে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই ফ্যাসিজমের চেহারা ও চরিত্র বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট এবং সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, শ্রমশিল্পে অনুন্নত ও অর্থনীতিতে বিপর্যস্ত দেশগুলিতেই এই মতবাদ শিকড় গাড়িয়া বসে।

'যুদ্ধের পুরস্কার' লাভে বঞ্চিত এবং ক্ষত-বিক্ষত ইতালীই প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের দোসর হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপে ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা দেয় এবং মুসোলিনীকে কেন্দ্র করিয়াই ফ্যাসিস্ট আন্দোলন নানা দেশে ঢেউ তুলিতে থাকে। প্রায় এক যুগ পরে জার্মানীতে হিটলার ইহার অনুসরণ করেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, পরাজিত জার্মানীতেই আগে ইহার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের নভেম্বরে জার্মানীতে যে বিপ্লব অন্ততঃ বাহ্যত অনুষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল, ইতালীতে সেই বৈপ্লবিক তরঙ্গ দেখা দিয়া থাকিলেও উহা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্লাবিত কিম্বা দখল করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করিবার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও দল ছিল না। জার্মানীতে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লব ঘটাইয়া থাকিলেও, সাম্যবাদী লেখকগণের মতে সমাজতান্ত্রিক বা সোসিয়্যাল ডেমোক্র্যাট দল উহার উপর নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব বজায় রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারাই সেই বিপ্লবকে পাল্টা-বিপ্লবীদের যূপকাষ্ঠে বলি দেন। কিন্তু ইতালীতে সমাজতন্ত্রী দল বিপ্লবের উপর কোন কর্তৃত্ব খাটাইতে পারিলেন না কিম্বা জার্মানীর মত ইতালীর শ্রমিকেরা প্রতিক্রিয়াশীলদের গুণ্ডার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংঘবদ্ধ প্রতিরোধও চালাইতে পারিলেন না। সুতরাং ইতালীতে ফ্যাসিজম অতি দ্রুত আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল।

১৯১৯ ও ১৯২০ সাল ধরিয়া ইতালীতে বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট চলিতে লাগিল। কিন্তু সোসিয়েলিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছিল দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর ইতালীতে এক ব্যাপক ধর্মঘটের অনুষ্ঠান হইল। ৬০০ কারখানায় মোট ৫ লক্ষ শ্রমিক ইহাতে জড়াইয়া পড়িল। তাহারা প্রায় একাধিপত্য স্থাপন করিল এবং গভর্নমেন্ট ও মালিক, উভয় পক্ষই অসহায় হইয়া পড়িল। এমন কি সৈন্যবাহিনীকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারা গেল না। অর্থাৎ বিপ্লবী দল কর্তৃক রাষ্ট্র দখলের একান্ত সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই সন্ধিক্ষণে সোসিয়েলিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের সভাগুলি কেবলমাত্র 'অর্থনৈতিক সমস্যার' উপর জোর দিলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের প্রশ্ন উপেক্ষা করিলেন—গভর্নমেন্ট দখল ও গঠনের পক্ষে যাহা ছিল অপরিহার্য। সুতরাং গভর্নমেন্টের সঙ্গে এই মর্মে আপোষ হইল যে, দখলীকৃত কারখানাগুলি শ্রমিকেরা অবিলম্বে ছাড়িয়া দিবে, শতকরা ২০ টাকা হারে তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি ঘটিবে এবং সেই সঙ্গে কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের একটা অংশের কথাও ছিল, যাহা পরবর্তীকালে কোন কাজেই আসে নাই। এভাবে শাসকবর্গ ও মালিকশ্রেণীর সহিত আপোষের দ্বারা গণ-বিপ্লবের আরম্ভকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এই সময় মুসোলিনী ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট দলের বিশেষ কোন পাত্তা ছিল না, তাঁহারা সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের স্রোতেই গা ভাসাইয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু বৈপ্লবিক শ্রমিক সংহতি আপোষ-রফার দ্বারা ভাঙিয়া পড়িবার পর মুসোলিনী ক্রমশ গা-ঝাড়া দিতে লাগিলেন। লিবারেল নেতা গিওলিটি, মডারেট সোসিয়্যল ডেমোক্রাট নেতা বোনোমি, পপুলার পার্টি নেতা স্টারজো প্রভৃতির প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে একদিকে চলিতে লাগিল আপোষ ও বাহিক শ্রমকল্যাণ নীতি কিন্তু অন্যদিকে চলিতে লাগিল ধনিক ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হিংস্রনীতি পরিপোষণের জন্য প্রস্তুতি। জার্মানীতে হিটলারের মত ইতালীতে মুসোলিনীকেও এই কার্যে ব্যবহার করা হইতে লাগিল, কিম্বা তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতে লাগিল। ১৯২০ সালের পর হইতে বড়-বড় জমিদার এবং কল-কারখানার মালিক ও পুঁজিপতিগণ নবগঠিত ফ্যাসিস্ট দলকে কৃষক ও মজুরদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়ার জন্য প্রভূত সাহায্য করিতে লাগিলেন। এবং ফ্যাসিস্ট সদস্য সংখ্যা ১৯২০ সালে ৪০ হাজার হইতে ১৯২১ সালে ২,৪৮০০০ হাজারে দাঁড়াইল। সামরিক কর্তৃপক্ষ অস্ত্র সরবরাহ

The Between War-world by J. Hampdern Jackson.

করিলেন, পেশাদার অফিসারেরা ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে ট্রেনিং ও 'রণকৌশল' শিক্ষা দিলেন। জেনারেল স্টাফ বা সেনানীমণ্ডলী নির্দেশ দিলেন ফ্যাসিস্ট সংঘগুলিকে সমর্থনের জন্য। কৃষক ও শ্রমিকদিগকে কঠোরভাবে নিরস্ত্র করা হইল এবং ফ্যাসিস্টদিগকে অস্ত্র বহন করিতে দেওয়া হইল। হত্যা, হিংসা ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট হয় নিরপেক্ষ না হয় উদাসীন সাজিল। কিন্তু সোসিয়েলিস্ট ও শ্রমিকদিগকে কঠোর সাজা দেওয়া হইল। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে বলোগনা শহর হইতে ফ্যাসিস্টদের পার্টির বিবৃতিতে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালের জানুয়ারী এবং মে মাসের মধ্যে ফ্যাসিস্টরা ১২০টি শ্রমিক হেড কোয়ার্টার ধ্বংস, ২৪০টি সোসিয়েলিস্ট কেন্দ্র ও গৃহ আক্রমণ, ২০২ জন শ্রমিককে খুন ও ১,১৪৪ জনকে জখম করে। এই সময় ধৃত শ্রমিকের সংখ্যা ২২৪০ জন।

তথাপি ১৯২১ সালে সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেল যে, সোসিয়েলিস্ট ও কমিউনিস্টরা অনেক বেশী ভোট ও সদস্যপদ পাইয়াছেন—সোসিয়েলিস্ট ১২২টি এবং কমিউনিস্টরা ১১৬টি আসন (১) কিন্তু ফ্যাসিস্টরা মাত্র ৩৫টি সদস্যপদ দখল করিয়াছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রীপক্ষ দলে অনেক গুণ ভারী ছিল। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকতা, আপোষরফা ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের পাল্লায় পড়িয়া তাঁহারা এই শক্তিকে নষ্ট করিলেন। ১৯২১ সালের ৩রা আগস্ট ফ্যাসিস্ট ও সোসিয়েলিস্ট দলের সহিত এক চুক্তি স্থাপিত হইল এবং উহা দ্বারা সর্বপ্রকার হিংসাত্মক কার্যের অবসান ঘোষণা করা হইল। স্বয়ং মুসোলিনী এবং তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী। কিন্তু এই স্বাক্ষরিত ঘোষণা কাগজপত্রেই রহিয়া গেল, ফ্যাসিস্ট দলের সন্ত্রাসবাদে কোন মন্দা পড়িল না। তারপর ১৯২২ সালের জুলাই মাসে টুরাটির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রীদল এক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে চাহিলেন। কিন্তু সর্তে বানবনা হইল না। তখন তাঁহারা 'জেনারেল স্ট্রাইক' সর্বজনীন ধর্মঘট আহ্বান করিয়া গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিতে চাহিলেন। ১লা আগস্ট এই আহ্বান জানান হইল। কিন্তু ইহার জন্য কোন প্রস্তুতি, সঙ্ঘশক্তি ও লড়াইয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ করা ছিল না। সুতরাং ইহা ব্যর্থ হইল, অধিকন্তু ইহার ফলে ফ্যাসিস্টরা তাঁহাদের হিংসাত্মক অভিযানের অধিকতর সুযোগ পাইল এবং রক্ষণশীল ও কায়েমী স্বার্থের বাহকেরা তাহাই চাহিতেছিল। (২)

ইহার পর ফ্যাসিস্টদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ পর্ব। রাজা, সেনানায়ক ও মন্ত্রিসভা সকলে মিলিয়া ইহার ভূমিকা রচনা করিলেন অকটোবর মাসে। ২৮শে অক্টোবর ফ্যাসিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে 'March on Rome' বা রোম অভিযানের এক প্রাহসনিক আয়োজন করেন। প্রকৃতপক্ষে সেনা বিভাগের ৬ জন সেনাপতি এই মার্চের প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং আগের দিন সন্ধ্যায় স্বয়ং প্রধান সেনাপতি এক উৎসাহী ফ্যাসিস্ট জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। মন্ত্রিসভা সাহায্যে এক সামরিক আইন জারী করেন। ফলে, অসামরিক কর্তৃপক্ষের সমস্ত ক্ষমতা গিয়া পড়িল মিলিটারীর হাতে এবং তাহারা ফ্যাসিস্টদিগকে সমস্ত সরকারী ভবন ও দপ্তর, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদি দখল করিতে দিল। ইহার পর ২৮শে অকটোবর সকালে রাজকীয় নির্দেশে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হইল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইল যে, ফ্যাসিস্টদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রোমনগরী রক্ষা করা সম্ভব নাই। সুতরাং মুসোলিনীকে ডাকা হইল মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য। তিনি কোন 'মার্চ' করিয়া আসিলেন না, বরং ৩০শে অকটোবর তিনি রোম নগরীতে আসিলেন ঘুমের গাড়ীতে বা স্লিপিং কারে। ইহাই মুসোলিনীর বিপ্লব এবং ফ্যাসিস্ট জয়যাত্রার মর্মকথা। ১৯২৫ সালে ইহার শুরু এবং ১৯২৬ সালে মুসোলিনী পুরাপুরি ডিক্টেটররূপে ইতালীর একচ্ছত্র শাসক হইয়া বসিলেন এবং সমস্ত বিরোধিতাকে হিংস্রতা, কঠোরতা ও বর্বরতার দ্বারা নিশ্চিহ্ন করিলেন।

এর পর জার্মানীর পালা এবং নাৎসী জার্মানীই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বপ্রধান হোতা।

জার্মানীতে ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানীতে বিপ্লব আরম্ভ হইল এবং এই বিপ্লব (৩) শুরু করিল সৈন্য, নাবিক ও শ্রমিকের দল। যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার প্রায় এক পক্ষকাল পূর্বে তাহারা বিদ্রোহ ঘটাইল এবং সম্রাট ও অভিজাতবর্গের রাজত্বের অবসান ঘটাইল। উইলহেল্‌মস্‌হাভেনের নৌবহরে প্রথম এই বিদ্রোহ দেখা দিল এবং অতি দ্রুত ইহা কিয়েল, হ্যাম্বুর্গ, ব্রেমেন ও বাল্টিক সমুদ্রতীরে ছড়াইয়া পড়িল। বন্দরে-বন্দরে সৈন্য, নাবিক ও শ্রমিকেরা লাল ঝাণ্ডা উড়াইল এবং নিজেদের সোভিয়েট গঠন করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করিল। জার্মানীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বনিত হইল। কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী হইলেন। ৯ই নভেম্বর বার্লিনে প্রায় বিনা রক্তপাতে যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে সারা দিনে মাত্র ১৫ জন নিহত হইল এবং সেই ১৫ জনের জীবনের বিনিময়ে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হোহেনজোলার্ন রাজবংশের পতন হইল, যে রাজবংশ পাঁচশ বছর ধরিয়া প্রুশিয়ার উপর শাসন চালাইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের অধীনে সমগ্র জার্মানী ক্রমে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে জার্মান সাম্রাজ্যের ২০টি উপরাজবংশেরও পতন হইল এবং জার্মানী সোসিয়েলিস্ট পার্টি নেতা ইবার্টের অধীনে রিপাবলিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

এই সমাজতন্ত্রী দল বা ডেমোক্রেটিক পার্টি দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দুই অংশে বিভক্ত ছিল এবং প্রেসিডেন্ট ইবার্ট ছিলেন প্রথম অংশের দলভুক্ত এবং তাঁহারাই ছিলেন বৃহত্তম মেজরিটি। তাঁহারা গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী শাসন চাহিতেছিলেন, কিন্তু অপরাংশ স্বতন্ত্র সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল

১। ১৯২১ সাল পর্যন্ত ইতালীতে কমিউনিস্টদের কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে তাঁহারা নূতন পৃথক দল গঠন করেন।

২। আর পাম দত্ত প্রণীত 'ফ্যাসিজম অ্যাণ্ড সোস্যাল রেভুল্যুশান' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৩) আসলে এই বিপ্লব ছিল অবাস্তব। কারণ, কাইজার অপসৃত হইলেন বটে, কিন্তু সেই পুরনো রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বজায় রহিল—লেখক।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ শাসনের উপর সোভিয়েট রিপাবলিক স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। আর চরমপন্থী কমিউনিস্ট-পন্থী দল, যাঁদের নেতা 'তরুণ কার্ল লিবেখনেক্ট', তাঁহারা সশস্ত্র জন-অভ্যুত্থানের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটারী স্থাপন এবং জমিনওয়ালা ও পুঁজিপতি-দিগকে উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং রাজতন্ত্রের পতনের এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসানের পর সোশিয়ালিস্ট মেজরিটি (মাইনরিটিদের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব রহিল না) (৪) ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিল।

এক পক্ষ গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তন এবং মিত্রপক্ষের সহিত মৈত্রীর দ্বারা জার্মানীর ভাগ্য সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিলেন। আর অপর পক্ষ রাশিয়ার মতই বলপূর্বক উচ্ছেদ ঘটাইয়া শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটারী প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন।

১৯১৯ সালের ৬ই জানুয়ারী কমিউনিস্টরা ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে বার্লিনের কয়েকটি সংবাদপত্র অফিস এবং সরকারী ভবন দখল করিলেন। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাট দল রাজতন্ত্রী সৈন্যবাহিনীর (ইম্পিরিয়াল আর্মি) সাহায্যে তাঁহাদের বিতাড়িত করিলেন এবং এই বিদ্রোহ দমনের পর শুরু হইল রাজধানী বার্লিনে terror বা ত্রাস সৃষ্টির পালা। কমিউনিস্টেরা ধৃত এবং নেতারা হত হইলেন। জার্মান কমিউনিস্ট দলে রোজা লাক্সেমবুর্গ ছিলেন সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও প্রভাবশালী নেত্রী। এই বীর নেত্রী এবং কার্ল লিবনেক্ট ধৃত হইলেন এবং কারাগারে নীত হইবার পথে পুলিশেরা তাঁহাদের বর্বরের মত হত্যা করিল।

(4) 'The Between — War world', 1942 by J. Hampden Jackson, Page 22

সারদা-রামকৃষ্ণ
—সন্ন্যাসিনী দুর্গামাতা রচিত—
দৈনিক বসুমতী—শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জীবনকথা এই প্রথম প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে......তাঁরা অভিন্ন ও একাত্ম।
যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত।......গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥
বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৮
গৌরীমা
আনন্দবাজার পত্রিকা—বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালির মেয়ে শ্রীগৌরী মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইহারা জাতির কল্যাণে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥
বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬, গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

বলা বাহুল্য যে, ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবের প্রেরণায় কয়েক মাসের মধ্যেই পরাজিত জার্মানীতে ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীতে বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু সেই বিপ্লব হাতে-কলমে রূপায়িত হইতে পারে নাই, বরং অঙ্কুরেই তার বিনাশসাধন হইয়াছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও বিরুদ্ধবাদীদের হাতে এবং তখন জনসাধারণের মধ্যেও তেমন কোন ব্যাপক সমর্থন ছিল না, যদিও জার্মানীতে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েই লিবেখনেক্ট ও রোজা লাক্সেমবার্গের নেতৃত্বে বামপন্থী দলের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং এই দল স্পার্টাকাস লীগ যে সংগঠন গড়িয়াছিল, ১৯১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সেই সংগঠন থেকেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসের সাত দিন ধরেই সরকারী সামরিক সেনারা স্পার্টাসিস্ট (কমিউনিস্ট) ও বাম সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের এবং সেই সঙ্গে হাজার-হাজার শ্রমিককে হত্যা করে। এর পর সমাজতন্ত্রী দল এবং অন্যান্য দল মিলিয়া জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিলেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহারা ভেইমার নগরে মিলিত হইলেন নূতন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। ইতিহাসে ইহাই ভেইমার শাসনতন্ত্র বা Weimar Constitution নামে পরিচিত। পার্লামেন্টারী প্রথার ভক্তেরা দাবী করেন যে, ভেইমার শাসনতন্ত্রের মত এমন চমৎকার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পৃথিবীতে খুব কমই রচিত হইয়াছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র চমৎকার হইলে কি হইবে, রাজতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদী এবং অন্যান্য চরমপন্থীদের নিকট ইহা অসহ্য ছিল। ১৯২০ সালের ১২ই মার্চ বার্লিনের রাজতন্ত্রী-দলের প্রবীণ সেনাপতি ব্যারণ ভন লুটভিৎস আট হাজার সৈন্যের সাহায্যে রাজধানী দখল করিলেন এবং ভন ক্যাপ নামক এক ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইবার্টের হাতে কোন সৈন্য ছিল না, সুতরাং তিনি নিরুপায় ছিলেন। কিন্তু সেই দুর্দিনে জার্মান শ্রমজীবীরা অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ইউনিয়ন-নেতাদের কোন হুকুমের অপেক্ষা না রাখিয়াই সর্বজনীন ধর্মঘট ঘোষণা করিলেন। হঠাৎ বার্লিনের সমস্ত জীবনযাত্রা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—জল নাই, আলো নাই, ট্রাম নাই, ট্রেন নাই, সমস্ত কিছুই বন্ধ। তখন ভন ক্যাপ ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকেরা পলায়ন করিলেন এবং এভাবে জার্মান শ্রমিকেরা ভেইমার শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করিলেন। কিন্তু এদিকে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় জার্মানীতে খাদ্যাভাব, দুর্নীতি ও অরাজকতা লাগিয়াই ছিল। যুদ্ধবিরতির এক বৎসর পর অন্ততঃ ৭ লক্ষ লোক মারা গেল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দ্বিগুণ দাঁড়াইল। তারপর আসিল ভার্সাই সন্ধির অভাবনীয় নিষ্ঠুরতা এবং অসম্ভব ক্ষতিপূরণের দাবী। এমন কি তখনকার দিনের জার্মান-বিরোধী বৃটিশ গভর্নমেন্ট পর্যন্ত মনে করিলেন যে, জার্মানী ক্ষতিপূরণস্বরূপ বড়জোর ২০০ কোটি পাউন্ড দিতে পারে। কিন্তু জার্মানীর নিকট দাবী করা হইল ইহার চেয়ে তিনগুণেরও বেশী। ইহার পর ১৯২৩ সালে ফ্রান্স জোর করিয়া দখল করিল রুর খনি অঞ্চল, ১০ লক্ষ বেকার এবং অর্ধভুক্ত জার্মান শ্রমিক ইহাতে বাধা দিল সত্যাগ্রহের দ্বারা। অর্থাৎ শিশুসন্তানসহ দুর্ভোগে অনশনক্লিষ্ট শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্তগণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ চালাইয়াছিল, সেদিনের ইউরোপীয় ইতিহাসে তার তুলনা ছিল না।

ইহার পর জার্মানীর প্রতি মিত্রশক্তির নীতি ও মনোভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটিল পারস্পরিক স্বার্থে এবং ইউরোপের শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যের জন্য। ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চলিল এই বাহ্যিক শান্তির যুগ এবং প্রেসিডেন্ট স্ট্রেসম্যানের আমলে জার্মানীও এই বাহ্যিক শান্তি ও উন্নতি বজায় রাখিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অবস্থা ছিল ইনজেকশন দেওয়া রোগীর মত, যার ফলে তার অসংখ্য রোগ-লক্ষণ বাহিরে নিরাময় না হইয়া চাপা পড়িয়াছিল মাত্র। জার্মানীর আসল দুরবস্থার কোন প্রতীকার সোশ্যাল ডেমোক্রাট গভর্নমেন্ট করিতে পারিতেছিলেন না। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রক্ষণশীল হইতে কমিউনিস্ট এবং ন্যাশনাল সোশিয়ালিস্ট (হিটলারী দল) পর্যন্ত সকলেই এই গভর্নমেন্ট ধ্বংসের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ১৯২৪-২৮ সালে সমগ্র ইউরোপের মত জার্মানীও কেবলমাত্র ঋণের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল। এই ঋণ ছাড়া তাহার পক্ষে কলকারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া তোলা সম্ভব ছিল না এবং এই সমস্ত শিল্পবাণিজ্য হইতে যে মুনাফা হইত, তাহা দিয়া মিত্রপক্ষের ক্ষতিপূরণ বাবদ কিস্তির টাকা দিতে হইত। ডস প্ল্যান অনুসারে জার্মানীকে এজন্য প্রতি সেকেন্ডে ৮০ মার্ক (জার্মান মুদ্রা) এবং প্রতি ঘণ্টায় ২,৮৮,০০০ হাজার মার্ক শোধ দিতে হইবে এবং তাহাও অপরিমিত কাল পর্যন্ত। ১৯২৯ সালে ইয়ং প্ল্যান অনুসারে এই অপরিমিত কালকে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল, অর্থাৎ ৫৯ বৎসর ধরিয়া জার্মানীকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হইবে। তারপর ১৯২৯ সালের অক্টোবরে ঘটিল নিউইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জের পতন এবং পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দার যুগ। জার্মানী দেউলিয়া হইয়া গেল। হিটলারী দলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিতে লাগিল এবং যে মতবাদ, তীব্র জাতীয়

সমাজতন্ত্রী দল' প্রচার করিতে লাগিল। তার মূল কথা হইল—

—'anti-Jew anti-profiteer, anti-foreigner, anti-Weimar, anti-Versailles'.

জার্মানীর পক্ষে এই স্লোগান নূতন মর্যাদা-সম্পন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। জনৈক গ্রন্থকার মন্তব্য করিয়াছেন,

'It is a wonder that any German could resist what Hitler offered at this time. A doctrine combining Nationalism and Socialism is enough to go to the head of any hungry and humiliated country' (৫)।

'এই সঙ্কটের ফলে হিটলার যে সমস্ত প্রস্তাব করিলেন, তাতে কোন জার্মানের পক্ষে বাধা দেওয়াও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইতে পারে। কেননা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র, এই দুইয়ের সংমিশ্রণে যে মতবাদ প্রচারিত হইল, তা যে কোন ক্ষুধার্ত ও অপমানিত দেশের মাথা ঘুরাইয়া দেওয়ার পক্ষেই যথেষ্ট ছিল।' এবং হিটলার জার্মানীর মাথা সত্যই ঘুরাইয়া দিলেন।

কিন্তু সোস্যাল ডেমোক্রাট (যাঁদের হাতে গভর্নমেন্ট ছিল) এবং কমিউনিস্ট এই দুই শক্তিশালী দল থাকিতে হিটলার ও তাঁর ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্ট পার্টি সমগ্র জার্মান রাষ্ট্রকে কুক্ষিগত করিলেন কিভাবে এবং কেনই বা নাৎসীবাদ জয়যুক্ত হইল?

সাম্যবাদী লেখকগণের মতে এর মূল কারণ ছিল জার্মান বিপ্লবের প্রতি সোস্যাল ডেমোক্রাট দলের বিশ্বাসঘাতকতা। অর্থাৎ সৈন্য ও শ্রমিক সাধারণ ১৯১৮ সালে যে বিপ্লব ঘটাইলেন এবং রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিলেন, তা যেমন সোস্যাল ডেমোক্রাট দলের অভিপ্রেত ছিল না, তেমনি তাঁরা বার্লিনে 'সোভিয়েট গভর্নমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হইতে দিলেন না। তাঁরা একদিকে নূতন সাম্যবাদী দলকে (মাত্র ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হইয়াছিল) প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন এবং অন্যদিকে ধনিক, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গেও হাত মিলাইয়া চলিতে লাগিলেন। আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো হিসাবে বর্ণিত 'ভেইমার শাসনতন্ত্র' প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া সমাজের সহিত মিলনের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং নূতন বিপ্লবের বনিয়াদ ইহার মধ্যে ছিল না। যদিও জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির ইতিহাস একদা গৌরবমণ্ডিত ছিল, এমন কি ইউরোপের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর উপর এই পার্টির আধিপত্য ছিল সর্বাধিক। এবং উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্মধারা গ্রহণ করিয়া তারা দীর্ঘকাল বিসমার্কের পীড়ননীতির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিতেছিল, তথাপি বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী আবহাওয়ায় এই দল সুবিধাবাদী, নীতিভ্রষ্ট এবং সংশোধনী মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িল. ফলে, জনসাধারণের সঙ্কটের দিনে কঠোর সঙ্কল্পের মত ইহারা কোন বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা দৃঢ়তার সহিত কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারেন না। তারা প্রতিবিপ্লবের আইন ও নিয়মতান্ত্রিকতার দাস হইয়া পড়িল, যার ফলে শ্রমিক মহলে তাদের প্রতিষ্ঠা ছিল নগণ্য। রাজতন্ত্রী, রক্ষণশীল, ন্যাশনালিস্ট এবং ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্ট—এই সমস্ত দলের উগ্রতা এমন কি সোভিয়েট কর্মীদেরও দমন করিয়া যাইতে লাগিল (৬)। তেমনি হাতে এই দুর্বলতা এবং অন্যদিকে জার্মানীর জটিল সমস্যা প্রতিকারে ব্যর্থতা ক্রমশঃ প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানগুলিকে শক্তিশালী করিতে লাগিল এবং ফ্যাসিজম মাথা চাড়া দিতে লাগিল। ১৯২৩-২৪ সালে মার্কের প্রেস্টিজ মুদ্রাস্ফীতির ফলে সর্বনাশগ্রস্ত হইল এবং বৈপ্লবিক শ্রমিকদের বামপন্থা ব্যর্থ হইল। ইহার ফলে ১৯২৮ সালের মে মাসে নাৎসী দল সাধারণ নির্বাচনে ৮০ লক্ষ ১০ হাজার ভোট পাইল, অথচ সোস্যাল ডেমোক্রাট দল ৬০ লক্ষ এবং কমিউনিস্ট দল ৫০ লক্ষাধিক ভোট পাইল। কিন্তু হিটলারের ঝটিকাবাহিনী শক্তির মূলে ছিল জার্মানীর ধনিক শিল্পপতির দল এবং সোস্যাল ডেমোক্রাটগণ নাৎসীদের নূতন স্বৈরাচার স্থাপনে বাধা দিবার জন্য নাৎসীদের ভোট কমাইয়া দিয়া ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ১ লক্ষে নামাইল, তাঁর

(5) The Between-War World'—by J. Hampden Jackson Page 127.

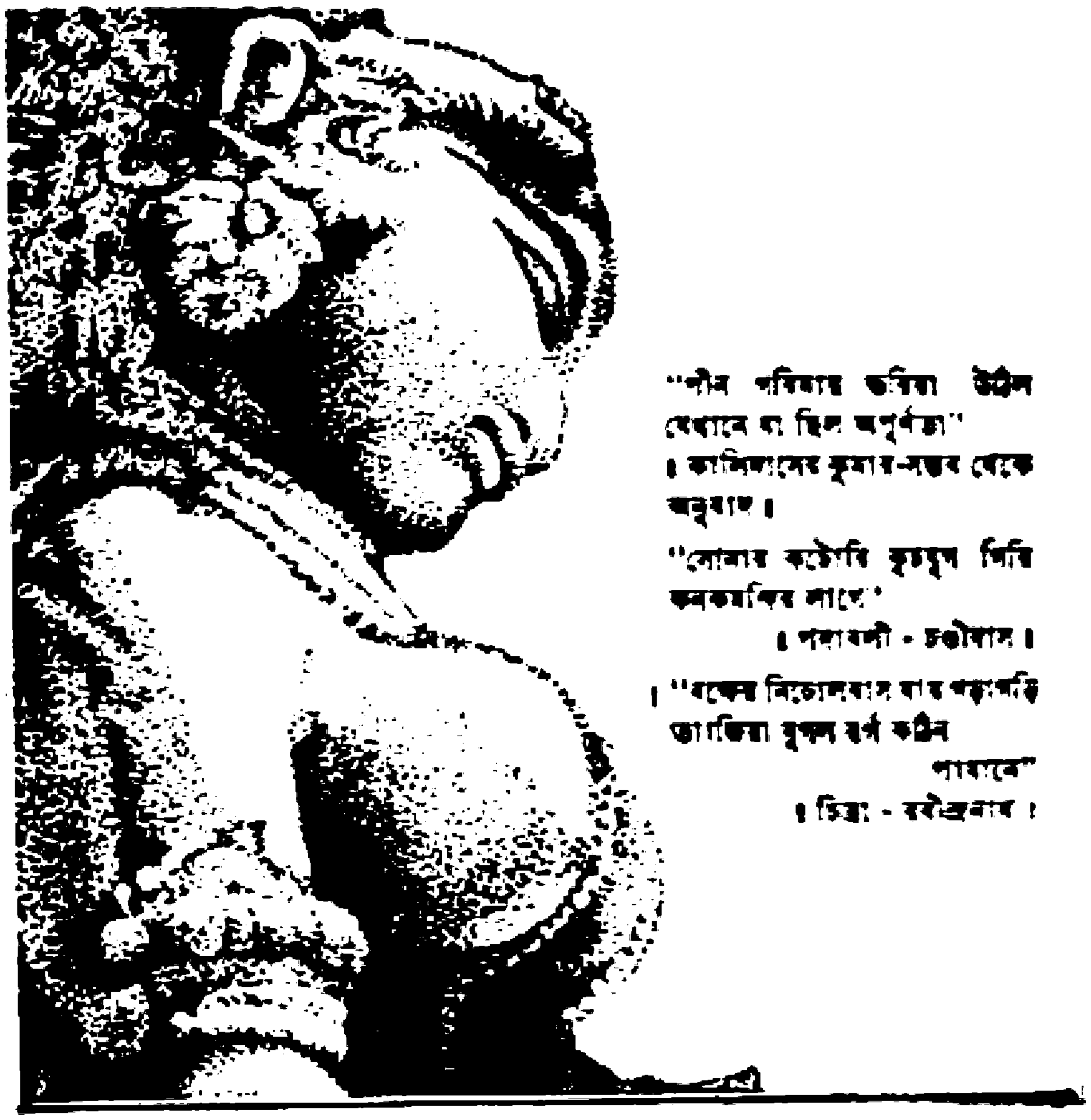

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার!

একটি বিশেষ হর্মোন আর নানা বিশিষ্ট উপকরণে তৈরি ডার্মাকেয়ার অস্ট্রোজেনিক ডেভলপিং ক্রীম। বক্ষের শিথিলতা, অপূর্ণতা এর প্রয়োগে নিমেষে উধাও। বিকশিত বক্ষ-সৌষ্ঠবে গরবিনী যৌবনবতীর দিকে চেয়ে সবার বুক তখন দুরুদুরু।

ডার্মাকেয়ার
অস্ট্রোজেনিক ডেভলপিং ক্রীম
প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্

• সব বড় স্টেশনারী দোকানে পাবেন •

'বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপচর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেন্টস্, পোস্ট বক্স : ৪৪০, দিল্লী,—এই ঠিকানায় লিখুন

SS—2/70

CENTRAL LIBRARY

বৎসর পর উহা আরও হ্রাস পাইয়া ৫৮ লক্ষে দাঁড়াইল, আর সোসিয়েল ডেমোক্রাটরা পাইল ১০ লক্ষাধিক ভোট। কিন্তু পৃথিবী-ব্যাপী আর্থিক মন্দার যুগে জার্মানী যখন সর্বস্বান্ত হইল, তখন নাৎসী দলের নূতন শক্তি বৃদ্ধি ঘটিল এবং ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তারা ৬০ লক্ষাধিক ভোট পাইল। আর ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং জুলাই মাসে সাধারণ নির্বাচনে ১ কোটি ৩০ লক্ষাধিক ভোট পাইল। ১৯৩০-৩২ সালে ফ্যাসিস্ট দলের এই আকস্মিক শক্তিবৃদ্ধির কারণ কি? প্রত্যেক দেশেই যখন সঙ্কট দেখা দেয়, গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা ও বুদ্ধির তখনই সত্যকার অগ্নিপরীক্ষা হইয়া থাকে। পরাজিত জার্মানীর পুনরুত্থানের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইতে লাগিল পৃথিবীব্যাপী আর্থিক সঙ্কট এবং আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থার জন্য। সোসিয়েল ডেমোক্রাট গভর্নমেন্ট ইহার উপযুক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁরা অপসৃত হইলেন এবং শ্রমিকদের যতটুকু সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, আর্থিক দুর্গতির চাপে ধনিক সম্প্রদায় তাহাও কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই সময় ১৯৩০ সালে হেনরিক ব্রুনিং গভর্নমেন্টের ভার গ্রহণ করিলেন এবং তিনি পার্লামেন্টারি শাসনের বদলে ডিক্টেটরি চালাইতে লাগিলেন। তিনি প্রকৃত পরিমাণে করভার বৃদ্ধি করিলেন এবং জনস্বার্থ-বিরোধী কতকগুলি বিসদৃশ আইনকানুন প্রবর্তন করিলেন। কিন্তু এদিকে আর্থিক দুর্গতি বাড়িয়াই চলিল এবং বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইল ৮০ লক্ষ। সুতরাং ব্রুনিং মন্ত্রিসভাও নেপথ্যে অপসারিত হইল এবং প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ ব্যারন বা অভিজাতদের মধ্য হইতে নূতন চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রীর সন্ধান করিলেন। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা জাতীয় সমাজতন্ত্র ইত্যাদি সকলই ইহাদের কাছে অস্পৃশ্য ছিল, কারণ ইঁহারা ছিলেন রক্ত-দম্ভবিলাসী এবং হিণ্ডেনবুর্গও তাহাই। সুতরাং ভন প্যাপেনের ডাক পড়িল। তিনি ছিলেন ন্যাশনালিস্ট দলপতি এবং তিনিও ডিক্টেটরি শাসন চালাইতে লাগিলেন এবং হিটলারের নাৎসীদলের (যাহারা নূতন নির্বাচনে রাইখস্ট্যাগে ২০০টি সদস্যপদ পাইয়াছিল) উপর এক-হাত লইবার জন্য রাইখস্ট্যাগের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন। সংবাদপত্রের উপর খবরদারি ও বেতারের উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রুশিয়ার সোসিয়েলিস্ট পার্লামেন্টের উচ্ছেদ হইল। বহু কমিউনিস্টকে বন্দী এবং ইহুদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইল। কিন্তু ইহাতেও যখন শেষ রক্ষা হইল না, তখন প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ জেনারেল ভন শ্লেইচারকে প্রধানমন্ত্রীর পদে আহ্বান করিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, শ্লেইচার সমাজতন্ত্রীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল এবং সেনানায়ক বলিয়া সরকারী সৈন্যদলের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব ছিল। এদিকে পদচ্যুত ভন প্যাপেন হিটলারী দলের সহিত প্যাক্ট করিয়া বসিলেন এবং দুই দল একত্রে রাইখস্ট্যাগে মেজরিটি হইয়া পড়িল। সুতরাং ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হিটলারের ডাক পড়িল চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণের জন্য। ইহার আগেই বড় বড় ধনপতি ও শিল্পপতিগণ হিটলারের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছিলেন কমিউনিস্ট আধিপত্যের আশঙ্কায়।

এই সময়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ আর পাম দত্ত বলিতেছেন,

> 'The class-conscious workers who became disillusioned with Social Democracy passed to Communism. The politically backward elements passed to Facism' (7)

সোসিয়েল ডেমোক্রাসি সম্পর্কে যাহাদের মোহ ভাঙিয়া গেল, সেই সমস্ত শ্রেণীসচেতন শ্রমিক চলিয়া গেল কমিউনিজমের দিকে, আর রাজনীতিতে যাহারা অনগ্রসর তাহারা গেল ফ্যাসিজমের দিকে। ইহার প্রমাণ এই যে, ১৯৩০-৩২ সালের গৃহীত ভোটে সোসিয়েল ডেমোক্রাটরা ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার ভোট হারাইল, আর কমিউনিস্টরা ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ভোট বেশী পাইল। অর্থাৎ জার্মান শ্রমিকসাধারণের উপর এই দুই দলের যে আধিপত্য ছিল, যদি তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠিত হইত, তাহা হইলে হিটলার ও জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি জয়যুক্ত হইতে পারিতেন না। কিন্তু সাম্যবাদী নেতাদের অভিযোগ এই যে, সোসিয়েল ডেমোক্রাটরা ব্রুনিং-প্যাপেন-হিটলার প্রভৃতির কুশাসন, স্বেচ্ছাচার ও পীড়ন-নীতিতে সমর্থন করিয়াই চলিলেন এবং কমিউনিস্টদের সহিত হাত মিলাইতে অস্বীকৃত হইলেন। ১৯৩২ সালে দুইবার এবং ১৯৩৩ সালে আরও দুইবার কমিউনিস্টরা ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠনের যে আবেদন জানাইলেন, সোসিয়েল ডেমোক্রাট দল তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে, ধনিকসমাজ ও ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধশক্তি কার্যকরীভাবে দানা বাঁধিতে পারিল না। তথাপি কমিউনিস্টদের আওতায় পরিচালিত বার্লিন শহরের যানবাহনের কর্মীরা ১৯৩২ সালের নভেম্বরে এক ধর্মঘট করিলেন। ফলে, সমস্ত যানবাহন বন্ধ হইয়াও গিয়াছিল, কিন্তু সরকারী হিংস্রনীতি এই ধর্মঘট ভাঙিয়া দেয়। ইহার পর হিটলারী ডিক্টেটরি ও পীড়ননীতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট দল এক সর্বজনীন ধর্মঘটের জন্য আহ্বান জানান, কিন্তু সেই আবেদনে সোসিয়েল ডেমোক্রাটগণ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কোন সাড়া দিলেন না, অথচ সংঘশক্তির দিক দিয়া এবং সর্বপ্রধান ভাবে কলকারখানার শ্রমিকদের উপর ইহাদেরই ছিল সর্বাধিক আধিপত্য।

এভাবে দল ও উপদলগত তীব্র বিরোধ, প্রতিক্রিয়াশীলদের জোটপাকানো শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে বাধাদানে অনিচ্ছা, বিদ্বেষ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে পাল্টা-অভিযানে ঔদাসীন্য এবং চারিদিকে কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত ও শ্রমিকশ্রেণী এবং জনসাধারণকে ভুল পথে পরিচালনার জন্য হিটলার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভ প্রতিরুদ্ধ হইতে পারিল না। নাৎসীদের জয়যাত্রা সুরু হইল। তাহারা বে-পরোয়া, দুর্ধর্ষ এবং গুণ্ডামীতে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিল। আর হিটলার জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বুলি আওড়াইয়া এবং সন্ত্রাসবাদীর নীতি অনুসরণ করিয়া জনসাধারণকে বিমূঢ় ও কুক্ষিগত করিয়া ফেলিলেন। তিনি 'মেঠো বক্তৃতার' বাকচাতুর্যে জনসাধারণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে সমগ্র জার্মানীর ঐক্য আনিয়া দিব, ঐশ্বর্য দিব এবং অন্যান্য রাজ্যের সহিত সমান মর্যাদার অধিকার দিব। যদি চারি বৎসরের মধ্যে আমি তাহা না করিতে পারি, তবে দেশদ্রোহীর মত আমার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিও।' আর সমস্ত বিরুদ্ধবাদীর বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টির জন্য গোয়েরিং পুলিশ বাহিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,

> 'Shoot first and inquire afterwards, and if you make mistakes, I will protect you'. (8)

'আগে গুলী চালাও এবং পরে তদন্ত করিও। যদি দেখ যে, ভুল হইয়াছে, তবে আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।' এভাবে হিটলারী রাজত্ব আরম্ভ হইল এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণ যুদ্ধপরবর্তী সর্বপ্রকার শাসনের ব্যর্থতায় গণতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া যে কোন আসুরিক দাওয়াইকেই রাষ্ট্রীয় ব্যাধির পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সুতরাং ১৯১৮ সালের বিপ্লব যেমন বানচাল হইয়া গেল, তেমনই নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধেও কোন ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটিল না।

বিদ্রোহ দূরের কথা, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধও ঘটিল না। কারণ, সোসাল ডেমোক্রাট পার্টি, যাঁরা ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী, তাঁরা ক্রমাগত পিছু হটিলেন, কোন ঐক্যবদ্ধ বাধা দানে অস্বীকৃত হইলেন এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে শত্রুতা করিতে লাগিলেন। অথচ হিটলারী ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বীরের সঙ্গে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাঁদের সমর্থক ও প্রভাবাধীন শ্রমিক সংগঠনগুলি, আর কিছু কিছু বিবেকবান বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, জার্মান জনগণের বৃহত্তম অংশ হিটলারকে সমর্থনই জানাইয়াছিলেন এবং তাঁরাই সন্ধির অবমাননা ও দুর্গতি হইতে ত্রাণ লাভের আশায় হিটলারকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁর বক্তৃতার চাতুর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, হিটলারও আইনসঙ্গতভাবেই জার্মান রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে।

(ক্রমশঃ)

৬ রজনী পাম দত্ত প্রণীত 'Fascism and Social Revolution'—দ্রষ্টব্য।

(7) 'Fascism and Social Revolution'— Page 158.

(8) The Between-War World—by J. Hampden Jackson — Page 135.

জনক

কল্লোল মজুমদার

বলতে গেলে একশো আটবার কালীনাম জপে গভীর রাত্রে কেষ্টচরণ বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিলো। এদিকে বুকের দুরু-দুরুনিও সমান তালেই চলছে। এতো আর কি বলে গেরস্ত বাড়ীতে তালাভাঙা নয়, অথবা ক্যানিং শেয়ালদা লাইনে হাতের কাজ। দস্তুর মতো মায়ের গলায় হাত। একরকম মায়ের অপাই বটে। এ কারণে প্রথম দিকে তার কিছু দ্বিধা ছিলো। অথচ লোভটাকে তাড়াতে পারছিলো না মন থেকে। গত দু' হপ্তা ধরে ব্যবসাবাণিজ্য খুব খারাপ যাচ্ছে। আর্বাদী ব্যবসা বলেই তার জোয়ার-ভাটা আছে, লাভ লোকসান আছে। তা বলে মাসের দ্বিতীয় হপ্তাতেই কারুর পকেটে দু' দশটাকা থাকবে না একথা কেষ্টচরণ হজম করে মেনে নিতে পারে না। অথচ এ' ক'দিনে তার সুদক্ষ তর্জনী চালনায় মাত্র একটি শূন্য চামড়ার ব্যাগ, একটি শেয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলের মান্থলী ও একটি সস্তা কলম ছাড়া কিছুই ওঠে নি। কলমটি নিজের কাছে রেখে বাকি জিনিসগুলো পুরোনো দরে বেচে দেওয়া ছাড়া কিই বা করার ছিলো। অর্থাৎ সোম থেকে শনি পর্যন্ত তার বাণিজ্য হয়েছে একুনে তিন টাকা দশ আনা এবং একটি সস্তা কলম। তার মানে কেষ্টচরণ এই করেছিলো যে হয় দুনিয়াশুদ্ধ লোক হুঁশিয়ার হয়ে যাচ্ছে, অথবা তার ব্যবসাবুদ্ধি পড়তির মুখে। হ্যাঁ, বাড়তি পড়তি মানুষ যে যাই বলুক, এ লাইনের দস্তুরই এই, যারা কাজ করে তারা এটাকে ব্যবসা বলেই বিশ্বাস করে। তুমি শালা যখন এ টেবিলের কাগজ ও টেবিলে চালান দিতে পান খরচা লাও, সেটা কি? ভাবলে কেষ্টচরণ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে নি এটা ঠিক। হোক না হোক নিয়মিত অফিস টাইমে ট্রেনে উঠেছে, প্রতি স্টেশনে কামরা বদল করেছে, এবং ঠারে ঠোরে অবশ্যই নানারকম ফিকির মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। এসব ভাবতে ভাবতেই কেষ্টচরণ ভর সন্ধ্যেবেলা বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলো। এই সময়টা ভোলা সাহার তাড়ির দোকানে এ তল্লাটের সাগরেদরা এসে জড় হয়, তাড়ি নিয়ে গুলতানি করে। যেরকমবাজ কেষ্টচরণ সেদিক পানে চলতে চলতে হিসেব মতো পথচলতি লোকজন দেখছিলো। সন্ধ্যের আঁধারে আর্বাদী কারুর মুখই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিলো না। রেল লাইনের এ পাশটায় এখনো ইলেকট্রিক এসে পৌঁছয় নি বলে এ অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে তার অবশ্যই বিস্তর আফশোষ আছে। তা সত্ত্বেও দু' একজন পরিচিত মানুষ মুখোমুখি এসে পড়লে সস্তাগোছের রসিকতা অন্ধকারেই লোফালুফি হচ্ছিলো। এহেন কেষ্টচরণ একটি তিনজন স্ত্রীলোকের দল পাশ কাটিয়ে সজনেখালির বাঁকের দিকে চলে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। 'এই অন্ধকারেও অন্তত একটি সুদৃশ্য ভ্যানিটি-ব্যাগ তার অভ্যস্ত নজর এড়িয়ে যায় নি। নিতান্তই তিনটি অবলা মেয়েলোক এবং আমি যেন একটি ব্যবসাদার পুরুষ যার ঐ ফুটানিকা ডিব্বাটি একান্তই প্রয়োজন, এই ভেবে কেষ্টচরণ একটু দূরে থেকে তাদের অনুসরণ করলো। অবলা বলেই তো আর কিছু যেখানে সেখানে ব্যাগ ধরে টান মারা যায় না। একটু নিরালা জায়গা চাই, আশ-পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পালানোর পথ চাই। নিদেনপক্ষে এ তল্লাটের সাগরেদদের কাছে সে অকর্মণ্য প্রতিপন্ন হতে পারে না কোনমতেই। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে কেউ তাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পেতো গামছা-মুখো খোচা খোচা গোঁফ-দাড়ি সমেত এক অতি সজ্জন ব্যক্তি মাস-কাবারি খরচের হিসেব কষতে কষতে পথ হেঁটে চলেছে। সামনে সজনেখালির বাঁক ঘুরলেই রক্ষেকালীর মন্দির এবং তার পরেই লোকবসতি শেষ। বাতাসে সন্ধ্যারতির ঘন্টাধ্বনি ভেসে ভেসে অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ছিলো। সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে বরং পথচারী লোকজন বেড়েই চলেছে বলে ক্রমশ সে যখন অধৈর্য হয়ে উঠছিলো তখন সহসা মুখ তুলে অবলা তিনটিকে আর দেখতে পেলো না। বলাবাহুল্য অপূর্ব তৎপরতার সঙ্গে এর পর সেই সজ্জন ব্যক্তিটি মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলো। সেখানে তখন এক রমরমা কান্ড। অন্তত এইরকম উপমাই তার মনে ঘোরাফেরা করলো। কাঁসর ঘন্টার ঢন্ ঢন্ আওয়াজ আর ভক্তরা চোখে জল নিয়ে 'মা' 'মা' আহ্বানে বড় আকুল। ধোঁয়ার আস্তরণে দেবী প্রতিমার মুখে আলো পড়ে ঘামতেল চকচক করছে। বলতে গেলে এই প্রায়-অলৌকিক দৃশ্য আর

CENTRAL LIBRARY

কল্পনারূপ কেন্টচরণও বাঁ চতুর না হয়ে পারে নি। তা সত্ত্বেও দেবী বড় জাগ্রত—ভক্ত কর, মা রক্ষাকালী ইত্যাদি প্রার্থনায় আকুল হতে হতে সে ভিড়ের মধ্যে পূর্বেকার জিনিসকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। আকুল হয়ে খুঁজে বেড়ালে কিছু না কিছু বস্তুকে নিশ্চয়ই এ তথ্য কিন্তু কেন্টচরণ কিছুক্ষণ আগেও জানতো না। তথাপি ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই নৃমুণ্ডমালিনী মায়ের গলায় কোন এক মহাভক্তের দেওয়া সোনার হার প্রদীপের আলোয় ঝরনার মতো ঝকঝক করছে। স্বভাবতই একের বদলে আর এবং দেবী বড় জাগ্রত—ভাবতে ভাবতে সংকুচ হয়ে সে এই সুমধুর দৃশ্যটি দেখতে থাকলো এবং বুকের মধ্যে ব্যাপক বঞ্চনাবোধ করলো। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে কেন্টচরণের এহেন বঞ্চনাবোধ চতুর্দশ পুরুষের যে উত্তরাধিকার সে নিজের অজান্তেই বয়ে নিয়ে চলেছে তারই একরকম বহিঃপ্রকাশ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ভাল-মন্দ নামক গুণাগুণগুলোকে সে অনায়াসেই উপেক্ষা করে থাকে। আসলে নিজের ব্যবসার ফাঁক ফোকর খুঁজে বেড়ানোই যেহেতু এতদিন তার জীবনসংগ্রামে প্রচলিত ছিলো। এই মুহূর্তে সেই অভ্যস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতে সে বড়ই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ আগে দেখা সুমধুর দৃশ্যটিকে বাণিজ্যের উপযোগী কি ভাবে করে তোলা যায়, এটা তার কাছে খুব একটা বড় সমস্যা মনে হলো না। ভিড় ঠেলে এবার প্রাঙ্গণের বাইরে এলো সে। উঠানের বাইরে মন্দিরটি পলকা ইঁটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকায় একনজরে কিছু অসুবিধের সৃষ্টি করেছে।

পারে যাতী পথ উঠানের দরজাতেই শেষ হয়েছে। প্রাচীরের ডাইনে-বাঁয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে গাঁটকয় উঁচু অশ্বত্থ গাছের নীচে ঘন ঝোপজঙ্গল। মন্দিরের পিছনেই রেল লাইন। অবশ্য এ সবই তার কার্যসূচীর পক্ষে বিশেষ অনুকূল ভেবে কেন্টচরণ উঁচু গাছগুলোর গুঁড়ির মধ্যে পথ করে করে ঝোপজঙ্গল পা দিয়ে মাড়িয়ে মন্দিরের পিছনে এসে পড়লো। এদিকটায় মন্দিরের প্রায় গা ঘেঁষে জমিটা বেশ ঢালু হয়ে নেমে আবার ওপরের দিকে উঠে রেল লাইনের সঙ্গে সমতল হয়েছে। হঠাৎ দেখলে কাঁটা-ঝোপে ভরা পরিখা বলে ভুল হয়। তবে কেন্টচরণ এসব নিয়ে মোটেই মাথা না ঘামিয়ে বরং তৎক্ষণে চার হাত পায়ের কসরতে গিরগিটির মতো প্রাচীরের ওপর উঠে বসেছে। এখান থেকে মন্দিরের সম্মুখভাগ এবং তার অভ্যন্তর সম্পূর্ণ অদৃশ্য। নিশ্চিন্ত কেন্টচরণ এপাশ ওপাশ ঘাড় ফেরাতেই দেবী প্রতিমার ঠিক দুহাত পিছনে লোহার গরাদ লাগানো জানলাটি খোলা আছে দেখা গেলো। বলতে গেলে এ দৃশ্য দেবীর অলৌকিক মহিমায় তার অন্তর ভরিয়ে দিলেও কি হবে সেই একরকমের বঞ্চনাবোধ তাকে মাথার মধ্যে কুরে খাচ্ছিলো। তথাপি আগামী কর্মসূচীর সফলতা সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না বলে বিরক্তকর চিন্তাটিকে সে মোটেই আমল দেয় নি। যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অসমতল পর্যায়গুলো অক্লেশে অতিক্রম করতে করতে নিজের ভাঙা দর্মাঘরে ফিরে এসেছিলো একসময়। তারপর রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত সে অস্থিরমনে অপেক্ষা করেছে। পকেটের অবস্থা প্রায় শূন্য হওয়ার জন্যই যে তার মেজাজ খিঁচড়ে গেছে একথা সে এই প্রথম ধর্মাধর্মের হিসেব নিকেশ করতে করতে অবশেষে উপলব্ধি করলো। বস্তুত এই উপলব্ধিই শেষ অবধি ঠাণ্ডা করেছে তাকে এবং স্থির মাথায় কাঁচা বাঁশের কঞ্চি চেঁছে ছুলে অতঃপর একটি আঁকশি প্রস্তুত হয়েছে। রাতে খাবার জন্য খানকয়েক আটার রুটি ও পোয়াটাক দুধ ঘরে মজুত ছিলো। কিন্তু তা খায় নি কেন্টচরণ। উপবাসী থেকে সাত্ত্বিক ভাব পালন করলো। নেহাৎ হ্যাঁচড়া কম্মো তো নয়। মায়ের অঙ্গস্পর্শ বলে কথা! এমনি করে তার সংকল্প যত দৃঢ় হয়েছে, ভক্তিভাবও নিবিড় হয়ে ততোখানিই আকুল করেছে তাকে। অবশেষে রাত্রি গভীর হলে কেন্টচরণ যখন কালীনাম জপ করতে করতে আঁকশি হাতে বাড়ির বাইরে পা দিলো বুকের দুরুদুরুনিও সমানতালেই তাকে তাড়া করে চললো।

রাত্রি অধিকতর বলে এ অঞ্চলের সবটাই অন্ধকারে ডুবিয়ে গেছে। ইলেকট্রিকের লম্বা পোস্টগুলো রেল লাইনের অপর দিক পর্যন্ত এসে থমকে গেছে বলে এ পারের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে এতকাল কেন্টচরণেরও বিরোধ ছিলো। অন্ধকারে গা মিলিয়ে চলতে গিয়ে আজ কিন্তু সে ইলেকট্রিসিটির উপযোগিতা কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছিলো না। যদিও মধ্যরাতের রাস্তা জনহীন তবু কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে অভিজ্ঞ লোকটি আগাছা আর ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে খানা-ডোবার পাশ কাটিয়ে একটু ঘুর পথেই সজনেখালির বাঁকের দিকে এগিয়ে চললো। অবশ্য অভ্যস্ত চোখে তার বিশেষ কিছুই অসুবিধে হচ্ছে না। শুধু এক আধটা বেজি ওঠা চতুষ্পদ জীব সামনে এসে গেলে হাতের আঁকশির সদ্ব্যবহার করতে হচ্ছে। এমনি করে চতুর্দিকে সতর্ক নজর রেখে দ্রুত পায়ে সে যখন সজনেখালির বাঁকের মুখে এলো, তার কিছুক্ষণ আগে থেকেই একদল কুকুরের মিলিত চিৎকার তার কানে মোটেই সুখশ্রাব্য লাগছিলো না। সত্যি বলতে এই মাঝরাতে দু পা'ওলা জীবের চেয়ে চতুষ্পদরাই বিপদ ঘটায় বেশী। এসব ক্ষেত্রে কাঁটাঝোপের আড়াল দিয়ে নিয়ে মন্দিরের দক্ষিণ দিকের ওপাশের মধ্যে সরে যেতে চাইলো সে। আর প্রায় একসময়ই নিয়তির নির্দেশের মতো শিশু কণ্ঠের অস্ফুট কান্নার শব্দ মন্দিরের সামনের জমি থেকে উঠে আসতে শুনলো।

হতচকিত কেন্টচরণ প্রথমে অন্ধকারে কান খাড়া করে দুদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়ালো। মধ্যরাতের বাতাসে হিমস্পর্শ ঝোপঝাড়ের পাতায় পাতায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াচ্ছে। জমাট অন্ধকারে বুঝি সারা পৃথিবী ডুবে গেছে। দূরে স্টেশনের দিকে একটি মাত্র কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। রেল ইঞ্জিনের শান্টিং-এর আওয়াজ। কেমন গা শির শির অনুভূতির মাঝে কেন্টচরণ ক্রমশ উপলব্ধি করলো সমবেত কুকুরবৃন্দের ঐকতান মন্দিরের পুরুত ঠাকুরের সুখনিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটায় নি। অতঃপর স্থির মস্তিষ্ক কেন্টেবাজটি ওস্তাদের মতো আঁকশি খাপিয়ে অতি সতর্ক পায়ে ধাবমান চতুষ্পদবাহিনীর সম্মুখীন হোলো। স্বভাবতই মধ্যরাতে জঙ্গলের পটভূমিকায় অতি শক্তিশালী এই দ্বিপদ প্রতিপক্ষের আবির্ভাবে তারা লেজ গুটিয়ে চার পায়ে ছুট দিলো এবং নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানাতে লাগলো। পরমুহূর্তে দৃশ্যপটের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। কেন্টচরণ মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নেবার মতো অনায়াস ভঙ্গীতে একটি পরিত্যক্ত চার পাঁচদিনের কচি বাচ্চাকে মন্দিরের দরজা থেকে তুলে নিলো। মাত্র কাঁথায় জড়ানো নবজাত শিশুটি গভীর রাতের হিমবাতাসে কুণ্ডলী থেকে টাঁ টাঁ করে কাঁদছিলো। এখন শঠমানুষটির পাঁজরা ঘেরা বুকের গরম উত্তাপে বুঝি পরম নির্ভরতায় জুল জুল করে তাকাতে লাগলো। শুধু কচি ঠোঁট দুটোর কম্পনে কান্নার রেশ তখনও লেগে রয়েছে দেখতে দেখতে তার মনে হোলো

পাপের পথেই এর জন্মো। শিশুর ডান বাহুতে বাঁধা একটি সোনার তাবিজ। ছোট্ট খুকিটি দেখতে গিয়ে সে ভাবলো—তার মানে, ভগবানকে নাও, সোনার তাবিজ নাও, ওটা তোমার পুরস্কার। তাবলে কেষ্টচরণ মোটেই নিজেকে ঋষি মনে করে না, যে স্বয়ং ধরিত্রী তার লাঙলের ফলায় উঠে এসেছে। আসলে সে যে ব্যবসায়ার মানুষ এবং যে কোন পরিস্থিতিতে বাণিজ্যের উপযুক্ত পণ্য চিনতে ভুল করে না একথা ভাবতে পেরে নিজেকে তারিফ করতেই ইচ্ছে করছিলো তার। পরক্ষণেই এক দোটানার মধ্যে পড়ে গেলো সে। অতঃপর মন্দিরে অবস্থিত দেবী প্রতিমার গলায় হার সংগ্রহে অধিকতর কর্তৃক দেবে অথবা পড়ে-পাওয়া-চোদ্দ আনা এই বেওয়ারিশ শিশুর সোনার তাবিজটি নিয়েই নিরাপদে প্রস্থান করবে। এদিকে মুখের শিকার ছিনিয়ে নেবার জন্য ক্ষুধ কুকুর দলের গলাবাজী তাকে বড়ই বিব্রত করে তুললো। কি করবে এবং করবে না ইত্যাদি ভেবে সে যখন ক্রমশ দিশেহারা হয়ে পড়ছে ঠিক তখনই পুরুত ঠাকুরের বিরক্তিসূচক মন্তব্য 'আরে থেমে যা ঘাটের মড়ারা' মন্দিরের বন্ধ কপাটের ওপাশ থেকে ভেসে এলো। এতক্ষণে কেষ্টচরণ চারদিকের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্বিত ফিরে পেলো। যে কোন মুহূর্তে সে সম্পূর্ণ নতুন বিপদের দেখা পেতে পারে এই আশঙ্কায় ঝাঁপিয়ে ঝোপের মধ্যে সরে এসে ফিরে চললো অন্য দিকে। পূর্বের পরিকল্পনা বাতিল হওয়াতে কেষ্ট স্বভাবতই এখন দ্বিধাহীন। তাই কয়েকটি চতুষ্পদ তাকে অনুসরণ করছে জেনেও সেদিকে কিছুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে অপেক্ষাকৃত ঘন ঝোপজঙ্গলে ঘেরা একটি পচা ডোবার কিনারে এসে দাঁড়ালো। এখানে কাছাকাছি মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন নেই। প্রায় তিনশো গজ দূরে রাস্তার মুখোমুখি একটি মাত্র হোগলার বেড়া দেওয়া টালির ছাউনি। চতুর্দিকে নজর বুলিয়ে সে সঠিক বুঝতে পারলো ওটা সাধুখাঁর কয়লা বেচাকেনার আড়ত, এখন জনশূন্য। নিঃশঙ্ক কেষ্টচরণ আর সময়ের অপব্যবহার করতে চাইলো না। সুদক্ষ অঙ্গুলী চালনায় সোনার তাবিজটি কয়েক মুহূর্তেই তার স্থান পরিবর্তন করলো অতঃপর কেষ্টচরণ সফল বাণিজ্যে উৎফুল্ল হয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে জোরে পা চালালো। অবোধ শিশু পচা ডোবার ধারে আবার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইলো।

পাপের ফল নিয়ে কেষ্টচরণ মোটেই মাথা ঘামালো না। তবু মিনিটখানেক চলার পরে বাচ্চাটার চাঁ চাঁ কান্না আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ রব অন্ধকার ভেদ করে তার কানে এসে পৌঁছলো। তল্লাটের কোন ভবঘুরে বুড়ী বিষফল উগরে দিয়েছে ইত্যাদি মন্তব্য ঠোঁটে বিড় বিড় করলেও কেষ্টচরণের চোখের সামনে এক অস্বস্তিকর ছবি পাটভাঙা ধুতির মত খুলে খুলে যাচ্ছে তখন। ঝোপজঙ্গলে ভরা পচা ডোবার পাড়ে পরিত্যক্ত শিশু আর রোঁয়াওঠা কয়েকটি জীব তার মুখ-হাত-পা নিয়ে খাবলাখাবলি করছে—এই এক ছবি। কেষ্টচরণ থমকে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করলো। আবার চললো। আবার থমকালো। অবশেষে ঘটনাস্রোতের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। কেউ তাকে ক্রমাগত তাড়া করে বেড়াচ্ছে বুঝতে পেরে রাগতভাবে হেঁচকা টান মেরে নিজের শরীরটাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলো সে এবং প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিতে নিতে অশ্লীল খিস্তি কাটলো। কলাবাদুড়ের মত বাঁ হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরা চারদিনের কচিবাচ্চা আর ডান হাতে আর্তনাদ উঁচিয়ে কেষ্টচরণ আগের মতোই ঘর্ম পথে যখন ডাঙা খুপরিতে ফিরে আসে তখন শেষ রাতের হাওয়া আরো হিম হয়ে উঠছে তল্লাটে।

অথচ বাচ্চার কান্নাকে এবার কিছুতেই থামাতে পারছে না কেষ্টচরণ। এই প্রথম অভুক্ত থেকেও কচি শিশুকে নিজের ভাগের দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। তার এহেন আত্মত্যাগেও শিশু এক ঢোক খেয়ে আর খায় নি। তারপর সবটাই উগড়ে দিলো তার জামাকাপড় ভিজিয়ে দিয়ে কেষ্টচরণের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়েছে। ঝিঁঝিঁ পোকার মতো ঘ্যানঘেনে কান্না অবশেষে পঞ্চমে উঠলো সে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলো। চুল খাড়া, নাকের দুটো বাঁশির মতো ফুলে উঠেছে, খোঁচা খোঁচা এবড়োখেবড়ো চেহারা করে একহাতে ঘস ঘস করে পিঠ চুলকোতে লাগলো সে এবং দাঁত খিঁচিয়ে অদৃশ্য অনর্থের উদ্দেশে অপরূপ খিস্তি কাটলো। এ পরিস্থিতিতে তার করণীয় কি সে জানে না। এ তল্লাটের ডাকাবুকো দাদের বাসিন্দাদের চেয়ে তার অশ্লীল চালনার দক্ষতা কিছু কম নেই। তাছাড়া নানান ফিকিরএর ঘাটিঘোঁটি তাকে ব্যবসায় খাটিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু পৃথিবীতে মাত্র বয়স মাত্র কয়েক দিনের এমন একটি জীবন্ত মাংসপিণ্ডের কান্না কি করে থামাতে হয় একথা ভাবতে গিয়ে সে অবিরাম চাঁ চাঁ শুনতে লাগলো এবং লাল-নীল-হলদে-সবুজ রঙের পোকা ছিটকে উঠতে দেখলো।

তথাপি পরদিন সকালে তাবৎ বস্তিবাসী গোল গোল চোখ করে দেখলো, গামছা মুখো কেষ্টচরণ একটি কচি বাচ্চাকে বুকের কাছে সাপটে ধরে প্রতিবেশী কলিমুদ্দিন মিঞার বাড়ীর দরজায় কথা নাড়ছে—'না বড় বাচ্চাটাকে এক ঠাঁই বুকের দুধ খাওয়াবে আম্মাজান?'

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ এ রাজ্যের প্রতিটি জেলার যাবতীয় পুরাকীর্তি বিষয়ে বাংলা ভাষায় যে সুলভ গ্রন্থরাজি (Archaeological Encyclopaedia of West. Bengal) প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' সে প্রকল্পের প্রথম পুস্তক। প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত পূর্ত বিভাগের প্রকাশন কমিটির সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ বই-এর ভূমিকা লিখেছেন—"এ পুস্তকের লেখক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরাদি বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম, তথ্যবহুল, প্রামাণিক গ্রন্থ 'বাঁকুড়ার মন্দির'-এর প্রণেতা হিসাবেই সমধিক খ্যাত।...এ গ্রন্থ পাঠে বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী সম্বন্ধে সকলের মনেই একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।...বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ে প্রচুর তথ্যবহুল এ গ্রন্থখানি যে বহুদিন পর্যন্ত ভবিষ্যৎ গবেষকদের পথনির্দেশ করিতে পারিবে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

পুরু, দীর্ঘস্থায়ী, ক্রীমকত কাগজে ছাপানো পাঠাংশ (১৪৬ পৃষ্ঠা), ভাল আর্ট কাগজে মুদ্রিত ৬৫টি উৎকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ (৪৮ পৃষ্ঠা), দুরঙের প্রচ্ছদ চিত্রশোভিত শক্ত বোর্ডের সুদৃশ্য 'ক্লিপ' বাঁধাই। এই অসামান্য বইটির মূল্য মাত্র ৩·৭৫ টাকা। পুস্তক-বিক্রেতারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী প্রেসের (৩৮, গোপালনগর রোড, কলকাতা—২৭) সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলে নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে ২০% কমিশনে দ্রুত সরবরাহ পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিচিত্র আত্মজীবনী

তখনো বত্রিশ বছর বয়স হয়নি পিটার ভ্যান ডার হার্ক একজন স্বাভাবিক ভাচম্যান বা ওলন্দাজ হিসাবেই সংসারে বিচরণ করেছেন তারপর একটা আশ্চর্য কান্ড ঘটে গেল, ১৯৪০-এর এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে তিনি হঠাৎ মই থেকে পড়ে জ্ঞানহীন হয়ে রইলেন তিন দিন। হাসপাতালে চেতনা লাভ করার পর তিনি বুঝলেন কারো দিকে একবার তাকালেই তাঁর জীবনের সমগ্র অতীত তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। পাশের বেডে শুয়ে আছে যে রোগীটি তার জীবনের সব কিছুই তাঁর জানা। আজ পৃথিবীর মধ্যে মহত্তম সাইকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ এই 'পিটার হারকস'। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর এই নতুন নাম।

তিনি এক বিস্ময়কর আত্মজীবনী রচনা করেছেন। এই আত্মজীবনী এক অলৌকিক গ্রন্থ। 'এক্সট্রা-সেনসরি পার্সেপসনের' (অতিমাত্রায় চেতনাবাহী উপলব্ধি) এই আশ্চর্য শক্তি চিকিৎসক সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে। পিটার হার্কোসের এই শক্তি প্রয়োগে হারানো বস্তুর সন্ধান করা থেকে গুরুতর অপরাধের রহস্য সমাধানও হচ্ছে। বর্তমানে হার্কোস নামেই তিনি পরিচিত।

পিটার হার্কোস এই আত্মজীবনীতে প্রচুর অভ্রান্ত প্রমাণ প্রয়োগে তাঁর এই অসামান্য শক্তির প্রসঙ্গে বিস্ময়কর বিবরণ দিয়েছেন। এই অত্যাশ্চর্য মানুষটির চোখে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যেমনটি ঘটত বলে শোনা গেছে ভারতের অতীত যুগের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের ক্ষেত্রে।

হার্কোসের এই শক্তি প্রয়োগের জন্য কোনো রকম কৌশল, ক্রিস্টাল বল, চক্র বা দীক্ষার প্রয়োজন হয় না অথচ এই শক্তি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমাজগতভাবে সর্বসাধারণের উপকারে লাগছে। এই সব কারণে পিটার হার্কোসের আত্মজীবনীটি এ যুগের এক বিস্ময়কর গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করছে।

হার্কোস গ্রন্থারম্ভে লিখছেন—

—"সহসা জেগে উঠলাম। ভীত চকিত হয়ে চারদিকে তাকালাম। এ কোথায় আমি? আমি দেখছি হাসপাতালে, কিন্তু কেন? বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করি। চীৎকার করে ডাকি—নার্স, নার্স! একবার এখানে আসুন দয়া করে।

নার্স যখন আমার বেডের পাশে এসে দাঁড়ালেন আমি সহসা কেমন উন্মাদ হয়ে উঠলাম। তারপর মনে পড়ল—আমি পড়ে গিয়েছিলাম আর সেই কারণেই এখানে এসেছি। আমার মাথায় ভীষণ আঘাত লেগেছিল। নার্সকে তাই বলি।

নার্স আমার কথায় মৃদু হেসে বলে—আঘাত? আঘাত কেন লাগবে না বলুন। আপনি ভাগ্যবান যুবক যে বেঁচে গেছেন। সবাই ত বলছে যে ত্রিশ ফিট নীচে পড়েছিলেন।

এই হল সূচনা। হার্কোস লিখেছেন—"এই হোল সূত্রপাত। প্রারম্ভকার সেই হাসপাতাল কক্ষে চেতনা লাভ করার দিন থেকেই শুরু হল। আমি ছিলাম হাগের জুইডওয়াল হাসপাতালে, ১৯৪০-এর জুন মাস, আমি তিন দিন অচেতন ছিলাম। আজ পর্যন্ত আমি এই দিনটিকে আমার পুনর্জন্মের দিন বলে বিবেচনা করি।"

ডাক্তাররা বলেছিলেন হার্কোসের মাথার খুলি ভেঙে গিয়েছিল এবং বাঁ দিকের কাঁধ ভেঙে গিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে, হার্কোস যে বেঁচে আছেন সেটা একটা 'মিরাকল'। এই প্রসঙ্গে হার্কোস লিখেছেন—"সেই দিন আমি বুঝতে পারলাম অর্থহীন ত্রিশ ফিট ওপর থেকে মাথা নীচে করে যখন পড়ছিলাম তখন সেই মুহূর্তে ঈশ্বর আমাকে এক অনন্যসাধারণ শক্তি দান করেছেন। প্রথমটা বুঝিনি ব্যাপারটা কি। কিন্তু হঠাৎ বুঝলাম যে অপর মানুষের মনের ভিতরকার কথা আমি বুঝতে পারছি। নার্স চলে যাওয়ার পরই বুঝতে পারলাম। দেখলাম আরেকটি বেডে একজন শুয়ে আছেন। আগে কখনও দেখিনি তাঁকে। কিন্তু সহসা বুঝতে পারলাম যে ওর সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই জানি, অথচ আমাদের মধ্যে কোনোরকম বাক্য বিনিময় হয়নি। আমি দুম্ করে বলে উঠলাম—আপনি অতি বদ লোক।

আমার এই রসিকতায় হাসবে কি রাগ করবে ভেবে না পেয়ে লোকটি প্রশ্ন করে—এ কথার হেতু কি?

—কারণ, আপনার বাবা মরার সময় আপনাকে একটা সোনার ঘড়ি দিয়েছিলেন, তিনি মাত্র কিছুকাল আগে মারা গেছেন। অথচ সেই ঘড়িটা আপনি বেচে দিয়েছেন।

একথায় লোকটি ত' হতভম্ব, আমার দিকে পাশ ফিরে প্রশ্ন করে—আপনি কি করে জানলেন!

আমি ভাবতে থাকি। সত্যাই ত' কিভাবে জানলাম। এখন আমার হতভম্ব হওয়ার পালা। অবশেষে অসহায় ভঙ্গীতে বলি—আমি জেনেছি। কিন্তু আমি কি ঠিক বলিনি?

লোকটি মাথা নাড়ল, তার মুখে ভীতির আতংক, যেন এইমাত্র ভূত দেখেছে।

সত্যিই হয়ত ভূত দেখেছিল, কোনো একরকমের ভূত, আইডিয়ার ভূত অন্ততঃ। কারণ পিটার হার্কোসের ধারণা এই যে, 'সাইকিক পাওয়ার' বা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী তিনি হয়েছেন অ্যাকসিডেন্টের পর তার পিছনে কোনো একটা অস্বাভাবিক শক্তি কাজ করছে। কারণ যে মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে আপনি একজন বদ লোক, তখনই মনে হয়েছে একথা তাঁর নয়, অন্য কারো। সেই ভিতর থেকে বলে উঠেছে। তার সম্পত্তি কে বিক্রী করেছ, পৈতৃক সম্পত্তি হলেও তার বিক্রীর অধিকার আছে, সুতরাং হার্কোস নিজে থেকে কখনই তাকে বদ লোক বলতে পারতেন না।

হার্কোস লিখছেন—"লোকটি কিন্তু আমাকে অতিশয় অপরাধী বোধ করছিল। তার মনোভঙ্গী আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম।"

CENTRAL LIBRARY

এর পর একজন নার্সকে হঠাৎ বললেন—আপনি ট্রেনে আসছিলেন, ভুলে একটা সুটকেস ফেলে এসেছেন, সুটকেসটা আবার আপনার নিজের নয়, কোনো বন্ধুর।

সত্যিই তাই। নার্স এই ক্ষতির কথা কাউকে জানান নি তাই তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

এই কথা জানাজানি হওয়ার পর হাসপাতালের স্টাফ সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ পাইটার্স হার্কোসকে দেখতে এলেন।

পড়ে যাওয়ার তিন চার দিন পরে একটি রোগী হাসপাতালের পোশাকের পরিবর্তে সাদা পোশাক পরে হার্কোসের ঘরে এলেন। এর পূর্বে তিনি জানালার বাইরে থেকে উঁকি দিতেন, আজ হার্কোসের মস্তিষ্ক প্রায় বিভ্রান্ত অবস্থায়। ভদ্রলোক এসে কুশল প্রশ্ন করলেন, তাড়াতাড়ি নিরাময়ের প্রার্থনা জানিয়ে চলে গেলেন। হার্কোস হ্যান্ডসেক করলেন একটু সজোরে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অনুভব করলেন লোকটি হল্যান্ডের কালভার স্ট্রীটে জার্মানদের হাতে মারা যাবেন। লোকটি ব্রিটিশ এজেন্ট, প্যারাসুটে হল্যান্ডে অবতরণ করবেন। চীৎকার করে নার্সকে ডেকে বললেন—ওঁকে ডাকুন, উনি মারা যাবেন—বাধা দিন।

হার্কোস প্রলাপ বকছেন মনে করে নার্স, ডাক্তার প্রভৃতি সবাই ওঁকে প্রবোধ দিতে থাকেন, সহজ ভাবে সব কিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করুন, আপনার স্কাল ফ্রাকচারটা অতিশয় গুরুতর।

হার্কোস কি আর করেন, চুপ করে গেলেন। কয়দিন পরে সংবাদ এল সেই কালভার স্ট্রীটেই জার্মান গেস্টাপোর হাতে নিহত হলেন। খবরটা চাপা রইলো না, সবাই জানলো, কারণ হল্যান্ডের অধিকাংশ লোক আত্মগোপনকারী জার্মান-বিরোধী।

এর কয়দিন পরে একজন অপরিচিত ব্যক্তি হার্কোসের ঘরে এসে বললেন—আপনি ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু কি করে জানলেন? শুধু ওঁর হাতটা স্পর্শ করেই বলে দিলেন। আমাদের ন্যাকা মনে করেন না?

হার্কোস বললেন—আমি বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম, করিনি?

—তুমি বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকের মনেও অনুকম্পা জাগে। হার্কোস সবিস্ময়ে বলে ওঠেন—বলেন কি আমি বিশ্বাসঘাতক!

সেই আগন্তুক জবাবে বললেন—আমিও জার্মানদের মধ্যে আমার স্বদেশ স্পেনে লড়েছি, গ্রীসে লড়েছি আবার এখানেও লড়ছি, কে জানে একদিন জার্মানদের অস্ত্র হয়ত আমার কাছেও স্বাদু মনে হবে।

এই পর্যন্ত বলে লোকটি হঠাৎ পাশের একটি খালি বেড থেকে বালিশ নিয়ে হার্কোসের শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করতেই হার্কোসের কণ্ঠে উচ্চারিত হল—

"Como aborrezo la matanza."

কি বলছেন তা জানেন না হার্কোস। শুধু আবার বললেন—

'Como aborrezo dar la muerte?'

লোকটি স্তব্ধ হয়ে গেল। একি ব্যাপার!

ডাক্তাররা দৌড়ে এলেন। তখন সেই উগ্র লোকটি বললেন—

আশ্চর্য! আমি যা ভাবছি লোকটি যে তাই বলল। সত্যি ওকি মনের কথা জানে!

সে যাত্রা বেঁচে গেলেন হার্কোস।

হার্কোসের এই আত্মজীবনী অতি বিচিত্র। সমগ্র গ্রন্থটিতে অজস্র কাহিনী সাজানো আছে এবং সেই সঙ্গে আছে যুদ্ধকালীন হল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ চিত্র।

হার্কোস রচিত এই আত্মজীবনীর মধ্যে আরো যে সব চাঞ্চল্যকর কাহিনী আছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে এবং গ্রন্থশেষে লেখক বলেছেন—

'The growing knowledge of psychic ability has given a glimpse into new creative dimensions of human nature, giving renewed hope and determination to mankind : The Peter Hurkos & Associates Foundation Inc. will provide the nessary research needed in this mysterious and fascinating field'.

পিটার হার্কোস এই বিষয়ে যাঁরা জানতে চান তাঁদের জন্য সময় ও উৎসাহ ব্যয় করতে সর্বদা প্রস্তুত।

—অভয়ঙ্কর

PSYCHIC : (An Autobiography) By PETER HURKOS : Published by ARTHUR BARKER Ltd. London. Price : 45 Shilling only.

সাহিত্যের খবর

ময়ূরভঞ্জে লেখক সম্মেলন।। ময়ূরভঞ্জ সংস্কৃতিকা সমারোহের উদ্যোগে আগামী ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ময়ূরভঞ্জে এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে সমকালীন ওড়িয়া গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি সেমিনার আয়োজিত হবে বলে জানা গেছে। এই সমস্ত সেমিনারে যাঁরা যোগ দেবেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিশিষ্ট ওড়িয়া লেখক সুরেন্দ্র মোহান্তী, গোপীনাথ মোহান্তী, চিন্তামণি বেহেরা, রমাকান্ত রথ প্রমুখ। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন উড়িষ্যার সঙ্গীত নাটক আকাদমির সভাপতি ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব। গত ১৮ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিশিষ্ট কবি সীতাকান্ত মহাপাত্র এই সংবাদ জানিয়ে বলেন যে, এ ছাড়াও অন্য ভাষাভাষি প্রতিবেশী রাজ্য থেকেও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখককে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়েছে।

পরলোকে বিশিষ্ট হিন্দি লেখক : বিশিষ্ট হিন্দি লেখক পদ্মভূষণ রাজা রাধিকারমণ প্রসাদ গত ২৪ মার্চ পাটনায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর। তিনি ছিলেন বিহার সাহিত্য সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি। এ ছাড়াও সাহিত্য আকাদমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'গান্ধী টুপি', 'পুরুষ-নারী' প্রভৃতি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

লিও তলস্তয় প্রসঙ্গে : লিও তলস্তয় সম্পর্কে তাঁর পুত্রদের সকলেই কিছু না কিছু স্মৃতিকথা লিখেছেন। এইসব স্মৃতিকাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে মহৎ লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অজস্র কাহিনী। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মিখাইল তলস্তয় লিখিত কোন স্মৃতিকথার কথা জানা ছিল না। কয়েকদিন আগে 'লিতারেতুরনাইয়া গাজেতা' পত্রিকায় এমন একটি স্মৃতিকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, এতে লিও তলস্তয়ের ব্যক্তিজীবনের অনেক কথা নতুন আলোকে পরিবেশিত হয়েছে। পাঠকের জ্ঞাতার্থে সেই স্মৃতিকাহিনীর কিছু কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। লিও তলস্তয়ের পুত্র মিখাইল তলস্তয় লিখেছেন—

তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে পুশকিনই ছিলেন বাবার সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি তাঁকে শিক্ষক মনে করতেন। বাবার মতে পুশকিনের সমতুল্য সাহিত্য প্রতিভা আর ছিল না। দস্তোইয়েভস্কিকে তিনি সম্মানার্হ মনে করতেন এবং তাঁর কিছু কিছু রচনার ভক্ত ছিলেন। তাছাড়া তাঁকে বাবা মহৎ মনোবিজ্ঞানী মনে করতেন। অবশ্য পুশকিনের জীবন-দর্শনের অনেকখানির সঙ্গেই তিনি একমত ছিলেন না। শিল্পবিচারের দিক থেকে দস্তোইয়েভস্কির চরিত্রগুলির মুখে

একই ধরনের কথা বৃদ্ধি ব্যবহারের তিনি সমালোচনা করতেন। দুঃখের বিষয়, স্যার ইয়োহাম্পের সঙ্গে বাবার দেখা হয়নি। তবু তাঁর মৃত্যুর পর বাবাকে বার বার বলতে শুনেছি, এ মৃত্যুতে জগতের সকলের ক্ষতি।'

অন্য একজন তরুণ লেখকের গল্প পড়ে সি ও উকস্তয়ের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে লিখেছেন—'একবার একজন তরুণ লেখকের লেখা একটি গল্প তাকে বাবার কাছে আসে। গল্পটি অবশ্য মাঝামাঝি ধরনের। বাবা কিন্তু বিরক্ত হয়ে ওঠেন তরুণ লেখকের অসাবধানতায়, তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির অভাব লক্ষ্য করে। বাবা সেদিন বলেছিলেন—'একটা প্রকাণ্ড বাগানের বর্ণনা দিয়ে এই গল্পটির সুরু। ওই বাগানের লম্বা লম্বা লাইম গাছের মাথায় সারস পাখিরা বাসা বাঁধছে। আচ্ছা, লোকে এমন আবোল-তাবোল লেখে কেমন করে বলতো? ছেলেটি সারস পাখির কথা লিখছে, অথচ জানেই না যে, সারসরা সব সময় জলের কাছাকাছি থাকে। এ ধরনের রচনা পাঠকের পড়ার ইচ্ছে একদম নষ্ট করে দেয়।' এরপর সেক্রেটারীকে ডেকে তিনি মুখে মুখে একটি চিঠির মুসাবিদা করে দেন। তাতে তরুণ লেখকটিকে তিনি অনুরোধ জানালেন, যেন গল্প লেখার সময় তাঁর আলোচ্য বিষয়ের প্রতি আর একটু সচেতন হন।

এর কিছুদিন পরে বাবা তাঁর ভাই সার্গেই নিকোলায়েভিচকে দেখতে তাঁর জমিদারীতে যান। সেখানে একদিন সকালে একটা প্রাচীন লাইম বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ লক্ষ্য করেন, কতকগুলো সারস পাখি একশ বছরের সব পুরোনো লাইম গাছের মাথায় বাসা বাঁধছে। দেখে অবাক হলেন তিনি। তরুণ লেখকটিকে অকারণে দুঃখ দিয়েছেন দেখে তিনি মনে মনে খুব লজ্জিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ত্রুটি স্বীকার করে সেই তরুণ লেখকের কাছে চিঠি লেখেন।'

স্মৃতি কথাটিতে লিও তলস্তয়ের জীবনের আরো অনেক অদ্ভুত কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে।

আফ্রো-এশীয় কবিতা সেমিনার : এ বছরের ডিসেম্বর মাসে সেনেগালের ডাকারে আফ্রো-এশীয় কবিতা সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে এই সেমিনার আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের' পার্মানেন্ট ব্যুরোর এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কবে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে, এখনও তা জানা যায়নি।

—চার্বাক

নতুন বই : সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

নবধারায় গীতার মর্মবাণী—দাশরথি সোম। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা যুগ যুগ ধরে মানুষকে দিয়ে আসছে সত্যের সন্ধান। স্বয়ং ভগবানের মুখোচ্চারিত ব্রহ্মবিদ্যার যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ গীতা দীর্ঘকাল ধর্মপিপাসুর চিত্ত-শুদ্ধি ঘটিয়েছে। গীতা যেমন যোগশাস্ত্র, তেমনি আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ। শ্রীদাশরথি সোম 'নবধারায় গীতার মর্মবাণী' গ্রন্থে কয়েকটি অধ্যায়ে গীতার মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন। ভাষা সহজ এবং সাবলীল হওয়ায় সাধারণ পাঠকও অনায়াসে বক্তব্য বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারবেন। বইটি প্রচারিত হবে আশা করি।

বিস্ময়—সম্পাদক : সুজিত ধর। ১০৬ রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা-৯। দাম : এক টাকা।

সায়েন্স ফিকশ্যান পত্রিকা 'বিস্ময়ের' আত্মপ্রকাশকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা কিছুকাল যাবৎ বেশ বিস্তৃত হচ্ছে। নানা ধরনের বই ও পত্রপত্রিকা বেরিয়েছে। কিন্তু সায়েন্স ফিকশ্যান পড়বার মত ব্যাপক পাঠক সংখ্যা বাংলা ভাষায় এখনও তৈরি হয়েছে কিনা সন্দেহ। তবুও এঁদের উদ্যম নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য। বর্তমান প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরজিৎ কর, এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, অদ্রীশ সেনাপতি এবং স্বপন ঘোষ। একটি বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস লিখেছেন বিন্দু দাস।

বাংলা সাহিত্যপত্র (৬ষ্ঠ সংকলন)—সম্পাদক : উমানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬ বাবুপাড়া লেন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। এক টাকা

অনেকের সম্পাদকীয় আলোচনাসহ এ সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধনিবন্ধ। লেখকদের মধ্যে আছেন গোপাল ভৌমিক, বঙ্কিম মাহাত, শ্রীমন্ত-কুমার জানা, সমীরণ দাশগুপ্ত, স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, উমানন্দর বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখ। প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'মলভূম লোকবৃত্তে খণ্ডিতমনা', 'মধুসূদন ও আধুনিকতা', 'দেশ বিভাগ ও সাহিত্যিকের দায়' প্রভৃতি রচনাগুলি পাঠককে নাড়া দেবে। পত্রিকাটি অনেকের কাছেই সংগ্রহযোগ্য মনে হবে।

বর্তিকা (শ্রীপঞ্চমী সংখ্যা)—সম্পাদক মনীশ ঘটক। গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ষাট পয়সা।

লিখেছেন মনীশ ঘটক, নচিকেতা ভরদ্বাজ, পুলকেশ সিংহ, পুলকেশ মণ্ডল, আবুল বাশার, অপর্ণা চ্যাটার্জি, আবু সুফিয়ান এবং আরো অনেক কবিসাহিত্যিক। পত্রিকাটি নতুন লেখক-লেখিকাদের ভালো লাগবে।

বিচিত্রা (অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত রাহা ও জীবন ভৌমিক।। ৩০২ পাগলীবাগান, চেতলা, কলকাতা ৪৭, দাম এক টাকা।।

এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের বহু বিতর্কিত ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ। তা ছাড়া জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন (৬ ফাল্গুন) উপলক্ষে ছাপা হয়েছে একটি আলোচনা। লেখকদের মধ্যে আছেন অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ভৌমিক, নলিনী-কুমার চক্রবর্তী, অমিতাভ চৌধুরী, সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত, সুব্রত রাহা, শশধর রায় এবং আরো অনেকে। আলবেয়ার কামুর একটি গল্পের অনুবাদ করেছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়। নিখিল বিশ্বাসের একটি স্কেচ (ঘোড়া) ও তাঁর ছবি সম্পর্কে আলোচনাটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। পত্রিকাটি পাঠকপাঠিকাদের কাছে ভালোই লাগবে। সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য।

ইশারা (অষ্টাদশ সংখ্যা)—সম্পাদক : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কামিনী কুটির। ১০৭ কে এন সি রোড, বারাসাত বাজার। বারাসাত। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতার পত্রিকা ইশারা। লিখেছেন রবীন্দ্র গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, তরুণ সেন, মণীন্দ্র ঘটক, তাপস গুপ্ত, রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব মাজী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, ফণী বসু, অরুণ-ইন্দু, দেবপ্রসাদ সিংহ, গণেশ সেন এবং সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। অমিয় ভাদুড়ী এবং সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতার অনুবাদ করেছেন।

সমতট (জানুয়ারী, মার্চ ১৯৭১)—অর্ধ্য-কুসুম দত্তগুপ্ত। ৫।১বি, দেশপ্রিয় পার্ক (ইস্ট), কলকাতা-২৯, দাম দু'টাকা।

ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা 'সমতট' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন ভাস্কর বসু, অসীম রায়, পুলোকেশ দে সরকার, প্রশান্তকুমার ঘোষ, অম্লান দত্ত, সুভাষচন্দ্র সরকার, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী কার্লেকর এবং আরো অনেকে।

Effective news of Socialist Production — Shiryaev. Novosti Press Agency Publishing House. Moscow.

এই পুস্তিকায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্কে তথ্যসহ আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমী লেখকরা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অসার্থকতা বা প্রাথমিক পর্যায়েই মাত্র সাফল্য লাভ করতে পারে—এটাই প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। শিরইয়াভেভ এই যুক্তিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা এবং এর উন্নতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

বইকুণ্ঠের খাতা

ইতিহাসের আশ্চর্য নায়ক তুলসী গোস্বামী

FOOTPRINTS OF LIBERTY

Speeches and Writings of
Tulsi Chandra Goswami

একেকটি বইয়ের আত্মপ্রকাশ কখনো কখনো আমাদের ভীষণ রকম নাড়া দিয়ে যায়, ঝিমিয়ে-পড়া স্মৃতিকে জাগ্রত করে। তখন মনে পড়ে, আমরা কেবল অমনোযোগী ছিলাম না, আত্মবিস্মৃতির লালিত স্বভাবে অসতর্ক ছিলাম অনেক জরুরী ব্যাপারেই।

না হলে তুলসী গোসাইকে নিয়ে আমরা অনেক বই লিখে ফেলতে পারতাম। অন্তত বেরোতে পারতো দু'একটা প্রবন্ধনিবন্ধের বই, কিংবা রম্যরচনা জাতীয় গ্রন্থ। ইঙ্গ-মার্কিন প্রকাশকেরা যখন আধ-চাষীর আত্মজীবনী ছেপে বিস্তর পয়সা উপার্জন করেন, তখন আমাদের দেশের লেখকপ্রকাশকদের উদাসীনতা দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

অথচ সেরকমই আশ্চর্য জীবন ছিল তুলসী গোস্বামীর। ছিল ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এবং সে ইতিহাস বাংলাদেশ তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত।

খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। আড়াই তিন দশক আগেও অনেকের মুখে মুখে ছিল তাঁর নাম। অনেকেই তাঁকে জানতেন অভিজাত পার্লামেন্টারিয়ান ও সুবক্তা হিসেবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুরাগী শিষ্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শরিক হিসেবে ছিল তাঁর কত নাম-ধাম। এককালে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডক্টর বিধান রায়ের সমর্থনে নেমেছিলেন নির্বাচনী প্রচারে।

আর, জীবিতকালেই পরিণত হয়েছিলেন জনশ্রুতির আশ্চর্য নায়কে।

এখন তিনি বাংলাদেশের লোকস্মৃতি থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে আর মনে রাখতে পারছেন না। হয়তো এদেশের রাজনীতিতে তাঁর উত্তরসূরী নেই বলেই।

কেবল বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের স্মৃতিতে এখনো তিনি উজ্জ্বল এবং অম্লান। অক্সফোর্ডে তাঁর এককালের সহপাঠী—পরে চীন ও রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত কে পি এস মেনন বলেন: 'হি ওয়াজ টু মাচ অব অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল, টু মাচ অব এ পার্টিজান, টু মাচ অব অ্যান ইন্ডিয়ান।"

ফুটপ্রিন্টস অব লিবার্টি

সম্প্রতি তাঁর কয়েকটি নির্বাচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ভাষণের একটি সংকলন বেরিয়েছে 'ফুটপ্রিন্টস অব লিবার্টি' নামে।

ফুটপ্রিন্টস?

হ্যাঁ, এই নামই সার্থক। এই সংকলন তাঁর বিচিত্র জীবনের আংশিক পরিচয়কেই স্পষ্ট করেছে। বাকি অংশ এখনো রহস্যাবৃত।

তুলসী গোস্বামী এককালে ঘোষণা করেছিলেন: 'পলিটিকস ইজ লাইফ টু মি।... পলিটিকস ইজ হেল লাইক।'

ঠিক এমন একটি ঘোষণাই যেন তাঁর কাছে ছিল প্রত্যাশিত। ১৯২০ সালের ১০ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের সুদীর্ঘ ভাষণে ভারতীয় ছাত্র-সমাজের দায়িত্ববোধ ও সক্রিয় ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে দেশবন্ধুর কথাই স্মরণ করেছিলেন: 'ইট ইজ দি ইয়ং হু ফাইট দি ব্যাটল অব ফ্রিডম ইন এভরি এজ অ্যান্ড ইন এভরি ক্লাইম, অ্যান্ড ইট ইজ দি ইয়ং হু আর পিওর ইন স্পিরিট অ্যান্ড আর এভার রেডি ফর স্যাক্রিফাইস।'

এবং দেশবন্ধুর মতোই তিনি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করতেন, ছাত্ররাই জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং গৌরব। দুই আর দুইয়ে মিলে চার—একথা জানাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। যে-শিক্ষা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে শেখায় না—সে শিক্ষা ব্যর্থ। কেননা, 'দ্যাট এডুকেশন ইন দিস কান্ট্রি হ্যাজ মেইনলি টু অ্যাচিভ ইটস পারপাস।'

দেশী বিদেশী নজীর টেনে তিনি মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অর্থনিশ্চয়তা ও ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সেইকালে। তাঁর মতে, ছাত্ররাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার সৈনিক। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ছাত্ররা কি প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই সরকারী নীতি ও পদ্ধতির সমালোচনা করে না?

তাহলে ভারতীয় ছাত্ররাই বা কেন এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে?

'ফুটপ্রিন্টস অব লিবার্টি'র কয়েকটি ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর এই মনোভাবের প্রতিচ্ছবি। এবং বিভিন্ন লেখায় লক্ষ্য করা যায়, তুলসী গোস্বামীর আভিজাত্যের সঙ্গে পাণ্ডিত্য ও দেশাত্মবোধের মিশ্রণ—রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের যুগ্ম উপস্থিতি—পরিহাসপ্রবণতা ও সামাজিকতাবোধের দ্বৈত প্রতিফলন।

রচনাবৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে এই সংকলনের লেখাগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যথাক্রমে: (১) অ্যান আর্লি স্পীচ অ্যান্ড আর্টিকলস, (২) স্পীচেস ইন লেজিসলেচার্স, (৩) অন পাবলিক প্ল্যাটফর্ম, (৪) আর্টিকলস অ্যান্ড কমেন্টারিজ, এবং (৫) ট্রিবিউটস টু এমিনেন্ট পার্সনস।

তাছাড়া আরো কিছু লেখা ছাপা হয়েছে বইটির প্রথম এবং শেষদিকে।

প্রথমদিকে আছে সম্পাদকদের ভূমিকা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মুখবন্ধ, এবং [illegible] লেখা তুলসী গোস্বামীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী। শেষের দিকের কয়েকটি রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে, সমকালীন বিভিন্ন ব্যক্তির চোখে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি কিভাবে

বন্ধ পড়েছিল—তার পরিচয়। এই পর্যায়ে লিখেছেন কে পি এস মেনন, শশাঙ্কশেখর সান্যাল, এ এন ট্যাম্পি, নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, শচীন সেন, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন বক্সী, দিলীপকুমার রায়, নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, হিরণকুমার সান্যাল প্রমুখ কয়েকজন কয়েকটি স্মৃতিচারণমূলক লেখা।

অর্থাৎ এ বইয়ের পাঠক কেবল তাঁর রচনা এবং চিন্তাধারার সঙ্গেই পরিচিত হবেন না, তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও পরিচিত হবার দুর্লভ সুযোগ পাবেন। সম্পাদকদের উদ্দেশ্য যদি তাই হয়ে থাকে—তাহলে তা সফল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়ের পরিধি

এই সঙ্কলনের বিভিন্ন রচনায় তুলসী গোস্বামী নিজের আত্মপরিচয়কে উদ্ঘাটিত করেছেন প্রচ্ছন্নভাবে নয়, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং সংবদ্ধভাবে। তাঁর আলোচ্য বিষয়ের পরিধি ও ব্যাপকতার কথা ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। কত বিচিত্র বিষয়েই না ছিল তাঁর কৌতূহল, নানা ব্যাপারেই ছিল তাঁর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা।

'ফুটপ্রিন্টস অব লিবার্টি'র প্রথমাংশে মুদ্রিত কয়েকটি লেখা (যথাক্রমে 'মেসোপটেমিয়া', 'বিক্রুশান অন কৌটিল্যস অর্থশাস্ত্র' ও 'সেপার্টিসজম') তিনি লিখেছিলেন ছাত্রাবস্থায়—যখন অক্সফোর্ডে ছাত্র ছিলেন, তখনই।

এবং সেই প্রথম যৌবনেই তিনি শিখেছিলেন ফরাসীভাষা।

শোনা যায়, তৎকালীন ফরাসী রাষ্ট্রপতির সম্মানে আয়োজিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে তিনি সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন ফরাসী ভাষায় একসটেমপোর বক্তৃতা দিয়ে। এবং ছাত্রজীবনেই সারা ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করেছিলেন সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী, যুব ও ছাত্র আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ ও মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য।

পাঠ্যবিষয়ের গতানুগতিকতায় সন্তুষ্ট হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি পড়াশোনা করেছিলেন অর্থশাস্ত্র ও দর্শন, রাজনীতি ও ক্লাসিক লিটারেচার, ইতিহাস ও আধুনিক সাহিত্য।

হয়তো এই জ্ঞানস্পৃহাই তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল শেষ জীবনের অনিবার্য বিপর্যয়ের হাত থেকে, প্রাণিত করেছিল মহত্তর জীবন সাধনায়।

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর নির্জন, নিঃসঙ্গ জীবনের কথা স্মরণ করে বিষাদ বোধ করেন আজো। লেখেছেন, এককালের হৈ হৈ-করা তুলসী গোস্বামী কিভাবে নিজেকে আটকে রেখেছিলেন নিজস্ব লাইব্রেরীর চতুর্দেয়ালে। হয়তো রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করলে তিনি সাংস্কৃতিক জগতের এক বিরল ব্যক্তিত্বে পরিণত হতেন।

বইটি পড়তে পড়তে একটি কথাই বারবার মনে পড়ে।

তুলসী গোস্বামী তাঁর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন আভিজাত্যের মধ্যেও আধুনিকতার শিক্ষা, যার মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য ভিক্টোরিয়ান গ্রানজার। আর, দেশবন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন স্বাদেশিকতার আদর্শ ও দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের সাহস।

অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর সহজাত সৌজন্যবোধ ও মানবিক গুণাবলী। তীব্রতর আবেগের মুহূর্তেও তিনি কখনো যুক্তি বিসর্জন দেননি, চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তেও মাথা নত করেননি—বরং সঙ্কটের সময়েও দিয়েছেন সাহসের পরিচয়। দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে, সমকালীন প্রায় প্রতিটি ঘটনাকেই তিনি বিচার করতেন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। মনে করতেন, কোনো ঘটনাই আকস্মিক বা অতর্কিত নয়, সময়ের ধারাবাহিকতার অবিচ্ছেদ্য। অন্তত এই সঙ্কলনের অন্তর্গত প্রতিটি রচনাই তাঁর এই মানসিকতার ফসল।

উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যায়, ১৯২১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলির কথা। এই সঙ্কলনে যেগুলি সঙ্কলিত হয়েছে "স্পীচেস ইন লেজিসলেচার" শিরোনামে। তুলসী গোস্বামীর জীবন ও স্বরাজ্য পার্টির স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষেও এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলের নীতি ও কার্যসূচীকে তিনি আইনসভার ভাষণে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন প্রতিনিয়ত বিরোধিতা ও সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে।

১৯২৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী 'বেঙ্গল স্টেট প্রিজনার্স রেগুলেশান বিল'-এর ওপর বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন: 'আই অ্যাম প্রাউড অব বেঙ্গল রেভ্যুলিউশনারিজ।'

তিনি বলেন, আইনের কারচুপিতে আমাদের দেশের দেশপ্রেমিকেরা পর্যন্ত 'ক্রিমিনাল' হিসেবে গণ্য। ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও এরকম উদাহরণ বিস্তর। যীশুখৃষ্ট, সক্রেটিস, গ্যালিলিওর বিচার হয়েছিল এভাবেই। এবং ঐ যুক্তিতেই মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ক্রিমিনাল হিসেবে অভিযুক্ত।

ঠিক তার দু' দিন পরে, ২৫ ফেব্রুয়ারীতে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দেন তিনি মান্দালয় জেলে রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে।

দেশের প্রতিটি জ্বলন্ত সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে তাঁর এই সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়, আইনসভার বিতর্কে ও জনসভার ভাষণে। রামমোহন যেমন দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে কলম হাতে নিয়েছিলেন, তেমনি গোস্বামীও তাঁর আশ্চর্য পাণ্ডিত্যকে সীমাবদ্ধ করেছিলেন উক্তি-প্রত্যুক্তির খণ্ডনে কিংবা সমর্থনে। ফলে, তাঁর অধিকাংশ রচনাই যুক্তিতর্কের বেড়াজালে নিয়মশাসিত। মতিলাল নেহরুর চীফ হুইপ থাকার সময়ে তিনি অভিহিত হয়েছিলেন, 'টাইগার অব স্বরাজ্য পার্টি' নামে।

সমকালের চোখে

কে পি এস মেনন তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'ম্যানি ওয়ার্ল্ডস'-এর একটি অধ্যায়ে তুলসী গোস্বামীর ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করেছেন বিশেষভাবে। অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান মজলিসের তিনি ছিলেন সভাপতি, আর তুলসী গোস্বামী সম্পাদক। সিংহলের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েক ছিলেন উভয়েরই সহপাঠী।

মেননের মতে, কেউই তাঁর সঙ্গে কথায়-বার্তায়, আচার-আচরণে টেক্কা দিয়ে উঠতে পারতেন না। নিজের ধারণা এবং বিশ্বাসে অবিচল থেকে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে—উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত—ইনটেলেকচুয়াল ও আর্টিস্ট—সকলের সঙ্গে তুলসী গোস্বামী মিশতে পারতেন সহজভাবে। যখন অক্সফোর্ডের ভারতীয় ছাত্রো ইংরেজ সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়তেন, তখনও তিনি ছিলেন এইসব দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। লিনকন কলেজে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে যে তিনজনকে 'ট্রিনিটি' বলা হতো, তাঁদের মধ্যে তুলসী গোস্বামী ছিলেন অন্যতম। অন্য দুজন হলেন এম সি চাগলা ও পি এন সপ্রু।

দেশে ফিরে এসে তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন। তখন তিনি পিতার মৃত্যুতে প্রচুর বিত্তসম্পত্তির মালিক। পার্লামেন্টে তিনি অভিহিত হলেন 'আর্ফা টেরিবল' হিসেবে, আর দেশবাসীর কাছে—'প্রিন্স প্যাট্রিয়ট'।

ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশ-প্রস্থানের বিবরণটি এখন কিছুটা নাটকীয় এবং রোমান্টিক মনে হয়। জাতীয় জীবনের সঙ্কটের মুহূর্তে, যখন প্রতিটি মানুষ তাঁকে আশা করতো সকলের মাঝখানে, তখন তিনি স্বভাবসুলভ নম্রতা, সৌজন্যবোধ ও লাজুকতা নিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে শুনতেন সকলের মতামত। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁর উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। বিরোধীপক্ষ নাস্তানাবুদ হতেন তাঁর কাছে।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় তখন অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

CENTRAL LIBRARY

পান, মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, প্যাটেল, মতিলাল নেহরু, ভুলাভাই দেশাইয়ের মতো প্রখ্যাত রাজনীতিকেরা। তুলসী গোস্বামী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

প্রমথ চৌধুরী একবার দিল্লী থেকে ঘুরে এসে স্বীকার করেছিলেন, এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তুলসীবাবু যেতেন না এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর ভাষণ ছিল একটি বিস্ময়কর আকর্ষণ। স্কটিশ-চার্চ কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক বি সি রায় মন্তব্য করেছিলেন : 'সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যে মাত্র তিনজনই বক্তা আছেন,... তাঁরা হলেন লয়েড জর্জ, উইনস্টন চার্চিল এবং তুলসী গোস্বামী।'

বাংলাদেশের 'বিগ ফাইভ'-দের অন্যতম ছিলেন তিনি। বাকি চারজন ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, শরৎচন্দ্র বসু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। তবু প্রকৃতিগত উদাসীনতা, ক্লান্তি ও পারিবারিক চাপে শেষপর্যন্ত রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থেকে তিনি সরে আসেন। তখন হয়তো সম্বল ছিল শুধুই স্মৃতি, আর পারিবারিক লাইব্রেরীর আশ্রয়।

মাঝে মাঝে তিনি 'পরিচয়'-এর আড্ডায় যেতেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বোধহয় তখন সম্পাদক।

হিরণকুমার সান্যাল সেদিনের স্মৃতি-চারণা প্রসঙ্গে বলেন : 'পরিচয়-এর আড্ডায় যখন কোনো বিতর্ক চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, তখন অনেক সময়ে দেখেছি তুলসীবাবুর ব্যর্থ চেষ্টা শান্তভাবে নিজের বক্তব্য শোনানো। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে চান, দু'-চারজন ছাড়া, যেমন আবু সৈয়দ আইয়ুব, হুমায়ুন কবির, ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি তুলসীবাবুরই মতো গরম পলিটিক্যাল বক্তৃতার পসারী।'

একবার এক প্রবীণ ভদ্রলোক কথা-প্রসঙ্গে বলেন, তুলসীবাবু যদি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হবার জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হন, তাহলে বাংলাদেশের সমস্ত বড় জমিদারই তাঁকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে হিরণবাবু লিখেছেন : 'অত্যন্ত নম্র-ভাবে তুলসীবাবু উত্তর দিলেন যে, কোনো সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ আসনের বিধান গণতন্ত্রবিরোধী, সুতরাং জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নির্বাচন-প্রার্থী হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।'

রাজনৈতিক জীবনে তিনি বাম-ঘেঁষা হলেও, প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ট্রটস্কিপন্থী। স্বভাবতই পরবর্তীকালের ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা হয়ে পড়ে গৌণ। এবং তিনি বর্জিত হয়েছেন সব মহলেই। তবু, তখনকার দিনের পক্ষে তুলসী গোস্বামী ছিলেন তাঁর কালের চেয়েও অনেক অগ্রগামী—একেবারে খাঁটি লিবারেল।

এই সঙ্কলন প্রকাশের সার্থকতা ও তাৎপর্য বিগত দিনের সমকালীনতাকে উপলব্ধির জন্যেই নয়, বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে পুনর্বিচারের জন্যও প্রয়োজনীয়। তদানীন্তন বাংলার প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীও ছিলেন তাঁর অন্যতম বন্ধু।

১৯৩৮ সালের কথা। একদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্র নরেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন তুলসীবাবুর রেনি পার্কের বাড়ীতে। তখন প্রায় বেলা দুপুর। তুলসীবাবু ছিলেন স্নানের ঘরে।

সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নরেন্দ্রবাবু লিখেছেন : 'মিনিট-পনের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। হাসতে হাসতে হাত জোড় করে সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন তুলসীবাবু। বাড়তি চেয়ার ধারে কাছে ছিল না। আমাদের সামনে হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে পড়লেন। একটা বিবৃতিতে সই দেবার কাজ ছিল। কাগজখানা নেতার হাত থেকে টেনে নিয়ে সই করে উঠে দাঁড়ালেন। অনির্বাণ সেই মুখের হাসি আজও ভুলিনি। ফিরতি পথে সুভাষ বলেছিলেন : বাংলার ধ্বংসোন্মুখ আভিজাত্যের শেষ চিহ্ন সম্ভবত তুলসীবাবু।'

তাঁর স্মৃতি এখন ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। এখন কে বলবে, এককালে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন অবহেলায়। তিনিই স্বরাজ্য পার্টির মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' ছাপার জন্য বেশ মোটা অঙ্ক দিয়ে কিনে দিয়েছিলেন 'ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ'-এর ছাপাখানা। এমনকি 'ফরওয়ার্ড' নিষিদ্ধ হলে বের করেন আরেকটি নতুন কাগজ—'লিবার্টি'।

শোনা যায়, দুর্ধর্ষ রাজনীতি করার দিনগুলিতেও তুলসীবাবু যখনই একা হতেন, কিংবা সুযোগ পেতেন রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনো আলোচনা করার, তখনই তিনি সকলকে চমকে দিতেন অনর্গল ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করে, কিংবা বলে যেতেন কাদম্বরী ও কুমারসম্ভবের শ্লোক।

হয়তো জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি নিজেকে ওভাবেই সংযত রাখতেন। নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর ভাষায় : 'তুলসী গোস্বামী শেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন আজাদ হিন্দ সৈনিকদের অভ্যর্থনা সভায়।... বেদনা, হতাশা আর ভবিষ্যতের প্রতি বিপুল ও সবল একটি ইঙ্গিত করে পড়েছিল তাঁর কথায়। প্রকাশ্য জনসভায় বাগ্মী তুলসী গোস্বামীর শেষ ভাষণ। আর, হয়তো তাঁর ফুটতে-চেয়েও-ফুটতে-না-পারা জীবনেরও এই শেষ পরিচয়।'

—গ্রন্থদর্শী

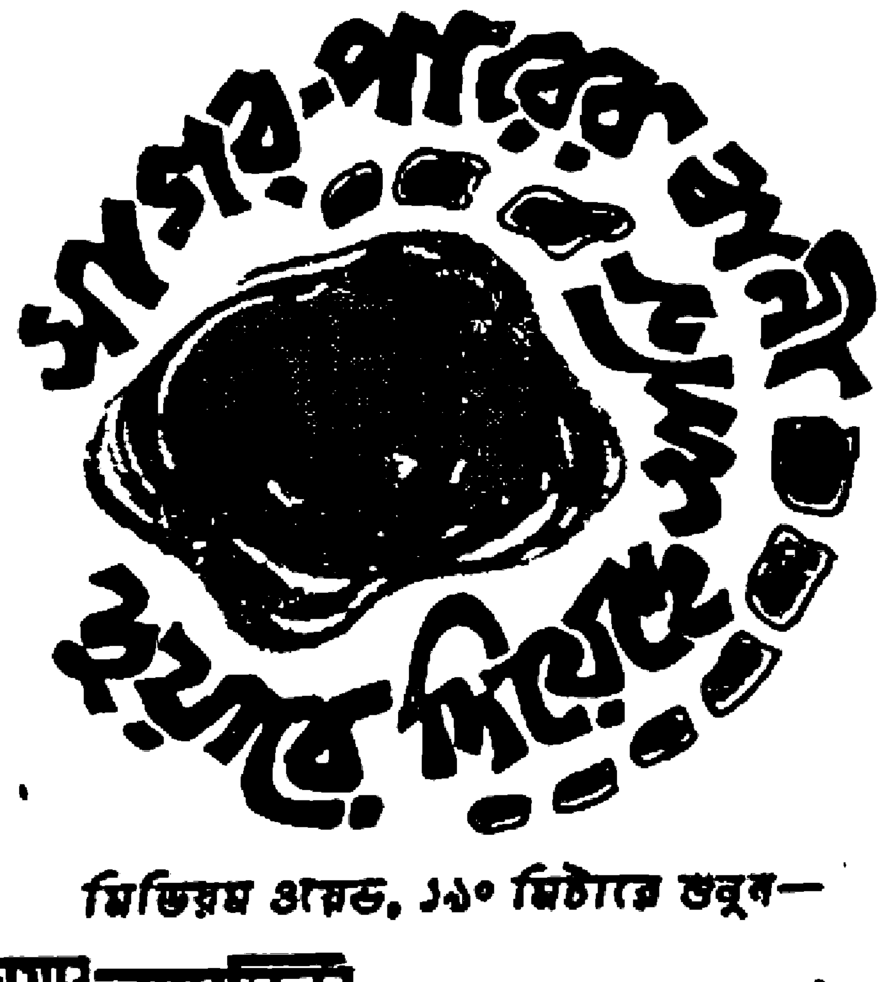

মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা   বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যাণ্ড	কিলোসাইকল্‌স্‌
১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১	২১৪৬৫, ১৫০৯৫ ১১৭০০ ও ৯৬৪০
মিডিয়ম-ওয়েভ ১৯০ মীটার	১৫৮০

বিরহোড় উপজাতি

কল্যাণী ঘোষাল

বিরহোড় এক যাযাবর উপজাতি। এরা ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হয়ে বিহারের হাজারিবাগ জেলার জঙ্গলে এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। এদের গায়ের রং কালো। চেহারা খর্বাকৃতি, লম্বা মাথা, ঢেউ খেলানো চুল আর লম্বা নাক। প্রোটো-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ এবং হো উপজাতিদের চেহারার সঙ্গে এদের চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বিরহোড় উপজাতি দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—জাঘি ও উথলু। এরা সকলে কিন্তু যাযাবর নয়। জাঘিরা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে কোনো খোলা জায়গায়, জঙ্গলা-কীর্ণ পাহাড়ের মাথায় অথবা জঙ্গলের প্রান্তে কয়েক বছরের জন্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। উথলুরাই প্রকৃত যাযাবর। এরা তিন থেকে দশটি পরিবারে বিভক্ত হয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এরা কোনো একটা জায়গায় একমাসের বেশী থাকে না। খাদ্য ফুরিয়ে গেলেই উথলুরা অন্য জায়গায় গিয়ে ডেরা বাঁধে। সে ডেরাও অস্থায়ী।

বিরহোড়দের বসতির নাম টান্ডা। এ আর কিছুই নয়, কতকগুলি কুটিরের সমষ্টিমাত্র। কুটিরগুলি পাতা দিয়ে তৈরী। বৃষ্টির জল ও বাতাস যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য কুটিরগুলিতে কখনও কখনও ছাউনিও দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর কুটিরের নাম কুম্ভাস। সাধারণত একটা কুটিরে একটি পরিবারেরই স্থান সঙ্কুলান হয়।

বিরহোড় উপজাতিরা সর্বভুক। ক্ষেতের ফসল যেমন এদের খাদ্য, তেমনি জীবজন্তুর মাংসও এদের বেশ প্রিয়। এরা ধান, ভুট্টা ও শাকসব্জি চাষ করে। বন থেকে সংগ্রহ করে ফল। পশু মাংসের মধ্যে গরু, মোষ, ছাগল, মুরগী এবং শুকরই প্রধান। এই সব জীবজন্তু সংগ্রহ বা শিকার করে এদের মাংস এরা পরম তৃপ্তি করে খায়।

এদের পুরুষেরা সাধারণত কৌপীন পরে থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরুষেরা ধুতি ও জামা পরে। মেয়েরা পরে শাড়ী ও পাড়-দেওয়া ব্লাউজ। রুপো ও অন্যান্য ধাতব অলঙ্কার এরা খুব পছন্দ করে। বিরহোড় উপজাতির মেয়েরা সাজতে বেশ ভালবাসে। উল্কি দিয়ে হাত ও পায়ে নানারকম চিত্রিত করা এদের একটা শিল্প। প্রসাধন সমাপন করে এরা পরস্পর হেসে লুটিয়ে পড়ে।

এরা জমিতে লাঙল দিতে জানে না। কিন্তু কিছু জাঘি পরিবার গাছপালা পুড়িয়ে এক টুকরো জমি তৈরী করে নেয়। তারপর সেই ছাইভর্তি জমিতে বীজ ছড়িয়ে ধান ভুট্টা ইত্যাদি চাষ করে। চাষবাস করলেও শিকার ও ফল সংগ্রহ করাই বিরহোড় উপজাতিদের প্রধান উপজীবিকা। এরা বন থেকে সংগ্রহ করে মূল, কন্দ, ফল, মোম ও মধু। যে সব জন্তুজানোয়ার এরা শিকার করে—তাদের মধ্যে প্রধান হল খরগোস, বানর, সজারু প্রভৃতি। এদের সমাজে বিক্রী ও বিনিময় উভয় প্রথাই প্রচলিত আছে। দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন যেমন চাল, নুন, কাপড় প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য এরা শিকার করা জন্তু-জানোয়ারগুলি হয় বিক্রী করে নতুবা বিনিময় করে। এদের কিছু কিছু হাতের কাজও আছে। মহুলান লতার ছাল থেকে পাওয়া আঁশ দিয়ে এরা দড়ি তৈরী করে। এটাই এদের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। নিজেদের প্রয়োজনে এই দড়ি দিয়ে এরা জাল বোনে। দরকার হলে এই জাল এরা বিক্রী বা বিনিময়ও করে। জাল বোনা ছাড়াও এরা মাদুর বোনে। এ নেহাৎ নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে। কাঠের উদুখলে এরা ধান মাড়াই করে।

এদের ভাষা বিহারের অন্যান্য উপজাতিদের মতই। এই ভাষা অস্ট্রো-এশিয় উপশ্রেণীর অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। মুণ্ডা বা সাঁওতালদের ভাষার সঙ্গে এদের ভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

এই উপজাতি সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। মা-বাবাই দেখাশোনা করে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয়। বিবাহ বিচ্ছেদ এদের সমাজে একটা সাধারণ ব্যাপার। পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারাই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। বিধবারা আবার বিয়ে করে সংসার করতে পারে। এরা পিতৃতান্ত্রিক উপজাতি এবং কয়েকটি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। স্বগোষ্ঠীতে বিবাহ নিষিদ্ধ।

হিন্দু ও সর্বপ্রাণবাদ ধর্মের মিলনই হল এদের ধর্ম। হিন্দু দেব-দেবীরাই এদের সমাজে পূজা পেয়ে থাকেন। তাঁরাই এদের ধর্মজীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছেন।

সব রকম অসুখ-বিসুখে ওঝাকে ডাকা হয়। ওঝা একটা মুরগী বলি দিতে নির্দেশ দেয়, মুরগীর আকার কি রকম হবে, তা নির্ভর করে রোগীর আর্থিক সম্পত্তির উপর আর মুরগীর রং নির্ভর করবে কি রকম অসুখ হয়েছে তার উপর।

এরা উৎসবপ্রিয় উপজাতি। প্রায় সারা বছরই এরা উৎসবে মেতে থাকে। জানুয়ারী মাসে মাঘ পরব অনুষ্ঠিত হয়। ফাগুন পরব যার প্রধান অঙ্গ পশু শিকার তা অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারী মাসে। মার্চ মাসে এরা পালন করে সরহুল উৎসব। করম ও জিতিয়া সেপ্টেম্বরে আর দশাই ও সোহরাই উৎসবের ধুম পড়ে যায় অকটোবর মাসে। প্রতিটি উৎসবের গতি-প্রকৃতি পৃথক ও স্বতন্ত্র। এই উৎসবগুলি এদের জাতীয় জীবনে সংহতি এনে দেয়। উৎসবে এরা নৃত্যগীত করে ঢাক ও বাঁশী বাজিয়ে। উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়াও কখনও কখনও সন্ধ্যাবেলায় ঢাক ও বাঁশী বাজিয়ে এদের নাচ-গান চলে।

মুরগী ও অন্যান্য পাখি ধরার রীতিটি কিন্তু ভারী অদ্ভুত। মুরগী শিকার এদের একটা বিলাস বলা যায়। শিকারের সময় এরা প্রধানত তীর-ধনুক ব্যবহার করে, তবে মুরগী ধরে ফাঁদ পেতে। অবশ্য অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে এই ধরনের শিকারের বিলাস যে একেবারে দুর্লভ, তা নয়।

বিরহোড় সমাজে মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এটাই সকলে পছন্দ করে। তবে কবর দেবার রীতিও যে প্রচলিত নেই তা নয়। ইচ্ছে করলে এরা মৃতদেহ কবরেও শোয়াতে পারে। শিশুদের মৃতদেহ কিম্বা সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে যে সব স্ত্রীলোক মারা যায়, তাদের মৃতদেহ সাধারণত কবর দেওয়া হয়।

হাসিখুশী-ভরা উজ্জ্বল প্রাণের আবেগ নিয়ে এরা বেঁচে আছে। সমস্যা যে এদের জীবনে নেই তা বলা যায় না, তবে এরা সমস্যাপীড়িত নয়। জঙ্গল প্রকৃতির মতই এরা সরল ও স্বচ্ছন্দ। উদ্দাম জীবনের স্ফুরণে এরা চির সবুজ না হয় কিসে। এও প্রকৃতিরই অবদান।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭০)

সোনা যখন মাস্তুলের নিচে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, যখন বাংলাদেশের আকাশ নীল, মানুষেরা শীতের রোদে উত্তাপ নিচ্ছে তখন সামসুদ্দিন দেখল ডায়াসে বিশ্ব-বিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন উঠে দাঁড়িয়েছেন। সামসুদ্দিন দেখছে সকাল থেকে অগণিত ছাত্র সমুদ্রের তরঙ্গের মতো ছুটে আসছে। ওরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকে যাচ্ছে। পুলিশের ব্যারিকেড তুচ্ছ করে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভিতরে। সে দেখছিল। ওর গর্বের অন্ত ছিল না। অজস্র পলাশ গাছ যদি কোথাও থাকে তার লাল পাপড়ি, ওর মনে হল ওরা পলাশের পাপড়িই হবে—নতুবা আকাশ এমন রাঙা হত না, যেন লক্ষ লক্ষ পলাশের পাপড়ি বাংলাদেশের আকাশ নিমেষে ঢেকে দিচ্ছে—আকাশটা রাঙা হয়ে গেলে, মতিনসাহেব বলে উঠলেন, ভাইসাব ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আমাদের দাবী বানচাল করে দেবার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

সামসুদ্দিনের সাদা রঙের শালের উপর নানারকম প্রজাপতি আঁকা। সে শালটা দিয়ে মুখ মুছল। এই শীতের দুপুরে সে ঘেমে যাচ্ছে। সে শালটা ঝেড়ে কাঁধে ফেলে রাখলে মনে হল প্রজাপতিগুলো উড়ে গেছে। প্রজাপতি উড়ে গেলে আর কিছু থাকে না। আজ এই দিনে মাঠে মাঠে যত ফুল আছে, সব ফুল থেকে প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে। এমন কি জালালির কবরে সে যে প্রজাপতি উড়িয়ে দেবে বলেছিল, পুলিশের অত্যাচার দেখে মনে হচ্ছে তাও সে আর বুঝি পারবে না। ফলে কবর থেকে জালালির মুখ ভেসে ভেসে চলে আসছে। জালালি যেন তাকিয়ে আছে অথবা সেই মহারাত্রির ঘটনা এই প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে হুবহু মনে পড়ে গেল। জালালি খুধায় হাঁসটার মাংস চিবুচ্ছে। কড়মড় করে হাঁসের হাড় গিলে ফেলছে। কি নিষ্ঠুর ছিল সেই ক্ষুধার্ত মুখের ছবি। এবং পেট ভরে গেলে জালালির মনোরম মুখ—সে এই বাংলা-দেশে এমন সুন্দর মনোরম মুখের ছবি আঁকতে চেয়েছে। পেট ভরে গেলেই মানুষের আর দুঃখ থাকে না। ঈশ্বরের পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ভাল লাগে। সে যে একটা শপথপত্র রেখে দিয়েছিল জালালির কবরে, সেই শপথপত্রটাও যেন কবরের নিচ থেকে উঠে এসে একটা ফেস্টুন হয়ে গেছে। বাতাসে পতপত করে উড়ছে। সে যা চেয়েছিল তা করতে পারে নি। কারা এসে সব উল্টেপাল্টে দিল। সে আর মুস্লিম লীগ জিন্দাবাদ, এমন বলতে সাহস পায় না। কত সব নীচ হীন স্বার্থপর মানুষ এসে ওর যে শপথপত্র ছিল জালালির কবরে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। সেও মতিনসাহেবের গলার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বলে উঠল, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আমার আপনার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।

সামসুদ্দিন এই বলে আরম্ভ করল। হাজার হাজার তরুণ, যুবা উন্মুখ হয়ে শুনছে। মহারণে যাবার আগে এক কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা ওরা শুনে যাচ্ছে। ওরা তাই কেউ কোন কথা বলছে না। বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা আমাদেরই বাংলা ভাষা, বাংলার জল, বাংলার মাটি আমাদেরই নিকনো ঘরের ছবি, তাকে ফেলে যাব কোথা! তারে ছাইড়া দিলে থাকেডা কি।

বুঝি ঈশমের হাতে সে এক মুসাফি-খানার লম্ফ দেখতে পেল। কেন যে এতদিন পর ঈশমচাচার কথা ওর মনে এল সে জানে না। যেন সেই ফকিরসাব, হাতে মুসাফিখানার লম্ফ—হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর পিছনে কে যেন বারবার তাকে অনুসরণ করতে বলছে। ঈশমচাচার সে এতদিন কোন খোঁজই রাখেনি। ঠাকুরবাড়ির সবাই চলে গেছে—তারপর চাচার কি হল, সে কোথায়, সে জানে না। সে জানে না ঈশম, অন্নহীন ভূমিহীন। ঈশম হয়ত গভীর রাতে তরমুজের জমিতে ফিরে আসতে চায়। ঈশম দেখতে পায় তখন তার নীলকণ্ঠ পাখিরা সব উড়ে গেছে কোথাও। হাতের তালিতে আর ওরা ফিরে আসছে না। ঠাকুরবাড়ির মানুষদের ও-পারে বুঝি এতদিনে সেই পাখিটার খোঁজ মিলে গেছে। না মিলে গেলে ওরা আবার নদী বন মাঠ পার হয়ে ছুটবে। সামসুদ্দিনের মনে হয়েছিল, তার পাখি আকাশে ওড়ে না, নদীর পাড়ে বসে থাকে। দেশভাগের পর পরই সে ভেবেছিল, তবে বুঝি এবারে সব মিলে গেল—কিন্তু হায় যত দিন যায়—সে দেখতে পায় সংসারে সবাই পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে—আবার খোঁজে বেড়ায়। পেলে মনে হয় পাখি মিলে গেছে, দুদিন যেতে না যেতেই মনে হয় পাখিটা আর নীলরঙের নয়, কেমন লাল রঙ হয়ে গেছে। সেই যে জনো মানুষ জীবন থেকে সোনার হরিণ ছাড়িয়ে দেয়, আজীবন তার খোঁজে থাকে—অথচ পায় না, পায় না বলেই সে থেমে থাকে না, সামসুদ্দিনও থেমে থাকেনি, সে আবার নতুন ভাবে পাখির খোঁজে রয়েছে। সে বলল, এটা আমাদের জীবন-মরণের সামিল। থামলে চলব না। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে।

সামসুদ্দিন একটু দম নিল।

বড় রাস্তায় সব পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে। দোকানপাট বন্ধ। সারা শহর থমথম করছে। পুলিশেরা মাঝে মাঝে কোথাও টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটাচ্ছে। অথচ বারবার কেন যে একজন মানুষ, আজ সবচেয়ে বেশি তাকে ইশারায় ডাকছে বুঝতে পারছে না। সে এবার বলতে চাইল, আমি আবার যাব আপনার কাছে। তার আজ সবার কথা মনে হচ্ছে। সেই ছোট্ট ছেলে সোনার কথা মনে হচ্ছে। সে যখন সোনার মতো ছিল তখন ঈশমচাচা গভীর রাতে এসে ডাকতেন, সামু ঘুমাইলি?

—না ঘুমাই নাই।

—উঠ লাইগা আনছি।

সামু ঝকঝকে তলোয়ার দেখে চাচাকে জড়িয়ে ধরত। সে মুগাঠাকুরের তলোয়ারটা বালিশের নিচে রেখে দিত। সকাল হলে সে রাজা সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আসত। মাথায় তার আমপাতার মুকুট।

সামুর মনে হল ওর সেই আম-জাম-পাতার মুকুট এখনও কে যেন মাথায় তার পরিয়ে রেখেছে। সে যতই হিন্দুবিদ্বেষের

কথা বলে থাকুক মাথায় আম-জামপাতার মুকুট ফেলে দিতে পারেনি। ফেলে দিতে গেলেই দেখেছে ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠেছে। মালতীর কথা মনে আসতেই আবেগে সে বলে উঠল, আজ আমাদের আন্দোলনের দিন, মায়ের ঋণ শোধ করার দিন। আমাদের মা, বাংলা মার চেয়ে বড় কিছু নেই। যতদিন ঋণ শোধ না হবে ততদিন আমাদের রেহাই নেই।

ধীরে ধীরে ছাত্ররা এবার বের হয়ে গেল। ওরা বন্দুকের নলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। আমাদের মা, বাংলা মার চেয়ে বড় কিছু নেই। দশজন করে এক একটা দল এগিয়ে যাচ্ছে। কি শান্ত নীল আকাশ। মাথায় সবার আম-জামপাতার মুকুট, রাজার মুকুট। মা তাদের যেন পরিয়ে দিয়েছেন। তারা যেতে যেতে গান গাইছে, ওগো মা-জননী, আমাগো মুখের ভাষা কাইড়্যা নিতে চায়, আমরা কি করি!

সফিকুর দশজনের একটা দল নিয়ে হাঁটছে। হাতে পোস্টার। তাতে লেখা—চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই—চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে, চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে। কারো পোস্টারে অথবা বুকে লেখা—ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে, ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে, ওরা এদেশের নয়, দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়, ওরা মানুষের অন্ন বস্ত্র শান্তি নিয়েছে কাড়ি, একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি। দল বেঁধে সেপাইদের মতো সফিকুর সবার সঙ্গে গায়, আমরা কি যে করি।

ফাতিমা যাচ্ছে দশজনের একটা দল নিয়ে। ওদের শাড়িতে জমিনের রঙ সাদা, পাড়ের রঙ নীল। ওরা বুকে ব্যাজ এঁটে নিয়েছে—একুশে ফেব্রুয়ারি। দৃপ্ত পায়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। তারাও গাইছে সমস্বরে—আমরা কি যে করি!

এ-ভাবে যাচ্ছে। একের পর এক দশ-জনের একটা দল বের হয়ে যাচ্ছে। হাতে নানা রঙের ফেস্টুন। মুখে গরিমা! তারা বন্দুকের নলের সামনে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা বাংলার জল, বাংলার বায়ু বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। শহরবাসিরা জানালা দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছে। তবু, কখন মাস্তানদের মতো বিদ্রোহী ছাত্ররা আগুন জ্বালিয়ে দেবে যাকে তাকে। শার্শির ফাঁকে দেখল, তবু কি নির্ভীক ওরা! ওরা এসে পুলিশ কর্ডনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সমস্বরে গাইছে, আমরা কি যে করি!

আর এই কি করি, কি করি করতেই রাইফেল গর্জে উঠল। মেডিকেল কলেজের গেটের নিচে ছাত্ররা এসে জমায়েত হচ্ছিল—তখন এমন এক কাণ্ড। কাণ্ড আর কাকে বলে। মানুষেরা চোখ মেলে দৃশ্যটা দেখতে পর্যন্ত পারছে না। দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। শার্শির ফাঁকটুকু পর্যন্ত রাখেনি। কি জানি ফাঁকে-ফোকরে যদি গুলি ঢুকে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে কে তখন বলে উঠল, বেইমান! এমন ছিটে গুলির ভিতরও ওরা এগিয়ে যাচ্ছে, ওরা ওদের মুখের গান থামাচ্ছে না, ওরা গাইছে, আমরা কি যে করি। ওরা হাত তুলে যেন পারলে আকাশ থেকে সূর্য ওপড়ে আনে—ওরা সমস্বরে বলছিল—আমাদের ভাষা, বাংলা ভাষা। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

তাজা রক্তে তখন বাংলার ঘাস মাটি ফুল ভেসে যাচ্ছে। যা কিছু রঙ নীল অথবা সবুজ সবই কেমন লালে লাল হয়ে গেল। মনে হচ্ছে সারা আকাশটাই একটা শিমুলের গাছ, ডালে ডালে অজস্র লাল ফুল, ফুলের পাপড়ি এবার এই রাজপথে, মিনারে, গম্বুজে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রামে মাঠে, শহরে গঞ্জে বাংলার মানুষ আকাশে এতসব শিমুল ফুলের পাপড়ি উড়তে দেখে যেন হা-হুতোশ করছে—এ-ঋণ শোধিবে কে! এই যে হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো—এ-ঋণ শোধিবে কে! কে মানুষ এমন আছে বলতে পারে, মায়ু মায়ু করে মায়ু, তাজা রক্ত ঢাইলা দিমু। আর কি দিমু তোমারে, দিমু আমার জান প্রাণ। সফিকুর হাই-কোর্টের সামনে তার জান প্রাণ দিয়ে মায়ের সম্মান রক্ষা করছে। ওর দুহাতে শক্ত করে ধরা পোস্টার। সে পড়ে গেলে পোস্টারটা ওর নিচে না পড়ে যায়, মায়ের জন্য তার মাথার কাছে পাতা আছে আসন, সে মাথার কাছে বিছিয়ে রেখেছে পোস্টার—আমার মুখের ভাষা ওরা কাইড়া নিতে চায়। সফিকুরের রক্তে পোস্টার ডুবে আছে। পোস্টারের নীল অথবা সবুজ রঙ আর চেনা যায় না। রক্তের এক রঙ। লাল রঙ। নীল রঙের পোস্টারে অজস্র নক্ষত্রের মতো গুলিবিদ্ধ, তোলে এই মহাকাশকে বাঙ্ময় করছে। সফিকুরের চোখ খোলা, যেন সে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে। শিশুর মতো মুখখানি তার সাদা নীল আকাশের দিকে, কোঠায় একটা মাছি উড়ে উড়ে বসছে।

ফাতিমা পাশে দাঁড়িয়ে। সবাই মুহূর্তের জন্য কেমন ঠান্ডা মেরে গেছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সফিকুরের মুখ দেখছিল। মাছিটা কি নির্ভয়ে ওর চোখের উপর বসে রয়েছে। সে পাশে বসল। চোখ থেকে মাছিটাকে তাড়াল। তারপর কপালে হাত দিয়ে দেখছে—সেই আম-জামপাতার মুকুট ওর মাথায় আছে কিনা। হাত দিতেই সে অনুভব করল, বড় সুন্দর সেই মুকুট, শিশুকালের সেই পাতার মুকুট। সবাই পরে যেন রাজা রাণী খেলতে যাচ্ছে। সেও সফিকুরের সঙ্গে নদীর চরে কোন শৈশবে যেতে রাজা রাণী খেলতে নেমে যাচ্ছে। সে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকল। কিনার দিয়ে যে রক্তটা উপচে এসে মুখের চারপাশে পড়েছে—আঁচল দিয়ে সেটা বড় ভালবাসায় মুছিয়ে দিল। বলতে ইচ্ছা হল, তুমি খেলবে না, আমাদের রাজা রাণীর খেলা। সফিকুর বুঝি হাসছে। কেন, আমাকে রাজার মতো লাগছে না? তুমি মাথায় হাত দিলে টের পাবে আমি পাতার মুকুট পরে আছি।

এবার সে সফিকুরের বুকে হাত রাখল। সামনে ভীরু, কাপুরুষের মতো পুলিশের দলটাকে আজ ভীষণভাবে উপেক্ষা করতে ভাল লাগছে। বুকে উত্তাপ আছে এখনও। ভালবাসার উত্তাপ। সে জানে বেশি সময় বসে থাকতে পারবে না। ওরা ছুটে এসে এক্ষুনি সফিকুরকে ঘিরে ফেলবে। তাড়াতাড়ি সে লাল রঙের পোস্টার মাথার উপর তুলে নিল। ওদের আসবার আগেই এই পোস্টার নিয়ে কোথাও পৌঁছে যেতে হবে। সে সফিকুরকে পিছনে ফেলে এবার হেঁটে যাচ্ছে। ভয় লাগলে সাহস ফিরে পাবার জন্য সে কবিতা বলছে মহাকবির—কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড় কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিকের প্রাণ জানি নাকো;—তবু যেন মরি আমি এই মাঠ ঘাটের ভিতর......।

এই মাঠ ঘাটের ভিতর তখন আর একজন মানুষ হাঁটছিল। সে ফিরে যাবে তার শৈশবের জমিতে। সে কতদিন যেন হারিয়ে গেছে দেশ থেকে। তার যেন সহসা মনে পড়েছে, সে এই দেশ ছেড়ে খেয়ে না খেয়ে না দেয়ে কেমন এক অবসাদে মানুষের মতো গাছের নিচে বসে থাকবে, কেউ ডেকে খেতে দিলে খাবে, নয়ত খাবে না, কেউ বসে না দিলে সে হাঁটবে না—তাকে শৈশবের জমিতে ফিরে যেতে হবে। সে খুঁজে বুঝতে পারছে তার এবার মাটির নীচে সামান্য আশ্রয় চাই। সারা দেশ চষে চষে নিজের জন্য সে একখণ্ড জমি পছন্দ করতে পারল না। নদীর চর, শৈশবের খেত মনে হলেই সে বুঝতে পারে ভিতরে তার একটা ভীষণ কষ্ট। অভিমান করে যে সে দেশ ছেড়ে যেন চলেছিল, এ-পোড়া দেশে আর সে থাকবে না ভেবে সময় মনে হয়েছে সে পৃথিবীর কোথাও শিকড় মেলে বাঁচতে পারবে না। সুতরাং আশ্রয়হীন ভূমিহীন ঈশম যেন সে

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতাঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখাঃ ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোনঃ ৬৭-২০৫৯।

আবার তার তরমুজের জমিতে গিয়ে বসবে বলে হাঁটছে।

তারপর একদিন সে তরমুজের জমিটার পাশে যখন দাঁড়াল—সে বলবে তখন এই সেই ইলম। ছেঁড়া তহবন। গায়ে জামা নেই। নাকে সর্দি। চোখে পিঁচুটি। শীর্ণকায়। ক্ষুধায় থরথর করে কাঁপছে। সে দাঁড়াতে পারছে না। কুকুরটা ওর পায়ে পায়ে ঘুরছে। জমির পাশে এসেই মনে হল, এ-জমি তার নয়। জমিটা যে হাজিসাহেবের বেটাদের দিয়ে গেছেন কোটঠাকুর। এতদিন পর কথাটা ফের মনে হতেই ওর ভারি হাসি পেল। ওর মাথার কি কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে। কি করে যে ভুলে গেল, জমিটা তার নয়, অন্যের। অথচ সে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে জমিটা নিজের ভেবে। রাতের আঁধারে ফিরে এসেছে বলে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে সবাই কি হাসাহাসি করত! আরে মিঞা তুমি! কৈ আছিলা এদ্দিন। শরীরের দশা এমন ক্যান। বান কেউ নাই তোমার। রাইত নিশাতে একা ঘুরলে তোমারে কেউ মনুষ্য কইব না। ঝোপে জঙ্গলে পালাইয়া থাক। কে কখন কামড়াইব টের পাইবা না।

কি এক ভালবাসা এই জমির জন্য তার, সে নিজেও জানে না, বোঝে না কেন এই ভালবাসা। সে কেন যে আবার তার জমিতে ফিরে এল। সে ক্ষুধায় কাতর। অন্ধকার বলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। না কি সে বছরের পর বছর ঠিকমতো আহার না পেয়ে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওর বড় ইচ্ছা দেখার এই জমিতে হাজি সাহেবের বেটারা কত বড় তরমুজ ফলিয়েছে। এই জমির নীচে শুয়ে থাকার ইচ্ছা। সে ভাবল এখানেই আজ রাত কাটিয়ে দেবে। ওর এই মাটি, কত যত্ন করে সে এই মাটিতে চাষা-বাদ করত, কত কষ্ট করে অনাবাদী জমি সে আবাদী করে তুলেছিল। আর সেই দিনের কথা মনে হলে ওর এখনও চোখে জল আসে। সবার কি ঠাট্টা-তামাসা, ঠাকুরের বড় ছেলের মত ঈশমটাও পাগল। উরাট জমিতে চাষ। কিছু ফলে না জমিতে, কেবল বেনা ঘাস আর বালি। ঈশম বড় যত্নে এবং ভালবাসায় আবাদ করে কি যে সে করেছিল জমির জন্য মনে করতে পারে না, কেবল মনে হয় সে আগে দাঁড়িয়ে সব ফকাড' মানুষের তরমুজ কেটে খাইয়েছিল। সে আবার ফিরে এসেছে। তরমুজের পাতার নিচে সে শুয়ে থাকবে। শুয়ে থাকলেই শান্তি। সে শান্তির জন্য পাতা ফাঁক করে উবু হয়ে অন্ধকারে বসল। মাটিতে হাত দিল। বারবে-বারবে সে মাটিটার সঙ্গে কথা বলছে। আবার ফিরা আইলাম মাজননী। তর কাছে ফিরা আইলাম। সে মুঠো-মুঠো মাটি তুলে গায়ে মুখে মেখে নিচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও কোন তরমুজ ফলে আছে কিনা হাত দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করছে। পেলেই সে একবার পাঁজাকোলে তুলে নেবে। কত ওজন, কত বড়, মাজননীর সেবা-যত্ন ঠিক না হলে ফসল ফলে না, সে তরমুজ ওজন করে যেন বলতে পারবে হাজিসাহেবের বেটারা কেমন যত্ন-আত্তি নিচ্ছে। কম ওজনের হলে মনে হবে শালারা বেইমান।

সে খুঁজে-খুঁজে একটাও তরমুজ পাচ্ছে না। বেশী দূর সে খুঁজতে পারছে না। এখানে এসেই শরীরটা তার ক্রমে যেন ভারি দুর্বল হয়ে আসছে। হাত-পা অসাড়। কেবল কুকুরটা ওর পাশে সেই থেকে আছে। কুকুরটাও আর কুকুর নেই। বড় মানুষের কুকুর কামড়ে সারা শরীরে ঘা করে দিয়েছে। সুতরাং কুকুরটার জন্য তার ভারী মায়া। সে কুকুরটাকে ফেলে কোথাও যায় নি, কুকুরটাও তাকে ফেলে কোথাও যাচ্ছে না। এখন একটা তরমুজ পেলে সে কামড়ে একটু রস খেলে আবার কিছু দিন বাঁচি বাঁচতে পারত। আবার সে তরমুজের জমিতে বসে নামাজ পড়তে পারত। আর তখনই হাতের কাছে ছোট্ট একটা তরমুজ পেয়ে গেল। তরমুজটাকে টেনে সে কাছে আনতে পারল না। হামা-গুড়ি দিয়ে সে তরমুজটার কাছে যাচ্ছে। দু হাতে জড় করে সে খেতে চেষ্টা করছে। তরমুজটাকে সে কাছে আনতে পারছে না। হাত থেকে হড়কে যাচ্ছে। ওর ক্ষুধার্ত মুখ জ্বলছিল। কোন রকমে সে তরমুজ-টাকে মুখের কাছে এনে কামড় দেবে, কোন রকমে একটু তৃষ্ণার জল পান করবে, করলেই গলা ভিজে যাবে, ওর যে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সেটা আর থাকবে না। সে কামড় দিল। তরমুজটাতে রস নেই। ওর গলা ভিজছে না। সে ক্রমে চোখে ঝাপসা-ঝাপসা দেখছে। মাটির উপর সে দু হাত বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কুকুরটা বুঝতে পারছে না, কেন তার মানুষ এভাবে পাতার নীচে লুকিয়ে পড়ছে। মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে উবু হয়ে আছে। নড়ছে না। মানুষটা যে মরে যাচ্ছে সে তা বুঝতে পারছে না। রাতে পাতার নীচে ঈশম লুকালে সে যেমন পাহারায় থাকে—আজও মানুষটা ঘুমে যাচ্ছে বলে শিয়রে জেগে বসে থাকল। সে আর ঈশম, মাথার উপর আকাশ, অজস্র নক্ষত্র এবং অন্ধকার, সোনালী বালির নদী, নদীর জল এবং অর্জুন গাছ মাঠের পাশে। কুকুরটা দূরে শেয়ালেরা উঠে আসছে টের পেল। সেই-সেই অন্ধকারে তরমুজের জমিতে বসে সব লক্ষ রাখছে। সে দুবার মাটি শুঁকে ঈশমের চার পাশটা একবার ঘুরে এসে শিয়রে বসল। ভয় পেলেই কুকুরটা এমন করছে। সারা রাত সে সতর্ক থাকছে। শেয়াল-কুকুরে ঈশমকে খাবে ভেবেই সে সতর্ক থাকছে। ঈশম তার মাটির কাছে তরমুজের পাতার নীচে মহানিদ্রায় মগ্ন। আশ্বিনের কুকুর এটা টের পেয়ে আর বসে পর্যন্ত থাকতে পারল না। দুপাক সব-দিকে। সে শিয়রে আর বসে থাকছে না। সারাক্ষণ ঘুরছে ঈশমের চারপাশে। কোন দিক থেকে শেয়াল কুকুরেরা উঠে এসে দাঁত বসাবে কে জানে।

হাজিসাহেবের বেটারা সকালে তরমুজ তুলতে এসে টের পাবে একজন ভিখারি

কোনারক। ফটো। ইন্দ্রাণী রায়

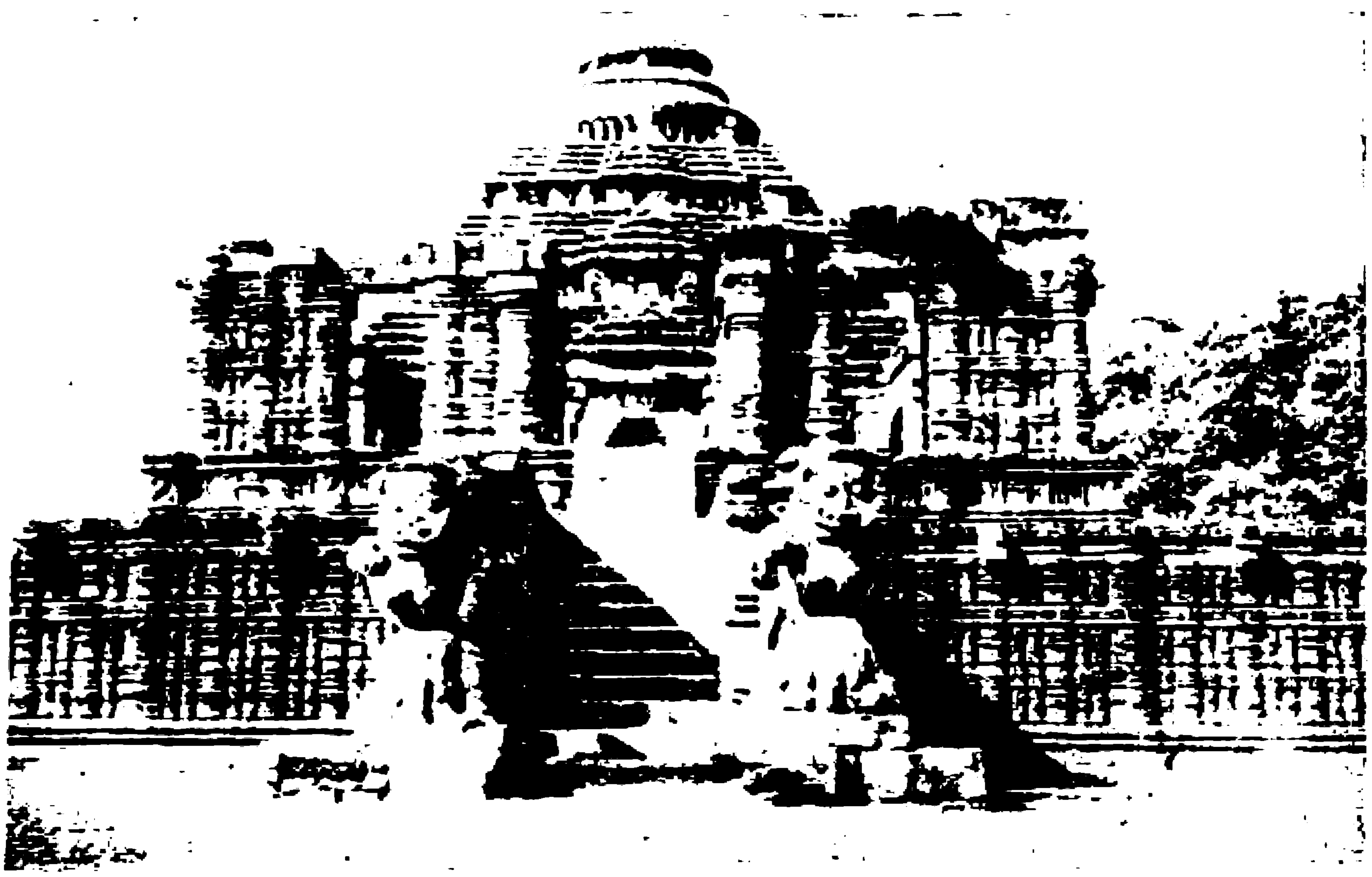

মানুষ তরমুজ পাতার নীচে মরে পড়ে আছে। প্রথমে ঈশ্বরকে ওরা চিনতেই পারত না। এই ঈশ্বর। ওর কাঠা দুই ভুঁই ছিল সড়ার পাশে। সেটাও তারা কাঁটা বাঁশের বেড়ায় নিজের করে নিয়েছে। চিনে ফেলালেই ভয়। যদি ওটা আবার সে ফিরে চায়। তবু ঈশ্বর এ-পোড়া বাংলা দেশে আবার ফিরে আসতে চায়। আবার জন্ম নিতে চায়। যেন একটা লাঠি নিয়ে সে একদিন উঠে দাঁড়াবে। মাথায় পাগড়ি, হাতে লন্ঠন নিয়ে রাতের আঁধারে সে খবর দিয়ে যাইবে, মহারাজা আপনের গোলা ভইরছে। আমারে কিন্তু একটা ভজন দিতে হইব।

অথচ সকালে অঞ্চলের মানুষেরা দেখল নদীর পাড় বড় রাস্তায় ঝকঝকে একটা মোটরগাড়ী। এ-গাড়ী দেখলে সবাই টের পায় মহকুমাশাসকসাহেব শহর থেকে এসেছে। সে নদীর পাড়ে গাড়ী রেখে আর সোজা নিজের গ্রামের দিকে উঠে গেল না। হিন্দু পাড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে। খুব কম আসে মহকুমাশাসক। বছরে মাস কেটেছে তারা জানে সাধু আজকাল সময়ই পায় না। বাড়ীতে ওর এখন কেউ নেই। জমিজায়গা দেখার জন্য শুধু একজন লোক আছে। তবু সে বছরে একবার অন্তত আসে। এক-দিন-দুদিন থাকে, তারপর আবার শহরে চলে যায়। সে কতবারই এসেছে ভুলেও হিন্দু পাড়ার দিকে উঠে যায় নি। কি যে ভিতরে ছিল কে জানে। সে ও-দিকে একেবারেই তাকায় না। কার কাছে কেন যা পড়ে যাবে, কার কাছে বুঝি তার কি কিনতে নিতে হবে। সে ভয়ে লোপাটে পর্যন্ত নেমে আসত না। কিন্তু আজ সকাল-সকাল সে এদিকে না এসে ওদিকে যাচ্ছে। ওদিকে কিছু নেই। খালি। পাড়াকে-পাড়া খালি। খাঁ-খাঁ করছে সব। সে একা যাচ্ছে না। সঙ্গে দুই যুবতী মেয়ে। ওরা দেখে চিনতেই পারল না, যে মেয়েটা ভোর হলে কাঁঠালের নীচে ছাগল নিয়ে আসত, যে মেয়ের নাম ফতিমা, নাকে নোলক ছিল, পায়ে মল ছিল, এখন সে মেয়ে কত ডাগর, কি সুন্দর চোখ-মুখ— পাকুর পাতার মতো হাওয়ায় কাঁপছে। ফতিমার সুন্দর লতাপাতা আঁকা শাড়িতে প্রায় যেন এই অঞ্চলের দৃশ্য আঁকা রয়েছে। সাধু তার মেয়েকে নিয়ে নীরবে হেঁটে-হেঁটে চলে যাচ্ছে সেদিকে। যারা ছোটা-ছুটি করে কেউ-কেউ ওর কাছে গেছে তাদের সঙ্গে কিন্তু সাধু কোন কথা বলছে না। নীরব। বুঝি ওর শৈশবের কথা মনে পড়ে গেছে। পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে মালতী বুঝি তাকে ডাকছে, সামু যাবি না ঠুকেরা আনতে। যাবিনা নদী সাঁতরে ও-পার। ডুই ডুব দিয়া নদীর অতল থাইকা আমার লাইগা মাটি তুলবি না। নদীর অতলে মাটি মাটি এঁটেল এবং পুতুল তৈরী করতে এমন মাটি আর নেই। সামুর বুঝি মালতীর পুতুলের জন্য মাটি তোলার কথা মনে হচ্ছে।

এখন আর একজন ভাবছে। ফতিমা মানজুর পিছনে। সে বাবার সঙ্গে কতদিন পর দেশে ফিরে এসেছে। গাড়ী থেকে নেমেই সে কেবল শুনতে পাচ্ছে—কেউ তাকে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ডাকছে। সফিকুরের মৃত্যুর পর সে বড় হাহাকারে ভুগছিল। তার কিছু ভাল লাগত না। সে চুপচাপ জানালায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসত। সফিকুর তাকে কি কি বলেছে সে সব মনে করার চেষ্টা করত। কবে প্রথম দেখা, কি ভাবে ফতিমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আবার সহসা নামিয়ে নিয়েছিল সে সব মনে করার চেষ্টা করত। এসবের ভিতর ফতিমা জানত না সে ক্রমে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে জানত না, ওর চোখ বসে যাচ্ছে। সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। এবং সে কথা কম বলছে। আব্বা আম্মা যখন কেউ ওর সঙ্গে কথা বলছে, সে কথা শুনতে-শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। বার-বার প্রশ্ন করেও কথার জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। সাধু মেয়ের মুখ দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। সফিকুরের মৃত্যুর পরই মেয়েটা কেমন শোকে পাষাণ হয়ে গেল। সে কিছু করতে পারছে না। মেয়েটা কখনও কাঁদে কিনা চুপি-চুপি দেখার চেষ্টা করেছে। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে জেগে থেকেছে রাতের পর রাত। — ফতিমা রাতে সংগোপনে যদি কাঁদে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস ওরা এমন লক্ষ করতে-করতে দেখল, মেয়েটা সারারাত না ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু কাঁদে না। ভিতরে যে অসহ্য কষ্ট চোখ-মুখ দেখলে টের পাওয়া যায়। হাত-পা ছড়িয়ে যদি ফতিমা এক রাতে মহাশোকে কাঁদতে পারত! সে তবে নিরাময় হত। সাধুর ডাক্তার বন্ধু শেষ পর্যন্ত এমন বলেছে। তুমি ওকে কোথাও নিয়ে যাও। পার তো দেশে নিয়ে যাও। সেখানে গেলে

CENTRAL LIBRARY

ওর শৈশবের কথা মনে হবে। মনে হলে দুঃখও পাবে, কিছুই থেমে থাকে না। এভাবেই মাটি মানুষ এবং নদীর জল বয়ে যায়। শৈশবের ভিতর ফিরে গেলে মানুষের শোক-দুঃখ অনেকখানি লাঘব হয়।

কথাগুলো সামুর ভাল লেগেছে। সে তার কথার পরামর্শ মত এসেছে এই দেশে, বাংলা দেশে। নদীর চরে, তরমুজ খেতে, অর্জুন গাছের ছায়ায়, ইসমানপীরের দরগায় সে যাবে। মেয়েকে বলবে, মা এই আমার দেশ, তোর দেশ, সকলের দেশ। এখানে তুই জন্মেছিস, আমি, মালতী, সোনা, ঈশমচাচা, ফেলু, সবাই জন্মেছে। মা এই দেশ বাংলা দেশ, আমরা সবাই বাংলা দেশের মানুষ। তুই একজনের জন্য পাষাণ হয়ে থাকবি সে ঠিক না। আয়। বলে সে মেয়ের হাত ধরে শৈশব সময়ে সে যা ফেলে এসেছে, সেই সোনালী বালু, অর্জুন গাছ এবং নাটকল ফল, কচুর পাতায় প্রজাপতি এসবের ভিতর মেয়েকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য যেতে যেতে সে সবকিছু ভুলে গেছে। মেয়ের হাত ছেড়ে সেই ন্যাওড়া গাছটার নীচে সে কেন একা-একা চলে যাচ্ছে! এখানেই প্রথম মালতী কোঁচা দিয়ে ওর ইস্তাহারটা নামিয়ে এনেছিল, এখানেই মালতী প্রথম লোকে ডেকে পড়েছিল। সে সেই থেকে কেন যে অভিমান করে মালতীর উপর বার-বার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। সে দেখল—সেই ইস্তাহার এখন সে নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছে। ছিঁড়ে ফেলে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। কাগজের সেই হাজার-হাজার টুকরো এখন বাতাসে উড়ছে। কে কটা সংগ্রহ করতে পারে—এমন বাজি রেখে মালতী এবং সে ছুটছে। ওরা প্রজাপতির মতো একটা-একটা ধরে কোঁচড়ে রাখছে—এমন একটা খেলা চোখের উপর ভেসে উঠলে, ওর মনে হল দূরে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কেউ হাউ-হাউ করে কাঁদছে। কে এমনভাবে কাঁদতে পারে।

এতক্ষণে ওর খেয়াল হল যে, সে মেয়ের হাত ধরে আসছিল, অথচ মেয়েটা তার পাশে নেই। সামু এখানে এসেই এমন প্রসন্ন সকাল দেখতে পাবে আশা করে নি। জ্যৈষ্ঠ মাসের আকাশ। মেঘ বৃষ্টি থাকার কথা। অথচ এক বিন্দু মেঘ নেই আকাশে। মাঠে ছোট-ছোট পাটের চারা। ঠাকুরবাড়ীর বড়-বড় টিনের ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে না, আর কেউ কোন দিন দেখতেও পাবে না। ওর বুকটা হাহাকার করে উঠল। ঠাকুরবাড়ীর কোথায় কবে লাঠি খেলা হত, কবে বাপ জঙ্গল সামুর হাত ধরে এবং লাঠি খেলা হত ঈশমচাচা বাবাকে কিভাবে জড়িয়ে ধরত মেয়েকে এমন বলতে-বলতে যাচ্ছিল। যেন একভাবে দেশের কথা, শৈশবের কথা শুনিয়েছে বলে যেন মেয়েটা তার আরোগ্য লাভ করবে। ফাতিমা তার দুঃখশোক ভুলে যাবে এবং তখনই সামুর মনে হল, মেয়েটা এইসব শুনতে-শুনতে হঠাৎ হাত ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মত করেছিল। সে মেয়েটাকে ছুটে যেতে দেখেছে। ছুটে গিয়ে অর্জুন গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। ফাতিমা যে তার শৈশবের জগতে ফিরে গেছে, সেও তার শৈশবের জগতে ফিরে যাবার জন্য মেয়েকে ফেলে এই গাছের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং সে কি সব ভাবছিল, ওর পাশে যে প্রাণের টুকরো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তা পর্যন্ত খেয়াল নেই। এখন কেউ কাঁদছে শুনেই স্থির থাকতে পারল না। ওর বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ফাতিমা কাঁদছে এটা সে বুঝতে পারে নি। কারণ সেই যে শিশুবয়সে একবার কি কারণে সে মেয়েকে মারতে গিয়ে পিঠে দাগ বসিয়ে দিয়েছিল, তারপর আর সে মারে নি। কসম খেয়েছে সে আর কোন দিন মেয়েকে আঘাত করবে না। মেয়েটা তারপর কোনদিন কাঁদে নি। কেমন হেসেছে। ফাতিমা হাসলে সে টের পেত ফাতিমা হাসছে। কিন্তু কাঁদলে সে টের পায় না—কারণ ফাতিমা এখন বড় হয়ে গেছে। বড় হলে কান্নাও নিঃশব্দে বয়ে যায়। সে শুধু এর ভিতর টের পেল কেউ কাঁদছে, বাংলা দেশের জন্য কাঁদছে।

সুতরাং সে অস্থির হয়ে উঠল। যে দিক থেকে কান্না ভেসে আসছে সেদিকে সে ছুটল। শৈশবের মত সে মাঠঘাট পার হয়ে যাচ্ছে। যেখানে দাঁড়িয়ে কেউ বাংলা দেশের জন্য কাঁদতে পারে সেখানে সে চলে যাবেই। সে পৌঁছেই দেখতে পেল—ফাতিমা উবু হয়ে অর্জুন গাছটার নীচে পড়ে কাঁদছে। আনজু দু হাতে আগলে ধরে রেখেছে ফাতিমাকে। বোবার মত দেখছে সব বড়-বড় অক্ষর গাছে লেখা। সে অক্ষরগুলো পড়ছে। গাছ বড় হয়ে যাওয়ায় অক্ষরগুলো আরও বড় হয়ে গেছে। যেন দেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই অক্ষরগুলো যতদিন যাবে তত বড় হয়ে যাবে। বাংলা দেশের মানুষ বড়-বড় হরফে পড়ুক, জ্যাঠামশাই আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি—ইতি, সোনা।

বড়-বড় অক্ষর কি গভীর ক্ষত নিয়ে এই মহাবৃক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য সামু নিজে বড় বেশী আক্রান্ত হয়ে গেল। মনে হল তার, এই দেশ বাংলা দেশ। এই দেশের অন্য কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, সে মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা পেল না। মেয়ের মাথায় হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

তখন মাঠ থেকে কিছু লোক ছুটে আসছে। ওরা এসে খবর দিল ঈশম তরমুজের জমিতে মরে পড়ে আছে। পাতার নীচে মরে কখন মরেছে কেউ বলতে পারে না। জমিতে তরমুজ এবার ভাল হয় নি। শুধু পাতাই সার। দু দিনের উপর হবে জমিতে কেউ তরমুজ তুলতে যায় নি। কেউ জানে না কখন থেকে ঈশম পাতার নীচে মরে পড়ে আছে।

ঈশমের কবরে সামু এবার নতুন একটা ইস্তাহার লিখে রেখে দিল। তার পর ওকে শুইয়ে দিল। নতুন পাজামা নতুন পাঞ্জাবি। সাদা দাড়ি ঈশমের। সে লম্বা হয়ে কবরে শুয়ে আছে। ভূমিহীন, অন্নহীন ঈশমের কানে-কানে মাটি দেবার আগে বলার ইচ্ছা হল, কিছুই করতে পারিনি এতদিন। স্বাধীনতার মানে বুঝি নি। আপনাকে দেখে মানেটা আমার পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর সে ঈশমের কবরে মাটি দিতে-দিতে বলল, যার মাটি পেলে আপনি সবচেয়ে খুশী হতেন চাচা সে নেই। সে থাকলে তাকে বলতাম তুমি এসে একটু মাটি দিয়ে যাও বাবু। ও'র আত্মা বড় শান্তি পাবে। সে বেইমান চাচা। আপনাকে ফেলে সে চলে গেছে। লিখে গেছে, জ্যাঠামশাই আমরা হিন্দুস্থানে চলে গেছি। যেন জ্যাঠামশাই ছাড়া তার বাংলা দেশে আর কেউ নেই।

তারপর থেকেই মাঝে-মাঝে আশ্বিনের কুকুর ঈশমের কবরের পাশে ঘোরাফেরা-করলে টের পাওয়া যায় মহাবৃক্ষে সেই ক্ষত ক্রমে আবার মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। অর্জুন গাছটা আরও বড় হচ্ছে। ডালপালা মেলে সজীব হচ্ছে।

।।শেষ।।

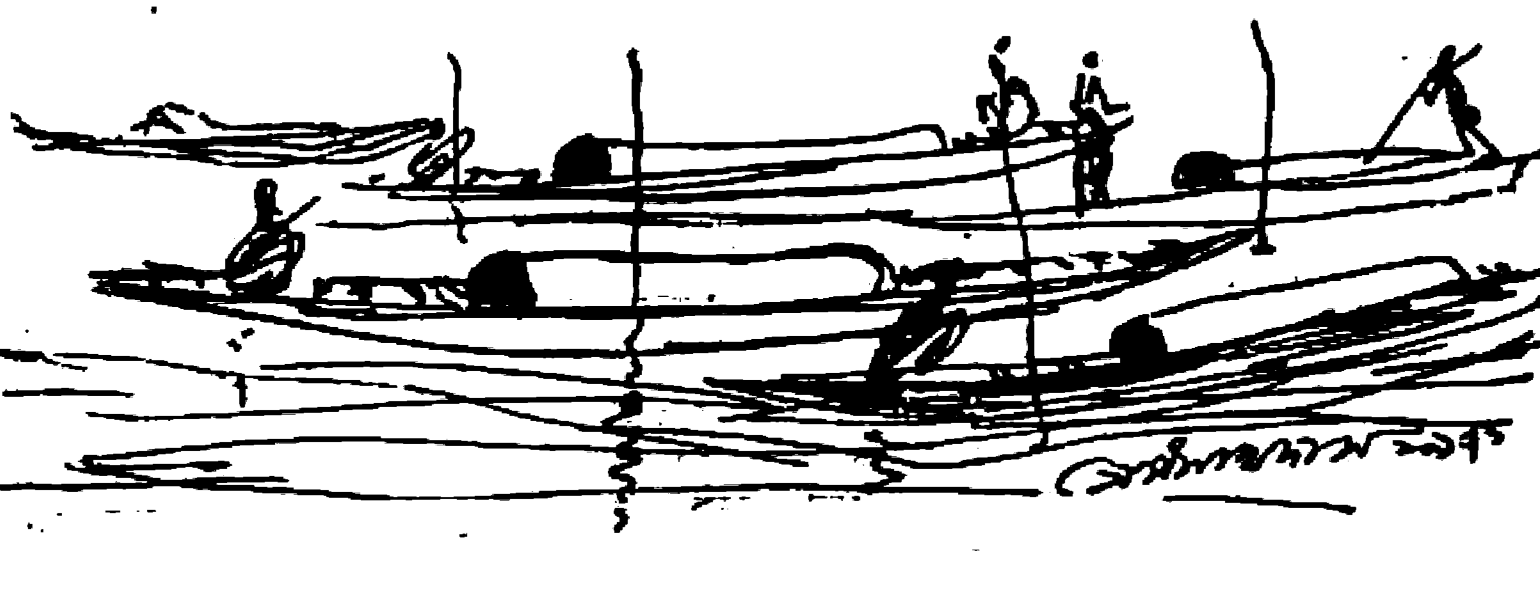

রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার পল্লী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী!

বাংলাদেশের হৃদয় হতে মহাকবি যাঁকে এমন অপরূপ রূপে আবির্ভূত হতে দেখেছিলেন, বলা অবশ্যই বাহুল্য যে, সে মূর্তি দেশজননীর কোন মৃন্ময়ী মূর্তি নয়, সে মূর্তি দেশমাতৃকার চিন্ময়ী মূর্তি। এ মূর্তিকে মহাকবি কোথায় দেখেছিলেন? আদৌ দেখেছিলেন কি? না, এ তাঁর ভাবগাঢ় কল্পনার প্রতিফলন?

আমাদের এই প্রাচীন দেশে, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ এ-কথা একান্ত অবিশ্বাস্য কল্পকথা হলেও, বিগত দিনে কালে কালে মহাপুরুষ সাধকরা পরমেশ্বরকে বাঞ্ছিত মূর্তিতে দর্শন করে মানবজন্ম ধন্য করেছেন বলে কথিত ছিল। মহাকবিও আধুনিককালে সেই মহৎ সাধন ধারার একজন অতি যোগ্য উত্তরপুরুষ। সেই কারণে বিশ্বাস করি, এ দর্শন শুধু-মাত্র ভাবগাঢ় কবিকল্পনা নয়; সত্যদর্শন। তিনিও বাঞ্ছিত মূর্তিতে পরমা জননীকে দর্শন করেছেন।

তবে এই দর্শনের রীতি-প্রকৃতি ভিন্ন। তিনি বাংলা দেশের আধারে সেই চিন্ময়ী জননীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর দিব্য-দর্শনের এই যে আধার বাংলা দেশ, এ বাংলা দেশের স্বরূপটি নির্ণয় করতে পারলেই সেই সত্যকে আমরা জানতে পারব।

এ কি শুধুমাত্র দেশের মৃত্তিকা? নিশ্চয়ই নয়। তা হলে দেশের সমাজ? বা দেশের অগণিত মানুষ? বিচ্ছিন্ন ও পৃথক-ভাবে তিনের কোনটিই নয়। এই তিন একসঙ্গে মিলে তাঁর সমগ্র মূর্তি। দেশের মৃত্তিকাময়ী মূর্তি সেই জননীর সুবিস্তীর্ণ মাতৃক্রোড়; দেশের সমাজ জননীর চেতন বুদ্ধি ও করুণার আধার; দেশের অগণিত মানুষের চৈতন্যের মধ্যে জননীর সর্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ। স্বদেশের মৃত্তিকা ও তার পরিমণ্ডল, স্বদেশের সমাজ এবং স্বদেশের স্বজন—এই তিনে মিলে এক অখণ্ড মূর্তিতে পরিপূর্ণ দেশজননীকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি বিচিত্র কথা এখানে উল্লেখ করি। মহাকবি পরমেশ্বরকে স্মরণ মাত্রেই পুরুষের মূর্তিতে কল্পনা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা কখনও বা প্রভু কি বন্ধু বলে। কিন্তু দেশের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে কখনও মা ছাড়া অন্য মূর্তিতে কল্পনা করেন নি, করতে পারেন নি। আমার অন্তত এই ধারণা।

দেশের সমাজকে আমি পূর্বেই মহা-কবির দৃষ্টিতে দেশের ভাবমূর্তির অবিভাজ্য অংশ এবং উপমার আশ্রয় নিয়ে দেশজননীর চেতনা বলে উল্লেখ করেছি। সে চেতনার আধারে জননীর প্রজ্ঞা ও করুণার অমৃত বিধৃত। আজ আমি মহা-কবির পল্লীসমাজ সম্পর্কে চিন্তা ও ধারণার কথা বলব।

বাংলা দেশের ও বঙ্গসংস্কৃতির পরম সৌভাগ্য যে মহাকবি এমন মুহূর্তে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে জন্মেছিলেন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন 'বেশে-ভূষায়, কাব্যে-গানে, চিত্রে-নাট্যে, ধর্মে-স্বাদেশিকতায় তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।' কাজেই তিনি শিশুকাল থেকেই জন্মসূত্রে অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে স্বাদেশিকতার একটি স্পষ্ট আদর্শের মধ্যে দেশের স্পর্শ লাভ করেছিলেন। সেই স্বাদেশিকতার বোধ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার একটি বিশিষ্ট অংশ ও অঙ্গ হিসাবে ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে একটি পরিণত মূর্তি লাভ করেছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ প্রয়োজন যে তাঁর স্বাদেশিকতার চিন্তা সমসাময়িক অন্য সকলের চিন্তা থেকে বিশেষভাবে পৃথক; সেই কারণেই সে চিন্তা বড় বিশিষ্ট এবং একক। এই চিন্তার যে বীজ তিনি বাল্য-কালে জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন তাকে তাঁর জীবনের সমস্ত চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে একযোগে বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করে-ছেন, বিগত কালের শাস্ত্র, ধর্ম ও ইতিহাস থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দো-লনের সঙ্গে নিজের বুদ্ধি ও রুচি মত-খানি এগিয়ে যেতে দিয়েছে ততখানি নিজেকে যুক্ত করেছেন, আবার নিজের স্বাধীন বুদ্ধি ও চারিত্রিক প্রবণতা ও বিবেচনা অনুযায়ী তাঁর থেকে সরে এসে নিজের মানসিক সিদ্ধান্তের স্থির ভূমিতে দাঁড়িয়েছেন। হয়তো একথা এই ভাবে বললেই আরও সঠিক হবে যে তিনি যেখানে থাকবার সেই খানেই ছিলেন বরাবর, তৎকালীন ইতিহাসের অনিবার্য আকর্ষণে রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ কাছা-কাছি গিয়ে পড়েছিলেন, আবার সেই অনিবার্য আকর্ষণেই তিনি এবং রাজনীতি দুইই আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে করতে পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

মহাকবির স্বাদেশিকতার মূর্তি পলিটিক্যাল স্বাদেশিকতা থেকে পৃথক। এ বিষয়ে তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ স্বদেশী সমাজ থেকে উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন:

'বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এই জন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম-শিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্ম-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত—এই জন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচালেই বাঁচে, আমরা ধর্ম ব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে জনসাধারণ সর্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থা-নির্বিচারে গভর্ন-মেন্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়ত বেলেস্তা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

•

আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধী-নতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে-কর্ম, সমাজ, সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে।'

মহাকবির কাছে তাঁর পরিণত জীবনা-দর্শের প্রথম কাল থেকেই স্বাদেশিকতার একটি স্পষ্ট মূর্তি ছিল। এবং সে মানস-মূর্তি সে সময়কার পোলিটিক্যাল বা বিদেশী স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যুক্ত সমস্ত দেশপ্রেমীর ব্যক্তির চিন্তা থেকে পৃথক। সকলেই স্বাদেশিকতা-

তাঁর যে দেশকে কল্পনা করতেন সে কল্পনা অনেকখানিই, তখনকার দিনে সব চিন্তা যেখান থেকে আমাদের দেশে এসে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় প্রভাবিত করত, সেই য়ুরোপ থেকে ধার করা। সেদিন অধিকাংশের কাছে দেশ ছিল ইংরেজী স্টেটেরই নামান্তর। তার সঙ্গে 'নেশনের' অনেকখানি আত্মিক সাদৃশ্য ও মিল আছে। মহাকবির কাছে দেশের সংজ্ঞা ছিল ভিন্ন। দেশের মূর্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ করতেন সমাজের মধ্যে। দেশের সমাজই তাঁর কাছে দেশের জাগ্রত মূর্তি।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সমাজের মূর্তির মধ্যে দেশের যে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ মূর্তিকে তিনি সকলের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও চিন্তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। এই থেকে স্থির অনুমান করা ও সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে এ সম্পর্কে তার বহু পূর্ব থেকেই তিনি বিশেষ চিন্তা করেছেন, এবং বহু চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ফলে এই বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। এখন যাকে দেশের জাগ্রত আধার বলে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার চরিত্র কেমন ছিল সেইটাই এখন আলোচ্য বিষয়।

স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে 'নেশনের' চেয়ে 'সমাজ' বড় কি ছোট, এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না; ভাল-মন্দের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত নেই। তিনি এই কথাই স্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছেন যে য়ুরোপের চরিত্র অনুযায়ী 'নেশন'কে অবলম্বন করেই তাদের বিকাশ, স্টেটই তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা জাগ্রত পদার্থ; স্টেটের শুভাশুভের উপরেই জাতির সমস্ত মানুষের ভালমন্দ নির্ভর করে। অথচ ভারতবর্ষের চরিত্র অনুযায়ী তার সমস্ত শুভাশুভ রাজার উপর নির্ভরশীল ছিল না; ছিল সমাজের উপর।

এখন স্বভাবতই সমাজ বলতে তিনি কি বলতে চেয়েছেন সেটি জানা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন ঃ

'আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমনভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।'

(স্বদেশী সমাজ ঃ আত্মশক্তি ও সমূহ)

এই সমাজ যেন এক প্রাচীন অতিকায় দুর্গের মত। তার বয়সের পরিমাণ নাই। তার বিশালকায় প্রাচীন দেহের চারিপাশে এক সুকঠিন অনুশাসন আবরণ যাতে কাল থেকে কালান্তরে যত আঘাত বাইরে থেকে এসেছে, সব প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়েছে; সেই আবরণের অভ্যন্তরে তার চলমান প্রাণক্রিয়াকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করতে পারেনি।

ভারতবর্ষে কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত প্রাণধারা এই সমাজের মধ্য দিয়েই তার অবশ্যম্ভাবী মূর্তিটি গ্রহণ করে নিজেকে সক্রিয় ও সচল রেখে আপনাকে পরিপূর্ণতায় প্রকাশিত করেছে। তাই ভারতবর্ষের আরাধ্য ও সাধ্য বিষয় 'নেশনের' কল্পনা নয়, সমাজের বহমানতা।

এই সমাজ আমাদের কোন কল্যাণ করেছে তা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

'কিন্তু একথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহুদুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধপেটা খাইয়া ছোটো ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে, সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড়ো করিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।'

(ভারতবর্ষীয় সমাজ ঃ আত্মশক্তি ও সমূহ)

ভারতবর্ষে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণের আধার এই সমাজ। মহাকবি ১৯০০ সালের কাছাকাছি সময়ে যখন এই চিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন সেই সময় সমাজের এই মূর্তি ছিল। আজ, সেই কালের পর সত্তর বৎসর অতিক্রম করতে চলেছে। দুটো মহাযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বিস্ময়কর পরিবর্তন সংঘটন করেছে। সত্তর বৎসর পূর্বেও সমাজের যে মূর্তি ছিল তা আজ শুধু ভগ্ন দেবদেউলের মত ভেঙেই পড়েছে নয়, তার বোধ হয় কোন চিহ্নও আর নাই। কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, প্রায় ধ্বংসোন্মুখ; একান্নবর্তী পরিবার প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত; নব শিল্পোন্নয়ন ও বিবিধ নব নব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনে বহু ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। সে সব পরিবর্তন দিনে দিনে ধীরে ধীরে ঘটে যাচ্ছে বলে আমরা ঠিক অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু তা বিস্ময়কর। এ সব সত্ত্বেও বলব, বাইরের কাঠামোতে এই পরিবর্তন সর্বত্র প্রকট হলেও, কাল থেকে কালান্তরে বাহিত সেই ভাবনাটির অনেক ভাবই এখনও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নাই, য়ুরোপের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কেও আমি অনভিজ্ঞ, তবু মনে হয় সাধারণভাবে আমাদের দেশে

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ শুষ্ক রুক্ষ দিনগুলিতে—
স্নো ভিউ হোটেল
দার্জ্জিলিং
আপনার বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য কামনা করে
মার্জিত রুচি ভ্রমণবিলাসীদের একান্ত নির্ভরযোগ্য বাসস্থান
পূর্বাহ্নে স্থান সংরক্ষণের জন্য ফোন দার্জিলিং ৪০

আত্মীয়ের জন্য আত্মীয় আজও বহু ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করে তা বোধ হয় পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলেই অপরিজ্ঞাত। আজও এই কঠিন অর্থনৈতিক চাপের মধ্যেও আমাদের দেশের অগণিত মানুষ, যাঁরা নূতন কালে সমাজ-জীবন এবং পারিবারিক-জীবনের মধ্যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এসে পড়েছেন ও তাতে অভ্যস্ত হয়ে প্রাচীনকালের অনেক ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করে নূতন চিন্তা ও নূতন অভ্যাসকে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সমস্ত লোকলোচনের আড়ালে, বহু দুঃখের বদলে সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করাবেই [illegible] বলে মনে করেই সেই ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে চলেছেন। একে তাঁরা কোন গৌরবের মহৎ কর্ম জ্ঞান করেন না, অন্যকেও তা মনে করাবার চেষ্টা করেন না। এদের এই দৈনন্দিন গৌরবময় স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগের কাহিনী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় না অথবা তাঁদের প্রশংসায় সভাগৃহ করতালিধ্বনিতে মুখর হয় না। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ আজও এই মহৎ আত্মত্যাগ ও দৈনন্দিন স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্রসাধনকে জীবনের অতি সাধারণ সহজ কর্তব্যের অতিরিক্ত কিছু বলে জ্ঞান করেন না; যাঁরা আচরণ করেন তাঁরাও না, যাঁরা তা চোখে দেখেন তাঁরাও না। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, বহুকালাবধি ধারাবাহিক চর্চার ফলে এই ত্যাগের প্রবৃত্তি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় ধাতুগত সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এ সম্পর্কে চেতনাহীনতার জন্যই আমাদের মুখের প্রসন্ন আত্মাবরণের অন্তরালে যে বিষণ্ণতা, ক্ষীণ হাসির অন্তরালে যে ক্লেশ ও দুঃখ আত্মগোপন করে থাকে তাকে আমরা দেখতে ও চিনতে ভুল করি, সে যে সুমহৎ বোধের সুবৃহৎ এক মহৎ জয়ের কথা এবং এক অভেদ্য কবচ-কুণ্ডলের কথা ঘোষণা করছে তা আমরা বুঝতে পারি না।

যদি ইতিহাসের ও কালের উজান বেয়ে একবার সেই উদ্ভবভূমি, ভাবগঙ্গোত্রীর সন্ধান করি তা হলে একে চেনা কষ্টকর হবে না। মহাকবির ভাষাতেই বলি :

'রাজা সমাজের অঙ্গ ছিলেন। সমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর—ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে সমাজধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই সমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্মে, ভাবে, কর্মে সমুন্নত রাখিবার জন্য সমাজের বিচিত্র শক্তি বিচিত্র দিকে সচেষ্টভাবে কাজ করিত। তখনকার নিয়ম তখনকার অনুষ্ঠান তখনকার কালের হিসাবে নিরর্থক ছিল না।......আমাদের পূর্বপুরুষের সেই [illegible] মঙ্গলের আদর্শকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বত্র তাহাকে প্রসারিত করি, তবেই বিপুল বিশৃঙ্খলতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পৎ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম, ইহাতেই আমাদের মঙ্গল—ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব।'

(ভারতবর্ষীয় সমাজ : আত্মশক্তি ও সমূহ)

এই পরিকল্পনা ঈশ্বর, ব্যক্তি-মানুষ, গৃহস্থ ও সমগ্রভাবে দেশের প্রাণধারাকে একসঙ্গে একটি পবিত্র, ভাবগম্ভীর সংগীতের মত এক সুরে গেঁথে মানুষের জীবনে একটি মহৎ ও পবিত্র ভাবের পরিমণ্ডল রচনা করে তার প্রাত্যহিক জীবনকে একান্ত সূক্ষ্মভাবে অথচ একান্ত সহজে একটি মহৎ আদর্শের সঙ্গে অভ্রান্ত ভাবে চিরকালের মত যুক্ত ও চলমান করে দিয়েছে। কালের গতির সঙ্গে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত পরিবর্তন সাধিত হয়নি বলেই তা পরবর্তীকালে সমাজের সম্পূর্ণ প্রাণধারাকে ধারণ করতে পারেনি। সংস্কারের অভাবে তার খাত মজে এসেছে। যদি কোনক্রমে কালে কালে কালোপযোগী প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন সম্ভব হত তা হলে আজও সমাজ নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে দেশের বৃহৎ জনমানসের সমগ্র জীবনধারাকে সেই পুরাতন ধ্রুব সংগীতের মতই ধারণ করতে পারত এবং যা তার পক্ষে বিঘ্ন ও বিরোধী তাকে অক্লেশে প্রতিহত করতে পারত।

কিন্তু তা হয়নি, হয় না বলেই হয়নি। ইতিহাসের নিয়ম হয়তো তা নয়। এবং হয়নি বলে আক্ষেপ করেও লাভ নেই। কিন্তু যা হয়েছিল, তাও টিঁকে ছিল এবং টিঁকে আছে বহুকাল ধরে। বহু বহু শতাব্দীর সেই বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও চেষ্টা করলে কিছু কিছু দেখা যাবে। বিচ্ছিন্ন এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে মানবজীবন যখন একটি আদর্শমুখী ছিল একথা উল্লেখ করলাম; তার বাইরের শৃঙ্খলার কথাও মহাকবির উক্তি উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছি। এবার তার মানস-মূর্তির সামান্য বর্ণনা মহাকবির রচনা থেকেই দিই :

'মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয় সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামী-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে—এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহবা পিতৃস্থানীয়, কেহবা পুত্রস্থানীয়, কেহবা ভাই, কেহবা বয়স্য। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এইজন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করতে পারি না।'

(স্বদেশী সমাজ : আত্মশক্তি ও সমূহ)

এর সামগ্রিক ব্যবস্থার ফলে, ভারতীয় ভাষায় ও ভঙ্গিতে বললে বলতে হয়, চতুর্বর্গ লাভ হত; লাভ হত অর্থ ও পরমার্থ; ইহজীবন এবং পরজীবন দুইই পরিপূর্ণ হত; লাভ হত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। আজকের ভাষায় বললে বলতে হয়—ব্যক্তিচরিত্রের সামগ্রিক বিকাশ হত আত্মশক্তি উদ্বোধনের পথে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সমষ্টি-শক্তির সুস্থ ও পরিপূর্ণ প্রকাশ হত। মানব-জীবনে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেয়তর ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? যে ব্যবস্থা বহু শতাব্দীর প্রাচীনতা নিয়েও জরাগ্রস্ত হয় না, যার মধ্যে যাবতীয় বাইরের আঘাতকে প্রতিহত করে নিজের জীবনধারাকে সহজে ও স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত করার শক্তি, যার মধ্যে মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধনের পথে তার সামগ্রিক চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা, তার চেয়ে বাঞ্ছিত ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

কিন্তু বহুকালের মহাপ্রাচীন হয়েও যে জীর্ণ হয়নি, ইংরেজ শাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার প্রাচীনতার মধ্যে জীর্ণতার স্পর্শ ধরা পড়ল। মহাকবির পরিপূর্ণ ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে তার মাহাত্ম্যই শুধু ধরা পড়েনি, তার জীর্ণতাও দৃষ্টিগোচর হল। সেই জীর্ণতার সুযোগে নবীন কালের নগর-সভ্যতার পত্তন হল দেশে। নগর পল্লীর রস শোষণ করতে লাগল। ভারতবর্ষের সনাতন পল্লীসমাজের মধ্যে এতকাল ধরে যে-মন, যে-চরিত্র ছিল, পল্লীসমাজ মানুষকে চরিত্রের যে গড়ন দিত তার ফলে আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত মানবচিত্ত একান্ত সহজে, না জেনেও, না বুঝেও শ্রেয়কে জীবনের কেন্দ্রমূলে প্রতিষ্ঠা দিতে পারত, গৃহস্থ হয়ে সংসারের যাবতীয় কর্মকে কর্মযজ্ঞের মত অনুষ্ঠান করতে পারত।

কিন্তু কালক্রমে মানবচিত্তের মধ্যে সে প্রবাহের খাতে তামসিক আলস্যের ও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বালি জমে তাকে মজা খাতে পরিণত করেছিল। একেই তিনি বার বার আপনার চারিপাশে প্রত্যক্ষ করেছেন। মনের মধ্যে সনাতন সমাজ-মূর্তির জাগরুক ধ্যানের সঙ্গে বাইরের প্রকাশকে মিলিয়ে পারেননি। সমাজের মানবচিত্ত তখন উৎসাহহীন ও অবসন্ন; কর্মযজ্ঞের সে ধারণা তখন মানবচিত্ত থেকে বিলুপ্ত হয়েছে; মানুষ তখন অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, শিক্ষাহীনতায় আত্মমগ্ন; মহৎ ধ্রুব ঐকতানসংগীতের তার থেকে স্খলিত হয়ে জৈব দুর্বুদ্ধির তাড়নায় তাড়িত; প্রাচীনকালের ধ্যান-ধারণা সব ছেঁড়া মালার পাথরের মত ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গিয়েছে। তারই ফলে চিরস্থায়ী

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

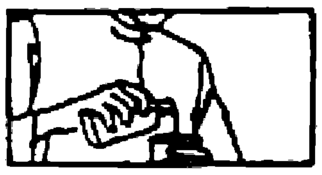

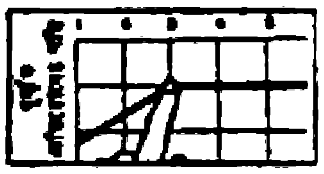

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 3130.

বন্দোবস্তের দ্বারা সৃষ্ট বাংলা দেশের নূতন জমিদার সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি ও জমিদারীর কেন্দ্রস্থল, স্বগ্রামে বসবাস ত্যাগ করলেন; তাঁরা অধিকাংশ জনই তাঁদের ভূসম্পত্তির মুনাফা স্বগ্রামে বাস করে খরচ করেননি; ক্ষেত্রবিশেষে কিছু অংশ খরচ করলেও, তার অধিকাংশটাই নবীন কালের নূতন শহর কলকাতায় বাস করে সেখানেই খরচ করছেন। পল্লীসমাজের মানুষের দেওয়া অর্থ, পূর্বকালের মত, পল্লীতে বাহিত হলো না; বাহিত হল কলকাতায়। অথচ পূর্বকালে এর বিপরীত ঘটত :

'পূর্বে যাহারা বাদশাহের দরবারে রাজ-রাজা হইয়াছেন, নবাবেরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না —সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজ-রাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এই জন্য দেশের অখ্যাত গ্রামেও কোনো দিন জলের কষ্ট হয় নাই এবং মনুষ্যত্ব-চর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই রক্ষিত হইত।'

(স্বদেশী সমাজ : আত্মশক্তি ও সমূহ)

সমাজের যে মূর্তির মধ্যে তাঁর স্বদেশের কল্যাণ নিহিত ছিল, কিন্তু যে মূর্তি তখন বিগতশ্রী, বিগতমহিমা, বিগত-রূপ, সেই মূর্তিরই নব-রূপায়ণ তিনি বার বার কামনা করেছেন। যে-কোন পোলিটিক্যাল সিদ্ধির চেয়ে এই প্রাচীনকে সংস্কার করে নবরূপে তাকেই প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে যে শ্রেয়লাভের সম্ভাবনা সেই কথাই বার বার উচ্চারণ করেছেন। সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর মত-পার্থক্যের মূল কারণ এইখানে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম থেকে তার সঙ্গে সাময়িক ভাবে যুক্ত হয়েও তিনি স্পষ্টভাবে এই পৃথক ও ভিন্ন বার্তা বার বার সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। বিংশ শতাব্দী আরম্ভের সময়েই ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে স্বদেশের মানুষের স্বার্থ ও পরমার্থ লাভের মূল উপায় হিসেবে তিনি তাঁর এই চিন্তা স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করেছিলেন।

এ সব আজ ইতিহাসের কথা। তবু সংক্ষেপে সঙ্গেই বলি, মহার্ষির স্বদেশিকতার এই চিন্তা পরাধীনতার বেদনাবিদ্ধ জাতি স্পষ্টভাবে দেখতেও পারেনি, বুঝতেও পারেনি, গ্রহণও করেনি। সেদিনের পরশাসনের অধীনতা-জনিত যে জ্বালা তাতে জাতির বুঝবার অবকাশ বা মন কোনটাই ছিল না। চিন্তায় ও ভাবনায় যে নির্মল, অনাবিল আকাশে মহার্ষির এই ধ্যান-ধারণা তাঁর কাছে একান্ত স্বচ্ছ ও ধ্রুব বলে ধরা পড়েছিল, পরাধীনতার যন্ত্রণায় জাতির মেঘাচ্ছন্ন চিত্তাকাশে এ লেখার প্রতিবিম্ব পড়তে পারেনি।

সেদিন পরশাসনের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। মানুষের ব্যক্তি-জীবনের ও মানব-সমাজের ধ্রুব ও স্থায়ী কল্যাণের পটভূমিকায় সমস্ত সমস্যাটিকে আবিষ্কার। বিচার ও তার জন্য প্রয়োজনমত প্রবৃত্তির প্রয়োজনে যে ধৈর্য, যে ধীরতা, যে শান্তচিত্ততা, যে শ্রদ্ধা ও যে কর্মনিষ্ঠা প্রয়োজন তার একান্ত অভাব ছিল সেদিন। তাই বা কেন? সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি আছে।

তপন দেবমূর্তির মত সমাজের তৎকালিক মূর্তিকে তিনি পদ্মাবক্ষে বাসের কালে প্রতিদিন দেখেছেন এবং তার প্রতিকারের কথা চিন্তা করেছেন। সামগ্রিক ভাবে দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে প্রতিকার হবে না তাও তিনি বুঝেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যে সাধনা—সাহিত্য-সরস্বতীর সাধনা—যা চিন্তা, মনন, ও সেই চিন্তা ও মননকে রূপদানেই আর পরিপূর্তি—তার সঙ্গে এই প্রতিকারের কাজে কর্মের যোগ না করলেও চলত। কিন্তু মানব-চরিত্রের ও মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা লাভ যাঁর সাধনা, চিন্তা থেকে প্রয়োজনের সমগ্র কর্মে না নেমে তাঁর পরিত্রাণ কোথায়?

মহার্ষির স্বদেশ-চিন্তার মূলে রয়েছে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম। স্বদেশকে তিনি জীবের আত্মা বলে মনে করতেন এবং স্বদেশের সেবা করবার জন্য উদ্বুদ্ধ হবার প্রয়োজন আছে সে কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন।

এই মানসিকতার পটভূমিতে যখন তাঁর পল্লীবাসের মধ্যে প্রতিদিন আশপাশের মানুষের জীবনে যে আত্মিক ও লৌকিক দুর্গতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে তাঁর মনের স্বদেশের দেবমূর্তির অঙ্গে আঘাত লেগেছে বলে অনুভব করেছেন। তাই সেই দেব-অঙ্গ থেকে আঘাত ও আবর্জনার কলঙ্কস্পর্শ দূর করা তিনি অবশ্যপ্রয়োজন জ্ঞান করেছেন। শুধু দেশের বা সমাজের কল্যাণ-সাধন নয়, প্লানিমোচন নয়, নিজের আত্মিক সাধনার সম্পূর্ণতাও নির্ভর করেছে এই কর্মের উপর।

সেই কারণেই শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করার জন্যই শ্রীনিকেতনের পত্তন। শ্রীনিকেতন ভিন্ন শান্তিনিকেতন সম্পূর্ণ হতে পারে না। এসম্পর্কে তাঁর নিজের কথাই উদ্ধৃত করি :

'আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সঙ্কল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সঙ্কীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।

কর্ম উপলক্ষ্যে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লী-বাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্য-গোচর হয়েছে। অশিক্ষার জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কি রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকে অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মেলনের সভাপতি পদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হল। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবি-কল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।'

(পল্লীপ্রকৃতি : শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অভিভাষণ)

এই প্রচেষ্টার মূল স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে তিনি বললেন :

'......রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার প্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে এই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে — আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্যবিধানের প্রতিষ্ঠা।'

(পল্লীপ্রকৃতি : তদেব)

(ক্রমশঃ)

অপ্রেম ও প্রেম

বীরবাহু

গোপনতাই প্রেমের লবণ। তা বিবাহের পূর্বেই হোক বা পরেই হোক। বিবাহ হয়ে গেলে পর বর-বধূর চালচলনে আর ঔৎসুক্য থাকে না। তারা নিজেরাও যেন ক্রমে কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই লবণ প্রয়োগের জন্য নানাবিধ কসরৎ করতে হয়। নব নব উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। মন কষাকষিও। অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকেও পরস্ত্রী বিবেচনা করে নিয়ে চলতে পারলে একটা রহস্যের স্বাদ বজায় থাকতে পারে। প্রণয় তাজা থাকে। নচেৎ আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

কিন্তু আপনার স্ত্রী যে আপনার নিজেরই স্ত্রী—আট আনাই আপনার অর্ধাঙ্গিনী, সে-বিষয়ে কি আপনি সুনিশ্চিত? বিবাহ করে থাকলেও পরের ঘর থেকে সংগ্রহ করেছেন, সুতরাং কিছুটা পরকীয়া ভাব থাকা এমনিতেও সম্ভব। বিবাহ করলে স্ত্রী-পরিচয়, ঘরকন্না করলে ঘরণী তাতে আর সন্দেহ কী। কিন্তু স্ত্রী তো মশাই আত্মীয়তার সামাজিক স্বীকৃতি মাত্র। একসঙ্গে থাকেন খান বসেন শোন সেজন্যই তিনি যে মনে-প্রাণে, হৃদয়ে-আত্মায় আপনার স্বকীয়া,—একচুলও অপরা নন সে-কথা কি হলফ করে বলতে পারেন? তার প্রমাণ বা স্বীকৃতি কি নিঃসংশয়? এমনকি আইনের চোখেও নিজের স্ত্রী যে পর গণ্য হতে পারে সেই জাপানী সমাচারও কিছুকাল আগে আপনারা পড়েছেন। পত্নীকে পাশে নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, দুর্ঘটনা ঘটল—স্ত্রী আঘাত পেলেন। এবং তজ্জনিত চিকিৎসা বাবদ বীমা কোম্পানীর কাছে খরচ আদায় করা হল আদালতের এই রায়ের ভিত্তিতে যে চালক-স্বামীর পাশে থাকলেও স্থানীয় আইন অনুযায়ী স্ত্রী অপরা, অনাত্মীয়া বা বন্ধু সহযাত্রীর মতো ক্ষতিপূরণ সেও পাবে।

সুতরাং আপনি যাকে স্ত্রী মনে করছেন তিনি কোন আইনের বলে আপনার পত্নী, সর্ব অবস্থাতেই আপনার পরমাত্মীয়া—একেবারে অর্ধাঙ্গিনী, হৃদয়-রানী—তা বলবেন কেমন করে? জাপানী বীমা সংস্থার এই বোমা-বিভ্রাট আর পাঁচটা আধুনিকতম রীতি-নীতির মতো এদেশে সংক্রামিত হতে কতক্ষণ? আপনি রেজেস্ট্রী-বিবাহই করুন, অগ্নিসাক্ষী রেখেই বিয়ে বসুন বা কণ্ঠিবদলই করুন তাতে আপনার অধিকারবোধের নিরাপত্তা অথবা পারস্পরিক নির্ভরতার নিশ্চিন্ততা কতটুকু? এবং এভাবে যদি বিয়ে নাই করেন, একসঙ্গে কণ্ঠলগ্নীকৃত হয়ে বসবাস করেন—ঘর-সংসার করেন, তাতেই বা আপনার আটকাচ্ছে কোথায়? একমাত্র সমাজের স্বীকৃতিতে? সে-সমাজই বা কোথায় যেটা আপনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে? সমাজ তো শুধু নিরীহ আর দুর্বলের জন্য। এখন সবটাই আইনের কারবার। সুতরাং ঐ আইনটাই আসল হয়ে দাঁড়ায়। কতকগুলো পার্থিব অপার্থিব সাক্ষীর সংস্কার কতটুকু নির্ভর-যোগ্য? অস্বীকার করলেই বা ধরে রাখছে কে? সে এককালে মশাই গান্ধর্ব-বিবাহেরও গৌরব ছিল। এখন ছাড়াছাড়িই বলুন বা জোড়াতালিই বলুন—সবেতেই ঐ আদালত ভরসা। সমাজ নয়। হৃদয় বা বিবেক তো নয়ই।

সহাবস্থানেই কি হৃদয় সমর্পণের মাপকাঠি? দেহে-মনে-প্রাণে অপরের প্রেয়সী হয়েও পত্নীরা স্বামী হিসেবে আপনাকে গ্রহণ করে নির্দ্বিধায় ঘর-সংসার করতে পারেন। স্বামীরা? আজকাল বিবাহ কেবল-মাত্র চুক্তিনামা হয়ে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রী অ্যান্ড কোম্পানী (লিমিটেড লায়াবিলিটি)। এবং ওর মধ্যেই চুরিচামারি করে কালো-বাজারে যে যা পারে করে নেওয়া। স্বামীরা আজকাল আর ঘরে ফিরে স্ত্রীর স্নিগ্ধ আঁচলের ছায়ায় ক্লান্তি অপনোদন করতে পারেন না। এখন সেয়ানে সেয়ানে কোলা-কুলি। মিলনে বা বিরহে।

তারপরে ধরুন, বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আপনারা আইন করেছেন, মেয়েদের সমান অধিকারের কানুন তৈরি হয়েছে, ভরণ-পোষণের দাবিও স্বীকৃত। ব্যাপারটা কিন্তু একতরফা। যদিচ বলা হয় দুপক্ষের যে-কেউ একজন অপরের নামে সপ্রমাণ নালিশ রুজু করে দিলেই তালাক সিদ্ধ। তা না হয় করলেন, কিন্তু মিলনের বেলায়? একজনের চরম আগ্রহ সত্ত্বেও যদি অপর পক্ষ গররাজি হয়, তাহলে তাকে ধরে রাখবার আইন কই? কার দিকে তাকাবেন আপনি? স্ত্রীর বেলায় যেমন সুযোগ স্বীকৃত, স্বামীর বেলায় তা কোথায়? ওইজন্যেই তো কদাচিৎ প্রেমিক-প্রেমিকার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে আবেদন জানিয়েছিলেন—তাঁর মানবিক অধিকার—হিউম্যান রাইটস বজায় রাখতে।

মহিলারা স্বামীদের কাছে যে মর্যাদা বা সুবিধা আইনত পেয়ে থাকেন, মহো-দয়েরা স্ত্রীদের সকাশে তা পান না—তা আপনারা যতই সমমর্যাদার দোহাই দেহাই দিন বা কেন। হায়দ্রাবাদ-রাজ্যসভায় সেদিন এই প্রশ্নটাই উঠেছিল। পুরুষ সদস্যদের স্ত্রীরা চিকিৎসাদির যেমন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন, মহিলা সদস্যদের স্বামীরাও তা পাবেন কিনা। কিন্তু দেশাচার যা তাতে বিধি স্ত্রীকেই স্বামীর আশ্রিতা হিসেবে গণ্য করা। স্ত্রী রোজগেরে হলেও স্বামী তাঁর আশ্রিত নন। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর বরাত—বিবাহ বা বিচ্ছেদ-নির্বিশেষে,—এমনকি বিবাহের পূর্বেও। বিচ্ছিন্নমনা পত্নীরা স্বাবলম্বিনী চাকুরিজীবিনী হলেও স্বামীর—ভূতপূর্ব স্বামীর কাছ থেকে ভাতা আদায় করে থাকেন। তাঁরা গাছেরও খান তলারও কুড়োন। স্বামী কি বিচ্ছেদবাঞ্ছিনী পত্নীর কাছে আইনত ভরণপোষণ দাবি করতে পারেন? বেকার হলেও?

অথচ আপনি আমি প্রতিটি বিবাহিত ব্যক্তিই একথা হাড়ে হাড়ে মর্মে মর্মে জানি যে স্বামীরা প্রকৃতপক্ষে কি প্রকারে স্ত্রীদের আশ্রয়েই কায়ক্লেশে কালাতিপাত করে থাকি। 'বিবাহিত হইলেও কী করিয়া সুখী হওয়া যায়'—

how to be happy though married

সকলেরই সমস্যার বিষয়। অন্ধ স্ত্রী এবং বধির স্বামীই (মন্টেনের মতে) নাকি সুখাবহ এবং আদর্শ জুটি। কিন্তু অধুনাতন স্বামীদের কেবলমাত্র বধির হলেই চলে না, অন্ধ এবং মূকও হতে হয়। এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এর কোনোটাই প্রযোজ্য নয়। সেই বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র স্মরণ করুন: স্ত্রীর মুখ হাত পা বেঁধে পাশের চেয়ারে রেখে স্বামী নির্বিকার চিত্তে সংবাদপত্র পাঠ করছেন, নিচে পরিচিতি লেখা আছে—এ ত অন্ধ—একটি দিনের ছুটি। অথবা সেই চীনা কৌতুক-কাহিনী: স্ত্রীদের অত্যাচার থেকে কী উপায়ে রক্ষা পাওয়া সম্ভব তার কার্যক্রম প্রস্তুতির জন্য স্বামীদের সমবেত সভায় সহসা পত্নীদের আকস্মিক আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত পতিকুল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলেন, কিন্তু দেখা গেল কেবলমাত্র একজন নির্ভীক বাহুবদ্ধ হয়ে উপবিষ্ট আছেন। কিছুক্ষণ বাদে স্বামীরা ফিরে এসে এই বীরকে মালা-ভূষিত করবার জন্য কাছে গিয়ে দেখেন তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত। এখনও নাকি লণ্ডনে বর-কনেদের সংসার-সুখ প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে জ্ঞান বিতরণের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এতদ্দেশে আমাদেরও নাকি নবদম্পতিকে একবার পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ঘুরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। হয়ত পারিবারিক বিকেন্দ্রায়িতের সঙ্গেই বাৎস্যায়নের এরটিক নবমূল্যায়ন। আশা করছি তাঁরা যথাসময়ে একটি বিধি বা ফর্মুলা তৈরি করে দেবেন, যদিও

ওনাদের 'আভরণে' আর আবরণ কেন যে চালু হচ্ছে।

মধ্যবিত্তদের প্রধান কামনা বা মূল বিত্তে সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য। উত্তম আহার ও অবাধ বিহার। এই কামনারই তারতম্য পকেটভর্তি হুমহু—অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-সই স্বামী সংগ্রহ যেমন একদিকে চিরকালীন ব্যাপকতায় চালু, অন্যদিকে তেমনি মহিলা পকেটকাটাদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। মহিলাদের একটি সুবিধা আছে, কারো গায়ে হেলে পড়লে অবহেলিত হন না। বিগলিত হয়ে ওঠেন আপনারা। সেই সুযোগে পকেটে হাত চালানোটা কোনো সমস্যাই নয়। বেকায়দা দেখলে স্রেফ চীৎকারমাত্রই বহু 'ভদ্রলোক' এখনো স্বভাবতই জমায়েৎ হয়ে যান। এইসব সুযোগ থাকায় সম্ভবই বোধকরি মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি চতুর বা স্মার্ট হয়ে থাকে। লৌকিক চলনে বললে তো বটেই। এবং নীরদ চৌধুরীরা এই চক্রান্তকে যাহা বলব্য তাহাই সোনা জেনে আধুনিকা পত্নীপ্রধানদের প্রতিষ্ঠিত পণ্ডশ্রম হন এবং যুবক বেচারাদের করেন নস্যাৎ। ঘটেও তেমনি সব কাণ্ড। এই তো সেদিন শুনলেন দিল্লীর রাস্তায় একটি মেয়ে জহুরী কায়দায় কনুই অভিনয় এক অসাবুত ভদ্রলোকের ধাক্কিত্বে ফেলে তদন্তরে যাবার পথে তাঁর পকেট থেকে চার হাজার টাকা মেরে নিলেন। টাকা মেরে নেবার প্রবৃত্তি অবশ্য বলতে পারেন—নারী-মাত্রই মজ্জাগত, তা সে কাজে অথবা যে উপলক্ষ্যেই হোক। এককালে নারীদের স্বাতন্ত্র্য আর ছিল না বলে সংসার খরচ থেকে কিছু টাকা সরিয়ে সঞ্চয় করে রাখবার প্রবৃত্তি থেকেই এর সূত্রপাত। বুদ্ধিমান স্বামীরা তাই বেতনের টাকাটা এনে আগাগোড়াই স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা স্বামীকে হাতখরচ বাবদ তার থেকে কিছু টাকা দান করেন। যে বাড়ির গিন্নীর আঁচলে যত বেশি চাবি, সে-বাড়ির সাংসারিক শান্তি তত বেশি পরিমাণে উজ্জ্বল। অপরদিকে প্রেমিকমাত্রেই জানেন তাঁর পকেটের সঙ্গে প্রেমিকার সম্পর্ক কী পরিমাণ ঘনিষ্ঠ। প্রেম এবং পার্স নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের মতই অবিচ্ছিন্ন।

সেকালের কথা আপনারা শুনতে পান, নারীজাতির প্রতি অত্যাচার কী মর্মান্তিক ছিল। মহিলাদের না ছিল সামাজিক মর্যাদা, না ছিল পারিবারিক গৌরব। পুরুষের পুতুল হিসেবে তাঁরা বেঁচেছেন। স্বামীরা থাকতেন বৈঠকে ফুর্তিতে মত্ত, স্ত্রীরা অন্দরে অবহেলায় ম্রিয়মান। সেই কথা মনে রেখে নারীরা সম্প্রতি জেগেছেন। অথবা জেগেছেন। এবং বোধ করি তারই বদলা নিতে বদ্ধপরিকর। (যদিও পরিকরটি তাঁরা আর আজকাল বন্ধ করেন না, আবার অনিবদ্ধও আপনি বলতে পারবেন না—এমনই কায়দা। যাঁশচ, এ-ব্যাপারেও নজির কিছু সেকালে।) বলুন তো, এটাই সেকালের সমাজের সর্বৈব চেহারা ছিল কিনা? এবং একালের চেহারাটাই বা সেকালের তুলনায় কত বেশি উজ্জ্বল? কিছু পরিমাণ লোক—বড়লোক ছোটলোক—বেলেল্লাপনা করতেন। সেকালেও করতেন, একালেও করেন। এবং বহুবিবাহ বা বৈধব্যের কথা মনে রেখেও বলুন তো সাধারণভাবে কটা গৃহিণীর অসম্মানের অমর্যাদায় আসন ছিল? স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে হাল ধরেছেন, স্বামী বাহির সামলেছেন, স্ত্রী অন্দর। যৌথ পরিবারে সকলে মিলে সংসার গড়ে তুলেছেন। অসহায়া নারীদের সংখ্যা কখনো বেশি থেকেছে কখনো কম। আর্থিক শাসকেই আমরা এর কারণ বলে জেনে রেখেছি। কিন্তু আর্থিক সুখ-সুবিধা পেয়েও বা আজকালকার সমাজের চেহারাটা এমন বেশি কী উজ্জ্বল? তফাৎটা খুব বেশি নয়—বেলেল্লাপনাটা মার্জিত রূপ নিয়েছে মাত্র। তখনকার দিনে বিন্দুমাত্র আভাসেই নারীদের সতীত্ব যেত—শুধু সমাজের চোখে নয় নারীর নিজের চোখেও। এখনকার দিনে কোনো অবস্থাতেই সতীত্ব লোপ পায় না—সমাজ (যদি থাকে বা মানা হয়) বা নারী কারো চোখেই নয়। শুচিতা নাকি দেহে আর নেই, মনে। এবং নারীর মন 'দেবা ন জানন্তি'।

পুরুষের স্বাধীনতা বা বিশেষ স্বভাবতই যে নারীর চেয়ে বেশি এবং বরাবরই তা থাকবে, সে-কথা বোধ করি ওনারাও মনে-প্রাণে জানেন। কেবলমাত্র গায়ের জোর বেশি বলেই নয়, সৃষ্টিরই নিয়ম। সে-নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ছটফট করেও ওনারা—আধুনিকা প্রগতিশীলারাও দেখতে পাই অর্থে প্রতিপত্তিতে বলীয়ান স্বামীদেরই কামনা করে থাকেন। এমন যদি হয় বলতেন হতেন গতানুগতিক ঘটকী বিবাহব্যাপারে, এখন স্বয়ংবৃতা হন ভেবেচিন্তে, দেখেশুনে। কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন যে, বিমান-সেবিকারা নাকি ব্যবসায় সংস্থার কর্মকর্তাদেরই স্বামী হিসেবে বেশি পছন্দ করেন। রাজনৈতিক নেতারাও নাকি মন্দের ভাল,—অন্তত বিপদে পড়লে বাঁচাবার ক্ষমতা থাকে। ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ভ্যানিটি ব্যাগের পক্ষে উপকারী, অন্য সব দিকেও সুভাবনাকী। সরকারী কর্মচারীদের আসন সবার পিছে। এটা শুধু বিমান-সেবিকাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। তাবৎ যুবতীকুলেরই সংবিধান। একসময় আই সি এস-জাতীয় পাত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। তারপরে এল ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার। অধ্যাপক বেচারাদের কস্মিনকালেও কোনো স্থান নেই। এখন তো পাত্র জুটিয়ে বিয়ে দেবার রীতি লোপ পাচ্ছে, বিশেষ করে আলোকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে। তাঁরা মেলামেশার মধ্য দিয়ে বাছাই করেন। বিজ্ঞাপন কেটার। ওদের বর্ণমালাতেও দেখুন 'এল' অক্ষরের পরে 'এম',—এলেমের খেলা,—আগে 'লভ' পরে 'ম্যারেজ'। বাংলাভাষায় 'ব'-এর পরে 'ভ', অর্থাৎ বিবাহের পরেই ভালবাসার অভ্যুদয়। [illegible]। কিন্তু আজকাল সেটাও উল্টে গেছে। বর্ণমালায় 'ব'-এর আগে তো 'প' আছে। অর্থাৎ প্রথমেই প্রেম। কিন্তু 'প' আর 'ব'-এর মাঝখানে একটা 'ফ' আছে, সেটাই ফাঁসাদ। গোলমাল বাধায়, ফয়সালা হয় না। ফ্লার্টেশন থেকে ফাঁস পর্যন্ত এর গতিবিধি।

পুরুষদের প্রতি আপনারা যতই নির্দয় হোন না কেন, মেয়েদের সঙ্গে সম্বন্ধ-সম্পর্ক ব্যাপারে যতই তাঁদের দোষ ধরুন না কেন, তাঁরা কিন্তু নির্বিকারচিত্তে প্রেম-ভালবাসা প্রতিজ্ঞার দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। দু-চারটে ক্ষেত্রে মেয়েদের পথে-বসানোর যে দৃষ্টান্ত আপনারা দেবেন, সেইসব পাষণ্ডদের (এবং পাষণ্ড এমন একটি শ্রেণী যার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই) হিসেবের মধ্যে ধরেও বলা যায় আসলে ব্যাপারটা নির্ভর করে মেয়েদেরই উপরে,—আধুনিকাদের তো বটেই। তাঁরাই পথে বসেন এবং বসান। আপনি আমি নিমিত্ত মাত্র। ব্যর্থ প্রেমিক একক জীবনের দুঃখ বরণ করে নিয়েছে বহু, তার হাজার ভাগের এক ভাগও দেননি ব্যর্থ প্রেমিকারা,—স্বনিষ্ঠরা হলেও না। তাঁরা বাস্তবপন্থী। বাস্তব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখবামাত্র অম্লানবদনে প্রেমিক বদল করে নেন। ছেলেরা এরকিম্বং বুকে ছুরি মারার কাণ্ড ঘটালে আপনারা তাদের বর্বর বলবেন, গুণ্ডা বলবেন। কিন্তু এহেন কর্ম করে ওনারা যখন নির্বিকার থাকেন, পতিপরায়ণা সতী হন, তখন বোধহয় কুকুর এবং মুগুরের তুলনায় বাহবা দেবারই রীতি আপনাদের। মেয়েদের নাকি 'অবলম্বন' না হলে চলে না, জীবন মসৃণ ও নিরাপদ হয় না। সেটা এই সমান শিক্ষা-চাকরি-অধিকারের যুগেও আপনাকে আমাকে দেখতে হচ্ছে, মানতে হচ্ছে। বেচারা পুরুষের দল,—তাঁরা তো আর চোখের জল ফেলে চিত্ত জয় করাতে পারেন না। দুর্বলতা দেখাতে পারেন না। প্রেম-ভালবাসায় ন্যাকামো তাঁদের জন্য নয়। ন্যাকামো বলুন, প্যাকামো বলুন, আর ঠ্যাকামো বলুন,—সব উত্তমাঙ্গিনীদের। অধমাঙ্গরা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবেন, অর্থ উপার্জন করবেন,—'জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন'। আত্মোৎসর্গ তাঁদেরই করণীয়।

একবার আপনারা ভদ্রলোকদের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করে দেখুন। সেই 'সেকাল অবধি একাল পর্যন্ত' তাঁরা কেবল বাইরের জগতেই ঐহিক দৈহিক আর্থিক পারমার্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে বেড়ালেন। ঘরের হৃদয়ঘটিত নহে তার তরে। প্রীতি-পরিবেশে মশগুল থাকলে তাঁর পুরুষত্ব থাকে না,—ঘরকুনো মেনিমুখো অপবাদ হয়। শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে নরেন মিত্তির—সকলেই মেয়েদের দুঃখে কাতর। তবু তাঁরা না ছিল। তবু মহিলাজন উঠলেন না ছেড়েছুঁড়ে। আর পুরুষ পুরুষই থেকে গেল। তা যাক। আসুন, আমরা না হয় কং-কথিত সুসমাচারের শান্তিবারি ছিটিয়ে যাই.—

'The love problem is part of mankind's heavy toll of suffering, and nobody should be ashamed that he must pay his tribute'.

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পর্ব

(২)

সাগরকে খাওয়াতে আমার খুব ভাল লাগে। মনে শান্তি পাই। ও যেদিন আমাদের এখানে বা পিসীর কাছে খায় না, বাইরের হোটেল-রেস্তোরায় কিংবা গেস্ট-হাউসে খায়, সেদিন মনে মনে অস্বস্তি বোধ করি। সেদিন আমি নিজেও ভাল করে খেতে পারি না। খাই না। আমি জানি, আমি বেশ বুঝতে পারি বাইরের হোটেল-রেস্তোরায় খেতে ওর ভাল লাগে না; পছন্দ করে না। বিরক্ত বোধ করে, ঘেন্না করে। তবু খায়। জোর করে খায়। না খেয়ে উপায় নেই বলে খায়। পেটে খিদে লাগলে খেতেই হয়।

মানসীর কথা ও আমাকে বলে না। বলতে পারে না। আমিও জানতে চাই না কিন্তু মাঝে মাঝেই মাগোর কথা বলে। মাগো কিভাবে আদর-যত্ন করে খাওয়াতেন, সে-কথাও বলে। বলেছে। বহুদিন। আমিও জিজ্ঞাসা করি, জানতে চাই।

'কোন রান্না করে মাগোর মনে একটু সন্দেহ হলেই আর আমাকে খেতে দিত না...

আমি জানতে চাইলাম, কেন?

'মাগো হয়ত ভেবেছে ঝাল বেশী হয়েছে অথবা মাছটা ঠিক তত টাটকা নয়...

সাগরও চুপ করে থাকার ছেলে ছিল না, মাগো আমাকে মাছ দেবে না?

একটু কাতর মুখে মাগো বলতেন, না, তুই আর আজকে মাছ খাস না।

'কেন?'

'মাছটা বোধহয় ভাল না। তাছাড়া...

'তাছাড়া আবার কি?'

'ভুল করে বেশী লঙ্কা দিয়ে ফেলেছি।'

সাগর হাসতে হাসতে বলত, মামার পাতের ধারে তো কাঁটা পড়ে আছে। মামা খেতে পারল আর আমি পারব না?

'না।'

সাগর তর্ক করলেও মাগো দিতেন না।

সাগরের মুখেই এইরকম ঘটনা আরো কত শুনেছি। তাছাড়া ওর ডায়েরীতে আরো কত পড়েছি। মাগোর সেই মানিক কি হোটেল-রেস্তোরায় খেতে পারে? খেয়ে পেট ভরে? নাকি তৃপ্তি পায়?

মাগো মারা যাবার পর ওকে নিশ্চয়ই আর কেউ তেমন আদর-যত্ন করে খাওয়ায়নি। মাগোর মত যদি আর কেউ ওকে ভালবাসত তাহলে জানতে পারতাম। ওর কাছেই শুনতে পেতাম অথবা ডায়েরীতে পড়তাম।

মাগোর মত আদর-যত্ন করে খাওয়াতে আমি পারি না। পারব না। পারা সম্ভব নয়। আমি চেষ্টাও করি না। আমি আমার মতনই চেষ্টা করি। আমি জানি ও ঝাল খেতে পারে না আমি জানি প্রতাপ সিংকে বলে দিলেই ও ঝাল কম দিয়ে রান্না করবে কিন্তু তবুও ঠিক স্বস্তি পাই না। নিশ্চিন্ত হতে পারি না। রান্নার ব্যাপারে আমাকে এত মাথা ঘামাতে দেখে প্রতাপ বলে, দিদি, আপ কিউ এতনা তকলিব উঠাতা হ্যায়? বাঙালীর বাড়ীতে কাজ করে আমি তো অন্য রকম রান্না প্রায় ভুলেই গেছি।

ও ঠিকই বলে। তবু আমি বলি, এমনি তো কোন কাজ নেই তাই রান্না করতে ভালই লাগে।

সাগরকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কদিন আগে পিসীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পিসী বলল, সাগর আজকাল বড় বেশী পরিশ্রম করছে।

আমি খুব বেশী সমবেদনা না দেখিয়ে বললাম, হ্যাঁ। তাইত মনে হয়।

'এত সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ে যে, ব্রেকফাস্ট খাওয়াও হয় না।'

'কিছুই খান না?'

'অত সকালে কে ওকে ব্রেকফাস্ট দেবে?'

আমি চুপ করে কফি খেতে খেতে পিসীর কথা ভাবছিলাম। আমি চুপ করে আছি দেখে পিসীই আবার প্রশ্ন করল তুই কি ওকে দুপুরে খেতে বলিস?

'বলেছি তো কিন্তু সপ্তাহে দু-একদিনের বেশী তো আসেন না।'

কফির কাপ মুখে তুলতে গিয়ে পিসী বলল, কেন? শহর থেকে তোদের বাড়ী আসতে আর কমিনিট লাগে?

'রোজ তো শহরের দিকে যান না।'

কফি খেয়ে অন্যান্য কথাবার্তার পর পিসী বলল, সাগরকে দেখলে মনটা বড় খারাপ লাগে।

আমি কিছু না বলে শুধু পিসীর দিকে তাকালাম।

'ছেলেটা সত্যি বড় লোনলি।'

'হ্যাঁ।'

'একলা থাকতে থাকতে ছেলেটা কেমন হয়ে গেছে, তাই নারে?'

'ঠিক বলেছ।'

'একটু আদর-যত্ন করলে ভীষণ খুশী হয়...

আমি মাঝপথেই বললাম, তোমার আদর-যত্নে খুশী হবে না?

'তা না। তবে ওকে আদর-যত্ন করতে ইচ্ছা করে।'

পিসীর মত আমারও ইচ্ছা করে। ভাল লাগে। প্রতাপ সিং আমাদের দুজনের খাবার-দাবার দিয়ে চলে গেল। আমি ওর কোয়ার্টার প্লেটে আরেকটা মাছ ভাজা তুলে দিতেই ও বলল, কি ভেবেছেন বলুন তো?

'কেন? কি হলো?'

'এত মাছ খাওয়া যায়?'

'এত কোথায়?'

ও মাছের ঝোল আর মাছভাজা দেখিয়ে বলল, দুটো ভাজা মাছ, দুটো ঝোলের মাছ খাওয়া যায়?

আমি কথাটা ঘুরিয়ে বললাম, কেন আমার হাতের রান্না কি আপনার ভাল লাগে না?

'না, না, তা বলছি কোথায়?'

'সোজাসুজি বলতে পারছেন না বলেই তো...

আমার কথা শেষ হবার আগেই সাগর বলল, আপনি কটা মাছ নিয়েছেন?

শুধু আজ নয়, খেতে বসে সবসময় ও এইরকম তর্ক করে। প্রথম কয়েকদিন তর্ক করেনি। নিশ্চয়ই লজ্জা করত কিন্তু ইদানীং বেশ তর্ক করে।

'আজকাল খেতে দিলেই আপনি এইরকম তর্ক করেন কেন বলুন তো? আমাকে দেখলেই কি আপনার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়?'

কথাগুলো আমি ঠাট্টা করে বললেও ও চিন্তিত না হয়ে পারল না।

'ছি ছি! ওকথা বলবেন না।'

'তাহলে চুপটি করে খেয়ে নিন।'

'এত খেলে কাজ করা যায়?'

'এখন আবার কি কাজ?'

সাগর একটু হাসল, একটু কাজ আছে।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে দুজনেই খেয়ে নিলাম। খেয়ে উঠে সাগর সিগারেট ধরাল। একটা টান দিতে না দিতেই বলল, মাই গড! একেবারে ভুলে গেছি!

পুরী / ফটো : কৌশিক রায়

'কি হলো?'

'রেজিডেন্ট অফিসারের সঙ্গে তিনটার সময় দেখা করার কথা কিন্তু একেবারেই মনে ছিল না।'

'টেলিফোন করে দিন না!'

সিগারেটে একটা টান দিয়েই ও বলল, ঠিক বলেছেন।

সাগরকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। ও রিসিভার তুলে নম্বর চাইতেই আমি একটু কাজ সারতে ভিতরে গেলাম। ফিরে আসতেই দেখলাম ও রিসিভার নামিয়ে রাখছে।

'কি টেলিফোন করা হলো?'
'হ্যাঁ।'
'তবে এত চিন্তা করছিলেন কেন?'

'এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে না যাওয়াটা খুব খারাপ।'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। ও আমার দিক থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে একবার ঘরের চারপাশে ঘুরিয়ে নিল।

'কি দেখছেন?'
'আপনার ঘর।'
'তা দেখবার কি আছে?'

সাগর একটু মুচকি হাসি হাসল, না দেখবার কিছু নেই, তবে...
'তবে কি?'

'এত সুন্দর ঘরে এলে আর যেতে ইচ্ছা করে না।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম বেশ তো। আপনি এখানেই একটু বিশ্রাম করুন।

'এই ঘরে কি একটু বিশ্রাম করা যায়?' কথাটা বলেই সাগর কেমন করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'একটু কেন? একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকুন।'

'সন্ধ্যার পরেও যদি যেতে ইচ্ছা না করে?'

কথাটা শুনে মজা লাগল। আমিও বললাম, যাবেন না।
'তারপর?'
'তারপর আবার কি?'
'তারপরেও যদি না যাই?'

আমি নির্বিকার হয়ে বললাম, থাকবেন।

সাগর একটু ভাবল। মাথা নীচু করেই বলল, ধন্যবাদ।

সাগর সত্যি একটা বিচিত্র ছেলে। আমি এখন এই বাড়ীতে একলা। বাবা অফিসে, প্রতাপ সিং গ্রামের লোকজনদের দেখাশুনা করতে গেছে। ও যদি আমাকে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরত, আদর করত, তাহলে কেউ জানতে পারত না। আমি সম্মতি না দিলেও আপত্তি করতাম কিনা জানি না। তবে একথা ঠিক সেকথা কাউকে বলতে পারতাম না। বলতাম না। এমন পরিস্থিতিতে অন্য কেউ হলে কি করত কে জানে? কেন, ছোড়দার বন্ধু বিমলদা?

আমি বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে আছি। পরীক্ষার সময় মা কলকাতায় ছিলেন কিন্তু হঠাৎ বাবার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাওয়ায় ডিগবয় চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে আমিও দাদু-দিদিমার কাছে যাব। এমন সময় বিমলদা কলকাতায় এলেন। মণিদা ওর মালপত্র তুলে বাইরের ঘরে বসতে দেবার পর আমি গেলাম।

'কি বিমলদা কেমন আছেন?'

বিমলদা আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি কেমন আছ?

'ভাল।'

'তুমি তো বেশ বড় হয়েছ?'

'বড় হব না? আমার বয়স কি কম হলো?'

উনি হাসতে হাসতে বললেন, তুমি তো এখন একটা চার্মিং ইয়ং লেডী।

আমিও হাসতে হাসতেই জবাব দিলাম, ইউ থিংক সো?

উনি ডান হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত মুঠোর মধ্যে ধরে বললেন, অফ-কোর্স!

বাস! ঐ পর্যন্ত।

পরের দিন আমি, ছোড়দা আর বিমলদা বসুশ্রীতে সিনেমা দেখতে গেলাম। একধারের পরপর তিনটে সীট। আমি প্যাসেজের ধারে বসলাম। বিমলদা মাঝখানে, ছোড়দা ওধারে। সিনেমা শুরু হবার পর বিমলদার হাতটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। কিছু মনে করলাম না কিন্তু ইণ্টারভ্যালের পর পপকর্ণের প্যাকেট এগিয়ে ধরার কায়দা দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। ভাবলাম পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখতে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে এমন হতেই পারে।

পরের দিন বিমলদা খুব সকালে বেরিয়ে গেলেন। দুপুরবেলা যখন ফিরে এলেন, তখন প্রায় আড়াইটা বাজে। একই সঙ্গে খেতে বসলাম। আমাদের খাবার পর মণিদা খেতে গেল। বিমলদা আর আমি বাইরের ঘরে বসে গল্প করছিলাম। মণিদা খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরের ঘরে আসতেই উনি বললেন, মণিদা আমার একটা কাজ করে দেবে?

মণিদা জানতে চাইল, আমার দ্বারা হবে তো?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা টেলিগ্রাম করতে হবে।'

'তা পারব না কেন?'

বিমলদা একটা সাদা কাগজে টেলিগ্রামটা লিখে ওকে বুঝিয়ে দিলেন, এই কাগজটা আঠা দিয়ে টেলিগ্রামের ফর্মে লাগিয়ে দিও।

'আচ্ছা।'

মণিদার হাতে ঐ কাগজ আর টাকা দিতেই চলে গেল।

মণিদা বেরিয়ে যাবার পর পরই বিমলদা একটা সিগরেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। বেশীক্ষণ না, কয়েক মিনিট। তারপর আমার পাশে বসে একটু খোস-গল্প শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ আমার হাতটা ধরে টান দিয়ে বললেন, অতদূরে বসেছ কেন? ভাল হয়ে বসো।

আমার একটু খটকা লাগল, ঠিক হয়েই তো বসেছি।

বিমলদা নিজেই এগিয়ে এলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে দু হাত দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে আমাকে টেনে নিলেন।

আমি ও'র হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, আঃ কি করছেন?

আর কি করছেন? বিমলদা জোর করে টেনে নিয়ে আমাকে একবার 'কিস' করলেন।

আমি একথা কাউকে বলিনি। বলতে পারি না কিন্তু কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এমন ঘটনা অনেক শুনেছি। মনে হয় মেয়েদের চাইতে পুরুষদের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তি অনেক বেশী প্রবল।

সাগরকে যত দেখছি, আমি তত বেশী আশ্চর্য হচ্ছি। আমি গেস্ট হাউসে ওর ঘরে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করেছি। আমাদের বাড়ীতেও শুধু দুজনে বসে বসে কত কথা, কত গল্প হয় কিন্তু একটি দিনের জন্যও ও আমার হাতটা চেপে ধরেনি। বলতে গেলে আমাকে স্পর্শই করেনি। গাড়ীতে দু-একবার হঠাৎ হাতে হাত লেগে গেছে। ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। বলেছে, সরি।

আমি ওকে যত অনুরোধই করি না কেন, ও কিছুতেই আমার ঘরে বিশ্রাম করে না, করবে না। তাই তো ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন বাইরের ঘরে যাওয়া যাক।

অনুরোধ করে কোন লাভ নেই জেনেও হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একটু বিশ্রাম করুন না।

সাগর হাসল। 'আর লোভ বাড়িয়ে দেবেন না।'

ড্রইংরুমেই গেলাম। ও যথারীতি আমার সামনের সিঙ্গল সোফায় বসল।

ও সিগরেট ধরাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পিসীদের ওখানে যান না কেন?

'কে বলল যাই না?'

'পিসীই বলছিল।'

'যাই না বলতে পারেন না। বলুন কম যাই।'

চার-পাঁচদিন পরে একবার যান।'

সিগারেটে বেশ জোরে টান দিয়ে বলল, তাতে আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

'তার মানে?'

'রোজই টিফিন কেরিয়ারে করে কিছু না কিছু এসে যায়।'

আমি এ খবর জানতাম না। হাসলাম। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

আমি এবার ওর কাজ-কর্মের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি শুধু ইন্টারভিউ নিচ্ছেন?

'না। নানা জায়গা থেকে নানারকম খবর জোগাড়ও করছি।'

'এইরকম ব্যস্ত কতদিন থাকবেন?'

'আরো সপ্তাহ দুয়েক।'

'তারপর?'

'তারপর ঐসব এ্যানালিসিস করতে হবে, রিপোর্ট তৈরী করতে হবে।'

'তার মানে কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন?'

'না, না, এখনও অনেক বাকি।'

এবার জানতে চাইলাম, আমার ইন্টারভিউ কবে নিচ্ছেন?

'যেদিন দুজনেই ফ্রি থাকব।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে না আপনি কোনদিন ফ্রি হবেন।'

সাগর হাসি মুখে জানতে চাইল, খুব তাড়াতাড়ি ইন্টারভিউ দিতে ইচ্ছা করছে?

'শুধু আমার ইচ্ছা নয়, আপনারও কর্তব্য আমার ইন্টারভিউ নেওয়া।'

দুজনেই হাসলাম।

সাগর বলল, ঠিক আছে। কালকের দিন বাদ দিন। পরশু দিনই ইন্টারভিউ হবে।

'ঠিক আছে।' আমি খুসী হলাম। 'আপনি কখন আসবেন?'

'আপনিই বরং গেস্ট হাউসে চলে আসবেন।'

'এখানে এলেই তো ভাল।'

'গেস্ট হাউসে আসতে আপত্তি আছে?'

'না, না, আপত্তি কি থাকবে?'

সাগর খুশী হলো। 'সকাল সকাল আসবেন। আপনার হাতে যেন মাঝে মাঝে চা পাই।'

আমি হাসলাম। বাপো আর মাসীর রাজত্বকালে ও অনেক বিলাসিতা করেছে। এখন সেসব কিছুই নেই। সব ছেড়ে দিয়েছে। মেনে নিয়েছে কিন্তু ঘুম ভাঙার পরই নিজের হাতে চা তৈরী করে খেতে আজও ওর দ্বিধা। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হয়ত স্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙার পরেও বোধহয় স্বপ্নের রেশ কাটে না। তাই তো নিজের হাতে চা তৈরী করে খেতে ওর এত কষ্ট।

'আচ্ছা।'

(ক্রমশঃ)

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অসাধারণ উপন্যাস
নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে
[১৫·০০]
প্রকাশিত হয়েছে
রূপরেখা ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

সংবাদের চোখে

দরজা খোলার অপেক্ষাতেই আছি : প্রফুল্ল রায়

লেখক হয়ে জন্মেই তো কেউ আর লেখক হয় না, আমিও ছিলাম না; কোন বাসনাও ছিল না হওয়ার। কিন্তু একদিনের একটা ব্যাপারেই মাথায় কেমন কি চেপে গেল। আমার সব ব্যাপারটাই কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। কথা ছিল, বাবা চেয়েছিলেন, আমি ইঞ্জিনিয়ার হব। হয়ে গেলাম সাহিত্যিক। আর এই উলট্পালটের জন্য যিনি দায়ী তিনিও একজন সাহিত্যিক।

তখন প্রেসিডেন্সীতে পড়ি। বাহান্ন-তিপ্পান্ন সাল। থাকি ভবানীপুরে। আমার এক বন্ধু লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস একটা ম্যাগাজিন বার করেছিল—মর্মবাণী। স্কুল বা কলেজে কোথাও কোনদিন কোন ম্যাগাজিনে লিখিনি। অথচ লক্ষ্মণের অনুরোধে ওর কাগজে বুক রিভিউ সেকশনটার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হল। ঐ কাগজের সুবাদেই মাঝে মাঝে যেতে হোত ঐ সাহিত্যিকের বাসায়। উনিও থাকতেন ভবানীপুরে।

নানা ধরনের গল্প হোত। হোত বিশেষ করে পূব বাংলার আলোচনা। ঢাকার কথা। বাহান্ন সালেই চিরদিনের জন্য দেশ ছেড়ে চলে এসেছি। অথচ যে দেশে আমার সমস্ত শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম দিনগুলি কেটেছে, তাকে ভুলি কি করে! আপাদমস্তক আমি যে বাঙাল।

মজার ব্যাপার আমার জন্ম কিন্তু ডায়মন্ডহারবারে। আমার দেশ ঢাকা-বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গাঁয়ে। বাবা (শ্রীপরেশনাথ রায়) খুব অল্প বয়সেই এ বাংলায় চলে এসেছিলেন—জীবিকার প্রয়োজনে। শেষ পর্যন্ত ডায়মন্ডহারবারে একটা ছোটখাট ব্যবসাও ফেঁদেছিলেন। আর ঠিক সেই সময় ঊনিশ শো চৌত্রিশে আমার জন্ম হোল।

তিন বছর বয়সেই আমায় মামাবাড়ীতে পাঠিয়ে দেন বাবা। আমার মামাবাড়ী বাসাইল, বজ্রযোগিনী থেকে মাইল কুড়ি। বলতে গেলে দিদিমার কাছেই আমি মানুষ হয়েছি।

ছেলেবেলায়, খুব তখন ছোট, সঙ্গী ছিল দুটি—একটা সোনালী গোসাপ আর বাজেপোড়া তালের মাথায় বসা একটা শঙ্খ চিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই হোল তিন। 'কেয়াপাতার নৌকো'র যুগলকে মনে আছে? বিয়ের পর দ্বিরাগমনে গিয়ে তিন বছর যে শ্বশুরবাড়ীতে কাটিয়েছিল। আসলে ওর নাম হরি। হরি একটা জিনিস। কিই বা তখন ওর বয়স। অথচ ও চিনত না এমন কোন গাছ, পাখী, ফল, ফুল আমি অন্তত দেখি নি। সব ওর জানা, সব ওর পরিচিত।

নিকটেই 'সাপ্তাহিক' বিভাগে সংবাদ, প্রায় বছরখানেক ধরে ধাড়িবাজ আর জোচ্চরদের কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দিয়েছেন। কিন্তু সমাজের এই অন্ধকারের দিকই একমাত্র সত্য নয়। আলোর দিকও নিশ্চয়ই আছে। সংবাদ চোখ ফিরিয়েছেন এবার সেই নবজীবনের দিকে, নবযৌবনের দিকে। সাহিত্য, শিল্প, খেলাধুলো ও শিক্ষাদীক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন সেই সেই নতুন যুগের প্রতিভাবানদের পরিচয় তুলে ধরাই হবে এবার তাঁর প্রয়াস। আমরা বিশ্বাস করি, বাঙালি এক মহান জাত। সংবাদের মারফৎ একালের শক্তিমানদের সাক্ষাৎ পেয়ে ভবিষ্যতের বিষয়েও আশা করি আমরা আশান্বিত হতে পারব।

CENTRAL LIBRARY

খালের জলে ভুসভুড়ি দেখে মুহূর্তে বলে দিতে পারত কোথায় কে—মাছ না কচ্ছপ। গর্ত দেখে বলে দিতে পারত কোনটা সাপ—ফলুই মাছের না সাপের। ওর সঙ্গেই মাঠে মাঠে, খালে নদীতে, হেঁটে, নৌকো বেয়ে ছোটবেলাটা কেটেছে আমার। কত মাছ, কত পাখীর নাম যে তখন শিখেছিলাম, আজ প্রায় কিছুই মনে পড়ে না।

সারাটা দিন বাইরে বাইরে টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম। কখনো কোষ নৌকোয় করে খাল পেরিয়ে চলে যেতাম ধলেশ্বরীর চওড়া বুকে, কখনো হেঁটেই চলে যেতাম ইনামগঞ্জের, গিরিগঞ্জের হাটে। আর এই-ভাবেই একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেলাম। তখন আমার বয়স সাত বছর।

বেদেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময়। মানে ফার্স্ট যুদ্ধটা ইউরোপে শুরু হয়েছে। এখনো তার ঢেউ এদেশে এসে পৌঁছোয় নি। ওরা আমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর একটা বছর বেবাজিয়া-দের বহরে করে গোটা পূব বাংলাটা ঘুরেছি। হয়তো কোনদিনই আর ফিরতে পারতাম না। নেহাৎ কপালজোর। একটি মেয়েকে নিয়ে দলের দুটি ছেলের মধ্যে লাগল খুনে ঝগড়া। যে পেল না সেই গিয়ে পুলিশকে সব লাগাল। ধরা পড়ল গোটা দলটি। আর তাই ঘরের ছেলে ফিরে এল ঘরে। আমার এই অভিজ্ঞতারই ফসল 'নাগমতী।'

ঘরে ফিরে এলাম ঠিকই, কিন্তু মন পড়ে রইল বাইরে। দিদিমার শক্ত মুঠো আলগা করে যখন তখন টুক করে বেরিয়ে পড়তাম। মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতাম চাষী-দের। খালে, নদীতে জেলেদের জাল ফেলে মাছ ধরা দেখতাম। কুমোর পাড়ার ঢেঁকির আওয়াজ আমায় উন্মনা করে দিত।

একটু একটু করে বড় হচ্ছি। চোখ মেলে দেখছি সব। কিছু কিছু মোটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। দিগন্তব্যাপী ধান-ক্ষেত আর সুনীল আকাশের তলে মানুষের উদয়াস্ত সংগ্রামের, তিল তিল করে বেঁচে থাকবার নিরন্তর চেষ্টার রহস্যটা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। দেখেছি ভূমি-হীন কৃষকদের খুব কাছে থেকে।

হাজার হাজার মানুষ আসত গাঁয়ে ঠিক ধান রোয়ার টাইমে। ওরা অধিকাংশই চরের বাসিন্দা। বেশীর ভাগই মুসলমান। বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞাসা করত—কর্তা কিসাম লাগব না কি?

আমাদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। জনমজুর দিয়েই চাষ করানো হোত। একটা লুঙ্গি, গামছা, সামান্য হাত খরচা আর পেটেভাতার বিনিময়ে মাসখানেক আমাদের বাড়ীতে থেকে জমি চষে, বীজ বুনে সমস্ত কাজ করে তবে ওরা ঘরে ফিরত।

আবার ধান তোলার সময়ে আর একবার আসত ওরা। এবারও থাকত প্রায় মাস-খানেক। জমির ধান গোলায় তুলে দেওয়ার পর ওদের ছুটি মিলত। বিনিময়ে যা ধান পেত তাতে বড় জোর চলত দু'টি মাস! জিজ্ঞাসা করেছি—এই যে তোমরা বাড়ীতে ছেলে, মেয়ে, বৌ, মা, বাবা সবাইকে ছেড়ে কাজে চলে আস, এই সময়টা ওদের চলে কি করে?

সরল মানুষগুলোর জবাবে কোন গোল ছিল না—ঘরে আসে দুই পালি (দশ সের) চাউল, দুইডা সোনার মার্কা আর আছেন খোদাতাল্লা।

যুগ যুগ ধরে খোদাতাল্লার দোয়া নির্ভর করে যে মানুষগুলো দিন কাটাচ্ছিল, যুদ্ধ এসে তাদের জীবনযাত্রার প্যাটার্নটাই দিল পাল্টে। যুদ্ধ এল, সঙ্গে নিয়ে এল দুর্ভিক্ষ, কলকাতায় জাপানী বোমার ভয়ে ভীত হাজার হাজার শহুরে মানুষ আর আমেরিকান টমি।

নির্ভেজাল গ্রাম বাংলায় এল ভেজাল। সামরিক ছাউনির আনাচে কানাচে গড়ে উঠল বেশ্যাপল্লী, মদের দোকান। কলকাতার মানুষ এসে সহজ সরল সম্পর্কের বাঁধুনীতে পাকাল জটিল গিঁট। হিন্দু মুসলমান, যুগ যুগ ধরে যারা পাশাপাশি বাস করেছে বন্ধুর মত, আপনজনের মত, দারিদ্র্য সত্ত্বেও অফুরন্ত প্রকৃতির দয়ার দানে যারা মিলে-মিশে একাকার হয়েছিল—এবার তারা ঘুরে দাঁড়াল পরস্পরের মুখোমুখি। চোখে মুখে সে যে কি সন্দেহের, অবিশ্বাসের ছায়া।

অথচ এ সব কিছুই ছিল না। মনে পড়ে এখনো কাশিম আলি সাহেবের কথা। আমার বাবার বন্ধু। কি যে ভালবাসতেন আমাকে। সেই মানুষটাই আমাকে একদিন নিষ্ঠুরভাবে মেরেছিলেন।

যুদ্ধ তখন শেষ হয় হয়। কলকাতার একটি ছেলের পাল্লায় পড়ে সবে সিগারেট খেতে শিখেছি। বলে রাখা ভাল—আমি জীবনে দু দিন মাত্র সিগারেটের স্বাদ পেয়েছি। প্রথম দিন নদীর পাড়ে বসে লুকিয়ে খেয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন বন্ধুর পরামর্শে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে হাতে সিগারেট নিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ মনে হল একটা সাঁড়াশি যেন আমার কান কামড়ে নিচ্ছে। পেছন ফিরতে না ফিরতেই টের পেলাম আলি সাহেব। বন্ধু তো পালাল, আমি পালাব কোথায়?

আমার কান ধরে টেনে হিঁচড়ে বাবুর কাছে নিয়ে গেলেন আলি সাহেব। সব শুনে বাবু চটে উঠলেন কাশেম আলির উপর—'আরে তুমি শাসনের লাইগা আমার কাছে নিয়া আইস। তুমি শাসন করতে পার নাই?'

সেদিন উঠোনের খুঁটিতে পিছমোড়া করে বেঁধে পাগলের মত আমায় মেরে-ছিলেন আলি সাহেব। আধমরা অবস্থায় আমাকে ঘরে তুলে দিয়ে চলে গেলেন কাশেম আলি। সন্ধ্যেবেলায় এক হাতে ফ্রুটেক্স অন্য হাতে এক চ্যাঙারী খাবার নিয়ে যখন দেখতে এলেন আমায়, তখন আমি জ্বরে বেহুঁশ। শুনেছি বড়দের মুখে, সেই রাতে আর একটি মানুষেরও আর কোন হুঁশ ছিল না। আমার ঐ অবস্থা দেখে তক্ষুনি সব ফেলে ছুটে গিয়েছিলেন সে- বিক্রমপুরী ডাক্তার ভৌমিক সাহেবের কাছে। ডাক্তার এনে, ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করেও সে শান্ত হয়নি। সারারাত বসেছিল আমার শিয়রে।

এত ভালবাসা এত মধুর সহজ সম্পর্ক সব গেল ঘুচে। যুদ্ধ ইউরোপের কতটা ক্ষতি করেছে জানি না, শুধু জানি খানকয়েক জাপানী বোমা আমাদের মনুষ্যত্বের শিকড় সমেত টান মেরে উপড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। আর তাই লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে আমাদেরও চলে আসতে হোল পূব বাংলা ছেড়ে।

দিনের পর দিন এইসব কথাই হোত সেই লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমার অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে উনি আমায় উৎসাহ দিতেন লিখতে। তাই একদিন কাগজ-কলম নিয়ে বসেও গেলাম লিখতে। লিখলাম আমার জীবনের প্রথম গল্প 'মাঝি।'

লেখাটা ওঁকে পড়তে দিয়েছিলাম। পড়ে খুশী হয়ে বলেছিলেন সে সময়ের একটা নামী কাগজে ছাপিয়ে দেবেন। উৎসাহে উদ্দীপনায় তখন টগবগ করছি। মাঝে মধ্যে উনি এসে আমাকে দিয়ে ওরই নতুন নতুন বই-এর সমালোচনা লিখিয়ে নিয়ে যেতেন। পরে দেখতাম সেগুলি ছাপা হোত নামী দামী সব কাগজে। আসলে সে সবই সমা-লোচনার বকলমে প্রশস্তি।

এরই মধ্যে ওঁর সক্রিয় উৎসাহে আমরা ক'জন মেতে উঠলাম ওর সম্বর্ধনার আয়োজনে।

সে সময় একদিন সকালে ওঁর বাসায় গেছি। কথা ছিল ভদ্রলোককে নিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যাব—শ্রীকুমারবাবু যাতে রাজী হন সম্বর্ধনা সভায় পৌরোহিত্য করতে। বাসায় ঢুকতেই উনি বললেন—অমুক এ সংখ্যার মর্মবাণীটা দিয়ে গেছে। শুনলাম তুমি আমার একটা বই-এর সমালোচনা করেছ। পড়, কি লিখেছ।

পড়ব কি? আমার তখন মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। কারণ এই একটা লেখাই আমি তখন স্বাধীন ভাবে লিখেছি। ফলে প্রশংসার কথা কিছুই বাদ দিইনি। অনেক কষ্টে বাদ-ছাঁদ দিয়ে লেখাটা পড়া শেষ করে বললাম, আপনি ড্রেস করে নিন, আমি অমুক বাবুকে ডেকে আনছি। অমুকবাবুরও সেদিন আমাদের সঙ্গে যাওয়ার কথা। পাশেই থাকেন।

অমুক বাবুকে ডাকতে আমি যখন পাশের বাড়ীতে গেছি, ইন দা মিন টাইম আমার আর এক বন্ধু তখন ঐ লেখক-ভদ্রলোকের বাসায় এসে হাজির। তাকে দেখে উনি আহ্লাদে গদ-গদ হয়ে বলেছেন, দেখ দেখ প্রফুল্ল আমার সম্পর্কে এ-সংখ্যার মর্মবাণীতে কি লিখেছে। বন্ধুটি পড়ে তো অবাক। সে তো আর ভেতরের ব্যাপার কিছুই জানে না। যা লিখেছি সব বলে ফেলেছে। আর তাই শুনে ভদ্রলোক তো রেগে কাঁই। শান্তি চক্রবর্তী লোকের মত ছোট পড়ুয়া আমার মত তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের সম্বর্ধনার দরকার নেই। তারপর

হাবজা গ্যাবজা নানা কথা। বেগতিক দেখে আমি কেটে পড়লাম।

দিন কয়েক বাদে যাকি গল্পটা যে কাগজে উনি ছাপতে দিয়েছেন, বলে বলে-ছিলেন, সেখানে গিয়ে সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, না, ওই নামের কোনো গল্প উনি পাঠাননি। শুনে তক্ষুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ভদ্রলোকের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। জানতে চাইলাম, কেন এই ছেলেমানুষিটি? মুখে বলেছেন ভাল হয়েছে, ছাপতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, অথচ সবই মিথ্যে, সবই ভুয়ো?

জবাবে বেশ কড়া করেই উনি বললেন —ওটা কোন গল্পই হয়নি। আর তোমার দ্বারা সাহিত্য-কাহিত্য হবে না। শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। নিজেকে আর সেদিন সামলাতে পারিনি। বলে ফেলে-ছিলাম, আপনি এতদিনে যে নাম করেছেন, সে নাম আমি চার বছরেই করব। আর সাহিত্য করাই হবে আমার পেশা।

নেশা ধরে গিয়েছিল। জেদের বশে সেদিন সমাজ সংসার আত্মীয় পরিজন সবার সব অনুরোধ, উপরোধ, উপদেশ অস্বীকার করে লিখতে শুরু করেছিলাম। তার জন্য কম খেসারত দিতে হয়নি আমাকে। কলেজ ছেড়েছি। বাড়ী ছাড়তে হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ফুটপাথে ফুট-পাথে লিটার‍্যারি কলের জল খেয়ে আমার দিন কেটেছে।

ফেস্পাম থেকে ঝাঁপাঝোর শুরু— একটা ঝড় যেন বয়ে গেছে আমার ওপর দিয়ে। এ সময় মাস-পাঁচেক ভবানীপুরে দেবেন্দ্রঘোষ রোডে একটা বস্তির ঘরে আমরা চারজন ছিলাম। আমি আর আমার শিল্পী বন্ধু কমলেন্দু রায়, দুজনে ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলাম। আরো দুজন থাকত সেই ঘরে। একটা কুকুর ও একটি হাঁস সন্তান ছেলে।

টুইশনি করে ঘরভাড়া আর খাওয়ার খরচ জোটাতাম। বাকী সময়টা ভাগ করে নিয়েছিলাম লেখার আর পড়ার। পাঁচ-ছ' ঘণ্টা দিনে পড়তাম। সাত-আট ঘণ্টা লিখতাম।

কি পড়তাম? পড়তাম বলতে গেলে জগতের বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত সাহিত্য। আর গিলতাম গো-গ্রাসে আমার প্রিয় লেখকদের—চেখভ, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, গোর্কি, মপাসাঁ, হেমিংওয়ে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও তিন বাঁড়ুজ্যে (বিভূতিভূষণ মানিক ও তারা-শঙ্কর) তখন আমার নিত্য সঙ্গী। আর ভাল লাগত, পড়তে সতীনাথ ভাদুড়ী।

কি লিখতাম?—সে কথা বলবার আগে বলে নেওয়া ভাল যে, আমার সেই প্রথম গল্পটার কি হোল? সেইদিনই ভদ্রলোকের কাছ থেকে গল্পটা চেয়ে নিয়ে 'দেশ' পত্রিকার অফিসে গিয়েছিলাম। জমা দিয়ে আসার দু' সপ্তাহ বাদেই গল্পটা বেরোল দেশে। এই গল্পটির জন্য সেদিন আমি কুড়িটা টাকা পেয়েছিলাম। সেই আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম উপার্জন। এসব ছাপান্ন সালের কথা।

ঐ বছরই বেরুল আমার প্রথম উপ-ন্যাস 'নতুন দিন।' লিখেছিলাম পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

তারপর থেকে প্রায় কি মাসেই একটা-দুটো করে গল্প নামী সব পত্র-পত্রিকায় বেরোতে লাগল। এরই মধ্যে দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের অনুরোধে আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম, কলকাতা ছেড়ে সুদূর নাগাল্যাণ্ডে। সেখানে ছিলাম আমি সাত-আট মাস। ফিরে এসে লিখলাম 'পূর্ব পার্বতী'। অত বড় উপন্যাসটা মাত্র দেড় মাসে লিখে শেষ করেছিলাম। 'পূর্ব-পার্বতী' আমার দারিদ্র্য অনেকটা দূর করল। এতদিনে নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নেবার অবকাশ পেলাম।

শান্ত ঝক-ঝকে চোখ দুটি চশমার কাচের পর্দা ফুঁড়ে এতক্ষণ অতীতের অন্ধকার থেকে টুকরো টুকরো স্মৃতির কণা খুঁটে খুঁটে ফিরছিল। ক্ষণিকের জন্য স্থির হল। পরক্ষণেই শুরু হোল ফের স্মৃতিচারণ।

কে কাকে গোছাবে বলুন? চৈত্রের উজ্জ্বল দিন তখন বাইরে আলোর উৎসবে বসন্ত। বসার ঘরে মুখোমুখি বসে আমরা দুজন—সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় আর আমি। এতক্ষণ একটি একটি করে আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। ফাঁকে ফাঁকে সাংসারিক টুকিটাকি কাজও করতে হচ্ছিল তাঁকে। ইন্টারভ্যুর মাঝখানে একবার রাজমিস্ত্রী এল। বেহালা বাজার ছাড়িয়ে নেতাজী সুভাষ রোডের প্রান্তে একখানা ছোট একতলা তুলেছেন, তারই কিছু কাজ এখনো বাকী। স্বামী-স্ত্রী আর সরসী, সুদেষ্ণার ছোট সংসার। সঙ্গে আছে ছোট একটি ভাই। ছ' ভাই, তিন বোনের মধ্যে প্রফুল্লবাবুই বড়। একবাড়িতে একটা বাস এ্যাক্সিডেন্টে মেজ ভাই মারা যাওয়ার পর দায়িত্বের বোঝা অনেক বেড়ে গেছে। গোটা ফ্যামিলীটা এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওঁর ইচ্ছে সবাইকে এনে এক জায়গায় রাখবেন। তাই বাড়ীর বাকী কাজটা এই গ্রীষ্মেই সেরে ফেলতে চান। রাজমিস্ত্রীর কাছ থেকে জোগাড় হিসেবটা টুকে রাখলেন। বাবা এখন নেই এখানে। এলে পর তাঁর পরামর্শ মত সব হবে। মিস্ত্রীকে দিন-দুই বাদে আসতে বলে দিলেন।

মিস্ত্রী চলে যেতেই আমি আমার প্রশ্নটা আবার মনে করিয়ে দিলাম— তারপর? ছাপ্পান্ন সালে 'পূর্ব-পার্বতী' বেরিয়ে গেল দেশে। আপনিও সুস্থির হলেন, তারপর?

কে বলল আমি সুস্থির হয়েছি। এক তিলও না। জানেন আমার মধ্যে বোধহয় একটা দুর্বার ভবঘুরেমি লুকিয়ে আছে। তাই কোনদিনই আমি স্থির হতে পারলাম না। ভেতরের মানুষটাই বারবার আমাকে ঘরের বাইরে ঠেলে বার করে দিয়েছে: আর তাই আমি ঘর ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরেছি অনেক অনেক দিন। গেছি আন্দামানে। গেছি দণ্ডকারণ্যে। গেছি বোম্বাই, কোঙ্কনের উপকূলে। সারা দক্ষিণ ভারত পায়ে হেঁটে, ট্রেনে বা বাসে চেপে ঘুরে বেরিয়েছি।

বিশেষ করে যেখানে যেখানে আমার পূর্ব বাংলার মানুষেরা আশ্রয়ের খোঁজে গেছে, সেখানেই আমি বার বার ছুটে গেছি দেখতে তারা কেমন আছে? কেমন করে তারা মানিয়ে নিচ্ছে নতুন পরিবেশে, নতুন মাটিতে। আর আমার সেই দীর্ঘ প্রবাস যাত্রারই ফসল 'সিন্ধুপারের পাখী', 'নোনা মাটি মিঠে জল।'

দেখুন আজ পর্যন্ত আমি লিখেছি ত্রিশখানা বড় গল্প ও উপন্যাস। চারখানা ছোট গল্পের কালেকশনও বেরিয়েছে। কিন্তু যদি জানতে চান কোন্ বইটি লিখে সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি তবে বলব অমৃতে প্রকাশিত 'কলা পাতার নৌকো।' আমার হারানো হোমল্যাণ্ডের কথাই মেলে ধরতে চেয়েছি এই উপন্যাসে। কতটা সার্থক হয়েছি, সে বিচার করবেন পাঠক। তবু আমার শিকড় যে বাংলার মাটিতে প্রোথিত সেই বাংলার ফুল, ফল, খাল-বিল, নদ-নদী, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, আর অসংখ্য নিজের মানুষের সুখ-দুঃখের গল্পগাছা যা আমি কোনদিনই ভুলতে পারি না, পারব না, তাদের ধরে রাখতে চেয়েছি এই উপন্যাসে। যদি কোনদিন এ-বাংলা আর ও-বাংলার মাঝের বন্ধ দরজাটা খুলে যায়, তবে আবার আমি যাব আমার ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া সেই বাসাইল গাঁয়ে। যাব ইনামগঞ্জ আর গিরিগঞ্জে। মুন্সীগঞ্জ আর গোয়ালন্দে। চোখ ভরে দেখব—এতদিন আসল মানুষগুলো কতটুকু পাল্টেছে? নাকি খোলস বদলালেও ভেতরের অমৃত আজো স্বাদে গন্ধে তেমনই আছে? সেই দরজা খোলার অপেক্ষাতেই আছি।

—সন্ধিৎসু

পিঞ্জর

সুভাষ সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কে যেন ওকে ধাক্কা মারছে। বিনয় তাকাল। শুকনো জিভ। সামনে শেফালী দাঁড়িয়ে। মুখে চাপা হাসি। মিষ্টি একটা গন্ধ। ভয়ঙ্কর জল পিপাসা। সে হঠাৎ আলোর সামনে দু-হাত মেলে ধরল। কোথায় রক্ত?

—এক গ্লাস জল দাও শেফালী। কখন ফিরলে?

—অনেকক্ষণ। শেফালী জলের গ্লাস এগিয়ে দেয়, তানিমার দাদাকে বের করতে পারলে?

নীরবে জলপান করে বিনয়। আর এক গ্লাস দাও। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়াল। হেসে বলল, আর বোল না। মেয়েটা এমন করে ধরল...। না, বের করা কী সহজ: অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

বাথরুমে ঢুকে বিনয় ঠান্ডা জলের ঝাপটা দেয় চোখমুখে। এর মধ্যেই শেফালীর কানে কথাটা চলে এসেছে। আর কে—মা চালান করেছেন। এখন মেজাজটা ঠিক নেই। আলতু-ফালতু কথা বললে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। এ-কী জেলাসী?

চায়ের কাপ হাতে করে বিনয় শেফালীর কাছ থেকে সরে যেতে চাইল। কিন্তু কোথায় যাবে। চারিদিকে দেয়াল। কখনও মনে হয় দেয়ালগুলো ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। তখন সে ঘরে থাকে না। পালিয়ে যায় বাইরে। ছাদে অথবা রাস্তায়। খোলামেলা জায়গা খোঁজে।

—কোথাকার একটা বখাটে ছোকরা, যার কোন শিক্ষা-দীক্ষা নেই, গুন্ডামী যার পেশা...। শেফালী বিনয়ের চোখে চোখ রাখল, ছাত্রীর ভাই তো কী হল? সে গুন্ডামী করে জেলে যাবে—আর তাকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য ছোটাছুটি করতে হবে তোমাকে। ব্যাপারটা কী? তুমি কী সাধারণ কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছো।

—শেফালী! প্রায় চিৎকার করে উঠল বিনয়, লিভ মি এলোন। তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও।

—গেলেই বাঁচ। শেফালী বিশ্রী মুখ-ভঙ্গি করল। তাহলেই ঐ মেয়েটাকে বিছানায় নিয়ে আসা সোজা হবে। তুমি ভাব আমি কিছু বুঝতে পারি না। কেন, আমাকে আর পছন্দ হয় না বুঝি? এখন কচি মেয়ের স্বাদ পেতে চাও।

বিনয় চায়ের কাপ সজোরে ছুঁড়ে মারল শেফালীর দিকে। শেফালী একটা প্রবল আর্তনাদ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ছুটে এলেন নীহার। সেই সঙ্গে খুন্তি হাতে উড়ে ঠাকুর।

রক্তে ভেসে যায় শেফালীর মুখ। নীহার শঙ্কিত বিনয়ের মুখে সজোরে চড় মারিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, এ-তুই কী করলি বিনু! চেয়ে দ্যাখ, কিভাবে রক্ত বেরোচ্ছে। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কী। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়।

বিনয় মাথা নীচু করে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

নীহার তাড়াতাড়ি শেফালীর মাথায় ডেটোল ভিজিয়ে তুলো চেপে ধরেন। শেফালী কোনরকম শব্দ করল না। রক্ত সহজে বন্ধ হয় না। নীহার ওকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেন। ঠাকুরকে এক ধমক লাগান। ঠাকুর ছুটে যায় রান্নাঘরে। শেফালী একবার উঠতে গেলে নীহার বাধা দেন।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারকে সঙ্গে করে বিনয় ঘরে ঢোকে। ডাক্তারবাবু শেফালীর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন। ইনজেকশন দেন একটা।

বিনয়ের হাত থেকে টাকা নেবার সময় বলে, বেশি ডিপ হয়নি। দুচারদিন বিশ্রাম করলে ঠিক হয়ে যাবে। এই ওষুধটা এখুনি নিয়ে আসুন।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ও বেরিয়ে যায়। ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরে দেখল শেফালী ঘুমিয়ে। মা শেফালীর মাথার

কাছে বসে ঝিমচ্ছেন। পায়ের শব্দে একবার চমকে তাকান। বিনয়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেন, তোরা সব পাগল হয়ে গেছিস। বলে তিনি বিনয়ের পাশ কাটিয়ে বাইরে চলে যান।

সারারাত বিনয় জেগে কাটায়। রাত্রে শেফালী কয়েকবার জেগে উঠেছে। জল খেতে চেয়েছে। বিনয়কে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। উঠতে চেষ্টা করেছে কয়েকবার। বিনয় বারান্দায় এসে ঘুমন্ত নীহারকে ডেকে তুলেছে। নীহার এসে বসেছেন শেফালীর শিয়রে। বিনয় বারান্দায় পায়চারী করেছে। একটার পর একটা সিগারেট টেনেছে। তারপর কাকভোরে নিঃশব্দে দরজা খুলে চলে এসেছে বাইরে। গঙ্গার ধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে। অনেকক্ষণ।

—উনত্রিশ—

গাড়ি থেকে নেমে রজত একপাশে সরে দাঁড়াল। ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছু দূরে একটা জটলা। একটু একটু করে এগোল সে। বক্তার কণ্ঠস্বর পরিচিত। একপলক উঁকি দিতেই চিনতে পারল। তার অফিসেরই একজন অধস্তন কর্মচারী। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ির ভিতর ঢুকে যায়। লিফটম্যান সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। আয়নার সামনে মুখ। রুমাল। কপালে ঘাম। রজত একবার ফের মুখ ফিরিয়ে নিল। সে কী ভয় পেয়েছে?

চেম্বারে ঢোকার আগে রজত কী ভেবে এগিয়ে যায়। সারি সারি চেয়ার টেবিল। স্তূপীকৃত ফাইল। কেউ নেই। ব্যাপারটা কী? হাতঘড়ি দেখল। তাহলে এরা সবাই ওখানে ছিল। ভীড়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সে অতটা লক্ষ্য করেনি। শুধুমাত্র বক্তার দিকে একঝলক তাকিয়ে ফিরে এসেছে।

এখানেও তাহলে ঢেউ এসে লেগেছে। সে চিন্তিত মুখে নিজের চেম্বারে ঢুকল। মুখোমুখি হল চন্দ্রানীর সঙ্গে। চন্দ্রানীর চোখমুখে আতঙ্ক। ওকে দেখে প্রায় ছুটে এল সে।

—স্যার! ওরা আমাকে শাসিয়েছে। চন্দ্রানী ভীত চোখে দরোজার দিকে তাকায়, আমি ওদের কথা শুনিনি। ওই শুনেনে চিৎকার।

গাউ-আপ! রজত ঘন-ঘন বেল বাজাল। কিন্তু কেউ এল না। চেম্বারে ঢোকার আগে বেয়ারাকে দেখতে পায়নি। চন্দ্রানী থরথর করে কাঁপছে। সে হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাস তুলে নিল। তার হাত কাঁপছে। ভীষণ গরম। ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে জল খেয়ে গ্লাস রেখে টাই-এর নট একটু আলগা করে নিল।

—চন্দ্রানী বস। রজত টেলিফোন তুলল। একবার ডায়াল করে রেখে দেয়। মিঃ হনুমানপ্রসাদকে জানান দরকার। চেয়ার ছেড়ে সে এগিয়ে যায়। চন্দ্রানীর পিঠে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল। তারপর পায়ে পায়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। বক্তাকে ঘিরে অনেকে। মাঝে মাঝে উত্তেজিত হাত ওপরে উঠছে। সে ফিরে এসে বসল চেয়ারে।

— নার্ভাস হয়ো না চন্দ্রানী। কে শাসিয়েছে তোমাকে?

চন্দ্রানী মাথা নীচু করল। ওদের নাম করবে কী? তার স্বামীর মুখে হঠাৎ মনে পড়ল। অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছে। বোস সাহেব অবশ্য অনেক সাহায্য করেছেন। এর জন্যে সে কৃতজ্ঞ। শুধু কৃতজ্ঞতা বোধ করি চান না বোস সাহেব। ফলে প্রায়ই সন্ধ্যের পর ফ্ল্যাটে যেতে হয়। উনি মদ খান। সে গ্লাস এগিয়ে দেয়। তাকেও একটু আধটু খেতে হয়। তারপর প্রথম দিন সে মাতাল হয়ে গিয়েছিল। কোন জ্ঞান ছিল না যথাসাধ্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সমর্পণ করেছে নিজেকে।

রজতের অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বরে চন্দ্রানী চমকে উঠল। সে আস্তে আস্তে বলে, কার নাম করবো। সবাই ছিল। ওরা জানাল যে, কোম্পানী অনেক লাভ করেছে অথচ মাইনে বাড়াচ্ছে না। বোনাস দিচ্ছে না। সুতরাং সংগ্রাম করতে হবে। ঘেরাও দিতে হবে। প্রয়োজন হলে স্ট্রাইক করবে। ওরা আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে বলল নীচে। সেখানে অন্যান্য অফিস থেকে কর্মচারীরা এসে জমায়েত হয়ে একসঙ্গে বিক্ষোভ জানাবে। আমি অসম্মতি জানাতে ওরা আমাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় অপমান করল। আর জানাল এর প্রতিশোধ ওরা নেবে।

—তুমি নিজের সীটে যাও। কাজ করগে। ভয় নেই—আমি তো আছি।

চন্দ্রানী নিজের সীটে গিয়ে বসে। রজত একটা সিগারেট ধরিয়ে বেল বাজাল। এবার বেয়ারা এসে সামনে দাঁড়াল। বাইরে অনেক কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। ওরা সব ফিরছে। সে বেয়ারার দিকে তাকাল। মাথা নীচু করে বেয়ারা দাঁড়িয়ে। এত রাগ হচ্ছে যে, ইচ্ছে করছে ঘাড় ধরে ওকে বাইরে বের করে দেয়। ঢেউ এসে লেগেছে। আর রক্ষা নেই।

হঠাৎ জলস্রোতের মত ওরা ঘরে ঢুকল। রজত সামান্য চমকে উঠল। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে পরক্ষণেই গুটিয়ে নিল।। বড়বাবুর পিছনে আরও কয়েকজন। উত্তেজিত মুখ। ভয়ঙ্কর চোখের চাহনী।

—কী ব্যাপার? রজত হাসার চেষ্টা করল। আয়না থাকলে সে দেখতে পেত তার মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। নিজের চেহারা দেখে চমকে যেত।

—আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সমস্বরে অনেক কণ্ঠ এক সঙ্গে প্রায় গর্জে উঠল।

—বেশ তো। রজত বড়বাবুর দিকে তাকায়, আপনি ওদের যার যার সীটে ফিরে কাজ করতে বলুন। ওদের হয়ে আপনি বক্তব্য রাখুন।

গুঞ্জন থেমে যায়। বড়বাবুর সঙ্গে ওরা সব বাইরে যায়। রজত টেলিফোন তোলার আগেই ক্রিং ক্রিং শব্দ হল। মিঃ হনুমানপ্রসাদের কণ্ঠস্বর টেলিফোনে ভীষণ উত্তেজিত শোনাল। এখুনি চলে আসতে বলছেন। উনি এইমাত্র এসেছেন। টেলিফোন রেখে রজত নীরবে হাসল।

বড়বাবু ঘরে ঢুকলে রজত বলে, আপনি একটু পরে আসবেন। আমি বড় সায়েবের ঘর থেকে আসছি। বলে সে সুইংডোর ঠেলে বাইরে এল। বেয়ারা উঠে দাঁড়ায়। সে বড় সায়েবের চেম্বারের দিকে যেতে যেতে একবার আড়চোখে পাশের ঘরের দিকে তাকাল। গুঞ্জন ভেসে আসছে। কেমন যেন বিশ্রী আবহাওয়া। থমথমে।

মিঃ হনুমানপ্রসাদ মাথায় হাত দিয়ে বসে। পায়ের শব্দে মাথা তুললেন। রজতের মনে হল বড় সায়েবের চোখমুখ অনেকটা চুপসে গেছে। এত নার্ভাস হলে চলে না। সে চেয়ারে বসে ভাবল, মালিককে একটু ঘাবড়ে দিলে কেমন হয়? তা হলে অনুচিত। তবে এইরকম পরিস্থিতিতে মানুষের আসল পরীক্ষা হয়।

—এরা কী সব বলছে? আমরা ওদের হুমকির সামনে নত হব না। মিঃ হনুমান-প্রসাদ উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, যত গণ্ডগোল এই রাজ্যে। এমন অরাজকতা চললে আমি অন্য জায়গায় অফিস উঠিয়ে নিয়ে যাব।

—কম বেশি সব প্রদেশে এমন অবস্থা। রজত দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আপনি উত্তেজিত হবেন না স্যার। দিনকাল পালটে যাচ্ছে এখন খুব সাবধানে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—আমি সব ব্যবস্থা করছি।

—ওরা কী চায়? দল বেঁধে অফিস ছেড়ে চলে যাওয়া...অফিসের ভিতর স্লোগান... খুব চিন্তার ব্যাপার বোস। আপনি তদন্ত করুন। তাড়াতাড়ি আমাকে রিপোর্ট দিন। আর হাঁ, মিসেস মুখার্জিকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

রজত নিজের চেম্বারে ফিরে এসে চন্দ্রাণীকে ডাক দিল, বড় সায়েবের তলব পড়েছে। বলে সে একটু মুচকি হাসল। চন্দ্রাণী গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যায়।

হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে রজত সিগারেট ধরাল। চন্দ্রাণীর শরীরটা ভাল। মনে হয় না বিয়ে হয়েছে, উঃ কী কান্না! আরে বাবা, এত কান্না কিসের। এসো, একটু মদ্যপান কর। শরীরটা চাঙ্গা করে নাও। পাপ মনে করলেই পাপ! কতকাল অপেক্ষা করবে। আমিও বিবাহিত। বউ ছেড়ে চলে গেছে। কারণ তারন জানতে চেয়ো না। তোমার স্বামী অসুস্থ। ভাল হতে সময়

নেবে। আমরা অন্তহীন অপেক্ষা করতে পারি না। অতএব কাছে এসো। চোখের জল মোছ। একটু হাসিমুখে তাকাও।

—স্যার।

রজত ভাসা ভাসা চোখে তাকাল। বড়-বাবু দাঁড়িয়ে। এই লোকটাকে সে এখন ঠিক চিনতে পারছে না! এর ব্যবহারে কথা-বার্তায় সেই ম্রিয়মাণ ভাব নেই। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। চোখদুটো কী জ্বলছে? এত সাহস পেল কোত্থেকে? একটা ধমক দিলে থতমত খেয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকত।

—বসুন। রজত তীক্ষ্ম চোখে বড়বাবুর দিকে তাকাল, আপনি বয়স্ক। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ছেলে ছোকরাদের কথা ছেড়ে দিলাম। ওদের রক্ত গরম। অল্পেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিনে আপনি কিভাবে ওদের দলে ভিড়লেন। এ বাজারে চাকরী পাওয়া কত কঠিন। সে তুলনায় চাকরী চলে যাওয়া খুব সহজ। আপনার ছেলেমেয়ে কটি?

বড়বাবু এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ হাত জোড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। কাঁপতে কাঁপতে অস্ফুটস্বরে বলে, দেখবেন স্যার আমার চাকরীটা যেন না যায়। কী করবো স্যার। ওরা ভয় দেখাল। আমি তো এসব চাই না।

—বসুন বড়বাবু। রজত ওর একটা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বেয়ারাকে ডেকে দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

চা খেতে খেতে রজত বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যায়। বড়বাবু একটু উসখুস করতে থাকে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে দরজার দিকে তাকায়। রজত মনে মনে হাসল। কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দেবে কিনা একবার ভাবল। দশ দফা দাবী। এসব পূরণ করতে হবে। নইলে এরা আন্দোলনের পথে নামবে স্থির করেছে।

এরা ভেতরের খবর এত জানতে পারল কিভাবে? অবশ্য সামান্যই জেনেছে। মিঃ হনুমানপ্রসাদ অতটা নির্বোধ নন। আব-বারের হিসাব রাখার জন্যে অন্যত্র ছোট্ট একটা অফিস রয়েছে। সেখানে রেখেছেন নিজের লোক। বলা যায় না ওদের কাউকে হয়ত এরা হাত করেছে। অবশ্য এটা নিছক অনুমান।

—এই মাইনেতে আপনার বেশ অসুবিধা হয়। বড় সাহেব আপনার কথা কিছুদিন ধরে ভাবছেন। আপনি পুরনো লোক। অনেক জানেন শোনেন। আশা করি শিঘ্রি আপনাকে একটা সুখবর জানাতে পারব।

—বড়বাবুর মুখ পলকে উজ্জ্বল দেখাল। বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের করে একবার দেখল। আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে ওঠে মুখের চেহারা। সে এবার রজতের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ নীচু করে বলে, ওদের কাছে গিয়ে কী বলবো স্যার? একবার যদি জানতে পারে আমি বেইমান...। বলে হঠাৎ সে রজতের একটা হাত জড়িয়ে ভগ্নকণ্ঠে বলল, বুড়ো বয়সে আর পাপ করতে চাইনে! আমি কিছু চাইনে। স্যার, মাফ করবেন, ওদের কাছে আমাকে সত্য কথাই বলতে হবে।

—হাত ছাড়ুন! রজতের মুখ খুব গম্ভীর দেখাল, বুড়ো বয়সে মশাই আপনার ভীমরতি ধরেছে! নিজের ভাল বলদেও বোঝে। আপনি কী ভাবছেন, আপনাদের এইসব দাবী-দাওয়া বড়সাহেব মেনে নেবেন? নেভার! কথায় কথায় স্ট্রাইক আর ঘেরাও। অবস্থা তো দেখছেন চারিদিকে। ক্ষতি কার? বলি মশাই এই বয়সে চাকরী গেলে দেখবে কে? কত মাইনে পান আপনি? সব মিলিয়ে প্রায় ছশো। খুব খারাপ বুঝি? আর ওই যারা পাঁচ-সাত বছর চাকরী করছে—ওদের এক একজনের মাইনে কত। এক একজন তিনশো সাড়ে তিনশো করে পাচ্ছে। খুব খারাপ বুঝি? যান না, আরও দু'পাঁচটা অফিস ঘুরে দেখে আসুন। তাহলেই নিজেদের অবস্থাটা টের পাবেন।

বড়বাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। রজত ভাবল মাথা গরম করে লাভ নেই। এদের প্রকৃত অবস্থাটা বোঝানো দরকার। ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করা দরকার। নইলে তার পজিসন, বলা যায় না, বড়সায়েব হয়ত মনে মনে তাকেও সন্দেহ করতে পারেন। কিন্তু এইসব ঝামেলা তার ভাল লাগছে না। কারু ক্ষতি হোক সে চায় না। সত্যি, মনেপ্রাণে চায় না।

—শুনুন, ওদের সাফ জানিয়ে দিন—এখন কিছু করা যাবে না। তবে ওদের বলবেন, দাবীদাওয়া সম্পর্কে কোম্পানী ভেবে দেখবে। আর হ্যাঁ, প্রত্যেককে লিখিত-ভাবে জবাব দিতে হবে অফিসে দেরী করে আসার জন্যে। আপনি এখন যেতে পারেন।

কিন্তু কোন যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না বড়বাবুর। সে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। করিডরে চাপা ফিসফাস শব্দ ভেসে এল। বড়বাবু সভয়ে সেদিকে একবার তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল রজতের দিকে।

—আমি একটা কথা বলব স্যার। অপরাধ নেবেন না। এত সহজে কিন্তু ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে না। মীমাংসার একটা পথ বের করা দরকার।

—আপনি ভয় দেখাচ্ছেন? রজত ক্রোধকণ্ঠে নিজেকে সংযত করল, ভাবাবেগে চলবেন না বড়বাবু। স্ট্রাইক করবেন? বড়-সাহেব জানিয়েছেন এখানকার অফিস গুটিয়ে উনি অন্য জায়গায় চলে যাবেন। হ্যাঁ, আমাকে জানিয়েছেন একথা। এখন ভেবে দেখুন কী করবেন।

বড়বাবু উঠে দাঁড়াল, আমার একার কথায় কিছু হবে না। স্যার, সবার যা গতি আমারও তাই হবে। বুড়ো বয়সে যদি ছেলেপুলে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হয়... বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না! কিছুটা বিবেচনা করলে স্যার...। সে কথা শেষ করতে পারল না। টেলিফোন বেজে উঠল।

—আপনি এখন আসতে পারেন। রজত টেলিফোন ধরল, ইয়েস স্যার। এখুনি আসছি। টেলিফোন নামিয়ে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। বড়বাবুকে হাতের মুঠোয় প্রায় এনে ফেলেছিল। বুড়ো কী ভেবে মত পালটে ফেলল। বড়সাহেব ডাকছেন। একটা আওয়াজ ভেসে আসছে: ও ঘরে বোধহয় উত্তেজিত স্বরে কথাবার্তা চলছে। একবার যাবে কিনা ভাবল।

চন্দ্রাণী ঘরে ঢুকল। সে একবার রজতের দিকে তাকিয়ে নিজের সীটের দিকে চলে যায়। হাতে নোটবই। বড়সাহেব বোধহয় ডিক্টেশান দিয়েছেন। ইদানীং ঘন ঘন চন্দ্রাণীকে ডাকছেন। রজত চেয়ার ছেড়ে বাইরে এল। তারপর সোজা মিঃ হনুমানপ্রসাদের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

—বসুন। মিঃ হনুমানপ্রসাদ গম্ভীরস্বরে বলেন, চিৎকার করছে কে? ওরা কী চায়?

—এই দেখুন। রজত দশ দফা দাবী সম্বলিত টাইপ করা কাগজ বড়সায়েবের টেবিলের সামনে রেখে দিল। মিঃ হনুমান-প্রসাদ কাগজের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

পড়া শেষ করে বড় সাহেব কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। তারপর রজতের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। রজত চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে। আগ বাড়িয়ে সে কিছু বলবে না।

—এ কী জুলুম! মিঃ হনুমানপ্রসাদ ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলেন, রিং-লিডার কে? খোঁজ করেছেন?

—কেউ না। রজত স্পষ্ট জানাল, আপনি উত্তেজিত না হয়ে বরং শান্তভাবে সমস্ত জিনিস বিচার করুন। আমার মনে হয় একেবারে বঞ্চিত করলে ওরা মানবে না। কিছু দেওয়া যেতে পারে। ধরুন পুজোর সময়ে দু' মাসের বোনাস। ব্যস, আর কিছু না। এতে ফল ভাল হবে। স্টাফ অসন্তুষ্ট থাকলে অফিসের ক্ষতি।

—তার মানে ওদের হুমকীর সামনে মাথা নত করতে হবে। ওরা তাহলে পেয়ে বসবে। ভাববে কর্তৃপক্ষ দুর্বল। এর পরিণাম কী ভেবেছেন বোস? ওদের চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাবে। না, না বোস ...ওরা কিসসু পাবে না। যার ভাল লাগে না, আরও মাইনে দরকার যার, তার জন্যে দরোজা খোলা রয়েছে। হ্যাঁ, ওদের জানিয়ে দিন এ-কথা।

রজত গম্ভীরমুখে বেরিয়ে এল। বস্তুত মিঃ হনুমানপ্রসাদের একরোখা

CENTRAL LIBRARY

মনোভাব তার ভাল লাগেনি। সে কিই বা করতে পারে। তার প্রস্তাবের পেছনে স্বাস্থ্যবোধ ছিল। এ-দেশের সাধারণ মানুষের মানসিকতা, বিশেষ করে বর্তমান অবস্থায়, সে কিছিং বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বড়সায়েব কী বোঝেন?

চেয়ারে বসে রজত বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল। আশ্চর্য! কোন ফাইল আসছে না। সাড়াশব্দও একটা নেই। মনে হয় ও-ঘরে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। নীচু গলায় যারা যেন কথা বলছে। চন্দ্রাণী এক-মনে টাইপ করছে। উঃ, কী ঝামেলায়ই না পড়া গেল! বেশ বিবি দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। কিছুদিন লতায় সান্নিধ্যে। কোথায় হারিয়ে গেল মেয়েটা? তারপর চন্দ্রাণী।

হঠাৎ শেফালীর কথা মনে পড়ল। বেশ মেয়েটি। কথাবার্তা আলাপ-পরিচয়ে ভারী সুন্দর। অথচ ঐ স্ক্যান্ডেলটা সন্দেহ করে সে আর শেফালী...! বিনয়, তোমাকে একদিন বাগে পেলে ছাড়তাম না। তোমার মন অত্যন্ত নীচু। হা-হা-হা! শেফালী তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। যাবেই তো। তোমার মত আত্মকেন্দ্রিক ভীরু আর অহঙ্কারী কোন যুবকের সঙ্গে (তোমার কী দেখে শেফালী মুগ্ধ হয়েছিল!) কোন সুন্দরী সুরুচিসম্পন্না যুবতী বেশীদিন থাকতে পারে না!

—চন্দ্রাণী। রজত সামান্য গলা উঁচু করে ডাকল।

—দেখুন, আপনি আর আমার নাম ধরে ডাকবেন না।

—কী হল? রজত অবাক চোখে তাকায়। চন্দ্রাণীর চোখমুখে স্পষ্ট বিরক্তি। ব্যাপারটা কী? হঠাৎ কেন আপত্তি? সে চন্দ্রাণীকে বসতে বলল।

—বলুন। চন্দ্রাণীর মুখ বেশ গম্ভীর, আমাকে এখুনি সীটে ফিরে যেতে হবে। সমস্ত চিঠি বড়সায়েবকে আজই টাইপ করে দিতে হবে।

রজত সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে চন্দ্রাণীর একটা হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করল। চন্দ্রাণী সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিল। চোখমুখ আরক্তিম হল ওর। তীব্রচোখে তাকাল রজতের দিকে।

—অফিসে যদি এমন অভদ্র আচরণ করেন, তবে বাধ্য হব বড়সায়েবকে জানাতে। ছি! আপনি একজন শিক্ষিত অফিসার। এ কি জঘন্য ব্যবহার আপনার!

—বাঃ! খুব কথা শিখেছো। এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে। মানুষ এমনিই হয় বটে। অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম! এখন বড়-সায়েবের ভয় দেখাচ্ছ। চাকরীটা কার দয়ায় পেয়েছিলে?

রজত উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে থাকে। ফলে বাকরুদ্ধ হয়ে আসে তার। বিস্ফারিত চোখে তাকায় চন্দ্রাণীর দিকে।

—কিছুই ভুলিনি স্যার। কিন্তু পরিবর্তে কী চেয়েছেন? যদি নিঃস্বার্থ-ভাবে করতেন, শ্রদ্ধা করতাম আপনাকে। আমার অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিতে ছাড়েননি। কী ভেবেছেন আমাকে? খুব সহজলভ্যা, তাই না?

দু'চোখে আগুন ছড়িয়ে চন্দ্রাণী নিজের সীটে ফিরে যায়। রজত হতভম্বের মত তাকায়। চন্দ্রাণী মাথা নীচু করে টাইপ করছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর চিৎকার করে বেয়ারার নাম ধরে ডাকল রজত।

—বড়বাবুকে ডেকে দাও।

বেয়ারা বেরিয়ে যায়। রজত চন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষল। 'নাম ধরে ডাকবেন না।' হঠাৎ এমন বিগড়ে গেল কেন! কী এমন অবিচার সে করেছে? অসহায় অবস্থায় সুযোগ...যত সব বাজে!

বড়বাবুকে দেখে রজতের মেজাজ আরও গরম হয়। এরা ভেবেছে কী? সে রুঢ় খবর কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়। বড়বাবুকে ইশারায় চেয়ারে বসতে বলল।

—দেখুন, বড়সায়েব সাফ জানিয়েছেন যে, এখন কোম্পানীর তরফ থেকে কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। যারা আরও মাইনে বাড়াবার জন্যে আন্দোলন করতে চায়, তাদের জন্যে দরোজা খোলা রয়েছে। আপনি সকলকে একথা জানিয়ে দিতে পারেন। এ সিদ্ধান্ত আমার নয়, বড় সায়েবের।

চেয়ার ছেড়ে বড়বাবু উঠে দাঁড়াল, বেশ। আমি ওদের জানাচ্ছি। তবে স্যার, জিনিসটা ভাল হল না। বলে সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

যা খুশি হোক। রজত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল চন্দ্রাণীর দিকে। চন্দ্রাণীর পিছনে এসে দাঁড়াল। একমনে টাইপ করছে। ওর উপ-স্থিতি গ্রাহ্যই করছে না। মনে মনে ভীষণ রেগে যায় রজত। চন্দ্রাণীর ফর্সা কাঁধ ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। খুব কায়দা করে চুল বেঁধেছে। মসৃণ নগ্ন বাহু। রজতের চোখদুটো জ্বলতে লাগল।

—মিসেস মুখার্জি।

—স্যার। চন্দ্রাণী টাইপ থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। একপলক রজতের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। বেশি বাড়াবাড়ি করলে সোজা বড় সায়েবকে গিয়ে বলবে।

—আজ অফিসের পর থাকতে হবে। জরুরী কাজ রয়েছে।

—সরি স্যার। অফিসের পর থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ন। আপনি তো জানেন আমার স্বামী অসুস্থ। অফিস ছুটির পর রোজ তাকে দেখতে যেতে হয়।

রজত ধমকের সুরে বলে, কোন কথা শুনছি না। অফিসের কাজ সবচেয়ে আগে। আপনাকে থাকতে হবে।

চন্দ্রাণীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদু হেসে বলে, বুঝেছি স্যার। আপনি ভয় পেয়েছেন। একজন সংগী দরকার। তাই না?

—শাট আপ! রজত প্রায় গর্জে উঠল, আপনার ঔদ্ধত্য দেখে অবাক হচ্ছি।

—দেখুন, ধমক-টমক দেবেন না। আমি ছুটির পর কাজ করবো না। চাই না ওভারটাইম।

চন্দ্রাণী ওর পাশ কাটিয়ে গটগট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। রজত বিবর্ণ মুখে সীটে ফিরে এসে বসল। কিছুটা সে আঁচ করতে পেরেছে। অন্যমনস্কভাবে একটা ফাইল টেনে নিল। যেভাবেই হোক বড়-সায়েবকে হাত করেছে চন্দ্রাণী। তাই ওর এত সাহস। বেশি চটাচটি করলে সে হয় পারে। বলা যায় না, চন্দ্রাণী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে। বড়সায়েব তাকে ডেকে দুকথা বললে সেটা হবে ভারী অসম্মানজনক।

রজত কান খাড়া করল। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। বড়সায়েবের কামরার দিক থেকে ভেসে আসছে মনে হল। একটা আশংকায় বুক ছাঁৎ করে উঠল। সে জোরে কলিংবেল বাজাল। কেউ এল না। বেয়ারার নাম ধরে ডাকল। কোন সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপারটা কী? সশব্দে চেয়ার সরিয়ে রজত সুইংডোর ঠেলে বাইরে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে যায়।

—আর এক পা বাড়াবেন না স্যার।

—তার মানে? রজত বিমূঢ় দৃষ্টিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো কর্মচারীদের দেখতে থাকে। এমনকি বেয়ারাটা পর্যন্ত ওর দিকে ফিরে তাকাল না। বড়সায়েবের কামরা থেকে মিশ্রিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

—আপনারা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। রজত ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর যথাসাধ্য নরম করল, যে যার সিটে ফিরে কাজ করুন। আমি কথা দিচ্ছি—আপনাদের হয়ে বড় সায়েবকে বলব।

—না না। আপনার দ্বারা কিছু হবে না। একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর চিৎ-কার করে উঠল, আপনি আপনার চেম্বারে গিয়ে বসুন। বড়সায়েব আমাদের দাবী-দাওয়া মানলে তবে আপনি ছাড়া পাবেন।

—আমি পুলিশ ডাকবো। এখুনি লালবাজারে টেলিফোন করছি।

—চেষ্টা করে দেখুন না। লাইন পাবেন না। হা-হা-হা!

প্রবল হাসি যেন ধাক্কা মেরে রজতকে চেম্বারে ঢুকিয়ে দেয়। সে টেলিফোন তুলে অনবরত রিং করল। কোন সাড়াশব্দ নেই। কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল।

তারপর বাধ্য ছেলের মত চেয়ারে গিয়ে বসল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মনের কথা

ধর্ষকামের মনস্তত্ত্ব

মনোহরবাবুর ইতিবৃত্ত

স্যাডিজম (ধর্ষকাম) ও ম্যাসোকিজম (মর্ষকাম) কথাদুটি যথাক্রমে ফরাসী দেশের এক মারকুইস ও অস্ট্রিয়ার এক ঔপন্যাসিকের নামের সঙ্গে জড়িত। এঁরা প্রধানত এঁদের লেখার মধ্যে বেদনা ও যৌনতৃপ্তির সম্পর্ক চিত্রিত করেন। ধর্ষকামীর তৃপ্তি বেদনা দেওয়ায় আর মর্ষকামীর তৃপ্তি বেদনা পাওয়ায়। ধর্ষকামী তার যৌনসঙ্গীর দেহে বা মনে বাধা না দিয়ে যৌন উত্তেজনা অনুভব করে না, ব্যথা না দিলে তার যৌন তৃপ্তি ঘটে না। আর মর্ষকামীর বেলায় ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। বলা বাহুল্য, এই দুই ধরনের প্রবণতাই যৌনবিকারের লক্ষণ এবং খাঁটি স্যাডিস্ট বা ম্যাসোকিস্ট-এর সংখ্যাও খুব বেশি নয়। তা সত্ত্বেও, যৌনতাত্ত্বিকরা এই দুই ধরনের বিকারগ্রস্তদের নিয়ে খুব মাথা ঘামিয়েছেন এবং ফ্রয়েড, হ্যাভেলক এলিস, ক্রাফ্ট এবিং, মোল প্রভৃতি পণ্ডিতরা নানা তত্ত্ব খাড়া করে ধর্ষকাম ও মর্ষকামের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করেছেন। যৌন সম্পর্করহিত হয়ে কথাদুটি বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিষ্ঠুরতা বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ধর্ষকাম অপরের প্রতি নিষ্ঠুর আর মর্ষকাম নিজের প্রতি নিষ্ঠুর। ফ্রয়েড মনে করেছেন মর্ষকাম ধর্ষকাম মূলত একই প্রবৃত্তির দুই রকমের অভিব্যক্তি। ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি অপরকে বা নিজেকে সময় ও ব্যক্তিবিশেষে, আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হিসেবে বেছে নিতে পারে। হ্যাভেলক এলিস মনে করেন যে, একই ব্যক্তির মধ্যে এই দুই প্রবণতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকতে পারে। মর্ষকামীর মধ্যে ধর্ষকামের প্রবণতা না দেখা গেলেও ধর্ষকামীর মধ্যে মর্ষকামেচ্ছা বিরল নয়। ম্যাকডুগালের মতে ধর্ষকাম মর্ষকাম প্রবৃত্তি সহজাত নয়, সকলের মধ্যে এর প্রকাশ ঘটে না, প্রাণীজগতেও এই প্রবৃত্তি দুর্লভ। অতএব তাঁর মতে এই বিরল প্রবণতার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে মানুষের অন্য দুটি সহজ-প্রবৃত্তির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। একটি আত্মজাহিরকারী (সেল্ফ-এ্যাসার্টিভ) প্রবৃত্তি, অপরটি বশ্যতা স্বীকারের (সাবমিশন) প্রবৃত্তি। পুরুষের মধ্যে প্রথমটির আধিক্য থাকে, স্ত্রীজাতির মধ্যে দ্বিতীয়টির। যৌনসঙ্গমের ব্যাপারে পুরুষ সাধারণত নিজেকে জাহির করে, সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে স্ত্রীকে বশীভূত করতে চায়। ময়ূর, পায়রাজাতীয় পাখীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, এরা নিজেদের পেখম-পালক ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে স্ত্রীজাতিকে আকৃষ্ট করে থাকে। কিন্তু এই জাহির করার প্রবৃত্তি শুধু যৌন ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই-এর ব্যাপারেও শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের মধ্যে এই জাহির করার প্রবৃত্তি আছে। প্রতিপক্ষকে আগে থেকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই জাহির করার প্রবৃত্তি। যৌন ব্যাপারেই হোক আর যুদ্ধের ব্যাপারেই হোক, দুর্বল পক্ষ সব সময়েই বশ্যতাস্বীকারের প্রবৃত্তি প্রকাশ করে। শক্তিমান স্বভাবত আত্মজাহিরকারী প্রবৃত্তি-পরিচালিত আর শক্তিহীন স্বাভাবিকভাবে বশ্যতাস্বীকারের প্রবৃত্তির অধীন। কিন্তু অন্যপক্ষ নজীর দেখিয়ে বলবেন যে, স্যাডিস্টরা প্রায়ই ভীরু-স্বভাবের হয়ে থাকে। তাদের শারীরিক দুর্বলতা ও মেয়েলী স্বভাব থেকে কোনোমতেই তাদের আত্মজাহিরকারী বলা যায় না। যে-দুটি স্যাডিস্ট যুবকের কথা প্রায়ই এঁরা উল্লেখ করে থাকেন, তাদের দুজনেই ছিল ধর্মভীরু, লাজুক, ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্বল। বাচ্চা ছেলেদের চোখের দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত এদের ছিল না। একজন এত বেশী লাজুক ছিল যে, অন্য লোকের উপস্থিতিতে প্রস্রাব করতে পারতো না। অশ্লীল কথাবার্তাতে এরা যোগ দিত না। অথচ রক্তপিপাসা দুজনেরই ছিল অদম্য এবং যৌন তৃপ্তির জন্যে এরা নরহত্যা করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। দুজনেই শেষপর্যন্ত উন্মাদ আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। স্বভাবের ব্যতিক্রম এই দুটি নজীর থেকে কোনো সাধারণ তত্ত্ব খাড়া করা যুক্তিযুক্ত হবে না; নিশ্চয়ই ম্যাকডুগালপন্থীরা এই বলে আত্মসমর্থন করবেন। আরো বলবেন, স্যাডিস্টরা সঙ্গীকে ঠিক বেদনা দিতে চায় না, বেদনাউদ্রেককারী উদ্দীপকের সাহায্যে নিজের যৌন-ইচ্ছাকে বাড়াতে চায়, সঙ্গীকেও উত্তেজিত করতে চায়। হ্যাভেলক এলিসের মতে এইসব বিকারগ্রস্তদের কামেচ্ছা স্তিমিত, সেই ইচ্ছাকে উসকে দেবার জন্য প্রয়োজন হয় বাধা দেওয়া অথবা বাধা পাওয়া। অনেক সৎ ও সুস্থ ব্যক্তিও নাকি ধর্মোন্মাদনায় অধীর হয়ে সহসা তীব্র যৌন উত্তেজনা বোধ করেন ও এইভাবে তাঁদের রাগমোচন ঘটে (অরগ্যাজম)। রাগ ও দুঃখ, এই দুই প্রক্ষোভই নাকি কোনো কোনো মানুষের কামেচ্ছা জাগিয়ে তোলে। স্যাডিস্টরা স্বভাবনিষ্ঠুর নয়, এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে এলিস অনেক কথা বলেছেন। একজন স্যাডিস্টের নিজের কথা এখানে উদ্ধৃত করা চলতে পারে।—ব্যথা দিয়ে আমি আনন্দ পাই না, বরং ব্যথাই পাই। যখন প্রিয়তমার পৃষ্ঠদেশে বা পশ্চাতে বেত্রাঘাত করতে থাকি, তখন আমার একটি মাত্র উদ্দেশ্য; তাকে উত্তেজিত করা এবং নিজে উত্তেজিত হওয়া। নিষ্ঠুরতা আমার কাছে ঘৃণ্য ও অমার্জনীয় অপরাধ।—এই ধরনের একটি-দুটি রোগীর বক্তব্য থেকে ধর্ষকামের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ সম্ভব বলে আমি মনে করি না। আদিম পূর্বপুরুষদের অনুকরণ এর মধ্যে আছে—এ-কথাও প্রমাণিত হয়নি। স্যাডিজম 'প্রিমিটিভ ও এ্যাটাভিস্টিক', এই ধরনের ধারণা প্রবৃত্তিবাদী মনস্তাত্ত্বিকরা মেনে নিলেও, বস্তুবাদীরা মানতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন যে ধর্ষকাম মর্ষকাম, দুইই শর্তাধীন অসুস্থ পরাবর্ত—একটা 'পারভারটেড' কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স। দুঃখ বা ক্রোধ কামেচ্ছা ও যৌন উত্তেজনাকে তখনই বাড়াতে পারে, যখন কোনো কারণে দুঃখ-ক্রোধ প্রক্ষোভের সঙ্গে যৌন-উত্তেজনা শর্তবদ্ধ হয়েছে। কিশোর কোনো কারণে অপমানিত বোধ করলে তার মনে দুঃখ ও ক্রোধ—দুয়েরই সঞ্চার হতে পারে। যে অপমানিত করেছে তার উপর রাগ ও ঘৃণা নিয়ে সে যদি সেই সময় হস্তমৈথুন বা মনোমৈথুনে রত হয়, তবে কয়েকদিন পর, রাগ ও ঘৃণার সঙ্গে যৌন-ইচ্ছা শর্তবদ্ধ

CENTRAL LIBRARY

হয়ে যাবে। ধর্ষকাম একটা ক্ষমতাধীন পরাবর্ত হয়ে তার মধ্যে প্রকাশ পাবে। ধর্ষকামিতার বাসনাও এইভাবে চলতে পারে।

ধর্ষকাম ও মর্ষকাম নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার কারণ এই যে, মৃত্যুপ্রবৃত্তিবাদীরা এই দুই প্রবণতাকে, বিশেষ করে ধর্ষকামকে প্রবৃত্তিমূলক ও অলৌকিক প্রতিপন্ন করতে বিশেষ তৎপর। ফলে, সমাজ সভ্যতার দোষ-ত্রুটিগুলির প্রতি, এই প্রবণতার মৌলিক কারণগুলোর দিকে স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। মানুষের পাশব নিষ্ঠুরতাকে সহজ প্রবৃত্তির একটা বিশেষ বহিবৃত্তি ভেবে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। প্রবৃত্তিবাদীদের প্রচারে অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ও তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে এই প্রবণতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। আবার সেই নিদর্শনগুলো উদ্ধৃত করে মনস্তাত্ত্বিকরা তাঁদের তত্ত্বকথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন।

পুরুষ প্রধান সমাজে স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেক স্ত্রীই বিদ্রোহ করেন না, বশ্যতা স্বীকার করে আপোষ করতে চান। কোন মেয়ে যখন বলেন, যে পুরুষ তার প্রেমিকাকে কতবিক্ষত করে না, তার চুল বা পোষাক ছেঁড়ে না, সে পুরুষ প্রেমে পড়ে নি; তখন আমরা মনে করি অত্যাচারিত হওয়াই বুঝি নারী জাতির স্বভাবধর্ম। এক ফরাসী মনস্তাত্ত্বিকের রোগিণী তাঁকে বলেছিলেন,—হি (স্বামী) ডাজ নট নো হাউ টু মেক মি সাফার এ লিটল। ওয়ান ক্যান নট লাভ এ ম্যান হু ডাজ নট মেক ওয়ান সাফার এ লিটল।' আর একজন মর্ষতত্ত্ব প্রচার করেন,—'ওয়ানস ক্রুয়েলটি ইজ ওয়ানস পাওয়ার।' ব্যথা না দিলে ভালবাসার প্রকাশ হয় না, নিষ্ঠুরতাই শক্তি,—এই ধরনের বিকৃত বক্তব্য সুস্থ মনের অভিব্যক্তি নয়, অসুস্থ মনের কথা। স্যাডিজম ম্যাসোকিজম স্বাভাবিক মনোবৃত্তির বিশেষ পরিণতি নয়, রুগ্ন মানসিকতার পরিচায়ক। ক্রাফট এবিং, মোল, প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিকরা স্যাডিজম ম্যাসোকিজমকে—'সিম্পলি এ হাইটেনড ডিগ্রী অফ নর্মাল এ্যাটিটিউড' বলে প্রচার করেছেন এবং অনেকে এই প্রচারে প্রভাবিত হয়েছেন।

স্যাডিস্টদের সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে যে, তারা মনে করে না অপর পক্ষ বেত্রাঘাতে বা পিন ফোটানোতে ব্যথা পাচ্ছে। অতিভোজনের ফলে বদ হজমে যাঁরা ভোগেন, তাঁরা মনে করতে পারেন উপবাস দিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে বোধ হয় কোন কষ্ট নেই। তাঁদের মনে করাটা উপোষী মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারে কি? উপোষী যদি চীৎকার হয় তবে হয়তো প্রচুর মতে বড জিনিষে খাতে পারে, সাঁতারে প্রভু উপোষ দেওয়াতে তেমন কোন কষ্ট নেই। প্রবৃত্তিবাদীরা বলে থাকেন যে, স্বাভাবিক সুস্থ মিলনেও পুরুষ নারীকে সামান্য কষ্ট দিয়ে থাকে (যেমন নখাঘাত, দন্তাঘাত ইত্যাদি)। স্যাডিস্ট আর একটু এগিয়ে গিয়ে হয়তো 'প্রিয়ার নরম গাত্রচর্মে' একটা পিন ফুটিয়ে দিয়ে থাকে, অথবা তার নগ্ন দেহের কোমল জায়গাতে বেত্রাঘাত করতে থাকে। তার মনে নাকি সব সময় এই ধারণা থাকে যে প্রিয়া এতে আহত অপমানিত হচ্ছে না, তার বেদনা বোধ হচ্ছে না। এমন কি যখন প্রেমাবেশে প্রিয়ার গলায় বা ফ্যাপেটে ছুরি চালিয়ে দিয়ে থাকে, তখনও নাকি হত্যা বা নিষ্ঠুরতা তার অভিপ্রেত নয়; শুধু রক্ত দর্শনের বিমল আনন্দ লাভ তার উদ্দেশ্য। 'ইভন হোয়েন দি স্যাডিস্ট গোজ সো ফার এ্যাজ টু কিল হিজ ভিকটিম, হি ইজ মুভড নট বাই দি ডিজায়ার টু কজ ডেথ, বাট টু শেড ব্লাড, সো সিকিউরিং দি ইমোশনাল স্টিমুলাস হুইচ ইজ ইম্পারটেড বাই দি স্পেকট্যাকল অফ শেড-ব্লাড এণ্ড লেম্যান হ্যাজ এ্যাকিউটলি অবজারভড দ্যাট ইন স্যাডিস্টিক ক্রাইমস ইট ইজ ইউজুয়াল টু ফাইণ্ড দি উণ্ড ইন সোজ পার্টস অফ দি বডি, লাইক দি নেক অর দি এ্যাবডোমেন, হুইচ উইল লিড টু দি ম্যাক্সিমাম শেডিং অফ ব্লাড।' বলেছেন হ্যাভেলক এলিস। একথা ঠিক যৌনমিলনের মুহূর্তে, যখন স্নায়ুতন্ত্র বিশেষভাবে উত্তেজিত, মস্তিষ্কে রক্ত তখন কেন্দ্রবিশেষে বেদনার অনুভূতি কোন সাড়া জাগাতে পারে না। কিন্তু তাই বলে, এই অস্বাভাবিক অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থার মাত্রাধিক্য মাত্র বলে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। মাত্রাগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে, ধরে নিতে হবে। আত্মধর্ষী উদ্দীপক কিছুদূর অবধি আনন্দদায়ক উদ্দীপকের সঙ্গে সম্বন্ধ হতে পারে, একথা ঠিক। কিন্তু আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি চরম মুহূর্তে সক্রিয় হয়ে উঠতে বাধা। হ্যাভেলক এলিস কিন্তু স্যাডিজমের সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সজাগ, এবং এদিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন।

ধর্ষকামের প্রকাশ পুরুষ নারী উভয়েরই মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু মর্ষকামীদের সংখ্যা পুরুষের মধ্যেই বেশী। কারণ হিসেবে মোল বলেছেন যে, মেয়েরা স্বভাবতই মর্ষকাম, প্রাথমিক পর্যায়ের মর্ষকামিতা তাদের মধ্যে স্বতঃপ্রকাশিত; যৌনমিলনের ব্যাপারে তারা নিষ্ক্রিয় ও পুরুষের প্রভাবাধীন; কামেচ্ছাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য তাদের তাই নাকি মর্ষকামী-প্রবণতার প্রয়োজন হয় না। এই বক্তব্য কিন্তু আগের বক্তব্যকে খণ্ডন করছে। মর্ষকাম ধর্ষকাম স্বাভাবিক প্রবণতার মাত্রাধিক্য যদি হয়, তবে নারীদের মধ্যেই মর্ষকামীর সংখ্যা বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে না।

এই দুই প্রবণতার সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা চলতে পারে। তার আগে মনোহরবাবুর রোগ ইতিহাস জানা দরকার। তাঁকে উপলক্ষ করেই এই আলোচনার সূত্রপাত। চল্লিশ বছরের রোগা ফর্সা ভদ্রলোক। এক মস্তবড় হিসাব-পরীক্ষক ফার্মের জুনিয়র পার্টনার। কাজের মানুষ। বড়-বড় কোম্পানীর বাঘা-বাঘা সাহেবরা মনোহরবাবুকে সমীহ করে চলেন। হিসাবের কারচুপি এক লহমায় ধরে ফেলতে পারেন, আবার খুশী হলে বড়-বড় গরমিলের কত হোয়াইট-ওয়াস করে মিলিয়ে দিতে পারেন। কয়েক মাস আগে এক পাঞ্জাবী কোম্পানীর বড়কর্তার এক-মাত্র কন্যাকে বিয়ে করেছেন। বিয়েটাকে একটা 'ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েন্স' বলা চলে। বড়কর্তা চাইলেন হিসাবের একটা মস্তবড় ফাটল সিমেণ্ট দিয়ে বন্ধ করতে, মনোহরবাবু পরিবর্তে চাইলেন কন্যাটিকে। বিপদটা ছিল গুরুতর আর মনোহর-বাবুকেও অনেকখানি ঝুঁকি নিতে হয়েছিল; কাজেই পিতার তরফ থেকে কোন আপত্তি ওঠে নি। মেয়েটিও এই বিয়েটাকে অনেকটা পরিবারের স্বার্থে আত্মোৎসর্গ হিসেবে গ্রহণ করল। অবশ্য বিবাহবন্ধন আজকাল খুলতে বা কাটতে আগেকার মত বেগ পেতে হয় না,—একথা জানা ব্যবসাদার পিতা কন্যাকে পাকে-প্রকারে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বিবাহের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অঘোষিত দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। স্ত্রী নিজের শয্যা থেকে স্বামীর শয্যায় আসতে চান না, স্বামী তাঁর শয্যায় গেলে তিনি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করে-করে হার মেনেছেন মনোহর। বুঝেছেন, এ ঘুম ভাঙান তাঁর সাধ্যাতীত। যে জেগে আছে, তার ঘুম ভাঙান যাবে কি করে? মেয়েটি এ কয় মাসে গৃহিণীর কাজ ঠিকমত করে যাচ্ছেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা মনোহরের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। তাঁরা কেউ জানেন না যে, গৃহিণী এখনও শয্যাসঙ্গিনী হন নি। চাকর-বাকররা কেউ কিছু বুঝতে পারে না, কেননা দুজনের শয্যা একই ঘরে। মদনের শরাহত হয়ে প্রতি রাত্রে স্বামী স্ত্রীকে হিন্দী-ইংরিজী প্রেমালাপে মুগ্ধ করার চেষ্টা করেন। মদনের শর হুইস্কির রস-সিক্ত হয়ে আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। স্ত্রী প্রেমালাপ শুনতে-শুনতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বামীর মনে তখন আগুন জ্বলে ওঠে; সেই আগুনে স্ত্রীকে তার শ্যাম্পেনের 'জলাহুতি' করে ফেলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ইচ্ছা কাজে পরিণত হবার আগেই তাঁর আগুন নিভে যায়। উত্তেজনা

উবে যায়। সব ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে আসে। পর্যাপ্ত পানে উঠে গিয়ে অর্ধ এক পেগ হুইস্কির সঙ্গে দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শয্যাগ্রহণ করেন মনোহর। অনেক দিন ধরে সেক্স সাইকোলজির বই পড়ছেন ভদ্রলোক। স্যাডিজম, ম্যাজোকিজমের তাৎপর্য তিনি বোঝেন। আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনেই জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যাজোকিস্টকে স্যাডিস্ট করা যায় না কি?

—আমি, বাংলায় যাকে বলে মর্ষকাম, তাই। ঘুমন্ত অথবা ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে মেয়েটা রাতের পর রাত, অথচ আমার এমন হিম্মত নেই যে, জোর করে ওর ঘুম ভাঙাই। মনে মনে ইচ্ছে করে ওর চুলের মুঠি ধরে ওকে বিছানা থেকে টেনে তুলি, ওর দুই গালে দুই চড় কষিয়ে ওর এই কপট নিদ্রার দফারফা করে দিই। কিন্তু এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি নীচের দিকে নেমে আসে। আমার দেহ শীতল হয়ে যায়, উত্তেজনা নিভে যায়। অনেক যৌন-উদ্দীপক বড়ি খেয়েছি, অনেক ইঞ্জেকশন নিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই ইচ্ছাটাকে কাজে পরিণত করতে পারি নি। তাবলে আমাকে অক্ষম মনে করবেন না যেন। এ-সব ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞও নই। আমি জানি আমি শক্তিমান। ডিনারের পর থেকেই আমি উত্তেজনা অনুভব করতে থাকি। ও যতক্ষণ জেগে থাকে আমি বুঝতে পারি যে 'দি ফায়ার ইজ অ্যাক্টিভ'। ওর বিছানায় গিয়ে ওকে দুটো-একটা হাল্কা চুমু খাওয়ার পরই ও ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে আর তখনই আমার মধ্যে ঘৃণা আর ক্রোধ জেগে ওঠে। তৎক্ষণাৎ উত্তেজনা চলে যায়, আমি নিস্তেজ হয়ে পড়ি। নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুম আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রার্থনা জানাই ঈশ্বরের কাছে। হে ঈশ্বর! 'মেক মি এ স্যাডিস্ট'।

এই মনোহরবাবুর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে স্টেকেল, ফ্রয়েড, হ্যাভেলক এলিস প্রমুখের আবির্ভাব ঘটে এবং ধর্ষকাম মর্ষকামের সামাজিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে আমাদের মধ্যে বাদানুবাদ চলে কয়েক দিন। তার সারাংশ মাত্র পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করছি।

—আপনি সমাজের উপরতলার লোকেদের সঙ্গে মিলে ক্ষমতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বড়-বড় কোম্পানীর বড়সাহেবদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে আপনি তাদের কব্জায় রাখতে চান, আবার তাদের যথাসময়ে সাহায্য করে শেয়ারহোল্ডার ও গ্রাহক কর্মচারীদের উপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান। কোম্পানীগুলোর সঙ্গে আপোষ, অর্থাৎ তাদের হিসেবের কারচুপিতে সাহায্য করাই আপনার অস্তিত্ব ও সামাজিক উন্নতির পক্ষে 'এসেনশিয়াল'। তা বলে তাদের মাইনে-করা চীফ এ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর মত তাদের নির্দেশ অবাধে মেনে নিয়ে চলতে আপনি চান না। একটা বিরোধের ভাব বজায় না রাখলে ওদের কাছ থেকে আপনারা সম্মান বা পাওনা কিছুই পাবেন না। তাই এই বিরোধের ভাব। আপনার স্ত্রী এক বড় কোম্পানীর প্রতিনিধিস্থানীয়। সেই কোম্পানীর একটা বড়দরের উপকার করে আপনি স্ত্রীরত্নটিকে লাভ করেছেন। পুরুষ-প্রধান সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা আপনাকে অনিচ্ছুক স্ত্রীর কাছ থেকে জোর করে ভালবাসা বা যৌনতৃপ্তি আদায়ের জন্য তাগিদ দিচ্ছে, আবার অন্যদিকে অত বড় কোম্পানীর প্রতিনিধির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করার পক্ষে আপনার আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি সাড়া দিচ্ছে না। যদি আপনার স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক মর্যাদা আপনার সমপর্যায়ের হত, তাহলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়াই আপনি অনায়াসে স্যাডিস্ট হতে পারতেন। যতদূর আপনার জীবন ইতিহাস জেনেছি, তা থেকে মনে হয় আপনার যৌনজীবনে বড়দরের কোন পারভার্শান নেই। আপনি মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই যৌনবিলাসে অভ্যস্ত। প্রতিষ্ঠা ও অর্থের বিনিময়ে নারীদেহ ভোগ করেছেন। আপনার সমাজে এই রকমই চলে আসছে। এর জন্যে আপনাকে দোষ দেওয়া চলে না। যে-বিশেষ ধরনের যৌনবিকারকে ম্যাজোকিজম বলা হয়, আপনার মধ্যে তার লক্ষণ দেখছি না। যে বিশেষ দুঃখজনক পরিবেশে যৌনউত্তেজনা ঘটিয়ে দুঃখ-বেদনাকে উদ্দীপককে যৌন-উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত করার ফলে ম্যাজোকিজম-এর জন্ম হয়, আপনার যৌন ইতিহাসে তার কোন উল্লেখ নেই। যেভাবে আপনি যৌনজীবন যাপনে অভ্যস্ত, তাতে মনে হয় বিবাহিত স্ত্রীসহবাসে আপনি আনন্দ পাবেন না। ধর্ষকামী-মর্ষকামী কথাগুলো বাজারে যতটা চালু, বাস্তব জীবনে এরা ততটা সহজপ্রাপ্য নয়। আমার স্বল্প অভিজ্ঞতার ফলে এই মত আমার গড়ে উঠেছে। এক দল সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে স্যাডিজম ম্যাজোকিজম যৌন সম্পর্করহিত হয়ে সমাজে নেতৃস্থানীয়ের মনোভাব ও অনুগামীদের মনোভাব বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। নেতারা আত্মপ্রাধান্য জাহির করতে চায়, অনুগামীরা বশ্যতা স্বীকার করে খুশী থাকতে চায়। নেতারা বেদনা দিয়ে, অত্যাচার করে আনন্দ পায়, আর অনুগামীরা ব্যথা পেয়ে অত্যাচারিত হয়ে আনন্দ পায়। এই ধরনের মত একদেশদর্শী। নেতা এবং অনুগামীদের মধ্যেকার সম্পর্ক অত সহজ একতরফা নয়। দল বাঁধার মধ্যে, দলে একজনকে নেতা নির্বাচিত করার মধ্যে কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিদ্যমান। একথা ভাবা ভুল। আদর্শ, উদ্দেশ্য, সব কিছুকে ছোট করে দেখানোর প্রচেষ্টা এর মধ্যে বিদ্যমান। সমাজের শ্রেণীস্বার্থকে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে যাওয়া এই সমাজ-বিজ্ঞানীদের অভিপ্রায়। আবার সব কিছুই আদর্শ-কেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক বা মনস্তাত্ত্বিক কোন সম্পর্ক নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে নেই; — এই ধারণাও সঙ্কীর্ণ ও একপেশে।

মনোহরবাবু স্যাডিজম ম্যাজোকিজম ইত্যাদি জারগন ব্যবহার না করেই নিজের অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান বুঝতে পেরেছিলেন।

—অনামিকা

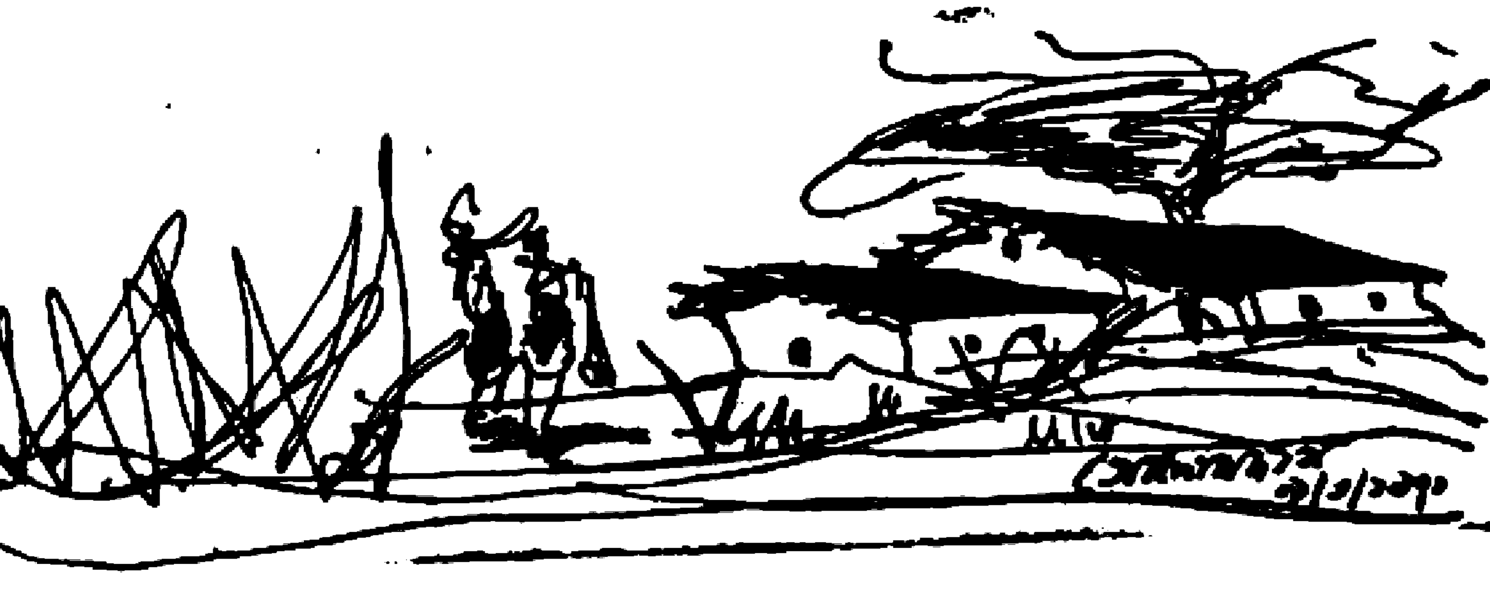

পরী হনহনিয়ে ধানক্ষেতের আল ধরে ভুধরের কুঁড়ের দিকে যাচ্ছিল কাছিমের খোল আনতে। ছোট ভাইয়ের হাঁপা হয়েছে। কাছিমের খোলে রোগ সারে। বলেছে চন্দার শাশুড়ী বাউণ্ডীবুড়ী। মা বলল, যা পরী ভুধরের কুঁড়েতে টাটকা কাছিমের খোল। নিয়ে আয়।

শ্রাবণের ক্ষেত রসে টইটম্বুর। পা মাথালে কাদায় জলে একাকার। ছপছপ ছপছপ সুরেলা শব্দ নয়, কাদা মাখামাখি মাঠে প্যাচপ্যাচে শব্দ। কাবিড়া ক্ষুদে পুঁটি ধরে খাগড়ে শোল শাকাল মাছের অন্তর্জালি পাহারালি। দীর্ঘ ঘাসের মত ধানের গুচ্ছের গায় সবুজ রঙ মাথায় ন্যুব্জ প্রণাম। কাকেদের ডানা-পাওয়া পিঁপড়ের উপর ঝাপটা-ঝাপটি, কালো ঠোঁট দিয়ে মরা ঢোঁড়া সাপ কিংবা ব্যাঙের উপর ঠোঁট ঠোকা। তপস্বী ধবধবে সাদা বকের নির্বাক নিস্পন্দ ভঙ্গী। এদিকে রোদ যেন ফাটি-ফাটা। গা জ্বললে, বুক পোড়ে। গায়ে লাল ডোরা শাড়ী, হাঁটুর উপর তোলা, নগ্ন বাহু, গলা কাঁধ, ওদিকে পিঠের মসৃণ উজ্জ্বল মাংসল অনেকখানি অংশ, তবু বুকের ভিতর পিঁপড়ের কামড়, সরসরানি, খাঁজে খাঁজে ঘাম। যুবতী মেয়ে কাপড় ফেলতে পারে না। কালো ছোটখাট শরীরে যৌবনের ঢেউ। চোখের তারায় ঘোর করে বহ্নির ছবি। আশ্চর্য উদ্ধত যৌবন রেখাঙ্কিত দেহের যেন টান টান সতেজ, ভুঁইচাঁপার কাঁটির মত ভঙ্গীমা। সুতরাং কালো মুখ আরও কালো হয়। উষ্ণতা আরও বাড়ে। মাথার উপর চিলের চাঁক, সোনার উজ্জ্বলো রোদে ডানা ছড়ান পায়রা, কিন্তু না, ওদিকে পশ্চিম কোণে কালো একটু মেঘ উঠেছে, চোখ তাতে আটকায়। আঃ জল যদি নামে! ঝরঝর ঝরঝর।

বৃষ্টি নামলে পরীর এখনও ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করে। ঘর ছেড়ে সতেরর এই দেহ নিয়ে কোমরে কষে কাপড় বাঁধা, মাথায় চুল এলো, এই সব মাঠঘাট, পুকুরের পাড়, উঁচু প্রান্তর, ওদিকে আমবাগান, তালের শ্রেণী, ছড়ানছিটান মহুয়ার শরীর এ সবের ভিতর দুটি নগ্ন বাহু দুদিকে ডানার মত দীর্ঘ কষে অবিরাম বৃষ্টিধারায় স্নাত হবেও যেন সুখ তার ফুরোয় না।

মা মাথায় শুকনো চুলের রাশি, আটটি সন্তানের জন্ম দেবার পর দেহের অতি ক্ষীণ শক্তি এবং মাংস অবশিষ্ট, হাড় জিরজিরে, রুক্ষ, সবসময়ই রুক্ষ কর্কশ স্বরে কথা বলে, আঁ সুয়ামী বেঁচে থাকলে তিন ছেলের মা হাঁড়িস মাগী, এখনও ভুর ঝলাভজাতে সখ।

বাপ মাথা চাপড়ায়। শুকনো শরীর। বেঁটেখাট। কোমরে এক চিলতে কাপড়। খালি গা। বয়স নয় সংসারের ভারেই দেহ যেন ক্লান্ত বিপর্যস্ত বয়সী। বলে, কপাল। আমার কপালের দুখ গো। যা মেয়েটো বুঝে না উর বুদ্ধি নাম নাই। ই জন্যই উর বিয়ল।

মেয়ে শাঁটাই বোঝে না। দুকালে দুঃখ থাকত, জ্বালা থাকত। দুঃখের পোকা বড় সর্বনাশা পোকা। হাড় মাংস মেদ মজ্জা সবকে কুরে কুরে খায়। খেয়ে খেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে। তখন দেহের দাম নেই। জীবনের দাম নেই। তখন চোখের সামনে আলো নেই। দু চোখের দৃষ্টি নেই। কিন্তু এ মেয়ে ভিন্ন। এ মেয়ের কথায় কথায় হাসি। যৌবন যেন দু হাত উজাড় করে ঢালছে তার ঐশ্বর্য। দেহের ছটা বাড়ছে, কমকানি নিচ্ছে, মসৃণ মাংসের উজ্জ্বলতা বাড়ছে, চোখেমুখে রক্তাভ রঙ বাড়ছে। এ মেয়ে শরীরে ঢেউ তোলে, বাজনার মত সুরেলা কণ্ঠস্বর বাজে, খলখলে হাসি জল-তরঙ্গ যব, আমি মুম গো। শশ কেনে কার মাথা খেতে হবেক। হাঁ হুঁ বাবা একমাসের লেগে ডাক্তার করব। ভাবাতে বল হরি হরি বোল।

কালসাপ

অশোককুমার সেনগুপ্ত

শ্রোতারা বাঁ কানে হাত রাখে, হেই মেয়ে চুপ কর। মনে বলে, রাক্ষসী।

আসলে মেয়ে দুরন্ত দুর্বার। বুকে যেন সাহসের পাহাড়। তরতর করে কাঠ-বিড়ালীর ক্ষিপ্রতায় গাছে ওঠে। মাছের মত জলে সাঁতার কাটে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে তেজীয়ান ঘোড়ার মত ছোটাছুটি করে। মা বললে রাজ্যি ঢুঁড়ে জিনিস এনে দেয়। কোথায় কলমি শাক কি সর্ষের ফুলো বাসক পাতা কিংবা কোন খালে মাগুর মাছের বাসা তা যেন মেয়ের নখদর্পণে। এদিকে কোমর বেঁধে ঝগড়া করাতে ও কুটিলা। বাঁধন ঘরের আলগা। দুঃখের পোকা মেয়ের মনে না থাক, ঘরের চালে ঘরের বাতাসে ঘরের উঠোনে ছড়াছড়ি। অবিরত কিলবিল করে বেড়ায়। সুতরাং আটকায় না। যাক মেয়ে যেখানে খুশী। ছিনিয়ে নিক যতটুকু পারে ততটুকু সুখ। পাড়ার মানুষ আগে বলত, এখন সব মুখ তাদের বন্ধ। মেয়ে তো নয় রাক্ষসী। গুজগুজ করে। ঘরের জোয়ান ছেলেদের আটকে রাখে। হেই বাপ ও মেয়ে নয়। রাক্ষসী বটেক। দু' দুটো সোয়ামীর মাথা খেলেক। উর দিকে চোখ দিস না। ভুর লেগে মেয়ে দেখছি বাবা। সোন্দর মেয়ে।

কান্তর মা আঙুল মটকে চোখের মধ্যে আতঙ্ক আর জ্বালা ফুটিয়ে বলেছে, মর মাগী মর! কান্ত জোয়ান ছেলে। বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে পরীকে দেখা যায়। কান্ত সেদিকে তাকিয়ে একদিন বলেছিল, মা পরীর বাড়া দুখ। উকে আর সাম্না করবেক কে! কিন্তুক আমার মনে হয়...। মা সটান দাঁড়িয়ে বলেছে, হেই বাপ চুপ কর। উ মেয়ের নাম লিস্ না।

কান্তর মায়ের জোয়ান ছেলে, কিন্তু মুখোর বৌ, তিনকড়ির পিসী, তারণের বিধবা নিঃসন্তানা দিদি সকলেরই যেন আতঙ্ক। মেয়ে না জানি কি অঘটন না ঘটায়। এদিকে আবার গণকঠাকুর হাত দেখে বলেছেন, মেয়ের হাতে চক্র। এ মেয়ের সাম্না দিস না বাবা। গণকঠাকুরের কথা পাড়াতে ছড়াতে দেরী হয় না। এবং তারপর থেকেই পরীকে ঘিরে কথার ঝড় কল্পনার ঝড় এবং ভয় আর আতঙ্ক যেন ওর সঙ্গে ছায়ার মত ওর পায়ে পায়ে হাঁটে।

পরীও ব্যাপারটাকে কতখানি গ্রাহ্য করে বলা কঠিন। সে বুকের আঁচল টেনে মুদীর দোকানের ছোকরা হরিদাসের দিকে তাকিয়ে খলখলিয়ে হেসে বলেছে, তা পুরুষমানুষ ইদিকে বাড়া লুভ। বিকার কথা বললে মুখ চুন। একটু থেমে বড়যন্ত্র করা ফিসফিসে গলায় তারপর বলেছে, হেই মানুষ আগুনে ঝাঁপ দিবার সখ কেনে। দেশে মেয়েমানুষ নাই। বৌ-মরা দু' ছেলের বাপ জগোকে বলেছে, হাঁ একট কথার মত কথা বটেক? তুমার সাথে বিয়া হলে কি যে হবেক। তা গণক-ঠাকুরকে দিখাও কেনে গো, হাতে চক্কর তুমার আছেক কি না। তারপর হাসি। যেন জগাকে নিয়ে তার বিদ্রূপ। দুঃখ অথবা জ্বালা নয় পরীর যুবতীশরীরকে ঘিরে যেন শ্রাবণের ক্ষেতের মত সবুজ ধানের গুচ্ছে বাতাসের ছোটাছুটি, যেন মাথার উপর আকাশ, আলো, যেন চতুর্দিকের তার এই জন্মভূমিতে অতুল ঐশ্বর্য, অজস্র অদেখা সামগ্রী—পরী তার দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে এ সবের ভিতর ছড়িয়ে দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

উঁচু ডাঙায় ভূধরের কুঁড়েখানা দেখা যায়। আমের ডাল খড় বাঁশ দিয়ে কুঁড়ে। চারদিকে উঁচু ওই ভুঁইটুকুতে দাঁড়ালে দেখা যায় অগম্য শস্যভূমি। অদূরে ঝোপ-ঝাড়ে, আড়ালে গাঁ। দক্ষিণ দিকটা হঠাৎ জমাট একটা আমবাগান, ছড়ানোছিটান তাল-খেজুরের টানটান শরীরও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। শ্রাবণ শুরু, পৌষে শেষ ভূধরের এই ঘর? জানালে সে এসব ক্ষেতে। গরু বাছুর ছাগল ভেড়া এখন তাড়ায়। তারপর আশ্বিনের গন্ধ পেয়ে সবুজ শরীর থেকে দুধ গেলে যখন সোনালী হবে ধানের গুচ্ছ, যখন ধান নয় মুঠো মুঠো সোনা নিয়ে শিশিরে ভিজবে তখন লাঠি হাতে সে হাঁক পাড়বে অন্ধকার অথবা জ্যোৎস্নালোকিত এই উঁচু ভুঁই-টুকুতে দাঁড়িয়ে, হো...হো...ও...ও। উত্তর আসবে অনেক দূর থেকে, আরও দূরে মাঝে মাঝে আরও আরও কুঁড়ে জাগানির কণ্ঠস্বরে। রাতের বাতাসে থমথম করবে। শিয়ালের হাঁকের মত সেই শব্দ ক্রমান্বয়ে তারপর দিগন্ত ছাড়িয়ে এক থেকে অন্যে ভেসে বেড়াবে।

উঁচু ভুঁইটুকুতে উঠে পরী কুঁড়ের সামনে ভূধরকে দেখতে পায় না। তবে কি ভেতরে মানুষটা। ইতিমধ্যে জোরালো বাতাস বয়। পশ্চিমের মেঘে আকাশ আবৃত হয়ে যায়। অজস্র ধারায় নয় ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি ঝিরঝির করে ঝরে। গায়ে হিম হিম অনুভূতি সব জ্বালা মুছে দেয়। সবুজ সতেজ ঘাসে পা চেপে চেপে পরী হাঁটে। ডাইয়ের চড়পা। কাশিমের খোল ভূধরের কুঁড়েতে। দিনকয়েক আগে কাশিম মেরেছে মানুষটা। ইয়া কাশিম। পরী দেখেনি। শুনেছে। কুঁড়ের আগল যেন আটকান। মানুষ থাকলে আটকান কেন! ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে মাথায় ঘোমটা টানে না পরী। দিনের আলো নিবে আসা বেলার দিকে তাকায়। ছাগলতাড়ানি দল, ওদিকে ছাগল ভেড়া ছুটেছে। অদূরের গরুর পাল শুধু নির্বিকার। আকাশ যেন ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। জোরে বৃষ্টি নামবে বোধ করি।

আগলটাকে নাড়া দিয়ে পরী টের পায় মানুষটা নেই। এদিকে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি আর নেই। কিছুটা জোর বাড়ল। মেঘেরও গুড়গুড় একটা শব্দ শোনা গেল। কার যেন কার উদ্দেশে হাঁক। পরী পিছন ফিরল। ক্রমান্বয়ে গাঁখানা বৃষ্টিধারায় ডুবছে। ডুবুক। পরী ছুটবে। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে বনবন সনসন যেন বাতাস পরী ছুটবে—ছুটবে। এমন সময় তালপড়ার শব্দ। মুহূর্তের দ্বিধা। একপলক দেখে নেওয়া। তারপরই ছুট। ওই তো জমাট আমবাগান, পাশেই তালের গাছ। পাকা তাল। আল ধরে নয়। ধানের মাঠ কাদা আল পরী ভ্রূক্ষেপ করে না, কাপড় কাদা লাগে, হোঁচট খেতে খেতে সামলে নেয় বনবনে ছোটে। তালটা দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় মাটিতে গাঁথল। ধানের গুচ্ছের পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কেউ কোথাও নেই। তবু ছুট। তালপড়ার শব্দ পেলেই পা শিরশির করে ওঠে।

তালগাছটার সামনে এসে নিজেকে সামলে নেবারও অবসর পায় না পরী। ক্ষেতের মাটিতে পা গেঁথে যায়, পাথরের মূর্তির মত সে স্থির, দেখে মাটি ফুঁড়ে যেন ভরত, কোমরে একটুকরো কাপড়, দীঘল শরীর, পেশীবহুল হাত পা, পাটল বুক, ঘামতেল দেওয়া মূর্তির মত ধর্মাসক্ত হস্তে তালটা, পাকা কালো তাল তুলে ধরে হাতের চাটুতে বলে, লাও।

পরী কাদা থেকে পা তোলে। অতি ধীর মন্থরগতিতে ক্ষেত থেকে উঠে বাগানের ঘাসে দাঁড়ায়। বৃষ্টির তোড় বাড়ে। চারপাশ বৃষ্টিধারায় ডুবে যায়। শাহগাছালি ক্ষেত, অদূরের গাঁ, গরুর পাল দেখা যায় না। ছুটে আসার পর ভিতরের উষ্ণতা, সামনে ভরত, সুতরাং বৃষ্টিধারা মুছে দিতে পারে না। বুকের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে। রক্তের ভিতর কেমন যেন পিপাসা ডানা ঝাপটায়। পরী চোখ তুলতে পারে না। তবে মুহূর্তের। তারপর বলে, কেনে দুব, তুমি কুড়িন-হ!

তুকে দিছি। ভরত হাত বাড়িয়ে দেয়।

দাতা হরিশচন্দ। পরী ঠোঁট বেঁকায়। বলে, সর। উপাশে গাছতলাতে দাঁড়ায়। একটা বিশাল আমের গুঁড়িতে গা ঠেসে দাঁড়ায় পরী। মুহূর্তকালের বিভ্রান্ত ভাব, তারপরই পরী সামলে নেয় নিজেকে। ভরতকে এ মুহূর্তে এই অজস্র বৃষ্টির মধ্যে এই নিরালায় এত নিকটে পাওয়ার উল্লাস রক্তধারায় তিরতির করে বয়। কতদিন থেকে যেন সাধ ছিল মানুষটাকে মুখোমুখি পাওয়ার। হাঁ, কি যেন আছে মনে। কোথায় যেন শূন্যতা। সব পুরুষকে অগ্রাহ্য জগাকে অগ্রাহ্য জীবনকে অগ্রাহ্য যৌবনকে অগ্রাহ্য করার পরও এই একটি পুরুষের কাছে যুবতীমন যুবতীশরীর যেন সমর্পণের ভঙ্গীমায় নতজানু হয়ে আশ্রয় দাও-এর প্রার্থনায় কাতর হয়। গণকঠাকুর হাত দেখার আগে সবই ঠিক

ছিল। ভালবাসা, বিয়ের প্রতিশ্রুতি, ভরতের সঙ্গে নতুন ঘর নতুন সংসারের স্বপ্ন সাধ আশা আহ্লাদ আকাঙ্ক্ষা মান অভিমান সবই। তারপরই ভরত ছাড়া ছাড়া। মুখোমুখি হয় না। যেন গণকঠাকুরের বায় দুটি জীবনের মধ্যে একখানা খরস্রোতা নদীকে ফেলে দিল। দুজন দুই তীরে। তখন থেকেই বুকে কাঁটা মনে কাঁটা। হাসির ফোয়ারা কথার ঢেউ সবকে ছাপিয়ে বুকের হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা তীব্র ক্ষত।

পরী।

উঁ।

জিব নাই?

মাথা দোলাল পরী। বলল, না। ই পাশে সরে এস কেন তুমারে খেয়ে লব না।

হাত থেকে জাল ফেলে দিল ভরত। পরীর দিকে তাকাল। তাকান যায় না। জলভেজা যুবতীশরীরখানা আকর্ষণের ভঙ্গীমায় স্থির? দেহের প্রতিটি ঈষৎ রেখা, সমুন্নত বুক, জলভেজা চিবুক ঠোঁট, নগ্ন বাহু, গায়ের চামড়া ছব, দৃষ্টি থেকে রেহাই নেই। যেন দিব্যি যেন বা অপরূপা যুবতী পরী অপূর্ব ভঙ্গীমায় ঠায় চেয়ে থাকে।

তুমি আমার সাথে মিথ্যা কর না।

সময় পাই না পরী। একটুস সময় পাই না।

এতেক কাল ত পেতে।

ভরত চোখ নামাল।

শুনছ?

উঁ।

আমি জলে ভিজছি? পরী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, তুমি বলেছিলা কষ্ট দিবে নাই আমারে। বলেছিলে তুমি আমারে সুখে দিবে। বলেছিলে, পরী তু আমার পরাণের পাখি? তুকে ছাড়া বাঁচব নাই।

হাঁ। হাঁ।

তাবাদে গণকঠাকুর এলেন।

হাঁ।

তাবাদে। পরী ধরা গলায় বলে ভরতের দিকে তাকাল।

ভরতের এ সময় বুকে যেন বা চতুর্দিকে প্রকৃতির প্রলয়কালের খেলার মত খেলা চলে। কাঁপুনি এনে দেয় মনে। পরীর কথা নয়, পরীর যুবতীশরীর কয়েক হাত মাত্র কয়েক হাত দূরে অনুপম ভঙ্গীমায় কাঠের গাঁড়িতে হেলান, সে ভঙ্গি বৃষ্টিভেজা শরীর মেঘের শব্দ, থমকে গাছগাছালিতে ঝরা বৃষ্টিপাত থরথর করে কাঁপে। নিজেকে স্থির রাখতে পারে না? বুকের ভিতর কল্লোল। পরী ভালবাসার মেয়েমানুষ। পরী যুবতী। শরীর দেহভরা যৌবন। ভরত বিড়বিড় করে, পরী আমি কি করব।

আমারে দেখ।

পরী আমারে কানা করে দে।

কেনে!

তুক, দেখতে হবে না।

হেই মানুষ, তুমি পুরুষ লও। তুমার বুকে সাহস নাই।

আছেক পরী।

গণকঠাকুরের রায় ফেরা যায়

না।

তুমার মন কি বলে।

ভরত মাটির দিকে তাকায়।

শুনছ?

উঁ।

কাছে এস আমার। এস। আমি জলে ভিজছি। তুমি আমারে ঢাকা দাও।

পরী!

তাকাও পুরুষ। আমার পানে তাকাও। আমি যে মরে গেছি গো। পরী আলুথালু কণ্ঠস্বর এখন বিড়বিড় করে, দেখ, আমার দিকে তাকাও। হেই পুরুষ।

মাথার উপর মেঘেরা শব্দ করে। অবিরল বৃষ্টিধারা গাছের পাতায় ভয়ঙ্কর শব্দ এনে দেয়? চতুর্দিক বৃষ্টিধারার ধবধবে সাদা তুষারে আপ্লুত। চোখের সামনে দেখা না কোন দৃশ্য না অবিরাম শব্দ, বৃষ্টিপাত। সম্মুখে যুবতী জলসিক্ত ভালবাসার মেয়েমানুষ পরী, এ মুহূর্তে ধার ভিন্ন এক সত্তা ভরত চোখের উপর দেখে যেতে দেখে পৃথিবীর ছবি। এগিয়ে যাবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা রক্তকণিকায় তীব্র উত্তেজনা এনে দেয়। সে ডাকে পরী।

পরীর চোখে চোখ, পরীর শরীর চোখ রাখতে গিয়েই তার চোখে পড়ে আমের জলসিক্ত কালো একটা শাখা বেয়ে লম্বা একখানা সাপ লকলকে চেরা জিভ বের করে এগিয়ে আসছে পরীর মাথা বরাবর। দেখামাত্র বুকের ভিতর প্রচণ্ড হিম, ভরত দূরে, মাথা বরাবর পরীর কালসাপ সে বলে উঠতে পারে না, চিৎকার করে পরী সরে আয়? বলে আর্তনাদ করে উঠবে না। প্রচণ্ড হিম তার শরীরখানার উষ্ণ রক্ত তুষার রক্ত মাংস হাড় যেন মজ্জার দেহখানা তুষার—অবিরাম বৃষ্টিপাতে গলে ক্রমশ গলে একটা দীর্ঘ জলধারা হয়ে বয়ে যাচ্ছে টের পায় শুধু।

বিজ্ঞানের কথা

পৃথিবীর আকার

পৃথিবীর আকার কি রকম? প্রশ্নটি পুরনো, সম্ভবত মানুষ যতোদিন এই পৃথিবীতে আছে ততোদিনের। কিন্তু ১৯৫৭ সালে মহাকাশ-অভিযানের যুগ শুরু হবার আগে পর্যন্ত এই প্রশ্নের পুরোপুরি সঠিক জবাব দেওয়া বাস্তব কারণেই অসম্ভব ছিল। কেননা কোনো জিনিসের সঠিক আকার জানতে হলে জিনিসটিকে বাইরে থেকে দেখা দরকার। পৃথিবীকে প্রথম বাইরে থেকে দেখা সম্ভব হয়েছিল স্পুৎনিক থেকে, পরবর্তীকালে আরো অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে। ফলে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কিছুটা বদলাতে হয়েছে। আজকের বিজ্ঞানের কথায় এই মানুষের মতো পুরনো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা তুলতে চাই। বিষয়টি পুরনো বটে কিন্তু বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য অগ্রগতির যুগেও বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে সে-কথা বলা চলে না।

তাহলে গোড়ার থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক।

মানুষ এই পৃথিবীতে আছে অন্তত দশ লক্ষ বছর ধরে। নিজেকে যদি সেই দশ লক্ষ বছর আগেকার আদিম মানুষদের একজন বলে ভাবি, তাহলে দেখব কোনো বা এমনি কোনো অঞ্চলের পর্বতের গুহায় আমি বাস করছি, তখনো খাদ্যের উৎপাদক নই, আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে ফলমূল সংগ্রহ ও শিকারের ওপরে। কিন্তু চোখের সামনে তখনো এমনিভাবেই প্রসারিত রয়েছে এই জগৎ ও এই আকাশ। দশ লক্ষ বছর আগে আমি অবশ্যই এখনকার মতো বুদ্ধিমান নই, কিন্তু চিন্তা করার ক্ষমতা আমার আছে। তাই বলে কি ভাবতে পারতাম যে, পৃথিবীটা গোলাকার? সম্ভবত পারতাম না।

কিন্তু চন্দ্র ও সূর্যের দিকে তাকিয়ে সেই দশ লক্ষ বছর আগেও নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারতাম এই দুটি জ্যোতিষ্কের আকার গোল। অন্ততপক্ষে ওই দুটি জ্যোতিষ্কের আকারকে থালার সঙ্গে তুলনা করতে পারতাম। পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা, আবার অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অনুমান করার মতো বুদ্ধি যদি থাকত, তাহলে এমন কথাও ভাবতে পারতাম যে, এই পৃথিবীর আকার গোলকের মতো। কিন্তু চোখের দেখার পৃথিবী যেমনি সমতল থাকত, কাজেই পৃথিবীর আকার গোলকের মতো ভাবতে পারা সে-সময়ে সহজ ছিল না।

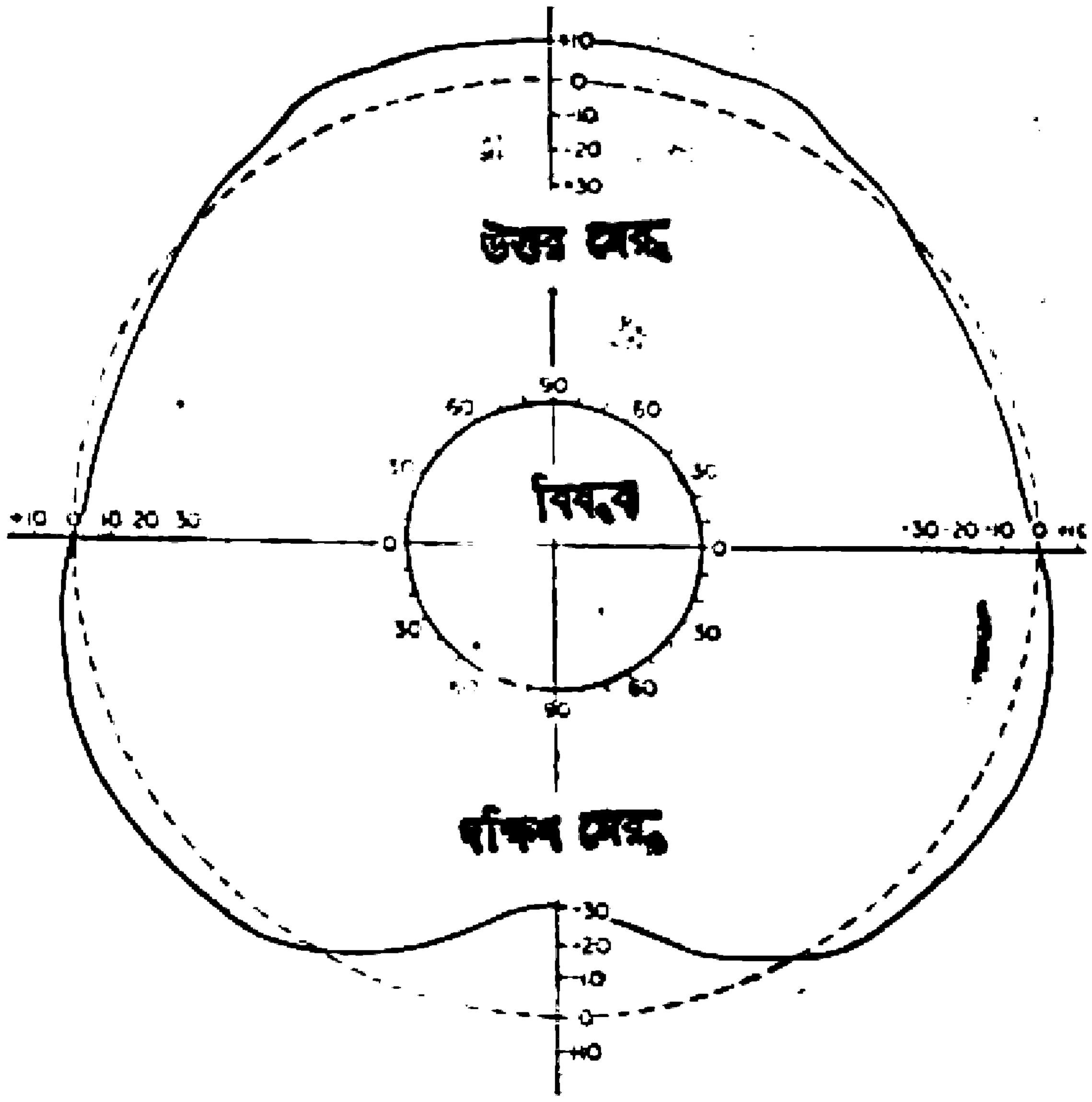

১৯৫৭ সালে মহাকাশ-অভিযানের যুগ শুরু হবার আগে পৃথিবীর চেহারা সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা দেখানো হয়েছে ভাঙা লাইনে। ১৯৫৭ সালের পরে স্পুৎনিক ও অন্যান্য উপগ্রহের সাহায্যে হিসেব করে পৃথিবীর চেহারা সম্পর্কে যে ধারণা করা হয়েছে তা আস্ত লাইনে। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তর মেরুর দূরত্ব পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ মেরুর দূরত্বের ৪০ মিটার বেশি। বিষয়টিকে বোঝাবার জন্যে এই মাপ অনেক বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

শুধু চোখের দেখায় যদি কোনো জিনিসের সঠিক আকার জানতে হয়, তাহলে জিনিসটিকে বাইরে থেকে দেখাই সুবিধে। এই সুবিধাজনক অবস্থাটি প্রথম সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীকে ঘিরে পাক দিতে শুরু করার পরে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে হেরফের ঘটলে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথেরও হেরফের ঘটে। এই হেরফেরের মাত্রা হিসেব করেই পৃথিবীর সঠিক আকারটি জানবার চেষ্টা করা হয়েছে।

যাই হোক, দশ লক্ষ বছর আগেকার আদিম অবস্থান থেকে যদি প্রাচীন গ্রীসের মহান যুগে এসে দাঁড়াই, তাহলে দেখব মানুষের চিন্তাজগতে বড়ো রকমের অগ্রগতি হয়ে গিয়েছে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্যেই গ্রীক-পণ্ডিতরা অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর আকার গোলকের মতো। তাঁরা মনে করতেন গোলাকার হওয়াটাই সবচেয়ে নিখুঁত আকারবিশিষ্ট হওয়া। অতএব সূর্য ও চন্দ্রের মতো পৃথিবীর আকারও গোলকের মতো। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত থেকে নয়, একটা বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে তাঁরা যে ধারণা করেছিলেন তা কিন্তু সঠিক ছিল।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে একজন গ্রীক পণ্ডিত আরো অনেকদূর এগিয়ে এসেছিলেন। পৃথিবীর পরিধির একটা মাপ পাওয়া গিয়েছিল তাঁর কাছ থেকে। পৃথিবীর পরিধি ৪০,০০০ কিলোমিটারের সামান্য কিছু বেশি। তিনি যে-মাপে পৌঁছেছিলেন, তার সঙ্গে আসল মাপের খুব বেশি হেরফের ছিল না (এক

অক্ষাংশেরও কম)। কোন্ পদ্ধতিতে মাপ নিয়েছিলেন তিনি? তিনি লক্ষ করেছিলেন সূর্য যখন আসওয়ানের আকাশে ঠিক মাথার ওপরে, আলেকজান্দ্রিয়ার আকাশে ঠিক মাথার ওপরের বিন্দু থেকে ৭·২ ডিগ্রী (অর্থাৎ একটি বৃত্তের বা ৩৬০ ডিগ্রীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ) দূরে। অতএব আসওয়ান থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার যা দূরত্ব, পৃথিবীর পরিধির মাপ হওয়া উচিত তার পঞ্চাশ গুণ। আসওয়ান থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত যেতে একটি উটের কত সময় লাগে, তা থেকে তিনি আসওয়ান থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত দূরত্ব নির্ণয় করলেন। তা থেকে পৃথিবীর পরিধির মাপ।

পৃথিবীর আকার যে গোলকের মতো —গোটা মধ্যযুগ ধরে এই ধারণা বজায় ছিল। মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার অনেক কিছুই পরে বাতিল হয়ে গিয়েছে। এমন মধ্যযুগেও পৃথিবীর আকার সম্পর্কে সঠিক ধারণাটি বজায় ছিল—একথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করার মতো। শেক্সপীয়রের রচনাতেও গোলকের মতো আকার বিশিষ্ট পৃথিবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিন্তু হুবহু গোলকের মতো নয়, মেরুদেশে খানিকটা ভিতরে ঢোকানো। প্রকাণ্ড একটা হাত যেন উত্তর মেরুতে ধরেছিল, তার ফলে উত্তর মেরু খানিকটা চেপে গিয়েছে। কতটা? পেট বরাবর পৃথিবীর ব্যাসের (বিষুব ব্যাস) চেয়ে মেরু বরাবর পৃথিবীর ব্যাস (মেরু ব্যাস) ৪০ কিলোমিটারের কম। এ থেকে বসে-যাওয়ার একটা মাত্রা পাওয়া যায়। তা হচ্ছে তিনশতে প্রায় এক ভাগ, বিষুব ব্যাস ও মেরু ব্যাসের বিয়োগফলকে বিষুব ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায়।

নিউটন ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি মেরুদেশের বসে-যাওয়ার মাত্রার একটা হিসেব করতে পেরেছিলেন। মোটামুটি ঠিক হিসেবই করেছিলেন।

তারপরে আঠারো শতকে এসে দেখতে পাব পৃথিবীর সঠিক আকারটি ঠিক করার জন্যে বিজ্ঞানীমহলে জোর চেষ্টা চলছে। এখনো স্থির হয় যে, উত্তর মেরু ও বিষুব অঞ্চলে ১ ডিগ্রী অক্ষাংশে ভূপৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য মেপে দেখা দরকার। ফরাসী বিজ্ঞানীদের একটি দল যায় ল্যাপল্যান্ডে, অন্যটি পেরুতে। কয়েক বছর অশেষ কষ্টের মধ্যে থেকে এই দু-দল বিজ্ঞানী অভীষ্ট মাপ নিয়ে প্যারিসে ফিরে আসেন। দুঃখের বিষয়, দু-দলের মধ্যে বিবাদের দরুণ এই বৈজ্ঞানিক অভিযান থেকে বড়ো রকমের ফল কিছু পাওয়া যায়নি।

তবুও নানাভাবে মাপজোক নেওয়া হতে থাকে। ১৭৫০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মেরুদেশের বসে-যাওয়ার মাপ আরো ভালোভাবে ও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়। ১৯৫৭ সালের আগে শেষ যে-মাপটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা একমত ছিলেন, তা হচ্ছে ২৯৭·১-এ ১ ভাগ। কিন্তু এই দুশো বছরের মধ্যেও পৃথিবীর আকারটি কিরকম তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি।

নির্ধারিত হল ১৯৫৭ সালের পরে। এই সময় থেকেই কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীকে পাক দিতে শুরু করেছে। এই কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন পৃথিবীর আকার নির্ধারণের একটি নতুন ও শক্তিশালী হাতিয়ার। আকার নির্ধারিত হতে পারে দু-রকম পদ্ধতিতে : (১) পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে উপগ্রহের কক্ষ কি-রকম চেহারা নিচ্ছে তার বিশ্লেষণ থেকে, (২) উপগ্রহকে শূন্যের বিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে জ্যামিতিক ত্রিভুজ থেকে। গত কয়েক বছরে প্রথম পদ্ধতির সাহায্যেই পৃথিবীর আকার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা হয়েছে।

পৃথিবীর আকার যদি হত নিখুঁত গোলকের মতো, তাহলে উপগ্রহের কক্ষের চেহারায় ও আকারে কোনো পরিবর্তনই ঘটত না, কক্ষের সমতলও থাকত শূন্যের একই দিকে নির্দিষ্ট। কিন্তু পৃথিবীর আকার যদি নিখুঁত গোলকের মতো না হয়, তাহলে মাধ্যাকর্ষণের টানে হেরফের ঘটবে এবং তার ফলে কক্ষেরও হেরফের। কতখানি হেরফের ঘটছে, তার মাপটিও অনায়াসে নেওয়া যেতে পারে। তখন এই মাপ থেকেই বেরিয়ে আসে মাধ্যাকর্ষণ কোথায় বেশি কোথায় কম তার একটি হিসেব।

শুধু এটুকুই নয়। পৃথিবীর মেরুদেশ যে খানিকটা করে বসে-যাওয়া, তার কী ফল উপগ্রহের কক্ষের ওপরে? ফল এই যে, কক্ষটি পৃথিবীর অক্ষের চারদিকে পাক খেতে শুরু করে, উপগ্রহের গতি যে-দিকে তার বিপরীত দিকে। মনে করা যাক উপগ্রহের গতি পূর্বদিকে। তাহলে কক্ষের যে-বিন্দুটি বিষুবরেখাকে ছেদ করছে, সেটি চলতে শুরু করবে পশ্চিম দিকে। অর্থাৎ কক্ষের সমতলটি পূব থেকে পশ্চিমে পাক খেয়ে চলবে। আর এই পাক খাওয়ার বেগ নিতান্ত কম নয়। কক্ষটি যদি হয় প্রায় বিষুবরেখা বরাবর, তাহলে এই বেগ দিনে প্রায় ৮ ডিগ্রী। কক্ষটি যদি হয় বিষুবরেখার ৬০ ডিগ্রি কোণাকুনি তাহলে এই বেগ দিনে প্রায় ৪ ডিগ্রী।

১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালে দ্বিতীয় স্পুৎনিকের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা গেল, বসে-যাওয়ার যে-মাপ এতদিন জানা ছিল তা ভুল। আসল মাপটি হওয়া উচিত ২৯৮·২ বা ১৯৮·৩-এ ১ ভাগ। তার মানে, বিষুব ব্যাসের চেয়ে মেরু ব্যাস ৪২·৭৭ কিলোমিটার ছোট।

এমনিভাবে উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর সঠিক আকার নির্ধারণের চেষ্টা শুরু। শেষপর্যন্ত পৃথিবীর যে-চেহারাটি বেরিয়ে এসেছে, তা নিখুঁত গোলকের তো নয়-ই, এমনকি দু-দিক সমান মাত্রায় চাপা গোলকেরও নয়। কোনো ফলের সঙ্গে যদি তুলনা করতে হয় (যেমন এতকাল করা হয়েছে কমলালেবুর সঙ্গে), তাহলে বলতে হয় ন্যাসপাতির মতো। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তরমেরুর দূরত্ব পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দক্ষিণমেরুর দূরত্বের চেয়ে ৪০ মিটার বেশি।

উপগ্রহের পর্যবেক্ষণ থেকে ভূপৃষ্ঠের চেহারাটি কেমন ধরা পড়েছে। সঙ্গের ছবি দেখলে এ-সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যাবে। ছবিটি নেওয়া হয়েছে 'অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স' পত্রিকার জুন ১৯৭০ সংখ্যা থেকে। ডিগ্রীর হিসেবে ভূমির রেখাটিতে দেখানো হয়েছে দ্রাঘিমাংশ —লম্বা রেখাটিতে অক্ষাংশ। ছবিতে বিশ্বের মানচিত্রের ওপরে যোগ ও বিয়োগ চিহ্নযুক্ত কতগুলো সংখ্যা রয়েছে। যোগ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে উঁচু জায়গা বা কুঁজ আর বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে খাদ। সংখ্যাগুলো মিটারে। তার মানে, ভারতের দক্ষিণে একটি খাদ রয়েছে ১৪ মিটার নিচু, আর নিউ গিনির কাছে একটি কুঁজ রয়েছে ৭৫ মিটার উঁচু। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ছবিতে দেখানো হয়েছে সমুদ্র-সমতলের ভূপৃষ্ঠ। এই ভূপৃষ্ঠেই কোথাও কোথাও আছে পর্বত, কোথাও কোথাও উপত্যকা, তা ছবিতে বিবেচনায় আনা হয়নি। ছবি থেকে শুধু জানা যাবে সমুদ্র-সমতলের ভূপৃষ্ঠের চেহারাটি কেমন।

খাদের অংশগুলো ছবিতে দেখানো হয়েছে হালকা কালো রঙে। ফলে অন্য একটা ছবিও ফুটে উঠেছে। মনে হতে পারে আঁকশির মতো নাকবিশিষ্ট একটি লোক আমেরিকাকে দখল করেছে আর প্রাচ্য জুড়ে অন্য রকমের চেহারার অন্য আরেকজন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা এই দুটি লোক একটা কিছু নিয়ে দর-কষাকষি করছে মনে হয়।

যাই হোক, উপগ্রহের সাহায্যে পাওয়া পৃথিবীর চেহারাটা তাহলে কি-রকম দাঁড়াচ্ছে মেরুদেশের দিকে চাপা একটি গোলকের মতো বললে ভুল বলা হয়। বরং বলা যেতে পারে ন্যাসপাতির মতো। আর ভূপৃষ্ঠের কোথাও কোথাও খাদ, কোথাও কোথাও কুঁজ। ন্যাসপাতির সঙ্গে তুলনা এদিক থেকে ভুল, কেননা ন্যাসপাতির গা সমতল হয়ে থাকে। বরং তুলনা করা যেতে পারে এবড়ো-খেবড়ো আলুর সঙ্গে।

তবে যতো তুলনাই করা হোক, শেষ বিচারে পৃথিবীর তুলনা পৃথিবী নিজেই। অন্য কোনো তুলনা খাটে না।

—অয়স্কান্ত

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যায় বিজ্ঞানের কথায় ৬২৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ লাইনে 'নখ' হবে 'নল'। লাইনটি হবে এই : একটি নলের ব্যাস যতো অধিক তার বিকীরণ ক্ষমতাও ততো অধিক।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

অঙ্গনা

শ্রুতকীর্তি চক্রবর্তী

সামাজিক উন্নতিবিধান

একদল কলেজের পড়ুয়া শহরের এই ডামাডোলের মধ্যেও এক নাগাড়ে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সামাজিক উন্নতি বিধানের। ১৯৬৭ সাল থেকে এঁদের কর্মধারা অব্যাহত। এই উদ্দেশ্যে গড়া এঁদের সংস্থাটির নাম হলো 'ইয়ং মেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'। এই সংস্থার বিশেষত্ব হলো যে, উদ্যোক্তা থেকে পরিচালক সবাই কলেজের ছাত্রছাত্রী। তাই সামাজিক উন্নয়নের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন যে আর্থিক সংস্থান তা সেদিন যেমন এঁদের ছিল না আজো নেই। এই বিরাট প্রতিকূলতার ঝুঁকি নিয়েই এঁরা কাজে নেমেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল মহৎ উদ্দেশ্য অর্থ মাথা উঁচিয়ে নিজের প্রতিবন্ধকতা জানান দিলেও যৌবনকে পথ আগলে রাখতে পারে না। ইয়ং মেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সে প্রমাণ পেয়েছে হাতে হাতে। নিঃস্ব অবস্থায় যে যাত্রা তাঁদের সুরু হয়েছিল তা আজো অব্যাহত আছে। এবং দিনে দিনেই তাঁরা কাজের পরিধিও বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

সমাজের অবহেলিত শিশুদের ভাবনা দিয়েই ইয়ং মেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কাজ শুরু। আমাদের সমাজের এক বৃহৎ অংশ অভাব এবং বঞ্চনায় তিলে তিলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ সবাই পায় না। অথচ একটু চেষ্টা করলে একটা জাত বিরাট অপচয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। হয়তো এর মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে দেশের মুখোজ্জ্বলকারী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আর যদি তা নাও হয়, তবু শিক্ষার সুযোগটুকুতো প্রসারিত করা প্রয়োজন। সে সুযোগও তো এরা পাচ্ছে না। সীমিত পরিধিতে এবং সকলের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে এগিয়ে এসেছে এই সংস্থা এই সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে।

সেন্ট লরেন্স হাইস্কুলে এঁরা চালু করেছেন একটি নৈশ বিদ্যালয়। এখানকার পড়ুয়ারা সবাই এসেছে সেই অবহেলিত এবং বঞ্চিতদের মধ্য থেকে। পাঁচ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে সকলের বয়স। কিণ্ডারগার্টেন থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। এজন্য আছেন চারজন মাইনে-করা শিক্ষক এবং বাদবাকি সবাই অবৈতনিক। এই শিশুদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্যে সবাই আপ্রাণ পরিশ্রম করেন। শুধু লেখাপড়া নয়, সেইসঙ্গে নাগরিকবোধেও শিশুদের উদ্বুদ্ধ করেন শিক্ষকরা। ওদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য আছে স্টুডেন্টস কাউন্সিল।

ইতিমধ্যে এঁরা আর একটা স্কুল চালু করেছেন ভবানীপুরে সিমেট্রির কাছে। সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত শিশুদের শিক্ষার আলোকে প্রদীপ্ত করাই এর উদ্দেশ্য। একই রকম নিয়মকানুন এখানেও।

এই দুটি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাই পাঠ্যপুস্তক সোসাইটি থেকে পায়। শিক্ষার গোড়ায় ইন্ধন জুগিয়েই এঁরা ক্ষান্ত হন না। যেসব ছাত্র পরীক্ষায় বেশ সন্তোষজনক ফলাফল দেখায় সোসাইটি তাদের আরো লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন। জলপানি দিয়ে তাদের পাঠানো হয় উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এর সম্পূর্ণ খরচ বহন করে সোসাইটি।

এছাড়া এন সি সি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে। শিশুদের নিয়মানুবর্তী করে গড়ে তুলতে হবে। তাই প্রায় সারাদিন এঁদের নানাভাবে আটকে রাখা হয়। পড়াশোনার একঘেয়েমিতে এরা যাতে না হাঁপিয়ে ওঠে, সেজন্য খেলাধুলার বন্দোবস্ত আছে। মাঝে মাঝে ওদের বাইরে থেকে ঘুরিয়ে আনা হয়। গত বছর গান্ধী শতবার্ষিকীতে ওদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ব্যারাকপুরে। সেখানে ক্যাম্প হয়েছিল ১০ দিনের জন্যে। মাঝে মধ্যে পিকনিকের ব্যবস্থাও আছে। আর চিত্তবিনোদনের জন্যে সিনেমা শো।

বিভিন্ন বস্তি ঘুরে ঘুরে এসব শিশুদের সংগ্রহ করেন সোসাইটির কর্মকর্তারা। ওদের দুরবস্থা তখন আরো বেশি করে নজরে এসেছে। অনাহার এবং অস্বাস্থ্যে ক্ষীণ শিশুদের মুখে একটু হাসি ফোটাবার জন্য সোসাইটি একটি মিল্ক সেন্টার খুলেছে আহিরীপুকুর অঞ্চলে। মোট ২৮০ জন শিশুকে রোজ দুধ দেওয়া হয় এখান থেকে। সেই সঙ্গে এক স্লাইস রুটি। কাউকে কাউকে আবার দুপুরের খাওয়ানোর বন্দোবস্তও আছে। একান্ত দুঃস্থ শিশুদের জনাই অবশ্য শেষোক্ত ব্যবস্থা।

ইয়ং মেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকর্তাদের দিনের অনেকটা সময়ই কাটাতে হয় বস্তিতে। অন্যভাবে বলা যায় যে, বস্তি নিয়েই এঁদের কাজ। এঁরা সেখান থেকে শিশুদের নিয়ে এসে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। এদের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেন। এরপর এসব ছেলেপুলেদের বাসস্থানের সমস্যাটাও এসে পড়ে। সেদিকেও সোসাইটির কর্মকর্তারা সজাগ। বস্তির উন্নয়ন কার্যেও এঁরা নিজেদের নিযুক্ত করেছেন। বর্ষার আগেই বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে টালি বদলে দেওয়া, দেওয়াল সারিয়ে দেওয়া

কথাসরিৎ সাগরের উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চমবর্ষ গল্পকথার প্রতিযোগিতায় অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অংশ গ্রহণ করে।

এবং অন্যান্য টুকিটাকি কাজ এ'রা করে দেন, যাতে অন্তত নিশ্চিন্তে কিছুদিন চলে। বস্তির ব্যাপারে কলকাতার একটা বিরাট অঞ্চল এ'দের উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। বেকবাগান, গড়িয়াহাট, ল্যান্সডাউন এবং ওল্ড বালিগঞ্জ রোড দিয়ে ঘেরা কলকাতার আশু উন্নয়নকার্য এ'দের লক্ষ্য। এর মধ্যে পড়ে রোলান্ড রোড বস্তি, হাজরা রোড বস্তি, ডোভার রোড বস্তি, পেয়ারাবাগান বস্তি এবং আহিরীপুকুর। আর্থিক সামর্থ্য তেমন নেই তাই কর্মসূচী আরো বিস্তৃত করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তবে এ'দের বিশ্বাস যে, এমনিভাবে এগোতে এগোতেই কাজের পরিধি আরো বাড়ানো সম্ভব।

বস্তির লোকের অসুখবিসুখের মুখোমুখিও দাঁড়াতে হয় এ'দের। কলেরা এবং বসন্তের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় প্রতি বছর। এছাড়া গুরুতর পীড়িত রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর দায়িত্বও বহন করতে হয় সোসাইটিকে। সে ব্যাপারে অবশ্য এ'রা লায়নস ক্লাব এবং সমগোত্রীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পেয়ে থাকেন।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের পর যে সমস্যাটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা হলো চাকরি। কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাজার হাজার বেকারের চিত্র। নিরাশায় মুখগুলি শুকিয়ে গেছে। সোসাইটি কিন্তু তবু এদের জন্য চাকরির চিন্তা করে। একদা খোলা হয়েছে শর্টহ্যান্ড এবং টাইপিং কোর্স। ১২ জন কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এর সূচনা। ভোকেশনাল গাইডেন্সেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশপস কলেজে একদা একটি চার মাসের কোর্স খোলা হয়েছিল। সুখের কথা যে চাকরির এই আকালের বাজারেও সোসাইটি তিনজনকে চাকরি দিয়েছে এবং একজনকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানেই বহাল করেছে।

এবার হাত দিচ্ছেন এ'রা আরো বড় কাজে। বেহালার কাছে কেওড়াপাড়ায় খোলা হচ্ছে একটি মাল্টিপারপাস কমিউনিটি প্রজেক্ট। সোসাইটির উন্নয়নকার্যকে আরো বিস্তৃত করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। সেখানে কাজ এখনো শুরু হয়নি। তবে আশা করা যায় যে, শুরু হয়ে যাবে অচিরেই। সেইসঙ্গে সোসাইটির কর্মকর্তারা ভাবতে শুরু করেছেন মেয়েদের এবং মায়েদের কথা। ইতিমধ্যে যে দুটি স্কুল এ'রা চালু করেছেন সেখানে শিশুদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তাঁরা নিয়মিত মায়েদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। তখনই ও'রা লক্ষ্য করেছেন, লেখাপড়ার ব্যাপারে মায়েদের গভীর আগ্রহ। তাই এবার ও'রা উদ্যোগী হয়েছেন মেয়েদের এবং মায়েদের জন্য স্কুল করার।

মেয়েদের এবং মায়েদের জন্য কিছু না করে উঠতে পারার জন্য বিশেষ দুঃখ স্বীকার করলেন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী ব্রতকীর্তি চক্রবর্তী। সোসাইটি গঠন হওয়ার বছরখানেক পরে তিনি এ'দের সঙ্গে যুক্ত হন। তারপর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তিনি কাজ করে চলেছেন। সোসাইটির বিরাট দায়িত্বপূর্ণ পদে এখন তার অধিষ্ঠান।

সোসাইটি নানাভাবে এই উন্নয়ন কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করে থাকে। এখনো নির্দিষ্ট সদস্য আছে। সংখ্যায় এ'রা প্রায় একশ জন। সদস্যরা প্রতিমাসে এক টাকা করে দেন। তারপর টাকা আসে পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে। আর ডোনেশান তো আছেই। কিন্তু এতে করেও সবদিক ঠিক কুলিয়ে ওঠা যায় না। আরো অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই বছরে একবার এ'রা ফ্ল্যাগ-ডের ব্যবস্থা করেন। এবারে অনেকটা সংকুলান হয়ে যায়। দিনে দিনে কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে। তাই টাকার প্রয়োজনও মাথা চাড়া দিচ্ছে। তাই এবার সোসাইটির পক্ষ থেকে সরকারী সাহায্যের জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। সে চেষ্টা এখনো ফলপ্রসূ হয়নি। ফলস্বরূপ সরকারী সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র নিজেদের উদ্যোগে এবং জনসাধারণের সাহায্যের উপর ভরসা করে এতবড়ো কাজ চালানো বাস্তবিক নিঃসন্দেহে অবাক হওয়ার মতো। কিন্তু এমনি ভাবেই এ'রা চালিয়ে নিয়ে আসছেন সেই গোড়া থেকে।

সোসাইটির প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সরকারী সাহায্য পেলে আপনাদের কাজের অনেক সুবিধা হয়, তাই না? উত্তরে বলেছিলেন 'সুবিধা তো হয় 'কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?' এসম্বন্ধে আপনারা একটু লিখুন না। এতে সরকারী সাহায্য না পেলেও জনসাধারণের কাছ থেকে হয়তো আরো বেশী সাড়া পাওয়া যাবে। সেটাই আমাদের অগ্রগতিতে অনেকখানি সাহায্য করবে।'

—প্রমীলা

শাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই একটি নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করছে। 'গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন' নামে এই মন্ত্রিসভা পরিচিতি লাভ করবে। শাসক কংগ্রেস, আদি কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, পি এস পি, বিক্ষুব্ধ এস এস পি, মুসলিম লীগ, ঝাড়খণ্ড, গুর্খা লীগ, সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মিলিত শক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এই নন-সি পি এম মন্ত্রিসভার পত্তন হচ্ছে। সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করছেন, কিন্তু মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করছেন না। চৌদ্দ দলের যুক্তফ্রন্টের অবসানের পর এবার দশ দলের 'গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এগিয়ে এসেছেন। এবং যুক্তফ্রন্টের পূর্বতন নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি এই দশ পার্টির ফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হলেন।

যুক্তফ্রন্টের একটি ন্যূনতম কর্মসূচী ছিল। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনও সকল অংশীদারের গ্রহণযোগ্য একটি ন্যূনতম কর্মসূচী গ্রহণ করছেন। এই কর্মসূচী প্রণয়নের ভার কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির উপরই ন্যস্ত হয়েছে। গতবারের কোয়ালিশনের অংশীদারদের মধ্যে সকলেই বামপন্থী ছিলেন এমন নয়—তবে সকলেরই যে বামপন্থী ঝোঁক ছিল, তা প্রমাণ করেছিলেন কর্মসূচীর স্বীকৃতির মাধ্যমে। এবারের কোয়ালিশন একটু বিচিত্র রকমের। এখানে বামপন্থী, প্রগতিশীল এমনকি স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন দলও আছে। কাজেই সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচী গ্রহণ করা সহজ হলেও, সেই কর্মসূচী কতখানি প্রগতির ধারক হবে, সে সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ রয়েছে। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের নেতারা নিশ্চয়ই একথা অনুধাবন করতে পারছেন এবং গণমনের আশঙ্কা দূর করার জন্য যে সচেষ্ট হবেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এবারের মন্ত্রিসভা গঠনের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যাঁরা এই গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের অংশীদার হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এক প্রশ্নে সহমত যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে গদিতে আসতে দেওয়া যায় না। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যখন গঠিত হয়েছিল, তখন শরিকদের একমাত্র স্লোগান ছিল 'কংগ্রেস হটাও'। এবার 'সি পি এম হটাও' কার্যকর হলেও সি পি এম একটি বিশেষ শক্তিশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্নে সেকেণ্ড রাউণ্ডেও পরাজিত হওয়ার পর সি পি এম নেতারা একটি 'ষড়যন্ত্রের' আভাস পেয়েছেন। এবং এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে রাজ্যপাল স্বয়ং জড়িত আছেন বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। সি পি এম ও তাঁদের সহযাত্রীরা মিলে ১২০টি আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছেন এবং এককভাবে তাঁদের দল ও ফ্রন্ট বৃহত্তম গোষ্ঠীরূপে রাজ্যপালের কাছ থেকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ দাবী করেছিলেন। রাজ্যপাল সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসুকে বলেছেন যে, তিনি শ্রীবসুকে আমন্ত্রণ জানাতে অপারগ—কেননা, তাঁর সমর্থকের চেয়ে বিরোধীর সংখ্যা বেশী এবং ইতিমধ্যেই সেই বিরোধীরা পত্রযোগে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অতএব, রাজ্যপাল নাচার। উত্তরে শ্রীবসু বলেছেন, বিধানসভার ভেতরে তিনি তাঁর মেজরিটি দেখাতে সমর্থ হবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে যাওয়ার পর শ্রীবসু অনুরূপ দাবী করে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চেয়েছিলেন। সেবারও যুক্তফ্রন্টের বেশীর ভাগ শরিক দল রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা শ্রীবসুকে সমর্থন করেন না। রাজ্যপাল অনেক জল ঘোলা করার পর শেষপর্যন্ত শ্রীবসুকে আর ডাকেননি। শ্রীবসু জানেন, বর্তমানে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, দু-একজন সদস্যের টালমাটাল ঘটলে মন্ত্রিসভার পতন হতে পারে। কাজেই শ্রীবসু যেখানে ১২৩ জনের বেশি সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন না, সেখানে কোন্ যাদুমন্ত্রবলে তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে দিলে তা রাতারাতি ১৩৯ জনে পরিণত হয়ে যাবে? শ্রীবসু কি ডিফেকসনের উপর নির্ভর করে ঐ দাবি জানিয়েছেন? না, একবার গদিতে বসতে পারলেই সব ঠিক করে ফেলতে পারবেন এরকম কিছু চিন্তা করেছিলেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে যাওয়ার পর রাজ্যপালের সেই 'গণতান্ত্রিক কুফাওয়াজ' মানুষের মনে, বিশেষ করে কর্মচারীদের মনে একটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ভাবী কর্তাদের আচরণ কি হবে—এই অজানা আশঙ্কায় চাকুরীনির্ভর কর্মচারীরা ভাবী প্রভুদের মন যোগানোর কাজে প্রবৃত্ত হন। এবং সেই অন্ধ মনোভাবের প্রভাব থেকে এখনও যে প্রশাসনিক যন্ত্র মুক্ত নয়, অনেকেই তা উপলব্ধি করছেন। যা হোক, সি পি এম নেতারা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, তাঁরা এখন গণ-আন্দোলনে মনোনিবেশ করবেন। উদ্দেশ্য, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ যাতে ব্যাহত না হয়। প্রত্যেক বিরোধী দলের এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। কেউ এই অধিকার প্রয়োগ করে থাকেন শাসক শ্রেণীর ভূমিকা সংশোধনের উদ্দেশ্যে। আবার কেউ এই ভূমিকা পালন করেন শাসক শ্রেণীর বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। সি পি এম শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করবে বলে আপাততঃ স্থির আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেই বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য কি পন্থা গ্রহণ করা হবে? শাসকরা যদি প্রগতিবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করে, তখন বিরোধী ভূমিকা যেরূপ নেওয়া উচিত—স্বৈরাচারী হলে অনুরূপ ভূমিকা না হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই পশ্চিমবাংলার আগামী দিনের রাজনীতি অনেকখানি 'গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের' চরিত্র ও নীতির উপর নির্ভরশীল।

আন্দাজ করা যেতে পারে যে, ইন্দিরাজী যদি কেন্দ্রে গণমুখী কর্মসূচী রূপায়ণে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যান, তবে তার শুভ প্রভাব এই রাজ্যেও যে পড়বে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু সি পি এম সম্বন্ধে আতঙ্কিত হলে ত চলে না। তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করে সিদ্ধান্ত যতই নির্ভুল হোক না কেন—জনতার মাঙ্গলিক কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হলে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের মূল্য কেতাবেই থেকে যাবে। কাজেই এবারের 'গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনে' শাসক কংগ্রেসের দায়িত্ব অনেক বেশী। গতবারের যুক্তফ্রন্টে সি-পি-এমের দায়িত্বও অনুরূপ ছিল। কিন্তু দেখা গেল, আদর্শগত পার্থক্য যথাসময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কোয়ালিশন সরকার চালাবার মত যে গুণাবলী বা আচার-বিধি থাকা প্রয়োজন, সেই সমস্ত বিষয়ের পুরোপুরি অভাব দেখা দিল। এবারেও আদর্শগত পার্থক্য দেখা দেবে—একথা পূর্বাহ্নেই বলা যায়। কারণ, শ্রমিক ও কৃষকের প্রতি ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত ইতিমধ্যেই সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অর্থনীতির প্রশ্নে একটা সামঞ্জস্য দেখা গেলেও কতকগুলি শক্তিশালী প্রশ্ন—যেমন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের সকল

অংশীদারদের মনোভাব কিরূপ হবে তা এখনও যাচাই করার সময় আসেনি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবশ্য বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু তাও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। তদুপরি গণতান্ত্রিক কোয়ালিসনের শরীকদের মধ্যে কিম্বা মন্ত্রিসভার মধ্যে শরীক মন্ত্রীদের আচরণ-বিধি কি প্রকার হবে তার সুস্পষ্ট ছবি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যে সম্প্রীতি ও বন্ধুভাব নিয়ে যুক্তফ্রন্ট লালদীঘির দপ্তরে আলোকিত করেছিলেন—দুই মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই তা মরীচিকার মতই অদৃশ্য হল। কাজেই আজকেও যে বন্ধুভাব দেখা যাচ্ছে তারও পরিণতি একই যে হবে না, একথা কে জোর করে বলতে পারে? প্রশ্নটা উঠছে এই কারণে যে, লোকের মনে সন্দেহ জমে উঠেছে এই কোয়ালিসন কতদিন টিঁকবে? তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, ভিন্ন মতাবলম্বী দলের কোয়ালিসন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। এটা ঐতিহাসিক তথ্য। অধিকন্তু, আমাদের দেশে এখনও কোয়ালিসন সরকার চালাতে হলে যে পরমত সহিষ্ণুতা দরকার তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দলগত মনোভাব পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকার ফলে কোয়ালিসনে সংকট আসে। বিগত যুক্তফ্রন্টের এই অভিজ্ঞতা কাজে না লাগালে 'গণতান্ত্রিক কোয়ালিসন' যে-কোনদিন তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়বে। ফলে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সরকার গঠন করা হচ্ছে—শুধু তা ব্যর্থ হবে না পরন্তু জন-মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। যাঁদের দূরে রাখার জন্য এত আয়োজন তাঁদেরই পরে জেঁকে বসবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

এবারের কোয়ালিসন সরকারের সামনে সংকট আরও বেশী। 'আয়ারাম গয়ারামের' ভয় একেবারেই নেই একথা বলা চলে না। কাজেই যে কিঞ্চিৎমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মন্ত্রিসভা হচ্ছে তা কখনও বিপদে পড়বে না, একথা বলা কঠিন। যে কোন ৫।৭ জন সদস্য ইচ্ছে করলে সাড়ে ৪ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন। কাজেই কোয়ালিসনের বড় শরীকগুলিকে খুব সতর্কতার সঙ্গে সরকার চালাবার দায়িত্ব বহন করতে হবে।

সেদিনের সাংবাদিক সম্মেলনেও সি-পি-এম নেতারা বলেছেন যে, শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বে কোন মন্ত্রিসভা দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে না। এই বক্তব্য মনে হয়, তাঁরা সেইরকম একটি অবস্থার জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। এবং এই কৌশল অবলম্বন করা বিরোধী দলের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাঁদের এই বক্তব্য থেকেও গণতান্ত্রিক কোয়ালিসনের শিক্ষা গ্রহণ করা যে প্রয়োজন তা নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করবেন না। মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাককালে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলনীশায় সি-পি-আই একটি দাবী নাকি শাসক কংগ্রেসের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন। সি-পি-আই নাকি শ্রীসুশীল ধাড়াকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়ার বিরোধী। এই মনোভাব নিয়ে প্রথম থেকেই চলতে সুরু করলে পরিণতি যে খারাপই হবে একথা হলফ করেই বলা যায়।

কর্মসূচী দলের চরিত্র নির্ধারণের কষ্টিপাথর মাত্র। কর্মসূচী যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, তা রূপায়ণের নিষ্ঠা না থাকলে তার কোন মূল্যই থাকে না। যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব হয়নি, কারণ ভেতর থেকেই বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। একতা বজায় রেখে প্রতিশ্রুতি পালন করার থেকে শরীকরা অন্তর্ঘাতী লড়াই করে দলীয় শক্তিবৃদ্ধিতে বেশী মনোনিবেশ করেছিলেন। ফলে, কোন বুনিয়াদী পরিবর্তন আনতে যুক্তফ্রন্ট সমর্থ হয়নি। প্রচারের মাধ্যমে একটা কিছু পরিবর্তন হয়েছে শুধু এই মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছিল। অবশ্য, এবারের নির্বাচনের পটভূমিকা অন্যরকম। যাঁরা গণতান্ত্রিক কোয়ালিসনের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা আগে ফ্রন্ট করে নির্বাচনে লড়েন নি। কেউ এককভাবে আবার কেউ বা ফ্রন্টের মাধ্যমে লড়ে এখন এক জায়গায় মিলিত হলেন। কিন্তু পৃথকভাবে তাঁরা জনতার সামনে যে কর্মসূচী রেখেছিলেন তাতে দেখা যায়, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই 'সি-পি-এম-এর সহিংস কর্মপন্থার' বিরুদ্ধে জনতার রায় চেয়েছিলেন। বামপন্থী স্টাইলে বলতে গেলে 'সি-পি-এম-এর হঠকারিতার' বিরুদ্ধেই তাঁদের জেহাদ ছিল। সেই জেহাদকে জনতার জেহাদে পরিণত করতে হলে যে কর্মসূচী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রয়োজন তা এই গণতান্ত্রিক কোয়ালিসনে কতটুকু দিতে পারবে তা কিছুকালের মধ্যেই স্পষ্ট হবে। যাঁরা মন্ত্রিসভায় যোগদান করছেন তাঁদের অনেকেই পূর্বে যে প্রগতিশীল আইন-কানুন পাশ করাননি এমন নয়। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

কাজেই আইন পাশ করালে জনকল্যাণ যে ইচ্ছানুযায়ী হয় না, কংগ্রেসের একক রাজত্বকালে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে যুক্তফ্রন্ট আমলে বহু বেনামী জমি উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু বিতরণ ঠিকমত হয়নি কিম্বা দলীয় লোকদের হাতে আছে। যে প্রথায় জমি উদ্ধার হয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে ভয়াবহ মনে হতে পারে। কিন্তু যাঁরা আইন অমান্য করে জমি লুকিয়ে রেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সৎ ব্যক্তি নন। কাজেই তাঁদের প্রতি যদি জনতার ক্রোধ জাগে—সেখানে কিছু করার থাকে কি? এইখানেই দলের ভূমিকার প্রশ্ন আসছে। শাসক কংগ্রেস কোয়ালিসনের বৃহত্তম দল। তাঁরা যদি জোর-জবরদস্তি বা হিংসায় বিশ্বাস না করেন তবে যাঁদের কাছে বেনামীতে জমি আছে বা যাঁরা মুনাফাবাজী করছেন তাঁদের ঐ পথ থেকে নিবৃত্ত হতে অনুপ্রেরিত করুন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে দলীয় লোকদের সেই সমস্ত মালিকদের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ মারফৎ জমি দখলের আন্দোলন চালান। নতুবা সাধারণ মানুষ কোনক্রমেই সন্তুষ্ট হতে পারবে না। কারণ, ইতিমধ্যেই তাঁদের জমির ক্ষুধা বেড়েছে এবং মালিক হওয়ার ইচ্ছা জেগেছে। তাঁরা বুঝেছেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে গেলে ভূমিহীন ভূমি লাভ করতে পারবে, কাজেই এই মনোভাবকে যদি সঠিক পথে চালাতে হয় তবে শাসক কংগ্রেসকেও দলীয় মেশিনারী সচল করতে হবে। অন্যদিকে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে বামপন্থী হিসাবে তাঁদের সাঁকো অনেক বেড়ে গেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বামপন্থী বিচ্যুতির যে অভিযোগ উঠবে, সেই প্রচারের মোকাবিলা তাঁদের করতে হবে কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে। কাজেই খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের পদক্ষেপ নিতে হবে। নতুবা প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে মুছে যেতে হবে। মুসলীম লীগ বা অন্য ছোট ছোট দলগুলির সেরকম স্বচ্ছ চিন্তাধারা আশার কথা নয়। কাজেই কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে অতন্দ্র প্রহরীর মত দৃষ্টি রাখতে হবে।

—সমদর্শী

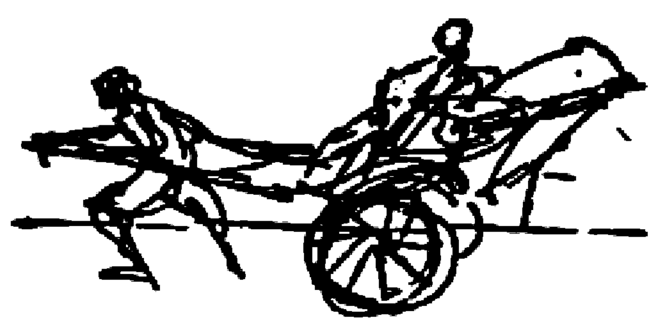

জলসা

মিনু ভাস্কর

সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজ

কলামন্দিরে সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজের সবচেয়ে স্মরণীয় অনুষ্ঠান বাংলার প্রথিতযশা শিল্পী শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠসঙ্গীত। লাহিড়ী পরিবেশিত রাগ 'কৌশীধ্বনি'। সম্পূর্ণ এই রাগে আশিকভাত মুন্সীয়ানা ছাড়াও মকলীয় তাঁর সৃজনপ্রতিভা ও নিজস্ব সঙ্গীতকল্পনার চিত্তগ্রাহী বিশ্লেষণ।

কৌশীধ্বনি রাগটি দক্ষিণ ভারতীয় বাজনার ঢাঁচের অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তর ভারতে দক্ষিণ ভারতীয় রাগের উপস্থাপনা, প্রচলন এবং তাকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

যন্ত্রসঙ্গীতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও কণ্ঠসঙ্গীতে চিন্ময় লাহিড়ী 'কৌশীধ্বনি' রাগ ললিতা ও রাগশ্রীর এক কাব্যমধুর মিলন। পঞ্চমের স্থায়িত্বের পূর্ব মুহূর্তে ষাম্বারের চাঁদস্পর্শে এক অপরূপ ধ্বনি-লাবণ্য সৃষ্টির নিবিড় আনন্দ শিল্পীর আনন্দভরা মেজাজ থেকে শ্রোতৃচিত্তেও সঞ্চারিত হয়ে যে ভাবলোচনার সৃষ্টি করে তা দুর্লভ বলেই স্মরণীয়। চিন্ময়বাবুর উদাত্ত ভরাট কণ্ঠের পরিসর কখনও দূর আকাশের মত সুরের অনন্ত ব্যাপ্তিতে প্রসারিত, কখনও বা মনুগুঞ্জনে সমাহিত হয়ে রাগের রাগবাক রসিক শ্রোতার মর্মগোচর করে। সাড়ে ১১ মাত্রার যোগীয়াশ তালে ছন্দবৈচিত্র, স্বরমূর্ছনার লালিত্যের সহজ পূর্ণতার একাধারে পাণ্ডিত্য ও শিল্পের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বাকরদীপ্ত হয়ে ওঠে। এঁর সঙ্গে তবলা-সঙ্গতে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ কর্মকার। আমীর খাঁর শিষ্য নিতাই সামন্ত গীত 'মারু-কল্যাণ' রাগে খাঁসাহেবের গায়কীর আদল অবশ্য ছিল, কিন্তু আরো খুশী হতাম যদি তাতে শিল্পীর মৌলিক চিন্তার একটু ছোঁয়া থাকত। রামপুর ঘরানার শিল্পী সাজ্জাদ হোসেন খাঁর পটমঞ্জরী 'বৈরাগী' সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়।

অস্বস্তিকর পরিবেশের কথা এড়িয়েও মিশ্র কল্‌ পরিবেশিত 'বিলাসখানি' যথা-যোগ্য মানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মাত্র কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেই আপন যোগ্যতার যে উজ্জ্বল পরিচয় রেখেছিলেন বিজয় চক্রবর্তী এখানে গাওয়া তাঁর 'ললিতা' সেই পরিচয়কেই দৃঢ় করে। শান্তি মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীকল্যাণী' এবং আরতি বাগচীর 'ইমন' ও 'তাপালা' যথাক্রমে সুর ও লয়ের শুদ্ধতা জাহির করার মতো। সরস্বতী রাণের গাওয়া কল্যাণ ও পূর্বী-কল্যাণে রাগ বিশ্লেষণ ত্রুটিহীন। তাহলেও নিষ্প্রাণ পরিবেশনায় তরুণ শিল্পী শ্রোতা-দের মনে কোন দাগ কাটতে পারেন নি। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ। শিল্পী পরিবেশিত ললিতে তাঁর নিজস্ব ঢং-এর মাধুর্য ও মর্যাদায় দীপ্ত হয়ে উঠলেও বিস্তার-অংশ হ্রস্ব করতে হয় সময় স্বল্পতার কারণে এবং ঐ একই কারণে শিল্পীকে পূর্ণভাবে পাওয়ায় অস্বস্তি হয়ে উঠে। এঁর সঙ্গে তবলাসঙ্গতে ছিলেন কানাই দত্ত।

তরুণ যন্ত্রীদের মধ্যে সেতারে মণিলাল নাগের 'মালকোষ' ও সুব্রত রায়চৌধুরীর 'যোগ' উপভোগ্য তবে সময় সংক্ষিপ্ততায় শিল্পীদের বাজনায় অকস্মাৎ পরিসমাপ্তিতে সুপারিশ ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব হানি করেছে। রবীন ঘোষের 'মালগুঞ্জি' রাগে বেহালা বাদন সুন্দর। উড়িষ্যার শিল্পী ভুবনেশ্বর মিশ্রর 'মহেশ্বরী' রাগে বেহালা বাদন মধ্য মানের। আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হল দুই পুত্রসহ শান্তাপ্রসাদের তবলা বাদন।

সারারাত্রব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান : সম্প্রতি 'ক্যেন্‌ইনের' পরিচালনায় মুন্সীপাড়া লেনে (কলিকাতা) একটি সারারাত্রব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণ করেন : সর্বশ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, মীরা ও বুবাই বিশ্বাস, মাঃ তপন ঘোষ, মীনা মুখোপাধ্যায়, কমলেশ বোস। নৃত্যে : সোনালী রায়। হাস্যকৌতুকে : সুশীল চক্রবর্তী ও তপন চক্রবর্তী। হরবোলা : শৈলেন সাহা। বাগ্গীতি : দুই কোয়া। আবৃত্তি : অরূপ গঙ্গোপাধ্যায়। যন্ত্র-সঙ্গীতে : অভিজিৎ নাথ ও সম্প্রদায় ও সুবোধিনয়ে : তপন দত্ত।

রবাবীণার অনুষ্ঠান : শিবপুরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'রবাবীণা' সম্প্রতি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ঐ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অতুলপ্রসাদের গানের শিল্পী ছিলেন যথাক্রমে ঋতু গুহ ও সুশীল চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শুরু সুখ্যাত শিল্পী ঋতু গুহ 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছো' গান দিয়ে। পরপর তিনি অনেকগুলি গান শোনালেন এর মধ্যে 'কি রাগিনী বাজালে হৃদয়ে', 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে', 'আমি নির্জন

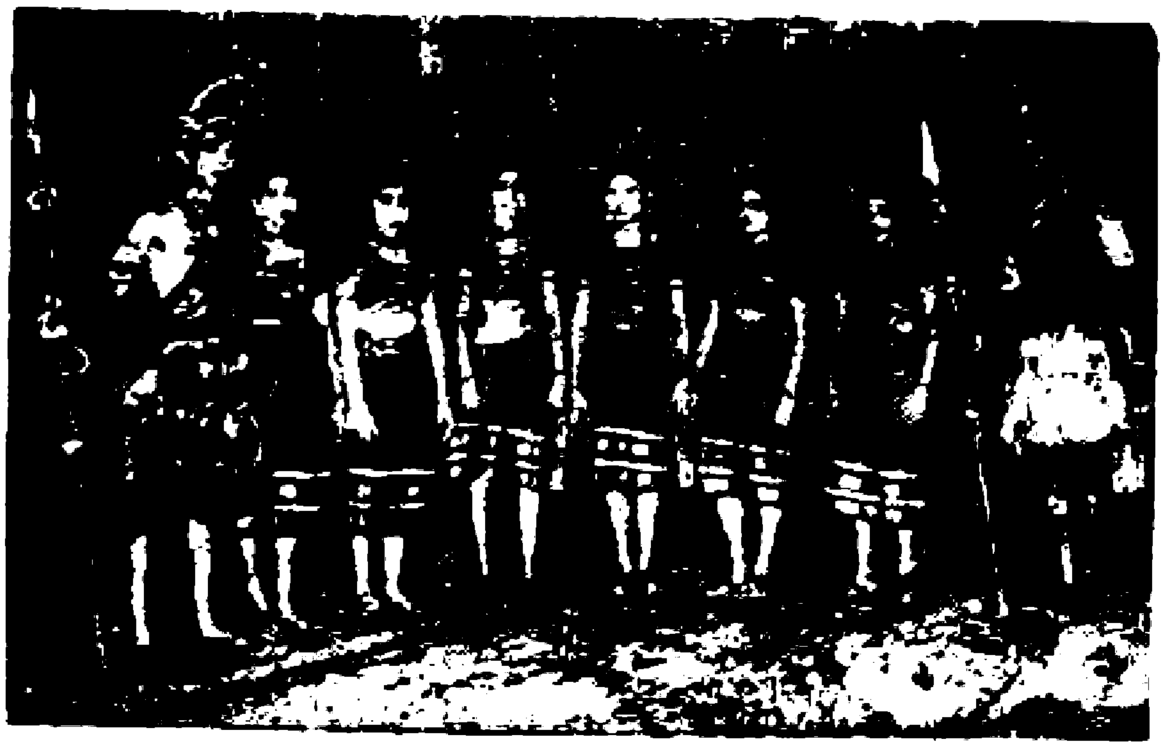

রবীন্দ্র-সদনে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের নাগা-নৃত্য—সূত্রধার বেশে নৃত্যাধিপ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

তোমায় 'ভালোবাসি' বারবার শোনবার মতো। 'খেলার সাথী, বিদায় দ্বার খোলো, ও দক্ষিণ ভারতীয় সুরের সেই প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত 'বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী, শিল্পীর কণ্ঠে এক অপরূপ মাধুর্যের সৃষ্টি করেছিল। অনুষ্ঠানের পরবর্তী শিল্পী ছিলেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের অতুলপ্রসাদের গান সেদিনকার শ্রোতাদের কাছে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। অতুলপ্রসাদের 'তুমি দাও গো দাও মোরে', 'আজি এ নিশি সখী', 'আইল সমস্ত আজি', মধুকালে এলো হোলি' প্রভৃতি গানের আবেদন শিল্পী শ্রোতাদের মনে সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তবলায় সহযোগিতা করেন রুদ্রমালী চক্রবর্তী ও শ্যামাচরণ দাস।

আলোচনার আসরে ওঁরা দুজন:

খ্যাতনামা শিল্পীদের গান ও বাজনা সংগীত-আসরে আমরা শুনে থাকি কিন্তু সংগীত সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার শরিক হবার সুযোগ বড় একটা মেলে না। সম্প্রতি মিলেছে সেজন্যে উদ্যোক্তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সদারং সংগীত সম্মেলনের তরফ থেকে সংবেদিত শ্রীকালিদাস সান্যাল সম্প্রতি বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিগত সংগীতদর্শন ও পরিবেশনা পদ্ধতির আলোকপাত করবার জন্যে পর পর দুটি চিত্তাকর্ষী আলোচনা আসরের আয়োজন করে সংঘের সভাপতি শ্রীদেশাই-এর পার্ক স্ট্রীটস্থ 'মোনালিসা'-য় আমন্ত্রিত দুই বিশিষ্ট কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত শিল্পীকে উপস্থিত করেন। প্রথম আসরে নিজস্ব সংগীতভাবনা, রাগ রচনা সম্পর্কে সংগীতরসিকদের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জবাব দেন এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন সুখ্যাত কণ্ঠসংগীত শিল্পী শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক এবং পরে স্বরচিত একটি রাগ ও ভজন গেয়ে শোনান। সংগীত সম্বন্ধে শ্রীমতী পট্টনায়ক বলেন—'আমি যে কোনো রাগ যখনই গাই মনে হয় যেন গানের ভাষায় সংগীতলক্ষ্মীর কাছে সুরের অঞ্জলিতে নিবেদন করছি অন্তরের ব্যাকুল আকুতি। যখন সত্যিই নিবিষ্টচিত্তে রাগের অন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হয় তখন আমার অন্তর্ভাবনার অনুরণনই শুনতে পাই শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে। অন্তরের সুর প্রতি শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করেই তিনি উচ্চাঙ্গসংগীত রসিক হোন আর যাই হোন কারিগর ছাড়াও সংগীতে সাহিত্যেরও একটা দিক আছে। সর্বজনীন আবেদন সঞ্চারিত হয় ঐ সাহিত্যেরই পথ বেয়ে।' এই প্রসঙ্গে তিনি স্বরচিত রাগ নীলমাধব, চন্দ্রেশ্বরী যোগেশ্বরী ভৃ-বাসিনী এবং অন্যান্য রাগ রচনার প্রেরণা ও পরিচিত শর্ত ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে সকলের অনুরোধে 'নীলমাধব' ও ভজন গান গেয়ে আসরের সমাপ্তি ঘটান।

দ্বিতীয় অধিবেশনে একতারা বাহাদুর খাঁ গুরু আলাউদ্দিনের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে তাঁর কঠোর নিয়মনিষ্ঠার উল্লেখ করে বলেন, 'ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়ালের প্রত্যেকটি অঙ্গে গুরুদেবের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকত এবং এ সম্বন্ধে প্রতি মুহূর্তে আমাদের সচেতন করে দিতেন। এতটুকু এদিক ওদিক হলেই কঠিন শাস্তি পেতে হোতো। এ ছাড়াও ভারতীয় সংগীতের মূল উৎস যে অধ্যাত্ম-চেতনা এ সত্য উপলব্ধির মত জপ করতে বলতেন। ওঁর মতে ৬টি স্বর হোলো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ। সব সময় 'আমি' টাকে 'তুমি' করে নিতে হবে তবেই ভক্তিভাবের বিনীত বাজবে এটি ছিল ওঁর অন্যতম প্রত্যয়।'

আলোচনার পর খাঁ সাহেব ইমন কল্যাণ ও পিলু বাজিয়ে শোনান। একটিতে ভক্তিবিনম্রতা অন্যটিতে মধুর রসের রঙিন উন্মাদনা এক আবেশময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। দুটি আসরই এক কথায় হয়েছে আশ্চর্য সুন্দর ও মধুর।

কলামণ্ডলম্ আয়োজিত ভারতনাট্যম ও কথাকলি: দক্ষিণ কলকাতার সুখ্যাত নৃত্যপ্রতিষ্ঠান 'কলামণ্ডলম্'-এর পক্ষ হতে শ্রী ও শ্রীমতী গোবিন্দন্ কুট্টি ও থাঙ্কুমণি কুট্টি নির্দেশিত এক সুবিন্যস্ত উচ্চাঙ্গ নৃত্যানুষ্ঠান গত শনিবার ত্যাগরাজ হলে এক অনবদ্য আনন্দোজ্জ্বল সন্ধ্যা সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা সকলেই 'কলামণ্ডলম্'-এর সভ্য এবং শ্রীমতী কুট্টির শিক্ষাধীনে বয়স ও মান অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতিও যে আভাস দিয়েছেন তা তারিফ করার মতো। আলারিপ্পু, জাতিস্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্, পদম্, তিল্লানা তথা ভারতনাট্যমের প্রতিটি অঙ্গ, মোহিনীআট্টম্, কথাকলির অংশবিশেষ এবং দু-একটি দক্ষিণ ভারতীয় লোকনৃত্যসমন্বিত পরিবেশন ও রচনা কুশলতা লক্ষ্য করবার মত। সবচেয়ে বড় কথা চিত্তবিনোদন ছাড়াও উপরি পাওনা হিসেবে পাওয়া গেল ভারতনাট্যমের ক্রমবিন্যস্ত এমন একটি রূপধারা যা একনিমেষেই নৃত্যানুষ্ঠিত দর্শকমনে বিভিন্ন নৃত্যাঙ্গের শিল্পরূপও পৌঁছে দিতে পেরেছে স্বাভাবিকভাবে।

আলারিপ্পুতে শিশুশিল্পীরা দেখালেন নৃত্যারম্ভে রূপলক্ষ্মীকে আবাহন। নৃত্যশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ দেহসঞ্চালনের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও গ্রীবা, চক্ষুতে গতির প্রেরণা আভাসিত হোলো। অংশ নিয়েছিলেন সুপর্ণ মহলানবিশ, বিষ্ণু দাস-সুব্রহ্মণ্যম্, রাজু সিং, প্রেমা মেনন, প্রীতি মেনন, কল্পনাকৃষ্ণণ ও অঞ্জু সিং। জাতিস্বরমে শ্রীলতা মেনন, স্মিতা মেনন, স্বপ্না রায়, অঞ্জু সিং, রাণী সিং, কল্পনাকৃষ্ণণ এবং জয়ন্তী ঘোষ সাবলীল ও আত্মবিশ্বাসী ছন্দেই তাল ও সুরের সঙ্গতে দেহভঙ্গির বিভিন্ন রূপান্তর মেলে ধরেন। শব্দমের 'আন্দ্রে' সমন্বয়ে অভিনয় ও ভাবপ্রকাশের বৈচিত্র্য, পরেই বর্ণম-এ অভিনয় ও যথার্থ নৃত্য মাধ্যমে দেহগতির মুহুর্মুহু রূপান্তর এবং মুদ্রাদোষ সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত ভক্তিগতিতে দ্রুতলয়ে পৌঁছনর সঙ্গেই দর্শকমণ্ডল চমকে পৌঁছে দেবার দাবির সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন প্রীতি মেনন, অলকা ওয়ারিয়র, জয়শ্রী ওয়ারিয়র, শালিনী মেনন, নূপুর ভট্টাচার্য ও রাণী মেনন। পদম্-এর অংশ 'পদ্মাভিনয়', 'নটনমাদিনার', 'কৃষ্ণানিবেদন', 'নাথার মুরলী-এর গীতিকাব্যকে যথাযোগ্যভাবে মেলে ধরেন রেখা নায়ার, কাজল দাশগুপ্ত, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। তিল্লানায় নূপুরের নিক্বণ ও তবলার বোলের মেলবন্ধনের ছন্দে ছন্দে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপভঙ্গি মনোমুগ্ধকর। মোহিনী আট্টমে মোহিনী রূপের উদ্ভ্রান্তকারী সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করার চেষ্টায় রাজেশ্বরী মেননের দিক থেকে কোনো শৈথিল্য ছিল না। স্বাভাবিকভাবে তিনি আশ্চর্য সার্থকতাও দেখাতে পেরেছেন। কথাকলির পদম-এ ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায় ও সাপুড়ে নৃত্যে ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও জয়শ্রী ওয়ারিয়রও সেদিনের নৃত্যানুষ্ঠানের সামগ্রিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছেন। পটভূমিকার সঙ্গতকারী সংগীতশিল্পীদেরও অংশ ছিল উল্লেখযোগ্য। —চিত্রাঙ্গদা

আধুনিক চিকিৎসা
ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সহজ ভাষায় লিখিত—
চলতি চিকিৎসার বই
★ পি. ব্যানার্জি ★
১১৫এ আশুতোষ মুখার্জি রোড
(ফোন - ৪৭ ২০১৮)
৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কলিকাতা ২৫
৫০ গ্রে স্ট্রীট
(ফোন—৫৫-৬২২৯)

CENTRAL LIBRARY

সীমাবদ্ধ/পরিচালক সত্যজিৎ রায়, শর্মিলা ঠাকুর, বরুণ চন্দ এবং পারমিতা চৌধুরী। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ভগীরথের জন্মজয়ন্তী

পরম শ্রদ্ধেয়,

বাংলা চলচ্চিত্রের ঊষা-লগ্নে নানা সমালোচনার ঊর্মি প্রাঙ্গণে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তোমার প্রদীপ্ত আবির্ভাব। তোমার তরুণ প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা দিনে দিনে পরিব্যাপ্ত করল বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বাঙ্গ।......

'অতীত দিনে ছিল সমাজের অপরিসম দৃষ্টিভঙ্গী। অপাংক্তেয় করে রেখেছিল অভিনয়-শিল্পীদের। তোমার ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় অন্তর্দৃষ্টি ঘটালো সেই অপপ্রয়াসের। তোমার আরব্ধ শুভকর্মের অনুভূতিতে স্বীকৃতি পেল তাঁদের শিল্প-প্রতিভা। সমাজে হলেন তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত।.........'

গেল শনিবার, ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় অসামান্য কৌতুকাভিনেতা ও চলচ্চিত্র-পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি)-র ঊনআশিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সংস্থা আনন্দ-মন্দিরের পক্ষ থেকে তাঁকে যে সশ্রদ্ধ মানপত্র দেওয়া হয়, তার গোড়ার দিকে ছিল এইকয়েকটি পংক্তি।

সে অনেক দিনের কথা। চলচ্চিত্র-[illegible] সেই থেকে ম্যাডান কোম্পানী তখন নির্বাক চলচ্চিত্র-প্রযোজনার কাজে হাত বাড়িয়েছেন। ম্যাডান-জামাতা রুস্তমজী ধোতিওয়ালার নির্দেশনায় পর পর তৈরি হচ্ছে বিল্বমঙ্গল, রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ছবি। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র, পূর্ববঙ্গীয় জমিদার বংশোদ্ভূত ধীরেন্দ্রনাথ একই সঙ্গে অঙ্কনবিদ্যা এবং অভিনয়বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় নানা প্রকার বিষয় অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন মেক-আপ নিয়ে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত করছেন ক্যামেরার ফোটোতে। কখনওবা ক্রীড়াবনতা বধূ, কখনওবা পাগল, আবার কখনও গর্বিতা আধুনিকা এবং তাঁরই পদানত মশলা-বাটা স্বামী বেচারী। 'বিয়ে', 'ফুলশয্যা', 'ভালোবাসা' প্রভৃতি নামে অন্তত দশখানি ফোটোচিত্রসম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল ধীরেন্দ্রনাথের 'ভাবের অভিব্যক্তি' অবলম্বনে।

এই ভাবের অভিব্যক্তি-বিষয়ক বই যখন ম্যাডান-জামাতা রুস্তমজীর হাতে গিয়ে পড়ে, তখন ধীরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। রুস্তমজী ধীরেন্দ্রনাথকে আহ্বান জানান তাঁর চলচ্চিত্র-প্রযোজনার কাজে যোগ দিতে। নূতন শিল্পের প্রতি আগ্রহ নিয়ে ধীরেন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যখন রুস্তমজী জানলেন, ধীরেন্দ্রনাথ বোলপুরের ছাত্র এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য, তখন তিনি ধীরেন্দ্রনাথকে বিসর্জন নাটকের স্বত্বটি সংগ্রহ করতে অনুরোধ করলেন। যেমন কথা, তেমনই কাজ। ধীরেন্দ্রনাথ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবির অনুমতি আদায় করে নিয়ে এলেন। কিন্তু এরই মধ্যে মর্যাদা নিয়ে গোল বাধল। কথায় কথায় রুস্তমজীর মুখের 'শালা' কথাটিকে তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। এই সময়ে বিখ্যাত মোটরবিদ পরলোকগত নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হন এবং ধনী ব্যবসায়ী মিঃ দত্তের আর্থিক সাহায্যে ইন্দো-বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানী স্থাপন করেন। এঁদের সঙ্গে যোগ দেন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান জ্যোতিষ সরকার। এঁরা ম্যাডান প্রদর্শিত পৌরাণিক ছবির পথে না গিয়ে 'ইংল্যান্ড রিটার্নড্ বা বিলাতফেরত' নামে একটি সামাজিক বাণীচিত্র নির্মাণ করেন। এই ছবিতে ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন নায়ক এবং সর্ব বিষয়ে আধুনিকা সুশীলাবালা ছিলেন নায়িকা। কিন্তু বিপদ বাধল ছবির মুক্তিদানের ব্যাপার নিয়ে। তখন কলকাতার প্রায় প্রতিটি চিত্রগৃহ ছিল ম্যাডান কোম্পানীর অধীনে। কাজেই সেসব চিত্রগৃহে ছবিটির প্রদর্শন হওয়া অসম্ভব। মাত্র দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের দক্ষিণ প্রান্তে রসা থিয়েটারটি (যার বর্তমান নাম পূর্ণ) ছিল বাঙালী প্রতিষ্ঠান। ছবি সমাপ্ত হবার পর বেশ কিছুকাল কেটে গিয়ে ১৯২১-এর ২৬ ফেব্রুয়ারী 'বিলাতফেরত' যখন এই রসা থিয়েটারে মুক্তিলাভ করল, তখন বাঙালী দর্শকমহলে রীতিমতো সাড়া জেগেছিল। এর পর এই ইন্দো-বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানী আরও দুখানি চিত্র নির্মাণ করে; এবং

কলানন্দন (কৃষ্ণ ধীরেন্দ্রনাথ, রাধা সুশীলা) দুই, সাধু কি শয়তান। এর পরে ইণ্ডো-বৃটিশ বন্ধ হয়ে গেলে ধীরেন্দ্রনাথ কলকাতায় নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান খুলতে অপারগ হয়ে হায়দ্রাবাদে ফিরে যান এবং সেখানে নিজামের সহায়তায় লোটাস ফিল্ম কর্পোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ১৯২২-এর শেষ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে অন্তত দশখানি ছবি নির্মাণ করেন। কিন্তু তিনি ক্রমাগত অনুভব করছিলেন বাংলাদেশের একটি বিপুল আকর্ষণ এবং শেষপর্যন্ত এই আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছান ঐ ১৯২৭-এর শেষাশেষি। এবং এসেই মিত্র থিয়েটারের প্রযোজনায় আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে (বর্তমানের গ্রেস সিনেমা) অভিনীত বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত রচিত 'শ্রীদুর্গা' নাটকের কুটুস নামে কৌতুক-চরিত্রে অবতীর্ণ হন। একদিকে শ্রীদুর্গার ভূমিকায় তারাসুন্দরী, অপরদিকে মহিষাসুরের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী; এরই মাঝে কুটুসরূপী ধীরেন্দ্রনাথের কৌতুকাভিনয় যে কি আশ্চর্য মাধুর্যের সৃষ্টি করেছিল, তা আমরা আজও ভুলতে পারিনি। এর কিছুদিন পরেই ১৯২৮-এর গোড়ার দিকে শুনলুম, ৪০, দমদম রোডে বহু ধনীর অর্থপুষ্টে বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানী' গড়ে উঠেছে ধীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। 'নাচঘর' সাপ্তাহিকের সহকারী সম্পাদকরূপে আমরা দেখতে গেলুম দমদম রোডের চলচ্চিত্রশালাটি। গিয়ে দেখলুম বহু শিল্পী ও কর্মীর সমাগম। ওইখানেই পরিচিত হলুম দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণগোপাল প্রভৃতির সংগে। দেখা হল 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের সংগে। দূর থেকে দেখলুম নায়িকা সবিতা দেবীকে (যাঁর আসল নাম আইরিস গ্যাসপার)।

পরে বুঝেছিলুম, ধীরেন্দ্রনাথ শুধু একজন সুপটু সংগঠকই নন, তিনি একজন পাকা জহুরীও বটেন। বাংলা চলচ্চিত্র-জগতে যাঁরা পরে দিকপাল পরিচালকরূপে খ্যাত হয়েছিলেন, সেই দেবকীকুমার বসু ও প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়াকে চলচ্চিত্রের দিকে আকৃষ্ট করেন তিনিই। ওই বৃটিশ ডোমিনিয়নে যাঁরা একদা বিভাগীয় সহকারীরূপে কাজ করতেন, পরে তাঁদের অনেকেই আমাদের চিত্রজগতকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের বিভিন্ন সৃষ্টি দ্বারা।

চলচ্চিত্রের প্রযোজনার পথে, চলচ্চিত্র-শিল্পের পথে তিনি বাঙালীকে না টেনে নিয়ে গেলে আজ বাঙালী এই শিল্পটিকে নিজের করে নিতে পারত কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে।

যিনি বাংলায় চলচ্চিত্রশিল্পে ভগীরথের মতো কাজ করেছেন, সেই ধীরেন্দ্রনাথ আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন এবং আশ্চর্য সুস্থ শরীর নিয়েই বেঁচে আছেন, একথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত আনন্দ জাগে। এবং আরও অদ্ভুত লাগে যখন ভাবি আমরা চিত্ররসিক জনসাধারণ ও আমাদের স্বাধীন দেশের সরকার কেমন অবলীলাক্রমে তাঁর দানের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছি নিশ্চিত উপেক্ষায়।

চিত্র-সমালোচনা

দীনেশ মিত্র নির্বাচিত ও পরিবেশিত, পীযূষ গাঙ্গুলী পরিচালিত ও সুখেন দাস রচিত 'সোনা বৌদি' ছবির প্রচার পুস্তিকা [illegible] মস্তান রংবাজ দুর্নিবার, কিন্তু [illegible] একান্নবর্তী পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল [illegible] চৌধুরী পরিবারের গৃহ-চিকিৎসক [illegible] এটাই কি আসল পরিচয়? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ও বক্তব্য চিত্ররসিক জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ছবির পর্দায় আসার আগে থাকতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ছবিটিতে যেমন একান্নবর্তী পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ডাক্তার ষড়যন্ত্রের কথা আছে, তেমনই আছে [illegible], অবহেলিত সমাজ-ব্যবস্থার অসহায়তার ফলে ছেলেরা মস্তান ও রংবাজে [illegible] তার বহু বাস্তব কাহিনী। কিন্তু ছবির কাহিনীকার সুখেন দাস মুশকিল ঘটিয়েছেন এইখানে। তিনি একটি উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারকে (ভুবন চৌধুরীর ব্যবসায় সংক্রান্ত যে অফিস ও যা বিষয়-সম্পত্তি, তাতে তিনি যে নিশ্চয়ই যথেষ্ট বিত্তশালী, তা বলাই বাহুল্য) ঘিরে এত বেশী রকম বক্তব্য পেশ করতে গেছেন যে, কোনোটিরই প্রতি সুবিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। এবং এরই ফলে কাহিনী অন্তর্গত কোনও চরিত্র স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এমনকি রমা নামে যে-মেয়েটি নিজের চারিত্রিক গুণে সোনায়

ও সোনা বৌদির পক্ষে অর্থিক্ত হয়েছিল। এবং যার নামে ছবির নাম, তারও চরিত্র-চিত্রণে কাহিনীকার সুবিচার করতে পারেননি। যে-পরিস্থিতির সম্মুখীন করে 'সোনা বৌদি'র স্বামী রমেশের চোর দুর্নাম রটানো হল, তাকে কি মেনে নেওয়া যায়? প্রথম কথা, বেশ কয়েক হাজার টাকার নোট লোহার সিন্দুকে তোলবার সময়ে টেলিফোনের বেল বেজে উঠতেই সিন্দুকের চাবি বন্ধ না করেই কোনো লোকের পক্ষে টেলিফোন ধরতে যাওয়া আদৌ স্বাভাবিক বলে মনে হয় কি? এবং দ্বিতীয় কথা, যখন দর্শকদের দেখিয়েই দেওয়া হল বিনোদ সিন্দুক খোলা দেখে টাকাটা নিয়ে নিল এবং বিনোদের স্ত্রী ইলা সেই টাকাকে রমেশ-রমার বিছানার নীচে রেখে এল, তখন ঐ বিছানার নীচে থেকে টাকাটা আবিষ্কৃত হল বলে মনে হয় না কি? রমেশকে যদি টাকা চুরির অপরাধে অপরাধী বলে সাময়িকভাবে দর্শকপ্রতীতি জন্মাতেই হয়, তাহলে ঐ টাকা চুরির ব্যাপারটাকে দর্শকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই সমীচীন ছিল। ছবির গোড়ার দিকে সোনা বৌদি ওরফে রমাকে যে-রকম বুদ্ধিমতী ও মাথা ঠান্ডা হিসেবে দেখানো হয়েছে, তাতে স্বামীর চৌর্যাপরাধে তার ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল ভিন্ন রকম। শ্বশুর তার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, এই অবস্থার সুযোগে তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল টাকা চুরির আসল রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া এবং সেই চেষ্টার দরুন ঐ মিথ্যা জালে নিজেও জড়িয়ে পড়া। বাড়ীর ছোটছেলে

চারণ দল / পাদপ্রদীপ
প্রযোজিত
স্ফুলিংগ
হিমালয়ের থেকেও ভারী
মঙ্গলবার, ৬ই এপ্রিল, সন্ধ্যা ৭টা
মুক্ত অঙ্গনে
"হলে টিকিট"

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নতুন নাটক —
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার : ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬টায়
রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, নীলিমা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, রেবেকা দাস, কুমারী মিঠু, মাধব ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিকাশ ধনীগৃহের সকল স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও পুলিন প্রভৃতি মাস্তান রকবাজদের দলে গিয়ে পড়ল কি করে, তার কোনো সদুত্তর দেওয়া হয়েছে কি? বলা হয়েছে, সে কলেজে পড়ে। জীবনে কোন্ অতৃপ্তিবোধ হেতু সে এবং তার সঙ্গীরা রকবাজ ও মাস্তান? শুধু কথার পিঠে কথা জুড়ে গলিত, অবহেলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে দায়ী করলেই চলচ্চিত্রকারের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। বিকাশ যে ভুবনবাবুর পরলোকগত ভাইয়ের অবৈধ সন্তান, এর জন্যে তার প্রতি তো ব্যবহারের কোনোরকম তারতম্য করেনি কেউ কোনোদিন। তবে কি জন্মদোষেই সে ঐরকম বিপথচালিত হয়েছিল, এই কথাই কাহিনীকার বলতে চান?

বিনোদকে প্রথম থেকেই কুচক্রী, স্বার্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন ও পানাসক্তরূপে দেখানো হয়েছে এবং তার স্ত্রী ইলাকে ক্লাব-পার্টি-করা অতিআধুনিকতা লোবরূপে। ছবি কিছুটা এগিয়ে যাবার পরই জানা যায়, ভুবনবাবু তাঁর এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে আদৌ পছন্দ ও বিশ্বাস করেন না। তিনি ওর থেকে অফিসের কর্মী সাতকড়িবাবুকে ঢের বেশী বিশ্বাস করেন। এ অবস্থায় টাকা চুরির ব্যাপারে বিনোদ রমেশকে মিথ্যা জালে জড়াচ্ছে, এই সাব্যস্ত করে ভুবনবাবুর পক্ষে রহস্য ভেদ করবার জন্যে অন্য কোনো রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল। শুধু তাই নয়, জমি বিক্রীর ব্যাপারে বাকী টাকা নেবার জন্যে রামগড়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে যদি স্বীকার করে নিতেই হয়, তাহলে ভুবনবাবুর বিনোদকে সঙ্গে নেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? তিনি তো অনায়াসেই তাঁর গৃহচিকিৎসক ডাঃ স্নেহাংশু মজুমদারকে সঙ্গে নিতেই পারতেন। এবং বিনোদ সেখানে একান্ত অতর্কিতে হাজির হলেই পারত। দেখা যাচ্ছে, চৌধুরী পরিবারকে ঘিরে যে-গার্হস্থ্য কাহিনীটি রচনা করা হয়েছে, তাতেই পদে পদে ঘটেছে ত্রুটি। আর এই কাহিনীভুক্ত বিকাশকে মাস্তান প্রভুত্ব করবার জন্যে পাড়া-প্রতিবেশী সমীরণ ও তার ভগ্নীর প্রতি অন্যায় ও কুৎসিত আক্রমণের যে পরিচ্ছেদটি রচনা করা হয়েছে, তাকে গহনার দোকান লুণ্ঠনরূপ বিকাশের পরবর্তী কার্যের সোপানস্বরূপ গ্রহণ করা গেলেও, অপরিহার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়: মাস্তানদের কার্যকলাপ চাঁদা চাওয়া উপলক্ষে একজোড়া ভাইবোনের উপর জুলুমে পরিণত না হয়ে যদি ছিনতাই, লুঠ প্রভৃতির মধ্যেই সীমিত থাকলে পরিণতিটা স্বাভাবিকতার পথ বেয়ে এগুতে পারত। পাড়ায় পাড়ায় ফিরিওয়ালারা তাদের বেসাতি সম্পর্কে হেঁকে যেতে অভ্যস্ত হলেও কলেজ স্ট্রীটের পথ ধরে ছোট ছেলেমেয়েদের 'জামারুল' কেউ চীৎকার করে ফিরি করে না, এই তথ্যটুকু পরিচালক এবং অভিনেতা—দুজনেরই জানা উচিত ছিল। এইরকম ছোটখাট ত্রুটিও ছবিটিতে লক্ষ্য করা যায় এখানে-সেখানে। ছবির নাম 'সোনা বৌদি' অথচ ছবিটি শেষ হল বিকাশের 'প্রজনত্যাগে' বন্দী হয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্যে, যেখানে থাকেন সোনা বৌদি একেবারেই অনুপস্থিত। অথচ কাহিনী তথা ছবিকে সোনা বৌদির উপরই শেষ করা উচিত ছিল।

কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ কাহিনী ও চিত্রনাট্য সত্ত্বেও অভিনয়গুণে 'সোনা বৌদি' যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কমবেশী নাট-নৈপুণ্য সকলের অভিনয়ের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তবে ওরই ভিতর সোনা বৌদি ওরফে রমার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিকতাপূর্ণ স্বাভাবিক অভিনয় দর্শকমনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। দলে পড়ে মাস্তান, অথচ আসলে খাঁটি সোনা, বিকাশের চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন সুখেন দাস তাঁর অন্তরঢালা অভিনয়ের মাধ্যমে। রমেশ চরিত্রে স্বাভাবিক অথচ সংযত অভিনয় করেছেন দিলীপ রায়। এছাড়া অনিল চট্টোপাধ্যায় (ডাঃ স্নেহাংশু মজুমদার), অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (ভুবন চৌধুরী), নিরঞ্জন রায় (বিনোদ), সমিত ভঞ্জ (মাস্তান পুলিন), কণিকা মজুমদার (ইলা), শিবানী বসু (অরুণা), মাস্টার অরিজিৎ (তুতুন), বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ সকলেই উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি সাধারণ মান রক্ষিত হয়েছে। তবে শিল্পনির্দেশনায় বেশ একটি বাস্তবানুগ অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। ঠিক তেমনই, কি কারণে জানি না, ছবির সঙ্গীতাংশে আমরা এমন একটি অস্বাভাবিক অস্পষ্টতা লক্ষ্য করলুম, যা আজকের দিনে আশাই করা যায় না। সংযুক্তা সেন-কৃত কাবারে নৃত্যটি গানের অস্পষ্টতার জন্যে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করতে অসমর্থ হয়েছে।

দীনেন গুপ্ত নির্দেশিত 'সোনা বৌদি' সাময়িক অভিনয়গুণে দর্শকসমাদর লাভ করবে।

—নান্দীকর

নববর্ষের নব আকর্ষণ
পরদে কে পিছে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ
বুড্ডা মিল গয়া
একমাত্র পরিবেশক বিলামোরিয়া এন্ড লালজী ১১ এ.এসপ্ল্যানেড ইস্ট-১

স্টুডিও থেকে

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র চিত্রগ্রহণ যেমন প্রায় সবটাই হয়েছিল কলকাতার রাস্তাঘাটে, বাস-ট্রামে ও পথচারীদের ভিড়ে, সত্যজিৎবাবুর নতুন ছবি 'সীমাবদ্ধ'র ব্যাপার ঠিক বিপরীত। এই ছবির বহুলাংশ গৃহীত হবে স্টুডিওর. রাস্তাঘাট বা স্টুডিও-ফ্লোরের বাইরে যে কোন কারণে কোনো দৃশ্যগ্রহণ হবে না তা নয়।

ইতিমধ্যেই শ্রীরায় পাটনা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কাজ সেরে এসেছেন। পাটনার লোকেশনে জায়গা ছিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, গোলঘর, পাটনা কলেজ ও বিভিন্ন রাস্তাঘাট। স্টুডিওর যে সকল দৃশ্যগ্রহণ হবে তার মধ্যে একটি বড় অংশ হোল ছবির নায়কের অতি আধুনিক ভাবে সাজানো ফ্ল্যাট। ইন্দ্রপুরীতে গত বুধবার থেকে এই ফ্ল্যাটেরই সেট পড়েছে। কাজ চলার প্রথম পাঁচদিন। এরই ফাঁকে সত্যজিৎবাবু অবশ্য [illegible] অফিসে এবং গ্র্যান্ড হোটেলেও কিছু দৃশ্য গ্রহণ করবেন। নবকল্লোলিতের সেটে-এর দ্বিতীয় দিনে ফ্লোরে ঢুকে দেখি সত্যজিৎবাবু ক্যামেরার সামনে বসে। আলোর মাপ নিচ্ছেন সৌমেন্দু রায়। শোবার ঘরের দৃশ্য। ডিটেলের ব্যাপারে তিনি যে কতখানি নিখুঁত, তার প্রমাণ তাঁর প্রতিটি ছবিতেই আছে। সেদিনও লক্ষ্য করলাম। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আলোর পরীক্ষা সেরে নেওয়ার পর সেটের শিল্পী শর্মিলা ঠাকুর ও নবাগত পারমিতা চৌধুরীর ডাক পড়ল। দৃশ্যটি ছিল 'শর্মিলা হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজাটি খুলে ভেতরে ঢুকবেন'। দুবার মনিটর নেওয়া হোল। ফাইনাল মনিটরের পর ক্যামেরার পিছনে কালো কাপড় থেকে হঠাৎ মুখ বার করে সত্যজিৎবাবু বললেন, 'হ্যান্ডেলের কাছে দরজার রংটা মারা হয়নি তো।' সঙ্গে সঙ্গে আর্ট ডিরেক্টর অশোকবাবু রংটা ঠিক করে দিলেন, তারপর দৃশ্যগ্রহণ হোল। পর্দায় আপনারা যখন ছবি দেখবেন তখন হয়তো কেউই দরজার হ্যান্ডেলের কাছের রংটা লক্ষ্য করবেন না। সারা ছবির দৃশ্যবিন্যাসের তুলনায় আপাতদৃষ্টিতে হয়তো ঐ সামান্য ত্রুটি ত্রুটিই নয়। কিন্তু সত্যজিৎবাবু বিন্দুমাত্র খুঁত রাখতে চান না, তাই তাঁর এই সতর্ক দৃষ্টি।

ছবির নায়ক এক বিদেশী ফার্মের বড় অফিসার। কাজেই সেই মাপকাঠিতেই নায়কের গৃহসজ্জা, অফিস সাজানো হওয়া উচিত। অফিসের প্রায় সকল দৃশ্যই গৃহীত হচ্ছে এক বেসরকারী অফিসে (জীবন দীপ), গৃহের সকল দৃশ্যই গৃহীত হবে ইন্দ্রপুরীর এই ফ্লোরে।

সেদিন সেটের শিল্পী ছিলেন উপরোক্ত শর্মিলা ঠাকুর ও পারমিতা চৌধুরী ছাড়া নায়ক নবাগত বরুণ চন্দ। আলাপ হোল নতুন দুজনের সঙ্গেই। পারমিতা চৌধুরী ভয়ানক প্রচারবিমুখ, সাক্ষাৎকার জাতীয় ঘটনাকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যান। সাংবাদিকদের ফর্মাল কোনো জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নিরুত্তর প্রায়। কিন্তু নায়ক বরুণ চন্দ ঠিক তার বিপরীত। ভয়ানক মিশুকে, অনর্গল কথা বলে যান। বিষয়বস্তুতে কোনো ঘাটতি নেই। বিজ্ঞান থেকে রাজনীতি, সাহিত্য থেকে চিত্রকলা সব নিয়েই আছেন তিনি। কথার ফাঁকে পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে কথা বলে আসর জমিয়ে রাখতে ওস্তাদ (আসলে তিনি পূর্ববাংলারই লোক)। কিন্তু সেটে পা দেওয়া মাত্র তাঁর অন্য রূপ। সত্যজিৎবাবু যখন রিহার্সাল দেওয়াচ্ছিলেন, তখন তিনি আর বরুণ চন্দ নন, ছবির নায়ক শ্যামল। চরিত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে তিনি তখন একাত্ম, একাকার।

এই দুজন ছাড়াও আরও কয়েকটি নতুন মুখ আছে ছবিতে—তাঁরা হলেন মিতা দেববর্মন, অজয় ব্যানার্জি, প্রমোদ গাঙ্গুলী ও মণি আয়ার।

প্রধান দুটি চরিত্রে নতুনের নির্বাচন প্রশংসনীয় একাধিক কারণে। প্রথমতঃ নায়ক বরুণ চন্দের পেশা ও ছবির চরিত্র মোটামুটি একই শ্রেণীর। সেজন্য বরুণকে বড় অফিসারের গাম্ভীর্য, দাম্ভিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র 'অভিনয়' করতে হবে না। তার চরিত্রেই সেটি আছে। এবং পারমিতা চৌধুরী সেজেছেন ওঁর স্ত্রী। ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে পারি না, কিন্তু তাঁর চেহারায়, চলনে-বলনে যথেষ্ট অ্যারিস্টোক্র্যাসির ছাপ পাওয়া যায়—এবং এই গুণটি চরিত্রটির অন্যতম গুণও বটে। শর্মিলা এ-ছবিতে করছেন নায়ক বরুণের শ্যালিকার ভূমিকায়। পাটনার মেয়ে, এম-এ পাশ। কদিন ছুটি কাটাতে এসেছে কলকাতায় জামাইবাবুর কাছে। দিদি-জামাইবাবুর মাধ্যমে শহরের ওপরতলার সমাজের একটা বিশেষ চেহারা তার চোখে পড়ে। তারপর একদিন সে চলে যায়।

• • •

চলচ্চিত্র ভারতী নিবেদিত অগ্রদূত-এর নবতম চিত্র 'ছদ্মবেশী'-র চিত্রগ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ইতিমধ্যে অগ্রদূত গোষ্ঠী এলাহাবাদে ছবির কিছু অংশের চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ করে বর্তমানে এন-টির দু নম্বরে অন্তর্দৃশ্য গ্রহণে ব্যস্ত। সুধীন দাশগুপ্ত সুরারোপিত গানে কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন—আশা ভোঁসলে ও মান্না দে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক এই

উইমেন্স কালচারাল এসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসবে মহিলা শিল্পী মহলের 'আলিবাবা' নাটকের শিল্পীদের সঙ্গে কানন দেবী।

বিশ্বরূপার প্রান্তের সার্কুলার রোড মোড় (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
৬, রবি ২৫ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
শুক্রবার ২৫টে ও ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শনি ৪ ও ১১ এপ্রিল ৬টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
'শতাব্দী'র : বাদল সরকারের
বল্লভপুরের রূপকথা
টিকিট : ১৲ থেকে ৫৲; ছাত্র-ছাত্রী ৫০ পঃ
অভিনয়ের দিন ১টা থেকে হলে
থিয়েটারে যা পাবেন, সিনেমায় তা নেই।
।। আরও থিয়েটার দেখুন ।।

কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন—উত্তমকুমার, মাধবী চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, অনুভা গুপ্ত (ঘোষ), শুভেন্দু চ্যাটার্জী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, তরুণকুমার, শমিতা বিশ্বাস, জহর রায় প্রভৃতি। ছবির তৃতীয় পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হচ্ছে আগামী বাইশে মার্চ, চলবে একটানা মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত। সাহা ফিল্মস-এর প্রথম প্রয়াস হিরণ্ময় সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে 'অচেনার' চিত্রগ্রহণ পীযূষ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। অভিনেতা সুখেন দাসের চিনোটা অবলম্বনে বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—শুভেন্দু চ্যাটার্জী, মাধবী চক্রবর্তী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুখেন দাস, শ্যামল ঘোষাল, তরুণকুমার, সুধীর সাহা, বিজন ভট্টাচার্য, গীতা দে প্রভৃতি। ভুটানের সামচী ও জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাছে দীর্ঘ পনের দিনের একটানা চিত্রগ্রহণ শেষ করে বর্তমানে ছবির অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ চলছে। আসছে বাইশ তারিখ থেকে চারদিন কোলকাতা এবং আশে-পাশে কিছু দৃশ্য গ্রহণ করা হলেই ছবি প্রায় শেষ হয়ে যাবে। অজয় দাসের সুর-সংযোজনায় ছবিতে নেপথ্যে কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও মৃণাল চক্রবর্তী।

মঞ্চাভিনয়

শেষরক্ষা : সম্প্রতি সাহিত্যিক-শিল্পী-সাংবাদিক সংস্থা মঞ্চলেখার দ্বিতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হল কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রহসন 'শেষরক্ষা'। গদাই-এর ভূমিকায় শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর। শিবচরণের ভূমিকায় অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)র এবং চন্দ্রকান্তর ভূমিকায় বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যর অভিনয়ও প্রশংসনীয়। এছাড়া নিবারণের ভূমিকায় আবু আতাহার, বিনোদ-এর ভূমিকায় রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজের ভূমিকায় সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ এবং ললিতের ভূমিকায় রমেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। একটি ছোট্ট ভূমিকায় গণেশচন্দ্রের অভিনয় আকর্ষণীয়। নায়িকা ইন্দুমতীর ভূমিকায় স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়-এর অভিনয় খুবই স্বচ্ছন্দ। তাঁর গানও সুন্দর। কান্তমণির ভূমিকায় মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং কমলমুখীর ভূমিকায় মাধবশ্রী মুখোপাধ্যায় চলনসই অভিনয় করেছেন।

ইউনিট থিয়েটার : গত ১ মার্চ ইউনিট থিয়েটারের তিনটে একাঙ্ক নাটক যথাক্রমে নিরূপ মিত্রের 'ছেদাবিন্দু' সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁচি' ও সুশান্তের 'রং' রংমহলে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম প্রশংসা করতে হয় তরুণ নাট্যকার নিরূপ মিত্রকে। তাঁর 'ছেদাবিন্দু' নাটকের জন্যে। নাটকের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্রায়ণ সঙ্গে প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ সংলাপে নাটকটির উপস্থাপনা প্রশংসনীয়। অভিনয় প্রসঙ্গে ফকির বেশী অজিত সামন্ত, মানু বেশী শোভনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছোকরা বয় গুরু পাল নিজ নিজ সাবলীল অভিনয়গুণে দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করেন। যুবকের ভূমিকায় শৈবাল বসু ও আগন্তুক অলক চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে সামান্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। দ্বিতীয় নাটক চেখভের ছোটগল্প 'ডেথ অফ এ ক্লার্ক' অবলম্বনে গঠিত। হাসির নাটক। গণেশের ভূমিকায় নিরূপ মিত্র, যুবক বরুণ দাস ও বসের চরিত্রে অমর পালের অভিনয় সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকায় অচিন্ত্য ও প্রৌঢ় যথাক্রমে শৈবাল বসু অরূপ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় বড় বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। অপর নাটক সুশান্তের রং যদিও একটি নাটক, দেখতে দেখতে মনে হয় একই সঙ্গে দুটো নাটক হচ্ছে। বক্তব্যও স্পষ্ট নয়। ভবানীচরণের ভূমিকায় অলক চট্টোপাধ্যায় নিজের অভিনয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রম্পটার নিত্যের চরিত্রে বরুণ দাসের অভিনয় সহজ সরল স্বাভাবিক। নাদির শা ও বেতাকুল খাঁর কথোপকথনে বরুণ দাসের বেতাকুল খাঁর সংলাপ খুবই মনোমুগ্ধকর। এঁদের মধ্যে কাজ বলিষ্ঠ। দৃশ্যসজ্জা ও নেপথ্য সংগীতে মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গী নিতান্তই সাবেকী। নাটকত্রয় পরিচালনা করেন শ্রীঅলক চট্টোপাধ্যায়।

নতুন নাটক 'কোথায় পাবো তারে' : বিশ্বরূপার আগামী আকর্ষণ কালকূট রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'কোথায় পাবো তারে'। নাট্যরূপ দিয়েছেন ও নাটকটি পরিচালনা করছেন শ্রীরাসবিহারী সরকার। শুভ উদ্বোধন বৃহস্পতিবার ১ এপ্রিল দুপুরে। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন—জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, প্রহ্লাদদাস বাউল, সুধাংশু মাইতি, নির্মল ঘোষ মনু মুখার্জি, উমা

শুক্রবার, ২রা এপ্রিল
বাজী ধরুন গ্যাম্বলারের সঙ্গে
যে কোন পরিমাণ অর্থ—সীমা যার মহাকাশ

অপেরা - জেম - প্রিয়া - কৃষ্ণা
নবীনা - লিবার্টি - পূর্ণশ্রী - ছায়া
শৈলশ্রী (মেটিয়াবুরুজ) : শান্তি (কদমতলা) : পারিজাত (শালকিয়া)
প্রফুল্ল (খড়দহ) - নীলা (ব্যারাকপুর) - শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল) - রাধাশ্রী (দমদম)
দীপক (উত্তরপাড়া) - জয়শ্রী (বিষড়া) - নন্দন (মহেশ) - অন্নপূর্ণা (কাঁচড়াপাড়া)
চিত্রা (আসানসোল) - মহুয়া (মেদিনীপুর) - কাবেরী (শিলিগুড়ি)
রূপকথা (মালদা) - শ্রীমহাবীর (দিনহাটা) - অপ্সরা (গৌহাটি) - পল্লীশ্রী (বেহালা)
ও অন্যান্য বহু প্রেক্ষাগৃহে।

চিত্র নিকেতন পরিবেশিত গ্যাম্বলার চিত্রে দেবানন্দ এবং জাহীদা

পালচৌধুরী, সঙ্গীতা কর, গীতা নাগ, মতী দত্ত ও দিলীপ রায় প্রভৃতি। লোক-সংগীতের আন্তর্জাতিক খ্যাত শিল্পী পূর্ণদাস বাউল লোকসংগীত নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সহকারীরূপে আছেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জু দাস। অন্যান্য সংগীতের নির্দেশনার ভার বহন করছেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীসুধাংশু মহীত। রচনা ও উপস্থাপনায় রাসবিহারী সরকার পরিচালিত বিন্দুরূপের এই নাটক মঞ্চরূপের অন্যতম আকর্ষণ।

বিবিধ সংবাদ

উইমেন্স কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব—উইমেনস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (মহিলা সংস্কৃত) তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও আসলে কিছু এই সংস্থার সত্যিকারের কাজ শুরু হয়েছে গেল বছর। এই এক বছরেই কল্যাণমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক উৎসবে অ্যাসোসিয়েশনের বছরের সালতামামি পেশ করলেন সংঘনেত্রী ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীমতী কানন দেবী থেকে জানা গেল—দরিদ্র ছাত্রদের পরীক্ষার ফি, মাইনা ও বই কেনার কাজে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেলে আরো ব্যাপকভাবে কাজ করবার ইচ্ছে এসোসিয়েশনের আছে। বিশেষ অতিথি ডঃ রমা চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ জন-কল্যাণমূলক কাজের অন্তরালের মহৎ উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানান। প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সভাপতি অশোকা গুপ্ত এবং সমবেত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদিকা সুতারা ঘোষ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর প্রতি-ষ্ঠানের সভ্যরা মহিলা শিল্পী মহল প্রযোজিত 'আলিবাবা' মঞ্চস্থ করেন। 'আলিবাবা' রূপায়ণে মহিলা শিল্পী মহলে তাঁদের খ্যাতিতে স-সম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিবারের মত এবারও প্রেক্ষা-গৃহে তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

নাটকাভিনয়ের প্রথমেই যাঁর কথা মনে আসে তিনি হলেন আবদাল্লারূপী রাজলক্ষ্মী দেবী। আবদাল্লার চরিত্রে—কৌতুক, মর্জিনার প্রতি প্রেমজনিত করুণ পরিহাস, প্রভুভক্তি ও সাহস অসাধারণ দক্ষতায় রূপায়িত করে ইনি সারা প্রেক্ষাগৃহ মাতিয়ে রেখেছিলেন। মর্জিনারূপী গীতশ্রী আশানুরূপ নয়। চেহারা এবং ভূমিকায় 'আলিবাবাকে যেন জীবন্ত করে তুলে-ছিলেন সাধনা রায়চৌধুরী। পৌরুষহীন প্রেমিকের ভূমিকায় শিপ্রা মিত্রের অভিনয় সুন্দর, সাকিনা ও ফতিমার ভূমিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা দেবী চরিত্রানুগ। ও বাবা মুস্তাফারূপী মঞ্জু দে ত মাত্র একটি দৃশ্যেই নাটক জমিয়ে তুলেছিলেন। নাটকের সামগ্রিক সাফল্যের সহায়ক হয়েছেন যথাক্রমে রাধারাণী বিশ্বাস, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊষা নন্দী, প্রফুল্লবালা দেবী। ঊষা মুখো-পাধ্যায়, বকুল হালদার, শেফালী গাঙ্গুলী, বীণা গাঙ্গুলী, শান্তা সরকার, পারুল কর, রুবী হালদার, অমিয়া দেবী।

জনপ্রিয় নট অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ৯৫তম জন্ম-জয়ন্তী : রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে 'সমিতি ভবনে' (৫৬।১, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩) আগামী ৩ এপ্রিল ৭১ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় এককালের অত্যন্ত জনপ্রিয় বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকার স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ৯৫তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহারীন্দ্র-নাথ দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে।

...মূকাভিনেতা হিরণ্ময়ের অনুষ্ঠান : এ মাসের মাঝামাঝি থেকে মূকাভিনেতা হিরণ্ময় এক মাসের জন্য ভারতের কয়েকটি স্থানে একক মূকাভিনয় পরিবেশন করতে রওনা হয়েছেন। স্থানগুলির মধ্যে আছে রায়পুর, বিলাসপুর, জব্বলপুর, কাটনি, কৈমুর, অজন্তা, ভিলাই, ভূপাল, নাগপুর এলাহাবাদ, বেনারস ও বোম্বাই।

CENTRAL LIBRARY

খেলার কথা

হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার

শঙ্করবিজয় মিত্র

খেলাধুলোর জগতেও বিংশ শতকের শেষার্ধের বিস্ময়কর বিজ্ঞানের মতই দ্রুত এগিয়ে চলেছে। শারীরিক সামর্থ্যের সঙ্গে অভিনব কৌশলের প্রয়োগে অ্যাথলেটিকস-এর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নূতন নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। পুরুষদের মত মেয়েরাও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। শটপুট প্রধানতঃ শারীরিক সামর্থ্যের বিষয়। দৃঢ় সংবদ্ধ পেশী, শারীরিক ভার ও প্রচণ্ড শক্তি গোলা নিক্ষেপের প্রধান সহায়ক। তাই অ্যাথলেটিকসের এই বিষয়টিতে পুরুষদের মতই অতি বলী নারীর প্রয়োজন। ১৯৬৪ সাল থেকে সোভিয়েৎ রাশিয়ার প্রতিযোগিনীরা এ বিষয়গুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। টোকিও ওলিম্পিকে শ্রীমতী তামারা প্রেস ১৮·১৪ মিটার দূরে গোলা নিক্ষেপ করে চমকের সৃষ্টি করেন এবং এই দূরত্ব (৫৯ ফুট সাড়ে ৬ইঃ) বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। টোকিও ওলিম্পিকের পরও প্রায় দু-তিন বছর ধরে তামারা প্রেসের আধিপত্য অক্ষুন্ন থাকে। শুধু তাই নয় প্রেস নিজের বিশ্ব-রেকর্ড প্রতি পদক্ষেপে বর্ধিত করে চলে। এই রেকর্ড ওঠে ১৮·৫৫ মিটারে। প্রচার চলতে থাকে এটা বিংশ শতাব্দীর রেকর্ড। এই শতাব্দীর মধ্যে কোন মেয়ে এ রেকর্ড ডিঙিয়ে যেতে পারবে না। তামারা তখন অনন্যসাধারণ। শটপুটে তখন যত মেয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে তার রেকর্ডের এক মিটার নীচেই তাদের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে।

টোকিও ওলিম্পিকের পর প্রায় দু বছর ধরে তামারা প্রেস শটপুটে অপরাজেয় বলে মনে হতে থাকে। এমন সময় সুদূর সাইবেরিয়ার বুকে এক অমিত শক্তিধারিণী মেয়ের আবির্ভাব ঘটল। নাম নাদেজদা সিজোভা। সোভিয়েতের আঙ্গারস্ক শহরের ৭০ কিলোমিটার দূরবর্তী ইউসোলি সিবিরস্কোয়া শহরে তার বাল্যকাল কাটে। খেলাধুলোয় আগ্রহ থাকলেও ছেলেবেলায় বিশেষ কোন পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়নি তার মধ্যে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় সিজোভা একবার শটপুটে প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় খেয়ালবশেই, ছুঁড়েছিল মাত্র সাত মিটার। এতে সেদিন কেউ আশা পোষণ করতে পারেনি যে, এই মেয়ে কালে শটপুটে এক অসাধারণ বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হবে।

খেলাধুলোয় প্রবণতার জন্য সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের নিয়মানুযায়ী সিজোভা ভর্তি হয় শারীর শিক্ষা কেন্দ্রে।

এই শিক্ষা কেন্দ্রে সিজোভার প্রতিভা বিকাশ লাভ করতে থাকে। এর মূলে ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু ভিকটর আলেকসিয়েভ। শিক্ষাকেন্দ্রে বিভিন্ন গ্রুপে শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। আলেকসিয়েভ এই মেয়েটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি নজর রেখে তাকে নিজের গ্রুপে স্থান দেন। এর পর চলল তার শিক্ষণ। গোলা নিক্ষেপের উপযোগী দেহ তৈরী, তাতে প্রয়োজনীয় সামর্থ্য সংগ্রহ, শটে পূর্বে প্রচণ্ড গতি সঞ্চার করে সেই শক্তি ছোঁড়ার মধ্যে চালিত করার কৌশল আয়ত্ত করাতে থাকেন তার গুরু। কিন্তু শুধু শিক্ষণে কিন্তু অসাধ্যসাধন করা যায় না; তা করতে হলে চাই শিক্ষার্থীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অটল সঙ্কল্প। এই নিষ্ঠা ও সঙ্কল্প নিয়েই সিজোভা তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন। সব কিছুতেই সিজোভা সকলের শীর্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রথম হতে না পারলে তার মন ভরে না। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাই সে চেষ্টা করতে থাকে। তাতেও যদি অভিষ্ট পূর্ণ না হয়, তাহলে সে জগৎ থেকে সে সরে দাঁড়ায়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জোরেই সিজোভা অসাধ্য সাধন করেছে। কিন্তু এমন সময় তার জীবনে এসেছে যখন হতাশাক্লিষ্ট চিত্তে সে গোলা নিক্ষেপের ক্রীড়াঙ্গন থেকে চিরতরে বিদায় নিতে চেয়েছে।

নাদেজদা এমন এক যুগে শটপুটের ক্রীড়াক্ষেত্রে আবির্ভূত হন যখন তামারা প্রেস তার জীবনের চরম সাফল্যের আশীর্বাদে বিমণ্ডিত। সংবাদপত্রে ও লোকমুখে তার প্রশংসা আর ধরে না। ওলিম্পিক বিজয়িনী তামারা প্রেস তখন সোভিয়েট রাশিয়ার স্নেহধন্যা শক্তিময়ী নারী। সেই ১৯৬৪ সালেই সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সংবাদপত্রগুলিতে ঊনবিংশ বর্ষীয়া সিজোভার নাম প্রকাশিত হতে থাকে। ওয়ারশতে অনুষ্ঠিত প্রথম ইউরোপীয় জুনিয়ার গেমসে নাদেজদা শটপুটে ১৬·৫০ মিটার রেকর্ড করে স্বর্ণ পদক পায়। এই ঘটনার পর স্বভাবতই তার প্রতি ক্রীড়ারসিক মহলের নজর পড়ে। কিন্তু তামারা প্রেসের খ্যাতি ও কৃতিত্বের নজীরে সিজোভা নিজের মধ্যে সাহস আনতে পারেনি।

কিন্তু বিধাতার এমনি বিধান যে, সেই তামারা প্রেসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই তাকে পথ করে নিতে হয়। সেদিনের কথা স্মরণ করে নাদেজদা আজও বলে তার বদ্ধ ধারণা ছিল অপরাজেয় তামারার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোন ফল হবে না। তবুও গুরুজী আলেকসিয়েভের প্রেরণায় সে ১৯২৬ সালের শীতের এক অপরাহ্নে লেনিনগ্রাদে তামারা প্রেসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। সিজোভা মনে মনে স্থির করেই ফেলেছিল শটপুটে এটাই তার শেষ দিন, কোন মতেই সে তামারা প্রেসকে হারাতে পারবে না এবং এই প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে সে শটপুট থেকে অবসর নেবে। কিন্তু ভাগ্যদেবী সেদিন সিজোভার প্রতি অতি প্রসন্ন ছিলেন। সিজোভা সর্বশক্তি নিয়োগ করে যে গোলা নিক্ষেপ করেছিল সেদিন তা তামারা প্রেসের দুর্ভেদ্য দুর্গকে ভেঙে চুর চুর করে দিল। সিজোভা এই ঘটনা সম্পর্কে বলে 'সেদিন জীবনে এই সত্যটা উপলব্ধি করেছি যে, অপরাজেয়কেও পরাজিত করা যায়।'

সিজোভার ভাগ্যের দ্বার গেল খুলে। সেই বছরই আগস্ট মাসে বুদাপেস্টে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের যে ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়, তাতে সিজোভা সোভিয়েট নারী দলের নেত্রী নির্বাচিত হয়। এটা তার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তামারা প্রেস তখনও সোভিয়েটের মুকুটমণি। কিন্তু যে কারণেই হোক শেষ মুহূর্তে তামারা বুদাপেস্টে যেতে পারবেন না বলে জানায়। কাজেই শটপুটে সোভিয়েট বিশেষ দাগ কাটতে পারবে না বলে সবাই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু বুদাপেস্টে সকলকে তাক লাগিয়ে সিজোভা সোনার মেডেলটাই ছিনিয়ে নেয়। প্রথম ক্ষেপণেই সে যে দূরত্বে গোলা পাঠিয়ে দেয়, অপরাপর দেশের প্রতিনিধিরা বার বার চেষ্টা করেও তা অতিক্রম করতে পারে নি। এ ঘটনার পর সিজোভার শক্তি ও পারদর্শিতা সম্পর্কে কারও আর কোন সন্দেহ রইল না।

এরপর চলে মেক্সিকো ওলিম্পিকের প্রস্তুতি। সিজোভাই শটপুটের সোনার মেডেল পাবে প্রায় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে নেন। তার সামনে প্রতিযোগিতায় কেউ যে দাঁড়াতে পারবে তা কেউ ভাবেও নি। কিন্তু এবার সিজোভার বিস্মিত হবার পালা। পূর্ব জার্মানীর প্রতিযোগিনী মার্গিটা গামেল এমন প্রচণ্ড শক্তিতে শট নিক্ষেপ করে যে, পূর্বের বিশ্ব-রেকর্ড অতিক্রম করে অনেক এগিয়ে যায় (১৯·৬১ মিটার)। তখন পর্যন্ত কোন প্রতিযোগিনী ১৯ মিটারের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে নি। সিজোভা নাদেজদা তার

নিজস্ব রেকর্ড এভাবে চূর্ণ হতে দেখে দুঃখ ও বিস্মিত। সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, ১৮·১১ মিটারের বেশি দূরে গোলা ছুঁড়তে পারে না। পূর্ব জার্মানীরই অপর প্রতিযোগিনী মারিটা লেঞ্জ ১৮·৭৮ মিটার নিক্ষেপ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তাই মেক্সিকো থেকে সোনার বদলে ব্রোঞ্জ মেডেল নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয় চিজোভাকে।

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো ওলিম্পিকের পরবর্তী বসন্তেই চিজোভা ২০·০৯ মিটার নিক্ষেপ করে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হন। কিন্তু গামেলও চুপ করে বসে থাকেন নি। এর সাথে আর এক সেন্টিমিটার যোগ করে গামেল নূতন রেকর্ড করে। এইভাবে পাল্লা চলে চিজোভা ও গামেলের মধ্যে। এরপর এথেন্সে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের অনুষ্ঠান হয়। দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্প নিয়ে চিজোভা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে ২০·৫৪ মিটার নিক্ষেপ করে এক বিস্ময়কর বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হলো।

ছাব্বিশ বছর বয়স্কা চিজোভার এই রেকর্ড হয়ত চিরস্থায়ী নয়। তবে মেয়েদের পক্ষে এ রেকর্ড অতিক্রম করাও সহজসাধ্য নয়। মেক্সিকোর ওলিম্পিক প্রাঙ্গণে যে গৌরব চিজোভার হস্তচ্যুত হয়েছিল, দৃঢ় সংকল্প ও অবিচল সাধনায় সে তা পুনরুদ্ধার করে [illegible] বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা এ্যাথলিট রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এগমার্ক কী জন্যে?

আপনি সুন্দর রঙচঙে
টিন দেখে কী কিনলেন,
কিন্তু তাতে হয়তো ভেজাল
আছে। বাসমতী চালের প্যাকেটে
বা বস্তায় বেশ খানিকটা
ধুলোবালি মেশানো
থাকতে পারে। দেখতে তাজা,
বড় বড় ডিম, আসলে হয়তো পচা।

মন খুঁত খুঁত না ক'রে
নিঃসন্দেহচিত্তে জিনিষ কিনতে
হ'লে এগমার্ক ছাপ আছে কি না
তা' দেখা উচিত।

এগমার্ক ছাপ
দেওয়া সব জিনিষের লেবেলে
ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া
থাকে।
উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ
জিনিষের জন্য এগমার্ক ছাপ
দেখে নিন।

AGMARK

এগমার্ক হ'ল
উৎকর্ষের প্রতীক।
পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার
পর এই গ্যারান্টী
দেওয়া হয়।

খেলাধুলা

দর্শক

অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার ২১ বছরের ছাত্র রুডি হার্টোনো পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি চারবার (১৯৬৮-৭১) এই সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। সিঙ্গলস ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার মুলজাদী। এই নিয়ে গত তিন বছরে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে শুধু ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড়দেরই দুবার খেলতে দেখা গেল। ১৯৬৯ সালের ফাইনালে মুলজাদীকে পরাজিত করে হার্টোনো দ্বিতীয়বার সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি প্রথম সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ীদের মধ্যে হার্টোনো সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় এবং যোগদানের প্রথম বছরেই খেতাব লাভ করেন। ১৯৭১ সালের প্রতিযোগিতায় তিনি ৬টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে মাত্র ৩৭ পয়েন্ট নষ্ট করেছেন যা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির।

এই অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা একটি আন্তর্জাতিক বার্ষিক অনুষ্ঠান, উদ্বোধন ১৮৯৯' সালে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এই প্রতিযোগিতায় যে-কোন বিভাগের খেতাব জয়ীকে বেসরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব বিজয়ী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে প্রথম খেলেছিলেন ভারতবর্ষের প্রকাশনাথ ১৯৪৭' সালে। ফাইনালে তিনি ডেনমার্কের কনি জেপসনের কাছে পরাজিত হন। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব প্রথম জয়ী হন মালয়েশিয়ার ওয়াং পেং সুন, ১৯৫০ সালে। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে প্রথম খেলেন জাপানের কুমারী নোরিকো তাকাগি, ১৯৬৭ সালে এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব প্রথম জয়ের গৌরব লাভ করেন জাপানের কুমারী হিরো জুকি, ১৯৬৯ সালে। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে একই বছরে পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের প্রথম নজির—১৯৬৯ সালে ইন্দোনেশিয়ার রুডি হার্টোনো এবং জাপানের কুমারী হিরো জুকির জয়লাভ।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—১ ও ১৫—৫ পয়েন্টে মুলজাদীকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : পেং গুণালম এবং এনজি বুন বী (মালয়েশিয়া) ১৫—৫ ও ১৫—৩ পয়েন্টে রুডি হার্টোনো এবং ইন্দ্র গুণায়নকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

রুডি হার্টোনো

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী ইভা টোয়েডবার্গ (সুইডেন) ১১—৩, ৬—১১ ও ১১—২ পয়েন্টে নিনি বার্গলুন্ডকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : নোরিকো তাকাগী এবং হিরো জুকি (জাপান) ১৫—১০ ও ১৮—১৩ পয়েন্টে শ্রীমতী জুডি হাসমান এবং শ্রীমতী গিলিয়ান গিলকসকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

মিকস্ড ডাবলস : সেভেন প্রী এবং শ্রীমতী উল্লা স্ট্র্যান্ড (ডেনমার্ক) ১৫—১২, ৮—১৫ ও ১৫—১১ পয়েন্টে ডেরেক টালবোট এবং শ্রীমতী গিলিয়ান গিলকসকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৩৬৩ রান (ডেসমন্ড লুইস নটআউট ৮১ এবং ক্লাইড লয়েড ৬০ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ১২৮ রানে ৩ এবং বেদী ৮৫ রানে ২ উইকেট)
ও ৩০৭ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। চার্লি ডেভিস নটআউট ১২৫ এবং সোবার্স নটআউট ১০৮ রান। বেদী ৫৫ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৩৭৬ রান (সুনীল গাভাস্কার ১১৬, জি আর বিশ্বনাথ ৫০ এবং সৈয়দ আবিদ আলী নটআউট ৫০ রান। সোবার্স ৭২ রানে ৩ উইকেট)
ও ১২৩ রান (কোন উইকেট না পড়ে। মানকাদ নটআউট ৫৩ এবং গাভাস্কার নটআউট ৬৪ রান)।

জর্জটাউনের বোরডা ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের তৃতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ভারতবর্ষ বর্তমানে ১—০ খেলায় (ড্র ২) এগিয়ে আছে। এই দুই দেশের ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজের আর দুটো খেলা বাকি।

টসে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ব্যাট করার দান নেয়। লাঞ্চের সময় তাদের রান দাঁড়ায় ৬৯ (কোন উইকেট না পড়ে) এবং চা-পানের সময় ১৭১ (৩ উইকেটে)। প্রথম দিনে তাদের ১ম ইনিংসের ৬টা উইকেট পড়ে ২০১ রান উঠেছিল। শেষ আধ ঘন্টার খেলায় ৩টে উইকেট পড়েছিল। খেলায় এক সময় যেখানে ৩টে উইকেট খুইয়ে ২১০ রান ছিল সেখানে দাঁড়াল ২০১ রান, ৬টা উইকেট পড়ে। খেলা ভাংগার পনের মিনিট আগে দলের ২২৬ রানের মাথায় সোবার্সের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি বাঁধেন লুইস। প্রথম দিনের খেলার শেষ ওভারে বেদী বল করেন এবং তাঁর শেষ বলটি ভেঙ্কটরাঘবনের হাতে তুলে দিয়ে অধিনায়ক সোবার্স আউট হন। সোবার্স মাত্র ৪ রান করেছিলেন। ভারতীয় মহলে সে কি আনন্দরোল!

দ্বিতীয় দিনে ৩৬৩ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ২৯১ (৮ উইকেটে)। ৯ম উইকেটের জুটিতে অফ স্পিনার নোরেস (২৫ রান) এবং উইকেটকিপার ডেসমন্ড লুইস (নটআউট ৮১ রান) দলের ৮৪ রান সংগ্রহ করেন। এই রানই ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ৯ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড ৭৩ রান (হেন্ড্রিকস এবং হল, ত্রিনিদাদ, ১৯৬২)। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩০০ রান পূর্ণ হয় ৪৪০ মিনিটে। তাদের প্রথম ইনিংসের ৩৬৩ রান উঠেছিল ৫১৮ মিনিটের খেলায়। উইকেট-কিপার ডেসমন্ড লুইস তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে ৮১ রান করে অপরাজিত থাকেন।

চা-পানের সময় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের খেলায় ৪৬ রান দাঁড়ায়, কোন উইকেট না পড়ে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে স্কোর বোর্ডে ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১১৪ (১ উইকেটে)। গাভাস্কার ৪৮ এবং ওয়াদেকার ১৬ রান করে অপরাজিত ছিলেন। হিসাবে দেখা গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংসের ৩৬৩ রানের থেকে ভারতবর্ষ ২৪৯ রানের পিছনে এবং হাতে জমা ১ম ইনিংসের ৯টা উইকেট।

তৃতীয় দিনের লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের রান ছিল ১৯২ (২ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন গাভাস্কার (৯৬ রান) এবং বিশ্বনাথ (২০ রান)। ২০৮ মিনিটের খেলায় ভারত-

বর্ষের ১ম ইনিংসের ২০০ রান পূর্ণ হয়। সুনীল গাভাস্কার তাঁর ১১৬ রানের মাথায় আউট হন। তাঁর এই ১১৬ রানে ১১টা বাউণ্ডারী ছিল। টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। আরও উল্লেখ্য, জর্জটাউনের এই বোরডা ওভাল মাঠে তাঁকে নিয়ে ছয়জন বিদেশী খেলোয়াড়

সুনীল গাভাস্কার

টেস্ট সেঞ্চুরী করলেন। তাঁর আগের ৫ জন (সকলেই ইংল্যাণ্ডের)—হেণ্ড্রেন, হাটন, সুব্বা রাও, ডেকস্টার এবং বয়কট। এঁদের মধ্যে গাভাস্কার বয়োকনিষ্ঠ হিসাবে টেস্ট সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন।

আলোচ্য প্রথম ইনিংসের খেলায় গাভাস্কার এবং বিশ্বনাথ ৩য় উইকেটের জুটিতে দলের ১১২ রান সংগ্রহ করেন।

তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৫৬ (৫ উইকেটে)। হিসাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের ৩৬৩ রানের থেকে ভারতবর্ষ ১০৭ রানের পিছনে এবং হাতে জমা ৫টা উইকেট। খেলায় অপরাজিত থাকেন সরদেশাই (৫ রান) এবং সোলকার (৬ রান)।

চতুর্থ দিনের লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের রান ছিল ৩১৫ (৬ উইকেটে) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের থেকে ৪৮ রানের পিছনে এবং হাতে জমা ৪টে উইকেট।

চা-পানের আগে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৩৭৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের ৩৬৩ রানের থেকে ১৩ রান বেশী করে এগিয়ে যায়। এইদিন ভারতবর্ষের ৫ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৩ জন খেলোয়াড়—সোলকার, সরদেশাই এবং কৃষ্ণমূর্তি রান আউট হন। সরদেশাইয়ের দোষে সোলকার এবং আবিদ আলীর দোষে সরদেশাই রান আউট হন। কৃষ্ণমূর্তি নিজের দোষেই আউট হয়েছিলেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় উভয় দলেরই একটা আশ্চর্য মিল ছিল। ১৫৯ ওভারের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ৩৬৩ রানে শেষ হয়। ভারতবর্ষও সমান সংখ্যক ওভার (অর্থাৎ ১৫৯) খেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের রান (৩৬৩ রান) স্পর্শ করেছিল। তবে এই রান তুলতে ভারতবর্ষের লেগেছিল ৬১৭ মিনিট অপরদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৫১৬ মিনিট সময়।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৬০ (১ উইকেটে)। চতুর্থ দিনে ৩১৮ মিনিটের খেলায় উভয় দলের ৬ উইকেটের বিনিময়ে মোট ১৮০ রান উঠেছিল—২০৬ মিনিটে ভারতবর্ষের ৫ উইকেটে ১২০ রান এবং ১১২ মিনিটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ উইকেটে ৬০ রান।

পঞ্চমদিনে লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের রান ছিল ১৫৫ (৩ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন ডেভিস (৭৭ রান) এবং সোবার্স (৯ রান)। চা-পানের সময় তাদের রান দাঁড়ায় ৩০৭ (৩ উইকেটে)। সোবার্স ১০৮ রান এবং ডেভিস ১২৫ রান অপরাজিত থাকেন। এই ৩০৭ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। অপরাজিত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডেভিস এবং সোবার্স দলের ১৭০ রান তোলেন।

ভারতবর্ষ খেলার বাকি ৯০ মিনিটে কোন উইকেট না খুইয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করেছিল। মানকাদ ৫৩ রান এবং গাভাস্কার ৬৪ রান করে অপরাজিত থাকেন।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই অমীমাংসিত তৃতীয় টেস্ট খেলায় ২৩টি উইকেটের বিনিময়ে মোট ১,১৬৯ রান উঠেছিল—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১০ উইকেটে ৬৭০ রান এবং ভারতবর্ষের ১০ উইকেটে ৪৯৯ রান। সোবার্স এই নিয়ে সরকারী টেস্ট খেলায় ২২টি সেঞ্চুরী করলেন (ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৮টি সেঞ্চুরী) এবং তাঁর ৭৯টি সরকারী টেস্ট খেলায় মোট রান সংখ্যা হল ৭,০৫৩।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

১৯৭১ সালে মোহনবাগান প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে উপর্যুপরি ৩ বছর অপরাজিত অবস্থায় লীগ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ইতিপূর্বে তারা ৪বার অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে (১৯৫৫—৫৮)। ১৯৬৯ সালে বিপক্ষের কাছে কোন গোল না খেয়ে সমস্ত খেলায় জয়লাভের সূত্রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে তারা এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছিল। মোহনবাগান এই নিয়ে ১১বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হল। তাদের থেকে বেশীবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ক্যালকাটা কাস্টমস—১৮বার।

এবছরের চূড়ান্ত লীগ তালিকায় মোহনবাগান ১ম স্থান (৩৩ পয়েন্ট), ইস্টার্ণ রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন ২য় স্থান (৩২ পয়েন্ট) এবং ইস্টবেঙ্গল ৩য় স্থান (পয়েন্ট ২৮) লাভ করেছে। সর্বাধিক গোল দিয়েছে মোহনবাগান—৫৫টা। মাত্র ১টা করে গোল খেয়েছে মোহনবাগান এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন। এখানে উল্লেখ্য, মোহনবাগান বনাম ইস্টার্ণ রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন দলের খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়।

উল্লেখযোগ্য গোলদাতা

গোবিন্দ (ইস্টবেঙ্গল)—১৮, ইনাম-উর-রহমান (ই আর এ এ)—১৩, অমিত দাশগুপ্ত (মোহনবাগান)—১৩, তৌফিক শের খাঁ (মোহনবাগান)—১০ এবং ওয়ার্ড (পোর্ট কমিশনার্স)—১০।

হ্যাটট্রিক

অমিত দাশগুপ্ত (মোহনবাগান)—৩টি, গোবিন্দ (ইস্টবেঙ্গল)—১টি, ওয়ার্ড (পোর্ট কমিশনার্স)—১টি এবং বলবীর সিং (খালসা ব্লুজ)—১টি।

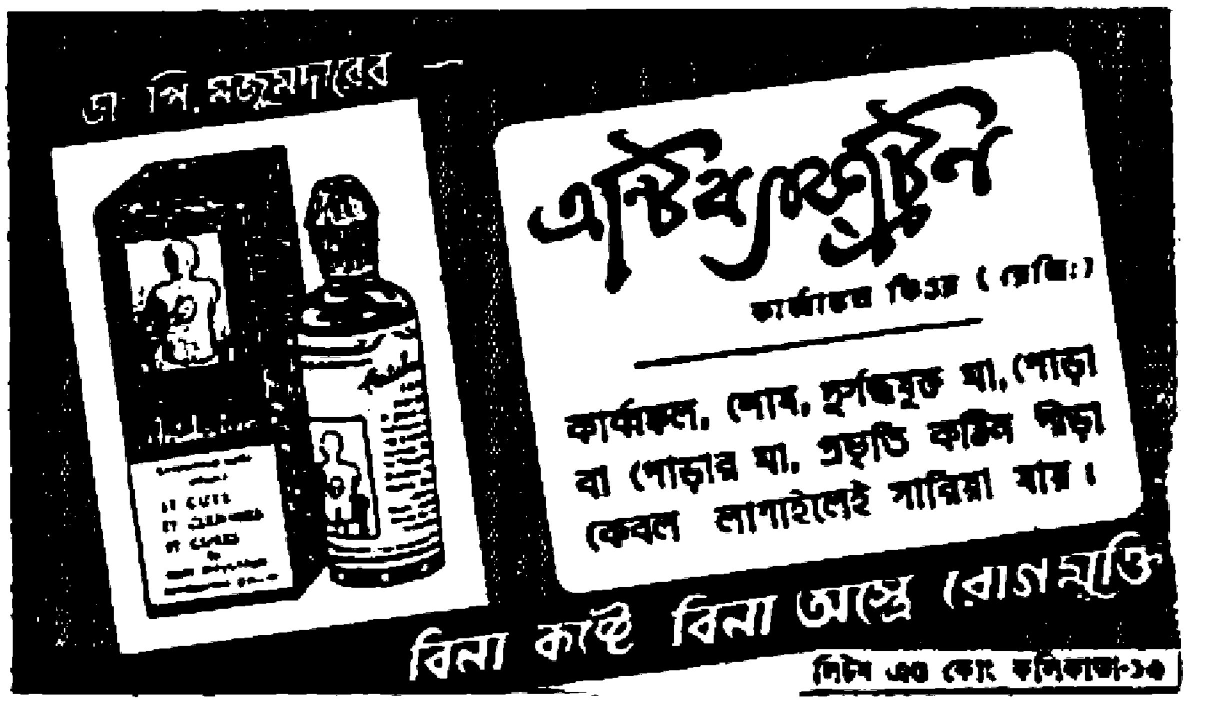

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ইনি সুচিত্রা দেবী

পাকা গিন্নী—দুই ছেলের মা
ঘুমপাড়ানী গল্পের ঝুড়ি

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

বারো মাস তিরিশ দিনই সুচিত্রা ব্যস্ত—সারাদিন তার কাজ লেগেই আছে। সে বলে, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব ঝক্কিই সামলানো যায়।

তাইতো সুচিত্রা হরলিক্‌সের ওপর অতটা নির্ভর করে। হরলিক্‌সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্‌সের পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন সুচিত্রাকে সারাদিন উদ্যম আর উৎসাহ যোগায়।

হরলিক্‌স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এত গুণ। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা হরলিক্‌স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্‌স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্‌স সত্যিকারের পুষ্টি এবং বাড়তি শক্তি দেয়।

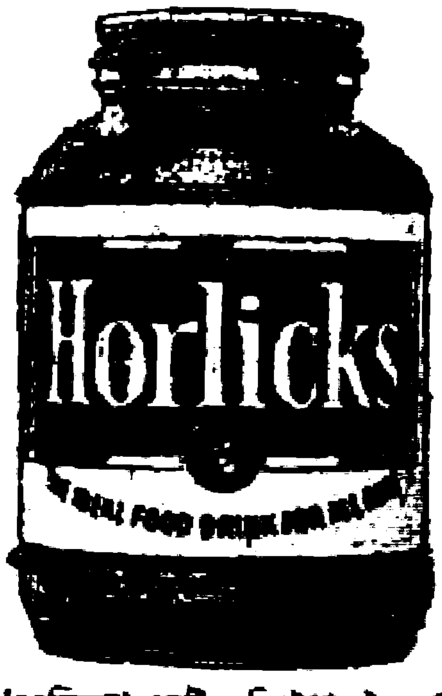

'হরলিক্‌স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্‌স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী বীজাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস। কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HCL 2130

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৮ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 9th April, 1971 শুক্রবার, ২৬শে চৈত্র, ১৩৭৭ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৭২৪	চিঠিপত্র		
৭২৫	সম্পাদকীয়		
৭২৬	এক নজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৭২৭	শেষ রাতের স্বপ্ন		—শ্রীনারায়ণরঞ্জন বসু
৭২৯	ওপার বাংলার বন্ধুর উদ্দেশে		—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৭৩০	তরুণ শীর্ষে দাঁড়িয়ে		—শ্রীপ্রফুল্ল রায়
৭৩১	তুমি আমার জন্য		—শ্রীকৃষ্ণ ধর
৭৩২	আমিও তোমারই মতো, বাংলাদেশ	(কবিতা)	—শ্রীমনীন্দ্র রায়
৭৩৩	বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর		
৭৪০	নানাদেশে		—শ্রীসমদর্শী
৭৪২	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৭৪৫	বাঁধানো দাঁত	(গল্প)	—শ্রীস্বপন চক্রবর্তী
৭৪৮	সাংবাদিকের চোখে		—শ্রীসাম্যবসু
৭৫১	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৭৫৫	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৭৬০	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৭৬৬	রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার পল্লী		—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৭০	পিঞ্জর	(উপন্যাস)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৭৭৫	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৭৭৮	মুখকাটি	(গল্প)	—শ্রীস্বজন গঙ্গোপাধ্যায়
৭৮৪	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৭৮৭	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৭৯০	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—শ্রীচিত্ররসিক
৭৯২	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকার
৭৯৬	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭৯৭	খেলার কথা		—শ্রীঅজয় বসু
৭৯৯	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : অময় কে যাদব

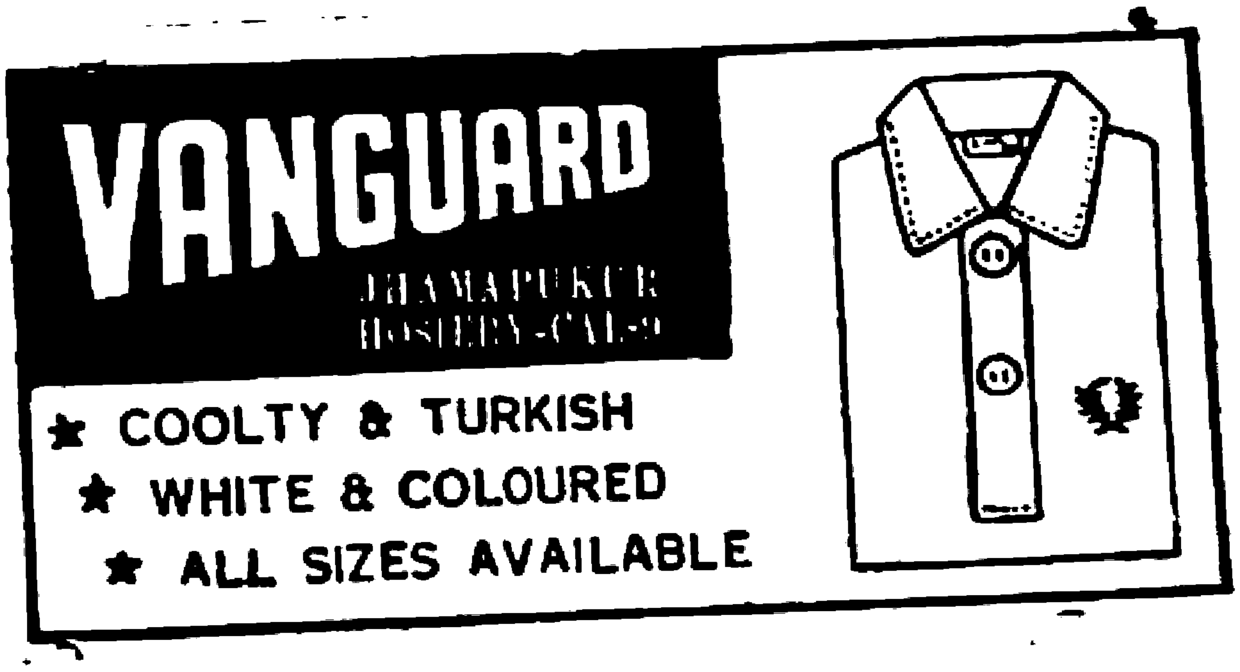

JHAMAPUKUR HOSIERY FACTORY (PRIVATE) LTD
22/A, Kalidas Singha Lane, Calcutta-9. 35-4832

চিঠিপত্র

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

পাঠকের কৌতূহলী মন নিয়ে কদিন ধরে খুঁজছিলাম 'মালতী'কে। ১১শে মার্চ '৭১ তাকে পেলাম স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে। চমকে উঠলাম—ওকে যে আমি চিনি। ওকে দেখেছি '৭০ সালের ৮ই মে, না-ঠিক ওকে দেখেনি, দেখেছি 'বিমলা'কে। নিতাইয়ের বাপের দলেও এসেছিল, সঙ্গে ছিল হাসুর মা, কুসুম, হয়ত মালতীও ছিল, সেই বাবুটিকে দেখেছি, কিন্তু বাবুটির মনে হয় মৃত্যু হয়েছিল।

'বিমলা কুসুমের গল্পে' মালতীর থাকা অসম্ভব নয়, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রঞ্জিতের মৃত্যুটা-স্বাভাবিক নয়, নিতাইয়ের বাপের জায়গায় যদি ওকে পেতাম কি হোত জানি না। ফতিমাকে দেখেছি বেশ বড় হোয়েছে, সোনাও বড় হোয়েছে নিশ্চয়ই। তাই বুক দুরু দুরু করছে।

কোনও অভিযোগ নেই লেখকের প্রতি। বিমলা ও মালতী এক হোয়ে যেতে বাধ্য। বিমলা হয়ত ছিল সূচনা, মালতী পরিণতি, কিংবা উল্টোটা।

জালালীশাবের কঙ্কালটা হয়ত আবিষ্কার হবে, কিন্তু সেটা তখন 'ফসিল' হোয়ে যাবে।

কিংবা হয়ত শ্রদ্ধেয় মুজিবর রহমান ও বাংলা দেশের বাঙালীরা জেন্দ্ বা জালালশাহের ফসিল হোতে দেবেন না, তারও আভাষ যেন পাচ্ছি শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। অভিনন্দন জানাই।

প্রবীর মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-২৫

(২)

৪৪শ সংখ্যায় অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে' শীর্ষক উপন্যাসের বিষয়ে মুস্তাফা সিরাজ যে আলোচনা করেছেন তা এই চিঠি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। এতদিন পর্যন্ত মনে ক্ষোভ ছিল—এই অনাস্বাদিতপূর্ব রসসমৃদ্ধ উপন্যাসটির সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন আলোচনা কেন প্রকাশিত হচ্ছে না। মুস্তাফা সিরাজ সেই ক্ষোভ মিটিয়েছেন।

উপন্যাসটির যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি বলেছেন, নিঃসন্দেহে তা এর উৎকৃষ্টতম দিক। আমরা উপলব্ধিতে আর একটি দিক যা ধরা পড়েছে তা হচ্ছে অনুপম অপূর্ব এক মাধুর্য মোহনীয়তায় মেশানো এর বর্ণনাভঙ্গী। স্থানবিশেষে এই বর্ণনাভঙ্গী যেন এক অপার্থিব অতীন্দ্রিয়তার আভাস এনে দেয়—যা ছুঁই ছুঁই করেও যেন ধরা ছোঁয়া যায় না—অথচ তির তির করে বইতে থাকা আনন্দবেদনার এক পরমাশ্চর্য রসে অন্তর্লোক আপ্লুত হয়ে ওঠে।

নিতাই দাসঘোষাল, সিউড়ী।

জলবিন্দু

আমি 'অমৃত' পত্রিকা নিয়মিত পড়ি। পত্রিকাটির অধিকাংশ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও ফিচার সুনির্বাচিত। এর জন্য সাধারণ পাঠক হিসেবে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আপনারা অনেক চিঠিপত্র ছাপেন। আমার পত্রটি প্রকাশিত হবে ভেবেই লিখছি। বিগত দশম বর্ষের ৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবীরেন্দ্র দত্তের 'জলবিন্দু' গল্পটি নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যে কিছুদিন হল শেষ করেছি। লেখক আপনাদের পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। যতদূর মনে পড়ে এঁর "উপনদী শাখা" নামে একখানি উপন্যাসও কিছুকাল আগে প্রকাশিত "পুরনো পট ধূসর ছায়া" নামে গল্পের বই পড়েছি। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র দত্তের লেখা আমার ভাল লাগে। "জলবিন্দু" গল্পটি আমাকে স্বতন্ত্র স্বাদের আনন্দ দিয়েছে। লেখককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। ভবিষ্যতে লেখকের নতুন ধরনের গল্প পড়ার আগ্রহ রইল।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, পাথেত, ধানবাদ

(২)

'অমৃত' পত্রিকা আমি আগ্রহ সহকারে পড়ে থাকি। এর প্রতিটি গল্প উপন্যাস সুনির্বাচিত। তবে মাঝে মাঝে কয়েকটা গল্প আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। কিন্তু গল্পের আলোচনা আমার লিখে প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই বলে চিঠি লিখতে ভরসা পাই না। তার উপর পত্র লিখলে আমার মত এক সাধারণ পাঠিকার পত্র ছাপবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। তবুও লিখলাম। কারণ সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র দত্তের 'জলবিন্দু' নামে একটি গল্প পড়ে অত্যন্ত ভাল লেগেছে। গল্পটির বিষয়বস্তু হয়ত পুরোনো, কিন্তু লেখক যেভাবে ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনা করেছেন তার বাস্তবিকই তুলনা নেই। কল্পনা চরিত্রটি যথেষ্ট ক্ষমতার দরকার। তাছাড়া লেখকের ভাষায় এমন কবিত্ব আছে, যা গল্পটির প্রধান আকর্ষণ বলে মনে হয়। লেখককে আমার মত সাধারণ এক পাঠিকার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। আপনি এধরনের বলিষ্ঠ গল্প পুনরায় প্রকাশ করলে বাধিত হব।

প্রণতি লাহিড়ী, করলবাগ, নতুন দিল্লী।

(৩)

আমরা প্রবাসে এমন এক জায়গায় বাস করি, যেখানে কলকাতার বিখ্যাত পত্রিকাগুলি সহজে পাওয়া যায় না। পুণা শহর থেকে দিনের কাজের শেষে ফেরার পথে কিনে আনতে হয়। আমি নিয়মিত না হলেও বেশ কিছু পত্রিকা পড়ি। 'অমৃতে' অনেক সংখ্যা পড়েছি। কয়েকদিন আগে শহর থেকে ফেরার পথে 'অমৃত' কিনে ট্রেনে পড়তে পড়তে আসছিলাম। এই বছরের ৩১ সংখ্যাটিতে শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত নামক এক নতুন গল্প লেখকের গল্প পড়লাম। যতদূর মনে পড়ে অমৃতের একটি বিশেষ সংখ্যায় এঁর গল্প পড়েছিলাম নাম 'অমরের শোণিত' একটি নায়কের অসহায় মৃত্যুর কথা আমাকে অনেকদিন দুঃখে ডুবিয়ে রেখেছিল। লেখকের 'কিশোর কিশোরী' গল্পটিকে একটি অন্যতম কীর্তি বলা যায়। এবারের অমৃতে সেই সুন্দর গল্পটির লেখকের নতুন লেখাটি এক টানা পড়ে শেষ করলাম। পড়েই চিঠি লিখছি। কোন গল্পের সমালোচনা লেখার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু গল্পটি আমার এত ভাল লাগল, যে কিছু না লিখে নীরব থাকতে পারছি না। বর্তমান সমাজের এমন বলিষ্ঠ একটি পরিবার জীবন, তার কেন্দ্রে একটি বিবাহিতা নারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র যে এমনভাবে কোন নতুন লেখক আঁকতে পারেন, এ ধারণা আমার ছিল না। আপনারা এরকম গল্প প্রকাশ করে শুধু আপনাদের পত্রিকার মর্যাদাই বাড়ান নি, আমার মত এক প্রবাসী বাঙালী পাঠিকাকে সুস্থ জীবনের ও সমাজের কথাও জানিয়েছেন। এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বীরেন্দ্র দত্তের নতুন লেখার জন্য অপেক্ষা করছি। পত্রটি আপনাদের পত্রিকায় ছাপা হবে কিনা জানি না, তবে ছাপলে বাধিত হবো।

সন্দীপা গঙ্গোপাধ্যায়,
ফিল্ড রোড, মহারাষ্ট্র

সম্পাদকীয়

রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভা

এক বছর রাষ্ট্রপতির শাসনের পর পশ্চিমবাংলায় আবার একটি নির্বাচিত মন্ত্রিসভা প্রশাসনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ, সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যে একটি গণতান্ত্রিক জনপ্রতিনিধিমূলক সরকারের প্রয়োজনের গুরুত্ব যে কত বেশি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৬৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে দুবার মধ্যবর্তী নির্বাচন করতে হয়েছে। দুটি যুক্তফ্রন্ট এবং একটি পি, ডি, এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে এরি মধ্যে। এই চার বৎসর শুধু মন্ত্রিসভারই পতন ঘটেনি পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনেও নানা অশান্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। সারা রাজ্যের মানুষ সে কারণেই একটি নির্বাচিত মন্ত্রিসভার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। ১৯৭১ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচন অবশ্য সুস্পষ্টভাবে কোনো পার্টিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয়নি। কিন্তু তা হলেও এই রাজ্যের জনগণের প্রতি কর্তব্যের কথা মনে রেখেই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের কোয়ালিশন নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। সেই প্রচেষ্টারই পরিণতি হিসাবে গত ২রা এপ্রিল শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২৬ জন সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে।

এবারের মন্ত্রিসভার বৈশিষ্ট্য এই যে, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে অকংগ্রেসী যে দুটি মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তিনিই এবারেও মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে রাজনীতির গতিপথ এই অনির্দেশ্য যে, এবারে তিনি আর অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার নায়ক নন—তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর প্রাক্তন সহযোগী মার্কসবাদী বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের। গত দুইটি নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং যে কোনো উপায়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা। বামপন্থীরাই ছিলেন এই রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্টের প্রবক্তা ও সংগঠক। যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি দুটি নির্বাচনেই বামপন্থী ও অকংগ্রেসীদের বিশেষভাবে লাভবান করেছিল। কারণ, গত দুটি নির্বাচনেই কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং যুক্তফ্রন্ট হয় ক্ষমতাসীন। কিন্তু অকংগ্রেসী জোট বা মনোভাব সব সময় কার্যকর হয় না। বিশেষ করে দুটি অকংগ্রেসী বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা দেখবার পর এবারের নির্বাচনে যে সেই মনোভাব কার্যকর ফল দেবে না তা অনুমান করাই গিয়েছিল।

তা হলেও সংগঠনশক্তির জোরে এবারের নির্বাচনে অন্যান্য অকংগ্রেসী বামপন্থীদের অনেক পেছনে ফেলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি একক বৃহত্তম পার্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার পরেই স্থান দখল করে শাসক কংগ্রেস। গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হবার পর এবারে শাসক কংগ্রেসের জয় অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয়। আরও লক্ষণীয় যে, সিন্ডিকেটের ধ্বজাধারী সংগঠন কংগ্রেস এবারের নির্বাচনে প্রায় নিশ্চিহ্ন। মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন যখন এল তখন দুটি প্রতিপক্ষ হলেন এর দাবিদার। মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে গঠিত সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট দাবি করেছিলেন যে, তাঁদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এবং বিধানসভায় এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিচয় তাঁরা দেবেন। রাজ্যপাল এই যুক্তি মানেননি। কারণ, আগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার যাচাই না হলে যে কোনো সংখ্যালঘু দলই এভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি করতে পারে। অপরপক্ষে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের সহযোগীরা চিঠি লিখে রাজ্যপালকে জানান যে তাঁদের সমর্থন এই মন্ত্রিসভার পেছনে আছে। মন্ত্রিসভা গঠনের দিন তাঁদের সমর্থনের সংখ্যা ১৪১। ২৮০ সদস্যবিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তিনটি আসনের নির্বাচন বাকী আছে। একজন সদস্য ইতিমধ্যে আততায়ীর হাতে নিহত।

নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে মানুষ-মারা রাজনীতির অবসান ঘটানোই হবে তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম কাজ। তিনি যদি এই কাজ করতে পারেন তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষ তাঁকে আশীর্বাদ করবে। গত এক বৎসর রাষ্ট্রপতির শাসনে পশ্চিমবঙ্গের শাসন-ব্যবস্থা, বিশেষ করে আইন ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা, সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল বলা চলে। এই এক বছরে তেরোশোর বেশি মানুষ পশ্চিমবঙ্গে দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষই আছেন। প্রবীণ জননায়ক থেকে শুরু করে নিরীহ নারী এবং স্কুলের কিশোর ছাত্রও বাদ পড়েনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের কোনো কিনারা সরকার করতে পারেননি। সরকারের পুলিশও অনেক নিহত হয়েছেন। সেই হত্যাকারীদেরও ধরা যায়নি বা কারো বিচার হয়নি। এই সঙ্কটকালে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় আবার পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এই দায়িত্ব অতীব কঠোর। পশ্চিমবাংলার মানুষ আজ চায় নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কলকাতার অনেক প্রথম শ্রেণীর কলেজ বন্ধ। পরীক্ষার পাট উঠেই গেছে। হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা কবে হবে তা আজও জানা গেল না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করলেন। তাঁরা দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে পশ্চিমবাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনুন এবং মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করুন—এই আমাদের আবেদন।

বঙ্গবন্ধুর বাণী

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষা, মায়ের ভাষা রক্ষারই সংগ্রাম ছিল না—সত্যিকার অর্থে তা ছিল এ-দেশের প্রথম সংঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম।

কি সীমাহীন ধৃষ্টতা! পাক-ভারত উপমহাদেশের বাঙালী মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রত্যক্ষ ফল এই পাকিস্তান—অথচ সেই পাকিস্তানে বাঙালী মাকে বলতে পারবে না 'মা'।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে খণ্ডিত খর্ব ও পঙ্গু করাবার যে-প্রচেষ্টা স্বাধীনতার লগ্নে শুরু হয়েছিল, সেই প্রচেষ্টার হোতা সেইসব প্রতিক্রিয়াশীলরা কুচক্রীরা সুযোগ পেলেই সুরক্ষিত বিবর থেকে বেরিয়ে আসবে। কবির সেই আশংকার কারণ আজও কাটেনি বরং অধিকতর সচেতন হবার সময় এখন।

"মায়ের শরীরে বাঘ পালায় না জানি কোন্ দূর বনে

কান্দনে কি সেই বাঘেরা ফিরে আমার দিন লোনে?"

জনগণের রায়কে নস্যাৎ করবার সমস্ত হীন প্রচেষ্টাকে রুখতেই হবে এবং তা যে-কোন মূল্যে।

ভাষাহীন ক্রন্দনে অপমানিতা তোমার মুখ কেমন আমরা দেখেছি মা—তবু তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। তোমার সন্তানেরা পৃথিবীর দিকে দিকে যুদ্ধ করছে—বাঘদের শেষ একদিন হবেই।

শেখ মুজিবর রহমান

এক নজরে

নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থীদের বিদায় :

স্বল্পকালের মধ্যে ভারতের তিনটি রাজ্যে মন্ত্রিসভার পতন হল, আর সেই সঙ্গে শেষ হল নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেসের রাজ্য শাসনের পালা। কংগ্রেস যখন দ্বিখণ্ডিত হয় তখন কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেসের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হলেও মহীশূর ও গুজরাট রাজ্যে তাঁদের দলীয় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে উত্তরপ্রদেশে শাসক কংগ্রেস-বি কে ডি কোয়ালিশনে ফাটল ধরলে তারও সুযোগ নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদ লাভ করেন নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী। তারপর বিহারে সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তারও অন্যতম শরিক নিজলিঙ্গাপ্পার কংগ্রেস। ফলে দিল্লীর তখ্ত থেকে উৎখাত হলেও নিজলিঙ্গাপ্পার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এতদিন মোটামুটিভাবে একটা শাসক দলের চেহারা বজায় রাখতে পেরেছিল।

কিন্তু লোকসভার সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ভারতের যে সমর্থনের জোয়ার প্রবাহিত হল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার অনুকূলে, তাতেই ছিন্নমূল তরুর মতো অকস্মাৎ ভেসে গেল নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থীদের সযত্নে সাজানো সংসার। অবশ্য দল বিভক্ত হওয়ার পর থেকে কোন সময়েই নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেসের সদস্যদের ইন্দিরা-কংগ্রেসে আসা বন্ধ হয়নি। তবু কাজ চলানোর উপযোগী একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থীরা এতদিন কোনরকমে বজায় রেখেছিলেন উল্লিখিত তিনটি রাজ্যে। কিন্তু লোকসভার নির্বাচনে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থীদের সম্পূর্ণ বর্জন করেছে ভারতের জনগণ। মহীশূরের রাজ্যশাসন হাতে থাকা সত্ত্বেও সে রাজ্যের ২৭টি লোকসভার আসনের মধ্যে একটিও পেলেন না নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থীরা; শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা স্বয়ং আবার সে রাজ্যের অধিবাসী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। মোরারজী দেশাইর দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে প্রচারিত গুজরাটের ২০টি আসনের মধ্যে মাত্র ১১টি এল নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থীদের হাতে। আর উত্তরপ্রদেশের ৮৫টি আসনের মধ্যে মাত্র একটি পেলেন তাঁরা। সুতরাং ঐ তিন রাজ্যের বিধানসভার যেসব সদস্য এতদিন বেড়ার উপর বসে ভাবছিলেন, কোনদিকে যাবেন তাঁরা আর কালক্ষয় করলেন না। সকলেই চলে গেলেন ইন্দিরার অনুগামী শাসক কংগ্রেসের শিবিরে। আর সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হলেন মহীশূরে বীরেন্দ্র পাটিল, গুজরাটে হিতেন্দ্র দেশাই ও উত্তরপ্রদেশে টি এন সিং। শ্রী সিং-এর ভাগ্য অবশ্য কয়েকমাস আগেই মণিরামের উপ-নির্বাচনে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, তবু তিনি এতদিন আশায় আশায় শূন্য আসনে বসেছিলেন।

বিহারেও এস এন সিংহ নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থার নোটিশ দিয়েছেন শাসক কংগ্রেস পক্ষ। তাঁদের দাবি, তাঁরাই এখন সে রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ দাবিও যে অনতিবিলম্বে সত্য প্রমাণ হবে তাতে রাজনৈতিক মহলে কারও কোন সন্দেহ নেই। বছর দুই আগে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর কংগ্রেস সভাপতিত্বের মেয়াদ শেষ হলেই তিনি রাজনীতি থেকে বিদায় নেবেন। সেদিন বোধহয় তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে তাঁর সঙ্গে তাঁর সেইদিনের দলটিকেও বানপ্রস্থে যেতে হবে।

ওড়িশায় নতুন মন্ত্রিসভা :

ওড়িশার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বে ওড়িশায় একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হল। ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট ওড়িশা বিধানসভায় স্বতন্ত্র, উৎকল কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড দলভুক্ত মাত্র ৭১ জন সদস্যের সমর্থনে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিধানসভার সদস্য নন। সুতরাং এ-মন্ত্রিসভার আয়ু যে খুব বেশি দিন নয় তা অতি বড় আশাবাদীও স্বীকার করবেন। শ্রীদাসের এখন ৮২ বছর বয়স; তাঁর সমকালীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদের (তখন প্রধানমন্ত্রীই বলা হত) মধ্যে একমাত্র শ্রীরাজাগোপালাচারী ছাড়া কেউই জীবিত নেই।

—[illegible]

শেষ রাতের স্বপ্ন

দক্ষিণারঞ্জন বসু

শেষ রাতের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়?

সেদিন শেষ রাতেই আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার বাল্য-কৈশোরের দিনগুলির মতো আমি আবার শেষ জীবনে এসে আমার গ্রাম-জননীর সেবায় মেতেছি।

ঘুমের মধ্যেই আমার গ্রামের সম্পূর্ণ ছবিখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। প্রথমেই আমার প্রিয় পাঠাগার 'শান্তি-সুধা লাইব্রেরীতে' ফিরে চললাম। ছেলেবেলার বন্ধুদের নিয়ে এ লাইব্রেরী আমি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম উনিশ শ' ছাব্বিশের মাঝামাঝি সময়ে। আমাদের বাইরের বাড়িতে সেই লাইব্রেরীতে সবাই এসে মিলিত হয়েছি, কী আনন্দ!

কিন্তু ছেলেবেলার সব বন্ধুরাই যে বুড়ো হয়ে গেছে—কালী, কান, বিশু, পদ্ম ওরা সবাই। ওরা কেউ ঢাউস পত্রিকা সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' মন দিয়ে পড়ছে, কেউ বা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'র পাতায় মনোনিবেশ করেছে। ওরা সবাই হুমড়ি খেয়ে যুদ্ধের খবর পড়ছে।

কোন যুদ্ধের খবর? বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর, বাঙালী মুক্তিফৌজ কিভাবে পাকিস্থানী হানাদারদের পর্যুদস্ত করেছে, তাদের কামান বিমান বন্দুক সব দখল করে নিয়েছে এবং ইয়াহিয়ার পাঞ্জাবী দস্যু ও বিহারী বিশ্বাসঘাতকের দলকে পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-শীতলক্ষ্যা এবং কর্ণফুলী-ব্রহ্মপুত্রে কিভাবে চুবিয়ে চুবিয়ে মারছে সেই খবর। বাংলা দেশকে যারা না চেনে সেনারা, বাংলা দেশের কমলার রোষ ওরা কল্পনাও করতে পারে না— সেই বর্ষার বন্যায়ও হাজার হাজার পাকিস্থানী কোথায় ভেসে গিয়েছে সেই খবর।

বন্ধুরা যখন এসব সংবাদে মত্ত ছিল আমি তখন আমার ঠাকুর্দার দেওয়া রামায়ণ ও জ্যাঠামশায়ের দেওয়া মহাভারত এবং ছোট কাকার 'প্রবাসী' মাসিক পত্রের বাঁধানো সেটগুলি সব ঠিক আছে কিনা দেখছিলাম। সেগুলির সন্ধান করতে করতেই একেবারে তাক্ ও হাক্ থেকে নতুন করে 'বাঁচবে বাঙালী', 'বাংলার বিপ্লববাদ', 'নির্বাসিতের আত্মকথা', 'আর্টাসিন' ইত্যাদি বইগুলি আমার চোখে পড়ে গেল। হর্ষে-আনন্দে-আবেগে।

নিতু থাঁর নাতি লেখাকে সুর করে 'দেশেশের ছড়া পড়ছে আর বাচ্চা মেয়ে শান্তা সোম 'মৌচাকের পাঁথী' মেলাচ্ছে নিবিষ্ট মনে—দেখে খুবই খুশি হলাম। এরই মধ্যে আমার এক ছোট্ট ভাইপো ফলটু এসে লাইব্রেরিয়ানের কাছ থেকে 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইখানা পড়তে নিয়ে গেল, এসব দৃশ্যে আনন্দে আমি আত্মহারা। কিন্তু পালপাড়ার মধু 'বিপ্লবী বাংলা' বইখানা চেয়ে পেলো না, তাই বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাইব্রেরিয়ান ওকে জানালো, ঐ বইটি ইস্যু হয়ে গেছে, তাই 'বাংলার বিপ্লববাদ' বইখানা ওর হাতে তুলে দিলো। অনেকটা খুশি হয়েই মধু পাল চলে গেল। আমারও উল্লাসের সীমা নেই তাই দেখে। বাঙালীর রক্তের কণায়-কণায় যে বিপ্লবের আকর্ষণী শক্তি কাজ করে চলেছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা তো তেমন বই-ই পড়তে চাইবে!

হঠাৎ নজর পড়ে গেল লাইব্রেরী ঘরের এক কোণায়। সেখানে জড়ো হয়ে আছে কয়েক জোড়া ডাম্বেল, পাঁচ-ছটি মুগুর, অনেকগুলি বাঁশের লাঠি এবং কাঠের তৈরি ছোরা ও বন্দুক। মনে পড়লো, শেষ রাতে উঠে আমরা সবাই এসে জড়ো হতাম লাইব্রেরীর পেছনে—সেখানে ডন-কুস্তি করতাম, লাঠি ও ছোরা খেলা শিখতাম এবং বন্দুক ছোড়ার কৌশলও আয়ত্ত করতাম। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে আমরা এভাবে তৈরি হচ্ছিলাম জীবনদার অনুপ্রেরণায়। শুনে তৃপ্ত হলাম আমাদের পরবর্তীরা ঠিক একইভাবে নাকি নিজেদের বছরের পর বছর ধরে তৈরি করে আসছিল পাক-শোষকদের পাপচক্রকে চরম আঘাত হানবার জন্যে। কারণ তারা জিন্না-চক্রান্তে দেশ বিভক্ত হবার অল্প দিনের মধ্যেই বুঝে নিয়েছে, ভাগীদারহীন হয়ে পশ্চিমা মুসলমানরা যাতে সোনার বাংলা দেশকে নির্বিচারে শোষণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই পাকিস্থানের সৃষ্টি এবং গত তেইশ বছরের অপশাসনে বাংলা দেশের মানুষ তা হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছে। সংখ্যাগুরু হয়েও সংখ্যালঘুর নির্যাতন তারা কেন সইতে যাবে? যার যার তাই তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার ইজ্জতকে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে, প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ওরা উদ্ধত জঙ্গী শাসক আয়ুব খাঁকে যবনিকার অন্তরালে পাঠিয়ে দিয়েছে। আয়ুবের পর আরো জবরদস্ত মির্জা ইয়াহিয়া এলেন রঙ্গমঞ্চে। হাতে তাঁর রুশ-মার্কিন ও চীনের দেওয়া আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ-সরঞ্জাম। তার ওপর রয়েছে তাঁর তুলনাহীন বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা ও অসাধুতার দম্ভ। এই সম্বল নিয়ে বাংলা দেশকে চূড়ান্ত নির্যাতনের খেলায় মেতে উঠলেন ইয়াহিয়া। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন যে ন্যায়ের কাছে অন্যায়ের, সত্যের কাছে মিথ্যার চূড়ান্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধে নেমে আজ যে ইয়াহিয়া হাবুডুবু খাচ্ছেন এবং তাঁর নাভিশ্বাস উঠেছে এর পেছনে মুক্তিফৌজ আর বাংলার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার গাঁয়ের নওজোয়ানদেরও যে অকাতর আত্মদান ও অসীম ত্যাগব্রত রয়ে গেছে সে বিষয় ভাবতেই বুক আমার আনন্দে নেচে উঠলো।

এমনি আত্মদানের ও ত্যাগব্রতের শিক্ষাই দিয়েছিলেন আমাদের জীবনদা। কিন্তু জীবনদা অর্থাৎ জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় আর নেই। থাকলে হয়তো তাঁর প্রিয় 'বিক্রমপুরে'—মুন্সিগঞ্জে স্বদল নিয়ে বাংলা দেশের বিপ্লবে গিয়ে সামিল হতেন।

মনের উপর তরঙ্গমালার এমনি সব চিন্তা যখন ভেসে চলছিল উত্তরের জানলা দিয়ে আমার চোখ গিয়ে পড়লো আমাদের পারিবারিক শ্মশানভূমিতে। দেখলাম, সেই ছেলেবেলায় যেমন দেখতাম, তেরাণ্ডা ও ধুতুরা গাছের বন ঘিরে আছে সেই শ্মশান। সকালের নরম রোদের আলোয় সাদা সাদা ধুতরো ফুলগুলিকে বেশ ভালোই দেখতে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেদিকেই তাকিয়ে থাকলাম। মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় এই ধুতরো ফুলকে আমরা শিবঠাকুরের গাঁজার কল্কের সঙ্গে তুলনা করতাম, কল্কিফুলও বলতাম। আমাদের ধারণা ছিল, শিবঠাকুর যখন অন্যায়কে পর্যুদস্ত করতে ধ্বংসে মেতে ওঠেন তখন তিনি নেশায় মাতাল হয়ে নেন। ধ্বংসলীলার আজ চূড়ান্তই হচ্ছে বাংলা দেশে, কবরের পর কবর খোঁড়া হচ্ছে ইয়াহিয়া আর তাঁর সাগরেদদের জন্যে। মনে হলো, শ্মশানে ধুতরো ফুলের ছড়াছড়ির সঙ্গে যেমন যেন একটা মিল রয়েছে আজকের বাংলাদেশের অবস্থার।

আরেক পাশে গোটাকয়েক জবাগাছে অনেকগুলি জবা ফুল যেন জ্বলছে। রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয় জবাফুলের রঙ। বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের বুকেও বোধহয় সেই আগুনই জ্বলছে! আশায় আমার বুক ভরে উঠেছে এই ভেবে যে, বাংলাদেশের মানুষের আজ চোখ খুলে গেছে, তারা বুঝতে পেরেছে পরিষ্কারভাবে—হিন্দু শোষক যেমন হিন্দুকে খাতির করে শুধুমাত্র মুসলমানকে শোষণ করে না, মুসলমান শোষকও মুসলমানকে খাতির করে কেবলমাত্র হিন্দুদের শোষণ করেই তৃপ্ত থাকতে পারে না।

এই হলো শ্রেণী-চরিত্র। তাই দেখা গেছে যুগ যুগ ধরে হিন্দু রাজা-মহারাজারা এবং মুসলমান নবাব-বাদশারা একই ভাবে হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের শোষণ-নির্যাতন দুর্বিষহ জীবন যাপনে বাধ্য করেছে। পশ্চিম পাকিস্থানের অত্যাচারে সেই সত্যও বোধ জাগ্রত হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এবং তারই পরিচয় আজ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে। এই শুভবোধ ও মুখের প্রতিক্রিয়া পশ্চিম বাংলায়ও অচিরে দেখা দেবে এবং গোটা ভারতকে একদিন প্লাবিত করবে আমার অন্তরে যখন এমনি এক চরমার স্পন্দন উঠেছিল ঠিক সেই সময় অতীশ দীপঙ্করের কথা আমার মনে জেগে উঠলো।

তাড়াতাড়ি আমি কালীকে ডেকে বললাম চল কালীভাই, আমরা দীপঙ্করের ভিটায় গিয়ে আগে প্রণাম রেখে আসি। তার পর আমরা পল্লীসেবার কাজে নেমে পড়বো। ঐ দ্যাখ, গোড়াকিনী দীঘির কী শোচনীয় অবস্থা! শঙ্করের বিলেরও নিশ্চয় সেই একই দশা—কচুরিপানার ভরাট! হাটঘাট সবই নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো সবই আবার আমরা ঠিক করে নেবো। আমাদের এই বজ্রযোগিনী আবার হয়ে উঠবে এক আদর্শ গ্রাম।

কালীভাইকে ডেকে যখন এই কথাগুলি বলছিলাম স্পষ্টভাবে তখন অনেক ছবিই মুখর হয়ে উঠতে চাইছে। তার একটি কলকাতার প্রাক্তন এক পাক ডেপুটি হাই-কমিশনারের সঙ্গে এক সান্ধ্য-সম্মেলনে আমার আলোচনার ছবি। ডেপুটি হাই-কমিশনারকে আমি বলেছিলাম, মহামনীষী শ্রীঅতীশ দীপঙ্করের তিরোধানের ন'শ বছর চলেছে এবং তাঁর আবির্ভাবের হাজার বছর পূর্ণ হবে উনিশ শ' আশী খৃষ্টাব্দে। এ দুটি বছরে যথাক্রমে পক্ষব্যাপী ও মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব পালনে উদ্যোগী হতে আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। দু' বাংলার মৈত্রী বন্ধন তাতে মজবুত হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন সে অনুরোধের কোনো সাড়া পাইনি এবং আলাপে এও আমার মনে হয়েছিল, অতীশ দীপঙ্কর সম্বন্ধে ডেপুটি হাই-কমিশনার মহোদয়ের কিছু জানাও নেই। কিন্তু আজ আর অন্য কারুর উদ্যোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। এবার আমরা নিজেরাই বজ্রযোগিনীতে দীপঙ্কর উৎসবের বিরাট আয়োজন করবো, দেশ-বিদেশের বিশেষ করে বৌদ্ধ-জগতের মনীষী পন্ডিতরা সব আসবেন সেখানে নাস্তিক পন্ডিতের ভিটের প্রণতি নিবেদন করতে, সে কি নেহাৎ কম আনন্দের কথা। দীপঙ্কর বাংলাদেশের এক অসামান্য গৌরব।

যে সন্ধ্যায় ঐ পাক-ডেপুটি হাই-কমিশনারের সঙ্গে দীপঙ্কর উৎসব সম্বন্ধে আমার আলাপ হয়েছিল তার অল্প কয়েকদিন আগে অবচেতন মনে আমি এক অস্ফুট আকুতি অনুভব করেছিলাম। আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম, দেশ বিভাগের ব্যথায় অস্থির আমারই 'ঘাসের মানুষ' এক বৃদ্ধ মুসলমান গাঁয়ের পথে দাঁড়িয়ে যাকে দেখছে তাকেই প্রশ্ন করছে—

ও মুন্সী ও মৌলবী
খবর-কিছু রাখনি,
এই দ্যাশ ছাইড়া গেছে যারা
আবার ফিরা আইবনি!

আমি স্বপ্নে দেখছি, দীর্ঘ আঠার বছর পর সেই বিরহ-কাতর বৃদ্ধ মুসলমানের আকুতি সফল হতে চলেছে। বাস্তুচ্যুত নিরপরাধ মানুষগুলি আবার দেশে ফিরে আসছে দলে দলে। আমিও আমার শপথ রাখতে পারছি, সে কি কম সন্তোষ, কম আত্মতৃপ্তির কথা। আমি শপথ নিয়েছিলাম পল্লীমায়ের কোল থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবো না।

দিন যত যায় জোর পিপাসা কেবল বাড়ে,
আপন আপন আয়ু ফুরোয় তবুও ভাবি,
মায়ের কাছে ফিরে যাবোই যাবোই যাবো;

সে শপথ আমার সার্থক। আমি আনন্দে আত্মহারা। আমার বাংলাদেশে আমার জন্মগ্রামে আমি এসে পৌঁছি। খোকনের ছেলে আশীষ এসে আমায় জিজ্ঞেস করলো, জেঠু, তোমার কাছে মহারাজের লেখা 'জেলে ত্রিশ বছর' বইখানা আছে? আর নেতাজীর 'মাই স্ট্রাগল'? আমার পড়তে ইচ্ছে করে।

বড়ো ভালো লাগলো আশীষের জিজ্ঞাসায়। মহাবিপ্লবীর আত্মকথায় বাঙালীর বিপ্লব-চেতনার গতির সন্ধান চায় এক কিশোর। এইতো চাই। দেশপ্রেমের দীপশিখা এমনি করেই তো জ্বলে ওঠে প্রাণে প্রাণে। 'জেলে ত্রিশ বছর' এবং 'মাই স্ট্রাগল' বই দু'খানা তাকে দেবো এই আশ্বাস দিয়ে আশীষকে বিদায় দিলাম।

ঠিক তখনই আমাদের ছেলেবেলার সেই কানা-বাউল কন্ঠের একটি সুর ভেসে আসছিল আমার কানে। আমাদের বাড়ির সামনের সড়ক দিয়ে বাউল একতারা বাজিয়ে গাইতে গাইতে চলেছে—ভাঙা নৌকায় জল উঠিয়াছে ডুবলো তরী মাঝ দরিয়ায়। কানা-বাউল তাহলে বেঁচে আছে এখনো? সে তবে অনেক বুড়ো।

আমি চমকে উঠলাম, এযে পাকিস্থানের ভরাডুবির কথা বলছে বাউল! আমার মন দেশবিভাগকে, পাকিস্থানকে কখনো স্বীকার করেনি। পূর্ব বাংলাকে আমি কোনোদিন পূর্ব পাকিস্থান বলতে পারিনি। যদি কখনো বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্থান কথাটি আমাকে লিখতেও হয়ে থাকে লেখনী-মুখ তখন আমার নিশ্চয়ই কেঁপে কেঁপে উঠেছে। রক্তের আখরে লেখা আমার সম্পাদিত দু-খন্ডের 'ছেড়ে আসা গ্রাম' লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নর-নারীর বেদনার্ত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বয়ে বেড়াচ্ছে। সেইসব বাস্তুহারা দুঃখী মানুষেরা এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা পাপবুদ্ধির সৃষ্টি পাকিস্থানের কবলমুক্ত বাংলাদেশে নিজ নিজ গ্রামে আবার ফিরে আসছে তাকে সত্যিকারের বাঙালী দেশে পরিণত করতে, একথা যতই ভাবছি ততই আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ছি।

আমার অনেকদিনের পুরনো আকাঙ্ক্ষা তাহলে সফল হলো! কি সেই আকাঙ্ক্ষা? —আমরা আবার বন্ধু হবো দু-বাংলার, ভাইবোনেরা যেমনি ছিলাম দু-বাংলায়।... আবার এসো এক হয়ে যাই দু-বাংলার, বাপ-ঠাকুর্দা যেমনি ছিলেন দু-বাংলায়। মনে মনে আমার এক পুরনো কবিতার এ দুটি কলি আওড়ালাম আমি। আসলে দু বাংলার অস্তিত্বে আমরা তো কেউ বিশ্বাসী নই, আমাদের চিত্তলোকে এক বাংলাই চিরন্তন। 'পদ্মা আমার গঙ্গা আমার' বইতে সেই কথাই ধ্বনিত।

বই ঘাটতে ঘাটতে এসব কথা যখন ভাবছিলাম তখনই কানু ভাইয়ের চিৎকার তার ফোকলা দাঁতের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এলো—আরো শোনো সব ভাইয়েরা, কেমন মজা! পশ্চিমারা নিজেরাই এখন মারামারি কইরা মরতে আছে।

হ, ঠিকই, পাপের সৃষ্টি পাকিস্থানের তাসের ঘর যে ভাইঙা পড়তে আছে তা বেশ বুঝতে পারছি—বললে আমার বাল্য-বন্ধু নসা।

আর তখনই সম্মিলিত কন্ঠে মুক্তিফৌজের একটা শ্লোগান ধ্বনিত হলো—'পাকিস্থানে লাথি মারো, বাংলাদেশ কায়েম করো।'

জোরে, তারপরে আরো জোরে এই ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, আমি কলকাতারই আমার নিজের বাড়িতে শুয়ে।

কিন্তু শেষ রাতের এই স্বপ্ন সত্যিই কি সত্য হতে চলেছে? ইতিহাস দেবতার কাছ থেকেই আমরা এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাবো।

CENTRAL LIBRARY

ওপার বাংলার বন্ধুর উদ্দেশে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বন্ধু,

সেই কবে একদিন ভারী মজার একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। ছবিটা প্রায়ই আমার চোখে ভাসে, আর অবচেতন মনের সেতুপথে নিছক মজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু যেন অর্থ খোঁজে। স্ফটিক জলের স্বতঃস্ফূর্ত একটি উৎস, তার অনেকগুলো মুখ। সেই মুখগুলো থেকে বহু ধারায় জলের ফোয়ারা ছুটেছে। সেই জল এত স্বচ্ছ, এত সাদা যে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। সাদাটে আলো ঠিকরে এসে চোখে লাগে। আবার চোখ জুড়িয়েও যায়। সেই জলরাশি যেখানে পড়ছে সে-জায়গাটা ফুলে উঠছে, ফেঁপে উঠছে। তারপরে দুটো বাহুর মত সেই পথ ধরে বিপুল বেগে কোন অনির্দিষ্ট লক্ষপথে ছুটে চলেছে। সেই দুই জীবন-বাহু-ধারা পরস্পরকে দেখে নিচ্ছে, পরস্পরকে ছাড়িয়ে যেতে চলার রেষারেষিতে কখনো তারা উল্লাসময়, কখনো বা হিংস্র কুটিল। এই বেগের আবর্তে পড়ে তারা তাদের একান্ত উৎসভূমির কথা ভুলে গেছে। বিচ্ছিন্ন আত্মতৃপ্তির অভিমানে উগ্রমুখর। ...ওদিকে কার অভিশাপে উৎসভূমির মুখগুলোর ওপর পাথর চাপা পড়েছে কখন। প্রাণের জোয়ারে টান ধরেছে, বাহুদুটো শীর্ণ হয়ে আসছে। পরস্পরের দিকে থমকে তাকায় তারা। সবিস্ময় চোখ, বিরূপ চাউনি। ভাবে, একে অপরের শক্তি শোষণ করল বুঝি। কখনো বা হতাশায় স্থির। একটা চকিত অনুভূতি উঁকিঝুঁকি দেয়... আমাদের দুটো পৃথক বাহু মিলিত হলে কি প্রাণের স্পর্শ মিলতে পারে? কিন্তু বহুদূর চোখ যায়, মাঝে ধু-ধু বিচ্ছিন্নতার মরুভূমি। এ অতিক্রম করা সম্ভব কেমন করে?

...তারপর। তারপর অমা-রাত্রির অবসানের মতো হঠাৎ যা ঘটে গেল সেও কি স্বপ্ন। স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন-ভঙ্গ। সেই একান্ত উৎসভূমির বুকের গভীরে যুগ যুগ ধরে যে প্রাণের ধারার অফুরন্ত তপস্যা চলছিল, অকস্মাৎ তার বজ্র-ঝংকারে আর অগ্নি-নিনাদে অভিশপ্ত পাথরটা খণ্ডখণ্ড হয়ে আকাশে ছিটকে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। সেই নতুন প্রাণের স্পর্শে দুই বাহু সচকিত, শিহরিত। পরস্পরকে আবার নতুন চোখে দেখেছে তারা, আর পিছন-পানে তাকিয়ে তাদের একান্ত মাতৃ-জঠর দেখতে পেয়েছে। একান্ত প্রাণের সেই বিপুল জোয়ারে মাঝের অভিশপ্ত বিচ্ছিন্নতার মরুভূমি ভেসে গেছে।

বন্ধু, আমি তোমাদেরই একজন। এপারে বসে এই সহজ সাদামাটা কথা কটা বলতে গিয়ে বুকের তলায় যে সুখের কান্নার ঢেউ উথাল-পাথাল করছে ওপার থেকে তোমরা কি তা টের পাচ্ছ? মন বলছে পাচ্ছ। ওপারের আঁধার-মন্দির-বিধ্বস্ত করার যে অগ্নি তোমাদের হাতে জ্বলে উঠেছে, এই উপলব্ধির অনুভূতিটুকুও সেই অগ্নি ঝকমক করতে দেখতে পাচ্ছি। আমার মতো এ-পারের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এই এক কথাই বলছে, আমি তোমাদের একজন, আমরা তোমাদের, তোমরা আমাদের।

...লিখতে বসে প্রায় তেতাল্লিশ বছর আগের একটা ছবি চোখের সামনে হঠাৎ যেন জ্বলজ্বল করে উঠল আবার। অন্তর-জগতের ধন কিছুই কি হারায় না!...আমি তখন নিতান্ত বালক। ঢাকার কার্জন হল ছেলে-বুড়োয় গিসগিস করছে। সেখানকার মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। এই সকল আয়োজনের জন্যই কার্জন হল বিখ্যাত। মঞ্চের গায়ক সৌম্যদর্শন দিলীপকুমার রায় যুবাপুরুষ তখন। প্রথম গাইলেন, নজরুলের 'বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিসনে আজো দোল'। তার পরের গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। এই দ্বিতীয় গানেই সভার হৃদয় মথিত। আমি নির্বাক, বিস্ফারিত। শিল্পী গাইছেন আর কাঁদছেন। দিনের অবসানে সন্ধ্যার সকল খেলা সাঙ্গ করে মায়ের কোলে ফেরার জন্য তাঁর সে কি আকুতি। সেই আকুতি প্রতিটি শ্রোতাকে স্পর্শ করছে, আমার কিশোর বুকের তলায়ও একটা দুর্বোধ কান্না যেন গুমরে গুমরে উঠছে। এরপর দিনকতক ধরে সকলের মুখে মুখে এই গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। আজ তেতাল্লিশ বছর পরে সেই পুঞ্জীভূত ভালবাসা বুকের তলায় কি যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাঁধিয়েছে সে যদি জানতে বন্ধু। শুনতে পাই সংস্কৃতির ধারক-বাহক মোগল স্থাপত্য ভাস্কর্যের সেই কার্জন হল নাকি বোমায় বিধ্বস্ত করে দিয়েছে তোমাদের মোহাম্মদ পশ্চিমী শাসকরা। কিন্তু মূর্খরা জানে না, ওই আগুনের গোলায় সেই সোনার বাংলার সেই ভালবাসায় দাগ পড়েছে শুধু, প্রাণ পোড়েনি।

বাগ্দেবীর মন্দিরে আমি এক নিরলস পূজারী। নিরলসে তাঁর ভান্ডারের মালা গাঁথি। অথচ এরই মধ্যে নির্মল বেদনা-বোধের মতো কি একটা অনুভূতি থেকে থেকে বিবশ করে আমাকে। সে কি শুধু ওই পদ্মার ওপারে আমি জন্মেছি বলে? ঠিক বুঝতাম না; বিশ্লেষণও করতাম না। এই মধুর বেদনাটুকু আমার দেশ ভাবনার মতো মনের গভীরে আমার আছে। তাছাড়া, দেশ যখন ছেড়েছিলাম, তখন মাত্র ন-দশ বছর বয়েস আমার। দুই বাংলার মাঝখানে দিয়ে বিচ্ছেদের তলোয়ার চালানো হয়নি তখনো, ছুটি-ছাটায় উৎসবে আনন্দে হামেশাই যেতাম। ফিরে আসতাম যখন, আনন্দের রেশটুকুই মনে লেগে থাকত।... দিন গেছে, বছর গেছে, যুগটা যুগ হয়েছে। ...সবটাই আমার দেশ, কিন্তু দেশের মাঝেও নিজস্ব ঘর বলে তো কিছু থাকে? আমার সে ঘর কোথায়? এদিকে দিন ফুরোচ্ছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে অথচ সকল খেলা সাঙ্গ করে মায়ের কোলের মতো সেই নিজস্ব ঘর কোথায় সন্ধানেও খুঁজে চিরতরে নিরস্ত।

তারপর, শোনো বন্ধু, পদ্মার ওপার থেকে হঠাৎ যেন একটা আলোর ঝাপটা এলো স্বাধীনতার প্রায় সাতের বছর পরে। তার আগে ভালবাসা একটা খবরই কানে আসছিল শুধু, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর এক দুর্বার ভাষা আন্দোলনের খবর। সেই আন্দোলন [illegible] নির্যাতিত তোমরা, ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সেই নিষ্ঠুর খবরের ওপর [illegible] শাসকেরা কিন্তু বাধা দিতে পারেনি। হঠাৎ আজকের দুর্দিনের মতো তার বিস্তৃত বিবরণ বুকের তলায় নিঃশব্দে জ্বলছে। দুঃখের এই মুক্তির তুলনা নেই। আজ আমার সব থেকে বড় আনন্দ আর বিস্ময় এই জন্য যে, ওপার বাংলার ছেলেদের আজকের এই অপ্রতিহত রাজনৈতিক চেতনা আর স্বাধীনতার বহ্নিশিখার মাতৃভাষা আর সাহিত্যের মধ্যে স্ফুরিত। যে সাহিত্য পড়া অবসর বিনোদনের বস্তু নয়, যে সাহিত্য অতন্দ্র স্বাধীনতার চতুষ্পার্শে লাঠি ধরে পাহারা দিতে বসে আছে। 'তোমাদের সে-সাহিত্যে আছে, '[illegible] প্রতি-লেখায় আমার সাধ ইতিহাস লিখে চলেছি।' কোথায় ছিল এই অগ্নি-স্বাধীনতার আলোর সাথী?—আমি তোমায় শীর্ষ নিশান দিলাম যখন ছাদের পাহাড় উঁচিয়ে, তবে নীল আগুন ছিল বুকের ভিতর লুকিয়ে।'

বন্ধু, ওই আগুনের তাপ আমাদের কিছু দেবে, যে আগুনে সৃষ্টির শিখা হয়ে আমাদের প্রতিটি বুকের তলায় প্রদীপের মতো জ্বলবে? এপারে আমাদের চেতনার আকাশে আত্মবঞ্চনের এক আঁধার-মানব ছায়া বিস্তার করে চলেছে। পুঁতিগন্ধ ওই আগুনের বড় প্রয়োজন এখন।

সামনের দিকে চেয়ে আমি কি দেখছি জানো বন্ধু?...না, দেখছি না, নতুন আলোয় হঠাৎ আমার এতদিনের উপোসী দুটো চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। শুনছি কিছু। অফুরন্ত একটা গান আমার কানে কানে উদার হয়ে বাজতে লেগেছে। এপার বাংলা আর ওপার বাংলার মানুষ গলা মিলিয়ে গান করছে। গাইছে, সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে......

গঙ্গা তীরে দাঁড়িয়ে

প্রফুল্ল রায়

দিন তিনেক আগে ওপার বাঙলার একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ছেলেটি এপার বাঙলায় এসেছিল অস্ত্রের সন্ধানে। উনিশ-কুড়ির মতো বয়েস; পূর্ণ যুবক তাকে বলা যায় না। ছেলেটিকে ঘিরে এখনও কৈশোরের স্নিগ্ধতা। তার চোখ ছিল লাল টকটকে, প্যান্ট-শার্ট ধূলি-ধূসর, হাত মুষ্টিবদ্ধ, চুল জট পাকানো। শুধু আমার মনে হচ্ছিল মশালের মতো সে জ্বলছে।

নিজের পরিচয় ছেলেটি এইভাবে দিয়েছে। একদা সে ছিল ছাত্র, এখন মুক্তি-যোদ্ধা। বাঙলা দেশের লক্ষ-লক্ষ যুবকের মধ্যে সেও লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে। ছেলেটি বলছিল, 'ওরা আমাদের সব কিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের কল-কারখানা, আমাদের শহর-বন্দর, সব—সব। আমাদের শ্রমে আমাদের সাধনায় যা গড়ে উঠেছে সমস্ত চুরমার করে ওরা বাঙলা দেশকে শ্মশান করে দিতে চায়। শুধু কি বাড়ী-ঘর, কল-কারখানা, আমাদের শিক্ষক-অধ্যাপক-সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক সবাইকে ওরা হত্যা করছে। বাঙলা দেশের যে কোন শহরে যান শুধু ধ্বংসস্তূপ, শুধু মরা মানুষের পাহাড়। আমরা এর প্রতিশোধ নেবই।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা ট্যাঙ্ক নিয়ে বেরিয়েছে, প্লেন থেকে বোম্বিং করছে। এর বিরুদ্ধে কি পারা যাবে?'

'নিশ্চয়ই যাবে। এ যুদ্ধে আমাদের জিততেই হবে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের একজনও যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন এ লড়াই চলবে। আপনারা শুধু আমাদের একটু সাহায্য করুন।'

'কিভাবে?'

'বাঙলা দেশকে স্বীকৃতি দিয়ে আর অস্ত্র দিয়ে।'

ছেলেটি যার কাছে অস্ত্র চাইল সে যে কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য আর কত অসহায় সে-ই শুধু জানে।

ছেলেটি আবার বলল, 'এ যুদ্ধে আমরা যদি হারি, মনে রাখবেন সে পাপ থেকে আপনাদের রেহাই নেই। আপনারা আমাদের পাশে থাকুন।'

আরো কিছুক্ষণ থেকে সে চলে গেল। তার প্রচুর কাজ; এপারের অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমার মনে হল, উজ্জ্বল সূর্যালোকের মতন কিছু একটা সামনে থেকে সরে গেল।

• • •

ওপার বাঙলায় আজ কী চলছে, না বললেও চলে। পাঁচ বছরের বাচ্চাটাও জানে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের পাল নিরস্ত্র মানুষের ওপর কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ক্ষেত-খামার, মাঠ-প্রান্তর, নগর-বন্দর জুড়ে যা তারা চালাচ্ছে তাতে ইতিহাসের নৃশংসতম অধ্যায়টিকে বদলে নতুন করে লিখতে হবে। ইয়াহিয়াশাহীর বর্বরতা কবরে শায়িত তৈমুর লং এবং হিটলারের প্রেতাত্মাকেও হয়তো লজ্জা দিচ্ছে। কে না জানে পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীতে আজ আর জল নেই, সেগুলো রক্তের নদী হয়ে দুলছে।

এ যেমন এক দিকের ছবি, আরেক দিকে আছে সাড়ে সাত কোটি মানুষ আর তাদের জীবন্ত জ্বলন্ত দেশপ্রেম। একটি মরণজয়ী সংকল্প তাদের এক সঙ্গে গ্রথিত করে দিয়েছে। তাই ও বাঙলার প্রতিটি মানুষ আজ মশালের শিখা, প্রতিটি কুটির অজেয় দুর্গ, প্রতিটি মৃতদেহ [illegible]। সাড়ে সাত কোটি মানুষ কাঁধে কাঁধ দিয়ে আজ পশ্চিমী দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। একদিন শবের পাহাড় থেকে রক্তের নদী থেকে সেই লাল কমলটি নিশ্চয়ই ফুটবে যার নাম স্বাধীনতা। কিন্তু তার আগে কত লক্ষ প্রাণ আহুতি দিতে হবে? দেশের প্রতি দুর্দম ভালবাসা মানুষকে উন্মাদনায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু তাই দিয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বর্বর জঙ্গী-শাহীর বিরুদ্ধে কতদিন লড়া যায়?

কোথায় সেই বোদ্ধারা, যারা দিকে-দিকে চিৎকার করে জানিয়েছে 'গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার শিখাকে চিরদিন অনির্বাণ রাখতে হবে?' পৃথিবী কি আজ এতই নির্বীর্য এতই কাপুরুষ হয়ে গেছে যে, চোখের সামনে নির্বিচার গণহত্যা দেখেও নীরব বসে আছে? তবে কি ধরে নিতে হবে এ যুগ মানুষের অযোগ্য হয়ে উঠেছে? জেনে রাখা ভাল, সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে যদি হত্যা করতে দেওয়া হয়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে।

পৃথিবীর কথা থাক, এপার বাঙলায় আমরা কী করছি? পথে-ঘাটে, দোকানে-বাজারে, সব জায়গায় শুনি, ওপার বাঙলার সাড়ে সাত কোটির সঙ্গে আমরা সাড়ে চার কোটিও আছি। কিন্তু কিভাবে? শুধু শোকাশ্রু বিসর্জন করে? কাগজের ভাষায় লেখা কিছু প্রস্তাব নিয়ে? মিছিল করে? কৌটো বাজিয়ে চাঁদা তুলে? কিংবা বাঙলা দেশের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে? এর নাম কি সঙ্গে থাকা? জয়ধ্বনি দিলেই কি বিজয়লক্ষ্মীকে ছিনিয়ে আনা যায়?

এপারের সাড়ে চার কোটির কথাও থাক আমার কথাই বলি। আমি এক অতি-নগণ্য লেখক। আমার কর্মভূমি সীমান্তের এপারে, মাতৃভূমি ওপারে। বাহান্ন সালে কলকাতায় আসার পর পূর্ব বাঙলা আমার স্মৃতি থেকে অনুভূতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। কে বলে সরে যাচ্ছিল? এই মুহূর্তে এখানে থাকলেও, অনুভব করছি, গাছের মতন আমার অস্তিত্বের শিকড় সীমান্তের তলা দিয়ে ওপার বাঙলায় ছড়িয়ে আছে। আর সেই শিকড়ে টান পড়েছে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে যাঁরা ছুটে গিয়েছিলেন, হায় তাঁদের উত্তরাধিকার নেবার ক্ষমতা আমার নেই। মালরোর মতো আমি অস্ত্র ধরতে পারি না, হেমিংওয়ের মতো আমি মেশিনগানও চালাতে জানি না। আমি শুধু বসে অসহায় কান্নায় চোখের জলে বুক ভাসাতে পারি।

তবু জানি বাঙালী জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন দিন আর কখনও আসে নি। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণ আমাকে, এবং আমার মতো আরো অনেককে আবেগের শেষ চূড়োয় তুলে এনেছে। হাতের পিঠে চোখ মুছে ঝাঁপ দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। কখন কিভাবে জানি না। শুধু জানি ঝাঁপ আমাকে দিতেই হবে, দিতেই হবে। শুধু আমাকেই না, আমার সঙ্গে এপারের সাড়ে চার কোটিকেও।

তুমি আমায় ডাকছ

কৃষ্ণ ধর

কী ইচ্ছা হয় তা তাকে কতটা বোঝানো যাবে? তারা চেয়ে মন বেশি দুরন্ত। সে ডানামেলা পাখি।

আমি তো দেখেছি এই মাত্র আমার মন কলকাতা থেকে চলে গেছে মেঘনার তীরে। সেখানে আমি প্রথম চোখ মেলে এই হিরণপ্রভ সূর্যকে দেখেছিলুম। আদুল শরীরে যে মাটির রেণু মেখে শুয়ে থাকতাম ঘাসের ওপর সে-তো ওখানে, সীমান্তের ওপারে।

আমি এখনও চোখ বুজে ওই বাংলার মেয়েদের শিশির-ভেজা গলায় মাঘমণ্ডলের ব্রতকথার অনুরণন অনুভব করছি মনে। ওরা বলছেন :

সূর্যাই উঠেন কোনদিকে
সূর্যাই উঠেন পূর্বদিকে
তেতুল গাছ আড়িল
সূর্যাই জাগিল, জাগিল।

সূর্য পুব দিকেই ওঠে। পশ্চিম তাকে কোনোদিন মেঘের আড়াল করে দাঁড়াতে পারে না। এ কথাটা তো একটি শিশুও জানে। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে সে পুব-দুয়ারী ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে রোদ্দুরে এসে দাঁড়ায়।

চব্বিশ বছর আগে, দেশভাগের সময় কত কান্নাই না ছিল আমাদের। তখনও সীমান্ত উন্মুক্ত। আমরা বুঝতেই পারিনি একটা দেশ যা ছিল অনাদিকাল ধরে এক, তা আলাদা হয় কী করে। কলেজ ছুটির পর সেই একবার মাত্র যাওয়া পূর্বদেশে, আমার জন্মভূমিতে। ট্রেন দিয়ে পৌঁছলে গোয়ালন্দ। পদ্মা পেরিয়ে যাব ওপারে। ঢাকা হয়ে নিজের গ্রামে। মেঘনার তীরে যে এখনও হয়তো তার ঘরছাড়া সন্তানদের জন্য অপেক্ষা করছে। হয়তো এখনও সুপুরি, আর নারকোল গাছের ছায়া-ঘেরা গ্রামের সরু কাঁচা পথটি তেমনি আছে। কে জানে? হয়তো বা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে এরি মধ্যে। কে বলবে আমাকে সে কথা?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পদ্মার স্টীমারে সেই তেমনিই ভীড়। পুজোর ছুটিতে তেমনি বাড়ি ফেরার তাড়া। স্টীমারের সারেং সুখানিরা নোয়াখালি, চট্টগ্রামের কথা বলছে, জল মাপছে, বয়লারে কয়লা জোগাচ্ছে। না, কোনো পরিবর্তন তো দেখছি না।

প্রথম চোট পেলুম সহযাত্রী একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে। প্রবীণ শান্ত, সৌম্য চেহারা। সপরিবারে কলকাতা থেকে চলেছেন ঢাকায়। তিনি একজন বিচারপতি। দেশ ভাগের পর 'অপশান' দিয়ে যাচ্ছেন ঢাকায় নতুন কাজে যোগ দিতে।

তিনি এই বাংলার লোক। এই প্রথম যাচ্ছেন। পদ্মার বিশাল বিক্ষুব্ধ ঘোলাটে জলের বিস্তার দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। দূরে জলসিক্ত গ্রামগুলো তার নিবিড় সবুজ শ্যামলতা নিয়ে যেন ঢেউয়ের দোলায় কাঁপছে।

কী আশ্চর্য দেশ!

আমি যেন ওঁর চোখ দিয়ে আবার নতুন করে দেখলাম নিজের দেশকে। এই জলধারার সঙ্গে আমার আজন্ম পরিচয়। এ-যেন আমাদের খেলার সঙ্গী; স্কুলের সোপান বেয়ে তার উচ্ছল উপস্থিতি সমস্ত মন-প্রাণ দিল অবলুপ্ত করে এক সুগভীর মমতার আচ্ছাদনে। এই বাংলাদেশ। এই জলরেখা যেন তার সাতনরী হার, তার তরঙ্গ উৎক্ষেপ যেন হাওয়ায় দোলানো কুন্তল-চূর্ণ। জলসিক্ত বাংলার অপরূপ মুখশ্রী। তাকে কতোবার কতদিকে যেন দেখেছি। লখাই-বেহুলার কান্নায়, গুণাই বিবির গানে, ফকীর কবরুদ্দিনের গাজীর পটে।

এই আমাদের বাংলা দেশ। তেইশ বছর আর তাকে দেখিনি। এই তেইশ বছরে অনেক বাঁধ ভেঙেছে আমার। আমার অভিজ্ঞতা বারবার তার শানিত আঘাতে ভেঙে দিতে চেয়েছে স্বপ্ন।

একে একে পরিজনরা চলে এসেছেন অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে। আমার গ্রাম হয়েছে পরিত্যক্ত। সীমান্তে তোলা হয়েছে পাসপোর্টের প্রাচীর। আমি এই বাংলার মানুষ হয়ে গেলাম। দুই বাংলাই আমার জননী। গঙ্গা-ময়ূরাক্ষী আমার জাগ্রত চেতনা, মেঘনা আমার পূর্বস্মৃতি।

ভাবিনি কোনোদিন আর সম্ভব হবে? বাংলার ওপারের নাম গেল বিলুপ্ত হয়ে। তাকে পরানো হল পাকিস্তানী পোশাক।

কিন্তু না। জলের চেয়ে শোণিত গাঢ়তর। প্রতিবেশীর চেয়ে সহোদর নিকটতর আত্মীয়।

বিশ্বাস আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াল বিস্মৃতির ভস্মশয্যা থেকে। সংশয় অবিশ্বাস স্থান করে দিল মানুষের অপরাজিত আত্মার।

কী ইচ্ছা হয় কী করে বোঝাব। সীমান্তের ওপারে আমাদের বাংলা দেশ আজ রক্তস্নাত। আমাদেরই আঙিনায় এসেছে হানাদার। রাত্রিদিন ঘুম নাই হার্মাদের ভয়ে—মগদস্যুদের বাংলার ঘরে এমনি এক অনিশ্চয়তা এসেছিল। আবার তা ফিরে এল এতকাল পরে বাংলায়।

গত তেইশ বছর সংবাদপত্রে যে নাম দেখিনি আজ সেই নামগুলো রক্তের অক্ষরে শিরোনামায়। যে-বাড়িতে ছিলেন মৌলানা ভাসানী, কুমিল্লার দীঘির পাড়ে যে-বাড়িতে থাকতেন প্রবীণ জননেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাদের সবগুলোই আমাদের চোখের সামনে যেন ভাসছে। ভাবছি কোথায় রয়েছেন আমাদের প্রিয় কবি জসিমুদ্দিন। এই সেদিনও তিনি কলকাতায় আমাদের কবিতা শুনিয়ে গেছেন। কোথায় কোন আগুন-ঝরা ঘরে বসে আমাদের তরুণ কবিবন্ধুরা লিখছেন বাংলাভাষার কবিতা। আমি কল্পনা করতে পারছি না সেই ঢাকা—রমনার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢুকে যেদিন হানাদাররা গুলী করে হত্যা করেছে বাংলাদেশের শতাধিক প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক, দার্শনিক গবেষকদের। সালাম-বরকত রক্ত দিয়ে বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের মুক্তির পথ দেখিয়ে গিয়েছিল ১৯৫২ সালে। উনিশ শো একাত্তরে কি সে পথ নাপামের আগুনে পোড় খেয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দেবে না?

আমরা কোনোদিন দুঃখ দেখিনি। আমাদের ঘরের দুয়ারে বাংলাদেশ আমাদের চোখের সামনে মুক্তিযুদ্ধের দুয়ারপাট উন্মোচিত করল।

কী করতে পারি আমরা? স্পেনের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এমনি এক মহাপরাক্রমশালী হানাদারের বিরুদ্ধে দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করেছিলেন স্পেনের স্বাধীনতাকামী মানুষ। সেই সংগ্রামীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবি, শিল্পী, ঔপন্যাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা। কডওয়েল, রালফ ফক্স, লোরকা প্রাণ দিয়েছিলেন সেই যুদ্ধে। তাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন এই বিশ্বাসে যে, তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে মানুষের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হবে নির্ভয়। এই রক্তপাতই হবে শেষ রক্তপাত। সেই যুদ্ধ এখনও চলছে। এতদিন তাকে আমরা দেখেছি আলজিরিয়ায়, অ্যাঙ্গোলায়, ভিয়েতনামে বা কিউবায়।

এখন বাংলাদেশের পূর্ব দুয়ারে সেই যুদ্ধ এসে হানা দিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সৎ ও স্বাধীনতাকামী মানুষ একদা দুঃসময়ে যা করেছেন, আমাদেরও তা করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

বাংলাদেশের মাটি, তার জল, তার শস্যের প্রতি যদি আমাদের কোনো ঋণ থাকে তবে তা শোধ করবার সময় এখন। আমি বলব :

বাংলা দেশ, তুমি আমায় ডাকছো
তোমার শস্যক্ষেতে, নদীজলে
তাল সুপারির ছিন্ন উদ্যানের বনে
শুধু একটি ডাকই আমি শুনছি
তিতুমীরের মা, তুমি ক্ষুদিরামের মা
তুমি আমাদের ডাকছো
রক্তের ঋণ শোধ করতে
আমরা আসছি।

আমিও তোমারই ঘরে, বাংলাদেশ

মণীন্দ্র রায়

আমিও তোমারই ঘরে
বাংলাদেশ,
জন্ম নিয়ে দেখেছি আকাশ।
ওই অন্নে এ জীবন,
ওই স্পন্দে আমার হৃদয়;
নিজ বাসভূমে আমি কাটিয়েছি ওই
দীর্ঘ পরবাস।
এখন রক্তের স্রোতে জেগে উঠে দেখি
কী রুদ্র মধুরে ওই দীপ্ত দু' চোখে
যাচ্ছে, যাচ্ছে—
পদতলে শত্রুর বিনাশ।

তোমার দুধের বাটি
ভেঙে বিষ মিশিয়েছে যারা;
তোমার ধানের মাঠে
ছড়িয়েছে শহীদের খুন;
তাদের শিয়রে আজ অনলের মতোই
জ্বলে ওঠে সমর নিশান!

তোমার প্রতিটি নদী নাগিনীর মতো
ফেটিয়ে ফেটিয়ে মেলেছে ছোবল;
তোমার প্রতিটি গ্রামে বাঙালির বুকে
বাঘের গর্জন।
মানুষে লুটেছে ওরা দস্যুর মতোই,
শত্রুর ভাঁড়ার ভরো। অপরাধের যে
মানুষের দল।

অদ্ভুত জোয়ান ডাকে, মাঝি ও মজুর,
বাঁশের কেল্লার তিতু মীর;
কেবা প্রাণ দেবে আর প্রাণ নেবে তারই
দুরন্ত প্রতিযোগিতায় মাতে পথে পথে
লাখো লাখো বীর।
তাদের শপথে জাগে সূর্য সেন, আর
জাগে বাঘা যতীনের নাম;
নিশানে সোনার বাংলা, জ্বলে ওঠে তাই
সবারই শোণিতে আজ রণতুরঙ্গের
দুরাশির উন্মাদ।

এমন দুরন্ত, তবু শিকল ভাঙার
এ উল্লাস এ মাটিতে কখনো দেখি নি।
প্রতি পদক্ষেপে তুমি প্রাণপণ মেলে মেলে আজ
যৌবনের তরঙ্গের শিখরে স্বাধীন
এলে বিজয়িনী।।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর

এমন সোনার বাংলা ভাগ করে ভাই
কল্লেরে দুখান।
এত ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি রে
সবই বিফল হলো গললো না পাষাণ।

এদের একই ভাষা, একই রীতিনীতি
একই রুচি, একই স্বভাব, প্রাণে এক প্রীতি
এরা একই ঘরে বসত করে রে,
এদের পরস্পরের দুঃখ-সুখ সমান।

দু' সীমানা কল্লে কি হবে?
হাত বাঁধিবে, পা বাঁধিবে, মন বাঁধিবে কে?
আমরা একই ছিলাম একই আছি রে,—
ওকে উড়িয়ে দিতে পারে প্রাণের টান?

—রজনীকান্ত সেন

বাংলা মা/নজরুল ইসলাম

আমার শ্যামলা-বরণ বাংলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
গিরি দরী বনে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।।
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মাকে,
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে
বৈরাগিনী বীণ বাজায়।।

ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটি
বিজন মাঠে সে বসায় নিয়ে কাদা ধড় মাটি।
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণায় সে বারি ছিটায়।।

কাজলা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত-মেয়ে বনে লয়ে বাঘ ভালুক;
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বেদের সাথে সাপ নাচায়।।
নদীর স্রোতে পাথর-নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজছে যে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের ঝিলিকে সে টিপটি পরে সন্ধ্যাতারার,
ঊষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর-বেলায়।।
হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে তার নূপুর বাজে
ভাটির স্রোতে গায় ভাটিয়াল গায় সে বাউল মাঠের মাঝে
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়।।

খুঁজে বেড়াচ্ছি — দাউদ হায়দার

কে যেন সড়কে দারুণ রক্তগঙ্গা
বইয়ে দিয়ে
মিছিলে ঢুকে গেলো
আমি তাকে সঠিক জানি না।

অথচ সেদিন বাতাসের শরীরে কি এক বিশ্রী বারুদের গন্ধ ছিল,
রাস্তায় কাঁদানে গ্যাস, দেয়ালে শহীদদের বুলেটের নানান কারুকাজ
যেন পিকাসো নিজেই এসে এঁকে গেলো এই সব

আমি এখন
সেই লোকটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি
যে এই কাজগুলো নিজ হাতে করছে।

[দাউদ হায়দার বাংলাদেশের কবি। মাত্র কদিন আগে কবিতাটি ঢাকা থেকে আশ্চর্য উপায়ে এক বন্ধুর মারফত আমাদের হাতে এসেছে।

[illegible]

আবার আসিব ফিরে/জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে,
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

ব্লাড ব্যাঙ্ক/হুমায়ুন আজাদ

বাঙলার মাটিতে কেমন রক্তপাত হচ্ছে প্রতিদিন
প্রতিটি পথিক কিছু রক্ত রেখে যায়
ব্লাড ব্যাঙ্কে : বাঙলার মাটিতে
জমা রাখে ভবিষ্যৎ ভেবে

প্রতিটি শ্রমিক তার চলার কুটিল পথে রাখে রক্তসূর্য বীজ
ইস্কুলের শিশু ছাত্র যুবতী যুবক
গ্রামবাসী চাষী রিকশঅলা নড়োবড়ো বৃদ্ধ ক্যানেভাসর
সবাই রক্ত রাখে ব্লাড ব্যাঙ্কে

বাঙলার সব রক্ত তীব্রভাবে মাটি অভিমুখী

শুকাতে পারেও পদ্মা, উঠে যেতে পারেও সাগর
বাঙলার নিসর্গমালা একদিন মরে যেতে পারে
তবু এই রক্ত থেকে একদিন
পাবোই নতুন পদ্মা, নিসর্গমালা
উঠে-যাওয়া সেই গ্রামটারে।

কে আর রক্ত রাখে ব্লাড ব্যাঙ্কে হাসপাতালে
সেখানে লাল রক্ত ঘোলা হয়ে যায়
কাচ শিশি ওষুধের বিষাক্ত ছোঁয়ায়

বাঙলার মাটির মতো ব্লাড ব্যাঙ্ক আর নেই
একবিন্দু লাল রক্ত
বর্ণবিন্দু হয়ে যায় সেই ব্যাঙ্কে রাখার সাথেই
তাই আর যায় না কেউ ব্লাড ব্যাঙ্কে হাসপাতালে
বাঙলার সব রক্ত তীব্রভাবে মাটি অভিমুখী।

আমার বাংলা/কায়সুল হক

এক
বাংলা, তোমার মাঠজুড়ে শুয়ে থাকে
চাঁদের অনল আলো যখন, তখন
পরীদের দেশে মন চলে যায়। আর সাতপাকে
বাঁধো জীবনকে আশীর্বাদের মতন।

দুই
সজনে ডাঁটার গন্ধ
মাছের চচ্চড়ি
সবকিছু মিলিয়ে আমার
আমারি সোনার বাংলাকে আমি দেখি।
শ্রাবণে অথবা সাইক্লোনে
অবিরাম লড়ে যে বাংলা,
নারিকেল সুপারির অন্তরঙ্গতায়
আম জাম কাঁঠালের কলার বাগানে
অথবা কলমি শাক-ভরা পুকুরের
টলটলে জলে যে বাংলা
তাকে আমি রোজ দেখি।

আ মরি সোনার বাংলা তোমায় আমি
ভালোবাসি—

ধারাপাত/আ খা ম জাকিউল হক

কত যে মুখর মুখ মূক হয়ে গেলো
আহা মূক হয়ে গেলো
পীচ-ঢালা কত পথ রাঙা হয়ে গেলো
আহা রাঙা হয়ে গেলো
সোনাঝরা কত ফুল ঝরে পড়ে গেলো
আহা ঝরে পড়ে গেলো
কত যে সোনালী দিনে রাত নেমে এলো
আহা রাত নেমে এলো
সামনের দিনে তবু পীচ-ঢালা রাজপথে
হেঁটে হেঁটে যাবো
নতুন ফুলের মাঝে ঝরে পড়া সে ফুলের
ঘ্রাণ শুঁকে নেবো।

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?/শামসুর রাহমান

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?
তেমন যোগ্য সমাধি কই?
মৃত্তিকা বলো, পর্বত বলো
অথবা সুনীল সাগর-জল
সবকিছু হেঁদো, তুচ্ছ শুধুই!
তাই তো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে, পাহাড়ে কিম্বা সাগরে—
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।

অমৃত নববর্ষ ১৩৭৮

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ। লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার রক্ত-স্রোতের উপর জেগে আছে তার অতন্দ্র প্রতিজ্ঞা—স্বাধীনতা। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা তাকে টলাতে পারে এ শপথ থেকে, কেননা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এক মন্ত্রে উজ্জীবিত, এক লক্ষ্যে নিবেদিত—স্বাধীনতা।

•

বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা সাধনা একদিনে পূর্ণ হয়নি। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তদান থেকে প্রায় দু'দশক ধরে অগণিত কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা তৈরি করেছেন তার মাটি। আজ তাই সেখানে সাংস্কৃতিক জাগরণ তার স্বাধীনতার কামনা একাকার। এর প্রেরণা, ওর আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে দিয়েছে পরম লগ্নের দিকে।

বাংলাদেশ সংখ্যা

•

বাংলাদেশের আজ সেই কালান্তরের মহাক্ষণে আমাদের ভাষার দোসর আত্মার সহোদর ওপার বাংলার সাহিত্যকৃতি ও চিন্তা-জগতের পরিচয় বহন করে আনবে অমৃত তার একাদশ জন্ম-দিনের নববর্ষ সংখ্যায়। এই সংগে থাকছে সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি এবং সাম্প্রতিক তথ্য ও অজস্র সংবাদচিত্র।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-তিন

গণসংগীত/কথা : নাজিম মাহমুদ
সুর : সাধন সরকার

শান্তি না সংগ্রাম
সংগ্রাম সংগ্রাম
আমাদের সংগ্রাম চলবে
জাগ্রত জনতার প্রতিজ্ঞা থরথার
লাখো লাখো চোখে শুধু জ্বলবে।।

আপোষ না প্রতিশোধ
প্রতিশোধ প্রতিশোধ
রক্তের প্রতিশোধ রক্তে
জাগো ওঠ দুর্বার ভাঙো কর চুরমার
লাথি মারো জালেমের তক্‌তে
জালেমের হুকুমত টলবে।।

ধ্বংস না বিপ্লব
বিপ্লব বিপ্লব
ইতিহাস জীবনের
খুনে লাল পতাকায় উড়ছে
রোদ-রাঙা বিপ্লব ফলবে।।

স্বাধীনতা বলছে/দিলওয়ার

ঐ দ্যাখো স্বাধীনতা জ্বলছে,
স্বাধীনতা : চৈতালী সূর্য,
বিরুদ্ধ আক্রোশে বলছে :
জনগণ! কই রণতূর্য?

তুলে নাও তূর্যটা হস্তে,
আজো আমি জালিমের বন্দী,
চোরামার — উঠতে ও বসতে,
আমাকে জড়িয়ে কতো ফন্দি!

স্বাধীনতা শ্রমিকের, জনতার
যারা এই দুনিয়ার ভিত্তি,
স্বাধীনতা মানুষের সমতার—
সে-যার স্বপ্নে দোলে পৃথিবী।

জনগণ! তোলো রণতূর্য,
আর নয় মৌখিক উক্তি
আমি যে তোদেরি প্রাণ-সূর্য,
শেষবার চাই আজ মুক্তি।

শপথ/ইমদাদ হোসেন ইমু

চেয়ে দেখো চোখ যার বন্দুর
কৃষকের হাতে ধরা কাস্তে,
মুক্তির প্রিয় পথ বন্ধুর
আমরা চাই আজ বাঁচতে।

আকাশটা ভরে যাক কপোতে
আসুক না ফিরে ফের শান্তি,
মুক্তির দীপ্ত এ-শপথে
মন থেকে সরে যাক ক্লান্তি।

পারবে না আজ আর ভোলাতে
নেই কেউ দুর্বল নিঃস্ব,
হাত দিতে দেব নাক গোলাতে
প্রতিবাদে নেড়ে দেব বিশ্ব।

মানব না কোন বাধা দুস্তর
ক্ষুধাতুর মন আজ ক্ষিপ্ত,
প্রস্তুত হাতে নিয়ে হাতিয়ার
লাখো প্রাণ উন্মেষে দীপ্ত।

ঘুম নেই/নাজিম মাহমুদ

কমরেড, এই রাত আঁধিয়ার
অজগর নিঃশ্বাস চারিধার
পিশাচের মোকাবেলা এই ক্ষণ—
কাঁধে নাও দুর্বার হাতিয়ার।

চোখে জ্বালো শপথের ইস্পাত
ভেঙে ফ্যালো শত্রুর বিষ দাঁত
মনে আনো দুরন্ত বিশ্বাস—
জয় করো জনতার স্বাধিকার।

কমরেড, এই রাত ঘুম নেই
জেগে আছি অতন্দ্র পাহারায়
নিষ্ফল স্বপনের ধূম নেই
শান্তির মরীচিকা সাহারায়।

পাপ অন্যায় করো প্রতিরোধ
প্রতি রক্তে নাও প্রতিশোধ
কেন আর বৃথা কাল অপচয়
কেন সংশয় কাঁদাকাটি আর।

পূর্ব বাঙলা/জে হোসেন

হায়রে এ-মাটি এক মায়ানারী 'সুজলা সুফলা'—
স্বর্ণ-শীর্ষ-মাঠে মোহ হাসি সম্রাজ্ঞীর,
মেঘে যত দূরাগত সমুদ্র-স্বপ্নের ভীড়;
হায়রে স্থাবর চোখে মৃগতৃষ্ণিকা আমাদের।

হায় রে হংসপাখা রৌদ্ররেখায় ঝলকিত :
হিরণ্য বিস্ময়ে স্বপ্ন-ক্লান্ত কার্ণিশে
দূরাতীত প্রাসাদের দুঃসহ মরীচিকা আনে।
হায় রে চেতনায় ঘুম; দু' চোখে তন্দ্রা আমাদের।

এবং চৌদিকে বহু বহু দেশে সূর্যোদয়ের
অসহ্য রক্তাভা নিমগ্ন কুম্ভীর চোখে
নিসাড় বিফলতা। বহুতর আগ্নেয়গিরি
এবং উল্কারাশি আমাদের চোখে ভাষাহীন।

তবুও স্বপ্ন দেখি, এই দেশ একদিন এক
উন্মাদ জোয়ারের উদ্দাম স্রোতাবেগ-শেষে
খুঁজে পাবে পৃথিবীকে। রবে যত কিশলয়
আর
মৃত্যু-পলিস্তূপে অস্ত্র-সাধনা আমাদের।

গণ মানুষের গান/আল মুজাহিদী

ঘরে ঘরে আজ বিদ্রোহ
হাতিয়ার তুলে নাও
শত্রু শিবিরে হানো আঘাত
বিজয় ঘোষণা দাও।

শোষণের ঐ স্বর্গ প্রাসাদে
মিথ্যে কলরব
ঝঞ্ঝা-ঝড়ের তাণ্ডবে আজ
যাক্ ধ্বংসে যাক সব।

মৃত্যু অথবা মুক্তি নেবো
শৃংখল নেবো না—
কণ্ঠে তোলো একই আওয়াজ
দাবীর ঝাণ্ডা ওড়াও।

শপথ/কাজী হেমায়তুল্লা

মহাপ্রলয়ের ডাক এসেছে
এগিয়ে যাবার
শপথ নেবার
আজিকে সবার ঘরে।
রক্তে এসেছে আদিম জোয়ার
তারি স্রোতে
নিয়েছি আমরা
নতুন অঙ্গীকার
মানবো না কোন বাধার প্রাচীর
কুণ্ঠিত নই—
দুর্বল নই—
আমরা ভয়ঙ্কর
ভাঙবো আমরা
শত্রুদের সকল বাঁধ
গড়বো আর এক—
নতুন ফাঁদ।
অত্যাচারীর জুলুম আর সইবো না
দাসগিরী আর করবো না
আমরা ভোর হবো স্বাধীন
শুনেবো আর এক রঙীন দিন।

বাঙালী সংস্কৃতির সংকট/বদরুদ্দিন উমর

পূর্ব পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ, সেজন্যে নগরবাসী মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখানে অনুপাতে অনেক কম। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতি বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, সে-সংস্কৃতি মোটামুটিভাবে এই অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্তেরই সংস্কৃতি। দেশের অগণিত কৃষক শ্রমিকের মধ্যে যে-সংস্কৃতি আজও প্রচলিত, তার মধ্যে পরিবর্তনের চাঞ্চল্য কিছু কিছু এলেও তাদের সাধারণ সংস্কৃতির ধারা এবং জীবনযাত্রা পূর্বের নির্দিষ্ট খাতেই প্রবাহিত। এ-কথা পশ্চিমবাংলার গ্রামসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য।

হিন্দু মধ্যবিত্তের সাথে মুসলমান মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক [illegible] বাংলাদেশের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনে [illegible] এর ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালী সংস্কৃতিকে হিন্দু-সংস্কৃতি বলে ধরে নিয়ে চেষ্টা করে তাকে বর্জন করতে। এবং এই প্রচেষ্টার মধ্যেই বাঙালী সংস্কৃতির সংকটের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যবিত্তের আর্থিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সংকট তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এই দুর্যোগ সৃষ্টি করলেও তার সাথে সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের বিশেষ কোন যোগাযোগ থাকেনি। গ্রামবাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বহুকাল পূর্ব থেকেই হিন্দুমুসলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবধারার সমন্বয় তুলনায় অনেকখানি সার্থক হয়েছিল। বাংলার লোকসাহিত্যই তার অন্যতম প্রধান স্বাক্ষর। মুসলমান মধ্যবিত্তের জীবনক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক সংকট আমরা লক্ষ্য করি সে সংকট সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের মধ্যে আজও অনুপস্থিত। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের অনেক ঢেউ এ-দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও গ্রামবাংলার মধ্যে এ-জাতীয় সংকট এখনো সৃষ্ট হয়নি। কারণ, এ সংকট মুখ্যতঃ সাম্প্রদায়িকতা-সৃষ্ট এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই সাম্প্রদায়িকতার জনক।

মুসলমান বাঙালীর জীবনে এই সাংস্কৃতিক সমস্যা সাম্প্রদায়িকতা যখনই তীব্র আকার ধারণ করেছে, 'আমরা বাঙালী, না মুসলমান?' এ-প্রশ্ন তখনই আনুপাতিক প্রচণ্ডতার সাথে মাথা তুলে এ-সাংস্কৃতিক সংকটকে করে তুলেছে দুরূহতর। এজন্যেই সাম্প্রদায়িকতা যে পর্যন্ত আমাদের মানসলোকে রাজত্ব করবে, সে পর্যন্ত আমরা এই সাংস্কৃতিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবো না। এ-সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র পথ সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বস্তরে এবং সর্বভাবে খর্ব করা এবং উত্তীর্ণ হওয়া। এ-প্রচেষ্টায় সফলকাম হলে 'আমরা বাঙালী, না মুসলমান, না পাকিস্তানী?' এ-ধরনের অদ্ভুত প্রশ্ন বাঙালী মুসলমানেরা আর কোনদিন নিজেদের কাছে উত্থাপন করবে না। এবং তখনই তারা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হবে নিজেদের জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়।

সংস্কৃতি আমাদের উত্তরাধিকার/আবুলফজল

সংস্কৃতি ও সভ্যতা কী জিনিস তা না-জেনেই আমরা বিশেষ বিশেষ সভ্যতার প্রতি আগ্রহ ও পক্ষপাত দেখিয়ে থাকি। এইভাবে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় বলেই আমরা সংস্কৃতির আসল স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না। সংস্কৃতির প্রতি যাঁর সত্যিকার দরদ রয়েছে, তিনি কখনো সংস্কৃতির নামে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন না। যদি কেউ এরকম করেন তিনি কখনো cultured বা সংস্কৃতিবান নন।

ফুল ফলে পরিণত হয় তার পাপড়ি ঝরিয়ে দিয়ে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্যও এ-ধরনের ত্যাগের প্রয়োজন। শুধু আর্থিক, বৈষয়িক ও আরামআয়াসের ত্যাগ যে দরকার তা নয়, সংকীর্ণ-দেশাচার ও সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও তার মোহ ত্যাগ করতে না পারলেও, প্রকৃত সংস্কৃতিসাধক হওয়া যায় না। তা পারি না বলেই আমরা হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির নামে উত্তেজিত হয়ে উঠি।

উৎকট বিশ্বাস ও অন্ধ ভাবাবেগ হচ্ছে সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তরায়। যে-কোনো উৎকট ভাব মানুষের বুদ্ধি ও মনকে করে রাখে সম্মোহিত আচ্ছন্ন। বিপ্লব ও আন্দোলন জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে ঝড় ও ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতা, তখন কারো মন থাকে না সুস্থ ও দৃষ্টি থাকে না স্বচ্ছ। ফলে তখন সংস্কৃতি থেকে সংস্কার হয়ে ওঠে বড়ো। এই সংস্কারই জাতীয়, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের দেয়ালে এঁটে বাধায় বিরোধ, ফলে সমাজ বা সম্প্রদায় হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিকতার অপর নাম হচ্ছে কূপমণ্ডুকতা।

ঘরের প্রয়োজন আমাদের নিশ্চয়ই আছে এবং চিরকাল থাকবে: কিন্তু ঘর যেন কবর হয়ে না ওঠে অর্থাৎ ঘর যেন ঘরের থেকেও বড়ো পৃথিবী ও আকাশকে আমাদের মন ও চোখ থেকে রুদ্ধ করে না রাখে। ঘরে বসে যেন বিশ্বের সঙ্গে বাণী বিনিময় করতে পারি। বলেছি মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যসাধনাই সংস্কৃতি, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের নেই কোনো সীমা, তা আকাশেরই মতো অসীম। মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনার উপর, এক কথায় মনুষ্যত্বের উপর যে-সংস্কৃতির ভিত্তি, একমাত্র সেই সংস্কৃতিই মানবজীবনে বিকিরণ করতে পারে আলো। যে-আলোর নেই কোনো দেশ, কোনো কাল ও কোনো জাত।

প্রতিক্রিয়াবাদের প্রতীকায়/আবুল কাসেম ফজলুল হক

ঊনিশ শতকে এই ভূখণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে শিক্ষিতেরা ছিল সমাজের উজ্জীবনী শক্তি, দেড় শতাধিক বৎসরের ব্যবধানে বিকাশের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করার পর তারা আজ ক্লীব—মুমূর্ষু শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমান সামাজিক অবস্থানে তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে—এখন ইতিহাসের পাতা থেকে তাদের বিদায় নেবার পালা। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদেরও বিদায়ের ঘন্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সিফিলিসাক্রান্ত বারবণিতাদের মতই পরদেহী সুবিধালোভী আত্মবিক্রীত—বশীভূত বুদ্ধিজীবীরা আজ সমাজ প্রগতির পথে আবর্জনা। স্বার্থলোভী চরিত্রহীন রাজনীতিকেরা ও স্বর্ণলোভী ধনিকেরা যেমন আজ সমাজ-প্রগতির সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে কেবলমাত্র শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত, তেমনি সুবিধালোভী শিক্ষিতেরাও আজ তাদের মানসিক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র ধনিকদের উচ্ছিষ্ট লাভের আশায় প্রতি মুহূর্তে লালায়িত। ব্যাধিগ্রস্ত বারবণিতাদের মতই তাদের মন শুকিয়ে মরে গেছে—দেহ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। ওই মন আজ সম্পূর্ণ বন্ধ্যা, ওতে আবাদ করতে চাইলে চেষ্টা হবে ব্যর্থ। ওতে ফসল ফলান যাবে না, ফুল ফোটান যাবে না, ফল ধরবে না। ওই মনে কোন প্রকার জীবন-জিজ্ঞাসা, নীতি-জিজ্ঞাসা, সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা ও মূল্য-জিজ্ঞাসাই আজ আর অবশিষ্ট নেই। সুতরাং ওর উদ্দেশ্যে যত উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করেই আবেদন জানান হোক না কেন, সকল আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য। সর্বাপেক্ষা অধিক আন্তরিকতা নিয়ে যিনি আবেদন জানাতে যাবেন, তাঁর কাছেও এক সময় মনে হবে 'আমার জীবন যেন সীমাহীন অরণ্যে রোদন।' প্রাণহীন, হৃদয়হীন, বুদ্ধিহীন, আবেগ অনুভূতিহীন, চরিত্রহীন, পরদেহী, উচ্ছিষ্টলোভী, সুবিধালোভী, মেরুদণ্ডহীন, আত্ম-বিক্রীত, অন্তঃসারশূন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জন্য সাহিত্য রচনা করতে গেলে লেখককেও অবশ্যই প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন,—হতে হবে এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা, জীবন-জিজ্ঞাসা, নীতি-জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'-এর শ্লোগান তুলতে হবে। কেবলমাত্র শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আমাদের দেশের সব-দুর্বোধ্য-দুষ্প্রাপ্য-আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা-হীন উভয় অংশই আজ এক সার্বিক ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—এই শ্রেণীর সামনে আজ আর কোন ভবিষ্যৎ নেই।... আজ আমাদের বক্তব্য, এই শ্রেণীর পুনরুজ্জীবন উদয়ের আশা পরি-ত্যাগ করে এর উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার মোহ বিসর্জন দিয়ে এর বিরুদ্ধে আপোষহীন প্রস্তুত হওয়া। যে শ্রেণী-বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে, সংগ্রামে সমাজের সেই শ্রেণীর উপরই বিজয়ের জন্য নির্ভর করতে হবে। সে শ্রেণী হল শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী, শ্রমিক কৃষকেরাই উপভোগ করতে পারেন, পড়ে সময় কাটাতে পারেন।...আমরা আজ এক অন্ধকার যুগে বসেছি, এক গৌরবময় নতুন যুগের অভ্যুদয়ের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আজ আমাদের সমস্ত কাজ পরিচালিত হওয়া উচিত। নতুন যুগ সৃষ্টির কাজের পদ্ধতিও অবশ্যই হবে নতুন।

সত্যের সংগ্রাম

ভাষা, কৃষ্টি, সাহিত্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোন প্রকারের নিপীড়ন নয়—স্বাভাবিক, সুন্দর, সুস্থ এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিল এ দেশের কোটি কোটি মানুষ একদিন। গুটিকয় পরি-বারের উদর স্ফীতির কোন প্রতিজ্ঞান ছিল না স্বাধীনতার চার্টারে। চরম প্রতিক্রিয়াশীল এ মহল অচিরে সক্রিয় হয়ে উঠল স্বাধীনতার উষালগ্নে।, স্বাধীনতার মহান লক্ষ্য ব্যর্থ করে দিল নিদারুণ-ভাবে।

সমগ্র এক জাতি হিসাবে বাঙালীকে খতম করে দেবার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করল এ মহল। বাঙালী, পাঠান, বেলুচ, সিন্ধি, পাঞ্জাবী কারুরই মাতৃভাষা নয়, এমন এক ভাষ উর্দু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা সম্পন্ন তখন! প্রশস্ত কোন জাতিকে কবরস্থ করবার সিভিলাইজড পন্থা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাইকেলের মত প্রতিভার জন্ম দেয় যে ভাষা সেভাষার ওপর এমন জুলুম! সহ্যের অতিক্রান্ত সীমানায় মায়ের টলটল অশ্রুবিন্দু সন্তানদের পাগল করে দিল—মরীয়া মায়ের ছেলেরা বুলেটের সামনে বুক পেতে দাঁড়াল। বুলেটের শীষে কাঁকরা বুকের রক্তে জন্ম নিল নূতন ইতিহাস। দুনিয়ার ইতিহাসে একক এবং অনন্য।

সেই হল প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ—গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা। প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সেই সংগ্রাম আজ চলছে। ব্যাখ্যা করে বলবার বোধকরি কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, যে সেই সংগ্রামের প্রয়োজন আজই সব চাইতে বেশী এ দেশকে যদি ভালবেসে থাকি এদেশের আলো-বাতাসের ঋণ যদি শোধ না দিতে পারি তবে অন্ততঃ একুশের মহান শহীদদের সামনে রেখে এদেশের মাটি মাথায় নিয়ে কসম খাব প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সংগ্রামে পিছপা হব না। বিজয় আমাদের হবেই। কারণ আমরা সংগ্রাম করছি সত্যের জন্য। [মা আমার ।। ঢাকা ।। সম্পাদকীয়]

বাঙলা সাহিত্য/মুহম্মদ ইদ্রিস আলী

বর্তমানের আন্তর্জাতিক জীবনধারার পটভূমিতে আমাদের দেশের জীবনধারাকে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিনিষ্ঠ খাতে প্রবাহিত করার অনুকূলে সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার উপলব্ধি লেখক-পাঠকের সংখ্যাল্পতা সত্যিই পীড়াদায়ক। আমরা সঠিক জীবনপ্রবাহ যেন লাভ করতে পারছিনে। আমাদের লেখক-পাঠক উভয় সম্প্রদায়েরই দৃষ্টি সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের লক্ষে পরিচালিত না হয়ে অন্যত্র নিবদ্ধ থাকছে। সনাতনপন্থিক আচ্ছন্ন মানসিকতার ও ভাবপ্রবণতায় শিকার হয়ে আমরা এক অনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আর সেজন্য আমাদের সাহিত্যের বন্ধ্যাত্ব এখনও কাটছে না। অথচ এদেশে সুস্থ ও বৃহত্তর চেতনা সৃষ্টির মত ঘটনাবলী তো প্রায়শই ঘটছে। বায়ান্ন—বাষট্টি থেকে শুরু করে ঊনষাট—সত্তরের গণআন্দোলন তো আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে বড় প্রমাণ। দেশ বিভাগ পরবর্তী বাইশ বছরে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি—অনেক অভিজ্ঞতা ব্যর্থতা সাফল্য-আশা-নিরাশার বিপুল তরঙ্গ বয়ে গেছে আমাদের

জীবনের ওপর দিয়ে। অথচ সেসব তরঙ্গ যেন আমাদের চেতনাকে আমানুরূপ প্লাবিত ও সক্রিয় করে তুলতে পারে নি। দেখা যাচ্ছে, মূল্যনিষ্ঠ বিজ্ঞজনীনতর বিপুল প্রবাহের সঙ্গে পা মিলিয়ে আমাদের সাহিত্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সামনের মহত্তর ভূমিতে এগিয়ে চলতে পারছে না। সাহিত্যের আঙিনায় স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তাকালে দেখা যায় আমাদের অধিক সংখ্যক লেখকের লেখায় নেই বলিষ্ঠ চেতনার সুস্পষ্ট ছাপ। গতানুগতিকতার আবর্ত ভেঙে অভিনব ও প্রদীপ্ত ফসলের সম্ভারে আমাদের সাহিত্যের ডালা ভরিয়ে তুলতে পারছেন না তাঁরা। কেউ-কেউ বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিতে-না-দিতেই আবার গতানুগতিকতায় অন্ধ আকর্ষে তলিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্কীর্ণ জীবন পরিবেশের মায়া ও মোহ কাটিয়ে সাধারণ ও ব্যাপক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাই আমাদের পাঠকরা পাচ্ছেন না বিশ্বদের সৈনিকজনের কর্ম ও কথার সত্য আত্মীয়তা অর্জন-করা সৃষ্টি : আমরা পাচ্ছি নে মহত্তর জাতীয় জীবন গড়ে তোলার উপযোগী সাহিত্য। দেশের সামগ্রিক জীবনকে ভালভাবে জানবার ও বুঝবার প্রয়াস যেন এখনও লেখকের সকল মনোযোগ ও তৎপরতার কেন্দ্রীভূত হতে পারছে না।

সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি/আবু আহসান

সাম্প্রদায়িকতা অপেক্ষাকৃত একটা সস্তা আবেগ, অথচ রাজনীতির খুব কাজে লাগে, এটা সুপ্রমাণিত; এবং কাজে লাগবে আরও কিছু দিন, সমাজের অবস্থা তার অনুকূল আপাতত তাছাড়া অন্যান্য আবেগ, যথা সংহত জাতীয়তাবোধের রোধেও এর ব্যবহার সম্ভব। সাম্প্রদায়িকতা অতএব, তাঁদের কাছে প্রশস্ত নিরাপদ পথ; এমন কি রাজপথ। কিন্তু যাঁদের মহান কর্তব্য মূল্যবোধকে উঁচু রাখা এবং সমাজের চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন রাখা,—সেই লেখক সম্প্রদায়ের কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতার এবং বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার চর্চায় উৎসাহী।...বস্তুত অনুভবে ও ক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার মূল লক্ষ্য স্বসম্প্রদায় নয়, অপর সম্প্রদায়; এই কারণে সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাধারণত স্বসম্প্রদায়ের চিন্তায় ব্রতী নন, অপর সম্প্রদায় চেতনার আবেশে, অবসেশনে, প্রপীড়িত; সেবা-পরায়ণ নন, অসূয়াপ্রবণ; স্বসম্প্রদায়ের জন্য তিনি ততোটা ক্রিয়াশীল নন, যতোটা অপর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। এই কারণে সাম্প্রদায়িকতার একটা লক্ষণ সুচিবায়ুগ্রস্ততা, চিন্তায় ও আচরণে।...সাম্প্রদায়িকতাবাদী অবশ্য অনেক সময় দাবী করেন সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহারই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের লোককে ঢুকতে দেব না, অথচ সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহার করব, এ একটা অদ্ভুত দাবী।...অনুভবে ও চিন্তায় সাম্প্রদায়িকতা অনৌদার্য এবং মধ্যমানসিকতার লক্ষণ। এ হচ্ছে সমষ্টি-চেতনা বিকাশের একটা অপেক্ষাকৃত অপরিণত স্তর বিশেষ। আমি যতটা বুঝি মানব-সমাজের সমষ্টি-চেতনা, বিকাশের এই কয়েকটি প্রধান স্তর : গোত্র-চেতনা বা উপজাতীয় চেতনা, সম্প্রদায়-চেতনা, জাতীয়-চেতনা এবং সর্বমানবীয় চেতনা। পৃথিবীময় সর্বমানবীয় চেতনা এখনো অবিকশিত: রক্তের সূত্রে গোত্র-চেতনা বা উপজাতীয় চেতনা বিলুপ্তিবান—অনুন্নত দেশগুলিতেও, জাতীয় চেতনাই এখন অধিকাংশ দেশে, এবং সকল উন্নত দেশে, সার্বভৌম—ভাষার ভিত্তিতে অথবা দেশের ভিত্তিতে; ধর্মবিশ্বাস সূত্রে সম্প্রদায়-চেতনা হচ্ছে অধিকতর অপরিমিত স্তর। সমস্ত সুপরিণত জাতিই যে-স্তর অতিক্রম করে এসেছে অনেক দিন আগে (ইউরোপের সেন্সরশিপ মধ্য যুগে); কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনো কেউ-কেউ বলেন, এমন কি চিন্তানায়কও বলেন—আমাদের চেতনা আবদ্ধ থাকা উচিত সমষ্টি-চেতনা-বিকাশের চারটি স্তরের অপেক্ষাকৃত অপরিণত ঐ দ্বিতীয় স্তরে।

ত্রিপুরা সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের একজন

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা/মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে অন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম বিশেষের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালান, কোনও জাতির ঐতিহাসিক চরিত্রকে বা কোনও ধর্মাবলম্বীর সম্মানিত পুরুষদের হীন বিকৃত করা। দেশের সাম্প্রদায়িক বিবাদের মূলে এই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে, বাংলার হিন্দু লেখকেরা এর সূত্রপাত করেন। তারপর মুসলমান লেখকেরা গালির বদলে গালি শুরু করেন। এর জন্য অবশ্য বৃটিশের ভেদনীতি ছিল অনেকটা দায়ী। আমরা পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা-বিবর্জিত 'পাক সাফ' সাহিত্য চাই—দেশের মঙ্গলের জন্য, দশের কল্যাণের জন্য। সাহিত্য যদি সত্য ও শিব হয়, তবে তা সুন্দর হবেই। নতুবা সে সাহিত্যই হবে না, হবে একটা অপসাহিত্য।

CENTRAL LIBRARY

শাদা চোখে

আশা, নিরাশা ও অনিশ্চয়তার এক বিচিত্র পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গে অবশেষে এক লোকায়ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৬৭ সালের পর থেকে এই রাজ্যে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার শিলান্যাস হয়েছে কংগ্রেসের এই নতুন মন্ত্রিসভার গঠনের পরও সে যুগের অবসান ঘটলো—শংকাহীন চিত্তে তা ঘোষণা করা কঠিন। তবুও এটাই লক্ষ করার বিষয় যে যখন ওপার বাংলায় জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পিণ্ডির দলবর্গীয় মারণযজ্ঞে ব্রতী হয়েছে তখন এপার বাংলার নির্বাচনোত্তর পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলগুলোর কসরৎ চলছিল কারা ক্ষমতার অধিকারী—এই প্রশ্ন নিয়ে। অবসান ঘটল ২রা এপ্রিল এই জল্পনা-কল্পনার। শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর চতুর্থবার আর একটি মন্ত্রিসভা মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭০ সালের ১৯ মার্চ যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল তারও অবসান ঘটল।

রাজ্য রাজনীতিতে যে বিচিত্র গতি-প্রকৃতি চলছে, বিশেষ করে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে, তার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শ্রীঅজয় মুখার্জির বাংলা কংগ্রেস। এক কথায় শ্রীঅজয় মুখার্জিই হচ্ছেন এই রাজনৈতিক পালা বদলের প্রধান অভিনেতা। তিনিই কংগ্রেসের একটানা শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং তিনিই আবার কংগ্রেসকে শাসনদণ্ডের দপ্তরে ফিরিয়ে আনলেন। অবশ্য রাজ্যের এই পাঁচ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস শুধুই কাহিনীহীন, বৈচিত্র্যময় এবং ইন্দিরাবাদী। কংগ্রেসও আর সেই কংগ্রেস নেই। নতুন শপথ ও আদর্শ নিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে এই নয়া কংগ্রেস দেশবাসীর কাছে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজেই শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে এই নতুন দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গড়তে একটুও অসুবিধা হয়নি। '৬৭ সালে ও '৬৯ সালে শ্রীমুখার্জির নেতৃত্বে যে দুটি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল সেগুলির চরিত্র ছিল বামঘেঁষা। এবারের মন্ত্রিসভা বা গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনেরও যে বামদিকে ঝোঁক আছে একথা বলা যেতে পারে। কারণ এর যে সবচেয়ে বড় শরীক সেই নব কংগ্রেসকে অনেক বামপন্থী দলও প্রগতিশীল আখ্যা না দিয়ে পারেননি। ফলে, ইন্দিরাজীর কংগ্রেস বামপন্থীদের মধ্যেই আসন লাভ করেছে। তাছাড়া, আসল কর্মসূচীই হচ্ছে দলের বা ফ্রন্টের চরিত্র নির্ধারণের নিয়ামক। যতই বিপরীতমুখী শক্তির সমাবেশ এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনে পরিলক্ষিত থাকুক না কেন, যে সাতদফা কর্মসূচী নিয়ে মন্ত্রগুপ্তির শপথ এই মন্ত্রীসভা নিল তাকে কোনক্রমেই প্রতিক্রিয়াশীল বলা চলে না।

একথা সত্য যে যুক্তফ্রন্টের জমানা শুরু হওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকালে মানুষ যতখানি পাবে বলে আশা করেছিল তা অবশ্য পায়নি। ফলে, মানুষের মধ্যে হতাশার ভাব দেখা দেয়নি যদি বলা হয় তবে তা সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু ফ্রন্টের আবির্ভাব লগ্নে যে নব চিন্তার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গে লেগেছিল তা এখনও অব্যাহত আছে। নতুনভাবে মানুষ চিন্তা করেছে—সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি নতুনভাবে দৃষ্টিপাত করেছে, এবং তার সমাধান খুঁজেছে। ফ্রন্ট আমলের শরীকী সংঘর্ষের উদ্দেশ্য ছিল শক্তির সংহতিকরণ। এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে তার কর্দাক্ত আভাষ পাওয়া গেলেও শরীকী সংঘর্ষের জন্য গণমনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার জের এখনও কাটেনি। সে যা হোক, পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র রাজনীতির ফলশ্রুতি এই গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন। আবার কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করার ফলে রাজনীতির গতিপথ আরও বিচিত্ররূপে পরিগ্রহ করল।

ইতিমধ্যেই অনেকে যাঁরা বামপন্থার চুলচেরা হিসেব-নিকেশ করেন তাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লককে সমালোচনা করছেন। প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এই সমালোচনা যে অমূলক নয় একথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছুই নেই। পারিপার্শ্বিকতা ও অন্যান্য পরিবেশ অনেক সময় রাজনীতিতে অনেক বিস্ময় ঘটায়। কট্টর কংগ্রেসী শ্রীঅজয় মুখার্জি যেদিন তাঁর ঘোষিত শত্রু কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন সেদিন বামপন্থীরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীমুখার্জি কৌশল হিসাবেই এই মিতালিকে যে গ্রহণ করেছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। বরঞ্চ কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক বিধান সভায় সীমিত শক্তি নিয়েও চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে বলেই গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের ৭-দফা নিম্নতম কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। সরকারকে আরও পরিষ্কার করে তুলে ধরবার জন্য কর্মসূচীর প্রত্যেকটি দফা হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম দফায় নয়া মন্ত্রীসভা বলেছেন: রাজ্যে জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য ও জনসাধারণের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করবার জন্য সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। পুলিশ, বিচার ও সাধারণ প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও সক্রিয় করে তোলা হবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরিবেশ প্রস্তুত করা হবে। বে-আইনীভাবে দখল করা ধর্মস্থান ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

দ্বিতীয় দফায় সরকার যে বক্তব্য রেখেছেন তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বতোভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই ঘোষণায় আছে যে শ্রমিক ও কৃষকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাকে আরও জোরদার করা হবে। সমাজের দুর্বল অংশের বৈধ আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করা হবে। এই দফার বক্তব্য থেকে সরকারী নীতি মেহনতী মানুষের প্রতি কিরূপ হবে তার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু যুক্তফ্রন্টেরও এই নীতি ছিল। শুধু তফাৎ ছিল এটুকু যে পুলিশ কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করবে না। আরও বিশদ করে বললে এই দাঁড়ায় যে পুলিশ শ্রমিক কৃষকের আন্দোলনে মালিক পক্ষের হয়ে আন্দোলন দমন করতে যাবে না। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের এই ঘোষণায় এই বক্তব্যটা নেই। কিন্তু মূল নীতি কি হবে তা পরিষ্কার। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার ও সক্রিয় করবার প্রতিশ্রুতি যেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে সেখানে পুলিশ অন্য কোন ভূমিকা যে গ্রহণ করতে পারবে না, ঘোষণায় তা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপরেখা কি? যুক্তফ্রন্টের আমলেও এর সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। বরং অভিজ্ঞতা এই যে শরীকরা ইচ্ছামতই যে কোন আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অনগ্রসর অর্থনৈতিক অবস্থায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সীমারেখা কি হওয়া উচিত অদ্যাবধি কোন তাত্ত্বিকই তা বিশ্লেষণ করেননি। কঠোর পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি যা হওয়া উচিত, সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামো যেখানে বজায় আছে সেখানে আন্দোলনের রূপরেখা সেইরকমই হবে বা অন্য কী রূপ নেবে তা নির্ধারণের সময় এসেছে। একথা সত্য, শুধু প্রশাসনিক যন্ত্রের মাধ্যমে ঈপ্সিত ফল লাভ করা কঠিন, এবং কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ দুরূহ। গণশক্তির এবং প্রশাসনিক যন্ত্রের পূর্ণ সহযোগিতা না ঘটলে জগদ্দল পাথরের মত যে ব্যবস্থা অনন্তকাল ধরে সমাজের বুকে চেপে আছে তাকে অপসারিত করা কঠিন। কিন্তু গণশক্তির বা সংগঠনের ভূমিকা যদি চিহ্নিত পথের বাইরে গিয়ে অত্যাচারের রূপ নেয় তাহলে কর্মসূচীকে রূপায়ণ অসম্ভব হয়ে উঠবে। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনও অজান্তেই বিগত যুক্তফ্রন্টের ভুল করে বসবে। গণশক্তিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যই নেতাদের অতন্দ্র প্রহরীর মত শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। ভুল হলেই পতন অনিবার্য। যা হোক, গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন এমন একটি ঘোষণা যে করতে পেরেছে এটা কম কথা নয়। রাজ্যের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য যে নয়া মন্ত্রিসভা বিশেষভাবে আগ্রহী এই নীতি ঘোষণার মধ্যে তার অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ঘোষণাই সব কিছু নয়। অনুশীলনই সব চেয়ে বড় কথা। নয়া মন্ত্রীসভাকে অনুশীলনের মাধ্যমেই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তার উপরই নির্ভর করবে তাঁদের স্থায়িত্বকাল।

তৃতীয় দফায় বলা হয়েছে যে বন্ধ কল-কারখানা খোলায় এবং নতুন কল-কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা হবে। রাজ্যের বাইরে মূলধন বা শিল্প যাতে না চলে যায় তার ব্যবস্থা করা, এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেমন চেষ্টা করা হবে তেমনি ক্ষেতমজুর ও শ্রমিকদের প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে। সংখ্যালঘু, তপশিলী ও উপজাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়কে চাকুরী ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আপাতদৃষ্টিতে অনুধাবন করলে এই দফায় নিতান্ত সদিচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। এক কথায় বলতে গেলে নির্গুণ। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই শুভ বাসনাকে বিস্তারিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সগুণ করে তোলা যায় ততক্ষণ এর কোন মূল্য নেই। অবশ্য একথা ঠিক, গদীতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সম্বন্ধে কংক্রীট কিছু বলা সম্ভব নয়। কেননা তার জন্য অনেক সমীক্ষার প্রয়োজন। সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বার করতে না পারলে দাওয়াই ঠিক করা সুকঠিন। মন্ত্রিসভা অবশ্য অবিলম্বে এর জন্য বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন করে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করুন, জনতার এটাই কাম্য। বন্ধ কলকারখানা খুলবার প্রতিশ্রুতি খুবই ভাল। কিন্তু যে কারখানা খুললে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে চলতে পারবে না, সেই সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া দরকার। প্রয়োজনবোধে সেই বন্ধ কারখানা অন্য শিল্পবস্তু উৎপাদনের জন্য পরিবর্তিত করা দরকার। তা না হলে শুধু জনতার অর্থপুষ্ট সরকারী তহবিলেরই অপচয় ঘটবে। মূল কথা হচ্ছে, বন্ধ কারখানার শ্রমিকের চাকুরী সংস্থান, এবং সেই চাকুরীর ফলশ্রুতি হওয়া উচিত চাহিদা ভিত্তিক উৎপাদন, যা থেকে মূলধন সৃষ্টি হতে পারে। সমাজের বৃহত্তর কোন কল্যাণে আসবে না, শুধু পণ-তহবিল থেকে অর্থব্যয় করে চাকুরী বজায় রাখতে হবে এই নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত নয়। অনুন্নত দেশের অর্থ-নীতির পক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গী মারাত্মক। এ কথা ঠিক, নতুন শিল্প স্থাপিত না হলে বেকার সমস্যা সমাধানের দিকে এগুনো যাবে না। কিন্তু শুধু নতুন শিল্প সৃষ্টি করব, এই রকম শ্লোগান দেওয়া অর্থহীন। আবেগে আন্দোলিত হলে চলবে না। গভীরভাবে চিন্তা করে এ কাজে হাত দেওয়া উচিত। ভবিষ্যত চাহিদা ও বাজার কি প্রকার হতে পারে এবং চাহিদা সাময়িক নয় এমনতর বিচার বিশ্লেষণ করেই কাজে হাত দেওয়া দরকার। তদুপরি আরও প্রয়োজন চাকুরী প্রার্থীর শ্রেণীবিন্যাস। কারিগরি শিল্পে নিযুক্ত হতে পারে এমন শ্রমিকের যথাযথ সংখ্যা নিরূপিত হওয়া দরকার। কারখানা করে দেখা যায় অনেক সময় প্রয়োজনমত শ্রমিক পাওয়া যায় না। কাজেই নতুন শিল্প স্থাপনের সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে যোগাযোগ না ঘটলে এইসব বক্তব্য নির্গুণ ও নিরাকারই থেকে যাবে। এই দফায় প্রয়োজন-ভিত্তিক বেতনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতিটা ভালই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্রয়োজনটা সঠিক কি, তা কিভাবে নিরূপিত হবে? অদ্যাবধি যে সব প্রয়োজন ন্যূনতম ধরে নিয়ে বেতন ঠিক করার চেষ্টা হয়েছে তা অপ্রতুল বলেই মনে হয়। কেননা মানুষের চাহিদা কখনও স্থিতিশীল হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে মানুষের চেতনাবোধ জাগে, সবচেয়ে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতিও মানুষ আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এই যে নয়া ভাবনা একে নিরস্ত করা খুব সহজ নয়। কাজেই প্রয়োজন-ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন কাঠামো বলে যা চলে আসছে সেখানে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অবশ্য উৎপাদনের সঙ্গে বেতনের প্রশ্নটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর জড়িত হচ্ছে পণ্যমূল্য। এই দুই প্রশ্নের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই ঐ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। এবং মনে হয় সেখানে অনেক কঠোরও হতে হবে। তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলে তাকে যদি সংযমের চৌহদ্দির মধ্যে না রাখা যায় তবে রাজ্যের সামগ্রিক কল্যাণের, অর্থাৎ সকল নিরালম্ব মানুষের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো, সম্ভব হবে না। অবশ্য সরকারের সদিচ্ছার উপরই সব কিছু নির্ভর করে। জনতা যদি বোঝে যে সরকার সত্যিই আগ্রহশীল এবং একপেশে নয় তবে আন্দোলনকারীদেরও বুঝে সুঝে পা ফেলতে হবে। নতুবা আন্দোলন আপনা থেকেই স্তিমিত হয়ে যাবে।

সরকারের ৪নং ঘোষণা—অতীব আশা-ব্যঞ্জক ও সুদূরপ্রসারী। এই ঘোষণায় বলা হয়েছে, খাস জমি ও সরকারের হাতে ন্যস্ত জমি আগামী ১০০ দিনের মধ্যেই দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে স্থায়ী রায়তি স্বত্ব দিয়ে বন্টন করার চেষ্টা করা হবে। ভূমি রাজস্ব ক্রমশ তুলে দিয়ে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র চাষীদের কৃষি আয়কর থেকে রেহাই দিয়ে ক্রমশ কৃষি আয়কর বসান হবে। এ কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিন একর অবধি জমির ভূমি রাজস্ব নেওয়া হবে না।

এই ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এটা একটি সময়-ভিত্তিক কর্মসূচী। খাস জমি ও সরকারের হাতে ন্যস্ত জমি গরীব ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় রেখার মধ্যেই ভাগ করে দিয়ে তাদের জমির মালিকে রূপান্তরিত করা হবে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আরও অনেক জমি আছে যা এখনও সরকারের দায়িত্বাধীনে আসে নি। যতি দ্রুত এই সমস্ত বেনামী জমি সরকারের খাসে এনে বণ্টন করে দিতে হবে। এই জমি উদ্ধারের জন্য কৃষক সংস্থাগুলির সাহায্য অতীব প্রয়োজন। আর প্রয়োজন বেনাম-দাররা আদালতের সাহায্যে সরকারী প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে না পারে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। যুক্তফ্রণ্টের আমল থেকে জমির ক্ষুধা চাষীর মনে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এই বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত দরা-দাক্ষিণ্যের কথা মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে কাজে অগ্রসর হতে হবে। নতুবা সমূহ বিপদ উপস্থিত হতে বাধ্য। মনে হয়, সমস্ত জমির নতুনভাবে খতিয়ান তৈরী করা উচিত। রাজস্ব বিভাগে যে খতিয়ান আছে তা ভুলভ্রান্তিতে ভরা। কেননা অনেক অদৃশ্য হস্ত জমির মালিকানা নির্ধারণের প্রশ্নে অনেক কারচুপি করেছেন। নয়া সরকার এই প্রস্তাব নজরে আনবেন আশা রাখি। আর শুধু দলীয় আনুগত্য থাকলেই সম্পন্ন ব্যক্তি গরীব ভূমিহীন চাষী হয়ে যাবে—এই নীতি যেন অনুসৃত না হয়। এই সঙ্গে ক্রমশ কৃষি আয়কর প্রবর্তনের নীতিটা সত্যিই বৈজ্ঞানিক। খুব চট করে এ কর্মসূচী কার্যকর করা কঠিন বটে। তবে আগ্রহ থাকলে সব কিছুই সম্ভব।

শিক্ষাক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বক্তব্য হচ্ছে, এই কথাগুলো দীর্ঘদিন ধরে জনতা শুনে আসছেন। যুক্তফ্রণ্টের আমলে অনেক হৈ হল্লা করে এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এতদিনের অভিজ্ঞতার পরও এই কর্মসূচী-গুলি রূপায়ণের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা গেল না কেন তা দুঃখের কথা। এই প্রতিশ্রুতি এখনও পর্যন্ত নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মের মতই থেকে গেল। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা একটি সংবিধানগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই পোড়া পশ্চিমবঙ্গে তা এখনও সম্ভব হয়নি। অর্থাভাবের জন্য এই কাজ ব্যাহত হয়েছে বললে ভুল বলা হবে। নেতৃত্বের অভাবই এই কার্যক্রম রূপায়ণের পথে দুস্তর বাধা হয়েই দেখা দিয়েছে।

যাহোক, এ ছাড়া বস্তী উন্নয়ন, উত্তর-বঙ্গের জন্য আলাদা উন্নয়ন কমিশন গঠন এবং পুরুলিয়া প্রভৃতি অনুন্নত এলাকার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি আরও কিছু প্রতিশ্রুতি এই ঘোষণায় আছে। এই সমস্ত প্রতিশ্রুতির মূল্য জনতা তখনই দেবে যখন বাস্তবে দেখতে পাবে কর্মসূচী বাস্তব কাজ শুরু হয়েছে।

—সমদর্শী

জয় বাংলার পতাকা। পতাকার রং সবুজ, তার মধ্যে গোলাকার অংশটি লাল এবং তার ভেতরে সোনালী রঙের বর্তমান পূর্ববাংলার মানচিত্র। ইয়াহিয়া সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আজ এই পতাকা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে

দেশে বিদেশে

পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র এখনও এগিয়ে এসে স্বাধীন 'বাংলাদেশের' সরকারকে মেনে নেয় নি, এমনকি পিণ্ডির ফৌজ সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর ট্যাঙ্ক, কামান, বিমান, যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার নিন্দা করতে ও সেই হানাহানি বন্ধ করার জন্য ইয়াহিয়ার উপর চাপ দিতেও এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র সরকারীভাবে এগিয়ে আসে নি ভারত সরকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ নড়েচড়ে বসে নি। আর, এদিকে, আলোচনার ছলে প্রায় এগারদিন সময় কাটিয়ে ইয়াহিয়ার ফৌজ যে বিশ্বাসঘাতকতায় মসীলিপ্ত অন্ধকার রাত্রে ঢাকা শহরে নিরস্ত্র মানুষের উপর বর্বর আঘাত হেনেছিল তার পর থেকে দেখতে দেখতে দশদিন পার হয়ে গেল। এই দশদিনে পূর্ব বাংলার মানুষ নিজেদের দেশকে 'বাংলাদেশ' নাম দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, সেখানকার পুলিশ, আধা-সামরিক ইস্ট পাকিস্থান রাইফেলস ও বাঙালী সৈনিকদের একাংশকে পাশে নিয়ে লড়াই করে তাঁরা ইয়াহিয়ার ফৌজকে কয়েকটি শহর অঞ্চলে ও সেনা ছাউনির মধ্যে আটকে রাখতে সমর্থ হয়েছেন এবং ধীরে ধীরে গ্রামাঞ্চলে একটি প্রশাসনিক শৃঙ্খলা গড়ে তুলছেন ও একটা দীর্ঘস্থায়ী, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এর জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কি বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে, কত প্রাণ বলি গেছে, কত মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে, কত সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। সেনসর আরোপ করে জঙ্গী কর্তৃপক্ষ যখন বাংলাদেশের ভিতর থেকে সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, যে জন তিনেক বিদেশী সাংবাদিক ঢাকায় ছিলেন তাঁদের যখন বিমানে তুলে বার করে দেওয়া হয়েছে তখন ইয়াহিয়া চক্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বেতার-কেন্দ্র থেকে বলা হচ্ছে, 'সব ঠিক হায়, সব কিছু শান্ত।'

কিন্তু, তবু পিণ্ডির শাসকরা একথা দায়া পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে গোপন করতে পারেন নি যে, বাংলাদেশে যা ঘটছে সেটা গণহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। ঢাকায় ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল হোটেলে আটক বিদেশী সাংবাদিকরা বহিষ্কৃত হওয়ার আগে ২৪ ঘণ্টার যেটুকু দেখেছেন ও যেটুকু শুনেছেন শুধু সেটুকুই একথা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে, ২৫ মার্চ তারিখে মধ্যরাত্রির একটু আগে পাকিস্থানী ফৌজ সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় ও একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে নিরস্ত্র, অপ্রস্তুত ও নির্দোষ অসামরিক জনগণের উপর মহাবিক্রমে আঘাত হেনেছিল। এইসব সাংবাদিক পাকিস্থান থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার যেসব বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, তাঁদের হোটেলের জানলা থেকে তাঁরা পাকিস্থানী মিলিটারী বাহিনীর ট্যাঙ্ক নিয়ে রাস্তায় নামতে এবং সেই ট্যাঙ্কের সাহায্যে রাস্তার উপর গড়ে-তোলা অবরোধ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অবরোধের পিছনের মানুষগুলিকে গুঁড়িয়ে দিতে চলে যেতে দেখেছেন। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলির উপর হামলা চালাতে নিরস্ত্র তরুণদের গুলি করে মারতে, 'দি পিপল' নামে ইংরেজী দৈনিক পত্রের অফিসে জ্বলন্ত মশাল হাতে, 'নারা-এ তকবির' ধ্বনি দিতে দিতে গোটা অফিস জ্বালিয়ে দিতে দেখেছেন।

বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে দুজন পাকিস্থানী ফৌজের নজর এড়িয়ে ঢাকায় রয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা হলেন লণ্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা সাইমন ড্রিং ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ফটোগ্রাফার মাইকেল লরেন্ট। মিঃ ড্রিং পরে ব্যাঙ্ককে পালিয়ে গিয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, ঐ এক রাত্রে ঢাকায় হাজার সাতেক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। মিঃ ড্রিংয়ের ধারণা, পুরানো ঢাকার রাস্তায় প্রতিটি মানুষকে গুলি করে এবং যারা বাড়ীর ভিতর ছিল তাদের

শেখ মুজিবর বলছেন, স্বাধীনতার জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে।

প্রত্যেককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। মিঃ স্ট্রিং হাজার হাজার মানুষকে ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যেতে দেখেছেন।

অসামরিক জনতার উপর সামরিক বাহিনীর এই অভূতপূর্ব তাণ্ডবের সাক্ষ্য লোপ করার উদ্দেশ্য নিয়েই যে জঙ্গী শাসকরা বিদেশী সাংবাদিকদের তাড়িয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ২৪ ঘণ্টা তাঁদের হোটেলে আটক করে রাখা হয়েছিল, শহরে কি ঘটছে সে বিষয়ে তাঁদের কোনরকম খবর সামরিক অফিসাররা দেন নি, মিলিটারি পাহারায়, মিলিটারি গাড়ীতে, মিলিটারি বিমানে তাঁদের ঢাকা থেকে করাচীতে পার করে দেওয়া হয়েছে এবং একবার ঢাকায় ও আর একবার করাচীতে তাঁদের তল্লাসী করে, এমনকি উলঙ্গ করেও, সমস্ত কাগজপত্র, ফিল্ম, নোটবই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার ডিরেকটর এ এম রোজেনথাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর কাছে এক তারবার্তায় সাংবাদিকদের এই বহিষ্কারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই ধরনের ঘটনার নজির মেলে না।

কিন্তু নির্লজ্জ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই বহিষ্কারের কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বরং, তাঁর পররাষ্ট্র দপ্তর ইসলামাবাদে ব্রিটিশ হাই-কমিশনার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়ে এই বলে 'ধমকে দিয়েছেন' যে, পূর্ববঙ্গের ঘটনা সম্পর্কে ভয়েস অব আমেরিকা ও বি-বি-সি মিথ্যা প্রচার করছে। ঢাকাস্থিত মার্কিন কনসালের দেওয়া একটি সংবাদ উদ্ধৃত করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কেন ঢাকায় ট্যাঙ্ক নামানোর খবর প্রচার করলেন, এই বলে পাকিস্থানের পররাষ্ট্র দপ্তর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর আমতা-আমতা করে বললেন, মার্কিন কনসাল-জেনারেল নিজে ঢাকার রাস্তায় ট্যাঙ্ক দেখেন নি, তিনি যেমন শুনেছিলেন তেমনি খবর দিয়েছিলেন। পাকিস্থান থেকে বেরিয়ে বিদেশী সংবাদদাতারা যখন তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ করলেন তখন কিন্তু প্রকৃত সত্যটা আর চাপা গেল না।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার এখনও এ বিষয়ে যতই দ্বিধাগ্রস্ত হন না কেন, সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত জনমত ইতিমধ্যেই জঙ্গীশাহী বর্বরতার বিরুদ্ধে ধিক্কারে মুখর হয়ে উঠেছে।

'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় একটি কড়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, 'এখন থেকে পাকিস্থানকে একটি নিতান্ত বর্বর ও নির্মম সামরিক ডিকটেটরশিপরূপে গণ্য করতে হবে। এদেশে রাজনৈতিক নেতারা কারারুদ্ধ, তার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারী অনুজ্ঞায় দ্বারা মুছে দেওয়া হয়েছে। ...হত্যার মধ্য দিয়ে ঐক্য আসতে পারে না এবং নির্দোষদের প্রাণের মূল্যে ঐক্য কায়েম করে লাভ নেই। ঢাকায় যা ঘটেছে সেটা মানবতার বিরুদ্ধে ও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে একটা উদ্ধত অপরাধ। মনরাখা বুলি বললেই কারও ক্ষান্ত থাকা উচিৎ নয়।'

'ডেইলি টেলিগ্রাফ' লিখেছে, 'এটা মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিক আচরণের একটা বড় দৃষ্টান্ত বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, শুধু গত কয়েক মাসে নয়, কয়েক বছরে এই পরিস্থিতিটা এড়ান যেত।'

ভারতবর্ষের সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে পরিস্থিতির এই মানবিক দিকের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে 'জনগণের এই সুপরিকল্পিত উৎসাদন, যা গণহত্যার সামিল, অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও সকল সরকার যাতে পাকিস্থানের উপর চাপ দেওয়ার জরুরী ও গঠনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই সভা সেজন্য তাদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।'

একটা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করে তাদের উপর সামরিক চক্রের যে অমানুষিক বর্বরতার কাহিনী পাকিস্থান সরকার অনেক চেষ্টা করেও চাপা দিয়ে রাখতে পারেন নি, সেই বর্বরতার অবসান ঘটাবার জন্য ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘ ও পৃথিবীর ছোট-বড় অনেক দেশের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কোন দেশই এখন পর্যন্ত 'উদ্বেগ প্রকাশ'-এর বেশী আর কিছু করে নি। ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের সাহায্য পর্যন্ত প্রত্যাখান করে পাকিস্থানের শাসকরা নিজেদের যে অসভ্যতার পরিচয় আরও বেশী করে দিয়েছেন তার পরও পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের টনক নড়ে নি। সুইডেন তবু বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্থানকে কয়েকটি বিমান বিক্রি করার প্রস্তাব স্থগিত রেখেছে।

পাকিস্থান ও তার অর্থনীতির প্রধান পরিপোষক হচ্ছে বৃটেন, একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লণ্ডনের 'সানডে এক্সপ্রেস' পত্রিকা লিখেছিল, পাকিস্থানকে সংযত করার ব্যাপারে বৃটেনের কর্তব্য রয়েছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকাও মার্কিন সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল, তাঁরা যেন পাকিস্থানকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখে।

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে তফাতে থাকার নীতি অবলম্বন করে চলেছে, যদিও দুই দেশই তাদের নাগরিকদের পূর্ববাংলা থেকে সরিয়ে আনছে। তাদের বিচারে, পূর্ববঙ্গে যা ঘটছে সেটা হচ্ছে পাকিস্থানের 'ঘরোয়া ব্যাপার।'

এমনকি মনবতার খাতিরেও যেখানে ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ছোট-বড় রাষ্ট্র পাকিস্থানের প্রকাশ্য সমালোচনা করতে অথবা তার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ দিতে রাজী নয় সেখানে এটা আশা করা মিথ্যা যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে সেটা অবশিষ্ট পৃথিবী মেনে নেবে।

যদিও বিভিন্ন সংবাদপত্রের রচনায় ও পর্যবেক্ষকদের মন্তব্যে এটা দেখান হয়েছে যে পূর্ববাংলার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলা চলে না, কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না এবং যদিও এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, আকস্মিক মিলিটারি হামলার আগে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে নি। তাহলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলাই এখন পর্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ মনে করছে।

গত ২৮ মার্চ তারিখে বিলাতের রবিবাসরীয় অবজার্ভার পত্রিকার কমনওয়েলথ সংবাদদাতা একটি সংবাদে বলেছিলেন যে, ভারত ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হয়ত একযোগে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে, প্রথমে ভারত, তারপর সোভিয়েট রাশিয়া। ঐ পত্রিকার মস্কোস্থিত সংবাদদাতা লিখেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্থানী সৈনাদলের প্রতিরোধ করতে পূর্ববঙ্গ কতটা সক্ষম হবে তার উপর সোভিয়েট স্বীকৃতি নির্ভর করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত, ভারত বা রাশিয়ার পক্ষ থেকে এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এই ব্যাপারে নয়াদিল্লী এখন পর্যন্ত কতটা অগ্রসর হতে প্রস্তুত, জনমতের একটা বৃহৎ অংশ তার চেয়ে অনেকদূর এগিয়ে যেতে উৎসুক। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে প্রতিদিন হাজার হাজার তরুণ সমবেত হয়ে যেভাবে ওপারের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং এই মুক্তিযোদ্ধারা দখলদারদের ঠেকাবার জন্য যখন অস্ত্র চাইছে তখন এই তরুণদের মধ্যে যে অসহায়তা প্রকাশ পাচ্ছে তাতেই এটা স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শুধু কথায় নয়, সব রকমভাবে পূর্ববঙ্গের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে উৎসুক। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আপাতত শুধু এইটুকু আশ্বাস দিয়েছেন যে, সরকার 'সময়মত' যা করার করবেন, এখন সরকার কি করবেন সে বিষয়ে প্রকাশ্যে যেন কোন বিতর্ক তোলা না হয়। ইতিমধ্যে, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের অস্থায়ী স্বাধীন সরকারকে সেখানকার বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী জানান হয়েছে। অন্যান্য যাঁরা বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকার করার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ভি কে কৃষ্ণ মেনন ও জয়প্রকাশ নারায়ণ।

নয়াদিল্লীর সাবধানতা সত্ত্বেও পাকিস্থান সরকার কিন্তু তার বিরুদ্ধে পাকিস্থানের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ আনতে ভোলে নি। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার ইসলামাবাদে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে সেখানকার পররাষ্ট্র দপ্তরে ডেকে নিয়ে গিয়ে এই অভিযোগ করা হয়েছে। ভারত থেকে পূর্ববাংলায় সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক পাঠান হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে।

ঘরোয়াভাবে নয়াদিল্লী থেকে সরকারী অভিমত যতটুকু জানা গেছে তা হল এই যে, পূর্ববঙ্গে একটি স্বাধীন সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নয়াদিল্লীতে কোন অনুরোধ আসে নি, ঐ সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয় নি এবং ঐ সরকারের অস্তিত্ব এখনও বিশেষ টের পাওয়া যাচ্ছে না।

আসলে, ভারত সরকার বাংলাদেশের এই সংগ্রামের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে যে ধারণা করবেন তার উপরই নির্ভর করে নয়াদিল্লীকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করতে হবে। এটা কি সম্ভব যে, পাকিস্থানের পশ্চিম ও পূর্ব অংশের মধ্যে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে? এটা কি সম্ভব যে, যা হয়ে গেছে তার পরও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা হবে এবং একটা আপোসের সূত্র পাওয়া যাবে?

এখন পর্যন্ত যেসব ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, এখন আর ফিরবার রাস্তা নেই। বিদেশী সংবাদপত্রগুলিরও সেই অভিমত। যদিও পশ্চিম পাকিস্থানের শতখানেক বুদ্ধিজীবী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ইত্যাদি বাংলাদেশের সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন তা হলেও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে একটা আপোষ করে নেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্থানের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপর কোন চাপ দেওয়া হবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং বাংলাদেশে উভয়পক্ষই একটা দীর্ঘ, গেরিলা ধরনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যেই পাকিস্থান সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টোচি স্কাউটস্ বাহিনীকে পূর্ববঙ্গে আমদানী করছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

লণ্ডন টাইমস পত্রিকার মতে এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের সামনে একটা উভয় সঙ্কট দেখা দিয়েছে। পূর্ববঙ্গের মাটিতে যদি একটা দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে তাহলে ঐ যুদ্ধে নেতৃত্ব এমন কিছু শক্তির হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যাদের উপর চীনের সঙ্গে প্রভাব আছে। আবার পশ্চিমবঙ্গের পাশে যদি একটা স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠে তাহলে এক বাংলার স্বপ্নটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে কিনা সে কথাও ভারত সরকারকে ভাবতে হবে।

টাইমস্-এর এই বিশ্লেষণ সঠিক হোক বা না হোক, আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যে মুক্তিসংগ্রামের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সম্পর্কে ভাবিত, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন এ-এফ-পি নামক ফরাসী সংবাদ সংস্থার সংবাদদাতা ব্রায়ান মে।

২-৪-৭১ —পুণ্ডরীক

বাঁধানো দাঁত

স্বপন চক্রবর্তী

কালীপুজোর সময় রংমশাল জ্বালিয়ে উঠান, জামগাছ, জামগাছের নিচে সুগন্ধ বেলফুলের ঝাড়, কুয়োতলায় যাবার পথ সব কিছুই আলোয় ভরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ছোটভাইয়ের চোখটা চকচক্ করছিল। ওর ছায়াটা বেড়ার ওপর কাঁপছিল। মা বলেছিল, রং বাতি জ্বালাস কেন। এ তো পয়সা জ্বালানো। তারপর সব রংমশালগুলো শেষ হতেই আবার আঁধার।

এখানকার আলো সেই রংমশালের চাইতেও অনেক সুন্দর, উজ্জ্বল। যেন এক হাজার রংমশালের আলো। এসব দেখতে পেলে আমার ছোটভাইয়ের চোখেও ফুলঝুরি ঝরতো। আঃ কি সুন্দর আলো। অথচ কেমন ভানুমতীর ভেল্কী—ছায়া নেই, —একটা ছায়াও নেই—এত লোক—পুরুষ-মেয়েমানুষ কারুর একটা ছায়াও চোখে পড়ছে না। কি সুন্দর বাজনার শব্দ। ঠিক রেডিওর মত। জলের গান। আর গন্ধ। ফুলের গন্ধ, ধিয়ের গন্ধ, খাবার জিনিষের গন্ধ। সমস্ত গন্ধগুলো মিলেমিশে কেমন যেন একটা ঘোর। চোখ বুজে আসে, তবু চোখ খোলা রাখতে হয়। চোখ বুজলে না রাখলে এইসব দেখব কি করে। এ যেন সেই রূপকথার রূপনগরের রাজবাড়ী। মেয়েগুলো সব বইতে রাখা পরীর মত। ফুলপরী, জলপরী। পরীদের কথা বিশ্বাস করতাম না—ভাবতাম যাঃ তাই আবার হয় নাকি—আকাশ থেকে রোজ ফুলবাগানে নেমে গান গায়—এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে পরী না থাক, পরীদের মতোন নিশ্চয় কিছু আছে—চোখের সামনেই তো দেখছি। বইয়ের ছবিতে দেখেছি প্রত্যেকটি পরীর মুখের চারিপাশে একটা গোল মতোন আলোর আভা এখানকার মেয়েগুলোর মুখ থেকেও আলোর একটা আভা বেরুচ্ছে। ঠোঁটগুলো কি সুন্দর টুকটুকে লাল - ঠিক লঙ্কা জবার মতো। যুঁইফুলের মতো সাদা গালের রং—শুঁকলে হয়তো যুঁইয়ের গন্ধের সুবাস পাবো। মাঝে মাঝে—ওই মেয়েটার জামাটা কিরকম চিকচিক করছে—যেন অনেক জোনাকী পোকা ধরে ধরে লাগিয়ে দিয়েছে—জ্বলছে নিবছে জ্বলছে নিবছে জ্বলছে।

মেয়েটা এমন করে হাসলো, মনে হল সেই হাসির ছটা বৃষ্টির ছাটের মতো আমাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

একটা রাজপুত্তুরের মত মানুষ এসে সেই মেয়েটার হাত ধরল। কানে কানে কি একটা কথা বলল। মেয়েটা আবার হাসলো।

ছেলেটা বলল—নট ফর ক্লোক ফ্রিনি—বাট লিরিক্যালি। মেয়েটা হি-হি করে হাসল—যেন শীত পড়ছে আষাঢ় মাসে। আচ্ছা জোক মানে কি যেন কি যেন ঠাট্টা বোধহয়। তা হলে দিয়ে মানেটা দাঁড়ালো ছেলেটা মেয়েটাকে ঠাট্টা করছে না: তবু মেয়েটা হাসছে। লোকটা বলল—বাগানে চলো প্লিজ—লেটস হ্যাভ এ.....শেষের কথাগুলো বুঝতে পারলাম না। লোকটা মেয়েটার হাত ধরল—মেয়েটা বলল—বাট ডোন্ট বি সিলি—অসভ্যতা করবে না কিন্তু। ওরা বাগানে গেল।

আমি পেছনের জানালা দিয়ে বাগান দেখতে পাচ্ছি। গাছে গাছে লাল নীল সবুজ আলো জ্বলছে। একটি শ্বেতপাথরের মেয়ের গায়ে চারদিক থেকে জল ঝরছে! রজনীগন্ধাগুলো সেজেগুজে সার দিয়ে আছে। ইস্কুলের প্রাইজের উৎসবে সভাপতি এলে মেয়েরা যেমন ধবধবে শাড়ী পরে, সার বেঁধে শঙ্খ বাজায়, রজনীগন্ধাগুলো যেন সেরকম সার বেঁধে শঙ্খ বাজাচ্ছে। রাজপুত্তুর-রাজকন্যে হাত ধরাধরি করে সারসার রজনীগন্ধার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা দিয়ে বাগানের গভীরে মিলিয়ে গেল। তাদের পথ চলার ছন্দে নিশ্চয় ঝুমঝুম ঝুমুর বেজেছিল আমিই শুনতে পাইনি।

সামনের ঘরটায় অনেক লোক কথাটি বলেছে। ঝোলানো লাল পর্দার ফাঁক দিয়ে বাজনার শব্দ, হাসির শব্দ, চুড়ির শব্দ, কাচের গ্লাস রাখার শব্দ—জুতোর শব্দ: একেবারে রঙীন রঙীন মানুষের পা কাশীরাম দাসের কবিতার ছন্দের মতো আসে আর যায়।

পক্ষীরাজ ঘোড়া—নাহে, না না হলদে মটর গাড়ীর থেকে কতগুলো সুন্দর সুন্দর মানুষ আসতেই একটা লোক একটা রুপোর কেটলীর উপর চাপ দিল আর দ্যাখো কি অবাক কাণ্ড, কুয়াশার মতো ফিস্ ফিস্ জল ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বাঃ কি সুন্দর গোলাপের গন্ধ। বাবা কানে কানে বললেন—এটা গোলাপ জলের খোকা, চোখে লাগলে বড় উপকার। বাবা আমার হাত ধরে একটু সামনে গেল। আমরা সেই আগন্তুক লোকগুলোর পেছনে দাঁড়ালাম—যাতে আমাদের গায়ে সেই গোলাপজলের ছিটে লাগে। লোকগুলো হাসতে হাসতে লাল পর্দার ফাঁক দিয়ে বড় ঘরে আলো শব্দ গান আর হাসির কোলাহলে চলে গেল। আচ্ছা লোকগুলোর চোখে কি চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে?

একটা সুন্দর লোক একটা সুন্দর মেয়েকে বলল—আপনি এতোক্ষণ আসছিলেন না বলে বড় লোনলী ফীল করছিলাম, জানেন। মেয়েটা তাই নাকি:—আমার সৌভাগ্য বলেই এমন হি হি হাসলো—আমি দেখেছি দুপ্পোপাড়োর আগে জোর হাওয়ায় শিউলী গাছ নাড়া দিলে এরকম হাসির মতো ফুল ঝরে পড়ে। ওরা আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। ওদের গায়ের থেকে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুল।

আমি দেখেছি আমার বাবার গায়ে সবসময় কেমন যেন মোশিন-মোশিন গন্ধ। আমার বাবা খাকী জামা গায়ে যখন বাড়ী ফেরে, গালে মুখে গলা বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ে ঠিক আমার লিক ফাউন্টেন পেনটার মতো। আমার বাবার জামায় সর্বদা একটা আঠালো তেল লেগে থাকে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ। আমার মায়ের শাড়ীতে কেমন একটা হলুদ হলুদ গন্ধ। অথচ এদের সবার গায়েই যেন সুগন্ধী ফুল ফুটে আছে।

আমরা এই বেঞ্চিতে বসে আছি। আরও যাঁরা বসে আছে এখানে—সবাই বাবার সঙ্গে কাজ করে। আর আছে তাদের ছেলেমেয়েরা। বাবার কারখানার মালিকের বাড়ীতে আজ উৎসব।

আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে, ঐ আরও আলোর মধ্যে যাই—আরও শব্দের কাছে যাই—নকসাকাটা সিঁড়ি বেয়ে রহস্যপুরীর ভিতরে গিয়ে কিছু অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখে আসি। বড় ইচ্ছে করছে লাল নীল আলো জ্বালানো বাগানে রজনীগন্ধার ঝাড়ের পাশে কিছুক্ষণ বসে থাকি। বড় ইচ্ছে করছে ঐ লাল পর্দা ঠেলে একবার উঁকি দিয়ে আসি। বড় ইচ্ছে করছে আনকলের মতো সাদা নরম চেয়ারে বসে ওদের মত সরু সরু সাদা নল দিয়ে বোতলে ভরা কমলা রং-এর পানীয় চেখে আসি। আমি তো দেখেছি, মেঝেতে পাতা ঘাসের মত নরম কাপড়ের উপর দিয়ে হেঁটে, কেমন পায়ে সুড়সুড়ি লাগে; আহারে, লোকগুলো জুতো পায়ে হেঁটে সেই আরামটা পেল না। আমি তো দেখলাম দেয়ালে টোকা মারতেই অনেকগুলো রঙমশাল জ্বলে উঠল আর নিভল না।

আমি তো দেখলাম, রুপোলী কেটলীর উপর বোতামটা টিপতেই লক্ষ লক্ষ গোলাপের রেণু বাতাসে ছড়ালো। আমি তো দেখলাম একটা ছোট বাক্সের গায়ে আলতো আঙুল ছোঁয়ালেই একঝলক বিদ্যুতের মত আলো ছড়িয়ে পড়ল—কে জানে এই বাড়ীর নকসাকাটা সিঁড়ি বেয়ে রঙীন মাছ কাটা বাক্সটার পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে ভেতরে চলে গেলে আরও কি রহস্য দেখতে পাবো।

কিন্তু বাবা তো বলে দিয়েছে—ওখানে গিয়ে কোন অসভ্যতা করবে না। চুপচাপ বসে থাকবে। যখন খাবার ডাক পড়বে, তখন খেতে যাব। বাবা বলেছে হরেকরকম খাওয়া, পোলাও—মানে ঘি দিয়ে ভাত ভাজা, ঘিয়ে চপ্‌চপ্ করছে তার মধ্যে পেস্তা বাদাম কিসমিস, তারপর মাংস, চপ, দই, সন্দেশ......কতো কি' আমি তো সেই থেকেই দিন গুনছি—রোববার কবে আসবে।

মা নীল চেক-চেক জামাটা কেচে তোষকের তলায় ভাঁজ করে রেখে দিয়েছে। জামের কষের দাগটা ওঠেনি বলে আমার বাবা মাকে বকেছিল খুব। বাবা বাইরে গেলে মা আমাকে উল্টে বকে দিয়েছে, আমি জামের দাগ লাগিয়েছি বলে। শুক্রবারে আমাদের ইস্কুলে প্রাইজের উৎসব ছিল। আমি থার্ড প্রাইজ পাবো, তবু সেই জামাটা পরিনি। সাদা জামাটা, যেটার পকেটে একটাও পয়সা রাখতে পারি না, ফুটো বলে পড়ে যায়, যেটা বাবার ধুতি কেটে বানিয়ে দিয়েছিল মা, সেটা পরে প্রাইজ নিতে গিয়েছি। আমি তো সেই থেকেই দিন গুনেছি ...। ওপাশে যারা বসে আছে, আমার বয়েসী সব ছেলেমেয়েরা সবাই হয়তো আমার মতই দিন গুনেছে—আর তিন দিন... আর দু'দিন ... আর একদিন তো মোটে।......এখানে যারা বসে আছে, সবার চোখগুলো কিরকম পাড়-

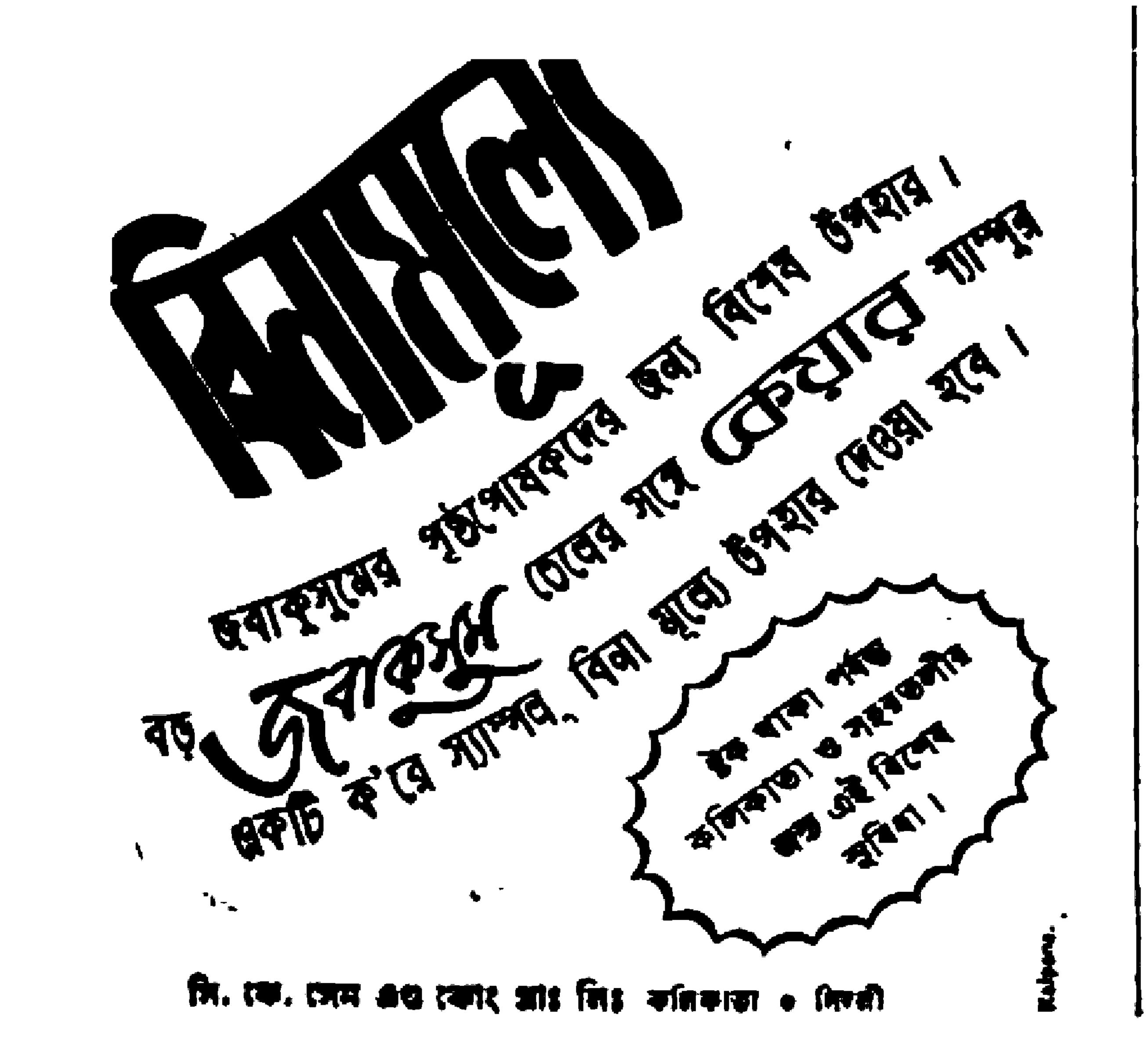

কুয়োর মত। হাসিটা কাটা তরমুজের মত। আমরা কেউ জোরে কথা বলছি না, জোরে হাসছি না, জোরে কাশছি না, ঐ বুড়ো লোকটা, কাশি চাপবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও পারছে না—বারবার রেলগাড়ীর ধোঁয়া ছাড়বার মতো কেশে উঠতেই অপরাধীর মত চারদিকে তাকাচ্ছে। সুন্দর জামাপরা কোন মানুষ এলেই আমরা সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াই—ক্লাসে হেডস্যার এলে যেমন করে উঠে দাঁড়াতে হয়। কেউ কেউ নখ খুঁটছে, কেউ মাজিক মাথায় অবাক চোখ নিয়ে স্থবির। কেউ কেউ ফিসফিস করে নিজেদের সংসারের কথা বলছে।

গরুর ল্যাজ ধরে সামনে গরু তাড়াবার মত একটা ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দকে পায়ের চকচকে জুতোর তাড়িয়ে তাড়িয়ে বাবু এলেন, সবাই উঠে দাঁড়ালো। বাবা আমার হাতে একটা চিমটি কাটতে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। অঞ্জলি দেওয়ার মন্ত্রপাঠের মত একটা সমবেত স্বর শোনা গেল—'নমস্কার বাবু'। তারপর কেউ মাথা চুলকোতে লাগল, কেউ একহাতের মধ্যে অন্য হাত ঢোকালো: বাবু বললেন, সব এসে গিয়েছিস? আঁ এত আন্ডাবাচ্চা—হ্যারে ব্রজবিলাস তোর আর ছিল না? হ্যারে......

একজন বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার ওয়ার্কার বুঝি সব?

বাবু বললেন—আরে হ্যাঁ, বুঝতেই তো পারছেন, খাবার নাম শুনলে গর্ভস্থ সন্তানকেও নিয়ে আসে ওরা।

বাবু আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন। হ্যারে, তোদের পরে ডাকছি—এদিকে একটু ফাঁকা হোক কেমন। হ্যাঁ পেটভরে খাস যেন।

বাবু হাসলেন।

দু-তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল—না বাবু—হ্যাঁ বাবু—তাইতো—সত্যিই তো......

আমার খারাপ লাগল কথাটা শুনে। বাবুর হাসিটা কি সত্যিকারের হাসি। বাবু কি খুশী নন? বাবু এভাবে কথা বললেন কেন? এখানকার বাতাসটা কেমন ভারী ভারী লাগল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বারান্দা বেয়ে সিংহ দরোজার দাঁড়ানো দারোয়ানের পাশ দিয়ে সুরকি ঢালা রাস্তা দিয়ে বেঁকে আস্তে আস্তে চলে গেলাম লাল আলো নীল আলো জ্বালান বাগানের ভিতর।

কি আশ্চর্য! রজনীগন্ধার ঝাড়ের পাশে আধখাওয়া চুরুটের তীব্র গন্ধ। কি আশ্চর্য মা সরস্বতীর মত সেই সুন্দর মেয়েটার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটা ছেলে। মেয়েটার হাতদুটো, যে হাতদুটো দিয়ে ছেলেটাকে জাপটে ধরে আছে, যে হাতদুটোকে সন্ধ্যেবেলায় রাজহাঁসের গলার মতো মনে হয়েছিল, সেই হাতদুটোকে এখন কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো লাগছে। সাপের নিশ্বাসের শব্দ। এখানে ওখানে জোড়া ব্যাঙের মতো—না-না চোরের মতো অনেক অন্ধকারে। যেন ডাইনী বুড়ির অট্টহাস্য

নাকি? একবার আমাদের দেশে এক নদী বাঁধের ইঞ্জিনীয়ার সাহেব বাঁশঝাড়ে এক সাঁওতাল মেয়েকে জাপটে ধরেছিল বলে সবাই মিলে সাহেবকে কি মারই না দিলে: নাক দিয়ে রক্ত পড়েছিল। অথচ এখানে কাউকে কেউ কিছু বলে না। একটা রজনীগন্ধার ঝাড়ের পাশে আধখাওয়া চুরুটের তীব্র গন্ধ—আমি বাগান ছাড়িয়ে চলে যাই...ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে ঘুরে, উপরে উঠি।

একটা লম্বা বারান্দা। থামগুলো প্রহরীর মত। আমি বাড়ীর পেছন দিকে...। দুটো থামের মাঝখানে বিরাট একটা মাকড়সা। একটা ঘর। জানালা বন্ধ। কি আছে ঐ ঘরের ভিতর? আমি খড়খড়ির ফুটোয় চোখ রাখি।

মুহূর্তে চলে যাই রাধাপুরের রথের মেলায় ডুগডুগির শব্দ কলের গান আর যাদু-করের তাঁবুর কাছে। মনে পড়ে যায়—একটা কাঠের বাক্সের কাঁচের ফুটোয় চোখ রেখে বাক্সের ভিতরে চলমান সাপের নাচ আগ্রার তাজমহল দিলীপকুমার বৈজয়ন্তীমালা গুরু নানক। আমার সেই রহস্যময় বাক্সটার কথা মনে পড়ে গেল। খড়খড়ির ফুটোয় আমার চোখ।

আমি খড়খড়ির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দেখলাম ভেতরের সবুজ ঘরে সারিসারি আলনা ফুলদানীর রজনীগন্ধার পাশে আধখাওয়া চুরুটের ধোঁয়া। একটা মেয়ের প্রায় টাকপড়া মাথায় নকলচুলের গুচ্ছ লাগিয়ে দিচ্ছে অন্য একটা মেয়ে। মনে পড়ছে আমার ছোটভাইটা একদিন ধুতরো ফুলের গাছে দড়ি দিয়ে মেলার থেকে কেনা প্লাস্টিকের গোলাপ ফুল বেঁধে দিয়েছিল বলে আমি খুব হেসেছিলাম। একটা লালমতো জিনিষ ঠোঁটে ঘসে দিতেই ঠোঁটটা হয়ে উঠল টুকটুকে লাল। মায়ের বয়েসী মেয়েটা, দেখতে দেখতে পরী হয়ে গেল। একটা লোক দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকলো, চুলে একটা চোখ ঢেকে গিয়েছে...এই লোকটাই তো কি সুন্দর হাসতে হাসতে রজনীগন্ধার তোড়া নিয়ে বাড়ীতে ঢুকেছিল। চোখদুটো সুন্দর ছিল। এখন চোখের রং করমচার মত লাল। লোকটা দুড়ুম করে চেয়ারে বসে বলল—আই অ্যাম দি নাইট... ইউ আর দি মুন। মেয়েটা বলে উঠল...স্টপ ইয়োর রোর প্লিজ...রোর মানে আমি জানতাম এখন মনে পড়ছে না।...লোকটা বলল, আই অ্যাম রেডি টু হ্যাভ এ কিস...

আমি রেলিং ধরে এগুতে থাকি...... এ ধারটায় কেউ নেই। বিরাট পেতলের টবে পাতাবাহার গাছ। আমার সন্দেহ হয়। গাছগুলো সত্যিকারের গাছ তো? আমি পরখ করি।

—এাই এাই ছোঁড়া...এখানে কেন? কোত্থেকে এলি এাঁ...যা-যা-যা। একটা কি আমাকে ধাক্কা দেয়। আমার কান্না পায়। আমি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি।

বাবার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ছিল। আমাকে দেখেই বলতে—কোথায় গিয়েছিলি—আঁ। আমি ফুঁপিয়ে বললাম—ওরা আমাকে মেরেছে। বাবা বলল—এই আস্তে আস্তে, ওরা শুনতে পাবে।

আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছে। ঘরের শব্দগুলো বমির মতো মনে হচ্ছে আমার। আলোগুলো সব ধাঁধার মতো। আমি বললাম—আমি বাড়ী যাব।

খাবার ডাক এলো—আমরা লনের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে চললাম। ছাতের এক পাশে আমরা বসলাম। খাবারগুলো ঢিল ছোঁড়ার মত ছুঁড়ে দিচ্ছে। লুচিগুলো ন্যাকড়ার মত লাগল: সন্দেশ রসগোল্লা সব ঢিলের মতো। দই মনে হল পুঁজ। আমি বললাম—আমার বমি আসছে বাবা। বাবা বলল—খেয়ে নে, বমি হলে পরে হবে।

আমরা এখন আগের জায়গায়। বাবুর জন্য অপেক্ষা করছি সবাই। বাবু আসছেন না। কিন্তু একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে একটা সুন্দর লোকের গায়ে ঢলে পড়ল। ভদ্রলোক আদর করে গাল টিপে দিল।

একি!

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম গালটা টিপতেই ঝপ্‌ঝপ করে দুপাটি মুক্তোর মত সুন্দর দাঁত মুখ থেকে খসে পড়ল মাটিতে। ঝনাৎ করে দুটো শব্দ। সুন্দর হাসির দাঁতগুলো মেঝেতে টুকরো টুকরো ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ে আছে।

বাবু এলেন ফুল মাড়িয়ে মাড়িয়ে।
বাবু এলেন শব্দ তাড়িয়ে তাড়িয়ে।
বাবু এলেন হাসি ছড়িয়ে ছড়িয়ে—
বললেন—হ্যারে, পেট ভরেছে তো?

একসঙ্গে দশ-বারোটা কণ্ঠ বলে উঠল, হ্যাঁ বাবু।

বাবু হাসলেন, তোরা খুশী হলেই আমি খুশী। তোদের নিয়েই তো আছি। আর।

বাবু হাসছেন।

কাঁচের শার্সিতে এখন অনেক ছায়া। কালীপুজোর প্যাণ্ডেলে কালীঠাকুরের পেছনের পর্দার কথা মনে হল। প্রেতের নাচ।

বাবু হাসছেন—

মনে হচ্ছে বাবুর মুখথেকে দুপাটি দাঁত খুলে কাঁপতে কাঁপতে আমায় তাড়া করছে—আমি বাবাকে বললাম—তাড়াতাড়ি চলো। খিল-খিল হাসির শব্দ—একি ডাইনী বুড়ির হাসি! ডাইনীরা বাবুদের ছদ্মবেশ ধরতে পারে। ওরা আসছে—। বাবাকে বললাম—তাড়াতাড়ি চলো। কাঁচের শার্সিতে অনেক ছায়া ভূতের মতো দুলছে—দুপাটি দাঁত মুখ থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। রজনীগন্ধার ঝাড়ের পাশে চুরুটের ধোঁয়া তার পাশে কাঁকড়ার দাঁড়ার মত একটা হাতে মেয়েটি ধরে আছে ছেলেটিকে। সেই হাত আমার দিকেও আসছে। দুপাটি দাঁত ছুটছে—কাঁকড়ার দাঁড়া ছুটছে, ছুটে আসছে—উঃ বাবা, তাড়াতাড়ি চলো।

CENTRAL LIBRARY

[illegible] চোখে

প্রকাশ পোদ্দার : আমি ক্রিকেটেই আছি

আমাদের সিলেক্টররা জায়গা ছেড়ে নড়েন না। কলকাতায় সারা বছর কত খেলা হয়, কে তার খোঁজ রাখে? কেউ না। অথচ এই তো সেদিন কাগজে পড়লাম গ্রেগ চ্যাপেলকে আবিষ্কার করার জন্য ব্র্যাডম্যান আড়াই হাজার মাইল ছুটে গিয়েছিলেন। কথা কটা শেষ করে খানিকটা সময় চুপ করে রইলেন পোদ্দার। অ্যাকুরিয়ামের মাছের মত কাচের পেপার ওয়েটে তারার চুমকী। পাশেই টেলিফোন। কাচের-নীল টেবিলের বাঁ ধারে গোটা দুয়েক ফাইল। ফোন আর ফাইলের মাঝখানে টেবিলে বিছানো হাতে পেপার ওয়েটটা অন্যমনস্কভাবে কখনো উঠছে কখনো নামছে। গোটা ঘরে আর কেউ নেই, শুধু আমি একা কলম বাগিয়ে ওঁর সব কটা কথা মন দিয়ে শুনছি।

বোধহয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই ফোনটা নড়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা ক্রেডল থেকে তুলে এনে কানে লাগালেন। তারপর যেন বেঙ্গল টীমের হয়ে ওপেন করতে নেমে স্বচ্ছন্দে ব্যাট চালাতে লাগলেন : হাঁ জী। স্টক তো এতনাই হ্যায়। লেকিন……।

পাঠক আমায় মাপ করুন। লজ্জার সঙ্গেই বলছি হিন্দী আমার আসে না। বুঝি না ভালো, মনেও রাখতে পারি না। নইলে টেলিফোনে কি একটা মালের স্টক নিয়ে ও পাশের বোলারের প্রতিটি অদ্ভুত বাউন্সার, বাম্পার, চায়নাম্যান, গুগলী, কাস্টিং কেমিক্যাল ডিলারের পারচেজ অফিসার প্রকাশ পোদ্দার সেদিন যেভাবে ফেস করছিলেন—তা সত্যিই শোনবার মত।

ফোনটা নামিয়ে রেখে ম্লান মুখে হাসলেন প্রকাশ : জানেন খেলার জন্য চার বছর আমার ইনক্রিমেন্ট স্টপড ছিল। খেলার জন্য স্পোর্টিং ইউনিয়ন ছেড়ে মিলন সমিতিতে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম মোহনবাগানে। শেষ পর্যন্ত কলকাতাকেই ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। খেলার জন্য আমার কোম্পানিটাতে কেউ আমাকে বোঝে না। মা বাবাও বিরক্ত। শুনলে অবাক হবেন এই খেলার জন্যই আমার তিন চারটে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল। তবু আমি খেলা ছাড়ি নি। ক্রিকেট ইজ এ রিলিজিয়ন। ধর্মকে কি কেউ কখনো ছাড়তে পারে? আর সেই কোন ছেলেবেলায় যে রক্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঢুকে গিয়েছিল।…

পরিষ্কার ঝরঝরে বাংলায় নিজেকে এলোমেলো করে দিলেন বাংলাদেশের খেলার মাঠের সত্তর-একাত্তরের মুকুটহীন সম্রাট পি সি পোদ্দার। তখন আমার বয়স সাত কি আট। নাইনটিন ফরটি এইট। কলকাতায় ব্যবসা ভাল চলছিল না বলে, বাবা আমাদের সবাইকে নিয়ে বোম্বেতে চলে গিয়েছিলেন। বাই দি বাই, বলে রাখি আমার দেশ কিন্তু রাজস্থানে। সীকর জেলার ফতেপুর গাঁয়ে। খুব ছেলেবেলায়, প্রোবাবলি পাঁচ বছর বয়সে, ঠাকুর্দা মারা যাওয়ার পর আমার বাবাকে তাঁর মামা সে যুগের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শেঠ যমুনালাল বাজাজ ওয়ার্ধার গান্ধী আশ্রমে রেখে আসেন। বাবা ওখানেই মানুষ।

তারপর বড় হয়ে চলে এলেন কলকাতায় ব্যবসা করতে। আমার জন্ম কলকাতায় বিপিন পাল রোডের বাসায়। আমি তিন ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট।

বোম্বেতে ছিলাম প্রায় এক বছর। বিছানাতে শুয়েই কেটেছে। টাইফয়েড হয়েছিল। তখন তো এত মাইসিন টাইসিন বেরোয় নি। শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে বাড়ীর পাশে ডন বসকো স্কুলের খেলার মাঠে ছেলেদের ক্রিকেট খেলা দেখতাম। রেডিওতে শুনতাম ক্রিকেটের রিলে। সে বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এসেছিল ইন্ডিয়ায়। আর আমার মনে চিরদিনের জন্য বাসা বাঁধল দুটি নাম—মার্চেন্ট, অমরনাথ।

বোম্বেতেও বাবা বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। এক বছর বাদে ফের কলকাতায় ফিরে এলেন। এবার আমি স্কুলে ভর্তি হলাম—হিন্দী হাই স্কুল।

স্কুলে যাই, মন দিয়ে পড়াশুনা করি, ক্লাসে ফার্স্ট হই। মাস্টারমশাইরা ভালবাসেন। বাবা মাকে বলেন, আমার নাকি

শাইন করার চান্স আছে। বাবা মা দুজনেই আমাকে আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরেন—পড়ার টেবিলের বাইরে গোটা পৃথিবীটাই গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে আসে। খেলিটেলি না। রোগা সোগা বলে কেউ দলেও নিত না। শুধু মামা অশোক সাতর্কোরয়া বাড়ীতে এলেই আমায় নিয়ে ফুটপাথে ইঁটের উইকেট বানিয়ে ক্রিকেট খেলতেন। ফুটপাথের উইকেটেই আমার ক্রিকেটের হাতেখড়ি।

বাহান্ন সালে একদিন কাগজে খবর বেরুল—কার্তিক বসু ছোটদের খেলা শেখাবেন। খবরটা পড়ে স্কুল থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে সোজা মাঠে চলে গেলাম। বারোর কম বয়স ছিল বলে কার্তিক বসুর ট্রেনিংয়ে চান্স পেলাম না। চান্স পেলাম পিয়ারসন সুরিটার ট্রেনিংয়ে। আর ঐ একটা চান্সেই আমার জীবনের প্যাটার্নটাই গেল বদলে। কার্তিকদা আর মিসটার সুরিটা দুজনেই ইমপ্রেসড হয়েছিলেন। তাই চান্স পেলাম সেবার স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলবার।

ক্লাস সেভেনে পড়তে পড়তে স্পোর্টিংয়ে সুযোগ পেলাম খেলার। টেনে উঠে বেঙ্গল স্কুল টীমের রিজার্ভে আমার জায়গা হোল। অথচ মজাটা কোথায় জানেন, আমি আমার স্কুল টীমে কোনদিন চান্স পাই নি। স্কুল টীমের ট্রায়ালে ওপেনিং করতে নেমে দলের পক্ষে হাইয়েস্ট রান (৫৭) করেও বাদ গেছি শুধু একটি কারণে। আজ আর বলতে কোন বাধা নেই—সেদিন স্কুলের কেউ কেউ আমার সোজা ব্যাটে ক্রিকেট খেলাটা পছন্দ করেন নি।

স্কুল টীমে চান্স না পেলেও, ক্লাবের হয়ে তখন মাঝেমধ্যে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলি। মনে আছে জীবনে প্রথম বড় খেলায় নামবার সুযোগ পেয়েছিলাম চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন সালে। নাইন পেরিয়ে টেন্থ উঠেছি। সিনিয়র নক আউট সেমি ফাইন্যালের খেলা। দলে তখন কার্তিক বোস, পঙ্কজ রায়, নীহার মিত্র, কল্যাণ মিত্র, সুনীত সোম, গৌর ঘোষের মত বাঘা বাঘা প্লেয়াররা খেলছেন। কি একটা কারণে কল্যাণ মিত্র, সুনীত সোমরা খেলতে রাজী হলেন না। তাই চান্স পেলাম। খেলাটা ছিল নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের এগেনস্টে তখন অপনেন্টে খেলছেন তারা ভট্চাজ, মোহিনী ব্যানার্জিরা। ইডেনের ভেজা পীচে ওয়ান ডাউন খেলতে নেমে সেদিন আমি ১০৮ করেছিলাম।

ঐ খেলার জন্যই ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে টীমে আবার আমি জায়গা পেলাম।

নক আউটে সেমিফাইন্যাল, ফাইন্যালে খেললেও আমি কোনদিন স্পোর্টিংয়ের হয়ে লীগ খেলি নি। ফ্রেন্ডলি প্রচুর খেলেছি। কিন্তু লীগে চান্স পাই নি। বয়সটা নাকি হেভি গেমের ফেভারে ছিল না। অথচ আজ দেখি গাভাসকর, রাজা মুখার্জিরা ঐ বয়সেই রণজি খেলে। তখন ক্রিকেট বড় কনজ়ার্ভেটিভ ছিল, উঠতি যৌবনের দাম দিত না কেউ। তবে হাতের লেখাটা সুন্দর ছিল বলে, দায় পেত্ত ব্যাবর। আমায় নিয়ে স্কোর লেখানো হোত।

স্কোর লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হোত আর বুঝি কোনদিন চান্সই পাব না। এমনি সময় বন্ধু রবীন (রবীন্দ্রলাল সাহা) আমায় টেনে নিয়ে গেল মিলন সমিতিতে।

চার বছর মিলন সমিতির হয়ে খেলেছি, আপ-টু সিক্সটি। চিরদিন সমিতির কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। ওরা আমায় বরাবর ওয়ান ডাউন খেলবার সুযোগ দিয়েছে।

মিলন সমিতিতে যখন খেলি, তখন পড়ি সেন্ট জেভিয়ার্সে। আই-এ (কমার্স) পড়তে পড়তে ফিফটি সেভেনে ইউনিভার্সিটি টীমে চান্স পেলাম। সেবার রোহিন্টন বারিয়া ট্রফির খেলায় বেনারস ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে চুনী গোস্বামী ছিলেন আমাদের ক্যাপ্টেন। ঐ ম্যাচে আমরা হেরে যাই। তবে আমি সিক্সথ ডাউনে নেমে দলের পক্ষে সবচেয়ে বেশী রাণ করেছিলাম (৪৭ নট আউট)।

নেকস্ট ইয়ার বিহার ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে আমরা ক্যালকাটার অল টাইম রেকর্ড করে বসলাম। ঐ ম্যাচে এক ইনিংসে আমাদের টোটাল হোল ৮১৭। চার চারটে সেঞ্চুরী করল সলিল ব্যানার্জি, এম পি বড়ুয়া, শ্যামসুন্দর মিত্র আর চুনী গোস্বামী। আমি করেছিলাম ৯৪।

পরের বছর আমিই ক্যালকাটার ক্যাপ্টেন। বর্ধমানের সময় খেলা পড়ল পাটনা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে, কালীঘাট মাঠে। পাঁচ নম্বর খেলতে নেমে আমি ২২৯ করে নট আউট ছিলাম। কানু চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার জুটিতে মোট রাণ উঠেছিল ৩২৫। আজ পর্যন্ত রোহিন্টন বারিয়া ট্রফির খেলায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আর কেউ এ দুটো রেকর্ড ভাঙতে পারে নি।

রোহিন্টন বারিয়ার পারফরমান্সের জন্য ফিফটি এইট্টে রণজিতে খেলার সুযোগ পেলাম। আমার সাত বছরের ক্রিকেট জীবনের চরম পুরস্কার। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম। কিন্তু ফসকে গেল। ক্লাবে চিঠি এসেছে যে আমি টিমে আছি। ওদিকে কাগজে বেরোল, আমাকে বাদ দিয়ে নাকি আমারই ক্লাবের এস রায় (বাচ্চু)কে নেওয়া হয়েছে। (মিলন সমিতির আর কেউ কোনদিন এর আগে রণজিতে খেলে নি) ব্যাপারটা আমাদের দুজনেরই খুব খারাপ লাগল। তাই দুজনের কেউই সেবার গেলাম না। শ্যামসুন্দরও সেবার প্রথম চান্স পেল রণজিতে।

ফিফটি নাইনে ইউনিভার্সিটির রেকর্ড রাণ করার জন্য আবার ডাক এল রণজিতে। টীম যাচ্ছে কটকে, উড়িষ্যার বিরুদ্ধে খেলা। প্রেমাংশু ক্যাপ্টেন। শুনেছিলাম আমিই নাকি টীমের ওপেনার। কিন্তু কটকে নামতেই, মতটা গেল পাল্টে। ওপেনিং করা তো দূরের কথা, টীমেই এলাম না।

বার বার ধাক্কা খেয়ে একটা ব্যাপার খুব ক্লিয়ার হয়ে গেল। বড় টীমে না খেললে রণজিতে কেউ খেলাবে না আমাকে। তাই পরের বছর মোহনবাগানের ধীরেন দত্ত যখন রিকোয়েস্ট করতে এলেন, মোহনবাগানের হয়ে খেলার জন্য তখন একটি শর্তে রাজী হয়েছিলাম : আমায় রণজিতে চান্স দিতেই হবে।

ক্লাব কন্ডিশন রেখেছিল। সিক্সটিতে সত্যি সত্যি ব্যাট হাতে রণজি ট্রফিতে খেলতে নামলাম, গৌহাটিতে আসামের বিরুদ্ধে। সেই আমার প্রথম ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ। ওয়ান ডাউন খেলতে নেমে আমি করেছিলাম ১৪১। আমার পার্টনার নিমাই রায়েরও ছিল ওটাই প্রথম খেলা। ও-ও করেছিল সেঞ্চুরী। পঙ্কজদা ঐ খেলায় বিশেষ কিছু করতে পারেন নি।

নেকস্ট ম্যাচ ছিল উড়িষ্যার সঙ্গে। কথা ছিল ওয়ান ডাউন নামব। কিন্তু দলের ম্যানেজার নীহার মিত্র খেতে দিলেন না। আমি নাকি ভীষণ স্লো। পাঁচ নম্বরে খেলতে গিয়ে সেদিন ১১০ মিনিটে করেছিলাম ১০৪ রাণ। আর ঐ খেলাটির জন্যই উইজডেনের পাতায় সেবার আমার নাম ছাপা হয়েছিল আরো দুটি বিখ্যাত মানুষের পাশে। প্রথম খেলতে নেমে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচে পর পর দুটি খেলায় সারা পৃথিবীতে এর আগে আর মাত্র দুজন সেঞ্চুরী করেছিলেন। তাঁদের নাম জানে সবাই—আর্থার মরিস ও নরী কনট্রাক্টর। উইজডেনের পাতায় আমার জায়গা হলেও দেশী কাগজে এ খবরটা কোনদিনই ছাপা হয় নি।

পরের খেলায় বিহারের এগেনস্টে করলায় সাতাত্তর। রণজির পারফরমান্স দেখে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দলে আমার ডাক পড়ল। জামসেদপুরের কয়ের ম্যাটিংয়ে প্রথম ইনিংসে সুবিধে করতে পারি নি। তবে সেকেন্ড ইনিংসে নট আউট ৫৪ করে সেদিন টীমকে বাঁচিয়ে ছিলাম আমিই।

ঐ ৭৪ নট আউট আমায় জামসেদপুর থেকে ডেকে নিয়ে গেল মাদ্রাজে, টেস্ট ট্রায়ালে। ফিফথ টেস্ট দিল্লীতে আমি রিজার্ভে এলাম।

এত বড় খবরটা যখন আমার মা শুনলেন, তখন দুঃখ করে বলেছিলেন, খেলাধুলো ছেড়ে টাকা রোজগারেই নাকি আমার মন দেওয়া উচিত।

আগেই বলেছি আপনাকে আমাদের মাড়োয়ারী কমিউনিটিতে কেউ খেলাধুলো পছন্দ করে না। চিরদিন আত্মীয়রা আমায় ডিসকারেজ করেছেন। পরিচিতরা আড়ালে ঠাট্টা করেছেন। শুধু সাহায্য পেয়েছি একজনের। তিনি বি কে বিড়লা। নিজে ডেকে আমায় এই চাকরীটা দিয়েছিলেন একবাক্যিতে। লেক ভিউ রোডের ওপর প্রাসাদ বাড়ীটার তেতলায় বিড়লা কোম্পানীর অফিসে বসে সেদিন শুনেছিলাম পোদ্দারের নিজের মুখে তাঁর ক্রিকেট জীবনের কথা।

পাতলা ছিপছিপে উজ্জ্বল শ্যামল মানুষটির চলনে বাঁশের মত নিকোনো-পুকোনো মেদবর্জিত শরীরের মজবুত। ঠিক জন্যই। যে বয়সে সবাই ভুঁড়ি বাগিয়ে সোজা সটান সামনে পথ আটকে হাঁটতে চায়, সেই বয়স হোতে প্রকাশ পোদ্দার আজো নিয়মিত ফ্রিহ্যাণ্ড এক্সার-সাইজ করেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন?

বাবা, তাহলে ক্রিকেট খেলব কি করে! ভুঁড়ি হলে ছুটতে পারব না, কোমর নোয়াতে পারব না। ফিল্ডিং দিতে কষ্ট হবে। তাহলে খেলার চার্মটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে। আর ঐ চার্মটুকু পেতে চাই বলে তো আজো সবাই ধর্ম আঁকড়ে রয়েছি। ক্রিকেট ছাড়ার কথা ভাবতেই পারি না। পারি না বলেই তো এতো ঘা খেয়েও আমি ক্রিকেটেই আছি। স্কুল টীমে চান্স পাইনি, যদিও বেঙ্গল স্কুল টীমে আমার নাম ছিল। ক্লাবের খেলায় ভাল খেলেও লীগ ম্যাচে চান্স পাই নি। ইউনিভার্সিটির খেলায় রেকর্ড করেও আমার সঙ্গ দাঁড়াতে হয়েছে অনেক, রণজি ট্রফির খেলায় দলে জায়গা করে নেওয়ার জন্য। আর জোনাল বা টেস্ট ট্রায়ালে বার বার প্রমাণ দিয়েও আমি হয়েছি উপেক্ষিত।

ষাট থেকে চৌষট্টি—পর পর চার বছরে তিনবার টেস্ট রিজার্ভে আমার নাম উঠেছে। পাকিস্থান এম সি সি, আবার এম সি সি। শেষ পর্যন্ত কিভাবে ওরা আমার নাম দিল জানেন? সিকসটি থ্রি-সিকসটি ফোর সিরিজে কলকাতায় থার্ড টেস্টের আগে হঠাৎ শুনলাম আমার নাকি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাই রিজার্ভেও আমার নাম নেই।

আজ চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটা টাটকা জোয়ান মানুষ। ধা ধা পোড়া রোদে কলকাতার এপ্রিল মে মাসে খেলি ক্রিকেট। খেলেছি এক যুগেরও ওপর। সেই আমি কিনা হার্টের রুগী। অথচ এর পরেই আবার আমাকে ডাকা হোল ফোর্থ আর ফিফথ টেস্টে টুয়েলফথ ম্যান হিসাবে। তারপর আর ডাক আসে নি।

আসে নি তো আসে নি। তাতে কি? জানি দৌড়োয় সবাই, কিন্তু পুরস্কার পায় একজন। টেস্ট দলে চান্স না পেয়ে যত না দুঃখ পেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী অপমানিত হয়েছি, আমার ক্লাবের (মোহনবাগান) প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসবে ফেস্টিভ্যাল ম্যাচে শেষ মুহূর্তে দল থেকে বাদ পড়ায়।

সোবার্স, বুচার, হান্টার আমেদ, কাউড্রে, ব্যারী নাইট, কেনিয়নদের নিয়ে আনন্দ গোতার এসেছিলেন সেবার (১৯৬৫) এই খেলায় যোগ দিতে। ভারতীয় দলের প্রথম বারো জনের মধ্যে আমিও ছিলাম। খেলার আগের দিন খবর এল নাদকার্ণী আসবেন না, হাত ভেঙ্গে গেছে। আমি জানি আমি নিশ্চয় খেলছি। শেষ মুহূর্তে শুনতে পেলাম এগারজনের লিস্টে আমার নাম নাই। আমার জায়গায় নেওয়া হয়েছে সুব্রামানিয়ামকে। ওর দুটি বড় জবর—স্বয়ং ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একজন মাতব্বর কর্তাব্যক্তি। তাঁর ফিয়াঁসেকে সম্মান জানাতে গিয়ে সেদিন ক্লাব আমার পাঁচ বছরের সার্ভিস রেকর্ডকে উপেক্ষা করেছিল। মনে আছে কে জানি বলেছিল, যাও না ধীরেনদাকে (ধীরেন দে) গিয়ে একটু বল টল। আমি রাজী হই নি। আমার অভিমানকে দম্ভ মনে করে সেদিন অনেক কর্তাব্যক্তি বড় নিষ্ঠুরের মত বলেছিলেন ঃ পোদ্দার, তোমার মত কত প্লেয়ার সাধে মোহনবাগানে খেলার জন্য।

আমি সাধি নি। জুবিলী ম্যাচ শেষ হোতে না হোতেই সিংহলের বিরুদ্ধে আন-অফিসিয়াল টেস্টে চান্স পেয়ে গেলাম ব্যাঙ্গালোরে। ঐ টেস্টে আমি ছিলাম টুয়েলফথ ম্যান। সেকেন্ড টেস্ট হায়দ্রাবাদে। জয়সীমার সঙ্গে আমি ইনিংস ওপেন করলাম। একশ রানের পার্টনারশীপে আমার কন্ট্রিবিউশন ছিল ৩৪। হায়দ্রাবাদ থেকেই চলে গেলাম রাজস্থানে। ভেবেছিলাম আর কোনদিনই খেলব না বাংলায়।

তিন বছর (১৯৬৫—'৬৭) আমি রাজস্থানের হয়ে খেলেছি। রণজি ট্রফির খেলায় রাজস্থানের হয়ে করেছি দুটো সেঞ্চুরী। পরবর্তী-জোনাল সিরিজে বিদর্ভের বিরুদ্ধে করেছিলাম ১৭৬। ঐ বছর দেশের সেরা পাঁচজন খেলোয়াড়ের যে লিস্ট বেরিয়েছিল হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে তাতে অজিত ওয়াদেকর, প্রসন্ন, অম্বর রায়, সি জি জোশীর পাশে আমারও নাম ছিল।

কিন্তু কলকাতায় চাকরী করে ঘর-সংসার সামলে (শেষটুকু বিয়ে করেছেন) শুধুমাত্র দু-একটা রণজির খেলায় রাজস্থানের হয়ে খেলে আমি নিজেই টের পাচ্ছিলাম যে শেষ হয়ে যাচ্ছি। তাই সাতষট্টির শেষে আবার কলকাতায় কালীঘাটে নাম লেখালাম। ঐ বছরটাই শুধু খেলেছি কালীঘাটে। আমি ছিলাম ক্যাপ্টেন। ন' বছর পরে কালীঘাট আবার সিনিয়র নক আউট টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হোল। যে সম্মান সুভাষ গুপ্তে, বালু গুপ্তে, পটু চৌধুরী, খোকন সেনের মত ভারত বিখ্যাত খেলোয়াড়েরাও ক্লাবকে এনে দিতে পারেন নি।

পরের বছর খেলি নি কোথাও। উনসত্তরে আবার এলাম মোহনবাগানে, ক্রিকেট সেক্রেটারী অশোক ঘোষের অনুরোধে। অশোকবাবুর অনুরোধ ঠেলতে পারি নি শুধু একটি কারণে, খেলার মাঠে এ রকম একটা মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। অন্তত আমি তো পাই নি এর আগে।

থামলেন পোদ্দার। দীর্ঘ পনেরো বছরের ক্লাব, স্টেট, জোনাল, ও আন-অফিসিয়াল টেস্ট কেরিয়ারের মাঠে-ময়দানে যে অভিজ্ঞতার পুঁজি আজ তাঁর সঞ্চয়ে বাংলাদেশে একমাত্র শ্যামসুন্দর মিত্র ছাড়া আর কারুর সাধ্য নেই যে তাঁর সঙ্গে টেক্কা দেয়। জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মতে বাংলার সেরা ব্যাটসম্যান কে? একটুও না ভেবে উত্তর দিয়েছেন, প্রথমে পঙ্কজ রায়, আর এখন শ্যামসুন্দর। আর সেরা বোলার কে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটু সময় নিয়েছেন পোদ্দার। তারপর ধীরে-সুস্থে ভেবেচিন্তে জবাব দিয়েছেন, দেখুন সুব্রত গুহ যখন পীকে (১৯৬৫—৬৭) তখন আমি রাজস্থানে খেলতাম, তাই ভাল করে দেখি নি ওকে। তবে যাদের সঙ্গে খেলেছি, তাদের মধ্যে অনডাউটেডলি সেরা বোলার সৌমেন কুণ্ডু (স্পিনার)।

বলেই একটু হাসলেন পোদ্দার, তারপর লাজুক মুখে বললেন, জানেন, কলেজ জীবনে প্রথম আমি টীমে চান্স পাই লেগ স্পিনার হিসাবে। তখন ব্যাট করতে নামতাম দশ নম্বরে।

দশ নম্বর ব্যাটসম্যান আজ বাংলাদেশের পয়লা নম্বরী খেলোয়াড়। সমবয়সী আর সবার যখন ফর্ম পড়ে যাচ্ছে, তখন পোদ্দার শুধু খেলছেন তাই নয়, হাত খুলে খেলছেন। মাত্র এক রানের জন্য সেদিন বিদর্ভের বিপক্ষে ডাবল সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। আর এ বছরের রণজি ট্রফিতে বাংলা দলের শেষ খেলার স্মৃতি তো এখনো ইডেনের ঘাসে মাখো মাখো হয়ে লেগে আছে।

তিরিশ বছর—এ শব্দ দুটি এদেশের ক্রিকেটে শেষের চেয়েও ভয়ংকর। যদিও বিদেশে তিরিশেই একজন ক্রিকেটার শিখর লাভ করেন। ব্যারিংটন, কাউড্রে, কম্পটন, ইলিংওয়ার্থ, কানহাই, সোবার্স কত আর নাম করব। তবে কেন আমরা ধরে নেব যে আমাদের ভাদ্দো জলের মত পাতলা? যদি একজনের কাছে আজ আশা করি যে সে এই অপবাদ দূর করবে তবে কি সেটা অন্যায় হবে?

কিন্তু যে যেখানে যাই খেলুন না কেন, তাদের দেখছে কে? সবটুকু পরিণতি নিয়ে একটা খেলোয়াড় যখন নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত, তখন আহ্বান এসে পৌঁছায় কে?

—অম্বিকা

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
অ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়

জার্মাণীর মহানায়ক এ্যাডলফ হিটলার

পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মত এমন প্রলয়কাণ্ড আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রাকৃতিক জগতে যেমন ভূমিকম্প, তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তুলনা একমাত্র সেই আদিম ধ্বংসকাণ্ডের সঙ্গেই দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই মহাপ্রলয়ের মহানায়ক কে? কে সমগ্র মনুষ্য জাতিকে এমন সর্বনাশের কিনারায় নিয়া আসিয়াছিল? তাঁর নাম এ্যাডলফ হিটলার, প্রকৃতপক্ষে যাঁকে কেন্দ্র করিয়া সারা পৃথিবী এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আবর্তিত হইয়াছিল। যদিও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে এমন কথা বলা উচিত নয় যে, একটিমাত্র ব্যক্তির জন্যই সমগ্র পৃথিবী এভাবে আলোড়িত হইয়াছিল, বরং বলা উচিত যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সমসাময়িক পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ঔপনিবেশিক ও সামাজিক প্রচণ্ড সংঘাতগুলির জন্যই মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল এবং হিটলারের মত এক অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল,—যেমন সময়-সময় সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গাঘাতে রাক্ষসে ধরনের অতিকায় তিমি মৎস্য পৃথিবীর তটপ্রান্তে ছিটকাইয়া পড়ে! তথাপি এই 'একক' মানুষটি—স্ত্রী-পুত্র পরিবারহীন 'নিঃসঙ্গ' বিচিত্র এই মানুষটি ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য এবং দুর্বোধ্যকর ব্যক্তিত্বের মত। আলেকজাণ্ডার বা সীজার, নেপোলিয়ন বা স্টালিন কারুর সঙ্গেই এঁর তুলনা দেওয়া যায় না। কারণ, হিটলারের মধ্যে কোন অনন্যসাধারণ মনীষা, কোন গভীর অন্তর্দৃষ্টি কিম্বা বিন্দুমাত্র মানবিকতা ও মনুষ্যবোধ ছিল না। যদিও কূটনৈতিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সামরিক কৌশলে 'অপরাজেয়' তুল্য ছিল। তথাপি এই মানুষটি সমগ্র ইউরোপকে এবং সমসাময়িক পৃথিবীকে যেন পাগল করিয়া দিয়াছিল, এমন কি, অতীতের সমস্ত জননায়ককে যেন অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই অদ্ভুত মানুষটির জীবনকথা একটু বিস্তৃত আকারে আমাদের জানা দরকার। যে জীবনের সঙ্গে কোটি-কোটি মানুষের জীবন-মৃত্যু জড়াইয়া পড়িয়াছিল।

অস্ট্রিয়া ও ব্যাভেরিয়ার সীমান্তে যেখানে ইন্ Inn নদী প্রবাহিত, তারই তটবর্তী ব্রাউনাউ নামক একটি ক্ষুদ্র শহরের এক পান্থশালায় হিটলার ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময়। সন্ধ্যাকালে যাঁর জন্ম, তিনি যে পৃথিবীতে অন্ধকার ডাকিয়া আনিবেন, তা আর বিচিত্র কি? অথচ সেদিনের ইউরোপ অন্ধকার ছিল না,—(যদিও সেই ইউরোপকে তিনিই ধ্বংস করিয়াছিলেন) বরং ছিল চারিদিকে সমারোহ ঐশ্বর্য গরিমায় ও রাজকীয় মহিমায় উজ্জ্বল—হ্যাপসবুর্গ বা ইউরোপের প্রাচীনতম রাজবংশের অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, হোহেনজোলার্ন বা কাইজারের জার্মানী, রোমানোভ বা জারদের রুশ সাম্রাজ্য এবং অটোমান বা তুর্কি সাম্রাজ্য। হিটলার যখন জন্মগ্রহণ করেন লেনিন তখন ১৯ বছরের ছাত্র মাত্র, এবং সে বয়স থেকেই তিনি সরকারের সঙ্গে সংগ্রামী, আর মুসোলিনী ৬ বছরের শিশু মাত্র, যাঁর জন্ম দরিদ্র কামারের ঘরে। বড় হইয়া হিটলার লেনিনের 'বর্বর বলশেভিক' রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য মুসোলিনীকে তিনি মনে-মনে অবজ্ঞা করিতেন, যদিও উভয়ে ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সহযাত্রী!

পারিবারিক ইতিহাস খুঁজিলে দেখা যায় যে, হিটলার বা তাঁর বংশ ও পূর্বপুরুষ আসলে জার্মানীর নাগরিক বা প্রজা ছিলেন না। এমন কি জার্মান ক্ষমতা লাভের দুই-এক বছর আগে পর্যন্ত তিনি জার্মানীর নাগরিকও ছিলেন না! এমন কি 'হিটলার' নামক পারিবারিক পদবীটি পর্যন্ত নকলভাবে পরিবর্তিত। অর্থাৎ হিটলারের পূর্বপুরুষ ছিলেন 'হিডলার' (Hiedler) এঁরা ছিলেন ভিয়েনা থেকে মাইল পঞ্চাশেক উত্তর-পশ্চিমে একটি দূরবর্তী জেলা ও দরিদ্র গ্রামের বাসিন্দা। হিটলারের পিতামহরূপে যিনি পরিচিত, সেই যোহান জর্জ হাইডলার (Johann Georg Hiedler) নামীয় ব্যক্তিটির কাহিনী কিঞ্চিৎ শোনাবো। তিনি ছিলেন ভবঘুরে গোছের লোক। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি মারিয়া আনা শিকলগ্রুবার নাম্নী একটি কৃষক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। কিন্তু পাঁচ বছর আগে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এই কৃষক রমণীর 'Alois' নামে একটি জারজ ছেলে জন্মিয়াছিল, কিন্তু এই জারজের জন্মদাতা কে, তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় নাই, যদিও হিটলারের পিতামহ বলিয়া কথিত যোহান হাইডলারই পরবর্তীকালে তাঁর পিতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অর্থাৎ হিটলারের পিতা এ্যালয়েস হাইডলারের আসল জন্মদাতা কে, (তিনি যে প্রথমে জারজ সন্তানরূপেই কৃষক রমণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, তাতে সন্দেহ নাই।) তা আজও নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় নাই। কেউ কেউ সন্দেহ করেন যে, একজন ইহুদীই এই জারজ সন্তানের (অর্থাৎ হিটলারের পিতার) জন্মদাতা ছিলেন। এজন্যই কি হিটলার অল্প বয়স হইতেই ইহুদী বিদ্বেষী ছিলেন এবং ইহুদীদিগকে চরিত্রহীন বলিয়া গালাগালি দিতেন? সেকথা যাউক। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে Alois Hiedler নিজকে 'হিটলার' নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন (এই পদবী পরিবর্তনও রহস্যজনক)। এবং এ্যালয়েস হিটলারের তৃতীয় স্ত্রীর তৃতীয় সন্তান হইতেছেন এ্যাডলফ হিটলার। একটিমাত্র বোন ছাড়া হিটলারের আর ভাই-বোনেরা ছোট বেলাতেই মারা গিয়াছিল। তবে হিটলারের বৈমাত্র ভাই-ভগ্নীও ছিল। (১)

মোট কথা হিটলার কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান নন শিক্ষা ও চিন্তাধারার কোন পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর নাই। স্বয়ং পিতামহীর দিক থেকে কিছু চরিত্র-ঘটিত কেলেঙ্কারী ছিল, পিতার বিশেষ ইতিহাসও সম্মানজনক ছিল না। এবং পারিবারিক জীবনও সুখের ছিল না। কারণ, হিটলারের পিতা এ্যালয়েস হিটলারের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন স্বামীর চেয়ে ১৪ বছরের বড় এবং অসুস্থ। (তিনি নিজও অপরের পালিতা কন্যা ছিলেন) তাঁর মৃত্যুর পর হিটলারের পিতা একটি হোটেলের চাকরাণীকে বিয়ে করেন। এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিবাহের আগেই একটি ছেলে হইয়াছিল, অবশ্য জন্মদাতা ছিলেন হিটলারের পিতাই। এবং বিবাহের তিন মাস পরেই একটি মেয়ে হইয়াছিল (অর্থাৎ হিটলারের বিমাতার বিবাহের আগেই গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল)। — তৃতীয় বার

---

(১) সম্প্রতি হিটলারের পারিবারিক জীবন ও নির্ভরযোগ্য কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৬২ সালে। বইটি Pelican সংস্করণে প্রকাশিত—নাম 'Hitler'। প্রণেতা প্রখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক। Allan Bullock

আত্মজা। এই সৎ বোনের সঙ্গে হিটলারের সম্পর্ক ভাল ছিল এবং পরবর্তীকালে এই সৎ বোনের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে হিটলার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু হিটলারের পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীও মারা যান এবং আর পর আবার তিনি বিবাহ করেন নিজের আত্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যেই। এই তৃতীয় স্ত্রীই ছিলেন অ্যাডল্ফ হিটলারের জননী এবং তিনি বয়সে স্বামীর চেয়ে ২৩ বছরের ছোট ছিলেন। হিটলারের পিতা সাধারণ এক কাস্টমস অফিসারের চাকুরী করিতেন। অবস্থা ছিল চলনসই — নিম্নমধ্যবিত্তের অনুরূপ। অর্থাৎ খুব দরিদ্র ছিলেন না, যদিও হিটলার তাঁর আত্মজীবনীতে এই দারিদ্র্যের বড়াই করিয়াছেন। বালক হিটলার পাঁচ বছর প্রাইমারী স্কুলে পড়িয়াছিলেন, তারপর এগার বছর বয়সে তাঁকে একটি সেকেণ্ডারী স্কুলে (টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়েল) ভর্তি করান হইয়াছিল। কিন্তু এখানে পড়াশুনায় তাঁর মন ছিল না। বাধ্য হইয়া তাঁকে অন্য একটি স্কুলে ট্রান্সফার নিতে হইয়াছিল এবং এখানে ১৬ বছর বয়সেই তাঁর লেখাপড়ার ইতি! স্কুল লীভিং সার্টিফিকেট পর্যন্ত তিনি পান নাই। অর্থাৎ লেখাপড়ায় তিনি মোটেই ভাল ছিলেন না এবং সেজন্যই বোধহয় পরবর্তী জীবনে তিনি ডিগ্রীধারী ও ডক্টরেট এবং স্পেশালিস্টদের উপরে অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন, আর উচ্চ শিক্ষিত সমাজের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা পোষণ করিতেন। ১৯০৩ সালে হিটলারের পিতা মারা যান, কিন্তু তাঁর বিধবা মাতা যে পেন্সন পাইতেন, তাতেই তাঁদের সংসার চলিয়া যাইত।

স্কুলের লেখাপড়ায় হিটলার ব্যর্থ হইলেন বটে, কিন্তু ওই ছোট বেলাতেই তিনি একজন আর্টিস্ট বা চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। ১৯০৭ সালে তিনি অস্ট্রিয়ার সুবিখ্যাত ও ঐশ্বর্যশালী রাজধানী ভিয়েনার আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এ ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এখানেও হিটলার সুবিধা করিতে পারিলেন না, চিত্রশিল্প শিক্ষার উপযুক্ত বলিয়া তিনি বিবেচিত হইলেন না। এই ঘটনায় হিটলার নিদারুণ আঘাত পাইলেন। এদিকে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মাতাও মারা গেলেন। মায়ের সামান্য যা টাকাকড়ি ছিল (অনাথ বালক হিসাবে হিটলারের পেন্সনও প্রাপ্য ছিল) তা সম্বল করিয়া হিটলার পুনরায় ভিয়েনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি 'আকাদেমী অব আর্টস'য়ে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর এবারের ব্যর্থতা আরও মারাত্মক। কারণ, এবার ভর্তি হওয়ার জন্য কোন পরীক্ষাতে পর্যন্ত তাঁকে গ্রহণ করা হইল না। ডাইরেক্টর তাঁকে উপদেশ দিলেন, 'তোমার আর্ট শিল্প হইবে না, 'আর্কিটেকচারে (স্থাপত্য বিদ্যায়) চেষ্টা করিয়া দেখ' কিন্তু স্থাপত্য বিদ্যালয়েও তিনি ভর্তি হইতে পারিলেন না। কারণ, স্কুল লীভিং সার্টিফিকেট তাঁর ছিল না। নিদারুণ দুর্ভাবনায় ও মানসিক ক্ষোভে হিটলার পাঁচ বছরের জন্য গা ঢাকা দিলেন। কিন্তু এই পাঁচ বছর তাঁর অত্যন্ত কষ্টে কাটিল। কখনও কখনও দিন-মজুরের কাজ করিয়া কখনও বা সাধারণ লোকের ছবি আঁকিয়া এবং সময় সময় অনশনে-অর্ধাশনে থাকিয়া দিন কাটাইলেন। তাঁর জামা-কাপড় নোংরা হইয়া গেল এবং এই সময় তাঁর চেহারা এমন হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁকে দেখিলে ভদ্র যুবক বলিয়াও মনে হইত না! তবে, ছবি আঁকার জন্য এবং চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য যে, এই দিক দিয়াও কোন সাফল্য তিনি অর্জন করিতে পারিলেন না। এই সময় তিনি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ, বিমর্ষ ও উদাসীন ছিলেন। এমন কি ভিয়েনার সুন্দরী যুবতীরাও তাঁকে আকর্ষণ করিতে পারিল না।

• • •

এভাবে যৌবনের প্রথম দিনগুলি হিটলারের কাটিল ভিয়েনা শহরে তাঁর জীবন-সংগ্রামে, উদাসীন ও বাউণ্ডুলে বৃত্তিতে। এই পর্যন্ত হিটলার তাঁর পরিচিত মহলের নিকট 'ভ্যাগাবণ্ড' বা ভবঘুরে ছাড়া আর কোন বোলাতার দ্বারা চিহ্নিত হইতে পারিলেন না। এমন কি তাঁর একজন বন্ধু পর্যন্ত জুটিল না। শেষ পর্যন্ত ১৯১৩ সালের বসন্ত কালে হিটলার চিরদিনের জন্য ভিয়েনার আশ্চর্য নগরী (যেখানে তাঁর জীবন ও জীবিকার কোন মীমাংসা হইল না) ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং জার্মানীর মিউনিক শহরে গিয়া হাজির হইলেন। এখান হইতেই হিটলারী জীবনের নূতন ইতিহাসের সূচনা—যদিও ভিয়েনার মত মিউনিক শহরেও তিনি কপর্দকশূন্য ছিলেন। কিন্তু মহাযুদ্ধ তাঁকে বাঁচাইয়া দিল, ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে (আগস্ট) পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ। হিটলার ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধের উত্তেজনা অনুভব করিতেন। সুতরাং তিনি সাগ্রহে এবং তীব্র আবেগের সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, স্বেচ্ছায় দরখাস্ত করিয়া একটি ব্যাভেরিয়ান রেজিমেন্টে যোগ দিলেন। কিন্তু ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে কর্পোরাল হিটলারকে দেখা গেল পোমেরানিয়ার একটি হাসপাতালে শায়িত অবস্থায়—যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি জখম হইয়াছিলেন, ক্লোরিণ গ্যাস বা বিষবাষ্প (কোমিনেসের নিকট বৃটিশ আক্রমণের ফল) লাগিয়া তাঁর চোখ অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য সেই অন্ধত্ব ছিল সাময়িক, পরে তিনি সারিয়া উঠিয়াছিলেন। (প্রথম মহাযুদ্ধের এই অন্ধত্বই কি তাঁকে পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক অন্ধত্ব আনিয়া দিয়াছিল?) কিন্তু হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিবার সময়েই তিনি জার্মানীর পরাজয়ের কথা শুনিয়াছিলেন। এই 'হৃদয়-বিদারক' সংবাদে অসুস্থ হিটলার প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, তাঁর কাছে ইহা অবিশ্বাস্য মনে হইল। সমগ্র জার্মানীতে তখন বিপর্যয়, পরাজয়ের আঘাতে সকলে মুহ্যমান—দেশে স্ফূর্তি নাই, আইন ও শৃঙ্খলা নাই, চতুর্দিকে দুর্দিন ও অন্ধকার। আর জার্মানীর 'চিরশত্রু' ফ্রান্স জয়ী! এই চিন্তা অন্ধ সিপাই হিটলারকে পাগল করিয়া তুলিল। তাঁর নিজস্ব বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—নিশ্চয়ই কোথাও কোন মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা ঘটিয়াছে। অন্যথা জার্মানীর পরাজয় ঘটিতে পারে না। কারা, কোন্ দুর্বৃত্তেরা এই পরাজয়ের জন্য দায়ী? এই চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকিল। কারণ, জার্মানী ও জার্মান জাতি তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল। তিনি নিজে জার্মানীতে জন্মান নাই, জার্মান নাগরিকও তিনি নন, (অস্ট্রিয়াতে তাঁর জন্ম) অথচ জার্মানী ও জার্মান জাতি বলিতে তিনি যেন অজ্ঞান! হিটলারের জীবনে যেমন অন্যান্য ব্যাপারে বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আছে, তেমনি জাতিপ্রেম ও জাতিবিদ্বেষেও ভয়ঙ্কর বাড়াবাড়ি আছে, তাঁর ইহুদীবিদ্বেষ ও নর্ডিক প্রীতি কিম্বা জর্মানীর প্রতি প্রেম বোধ এবং অনুভূতির দুই বিপরীত দিক মাত্র।

হিটলার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাইলেন। কিন্তু তখনও সৈন্যের ইউনিফর্ম তাঁর পরণে। নতুন জামার প্রতি একটা ছোট ছেলের যেমন গভীর মমতা থাকে, তেমনি মমতা ও আগ্রহ ছিল তাঁর সৈনিকের ইউনিফর্মের প্রতি। তাঁর এই আগ্রহ থেকেই বোঝা যায় যে, যুদ্ধের জন্য তাঁর যেন একটা স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। অবশ্য তিনি নিজেও তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাঁর আত্মজীবনীতে এবং পরবর্তীকালে তাঁর পার্শ্বচর ও সেনাপতিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাইয়া হিটলার কি দেখিলেন তাঁর চারিদিকে? তখন ১৯১৮ সালের শীতকাল। জার্মানীতে বিপ্লবের নামে বিপর্যয় চলিতেছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জার্মান সম্রাট বা কাইজার দেশত্যাগী হইয়াছেন (হল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়াছিলেন)। রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন করিয়া রিপাবলিক ঘোষণা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলত সেই পুরাতন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই চলিতেছিল। অর্থাৎ ১৯১৮ সালের বিপ্লবটা আসলে বিপ্লবের ফাঁকা আওয়াজ ছিল মাত্র—যদিও 'লাল বিপ্লবের' আতঙ্ক চারিদিকে ঘনীভূত ছিল। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হিটলারের চোখের সামনে জার্মানীর কি চিত্র ভাসিয়া উঠিল? চার্চিলের ভাষায়—

Around him in the atmosphere of despair and frenzy glared the lineaments of Red Revolution. Armoured cars dashed through the streets of Munich scattering leaflets or bullets upon the fugitive way-farers. His own comrades, with defiant red arm-bands on their uniform, were shouting slogans of fury against all that he cared for on earth. As in a dream everything suddenly became clear.

Germany had been stabbed in the back and clawed down by the Jews, by the profiteers and intriguers behind the Front, by the accursed Bolsheviks in their international conspiracy of Jewish intellectuals. Shining before him he saw his duty, to save Germany from these plagues, to avenge her wrongs and lead the master race to their long-decreed destiny".

সোজা কথায় এবং সংক্ষেপে হিটলারের ধারণা ছিল যে, ইহুদীরাই জার্মানীকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করিয়াছে, আর আঘাত করিয়াছে মুনাফাবাজ লুঠেরার দল এবং চক্রান্তবাজেরা। সেই সঙ্গে তিনি জার্মানীর এই পতনের জন্য 'অভিশপ্ত বলশেভিকদের'ও দায়ী করিলেন।—ইহুদী বুদ্ধিজীবিদের আন্তর্জাতিক চক্রান্তে যে বলশেভিকরা অংশীদার। হিটলার তাঁর কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন—জার্মানীকে এই অধঃপতন থেকে উদ্ধার করিতে হইবে, তার প্রতি এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে হইবে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ জার্মানীর জন্য যে ভাগ্য-লিপি অপেক্ষা করিয়া আছে, তাকে সেই 'মাস্টার রেস'এর বা পৃথিবীর সেরা জাতির শীর্ষমর্যাদায় উন্নীত করিবার মহৎ ব্রত পালন করিতে হইবে। পরাজিত জার্মানীর আহত হিটলারের ইহাই হইল নূতন সঙ্কল্প।

এই সঙ্কল্প সাধনের প্রথম সুযোগ আসিল মিউনিকের এক ভাটিখানায় জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির সভায় যোগদানের ফলে। হিটলার যে রেজিমেন্টের অধীনে সৈনিকের চাকুরি নিয়াছিলেন সেই রেজিমেন্টের অফিসারেরা মিউনিকের বৈপ্লবিক ও অরাজক আবহাওয়ার জন্য প্রমাদ গণিলেন। তাঁরা হিটলারের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন যে, এই লোক দিয়া তাঁদের কার্যোদ্ধার সম্ভব হইবে। অর্থাৎ কোথায় কে চক্রান্ত করিতেছে, কারা সাবোটাজ করার জন্য তৈয়ার হইতেছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কোথায় কি করিতেছে, এই সমস্ত গোপন কার্যকলাপ সন্ধানের জন্য হিটলারকে নিয়োগ করা হইল। বাহ্যতঃ পদটির নাম হইল 'পলিটি-ক্যাল এডুকেশন অফিসার', কিন্তু কার্যত রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরি মাত্র। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় 'কর্পোরাল হিটলার' এই গোয়েন্দাগিরি কার্যের ব্যাপদেশেই গিয়া হাজির হইলেন জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির এক সমাবেশে। কিন্তু সেখানে গিয়া এই প্রথম তিনি তাঁর মনের মত কথা শুনিতে পাইলেন। অর্থাৎ কারা জার্মানীর সর্বনাশ করিয়াছে, কারা সেই 'নভেম্বর ক্রিমিন্যাল' (১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর জার্মানী পরাজয় স্বীকারে ও যুদ্ধবিরতিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিল) যারা জার্মান বাহিনীর এই অসম্মানের জন্য দায়ী, আর দুষমন ইহুদী, ইহাদের সাবাড় করিতে হইবে—এই ধরনের মুখ চাপা কথা হিটলার শুনিতে পাইলেন সেই সভায়। ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি এই পার্টিতে যোগ দিলেন এবং ছোটবেলা হইতেই বক্তৃতাবাজীতে তাঁর অভ্যাস ছিল, এই পার্টিতে যোগ দিয়া তিনি প্রোপাগাণ্ডার ভার বহিতে লাগিলেন। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিউনিকে জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির প্রথম জনসমাবেশ হয় এবং এই সমাবেশে হিটলার ২৫ দফা কর্মসূচী পেশ করিলেন, তিনিই সমগ্র সভার উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন এবং সেদিনের সমাবেশেই তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা বনিয়া গেলেন। জাতীয় মুক্তির অভিযান তিনি শুরু করিলেন। এপ্রিল মাসে তিনি সরকারীভাবে রেজিমেন্ট হইতে ছাড়া পাইলেন এবং তখন হইতে তাঁর সমস্ত শক্তি ও সমগ্র জীবন পার্টি ও রাজনৈতিক কর্মে নিয়োজিত হইল। পরের বছর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই তিনি দলের সমস্ত পুরনো নেতাদের হটাইয়া দিলেন, আর নিজের প্রতিভা ও শক্তির দ্বারা সমগ্র পার্টির উপর যেন ইন্দ্রজাল বিস্তার করিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্বের মোহের দ্বারা পার্টি ইতিমধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বলা যাইতে পারে যে, তখন হইতেই তিনি 'ফুয়েরার'রূপে দেখা দিলেন।

জার্মানীর তখন ঘোরতর দুর্দিন। সেই দুর্দিনে হিটলারের প্রচণ্ড উত্তেজক বক্তৃতাগুলি যেন অগ্নিকণা ছড়াইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত জার্মান জনগণ তাঁর কথা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৯২৩ সালে ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর খনিসমৃদ্ধ বিখ্যাত রুড় অঞ্চল দখলের ফলে সারা জার্মানীতে ক্রোধ ও ক্ষোভের ঝড় বহিয়া গেল। সেই সঙ্গে জার্মানীর মার্ক মুদ্রার পতন জার্মানীর মধ্যবিত্ত সমাজকে একেবারে পথে বসাইয়া দিল। এই দুরবস্থা হইতে ত্রাণ পাইবার আশায় ১৯২৩-২৪ সালের মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিটলারের দলে যোগ দিল এবং যারা বেকার সংখ্যায় অজস্র। দরিদ্র ও বঞ্চিত তারাও হিটলারী মতবাদের ভক্ত হইয়া উঠিল। জার্মানীর সামরিক ঐতিহ্য-বাদী পুরাতন আর্মি বা সেনাবাহিনীর এক শ্রেণীর অফিসারও হিটলারের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এভাবে নবগঠিত হিটলারী দল বিশেষ 'National sozialist Party' (সংক্ষেপে Nazi বা নাৎসী) শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কার্যত মিউনিকের সেই ওয়ার্কার্স পার্টিই ১৯২০ সালের ১লা এপ্রিল নাৎসী পার্টিতে পরিণত হইল। Storm Troopers বা ঝটিকাবাহিনী নামে প্রাইভেট আর্মি (ভাড়াটে সৈন্যদের মাঠে নামিয়ে দেওয়ার জন্য) গঠিত হইল, তাদের ইউনিফর্ম হইল বাদামি রংয়ের শার্ট, এজন্য নাৎসীদিগকে 'ব্রাউন শার্ট'ও বলা হইত। যেমন ইতালীয় ফ্যাসিস্টদিগকে 'ব্লাকশার্ট' বলা হইত। আর স্বাস্তিক চিহ্ন হইল নাৎসী পার্টির সুপরিচিত প্রতীক চিহ্ন—যে চিহ্ন ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে পবিত্রতার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত, সেটা এখন ভয়ের ও নৃশংসতার চিহ্ন হইয়া উঠিল। একে একে হিটলারের চারিদিকে আসিয়া জুটিল সেই সমস্ত দুর্ধর্ষ নাৎসী নেতা যাদের একত্র সমবায়ে জার্মানী এবং ইউরোপ কাঁপিয়া উঠিল। গোয়েরিং, হেস, রোজেনবার্গ, রোয়েম প্রভৃতি ধূমকেতুর মত উদিত হইতে লাগিলেন। হিটলার ও তাঁর সঙ্গীরা স্থির করিলেন যে, ব্যাভেরিয়া রাজ্যের রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিতে হইবে। এজন্য তাঁরা 'Putsch' বা ক্ষমতা দখলের অভিযান সংগঠন করিলেন। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ সৌনিকের

(২) উইনস্টোন চার্চিল রচিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড—"The Gathering Storm". পৃঃ ৪২

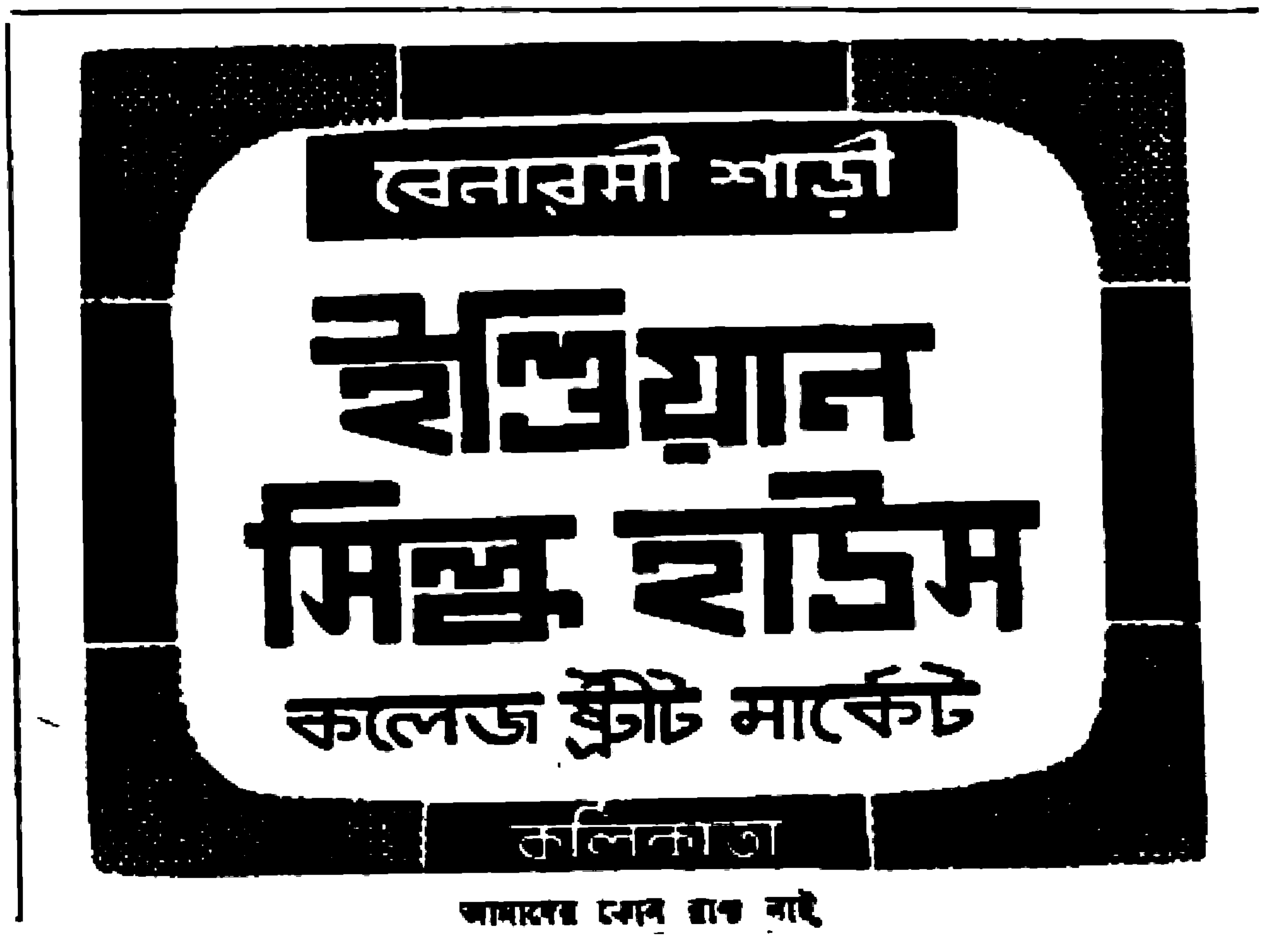

জার্মানীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতা জেনারেল লুডেনডর্ফ হিটলারকে সমর্থন জানাইলেন এবং এই বে-আইনী অভিযানে নিজে যোগ দিলেন। কিন্তু মহাযুদ্ধের আগে হইতেই জার্মানীতে একটা চলতি কথা ছিল—

> 'In Germany there will be no revolution, because in Germany all revolutions are strictly forbidden.'

অর্থাৎ জার্মানীতে কোন বিপ্লব হইতে পারিবে না। কারণ, জার্মানীতে সমস্ত বিপ্লবই অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ! সুতরাং এই সূত্র অনুসারে হিটলারী বৈপ্লবিক অভিযানে মিউনিকের পুলিশ ও মিলিটারি বাধা দিল। তারা গুলী চালাইল, কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জেনারেলকে বাঁচাইয়া। এদিকে জেনারেল লুডেনডর্ফ সোজা মার্চ করিয়া সৈন্যদের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্যরা তাঁকে সাষ্টাঙ্গপূর্বক সসম্ভ্রমে স্বাগত জানাইল।(৩) আর এদিকে হিটলার গুলীর মুখে মাটিতে একেবারে শুইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিলেন। কিন্তু এই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে প্রায় ২০ জন নিহত হইল। হিটলার পালাইলেন, কিন্তু পরে ধৃত হইয়া ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে চারি বছরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু হিটলারকে জার্মানীর একজন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক সুসন্তান বলিয়া মনে করা হইল। সুতরাং কর্তৃপক্ষ তাঁর দণ্ডাদেশ কমাইয়া ১৩ মাস করিলেন। তিনি ল্যান্ডসবার্গ দুর্গে বন্দী হইলেন এবং এই কারাবাসের সময়েই তিনি তাঁর সুবিখ্যাত আত্মজীবনী 'Mein Kampf' লিখিলেন। ফলে পরবর্তীকালে নাৎসীদের কাছে নতুন বাইবেলে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে হিটলারী জার্মানীতে বাইবেলের পর আর কোন বইয়ের এত বিক্রি হয় নাই। একটি নাৎসী প্রকাশক কোম্পানী যখন এই বই প্রকাশ করেন, তখন ১৯২৫ সালে এই বইয়ের প্রথম বিক্রি হইয়াছিল ৯৪৭৩ কপি। পরবর্তী তিন বছরে বিক্রি আরও অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু নাৎসী দলের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের বিক্রি বাড়িতে থাকে এবং ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর মেইন ক্যাম্পের বিক্রি দাঁড়াইল ১০ লক্ষ কপি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইবার পর একমাত্র জার্মানীতেই এই বই ৬০ লক্ষেরও বেশী কপি বিক্রি হইয়াছিল ১৯৪০ সালে। ব্যক্তিগতভাবে হিটলার এই বই বিক্রির টাকায় একজন ক্রোড়পতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। কারণ একমাত্র ১৯৩৩ সালেই তিনি রয়েলটি বাবদ ১০ লক্ষ মার্ক বা ৩ লক্ষ ডলার পাইয়াছিলেন।(৪)

এই বই পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, হিটলার একজন জাতিবিদ্বেষপরায়ণ যুদ্ধোন্মাদ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও মনীষা ছিল না, ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সহজাত বুদ্ধি, যুক্তিতর্কের স্বাভাবিক ক্ষমতা আর সাধারণ লোককে বা জনতাকে ভুলাইবার জন্য খুব বড় বড় চটকদার কথার এবং মেঠো বক্তৃতার আশ্চর্য শক্তি—যে মেঠো বক্তৃতার উন্মাদিনী শক্তি সেদিনের জার্মান জনতাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই বইতে তাঁর ভবিষ্যৎ রণ-পরিকল্পনারও (এবং সোভিয়েট ভূমি আক্রমণের) আভাস ছিল। হিটলার মনে করিতেন :

> 'Man is a fighting animal, therefore the nation, being community of fighters, is a fighting unit. Any living organism which ceases to fight is equally doomed. The fighting capacity of a race depends on its unity.

সুতরাং অল্পবয়স হইতেই হিটলারের যুদ্ধে অত্যাসক্তি ছিল। কারণ, মূলতঃ মানুষ হইতেছে 'লড়িয়ে জন্তু' মাত্র! এই মনোভাব ইতালীর ডিক্টেটর মুসোলিনীরও ছিল। মুসোলিনীও মনে করিতেন—

> 'War is to the male what child bearing is to the female'.

অর্থাৎ মেয়েদের পক্ষে যেমন সন্তান-ধারণ স্বাভাবিক, তেমনি পুরুষের পক্ষে যুদ্ধও স্বাভাবিক। হিটলার কেবল যুদ্ধেই বিশ্বাস করিতেন না, তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল যে, জার্মানেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর্য জাতি এবং নর্ডিকরাই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—খাঁটি বিশুদ্ধ রক্তের জার্মানরাই নর্ডিক। হিটলার ও নাৎসী দলের এই বিকৃত বিশ্বাসের মূলে অবশ্য প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন তদানীন্তন জার্মানীর এবং পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিক ওসওয়াল্ড স্পেংলার Oswald Spengler যে কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্পেংলার একদিকে জার্মান জাতির 'আর্যামির' শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যদিকে ভায়োলেন্স বা হিংসা ও যুদ্ধের মহিমা প্রচার করিলেন। হিটলারী মতবাদ হিংসা ও জাতিবিদ্বেষ এবং স্বজাতি দাম্ভিকতার মদিরায় আচ্ছন্ন হইয়া শেষ পর্যন্ত যে মাতাল হইয়া গিয়াছিল, স্পেংলারের মত একজন সেরা দার্শনিকও তার জন্য কম দায়ী ছিলেন না। কারণ, তিনি প্রচার করিলেন :

> "Man is a beast of pray, brave and crafty and cruel ......Ideals are cowardice....The animal of prey is the highest form of mobile life..........
> Man should be like the lion never tolerating an equal in his den, and not like the meck cow living in herds and driven hither and thither. For such a man, war is of course the supreme occupation and joy.

সুতরাং হিটলার এবং তাঁর অনুগামীদেরও ধারণা হইল যে, জার্মানরা গৃহপালিত শান্ত গরুর মত ভীরু জাত নয়। তারা সিংহের মত শক্তিশালী, অতএব হিংসা ও যুদ্ধের দ্বারা অপরকে 'শিকার' করিয়া বড় হইতে হইবে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ ও আর্য জাতিকে কারা নষ্ট ও কলুষিত করিতেছে? —হিটলারের

(ক্রমশঃ)

---

(৩) কিন্তু এই ঘটনা সম্পর্কে কিছু কিছু মতভেদ ঐতিহাসিকদের আছে। কেউ কেউ বলেন যে, লুডেনডর্ফও মাটিতে শুইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

(৪) মহাযুদ্ধের পর ধৃত জার্মানীর কাগজ-পত্র হইতে এই কথা জানা গিয়াছে। প্রত্যেক বিয়ের বাসরে এই বই উপহার দেওয়া এবং প্রত্যেক বাড়ীর টেবিলে এই বই রাখা যেন বাধ্যতামূলক ছিল। —উইলিয়াম শীরার প্রণীত 'দি রাইজ এণ্ড ফল অব থার্ড রাইখ'। পৃঃ ১০৯

৫ জওহরলাল নেহরু প্রণীত "Glimses of World History", পৃঃ ৯১৪।

• আলকাতরা টনিক • কিং হোমোটোন
• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• ক্যাসিয়া সিরাপ • ইলেক্ট্রোটোন
কিং এণ্ড কোম্পানীর [illegible]
[illegible]
প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং
১০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী :
৬বি, [illegible] লেন, কলিকাতা-৯
কিং এণ্ড কোম্পানীর [সকল শাখায়] ঔষধ বিভাগ প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ছায়া মানবী

মাঝে মাঝে এমন এক আধখানি উপন্যাস হাতে আসে যার স্মৃতি অনেকদিন পর্যন্ত মনকে ভরিয়ে রাখে। সব দেশের সাহিত্যেই এমন একাধিক উপন্যাস থাকে, যার রেশ পাঠকচিত্তকে পরিণত বয়স পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখে।

মার্কিন উপন্যাসকার রবার্ট নাথানের 'পোর্টরেট অব জেনি' এই জাতীয় একটি করুণ মধুর কাহিনী। ১৯৩৯-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসটির চিররূপ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মডার্ণ ক্লাসিক হিসাবে স্বীকৃত এই উপন্যাসটির (প্রথম প্রকাশ কাল—১৯৩৯) একটি বিশেষ সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

বাস্তব ও ফ্যানটাসির সংমিশ্রণে রচিত 'পোর্টরেট অব জেনী' রোমহর্ষক প্রেমকাহিনী, রোমহর্ষক হলেও খুনজখম ইত্যাদি অনুপস্থিত। এ উপন্যাসের চমক অন্যত্র।

রবার্ট নাথান মার্কিন সাহিত্যে স্বপ্রতিষ্ঠ উপন্যাসকার। ন্যুইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ণালিজম বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। নাথান 'হারভার্ড মনথলি'র সম্পাদক ছিলেন এবং সেই পত্রিকাতেই কবি ও গল্পকার হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ। স্ত্রী হেলেন এবং নাথান ক্যালিফোর্ণিয়ার বাসিন্দা। তাঁর আর সব রচনার মধ্যে নাথানের কাছে 'পোর্টরেট অব জেনী'ই বেশী আদরের।

নায়ক দরিদ্র শিল্পী। তার ছবি বিক্রী হয় না। প্রায়ই অন্ন জোটে না। শীতের দিনে ঠাণ্ডা ঘরে কাজ করতে হয়। তার শিল্পকর্ম সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। অথচ অন্নাভাবের চেয়েও প্রবল আরেক জাতের বুভুক্ষা—শীতের ক্লেশ নয়, মনের শীতই হল সর্বনাশা। দারিদ্র্য বা অন্ন ক্ষুধার চেয়ে এ এক অসহনীয় যন্ত্রণা। এই জাতীয় মনের শীতে শিল্পীর প্রতিভা রুদ্ধ হয়, বরফের মত জমে যায়। কখন বসন্ত আসবে কে জানে। বসন্তের আগমনে জড়ত্ব নাশ হয়, আবার প্রাণরসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হিমাচ্ছন্ন জগৎ।

ছবি বিক্রি হয় না সেটা বড়ো কথা নয়, কারণ অনেক শিল্পীর ছবি অবিক্রীত থেকে যায়, উপযুক্ত মর্যাদা পায় না। যা কিছু ছবি আঁকা হয় পোর্টরেট, ল্যাণ্ডস্কেপ বা স্টিল লাইফ সবই যেন অন্য একরকম। শিল্পী যা চান তা নয়।

এই শিল্পীর নাম এবেন এডামস। তাঁর ধারণা অধিকাংশ শিল্পীর জীবনেই এই দুর্দশা ঘটে। ঈশ্বর প্রশ্ন করেন কিংবা তুমি আমার স্বপক্ষে—না বিপক্ষে? এর উপযুক্ত জবাবও শিল্পীর থাকে—নয়ত বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না।

১৯৩৮-এর এক শীতের সন্ধ্যায় শিল্পী বাসায় ফিরছেন, বগলে একটি পোর্টফোলিওতে নিজের আঁকা ছবি, ক্লান্ত পদক্ষেপে শিল্পী চলেছেন। জনহীন পথ কুয়াশায় মাখা চারদিক। পোর্টফোলিওটা ভারী তাই এক বগল থেকে অন্য বগলে ঘন ঘন বদল করা হচ্ছে। পয়সা নেই যে কোনো একটা গাড়িতে উঠবে। পার্কে ছেলেমেয়েরা খেলা করে এই সময়, তারাও বাড়ি চলে গেছে। সারাদিন চেষ্টা করেও একটি ছবি বিক্রী হয়নি। শিল্পীর মনে সেই হতাশা যে হতাশা মানুষকে গ্রাস করে। সারা পৃথিবী যেন তার প্রতি উদাসীন, উপেক্ষার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। সকালবেলা যেটুকু সাহস সঞ্চয় করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে এখন যেন তার সবটুকু নিঃশেষিত।

শিল্পী সেই রাতে সবদিক থেকেই একেবারে তলিয়ে গেছেন। অর্থ নেই, বন্ধু নেই। শীতের কামড় ও ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত—কোনো আশা নেই। কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। পথের সামনে ঘন কুয়াশা, নিজের পায়ের আওয়াজটুকু মাত্র শোনা যাচ্ছে। দূরে কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর গুঞ্জন পিছনে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সে শব্দ অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। যেন কোন ইতিহাসে ফেলে আসা অতীতের সুর, কোথায় যেন বসন্তের আমেজ—যেন ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। শিল্পীর মনে হচ্ছে—

"I walked on, as though through the quiet arches of a dream. My body seemed light, without weight, made up in the evening air".

এই যখন অবস্থা তখন দেখা গেল একটি ছোট মেয়ে আপন মনে খেলায় মত্ত। তার সঙ্গে কেউ নেই। এভাবে একা ওকে খেলা করতে দেখে শিল্পী বিস্মিত হলেন, কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

শিল্পী উৎকণ্ঠাভরা কণ্ঠে বললেন—অন্ধকার হয়ে আসছে বাড়ি ফিরে যাও। এই কথায় মেয়েটি ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তারপর বলে, সত্যি খুব দেরী হয়ে গেছে বুঝি। আমি সময় ঠিক করতে পারি না যে। আমার কোনো ধারণা নেই।

শিল্পী বললেন—দেরী হয়ে গেছে।

মেয়েটি বলল—কিন্তু আমার বাড়ি যাওয়ার তাড়া নেই। আমার জন্য কেউ বাড়িতে বসে নেই।

শিল্পী ভাবলেন, আমার কি মাথা ব্যথা। কিন্তু মেয়েটি মাথার চুল ঠিক করে সরিয়ে নিয়ে টুপিটা ভালো করে এঁটে বলল—চলুন আপনার সঙ্গেই যাওয়া যাক যদি আপনার আপত্তি না থাকে। এখানে নিরিবিলি, বড় একা একা—

পথ চলতে পরিচয় হয়। অনেক আলোচনা হল। মেয়েটির কাছ থেকে জানা গেল যে তার বাপ-মা হ্যামারস্টেন মিউজিক হলে দড়ির খেলা দেখান। আর মেয়েটির নাম জেনী অ্যাপেলটন।

হ্যামারস্টেন নামটি অনেক প্রাচীন। শিল্পী ছোটবেলায় শুনেছিলেন। মেয়েটি অনেক এলোমেলো কথা বলতে লাগল। তার পোষাকও যেন কিছু প্রাচীন ঢঙের। কোন মিউজিয়মে এইরকম পোষাক পরা কোনো শিশুর ছবি দেখেছেন মনে পড়ল শিল্পীর। কিন্তু কার যেন আঁকা, শিল্পীর নাম মনে পড়ে না।

মেয়েটি বেসুরো গলায় হঠাৎ গেয়ে উঠল, 'কোথা থেকে এলাম কেউ জানে না/ যেখানে সবাই যায় সেখানে যাবো/হাওয়া বয়, সাগর ধায়—কেউ জানে না, কেউ জানে না।"

এ আবার কি গান! অথচ বেসুরো এই সুর মন্দ মনে হচ্ছে না। শিল্পী জানতে চাইলেন এ গান কোথায় শিখেছ? মেয়েটি জবাব দেয়, কেউ শেখায় নি, আমি জানি! এ একটা গান ত'!

তারপর যখন বিদায় নেওয়ার সময় এল তখন মেয়েটি বলল—আমি একটা খেলা ভালোবাসি, ইচ্ছা পূরণের খেলা। আমি

যতদিন না বড় হব আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। তবে আপনি বোধ হয় আমার অপেক্ষায় থাকবেন না।

এই কথা বলেই মেয়েটি চলে গেল এবং কিছু পর আর তাকে দেখা গেল না।

এইভাবে কাহিনীর সুরু। দরিদ্র শিল্পীর মনে এই আশ্চর্য বালিকার কথা গভীর রেখাপাত করে। এরপর ছবি বিক্রী করতে গিয়ে দেখা গেল সব ছবি অপছন্দ হলেও চিত্র ব্যবসায়ী জেনির একটি স্কেচ বেশ দাম দিয়ে কিনলেন। এরপর থেকে জেনীর আরো ছবির চাহিদা হল। জেনিও মাঝে মাঝে দেখা দেয়, তবে প্রতিবারেই তার বয়স আগের চেয়ে বেড়ে যায়।

শিল্পী নানাদিক থেকে মেয়েটির সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করে, কিছু জানা যায় না। কিন্তু জানা গেল হ্যামার-স্টিনরা অনেক আগে খেলা দেখাত, তাদের দলে অ্যাপল্টন দম্পতি দড়ির খেলা দেখাতেন, একটা অ্যাক্সিডেন্টে ওরা দুজনেই মারা গিয়েছেন।

জেনী কিন্তু মাঝে মাঝে আসে, একবার এসে হাজির হল যখন সে পূর্ণ যুবতী। বাড়ির মালিকের সন্দেহ হল, শিল্পীকে যা তা বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

শিল্পীর উদভ্রান্ত মনোভঙ্গী। জেনির চিন্তায় অনেক সময় কাটে, কোনো কাজে মন বসে না। জেনি কিন্তু মাঝে মাঝে আসে, অনেক রকম কথা বলে কিন্তু আগের কথার সঙ্গে পরের কথার যোগ নেই। তবে জেনি যে শিল্পীকে ভালোবেসেছে এবং সে ভালো-বাসার গভীরতা অসীম তা বোঝা যায়।

একটা অশরিরী আত্মা মানবীর দেহ নিয়ে মর্তভূমিতে আবির্ভূত হয়ে একটি জীবন্ত মানুষের প্রেমে আকুল। শিল্পী ও জেনীর মধ্যে যেসব আলোচনা এবং যে ধরণের কথা হয়েছে তা যেন সুমধুর কাব্যের মত মনোরম।

উপন্যাসের শেষাংশে ইঙ্গিত আছে অশরিরী আত্মা জেনি তাঁর প্রাণের মানুষটিকে সমুদ্রের অতলে ডুবিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শিল্পী কোনোরকমে বেঁচেছেন, সমুদ্রতীরে তাঁর অচেতন দেহ পাওয়া গেছে।

পোর্টরেট অব জেনিকে অতি প্রাকৃত কাহিনী বলা যায় না, টাইম অ্যান্ড স্পেসের তত্ত্ব এই উপন্যাসে আভাসে বর্ণিত। অনেক-দিনের মানুষও যে বর্তমানের মধ্যে এসে হাজির হতে পারে এবং যদি সে আসে তাহলে কি অবস্থা ঘটে তারই ইঙ্গিত রবার্ট নাথানের এই করুণ মধুর উপন্যাসে রূপায়িত। —অভয়ঙ্কর

PORTRAIT OF JENNIE. By ROBERT NATHAN. Published by ALFRED A KNOPFINC. NEW YORK. Price Three Dollars only.

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রতীচ্য সাহিত্যের সম্পর্ক

ইংরেজি ভাষায় লিখিত মূল প্রবন্ধটি লেখিকা অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ সম্মেলন (জানুয়ারী ৬-১-১৯৭১) পাঠ করেন। 'অমৃতে' বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন।

জেরা নোভিকোভা

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতীয় ভাষায় রচিত বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে বাংলার মত আর কোন সাহিত্যকেই প্রতীচ্য সাহিত্যের এত ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যায় নি। এর মূল বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে নিহিত—যে বাংলাদেশে ইংরেজরা ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় আগে তাঁদের শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলো।

১৮২০ এর দশক থেকে বাংলা দেশে একটা সংস্কারবাদী ও ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই সম্পর্ক বৃদ্ধির দিকে এই আন্দোলন একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যতই এদেশে জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই প্রতীচ্য সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধেও জনমত ক্রমশঃ গড়ে উঠতে থাকে।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের এবং ইংরেজির মাধ্যমে অন্যান্য প্রতীচ্য সাহিত্যের এই যে সম্পর্ক, আমরা মনে করি, বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও অগ্র-গতির যথার্থ ইতিহাস অনুধাবনে তার গুরুত্ব খুবই মূল্যবান।

ইউরোপীয় লেখকদের বিশিষ্ট রচনার সঙ্গে বাঙালীদের পরিচয় উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই। এই সময় শ্রীরামপুরে বৃটিশ মিশনারীদের দ্বারা মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাঁরা খৃষ্টধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ছাড়াও বহু গ্রন্থের অনুবাদও প্রকাশ করেন। এইসব অনুবাদের মধ্যে 'ঈশপ ফেবলস' (১৮০০) (১), ভার্জিলের 'ঈনিড (১৮০৫), আঠার শতকের বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক জন বুনিয়ানের 'দি পিলগ্রিম প্রগ্রেস', (২), জন গে'র 'ফেবলস' (১৮০৬) এবং হোমরের 'ইলিয়াড' (১৮০৭) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৩১ খৃঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর শুঁড়া অঞ্চলে প্রথম অপেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা "জুলিয়াস সিজার' অভিনয় আরম্ভ করে। ১৮৩০-১৮৫০ খৃঃ মধ্যে পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে শেক্সপীয়রের নাটক খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৮০৬ খৃঃ শেক্সপীয়রের 'দি টেমপেস্ট' নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। চার্লস ল্যাম্বের 'টেলস ফ্রম শেকসপীয়র' অবলম্বনে শেকস-পীয়রের 'রোমিও জুলিয়েটের' অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খৃঃ। 'টেলস ফ্রম শেকসপীয়র' অনূদিত হয় ১৮৫৩ খৃঃ। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে শেকসপীয়রের রচনা থেকে বহু অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হয়। ১৮৫২ খৃঃ ড্যানিয়েল ডেফোর 'রবিনসন ক্রুসো'র বঙ্গানুবাদ এবং ১৮৫৪ খৃঃ জন মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্টের' অনুবাদও এ সময়ের উল্লেখ্য সাহিত্য কর্ম। কিন্তু সে সময়ের একটা বিশিষ্ট দিক হলো, অনেক ক্ষেত্রেই মূল কাহিনীকে ঠিক রেখে তার চরিত্র ও ঘটনাস্থানের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। (*৩)

অবশ্য কেবলমাত্র অনুবাদ বা ভাবানু-বাদ থেকে ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালীদের জ্ঞানের বিচার অসম্ভব। একটা বিষয় মনে রাখা দরকার, বঙ্গীয় তরুণ সমাজের একটা অংশ তখন ইউরোপীয় শিক্ষাধারায় তখন শিক্ষালাভ করছিল এবং ইংরেজি ভাষায় অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবী পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তখন মূল ইংরেজি ভাষায় অনেকেই বই পড়ত এবং ইংরেজির মাধ্যমে অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

১৮৪৯ খৃঃ একটি প্রবন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন যে, হোমার, প্লুটার্ক ও সোফোক্লেসের রচনা খুবই সুন্দর। তাঁদের কবিতা পাঠ করে আমরা খুব আনন্দ লাভ

(*১) তারিণীচরণ মিত্র কর্তৃক অনূদিত এই বইটি জন গিলক্রিস্টের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট'-এর অন্তর্গত।

(*২) 'দি পিলগ্রিম প্রগ্রেস' আবার ১৮০৪ ও ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

(*৩) দি লেস—ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স ইন বেঙ্গলি নভেলস', জার্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব লেটার্স. ২২ সংখ্যা, কলকাতা-১৯৩২।

করি। শেক্সপীয়রের অমর নাটকগুলি পাঠ করে আমরা এক ধরনের সৌন্দর্যানুভূতি অর্জন করি। শিলার এবং গ্যয়টের রচনা পাঠ কালে আমাদের মনে অদ্ভুতপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হয়। (* ৪) অবশ্য রাজনারায়ণ বসু এই যে ইউরোপীয় ক্লাসিক, মধ্য ও আধুনিক যুগের লেখকদের নাম করেছেন, বঠাৎ কিছু নয়। তখন কলেজের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে শেক্সপীয়র, এডিসন, পোপ, ড্রাইডেন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে অনেকেই তাঁদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে আরম্ভ করেছেন। (*৫)

তবে একথাও ঠিক, বাঙালীদের বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে জানার আগ্রহ কেবলমাত্র ইংরেজির মাধ্যমেই সীমিত ছিল না। ১৮০১ খৃঃ থেকেই দেখা যায় মূল গ্রীক বা পার্শি থেকে অনুবাদের প্রচেষ্টা এবং এই ধরনের প্রচেষ্টা বছরের পর বছর বৃদ্ধিই পেতে থাকে। প্রতীচ্য সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে মুদ্রণযন্ত্রের অবদানও কম নয়। এইসব মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে "সম্বাদ প্রভাকর", "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্য সন্দর্ভ', "সোমপ্রকাশ" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৮৫০ খৃঃ দশকের মধ্যভাগকে ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম পর্যায়ের সীমান্ত মনে করা যেতে পারে। ১৮৫০—১৮৭০ খৃঃ মধ্যে আরো অনেক গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হতে দেখা যায়। এর মধ্যে অলিভার গোল্ডস্মিথের "হারমিট" (১৮৫৮, ১৮৭৮) এবং 'দি ডেজার্টেড ভিলেজ' (১৮৬২, ১৮৭৬), টমাস গ্রে'র 'এলিজি', টমাস মুরের 'মোল্লা মুখ' (১৮৭৬), ওয়াল্টার স্কটের "লেডি অব দি লেক' (১৮৭১) এবং 'দি লেডি অব দি লাস্ট মিনিস্ট্রেল" (১৮৭০), কাউপার, ড্রাইডেন, শেলির কবিতার অনুবাদ এবং এছাড়াও ড্রাইডেনের একটি গ্রন্থের গদ্যানুবাদ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ১৮৭৬ খৃঃ 'অপূর্ব দেশভ্রমণ' নামে জনাথন সুইফটের 'গ্যালিভার'স ট্রাভেলস' বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এক বছর পরে ফিল্ডিংয়ের "জোসেফ আণ্ড্রুজ'' বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সময়েও কিন্তু সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা শেক্সপীয়রের রচনার অনুবাদেতেই লক্ষ্য করা যায়। শেক্সপীয়রের রচনার বহু অনুবাদও তখন প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫৩ খৃঃ শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'এর অনুসরণে প্রকাশিত হয় 'ভানুমতী চিত্তবিলাস'। জেমস লঙ বলেছেন যে, এই বইয়ে বাংলার সামাজিক পরিবেশে শেক্সপীয়রের ধারণাকে পরিবেশন করা হয়েছে। (*৬) এরপর 'রোমিও জুলিয়েটের' অনুসরণে 'চারুমুখ চিত্তহারা', কমেডি অব এররস-এর অনুসরণে 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯), দি টুয়েলফথ নাইট অনুসরণে 'সুশীলা ও চন্দ্রকেতু' (১৮৭২), হ্যামলেটের অনুসরণে "অমরসিংহ" (১৮৭২) এবং 'রুদ্রপাল' (১৮৭৪), ওথেলোর অনুসরণে 'ভীমসিংহ' (১৮৭৫), এবং ম্যাকবেথের অনুবাদ (১৮৭৫) প্রকাশিত হয়। উপরে উল্লিখিত শেক্সপীয়রের সব কটি বইই চার্লস ল্যাম ও মেরি ল্যামের "টেলস ফ্রম শেক্সপীয়র" গ্রন্থে সংকলিত আছে। মনে হয়, এই বইটিই উপরের শেক্সপীয়রের এইসব অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মূল প্রেরণা ছিল।

আর, জি, শাহানি তাঁর "প্রাচ্যের দৃষ্টিতে শেক্সপীয়র" (*৭) নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রাচ্যে শেক্সপীয়রের মূলানুগত অনুবাদ ও ভাবানুবাদ সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলায়। বাঙালী অনুবাদকেরা যেখানে দেশীয় আবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল নামগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন 'রোমিও ও জুলিয়েটের' অনুবাদে জুলিয়েটের নাম করা হয়েছে 'চারুমুখ'। আবার ১৮৭৮ খৃঃ-এর যে অনুবাদ বেরিয়েছে, তাতে তাঁর নাম হয়েছে বিলাসবতী এবং রোমিওর নাম অজয়সিংহ। অনুবাদক ঘটনার স্থানও পরিবর্তন করেন। অনুরূপে দেখা যাবে ১৮৬০ খৃঃ অনূদিত 'মার্চেন্ট অব ভেনিসের' অনুবাদে দেখা যায় ঘটনার স্থান নির্দেশিত হয়েছে উজ্জয়িনী এবং অংশত গুজরাট। এমন কি অনুবাদক কস্ট্যাকটি শেক্সপীয়রীয় বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত বর্জন করেন। প্রেমের অনেক দৃশ্য বাদ দেন এবং পরিবর্তে বাঙালী পাঠকের উপযোগী উপকাহিনীর সংস্থাপন করেন। এছাড়াও নামগুলি সব পরিবর্তিত হয়। এক কথায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যা বলেছেন যে হেমচন্দ্র ঘোষের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ও 'রোমিও জুলিয়েটের' অনুবাদে কেবল শেক্সপীয়রের মূল কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সারটুকু রক্ষিত হয়েছে। (*৮)

বৃটিশ লেখকদের রচনার অনুবাদ ছাড়াও ১৮৪০-৭০এর মধ্যে অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের রচনাও বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে রুশ ও ফ্রেঞ্চ

(*৪) এন রায়—সাহিত্য বীক্ষা, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ১০৭।

(*৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা ১৯৫৪।

(*৬) জে, লঙ—এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি ওয়ার্কস, কলকাতা-১৮৫৫।

*৭ R. G. Shahani, Shakespeare on par les Orientaux-Paris, 1932.

(*৮) আশুতোষ ভট্টাচার্য : আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—কলিকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ ৭০।

রচনাবলী সিরিজ

বঙ্কিম রচনাবলী	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪টি)—টাঃ ১৫·০০। দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য-অংশ। —টাঃ ১৭·৫০। তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি রচনা—টাঃ ১৫·০০।
রমেশ রচনাবলী	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬টি)—টাঃ ১০·০০।
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী	ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সমগ্র রচনা। প্রথম খণ্ডে (৫টি নাটক, ৩টি প্রহসন, ৪টি কবিতা ও গানের গ্রন্থ ও ২টি গদ্য-রচনা—টাঃ ১২·৫০। দ্বিতীয় খণ্ডে (৮টি নাটক, ৩টি প্রহসন, ৪টি কবিতা গ্রন্থ, ২টি গদ্য-রচনা ও ইংরেজি কবিতা)—টাঃ ১৫·০০।
দীনবন্ধু রচনাবলী	ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সমগ্র রচনা (৮টি নাটক ও প্রহসন, ২টি গল্প-উপন্যাস, ৩টি কাব্য ও কবিতা গ্রন্থ)—টাঃ ১০·০০।
গিরিশ রচনাবলী	ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে ২১টি নাটক ও প্রহসন।—টাঃ ২০·০০। চার খণ্ডে সমগ্র রচনা সন্নিবিষ্ট হবে।

প্রতি রচনাবলীতে জীবনী ও সাহিত্য-কীর্তি আলোচিত

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃ কলিকাতা-৯

ভাষার লেখকরাও আছেন। যেমন লড— ফ্রেঞ্চ ভাষা থেকে ইংরেজিতে ডিনারস কেবলস অনুবাদ করেন। সেই ইংরেজি অনুবাদ থেকে ১৮৭০ খৃঃ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি থেকে আরো কয়েকটি ফরাসী বইয়ের বঙ্গানুবাদ এই সময়ের সাহিত্য কর্মে বিশিষ্ট সংযোজন।

এতক্ষণ ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদ সম্বন্ধে যে পর্যালোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় বলে দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ের অনুবাদগুলির অনুবাদক প্রধানতঃ ইংরেজী মিশনারী সম্প্রদায় ও রাজকর্মচারীরা। কিন্তু ১৮৫০ খৃঃ দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে যে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত তাতে অনুবাদকের ভূমিকায় বাঙালীদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এইসব অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, গীতি-কাব্য, সনেট ইত্যাদির বিকাশের ক্ষেত্রে এর অবদান অপরিসীম। কারণ, এইসব অনুবাদ বহু তরুণ লেখকের কাছে আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়।

সাহিত্যে এই নবীন প্রভাব—বিশেষ করে উপন্যাস, গল্প ও নাটকের ক্ষেত্রে এই প্রভাব বাংলার সমাজজীবনে ব্যাপক ও গভীরতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রগতিশীল লেখকদের মনে এই প্রতিক্রিয়া সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কার এবং সামন্ততান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামকে আরো তীব্র করে তোলে। এটা যে খুব সহজসাধ্য ছিল, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। বাঙালী সমাজেরই একটা অংশ ছিল এর বিরোধী। এই বিরোধী অংশ চাইতেন পুরোনো সাহিত্যধারা ও চিন্তাকে বজায় রাখতে।

যাই হোক, প্রতীচ্য প্রভাব বাংলা সাহিত্যে কতদূর সক্রিয় ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া যাবে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়। রঙ্গলাল তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ লোক-সাহিত্যের যে সব উপাদান গ্রহণ করেছেন, তা ওয়াল্টার স্কট ও টমাস মুরের কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। (*৯)

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য ভাবনার একটা অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় মধুসূদনের কবিতা ও নাটকে। অবশ্য মধুসূদন যদিও কিটস, শেলি, মিল্টন, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিদের কাছ থেকে অনেক গ্রহণ করেছেন, তবু সর্বক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্ব কাব্যপ্রতিভা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর মধ্যে অনুরণিত হয়েছে জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে গ্রীক মহাকাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট আছে এবং বাল্মীকির কাহিনীও যথাযথভাবে অনুসৃত হয় নি। তবু কাহিনীটির ভারতীয় রূপ, এমন কি বাঙালীভাব একটুকুও ক্ষুন্ন হয় নি। একটি চিঠিতে মধুসূদন লিখেছিলেন—

> It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; .... I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done".

মধুসূদনের সমকালীনেরা তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সম্বন্ধে মনে করতেন যে, এটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সমন্বয়ের এক অপূর্ব নিদর্শন। তাঁরা এই গ্রন্থে একদিকে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি এবং কৃত্তিবাসের প্রভাব অনুভব করতেন এবং অন্যদিকে অনুভব করতেন হোমার, ভার্জিল, দান্তে, টাসো, শেকসপীয়র এবং মিল্টনের প্রভাব। (*১০)

বাংলা গদ্য সাহিত্যে উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর কোন লেখককে পাওয়া যায় না যিনি সমৃদ্ধ প্রতীচ্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল গদ্য সাহিত্য এবং বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়।

একথা অনস্বীকার্য যে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে ওয়াল্টার স্কটের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছেন। অবশ্য এই প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় এবং চরিত্র চিত্রণে উভয়ের সাধর্ম্য কতদূর তা নির্ধারণ করাও দুরূহ। তবে ওয়াল্টার স্কটের মতই তিনি তাঁর উপন্যাসে বিষয়, ভাব ও আঙ্গিক প্রকরণে দেশের জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে তাই দেখি বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতীচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সম্পর্কের একটা ফলপ্রদ প্রভাবও রয়েছে বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলার বৃহত্তর গণমানসে সাহিত্যের যথার্থ কর্তব্য পালনে এই সম্পর্ক একটা উল্লেখ্য স্থান অধিকার করেছে।

অনুবাদ : আশিস সান্যাল

(*৯) এস, সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃঃ ১২।

(*১০) জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত—ওয়েস্টার্ণ ইনফ্লুয়েন্স অন দি পোয়েট্রি অব মধুসূদন দত্ত; বুলেটিন অব দি স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, লণ্ডন; সপ্তম খণ্ড ১৯০০।

নতুন বই

ভাগবতী তনু (প্রথম খণ্ড)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক — মিত্র ও ঘোষ; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—দশ টাকা।

জীবনী-সাহিত্যকার হিসেবে কবি ও কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমারের কৃতিত্ব সর্বজন-স্বীকৃত। জীবন তাঁর কাছে অনেকের যোগফল নয়, অথচ অনন্তও একটি সত্তা। তাকে কাছে থেকে টুকরো টুকরো করে দেখেন না তিনি; দূরের দৃষ্টির একসঙ্গে দেখেন। ফলে, তাঁর জীবনীসাহিত্য তথ্যের চেয়ে সত্যের, ঘটনার চেয়ে অনুভূতির এবং ব্যক্তির চেয়ে রসের সাধনা।

অচিন্ত্যকুমারের বাগ্ভঙ্গি প্রাঞ্জল, ভাষা স্বচ্ছ: নিত্য নতুন নতুন শব্দের প্রসাধনে বেগবতী। তাই জীবনকাহিনী তাঁর লেখনীতে অনুসরণ স্রোতস্বিনীর মতো; নিজেই নিজের টানে এগোয়; স্রোতস্বিনী যেমন সমুদ্রের, জীবনকাহিনী তেমনি অনন্তের অভিমুখী হয়।

'ভাগবতী তনু'র বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ। কবির প্রার্থনা ছিল,—হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক।

কবির এই প্রার্থনাটিকে শিরোভূষণ করেছেন লেখক। ঠিকই করেছেন। কারণ, জীবনীসাহিত্য রচনায় অচিন্ত্যকুমারের যে মানসিক প্রবণতা তা লোক থেকে লোকোত্তরে, মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তরণের প্রয়াস।

লেখক কবির এই উক্তির মধ্যে নিজের দর্শনকেই খুঁজে পেয়েছেন। নিজের আদর্শবাদেরই অনুরণন শুনেছেন। ফলে এই জীবনকাহিনী শুরু থেকেই রসে ভরো ভরো, অনুভবের অকৃত্রিমতায় অপরূপ।

এদিকে 'ভাষার শেষ আছে অভিধানে কিন্তু অনুভবের অভিধান কোথায়?' অচিন্ত্যকুমারের 'ভাগবতী তনু' পড়ে মনে হল, এই শেষোক্ত অভিধানেরও হদিস তিনি পেয়েছেন। তা না হলে শৈশবের বাগানবাড়ি থেকে শুরু করে ১৯১২ সালের বিলেতযাত্রী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মহাজীবনের বিরাট একটি অধ্যায় কেন এমন মহৎ সাহিত্য হয়ে উঠবে?

লেখকের কাছে আমাদের অনুরোধ, রবীন্দ্র-জীবনের বাকি অংশ নিয়ে যথাসম্ভব সত্বর তিনি লিখুন, ভাগবতী তনুর দ্বিতীয় খণ্ড আমাদের উপহার দিন।

সাহিত্যিক মূল্যের জন্য এ-বই রবীন্দ্রচর্চার উপল-বিকীর্ণ সমুদ্রসৈকতে হীরকখণ্ডের মর্যাদা পাবে।

দেশবিদেশের শিক্ষণ—জ্ঞানান্বেষী। দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড। ৫৪-৩ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম ঃ চার টাকা।

অসমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সনাতন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে বইটিতে। এই ধরনের বই আমাদের দেশের শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন মেটাবে। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ বিবিধ রাষ্ট্রে শিক্ষার অর্থ যে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, আধুনিকীকরণ ঘটেছে, সে সম্পর্কে কোন তথ্য এই বই থেকে পাওয়া যাবে না।

পঞ্চদশী—রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী। দাম ঃ ৩-৫০। এরিনা। ৯।২বি, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কলিকাতা—২৬ থেকে প্রকাশিত।

'পঞ্চদশী' শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা পনেরটি ছোটগল্পের একটি সঙ্কলন। গ্রন্থের গল্পগুলির প্রকৃতি স্বতন্ত্র। আধুনিক বাংলাগল্পের পাঠক যে শ্রেণীর গল্পের সঙ্গে পরিচিত 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের গল্পগুলি ঠিক সেই শ্রেণীর নয়। সমকালীন জীবন, সেই জীবনের জটিলতা, সমস্যাগুলি লেখককে বিচলিত করে নি, অন্ততঃ লেখকের কোন গল্পেই তার স্বাক্ষর নেই। আশ্চর্য যে, এই তরুণ লেখক যুগযন্ত্রণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর গল্পের বিষয় অবশ্যই জীবন; কিন্তু সেই জীবন কোন বিশেষ দেশের, কোন বিশেষ কালের মনে হয় না। প্রেম, প্রীতি, ঈর্ষা, ব্যর্থতা, হতাশা—জীবনের চিরন্তন সংস্কার ও সমস্যাগুলিই লেখকের গল্পের উপজীব্য। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধের অভাব এবং প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই বাস্তববোধের অভাব লেখকের গল্পের রসোত্তীর্ণতার পথে অন্তরায় হয়েছে; কয়েকটি সম্ভাবনাময় গল্পকে পরিণামে দুঃখজনক পরিণতি দিয়েছে। প্রথাগত রীতিতে গল্প বলা, এবং চরিত্র চিত্রণ লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে হয়।

'থিয়েটার' গল্পের বলাই সরকারের অভিজ্ঞতা; 'একটি সুন্দর মৃত্যু' গল্পের গৌরীর অভিজ্ঞতা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করবে। 'দাক্ষিণাত্য' একটি রসোত্তীর্ণ রচনা; এবং এই গল্পের মালবিকা চরিত্রটি লেখকের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। 'মিথ্যা' এবং 'দ্বিতীয় বাড়ি' শীর্ষক গল্প দুটি যথেষ্ট কৌতুক-দীপ্ত। বাস্তবের আরো কিছুটা স্পর্শ থাকলে 'আলেয়া' একটি বিশিষ্ট রচনা হতে উঠত নিঃসন্দেহে। 'সেতু' শীর্ষক গল্পটিতে বাংলাদেশের প্রথিতযশা প্রবীণ একজন কথাশিল্পীর একটি গল্পের ছায়া অবাঞ্ছিতভাবে লক্ষ্য করা গেল।

লেখকের গল্পের ভাষা খুবই স্বাচ্ছন্দ, আবেগমুক্ত এবং অকৃত্রিম। গল্প বলার কৌশলও লেখক চমৎকার আয়ত্ত করেছেন স্বীকার করতেই হয়। অবশ্য উত্তমানের গল্পচাতুর্য এখনও লেখকের অনায়ত্ত।

আরো কিছুটা বাস্তবচেতনা, এবং সমকালীন জীবনের প্রতি কৌতূহল লেখকের প্রতিভাকে পরবর্তীকালে সম্পূর্ণতা দান করবে আশা করা যায়।

কিছু কবিকণ্ঠ (কাব্য সংগ্রহ)—সুনীল দাশ ও সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।। সাহিত্য প্রয়াসী, ৪৫ মধব দাস লেন, হাওড়া-২। দাম তিন টাকা।

কয়েকজন কবির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এই সঙ্কলন। সকলেই নবীন নন, প্রবীণও আছেন। আছে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সহজাত কাব্যিক কারুকাজের উপস্থিতি। সেজন্যেই কবিতা পাঠক সঙ্কলনটিকে উপেক্ষা করতে পারবেন না, আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। 'প্রস্তাবনা'য় মণীন্দ্র রায় লিখেছেন ঃ "কিছু কিছু কবিতা কেবল নতুন কবির লেখাই নয়, বক্তব্যের দিক দিয়েও নতুন।" সঙ্কলনের কবিতাগুলি সম্পর্কে এটাই খাঁটি কথা। তবু 'পরিকল্পনাটি অভিনব।' কেননা, একসঙ্গে কবিতার সঙ্গে পাঠক পাবেন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সাম্প্রতিক মেজাজের গতিপ্রকৃতি।

সঙ্কলনের প্রথম কবি গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে বাংলা কবিতার পাঠক কমবেশী পরিচিত। নির্মল বর একদালে ছোটগল্প লিখতেন, এখনো লেখেন। তবু কবিতার প্রতি তাঁর ঝোঁক সহজাত। হয়তো গল্পের মেজাজকে তিনি কবিতায় এবং কবিতার মেজাজকে ছোট-গল্পে সঞ্চারিত করার পক্ষপাতী। পরেশ মজুমদার ছন্দের কারুকাজে, বিষয়ের বিন্যাসে নির্মল বরের চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক এবং শব্দ ব্যবহারে নিপুণ। চেতনার দিক থেকেও তিনি অনেক বেশী মার্জিত-ভাবে আধুনিক। এমন কি পুরনো ছন্দের, পুরনো রীতির কবিতাতেও তিনি পাঠককে চমকে দেবার ক্ষমতা রাখেন।

এই সঙ্কলনের অন্যান্য কবিদের মধ্যে আছেন সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ শেঠ, বরুণ ঘোষ ও দিলীপ দাশগুপ্ত।

সঙ্কলন ও পত্র-পত্রিকা

কালি ও কলম (সপ্তম সংখ্যা)—সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।। ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ঃ পঁচাত্তর পয়সা।

এত সুলভ মূল্যে এমন একটি পত্রিকা নিয়মিত যে কিভাবে বেরোয়, তা ভাবতে গেলেই বিস্মিত হতে হয়। এ সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে পূর্ববাংলার গণজাগরণের ওপর। সম্পাদক স্মরণ করেছেন ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত জাতীয় সঙ্গীতের কয়েকটি লাইন ঃ

জয় জয় জয় বাংলা
পদ্মা মেঘনা যমুনা
মুক্তি ধারার সীমানা
জয় জয় জয় বাংলা।

এ সংখ্যায় লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বর সামন্ত, হরি মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটির অন্যতম আকর্ষণীয় বিভাগ 'সাহিত্যের খবর'।

OCARINA (Vol 1. No 2) - Editor AMAL GHOSH. The Nook Jalsaras, 30B Chamiers Road Madras 28.

চমক? হ্যাঁ, চমকই বলতে হবে। কবিতা ও নন্দনতত্ত্বের দ্বিমাসিক এই কাগজটি লেখা, অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদবৈচিত্র্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক নজরেই। এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলি প্রায় সবই কলকাতার ওপরে লেখা। কবিতাগুলি নানা শ্রেণীর, নানা স্বাদের। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত অনূদিত কয়েকটি বাংলা কবিতার অনুবাদসহ মূল দর, রায় বসু, বাগেন্দ্র দেবনাথের অনূদিত কবিতাগুলি সংখ্যাটির মূল্যবৃদ্ধি করেছে। অন্যান্য লেখক লেখিকাদের মধ্যে আছেন শতকলি শেঠি, কে বি সীতারামাইয়া, সি ডি রমন, বালকৃষ্ণ নায়ার, সীতা চট্টোপাধ্যায়, তাপসী চৌধুরী, নবারুণ ঘোষ, সুচন্দ্র সরকার, প্রীতি ঘোষ এবং আরো অনেকে। আমরা পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

এবং (অষ্টম সংখ্যা)—সম্পাদক ধূর্জটি চন্দ।। ২।৭৫ যতীন দাস নগর, কলকাতা-৫৬।। দাম পঞ্চাশ পয়সা।।

লিখেছেন বিনয় মজুমদার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শুভ্র মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্কর দাশগুপ্ত, অজয় সেন, অসীম মাহাতো, মার্গারেট চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। কবিতার কাগজ হিসেবে নিরাভরণ ও শব্দবর্জিত হলেও কবিতা-পাঠকের কাছে পত্রিকাটি ভালোই লাগবে।

অনীদিন (পঞ্চম সঙ্কলন)—সম্পাদক শিশির ভট্টাচার্য।। ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা-৪৫।। দাম ঃ এক টাকা।

প্রচ্ছন্ন পুরনো হলেও পত্রিকাটির পরিবর্তন ঘটেছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে—অন্তর্নিহিত প্রবণতায়। আগে 'অনীদিন' বেরোত বাটের কবিদের কবিতা ও আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে। এ সংখ্যায় নবীন-প্রবীণেরা পাশাপাশি স্থান পেয়েছেন। এপার বাংলা, ওপার বাংলার কবিদের কবিতায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। তা ছাড়া আছে হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, ইংরেজী, ফরাসী কবিতার অনুবাদ, পুস্তক সমালোচনা, প্রবন্ধ ও কবিতার মতো গল্প। লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, সুনীল রায়, সৈয়দ আলি আহসান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান, আবুল কাসেম, অমরশঙ্কর রায়, দিনেশ দাশ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সৌরাংশু ভৌমিক, অমল ভৌমিক, শান্তনু দাশ, মঞ্জুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন সরকার প্রমুখ। কবিতার মতো অন্যান্য রচনাগুলিও মূল্যবান। বিশেষ করে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা 'কবিতার অরুচি' এবং মণীন্দ্র রায়ের লেখা 'অ্যাবসার্ড কী ও কেন'—প্রবন্ধ দুটি পাঠকের কাছে অবশ্যপাঠ্য।

CENTRAL LIBRARY

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

৪

জরতীর অনুরোধে সে একাই ফিরে চলল বাড়ীর দিকে। বাড়ীর কাছে আসতেই তার পোষা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ রবে ডেকে এসে তাকে আক্রমণ করলো। জরা বিস্মিত হয়ে বলল—এ কিরকম তার ব্যবহার। অনেক দিনের পোষা কুকুর, বড় প্রিয় প্রভুর পায়ের শব্দ শুনতে না শুনতে পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে লেজ নাড়তে থাকে, হাত চাটে। জরা ভাবে আজ তার কি হল? সে বলল, বাঘা বাঘা আমি রে, চিনতে পারছিস না! কুকুর আরও ক্ষেপে ওঠে, তার গায়ে আঁচড়াতে থাকে। বাঘা এমন ক্ষেপে উঠল কেন? বাঘার ডাকে পাড়ার কুকুরগুলো ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করে আঁচড়াতে কামড়াতে লাগলো। সে যত তাড়ায় তত বেশি করে তারা আক্রমণ করে। ওদিকে তাদের দেখাদেখি বাড়ীর অন্য সব পোষা জানোয়ার ক্ষেপে উঠে তাকে আক্রমণ শুরু করলো। ব্যাধের বাড়ীতে পোষা জানোয়ারের অভাব হয় না। তার উপরে আবার জরার নানারকম পশুপাখী পোষার বাতিক ছিল। বেড়াল, বেজি, নেউল, সজারু, গোসাপ অনেকগুলো ছিল: সব একযোগে বিকট রব তুলে তাকে ঘেরাও করলো, কেউ আঁচড়ায়, কেউ কামড়ায়, গোসাপটা পায় খুব ছিটোয়। দাওয়ায় খাঁচায় ঝুলছিল ময়না টিয়া চন্দনা। তারা জেগে উঠে কিচিমিচি রব তুললো। ময়নাটা ক্রমাগত বলতে লাগলো, চোর ডাকাত খুনে পাকড়াও, পাকড়াও। এ-বুলি জরা সঙ্কটকালের জন্য সযত্নে শিখিয়েছিল, আজ সেই সব বুলি তার উপরে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো, 'চোর ডাকাত খুনে পাকড়াও, পাকড়াও'। বিব্রত বিপন্ন ব্যতিব্যস্ত জরা অগত্যা একটা মোটা ঠেঙা নিয়ে কুকুরগুলোকে মারতে লাগলো। কিন্তু সে একা, কুকুর অনেক। একটা মার খেয়ে ভাগে তো আর পাঁচটা এসে কামড়ায়, শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। তখন সে ছুটে গিয়ে নিরীহ পাখীগুলোর উপরে পড়লো, তারা পাখা ঝাপটিয়ে কর্কশ চীৎকার করে উঠল, চোর ডাকাত খুনে পাকড়াও, পাকড়াও।

দাঁড়া, পাকড়ানো বের করে দিচ্ছি, আমারই খেয়ে, আমারই ঘরে থেকে আমাকে চোর ডাকাত খুনে বলা!

ধাঁই ধাঁই করে লাঠি চালায়, খাঁচা ভেঙে যায়, কতক উড়ে পালায়, কতক মরে, কতক আধমরা হয়, টিয়েটা মাথার উপরে বসে ঠোকরাতে থাকে। ওদিকে কুকুর বেজি সজারু গোসাপগুলো তো আছেই। চারদিক থেকে আক্রমণ। সে কি করবে। হাত-পা সমস্ত গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, ব্যথায় বেদনায় সে পাগলপ্রায়। এখন সত্য সত্যই তার মাথায় খুন চেপে গেল।

দাঁড়া, মজা করে বাড়ীতে বাস করা বের করে দিচ্ছি।

উনুনে আগুন ছিল। সেই আগুন তুলে নিয়ে খড়ের চালে গুঁজে দিল. দেখতে দেখতে সমস্ত চাল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

নে, এবার বাড়ীতে বাস করা বের হয়ে যাক। বনের পশু যা বনে ফিরে।

পশুগুলো আরও ক্ষেপে উঠে তাকে আক্রমণ করলো, অগত্যা তখন সে ছুটে পালালো।

বাড়ীর চারদিকে বন। আগুন দেখে বনের পশুপাখী সচকিত হয়ে জেগে উঠে কোলাহল শুরু করে দিল। পেঁচা কাল-পেঁচা কুটুরে পেঁচা তার মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগলো, চ্যাঁ-চ্যাঁ, সে কি উৎকট ডাক; অকালে উদ্বোধিত উৎক্রোশ পাখী দীর্ঘতানে আওয়াজ শুরু করলো; হাজার হাজার কাক কা-কা রবে ডেকে উড়তে উড়তে পূর্ণিমার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে দিল; বন থেকে বেরিয়ে এলো হুঁড়ার, ভাল্লুক, বুনো কুকুর। তখন আরও দ্রুত সে ছুটলো। এমন সময়ে কোথা থেকে প্রকাণ্ড একটা বিষধর সাপ ফণা তুলে তার গতিরোধ করে দাঁড়ালো। সে বাঁয়ে ছোটে, সেদিকেও আক্রমণকারী, ডানে ছোটে, সেদিকেও তাই। অবশেষে তার মুখ দিয়ে বের হল ভগবান, রক্ষা করো। হঠাৎ চারদিকে উঠল বিকট হাসির আওয়াজ, তীক্ষ্ণ, উচ্চ, কর্কশ। প্রকৃতিস্থ থাকলে বুঝতে পারতো খটাসের ডাক। তখন তার মনে হল পোষা পশুপাখী থেকে শুরু করে চরাচরের সমস্ত জীবজন্তু আজ তার বিরুদ্ধে। উপরে আকাশে তাকিয়ে দেখল, সেখানেও সান্ত্বনা নেই—জ্বলিত উল্কাগুলো ছোবল মারবার উদ্দেশ্যে ছুটে আসছে তার দিকে। ঐ একটি মুহূর্তে যেন নিখিলের নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল হয়ে গিয়েছে। কেন, এমন কি অন্যায় সে করেছে, অজান্তে একটা মানুষ মেরে ফেলেছে বই তো নয়! এর আগে জেনে-শুনে কত মানুষ মেরেছে কই তখন তো সবাই নীরব ছিল, তবে এখন কেন? ভগবান, না ছাই! বসুদেবের বেটা বাসুদেব, মানুষের বেটা আবার ভগবান হয়, সব বুজরুকি। বাসুদেবের দশটা প্রাণ থাকলে তখন সে দশবার হত্যা করতে পারতো এমন মনের অবস্থা। মরীয়া হয়ে সে প্রাণ-পণে ছুটলো, আততায়ীরা এবারে পিছনে পড়েছে, তবু সঙ্গ ছাড়েনি।

তখন তার সব ক্রোধ গিয়ে পড়লো জরতীর উপরে। ঐ বেটিই সব অনর্থের মূল। যত সব আধিখ্যেতা। ভগবান! ভগবান তবে মানুষের হাতে মরে কেন! যে নিজেকে বাঁচাতে পারে না, সে নাকি পৃথিবীর লোককে বাঁচায়। কেলাবো মাগীর টুঁটি ছিঁড়ে, দেখি তার ভগবান কেমন তাকে বাঁচায়।

আর বসুদেবের বেটা যদি সত্যি ভগবান হয়, তবে ভগবান মরেছে, আর ভগবান যদি মরেই থাকে তবে আর কাকে ভয়। পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম সব গিয়েছে ভগ-বেটার সঙ্গে। তাহলে আর কাকে ভয়! এই বলে সে দুই বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সগর্বে উত্থিত করলো চরাচরের মুখের দিকে।

সে ছুটছে আর ভাবছে, দাঁড়া আজ বেটিকেও পাঠাচ্ছি তার ভগবানের সঙ্গে, দুজনেই যাক এক চিতায়।

একি, জরা আবার ফিরে এলে কেন? একি, পিছনে এত জন্তু জানোয়ার কেন?

আরে ওরা যে তোর ভগবানের চেলা-চামুণ্ডা।

তা আবার ফিরলে কেন?

একটু কাজ বাকি আছে।

কি আবার কাজ—

জরতী কথা শেষ করবার অবসর পেল না।

জরা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবলে তার গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলে দিল, বলল, নে এবার বেটি, যা তোর ভগবানের সঙ্গে।

জরতীর দেহ বাসুদেবের পায়ের উপরে লুটিয়ে পড়লো। জরা ছুটে পালালো নগরের দিকে। কিয়দ্দূর গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলো পাখীগুলো ছত্রাকারে উড়ছে বাসুদেবের দেহের উপরে আর পশুগুলো চক্রাকারে ঘিরে রয়েছে তার দেহ। জরা উচ্চস্বরে বলল, নে বেটারা, আজ ভগবানের মাংস খেয়ে জীবন ধন্য কর, পরজন্মে সব দেবতা হয়ে জন্মাবি।

(৫)

মদিরা, দরজা খোল্, দরজা খোল্।

দরজা খুলে দিয়ে মদিরা বলল, দরজা যে ভেঙে ফেলবে।

সে ভয় যদি থাকে তবে দরজা ধাক্কা করতে নেই।

তবে আর খরচ করে দরজা গড়ানো কেন?

নইলে দরজা খোলার সুখ পাবো কি করে?

তাই তো দেখছি, তোমার সুখের অবধি নেই।

তা কি আজ নতুন জানলে। তা এত রাতে কি মনে করে?

তোমার তো রাতের বেলারই সংসার। তাছাড়া তোমার বাড়ীতেও কি দেখে ঘড়ি ধরে আসতে হবে।

বেশ এসেছ যখন, বসো।

ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপরে রেড়ির তেলের বাতি জ্বলছিল, পাশেই প্রশস্ত ফরাস, তার এক পাশে মৃদঙ্গ, সেতার বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। এবারে বাতির আলোর জরাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করে মদিরা বলল, একি, সর্বাঙ্গে যে ছিঁড়ে খুঁড়ে গিয়েছে, ব্যাপার কি? তুমি ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করছিলে নাকি?

নিতান্ত মিথ্যা বলোনি মদিরা, তবে শুধু ভাল্লুক নয়, বুনো কুকুর,হুড়োর, বনবেড়াল, আরও সব জানোয়ার ছিল।

তাই বলো, সপ্তরথীতে অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলেছিল। তা বেরিয়ে এলে কি করে?

কপালজোরে।

ইস, সারা গা যে রক্তে ভরে গিয়েছে! দাঁড়াও কিছু লাগিয়ে দি।

এই বলে কুলুঙ্গি থেকে মহুয়ার তেল নিয়ে এসে ফরসা ন্যাকড়া দিয়ে সযত্নে লাগাতে লাগলো।

বাঃ, বেশ আরাম লাগছে। জানিস মদিরা, আমি মানুষ মেরেছি।

কৃত্রিম আনন্দে মদিরা বলে উঠল, চমৎকার, বীরপুরুষ সন্দেহ নেই। তোমার একটা মূর্তি গড়িয়ে নগরের চকে দাঁড় করিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে।

একটা মানুষ নয় রে, দুটো, একটা পুরুষ, একটা মেয়েছেলে।

তবে তো দুটো মূর্তি গড়তে হল দেখছি।

ঠাট্টা নয় রে।

কে বলছে ঠাট্টা। দেখনি নগরের চক বীরপুরুষদের মূর্তিতে এমন ভরে গিয়েছে যে, জীবিতদের পা ফেলা কঠিন। সাত্যকি, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব যার শিখণ্ডী সব কুরুক্ষেত্রের বীরপুরুষগণ।

মনে হচ্ছে তুই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিস।

মোটেই নয়। এতকাল জন্তুজানোয়ার মেরে হাত পাকাচ্ছিলে, এবারে মানুষে হাত দিয়েছ—এই তো বীরের মতো কাজ।

ঠাট্টা না হলে প্রশংসা।

যেমন বোঝো।

আচ্ছা ঠাট্টাও থাক, প্রশংসাও থাক, মদ বের কর।

মদ! মদ কোথায় পাবো! জানো না, মদ তৈরি করা রাজার নিষেধ।

দেশে রাজা আছে নাকি! আছে আছে নেই তো ভরসা।

কেমন?

নইলে এত চোর-ডাকাত আসে কোথা থেকে?

নিজেকে দিয়ে বোঝো।

আরে আমাদের তো সবাই জানে। চোরের উপর যারা বাটপাড়ি করে বেড়ায়, সেই রাজপুরুষদের কথা বলছি।

আমার কি সেই রাজপুরুষদের ভয় নেই?

কম ভরসা নেই। রাজার নিষেধে মদ তৈরি বন্ধ হয় না, কেবল তার দামটা বাড়ে। নে, এখন মদ বের কর।

মদিরা এক ভাঁড় মদ এনে দিল, জরা খুব আরামে পান করতে শুরু করলো।

দেখ মদিরা, পৃথিবীতে কেউ কখনো মদ তৈরি বন্ধ করতে পারবে না।

আহা, কি আশার কথাই না শোনালে।

তবে হাঁ, নামটা বদলাতে পারে এই পর্যন্ত।

কি রকম?

দেবতারা খায় অমৃত বলে, মুনি-ঋষিরা খায় সোমরস বলে, রাজারা খায় সুরা বলে, পশুপাখীরা খায় মধু বলে আর তার এই দাসসা দাস জরা খায় মেনে বলে।

অবশেষে জরাও যে পণ্ডিত হল, এত শিখলে কোথায়?

টোলের পণ্ডিতমশায়কে মধু জোগাই, একদিন শুনি যে তিনি পড়ুয়াদের পাঠ দিচ্ছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম।

টোলে এমন পাঠ দেওয়া হয় জানলে ভর্তি হতাম। তা তাকেই বুঝি গুরুদক্ষিণা দিয়ে বধ করেছ।

জরা হঠাৎ মদের ভাঁড়টা আছড়ে ভেঙে দিয়ে লাফিয়ে উঠল, শিগগির বাইরে চল, মাটি কাঁপছে, মাথার উপরে বাড়ী ভেঙে পড়বে।

পাগল হলে নাকি। না, ফেনোটা খুব অনেকখানি খেয়েছ।

কে কার কথা শোনে। মদিরার হাত ধরে জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, ঐ দেখ, চাঁদের কোণাটা কালো, গেরণ আরম্ভ হয়েছে।

কি বাজে কথা বলছ জরা।

ঐ দেখ, বলে বলে তারা খসে পড়ছে।

মদিরা বুঝলো জরা ঘোর নেশাগ্রস্ত—জোর করে তাকে ধরে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল।

জরা তার হাত ছাড়ে না, বলে আমার কাছে শো।

না, না, ওসব আজ থাক।

সে-কথা বলছি না রে, বলছি, আমার বড় ভয় করছে।

ভয় কিসের? এখনো কি আগে থাকোনি?

তখন তো মানুষ মারিনি।

বাজে কথা রাখো তো। আমি তোমাকে কত বছর দেখছি, তার মধ্যে অন্তত বিশ-পঁচিশটা মানুষ তুমি মেরেছো।

এ মানুষ আলাদা।

মানুষ মানুষ, তার আবার আলাদা সালাদা কি!

কিছুতেই কিছু হল না, জরা অঝোরে কাঁদতে শুরু করলো। মদিরা সান্ত্বনার্থে বোঝাতে লাগলো, আরে পাগল, একটা-দুটো মানুষ মেরে তোমার এত অনুতাপ আর রাজবাড়ীর পুরুষগুলো যেসব হানাহানি করে দেবাক মরে গেল তার কি হয়।

সব মরেছে?

সব। বুড়ো রাজা আর বলভদ্র বাসুদেব ছাড়া সব। শুনলাম দুদিন আগে বলভদ্রও নাকি যোগে দেহত্যাগ করেছেন।

আর বাসুদেব।

তিনি এখনও আছেন।

মর মর, শিগগীর মর যে।

এই তো এক ভাঁড় গিললে, আবার কি হবে।

দে দে, আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

ঢক ঢক করে অনেকখানি মদ খেয়ে ফেলে বলল, বসুদেবের বেটা বাসুদেব তবে এখনো মরেনি।

তিনিই তো শেষ ভরসা।

কেন?

কেন বুঝতে পারো না? ঘরের বড় খুঁটিটা পড়ে গেলে, সন্তানের ভিৎ নড়ে গেলে কি হয়।

বসুদেবের বেটা তবে এমনি শক্ত লোক!

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ শুষ্ক রুক্ষ দিনগুলিতে—
স্নো ভিউ হোটেল
দার্জিলিং
আপনার বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য কামনা করে
মার্জিত রুচি ভ্রমণবিলাসীদের একান্ত নির্ভরযোগ্য বাসস্থান
পূর্বাহ্নে স্থান সংরক্ষণের জন্য ফোন দার্জিলিং ৪০

জোর বলছ কি?

তবে কি দেবতা?

দেবতার দেবতা স্বয়ং ভগবান।

তা তিনি রুষ্ট হলে কি হবে?

ভূমিকম্প শুরু হবে, গ্রহ-নক্ষত্র খসে পড়বে, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়ে যাবে, সমুদ্র এগিয়ে এসে চরাচর গ্রাস করে ফেলবে। মানুষ আর মানুষ থাকবে না, যমের পশু হয়ে এ ওকে ধরে খাবে।

তবে কেন বিশ্বাস করছ না যে, দোষ লেগেছে। ভূই দোল আরম্ভ হয়েছে, তারাগুলো খসে পড়ছে।

মদের নেশায় বিভীষিকা দেখছ জরা। এখনো বাসুদেব জীবিত!

জীবিত! তবে ও কিসের হুল্-হুলা? সত্যই বুঝি সমুদ্র সমস্ত গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। ঐ শোনো, শব্দ কান পেতে শোনো।

এবারে আর মদিরার পক্ষে নিজের কানকে অবিশ্বাস করা সম্ভব হল না, ধীরভাবে কান পেতে শুনে সবলে টান মেরে জরাকে দাঁড় করিয়ে দিল, বলল, প্রাণে বাঁচতে চাও যদি শিগ্‌গীর পালাও।

কেন, কি হয়েছে?

আর মুহূর্তকাল বিলম্ব নয়, এই দণ্ডে পালাও।

কোন্ দিকে যাবো?

ঐ বনের দিকে চলে যাও।

তুমি?

আমার ভয় নেই?

তুমি মেয়েছেলে তোমার ভয় নেই আর আমার পুরুষের ভয়!

এখন ভয় সম্ভব যা পুরুষেরই, আর নয় পালাও, ঐ শোনো হুল্-হুলা আরও কাছে এসে পড়েছে।

সমুদ্রের শব্দ!

না, এ-শব্দ আসছে নগরের দিক থেকে।

বনের দিকে যাবো? কিছুই বুঝতে পারছি না।

কালকে এসো, বুঝিয়ে দেব।

জরা যেতে উদ্যত হলে মদিরা বলল, শোনো, তোমার ধুতি ছেড়ে এই ঘাগরা আর কাঁচুলি পরো।

বিস্মিত বিহ্বল জরাকে একরকম জোর করেই নারীবেশে সুসজ্জিত করে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়ে মদিরা বলল, ঐ বনের দিকে পালিয়ে যাও, শিগ্‌গীর।

কিছুই বুঝতে পারছি না বলতে বলতে জরা বনের দিকে ছুটলো।

দারুণ হলহলা কাছে এসে পড়েছে।

(৬)

জরা বনের দিকে অন্তর্হিত হলে মদিরা বাড়ীর ছাদের উপরে উঠে যে-দৃশ্য দেখতে পেলো, মোটেই তার কাছে নূতন নয়, আজ ক' রাত ধরে দেখে আসছে, তবু তার অভিনবত্ব ম্লান হয়নি। রাজপুরীর সিংহদ্বার খুলে দিয়ে দলন্ত ধাতবপ্রবাহের মতো একটা বিপুল জনসংঘ বেরিয়ে আসছে, অনেক মশালের আলোয় উজ্জ্বল। সমুদ্রের উদ্দেশে প্রবাহে।

প্রথম যে রাতে উৎকট অস্বাভাবিক অসামরিক কোলাহলে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, প্রথমটা বুঝতে পারেনি ব্যাপার কি তারপরে ছাদে উঠে দেখলো ঠিক সেই দৃশ্য আজ যেমনটি দেখছে। রাজপুরীর উপকণ্ঠে তার বাড়ী হলেও মাঝখানে সিকি ক্রোশের ব্যবধান। সেই অপরিস্রিয়মান জন-প্রবাহকে ধাতবপ্রবাহ বলেই তার মনে হয়েছিল; ধাতবপ্রবাহের মতোই কঠিন কর্কশ ধ্বনি, গলিত ধাতুর মতোই উজ্জ্বল দীপ্তিময় ভয়ঙ্কর সুন্দর। আরো কাছে এসে পড়লে দেখেছিল, লক্ষ্য করেছিল, তখন স্পষ্ট লক্ষগোচর হচ্ছিল ঐ চলমান জনপিণ্ড শত শত সুন্দরী যুবতী নারীর সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়, অনেকের হাতে দীপ্তমশাল। সেই মশালের আলোয় প্রত্যেকের মুখচোখ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ছিন্ন কাঁচুলির ফাঁকে নিটোল স্তন, ছিন্ন ঘাগরার অবকাশে সুডোল উরু প্রভৃতির প্রত্যেকটি রেখা ক্রমেই অধিকতর চক্ষুগ্রাহ্য হয়ে উঠছিল। সকলে একযোগে উচ্চস্বরে কিছু বলছিল, যেন কোন কিছুর দাবী, তবে বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। তারা আরও কাছে এসে পড়লে তাদের মুখে-চোখের ভাবভাবে মদিরা চকিত ভীত হয়ে উঠল। এ তার অজানা থাকবার কথা নয়, কাম-ব্যবসায়ী সুন্দরী যুবতী হিসাবে এ-ভাবের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু এরা কারা, কোথায় চলেছে, কাদের সন্ধানে চলেছে কিছুই বুঝতে পারলো না। হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। তার দরজায় ধাক্কা পড়লো।

সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে জানলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি চাও তোমরা।

অনেক কণ্ঠে উত্তর শুনতে পেলো, তোকে চাই না, দরজা খুলে দে, তোর ঘরে যে পুরুষ আছে তাকে চাই।

সে রাতে তার ঘরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল এক বিদেশী বণিক। বেচারী ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

খোল্ খোল্ শীগ্‌গীর দরজা খোল।

আমার ঘরে আজ কেউ নেই।

আছে কি নেই পরীক্ষা করবো, দরজা খোল্।

না খুলবো না দরজা। এখান থেকে যাও।

প্রচণ্ড ধাক্কায় আগল ছুটে গিয়ে দরজা হাঁ হয়ে যেতেই একসঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশজন যুবতী প্রবেশ করলো এবং সকলে একযোগে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল, ঐ যে।

বণিক হঠাৎ জাগরিত হয়ে উঠে পুরোপুরি সম্বিৎ লাভ করবার আগেই বিশ পঁচিশজন তার উপরে গিয়ে লাফিয়ে পড়লো, সকলেই সকলের আগে দখল করতে চায়। মদিরা বাধা দিতে চেষ্টা করতেই একজন ছুঁড়ে মারলো তার দিকে পানের ডিবে, তার কপাল কেটে গিয়ে রক্তে মুখ চোখ ভেসে গেল। বাইরে গিয়ে মুখ চোখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখতে পেলো সেই বিশ পঁচিশজন মিলে বণিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জবরদখল করবার চেষ্টায় নিযুক্ত।

গেলাম গেলাম মলাম।

কে কার কথা শোনে। প্রথম টানা-টানিতে তার ধুতি আঙরাখা ছিঁড়ে-খুঁড়ে উড়ে গিয়েছে, এখন নগ্ন দেহটার উপরে জুলুম চলছে। কেউ নিজ দাবী ছাড়তে রাজি নয়। শুধু তাই নয় অপরকে দাবীচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে হানাহানি মারামারি চলছে।

বণিক, তুমি আবার হাতখানা ধরতে এলে কেন?

মর ছুঁড়ি এ হাত কি তোর একচেটিয়া?

যারা দেহের কাছে অগ্রসর হতে পারেনি তারা সকলে মিলে অগ্রবর্তী দলকে আক্রমণ করছে, তখন দুই দলে লড়াই বেধে গিয়ে গৃহের মেঝে যুধ্যমান ভূলুণ্ঠিত নারীদেহে বন্ধুর হয়ে উঠল। বেশভূষা ও অলঙ্কার আর দেহাশ্রয়ী নয়। কুন্তলজাল ছিন্ন ও বিস্রস্ত, গালে মুখে স্তনে উরুতে নখক্ষত ও দংশনজাত রক্তধারা।

ওদিকে বিশ পঁচিশজনের চুম্বনে আলিঙ্গনে পীড়নে দংশনে বণিক মৃতপ্রায়।

তবু কেহ দখলীকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দাবী ছাড়তে রাজি নয়। অবশেষে কয়েক-বার হিক্কা তুলে বণিক যে কখন প্রাণত্যাগ করলো কারো হুঁস নেই। তখনো কামোন্মাদিনীগণ দেহটা নিয়ে টানাটানি করছে। কামার্ত নারী ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রী, না তার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

ঘণ্টাখানেক বাদে যুবতীদের হুঁস হল যে লোকটা মারা গিয়েছে। তখন সেই দেহ থেকে ক্ষরিত রক্তে অঞ্চল, কাঁচুলি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শোণিত সিক্ত করে যেমন অকস্মাৎ প্রবেশ করেছিল তেমনি অকস্মাৎ প্রস্থান করলো, চল চল অন্য বাড়ীগুলো খুঁজে দেখি গে, আরও পুরুষ আছে।

পরদিন প্রাতে এই বৃহৎ বারাঙ্গনা পল্লীর প্রত্যেক গৃহ থেকে দলিত মথিত পিণ্ডীকৃত পুরুষদেহ বের হতে লাগলো। বারাঙ্গনারা মিলে শ্মশানে তাদের সৎকার করলো। অপরাহ্নে মদিরার গৃহে বারাঙ্গনাদের একইষ্টগোষ্ঠী আহূত হল, নেত্রী স্বয়ং মদিরা।

(৭)

রাজপুরীর বাইরে দক্ষিণ দিকে বৃহৎ বারাঙ্গনা পল্লী। পল্লীর মাঝখানে মদিরার বাড়ী, কৌলীন্যে সকলের সেরা না হলেও রূপে ও অর্থে মদিরা সকলের উপরে। তার আহ্বান কেউ উপেক্ষা করতে পারেনি, সকলেরই সমান সঙ্কট। সবাই এসে বসেছে মদিরার বাড়ীর বাগানে পম্পা সরোবর নামে পুষ্করিণীর বাঁধানো চাতালে। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ, কিন্তু সমুদ্রের হাওয়ার এমন উল্টোপাল্টা চলছে যে রৌদ্র দীপ্তি বসাতে পারেনি। চারদিকে ফুলের বাগিচা, গন্ধে মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে।

বিনামূল্যে

ভিকো বজ্রদন্তী
ইকোনমি সাইজ
টুথ পেষ্ট
কিনিলে

এক জার
ভিকো টারমেরিক
ভ্যানিসিং ক্রিম
বিনামূল্যে পাইবেন

সুবর্ণ সুযোগ

ভিকো বজ্রদন্তী
আয়ুর্বেদিক টুথপেষ্ট
গাছ-গাছড়া দিয়ে তৈরী। নিয়মিত ব্যবহারে দাঁতক্ষয়, পায়োরিয়া দাঁত থেকে রক্ত ও পুঁজ পড়া, এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

ভিকো টারমেরিক
চন্দনসুগন্ধী ভ্যানিসিং ক্রিম
দেহকান্তি উজ্জ্বল করে, চর্মকে কমনীয় ও কান্তিযুক্ত করে, কামানোর পর ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ, ছোট খাটো কাটা ছেঁড়া সারায়।

দেরি করিবেন না
আজই কিনুন

যতদিন ষ্টকে মাল মজুত আছে ততদিন পর্যন্ত এই উপহার পাইবেন

ভিকো ল্যাবোরেটরিজ
বোম্বাই—১৪

উপস্থিতগণের মধ্যে চোদ্দ পনেরো থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বয়সের নারী আছে, কেউ বা সদ্য আগত, কেউ বা বিদায়ের মুখে। এরা সকলেই সকলের বহিন, সম্বন্ধে সমান, বয়সের তফাটাকে তেমন আমল দিতে চায় না এরা। তৎসত্ত্বেও দুজনের বিশেষ সম্মান, একজন মদিরা, আর একজন বড়বহিন নামে পরিজ্ঞাত, পাড়ার ও রাজপুরীর সকলের কাছেই সে বড় বহিন।

কিছুক্ষণ হল আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, তবে ভূমিকার প্রয়োজন হয়নি, সঙ্কট সকলেরই, সঙ্কটের কারণ সকলেরই পরিচিত।

মদিরা বলছিল, এরকম করে আমরা বেগানা পুরুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারি না। বেচারারা সুখের আশায় এসে প্রাণ হারায়। এই নিয়ে আমার ঘরে পর পর তিনজন মারা পড়লো।

বহিন, তবে তো তোমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে, তিনজন মাত্র। আমার ঘরে এ পর্যন্ত পাঁচজন মারা পড়েছে, বললো চন্দনা নামে একটি মেয়ে।

তখন অনেকগুলো কণ্ঠস্বরে একসঙ্গে রব উঠল, আমার ঘরে চারজন।

আমার ঘরে সাতজন

আমার ঘরেও সাতজন

এসব পাপের ভাগ কি আমাদের বহন করতে হবে না ?

তখন বড় বহিন সকলকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কেন এমন হচ্ছে জানবার জন্যে তিনদিন আগে রাজপুরীতে গিয়েছিলাম। যাদবদের একজনের বউকে বললাম, বউমা, এই যে কাণ্ডটা ঘটছে একি ভালো হচ্ছে। আমি জানতাম যে সেও এই দলে কিন্তু এমন ভাব দেখালাম যেন সে এ ব্যাপারের মধ্যে নেই। বললাম, বউমা, তোমাকে তো বড়ঘরের মেয়ে বলে জানি, আর এদিকে তো রাজবাড়ীর বউ, দু দশজনের জন্য তোমাদের সকলেরই যে নাম খারাপ হতে চলল।

বউটি এদিকওদিক দেখে নিয়ে কথা বলতে শুরু করতেই কোথা থেকে আট-দশজন বউ এসে উপস্থিত হল। আমাকে দেখেও দেখল না। বলল, কি লো এখনো যে চুপ করে বসে আছিস, তৈরি হয়ে নে, বের হওয়ার সময় হল যে।

বউটি একটু লজ্জা পেলো, আমার কাছে ধরা পড়লো কিনা যে সে-ও এই দলের লোক, তাদের বলল, এই যে বড় বহিন এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে নি।

সঙ্গে সঙ্গে তিনচারজন বলে উঠল, ও গোপনে বুঝি শলা-পরামর্শ হচ্ছে, আমাদের ফাঁকি দিয়ে তার ঘরের, মানুষটিকে দখল করবার মতলব। সে হচ্ছে না, সবাই একসঙ্গে বের হব, যার ভাগ্যে যা জোটে।

তখন আমাকে নিজ মূর্তি ধরতে হল, বললাম, দেখো তোমরা রাজবংশের বউ, তোমরা যদি এভাবে নরহত্যা করতে থাকো তবে আমাদেরও লাগতে হবে তার প্রতিকার চিন্তায়।

কি প্রতিকার করবে ভাবছ।

আমরা আর ঘরে মানুষ বসাবো না।

তবে খাবে কি করে?

খাই না খাই পাপের ভাগ থেকে তো বেঁচে যাবো।

একসঙ্গে হেসে উঠল অনেকে। বলল, এদিকে ধরেছ বেশ্যাবৃত্তি ওদিকে পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে এত হিসাব।

বললাম, নরহত্যা তো বেশ্যাবৃত্তির অঙ্গ নয়।

কমই বা কি!

সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে অল্পবয়সের একটি মেয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, কেন তাদের বললে না বড় বহিন, যদি নিতান্তই পুরুষ চাই তবে আমাদের পল্লীতে এসে বাস করে না কেন! দেখো না একবার মজা! এদিকে রাজবাড়ীতে ঘোমটা টেনে ঢেকে সতীপনা দেখানোও চাই আবার নিত্য পরপুরুষ না হলে চলে না।

এই মেয়েটির কোল থেকে কালকে একটি যুবককে কেড়ে নিয়ে আটদশজনে পাড়াপাড়ি করে মেরে ফেলেছিল। তার অতৃপ্ত কামনা চোখে মুখে রসনায় শতমুখ তক্ষের মতো বের হয়ে পড়লো।

বড় বহিন বলল, কথাটা যে একেবারে অযৌক্তিক তা নয়। শুনে তারা বলল, তোমরা ছোট লোক, তোমাদের জাতজন্মের ঠিক নেই, তোমরা বেশ্যাবৃত্তি করতে পারো। আমরা যে যদুকুলের বউ।

বললাম, তবে সেইরকম থাকো। তোমরা যা করছ তাতে কাশী কাঞ্চী পাঞ্চাল কোশল সর্বত্র যে ঢী ঢী পড়ে যাবে।

একজন বলল, ওগো পুরুঠাকরুণ, একটু খোঁজ নিয়ে দেখো গে, দ্বারকা থেকে প্রাগজ্যোতিষ অবধি সর্বত্র এইরকম অবস্থা। আঠারোদিনে আঠারো অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয় মারা পড়লো, তাদের পত্নীরা কি করবে! এদিকে যদুবংশের সমস্ত পুরুষ তিনদিনে মারামারি কাটাকাটি করে মরলো, তাদের পত্নীরা কি করবে! কি গো পুরুঠাকরুণ তুমি হলে কি করতে।

আর যাই করি এমন বেলেল্লাপনা করতাম না।

তবু শুনি না কি করতে?

আমাকে উত্তর দেওয়ার সময় দিল না, এক একজন এক এক রকম মন্তব্য করে বলল,

শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে হবিষ্যান্ন করতে করতে ফুলে ঢোল হয়ে উঠতে!

থান পরে রাত্রিদিন কোণে কোণে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে।

শঙ্খধ্বনি আর পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে ঢোল পরে পতির সঙ্গে চিতারোহন করতে!

এমনি কত কি মন্তব্য, চুপ করে শোনা ছাড়া আর উপায় কি! অবশেষে একটা দুর্জয় কথা শুনে সংযম রক্ষা করতে পারলাম না।

কি বলল সে বড়বহিন।

সে বলল, না গো না, স্বামী মরলে ভাসুর দেওর যাকে হাতের কাছে পেতো টেনে নিয়ে সতীত্ব রক্ষা করতো। একটা দরজা বন্ধ হতেই দশটা জানলা খুলে যেতো।

আমি বললাম, যেমন তোমাদের গিয়েছে। বললাম, দেখো তোমরা বড়ঘরের বউ, এ পথ ছেড়ে দাও।

তার চেয়ে বলোনা কেন আহার পরিত্যাগ করো।

দু-ই কি এক হল?

অবশ্যই হল না। খাদ্যের চেয়েও বেশি প্রয়োজন পুরুষের সঙ্গ। আগে কাম পরে ক্ষুধা।

বললাম, তোমরা রাজবংশের বউ, টের পাওনি কখনো ক্ষুধার জ্বালা, তাই ওরকম বলছ।

তোমরা বুঝি ঐ জ্বালাতেই বেশ্যা-বৃত্তি ধরেছ।

কথাটা বুঝি নেহাৎ মিথ্যা নয়, ক্ষুধার জ্বালা না থাকলে অনেকেই ফিরে যেতে সংসারে।

অনেকেই, সকলে নয়।

তোমরা যে সকলে দেখছি।

তখন একজন বলল, দেখো বড় বহিন, তোমাকে ভালো মানুষ বলেই জানতাম, কি জন্যে এসেছেন জানি না। যদি আমাদের মতিগতি ফেরাবার জন্যে এসে থাকো তবে জেনে রাখো সে আশা নেই।

কেন?

তৃষ্ণায় যার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, সম্মুখে যার শীতল পানীয় সে পান না করবে কেন? ক্ষুধায় যার সর্বাঙ্গ শিথিল, সম্মুখে যার ভোজ্য পেয় সে গ্রহণ না করবে কেন? এদের চেয়েও প্রবল, সহস্র গুণে প্রবল নিদারুণ কামের তাড়নায় যার সর্বদেহ মন আপাদমস্তক উত্তপ্ত তার কাছে ধর্ম নীতি বিবেক সমাজ সংসার ভদ্রতা শিষ্টতা কেবেও মিথ্যা। বাজে তত্ত্ব-কথা শোনাতে এসেছ! নদীকে বলো না কেন নিম্নে প্রবাহিত হয়ো না, অগ্নিকে বলো না কেন ঊর্ধ্বে জ্বলিত হয়ো না, জোয়ারের বন্যাকে বলো না কেন আর অগ্রসর হয়ো না। কি বুঝ্লে?

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

আমি বললাম, এসব যে নৈসর্গিক নিয়ম।

কামও নৈসর্গিক নিয়ম, অনাদি অনন্ত আদিম প্রবলতম নৈসর্গিক নিয়ম।

সে উন্মত্তের মতো বলে চলল, এই দেখোনা, আগে আমার প্রত্যহ স্বামী সঙ্গ ছাড়া নিদ্রা হতো না। কিন্তু পোড়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হতে আমি স্বামী সঙ্গ বঞ্চিত, আমি অনিদ্র। তার পরে স্বামী যখন ফিরে এল হাতে চাঁদ পেলাম। কিন্তু কে জানতো চাঁদ এমন শীতল, এমন মৃত, এমন জড়পিণ্ড! কেবলি বীরের গল্প! ভীষ্ম অর্জুন, ভীম কর্ণ, অশ্বত্থামা অভিমন্যু! এ যেন করলো ও যেন করলো, ও জয়দ্রথ বধ করলো, ও অভিমন্যুকে বেষ্টিত করলো, পোড়া গল্প আর ফুরোতে চায় না! বীরত্বে আমার কী হবে! তারপরে একদিন গল্প ফুরোতেই আরম্ভ হয় মাতলামি আর মারামারি, তারপরে সব শেষ, যদুবংশ নির্বংশ! ক্ষুধার জ্বালায় লোকে পরস্ব আত্মসাৎ করে, পোড়া রাজপুরীতে আত্মসাৎ করবো এমন একটা পুরুষ নেই. কেবল বৃদ্ধ আর শিশু! দেখো, দেখো, এই দেখো আমার সর্বদেহ বালুখোলার মতো তপ্ত, ধান পড়লে খই হয়ে যাবে। লোকে বলে জ্বর! জ্বর, জ্বরই বটে তবে সান্নিপাত নয়, কাম-জ্বর, যার বাড়া আর তাপ নেই, পাপ নেই শাপ নেই!

এই বলে সে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বুকের উপরে স্থাপিত করলো। সত্যি বটে কি তাপ ভেতরে যেন রক্ত টগবগ করে ফুটছে।

ছাড়লো না আমার হাতখানা, বুকের উপরে চেপে রেখেই বলতে লাগলো, নারী-দেহের একি জ্বালা, একি অভিসম্পাৎ। পুরুষ ভালোবাসে শুধু মন দিয়ে, নারীর ভালোবাসা সর্বাঙ্গ দিয়ে। নারীদেহের জতুগৃহে আগুন লেগেছে, পুড়ে মলুম, জ্বলে মলুম, পুড়ে মলুম, জ্বলে মলুম, বলতে বলতে পতনোন্মুখ উল্কার মতো সে ছুটে চলে গেল।

তাকিয়ে দেখি যে শত শত মেয়ে আগুনের হল্কার মতো ছুটে চলেছে, এতক্ষণ যার সঙ্গে কথা বলছিলাম সেই রাজবধূ রত্নাও তাদের দলে গিয়ে মিশলো, আশেপাশে কেউ আর কোথাও থাকলো না। শূন্য চত্বরে দাঁড়িয়ে আর কি করি, রাজপুরী থেকে বের হয়ে চললাম সমুদ্রের দিকে। ভাবলাম স্নান করে যাই, শরীরের গ্লানি দূর হবে, হয়তো বা মনেরও।

স্নান সেরে উঠেছি দেখি সম্মুখে সর্বান্ত বিন্দুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুজনে যেন পাশাপাশি অমাবস্যা আর পূর্ণিমা।

বারাঙ্গনাদের মধ্যে থেকে কে একজন শুধালো, কে ঠিক বুঝতে পারা গেল না। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, শুধালো কারা?

বড় বাহিন বলল, বলবার সময়ে হাত দুখানি মাথায় ঠেকালো, বাসুদেব আর বলভদ্র। কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম, বললাম, রাজা, একি অবস্থায় ফেললে?

বাসুদেব বললেন, বাছা, রাজার রাজাকে ডাকো।

বললাম, রাজা, আমি পাপীতাপী মানুষ, অত বড়র সন্ধান তো জানিনে. তোমাদের ছাড়া তো আর কাউকে চিনিনে।

তিনি বললেন, কি করবে বলো বাছা, সমস্ত রাজার উপরে কাল।

কেন বাবা এক সময়ে তুমি তো কালনাগকে দমন করেছিলে, আজকে এমন কথা বলছ কেন?

এ যে মহাকাল।

তুমিও তো বাবা মহারাজা। এ যে পায়ের তলাকার মাটি টলমল করে উঠেছে।

বাছা, বাসুকির মাথা নড়লে মাটি তো কাঁপবেই।

কেন এমন হল বাপ।

মাঝে মাঝে সংসার ভোগবদল করে তারই সূচনা বাসুকির মাথা নাড়ায়।

সংসার তো বেশ চলছিল।

তবু কখনো কখনো তেলে সাজা দরকার হয়ে পড়ে. তাকেই মন্বন্তর বলে, ইন্দ্রপাত বলে, বিপ্লব বলে, যার যেমন দৃষ্টির প্রসার।

কি দরকার ছিল বাবা।

নইলে মানুষ বড় একপেশে হয়ে পড়ে, তখন তাকে সোজা করবার জন্যে উল্টো দিকে ঝাঁকুনি দিতে হয়।

কিন্তু বাবা, এ যে রসাতলমুখো নামছে।

তাশেই তো আশা যে আবার উপরের দিকে উঠবে। পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই দেখনি।

কিন্তু বাবা তুমি থাকতে বাসুকির উপরে ভার ছেড়ে দেওয়ার কি দরকার ছিল?

বাছা, তোমাদের মতো আমিও তো বাসুকির মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছি।

জিভ কেটে বললাম, ও কি কথা বাবা, তুমি যে দেবতা।

তিনি কি উত্তর দিতেন জানি না, বলভদ্র বলে উঠলেন চলো হে বাসুদেব, সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হ'ল।

তারা দুজনে অস্তগিরি উদয়গিরির মতো চলে গেলেন রাজপুরীর দিকে—যতক্ষণ চোখে পড়লো চেয়ে দেখলাম।

বড় বাহিন থামলো। তার কথার প্রতিক্রিয়ায় সভাস্থল এমনি নিস্তব্ধ হ'ল যে ঝোঁয়াছিগুলোর গুঞ্জন শ্রুতিগোচর হয়ে উঠল।

সবাই ভাবছে কে কি বলবে। এমন সময় মল্লিকা নামে সেই কিশোরী মেয়েটি বলে উঠল, সবই তো শুনলাম, অমাবস্যা পূর্ণিমা উদয়গিরি অস্তগিরি কিছুই বাদ গেল না, কিন্তু আমার কোল থেকে যে মানুষটাকে কেড়ে নিয়ে বাঘিনীরা মেরে ফেললো তার কি করছ।

সকলেরই তো মনে মনে ঐ এক অভিযোগ, তবে মল্লিকার কিছু তীব্র। আর সকলে অভ্যাসের বশে শোকটা বয়সা বলে নিয়েছে, মল্লিকার এখনো নেশা। ঐ যুবকটির সঙ্গে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে আসে, হয়তো আর কিছুকাল পরে নেশা হয়ে দাঁড়াতো কিন্তু তার আগেই ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার কোল থেকে। সেই শূন্যের অতৃপ্ত প্রতিহিংসার ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে, জিজ্ঞাসা করছে এর কি প্রতিকার নেই।

মদিরা বলল, মৃত্যুর আর কি প্রতিকার বহিন।

কেন দেশে কি রাজা নেই।

রাজার কথা এইমাত্র তো শুনলে। তা-ছাড়া, পরশু তো বলভদ্র দেহত্যাগ করেছেন।

তবে চলো সবাই যাই অমাবস্যা মহারাজার কাছে। তিনি তো কৌরব-পাণ্ডব সম্রাটকে খতম করে এসেছেন আর এর একটা বিহিত করতে পারবেন না।

তার কথা শুনে বড় বহিন ও মদিরা, তারাই পাড়ার মুরুব্বি, বলে উঠল মল্লিকার যুক্তি মন্দ নয়, চলো সকলে মিলে গিয়ে বাসুদেবের পায়ে কেঁদে পড়ি।

সেই সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে সভাভঙ্গের উপক্রম হ'ল এমন সময়ে সবাই দেখতে পেলো, ভজন দাস ছুটতে ছুটতে আসছে। লোকটা সামান্য, তবে এদের কাছে অসামান্য, নিঃস্বার্থপর ভাবে এদের দেখাশোনা করে, সকলকেই বলে বহিন, সকলে বলে দাদা।

বহিন বহিন সর্বনাশ হয়েছে।

কি হয়েছে দাদা।

কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে, চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভজন দাস বললে সর্বনাশ, মন্বন্তর, ইন্দ্রপাত, বাসুদেব দেহত্যাগ করেছেন।

সমস্ত সভা একসঙ্গে বলে ওঠে অসম্ভব।

স্বচক্ষে দেখে এলাম সমুদ্রতীরে চিতা-শয্যায় শায়িত।

বড় বহিন বলল তবে বুঝি তিনিও বলভদ্রের মতো যোগে দেহত্যাগ করেছেন।

না, বড়বহিন না, কাল রাতে এক ব্যাধ তীরের আঘাতে তাঁকে নিহত করেছে।

এমন দুঃসংবাদের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, বস্তুত সকলেরই বিশ্বাস ছিল বাসুদেব দেবতা, জরা মৃত্যুর অতীত। বিস্ময় প্রকাশ করবার ভাষা কেউ খুঁজে পায় না।

কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করলো মল্লিকা, বলল, দেবতা না ছাই। একটা তীরের আঘাত যিনি সহ্য করতে পারেন না তাঁরই কাছে নাকি যাচ্ছিলাম প্রতিকারের আশায়

সকলকে নীরব দেখে বলল, কি সবাই যে হাঁ করে বসে থাকলে।

কি করা যায় তাই ভাবছি।

তবে বসে বসে ভাবো, আমি চললাম।

কোথায়?

যেখানে দুই চোখ যায় বলে অধিক চিন্তা মাত্র না করে অন্ধকারের মধ্যে সে প্রস্থান করলো।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার পল্লী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বাদেশিকতা সম্পর্কে তাঁর মূলগত ধারণার সঙ্গে তাঁর সমকালীন রাজনীতি-মুখী স্বাদেশিকতা ও আন্দোলনের মূলগত পার্থক্য ছিল বলেই সমকালীন রাজনীতির আদর্শ সম্পর্কে সহানুভূতি থাকলেও তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন নি। এবং এই পার্থক্যের কথাও তিনি অসংকোচে তাঁর রচনায় ব্যক্ত করেছেন :

'সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব—আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কেনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে, একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।'

(কালান্তর : স্বরাজসাধন)

'অন্তরে বাহিরে এই আত্মকর্তৃত্বের চর্চার' যে অভাব তা তাঁর কল্পনালব্ধ কোন চিন্তা নয়; অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ। ভারতবর্ষের সমাজের মূল অন্তর্মূর্তি ও তার উদ্দেশ্যকে তিনি প্রাথমিকভাবে জন্মসূত্রেলব্ধ বোধ এবং পরবর্তী কল্পনা, চিন্তা ও ধ্যান থেকে আবিষ্কার করেছিলেন, যার মূলে ছিল সশ্রদ্ধ প্রেম—দেশের মানুষ ও মাটিকার সম্মিলনে গঠিত সমাজের প্রতি প্রেম। এই মূর্তি ও তার অভিপ্রায়কে তিনি তপন দেবমূর্তির মধ্যেই দেবতার অস্তিত্বের মত নিজের পল্লীবাসের সময় দেশের গভীর অভ্যন্তরে পল্লীসমাজের মর্মলোকে প্রত্যক্ষভাবে স্থিত রূপে দেখতে পেয়েছিলেন; সেই সঙ্গে তার বিকৃতিও তাঁর দৃষ্টির অগোচর ছিল না। তাই দেশের অন্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও আনন্দের অভাবের অন্তরালে এই সমস্ত অভাবের মূল কারণ যে 'অন্তরে বাহিরে আত্মকর্তৃত্বের অভাব' তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর স্বাদেশিকতার মূল ধ্যানকে অটুট প্রত্যয়ে পরিণত করেছিল। এই প্রত্যয়ের জন্যই নিজের সমকালীন রাজনীতি ও আন্দোলন থেকে নিজেকে পৃথক রাখা সম্পূর্ণ অসংকোচেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

মহাকবি ধনীর সন্তান ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে, ঠাকুর-পরিবারের সন্তান হিসাবে তাঁদের বৃহৎ জমিদারী পরিচালনার দায়িত্বও তাঁকে বেশ কিছুকাল বহন করতে হয়েছিল। আমাদের যখন প্রথম যৌবন, যখন দেশ স্বাধীন হয় নি, যখন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার বইছে অথচ মহাকবি তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও তার থেকে দূরে আছেন, সেই কালে মহাকবির সমাজের উচ্চমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত জীবনের সঙ্গে নিম্নতলবাসী সাধারণ মানুষের জীবনের যোগাযোগ নাই—এমনি ধরনের একটা কথা, একটা ধারণা শিক্ষিত সমাজে দৃঢ়-বিশ্বাসের মত প্রচলিত ছিল; এবং সে কথা নিম্নকণ্ঠে কোথাও কোথাও উচ্চারিতও হত। বলা বাহুল্য তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অভিযোগের মৃদু সুরও অনুপস্থিত থাকত না।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও স্বাদেশিকতা সংক্রান্ত রচনাগুলি, যা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে তাঁর জীবনের অন্তিম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘকালের মধ্যে রচিত, সেগুলির সঙ্গে যথাযথ পরিচয় হলে এ সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন হবে। এবং পাঠক একান্ত শ্রদ্ধা ও বিস্মিত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারবেন যে ধনীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও যে কোন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মানুষের চেয়ে দেশের সাধারণ মানুষ ও চাষী সম্পর্কে মহাকবির পরিচয় ও অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেকগুণে ভারী ও তীক্ষ্ণতরভাবে স্পষ্ট। পল্লীর মানুষ ও চাষী পরিবারের আর্থিক অবস্থা, তাদের অভ্যাস, তাদের চরিত্র ও চরিত্রের গড়ন সব তিনি বিশিষ্ট ও স্পষ্টভাবে জানতেন। তিনি চাষীর সম্পর্কে লক্ষ্য করেছেন, চাষী যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে সে কাজ করে না, এ অপবাদ তাকে দেওয়া অন্যায় একথা তিনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন। আমাদের দেশের চাষীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, চিত্ত ভীরু এবং সংস্কারগ্রস্ত এ তাঁরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। তিনি দেখেছেন চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এমনি যে তাতে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। অথচ একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আর একটা ভিন্নপ্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা প্রয়োজন; সে সক্রিয়তা চাষের লাইন-বাঁধা কাজে থাকে না। বাংলা দেশের অন্তত দুটি জেলার চাষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে তিনি নিজেই দাবী করেছেন। এই অঞ্চলের চাষীদের অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তিনি দেখেছেন এক জেলা এক ফসলের দেশ যেখানে ধান ফলাতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তারপরে তারা তাদের ভিটের জমিতে অবসরকালে সব্জি উৎপন্ন করতে পারত। এ নিয়ে তিনি তাদের যথেষ্ট উৎসাহও দিয়েছিলেন। কিন্তু ফল পান নি। যারা ধান-চাষের জন্যে প্রাণপণ করতে পারে তারা সব্জি-চাষের জন্য নড়ে বসতে চায় না; ধানের লাইন থেকে তাদের মনকে সব্জির লাইনে টেনে তোলা অত্যন্ত দুঃসহ কর্ম একথা তিনি বাথিত বিস্ময়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। আর এক জেলার চাষী ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকল রকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু যে জমিতে এসব ফসল হয় না সহজে, সে জমি তাদের এমনি পড়ে থাকে, তার জন্য খাজনা বহন করে চলে তবু নিজের অভ্যাস ছেড়ে তাতে কিছু ফলাবার চেষ্টা করবে না। অথচ বৎসরে-বৎসরে পশ্চিম অঞ্চল থেকে চাষী এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে নিয়ে দেশে ফেরে।

এসব মহাকবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর রায়ত সম্পর্কে আরও কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা আমি তাঁর রচনা থেকেই উদ্ধৃত করব। প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের 'রায়তের কথা' প্রকাশিত হবার পর, আজ থেকে চুয়াল্লিশ বৎসর আগে প্রমথ চৌধুরী মশায়কে তিনি লিখেছিলেন :

'আমি নিজে জমিদার, এই জন্য হঠাৎ মনে হতে পারে আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তাহলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মনাবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি; অর্থাৎ কোনটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই ধনীবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয় পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁত নখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরনের হবে না।......

আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারী। এই কারণেই জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে

প্যারাসাইট, পরান্নপুষ্ট জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোন যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোট হাতের মাপে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে। 'রায়তের কথায়' পুরাতন দপ্তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখ-স্বপ্নের বাদ সাধতে বসেছ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি; রায়তদের বলছি 'প্রজা', তারা আমাদের বলছে 'রাজা'—মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারী ছেড়ে দিলেই তো হয়? কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলাম-চোর খেলায় গোলাম যাকেই গছিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে-দেখতে এক বড় জমিদারের জায়গায় দশ ছোট জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড় জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোন পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরের বাধা না থাকে?......

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রী হয়ই তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার টাকা আছে, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে-কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, একথা সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড-খণ্ড হতে থাকবে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্পস্বল্প হবেই, কাজেই অভাবের তাড়নায় খরিদ-বিক্রী বেড়েই চলবে। এমনি করে ছোট-ছোট জমিগুলি ধনীর মহাজনের বড়-বড় বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে-ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে যাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকী থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্বসমাসে তা আর টেকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি। কিন্তু তাকে রফা করতে বাধ্য করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একে-বারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের জায়গা আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোন খেসারত পাবে কি না সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

*

মূল কথাটাই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা নিজেকে কোনমতে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জন্মে তাদের মত ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়তখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে-হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল-জালিয়াতী, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরুপ — কোন বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোট-ছোট ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড়-বড় ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোট-ছোট জমি ছলে-বলে-কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গরুর গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোন প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে, গদার আবির্ভাব হয়।......

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের অনুকূল করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উল্টিয়ে মারা ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড়-বড় পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যত দিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে তত দিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।

এই কথা বলতে ইচ্ছা করে না শুনতেও ভাল লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। এক দিক থেকে দেখতে

মিডিয়াম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যাণ্ড	কিলোসাইকলস্
১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১	২১৪৬০, ১৫০৯৫ ১১৭৩০ ও ৯৬৪০
মিডিয়াম-ওয়েভ	
১৯০ মীটার	১৫৮০

গেলে ষোল-আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে।... আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তরের করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকী থাকবে?......

আমি জানি, জমিদার নির্লোভ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশী আটক পড়ে।......দেখতে-দেখতে চাষীর জমি সরে-সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোন হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশী কড়া—যদি তাও না মানো এটা মানতে হবে, সেটা আর-একটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়। একথা খুব সত্য। রাজ-সরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমার কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়-বিরুদ্ধ। তাছাড়া এই ব্যবস্থাটা জমির উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে স্বাভাবিক উৎসাহের একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তাছাড়া গাছ কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোন মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এ-সব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোন আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোন-একটা খাপ-ছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।'

(কালান্তর : রায়তের কথা)

অতি-দীর্ঘ উদ্ধৃতির জন্য আমাকে মার্জনা করবেন। কিন্তু আমি মনে করি, এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির প্রয়োজন ছিল। দেশের সাধারণ মানুষের সমগ্র জীবনের প্রায় সবটাই আজকের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে, ভূমি-নির্ভর ছিল। এই ভূমি-ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল ১৭৯৩ সালে ইংরেজ-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় জমিদার, রায়ত, তার মাঝখানে নানান ধরনের জমিদারী স্বত্ব ও উপস্বত্বভোগী নানান শ্রেণীর জমিদার; তার সঙ্গে নানান শ্রেণীর মহাজন; সব সমেত মিলে এক অতিজটিল ব্যবস্থা। যিনি এই জটিল ও বিচিত্র ব্যবস্থার সঙ্গে বংশানুক্রমিকভাবে সাত পাকে বাঁধা না পড়ে, এর হাজার ঘাটে জল না খেয়েছেন, তাঁর পক্ষে এই ব্যবস্থার হালহদ্দ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব বলেই মনে করি। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিত কেতাবী বিদ্যার আন্তরিক অভিজ্ঞতা দিয়ে একে বুঝলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে এই সহস্র গ্রন্থিতে গাঁথা, জটিল ব্যবস্থার কোন্ গ্রন্থিতে কতখানি ব্যথা, কতখানি সুখ, কতখানি ছলনা, কতখানি ধূর্ততা, কতখানি সুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি আবদ্ধ মানুষটিকে পীড়ন করেছে তা সঠিক উপলব্ধি করা অসম্ভব। আর যিনি এই ব্যবস্থার মধ্যস্থলের জীব, জমিদার মহাজন বা রায়ত যাই হোন, তার পক্ষেও একে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা তো আরও অসম্ভব। কারণ নিজের অবস্থা ও দৃষ্টি দিয়ে বিচার করার ফলে নিজের স্বার্থই তাঁকে বার-বার ছলনা করে যা বুঝাবে তা সম্পূর্ণ সত্যের থেকে অনেক দূরের পদার্থ। কাজেই এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও যিনি এর সম্পর্কে স্বার্থহীন সামুক্রম্প উদার দৃষ্টি অব্যাহত রাখতে পেরেছেন তিনিই এ সম্পর্কে সঠিক কথা শোনাতে পারেন। বলাই বাহুল্য, সেই দৃষ্টিই দেশের সাধারণ মানুষ যে রায়তের মূর্তিতে, প্রজার মূর্তিতে এই ব্যবস্থায় জড়ীভূত ছিল তাদের সঠিক অবস্থাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেখাতে পারে।

মহাকবি আপনার সাধারণ গুণে এবং অভিজ্ঞতার আনুকূল্যে সেই দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তিনি জন্মসূত্রে জমিদারের কর্ম সাময়িকভাবে করলেও, তিনি, তাঁর কথা মতই, আসলে ছিলেন আসমানদার। তাই কর্মে জমিদারী করলেও মর্মে জমিদারী বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির প্রবেশাধিকার পায়

গায়ে ব্যথা?

অ্যানাসিন

ব্যথাবেদনায় অনেক বেশী আরাম দেয়

কারণ জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

চিত্র-প্রযোজক শ্রী সৌরেন্দ্র মুখার্জি ও তাঁর কন্যা রোমিলা। দুজনেই অ্যানাসিন ব্যবহার করেন। শ্রী মুখার্জি বলেন, "অ্যানাসিন আমাকে চটপট আরাম দেয়"।

জোরালো, কারণ সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা ব্যথা-বেদনা উপশমের যে সব ওষুধ সবচেয়ে বেশী খেতে বলেন তা অ্যানাসিনে বেশী পরিমাণে আছে। তাই অ্যানাসিন ব্যথা-বেদনায় চট্ করে আরাম দেয়।

নির্ভরযোগ্য, কারণ ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের মতই এটি বিভিন্ন ওষুধ মিশিয়ে তৈরী। আপনি বাচ্চাদেরও নিশ্চিন্তে অ্যানাসিন দিতে পারেন। বড়দের মাত্রার অর্ধেক, ওদের পক্ষে যথেষ্ট।

ফলদায়ক, —সর্দি ও জ্বরের ব্যথা-বেদনায়, মাথার যন্ত্রণায়, পিঠ কোমরের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায়, দাঁতের ব্যথায়।

অ্যানাসিন

Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co., Ltd.

৪ ভাবে কাজ করে

নি। কর্মের সুযোগে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়েছে এ বিষয়ে; আর মর্মের চারিত্রগুণে রায়তরূপী দেশের লক্ষ-লক্ষ সাধারণ মানুষের অসহায় বেদনা ও দুঃখের সর্বপ্রকারের মূর্তিকে অনুভব করে অসীম মমতার সঙ্গে হৃদয়ে অক্ষয় বেদনার মত ধারণ করে রেখেছিলেন। উপলব্ধির সঙ্গে বেদনার মণি-কাঞ্চনযোগে তাঁকে তাই রায়তের স্বার্থ সম্পর্কে ভিন্নকথা উচ্চারণ করিয়েছিল। আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে প্রথিতযশা প্রমথ চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন জমি যে চাষ করে জমি তারই হওয়া উচিত। যুক্তিগতভাবে একমত হয়েও রায়তের প্রতি সহানুভূতি ও মমতাবশতই পুরোপুরি একথা মানতে তাঁর দ্বিধা এসেছে। বুদ্ধিতে দুর্বল, অর্থশক্তিতে সম্বলহীন রায়তের নিঃসহায় অবস্থার কথা ভেবে তাঁর যে যুক্তি যে জমি চাষ করে জমি তারই—এই প্রাথমিক প্রতিপাদ্যকে মেনে নিয়েছে সেই যুক্তিকেই তাঁর প্রবলতর মমতা করুণ মুখে প্রশ্ন করেছে — জমির উপর প্রজার ষোল আনা অধিকার মানেই প্রজার জমি হস্তান্তর করার অধিকারও স্বীকার করে নেওয়া; যা তিনি নির্ভুলভাবে জানতেন প্রজার পক্ষে তৎকালে আত্মহত্যার অধিকার পাওয়াই হবে। তাই একে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন নি। তবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তার আবশ্যিক আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করাই শ্রেয় বলে মনে করেছেন।

আজ কালধর্মে জমিদার, মহাজন ও রায়তের মধ্যে জমিদার-ভূত কালের প্রাণীতে পরিণত। বাকী শুধু মহাজন ও রায়ত। আজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটেছে; জমিদারী বিলুপ্তির পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভাগ্যবাসরের অন্তে আজ আমাদের সম্মুখের চলমান কালের নাটক মুখর ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মহাজনের যে আধুনিক মূর্তি জোতদার, সেই জোতদার রায়ত আজ সেই নাটকের মুখ্য দুই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। জমিদারী ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে, গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল পূর্বে যা-যা উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলি আজ সব স্তরে-স্তরে ইতিহাসের পূর্ব লিখিত পৃষ্ঠার মত উন্মোচিত হয়ে চলেছে। রায়ত আজ সম্পূর্ণভাবে স্ব-কর্ষিত মৃত্তিকার উপর পূর্ণ কর্তৃত্বলাভের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি এই জটিল সমস্যাকে রায়তের দৃষ্টি দিয়েই দেখেছিলেন এবং সমস্যাটিকে তার পূর্ণ মূর্তিতেই চিনতেন। যে ধাতুগত সাধনা ও হৃদয়গত মমতা জমিদার রবীন্দ্রনাথকে রায়তের চোখ দিয়ে সমস্যাটিকে দেখতে শিখিয়েছিল সেই তাকে ওইখানেই থামতে দেয় নি, আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই কুম্ভীপাক থেকে মুক্তির পথ সন্ধানে। 'রায়তের কথা'র শেষ অংশে তাই তিনি উচ্চারণ করলেন:

'কেমন করে সেটা হবে সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছু কাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কিনা জানি নে—জবাব তৈরী হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে।'

স্বদেশের যে মূর্তিকে সমাজের মধ্যে তিনি প্রকট দেখেছেন তার বাঁচবার পথও তিনি চিন্তা, পড়াশুনো ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—এই তিনের মধ্য দিয়ে অভ্রান্তভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। তার বাঁচবার যে শক্তি তা নিহিত আছে সমাজের জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, বিচ্ছিন্ন কোন অংশে বা বিশেষ কোন কর্মের মধ্যে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলেই তা সম্ভব। আর পল্লীর সামগ্রিক প্রাণসঞ্চার সামগ্রিক আত্ম-উদ্বোধনের মধ্যে, উদ্বুদ্ধ আত্মশক্তির মধ্যেই নির্ভুলভাবে নিহিত। সে আত্ম-উদ্বোধনের অর্থ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুই অংশের এক সঙ্গে উদ্বোধন।

এরই জন্য শ্রীনিকেতনে হাতে-কলমে কাজের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা হয়েছে। আবার এই চিন্তা ও কর্মের রূপ কেমন হবে বা হতে পারে তার ভাবনা তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। প্রাণকে জড়ত্ব থেকে উদ্বোধনের জন্য যে প্রাণ পর্যন্ত পণ করার প্রয়োজন হতে পারে তাও বলেছেন তিনি। সেই বহু সংখ্যক রচনার মধ্যে, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি:

'প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকী—দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না! এতো বড় আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী করে?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে-আরে, এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপাদিত্য। দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ—সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক।

(তৃতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য)

জীবনের দীর্ঘকাল সর্ববিধ অভাবে জর্জর, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অন্তরে ভীরু, অসহায়, দুর্বল দেশবাসীর সামগ্রিক কল্যাণকামনায় তাদের পূর্ণ উদ্বোধনের দ্বারা আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠালাভের স্বপ্নকে মহাকবি আজীবন মন্ত্রজপের মত নিরন্তর চিন্তা করেছেন। সেইখানেই তার শেষ হয় নি। তাদের বাইরের ও ভিতরের অভাব ও দৈন্য দূর করবার কামনায় যতটুকু পারেন কাজে হাত লাগিয়েছেন। নিজের সীমিত সম্পত্তি ও কর্মের সংকীর্ণ পরিধির কথা জেনেও কাজে হাত না দিয়ে পারেন নি। সম্পূর্ণই জানতেন যে, আলো জ্বলবে কি না কে জানে, আর জ্বললেও তার শিখায় অতিবৎসামান্য অন্ধকার বিদূরিত হবে। তবে মনে অন্তত এই আশা ছিল যে, কোথাও কোনও এক কোণের অন্ধকারও তো দূর হবে!

তাই সেই আলো জ্বালার কাজে কলম রেখে হাত লাগিয়েছেন। জ্বালা আলোর কম্পিত শিখাটিকে প্রতিকূলতার ঝোড়ো বাতাস থেকে আড়াল করে বাঁচাতে চেয়েছেন।

কিন্তু কেন?

সারাজীবন মনে পড়েছে পীড়িত দেখা-অদেখা কোটি মানুষের মুখ, অভাবে শীর্ণ, ভীরুতায় সকরুণ, অজস্র পীড়নে অসহায় ও ভয়ার্ত। সেই বেদনা সারাজীবন তাঁকে ব্যথিত করে রেখেছে। বোধহয় সুগভীর স্নেহে, আকুল মমতায় তাদের সকলের সব ব্যথা নিজের বুকে কেড়ে নেবার সুতীব্র কামনা জেগেছে। তাই কাজে হাত দিয়েও মনে হয়েছে এ কতটুকু! তাদের সবারই মুখ মনে পড়ে হতাশার মর্মযাতনা ভোগ করেছেন। বুঝেছেন প্রয়োজন অনেক-অনেক বেশী।

স্বদেশের সব পীড়িত মানুষের সব দুঃখ এক নিমেষে নিঃশেষে মুছে নিতে পারলে যাঁর পরিতৃপ্তি হত, কিন্তু দেশের মানুষের দুঃখকে অশেষ বলে দেখতে পেয়ে যাঁকে সারাজীবন অপরিতৃপ্ত থাকতে হয়েছে, সেই স্বদেশ ও সমাজপ্রেমিক মহাকবি দেশের মানুষ ও মৃত্তিকার মঙ্গল সম্মিলনে রচিত স্বদেশের সমাজের সম্মুখে একান্ত নম্র ক্ষমা-প্রার্থনার জন্যই যেন সকরুণ কাতরতার সঙ্গে জোড় হাতে প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন:

'অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা—
তবু জানি নে যে
কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা।'

তাঁর সুবৃহৎ, সুবিশাল ও সুদূর-প্রসারী স্বদেশ-চিন্তার মধ্যে তাঁর মনটিকে বুঝতে যদি কারও ভুল হয়, তাঁর এই সকরুণ, নম্র, কাতর আক্ষেপের তীব্রতার মধ্যে তাঁর মনটিকে চিনতে নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি ঘটবে না।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। তিরিশ ।।

নবেন্দুর ম্যানেজার মৃদু টোকা শুনে মীরা দু চোখ একবার আয়নার দিকে তাকাল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের পাউডার পাউডার মিলিয়ে তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিল। সমীর হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। দরজা খোলা রেখে পর্দাটা ফেলে মীরা গম্ভীর মুখে ফিরে এল। সমীর সোফা চেয়ারে বসে আয়েস করে সিগারেট টানছে।

—আপনি আবার এসেছেন। মীরা মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, সেদিন আপনার কাকিমা তো যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করে গেলেন। আমি শিগগির এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

—যান না যেখানে খুশি। সমীর তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, কাকিমাকেও আমি জানিনে। জানেন মিস মিত্র। কাকিমার চোখে জল এসে পড়েছিল। কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন?

—দেখুন সমীরবাবু, আমার সম্পূর্ণ পরিচয় আপনি জানেন না। আমি বিবাহিতা। পাঁচ বছরের একটা ছেলে রয়েছে। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না দেখে এখানে আছি। ছেলে বোর্ডিং থাকে। আমি তো চাকরি করছি কলকাতায়। যাওয়ার আগে আপনাকে জানালাম।

সমীরের মুখে একটা হাসি ফুটে মিলিয়ে যায়। মীরা নীরবে লক্ষ্য ক

চাকরীটা হয়েছে বস অত্যন্ত ভালমানুষ। মাইনেও মোটামুটি মন্দ নয়। সমীরের মাথায় যে বুদ্ধি। তীক্ষ্ণচোখে সে সমীরের দিকে তাকাল। না, মুখে হাসি ফুটেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে।

তাড়াতাড়ি দু-কাপ চা বানিয়ে নিল মীরা। এক কাপ সমীরের দিকে এগিয়ে দিল, আপনার কী এতদিনেও একটা বান্ধবী জোগাড় হল না?

—দূর! কিচ্ছু ভাল লাগছে না। সমীর চায়ের কাপে চুমুক দিল, আপনি সত্যি অদ্ভুত। ডাইভোর্স করছেন না কেন? ভদ্রলোক কোথায় থাকেন?

—থাক, থাক! মীরা ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল, ঐ জন্যেই তো আপনাকে কিছু বলতে চাই নে। একটা কথা বললে হাজার প্রশ্ন করবেন। এত কৌতূহল কেন!

সমীর চুপ। চোখমুখ কেমন বিমর্ষ লাগছে। মীরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে সমীরকে আড়চোখে দেখতে থাকে। হাঁ, অন্য জায়গায় উঠে যেতে হবে। এবার উঠবে মেয়েদের কোন হোস্টেলে কিংবা বোর্ডিংয়ে। নতুন চাকরীতে কিছুটা শান্তি মনে হয়। পল্টুকে মাসে দশ একবার সে দেখে না। বাড়িটাও তেমনি। কলিং বেল বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই। সমীর উঠে গেল। আশ্চর্য।

—রাগ করলেন সমীরবাবু? মীরা হাসিমুখে তাকাল, আপনি যা আমার উপকার করেছেন...। বলতে বলতে সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এগিয়ে যায়। ড্রয়ার খুলে পোস্টকার্ড সাইজের একখানা ফটো

বের করে সমীরের চোখের সামনে মেলে ধরল, দেখুন ভাল করে। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ সুন্দর। এই আমার পল্টু। উঃ যা দুষ্টু কী বলবো!

মীরা হাসতে হাসতে বলে, জানেন। এই ভদ্রলোক মাঝে মাঝে এসে ডিভোর্সের কথা বলেন। তারপর একথা সেকথায় পরে চলে যান। শুধু তারিখ পাল্টে যাচ্ছে। আমি অপেক্ষা করে আছি কবে টেলিফোন আসবে।

—রাখুন এসব কথা। সমীর কাঁধ নেড়ে বলে, আপনাদের এই কলকাতা শহরে থাকতে আর ভাল লাগছে না। মানুষের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় এরা সব সবুর রোগে ভোগে। একটা প্রশ্ন করলে নিস্পৃহভাবে জবাব দেয়। দূর ছাই! আর বেশিদিন নয়। একটা চান্স পেয়েছি বাইরে যাবার। অফিস পাঠাচ্ছে।

—বাঃ বেশ সুখবর। কবে যাচ্ছেন?

—খুব শিগগির। গিয়ে চিঠি দেব। জবাব দেবেন তো?

—রাখুন তো সব তোলা কথা! মীরা দর্পভরে মুখভঙ্গি করল, কত মনে থাকবে আমার কথা। সাদা চামড়ার মেয়েদের দেখলে তো আপনারা গলে যান! নিন এবার উঠুন। আমি আর দ্বিতীয়বার থেকে অপমানিত হতে চাই না আপনার কাকিমার কাছে।

সমীর চলে গেলে মীরা দরজা বন্ধ করে দিল। এই তাক হল। কী নোংরা মানুষের মন! সমীরের কাকিমার বক্তৃতা মনে পড়ল। মীরা একবার ঘড়ির দিকে

তাকাল। সবে সাড়ে আটটা। এত তাড়াতাড়ি খাবে না। একটা উপন্যাস খুলে পড়তে বসল। কয়েক পাতা পড়ার পর রেখে দিল। এমন অশান্ত মন নিয়ে বই পড়া যায় না। সে এখন কী করবে...বাস্তবিক সকালটা কাজ-কর্মের মধ্যে কেটে যায় কিন্তু অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যার পর সময় কাটাতে চায় না।

দুজনেরই এক অফিস। অফিসের মধ্যেই এঘর-ওঘর যাতায়াতের সময় দেখা হয়ে যায়। সামান্য দু-একটি কথাবার্তা। কেমন লাগছে, নতুন চাকরী? মন্দ কি? মীরার মুখে সামান্য হাসি। সাহেব ডাকছে—চলি। স্মিতমুখে সমীর ফাইল হাতে হনহন করে এগোয়।

—সমীরবাবু। একটু শুনুন।

কী? সমীর দু-এক পা এগিয়ে আসে। মীরার মুখের দিকে তাকায়। বড় তীক্ষ্ণ কথাবার্তা মীরার। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে যায়। অবশ্য হাসিমুখেই কথাগুলি বলে। যদি কখনও সামান্য রাগ বা বিরক্তি হয়, চেপে রাখতে হয় মনে মনে।

—আজ অফিসের পর আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। কথা আছে। একসঙ্গে ফিরবো।

মীরা এদিক ওদিক তাকিয়ে চলে যায়। সমীর একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সামান্য হেসে সাহেবের ঘরের দিকে পা বাড়াল। একটু অন্যরকম লাগছিল মীরাকে। কেমন যেন অন্যমনস্ক। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না। কেন? অনেক কারণ থাকতে পারে। তার এত জানবার জন্যে আগ্রহ কেন?

ছুটির পর রাস্তায় দুজনে পাশাপাশি হাটল নিঃশব্দে। সমীর দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে দমে যায়। গম্ভীর মুখ। সমীর চারদিকে তাকাল। উঃ কী ভীড়! সবে সন্ধ্যা পেরিয়েছে। নিয়নের বিজ্ঞাপন দপ্-দপ্ করে জ্বলছে আর নিভছে।

—বলুন কী কথা মীরা দেবী? সমীর এইরকম নীরবে হেঁটে যাওয়াকে বরদাস্ত করতে পারছিল না। এত কী ভাবছে? ঠিক আছে, বাড়িতে না হয় কথাবার্তা বলবে না। কাকিমা পছন্দ করে না। মেয়েটা নাকি ভাল নয়। আগে একটা ছেলে থাকত। মেয়েটার দূর সম্পর্কের দাদা। তা অনেকদিন সে বাড়াটির পাত্তা নেই। খুকীকে সমু, তুই ওর ঘরে গিয়ে আর গল্প করিস না। ফ্যাসাদে পড়বি। মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র ঠিক নেই।

মীরা চোখ কাঁপিয়ে হাসল, অবাক করলেন তো। বলে সে হঠাৎ সমীরের একটা হাত ধরে সামান্য টেনে আনল, সাবধানে হাটুন। আর একটু হলেই ভদ্রমহিলার গায়ের ওপর...। আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে দেখুন।

সমীর কোনরকম লজ্জিত হল না। বরং হেসে বলল, আপনাকে আজ অন্যরকম লাগছে।

—কী রকম?

—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিছু বলতে চান—অথচ পারছেন না। বলুন, আমি শুনতে আগ্রহী।

—বেশি আগ্রহ ভাল না। মীরা মুখ টিপে হাসল, আপনার কোন কাজ নেই তো এখন?

—এখন আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোই একমাত্র কাজ। কিন্তু ব্যাপার কী? বাড়ি ফিরবেন না?

—রোজই তো ফিরি। একা ঘরে সন্ধ্যে থেকে রাত...আপনি বুঝবেন না...। মীরা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চাই না। তবু একা ঘরে, গোটা অতীত ছায়ার মত আমাকে ঘিরে ধরে। জীবনের স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বীকার করে বাঁচা ভীষণ কষ্টের। ভীষণ ক্লান্তিকর।

মীরা হঠাৎ উজ্জ্বল হাসিতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলে, দূর ছাই এসব আবোল তাবোল কথা কেন আপনাকে শোনাচ্ছি। চলুন আজ খুব ঘুরে বেড়াই। খিদে লাগলে কোন রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়বো। পরিশ্রান্ত হলে পার্কে ঘাসের ওপর বসব। আপনি কথা বলবেন, আমি শুনবো। দুঃখের কথা বলা চলবে না। শুধু শুভ-মুহূর্তের কথা। আনন্দের কথা। গৌরবের কথা। চলুন চলুন সমীরবাবু।

—কোথায় যাবেন? সমীর রীতিমত অবাক। মীরার মুখে যেন খৈ ফুটছে। নিয়নের আলোয় বড় সুন্দর লাগছে মীরাকে। এমন চঞ্চল মীরাকে সে চেনে না।

—আরে হাটুন না। মীরা সমীরের একটা হাত ধরে মৃদু টান দিল, দেখুন চারপাশে কী এলাহি কাণ্ড। কী চোখ-ঝলসানো আলো! ঐ দেখুন মেয়েটার চুল কী সুন্দর। ফিগারটাও ভাল। দেখুন সবার মুখে হাসি। আসুন না এই ছবিগুলি দেখি। এর ছবি দেখেছেন? সোফিয়া লোরেন। খুব সুন্দর অভিনয় করেন। কটা বাজে দেখুন তো। ছটা বেজে দশ। চলুন এই ছবিটা দেখি।

সমীর ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। মীরা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে ভাবল, আজ মীরার কী যেন হয়েছে। যাই হোক, এমনটি সে পছন্দ করে। মানুষের মধ্যে উৎসাহ থাকা দরকার। সব সময় মুখ গোমড়া করে থাকা—এ-জাতীয় নর-নারীর সংস্পর্শ থেকে সে যথাসাধ্য দূরে থাকে।

—পেয়েছি টিকিট। মীরা হাসিমুখে এসে দাঁড়াল, চলুন আর দাঁড়ালে চলবে না। এখুনি বই আরম্ভ হবে। আরে সিগারেটটা ফেলুন না।

সমীর কিছু কাজুবাদাম কিনে মীরার পিছন পিছন সিনেমা হলে ঢুকল। অন্ধকারে কোথায় যেন মীরা হারিয়ে যায়। পর্দায় বিজ্ঞাপন। টর্চ হাতে একজন এগিয়ে এল। সমীর টর্চের ক্ষীণ আলোয় মীরাকে দেখল।

একধারে দুটো সীট। পাশাপাশি ওরা বসল। ছবি শুরু হয়েছে। সমীর মীরার চুলের সুন্দর, বাদের মতন গন্ধটা অনুভব করল। পরক্ষে ওর সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ সে একটু সরে বসল।

—এই নিন। কাজুবাদামের প্যাকেট মীরার হাতে দিতে দিতে নরম আঙ্গুলের স্পর্শসুখ অনুভব করল সমীর। আবছা আলোয় মীরার মুখের অভিব্যক্তি সে টের পেল না। তার হঠাৎ ভীষণ খারাপ লাগল এই ভেবে যে, সে কিছুদিন পর বাইরে চলে যাচ্ছে। মীরা হয়ত তার আগেই অন্য কোথাও উঠে যাবে। তাদের মধ্যে আর দেখাশোনাও হবে না। দুদিনের আলাপ পরিচয়। এর মধ্যেই পরস্পরকে তারা বিশ্বাস করেছিল। সহজ স্বাভাবিক একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে।

কী যে ছবি সমীর বুঝতে পারল না। বুঝবে কি, ভাল করে দেখাই হল না। সমস্ত শরীর ওপর বসে শুধুই অন্য কথা ভেবেছে। আর লুকিয়ে মীরাকে দেখেছে। এক সময় মীরা ওর একটা হাত কিছুক্ষণ মুঠোয় চেপে রেখেছিল। সেই সময়টা কেউ কারুর মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। কিন্তু না তাকালেও সমীর অন্য একটি ভিতর হাতের কম্পন অনুভব করেছে। আর কেন জানি ওর মনে হয়েছে, নিঃশব্দে কাঁদছে মীরা। যদিও সে ওর দিকে তাকায়নি।

ছবি শেষ হওয়ার পর ওরা একটু অপেক্ষা করল। ভীড় পাতলা হলে বাইরে এল। সমীর লক্ষ্য করল মীরার মুখ বেশ গম্ভীর। না গম্ভীর নয়, অনেকটা বিষাদ মাখানো। ম্লান সন্ধ্যায় একা একা নির্জন পথে হাটলে যেরকম বিষাদ বুকের মধ্যে জমে ওঠে...কেমন ফাঁকা মনে হয় বুকের চাপা কান্না গুমড়ে ওঠে।

সমীর সিগারেট ধরাল। চারদিকে এত মানুষের হাসি, কণ্ঠস্বর, অথচ তার বুকে একটা ভারী পাথর যেন চেপে বসেছে। আজকের এই সিনেমা দেখা, একসঙ্গে কিছুক্ষণ ঘোরা, কিছুদিন পর স্মৃতি হয়ে যাবে। বিদেশে থাকাকালীন হঠাৎ কোন নির্জন সন্ধ্যায়, একাকী চাটায় সময়, নিজের অলক্ষ্যে চমকে উঠবে—আর ভেসে উঠবে একটা মুখ, আনন্দ-বিষাদ আরও অনেক কিছু মাখানো। সে হয়তো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কোটের কলার তুলে হাটতে শুরু করবে।

চলুন। কী দেখছেন অমন করে?

—আপনাকে। সমীর চঞ্চল স্বরে বলল, যত পারি দেখেনি। চলেই তো যাচ্ছেন।

—প্রাণভরে দেখুন। মীরা খিলখিল করে হাসল, তবুও যদি ভবিষ্যতে হয়ত কখন মনে হয়, আমার কথা। এখন বাড়ি ফেরা যাক। নাকি আরও ঘুরবেন সমীরবাবু?

—আপত্তি নেই। একেবারে সারারাত।

—ইস্ সখ তো কম নয়। বরং কিছুক্ষণ ঘাসের ওপর বসা যাক। চলুন।

সমীরের কিছুতেই আপত্তি নেই। যা বলছে মীরা তাতেই সে রাজী। ঘাসের ওপর মুখোমুখি বসল দুজনে। বাতাস কিমন মীরা। খোঁপা ছাড়াল অল্প করে। আলুথালু এলোমেলো চুল হয়েছে। একটু পর

CENTRAL LIBRARY

পর চা-ওলা, ফুচকেঅলা, চানাচুরঅলা এসে ওদের বিরক্ত করতে লাগল। গ্রীনফিল্ডের হাতে যৌবন-প্রাবল্যে উপচে পড়া কতিপয় যুবক ওদের দিকে কঠোর মন্তব্য ছুঁড়ে চলে যায়।

—থাক। মীরা মৃদু ধমক দিল, বীরত্ব দেখাতে হবে না। ওরা দলে ভারী। মেরে আপনাকে ভূত করে দেবে। বলে সে হাসতে থাকে, আর আমাকে রোস্ট বানাত!

—একটা কথা বলবো। সমীর গম্ভীর মুখ করল, আপনি মার কাছে ফিরে যান। অথবা নতুন জীবনের কথা চিন্তা করুন। এভাবে একা বেশিদিন থাকতে পারবেন না।

—একা কোথায়, আপনি তো আছেন। মুখ টিপে হাসল মীরা আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন না।

—থাক মীরা। সমীর উঠে দাঁড়াল, রাত দশটা। আরও বসবেন নাকি?

—এরপর পুলিশে ধরবে। মীরাও উঠে দাঁড়াল, সত্যি বলছি আমার কিন্তু এখন ফিরতে ইচ্ছে করছে না। কোথায় ফিরবো? কেউ নেই পাশে!

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকে মীরা।

সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় মার জ্বর লক্ষ্য করল বিনয়। স্কুলে যাবে না একরকম ঠিক করেছিল; নীরব জানালেন তার জন্যে স্কুল কামাই করতে হবে না। সামান্য জ্বর। একটু বিশ্রাম নিলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। সুতরাং নিশ্চিন্ত চিত্তে বিনয় স্কুলে যায়।

ট্রেনে অসম্ভব ভীড়। রোজ দাঁড়িয়ে যেতে হয়। বিনয় জানালার কাছে দাঁড়ায়। বাড়িতে মাকে দেখবার কেউ নেই। শেফালী সেই ঘটনার পর থেকে পিত্রালয়ে থাকছে। শেফালীর বাবা খুব কড়া চিঠি লিখেছেন। এমন পাষণ্ড জামাইয়ের কাছে আর মেয়ে পাঠাবেন না। আরও অনেক কিছু। চিঠি পড়ে বিনয় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছে।

এদিক ওদিক তাকাল বিনয়। অনেক মুখচেনা। রোজকার যাত্রী। কামরায় জোর আলোচনা। রাজনীতি থেকে খেলাধুলো, সিনেমা। চালের দর ইত্যাদি। বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া আর [illegible] করছে লোক। দমবন্ধ হয়ে আসতে চায়। সেই জন্যে জানালার কাছে দাঁড়ানো। অন্ততঃ স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারবে।

নিত্যর জেল হয়ে গিয়েছে। চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তার। উকিলের কাছে ছোটাছুটি টাকা পয়সা খরচ; তানিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে এসব করেছে। কিন্তু নিত্য কোর্টে আবোলতাবোল কথা বলে কেসটার বারটা বাজিয়ে দিল। একেই নামকরা ক্রিমিনাল। তাছাড়া এবারের মারপিটের ঘটনায় ও জড়িত না থাকলেও, কেস সাজানোর কারসাজিতে ওর পক্ষে রেহাই পাওয়া সম্ভব হল না।

—ভাল হয়েছে মাস্টারমশাই। কিছুদিন শান্তিতে থাকা যাবে।

বিনয় একটু অবাক দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়েছে। তানিয়ার বাবা। নিরীহ চেহারা।

—আপনি তানিয়াকে একটু যত্ন করে পড়ান। ও লেখাপড়া শিখে যদি নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারে, একমাত্র এই আমার কামনা। খুকি, মাস্টারমশাইকে চা এনে দাও।

শোভাবাজারের মোড়ে বাড়ি ফেরার পথে সেদিন তানিয়ার সঙ্গে দেখা। বিনয় হেসে বলে, কী খুকি, কোথায় চললে?

—স্যার, আমাকে খুকি বলবেন না। দেখুন আমি প্রায় আপনার সমান লম্বা। বলে তানিয়া বিনয়ের প্রায় বুক ঘেঁষে দাঁড়ায়।

বয়সের একটা স্বাভাবিক ধর্ম আছে। ষোড়শী তানিয়ার সর্বাঙ্গে উদ্দাম যৌবন। শাড়ির শাসন মানতে চায় না। বিনয় ছাত্রীর বুকের দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে যায়। তানিয়া রাস্তাঘাটে অনেক সময় অদ্ভুত আচরণ করে। ও হয়তো কিছু না ভেবেই .....কিন্তু আশেপাশের লোক যে বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

—কেমন আছ তানিয়া?

বিনয় ভ্রূকুঞ্চিত তাকাল। লম্বা চেহারা যুবকটির। খুব ফর্সা। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। পরনে চোঙা প্যান্ট। চওড়া বেল্ট। বিশ্রীভাবে তানিয়ার দিকে তাকিয়ে।

—ভাল। চলুন মাস্টার মশাই। তানিয়া বিনয়ের একটা হাত খপ করে ধরে মৃদু টান দেয়। যুবকটির দিকে মোটেও ফিরে তাকায় না। যুবকটির মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সে একবার বিনয়ের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকায়। বিনয় চোখাচোখি হতে অন্যদিকে মুখ ঘোরায়।

—একটা কথা শুনে যাও তানিয়া।

—কী? তানিয়া বিনয়ের পাশে দাঁড়িয়ে অপ্রসন্নচোখে যুবকটির দিকে তাকায়। তারপর কী ভেবে এগিয়ে যায় যুবকটির কাছে। ওরা একটু দূরে সরে যায়। বিনয় এবার আড়চোখে ওদের দিকে তাকায়। তানিয়ার মুখ লাল। মাথা নেড়ে কী যেন বলছে। একটু পরে যুবকটি তাচ্ছিল্যের সাথে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে শিস দিতে দিতে চলে যায়।

তানিয়া ফিরে এসে বলে, চলুন স্যার। ভোম্বলদাটা ভারী অসভ্য।

—ছেলেটি কে? বিনয়ের ভীষণ রাগ হয়। এসব বাজে ছেলের সঙ্গে তানিয়ার আলাপ পরিচয় আছে একথা ভাবতেই কষ্ট।

তানিয়া ফিক করে হেসে দিল, আমার এক বান্ধবীর দাদা। ম্যাটিনি শোতে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়। জানেন, বলে কিনা আমার মত সুন্দর মেয়ে দেখেনি।

—থাম! বিনয় ধমক দিয়েছে। কিন্তু ঠেকেছে সব কিছু। ধমক খেয়ে তানিয়ার মুখ ম্লান। পথে আর কোন কথা বলেনি। বাড়ির কাছে আসতে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে।

নিজের মনে একবার হাসল বিনয়। ট্রেন থেকে নেমে হাঁটতে থাকে। শেফালীর সঙ্গে বিচ্ছেদ কী চিরতরে হয়ে গেল? ও তানিয়াকে সহ্য করতে পারত না! সন্দেহ করত। ফলে যত গণ্ডগোল। অথচ তানিয়ার প্রতি সে আসক্ত নয়। একথা শেফালীকে বোঝাবার চেষ্টা করেনি।

স্কুলে ঢোকার মুখে আদিত্যের মুখোমুখি হল বিনয়। ওকে দেখে হনহন করে টীচার্স রুমের দিকে এগিয়ে যায়। মনে মনে হাসল বিনয়। টীচার্স রুমে ঢুকে সে এককোণে বসল।

—এবার আমাদের আন্দোলনের পথে নামতে হবে। ইতিহাসের শিক্ষক বিনয়ের দিকে তাকান, বললেন, আন্দোলন ছাড়া কিছু হবে না। প্রেসার না দিলে কেউ কিছু দিতে চায় না।

বিনয় চুপ। সে মার কথা ভাবছে। কেউ নেই বাড়িতে। অবশ্য তানিয়াকে বলে এসেছে সে যদি পারে, মার কাছে এসে যেন বসে। কিন্তু তানিয়ার ওপর ভরসা করা যায় না। ছেলেমানুষ। ওর কথাবার্তা শুনলে ভীষণ রাগ হয়। কবে কোন ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছে জানালা দিয়ে চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছে......ধমক টমক দিলে আবার দু'চোখ ছলছল হয়ে ওঠে।

—আপনার কী শরীর খারাপ? হ্যাঁ, বিনয়বাবু। আপনাকেই বলছি।

—মনটা ভাল নেই। মার জ্বর দেখে এসেছি।

—চিন্তা করবেন না। ইতিহাসের শিক্ষক বৃদ্ধ মানুষ। দুহাত কপালে তুলে বললেন, ঈশ্বরকে ডাকুন। তাঁর ইচ্ছাই সব। জয় মাধব!

ঘণ্টা পড়তে বিনয় রেহাই পেল। যতসব ভণ্ডামী! সে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এল। তারপর ক্লাসে গিয়ে ঢুকল। যান্ত্রিকভাবে রোলকল করে চিৎকার করতে শুরু করল। চিৎকার ছাড়া কি। একটা ক্লাসে [illegible] ছেলে।

পরপর গোটা চারেক ক্লাস নিয়ে বিনয় হাঁফিয়ে উঠল। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী। ফাঁকি দিতে বিবেকে বাধে। জানে, অধিকাংশ ছেলে মানুষ হবে না। পড়াশুনার একটা চেষ্টা করে। তারাও পড়ানোর ভান করে যায়। এই পর্যন্ত। এতদিনে বুঝেছে শিক্ষকতা পেশা হিসেবে আর পাঁচটা চাকরীর মতই নিতান্ত দিনগত পাপক্ষয়।

বাড়ি ফিরল বিনয় অস্থির মন নিয়ে। বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র তানিয়া ছুটে এসে বলে, স্যার, মাসীমার জ্বর খুব বেড়েছে। প্রায় একশো চার ডিগ্রী। আপনি শিগ্গির ডাক্তার নিয়ে আসুন।

বিনয় তাড়াতাড়ি মার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল। কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল। মাকে ডাকল কয়েকবার। কোন সাড়াশব্দ নেই। তানিয়ার মুখ অনেকটা বিবর্ণ। সে আবার ডাক্তার আনবার জন্যে বিনয়কে তাড়া দিল।

—কখন জ্বরটা বেড়েছে তানিয়া?

—দুপুরের দিকে। আমি এসে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখলাম। আপনি এখনও দাঁড়িয়ে?

—যাচ্ছি।

ভাগ্যিস তানিয়া ছিল। বিনয় তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। ঠাকুর বাড়িটাকে ছাড়িয়ে

দিয়েছে। শেফালী কোথেকে ধরে এনেছিল কে জানে। প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি নিয়ে যে এত গালভরা কথা বলা হয়—এর মানেটা কী? সে এবং শেফালী পরস্পরকে ভালবাসত। একদা। তারপর কাপ ছুঁড়ে মারার ঘটনার পর প্রেম উধাও!

ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে বিনয় তাড়াতাড়ি ফিরে এল। পরিচিত ডাক্তার। তিনি রোগী পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখলেন। তারপর ভিজিটের টাকা পকেটে পুরে জুতোর মচমচ শব্দ করে চলে যান। যাওয়ার আগে অবশ্য বিনয়কে জানালেন চিন্তার কিছু নেই। তবে রোগীর কাছে সব সময় একজন যেন থাকে। এমনকি রাতেও।

তানিয়া আর কতক্ষণ থাকবে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। বিনয় ওষুধ কিনে মার শিয়রের কাছে বসল। তানিয়া স্টোভ জেলে বিনয়ের জন্যে এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এল।

—তুমি এবার বাড়ি যাও তানিয়া। অনেকক্ষণ এসেছো।

—কিন্তু মাসীমার যা অবস্থা......। সময়, আপনি বরং বাড়িতে গিয়ে একটা খবর দিন—আমার ফিরতে দেরী হবে।

—না! বিনয় জোরগলায় বলে, তোমার মা চিন্তা করছেন। এখুনি চলে যাও। বরং কাল একটু সকাল করে এসো।

তানিয়া মুখ কালো করে চলে যায়।

নীহার অস্ফুটস্বরে কী যেন বলছেন। বিনয় একটু নীচু হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী বলছো মা? মা মা! চোখ খুলে দ্যাখ—এই যে আমি। তোমার বিনু।

বিনু! নীহার ঝাপসা চোখে তাকালেন, আমার সময় হয়ে এসেছে। শেফালী কোথায়? মীরাকে ডাক। রজত কোথায়? বিনু, আমার কাছে এগিয়ে আয়। বৌমাকে ডেকে আন।

—তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর মা। কাল ভোরে সবাইকে দেখতে পাবে।

বিনয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে তাকায়। বিড়বিড় করে কী সব বলছেন। কপালে হাত দিল। বেশ গরম। মা কী প্রলাপ বকছেন? সে টের পেল বুকের ভিতরটা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছে। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। অসহনীয় স্তব্ধতা।

—বিনু! নীহার উঠে বসার চেষ্টা করলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি শুইয়ে দেয় মাকে। মার অবস্থা দেখে সে ঘাবড়ে যায়। কেউ নেই। কাকে ডাকবে? হঠাৎ মনে পড়ল তিনতলার সেন দিদির কথা। মার সঙ্গে খাতিরও বেশ।

মার দুচোখ বোজা বিনয় পা টিপে টিপে এগোয়। দরোজা ফাঁক করে নিঃশব্দে বাইরে পা বাড়াল। তাড়াতাড়ি সেনদিদিকে সঙ্গে করে ফিরল। এ কী? মার মাথা তক্তপোষের কিনারে। সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ঠিক মত শুইয়ে দেয় নীহারকে।

—বৌমা-কোথায়? নীহার ঘোলাটে চোখে তাকালেন, শেফালী, তুমি ফিরে এস। রাগ করে দূরে চলে যেও না। বিনুকে আমি আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছি। লক্ষ্মীটি তুমি ফিরে এস।

সেনদিদি নীহারের মাথার কাছে বসে বললেন, তুমি আর দেরী কর না। এখুনি শেফালীকে নিয়ে চলে এস। নইলে তোমার মাকে বাঁচাতে পারবে না। তোমার মার এরকম অবস্থা, একটা খবর পর্যন্ত আমাকে দিলে না। দেরী কর না, তাড়াতাড়ি বৌমাকে নিয়ে এস।

বিনয় উন্মাদের মত রাস্তায় হাঁটতে থাকে। ঘনঘন বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে। মার পাশে সেনদিদি আছেন। তবে কিছুটা ভরসা। এখন রাত প্রায় নটা। বিনয় বড় রাস্তায় এসে একটা ট্যাকসী ডেকে উঠে পড়ল।

শেফালী আসবে কী? মার এরকম অবস্থা জানালে নিশ্চয়ই আসবে। ট্যাকসী জোরে ছুটেছে। এক রকম রাগ করে শেফালীর বাবা মা অন্যত্র উঠে গেছেন। তাকে দেখলে হয়ত কথাই বলবেন না। বহুদিন পর মীরার নাম উচ্চারণ করলেন মা। সে মেয়েটা এখন কেমন আছে কে জানে। বাস্তবিক বড় সে মীরার কথা ভাবে......রজতদাই বা কেমন মানুষ..... শেফালী কী এখনও রজতদা সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করে? এখন তো লুকোচুরির কোন ব্যাপার নেই। শেফালী কী রজতদার সঙ্গে মেলামেশা বজায় রেখেছে? এসব প্রশ্ন ভাবলে সে বড় কষ্ট পায়। শেফালীকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে পারলে সে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে পারবে। সে কী সম্ভব?

গন্তব্যস্থানে নেমে বিনয় ট্যাকসীর ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে যায়। পুরনো দোতলা বাড়ি। কোনদিন সে আসেনি। শেফালীর মুখে থেকে শুনেছে দোতলায় ওরা থাকেন। সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। সিঁড়ির মুখে দরোজা। কড়া নাড়ল কয়েকবার। তারপর শুনল পায়ের শব্দ। সে মনে মনে রীতিমত অস্বস্তি অনুভব করল।

দরোজা খুলে দাঁড়ালেন শেফালীর মা। তিনি চশমার ভিতর দিয়ে বিনয়কে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর নিরুত্তাপ গলায় বললেন, ভেতরে এসো।

বিনয় প্রণাম করল না। ভিতরেও গেল না। তাড়াতাড়ি বলল, মা খুব অসুস্থ। এখন বসবার সময় নেই। এখুনি শেফালীর যাওয়া দরকার। ওকে একবার ডেকে দিন।

—শেফালী বাড়িতে নেই।

—নেই! প্রতিধ্বনির মত শোনাল বিনয়ের কণ্ঠস্বর, কোথায় গেছে?

—জানি না। শেফালীর মার সংক্ষিপ্ত উত্তর। ইতিমধ্যে শেফালীর বাবা এসে উপস্থিত। তিনি বিনয়কে দেখে রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, কী চাই? কেন এসেছো? তোমাকে আমি শিক্ষিত ভদ্র ছেলে হিসেবে জানতাম। কিন্তু তুমি যে এত ইতর, এত ছোট লোক......! উত্তেজনায় তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। থরথর করে কাঁপতে থাকেন।

বিনয় কটমট করে ওঁদের দিকে তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে।

রাস্তায় পা দিয়ে বিনয় থমকে দাঁড়াল। এখন সে কোথায় খুঁজবে শেফালীকে?

কোথায় যেতে পারে শেফালী? ওরা ছোটলোক! হ্যাঁ শেফালীর বাবা মা। অন্য সময় হলে যোগ্য উত্তর দিতে পারত। শেফালী যে একখানা কী রকম চীজ—তা যদি ওরা জানতেন......।

বিনয় মার কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠল। শেফালীকে খুঁজে বের করা দরকার। ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে শেফালী। সিনেমায় গেছে হয়ত। অথবা কোন বান্ধবীর বাড়ি। বস্তুত ওর স্কুলের বান্ধবীদের সে চাক্ষুষ দেখেনি। গল্প শুনেছে শেফালীর কাছে।

হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল। বিনয়ের শেফালী হয়ত রজতদার কাছে গিয়ে থাকতে পারে। হ্যাঁ ওর ফ্ল্যাটে। এর আগেও বোধহয় দু'একবার গিয়েছে। 'তোমরা কেউ রজতদাকে চেন না। ও বড় দুঃখী।' শেফালী হাসতে হাসতেই একথা বলেছিল। হ্যাঁ, একবার ওখানে গিয়ে দেখতে হয়।

বাবার মৃত্যুর কথা বড় স্পষ্ট মনে হয়। ঠাণ্ডা আসছে। জানলায় কাচ নামিয়ে দিল বিনয়। বাবা অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় জলচৌকিতে বসে অন্ধকারে বিড়ি খেতেন। তাকে সামনাসামনি কিছু বলতেন না। বেড়ার ঘরে এক ঘরের কথা অন্য ঘরে শোনা যায়। মার সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকত। তাকে কেন্দ্র করে ওদের মধ্যে ঝগড়া হোত। সেইসব দিন, রুক্ষ গ্লানিময়, সরীসৃপের মত কিলবিল করে পায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় মাঝে মাঝে! এখনও।

মা প্রায়ই আক্ষেপ করেন তাদের ভাঙাচোরা চেহারা দেখে। বিশেষ করে শেফালী চলে যাওয়ার পর তাঁর মুখে সব সময় যেন শোকের চিহ্ন লেগে থাকত। হয়ত গোপনে তিনি কাঁদতেন। ঠাকুরের সামনে বসে প্রার্থনা করতেন ওদের জন্যে। বিনয় সব টের পেত।

এই রকম জীবনই কী সে চেয়েছিল? প্রতি মুহূর্তে আলপিনের ওপর দিয়ে যেন হাঁটা! নারীর ভালবাসার ওপর আস্থাবান ছিল সে। ভেবেছিল শেফালীর মধ্যে ডুবে বাঁচার একটা সার্থকতা সে খুঁজে পাবে। কিন্তু কিছুই হল না শেষ পর্যন্ত। বিপথগামীর মত আবার হয়ত অন্য কিছু? মানুষের সেবা বা রাজনীতি......। অথবা আর পাঁচজনের মত দিনের পর দিন ভোঁতা হয়ে যাওয়া...। তার চোখের সামনে স্পষ্ট কোন চেহারা নেই।

সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপল বিনয়। চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে আসছে। একটা শব্দ। জড়িত কণ্ঠে কে যেন এক কলি গান গেয়ে উঠল। দরোজার এক পাট খুলে রজতদা মুখ বের করল। রাতবাস পরিহিত। এক পলক বিনয়কে লক্ষ্য করল। তারপর মৃদু হাসল। নারীকণ্ঠের অস্পষ্ট আওয়াজ।

—কী চাই?

বিনয় একটু সরে দাঁড়াল। বেহেড মাতাল। আবার নারী কণ্ঠের আওয়াজ। শেফালী কী? এই মাতালটার কাছে...... বিনয়ের দুচোখ জ্বলে ওঠে। সে রজতদার দিকে কঠিনচোখে তাকাল। চারজোড়া চোখ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। যেন একে অন্যের ওপর লাফিয়ে পড়তে উদ্যত।

—শেফালী কোথায়? বিনয় একটু কাছে এগিয়ে আসে, ধরে কে?

—শেফালীর খোঁজে এত রাতে এখানে। রজত হো হো করে হেসে উঠল, বিনয়, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। বাড়ি যাও। হা হা হা! পুওর বয়!

—শাট আপ! বিনয় রজতকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। কিন্তু সে আর অগ্রসর হতে পারল না। পিছন থেকে রজত এসে তার শার্টের কলার চেপে ধরল।

—গেট আউট! রজত হিংস্রভাবে বিনয়কে কলার ধরে টানতে টানতে দরোজার দিকে নিয়ে আসে, এত রাত্রে গুণ্ডামী করতে এসেছো। বেরিয়ে যাও। বলে সে বিনয়কে সজোরে ধাক্কা মারল। দরোজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিনয়। আর অস্ফুট চিৎকার করে আর্তনাদ করে উঠল।

—এত চিৎকার কেন! রাত্রিবাস পরিহিতা লতা শোবার ঘরের দরোজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মুখ বের করল। তারপর বিনয়কে দেখে আঁতকে উঠে তাকাল রজতের দিকে।

—তুমি উঠে এলে কেন? রজত মৃদু ধাক্কা দিয়ে লতাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

শোবার ঘর থেকে ছিটকে আসা আলোয় বিনয় দেখল তার দু'হাত রক্তাক্ত। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথায় চেপে ধরল। রজতের হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বিনয় মাথা নীচু করে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। পিছনে অট্টহাসি। সশব্দে দরোজা বন্ধ হয়। সে একবার চমকে পিছনে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে।

রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটার পর বিনয় টের পেল রক্ত এখনও পড়ছে। রুমাল ভিজে চপচপ। সে দু'পাশের দোকান দেখতে দেখতে অগ্রসর হয়। এক হাত দিয়ে রুমাল জোরে চেপে রাখে। ঐ যে একটা ডিসপেনসারি। সে তাড়াতাড়ি হাঁটল।

—কী করে মাথা ফাটল? ডাক্তারবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল বিনয়ের দিকে, হাত সরান। ইস্ অনেকটা কেটে গেছে!

বিনয় যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করে উঠল। ডাক্তারবাবু ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। বিনয় জানাল বাস থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে...টাকা দিয়ে ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে এল।

শেফালী, তোমাকে এখন আমি কোথায় খুঁজব? এতবড় শহরে কোথায় তুমি লুকিয়ে রয়েছে...মার বড় প্রয়োজন তোমাকে...তোমার নাম বারবার উচ্চারণ করছেন তিনি। একবারটি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। তিনি মৃত্যুপথযাত্রী।

বিনয় উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় হাঁটতে থাকে। মাথায় বেশ যন্ত্রণা। শরীর কাঁপছে। ভীষণ দুর্বল বোধ করল সে। মনে হল যে কোন মুহূর্তে মুখ থুবড়ে কঠিন ফুটপাতের ওপর পড়ে যেতে পারে। কেউ ফিরে তাকাবে না। যে যার গন্তব্যস্থানের দিকে ছুটে যাবে। কেননা তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান রয়েছে।

মোড়ের ইশারায় বিনয় একটা ট্যাক্সী ডাকল। তারপর নরম গদীর ওপর এলিয়ে দিল অবসন্ন শরীর। কোথায় যাবেন? সে অস্ফুটস্বরে বাড়ীর পথ জানাল ট্যাক্সী-ড্রাইভারকে। ঘুম পাচ্ছে তার। চোখ বুজে এল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পর টের পেল কে যেন তাকে ডাকছে। চোখ খুলে তাকাল। গাড়ির ভিতর আলো। ড্রাইভার কী যেন বলছে। বিনয় পকেট থেকে টাকা বের করে গুঁজে দিল ড্রাইভারের হাতে। তারপর দরোজা খুলে বাইরে এল।

বিশাল চাতাল অন্ধকার। বিনয় প্রতি-মুহূর্তে পড়ার আশঙ্কা করতে করতে এগিয়ে যায়। রেলিং ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। মা কী এখনও বেঁচে আছেন? হঠাৎ সে ভীষণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সিঁড়ির ওপর পদাঘাত করল কয়েকবার। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চিনচিন করে উঠল একটা ব্যথা। সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। এখন তার মনে পড়ল রজতদার কথা। সে কাপুরুষের মত মাথা নীচু করে পালিয়ে এল! রাগে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে।

দরোজা খোলা। বিনয় বারান্দায় অনেক লোক দেখতে পায়। সে আস্তে আস্তে এগোয়।

—একী! সেজদিদি ছুটে এলেন, তোমার মাথায়...। তিনি প্রায় কান্নার সুরে বলেন, কিন্তু তোমার কপালে ব্যাণ্ডেজ কেন?

—বাস থেকে পড়ে । বিনয় ভীড়ের মধ্যে শেফালীকে দেখে যেন বুকের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। মার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল। মা ঘুমিয়ে। শেফালী মার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে নিঃশব্দে শোবার ঘরে ঢুকে যায়। তারপর বিছানায় শুতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

• • •

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বাস-স্টপেজে হঠাৎ বিনয় মুখোমুখি হল মীরার। বিনয় না দেখার ভান করে ভীড়ের মধ্যে লুকোতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। মীরা হাসিমুখে এগিয়ে এল। ফলে বিনয়কেও থামার চেষ্টা করতে হল।

—ইস তুমি কী রোগা হয়ে গেছ দাদা! অনেক দিন পর দেখলাম তোমাকে। মীরা চোখ কাঁপিয়ে হাসল, মা কেমন আছেন? বৌদি?

—সব ভাল। বিনয় খানিকটা হালকা-সুরে বলে, তোর খবর কী বল? পল্টু কেমন আছে?

—পল্টু। মীরা একবারটি থমকে যায়। পলকে মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। চোখাচোখি হল বিনয়ের সঙ্গে। পরক্ষণেই মুখ ভরে যায় হাসিতে।

—ওকে তুমি দেখলে চিনতেই পারবে না দাদা। বেশ বড় সড় হয়েছে। খুব দুষ্টু। তবে পড়াশুনায় ভাল। মাঝে মাঝে গিয়ে ওকে দেখে আসি। তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে। বলে মামা আমাকে একবারটি দেখতে আসে না।

মীরার মুখ থেকে অনর্গল কথা বেরোয়। বিনয় ভাবল, মীরা যা বলছে তা কী সত্যি? নাকি সব বড় বেমালুম মিথ্যে... শেফালী আমার [illegible] ...মা মুর্ছাযানে খানিকটা সুস্থ। মার কান্নাকাটিতে পর্যন্ত শেফালী টলে নি। বিনয়ের সঙ্গে একত্র বসবাস তার পক্ষে নাকি একেবারেই অসম্ভব।

—রজতদার কী খবর? বিনয় মাথার ক্ষতস্থানে একবার হাত রাখল। অন্যমনস্কভাবে যখনই সে মাথায় হাত রাখবে, মনে পড়বে রজতদার হিংস্র দৃষ্টি। সেদিনকার অপমানের প্রতিশোধ একদিন সে নেবে। একদিন না একদিন সুযোগ আসবেই।

মীরা তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, ওই একই রকম। হঠাৎ এসে ডিভোর্সের প্রসঙ্গ তোলে। আবোলতাবোল বকে চলে যায়। এইরকম ভাবে দিন কাটছে। এই বেশ আছি। ডিভোর্সের জন্যে আমারও কোন মাথাব্যথা নেই।

বেশ আছিস তাহলে। বিনয় হাতঘড়ি দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, চলি রে মীরা। টিউশানীর সময় হয়েছে। মার কথা কী মনে পড়ে না তোর?

মীরার মুখ পলকে থমথমে হয়ে ওঠে। সে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সামলায়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। কেমন বিস্বাদ মনে হচ্ছে সবকিছু। এখন ফিরে যাবে মেসে। কিছুদিন হল সাংঘাতিক মেয়েদের মেসে উঠে গিয়েছে। সমীর কানাডা চলে গিয়েছে। বলেছিল চিঠি লিখবে। এক ঘরে অন্য একজন মেয়ের সঙ্গে...এভাবেই কী বাকি জীবন..!

—কী হল তোর? বিনয় টের পেয়েছে মীরা নিজেকে লুকোবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সেই মীরা! হালকা মেঘের মত ফ্রক পরে বাগানে ছোটাছুটি করত। বাবার বড় আদরের ছিল। চোখের সামনে একটু একটু করে বড় হল। রজতদার সঙ্গে প্রেম ও বিয়ে। কী দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে সময়! টাল সামলাতে না পেরে দিশেহারা লক্ষ্যহীন।

মীরা ভাঙাগলায় বলল, আমার কথা মাকে বল না। আচ্ছা এস দাদা। তোমার তো আবার টিউশানী আছে।

—তুই আমাদের কাছে এসে থাকতে পারিস। মা অনেক নরম এখন।

—কী দরকার। আবার অশান্তি সুরু হবে। তার চেয়ে এই ভাল আছি।

—এভাবে একা কতদিন?

—এই বাসটায় আমি উঠলাম দাদা। মীরা তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়ল।

বিনয় দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। পালিয়ে গেল কী মীরা? শেষ প্রশ্নের জবাব দিল না। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে কী উত্তর দিতে পারত? সেও হয়ত কোন অছিলায় পালিয়ে যেত।

হাঁটতে হাঁটতে বিনয় একটা পার্কের ভিতর ঢুকল। এদিক ওদিক তাকিয়ে ফাঁকা একটা জায়গা দেখে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। মাথার নীচে দু'হাত রাখল। কালো আকাশে তারার মেলা। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মনে পড়ল কাল বা পরশু থেকে অন্য কিছু তাকে ভাবতে হবে। অন্যভাবে বাঁচার কথা।

॥ সমাপ্ত ॥

মনের কথা

মর্ষকামের কাহিনী
মনোহর ও মতিলাল

মর্ষকাম বা ম্যাজোকিজম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছিল মনোহরবাবু ও মতিলালবাবুর কেস নিয়ে। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো, তাঁরা ভিন্ন জগতের লোক, কিন্তু সমস্যাটা ছিল তাঁদের অনেকটা এক ধরনের। তাই এক সূত্রে কেসদুটোকে বাঁধবার চেষ্টা করছি।

মনোহর ছিলেন সরকারী অফিসের কেরানী। পুত্র-কন্যা-স্ত্রীকে নিয়ে উত্তর কোলকাতার এক গলিতে বাসা বেঁধেছেন আজ প্রায় কুড়ি বছর। আদি বাড়ী ছিল ফরিদপুরে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স। টাইপিস্ট হিসেবে চাকরীতে ঢুকেছিলেন, এখন প্রমোশন পেয়ে একটা বিভাগের আংশিক দায়দায়িত্ব নিতে গিয়ে তিনি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। যা দেখতেন তাই নিখুঁতভাবে টাইপ করে বড়বাবুর হাতে তুলে দিয়ে বাড়ী আসতেন। ভাবনাচিন্তা কিছু ছিল না। কিন্তু এখন খুবই অসুবিধায় পড়ে গেছেন। এই নতুন কাজে সুবিধা করতে পারছেন না। তাঁর চেয়ারের পূর্ববর্তী অধিকারী অবসর গ্রহণ করার আগে কয়েক মাস বোধহয় ছুটিতে ছিলেন। ফাইলের স্তূপ জমেছে টেবিলে। জরুরী, বেশী জরুরী, অতিশয় জরুরী পতাকা বহন করে ফাইলগুলো মনোহরবাবুর সামনে সারাদিন পড়ে থাকে, মনোহরবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখতে থাকেন। কোন ফাইলটা নিয়ে কাজ শুরু করবেন বুঝতে পারেন না। বড়বাবুর কাছ থেকে তাগিদ আসে—অমুকটা আজই চাই, তমুকটার ওপর নোটটা যেন অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, মনোহরবাবু উচ্চবাচ্য করেন না, কথাগুলো তাঁর মাথায় ঢোকে না। কাউকে কিছু মুখফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। যদি তারা মুচকি হাসে, যদি উত্তর না দিয়ে বিদ্রূপ করে, যদি তাঁকে অপদার্থ মনে করে যদি রিপোর্ট করে...এইসব সাত-পাঁচ ভেবে তিনি সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যান আর নিশ্চুপ বসে থাকেন। বাড়ী এসে মনে হয়, এরকম করলে রিপোর্ট হবেই, তারপর ঘটবে পদাবনতি। দারুন অপমান। সবাই বাঁকা চোখে তাকাবে, ফিসফিস করে তাঁকে নিয়ে আলোচনা করবে, ওঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টা চলবে। ভাবতে গিয়ে সারা শরীর কাঁপতে থাকে, কান-নাক দিয়ে আগুন বেরোয়, মাথাগরম হয়ে যায়। প্রাইভেট টিউশনীতে যেতে ভয় হয়। মনে হয় সব তিনি ভুলে গেছেন। মনে হয় তিনি ফাঁকি দিয়ে বি-এ পাশ করেছেন। তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই বোঝেন না। ক্লাস এইটের অঙ্ক কষার ক্ষমতা তাঁর নেই। এতদিন বাঁধা ছকে ফেলে অঙ্ক কষেছেন, মুখস্থ করে ব্যাকরণ পড়িয়েছেন, আসলে তাঁর কোন বিষয়েই ঠিকমত জ্ঞান নেই। তিনি নিজেও নোট মুখস্থ করে গোঁজামিল দিয়ে পাশ করেছেন। তাই ফাইলের করেসপণ্ডেন্স তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁর উচিত ছিল ঐ টাইপের কাজে ফিরে যাওয়া, তাঁর উচিত টিউশনীগুলো ছেড়ে দেওয়া। তিনি ঠকিয়ে টাকা নিচ্ছেন, নিজেকে শিক্ষিত বলে জাহির করার কোনো অধিকার তাঁর নেই। চাকরীতে ইস্তফা দেবেন? টিউশনীগুলো ছেড়ে দেবেন? কিন্তু তারপর? অতগুলো পেট চলবে কি করে? ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজের মাইনে জোগাবেন কিভাবে? এইসব ভেবে ভেবে তাঁর ঘুম হয় না, মাথা গরম হয়ে যায়, হাত-পা আরো বেশী কাঁপতে থাকে।

—ছোটবেলা থেকেই আমি একটু বেশী চিন্তা করি। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, এই চিন্তা আমায় শৈশবেও আমাকে অস্থির করে তুলতো। অল্প বয়সে বাবাকে হারাই। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়সম্পত্তি সব নিলামে ওঠে। জ্ঞাতিরা সব শত্রু হয়ে দাঁড়ান। বাস্তুভিটে ছাড়া সব আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। মা গয়নাগাটি বেচে খুবই কষ্টে আমার পড়াশুনা চালিয়ে যান। পড়াশুনায় আমি ভাল ছিলাম। বরাবর স্কুলে প্রথম স্থান অধিকার করতাম। আমার সুশ্রী চেহারার জন্য আর লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাবার জন্য মাস্টারমশাইরা আমাকে ভালবাসতেন। গ্রামের সকলেই আমাকে স্নেহ করতেন। বিশেষ করে খুড়িমা জ্যাঠাইমা স্থানীয় মেয়েরা আমাকে খুবই আদর করতেন। আমার বাবা গ্রামের একজন স্বচ্ছল অবস্থার গৃহস্থ ছিলেন। আমাদের ভাগ্যবিপর্যয়ে সকলেই খুবই সহানুভূতি দেখাতেন। আমার মন্দভাগ্যের কথা শুনে শুনে মনে ধারণা জন্মেছিল যে, গত জন্মে নিশ্চয়ই আমি গর্হিত কোনো পাপ করেছিলাম, তাই এই জন্মে কষ্ট পাচ্ছি। মেয়েরা ও বৃদ্ধারা এইরকমই বলাবলি করতেন। তাই আমি প্রতি পদে পদে ভেবেচিন্তে চলতাম। আবার ভুল করে কোন পাপ করে না বসি, এই চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকতাম। সেকেণ্ড ক্লাস থেকে আমি ছেলে পড়িয়ে রোজগার করতে থাকি। অন্য ছেলেদের মত লাফালাফি খেলাধুলোয় আমার কোনো আসক্তি ছিল না, আর সময়ও পেতাম না। ম্যাট্রিক পাশ করেই চাকরীর খোঁজে কোলকাতায় আসি। ম্যাট্রিকে আমি তিনটে লেটার পেয়েছিলাম, কিন্তু কলেজে পড়া চালাবার মত অবস্থা ছিল না। বাধ্য হয়ে টাইপরাইটিং শিখতে থাকি ও ছেলে পড়াতে থাকি। কিছুদিন পরে এই চাকরিটা হয়। এর মধ্যে দেশ ভাগ হয়ে যায়, বাসা করে মাকে কোলকাতায় নিয়ে আসি। মার বিশেষ পীড়াপীড়িতে বিয়ে করি। কয়েক বছর বাদেই মা মারা যান। এই সময় থেকে বাইরের বই পড়ার ঝোঁক হয়; ইউনিয়নেও যোগদান করি। অবশ্য কোনো ব্যাপারেই কোনোদিন আমি সক্রিয় বা সরব ছিলাম না। কথা আমি কম বলি চিরকাল। মেলামেশাতেও অপটু, তাই বন্ধুবান্ধব বলতে যা বোঝায়, আমার তা নেই। অন্তরঙ্গতা কারুর সঙ্গেই হয়নি। নিজের কথা, নিজের সমস্যা নিয়ে এই দ্বিতীয়বার আমি মুখ খুলেছি। আপনার কাছে আসবার আগে অন্য একজন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম। সেখানেও মুখ খুলেছিলাম। সেকথায় পরে আসছি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ইউনিয়নে ঢুকে ও মার্কসবাদী লিটারেচার পড়ার ফলে আমার চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। পূর্বজন্ম, পরজন্ম, ধর্ম, ঈশ্বর, সব সম্পর্কে আমার ধারণায় ওলোটপালোট হয়ে গেল। ঠিক বেঠিক, ন্যায় অন্যায়, ইত্যাদি চিন্তা অন্যভাবে দেখা দিলো। আমার দুর্ভাগ্য কর্মফল নয়, বিষম সমাজ ব্যবস্থায় শোষণের ফল। আমাদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য আমরা পাই না। এই সরকার বুর্জোয়া সরকার, নিজের নয়। কাজও নিজের নয়। কাজে ফাঁকি দিলে অধর্ম হয় না, তার ফলভোগ করতে হবে না পরজন্মে, এইসব কথা আমার মগজে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। কিন্তু এগুলো বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও, মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারলাম না। কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেল। কাজেই ফাঁকি দিয়ে আমি অন্যদের মত নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম না। পুরনো দিনের সংস্কার, আমার বিবেক আমাকে পীড়িত করতো। মাইনে বাড়ানোর আন্দোলনে যোগ দিতাম, কিন্তু আবার মনে হতো আমার কাজের জন্যে বেতন বৃদ্ধির দাবী করা আমার পক্ষে সঙ্গত নয়। আমি অন্যের মত দ্রুত টাইপ করতে পারি না। ওরা হয়তো বেশী মাইনে দাবী করে কোনো অন্যায় করছে না, কিন্তু আমার পক্ষে নিশ্চয়ই এটা অন্যায় কাজ। স্লোগান দিয়ে, মিছিলে যোগ দিয়ে

CENTRAL LIBRARY

বাড়ী এসে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়তাম। খিদে নেই বলে ইচ্ছে করে এক রাত উপবাস দিয়ে পাপের ভার কমাবার চেষ্টা করতাম। এরকম উপোষ আমি অনেক দিয়েছি। বিশেষ করে যেদিন টিউশনীতে গিয়ে ফাঁকি দিতাম, সেদিন এবং তার পরদিনও কিছু খেতে পারতাম না। ছাত্রের ঠাকুমা কড়া নজর রেখে পড়ানোর সময় ইজিচেয়ারে শুয়ে গড় গড়া টানতেন বলেই আমার ফাঁকি দেবার ইচ্ছে হতো। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে কিম্বা কোনো কারণে উপস্থিত না থাকলে আমি ছাত্রকে ট্রান্সলেশন করতে দিয়ে একটা বই খুলে নিজের পড়া পড়তাম। কিন্তু এই ফাঁকি দেওয়া আমার সহ্য হতো না। নিজেকে আরো নানাভাবে কষ্ট দিতাম। অফিস গিয়ে টিফিন খেতাম না, ইচ্ছে করে রোদ্দুর-ভরা ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতাম, বর্ষায় ভিজতাম, ময়লা জামাকাপড় পরে অফিসে যেতাম। কয়েক সপ্তাহ আগে কাজকর্ম করা যখন একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন একজন মনস্তাত্ত্বিকের কাছে যাই। এইসব কথা বলি। তিনি বলেন আমি মর্ষকাম, ইংরিজীতে যাকে বলে মেসোচিস্ট। উনি বললেন, কথাটা ম্যাজোকিস্ট। মেসোচিস্টই হোক আর ম্যাজোকিস্টই হোক, কথাটার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। মর্ষকাম কথাটাও ভাল করে জানি না। উনি বললেন, নিজেকে নির্যাতন করেই নাকি আমার আনন্দ। আমি তো আনন্দ পাচ্ছি না। উনি বললেন, এ-আনন্দ নির্জ্ঞান মনের, তাই বুঝতে পারছি না। শিল্পী-সাহিত্যিকরা নাকি বেশির ভাগই মর্ষকাম। তাঁদের কাছে ব্যথার গান আনন্দের শিহরণ জাগায়, নিজের অঙ্গে আঘাত করে তাঁরা হর্ষান্বিত হন; বারবার বিফল হবার জন্যেই তাঁরা প্রেমে পড়েন। ব্যর্থতার মধ্যে তাঁরা জীবনের সার্থকতা খোঁজেন। কথাগুলো হেঁয়ালীর মত মনে হলো। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কয়েকটা সিটিং নিয়ে কোনো ফল পেলাম না। উনি আমার যৌনজীবনের ও বিবাহিত জীবনের অনেক খুঁটিনাটি জানতে চাইলেন। স্ত্রী আমার উপর অত্যাচার করেন কিনা? স্ত্রীর কাছে অপমানিত হলে আমার যৌনাবেগ জেগে ওঠে কিনা? ইত্যাদি আরো অনেক কথা। সব কথার উত্তর ওঁর মনোমত হয়তো হয়নি; উনি তাই বললেন আমি পুরোপুরি 'পারভার্টেড' হয়ে গেছি। মর্ষকামী তার প্রেমিকার কাছ থেকে অত্যাচারিত হতে ভালবাসে; তাইতেই তার তৃপ্তি। এটা অবশ্য প্রাইমারী স্টেজ। সেকেন্ডারী স্টেজে যে-কোনো উৎপীড়নেই রোগীর আনন্দ হয়; যৌনসম্পর্ক ছেড়ে ম্যাজোকিজম তখন সব সম্পর্কের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। আসলে আমার নাকি এখন সেই সেকেন্ডারী স্টেজ। যেসব শিল্পী-সাহিত্যিকদের কথা উনি বলছিলেন, তাঁরা নাকি এই স্টেজের রোগী। জীবনে এক লাইনও কবিতা লিখিনি, কোনো শিল্পীর ছবি দেখিনি, তবে আমার কেন এই রোগ হবে? আমার অপরাধের ভয়, লাজুক স্বভাব, সব নাকি এই ম্যাজোকিজমের বহিঃস্ফূর্তি। আমি লিবিডোকে বাধা দিয়েছি, তাই মর্ষকামী হয়েছি। আমার নির্জ্ঞান মনে নাকি আছে অন্যকে ব্যথা দেবার কষ্ট দেবার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাকে আমি অবদমিত করেছি, তাই এখন উৎপীড়ন ইচ্ছা আমার নিজের দিকে পরিচালিত হয়েছে। ফ্রয়েড যাকে বলেছেন, 'স্যাডিজম ডিরেকটেড এগেইনস্ট ওয়ানস ওন পার্সন'—আমার কেস ঠিক তাই। এইসব কথা শুনে আমার ভাবনা-চিন্তা আরো বাড়লো। কাজ করার ইচ্ছে একেবারে চলে গেল। অফিস থেকে আবার ছুটি নিতে হোলো। বাড়ীর থেকে বেরুনোই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। ভয়, মাথা ঘুরে বোধহয় পড়ে যাব। অনেকবার প্রেসার চেক করালাম। প্রেসারের কোনো গোলমাল নেই। 'মর্ষকাম' নিয়ে পড়াশুনো করবো ভাবলাম কিন্তু সাহস হলো না। যদি আরো কিছু গণ্ডগোল বেরিয়ে পড়ে, তাহলে আমি আর বাঁচবো না। আর পড়াশুনো করবার ক্ষমতাও আমার একেবারেই নেই। অথচ তিনটে টুইশানীর ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনো করে আমি বি-এ পরীক্ষায় পাশ করেছি, হিন্দীর ডিপ্লোমা নিয়েছি, আইনের ও-দুটো পরীক্ষাতে পাশ করা আছে। ফাইনালটা দিলেই এল-এল-বি হয়ে যাবো। এখন আপনি বলুন, এই দুর্দশামোচনের উপায় কি?

এবার মতিলালের কথা।

মতিলাল আমার কাছে আসেন আরো বেশি বয়সে। তাঁর সমস্যা মূলত এক হলেও প্রকাশ ভিন্ন ভাবে। মতিলালবাবুর ধারণা তিনি আজীবন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক অবহেলিত। প্যারানইয়ার রোগী তিনি নন। ঠিক ডিলিউশন নয় তাঁর এই ধারণা। এ নিয়ে তিনি কারুর কাছে নালিশ জানাননি, বা কাউকে নিজের শত্রু মনে করেননি। ষাট বছর বয়সে তাঁর—'অবহেলিত নিদ্রিত সত্তা' সহসা অভিঘাতে সজাগ হয়ে উঠেছে। তাঁর অতি ভাল ব্যবহারের সুযোগ নিয়েছে সকলে। তিনি কঠোর হতে পারেননি, কাউকে মুখের উপর উচিত কথা শোনাতে পারেননি, নিজেকে জাহির করতে পারেন নি। ধার করে বন্ধুদের অসময়ে সাহায্য করেছেন, কর্মচারীরা ফাঁকী দিলেও তাদের সংগে রূঢ় ব্যবহার করতে পারেননি। বন্ধুরা টাকা নিয়ে উপুড়-হস্ত করেনি, কর্মচারীদের অবহেলায় পৈতৃক ব্যবসা লাটে উঠেছে। ক্লাবের পার্টিতে দরাজ হাতে চাঁদা দিয়েও কোনোদিন সেসব জায়গায় কর্মকর্তাদের একজন হতে পারেননি। মুখ ফুটে কোনোদিন বলতে পারেননি তিনি কর্মকর্তা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান। ছিঃ! লোকে কি ভাববে? এই চিন্তাতে সঙ্কুচিত থেকেছেন। তাঁর নাম কেউ প্রস্তাব করলে তিনি নিজে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যদি সভ্যরা তাঁকে ভোট না দেয়, এই ভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চাননি। ইউনিভার্সিটীর নাম করা ছাত্র ছিলেন; প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিলে পাশ করতেন, স্ট্যান্ডও করতেন বোধহয়। কিন্তু যদি না পারি, এই চিন্তা তাঁকে সবরকম প্রতিযোগিতা থেকে নিবৃত্ত করেছে। কলেজে থাকতে একটি সতীর্থকে ভালবেসেছিলেন, তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখে বে-নামীতে তার কাছে পাঠিয়েছেন, কিন্তু কোনোদিন মুখ ফুটে প্রেম জানাবার সাহস হয়নি। চোখের সামনে অন্য এক বন্ধু মেয়েটিকে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে ট্রামে করে বেরিয়ে গেছে, নিরালায় বসে প্রেম নিবেদন করেছে। আর তিনি অবহেলিত অপমানিত আত্মার আর্তনাদ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে পিতামাতা মারা গেলে ছোট শিশুর মত চীৎকার করে কেঁদেছেন। নিজেকে অসহায় মনে করে আতংকিত হয়েছেন। পৈতৃক ব্যবসার সংগে অনেক আশ্রিতের দায়দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়েছে। তিনি চোখে অন্ধকার দেখে কর্মচারীদের হাতে ব্যবসার দায়দায়িত্ব আর দূর সম্পর্কীয় কাকীমার হাতে গৃহস্থালীর ভার তুলে দিয়ে নিজেকে মহৎ কল্পনা করে আনন্দ পেয়েছেন। দশ বছরের মধ্যে ব্যবসা ফেল পড়েছে, আশ্রিতেরা নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে। যাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি, তারা ওঁর কাঁধে ভর করে থেকে, ওঁর বুদ্ধিহীনতার কথা শুনিয়ে ওঁকে কৃতার্থ করছে। এতটুকু হিম্মত নেই যে স্পষ্ট ভাষায় ওদের অন্য আশ্রয় দেখে নিতে বলেন। এই বাজারে পাঁচ ছয় জনের অন্ন-বস্ত্র জোগানোর সামর্থ্য তাঁর নেই। এই সাহস তিনি পেতে চান, সোজা ভাবে বলার সাহস। বিয়ে করেননি, নিকটাত্মীয় বলতে কেউ নেই, অতবড় বাড়ী দিয়ে তাঁর দরকারটা কি? ট্যাক্স বাবদ কোয়ার্টারে যে টাকা গুনতে হয় তাই দিয়ে তিনি সাবেকী চালে না হোক ভদ্রভাবে কোথাও গিয়ে থাকতে পারেন। বাড়ী বিক্রীর টাকা না পেলে খুচরো দেনাগুলো শোধ করা যাচ্ছে না। কেউ আজকাল ঝামেলা পোহাতে চায় না। আশ্রিতদের বাড়ী ছাড়া করতে না পারলে বাড়ী বিক্রী করা যাবে না। অথচ বাড়ী বিক্রীর টাকা না পেলে তাঁর মানসম্মান থাকবে না। এটর্নী দত্ত বলছেন যে কয়েক শত টাকা পেলে তিনি পাড়ার মস্তানদের দিয়ে অতি সহজে কাজটা মিটিয়ে ফেলতে পারেন। প্রস্তাবটা মতিলালবাবুর মনঃপূত হয়নি। দাঙ্গা-হাঙ্গামা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। তাছাড়া আজকাল সকলেরই পকেটে বোমা-পিস্তল আছে। ওরাও ছেড়ে কথা কইবে কেন? তিনি চান বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, আশ্রিতদের তাঁর আশ্রয় ত্যাগে রাজী করাতে। তাঁর ক্ষমতা নেই এটা তিনি দৃঢ়তার সংগে জানাতে চান। মানে যাকে বলে, 'এ্যাসার্ট' করা। সেই 'এ্যাসার্ট' করার ক্ষমতা আয়ত্তের ব্যাপারে ভদ্রলোক আমার সাহায্য চান।

মতিলাল কৃতী ছাত্র ছিলেন। পরবর্তী জীবনে পড়াশুনোই করেছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে, বিশেষ করে নিজের ত্রুটী-দুর্বলতা সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। মর্ষকামিতার মনস্তত্ত্ব তিনি জানেন ও বোঝেন। ম্যাজোকিজম বই পড়েছেন, অন্যান্য লেখকের—

'ম্যাজোকিস্টিক' ট্রেইট্স নিয়ে কিছু কিছু গবেষণাও করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আত্মনিবেদনের কবিতার মধ্যে ম্যাজোকিজম-এর সন্ধান পেয়েছেন, শরৎচন্দ্রের প্রায় সব নায়কের মধ্যে আত্ম-নিপীড়নের প্রবণতা দেখেছেন। তিনি অবশ্য সেচে আমাকে কিছু বলেননি। আলোচনা প্রসংগে কথাগুলো বেরিয়ে পড়েছে। তাঁর দু' একটা লেখাও চেয়ে পড়ে দেখলাম। মুখের জোর নেই বটে, কিন্তু কলমের জোর আছে। যে-কোনো পত্র-পত্রিকা সাগ্রহে লেখাগুলো ছাপতে চাইবে। চেয়েছিল ; কিন্তু লেখক ছাপতে রাজী হননি। প্রতিবাদের ভয়। যদি কেউ প্রতিবাদ করে, যদি কেউ মনে করে তিনি রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অসম্মান করছেন, তা হলে কি হবে? কী যে হবে, মতিলাল জানেন না। তবে বাদানুবাদ, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি নারাজ। নিজেই ব্যাখ্যা করে বললেন যে তাঁর মর্ষকাম প্রবণতা এই দুর্বলতার জন্য দায়ী। আমি যদি তাঁর চরিত্রের এই ত্রুটী দূর করে দিতে পারি, তবে তিনি গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার এমন সব দিক মেলে ধরতে পারেন যে চারদিকে একেবারে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। তবে সে পরের কথা। আপাতত তিনি বাড়ী বেচতে চান, তার জন্যে দরকার আত্মীয়দের মুখ ফুটে তাঁর অসামর্থ্যের কথা জানানো। বেশ দৃঢ়তার সংগে জানানো। সেই দৃঢ়তা, সেই 'অ্যাসার্ট' করার ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করতে চান।

—আপনি নিজেকে 'ম্যাজোকিস্ট' ভাবছেন কেন? প্রেমের ক্ষেত্রে কলেজ-লাইফ ছাড়া আর কোথাও কি কোনো তথাকথিত আত্মবঞ্চনা বা আত্ম-নিপীড়নের ইতিহাস আছে? আপনার অবিবাহিত থাকার মূলে কোনো ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী-টাহিনী থাকে তো বলে ফেলুন। দেখি, কি করতে পারি।

একটু ইতস্ততঃ করে মতিলাল বললেন,—একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। কুড়ি বছর আগেকার কথা। পূর্ববংগের থেকে দূরসম্পর্কিত এক আত্মীয়া তাঁর বাইশ বছরের মেয়েকে নিয়ে আমাদের আশ্রয়ে এসে উঠলেন। বাবা, মা এক বছর হল মারা গেছেন। উদ্বাস্তু হিসেবে তাঁরা প্রথমটায় এসেছিলেন। ক্যাম্পে থাকার সময় মেয়েটি নাকি কর্পোরেশনের এক ভ্যাক্সিনেটরের প্রেমে পড়ে। ভ্যাক্সিনেটর কুৎসিত ছেলে। মেয়েটিকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কয়েক রাত তাকে নিয়ে এক হোটেলে কাটায়। তারপর যথারীতি রংগমঞ্চ থেকে প্রস্থান করে। এই ঘটনায় খুব একটা বড়দরের সোরগোল না উঠলেও, ওদের পক্ষে সম্ভ্রমের সংগে ঐ ক্যাম্পে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তারপর খোঁজ-খবর নিয়ে আমাদের আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হয়। মেয়েকে আমার হাতে সমর্পণ করে মা দু-একদিন পরেই বৃন্দাবন চলে যান। এক আশ্রমের রাঁধুনীর কাজ তিনি পেয়েছিলেন। আত্মীয়তার ক্ষীণসূত্র ধরে আমাদের গলগ্রহ থাকতে তাঁর সম্মানে আটকাচ্ছিল।

তবে মেয়েটিকে তিনি একরকম পরিত্যাগ করেই চলে যান। মেয়েটির আচরণে ভদ্রমহিলা মর্মাহত হয়েছিলেন। মা চলে যাবার পর মেয়েটি আমার খাওয়া-দাওয়ার ভার নিজের হাতে তুলে নিল। আমার কালী-কলম, খাতাপত্র, বই পাণ্ডুলিপির ভার স্বহস্তে তুলে নিলো। ক্রমশ আমি সব ব্যাপারে নেলীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠলাম। ওকে যে আমি মনে মনে ভালবেসে ফেলেছি সেটা তখনও ধরতে পারিনি। মনের খবর ধরতে পারলেও জানাতে পারতাম না। প্রায় কুড়ি বছরের কমবয়সী একটা মেয়েকে আমি বিয়ে করার কথা কিছুতেই বলতে পারতাম না। নেলী বরিশাল কলেজে বি এ ক্লাসের ছাত্রী ছিল। বাংলা সাহিত্যের সব লেখকই প্রায় ওর পরিচিত, অবশ্য লেখার মাধ্যমে। আমরা প্রায়ই সাহিত্য আলোচনা করতাম। মাঝে মাঝে সেই আলোচনায় ডেকে আনতাম আমার এক অধ্যাপক বন্ধুকে। বন্ধুটী বিলেতের ডিগ্রী এনে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিজ্ঞানের লোক। সাহিত্য-প্রীতি খুব যে ছিল তা নয়, তবে আড্ডা দিতে ভালবাসতো। আমি নেলীর সংগে থাকতে কি রকম একটা সঙ্কোচ বোধ করতাম, তাই ওকে প্রায় সন্ধ্যায় ডাকতাম। পরে আর ডাকতে হতো না। আমি অফিস থেকে ফিরে এসে প্রায়ই দেখতাম ওরা দুটিতে আড্ডা জমিয়েছে। বন্ধুটী অবশ্য বিবাহিত, নেলী তা জানতো। কিন্তু তা সত্বেও বুঝতে পারলাম নেলী পতঙ্গ হয়ে বন্ধুর প্রেমের আগুনে ঝাঁপ দিতে উৎসুক। এই সময় একদিন বেশ তোড়জোড় করে নেলীকে আমার ঘরে ডেকে এনে আমি জীবনে এই প্রথম বোধহয় স্বাভাবিকরূপে একটা কাজ করে বসলাম। না করে উপায় ছিল না। আমি বুঝতে পারছি নেলী ভালবাসতে জানে, আমার বয়সী অন্য একটি পুরুষ যদি তাকে ভালবাসা জানিয়ে থাকে, আমিই বা জানবো না কেন? আমরা বসবার ঘরের টেবিলে দুটো চেয়ারে আমরা মুখোমুখি বসে। নেলীর চোখ দুটো নীচু। ও বুঝতে পারছিলো বোধহয় আমি কি বলবো। সব মেয়েই বোধহয় বুঝতে পারে। ইদানীং ওরা লুকিয়ে-চুরিয়ে যে বেরিয়ে যেত, সে খবর আমি পেতাম। আমাকে গোয়েন্দা লাগাতে হয়নি। নেলী আর অসিতের ঘনিষ্ঠতার খবর আমার আশ্রিতদের মধ্যে আর অজানা ছিল না। আমার ঐ সব হিতাকাংক্ষীরা যেচেই খবরা-খবর আমাকে শোনাতো। ওরা হিংসাবশেই বোধহয় আপনা থেকে গোয়েন্দাগিরি করতো। নেলীকে ঠিক কি বলেছিলাম মনে নেই। ভালবাসার কথা বলেছিলাম নিশ্চয়ই। আমার বন্ধু যে বিবাহিত সেটাও ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বোধহয় বিয়ের প্রস্তাব তুলিনি। কথাগুলো বলে ফেলেই ঘর থেকে আমি বেরিয়ে যাই। আধঘন্টাটাক পরে ফিরে এসে দেখি নেলী ঠিক সেই একইভাবে বসে আছে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ইচ্ছে হচ্ছিল ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে, ওর রুক্ষ গালে একটা আঙুল ছোঁয়াতে ওর ঘাড়ের কাছে যেখানে খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে সেখানে খুব আলগোছে একটা চুমু খেতে। সাহস হয়নি। আমাকে দেখে ও আঁচলে চোখ মুছলো, আমার দিকে সহজভাবে তাকালো। তারপর ধরা গলায় বললো, এর ফল কতদূর গড়াতে পারে জানেন তো। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমি কয়েকদিন ওকে এড়িয়ে চললাম। ও আমাকে জানিয়েই অসিতের সংগে সান্ধ্যভ্রমণে বেরুতে লাগলো। কিছুদিন পরে নেলীকে কলেজে ভর্তি করে দিয়ে, একটা বোর্ডিং-এ থাকার বন্দোবস্ত করে দিলাম। গার্জিয়ান হিসেবে অসিতের নাম লিখিয়ে দিলাম। অসিতের সংগে ওর যোরা-ফেরার যাতে অসুবিধা না হয়, এই জন্যে আমার গাড়ীটা অসিতের কাছে পাঠিয়ে দিতাম মধ্যে মধ্যে। আমার এই ব্যবহার মর্ষকামের ব্যবহার। নিশ্চয়ই আপনি সেটা বুঝতে পারছেন। তখন আমি 'এ্যাসার্ট' করতে পারলে নেলীকে আমি পেতাম। নেলী আমাকে অসিতকে দুজনকেই ভালবেসেছিল। আমি ভীরু কাপুরুষ। তাই জয়মালা জুটলো অসিতের কপালে। নেলী এখন নেত্রকোনায় একটা স্কুলে মাস্টারী করে। বিয়ে করে নি। বন্ধু অসিত এই ক' মাস হল মারা গেছে। নেলীর সংগে দেখা দু' একবার হয়েছে, কিন্তু কেউই কথা বলিনি। এখনও নেলীকে ভুলিনি। যে-ঘরে নেলীকে কুড়ি বছর আগে প্রেম জানিয়েছিলাম, সে ঘরের আসবাবপত্র ঠিক সেদিনের মতই সাজানো আছে। নেলীর সেই অশ্রুসজল মুখখানা এখনও রোজই অন্তত কয়েকবার আমার মনে পড়ে। সেদিন ওর চোখের জল মুছিয়ে দেবার সাহস কোনোরকমে পেতাম, তা হলে ওর জীবনটা এমনিভাবে নষ্ট হয়ে যেতো না।

মর্ষকামের মনস্তত্ত্ব মনোহর জানেন না, আর মতিলাল যা জেনেছেন, সেটা ভুল। 'লিবিডো-সর্বস্ব' স্যুরিয়োলিস্টদের একতরফা ধারণা তাঁকে প্রভাবিত করেছে। এ-নিয়ে ওঁদের সংগে বেশ কয়েকদিন আলোচনা চলেছিল।

—মনোবিদ

টেলিগ্রাম : জুয়েলারী
ফোন : ২৩-[illegible]
জড়োয়া গহনা • ঘড়ি
ও
গ্যারান্টিযুক্ত ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স অ্যাণ্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা-১

পুষ্পকলি

দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

গত দুবারের মত এবারও ডাক্তার লাহিড়ী যথারীতি আশ্বাস দিয়ে গেছেন বটে আমি কিন্তু সে আশ্বাসে এবার আর ঠিক ভরসা করতে পারছি না।

ডাক্তাররা সবসময়েই ওরকম আশ্বাস দিয়ে থাকে। আমরা যখন স্পষ্ট দেখছি রোগীর বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে ও স্থির, হাত-পা সব বরফ হয়ে গেছে, বাড়ীশুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তখনও ওরা নাড়ী ধরবার চেষ্টা করে, স্টেথোস্কোপ লাগায়, ইনজেকশনও রেডি করে, কেউ শুনুক না শুনুক, বিড়বিড় করে তখনও ভরসার বাণী আওড়ায়, এখনও বলা যায় না। সীমাহীন ওদের আশা। কিংবা কি জানি, ডাক্তারী-শাস্ত্রের এটাই হয়ত মূল উপদেশ, হোপ এগেনস্ট হোপ!

আমি কিন্তু এবার আর হোপ রাখতে পারছি না। প্রথম এ্যাটাকেই ফ্যাটাল হয়ে গেছে, ডাক্তার এসে আর কিছু করতে না পেরে শুধু চাদরটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেছেন, এমনি অনেক উদাহরণ আছে। প্রথমটা কোনরকমে কাটিয়ে উঠতে পারলেও দ্বিতীয়টার ধাক্কা আর সামলাতে পারেনি, তার উদাহরণও কম নয়। কিন্তু বারবার তিন বারের পরও আবার খাড়া হয়ে উঠেছে, কই এমনি একটা ঘটনার কথাও মনে পড়ছে না। অথচ ডাক্তার লাহিড়ী মমতাকে বলে গেছেন, দেখবেন, আমি বলছি আবার উনি হাইকোর্টে যেতে পারবেন। যেন আমার লেজারটা ওঁরই আলমারীতে আছে, ইনডেক্স দেখে নাম বার করলেন, হিসেব কষে দেখলেন, তারপর সিগারেটে একটা টান মেরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে দিলেন, না, না, এখনও সময় হয়নি।

একেবারে হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে পারব কিনা জানি না, তবে বুঝতে পারছি আজ সকাল থেকে নিঃশ্বাসের কষ্টটা যেন একটু কমে গেছে, সেই সঙ্গে বুকের ব্যথাটাও। রক্তের সেই অতি সূক্ষ্ম মারাত্মক ক্লটটি, যেটি শিরার মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে হার্টে গিয়ে হানা দিয়ে সেখানকার কলকব্জা স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করছিল, হয়ত সেটি ক্ষয় হয়ে আরও সূক্ষ্ম হবে হার্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাই হার্ট অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, তাই খুশী হয়ে লাহিড়ী শুনিয়ে গেছেন আমার বাণী। সেটি যে আবার বুকের মেসিনরুমে হানা দিয়ে সব তছনছ করে দেবে না, পারে কি লাহিড়ীর ভাক্তারীশাস্ত্র সে গ্যারান্টি দিতে?

মমতা বলে গেল, লাহিড়ী বলেছেন ক্রাইসিস পিরিয়ড ওভার। এ কি টাইফয়েড নাকি যে এর ক্রাইসিসের পিরিয়ড বলে কিছু আছে? করোনারী থ্রম্বসিস মানেই আরম্ভেই ক্রাইসিস আর সেই ক্রাইসিস থাকবে প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেন্ডে, একেবারে শেষ পর্যন্ত। এ থেকে ভাল হয়ে যাওয়া মানেই ভাল হয়ে যাওয়া নয়। হেঁটে চলে বেড়ালে কি হবে, সেই ক্লটটি যদি একেবারে ডিজল্ভও হয়ে গিয়ে থাকে, তবুও শুনেছি, একবারের ফলেই নাকি রক্তে অমনি ক্লট বাঁধবার একটা প্রবণতা এসে যায়। অর্থাৎ ভাল হয়ে গেলেও ক্রাইসিসের বিষ-বাতিটি শিরার মধ্যে থেকেই গেছে। অর্থাৎ ফাঁসির হুকুম হলেই গেছে, এখন একদিন ঝুলিয়ে দেবার অপেক্ষা।

মনে পড়ে, বছর সাতেক আগে প্রথম এ্যাটাক হয়েছিল। শীলা তখন কোনভ পড়েছে, নীলা আঠারো আর ইলা একুশের চাইতে কিছু বেশী। সমিত বছর দুয়েক আগে ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা খুলেছে আর অমিত সবে কোর্টে যাতায়াত শুরু করেছে।

বড়দিনে বোটানিক্স-এ গিয়েছিলাম পিকনিক করতে। আমরা সবাই, সঙ্গে জয়ন্ত আর তাপস। বাস্কেট ও ক্যারিয়ার-ভর্তি খাবার। ক্যামেরা আর গ্রামোফোন। সবার জন্য কার্পেট, আমার জন্য মোড়া।

মমতা তার চাউস হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে এনেছিল আরও একটি দ্রব্য—ছোট একটি চ্যাপটা বোতল আর দুটো পেগ গ্লাস। ছেলেমেয়ে বোঝা জানত যে আমরা দুজন একটু একটু খাই। লুকিয়ে এনেছিল, যাতে জয়ন্ত আর তাপস না টের পায়। টের ত একদিন পাবেই জানি, কিন্তু ভাবী জামাইদের এখনই জানিয়ে দেবার দরকার কি? মমতা তাই বলত।

নীলা আর জয়ন্ত মেলামেশার পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, দেখে বেশ ভাল লাগত আমাদের। আলোচনা করতাম, নীলা যেমন আলট্রা-মডার্ন, জয়ন্তও তেমনি। দুটিতে চমৎকার মানাবে। কিন্তু ইলা তাপসের প্রতি বড্ড বিমুখ। মমতা বলত আর দুঃখ করত। ইলা ভয়ানকভাবে সফিস্টিকেটেড। কত সুযোগ যে করে দিত মমতা অথচ মেয়ের মন নেই। না কি আর কোথাও বাঁধা পড়েছে? মমতা একদিন আড়ালে ডেকে স্পষ্টই জিজ্ঞেস করেছিল। ইলা নাকি শুধু হেসেছে। ছেলেটা বোধহয় খানিকটে কুসংস্কারাচ্ছন্নও ছিল, আমরা তাই ভাবতাম। অথচ আমাদের এতটুকু প্রেজুডিস নেই। তারপর যার সঙ্গে একদিন বিয়েই হবে, তার সঙ্গে মেলামেশায় একটু সীমানা মেনে না চললেই বা কি হয়? দুটো বোনই পোশাকে বা চলাফেরায় চমৎকার মডার্ন, অথচ নীলা যেখানে উড়ে চলতে চায় মুক্তবিহঙ্গীর মত, ইলার পদক্ষেপ সেখানে শক্ত মাটির ওপর, দ্বিধা ও সংকোচে মন্থর।

ঝিলের ধারে মোড়ায় বসেছিলাম। মমতা আমি আর শীলা। নীলা আর জয়ন্ত হাত ধরাধরি করে দূরের অর্কিডটা পেরিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনেক দূরে এই ঝিলের ধারেই দেখা যাচ্ছে বসে আছে ইলা আর তাপস। বেশ দূরত্ব রেখে। সুমিত অমিত বৌদের নিয়ে গেছে গঙ্গা দেখতে।

বসে বসে সিগার টানছিলাম আর শীলা মনোযোগ দিয়ে রেকর্ডের পর রেকর্ড বাজাচ্ছিল। তখন কটা হবে? বোধহয় চারটে পার হয়ে গেছে। গাছের ছায়াগুলো বেশ লম্বা, পাতার ফাঁকে একমুঠো শীতের রোদ আমার পায়ের ওপর এসে পড়েছে: আরাম লাগছিল।

মমতা জিজ্ঞেস করল, দোব একটু?

হেসে সম্মতি জানাতেই সে বোতল বার করল, সোডা মিশিয়ে একটা গ্লাস আমার দিয়ে নিজে আরেকটা নিল।

ভারী মিষ্টি একটা বাজনা কানে আসতেই ডাকলাম, শীলা।

ইয়েস বাপি? সাড়া দিল শীলা।

ভারী মিষ্টি ত নাচের বাজনা, ইনভিগরেটিং, লন্ডনের নাইট ক্লাবের কথা মনে পড়ে যায়। এ দেশে ওসব চিকটিং ডান্সের তত একটা রেওয়াজ নেই।

কি যে বলছ তুমি, মমতা বলে উঠল, শীলা কি শুধু ভারতনাট্যমই শিখছে নাকি, মিস ডসাণ্ট ল্যান্ডারের স্কুলে যে ইংলিশ ডান্স শিখতে যায়, তা বুঝি ভুলে গেলে? শীলা, তুমি বাজনার সঙ্গে নেচে দেখাও ত বাপীকে, কি শিখছ।

শীলা জিজ্ঞেস করল, এই ঘাসের ওপর? চারদিকে কত লোক—

লোক! বাধা দিলাম, তুমি কি লুকিয়ে লুকিয়ে নাচবার জন্য নাচ শিখছ নাকি? সবাই দেখতে পাবে, দেখুক না। আর ঘাসের ওপর আমার মেয়েটা যখন নাচবে, তখন মনে হবে যেন একটা ড্যান্সিং পিকক—

যাও, তুমি বড্ড বাড়িয়ে বল বাপী। শীলা গাল ফোলাল। কিন্তু পরক্ষণেই রেকর্ডখানা আবার প্রথম থেকে দিল আর বাজনা শুরু হতেই স্মার্ট মেয়ে স্কার্ট একমনে করে উঠল।

নাচের অপূর্ব কিলারম্যান্ডেল দেখতে দেখতে মমতার সঙ্গে আমিও যেই হাত-তালি দিয়ে ওকে চিয়ার-আপ করতে যাব, অমনি অসহ্য ব্যথার ধাক্কা পেলাম বুকের বাঁ দিকটাতে। মোড়া উল্টে পড়ে গেলাম।

ডাক্তার লাহিড়ী বলেছিলেন, সামান্য এ্যাটাক, ঠিক হয়ে যাবে।

সত্যিই তাই।

কিছুদিন পরেই আবার বার-এ জয়েন করলাম।

বছর তিনেক পর দ্বিতীয়বার।

লাঞ্চের পরই জাস্টিস ডোমিনিকের কোর্টে নিকসন ভার্সাস গজানন ভাটিয়ার ফাইনাল আরগুমেন্ট। চেম্বারে বসে পেশকারের মত

হাঁটুর চোখ বুজিয়ে দিচ্ছিলাম, তখনও জেগিয়ে পড়ছে দুটো একটা ফ্লাশিং পয়েন্ট, পাচ্ছি আর নোট দিচ্ছি স্টেনোকে, আড়াই লাখ টাকার মামলা, এই হেরো মক্কেলকে জিতিয়ে দিতে পারলে ভাটিয়া ব্যাটা দশ হাজার টাকা প্রমিস করেছে, তাই খুব ইন্টারেস্টে নিচ্ছি আর মাঝে মাঝে গ্লাসটা তুলে নিচ্ছি, এমন সময় অকস্মাৎ—

ধরাধরি করে ওরা আমায় ডিভানের ওপর শুইয়ে দিল, কাছাকাছি ডাক্তারের কাছে লোক ছুটল, বাড়ীতে ফোন গেল, খবর পেয়ে ডাক্তার লাহিড়ী ছুটে এলেন।

কেস এ্যাটেন্ড করে ফিরে জাস্টিস চৌধুরীও এসে পড়লেন।

কিন্তু না, এবারও মৃত্যুর ফাঁস থেকে ফিরে বেরিয়ে এলাম।

ডাক্তার লাহিড়ীর কেরামতি।

কিন্তু বারবার তিন বার।

গত রাত্রির কথা মনে হলে এখনও পা হিম হয়ে আসে। মনে আছে, বুকের ব্যথাটা অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছিল, এতবড় ঘর পাখার নীচেও মনে হচ্ছিল পর্যাপ্ত হাওয়া নেই, ছুটে এল বাড়ীর সবাই, ছুটে এলেন লাহিড়ী, অক্সিজেন সিলিন্ডার এল, লাহিড়ী ইনজেকশন রেডি করতে লাগলেন, মমতার চোখে আঁচল, আর সবাই কাঁদতে পারছে না, দেখছি, আমি সবই দেখতে পাচ্ছি, অথচ আমার চোখে দৃষ্টি নেই, এত আলোতেও সব অন্ধকার হয়ে আসছে, হাত তুলে মমতার হাত ধরতে গেলাম, হাত উঠল না, কথা বলতে গেলাম, কথা ফুটল না, মনে হল আমি যেন কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গহ্বর, সিঁড়ি আরও নীচে গড়িয়ে পড়লাম, ওপর থেকে চাপ চাপ পাথর আমার মাথায় এসে

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার'
এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

পড়ছে, ধারালো নখওয়ালা ভয়ঙ্কর একটা দানব আমার কাঁধটা ধরল—তারপর আর কিছু মনে নেই।

আজ সকালে চোখ মেলে দেখি নীলা শিয়রে বসে রয়েছে, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, পাতলা চুলে বিলি কাটছে। আমায় চাইতে দেখে নীচু হয়ে জিজ্ঞেস করল, ব্যথাটা একটু কমেছে বাপি?

ওর হাতখানা গালে চেপে ধরলাম, জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি সারাটি রাত এমন ঠায় বসেছিলে?

আরও নীচু হয়ে আমার কপালের ওপর গাল রাখল নীলা, ধরা গলায় বলল, আমার বাপী।

মাই সুইট ডার্লিং মাদার! হাত বাড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরলাম।

আমার চোখে জল এসে পড়েছিল।

তেইশ পার হয়ে গেল, এখনও মেয়েটা বিয়ে করল না। ইংরেজীতে শুধু ফার্স্ট ক্লাসই পায়নি, থার্ড হয়েছে। এত নাম করেছে নাচে যে, সাংস্কৃতিক নানা সংস্থা থেকে প্রায়। ওর নাচের আমন্ত্রণ আসে, কাউকে প্রত্যাখ্যান করে বলে মনে পড়ছে না, বহু ছেলের সঙ্গে ওর আলাপ, হৃদ্যতা, অসংখ্য ওর এ্যাডমায়রার, তাদের মধ্যে কত যোগ্য ছেলে আছে, তাদের সঙ্গে বেশ হাসিঠাট্টাও করতে দেখেছে মমতা, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মেলামেশার মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে চলে, কোনো প্রশ্রয় বা প্ররোচনাতেও সেই রেখা অতিক্রম করে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, কেন বাপি, আমায় ভাল লাগে না তোমার, তাই তাড়াতে চাও?

শোন মেয়ের কথা! বিয়ে দেয়া মানেই কি তাড়িয়ে দেয়া?

কিংবা কি জানি, দিদিদের বিবাহিত জীবনের পরিণতি দেখে হয়ত ত্যক্তবিরক্ত হয়ে মনটাকে পাথর করে ফেলেছে। অনিশ্চয়তার ফাঁদে পা বাড়াতে চায় না। জীবনভর ত দেখছি, নেগোশিয়েটেড ম্যারেজই হোক বা প্রেম করেই বিয়ে হোক, সব বিয়েই লটারি খেলার মত। লাগল ত চমৎকার, আর না লাগলে শুধু নিজের নয়, মা বাবারও দুশ্চিন্তার একশেষ।

তাপস কতরকমে মন ভেজাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ইলা কিছুতেই ওকে বিয়ে করতে রাজী হল না। নেগোশিয়েটেড বিয়েই করেছে। আমি নিজে ইন্দ্রজিতকে সিলেক্ট করেছি। রূপে গুণে, যাকে বলে, প্রাইজ বয়। ইন্দো-জার্মান কমার্শিয়াল ফার্মের এ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার। লম্বা মাইনে, গাড়ী, বাড়ী। তারপর ভরা সংসার, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেওর, ননদ, ননদাই, জা, অর্থাৎ নিশ্চিন্ত ছিলাম, হেসেখেলেই ওর দিন কাটছে, কাটবে।

কিন্তু দেখলাম, লটারিতে হেরে গেছি। অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড।

মারাত্মক অভিযোগ ইলার। ইন্দ্রজিতের পুরোনো স্টেনো কোথায় ভাল চাকরি পেয়ে চলে গেছে বছরখানেক আগে। নতুন একটা পার্শী মেয়ে এসেছে। সে নাকি একটি ককেট। এসেই বস-কে হাত করে ফেলেছে। ইন্দ্র নাকি ফেরবার সময় প্রায়ই ওকে লিফট দেয়, মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে হোটেলে ডিনার খেয়ে আসে, ওর মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যায়। এতখানিও সয়েছিল ইলা। কিন্তু ইন্দ্র এখন মাঝে মাঝে নাকি স্টেনোর ফ্ল্যাটেই রাত কাটিয়ে আসে। এ নিয়ে মাঝে মাঝেই ওদের ঝগড়া হয় আর ইলা চলে আসে, শ্বশুরশাশুড়ীকে বলে আসে, বাবামাকে দেখে আসি। এসে আর যেতে চায় না, মমতা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার পাঠায়। আত্মসম্মানজ্ঞান খুব বেশী, তাই মেয়েটা শ্বশুরবাড়ীর কাউকে এসব কিছু বলেনি, বলে না। নিজেই জ্বলেপুড়ে মরছে। একদিন আমার কথার জবাবে বলল, আমাদের দেশটা এখনও আমেরিকা হয়ে যায়নি বাপি।

আমেরিকা করে তুলেছে নীলা।

মনে আছে, মমতা একদিন বলেছিল, নীলা একদিন সখ করে আমাদের গ্লাসের তলানিটুকুতে জিভ ঠেকিয়ে নাক সিঁটকে বলেছিল, কি বিশ্রি তেতো তেতো স্বাদ আর কি ঝাঁঝ! আচ্ছা মা-মণি, তোমরা খাও কি করে? ভাল লাগে?

মমতা জবাব দিয়েছিল, দেখতেই ত পাস, আমরা সামান্য খাই, অনেকটা মেডিসিনের মত। মেডিসিন কি আর ভাল খারাপ দেখে খেতে হয়?

নীলা আবার নাক সিঁটকে বলেছিল, আমি ত অসুখে মরে গেলেও ঐ নিমপাতার ঝোল কিছুতেই মুখে তুলব না।

আশ্চর্য, সেই নাকসিঁটকানো মেয়েটাই যখন সিক্সথ ইয়ারে উঠল, তখন ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে প্রায়ই 'বার' হয়ে আসতে লাগল আর মা কোন প্রশ্ন করার আগে নিজে থেকেই বলল, জানলে মা-মণি, ভেবেছিলাম ওটা বুঝি শুধু তেতোই। কই, এমন কিছু তেতো নয় ত, একটু বেশী করে সোডা মিশিয়ে নিলে কি সুদিং লাগে! সারাদিন ক্লাশে ক্লাবের পর এক-একটি সিপ যে কী ইনভিগরেটিং—আর বন্ধুদের সঙ্গে খেতে, যাকে বলে সিম্পলি মারভেলাস!

জানতে পেরেছিলাম, ওদের দলে শুধু জয়ন্ত একাই নয়, শ্রীমন্ত বসন্তরাও এসে জুটে গেছে। তাই বাড়ী ফিরতে প্রায়ই দেরী হয়ে যাচ্ছে।

দেখা গেল, কোনদিন ফিরে এসে নীলা গাড়ী থেকে একা নামতে পারছে না শীলা গিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসছে, জড়িয়ে জড়িয়ে আপন মনে কথা বলছে, অকারণে হি হি করে হেসে উঠছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠছে রেলিং ধরে টাল সামলে সামলে, গায়ের আঁচলই শুধু পড়ে যায় নি, কোমরের বাঁধনও আলগা হয়ে গেছে,

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
বাটার জুবিলি
চপ্পলগুলির সবগুলিই এমন, যাতে হাওয়া
খেলতে পায়, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে
থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ।
সুশ্রী ছিমছাপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের
স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি
আসুন না, একবার
প'রে দেখুন।
বাটা জুবিলি
জুবিলি ৬৬
১৬·৯৫
জুবিলি ২১
১৩·৯৫
জুবিলি ৫১
১৭·৯৫
জুবিলি ৩০
১৪·৯৫
Bata

নীলাও সামলাতে পারছে না। আর একদিন মাকে সামনে পেয়ে অকস্মাৎ তাকে জাপটে ধরে 'ও মাই ডিয়ারী মাদার' বলে চকর-বাকরের সামনেই চক চক করে চুমু খেতে লাগল। সেদিনই আমরা বুঝেছিলাম, সিপ এখন বোতলে উঠেছে আর বোতলটা ওকে খাওয়া শুরু করেছে।

এখন উপায়?

মমতা বলল, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও।

কিন্তু জয়ন্তকে ও বিয়ে করতে রাজী নয়। স্পষ্ট বলল মমতাকে, জয়ন্ত নাকি স্বামীর চাইতে অনেক প্রিয় আর ওর সঙ্গে সম্পর্কটা বিয়ের চাইতে অনেক বড়, তাই ওকে বিয়ে করে খাটো করতে সে রাজী নয়। প্রথমে ভেবেছিলাম, নীলা আর জয়ন্ত, দুটোই যখন একই জাতের, তখন বিয়ে দিয়ে বিদায় করে দেব, তারপর যা খুশী করুক গে ওরা। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গী দেখে স্থির করলাম, খুব কড়া একটি মর্য্যালিস্ট ছেলের হাতে তুলে দিই, স্বামীর ব্যক্তিত্ব ও শাসনের কাছে ও নত হতে আসবে, সৎসঙ্গে পড়লে মদ ও উচ্ছৃঙ্খলতার দুর্বলতা কেটে যাবে।

তাই খানিকটা জোর করেই বলা যায়, সোমনাথকে জামাই করে নিয়ে এলাম।

কিন্তু না, কিছুই হল না। একটা বড় ফার্মের সেলস অর্গানাইজার সোমনাথকে মাঝে মাঝেই দিনকয়েকের জন্য ট্যুরে যেতে হয় আর সেই অবসরে ফাঁক বুঝে আসে সেই জয়ন্ত আর শ্রীমন্ত বসন্তের দল।

সোমনাথ অনেক বুঝিয়েছিল, মমতা আর আমিও কি কম বলেছিলাম, কিন্তু কোন ফল হল না। স্বামীকে অগ্রাহ্য করে মেয়েটা নিত্যনতুন নাগর জোটাতে লাগল।

অবশেষে যা হবার, তাই হয়েছে। সোমনাথ ওকে ত্যাগ করেছে। বদনাম হবে বলে সে আর যায়নি। আমরাও নীলার জন্য চিরতরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। একটা বিদেশী ফার্মে ভাল চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে, জেনারেল ম্যানেজারের প্রাইভেট সেক্রেটারী। সাহেবদের সাধারণতঃ বাঙালী মেয়ের ওপর ঝোঁক থাকে। শুধু সে কেন, শুনেছি, আরও সাহেব খদ্দের জুটে গেছে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে একা থাকে, আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

বাইরের সম্পর্ক যতই ছাঁটাই করি না কেন, মন তা বুঝবে কেন? চরিত্রহীনা হলেও নীলা যে আমারই সৃষ্টি মমতার রক্ত দিয়ে তৈরী। সন্তান মা বাবাকে মন থেকে মুছে ফেললেও তারা কি সন্তানকে ভুলে যেতে পারে? নীলা হয়ত এসব দেখেই পাথর হয়ে গেছে, আমাদের সঙ্গেই ছাড়ার মত লেপটে রয়েছে। কিন্তু মেয়ে যদি যৌবনে যোগিনী হয়ে যায়, তাহলে কোন বাবা মা সইতে পারে?

এ কি, দু ফোঁটা জল পড়ল কপালের ওপর।

নীলা, তুই কাঁদছিস?

তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল হাতের পিঠ দিয়ে, বলল, কই, কাঁদছি না ত বাপি। রাতটা জেগেছি কিনা, তাই—

তুমি এখন যাওনা মা, আমি বললাম, স্নান করে ঘুমিয়ে নাও তো। ইলা বা বৌমারা কেউ এসে বসবেখন। আর আমি ত এখন ভাল আছি—

না, না, বাপি, যাব না আমি।

কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে ওর মুখখানা নামিয়ে আনলাম, কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললাম, মাই ডার্লিং! মাই মাদার!

মমতা ঘরে এল। লাল পেড়ে গরদ, ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী। গলায় আঁচল জড়িয়ে মেঝের বসে পুজো করল, পঞ্চপ্রদীপ তুলে আরতি করল, শঙ্খ বাজাল, মেঝেতে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল, তারপর আশীর্বাদী ফুল আমার কপালে ও বুকে ছুঁইয়ে মোজেকবরণ বালিশের পাশে রেখে দিল, টিপয়ের ওপরকার সোনার নটরাজের চারহাতে চারটি জ্বলন্ত ধূপকাঠি গুঁজে দিল। তারপর এক ঝলক আমার দেখে মৃদু হেসে নীলার গাল টিপে আদর জানিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

আমার সেকেণ্ড এ্যাটাকের পর থেকেই লক্ষ্য করেছি, ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসছে মমতার মধ্যে। নাহিড়ী খাড়া করে তুললে কি হবে, ভগবানের ওপর মমতার বিশ্বাস এসে গেছে। ঠাকুর বসিয়েছে একেবারে আমাদের শোবার ঘরে, প্রতিদিন স্নান করে পুজো করে, পুজান্তে প্রসাদ বিতরণ করে। হুইস্কি, জীন, এমন কি বীয়ার পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। এই মমতাই, বছর তিনেক আগে, যখন ওর বয়স একুশ বাইশ, কী ছিল তখন?

ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়টাই ত ড্রামাটিক!

আটত্রিশ, না ঊনচল্লিশ, কোন ইয়ার, এখন ঠিক মনে করতে পারছি না, রংজোরা চাবাগানের ফ্যাক্টরীবাবু মার্ডার কেসে আরগুমেন্ট করতে গিয়েছিলাম জলপাই-গুড়ি। ফিরছিলাম নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে। রাত এগারোটার খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম, ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত বোধহয় তিনটে হবে, অকস্মাৎ ভীষণ ঝাঁকুনি খেয়ে ছিটকে পড়লাম মেঝেতে, বাঙ্কের ওপর থেকে সুটকেশ আর বাসকেট আমার ঘাড়ে পড়ল। ভাগ্যিস, মাথায় পড়েনি। বুঝলাম, মরিনি। কিন্তু এ কি ভূমিকম্প? বাইরে অসংখ্য মানুষের চীৎকার আর আর্তনাদ গাড়ীর আলো নিভে গেছে, তবে বাইরে মনে হচ্ছে প্ল্যাটফরম, স্তিমিত কেরোসিনের লাইটপোস্ট দেখা যাচ্ছে। হাতড়ে গিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করলাম, খুলল না, বেঁকে গেছে। অগত্যা জানালা দিয়েই প্ল্যাটফরমে নেমে পড়লাম। না, ভূমিকম্প নয়, মারাত্মক ট্রেন এ্যাকসিডেন্ট। ক্ষুদ্র মার্জাদিয়া স্টেশনে এক্সপ্রেস দাঁড়ায় না, কিন্তু বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। নাইট ডিউটি ছিল যে কর্মচারীটির, তার ছিল নৈশ বিহারের দোষ। পয়েন্টম্যানকে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস আর ঢাকা মেলকে পাশ করিয়ে দিতে বলে তিনি বিহারে গিয়েছিলেন। পয়েন্ট-ম্যানেরও শেষ রাতে পেয়েছিল দারুণ ছোট কলকেতে বড় তামাকের নেশা। তাকা মিটিয়ে যখন সে ঝিমুচ্ছিল, এর মধ্যে আমাদের এক্সপ্রেস মার্জাদিয়া পৌঁছে গেছে, নীল আলো দেখতে না পেয়ে ড্রাইভার ট্রেন থামিয়ে দিয়েছিল। পয়েন্টম্যানকে ধাক্কা দিয়ে তুলে অনেক বকাবকি করে গার্ড যখন আবার ট্রেন ছাড়বার উদ্যোগ করছে, এমন সময় পেছন দিক থেকে পঞ্চাশ মাইল স্পিডে ধেয়ে আসছিল ঢাকা মেল। কেরোসিনের আলোয় ড্রাইভার আর আমাদের গাড়ীখানা দেখতে পায়নি, তবুও তার সার্চলাইটেও ত দেখা উচিত ছিল, জানা গেল, দেখেছিল সে, দেখেই প্রাণপণে ব্রেক কসেছিল, কিন্তু পঞ্চাশ মাইলের গতিকে একেবারে স্তব্ধ করে দিতেও মেল এসে এক্সপ্রেসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের পেছন দিককার দুখানা বগী একেবারে চুরমার, ফার্স্টক্লাশ-গুলো মাঝখানে বলে আমরা বেঁচে গেছি। মেলের ইঞ্জিনের সম্মুখভাগ আমাদের পেছন-দিকের বগীর ওপরে উঠে গেছে, পশ্চাৎভাগ প্ল্যাটফরম ভেঙে দুমড়ে পড়ে আছে।

অসংখ্য শব চতুর্দিকে, অসংখ্য আহত। চতুর্দিকে ছুটোছুটি। কাছেই স্টেশন বাজার, সেখানে সারারাত যাত্রাগান হয়েছে, তখনও হ্যাজাকগুলো সব নেভানো হয় নি, তাই এনে লোহালক্কড়ের নীচে চাপা-পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করবার চেষ্টা চলছে।

আমিও ছুটোছুটি করছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল একটি মেয়ে খোয়ার মধ্যে

এলিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ছুটে গেলাম, তুলতে চেষ্টা করলাম, বলল ওর এ্যাংকেলে ভীষণ লেগেছে, হাঁটতে পারবে না। তখন কি আর করব, ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে বাজারে নিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর শুইয়ে দিয়ে ওর সাথী বাবার সন্ধানে ছুটলাম।

পাওয়া গল তাঁকে, বেশী লাগেনি, শুধু শরীরের কয়েকটা জায়গা ছড়ে গেছে।

সেই মেয়ে, উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী মেয়ে এই মমতা।

যে দুটো বগী গুঁড়ো হয়ে গেছে, তার পাশের বগীতে ওরা ছিল।

রিলিফ ট্রেন এল, ওদের নিয়ে কলকাতা এলাম, ওদের বাড়ী পৌঁছে দিলাম।

ওদের পরিবারের সবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল, হৃদ্যতা হল, হৃদ্যতা বাড়ল এবং মাখামাখি হতে লাগল সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে। মমতা তখন বি-এ পড়ে। কলেজ পালিয়ে সে আমার চেম্বারে আসত, তারপর আমরা দুটিতে যেতাম ইডেনে, আউটরাম ঘাটে, ময়দানের অন্ধকার নিরালায়। কি স্পোর্টফুল, কি সুইট ছিল মমতা। আমার খাওয়া জীনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলত, জীন আর তুমি, কোনটা রেখে কোনটা খাই বল ত!

প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে চলছিল দিনগুলি!

হঠাৎ একদিন বুকে মাথা রেখে দুষ্টু হেসে বলল মমতা, ইউ হ্যাভ ডান মি মিসচিফ, ইউ নটি বয়!

এখন উপায়?

পরক্ষণেই ক্লেলের ওপর এলিয়ে পড়ল, ডনচিউ ওয়ারী, মাকে সব বলেছি, মা বাবাকে বলেছে, আসছে ফাল্গুনেই—

ফাল্গুনে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

সেই ফুলে আমাদের সুমিত।

আচ্ছা, সুমিতকে এটা জানিয়ে দেয়া উচিত নয়? অপ্রীতিকর হলেও ত এটা সত্য। মরে চলেই যদি সত্য গোপন রেখে আরো পরে সুমিত মার কাছ থেকে জানতে পারে, তাহলে বাবার সম্বন্ধে ওর মনে কি অশ্রদ্ধা এসে যাবে না? আজকালকার ছেলেমেয়েরা ঐ ঘটনার জন্য দুঃখ হবে না জানি, আরও বিশেষ করে যখন সেই মেয়েকেই বিয়ে করেছি আমি, কিন্তু ঘটনা এতকাল গোপন রাখার জন্য হয়ত ওরা অভিমান করতে পারে। আর পরপারে গিয়ে আমার মনেও কি কাঁটা বিঁধে থাকবে না? না কি আমরাই যখন প্রায় ভুলে গিয়েছি, তখন আবার নতুন করে মনে করা ও মনে ঢুকিয়ে দিয়ে সুমিতের ফুলের মত মনে কত সৃষ্টি করাটা অন্যায় হবে? ওর জন্মের জন্য ত আর ও দায়ী নয়। ওর কলঙ্ক? সেদিক থেকে সুমিত আমাদের সোনার ছেলে।

ধূপকাঠিগুলো অনেকখানি পুড়ে গেছে। ছাইগুলো কেমন ঝুলে ঝুলে রয়েছে, বাতাসের ঘায়ে কোন কোনটা খসে পড়ছে। ভারী মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি। আর পাচ্ছি আমার সোনার মেয়ে লীলার নরম হাতের মিষ্টি পরশ!

নীচে গাড়ীর আওয়াজ হল। নিশ্চয়ই বেলা দশটা বেজেছে, কারখানায় রওনা হলেন শ্রীমান সুমিত। এবং প্রায়ই যা করে থাকে, নিশ্চয়ই ফাউন্টেন পেন বা আলমারীর চাবি ফেলেই চলে গেল। এর পরই আসবে দারোয়ান দল বাহাদুর। হেসে বলবে মমতাকে, মাইজি, চাবিঠো—কলমঠো—

নামেও খোকা, কাজেও এখনও খোকাই রয়ে গেছে। বৌমারও তা আর বুঝতে বাকি নেই। ব্যবসায়ী হবার আগো উপযুক্ত নয়। নইলে এমন মালিক কে আছে, যে প্রতি সপ্তর লোকসান মেটাতে আমার কাছে হাত পাতবে, আবার কোন দাবী জানবার আগেই লেবারদের মাইনে বাড়িয়ে দেবে? বৌমা পর্যন্ত চার্জ করেছিল ওকে, শ্রীমান বলেছে, দাঁড়াও না, এবার দেখ, নিশ্চয়ই প্রফিট হবে আর অমনি বাবার ধার ধীরে ধীরে শোধ করা শুরু করব।

পাগলা কোথাকার! বাবার কাছ থেকে টাকা নিলে কি ধার নেয়া হয়?

কিন্তু আর বুঝি তোকে টাকা দিতে পারব না রে খোকা! আর কি বার-এ যেতে পারব?

ভাবতে গেলেই মোচড় দিয়ে ওঠে বুকটা। যখন মনে হয়, আমি আর থাকব না, আমার সোনার সংসার ফেলে চিরদিনের মত চলে যেতে হবে, পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাব ঐ ধূপকাঠির মত, চোখের সামনে সব তখন ঝাপসা হয়ে আসে।

শ্রীমান অমিতের প্রবেশ। কোর্টে যাবার জন্য রেডি হয়ে এসেছে। আমি যে বহুত বলেছি, কাল সারারাত যে মৃত্যুর সঙ্গে টাগ অব ওয়ার চলেছে, পাষাণটার সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। কেমন হেসে হেসে বলছে, জানেন বাবা, ক্রিমিনাল যতই একস-পার্ট হোক না কেন, সে যেমন ক্রাইমের সূত্র কিছু একটা রেখে যাবেই, যার সূত্র ধরে পুলিশ সেখানে ওকে ধরে ফেলে, ঠিক তেমনি পুলিশও যতই টিপটাপ করে মামলা সাজাক না কেন, লুপহোল একটা কিছু থাকেই আর সেই লুপহোল দিয়ে অনায়াসে আসামীকে বার করে নিয়ে আসা যায়। কোর্ট যতই দুঃখুক না কেন, আইনের বাইরে কিছু করবার তার উপায় নেই।

দুঃখ হত না, যদি এই ছেলেটার হাতে ওদের না রেখে যেতে হত। কি জানি, আমি চোখ বোজামাত্র স্কাউণ্ড্রেল আমার উইলখানারও হয়ত একটা কিছু লুপহোল বার করে ফেলবে আর সেই হোল দিয়েই সবাইকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়ে একাই সব দখল করে বসবে। বৌটিও যে সহধর্মিণী!

ভাবতে গেলেই বুকটা আবার টিকটিক করে ওঠে। দেখছি ঐ ধূপকাঠিগুলো আর মনে হচ্ছে, ওগুলো যেন আমারই জীবনের প্রতীক। আমি যেন একটা ধূপকাঠি, ভগবান জ্বালিয়ে দিয়ে পৃথিবীর বুকে গুঁজে দিয়েছেন। জ্বলেছি অনেক দিন, অনেক বছর, অনেক সুগন্ধ বিকীরণ করেছি। এবার এসেছে ছাই হয়ে খসে পড়ার সময়। কাঠের কাণ্ডটা দুবার ঠেকরেছি, এবার আর পারব না, এক মুঠো ছাই হয়ে বিস্মৃতির মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাব।

কিন্তু আমার মমতার কি হবে? কার বুকে মাথা রাখবে সে? আমার সুমিত খোকা? আমার লীলা-মা? আমার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মেয়ে ইলা? বুকের রক্ত দিয়ে গড়া ঐ কচি নীলা আর হাসের অমিত? এদের সবাইকে ফেলে রেখে কেমন করে চলে যাব?

ভগবান, নাস্তিকের মিথ্যা আশ্বাস কি সত্য হতে পারে না? এমন কোন ধূপকাঠি কি আমি হতে পারি না, যা জ্বলছে, যা জ্বলবে?

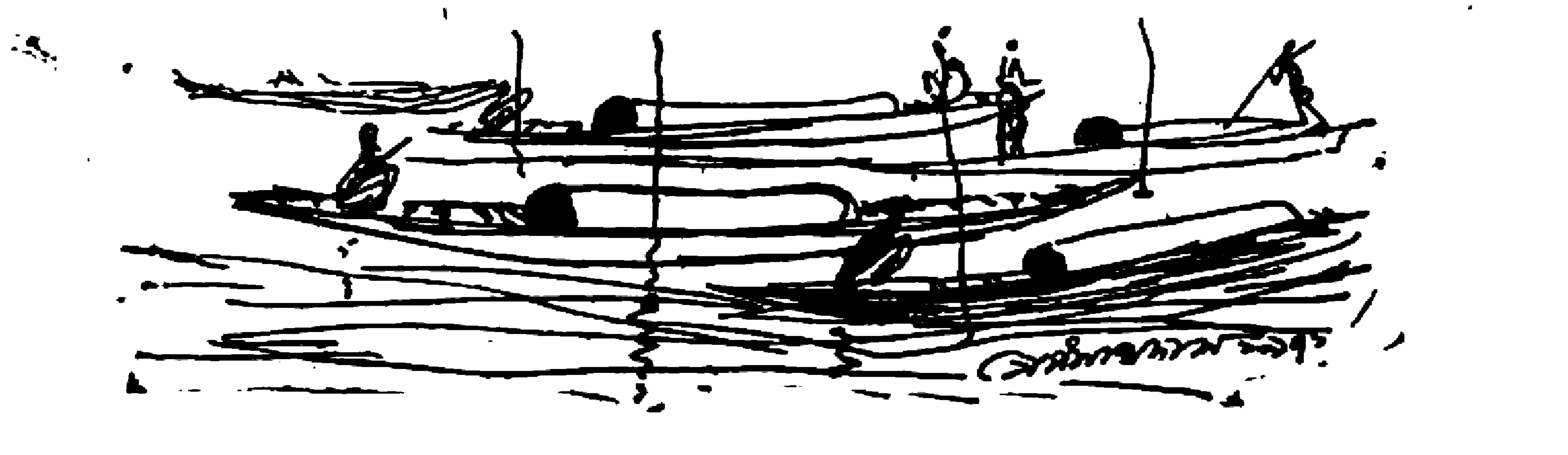

বিজ্ঞানের কথা

ভেনাস—৭ ও শুক্রগ্রহের খবর

মহাকাশ-অভিযানে ১৯৭০ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কয়েকটি বড়ো রকমের কাজে অর্জন করেছেন। স-মন্ত্রা সয়ুজ-৯ সবচেয়ে দীর্ঘকাল পৃথিবীর কক্ষপথে থেকেছে। লুনা-১৬ চাঁদের পাথর নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। লুনা-১৭ চাঁদের মাটিতে নামিয়েছে স্বয়ংচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার লুনোখোদ-১। লুনা-১৬ ও লুনা-১৭ অভিযানে কোনো মানুষ যাত্রী ছিলেন না। দুটি অভিযানের সমস্ত কাজই সম্পন্ন হয়েছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে। লুনা-১৬ ও লুনা-১৭ সমস্ত বিশ্বের কাছে প্রমাণ রেখেছে বর্তমান অবস্থায় মনুষ্যহীন স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ-অভিযানের উপযোগিতা ও সার্থকতা কতখানি। এ ছাড়া ১৯৭০ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মোট ৮৭টি ব্যোমযান আকাশে তুলেছেন ও নানা বিষয়ে পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। এবং এই ১৯৭০ সালেই ১৭ই আগস্ট তারিখে ভেনাস বা শুক্রগ্রহের উদ্দেশে পাঠিয়েছেন একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তগ্রহ অনুসন্ধানী ব্যোমযান—ভেনাস-৭। ১২০ দিনের যাত্রাশেষে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে অবতরণের অংশটি ব্যোমযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত শুক্রগ্রহের মাটি পর্যন্ত পৌঁছয়। মানুষের তৈরী একটি অনুসন্ধানী ব্যবস্থা শুক্রগ্রহের মাটিতে নামানো এর আগে সম্ভব হয় নি। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ভেনাস—৪ (অক্টোবর ১৯৬৭), ভেনাস-৫ ও ভেনাস-৬ (মে ১৯৬৯) শুক্রগ্রহে পৌঁছে শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে অবতরণ শুরু করার পরেও শেষ পর্যন্ত শুক্রগ্রহের মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি। এদিক থেকে ভেনাস-৭ একটি বড়ো রকমের সাফল্য এবং মহাকাশ অভিযানে ১৯৭০ সালের একটি বড়ো ঘটনা। ভেনাস-৪ থেকে ৭, এই চারটি অনুসন্ধানী অভিযানের ফলে শুক্রগ্রহ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্যও জানা গিয়েছে। আজকের বিজ্ঞানের কথায় এই তথ্যগুলো উপস্থিত করতে চাই।

সৌরমণ্ডলের নটি গ্রহের মধ্যে পৃথিবীর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল শুক্রের। কখনো 'শুকতারা', কখনো 'সন্ধ্যাতারা', এই গ্রহটি সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলও সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রের মিল যে কতখানি তা বোঝা যাবে কিছু তুলনামূলক সংখ্যা উপস্থিত করলে। পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৫৭ কিলোমিটার, শুক্রের ব্যাস ১২,১০০ কিলোমিটার। জলের ঘনত্ব একক ধরে পৃথিবীর ঘনত্ব ৫·৫২, শুক্রের ঘনত্ব ৫·১। সূর্য থেকে দূরত্ব পৃথিবীর ১,৪৯৭ লক্ষ কিলোমিটার, শুক্রের ১,০৮০ লক্ষ কিলোমিটার। কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন, শুক্রের ২২৫ দিন। কক্ষপথে পৃথিবীর বেগ সেকেন্ডে ২৯·৭৬ কিলোমিটার, শুক্রের ৩৫·০ কিলোমিটার। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি যে গ্রহটি আসে তা এই শুক্র। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শুক্রকে বলা হয়েছে 'পৃথিবীর সহযাত্রী'। বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকেও কথাটা সত্যি।

গত কয়েক শতাব্দী ধরেই বিজ্ঞানীদের বিশেষ মনোযোগ এই গ্রহটির ওপরে। তবুও এতকাল পর্যন্ত এই গ্রহটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। কারণ এই গ্রহটিকে ঘিরে রয়েছে ঘন ও নিশ্ছিদ্র মেঘের আবরণ। পৃথিবীর মাটি থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করলে এই মেঘের আবরণের বাইরের দিকটি দেখা যেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। তবে গত কয়েক দশকে অবলোহিত বর্ণালী-মাপনের সাহায্যে শুক্রের এই ঘন মেঘের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলের কিছু খবর জানা গিয়েছিল। তারপরে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন বিজ্ঞানীদের মেরিনার-২ গিয়ে পৌঁছেছিল শুক্রের খুব কাছাকাছি এলাকায় (৩৪,৬৪০ কিলোমিটারের মধ্যে) এবং ৪২ মিনিট ধরে শুক্রকে পর্যবেক্ষণ করেছিল। ভেনাস-৪ অভিযান শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে শুক্র সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে একটা ধারণা করা গিয়েছিল মাত্র। যেমন, আকারে ঘনত্বে ও ভরে পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রের যতোই মিল থাকুক, মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর বাসযোগ্য স্থান হিসেবে এই গ্রহটি একেবারেই অনুপযুক্ত এবং পৃথিবীর সঙ্গে এই গ্রহের প্রকাণ্ড অমিল। কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে শুক্রের সময় লাগে ২২৫ দিন, আবার এই একই সময়ে নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খায়। তার মানে শুক্রের একদিকে একটানা দিন, অন্যদিকে একটানা রাত্রি—শুক্রের একদিক বরাবরই আলোর দিক, অন্যদিক বরাবরই অন্ধকারের দিক। মেরিনার-২ কিছুটা সময় পর্যবেক্ষণ করেছিল শুক্রের অন্ধকার দিককে, তারপরে আলোর দিককে। মেরিনারের যন্ত্রপাতিতে শুক্রের এই দু-দিকের বায়ুমণ্ডলের উত্তাপে বিশেষ তারতম্য ধরা পড়ে নি। অথচ স্বাভাবিক ছিল একটানা দিনের দিকে খুব বেশি রকমের উত্তাপ, একটানা রাত্রির দিকে খুব বেশি রকমের ঠাণ্ডা। তা যখন হয়নি তখন ধরে নিতে হয় শুক্রে রয়েছে প্রচণ্ড একটি বায়ুপ্রবাহ যার ফলে একদিকের বিপুল পরিমাণ উত্তাপ অন্যদিকে প্রবাহিত হয়ে চলে। মেরিনার-২ শুক্র সম্পর্কে আরো একটি নতুন খবর জানিয়েছিল। পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন যেদিকে (পশ্চিম থেকে পূবে), শুক্রের অক্ষ-আবর্তন তার বিপরীত দিকে (পূব থেকে পশ্চিমে)। মেরিনার-২ শুক্রের চৌম্বকত্বের কোনো সাড়া পায়নি।

আগেই বলেছি, মেরিনার-২ শুক্রের কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিল, শুক্রের মেঘের ভিতর দিয়ে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেনি। এ-কাজটি প্রথম সম্পন্ন করে ভেনাস-৪, তারপরে ভেনাস-৫ ও ভেনাস-৬। এর ফলে বিভিন্ন উচ্চতায় শুক্রের বায়ুমণ্ডলের গড়ন, উত্তাপ, চাপ ও ঘনত্ব নির্ভুলভাবে জানা যায়। ভেনাস-৪, ৫ ও ৬'এর খবর অনুযায়ী শুক্রের বায়ুমণ্ডলে আছে প্রায় ৯৭ শতাংশ কার্বনিক এ্যাসিড, অনধিক ২ শতাংশ নাইট্রোজেন, প্রায় ১ শতাংশ জলীয় বাষ্প (মেঘের কাছে) এবং অনধিক ০·১ শতাংশ অক্সিজেন।

শুক্রের মাটি ছুঁতে যখন আর প্রায় ২০ কিলোমিটার বাকি ততোদূর পর্যন্ত শুক্রের বায়ুমণ্ডলের খবর পাওয়া গিয়েছিল ভেনাস-৫ ও ভেনাস-৬ থেকে। শেষ খবর এসেছিল ২০ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে। সেখানে উত্তাপ ছিল ৩২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, চাপ ছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ২৭ গুণ। এই খবরের সঙ্গে অন্যান্য খবর মিলিয়ে বিশ্লেষণ করে সে সময়ে অনুমান করা হয়েছিল যে শুক্রের উপরিতলের উত্তাপ হবে ৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি, চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ১০০ গুণ।

এই সমস্ত খবরের ভিত্তিতেই ভেনাস-৭ এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যাতে প্রচণ্ড চাপ ও উত্তাপ সহ্য করেও মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কাজটি সহজ নয়। সীসে ও দস্তা গলে যায় এমন উত্তাপ, সমুদ্রের এক কিলোমিটার গভীরে ডুব দিলে যতোখানি চাপ তার চেয়েও বেশি চাপ, অথচ তারই মধ্যে সূক্ষ্ম-স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি চালু রাখা এবং হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে

তা থেকে খবর পাঠানো—মহাকাশ-যানে-বলার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সবদিক বিবেচনা করে এমনি একটি আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে মস্কো সময় সকাল ৭টা বেজে ৫৮ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ডে ভেনাস-৭ শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং সকাল ৮টা বেজে ৩৪ মিনিট ১০ সেকেণ্ডে শুক্রের মাটি স্পর্শ করে। তারপরেও ২৩ মিনিট ধরে পৃথিবীতে খবর পাঠিয়ে চলে।

ভেনাস-৭এর খবর অনুসারে শুক্রের উপরিতলের উত্তাপ ৪৭৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৪২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে, চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে ৯০ থেকে ১০৫ গুণ বেশি। উপরিতলের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৬০ গুণ বেশি।

এই হচ্ছে শুক্র। কোনও জীবের টিকে-থাকা নেই। [illegible] উত্তাপ [illegible] প্রচণ্ড [illegible] [illegible] [illegible] বসবাসই ছিল। [illegible] বসবাসই নাই।

[illegible] মিল—[illegible] [illegible] কি করে তার [illegible] বিজ্ঞানীদের [illegible]।

[illegible] এই ঘটনাই [illegible] বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ু-

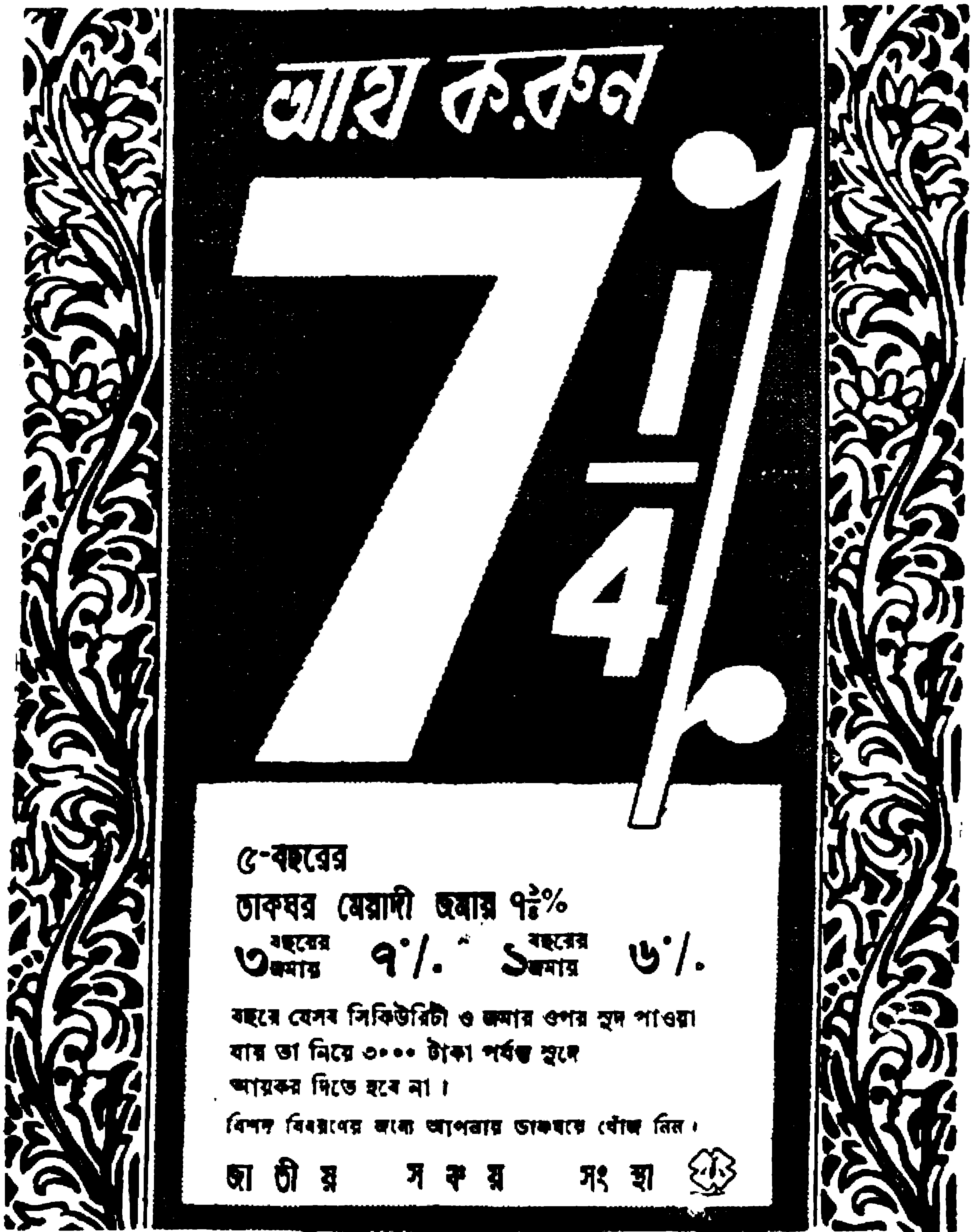

davp 70/661

এই ছবি থেকে ভূপৃষ্ঠের চেহারা সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। বিয়োগ চিহ্নযুক্ত সংখ্যার সাহায্যে বোঝানো হয়েছে খাদ, যোগ চিহ্নযুক্ত সংখ্যার সাহায্যে কুঁজ। সংখ্যাগুলো মিটারে। ভূমির রেখায় অক্ষাংশ, লম্ব রেখায় দ্রাঘিমাংশ।

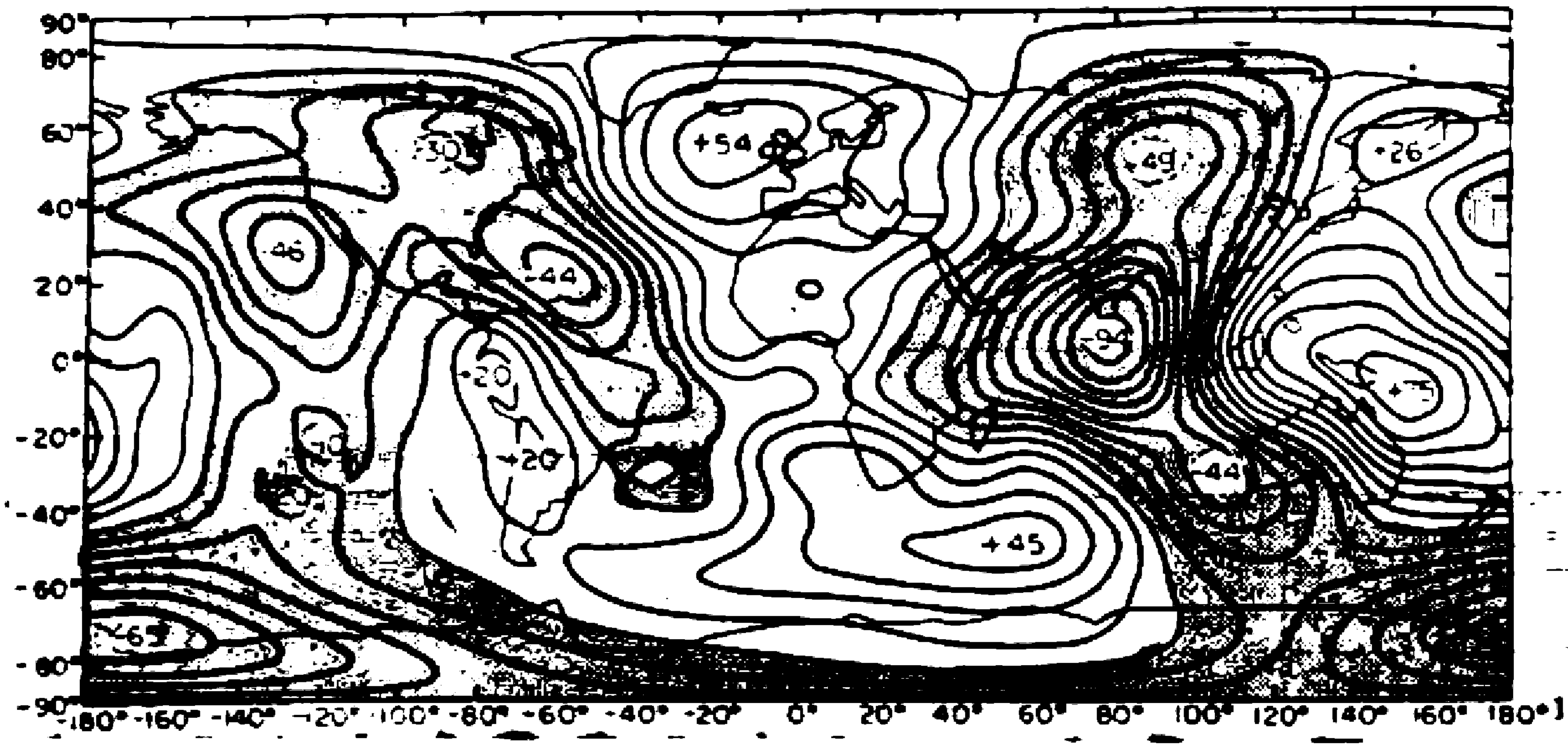

মণ্ডল থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণ। পৃথিবীতে সূর্যের উত্তাপ যতখানি, শুক্রে ছিল তার চেয়ে বেশি। তার ফলে শুক্র থেকে হাইড্রোজেন উবে গিয়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে গিয়েছিল। অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ ঘটেছিল শুক্রের কঠিন আস্তরণের। শুক্রের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা এসে ঠেকেছিল প্রায় শূন্যে। ফলে ভূস্তরকণের সৌর বিকীরণ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অবস্থা থাকে নি (পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন থাকার দরুন যা আছে)। এই একই কারণে অতিবেগুনী বিকীরণও আরো অনেক গভীরে এসে পৌঁছুতে পারে।

ভেনাস-৭ শুক্রের উপরিতলের যে প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাপের খবর পাঠিয়েছে তার বিশ্লেষণ থেকে শুক্রের বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সম্পর্কে একটি ধারণায় পৌঁছনো যেতে পারে। উল্লেখ করার বিষয় এই যে, পৃথিবীতে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অকসাইড আবদ্ধ হয়ে আছে তার পরিমাণ শুক্রের বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অকসাইডের পরিমাণের সমান। পৃথিবীর উত্তাপ যদি শুক্রের উত্তাপের সমান হত তাহলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ শুক্রের বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে বেশি বই কম হত না।

শুক্রের এই প্রচণ্ড উত্তাপের কারণ কী? বিজ্ঞানীরা বলেন, ঘন মেঘের ঘেরা-টোপের মধ্যে গোটা শুক্র হয়ে উঠেছে একটি গ্রীণহাউস বা কাচঘরের মতো। কাচঘরে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রবেশ করে, বেরিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে কম—ফলে উত্তাপ ক্রমেই বাড়ে। শুক্রগ্রহেও এই একই অবস্থা। তাই এই প্রচণ্ড উত্তাপ। তবে এটাই যে নিশ্চিত ব্যাখ্যা তা নাও হতে পারে।

শুক্র সম্পর্কে কিছু কিছু খবর জানা গিয়েছে মাত্র, এখনো অনেক কিছু জানতে বাকি। শুক্রের অনেক কিছুই এখনো পর্যন্ত রহস্যের গভীরে। ঘন মেঘের যে আবরণটির কথা এতক্ষণ বলা হয়েছে তার গড়ন ও গঠন কেমন? শুক্রের অক্ষ-আবর্তন কেন বিপরীত দিকে? মেরিনার-২ যদিও শুক্রের চৌম্বকত্বের সাড়া পায়নি কিন্তু ভেনাস পর্বের অনুসন্ধান থেকে জানা গিয়েছে শুক্র চুম্বকত্বহীন নয়। কিন্তু মহাজাগতিক পরিবেশে শুক্রের চৌম্বক ক্রিয়া পৃথিবীর চৌম্বক ক্রিয়ার মতো নয়। এ-ঘটনার ব্যাখ্যা কী? শুক্রের আরো অনেক ব্যাপারই এখনো পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা যায়নি। তিন তিনটি ভেনাস শুক্রের মেঘাবরণ বিদীর্ণ করে বায়ুমণ্ডলে অবতরণ করেছে, অনেক খবর জানিয়েছে, কিন্তু যতো খবর জানার আছে তার তুলনায় তা যৎসামান্যই।

তবে যতোটুকু খবর জানা গিয়েছে তার ভিত্তিতে বলা চলে শুক্রের উপরিতলটি মোটেই মনোরম নয়। প্রচণ্ড চাপ, প্রচণ্ড উত্তাপ, প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ, আর তারই মধ্যে নিষ্প্রাণ এক মরুভূমি। অন্তত পৃথিবীতে যে ধরনের প্রাণের সঙ্গে আমরা পরিচিত, শুক্রের উপরিতলের পরিবেশে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে, বিজ্ঞানীদের ধারণা, শুক্রের মেঘাবরণের পরিবেশে সরল ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে, কারণ এই পরিবেশটি পৃথিবীর পরিবেশের প্রায় অনুরূপ।

পৃথিবীর আকার

গত সংখ্যার বিজ্ঞানের কথায় পৃথিবীর আকার নিয়ে আলোচনা তুলেছিলাম। লেখার শেষদিকে একটি ছবির কথা বলা হয়েছে, অথচ লেখার সঙ্গে ছবিটি ছাপানো হয়নি। এই ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত। ছবিটি এখানে দেওয়া হল। পাঠকদের অনুরোধ, গত সংখ্যার লেখার সঙ্গে ছবিটি মিলিয়ে নেবেন। লেখার সংশ্লিষ্ট অংশটিও এই সঙ্গে তুলে দিচ্ছি।

"উপগ্রহের পর্যবেক্ষণ থেকে ভূপৃষ্ঠের চেহারাটি কেমন ধরা পড়েছে, সঙ্গের ছবি দেখলে এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যাবে। ছবিটি নেওয়া হয়েছে 'অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স' পত্রিকার জুন ১৯৭০ সংখ্যা থেকে। ভিত্তির হিসেবে ভূমির রেখাটিতে দেখানো হয়েছে দ্রাঘিমাংশ, লম্ব রেখাটিতে অক্ষাংশ। ছবিতে বিশ্বের মানচিত্রের ওপরে যোগ ও বিয়োগ চিহ্নযুক্ত কতগুলো সংখ্যা রয়েছে। যোগ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে উঁচু জায়গা বা কুঁজ আর বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে খাদ। সংখ্যাগুলো মিটারে। তার মানে, ভারতের দক্ষিণে একটি খাদ রয়েছে ১৪ মিটার গভীর, আর নিউগিনির কাছে একটি কুঁজ রয়েছে ৭৫ মিটার উঁচু। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ছবিতে দেখানো হয়েছে সমুদ্র-সমতলের ভূপৃষ্ঠ। এই ভূপৃষ্ঠেই কোথাও কোথাও আছে পর্বত, কোথাও কোথাও উপত্যকা, তা ছবিতে বিবেচনায় আনা হয়নি। ছবি থেকে শুধু জানা যাবে সমুদ্র-সমতলের ভূপৃষ্ঠের চেহারাটি কেমন।

খাদের অংশগুলো ছবিতে দেখানো হয়েছে হালকা কালো রঙে। ফলে অন্য একটা ছবিও ফুটে উঠেছে। মনে হতে পারে আর্কিশের মতো নাকবিশিষ্ট একটি লোক আমেরিকাকে দখল করেছে আর প্রাচ্য জুড়ে অন্য রকমের চেহারার অন্য আরেকজন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা এই দুটি লোক একটা কিছু নিয়ে দর-কষাকষি করছে মনে হয়।"

—অমরকান্ত

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পর্ব

(৩)

বাবা অফিস যাবার পথে আমাকে গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিলেন। দুপুরে পিসীর ওখানে লাঞ্চ খাবার কথা। গাড়ী থেকে নেমে আরেকবার বলে দিলাম, পিসীর ওখানে আসতে ভুলে যেও না কিন্তু।

না, না, ভুলে যাব না।'

বাবা চলে গেলেন। গেস্ট হাউসে ঢুকতে গিয়ে হাতের ঘড়িতে দেখলাম পৌনে নটা বাজে। চৌকিদার আমাকে হাত তুলে একটা সেলাম করল। জিজ্ঞাসা করলাম, সাব হ্যায়?

জী হাঁ।'

আস্তে হাতল ঘুরিয়ে সাগরের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। ভিতরের দিকের নেটের দরজার পর্দা সরান কিন্তু যে দুটো জানলা দিয়ে রোদ্দুর আসে, তাদের পর্দা টেনে দেওয়া রয়েছে। বিছানার পাশে সাইড টেবিলের উপর টেবিল-লাইট জ্বলছে। দু'এক পা এগিয়ে যেতেই দেখলাম একটা মোটা বই মাটিতে পড়ে। তুলে দেখলাম জেরাডুনের সেন্সাস রিপোর্ট। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটার। বুঝলাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটার পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কখন যে বইটা পড়ে গিয়েছে তা টের পায়নি। তাছাড়া এত অঘোরে সারারাত ঘুমিয়েছে, এখনও ঘুমুচ্ছে যে টেবিল-লাইটের আলোতে কিছু ব্যাঘাত করতে পারেনি, পারছে না।

সাগর ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। বেশ বুঝলাম কাল বড় পরিশ্রম করেছে, বড় ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। এখন না ডাকলে হয়ত আরো অনেকক্ষণ ঘুমুবে। কত রাতে ঘুমিয়েছে, তাই বা কে জানে?

টেবিল-লাইটের আলোটা অফ্ করে দিলাম। সকালে বেয়ারাটাও নিশ্চয়ই আসেনি। ও এলে আলোটা অফ্ করে দিত। সাগর বোধহয় ডাকাডাকি করতে মানা করেছে। বোধহয় কেন? নিশ্চয়ই মানা করেছে। হঠাৎ মনে হলো আমি আসব বলে ওদের ডাকাডাকি করতে বারণ করেনি তো?

হয়ত।

কথাটা মনে হতেই হাসি পেল। আরেকবার ওর দিকে, ওর মুখের দিকে তাকালাম। কত অসহায়! কত নিঃসঙ্গতার জ্বালা বুকে নিয়ে ঘুমুচ্ছে তা অনুভব করার ক্ষমতাও আমার নেই। কোনদিন সে ক্ষমতা আমার হবে না, হতে পারে না। আমি তো ওর মত নিঃসঙ্গতার জ্বালা কোনদিন সহ্য করিনি।

জানলার পর্দা সরাতে যাব বলেও দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো ও হয়ত ছোট্ট একটা স্বপ্ন বুকে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে আমি আসব, ওকে ডাকব, চায়ের কাপ এগিয়ে দেব। এই স্বপ্ন দেখবে বলেই কি বেয়ারাকে ডাকাডাকি করতে বারণ করেছে?

খুব সম্ভব তাই।

আমি আর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম না। জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দিলাম। সারা ঘরটা আলোয় ভরে গেল।

আমি ঘুরতেই দেখলাম ও খুব জোরে আলসেমি ভেঙে ওপাশ থেকে এপাশ ফিরে শুয়েছে। এবার আলোয় ওর মুখ দেখে বিশেষ ক্লান্তির চিহ্ন পেলাম না। ভাল লাগল। একবার ইচ্ছা করল ওর মুখে, কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডাকি। আবার ভাবলাম না, দরকার নেই। তার চাইতে আগে চায়ের ব্যবস্থা করি।

লবীতে গিয়ে চৌকিদারকে বললাম চা পাঠিয়ে দেবার কথা বলতে।

এবার সাগরের ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসলাম। একটু কায়দা করে ঘুরিয়ে বসলাম। সাগরের মুখ প্রায় সোজাসুজি দেখতে পাচ্ছি; আবার দরজা খুলে বেয়ারা এলেও দেখতে পাব। ও কিছু বুঝতে পারবে না, কিছু মনে করার সুযোগ পাবে না।

একটু পরেই বেয়ারা এসে চায়ের ট্রে রেখে গেল। যাবার সময় দরজাটা টেনে দিল। বড় বড় অফিসারদের সেবা-যত্ন করে বলে আদব-কায়দা জানা আছে।

আমি এবার চেয়ারটা ছেড়ে সাগরের কাছে গিয়ে ডাকলাম, উঠবেন না?

কোন সাড়াশব্দ পেলাম না।

আবার ডাকলাম, চা এসে গেছে, উঠে পড়ুন।

একটা জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। ঘুমটা পাতলা হয়ে এসেছে কিন্তু তবু চোখ মেলে তাকাল না।

উঠুন! অনেক বেলা হয়ে গেল। একটু জোরেই বললাম। না, তাতেও কিছু হলো না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আবার একটু ভাবলাম। বেশী জোরে ডাকাডাকি করলে ঘরের বাইরে শুনতে পাবে। গেস্ট হাউসের অন্য গেস্টরা শুনতে পাবেন। হয়ত বেয়ারা-সার্ভেন্টও শুনতে পাবে।

চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

কি করব? ডান হাতটা ওর কপালে দিয়ে একটু নাড়া দিলাম, উঠুন। বেলা হয়ে গেছে।

আমি হাতটা টেনে নেবার আগেই ও আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে একবার এক মুহূর্তের জন্য চোখ মেলে তাকাল। আবার চোখ বন্ধ করল। আমি ও'র কপালে হাত দিয়ে একটু জোরে মাথাটায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। উঠবেন না?

আমি ওর কপালে হাত দেবার জন্য বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েছিলাম। ও চোখ মেলে তাকাতেই একটু লজ্জা পেলাম কিন্তু হাতটা সরিয়ে নিতে পারলাম না। সোজা হয়েও দাঁড়ালাম না।

ও ঘুমের ঘোরেই বলল, কে?

'আমি। বুলা।'

ও এবার ভাল করে আমার দিকে তাকিয়েই হাসল, আপনি?

'হাঁ।'

হাতটা সরাতে গেলাম কিন্তু ও হাত দিয়ে চেপে ধরল। ওর কপালে আমার হাত আর আমার হাতের উপর ওর হাত। 'কতক্ষণ এসেছেন?'

'অনেকক্ষণ।'

কয়েকটা মুহূর্ত দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে রইলাম বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। কারুর মুখ দিয়েই কোন কথা বেরুল না।

একটু পরে আমি বললাম, চা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ও একটু মুচকি হাসল।

'হাসছেন কেন?'
'এর চাইতে চায়ের দাম বেশী?'

আমি আরো লজ্জা পেলাম। বাঁ হাত দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা টেনে ব্লাউজের সামনের দিকটা ঢাকবার চেষ্টা করলাম। আর না, সাগর হাতটা ছেড়ে দিল। আমি হাতটা উঠিয়ে একটু সরে দাঁড়ালাম।

কী করব?'

ও মুখে কিছু বলল না। ঘাড় নেড়ে চা করতে ইঙ্গিত করল।

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল বুঝি অনেক রাতে শুয়েছেন?

সাগর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ। বেশ রাত হয়েছিল। একটু পরে আবার বলল, ভালই হয়েছিল।

'কেন?'

রাত করে শুয়েছিলাম বলেই তো এমন সৌভাগ্য...

মাথা নীচু করে একটু ভাবলাম। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বললাম, ঘুমিয়ে থাকলে ডাকব না?

'নিশ্চয়ই ডাকবেন কিন্তু কেউ তো ডাকে না। যদি দয়া একেবারেই না ডাকে তাহলেও কেউ আমাকে ডাকবে না।'

কথা সত্যি হলেও শুনতে খারাপ লাগল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম, এই-সব আজেবাজে কথা বললে এক্ষুনি চলে যাব।

আমি সাগরের প্রেমে পড়িনি। পড়ব না। পড়তে পারি না। নানা কারণে। দাদা শুধু নিজের পছন্দমত বিয়ে করেনি, বাবার অপছন্দ, প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই বিয়ে করেছে। কি করে যে কি হলো ভাবতে পারি না। দাদার মত শান্ত ছেলে যে কিভাবে এমন কাজ করতে পারল, তা ভাবলেও অবাক লাগে।

প্রেম করে বিয়ে করা অন্যায় নয়। দাদা প্রেম করেছে বলে আমাদের দুঃখ নয়। দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে চিরকাল পিতৃমাতৃভক্ত থেকে, ভাইবোনের একান্ত অনুগত থাকার পর, আমাদের পরিবারের সবকিছু জেনে-শুনেও কিভাবে সবাইকে অগ্রাহ্য করতে পারল? আরো কত কি করল? এই বিয়ে হবার পর কেমন যেন সবকিছু পাল্টে গেল। আমাকে বা ছোড়দাকে বৌদির পছন্দ না হতে পারে কিন্তু মণিদা কি অপরাধ করেছিল?

দাদার বিয়ের মাস দুয়েকের মধ্যেই আমি মণিদার সঙ্গে দেরাদুন এলাম। না এসে কোন উপায় ছিল না। দাদার ওখানে অবস্থা খুব সুবিধাজনক ছিল না, সেকথা বাবা-মা জানতেন কিন্তু ভাবতে পারেননি আমরা দু'জনে এমন করে চলে আসব। মণিদা শুধু আমাকে পৌঁছে দিতেই এসেছিল না, এসেছিল বাবা-মা'র কাছ থেকে বিদায় নিতে।

ওর কথা শুনে বাবা চমকে উঠলেন, সেকি মণি? তুমি চলে যাবে, তাই কি হয়?

মণিদা বলল, না কাকাবাবু, এবার আমি দেশে ফিরে যাব।

'দেশে গিয়ে কি করবে? ওখানে তোমার কে আছে?'

মণিদা কি বলবে? একটু শুকনো হাসি হাসল। বলল, কোনদিন তো দেশে থাকা হলো না, শেষ বয়সটা ওখানেই কাটাই।

মণিদা চলে গেল। তবে যাবার সময় বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে আমার বিয়েতে আসবে।

পরের মাসে বাবার মণি অর্ডার ফেরত পাঠাল মণিদা। বাবা সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে জানালেন, মণি, তুমি তো জান এই সংসারের সবচাইতে আপনজনের কাছ থেকে সবচাইতে বড় আঘাত পেয়েছি। তুমি আমাকে দুঃখ দেবে, ভাবতে পারি না। টাকা আবার পাঠাচ্ছি। ফেরৎ দিও না। যতদিন আমি আছি ততদিন তোমার ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার।

মণিদা সে চিঠির জবাব দেয়নি, তবে মণি-অর্ডার ফেরৎ আসেনি। এখনও পর্যন্ত আসেনি।

পাকা সোনা দিয়ে গহনা গড়া যায় না। একটু খাদ মেশাতে হয়। না মেশালে মজবুত হয় না। ব্যবহার করা যায় না। মানুষের মধ্যেও একটু খাদ থাকা দরকার। যেসব ছেলেমেয়েরা কৈশোর-যৌবনে পাকা সোনার মত একেবারে নির্ভেজাল থাকে, যাদের গর্বে বাবা-মার বুক ফুলে উঠে, সাধারণতঃ তারাই সংসার ভাঙে, অশান্তি সৃষ্টি করে।

যাকার হোক প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু পশুপ্রবৃত্তি থাকে। মাঝে মাঝে সে প্রবৃত্তির প্রকাশ হওয়ার দরকার। যারা প্রথমের দিকে প্রকাশ করে না, চেপে রাখে, পরবর্তী জীবনে তারাই আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ে। আমি কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই মোরাভিয়ার বইগুলো শেষ করে ফেললাম, লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার, কার্পেটব্যাগার্সের কিছু কিছু লাইন লাল পেন্সিল দিয়ে আণ্ডার-লাইন করে বন্ধুদের পড়তে দিতাম, দাদা তখন বন্ধুদের বন্দু নিয়েই হিমসিম খেতো। আমি, রেখা, অসিমা ও আরো কয়েকজন মেয়ে যখন মাসে অন্ততঃ একটা অশ্লীল ইংরেজি সিনেমা দেখছি, তখন মণিদাকে নিয়ে দাদা স্বামী রামমণি বা সাত পাকে বাঁধা দেখত।

মনে হচ্ছে ছোড়দাও লণ্ডনে গিয়ে নিজের একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। পাকা-পাকি খবর এখনও আসেনি, হয়ত এখনও মার্বেল আর্চের ধারে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ক্যামডেন টাউনের ফ্ল্যাটে যায়, তবে যতটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে ছোড়দাকে নিয়ে আর ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন নেই।

বাবা-মা এসব নিয়ে একেবারেই আলোচনা করেন না। কেউ এসব জানে না। পিসীও না। বৌদির বাচ্চা হবার পর বাবা-মা আর আমি গিয়েছিলাম। আমি আর বাবা দু'দিন থেকেই চলে এলাম।

আমি প্রেম করে বিয়ে করব, তা হতেই পারে না। প্রেম তো দূরের কথা, কোন জানাশুনা ছেলেকেও আমি বিয়ে করব না। কিছুতেই না। দু' একজন জানাশুনা ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা উঠেছিল, আমি বাতিল করে দিয়েছি। জিওলজিক্যাল সার্ভের বিকাশদার সঙ্গে বিয়ে দিতে মা বেশ খানিকদূর এগিয়েছিলেন কিন্তু আমি অনেক কষ্টে মাকে ফিরিয়েছিলাম।

তাইতো সাগরের প্রেমে পড়ে ওকে বিয়ে করব, এ স্বপ্ন আমি দেখি না। তবু ওকে আমার ভাল লাগে। ভাল লাগে ওর ব্যবহার, ওর চেহারা। যে যাই বলুক না কেন, দেখতে-শুনতে একটু ভাল না হলে ভাব করতেও ইচ্ছা করে না। অন্ততঃ আমার করে না। কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে এই নিয়ে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কম তর্ক হতো?

একদিন হঠাৎ আমাদের আড্ডাখানায় এসে লিলি বলল, জয়া কর্ট।

রেখা সঙ্গে সঙ্গে বলল, কার সঙ্গে রে?

আমরা উদগ্রীব হয়ে লিলির কাছে শুনলাম রোজ কলেজ ছুটির পর পার্ক-সার্কাস ট্রাম ডিপোর পাশের পান-সিগারেটের দোকানে একজন কালো রংয়ের লম্বা চওড়া ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকেন। জয়াকে নিয়ে উনি প্রায়ই ট্যাক্সি করে গড়িয়াহাটের দিকে যান।

সঙ্গে সঙ্গে রেখা আমাদের তিন-চার-জনকে অর্ডার করল, ওয়াচ্ জয়া। তারপর ক্যাবিনেটে রিপোর্ট। তারপর আলোচনা। সব শেষে সিদ্ধান্ত।

কয়েকদিন নজর রাখতেই দেখা গেল লিলি ঠিকই বলেছে। ক্যাবিনেটে রিপোর্ট করার সময় সব পয়েন্ট মিলে গেল, অমিল হলো শুধু ভদ্রলোকের বয়স নিয়ে। আমি বললাম সাতাশ-আটাশ, কৃষ্ণা বলল, তিন-বত্রিশ হবে, এবা বলল, বয়স চল্লিশ-পঁচিশের বেশী হবে না তবে স্বাস্থ্য বেশ ভাল।

বয়স আর চেহারা নিয়ে শুরু হলো তর্ক। বিতর্ক। এক একজনের এক এক-রকম ছেলে পছন্দ। চীফ জাস্টিসের মত রেখা বলল, অলওয়েজ একটু ম্যাচিওর্ড লোককে বিয়ে করা ভাল।

দু'তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম, তার মানে?

'একটু বেশী বয়সের একটু অভিজ্ঞ লোককে বিয়ে করলেই বেশী সুখী হওয়া যায়।'

রেখার কথা শুনে আমরা তো অবাক, বলিস কিরে?

'যা বলছি তাই শোন। ছোকরারা একটু নষ্টামি-দুষ্টামি করতে পারে ঠিকই তবে মেয়েদের ঠিক হ্যাণ্ডেল করতে পারে না কিন্তু ম্যাচিওর্ড লোকের পর যেমন ডিপেণ্ড করা যায় তেমন আদর-ভালবাসা পাওয়া যায়।'

ওর কথায় আমরা হেসে উঠলাম।

ইউনিভার্সিটিতে গিয়েও এইরকম কতি শুনেছে হেসেছি কিন্তু মনে মনে রেখা

CENTRAL LIBRARY

আর চন্দনা বলত, মার্ক করে দেখবি ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করে মেয়েরা বেঁচে যায়, বেঁচে যেতে পারে, ভুলে যেতে পারে বাট প্রফেসরদের প্রেমে পড়লে উদ্ধার পায় না কেউ। উদ্ধার পেতে চায় না কেউ।

যে যাই বলুক আমি একটু স্মার্ট, দেখতে-শুনতে ভাল ছেলেদেরই পছন্দ করি। তিনবছরে বড় ইয়ং ও ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট ছেলে বাবার আন্ডারে চাকরি করত। ওদের অনেকেই আমাদের বাড়ীতে আসতেন কিন্তু বিকাশদাকে ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা পর্যন্ত বলতাম না। উনি জিওলজিক্যাল সার্ভেতে চাকরি নিয়ে কলকাতায় আসার পরও আমার সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাইতো বোধহয় মা সন্দেহ করেছিলেন আমি বিকাশদার প্রেমে পড়েছি!

সে যাই হোক সাগরকে আমার বেশ লাগে। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ওর উচ্ছ্বাস নেই কিন্তু হৃদয়-প্রাচুর্য আছে। জীবনে অনেক আঘাত পেয়েও মুখের হাসি, চোখের বিদ্যুৎ হারায়নি। এমন একটা সুন্দর জীবন নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে হাহাকার করছে, আমি ভাবতে পারি না। আমার দেবার ক্ষমতা সীমিত কিন্তু তবুও যেটুকু ও চাইবে, দাবী করবে, তা আমি দেব। দিয়ে আনন্দ পাব। তৃপ্তি পাব। ওর শূন্যতা আংশিকভাবে ভরাট করতে পারলেও সার্থকতা আছে বৈকি।

সাগর কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে থাকল। তারপর বলল, অনেক কথাই আপনাকে বলি না, বলতে পারি না। তবে আজ আর না বলে পারছি না যে বহুদিন পর আজ আপনার কল্যাণে মনটা খুশীতে ভরে গেছে।

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

আবার একটু থামল।

'আপনাকে দেখলে অনেক পুরোনো দিনের কথা মনে হয়। আপনার সঙ্গে কথা বলে পুরোনো দিনের হারিয়ে-যাওয়া আনন্দ আবার যেন ফিরে পাই।'

আমি সেকথা জানি। জানি আমার মধ্যে ও মানসীকে দেখতে চায়, দেখতে পায়। ওর ডায়েরী পড়ে মানসীর কথা, মানসীর সঙ্গে আমার মিলের কথা ভেবে প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ করতাম। ভাবতাম, সাগরের কাছে কি আমার কোন অস্তিত্ব নেই? আমি কি মানসীর প্রতিবিম্ব মাত্র? অনেকদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। ভেবেছি রাত জেগে জেগে। হাতে কাজকর্ম না থাকলে দিনের বেলায়ও ভেবেছি। বহুদিন, বহুক্ষণ, বহুবার। যে মানসী নেই, তার জন্য ঈর্ষা কেন? হিংসা কেন? আমাকে দেখে, আমাকে কাছে পেয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলে একটা আহত মন যদি শান্তি পায়, তাতে আপত্তি কি? অন্যায় কি?

'আমার সঙ্গে কথা বলে আপনি যদি আনন্দ পান, তাতে আমার তো দুঃখ পাবার কোন কারণ নেই।'

সাগর এবার সিগারেট ধরাল। 'কিন্তু আপনাকে কত বিরক্ত করতে পারি?'

'আমি বিরক্ত হবো, জানলেন কেমন করে?'

'বিরক্ত হবেন না?'

'মনে হয় না।'

'ভেরী গুড!' সাগর হেসে ফেলল, তাহলে আর এক কাপ চা খাওয়া যাক, কি বলুন?

আমি হাসলাম। ওর তৃপ্তিমাখা হাসি-ভরা মুখখানা দেখে আমিও খুশী হলাম।

আমি উঠে গিয়ে বেয়ারাকে চা দিতে বললাম। চা এলো। ওকে এক কাপ চা দিয়ে আমিও এক কাপ নিলাম।

চায়ে চুমুক দিয়ে সাগর জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিভাবে এলেন?

'বাবা নামিয়ে দিয়ে গেলেন।'

'ছি ছি। উনিও দেখে গেলেন আমি ছন্নছাড়া?'

'না। বাবা আর ভিতরে আসেননি।'

'যাবেন কিভাবে?'

'আপনার এখান থেকে তো পিসীর ওখানে যাব...

'ও হ্যাঁ তাইতো। আজ দুপুরে তো ওখানেই খাওয়া।'

ওর কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম আপনিই তো পিসীকে বলেছেন আমি এখানে ইন্টারভিউ দিতে আসব বলে রান্না-টান্না করতে পারব না...

'আপনি জানলেন কি করে?'

'কেন? পিসীই বলল।'

'উনি কি আপনাকে সব কথাই বলেন?'

'যা দরকার তাই বলেন।'

'আপনিও কি ওকে সব কথা বলেন?'

'যা বলা যায় তাই বলি।'

'কি কি বলা যায় না?'

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আপনি যে আমার স্কেচ আঁকেন...

আর এগুতে পারলাম না। এতক্ষণে মনেই হুঁশ হলো। কিন্তু কি করব? যা বলে ফেলেছি তা তো আর ফেরৎ নেওয়া যায় না?

সাগর সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ালো। 'আপনি দেখেছেন?'

মনে হলো কথাটা বলে ভালই করেছি। কত আর মনের মধ্যে চেপে রাখা যায়?

হাসি চাপতে চাপতে বললাম, অমন করে টেবিলের উপর পড়ে থাকলে দেখব না?

আমার কথায় ও নার্ভাস হয়ে গেল। 'আর কি দেখেছেন?'

'আরো অনেককিছু দেখার আছে নাকি?'

'বলুন না, আর কি দেখেছেন?'

'আমার বিশ্বাস আপনি কিছুই লুকিয়ে রাখবেন না। তাই তো নিজে থেকে আর কিছু দেখিনি।'

'দেখেননি?'

'না।'

আমি একটু থেমে বললাম, এখনই দেখাবেন?

সাগর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, কি আর দেখবেন? আমার এই ব্যর্থ জীবনের কিছু কিছু সুখ-দুঃখের কথা মাঝে মাঝে লিখে রেখেছি; যদি পড়তে চান দেব।

মুখ নীচু করে আস্তে আস্তে কথাগুলো বলতে বলতে আমার দিকে চাইল। জোর করে একটু হাসতে চেষ্টা করল। 'পড়বেন?'

'আপনার মনে যদি কোন দ্বিধা থাকে তাহলে পড়ব না।'

মাথা নাড়তে নাড়তে ও বলল, আপনাকে পড়াতে কিছু দ্বিধা নেই তবে ভাবছি...

'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি হয়ত কিছু মনে করতে পারেন।'

'আমি কিছু মনে করব না।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

সাগর হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও এগিয়ে দিলাম আমার হাত।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

১২ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী মার্কেট স্কোয়ারে চিত্র ও ভাস্কর্যের মেলা অনুষ্ঠিত হল। এই মেলা এবারে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করলো। অন্যান্যবারের মত এবারেও প্রচুর শিল্পী সমাগম হয়। ছবি ও মূর্তি এবং কিছু হাতের কাজ প্রদর্শিত হয় এবং খুবই অল্প দামে বিক্রি হয়। মাঠের মাঝখানে অনেক শিল্পীই মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে মেলার বহু অভ্যাগতদের পোর্ট্রেট প্রতিকৃতি এঁকে দেন। এবারে ছাত্রছাত্রীদের কাজের সংখ্যাই বেশী ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠরা নিজেদের কাজ কম দিয়ে ছোটদের জন্যে জায়গা করে দিয়েছিলেন। তবে ছোটদের কাজের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছিল ২২ পল্লীর 'সিট অ্যান্ড ড্র' প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের বেশ কিছু সংখ্যক ছবি। বছরে একবার শিল্পীদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ হওয়ার ফলে মেলাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১০ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ওয়াই. সি. মোহান্তি তিনখানা ছবির প্রদর্শনী করেন। শ্রীমোহান্তি বাস্তুবিদ্যাবিশারদ। চিত্রকলায় তাঁর হাতেখড়ি। কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নি। তাই ছবিতে শিশু শিল্পের প্রভাবটাই বেশী। ডিজাইন ও ড্রয়িং এবং রং অনুজ্জ্বল। হলুদ, নীল ও গোলাপী রংয়ের ছড়াছড়ি। কিন্তু কম্পোজিশনের দিকেই তাঁর ঝোঁক; তবে ড্রয়িংয়ের হাত আরেকটু পাকা হলেই মানাতো ভাল। জলরংয়ে আঁকা একটি ঘোড়া মন্দ হয়নি।

১৭ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অ্যাকাডেমির দুখানি ঘরে শিল্পী হাঁরলালের দুটি প্রদর্শনী হল। একটি আমেরিকান মহিলা শ্রীমতী ডরিস ফ্লিনের 'কস্টিউমস অব ইন্ডিয়া' বইখানির দুশো ইলাস্ট্রেশান নিয়ে প্রায় ৭০ খানি ছবির এবং অন্যটি শিল্পীর স্কেচ ও পেন্টিংয়ের ২২ খানি ছবির প্রদর্শনী। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীর বিচিত্র পোশাক সহজেই দর্শকদের কৌতূহল যোগায়। পেন অ্যান্ড ইঙ্কে আঁকা এই ছবিগুলির মধ্যে কাশ্মীর, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা, বিহার, আসাম ও দক্ষিণ ভারতের নানা জাতির মানুষের পোশাকগুলি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে সব ছবিতে মানুষের টাইপের বৈচিত্র্য খুব একটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েনি। রঙীন ছবিগুলি একটু রংকরা ফটোগ্রাফের মত দেখায়। অন্য প্রদর্শনীতে তেলরঙের কাজগুলিতে একটু স্টাডি করার ভাব আছে। বিশেষ করে বেশ্যালি সাধুসন্ন্যাসীর ছবি। জল রঙের কয়েকটি ছবিতে বাংলাদেশের গ্রামের দৃশ্য মন্দ নয়। দুধওয়ালা, ভিখারিণী মেয়ে শাহেদের

শিল্পী : সত্যেন ঘোষাল

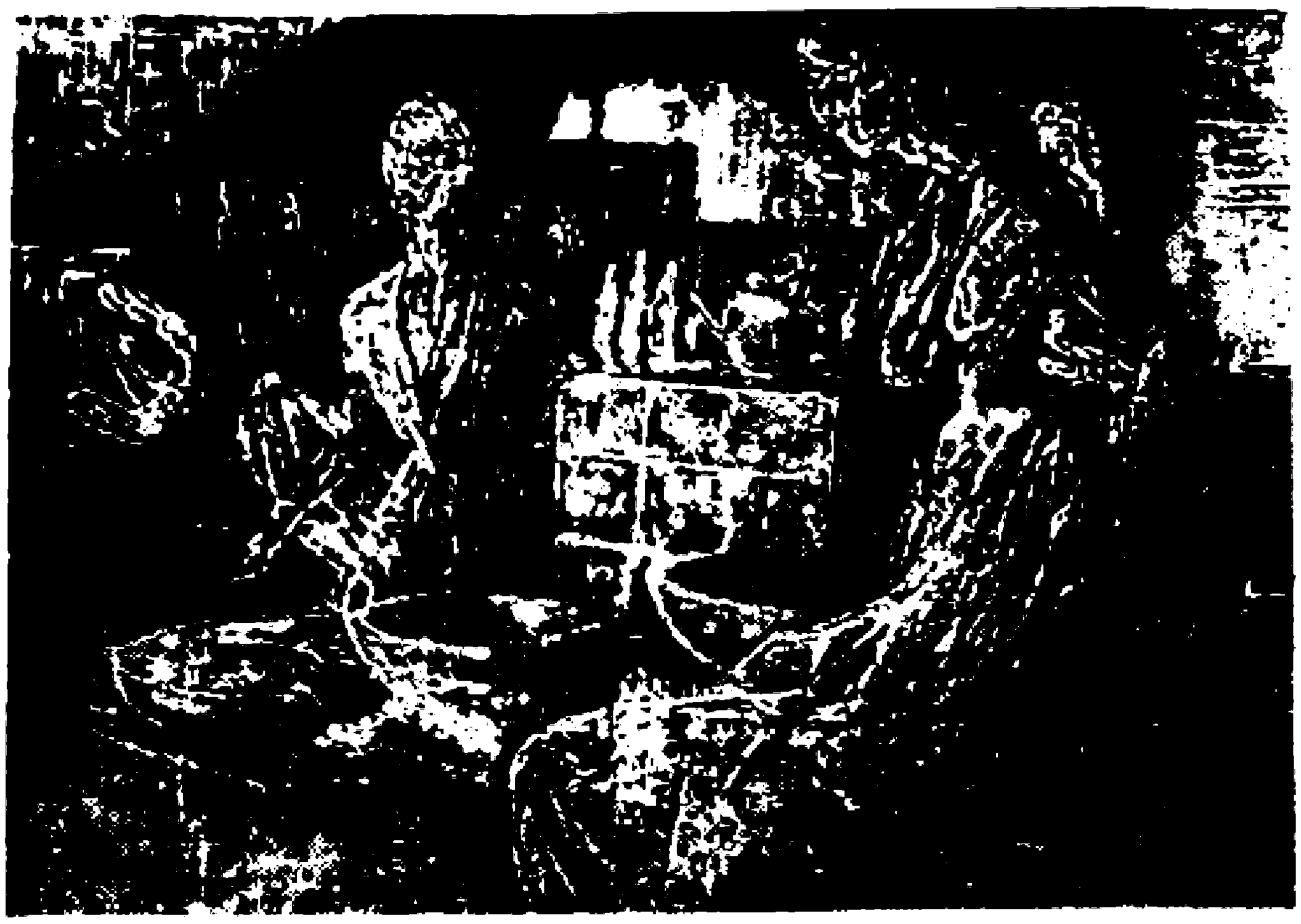

সমাধি ইত্যাদি কয়েকটি কালি কলমের স্কেচ পরিচ্ছন্ন কাজ।

*

পরিতোষ দাস ১০ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জলরং ও তেল রঙের ২২ খানি ছবির প্রদর্শনী করেন। তাঁর কাজে স্টাইলের বৈচিত্র্যই বেশী। জল রঙের ছবিগুলিতে দার্জিলিং, বরাকর ইত্যাদি অঞ্চলের দৃশ্য। স্কেচি ভাবটাই বেশী। তেলরঙের একটি প্রতিকৃতি ও একটি নুড স্টাডি উল্লেখযোগ্য। আধুনিক রীতিতে সমস্যার প্রতিফলনের উদ্দেশ্য, রেখাপ্রধান ও সরলীকৃত ফর্ম নিয়ে যে ছবিগুলি তিনি করেছেন সেগুলির সংগঠন ও বর্ণিকাভঙ্গ এখনো রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা যায় না।

১১ বছরের ছেলে সুচির ঘোশীর পরিণত কাজ সকলকেই বিস্মিত করেছে। এর জল রং তেল রং ও ক্রেয়নে আঁকা ছবিগুলি এত পরিণত যে, শিশুশিল্পের শ্রেণীতে এদের ফেলা যায় না। প্রধানতঃ পার্বত্য দৃশ্য নিয়েই সে ছবি এঁকেছে। পাহাড়, উপত্যকা, পাহাড়ের কোলে নদী বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে সুন্দর পারস্পেকটিভে আঁকা। 'দিস ম্যান অ্যান্ড হিজ মিস্টিক' ছবির ঝরঝরে হাল্কা চালের ড্রয়িং অনেকখানি দক্ষতার পরিচায়ক। এরোপ্লেন থেকে দেখা ডাঙা ও সমুদ্রের মিলন বা চন্দ্রাশিলার ছবি অ্যাবস্ট্রাক্ট মনে হলেও ঠিক তা নয়। 'ইট ইজ এ গ্রীণ গ্রীণ ওয়ার্লড'এর সবুজ ও কালোর ব্যবহার ভারি চমৎকার। প্রদর্শনী ১৮ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি খোলা ছিল।

*

বাংলা দেশের বিবাহের অনুষ্ঠানে যে বিচিত্র সৌন্দর্যবোধ রয়েছে তা অভারতীয়দের কাছেও সমাদর লাভ করেছে। দেশের লোকের কাছে সেগুলি আবার তুলে ধরবার জন্য 'কুসুমিকা' নামে পুষ্পসজ্জা শিক্ষণ সংস্থা ১১ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি একটি প্রদর্শনী করেন। উদ্বোধনের দিন সুসজ্জিত একজোড়া বরবধূ প্রদর্শনীগৃহ অলংকৃত করেন। প্রদর্শনীতে ফুলশয্যার খাট, খামসামগ্রী ও তত্ত্ব ইত্যাদির মিনিয়েচার মডেল ছিল। তাছাড়া অনেকগুলি সুন্দরভাবে অলংকৃত পিঁড়ি, কুলো, মঙ্গলা ঘট, বাক্স ঘট ইত্যাদি সর্বসাধারণের প্রশংসা অর্জন করে। রক্ত ও শ্বেত পুষ্পসজ্জার মাধ্যমে মালাবদলির একটি মডেল বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। তবে প্রধান আকর্ষণ হয়েছিল, জনৈকা প্রাচীনার তৈরী ধান ও চালের দুটি মালা। শ্রমসাধ্য কাজ এবং অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন কাজ।

*

শিল্পী সত্যেন ঘোষাল ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ অ্যাকাডেমির দক্ষিণের গ্যালারিতে ১৮ খানি নতুন ছবির প্রদর্শনী করলেন। তাঁর এবারকার ছবিগুলিতে ফিগারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল। একমাত্র 'সিটি অ্যাট নাইট' ছবিটিই অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ। এতে কালোর ব্যবহার সুন্দরভাবে করা হয়েছে। অন্যান্য ছবিগুলিতে প্রায় ক্ষেত্রেই আধুনিক জীবনের কোন না কোন সমস্যাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ছবির নানা স্থানে অল্প একটু রিলিফ তুলে একটা প্যাটার্ণ তৈরী করা হয়েছে। তবে এই রীতি প্রয়োগে দু একটি ক্ষেত্রে একটু আতিশয্য আছে। কম্পোজিশন তাঁর মোটামুটি কিছুটা আগের মতই আছে। রং অনেক চাপা এবং খুব কাছাকাছি টোনের কাজ। 'হোম লেস' ছবিতে পথে পড়ে থাকা মানুষগুলি প্রায় হেনরী মূরের লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডের ছবির মত ভাস্কর্য গুণযুক্ত। শহরের ফেরিওয়ালা বা 'সুপার মার্কেট'এর মত ছবিতে দৈনন্দিন জীবনের চেনা ছবিকেই নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

পথের ধারের চায়ের দোকান ছবিটিতে মুক্তাকারে সাজানো ফিগার ও লালচে রংয়ের আভায় বেশ একটা গম্ভোট আবহাওয়া পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রাম-জীবনের ছবিটিতে লাল, নীল, হলুদ এবং কালো রংয়ের প্যাটার্নে কোথায় একটা কার্পেট বোনার ভাব থেকে গেছে। তবে তাঁর ১৮ নম্বরের নিসর্গ দৃশ্যটি অপূর্ব লাগল। পাহাড় পাথরের চাপা-সবুজ, বাদামী ও বিভিন্ন গ্রামের ধূসর বর্ণের প্রয়োগে একটি চমৎকার অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইনে তৈরী হলেও বিষয়টি চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। এমন কি এই সব রং ও প্যাটার্নে কোথায় যেন অবনীন্দ্রনাথের আঁকা পার্বত্য রমণীর একটি ছবির পটভূমিকার নিসর্গ দৃশ্যের প্রচ্ছন্ন ক্ষীণ যোগসূত্রও পাওয়া যায় যা শ্রীঘোষাল হয়ত সচেতনভাবে নাও করে থাকতে পারেন। তবে সেটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, আসল কথা হল ছবিটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

●

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ১৬ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী এ সি মাথুর এবং শঙ্কর মজুমদার দুটি একক প্রদর্শনী করলেন। শ্রীমাথুর দেরাদুনের শিল্পী, কাজ করেছেন জল রংয়ে। ছবির বিষয় দেরাদুন, হরিদ্বার ইত্যাদি অঞ্চলের নিসর্গ দৃশ্য। কয়েকটি বন্য প্রকৃতির দৃশ্যে গাছের পাতার ভেতর থেকে চুঁইয়ে পড়া আলোর ছবি বেশ সুন্দর ভাবে ফোটানো হয়েছে। পার্বত্য উপত্যকার দৃশ্যগুলিতে মুক্ত প্রকৃতির আলোবাতাসের আমেজ কখনো কখনো পাওয়া যায়। হরিদ্বারের গঙ্গার স্রোতবেগ বা কোন রাজপথের দুধারের বাঁধা তরু-শ্রেণী দেখে ঘরে বসে ভ্রমণের আস্বাদ পাওয়া যায়।

শঙ্কর মজুমদার তেলরংয়ে কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান তাঁর ছবির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তবে গানের মেজাজ যদি ছবিতে ফোটানো যেত, তাহলে লোকে গান না শুনে ছবিই দেখত। শ্রীমজুমদারের কাজকে ঠিক পাকা হাতের কাজ বলতে পারলে খুশী হতাম। ছবি-গুলি এককথায় যাকে বলে "ডিপ্রেসিং"। রং ময়লা, রেখা দুর্বল এবং বক্তব্য উপ-স্থাপন ছেলেমানুষী ধরনের। এক "দীপ নিভে গেছে মম" ছবিটির রংও কম্পো-জিশন এই ছবিগুলির মধ্যে কিছুটা চলন-সই।

●

শিল্পী এবং শিল্পরসিকদের জন্যে একটা সুখবর আছে। বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ের বই থাকলেও শিল্প বিষয়ক প্রকাশনা খুবই কম। অনেক খ্যাতনামা প্রকাশক এ কাজে হাত দিয়েছেন। দু'তিন মাসের মধ্যেই ইউরোপের চিত্রকলার ওপর একটি সুপ্রকাশিত বই বাজারে পাওয়া যাবে। বইটিতে ৮০ থেকে ১০০ খানির মত ছবি থাকবে। ছবিগুলি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে রকম ছাপা হয়ে থাকে সে তুলনায় বেশ ভালই মনে হল। বইটিতে প্রাচীন গুহামানবের ছবি থেকে মিসর, ক্রীট, গ্রীস, রেনেসাঁস ইউরোপ, বারোক, রোকোকো, রোমান্টিক, ইম্প্রেশনিস্ট, পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট, ফভ ইত্যাদি থেকে একেবারে আজকের দিন পর্যন্ত ইউরোপীয় চিত্র-কলার একটি ধারাবাহিক বিবরণ ও আলোচনা থাকছে। বইটি লিখেছেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। গত ১০।১২ বছর ধরে এ নিয়ে তিনি কাজ করে আসছেন এবং ইউরোপের বহু গ্যালারি পর্যটন করেছেন। অতএব বইখানি যে প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে রচিত তা বলাই বাহুল্য। বইটি যদি রসিকজনের সমাদর লাভ করে তবে এ ধরনের বই আরো প্রকাশিত হতে পারে এবং শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা অভাবও পূরণ হবে।

পন্ডিচেরির রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিকিমের শিল্পী প্রণব দেববর্মন উডল্যান্ড গ্যালারিতে ৩০খানি ছবি ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করলেন ১ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পন্ডিচেরির লোকশিল্প এবং সেখানকার জীবন-ধারা থেকে অনেকখানি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এমন কি স্থানীয় মাটি ও পাথর থেকে দেশী রং তৈরী করে দেশী প্রথায় ছবি তৈরীর চেষ্টাও করেছেন। পটচিত্রের প্রভাব তাঁর কয়েকটি ছবিতে বেশ পরিস্ফুট। নবদ্বাদ সম্পাদ, ওয়েসাইড কাফে, স্ট্রীট পেন্ডলার প্রমুখ ছবিতে তার নিদর্শন আছে। আশেপাশের জীবনযাত্রার নিদর্শন তাঁর বর্ণাঢ্য (কিছুটা পোস্টার ঘেঁষা) 'ফোক ডান্সার', দাড়ি যোগানো বা বদিরওয়ালার ছবিতে পাওয়া গেল। সবচেয়ে ভাল লাগল তাঁর নিরাভরণ 'ডিলেজ ম্যাডোনা'। হলদে ধূসর ও সামান্য একটু কালো রঙে অনেকখানি শান্ত গভীর ভাব ফুটেছে।

প্রণব দেববর্মন অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইন ও টেকসচারের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন বেশী। কিন্তু অনেক ছবি বাস্তব বর্জিত হয়নি। তাই মধ ছবির রেখা ও রঙের গতি-ছন্দ বা ঘুড়ি ওড়ানোর ছবির কোণাকুণি রেখার গতি বেশ একটা আমেজ সৃষ্টি করে। তাঁর সাপ, উৎসব ইত্যাদি ছবিগুলিও উল্লেখ-যোগ্য। দুটি ফিগারেটিভ ডেকরেটিভ মূর্তি গঠন ভঙ্গিমাতে ছোট পরিধির মধ্যেও বেশ বিস্তৃতির আভাস আছে।

●

১ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি লিটল ফ্লাওয়ার গোষ্ঠীর ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির একটি চমৎকার প্রদর্শনী অ্যাকাডেমির দক্ষিণের হলে হয়ে গেল। ৪ থেকে ১০ বছরের ছেলেমেয়েদের কাজ। রঙে এবং ডিজাইনে কতকগুলি ছবি বেশ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ছবির নামগুলিও বোধ হয় ছেলেমেয়েদেরই দেওয়া। প্রবাল গোস্বামীর 'বাঘ মাসে খাচ্ছে' একেবারে অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইন কিন্তু নামের সঙ্গে সঙ্গতি আছে। রেশমী দাশগুপ্তের 'কক'ও ঠিক এই ধরনের কাজ। সিদ্ধার্থ সরকারের 'কংকাল ভূত' আর 'টেন' এক সুরে রিয়ালিস্টিক জগৎ-এর ছবি। অঞ্জলি কাপাডের 'হাতির উপর দুই জোন' চমৎকার ডিজাইন। কয়েকটি ক্ষেত্রে অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইন তৈরী করে 'আধুনিক চিত্রকলা' বলে নাম দেওয়া হয়েছে। এদের রসবোধ ও রং এবং ডিজাইন বোধ সুন্দর লাগল। উদ্বোধনের দিন পুতুল নাচ দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের আনন্দ দানের আয়োজন করা হয়েছিল।

●

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাঁচজন শিল্পীর ২৫ খানি তৈলচিত্রের প্রদর্শনী হয়ে গেল। এদের মধ্যে শ্রীমতী মাধবী পারেখ লোক-শিল্পের অনুপ্রেরণায় ছবি এঁকেছেন এবং বাকি চারজন বিভিন্ন ধরনের অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইনের ওপর কাজ করেছেন।

মাধবী পারেখের 'সী গড' ছবিটি বেশ বড়, ছবির মাঝখানে গভীর নীল রং ব্যবহার করে চারপাশে হলুদ, সবুজ, কমলা ইত্যাদি রঙের ডিজাইন ও ফিগার বসিয়ে বেশ সুন্দর ফ্যান্টাসী তৈরী করা হয়। 'কিং' 'স্টোরি টেলার' ইত্যাদি ছবিগুলি শিশুদের শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণায় তৈরী, মাদার অ্যান্ড চাইল্ডে লোকশিল্পের সঙ্গে পাগল ঘেঁষা ফ্যান্টাসীর সুন্দর প্রয়োগ দেখা গেল। জোফিন মুক্তালা আতাম, মাছ, নীল-নদী ইত্যাদি কতকগুলি খাড়া আবছা ফিগারের আমেজ নিয়ে অ্যাবস্ট্রাকশন তৈরী করেছেন। মূলতঃ লাল, সবুজ, হলুদ রং প্রধান। সার্পেন্ট অ্যান্ড ইভ ছবিতে কালো রেখার ব্যবহারে একটু অন্য ধরনের রূপ তৈরী হয়েছে। মনু রাঠোর ক্যানভাসকে নানাভাবে ভাগ করে আবছা হায়রো-গ্লিফিকের মত বিভিন্ন ছোট ছোট প্রতীক-চিহ্ন ও ফিগার বসিয়ে ডিজাইন সৃষ্টি করেছেন। ফলতঃ আগরওয়াল বিভিন্ন রং ও মাপের বৃত্ত নিয়ে কাজ করেছেন। কোথাও এগুলি যন্ত্রের আভাস নিয়ে আসে, কোথাও বা মহাশূন্যের কথা মনে হয়। বিভিন্ন রং ও টোনের ব্যবহারে বৃত্তগুলি কখনো এগিয়ে আসে, কখনো বা পিছিয়ে যায়। বেশ একটা গতিময়তা আছে। মন্দু পারেখ এক বিশেষ ধরনের অর্থবোধক ছবি তৈরী করবার চেষ্টা করেছেন। এর সূত্র তাঁর ইতিপূর্বের প্রদর্শনীতেই পেয়েছিলাম। ডিজাইনগুলি সিম্বলিক এবং হঠাৎ দেখলে মনে হয় অপারেশনের সময় মানবদেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশের ছবি যেন একত্র করা হয়েছে। কোথাও বা দেহের মিলনের প্রতীক বলেও বিভ্রম ঘটায়। ২১ এবং ২৫ নম্বরের ছবি দুটোর গঠন ও উজ্জ্বল বর্ণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—চিত্ররসিক

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস-এর ৬৬০ পাতায় প্রথম কলমে নেতা রোজা লাক্সেমবুর্গ ভুল ছাপা হয়েছে নেতা হিসাবে। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রেক্ষাগৃহ

আনন্দ / রাজেশ খান্না, রমেশ দেও এবং ললিতা পাওয়ার

চিত্র-সমালোচনা

সুরের আগুন :

বার্নার্ড শ-এর 'পিগম্যালিয়ন' নাটকটির বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত গান ও ছড়ায় ভরা 'মাই ফেয়ার লেডী' যেদিন মঞ্চরূপকারে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে তুলেছিল, সেদিন থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন কাহিনীকে আশ্রয় করে এই 'সুরের আগুন' ছড়ানো অভিযান। অবশ্য এর আগেই চলচ্চিত্রের পর্দায় আমরা দেখেছি, 'সাউথ প্যাসিফিক' (টেড-এতে), ওয়েস্ট সাইড স্টোরী এবং ক্যানক্যান। লণ্ডন রঙ্গমঞ্চের পরে নিউইয়র্কের ব্রডওয়েতেও 'মাই ফেয়ার লেডী' যখন জাঁকিয়ে বসল, তখন বইটি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়ে জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করল। এরপর থেকেই বছরে বছরে নির্মিত হতে লাগল নাচ-গান ও যথাসম্ভব জাঁকজমকে ভরা ছবি 'সাউণ্ড অব মিউজিক', 'অলিভার', 'স্টার', 'ফানি গার্ল', 'সেবী পম্পিন' প্রভৃতি চোখধাঁধানো জমকালো ছবি। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত শিখরে উঠেছিল 'সাউণ্ড অব মিউজিক'। আর একখানি এই ধরনের ছবি শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে স্থানীয় লোব সিনেমায়, যার নাম হচ্ছে 'হ্যালো ডলি'। আমেরিকার নাট্যকার থর্নটন ওয়াইল্ডার লিখিত 'দি ম্যাচমেকার'-এর কাহিনী অবলম্বনে মাইকেল স্টুয়ার্ট 'হ্যালো ডলি' নামে যে নৃত্য-গীতবহুল নাটক রচনা করেন, তা যখন ডেভিড মেরিক দ্বারা নিউইয়র্ক মঞ্চে অত্যন্ত সাফল্যপূর্ণভাবে প্রযোজিত হতে দেখা যায়, তখন এটিকে চেনো প্রোডাকসন্স-এর হয়ে চলচ্চিত্রোপযোগী করে প্রযোজনা করেন আর্নেস্ট লেহম্যান। জেন কেলী পরিচালিত এবং বারবারা স্ট্রীস্যাণ্ড, মাইকেল ক্রফোর্ড ম্যাক-অ্যাণ্ড্রু এবং ওয়াল্টার ম্যাথু অভিনীত 'হ্যালো ডলি' মুক্তিলাভ করবে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী-ফক্স ফিল্ম কর্পোরেশনের পরিবেশনায়।

তরুণী বিধবা ডলি লেভি তার পরলোকগত স্বামী এফ্রেম-এর পরামর্শ ভোলে নি; তিনি বলেছেন, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে উপার্জন করবার সময়ে বুদ্ধিকে বহুমুখী করতে হবে। তাই যদিও সে আসলে ঘটকীর কাজ করে, তবু সে বিল আদায় করা, ভুরুর চুল তোলা প্রভৃতি যে-কোনও কাজ করতে রাজী। এ হেন ডলি লেভিকে ইয়ঙ্কার্স শহরের ঘোড়া ও দানাদের খাদ্যবিক্রেতা, বিত্তশালী হোরেস ভ্যাণ্ডারগেল্ডার তাঁর ভাগ্নী আর্মেনগার্ডকে শায়েস্তা করবার জন্যে নিযুক্ত করলেন। সে নাকি অ্যামব্রোস নামে এক বেকার শিল্পীকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু ডলি যখন শুনল, প্রৌঢ় হোরেস নিজে ১৪তম স্ট্রীট অ্যাসোসিয়েশন প্যারেডে যোগ দেবার জন্যে নিউইয়র্ক শহরে গিয়ে তারই দ্বারা আলাপ করিয়ে দেওয়া মেয়ে আইরিনের সঙ্গে বিবাহিত হবার জন্য কথাবার্তা কইতে চায়, তখন সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হল; কারণ মুখে স্বীকার না করলেও ডলি নিজেই প্রৌঢ় হোরেসকে স্বামীরূপে পেতে চেয়েছিল। এরপরে সে কত রকম কায়দা করে কত রকম পরিস্থিতির মাধ্যমে নিজের অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়েছিল, তাই নিয়েই এই আড়াই ঘণ্টাকালব্যাপী নৃত্যগীত প্রমোদবহুল নয়নপ্রলোভনবিমোহন সুদীর্ঘ ছবিখানি রচিত হয়েছে।

কি অসামান্য নিষ্ঠা, অভিজ্ঞতা, পরিকল্পনাশক্তি ও সংস্কৃতিবোধ থাকলে 'হ্যালো ডলি'র মতো ছবি নির্মাণ করা যায়, তা আমাদের চিন্তার অতীত। ১৪তম স্ট্রীট অ্যাসোসিয়েশন প্যারেড এবং বিরাট ভোজশালা হার্মোনিয়া গার্ডেন-এর দৃশ্য দুটি সামগ্রিকভাবে যে মোহময় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, তা অবর্ণনীয়। ১৮৯০ সালের ঘটনারূপে বর্ণিত ছবির কাহিনীটি দর্শককে স্বভাবতই একটি রোমান্টিক জগতে নিয়ে যায়; কিন্তু সেই জগৎ সৃষ্টিতে সামান্যতম ত্রুটিও নেই এবং এইটিই হচ্ছে শিল্পপ্রযোজনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো কথা। দর্শককে বিস্ময়ে হতবাক করবার ক্ষমতা রাখে 'হ্যালো ডলি' ছবিটি। এ-ব্যাপারে 'স্পেশিয়াল এফেক্টস্'-এর কাজের দান কম নয়।

এই ছবির প্রতিটি শিল্পীই তাঁর গৃহীত চরিত্রচিত্রণে শেষপর্যন্ত যত্ন করেছেন। তবে ওঁদেরই মধ্যে অত্যুজ্জ্বল হয়ে থাকবেন বারবারা স্ট্রীস্যাণ্ড (ডলি), ওয়াল্টার ম্যাথু (হোরেস) এবং মাইকেল ক্রফোর্ড ম্যাক অ্যাণ্ড্রু (আইরিন): 'হ্যালো ডলি' একটি বর্ণোজ্জ্বল বিরাট নৃত্যগীতমুখর সুসার্থক চিত্র।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

ক্যালকাটা মুভিটোনের দু নম্বর ফ্লোরে ঢুকে দেখি বিরাট অংশ জুড়ে সেট পড়েছে কুঁড়ে ঘরের। এখানে-ওখানে ঝোপঝাড়, আবার কুঁড়ে ঘরের আঙিনাটুকু মাটির প্রলেপে পরিষ্কার তকতকে। ক্যামেরাম্যান শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় লাইট মাপছেন। সেটের বাইরে ফ্লোরের আধা-অন্ধকারে অন্যান্য কুশলীরা দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পরিচালক তরুণ মজুমদার, শিল্পী অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায় (মজুমদার)। তরুণবাবুকে দেখেই বুঝতে বাকী রইল না ছবির নাম 'নিমন্ত্রণ'। তাছাড়া অনুপকুমারের দেহে সেই ভিক্টোরীয় যুগের পোশাক, অর্থাৎ মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা এবং গলাবন্ধ ফুল শার্ট কোমরের তলায় কাপড়ের মধ্যে গোঁজা। হেয়ারস্টাইল কেমন যেন পুরোনো স্টাইলে। চুল সব সামনে টেনে সিঁথি কাটা।

বেশ কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছিলাম অনুপকুমার রোগা হচ্ছেন দিন-দিন। সেদিন আরও বেশী মনে হল। ইতিপূর্বে যাঁরা অনুপকুমারের মেদবহুল ভারী চেহারা দেখেছেন তাঁদের অনেকের চোখেই হয়ত এই অনুপকুমারকে প্রথম দৃষ্টিতে চিনতে একটু অসুবিধেই হবে। জিজ্ঞেস করে জানলাম — তাঁর দেহের এই অস্বাভাবিক পরিমাণ মেদ কমাতে হয়েছে তরুণবাবুর এই 'নিমন্ত্রণ' ছবির কাজের জন্যই। পরিচালকের নির্দেশেই তিনি ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ আলু, ভাত, ডিম ইত্যাদি খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। চরিত্রের চেহারা নাকি অনুপবাবুর কিঞ্চিৎ বেশী পরিমাণ মেদের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং এই মেদনিধন [illegible]।

অতর্কিতে এরকম খাওয়া বন্ধ করায় শরীরে যে ক্ষতি হয়েছে তাতে তিনি দুর্বল

বোধ করেন কিনা প্রশ্ন করায় তিনি বললেন—'বিন্দুমাত্র মিস করি না। বরং বেশ হাল্কা লাগে। রোজ একটু ব্যায়াম করছি—তাতেই বোধ হয়।' পরিচালকের নির্দেশে চরিত্রের খাতিরে শিল্পীর এই নিষ্ঠা খুব একটা চোখে পড়ে না। সত্যজিৎবাবুর নির্দেশে 'চারুলতা' ছবি করার সময় রূপসজ্জাশিল্পী শৈলেন মুখার্জি চুল-দাড়ি কাটেন নি জানতাম এবং সৌমিত্রবাবুও অমল চরিত্রের জন্য একই কাজ করেছিলেন। যতদিন 'চারুলতা'র কাজ চলেছে অন্য কোন ছবিতে তাঁরা কাজ করেন নি। 'গুপী গাইনে' গুপীবেশী তপেনবাবুকেও শ্রীরায় নাকি বর্ধিত চর্বি কমাবার জন্য খাবার বাঁধাধরা নিয়ম করে দিয়েছিলেন। তরুণবাবুর ছবিতে অনুপকুমারের বেলাতেও তাই হল।

পরিচালক তরুণবাবুও বিভূতিভূষণের 'অরণ্যের নিমন্ত্রণ' কাহিনীটি নির্বাচনের সময় থেকেই তৎকালীন পারসপেকটিভে চরিত্রটিকে কল্পনা করেছেন। পোশাক, চেহারা, ব্যবহার দৃশ্য পরিকল্পনা সব দিক দিয়েই তৎকালীন গ্রামীণ চেহারাটাকে তিনি তুলে ধরতে সচেষ্ট। তরুণবাবু আর পাঁচজন সাধারণ পরিচালকদের সারিতে পড়েন না এই কারণেই। তাঁর ছবি করার ভঙ্গী অন্যের থেকে আলাদা। 'কাঁচের স্বর্গ' তার প্রমাণ (তখন অবশ্য তিনি ও আরও দুজনে মিলে 'যাত্রিক' নামের আড়ালে ছিলেন)। 'পলাতক' প্রমাণ করে তরুণবাবুর (অপর দুজনেরও) বিশিষ্টতা কোথায়। 'যাত্রিক' থেকে আলাদা হবার পর তরুণবাবু বেশ কয়েকটি ছবি করেছেন। 'আলোর পিপাসা' ও 'রাহগীরে'র (হিন্দী 'পলাতক') অপ্রত্যাশিত সাফল্য প্রমাণ করে ফিল্ম মিডিয়মটির ওপর তাঁর কুশলী চিন্তা ও সাধারণ দর্শকের চাহিদায় তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয়।

'নিমন্ত্রণে'র আগে তিনি করেছেন 'কুহেলী' নামে একটি রহস্যঘন ছবি। পার্বত্য লোকালয়ে একটি প্রাসাদোপম বাড়ী ঘিরে এক রোমাঞ্চঘেরা লোমহর্ষক কাহিনী নিয়ে তিনি তুলেছেন এই ছবি। এখনও ছবি মুক্তি পায় নি, শুনেছি শিগগিরই মুক্তি পাবে। এদিকে 'নিমন্ত্রণে'র কাজও শেষ প্রায়। আবার নতুন ছবি শুরু করার খবরও কানে এসেছে। যতদূর জেনেছি এবার তরুণবাবু হিন্দী ছবি করবেন। নাম 'পান্থশালা'। বোম্বেতেই সব কাজ হবে। নায়ক নাকি ধর্মেন্দ্র এবং নায়িকা সন্ধ্যা। বিস্তারিত পরে জানাব।

• •

জননী—আগামী ১ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) রজিতমল কাঙ্কারিয়া প্রযোজিত 'জননী' পূর্ণ ও অন্যত্র মুক্তিলাভ করবে। শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে সর্বজয়া সংসার কে বাঁচিয়ে রাখেন। ফিরিয়ে আনেন সংসারের সুখ আর হাসি। 'জননী'র এই সার্বজনীন আবেদন প্রতিটি দর্শকমনকে নিশ্চয় জয় করবে বলে স্থির বিশ্বাস। কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী। সুর দিয়েছেন শ্যামল মিত্র। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন সন্ধ্যা মুখার্জি, আরতি মুখার্জি ও শ্যামল মিত্র। প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন সুলোচনা চ্যাটার্জি, সুলতা চৌধুরী, দিলীপ চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, কালী ব্যানার্জি, তপেন চক্রবর্তী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী সমিত ভঞ্জ ও জয়া ভাদুড়ী। শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ছবিটির একমাত্র পরিবেশক।

জাপানে যাদু-প্রদর্শনীতে পি সি সরকার জুনিয়র

মাল্যদান : রবীন্দ্রনাথের কাহিনী 'মাল্যদান' পরিচালনা করেছেন অজয় কর। শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং শহরতলীর অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে। নন্দিনী মালিয়া, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, বিকাশ রায় (অতিথি), শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন অভিনয় করেছেন। সুরারোপ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

মঞ্চাভিনয়

দিল্লীতে খ্যাটের নাট্য সমারোহ : নয়াদিল্লীর ফাইন আর্টস থিয়েটার হলে আগামী ১৬ই থেকে ১৮ই এপ্রিল তিন-দিনব্যাপী খ্যাটের নাট্যসমারোহ হবে। বিহারের বিখ্যাত নাট্যসংস্থা বিহার আর্ট থিয়েটার যাঁরা খ্যাট্ নামে সুপরিচিত এই নাট্যসমারোহে তাঁদের বিখ্যাত দুটি নাটক বাংলা ও হিন্দী ভাষায় মঞ্চস্থ করবেন। নাটক দুটির নাম বিপ্লবী ও আসাম মেল।

নাট্য সমারোহ উদ্বোধন করবেন বিখ্যাত শিল্পপতি রায় বাহাদুর জি এম মোদি, পদ্মভূষণ। প্রথম দিন বিপ্লবী (হিন্দী) মঞ্চস্থ হবে। দ্বিতীয় দিন কেন্দ্রীয় সুরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম প্রধান অতিথিরূপে আসাম মেল নাটকে উপস্থিত থাকবেন। উৎসবের শেষদিন প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং এদিন খ্যাটের সর্বাধুনিক জনপ্রিয় নাটক আসাম মেল (বাংলা) মঞ্চস্থ করা হবে।

পরাজিত নায়ক : থিয়েটার সেন্টারে প্রতি রবিবার নিয়মিতভাবে নাট্যাভিনয় শুরু হচ্ছে, বাংলা নববর্ষ থেকে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর লেখা 'পরাজিত নায়ক' সাম্প্রতিক পটভূমিকায় রচিত একটি বলিষ্ঠ নাটক। পরিচালক তরুণ রায়। মঞ্চ পরিকল্পনা যদুনাথ গোস্বামীর। আলোক নিয়ন্ত্রণে বিমল দাস। মাত্র দুটি চরি... সম্বলিত এই

মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯
নতুন নাটক
নাটক ॥ অভিজিত দত্ত
পরিচালনা ॥ ইন্দ্রজিত সেন (চারণ দল)
সুজিত দত্ত (শারদপ্রদীপ)
১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার থেকে
অগ্রিম বুকিং চলিতেছে

সবারই ভাল লেগেছে
সবাই প্রশংসায় মুখর
কটী পতঙ্গ
রাজেশ খান্না - আশা পারেখ
রক্সি : দর্পনা : মেনকা
২৷, ৫৷, ৯   ১৷, ৪৷, ৭৷   ২, ৫, ৮
(সব কটি চিত্রগৃহই তাপনিয়ন্ত্রিত)
ও অন্যান্য

নাটকটিতে অভিনয় করছেন তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায়।

মিনার্ভা থিয়েটার—তিরিশ দশক-এর ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আজকের দিন পর্যন্ত একইভাবে প্রবাহিত; শুধু তার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র—এই বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নাট্যকার অমিতাভ দত্তের নতুন নাটক প্রবাহ আসছে ১লা বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) থেকে মিনার্ভা থিয়েটারের সংগ্রামী কর্মীদের প্রযোজনায় নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হবে। নির্দেশনায় থাকছেন ইন্দ্রজিত সেন (চারণ দল) এবং সুজিত দত্ত (পাদপ্রদীপ)। মঞ্চ-নির্দেশনা, আলো, শব্দ-প্রক্ষেপণ এবং অন্যান্য দায়িত্বে থাকছেন মিনার্ভার কলা-কুশলীবৃন্দ।

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৩)

নান্দীকার

শনি ৬, রবি ২৷৷ ও ৬টায়

তিন পয়সার পালা

১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার ২৷৷ ও ৬টায়

শের আফগান

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবিধ সংবাদ

অবাস্তব ও নিম্নরুচির হিন্দি ছবির একঘেয়েমির দিনে একটি স্বাগত ব্যতিক্রমের আভাষ দিচ্ছে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'আনন্দ' (ইস্টম্যানকলার)। শ্রীমুখোপাধ্যায় চলচ্চিত্রে কল্যাণমূলক জীবন-ভাবনা প্রকাশে নব-নব আঙ্গিক রচনায় নিরত। প্রতিফলন পাওয়া যায় তাঁর অনুপমা, অনুরাধা, আশীর্বাদ, সত্যকাম ছবিগুলোতে। 'আনন্দ' তাঁর সেই প্রয়াসেরই নবতম পরিচয়।

ছবির ভূমিকাগুলিতে আছেন রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, সুমিতা সান্যাল, সীমা, রমেশ দেও, ললিতা পাওয়ার; ছবিটির ভাব সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে একটি টেপ রেকর্ডার, এছাড়া অতিথি শিল্পী হিসেবে তিনটি বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন—দুর্গা খোটে, জনি ওয়াকার ও দারা সিং।

সুরযোজনা করেছেন সলিল চৌধুরী। গুলজারের সংলাপ নাকি ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ।।

মার্চেন্ট আইভরি প্রোডাকসনের নতুন ইংরেজী ছবি বম্বে টকি এই মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করবে। শ্রীমতী ঝুথ বাংলায় লিখিত উপন্যাসটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় দায়িত্বে আছেন শ্রীআইভরি। শ্রীমার্চেন্ট ছবির মুখ্য প্রযোজক। বম্বে চিত্র জগতের এক হাস্যরসাত্মক ছবির মূল আখ্যান। প্রধান তিনটি চরিত্রে আছেন শশীকাপুর, অপর্ণা সেন ও জেনিফার কাপুর। অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন উৎপল দত্ত, পাকিস্তানের জিয়া মহিউদ্দিন, নাদিরা ও হেলেন। শঙ্কর-জয়কিষণ সুরারোপিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন কিশোরকুমার, মহম্মদ রফি ও পপ গায়িকা ঊষা আয়ার।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, প্রায় তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর ধরে স্বত্বাধিকারী থাকবার পরে সলিল মিত্র স্টারের মালিকানা হস্তান্তরিত করেছেন। থিয়েটারটির নতুন মালিক হলেন রাজকমল কাংকারিয়া।

গেল ২৯ মার্চ, সোমবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পী সংসদ তাঁদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক উদয়শঙ্কর, পৃষ্ঠপোষিকা সরযূ দেবী, অন্যতম সভ্য মায়া দে এবং তৃপ্তি মিত্রকে প্রথম দুজন যথাক্রমে পদ্মবিভূষণ উপাধি ও সঙ্গীত-নাটক আকাদেমী কর্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে স্বীকৃত এবং শেষোক্ত দুজনেই পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেছেন বলে তাঁদের প্রতি সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।। সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রত্যেকের প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংসদ-সভাপতি উত্তমকুমার: পরে তাঁদের উপহার দ্বারা সম্মানিত করেন মলিনা দেবী। গুণিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পরে শিল্পীসংসদ আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য উৎসবে যোগদানকারী দলগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি স্থান অধিকারী দলকে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, সহ-অভিনেতা, অভিনেত্রী, সহ-অভিনেত্রী ও বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্তদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন স্বনামধন্য উদয়শঙ্কর। সবশেষে প্রথম তিনটি স্থানাধিকারী নাটক তিনখানি—(১) মিছিল, (২) চাঁদনীরাত ও (৩) খিলাফ উপস্থিত দর্শকসমক্ষে অভিনীত হয়।

কালীবালা স্মৃতি সঙ্গীত বিদ্যালয় : বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে কালীবালা স্মৃতি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ৫ম বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল। এই সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা

আনন্দ আসছে শুক্রবার, ৯ই এপ্রিল

দুঃখের ঘরের চাবিটি তারই হাতে পাবেন!

ওরিয়েন্ট — হিন্দ — প্রিয়া

পূর্ণশ্রী : ছায়া : কালিকা : পার্কশো : প্যারামাউন্ট

সাফল্য কামনা করে সভাপতি মহাশয় বলেন যে সুরেই ব্রহ্ম সুরের মাধ্যমে সঙ্গীতজ্ঞ ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে সক্ষম হতে পারে। এমন সুর সৃষ্টি করতে হবে যাতে মানুষের অন্তর লোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে বহু জ্ঞানী, গুণী, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

জয় বাংলা : একক নাট্যশিল্পী সাহাদাত হোসেন পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কেন্দ্র করে যে নতুন নাটকটি রচনা করেছেন তার নাম 'জয় বাংলা'। শ্রীহোসেন জানিয়েছেন তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিনা পারিশ্রমিকে এই নাটকটি অভিনয় করবেন। যোগাযোগের ঠিকানা: ১২।১ সৈয়দ আমির আলী অ্যাভিনু, কলিকাতা—১৭।

তরুণ অপেরার সফর সূচী : তরুণ অপেরা মধ্যপ্রদেশের ভিলাইনগর মিলন সংঘের আমন্ত্রণে আগামী ২৪ ও ২৫ এপ্রিল অভিনয় করবেন তাদের জনপ্রিয় পালা 'হিটলার' ও 'লেনিন'। অতঃপর ২৬ ও ২৭ এপ্রিল এঁরা রায়পুর রবীন্দ্র ভারতীর আমন্ত্রণে অভিনয় করবেন লেনিন ও নেপোলিয়ন পালা দুটি। এই পর্যায়ের সফর উড়িষ্যার রাউরকেলায় প্রবাসী ক্লাবের আমন্ত্রণে পরিবেশিত হবে হিটলার ও লেনিন যথাক্রমে ২৮ ও ২৯ এপ্রিল।

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ৯৫তম জন্মজয়ন্তী : গত শনিবার ৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা কর্তৃক সমিতি ভবনে প্রথিতযশা নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ৯৫তম জন্ম বার্ষিকী পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত। সভার উদ্বোধন করেন প্রভাতকুমার ঘোষ অমরেন্দ্রনাথের রচিত একখানি গান দিয়ে। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অমরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও রচনা পাঠ করেন। সভাপতির ভাষণে হরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অমরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন করেন এবং এক সময় (অমরেন্দ্রনাথের সমকালীন) বহু গুণীজন যে তাঁর প্রতিভায় বিমুগ্ধ হয়ে বহু প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি রচনা করেছিলেন তার কিছু কিছু পাঠ করে শোনান।

হাওড়া কালচারাল এসোসিয়েশন
কদিন আগে হাওড়া কালচারাল এসোসিয়েশন আয়োজিত সারা রাতব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠানে সর্বশ্রী শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পুষ্পনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেঁকে বসাক প্রমুখ শিল্পীরা অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

এ ছাড়া ব্যায়াম প্রদর্শনীতে অংশ নেন মনোরঞ্জন সাহা ও পুলিন গাঙ্গুলী।

ঐদিন রাতেই শ্রীঅতুলরঞ্জন সান্যাল রচিত 'অস্তাচলে' নাটকটি অভিনীত হয়। অংশ গ্রহণ করেন অজিতহরি দত্ত, শ্যামল ভট্টাচার্য, দেবরঞ্জন সান্যাল, নিরঞ্জন পাল, মাধব কুণ্ডু, গোপা মুখার্জি, প্রতিমা পাত্র, প্রতিমা ব্যানার্জী। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীবিজয় দাস।

গীতাঞ্জলি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা : প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন 'গীতাঞ্জলি' আয়োজিত চতুর্থ বর্ষ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ দিন ২০ এপ্রিল। প্রতিযোগিতার বিষয় : কণ্ঠসঙ্গীত, সেতার, বেহালা, গীটার, নৃত্য, তবলা, বাঁশী ও আবৃত্তি এবং সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত, গীটার ও নৃত্য। যোগাযোগের ঠিকানা : পঙ্কজ সাহা, ৩বি, ললিত মিত্র লেন, কলিকাতা-৪।

পি সি সরকার জুনিয়ার

ভারতীয় যাদুবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বে স্বীকৃত। এবং এই জনস্বীকৃতির একমাত্র দাবীদার যুগ্ম বিশ্বশ্রেষ্ঠ যাদুসম্রাট পরলোকগত পি সি সরকার। শ্রীসরকারের অকালমৃত্যুতে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীপ্রদীপ সরকার জাপানে ভারতীয় ইন্দ্রজালের শততম অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। ভারতীয় যাদুবিদ্যার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রমাণ উক্ত অনুষ্ঠানে অস্বাভাবিক দর্শক সমাগম ও সম্প্রতি বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রীসরকারের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর ঘটনা।

প্রেক্ষাগৃহ প্রসঙ্গে নাস্তিক

৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রের জন্যে শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। অত্যন্ত অনবধানতার জন্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে সুমিত্রা সেনের নাম লিখে ফেলেছি। ভবিষ্যতে সাবধান হবার চেষ্টা করব। এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরীর পত্রের উত্তরে জানাচ্ছি, রাজু যেমন অভিধান সম্বল করে রুশভাষা শেখবার চেষ্টা করছিল, মারিয়াও তেমনই হিন্দীভাষা শিখছিল। যে কোনও ভাষান্তরের অভিধান খুললেই দেখা যাবে, মূল ভাষার শব্দটির উচ্চারণ যে ভাষায় অর্থান্তর করা হবে, ব্র্যাকেটের মধ্যে সেই ভাষাতেও লেখা থাকে। কাজেই হিন্দী-রুশী অভিধানে 'বহু' এই দেবনাগরী লেখার পাশেই ব্র্যাকেটে রুশী অক্ষরে ঐ 'বহু' কথাটি লেখা থাকে এবং তার পরে রুশ ভাষায় ঐ হিন্দী কথার কি অর্থ হয়, তা লেখা থাকে। কাজেই রাজুর মুখ থেকে 'বহু' কথা শোনবার পরে হিন্দী-রুশী অভিধান থেকে ঐ কথাটি আবিষ্কার করা মারিয়ার পক্ষে কঠিন নয়।

—নাস্তিক

শনি ১১ এপ্রিল ৬টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
শতাব্দীর
বাংলা সরকারের

১৲ থেকে ৫৲ হাত ৫০ পঃ টিকিট হলে
উত্তর কলকাতায় আর একটি সুযোগ
শনি ১৭ এপ্রিল : মহাজাতি সদন
টিকিট : দেবী পুস্তকালয় (হেদুয়া মোড়)
বাংলা থিয়েটারকে বাঁচান
॥ আরও থিয়েটার দেখুন ॥

অভিনব সিনেমা মাসিক পত্রিকা
আলোছায়া
প্রতি সংখ্যায় থাকে হিন্দী উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প, শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প, বিভিন্ন অভিনব ফিচার, গান স্বরলিপি, মনস্তাত্ত্বিক যৌনতথ্য ও অসংখ্য সিনেমার রঙীন ছবি।
প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ ॥ বার্ষিক ৬৲
১৬/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রবীন্দ্রনাথের প্রাক্ ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে
প্রথম অনুষ্ঠান
রবিরশ্মির চিত্তজন মোহিছে
৩রা মে সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে
...শাশ্বর সেনের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় রবিরশ্মির শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন।
নৃত্য পরিচালনায় মঞ্জুলিকা দাস। রামগোপাল।
একক সংগীত ? দ্বৈত ?? সমবেত ???
এর কোনোটাই নয়, হয়ত বা সবকটাই। রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিচিত্র অসাধারণ প্রযোজনা
প্রবেশমূল্য : ১০৲ ৭৲ ৫৲ ও ৩৲

জলসা

বাহাদুর খাঁ

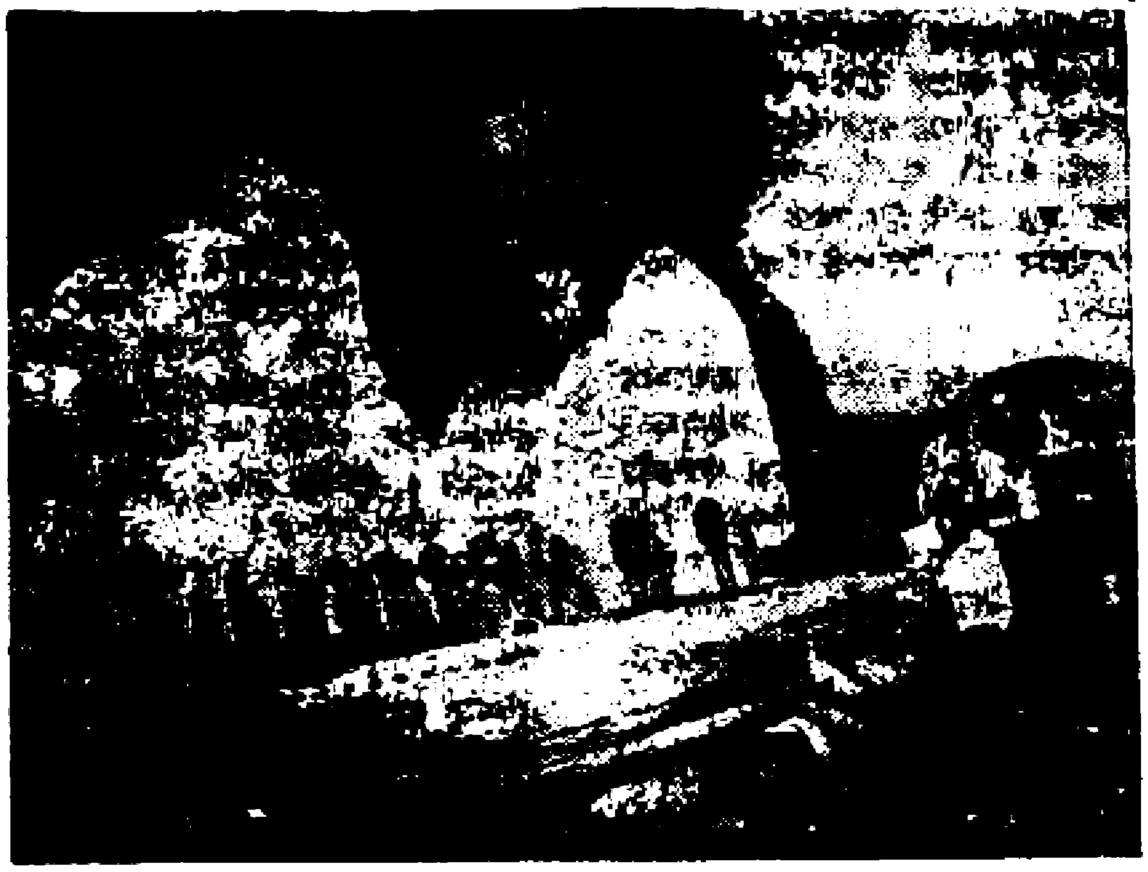

আসলে বাহাদুর খাঁর জন্মদিন ছিল জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে এক চিত্তাকর্ষী সঙ্গীতের আয়োজন হয়েছিল শেষ সপ্তাহে ওস্তাদের পাম এভিনুর বাসভবনে। আয়োজন করেছিলেন শিল্পীর শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ।

ফুল ও পাতায় শিল্পিত এবং ধূপবাসে সুবাসিত মঞ্চ ও পরিবেশে যেন পূজো-পরিবেশ। একনিষ্ঠ সঙ্গীত সাধনা এবং ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীতধারাকে প্রবহমান রাখার নিষ্ঠাকে বাহাদুর খাঁকে অভিনন্দন জানান হয়। এঁর মত শিল্পসাধকদের‌ই যে সঙ্গীতের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনকে নিত্যপরিবর্তনশীল কালস্রোতের মধ্যেও অপরিবর্তিত রেখেছেন—এ সত্যই অনুরাগীদের অভিনন্দন ভাষণে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

শিল্পী এই অভিনন্দনের উত্তর দিলেন তাঁর প্রাণ-কাড়া অনুষ্ঠানে 'কৌশি কানাড়া' রাগ বাজিয়ে। 'মালকোশ' অঙ্গেই এই রাগ সচরাচর শোনা যায়। কিন্তু সেদিন বাহাদুর খাঁ পরিবেশিত 'বাগেশ্রী' রঙ্গে রাগ রূপায়ণ এই রাগেরই আর এক রূপকে উদ্ভাসিত করে। রাগের অন্তঃপ্রবাহী বিয়োগান্তক করুণ রস ও সুগম্ভীর মর্যাদা উভয় দিকটিই যথাযথভাবে শ্রোতাদের প্রাণের গভীরে সাড়া জাগায়।

বিশেষ করে গান্ধারের আবেশ ও উন্মাদনা ভোলার নয়। সুর ও ছন্দ উভয় দিকটি অনাহত রেখেও অনিল ভট্টাচার্য তবলার সাথ-সঙ্গতে ও সওয়াল জবাবের চমৎকারী খেলে অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়িয়েছেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বাহাদুর খাঁর অন্যতম শিষ্য মনোরঞ্জনকরের সেতার বাজনে এক নবীন প্রতিভার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আভাষিত হয়। ইনি বাজালেন 'ইমন কল্যাণ'। সংক্ষিপ্ত আলাপে রূপদের আভাষ সহজ্য রক্ষিত। গতের সঙ্গেও লয় ছাড়াও স্বরস্বচ্ছতা ও সুরবিন্যাস প্রশংসনীয়।

•

আসন্ন রবীন্দ্র-জয়ন্তীর রেকর্ড সিরিজে প্রতিবারের মত এবারও রবীন্দ্র-আকর্ষণকারী তারকা শিল্পীরা ত থাকছেনই। এ ছাড়াও এবারের বিশেষ অবদান হলো বাংলা দেশের সুবিখ্যাত কয়েকজন শিল্পীর কণ্ঠে কিছু সুনির্বাচিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত। শ্রীযুক্ত প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও টি পি রায়চৌধুরীর কাছে জানা গেল এঁরা শুধু বাংলা দেশের স্বনামধন্য শিল্পীই নন, এঁদের মধ্যে অনেকে শিল্পী রাখী চক্রবর্তী নাকি ওপার বাংলায় লতা মঙ্গেশকার নামেই পরিচিতা। এ পর্যন্ত সংগৃহীত শিল্পীদের নাম ও গানের তালিকা:—ইফফৎ আরা দেওয়ান : আমি রূপে তোমায়, প্রভু বলো বলো। সঞ্জীদা খাতুন : ফামিদা খাতুন : আসা-যাওয়ার পথের ধারে (সঞ্জীদা), কাছে থেকে দূর রচিল (সঞ্জীদা), এখনো তারে চোখে দেখিনি (ফাহমিদা), ভরা থাক স্মৃতি সুধায় (ফাহমিদা), রাখী চক্রবর্তী। কলিম শরাফী সখী, ভাবনা কাহারে বলে (রাখী), আহা আজি এ বসন্তে (রাখী), দিন পরে যায় দিন (কলিম), বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি (কলিম)।

ভক্তিভাব নানারূপী আবেগভরা গানগুলি ওপার বাংলার অনুভব কল্লোলকে এপার বাংলায় পৌঁছে দেবে বলেই আমরা আশা করি। গ্রামোফোন কোম্পানীর এ উদ্যম অভিনন্দনীয়।

রবীন্দ্রভারতীর মুক্তাঙ্গনে ছো-নৃত্য : গত সপ্তাহের এক উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি সংবাদ হলো রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তাঙ্গনে দুই সন্ধ্যাব্যাপী ছো-নাচের এক সুকল্পিত অনুষ্ঠান। ডঃ রমা চৌধুরী ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের চিত্তবিনোদনী মূল্য ছাড়া তথ্যমূল্যও যথেষ্ট। কারণ বাংলারই মৃত্তিকাজাত লোকনৃত্যের একটি বিশেষ ধারার সঙ্গে কোলকাতার কলারসিকবৃন্দের পরিচয় ঘটাবার দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগের তরফ থেকে এঁরা যোগ্যতা পালন করেছেন।

পুরুলিয়ার গ্রামে-গ্রামে সাংস্কৃতিক সফরের সময় আশুতোষবাবু গ্রামবাসীদের বিশেষ উৎসবে মুক্ত মেলায় এই মুখোশ-পরা ছো নাচে অপরিবর্তিত এই লোকনৃত্যের বিশেষ প্রকাশভঙ্গীর প্রাণোজ্জ্বলতা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও পুরাণানুসারী উপাখ্যানের নাটকীয় পরিবেশনা দেখে মুগ্ধ হয়ে নাগরিক পরিবেশে এই নৃত্য উপস্থাপনায় ব্রতী হন। তাঁরই উদ্যোগে দিল্লীতে সর্বপ্রথম পরিবেশিত এই ছো-নৃত্য বিদগ্ধ মহলকে আনন্দ দিয়েছে। কোলকাতার অনুষ্ঠানে এই নৃত্য প্রচার প্রয়াসের দ্বিতীয় অধ্যায়। এ অধ্যায় যে সার্থক রবীন্দ্রভারতীর সুবিশাল প্রাঙ্গণে অগণিত দর্শক সমাগমই তার প্রমাণ।

দুই সন্ধ্যায় পরিবেশিত হল যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান কাহিনী এর পটভূমি—তারকাসুর বধ, হরধনু ভঙ্গ লক্ষ্মণের শক্তিশেল, নরান্তক বধ, পুরাণে বর্ণিত মহিষাসুর বধ, চাঁদ সদাগর, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ও শিকারী নৃত্য। বিভিন্ন বিষয়ের এই মুখোশ নৃত্যগুলি পরিচালনা করেন পুরুলিয়া গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় ওস্তাদবৃন্দ গম্ভীর সিং, মুরা, ইন্দ্রকুমার ও কমলেশকুমার।

প্রাচীন বাংলার প্রথানুযায়ী সকল নৃত্যই 'গণেশ বন্দনা' দিয়ে শুরু হয়। শুণ্ড দুলিয়ে দর্শক সমক্ষে গণেশের আবির্ভাব যুগপৎ কৌতুক ও আনন্দে সারা অঙ্গন মুখরিত করে তোলে।

প্রকাশ ভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে আঙ্গিকের সূক্ষ্মতার চেয়ে সাদামাটা 'নাটকীয়' প্রকাশ-এর দিকেই এঁরা জোর দিয়েছেন বেশী, খুব সম্ভব সহজ জীবনাভ্যস্ত গ্রামবাসীর গল্প শোনার ঔৎসুক্য ও অভিনীত চরিত্রগুলি প্রাণবন্ততা প্রত্যক্ষ করবার আগ্রহের প্রতি নজর রেখেই।

মুখোশে নানান বর্ণবিন্যাস, 'অভিনয়' ও হস্ত সঞ্চালন ও পদক্ষেপে দেখলাম কল্পনার সেই বিপুল বিস্তার যা জীবনকে সকল সংস্কারমুক্ত আদি ও অকৃত্রিম মানসিক আবেগে তুলে ধরে। সঙ্গত সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে শুধুমাত্র ঢোল ও মাদল। শুধু ছন্দ-বৈচিত্র্যের ভাষায় বক্তব্য বিষয়কে বর্ণনা করবার অভিনব রীতি লক্ষ্য করবার মত। একটি উপাখ্যান বিলম্বিত লয়ের সঙ্গে মাত্রায় শুরু হয়ে যুদ্ধের শেষে চৌদ্দ মাত্রায় দ্রুত লয়ে উত্তেজনা মুহূর্ত সৃষ্টি করে একটি সম্পূর্ণ তালবৃত্ত পূর্ণ করার পরিকল্পনা সত্যিই বিস্ময়কর।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলার কথা

চাকা ঘুরে গেছে

অজয় বসু

আলি, আলি, আলি! হাজারো কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চীৎকার রাত্রের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক টুকরো আওয়াজ, কিন্তু ব্যাপ্তিতে তা এতোখানি! ওই আওয়াজ, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের মাথার আকাশকে ছাপিয়ে দূর দূরান্তে খেলার দুনিয়ার কোণে কোণে কলরব জাগাতেও সময় নেয়নি।

সমর্থকদের উৎসাহ, অনুরাগীদের জয়ধ্বনি শুনে মহম্মদ আলি ওরফে ক্যাসিয়াস ক্লে হাত তুলে জানাবার চেষ্টা করলেন, সব ঠিক হ্যায়, এখুনিই এক ঘুষিতে আমি ফ্রেজিয়ারের জারিজুরি জুড়িয়ে দিচ্ছি! বলবার, বোঝাবার চেষ্টা করলেন বটে। কিন্তু ভঙ্গীতে তাঁর জোর কই, ঘোষিত পূর্বভাবে প্রত্যয়ই বা কোথায়! ক্লের ডান চোয়াল ততোক্ষণে ফুলে ফানুষ হয়ে উঠেছে, পদযুগল নড়বড় করছে, চোখের দৃষ্টিও ঘোলাটে।

আলি কি জিততে পারবেন?

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাঁ হাতের এক ঘুষির ঘায়ে জো ফ্রেজিয়ার প্রশ্নটির নিশ্চিত জবাব জানিয়ে দিলেন। ঘুষি তো নয়, যেন হাতুড়ির ধাক্কা! এক ধাক্কায় কাটা কলাগাছের মতো ক্লে মেঝেতে ছিটকে পড়লেন। পরে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন, বটে, কিন্তু ততোক্ষণে 'শতাব্দীর সেরা মুষ্টিযুদ্ধের' ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। বিচারক জো ফ্রেজিয়ারের ডান হাতখানি শূন্যে তুলে ঘোষণা করলেন, জিতেছেন ফ্রেজিয়ারই।

ফ্রেজিয়ারের জয়। মানে ক্লের পরাজয়। পরাজয় যে কি জিনিষ তা ক্লে বা মহম্মদ আলি জানতেন না। ৮ই মার্চের ওই অলক্ষণে রাত্রির আগে ক্লে তাঁর পেশাদারী জীবনে একটানা একত্রিশটি লড়াইয়ে জিতেছিলেন। তার মধ্যে ছাব্বিশবার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘায়েল করেছিলেন নক-আউটে। তারপরেই এই অঘটন। এই বিপর্যয়ের খবর শুনে ক্লে একবার বিড়বিড় করে কি যেন বলতে চেয়েছিলেন। কি বলছিলেন? আমি হারি নি, জিতেছি। কিন্তু তাঁর কথা তখন কে শোনে! একদিন ছিল যখন দুনিয়ার ক্রীড়ামোদীদের ক্লের বচন-বটিকা, তিক্ত হলেও সাগ্রহে গিলতে হোতো। কিন্তু এখন চাকা ঘুরে গিয়েছে। সেদিনের চ্যাম্পিয়ন, আজ পরাজয়ের ভারে নাস্ত, নতশির।

ক্যাসিয়াস ক্লের আগেকার প্রতিচ্ছবির রং যেন পুরোপুরিই ঘোলাটে গিয়েছে। ছ ফুট তিন ইঞ্চি দীর্ঘকায় এই নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধার মেদবর্জিত পেশীবহুল সক্রিয় আকৃতির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকেই একদিন তারিফ করে বলতেন, এমন ক্ষিপ্র মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে কারুরই তুলনা হয় না! এই দর্পিত বচনের মধ্যে ক্লের যে ভাবমূর্তি সাজানো হয়েছিল, জো ফ্রেজিয়ার সেই মূর্তিকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন।

ক্লে যে কোনোদিন কারুর হাতে হারবেন (তাঁর নিজের কথায় আমার এমন সুন্দর মুখশ্রীর ওপর কারুর ঘুঁষি কি আঁচড় বসাতে পারবে?) তা ছিল অনেকেরই ধারণার অতীত। তবু তিনি হেরেছেন, বেধড়ক মারের হাত এড়াবার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে পালিয়ে গিয়েও রেহাই পান নি। তাঁর হার শোচনীয় এবং এই দৃষ্টান্ত সেই আপ্তবাক্য, যে নেতার কাম ব্যাক-এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। একবার ছেড়ে দিলে আর ফেরা যায় না, সাম্রাজ্য একবার বেহাত হয়ে গেলে আর উদ্ধার করা যায় না— এই মত মুষ্টিযুদ্ধ মহলে স্বতঃপ্রমাণিত সত্যের মতো। সাড়ে তিন বছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের রিংয়ে ফিরে ক্যাসিয়াস ক্লেকেও ওই সত্যের মর্যাদা রক্ষায় মান এবং জান(!) দুইই বিসর্জন দিতে হলো। ক্লে সুপার-বকনায় হলেও সুপার-ম্যান যে নন, জো ফ্রেজিয়ারের জয়ে ওই তত্ত্বই সোচ্চার হয়েছে।

প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন জো লুই, জ্যাক ডেমপসি, আর্চি মুরেরা আগেই বলেছিলেন, ৮ই মার্চের লড়াইয়ে ফ্রেজিয়ার জিতবেন। কারণ, সাড়ে তিন বছরের অনুপস্থিতি ও অনভ্যাসের বাধা অতিক্রম করা ক্লের পক্ষে সম্ভব হবে না। শুনে ক্লে হেসে বলেছিলেন, লড়াই শেষে কথাগুলো ওঁদের গিলতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে জো লুই, ডেমপসিরাই অভ্রান্ত। আয়নার সামনে হাতের গুলি ফোলাতে ফোলাতে ক্যাসিয়াস ক্লে যা দেখেছিলেন তাতে সত্যের ছায়া ছিল না।

ক্লের পরাজয়ে একটি যুগের অবসান ঘটলো, সেই সঙ্গে আর এক নিগ্রো তরুণ জো ফ্রেজিয়ারকে ঘিরে নতুন এক যুগের সূচনা ঘটলো। নতুন যুগের মধ্যমণি যখন বাকবাগীশ ক্লে নন তখন তাঁর বাকবৈরথ্যের আপ্যায়ন থেকে মুষ্টিযুদ্ধ মহলেরও রেহাই মিলবে। অবস্থার এই পরিবর্তন অনেকের কাছেই স্বস্তিদায়ক বৈকি।

বাকবাগীশ। ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলির কথা উঠলেই ওই বিশেষণটি সবার আগে মনে এসে পড়ে। সনি লিস্টনের সঙ্গে লড়াই আরম্ভের মুখেই ক্লে সেই যে মুখ খুলেছিলেন, নিজে অপরাজিত থাকার কালে সেই মুখে আর চাবি পড়েনি। তবে মনে হয় যে জো ফ্রেজিয়ার বোধহয় এতোদিনে ক্যাসিয়াস ক্লের ঠোঁট দুটিতে চাবিকাঠি এঁটে দিতে পেরেছেন। আশা করা যায় যে, এরপর অন্ততঃ ক্লের বকবকানি কমবে। আর তাও যদি না কমে তাহলেই বা ওঁর উচ্চকণ্ঠে কে কান পাতবেন? ক্লের বাণী কি শুধু অরণ্যে রোদনের সামিল হয়ে দাঁড়াবে না? যেহেতু যে বিজয়মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্লে এতোদিন বিশ্ববাসীকে তাঁর নিজের কথা হেঁকে শোনাতেন, সেই মঞ্চের পায়ের তলার জমি যে সরে গিয়েছে!

তবে ওই হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি ও নিজের ঢাক নিজেই পেটানো—ব্যাপারগুলি সবই বোধহয় ইচ্ছাকৃত। ক্লে নিজেও যেন একদিন তাঁর চিন্তিত পরিকল্পনার কথা সবাইকে জানিয়েও দিয়েছিলেন। ক্লে জানতেন যে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবসার দিকটা সুসংগঠিত রাখতে হলে প্রচারের ঢাকটিকে সর্বদাই সরব রাখা দরকার। যতো প্রচার ততোই তাঁকে দেখার, তাঁর লড়াই দেখার চাহিদা। সেদিক থেকে ক্লের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। প্রচারের ঘটায় তিনি অনুষ্ঠানকেন্দ্রে বাড়তি লোকের সমাবেশ ঘটাতে এবং টেলিভিশনের পর্দায় অনেক জোড়া দৃষ্টিকে আটকে রাখতেও পেরেছেন। আর পেরেছেন এই সব কাণ্ডের সূত্রে রিং থেকে মোটা অঙ্কের মুনাফাও তুলতে।

জো ফ্রেজিয়ার বনাম ক্যাসিয়াস ক্লে বা মহম্মদ আলির যে লড়াই গত ৮ই মার্চ ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে হয়ে গেল তাতে যে কতো টাকা এ হাত থেকে ও হাতে চলে গেল তার হিসেব কে রাখে। ক্লে ও ফ্রেজিয়ার, দুজনের প্রত্যেকেরই প্রাপ্যের পরিমাণ অন্ততঃ পঁচিশ লক্ষ ডলার। তাছাড়া ওই পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের সঙ্গে যাঁরা নানাভাবে যুক্ত তাঁরাও সবাই মিলে কতো লক্ষ যে কামিয়েছেন তাই বা কে জানে? নামে মুষ্টিযুদ্ধ, কিন্তু আসলে ব্যাপারটি মস্তোবড় এক ব্যবসা। লাখো কোটি টাকার এই ব্যবসার নেপথ্য মহলটিও ধোয়া তুলসী পাতার মতো যে নয় তার প্রমাণ এবারেই একটি ঘটনার সূত্রে পাওয়া গিয়েছে। ঘটনা এই যে ক্লের সঙ্গে লড়াইয়ের আগে কে বা কারা পত্রযোগে হুমকী তুলে ফ্রেজিয়ারকে জানিয়ে দেয় যে তিনি যদি না হেরে যান তাহলে তাঁর জীবনই হারাতে হবে। এই হুমকীর অর্থ কি? অর্থ এই যে লড়াই ঘিরে বাজী ধরার যে ব্যাপারটি ছিল তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তারাই হুমকী তুলে নিজেদের অর্থোপার্জনের পথে বাজীমাৎ করে দিতে চেয়েছিলেন। একরোখা ফ্রেজিয়ার অবশ্য

CENTRAL LIBRARY

হুমকীর সামনে মাথা না নোয়ানোর ফলে বেচারীদের মস্করাটি মাঠেই মারা যায়।

সনি লিসটনকেও এই জাতীয় হুমকির ফোঁসফোঁসানি সইতে হয়েছিল। অন্ধকারের মানুষ যারা তারা অনেক সময় পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের ফলাফল নিয়ন্ত্রণে নেপথ্য ভূমিকা নেয় বলে সাধারণের চোখে মুষ্টিযুদ্ধের মর্যাদা ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। আত্মপ্রচারের এক অভিনব ঘণ্টা নিজের গলায় ঝুলিয়ে ক্যাসিয়াস ক্লে হয়তো পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবসাগত স্বার্থের অকাতর সেবা করে গিয়েছেন। কিন্তু তিনিও মুষ্টিযুদ্ধের মর্যাদা বাড়াতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। ক্লে অতি দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা, এক আকর্ষণীয় চরিত্র। কিন্তু ক্লে কি তেমন একজন খেলোয়াড় বা 'স্পোর্টসম্যান' বিনয়ই যাঁর চরিত্রের ভূষণ? তা নয় নিশ্চয়ই। তাই উঠতি কোনো খেলোয়াড়কে কেউ ক্যাসিয়াস ক্লের পদাঙ্ক অনুসরণে কেউ কোনোদিনই উপদেশ দেবেন না। তাই বলছিলাম, নানা আকস্মিক কাণ্ডের বিশিষ্ট নায়ক সেজে ক্লে মুষ্টি-যুদ্ধের আঙিনায় যতোই কেন না দর্শক ও অর্থ জড়ো করায় সফল হোন, পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি তাঁর ভূমিকায় শালীন ও মর্যাদামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। এখানেতেই মুষ্টিযুদ্ধকে অনেকে আদিম অসভ্য যুগের বর্বর কাণ্ড বলে নিন্দা করেন। কারণ ঘুষোঘুষিতে খুনোখুনি বাধিয়ে তুলে অর্থোপার্জন করা বা আনন্দ বিতরণ করার (মারামারি, রক্তারক্তি দেখে আনন্দ পায় কারা!) প্রয়াস দেখে একালের রুচিবোধ আহত হয় বৈকি। তার উপর এই উন্নাসিক ক্লের মতো চড়া গলা যদি আত্মপ্রচারে ও পরনিন্দায় নিতাই আকাশ কাঁপায় তাহলে ওই আসরে 'স্পোর্টিং স্পিরিট' বা খেলোয়াড়োচিত সদাচরণের অস্তিত্ব থাকেই বা কি করে!

তবে ক্লে যা পারেন নি, জো ফ্রেজিয়ারের তা আয়াসলভ্য হতে পারে। যেহেতু জো ভিন্ন প্রকৃতির চ্যাম্পিয়ন। জো মিতবাক, বিনয়ী, প্রতিদ্বন্দ্বীর গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রিংয়ের বাইরে জো ফ্রেজিয়ার গান বাজনায় সময় কাটান। 'দি নক আউটস' নামে তাঁর নিজস্ব একটি গাইয়ে দলও আছে। মুষ্টিযুদ্ধ থেকে অবসর নেওয়ার পর জো ফ্রেজিয়ার ওই গাইয়ে দলের সঙ্গেই অষ্টপ্রহর কাটাবেন বলে স্থির করেছেন।

ক্লে বলেছিলেন যে ফ্রেজিয়ারকে তিনি হারাতে না পারলে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে সর্বসমক্ষে হামাগুড়ি দিয়েই তিনি তাঁর হার স্বীকার করে নেবেন। হারের পর দেখা গেল, ক্লের দম্ভোক্তি শুধু কথারই কথা। জেতার পর ফ্রেজিয়ার অবশ্য ওই কথাটি ক্লেকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান নি। তবে বলেছিলেন, এর পর ক্লের উচিত তাঁর কথাগুলি ফিরিয়ে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা। হামাগুড়ি দেওয়ার কি হলো? এই বাক্যটি অনুচ্চার রেখে জো ফ্রেজিয়ার ভালই করেছেন। এতে তাঁর মর্যাদা বেড়েছে। হারে জিতে নির্বিকার থাকাই তো খাঁটি স্পোর্টসম্যানের লক্ষণ। তাছাড়া মড়ার ওপর খাঁড়ার কোপ বসিয়ে লাভই বা কি!

জো ফ্রেজিয়ার মদ স্পর্শ করেন না, ধূমপানও করেন না। তবু মজা এই যে তাঁর নামের আগে 'স্মোকিং' বিশেষণটি জুড়ে দেওয়া হয় কেন? কারণ এই যে যে কোনো লড়াইয়ের আগে ফলাফল কি হবে, এই প্রশ্ন রাখা মাত্রই 'আই উইল কাম আউট স্মোকিং হট!' বলাই ফ্রেজিয়ারের অভ্যাস। বেশি কথা বলেন না। বলেন, বারে বারে ওই কথা। তাই শুনে কাগজের মানুষেরাও ফ্রেজিয়ারকে 'স্মোকিং জো' বলে মজা পেতে চান। তবে অন্যে যা বলে মজা পাক না কেন, লড়াইয়ের দিনে ফ্রেজিয়ার বিন্দুমাত্র মজা করতে রাজী নন। সব সময়েই সিরিয়াস। গত ৮ই মার্চে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ক্যাসিয়াস ক্লে একথা সেকথা বলে প্রথম দিকে কিছুটা হালকা পরিবেশের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'স্মোকিং জো' জ্বলন্ত বারুদের মতো ফেটে পড়ে ক্লেকে মজা দেখিয়ে তবেই ছেড়েছেন।

পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ মহলের বিশ্বাস, বড় বক্সার তাঁরাই হন যাঁরা ছেলেবেলা থেকে ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে জীবনী-শক্তি সঞ্চয় করেন। এই কথাটা সকলের ক্ষেত্রে খাটে কিনা জানি না, তবে জো ফ্রেজিয়ারের ক্ষেত্রে যে খেটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেহেতু জো ফ্রেজিয়ারকে কৈশোরে ও যৌবনের আরম্ভে দারিদ্র্যের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম করতে হয়েছে।

সাউথ ক্যারোলিনের বোফোর্টে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত নিগ্রো পরিবারে জো ফ্রেজিয়ারের জন্ম। ভাইবোন তেরোটি, তার মধ্যে জো হলেন সপ্তম জন। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই রুটির সন্ধানে কায়িক পরিশ্রম করতে হোতো। বাইরের দুনিয়ার কোনো অভিজ্ঞতাই যখন ছিল না তখনই জো দুধ দোয়ানো থেকে ট্রাকটর চালানো পর্যন্ত—নানা কাজ হাতে নিয়ে সামান্য কিছু রোজগার করতেন। তখনও পর্যন্ত মুষ্টিযুদ্ধ বা ব্যায়াম অনুশীলনের দিকে মন যায় নি। সেদিকে মন গেল নিউইয়র্কে আসার পর।

নিউইয়র্ক মস্ত শহর। চাকুরীর অঢেল সুযোগ। সেই সুযোগ পেতেই বড় ভাই-বোনেদের সঙ্গে জো একদিন এসে হাজির হলেন নিউইয়র্কে। তখন তাঁর বয়স ষোল। নিউইয়র্কে আসার পর কপাল জোরে জুটলো কসাইখানার চাকুরী। প্রতিদিন কুঁপিয়ে হাড়সমেত মাংস কাটার সূত্রে হাতের জোর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো বটে। কিন্তু শরীরের মেদ বুঝি যাবার নয়! ছেলেবেলা থেকেই ফ্রেজিয়ারের শরীর রীতিমতো মেদবহুল, ভারী। ষোল বছর বয়সেই তাঁর দেহভার পৌঁছেছিল ২৩০ পাউণ্ডে। অথচ সাতাশ বছরে যেদিন তিনি ক্লের মোকাবিলায় রিংয়ে নামলেন সেদিন তাঁর শরীরের ওজন ছিল ২০৫ পাউণ্ডের মতো।

দেহভার বা মেদ কমাবার জন্যে চাকুরীস্থল কসাইখানার কাছাকাছি এক পুলিশ জিমনাসিয়ামে গিয়ে জো ব্যায়াম চর্চা আরম্ভ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ইয়ানসি ডারহাম নামে এক ব্যায়ামবিদ ওই জিমনাসিয়ামে যুক্ত ছিলেন। তিনি জো ফ্রেজিয়ারের হাতের জোর দেখেই বুঝতে পারেন যে মুষ্টিযুদ্ধে এই তরুণের সম্ভাবনা বিপুল। ইয়ানসিই জোর হাত ধরে বক্সিং রিংয়ে নিয়ে যান এবং সেই থেকে একটানা দীর্ঘ এগারো বছর জো ফ্রেজিয়ার ওই ইয়ানসি ডারহামের তত্ত্বাবধানেই রয়েছেন।

অপেশাদার হিসেবে জো ফ্রেজিয়ার দুজনের কাছে হেরেছেন (জিতেছেন চল্লিশটি লড়াইয়ে) কিন্তু পেশাদার হওয়ার পর তিনি কারুর কাছে হারেন নি। পেশাদার রূপে লড়েছেন ও জিতেছেন সাতাশবার, তার মধ্যে তেইশটি ক্ষেত্রে তাঁর জিত হয়েছে নক আউটে।

অপেশাদার রূপে জো ফ্রেজিয়ার শেষবারের মতো লড়েন ও জেতেন ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকের হেভিওয়েট ফাইনালে। টোকিওতে লড়াটাও কাকতালীয়বৎ। অলিম্পিকের আগে ট্রায়ালে তিনি হেরে যান। কিন্তু দলে নির্বাচিত মুষ্টি-যোদ্ধা টোকিও যেতে না পারায় জো টোকিও যাবার ডাক পান। যাবার আগে জো ছিলেন তাঁর বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু টোকিও থেকে ফিরলেন বিশ্ব-শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি নিয়ে। ফিরেই পেশাদার হন এবং একটানা এগারোজনকে নক আউট করে দেন।

এমনি করে এগোতে এগোতে জো একদিন বাস্টার ম্যাথায়াসকে হারিয়ে নিউইয়র্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের আরও পাঁচটি অঞ্চলে এবং মেকসিকোতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পান। তারপর গেল বছরে জিমি এলিসকে পঞ্চম রাউণ্ডে নক আউট করে সর্বসম্মত রূপে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলে অভিহিত হন। ১৯৭০ সালেই সবাই জো ফ্রেজিয়ারকে বিশ্ব-বিজয়ী বলে মেনেছিলেন শুধু মানতে পারেন নি ক্যাসিয়াস ক্লে। গত ৮ই মার্চ ম্যাডিসন স্কোয়ারে ফ্রেজিয়ার ক্লের সন্দেহ নিরসন করে দিয়েছেন—যদিও তারপরও ক্লে বলবার চেষ্টা করেছেন যে ম্যাডিসন স্কোয়ারে তিনিই জিতেছেন, জো নন!

তবে ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলি যাই বলুন না কেন, জো ফ্রেজিয়ারই আজ অবিসম্বাদী চ্যাম্পিয়ন। কথার খই ফুটিয়েও ক্লে সর্বসম্মত রায় সম্পর্কে অন্য কারুর মনে সন্দেহ জাগাতে পারছেন না। কোনো সন্দেহ নেই যে চাকা আজ উল্টো মুখে ঘুরে গিয়েছে। ক্লে এখন সাত কথা বললেও তাতে অন্য কেউ সায় দিতে উৎসাহই পাচ্ছে না!

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

জাপানের নাগোয়া শহরে ৩১তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার দলগত বিভাগে এশিয়া মহাদেশ নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের দলগত বিভাগের ফাইনালে খেলেছিল এশিয়া মহাদেশের দুই দেশ—জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীন। পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে প্রজাতন্ত্রী চীন ৫—২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে এই নিয়ে মোট ৪ বার সোয়েথলিং কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ইতিপূর্বে প্রজাতন্ত্রী চীন সোয়েথলিং কাপ জয়ী হয়েছে ১৯৬১, ১৯৬৩ ও ১৯৬৫ সালে। মহিলাদের দলগত বিভাগের ফাইনালে জাপান ৩—১ খেলায় প্রজাতন্ত্রী চীনকে পরাজিত করে মোট ৮বার কোর্বিলোন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

এশিয়া মহাদেশের প্রাধান্য

বিগত ১৩ বারের প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশ কি বিরাট সাফল্যের পরিচয়ই না দিয়েছে! এই ১৩ বারের প্রতিযোগিতায় সোয়েথলিং কাপ জয়ী হয়েছে জাপান ৭ বার, প্রজাতন্ত্রী চীন ৪ বার, হাঙ্গেরী ১ বার এবং ইংল্যান্ড ১ বার। অপরদিকে কোর্বিলোন কাপ জয়ী হয়েছে জাপান ৮ বার, রুমানিয়া ৩ বার, প্রজাতন্ত্রী চীন ১ বার এবং রাশিয়া ১ বার।

এখানে উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্রী চীন ১৯৬৫ সালের পরবর্তী দুটি অনুষ্ঠানে (১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে) অংশ গ্রহণ করেনি।

১৯৭১ সালের ক্রমপর্যায় তালিকা

সোয়েথলিং কাপ (পুরুষদের দলগত বিভাগ) : (১) প্রজাতন্ত্রী চীন, (২) জাপান, (৩) যুগোস্লাভিয়া, (৪) সুইডেন, (৫) হাঙ্গেরী, (৬) পশ্চিম জার্মানী, (৭) ফ্রান্স, (৮) দক্ষিণ কোরিয়া, (৯) উত্তর কোরিয়া, (১০) ইংল্যান্ড, (১১) চেকোস্লোভাকিয়া, (১২) ইন্দোনেশিয়া, (১৩) অস্ট্রিয়া, (১৪) ভারতবর্ষ, (১৫) ডেনমার্ক, (১৬) ইরান, (১৭) নাইজেরিয়া, (১৮) কম্বোডিয়া, (১৯) নেদারল্যান্ডস, (২০) গ্রীস, (২১) হংকং, (২২) কানাডা, (২৩) থাইল্যান্ড, (২৪) ইউ এ আর, (২৫) মালয়েশিয়া, (২৬) ফিলিপাইনস, (২৭) সিঙ্গাপুর, (২৮) আমেরিকা, (২৯) অস্ট্রেলিয়া, (৩০) ঘানা, (৩১) দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, (৩২) পেরু, (৩৩) ব্রেজিল, (৩৪) নেপাল, (৩৫) মেক্সিকো, (৩৬) ইস্রাইল, (৩৭) নিউজিল্যান্ড এবং (৩৮) লুক্সেমবুর্গ।

এলাহাবাদে ভারতবর্ষ বনাম ব্রহ্মদেশের তৃতীয় ভলিবল টেস্ট খেলার একটি দৃশ্য। ভারতবর্ষ ১৫-১০, ১৫-৬ ও ১৫-১২ পয়েন্টে জয়ী হয়ে টেস্ট সিরিজে ৩-০ খেলায় রাবার জয় করে।

কোর্বিলোন কাপ (মহিলাদের দলগত বিভাগ : (১) জাপান, (২) প্রজাতন্ত্রী চীন, (৩) দক্ষিণ কোরিয়া, (৪) চেকোস্লোভাকিয়া, (৫) রাশিয়া, (৬) রুমানিয়া, (৭) পশ্চিম জার্মানী, (৮) ইংল্যান্ড (৯) হাঙ্গেরী, (১০) সুইডেন, (১১) ফ্রান্স, (১২) কম্বোডিয়া, (১৩) ইন্দোনেশিয়া, (১৪) অস্ট্রিয়া, (১৫) ভারতবর্ষ, (১৬) কানাডা, (১৭) মালয়েশিয়া, (১৮) অস্ট্রেলিয়া, (১৯) গ্রীস, (২০) হংকং, (২১) আমেরিকা, (২২) থাইল্যান্ড (২৩) কলম্বিয়া (২৪) নেপাল, (২৫) নিউজিল্যান্ড, (২৬) সিঙ্গাপুর এবং (২৭) ঘানা।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

৪র্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা

বারবাডোজের কেনসিংটন ওভাল মাঠে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৪র্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

আগামী সংখ্যায় এই চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক বিবরণ, আলোচনা এবং বিবিধ রেকর্ড পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থে পরিবেশিত হবে।

সোয়েথলিং কাপ বিজয়ী দেশ

১৯২৭ হাঙ্গেরী, ১৯২৮ হাঙ্গেরী, ১৯২৯ হাঙ্গেরী, ১৯৩০ হাঙ্গেরী, ১৯৩১ হাঙ্গেরী, ১৯৩২ চেকোস্লোভাকিয়া, ১৯৩৩ হাঙ্গেরী, ১৯৩৪ হাঙ্গেরী, ১৯৩৫ হাঙ্গেরী, ১৯৩৬ অস্ট্রিয়া, ১৯৩৭ আমেরিকা, ১৯৩৮ হাঙ্গেরী, ১৯৩৯ চেকোস্লোভাকিয়া, ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত খেলা বন্ধ, ১৯৪৭ চেকোস্লোভাকিয়া, ১৯৪৮ চেকোস্লোভাকিয়া, ১৯৪৯ হাঙ্গেরী, ১৯৫০ চেকোস্লোভাকিয়া, ১৯৫১ চেকোস্লোভাকিয়া, ১৯৫২ হাঙ্গেরী, ১৯৫৩ ইংল্যান্ড, ১৯৫৪ জাপান, ১৯৫৫ জাপান, ১৯৫৬ জাপান, ১৯৫৭ জাপান, ১৯৫৯ জাপান, ১৯৬১ প্রজাতন্ত্রী চীন, ১৯৬৩ প্রজাতন্ত্রী চীন, ১৯৬৫ প্রজাতন্ত্রী চীন, ১৯৬৭ জাপান, ১৯৬৯ জাপান ১৯৭১ প্রজাতন্ত্রী চীন।

কোর্বিলোন কাপ বিজয়ী দেশ

১৯৩৪ জার্মানী, ১৯৩৫ চেকোস্লোভাকিয়া, ১৯৩৬ চেকোস্লোভাকিয়া, ১৯৩৭ আমেরিকা, ১৯৩৮ চেকোস্লোভাকিয়া, ১৯৩৯ জার্মানী, ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত খেলা বন্ধ, ১৯৪৭ ইংল্যান্ড, ১৯৪৮ ইংল্যান্ড, ১৯৪৯ আমেরিকা, ১৯৫০ রুমানিয়া, ১৯৫১ রুমানিয়া, ১৯৫২ জাপান, ১৯৫৩ রুমানিয়া, ১৯৫৪ জাপান, ১৯৫৫ রুমানিয়া, ১৯৫৬ রুমানিয়া, ১৯৫৭ জাপান, ১৯৫৯ জাপান, ১৯৬১ জাপান, ১৯৬৩ জাপান, ১৯৬৫ গণতন্ত্রী চীন, ১৯৬৭ জাপান, ১৯৬৯ রাশিয়া, ১৯৭১ জাপান।

একই আসরে
সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ জয়

৪ বার : জাপান (১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৫৯ ও ১৯৬৭)
১ বার : আমেরিকা (১৯৩৭)
১ বার : গণতন্ত্রী চীন (১৯৬৫)

দলগত বিভাগে সর্বাধিক জয়

সোয়েথলিং কাপ : ১১ বার—হাঙ্গেরী
কোর্বিলোন কাপ : ৮ বার—জাপান।

কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ড বাইচ প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৭তম বাৎসরিক বাইচ প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ ১০ লেংথে জয়ী হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক বাৎসরিক বাইচ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৮২৯ সালে। লন্ডনের বিখ্যাত টেমস নদীর বুকে এই প্রতিযোগিতার আসর বসে, পথ পরিক্রমা—পুটনি ব্রিজ থেকে মর্টলেক (দূরত্ব ৩ মাইল ৩৪৭ গজ)। দুটি বিশ্বযুদ্ধের জন্যে মোট অনেক বছর প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল।

বর্তমানে প্রতিযোগিতার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : কেম্ব্রিজের জয় ৬৫ বার, অক্সফোর্ডের জয় ৫১ বার এবং ডেড হিট ১ বার (১৮৭৭ সালে)। অক্সফোর্ড শেষ জয়ী হয়েছে ১৯৬৭ সালে।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাৎসরিক বাইচ প্রতিযোগিতা ইংল্যান্ডের এক জাতীয় উৎসব এবং আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরেও এক বিশেষ আকর্ষণ এই কারণে যে, এই প্রতিযোগিতার ঐতিহ্য এবং সুচিতার তুলনা নেই।

ভলিবল টেস্ট

ভারতবর্ষ বনাম ব্রহ্মদেশের ভলিবল টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ৩—০ খেলায় ব্রহ্মদেশকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১ম টেস্ট (গোরখপুর) : ভারতবর্ষ ১৫—১১, ১০—১৫, ১৫—৮ ও ১৫—৮ পয়েন্টে জয়ী।
২য় টেস্ট (নিউদিল্লী): ভারতবর্ষ ১৫—৭, ১৫—১৩ ও ১৫—৮ পয়েন্টে জয়ী।
৩য় টেস্ট (এলাহাবাদ) : ভারতবর্ষ ১৫—১০ ১৫—৬ ও ১৫—১২ পয়েন্টে জয়ী।

ডেভিস কাপ

এশিয়া অঞ্চলের খেলা

অস্ট্রেলিয়া ৫—০ খেলায় হংকংকে পরাজিত করেছে। ভারতবর্ষ ৪—০ খেলায় সিংহলকে পরাজিত করে পরবর্তী রাউন্ডে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। অপরদিকে পাকিস্তান ৫—০ খেলায় মালয়েশিয়াকে পরাজিত করেছে।

কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত প্রথম কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সাতটি খেতাবই ইংল্যান্ড জয়ী হয়েছে—দলগত বিভাগে দুটি এবং ব্যক্তিগত বিভাগে পাঁচটি।

সংক্ষিপ্ত ফাইনাল খেলা

পুরুষদের দলগত বিভাগ : ইংল্যান্ড ৫—২ খেলায় হংকংকে পরাজিত করে।
মহিলাদের দলগত বিভাগ : ইংল্যান্ড ৩—০ খেলায় নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত বিভাগ

পুরুষদের সিঙ্গলস : ট্রেভর টেলর (ইংল্যান্ড) ২১—১৪, ২১—১৮ ও ২২—২০ পয়েন্টে মীর কাসিম আলীকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।
মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী জিল হ্যামার্সলি (ইংল্যান্ড) ২০—২১, ১৭—২১, ২১—১৯ ও ২১—১৮ পয়েন্টে কারেঞ্জা মাথুজকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।
মহিলাদের ডাবলস : ক্যারেঞ্জা মাথুজ এবং পি পিডক (ইংল্যান্ড) ২১—১৫, ২১—১৬, ১৬—২১ ও ২১—১৮ পয়েন্টে রুপা মুখার্জি এবং কে চার্জমানকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।
পুরুষদের ডাবলস : টেলর এবং হাইডস (ইংল্যান্ড) ২১—১৭, ২১—১৬ ও ২১—১০ পয়েন্টে ম্যা লাং এবং চান চিক মিনকে (সিঙ্গাপুর) পরাজিত করেন।
মিক্সড ডাবলস : হাইডস এবং পিডক (ইংল্যান্ড) ১২—২১, ২১—১৮, ১৭—২১, ২১—১৫ ও ২১—১৫ পয়েন্টে টি রুটন এবং কে মাথুজকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

আম্বালায় আয়োজিত ১৭তম জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল সমস্ত বিভাগেই খেতাব জয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী সার্ভিসেস দল ৫৫ পয়েন্ট এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রেলওয়ে ২৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। এখানে উল্লেখ্য, গত চার বছরে সার্ভিসেস দল এই নিয়ে তিনবার প্রতিযোগিতার সমস্ত বিভাগেই খেতাব জয়ী হল এবং প্রকৃতপক্ষে এই নিয়ে তারা উপর্যুপরি ১৪বার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো। ১৯৬২ সালে চীনা হামলার দরুন তারা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে নি।

বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী।

লাইট-ফ্লাই : বিশ্বকর্মা (সার্ভিসেস)
ফ্লাই : নারায়ণ (ঐ)
ব্যান্টম : বি মোর (ঐ)
ফেদার : নিম বাহাদুর (ঐ)
লাইট : এম বেণু (ঐ)
লাইট-ওয়েল্টার : মণিকুমার (ঐ)
ওয়েল্টার : এম সিং (ঐ)
লাইট-মিডল : নাগিন্দর সিং (ঐ)
মিডল : ভগবান সিং (ঐ)
লাইট-হেভী : মহতাব সিং (ঐ)
হেভী : হাওয়া সিং (ঐ)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।৯, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

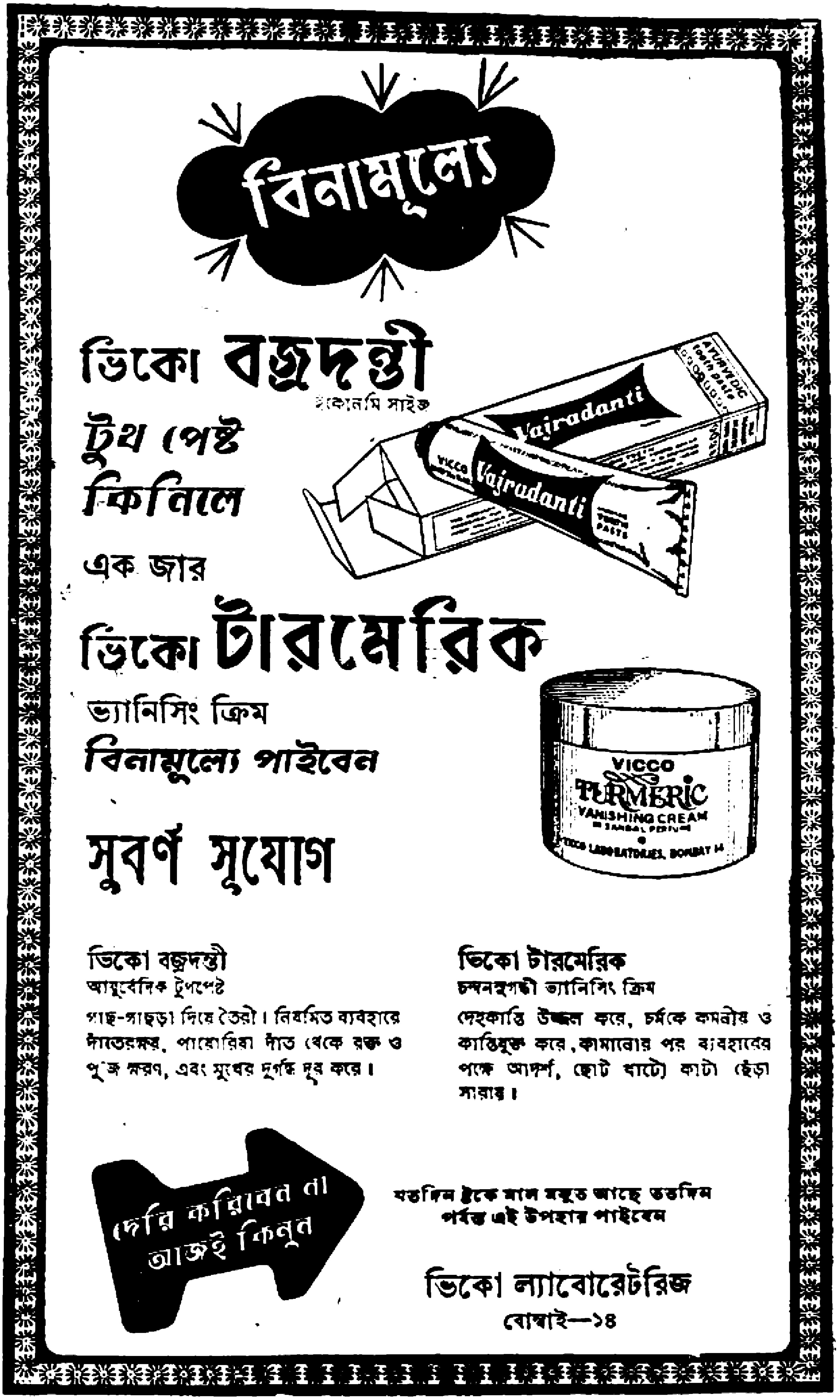

ষ্টকিষ্টস : মেসার্স ডি সিটি ষ্টোর্স, ২০ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬, ফোন : ২০-৩৩১৪ এবং ২০-৪৫৪৬

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে
ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-পাতি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়…তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় রবারের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। **ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।**

70,580

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৫১ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 16th April, 1971 শুক্রবার, ২রা বৈশাখ, ১৩৭৮ — 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮০৪	চিঠিপত্র		
৮০৬	দেশে-বিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৮০৯	সম্পাদকীয়		
৮১০	এক নজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৮১১	সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীনতার স্বীকৃতি চাই		—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
৮১৩	রক্তাক্ত স্বাক্ষর		—শ্রীদীপ্র আদিত্য
৮১৮	বৈশাখী মন	(কবিতা)	—শ্রীলক্ষ্মণরঞ্জন বসু
৮১৮	বাংলার ছবির সঙ্গে	(কবিতা)	—শ্রীশ্যামসুন্দর দে
৮১৮	আমার সোনার বাংলা	(কবিতা)	—শ্রীঅরুন্ধতী সেনগুপ্ত
৮১৮	বাংলার এখন চৈত্র	(কবিতা)	—শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
৮১৯	চাণক্য চাকলাদারের কীর্তিকথা	(রহস্য উপন্যাস)	—শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
৮২৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৮২৯	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৮৩১	আবার	(গল্প)	—শ্রীগোষ্ঠ শেঠ
৮৩৭	সপ্তিবংশের চোখে		—শ্রীসপ্তিবংশ
৮৪১	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৮৪৫	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৮৪৯	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৮৫১	রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী		—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৫৮	নাক ও নাকের বদলে		—শ্রীঅমল দাশগুপ্ত
৮৫৯	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৮৬১	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৮৬৪	স্বয়ম্বরা	(গল্প)	—শ্রীরমেন গঙ্গোপাধ্যায়
৮৬৯	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৮৭১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকার
৮৭৭	খেলার কথা		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
৮৭৯	খেলাধূলো		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীসুনীল সাহা

বহুপ্রতীক্ষিত গ্রন্থখানি
প্রকাশিত হইয়াছে—

"দুর্গামা"

শ্রীশ্রীসারদামাতার মানসকন্যা,
তপস্বিনী গৌরীমাতার উত্তরসাধিকা,
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের পরিচালিকা,
দুর্গামাতার অপূর্ব জীবনচরিত।
শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।
(৫৪৮ পৃষ্ঠা, ২১ খানি ছবি)
মূল্য—আট টাকা

॥ ডাকযোগে লইতে মনিঅর্ডারে দশ টাকা পাঠাইবেন — আশ্রম-সম্পাদিকার নিকট। রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে গ্রন্থখানি যাইবে ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান
আকর্ষণীয়

অজস্র চিত্র সম্বলিত
বিচিত্র গল্পগ্রন্থ । মূল্য : দুই টাকা
লেখকের

আর একখানা বই

আরও বিচিত্র কাহিনী

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম : তিন টাকা

প্রকাশক :
এম সি সরকার এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিমিটেড

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

পি. ব্যানার্জীর

অর্শ চিকিৎসা

৩০ পিল টাঃ ২.৫০
১৬ পুরিয়া চূর্ণ ২.২৫
মলম ৩০ গ্রাঃ ২.৫০
বিনামূল্যে বিবরণী দেওয়া হয়

পি. ব্যানার্জী

৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫
৫০, গ্রে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

চিকিৎসকদের স্বনামধন্য স্বর্গীয়
ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মহান আদর্শে লিখিত একমাত্র
হোমিও পারিবারিক চিকিৎসার বই

আধুনিক চিকিৎসা

বহুল পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ এই মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশ পাইবে। পুস্তকটি যাহাতে চিকিৎসকদেরও বহু উপকারে আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনেক নূতন সংযোজন করিয়াছি। পুস্তকের পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিলে পুস্তক প্রকাশের পরেই রেজিস্ট্রী ডাকে প্রেরণ করিব। কোন ডাক খরচা লাগিবে না।

মূল্য : ৮৲ (শোভন) ও ৬৲ (সাধারণ)

চিঠিপত্র

'শূন্য' প্রসঙ্গে

আমি 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা। ৩য় খণ্ড ৪১শ সংখ্যার (১৩৭৭) শ্রীদেবল দেববর্মা লিখিত 'শূন্য' গল্পটি প্রসঙ্গে শ্রীমতী মিনারা খাতুন ৪৬শ সংখ্যায় (১৩৭৭) চিঠির মাধ্যমে গল্পের যে ত্রুটির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ঐ ত্রুটি সম্পর্কে আমিও শ্রীমতী খাতুনের সঙ্গে একমত। ঋতু বর্ণনার প্রসঙ্গে গল্পের দু' জায়গায় যে দু'রকম লেখা হয়েছে (এক জায়গায় পৌষ মাস এবং অপর জায়গায় কার্তিক মাস) তা আমারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং এই নিয়ে আমি বাড়ীতে আলোচনাও করেছি। কিন্তু প্রশংসাহীন পত্র পাঠালে তা প্রকাশিত হবে না এই আশংকায় আর পত্রাঘাত করিনি। কিন্তু শ্রীমতী খাতুনের চিঠি প্রকাশিত হতে দেখে আশান্বিত হয়ে চিঠিটি লিখছি। শ্রীমতী খাতুনের চিঠির উত্তরে দেওয়া লেখকের বক্তব্যও পড়লাম। লেখক বিনয়ের সঙ্গে ত্রুটি স্বীকার করলেও গল্পচ্ছলে যে-কাহিনীকে টেনে এনেছেন, তা ঠিক এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ব্যাকরণগত ভুলের কথা। ছন্দ-সৌন্দর্যের খাতিরে ব্যাকরণগত ভুলের কথা আছে কবিদের। ইংরেজীতে যাকে বলে Poetic Licence কিন্তু কাহিনী বিস্তারের ক্ষেত্রে পটভূমি রচনার সময় সুন্দর সুন্দর ভাষা ব্যবহারের ইচ্ছাপূরণের জন্য কাহিনীকালকে গল্পের দু' জায়গায় দু'রকম বলা ক্ষমার্হ নয় নিশ্চয়ই। তাছাড়া 'মেঘনাদ বধ' কাব্য প্রসঙ্গে বলা চলে যে, সকলেই তো আর বিদ্যাসাগর নন, কাজেই অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ত ব্যাকরণগত ঐ সূক্ষ্ম ভুলত্রুটি ধরা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু 'শূন্যের' এই ভুল সাধারণের পক্ষেও ধরা অসম্ভব নয়। সর্বোপরি বড় কথা, গল্পের তুলনায় কোন প্রশ্নই ওঠে না, কেননা দুটি ভুল একেবারেই দু' ধরনের।

লেখক শ্রীমতী খাতুনকে ধন্যবাদ জানালেও তাঁর চিঠি থেকে মনে হয় যেন, যেসব পাঠক-পাঠিকারা তাঁর ভুল ধরতে পারেননি, তাঁদের কথায় লেখক যেন সেই আনন্দই পেয়েছেন অনেকটা, যে আনন্দে শ্রীমধুসূদন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফিরেছিলেন। সাধারণ লোকেও যে ভুল ধরতে পারে সে-ভুল যেসব পাঠক-পাঠিকারা ধরতে পারেননি, তাঁরা যে দিবানিদ্রার পূর্ব-মুহূর্তে গল্পটি পড়েছিলেন, একথা ভাবলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। সেই জন্যেই বক্তব্য উদ্ধৃত করবার যুক্তি যে লেখক কোথায় পেলেন ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।

জানি না এতটা সমালোচনামূলক চিঠি প্রকাশের সম্মান লাভ করবে কিনা।

জয়শ্রী নাগ,
টালিগঞ্জ,
কলকাতা-৩৩

(২)

আমি আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃতের' একজন নিয়মিত অনুরাগী পাঠক। এই সপ্তাহের 'অমৃতে' (৪৬শ সংখ্যা) চিঠিপত্র বিভাগে চুঁচুড়া থেকে লেখা শ্রীমতী মিনারা খাতুন-এর চিঠি পড়লাম। দেবল দেববর্মা রচিত 'শূন্য' গল্পটির যে ভুলত্রুটি তিনি খুঁজে পেয়েছেন এবং সে-বিষয় তিনি যে মন্তব্য করেছেন, সে সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই, কারণ সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। কিন্তু ঐ চিঠির শেষ অংশে 'অমৃত' পত্রিকা সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, 'অমৃতের' একজন নিয়মিত পাঠক হিসেবে তার প্রতি আমার কিছু বক্তব্য আছে। ঐ চিঠির শেষাংশে শ্রীমতী খাতুন লিখেছেন 'অবশ্য এ-চিঠি অমৃতের পাতায় আদৌ ছাপা হবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহাকুল।'—এই বক্তব্যটুকু কেবল আমার নয়, এই রকম আমার মত বহু সমালোচকের। তাঁর এই ধারণা যে কত ভুল তা এই সপ্তাহের 'অমৃতে' তাঁর এই চিঠিই প্রমাণ করবে। বস্তুতঃ আমার মনে হয় 'অমৃতের' কোন নিয়মিত পাঠক বা পাঠিকা শ্রীমতী খাতুনের উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন না। আমার মতে 'অমৃতই' একমাত্র পত্রিকা (অন্ততঃ আমি যে-কটি সাহিত্য পত্রিকা পড়ি তার মধ্যে) যে তার পাঠক-পাঠিকাদের সুযোগ দেয়, তাদের স্বাধীন মতামত 'অমৃতের' পাতায় ব্যক্ত করতে। এর আগে প্রশংসাহীন বহু চিঠিই অমৃতের পাতায় স্থান পেয়েছে। শ্রীমতী খাতুন যদি তাঁর চিঠি লেখার আগে কিছু পুরানো 'অমৃত' পড়ে দেখতেন, তাহলে বোধহয় তাঁর শেষের মন্তব্যটুকু প্রয়োজন হত না। শ্রীমতী খাতুন লিখেছেন, তিনি 'অমৃতের' নিয়মিত পাঠিকা নন, এই ধরনের কোন মন্তব্য করার আগে 'অমৃত' সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়োজন ছিল না কি?

প্রশান্তকুমার দাস
সাহাগঞ্জ বাজার
[illegible]।

'অমৃত' প্রসঙ্গে

আমি 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। অমৃতের প্রতিটি বিষয় ও বিভাগ আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে এই পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাসগুলো। নিমাই ভট্টাচার্যের 'তোমাকে' ধারাবাহিক উপন্যাস আশা করি সকলের মনঃজয় করে চলেছে। সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ধারাবাহিক উপন্যাসখানা প্রশংসার যোগ্য। এছাড়া নিকট অতীতে আবদুল জব্বারের 'দুঃখের মেলা', শ্রীসমরেশ বসুর 'নিকটেই আছে' সকলের মন বিশেষভাবে জয় করেছে। এই লেখাগুলোতে সমাজের বিভিন্ন দিক যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। 'অমৃতে' উদীয়মান তরুণ লেখকদের ছোট গল্পগুলো সকলের মন জয় করতে পেরেছে। এছাড়া খেলাধুলোর আর্টিকল, চিত্রসমালোচনা, মনের কথা, বিজ্ঞানের কথা—সবকিছুই সমভাবে প্রশংসার যোগ্য।

'অমৃতের' এই সাফল্যের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে গভীর অভিনন্দন জানাই। আশা করি 'অমৃত' পত্রিকা পাঠকদের মনে নিয়মিতভাবে অমৃত দান করে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে এক শ্রেষ্ঠ পত্রিকার আসন দখল করবে।

—সীতেশ সান্যালচৌধুরী
সালকিয়া,
হাওড়া

'জলসা প্রসঙ্গে'

'অমৃতের' ১৯শে চৈত্র সংখ্যায় 'জলসা' বিভাগে 'কলামণ্ডলম্' আয়োজিত ভরত-নাট্যম অনুষ্ঠানের যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলার ইচ্ছা রাখি। শ্রীচিত্রাঙ্গদার মতে 'শবরী' নৃত্য অনুষ্ঠিতে অংশগ্রহণ করেছেন প্রীতি মেনন, জলজা ওয়ারিয়ার ও জয়শ্রী ওয়ারিয়ার। তিনি এদের নাচের প্রশংসাও করেছেন কিন্তু যদিও নৃত্য-সংস্থার সার্কুলারে এই তিনজনের নামই প্রকাশিত হয়েছিল, কার্যতঃ 'শবরী'-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন শুধু প্রীতি মেনন। জলজা ও জয়শ্রী ওয়ারিয়ার সেদিনকার নৃত্য-অনুষ্ঠানে কোন কারণ-বশতঃ অংশগ্রহণ করেননি। শ্রীচিত্রাঙ্গদা একক নৃত্যকে সম্মিলিত নৃত্য বলে ভুল করলেন কী করে? তিনি কী অনুষ্ঠানের

চিঠিপত্র

বিবরণী লিখতে শুধু সংস্থাগুলির সাহায্যই নিয়েছেন? দ্বিতীয়তঃ 'সাগরে' নৃত্যে ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন জয়শ্রী নয়—সুজাতা ওয়ারিয়ার। ভবিষ্যতে এ-ধরনের অনুষ্ঠানের বিবরণীতে আর একটু তথ্যগত যাথার্থ দেখতে পাবো কী?

মীরা পাকড়াশী
ন্যাশনাল লাইব্রেরী,
কলিকাতা-২৭

'তোমাকে'

আমি 'অমৃত' নিয়মিত পড়ি। নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা 'তোমাকে' পড়ছি। সত্যি খুব ভাল লাগছে। বিশেষ করে মানসী ও বুলোর ঘটনাবলী। এই উপন্যাসে আমার জীবনেরও কিছু কিছু ঘটনা দেখতে পাই।

এই উপন্যাসের ভাষা সুন্দর প্রাঞ্জল। লেখকের কখন আবেগ, কখন অভিমান সত্যি মনকে আনন্দ দেয়। লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, জানি না আমার এ-চিঠি অমৃতে ছাপা হবে কিনা?

স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
আড়ংঘাটা
নদীয়া

প্রেক্ষাগৃহ

১০ম বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা 'অমৃতের' ৩১৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'প্রেক্ষাগৃহ' বিভাগে কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়লো। সেইগুলি যথাক্রমে লিখছি—

প্রথমতঃ, 'বি এফ জে এ-র বিচার—বছরের সেরা দশটি ভারতীয় চিত্র' কলমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছবির কিঞ্চিৎ স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে 'সমাজকো বদল ডালোকে' পঞ্চম ও 'দিবারাত্রির কাব্যকে' ষষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। একটি বিখ্যাত দৈনিক কাগজে কিন্তু দেখেছি—'দিবারাত্রির কাব্য' ছবি পঞ্চম ও 'সমাজকো বদল ডালো' ছবি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, এতে পুরস্কৃতদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হয়নি। শ্রীনান্দীকর প্রদত্ত তালিকার সঙ্গে এই অংশটুকু যুক্ত হবে—শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র (বাংলো—সাগিনা মাহাতো), এম আর আচরেকার (হিন্দী ও অন্যান্য—মেরা নাম জোকার)। শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রী : জে ডি ইরাণী, দুর্গাদাস মিত্র (বাংলা—প্রতিদ্বন্দ্বী), আলাউদ্দীন (হিন্দী ও অন্যান্য—মেরা নাম জোকার)। শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা : দুলাল দত্ত (বাংলা—প্রতিদ্বন্দ্বী), ভরুপ দত্ত (হিন্দী ও অন্যান্য—সফর)।

তৃতীয়তঃ, শ্রীনান্দীকর লিখেছেন, 'বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে রাজ-কাপুরকে...'। কিন্তু তা ঠিক নয়। বিশেষ এই পুরস্কারটি পেয়েছেন ঋষি রাজ-কাপুর।

শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সগড়াই : বর্ধমান।

'বৃত্ত' গল্প প্রসঙ্গে

গল্পের ভাল নির্বাচনের দরুণ 'অমৃত' আজকাল দারুণ উপভোগ্য বলে মনে হচ্ছে আমার। বিগত ১৩৭৭, ৪৪শ সংখ্যায় বৈদ্যনাথ সাহার 'বৃত্ত' ছোটগল্প বেশ ভালো লেগে গেল। লেখক অতি সুকৌশলে উক্ত গল্পে রীতিমত আধুনিকতা বজায় রেখে সহজ সরল ভাষার প্রয়োগ দ্বারা জীবনের এক টুকরো ছবি পাঠক সমক্ষে তুলে ধরেছেন। গল্পটি পড়ে বোঝা যায়, সমাজে লেখাপড়া শিখে বয়সে ও বুদ্ধিতে কর্মোপযুক্ত হয়ে যারা দেখে করার মত কোন কর্ম নেই, কিন্তু কর্ম না করলেও সামাজিক, সাংসারিক এবং দৈহিক সমস্যা আছে প্রচুর, তারা নিজেদের অজান্তে কর্মক্ষুধা নিবারণে অনেক অপকর্ম করতে শুরু করে এবং স্বভাবতই ভালো কর্মওয়ালা লোক দেখলেই মনে তাদের বিদ্বেষ জাগে। উক্ত গল্পে একজন লেখকের প্রতি তিনজন বেকার যুবকের অহেতুক বিদ্বেষ অপরাধজনক এবং নিন্দাসূচক হলেও অস্বাভাবিক নয়। উপসংহারে দেখা যায় সুখী মানুষ লেখকের অন্তরালে আরেকজন সমস্যাজীর্ণ মানুষের পরিচয় পেয়ে বেকারদের একজন (গল্পের লেখক) সুবোধ যুবকে রূপায়িত হচ্ছেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে লক্ষণীয় যে সমাজের বর্তমান অচলাবস্থার দরুণ যুব-সমাজরাই পুরোপুরি দায়ী নয়। দায়ী বলতে চিরন্তন একই কথা বলতে হয়—আমাদের সমাজব্যবস্থা।

পরিশেষে বলতে হচ্ছে 'অমৃত'এ মাঝে মাঝে এধরনের গল্প প্রকাশিত হলে পাঠক-সমাজ বাধিত হবেন। লেখক ও সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কেশেপদ সাহা
ধনিয়ান, মুর্শিদাবাদ

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি পড়ে অভিভূত হচ্ছি। পূর্বকালের পট-ভূমিকায় এ অবধি অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে, কিন্তু এর সঙ্গে [illegible]টিরই তুলনা হয় না। আমি মনে করি, এমন 'অমৃত' পত্রিকা এবং পত্রিকার পাঠকদের গর্বিত হওয়া উচিত। উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়ে থাকবে কোন সন্দেহ নেই। উপন্যাসটির লেখক সম্বন্ধে কিছু বলা অবান্তর, কেননা, তিনি ছোট-খাট প্রশংসার অনেক ঊর্ধ্বে। এবং পরিকল্পনা অভূতপূর্ব। এমন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় আনন্দ দেওয়া ও হৃদয় নেওয়া শুধু এর লেখকের পক্ষেই সম্ভব। তাঁকে নমস্কার জানাই।

'অমৃত' পত্রিকার দুর্বার আত্মপ্রকাশের জয়যাত্রা কামনা করি।

নিখিল রায়,
দুর্গাপুর-২

(২)

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' শীর্ষক উপন্যাসের বলিষ্ঠ হৃদয়গ্রাহী লেখনীর জন্য অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। আগামী সংখ্যায় এই উপন্যাসের শেষ কিস্তি প্রকাশ হবে পড়ে বিচলিত হয়ে উঠেছি। যত পড়ছিলাম ততই পড়ার উৎসাহ বাড়ছিল।...যেন আরও খানিকটা থাকলে ভাল হত।

'অমৃত' কর্তৃপক্ষের কাছে আমার সবিনয় প্রার্থনা, তাঁরা যেন এই রকম রুচি-শীল লেখাই 'অমৃতে' প্রকাশ করেন। দামী নামের চেয়ে দামী লেখার দিকে দৃষ্টি দিলে 'অমৃতের' সুনাম উত্তরোত্তর যে বৃদ্ধি পাবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মণিমোহন তেওয়ারী
তালডাংরা, বাঁকুড়া।

'অমৃত' ও 'পিঞ্জর'

আমি একজন মাদ্রাজের বাসিন্দা। এখানে বাংলার কোনরকম স্পর্শ পাওয়া যায় না। এখানে 'অমৃত' পত্রিকাটি আসে। এই একটিমাত্র বাংলা পত্রিকার জন্য আমি সারা সপ্তাহ উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। এ-জায়গায় পত্রিকা পাঠানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি অমৃতের নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকায় সুভাষ সিংহের 'পিঞ্জর' গল্পটি আমার খুব ভাল লেগেছে। লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আপনাকেও ধন্যবাদ গল্পটা প্রকাশের জন্য।

রাণা সেনগুপ্ত,
ফিলিপস স্ট্রীট,
মাদ্রাজ।

দেশে বিদেশে

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ইসলামাবাদের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর যে দুই সপ্তাহ সময় পার হয়ে গেল, সেই সময়ের ভিতর ধীরে ধীরে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে আসছে।

(১) পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা বাংলাদেশ থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের তাড়িয়ে, নিজেদের সংবাদপত্রগুলির উপর কঠোর সেন্সর আরোপ করে এবং রেডিওর মারফৎ ক্রমাগত 'সব স্বাভাবিক' বলে প্রচার চালিয়েও একথা সারা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে গোপন করতে পারেননি যে, সামরিক-বাহিনীর অভিযানের দ্বারা বাংলাদেশকে পদানত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। বন্দর, বিমানঘাঁটি, সেনানিবাস এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো দুই-একটা বড় শহরের বাইরে আর কোথাও সামরিকবাহিনীর অস্তিত্ব নেই, একথা এখন আর সারা পৃথিবীর চক্ষুষ্মানদের বুঝতে বাকী নেই। যশোর ও কুষ্টিয়া বাংলাদেশের অন্ততঃ এই দুটি শহরে গিয়ে বিদেশী সাংবাদিকরা দেখে এসেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেদেশের যোদ্ধারা শুধু প্রচণ্ড মনোবল সম্বল করে পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীর অস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আর সারা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলই যে 'বাংলাদেশের হাতে' রয়েছে সেকথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-দপ্তরের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) অসামরিক অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সামরিকবাহিনীর পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করে পাকিস্তান যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকি যেভাবে ধ্বংস, লুঠপাট ও নারীধর্ষণ করছে, তার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত এখন শুধু বে-সরকারী স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, সরকারী স্তরেও এই বিশ্ব জনমতের অল্পস্বল্প অভিব্যক্তি দেখা যেতে আরম্ভ করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া খুব সাফ কথায় এবং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতকটা ঢেকে-ঢেকে এই রক্তলোলুপতার সমালোচনা করেছে। ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছিল, বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালান হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী যেন ধিক্কার দেয়। কতকটা ভারত সরকারের চেষ্টার ফলে, কতকটা সংবাদপত্রের বিবরণ, বাংলাদেশ থেকে যেসব বিদেশী চলে এসেছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ ও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ঐ তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্র তাদের প্রথম দিককার ঔদাসীন্য কাটিয়ে উঠেছে। তারা এখন এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যখন তারা বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য ইসলামাবাদের উপর চাপ দিতে প্রস্তুত। বর্মা ইতিমধ্যে পাকিস্তানকে তেল বিক্রি করা বন্ধ করেছে এবং সিংহল পাকিস্তানী বিমানকে তার মাটিতে নামতে দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করছে।

সবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা একজন মুক্তিযোদ্ধা

(৩) বাংলাদেশে এই ধ্বংসলীলার পিছু পিছু দুর্ভিক্ষ ও মড়ক দেখা দেবে বলে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট, বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম ও মার্কিন পররাষ্ট্র-দপ্তর বাংলাদেশের দুর্গত মানুষকে সাহায্য দেওয়ার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রয়াস গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রশের একটি বিমান ইতিমধ্যে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ঢাকার পথে করাচীতে গিয়েছিল। কিন্তু ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে ঢাকায় যেতে দেননি। তাঁদের যুক্তি, তাঁদের অনুমোদন না নিয়ে এই সাহায্য পাঠান হয়েছে।

(৪) বিশ্ব জনমতের দরবারে এভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়ে পাকিস্তান এখন নিজের দোষ ঢাকবার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার-অভিযানে নামছে। সে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, ভারতবর্ষ বাংলাদেশ সম্পর্কে লোকসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে, সমুদ্রে পাকিস্তানী জাহাজকে হয়রান করে, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়ে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করছে। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করার বিষয় তা হল, চীন ছাড়া অন্য কোন দেশ এখন পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এই অভিযোগে কান দেয়নি।

(৫) অন্যদিকে, এই ব্যাপারে পাকিস্তান মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক প্রভৃতি দেশকে নিজের পক্ষে আনতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে। এরা সকলেই বলেছে, বাংলাদেশে যা হচ্ছে, সেটা পাকিস্তানের নিজস্ব ব্যাপার। ইরাণ, তুরস্ক প্রভৃতি 'সেণ্টো' দেশগুলিও এই জোটের অন্যতম শরিক পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য সামরিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

(৬) ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের ত্রিভুজ সম্পর্কের কাঠামোটির কি ধরনের পরিবর্তন দরকার, সে-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজধানীগুলিতে চিন্তাভাবনা শুরু হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের হেঁয়ালি ভাবার আগেকার প্রশ্ন অবশ্য হল, বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণাম কি? সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁকে যে-পত্র দিয়েছেন তাতে তিনি বাংলাদেশে সামরিক সমাধান না খুঁজে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজবার পরামর্শ দিয়েছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র-দপ্তরের বিবৃতিতেও 'শান্তিপূর্ণ মীমাংসার' কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে তাঁরা মীমাংসার ও শান্তির কি পথ দেখেন?

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধ করে আবার রাজনৈতিক আলোচনা করা সম্ভব, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, এই আলোচনা হবে কি নিয়ে। গত ২৫ মার্চ তারিখে অকস্মাৎ রাস্তায় মিলিটারি নামিয়ে বাঙালীদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার নীতি চালু করা হল, শেখ মুজিবর রহমানের অনুগামীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মুজিবর ও তাঁর অনুগামীদের দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করলেন, ইয়াহিয়ার ফৌজ মৃতের পাহাড় তৈরি করল, পুরুষ-নারী-শিশুকে নির্বিচারে খুন করল, লুঠতরাজ, ধ্বংস ও ধর্ষণ চালিয়ে সমগ্র বাঙালী জাতির শত্রুতা করল, এত কাণ্ডের পর আবার নূতন করে আলোচনা শুরু হবে কোথা থেকে?

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অবশ্য একটা চেষ্টা করতে পারেন। তিনি কিছু কুইসলিং খুঁজে বার করে তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে পারেন। পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা নূরুল আমিন, পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হকচৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলে পাকিস্তান থেকে খবর প্রচার করা হয়েছে। নূরুল আমিনের নিজের কণ্ঠস্বরে এই ধরনের কথা পাকিস্তান বেতার থেকে প্রচার করা হয়েছে। এইসব প্রচারের সত্য-মিথ্যা যাই থাকুক, কুইসলিং খোঁজার জন্য ইয়াহিয়া সরকার যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন সেটা এই প্রচারের মধ্য দিয়েই বোঝা যাচ্ছে। পাকিস্তান অনবরত যে ভারতের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করে যাচ্ছে, তারও উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এই চেষ্টায় কিছু কিছু সাফল্যের লক্ষণও ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। মুসলিম লীগ, জামাৎ-এ-ইসলাম প্রভৃতি দলের সমর্থকরা খুব সন্তর্পণে সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও কোথাও তারা মুক্তিফৌজের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে বলে প্রকাশ।

কিন্তু তাহলেও, সংগ্রামী বাঙালীদের মধ্যে বড় রকমের কোন বিভেদ আনতে ইয়াহিয়া সরকার সমর্থ হবেন বলে মনে হচ্ছে না। একটি কুইসলিং সরকার প্রতিষ্ঠা করা যদিবা সম্ভব হয়, সেই সরকার পূর্ব বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান হাই-কমিশনার অফিসের সেকেণ্ড সেক্রেটারি কে এম শাহাবুদ্দিন ও সহকারী প্রেস অ্যাটাশে আমজাদুল হক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে যে-বিবৃতি দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে, এমনকি উচ্চ পদাধিকারী বাঙালী অফিসারদের মধ্যেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে কি দারুণ বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছে। শুধুমাত্র বাঙালী হওয়ার অপরাধেই যেখানে হাজার-হাজার, অথবা লক্ষ-লক্ষ মানুষকে মরতে হয়েছে, সেখানে দখলদারদের হয়ে কথা বলার জন্য কজন বাঙালীকে পাওয়া যাবে?

তাহলে ইয়াহিয়া কি করবেন? তিনি কি পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে সেখান থেকে সরে আসবেন? অথবা যুদ্ধ করে 'বিদ্রোহী' বাঙালীদের শায়েস্তা করবেন? যাই তিনি করুন না কেন, বিদেশী সংবাদপত্রগুলি এ-বিষয়ে একমত যে, দুই পাকিস্তান আর কখনই এক হবে না। যেমন, 'নিউইয়র্ক পোস্ট' পত্রিকায় মার্কাস শার্পার লিখেছেন, 'পাকিস্তানের ভাঙা টুকরোগুলো আর জোড়া লাগানো যাবে না।'

দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ইয়াহিয়ার নেই। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে তার ফৌজ তেলের অভাবে এগোতে পারছে না। বর্ষা নামলে এই ফৌজের এগোবার ক্ষমতা আরও কমে যাবে। দীর্ঘ যুদ্ধ চালাতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর যে অর্থনৈতিক আঘাত আসবে, তা সামলান অসম্ভব।

ভাঙা পাকিস্তান যে আর জোড়া লাগবে না, এই অনুমানের একটা বড় যুক্তি হল, পাকিস্তানের মূল ভিত্তি যে দ্বিজাতি-তত্ত্ব, সেই তত্ত্বকেই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে বাংলাদেশের ঘটনা। বাংলাদেশের মানুষ এ-কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, শুধু ধর্মের বন্ধনে একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলা যায় না এবং ধর্মের প্রাচীর তুলে সাংস্কৃতিক ঐক্যকে অস্বীকার করা যায় না। পাকিস্তানের শাসক-চক্র এ-কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। বুঝতে পারছেন বলেই রাষ্ট্রায়ত্ত পাকিস্তান টাইমস পত্রিকায় লেখা হয়েছে, 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে আমরা প্রথমেই ভুল করেছি। হিন্দু-মুসলিম যুক্ত নির্বাচনই বাংলাদেশের ভিত্তি তৈরি করেছে।' পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন উর্দু পত্রিকায় বলা হয়েছে, দু'কোটি হিন্দু ভোটাধিকার পেয়ে ১২ কোটি পাকিস্তানীর ব্যাপারে ভেটো প্রয়োগ করছে। আবার একটি উর্দু পত্রিকায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে, মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দুদের ভোটের অধিকার আদৌ থাকা উচিত কিনা। কিন্তু, এইসব ধর্মের ধুয়া তুলে ইয়াহিয়া ও তাঁর পরামর্শদাতারা কি বাংলাদেশে ইতিহাসের চাকা উল্টে দিতে পারবেন?

দুঃখের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াকে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে তাদের ভবিষ্যৎ নীতি স্থির করার আগে উপরের এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে হবে। পাকিস্তান সম্পর্কে আমেরিকার নীতির যে কাঠামো জন ফস্টার ডালেসের আমলে তৈরি হয়েছিল, এখনও মোটামুটি সেই নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। ডালেস স্থির করেছিলেন যে, বন্ধু হিসাবে ভারতের চেয়ে পাকিস্তান অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান ভারতের চেয়ে অধিকতর স্থায়িত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনা। পাকিস্তান একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনকে খেলিয়ে তার আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের দাম নিয়েছে। আর নয়াদিল্লীতে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যখন একটা স্থায়ী সরকার গঠিত হল, তখন প্রতিবেশী পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সমাধি ও বাঙালী ভাইদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে দুই দেশের মধ্যে কোনটির সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা সহজতর। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এখন মুশকিল হচ্ছে এই যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আগুনে হাত দিয়ে আঙুল পোড়াবার পর এখন সে-দেশের জনমত এশিয়ার অন্য কোন দেশের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে খুবই অনিচ্ছুক। নিক্সন সরকারের পক্ষে এই জনমত অগ্রাহ্য করে কোন কিছু করা সহজ হবে না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে দমন করার জন্য ইয়াহিয়াবাহিনী যে আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহার করছে, সে-বিষয়েও কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু করবে না? মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি একটি কঠোর বিবৃতি দিয়ে সেদেশের সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে যারা এই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের নিবৃত্ত করার ব্যাপারে মার্কিন সরকারের দায়িত্ব আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে মার্কিন অস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্নটি উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। তার পররাষ্ট্র-দপ্তরের মুখপাত্র ১৯৫৪ সালের মার্কিন-পাকিস্তান চুক্তির কথা উল্লেখ করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহার করার অধিকার পাকিস্তানের আছে। কিন্তু পরে ওয়াশিংটনের এই নিশ্চিন্ততার পরিবর্তে কিছু উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। (পররাষ্ট্র-দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সরিয়ে আনার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের রেখে-ঢেকে কথা বলতে হচ্ছিল।)

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ইসলামাবাদের সম্পর্কটা গত কয়েক বছর যাবৎ উন্নতির পথে যাচ্ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে

পত্তিত এবং দেড় হাজার মাইলের বেশী ভৌগোলিক ব্যবধানের দ্বারা বিভক্ত পাকিস্তানকে স্ট্যালিন একটা 'আজগুবী জিনিস' মনে করতেন। সম্প্রতি তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীকে পি এস মেনন স্ট্যালিন নিজে সে-কথা বলেছেন। কিন্তু ইদানীং সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে একটা মধুরপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে, তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিই সোভিয়েট রাশিয়া বেশী নজর দিয়েছে। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশেই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিবেশী, পূর্ব অংশ নয়। স্বাভাবিকভাবে, সেই কারণেই রাশিয়া পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছে। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একদিন বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, এই হিসাবটা বোধহয় রাশিয়ার নীতিনির্ধারকেরা গণনার মধ্যে আনেননি।

চীন ইদানীং কালে ইয়াহিয়া খাঁর পিছনে খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সে ভারতকে পাকিস্তানের ব্যাপারে নাক গলাতে নিষেধ করেছে। এর দ্বারা সে হয়ত বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে, ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতায় সে পাকিস্তানের সঙ্গে আছে। কিন্তু ভারত-বিরোধিতার খাতিরেও চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে তার বৈপ্লবিক ভাবপ্রতিমাকে ম্লান হতে দেবে কিনা সেটা লক্ষ্য করার বিষয়।

ইতিমধ্যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, কিছু দিনের ভিতরেই স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রীদের নাম এবং রাজধানীর নাম ঘোষণা করা হবে। যদি তা করা হয়, তাহলে সেই সঙ্গেই ঐ অস্থায়ী সরকার নিশ্চয়ই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে স্বীকৃতির জন্য আবেদন জানাবেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দল, জননেতা ও সংসদের সদস্যরা, কোন কোন বিধানসভা এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকার অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন। এই দাবীর সপক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল: (১) বাংলাদেশের যে প্রার্থীরা জনগণের ভোটে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছেন, তাঁদের সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে অসঙ্গতি কিছু নেই। বরং এই সরকার ইসলামাবাদের ক্ষমতা-দখলকারী সামরিক শাসকদের চেয়ে অধিকতর বৈধ হবেন। (২) স্বীকৃতি দেওয়া মানে যা অনিবার্য তাকেই মেনে নেওয়া। (৩) ভারত যে সব সময় অন্যের পিছু পিছু না গিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের নীতি স্থির করতে পারে এবং এই একটি ব্যাপারে অন্যান্য রাষ্ট্রের পথপ্রদর্শক হতে পারে সেটা দেখান দরকার। (৪) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক বা না হোক ইসলামাবাদের সঙ্গে নয়াদিল্লীর বন্ধুত্ব হওয়ার আশা আর নেই। অথচ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে ভারতবর্ষের দুই দিককার সীমান্তে দুটি বিদ্বেষভাবাপন্ন দেশের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। (৫) চীন যদি হঠাৎ তার মতি পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে ভারত অসুবিধায় পড়ে যেতে পারে। (৬) সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত যে সহানুভূতি দেখাচ্ছে, স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তাকে একটা বাস্তব রূপ দেওয়া যাবে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অনেকখানি বেড়ে যাবে।

অবশ্য বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দানের বিরুদ্ধেও যে কিছু মতামত শোনা যাচ্ছে না তা নয়। কাশ্মীরের আওয়ামী সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান মৌলানা মহম্মদ সায়ীদ বলেছেন, বাংলাদেশে যা হচ্ছে সেটা 'একটা স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক মতবৈষম্য' এবং এ-ব্যাপারে ভারতের কিছু করতে যাওয়ার মানে হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক আচরণবিধি নগ্নভাবে লংঘন করা।' শ্রীনগর থেকে নির্বাচিত লোকসভার নির্দলীয় সদস্য শামিম আহমেদ শামিমও চান না যে, বাংলাদেশের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলনে ভারত কোনরকম উৎসাহ দিক। আবার কোন কোন মহল থেকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, ভারতবর্ষ যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে অযথা তাড়াহুড়া করে, তাহলে ইসলামাবাদ ভারত-বিরোধী জিগির তুলে বাংলাদেশের জনগণকে বিভক্ত করার সুযোগ পাবে।

কিন্তু বিরুদ্ধ মত যাই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের সমর্থনে আমাদের দেশে মানুষের যে আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাতে নয়াদিল্লীর পক্ষে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় থাকবে না এবং এই সম্ভাবনাও প্রবল যে, এ-ব্যাপারে ভারত যদি এগিয়ে আসে, তাহলে অন্ততপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া তাকে অনুসরণ করবে। ঘটনার গতি সেদিকেই যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

—পুণ্ডরীক
১, ৪, ৭১

*

ইয়াহিয়া খানের জহ্লাদবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের সায়েস্তা করতে না পেরে সাধারণ মানুষদের মনোবল নষ্ট করবার জন্যে বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এই গণহত্যা বন্ধ করা এবং সীমান্তে ধৃত সাংবাদিকদের মুক্তির দাবীতে অমৃতবাজার পত্রিকা-যুগান্তর-অমৃত কর্মচারী সমিতির তরফ থেকে গত শনিবার কলকাতার পাক ডেপুটি হাই-কমিশনারের অফিসের সামনে বিপুলভাবে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সমিতির সভাপতি শ্রীহরিদাস ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লরতন গাঙ্গুলী ডেপুটি হাই-কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

পাক বর্বরতার বিরুদ্ধে কলকাতাস্থিত পাক ডেপুটি হাই-কমিশনের সামনে শনিবার অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও অমৃত কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

নববর্ষের বাংলা দেশ

বর্ষচক্রের আবর্তনে আবার নববর্ষের প্রথম দিনের সূর্য তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে আমাদের জীবন উদ্ভাসিত করল। শুভ নববর্ষ, শুভ পয়লা বৈশাখ আমাদের কাছে একটি বিশেষ দিন। এই দিনে আমরা সকলকে জানাই শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সকলের কল্যাণে, বিশ্বের কল্যাণে এই দিনটি অক্ষয় জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠুক। আমাদের জীবনে বিগত দিনের গ্লানি, হতাশা এবং অসাফল্যের বেদনা দূর হয়ে নতুন দিনের আলোয় সার্থকতায় ও সাফল্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। আমরা এক অভাবিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মর্মান্তিক ঘটনাবলী থেকে। বাংলাদেশ রাজনীতির বিধানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবার পর সীমান্তের এপারে ও ওপারে এক কৃত্রিম বিরোধ ও অবিশ্বাস সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে আসছিল গত ২৩ বছর ধরে। ওপার থেকে সংখ্যালঘুরা বার-বার বিতাড়িত হয়ে এসেছেন এপারে। আমরা ভেবে অবাক হয়েছি পূর্ব বাংলার মাটিতে কেন এই অসহায় সংখ্যালঘুদের স্থান হচ্ছে না। এখন তার কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্ব বাংলা যাঁরা শাসন করতেন তাঁরা নির্বিচারে সকলের ওপরেই চালিয়েছেন শোষণ ও অত্যাচার। সংখ্যাগুরুরা পালিয়ে আসতে পারে নি, সংখ্যালঘুরা সমস্ত বিসর্জন দিয়ে চলে আসত সীমান্তের এপারে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে গত ২৩ বছর পূর্ব বাংলার মানুষ নানাদিক দিয়ে শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছেন। তার নজীর এত বিশদ যে, এখানে তা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন নেই বলে মনে করি। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা বলছেন যে, এ হল এক বিচ্ছিন্নতাকামী বিদ্রোহ, একে দমন করতেই হবে। সারা দুনিয়ার মানুষ স্তম্ভিত হয়ে দেখেছে যে, পাকিস্তানীরা যে দেশকে তাদের এক্তিয়ারভুক্ত বলে মনে করে সেই বাংলাদেশের নিরস্ত্র লক্ষ-লক্ষ মানুষকে বোমা, মেশিনগান ও নাপামের আগুনে ঝলসে হত্যা করছে। এ শুধু আমাদের কথা নয়। পাকিস্তানের মিত্র এবং তার প্রধান অস্ত্রসরবরাহকারী মার্কিন দেশের সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল নেতাও এই গণহত্যায় স্তম্ভিত ও মর্মাহত। একটি দেশের সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী যে এই রকম দস্যুবৃত্তি করতে পারে তা বাংলাদেশে পাক সেনাদের অত্যাচার না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত।

আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, অত্যাচার করা হচ্ছে তাদেরই ওপর যাদের একই ধর্মাবলম্বী দাবী করে একটি রাষ্ট্রের এক্তিয়ারে আনা হয়েছিল। ধর্মই যে এক জাতিতত্ত্বের মূল সূত্র নয় তা পাকিস্তানীরা প্রমাণ করল বাংলাদেশে। বাংলাদেশে আজ মুস্লিম ও হিন্দু একই সঙ্গে প্রাণ দিচ্ছেন নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। এই মুক্তিযুদ্ধ বাংলার মানুষের স্বধর্ম রক্ষার যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাঙালীর জয় সুনিশ্চিত। বাংলাদেশের মানুষ কখনো একথা বলেনি যে, তারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবীর ভিত্তি হল বাংলাদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন। দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পরই তাঁরা এই দাবী তুলেছিলেন। এই দাবীর ভিত্তিতেই তাঁরা পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণের বিপুল সমর্থন পেয়েছিলেন।

নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করার নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, পাকিস্তানের শাসকরা কোনদিনই বাংলাদেশের মানুষকে, তাঁদের নেতাদের বিশ্বাস করতেন না। নতুবা আলোচনা শেষ হবার আগেই জল্লাদ বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে বাংলার নরনারী শিশুকে, তার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিককে বেয়নেটের মুখে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ইয়াহিয়া খান এমন মরিয়া হয়ে উঠলেন কেন?

একে আমরা গৃহযুদ্ধ বলি না। এ হল মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের দ্বারাই স্থির হবে বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীন জীবন যাপন করবে, না ইসলামাবাদের দাস হয়ে থাকবে। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এত বড় গণহত্যার পরও বিশ্বের বিবেক জাগ্রত হয় নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিজেকে শান্তির প্রহরী বলে বড়াই করে থাকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট মহোদয় এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, পাকিস্তান সরকার যদি অনুরোধ করে তাহলেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাংলাদেশে যুদ্ধে নির্যাতিতদের সহায়তার জন্য এগিয়ে যেতে পারে। কোরিয়া যুদ্ধের সময় তো রাষ্ট্রসঙ্ঘকে কারুর অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করতে হয় নি? দুর্বল ও দরিদ্র বলেই কি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ এভাবে অত্যাচারীর হাতে প্রাণ দেবে? বিলম্বে হলেও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খান বাহিনীর নারকীয় গণহত্যা সম্পর্কে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিবাদকে ইয়াহিয়া খান তাঁর দেশের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে পরোক্ষে অভিযোগ করেছেন। আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একমাত্র আমেরিকাই পারে এই জল্লাদের রক্তসিক্ত হাত মুচড়ে ধরতে। আমেরিকার অর্থে ও অস্ত্রেই পাকিস্তানের জল্লাদরা তার নিজের দেশবাসীকে এমনভাবে হত্যা করার শক্তি ও সামর্থ পেয়েছে। মার্কিন সরকারের ক্ষোভকে আমরা যথার্থ বলেই মনে করি। আমরা আশা করব, বাংলাদেশ নিশ্চিহ্ন হবার আগেই বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষ করে আমেরিকা ইসলামাবাদকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবেন যে, এই গণহত্যা তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। বাংলাদেশের দাবী ন্যায্য এবং এই যুদ্ধ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক অভিমতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিকে ধ্বংস করার জন্য। আমরা দুই বাংলার মানুষ নববর্ষের দিনে এই প্রার্থনাই করব, অত্যাচারী যেন শাস্তি পায়, নিপীড়িতের বন্ধনমুক্তি যেন হয় সুনিশ্চিত।

CENTRAL LIBRARY

এক নজরে

মহাভারতের সেই কলঙ্কিত অধ্যায় :

রাজদরবারে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, ভীম, অর্জুন প্রমুখ মহাপরাক্রম বীরবৃন্দ স্থিরদৃষ্টি প্রস্তরমূর্তির মতো বসে আছেন, আর নির্লজ্জ নিষ্ঠুর দুঃশাসন তাঁদের সম্মুখে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে লাঞ্ছিত করছে দ্রৌপদীকে। অপমানিতা নিগৃহীতা দ্রৌপদীর আর্ত কণ্ঠের আকুল প্রার্থনা সভাগৃহে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। কিন্তু সভাস্থ কেউ এগিয়ে আসছেন না সেই বিপন্না নারীকে রক্ষা করতে। অবমানিতা মানবীর আর্তকণ্ঠের ভর্ৎসনায় কাতর্যহীন সেই ধিক্কার মনুষ্যত্বের কাছে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, শক্তি ও কর্তব্যবোধের সেই নির্লজ্জ পরাজয়ের কাহিনী যেন আরও ভয়াল ভয়ঙ্কররূপে অভিনীত হচ্ছে আজকের বিশ্বে। পাকিস্তানের জঙ্গী নায়ক, নাদির শাহের বংশধর ইয়াহিয়া খাঁ সমগ্র শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙলার বুকে। বাঙালীর রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে সোনার বাঙলার শ্যামল প্রান্তর, বাঙলাদেশের মেয়েরা পাঠান সৈন্যদের পাশব লোলুপতা থেকে রক্ষা পেতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মৃত্যুর বুকে, সন্তানহারা বাঙালী মায়ের বুকফাটা আর্তনাদে আলোড়িত হচ্ছে বিশ্বের আকাশ-বাতাস। মানবিক কারণে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের আবেদন পৌঁছেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দরবারে, পৌঁছেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত, বৃটেন সকলের কাছে। কিন্তু সকলেই মূক, সকলেরই মুখে নিরুপায়ের অভিব্যক্তি। ইয়াহিয়াকে সংযত হওয়ার জন্য ক্ষীণ আবেদন জানিয়েছে হয়ত বা কেউ-কেউ, কিন্তু সে আবেদনের অন্তঃসার-শূন্যতা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি সেই রক্তলোলুপ নিষ্ঠুর জঙ্গী শাসকের। তাই তার জিঘাংসা দিনে-দিনে হয়ে উঠছে আরও সর্বনাশা, আরও ভয়ঙ্কর। একেবারে পায়ের কাছে এসে পড়ে নতিস্বীকার করতে হবে বাঙলা দেশকে, তবেই সংযত হবে ইয়াহিয়ার নিষ্ঠুরতা।

কিন্তু মহাভারতের কাহিনী দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও পরাজয়ে শেষ হয় নি। রাজদরবারে তাঁর আবেদন সাড়া না পেলেও ভগবানের কানে তা পৌঁছেছিল, আর সেই কারণেই সেদিন আপাতদৃষ্টিতে অসহায়া সেই বীরাঙ্গনারই জয় হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। দ্রৌপদীকে সভাস্থলে বিবস্ত্রা করতে এসে সভাস্থলেই পরাজয়ের গ্লানি মাথা পেতে নিতে হয়েছিল ক্লান্ত অবসন্ন দুঃশাসনকে। একই কারণে, বাঙলাদেশে আজ যে বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে না। বিশ্বের ভাণ্ডারীকে এ ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। ইতিহাসের দেবতা যার সহায় তার জয় অনিবার্য।

পরাজয় মেনে নেওয়াই ভালো :

লোকসভার সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের নানা কারণ উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন পরাজিত পক্ষের নেতৃবৃন্দ। বিরোধী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেছেন, নানা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সরকারপক্ষ নির্বাচনের ফলাফল তাঁদের অনুকূলে নিয়ে গেছেন; এস এস পি নেতা রাজনারায়ণ বলেছেন, ব্যালটপত্র অদল-বদল করে বহু প্রার্থীদের পরাজিত করা হয়েছে; জনসঙ্ঘের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এক রকম ম্যাজিক কালি ব্যবহার করা হয়েছিল ভোটপত্রে ছাপ দেওয়ার সময় যা পরে আপনা থেকেই উঠে যায়, এবং পরে আবার ঐ ব্যালটপত্রগুলিতেই সরকার পক্ষের প্রার্থীর প্রতীক চিহ্নে নতুন ছাপ দেওয়া হয়। বলা-বাহুল্য, ঐ ধরনের অভিযোগগুলির সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই কোন নেতা উপস্থাপিত করেন নি, এবং সে কারণে সরকারপক্ষ থেকেও তা খণ্ডনের কোন চেষ্টা হয় নি।

কিন্তু ঐ নিত্যনতুন অভিযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ এসেছে বিরোধীপক্ষেরই এক নেতার কাছ থেকে। এস এস পি নেতা শ্রীমধু লিমায়ে বলেছেন, কতকগুলি কষ্টকল্পিত অভিযোগ সৃষ্টি না করে নির্বাচনে পরাজয় সহজভাবেই মেনে নেওয়া উচিত, এবং এ পরাজয়ের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য পরাজয়ের প্রকৃত কারণগুলি অন্বেষণে তৎপর হওয়া উচিত।

কার দুর্নীতি ?

সমর্থকদের দুর্নিবার গতিতে দলত্যাগের ফলে নিরুপায় হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন গুজরাটের শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই। কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আবার একটা জোড়াতালি দেওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়ে স্বপদে ফিরে এলেন তিনি। রাজ্যপালের কাছে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে নতুন মুখ্যমন্ত্রীরূপে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতেও এগিয়ে এলেন শ্রীদেশাই। তিনি বিশেষ দৃঢ়তা প্রকাশ করে বললেন, রাজ্য প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করাই হবে তাঁর প্রথম কাজ। কিন্তু তাঁর সব উক্তি, মন্তব্য ও শপথ নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ভেবেই বোধহয় কোন সাংবাদিক জানতে চাইলেন না যে, কার দুর্নীতি তিনি দূর করবেন। রাজ্য প্রশাসন ত তাঁরই পরিচালনাধীনে ছিল বিগত ছয় বছর। তাছাড়া যত সদিচ্ছাই 'নবনিযুক্ত' মুখ্যমন্ত্রীর থাকুক না কেন তা পূরণের যথেষ্ট সময় তিনি পাবেন কিনা সে বিষয়েও হয়ত সাংবাদিকদের মনে সন্দেহ ছিল। কারণ যেদিন শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নেন সেই দিনই তাঁর দলের দুজন সদস্য বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসেন।

ইচ্ছা পূরণ :

শ্রীবিশ্বনাথ দাস বিরাশী বছর বয়সে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি বিধানসভার সদস্য নন, যে চুলচেরা সংখ্যাধিক্য নিয়ে স্বতন্ত্র-উৎকল কংগ্রেস-ঝাড়খণ্ড জোট মন্ত্রিসভা গঠন করেছে তা যদি আগামী ছয় মাসেরও অধিককাল অটুট থাকে তবে তাঁকে ছ' মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় আসতে হবে।

শ্রীদাসই ওড়িশার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতের তৎকালীন এগারোটি প্রদেশে যে এগারোটি মুখ্যমন্ত্রী হন তাঁদের মধ্যে একমাত্র তৎকালীন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারী ছাড়া কেউ আজ জীবিত নেই। আসামের গোপীনাথ বড়দলুই, বাঙলার ফজলুল হক, বিহারের শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, উত্তরপ্রদেশের গোবিন্দবল্লভ পন্থ, মধ্যপ্রদেশের ডাঃ এন বি খারে, বোম্বাইয়ের বি জি খের, সিন্ধুর আল্লা-বক্স, পাঞ্জাবের সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ডঃ খান সাহেব—সবাই আজ পরলোকে। কিন্তু তাঁরা সবাই দীর্ঘকাল ধরে স্ব-স্ব প্রদেশের প্রধান ছিলেন, অনেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছিলেন স্বপদে অধিষ্ঠিত। সে জায়গায় শ্রীদাস ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশে পদত্যাগের পর দীর্ঘ বত্রিশ বছর ছিলেন রাজ্য রাজনীতি থেকে নির্বাসিত। স্বভাবতই শ্রীদাস ভাবতে পারেন, স্বরাজ্যের এই শেষ আহ্বানটুকুর জন্যই ভগবান তাঁকে তাঁর চৌত্রিশ বছর পূর্বের সতীর্থদের তুলনায় এত দীর্ঘজীবী করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী

সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীনতার স্বীকৃতি চাই

তুষারকান্তি ঘোষ

পূর্ব বাঙলায়, যাকে এখন আমরা বাঙলাদেশ বলি, আজ যা ঘটছে, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। যে বর্বরতা পরিকল্পিতভাবে আজ গণহত্যায় মত্ত, তার পাশবিকতা মানুষের ইতিহাসে নজীরহীন! জঙ্গী ডিক্টেটর ইয়াহিয়া ও তার অনুগত নেকড়ের দল, নদীমাতৃক পূর্ব বাঙলার বুকে আজ যে রক্তের নদী বইয়ে দিচ্ছেন, বিদেশ থেকে ভিক্ষেকরা আধুনিক অস্ত্রের দম্ভে, তাঁরা যে নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করছেন, এমন নির্মমতা ও নৃশংসতা আমরা আগে কখনো শুনি নি।

কিন্তু কেন? পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকের কাছে এমন কি অপরাধ করেছেন, যার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁদের নির্বিচারে হত্যা করতে এবং তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে, তাঁর সৈন্যবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছেন? পূর্ব বাঙলার মানুষের বিরুদ্ধে তাঁর এমন কি অভিযোগ, যাতে তাঁদের নিধন করার জন্যে বোমারু বিমান, প্যাটন ট্যাংক, কামান মেশিনগান-সজ্জিত বিরাট এক সৈন্যবাহিনীকে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়? নারী জাতের সম্ভ্রমের উপর বলাৎকার করতে হয়?

পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ইসলামাবাদের জঙ্গী প্রভুদের কাছে ন্যায়-বিচার চেয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, প্রবল জাতি দুর্বল জাতিকে তাদের কলোনী বানায় এবং শোষণ চালিয়ে নিজের দেশকে পুষ্ট করে। কিন্তু কেউ কোথাও শোনেন নি, দেশের একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অঞ্চল, তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে শোষণ করে, লুঠ করে তার অধিবাসীদের এমনভাবে পথের ভিখিরী বানিয়ে দেয়।

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন তাঁদের সোনার বাঙলায় পশ্চিম পাকিস্থানী কায়েমী স্বার্থের অবাধ শোষণ শুরু হয়ে গেছে। চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য—সর্বত্রই এই লুণ্ঠনের একতরফা ইতিহাস। শুধু তাই নয়, পূর্ব বাঙলার বাঙালীকে চিরকালের মত ক্রীতদাস বানাতে পশ্চিম পাকিস্থানী পাঞ্জাবী শাসকচক্র, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর সংস্কৃতির উপর আঘাত হানতে বদ্ধপরিকর।

পূর্ব বাঙলার বাঙালী যখন প্রশ্ন করলেন, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলাভাষাকে দুয়োরাণীর মর্যাদা করার অপচেষ্টা কেন? পশ্চিমী মুন্সীরা উত্তর দিলেন, 'বাঙলাভাষা সংস্কৃতের দুহিতা। ওর সারা গায়ে হিন্দুয়ানীর গন্ধ। সাচ্চা মুসলমানের ভাবরস, চিন্তাধারা ওর ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে না।'

পূর্ববঙ্গের জিজ্ঞাসা :

পূর্ববাংলার জিজ্ঞাসা, পূর্ববঙ্গ সারা পাকিস্থানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জনের বাসভূমি হলেও চাকুরী-বাকুরী, বৈদেশিক সাহায্যাদির ক্ষেত্রে এতো বৈষম্য কেন? রাজস্ব খাতে পূর্ব বাংলার জন্য ব্যয় করা হয় দেড় হাজার কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্থানের ভাগ্যে সেখানে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে পূর্ব বাঙলা পায় তিনশ কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্থানের হিস্যা সেখানে ছশ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ২০ ভাগ পূর্ব বাঙলার ভাগ্যে জোটে, পশ্চিম পাকিস্থানের ভাগ্যে সেখানে সিংহভাগ, মোট সাহায্যের শতকরা ৮০ অংশ।

চা ও পাট বাঙলাদেশেই উৎপন্ন হয়, যা থেকে সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রার আমদানী হয়। অথচ বৈদেশিক আমদানী করা দ্রব্যসামগ্রীর শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ পায় পূর্ববঙ্গ, শতকরা ৭৫ ভাগ যায় পশ্চিম পাকিস্থানের ভাগে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে পূর্ব বাঙলার বাঙালীদের ভাগ শতকরা ১৫, পশ্চিম পাকিস্থানের শতকরা ৮৫। সামরিক বিভাগে বাঙালীর চাকুরী শতকরা ১০, পশ্চিম পাকিস্থানীদের শতকরা ৯০। চাউলের দর পূর্ববঙ্গে প্রতি মণ ৫০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্থানে ২৫ টাকা।

পশ্চিম পাকিস্থানী শাসকবর্গ পূর্ব বাঙলার এই ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের উত্তরে একেবারে নীরব। এই অভিযোগ দূর করার জন্যে তাঁরা তো কোন চেষ্টা করেনই নি, বরং যাঁরা এই অন্যায়, শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্থান তাঁদের নামে এনেছে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। তাঁদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেবার জন্যে চালিয়েছে নানা ষড়যন্ত্র। যখনি বাঙলাদেশ তার ন্যায্য দাবীর কথা তুলেছে তখনই পশ্চিম পাকিস্থানের শোষকবর্গ জুজুর ভয় দেখিয়েছে। 'সাবধান ভারত আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করছে। এখন আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব বন্ধ রাখ। অর্থাৎ আমরা এখন যেমন শোষণ করছি, তা চালিয়ে যেতে দাও।

পশ্চিম পাকিস্থানী শাসকগুলের এই শঠতা, এই শোষণের রথচক্রকে রুখবার সংকল্প নিয়েই আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবী, যার মূল বক্তব্য হলো পূর্ব বাঙলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। পশ্চিম পাকিস্থানের শোষক দল কিছুতেই নির্বাচন করতে দেয় নি। তারা অবাধে চালিয়েছে জঙ্গী শাসন, বাঙালীর আশা আকাঙ্ক্ষা রুখবার জন্য। অবশেষে অনুপায় হয়ে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো পাকিস্থানের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-পরিচালিত আওয়ামী লীগ এই ছয় দফা দাবীর ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জাতীয় পরিষদে ও প্রাদেশিক পরিষদে

ময়মনসিংহ জেলার নবাবগঞ্জ হাটের চালাগুলোর ওপর উড়ছে কালো পতাকা।

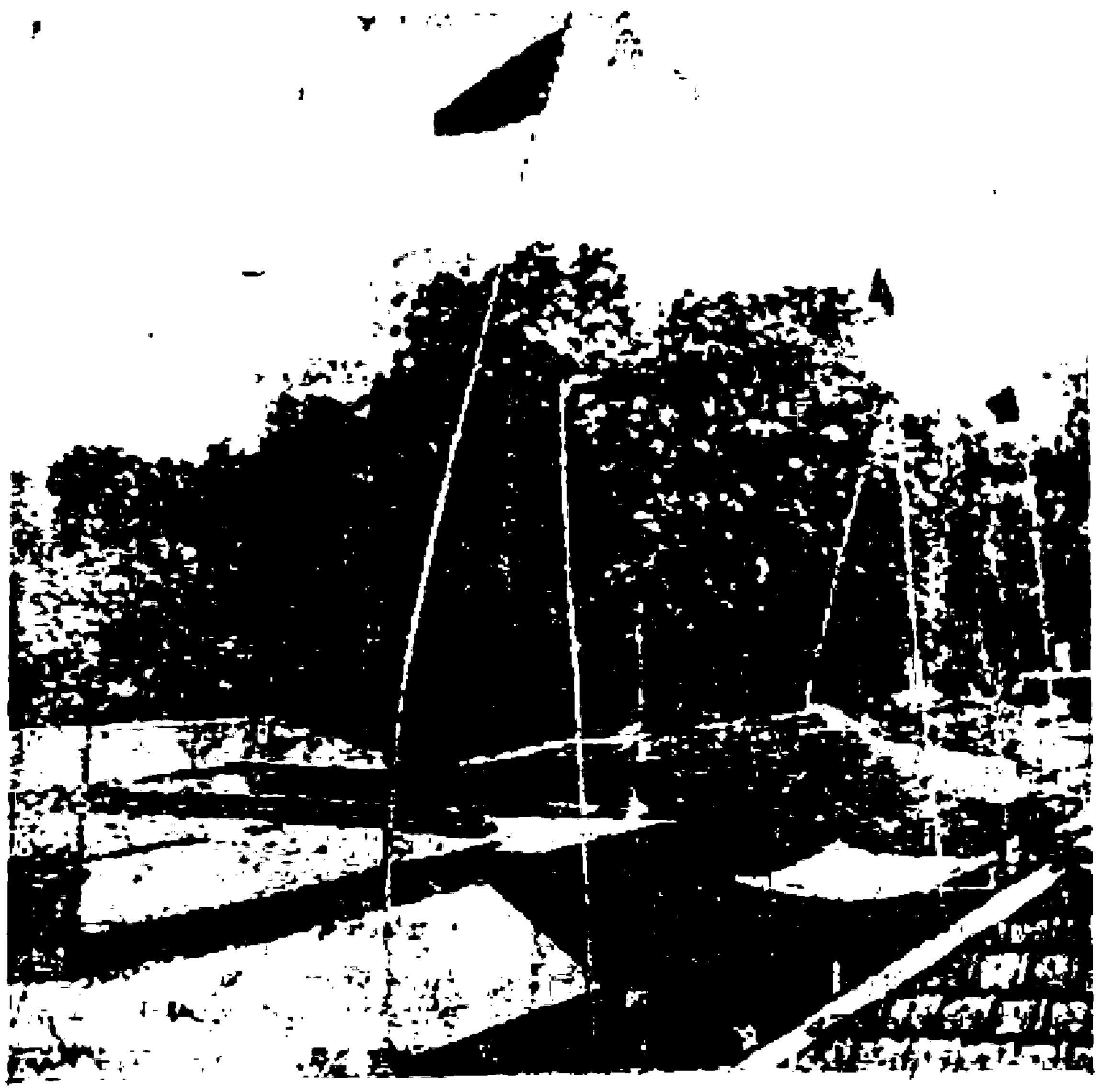

লাভ করলেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। নির্বাচনের পর শেখ মুজিব বললেন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এই অভূতপূর্ব জয় হলো তাদের ছয় দফা দাবীর অনুকূলে গণভোট। কাজেই পাকিস্তানে যে সংবিধান গৃহীত হবে তাতে এই ছয় দফা দাবীর স্বীকৃতি চাই, চাই প্রাদেশ বা দেশগুলির জন্য স্বায়ত্তশাসন।

ভুট্টোর অভিসন্ধি

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ও আরও দু-একজন মতলববাজ রাজনীতিক, শেখ মুজিবর রহমানের এই দাবীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার গন্ধ খুঁজে বার করলেন। কিন্তু তাঁরা যদি একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দিকে চোখ ফেলতেন, তা হলেই বুঝতেন আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত সংবিধানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বহুলাংশেই মিল আছে। ইতিহাস প্রমাণ করছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক সংবিধান সে দেশকে গোল্লায় পাঠায় নি, বরং তার ঐক্যকে তা আরও দৃঢ় করেছে। কাজেই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত সংবিধান গৃহীত হলে, পাকিস্তানের দু' হিস্যা বিচ্ছিন্ন হবে যেতো এমন কথা মনে করার কোন কারণ ছিল না। বরং জনাব ভুট্টো যেখানে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্যে দুজন প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা করেছিলেন, বিচ্ছিন্নতার বীজ তার মধ্যেই নিহিত ছিল।

আশ্চর্য; অতি নিকৃষ্ট লোকেরও একটা চক্ষুলজ্জা থাকে, ইসলামাবাদের জঙ্গী ডিক্টেটরদের সেটুকুও নেই। যাঁরা কথায় কথায় কাশ্মীরের গণভোটের দাবী তোলেন তাঁদের হাতেই পূর্ববঙ্গের গণভোটের রায় খুন হলো। তাঁরাই আঁতুড়ে পাকিস্তানের গণতন্ত্রের সম্ভাবনাকে হত্যা করলেন। পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামরিক বুটের নীচে থেঁৎলে মেরে শুরু করলেন গণহত্যার বর্বরতা।

কিন্তু মানুষের অপরাজেয় মনুষ্যত্ব কখনো অত্যাচারের কাছে মাথা নত করেনি। সে গর্জে উঠেছে, প্রতিরোধ গড়েছে। আদর্শ প্রীতি ও মনোবলের দুর্জয় হাতিয়ার নিয়ে সে রুখে দাঁড়িয়েছে বিবেকবর্জিত স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে।

বাঙলাদেশেও তাই ঘটেছে। সেখানকার নিরস্ত্র মানুষ সামরিক শাসনের নজীরহীন বর্বরতার মোকাবিলা করছেন, অপরাজেয় মনোবল নিয়ে। তাঁরা ঘোষণা করেছেন বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে স্বাধীন লোকতান্ত্রিক বাঙলা সরকার। আর ইসলামাবাদের ফিল্ড জঙ্গী শাসক সে জন্যই বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর [illegible] নারকীয় অত্যাচার।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীরবতা

প্রত্যাশা ছিল, আর্ত মানবতার ক্রন্দনে রাষ্ট্রসংঘ পূর্ববঙ্গের এই গণহত্যা বন্ধের জন্যে কার্যকর কোন পন্থা অবলম্বন করবেন। আশা ছিল, বৌদ্ধধর্মের উদার আদর্শের পরিবেশে মানুষ, রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব উ থান্ট এই নরমেধ যজ্ঞ বন্ধ করতে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করবেন। কিন্তু যদিও পূর্ব বাংলায় আর্ত মানুষের ক্রন্দনে সেখানকার আকাশবাতাস ভারাক্রান্ত, তবুও স্বৈরাচারীর রক্তাক্ত হাতকে সংবরণ করতে কেউ সেখানে এগিয়ে আসছেন না।

এখন আমাদের কর্তব্য কি? পৃথিবীর অন্য দেশরা আপাতত চুপ করে থাকলেও আমরা, ভারতবর্ষের লোকেরা, আমাদের সাড়ে সাত কোটি বাঙালী ভাই-বোনেদের জন্যে কি কিছুই করব না? এ ব্যাপারে সোজাসুজি সব কিছু করার পক্ষে আমাদের রাজনৈতিক বাধা থাকতে পারে। তবে কতকগুলি কাজ তো আমরা এখুনি করতে পারি। আজ তো আমরা বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিতে পারি। এতে মানবতা কিম্বা রাজনৈতিক দিক দিয়ে তো কোন বাধা থাকা উচিত নয়। বাংলা দেশের অধিবাসীরা ইলেকসানের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা কি চান। তাঁদের দাবী আমাদের সমর্থন করতে বাধা কি? আজ যদি ভারত এই দাবী মেনে নেয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর আরও অনেক সভ্য জাতি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। বাংলা দেশে আজ এত বড় ঘটনা ঘটেছে, এত নিরস্ত্র নরনারী, শিশু হত্যা চলছে, গণতন্ত্রকে এইভাবে জবাই করা হচ্ছে, তবে কেন আজ বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন বাংলা দেশকে স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন না? একদিন যাঁরা কাশ্মীরে গণভোট চেয়েছিলেন, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চেয়েছিলেন, তাঁরা কি বাংলা দেশের সব খবর জানেন না? বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি লোক তো গণভোটের মাধ্যমে তাঁদের জাতীয় ইচ্ছা ও দাবী জানিয়েছেন। তাঁরা যদি একটু খোঁজ নিতেন যে, এত বছর ধরে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তান বাংলা দেশের বুকে বসে অত্যাচার ও শোষণ চালিয়েছে, তাহলে তাঁরা কখনই ইয়াহিয়া, ভুট্টোর প্রচারে একটুও কর্ণপাত করতেন না। এখনও সময় আছে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতি আর চুপ করে না থেকে এখুনি এগিয়ে আসুন এবং এই অত্যাচার বন্ধ করুন।

আমি বিশ্বাস করি, বর্বরের সঙ্গে সংগ্রামে মানবতা জয়ী হবেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ন্যায় ও সত্য জয়লাভ করবে। বাংলা দেশ জয়ী হবে। অবশ্য হবে। জয় বাংলা।

(আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত ভাষণ)।

CENTRAL LIBRARY

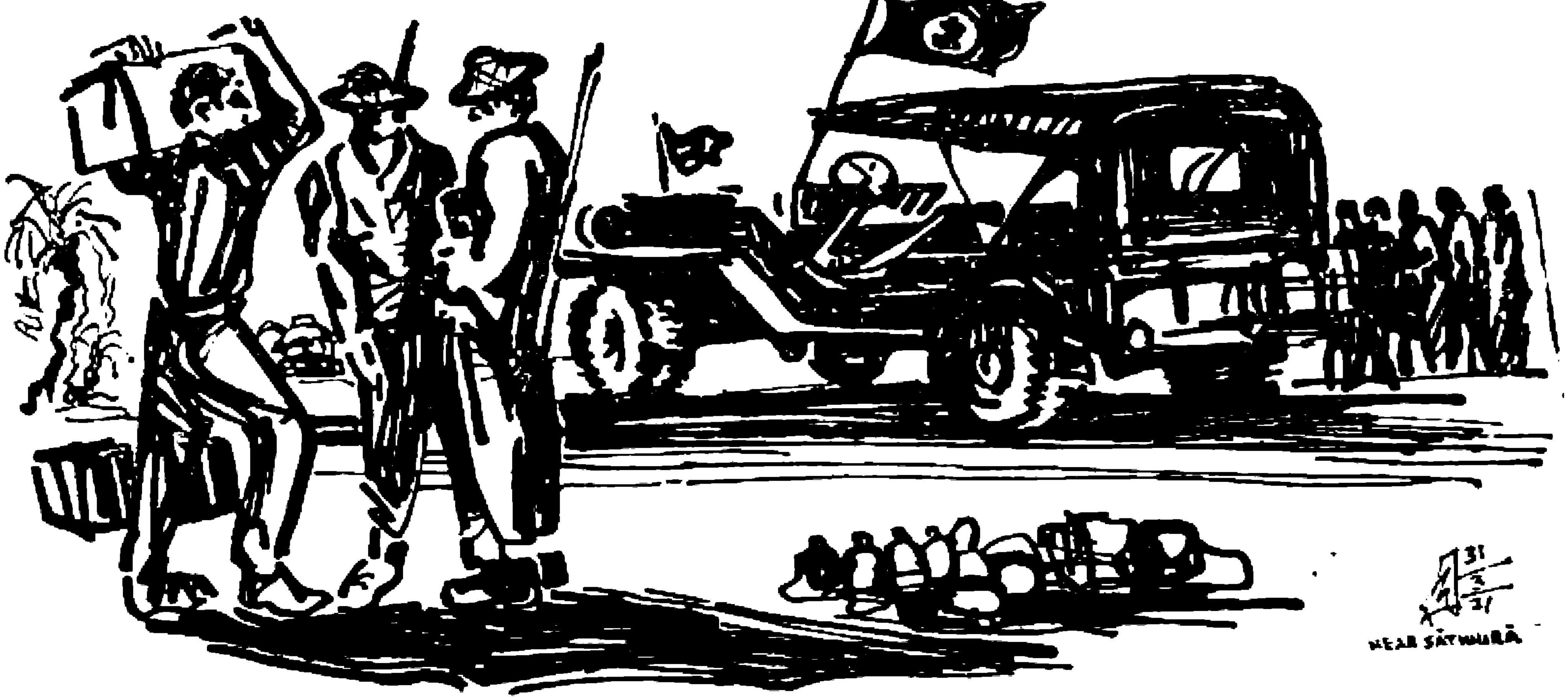

রক্তের স্বাক্ষর

শিপ্রা আদিত্য

বাংলাদেশের সংগ্রামী ভাইবোনেদের স্বাধীনতার রক্তাক্ত সংগ্রামের খবর জানতে সহকর্মী মন নিয়ে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম তাঁদের ওখানে। বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কয়েক মাইল পথ পায়ে হেঁটে, ৩১ মার্চের এক গভীর রাতে এসে পোঁছুলাম এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়ী বসিরহাটের ধলতিতায়।

বাংলা বন্ধের (পশ্চিমবাংলা) প্রত্যুষে সদলবলে পদযাত্রা শুরু করলাম সীমান্তের উদ্দেশ্যে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। আমাদের পাশাপাশি চলছে কয়েকশ' সাইকেল, তার প্রতিটিতে প্রায় জনা দুই-তিন করে যাত্রী। মাঝে মাঝে বন্ধের নির্দেশ অমান্য করে ছুটে চলেছে আপাদমস্তক লোকে ভর্তি দু-তিনটি করে মোটরবাস। এপার বাংলার যাত্রীদের স্বতস্ফূর্ত সহানুভূতি ছাড়াও ছিল, প্রত্যক্ষ সাহায্যের রসদ। সাইকেলের সামনে, বাসের বনেটে পত পত করে উড়ছিল ওপার বাংলার সংগ্রামী শহীদদের শোকে আভূমি কাল পতাকা। প্রতিটি যাত্রীর মুখেই ছিল আসন্ন বিজয়ের ঘোষণা —'জয় বাংলা'।

প্রায় তিন মাইল পথ হেঁটে ইটিণ্ডা ঘাটের খেয়াপাড়ে পৌছে দেখি শয়ে শয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে পারাপারের জন্য। দলমত নির্বিশেষে সংগ্রামরত ওপারের ভাইবোনেদের প্রেরণায় এপারেও আজ স্থানীয় স্বেচ্ছাবাহিনী সংগঠিত হয়েছে দলমত নির্বিশেষে। তাঁদের সাহায্যে তক্ষুনি একটি খেয়া নৌকায় ওপারে পৌঁছুবার ব্যবস্থা হয়ে গেলো, ইটিণ্ডায় পৌঁছুলাম, নোনাজলের জোয়ারের প্লাবনে বাঁচার জন্য নিম্নবাংলার নদীগুলির মতই এখানের ইছামতীরও ভেড়ী বা ঘেরী (উঁচু পাড়) দিয়ে ঘেরা নদীতট, তারই ওপর মাচাবাঁধা খেয়াঘাট। সুন্দরবনের 'প্রেমকাদার' আলিঙ্গন থেকে বাঁচার জন্য এ ব্যবস্থা এসব অঞ্চলে অপরিহার্য। ধীরে ধীরে উঁচুপাড়ে উঠে খেয়াঘাটের পসারীদের ছোটখাটো কথ দোকানগুলির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে পথ। সীমান্তের চেকপোস্ট-এর দিকে, পাক্কা তিন মাইল দূরে। ইটিণ্ডাগ্রামের মধ্য দিয়ে, হাইস্কুলের গা ঘেঁসে, গ্রন্থাগারের পাশ কাটিয়ে পৌছেছি সীমান্তের ছোট খালপুল-এর ওপর। গ্রন্থাগারের বিপরীত দিকে কাস্টমস অফিস আর তার কর্মীদের আবাসগৃহ। পাশেই সীমান্ত প্রহরীদের ছাউনী। আশেপাশে দু-একটি চা-খানা। অতি উৎসাহী এপার বাংলার জনসমুদ্রকে আজ এপারে আটকে রাখতে সীমান্ত প্রহরীরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

চেকপোস্ট-এর সীমানা এড়িয়ে গ্রাম-প্রান্তের পথে সদলবলে পাড়ি দিলাম। ক্ষেত ভেঙে, আল বেয়ে, আরো এক মাইল পথ হেঁটে এতক্ষণে এসে পোঁছেছি সেই সীমান্ত নির্দেশিত ছোট খালটির ধারে। পায়ের পাতা ডোবা স্বল্প জল আর প্রেমকাদার প্রচণ্ড আকর্ষণ ছাড়িয়ে কদমে কদমে এগিয়ে গেলাম সীমান্তের ওপারে, একে একে আমরা সবাই। এপার বাংলার অগ্রগামী যুব-প্রতিনিধিরা কয়েক পা এগিয়ে ওপার বাংলার সংগ্রামী যুবকদের কয়েক জনের সঙ্গে এক-সুরে সুর মিলিয়ে আওয়াজ তুললেন 'জয় বাংলা'। আমরাও সমস্বরে ডেকে উঠলম জয় বাংলা। এপার বাংলার দিলীপভাই আর মালতীভাই-এর সঙ্গে ওপার বাংলার দুলুভাই আর রফিকভাইরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেন। বাংলাদেশের সীমান্তে নিভৃত এ কোণটিও আজ এপার বাংলার বাঁধনছেঁড়া সহকর্মী জনতার উচ্ছ্বসিত প্লাবনে মুখর ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ

বর্বর পাকিস্তানের জঙ্গী শক্তির লাগাম-ছাড়া শিকারীদের আক্রমণে শান্তিবেরা এপারের এই নিভৃত গ্রামটিও আজ বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামগুলির মতই বিপন্ন।

এখানের দৈনন্দিন যাত্রা আজ ব্যাহত। দোকানপাট বন্ধ। মাত্র ত্রিশ মাইল দূরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে জয়-পরাজয়ের সংবাদে গ্রামবাসী কখনো উচ্ছ্বসিত কখনো অভিভূত হয়ে পড়ছেন। অনিশ্চয়তার দোটানায় এরা আজ অভিভূত। সেই সঙ্গে আছে চরম খাদ্যাভাব, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব তার ওপর আছে—দূরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে সংগ্রামরত বাঙালীর অপ্রতুল অস্ত্র-শস্ত্রের দুঃশ্চিন্তা। এমন মুহূর্তে এপার বাংলার সহানুভূতিশীল যুবচেতনার সীমান্ত-ভাঙ্গা অতি উৎসাহ উচ্ছ্বাস আজ এপারের গ্রামীণ জীবনে আরো বিপন্ন করে তুলেছে। ক্ষেতে-খামারে, গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে আজ এপার বাংলার শত সহস্র যুবক। মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটার ক্লান্তি আর দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় তারা যেখান থেকে যা পারছে তাই সংগ্রহ করে কোনক্রমে ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করে চলেছে। ঠাকুমা-দিদিমার কথায় শোনা—স্বপ্নে আসা সেই রূপকথার দেশ আজ এদের খুবই কাছের হয়ে পড়েছে। তাই আনন্দে আবেগে ওপারের কিছু স্মৃতি-চিহ্ন সংগ্রহের আগ্রহে এপারের যুবকবৃন্দ উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। হয় এরা জানে না, এদের এই সহানুভূতির অতি-উৎসাহ পরোক্ষে যে বর্বর জঙ্গী পাকিস্তানী পশুশক্তিকেই সাহায্য করবে। যশোর-খুলনায় সংগ্রামরত প্রতিটি বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব রয়েছে এইসব খাদ্যাভাব প্রপীড়িত গ্রামগুলির ওপর। দু-চারটি বিস্কুট, দু-একটি রুটি, দু-এক হাতা ভাত, দু-এক দানা শস্য, তাও আর অপচয়ের সাধ্য নেই বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের পক্ষে। প্রতি গ্রাস অন্নের ওপর নির্ভর করছে প্রতিটি বাঙালী সৈনিকের প্রতিদিনের যুদ্ধসামর্থ্য। উত্তেজনা ও কায়িক পরিশ্রমে শ্রান্ত প্রতিটি সৈনিককে উৎসাহী করে তুলতে আজ এদের প্রয়োজন প্রতিটি সিগারেট, প্রতিটি বিড়ি, প্রতি কাপ চা, যার প্রচণ্ড অনটন ঘটেছে আজ ও বাংলায়। এপার বাংলার যুবশক্তিকে তার আবেগ, উচ্ছ্বাস আরো সংযত করে সামিল হতে হবে ওপার বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে। প্রয়োজনীয় আবশ্যকীয় সামগ্রী-গুলি পাঠিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। মনে রাখতে হবে এ এক দুঃসাধ্য অসম সংগ্রামে মোকাবিলা করছেন বাংলাদেশের সংগ্রামী যুব-শক্তি। বিপক্ষে বার—সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিজ্ঞানজাত অতি আধুনিক সমরাস্ত্র। তার ওপর আছে ফ্যাসীবাদ ও মার্কিনী বিত্তশালীর প্রেরণায় উৎসাহী বর্বর পাকিস্তানী ধ্বংসনীতি। সপক্ষে আছে—বিশ্বের প্রতিটি বিপ্লবের চরম প্রেরণার উদ্বুদ্ধ, প্রায় নিরস্ত্র, বুভুক্ষু, অটুট মনোবলে বলীয়ান যুবশক্তি। তাই বাংলাদেশের এই মহান বিপ্লবকে সার্থক রূপ দেবার দায়িত্বে প্রতিটি বাঙালীকেই আজ অংশ গ্রহণ করতে হবে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, চিকিৎসা-দ্রব্য, নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য প্রভৃতি জুগিয়ে। আর প্রয়োজন মত প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ সাহায্য দিয়ে। খেলার মত ভীড় বাড়িয়ে নয়?

বোজাডাঙ্গার হাঁটাপথ পেরিয়ে রাস্তার তে-মাথায় এক বাঁশঝাড়ের ছায়ায় আমাদের প্রথম বৈঠক বসলো ওপারের জঙ্গী যুবকদের সঙ্গে। যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা নিয়ে খবরের আদান-প্রদান চললো। এখান থেকে যশোরের যুদ্ধক্ষেত্র প্রায় ৪০ মাইল দূরে এবং খুলনাও প্রায় ৭০।৭৫ মাইল দূরে। স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের যোগাযোগরক্ষী যানবাহন প্রতি-দিনই, বার বার যাতায়াত করে এখানে। তাই এসব রণাঙ্গনের টাটকা খবর সব সময় এখানে পাওয়া গেলেও অন্য সীমান্তের যুদ্ধ-সংবাদ পাবার আগ্রহে এ অঞ্চলের লোক সর্বদাই এপার বাংলার দৈনিকপত্র বা আকাশ বাণীর ওপরেই নির্ভর করে এখন। কলকাতার দৈনিক সংবাদ সংবাদপত্র পত্রিকাগুলির প্রতি এদের অসীম আগ্রহ। তাই যে কোন সীমান্ত অতিক্রমকারী আগন্তুকদের কাছে এরা প্রথমেই অনুরোধ করে সেদিনের সংবাদপত্রটি দেবার জন্য।

দু-এক মাইল হেঁটে এসে পড়লাম ভোমরাগাছের খেজুর বাগানে। চারদিক ধু-ধু করছে বর্তমানে নিঃস্ব চষাক্ষেতের অসমতল দিগন্তপ্রসারী মাঠ, মাঝে মাঝে দু-একটি খেজুর গাছ, বাঁশঝাড়, দু-একটি আমবাগান, দূরে গ্রাম রেখার কলাবাগানের শান্ত পরিবেশ। চড়া রোদের ক্লান্তি কাটাতে খেজুর ছায়ায় আশ্রয় নিলাম এপার বাংলা ওপার বাংলার সহমর্মী কয়েকজন। অদূরে গ্রাম থেকে ছোট বড় অনেকেই এসে এ জমায়েতকে প্রায় সমাবেশ করে তুললেন। সেই সঙ্গে এসে জুটলেন পাকিস্তান সরকারের বাংলার দু-একজন কর্মচারী, যারা আজ বিপ্লবের সামিল হয়ে চলেছেন এখানের অগ্রগামী যুবশক্তির সঙ্গে।

দূর দূরান্তের নিস্তব্ধ পথকে সচকিত করে হঠাৎ শুরু হলো প্রাণভয়ে পলায়মান মানুষের দৌড়ঝাঁপ। সীমান্ত লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুটে চলেছে আবাল বৃদ্ধ জনতা, জমায়েতে আলোচনারত জঙ্গী যুবকরা সচকিত হয়ে ছুটে গেলেন সংবাদের আশায়, পলায়মান জনতার পিছে পিছে এমন ভীতির কার্যকারণ জানতে। বিফল হয়ে ফিরে এলেন তাঁরা, পলায়মান কোন লোকই জানে না কারণ কি, কি বা ঘটেছে, কেনই বা ছুটছে? দূর সীমান্তের পথ বেয়ে মোড় ফিরে হঠাৎ আবির্ভূত হল এক দ্রুত ধাবমান জঙ্গী জীপ সশস্ত্র কয়েকজন সৈনিককেও দেখা গেল ঐ গাড়ীতে। জমায়েতের যুবকবৃন্দ নিশ্চিত হয়ে জানালো, এটি মুক্তি ফৌজের যোগাযোগরক্ষী গাড়ী। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল স্থানীয় কয়েকজন গ্রামবাসীদের, কয়েকটি আহত সীমান্ত অতিক্রমকারী অতি-উৎসাহী দর্শককে কাঁধে করে নিয়ে চলেছেন সীমান্তের দিকে। এরা গাড়ীর শব্দে ভীত হয়ে প্রাণভয়ে খালে-বিলে পড়ে হাত-পা ভেঙ্গে বসে আছে।

পায়ে পায়ে আমরা এগিয়ে চলছি সাত-ক্ষীরার পথে। সাতক্ষীরা এখনো নয় মাইল পথ। পথে সাতক্ষীরা গার্লস কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী কামেলা আসাদ-এর সঙ্গে পরিচয় বিনিময় হল। কামেলার জবানীতে জানলাম—'কলেজের ছাত্ররা মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে আর ছাত্রীরা

31/3/71
NEAR SĀTKHIRĀ

কেউ কেউ রাইফেল ট্রেনিং-এ, কেউ সমরাস্ত্র সংগ্রহে, কেউবা লড়ুয়ে ভাইদের খাবার জোগাড় করছে, খাবারের প্যাকেট পাঠাবার বন্দোবস্ত করে যাচ্ছে, আবার কেউ কেউ নার্সিং-এর কাজেও লেগে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার দায়িত্ব কিসের ওপর?

উত্তরে কামেলা বললো—আমি আর আমার মত আরো দুজন, রুটি করা থেকে প্যাকেট করে ট্রাকে তুলে দেওয়া অবধি সবই আমাদের দায়িত্বে।

খানিকবাদে এনামুল হাকদার স্ত্রী ফতেমা বিবির সঙ্গে দেখা। মাকবয়সী সরল সাদাসিধে ফতেমা বিবি যুদ্ধের কিছু বোঝে না শুধু জানে দেশ স্বাধীন হবে। একমাত্র ছেলে বাইমও আজ বাড়ী নেই, লড়াই করছে শত্রুর বিরুদ্ধে। বুড়ো মরদ এনামুল চোখে ঠাহর করতে পারে না-তাই ফতেমাই রাতের বেলা বাঁটি-দা নিয়ে পাহারা দেয় উঠোন-ঘর, মরাই-ধান।

বেতনা নদীর (বেত্রবতী) ছোটখালের আশপাশের গ্রামগুলিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে স্থানীয় কয়েকটি যুবকের সঙ্গে মিলিত হলাম। এদের মধ্যে আবদুল আর কাদেরের বক্তব্য—যুদ্ধ চলবে—দরকার হলে লোক বদলাবে।

বুড়ো কাসিম চাচা তো অনেক আগেই গজগজ করছিল 'কি দরকার আছে এমন খুনোখুনির, পরে হাতে পানি পাবি হয়।'

সাতক্ষীরা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র সামসের এতক্ষণ সব শুনছিল, এবার সে চিৎকার করে বলে উঠলো—'এ লড়াই বাংলা দেশের লড়াই, সমগ্র বাঙালীর লড়াই। এ লড়াই চলছে চলবে।'

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
২, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

এরপর কয়েকটি ছাত্রের কাছ থেকে শুনলাম বর্বর জঙ্গীরা কিভাবেই না বলাৎকার করেছে নিরীহ মা-বোনেদের ওপর। যশোর শহরে, বিশেষ করে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এখনো ছড়ানো-ছিটানো আছে রাশ-রাশ মৃতদেহ। কী বীভৎসই না সে দৃশ্য। পথ শকুন আর কুকুরে ছেয়ে ফেলেছে। মহামারী এই আরম্ভ হলো বলে: যশোর-এর যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন সংবাদ জানা গেল এদের কাছ থেকে। এখানে এখন পাকিস্থানী জঙ্গীশাহী ২২নং ফিল্ড ফ্রন্টিয়ার রাইফেল, ২৭নং বেলুচ রেজিমেন্ট, ২৫নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট-এর তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্যের সঙ্গে যে মুক্তিফৌজ আমৃত্যু সংগ্রামে লড়ে চলেছে তাঁরা হচ্ছেন—ইস্টার্ণ পাকিস্থান রাইফেলস, সশস্ত্র পুলিশ, আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক। এখন লক্ষ্য কিভাবে পাক-সৈন্যকে কব্জা করা যায়। দিকে দিকে তারই প্রস্তুতি। রাইফেল চালানো থেকে শুরু করে গ্রেনেড মলোটভ ককটেল কিভাবে তৈরী করতে হয় বা কিভাবে ছুঁড়তে হয়। ব্যারিকেড তৈরী থেকে ব্রীজ উড়িয়ে দেবার সব কলাকৌশলই আজ এরা আয়ত্ত করার চেষ্টা করে চলেছে। একদিকে চলছে লড়াই, আর অন্যদিকে গেরিলা কায়দায় চলছে তারই প্রস্তুতি। হয়তো বা দীর্ঘদিন ধরেই চলবে এ লড়াই তারই জন্য। তবে একটাই ভরসা সামনেই বর্ষা—জঙ্গী সেনারা পথ পাবে না পালাতে। জঙ্গীশাহীর লড়াই-এ কৃষকের এরা এখুনি প্রায় ছাউনীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে এখন। তবু তৃষ্ণা ও ক্ষুধার তাড়নায় মরীয়া এ দখলদারী সেনারা মাঝে মাঝে শহরের অলিতেগলিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আধুনিক মারণাস্ত্রের সাহায্যে গণ-হত্যা করে চলেছে নিরীহ নগরবাসীদের উপর। তাই লড়াই চলছে অলিতেগলিতে পথেপ্রান্তরে। যশোর রোডে, খুলনা রোডে, চাঁচড়া মোড়ে, পুরাতন কসবায়, ঝিনাইদা রোডে, এয়ারপোর্ট রোডে, পুলিশ লাইনে কালেক্টরেটে, কুলবাড়িতে।

আপাদমস্তক আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এ দখলদারী বাহিনীর অন্যায় অত্যাচারের সংবাদ লজ্জা দেবে ইহুদী হত্যাকারী নাজীদের অথবা ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামের গণহত্যাকারী মার্কিনী, দখলদারী সৈন্যদের কুখ্যাত ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ক্যালেকে। অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে নাবালক শিশুরা বাদ যায়নি এদের নির্যাতন ও হত্যার তালিকা থেকে। বৃদ্ধা, যুবতী, তরুণী বা বালিকা কেউই এদের লোলুপ কামনার শিকার থেকে বাদ পড়ে নি। এর জবাব বাংলার ছেলেরা দিচ্ছে আরো দেবে।

পথের মোড়ে প্রচারপত্রে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কার্য-কারণ প্রকাশ করেছেন। 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শিরোনামা দিয়ে। পাকিস্থান ও বাংলা দেশ-এর অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখিয়েছেন—

রাজস্বখাতে ব্যয় বাংলাদেশের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা। আর পাকিস্তানের জন্য ৫০০০ কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে—বাংলাদেশে ৩০০০ কোটি টাকা। পাকিস্তানে ৬০০০ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্য—বাংলাদেশে শতকরা ২০ ভাগ, পাকিস্তান শতকরা ৮০ ভাগ। বৈদেশিক দ্রব্য আমদানীতে বাংলাদেশ শতকরা ২৫ ভাগ, পাকিস্তান শতকরা ৭৫ ভাগ। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী—বাংলাদেশে শতকরা ১৫ জন, পাকিস্তানে শতকরা ৮৫ জন। সামরিক বিভাগে চাকুরী—বাংলাদেশে শতকরা ১০ জন, পাকিস্তানে শতকরা ৯০ জন। এছাড়া চাল বাংলাদেশে প্রতি মণ ৫০ টাকা, পাকিস্তানে ২৫ টাকা। আটা—বাংলাদেশে প্রতি মণ ৩০ টাকা, পাকিস্তানে ১৫ টাকা প্রতি মণ। সরষের তৈল—বাংলাদেশে প্রতি সের ৫ টাকা, পাকিস্তানে প্রতি সের ২-৫০ নয়া পয়সা। সোনা প্রতি ভরি—বাংলাদেশে ১৭০ টাকা, পাকিস্তানে ১৩৫ টাকা। সেই সঙ্গে আছে ভারী বা নিত্য-ব্যবহার্য শিল্প নির্মাণের পরিকল্পনায় এদেশ ওদেশের দুয়োরাণী সুয়োরাণী ভাব। যথাযথ জায়গায় ঘুষ না দিলে উচ্চশিক্ষিতেরও চাকরী হয় না ওদেশে। সেই সঙ্গে আছে চরম বেকার সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যতা।

গত ২৩ বছরের এই ঔপনিবেশিক অসম অর্থনীতির চাপের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অবমাননার দুঃসহ ব্যথায় বিপর্যস্ত হয়ে হঠাৎ এই সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ পূর্ব পাকিস্তানের ঘুম ভাঙলো। তাই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের পথ বেছে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আজ স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। তবে সেই চরম এবং সুরক্ষিত স্বাধীনতা ঘোষণার শুভ মুহূর্তটির জন্য লড়াই চলছে, লড়াই চলবে। যতক্ষণ না সুষ্ঠু সমৃদ্ধ জনকল্যাণকর সমাজব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হবে, বাংলাদেশের প্রতিটি বাঙালীদের মধ্যে।

ফেরার পথে ইটিন্ডা সীমান্তের ছোট খাল পেরিয়ে চেকপোস্ট-এর পথে ঘাস পুলের ওপর উঠে এলাম। আজকের এই সীমা নির্দেশী জলে পারের পাতা ভোবে না, সীমান্তের বাধা শুকিয়ে এসেছে। চেক-পোস্টএর কাঁটাতারের বেড়ায় জং ধরেছে। এখানে ওখানে পিলপের মাথায় পাকিয়ে পড়ে রয়েছে ছেঁড়া তার—দূর অতীত অত্যাচারের ধ্বংসাবশেষ।

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকার্বানিলাইড

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

বৈশাখী মন ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সামনে বোশেখ মাস বছরের সেরা পুণ্য মাস,
ঝড়-ঝঞ্ঝা পার হয়ে শুরু হবে নতুন জীবন;
পশ্চাতের রক্তমাখা দিন-মাস সমস্ত সন্তাপ
স্মৃতি থেকে মুছে যাবে; শুচিস্নিগ্ধ শুভ্র আলিঙ্গন
ঘরে ঘরে আঁকা হবে, সুখ-স্বপ্নের আশা ও আশ্বাস;
সামনে বোশেখ মাস বছরের সেরা পুণ্য মাস।

সামনে বোশেখ মাস আসে নিয়ে নতুন বছর,
আগুনে রোদ্দুরে পুড়ে অতীতের পাপ ছারখার;
নতুন শপথে হবে ভাস্বর প্রত্যয়ের স্বর,
নতুন তরুণ-বেলা প্রাণে প্রাণে আনন্দ সঞ্চার।
সম্মুখে ছড়িয়ে দৃষ্টি দেখি বাঙলা কেমন সুন্দর!
সামনে বোশেখ মাস আসে নিয়ে নতুন বছর।

সামনে বোশেখ মাস নববর্ষ মহা পুণ্যদিন,
আরম্ভ সেদিন থেকে জীবনের নব মহোৎসব;
আবার সকল চিন্তা আমাদের স্বার্থলেশহীন,
প্রীতির বন্যায় হাসি দেশময় হর্ষ-কলরব।
ভালোবাসা দিয়ে এসো এইবার শুধি প্রাণঋণ,
সামনে বোশেখ মাস নববর্ষ মহা পুণ্যদিন।

আমার সোনার বাংলা ॥

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে
যে কোন মুহূর্তে
আমার বাঙালী মন ভরে ওঠে
বাংলা মায়ের নিবিড়তম গন্ধে।
পূর্ব পশ্চিম বাংলা মায়েরই গর্ভজাত দুই সন্তান
শুধু চোখে দেখা নেই
শুধু বুকে বুক রেখে কথা বলা হয় নি বহু দিন।

আমি এদেশে জন্মেছি
ওদেশের মাটি দেখি নি
পাই নি জল বায়ুর স্পর্শ
অথচ পূর্বপুরুষের রক্তের টানে
অচেনা ঘাসের গন্ধ বড় পরিচিত মনে হয়।
অচেনা আম কাঁঠালের বাগান
পদ্মা নদীর গর্জন, হিমেল বাতাস
মাটির আঘ্রাণ — সব কিছু যেন চেনা
আজন্ম পরিচিত।

আমার বাংলা মা
তোমার বুকে আজ গোলা-গুলির ঝড়
জঙ্গী শাসকের ভীরু অত্যাচার।
তোমার সাত কোটি নির্ভীক সন্তান
অমান্য করেছে সেই রক্তচক্ষুর আস্ফালন
আকাশে বাতাসে তুলেছে তোমার জয়গান
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

বাংলার ছবির সঙ্গে ॥

শ্যামসুন্দর দে

পায়ে পায়ে ঘাসগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে
আমি যতবার চলে যেতে চাই
ততবার পেছনেতে ওরা ডাকে।
আমি যতবার চোখ বন্ধ করি
ততবার চোখে জ্বলে কিংশুকের মতো
ঘুম ঘুম অন্ধকার যতবার ঢেকে আনি
আগর প্রহরগুলো ততবার ভরে
সেই সব মুখচ্ছবি।
ওরা জড়িয়ে জড়িয়ে
আমার স্মৃতিকে ভরে রাখে
ভাবনার আঙিনাতে ওদের সাম্রাজ্য
কয়েদীর মতো রাখে।
আজিকার রণক্ষেত্র ছেড়ে যেতে
পলায়নী মন যদি ডাকে
পায়ে পায়ে ঘাসগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে
আমি তো পারি না ছিঁড়ে চলে যেতে
আমার মনের তারে তার গান
সারাটা সময় কেবল বেজে বেজে চলে।
কোথায় অঞ্জলি ভরা ফুল আমি পাব
জীবনে কোথায় ধীর মন্থরতা।
আমার বাংলার মন রক্তাক্ত কিংশুকে জ্বলে
উন্মত্ত শাখাতে তার আকাশের অভিযান
কল্পনা-আবীরে রাঙা প্রতিরোধ ডাকে
আমার বাংলার ছবি
আমার প্রিয় শোণিতে লাল।

বাংলায় এখন চৈত্র ॥

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

কে বলেছে আমি নির্বাক?
বর্ডারের পার থেকে পাড়ি আমি হাহাকার হাঁক
মাগো, আমার রক্তের দাগ!
আমি ভুলব না—থাক—
এই রক্তের দাগ
সমস্ত শরীরে লেগে থাক।

বাংলায় এখন চৈত্র
অথচ কি বসন্তের গন্ধবর্ণ চেকপোস্ট বর্ডারের
সীমা লঙ্ঘন করে সমাবে না মৌহিমী আড়াল
তবে থাক
ভুলবো না রক্তের দাগ
বাংলার রক্তের দাগ
আমার সর্বাঙ্গে লেগে থাক।।

মুখবন্ধ

চাণক্য চাকলাদার আমারই নাম। থাকি মুচিপাড়ার মেসে। সারাদিন উদ্ভট বই পড়ি। ফ্যানটাসি ফিল্ম দেখি। প্রতি সন্ধ্যায় আফিং খাই। তারপর ডাইরী লিখতে বসি।

আমি বৃদ্ধ। কুব্জ। পলিতকেশ। আমি রোগজীর্ণ, বদহজমে শীর্ণ, মনেরও অরুচি। কিন্তু একদিন আমি ছিলাম দুরন্ত, দুর্দম, দুর্বার। সারা পৃথিবী ছিল আমার কর্মক্ষেত্র। সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত হেন স্থান নেই যেখানে আমার লীলাখেলা ঘটেনি; যেখানকার আরক্ষা-বাহিনী আমার হুহুংকারে কাঁপেনি; আমার প্রতাপে নাকানিচোবানি খায়নি।

আমি ছিলাম প্রচণ্ড, প্রবল, প্রলয়ংকর। মাথায় ছিলাম সাত ফুট। আকারে তাল-পাতার সেপাই। কিন্তু পরাক্রমে আমার কাছে নতি স্বীকার করেছিল মার্তণ্ডের মত নিঃশব্দচরণ, মূর্তিমান আতংক মাসা হাউন্ড আর তার কুচুণ্ডে স্যাঙাতরা।

অতীতের সে রোমাঞ্চ-কাহিনী এই বৃদ্ধ বয়েসেও শিহরণ আনে প্রতিটি লোম-কূপে। তাই আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে নিয়ে বসি ডাইরী লিখতে। কীর্তিকথার ছত্র ছত্রে বর্ণনা করি হারেম-মেয়ে ইসাবেলার সঙ্গে আমার সেহারাতে প্রেমের উদ্ভট কাহিনী। মিসেস ফ্যানটমাসের সঙ্গে পাঞ্জাকষার অলীক উপাখ্যান।

অলীক! উদ্ভট! সবাই তাই বলে। বলে, মৌতাতের মুহূর্তে লেখা তো! বলে, ঘনাদার সেকেন্ড এডিশন! ব্রজদার ভায়রা-ভাই!

একটা কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি। আপনারাই বলুন, অলীক কিনা, উদ্ভট কিনা। চাণক্য চাকলাদারের চালিয়াতি বদনাম আপনারাই খণ্ডন করুন!

•

নয়াদিল্লী। রাত প্রায় দশটা।

ঢালু পথ বেয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মত নেমে এল একটা প্রকাণ্ড বেন্টলি গাড়ি! ছুটেছে ভিড়ের মধ্য দিয়ে। চাপা গর্জি-গলায়ের শব্দ শোনা গেল। দুপাশে ছিটকে গেল গাড়ি আর পথচারী।

পেছনে মখমল-কোমল আসনে উপ-বিষ্ট দুজন পুরুষ গভীর আলাপে মগ্ন। এঁদের একজন 'হান্টার'-এর কেন্দ্রীয় দফতরের চীফ সেক্রেটারী। ধরা যাক, এঁর নাম সর্দার বন্দুক সিং। অপরজন সর্দার-জীর ডান হাত—গ্রান্ডকল্যাণ।

'হান্টার' একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বের তাবৎ ব্যবসায়ীদের অর্থে স্থাপিত এবং চালিত 'হান্টার'-এর কার্যকলাপ অতীব প্রহেলিকাবৎ।

'হান্টার'-এর এজেন্ট ছড়ানো বিশ্বের সর্বত্র। অথচ 'হান্টার'-এর অস্তিত্ব মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া বিশ্বের আর কেউ জানে না। অর্থাৎ 'হান্টার' একটি গোপন সংস্থা।

'হান্টার'-এর কার্যকলাপ তাই এত রহস্যময়। কেউ বলে 'হান্টার' একটা গুপ্ত-চর সংস্থা। স্পাইদের আড্ডা। কেউ বলে

মেটেই না। 'হান্টার' গুপ্তচর নিয়োগ করে ঠিকই, কিন্তু রাজনীতি নিয়ে এদের মাথাব্যথা নেই। ভারতীয় কারবারীদের বাক্সা যাতে বিদেশে সর্বত্র বজায় হয়, নির্বিঘ্নে বৃদ্ধি পায়—এজেন্টরা তাই দেখে। রেডিও-ট্রান্সমিটারে খবর পাঠায় কেন্দ্রীয় দফতরে। খবর দেয়।

আসলে 'হান্টার' বেসরকারী সংগঠন। কিন্তু পাঁকে পা পড়লে সরকারও এদের দ্বারে ধরণা দেয়। সাহায্য নেয়।

কানাঘুষো অনেককথাই শোনা যায়। মাঝে মাঝে 'ইন্টারপোল' বা আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনীর মত তৎপর হতে দেখা যায় হান্টার-এজেন্টদের। দেশে-বিদেশে কুখ্যাত ঠগরা টিট হয় এদের হাতে। ইন্ডিয়ান কারবারীদের কেউ পথে বসানোর প্ল্যান করে তাপ পায় পায় না। জুয়াচোররা ভয় পায় হান্টারকে।

এই কারণেই কিনা জানা নেই, খবরে পড়লে টনক নড়ে সরকারী মহলের। পৃথিবীময় ছড়ানো হান্টার-এর গুপ্তচর-জালের অসাধ্য নাকি কিছু নেই। অর্থ দেয়। ট্যাক্স দেয়।

সরকারকে চটান না হান্টার-এর কর্তারা। টাকাও যথাসাধ্য। কাজের জিনিসটা ভালই বোঝেন। ভাড়া খাটাতে কসুর করেন না হান্টার-এজেন্টদের।

মনস্বীরা নাকি বলেন, এভাবে ভাড়া না খাটালে হান্টার-এর রাজত্ব বহন করা মুশকিল হত। সারা পৃথিবীতে অরাজকতা দেখা দিয়েছে। লুঠতরাজ জালজোচ্চুরী, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির ফলে ক্ষতি হচ্ছে ভারতীয় ব্যবসার—অঙ্কের কাটতি কমছে—প্রসার ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষতিটুকু যদি বন্ধ করা যায়। তাহলেই অবশ্য হান্টার-এর খরচ উঠে আসে ঠিকই : কিন্তু চালু সংগঠনটাকে মধ্যে মধ্যে সরকারী স্বার্থে ভাড়া খাটালে ক্ষতি কি?

এ-কাহিনী এমনি এক অভিযানের বিবরণ।

গল্পের গন্ধ পাছে ওঠে। এ-উপাখ্যানেও যা ঘটবে তা অবাস্তব, অলীক মনে হতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি তা সত্যিই কপোলকল্পিত?

হাজার হোক চাণক্য চাকলাদারের ডাইরী তো!

•

বন্ধুর মতই কথা বলছিলেন সর্দারজী এবং লালজী। কেননা, অন্তরে ওঁরা পরম সুহৃদ।

চাম্বকলাল—চাণক্য চাকলাদার আপনার নাম জানে দেখলাম। তাই আধমিনিটও ফোন ধরতে হল না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল।'

সর্দার বন্দুক সিং—তা জানে। হপ্তাকয়েকে দুবার ইসাবেলা আমার কাছে এসেছিল দুটো মূল্যবান খবর বেচতে। চাণক্য চাকলাদারই পাঠিয়েছিল। একটা খবর কোকেন পাচার সম্পর্কে। আর একটা ঘোরোহপুরের আফিমচালানের ঘাঁটি সম্পর্কে। দুটোই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। খুব কাজে লেগেছিল।'

'ইসাবেলাকে দেখেছেন? কি রকম মনে হয়?'

'খাসা।'

'কি যে বলেন! আমি অন্য কথা বলছি।'

'তাই বল। ইসাবেলাকে এক কথায় আকাটা হীরে বলা যায়। মাঝে মাঝে কিন্তু পালিশ আছে। অদ্ভুত পালিশ। চোখ ঠিকরে যায়। ইসাবেলার মাতৃভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু ফ্রেঞ্চ, আরবী, ইংলিশ মাতৃভাষার মতই চোস্ত বলে। আদব-কায়দায় চৌকস। লর্ডস ক্লাবে ইসাবেলাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম ঘাবড়ে দেবার জন্যে। বলব কি চাম্বকলাল আমিই ঘাবড়ে গেলাম ওর চালচলন দেখে। লর্ডস ক্লাবের জন্ম যেন ওরই হাতে, এমনি একটা ভাব দেখালো ইসাবেলা। দর-কষাকষি করল নির্দয়ভাবে। বিল অফিসার যখন আমাকে খাতির করল না। সাংঘাতিক গেছো মেয়ে। মহা ডানপিটে।'

হাই রোড দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটছিল বেন্টলি। বাইরের দিকে চোখ রেখে আপন-মনেই বললেন, চাম্বকলাল—'এহেন ডান-পিটে মেয়েই কিনা শেষে বিপদে পড়ল।'

'আমাদেরও পোয়াবারো হল', বললেন সর্দার বন্দুক সিং, 'নইলে চাণক্যকে বাগে আনা যেত না। সোজা কথায়, ব্ল্যাকমেল করতে হবে।'

•

ফিরোজ শা কোটলার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা সোনার ইমারত। চণ্ডীগড়নির্মাতা লাকরবুসারের এক নামী চেলার পরিকল্পনা। সৌধ সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র বছরখানেক আগে। ছিমছাম নকশা যে কত সুন্দর হতে পারে, আকাশচুম্বী এই অট্টালিকা তার নিদর্শন। নিচের তলায় প্রাইভেট সুইমিং পুল, আখড়া এবং খেলার মাঠ। ছাদের আলসে বরাবর সবুজ ঘাস আর ফুলের চারার সমারোহ। কংক্রীটের বুকে প্রকৃতির আলপনা। নিঃসন্দেহে চোখজুড়োনো।

সর্দার বন্দুক সিংকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল ইউনিফর্মধারী কর্মচারী। বলল—'মিঃ চাকলাদার এইমাত্র ফোন করেছিলেন। আসুন।'

মেরুন রঙের তুলতুলে গালিচার শেষে প্রাইভেট লিফটের সামনে দাঁড়াল ইউনি-ফর্মধারী। সবিনয়ে বলল—'মিঃ চাকলা-দারের প্রাইভেট লিফট। আর কোনো তলায় দাঁড়াবে না—ওঁর নিজের তলায় ছাড়া।'

সর্দার বন্দুক সিংয়ের পেছন পেছন চাম্বকলাল প্রবেশ করল ভেতরে। বোতামে আঙুল ছোঁয়াতেই নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হল। প্রথমে ধীরে, তারপর হাউইয়ের মত তীব্র বেগে ওপরে উঠে গেল উড়ন্ত কুঠরি।

নিঃশব্দে দরজা সরে গেল। বাইরে এসে দাঁড়ালেন দুজনে।

বিশাল দালান। নিকষকালো মেঝে। যেন, কালো মুকুর।

দালানের অপর প্রান্তে একটি ঘর। হলঘর। লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট। ঘরের একটি মাত্র জানলা মেঝে থেকে উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত। উন্মুক্ত বাতায়নপথে চোখে পড়ছে ফিরোজ শা কোটলার বিস্তার। দালান যতখানি লম্বা, ঘরটিও ততখানি লম্বা। তবে একটু নিচের লেভেলে। অ্যালুমিনিয়াম রেলিংয়ে হাত দিয়ে তিন ধাপ সিঁড়ি নামলে তবে ঘরের মেঝেতে পা দেওয়া যায়।

প্রখর রুচির যেন ঠিকরে পড়ছে দালান আর ঘরের সাজসজ্জায়। ছিমছাম সুন্দর। বাহুল্য কোথাও নেই। কিন্তু বলিষ্ঠ। প্রচণ্ড শক্তি যেন সর্বত্র মূর্ত। একটু খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্য অবাক হতে হয়। কেননা, ঘর সাজানোর পরিকল্পনাটা অদ্ভুত। কোনো ফরমুলায় পড়ে না। বহু-বিচিত্র বেশ কয়েকটি স্টাইলের আশ্চর্য মিশ্রণ।

আটকোণা আইভরি রঙের টালি দিয়ে ঘরের মেঝে বাঁধানো। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো বামআন্টেক গালিচা। পারস্যের উজ্জ্বল বর্ণসমারোহ বিকশিত করছে সূক্ষ্ম কারুকার্যে।

একটা দেওয়ালে কাঠের কাজ। আরেক দেওয়ালে ভেলভেটের পর্দা। তৃতীয় দেওয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং। লিও-নার্দো থেকে আরম্ভ করে যামিনী রায় পর্যন্ত সবই সেখানে আছে। কতকগুলো পেন্টিং অবশ্য এমন উদ্ভট কিন্তু এমন সুন্দর যে শুধু তাকিয়েই থাকতে হয়। কিছু বোঝা যায় না।

ঘরের সবকটা দরজাই পালিশ করা কাঠের। সিংদরজার মতই অতিকায় পাল্লা। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত। দরজায় দুটুক তিব্বতী তামার কারুকাজ।

ঘরের এক কোণে মধু রঙের ইটালিয়ান মার্বেলের মস্ত টেবিল। সেখানে এলো-মেলোভাবে ছড়ানো দামী দামী গয়না। পোর্সিলেনের সিংহের পিঠে অ্যালার্ম ঘড়ি, জেড পাথরের চৈনিক ড্রাগন। আবলুস কাঠের আফ্রিকান দানো। হাতীর দাঁতে খোদাই-করা তিনটে আশ্চর্যসুন্দর নারী-মূর্তি। একটা শ্বেতপাথরের হার্কিউলিস। আর একটা ব্রোঞ্জের রাণা প্রতাপ।

ঘরের আলো শ্বেতশুভ্র নয়, নীলাভ নয়। অথচ ভালো লাগে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেকেলে প্যাটার্নের কতকগুলো গদীমোড়া সিংহাসন দেখে বসতে লোভ হয়। মণি-মাণিক্যমোড়া ভেলভেটে জ্বলজ্বলে আসনে এইমাত্র যেন রাজামহারাজারা বসেছিল। এ-ঘর যেন দেওয়ানী খাস। দরবার আবার শুরু হল বলে। শিশমহলের রোশনাই তাই এ-ঘরের সর্বত্র।

ঘরের এককোণে রিভলভিং বুককেসে থরে থরে বই সাজানো। ঝকঝকে তকতকে

বই নয়। কোণমোড়া, হাতে হাতে মলিন। যেন, এ-বইয়ের প্রতিটি পাতা গৃহস্বামীর নখদর্পণে।

ঘরের আর এককোণে সাজানো টেবিল ডিনারের পর্ব এখন নিষ্প্রাণ। পাশের হাই-ফাই রেডিওগ্রাম অবশ্য সরব। জলতরঙ্গ বাজছে। টুং টাং শব্দে ঘরের বাতাস যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে।

এ-ঘরে বিরাম নেই, উল্লাস নেই; শুধু নিবিড় শান্তি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাম্বকলাল—'আরব্য উপন্যাসের একটি রজনী মনে হচ্ছে।'

চকিত চাহনি নিক্ষেপ করলেন সর্দার বন্দুক সিং। কিছু বললেন না। পায়ে পায়ে নেমে এলেন নিচু লেভেলের ঘরে। সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন এদিকে ওদিকে। পাশের একটা দরজা খোলা। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীলাভ দ্যুতি। শোনা যাচ্ছে, মেশিন চলার একঘেয়ে গুঞ্জনধ্বনি।

সর্দার বন্দুক সিং বললেন—'গলা-খাঁকারি দিতে হয় না?'

'দরকার হয় না', বললেন রাম্বকলাল।

আচম্বিতে মেশিনের মৃদু গুঞ্জনের ওপরে শোনা গেল ছিমি-ছিমি কণ্ঠ। কণ্ঠ তো নয়, যেন মহাকালের ডম্বরুধ্বনি।

'গলা খাঁকারির দরকার হবে না, মালক্ষী। আমি হাজির।'

সবেগে ঘরে দাঁড়ালেন দুই অভ্যাগত। নীলাভ দ্যুতি যে-ঘরে, সেই ঘরের বিশাল দরজায় ফ্রেমে যেন যাদুমন্ত্রবলে আবির্ভূত হয়েছে এক তালঢ্যাঙা পুরুষ। মাথায় সাত ফুট। কিন্তু সতেজ বাঁশের মত শীর্ণ অথচ মজবুত। স্মিত মুখ। চোখের তারায় একাগ্র-দৃষ্টি। ব্যাকব্রাশ করা চুল। অগ্নিশিখার উজ্জ্বল হলুদ রঙের চিকাহাতা আলখাল্লা। সোনালী সুতোর কাজ মহার্ঘ আলখাল্লার সর্বত্র। বুকের ওপর নটরাজের তাথৈ-তাথৈ মূর্তি। দামী দামী পাথর চিকমিক করছে নৃত্যের তালে তালে।

অস্ফুট কণ্ঠে বললেন রাম্বকলাল—চাণক্য চাকলাদার!'

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালো জমকালো তালগাছ—'ইয়েস স্যার। দীনের কুটির আপনাদের পায়ের ধুলোয় আজ ধন্য হল।'

'আসুন, আলাপ করিয়ে দিই', বললেন রাম্বকলাল। 'আমাদের চীফ সর্দার বন্দুক সিং।'

নমস্কারের পালা শেষ হল। চাণক্যর অন্তর্ভেদী চোখ পারার মত পিছলে গেল সর্দারজীর চুলের ডগা থেকে নখের ডগা পর্যন্ত।

'এত রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মিঃ চাকলাদার', একটু দুঃখের ভান করলেন সর্দার বন্দুক সিং, 'অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'তেমন কিছু নয়। মিনিট দু-তিনের একটা কাজ বাকি রয়েছে। সেটা সেরে নিই। তারপর বলা যাবেখন। আসুন।'

নীলাভ দ্যুতিময় ঘরের মধ্যে আবার অন্তর্হিত হল চাণক্য। পেছন পেছন এলেন দুই অভ্যাগত। দেখলেন, একটা ছোট্ট কারখানা।

কারখানা এঁদের কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু এ-কারখানার মধ্যে একটু নতুনত্ব ছিল বইকি। এত পরিষ্কার, এত ছিমছাম গুছানো কারখানা এর আগে কখনো চোখে পড়েনি। তিনটে আলাদা বেঞ্চি তিনদিকে বসানো। প্রতিটির সামনে উঁচু টুল পাতা। একটা বেঞ্চির ওপর তিনটে চাকা কনভেয়ের বেল্ট দিয়ে লাগানো একটা মোটরে। তিনটে চাকাই ঘুরছে বেঞ্চির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায়। প্রথম চাকাটা বাকি দুটো চাকার থেকে একটু দূরে। পাশেই একটা বাক্স। বাক্সের মধ্যে কারবোরান্ডাম। একটা কাঠের বাক্সে অতি-সূক্ষ্ম এমারি পাউডার। আর এক শিশি পুটিন-পাউডার। সবকটি বস্তুই একেবারে মসৃণ করে। শিরিষ কাগজের উন্নত সংস্করণ।

দ্বিতীয় বেঞ্চিতে একটা কাটা মেশিন। মেশিনে লাগানো গোলাকার করাত। সাধারণ করাত নয়। ফসফর-ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি একটা চার ইঞ্চি চাকা। চাকাটা ঘুরছে খাড়াইভাবে। চাকার গায়ে লেগে হীরকচূর্ণ।

তৃতীয় বেঞ্চিতে বসল চাণক্য চাকলাদার। দুই অভ্যাগতকে অপর্দুলি-হেলনে বসতে নির্দেশ করল বাকি দুটো বেঞ্চিতে। আলগোছে তুলে নিল একটা ডপস্টিক। কাঠির ডগায় লাক্ষা আঠা দিয়ে লাগানো একটা নীলকান্তমণি।

বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিলেন সর্দার বন্দুক সিং। নীলোৎপলের ওজন চল্লিশ ক্যারেটের কম নয়। দক্ষ কারিগরের হাতে পড়ে পালিশ পেয়েছে নীলকান্তমণি। ঝিকমিক করছে নীলাভ দ্যুতিতে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি। মণির বুকে কি যেন একটা খোদাই করার চেষ্টা হচ্ছে।

চাণক্য দুহাতে ডপস্টিক ধরল। সন্তর্পণে মণিটা এগিয়ে নিয়ে গেল ঘূর্ণ্যমান করাতের সামনে। দুই চোখে নিবিড় তন্ময়তা দেখে মনে হল যেন শিল্পী রবিশংকর সেতার নিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। অথবা বিসমিল্লা খান সুরের স্বর্গে আত্মহারা হয়েছেন।

চোখ তুললেন সর্দার বন্দুক সিং। সামনেই একটা খোলা সিন্দুক। ড্রয়ার-গুলো নামানো চাণক্যর কনুইয়ের কাছে। একটা ড্রয়ারে ডজনখানেক আকাটা মণি। হীরে, চুণী, মরকত, নীলকান্ত। আর একটা টালার ছোট ছোট পাথর। পালিশ করা, সুন্দরভাবে কাটা, ঝকঝকে।

তৃতীয় ড্রয়ারে চোখ পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সর্দার বন্দুক সিং।

ড্রয়ারে থরে থরে সাজানো হীরে জহরতের মূর্তি। কি নেই সেখানে? বিচিত্র রঙের জেডপাথরে খোদাই করা কিমতুতে নানো, সুন্দরী পরী আর সুবেশী পুরুষ। এত রঙের এত জেডের জেড সংগ্রহ শুধু দেখা যায় সালারজঙ্গের জেড মিউজিয়ামে। একটা রক্তচক্ষু ড্রাগন চোখে পড়ল। তারপরেই দশভুজা প্রতিমা। মা দুর্গা বলেই মনে হল।

পুরো তিন মিনিট ঘরের মধ্যে মোটরের গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা গেল না। ঝাড়া একশ আশি সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন রাম্বকলাল। রুদ্ধ বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলেন চাণক্য চাকলাদারের হাতের নীলকান্ত মণির দিকে।

সুইচ টিপে মোটর বন্ধ করে দিল চাণক্য। সাকরার ঠুলি চোখে লাগিয়ে নিবিষ্ট মনে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল নীলকান্ত মণির দিকে। তারপর সিধে হয়ে বসল। ঠুলি খুললেই দেখা গেল খুশী যেন উপচে পড়ছে দুই চোখে।

সর্দারজী হাত বাড়িয়ে বললেন—'দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়।' ডপস্টিক আর আইগ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল চাণক্য—'এখনও পালিশ বাকি আছে কিন্তু।'

আইসপ্যাসের ভেতর দিয়ে সর্দার বন্দুক সিংয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি মেয়ের মুখ। সুন্দরী। অত্যন্ত ছোট। কিন্তু দুই চোখ যেন জীবন্ত। এলো খোঁপা এলিয়ে পড়েছে অনাবৃত পিঠে, বুকে। দুর্ধানিতম্বের ওপর দিয়ে শাড়ি ঝুলছে নিতোল জঙ্ঘার ওপরে। নীলকান্ত মণির বুকে নীলবসনা সুন্দরী যেন হাসছে। নিবিড় চাহনি দিয়ে হাতছানি দিচ্ছে।

আশ্চর্য! এইটুকু মণির বুকে এত নিখুঁত কারুকাজ! সর্দারজীর চোখ শামুকের চোখের মত ঠেলে বেরিয়ে এল। তুর্মালিক আর আইসপ্যাস চাণক্যর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—মণি খোদাই করা বুঝি আপনার নেশা?'

'হ্যাঁ,' স্মিতমুখে জবাব দিল চাণক্য। 'এককালে পেশা ছিল। এখন শুধু নেশা।' সহসা যেন শব্দহীন অট্টহাস্য নৃত্য করে উঠল চাণক্যর আশ্চর্য দুই চোখে। নষ্টামি আর দুষ্টামির এ এক বিচিত্র অভিব্যক্তি। অবাক হলেন ত্র্যম্বকলাল।

সায় দিলেন সর্দারজী—'ঠিক। এখন আর পেশা নয়। নিছক নেশা। চাণক্য চাকলাদার এখন শ্রান্ত, অবসন্ন, রিটায়ার্ড। নেশা তো এখনই দরকার।'

চাণক্য চাকলাদারের চোখের শব্দহীন অট্টহাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সে জায়গায় ভেসে উঠল অতীতের রোমন্থন। দূরবিস্তৃত দুই চোখে দুরন্ত বন্যার ছায়াপাত।

চোখ ফেরাল চাণক্য। সহজ গলায় বলল—'কি নেব? ব্র্যান্ডি, না, হুইস্কি?'

'ব্র্যান্ডি। ছোট।'

'আপনি?'

'ব্র্যান্ডি। বড়।'

বড় ঘরে এল তিনজনে। ময়ূর সিংহাসনের মত দুটি ভেলভেট মোড়া আসনে বসলেন দুই অভ্যাগত। চাণক্য জিরাফের মত লম্বা ঠ্যাঙ নেড়ে গেল অ্যাকোভের সামনে। গেলাস আর বোতল বার করতে লাগল।

ত্র্যম্বকলাল চটপট ব্রীফকেশ খুলে দুটো কাগজ বার করে রাখলেন কোলের ওপর।

বাদশাহী কায়দায় সুরাপানের আয়োজন করল চাণক্য। কাটগ্লাসের ঝলমলে আসব-পাত্র আর সোডা সাইফন এল রুপোর ট্রেতে। পাশে প্লেটে আলুভাজা এবং চীজ-স্লাইস।

হাতে হাতে সুরা পাত্র ধরিয়ে দিল চাণক্য। ত্র্যম্বকলালের কোলে রক্ষিত কাগজ দুটোর দিক তাকিয়ে বলল মৃদু কণ্ঠে—সর্দারজী, আপনি আমার আমার অনেক দিনের আড্ডায় পর্দা হল। রিটায়ার করার আগে আপনার নামে সিক্রেট ফাইল দেখেছিলাম। কিন্তু চাক্ষুস আলাপ এই প্রথম।'

সর্দারজী চুমুক দিলেন সোনালী সুরায়। খোকা স্বাদ। বললেন—'আপনার জীবনীও কম ইন্টারেস্টিং নয়।'

'তাই নাকি? আমার জীবনের আদ্যো-পান্ত আপনি জানেন?'

'জানতে চেষ্টা করেছি।'

'শুনতে পারি?'

'অবশ্যই,' ত্র্যম্বকলালকে চোখের ইঙ্গিত করলেন সর্দার বন্দুক সিং। ত্র্যম্বকলাল কেশে নিয়ে কোলের একটা কাগজ তুলে পড়তে শুরু করল :

'মিঃ চাকলাদার, আপনার শৈশব রহস্যময়। আপনার জন্ম ইন্ডিয়ায় কি তেহরানে তা বলা মুশকিল। শুনেছি জানা গেছে, আপনি একজন দাসব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়েন। আপনার সঠিক বয়স সেই কারণেই জানা যায়নি।'

স্বপ্নিল চোখে বলল চাণক্য চাকলাদার —'আমার বয়স আমি নিজেও জানি না।'

'আপনার জন্মভূমি আমরা জানি না। এইটুকু জানি যে ডিমের সমুদ্রে বোম্বেটের দলে আপনার হাত পাকে। গেনগাজি ছিল এ দলের নেতা—কিন্তু শুধু নামেই।'

'ঠিক।'

'গেনগাজি মারা গেলে এক বছরের মধ্যে আপনি সে দলের নেতা হন। পরের বছরই দলটার আশ্চর্য সম্প্রসারণ ঘটে—আপনার নেতৃত্বে।'

রুপোর সিগারেট কেস এগিয়ে দিল চাণক্য। দুই চোখের কোণে স্বপ্ন-মেঘ ভাসতে লাগল।

মৃদুকণ্ঠে বলল—'তারপর?'

'সংক্ষেপে সারছি। কয়েক বছরের মধ্যেই চাণক্য চাকলাদারের গ্যাং আধখানা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। দেশে দেশে চলল আপনার অভিযান। কঙ্গো থেকে সুন্দ সাগর পর্যন্ত আপনি রাজত্ব করেছেন। আপনার দল হীরে জহরৎ চুরী করেছে, দুষ্প্রাপ্য শিল্পকর্ম লোপাট করেছে, স্মাগল করেছে, জাল নোট ছাপিয়ে বহু দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। এমন কি অর্থের বিনিময়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে।'

একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল চাণক্য। ধোঁয়ার রিঙ সিলিংয়ের দিকে উঠতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে যেন আপন মনেই বলল—'সব করেছি। কিন্তু ভায়লেন্সে আমার অপরাধের জাল কখনো বিছোইনি।'

'জানি। কিন্তু কেন ইন্ডিয়াকে আপনি রেহাই দিয়েছেন—তা ভেবে পাইনি। কারণটা বলতে পারেন?' বললেন সর্দার বন্দুক সিং।

'সে আর এক কাহিনী। পরে হবে 'খন। -স্মিতমুখে পাশ কাটিয়ে গেল চাণক্য।

'ইসাবেলার মত ডাকাত-রাণীকে আপনি দলে টানেন বছর সাতেক আগে। কারাগার ইসাবেলাকে আটকাতে পারেনি। ফাঁসীর মঞ্চকে বারবার বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে ইসাবেলা। ইসাবেলার মত সুন্দরী অথচ নিষ্ঠুরা ছলনাময়ী আর কুশলী মক্ষিরাণী অপরাধের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। ইসাবেলা তার রূপ, যৌবন আর বুদ্ধির জোরে নিজের দল গড়েছিল। কিন্তু এই ইসাবেলাও আপনাকে গুরু বলে মেনে নেয়। আত্মসমর্পণ করে। ঠিক?'

নীরবে সায় দিল চাণক্য। ধোঁয়ার আড়ালে ব্রোঞ্জ মূর্তির মত মনে হল তার নিশ্চল দেহকে।

ত্র্যম্বকলাল এক চুমুকে ব্র্যান্ডির পাত্র শেষ করে দিয়ে বলল—'আপনার অপরাধময় কর্মজীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইসাবেলা আপনার সঙ্গিনী ছিল। বছরখানেক আগে আপনি আপনার দল ভেঙে দেন। পৃথিবীর নানান দেশের ব্রাঞ্চ ম্যানেজাররা নিজের নিজের দল গঠন করে। আপনি ইন্ডিয়ায় আসেন। ইসাবেলাও আসে। ইসাবেলা শ্রীনগরে হোটেলের পত্তন করে। আপনি শিলিগুড়িতে আস্তানা নেন। আপনারা দুজনেই কুবেরের সম্পদ সঙ্গে নিয়ে আসেন। সে সম্পদের পরিমাণ আমাদের জানা নেই।'

ব্রোঞ্জ মূর্তির অধরপ্রান্তে পাতলা হাসি ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

ত্র্যম্বকলাল বলল—'আপনার গতিবিধির ওপর আমরা নজর রেখেছিলাম। আমরা দেখেছি, আপনি অপরাধের দুনিয়ার সব সংস্রব ত্যাগ করেছেন। শান্তির জীবনযাপন করছেন।'

'তা করছি,' মহাকালের ডম্বরু-ধ্বনি আবার শোনা গেল ব্রোঞ্জ-চাণক্যর কণ্ঠে।

সর্দার বন্দুক সিংয়ের দিকে ত্র্যম্বকলাল তাকালেন। চোখে চোখে ইসারা হল। কয়েক সেকেন্ড থমথমে নৈঃশব্দ্যের পর মুখ খুললেন সর্দারজী—'মিঃ চাণক্য চাকলাদার?'

'ফরমাইয়ে, সর্দারজী।'

'টাকা নয়। আপনার অভিজ্ঞতা, আপনার সাহস, আপনার সংগঠনী প্রতিভাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। আপনাকে চাই।'

মৃদু হাসল চাণক্য—'আমাকে কেউ পায় না, সর্দারজী।'

'জানি। অর্থের বিনিময়ে আপনাকে আমরা চাই না।'

'তবে কিসের বিনিময়ে?'

'ইসাবেলার।'

ঘরের আবহাওয়া যেন আচম্বিতে পালটে গেল। যেন সহসা ভিসুভিয়াসের বিস্ফোরণ মুহূর্ত উপস্থিত হল। ত্র্যম্বকলাল দেখলেন, চাণক্য চাকলাদারের বংশদণ্ডের মত ব্রোঞ্জ মূর্তি এতটুকু কাঁপল না, কিন্তু চকিতে সহসা যেন প্রচণ্ড শক্তি অদৃশ্য বিকিরণের মত বিচ্ছুরিত হল অবয়ব ঘিরে।

খুশী হলেন ত্র্যম্বকলাল। চাণক্য চাকলাদারের নিবিড় প্রশস্তি এইভাবেই

তাকাতে চেয়েছিলেন উনি। ধরণীর আতংক চাণক্য চাকলাদারকে সহসা জীবন্ত করে দেখলেন ত্রাম্বকলাল।

অস্ফুট ফিসফিস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল চাণক্য—'কি হয়েছে ইসাবেলার?'

'এই মুহূর্তে ইসাবেলা বন্দিনী। শীগগিরই তার জীবনান্ত ঘটবে রাইফেলের গুলিতে অথবা তার চাইতেও ভয়ংকরভাবে। শ্রীনগর থেকে অনেক দূরে তার বন্দীশিবির। ঠিকানা কেবল আমরা জানি।'

চাণক্যর ঠোঁটে আড়াআড়ি ফাঁকে সিগারেট পুড়তে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বলল—'মাসদেড়েক আগে আমি শ্রীনগরে গিয়েছিলাম। ইসাবেলা নতুন স্পীডবোট কিনেছে। তাই নিয়ে ডাল লেকে হাওয়া খেয়েছি। এ ঘটনা ঘটেছে তারপর?'

'হ্যাঁ, তারপর।'

'কি চান আপনারা?'

'ইসাবেলার ঠিকানা আপনাকে উপহার দিতে চাই।'

'বিনিময়ে?'

'আমাদের একটা সামান্য কাজে আপনার শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ চাই। কাজটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।'

'কোথায় ঠিকানা?'

চকিতে কোলে রক্ষিত অপর কাগজটা এগিয়ে দিল ত্রাম্বকলাল। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল চাণক্য। কাগজটা টেনে নিয়ে চেয়ে রইল। ঠিকানাটা মনের পর্দায় যেন ছাপা হয়ে গেল। ফসফরাস চোখে মরকত আভা দেখা গেল।

কাগজ ফিরিয়ে দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলল চাণক্য—'রাজী। কিন্তু দিনদশেকের আগে নয়। এই কদিন বাইরে যাব আমি।'

'বেশ।' উঠে দাঁড়ালেন সর্দার কন্দুক সিং। 'দশদিন পরে আমরা আসব।'

চোখে চোখ রাখল চাণক্য। সহজ গলায় বলল—'সর্দারজী, আপনি বুদ্ধিমান। ইসাবেলার ঠিকানা উপহার দিয়ে ভালই করেছেন। দর হাঁকলে আমাকে পেতেন না।'

'চাণক্য চাকলাদারকে আমি চিনি।'

'গুড। ভেরি গুড। যে কাজ আমাকে দিচ্ছেন তা দেশের স্বার্থে নিশ্চয়?'

'নিশ্চয়। নইলে আপনার কাছে আসব কেন?'

আর বিশেষ কোনো কথা হল না। বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নেমে এলেন দুই অভ্যাগত। বেন্টলিতে বসে হাঁফ ছেড়ে বললেন ত্রাম্বকলাল—'বাসরে! এত সহজে চাণক্য রাজী হবে, ভাবতেই পারি নি।'

বিজ্ঞের মত হাসলেন সর্দার কন্দুক সিং—'একেই বলে ভানুমতীর ভেলকি! বুঝলে ত্রাম্বকলাল, এই নিয়েই তো আমার সর্দারি!'

•

ঠিক সেই মুহূর্তে মেশিনঘরের পাশের কুঠরিতে ঢুকল চাণক্য চাকলাদার। পাশাপাশি রাখা তিনটে বিশাল ট্রাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। অর্ধনিমীলিত দুই চোখে দেখা গেল স্মৃতির রোমন্থন। অদ্ভুতদর্শন অতিকায় তোরঙ্গ তিনটে যেন মণিকোঠার দরজা খুলে দিল। ধীরে ধীরে অধরপ্রান্তে জাগ্রত হল নিগূঢ় হাসি।

আপনমনে বলল—'ইসাবেলা, কোনোদিন ভাবিনি, মন্ত্রতন্ত্রের বাক্স আবার খুলতে হবে।' ছোট্ট হল চাণক্য। খুলল ট্রাঙ্কের ডালা। ভেতরে থরে থরে সাজানো বিচিত্রদর্শন কলকব্জা। বিদঘুটে তাদের গড়ন। কোনো কোনোটি অতিশয় নিরীহ-দর্শন।—কিন্তু ক্রিয়াকলাপে হৃৎকম্পের কারণ।

এই হল চাণক্য চাকলাদারের মন্ত্র-তন্ত্রের বাক্স। আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান আশ্চর্য অদ্ভুত—ভয়ংকর হাতিয়ারের বাক্স।

(ক্রমশঃ)

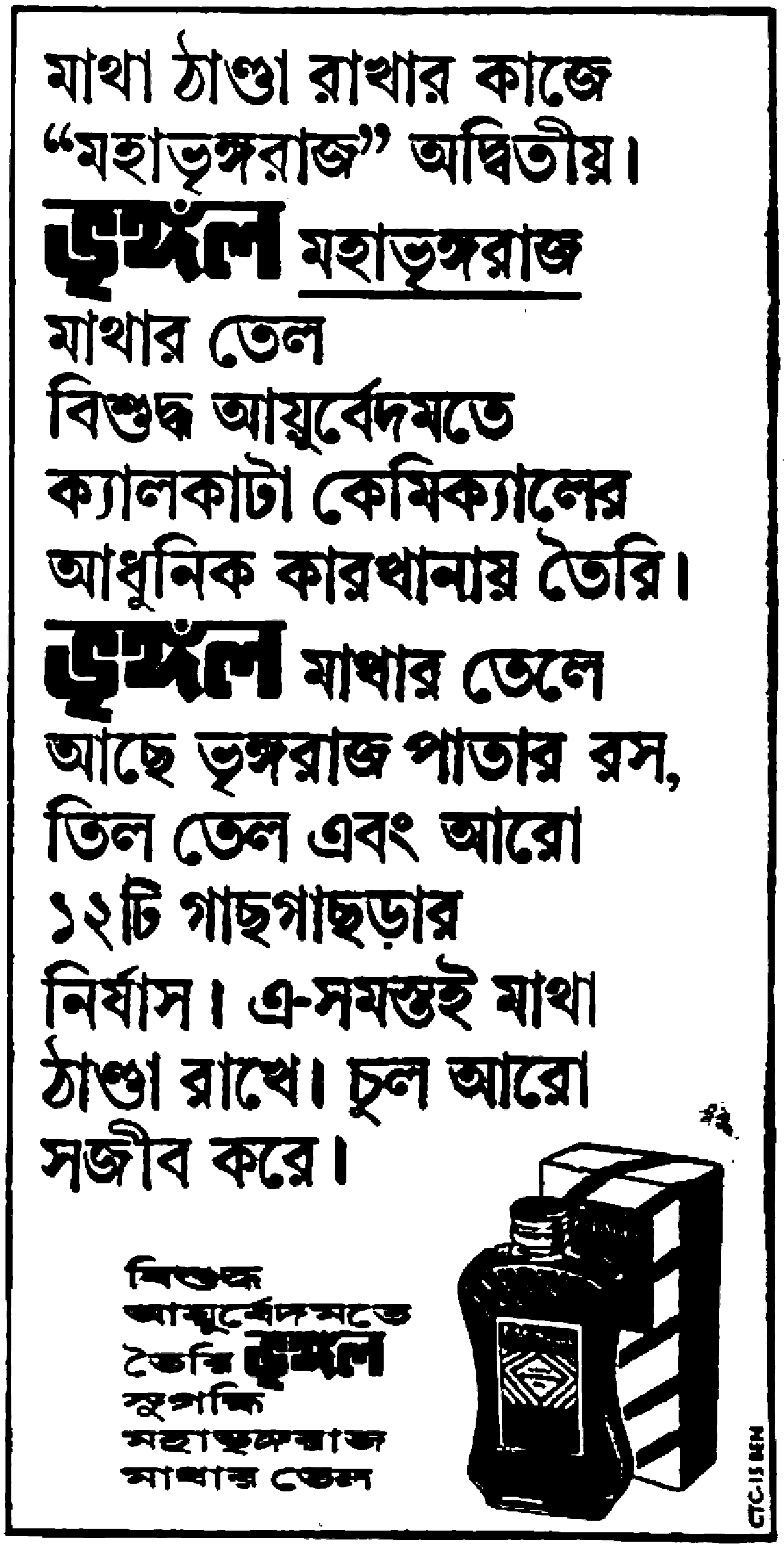

সাহিত্য সংস্কৃতি

দিব্য-জীবনের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ মহাপ্রাণ মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর নির্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য এবং অশেষ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের যে স্থানে আবির্ভাব ঘটে সেই গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটের তিন নম্বর বাড়ীতেই শ্রীমহেন্দ্রনাথ জীবনের অনেকাংশ কাটিয়ে লোকান্তরিত হন। মহেন্দ্রনাথ স্বামীজীর সঙ্গে একত্রেও অনেক দিন য়ুরোপের কোন কোন অঞ্চলে বাস করেছেন এবং সেই সূত্রে স্বামীজীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গোড়ার দিকের ইতিহাস তাঁর বিশেষভাবে জানা ছিল।

মহেন্দ্রনাথ বিশ্বপরিক্রমার কালে পদব্রজে অনেক দেশ ঘুরেছেন, সেই সব দেশের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন এবং তাঁদের সংস্কৃতি ও দেশাচারের পরিচয় পেয়েছিলেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মত শ্রীমহেন্দ্রনাথও দেশপ্রেমিক ছিলেন তবে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথের মত কোন রকম আন্দোলনের সঙ্গে হয়ত তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। তবে এই তিনটি ভাই যে পরম বিপ্লবী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় এঁদের রচনাবলীর মধ্যে। ভারতবর্ষের নবজাগরণে স্বামীজীর অবদান আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু এবং এই বিরাট পুরুষের দু অনুজ গেরুয়া বসনে অঙ্গ সজ্জিত না করেও ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

মহেন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ভক্তপ্রবর ধীরেন্দ্রনাথ বসু নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন এবং প্রতিদিনের আলাপ-আলোচনা নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এই সব সংলাপের ১৩৪০-৪১ সালের অংশ ইতিপূর্বে 'সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সুবৃহৎ দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে ১৩৪২, ১৩৪৫, ১৩৪৭, ১৩৪৯, ১৩৫০—৫৫ এই কালের সংলাপাবলী লিপিবদ্ধ। ধীরেন্দ্রনাথ বসু এখন পরিণত বয়সে পৌঁছেছেন, তিনি প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন কিভাবে মহেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সামগ্রিক দিনলিপি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি, আয়তন সীমিত রাখার প্রয়োজনে। এই সংলাপের মধ্যে শ্রীমহেন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থাবলীর অনেক প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে, সেই কারণে এই গ্রন্থ পাঠকালে মহেন্দ্রনাথ সাহিত্য বিষয়ে পাঠকের কিছু পরিচয় থাকলে 'সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথের' মর্মকথা উপলব্ধি করা অনেক সহজ হয়ে উঠবে। ধীরেন্দ্রনাথ গ্রন্থারম্ভে লিখেছেন—"সহোদর তিন ভাই তিনের তুলনা নাই/তিনজন তিনভাবে বড়/কেবা ছোট কেবা বড়/কহিবারে নাই দড়/তিন ধরে মহা উচ্চতর।"

ধীরেন্দ্রনাথ গেরুয়াবিহীন সাধুর কথাবার্তার দিনলিপি ধরে রেখেছেন, কোন অতিরঞ্জন নেই, নিখুঁত রেখাচিত্র. একটি মানুষের জীবনের টুকরো কথার মধ্যে ফুটে উঠেছে চরিত্র, ফুটেছে অন্তরের মানুষটি। ধীরেন্দ্রনাথের সেখানেই কৃতিত্ব। ধীরেন্দ্রনাথ যথাযথ টুকেছেন কোনো জায়গা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে বা নিজস্ব মতামত আরোপ করে গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি, এই কৃতিত্বের জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

মহেন্দ্রনাথ একদিন কথায় কথায় বললেন—পশ্চী চৌনো কেন?

'সব জমীন গোপাল কি—
উসমে নহী কুছ আটক
হরতরফ আটক জমিকে
দিলমে হ্যায় আটক।'

তারপর ব্যাখ্যা করলেন কোথায় এই ছড়া পেলেন, বললেন—কাবুল জিতে গেল, আকবর দেখলে, মানসিংহই উপযুক্ত ব্যক্তি মারপিট করে ঠিক করতে। মানসিংহকে বললে। মানসিংহ বললে—আমি হিন্দু, অ্যাটক পার হব না। মানসিংহের ওপর তো আর কথা বলতে পারে না—মানসিংহকে দ্বিতীয় বাদশা বলতো।' তাই ভেবে উঠেই বললে—[illegible] গেছেন।'

প্রশ্ন হল এটা কিসে আছে, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বললেন, টডের রাজস্থানে পড়েছি বোধ হয়, এই রকম আরো অনেক ছড়া আছে। বীরবল মারা গেল, তা তো আর বলতে পারে না, তাই ছড়া করলে—

'কালহাই বীজ তজ গিয়া
যহ্ গয়া সব আহীর।
সব পোতা দরবার কি
হয় লিয়া বলকে বীর।'

আবার বললেন—ঔরংজেব দারাকে মারলে, তা তো বলতে পারে না। যাদের কবিত্বশক্তি ছিল ছড়া করে ছোট ছেলেদের শিখিয়ে দিত। ছেলেরা তাই গেয়ে বেড়াতো—

'সিকন্দর—না রহে তেরা আলমগিরী
কে'ও না তুম দারাকো মারা।'

ঔরংজেব দারাকে মেরেছিল, সেকেন্দর দারায়ুসকে মেরেছিল। পারসী ভাষায় সেকেন্দর আলেকজান্দারেরই নাম।

অমলা নন্দীর বিবাহের সংবাদ শুনে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বললেন—'অক্ষয় সেলফমেড ম্যান। (অক্ষয় নন্দী অমলা নন্দীর পিতা)। তা বেশ হল, হর-গৌরীর মিলন হল। (ডান হাতের আঙুল তুলে দেখালেন) — হরও নাচবে, গৌরীও নাচবে।'

আরো অনেক কথার পর বললেন—সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে কালীতলায় ধরেছিল গুণ্ডাতে—রাধাকান্ত দেবের লোক। কেশব সেনকেও কত—।'

বর্তমানে সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

একদিন বললেন 'বয়বলি দিতে হয়। বয়বলি কে দিয়েছে?

—বিনয়, বাদল, দীনেশ। বয়বলি দেয় নি?'

একদিন (৩১শে মে ১৯৪২) পরলোকগত শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বলছেন—

'বঙ্কিম মুখুজ্যে এসেছিল, বললুম বাপু ওসব হুজুক ছাড়ো—Industrialite the National Industrialite the National, ভাবপর (সব হবে)—' ইত্যাদি।

হিগেল প্রসঙ্গে একদিন বলেছেন—

'হিগেল গরীব লোক ছিল। নেপোলিয়ান ব্যাটল অব জেনায় লড়াই জিতলে। সেপাইরা সব বার্লিনে ঢুকে লুঠতরাজ করলে, বললে, বড় লোকের পাড়া তো লুঠ করলুম, গরীব পাড়ায় চল। তা একটা বাড়ীতে গেল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে গেল। দেখে একটা ছেঁড়া কম্বল। একটা টেবিল, একটা চেয়ার—পায়াগুলো রিকেটি—বোতলের ওপর একটা বাতি দিয়ে একটা লোক লিখছে। বললে আমার যা নেবার নাও। কাগজগুলো নিও না। তারা তো ভাবলে, এর বাতিদানও নেই, বোতলের ওপর বাতি রেখে লিখছে, এত গরীব। একে তো আমাদেরই কিছু দেওয়া উচিত। চলে গেল। একশো-দেড়শো বছর বাদ হিগেল-এর বই বেরুলো।' এদেশের একজন সে যুগের বিখ্যাত বক্তা প্রসঙ্গে বলছেন—'কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের নাম শুনেছো? গঙ্গী কবিরাজের শালা। গঙ্গী কবিরাজ তখনকার শ্রেষ্ঠ কবিরাজ। এমন বক্তৃতা দিত, হাসিয়ে মারত। বলরামবাবু, আমি তো হেসে মরি। এই হাসাচ্ছে, এই কাঁদাচ্ছে। এমন যে, মেয়েরা গয়না খুলে দিত।'

একদিন অবনীন্দ্রনাথের 'খরোয়া'র কথা শুনে বললেন—'রবি ঠাকুররা খড়দার গোঁসাইদের শিষ্য। ওদের কথায় অনেক মুসলমানি কথা পাবে, বোষ্টুম কথাও পাবে।'

প্রশ্ন হল—খড়দার গোঁসাইদের শিষ্য?

উত্তরে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বললেন—'অনেক আগেকার কথা। দল বানিয়ে দাও বলবে। কেউ দাও বলবে না।'

আর একদিন একটি ছেলেকে বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে আসতে। ছেলেটি ও তার দাদা গিছল। তারা এসে সেই কথা বলছিল—

'অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা পাশ করে বেরিয়েছো? দাদা বললে হাঁ! বললেন—বেশ-বেশ, এখন কি করছো? বললে এ্যানাটমি করছি। বললেন—ওতে বাপু কিছু হয় না ও অনেক করেছি। করছো কর। যার কোলে-পিঠে চড়লুম, তাকে আঁকতে গেলে হাড় থেকে আরম্ভ করবো কেন? বেশ বললেন একটি কথা—জলে মাছ থাকে, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন থেকে আরম্ভ করবো। আমার অত কি দেখবো আঁকবো!'

গ্রীক মূর্তি প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বললেন—'আলাদা থিয়োরী, আলাদা মাপ, ওরকম কি মানুষ হয়?'

মহেন্দ্রনাথ চিত্ররসিক ছিলেন, আচার্য নন্দলাল তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং অনেক বিষয় পরামর্শ করতেন। মহেন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রসঙ্গে বলছেন—

'একজন কে বলেছিল, আপনি নোট নেবেন না, কি করে লেখেন?—আমি দেখি, আমার সামনে এসে বসে যায়। কারণ এ উঠতে হয়; সেখেনে উঠলে, সামনে এসে দাঁড়ায়।

নন্দলালকে বলেছিলুম। নন্দলাল লাইনে টেনে একটা আঁকলে, বললে, হাঁ এই রকমই হয়।

অর্থাৎ নন্দলাল বিভোর হয়ে এঁকেছিলেন।

কারা একদিন এসে শান্তি-অশান্তি নিয়ে কি বলছিল। মহেন্দ্রনাথ বললেন—'উষা-অনিরুদ্ধ বই আছে? উনি একবার শান্তি-অশান্তি কথাটা বললেন। শান্তি-অশান্তি বৈতরণী—'

বইটি আনা হল, পড়তে বললেন, যতকটি পড়ছে—

'শান্তিতে অশান্তি নয়, অশান্তি শান্তিতে
জনম মৃত্যুতে যায়, মৃত্যু জনমেতে
সার্থক নবীন ভাব কিছু নাহি তথা
সত্য মাত্র নিজ নিজ বিরাজিছে সেথা।'

এর পর বললেন—'শান্তি-অশান্তি বুঝলে—অশান্তি শান্তিতে যায়—শান্তি অশান্তিতে যায়। একবার ভাব দেখি—'

এই ধরনের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের অনেক জটিল সূত্রের সহজ ব্যাখ্যা ও সমাধান মহেন্দ্রনাথের আলাপাচারে পাওয়া যায়।

ধীরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য নিষ্ঠায় সেই সব কথা সাধারণের জন্য লেখে রাখলেন, তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

গ্রন্থ দুটি সুমুদ্রিত এবং পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত।

অভয়ঙ্কর

সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথ (১ম ও ২য় খণ্ড) ধীরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক : ধীরেন্দ্রনাথ বসু, ৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম প্রথম পর্ব আট টাকা, দ্বিতীয় পর্ব—পাঁচ টাকা।

সাহিত্যের খবর

বাংলাদেশ আজ রক্তাপ্লিত। জঙ্গীশাহী শাসকের অত্যাচার আর অবিচারের অবসান ঘটিয়ে জয়ের মুখে এগিয়ে চলেছে জয় বাংলা বাহিনী। পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিক সমাজও আজ এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন এবং বিভিন্ন সভা ও বিবৃতির মাধ্যমে তাঁদের গভীর একাত্মতার কথা জানাচ্ছেন। এ ছাড়াও কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার ভেতর দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জানাচ্ছেন যে, বাংলাদেশের জনসাধারণের সঙ্গে আজ তাঁরা একাত্ম।

বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিকদের আবেগ এবং মর্মবেদনা পৃথিবীর অন্য যে কোন ভাষার কবি লেখকদের চেয়ে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবাংলার লেখকদের ভাষা এক। বাংলাদেশ এই ভাষার জন্য যে ত্যাগস্বীকার করেছে তার তুলনা নেই। রাজনৈতিক কারণে আজ এ দেশ দ্বিখণ্ডিত। কিন্তু অন্তরের যোগাযোগ পরিবর্তিত হয়নি। স্বদেশ, আমার স্বদেশ' কাব্য সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদক কৃষ্ণ ধর বোধহয় এ কারণেই লিখেছেন—'আমরা যাকে বাংলাদেশ বলে জানতাম তার ভূগোল বার বার বদলেছে। বদলায়নি তার অন্তরের সীমানা। সেইজন্যই বাংলাদেশ বলতে আমরা বুঝি বঙ্গ সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে যে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাভূমি তাকে। রাজনৈতিক সীমারেখায় তার হৃদয়ের কণ্ঠকে আমরা অস্বীকার করতে চাই। আমাদের মনের জগতে বাংলাদেশের এই প্রতিমা চিরকালই অম্লান ও উজ্জ্বল।' কবি মণীন্দ্র রায়ের কণ্ঠেও শোনা যায় সেই একই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর—

'জরিপের ফিতে-মাপা নির্বিকার
কয়েক মাইল
যা দেখ সে রাজস্বের সীমা।
আমাদেরই ধাম রক্ত প্রেমের মন্দিরে
দেখ এক আশ্চর্য প্রতিমা।
আমরা রেখেছি তাকে
স্মৃতি দিয়ে ঘিরে।

ভাষা আন্দোলনের দিনেও তাই শুনেছি এবার বাংলার কবিদের কণ্ঠে একই কণ্ঠস্বর। প্রতিবার স্মরণ করেছে সেইদিকে ...

সঙ্গে। আবার ওপারে মধুসূদনের জন্মদিনে পাঁচ হাজার লোক সমবেত হয়েছে সেই দিনটিকে যথার্থ মর্যাদা দানের জন্য। রবীন্দ্র জয়ন্তী আর নজরুল জয়ন্তী দিনেও সেই ঐকান্তিক আকুতিই হয়েছে প্রকাশিত।

জঙ্গীশাহীর শাসনকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর জনতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এপারের সাহিত্যিকরাও এগিয়ে এসেছেন। গত ২৭ মার্চ সর্বশ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, অন্নদাশঙ্কর রায়, অশোককুমার সরকার, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, সন্তোষকুমার ঘোষ, ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার দত্ত, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী প্রমুখ 'পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতির' পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলেন—পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিবর্তনে সমিতি মনে করে তার কর্মসূচী আরো প্রসার করা দরকার, যাতে ওপারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের আরো ঘনিষ্ঠ করা যায়।' অপর একটি বিবৃতিতে কয়েকজন সাহিত্যিক ও শিল্পী বাংলাদেশে যেভাবে ব্যাপক নরহত্যা চলছে তার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁরা মুজিবর রহমানের সংগ্রামের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, অমলেন্দু দত্ত, আবু সৈয়দ আয়ুব মন্ত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন, মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরী আয়ুব দত্ত, তৃপ্তি মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ। এই বিবৃতিতে তাঁরা আরো বলেন যে, ধর্ম নয়, ভাষাই যে জাতির ঐক্যের ভিত্তিভূমি, মুজিবর আজ তা প্রমাণ করলেন। আজ বাংলাদেশে যা ঘটছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর ঘটেনি।

পূর্ব বাংলার এই মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে বহু কবি কবিতায় তাঁদের নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করছেন। কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু লিখেছেন—

'মরবো না আর মরবো না।'
টুকরো কাগজে তলোয়ার আর ধরবো না;
হলাহলে আর প্রাণসমুদ্র ভরবো না,
'মরবো না আর মরবো না।'

বাংলার এই নব উজ্জীবনে আনন্দিত হয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন
'আমি আমার অস্তিত্বকে দুই খণ্ড করে নিজেকে বার বার শোনাচ্ছি:

সীমান্তের ওইদিকে আমার জন্মভূমি,
এইদিকে আমার স্বদেশ।'
শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচা নয়,
আগুন খুঁজে না,
হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বালো দারুণ সন্ত্রাসে
করো ভুল—

মরো—কিন্তু মেরে মরো এবং
উদ্ধার করো ঘর,
নিশ্চিত রয়েছি পাশে আমি তোর
জন্ম সহোদর।'

এ ছাড়াও মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু প্রমুখও কয়েকটি উল্লেখ্য কবিতায় জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

শুধু কবিতা রচনা নয়, সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে জনমত সৃষ্টি এবং বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতির দাবীও জানান হয়েছে। গত ৩০ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতার স্টুডেন্টস হলে 'পরিচয়', 'আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন' প্রভৃতির উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, বাংলার ঘটনাবলীতে তিনি অভিভূত। মনোজ বসু তাঁর ভাষণে বলেন যে, এক সময় তাঁর মনে হয়েছিল যে, জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হবে না। কিন্তু আজ তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে। তিনি আবার ফিরে যাবার বাসনা প্রকাশ করেন।

তরুণ সান্যাল তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করে বলেন, আমাদের উচিত মুজিবর সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। তিনি আকাশবাণীর বর্তমান অনুষ্ঠান-সূচীর নিন্দা করেন। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসব সরকার প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিলাদ্রিশেখর বসু আবৃত্তি করে শোনান।

গত ১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতার স্টুডেন্টস হলে 'সারা বাংলা যুব লেখক সম্মেলনের' উদ্যোগে আর একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন তরুণ সান্যাল এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোজ বসু। প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবং তরুণ সাংবাদিক স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বিবরণ বর্ণনা করেন। তাঁদের বর্ণনার মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়ার জঙ্গী সেনার নৃশংস বর্বরতার কথা শুনে সভার সকলে ধিক্কার দিতে থাকেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাস, গণেশ বসু, আশিস সান্যাল প্রমুখ। পূর্ব বাংলার সমর্থনে কবিতা পাঠ করেন সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীরকুমার বসু ও অজিতকৃষ্ণ সরকার। সভায় প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করেন শুভ মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, অজয় সেন ও বাণীব্রত চক্রবর্তী। প্রস্তাবে বলা হয়—'এই সভা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করছে যে, বাংলাদেশের এই জঙ্গীশাহী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এপারের যুব লেখকরাও রয়েছেন তাদের পাশে। প্রয়োজনে তারাও পরখ করে নেবেন রক্ত আর আগের মত লাল আছে কিনা। তাদের বুকের মধ্যে বাংলার একই প্রতিমা, একই মুখ।' সভায় ঢাকায় কবি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে তা পাঠ করে শোনান হয়। ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে কবি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান অসামান্য।

চার্বাক

নতুন বই

সাদা মেঘ কালো পাহাড় (কাব্যগ্রন্থ)—অজিত দত্ত। কিরণ পাবলিকেশনস, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯। দাম : তিন টাকা।

কবি-প্রসিদ্ধিতে ও অন্তরঙ্গ জীবন-চর্চায় অজিত দত্ত আধুনিক কবিতা পাঠকের অত্যন্ত কাছের মানুষ—অন্যতম প্রিয় কবি। কর্ম ও টেকনিকের বিশিষ্টতায়, সৌন্দর্যের আকস্মিক আবিষ্কারে ও উপলব্ধির গভীরতায় তিনি পাঠককে চমকে দেন। অনেক পরিবর্তিত হয়েও তিনি এই কাব্যে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। সময়ের অভিজ্ঞতা নয়, নিঃসময়ের আলোই তাঁকে পথ দেখিয়েছে বরাবর। যদিও আত্মজিজ্ঞাসার কঠিনতম প্রশ্নে তিনি প্রায়শ কর্তব্যরত।

এই কাব্যগ্রন্থের একটি বহুল-ব্যবহৃত শব্দ 'অন্ধকার'। কখনই সাধারণ অর্থে নয়, অনুসন্ধান ও নিজেকে পরিপূর্ণরূপে দেখার—পুনরাবিষ্কারের বিশিষ্ট অর্থেই শব্দটি বারবার উচ্চারিত।

অনেকটা স্বগতোক্তির মতো মনে হয় তাঁর উচ্চারণ। হয়তো-বা গভীরতর অর্থে তিনি রোমান্টিকও। সেজন্যেই তাঁর কল্পনার কোনো সুস্পষ্ট ভাষা নেই, অতি-লৌকিকতার পরিবেশে রহস্যাবৃত। এবং ভীতত্রস্ত প্রতীক্ষায় আবদ্ধ তাঁর চারদিকে।

"আমার শয্যার চারপাশে কত চুড়ি!
আর অস্পষ্ট ফিসফিস আওয়াজ—
জেগে আছো?

আমার সর্বাঙ্গে জ্বালা।
আমি অগ্নিসাক্ষী করে চেঁচিয়ে বলি—
আমি জেগে আছি, তুমি এসো।"

এই প্রতীক্ষা এবং জাগরণ, আত্ম-আবিষ্কার এবং আত্মজিজ্ঞাসা নিয়েই এই সংকলনের বেশির ভাগ কবিতা লেখা। উৎসের গভীরতায় ডুব দিয়েই তিনি পাঠকের সংগে কথা বলেছেন।

এবং পাশাপাশি, অনেকগুলি কবিতাই এক অদৃশ্য প্রেমিকার উদ্দেশ্যে লেখা। 'তুমি' সর্বনামটির অন্তরালে যার অস্তিত্ব নিহিত, তাকে নারী বলেই অনুমান হয়। কিন্তু কবিতায় 'ফুল' 'তপ্তস্পর্শ' 'আলিঙ্গন' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার অন্তত সে ধারণাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। উদাহরণ হিসেবে 'তামসী' 'বৃষ্টি' 'আর যখন' 'অনপনেয়' দুটি প্রেমের কবিতা'-র নাম মনে পড়ে।

অবশ্য সবই প্রেমের কবিতা নয়। কিন্তু কিছু কবিতা মাটি, মানুষ ও পৃথিবীর ভালোবাসায় নত ও কোমল। মনে পড়িয়ে দেয়, বাংলাদেশের নিসর্গ ও প্রকৃতির ঘন-সান্নিধ্যের স্মৃতি। বৃষ্টি, ও ঋতুর আবরণ ও অন্বেষণ জড়িয়ে আছে কয়েকটি কবিতার শরীরে।

এবং অধিকাংশে কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে কবির অতৃপ্তি, হতাশা ও না-পাওয়ার যন্ত্রণাজাত অস্থিরতা। হয়তো এই যন্ত্রণাকেই কবিরা আনন্দে বরণ করে আসছেন চিরকাল। হয়তো এই অস্থিরতাই কবিকে সৃজনক্ষম রাখে।

'সাদা মেঘ কালো পাহাড়'-এর পাঠক পাবেন যুবক কবির তপ্ত সান্নিধ্য। পাবেন অসংখ্য ইমেজ ও ইমেজারি, উপমা ও প্রতীকের ব্যবহার, শব্দ ও দৃশ্যের বিরল উপস্থিতি—যা প্রতি মুহূর্তে তিরিশের কবি অজিত দত্তকে নতুন করে মনে পড়িয়ে দেয়। যেমন কয়েকটি লাইন: (১) তুমি দেখবে মহাশূন্যে নিশ্ছিদ্র মেঘের মতো স্তম্ভিত কৃষ্ণতা, (২) ছোট পাখিটার টুক রক্ত ওর রক্তে মিশে গেল, (৩) একটি তারাকে আমি ফোটালাম সমস্ত আকাশে, (৪) অন্তঃপুরে বাসনারা যৌবনের সহমতা হবে।—ইত্যাদি।

সংকলনটির শেষের দিকে 'রূপান্তর' পর্যায়ে ছাপা হয়েছে চারটে বিদেশী কবিতার অনুবাদ। এবং প্রতিটি কবিতাই কবির মেজাজ ও প্রবণতার সংগে সামঞ্জস্য-পূর্ণ। কবির স্বীকৃতি ছাড়া বোঝা যায় না, কবিতাগুলি আসলে কোনো বিদেশী কবির লেখা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

নইহৰ (ফাল্গুন-বৈশাখ) — সম্পাদক: অরুণ ইন্দু, সুবোধ ভট্টাচার্য, সুজিত মুখোপাধ্যায়, ৫।১৩ রাজাবাগান লেন, দমদম, কলকাতা—৩০। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

পাইকা হরফে পরিচ্ছন্ন ছাপা। গল্প-কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ও অনুবাদে সমৃদ্ধ। লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন শুভি

সারস্বতের বই

হাজার বছরের বাংলা গান ১৫
প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পাদিত
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ১০
নেপাল মজুমদার
প্রবন্ধ সংকলন ৮
মুজফ্ফর আহ্মদ
ধান্য থেকে মাণ্ডু ২·৫০
বাঘ ও অজন্তা ৬·৫০
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
আবৃত ইতিহাস ঊনকোটি ৫
জয়ন্তনাথ চৌধুরী
দেবেশ রায়ের গল্প ৬
দেবেশ রায়

সুকান্ত ভট্টাচার্য
সুকান্ত সমগ্র ১৫
ছাড়পত্র ৩
ঘুম নেই ৩
পূর্বাভাস ২
মিঠে কড়া ২·৫০
অভিযান ২
হরতাল ১·৫০
গীতিগুচ্ছ ১·৫০
সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত
আকাল ২

কবি সুকান্ত ৩
অশোক ভট্টাচার্য
কবি কিশোর সুকান্ত ৩·৫০
অন্নপূর্ণা বসু ও সরলা বসু
সুকান্তনামা ৩
মিহির আচার্য সম্পাদিত

ইতিহাসে গ্রীকের উজানে ৫
বিষ্ণু দে
মনের বাইরে মাটিতে ৪·৫০
অরুণ মিত্র
বৈরী কল ৪·৫০
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
আমার প্রথম গান ৪
মণীন্দ্র রায়
মলিন আয়না ২·৫০
রাম বসু
মধ্যেকার দীর্ঘবেলা একা ৩
অরুণ সান্যাল
রৌদ্র দিন ২
অশোক ভট্টাচার্য

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ
পরেশচন্দ্র মজুমদার ২৫·০০
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ৮
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী
বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব
পদাবলীর ক্রমবিকাশ ৫
ডঃ সতী ঘোষ
রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি ৫
অভিনব গুপ্তের রসভাষ্য ৫
অবন্তীকুমার সান্যাল
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৫
ডঃ শিশিরকুমার মিত্র
রমেশচন্দ্র দত্ত ৩
ডঃ সুনীল সেন
সংখ্যা বিজ্ঞানের অ আ ক খ ৪
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
বিজ্ঞানীদের বাল্যে ৬
নির্মলকুমার বসু
ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ ১·৫০
বিনয়কৃষ্ণ দত্ত
ডিরোজিও: কবি ও প্রাবন্ধিক ১·৫০
পল্লব সেনগুপ্ত
আধুনিক কবিতার উৎস ৩
বুদ্ধ বসু
ডঃ অতুলচন্দ্র সেন
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৩
বুদ্ধদেব ৩
অশোক চরিত ২
অভিজ্ঞান শকুন্তলা ৮·৫০
কালিদাসের মেঘদূত ৫
কবিতার কথা ৩
মৃগাঙ্ক রায়

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ
বাংলা কবিতা ৪
মণীন্দ্র রায়
অর্থনীতিবিদ মার্কস ৩
অরুণ সান্যাল
ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ ৪
অশোক ভট্টাচার্য অনূদিত
ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায় চিত্রিত
অ্যাদিমির ইলিচ লেনিন ৩·৫০
সিদ্ধেশ্বর সেন অনূদিত
অরূপ কাজল ৩
অলকা ভৌমিক

সারস্বত লাইব্রেরী ॥ ২০৬ বিধান সরণী ॥ কলিকাতা—৬

চট্টোপাধ্যায়, সুনীল বসু, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ, অমিয় চক্রবর্তী, শঙ্কর দত্ত, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য— এবং আরো অনেকে। প্রচ্ছদ ভালো। নাটক সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

বাহিনদ্ত (চতুর্থ সংখ্যা) — রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। গরিফা, পোঃ হালিশহর, ২৪ পরগণা। পাঁচিশ পয়সা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখাসহ অন্যান্য রচনায় পত্রিকাটি সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে। লিখেছেন রেখা দত্ত, ধীরেন্দ্র ভৌমিক, জয়ন্ত সাহা, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং আরো কয়েকজন।

জ্যা পর্জোজ (পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা)— সম্পাদক : বার্ণিক রায়। বেলগাছিয়া ভিলা। এম আই জি স্কিম, ব্লক একস, ফ্ল্যাট ১, কলকাতা—৩৭। দাম এক টাকা।

কবিতায় ঠাসা, প্রবন্ধে-নিবন্ধে আকর্ষণীয়, রোমান অক্ষরে মূলে বাংলা কবিতাসহ ইংরেজী-গদ্যানুবাদে জ্যা-পর্জোজ'র এ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। দাম খুবই সস্তা। প্রচ্ছদ চমকপ্রদ। বাংলা দেশের প্রায় সব তরুণ কবিই এ সংখ্যাটির লেখক। লিখেছেন শঙ্কর ঘোষ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, বার্ণিক রায়, শিবশম্ভু পাল, প্রমোদকুমার আচার্য চৌধুরী, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ এবং আরো অনেকে। সাম্প্রতিককালে এক সঙ্গে আর কোন পত্রিকায় এত কবিতা বেরোয় নি। কয়েকটি কবিতার অনুবাদসহ নন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সমালোচনা ও 'একজন পঞ্চাশের কবির জবানবন্দী' বেশ চমকপ্রদ। ভবতোষ দত্তের আলোচনা 'শিবাদের আদিম চিৎকার' পাঠককে ভাবনার খোরাক জোগাবে।

অধুনা সাহিত্য (চৈত্র ১৩৭৭)—সম্পাদক : তুলসী মুখোপাধ্যায়। হালিশহর, ২৪-পরগণা। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

পত্রিকাটির স্থায়ী সম্পাদক সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। কেবল এ সংখ্যার জন্যে ভিন্ন সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন একজন কবি। তরুণতম কবিদের কবিতা ও গল্পের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকদের আলোচনা প্রকাশ করার দিকেই ছিল সম্পাদকের ঝোঁক। গল্প লিখেছেন সমীরকান্তি বিশ্বাস ও উৎপল সরকার। মণীন্দ্র রায় ও কৃষ্ণ ধরের প্রবন্ধ দুটি এ সংখ্যার প্রধানতম সম্পদ। কবিতা লিখেছেন অজয় সেন, নিশ্চিলেশ্বর সেনগুপ্ত, উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল ভট্টাচার্য, কেদার ভাদুড়ী, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। নতুন সম্পাদক নিজেকে আড়ালে রেখে লেখা নির্বাচন করেছেন।

হিন্দোল (বসন্ত সঙ্কলন) — সম্পাদক তুষারকান্তি দে, দীপক দত্ত। ১৭ হরিরাম মুখার্জি রোড, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী। দাম কুড়ি পয়সা।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষদের উদ্দেশ্যে লেখা প্রাক-সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য লেখায় পত্রিকাটি জাগ্রত যুব-মানসের চিন্তা-ভাবনারই প্রতিধ্বনি। সম্পাদক দুজন কবিতার মতো লাইন-ভাঙা সম্পাদকীয়ে লিখেছেন : 'বন্দরে-বন্দরে কান্নার সাইরেন—শতাব্দীর আকাশ ম্লান। সেই গহীন রাতের অন্ধকারে— আকাশের তারারা স্পষ্ট...বিন্দু...বি...ন্দু... ঘুরে-ঘুরে—ছায়াপথ পেরিয়ে, চেয়ে দেখি— 'হিন্দোল জ্বলছে।' এ সংখ্যায় চমৎকার একটি নাটিকা লিখেছেন ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন সজল ঘোষ, বহ্নি ভট্টাচার্য, তুহিন দেবরায়, অমিয় নাথ, জয়নাল দত্ত, সুশান্ত অধিকারী, বিকাশ দত্ত, রত্নলাল বর্মণ, মনীশ রায়, তুষারকান্তি দে এবং আরো কয়েকজন।

চতুর্ভাস (প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক : দত্তাত্রেয় দত্ত। সি আই টি বিল্ডিংস, বি-২৬, কলকাতা—৭। দাম ষাট পয়সা।

পত্রিকাটি হাতে নিলেই পাঠক খুশি হবেন দুটি কারণে। প্রথমত, পূর্ব বাংলার এক গুচ্ছের গল্পের ওপর এপার বাংলার কবির সমালোচনা স্থান পেয়েছে একেবারে প্রথম দিকে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানের সময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের স্বাক্ষর রয়েছে প্রতিটি লেখায়। আছে কবি ও নাট্যকারদের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ। এবং স্মৃতিমূলক রচনা। লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, লোকনাথ ভট্টাচার্য, তুলসী মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, রাম বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, রবীন সুর, অমিতাভ সেনগুপ্ত, বাদল সরকার, তরুণ সেন, বিমান মিত্র প্রমুখ। পত্রিকাটির ছাপা, অঙ্গসজ্জা ভাল। সূচীপত্র ছাপা হয়েছে গোলাপী কাগজে।

দিশারী (প্রথম সঙ্কলন) — দুলাল কর। শিমুরালী, নদীয়া। এক টাকা।

সম্পাদক দাবী করেছেন : 'দিশারী আজকের দিনের হতাশাপূর্ণ লেখকদের দিগদর্শন।' খুবই দুঃসাহসী ঘোষণা। এখন ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই। লিখেছেন, সমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মপুত্র হালদার, উদয়ন নন্দী, মলয়কুমার সরকার, অমিতকুমার দে প্রমুখ। সাধারণ পাঠকের কাছে পত্রিকাটি ভালই লাগবে।

Soviet Jews: Fact and Fiction — Novosti Press Agency. Publishing House. Moscow.

সোভিয়েত রাশিয়ায় ইহুদিদের বিরুদ্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নানাধরনের প্রচার শুরু করেছিলেন। বর্তমান পুস্তিকায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইহুদিদের সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। সেইসব প্রচারের যুক্তিহীনতা এবং মিথ্যাচারই স্পষ্ট হয়ে ওঠে পুস্তিকার আলোচনায়।

কণ্ঠস্বর (পৌষ-মাঘ) — সম্পাদক সত্যরঞ্জন বিশ্বাস।। ৪১এল।৭ নারকেলডাঙা নর্থ রোড, কলকাতা-১১।। পঞ্চাশ পয়সা।।

এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শান্তিকুমার ঘোষের "কবিতায় নিসর্গপ্রকৃতি : একটি অভিজ্ঞতা।" কবিতার বইয়ের আলোচনা লিখেছেন বোধহয় সম্পাদক। এবং কবিতা লিখেছেন বামিনীভূষণ সিংহ, অমরেন্দ্র সান্যাল, কার্তিক মিত্র, মুকুল বসু, শিবাজী গুপ্ত, রবীন সুর, গণেশ সেন এবং আরো অনেকে।

প্রিয়ম (বাসন্তী সংখ্যা)—সম্পাদক হুবীক। ৬৭।১ উল্টাডাঙা মেন রোড, কলকাতা-৪।। এক টাকা।।

মূলত বাংলা হরফে ছাপা সংস্কৃত কবিতা ও গদ্যরচনা স্থান পেয়েছে পত্রিকাটিতে। প্রয়াস হিসেবে মন্দ লাগবে না। সংস্কৃত যখন মৃতভাষায় পরিণত হতে চলেছে, তখন তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন সম্পাদক। পত্রিকাটি বেরুচ্ছে ডঃ রমা চৌধুরী, কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী ও কে এস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে।

জাগরী (ষোড়শবর্ষ : মাঘ '৭৭)—সম্পাদক শ্রীঅপূর্বকুমার সাহা। ৭৪।৫এ বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা : ৩। পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগীদের সাময়িক পত্রিকা 'জাগরী'। এই সংখ্যা শ্রীমার বাণী নিয়েই সমৃদ্ধ। গল্প কবিতা নিবন্ধও আছে। নিবন্ধগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শ্রীঅরবিন্দ-এর দিব্যজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পত্রিকার বৈশিষ্ট্যহীন আর পাঁচটা পত্রিকার মতো 'মঞ্চ-চিত্র-কথা' প্রকাশ কেমন যেন বেমানান এবং দৃষ্টিকটু।

রাজা রাণী আর রাজকন্যা (গল্পগ্রন্থ)—অর্চনা মিত্র। রাণার প্রকাশনী : ১৪বি, রড স্ট্রীট, কলকাতা-১৯। দু'টাকা।

যে বংশ এককালে মর্যাদায় আভিজাত্যে এবং চালচলনে রাজার মতো ছিল সেই রাজা রাণী আর রাজকন্যার প্রেম-ভালবাসা নিয়েই এই গল্পগ্রন্থ।

আলোর জোয়ার (সম্ভাবনা সঙ্কলন)— সম্পাদক ফাল্গুনীচরণ মাইতি।।গড়বেতা, মেদিনীপুর।। পঞ্চাশ পয়সা।

তরুণ লেখক-লেখিকাদের মুখপত্র। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের মন্দ লাগবে না। লিখেছেন হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আবদুস সামাদ, শেখ নজরুল ইসলাম, নিত্যানন্দ দাশ, লীনা সরকার, পান্নালাল রায় প্রমুখ।

CENTRAL LIBRARY

বইকুণ্ঠের খাতা

উড়িয়া ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা

পশ্চিমবাংলায় 'কিছুই হচ্ছে না' 'কিছুই হচ্ছে না' সোরগোলের মধ্যেও অনেক কিছুই হচ্ছে। অন্তত অনুসন্ধানের কাজ স্তব্ধ হয়ে নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে নবীন-প্রবীণ গবেষকরা নানা বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে যাচ্ছেন। হয়তো বাইরের কোলাহলে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না বলেই তাঁরা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে থাকাও পছন্দ করেন না। অবশ্য তার অন্য কারণও থাকতে পারে।

সাধারণত আমাদের দেশের গবেষকরা যেসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, তার সঙ্গে সাধারণত পাঠকের পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। এবং থাকলেও প্রায়শ অনাত্মীয়ের। কখনো বৈরীতার।

সৃজনশীল সাহিত্যের পাঠক গুরু-গম্ভীর ইতিহাসের চর্চায় তৃপ্তি পান না। এটা দেখেছি, অনেক সিরিয়াস পাঠকের পক্ষেও সত্য। তাঁরা চান, সমকালীন ঘটনাবলীর ওপরে আলোকপাত, কিংবা প্রিয়তম লেখক-লেখিকাদের ওপরে আলোচনা।

ঠিক এজন্যেই নিষ্ঠাবান গবেষকেরা সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত থেকে যান। অনেকে তাঁদের সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করেন না।

অমৃতের কয়েকটি সংখ্যায় আমরা তাই নিয়ে অনেক আক্ষেপ করেছি। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখাতে চেয়েছি, কি কারণে গবেষণার মান নেমে যাচ্ছে—কেন নতুনতর বিষয়ে গবেষণা করার উৎসাহ গবেষকরা হারিয়ে ফেলছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, সরকারী-বেসরকারী উদ্যমের দোষত্রুটির কথাও। বোঝাতে চেয়েছিলাম, কি কারণে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস পান না তরুণতর গবেষকরা পর্যন্ত।

সেই কারণগুলি নিশ্চয়ই এখনো বর্তমান।

দীর্ঘকালের অভ্যাসে ও জটিলতায় যার সৃষ্টি, একদিনেই তার প্রতিকার হবে—এমন আশা করাও বোধহয় দুরাশা। কেবল বিশ্বাস রাখি, সকলে সচেতন হলে, দূর কিংবা অদূর ভবিষ্যতে গবেষণার গতি ও বিষয়-মুখ অবশ্যই আলটে যাবে—অভিজ্ঞতার পুনর্মূল্যায়নে সহায়ক হবে।

আসন্ন সেই পরিবর্তনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এখনো অনেক ক্ষীণ, তবে অস্পষ্ট নয়। গবেষকরা চেষ্টা করছেন, ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগসূত্র আবিষ্কার করতে। লেখকেরা লিখে যাচ্ছেন কমবেশী সৃজনশীল সাহিত্য।

পরেশ মজুমদারের গবেষণা

কথা হচ্ছিল সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। বয়সে তরুণ, স্বভাবে মৃদু, ভদ্রলোক কথা বলেন সহজ সরল সুস্পষ্ট ভাষায়। তাৎক্ষণিক পরিচয়ে মনে হলো, কোনো ঘোর-প্যাঁচে থাকেন না—নিজের কাজ নিয়েই সবসময় ব্যস্ত। হয়তো অন্তরের দিক থেকে ধ্রুপদী জগতের মানুষ।

সেদিন তাঁর হাতে ছিল, আসন্ন-প্রকাশিত একটি বইয়ের কতকগুলি ছাপানো ফর্মা। বেরোবার আগেই বাঁধিয়ে নিয়েছেন চকোলেট রঙের রেকসিন দিয়ে।

অভ্যাস বশে আমি তার পাতা উল্টেছিলাম। সত্যি বলতে কি, মনে শ্রদ্ধা ছিল না।

বইটির নাম : এ হিস্টরিক্যাল ফোনোলজি অব ওড়িয়া'। প্রকাশক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সংস্কৃত কলেজ। দাম : পনেরো টাকা। ছাপা হয়েছে, নানা চিহ্নে কণ্টকিত হয়ে ইংরেজী ভাষায় ও হরফে।

কেবল লেখক বা প্রকাশকের নামের গুণে নয়, বিষয়ের অভিনবত্বের জন্যই আমি চমকে উঠেছিলাম।

লেখক?

তাঁকে তো চিনতামই না, নাম শুনেছি দু'এক জায়গায়। তার বেশি পরিচয় পাইনি। উপরন্তু তিনি সাহিত্যজগতের লোক নন, অধ্যাপক মহলেও অপেক্ষাকৃত অপরিচিত—অনেকের কাছেই অচেনা।

জিজ্ঞেস করলাম, উড়িয়া ভাষা জানেন?

ভদ্রলোক নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলেন, জানতাম না। শিখে নিয়েছি। এখনো ভালো বলতে পারি না, পড়তে পারি অনায়াসে। বলাটা নিয়মিত চর্চা না থাকলে হয় না।

আমি অবাক।

বললাম, এত সব বিষয় থাকতে, আপনি উড়িয়া ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করলেন কেন? কি নিয়ে পাশ করেছেন?

—আমার অধ্যাপনার বিষয় ভাষাতত্ত্ব—কৌতূহলেরও একমাত্র বিষয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে পাশ করেছিলাম, বাংলা নিয়ে। কিন্তু সেই ছাত্রজীবনেই ভাষাতত্ত্ব আমাকে এমনভাবে টেনেছিল যে, কেবল সাহিত্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারিনি—পরে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছি, পাশ করেছি। আর তখনই আকৃষ্ট হয়েছিলাম, উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি।

একটু থেমে বললেন, বৈষ্ণব সাহিত্য আমার ভালো লাগে এবং ছাত্রজীবনেও লাগতো। পদাবলীর অনেক কবিই ছিলেন উড়িষ্যার লোক। বিশেষ করে, চৈতন্যদেব শেষ জীবনটা কাটিয়েছেন উড়িষ্যায়। হয়তো এটাই ছিল, উড়িয়া ভাষার প্রতি আমার আকর্ষণের অন্যতম কারণ। তবে গবেষণার কারণটা অন্যরকম।

জিজ্ঞেস করলাম, সেই কারণটা কি?

বললেন : উড়িষ্যা আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য। ওখানকার ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের অত্যন্ত গভীর। অথচ সেই ভাষা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার সীমা নেই। তাছাড়া প্রায় প্রতিটি ভাষার ওপরে উল্লেখযোগ্য এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ যখন লেখা হয়ে গেছে, তখনও উড়িয়া ধ্বনিতত্ত্বের ওপর তেমন কোনো বই নেই। আমার গবেষণার মূল কারণও কিন্তু তাই।

কবে থেকে কাজ শুরু করেছেন?

—১৯৬০ সাল থেকে। তবে ১৯৬৪-র আগে কলম ধরিনি। টুকিটাকি নোট নিয়েছি। পড়াশোনা করেছি। সারা উড়িষ্যা

হয়েছি। একই সঙ্গে সাহিত্যের উপাদান, শব্দের পরিবর্তন, উচ্চারণের রীতিপদ্ধতির দিকে নজর রাখতে গিয়েই এই সময়টা কেটে গেছে।

রিসার্চ করেছেন কার অধীনে?

—কারো অধীনে নয়, একা। অনেকের সাহায্য নিয়েছি, অনেকের অকৃপণ পরামর্শ পেয়েছি। ডকটরেট হবার লোভে কিছু করিনি।

আপনি কি ডকটরেট নন?

—না।

আমি দ্বিগুণ বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন—তাঁর এই কথায়। গবেষণা করেছেন, অথচ ডকটরেটের জন্য প্রলুব্ধ নন—এমন মানুষও আছে নাকি এখনো এদেশে?

বললাম, বিচ্ছিন্নভাবে ছাপা হয়েছে এ বইয়ের বিভিন্ন অংশ? নাকি একবারেই বই আকারেই বেরোচ্ছে?

—সংস্কৃত কলেজের গবেষণামূলক রচনার পত্রিকা 'আওয়ার হেরিটেজ'-এ বইটির বিভিন্ন অংশ ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে ১৯৬৭ সাল থেকে।

সরকারের সহযোগিতা

বললাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বই ছাপলেন কেন? সুনীতিবাবুর ও-ডি-বি-এল যখন দীর্ঘকাল অমুদ্রিত, তখন আপনার এ বই ছাপার কি কারণ থাকতে পারে?

—আমি সংস্কৃত কলেজে পড়াই, সরকারের চাকরী করি—বোধহয় সেজন্যেই। তার ওপরে সুনীতিবাবু ছিলেন, আমার এ বই প্রকাশের অন্যতম উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক।

কি রকম? কিভাবে তিনি সাহায্য করেছেন?

—গৌরীনাথ শাস্ত্রী যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন থেকেই বইটি ছাপা শুরু হয়। কিন্তু আমি ডকটরেট নই। ফলে, ও'রা দ্বিধায় পড়লেন। ছাপা উচিত কি উচিত না—তাই নিয়ে সংশয় দেখা দিল।

তারপর?

—গেলাম সুনীতিবাবুর কাছে। তিনি আমাদের কলেজের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য। তাঁকে সব কথা খুলে বলতেই বিনা দ্বিধায় তিনি আমাকে সমর্থন করলেন। চিঠি দিলেন তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে। বইটির প্রশংসাও করলেন। লিখলেন, এ বই ছাপা হওয়া উচিত—যেন তাড়াতাড়ি ছাপা হয়।

ছাপা হতে কতদিন লাগলো?

—তিন চার বছর।

মানে, ১৯৬৪ সাল থেকে?

—হাঁ, 'আওয়ার হেরিটেজ'-এর একেকটি সংখ্যায় আমি যেমনভাবে লিখেছি, এবং যেমনভাবে ছাপা হয়েছে—এ বইটিও ঠিক তেমনিভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। আসলে এটি সংস্কৃত কলেজের মুখপত্র 'আওয়ার হেরিটেজ'-এর অফপ্রিন্ট। জানেন তো, সরকার বের না করলে, এ বই হয়তো কোনোদিনই বেরোত না।

বললাম, গবেষণার সময় সরকারী সাহায্য কিছু পেয়েছেন?

—পাইনি। চেষ্টাও করিনি। নিজেই টাকা পয়সা খরচা করেছি, যাতায়াত এবং যোগাযোগ করেছি। সমস্ত উদ্যমটা একান্তভাবেই আমার।

গবেষণার নেপথ্যে

কি পরিমাণ পরিশ্রম ও ধৈর্য থাকলে যে এধরনের কাজ-শেষ করে ওঠা সম্ভব—তা টের পেয়েছি ছাপা ফর্মাগুলি উল্টে-পাল্টেই। এমন নীরস, এমন পাঠকবর্জিত বিষয়ে যাঁর উৎসাহ—তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।

তবু জিজ্ঞেস করলাম, তথ্য সংগ্রহে আপনি কার কার সাহায্য পেয়েছেন? এবং কিভাবে?

—সুনীতিবাবুর ও-ডি-বি-এল ছিল আমার প্রচ্ছন্ন প্রেরণা। বইপত্রের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগারের। তা ছাড়া উড়িষ্যা থেকে আনিয়েছি বহু বই। আধুনিক উড়িয়া ভাষাকে বোঝার জন্য।

একটু থেমে বললেন, সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি যাঁদের কাছ থেকে, তাঁরা আমার কাছেও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই অপরিচিত। জানেন নিশ্চয়ই, সুনীতিবাবু বাংলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে কলকাতার চলিত বাংলাকে স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালেক্ট হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আমিও তেমনি উড়িষ্যার চারটে উপভাষার মধ্যে দুটোকে স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালেক্ট হিসেবে গ্রহণ করেছি। সেজন্যে আমাকে অনেক বার যেতে হয়েছে পুরী এবং কটক। ওখানকার মানুষ কিভাবে কথা বলে, কিভাবে উচ্চারণ করে—তার নমুনা সংগ্রহের জন্যে অনেকের কণ্ঠস্বর টেপ করে এনেছি। উচ্চারণের ব্যবধান বোঝাবার জন্য—এসবই হলো অত্যন্ত জরুরী কাজ। কেননা, ভাষা জিনিসটা খুবই সচল এবং সজীব—নদীর মতোই গতিশীল। আমার গবেষণার নেপথ্যে যাঁরা আছেন, সেজন্যেই তাঁদের নাম বলা যায় না। তাঁরা অচিহ্নিত—জনপদের মানুষ।

পুরনো পাণ্ডুলিপি কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন?

—কিছু করেছি। তবে ওরিজিন্যাল ম্যানাসক্রিপ্ট ঘাঁটাঘাঁটির কোনো সুযোগ ছিল না। উড়িয়া সাহিত্যের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি প্রায় সবই ছাপা হয়ে গেছে। আর্তবল্লভ মহান্তিকে এজন্যে ধন্যবাদ জানাতে হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় প্রতিটি দুষ্প্রাপ্য বইই তিনি একাই বহু প্রকাশ করেছেন। বাংলার যেমন বহু পাণ্ডুলিপিই এখনো অমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে আছে, উড়িষ্যার কিন্তু সেরকম পাণ্ডুলিপি প্রায় নেই বললেই চলে।

সার্থকতা এবং বৈশিষ্ট্য

কথায় কথায় পরেশবাবু বললেন, এককালে আমাদের দেশে হর্নলে, বীমস প্রমুখ প্রাচ্যবিদেরা গ্রেটার পার্সপেকটিভে সমগ্র উত্তর ভারতের ভাষাগুলিকে দেখে-ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি ছিল অনেক বড়। তার ফলে, আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক ভিত্তিতে ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধরা যেতো না। সুনীতিবাবু, জুল ব্লক, গ্রীয়ারসন, টার্ণার প্রমুখ মনীষীরা প্রথম স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি ভাষার ও ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের স্টাডি শুরু করেন। এতদিন বাকি ছিল উড়িয়া। আমি এ বই লিখে সেই অসম্পূর্ণ কাজটিই সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছি।

আপনার এই গবেষণার কোনো স্বাতন্ত্র্য আছে কি?

—বোধহয় আছে। প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেছি আগাগোড়া। একসঙ্গে স্টাডি করেছি, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মাগধী ও ভোজপুরী ভাষার বৈশিষ্ট্যকে। কেননা, এই ছয়টি ভাষাই এসেছে মূল মাগধী প্রাকৃত থেকে।

উদাহরণ দিয়ে বললেন, যেমন ধরুন বাংলার রাখাল শব্দটি। ওড়িয়ায় শব্দটির উচ্চারণ 'রখুয়াল', অসমীয়ায় 'রাখোৱাল' এবং বিহারীতে 'রখবার'। অথচ এই শব্দগুলির মূল সংস্কৃত 'রক্ষপাল'।

মুগ্ধ ধ্বনিবিজ্ঞানীর মতো আশ্চর্য রোম্যান্টিক কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন, এভাবে ধ্বনি-ব্যবধানের গোপনসূত্র ধরে বিভিন্ন ভাষার সূত্র হয়েছে, একই শব্দ রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। সব কিছুরই মূলে ঐ ধ্বনি-বৈচিত্র, উচ্চারণের বিভিন্নতা। আমার মনে হয়, এক সময়ে এই আঞ্চলিক ভাষাগুলি গড়ে-ওঠার আগে নিশ্চয়ই একটি স্টেজ ছিল। সেজন্যেই আমি প্রিও-হিস্টোরিক্যাল পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি।

এ বইয়ের পাঠক কারা? কি প্রয়োজনে লাগবে?

বললেন, পাঠক যে বেশি হবে না, সেকথা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেও জানি। যাঁরা আধুনিক আর্যভাষা নিয়ে চর্চা করবেন এবং করছেন—তাঁদের পক্ষে এই অত্যন্ত জরুরী। ওড়িয়া ভাষার গবেষকদের কাজে লাগবেই। এখনো আমি কাজ করে যাচ্ছি। যদি শেষ করে উঠতে পারি, তা হলে হয়তো পূর্বভারতীয় ভাষাগুলির একটা তুলনামূলক অভিধানও লিখে উঠতে পারবো।

—[illegible]

আবাদ গোঠ শেষ

ফ্রেজারগঞ্জ নামখানার বুক বেয়ে ভেসে আসা সাগরের খোড়ো হাওয়া চরণ হালদারের বাপের মত চুলের রাশ চোখে-মুখে ছড়িয়ে দেয়, আশী বছরের বুড়ো চরণ নড়বড়ে লাঠিতে ভর করে লক্ষ্মীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে, কোঠরে বসা চোখ মেলে বলে—'ওপারে যেখানে ধুঁয়ো উড়ছে দেখছো, ওখানে আমার ঘর ছিল এককালে। এপারে রাজচকে গড়তেছে মাছের বোঁদর—ওপারে হলদের বোঁদর। এপার-ওপারে শুধু গড়তেছে নগর বোঁদরের বনেদ, গড়ার নেশায় শেষ বনেদ গড়তে, মেহনতী মানুষরা কি সব হারিয়ে বসবে মালক্ষ্মী।'

হুগলীর এপারে মাছের বন্দর রাজচক, হুগলীর ওপারে কলকাতার পরিপূরক বন্দর হলদিয়া, রাজধানী কলকাতা শহর ছেড়ে, ছুটির দিনে, বাস ট্যাক্সি, গাড়ী চড়ে দলে-দলে লোকে বেড়াতে আসে ডায়মণ্ডহারবারে, সেখান হয়ে কুলপী কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জে লোকে আসে বুক ভরে ওজন মেশানো সাগরের হাওয়া খেতে। ফ্রেজারগঞ্জে সাগরের বুকে উঠছে স্বাস্থ্যনিবাস ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপে তৈরী হয়েছে সাগরিকা ট্যুরিষ্ট লজ, নগরের গোড়াপত্তন শুরু হয়েছে সুন্দরবনের গঞ্জে বাজারে।

আজ যেখানে রাজচক ফিশিং বন্দর গড়ে উঠছে, সত্তর-আশী বছর আগে সেখানে ছিল সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল। আবাদের গোড়া পত্তন করতে দলে-দলে লোক এসেছে ওপারের মেদিনীপুর হাওড়া, এপারের চব্বিশ পরগণা, খুলনা, যশোর থেকে। জঙ্গল সাফ করে, পোনা বাঁধ বেঁধে, গরান হেতালের গোড়া তুলে ফেলে, তারা আবাদী জমির পত্তন করেছে সুন্দরবনের জংলা ভূমিতে, লাটদারের বেগার খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, পুরুষের পর পুরুষ, ভূমিহীন কিষাণ আবাদের বনের পোস্ত করে গড়েছে।

ডায়মণ্ডহারবার-নামখানা জলপথের দুধারে গড়ে উঠেছে বর্ধিষ্ণু গ্রাম, গঞ্জ, গড়ে উঠেছে বাজার-হাট, মন্দির-মসজিদ, পাঠশালা হাইস্কুল, হিন্দু-মুসলমান একই পরিবারের লোকের মত শান্তির নীড় বেঁধেছে সে সব গাঁয়ে।

বর্ষার শুরু থেকে শীতের শেষ অবধি সুন্দরবনের নোনা মাছে বুঁদ্ধ বোঝাই হয়ে চালান হয়েছে কলকাতার বাজারে। নৌকোবোঝাই সরু ধানের চালান গেছে চেতলা টালিগঞ্জের দালালকে সুন্দরী গরান চালান হয়েছে নিমতলা উল্টোডিঙির আড়তে, সুন্দরবনের উপর বনের গড়ে চালের কল বসেছে কাকদ্বীপ হটুগঞ্জ, নুরপুর কলকাতার হুগলীর তীরে-তীরে, শিল্প শহরগুলির গোড়াতে, দেশ গড়তে সুন্দরবনের মানুষ নানাভাবে নিজেদের নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছে শহর গঞ্জের গোড়াপত্তন করতে।

কিরবোপা মহাযুদ্ধের অভিশাপ নেমে আসে গ্রাম বাংলার ঘরে-ঘরে। নিত্য-ব্যবহার্য পণ্যের অগ্নিমূল্য সাধা করে আনে দুর্ভাগ্যের বন্যা, দুঃখ হয় দুর্বিষহ হলদির ওপারের গাঁয়ের মানুষদের জীবন করে তোলে দুর্বিসহ। পেটের জ্বালা

মেটোতে দেনার দায়ে চরণ হালদারের ভিটে-মাটি বাঁধা পড়ে মহাজনের আড়তে। শোধবার উপায় না দেখে, বুড়ো বাপের কথা উপেক্ষা করে, ছেলে-বউয়ের হাত ধরে চরণ হাজির হয় হোড়খালির খেয়াঘাটে।

খেয়া পার হয়ে, রূপসী ঘাটে উঠে, রুজি-রোজগারের আশায় তারা হেঁটে চলে আবাদী লাট জঙ্গলের পথে। কত খাল-নালা পার হয়ে দু দিন পথ হেঁটে, চরণ এসে পৌঁছে রাজচকে ইন্দ্রবাবুদের লাটে। দশ বিঘে জমির পত্তনি নিয়ে, চরণ কুন্তী দুজনে মিলে গড়ে তোলে হেঁতাল বেড়ার ঘর, গোলপাতার ছাউনি দেয়া।

সে আজ কত কাল আগেকার কথা, চরণ তখন তিরিশ বছরের খাটুনে জোয়ান, কুন্তী পঁচিশ বছরের পূর্ণ যুবতী। পাঁচ বছরের ছেলে নারাণ তাদের চোখের মণি। নারাণকে ঘিরে কুন্তী-চরণ কত স্বপ্ন দেখেছে বাড়বাড়ন্ত সংসারের, বুড়ো শ্বশুরের কথা তুলে কুন্তী চরণকে দেশে যেতে বললে, চরণ তাকে ধমক দিয়ে বলে—'আমার কথা সে রাখে নি, আখেরে তাকে পস্তাতে হবে বউ।' অসহায় মানুষটার জন্যে ব্যথা পায় কুন্তী।

সাতসকালে পান্তার হাঁড়ি, জলের কলসী নিয়ে বাদায় গেছে স্বামী-স্ত্রী, কোদাল-কুড়ুল কাঁধে করে। কুড়ুলের ঘায় চরণ সুন্দরী গাছ কেটেছে। কোদাল চালিয়ে কুন্তী গাছের গোড়া তুলে ফেলেছে। শুকনো গাছের আগুন জ্বেলে বাদায় সার দিয়েছে কুন্তী, ছোট ডালপালা জড় করে মাঝে মাঝে পাতায় আগুন ধরিয়েছে নারাণ, শুকনো পাতার আগুনে জ্বেলে ফাগুনে দোলের চাঁচর খেলেছে নারাণ।

দুপুরের নুন পান্তা খেয়ে, ঝোপের আড়ালে দুপুরের রোদ কাটিয়ে, পড়ন্ত বেলায় চরণ কুন্তী ধান বুনেছে, আগাছা তুলে ফেলেছে, চারার গোড়ার মাটি আলগা করে দিয়েছে। এমনি করে দশ বছরে, দশ বিঘে জংলা জমি আবাদে পরিণত করেছে তারা।

বর্ষার খালে ছাঁদিন জাল পেতে মাছ ধরে এনে, কুন্তী শুকো ঝাঁকিয়ে রাখে সে মাছকে, শুটকী মাছের ঝাল রেঁধে চরণরা ভাত খায় সারাবছর, নোনা জমিতে শাকসব্জী জন্মে না। কাঁকড়া, ভেটকি, পোনামাছ তাদের জোগায় সুষম খাদ্য।

কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে বাদার ওধারে হেঁতাল বনের পাশে দেউলির নদীতে টানা জাল পাতে চরণ কুন্তী, বাগদা, ভাঙ্গন ও ময়না বাদা ছেড়ে বেরিয়ে যায় গাঙের জলে, হেঁতালবনে পাতার কুঁড়ে বেঁধে মাছ মারে চরণ কুন্তী, ফি বছর পূর্ণিমা অমাবস্যায় কোটালে।

জেরাকাটী সুন্দরবনের বাঘকে দক্ষিণ রায় বলে সে দেশের লোকে, চরণ কুন্তীর কুঁড়ের পাশে সে ঘুরে বেড়ায় রাত-বেরাতে, চরণরা দক্ষিণরায়ের পুজো মানত করে, জাল ফেলতে যায় দেউলি নদীতে। 'রয়েল বেঙ্গল' তাদের আপনজনের মত। কোনদিন সে কিছু বলে নি তাদের।

শিকারের খুনী খাওয়া বুড়ো দক্ষিণ রায়, সে বছর ওৎপেতে বেড়ায় গেরস্তের আঙিনায়। হালের গরু বাছুর — দু-চার জোড়া খোয়া যায় এলাকায় চরতে গিয়ে, পূর্ণিমার রাতে চরণের কুঁড়ের অদূরে একজোড়া জ্বলন্ত আগুন বসে থাকে। রাতে কুঁড়ে ছেড়ে চরণ কুন্তীকে বাইরে যেতে মানা করে, ভোর রাতে জাল গুটোতে চরণ নামে জলে। কুন্তী তার পেছনে মাছের চুপড়ি বয়ে আনে মাথায়, দক্ষিণ রায়ের হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে বনভূমি। জলে দাঁড়িয়ে চরণ দেখে দক্ষিণ রায় কুন্তীকে পুতুলের মত মুখে তুলে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বনের ভেতর। মূর্ছিতপ্রায় চরণের মুখ থেকে কথা বের হয় না। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও, তার স্বর ফোটে না। রয়েল বেঙ্গলের আস্ফালনে, কুন্তীর চিৎকারে নদীর জল কেঁপে ওঠে। চরণ সংজ্ঞাহারার মত বসে পড়ে নদীর মাটিতে। জ্ঞান ফিরে দেখে সব শূন্য—কুন্তীর চিহ্নমাত্র নেই। চাপ-চাপ রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে হেঁতাল বনের ভেতর। কাঁটা-ঝোপের ভেতর কুন্তীর পরণের কাপড় টুকরো-টুকরো হয়ে কাঁটায় বেঁধা।

গাঁয়ে ফিরে লোকজন জড় করে, লাঠি বর্শা নিয়ে চরণ বনে-বনে কুন্তীকে খুঁজে বেড়ায়। হেঁতালবনে মাথার চুল, টুকরো হাড়গোড় সম্বল করে চরণ ফিরে আসে। হুগলীর তীরে চিতা জ্বালিয়ে কুন্তীর হাড়গোড় জ্বালিয়ে দেয় চরণ। চিতার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, নদীচরে চোখ গেল পাখী ব্যাকুল হয়ে ডাকে—চোখ গেল, চোখ গেল। চিতার এক ধারে বসে চরণ ভাবে কুন্তীর কথা—বন-বাদাড় ছেড়ে ঘরে যাও ঘরামি। নারাণের ভবিষ্যৎ ভেবে চরণের আর ঘরে ফেরা হয় না।

নারাণকে অসহায় করে, চরণকে একা ফেলে কুন্তী চলে যায়। নারাণের মুখ চেয়ে সাথীহারা ব্যথা বুকে চেপে, দ্বিতীয় সংসার করতে চরণের মন চায় নি। সে স্বপ্ন দেখে নারাণের বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে দেশের ভিটেতে ফিরে যাবে। তার সে আশাও মনে-মনেই থেকে গেছে। দুর্গা-চকের ভিটেতে ফেরা তার হয় নি।

চোখের সামনে দেখতে-দেখতে নারাণ কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। সুন্দরবনে মানুষ চার বছরের নারাণ বিশের কোঠা ছাড়িয়ে একুশে পা দেয়। চরণের মত খাটুনে জোয়ান হয়ে ওঠে সে। বাপের সঙ্গে চাষবাসের কাজ সেরে, বাহার গাঙে ইলিশের জাল ফেলতে যায় ওবর আলির পানসির বখরায়। চরণের হাতে কুড়ি-কুড়ি টাকা এনে দেয় ইলিশের কারবার করে।

কুন্তীর শূন্য আসনে, সংসারের হাল ধরতে, চরণ নারাণের জন্য মেয়ে খুঁজতে থাকে। কশোরের দুখন দাস চণ্ডীপুরের সেরা চাষী, দুখনের মেয়ে লক্ষ্মী রূপে-গুণে তার আঁধার ঘর আলো করে তুলবে ভেবে, নারাণের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনে চরণ। সারারাত ধরে দু গাঁয়ের লোক খাওয়ায় বউভাতে।

লক্ষ্মী ঘরে আসার পর, চরণের সংসারে বাড়বাড়ন্ত হতে থাকে। ইলিশ বিক্রীর জমান টাকা থেকে দু বিঘে জমি, গোয়াল গাই একটা কেনে নারাণ। কাঁচা পয়সা আয় করতে নারাণ পানসি কেনে। লোকলস্কর রেখে হাজিপুরে মাছ চালান দেয় মহাজনের আড়তে। শ্রাবণ-ভাদ্র দু মাস হলদির মোহানা থেকে নূরপুর হুগলী পয়েন্টে জাল পেতে, নারাণ ভেসে বেড়ায় নদীর জলে। শ্বশুর বউ নারাণের পথ চেয়ে থাকে রাজচকের মেটে ঘরে।

রাজচকের ঘরেই বসে লক্ষ্মী দেখে বড়-বড় জাহাজ ভেসে চলে বাহার গাঙে। ভয়ে তার গা ছমছম করে। জাহাজের ধাক্কা খেয়ে, চণ্ডীপুরের মেহের আলির পানসি উল্টে ডুবে যায় সে বছর। নারাণকে গাঙে যেতে লক্ষ্মী মানা করে। রাতে নারাণের বুকে মাথা রেখে চুপি-চুপি লক্ষ্মী তাকে বলে—'আমার একা থাকতে বড্ড ভয় করে। পোয়াতি হয়েছি আমি। তুমি আর গাঙে যাইয়ো না। বাবার চাষে মন দেও।'

তার কথা শুনে হেসে ফেলে নারাণ। আদর করে চিবুকে নাড়া দিয়ে বলে—'ভয় কিসের? বিশালাক্ষীর পুজো মানত করে আমি গাঙে না আসাই। মার কৃপায় জাহাজ ইস্টিমারকে আমি ভয় পাই না।'

'তোমার ভয়ডর না করলেও, আমার কথা তোমার রাখতে হবে। গাঙে যাওয়া তোমার চলবে না।'

'তোমার কথা রাখতে হলে, সংসারে বাড়তি আয়ের পথ বন্ধ হবে। অভাব-অনটন লেগেই থাকবে।'

'কিসের অভাব সংসারে? বাদার ধানে তিনটে মানুষের বছরের ভাত হয়ে বেশী হয়ে যায়। গরুর দুধ, নলেন গুড় বেচে যে পয়সা আসে বাজার-হাট, কাপড়-জামার খরচা কুলিয়ে যায়। তোমাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে নি।'

বললেই হল। যে মানুষটা আসছে তার কথা ভাবব নি, বল কি, বাপ-বেটা জীবন-ভোর মাথার ঘাম পায় ফেলে পেটের ভাতের যোগাড় করেছি। ছেলেকে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে নি?

ছেলের কথা উঠলে লজ্জা পেয়ে লক্ষ্মী নারাণকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—'তোমার ছেলে, তোমার মত জোয়ান খাটনে হবে। তার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে নি। ছেলে মানুষ করার ভার আমার।'

মনের অগোচরে, লক্ষ্মী যে দূর-ভবিষ্যতের কথা বলেছে তা শুনে অলক্ষ্যে নিয়তি হেসে ওঠে। নারাণ লক্ষ্মী বিন্দু-বিসর্গ টের পায় না সে হাসি। তারা নিজের-নিজের কথা বলে চলে।

'এবার ইলিশের নৌকো কেউ আর নেবে না এ বছর, মাঝি-মাল্লাদের আগাম দেওয়া হয়ে গেছে। সামনের বছর তোমার কথা ভেবে দেখবো।'

ভাই তোমার সোহাগের বহুরী। বউকে একটা কথা তুমি রাখতে না। কেন, যা ভাল লোক তাই কর, তোমার জন্য কর না, দিব্যি কাটলাম।'

কথায়-কথায় রাত বেড়ে যায়। আকাশ-পাতাল ভেবে নারাণ কূল পায় না। গায়ে মেখে নিতে লক্ষ্মীর এত জল কেন—তাও সে বোঝে না। নানা কথা বলে লক্ষ্মীর রাগ ভাঙিয়ে তাকে হালকা করতে চায় নারাণ। লক্ষ্মী জেদ ধরে, তাকে ছেড়ে নারাণের গাঙে যাওয়া চলবে না।

বিরক্ত হয়ে লক্ষ্মীকে ধমক দিয়ে নারাণ ঘরের বাইরে আসে, অন্ধকারে আঙিনায় দাঁড়িয়ে সে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। লক্ষ্মী তাকে বই কিছুই জানে না। কথার অবাধ্য হতে তাকে সে দেখে নি কখনও। লক্ষ্মীরই জন্যে জীবনপণ করে ঝড়তুফানে লড়াই করে সে। লক্ষ্মী তাকে ভুল বোঝে কি ভেবে? সংসারের বাড়বাড়ন্ত কি সে চায় না? সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে নারাণ ঘরে ফিরে আসে।

লক্ষ্মী কেঁদে-কেটে মুখ ভার করে থাকে। নারাণ লক্ষ্মীকে কাকদ্বীপের বাজারে এনে, কোমরের বিছে, হাতের বাউটি গড়িয়ে দেয়। গয়না পেলে লক্ষ্মীর মনভার কেটে যাবে নারাণ ভাবে। আদরে-সোহাগে দু দিন কাটিয়ে নারাণ ভেসে চলে হলদির জলে. বাদার আল বাঁধ ধরে নারাণকে চলতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লক্ষ্মী মনে-মনে বলে — 'তোমার জেদের সাথে আমি এঁটে উঠতে পারলাম না। আমার হার মানতে হল।'

নারাণের একগুঁয়েমি চরণেরও ভাল লাগে না। নিজের মতেই সে চলে। বাপের কথা বড় একটা মানে না, গদাধরুয়ার চরে পত্তনি নিতে নারাণ রাজি নয়। যুক্তি দেখিয়ে চরণকে সে বলে—'জলো জমিতে, পেখম-পেখম চারা ভাল জন্মাবে না। হাঙা-শুকো আছে। নোনা বানে বাঁধ ভাঙার ভয় আছে। বেড়ী বাঁধতে বিস্তর মেহনত করতে হবে। নোনা পলিতে ধানই বা জন্মাবে কখন?'

চরণ বোঝে নারাণের দৃষ্টি সামনে। অদূরভবিষ্যতের কথা সে ভাবতে শেখে নি। নারাণের কথা চরণের মনে লাগে না। তবুও সে চুপ করে থাকে। ছেলের মুখের উপর কথা বলা তার স্বভাবের বাইরে। বাপের কথা না শুনে, সেও একদিন ছেলে-বউয়ের হাত ধরে ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে এসেছে এপারে। তার ছেলে নারাণই বা তার কথা শুনবে কেন। বাপের মনে দুঃখ দিয়েছে বলে, সেও পদে-পদে দুঃখ পাচ্ছে।

শ্রাবণে ইলিশের জাল পাততে নারাণ ভেসে চলে হলদী হুগলীতে। নারাণ চলে যাওয়ার পর লক্ষ্মীর সন্তান জন্ম নেয়। চরণ তার নাম রাখে মদন। চাঁদের কলার মত মদন বেড়ে ওঠে লক্ষ্মীর পয়মন্ত সংসারে। তাদের সুখ বেশী দিন সয় না। আশ্বিনের ঝড়ে ছোট বোট পানসী মিলিয়ে শত-শত নৌকো ডুবে যায় হলদির জলে। সুন্দরবনের হাজার-হাজার মানুষ ঠাঁই-স্রোতের মুখে খুঁটির মত ভেসে যায় সাগরের জলে।

চালার সঙ্গে নিজেদের বেঁধে চরণ লক্ষ্মী ভাসতে-ভাসতে পরদিন এসে ওঠে কুলপি বাজারে। শিশু মদনকে বুকে বেঁধে লক্ষ্মী শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অথৈ জলে ভরা বাদার পানে। ঘর-বাড়ী, গরু-ছাগল, তৈজসপত্র সব ভেসে যায় বানের জলে। নারাণের খোঁজ তারা আর পায় নি কোনদিন।

রিলিফ ক্যাম্পে মাথা গোঁজে চরণ লক্ষ্মী। দিন পনেক পরে মাঠঘাটের জল নেমে গেলে, চরণ একা ফিরে আসে গাঁয়ে। চারধারে বানের জলে ডোবা মাঠ ছাড়া গাঁয়ের অস্তিত্ব বলতে কিছু ঠেকে না চরণের চোখে, বাড়ন্ত ধানের চারার চিহ্নও নেই। দু-দশজন ছাড়া দেশীর ভাগ লোকই নিখোঁজ। ঘর-বাড়ী নজরে পড়ে না মোটেই।

ধসে পড়া ভিটেয় বসে চরণের বুক-ফাটা কান্নায় প্রবোধ দিতে কেউ নেই তার পাশে। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে। সর্ব-হারার দল বানে ডোবা মানুষের ভেসে-ওঠা মুখে। কথা নেই কারও মুখে, ভূতের মত ঘুরে বেড়ায় তারা।

নারাণের আশাপথ চেয়ে দুদিন না না খেয়ে দেয়ে, ভিটেয় পড়ে থেকে, চরণ ফিরে আসে কুলপীহাটে, লক্ষ্মীমদনকে

॥ রবীন্দ্র-জন্মদিনে জেনারেলের অর্ঘ ॥

ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী

রবীন্দ্র-সংগীত

লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব

প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার বলেন : "......কি করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে পরকে আপন করে নিয়েছেন অর্থাৎ মার্গ দেশী ও বিদেশী সংগীতের সুর ও উপাদানকে তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন ও সে-সব গান কি করে তাঁর হাতে পড়ে ভাব ও রসের দিক দিয়ে এক স্বতন্ত্র ও নূতন সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে, তা লেখক এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।"...... ।। বারো টাকা ।।

ডঃ অমলেন্দু বসু

সাহিত্যলোক

রবীন্দ্রকাব্য-চর্চায় এমন কয়েকটি স্থলে তিনি এমন উজ্জ্বল আলোক-পাত করেছেন যার পরিচয় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে প্রায় অদৃষ্টপূর্ব। ।। দশ টাকা ।।

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে গবেষণাত্মক গ্রন্থ। ।। পাঁচ টাকা ।।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

ঋষি রবীন্দ্রনাথ

শান্তত ত্যাগের পরিব্যাপ্ত নির্ভীক জীবন স্বদেশে দেখার নিবিড় অনুভবের কাহিনীই "ঋষি রবীন্দ্রনাথ"-এর এক অভিনব কথা। ।। তিন টাকা ।।

অধ্যাপক সরোজকুমার বসু

রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস

বিশ্বকবির রচনায় হাস্যরসের প্রকাশভঙ্গির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লেখক এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ।। দুই টাকা ।।

ডঃ শচীন সেন

Political Thought of Tagore

বিশ্বচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে কবির সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শবাদের সুনিপুণ বিশ্লেষণ। সুবৃহৎ ইংরেজী গ্রন্থ। ।। দশ টাকা ।।

[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্—এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

সঙ্গে করে তোলা যেমনে সরকারী কল্যাণ-খানা তৈরী হচ্ছে। প্রকৃতির কালাযাসে পর্যন্ত চাষী সব হালদার ভিখেরী বসে যায়—লক্ষ্মীর ভাঁড়ারে চাল-বাড়ন্ত। মানস তখন সবে তিনমাসের শিশু।

কার্তিকের শেষে লক্ষ্মী মানসকে নিয়ে ফিরে আসে রাজচকের শেষপ্রান্তে ভিটের, সরকারী লোন তিনটে মানুষের সংসারে একমাত্র সম্বল। অকালে কুন্তীকে হারিয়ে, চরণের বুকের পাঁজর ভেঙে ছিল, নারাণের নিরুদ্দেশে, হাত পা গুটিয়ে, চরণ পঙ্গু হয়ে গেল। দুঃখের কথা, বুকের জ্বালা, সে হারিয়ে ফেলল চিরদিনের মত।

নারাণের খোঁজে দু চার কোশের ভেতর, ঠাঁই ঠাঁই ভেসে চলা নৌকোর দিকে তাকিয়ে থাকে চরণ। দু-চোখ বেয়ে জল করে তার বুক বেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস কেটে যায়, বছরের পর বছর ঘুরে আসে, নদীতীরে খোঁজা চরণের শেষ হয় না। সে ভাবতে পারে না, নারাণ আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

একুশ বছর বয়সে স্বামীকে হারিয়ে, শিশুপুত্র-বুড়ো শ্বশুরের ভার মাথায় নিয়ে, লক্ষ্মী অকূল পাথারে ভাসতে থাকে, যে কোনদিন ঘরের বাইরে যায় নি, ক্ষেত-খামার বাজারহাটের ভার তাকে নিতে হয়। মানসের মুখচেয়ে লক্ষ্মী আশায় বুক বাঁধে, কায়ক্লেশে দিন কাটায়।

মানসকে জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করে, তাকে মানুষ করে তুলতে মেয়েদের মর্যাদা খোয়াতে সে দ্বিধা করে নি। পুরুষের মত, চরণের সঙ্গে মাঠে লাঙ্গল চষে, ধান বনে, ফসল কাটে লক্ষ্মী। মেয়ে হলেও শক্তিতে পুরুষের চেয়ে কম নয়, সে প্রমাণ করে।

দু'শ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ঘুচিয়ে দেশ স্বাধীন হয়, স্বাধীনতার ছোঁয়া এসে লাগে পল্লী-বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে, সুন্দর বনের আবাদের উপর গড়ে ওঠে জনপদ—ওধারে কাকদ্বীপ নামখানায়, এধারে বর্ণিকপুর-রাক্ষীঘিতে। দেশ-বিদেশের কুলি-কামিন আসে বাঁধে মাটী কাটতে। চরণের দশ বিঘে জমির মাঝ দিয়ে রাস্তা চলে যায় নামখানায়, চার বিঘে জমি পড়ে রাস্তায়। ক্ষতিপূরণ পায় দু' হাজার টাকা।

মানসের হাত ধরে লক্ষ্মী উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখে সর্পিল গতিতে পথ চলেছে দূর-দূরান্তরে। তারও পরে, ইট পেতে পিচ ঢেলে পাকা সড়ক তৈরী হয়েছে মাটির রাস্তায়, বাস, লরি, টোর্কার রিক্সা চলতে সুরু করেছে সে পথে। শহরের ছোঁয়া এসে লেগেছে পল্লীর আঙিনায়।

যুগের সাথে সাথে, মানুষের জীবন-যাত্রা বদলাতে সুরু করেছে। গাঁয়ে গাঁয়ে নিবিড় ধান চাষের ক্ষেত, হাঁস-মুরগী গরু-ছাগলের চিকিৎসা কেন্দ্র, হাট-বাজারের দোকানে সস্তা রেডিও বাজতে সুরু করে। জামা-কাপড়, স্নো-পাউডার, ঘড়ি-চশমার পসরা সাজিয়ে দোকানদারেরা ভিড় জমায়।

ধান-চাল, শাক-সব্জী, দুধ-মাছের দাম দিন দিন চড়তে থাকে। গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরের কলকারখানায় চাকরি নেয়, লেখাপড়া জানা ছেলেরা সরকারী চাকরীতে যোগ দেয়। দেশ গড়তে দলে দলে মানুষ এগিয়ে আসে, লক্ষ্মী স্বপ্ন দেখে, লেখা-পড়া শিখিয়ে মানসকে সে যুগের উপযোগী করে গড়ে তুলবে। বাপ-দাদার মত সোনা জমিতে চাষ করতে সে দেবে না তাকে।

রাজচকের বুনিয়াদি স্কুলে পড়া শেষ হলে, মানুষকে লক্ষ্মী...ভর্তি করে চণ্ডী-পুরের হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে। খেয়ে-দেয়ে, জামা-কাপড় পরে, মানস সাথে বেঁধে নেয় দুপুরের টিফিন—চিঁড়ের মোয়া নারকেল নাড়ু। দু মাইল দূরের পথ হেঁটে যেতে হয় চণ্ডীপুরের স্কুলে। ঘরে ফিরতে সন্ধ্যে নেমে আসে। সারাদিনের খিদে তেস-টায় পথের কষ্টে, মানসের চোখমুখ শুকিয়ে যায় আমসির মত। ঘরে ফিরতে দেরী হলে, অজানা আশঙ্কায় লক্ষ্মী ঘর-বার করে।

বিকেল পড়ে এলে, চরণ লাঠিতে ভর করে হেঁটে চলে রাজচকের নদীতীরে। চরণের বুকজুড়ে নারাণের শূন্য ঠাঁই, আজও সে নারাণের খোঁজে ফিরে নদীর তীরে তীরে রাতে আঁধারে, খা খা করে শূন্য মনে ঘরে ফিরে আঁধার ঘেরা আঙিনায় দাঁড়িয়ে ডাকে—লক্ষ্মী মা। এক একদিন, তার বুক চিরে নিরাশার চাপা বেদনা দীর্ঘ-শ্বাসের রূপ ধরে বেরু হয়ে আসে। সামনে দিগন্ত জোড়া বাদা পানে তাকিয়ে চরণ দাঁড়িয়ে থাকে, লক্ষ্মীকে ডাক দিতে ভুলে যায়। রান্নাবান্না শেষ করে, চরণের খোঁজে বাইরে এসে লক্ষ্মী দেখে, এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে কি যেন সে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নামখানা থেকে ছুটে-আসা লরির আলোতে লক্ষ্মী দেখতে পায়, চরণের দু চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। কি যে তার বেদনা, লক্ষ্মী তা বোঝে। অভাগা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে, চরণের পাশে এসে তার হাত ধরে লক্ষ্মী বলে—মানসের মুখে তোমার ছেলের ছায়া কি দেখনি বাবা।'

অভিমানে চরণ হাহাকার ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে—'রাক্ষসী গাঙ আমার সোনার সংসার ছারখার করে দিয়েছে লক্ষ্মী মা, আমাকে সে নিতে চায় নি, বাঁচিয়ে রেখেছে তুষের আগুনে ধিকিধিকি জ্বালাতে। ভিটে-মাটি ছেড়ে আমার বাপের, সব খুইয়ে আমি বেঁচে রইলাম।

চরণের কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে, শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে, লক্ষ্মী চেয়ে থাকে আঁধার-ঘেরা রাজচক জেটিঘাটের দিকে, বার বছর ধরে যে আগুন সে চেপে রেখেছে বুকের ভেতর, সে আগুন তার চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে অন্ধকারের মাঝে। দখিনা বাতাসের একটানা শোঁ শোঁ শব্দে দূর থেকে লক্ষ্মী শুনতে পায় নারাণের ডাক—সোনা বউ! বড্ড অন্ধকার, আলো নিয়ে এগিয়ে এসো।' মনের ভুল ভেবেও, সে কান পেতে থাকে বাতাসে।

আদর করে নারাণ লক্ষ্মীকে সোনা বউ বলে ডাকত। সোনার পারা গায়ের রঙের জন্য—সুন্দরী বলে ডাকত গাঁয়ের মেয়েরা। লক্ষ্মীর দোহারা লম্বা চেহারায় টানাটানা চোখ দুটো সুধা ভরা থাকত সব সময়। কুমপো হাটের ডংলা শাড়ীতে যা মানাত তাকে। লক্ষ্মীকে নতুন শাড়ী পরিয়ে, নারাণ চেয়ে থাকত অপলক দৃষ্টিতে। তার দিকে দু' পা এগিয়ে এসে একহাতে লক্ষ্মীর মুখ তুলে ধরে নারাণ বলত—'আমার লক্ষ্মী-সুধা, জন্মে জন্মে যেন তোমার দেখা পাই।'

সেদিনের কথা মনে করে লক্ষ্মী আনমনা হয়ে পড়ে। দুঃখের কথা, মনের বল সে হারিয়ে বসে। নারাণের হাসিখুশিভরা মুখ ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। কথা না বলে লক্ষ্মী চরণের হাত ধরে ঘরের ভেতর আনে।

চরণ মানসকে খাইয়ে দেখসেল গুছিয়ে রেখে, লক্ষ্মী শোয়ার ঘরে আসে। রঙ ওঠা টিনের পোর্টম্যান খুলে, কতকাল পর, সাগরমেলায় তোলা নারাণের ফটো বের করে। হারিয়ে যাওয়া নারাণের হাসিমাখা চোখমুখ দেখে, তার বুকের মাঝে, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বিগত যৌবনের উজ্জ্বল দিনের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে, ফটোর নারাণকে দেখতে দেখতে লজ্জায় মাথার আঁচল তুলতে গিয়ে, হ্যারিকেন উল্টে দেয়।

ভুল বুঝতে পেরে, অন্ধকারে বিছানায় বসে, লক্ষ্মী অঝোরে কাঁদতে থাকে। অতী-তের বারোটা বছর, বারো যুগের পাষাণের ভার নিয়ে চেপে বসে তার বুকে। নিজের অস্তিত্ব ভুলে, জানালার পাশে বসে, লক্ষ্মী চেয়ে দেখে, রাজচকের জেটির গায় জ্বলছে বিজলির আলো। বিধবার কপালে সিঁদুরের ফোঁটার মত, বিজলি বাতি বেমানান লাগে অন্ধকারে-ভরা দিগন্ত জোড়া সুন্দরবনের আবাদের বুকে।

ভোরের শীতল হাওয়া, অভুক্ত রাতজাগা লক্ষ্মীকে ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়ে, তার দু চোখ ভরে ঢেলে দেয় তন্দ্রার ঘোর। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লক্ষ্মী স্বপ্ন দেখে, নারাণ তার গায়ে হাত রেখে ডাক দিয়ে বলছে—'চোখ খোল সোনা বউ, দেখ কি এনেছি তোমার জন্যে।'

তন্দ্রার ঘোরে লক্ষ্মী বলে—'তুমি আমারে বইকো, তুমি আমারে মাইরো। আমারে ছাইড়া যাইয়ো না সোনা, আমারে ঠাঁই দেও তোমার পায়ে।'

ধমক দিয়ে নারাণ বলে—'কি সব বাজে বকছ সোনাবউ, তোমারে আমি ছাড়বো কেন, আর আমি গাঙে যাবো না'

হাত বাড়িয়ে নারাণের হাত ধরতে গিয়ে লক্ষ্মীর ঘুম ভেঙে যায়। ধড়ফড় করে উঠে বসে দেখে কখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, সোনালী রোদে আঙিনা ঝলমল করছে, চড়ুই বুলবুল দানার খোঁজে কিচির-মিচির ডাকে বাগান সরগরম করে তুলছে। জাহাজের সিটি ভেসে আসছে সাগর মোহনা থেকে। জোয়ারের জলে ভাঁটার টান ধরেছে। জাহাজের সাইরেনে তারই সঙ্কেত। পুঞ্জী-ভূত বেদনা বুকে চেপে ঘরের বাইরে এসে লক্ষ্মী সংসারের কাজে ডুবে যায়।

ঋতু ঋতুর বর্ণ সুষমা নিয়ে বছরের পর বছর ঘুরে ফিরে আসে। ক্ষেত-খামারের কাজে, চরণের সাথে লক্ষ্মী এক থেয়ে জীবনের ছক পাতে। চোখের সামনে, মানস বাপের দুর্জয় সাহস মায়ের তেজ নিয়ে বেড়ে ওঠে।

আধ ঘণ্টার ভেতর এখন সে স্কুলে পৌঁছোতে পারে। যাতায়াতের পথে তার সঙ্গী জোটে বুনিয়াদী স্কুলের মাস্টার হরিশ বাগ্‌দীর মেয়ে মানসী। চণ্ডীপুরে মেয়েদের জুনিয়ার হাইস্কুলে সে পড়তে যায়। রাস্তায় তার খবরদারী করতে হরিশ-মাস্টার মানসকে ভার দেয়। রাস্তায় বাস-ট্রাকের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, পথ চলতে হুঁশিয়ারি দরকার।

খেয়ে-দেয়ে বইখাতা হাতে মানসী আসে লক্ষ্মীদের বাড়ী। দেরী থাকলে, হেঁসেলে এসে, লক্ষ্মীর পাশে বসে এ কথা সেকথা বলে। স্কুলের খবর, রাস্তা হেঁটে চলার ধকল, বাড়ীর খবর—সব সে বলে লক্ষ্মীকে। সরল মেয়েটীকে খুব ভাল লাগে লক্ষ্মীর। মানসের টিফিনের অংশ থেকে, চিড়ে-মুড়ি তাকেও দেয়।

সদরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী দেখে, চণ্ডীপুরের পথ ধরে, আগে আগে মানস, পেছনে মানসী চলেছে স্কুলে। পথের বাঁকে তারা অদৃশ্য হয়ে গেলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ফিরে যায় ক্ষেতের কাজে।

পথঘাট তখনও তৈরী হয় নি, ইলিশের জাল ফেলতে আল বাঁধ ধরে বাদার ভেতর চলতে দেখে, লক্ষ্মী একঠাঁই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। যতদূর দৃষ্টি চলে, তার কাঙাল চোখ দুটি নারাণের পেছনে পেছনে ছুটে যেত।

পনের বছর আগেকার দেখা যে শেষ দেখা হবে, আশ্বিনের আকাশে পিঙ্গল মেঘে বিদ্যুৎ চমক দেখে, চরণ লক্ষ্মী কেউ সেকথা বোঝে নি। আজও মানস মানসীকে স্কুলে যেতে দেখে, লক্ষ্মী খুঁজে ফেরে পনের বছর আগেকার দেখা নারাণকে—লক্ষ্মী সুধার শত আদরের পরানধন নারাণকে।

হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে, মানস ডায়মণ্ড হারবার কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হয়। মানসী চণ্ডীপুরের স্কুলে পড়তে থাকে। মানসকে শহরে যেতে দিতে চরণ লক্ষ্মীর কারও মত ছিল না। মানস জিদ ধরে টিউসন করে পড়ার খরচা জোগাবে। হরিশ-মাস্টারের প্রেরণা তাকে নতুন জীবনের পথ দেখিয়ে আনে। মানস মানসীর ভবিষ্যৎ যে একই সুতোয় গাঁথা, হরিশ লক্ষ্মীর বুঝতে বাকী থাকে না।

জেদের বশে, কলেজে ভর্তি হলেও, শহরের পরিবেশ মানসের ভাললাগে না। একই নদী ডায়মণ্ডহারবার রাজচকের পাশ দিয়ে বয়ে গেলেও শহর গ্রামের মানুষে মানুষে কত তফাৎ। শহরের সর্বাঙ্গেতেই প্রাণের অভাব বোধ করে মানস। যন্ত্রের মত প্রাণহীন মনে হয় শহরের জীবন। ছুটীর দিনে গ্রামে ফিরে হরিশ-মাস্টারকে সে বলে—মাস্টারমশাই শহর আমার ভাল লাগে না।

মানসের মনের কথা বুঝতে হরিশের দেরী হয় না। গ্রামের ঘরে জন্মে আবাল্য দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে, শহরকে সে নিজের করে নিতে পারছে না। তাই তার এত অভাববোধ। স্কুলের পথে তার সাথী মানসীর অভাবও বড় বেশী করে দেখা পড়েছে তার কাছে, তাও সে বোঝে। মানসকে সে বলে—জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করতে, তোমাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। পেছনে ফেলে আসা ছোটখাটো ঘটনা, তোমার চলার পথে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে কড়া নজর দিতে হবে।

মানসীকে মনের কথা জানালে, সেও বাবার সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলে, মানস ভাবে সবাই তাকে বড় হতে দেখতে চায়, কারও চোখে তার অভাব ঠেকেনা। চরণ, লক্ষ্মী সংসারের ভাঙা হাল ধরে দিনপাত পাপক্ষয় করে যায়। তাদের জানানো নিরর্থক ভেবে, মানস চুপ করে থাকে, কলেজে ফিরে, মনে জোর আনতে চেষ্টা করে। মানসীর উপর অভিমানে, সে দেশে যাওয়া কমিয়ে আনে, মনের কথাও তাদের জানায় না।

বছর ঘুরে আসে। বাংলা দেশে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে, ছাত্রদের মাঝে নেমে আসে চরম অশান্তি, রাজনীতি ডানা বাঁধে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচন কেন্দ্র করে। পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রদের মনে বিদ্বেষের আগুন জেলে দেয়, সরস্বতীর বেদীমূলে জ্বলে ওঠে রাজনীতির দাবানল। ক্ষমতা-লিপ্সা চরম আকার ধারণ করে ছাত্র-আন্দোলনের ধুয়ো তুলে।

হরিশ-মাস্টার প্রমাদ গনে। দু'বার শহরে এসে মানসকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিতে গিয়ে বিফল হয়। মানস তার সঙ্কল্পে অটল। কলেজ ছেড়ে সে গাঁয়ে ফিরতে চায় না। চরণ লক্ষ্মী সেকথা শুনে আশঙ্কায় দিন গুণে। বারবার চিঠি লিখেও মানসী জবাব পায় না। শেষে একদিন লক্ষ্মীকে সাথে করে, ৭৯ নম্বর বাসে চড়ে শহরে আসে সে।

লক্ষ্মী মানসীর অনুরোধে, কলেজের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে, মানস ফিরে আসে গ্রামের ঘরে। তার উচ্চ-শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা আটকা পড়ে রাজনীতির চোরা-বালুতে। বাড়ীতে বসে, প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে উপদেশ দেয় হরিশ-মাস্টার। সেকথা মানসের মনে রেখাপাত করে না। নিরালা ঘরে বসে, দারিদ্র্যের সামনে দাঁড়িয়ে, মানস তার জীবনকে ব্যর্থ ভাবতে শেখে।

রাজচকে ফিশিং হারবারের কাজ পুরোদমে চলতে থাকে, নরওয়ে ও পশ্চিম জার্মানীর অর্থানুকূল্যে, বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলে ডিপ্-সি-ফিশিং সেরে রাজচক বন্দরে ফিরে আসে। চরণদের সামনের রাস্তা চওড়া করে পিচ্ ঢেলে পাকা সড়ক তৈরী হয় রাজচক বন্দরে যেতে। লরী বোঝাই নোনা মাছ দিন-রাত চালান যায় কলকাতার বাজারে সে পথ ধরে। মানস রোজ রাজচক বন্দরে আসে কাজের সন্ধানে। স্বাস্থ্যবান মানুষের পক্ষে ঘরের কোণে বসে থাকা অভিশাপের মত মনে হয়।

মানস মুশকিলে পড়ে। বেকার জীবনের গ্লানি তার কাছে দুর্বিসহ ঠেকে। নরওয়েজিয়ান ট্রলারের ক্যাপ্টেন হ্যামারশিল্ডকে মানস ধরে পড়ে যে কোন চাকরীর জন্যে। ক্যাপ্টেনকে সে বলে—'আমার বুড়ো ঠাকুরদা, বিধবা মার ভরণ-পোষণের জন্য আমি জাহাজের খালের কাজ নিতে রাজি আছি।'

হ্যামারশিল্ড মানসের বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ দেখে, তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়। মানসকে টালি ক্লার্কের পদে নিয়োগ করে, তার হাতে নিয়োগপত্র দিয়ে পরদিন কাজে যোগ দিতে বলে, খোরাক-পোষাক ছাড়া, মাসিক বেতন আড়াই শ' টাকা। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে এসে, মানস হরিশ-মাস্টারকে নিয়োগপত্র দেখায়। মানসীকে সাথে করে বাড়ীতে এসে চরণ লক্ষ্মীকে বলে তার চাকরীর কথা।

জাহাজে চাকরীর কথা শুনে চরণ হাউ-মাউ করে কেঁদে বলে—'আবার সেই রাক্ষসী শাও আমায় সাথে যাদ সেধেছে। ও চাকরীতে দরকার নেই মানসভাই। সুন্দরবন ছেড়ে, লক্ষ্মীমা তোমাকে নিয়ে এবার আমি নিরাপত্তি ফিরে যাবো দুর্গাচকের ভিটেতে।

সে ভিটে কি তোমার আর আছে দাদু। সেখানে এখন মস্ত বড় বন্দরের গোড়া পত্তন হয়েছে। সেখানে গড়ে উঠছে তেল-শোধনাগার, সারের কারখানা, আরো কত কি'।

'তা হোক দুর্গাচকে কেউ যদি থাকে, সে চরণ হালদারকে চিনতে ভুল করবে না। আমি নিজে না খেয়ে পরকে খাইয়েছি, নিজে না পরে অপরকে পরিয়েছি। সে কথা কি কেউ মনে রাখবে না বলতে চাও?'

'চিনলেও, কেউ তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে, মানুষ স্বার্থপর হয়ে গেছে। মুখে হেসে মিষ্টি কথা বললেও, কেউ তোমায় খেতে বলবে না, ঘর বাঁধতে সাহায্য করবে না।

চরণ চুপ করে যায়, ভাবে হয়ত মানসের কথাই ঠিক, তারা যখন রাজচকে ডেরা বাঁধে, তখন পিচঢালা রাস্তা, মোটর, লরি, লঞ্চ ছিল না। নৌকো চড়ে নদী-নালা পার হয়ে হাঁটা পথ ধরে দু দিন লেগেছে রাজচকে পৌঁছোতে। এখন দু ঘণ্টার ভেতর 'হাজিপুরে' যাওয়া-আসা চলে। যুগের সঙ্গে, মানুষের পরিবর্তন এসেছে ঠিক। সেদিনও দুর্গাচকে ফেরার বাসনা চরণ চেপে যায়।

মানসীর মুখচেয়ে লক্ষ্মী মানের মতে যেতে মত দেয় মানসকে। মানসীকে সঙ্গে করে মঙ্গলবার বিশালাক্ষ্মী তলায় পুজো দিয়ে আসে। ভোর রাতে উঠে চা-জলখাবার তৈরী করে, মানসকে সে ডেকে তোলে।

সকাল হতে তখনও বেশ দেরী। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে পূব আকাশের গায়। হ্যারিকেনের আলোয় পথ দেখে হরিণ-মাস্টারের সঙ্গে মানস আসে রাজচকের জাহাজ ঘাটে। সকাল জোয়ারে ফিশিং-ট্রলার মাছ ধরতে ভেসে চলবে সাগরের জলে।

সকালে চরণের সঙ্গে লক্ষ্মী আসে রাজচকের নদীতীরে। নেভি ব্লু রংয়ের পোশাক পরে ট্রলারের ডেকে দাঁড়িয়ে মানস তাদের দেখতে পায়। জাহাজ ছাড়ার সিটি বাজে। রুমাল উড়িয়ে মানস মা বাবুকে বিদায় জানায়। বিধবার একমাত্র আশা-ভরসা চাকরির খাতিরে আজ ভেসে চলেছে দরিয়ার বুকে। রিপার্বলিক চোখের আড়ালে চলে গেলে লক্ষ্মী ভাবতে থাকে—রাক্ষসী কি সত্যি চরণ হালদারের সাথে বাদ সেধেছে? শূন্যমনে চরণের হাত ধরে লক্ষ্মী ঘরে ফিরে আসে। দেখতে দেখতে দু বছর কেটে যায়, মানসের চাকরী পাকা হয়। লক্ষ্মী হরিণ-মাস্টারকে বলে—'আসাছে বৈশাখে মানস-মানসীর দুহাত এক করে দিন মাস্টারদা।'

লক্ষ্মীর কথায় সম্মতি জানিয়ে হরিণ-মাস্টার উঠে পড়ে লাগে মেয়ের বিয়ের জোগাড় করতে, মেয়ের বিয়েতে সাধ্যমত খরচ করতে চায় সে, গ্রামের স্কুল-মাস্টারের পক্ষে যতখানি সম্ভব।

মানস ফিরে এলে, লক্ষ্মী তাকে বিয়ের কথা জানিয়ে ছুটির জন্য দরখাস্ত করতে বলে, কালবৈশাখীর ঝড়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা পড়ে না বলে, বৈশাখের মাঝ থেকে জাহাজ সাগরে যায় না, সেকথা ভেবে মানস লক্ষ্মীকে জানায়, বৈশাখের শেষে সে ছুটি পেতে পারে।

চৈত্রের শেষ ট্রিপে জাহাজ যাওয়ার আগে হরিণ-মাস্টার মানসদের সবাইকে রাতে তাদের বাড়ীতে খেতে নিমন্ত্রণ করে, খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত গভীর হয়ে যায়, ঘুম থেকে উঠতে মানসের দেরী হয়ে যায়। মানসীর সঙ্গে দেখা করে যেতে পায় না সে, রিকশা চড়ে বন্দরে পৌঁছানর অল্প পরেই জাহাজ ছেড়ে দেয়, জাহাজের সিটিতে মানসীর ঘুম ভেঙে যায়। ধড়ফড় করে উঠে বারান্দায় এসে সে দেখে ট্রলার রিপার্বলিক মানসকে নিয়ে বন্দর ছেড়ে চলেছে সাগর মোহানায়, মানসকে বিদায় জানাতে না পারায় সে নিজেকে অপরাধী মনে করে।

রিপার্বলিকের শেষ ট্রিপ পনের দিনের, উড়িষ্যার পারাদ্বীপ, অন্ধের ভাইজাগ ছাড়িয়ে মাছ ধরতে ধরতে রিপার্বলিক এগোতে থাকে মাদ্রাজের উপকূলে। বৈশাখের প্রথম দিনে, ঝড়ের সংকেত উপেক্ষা করে, ট্রলার কূল ছেড়ে ভারত মহাসাগরের বুকে ভেসে চলে, সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে ভাইজাগ ও মাদ্রাজ বন্দরের রাডারে একই সংগে ধরা পড়ে রিপার্বলিকের এস-ও-এস। কলকাতা থেকে ৭২১ নটিক্যাল মাইল দূরে ফিশিং ট্রলার রিপার্বলিক ঝড়ের মুখে গভীর সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে।

গোধূলির রক্তিম আভায়, দৈত্যের মত ফুলে ফেঁপে ওঠে উত্তাল দরিয়ায় ভেসে চলে রিপার্বলিক। জাহাজের ওয়্যারলেস বন্ধ হয়ে যায়, ইঞ্জিনরুমে জল ঢুকে আসে। পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউয়ের মাথায় কাগজের নৌকোর মত উঠে পড়ে রিপার্বলিক, জাহাজ বাঁচাতে জেটিসন করে হিমঘর থেকে মাছ সাগরের জলে ফেলে দেওয়া হয়।

রিপার্বলিকের খোঁজে শহর থেকে রিলিফ জাহাজ ছুটে আসে। সামরিক বিমান থেকে আকাশপথে তল্লাশী চালানো হয়। পরদিন, কলম্বোর অদূরে অচল অবস্থায় রিপার্বলিককে ভাসতে দেখা যায়, রিলিফ জাহাজ অনেকক্ষণ রিপার্বলিককে টেনে নিয়ে যায় ভাইজাগ শিপিং ইয়ার্ডে, জাহাজের মেরামতি চলে সেখানে।

অসুস্থ দেহে মানস ঘরে ফিরে আসে বৈশাখের মাঝে। রিপার্বলিকের ঝড়ে পড়ার কথা শুনে লক্ষ্মী বিচলিত হয়ে ওঠে, মানসকে জাহাজের চাকরী ছেড়ে দিতে বলে

সে। মার কথা মানস কানে তোলে না। বউয়ের চাঁদের পারা মুখ দেখে মানস জাহাজের কাজ ছেড়ে দিলেও দিতে পারে ভেবে, বৈশাখের শেষে মানসীর সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। মানসীকে লক্ষ্মী শিখিয়ে দেয়, মানসকে আটকে রাখতে।

মধুযামিনীর দুটি মাস কেটে যায় হাসি-গল্পে। শ্রাবণের মেঘমেদুর আকাশ মাথায় করে, মানস বেরিয়ে পড়ে ভাইজাগ বন্দরে ফিরে যেতে, মানসীর আবদার, চোখের জল কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারে না রাজচকে। মা-বাবুর কথা সে মানে না, মানসীকে বলে আসে, কোয়ার্টার পেলে, তাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

মাসের পর মাস চলে যায়, মানস দেশে ফেরার নাম করে না, সপ্তাহে সপ্তাহে সে চিঠি লেখে মানসীকে, মাসে মাসে মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠায় চরণের নামে। আশ্বিনের শেষে সে লক্ষ্মীকে লেখে, দেওয়ালীর ছুটিতে দেশে, এসে মানসীকে নিয়ে আসবে ভাইজাগে। ফিশিং করপোরেশনের লোক এমপ্লয়মেন্টে ভাইজাগে তাকে স্থায়ী করা হয়েছে জানায়।

লক্ষ্মীর কথা মানস রাখতে দেয় না, চাষবাস দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তা সে স্পষ্ট জানায়, চাকরী ছাড়ার কথাই ওঠে না। লক্ষ্মীর চোখের জল, চরণের হা-হুতাশ উপেক্ষা করে, মানসীকে সাথে নিয়ে রাজচক বন্দর থেকে জলপথে মানস পাড়ি দেয় ভাইজাগে, তার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে লক্ষ্মীর মন চায় না, তার সকল আশা মানস ভেঙে দিয়েছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ফিশিং হারবারের দিকে। দূর থেকে, চরণ হালদারের শনের মত সাদা চুলের রাশ চোখে পড়লে, লক্ষ্মী তার পিছু নেয়, লক্ষ্মীর হাত ধরে নদীতীরে দাঁড়িয়ে চরণ বলে—'আমাদের গোড়া পত্তন করতে এসে, নগর বন্দরের শেষ পত্তন করতে, আমাদের মত নিঃস্ব মানুষদের কি সব হারাতে হয় লক্ষ্মীমা?'

চরণের দিকে চেয়ে লক্ষ্মী বলে—'জেলের ঘরে ভিটেমাটি ছেড়ে আসার পরে, হালদারবংশের কেউ কারও ভিদ ছাড়েনি না, রাক্ষসী সাত তোমার সাথে সত্যি বাদ সেধেছে বাবা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চরণের সঙ্গে দুজনেমে পা-পা করে লক্ষ্মী ফিরে আসে ঘরে, তুলসীতলায়, লেপাপোঁছা উঠোন আঙিনায়, লক্ষ্মীলোনার মানসীর হাতের ছোঁয়া সজীব হয়ে উঠে তাকে টেনে আনে পাঁচিল ঘেরা অনেকার দিকে, লক্ষ্মীশ্রীর পরিপূর্ণ সংসারে, মানস যেদিন ঘর আলো করে তার গলা জড়িয়ে চুমোয় ভরে দিয়ে আধো কথায় বলত—'আমায় ছাইড়া, মালায় যাও না মা।'

উঠোনে একটাই দাঁড়িয়ে শ্বশুর-বউ আকাশপাতাল ভাবতে থাকে। ঘরে যেতে তাদের পা উঠে না, বাতাসে লক্ষ্মীর মাথার রুক্ষ চুল ছড়িয়ে পড়ে সারা পিঠে, লোনায় লক্ষ্মীর মুখে কালিমা ভরা, তার মুখের পানে চেয়ে চরণ বলে—'কাজ কি মা আর কাঁদ করে পড়ে থেকে, চল এবার দুর্গা-দেবের ভিটেতে ফিরে যাই।'

'না আর হয় না বাবা, তোমার ছেলে যেতে চায় নি, মানস ফিরে যেতে চায় নি, তাদের ছেড়ে, কোন মুখে আমি দেশে ফিরবো।'

কি ভেবে সেদিনও চরণ চুপ করে থাকে, দেশে ফেরা তার আর কোনদিন হয়ে উঠবে না, তা সে বোঝে। ভিটেমাটি ছেড়ে আসার অভিশাপে পরদেশের মাটিতে তাকে শেষ-নিশ্বাস ফেলতে হবে, ভাবে। মাটির মায়া অভিশপ্ত চরণকে আর তেমন করে হাতছানি দেয় না তার কাছে ফিরে যেতে। আমাদের গোড়াপত্তন করতে এসে, বন্দরের শেষ পত্তন দেখতে, দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে, বেঁচে থাকে চরণ হালদার।

সন্ধিৎসুর চোখে

এশিয়ান বা অলিম্পিককে ছুটবো : রীতা পাল

শুনেছি এবার নাকি নামকরা একজন ফুটবলার বারো হাজার টাকার বিনিময়ে দল পাল্টেছেন। এ রাজ্যের ফুটবলে দশ থেকে বারো হাজারী মনসবদার আছেন প্রায় ডজনখানেক, তবু সন্তোষ ট্রফি আমরা পাই নি।

ক্রিকেটেও হাফ ডজন তিন থেকে পাঁচ হাজারী মনসবদার আছেন। আছেন কয়েক ডজন এক, দুই-হাজারী মনসবদার। তবু রণজি ট্রফির লীগ খেলায় বিহার আমাদের হারায়, নক-আউটে বোম্বে দেয় কানমলা।

আর কারুর কোন সাহায্য না পেয়ে একা একটা চোদ্দ বছরের ছোট্ট মেয়ে বার বার আমাদের জন্য সোনার মেডেল খেটে-খুটে এনে দিচ্ছে, অথচ আমরা কেউ একবার ফিরেও তাকাই নি তার দিকে। পাঁচ পাঁচবার রাজ্য রেকর্ড, বার তিনেক জাতীয় রেকর্ড একই মরশুমে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটি—ওর বালিকা বিভাগের রেকর্ডের ধারে কাছেও পৌঁছোতে পারছে না বয়স্করা, তবু কই আজো তো আমরা আমাদের সাহায্যের হাত বাড়াই নি এই মেয়েটির দিকে। আর কতদিন ও একা পারবে? এই তো ওর বেড়ে ওঠার বয়স, অথচ এখন যদি ও খেতে না পায়, সামান্যতম স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও যদি ওকে আমরা না দিই, তবে পশ্চিমবাংলার অ্যাথলেট জগতের উজ্জ্বলনীলরত্নটি অনাদরে অবহেলায় শীগ্‌গিরই ম্লান হয়ে একদিন ফুরিয়ে যাবে—সেদিন কোটি কণ্ঠের আর্ত-নাদেও কিন্তু রীতা পালকে খুঁজে পাওয়া যাবে না দৌড়ের মাঠে।

সময় থাকতে থাকতে চলুন একবার রীতার বাসায় যাই। চোখ মেলে দেখে আসি একটি মেয়েকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে আটজনের একটি পরিবার কিভাবে নিজেদের নিঃশেষ করে ফেলছে।

পথ বেশী নয়। হাওড়া স্টেশন থেকে একাম্ন বা ছাপ্পান্নোয় উঠুন, ভাড়া মাত্র তেরো পয়সা।

পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা না থাকলে সেই অভিজ্ঞতাটুকু সালকের পথেই আপনার আয়ত্ত হয়ে যাবে। ধাড় চুর চুর গতরের শোকে যখন সব ঠিকানা-ফিকানা ভুলে গেছেন, তখনই কানে পৌঁছোবে কনডাক-টরের পাড়ামাতানো চীৎকার—ফুলতলা, ফুলতলার মোড়। নামুন, নামুন। এসে গেছি আমরা।

যদি বাসার নম্বরটা ভুলে গিয়ে থাকেন, তাহলে মোড়ের মাথায় যে কোন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করুন, রীতা পালের বাড়ীটা কোথায়, সেই দেখিয়ে দেবে। ফুলতলার মোড় থেকে বাম দিকে লেন ধরে মিনিট কয়েক ডান হাতে আর একটা সরু গলি পড়বে—স্টেশন কাট লেন। আর ঐ গলি যেখানে এসে নন্দীর মাঠে মিশেছে, সেখানে বাঁ-হাতি একতলা জীর্ণ বাড়ীটি রীতাদের। দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে আছেন রীতার বাবা বিশ্বনাথ পাল। ধুতির ওপর গেঞ্জী চড়ানো লম্বা-চওড়া কাঠামোর এই মানুষটিকে পশ্চিমবাংলার সেরা অ্যাথ-লেটের শুধু জনক বলে ভুল করবেন না—উনি তার চেয়েও বেশী। কেন? সে কথাই এবার বলব।

রীতা যে কোনদিন দৌড়াবে, মেডেল-টেডেল পাবে বা রেকর্ড-টেকর্ড করবে একথা বিশ্বনাথবাবু, বা তাঁর স্ত্রী গীতা দেবী বা রীতার ঠাকুমা কমলা দেবী বা রীতার অন্য চারটি ভাই-বোন, পাড়া প্রতিবেশী কেউ কোনদিনও ভাবেনি। ভাববে কি? শ্যামলা লাজুক, পুঁচকে মেয়েটা আবার কি দৌড়োবে? বাড়ীর পাশে নন্দীর মাঠে কি বছর স্পোর্টস হয়। মান্টাদাদা (নিরঞ্জন চক্রবর্তী) দৌড়ের প্রাইজ পায়। রীতা বিছানায় শুয়ে, জানালা খুলে বড় বড় চোখ দুটো মেলে সব দেখে। ওর দৌড়োনো তো দূরের কথা, বিছানা ছাড়াই [illegible]।

দু বছর ধরে কি একটা বিচ্ছিরি রোগে ভুগছে। বাঁ পা-টা ক্রমে রোগা—বেরিবেরি না পাইলোরিয়া কে জানে? জানেন শুধু ডাক্তারবাবু, শৈলকাকা। পাশের বাড়ীতেই থাকেন। উনি ওর চিকিৎসা করছেন। রোজ চলছে ইনজেকশন। রীতা শুনেছে তাকে নাকি অনেক অনেকদিন এমনিভাবে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে।

মেয়ের বয়স বাড়ছে, অথচ হাঁটতে চলতে পারে না। স্কুলে (উর্বাশিনী বালিকা বিদ্যালয়ে) যাওয়াও বন্ধ। সব দেখেও কিছু করতে পারেন না বিশ্বনাথবাবু। করবেন কি? কুমারেশ কোম্পানীতে কেরাণীর কাজ করতেন। কিন্তু কোম্পানীর যা হাল। চাকরীটা আছে—কাজ নেই, মাইনেও নেই। অথচ আত্মজনের বিরাট পরিবার। থাকার মধ্যে পৈতৃক ভিটেখানা ছাড়া আর নেই কিছু। এদিকে একটা মেয়ে এভাবে দু বছর ধরে বিছানায় পড়ে।

সবার সব নিষেধাজ্ঞা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে মাস্টামা এসে ডাকলেন—চল রীতা, তুই আমাদের সঙ্গে দৌড়োবি। স্পোর্টসে নাম দিতে হবে তোকে। পাড়ার একটা মেয়ে এভাবে দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, এ বোধহয় মাস্টামার ভাল লাগেনি। তাই জোর করে ওকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে মাঠে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন—ছোট রীতা, ছোট। ছোট রীতা অশক্ত বাঁ পাখানা টেনে টেনে টলমল করে ছুটতে শুরু করল। এসব

কারণ অল্প টাকার ওপর এখন বেশী সুদ পাওয়া যাচ্ছে

কেন্দ্রীয় সরকার সুদের যে বর্ধিত হার ঘোষণা করেছেন তা এখন চালু হয়ে গেছে

এবার সঞ্চয় না করলেই নয়!

	পুরোনো হার (বছরে)	নতুন হার (বছরে)
ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্ক		
১) একলার, দুজনের এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এ্যাকাউণ্ট	৩½%	৪%
২) সারা বছর জমার খাতায় অন্ততঃ ১০০ টাকা গচ্ছিত	৪%	৪¼%
৩) দু'বছরের জন্য জমা আটক	৪¼%	৫½%
ডাকঘর মেয়াদী জমা	৫½% থেকে ৬¾%	৬% থেকে ৭¼%
ডাকঘর পৌনঃপুনিক জমা	৬¼%	৬¾%
৭ বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (চতুর্থ ইস্যু)	৭¼%	৭½%

বিশদ বিবরণের জন্য আপনার বাড়ীর সবচেয়ে কাছের ডাকঘরে খোঁজ করুন অথবা আপনার রাজ্যের জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার আঞ্চলিক অধিকর্তাকে-রিজিয়নাল ডিরেক্টার, ন্যাশনাল সেভিংস (গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া), হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ফার্স্ট ফ্লোর, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলকাতা-এই ঠিকানায় লিখুন।

জা তী য় স ঞ্চ য় সং স্থা

আটর্যাক্টির ঘোড়ার কথা। তখন ওর বয়স মোটে এগারো।

সেই বছরই স্টেলকার্ট ফ্রেণ্ডস এ্যাসোসিয়েশনের স্পোর্টস হচ্ছে নন্দীর মাঠে। রীতাও নাম দিয়েছে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার। পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক এসেছে দেখতে। রীতার মা, ঠাকুমা একতলার ছাদে আলসের ভর দিয়ে উদ্গ্রীবভাবে তাকিয়ে আছেন মাঠের দিকে। দূরে প্যাণ্ডেলের ছায়ায় বসে আছেন পশ্চিম বাংলা এ্যাথলেটিকসের অন্যতম কর্মকর্তা কালী সিং। উনি এসেছেন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করতে।

১০০ মিটার দৌড় শুরু হয়ে গেল। কিছুটা পথ যেতে না যেতেই, প্রতিযোগীদের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে, টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ল রীতা। হাত, পা কনুই সব ছড়ে গেছে। মাথাতেও লেগেছে আঘাত। রোগাভোগা মেয়েটাকে স্পোর্টসে নাম দেওয়ানোর জন্য রীতার মা, ঠাকুমা যখন বিশ্বনাথবাবুকে রীতিমত গঞ্জনা করতে শুরু করেছেন। ওদিকে মাস্টাদারা তখন রীতাকে শুশ্রূষা করছেন।

আধঘন্টা বাদেই শুরু হোল ২০০ মিটার দৌড়। যে রুগ্ন মেয়েটাকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্য পাড়ার ছেলেরা খেলার মাঠে ওকে টেনে এনেছিল, সবাই হাঁ হয়ে গেল দেখে যে, সেই রীতাই আসছে সবার আগে ছুটে, সবাইকে পেছনে ফেলে। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় রীতার হাতে ফার্স্ট প্রাইজটা তুলে দিতে দিতে কালী সিং মশাই মাস্টাদাকে বললেন তুমি ওকে গোলমোহর মাঠে কালীঘাট স্পোর্টস ক্লাবের অ্যানুয়াল স্পোর্টসে নিয়ে যেও। জহুরীর চোখে সেদিন কিছুই ধরা পড়েছিল।

মার্চ মাসে হাওড়ার গোলমোহর মাঠে দৌড়োতে গেল রীতা। ১০০ মিটারে হোল ফোর্থ। ওর দৌড়োনোর ঢং দেখে গোলমোহর মাঠের বিখ্যাত কোচ বিশ্বনাথ সিং-এর (কালী সিং-এর ভাই) ভাল লেগে গেল। ওঁর অনুরোধে রীতা ২০০ মিটারে দৌড়োল। দৌড়ে সেকেণ্ড হোল।

স্পোর্টসের শেষে বিশ্বনাথদা শিশু মাস্টাকে বলে দিলেন—মেয়েটিকে নিয়ে এসো তো। ওর প্রতিভা আছে। বাবার হাত ধরে, মাস্টাদার সঙ্গে রীতা গেল গোলমোহর মাঠে কোচিং নিতে—৩১ জুলাই, ১৯৬৮।

সপ্তাহও কাটল না বিশ্বনাথদা কি দেখলেন রীতার মধ্যে, রীতার বাবাকে বললেন: সামনে সেকেণ্ড ন্যাশনাল ক্রস কাণ্ট্রি রেস। কলকাতায় হবে। আপনি অনুমতি দিন, আমি রীতাকে নামাব।

পাকাপাকাই জবাব হয়ে গিয়েছিলেন। তিন হাজার মিটার ক্রসকাণ্ট্রি। সারা ভারত থেকে মেয়েরা আসবে। রীতা কি পারবে?

সে ভাবনা কোচের। রীতাকে তৈরী করতে শুরু করে দিলেন বিশ্বনাথ সিং। ক্রস কান্ট্রির বেঙ্গল সিলেকশনে রীতা সেকেণ্ড হল বালিকা বিভাগে—তার ওপর গুরুর আস্থার মর্যাদা রাখল রীতা।

বিশ দিন বাদে ৩১ আগস্ট শুরু হোল সেকেণ্ড ন্যাশনাল ক্রসকান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতা। রীতা প্রথম দৌড়েই বালিকা বিভাগের প্রথম পুরস্কারটি এনে দিল পশ্চিম বাংলার হাতে। ওর টাইম হোল ১৩মিঃ ১২'৬ সেকেণ্ড। দ্বিতীয়স্থানের দৌড়ে টাইম হয়েছিল ১৩মিঃ ১৬ সেকেণ্ড। নন্দীর পাড়ার মাঠের সেই অজ্ঞাত অখ্যাত মেয়েটি রাতারাতি হয়ে উঠল পশ্চিমবাংলার প্রথম সারির একজন অ্যাথলীট। বাঁ পায়ের ব্যথা-টাথার কথা সব ভুলে গেল রীতা। ঐ বছরই রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৬০০ মিটারের বালিকা বিভাগে রীতাই হোল ফার্স্ট। টাইম ছিল ১মিঃ ৫৪·৩ সেকেণ্ড।

এক বছর দৌড়েই রীতা এসে গেল রাজ্য দলে। উনসত্তরে জলন্ধরে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের প্রতিনিধিত্বের সম্মান অর্জন করলেও, সেবার বিশেষ কোন কৃতিত্ব রীতা দেখাতে পারেনি। অতবড় কম্পিটিশনের অভিজ্ঞতা তখন কোথায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রীতা দেখিয়ে দিল যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ওর ওপরই নির্ভর করছে। ৬০০ মিটারের ও ৮০০ মিটারের বালিকা বিভাগের পুরোনো সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে রীতাই হল প্রথম (৬০০—১মিঃ ৫১'৯সেঃ ৮০০—২মিঃ ৩১'৮সেঃ)।

পরের বছর অর্থাৎ সত্তর সালে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধি হয়ে রীতা গেল কটকে ন্যাশনালে কম্পিট করতে। উনসত্তরের পরাজয়ের কথা রীতা আদৌ ভোলে নি। সত্তরে নিল সেই শোধ ৬০০ মিটারে (বালিকা বিভাগ) শুধু ফার্স্টই হল না, সেই সঙ্গে করল নতুন জাতীয় রেকর্ড—১মিঃ ৪৮·৭ সেঃ। ৮০০ মিটারে (বালিকা) রীতা হয়েছিল সেকেণ্ড।

কটক থেকে সোনার মেডেল এনেই ক্ষান্ত হোল না রীতা। চলল এবার হায়দ্রাবাদে—চতুর্থ জাতীয় ক্রস কান্ট্রি দৌড়ে অংশ নিতে। নিয়ে এল আর একটা সোনার মেডেল। তিন হাজার মিটার ক্রস কান্ট্রি রেসে নতুন জাতীয় রেকর্ড করল রীতা—১২মিঃ ২৯·২ সেঃ।

রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। রীতা সবার আগে। বালিকা বিভাগে ৬০০ ও মহিলা বিভাগে ৮০০ মিটারের দুটি ফার্স্ট প্রাইজই পেল রীতা। দুটি ইভেন্টেই করল নতুন রাজ্য রেকর্ড—১মিঃ ৪৬·৫ সেঃ (৬০০) ও ২ মিঃ ৩০·৪ সেঃ (৮০০)। সত্তরেই এরিয়ান্স ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টসে ৮০০ মিটার দৌড়ে ৩ বছরের পুরোনো আভা মণ্ডলের রাজ্য রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নতুন নজির সৃষ্টি করল রীতা—২ মিঃ ২৯ সেঃ।

আর এবার (১৯৭১) আমেদাবাদে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রাঙ্গণ থেকে এরই মধ্যে রীতা আমাদের এনে দিয়েছে আরো দুটি সোনার মেডেল। ৬০০ মিটারের বালিকা বিভাগে নিজেরই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে রীতা—১ মিঃ ৪৫ সেঃ। ৮০০ মিটার দৌড়েও হয়েছে ফার্স্ট।

যে আমাদের এত দিয়েছে, পশ্চিমবাংলার নাম সর্বভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল করে তুলেছে, বিনিময়ে তাকে আমরা কি দিয়েছি? একেবারে কিছু দিই নি বলা ভুল হবে। আমাদের জন্যে রাজ্য সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন: 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার অ্যাথলীট কুমারী রীতা পালকে প্রতি মাসে একশ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেছেন। রীতা এক বছর এই বৃত্তি পাবে।' হ্যাঁ এই প্রতিশ্রুতি আমরা রীতাকে দিয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় চোদ্দ মাস আগে। কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি পর্যন্তই। টাকা দেওয়া তো দূরের কথা, রীতার বাবা রাজ্যসরকারের শিক্ষা দপ্তরকে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে যে চিঠিটি দিয়েছিলেন, অসাধারণ এই দুটি শব্দের জবাব তিনি পেয়েছেন: রিসিভড অ্যাটেনশন।

আর কবে আপনাদের অ্যাটেনশনের পালা সাঙ্গ হয়ে কাজের দিন শুরু হবে রাজ্য সরকার? রীতার বাবার চাকরী থেকেও নেই। অত বড় পরিবার। বিশ বছরের একমাত্র ছেলে কাঞ্চনকে পাঠিয়েছেন গৌহাটিতে। ঐ ছেলেটিই গোটা পরিবারের একমাত্র ভরসা। কিন্তু ঐ সামান্য ভরসাটুকু সম্বল করে কি প্রতিভাকে জিইয়ে রাখা যায়? দেখুন তো তাকিয়ে আশপাশের অন্য রাজ্যের দিকে। দেখুন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মহীশূর বা ঘরের কাছে উড়িষ্যা কি করছে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য। আর সে তুলনায় আমরা কি করছি?

শুধু নীতি উপদেশে চিঁড়ে ভেজে না। প্রতিভার কদর করতে না জানলে, সব ক্ষমতাই একদিন উবে যায়। কি করবেন বিশ্বনাথ পাল? কি করতে পারেন কোচ বিশ্বনাথ সিং? যদি সবাই মিলে আমরা আমাদের এই ছোট্ট গোলাপ শিশুটিকে আজ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করি তাহলে আগামীদিনে সর্বভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সুনামের বাস ছড়াবে কে?

তবু সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাব সেই স্বর্ণাভিত মানুষটিকে, যিনি খবরের কাগজে রীতাদের দুরবস্থার কথা পড়ে একাই এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর সীমিত ক্ষমতার ভাণ্ডার নিয়ে। চন্দননগরের শশাঙ্ক বিশ্বাস নির্বামিতভাবে মাসের পর মাস রীতার দৈনিক বরাদ্দ একপো দুধের ও অন্যান্য টুকিটাকি খরচের দায় জুগিয়ে চলেছেন। কিন্তু যে দায়িত্ব সরকারের তা কি কখনো কোন মধ্যবিত্ত গেরস্থ মানুষের পক্ষে দীর্ঘদিন বওয়া সম্ভব? আপনারা তো নিজের চোখে রীতাদের অবস্থা দেখলেন, এখন বলুন ওর জন্য আমাদের কি করা উচিত? রীতার একমাত্র কামনা একদিন এশিয়ান গেমসে বা অলিম্পিকের মাঠে বড় বড় পা ফেলে ও ছুটবে। আমরাও কি তাই চাই না?

—শীম্বনন্দ

ইনি সুচিত্রা দেবী

পাকা গিন্নী—দুই ছেলের মা
ঘুমপাড়ানী গল্পের ঝুড়ি

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

বারো মাস তিরিশ দিনই সুচিত্রা ব্যস্ত—সারাদিন তার কাজ লেগেই আছে। সে বলে, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব ঝক্কিই সামলানো যায়।

তাইতো সুচিত্রা হরলিক্সের ওপর অতটা নির্ভর করে। হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্সের পুষ্টিকর উপাদান আর অতিরিক্ত প্রোটিন সুচিত্রাকে সারাদিন উদ্যম আর উৎসাহ যোগায়।

হরলিক্স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এত গুণ। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি এবং বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

(৮)

আগের রাত্রের কথা। ঘাগরা, কাঁচুলি ও দোপাট্টায় ভূষিত হয়ে বনের দিকে দৌড়ান জরা। মদিরা দরজায় দাঁড়িয়ে কোন দিকে যেতে হবে দেখিয়ে দিয়েছিল। জরার যদি সম্বিৎ থাকতো তবে নিজের নূতন বেশভূষায় ও আচরণে বিস্ময় বোধ করতো কিম্বা আদৌ নূতন বেশ স্বীকার করতো না। কিন্তু তার মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না, অপরাহ্ন থেকে যে-অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার ঢেউ একটার পরে একটা তার মনের উপরে এসে ধাক্কা মেরেছে তাতে কোন লোকের পক্ষেই সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। কাজেই সে যন্ত্রের মতো মদিরার নির্দেশিত পথে ছুটে চলল। ছুটবার যথেষ্ট কারণও ছিল, পিছনে, খুব দূরে নয় তবু তখনো নজরের বাইরে একটা তুমুল কলরব শ্রুত হচ্ছিল, যার অনুরূপ আগে কখনো শোনেনি।

বনে বনে ঘোরা তার অভ্যাস, শ্বাপদের গর্জন শুনেছে, আহত পশুর আর্তনাদ শুনেছে, জনতার ক্রুদ্ধ কলরব শুনেছে, মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের শব্দ, পাহাড়ে ধসে নামার ভৈরব আরাব দাবানলের হুঙ্কার, সমুদ্রে জোয়ারের উৎকট ধ্বনি কিছুই তার অপরিচিত নয়। কিন্তু এখন যে আওয়াজ তার কানে আসছে, তার সঙ্গে কোন অভিজ্ঞতার মিল হয় না। হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ থেকে হাজার হাজার ক্ষুধিত নেকড়ের আর্ত আকাঙ্ক্ষা শব্দরূপে নির্গত হলে খানিকটা যেন মেলে এই আওয়াজের সঙ্গে। জরাকে বন্য বললেই হয়, বনে অরণ্যে যার ভয় নেই আজ লোকালয়ে সে ভীত বোধ করলো, বনকে মাতৃক্রোড়ের মতো বোধ হল তার, বনের দিকে ছুটলো সে। সেই উৎকট শব্দ যতই নিকট থেকে নিকটতর হতে লাগলো তার গতিও হতে লাগলো তত দ্রুততর। অবশেষে ধ্বনির কাছে গতি হার মানলো, শব্দের অনুমানে বুঝলো শব্দের হেতু প্রায় তার পিঠের উপরে এসে পড়েছে। এতক্ষণ চোখ ছিল সামনের দিকে, এবারে পিছনে ফিরে তাকালো। তাকিয়ে যা দেখলো এমনি অভূতপূর্ব যে ক্ষণকালের জন্য ভয় পেতেও ভুলে গেল।

সে দেখলো তার তিন-চার রশি পিছনে বিপুল এক জনপিণ্ড ছুটে আসছে। সে মানুষও বটে আবার যেন মানুষও নয়। হাজার খানেক মানুষ অতি ঘনিষ্ঠ অতি নিবিড়ভাবে গায়ে গায়ে সম্মর্দিত হয়ে একটা পিণ্ড পাকিয়ে গিয়েছে, তারা যেন আর আলাদা নয়, তাদের মন বুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা সমস্তই একীভূত। এরকম দৃশ্য আগে কখনো জরার চোখে পড়েনি। মেলায় নিবিড় জনতা দেখেছে, গায়ে গায়ে সান্নিধ্য হলেও তারা আলাদা—এরা এক। বিস্ময় কমতেই ভয় এসে ঢুকলো মনে, ভয় ঢুকতেই মনে পড়লো মদিরার পরামর্শ, নিরুপায় হলে গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করো, ধরা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। কার হাতে মৃত্যু, কেন মৃত্যু, তাড়াতাড়ির মুখে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিল। সম্মুখেই একটা শাল্মলী গাছ ছিল, তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে পড়ে ঘন পাতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন হল। ততক্ষণে সেই বিপুল জনপিণ্ড গাছের তলায় এসে পৌঁছেছে।

জরার যদি সম্বিৎ থাকতো তবে বুঝতে পারতো যে জনপিণ্ড যতই বিপুল হোক, অন্ধকার রাতে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে যে দেখছিল তা মশালের আলোয়। তবে এত বুঝবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। গাছের উপরে প্রচ্ছন্ন থেকে সে যা দেখলো তাতে ভয় আর বিস্ময় সমান আসন দখল করে নিল তার মনে। নিতান্ত কাছে এসে পড়ায় পিণ্ডকে এবারে আলাদা করে দেখা সম্ভব হচ্ছে, হাজার খানেক মানুষ, মানুষ তবে পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে জ্বলন্ত মশাল, চোখ-মুখে তাদের তীব্র আভা, খোলা চুলে যেন তারই ধোঁয়া। সে দেখতে লাগলো উড়ে গিয়েছে তাদের দোপাট্টা, খুলে গিয়েছে তাদের কাঁচুলি, ঘাগরা-গুলোও আর ঠিক সুবিন্যস্ত নয়। সেই বিপর্যস্ত বেশভূষার ফাঁক দিয়ে দেহের স্বেদোজ্জ্বল হেমকান্তির উপরে মশালের আলো স্নিগ্ধ প্রতিফলিত। দূর থেকে শ্রুত উৎকট ধ্বনি কিন্তু এবারে বেশ বোধগম্য হচ্ছে, ঐ হাজার কণ্ঠে একটিই আকাঙ্ক্ষা একটিই শব্দ, পুরুষ কই, পুরুষ কই। পুরুষ সন্ধানে মদমত্ত রমণীগণ নির্গত, অভিসারে নয় মৃগয়ায়।

যদুবংশের পুরুষগণ পরস্পরে হানাহানি করে নিহত হলে রাজপুরীতে অবশিষ্ট রইলো অশক্ত বৃদ্ধ ও শিশুর দল, আর অবশিষ্ট রইলো যুবতী পুরস্ত্রীগণ। যদুবংশের পুরুষগণ যেমন বীর তেমনি রূপবান, কাজেই নারীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সময়াভাব ছিলো। এখন তারা নিহত হতেই রাজপুরী মধ্যে হাহাকার উঠল, শোকের উচ্ছ্বাস দূর হতেই পুরস্ত্রীগণ নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করলো। প্রথমে কিছুদিন তারা সংযত ছিল, কেননা বলভদ্র ও বাসুদেব জীবিত। তারা নামে রাজা না হলেও আছে বটে, তাদের সম্মুখে বিকৃতি দূর না করে উপায় নেই। এমন সময় খবর এলো বলভদ্র দেহত্যাগ করেছেন! নারীদের বুকের উপর থেকে একখানা পাষাণভার নেমে গেল কিন্তু তখনো চেপে রইলো আর একখানা পাথর, সেখানাই বড়। বাসুদেব জীবিত। তাকে না ভয় করবে কে? বলভদ্রকে যা ভয় তা ঐ লাঙ্গলের সুবাদে। কিন্তু বাসুদেবকে ভয় নিতান্ত বাস্তব? দুর্লঙ্ঘ্য। অনেকে মনে মনে তার মৃত্যু কামনা করতে শুরু করলো।

দিনের বেলায় রমণীরা সংযত হয়ে রাজপুরী মধ্যে বাস করতো, কিন্তু সন্ধ্যা হতেই তাদের চরিত্রগতির পরিবর্তন শুরু হতো। প্রথমে শুরু হতো প্রসাধন, তারপর সকলে মিলে সুরাপান, সবশেষে মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে দলে দলে বিভিন্ন দিকে বের হয়ে পড়তো পুরুষমৃগয়ায়।

রাজপুরীর ঠিক বাইরে দক্ষিণ দিকে বৃহৎ বারাঙ্গনা পল্লী। প্রথমে সকলেই সেদিকে যেতো, কয়েকদিন পরেই প্রতিযোগিতার চাপে যদুবংশের নারীরা তিন-চারটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। উত্তর দিকে ঘন বন, সেদিকে যারা যেতো তাদের প্রধান লক্ষ্য।

বনের মধ্যে কাঠুরিয়ারা কাঠকুটো ডালপালা দিয়ে ঘর বেঁধে বাস করে, কেউ বা স্থায়ী কেউ বা সাময়িক। স্থায়ী কুটিরগুলোর কাছে কিছু কিছু শাক-সব্জির গাছ, দু-চারটে গরু-ছাগল, আর স্থায়ী অস্থায়ী সকল কুটিরেই বড় বড় পোষা বুনো কুকুর। এরাই দিন-রাতের পাহারাদার, বিশেষ করে রাতের। সারাদিন খেটেখুটে কাঠুরের দল সাঁঝ না লাগতেই ঘুমিয়ে পড়ে, বাতি জ্বালাবার কড়ি জোগাবার সাধ্য নেই তাদের। কখনো কোন কাঠুরে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললে শ্বাপদের হাতে প্রাণ হারায়। কিম্বা হয়তো আহত অবস্থায় অনেক রাতে ফিরে আসে। এই কাঠুরে পল্লী জরার পরিচিত।

জরা গাছের উপরে থেকে দেখতে পেলো নারীর জনতা সেই পল্লীর দিকে চলেছে, কেন চলেছে বুঝতে পারলো না। চুরি, ডাকাতি অবশ্যই নয়। হঠাৎ মশালের আলোয় চোখে পড়লো গাছের নীচে একটা নেকড়ে বাঘ গুঁড়ি মেরে বসে আছে, তার মনে হল এখনি শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, শিকার কাছেই ছিল। দল ছাড়া একটি মেয়ে বাঘের আওতার মধ্যে। জরা ভাবলো চীৎকার করে মেয়েটিকে সতর্ক করে দেবে। কিন্তু চীৎকার করবার আগেই এক অভাবনীয় কান্ড ঘটলো। বাঘ ও মেয়েটি মুখোমুখি হল, শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার উল্লাসসূচক লেজ আছড়াতে লাগল বাঘটা, মুখে-চোখে তার কি হিংস্র উল্লাস, মশালের আলোয় সমস্ত দেখা যাচ্ছিল।

হঠাৎ বাঘটা লেজ গুটিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের দিকে ছুটে পালালো। জরা ভাবলো এ কি ব্যাপার, এ কেমন করে সম্ভব হল। নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ শিকার ছেড়ে পালানো তো বাঘের স্বভাব নয়। একবার ভাবলো মশালের আলো দেখে বাঘটা ভড়কে গিয়েছে, কিন্তু তার মনে হল না যে মশালের আলো দেখে নয়, মশালের আলোয় মেয়েটির মুখ দেখে ভয় পেতে পারে। কামার্ত নারীর মুখে ভয়ংকর ক্ষুধার ছাপ যে শ্বাপদের পক্ষেও আতঙ্কের হতে পারে কেমন করে বুঝবে জরা।

বাঘের পলায়নে যখন সে বিস্ময় অনুভব করছে তখন কাঠুরে পল্লীর দিক থেকে একটা কোলাহল এসে তার কানে ঢুকলো। নারী জনতায় কোলাহল ছিল এক রকম, এখন দোহকা কোলাহল: ব্যাপার কি? তাকিয়ে দেখে যে ঐ নারীর জনতা কাঠুরেদের কুটিরের উপরে চড়াও হয়েছে। এদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে বড় ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়েছিল জরার, তবে আবার এরা হতদরিদ্রের উপরে চড়াও হল কেন। মূর্খ জরা কেমন করে বুঝবে যে হতদরিদ্রের কুটিরেও এমন কিছু থাকতে পারে যা রাজরাণীর কাম্য।

বাঘা বাঘা কুকুরগুলো আক্রমণ করছে মেয়েদের কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা দরজা ভেঙে ঢুকে নিদ্রিত বা অর্ধ-জাগ্রত কাঠুরেদের টেনে বের করে আনছে, কাঠুরে রমণীরা লাঠিসোটা নিয়ে মশালধারিণী আক্রমণকারিণীদের, কুকুরগুলো কামড়ে ফেলে নিচ্ছে গায়ের মাংস, কিন্তু হুঁস নেই নির্লজ্জদের। পাঁচ-সাতজনে ধরে বাইরে আনছে একটি পুরুষকে, অমনি তাকে নিয়ে পড়ে যাচ্ছে কাড়াকাড়ি, যারা আগে পায়নি তারা এসে জুটেছে, তখন কাড়াকাড়ি তীব্রতর হয়ে উঠছে। মশালের আলোয় জরা সে দেখতে পেলো অসহায় অবস্থার সুযোগে একটি মেয়ে একটা কাঠুরেকে ছিনিয়ে নিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অমনি ভিড়-পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো, সেদিকে, সবাই মিলে মেয়েটিকে

টেনে সরিয়ে দিয়ে পুরুষটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এমন অবস্থায় ভাগাভাগি হয় না, কেউ কারো অংশ ছাড়তে রাজি নয়, ফলে বিশ-পঁচিশজনের টানাটানিতে পুরুষটি ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে প্রাণত্যাগ করলো। যার ভাগে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পড়লো তাই নিয়ে মেয়েদের কি উল্লাস। এদিকে কুকুরে কামড়ে খণ্ড খণ্ড মাংস তুলে নিচ্ছে, কাঠুরে রমণীরা লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, মাথা থেকে রক্ত ঝরছে, শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, তবু কারো হাত থেকে স্খলিত হচ্ছে না দেহখণ্ড, পালাবার কথা মনেই আসছে না, রক্তাপ্লুত দেহে উন্মাদিনীদের সে কী কামনৃত্য!

এতক্ষণে জরা বুঝতে পারলো কেন মহিষী তাকে নারীবেশ পরতে পরামর্শ দিয়েছিল, কেন তাকে বনের দিকে যেতে বাধা করেছিল। তার মনে হল পুরুষ সন্ধানে, এই উন্মাদিনীগণ নিশ্চয় মদিরার ঘরে হানা দেয়, তবে যে তারা বনের দিকেও যায় এ বোধকরি মদিরার জানা নেই, নইলে এদিকে আসতে পরামর্শ কেন? জনপদের সঙ্কটে লোক বনে পালায়, এখন দেখল বনের সঙ্কটও কম নয়, তবে তারা আর পালানোর জায়গা রইলো না। এতক্ষণ প্রত্যক্ষ ঘটনার ভয়াবহতায় চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে ছিল, এবারে আতঙ্কে শরীর অসাড় হবার উপক্রম হল। সে কোনমতে গাছের ডাল আঁকড়ে কাঠুরে পল্লীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। নূতন আর দেখবে কি। সেই একই পুনরাবর্তন।

একদিকে কামোন্মাদিনী নারীর দল, অন্যদিকে কাঠুরে রমণী ও শিকারী কুকুর। পুরুষ, হাঁ আছে বইকি। তাদের কতক ছিন্নভিন্ন দেহ হয়ে মৃত, কতক অর্ধমৃত, কতক পলায়িত। পলায়নপর পুরুষকে দেখলেই শতাধিক প্রতিযোগিণী গিয়ে পাকড়াও করে তাকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতৃপ্ত কামপ্রবাস ঘোষণা করে, তারা ধাবিত হয় অন্য একজন পলায়নপরের পিছে। কতক্ষণ যে চলল এই নিষ্ঠুর কান্ড তার হুঁস নেই, হঠাৎ এক সময়ে দেখল যে কাঠুরে পল্লী জ্বলছে। নারীদের মৃগয়া শেষ হয়েছে, এবারে ফিরবার আগে মশাল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো। কাঠকুটোর ঘর-বাড়ী এক আধ দণ্ডের মধ্যেই জ্বলে-পুড়ে নিভে শেষ হয়ে গেল। নারীরা ফিরে চলল নগরের দিকে। কাঠুরে নারীরা শিশুদের হাত ধরে পালালো গভীরতর অরণ্যের দিকে।

জরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো গাছের উপরে, যখন দেখল যে কেউ কোথাও নেই, আর কারো আসবার সম্ভাবনাও নেই তখন সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামলো, ভাবলো দেখাই যাক কটা চললো, তবে আক্রমণ হতে হইলো। খানিকটা বাহুল্য হতেই চমকে উঠল জরা।

এই বিজন অরণ্যে, গভীর রাতে, সদ্য শ্মশানে হাসে কে!

কঠিন কর্কশ হাসির গমক অন্ধকারের আবরণ কাঁচকে করাত দিয়ে চিরছে, অন্ধকারও অটল, সে হাসিও থামে না। বনের ভাবগতিক জরার অজানা থাকবার কথা নয়, তার সম্বিৎ হল, বুঝলো ওটা হাসি নয়, খটাসের ডাক। মনে মনে বলল, তাই বলো খটাস।

শেষের শব্দটি হয়তো জোরে বলেছিল অমনি অন্ধকারের মধ্য থেকে শুনতে পেলো, ঠিক ধরেছ খটাসই বটে, ওটাই আমার নামে দাঁড়িয়েছে।

এবারে সত্য সত্যই ভয় পেলো জরা, শুষ্ক কণ্ঠে শুধালো, তুমি কে?

আবার সেই করাতে কাঠচেরা শব্দ। জরা ভাবে ইস কি কর্কশ, কঠিন, শুধায়—কে তুমি?

ঐ তো নিজেই বললে খটাস।

ওতো নাম হল, পরিচয়টা কি?

এই ঘোর অন্ধকারে পরিচয় দেব কিভাবে, আলো থাকলে পরিচয় পেতে।

আমার পরিচয় তো অন্ধকারেই পেলে।

না, তখনো অন্ধকার হয়নি, মদিরার ঘর থেকে বের হওয়ার পরেই তোমার পিছু পিছু আছি।

কেন বলো তো।

তোমাকে বড় দরকার।

আমাকে দরকার। এমন কথা তো এই প্রথম শুনলাম।

এখনো কিছুই শোননি।

তবে না হয় শুনেই হলো। কিন্তু তার আগে বলো তো কি কাণ্ডখানা হয়ে গেল।

এর মধ্যে আর বলাবলির কি আছে। চোখেই তো সব দেখলে।

দেখলাম তো, বুঝতে পারলাম না।

বুঝতে পারলে না তবে গাছে উঠেছিলে কেন? বাঘরা কাহিল করেছিলে কেন।

নইলে যে প্রাণে মারা যেতাম।

তবে আর বুঝবার বাকি রইলো কি?

সবই। এরা কারা? এদের ঘরে কি পুরুষ নেই, এদের মনে কি লজ্জাসরম নেই, দয়ামায়া নেই, এদের কি শাসন করবার কেউ নেই?

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলে কোনটার উত্তর দেব?

সবগুলোরই দাও, একে একে দাও।

সেই ভালো। এরা যদুবংশের নারী।

তার মানে রাজবংশের বউ?

চমকালে কেন? বউ আছে, মেয়ে আছে, সব রকম—আছে।

স্বামী পুত্র তো আছে।

ছিল এখন নেই।

তার মানে?

বনে বনে পশু শিকার করে বেড়াও, এদিকের খবর কিছুই রাখো না দেখি। যদুবংশের পুরুষগুলো সব হানাহানি করে মরেছে, থাকবার মধ্যে আছে উগ্রসেন, বৃদ্ধ

শেকলের মতো কতগুলো বুড়ো আর সজা-তাজা বুদ্ধিমতীদের মতো কতকগুলো বুড়ী, আর আছে হামাহাটা শিশু। সমর্থ পুরুষ বলতে কেউ নেই বনকুলে।

তাই বলে এই রকম ব্যবহার করতে হবে।

নাও শোন একবার কথা। সমর্থ পুরুষ না থাকলে সমর্থ নারীর চলে কি করে।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ যে পশুর মতো কাণ্ড।

আরে মূর্খ, এক জায়গায় যে পশু আর রাজবংশের মেয়ে সমান। শোনোনি নীতিবাদীরা বলাৎকারকে দুর্বিষহ পাশবিক অত্যাচার বলে।

বলে নাকি?

তাই তো তুমি জানবে কি করে।

তাই বলে এমন কাণ্ড! বনে থেকেও মানুষের স্বস্তি নেই।

আরে গণ্ডমূর্খ, মানুষ যখন পশুর ভূমিকা নেয় তখন বন ছাড়া আর কোথায় যাবে।

এবারে দেখছি বন ছাড়তে হবে।

বন ছেড়ে কোথায় যাবে শুনি, গিয়েছিলে তো মানুষদের পাড়ায়, পালালে কেন?

তবে দেশান্তরী হব।

কোন দেশে যাবে? সব জায়গাতেই এই কাণ্ড চলছে। শোননি যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী পুরুষ মরেছে, তাদের আঠারো অক্ষৌহিণী স্ত্রী কি করছে? যদুবংশেও যা কুরুবংশেও তাই কাশী কাঞ্চী মদ্র পাঞ্চাল অঙ্গবঙ্গ প্রাগজ্যোতিষ সর্বত্র তাই সমস্ত দেশ আজ অকাল বৈধব্যের কামনার তাপে উত্তপ্ত বালু খোলা হয়ে আছে। যাও না পা পুড়ে খই হয়ে যাবে।

তাই খট্টাস, তুমি এত কথা জানলে কি করে? শিরোমণি মশায়ের টোলে তো কখনো দেখিনি তোমাকে।

কাঠফাটা হাসি ওঠে। চমকে ওঠে জয়া, এখনো হাসিটার সে অভ্যস্ত হয়নি, বলে, ঐ হাসিটা থামাও, ও যেন করাত দিয়ে কাঠ চেরার শব্দ।

তাতে ভয় কি তোমার। তোমার বুক তো কাঠের নয়।

এমন হাসি তো মানুষকে হাসতে শুনিনি।

আমি যে মানুষ জানলে কি করে? অন্ধকার একটু ফিকে হোক চোখে দেখলেই আর ব্যাখ্যার দরকার হবে না।

ততক্ষণ না হয় আগের প্রশ্নটার উত্তর দাও। তোমাকে তো আমার মতো মুখ্যু-সুখ্যু লোক মনে হয় না। এত কথা শিখলে কোথায়?

সব বলবো, সব বলবো, আঁটি ভেলেশ মাস অবধি বলবো, কিছু বাদ যাবে না।

তবে তোমাকে ছাড়ছি নে।

আমাকে কি এমন দরকার।। দেখছই তো আমি তোমার মতো পণ্ডিত নই।

তবে টোলে দেখা হবে বলছিলে কেন?

মোহিতলাল মজুমদার

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

সর্বকালের সাহিত্যের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মধুসূদনে যাহার প্রথম উন্মেষ ও রবীন্দ্রনাথে যাহার অন্তিম পরিণতি সেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল নির্ণয় করিয়াছেন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক। ॥ ৮·০০ ॥

●

ডক্টর অমলেন্দু বসু

সাহিত্যলোক

রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত 'পোয়েটিক ইমেজ'—যার বাংলা প্রতিরূপ 'বাক্‌প্রতিমা'—লেখকেরই সৃষ্ট। তার এক পূর্ণাঙ্গ রসসম্মত বিচার করিতে রবীন্দ্র-কাব্যচর্চায় এমন কয়েকটি সত্যে তিনি উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছেন যাহার পরিচয় বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে প্রায় অভূতপূর্ব। ॥ ১০·০০ ॥

●

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ

বাংলা নাটকের ইতিহাস

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার উৎপত্তি হইতে আজ পর্যন্ত তাহার বিকাশের এই ধারাবাহিক বিরাট ইতিহাসটি বাংলা নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রে এক অক্ষয় কীর্তি। ॥ পঞ্চম সংস্করণ ॥ ১৬·০০ ॥

●

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

মধ্যযুগের কবি ও কাব্য

বিদ্যাপতি হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পর্যন্ত বিভিন্ন কবির কাব্যকৃতির এক সার্বভৌম সাহিত্যিক আদর্শে নূতন মূল্যায়ণে লেখকের রসবোধ ও বিশ্লেষণী শক্তি অতুলনীয়। ॥ ৮·০০ ॥

●

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর

বিদ্যাসাগর-অয়দাশঙ্কর তর্করত্ন হইতে বনফুল-তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—এই যুগের সৃষ্টি ও উত্থানিকার এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত মূল্যায়ণ। ॥ ৫·০০ ॥

ডক্টর প্রিয়ব্রত চৌধুরী

রবীন্দ্র-সংগীত

লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত, বাংলার লোকগীতি ও কীর্তনের প্রভাব রবীন্দ্র-সংগীতের উপর কতখানি বিস্তারলাভ করিয়াছে, অনুসন্ধিৎসু গ্রন্থকার অক্লান্ত এষণা আর সুনিপুণ আলোচনা করিয়াছেন এই গ্রন্থে। ॥ ১২·০০ ॥

●

[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

ঢোকে কি পোড়োতে যাব। আমি সেখানে মধু জোগাই।

মধু না মদ! সেই মধু খেয়ে ঢোলের পোকা বুঝি টেল পড়ে!

নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে খটাস, খাক, খ্যক, খাক!

ঐ হাসিতো বরদাস্ত করতে পারে না জয়া, ভাবে কাজের চাপে না থাকলে লোকটা হাসতেই থাকবে, কাজের প্রস্তাব করে বলে চলো না এগিয়ে দেখি কাঠুরে-দের কি অবস্থা হল।

ও আমার খুব দেখা আছে তুমি দেখোগা।

কবে দেখলে?

প্রত্যেক দিন রাতে দেখছি।

বলো কি, চমকে শুধায় জয়া, তোমাকে ওরা দেখতে পায় না।

খুব পায়।

তবে যে পাকড়াও করে না বড়।

সে গুড়ে বালি, সে গুড়ে বালি বলে হেসে ওঠে খটাস।

তাই খটাস হাসিটা কমিয়ে কথার জাল বাড়াতে পারো না? খুলেই বলো না কি বলতে চাও?

ওরা জানে আমাকে দিয়ে ওদের কাজ চলবে না—তা না হলে কি ছেড়ে দিত।

তার মানে?

তার মানে অত্যন্ত স্পষ্ট, আমি হিজড়ে। খাক, খাক, খাক।

কি বললে?

বললাম হিজড়ে, হিজড়ে, হিজড়ে, বুঝলে!

নিজের মুখে স্বীকার করলে। তুমি কি মানুষ?

ও গুণটা না থাকলে যদি মানুষ না হয় তবে মানুষ নই।

তাই বলে নিজে বলে বেড়াবে।

না বলে আর করি কি, রাতের মধ্যে যে হাঁড়ি ভেঙ্গে গিয়েছে। দেখো না বসু-বংশের মাগীগুলোকে দেখলে পুরুষে পথ ছেড়ে দিয়ে পালায় আর সেই মাগীগুলো আমাকে সম্মুখে দেখলে অনায়াসে মনে করে পথ ছেড়ে দেয়। তাইতেই ওদের কাছা-কাছি থেকেও বেঁচে রয়েছি। তোমাকে দেখতে পেলে প্রাণটা যেতো।

তা হোক বাপু আমার গা কেমন ছিন-ছিন করছে, আমি চললাম।

চলবে কোথায় চাঁদ, এতক্ষণ যে তোমার সঙ্গে আলাপ করলাম তা কি ছেড়ে দেওয়ার জন্যে? না সেই সন্ধ্যাবেলা থেকে যে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি শুধু দুটো বিশ্রম্ভালাপ করবার জন্যে।

কেন আমাকে এত দরকার কিসের?

বলো কি! তুমি যে কাজ করেছ তা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণার্জুন কেউ করতে পারেনি, তোমার নাম যে সোনার অক্ষরে পুঁথির পাতায় লেখা থাকবে।

কি যত সব বাজে বকছ?

এতক্ষণ তাই বলছিলাম বটে, এবারে তবে আসল কথায় আসি।

এই বলে খটাস টাঁক থেকে একটা পাথর বের করলো, নিশান্তের অন্ধকারের মধ্যেও তার দ্যুতি কালো চোখ এড়ালো না।

চমকে উঠলো জয়া। বলল, কোথায় পেলে পাথরটা!

তবেই দেখো ঠিক লোক ধরেছি কিনা, সাধে কি খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে।

গর্জে উঠে জয়া শুধালো কোথায় পেলে পাথরটা। নির্বিকারভাবে খটাস বলল, যেখানে তুমি দেখেছিলে।

আমি কোথাও দেখিনি।

বটে তবে চমকে উঠলে কেন?

সোজাসুজি বলো না কোথায় পেলে।

যে লোকটাকে খুন করেছিলে তার গলায়।

দোষ অস্বীকার করবার ভঙ্গীতে জয়া বলল, কাকে খুন করলাম আমি?

বাসুদেবকে। এবারে হল তো। আরও বলবো? বাসুদেবকে খুন করবার পরে বুঝতে পারোনি লোকটা কে? তাই গিয়ে-ছিলে গিন্নিকে ডাকতে। বুদ্ধি ছেলেমানুষ উদ্দেশ্য যে পুরুষে গিন্নিকে ডাকে সে তো হিজড়েরও অধম।

ওসব থাক, যা বলছিলে বলো। ভেক যেমনিভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে সাপের দিকে তেমনি অসহায়ভাবে জয়ার দৃষ্টিনিবদ্ধ খটাসের মুখে।

তুমি গিয়েছ তখন জনতার সন্ধানে। আমি, হঠাৎ এসে পড়ে দেখলাম, বা-বা, এ কার্যটি করলো কোন বীরপুরুষ। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম বাসুদেব ভিরমি খেয়ে পড়ে আছে ওর আবার নানা রকম রঙ কিনা। কিন্তু না, বেটা মরেছে, আগাগোড়া মরেছে, ষোল আনা মরেছে, পায়ের পাতা থেকে আমার ব্রহ্মা-ন্ড অবধি মরেছে সন্দেহ নেই। বাপ্পা, বাঁচা গেল। সেদিন গিয়েছে ধনাটা আর গেল মানাটা। বাঃ বাঃ! কিন্তু এমন কাজটি করলে কোন বাপের সুপুত্তুর। এই সব কথা ভাবছি এমন সময়ে বুকের উপরে চকচক করে উঠল পাথরটা। তখনি নিয়ে টাঁকে গুঁজলাম, বেটা গিয়েছে কিছু চিহ্ন রেখে দিলাম। এমন সময়ে তোমরা দুজনে গুটি গুটি এসে উপস্থিত হলো। কি সাংঘাতিক মনে পড়ছে।

দেখো দেখো মাটি কাঁপছে, ভূই লোল সুরু হয়েছে—আর দেখতে পাচ্ছ না চাঁদের ঐ কোণাটায় গেরণের ছায়া পড়েছে।

ভয় নেই জয়া, ও ভুঁই লোলও নয়, গেরণের ছায়াও নয়, সমস্ত মনের ভয়।

মনের ভয়!

মনের ভয় বইকি! পাপের শুরুতে ওরকম হয়ে থাকে, আমারও হয়েছে। আর খানিকটা এগিয়ে গেলে ঠিক উল্টো মনে হবে।

উল্টো আবার কি রকম?

তখন গেরণের চাঁদকে মনে হবে পূর্ণিমার চাঁদ আর সাতাশের ভূঁইদোলকে মনে হবে অচলা অটলা পৃথিবী। কেমন ভাষা শুনে বুঝতে পারছ যে টোলে পড়েছি।

খটাসের কথায় জয়া কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করলো না, বরঞ্চ তার ত্রাস যেন বৃদ্ধি পেলো। সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, পালাও পালাও ঐ শুনছ না গর্জন। হাজার হাজার ডাকিনী তাড়া করে আসছে—এই বলে ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই খটাস ধরে ফেলেছে তার হাত, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে আমার বড় দরকার।

আমাকে দিয়ে এ সংসারে কারো কিছু দরকার নেই, আমি দুখোদুখু ব্যাধের ছেলে। আমাকে ছেড়ে দাও।

তবে শোনো, তুমি ব্যাধের ছেলে নও, তুমি রাজপুত্র।

এখন রহস্য ভালো লাগে না।

রহস্য নয়, জয়া, কিম্বা রহস্যই বটে, তুমি ব্যাধপুত্র নও তুমি রাজপুত্র।

কার পুত্র বললে?

রাজপুত্র! যেমন বাসুদেব রাজপুত্র, বলভদ্র রাজপুত্র, তেমনি রাজপুত্র তুমি।

জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে খটাস বলে উঠল, কি বিশ্বাস হচ্ছে না! না হওয়ারই কথা বটে। সমস্ত খুলে বলছি। চলো আমার বাড়ীতে চলো, এদিকেও ভোর হয়ে এল।

(ক্রমশঃ)

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হিটলারের ধারণা এই শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীব্যাপী ইহুদীদের চক্রান্তে ধ্বংস হইতেছে। এই ইহুদীরা জার্মানীতে বণিক ও ধনিক শ্রেণীরূপে জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় বলশেভিকগণ (যাদের মধ্যে বহু ইহুদী ছিলেন) বিপ্লব ও যুদ্ধের দ্বারা জার্মান জাতিকে বিপন্ন করিতেছে। এ জন্য হিটলারের ক্ষমতা লাভের আগেই জনমনে হিংসা ও সন্ত্রাসবাদ সুরু হইয়াছিল, ক্ষমতা লাভের পর উহা সর্বত্র অভিযানে পরিণত হইল। ইহুদীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, জঘন্য এবং পৈশাচিক অত্যাচার সুরু হইল, যার ভয়াবহ পরিণতি ঘটিল যুদ্ধের সময় বন্দী শিবিরগুলিতে; যেখানে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে পাইকারিভাবে হত্যা করা হইল।

হিটলারের জার্মানীতে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো নিভিবার উপক্রম হইল এবং শিক্ষায় মূঢ়তম নাৎসীবাদ শুরু হইতে লাগিল। জার্মানকে ইহুদী সন্দেহে, কিম্বা একমাত্র জাতিতে ইহুদী এই অপরাধে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী ও কর্মীরা নির্যাতিত হইতে থাকিলেন। অনেকে জার্মানী হইতে পলায়ন করিয়া (যেমন, আইনস্টাইন) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নাৎসীরা যে সমস্ত গ্রন্থ ও বই পছন্দ করিতেন না, সেগুলি নিষিদ্ধ হইল কিম্বা পুড়াইয়া ফেলা হইল। এমন কি যেমন জার্মানের দেহে ইহুদী রক্তের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইলেও তাকে নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। যে সমস্ত রাষ্ট্র জার্মানীকে যুদ্ধে হারাইয়াছিল, হিটলার তাদের বিরুদ্ধে অনবরত বিদ্বেষ প্রচার ও আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন।

> 'Two myths he persuaded many Germans, perhaps the majority, to believe: that their armies were not defeated on the field of battle in 1918, but suffered betrayal by a 'stab in the back' from cowardly politicians at home; and that the Versailles Treaty which the betrayers signed, was the severest peace ever dictated to a nation, reducing Germany to an ignominious position in Europe. Hitler proposed to break the fetters of the treaty, rearm Germany, crush France, and carve an empire out of Communist Russia. For this mission he demanded that Nazis be made masters of Germany.'

অর্থাৎ হিটলার অধিকাংশ জার্মানকে বুঝাইলেন যে, ১৯১৮ সালের যুদ্ধে (প্রথম মহাযুদ্ধে) জার্মান সৈন্যবাহিনীর কোন পরাজয় হয় নাই। কিন্তু স্বদেশের কাপুরুষ রাজনীতিকেরা তাদের পিছন হইতে ছুরি মারিয়া তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এই বিশ্বাসঘাতকেরা সবাই ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছে। এমন কড়া সন্ধিসর্ত পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই, ইহার ফলে ইউরোপে জার্মানীর অপমানজনক দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সুতরাং এই সন্ধিসর্তের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে হইবে, ফ্রান্সকে ধ্বংস করিতে হইবে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার দেশগুলি কাড়িয়া লইয়া এক নূতন সাম্রাজ্য গঠন করিতে হইবে। সুতরাং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নাৎসী পার্টিকে জার্মানীর উপর একচ্ছত্র অধিকার দিতে হইবে।

গোড়ার দিকে নাৎসী দল তেমন সমর্থক পায় নাই এবং নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট হইতেও মোট ১০ লক্ষের বেশী ভোট পায় নাই। কিন্তু ১৯৩০ সাল হইতে পৃথিবীব্যাপী বাজার মন্দা সুরু হইল এবং ১৯৩৩ সালে তাহা চরমে উঠিল। জার্মানীর দুর্গতির অবধি রহিল না। সেই সময়কার গভর্নমেন্ট ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। এদিকে হিটলার ও নাৎসী দল ঝটিকা বাহিনী 'এস এস'

---

* 'The World At War' — published by the 'Infantry Journal', Washington. USA. Page 25.

CENTRAL LIBRARY

গার্ড" ইত্যাদি নামে কতকগুলি 'প্রাইভেট আর্মি' গঠন করিয়া বিরুদ্ধ দল ও গভর্নমেন্টকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। অপরদিকে জার্মানীর অর্থনৈতিক দুর্দশা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, জনসাধারণও ততই চরমপন্থীদের প্রতি ঝুঁকিতে লাগিল। কমিউনিস্ট দলও জার্মানীতে বেশ শক্তিশালী ছিল, এবং তাদের সঙ্গে নাৎসী বাহিনীর অনবরত সংঘর্ষ হইতে লাগিল। উভয় দলই জনগণের দুর্গতি মোচনের জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রোগ্রামের উপর জোর দিতে লাগিলেন। তাঁরা তদানীন্তন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধবাদীরূপে রাইখস্টাগ বা পার্লামেন্টে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিলেন। এই সঙ্কটের সময় মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম নায়ক ছিলেন, তিনি হিটলারের চেয়ে ৪০ লক্ষাধিক ভোট বেশী পাইয়া পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইলেন, ১০ই এপ্রিল, ১৯৩২। এই সময় রাইনল্যান্ডের শক্তিশালী শ্রমশিল্পের মালিকগণ কমিউনিস্টদের ভয়ে আতঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা হিটলারকে সমর্থন জানাইলেন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সহায়তা পাইবার আশায়। অন্যদিকে সমরবাদী জার্মানীর মেরুদণ্ড স্বরূপ প্রুশিয়ার বড় বড় জমিদার, যাঁরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণী, তাঁরা হাত মিলাইলেন রাইনল্যান্ডের শিল্পপতিদের সঙ্গে। প্রুশিয়াতে ইঁহাদের জমিদারীতে তখন প্রবল কিষাণ আন্দোলন চলিতেছিল। এই সমস্ত জমিদার ও শিল্পপতি, উভয় শ্রেণী মিলিয়া বয়োবৃদ্ধ হিণ্ডেনবুর্গের উপর চাপ দিলেন হিটলারকে 'চ্যান্সেলর' বা প্রধান মন্ত্রীপদে নিয়োগের জন্য। ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হিটলার প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের আমন্ত্রণে এই পদ লাভ করিলেন। হিটলারের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন অতি সহজেই চরিতার্থ হইল।

কিন্তু চার্চিলের মতে মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের উপর সবচেয়ে বেশী চাপ আসিয়াছিল জার্মানীর জেনারেল স্টাফ বা সেনানীমণ্ডলীর পক্ষ হইতে। জার্মান রাষ্ট্রে, পার্লামেন্টে, মন্ত্রিসভায় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সংস্থাগুলিতে এই জেনারেল স্টাফের প্রভাব প্রতিপত্তি বরাবরই অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁরা ছিলেন মূলতঃ রাজতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের সমর্থক এবং ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী। সুতরাং তাঁরা হিণ্ডেনবুর্গের উপর প্রথম চাপ দিলেন হিটলারকে গ্রহণের জন্য। হিণ্ডেনবুর্গ তখন বৃদ্ধ, বয়স ৮৫ বছর। গভীর চিন্তা ও মস্তিষ্কের শক্তি তখন তাঁর জোরদার ছিল না। কাজেকর্মেও তেমন উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল না। প্রকাশ যে, তিনি যখন প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন, তখন তাঁর ছেলে ভোর ৭টার সময় তাঁকে সেই সংবাদ দিলে তিনি বিরক্ত হন এবং বলেন, 'এই সংবাদ দেওয়ার জন্য এক ঘণ্টা আগে আমার ঘুম ভাঙ্গাবার কি দরকার ছিল? এক ঘণ্টা পরেও কি এই খবর সত্য হতো না?'—এই মন্তব্য করিয়া তিনি পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু হিটলারকে প্রথম দেখিয়া হিণ্ডেনবুর্গ নাকি আদৌ খুশী হইতে পারেন নাই। তিনি বিদ্রুপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছিলেন—'এই হিটলার? এঁকে তো আমি ডাকটিকেটে সীল মারার জন্য পোস্টমাস্টারের কাজ দেওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না।' কিন্তু যাঁকে হিণ্ডেনবুর্গ এত তুচ্ছ ভাবিয়াছিলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত হিণ্ডেনবুর্গের আসনে বসিয়া সারা জার্মানীর একচ্ছত্র ডিক্টেটর হইলেন। অবশ্য হিটলার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ, তিনি মনে করিতেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে না পারিলে রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া লাভ নাই এবং দল গঠনের মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে সরকারী ক্ষমতা লাভ। সে জন্য তিনি প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করিলেন এবং প্রত্যেককে কৌশলে ধাপ্পা দিলেন, যেমন, জার্মান জেনারেল স্টাফকে তিনি বুঝাইলেন যে, তাঁকে সরকারী ক্ষমতায় বসানো হইলে তিনি সমস্ত প্রাইভেট আর্মির উপর পূর্ণ ক্ষমতা জার্মান সেনানীমণ্ডলীর হাতে (হিটলারী ঝটিকা বাহিনীর সঙ্গে জার্মান সৈন্য বাহিনীর বিরোধ ছিল।) তুলিয়া দিবেন, এমন কি ওই সমস্ত আর্মি বিলোপ করিয়া দিবেন। এভাবে তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গেও নানা ছল-চাতুরি খেলিলেন। বলাবাহুল্য যে, ক্ষমতা হাতে পাইয়া হিটলার তাঁর স্বাভাবিক হিংস্র মূর্তি ধারণ করিলেন। যদিও তাঁর পার্টি ন্যাশনাল সোশিয়ালিস্ট নাম ধারণ করিয়া একদিকে জাতীয়তাবাদীদিগকে (ধনিক ও রাজতন্ত্রবাদীদিগকে) এবং অন্য দিকে সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী দেশকে (গরীব, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক প্রভৃতিকে) আকৃষ্ট করিতে চাহিলেন, তথাপি নাৎসীবাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের নাম গন্ধও ছিল না। বরং আসলে ইহা ছিল সমাজতন্ত্র-বিরোধী কমিউনিস্ট - বিরোধী, ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী, ইহুদী-বিরোধী—এমন কি বুদ্ধিজীবী-বিরোধী (হিটলার বুদ্ধিজীবীদের সহ্য করিতে পারিতেন না) এক অদ্ভুত বিকৃত মতবাদ। সুতরাং হিটলার সরকারী ক্ষমতা হাতে পাইয়াই ধাপে ধাপে সমস্ত জার্মানী রাষ্ট্রকে নিজের হাতের মুঠোয় আনিলেন এবং বিরোধীদিগকে একেবারে নির্মূল করিলেন। ভেইমার রাষ্ট্রতন্ত্র বাতিল হইয়া গেল। তৃতীয় রাইখের উদ্ভব হইল এবং নাৎসীদের প্রভুত্ব অক্টোপাসের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইল। নাৎসী দালালদের সাহায্যে রাতে রাইখস্টাগ বা পার্লামেন্টভবনে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল এবং ইহা 'কমিউনিস্টদের ধ্বংসাত্মক কার্য' এই অজুহাত তুলিয়া গোটা কমিউনিস্ট পার্টিকে উচ্ছেদ করা হইল। (ভ্যানডার লুবে নামক এক ব্যক্তিকে রাইখস্ট্যাগে আগুন ধরাইবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই নাৎসীদের সাজানো বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল। অবশ্য ভ্যানডার লুবের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।) মাত্র এক বছরের মধ্যে হিটলার ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র জার্মানীর উপর তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, প্রভাব ও শক্তি প্রয়োগ করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রকে যেন নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। এমন কাণ্ড জার্মানীর ইতিহাসে আর ঘটে নাই। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বা জুড়ি আর কেহ রহিল না। গর্বে ও আনন্দে হিটলার জার্মান ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া নিজেকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

৩০শে জুনের রক্তস্নান

কিন্তু ইতিহাসের এই 'সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান'ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছিলেন না। তাঁর নিজস্ব নাৎসী দলের কৃপায় যে সমস্ত সামরিক ও আধা-সামরিক প্রাইভেট আর্মি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাদের সাহায্যে নাৎসীদল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাইতেছিলেন, তাদের দলপতিরা ছিলেন নিষ্ঠুর ও উচ্চাভিলাষী। এই সমস্ত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী ইংরাজীতে এস-এ, এস-এস স্টর্ম ট্রুপার্স, ব্রাউন সার্টস্ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। আমাদের দেশের সংবাদপত্রে তখন এই সমস্ত প্রাইভেট বাহিনী মোটামুটি 'ঝটিকা বাহিনী' নামেই প্রচারিত হইয়াছিল। এই ঝটিকা বাহিনী এস-এস-এ'র সেনানীমণ্ডলীর প্রধান অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আর্নেস্ট রোহেম (Ernst Roehm) —ইনি একজন দক্ষ ও সাহসী সামরিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একজন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিও ছিলেন। আর সেই সময় নাৎসী পার্টিতে এবং ঝটিকা বাহিনীর বিভিন্ন পদে এমন অনেক অফিসার ছিলেন যাঁরা নিষ্ঠুর, ধর্ষকাম এবং যৌন কদাচারে লিপ্ত ছিলেন। সমকামিতা (homosexuality) ছিল তাদের যৌন চরিত্রের প্রধান বিকৃতি। ক্যাপ্টেন রোহেমও এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত হিটলারের ক্ষমতার শীর্ষারোহণে তাঁর সাহায্য, সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব প্রয়োজন ছিল, ততদিন এই যৌন কদাচার লইয়া হিটলারের কোন মাথা ঘামান নাই। কিন্তু বিরোধ বাধিল রোহেমের রাজনৈতিক মতবাদ ও উচ্চাভিলাষের প্রশ্ন নিয়া। কারণ, ইতিমধ্যে ঝটিকা বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ২০ লক্ষ ছাড়াইয়া গেল। অর্থাৎ জার্মানীর সরকারী সৈন্য বাহিনীর মোট সংখ্যার থেকে ২০ গুণ বেশী। (ভার্সাই সন্ধির চুক্তি অনুসারে সরকারী বাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।) সুতরাং জার্মান সেনানীমণ্ডলী বিচলিত হইলেন। এদিকে ২০ লক্ষ ঝটিকা সৈন্যের অধিনায়ক প্রচার করিতে লাগিলেন যে, হিটলার ও নাৎসী পার্টির ক্ষমতা দখলের দ্বারা প্রথম বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'দ্বিতীয় বিপ্লব' এখনও বাকী। এই দ্বিতীয় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবে সমগ্র দক্ষিণপন্থী দলকে উচ্ছেদের দ্বারা। অর্থাৎ হিটলারের নাৎসী পার্টিতে দুইটি শক্তিশালী গ্রুপ ছিল—দক্ষিণ ও বাম। শ্রমশিল্পের মালিক, বড় ব্যবসায়ী এবং ধনপতিদের প্রতিনিধি ছিলেন দক্ষিণপন্থী গ্রুপে, আর বামপন্থী অংশে ছিলেন মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক

শ্রেণীর প্রতিনিধি। দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রচারক ক্যাপ্টেন রোয়েম, ডঃ গোয়েবেলস প্রভৃতি নাৎসীদের মধ্যেও কট্টর চরমবাদী বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁরা বিগ বিজনেস থেকে শুরু করিয়া প্রুশিয়ান জেনারেলদের পর্যন্ত উচ্ছেদ করিতে চাহিলেন। কিন্তু হিটলার ইহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, বড় বড় জেনারেলসহ সমস্ত জুংকার, জমিদার, শিল্পপতি প্রভৃতিকে উচ্ছেদ করিতে গেলে অবিলম্বেই সরকারী বাহিনী বাঁকিয়া দাঁড়াইবে এবং হিটলার ও নাৎসী দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিবে। সুতরাং রোয়েমের প্রস্তাবে ও সংকল্পে তিনি বাধা দিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে চরমপন্থীদের কার্যকলাপ চলিতে লাগিল এবং প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ এক সময় সমস্ত জার্মানীর ভার আর্মির হাতে তুলিয়া দেওয়ারও ভয় দেখাইলেন (জেনারেল ব্লুমবার্গই প্রেসিডেন্টকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন)। এবার হিটলার সত্য সত্যই শঙ্কিত হইলেন এবং ক্ষমতা হারাইবার ভয়ে ভীত হইলেন। এদিকে গোয়েরিং এবং হিমলার ক্যাপ্টেন রোয়েমের প্রতি ছিলেন ঈর্ষান্বিত। তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য নানা ছলচাতুরি তাঁরা অবলম্বন করিতেছিলেন এবং হিটলারের কানে কানে এই মন্ত্র দিলেন যে, ক্যাপ্টেন রোয়েম তাঁর ঝটিকাবাহিনীসহ এক আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটাইয়া হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত ও বার্লিন দখলের চক্রান্ত করিতেছে। তখন ১৯৩৪ সালের জুন মাস। সরকারী সৈনাবাহিনীর নেতারা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন এবং এস-এ বা ঝটিকাবাহিনীকে দমন করিবার জন্য দাবী তুলিয়াছেন। এই সময় বার্লিন ও মিউনিক হইতে হিটলার নাকি দুইটি গোপন বার্তা পাইলেন (কিন্তু সেই সত্য কোন দিন প্রকাশ করা হয় নাই) এবং মনে করিলেন প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ হইতে আর বাকি নাই। (কিন্তু ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, 'রক্তস্নানের' সাফাই গাহিবার জন্য হিটলার সমস্ত ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন।) হিটলার তৎক্ষণাৎ তাঁর মন স্থির করিলেন, ৩০শে জুন রাত্রি ২টার সময় কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ বিমানযোগে মিউনিক রওনা হইলেন। হিটলার যখন রওনা হইলেন তখন ক্যাপ্টেন রোয়েম প্রভৃতি মিউনিক হইতে কয়েক মাইল দূরে Wiessee নামক শহরের এক হোটেলের কক্ষে ঘুমাইতেছিলেন। ৩০শে জুন শনিবার ভোর চারিটার সময় হিটলার তাঁর ক্ষুদ্র দলসহ মিউনিকে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, কয়েকজন এস-এ নেতাকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হিটলার মিউনিক থেকে মোটর গাড়ীযোগে রোয়েমের সন্ধানে Wiessee এর দিকে যাত্রা করিলেন এবং Hansbanor Hotel এ পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, রোয়েম এবং তাঁর বন্ধুরা গভীর ঘুমে মগ্ন। ঘরে ঢুকিয়া দেখা গেল হেইন্স নামক একজন এস-এ নেতা এক যুবক সঙ্গীর সঙ্গে শুইয়া আছে। (পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহাদের অনেকেই সমকামিতায় এবং মাদকাসক্তিতে অভ্যস্ত ছিল।) তাদের দুইজনকে বিছানা হইতে টানিয়া-হিঁচড়াইয়া হোটেলের বাহিরে নিয়া গিয়া সোজাসুজি গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। এভাবে ৩০শে জুনের রক্তস্নান শুরু হইল। ফুয়েরার নিজে ক্যাপ্টেন রোয়েমের ঘরে গেলেন। তাঁকে বিছানা হইতে তুলিয়া পরিবার জন্য একটি ড্রেসিং গাউন দেওয়া হইল এবং তারপর তাঁকে বন্দী করিয়া মিউনিকে ফিরাইয়া নেওয়া হইল, সেখানে স্টাডেলহেইম কারাগারে তাঁকে আটক করা হইল, কিন্তু হিটলার সরাসরি নিজে তাঁকে হত্যা করিলেন না। আজীবনের পুরাতন বন্ধু, সুখ-দুঃখের সঙ্গী এবং যাঁর সহায়তায় তিনি জার্মানীর শীর্ষস্থান দখল করিয়াছেন; শেষ সময়ে তাঁর প্রতি একটু 'উদারতা' দেখাইতে চাহিলেন। হিটলারের আদেশে আত্মহত্যার জন্য রোয়েমকে একটি পিস্তল দেওয়া হইল। কিন্তু রোয়েম সেই পিস্তল ব্যবহারে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন—

> 'If I am to be killed, let Adolf do it himself.'

অর্থাৎ 'যদি আমাকে মরিতেই হয়, তবে হিটলার নিজ হাতে গুলী করুন!' তখন হিটলারের আদেশে দুইজন এস-এ অফিসার রোয়েমের সেলে প্রবেশ করিয়া এবং তাঁর বুকের কাছে রিভলভার ধরিয়া তাঁকে গুলী করিল। রোয়েম মৃত্যুর আগে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হত্যাকারীরা তাঁকে থামাইয়া দিল, রোয়েম স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁর গায়ের জামা খুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তখন তাঁর মুখে ছিল অপরিসীম ঘৃণার অভিব্যক্তি। এভাবে হিটলারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সহযোদ্ধা হিংস্র মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইলেন। *

মিউনিকে যার শুরু হইল বার্লিনেও এবং অন্যত্র তাহা ছড়াইয়া পড়িল। গোয়েরিং হিমলার প্রভৃতি 'সন্দেহভাজন' ব্যক্তিদের একটা লিস্টি নাকি তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই তালিকা অনুসারে কোন আইন আদালত ও বিচার ইত্যাদি ছাড়াই নৃশংসভাবে তাদের গুলী করিয়া হত্যা করা হইল। জেনারেল শ্লিখার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারাইলেন। ৩০০ হইতে ১১০০ পর্যন্ত লোক খুন হইয়াছিল। সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তি, অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বহু ব্যক্তি নিহত হইয়াছিলেন। ১লা জুলাই, রবিবার, অপরাহ্নে এই নরমেধযজ্ঞ থামিল। বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ এবং দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ব্লোমবার্গ এভাবে জার্মানীকে এক ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষার জন্য হিটলারকে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং তাঁর দৃঢ়তা ও সাহসিকতার প্রশংসা করিলেন। বিমূঢ় জনসাধারণও এই হত্যাকাণ্ড মানিয়া লইল।

চৌদ্দ দিন পর ফুয়েরার রাইখস্টাগে এই হত্যাকাণ্ডের স্বপক্ষে দুই ঘণ্টা ধরিয়া যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে কেবল তাঁর বাগ্মীতার সম্মোহিনী শক্তিই নয়, তার গভীর বুদ্ধিজ্ঞান এবং জার্মানীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। (স্বয়ং চার্চিলের এই অভিমত)। হত্যাকাণ্ডের সাফাই গাহিয়া তিনি বলিলেন—'কেন আমি আইন-আদালতের আশ্রয় নিলাম না?' — জবাবে নিজেই বলিলেন :

> "Mutinies are suppressed in accordance with laws of iron which are eternally the same.
> If anyone reproaches me and asks why I did not resort to the regular Courts of Justice for conviction of the offenders, then all that I can say to him is this: In this hour I was responsible for the fate of the German people and thereby I became the supreme Justiciar of the German people."

*The Rise and Fall of the Third Reich by William L. Shirer. Pan সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৭৭

॥ প্রকাশিত হইল ॥

বাঙ্গালার ইতিহাস

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রস্তর যুগ থেকে বাঙলার কথা—বাঙালীর কথা। স্বাধীন বাঙলার রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাস। ঘরে রাখবার মত বই। প্রথম ভাগ (সচিত্র)—১২·৫০, দ্বিতীয় ভাগ—১২·৫০।

নবভারত পাবলিশার্স

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯ : ফোন : ৩৪-১৪৪৬

হিটলারের বক্তব্য এই যে, বিদ্রোহ চিরকালই লৌহকঠিন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হইয়া থাকে। যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাতে আমার পক্ষে এই পথ গ্রহণ করা ছাড়া জার্মানীকে বাঁচান যাইত না এবং জার্মান জাতির ভাগ্য-বিধাতারূপে আমি নিজেই চরম বিচারক হিসাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলাম।

এভাবে ৩০শে জুন তারিখের চরম বর্বরতার সাফাই গাহিয়া হিটলার সেদিনের জার্মান পার্লামেন্টের সমর্থন আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু জার্মানীর অবস্থা কি দাঁড়াইল? চার্চিল বলিতেছেন :

"This massacre however explicable by the hideous forces at work showed that the New Master of Germany would stop at nothing, and the conditions in Germany bore no resemblance to those of a civilised state. A Dictatorship based upon terror and reeking with blood had confronted the world ..."

অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে জার্মানীর নতুন প্রভু কোন কিছুতেই থামিবেন না এবং জার্মান রাষ্ট্র আর সভ্যদেশসদৃশ রহিল না। রক্তসিক্ত এবং ত্রাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ভয়ঙ্কর ডিক্টেটরী পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াইল।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে হিটলার

এর পর হিটলারের পথ একেবারেই খুলিয়া গেল। এতদিন তিনি ছিলেন চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী, এবার তিনি খোদ রাষ্ট্রপ্রধানের পদে বসিলেন। বৃদ্ধ মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল, ২রা আগস্ট (১৯৩৪) সকাল ৯টায় ৮৭ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আর দুপুর বারোটায় সরকারী ঘোষণা করা হইল যে, আগের দিন ক্যাবিনেটের গৃহীত এক আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদ এক করা হইল এবং অতঃপর হিটলার রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। তিনি সমস্ত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদেও (Commandes inChief of the Armed Forces) বৃত হইলেন। প্রেসিডেন্ট পদটি বিলোপ করা হইল। এখন হইতে হিটলার ফুয়ার ও রাইখ চ্যান্সেলার নামে অভিহিত হইবেন। এভাবে হিণ্ডেনবুর্গের শূন্য পদের জন্য কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল না। সুতরাং সংবিধান অগ্রাহ্য করিয়াই হিটলারকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে 'মনোনীত' করা হইল। কিন্তু এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের মধ্যেও যাতে কোথাও কোন ছিদ্র না থাকে, এজন্য হিটলার সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ আদায় করিয়া ছাড়িলেন। এই শপথ জার্মানীর নামে নয়, সংবিধানের নামেও নয় ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের নামে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহাও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই শপথ-বাক্য ইতিহাসের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য এবং তাহা এই :—

'I swear by God this sacred oath, that I will render unconditional obedience to Adolf Hitler, the Fuehrer of the German Reich and people, supreme commander of the Armed Forces, and will be ready as a brave soldier to risk my life at any time for this oath'.

এই শপথবাক্যটি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে কিরূপ সতর্কতা ও কৌশলের সঙ্গে ইহা রচিত। ইহার মধ্যে কোথাও ফাঁক রাখা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যমণ্ডিত জার্মান বাহিনী এই প্রকার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন মাত্র! পরবর্তী কালে অনেক জার্মান অফিসার এই আনুগত্যের দোহাই দিয়া যুদ্ধাপরাধ হইতে রেহাই পাইতে চাহিয়াছিলেন। যে জার্মান বাহিনী ও সেনানীমণ্ডলী ইচ্ছা করিলে হিটলারকে ১৯৩৪ সালেই ক্ষমতাচ্যুত বা খতম করিতে পারিতেন, তাঁহারাই কেন স্বেচ্ছায় হিটলারী ডিক্টেটরীর ফাঁদে ধরা দিলেন। কিন্তু প্রুশিয়ান সামরিক আভিজাত্যের গর্বিত জার্মান সেনানীমণ্ডলী যাঁর ফাঁদে ধরা দিলেন, তিনি কি চরিত্রের এবং কি ধরনের লোক ছিলেন? সেই লোকটি, অর্থাৎ হিটলার সম্পর্কে অক্সফোর্ডের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ট্রেভর-রোপার মন্তব্য করিয়াছেন :

A terrible phenomenon, imposing indeed in its granite harshness and yet infinitely squalid in its miscellaneous cumber — like some huge barbarian monolith, the expression of giant strength and savage genius, surrounded by a festering heap of refuse—old tins and dead vermin, ashes and eggshells and ordure—the intellectual detritus of centuries.

এ হেন ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকটিকে নিয়া সেনাপতিরাও কিন্তু অনেক ভোগান্তি ও বিরোধের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। এমন কি, হিটলারকে অপসারণের ও হত্যার চেষ্টাও কয়েকবার হইয়াছিল। কিন্তু সেদিনের জার্মানীতে হিটলার অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিলেন সুতরাং এর পরের ইতিহাস সোজা। হিটলার ও নাৎসী দলকে বাধা দেওয়ার ও প্রতিরোধ করার আর কিছু রহিল না। একে-একে তিনি জার্মানীর দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিতে লাগিলেন। হিটলারের ব্যক্তিত্ব দ্বারা ইউরোপীয় ধনিক ও বণিক সমাজের এক সুবৃহৎ অংশ মোহাচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমন কি যে ইতালীর ডিক্টেটর মুসোলিনী এতদিন সিংহের মত গর্জন করিতেছিলেন রোমক সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায় তিনি পর্যন্ত পিছনে পড়িয়া গেলেন।

অত্যন্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হিটলার বিনা রক্তপাতে কেবল মাত্র হুমকীর দ্বারা এবং সন্ত্রাসবাদ ও যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া জার্মানীর পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি দখল করিয়া ফেলিলেন। ১৯৩৬ সালে রাইনল্যান্ড হইতে ১৯৩৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া পর্যন্ত হিটলারের মুঠির তলায় আসিয়া গেল। জার্মানী, জাপান ও ইতালী কর্তৃক বিশ্বশান্তিসংঘ পরিত্যাগ হইল, সম্মিলিত নিরাপত্তার নীতি ভাঙ্গিয়া পড়িল, তারা কমিন্টার্ন বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জোট পাকাইল এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। হিটলার ভার্সাই সন্ধি, লোকার্ণো চুক্তি, কেলগ চুক্তি ইত্যাদি সমস্ত আন্তর্জাতিক সন্ধি বাতিল করিয়া দিলেন এবং জার্মানীকে এক সর্বগ্রাসী ব্যাপক যুদ্ধের দিকে টানিয়া নিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সালে জাপান পুনরায় চীন আক্রমণ করিল, ১৯৩৬—৩৯ সালে স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক গৃহযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল, ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং পরের বৎসর এপ্রিল মাসে মুসোলিনী আলবানিয়া দখল করিলেন। এবং তারপর ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে অকস্মাৎ হিটলার ঐতিহাসিক রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহাই ছিল তাঁর সেদিনের ডিপ্লোম্যাসির সবচেয়ে চতুরতাপূর্ণ কাজ। ইহার দ্বারা তিনি দুই রণাঙ্গনের ঝক্কি হইতে মুক্তি পাইলেন। ইঙ্গ-ফরাসী শাসকবর্গ কমিউনিজমের আশঙ্কায় হিটলারকে কোন বাধা দিলেন না। একটিমাত্র ব্যক্তি এবং সেই একক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে ইউরোপীয় মহাদেশ ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের প্রান্তসীমায় আসিয়া দাঁড়াইল। পৃথিবী যেন নিঃশব্দ উৎকণ্ঠায় হিটলারী বিভীষিকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

১৯৩৩ সালের পর ইউরোপীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত ও ঘটনাবলী পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখানে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ইতিহাসের প্রধান-প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হইল মাত্র — লেখক।

বিজ্ঞানের কথা

স্মৃতি শক্তির পরীক্ষা

নিচে কতকগুলো সংখ্যা, কতকগুলো অক্ষর ও কতকগুলো শব্দ লাইনে লাইনে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হতে পারে।

সংখ্যা

৩ ৮ ১ ৭ ২ ৫
৬ ২ ৫ ১ ৮ ৪ ৯
৭ ৪ ১ ৩ ৬ ৯ ২ ৫
৫ ৯ ৪ ৬ ৩ ৮ ৭ ১ ২
৪ ০ ৩ ৭ ২ ৯ ৬ ১ ৮ ৫

অক্ষর

ক ল ব হ
জ চ ম ত স
ক য র প গ অ
ম ক ট হ ল ত স
জ ক ন গ প র ফ ট
র আ ব ফ হ ক ম ড ন

শব্দ

পাত্র ভেড়া কাঁচি
বিড়াল বিছানা ঘড়ি আকাশ
চামড়া বই কল চেয়ার দোকান
কাপড় বাক্স কাপ কুকুর ঘাস ঘণ্টা
কাদা রক্ত কাক কাঁটা উঁচু কন্যা বন্দুক
ভাড়া বালক আগুন টেবিল কলম পেশা সময় ঘোড়া

সংখ্যা দিয়ে শুরু করতে হবে। সবশুদ্ধ পাঁচটি লাইন। প্রথম লাইনে পাঁচটি পৃথক সংখ্যা। তার পরে একটি করে বাড়তে বাড়তে শেষ লাইনে দশটি। এক-একটি লাইন এক-এক করে পড়তে হবে, প্রতিটি সংখ্যার জন্যে এক সেকেণ্ড করে সময় দিয়ে। লাইনটি পড়া হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে হুবহু লাইনটি কাগজে লেখার চেষ্টা করতে হবে। একটি লাইন হয়ে গেলে পরের লাইন। পরের পর পাঁচটি লাইন। একবারের বেশি পড়া চলবে না। সবচেয়ে ভালো হয় অন্য কেউ পড়ে শোনালে। লেখার সময়ে পুরোপুরি স্মৃতিশক্তির ওপরে নির্ভর করতে হবে।

অক্ষরের বেলায় ছটি লাইন। শুরু চারটি দিয়ে, শেষ নটি দিয়ে। একইভাবে এক-একটি লাইন ধরে পড়তে হবে। এক-এক সেকেণ্ডে এক-একটি অক্ষর। প্রতিটি লাইন পড়া শেষ হলেই লিখে ফেলা।

শব্দের বেলাতেও ছটি লাইন। শুরুতে তিন, শেষে আট। পড়তে হবে প্রতিটি অক্ষরের জন্যে দু সেকেণ্ড সময় দিয়ে। এক-একটি লাইন পড়ার পরে লেখা।

পরবর্তী পর্যায়ে লেখা আর নয়। প্রতিটি লাইন আবার নতুন করে মনে করার চেষ্টা করা। কতক্ষণ পর্যন্ত মনে থাকে তা দেখা।

এভাবে সংখ্যা না অক্ষর বা শব্দ ছেড়ে বাক্যে আসা যেতে পারে। নিচে খবরের কাগজ থেকে চারটি বাক্য তুলে দেওয়া হল। প্রথম বাক্যে ১৬টি শব্দ, দ্বিতীয় বাক্যে ১৭টি, তৃতীয় বাক্যে ২৫টি, চতুর্থ বাক্যে ৩৯টি।

প্রত্যেক বাক্য একবার পড়ে নিয়ে তারপরে লিখতে হবে, পুরোপুরি স্মৃতির ওপরে নির্ভর করে।

কোনো অর্থ হয় না এমন বাক্য দিয়েও এই একই পরীক্ষা চলতে পারে। যেমন নিচের বাক্যটি

উজ্জ্বল পক্ষী অবশ্য দ্রুত নিদ্রা যায়

অনাথ স্বর্ণ কুটিরে।

কতগুলো সংখ্যা আপনি সঠিকভাবে মনে করতে পেরেছেন তা থেকে পাওয়া যাচ্ছে আপনার স্মৃতিশক্তির মাত্রা। সাধারণত দেখা যায় ছ সংখ্যার একটি টেলিফোন নম্বর একবার শুনে লিখতে অনেকেই ভুল করে বসে। তবে পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে সাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন একজন বয়স্ক মানুষ সাতটি পর্যন্ত সংখ্যা নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারে। আপনি যদি সাতটিরও বেশি পেরে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

অক্ষর ও শব্দের বেলায় কিন্তু স্মৃতিতে ধরে রাখার ক্ষমতা আরো কম। অক্ষরের বেলায় ছটি, শব্দের বেলায় পাঁচটি। আপনি যদি আরো বেশিসংখ্যক ধরে রাখতে পেরে থাকেন তাহলে আপনার স্মৃতিশক্তি সাধারণের চেয়ে উচ্চতর মাত্রার।

সংখ্যার বেলায় অপেক্ষাকৃত বেশিসংখ্যক ধরা পড়ার কারণ, প্রত্যেকটি সংখ্যার সুস্পষ্ট পার্থক্যসূচক ধ্বনি। '১' এই সংখ্যাটি

(১) পূর্ব বাঙলায়, যাকে এখন আমরা বাংলাদেশ বলি, আজ যা ঘটছে, ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

(২) পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী আমরা, রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ আমরা, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না।

(৩) ঘন ঘন বোমার বর্ষণ ও ফিল্ডিং বদল করে সোবার্স এক সর্বাত্মক পরিকল্পনা নিলেও নিজের ওপর অগাধ আস্থা রেখে গাভাস্কার একার হাতেই সার্থক লড়াই চালিয়ে যান।

(৪) যে উদ্যোগী ছেলেটি অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর পাড়ায় একখানি চা-এর কিংবা পান-বিড়ির অথবা মনিহারী দোকান খুলে বসলেন, তারপর তাঁর বন্ধুর দেওয়া এমন ধারের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে দিলেন যে, অবিলম্বে দেখা গেল, তাঁর নগদ বিক্রির চাইতে ধারের বিক্রিই পরিমাণে অনেক বেশি।

টেলিগ্রাম : কুজেলারী
ফোন : ২৩-৩১১১
জড়োয়া গহনা • ঘড়ি
•
গ্যারান্টিযুক্ত ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স অ্যাণ্ড ওয়াচ মেকার্স

CENTRAL LIBRARY

শোনার পরে যদি শেষের 'ক্' ধ্বনিটুকু রেশমাত্র কানে লেগে থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই সংখ্যাটি বলে দেওয়া চলে, কেননা অন্য কোনো সংখ্যার উচ্চারণ 'ক্' দিয়ে শেষ নয়। একই কথা অন্য প্রত্যেকটি সংখ্যা সম্পর্কে—শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত। কিন্তু যখন উচ্চারণ করা হয় 'ব' বা 'ভ' তখন কিন্তু ধ্বনিগত পার্থক্য খুবই কম। শব্দের বেলাতেও একই কথা।

অর্থহীনকে শব্দ মনে রাখা যতোই শক্ত হোক, বাক্যের বেলায় কিন্তু দেখা যাবে, সাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন একজন মানুষ অনায়াসেই ১৫ থেকে ১৮টি শব্দের একটি বাক্য মনে রাখতে পারে। ২০ থেকে ২৫টি শব্দের বাক্য মনে রাখা তো রীতিমতো কৃতিত্বের পরিচয়। বাক্যের বেলায় স্মৃতি-শক্তির মাত্রা বেশি হওয়ার কারণ, বাক্যের অর্থপূর্ণতা। ব্যাকরণ-জ্ঞানও এক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক। যে কারণে শব্দটির বেশি শব্দ মনে রাখা না গেলেও নাটি শব্দ সম্বলিত অর্থহীন বাক্য কিন্তু সহজেই ধরা পড়ে।

এবারে শেষ আরেকটি পরীক্ষা।

নিচে অনেকগুলো শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি শব্দের জন্যে দু সেকেন্ড সময় নিয়ে পুরো তালিকাটি পড়তে হবে, তারপরে পুরো তালিকাটি মনে করার চেষ্টা করতে হবে। যেভাবে লেখা হয়েছে পর-পর ঠিক সেইভাবে না হলেও চলবে, সব মিলিয়ে পুরো তালিকাটি, আগেরটি পরে বা পরেরটি আগে হলেও ক্ষতি নেই।

তালিকা

সভা মাখন কাহিনী বাজার বিবাহ
ফুল তুলো চিঠি হলুদ নোঙর
গ্রাম কলম চাকুরি বাঘ ছাত
প্রাণবান উদর হাড়গড় টেবিল নাবিক

নিচের তালিকায় জোড়ায় জোড়ায় শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জোড়ায় একটি শব্দ পূর্ববর্তী তালিকা থেকে নেওয়া। কোনটি?

মার্বেল তুলো ।। গ্রাম পদ্ম
সভা নোঙর ।। কাকা টেবিল
শাখা ফুল ।। নাবিক মাকড়সা
হাড়গড় প্রভু ।। নদী কাহিনী
শিল্পী মাখন ।। খাল কলম
নোঙর মুক্তো ।। কমলা চাকুরি
চিঠি চিনি ।। বাঘ বাক্স
বাগান উদর ।। বিবাহ আপেল
বিষয় তুলো ।। চিঠি খাতা
সভা ছাত ।। হাড়গড় দক্ষিণ
তালিকা হাড়গড় ।। বিষয় উদর
প্রাণবান সন্দেশ ।। বাঘ বান

উপরের একটানা তালিকার শেষের দিকের মোটা তিন-চার শব্দ এই জোড়গুলো তালিকা থেকে চিনে নিতে পারা শক্ত নয়। স্মৃতিশক্তির আসল পরীক্ষা হবে গোড়ার দিকের শব্দগুলো চিনে নিতে পারায়। স্মৃতিশক্তি যাঁর অসাধারণ তিনি এমনি সব মোটা হরেক চিনে নিতে পারবেন। বয়স হতো বাড়ে শব্দ চেনার ক্ষমতা ততো কমে। যাটের কোঠা যাঁরা পেরিয়েছেন তাঁরা অনেক সময়ে দুটির বেশি শব্দ ধরে রাখতে পারেন না।

মানুষের স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটাই এখনো পর্যন্ত খানিকটা গোলমেলে। এই অর্থে গোলমেলে যে বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যায় ব্যাপারটাকে এখনো পর্যন্ত ধরা যায়নি। বিশ্বে এমন মানুষের সন্ধান একাধিক পাওয়া গিয়েছে যাঁরা সম্পূর্ণ অজানা বিদেশী ভাষার একটি কবিতা একবার মাত্র শুনে গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে পারেন—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, কিংবা এমনকি শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত। যাঁরা একটি ছবি একবার মাত্র দেখে পরে স্মৃতি থেকে এমন খুঁটিয়ে উদ্ধার করতে পারেন—সম্পূর্ণ অজানা বিদেশী ভাষায় লেখা সাইনবোর্ডের লেখাগুলো পর্যন্ত—যেন পুরো ছবিটি চোখের সামনে মেলা রয়েছে। আমাদের দেশেও এমন ঘটনা ঘটেছে যে ইংরেজি-না-জানা ব্যক্তি দুজন গোরা সৈন্যের কথোপকথন একবারমাত্র শুনে পরে হুবহু তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। অন্যদিকে অল্প-দিনের অদর্শনেই পরিচিত ব্যক্তির নাম ভুলে যাওয়া, এমনকি চেহারাও, এমন ঘটনা তো আকছার ঘটে থাকে। অদর্শনেরও দরকার নেই, নিত্য যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বা যার কথা শোনা যাচ্ছে, কোনো একটা উপলক্ষে তার নাম স্মরণ করতে গিয়ে আবিষ্কার করতে হয় এই মানুষটির নামও স্মৃতি থেকে কেমনভাবে মুছে গিয়েছে যেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছুতেই আর মনে করা যায় না। এই নিদারুণ অস্বস্তির অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে।

যে-কেউ নিজের অতীত জীবনের দিকে তাকালেও উপলব্ধি করবেন স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটা প্রকৃতই গোলমেলে। বহু বহু আগেকার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর একটি ঘটনা হয়তো স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু জীবনের-মোড়-ফেরানো অনেক বড়ো বড়ো ঘটনা সহজে মনে পড়তে চায় না।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে একটি চৌম্বক ড্রাম থাকে যেটিকে বলা হয় তার স্মৃতিভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে একবারটি যা জমা পড়ে তার অবলুপ্তি নেই। নির্ভুলভাবে সেটি আবার যে-কোনো সময়ে পাঠ করা যেতে পারে। ইচ্ছে করে মুছে না ফেলা পর্যন্ত এই জমার ভাণ্ডার অক্ষয়। একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

মানুষের স্মৃতিভাণ্ডার অবশ্যই এমনি একটি চৌম্বক ড্রাম নয়। এই ভাণ্ডারের জমার ঘরে সমস্ত ঘটনা একরকম দাগ ফেলে না, একই ঘটনা সর্বক্ষেত্রে একই রকম দাগ ফেলে তাও নয়, আদৌ দাগ ফেলেছে কিনা অনেক সময়ে তাও বোঝা যায় না। কেন এমন হয় তার জবাব এখনো পুরোপুরি দেওয়া সম্ভব নয়। একালের বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে প্রচুর গবেষণা করছেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটি গত চব্বিশ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান বছরের তৃতীয় সংখ্যাটি (মার্চ, ১৯৭১) রামন স্মৃতি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত। নিবেদনে বলা হয়েছে, 'আচার্য রামনের বিজ্ঞান-সাধনা, বিশেষতঃ শব্দ ও আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক ও যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহের বিবরণ এবং বিজ্ঞানের ঐ দুইটি শাখা সম্পর্কে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ এই সংখ্যায় পরিবেশিত হইয়াছে। ...লেসার আবিষ্কারের পর রামন এফেক্টের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে—এই বিষয়ে গবেষণার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাম্প্রতিককালে প্লাজমাতেও রামন এফেক্ট পরিলক্ষিত হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যায় এই বিষয়গুলি এবং আচার্য রামন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামন গবেষণা মন্দির সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।'

নিবেদনে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ হাতের প্রবন্ধ আলোচ্য সংখ্যাটিতে পাওয়া যাবে। প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন সুকুমারচন্দ্র সরকার, সতীশ-রঞ্জন খাস্তগীর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, জয়ন্ত বসু, কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যেন্দু-বিকাশ কর, সুনীলকুমার সিংহ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার ঘোষ, ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও প্রভাসচন্দ্র কর। এঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা আচার্য রামনের সহযোগী ও সহকর্মী, এমন কয়েকজন যাঁরা আচার্য রামনের ছাত্র। তার চেয়েও বড়ো কথা, প্রায় সকলেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষক বিজ্ঞানী বা অধ্যাপক। ফলে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়ে লেখা সাধারণ পাঠকদের জন্যে এই প্রবন্ধগুলি একদিকে জানবার বিষয়ে যেমন যথাযথ, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপনায় তেমনি প্রাঞ্জল। আচার্য রামনের গবেষণা ও জীবন সম্পর্কে যাঁরা ধারণা করতে চান তাঁরা নির্ভয়ে এই একটি সংখ্যার আশ্রয় নিতে পারেন। পত্রিকার একটি বিভাগের নাম 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর'। এই বিভাগেও আচার্য রামনকেই নানাভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। লিখেছেন সুধাংশু-প্রকাশ চৌধুরী, রাসবিহারী রায় ও শ্যামসুন্দর দে। বিভাগটি সুপরিকল্পিত ও সুলিখিত। সব মিলিয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্তমান সংখ্যাটির জন্যে সম্পাদক গোপাল-চন্দ্র ভট্টাচার্য বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদ অবশ্যই পাবেন। মাত্র ৬৪টি পৃষ্ঠার মধ্যে আচার্য রামনের মতো বিজ্ঞানীর এমন একটি সর্বাঙ্গীণ পরিচয় তুলে ধরার মধ্যে সম্পাদনার কৃতিত্ব কম নয়।

—অয়স্কান্ত

রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার পল্লী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের প্রতিদিনের প্রাণযাত্রায় এই বৃহৎ পৃথিবীর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশকেই আমরা সচরাচর স্পর্শ করি, সেই কারণেই আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা সেই সামান্য, ক্ষুদ্র অংশ থেকেই সংগৃহীত হয়ে আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। একান্ত জীবযাত্রার প্রয়োজনে যে জীবন শুধুমাত্র আপনার বাঁচবার রসদ সংগ্রহে ব্যাপৃত, তার প্রয়োজন সীমিত থাকে কলকোলাহলময় মানুষের কর্মব্যস্ত সংসারের একটি সামান্য অংশে। সে পৃথিবী মানুষের কলকাকলিতে মুখর, কর্মের প্রেরণায় ও তাড়নায় চঞ্চল, উত্তপ্ত ও উন্মত্ত; তার সঞ্চয়ের পরিমাপ হয় অর্থমূল্যে। সে জীবন অতি বিচিত্র, অতি দুর্বার, অতি বেগবান।

কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত প্রাণযাত্রার সীমানার ঠিক ওপারেই, কখনও বা তারই মধ্যে, আর এক প্রাণলীলার জগৎ সুদূর আকাশের নক্ষত্রলোক পর্যন্ত প্রসারিত। তা আমাদের প্রতিদিনের কাজে বড় একটা লাগে না। তাই তার অস্তিত্বই আমরা ভুলে থাকি। শুধু তাই নয়, মর্তলোকের মৃত্তিকা থেকে দূরান্ত জ্যোতিষ্কলোক পর্যন্ত বিস্তৃত এই জগৎ যেন আমাদের তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেও দিতে চায় না। তার মধ্যে নিত্যকালের প্রাণলীলা বিধৃত, সে অনন্তব্যাপ্ত, অথচ সে একান্ত নিঃশব্দ, নির্বাক ও মূক। সে যেন আমাদের একান্ত সান্নিধ্যে থেকেও অহরহ নিজের অস্তিত্বকে গোপন করবার জন্যই পাষাণ মূর্তির মত নিজেকে নিশ্চল ও প্রচ্ছন্ন রেখেছে। তার দিকে চকিত অনবহিত দৃষ্টি পড়লে মনে হয়, সে পাষাণ পদার্থমাত্র।

কিন্তু সেই অনন্ত-প্রসারিত নিত্যকালের প্রাণলীলা আমাদের জীবনযাত্রার মতই চঞ্চল ও স্পন্দমান। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আমাদের চারিপাশের বাস্তব কর্মচঞ্চল-পৃথিবীর সঙ্গে তার বাইরের অজানিত, নির্বাক পৃথিবী একযোগে যুক্ত হলে তবেই পৃথিবীর মানব-চেতনায় ব্রহ্মাণ্ডের মূর্তিটি সম্পূর্ণ হয়। মানব-চেতনায় সম্মুখে এই সৃষ্টি পৃথিবী থেকে অনন্তলোক পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে সবুজ ফুল-তোলা, জ্যোতির্বিন্দুর বুটি-বসানো, নীলাভের মত রঙীন, অনন্ত নৈঃশব্দ্যের এক যবনিকার মত, যার প্রান্তে প্রান্তে এই মর্তজীবনের মুখরতা ও চাঞ্চল্য জরির পাড়ের মত বসানো। মানুষের মুখরতা আর চাঞ্চল্যের পাড়টি সেই অনন্ত নৈঃশব্দ্যের যবনিকা থেকে পৃথক করে দেখলে কোনটিই সৃষ্টির সম্পূর্ণ মূর্তি হবে না। দুইকে এক করে একসঙ্গে দেখলে তবেই দুইয়ের পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি হতে পারে।

অথচ মানব-চেতনায় এই দুইকে পৃথক করে দেখারই রেওয়াজ। যাঁরা এই অস্তিত্বের আস্বাদ আমাদের কাছে চিরকালের সামগ্রী করে বহন করে নিয়ে আসেন, সেই শিল্পীদের মধ্যেও কেউবা এই পাড়ের কথা বলেছেন, কদাচিৎ কেউবা বলেছেন এই পাড়হীন কাপড়খানির কথা, এই দুই ভিন্নের আস্বাদ ভিন্নভাবেই আমাদের দিয়েছেন; কেউ এটা দিয়েছেন, কেউবা অন্যটা দিয়েছেন। কেউবা এই মুখরতা ও চঞ্চলতার কবি, কেউবা এই নৈঃশব্দ্যের কাব্য রচনা করেছেন। কেউবা কবি মানব-হৃদয়ের বা মানব-প্রবৃত্তির, কেউবা কবি প্রকৃতি-চরিত্রের।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে মানব-হৃদয়ের এক কবি-কথাশিল্পীর রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশী উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশী হইল। বলিল, 'কি কি নিবি পুঁটলি বাইধা ফেলা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চান্দ উঠবো, আলোয় পথটুকু পার হমু।'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উঠবো পাঁচী'।

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কই ?'

'সদর। ঘাটে না চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের জংলার মাধ্য ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।'

পায়ের ঘা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা এক সময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল 'পারবি না তুই বাধা পাস পাঁচী ?'

'হ, বাধা জানায়।'

'পিঠে চাপামু ?'

'পারবি ক্যান ?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দু দিকে ধানের খেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।"

(প্রাগৈতিহাসিক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

এ কাব্য একান্তভাবে প্রকৃতি-নিরপেক্ষ মানব-হৃদয়ের। একটি মানব-দম্পতির একান্ত দেহের আধারে রচিত এক তীব্র তীক্ষ্ণ কাব্য-কাহিনী। পৃথিবীতে মানব-হৃদয়ের শিল্পী ও কবির সংখ্যাই সমধিক। তার কারণও একান্ত স্পষ্ট। চারিপাশের ছড়ানো মানব-জীবন থেকেই তাঁরা শিল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তার বাইরে তাকাবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি কোনোটাই হয় নি তাঁদের।

আর এক শ্রেণীর স্রষ্টা আছেন যাঁরা ধাতুগতভাবে মানব-জীবনের প্রাণচঞ্চলতা, মুখরতা, কোলাহল ও কলাকলির মধ্যে অবস্থান করেও এই সবকিছুকে ছাড়িয়ে বা আত্মিক সম্পর্কশূন্য হয়ে এই প্রাণ-চঞ্চলতা, কোলাহল ও মুখরতার বাইরে যে নিঃশব্দ নির্বাক মৌন পৃথিবী তারই সঙ্গী, তারই অধিবাসী। এ যেন হয়েছেন তাঁরা বিচিত্র ভাবে—জন্মসূত্রে। তাঁরা আপনার মনের ও প্রাণের স্থায়ী আবাস-স্থল আবিষ্কার করেন এই বিপুল-বিস্তার মৌন নির্বাকের মধ্যে। এ এক ধরনের মানব-প্রবৃত্তির উজানে বয়ে যাওয়া যেন। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এমনি দুজন শিল্পীর রচনা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি আপনাদের আস্বাদনের জন্য পরিবেশন করছি :

"এতক্ষণ তাদের কলে-ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখী ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট নিঃশব্দ, শান্ত বৈকাল—সেই হলদে পাখীটা আজও আসিয়া পাঁচিলের উপরের কাঁঠাল ডালটাতে সেই সবই বসে। মায়ের হাতে পোঁতা লেবু চারাটাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে......

আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁঝ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকা ডাকিবে গভীর রাতে পিছনের বন বাজ জগডুমুর গাছে লক্ষ্মী-

পেঁচার রব শোনা যাইবে।......কেহ কোনদিন সে দিক মাড়াইবে না. গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া, মায়ের সে লেবু-গাছটার সন্ধান কেহ কোনদিন জানিবে না, ওড়্-কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, ফুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলদে-ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।"

(পথের পাঁচালী :
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

"সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা;
খড় মুখে নিয়ে এক শালিক যেতেছে উড়ে চুপে;
গোরুর গাড়ীটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে;

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।"

(রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ দাশ)

এই দুই ক্ষেত্রে কোলাহল-মুখর মানব-জীবনের বাইরে পরিকীর্ণ যে নিঃশব্দ পৃথিবী, মাটি জল গাছপালা থেকে আকাশ ও জ্যোতির্লোক পর্যন্ত প্রসারিত যে নিঃশব্দ অস্তিত্ব, তার কাব্যই শুধু এঁরা রচনা করেন নি, এঁদের রচনার চারিত্র বিচার করলে দেখা যাবে যে এঁরা এরই মধ্যে প্রাণের স্থায়ী ও অনন্ত আরাম আস্বাদ করেছেন। যে মানব-গৃহে এঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই মানব-গৃহে মানবী-জননীর স্নেহ-সমাদরে তাঁদের স্থূল দেহটি লালিত হয়েছে, কিন্তু মন ও প্রাণটির পুনর্জন্ম হয়েছে এই অনন্ত রূপ-ময়ী, মূক, অবজ্ঞাত, ও অনা-অজ্ঞাত প্রকৃতির সূতিকাগৃহে, এবং তারই স্নেহে তাঁদের মন ও প্রাণ লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে তাঁরা প্রাণের এ জন্মের আরাম ও জন্ম-জন্মান্তরের ভুলে-যাওয়া চিরস্থায়ী আবাসকে খুঁজে পেয়েছেন।

কিন্তু তাতে অন্য দিকটি বাদ পড়ে গিয়েছে। কোলাহলময় মানব-লোককে তাঁরা পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন, কেবল মানব-লোক থেকে, প্রাত্যহিক জীবন থেকে মানব-চিত্রের ও মানব-চরিত্রের সব ফেলে দিয়ে শুধু সেই সব বৃত্তি ও আবেগ বা অভিজ্ঞতা-গুলিকেই নিয়ে গিয়েছেন যা তাঁদের আত্মিক আবাস অন্বেষণ ও রচনের প্রয়োজনে প্রয়োজন। বাকীগুলিকে বর্জন করে গিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের মহাকবির দৃষ্টি ভিন্ন-শ্রেণীর। তিনি এই কোলাহলমুখর মানব-জীবনের মাঝখানেই জন্মেছিলেন, এই-খানেই, এই ভূমিতেই আপনার জীবনব্যাপী সাধনার স্থির আসন পেতেছিলেন এবং এই ভূমিতে অবস্থান করেই সমগ্রের সাধনা করেছিলেন। কোলাহলমুখরতার মধ্যে অবস্থান করেও তাঁর দৃষ্টি এই মানব-লোকের দ্বারা মাত্র সীমাবদ্ধ হয়নি, তা স্থির ও ধ্রুবভাবেই চিরকাল যুক্ত ছিল কলরবমুখরিত জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে সুদূরতম জ্যোতিষ্কলোকের মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্যন্ত। তাই তাঁর পৃথিবী অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, এবং সেই অনন্ত প্রসারিত সংসারকে নিত্যউৎসবময় রূপে নিরীক্ষণও করতেন তাঁর বিচিত্র দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর অগণিত গানে জ্যোতিষ্কলোকের অজস্র, একান্ত সহজ উপমা এই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করছে। এই নিত্যউৎসবময় সংসারে, সুন্দর ভবনের মাঝখানে, মানবের মাঝে তিনি বসে এই অনন্তপ্রসারিত নিত্য-উৎসবের আনন্দধারা পান করছেন।

তাঁর এই আনন্দআস্বাদ, আমার যত-দূর মনে হয়েছে, মোটামুটি দুই ধরনের মনোভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এক প্রত্যক্ষ রূপকে আস্বাদের আনন্দ-অভিজ্ঞতা, অন্যটি রূপকে অবলম্বন করে সৌন্দর্যমাধুর্যলব্ধ ধ্যানের তন্ময়তা থেকে আনন্দ-আস্বাদের অভিজ্ঞতা। চরিত্রে প্রথমটি প্রধানত লৌকিক, দ্বিতীয়টি চরিত্রে মূলত আত্মিক। লৌকিক রূপময়তায় আত্মিক স্পর্শ লেগেছে কোথাও, আবার কোথাও আনন্দময়তা রূপকে অবলম্বন করে মূর্ত হয়ে উঠে আত্মাকে ধ্যানমগ্ন করেছে। এই আনন্দাস্বাদ ব্রহ্মস্বাদসহোদর। এই রূপপ্রধান ও আনন্দপ্রধান স্বরূপের দুটি নমুনা আপনাদের আস্বাদের জন্য পরি-বেশন করছি :

"আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্‌বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ভাঙা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটির;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো।"

(সুখ : চিত্রা)

"পাহাড়ের নীল আর দিগন্তের নীল
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে
ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের
রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে
বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে
নিঃশব্দ করতালি।"

(১৪নং কবিতা : জন্মদিন)

প্রথমটিতে পরিপূর্ণ রূপময়তা আনন্দের স্পর্শ বহন করে প্রকাশিত আর দ্বিতীয়টিতে আনন্দময়তা শরতের সোনালি আলোয় স্নাত হলদে ফুলের মতই প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বর্তমান আলোচনায় আমার আলো-চনার বিষয় পল্লীপ্রকৃতি; সেই কারণে আমি আমার বক্তব্য পল্লীপ্রকৃতির রূপময় প্রকাশের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি।

পূর্বে বলেছি, মহাকবি কোলাহলমুখর, কর্মচঞ্চল মানবজীবনের মাঝখানে জীবনের ধ্রুব আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই অতি-বাস্তব ও চঞ্চল—মুখর জীবনের বহির্দেশে নিত্যকাল 'অনন্ত-প্রসারিত নিঃশব্দ, নির্বাক জীবনের সঙ্গে চিরকাল আপনার কাব্য-চেতনার মধ্যে গ্রন্থিবদ্ধ ছিলেন। সেই কারণে প্রকৃতি-অভিমুখী ও প্রকৃতি-প্রেমিক অন্যান্য শিল্পীদের মত মানব-অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ প্রকৃতির মূর্তি ও প্রেম প্রকাশিত হয় নি। তাঁর প্রকৃতির ধ্যানের মাঝখানে সবসময় মানুষের ধ্রুব আসন পাতা থাকত। প্রকৃতির মূর্তি তাঁর শিল্পে তাই সর্বদা মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধনে যুক্ত। এই বোধকে ও প্রবণতাকে তিনি তাঁর কবি-জীবনের প্রায় আরম্ভেই আবিষ্কার করে-ছিলেন। তাঁর তরুণ কালের রচনা কড়ি ও কোমলের প্রথম কবিতাটিতে তিনি আপনার কবিচিত্তের প্রবণতা আবিষ্কার করে উচ্চারণ করেছিলেন :

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।"

(প্রাণ : কড়ি ও কোমল)

পরিপূর্ণ মানব-অস্তিত্বের যে ধ্যান ও বোধ তিনি লাভ করেছিলেন তাতে নিজের কবিশক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষকে বাদ দিয়ে প্রকৃতি বিগ্রহহীন শূন্য সিংহাসনের মত; আর প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মানব-অস্তিত্ব সিংহাসন-মহিমাহীন বিগ্রহের মত। তাই সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্য শোভা ও মহিমামণ্ডিত প্রকৃতির সিংহাসনে তিনি মানব-বিগ্রহকে স্থাপন করেছিলেন। দুইয়ে একত্রিত ও যুক্ত হলে তবেই মানব-অস্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ। মহাকবির শিল্প-চেতনায় এ কোন পূর্ব পরিকল্পনা নয়। এ বোধটি প্রথম থেকেই তাঁর কাব্য-চেতনায় নিহিত ছিল; প্রথমে অস্ফুট অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তা পরিস্ফুট হয়ে দিনে দিনে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর

দীর্ঘকালব্যাপী শিল্প-সাধনার মধ্যে তার প্রকাশ সুস্পষ্ট। কড়ি ও কোমল থেকে পূরবী পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘকালের মধ্যে এর প্রকাশ লক্ষণীয় :

(১)

"বহুদিন পরে আজি মেঘ গেল চলে,
রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি ওঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ-বিদ্যুৎ-আলো নাচে।
জুঁই সরোবরতীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
অতি মৃদু হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।

....

ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন্ উপবনে
কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা, একটু দেছে কি দেখা
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।"
(যোগিয়া : কড়ি ও কোমল)
১৮৮৬।১২৯৩

(২)

"কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল
অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।
সেই মতো আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্ত কাননে
কোনো এক কোণে
এক বেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি—
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।"
(১৪ সংখ্যক কবিতা : বলাকা ১৩২২)

(৩)

"দুজনের সেই বাণী
কানাকানি
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা,
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তারপরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
দেখাশুনা হল হারা
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর;"
(পূর্ণতা : পূরবী ১৩৩১)

কবি-জীবনের প্রথম কাল থেকে একান্ত পরিণত কবি-কর্মের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত মহাকবির কবি-কর্মের আলোচনা করলে দেখা যাবে, যেসব কবিতায় তিনি পল্লীজীবনের লৌকিক চিত্র এঁকেছেন—সে অভিজ্ঞতা, বলাবাহুল্য, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ভিন্নতর আনন্দ-আস্বাদের উচ্চ ভূমিতে উত্তরিত হয়েছে—তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর কল্পনার একটি বিশেষ গড়নের আভাস পাওয়া যায়। অজস্র ও অফুরন্ত ঐশ্বর্য-সম্ভারের যে রাশি-রাশি সম্পদ প্রকৃতি আমাদের অগোচরে একান্ত নিঃশব্দে আমাদের চতুর্দিকে থরে-থরে নিত্যকাল ধরে অফুরন্ত উপহারের সামগ্রী হিসাবে সজ্জিত করে আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করছে, তারই মধ্যের কোন সামগ্রী কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। কবি সেই উপকরণ দিয়ে আপনার কল্পনার দোলমঞ্চ রচনা আরম্ভ করলেন একান্ত চারু রুচিতে। অপরূপ দোলমঞ্চ রচিত হয়ে প্রায় সম্পূর্ণ হল; কিন্তু পরিপূর্ণ হল না; সেই মুহূর্তে সেই সজ্জিত মঞ্চের নেপথ্য থেকে হাত ধরাধরি করে এসে ঢুকল মানুষ আর মানবী, এসে তারা দুজনে বসল সেই মঞ্চের মাঝখানে; অমনি কবির কল্পনায়, পাঠকের হৃদয়ে গান বেজে উঠল; রসাপ্লুতচিত্ত পাঠক পরিতৃপ্ত হয়ে বলে উঠল, এইবার পরিপূর্ণ হয়েছে। মানুষে প্রকৃতিতে, প্রেমে সৌন্দর্যে মাখামাখি হয়ে পরম স্রষ্টার অমূর্ত পরিকল্পনাটিকে মর্তলোকে পূর্ণ প্রকাশিত করে তুলল।

রবীন্দ্র প্রতিভার এইটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সৌভাগ্যক্রমে — সৌভাগ্যক্রমেই বলব, কারণ একে সৌভাগ্য ছাড়া আর কি বলতে পারি—মহাকবি জীবন সম্পর্কে এই সমগ্র দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সাধারণত অধিকাংশ শিল্পীর জীবন ও দৃষ্টি, সাধারণ মানুষের মতই, খণ্ডিত হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত অভিজ্ঞতা মানব-লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে বলে অধিকাংশ শিল্পী মানব-জীবনের কবি ও কথাকার হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। আবার কেউ-কেউ বা প্রশান্ত গুণে প্রকৃতির রাজ্যেই নিজের আবাস সংগ্রহ করে নেন। যাঁরা প্রকৃতির মধ্যেই নিজের আবাস খুঁজে পান তাঁরা মানব-লোকের দিকে বড়-একটা মুখ ফেরান না; ফেরালেও সেখানকার ধুলো-মাটির রঙে রঞ্জিত না করে কাউকে তাঁরা তাঁদের ভাবরাজ্যে প্রবেশের অধিকার দেন না। মোট কথা, দুই ক্ষেত্রেই সেখানে জগৎ খণ্ডিত। মহাকবির কাছে জগৎ খণ্ডিত ছিল না; তিনি সমগ্রকেই একেবারে লাভ করেছিলেন। কবিসত্তার আবির্ভাবের প্রথম দৃষ্টিপাতের সময়েই যে জগতের সঙ্গে তাঁর প্রথম শুভ-দৃষ্টি ঘটেছিল সে জগৎ মানব-লোক ও প্রকৃতি-লোক দুই মিলিয়ে সমগ্র জগৎ। আর সেই জগতের কেন্দ্রস্থলে যার স্থিতি সে মানুষ। তাই তাঁর কবিদৃষ্টি যেমন সার্বিক তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন আমাদের প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রতিমাগঠনের সময় দেবমূর্তিটি কেন্দ্রস্থলে রেখে তার

মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড	কিলোসাইকলস
১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১	২১৪৬৫, ১৫০৯৫ ১১৭০০ ও ৯৬৪০
মিডিয়ম-ওয়েভ	
১৯০ মীটার	১৫৮০

চারিপাশে চালচিত্র করা হত, মহাকবির বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কেও তাই বলা যায়: তাঁর ভাবজগতের কেন্দ্রস্থলে মানুষের বিগ্রহ, আর তার চারিপাশে প্রকৃতির সৌন্দর্যময়, মহিমান্বিত সজ্জা।

যে প্রকৃতিকে মহাকবি মানব-জীবনের মত সর্বত্রই দেখেছেন, তাকে স্বদেশে দেখেছেন, বিদেশে দেখেছেন; তাকে নগরে দেখেছেন, পল্লীগ্রামে দেখেছেন। নগরে প্রধানত যেমন মানব-লোককেই পেয়েছেন তেমনি পল্লীতে প্রধানত প্রকৃতিকেই পেয়েছেন। এক জায়গায় প্রধানত মানুষের সান্নিধ্য, অন্যত্র প্রধান সান্নিধ্য প্রকৃতির। পল্লী অঞ্চলে তাই মানুষও প্রকৃতির অংশ। পল্লী অঞ্চলে নির্জনবাসের কালে রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি :

'হেথায় তাহারে পাই কাছে—
যত কাছে ধরাতল যত কাছে ফুলফল—
যত কাছে বায়ু, জল আছে।
যেমন পাখির গান, যেমন জলের তান,
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
শুকতারা আকাশের ধারে,
যেমন সে অকলুষা শিশির নির্মলা ঊষা
তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
যেমন বৃষ্টির জল যেমন আকাশতল,
সুখসুপ্তি যেমন নিশার,
যেমন তটিনীনীর বটচ্ছায়া অটবীর
তেমনি সে মোর আপনার।
যেমন নয়ন তাঁর অশ্রুজলে পড়ে ঝরি
তেমনি সহজ মোর গীতি;
যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্মস্থান
তেমনি রয়েছে তার প্রীতি।'
(পল্লীগ্রাম : চৈতালি)

এ এমন এক সংসার, যা নির্মল, সুন্দর, প্রশান্ত, নম্র, সহজ এবং বহু সমস্যার দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সমস্যাহীন। এ যেন এমন এক সংসার, যেখানে ঈশ্বর স্বর্গে অধিষ্ঠিত আর মর্তলোকে সবই নিয়ম মত চলছে। পল্লীগ্রামের সব সমস্যাই মহাকবি জানতেন, সেখানকার দুঃখ-দারিদ্র্য তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তা সত্ত্বেও নিত্যকালের প্রকৃতির পটে মানব-জীবনের যে নির্মল, নম্র, সহজ, প্রশান্ত নিত্যমূর্তি প্রকাশ তা পল্লীর পরিবেশে স্পষ্টতর মূর্তিতে প্রকাশিত। সৃষ্টির সর্বত্রই এ রূপের অব্যাহত প্রকাশ ঘটছে, কিন্তু সর্বত্র তাকে স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে ধরা যায় না। যেখানে মানুষের প্রাণধারা অপেক্ষাকৃত কম মুখর, বেশী নির্জন, যেখানে মানব-জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ ও দৃশ্যের মিলিত অস্তিত্বকেও চিনতে পারা যায়, সেই পল্লীর মধ্যেই একে আবিষ্কার করা সহজ। দৈনন্দিন মানব-জীবন, যা সেই বিশেষ দিনটির অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে আপনার সকল লাভ-ক্ষতি, দুর্বলতা-স্বার্থ, কোলাহল-কলরব নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পুনর্জন্মের জন্য মানুষের হৃদয়ে কোন সঞ্চয় রেখে যায় না, সেই দৈনন্দিন মানব-জীবনের সঙ্গে মানব-জীবনের এই নিত্যমূর্তির সংযোগ না ঘটলে মানব-জীবন রসের যোগানে সরস ও পরিপূর্ণ এবং পরিপক্ব হয় না। সেই পরিপূর্ণতার সহজ উপকরণ তিনি পল্লী-প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত ভাণ্ডারের মত দেখতে পেয়েছিলেন এবং দেখাতে চেয়েছেন।

আমি যদিও মানব-জীবন ও প্রকৃতি এই দুইকে আমাদের সাধারণ ও সচরাচরের অভ্যাসবশত পৃথকভাবে বার-বার উল্লেখ করেছি, মানব-অস্তিত্বের সমগ্রতার দৃষ্টিতে এ দুই কখনও বিচ্ছিন্ন নয়; এ সর্বদা এক ও অবিভাজ্য। মহাকবির মানব-জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিও সর্বদা সেই সমগ্রতা-বোধের দ্বারা চিহ্নিত এবং তাঁর চেতনা সর্বদা এই সমগ্রতাবোধে সজাগ ছিল। দুইকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে দেখার দৃষ্টি তাঁর ছিল না। তবে জীবনের, চিন্তার ও শিল্পের প্রয়োজনবোধে সেই সমগ্রের বৃহৎ পরিধির এক-এক স্থানে এক-এক সময় চেতনার আলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই মাত্র। একের কথার সঙ্গে অন্যের কথা স্বতই এসে পড়েছে, একের আলোকিত মূর্তির পশ্চাতে অন্যের অস্তিত্ব সর্বদাই আভাসিত হয়েছে। মানুষ পল্লীর পরিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত; শুধু তাই নয়, সেখানে সে বৃহৎ প্রকৃতির অংশ মাত্র। শিল্প-কর্ম নয়, মহাকবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অংশ নীচে নিবেদন করছি :

শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারী বিশ্রী লাগে। সকালবেলাটা তাই নিতান্ত নির্জীবের মত ছিলুম। বেলা দুটোর সময় রোদ উঠল। তারপর থেকে চমৎকার। খুব উঁচু পাড় বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়—এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুই ধারে স্নেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে-বেঁকে চলে গেছে—আমাদের বাংলা দেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে বসে-বসে অতিযত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়—তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।'
(ছিন্নপত্রাবলী : ১৫ সংখ্যক পত্র)

এ ছাড়া, মোটামুটি ১২৯৮ সাল থেকে ১৩০৭ সাল পর্যন্ত রচিত গল্পগুচ্ছের কম-বেশী পঞ্চাশটি গল্প এর সর্বশ্রেষ্ঠ চিহ্ন বহন করে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পৃথিবীর গল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে সবিনয়ে একথা বলতে পারি যে, মানুষে প্রকৃতিতে মাখামাখির এমন রসমধুর স্বাদু অভিজ্ঞতা সাহিত্যের বৃহৎ ও উজ্জ্বল ইতিহাসে কমই আছে। নদীমাতৃক, শ্যামল, কোমল বাংলা দেশের নিভৃত অন্তঃপুর—সেখানে একদিকে দূর-দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র বা প্রান্তর, অন্যদিকে বিপুল-বিস্তার শুভ্র বালুকারাশি, মাঝখানে কলস্বরা, খরস্রোতা পদ্মা ও তার বিভিন্ন জলধারার প্রবাহ; মাথার উপরে অনন্ত-বিস্তার আকাশ; নদীর দুই দিকে কোথাও দূরে ও কোথাও নিকটে আম-কাঁঠাল-বট - অশথ - শিরীষের প্রাচীন বনশোভার ভিতরে ও আড়ালে কোটোর মধ্যে বাংলা দেশের প্রাণ-ভোমরার মত ঘন-সন্নিবিষ্ট কুটিরের সমাবেশে বাংলার পল্লীগ্রাম। এই বৃহৎ, নিঃশব্দ, প্রশান্ত প্রকৃতির পটভূমি, যার দিকে সারা আকাশ সকলের অগোচরে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে, সেই শব্দহীন কোলে ছোট-ছোট পুতুলের মত মানুষের সহজ ও জটিল জীবনের ছোট-ছোট হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের লীলা।—যা যতই ছোট, যার উচ্চরোল এই বৃহৎ নৈঃশব্দকে সামান্যই বিঘ্নিত করে, যার সুখ-দুঃখ এই অনন্ত-বিস্তৃত উদাসীনতাকে সামান্যই স্পর্শ করে। জীবনের এমন সমগ্র মূর্তি শিল্প-অভিজ্ঞতার মধ্যে কদাচিৎ আস্বাদ করা যায়। এই ভীষণ নীরব, বিপুল-বিস্তার ব্রহ্মাণ্ডের পটভূমিতে কোলাহলময় মানব-জীবন যেমন অনুপাতে একান্ত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র, এবং একান্ত তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও যেমন তার বৈচিত্র্যের শেষ নাই, বিশাল পদ্মার দুই তীরের নিভৃত পল্লীর মানুষের ক্ষুদ্র, তুচ্ছ জীবনের দুঃখ-সুখের বৈচিত্র্যের তেমনি অবধি নাই। আবার এই ক্ষুদ্র মানুষের হৃদয়ে আবেগ ও প্রবৃত্তি পদ্মা মেঘনার চেয়েও দুর্বার, প্রবল এবং দুস্তর। প্রকৃতির বিশাল ও নিভৃত পটভূমিতে মানব-আবেগের এই গল্পগুলি রচনার পর দীর্ঘকাল পার হয়ে গিয়েছে; তারপর থেকে পদ্মার অনেক জলধারা বয়ে গিয়েছে, দেশের ইতিহাসে এবং মানুষের মনে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু আকাশ ও মৃত্তিকার শুক্তির আবরণের মধ্যে বাংলা দেশের নিভৃত পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের যে লুকানো মুক্তা মহাকবি শুক্তি-পেটিকার আবরণের মধ্য থেকে আমাদের জন্য উদ্ঘাটন করে গিয়েছেন তা এখনও অম্লান লাবণ্যে ঝলমল করছে। নদীমাতৃক বাংলা দেশে জলের মধ্যে কতটা মাটি মেশানো আর মাটিতে জলের অংশ কতখানি তা নির্ণয় করা যেমন দুরূহ তেমনি এই গল্পগুলিতে কতটা মানুষের মৌল আবেগ আর কতটা প্রকৃতির নিঃশব্দ ক্রিয়া আছে তার সীমারেখা টানাও তেমনি কঠিন। নীচের আশ্চর্য অংশটিতে এক অখণ্ড মধুর অভিজ্ঞতা তার অপরূপ সাক্ষ্য বহন করছে :

'অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারিদিক দেখিতে কি রকম তাহা বুঝিলাম না। কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশির-ভেজা নূতন চষা খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই

সোনা-ঢালা অদ্ভুত এবং সরিষা-খেতের আকাশ-ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন কি ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ী চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ষু তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম; কেবল মাকে পাইলাম না। মনে-মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদু-কম্পিত প্রাচীন দুর্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের দেহ-তত্ত্ব গান গুঞ্জন স্বরে শুনিতে পাইলাম না; সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোট-ছোট পল্লীসঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে হাম্বা-ধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেই সঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড় জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুনিতে পাই, পুকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ী হইতে কাঁসর-ঘন্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু গন্ধটুকু আমার চারিদিকে রাশীকৃত করিয়াছে।'

(দৃষ্টিদান : গল্পগুচ্ছ)

এখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির চরম সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রতি-দিনের প্রয়োজনের বাইরে যে বৃহৎ, নিঃশব্দ সংসার, যাকে প্রকৃতি বলে উল্লেখ করেছি, সে তার সকল সম্ভার উদ্যত করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেনা-পাওনার সম্পর্কই আমাদের এত ব্যাপৃত করে রাখে, আমাদের ক্ষুদ্র, বস্তুনির্ভর ও নিকট-নির্ভর মন তাতেই এত নিমগ্ন থাকে যে আমরা সেই গম্ভীর ওপারে তাকাই না। অথচ সে নিঃশব্দে দিয়েই যাচ্ছে, তার সব দেবার জন্যই যেন অপেক্ষা করছে। অথচ আমাদের তা খেয়াল থাকে না। তাই দৈব-দুর্বিপাকে কোনদিন জীবনে বিপর্যয় নেমে এলে, যখন মানুষ হারিয়ে যায়, আর চাইলেও যখন মানুষকে পাওয়া যায় না, তখন যে চিরকাল নিঃশব্দে, অনন্ত ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে আছে ও থাকে আমাদের জন্য, সে সস্নেহে তার অনন্তবাহু বেষ্টন করে আমাদের জড়িয়ে ধরে। সেই তখন পরমাশ্বাসে আশ্রয় দেয়, সব অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করে তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ও স্বাদের সম্ভার নিয়ে, সেই সম্ভারের স্মৃতি নিয়ে, মানব-জীবনের আদি অস্তিত্ব ও আদি আনন্দ যা থেকে উদ্ভূত। উপরের উদ্ধৃতিতে একটি তরুণী পল্লীবধূ চিকিৎসার দোষে অন্ধ হয়ে যাবার পর, যখন বাইরের পৃথিবী তার কাছে হারিয়ে গেল তখন চিরকালের নিঃশব্দ প্রকৃতিই তাকে মায়ের মত তার সকল সান্ত্বনা ও সকল ঐশ্বর্য নিয়ে এসে স্মৃতি ও অনুভব দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে।

জননী-স্বরূপা বাংলা দেশের অপরূপ স্নেহ-সজল মূর্তি মহাকবির দুই চোখ, চিত্তলোক এবং কল্পনাকে চিরকাল মুগ্ধ করে রেখেছিল। দেশের মাটির দিকে চোখ মেললেই তাঁর দুই চোখ মুগ্ধতায় আবিষ্ট হত; চোখ বন্ধ করলে তারই ছবি সমস্ত মনকে প্রেমে, সৌন্দর্যে ও রসে পরিপ্লুত করত। তাঁর সমস্ত জীবনের সুবৃহৎ রচনা-সম্ভার তার সাক্ষ্য সগৌরবে বহন করছে। তাঁর বড় প্রেমের, বড় মুগ্ধতার আধার বাংলাদেশের প্রকৃতি তাঁকে চিরকাল তার সৌন্দর্য দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল, ভুলিয়ে রেখেছিল। বোধ হয় সে হৃদয়ে দ্বিতীয় কোন মূর্তির স্থান ছিল না।

এই বাংলাদেশের প্রকৃতিকে তিনি কত মূর্তিতেই না এঁকেছেন। বার বার তার ছবি, তার সৌন্দর্য এঁকেও যেন তাঁর কবিচিত্ত পরিতৃপ্ত হয় নাই। বার বার বোধ হয় মনে হয়েছে যা দেখেছেন তাকে বোধ হয় পুরো রূপ দেওয়া হয় নাই। তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে এই সৌন্দর্যমূর্তির সহর্ষ প্রকাশ তাই স্বভাবতই অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

শুধু সৌন্দর্যমূর্তি নয়, তার সঙ্গে ভাবমূর্তি। ভাবমূর্তি বলতে আমি সেই চিরন্তন মানব-ভাবনার কথাই বলতে চাচ্ছি—যে ভাবনায় এই বিশ্বের মানব-জীবন সাধনায় সেই পরম রহস্যকে আবিষ্কার করার তপস্যা আছে, আকুতি আছে, সেই রহস্যকে ছুঁতে স্পর্শের আনন্দ-স্বাদ আছে; যা নাকি বিশ্বমানবের মহত্তম অবিনশ্বর উত্তরাধিকার, যা আছে আমাদের বেদে বেদান্তে-উপনিষদে, যা আছে রামায়ণে-মহাভারতে ও বিশ্বের এই জাতীয় সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সংস্কৃতিতে। সেই ভাবমূর্তিকেও তিনি বিশিষ্টভাবে বাংলার পল্লীর জীবন-সাধনার মধ্যে, সঙ্গীতের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন।

তারই কথা আমার বক্তৃতার শেষ কথা।

'অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা'। মহাকবিরই নিজের কথা। রবীন্দ্রনাথ অনেক নিয়েছেন পল্লীগ্রাম, পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীজীবন ও পল্লীসাধনা থেকে—এই কথাটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে সকলের কাছে। দিয়েছেন তিনি অনেক। তাঁর সমগ্র জীবন-সাধনাই দিয়ে গেছেন। যা নগর পেয়েছে তাই পল্লীও পেয়েছে। কিন্তু নিয়েছেন কি?

রবীন্দ্রনাথের সকল কীর্তিই অনন্য-সাধারণ। তার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতই বোধ-হয় সর্বোত্তম। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুধু শিল্প নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত একাধারে তাঁর জীবন-সঙ্গীত এবং সাধনাসঙ্গীত। ভারতীয় মার্গসঙ্গীত নিয়ে তার সঙ্গীতসাধনার শুরু হয়েছিল। ব্রহ্মসঙ্গীত এবং কিছু প্রকৃতি নিয়ে, কিছু প্রেম নিয়ে, কিছু পূজো নিয়ে সঙ্গীতও তার মধ্যে আছে। কিন্তু তার বিচিত্র এবং পরমানন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার এবং প্রকাশ ঘটেছে বাংলার কীর্তনাঙ্গ, বাউল ও লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর।

ভারতজীবনের প্রাণধারা-স্বরূপিণী গঙ্গা যেমন বাংলায় ঢুকে ভাগিরথী ও পদ্মা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন, ভারতীয় সঙ্গীত বাংলায় তেমনি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। বাংলার লোকসঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীত ভাগিরথীর মত এখানে স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। ছায়াপথের প্রকাশেও আশ্চর্য প্রভেদ ঘটেছে। বাংলার

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ শুষ্ক রুক্ষ্ম দিনগুলিতে—

স্নো ভিউ হোটেল

দার্জ্জিলিং

আপনার বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য কামনা করে

মার্জিত রুচি ভ্রমণবিলাসীদের একান্ত নির্ভরযোগ্য বাসস্থান

পূর্বাহ্নে স্থান সংরক্ষণের জন্য ফোন দার্জিলিং ৪০

বাউল, কীর্তন ও শাক্তসংগীতের মধ্যে তা সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ এইখানে এসে সেই মহান সম্পদভাণ্ডার যা নাকি গুপ্তধনের ধন-ভাণ্ডারের মত, তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত পেয়েছিলেন এবং সেই ভাণ্ডারকে তিনি জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

যে মহাকবি ও জমিদার জমিদারী কাছারীতে পল্লীবালকদের মুখস্থকরা সংস্কৃতিবহুল সাধু শব্দে রচিত বক্তৃতা শুনে বহু কষ্টে হাস্যসম্বরণ করেছিলেন, তিনিই লালন ফকীর, গগন হরকরা প্রভৃতিদের মত বাংলার বাউলদের কাছে তাদের গোপীযন্ত্র ও একতারা সহযোগে খাঁচার অচিন পাখীর আনাগোনায় গান শুনে তার মধ্য থেকে—যে দিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' জাতীয় গান দিয়ে বাঙালীর জীবনকেই শুধু নয়, সমগ্র বাংলাদেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন; এবং এই গান গাইতে গাইতেই বাংলার পল্লীর মাটিতে পা রেখে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে অনুভব করেছিলেন—যে এ সংসারে এমন আশ্চর্য ধনও আছে যাকে না চাইলে তাকে পাওয়া যায়। বাংলার বাউল-সংস্কৃতি, বাউল-সংগীত, কীর্তন গান, বৈষ্ণবকাব্য —যার মধ্যে হিন্দু সভ্যতার ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বার্তা কাল থেকে কালান্তরের নব রসায়নে এক অভিনব লোকায়ত মূর্তি নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অপেক্ষা করছিল—এই সবকিছু তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করেছিল এক অভিনব সম্পদের ভাণ্ডার। এই বাউলগান, বাউলসংস্কৃতি, কীর্তনের সুর, বৈষ্ণবকাব্য তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে নবজন্ম লাভ করেছে সেই নব-জন্মেই বাংলা সাহিত্য অমৃতে পরিপ্লুত হয়েছে।

মহাকবির সমসাময়িক কীর্তিমানদের ও পূর্বসূরীদের শিল্পকর্মের পাশাপাশি তাঁর শিল্পকর্মকে স্থাপন করলেই এর প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। বলা বাহুল্য, এ আলোচনার উদ্দেশ্য অন্য কোন মহৎ শিল্পীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মহাকবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের চেষ্টা নয়, কেবলমাত্র শিল্পরীতির বিশ্লেষণ করা। মহাকবি মধুসূদন বলতে গেলে তাঁর সমসাময়িক দেশ ও কাল থেকে সামান্যই গ্রহণ করে-ছিলেন। তাঁর কবি-কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়েছিল পশ্চিমের এক মহাকবির কাব্য-কীর্তি থেকে। তাঁর উদ্দীপ্ত কবি-কল্পনা তাঁর রুচি অনুযায়ী আপনার কাব্যের অধিকাংশের আখ্যানভাগ সংগ্রহ করেছে আমাদের দুই মহৎ গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত থেকে। ইংরেজী ভাষায় কাব্য-রচনা ত্যাগ করে যে কবি 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' বলে মাতৃভাষার , স্মরণ নিয়েছিলেন তিনিও একেবারে অলঙ্কার-হীন ভাষার কথা-বলা সম্পদহীন, ঐশ্বর্যহীন সমসাময়িক বঙ্গজননীর কোলে ফিরে আসতে পারেন নি। তিনি যে-দেশজননীর কোলে ফিরেছিলেন কল্পনা-[illegible], তিনি আত্মিক সংস্কৃতি ও ব্যক্তিক ঐশ্বর্য ও বীর্যের বহুতর অলঙ্কারে ভূষিতা, ঐশ্বর্যশালিনী রামায়ণ-মহাভারতের প্রাচীন ভারতভূমি। ত্রিকাল-দর্শী ঋষিতুল্য বঙ্কিমচন্দ্র বার বার অতীত বঙ্গদেশ ও ইতিহাসঐশ্বর্যময় ভারতবর্ষের অন্দরে ছুটে গিয়েছেন তাঁর কল্পনার নবতর ক্ষেত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। এত বড় দুজন মহান শিল্পীর দৃষ্টি বাংলার পল্লীর দিকে ঠিক নিবদ্ধ হয়নি। বৃহৎ দেশ সমগ্রভাবে যে-পল্লীগ্রামে স্থাপিত তাঁরা সেই পল্লীগ্রামকে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু পল্লীর সংস্কৃতি-সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে চাননি বা তাঁদের যেন তার সুযোগ হয়নি।

এই গ্রহণ করবার ক্ষমতার উপরেই শিল্পীর শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ নিজের মাতৃভূমিকে এবং সমসাময়িক কালকে যেমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। নিজের কালকে, নিজের দেশকে, নিজের সমসাময়িক মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার মূল্যেই এ আশ্চর্য ইন্দ্রজাল সম্ভব হয়েছে। তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য যেমন তাঁর সুমহৎ গৌরব আছে তেমনি দেশের সমগ্রকে সপ্রেমে বুকে তুলে নেওয়ার মধ্যে যে দ্বিগুণ গৌরব আছে এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। দেশের সমগ্রকে সম্পূর্ণ গ্রহণের গৌরবে গৌরবান্বিত মহাকবি আমাদের দ্বিগুণ শ্রদ্ধার পাত্র।

আমার বয়স সত্তর পার হয়েছে; পৃথিবীর মূর্তি আমার কাছে আজ অনেক পরিমাণে ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে; দিনান্তের ঘণ্টার গভীর ধ্বনি যেন সকল কোলাহলের ওপার থেকে মধ্যে মধ্যে মনে এসে প্রতিধ্বনি তোলে। শেষ খেয়ায় পা বাড়াবার জন্য প্রস্তুত হবার দিন সমাগত। পুরনো বন্ধুরা, যাঁদের সঙ্গে সমসাময়িক-কালে একই গ্রামের সীমানায় পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেছিলাম তাঁদের সকলেই প্রায় বিগত। শেষ জন যিনি ছিলেন তিনি আমার প্রিয়তম বাল্যবন্ধু এবং একান্ত পরমাত্মীয়। এবার শরতের প্রারম্ভেই তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগ দিতে দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। শুধু বাইরের সামগ্রী গোছানো নয়, নিজের মনকেও প্রস্তুত করছি। এমনি সময়ে শরতের এক প্রভাতে অকস্মাৎ বাড়ীর ভিতর থেকে কচি কলকণ্ঠে আবৃত্তি শুনতে পেলাম। কান পেতে শুনতেই বুঝলাম আমার পাঁচ বছরের পৌত্রী কলকণ্ঠে আবৃত্তি করছে :

"আশ্বিনে হাট বসে
    ভারী ধুম করে,
মহাজনি নৌকায়
    ঘাট যায় ভরে।
হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি,
    মহা সোরগোলে—
পাঁচগ্রাম মাঝারা
    বাজায় মাদোল।
বোঝা নিয়ে মন্থর
    চলে গোরু গাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন
    করে ডাক ছাড়ি।
কল্লোলে কোলাহলে
    জাগে এক ধ্বনি
অন্ধের কণ্ঠের
    গান আগমনী।
সেই গান মিলে যায়
    দূর হতে দূরে
শরতের আকাশেতে
    সোনা রোদ্দুরে।"
(আগমনী : চিত্রবিচিত্র)

মুহূর্তে মন উজান বেয়ে আমার বালককালের দিকে মুখ ফেরালে। সেই দিনই এক সুযোগে 'চিত্রবিচিত্রে'র কবিতা-গুলি একবার উল্টে দেখলাম। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির রেখাচিত্রগুলির পথ ধরে উজান-বাওয়া, বালককালের দিকে মুখ-ফেরানো মন সোজা এগিয়ে চলল মনে মনে। হিমের পরশ-লাগা হাওয়ায়, ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা-ধরা পথ বেয়ে, বুক-দুরুদুরু, কাঁপা আমলকী বনের পাশ দিয়ে, কুঁড়ি-ভরা শিউলির ডালে হাত ছুঁয়ে, বর্ষণশেষে ছাড়া-পাওয়া মেঘের নীচে নীচে, ছুটির ছোঁয়াচ-লাগা সোনার আলোয় মন এগিয়ে চলল। যে তারাগুলি রাতি নিয়ে সারারাত জেগে সকালবেলা বেলফুল আর জুঁইফুল হয়ে নেমে এসেছিল তারা কবে মিলিয়ে গিয়েছে, তারা আর নেই। মন চলল এগিয়ে। আমাদের পাড়াখানি ডাগর ঘোমটা টেনে পাশে পড়ে রইল; পড়ে রইল চারিদিকে তালবন নিয়ে পাড়ার মাঝখানের দীঘিটি। চলতে চলতে শরৎ গেল, হেমন্ত গেল, শীতের ছোঁয়া লাগল। মন পৌঁছে গেছে বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে যেখানে শুক্রবারে হাট বসেছে। সঙ্গে ভাগনে মদনকে নিয়ে কুমোরপাড়ার বংশী-বদন কলসী-হাঁড়ি বোঝাই করে গোরুর গাড়ি নিয়ে চলেছে। হাট ছেড়ে ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে মন মোতি বিলের ধারে, যার 'থইথই জল, হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল', 'পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে, মাছরাঙা ঝুপ করে পড়ে এসে জলে'। মোতি বিল ফেলে রেখে মন আবার ফিরে এল নিজের পাড়ায়, যেখানে 'ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি, খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি; বিধু গয়লানি মায়-পোয়, সকালবেলায় গোরু দোয়'; 'আঙিনায় কানাই বলাই রাশি করে সরিষা কলাই' 'বড়ো বউ মেজো বউ মিলে ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে'। অঘ্রাণ সারা হয়েছে, নদীর ধারা স্বচ্ছ, শিরীষের পাতা ঝরতে শুরু করেছে; 'ওপারে চরের মাঠে, কৃষাণেরা ধান কাটে, কাস্তে চালায় নত-শিরে'। 'শুকনো খালের তলে, এক হাঁটু ডোবা জলে বাগদিনি সেওলায় পাঁকে', বুকে আঁচল এঁটে, জল ঘাঁটাঘাঁটি করে মাছ ধরে চুবড়িতে রাখে। ওই দূরের রাস্তা দিয়ে বউ চলেছে চৌদোলে, কি-বাড়ি চলেছে বাজিয়ে, দুইজনের পাড়ওয়ালা কাপড়ে

জল; জলে নেমে চলেছে, তাই হাঁই-হুঁই ডাক ছেড়ে মাঝিকেরা হনহন করে ছুটেছে। পৌষে মেলা বসেছে। 'শীতের দিনে নামল বাদল কাল শুধু মেলা', 'বিকেলবেলা ভিড় জমেছে ভাঙল সকালবেলা'। পথে দেখি, 'দু-তিন টুকরো কাচের চুড়ি রাঙা,' 'তারি সঙ্গে চিত্র-করা মাটির পাত্র ভাঙা'। মন শীত পার হয়ে বসন্তের অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। ডিম ডিম রবে দুন্দুভি বেজে ওঠে, সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব। 'পূর্ণিমা চন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায় সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়'। তারই পায়ে পায়ে 'ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল', 'ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল', 'চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জরি গায়', 'বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণ বায়'। বসন্তের সীমা শেষ হয়, মন এসে দাঁড়ায় বৈশাখের দিনে গ্রামের ছোট্ট নদীটির ধারে। আমাদের সেই ছোট্ট নদী যা চলে বাঁকে বাঁকে, 'বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে', 'পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি', 'দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি'। সেখানে 'চিক্ চিক্ করে বালি কোথা নাই কাদা', সেখানে 'কিচ কিচ করে খালি শালিকের ঝাঁক', 'রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের ডাক'। তারপর একদিন বর্ষার ঝোড়ো রাত পার হয়ে গেল, বাদল-ধারা নামল, চন্দ্র তারা লুপ্ত হল, বাতাস থেকে থেকে আকাশকে হানা দিল। আবার এক শরতের দিনে মন ফিরে এসে দাঁড়াল গঞ্জের বাঁয়ে অঞ্জনা নদীতীরে। সামনে সন্ধ্যা নামছে। সূর্যের অন্তিম আলো রক্তিম আকাশের শেষ কিনারায় হারিয়ে গেল; সামনে সঙ্গীতহীন অনন্ত অন্ধকার!

মন আমার পাঁচ বছরের পৌত্রীর হাত ধরে যেন সমগ্র বাংলা আর সমগ্র ঋতুচক্র পরিক্রমা করে আবার অঞ্জনা-নদীর তীরে এসে দাঁড়াল। ভুলে গিয়েছি যে আমি পরিণত-বয়স্ক মানুষ, আমি শিশু নই। কিন্তু সামনের প্রসারিত অন্ধকারের কথা আমাকে আবার আমার বাহাত্তর বৎসর বয়সে ফিরিয়ে আনলে। তবু একবার, জীবনের এই শেষ পর্বে মহাকবির চোখের মায়া অনুসরণ করে আমার শিশুকালের, আমার চিরকালের বাংলাদেশকে বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ফিরে পেলাম। এই মাটিতেই মহাকবির মত, আপনাদের মত আমারও জন্ম হয়েছে, এই দেশেরই আলো, বাতাস, গাছপালা, জলধারা, অন্ন আমার দেহ-মনকে লালন, পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে, এই মাটির মানুষদের ভালবাসায় কৃতকৃতার্থ হয়েছি, এই ভাষাতে হেসেছি কেঁদেছি; একান্ত দুঃখের দিনে, হতাশার মুহূর্তে এই আলো বাতাস মাটি আমাকে কোলে নিয়ে আমার তাপিত মনকে আরোগ্য করেছে, এখানকার প্রকৃতিই আমার শেষ ও শ্রেষ্ঠ আনন্দের আশ্রয়, এখানকার মৃত্তিকাতেই আমার দেহভস্ম মিশে যাবে, আমার প্রাণ এই দেশের আকাশেই মহাব্যোমে বিলীন হবে। যে কবি আমাকে আমার সেই দেশকে চিনিয়েছেন, হাতে ধরে তার গোপন অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছেন, পরম সমাদরে এখানকার মাটির একটি টিককে আমার মত ললাটকে অলঙ্কৃত করে দিয়েছেন তাঁকে আমি কি নিবেদন করব? শুধু আমার প্রণাম নয়, শ্রদ্ধা নয়, তাঁকে আমি আমার সমগ্র সকৃতজ্ঞ হৃদয় নিবেদন করলাম।

আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। আমার বক্তৃতামালায় কোন কিছু প্রমাণের চেষ্টা ছিল না, সাহিত্যশিল্পের বিচার এবং বিশ্লেষণও আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এবং তা আমার সাধ্যের বস্তুও নয়। রবীন্দ্রনাথ নামক যে মহাকবি আমাদের জাতির বহু পুণ্যফলে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর একক প্রভাবে একটি জাতির মধ্যে অতি বৃহৎ তুলনাহীন পরিবর্তন এক কি দুই প্রজন্মের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, তিনি তাঁর দেশের নগর-জীবনের বাইরে গ্রামে দেশের যে মূল জীবন প্রবহমান, যা তাঁর কাছে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে মনে হয়েছে, আমি সেই স্বদেশের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব, ধ্যান ও চিন্তার কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করবার চেষ্টা করেছি। পল্লীর মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি এই তিনে মিলে ত্রিমূর্তি শঙ্করের মতই স্বদেশ তাঁর ধ্যানবস্তু ছিল। মহাকালের যে অক্ষমালায় পল্লীর প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ, সপ্তম উৎকর্ষ থেকে অন্ত্যেবাসী মানুষ পর্যন্ত, একই সম্মানে ও শ্রদ্ধায় বিধৃত, মহাকবি তাঁর জন্মসূত্রে লব্ধ ধাতুগত প্রেম ও জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সেই অক্ষমালাতেই রসের মন্ত্র জপ করেছেন, এবং আন্তরিকভাবে নিজেকেও স্বদেশের অসংখ্যের একজন বলে একান্ত শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে অনুভব করেছেন, এবং সেই অনুভবের মধ্যেই যে তাঁর নব-জন্মের চরিতার্থতা নিহিত তাও উপলব্ধি করেছেন। তাই জীবনের অন্তিম পর্বে, জীবনব্যাপী সাধনা সমাপনের শেষক্ষণে নিজের পরিচয় বিবৃত করতে গিয়ে সুগভীর শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে শেষবার উচ্চারণ করেছিলেন :

"সেতারেতে বাঁধিলাম তার
গাহিলাম আরবার
"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরি লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।" "

'সেই আমাদেরই লোক', আমাদেরই স্বজন রবীন্দ্রনাথকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলাম। জীবিতকালে তিনি আমাদের স্বজন হয়েই আমাদের জন্যই জীবন-সাধনা করেছেন, আজও তিনি আমাদের স্বজন রয়েছেন, ভবিষ্যতেও অনাগত দিনে তিনি 'আমাদেরি লোক' হয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়ে পরম প্রেমের আসনে বিরাজ করবেন।

ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পথরেখা ধরে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায়, কখনও আলোয় কখনও অন্ধকারে আমাদের মাতৃভাষাভাষী ভাবীকালের প্রজন্ম একের পর এক পথ চলবে, আর সেই ভবিষ্যৎ প্রাণযাত্রার মিছিলের যাত্রীদের মুখের ভাষায়, কণ্ঠের গানে, চিন্তায় ও মননে চিরস্থিতি লাভ করে মহাকবিও তাদের চিরসঙ্গী হয়ে থাকবেন। একটু কান পাতলে সেদিনও আজকের মতই মিছিলের কোন এক নবীনের মুখের বাউল সুরের গানে শোনা যাবে, বোঝা যাবে—

তখন কে বলে গো,
সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।

সেই কথা, সেই সুর সেদিনও আজকের মত সেদিনের শ্রোতার মনে কাঁপন, চোখে জল, মুখে হাসি টেনে নিয়ে আসবে। যে মাটিতে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি এ ভাষা এ সুর সেই মাটিরই, সেই বাংলাদেশেরই। সেদিন নূতন করে ভবিষ্যতের মানুষ আবার অনুভব করবে চিরকালের অনন্ত-যৌবন, নবীন বাউলের মত মুখে গান নিয়ে মহাকবি তাদের মিছিলের পুরোভাগে রয়েছেন।

২৫-১০-৭০

সমাপ্ত

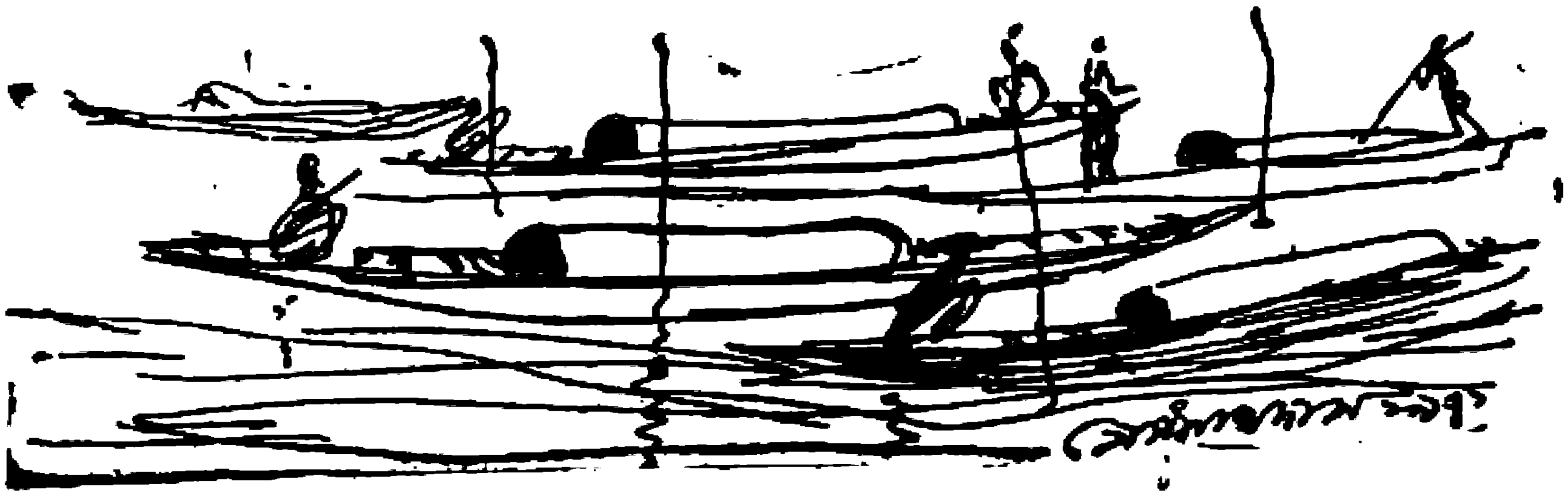

নাক ও নাকের বদল

অমল দাশগুপ্ত

কানের নকল হয়েছে, চোখের নকল হয়েছে (টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন)। কিন্তু নাকের নকল এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে মার্কিনী পেন্টাগন নাকি এমন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা দূর থেকে গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারবে কোনো ঝোপের আড়ালে ভিয়েৎকং গেরিলা আছে কিনা। এটা কতখানি রটনা, কতখানি ঘটনা—অন্তত যুদ্ধের ফলাফল থেকে তার কোনো একদিকেই নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে এ-ধরনের কোনো যন্ত্রের অস্তিত্ব এখনো পর্যন্ত স্বীকৃত নয়। ধরে নেওয়া চলে নাক এখনো পর্যন্ত অননুকৃত ইন্দ্রিয়।

নাকের ক্ষমতা যে কতখানি তা উপলব্ধি করার জন্যে খুব সহজ একটি পরীক্ষাকার্য করে দেখতে পারেন। নাক বন্ধ করুন, তারপরে চোখ বুজে একটি আপেল ও একটি পেঁয়াজ খান—নাক, যদি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে কিছুতেই আপনার পক্ষে বলা সম্ভব হবে না কোনটি আপেল আর কোনটি পেঁয়াজ। এই পরীক্ষাকার্য যদি যথেষ্ট মনে না হয় তাহলে অন্দরমহলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, নাকের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অজস্র প্রমাণ পেতে পারবেন। মনে করুন তারের ওপরে সারি সারি গেঞ্জি মেলা রয়েছে, একই মাপের ও একই চেহারার। আচমকা বৃষ্টি নামল। একজন গিয়ে সবকটা গেঞ্জি একসঙ্গে তুলে এনে ডাঁই করে রেখে গেল। গেঞ্জিতে আলাদা আলাদা চিহ্ন নেই, আপনার নিশ্চয়ই ধারণা হবে যে এই ডাঁই থেকে বার বার আলাদা গেঞ্জি খুঁজে বার করাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আপনার স্ত্রীর কাছে নয়, শুধু গন্ধ শুঁকেই তিনি আপনার গায়ের গেঞ্জিটি অনায়াসে তুলে আনতে পারেন। একটু চেষ্টা করলে আপনিও পারবেন। আমাদের প্রত্যেকের গায়ের গন্ধ আলাদা আলাদা। যমজ ভাইদের চোখের দেখায় চিনতে ভুল হতে পারে, কিন্তু গন্ধের বিচারে কদাচ নয়। আদর্শ হিন্দু হোটেলের হাজারী ঠাকুর শুধু গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারতেন রান্নায় আগের রাত্তিরের বাটা মশলা ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। নাকের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার এমনি দৃষ্টান্ত অজস্র।

বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বহু বিশ্ব-আলোড়নকারী ঘটনার মূলে থেকে গিয়েছে, আর কিছু নয়, নাক। ক্লিওপেট্রার নাক আর চার্লস ডারউইনের নাক—এ দুটির উল্লেখ করাই যথেষ্ট। শুধু নাকের জন্যেই আরেকটু হলে 'বীগল' জাহাজে চার্লস ডারউইনের যাত্রা বাতিল হতে বসেছিল।

অরওয়েল অবশ্য শুধু নাক দিয়ে গোটা ইতিহাসের একটা বিচার দাঁড় করিয়েছেন। মার্কস ও এঙ্গেলসদের মতো অরওয়েলও ঘোষণা করতে পারতেন, মানুষের ইতিহাস (লিখিত ও অলিখিত) হচ্ছে গন্ধের ইতিহাস। এক-এক জাতির এক-এক গন্ধ, এমনকি এক-এক শ্রেণীরও। শক-হূন-মোগল-পাঠান শুধু নয়, কে প্রভু কে দাস তাও চেনা যায় গন্ধ দিয়ে। জাতির সঙ্গে জাতির যুদ্ধ হয়েছে, আসলে সেটা গন্ধের সঙ্গে গন্ধের যুদ্ধ। প্রভু দাসকে শোষণ করেছে, আসলে শোষণটা এক গন্ধকে আরেক গন্ধের। মজুরদের ধর্মঘট আসলে গন্ধের বিরুদ্ধে গন্ধের লড়াই। বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট ভাঙল কেন? এমন কতকগুলো গন্ধকে একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করা হয়েছিল যাদের সম্পর্ক আসলে বিরোধিতার।

এ থেকে আরো বোঝা যাচ্ছে, পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান যদিও সম্ভব, দুই বিরোধী গন্ধের কদাচ নয়। গন্ধকে বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েত এই দুই প্রধান শিবিরে ভাগ করা চলে কিনা তা এখনো বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়, তবে এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে অন্য কোনো বিচারের চেয়ে গন্ধের বিচারটাই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। যুক্তফ্রন্ট গড়ার আগে আলাদা আলাদা গন্ধগুলোকে যদি ঠিক-ঠিক চিনে নেবার চেষ্টা হত তাহলে এমন একটা বিপর্যয় নিশ্চয়ই ঘটত না। পরবর্তীকালে যাকে বলা হয়েছে শরিকী সংঘর্ষ তার একটা ভালো দিক এই যে গন্ধগুলো আলাদা আলাদা ছড়াতে পেরেছে। এখন দরকার শুধু কয়েকটি পাকা ও পোক্ত নাকের। গন্ধগুলোকে চিনে নেবার এই সুযোগ হেলায় হারালে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে জরুরী ও আশু প্রয়োজন হচ্ছে পাকা ও পোক্ত নাক। পরিতাপের বিষয়, আমাদের নাকের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী একটা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট অবহিত নই। কেননা আমরা ভুলতে বসেছি কোনটা আবর্জনার গন্ধ আর কোনটা ফুলের, কোনটা খাদ্যের গন্ধ আর কোনটা অখাদ্যের। অনেক সময়ে এমনও ঘটে থাকে যে আবর্জনাকে আমরা ফুল বলে গ্রহণ করি, অখাদ্যকে খাদ্য বলে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্র এক্ষেত্রেও খানিকটা খেটে যাচ্ছে মনে হয়।

এ-অবস্থায় আমরা আমাদের নাক ফিরে পাব, এমন সম্ভাবনা কম। পাকা ও পোক্ত নাকের সাহায্য পাব এমন সম্ভাবনা আরো কম। বন্যা হোক, মহামারী হোক, দুর্ভিক্ষ হোক—আমাদের নাক পেঁয়াজ ও আপেলের তফাৎ ধরবার ক্ষমতা হারিয়ে বসেছে।

নাকই যদি না-থাকে তাহলে আর থাকে কী!

মানুষ আঁক কষার যন্ত্র বানিয়েছে, অনুবাদ করার, কথা বলার, কবিতা লেখার, ছবি আঁকার, এমনকি দাবা খেলারও। কিন্তু গন্ধ শোঁকার যন্ত্র বানাতে পেরেছে এমন কথা অন্তত বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত নয়। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড দিয়ে কাজ চলতে পারে, কৃত্রিম কিডনি দিয়েও, কিন্তু কৃত্রিম নাকের কথা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে নাকের আদল পাল্টানো যায় মাত্র কিন্তু নাকের বদল করতে গেলে শেষপর্যন্ত টুনটুনির সেই নরুণ ছাড়া আর কিছু থাকে না।

তাই যদি হত তাহলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে অপরাধীকে ধরবার কাজে মানুষের চেয়ে কুকুরের কদর বেশি হত না। হাঙর জীবটিকে যদি পোষ মানানো যেত ও মাটির ওপর দিয়ে হাঁটানো চলত তাহলে কুকুরের চেয়েও হাঙরের কদর হত বেশি। কেন? অন্য কোনো কারণে নয়, নাকের জন্যে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু মানুষের নাকের ডগায় সিকি বর্গ ইঞ্চি, কুকুরের দশ বর্গ-ইঞ্চি, হাঙরের বিশ বর্গইঞ্চি।

ছারপোকার তাহলে কত? বিছানার দূরে আলোটি যেই নেবানো হল কোথা থেকে পালে পালে এসে হাজির। গন্ধ শুঁকে কি? ছারপোকার নাক কেমন?

জবাবে বিজ্ঞানী বলছেন, ইনফ্রারেড রশ্মি। মানুষটির শরীর থেকে এই রশ্মির বিকীরণ ঘটছে। ধরছে কে? ছারপোকা।

নাক যদি না হয় তাহলে নাকের বদলে নরুণের চেয়েও দরকারী বটে। গন্ধ দিয়ে জানা নয় রশ্মি দিয়ে টের পাওয়া।

বাদুড় তো টের পায়। নাক দিয়ে নয়, কান দিয়ে। অন্ধকার রাত্তিরে বাদুড় তার উড়ে চলার পথের বাধা কাটিয়ে চলে আলট্রাসোনিক তরঙ্গ ছুঁড়ে ছুঁড়ে।

নাকের বদলে নরুণ যদি না হয় তাহলে আছে এই ইনফ্রারেড রশ্মি ও আলট্রাসোনিক তরঙ্গ।

মনে করুন কলুটোলার মোড়ে বোমার লড়াই চলছে। এসপ্ল্যানেড থেকে রওনা হবার সময়েই আপনি তা টের পেতে পারেন (১) গন্ধ শুঁকে (২) ইনফ্রারেড রশ্মি অনুভব করে ও (৩) আলট্রাসোনিক তরঙ্গ শুনে। নাকের বদলে শেষোক্ত দুটি কোনো রকম চলতে পারে হয়তো।

কিন্তু আমরা বলি, নাকের বদল নয়, নাকই চাই। গন্ধ শুঁকে চলাটাই সেরা চলা, কি বাজারে কি বাসরে।

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পর্ব

(৪)

সাগর বাথরুম থেকে বেরুবার পরই ব্রেকফাস্ট খাওয়া হলো। তারপরই শুরু হলো আমার ইন্টারভিউ।

'আপনার নাম?'

'আপনি আমার নামটাও জানেন না?'

'আপনি তো বলেননি।'

'সরি!'

'দ্যাটস অল রাইট। নাম বলুন।'

'মিস বকুল সরকার।'

ও আমার নাম লিখতে লিখতে হাসছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন?

'নামটা ভারী আদরে আদরে। ভারী মিষ্টি।'

আমি কি বলব? আমিও একটু হাসলাম।

ও আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই ফর্মে অনেক কিছু লিখছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কি সব লিখছেন?

'ভয় নেই। আজেবাজে কিছু লিখছি না।'

'তবুও কি লিখছেন?'

'যেসব প্রশ্নের উত্তর জানা আছে সেগুলো লিখে নিচ্ছি।'

'তার মানে?'

'আপনার বাবার নাম, ক' ভাই-বোন, বাড়ী ঠিকানা, কতদিন এখানে আছেন, বিয়ে করেছেন কিনা, চাকরি করেন কিনা, কতদূর লেখাপড়া করেছেন, ভাড়া বাড়ী না নিজেদের বাড়ী, ব্যবসা আছে কিনা, কিসে যাতায়াত করেন, কোন কোন ক্লাবের সদস্য, ড্রিংক করেন কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি বহু খবরো প্রশ্নের উত্তর জানা আছে বলে আপনাকে বিরক্ত করছি না।'

আমি বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম, ও, কে। গো অ্যাহেড।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর আবার ফর্ম ভরতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল। পনের-কুড়ি মিনিট তো হবেই। ও তখনও সিগারেট টানতে টানতে লিখে যাচ্ছে। আমি অধৈর্য হয়ে উঠছি।

'সারা ফর্মটাই কি আপনি ফিল-আপ করছেন?'

ও মুখ না তুলেই উত্তর দিল, সম্ভব না।

'তাহলে আর কতক্ষণ?'

'হোল্ড ইওর ধৈর্য।'

বসলাম। ধৈর্য ধরে আরো কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর হঠাৎ ও আবার প্রশ্ন করতে শুরু করল, এখানে আসার পর কি আপনার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বেড়েছে?

'কিছুটা বেড়েছে তো নিশ্চয়ই।'

'সংসারের জিনিসপত্র কি নগদ কেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি রেডিমেড জামা-টামা......

'আমাদের আর কি রেডিমেড জামা হবে?'

দুজনেই হেসে ফেললাম।

'সূতী - সিল্ক - টেরিলিন—তিনরকম কাপড়ই ব্যবহার করেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোনটা বেশী?'

'সূতী।'

'মিলের না হ্যান্ডলুমের?'

'হ্যান্ডলুম বা তাঁতের।'

'আপনাদের কি ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান আছেন?'

'হ্যাঁ। একজন আছেন।'

'প্রয়োজনবোধে কোন স্পেশ্যালিস্টের পরামর্শ করেন?'

'হ্যাঁ। দু'একবার করা হয়েছে......'

'চিকিৎসার খরচ কি নিজেরাই বহন করেন?'

'হ্যাঁ।'

'হাসপাতালে যান কি?'

'না।'

'এখানে আসার পর কোন ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে?'

'না।'

আবার সাগর ফর্মের কয়েকটা জায়গা নিজেই ভরল।

'সিনেমা দেখেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভারতীয় না ইংরেজি ছবি দেখেন? নাকি দুইই?'

'এখানে শুধু ইংরেজি ছবি দেখি। হিন্দী সিনেমা দেখি না।'

'মাসে কটা সিনেমা দেখেন?'

'দুটো-তিনটে।'

'আমাকে কবে দেখাবেন?'

ও যেমন গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল আমিও তেমনি গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলাম, আজই।

এবারও আমার দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ম্যাটিনী না ইভনিং শোতে?

'ম্যাটিনীই ভাল।'

সাগর এতক্ষণে কলম বন্ধ করে আমার দিকে তাকাল। 'সত্যি সিনেমা দেখাবেন?'

'কেন দেখাব না?'

'ভেরী গুড।'

ও আবার হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও ডান হাত এগিয়ে দিলাম। হ্যান্ডসেক করলাম। ও বেশ জোরে আমার হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে হ্যান্ডসেক করল।

সাগর এবার একটা সিগরেট ধরিয়ে বলল, চা খাবেন?

'আপনি খেলে খেতে পারি।'

আমি বসে রইলাম। ও উঠে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে এলো। চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি বসে সিগরেট টানতে টানতে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। মিট মিট করে চাপা হাসি হাসছিল।

'হাসছেন কেন?'

'ভাল লাগছে।'

'কেন?'

'এমন একটা বকুল সরকারের সংগে পরিচিত হয়ে ভাল লাগছে।'

'বাজে বকবেন না।'

বেয়ারা চা দিয়ে এলো। চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ইন্টারভিউ শেষ?

'না।'

'তবে আবার শুরু করুন।'

'আজ আর না।'

'তবে আবার কবে?'

'আবার যেদিন আপনি আমার কপালে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙাবেন, সেদিন......'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, যত মেয়ের ইন্টারভিউ নিয়েছেন তারা সবাই বুঝি আপনার কপালে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছে?

'কেন হিংসা হচ্ছে?'

'হিংসা হবে কেন? জানতে চাইছি।'

সাগর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে হাসল।

'ইন্টারভিউ নিন।'

'আজ আর না।'

'তবে কবে?'

'আজ একটু গল্প করব।'

আমি আরো কয়েকবার বললাম। রাজী হলো না। শেষে হাতের ঘড়ি দেখিয়ে বলল, সাড়ে এগারটা বাজে। একটু পরেই তো খেতে যেতে হবে।

'একটু পরে কেন? চলুন এখনই পিসীর ওখানে যাই।'

'আগে গেলে উনি খুশী হবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সাগর অ্যান্টিরুমে গিয়ে বুশ-সার্ট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলো। ফাউন্টেন পেন, পার্স ইত্যাদি পকেটে পুরতে পুরতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, সত্যি সিনেমা দেখাবেন নাকি কাজকর্ম করার জন্য কাগজপত্র নিয়ে বেরুবে?

'কাগজপত্র নিয়ে বেরুতে হবে না।'

'তাহলে শুধু আপনাকে নিয়েই বেরুব?'

আমি হাসলাম। 'আমার নাম বুলবুল কিন্তু আপনার মুখেই বেশ বুলবুলি শুনতে ভাল লাগে।'

'বুলবুলের সঙ্গ-দোষে।'

বেরুবার আগে বাবাকে টেলিফোন করলাম, আমরা এখনই পিসীর ওখানে যাচ্ছি। তুমি ঠিক সময় আসছ তো?

বাবা বললেন, তোরা কি ভেবেছিস বলতো?

কেন?'

একটু আগেই মাধুরী ফোন করল, এখন তুই করছিস।'

'পিসী যে জন্যে টেলিফোন করেছে আমিও সেই একই কারণে ফোন করছি।'

বাবা হাসলেন। 'তোরা রওনা হয়ে যা, আমিও এক্ষুণি আসছি।'

আমরা দুজনে এবার বেরিয়ে পড়লাম। এত তাড়াতাড়ি আসব, পিসী ভাবতে পারেনি। দারুণ খুশী হলো।

আমি বললাম, তোমরা দুজনে গল্প কর, আমি বরং একটু কফি করে আনি।

পিসী বাধা দিল না। বলল, যা।

তিনজনে মিলে কফি খাবার সময় পিসী সাগরকে বলল, কিছুদিন ধরেই ভাবছি আপনাকে আর আপনি আপনি বলব না—বড় ঠিক ভাল লাগে না।

সাগর বলল, আমার তো মনে হয় আপনি আমাকে তুই বললে আরো সম্মানিত মনে করব।

এই পিসী একটা বিচিত্র নারী। খুব বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে না কিন্তু দুর্ভাগ্যের মানুষের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা তাদের উনি ভালবাসেন। কল্যাণ কামনা করেন। এই নিউ আলিপুরে এতদিন ধরে আছেন কিন্তু পাড়ার এখানকার সব বাঙালীদের সঙ্গেও ওঁর আলাপ নেই। অনেকেই ওকে এর জন্য সমালোচনা করেন। ওকে কেউ বলেন—আরিস্টোক্র্যাট, কেউ বলেন অহংকারী।

আমি নিজেও পিসীকে অনেকবার বলেছি আরো একটু বেশী মেলামেশা করতে। প্রথমে একদিন বলেছিল, সংসারের কাজকর্ম করে কতটুকুই বা সময় পাই? তারপর একটু পড়াশুনা করি। বেশী লোকজনের মেলামেশা বা গল্পগুজব করার সময় কোথায় বল?

কিছুকাল পরে আমার কথায় কথায় ঐ একই প্রসঙ্গ উঠল। সেদিন পিসী একটু হাসল। বলল, আকাশে কত অসংখ্য তারা থাকে। ওদের সবাইকে দেখার চেষ্টা করলেও পারব না। তাইতো শুধু চাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকি।

পিসী বোধহয় মানুষের মনের কথা জানতে পারে। বুঝতে পারে। দাদার বিয়ে, প্রতিমার বিদায়ের পর বাবা কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লেন। আমি আর মা সবকিছু দেখেও কিছু করতে পারতাম না, বলতে পারতাম না। বাইরের কেউ আমাদের এসব জানত না। পিসীও না, কিন্তু তবুও বোধহয় অনুভব করেছিলেন বাবার মনের শূন্যতা। দিনকয়েক পরে, ডাইরেক্টার কি আসে পিসী এসে বাবাকে ফোটা দিতে নেমন্তন্ন করল আর বললেন, দাদা আপনি আমাকে মাধুরী বলে ডাকবেন।

বাবা বলেন, কত ছেলেমেয়েই আমাকে দাদা বলে ডেকেছে কিন্তু মাধুরীর মত এমন মিষ্টি করে আর কেউ দাদা ডাকেনি।

সাগরের মনের মধ্যেও একটা বিরাট শূন্যতা চব্বিশ ঘণ্টা হাহাকার করছে। আমাকে ওর ভাল লাগে, আমার মধ্যে মানসীর ছায়া দেখে কিন্তু তবুও শূন্যতার জ্বালা ওর ঘুচে না। পিসী ঠিক সময়ে ওর পাশে এসেও দাঁড়াল। আমি কফির কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে এইসব ভাবছিলাম।

সাগরকে দেখলাম তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পিসীকে একটা প্রণাম করল। বলল, জানি আপনি মনে মনে সব সময়ই আমাকে আশীর্বাদ করেন তবু আজকে আরেকবার করুন।

পিসী কিছু বলতে পারল না। দু'হাত দিয়ে শুধু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েই ভিতরে চলে গেল।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম আনন্দে, খুশিতে দুজনের চোখে জল এসেছে। দুজনের মুখ থেকেই কথা হারিয়ে গেছে। আমিও কিছু বলতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ পরে সাগর বলল, পিসীকেও সিনেমায় যেতে বলবেন?

'আপনি বললে ঠিক যাবে।'

'আমার নাম করে আপনিই বলুন।'

আমি উঠে গিয়ে পিসীকে বললাম। ওর নাম করেই বললাম। পিসী একটু হাসল। বলল, তোরা দুজনেই যা।

'তুমি গেলে ও খুব খুশী হবে।'

পিসী আবার একটু হেসে বলল, আচ্ছা যাব।

খাওয়া-দাওয়ার পর পিসী বাবাকে বলল, দাদা, আপনি ওঁর গাড়ীতে অফিস যান। ছুটির পর উনিই আপনাকে আবার বাড়ীতে পৌঁছে দেবেন।

বাবা শুধু বললেন, ঠিক আছে।

পিসেমশাই, পিসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? তোমরা কোথাও যাচ্ছ?

পিসী জবাব দিল, আমি, সাগর, আর বুলা একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাচ্ছি।

'আচ্ছা।'

তিনজনে সিনেমায় গেলাম। তারপর কোয়ালিটিতে পেস্ট্রি আর এসপ্রেসো কফি খেলাম। বেশ কাটল। পিসীকে পৌঁছে দেবার পর সাগরকে নামিয়ে দিতে গেস্ট হাউসে গেলাম। আমি আর নামলাম না। ও গাড়ী থেকে নামার আগে বলে গেল, এমন সুন্দর একটা দিন আর আসবে কিনা জানি না তবে আজকের দিনের কথা কোনদিন ভুলব না।

আমি বললাম, এমন দিন আর আসবে না কেন?

'জানি না। তবে ভয় হয়, আশঙ্কা হয়।'

স্টিয়ারিং-এর উপর দুটো হাত রেখে মাথা নীচু করে ওর কথা শুনলাম। তারপর প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ইন্টারভিউ আবার কবে নেবেন?

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, যেদিন আবার অমন করে ঘুম ভাঙিয়ে চা দেবেন, সেইদিনই।

'গুড নাইট!'

'গুড নাইট!'

এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা শুধু চাইতে জানে। পাবার অধিকার না থাকলেও চায়। সবার কাছ থেকে। সব সময়। প্রকাশ্যে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে। দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে সমান-ভাবে। সমাজে এইরকম মানুষই বেশী। গিজগিজ করছে চারপাশে। ঘরে-বাইরে সর্বত্র। ইচ্ছা না করলেও মন স্বীকার না জানালেও সব সময় এদের শূন্যহাতে বিদায় দেওয়া যায় না। শুধু আমি নয়, বোধহয় সব মেয়েকেই, সব মানুষকেই এই-সব চির-অতৃপ্ত প্রেতাত্মাস্বরূপ মানুষের শিকার হতে হয়। কাউকে একবার, কাউকে বহুবার। কাউকে মুহূর্তের জন্য, কাউকে জীবনভোর। এর থেকেই জন্ম নেয় জীবনের কত বেদনা, ব্যর্থতা। সবকিছু পেয়েও, সবকিছু থেকেও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এই ব্যথা-বেদনার গ্লানিতে জ্বলে পুড়ে মরছে।

আবার এই পৃথিবীতেই কিছু দুর্ভাগা মানুষ আছেন যাঁরা নিজের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন না। কারুর কাছ থেকেই কিছু চাইতে পারেন না, নিতে পারেন না। এদের জন্য কত মা, কত স্ত্রী, কত পুত্র-কন্যা উজাড় করে বিলিয়ে দিতে চাইলেও পারেন না। জীবনের এক অধ্যায়ে সঞ্চয় করে আরেক অধ্যায়ে বিলিয়ে দিতে হয়। সেটাই নিয়ম, সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই ধর্ম। সবার। মানুষের ও প্রকৃতির। কিন্তু সবাই কি বিলিয়ে দিতে পারে? সুযোগ পায়?

পায় না। পেতে পারে না। তা না হলে যে পৃথিবীতে অতৃপ্ত আত্মার হাহাকার থাকত না। বাতাস এত উত্তপ্ত হতো না, কালবৈশাখীর ঝড়ে সবকিছু ভাঙতো না, বর্ষার দুকূল ভেসে যেত না।

বিচিত্র! অদ্ভুত।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছিল না। বিছানার পাশের জানলা দিয়ে অজস্র কোটি মাইল দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এইসব কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম সাগরের কথা। আর কিছু না হোক, গাড়ী থেকে নামার সময় একবার কি আমার হাতটা ধরে বলতে পারত না গুড নাইট?

(ক্রমশঃ)

মনের কথা

মর্ষকামের মনস্তত্ত্ব
প্রতিষ্ঠা ও অমরত্ব

যাদের মনের কথা পাঠকদের কাছে পরিবেশন করছি, তাদের সকলকেই রুগ্ন বা অস্বাভাবিক চরিত্রের লোক মনে করা ঠিক হবে না। জীবনপথে বাধাবিপত্তি দ্বন্দ্ব-বিরোধের সম্মুখীন হয়ে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত বিমূঢ় হয়ে পড়তে পারেন অনেকেই। সেই সময় অস্থিরতা, নিদ্রাহীনতা, হতাশা ইত্যাদি নানা রকমের উপসর্গ তাদের মধ্যে দেখা দিতে পারে। কিছুদিনের মধ্যে কোনো চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই তারা এ অবস্থা কাটিয়ে উঠে আবার দৃঢ়হস্তে জীবনতরীর হাল ধরতে পারেন, নিজেদের ঠিক মত চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আবার এই সময় অনেকে চিকিৎসকের সাহায্য বা পরামর্শ নিতে এসে থাকেন। মানসিক রোগের চিকিৎসক যদি তাদের পরিচিতমহলে কেউ থাকেন, তবে খুব বেশী প্রয়োজন না থাকলেও অনেক সময় আলাপ আলোচনার জন্য তাঁরা তাঁর শরণাপন্ন হতে পারেন। নিজেকে সামলে নেওয়া এর ফলে অনেক সময় সহজ হয়ে ওঠে। 'মনের কথা' শুধু রুগ্ন মনের কথা নয়, সুস্থ স্বাভাবিক মনের নানা তথ্য, তত্ত্বও মাঝে মাঝে পরিবেশিত হচ্ছে।

মনোহরবাবুর (গত সংখ্যায়) মত মানুষ কি খুব বিরল? এঁকে কি মর্ষকামী বলা চলে? আজকাল মর্ষকাম, ধর্ষকাম কথাগুলো কামবিবর্জিত হয়ে যে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই অর্থে অবশ্য মনোহরবাবুকে মনস্তাত্ত্বিকরা মর্ষকামী বলতে পারেন। তাঁর চিকিৎসক ঐ কথাটির উল্লেখ না করলে এ-লোকের সঙ্গে মর্ষকামের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় বসতে হতো না। মতিলালবাবু তাঁর পুঁথিগত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও কথাটির সঠিক তাৎপর্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন নি। তাঁর লেখা প্রবন্ধ পড়ে আমার অন্তত সেই রকম মনে হয়েছিল। এঁরা দুজনেই নিজেদের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সাময়িকভাবে অসুবিধা ভোগ করেছিলেন। এঁদের মানসিকতত্ত্ব যথোচিত বিশ্লেষণ বোধ হয় পাঠকদের কাছে খুব অরুচিকর হবে না।

দুজনে সমাজের দুই স্তর থেকে এসেছেন। মনোহরবাবু আশৈশব দারিদ্র্যক্লিষ্ট, মতিলালবাবু মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ হয়ে শেষ জীবনে অভাব অনটনের চাপে বিপর্যস্ত। মনোহরবাবু কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারের ভরণপোষণ চালান, মতিলালবাবু পৈতৃক ব্যবসা ও সঞ্চিত অর্থ থেকে অনাত্মীয় দুরাত্মীয় পোষ্যদের প্রতিপালন করেন।

মনোহরবাবু স্বল্প শিক্ষিত, মতিলালবাবুর পড়াশুনো প্রচুর। অফিস ইউনিয়নে যোগদান করার আগে পর্যন্ত মনোহরবাবুর নীতিবোধ মূল্যবোধ সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা প্রভাবিত। মার্কসীয় লিটারেচার তাঁর আজন্মলালিত সংস্কারের মূলে ঘা দিয়ে নাড়া না দিলে তিনি হয়তো পুরনো ধ্যানধারণা নিয়ে কায়ক্লেশে, দ্বন্দ্ববিরোধের পাশ কাটিয়ে পুরোহিতের উপর নির্ভর করে, পরলোকের কথা চিন্তা করে, ইহলোকের দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু আজকের দিনে সেটা বোধ হয় সম্ভব নয়। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, সুতরাং অফিস ও টিউশনীতে ও কর্তব্যনিষ্ঠ থাকা তাঁর চলবে না। তাঁর এই বোঝার গলদ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন এখন নেই। শুধু তিনি যা বলেছিলেন ও করেছিলেন, সেই কথাগুলোই লিপিবদ্ধ করে যাই। কাজে ফাঁকি দিয়ে কিন্তু স্বস্তি পেলেন না, পুরনো দিনের সংস্কার তাঁকে পীড়িত করলো। প্রোমোশন পাবার পর এই কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রয়োজনটাও বেড়ে গেল। আগে ছিলেন টাইপিস্ট, বিশেষ কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না। এখন অনেক ফাইলের নানাধরনের ঝক্কি-ঝামেলা তাঁর কাঁধে এসে চাপলো। সিনিয়র কারুর কাছে পরামর্শ চাইতে তাঁর লজ্জা হলো। কেন? কারণ, শৈশব থেকে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশংসা শুনেছেন, বিবেচক বুদ্ধিমান বলে পরিচিত মহলে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর বুদ্ধিবিবেচনার উপর যদি কেউ কটাক্ষপাত করে, তাহলে তাঁর নিরাপত্তার গণ্ডী ভেঙে যাবে, তিনি উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর জীবনের একমাত্র আশ্রয়, নিরাপত্তাবোধের এই একমাত্র উপায়কে তিনি কোনোমতেই অন্যের সমালোচনার সামনে আনতে পারেন না। কাজেই তিনি অফিস থেকে 'ডেড্ আকাউন্ট'-এর পুরনো দেওয়া ফাইলগুলো সরাতে লাগলেন। একদিকের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা অটুট রাখতে গিয়ে, অন্যদিকের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়লো। ফাইল সরানোর পর থেকেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বেড়ে চললো। তিনি মনস্তাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হলেন। এইবার মতিলালবাবুর কথা ভেবে দেখুন। ছাত্র হিসেবে তিনি শিক্ষকদের ব্রিলিয়ান্ট। মনোহরের মত পল্লীগ্রামের স্কুলের 'ফার্স্ট-বয়' নন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। পৈতৃক অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তির চেয়ে তাঁর এই ছাত্রজীবনের কৃতকার্যতা তাঁকে বোধ হয় বেশী নিরাপত্তাবোধ দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর থেকেও অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিল, যারা লেখাপড়ায় মতিলালবাবুর সমকক্ষ না হওয়ায়, তাঁর মত প্রশংসা আদায় পারেনি; কাজেই 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' এই নীতিবাক্যে মতিলালবাবুর আস্থা ও

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী দুর্গামাতা রচিত—

দৈনিক বসুমতী—এইরকম সুন্দরভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে......তাঁরা অভিন্ন ও একাত্মা।
যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত।......গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহুচিত্রশোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

গৌরীমা

আনন্দবাজার পত্রিকা—বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরীমা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির কল্যাণে [illegible] ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬, গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

নির্ভরতা। মেধাবী ছাত্র হিসেবে সুনামের অধিকারী হয়ে তিনি নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন, মেধার উপর মনোহরবাবুর মতই নির্ভর করেছিলেন। এই মেধার কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে তিনি রাজী ছিলেন না, মেধার উপর কোনো কটাক্ষপাত তিনিও সহ্য করতে পারতেন না। দুজনেই মেধা জাহির করতে পরাঙমুখ। পাছে মেধা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ জাগে, এই ভয়ে দুজনেই পরীক্ষা দিতে নারাজ, জাহির করতে অরাজী। আমার ধারণা মতিলালবাবুর শৈশব, পিতার স্বাচ্ছল্য সত্ত্বেও, খুব সুখের ছিল না। মতিলালবাবুও আকারে ইঙ্গিতে সে কথা স্বীকার করেছেন। পিতামাতার মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল না। পারিবারিক জীবনে নিরাপত্তাবোধের অভাব না থাকলে মেধার উপর এই অতি-নির্ভরতা হয়তো থাকতো না। মতিলালবাবুর চেহারা ছিল অতি-সাধারণ। নিজের এই 'অতি-সাধারণ' চেহারার জন্যে, তাঁর ধারণা, কোনো মেয়ে তাঁকে কোনোদিন ভালবাসতে পারেনি। প্রেমের ব্যাপারে তিনি উদাসীনতার ভান করতেন। আসলে তিনি চাইতেন কাব্যলোকের কোনো নায়িকা তাঁর অসাধারণ মেধার জন্য তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আপনা থেকে প্রেম জানাবে। পাণ্ডিত্যানুরাগের এই ধরনের অবাস্তব রোমান্টিক ধারণা থাকা খুব বিচিত্র নয়। আসলে ভদ্রলোক ছিলেন পুঁথির জগতের মানুষ, কাব্যজগতের নায়িকাদের তিনি চিনতেন, রক্তমাংসের মেয়েদের বুঝতেন না, বুঝতে চেষ্টাও করতেন না। নেলী সম্পর্কে তাঁর উক্তি ও নেলীকে প্রেম নিবেদনের প্রয়াস সস্তা নাটক নভেলের নায়কের সাজে। এ যুগের ছেলেমেয়েদের চোখে মতিলালের আচরণ হাস্যকর। মনোহর-মতিলালের আর একটি আচরণে ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। নিজেকে কষ্ট দেওয়ার ও মুখ বুজে দুঃখ সহ্য করবার ব্যাপারে দুজনেই সমগোত্র। মনোহরবাবু কাজে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে কষ্ট দিয়েছেন; আর মতিলালবাবু অসৎ কর্মচারীদের হাতে ব্যবসাবাণিজ্য তুলে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মনিপীড়ন করেছেন। মনোহরবাবু তবু মাঝে মাঝে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, মতিলালবাবু তাও করেন নি।

বাড়ী বেচবার তাগিদেও দোষালের মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছেন না। এই মুখ-বুজে সহ্য করার প্রবৃত্তি ও প্রতিবাদবিমুখীনতা এই দুই চরিত্রের বিশেষ ধর্ম। এর জন্যে মনস্তাত্ত্বিকরা এদের মর্ষকামী বলে অভিহিত করতে চান। মর্ষকাম কথাটি বিশেষ ধরনের পারভার্টদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। মনোহর-মতিলাল তাদের দলে পড়েন না। তাঁরা চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে এসেছেন বলেই তাঁদের ঐ ধরনের বিকারগ্রস্ত মনে করা ঠিক হবে না। অনেকেই হয়তো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মনোহরবাবুর মত দুর্বল, কিন্তু তাঁদের অসুস্থ বলা বোধহয় সঙ্গত নয়। মুখ ফুটে বন্ধুবান্ধব, কর্মচারীকে অনেকেই স্পষ্ট কথা জানাতে পারেন না, এই মতিলালবাবুর মতন। তাঁরা সবাই অসুস্থ নন। তাঁরা মনে করেন এটা তাঁদের সহজাত ভদ্রতা, আমরা মনে করি দুর্বলতা। এই দুর্বলতার মূল কোথায়?

এ দুর্বলতা মস্তিষ্ককোষের দুর্বলতা নয়, স্বভাবজাত নয়। এ দুর্বলতা পরিবেশজাত। মনোহরবাবুর শৈশব কেটেছে অনেকটা অসহায় অবস্থায়, প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে নয়, প্রতিকূলতার সঙ্গে আপোষ করে। হিতৈষী জ্ঞাতিপ্রতিবেশীর শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে বড় হয়েছেন। বশ্যতা স্বীকার করে, অনুগামী হয়ে তিনি নিরাপত্তা বজায় রেখেছেন। জ্ঞাতিপ্রতিবেশীর উপর নির্ভরতা জীবনের প্রথম দিকে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অপরের সাহায্য, (মার কাছে শুনে শুনে মনে হয়েছে) আর দেবতার আশীর্বাদ ছাড়া গ্রামে তাঁরা টিঁকতে পারতেন না। কাজেই প্রতিবেশীদের সামান্য উপকারকে তাঁরা অসামান্য মূল্যবান মনে করেছেন। অন্যের ব্যবহারের ত্রুটিবিচ্যুতি যাতে না ঘটে, এই চেষ্টায় মনোহর সব সময়ে অতিমাত্রায় বশংবদ ভাব দেখিয়েছেন, পরবর্তীকালে এই পরনির্ভরতা ও বশ্যতাস্বীকার তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। লেখাপড়ায় ভালো হবার জন্যে পরিচিতমহলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন, এবং সেই প্রশংসাকে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কাজেই কোনো ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁদের সহানুভূতি হারানো বা তাঁদের প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হবার সূক্ষ্মতম কল্পনাও তাঁর মনে আসেনি। অপরের সাহায্য সামাজিক মানুষ হিসেবে যে তাঁদের প্রাপ্য একথা মাতা-পিতা কারুরই মনে জাগেনি। কেননা গ্রামীণ সমাজ অনেক আগেই এ ধরনের দায়িত্ববোধ থেকে মুক্ত হয়েছে। অপরের সাহায্যপুষ্ট হয়ে বেঁচে থাকার দরুণ, সহজেই মনে সংক্রামিত হয়েছে দৈন্যবোধ ও হীনমন্যতা। কর্মজীবনে মার্কসবাদীদের সংস্পর্শে এসেও তাঁর এই দুর্বলতা কাটেনি। সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে, পুরনো সমাজের মূল্যবোধকে অস্বীকার করে তিনি সাময়িক-ভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছেন।

মতিলালবাবুর দুর্বলতাও প্রায় একই কারণে উদ্ভূত। পিতার অর্থাগমের উপায়কে তিনি কোনোদিন সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেননি, আবার সেই অর্থকে কোনো দিন প্রত্যাখ্যানও করেন নি। অনেক বয়স অবধি অনেকটা পরগাছার জীবন যাপন করেছেন। পারিবারিক কোনো বিশেষ বিধি-নিষেধের অধীনে তাঁকে থাকতে হয়নি, সব কিছু থেকে অনেকটা নির্লিপ্ত থেকে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। পরিবেশের সঙ্গে কোনো বিরোধ কোনো দিন ঘটেনি। কাজেই প্রতিবাদ জানানো বা বিদ্রোহ করার কথাই ওঠেনি। ব্যবসা করা, দোকান চালানো তাঁর শিল্প-সাহিত্যে আগ্রহী মনের কাছে অনেকটা ভারগ্রস্ত মনে হয়েছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা, চালানের সঙ্গে বিল মিলিয়ে দেখা, বাকীবকেয়ার তাগাদা দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপার সাহিত্য-দর্শন-অনুপ্রাণিত মনের কাছে দুঃসাধ্য ঠেকেছে। তাই অসাধু কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন। নির্লিপ্ত ভাল ব্যবহার দিয়ে তাদের চিত্ত জয় করবেন এই ভেবে ব্লাঙ্ক চেকে সই করে এদের কাছে ফেলে রেখেছেন। 'ছোটবাবুর মতন মানুষ হয় না', 'দেবতুল্য মানুষ আমাদের ছোটবাবু'— কর্মচারীদের এই সব স্তোকবাক্য তাঁকে আশ্বস্ত করেছে। বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর লেখা জোর করে শুনেছেন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। মতিলালবাবু অম্লানবদনে তাঁদের বিপদে-আপদের মিথ্যা-কাহিনী শুনেছেন ও সেই কাল্পনিক বিপদ-

শুরু করতে তাদের টাকা নিয়েছেন। পুরনো পাওনার কথা মুখ ফুটে কোনো দিন তুলতেও পারেননি। নামকরা লেখক হবেন, তাঁর কাছে এসে প্রকাশকরা ধর্না দেবে, নানা ভাষায় তাঁর লেখার অনুবাদ বেরুবে; এই স্বপ্ন দেখেছেন। এই স্বপ্ন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে তাঁর বন্ধুরা, যারা তাঁর বিদ্যেয় মুগ্ধ, তাঁর পাণ্ডিত্যে বিস্মিত, তাঁর স্টাইলে হতচকিত। নিরাপত্তার অভাব মনোহরের মত তাঁর অত তীব্র না হলেও সাহিত্যসৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপাদানগুলোর উপর নির্ভরতা স্বাভাবিক। নিজের মেধা, বিশেষ করে সে সম্পর্কে অন্যের স্বীকৃতি তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রধান উপায়। কাজেই তাঁর মেধা যাদের কাছে স্বীকৃত, তাদের প্রতি তাঁর এই দুর্বলতা। এই দুর্বলতা এতদূর গড়িয়েছে যে, গুণমুগ্ধদের সব রকম অত্যাচার তিনি বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে চলেছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনো বাস্তবপন্থা গ্রহণে কিন্তু তাঁর কোনো আগ্রহই নেই। পাছে অনাদৃত হন, এই ভয়ে তিনি অন্তরঙ্গ মহলের বাইরে কারো কাছে লেখা পাঠাতে অনিচ্ছুক। সত্যকারের গুণীজনের মতামত গ্রহণেও তাঁর আগ্রহ নেই। কারণ ঐ একই। মনোহরবাবু যে কারণে কোনো সিনিয়র কেরাণীর পরামর্শ নিতে নারাজ, মতিলালবাবুও সেই কারণে সম্পাদক বা সমালোচকের সম্মুখীন হতে গররাজী। আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তার জন্য প্রতিযোগিতা করতে তিনি নারাজ।

আমার মনে হয়, এইভাবে বিশ্লেষণ করলে এই দুইজনের মানসিকতার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে, এবং এঁদের আচরণের তাৎপর্য বোঝা যাবে।

এই প্রসঙ্গে মতিলালবাবুর আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার আকুলতা সম্পর্কে দু-এক কথা বলা চলতে পারে।

মানুষ মাত্রেই প্রতিষ্ঠালাভ করতে চায়, একথা হয়তো ঠিক। সুযোগ সুবিধার অভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না অথবা দৈনন্দিন জীবনধারণের তাড়নায় হয়তো প্রতিষ্ঠালাভের কথা মনে আসে না। মান-সম্মান প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা—এসব কি শুধু এই সমাজে নিরাপত্তা লাভের উপকরণ, না এ সবের আরো কোনো উদ্দেশ্য আছে? আমাদের সমাজে অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপত্তা দানে সক্ষম, কিন্তু অর্থশালী লোকও মান-সম্মান প্রতিপত্তির কাঙাল, নানাভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য চেষ্টা করে থাকেন। আগেকার জমিদাররা মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন, জলাশয় খনন করতেন, রাস্তা বানাতেন। সে কি শুধু প্রজার হিতার্থে? না। শুধু ইহলোকের পরিচিত ব্যক্তির প্রশংসাবাণী শোনবার জন্যে, শুধু বর্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁরা এই অর্থব্যয় করতেন না। তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল ভবিষ্যতের দিকে। আজকালকার শিল্পপতিরা জনহিতের নানাকাজের জন্য অগাধ অর্থব্যয় করে থাকেন। প্রতিষ্ঠালাভ তাঁদেরও উদ্দেশ্য। শুধু জন্মান্তরে জীবনে সাময়িক প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাঁরা আকুল, একথা ভাবলে ভুল হবে। তাঁরাও চান স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। এই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষার আর এক নাম অমরত্ব লাভের স্পৃহা। একজন মনস্তাত্ত্বিক বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত একখানি পুস্তকে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে অমরত্বের (সিম্বলিক ইমমর্টালিটি) কথা উল্লেখ করেছেন। সন্তান-সন্ততি উত্তরপুরুষের মধ্যে বেঁচে থাকার কামনা জৈবিক অমরত্ব লাভের ইচ্ছা। মৃত্যুর পর অন্যলোকে অবস্থানের ইচ্ছা ধর্মশাস্ত্রপ্রভাবিত, একে বলা চলে স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট অফ ডেথ। নিজের সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যের বা ভাবধারার মাধ্যমে অমর হবার কল্পনা করেন শিল্পীসাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক। সাধু-সন্তরা যোগাভ্যাসের ফলে তুরীয়মার্গে উপনীত হতে চান, মৃত্যুকে জয় করার অভিলাষে। সমাধিস্থ অবস্থায় সাময়িকভাবে তাঁরা কালজয়ী হয়ে পড়েন। এই লেখকের সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও বলা চলে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা অমরত্বের প্রতীক। কোনো মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাণ দানের ব্যাপারকে অমরত্ব লাভের নিজ্ঞান প্রেরণা রূপে মনে করা আদর্শের প্রতি অসম্মান। মানবপ্রজাতির প্রতি আনুগত্য মানুষকে যে সব মহৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করায়, সে আনুগত্যকে অমরত্বলাভ বা মোক্ষলাভের মত ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভীপ্সা ভাবা চলে না। তবে অমরত্বের স্পৃহা বলতে যদি অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম হবার ইচ্ছা বোঝায়, তাহলে সেই স্পৃহা স্বার্থদুষ্ট বা মৃত্যুভয়তাড়িত নিউরোটিক প্রবণতা নয়।

মতিলালবাবুর প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছাকে আমরা কোন্ পর্যায়ে ফেলব? এটা একটা সুস্থ বাসনা না নিউরোটিক অমরত্বের কামনা? এদিক থেকে মতিলালবাবু সুস্থ বাসনা পোষণ করছেন বলা চলে না। তিনি যশকামী পারভার্ট নন, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠালাভের আকুল বাসনা একটা সাময়িক দুর্বলতা বা ব্যাকুলতাও নয়। এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী চারিত্রিক দুর্বলতা। পরগাছাবৃত্তি থেকে এর উদ্ভব ঘটেছে, তাঁর দায়িত্বহীন জীবন এই বৃত্তিকে পুষ্ট করেছে। জীবিকা অর্জন করার জন্যে মেহনত করতে হয়নি, অবিবাহিত থেকে পারিবারিক দায়িত্ব এড়িয়েছেন, কোনো সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি। নানা ধরনের পড়াশুনা করেছেন। জ্ঞানবুদ্ধিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে অধীত বিদ্যার মর্যাদা রাখবার চেষ্টা করেন নি, নিজের ক্ষমতা যাচাই করেও দেখেন নি। কাজেই হয়ে উঠেছেন আত্মশক্তি অবিশ্বাসী, পরমুখাপেক্ষী, দুর্বল স্বপ্নবিলাসী। মনেপ্রাণে তিনি নিঃসঙ্গ। প্রতিমুহূর্তে তিনি অনুভব করছেন যে মুহূর্তটি চলে গেল, সেটি আর ফিরে আসবে না। অতীতে ফিরে যাওয়া যায় না, নেলীর অশ্রু মুছিয়ে দেবার সুযোগ আর জীবনে পাবেন না। তাকে সেই অক্লুতভাবে প্রেম জানানো বর্তমানে আর চলে না। কাজেই তিনি এমন একটি কিছু সৃষ্টি করতে চান, যা তাঁকে আর নেলীকে অতীতের সেই প্রথম প্রেম জানানোর দিনটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আবার সেখান থেকে তাঁর সৃষ্ট কাহিনী লক্ষ বছরের পরিক্রমার শেষে ভবিষ্যতের সময় আকাশে গিয়ে উজ্জ্বল তারকা হয়ে ফুটে থাকবে। তাঁরা অমর হবেন।

এই আজগুবি ফেলেমানুষী পরিকল্পনা ভদ্রলোকের লেখাগুলোর সঙ্গে আমার হাতে এসে পড়েছিল। তিনি নিজে জানানিনি। দুঃখ হয়েছেন, লেখার ক্ষমতা নেই, এখনও তিনি নতুন সৃষ্টির পরিকল্পনা করে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করিনি। এদিক থেকে তিনি খুবই স্পর্শপ্রবণ। তাঁকে আঘাত দিতে চাইনি।

—মনোবিদ্

নমিতা এখনও সুন্দর। স্তম্ভিত হয়ে যায় নমিতা। বিমূঢ় বিস্ময়ে অন্ধকারে চেয়ে থাকে। কালিন্দি ঘুমিয়েছে আবার। ঘুম ঠিক নয়। ঘুম তার হয় না। শুধু ঘুম ঘুম আচ্ছন্ন ভাব। পোলে কমলা আর খোঁড়া রতন গুজ-গুজ করছিল কিছুক্ষণ আগে। কালিন্দি ঘুমের ঘোরেই ধমক দিয়েছে—'উ বাবা! ইয়াদের পীরিত যে ফুরায় নাই গো! —ঘুমা লো ঘুমা লো।' কালিন্দির ধমক খেয়ে ওরা চুপ কোরে গেছে। খানিক অস্পষ্ট স্বরে বিড়-বিড় কোরে থেমে গেছে কালিন্দিও। সুদাম আর একটা কোণে পড়ে আছে চুপ কোরে। এমনিতেই কম কথা বলে সে। জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে বোঝা যায় না।

কালিন্দি বলে, 'বড় ভাল মানুষ আমাদের সুদাম গো। বউটা মরে যেয়েই উ অমুনি হয়ে গেলছে। নয়ত দেখতিস কত হাসি কত রঙ্গ।' কালিন্দির জীবন হাসি আর রঙ্গ ভরা। বলে, 'দুদিনের জিন্দগানি, অর্থাৎ জীবন, কি পেলাম কি রইল—' হেইসে লে, খেলে লে।'

সুদামের বৌ পেল না। বিয়ে দিয়েছিল এই কালিন্দিই। যেমন কোরে কমলা আর রতনের বিয়ে দিয়েছে। বিয়ে মানে কালিন্দির হুকুম। হুকুম দেয়—'তা করগা—ভোজ খাওয়া আমাদিকে।' ভোজ মানে ভিক্ষেরই খাঁড়া-আঁকড়া চালের নিত্যকার বরাদ্দ ভাত। শুধু বরটা তাদের বেঁধে রান্না করবে। এছাড়া উপঢৌকন বোলতে কালিন্দির জন্যে দুই মিষ্টি আনা চাই। কালিন্দিই বলে দেয়, 'মিঠাই দিয়ে আসবি।' ব্যস। ওই হল মন্তর ওই হল

বিয়ে। আর কারো কিছু করার নেই, বলারও। সেই পেমলা একদিন মরে গেছে। মরে বেঁচেছে। কিন্তু সুদাম দুঃখ পেয়েছে এবং সেই দুঃখে ওই একদা হাসি রঙ্গ ভরা মানুষটা চুপ কোরে গেছে। আপন মনেই থাকে।

সারা ঘরটা যেন অন্ধকারে ডুবে আছে। জানলা দরজার কপাট বিহীন ফোকরগুলো যেন এক-একটা বিশাল দৈত্যের হাঁ করা মুখের গহ্বর। নমিতার শিয়রের জানলাটার ওপাশে নেড়া গুলঞ্চ গাছটার ডালগুলো বাতাসে দুলছে। বহু দূর থেকে ছিটকে আসা একটুকরো আলোর রশ্মি পড়ে তার কংকাল ছায়াটা বিলম্বিত হোয়ে নমিতার মাথা, বুক বেয়ে পায়ের দিকে দেওয়াল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

কালিন্দি বলে, 'ই গাছটি আজকার না। কামিখ্যা যে বছর হোয়েছিল সেই বছরকার। কামিখ্যের বাপ কুথা থেকে আইনেছিল। বলেছিল বৌ-ই গাছটি যতন কর—ই গাছটি রইল, আমি যখন রইব নাই তখন ই গাছটির দিকে দেখবি তো আমাকে তুর খেয়াল পড়বেক।' কামাখ্যার বাপ আজ বেঁচে নাই কিন্তু গুলঞ্চগাছটা আছে। সারা বছরে শুধু বর্ষাকালে দু-চারটি পাতা গজায় মাত্র, দিনকতক বাদে তাও ঝরে যায়। নেড়া ডালেই ফুল ফোটে। কালিন্দি বলে, 'তানেই তো কামিখ্যাকে বলি,—উটি গাছ নয় উটি তুর বাপ বটে।' ফোকলা মুখে হা-হা করে হাসে কালিন্দি, বলে—'কামিখ্যার বাপ বটেক কালীর গড়'—অর্থাৎ দুর্গ। দুর্গই বটে। প্রান্তরের মাঝখানে পরিত্যক্ত একখানা বাড়ি। বাড়ি নয় ঘর মোটে একখানাই। কোলিয়ারীর একখানা ইঞ্জিন ঘর। এখান থেকে লোহার রশি টান কোরে খাদের চালকের চাকা দুটো বেয়ে ডুলির সংগে বাঁধা থাকত আর ওই ঘরখানায় বসে চালক যন্ত্রের সাহায্যে সেই ডুলি প্রয়োজনমত ওঠাত নামাত। তারপর একদিন এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতিগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দরজা-জানলাগুলোও। কিন্তু বিশ ইঞ্চি পাকা গাঁথনির দেওয়াল সমেত এই বিশ ফুট উঁচু বিশাল ঘরখানা সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি তাই পড়েছিল। একদিন কামাখ্যার বাপ এসে আবিষ্কার করেছিল। সমাজ সংসার পরিত্যক্ত মানুষটা ঘুরতে ঘুরতে এসে আস্তানা গেড়েছিল এই ঘরখানাতে। তারপর এসেছে কালিন্দি। কামাখ্যার বাপের নতুন সংসারের নতুন ঘরণী হোয়ে।

নমিতার প্রথম প্রথম ভয় করত ছায়াটা দেখে। সয়ে যাবার পর অনেক রাতে ওই ছায়াটার দিকে চেয়ে থাকতে এখন বরং ভালই লাগে। ওই ছায়াটার পানে চেয়ে চেয়ে জীবনের হিসাব করে নমিতা। স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে তার অতীতটাকে। যে অতীতটা সে ছেড়ে এসেছে। যে অতীতটা তাকে আর কোনদিন ফিরে ডাকবে না। সারা দেহটা কুৎসিৎ ব্যাধিতে ভরে গেছে। জীবনে আশা নেই ভরসা নেই। আকাঙ্খার দিন গেছে হারিয়ে ফুরিয়ে।

বয়স তার কত। পাঁজি-পুঁথি সাল তারিখের হিসেবে বিশেষ কোঠাও পার হয়নি। কিন্তু এমনি নিস্তব্ধ অবসরে ওই গুলঞ্চ গাছের ছায়াটার পানে চেয়ে ভাবতে ভাবতে নমিতার নিজেরই মনে হয় বয়স তার অনেক। অনেক জটিল পথ পার হয়ে যে পথের সীমায় আজ সে এসে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের সেখানে পৌঁছতে হয়ত অনেকখানি বয়সের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নমিতার তাই অনেক বয়স।

●

নমিতা শুনেছে কালিন্দির জীবন কাহিনী। টুকরো টুকরো ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে কালিন্দি তার জীবনের ইতিহাস বহুবার বহুজনকে বলেছে। কমলা রঞ্জন কতবার হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছে, 'হাঁ মাসী মেসো কি করেছিল গো—কালিন্দি প্রতিবারের মত একই কথা দিয়ে শুরু কোরেছে,—'বড় রগড়া ছিল' মানে ওই কামাখ্যার বাপ। বলে, 'পরথম দিনেই'—তখন কালিন্দির চোখ ছিল, হাত-পাও। আর ছিল ভরা ভর্তি যৌবন। কালিন্দি বলে, 'দশহাত কাপড়ে আঁটাত নাই।'

—'তখন পথঘাট চিনিহ নাই। কভু ভিক মাঙ্গি নাই। কি যে করি দিশা নাই।' বলে, 'কামিখ্যার বাপেরও দশসাই চেহারা। তখুন লোকের পারা।' কিন্তু কাল ব্যাধির আক্রমণে অমন মানুষটাকে আর চিনবার উপায় ছিল না। সারা গায়ে চাকা চাকা ফুলা ফুলা দাগ। 'মানহুসকে মানহুস বইলে চিনহা যায় নাই।' কামাখ্যার বাপের জন্যে কালিন্দির মনটা—হঠাৎই করুণায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। কমলা ওপাশ থেকে মুচকি হেসে তাড়া দেয়, 'তারপর কি হল গো মাসি চুপ কইরে রইলে যে।' কালিন্দি সস্নেহ ধমক দিয়েছে, 'দুর ছুঁড়ি মা মাসির কেলেঙ্কার কোথা শুনবি কি না।' কিন্তু চুপ কোরেও থাকতে পারে না। ঠোঁটের কোণে সেই বিস্মৃত দিনের ঘটনার কথা স্মরণ করে হাসি ফুটে ওঠে কালিন্দির। গলে যাওয়া চোখ দুটো পিট-পিট করে নড়ে ওঠে বিগত দিনের কৌতুকের উত্তেজনায়। তারপর আপন মনেই সেই পুরোতন বহু কথিত কাহিনী আবার নতুন করে বলে,

—'আমার পানে খানিক চেয়ে থেকে বললেক—এই কুথা যাচ্ছিস?'

—'টাউনে ভিক মাঙ্গতে।'

—'উদিকে যাস নাই।'

'কেনে?'

—'কুথাকার মন্ত্রী না সাহেব আইসেছে। রাস্তায় ভিক মাঙ্গাদিকে বসতে দিছে না। খেদাই দিচ্ছে পুলিশ।'

—'সেই মা।' কালিন্দি যেন সেদিনকার মত আজও শিউরে ওঠে। বলে, 'মা, মার কভু খাই নাই, পুলিশ কভু দেখি নাই। ভয়ে তখুন আমার হাত-পা একাকুন। বললম কি হবেক? তু কামিখ্যার বাপ বললেক পালাই আয় আমার সাথে।'

—'কি খাব?'

—'আমি খাওয়াব গো তুখে।'

—'সেই কামিখ্যার বাপ যেথায় নিয়ে তুলেছিল। হাসতে হাসতে বইলেছিল তোর মিছা কোথা। একা একা থাকি হাই তুখে মনের মানহুস কইরে নিয়ে আসম।'

কালিন্দি হাসে আর বলে, 'সেই হতে এই ঠেয়েই আছি মা। সেই বলে নাই জনম দিলেক ভোগমান আর খাওয়াবেকও সেই ভোগমানই—সারা গা ভর্তি পারা যা তবু মনের মানহুস পেলম।'

কামাখ্যার বাপের সংগে বিয়ে হয়েছে কালিন্দির। নতুন করে সংসার পেতেছে। ক্রমে সব ভুলে গেছে। তার ফেলে আসা জীবনকে, সমাজকে, আত্মীয়-স্বজনকে। কামাখ্যার বাপকেই পরমার্থ বলে ভেবে নিয়েছে। স্বপ্ন দেখে কালিন্দি।

স্বপ্ন দেখে নমিতাও। সে যেন অনেক কালের কথা। পাড়ার লোকে বলত ফুটফুটে মেয়ে, যেন চাঁদের কণা। রাজপুত্রের মত বর হবে। মধ্যবিত্ত সংসারে মেয়ের রূপটা তবু শূন্য ভাঁড়ারে আওয়াজ করার মত কানাকড়ি। বিধাতার নিজের তদারকিতেই বুঝি গড়া হোয়েছিল নমিতার দেহখানা। পাড়ার লোকের আশীর্বাদ কুড়িয়ে রাজপুত্র না হক অলকের মত স্বামী পেয়েছিল নমিতা। স্বপ্নই যেন!

কিন্তু সবটাই স্বপ্ন নয়। পিঠের মাঝখানে একটা সাদা গোল দাগ নমিতার ফর্সা চামড়াকে ছাপিয়ে তিন প্রস্থ কাপড় ভেদ করে একদিন অলকের চোখে পড়ে গেল।

—'এ দাগটা কিসের বল তো?'

—'কোথায়?' নমিতা গা বেঁধেই শিউরে উঠেছিল।

—'এই তো পিঠের মাঝখানে?'

—'জানি নে তো।' শুকনো গলায় জবাব দিয়েছিল নমিতা।

'চুলকোয়?'

—'কই না।'

—'লাগছে?' —অলক চিমটি কাটে দাগটার ওপর।

—'না তো।'

অলক আর কিছু বলেনি সেদিন। তারপর কি একটা কাজে তাকে দিন তিনেক বাইরে যেতে হয়েছিল। বাড়ি ফিরেছিল সংগে একজন ডাক্তার নিয়ে। শুধু পিঠেই নয় খোঁজাখুঁজির পর দেহের অন্যান্য অংশেও অনেকগুলো সাদাটে ধরনের চাকা চাকা দাগ ধরা পড়েছে। অভিজ্ঞ ডাক্তার কি বলে গিয়েছিল নমিতা শুনতে পারেনি কিন্তু ঠাঁই হল তার বাইরের ঘরে।

কালিন্দি বলে, 'ই রোগকে সোবাই ডরায় মা। মা-বাপে পর কইরে দেয়।'

অনেক কটা দিন তোর বন্ধ কোরে নমিতা সেই ঘরে কাটিয়েছে। জানলা খুলেছে গভীর রাতে, সবাই ঘুমিয়ে গেলে।, একা-একা কখনও বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে গোটা আকাশটার নীচে। চাঁদ দেখেছে। জ্যোৎস্নার ধারায় স্নান কোরেছে। তারা গোনবার চেষ্টা করেছে। কখনও বা গান গেয়েছে আপন মনে। কখন চোখের জলে ভেসেছে। নমিতার চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে ওঠে আজকে এতদিন পরে।

পৃথিবীটাকে সেদিন বড় সুন্দর মনে হোয়েছে তার। তাই হারিয়ে গেল একদিন নমিতা। রাতের অন্ধকারে—এই পৃথিবীর বুকেই। তার সমাজ ছেড়ে, তার সেই জীবন ছেড়ে, উন্মুক্ত আকাশের তলে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে তার নির্দিষ্ট কুঠরীখানার মধ্যে ফিরে যেতে আর মন চাইল না। সেদিন সে জেনেছিল তার এই হারিয়ে যাওয়ার পেছনে কোন ইতিহাস থাকবে না হয়ত কোন প্রশ্নও না। এমন কি তাকে অসতীও ভাববে না কেউ। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে হারিয়ে যেতে পেরেছিল।

সারাদিন পথশ্রমে শ্রান্ত হোয়ে রাতের অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছিল একটা বাড়ির বারান্দায়। খিদের জ্বালায় ঘুম আসেনি। ক্লান্তিতে আচ্ছন্নের মত পড়েছিল। রাত তখন কত কে জানে। হঠাৎ জাগেই যেন ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চাইতে পারেনি—মুখের ওপর টর্চের আলো। সন্ত্রস্ত হোয়ে উঠে জড়সড় হোয়ে বসেছিল। কলঙ্কের ভয় যেন শত্রুর মত তখনও পেছন ছাড়েনি। নেশাগ্রস্ত মানুষটা খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ পায়নি। হঠাৎ পাওয়ার আনন্দেই বিভোর। বারান্দা থেকে সামগ্রীর মত যত্ন করে তুলে এনেছিল নরম শয্যায়। পেট ভরে খেতে দিয়েছিল। ঘোমটার আড়ালে ক্রূর হাসি হেসে শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছিল লোকটার আলিঙ্গনে—যৌবন পাগলা পুরুষে কাঙ্গাল মেয়ের মত। তারপর ভোর না হতেই পালিয়ে এসেছিল।

নমিতা হিসেব কোরে দেখেছে এমনি কোরে অনেকগুলো মানুষের ওপর সে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। কিন্তু ক্রমশঃ প্রকাশ পেয়েছে। কাপড়ের আড়ালে ঢেকে রাখা সম্ভব হয়নি। ধরা পড়েছে। লাঞ্ছনাও সহ্য কোরেছে। কামাতুর পশুগুলোও তা পেয়েছে চরম মুহূর্তে। ক্ষোভে দুঃখে নমিতা পাগল হোয়ে উঠেছে। নিজের হাতে পাথর দিয়ে একদিন নিজেরই কপাল ফাটিয়েছে। এক বিন্দুর পরিবর্তে আঁজলা ভর্তি রক্ত নিয়ে নমিতা দেখতে চেয়েছে রক্তের রক্তের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। খুঁজে বের কোরতে চেয়েছে ব্যাধির সূক্ষ্ম অদৃশ্য কীটাণুগুলোকে।

কালিন্দি বলে, 'ভোগমানের দিরা সাজা মা। ইথাতে মানুষ তো মরে নাই। মরণ যদি তবে ভাবনা কি। মরণ তো ফুরান। তা তো হবেক নাই। একটুন একটুন কইরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরবেক। যার যেমন পাপ তার ততদিন ভোগ। পেমলা পণ্ডিত তাই কষ্ট কইরে মরল। কামিখ্যার বাপেরও পাপ ফুরাল সেও মরল। মরণ তো নয় জুড়ান। নইলে এত লোকের মরণ হয় আমার মরণ হয় নাই।'

●

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে অথবা ভাসতে ভাসতেই নমিতা একদিন এসে পৌঁছেছিল এই ভাঙ্গা পরিত্যক্ত এমন ঘরটার সামনে। ঝোপ-জঙ্গল আর ইতস্ততঃ পাথরের চাঁই-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই বিশাল ঘরখানা যেন ইতিহাস বিস্মৃত কোন এক রাজার কেল্লা। কামাখ্যার বাপের দেওয়া নাম—কালীর গড়।

দরজার সামনেই বসেছিল কালিন্দি। এই গড়ের একচ্ছত্র অধিশ্বরী। কব্জী পর্যন্ত হাত দুটো এবং গোড়ালি পর্যন্ত পা দুখানা কুষ্ঠের দুষ্ট ক্ষতে ক্ষয়ে গেছে। চোখের তারা দুটোও গলা। কিন্তু অদ্ভুত অনুভূতি শক্তি কালিন্দির। নমিতা এসে দাঁড়াতেই জানতে পেরেছে। জিজ্ঞেস কোরেছে, 'কে বটেক এলি?'

নমিতা কালিন্দির ওই বীভৎস মূর্তি দেখে স্তব্ধ এবং স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

কালিন্দি আবার প্রশ্ন করেছে, 'কা গো কা বটিস।'

নমিতা ভয়ে ভয়ে সাড়া দিয়েছে, 'আমি—'

কালিন্দি সন্ত্রস্ত হোয়ে উঠেছে, 'কা কা? নউতুন মানহুস লাগছে?' কালিন্দি ভাবে এ বুঝি কোন নতুন উপদ্রব। কেউ বুঝি এসেছে তার এতকালের কেল্লা দখল কোরতে। রুখে ওঠে তাই। গলার স্বর তুলে বলে, 'কা গো,—আমি কা, বলি 'যা বিচার নাই নাকি? লোকের হাতে পায়ে কুষ্ট হয় তুমার কি গোলায় নলিতে হোয়েছে?'

শিউরে উঠেছে নমিতা। একবার মনে হোয়েছে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ক্লান্ত পা দুটো মাটির সংগে শক্ত হয়ে বসে গেছে। একটু বিশ্রাম তার চাই। ভাবেও বা। পালিয়ে গিয়ে কি হবে? কোথায় পালিয়ে যাবে? আজ কালিন্দিকে দেখে ভয় পাচ্ছে কিন্তু সেদিন নিজেকে দেখে ভয় লাগবে? সেদিন কোথায় পালাবে? কালিন্দি তো তারই অদূর ভবিষ্যতের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এই কালিন্দির মত একদিন তারও হাত-পা ক্ষয়ে যাবে। হয়ত একদিন এক অন্ধ নমিতাকেই এমনি কোরে এইখানে এই ভাঙা দরজার সামনে প্রহরায় বসে থাকতে হবে। কেউ এসে পড়লে এমনি কোরেই প্রশ্ন কোরবে। এ বুঝি এখানকার রীতি। নমিতা তাই শক্ত কোরেছে মনকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে। জবাব দিয়েছে—'আমি নতুন মানুষ।'

—'ভদ্দর লোক?'

কালিন্দির এ ধরনের প্রশ্নে নমিতা বিব্রত বোধ করে। ভেবে পায় না কি জবাব দেবে। ব্যাধির আবার ভদ্রাভদ্র বিচার আছে? নাকি কালিন্দির এই কেল্লায় ভদ্রাভদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের আলাদা আলাদা স্থান আছে? উঁকি মেরে এক পলকে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করে। ঘরখানার তিনদিকের তিন কোণে কিছু কিছু গৃহস্থালীর সরঞ্জাম। নমিতা বুঝতে পারে কালিন্দি ছাড়াও আরও লোক থাকে। এদিকের কোনটা শুধু ফাঁকা। কোনটার পাশে মস্ত একটা জানলার ফোকর। সেই ফোকরটার গা ঘেঁষে বাইরের দিকে একটা নেড়া গজেন্দ্র গাছ। কুষ্ঠ রোগীর ক্ষয়ে যাওয়া হাত পায়ের আঙ্গুলের মত গাছটার পত্রবিহীন শাখা-প্রশাখাগুলো হাওয়ায় দোলে। কুষ্ঠ রোগীর গায়ের ফোস্কা পড়া মসৃণ চামড়ার মত গাছটার মসৃণ অবয়বে রোদের আভা ঝলসায়। নমিতা দিনের আলোয় চাইতে পারে না গাছটার দিকে আজও। রাত্রে যখন গাছটার ছায়া পড়ে নমিতার মাথা, মুখ বুক বেয়ে পায়ের তলায় দেওয়ালটা পর্যন্ত, মাথা নাড়ে দমকা বাতাসে, তখন নমিতা চেয়ে থাকে। অনেক রাত অনেকক্ষণ ধরে। ঘুম না আসা পর্যন্ত। কালিন্দি তারপর নিজেই ডেকেছে নমিতাকে পরমাত্মীয়ের মত, 'ভাড়াই রইলে কেনে গো। দেখে লাও, ই পাশের কুনাটা খালি রইছে। ওই ঠেঁয়েই থাক—নাম কি তুমার।'

—'নমিতা।' নমিতা চমকে উঠেছে নিজের মুখে নিজের নামটা শুনে। এখানে এই কালিন্দির সামনে দাঁড়িয়ে এ নামটা যেন অচল। অন্ততঃ বেমানান।

'নমিতা?—বামুন বিটি ছেলা মনে হচ্ছে।' কালিন্দি নমিতার কণ্ঠস্বরেই তার বয়স আন্দাজ করেছে। —'বিহা হোয়েছে? বামুনের বিটি?' কথাটা বলে দন্তহীন মুখে কালিন্দি নিজেই হেসে ওঠে হাহা কোরে। —'কুষ্ঠিয়ার আবার জাত!'

—'বাপের ছিল, না মায়ের।' কালিন্দি আবার প্রশ্ন তোলে। হাজার প্রশ্ন কালিন্দির।

নমিতা আর দাঁড়াতে পারে না। কালিন্দির হোঁচট বাঁচিয়ে একটু দূরেই দেখে তাই বসে পড়ে। একটু জিরোয়। শুয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যেত। কিন্তু কালিন্দির ঐ বীভৎস দেহখানার সামনে

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

পড়ে পড়তে সেদিন সেই মুহূর্তে তার সাহসে কুলোয়নি।

কালিন্দি নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেয়। নমিতার অপেক্ষা রাখে না। বলে,—'মা বাপের রইলেও হয় না রইলেও হয়। আমার বাপেরও ছিল নাই, মায়েরও নাই।—কম্মোফল। আপনার আপনার কম্মে আপন আপন সাজা ভোগ করে মানহুসে।'

বলে, 'আমার তো কুঁড়িয়া লব—পারা। সকলের কাছে কৌলিন্যের এই আভিজাত্যটুকুই কালিন্দির গর্ব। এই কৌলিন্যের গৌরবেই কালীর গড়ের রাজা-প্রজার যে প্রতি সৃষ্টি ব্যবধানটুকু সৃষ্টি হোয়েছে সেটা কালিন্দির নিজের তৈরী। তার নিজের দৃষ্টি ছাড়া আর কারো চোখে পড়ে না এ প্রভেদ। কালিন্দি তাই নিজের মুখেই ব্যক্ত করে। এ কাহিনী সবাই শুনেছে। কমলা, রঞ্জন, সুদাম পেমলা এমন কি কামাখ্যার বাপকেও বলতে বাদ দেয়নি। নমিতার কাছেও সেই একই গল্প কোরেছে কালিন্দি। জানিয়ে দিয়েছে রাজা-প্রজার অন্তরটুকু—'কুঁড়িয়া লব পারা।—গর্মি হ'য়েছিল।'

আদিকালের বাদাবুড়ির মত আপন মনেই বলে যায় আপনি শোনে। 'তুমার পারা আমিও ভদ্দর ঘরের মেয়া মা—আইত্তে লোহার'—অর্থাৎ কামার। গল্পের খেই ধরে চলে কালিন্দি,—'পুরুষা আমাদের ঘর। গরীবের ঘরে বিটি ছেলার, কি জানো জান তো মা। তায় ভোগমানে রূপ দেয় নাই। ইদিকে গতরে সাবধান। খেতে পেত বিহা হইল এক বুড়া বুড়ার সাথে। হাঁপের ব্যারাম ছিল মিনসের। এই আছে তো এই নাই। খালি বইলত, কালী একটুন মালিশ কইরে দিবি? শুনলে কান্না পেত। সারাদিন গতর খাইটে রাইতের বেলায় মেয়ামানুষ মরদের কাছে দুটো মনের কোথা শুনে দুটা মনের কোথা বলে—মন জুড়ায়। তা নয় খালি মালিশ আর মালিশ।' বলে,—'আমার তখন আই যৈবন—আই গতর দশহাত কাপড়ে আঁটত নাই। আর দেহটাকে কাপড় ঢাকুন দিলে হবেক কি? মন কি মানবেক?'

নমিতাকে এক মুহূর্তে আপন করে নিয়েছে। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি উঠেছে জেগে। গলা চোখ দুটো পিট-পিট করে নড়ে উঠেছে বারবতক। তারপর এক অদ্ভুত কায়দায় ঘষে ঘষে আন্দাজে আন্দাজে সরে এসেছে। নমিতার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস-ফিস কোরে বলেছে তার জীবনের মস্ত গল্প কথাটা—'ব'য়ে গেল ষাঁড়ে লণ্ডি।' বলেই হা-হা কোরে হেসেছে। এবয়সের বিজাতীয় আঁশটে দুর্গন্ধ নমিতার নাকে-মুখে ঝাপটা মারতেই বমি এসেছে নমিতার। সমস্ত স্নায়ুগুলো জমাট বেঁধে গেছে। হাত-পা নেড়ে বসবার ক্ষমতাটুকুও লোপ পেয়ে গেছে। এমন কি মুখখানাও ঘুরিয়ে নিতে পারেনি। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছে কালিন্দির পানে। কালিন্দি বলে গেছে তার জীবনের ইতিবৃত্ত। —'সেই লাগিত ছোঁড়ার ছিল ঐ রোগ। কি যন্তোনা মা। গাঁয়-গ্যাঁয় এক রোজার কাছে দুটো টাকা দি'য়ে দাওয়াই লিলাম। দাওয়াই খেয়ে যন্তোনা গেল কিন্তু মাস ফুরাল নাই সারা গায়ে ফুটে গেল পারা ঘা। দাওয়াই-এ পারা ছিল মা।'

কৃতকর্মের জন্যে কালিন্দির তবু কোন অনুশোচনা নেই। তাই কালিন্দি হাসতে হাসতেই বোলতে পারে সব কথা। বলে, 'নিজের হাতে বিষ খেয়েছি—কাঁদলে শুনিবেক ক্যা?' ফেলে আসা জীবনের কোন স্মৃতি সাময়িকভাবে মনটাকে উন্মনা কোরলেও কালিন্দি তাকে প্রশ্রয় দেয় না: তার জীবনের ইতিবৃত্তের মাধ্যমে তৈরী তদন্ত সেতুটা দিয়ে সে এপার-ওপার করে শুধুমাত্র অভ্যাসের বশে। গত জীবনের প্রতি যেমন তার কোন মোহ নেই আজকের এই ব্যাধি কবলিত পঙ্গু দেহটার জন্য তেমনি কোন আক্ষেপও নেই।

নমিতা এখানে এসে বুঝতে পেরেছে এখানেও সমাজ আছে সংসার আছে, রীতি-নীতিও। আছে প্রেম ভালবাসা। কালিন্দি আজ নতুন সমাজের মানুষ। নতুন সংসারের কর্ত্রী। নতুন রাজ্যের অধিশ্বরী। ত্রিশ বছর আগে একদিন কামাখ্যার বাপের সংগে এখানে এসে সংসার পেতেছিল। তারপর সুদাম এসেছে, পেমলা এসেছে। এসেছে কমলা রঞ্জন। তারপর এসেছে কামাখ্যা। পেমলা মরে গেছে। কামাখ্যার বাপ মরে গেছে। হয়ত আরও কতজন এসেছে গেছে। তার সংসারের সুখ-দুঃখ, তার রাজ্যের উত্থান-পতনের সংগে সংগে, কালিন্দি তাই কখনো হেসেছে কখনো কেঁদেছে।

*

নেড়া গুলঞ্চ গাছটাতে কলি আসে, ফুল ফোটে। সমস্ত দিনের পর কুলায় ফেরা পাখির মত কালীর গড়ের বাসিন্দারা ফিরে আসে। নিস্তব্ধ পাষাণ পুরী খানিকক্ষণের জন্যে মুখর হয়ে ওঠে হাসিতে কথায় আর কলরবে। রান্নাবান্নার আয়োজনের মাঝে-মাঝে গল্প-গুজবে।

নমিতাকে দেখে কমলাই প্রথম প্রশ্ন করে,—'ক্যা মাসী?'

কালিন্দি তার চিরাচরিত হাসি হেসে জবাব দেয়,—'কইটুন মানহুস।'

কামাখ্যা হ্যারিকেন বাতিটায় তেল ভরে জেলে দেয়। কালিন্দি বলে, 'আঁধারে র'ইতে লারি মা। কামাখ্যার বাপও লারত।' কালিন্দির চোখে আজ আলো-অন্ধকার সমান। কিন্তু অভ্যাসটুকু আজও আছে। নিজেই বলে, 'বাতিটা জ্বালা বে,—বলে, —ভূত তো নাই মানহুস।'

হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় নমিতার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে কামাখ্যা কালিন্দির গা ঘেঁষে এসে প্রশ্ন করে, 'ক্যা মা?'

—'তুর বৌ বে হারামজাদা।' আবার হা-হা করে হেসে ওঠে। এই আবছা অন্ধকারে কালিন্দির হাসিটা প্রতিধ্বনিত হয়ে দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘুরতে থাকে। হ্যারিকেনের আলোয় কালিন্দির দেহের ছায়াটা একটা বিরাটকায় রাক্ষসীর অবয়বের মত প্রতিফলিত হয় ঘরটার দেওয়ালে-দেওয়ালে। নমিতা উদ্ভ্রান্তের মত চেয়ে থাকে কামাখ্যা আর কালিন্দির দিকে।

কালিন্দি বলে, 'কামিখ্যার বাপ বইলথ, কালী ছেলাটাকে হুতাদর করিস নাই। মানহুস করিস।' আদিখ্যেতার যেন শেষ নেই কালিন্দির জীবনে। কালিন্দি হাসবে না কাঁদবে ঠিক কোরতে পারে না।—'বাপ কুঁড়িয়া, মা কুঁড়িয়া মানহুস কোরবেক কি দি'য়ে?'

নমিতা দেখেছে আধ-পাগলা কামাখ্যা তাই মানুষ হয় নি। পঁচিশ বছরের যে ছেলেটার দেহ স্বাস্থ্য, যৌবনে ভরে ওঠার কথা। কালব্যাধির বিষ দংশনে সে আজ জর্জরিত। সারা মুখের চামড়ায় ফোস্কা পড়েছে। নাক এবং কানের নরম জায়গাগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছে। উপরের ঠোঁটটা ফুলে দ্বিগুণ হয়ে নীচের ঠোঁটটা ঢেকে দিয়েছে। দু হাতের আঙুলেই ক্ষতের আক্রমণ শুরু হয়েছে।

এই কামাখ্যা নমিতার দেহটার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। প্রথম রাত্রেই সে সরে এসেছিল নমিতার কাছে। নমিতার এখনও ঘুম আসে নি। মাটির ওপরে কাপড়ের এক দিকের খুঁট বিছিয়ে শুয়েছিল। দেহটা শ্রান্ত হয়েছে। মনটা সেই পরিমাণে অশান্ত। গুলঞ্চ গাছের ছায়াটা দুলে দুলে উঠেছে নমিতার মুখ বুক হাঁটু বেয়ে পা তলায় দেওয়াল পর্যন্ত। নমিতা চোখ বন্ধ করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে কামাখ্যার স্পর্শ বেয়ে লাগতে একটা প্রচণ্ড ভয়ে নমিতা চিৎকার করে উঠেছে। কামাখ্যা সরে গেছে আবার মায়ের কাছে। ক্ষুব্ধ বোবা পশুর মত অব্যক্ত স্বরে অভিযোগ জানিয়েছে কালিন্দির কাছে। ওপাশ থেকে কালিন্দির চাপা ধমক শোনা গেছে,—'দু দিন সবুর নাই। নোলা স'ক-স'ক করছে।' কামাখ্যা কোন জবাব দেয় নি। খানিক পরে কালিন্দিই আবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'ছুঁড়িটা দেখতে কেমনে রা?'

—'ভারি সোন্দর।'

নমিতা স্তম্ভিত হয়ে যায়—এখনও সে সুন্দর!

কখনও পড়ন্ত রোদের আলোয় হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে নমিতা তার দেহখানাকে আদর করেছে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছে। কামাখ্যা দেখতে পেয়ে হেসে এসেছে—

—'কি দেখছিস?—উ আর ভাল হবেক নাই। তুর পারা একদিন আমারও হ'য়েছিল। তুরও দেখবি আমার পারা কান ফুলবেক, নাক ফুলবেক, হাতে ঘা হবেক।'

নমিতা শিউরে উঠেছে এবং প্রায় চিৎকার করে কামাখ্যাকে ডাকা দিয়েছে, 'পাগল হলে? কলছি।'

কামাখ্যা বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে নমিতার হাতের রুমালটা বোঝবার চেষ্টা করে। তারপর আদর করে ডাকে, 'বউ, রাগ করলি—'

—'তুই আমায় বউ-বউ করিস কানে লাগে দেখি?'

কামাখ্যা সলজ্জ অথচ সরল ভঙ্গিতে জবাব দেয়, 'বা বলে কি!'

'বা কললেই হল?'

এবার কামাখ্যার অবাক হবার পালা। মেয়েটা বলে কি! চিরদিন যে প্রথাটা এখানে চলে এসেছে আজ এক মুহূর্তে সেই চিরকালের রীতি-নীতিকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায় নাকি নমিতা! ও পাশ থেকে কালিন্দি ডাক দেয়, 'ভাতটা দেখ তো বউ ধরে উঠেছে।' নমিতা প্রতিবাদ করে না। উঠে গিয়ে জল দিয়ে আসে।

রোজগার নমিতাকেও করতে হয়। রোজগার মানে ভিক্ষা। কালিন্দিই একদিন বলেছে, — 'বাও মা বইসে রইলে তো চলবেক নাই। প্যাট তো মানবেক নাই। কোথায় বলে প্যাট তো নয় শত্তুর। ভেগমান সব দিয়েছে। ই দেশে সকল যায় কিন্তু প্যাট যেমনটি তেমনটি-ই থাকে।' সমবেদনার সুরে সান্ত্বনা দিয়েছে, —'কপোবল মা—ভদ্দর ভাল ঘরের মেয়া তুমি এখানে আসতে হবেক কেনে।' কালিন্দির এই সহানুভূতিতে নমিতার চোখে জল এসেছে।

ওই কামাখ্যাই তাকে ভিক্ষা করতে শিখিয়েছে। নমিতার ভিক্ষাগুরু। বেলা না পড়তেই নমিতার হাতে যতখানি পেরেছে রোজগারের সামগ্রী তুলে দিয়ে আগে ভাগে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে,— 'তুই ঘর চলে যা বউ। হাঁড়িটা চাপা গা, আমি আরও দু-ঘর দেইখে যাই।'

নমিতা বুঝতে পারে কামাখ্যা তাকে ভালবাসে। তার পঁচিশ বছরের বুভুক্ষু অন্তরের সঞ্চিত বাসনাটুকু নমিতার চোখে ধরা পড়ে। নমিতার অবহেলিত লাঞ্ছিত হৃদয়ে কামাখ্যার এই প্রেমটুকু হঠাৎ যেন সম্পদ হয়ে ওঠে। গভীর নিশীথে তারার আবছা আলোয় পায়ে চলা সরু পথটা ছায়াপথের মত দৃষ্টির গোচরে আসে। যার শুধু সম্মুখ আছে পশ্চাৎ নেই। নমিতা এগিয়ে চলেছে অতি ধীরে-ধীরে অতি সাবধানে।

কামাখ্যার দেহটা নড়ে-চড়ে ওঠে। নমিতা জানে কামাখ্যা ঘুমোয় নি। কোন দিনই ঘুমোয় না। শুধু নমিতার ঘুমের অপেক্ষায় থাকে। তারপর আস্তে-আস্তে পাশ ফিরে-ফিরে নমিতার কাছে সরে আসে। [illegible] আর দ্বিধা করে না। শুধু ঠেলে সরিয়ে দেয় কামাখ্যাকে। পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। কামাখ্যা খানিক চুপ করে পড়ে থেকে আবার নিঃশব্দে সরে যায় নিজের জায়গায়—কালিন্দির পাশে।

নমিতার একখানা পা জন্মের আয়ত্তে হঠাৎ পঙ্গু হয়ে গেছে। মরণের মত এখন একটা লাঠির প্রয়োজন তার। এখনও অনেকখানি জীবন। অনেকখানি পথ। অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করে নমিতার। বুকটা সেই যন্ত্রণার হাপরের মত ওঠা-নামা করতে থাকে।

কামাখ্যা এবার সাঁতা-সাঁতা এগিয়ে আসছে। দেহটাকে চুপিসারে সরীসৃপের মত টেনে-টেনে ক্রমশ সরে আসছে নমিতার কাছে। নমিতা শব্দটা কান পেতে শোনে।

দেহটাকে আর যেন বইতে পারে না নমিতা। একটুখানি বসতে চায়। একটু জিরোতে। অনেক পথ হেঁটেছে। চোখ বন্ধ করে থাকে নমিতা। পথের হিসাব পথেই মিটিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু দুর্যোগও একটা আলোর রশ্মি বন্ধ চোখের চামড়া ভেদ করে চোখের তারায় ওপর তীব্র প্রতিফলন সৃষ্টি করে। অসহ্য সেই অনুভূতি। নমিতার নিশ্বাস বুঝি এবার বন্ধ হয়ে যাবে!

কামাখ্যা নমিতার বুকের ওপর হাত রাখে। বুঝতে চেষ্টা করে নমিতাকে। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। নমিতার এই অস্বাভাবিক নীরবতায় যেন ভয়-ভয় করে কামাখ্যার।

নমিতার আর শক্তি নেই। অন্তত এই মুহূর্তে। একটা পাথরের আড়ালে সে দেহটাকে এলিয়ে দিল। হাতের লাঠিটা শক্ত করে মুঠিতে ধরে সে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল।

পাগলের মত সমস্ত আবরণ সরিয়ে নমিতার দেহটাকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় কামাখ্যা। উত্তেজনায় হাত দুখানা কাঁপছে তার। নিশ্বাস দ্রুত তালে বইছে। নমিতার নাকে-মুখে সেই বিজাতীয় ঘরনের বাঁসটে দুর্গন্ধটা ঝলক হাওয়ার মত ঝাপটা মারছে।

নমিতার দুটো হাত-পাই পড়ে গেছে কালিন্দির মত। লাঠিটা পড়ে আছে কোণের কাছে। আর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বাড়িটা — কামাখ্যার বাপের দেওয়া নাম—কালীর গড়। কখন যে এতখানি পথ পার হয়ে এসেছে ভাবতে নমিতার নিজেরই অবাক লাগে।

কামাখ্যা এতক্ষণ পরে মুঠ করতে পারে নমিতার দেহখানাকে। পরম যত্নে ও সোহাগে উপভোগ করে সেই উষ্ণতাটুকু। আর নমিতা, অনড় স্তব্ধতার মধ্যে অদ্ভুত [illegible] একটা নড়াবিহীন বহুদূর বালোশী [illegible] মত কামাখ্যার কড় আঙুলগুলো ডুবে যাচ্ছে তার কোমলাঙ্গের স্তরে-স্তরে। নমিতা স্থির করে ফেলতে বাধা হয় কামাখ্যার দাবীকে একদিন তাকে মানতেই হত।

কামাখ্যা ততক্ষণে তার দেহখানাকে টেনে তুলেছে নমিতার দেহের পরে। সাফল্যের নিশ্চয়তায় আগের তুলনায় সে এখন অনেক শান্ত। এখন সে অন্ধকারেই কল্পনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নমিতার মুখের দিকে। তারপর অতি কমনীয় বাসনার মত তার স্ফীত ঠোঁট দুটো নমিতার ঠোঁটের পরে রাখে।

নমিতা তখন আবার অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। ডুবতে-ডুবতে তলিয়ে যায়। কামাখ্যার দেহটাকে আর দেহ বলে মনে হয় না তার। যেন পাখীর পালকের মত অনুভূতিহীন। এ যেন কোন এক বর্ণহীন সৌন্দর্য অথবা গন্ধহীন সৌরভের মত স্বপ্নময় এবং অলৌকিক। নমিতা যতবার চেষ্টা করল অলকের—তার স্বামীর মুখখানা স্মরণ করতে ততবারই কামাখ্যার মুখখানাই ভেসে উঠল চোখের সামনে। সেই অন্ধকারেই। এবং শেষ পর্যন্ত সে ভাবতে পারল অলক তার শুধু কামাখ্যা তার গতি এবং কালিন্দিতে সে শেষ হয়ে যাবে। অলককে হারিয়েছে কিন্তু কামাখ্যাকে পেয়েছে। অলকের কাছে পেয়েছে অবহেলা আর ঘৃণা আর কামাখ্যার কাছে পেল প্রেম আর ভালবাসা। সেখানে ব্যাধি নেই, ক্ষত নেই, দুর্গন্ধ নেই।

আরও অনেকক্ষণ পরে এক সময় কামাখ্যা মুখ তুলে মৃদুস্বরে নমিতাকে ডাকে,—'বউ—'

—'উঁ—'

—'ভালবাসিস?'

নমিতা জবাব দেয় না। সেই গভীর অক্লান্ত অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে দু বাহুর আলিঙ্গনে বেষ্টন করে রাখে কামাখ্যার দেহটাকে।

×

হঠাৎ বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। নমিতা বুঝতে পারে নেড়া পলাশ গাছটায় কলিগুলো ফুটল এতক্ষণে। চোখ মেলতে দেখতে পায় জানলার ফোকরটার বাইরে, পলাশ গাছটার মাথা ছাড়িয়ে অন্ধকারে অনেক দূরে এক আকাশ তারার মাঝে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। আর তারই কিরণে পলাশ গাছের ছায়াটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে কামাখ্যার মাথা ঘাড় পিঠ ও গোড়ালি বেয়ে পায়ের তলায় দেওয়াল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। —আর কালন্দোর কত জীবন সে কথা নমিতাকে কে বলে দেবে!

অঙ্গনা

নতুন মার্টিন লুথার কিং

আইরিশ সিভিল রাইটের প্রবক্তা মিস বারনাডেট ডেভলিন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সর্বকনিষ্ঠা সদস্যা। তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। ইতিমধ্যেই তিনি ব্রিটেনের রাজনীতিতে অত্যন্ত বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে ঘিরে নানা জল্পনা-কল্পনা পক্ষবিস্তার করছে। বিশেষ, উলস্টারে এখন প্রচণ্ড ধস নেমেছে। সিভিল রাইট থেকে এখন অনেকের দৃষ্টি সরে এসেছে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির দিকে। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু মিস ডেভলিনকে ঘিরে তাই সকলের কৌতূহলী জিজ্ঞাসাঃ তিনি কি উলস্টারের মার্টিন লুথার কিং হবেন?

মিস ডেভলিন সম্প্রতি আমেরিকা থেকে সফর সেরে ফিরে এসেছেন। এক মাসব্যাপী এই সফরে তিনি সে দেশের ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। এর উদ্দেশ্য দ্বিবিধঃ (১) বেলফাস্টের সোস্যালিস্ট রিসার্চ সেন্টারের জন্য ১২ হাজার ডলারের সংস্থান, (২) নিজের বক্তব্যের পক্ষে জনমত প্রস্তুত করা। বস্তুত, দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটিই তার এই সফরে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এবং তিনি তা স্বীকারও করেছেন। এদিক থেকে তিনি বেশ স্পষ্ট বক্তা। ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নয়, মনোভাব সোজা ব্যক্ত করার পক্ষপাতী তিনি।

কিন্তু এর প্রয়োজন কি ছিল? এর উত্তরে মিস ডেভলিন বলেন, সকলের সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের অভেদ্যতা প্রমাণই এর উদ্দেশ্য। এই মনোভাব থেকেই তিনি মেক্সিকান-আমেরিকান নেতৃবর্গ এবং মিস অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের মতো অশ্বেতকায় উগ্রপন্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, মিস অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা থেকেই তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন করে চিন্তার প্রয়োজন। একইসঙ্গে তিনি সংগ্রামরত বিভিন্ন শ্রমজীবীদের সঙ্গেও মেলামেশার চেষ্টা করেছেন।

নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিস ডেভলিন একটু উচ্চাশাই পোষণ করেন। তিনি নিজেকে লেফট উইং সোস্যালিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। তবে সমাজবাদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কিছুটা ভিন্নতর। সমাজবাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তা পুরোপুরি মেলে না। এই নতুনত্ব নিয়ে তিনি জোয়ান অব আর্কের আইরিশ সংস্করণ রূপে নিজেকে জাহির করেন।

এ থেকে নানারকম প্রশ্ন মনকে আলোড়িত করে। উপস্থিত সাংবাদিকদের একজনের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আপনার সমাজবাদটা তাহলে কেমন? আর একজন বলে উঠলেন, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে যে ভিন্ন ব্যবস্থা চলছে তার সঙ্গেই বা আপনার সম্পর্ক কি?

মিস ডেভলিন সংক্ষেপে এর উত্তর দিয়েছেন। সর্বদিক গুছিয়ে বক্তব্য রেখেছেন তিনি। অবশ্যই তিনি বিপ্লবী। তবে বিপ্লব তো সময়সাপেক্ষ। তাই তিনি আপাততঃ সংস্কারক হয়েই থাকতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে বিপ্লব সফল করার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় না এবং দীর্ঘ ধৈর্য ও শৌর্যের পরীক্ষা দিতে হয় না। তাই এই শর্টকাটকেই তিনি বর্তমানের মতো বেছে নিয়েছেন। তবে গীর্জার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে তিনি রাজী নন। কারণ, তিনি মনে করেন যে, কায়েমী স্বার্থের গেটপাশ নিয়ে যথার্থ কোন কাজ হয় না। সমাজের নীচুতলার লোকেরাই হলো তাঁর আন্দোলনের প্রধান শক্তি। এবং এরাই বেলফাস্টে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়ছে। তাই গীর্জার সঙ্গে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের ব্যাপারে কোন সম্পর্ক রাখেননি।

কিন্তু উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে দ্রুতগতিতে ঘটনার বিস্তার ঘটছে। সেখানে এখন জটিল অবস্থা চলছে। ঘটনাদৃষ্টে মনে হয় যে, মিস ডেভলিন নর্দার্ন আয়ার্ল্যাণ্ড সিভিল রাইট মুভমেন্টের প্রতিনিধিত্ব করলেও জল সেখানে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। সেদিক থেকে বিচার করে মিস ডেভলিনকে সে দেশের মার্টিন লুথার কিং হিসেবে অভিহিত করাই সঙ্গত।

এ সম্পর্কে মিস ডেভলিন বলেন যে, আমাদের ধীরে ধীরে শান্ত সংযত করে এগুতে হয়েছে। আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শক্তিমত্তায় সকলকে কাঁপিয়ে দিতে চাইনি। তাহলে আমাদেরই ক্ষতি হতো। কারণ, অপরিমিত শক্তির দম্ভকে সবাই গুঁড়িয়ে দিতে চাইতো। সেক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতো। আমরা আজকের মতো দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে পারতাম না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এই অগ্রগতিতে আমাদের মতো সুখী কেউ নেই।

মিস ডেভলিন লণ্ডনের এক ছোট্ট বাড়িতে বসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর বাসস্থান যদিও লণ্ডনের এক বিলাস বহুল অঞ্চলে তবুও প্রদীপের নীচেই যেমন অন্ধকার এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। অর্থাৎ গলির একেবারে শেষ প্রান্তে লাইনবাড়ির একটিতে তিনি থাকেন। তাঁর পরনে ছিল মিনিস্কার্ট। হয়তো এ পোশাকই তিনি পছন্দ করেন। কথা বলতে বলতে তিনি আগুনের মতো জ্বলে উঠছিলেন। তবে তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং আগ্রহ খুবই প্রশংসনীয়। কথাবার্তায় তিনি সবসময়ই নমনীয়।

সম্প্রতি খবরের কাগজে তিনি একটি বক্তব্য রেখেছিলেন যে, নর্দার্ন আয়ার্ল্যাণ্ড নিয়ে সমস্ত ব্রিটিশ শ্রমজীবীরা জড়িয়ে পড়ছে। যদিও এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধুমাত্র এই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আর কারো এতটা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয় না। মিস ডেভলিনের এই বক্তব্য সম্পর্কে সাংবাদিকদের মধ্যে একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কারো কারো মতে মিস ডেভলিনের এই উক্তি হচ্ছে সিভিল রাইট মুভমেন্টের পরাজয়সূচক। এবং এই বক্তব্যের মাধ্যমে তাই মেনে নেওয়া হয়েছে। কারণ, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সংগে এর যেন কোন মিল নেই।

এ সম্পর্কে একজন কথা পাড়তেই মিস ডেভলিন যেন তা লুফে নিলেন এবং কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই চটপট জবাব দিলেন, আমরা যদি একটা সোস্যালিস্ট রিপাবলিক অফ আয়ার্ল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠা করি তবে তা কতদিন স্থায়ী হবে? তারপর নিজে নিজেই হাসতে লাগলেন। এটা যে এক্ষুনি সম্ভব নয় সে কথা ভেবেই তিনি হাসছিলেন। তারপর তিনি বললেন, যদি ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সামরিক শক্তির তিনি অধিকারী হতেন তবে হয়তো সেই প্রজাতন্ত্রকে বড়জোর দশ বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। অবশ্য প্রয়োজনে আরো কিছুদিন।

মিস ডেভলিন বললেন, এই হোল আমাদের লক্ষ্য এবং সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা-চিন্তা করাই সঙ্গত। ব্রিটিশ শ্রমজীবীদের এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠা উচিত, আয়ার্ল্যাণ্ডে এ ধরনের একটি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এবং

ব্রিটেনেও। এ সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করতে করতেই দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ হয়ে আসবে আর সংস্কারের ঘোরও কাটবে। তাই তিনি মনে করেন যে, সকলেরই আজ এদিকে নজর ফেরাবার সময় এসেছে। এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারকে উপেক্ষা করা কোনক্রমেই সমীচীন হবে না। বরং তা হবে অদূরদর্শিতারই নামান্তর।

এরপরই মিস ডেভলিন ফিরে যান সেই প্রসঙ্গে। সমস্ত অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেন তিনি। একটু থেমে বললেন তিনি, সমস্ত ব্রিটিশ শ্রমজীবীকে সচেতন হবার আহবানের মধ্য দিয়ে তাঁরা মূল লক্ষ্য থেকে কোনক্রমেই সরে আসছেন না। এই বিভ্রান্তির অভিযোগ যেমন সত্য নয় তেমনি সর্ট টার্মে পরাজয়কে মেনে নেওয়ার অভিযোগও মিথ্যা।

মিস ডেভলিন বললেন, একইসঙ্গে আমরা অন্যদিকেও এগুনোর চেষ্টা করছি। সেজন্যই কোনক্রমে এক জায়গায় আটকে থাকতে চাই না। লং টার্ম কর্মসূচী যেমন অব্যাহত আছে তেমনি টুকরো টুকরো এমন কিছু কাজও আছে যাতে সাফল্যের সম্ভাবনা হাতেনাতে। সেই উদ্দেশ্য থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে টেনান্টস অ্যাসোসিয়েশন। আপাততঃ এই টেনান্টস অ্যাসোসিয়েশনের কাজ হচ্ছে বাড়ি-ঘরের উন্নতির দিকে নজর রাখা। তারচেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে যে, বাড়িওয়ালা যেন ভাড়াটেকে শুষে না খায়। বাড়িভাড়া যেন উপযুক্ত হয়।

একজন সাংবাদিক আবার একটি বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসলো। প্রশ্নটি হলো আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি সংক্রান্ত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই আর্মি কি ব্রিটিশ সেনানীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে নারাজ? কিংবা, কার্যতঃ প্রধান অস্ত্র। মিস ডেভলিন প্রশ্নটা শুনলেন। কোন ক্ষোভ বা ক্রোধ সেই মুহূর্তে তাঁর চোখে-মুখে প্রকাশ পেল না। জবাব যেন তৈরিই ছিল। তিনি প্রশ্ন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। গোড়াতেই এরকম একটা সম্ভাবনার কথা তিনি উড়িয়ে দিলেন। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি এমন লোক নিয়ে গঠিত যাঁরা প্রয়োজনে যে কোন অবস্থায় মুখোমুখি দাঁড়াতে দ্বিধা করবেন না। এঁরা সবাই শিক্ষিত এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই কোন পরিস্থিতিতে কি করণীয় তা তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। তাই তাঁরা ওপথ মাড়াবেন বলে মনে হয় না।

তারপর তিনি জুড়ে দিলেন, এঁদের সম্বন্ধে জানতে হলে আগে আয়র্ল্যাণ্ডের প্রকৃত অবস্থা জানতে হবে। না হলে অন্ধকারে হাতড়ে মরাই সার হবে। এঁরা যখন উগ্রপন্থা অবলম্বন করে তা কতগুলি সুনির্দিষ্ট কারণের ভিত্তিতে। সেদেশে বস্তিগুলি হলো গীর্জার মালিকানাধীন। যুগ যুগ ধরে তাই চলে আসছে। একে কায়েমী স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা চলে না। এই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করাই হলো মূল লক্ষ্য। এই সচেতনতাকে রাজনৈতিক রূপদানের কথা তিনি স্বীকার করেন। এজন্যই আমেরিকায় তাঁর প্রচার অভিযান এবং একই কারণে ব্রিটেনের জনমতকেও তিনি স্বপক্ষে চান।

মিস ডেভলিন এই জনমত গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী তৎপরতাও চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। তবুও বিপ্লবী কার্যকলাপকে তিনি শুধুমাত্র ধ্বংসের উৎসব বলে মেনে নিতে রাজী নন। তিনি পরিষ্কার বললেন, মৃতের স্তূপের উপর দিয়ে আমরা রক্তের হোলিখেলা কখনো করবো না। এতে আমরা মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবো এবং আমাদের ব্যর্থতাও হবে অবশ্যম্ভাবী।

মিস ডেভলিনের আশঙ্কা যে, গীর্জাকে অস্বীকার করে এই বিপ্লবী সংগঠনে মদত জোগানো আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর পক্ষে খুবই দুষ্কর। সাধারণ মানুষ ধর্মভীরু। তাঁরা গীর্জার বিরুদ্ধে যে কোন কথাকেই ধর্মবিরোধী বলে মনে করেন। কিন্তু আন্দোলন যখন আরো তীব্র হবে তখন জনসাধারণের এই মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। শুধুমাত্র ভার্জিন মেরী বা যিশুর দোহাই দিয়ে দীর্ঘকাল অন্যায় চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্যও গীর্জাকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এদিকে গীর্জা কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য নেই। সেই পুরনো পথ তাঁরা এখনো আঁকড়ে আছেন। তাই কারো কারো মধ্যে এই জিজ্ঞাসা তীব্র হয়ে উঠেছে যে, গীর্জা কোথা কোথা ধর্মের বুলি ছাড়া যীশুর মানবহিতে নির্দিষ্ট পথে পা বাড়াচ্ছে না। এমনিভাবে সকলেরই চোখ ফুটবে। আর তখন লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের কোন অসুবিধাই হবে না। ইতিমধ্যে 'সর্ট টার্মে' আমরা জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবো।

—প্রমীলা

[illegible] এই আকর্ষণীয় নিদর্শনটি সম্পূর্ণ উলের তৈরি। ঘরের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে এর ব্যবহার চলে। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর কয়েকটি প্রদর্শনী কক্ষে এটি বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

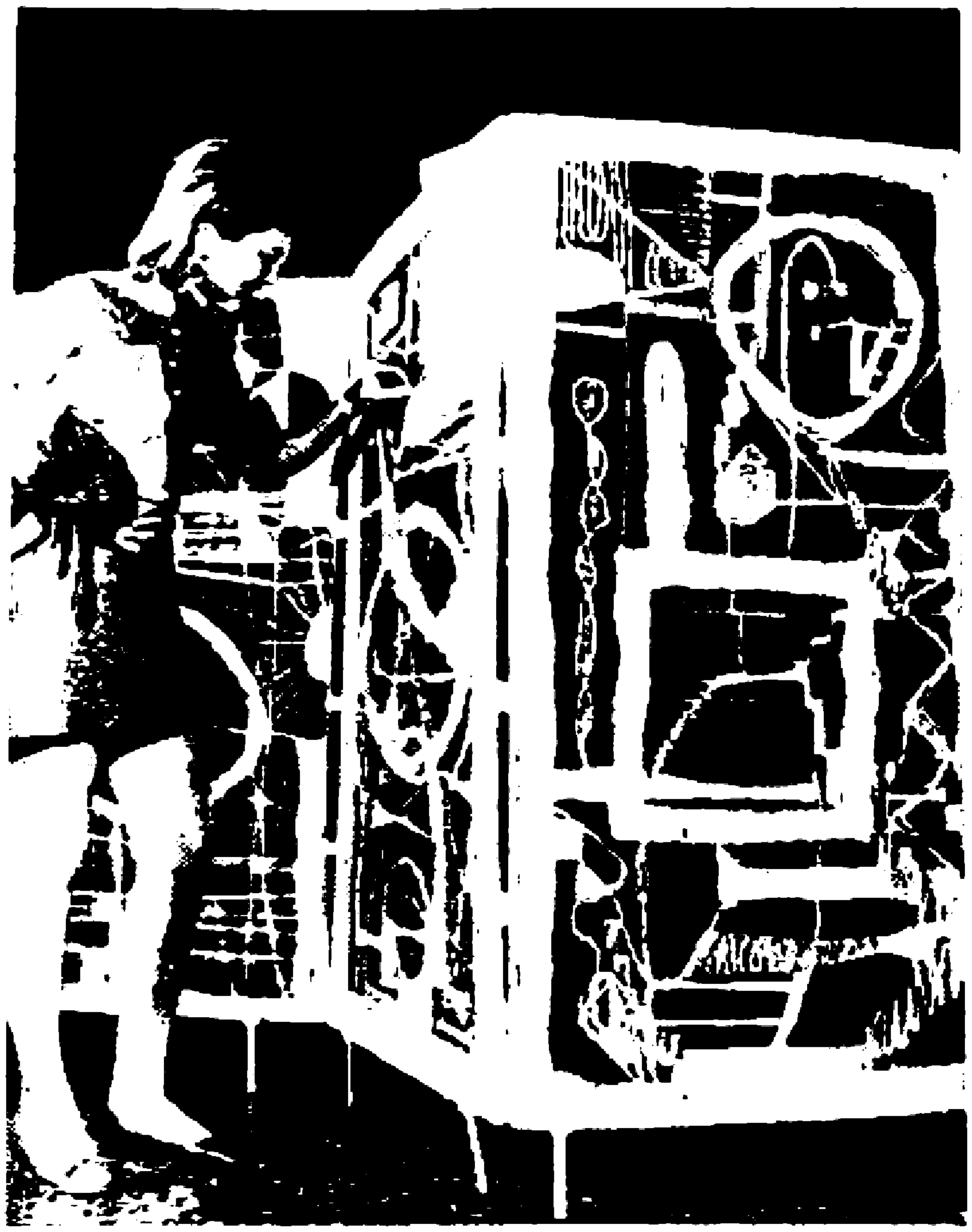

মার্চেন্ট আইভরি প্রোডাকসনের বোম্বে টকিজে অপর্ণা সেন

প্রেক্ষাগৃহ

হেসে নাও দু'দিন বৈ ত' নয়

হেসে নাও দু'দিন বৈ ত' নয়, এই কথাটিকে চরমভাবে সত্য করে তুলতে চেয়েছিল আনন্দ সাইগল, যে হচ্ছে রূপম চিত্র নিবেদিত এবং হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'আনন্দ' চিত্রের নায়ক। লিমফো সার্কোমা অব দি ইন্টেস্টাইনস্ নামে রোগ দ্বারা যে-মানুষ আক্রান্ত হয়, তার রোগটি নাকি ধরা পড়ে একেবারে শেষাবস্থায়, যখন মাস-তিন-চারের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া মানুষের আর কিছুই করবার থাকে না। দিল্লীবাসী আনন্দ যেদিন তার এই দুরারোগ্য রোগের কথা জানতে পারল, সেইদিনই সে তার প্রিয়তমা 'সোনার বাঙলার মেয়ে থেকে দূরে থাকবার অভিপ্রায়ে সুদূর বোম্বাই শহরে রওনা হল এবং এসে উঠল ডাঃ প্রকাশ কুলকার্ণির আরোগ্যালয়ে (ক্লিনিক-এ)। এইখানে তার আলাপ হল ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে গবেষণারত ডাঃ ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ভারতীয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনসাধারণের অধিকাংশেরই রোগের মূলে আছে নিদারুণ দারিদ্র্য, অভিজ্ঞতালব্ধ এই জ্ঞান ডাঃ ভাস্করকে ক্রমেই যখন জীবন সম্বন্ধে সিনিক করে তুলছিল, ঠিক এই সময়েই দেখা হল তার আনন্দের সঙ্গে। আনন্দ বিস্ময়ের সৃষ্টি করল ভাস্করের মনে। লোকটা বলে কি! জানি, আমার এমন রোগ হয়েছে, যা সারবে তো নাই, উল্টে আমার দেহটাকে ক্রমে ক্রমে অধিকার করে মাস-দুতিনের মধ্যে আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। তাই তো যতদিন না একেবারে অসমর্থ হয়ে শুয়ে পড়ছি, ততদিন জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে হাসিখুশীতে ভরিয়ে রাখতে চাই। সার্থক ওর আনন্দ নাম। চেনা-অচেনা, সকলকেই সে আনন্দ বিতরণ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। ডাঃ ভাস্করের গোপন প্রেমকে সেই নিয়ে গেল সার্থকতার পথে, ভাস্কর ও রেণুকে সেই নিয়ে এল কাছাকাছি। প্রকাশের স্ত্রী সুমনকে সে খুশীতে ভরিয়ে তুলল। পথের অচেনা লোককে ক্ষণিক আনন্দে উদ্ভাসিত করল। অচেনা অভিনেতাকে আপন করে নিল। অমন গম্ভীর মেট্রন মিসেস ডিসাকে মা ডেকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে ফেলল। ভাস্কর, রেণু, প্রকাশ, সুমন, ডিসা, এমনকি ভাস্করের বৃদ্ধ ভৃত্য রঘুকাকা—সবাইকে সে তার হাসিখুশী দিয়ে এমন প্রীতির বন্ধনে বেঁধে ফেলল যে, তার নিশ্চিত মরণ জেনেও সবাই প্রার্থনা করতে লাগল একটা অঘটন ঘটবার জন্যে, যার ফলে আনন্দ বেঁচে যায়। কিন্তু তা যখন হল না, যখন আনন্দ নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, তখন ওরা বুঝল আনন্দের মৃত্যু নেই, যে-আনন্দধারা সে ওদের মধ্যে অকৃপণ হস্তে ছড়িয়ে গেছে, তারই ভেতর সে বেঁচে থাকবে।

আকিরা কুরসাওয়ার একখানি ছবি দেখেছিলুম, যাতে এক বৃদ্ধ নিশ্চিত মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে জেনে বহু শ্রম স্বীকার করেও লোকের মঙ্গলবিধানে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল।—জানি না, পরিচালক-প্রযোজক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এই চরিত্রটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'আনন্দ' কাহিনীটি রচনা করেছেন কিনা। অবশ্য তাহলেও এমন কিছু এসে যায় না। কারণ, মঙ্গলবিধান এবং আনন্দ বিতরণ—এক কথা নয়; তাছাড়া সেখানে নায়ক ছিল বৃদ্ধ, আর এখানে নায়ক হচ্ছে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এক যুবক। অনেক প্রভেদ। 'আনন্দ'-এর মতো একটি মন-কেড়ে-নেওয়া চরিত্র সৃষ্টি যে-কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাহিনীকারের পক্ষেও অপরিসীম গৌরবের বস্তু। বলা চলে, এই 'আনন্দ' চরিত্রটিই ছবিটিকে আশ্চর্যভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এরই সঙ্গে এও বলা প্রয়োজন যে, শ্রীমুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য রচনা-কৌশল বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে চরিত্রটির উপস্থাপনাকে অতিমাত্রায় সার্থক করে তুলেছে। তবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে, ছবির একেবারে শেষভাগে, যেখানে আনন্দ ক্রমেই শয্যাগত হয়ে পড়েছে, সেখানেও অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে আনন্দ যদি উপস্থিত সকলকে হাসাবার চেষ্টা করত এবং আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথায় কাতর না হয়ে তাকে হাসিমুখে বিদায় দেবার জন্যে অনুরোধ করতে করতে হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে

পড়ত, তাহলে দর্শকদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হত না কি?

আজকের হিন্দী চলচ্চিত্রজগতের বহু ঈপ্সিত নক্ষত্র রাজেশ খান্না ছবির নামভূমিকায় যে ঈর্ষণীয়, অর্থবহ, বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন, তা এই ভূমিকাটিকে তাঁর জীবনে অবিস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর জীবন্ত চরিত্রাভিনয় দর্শকমনকে একেবারে অভিভূত করে রাখে। তাঁর পরিপূরকরূপে কাজ করেছেন অমিতাভ বচ্চন ডাঃ ভাস্করের ভূমিকায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ অভিনয়ের মাধ্যমে। শ্রীবচ্চনের কণ্ঠের সুগভীর মাধুর্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। অভিনেতার চরিত্রে জনি ওয়াকারের সু-অভিনয় স্মরণীয়। রেণু ও সুমনরূপে যথাক্রমে সুমিতা সান্যাল ও সীমা চরিত্রানুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন। মেট্রনবেশে ললিতা পাওয়ার চরিত্রটির বিভিন্ন পর্যায়কে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় রমেশ দেও (প্রকাশ), দুর্গা খোটে (রেণুর মা), দারা সিং (কুস্তি আখড়ার পালোয়ান) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের সর্বত্র একটি উচ্চমান রক্ষার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। তবে চিত্রগ্রহণে রঙের সামঞ্জস্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে বোধহয়। সম্পাদনার কাজ পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজেই করেছেন। সেই কারণেই ছবিটি যেমন অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হয়নি, তেমনই পরিস্থিতি অনুযায়ী ছবির টেম্পো আশ্চর্যভাবে সুরক্ষিত। ছবির আর একটি প্রশংসনীয় অংশ হচ্ছে এর সংলাপ; এমন হৃদয়গ্রাহী সংলাপ গুলজারের হাত থেকেও কমই বেরিয়েছে। আর প্রশংসনীয় হয়েছে ছবির গানগুলি—যেমন রচনা, তেমনই সুর, আর তেমনই গাওয়া।

এন সি সিপ্পি ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত রূপম চিত্র-এর নিবেদন 'আনন্দ' অভিনব মানবিক আবেদনসম্পন্ন অপরূপ চিত্রসৃষ্টি।

স্টুডিও থেকে

মণীষা আর্ট ইন্টারন্যাশনালের পতাকাতলে তরুণ পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত হাসির ছবি 'চিঠি'র কাজ এগিয়ে চলেছে। গল্পের কাহিনীকার হলেন ডাঃ আর এন গুপ্ত। প্রধান দুটি চরিত্রে অংশ নিয়েছেন শমিত ভঞ্জ ও সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন রবি ঘোষ, সুব্রতা চ্যাটার্জি, উৎপল দত্ত, অজিতেশ ব্যানার্জি, কণিকা মজুমদার, অসীম চক্রবর্তী, জয়শ্রী রায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। শ্যামল মিত্রের সুরে এই ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সুরকার নিজে...

সলিল দত্তের নতুন ছবি 'খুঁজে বেড়াই'এর চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। আজকের ভাবনা, আজকের জীবনযন্ত্রণা, আজকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এক মহা-নৈতিক বাস্তব কাহিনী নিয়ে চিত্রনাট্য লিখেছেন সলিল বাবু নিজে। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, শোভেন সেন, তরুণকুমার, দিলীপ রায় প্রভৃতি এবং নায়ক নায়িকার চরিত্রে আছেন সৌমিত্র ও অপর্ণা...

নবরূপা নিবেদিত 'ছন্দপতন' ছবির সম্প্রতি আউটডোর স্যুটিং আরম্ভ হয়েছে। পুলক মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন গুরু বাগচী। ছবিখানি পরিচালনাও করছেন গুরুবাবু। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে অংশ নিচ্ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল ও সুমিত্রা সেন। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন অনিল চ্যাটার্জি, নন্দিনী মালিয়া, অসিতবরণ, সমিত ভঞ্জ, দিলীপ চক্রবর্তী, অনুভা ঘোষ, জহর রায়, শিবানী বসু প্রমুখ—

•

পীযূষবাবু এখন 'জীবন জিজ্ঞাসা' ছবির কাজে ব্যস্ত। এন-টির এক নম্বর ফ্লোরে তিনি গত সপ্তাহে কাজ করেছেন। দু নম্বর সেট পড়েছে একটি ছোটো রেল-স্টেশনের। প্ল্যাটফরমের পাশে রেল

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ ৩৫-৫৫৯৮

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬টা
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬টা

নাট্যরূপ : সমরেশ চক্রবর্তী। আলো ও মঞ্চ : অমর ঘোষ।
বিশেষ আলো : শিবনাথ ব্যানার্জী। দৃশ্যাঙ্কন : গণেশ দাস।
ধরণি : পাইওনিয়ার রেডিও
।। কণ্ঠসঙ্গীতে মঞ্চে এই প্রথম ।।
মান্না দে - হেমন্ত মুখার্জী - সতীনাথ মুখার্জী - শ্যামল মিত্র
ব্যবস্থাপনা : বিভাস মুখার্জী। রূপসজ্জা : শেখ মেহেবুব
গান : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর : নচিকেতা ঘোষ
তত্ত্বাবধায়ক : তপন চ্যাটার্জী

নায়িকা চরিত্রে : পদ্মশ্রী তৃপ্তি মিত্র
মেঘনাদ : জ্ঞানেশ মুখার্জী
বিভিন্নাংশে : রবীন মজুমদার, অর্পণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, শম্ভু ব্যানার্জী, গণেশ শর্মা, ব্রজেন চ্যাটার্জী, কমল গুপ্ত, পান্না চ্যাটার্জী, ঋষি চক্রবর্তী, চিত্ত চ্যাটার্জী, সতীকান্ত, মৃণাল ঘোষাল, শোভেন দেব, অরিন্দম কুণ্ডু, সুকুমার, অভিজিৎ, প্রদীপ, রাধেশ্যাম, অলকা গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা মুখার্জী, তাপসী চক্রবর্তী এবং সুলতা চৌধুরী।
বিশিষ্ট চরিত্র চিত্রণে : তরুণকুমার
অনন্য ভূমিকায় : রবি ঘোষ

লাইনের ওপর একটি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়ীর মধ্যেই স্যুটিং হোল। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সুনন্দা দাশগুপ্তা মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পবিত্রবাবু জানালেন এই পর্যায়ের কাজ হলেই নাকি এ ছবির প্রায় সাড়ে তিনভাগ কাজ শেষ হয়ে যাবে।

বুদ্ধদেবের মহরৎ পয়লা বৈশাখ হলেও ঐ ছবির কাজ তিনি সেদিনই শুরু করতে পারবেন না, কিছুদিন বাদেই শুরু করবেন। তদ্দিনে [illegible] কাজ হয়তো শেষ হয়ে যাবে। একই সঙ্গে তিনি দুখানা ছবির কাজ করার পক্ষপাতী নন।

•

পরিচালক সলিল সেন 'অপর্ণা'র বাকি কাজটুকু শেষ করলেন গত সপ্তাহে। মোট ন'দিন কাজ হলো। বম্বে থেকে তনুজা এসেছিলেন এই কাজের জন্য। ভাগ্যবিড়ম্বিতা অপর্ণা নামের এক যুবতীর জীবন কাহিনী 'অপর্ণা'। কাহিনীকার জরাসন্ধ। গাঁয়ের মেয়ে অপর্ণা একদিন বাবা হারিয়ে শহরে এসেছিল শুভানুধ্যায়ী বারবনিতার খোঁজে। দাদার স্নেহচ্ছায়ায় অপর্ণার দিন কাটছিল শান্তিতেই। কিন্তু ভাগ্যচক্রে তাকে একদিন জড়িয়ে পড়তে হোল এক ঘৃণ্য ব্যবসায়ে। যাকে নিয়ে তার বিচিত্র চক্রান্ত জালের বিস্তার, একদিন দেখল মনে মনে সেই যুবক কবে যেন তাকেই মন দিয়ে বসে আছে। চিত্রনাট্যকার সলিল সেন স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় এই মর্মস্পর্শী কাহিনীকে ছবির উপযোগী করে তুলেছেন। নায়িকা চরিত্রে তনুজা ছাড়া আর দুটি প্রধান পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জী ও শুভেন্দু চ্যাটার্জী।

•

পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় যাদের যৌবনের রক্ত একদিন টগবগ করে উঠেছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় মসনদ যাঁদের মৃত্যুযজ্ঞের রণহুংকারে টলমল করে উঠেছিল, সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্যের বেয়নেটের খোঁচা যাঁদের বিপ্লব রোধ করতে পারেনি, যাঁরা মৃত্যু দিয়ে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসাধনার দলিল—'শপথ নিলাম' মুক্তি প্রতীক্ষায়।

কৃষ্ণা মল্লিক প্রযোজিত ও শচীন অধিকারী পরিচালিত এ ছবির কাহিনী রচয়িতা শৈলেশ দে। সুকুমার মিত্র সুরারোপিত এই ছবির গীত রচয়িতা অমিতাভ নাহা।

কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন, শমিত ভঞ্জ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, ভাস্কর চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, মৃণাল ও নবাগতা সুনন্দা দাশগুপ্ত।

একমাত্র পরিবেশক : ইস্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ।

সত্যজিৎবাবুর 'সীমাবদ্ধ' ছবির ইনডোরের কাজ শেষ হয়ে গেল। একটানা প্রায় পনেরদিন চিত্রগ্রহণ করলেন তিনি। কোনো কোনোদিন রাত্রেও কাজ হয়েছে। এ পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে ছবির বেশীর ভাগ কাজই শেষ হয়ে গেলো। এখন বাকি কিছু আউটডোরের কাজ। মৃণালবাবুর নতুন ছবি 'এক অধুরী কাহানী'র সম্পাদনার কাজ শেষ। শব্দ ও সংগীত গ্রহণের জন্য তিনি বৈশাখের শুরুতেই বম্বে যাচ্ছেন। ঐটুকু কাজ হলেই ছবির কাজ শেষ।

মঞ্চাভিনয়

পঙ্গু-জীবনের ঘন মেঘের অন্তরালে দীপ্ত কিরণচ্ছটা

সুন্দরী মেয়ে যদি কোনো কারণে পঙ্গু হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে নিয়ে বাপ-মায়ের ভাবনার অন্ত থাকে না। এর ওপর সে যদি মতিহারা হয়, তাহলে কন্যাগতপ্রাণ বাপের পক্ষে সে এক বিষম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়ে। পঙ্গু মেয়ের বিবাহ দেবেন, কি দেবেন না। বিবাহ দিলে তার স্বামী ও স্বামীর পরিজনবর্গ তার প্রতি কিরূপ আচরণ করবে, এই ভাবনাই তাঁকে অস্থির করে তোলে। তিনি মনে করতে থাকেন, তাঁর মেয়েটি বড়জোর কারুর করুণার পাত্রী হতে পারে, তার বেশী কিছু নয়। কাজেই করুণার পাত্রী হয়েই যদি জীবন কাটাতে হয়, তাহলে অন্য পাঁচজনের করুণার পাত্রী না হয়ে মেয়ে চিরকাল বাপের স্নেহচ্ছায়াতেই থাকুক।

স্টার থিয়েটারে বর্তমানে অভিনীত দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত ও পরিচালিত 'সীমা' নাটকটির নায়িকা সীমা এমনই এক

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নতুন নাটক —
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার : ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬টায়
রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, রেণুকা দাস, কুমারী মিলু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

শুভ নববর্ষে ১লা বৈশাখে

রাধা - পূর্ণ
পদ্মশ্রী (যাদবপুর) - মায়া (সালকিয়া) - অলকা (শিবপুর)
ছন্দশ্রী (বরানগর) - উদয়ন (শেওড়াফুলি) - যোগমায়া (হাওড়া)
—বিশ্ব পরিবেশনা : শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ—

নববর্ষের নব আকর্ষণ
বুড্ডা মিল গয়া
বিলামোরিয়া
লালজী

পঙ্গু মেয়ে এবং তার প্রতি মমতায় ভরা পিতা, অধ্যাপক শৈলেশ্বর চট্টরাজের কাহিনী। 'সীমা' নাটকটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এর প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই আদর্শ চরিত্র, প্রত্যেকেই অসম্ভব ভালো, কারুর মধ্যে কণামাত্রও মন্দ নেই। মনে হয়, এরা কেউই রক্তমাংসের মানুষ নয়, প্রত্যেকেই দেবতুল্য। অমন যে গোঁড়া পণ্ডিত রামহরি রায়, সেও যেইমাত্র শুনল, মানবিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে সুশোভন সদ্যবিধবা শান্তাকে বিবাহ করেন, অমনই তাঁর গোঁড়ামি চলে গেল, তিনি তাঁর নাতি অলকের সঙ্গে সুশোভন-কন্যা সরমার বিবাহকে মঞ্জুর করে ফেললেন। ঐ সুশোভনেরই একমাত্র পুত্র অসীম রবীন্দ্র-সাহিত্যে থিসিস তৈরি করার উদগ্র মন নিয়ে তার অধ্যাপক শৈলেশ্বরের পঙ্গু মেয়েকে তার অন্তর্বেদনা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে জীবনসঙ্গিনী করে এবং অধ্যাপককে তাঁর কন্যার জীবনে তিনি যে শেষ সীমারেখা টানতে চেয়েছিলেন, তা যে ভুল, তা প্রতিপন্ন করে। নাটকটির কোথাও হিংসা, দ্বেষ, কলহ, ক্রূরতা নেই, সবটা জুড়ে রয়েছে সহানুভূতি, প্রেম, বাৎসল্য এবং কিছুটা রহস্যপ্রিয়তা। বলা হয় রঙ্গমঞ্চ জীবনের দর্পণস্বরূপ। কিন্তু 'সীমা' যে-জীবনের দর্পণ, সেই জীবনাদর্শ আমাদের মধ্যে বহুজনেরই লক্ষ্য হলেও আজকের সংঘাতময় নিষ্ঠুর বাস্তবজীবনে আদৌ সহজলভ্য নয়।

তবে কিনা, থিয়েটার জগৎ, মেক-বিলিফের জগৎ। কঠিন রূঢ় বাস্তব থেকে পলায়নপর মন তাই 'সীমা' নাট্যাভিনয় দেখে অভিভূত হয়; হাসিকান্নায় পুরো তিনটি ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করে খুশীতে ভরে ওঠে। অভিনয়শেষে দর্শকরা অজস্র সাধুবাদ দিতে দিতে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেন এবং এইখানেই নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের লেখনী ও শ্রমের সার্থকতা। তিনি এমন সব চরিত্রকে তাঁর নাটকের মধ্যে এনে জড়ো করেছেন, যাদের ভালোবেসে ফেলা ছাড়া আর পথ নেই: সে কিবা সীমা ও শৈলেশ্বর, পতিতপাবন আর তার স্ত্রী ইন্দুমতী কিংবা রামহরি ও তাঁর নাতি অলক। বিভিন্নতা আছে চরিত্র থেকে চরিত্রে; সরসতা আছে ওদের অনেকেরই মধ্যে। কিন্তু কেউই ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে স্বাভাবিক মানুষ নয়, সবাই সবটাই ভালো এবং অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ।

অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীই তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। খারাপ অভিনয় কেউ করেননি। এবং সকলের অভিনয় একটি সুরে বাঁধা। তবে ওরই মধ্যে মুখ্য চরিত্র সীমার ভূমিকায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় চরিত্রগত অব্যক্ত আনন্দ ও বেদনা প্রকাশে চূড়ান্ত নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। শান্তাবেশে নীলিমা দাস মাধুর্যে ভরা। পতিতপাবন-প্রিয়া ইন্দুমতী-রূপে দীপিকা দাস চরিত্রচিত্রণে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। মেডিক্যাল ছাত্রী সরমার ভূমিকায় বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সংযতভাবে রোমান্সের প্রকাশ করেছেন; তাঁর মুখের রবীন্দ্রসঙ্গীত মিষ্টতে ভরা। পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অলক ও পতিতপাবন-বেশে যথাক্রমে সুখেন দাস ও বঙ্কিম ঘোষ। এঁদের দৃষ্টিমিতরা শিষ্ট অভিনয় দর্শকদের খুশীতে ভরিয়ে দিয়েছে। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (শৈলেশ্বর), পঞ্চানন ভট্টাচার্য (রামহরি), সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (অসীম) ও প্রেমাংশু বসু (সুশোভন) বিভিন্ন চরিত্রোচিত অভিনয়ে নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে গীতা দে, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, মেনকা দাস, রঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী বিন্দু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

দৃশ্যসজ্জা, আলোকনিয়ন্ত্রণ এবং আবহসঙ্গীত নাটকটির উত্তরণে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

স্টারের বর্তমান নাটক 'সীমা' নাট্যপ্রিয় দর্শকবৃন্দকে খুশীতে ভরিয়ে দেবে।

।। ডি, ভি, সি বোকারোর অনুষ্ঠান ।।

ডি. ভি. সি বোকারোর নবগঠিত চৈতালীর সভাবৃন্দ বোকারো ক্লাবের পরিচালনায় এবং শ্রীগোপাল দে-র ব্যবস্থাপনায় গত ৮ মার্চ নাট্যকার সুনীল দত্তের 'তোন্দ পাকে বাঁধা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। অভিনয়ে ছিলেন সর্বশ্রী : স্বপন রায়-চৌধুরী, স্বপন দাস, রতনলাল চক্রবর্তী, দেবু দত্ত অশোক ভট্টাচার্য, বরেন্দু লাহিড়ী, দিবাকর দত্ত, অশোক রায়।

রঙ্গনা (৫৫-৬৮৪১)
নান্দীকার
শনি ৬, রবি ২।। ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
প্রতি বৃহস্পতিবার ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুভমুক্তি সমাসন্ন
লক্ষ কথার এক কথায় * লক্ষ ছবির এক ছবি * অযুত লক্ষ হৃদয়কে একই অভিমতে অনুপ্রাণিত করবে.....
জেমিনীর

আপনার প্রিয় প্রেক্ষাগৃহসমূহে
সোনালী ফিল্মস-এর পরিবেশনায়

মৌসুমী সেন/মিতা এবং সন্তোষ

নাটকের প্রারম্ভে আবৃত্তি এবং সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী : স্বপন চক্রবর্তী, সৌমেন দাস এবং নারায়ণ মজুমদার।

'বিপ্লব ও বিবেকানন্দ' নাট্যাভিনয় : গত ২৮শে মার্চ, বনগ্রাম টাউন হল ময়দানে তীর্থঙ্করা কর্তৃক বিশ্বনাথ মৈত্রের নতুন নাটক 'বিপ্লব ও বিবেকানন্দ' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। নামভূমিকায় অভিনয় চিত্তরঞ্জন। আলোকসম্পাতে শ্রীনিতাই প্রামাণিক দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ জন্ম-জয়ন্তী : সম্প্রতি নাগরিকদের পক্ষে উত্তর কলকাতার আজাদ হিন্দ বাগে (হেদুয়া) স্বামী বিবেকানন্দের ১০১তম জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি। সকালে গোয়াবাগান সি আই টি পার্ক থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমার পর স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবনে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে এবং তার পরে আজাদ হিন্দ বাগে স্বামীজীর প্রতিমূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হয়। বিভিন্ন ব্যান্ডদল, স্কাউটদল, ব্রতচারী দল, রামকৃষ্ণ সেবাদল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং স্বামীজী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাণীসমূহ ও সঙ্গীতাদি প্রভাত ফেরীর অঙ্গ ছিল। বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র কলিকাতার শেরিফ, শ্রীশান্তিপদ ঘোষ, শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদুর্গাপদ ব্যানার্জী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমাণিক দাস রায়, শ্রীগৌর পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রভাত ফেরী পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, জাতীয় যুব সংঘ, সিমুলিয়া এ-সি ন্যাশনাল এস-সি, সেন্ট্রাল সুইমিং জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ প্রভৃতি মাল্যদান করেন। সঙ্গীতাঞ্জলিতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচালনায় বৌবাজার 'মন্দিরা চক্র' শ্রীসত্যচরণ দে'র পরিচালনায় ভক্তিসঙ্গীত, শ্রীদিলীপ ঘটকের পরিচালনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান, যন্ত্রসংগীতে শ্রীসুব্রত দে। বন্দনা ও বিবেকানন্দ গীতিতে অংশ গ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, সেবাকেন্দ্র, নিবেদিতা স্মৃতি সংঘ, সুবল সাহা ও অনিল কর সম্প্রদায়, গীতা সেনগুপ্ত। বেদ ও বাইবেল পাঠ করেন যথাক্রমে কাশীধামের তিনজন পণ্ডিত ও আচার্য প্রবোধকুমার অধিকারী। সেহালার অনুষ্ঠানে বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে মেজর জেনারেল জ্যোতির্ময় চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পাঠ, আবৃত্তি ও আলোচনায় যোগদান করেন শ্রীমতী সান্ত্বনা পাল, স্বাতী লাহিড়ী। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অধ্যাপক নির্মল বসু, ডক্টর রমা চৌধুরী, ডঃ নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী সর্বশ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধীরেন্দ্র বসু, সমর সরকার।

বিচিত্রানুষ্ঠান : সম্প্রতি এ টি এস হলে ইছাপুরে এ টি এস সারা ভারত (উত্তর) প্রাক্তন ছাত্রদের সারাদিনব্যাপী পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল নানান আকর্ষণীয় আয়োজন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠান। বিচিত্রানুষ্ঠানে ছিলেন নামী শিল্পীরা : সর্বশ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, প্রীতি চক্রবর্তী, রথীন ভট্টাচার্য, দুই বেচারা, অরুন্ধতী গঙ্গোপাধ্যায়, সাগ্নমারা ও তপন দত্ত।

জাপানে তরুণ যোগী যাদুকর মৃণাল রায়

যাদুবিদ্যা ভারতীয় শিল্পকলারই এক অঙ্গ অন্যান্য কলাশিল্পের মত যাদু-বিদ্যাও প্রেরণা হোলো অধ্যাত্ম চেতনা। যাদুবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা একথা বলেছিলেন পি সি সরকার। 'সরকার তাঁর ইন্দ্রজাল এক বিশ্বকে জয় করেছিলেন। তাঁরই সাধনা ধারাকে বিদেশে বহমান রেখেছেন বাঙ্গালী তরুণের যাদুকর মৃণাল রায়। তিন মাস আগে যাদুনাটক 'মায়ামহল' নিয়ে জাপান যাত্রা করেন তরুণ যোগী যাদুকর মৃণাল রায়।

গত সপ্তাহে জাপান থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল শ্রীরায়ের যাদুখেলার নাট্য পরিকল্পনা ওর্দেলের পুলীমহলের এবং সাংবাদিক জগতের প্রকৃষ্ট সাধুবাদ কুড়িয়েছে। যাদুনাটকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো যেমন : করাত-কাটা খেলা, আজব দেশ, নাইট ক্লাব এবং অলৌকিকতার শিল্পসম্মত প্রয়োগনৈপুণ্য বিদেশীদের মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছে। ইতিমধ্যে আটটি অনুষ্ঠান হয়ে গেছে আরো বাইশটি অনুষ্ঠান বাকী। দৈনিক দুটি করে শো-এ হাউসে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। এ পর্যন্ত শ্রীরায় পঞ্চাশটি শহরে 'মায়ামহল' মঞ্চস্থ করেছেন।

জুনিয়র পি সি সরকার সম্মানিত : যাদুকর জুনিয়র পি সি সরকারকে জাপানের কালচারাল সোসাইটি 'সামুরাই' অ্যাকাডেমী পুরস্কার দিয়েছেন। গত ১১ মার্চ টোকিওতে ১০০তম 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনীর সময় জুনিয়র পি সি সরকারকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। জাপানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্লাটিনামের তরবারি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। একজন অ-জাপানী এই প্রথম 'সামুরাই' পুরস্কার পেলেন। জাপানের বিভিন্ন শহরে তিনি আরও প্রদর্শনী করবেন। ইতিমধ্যে কোরিয়ার বিভিন্ন শহরে তিনি যাদু প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন।

শনিবার ১৭ই এপ্রিল ৬টা
প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে
শতাব্দী ॥ বাদল সরকারের
ইন্দ্রপুরের রূপকথা
টিকিট : ১, ২, ৩ এডিন হলে
—আসুন বিকেলের শোতে—

অভিনব সিনেমা মাসিক পত্রিকা
আলোছায়া
প্রতি সংখ্যায় থাকে রহস্য উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প, শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প, বিভিন্ন অভিনব ফিচার, গান স্বরলিপি, মনস্তাত্ত্বিক যৌনতথ্য ও অসংখ্য সিনেমার রঙীন ছবি।
প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ ॥ বার্ষিক ৬
১৭/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

খেলার কথা

বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা সোবার্স

ক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতবর্ষের বিপক্ষে সদ্যসমাপ্ত চতুর্থ টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে কিষেণচাঁদের উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উইকেট পূর্ণ করেন এবং সেই সূত্রে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন যা বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে গণ্য। বর্তমানে সোবার্সের ৮০টি সরকারী টেস্ট খেলার পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে: মোট রাণ ৭২৪১ এবং মোট উইকেট ২০২। এখানে উল্লেখ্য, অপর কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে এমন কি মোট ৩০০০ রাণ করা এবং মোট ১০০ উইকেট পাওয়া সম্ভব হয়নি। এই কৃতিত্বের নিকট দূরত্বে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার। তার টেস্ট পরিসংখ্যান এই রকম দাঁড়ায়: ৫৫টি খেলায় মোট রাণ ২৯৫৮ এবং মোট উইকেট ১৭০। মিলার মাত্র ৪২ রাণের জন্যে লক্ষভ্রষ্ট হন।

আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে গারফিল্ড সোবার্স নিঃসন্দেহে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড়। তিনি যেমন ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন অপর কোন একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া দক্ষ অধিনায়ক হিসাবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। সোবার্স সহজাত ক্রিকেট খেলোয়াড়, কখনও কোচের দ্বারস্থ হন নি। তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের এই বিরাট সাফল্যের মূলে আছে বার্বাডোজের ক্রিকেট খেলার অনুকূল পরিবেশ এবং বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে ক্রিকেট খেলার সূত্রে অভিজ্ঞতা। সোবার্স একজন খাঁটি ন্যাচারাল খেলোয়াড়—বাঁ-হাতেই ব্যাট এবং বল করেন।

সোবার্সের বিবিধ টেস্ট রেকর্ড

একটি সিরিজে মোট রান

৮২৪ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮, নট আউট ২ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট-আউট ৩৬৫, সেঞ্চুরী ৩, এবং গড় ১০৭-৩৩), বিপক্ষে পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮।

দ্রষ্টব্য: একটি টেস্ট সিরিজে যাঁরা উল্লেখযোগ্য মোট রান (৮০০ রানের ভিত্তিতে) করেছেন সেই দলের ৭ জনের তালিকায় সোবার্সের স্থান ৩য়। এই ৮২৪ রান সংগ্রহের সূত্রে তাঁর গড় ১০৭-৩৩ রান দাঁড়িয়েছে তা রেকর্ড

টেস্ট ক্রিকেটে গারফিল্ড সোবার্স

১৯৭১ সালের ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত

	ব্যাটিং				বোলিং	
বিপক্ষে	টেস্ট খেলা	মোট রান	এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী	রান	উইকেট
ইংল্যান্ড	২৯	২৮০৮	২২৬	৯	২৭৩৪	৮২
অস্ট্রেলিয়া	১৯	১৫১০	১৬৮	৪	২০২৫	৫১
ভারতবর্ষ	১৭	১৭৮৮	১১৮	৭	১৪০৪	৫৬
পাকিস্তান	৮	৯৮৪	৩৬৫*	৩	৪৫৫	৪
নিউজিল্যান্ড	৭	১৫১	৩৯	০	৩৫০	৯
মোট	৮০	৭২৪১	৩৬৫*	২৩	৬৯৬৮	২০২

ইন্ডিজের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ গড়ের রেকর্ড। এখানে উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রানের রেকর্ড: ৮২৭—ক্লাইড ওয়ালকট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫)।

৭০৯ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ১-বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৬, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০১-২৮), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫৯-৬০।

৭২২ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮ নটআউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান

গারফিল্ড সোবার্স

১৭৪ এবং গড় ১০০-১৪), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৬৬।

এক সিরিজে অল-রাউণ্ড সাফল্য

মোট ৪২৪ রান (গড় ৭০-৬৬) এবং মোট ২৩ উইকেট (গড় ২০-৩৬), বিপক্ষে ভারতবর্ষ, ১৯৬১-৬২

মোট ৭২২ রান (গড় ১০৩-১৪) এবং মোট ২০ উইকেট (গড় ২৭-২৫), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৬৬।

দ্রষ্টব্যঃ উক্ত দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে ১ম এবং বোলিংয়ে ৩য় স্থান।

খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১২৫ ও ১০৯ নটআউট—বিপক্ষে পাকিস্তান, জর্জটাউন, ১৯৫৭—৫৮

এক ইনিংসে সর্বাধিক রান

৩৬৫ নটআউট (বিশ্ব রেকর্ড) বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮।

উপর্যুপরি ইনিংসে সেঞ্চুরী

৩টিঃ ৩৬৫ নটআউট (কিংস্টন), ১২৫ এবং ১০৯ নটআউট (জর্জটাউন), বিপক্ষে পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮।

উপর্যুপরি ইনিংসে অর্ধ-শত রান

৬-বারঃ ৫২, ৫২, ৮০, ৩৬৫ নটআউট, ১২৫ ও ১০৯ নটআউট (বিপক্ষে পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮)।

উপর্যুপরি টেস্ট সেঞ্চুরী

৬টি : ১৯৫৭—৫৮ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে উপর্যুপরি ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরী—৩৬৫ নটআউট (কিংস্টন), ১২৫ ও ১০৯ নটআউট (জর্জটাউন) এবং ১৯৫৮—৫৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে উপর্যুপরি টেস্ট ম্যাচে ৩টি—১৪২ নটআউট (১ম টেস্ট, বোম্বাই), ১৯৮ রান আউট (২য় টেস্ট, কানপুর) এবং ১০৬ নটআউট (৩য় টেস্ট, কলকাতা)

একদিনের খেলায় সর্বাধিক রান

২০৮ রান (নটআউট ৩৬৫ রানের মধ্যে), বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭—৫৮।

উল্লেখযোগ্য পার্টনারশীপ রান

৪৪৬ রান (২য় উইকেটের জুটিতে) : হান্ট এবং সোবার্স, বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭—৫৮। এই ৪৪৬ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেটে যে কোন উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রান এবং ২য় উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড রানের (৪৫১ রান) থেকে মাত্র ৫ রান কম।

৩৯৯ রান (৪র্থ উইকেট জুটিতে) : সোবার্স এবং ওরেল, বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ব্রিজটাউন, ১৯৫৯-৬০।

দ্রষ্টব্য : ৪র্থ উইকেট জুটির বিশ্ব-রেকর্ড রানের থেকে ১২ রান কম।

৪০০০ রান এবং ১০০ উইকেট

১৯৬৫ সালের ৮ই মার্চ কিংস্টনে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের খেলায় ফিলপটের উইকেট নিয়ে সোবার্স তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের ১০০ উইকেট পূর্ণ করেন এবং সেই সূত্রে টেস্ট খেলায় মোট ৪০০০ রান এবং ১০০ উইকেট পাওয়ার বিশ্বরেকর্ড করেন। এই সময় তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান ছিল : খেলা ৪৮, মোট রান ৪১৫৫ এবং মোট উইকেট ১০০।

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউণ্ডারী

৩৪টি (নট-আউট ৩৬৫ রাণের মধ্যে)—বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮।

উপর্যুপরি টেস্ট খেলায় যোগদান

৭৯টি টেস্ট খেলা (বিশ্ব রেকর্ড)।

টেস্ট সেঞ্চুরী

২৩টি সেঞ্চুরী : বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড ৯, অস্ট্রেলিয়া ৪, ভারতবর্ষ ৭, পাকিস্তান ৩ এবং নিউজিল্যাণ্ড ০ (নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে এক ইনিংস-এর খেলায় সর্বোচ্চ রান ৩৯)।

সোবার্সের নেতৃত্ব

সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে যে ৭টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে তার ফলাফল : জয় ৩, পরাজয় ৩ এবং ড্র ১।

খেলাধুলা

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজঃ ৫০১ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লুইস ৮৮, কানহাই ৮৫ এবং সোবার্স নটআউট ১৭৮ রান। বেদী ১২৪ রানে ২ এবং আবিদ আলী ১২৭ রানে ২ উইকেট)

ও ১৮০ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ফ্রেডারিকস ৪৮ রান। আবিদ আলী ৭০ রানে ৩ এবং ভেঙ্কট রাঘবন ২৫ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষঃ ৩৪৭ রান (সারদেশাই ১৫০ এবং সোলকার ৬৫ রান। ডো ৬৯ রানে ৪, সোবার্স ৩৪ রানে ২ এবং হোল্ডার ৭০ রানে ২ উইকেট)

ও ২২১ রান (৫ উইকেটে। সুনীল গাভাস্কার নটআউট ১১৭ রান। সোবার্স ৩১ রানে ২ উইকেট)

ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৪২' টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই দুই দেশের ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ বর্তমানে ১-০ খেলায় (ড্র ৩) এগিয়ে আছে। সুতরাং শেষ ৫ম টেস্ট খেলা অন্তত ড্র রাখতে পারলেই ভারতবর্ষ 'রাবার' জয়ী হবে। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ আজও অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে রাবার জয়ী হননি।

দর্শক

ভারতবর্ষের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার তাঁর ৩০তম জন্মদিনে টসে জয়ী হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান।

প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ২২৪ রান সংগ্রহ করে। ২য় উইকেটের জুটিতে লুইস এবং কানহাই ১৬৬ রান তুলে নতুন রেকর্ড করেন। ২য় উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ডঃ ১০৩ রান (ক্যারু এবং ডেভিস, ৩য় টেস্ট, ১৯৭১)। ফিল্ডিংয়ের দোষে কানহাই দু'বার আউটের হাত থেকে খুব জোর বেঁচে যান। ভারতবর্ষের দুটি রান-আউটের আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের আধ ঘণ্টা পর ৫০১ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডেভিস (৭৯ রান) এবং সোবার্স ২১৮ মিনিট খেলে দলের ১৬৭ রান তুলেছিলেন এবং সোবার্স ও ফস্টারের অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১০৭ রান উঠেছিল। দ্বিতীয় দিনের একসময়ের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৩ ওভারে ৮৪ রান সংগ্রহ করেছিল। মধ্যাহ্নভোজ এবং চা-পানের মধ্যবর্তী সময়ের খেলায় রানের গতি বেড়ে যায়—৩১ ওভারে ১৫৩ রান। ভারতবর্ষ সব রকমের কৌশল প্রয়োগ করেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রানের গতি প্রতিরোধ করতে পারেনি। ভারতবর্ষের আক্রমণে কোন ধার ছিল না। সোবার্স দাপটের সঙ্গে খেলে ১৭৮ রান তুলে নট-আউট থাকেন। তিনি তাঁর ৩৩৯ মিনিটের খেলায় ১৯টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার বাউণ্ডারী করেন। টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে এই নিয়ে তিনি ২৩টা সেঞ্চুরী করলেন—ভারতবর্ষের বিপক্ষে তাঁর টেস্ট সেঞ্চুরী ৭টা।

খেলার উপযুক্ত আলো না থাকায় খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা আগে দ্বিতীয় দিনের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় রান দাঁড়ায় মাত্র ২ (১ উইকেটে)।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের স্কোর ছিল ৭৫ রান (৫ উইকেটে)। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন সারদেশাই এবং সোলকার। ভারতবর্ষের ৭০ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়েছিল। দলের কি শোচনীয় অবস্থা! চা-পানের সময় রাণ দাঁড়ায় ১৫৭ (৫ উইকেটে)। সারদেশাই ৫৮ এবং সোলকার ২৯ রাণ করে অপরাজিত ছিলেন। এই অবস্থায় ফলো-অন থেকে

অব্যাহতি পেতে ভারতবর্ষের আরও ১৪৫ রানের দরকার ছিল, হাতে জমা ছিল মাত্র ৪টি উইকেট। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ২৯৭ (৬ উইকেটে)। 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও ৫৫ রানের প্রয়োজন ছিল। সারদেশাই ১১১ রান এবং সোলকার ৫১ রান তুলে অপরাজিত ছিলেন। অসমাপ্ত ৭ম উইকেটের জুটিতে সারদেশাই এবং সোলকার ১৭৭ রান তুলে নতুন রেকর্ড করেন। ৭ম উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড ছিল ১৫৩ রান (মাধব আপ্তে এবং ভিনু মানকাদ, ত্রিনিদাদ, ১৯৫২-৫৩)। এখানে উল্লেখ্য, সারদেশাই এই নিয়ে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে ৫টি সেঞ্চুরী করলেন এবং বর্তমান টেস্ট সিরিজে ৩টি। তিনি প্রথম টেস্টে ২১২ রান এবং দ্বিতীয় টেস্টে ১১২ রান করেছিলেন।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের রান ছিল ৩৪৬ (৯ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন সারদেশাই (১৫০ রান এবং বেদী ২০ রান)। ভারতবর্ষের ২৫৬ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়েছিল—সোলকার ৬৫ রান করে আউট হন। ৭ম উইকেটের জুটিতে সোলকার এবং সারদেশাই দলের ১৮৬ রান তুলেছিলেন। এই জুটিই পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে শোচনীয় পরাজয় থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম টেস্টে সারদেশাই এবং সোলকারের ৬ষ্ঠ উইকেট জুটি ১৩৭ রান তুলে ঠিক এইভাবেই দলকে বিপদমুক্ত করেছিলেন।

ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের শেষ দিকটা খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। ২৫৬ রানের মাথায় যখন ৭ম উইকেট পড়ে ভারতবর্ষ তখনও 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি লাভের নির্দিষ্ট ৩০২ রানের থেকে ৪৬ রানের পিছনে ছিল। ভারতবর্ষের ৯ম উইকেট পড়েছিল ২৮৫ রানের মাথায়। সারদেশাইয়ের সঙ্গে শেষ খেলোয়াড় বেদী ১০ম উইকেটের জুটি বাঁধেন। ভারতবর্ষের ৩০২ রান পূর্ণ হওয়ার আগেই বেদী দু-বার আউট হওয়া থেকে রক্ষা পান। ফলে ভারতবর্ষও 'ফলো-অন' করা থেকে ছাড়ান পায়। লাঞ্চের ৭ মিনিট পর ৩৪৭ রানের মাথায় সারদেশাই তাঁর ১৫০ রান করে আউট হলে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ১০ম উইকেটের জুটিতে সারদেশাই এবং বেদী (নটআউট ২০ রান) ৬০ মিনিটের খেলায় ঝড়ের গতিতে যে ৬২ রান তোলেন তা এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তাঁদের এই ৬২ রান হল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে যে কোন বিদেশী দলের পক্ষে টেস্ট খেলায় ১০ম উইকেট জুটির সর্বাধিক রানের রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড ৫৬ রান—লেকার এবং বাটলার (ইংল্যান্ড), ত্রিনিদাদ, ১৯৪৭-৪৮।

সারদেশাই ৩৫৪ মিনিট খেলে তাঁর ১৫০ রানে ২০টা বাউন্ডারী করেছিলেন। বর্তমান সিরিজে এই নিয়ে তিনি তিনটি সেঞ্চুরী করলেন।

চতুর্থ দিনের খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২য় ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ১৭৫ রান তুলেছিল।

দিলীপ সারদেশাই

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাত্র এক ওভার খেলে ১৮০ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় তাদের ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। উইকেটে ভারী ওজনের রোলার ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা শেষ দিনেও ব্যাট করতে নেমেছিল। তবে এই সুযোগ নিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে কাবু করতে পারেনি। খেলায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ৩৩৫ রানের প্রয়োজন ছিল, যা শেষ দিনের খেলায় সংগ্রহ করা মোটেই সহজ ছিল না। ভারতবর্ষের ৭১ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়লে খেলার গতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনুকূলে ঘুরে যায়। এই সঙ্কটকালে জয়সীমা দৃঢ়তার সঙ্গে গাভাস্কারের জুটিতে ৯৬ মিনিট খেলে দলকে বিপদমুক্ত করেন। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৩৭ (৪ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন গাভাস্কার (৭০ রান) এবং সারদেশাই (২ রান)। ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের ২২১ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় ৪র্থ টেস্ট খেলা শেষ হলে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার ১১৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। বর্তমান টেস্ট সিরিজে তাঁর পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৩, ইনিংস ৬, নটআউট ৩ বার, সেঞ্চুরী ২ এবং মোট রান ৪০০। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বর্তমান টেস্ট সিরিজে দিলীপ সারদেশাইয়ের পরিসংখ্যান : খেলা ৪, ইনিংস ৬, নটআউট ০, সেঞ্চুরী ৩ এবং মোট রান ৫৪৬। তিনি আর মাত্র ১৫ রান সংগ্রহ করলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক মোট রানের ভারতীয় রেকর্ড করবেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে মোট সর্বাধিক রানের ভারতীয় রেকর্ড ৫৬০—রুসী মোদী (১৯৪৮-৪৯) এবং পলি উমরীগড় (১৯৫২-৫৩)। ভারতবর্ষের বিপক্ষে এই বিষয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেকর্ড : ৭৭৯ রান (গড় ১১১-২৮)—এভার্টন উইকস (১৯৪৮-৪৯)।

সোবার্স ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের খেলায় বিশ্বনাথের উইকেট নিয়ে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে ২০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন।

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল

১৯৭১ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই ৪৮ রানে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতার ৩৭ বছরের ইতিহাসে উপর্যুপরি ১৩ বার এবং মোট ২২ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। বোম্বাই দলের পক্ষে এ-বছরের রঞ্জি ট্রফি জয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তারা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে খেলায় নামেনি, তাদের পাঁচজন শক্তিশালী খেলোয়াড় ভারতীয় ক্রিকেট দলে নির্বাচিত হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর করছেন। এখানে আরও উল্লেখ্য, বোম্বাই ২৩ বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে খেলে যে ২২ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে, তার মধ্যে উপর্যুপরি জয় ১৩ বার (১৯৫৯-৭১)—যা আজও যে-কোন দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি সর্বাধিকবার জাতীয় ট্রফি জয়ের বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে গণ্য।

প্রথম দিনের খেলায় বোম্বাই ৮ উইকেট খুইয়ে ২৪১ রান সংগ্রহ করেছিল। তাদের খেলার সূচনা সুবিধার হয়নি। মাত্র ১২ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে রামনাথ পার্কার (১০৮ রান) এবং অজিত নায়েক (৪২ রান) ১৪২ রান তুলে দলের পতন রোধ করেন।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাই দলের ১ম ইনিংস ২৮৭ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেট খুইয়ে ১৭৯ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্র দলের ১ম ইনিংস ২৩০ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে বোম্বাই ৫৭ রানের ব্যবধানে অগ্রগামী হয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৩০ রান তুলে ১৮৭ রানে এগিয়ে যায়।

চতুর্থ দিনে বোম্বাই দলের ২য় ইনিংস ১৯৬ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৫৪ রান তুলতে মহারাষ্ট্র ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৫ উইকেট খুইয়ে ১৪৪ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় জয়লাভের জন্য তাদের আরও ১১০ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে জমা ছিল ৫টা উইকেট।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের আধঘণ্টা আগে মহারাষ্ট্রের ২য় ইনিংস ২০৫ রানের মাথায় শেষ হলে বোম্বাই ৪৮ রানে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বোম্বাই : ২৮৭ রান (রামনাথ পার্কার ১০৮ এবং অজিত নায়েক ৪২ রান। শেখ ৫৬ রানে ৩ এবং সালদানা ৬৬ রানে ৬ উইকেট)।

ও ১১৬ রান (ভোঁসলে ৫৫ এবং সম্পৎ ৬০ রান। সোহনী ৪১ রানে ৩ এবং যোশী ৬২ রানে ৫ উইকেট)

মহারাষ্ট্র ২০০ রান (সালদনা ৫০ এবং বোরদে ৪৮ রান। অজিত পাই ৭৫ রানে ৩ এবং আবদুল ইসমাইল ৪১ রানে ৪ উইকেট)

ও ২০৫ রান (বোরদে ৫১ রান। ইসমাইল ৯৭ রানে ৩ এবং শিভালকার ৫৬ রানে ৬ উইকেট)

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

জাপানের নাগোয়া শহরে আয়োজিত ৩১তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীন মোট ৭টি খেতাবের মধ্যে ৪টি খেতাব জয়ী হয়ে সর্বাধিক খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। বাকি তিনটি খেতাবের একটি করে পেয়েছে জাপান, হাঙ্গেরী এবং সুইডেন। প্রজাতন্ত্রী চীন এই ৪টি খেতাব পেয়েছে—পুরুষদের দলগত বিভাগের সোয়েথলিং কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগে মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব। বাকি তিনটি খেতাবের মধ্যে জাপান পেয়েছে ১টি (মহিলাদের দলগত বিভাগের কোর্বিলোন কাপ), হাঙ্গেরী ১টি (পুরুষদের ডাবলস) এবং সুইডেন ১টি (পুরুষদের সিঙ্গলস)। এখানে উল্লেখ্য গতবার অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ৩০তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান ৪টি, রাশিয়া ২টি এবং সুইডেন ১টি খেতাব জয়ী হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রী চীন অনির্দিষ্ট কারণে ১৯৬৫ সালের পরবর্তী দুটি আসরে (১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে) প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেনি।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত বিভাগে অনেকেই অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করেছেন। গতবার যাঁরা ব্যক্তিগত বিভাগের খেতাব পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী জাপানের সিগিও ইতো এ-বছরের ফাইনালে উঠেছিলেন। এবার প্রজাতন্ত্রী চীনের মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের ফলে জাপানের দীর্ঘদিনের একটানা প্রাধান্য খর্ব হল। জাপান উপর্যুপরি ৭ বার এই মিক্সড ডাবলস খেতাব পেয়েছিল।

ত্রিমুকুট সম্মান লাভ

প্রজাতন্ত্রী চীনের লিন হুই-চিং মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে ত্রিমুকুট সম্মান লাভ করেছেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস: স্টেল্যান বেংগটসন (সুইডেন) ২১-১৭, ১৯-২১ ২১-১৩ ও ২১-১৩ পয়েন্টে ১৯৬৯ সালের চ্যাম্পিয়ান সিগিও ইতোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: টিবোর ক্লাম্পার এবং ইস্ট ভান জনিয়ার (হাঙ্গেরী) ১৯-২১, ২১-১৬, ২১-১৩ ও ২১-১৬ পয়েন্টে চুয়াং টিসে—তাং এবং লিয়াং কো লিয়াংকে (প্রজাতন্ত্রী চীন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: লিন হুই-চিং (প্রজাতন্ত্রী চীন) ২১-১৭, ২১-১৩, ১৩-২১ ও ২১-১৯ পয়েন্টে চেং মিন চীহকে (প্রজাতন্ত্রী চীন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস: লিন হুই-চিং এবং চেং মিন চীহ (প্রজাতন্ত্রী চীন) ২১-৯, ২১-৬, ১৩-২১ ও ২১-১৭ পয়েন্টে মিকো হামাদা এবং মিকো সাকামাতোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: লিন হুই-চিং এবং চাং সীন-লিন (প্রজাতন্ত্রী চীন) ২১-১৯, ১৩-২১, ২১-১৬ ও ২১-১৮ পয়েন্টে এ্যান্টন স্টিপানসিক (যুগোস্লাভিয়া) এবং মারিয়া আলেকজান্দ্রুকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

বিদেশের মাটিতে ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় জয়

ভারতবর্ষ বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ৫১টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলে এপর্যন্ত ৪টি টেস্ট খেলায় জয়ী হয়েছে—১৯৬৮ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩টি এবং ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১টি।

নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে (জয় ৩):
১৯৬৮ সাল:

৫ উইকেটে (১ম টেস্ট, ডুনেডিন)
৮ উইকেটে (৩য় টেস্ট, ওয়েলিংটন)
২৭২ রানে (৪র্থ টেস্ট, অকল্যাণ্ড)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে (জয় ১):
১৯৭১ সাল:
৭ উইকেটে (২য় টেস্ট, ত্রিনিদাদ)

জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ানশিপ

রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজিত জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগি[তায়] বাংলার কুমারী শিখা সেন ৩টি খেতা[ব] জয়ের সূত্রে মহিলা ও বালিকা বিভা[গে] ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। বাংলা এই তিনটি বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—মহিলা বিভাগ, বালক বিভাগ এবং বালিকা বিভাগ।

দলগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ: মহারাষ্ট্র (৩৮ পয়েন্ট)
মহিলা বিভাগ: বাংলা (২৪ পয়েন্ট)
বালক বিভাগ: বাংলা (২৫½ পয়েন্ট)
বালিকা বিভাগ: বাংলা (১৪ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

পুঃ বিভাগ: বি মালকম (মহারাষ্ট্র) ১৪ পঃ
মহিলা বিভাগ: শিখা সেন (বাংলা) ১৩ প
বালক বিভাগ: চয়ন চৌধুরী (বাং) ১০ প
বালিকা বিভাগ: শিখা সেন (বাং) ১০ প

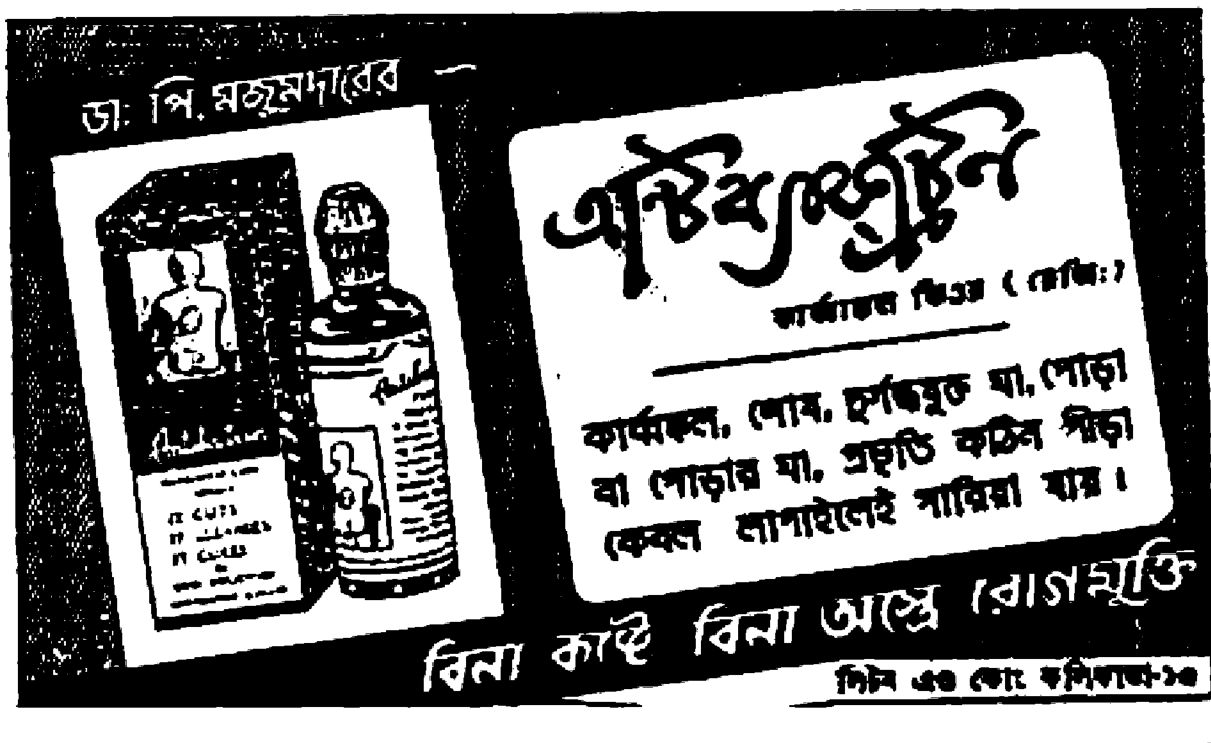

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক : শ্রেষ্ঠ রচনা

শংকর-এর

সীমাবদ্ধ

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যতিক্রম। বড় আলো-ঝিলিক অফিসের উঁচুতলার মানুষের নিচুতলার কাহিনী এইভাবে আর কখনও উদ্ঘাটিত হয়নি।

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

— ছটাকা —

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের

জঙ্গলে জঙ্গলে ৫৲

বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য গ্রন্থ

লীলা মজুমদারের

পাখী ৫৷৷

সাময়িকপত্রে প্রশংসায় মুখর ই অসংখ্য অভিনন্দন লাভে ধন্য।

প্রমথনাথ বিশী ও বীথিকা চক্রবর্তীর

বঙ্কিম সাহিত্য বিচার ১২৷৷

বঙ্কিম-সাহিত্য-আলোচনার উপযোগী একটি সহায়ক গ্রন্থ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বৃহত্তম উপন্যাস

নগর পারে রূপ নগর ১৮৲

জরাসন্ধের

লৌহকপাট

সমগ্র-সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধা

॥ কুড়ি টাকা ॥

জরাসন্ধের লৌহকপাট বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ সম্পদ—একথা বললে বর্ণনা মাত্র হয়, বাড়ান হয় না। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে যে সব মানুষ চোর ডাকাত তাদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করছে—তারা মানুষই, সাধারণ মানুষের দুর্বলতাই তাদের এই সব অপরাধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতাও তাকে বলা যায় না—মনুষ্যত্বের দায়েই এমন করছে তারা—কোন কোন ক্ষেত্রে অপরের অপরাধের শাস্তিও। এদের কথা এমন সহৃদয়তার সঙ্গে আর কোন দেশে কোন ভাষায় লেখা হয়নি। তাই এই গ্রন্থখানির বিভিন্ন খণ্ড বহু সহস্র কপি করে বিক্রী হয়েছে। তবু আজও এর চাহিদা কমেনি। এবার সেই সব কটি খণ্ড একত্রে ডিলাক্স সংস্করণে প্রকাশিত হল।

আবদুল জব্বারের

বাংলার চালচিত্র ১০৲

ভবতারণ দত্ত সঙ্কলিত

বাংলা দেশের ছড়া ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৮৲

কালিকারঞ্জন কানুনগোর

রাজস্থান কাহিনী ৮৷৷

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ইছামতী ৯৲ অনুবর্তন ৬৲

লীলা মজুমদারের

আর কোনখানে ৫৲

সুকুমার রায় ৪৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে ৯ রাত্রির তপস্যা ৮৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সেই মরু প্রান্তে ১১৲

হাসপাতাল ৮৲ অপারেশন ৭৷৷

মিত্র ঘোষের **বাংলা পকেট বইয়ের**

প্রথম দফার সাতখানি বই একদিনেই প্রায় এক সহস্র কপি বিক্রী হয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করল। প্রায় মুমূর্ষু বাংলা-সাহিত্য-বাজারে এইভাবে নব আশা ও প্রেরণা সঞ্চার করার জন্য সমগ্রভাবে বাঙ্গলী পাঠক সমাজকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আশা করছি এই পৃষ্ঠপোষকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে।

প্রতি খণ্ড ২। সুন্দর ছাপা, নামী লেখক। সব কটিই সম্পূর্ণ উপন্যাস।

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে
ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়...তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। **ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।**

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

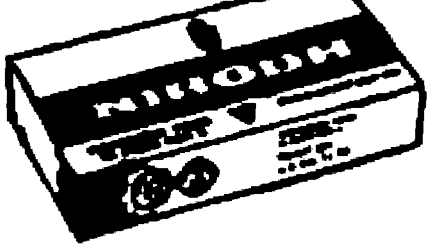

নিরোধ ▼

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

বহুপ্রতীক্ষিত গ্রন্থখানি
প্রকাশিত হইয়াছে—

"দুর্গামা"

শ্রীশ্রীসারদামাতার মানসকন্যা,
তপস্বিনী গৌরীমাতার উত্তরসাধিকা,
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের পরিচালিকা,
দুর্গামাতার অপূর্ব জীবনচরিত।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।
(৪৮৮ পৃষ্ঠা, ২১ খানি ছবি)
মূল্য—আট টাকা

॥ ডাকযোগে লইলে মনিঅর্ডারে দশ টাকা পাঠাইবেন — আশ্রম-সম্পাদিকার নিকট। রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে গ্রন্থখানি যাইবে ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান
আকর্ষণীয়

অজস্র চিত্র সম্বলিত
বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্য : চার টাকা
লেখকের

আর একখানা বই

আরও বিচিত্র কাহিনী

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম : চার টাকা

প্রকাশক :
এম সি সরকার এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিমিটেড

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৫০ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 23rd, April, 1971, শুক্রবার, ৯ই বৈশাখ, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮৮৪	চিঠিপত্র		
৮৮৬	সাদাচোখে		—শ্রীসমদর্শী
৮৮৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৮৯১	সম্পাদকীয়		
৮৯২	এক নজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৮৯৩	বাংলাদেশ	(কবিতা)	—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৮৯৪	রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ		—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
৮৯৬	চাণক্য চাকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা	(রহস্য উপন্যাস)	—শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
৯০২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৯০৫	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৯০৭	রাধা	(গল্প)	—শ্রীসতীকান্ত গুহ
৯১৫	দশিবন্দুর চোখে		—শ্রীসহিংস্র
৯১৯	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৯২৫	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৯২৭	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৯৩০	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৯৩৬	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৯৩৯	চান	(গল্প)	—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৪০	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৯৪৬	অপার শিল্পের নায়িকা		—শ্রীবিমল বসু
৯৪৭	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৯৫২	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৯৫৪	খেলার কথা		—শ্রীক্ষেত্র ভট্টাচার্য
৯৫৫	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
৯৫৬	ত্রৈমাসিক সূচীপত্র		

VANGUARD
JHAMAPUKUR
HOSIERY-CAL-9

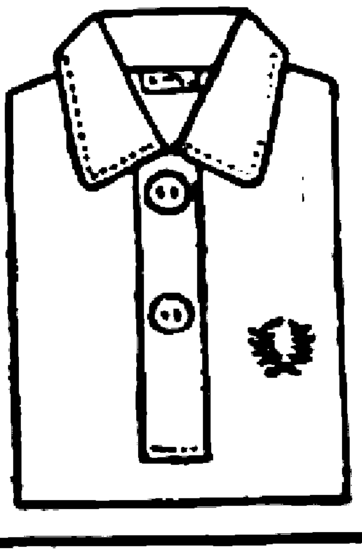

★ COOLTY & TURKISH
★ WHITE & COLOURED
★ ALL SIZES AVAILABLE

JHAMAPUKUR HOSIERY FACTORY (PRIVATE) LTD
22/A, Kalidas Singha Lane, Calcutta-9 35-4832

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

একটি অভিযোগ ও প্রস্তাব

সমালোচনা প্রকৃত শিল্প হতে পারে এবং কখনো কখনো তা হয়ও, সুরেশ সমাজপতি অথবা সজনীকান্ত, তালিকা বাড়াতে চাই না, আরও দু-একজন ছিলেন অদ্যাবধি আছেন, যাঁরা সমালোচনাকে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছিলেন ও পেরে থাকেন। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই বা কাদামাটির ছিটে। অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে প্রতি সপ্তাহেই বেশ কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, যাতে অমৃতে প্রকাশিত গল্প উপন্যাস এবং অন্যান্য গদ্যের সমালোচনা করে থাকেন মনোযোগী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ। কবিতার সমালোচনা দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। এই চিঠিপত্রগুলির বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি অভিযোগ আছে। আশা করি এই চিঠি অমৃতে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

এই আলোচনাগুলি লক্ষ্য করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যা প্রায় শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে 'কমন'—অর্থাৎ অমুকের অমুক লেখাটি পড়লাম...লেখককে অভিনন্দন না জানিয়ে থাকতে পারছি না... অথবা এরকম কুরুচিপূর্ণ লেখা অমৃতের মত কাগজের মানহানি করেছে...লেখক এত সুন্দরভাবে আমাদের চারপাশের ছবি তুলে ধরেছে যে...ইত্যাদি ইত্যাদি। মূলত ছোট গল্প ও উপন্যাসের সমালোচনাই জুড়ে থাকে দুটি পুরো পৃষ্ঠা।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, এই সমস্ত বন্ধকে গল্পকার কেবল গল্প বলার জন্যই কলম ধরেন। অন্তত তরুণেরা। গল্প অবশ্যই আছে, থাকে, কিন্তু গদ্যকারের হাত থেকে আরও অনেক মণিমুক্তো জন্ম নেয়, গদ্যের শরীরে ছড়িয়ে থাকে যা। উপস্থাপনা, আঙ্গিক ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত তো নয়ই বরং মূলে গল্পটি ছাড়িয়ে কখনো কখনো এগুলো লেখকের পরিচয় বহন করে। গদ্যচর্চার ফলে ভাষার এত উন্নতি হয়েছে, হাজারো নতুন শব্দ ছড়ানো থাকে—তা অমৃতের চিঠির প্রেরকরা সাধারণত লক্ষ্য করেন না, যেমন লক্ষ্য করেন না একটি লেখার পিছনে লুকোনো যন্ত্রণাকে, আবেগতাড়িত চঞ্চল অথচ সংযত কলমের সন্তানদের। চরিত্রচিত্রণের ক্ষমতাকে অসম্মান করতে চাই না, কিন্তু যে সমালোচক গল্প-উপন্যাসে একমাত্র নিজের প্রতিমূর্তিই দেখতে চান, সনাতন চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেন অমৃতে—সে ধরনের সমালোচনা প্রকাশ করবার কি যুক্তি থাকতে পারে? যা আলোচনা কিন্তু সমালোচনা নয়। অমৃতে প্রকাশিত চণ্ডী মণ্ডল, স্বপন চক্রবর্তীর গল্পে যে অজস্র কারুকাজ নজর কাড়ে, দিবানিদ্রার ঝোঁকে তা অবশ্যই পরিষ্কার হয় না।

আরও একটি কথা : অমৃত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলিতে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা নিশ্চয়ই থাকে। অদ্যাবধি তা নিয়ে কখনো কেউ অভিযোগ করেন নি। যেমন গত বছরের গল্প সংকলনে অনায়াসেই আপনারা অনেককে বাদ দিয়েছিলেন। প্রবীণ দু' চারজন বাদ পড়লে অবশ্য বিশেষ যায় আসে না, কিন্তু যাঁরা তরুণ, শক্তিমান অথচ অপরিচিত? কমলকুমার মজুমদার অবশ্য প্রবীণ লেখক—কিন্তু বাংলা গদ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, থাকা উচিত ছিল তাঁর ছোটগল্প। যেমন অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে বাদ পড়েছেন—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মত লেখক। এ নিয়ে কাউকে সরব হতে দেখা যায় নি। আশঙ্কা অমূলক নয় যে, আধুনিক ছোটগল্পের যাঁরা বিশিষ্টতম লেখক, তাঁদের কারো লেখাই অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগের লেখক-লেখিকাবৃন্দ পড়েননি। অমৃতের গল্প সংকলনে যে কয়েকটি অসাধারণ গল্প ছিল, তার লেখকদের মধ্যে ছিলেন, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদিরা। সোমেন চন্দকে ভোলা পাঠক-পাঠিকার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে অন্য দুজনের, অস্থি-রক্তমাংসে দিয়ে আজকের ছোটগল্পের শরীরের বেশ কিছু নির্মিত। যশোদাজীবন ভট্টাচার্য হালকা গল্প লেখেন না, চিঠিপত্র বিভাগে তাঁর গদ্যরীতি নিয়ে কখনো আলোচনা হয়েছে? শারদীয় অমৃতে প্রকাশিত উপন্যাসের প্রচুর আলোচনা (ইচ্ছে করেই সমালোচনা শব্দটি ব্যবহার করছি না) বেরিয়েছে। একক প্রদর্শনীর মাত্র একটি, যেটি নিতাই বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। একই ভাব, একই বাক্যবিন্যাস ও সংলাপের রাস্তায় জোড়া পান বার বার মুখে ফেললে, অবশেষে চিঠিপত্রগুলি পড়ার ইচ্ছেও থাকবে না।

একজন সৎ লেখক এই জাতীয় আলোচনা বা প্রশংসা থেকে আরো লেখার উৎসাহ পান, এমনও ভাবা চলে না। এতে বরং প্রমাণ হয়, তাঁর প্রচারবৃদ্ধি ঘটেছে। যে আলোচনা পাঠান্তে অনায়াসেই লেখক বুঝতে পারেন তাঁর লেখার একটা বড় মহাদেশই পাঠকের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেল, তাঁর নিশ্চয়ই তখন দুঃখ হতে পারে। যাঁরা পাঠকের প্রত্যাশী নন, তাঁদের কথা অবশ্যই বাদ দিচ্ছি। লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিয়ে অমৃতে কিছু ভালো আলোচনা বেরিয়েছিল। আমরা আশা করব, সৎ পাঠকেরা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল হবেন। বহুবার আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাব রাখা হয়েছে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ভালো লেখাগুলির পুনর্মুদ্রণ করা হোক—হয়নি সে তো দেখাই যাচ্ছে। অমৃতের মানহানির আশঙ্কা অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক।

আলোচনার উপযুক্ত সমালোচনা হলে বাধিত হব।

চন্দন দাশগুপ্ত,
নব্বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের উপাদান প্রসঙ্গে

আপনাদের বহুল প্রচারিত অমৃত (১০ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৫শ সংখ্যা) পত্রিকায় স্মরজিৎ চক্রবর্তীর 'উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের উপাদান' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি ৮৩১ পৃঃ ২য় কলমে উদ্ধৃত করেছেন :

"নিভাতারির ভাতার পাব
মঙ্গল চণ্ডীর বরে।।"

লেখক 'নিভাতারির' কথাটির অর্থ সুস্পষ্ট করতে পারেন নি। পাঠকবর্গও কথাটির অর্থ ঠিকমত ধরতে পারবেন কিনা সন্দেহ। লেখকের উচিত ছিল 'নি-ভাতারির' এরকম করে লেখা। নাই ভাতার (অর্থাৎ স্বামী) যার, নি-ভাতারি।

৮৩২ পৃঃ ১ম কলমে আছে :—
'মারে না শিখান্দু বাছা শিকার করন ধর।'

আবার শেষের দিকে উদ্ধৃত করেছেন :
'মারে না শিখান্দু লাছা বত নিয়ম-নীতি।'
—এখানে 'লাছা' বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি কি 'বাছা' ও 'লাছা' দুটি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করতে চেয়েছেন? তাহলে তিনি ঠিক বোঝেন নি। লাছা মানে বাছা নয়।

ঐ একই পৃষ্ঠায় আছে :—
'শুর শাশুড়ি তোর হয় গুরুজন।'
এবং ঐ পৃষ্ঠার মধ্যখানে আছে :—

'প্রথমে সেইস অম শশুর সমাগম।'

'শুর' = 'শশুর'। এ-কথাই কি তিনি পাঠক-বর্গকে বোঝাতে চেয়েছেন। মূল পাণ্ডুলিপিতে কি তাই আছে? আমার জানতে বিশেষ আগ্রহ হয়। যদি থেকেও থাকে তাহলে তা ভুল, রাজবংশী সমাজে 'শশুরকে 'শুর'

চিঠিপত্র

বলতে কখনোও শোনিনি। আবার ঐ একই পৃষ্ঠায় তিনি উদ্ধৃত করেছেন:—

'আরি জয় জায়ের সংগে জলক লাগি যাবু।' আরি=আর, জয়—বউ, জায়ের=জায়েরে, সংগে=সঙ্গে, জলক=জলের, লাগি=জন্য, যাবু=যাবো। এখানে জয়=বউ। 'জয়' শব্দটিতে 'জ'-এর পরিবর্তে 'য' ব্যবহার করলে অর্থটি তাড়াতাড়ি সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। কারণ 'জয়' বলতে (বাংলায়) বুঝি 'বিজয়'। কিন্তু বর্তমানে রাজবংশী ভাষায় 'জয়' ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং মূল পান্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত করার সময় এই শব্দের রকমফের দেখা উচিত ছিল। আবার ঐ একই পৃষ্ঠায়:—

'গৃহস্থির কথা কন্যা শুন মন দিয়া।'
শেষ লাইনে (১ম কলমে) লিখেছেন:—
'কহিলাম গৃহস্থির কতা এই মত পৌরষ।'
গৃহস্থির-গৃহস্থির, কথা-কতা। লেখকের এখানে একই কথা উদ্ধৃত করতে বানানের এত পার্থক্য কেন? রাজবংশীতে 'গৃহস্থির' কথাটাই আসল। কথা বা কতা এ দুটো শব্দ রাজবংশী ভাষায় নিজস্ব নয়। বিশেষ করে 'কথা' শব্দটি। রাজবংশীতে কথা-'কাথা' (রাজবংশী অভিধান, কালিন্দ্রনাথ বর্মন)। 'কতা' শব্দটি 'আসামী' রাজবংশী অঞ্চলে খুবই কম ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মূল পান্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতি লেখবার সময়, একটু ভেবেচিন্তে ভাষায় শব্দের রকমফের বোঝা উচিত ছিল। কারণ আজও তো এ ভাষায় কোন 'ব্যাকরণ' বই লেখা হল না। অমার্জিতভাবে পড়ে রয়েছে।

৮০০ পৃঃ ১ম ও ২য় কলমে:—
'সকালে উঠিয়া দেখে হয় আটকুয়া দরশন',
'দুয়ার বড় বাটা উঠিয়া কয়—'

রাজবংশীরা (যারা রাজবংশী ভাষায় কথা বলেন) 'সকাল'কে 'সকাল' বলেন না বলেন 'সাকাল', নাহলে 'বেহান' আবার কোনো কোনো জায়গায় 'খুব ভোর' এই অর্থে একসংগে দুটো শব্দ 'বেহান-সাকাল' ব্যবহার করেন। তাহলে বলতে হয় বাংলা ভাষার প্রভাব ঐ পালায় প্রকটভাবে পড়েছে। অসংস্কৃত, অমার্জিত, অবহেলিত ভাষার উপর অন্য ভাষার প্রভাব পড়তে বাধ্য। লেখকের তো এই সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাহলে এমন ভুল কেমন করে হয় বলুন তো।

(১০ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪০শ সংখ্যা) উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের উপাদানে তিনি একটি গানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদাহরণটি ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

'ছেরির ডাইনে গালে হইল কালা দাগ,
হাটে যেমন ডিমপাড়া হাস—
ন্যাপেশ প্যাপেশ করিয়া।'

—'ছেরেটির ডান গালে কালো দাগ। হাটে ডিম দেয় এমন হাঁসের মত থপথপ করে।' (১০০ পৃঃ ৩য় কলম)

—এখানে লেখক শেষের দুই লাইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সব হাঁসই ডিম দেয় এখানে বিশেষ করে পাতিহাঁসের কথা বলা হচ্ছে। গানের 'হাটে' শব্দটির বাংলা অর্থ হবে 'হাঁটে' (to walk) তিনি 'হাটে' শব্দটিকে 'হাট' (Market) ধরে নিয়ে ভুল করেছেন।

ঐ পৃষ্ঠার মাঝখানে আছে:—
'দল বাড়ীখান দলোমলো যায় বাগের ডর,
তোমরা ক্যানে অনাইস্যেন বন্ধু
আমি গেইলোং হয়।'
'অনাইস্যেন' শব্দটি বোধহয় 'আইস্যেন' হত। আমি শব্দটি বাংলা এখানে 'মুই' হত বোধ করি।
'মুই নারী দিব; ছ্যাকপাড়া,
'দিব', এর জায়গায় 'দিমু' হত আশাকরি।

'তাছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও মিলছে। সেটা হচ্ছে বরযাত্রীরা কুচবিহারের ব্রাহ্মণ। এ থেকে মনে হয় যে, এই গানগুলি উত্তরবাংলার পল্লীর ব্রাহ্মণ সমাজেই প্রচলিত ছিল।'

(১০০ পৃঃ ২য় কলম)

সব বরযাত্রী যে কুচবিহারের ব্রাহ্মণ হবে এমন কোনো কথা নেই। আর শুধু বরযাত্রীদের তাঁরা আক্রমণ করে না। ব্রাহ্মণ নাপিত, বরের সংগে মিতালি করবে যে ব্যক্তি অর্থাৎ রাজবংশীর ভাষায় 'মিতর' প্রভৃতিকে আক্রমণ করা হয় গানের সাহায্যে। এই সমাজে কুচবিহারে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ বা কুচবিহারের বসবাসকারী ব্রাহ্মণের কৌলীন্য বেশী। তাই ব্রাহ্মণকেও গানের দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছে বা হয় আজও উত্তর বাংলার পল্লীগ্রামে তাই বলে একথাটি বলা যায় না দীর্ঘদিনের বসবাসের ফলে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব এদের সঙ্গীতে এসে পড়েছে।' এই বিবাহ গানগুলি বর্ষীয়সী মহিলারা রচনা করতেন শুধু ব্রাহ্মণরাই গান রচনা করতেন একথা ঠিক নয়। যেমন নাপিতকেও বিয়ের সময় নাজেহাল হতে হয়:—

'এক পাখে মালা আর পাখে মালা
নাউভাতা-তে কোম কামাচে।
চক্ষু দুইটা কানা।'

—এদিকেও মালকড়ু ওদিকেও তাই। মাঝখানে বর-কনেকে যে নাপিতমশাই 'কেঁৌর' অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ক্ষৌরকর্ম করাচ্ছেন তার কি নিজের চক্ষু দুটি কানা?' লেখক উত্তর-বাংলার লোক-সাহিত্যের উপাদান যে সারা বাংলার পাঠকবর্গকে কিছুটা আহরিত করে এনে দিতে পেরেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আমার কোন ত্রুটি হলে মার্জনীয়।

—সহদেব রায়
সাহিত্য-সংসদ, শিলিগুড়ি

বাংলা খেয়াল গান বিষয়ে

গত ৫ই চৈত্র, ১৩৭৭ সংখ্যার 'অমৃত'-এ প্রকাশিত পবিত্র দাশগুপ্তের 'খেয়ালগানে স্থায়ী ও অন্তরার ভাবা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে আনন্দিত হলাম। লেখক তাঁর প্রবন্ধে বাংলা খেয়াল গানের সপক্ষে যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন, তা সত্যই প্রশংসার্হ। এতে দ্বিমত হবার কোন কারণ দেখি না।

রেডিও খুললে বা গানের কোন আসরে বসলে বা রেকর্ড বাজালে যে বাংলা গান আজ আমরা শুনতে পাই, তার বেশির ভাগই 'রক এ্যান্ড রোল', 'টুইস্ট' বা 'পপস্' স্টাইলের গান। বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর উপর গাওয়া বাংলা গান আজ আমরা বড়-একটা শুনতে পাই না। অথচ এই রাগ-রাগিণীর উপর গাওয়া গানই আমাদের সঠিক পরিচয় বহন করতো ও উপযুক্ত মর্যাদা দিত। দুঃখ হয় বড় বেশি, যখন অনেক নামকরা সংগীতশিল্পীকেও দেখি এই ঢঙে গান গাইতে এবং তাঁদের উত্তর-সূরিদের এপথে চালিত করতে। আমরা বাঙালীরা জাত শিল্পী। শিল্পানুরাগের জন্যেই আমাদের কদর। অথচ আজ এই বাংলাগানকে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী বর্জিত করে তাকে আমরা যে-পথে নিয়ে চলেছি, তা সত্যই লজ্জাকর ও নিন্দনীয়। দুঃখ হয় এই দেখে যে, এ বিষয়ে কি শিল্পী, কি শ্রোতা কারও কোন ভ্রূক্ষেপও নেই।

খেয়ালগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল তানালাপ অর্থাৎ স্বরবিস্তারকরণ। হিন্দুস্থানী খেয়ালগানের সংগীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবেন এভাবেই কাজে অগ্রসর হন। গায়ক এই ফাঁকটা ভরিয়ে দেন তানের দ্বারা। আমাদের বাংলা খেয়াল গানের সংগীতকারদেরও এ-বিষয়ে দুর্নিবার হয়ে কাজে নামতে হবে। নচেত্, আজকের বাংলা গানের মতো 'বাংলা খেয়াল গানও' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে,—বাহবার জায়গায় আমাদের দুর্নাম কুড়োতে হবে।

বাঁশিবরণ ঘোষ।
চুঁচুড়া, হুগলী।

শাদা চোখে

ওপার বাংলার দুর্বার তরঙ্গাভিঘাতে এপার বাংলায় সাড়া জেগেছে। সমস্যা-সঙ্কুল এই বাংলার আপামর জনসাধারণ এখন ওপারের দুঃখদুর্দশার কথা ভেবে বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। সেই উত্তেজনা বিস্ফোরণে রূপান্তরিত কখন, কোন মুহূর্তে হবে তার সঠিক সময় নির্দেশ করা কঠিন। নকল রাজনৈতিক সীমারেখার প্রাচীর ভেঙে দিয়ে ওপারের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী দানবের সঙ্গে লড়াই করবার উদগ্র বাসনা থাকা সত্ত্বেও পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত এপারের মানুষ গুমরে মরছে। তারা ভুলে গেছে নিজেদের জীবনদুঃখের কথা। ভুলে গেছে বেকার তার বেকারীর জ্বালা। সর্বত্রই এপারে শুধু চিন্তা—আলোচনা। কি করে ওপার বাংলার ভাইবোনদের মান ইজ্জত রক্ষা করা যায় বর্বর, অত্যাচারী ও আক্রমণকারী দস্যুদের হাত থেকে। বাংলাদেশে যে নবজাতির অভ্যুত্থান ঘটেছে, এদিকের মানুষ সাগ্রহ প্রতীক্ষায় তাদের প্রতিষ্ঠালগ্নের প্রহর গুনেছে। জয় বাংলা শুধু শ্লোগান আর নয়, নবজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার নিশানা। সেই ধ্বনির অনুরণন আজ যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে, এপার বাংলার মানুষ নিজেদের লাভালাভের কথা ভুলে গিয়ে কিভাবে নির্যাতীত ভাইবোনদের হাত শক্ত করতে পারবে সেই চিন্তায় আকুল।

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণ এপার বাংলার পক্ষেও শুভ মুহূর্ত। নব-প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষে এসময় মাহেন্দ্রক্ষণ। ওপারের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে এপারে তাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করে যদি গঠনাত্মক কাজে নিয়োজিত করা যায়, তবে যে সমস্ত সমস্যা মানুষকে পীড়ন করছে তার সমাধান সুদূরপরাহত থাকবে না। সরকারকে তার জন্যে অবশ্য খুবই সতর্কতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ সম্পন্ন করতে এগিয়ে যেতে হবে। একথা সত্য, ওপার বাংলার সৃষ্ট সমস্যা এপারের অর্থনীতির উপর ক্রমশই ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করছে। নতুন করে শরণার্থী আসার ফলে সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু এবারকার এই সমস্যাকে সঙ্গে সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব। প্রথমত কেউ চিরস্থায়ী হবার জন্য এপারে আসছেন না। দ্বিতীয়ত সাময়িক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উদ্বিগ্ন হবারও বিশেষ কারণ নেই। কারণ, শুধু সরকারের উপর দায়িত্ব এবার নেই। অকৃপণ হাতে প্রতিটি মানুষ এবার এগিয়ে আসছেন তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাপনায়। সরকারের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত অকাতর দানসামগ্রীকে উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে বিলিবণ্টন করার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই সমস্যাকেই বড় করে দেখে প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে শুরু করে মন্ত্রীমহোদয়গণ পর্যন্ত যদি শুধু ওপার বাংলার কথায় নিমগ্ন হয়ে থাকেন তবে গঠনাত্মক কর্ম-কাণ্ডের মাহেন্দ্রক্ষণ অজান্তেই বয়ে যাবে।

সব্যসাচীর মত দুই হাতেই এপার বাংলার সরকারকে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হতে হবে। ইতিমধ্যেই এই দপ্তরের নয়া সরকার চাকুরীর বয়স সীমা পাঁচ বৎসর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব গ্রহণ করে সকলেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এই বয়স সীমা বৃদ্ধির জন্য হয়ত বেকারদের লড়াই-এর ক্ষেত্র প্রসারিত হলো, কিন্তু একথা ঠিক যে নতুন করে সময় পাওয়ার ফলে সরকারী চাকুরীর আর কোন আশা নেই—এরকম একটা মানসিক জ্বালার হাত থেকে বেকারের যন্ত্রণার সাময়িক অবসান ঘটলো। এটাও কম আশার কথা নয়। যাহোক, সরকার যদি কিছু প্রকল্পের সৃষ্টি করে এই কর্মহীন যুবকদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথঞ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন তবে চাকা ঘুরবে।

বিধানসভা ডাকবার কথা ঘোষণা করে নতুন মন্ত্রিসভা প্রবল বিরোধীপক্ষকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছেন। এতদিন যাঁরা মনে করছিলেন যে ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশান বিধানসভা না ডেকে কায়দা করে প্রশাসনিক যন্ত্র সতেজ ও সক্রিয় করে গদীতে থাকবেন—এই ঘোষণা তাঁদের ধারণা যে অমূলক তা প্রমাণ করে দিয়েছে। ওপার বাংলার সঙ্গে এই বিষয়ে যাঁরা এপার বাংলার পার্থক্য দেখছিলেন না এই সিদ্ধান্ত তাঁদের বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। অধিকন্তু সব বিচারধারা ও সব অনুমান সব সময় সর্বক্ষেত্রে যে সমভাবে প্রযোজ্য নয়—বিধানসভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত তা প্রমাণ করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশান নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে যে শক্তি যতই সীমিত হোক না কেন, সে শক্তির ক্ষয় আপাতত হবে না। বরঞ্চ, ওপার বাংলার ঢেউ লাগার ফলে এই শক্তি আরও সুদৃঢ় হবে, অপরাজেয় হবে। কাজেই বলছিলাম, এই সরকারের এখন মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রতিশ্রুত কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শুভক্ষণ। যে হানাহানি এপারের মানুষকে সর্বক্ষণ আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখছিল, আজকে তা ঘটলেও মানুষের মন ক্রমেই ইস্পাত দৃঢ় হয়ে উঠছে। ওপারের মর্টারের গর্জন শুনে ক্রমেই আজ এপারের মানুষ সাহস ফিরে পাচ্ছে। ওপারের ঘটনা এপারের দুর্ঘটনাগুলোকে ক্রমেই গ্রাস করে ফেলছে। তাই মনে হয়, এই সন্ধিক্ষণে নয়া সরকার যদি এগুতে চান তবে খুব বাধার সম্মুখীন হবেন না।

প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এগুতে হবে। শোনা যাচ্ছে, সরকার কিছু প্রশাসনিক রদবদলের কথা ভাবছেন এবং শুধু তাই

নয়, ইতিমধ্যে কিছু অফিসারকে এধার-ওধার করেছেনও। এই অফিসার সরিয়ে কাজকর্মে প্রাণ সঞ্চার করা যাবে বলে মনে হয় না। এই চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করে খুব বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। সময়-ভিত্তিক কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব প্রশাসনিক যন্ত্রের। কিন্তু গাফিলতি হলে শাসনের ন্যায়দণ্ড সেখানে কার্যকর হয় না। যে সমস্ত আইনকানুনে এই সমস্ত অকর্মণ্য প্রশাসনিক ধুরন্ধরদের 'অমর' করে রেখেছে এবার তার খোল-নলচে পালটাবার চেষ্টা করা উচিত। আর সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় করা দরকার দলীয় সংগঠন। সংগঠনের লোকেরা অতন্দ্র প্রহরীর মত নজর রেখে যদি এ'দের চলতে বাধ্য করেন তবেই কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব। নতুবা নয়। তবে, শুধু খবরদারীর জন্য খবরদারী করলেও চলবে না। থাকতে হবে আন্তরিকতা আর সততা। এই দুয়ের অভাব ঘটলে সব কিছু ব্যর্থ হয়ে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে।

পরিষদীয় গণতন্ত্রে সরকার পক্ষের কৌশলই হল বিরোধীপক্ষকে কোন প্রকার আন্দোলনের সুযোগ না দেওয়া এবং বিরোধী দলে হতাশা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা। ওপার বাংলার উদ্দাম, উত্তাল তরুণ এপারে বিরোধীপক্ষকে সাময়িকভাবে অন্যমনস্ক করেছে। আর এপারের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশান বিরোধীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। বিভ্রান্তির ফলশ্রুতি—পৌর রাজনীতিতে বামপন্থী পৌরফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন। পৌরসভায় ছিল পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের সর্বশেষ মিলনক্ষেত্র। কিন্তু গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের সৃষ্ট রাজনৈতিক ঢেউয়ের আঘাতে সেই শেষ স্মারক ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার পরও যুক্তফ্রন্টের শরিকরা ঐক্য বজায় রেখেছিলেন পৌরফ্রন্টে। অবশেষে তাও বিধ্বস্ত হতে চললো। এই পৌরফ্রন্টকে ভেঙে দেওয়ার জন্য মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের দিক থেকে অর্থাৎ রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তা যুক্তিসহ। কেননা এই রাজ্যে অন্তত তাঁরা শাসক কংগ্রেসকে অপাংক্তেয় মনে করছেন। কাজেই রাজ্য রাজনীতিতে কৌশল অবলম্বন করে যাঁরা তাঁদের মন্ত্রিত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন সেই দলগুলির সঙ্গে কি করে তাঁরা চলবেন? তাই কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে তাঁরা আর ঘর করতে রাজী নয়। শেষোক্ত দুটো দলও এ বিষয়ে পরিষ্কার। তাঁরাও বাম কম্যুনিস্টদের রাজ্যের যে কোন প্রশাসনিক সংস্থা থেকে তফাতে রাখতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আর এস পির ভূমিকাটাই যেন পরিষ্কার মনে হচ্ছে না। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা ইতিমধ্যে তাঁদের বলেছেন, ঐ দল থেকে যদি পৌরপ্রধানের অর্থাৎ মেয়রের পদের জন্য প্রার্থী হয় তবে মার্কসবাদীরা তাঁকে সমর্থন জানাবেন। অর্থাৎ একটা বোঝাপড়া হয়েছে, এমন হতে পারে। স্মরণ থাকতে পারে যে রাজ্য রাজনীতির পটভূমিকায় আর এস পি শেষ পর্যন্ত বাম কম্যুনিস্ট-দের সঙ্গে হাত মেলায় নি বা মেলাতে সক্ষম হয় নি। কর্মীদের বিরোধিতা আর বাম কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দের মন্তব্য আর এস পিকে তফাৎ রেখেছিল। চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত অপদস্থ হতেই হয়েছিল। তাই আর এস পি 'বামপন্থীদের' মিলন হলো না বলে একলা চলার নীতি গ্রহণ করেছিল। সে অনেক দিনের আগের কথা বলে আর এস পি হয়ত মনে করছে লোকে সব ভুলে গেছে। অতএব, এখন শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে গিয়ে যদি বাম কম্যুনিস্টদের বন্ধুত্বের হাতটা ধরে ফেলতে পারা যায় তবে একেবারে কোলকাতা কর্পোরেশনের আর এস পি মেয়র। নেতারা এই স্বপ্ন দেখলেও কর্মীরা এটা কি করে মেনে নেবেন, সেটা ভাবতে আশ্চর্যই লাগে। যুক্তফ্রন্টের অর্থাৎ পৌর যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে কণ্টুক্ট-পক্ষে একটি লিখিত চুক্তিই ছিল যে কোন্ শরিক কবে মেয়র হবেন। এবার ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের পালা। কিন্তু বড় শরিক চুক্তি মানবে না—কেননা ব্লক গণতান্ত্রিক কোয়ালিশানের সমর্থক হওয়ার ফলে অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। অতএব, চুক্তি নেই। আর এস পি এই সুযোগটা নিয়ে মেয়র হবার সাধটা মিটিয়ে নিতে চায়, আর চিক্ত খাওয়া বন্ধুত্বটা জোড়া লাগিয়ে একেবারে নির্ভেজাল বামপন্থী হতে চায়। অতএব অতীতের কথা মনে রেখে লাভ কি? আর পৌরসভা ত বিধানসভা নয়। একমাত্র বিধানসভাই ত আদর্শ ও তত্ত্বগত বক্তব্য রাখবার প্রশস্ত ক্ষেত্র। আর পৌর-ক্ষেত্র মূলত সেবা প্রতিষ্ঠান। অতএব, এখান থেকে যদি মিলনের পথটা তৈরী করা যায় তবে ক্ষতি কি? আদর্শগত বিচ্যুতি ত আর ঘটছে না। যাই হোক, আখেরে যাই ঘটুক না কেন পৌর রাজনীতিতেও বামপন্থীরা যে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারলেন না—এটাই শাসক কংগ্রেসের সমূহ লাভ।

পৌর রাজনীতি দেখে মনে হয় বিধানসভাতেও এর ছায়া পড়বে। আর এস পি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশানকে সমর্থন করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিও দেন নি যে মার্কসবাদীদের সমর্থন করবেন। কিন্তু স্পীকার নির্বাচনের পালা যখন আসবে তখন বাম কম্যুনিস্টরা যদি আর এস পির সমর্থন নিয়ে এস ইউ সির কোন সদস্যকে ঐ পদে প্রার্থী দাঁড় করে দেন তবে এস ইউ সি স্বয়োপ্রতি বিরোধী দলে চলে আসতে পারে। কারণ, এস ইউ সি ও অনাবধি যা বলেছেন তাতে সমস্ত বামপন্থী দলের একটি সরকারের গঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আর একবার নতুন করে যুক্তফ্রন্টের ট্রায়াল দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এস ইউ সি বিলক্ষণ জানতেন যে রাধাও নাচবে না, তেলও পুড়বে না। কাজেই এ শুধু একটি প্যাঁচ, যাতে বামপন্থী ভূমিকাও বজায় রাখা গেল এবং বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাতও মিলাতে হোল না। বাম কম্যু-নিস্টরা অবশ্য এস ইউ সিকে এই অবস্থায় থাকতে দিতে রাজী না হতে পারেন। কর্পোরেশান থেকে শুরু করে বিধানসভা পর্যন্ত বাম কম্যুনিস্টরা একই কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করতে পারেন। সেদিক থেকে বিচার করলে এবারকার বিধানসভা অধিবেশন খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এবং রাজনীতিক মারপ্যাঁচের প্রশস্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে।

আগেই বলেছি, গণতান্ত্রিক কোয়ালিশানের পক্ষে সময়টা অত্যন্ত সুসময়। তাঁদের প্রগতিশীল কর্মপন্থার প্রতিফলন যদি ঘটে তবে বিরোধীপক্ষে বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যাবে। অতএব, নিপুণতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যদি কোয়ালিশান সরকার পদক্ষেপ নিতে পারে তবে পারিপার্শ্বিকতার সুযোগ নিয়ে গণমনে স্থান করে নেওয়া আদৌ কষ্টসাধ্য হবে না বলে মনে হয়।

—সমদর্শী

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ শুষ্ক রুক্ষ দিনগুলিতে—

স্নো ভিউ হোটেল

দার্জিলিং

আপনার বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য কামনা করে

মার্জিত রুচি ভ্রমণবিলাসীদের একান্ত নির্ভরযোগ্য বাসস্থান

পূর্বাহ্নে স্থান সংরক্ষণের জন্য ফোন দার্জিলিং ৪০

CENTRAL LIBRARY

মুক্তিযোদ্ধারা ওপারের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ছেন।

দেশ বিদেশ

ইয়াহিয়া খাঁর দখলদার বাহিনীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র অদম্য মনোবল সম্বল করে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ যখন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, বর্ষার আগে যতখানি সম্ভব বাংলাদেশের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ার জন্য ও বড় বড় ঘাঁটিগুলি দখলে আনার জন্য পাকিস্থানী ফৌজ যখন মরিয়া হয়ে একই সঙ্গে পূর্বে পশ্চিমে ও উত্তরে এগোচ্ছে তখন এই প্রচণ্ড অসম সংগ্রামের মধ্যেই ঘোষিত হল স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদ। শুধু তাই নয়, এই সরকারের মন্ত্রীরা সীমান্তের ওপারে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করলেন দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিলেন, তিন সপ্তাহ ধরে যাবতীয় আধুনিক যুদ্ধোপকরণ নিয়ে আক্রমণ চালিয়েও এবং অসামরিক জনগণের উপর অকথ্য ও অভূতপূর্ব অত্যাচার, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, গৃহদাহ চালিয়েও পাকিস্থানী ফৌজ বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের সংকল্প থেকে আদৌ বিচ্যুত করতে পারে নি।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে নতুন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়ে জানান হয়েছে যে, এই সরকারের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ইনি পূর্ববাংলা আওয়ামী লীগের সহঃ-সভাপতি, জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য এবং আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সহঃ নেতা। এঁর বাড়ী ময়মনসিংহ জেলায়, বয়স ৪৬। এম-এ ও এল-এল-বি পাশ করার পর ইনি কিছুকাল অধ্যাপনা করেন ও পরে আইনব্যবসায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। ইনি পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। এঁর বাড়ী ঢাকা জেলায়, বয়স ৪৬। ইনি বি-এ ও এল-এল-বি পাশকরা অ্যাডভোকেট। মন্ত্রীদের মধ্যে একজনের নাম খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ। ইনি পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগের আর একজন সহঃ সভাপতি ও জাতীয় পরিষদের সদস্য। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের চীফ হুইপ ছিলেন। এঁর বাড়ী কুমিল্লা জেলায়, বয়স ৫৩। ইনিও পেশায় অ্যাডভোকেট, এম-এ ও এল-এল-বি পাশ করেছেন। মন্ত্রীদের মধ্যে সব চেয়ে বয়স্ক মনসুর আলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দিয়ে ক্যাপ্টেনের পদমর্যাদা পেয়েছিলেন। এঁর বয়স ৫৫। তিনিও পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের একজন সহঃ সভাপতি ও পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য। তিনি পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিরও একজন সহঃ সভাপতি। তিনিও একজন অ্যাডভোকেট, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও এল-এল-বি। তাঁর বাড়ী পাবনা জেলায়। আর একজন মন্ত্রীর নাম এ এইচ এম কামরুজ্জামান। নিখিল পাকিস্থান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। ১৯৪৬—৪৭ সালে তিনি কলকাতায় ছাত্রনেতা ছিলেন. তিনিও অ্যাডভোকেট, বি-এ ও এল-এল-বি পাশ।

তাঁর বর্তমান বয়স ৫৮, বাড়ী রাজশাহী জেলায়।

স্বাধীন বাঙলা বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বাঙলাদেশের এই সরকার যুদ্ধকালীন সরকার হিসাবে কাজ করবেন। প্রধানমন্ত্রীরূপে বেতার ভাষণ দিয়ে তাজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, "সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল লোকের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা স্মরণ করছি তাঁদের যাঁরা বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে মূল্যবান জীবন আহুতি দিয়েছেন। আকাশে যতদিন চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা থাকবে, মাটিতে মানুষ থাকবে ততদিন বীর শহীদদের এই সমর-কীর্তি বাঙালীর মানসপটে অম্লান থাকবে। পঁচিশে মার্চ থেকে ইয়াহিয়া তাঁর ফৌজ লেলিয়ে দিয়েছেন আমাদের উপর। সেই সঙ্গে শেখ মুজিবুর ঘোষণা করেছেন স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতার পতাকাতলে আমরা সকলে আজ একতাবদ্ধ। যে প্রতিরোধ আপনারা গড়ে তুলেছেন তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই অভূতপূর্ব সংগ্রাম ও অসাধারণ মনোবল যা নিয়ে আপনারা দাঁড়িয়েছেন প্রমাণ করুন নূতন বাঙালী জাতি জন্ম নিয়েছে।"

এই "নূতন বাঙালী জাতি"র পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীর প্রতি আহ্বান জানান হয়েছে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। এই সরকারের একজন প্রতিনিধি এরই মধ্যে দিল্লীতে পৌঁছে গেছেন বলে বি-বি-সি-র মারফৎ খবর পাওয়া গেছে।

"ভারত সরকার যথাসময়ে যথোচিত কাজ করবেন"—বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে এখন এর চেয়ে বেশী আর কিছু বলতে নয়াদিল্লী নারাজ। নয়াদিল্লীর সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছে যে, তাঁরা তাড়াহুড়ো করে এমন একটা কিছু করতে চান না যাতে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারটা একটা ভারত-পাকিস্থান বিরোধের প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

কিন্তু নয়াদিল্লী না চাইলে কি হবে, পাকিস্থান তার এই "ঘরোয়া ব্যাপারের" সঙ্গে ভারতকে জড়িত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে। ভারত বাঙলাদেশের ভিতরে লড়াই করার জন্য সৈন্য পাঠাচ্ছে এবং রসদ যোগাচ্ছে, এই অভিযোগ পাকিস্থান কিছুকাল আগে থেকেই করছিল। এখন সেই প্রচারের মাত্রা আরও চড়িয়ে দিয়ে পাকিস্থান রেডিও ও পাকিস্থানী সংবাদপত্রগুলি বলছে, ভারত পাকিস্থানকে আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাঙলাদেশের ভিতরকার যুদ্ধকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাকিস্থান ক্রমাগত ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচনার সৃষ্টি করছে। ত্রিপুরার সীমান্তের অপরপারে কসবা নামক একটি স্থানে বোমাবর্ষণ করতে গিয়ে পাকিস্থানী বিমান ভারত-পাকিস্থান চুক্তির বিধিলঙ্ঘন করে সীমান্তের এপারে ভারতীয় এলাকায়ও

শুভ নববর্ষে প্রকাশিত হয়েছে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
উপনিবেশ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দীর্ঘকাল মুদ্রিত ছিল না। নতুন কলেবরে প্রকাশিত হল। ৩ খণ্ড একত্রে ৮·৫০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস
প্রণয়পাশা
এই উপন্যাসের পটভূমিকা অভিনব। প্রণয়ের অনুরাগ ও বিরাগের পথে, প্রকৃত প্রেমের জয়।
দাম : ৬·০০

ডঃ নন্দগোপাল দাস-এর নতুন উপন্যাস
দুই নারী ৬·০০
বর্তমান সমাজের নিখুঁত দর্পণ

নলিনীমাধব চৌধুরীর নতুন উপন্যাস
আবির্ভাব ১০·০০
স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় লিখিত

আশীষ বসুর নতুন উপন্যাস
মনে রেখো ৩·৫০

নমিতা চক্রবর্তীর নতুন উপন্যাস
অহল্যা রাত্রি ৯·০০

১৩৭৭ সালের সর্বাধিক আলোচিত বই

শঙ্কর-এর
এপার বাংলা ওপার বাংলা
কোটি কোটি মানুষের মুখে এখন যা উচ্চারিত হচ্ছে সেই 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' প্রবন্ধটির স্রষ্টা শংকর। ওপার বাংলার নতুন যুগের নতুন মানুষের কথা এমনভাবে এর আগে কখনও বলা হয়নি। দাম : দশ টাকা।

তেরো মাসে চতুর্দশ মুদ্রণ ১০·০০

শংকর গুপ্তের
ব্যাপার বহুতর
সচিত্র ব্যঙ্গ রচনা ৫·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন তুলির টান
অবরাগ নামে ছায়াচিত্র দেখান হচ্ছে : ৭·০০

বিমল মিত্রের
এর নাম সংসার
৫ম মুদ্রণ ৮·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
তাঞ্জাম
দাম : ৫·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
আলোকপর্ণা
দাম : ১০·০০

কমলাকান্ত শর্মার
এক বর অনেক কনে
দাম : ১০·০০

শৈলেশ বসুর
তরাই
দাম : ১০·০০

বনফুলের
অধিকলাল
২য় মুদ্রণ : ৪·৫০

সুভাষ সমাজদারের
আবগারী দারোগার ডায়েরী
দাম : ৫·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিশিপদ্ম
৮ম মুদ্রণ : ৪·৫০

চাণক্য সেনের
তিন তরঙ্গ
৩য় মুদ্রণ : ৭·০০

কথাকও
২য় মুদ্রণ ৩·৫০

জরাসন্ধ-র
স্বীকৃতি
দাম : ৫·০০

সমরেশ বসুর
জগদ্দল
২য় মুদ্রণ ১৫·০০

বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

কিষণগঞ্জের বাসের ওপর স্বেচ্ছাসেবকরা দাঁড়িয়ে বিজয়উল্লাস প্রকাশ করছেন।

কিছু মেশিনগানের গুলী ছুড়েছে। ত্রিপুরার মহকুমা শহর সোনামুড়ার একজন তহশিলদার তাঁর নিজের বাসভবনের উঠানে পাকিস্থানী গুলীতে আহত হয়েছেন। এইভাবে ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে দিল্লী ইসলামাবাদে নোট পাঠিয়েছে। তাতে ভারত এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, পাকিস্থানী বাহিনী এই ধরনের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ চালালে যে কোন পরিণতির জন্য পাকিস্থান সরকারকে দায়ী করা হবে।

●

রোহানা বিজয়বীর নামক একজন সিংহলী ছাত্র কয়েক বছর আগে মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন পড়াশুনা করতে। রোহানা সিংহলের একটি সুপরিচিত কম্যুনিস্ট পরিবারের সন্তান। মস্কোতে গিয়ে তিনি নাকি একটু বেশী মাত্রায় চীনা-প্রীতি দেখাতে থাকেন। তার ফলে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। মস্কো থেকে তিনি উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়াংয়েও গিয়েছিলেন বলে খবর আছে। রোহানা দেশে ফিরে এসে "জনতা বিমুক্তি পেরামুনা" নামক একটি দল গঠন করেন।

সিংহলের শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের সরকার এখন তাঁর স্থল, বিমান ও নৌসেনা নিয়োগ করে, দেশব্যাপী জরুরি অবস্থায় কারফিউ জারি করে এবং "বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির" সাহায্য নিয়ে এই জনতা বিমুক্তি পেরামুনা দলকে দমন করছেন। বলা হয়েছে যে, এই দল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা সিংহল সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। শ্রীমতী বন্দরনায়েক তাঁর বেতার ভাষণে বলেছেন, "গোপনে এই দল গড়া হয়েছে, অর্থের জোরে এই দলকে পুষ্ট করা হয়েছে এবং ক্ষমতালিপ্সার দ্বারা এই দলকে চালিত করা হয়েছে।"

যদিও বলা হচ্ছে যে, রোহানার জনতা বিমুক্তি পেরামুনা চে গুয়েভারার মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, তথাপি এই দলের আদর্শগত প্রেরণার সূত্রটি পরিষ্কার নয়। একটা অনুমান এই যে, এই দলের পিছনে চীনা অনুপ্রেরণা রয়েছে, কিন্তু সেকথা জেনেও সিংহল সরকার খোলাখুলিভাবে বলতে পারছেন না। কেননা, সিংহলকে তার রবার বিক্রি করার জন্য ও সেই রবারের বিনিময়ে চাল সংগ্রহ করার জন্য চীনের উপর নির্ভর করতে হয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে চীনের নাম জড়িয়ে সিংহল চীনকে চটাতে চায় না। সিংহলের পিকিংপন্থী কম্যুনিস্ট নেতা ও সেখানকার ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এন ষণ্মুগতাসনকে গ্রেপ্তার করায় এই সন্দেহ আরও প্রকট হয়ে উঠেছে যে, চীনকে ঢাকাতে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে সিংহল সরকার ইচ্ছা করেই বিদ্রোহীদের গুয়েভারাপন্থী বলে অভিহিত করছেন। লণ্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা একটি সংবাদে বলেছেন যে, বিদ্রোহীদের কাছ থেকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে তাতে চীন ও উত্তর কোরিয়ার ছাপ পাওয়া গেছে। এই সংবাদদাতার মতে, কলম্বোতে সিংহলের পরলোকগত নেতা (ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর স্বামী) বন্দরনায়েকের স্মারক সৌধ তৈরি করার জন্য যে দুইশ চীনা কারিগর আনা হয়েছে তাদের কেউ কেউ বিদ্রোহীদের সঙ্গে আছেন।

পরবর্তী একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সিংহল সরকার কলম্বো থেকে উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন। ঘটনার পরিহাস এই যে, সিংহলের বর্তমান সরকার বামপন্থী সরকার বলে পরিচিত। মস্কোপন্থী ও ট্রটস্কিপন্থী কম্যুনিস্টরা এই সরকারের অংশীদার। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরই উত্তর কোরিয়ান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

আরও পরিহাস এই যে, নিজেদের দেশের মার্কসবাদী বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য এই বামপন্থী সরকারকে আমেরিকা ও বৃটেন সহ বিভিন্ন দেশের কাছে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ চাইতে হয়েছে। আমেরিকা হেলিকপ্টারের যন্ত্রাংশ ও বৃটেন ছয়টি মার্কিন হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে চারখানি হেলিকপ্টার গেছে ও তার সঙ্গে কিছু বৈমানিকও গেছেন বলে প্রকাশ। তাছাড়া কিছু ভারতীয় সৈনিকও পাঠান হয়েছে বলে প্রকাশ। এই সৈনিকদের অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হবে না। সিংহলী সৈনিকদের যাতে যুদ্ধের কাজে ছেড়ে দেওয়া যায় সেজন্য ভারতীয় সৈনিকরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়ার কাজ করবেন।

১৭-৪-৭১ —দৃষ্টিশ্রীক

সম্পাদকীয়

এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

সীমান্তের ওপারে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে তার আঘাত এই বাংলাতেও এসে লাগছে। কৃত্রিমভাবে দেশভাগ করা হলেও, দুই বাংলার মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। শুধু জন্মসূত্রে নয়, এখনও দুই বাংলায় বহু পরিবারের আত্মীয়স্বজন বাস করেন। পাকিস্তান সরকার বাংলার এই আত্মিক বন্ধন ভাঙবার জন্য গত ২৩ বছর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বাঙালীর মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছে। কিন্তু সে-কাজ সফল হয়নি। তা না হলেও বাংলার অর্থনৈতিক শোষণই পশ্চিম পাকিস্তানীদের আকর্ষণ করে এনেছিল সীমান্তের ওপারে। তার প্রতিক্রিয়াতেই আজ বাংলাদেশ বহ্নিমান।

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীতাজুদ্দিন আহমেদের প্রধানমন্ত্রিত্বে। শেখ মুজিবর রহমান হলেন এই অস্থায়ী যুদ্ধকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হয়। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানীদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত না করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবসান হতে পারে না। কোনো যুদ্ধেই চমকপ্রদ ফল তাড়াতাড়ি আশা করা যায় না। যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে অস্ত্রশক্তি, রণকৌশল এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর। পশ্চিম পাকিস্তানের অস্ত্রশক্তি নিশ্চিতই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের চেয়ে বেশি। কিন্তু রণকৌশলে মুক্তিফৌজের শ্রেষ্ঠত্ব বহু রণাঙ্গনেই প্রমাণিত হয়েছে। সরবরাহ ব্যবস্থাও মুক্তিফৌজেরই পক্ষে। পাকিস্তানীরা সীমাবদ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে এখন মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

যে কোনো যুদ্ধাবস্থাতেই দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বানচাল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এমন একটা ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইয়াহিয়া খান এই যুদ্ধ তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আওয়ামি লীগ এত বড় একটা যুদ্ধের মোকাবিলা করতে প্রথমে খানিকটা হয়তো অসুবিধায় পড়েছিল। কিন্তু ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশবাহিনী সামগ্রিকভাবে এই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ায় পাকিস্তানীদের আক্রমণ প্রতিহত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। যতই দিন যাবে মুক্তিফৌজের সংখ্যা বাড়বে এবং অভিজ্ঞতার ফলে রণকৌশলেরও অনেক উন্নতি হবে। মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা কায়দাতেই যুদ্ধ করছেন এবং গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে পারবেন এই সময়ের মধ্যে।

প্রত্যেক যুদ্ধেই গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতক দেখা দেয়। বাংলাদেশেও তা কিছু কিছু দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। পশ্চিম পাকিস্তানী প্রসাদপুষ্ট এই ঘৃণ্য মানুষগুলো মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কয়েকটি জায়গায় মুক্তিফৌজকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছে। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুক্তিফৌজের লোক হতাহত হয়েছেন পাকিস্তানীদের আক্রমণে। কিন্তু এ'দের সংখ্যা সামান্য। বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জনই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। এজন্য তাঁরা চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক যে অসুবিধাগুলো দেখা দিচ্ছে তা হল সাংগঠনিক নেতৃত্বের। এত বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ বেশী দিন চলে না। তাকে সুদক্ষ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীনে এনে সুপরিকল্পিত আক্রমণ ও শত্রুদুর্গ দখলের অভিযানে রূপায়িত করতে হয়। এখন পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টগুলো থেকে পাকিস্তানী বাহিনীকে হঠানো সম্ভব হয়নি। তবে তাদের সরবরাহ ব্যবস্থা অনেক জায়গাতেই ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এজন্যই পাকিস্তানীরা মরিয়া হয়ে বিমান আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজকে ছত্রভঙ্গ এবং জনসাধারণের মনোবল ভাঙবার চেষ্টা করছে। আশা করা যায় যে, যুদ্ধের প্রথম স্তরের অপ্রস্তুতি এবং বিহ্বলতা কেটে যাবার পর মুক্তিযুদ্ধের গতি হবে দুর্বার এবং অপ্রতিরোধ্য।

এই যুদ্ধের ফলে ভারতের পক্ষ থেকে প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হল শরণার্থী আগমন। গত ২৩ বছরে পূর্ববাংলা থেকে বহু শরণার্থী এসেছে ভারতে। তাদের অধিকাংশই ছিল সংখ্যালঘু। পাকিস্তানীদের অত্যাচারে তখন তারা ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। এখন সেই পাকিস্তানীদের ভয়েই সংখ্যাগুরু মুসলিম ও সংখ্যালঘু হিন্দু নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার সীমান্ত পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছেন। গত সপ্তাহের হিসাবে জানা যায় ইতিমধ্যেই এক লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন পাকিস্তানীদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য। এই শরণার্থীদের আশ্রয় ও বাসস্থান দেওয়া আমাদের মানবিক কর্তব্য। আপৎকালেই মানবতার পরিচয়। কিন্তু সকলেই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সঙ্গতি কত সীমাবদ্ধ। এবং এই কাজ একা পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতের পক্ষেও করা সম্ভব নয়। এর দায়িত্ব রাষ্ট্রসংঘকে নিতে হবে। বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ কিছু করেনি। যারা জল্লাদের হাত এড়িয়ে চলে এসেছে তাদের জন্যও যদি রাষ্ট্রসংঘ কিছু না করে, তবে এই সংস্থা থেকেই বা লাভ কী? আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে পাকিস্তান সরকার ঢাকায় যেতে দেয়নি। ভারত সরকার তাঁদের আমন্ত্রণ করে আনুন বাংলাদেশের এই শরণার্থীদের সেবার জন্য। বাংলাদেশের যুদ্ধের ভয়াবহতাও তাহলে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা খানিকটা নিজের চোখে দেখে যেতে পারবেন।

CENTRAL LIBRARY

এক নজরে

ভারতের জনসংখ্যা ঃ

সেন্সাস কমিশনার শ্রী এ চন্দ্রশেখর ১৯৭১ সালের লোক-গণনার যে প্রাথমিক হিসাব প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যায়, দশ বছরের ব্যবধানে ভারতের লোক বেড়েছে প্রায় বারো কোটি। অর্থাৎ বৃটেন ও ফ্রান্সে যত লোকের বাস তার চেয়েও কিছু বেশি লোক ভারতে বেড়েছে বিগত এক দশকে। আরও এক হিসাবে বলা যায়, ভারতের চেয়ে আয়তনে সাতগুণ বড় সোভিয়েট ইউনিয়নে বিগত দশ লক্ষ বছরের মানব-জন্ম ও মৃত্যুর যা ফিরোজফল, ভারতের মাত্র দশ বছরের সৃষ্টি সে-সংখ্যার অর্ধেক অতিক্রম করে গেছে। ১৯৬১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ৯১ লক্ষ, ১৯৭১ সালে সে-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ। মোটামুটি হিসাবে দশ বছরে বৃদ্ধির হার ২৪·৫৭ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় সিকি ভাগ। পূর্বের দশকে এই বৃদ্ধির হার ছিল ২১·৫০ শতাংশ।

কিন্তু আমাদের জনগণনার সেন্সাস কমিশনার এই বৃদ্ধিতে খুব বিচলিত হননি, পরন্তু তিনি এর মধ্যে বিগত দশকের পরিবার পরিকল্পনা অভিযানের উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেছেন, জনসংখ্যা সম্পর্কে সরকারের অনুমিত হিসাব ছিল পঞ্চান্ন কোটি, কিন্তু প্রকৃত লোকবৃদ্ধি যে তার চেয়ে এক কোটি তিন লক্ষ কম হয়েছে, সেটা পরিবার-পরিকল্পনার জন্যই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রশেখরের এই বক্তব্য খুব যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী অনুমান কোন হিসাবের ভিত্তিতে করা হয়েছিল তা তিনি বলেননি। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বিগত দশকে লোকবৃদ্ধির হার পূর্বের দশকের তুলনায় বেড়েছে, পরিবার-পরিকল্পনা অভিযানের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটলে সেটা কিছুতেই হতে পারত না। জাপান তার লোকবৃদ্ধির হার এক দশকের চেষ্টায় শতকরা ২·৩ থেকে কমিয়ে শতকরা ১-এ নামিয়ে আনে। আর ভারতে দেখা যাচ্ছে, এক দশকের ব্যবধানে লোকবৃদ্ধির হার শতকরা ২·২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে শতকরা ২·৫। এ-বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে, আর আঠাশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই, ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১১০ কোটির কাছাকাছি।

আর এক অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি ঃ

ভারতের লোকসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতের রাজ্য-গুলিতে মন্ত্রীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বেপরোয়াভাবে মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়িয়ে মন্ত্রিত্ব রক্ষার নির্লজ্জ প্রয়াস কয়েক বছর আগেই বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয়। সব দলই এর নিন্দা করেছে, কিন্তু সরকারী তখ্‌তে টিকে থাকার দায় যখনই বড় হয়েছে, তখনই সব দলকে এই একই উপায় অবলম্বন করতে দেখা গেছে। কিছু-দিন আগে এ নিয়ে সকল দলের এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা হয় এবং তাতে মোটামুটিভাবে স্থির হয় যে, যে-দল বা জোট মন্ত্রিসভা গঠন করবে, মন্ত্রিসভা সেই দল বা জোটের সদস্য-সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশি হওয়া উচিত হবে না। মুখ্যত সেই নীতির ভিত্তিতে এবার কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন শ্রীমতী গান্ধী। কেন্দ্রে শাসক দলের সদস্য-সংখ্যা সাড়ে তিনশ' হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা পঁয়ত্রিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, এবং তার মধ্যে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সংখ্যা মাত্র তেরো। ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্যাবিনেটে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ থেকে একজনকেও নেওয়া সম্ভব হয়নি। সমভাবে বাদ পড়েছে তামিলনাড়ু, ওড়িশা, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ার জন্যই প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা গঠনকালে প্রশাসনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করতে হয়নি।

এর পাশে বিভিন্ন রাজ্যের চিত্র কদাচিৎ কখনও অত্যুক্তি করা হবে না। উত্তরপ্রদেশে সম্প্রতি পরিত্যক্ত এস ভি ডি মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা ধাপে ধাপে বাড়তে বাড়তে ৫৪ হয়েছিল, কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাবে বিধানসভার ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে অকালি দলের সদস্য-সংখ্যা ৫৪, কিন্তু অকালি মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা ২৬, অর্থাৎ প্রতি দুজন এম এল এ-র মধ্যে একজন মন্ত্রী। ওড়িশা বিধানসভার মোট সদস্য-সংখ্যা ১৪০, বর্তমানে চারটি আসন শূন্য থাকায় ১৩৬; তার মধ্যে মাত্র ৭০ জন সদস্যের সমর্থনে শ্রীবিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে যে-মন্ত্রিসভা তার সদস্য-সংখ্যা ১৪, অর্থাৎ প্রতি পাঁচ এম এল এ পিছু একজন মন্ত্রী। কিন্তু এ-সংখ্যানুপাতও বেশী দিন বজায় থাকবে না, কারণ মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে, শীঘ্রই আরও কয়েকজন উপমন্ত্রী নিয়োগ করা হবে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেপরোয়া বিহারের বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। বিহার বিধানসভার ৩১৮ জন সদস্যের মধ্যে ১৭০ জনের সমর্থনের দাবি রাখেন বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা; তাঁদের মধ্যে ৫২ জনকে এপর্যন্ত মন্ত্রী করা হয়েছে। মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখতে মন্ত্রিসভার আরম্ভকালের মাত্র ১০১ দিনের মধ্যে মন্ত্রীর সংখ্যা অর্ধ-শতাধিক করা হলেও বিহার মন্ত্রিসভার অতি বড় সমর্থকও এ-কথা বলতে পারবেন না যে, এ-মন্ত্রিসভা ছ' মাসের বেশি টিকবে।

শুধু রাজনৈতিক দলগুলির দুর্নীতি দূর করার জন্যই নয়, গরীব দেশের রাজকোষের অপচয় বন্ধের জন্যও অবিলম্বে এ-ব্যাপারে একটা সাংবিধানিক ব্যবস্থাবলম্বন প্রয়োজন। মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা কোন অবস্থাতেই লোকসভা বা বিধানসভার সরকারী দল বা কোয়ালিশনের সদস্য-সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়।

চার সম্রাট ঃ ঃ

ভারতে আগামী যে মাস থেকে যে চারটি জাম্বো জেট বোয়িং-৭৪৭ বিমানের চলাচল শুরু হচ্ছে তাদের নাম রাখা হয়েছে সম্রাট মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত, সম্রাট অশোক, সম্রাট আকবর ও সম্রাট শাহজাহান। বিমানগুলির বিশালতা, সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের সঙ্গে এই নামকরণ যে বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের চার মহান সম্রাটের মতোই তারা অনন্য। অর্ধ সহস্র যাত্রী নিয়ে দশ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ঐ খেচর দুর্গগুলি যখন পৃথিবী পরিক্রমা করবে তখন এই গ্রহ নিশ্চয়ই আরও ছোট হয়ে যাবে ভারতের কাছে।

—প্রজ্ঞাবাণী

CENTRAL LIBRARY

বাংলা দেশ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নয় কোনো ফাঁকা গোল টেবিলের
ঠকের বৈঠক,
কাঁটে কাটা রোয়েদাদ
ক্ষুদ্র লুব্ধ কৃপণের ধূর্ত ফয়সালা,
না বা কোনো দেয়ালে পোস্টার
শূন্যগর্ভ বুলির দাপট—
এ এক পৃথক মূর্তি,
আরেক অস্তিত্বে এসে
এ এক পৃথক উচ্চারণ—
হৃদয়ের আদিগন্ত অনাবৃত ঊর্মি-উন্মেষ,
রিক্ত হাতে মুখোমুখি নির্লজ্জ মৃত্যুর মোকাবিলা
লক্ষ লক্ষ মরণেও রক্তবীজ প্রাণ অনিঃশেষ—
নাম শোনো গান শোনো
স্থলে-জলে স্থাবরে-জঙ্গমে
বাংলা দেশ বাংলা দেশ
স্বাধীন নবীন বাংলা দেশ।

গর্জমান ব্রহ্মপুত্র, প্রমত্ত ভৈরব
পদ্মা মেঘনা করতোয়া ত্রিস্রোতা গোমতী
মহানন্দা কর্ণফুলি সুনন্দা কুমার
নদী নালা খাল বিল এক সুরে খরশাণ মন্দ্রিত স্পন্দিত
তরঙ্গে তুমুলে কল্লোল
বন্দরে বন্ধনকাল হয়ে গেছে শেষ,
জেগেছে নতুন রাজা—
প্রত্যয়ে অচল থেকে প্রত্যেকে সৈনিক
প্রত্যেকেই বীর নেতা বর্বরের বিপুল উচ্ছেদে,
এক ছন্দে গাঁথা মন্ত্র
রব না রব না আর বিদেশীর ভোগোপনিবেশ,
বাংলা দেশ, বাংলা দেশ
সোনার শ্যামল বাংলা দেশ।

উত্তরে সৈয়দপুর দক্ষিণে সন্দ্বীপ
অটলা চট্টলা পূবে, পশ্চিমে যশোর
নয় কোনো সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডের রেখা
মানচিত্রে পরিমিত—
এই এক মহান মানসলোকে
মহাতীর্থে মানবগৌরবে
উত্তরণ করে দেওয়া আমারে-তোমারে
বিশ্বজগতেরে,
শিরায় লাগিয়ে দেওয়া আগুনের সুর—
ধর্মের চেয়েও বড়ো মর্মের সংবাদবাহী মুখের যে ভাষা,
অন্নের চেয়েও বড়ো শোষণের পীড়নের মুক্তির পিপাসা।
এই এক অবধি-পরিধি-হীন দিব্য পরিবেশ
যেথা আমি-তুমি প্রতিবেশী
পরস্পর বন্ধুতার নিবিড় আশ্লেষ,
বাংলা দেশ, বাংলা দেশ
ঘনিষ্ঠ গরিষ্ঠ বাংলা দেশ।।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

তুষারকান্তি ঘোষ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এত বড় লোকের জীবন-কথা অল্প সময়ে বলা যায় না। সেই জন্য তাঁর জীবনের মোটা-মুটি কাহিনী আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের পর তিনজন বাঙালীর যে দলটি বিলেত থেকে আই সি এস পাশ করে দেশে ফিরে এলেন তাঁদের একজন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে শ্রীহট্টে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হলেন। তখন তাঁর উপরওয়ালা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সাদার-ল্যান্ড।

সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজের সমকক্ষতা দাবী সাদারল্যান্ডের বিরক্তি উৎপাদন করেছিল, এবং এই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ষড়যন্ত্র করে সামান্য একটা দোষ ধরে সুরেন্দ্রনাথকে কর্মচ্যুত করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বিলেত গিয়ে আপিল করেও কোন ফল পান নি।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের এই কর্মচ্যুতিতে দেশের এক মহাকল্যাণ সাধিত হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাওয়া গিয়েছিল এক অনন্যসাধারণ পুরুষকে।

সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ২৭ বছর। বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন কলেজে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। দেশের যুবশক্তিকে গড়ে তোলার এবং দেশের কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করার একটা পরম সুযোগ এল তাঁর কাছে।

এর কিছু দিনের মধ্যেই আনন্দমোহন বসু বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে হাইকোর্টে যোগ দিলেন। আনন্দ-মোহন দেশে ফেরার পর এই দুই তরুণ নেতার উদ্যোগে গড়ে উঠল Calcutta Students' Association —এবং এই অ্যাসোসিয়েশনকে ভিত্তি করেই সুরেন্দ্র-নাথের রাষ্ট্রনায়কত্বের বিকাশ ঘটতে লাগল। সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এই ছাত্র সমিতিরই বক্তৃতামঞ্চে।

সুরেন্দ্রনাথ সেই সময় আধুনিক ইতিহাস থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেশপ্রেমের বহ্নি-শিখা জ্বালিয়ে তুলতে আরম্ভ করলেন।

সুরেন্দ্রনাথ এর পর উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত সমাজবিপ্লবে স্বাধীনতা ও মানবতার অতুলনীয় প্রেরণা সম্পর্কে। সাধনক্ষেত্রে অধিকারভেদ ও জাতিভেদ অস্বীকার করে মহাপ্রভু সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যে অপূর্ব বাণী ও আদর্শ প্রচার করেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথই প্রথম তাকে রাষ্ট্রীয় উন্মাদনা সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছিলেন।

এর কিছুকাল পরে বন্ধু আনন্দ-মোহনের সহযোগিতায় Indian Association বা ভারতসভা স্থাপন করলেন সুরেন্দ্রনাথ। এবং এই সংস্থার মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথ ছড়াতে আরম্ভ করলেন স্বাধীনতার প্রেরণা।

ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিন পরেই সুরেন্দ্রনাথ স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য ভারত পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর সংগঠন ভারতসভা স্থাপিত হবার দু বছর পরে ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র দমনে গভর্নর জেনারেল লিটনের কুখ্যাত ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট ঘোষিত হল। বাংলা অমৃত-বাজার পত্রিকা রাতারাতি ইংরেজী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়ে বৃটিশ সরকারের দণ্ড-নীতির কঠোর সমালোচনা করে যেতে লাগল। অন্য দিকে সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করে ইংরেজ রাজের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করে দিলেন। দেশের আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পরের বছর কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসে, সেখানেই তার প্রকৃত জাতীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫·৫০	দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
ডক্টর হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৮·০০	রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব
সুরেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৩·০০	রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২·০০	হাউস অফ দি টেগোরস
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৫·০০	পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫·০০	সঙ্গীতকল্পিকা
রবীন্দ্র রচনার উপদেষ্টা-পরিষদ	১২·০০	রবীন্দ্র-সুভাষিত
ডক্টর কল্যাণ সেন	১৫·০০	এ ক্রিটিক অফ দি থিওরিজ অফ বিপর্যয়
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন	২৫·০০	ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল ডান্সেস্
ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ	৬·০০	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ডক্টর মনন চক্রবর্তী	১৫·০০	স্টাডিজ ইন্ আর্টিস্টিক ক্রিয়েটিভিটি
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	১৬·৫০	রিফর্ম অ্যান্ড রিজেনারেশন ইন্ বেঙ্গল
ডক্টর শোভনলাল মুখোপাধ্যায়	১৪·৫০	সোশিওলজি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
পরিবেশক: জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

সেদিন সুরেন্দ্রনাথ স্বাধিকারের যে দাবী তুলেছিলেন, স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত কংগ্রেস সেই দাবী পূরণের আন্দোলনই করেছে। সেই বিচারেই সুরেন্দ্রনাথ প্রকৃত জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা বলে গণ্য, এবং ভারতকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে, শিক্ষিত জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জাগাবার জন্য ১৮৮২ সালের শরৎকালে তিনি পাটনা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত উত্তর ভারতের শহরে শহরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। পরের বছর সাপ্তাহিক বেঙ্গলী পত্রিকার একটি লেখার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে আদালত অবমাননার দায়ে গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত করা হলে সারা দেশে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা যায়। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আবার তিনি তাঁর প্রচার অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তার প্রথম ও প্রধান হোতা হিসেবে, রাষ্ট্রগুরুরূপে সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র দেশে স্বীকৃতি লাভ করলেন। ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে ও ১৯০২ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।

১৯১৮ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে ত্যাগ করে সুরেন্দ্রনাথ মডারেট দলে যোগ দিলে তাঁর সুনামের কিছুটা হানি হয় এবং বাংলা দেশেই তাঁর বিরুদ্ধবাদী একটি দল গড়ে ওঠে।

কিছুকালের মধ্যে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার ঘোষিত হলে তিনি তা মেনে নেন এবং তখনকার বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর মন্ত্রিত্ব কালেই বিখ্যাত স্বায়ত্তশাসন আইন গৃহীত হয়, যার ফলে কলকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌরসভাগুলি জনপ্রতিনিধিদের শাসনাধীনে আসে।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের আরও বড় কীর্তি, বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব। লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলা দেশকে দু ভাগ করে বলেছিলেন Partition of Bengal is a settled fact. সুরেন্দ্রনাথ এই বলে তার উত্তর দিয়েছিলেন যে, I will unsettle the settled fact, এবং কার্জনের অন্যায় প্রতিরোধে তিনি যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তারই ফলে ১৯১১ সালে দিল্লী দরবারে স্বয়ং পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হন।

এতক্ষণ আমি সুরেন্দ্রনাথের প্রধানত রাজনীতিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বললুম। এইবার তাঁর স্নেহময় হৃদয়ের সম্বন্ধে কিছু বলব। এটা ১৯২২ সালের কথা। এ ঘটনা ঘটে আমার কাকা মতিলাল ঘোষের মৃত্যুর পরেই। মৃত্যুর আগে বেশ কিছুদিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তার কিছু আগে অমৃতবাজারে সুরেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে এক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে মডারেট দলের একজন নেতা ও বাংলা দেশের মন্ত্রী ছিলেন আর অমৃতবাজার ছিল কংগ্রেসের সে সময়কার উগ্রপন্থীদের মুখপত্র। অমৃতবাজারের প্রবন্ধে যা লেখা হয়েছিল, তার জন্যে সুরেনবাবু পত্রিকার বিরুদ্ধে একটি মানহানির মকর্দমা আনেন।

মতিলাল তখন মৃত্যুশয্যাশায়ী এবং তার কিছুদিন পরেই পরলোকগমন করেন। তার পরলোকগমনের পরেই এক দিন প্রসিদ্ধ এটর্নী স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু আমার ছোটকাকা গোলাপলালের সঙ্গে এই মকর্দমা নিয়ে আলোচনা করেন। ভূপেনবাবু আমাদের সংসারের একজন পরম বন্ধু ছিলেন এবং আমার ছোটকাকাকে বললেন, 'গোলাপ, এখন তো মতিবাবু বেঁচে নেই, এখন তোমাদের উচিত সুরেনবাবুর সঙ্গে মকর্দমাটা মিটিয়ে ফেলা। আমি সুরেনবাবুর নামে একটা চিঠি দিচ্ছি। তোমরা কেউ ব্যারাকপুরে গিয়ে সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা কর।' গোলাপবাবু এই প্রস্তাবে তখনই রাজী হলেন এবং ভূপেনবাবু সেইখানে বসেই সুরেনবাবুকে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। গোলাপবাবু বড় কোথাও যেতেন না, তাই এই চিঠি সুরেনবাবুর কাছে নিয়ে যাবার ভার আমার ওপর পড়ল। আমাকে বলা হল যে, মকর্দমা মেটানো ছাড়া সুরেনবাবুকে বলে আসতে হবে যে তিনি যেন মতিবাবুর শ্রাদ্ধসভায় যোগদান করেন।

তখন আমার বয়স ২৪ বছর। কিন্তু তার আগেই আমি পুরো সাব-এডিটর হয়ে গেছি।

পরদিন সকালে আমি ভূপেনবাবুর চিঠি নিয়ে ব্যারাকপুরে চলে গেলুম এবং সুরেনবাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম। সেখানে গিয়ে দেখি যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের চিফ মেডিকেল অফিসার স্যার হাসান সুরাবর্দি'ও বসে আছেন।

সুরেনবাবু ভূপেনবাবুর চিঠি নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন 'বাবা, তুমি মতিবাবুর কে হও'। আমি বললুম, 'আমি মতিবাবুর ভাইপো এবং শিশিরকুমার ঘোষের ছেলে।' তিনি আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে অনেক স্নেহ আদর দেখালেন, তারপর মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন। চিঠি পড়া শেষ হলে তিনি বললেন যে, অমৃতবাজার যে ভাবে তাঁকে আক্রমণ করেছে, তাতে মকর্দমা করে না জিতলে তাঁর রেপুটেশন থাকবে না। আমি জবাবে বললুম, এ প্রবন্ধ মতিবাবুর আমলে লেখা হয়েছিল। তা তিনি তো এখন স্বর্গে। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে আপনাকে তো স্বর্গে যেতে হবে। আমার কথায় সুরেনবাবু হেসে ফেললেন ও বললেন, এখন তো তুমি এখানে খাও-দাও, পরে মকর্দমার কথা হবে।' আমি বললুম, 'আপনি বলেন কি? আপনি আমাদের ওপর মকর্দমা চালাবেন আর আমি আপনাদের বাড়ীতে ভাত খাব। আমার এক সর্ত যে, আপনি যদি এখুনি মকর্দমা তুলে নিয়ে ভূপেনবাবুকে চিঠি লিখে দেন, তাহলে খাওয়া-দাওয়া তো করবই, তার ওপর সারাদিন এখানে থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ী ফিরবো।' আমার কথা শুনে সুরেনবাবুর মুখের যা ভাব হল, তা আজও আমার মনে আছে। তিনি তখুনি টেলিফোনে তাঁর Lawyer বি এল মিত্র মহাশয়কে বললেন যে, তিনি মকর্দমা তুলে নিতে চান। ও'দিক থেকে কি জবাব এল আমি জানি না, কিন্তু সুরেনবাবু বললেন যে, মকর্দমা না তুললে তুমি এখানে জলগ্রহণ করবে না। আর দু-একটা কথার পরই সুরেনবাবু টেলিফোন ছেড়ে দিলেন এবং তখনই ভূপেনবাবুকে চিঠি লিখে দিলেন যে, তিনি মকর্দমা তুলে নিচ্ছেন। আর আমায় বললেন, 'এইবার তো খাবে?' আমি বললুম, 'নিশ্চয়। আর শুধু এখানে নয়, আমার ছোট কাকা বলেছেন যে, এই মকর্দমা মেটাতে পারলে বাড়ীতেও আমাকে ভোজ দেওয়া হবে।' একথা বলাই বাহুল্য যে, হাসান সুরাবর্দি'ও আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন এবং তাঁর মোটর গাড়ীতেই আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। অবশ্য আমার কাকার শ্রাদ্ধে তাঁকে আমি নেমন্তন্ন করতে ভুলিনি এবং যথাদিনে তিনি আমাদের পত্রিকা ভবনে এসে সেই শ্রাদ্ধসভায় যোগদান করেছিলেন। তাঁকে আমাদের বাড়ীতে পেয়ে আমার প্রাণের ভক্তিশ্রদ্ধা দিয়ে আমি প্রণাম ও অভ্যর্থনা করেছিলুম। এই ব্যাপার এইভাবে মিটে যাবার জন্য আমাদের বাড়ীতে একদিন বেশ জাঁকজমকভাবে আমাকে খাওয়ানো হয়েছিল। এমন মানুষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। •

• আকাশবাণী, কলকাতা থেকে প্রচারিত।

শাড়ীর মেলা
নিউ বেনারসী হাউস

অদ্রীশ বর্ধন

চাণক্য চাকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা

॥২॥

পরীরী প্রেতচ্ছায়ার মত ওৎ পেতে ছিল চাণক্য চাকলাদার।

মাথার ওপর ঘন পাতার চাঁদোয়া। অমাবস্যার রাত। তাই চাঁদের লুকোচুরিও নেই। নিবিড় অরণ্য ফিসফিস করছে। নিশীথ হাওয়ায়। দূরে-দূরে পাহাড়চূড়া দাঁড়িয়ে উন্নত শিরে। নিশ্চল, নিশ্চুপ। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষারত আঁধার-মায়ারা।

ফ্যানটাসি হিরোর মতই বেশভূষা চাণক্য চাকলাদারের। টাইট প্লেটকাস্টের ওপর টাইট পুলওভার। মাথায় কানঢাকা চুলঢাকা উলের টুপী। আগাগোড়া মিশমিশে কালো। সাদার চিহ্ন নেই কোথাও।

হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন সবেমাত্র অরণ্যদেব ফ্যানটাসি-কমিকের পৃষ্ঠা থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসেছে জ্যান্ত মানুষ। অরণ্যদেবের তুরঙ্গ? তাও আছে। অন্ধকার

চাণক্য চাকলাদার মানুষ, আহিফেনসেবী, কিন্তু আত্মকথায় গল্পপ্রিয় ও ফ্যানটাসটিক ফিকশন ভক্ত। ভদ্রলোকের দুঃখ, যেহেতু তিনি আহিফেনসেবী, সুতরাং তাঁর জীবন-কাহিনী নাকি আষাঢ়ে কাহিনী। দুঃখ তাই আপনাদের রায় প্রার্থী। এ কাহিনী তাঁরই ডাইরীর অংশ...

তমিস্রার মধ্যে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে একটি নব—ঘাটি ঘোড়া। গ্রীবা বেঁকিয়ে নাসারন্ধ্র স্ফীত করে তারাও প্রতীক্ষমান। কিন্তু কিসের?

ঝাড়া দু ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে চাণক্য সুযোগের মুহূর্তে। গাছের সঙ্গে মিশে গিয়েছে তার কৃষ্ণ মূর্তি। শুধু জ্বল-জ্বলে চোখের দীপ্তি [illegible] প্রজ্বলিত থেকেছে। বাকী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব অন্ধকারে মিশিয়ে। [illegible]-

হিরো চাণক্য চাকলাদার যেন বনানীরই একটি অংশ। নিষ্প্রাণ, নিথর, নীরব।

ত্রিশ গজ দূরে ছোট্ট পাথরের [illegible]। ইংরেজী 'টি' প্যাটার্নের শিবির। 'টি'-এর সাঁথস্থল রাস্তার দিকে। লেজ-টুকু বিস্তৃত পেছনের অরণ্য পর্যন্ত। শেষ প্রান্তে একটি দরজা। দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে বন্দুকধারী সেন্ট্রি। অনতি-দূরে নিবিড় অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে চাণক্য। যেন, মানুষ-চিতাবাঘ। প্রতিটি মাংসপেশী টান-টান। কিন্তু আশ্চর্য স্থির স্নায়ুমণ্ডলী।

সেন্ট্রির সিগারেটের আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। পেণ্ডুলামের মত যাতায়াত করছে সান্ত্রী। প্রতিবারে অ্যাবাউট টার্ন করার সময়ে রাইফেল নামানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চাণক্যর জ্বলজ্বলে-চক্ষু বাঘের চোখের মতই জ্বলছে অরণ্যের অন্ধকারে। লক্ষ্য তার স্থির। সান্ত্রী যে দরজা আগলাচ্ছে,

পর চৌকাঠ পেরোলেই ডিউটিরুম। সেখানে আছে আরও একজন বন্দুকধারী। ভেতরে লম্বা করিডর। দু'পাশে গরাদ দেওয়া খাঁচা। একটি খাঁচার মধ্যে মৃত্যুর মুহূর্ত গুনছে হতভাগিনী ইসাবেলা।

ইসাবেলা! নর্তকী ইসাবেলা! পদ্মিনীর মত রূপ আর দেবীচৌধুরানীর মত সাহস নিয়েও ইসাবেলা চাণক্য চাকলাদারের বাহুর মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল শুধু একটি কারণে। চাণক্য চাকলাদার প্রয়োজন হলে যে জাদুকর মানড্রেকের মত অলৌকিক ক্রিয়া দেখাতে পারে, ইসাবেলা তা দেখেছিল। চাণক্য যদিও জানে, ম্যাজিক দেখানো তার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। বাদুবিদ্যা তার অধীত বিদ্যা নয়। ওর একমাত্র সম্বল দুরন্ত সাহস। মৃত্যু সামনে জেনেও অশ্বারোহীর মত সে আবির্ভূত হয়েছিল এক মরণ যাঁদের ঠিক কেন্দ্রস্থলে। ইসাবেলাকে শত্রুব্যূহের মধ্য থেকে তুলে নিয়ে উধাও হয়েছিল। ইসাবেলা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। ধরা দিয়েছিল চাণক্যর বাহুমধ্যে। কিন্তু সে অন্য এক কাহিনী।

বনকুরঙ্গীর মতই মায়াবিনী ইসাবেলা আবার বিপদে পড়েছে। এবারেও তার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়েছে। অকুস্থল পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরের দুর্গম অঞ্চল। দূরে তুষারকিরীট—চীনের সীমান্ত।

নিউদিল্লীর মানসনে সর্দার বল্লভ সিংহের দেওয়া চিরকুটে চোখ বুলিয়েই চাণক্য বুঝেছিল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। চাণক্য চাকলাদার কাদার ঘুঁটি নয় যে, যেদিকে নড়ানো যায়, সেই দিকেই নড়ে। কিন্তু এহেন তেরিয়া মানুষকেই কাজে লাগানোর জন্যে সর্দারজী যে সংবাদ উপহারস্বরূপ এনেছিলেন, তা সত্যই ভয়ংকর।

ইসাবেলা আজাদ কাশ্মীরের বনবাসী হাউন্ডুলেদের হাতে পড়েছে। ভয়ংকর পুরুষ। এদের নীতি নেই। দেশ নেই। কুখ্যাত শুনে গুন্ডার একটি দল ভারতের মাটি থেকে চম্পট দিয়ে আস্তানা নিয়েছে আজাদ কাশ্মীরের গহন অঞ্চলে। ইসাবেলাকে তারাই লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে নিছক ভোগের জন্য। নারী এদের কাছে পণ্য ছাড়া কিছুই নয়।

মূর্খ! চোয়ালের রেখা কঠিন হয়ে উঠল চাণক্য চাকলাদারের। আহাম্মক! আর পাঁচটা নারী লুণ্ঠনের মতই ইসাবেলাকে তারা নিয়ে গিয়েছে ধর্ষণ, বিক্রয় অথবা হত্যার জন্য। ঘুণাক্ষরেও যোর্কোন সিংহের বিবর আক্রান্ত হলে পরিণাম কি ভয়ংকর হতে পারে!

ইসাবেলা অবলা নয়। তার গাত্রস্পর্শ করা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু একদল হোঁৎকামুখো বর্বরের হাতে প্রাণ টিকিয়ে রাখাও একা ইসাবেলার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই অনেক আয়োজন করতে হয়েছে চাণক্যকে। নয়াদিল্লীতে সর্দারজীর দেওয়া কাগজে ঠিকানা জানার পর দু'দিন কেটেছে। এই দু'দিনেই সীমান্ত অঞ্চলে পুরোনো সাগরেদদের সজাগ করেছে চাণক্য। বিস্তর টাকা ছড়িয়ে হাত করেছে প্রহরীদের।

দু'টি ঘোড়া নিয়ে যথাসময়ে হাজির হবেন ইসাবেলার বন্দীশিবিরে।

লেফটেনান্টের ছাউনি দেওয়া পিটপাটারের সেডটা একেবারে বোধহয় সেনানী শিবির ছিল। যে কোন কারণেই হোক, এখন তা পরিত্যক্ত। হানাদাররা ঘাঁটি নিয়েছে এই শিবিরেই। এখান থেকে ভারতসীমান্তে উপদ্রব সৃষ্টি করা সহজ হবে ভেবেছিল।

বাঘের চোখের মতই চোখ জ্বলছে চাণক্য চাকলাদারের। এবার সময় হয়েছে। হিপ-পকেট থেকে একটা ছোট্ট বস্তু বার করল চাণক্য। অদ্ভুতদর্শন জিনিসটা শক্ত কাঠের তৈরি। যেন একটা থ্যাবড়ানো হাম্বক। হাতলটা খেটের মত হাতের মুঠোয় ধরা যায়। মুঠোর তলা থেকেই বাঘের থাবার মত চ্যাটালো কাঠ বাড়িয়ে দিয়েছে। নিরীহদর্শন ব্যাঙের ছাতার মত এই খেটের গুরুত্ব নাম বলা। চাণক্যের অতি-প্রিয় হাতিয়ার। নিঃশব্দে যে কোন প্রাণ শিকার শুরু করতে অদ্বিতীয়।

সিগারেট জ্বলছে টানছে প্রহরাবক্ত সান্ত্রী নতুন প্রিয়ার কথা ভাবছিল। চিন্তাটা বড় মধুর।

মেয়েটিকে দেখতে পেল। চিন্তে সুন্দরী নয়। লিখি ভাঁটা চেহারা। ডাগর চোখ। ঠোঁটটাও নেই। লটরপটরে সভ্যতে। মানে, নাগর নিয়ে মোচ্ছব করতে জানে।

পাহাড়ের কোলে ঐ যে গাঁ, ঐখানে লুঠতরাজে গিয়েছিল সবাই। কুপচাল আর ভবকাহাড়ি—এই নিয়েই এদের কারবার।

শুভ নববর্ষে প্রকাশিত হয়েছে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর
চট্‌জলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প
সচিত্র সংস্করণ দাম : ৪·০০

গৌরকিশোর চক্রবর্তীর নতুন উপন্যাস
দিগন্তের রঙ
কয়লা খনি ও তার শ্রমিকদের জীবনের পটভূমিকায় রচিত অপূর্ব উপন্যাস। দাম : ৭·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস
হাঁসের আকাশ
উত্তরবঙ্গের পটভূমিকায় রচিত শারদীয়া সংখ্যা বেতার জগতে প্রকাশিত। বিদগ্ধ সমাজে উচ্চ প্রশংসিত। দাম : ৪·০০

সুরেশচন্দ্র সাহার **অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে** (সচিত্র সং) ৫·৫০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
বলাকার মন ৫ম মুদ্রণ ৩·৫০
আবার আমি আসব ২য় মুদ্রণ ৭·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **মন্দাক্রান্তা** ৬·০০
বিমল মিত্রের **কথা চরিত মানস** ২য় মুদ্রণ ৬·৫০

সঞ্জীবকুমার রায়ের **বালজাক** দাম : ৫·০০
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের **রুদ্ধ যাযাবর** দাম : ৮·৫০
নারায়ণ সান্যালের **নাগচম্পা** দাম : ১·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মহাশ্বেতা** ৯·০০
সতীনাথ ভাদুড়ীর **দিগভ্রান্ত** ৯·০০
জরাসন্ধ-র **ন্যায়দণ্ড** ৭·০০

সমরেশ বসুর **শ্রীমতী কাফে** দাম : ৭·০০
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **সমুদ্রের চূড়া** দাম : ৭·০০
বনফুলের **জঙ্গম** ২য় খণ্ড ৫·৫০

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

ধুমসী ধুমেড়ী মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকায় না। নজর ঘোরে শুধু সামন্ত মেয়ের দিকে।

কিন্তু এ মেয়েটি যেন ধরা দেওয়ার জন্যেই তৈরি হয়েছিল। একগাল হেসে এগিয়ে এসেছিল। পিড়ান দেবার কোনো চেষ্টাই করেনি। জোর-জুলুমও করেনি।

পাঁচ-পাঁচটা নওজোয়ানকে একই চুমকুড়ি দিল ডাঁটো মেয়েটো। শুধু নিতম্ব দুলিয়ে এমন তোলপাড় করল যে, কাহারাও পরোয়ানো তো হতবাক। কে আগে ভালবাসবে, এ সমস্যারও সুরাহা করে দিল ছেমড়ী। একটা পয়সা দিয়ে টস করল। শান্ত্রী বেচারীর কপালে শিকে ছিঁড়লো। প্রেমনীর মতই ওর কোমর জড়িয়ে মেয়েটো ঘরের দিকে গিয়েছিল। সেদিন যে আনন্দ হয়েছিল, তার তুলনা নেই। ফিক ফিক করে হাসতে লাগল শান্ত্রী।

অ্যাবাউট টার্ন করল। করেই থমকে গেল। পায়ের কাছে কি-একটা চকচক করছে না? হেঁট হল শান্ত্রী। তোবা! তোবা! এযে দামী আংটি! পাথর বসানো। হীরে নয়তো?

শান্ত্রী হেঁট হওয়ার আগেই অলিন্দের অন্ধকার থেকে অরণ্যদেবের মত ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল চাণক্য চাকলাদার। মার্জারের মত লঘু চরণে এগিয়ে এসেছিল অনেকটা। হেঁট হয়ে শান্ত্রী সিধে হবারও অবসর পেল না। যেন দমকা বাতাসে শুকনো পাতা উড়ে এল। নিমেষে হীরের জৌলুসমুগ্ধ শান্ত্রীর ঠিক পেছনে আবির্ভূত হল চাণক্যর দীর্ঘ কৃশ কৃষ্ণমূর্তি। বাঁ-হাতে খামচে ধরল ঝাঁকড়-মাকড় চুল; ডান-হাতের কংগো নেমে এল নিষ্ঠুর বজ্রের মত। কানের ঠিক পেছনে কংগোর চাটালো দিকটা আছড়ে পড়ল। টাঁ-ফোঁ করল না প্রহরী বেচারী। সবল দেহটা ধড়াস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল। রাইফেলটা শিথিলমুষ্টি থেকে ঠিকরে পড়ার আগেই লুফে নিল চাণক্য। সন্তর্পণে শুইয়ে দিল নিথর দেহের পাশে।

হিপ-পকেটের খাপে কংগো চালান হয়ে গেল। আর একটা হিপ-পকেট থেকে বেরুল অ্যালুমিনিয়ামের টিউব। পেন্সিলের আকারে সরু করে পাকানো দুটো তুলোর সলতে বার করল চাণক্য। আরকে ভিজোনো সলতে। মিঠে সৌরভের আঘ্রাণ নিল। তারপর অচেতন শান্ত্রীর নাসিকা-গহ্বরে ঠেসে ঢুকিয়ে দিল আরক-সিক্ত অ্যানেস্থেটিক প্যাড। ভোর পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। প্রহরীর ঘুম তখনও ভাঙবে কিনা সন্দেহ।

পা টিপে টিপে প্রবেশদ্বারের দিকে অগ্রসর হল চাণক্যর মিশমিশে মূর্তি। নিবিড় তমিস্রায় গা ঢেকে যেন একটা কালো পান্থার এগিয়ে চলল ক্লেদমসৃণ পিচ্ছিলতা নিয়ে।

চৌকাঠ। ভেতরে লণ্ঠন জ্বলছে। ওপাশের দরজার সামনে পা ছড়িয়ে বসে একজন রাইফেলধারী লেঠেল। ঢুলুঢুলু চোখ। কাট-খোট্টা চেহারা। লোকটা চৌকাঠের দিকে ফিরে বসে আছে। কংগোর কোৎকা হাঁকড়ানোর সময়ও পাওয়া যাবে না।

অতএব একটা অত্যন্ত ছোটলোকি প্যাঁচ ছাড়ল চাণক্য। জাপানী প্রথায় যার নাম জুডোর প্যাঁচ।

আচম্বিতে লংজাম্প দিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মাঝে আবির্ভূত হল চাণক্যর লিকলিকে মূর্তি। প্রেতচ্ছায়ার মত শূন্য-পথে মিশকালো মূর্তিকে অবতীর্ণ হতে দেখে আঁৎকে উঠল কাটখোট্টা প্রহরী। পর-মুহূর্তেই হাত দিল কোলের রাইফেলে। কিন্তু তোলবারও সময় পেল না।

চাণক্যর ডান পাটা শূন্যপথে অর্ধবৃত্ত রচনা করে ঘুরে এল—সবেগে আছড়ে পড়ল শান্ত্রীর তলপেটের ঠিক নীচে।

'কোঁক' জাতীয় একটা অবরুদ্ধ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ বেরুল না বেচারীর গলা দিয়ে। শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে গোড়ালীর লাথি ও-স্থানে পড়লে মানুষ-মাত্রই চোখে তিনলক্ষ সর্ষেফুল দর্শন করে তিন সেকেণ্ডেই জ্ঞান হারায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

হেঁট হয়ে অবস্থাটা দেখে নিল চাণক্য। না। অ্যানেস্থেটিক প্যাডের দরকার হবে না। বেচারীর ব্রহ্মতালু পর্যন্ত এখন অসাড়।

সিধে হয়ে দাঁড়াল চাণক্য। সামনেই লম্বা গলিপথ। দুপাশে ছোট ছোট কুঠরি। কোনোটির সামনে লোহার গরাদ, কোনো-টিতে কাঠের। দেওয়ালের সঙ্গে লেপটে গিয়ে এগিয়ে চলল চাণক্য। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন একটা কিম্ভূতকিমাকার গঙ্গাফড়িং লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

অদূরে একটা ঘরের সামনে আলো এসে পড়েছে। কথোপকথনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। টুকরো হাসি। টুকরো কথা। তাস খেলা হচ্ছে বোধহয়।

থমকে দাঁড়াল চাণক্য। ও একা। ওরা অনেক। ধাপড়খাই প্যাঁচেও সুবিধে হবে না। এখানে প্রয়োজন অন্য দাওয়াই।

ডান উরুর সামনে চামড়ার খাপ থেকে দুটি বিচিত্র জিনিস বার করল চাণক্য। এক বিঘৎ লম্বা একটা পুঁচকে সিলিণ্ডার। আর একটা অত্যন্ত ক্ষুদে গ্যাস-মুখোস। ক্লিপ দিয়ে গ্যাস-মুখোসটা নাকে লাগাল চাণক্য। পলিথিনের পাইপ জুড়ে দিল সিলিণ্ডারের মাথায়। বুকের কাছে ছোট পকেটে রইল সিলিণ্ডার।

বাঁ উরুর সামনে চামড়ার খাপ থেকে বেরুল আর একটা অদ্ভুত বস্তু। রেস্তোরাঁর নুন-মরিচ রাখার প্লাস্টিক-পাত্রর মত দেখতে। মাথায় একটা ছোট্ট ঢাকনা।

মিডিয়াম ওয়েভ, ১৯° মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যাণ্ড	কিলোসাইকল্‌স্‌
১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১	২১৪৬৫, ১৫০৯৫
	১১৭০০ ও ৯৬৪০
মিডিয়াম-ওয়েভ ১৯০ মীটার	১৫৮০

এর নাম অপর্ণা

মায়ের চোখের মণি, ১০০ অবধি স্কিপিং করতে পারে
আর নামতা পারে ১১ ঘর অবধি!

আসল জিনিসটি ওর চাই!

অপর্ণা কেবল বলে, 'আমি যখন হব মায়ের মত বড়'।
ওর মা তাতে বলেন, 'খুব ভাল হবি, খুব কাজের হবি'।
আর তাইতো মা ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দেন—
যাতে ওর বাড়ন্ত শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়।
হরলিক্সই হলো আসল জিনিস।
পুষ্টির উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন থাকাতে
হরলিক্স ছেলেমেয়েদের শরীর গড়ে তুলতে বিশেষ
সাহায্য করে।

হরলিক্স খাঁটি তাজা দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং যবের
পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এতো গুণ।
হরলিক্সের ওপর মায়েদের অগাধ বিশ্বাস।
ডাক্তারেরা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে
নির্দেশ দিয়ে আসছেন।
রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের
স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।
হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

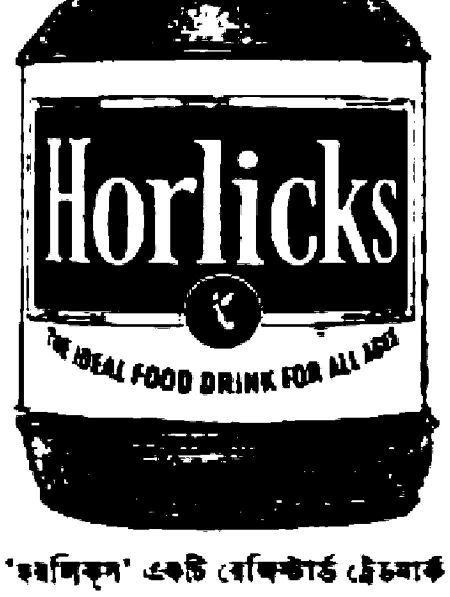

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিস

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1054 A

বাঁ-হাতে নিরীহদর্শন প্লাস্টিক-পাত্র ধরে ডান-হাতে চামড়ার হোলস্টার থেকে নিকলালো অটোমেটিক বার করল চাণক্য। নতুন মডেলের অটোমেটিক। এম-এ-বি ব্রেকেটি। নিঃশব্দে অগ্নিবর্ষণ করবে।

পরমুহূর্তেই দরজার ফ্রেমে আবির্ভূত হল চাণক্য। যেন একটা অতিকায় কনভেড়াল। নিঃশব্দপদসঞ্চারে চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। হিমশীতল দুর চোখদুটো কেবল জ্বল জ্বল করতে লাগল ফসফরাসের দীপ্তি নিয়ে।

ছোট ঘর। জানালায় চট টাঙানো। দড়ির আলনায় ঝুলছে কতকগুলো শার্ট। মাঝখানে একটা সস্তা কাঠের টেবিল। চারপাশে চারখানা চেয়ার। চেয়ারে উপবিষ্ট চারজনেই তন্ময় তাসের জুয়োয়। চারজনের চেহারাই মার্কামারা বদমায়েশের মত। কোমরে রিভলবার। কাঁধে টোটার বেল্ট। ঝাঁটার মত গোঁফ। রক্তচোখ।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড কেউ টের পায়নি চাণক্যর অস্তিত্ব। নোরগোড়ায় কালান্তক যমদূতের মত মূর্তিটিকে দেখতেও পায় নি। দরজার দিকে ফিরে যে বসেছিল, হঠাৎ দুনো হাত ছুড়ে সে অট্টহাসি হাসল। হাসি গলাতেই আটকে গেল উন্মত্ত রেভলভারের নলচে দেখে। সাপের চোখের মত শুধু চক-চক করতে লাগল ফোটোগ্রাফিক্ট প্রত্যঙ্গ দুটি—গলা দিয়ে আর শব্দ বেরুল না।

খাপছাড়া হাসির পর সহসা নৈঃশব্দের কারণ অন্বেষণ করতে চোখ তুলল বাকি তিনজন। সম্মোহিতের মত উপবিষ্ট প্রথম জনের দৃষ্টি অনুসরণ করে কাঠ হয়ে গেল সবাই। হাতের তাস হাতেই রইল।

হায়নার মত হাসল চাণক্য। এ হাসির অর্থ কাউকে বলে দিতে হয় না। প্রমাদ গুনল চার জুয়ারী।

চোস্ত উর্দু বলল ভয়ংকর— নড়বার চেষ্টা কর না। চাগাড়ি মারতে যেও না। এ রিভলবারে আওয়াজ হয় না। গুলি ফসকায় না।'

চারজনেই যেন হিপনোটাইজড্।

চাণক্য দু'পা এগিয়ে এল ঘরের মধ্যে। রিভলবারের ইঙ্গিতে একজনকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করল। লম্বা ঠ্যাং দিয়ে চেয়ারটাকে সামান্য টেনে আনল। তারপর বাঁ-হাতের বিচিত্র প্লাস্টিক-বস্তুটা রাখল চেয়ারের ওপর। রেখেই ওপরের বোতামটা টিপে দিল।

হিস্ হিস্ শব্দ শোনা গেল। গ্যাস বেরুচ্ছে। সবুজ রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে প্লাস্টিক-পাত্রর মাথা দিয়ে।

চেয়ারে উপবিষ্ট একজন মুশকোর হাত হাঁপ হাঁপ করে সরল কোমরের রিভল-বারের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ঝলসে উঠল চাণক্যর মুঠোয়। বুলেটটা আর্তনাদ করে টেবিলে লেগে ঠিকরে গেল।। কাটাও হাত সরিয়ে নিল শুঁফো।

সবুজ ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে চেয়ারের ওপর। সবচেয়ে কাছের দুজন ঝিমোতে লাগল। তারপর চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। তৃতীয়জন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। দণ্ডায়-মান চতুর্থজন সটান আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

বোতাম টিপে গ্যাস বন্ধ করল চাণক্য। ঘুম-গ্যাস পাত্র আবার চালান হয়ে গেল উর্দির পকেটে। আবার সেদুলো আধমুমূর্ষি-মান হিবে আর আকস্মিক তুলোর সলতে। চারজনের নাসিকারন্ধ্রে অ্যানেসথেটিক প্যাড ঠেসে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফ্যানটাসি-বিরো চাণক্য। ওঠবার সময়ে পাশের লোকের কোমর থেকে চাবির গোছা নিতে ভুলল না।

কালো গঙ্গাফড়িংয়ের মত লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে আবার শুরু হল কারাগার পর্যবেক্ষণ।

*

মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল ইসাবেলা। সুন্দরী ইসাবেলা। মোহিনী ইসাবেলা।

একাকিনী শিকারে বেরিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে ইসাবেলা। আচম্বিতে জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। জালটা পাতা ছিল ঠিক মাথার ওপর। হাটিতে দড়ি লেগেছে। টান পড়তেই জাল মাথায় পড়েছে। তারপর এসেছে এই বর্বর-গুলো।

ইসাবেলা নারী বটে, কিন্তু দুর্বল নয়। চার-পাঁচজন পুরুষকে শুধু হাতে ঠেকিয়ে রাখার মন্ত্রগুপ্তি তার জানা আছে। যুযুৎসুর অনেকগুলি মোক্ষম প্যাঁচ চাণক্য চাকলাদার তাকে হাতে ধরিয়ে শিখিয়েছে। হাতে অস্ত্র থাকলে তো রক্ষে নেই। দাও-তালি কারদায় বীরধনুকের মারণবিদ্যা শিখেছে চাণক্যর হাতে। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র চালনা শিখেছে ইউরোপে। শৈশব থেকেই দুনকষর দুষ্টেবাজের মধ্যে মানুষ হয়েছে ইসাবেলা। লৌহকঠিন স্নায়ু আর অপরিমেয় সাহস নিয়ে গঠন করেছিল নিজের দল।

দস্যুরানী ইসাবেলা এক সময়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল সারা ইউরোপে। সাগরের ঢেউয়ে নাচতে নাচতে জাহাজ লুঠ করেছে বোম্বেটের মত, পুলিশবাহিনীর নাকের ওপর দিয়ে হাসতে হাসতে ব্যাঙ্ক লুঠ করেছে জাদুকর লুঠেরার মত।

বিস্ময়কর ছিল তার কৌশল। অভিনব ছিল তার উপস্থিত বুদ্ধি। রোমের একটি বিখ্যাত ব্যাংক লুঠ করতে গিয়ে পুলিশের বেড়াজালে পড়েছিল ইসাবেলা। বেরোবার একটি মাত্র পথে বন্দুক উঁচিয়ে বসেছিল প্রহরীর দল।

পালাবার কোনো পথ ছিল না। তবু পালিয়েছিল ইসাবেলা। আচম্বিতে বিবস্ত্রা হয়ে গিয়েছিল। স্ট্রীপটিজ নর্তকীর মত একে-একে নিক্ষেপ করেছিল অঙ্গের প্রতিটি বস্ত্র। মায় প্যান্টি পর্যন্ত। স্তম্ভিত জনসাধারণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল ইসাবেলার ভেনাস-রূপ দেখে। যেন শ্বেত-পাথরে খোদাই করা অপরূপা নারীমূর্তি সহসা প্রাণবন্ত হয়েছিল প্রকাশ্য দিবা-লোকে। রূপসী বোম্বেটের নিখুঁত নাক-মুখ-চোখ তো বটেই, নিটোল বুক, গুরু-নিতম্ব এবং ক্ষীণ কটির রঙমাতানো হিল্লোল অতি বড় সুন্দরীর তনুতেও এভাবে দেখা যায় না।

ক্ষণিকের পুলিশের রূপসুধা নিয়ে সবাই যখন তন্ময়, চতুরা ইসাবেলা সেই অবসরে পুলিশ-বন্দুকের চোখের সামনে দিয়েই বাইরে পা দিয়েছিল এবং পরমুহূর্তে প্রতীক্ষমান মোটরে উঠে চম্পট দিয়েছিল।

জাদুকরী সেই ইসাবেলাই এখন বন্দিনী কয়েকজন নারী ব্যবসায়ী লুঠেরার হাতে।

শ্বেতপাথরের এই বন্দীশিবিরে কয়েকজন যুবতীকে দেখেছে ইসাবেলা। কেউ বন্দ-নাম, কেউ পরে নাম। বন্দিনীদের কানাকাজ আহুতি দিতে হয়েছে প্রত্যেককেই। শুধু ইসাবেলা বাদে।

ইসাবেলা তাই বন্দিনী এবং একাকিনী। ওর খাঁচায় আর কেউ নেই। ভাগ্য তার অনিশ্চিত। যে ক'জন বোনং ভুক্ত পশু এসেছিল, প্রত্যেকেই উচিত শিক্ষা নিয়ে ফিরেছে। সুতরাং ইসাবেলার আর রেহাই নেই।

নিজেকে নিঃসঙ্গ, বড় অসহায় বোধ হচ্ছিল ইসাবেলার। এ অনুভূতি ইদানীং তাকে পেয়ে বসেছে। চাণক্য তার দর্পচূর্ণ করেছে। একহারা লিকলিকে ঐ মানুষটি কাছে না থাকলে অগ্নিশিখার মত জ্বলন্ত ইসাবেলা যেন নিবন্ত থাকে। চাণক্যর ছোঁয়া পেলে মুহূর্তে সে প্রজ্বলিত হয়। দুর্বার সাহস আর দুরন্ত উপস্থিত বুদ্ধি নিমেষে জাগ্রত হয়। ফিরে আসে অতীতের ইসাবেলা। হার্মাদ মেয়ে ইসাবেলা।

কারাগারের অন্ধকারে তাই মর্মর-মূর্তির মত নীরবে বসেছিল ইসাবেলা। হয়ত আজই শেষ রজনী। হয়ত কাল ভোরের আলো ইসাবেলার অদৃষ্টে নেই।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!
DOL-727 BEN

আজ রাতেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ইসাবেলার নিখুঁত সুন্দর স্বপ্ন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইসাবেলা। এবং চমকে উঠল।

লোহার কুলুপে চাবি লাগানোর শব্দ। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি শুধু ছায়ামূর্তি। আপাদমস্তক মিশমিশে কালো। অসম্ভব ঢ্যাঙা। যেন একটা প্রেত-ছায়া। ছায়ামায়ার মধ্যেও চিনতে বিলম্ব হল না ইসাবেলার।

বিন্দুমাত্র ব্যগ্রতা দেখাল না হার্মাদ-রানী। কিন্তু যেন মহানিদ্রা ভঙ্গ হল। বিষাদের নাগপাশ মুহূর্তে খসে পড়ল। যেন, চকিতে লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চারিত হল মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

নিকট অতীত দুঃস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হল সুদূরে। জাগ্রত হল ইসাবেলার সুপ্ত শক্তি। বারে বারে এই কাণ্ডই ঘটেছে। চাণক্য ইস্পাত আর ইসাবেলা চুম্বক। স্ফুলিঙ্গের রোশনাই কেবল চাণক্যই জাগিয়েছে—আর কেউ নয়।

ধীরে-সুস্থে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল ইসাবেলা। শরীরী আতংকের মত ঐ যে দীর্ঘ কৃশ কৃষ্ণমূর্তি—ও বুঝি অপ্রত্যাশিত নয়—ওর আবির্ভাবের জন্যই বুঝি প্রহর গুনছিল কুহকিনী ইসাবেলা।

শব্দহীন পদক্ষেপে ঘরের মধ্যস্থলে পৌঁছোলো চাণক্য। আধো-অন্ধকারে বাঘের চোখের মত দপ দপ করছে পাগল জোড়া চক্ষু। পলকের জন্য স্থির রইল ইসাবেলার টানাটানা চোখের ওপর। ইসাবেলা ভাবলেশ-হীন। আবেগহীন। নির্বিকার। শক্তির ডায়নামো আবার চালু হয়ে গিয়েছে। তাই এই স্নায়ু-সংযম।

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। বুঝি বহুবার মহড়া হয়ে গিয়েছে। এরপর কি করণীয়, ইসাবেলা তা জানে। এ শুধু পুনরাভিনয়।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গলিপথে পা দিল দুজনে। ইসাবেলার হাতে নিজের অটো-মেটিক ধরিয়ে দিল চাণক্য। চামড়ার বেল্ট থেকে একটা হিলহিলে ছুরিকা টেনে নিয়ে ফলাটাকে ধরল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর ফাঁকে। একরত্তি ঐ ছুরিকার ক্ষমতা ইসাবেলা জানে। দধীচির হাড় দিয়ে তৈরী বজ্রের মতই অমোঘ ঐ ইস্পাত ছুরিকা চাণক্যর হাতে যে কতখানি রক্তলোলুপ হতে পারে, ইসাবেলা তা দেখেছে, একাধিকবার।

পাশের গরাদে রক্তহীন কতকগুলি মুখ দেখা গেল। আতংকে অত্যাচারে ফ্যাকাশে কয়েকটি যুবতী আকুল নয়নে তাকিয়ে ওদের দিকে। চাণক্য জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ইসাবেলার দিকে। ঘাড় নেড়ে সায় দিল ইসাবেলা। চাণক্য বাঁ-হাতের চাবির গোছা ধরিয়ে দিল ওদের হাতে। জঘন্য দৃশ্যটা চোখে পড়ল তখনি। আদিম মানবীর মতই ওরা নিরাবরণ। সাপের মত বেণী দিয়ে লজ্জা ঢাকার বৃথা চেষ্টা।

চাণক্য চোখ ফিরিয়ে নিল। কলকাতার বাগানেও এ দৃশ্য বহুবার দেখা গিয়েছে। নতুন কিছু নয়।

গলিপথের শেষ দেখা যাচ্ছে। সদর দরজা আর মাত্র ফুট পনেরো দূরে। বাইরে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ, অরণ্য আর পর্বত।

আচমকা একটা চীৎকার শোনা গেল। বিস্ময় আর হুঁশিয়ারি যেন ফেটে পড়ল সে চীৎকারে।

চাণক্য বুঝল। খোলাদ্বারে বেহুঁশ প্রহরীর দেহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

চকিতে কোণগোড়ায় এসে দাঁড়াল একজন স্টেনগানধারী। দাঁড়িয়েই থ হয়ে গেল। দশফুট দূরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার দানবের মত এক জ্বলন্তচক্ষু ঢ্যাঙা মূর্তি। পাশেই সেই রায়বাঘিনী রূপসী মেমসাহেব।

স্টেনগানের নলচে দিশাহারা হল। কাকে তাগ করা যায়? ইসাবেলা অটো-মেটিক তুলতেই স্টেনগান সেদিকে ঘুরল।

বিপক্ষকে চাণক্যর সার্কাস ঠিক তখনি দেখা গেল।

চোখের পলক ফেলবার আগেই মাটিতে সটান আছড়ে পড়ল চাণক্য। পড়েই গড়িয়ে গেল। পরমুহূর্তে বকের ঠ্যাঙের একটা ঠ্যাঙ দিয়ে স্টেনগানধারীর দুপা হুকের মত বাঁধল। অপর পায়ের লাথি কার্তুজের মত গিয়ে পড়ল জোড়াহাঁটুর ওপর।

গোড়াকাটা কলাগাছের মত ধড়াম করে চিৎপাত হয়ে পড়ল প্রহরী। খুলিটা পাথরে লেগে চৌচির হয়ে গেল কিনা বোঝা গেল না। তবে একটি বিশ্রী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নিস্পন্দ হয়ে গেল কোতোয়ালের দেহ।

কাঁধের ওপর ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার ওপর উঁচো ডিগবাজি খেয়ে চট করে খাড়া হয়ে দাঁড়াল চাণক্য। আশ্চর্য এই কৌশলটা বহু সাধনাতেও রপ্ত করতে পারেনি ইসাবেলা।

ইস্পাত ছুরিকা তুলে নিয়ে বাইরে পা দিল চাণক্য। কেউ নেই। দূরে অরণ্যের অন্ধকার। মাথা নিচু করে জ্যামুক্ত তীরের মত ছুটল দুই মূর্তি।

পেছনে সোরগোল শোনা যাচ্ছে। বন্দিনীরা দৌড়ে পালাচ্ছে। কয়েকটা বন্দুক-নির্ঘোষও শোনা গেল।

অরণ্যের প্রান্তে এসে গেছে। গুঁড়িতে গুঁড়িতে সাদা দাগের আঁক দিয়ে রেখেছে। চাণক্যর দৃষ্টি অন্ধকারে তাড়া খেয়েও পথ হারাবে না। সাদা দাগের নিশানা দেখে ঘোড়া দুটির কাছে অনায়াসেই পৌঁছোনো যাবে।

পেছনের শোরগোল বাড়ছে। বন্দী-শিবিরের ঘুম ভেঙে গেছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই কালো মেঘের মত ঘোড়াদুটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল দুই মূর্তি। অদৃশ্য হল চোখের নিমেষে। শিক্ষিত তুরঙ্গের কণ্ঠ দিয়ে হ্রেষাধ্বনি তো দূরের কথা, নাসিকাধ্বনিও শোনা গেল না। পা টিপে ঘাসের ওপর হাঁটিয়ে দূরে সরল দূরে সীমান্তের দিকে। পাহাড়ের কুয়াশায় অদৃশ্য রইল অশ্বখুরধ্বনি।

দেখতে দেখতে পাহাড়ী পথে অদৃশ্য হল পাহাড়ী টাট্টু। যবনিকা পড়ল নিশীথ নাটকে। জাগ্রত হল বিস্মিত ঐরাবত।

—ক্রমশঃ

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

একটি সোবিয়েত উপন্যাস

ভেরা পানোভা সোবিয়েত রাশিয়ার একজন প্রথম শ্রেণীর লেখিকা। ১৯০৫ খৃঃ রোসটভ্-অন-ডন-এ তাঁর জন্ম। সোবিয়েত রাশিয়ার জনপ্রিয় লেখক-লেখিকাদের তিনি একজন। অজস্র ছোটগল্প ও নাটক রচনা করে ভেরা পানোভা খ্যাতির অধিকারিণী হয়েছেন, এমন কি মিস পানোভার রচনাকে শেখভের সমগোত্রীয় এমন কথাও সমালোচকরা বলে থাকেন। মিস পানোভার রচনাবলী অন্ততঃ ত্রিশটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সেরিয়োঝা মিস পানোভার বহু প্রশংসিত উপন্যাসিকা। এই গ্রন্থটি সম্প্রতি ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে।

মাত্র সতের বছর বয়সে পানোভা স্থানীয় সংবাদপত্রে যোগ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামান্য কিছু পূর্বে তিনি ছোটগল্প ও নাটক রচনা সুরু করেন। ১৯৪৪ খৃঃ তিনি 'হসপিটাল-ট্রেনে' রিপোর্টারের কাজ করেন। এই অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তিনি যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন তার ইংরাজী অনুবাদের নাম 'ফেলো ক্ম্প্যানিয়ন'। ১৯৪৬ খৃঃ প্রকাশিত এই উপন্যাসটি তাঁকে লেখিকা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

'সেরিয়োঝা' একটি ছোট ছেলের বড় হয়ে ওঠার কাহিনী, এ কাহিনী সর্বকালের। সেই ছোট ছেলেটির অভিজ্ঞতা, মানসিক প্রতিক্রিয়ার নিখুত ছবি—এই উপন্যাসে রূপায়িত। জীবনের ভালো ও মন্দ, কাছের ও দূরের মানুষ, দূরের জগৎ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বেড়ে চলে। ছেলেটি অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়েছিল। তার পর একদিন তাদের সংসারে আবির্ভূত হল 'বিপিতা'। এই বি-পিতা সহৃদয় মানুষ অথচ দৃঢ় চেতা। তাঁর সঙ্গে ক্রমে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে সেরিয়োঝা নামক সেই শিশুটির এবং সেই শিশু একদিন বি-পিতার সহযোগিতায় পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতিশয় সরল এবং সহজ ভঙ্গীতে ভেরা পানোভা এই কাহিনীটি বিধৃত করেছেন। সরলতা এবং স্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ এই উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম রস উপন্যাসটিকে আশ্চর্য শিল্পকর্মে পরিণত করেছে।

গ্রন্থের সূচনায় সেরিয়োঝা অবশ্যে সবাই ওকে মেয়ের মত মনে করে, কি আশ্চর্য বোকা ওরা। মেয়েরা ত ফ্রক পরে, সেরিয়োঝা ত' কতকাল আগে ফ্রক পরা ছেড়েছে, তার কেমন গুলতি আছে, কোনো মেয়ের কি গুলতি আছে? সেরিয়োঝা তার সেই গুলতি দিয়ে ঢিল ছুঁড়তে পারে। এটা শুরিক বানিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে সেরিয়োঝা শুরিককে সারা জীবন ধরে সঞ্চিত সুতোর খালি কাঠিম দিয়েছে।

আর ওর মাথার চুল, সে ত' কতবার ছাঁটা হয়েছে, কিন্তু ঠিক আগের মত হয়ে উঠেছে আবার। তবে, ও পুষিয়ে নিয়েছে। সবাই বলে ও নাকি বয়সের অনুপাতে ভারী চতুর। যে কোনো বই ওর কাছে দু-তিনবার পড়ে শোনালে সে আগাগোড়া মুখস্ত বলতে পারে। নিজের অক্ষর পরিচয় হয়েছে, তবে নিজে নিজে পড়ে শিখতে অনেক সময় লাগে। সমস্ত বই ক্রেয়ন বা রঙীন পেনসিল দিয়ে বিচিত্র করে রেখেছে সেরিয়োঝা, সে যেমন বুঝেছে যেখানে যে রং ভালো লাগে সেই রং দিয়েছে। বই পড়তে ভালোবাসে, তবে বই-এর সব কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কেন না জন্তুরা সত্যি কথা বলতে পারে না, উড়ন্ত কার্পেট সত্যই ত' উড়তে পারে না—ইঞ্জিন কোথায়, এ সব না জানাটাই বোকামি।

তা ছাড়া কি করেই বা গল্প বিশ্বাস করবে, একটা ডাইনির গল্প পড়ে শোনানো হল, তার পর কিনা সবাই বলে—না না, সত্যি ডাইনি বলে কোনো কিছু নেই সেরিয়োঝা।

একটা কাঠুরে তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে হারিয়ে যায়, হারিয়ে যাওয়ার জন্যই গিয়েছিল। আর বাড়ি ফেরেনি। তাদের নাকি বুড়ো আংলা শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে ছিল। এ সব বই যে কেউ পড়িয়ে শোনাক সেরিয়োঝা ত চায় না।

সেরিয়োঝার কাছে থাকে তার মামণি, পাশা মাসি আর লুকিয়ানিচ। বাড়িতে তিনটে ঘর সেরিয়োঝা ও মা মণি একটা ঘরে শোয়, আরেকটায় পাশা মাসি আর লুকিয়ানিচ, আরেকটা ঘর ডাইনিং রুম হিসাবে ব্যবহার হয়। লোকে বলে এটা ছোট শহর সেরিয়োঝা ও তার বন্ধুরা কিন্তু জানে, এটা ভুল কথা। কারণ শহরে জলের স্তম্ভ আছে, মনুমেন্ট আছে। সিনেমা আছে। একদিন মা ডেকে বলেন—সেরিয়োঝা, তুমি জানো, তোমার একজন বাবা আসছেন। সেরিয়োঝা ব্যাপারটি ঠিক বোঝে না—কোনো কিছু ভাবেনি কোনোদিন এ বিষয়। কিছু ছেলেমেয়ের বাবা আছেন, অনেকের আবার নেই। সেরিয়োঝার বাবা যুদ্ধে নিহত, তাই তার বাবা নেই। সে তাঁর ফটো দেখেছে। মাঝে মাঝে মা ছবিটায় চুমা খান ওকেও চুমা খেতে বলেন। মা বলেন—বাবা না থাকা খারাপ, তাই না সেরিয়োঝা।

অনেক কষ্টে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে সেরিয়োঝা বলে—হ্যাঁ-তা-ই। সত্যি সত্যি ও কিছু বোঝে না, মা চান তাই ও হ্যাঁ বলল। সুতরাং মনে প্রশ্ন জাগল—বাবা চাই-না-বাবা চাই না। টিমোখিন একদিন লরিতে চড়িয়েছিল পাড়ার সব ছেলেকে, সবাই পিছনে বসল, কিন্তু শুরিক বসলো একেবারে ড্রাইভারের পাশে। সবারের হিংসে হলেও কেউ কিছু বলতে পারে না, কারণ টিমোখিন শুরিকের বাবা। তবে দুষ্টুমি করলে আবার টিমোখিন শুরিককে খুব

প্রহার দেয়। যাই হোক—হয়ত একটা বাবা থাকা ভালোই।

করসটেলেভ যেদিন এলেন সেদিন সেরিয়োজাকে তিনি কয়েকবার চুমা খেলেন। সেরিয়োজা ভাবে এখন ত আমার বাবা হয়েছেন, তাই বোধহয় এত চুমা খাচ্ছেন। তিনি স্যুটকেস থেকে একটা মা-র ফটো নিয়ে সেটি চুম্বন করে দেয়ালে পেরেক পুঁতে টাঙ্গালেন। মা এসে বললেন—এ আবার কেন, আমি ত' এখন সব সময় তোমার কাছেই থাকছি।

করসটেলেভ ওর হাত দুটি ধরে কাছে টেনে আনলেন তারপর সেরিয়োজার দিকে নজর পড়ায় থেমে গিয়ে বললেন—তারপর, সেরিয়োজা এখন থেকে তোমাদের কাছেই থাকবো, তোমার আপত্তি নেই ত'?

সেরিয়োজা প্রশ্ন করে—তুমি বরাবর থাকবে। তুমি আমাকে মারবে ত'? যদি দুষ্টুমি করি।

না-না, মারব কেন দুষ্টামি করলে সে যা হয় একটা কিছু করা যাবে। সে আমরা বোঝাপড়া করব।

সেরিয়োজা বলে—আমার একটা বাই সিকল চাই কিন্তু। রবিবার হতে কি অনেক দেরী।

করসটেলেভ বললেন—না তেমন দেরী কই, আর ক' দিন পরে।

রাতের আহারে বসেছিল তিনজন। সেরিয়োজা, মা-মণি আর করসটেলেভ। পাশা মাসিমা আর লুকিয়ানিচ অন্য কোথায় গেছেন। সেরিয়োজার ঘুম পাচ্ছিল।

সকালে ঘুম ভাঙতে সেরিয়োজা যে কোথায় শুয়ে আছে স্থির করতে পারে না। এ ঘরে তিনটের জায়গায় দুটি জানলা। জানলার পরদাগুলো অন্যরকম। তাহলে এটা পাশা মাসিমার ঘর। খোলা জানালা দিয়ে প্রভাতী রোদ গাছের মাথায় পড়েছে দেখা যাচ্ছে। উঠে যাচ্ছে। উঠে দরজা খোলার চেষ্টা করল, দরজা বন্ধ, খুলছে না। ওর ইচ্ছা হল এখন ওর খেলাঘরের কোদালটা টেনে নিয়ে গর্ত খুঁড়তে আসে। দরজার ধাক্কা দিয়ে সে চেঁচায়—মা ও মা মণি।

দরজা বন্ধ। চারিদিক স্তব্ধ। ও গলা ছেড়ে চেঁচায়—মা ও মা, মাগো। পাশা মাসিমা রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসে ঠাণ্ডা করে দিয়ে বলে—ছিঃ ছিঃ একি! তুমি কি আর ছোট্ট আছো যে এভাবে চেঁচাও! মা মণি ঘুমুচ্ছেন, তাঁকে ঘুমুতে দাও, এমন চেঁচাও কেন?

উত্তেজিতভাবে সেরিয়োজা বলে—আমার কোদালটা কোথায়। কোদাল চাই।

—বেশ ত' পাবে—কোদাল ত' আর পালাচ্ছে না। এই নাও তোমার পুতুলটি এটা নিয়ে খেলা করোগে যাও। তবে তার আগে ভদ্দর লোকের মত মুখটা ধুয়ে নাও।'

সহৃদয় এবং বিচার সম্মত যুক্তিপূর্ণ কথায় সেরিয়োজা চিরদিন শান্ত হয়েছে। সে মাসির কাছে মুখ ধুয়ে এক মগ দুধ পান করে। পুতুলটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

গ্রন্থ শেষে ওরা চলে যাচ্ছে। করসটেলেভ আর মা মণি চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে মা মণি—সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। এখানে ওখানে বসছেন, কিছুক্ষণ নীরব থাকছেন। এইটাই রুশদেশের প্রাচীন লোকাচার। মা মণি পাশা মাসিকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—সেরিয়োজাকে দেখো।

সেরিয়োজার কাছে সব কেমন অপরিচিত ঠেকছে। এই উঠানটা যেন ওদের বাড়ির উঠান নয়। এই সব ছেলেদের সঙ্গে ও যেন কখনও খেলা করেনি। ও আজ পরিত্যক্ত।

লরী ছাড়ল। টিমোখিন লরীতে উঠে বসল। সেরিয়োজা লক্ষী হয়ে থাকার সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভুলে তুষারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। নিঃশব্দ কান্না।

সহসা করসটেলেভ লরী থামালেন। বললেন—সেরিয়োজা তুমি তোমার জিনিষপত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলে এসো। তুমিও আমাদের সঙ্গী। এসো, তাড়াতাড়ি এসো।

সবাই তাকে বলল—একি! এটা কি করছ। পাশা মাসিমা বললেন—ও যে মরে যাবে ওখানে ও কি বাঁচবে?

করসটেলেভ বললেন—বাজে। সে দায়িত্ব আমার। এসো এসো সেরিয়োজা!

এই বলে দৌড়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। সেরিয়োজা প্রথমটা বুঝতে পারেনি। বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে ভয় হয়। বুকটা কেমন করছে, ধুক্ ধুক্ করছে—

দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে ওর খোলা বাক্সটা নিল, আরো কিছু সেই সঙ্গে। তবু ভয় হয়, হয় করসটেলেভ এখনই মত পরিবর্তন করবেন। সে আবার এলে করসটেলেভের কাছে, মা এবং মাসির প্ররোচনায় তাঁর মত পরিবর্তন হতে কতক্ষণ!

সে বেরিয়ে এল। করসটেলেভ বললেন—কই, চলে এসো তাড়াতাড়ি।

সেরিয়োজার জিনিষপত্র সবাই মিলে একত্রিত করল।

তারপর লরীতে উঠে বসল। ড্রাইভারের পাশে একটু ভীড় বেশী। চারজন বসেছেন। ভেড়ার চামড়ার গন্ধ। টিমোখিন ধূমপান করছে। সেরিয়োজা কাশছে।

শেষ মুহূর্তে সেরিয়োজা ভাবছে—আমরা চলেছি-চলেছি। টিমোখিন নিয়ে চলেছে। আর পিছনে অনেক উঁচুতে বসে আছেন করসটেলেভ। তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বাইরে তুষারে বসে আছেন। কিন্তু আমাদের বসিয়েছেন ভিতরে স্বাচ্ছন্দে ও শান্তিতে। ওপরে স্বর্গধাম আমরা সবাই চলেছি হলমগোরীতে চলেছি। টিমোখিনের লরীর দর্প বাড়ছে, আর তুষারকণা সেরিয়োজার গায়ে এসে লাগছে।

এইখানেই উপন্যাসের যবনিকা। অনন্ত কালের একটি খণ্ড চিত্র। চলমান জীবনের চলচ্চিত্র এই উপন্যাস।

—[illegible]

TIME WALKED—By VERA PANOVA. Ppblished by Collins Ltd (London) : 30 Shikings.

সাহিত্যের খবর

এ বছরের বাংলা সাহিত্য পুরস্কার।। প্রতি বছরই বাংলা দেশের কয়েকটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র এবং প্রকাশন সংস্থা কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে কয়েকটি পুরস্কারে সম্মানিত করে থাকেন। এ বছর যাঁরা সম্মানিত হবেন, তাঁদের নাম সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই একটি অনুষ্ঠানে এদের এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

অমৃতবাজার, যুগান্তর ও অমৃত, পত্রিকার পক্ষ থেকে 'শিশিরকুমার' ও 'মতিলাল পুরস্কার' দুটি প্রদান করা হয়ে থাকে। উভয় পুরস্কারেরই সম্মানমূল্য এক হাজার টাকা। এবারের শিশিরকুমার পুরস্কার লাভ করেছেন কবি নরেন্দ্র দেব। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত। মতিলাল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন প্রখ্যাত লেখক মণীন্দ্রলাল বসু। এই পুরস্কারটি সাধারণত গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিকদের দেওয়া হয়।

আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে যে দুটি পুরস্কার দেওয়া হয়, তার নাম প্রফুল্ল স্মৃতি ও সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার। এবার প্রফুল্ল স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ। সুরেশ স্মৃতি' পুরস্কার লাভ করেছেন প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য। এই পুরস্কার দুটিরও সম্মান মূল্য এক হাজার টাকা করে।

শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 'সুধীরচন্দ্র সরকার' পুরস্কার প্রদান করা হয় একজন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিককে। মৌচাক পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই পুরস্কার এবার পেয়েছেন বিশিষ্ট কবি ও শিশু সাহিত্যিক কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই পুরস্কারের সম্মানমূল্য পাঁচ শত টাকা।

এ বছর 'বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড' আর একটি নতুন পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। বাংলা দেশের কোন

CENTRAL LIBRARY

বিশিষ্ট লেখককে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। পুরস্কারটির নাম 'জয় বাংলা'। প্রথম বছরে এই পুরস্কার লাভ করেছেন বিশিষ্ট লেখক শহীদুল্লা কাইসার তাঁর 'সংশপ্তক' গ্রন্থটির জন্য।

প্রতি বছর এই একই সময়ে উল্টোরথ পুরস্কারে একজন কবিকে সম্মানিত করা হত। এ বছর এখনও এই পুরস্কার প্রাপ্ত কোন কবির নাম ঘোষিত হয়নি।

রবীন্দ্র পুরস্কার।। বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ তাঁর 'মহাকাশ পরিচয়' গ্রন্থটির জন্য। এই পুরস্কারের নগদ মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি।। কলকাতার প্রান্তে এক সংবাদে প্রকাশ পাকিস্থানী জঙ্গী বাহিনী পাবনা শহর দখলে উল্লসিত হয়ে পদ্মার তীরে শিলাইদহে বোমা বর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ীটি ধ্বংস করে দেয়। এই কাছারিবাড়িটি স্বাধীন বাংলাদেশের ছাত্র ও জনসমাজের কাছে তীর্থভূমিরূপে পরিগণিত হয়েছিল। অতীতেও পাকিস্থানের সামরিক শাসক বার বার রবীন্দ্রনাথকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ বার বার বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছে রবীন্দ্রনাথকে। এবারও তাঁরা তা প্রমাণ করবে। বোমার আঘাতে এই স্মৃতি ভেঙে ফেললেও বাংলাদেশের সাত কোটি বাঙালির মন থেকে তা কখনও মুছে ফেলা যাবে না।

করুণানিধি বছরের শ্রেষ্ঠ তামিল লেখক।। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম করুণানিধি এ বছরের শ্রেষ্ঠ তামিল লেখক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৭ এপ্রিল তামিল লেখক সম্মেলনের কার্যকরী সমিতি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আগামী জুন মাসে তামিল লেখক সঙ্ঘের প্রকাশ্য সম্মেলনে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। সঙ্ঘের সভাপতি শ্রী জি পাথেরসারথম এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে এই পুরস্কার প্রদান করবেন বলে জানা গেছে। তামিল সাহিত্যে শ্রীকরুণানিধির অবদান নিতান্ত স্বল্প নয়। গল্প, কবিতা এবং উপন্যাসের জগতে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তামিল ভাষায় তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক থিয়েটার দিবসে পাবলো নেরুদার বাণী।। আন্তর্জাতিক থিয়েটার দিবসের প্রথম পরিকল্পনা হয় হেলসিঙ্কিতে ১৯৬১ সালে। তখন থেকেই প্রতি বৎসর ২৭ মার্চ দিবসটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক থিয়েটার দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৭০টি দেশ এই দিবস পালন করে থাকেন। এই উপলক্ষে প্রতি বছরই একজন বিখ্যাত লেখক একটি বাণী প্রচার করে থাকেন। যে সব দেশে এই উৎসব পালন করা হয়, সেই সব দেশে এই বাণীর অনুবাদ সংবাদপত্র বা রেডিয়োর মাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত যে সব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক এই দিবসে বাণী দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন আর্থার মিলার, জাঁ লুই বারোঁ, জাঁ ককতো পিটার ব্রুক প্রমুখ। এবার বাণী প্রচার করেছেন ল্যাটিন আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি পাবলো নেরুদা। তাঁর বাণী থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

I saw a play of Arthur Miller's The Price, some where, in Montevideo or Caracas. I liked it but it hurt : a kind of hand, unbending chekov, without a smile. Leaving the Theatre, I left it too, wanting to forget its truths and bitterness .... Our times, I think, oscillate ostrich egg through which the theatre has broken, the rest of us wait expectantly in our seats, from the first row to the last, for the new fledgling to take wing and fly.

Poetry is my daily bread : a poet only of chile, I am near to each of you and distant, men and women of the world theatre.

—অর্বাক

নতুন বই

মিশরের নবসূর্য নাসের—প্রফুল্ল চন্দ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

নাসের সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এশিয়া-আফ্রিকার চরম রাজনৈতিক সংকট মুহূর্তকালে। অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও, মিশরের সামরিক বাহিনীতে অল্প বয়স থেকেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কুখ্যাত সম্রাট ফারুকের অপসারণে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা স্বাধীনতা-সংগ্রামী মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার উপাদান হয়ে আছে। রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকারের পর আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বার বার তাঁকে বিব্রত করেছে। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স-এর চরম প্রতিকূলতা তাঁকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। অতঃপর ইস্রাইলের প্রতিষ্ঠা এবং মার্কিন সাহায্য-পুষ্ট এই শিশুরাষ্ট্রের আগ্রাসন নীতি, নাসেরের আরব ঐক্যের নীতি এবং আরব রাষ্ট্রগুলির পুনর্জাগরণের স্বপ্নকে বারবার বিনষ্ট করেছে। আরব রাষ্ট্রগুলির রক্ষণশীল নীতি সমগ্র আরব জাতিকে পুরাতন চিন্তাধারার পঙ্কে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে রেখেছে—বারবার আঘাত খেয়ে নাসের এ-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তু আরবদের পুনর্বাসনও তাঁর কাছে একটি মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্যালেস্টাইন গেরিলা ও জর্ডনের মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ বন্ধ করেছিলেন নাসের। কিন্তু অকালমৃত্যু এসে নাসেরকে ছিনিয়ে নিল—সেই সঙ্গে আরব ঐক্যের দৃঢ়ভিত্তিমূলে যেন করে গেল চরম কুঠারাঘাত।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ একজন প্রবীণ ও বিদগ্ধ সাংবাদিক। দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়েছেন। বহু আরব নেতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়েছিল এক সময়। নাসেরের ব্যক্তিগত সাহচর্য এবং আরব রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সংযোগ তাঁর বর্তমান গ্রন্থখানিকে বহু উপাদান সমৃদ্ধ করেছে। নাসের ঘোরতর জাতীয়তাবাদী নেতা এবং ধর্মীয় চিন্তায় প্রভাবিত হওয়া সত্বেও সমাজতন্ত্রের দিকে কেন ঝুঁকেছিলেন, নৈপুণ্যের সঙ্গে শ্রীচন্দ তা বিশ্লেষণ করেছেন। নাসেরের জীবন এবং কর্মপ্রবাহ দীর্ঘ না হলেও, তাঁর জীবন যে কতখানি রোমাঞ্চকর, বইখানি থেকে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। মধ্যপ্রাচ্য তথা বিশ্ব-রাজনীতির সমকালীন যুগের দলিল হিসাবেও বইখানির মূল্য যথেষ্ট। এর প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বাঁশপাহাড়ী—অ্যাকাডেমী অব ফোকলোর। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

অ্যাকাডেমী অব ফোকলোরের গ্রাম বাংলা সমীক্ষা পর্যায়ে প্রকাশিত প্রথম পুস্তিকা মেদিনীপুর জেলার 'বাঁশপাহাড়ী'। বাঁশপাহাড়ীর অবস্থান, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, বনসম্পদ, বন্য প্রাণী, গ্রাম-নাম, পথ-ঘাট, যানবাহন, ভূমি বন্টন, জনবিন্যাস, পেশা, কৃষি ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাকাটা, কুটির শিল্প, শিল্পকলা, আর্থিক অবস্থা, ঘর-বাড়ী, খাওয়া-দাওয়া, নেশা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পশু-পাখি পালন, নানা প্রতিষ্ঠান, বিনোদন, ধর্মমত, দেব-দেবীর থান, পুজো-পার্বণ, জীবনের নানা আচার, ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সম্পাদক : দেবব্রত চক্রবর্তী। সমীক্ষক দলে আছেন দুলাল চৌধুরী, দেবব্রত চক্রবর্তী, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, তুলিকা মজুমদার, জ্যোতির্ময় বসু রায়চৌধুরী, বিমল গোস্বামী এবং অজয় দে। অ্যাকাডেমী অব ফোকলোরের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ হবে।

দাবি (ভাষা শহীদস্মরণ সংখ্যা)—সম্পাদক প্রশান্ত রায়।। ২৮বি সিমলা স্ট্রীট, কলকাতা ৬।। দশ পয়সা।।

ঠিক পত্রিকা বলা যায় না। আসলে এটি একটি বুলেটিন। দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে প্রশান্ত রায় ভাষা আন্দোলনে পূর্ববাংলার মানুষের ভূমিকার কথা স্মরণ করে প্রশ্ন করেছেন : ওপারে সাত কোটি বাঙালী যখন মুক্তিযুদ্ধের ডাকে উত্তাল, তখন এপারে তার প্রতিধ্বনি কোথায়? মুদ্রিত একটি কবিতার কয়েকটি লাইন : "মুক্তি স্নান সেরে পৃথ্বী ওঠে। পশ্চিমকে ডাকে।—বাঁধ ভেঙেছে। এবার কে আটক রাখে। এল বিজয় উল্লাসে।"

বইকুণ্ঠের খাতা

দুই ঠাকুরের পুনর্বিচার ও অন্যান্য

সভা-সমিতিতে তাঁকে বড় একটা দেখা যায় না। বোধহয়, হৈ-চৈ বিশেষ পছন্দ করেন না। কথা বলেন সামান্য ভারী গলায়। সহজ, সরল, অকৃত্রিম কণ্ঠস্বর। কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। মুখমণ্ডল সামান্য গোলাকার। গায়ের রঙ ফর্সা। উচ্চতায় একজন স্বাভাবিক বাঙালীর মতোই।

বয়স জিজ্ঞেস করিনি। চেহারা দেখে অনুমান করাও কঠিন।

শুনেছি, ভিন্ন ভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করলেও তিনি কবি অজিত দত্তের সহপাঠী। এক ক্লাস নিচুতে পড়তেন বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন এক বছরের সিনিয়র। অর্থাৎ পঞ্জিকামতে ষাটোত্তীর্ণ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের নামী অধ্যাপক অমলেন্দু বসুর কথা বলছি। দীপ্তিময় উজ্জ্বল একটি মানুষ। প্রায় সব সময়েই হাস্যদীপ্ত। বলেন, 'অলসভাবে থাকা আমার স্বভাব নয়, থাকতে পারি না।' বেশীর ভাগ সময়টাই তিনি কাটিয়েছেন অধ্যয়নে ও অনুশীলনে। তাঁর ভাষায়: 'হয় পড়ি, না হয় লিখি।'

দীর্ঘকাল তিনি কাটিয়েছেন দেশের বাইরে, বিদেশে। চোস্ত ইংরেজী বলিয়ে মানুষ। কিন্তু মাতৃভাষার উচ্চারণে পূর্ব-বাংলার টানটা বজায় রেখেছেন পুরোপুরি। শুনতে এতটুকু খারাপ লাগে না। চলিত বাংলার ক্রিয়াপদ ও অন্যান্য শব্দগুলি উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য পায়।

বলেন: 'আমি ঢাকার মানুষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করিনি বলে গর্ববোধ করি।'

বোধহয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল, গতিপ্রকৃতি, পড়াশোনার মান ও গবেষণার ধরণ-ধারণে তেমন খুশি নন। বিশেষত, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে নানা কারণেই অতুষ্ট। দীর্ঘকাল ছাত্র পড়িয়ে ও গবেষণার কাজ পরিচালনা করে বুঝেছেন, ভালো শিক্ষক হলেই ভালো পরামর্শদাতা হওয়া যায় না।

অতি-সাম্প্রতিক ইংরেজী-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অত্যন্ত গভীর। বিশেষ করে, সমালোচনামূলক প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের তিনি নিয়মিত পাঠক। বিদেশী কোনো নতুন বই এলেই তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন।

একদিন ছুটির ভোরে গিয়েছিলাম তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়ীতে। উদ্দেশ্য একটা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সেদিকে আমল না দিয়েই তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর পড়ার ঘরে। চারদিকে বই ঠাসা। বললেন: 'এককালে কবিতা লিখতাম, এখনো লিখি।'

এবং পরে অসংকোচ আত্মসমালোচনা করে বললেন: 'তবে কবিতা লিখে তেমন কিছু হবে না—একথা আমি টের পেয়েছিলাম অনেক আগেই। সেজন্যেই কবিতা ছাপাবার জন্যে কখনো ব্যস্ত হইনি। নিয়মিত কবিতা লিখলেও আমি একজন বড়জোর মাইনর পোয়েট হয়েই থাকতাম।'

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর কথা শুনে। প্রকৃত সমালোচকের তো এমনি নির্মম হবারই কথা—এমনি নিরপেক্ষ এবং উদাসীন। কেননা, তাঁর ভূমিকা অনেকটা বিচারকের মতো। অমলেন্দুবাবু বিশ্বাস করেন, সমালোচকের নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিই সাহিত্যবিচারের সঠিক মানদণ্ড। তাঁর ভাষায়: 'আমি কখনো কারো মুখ চেয়ে কিছু লিখি না।'

মনে হয়, গতানুগতিক সমালোচনার পদ্ধতিতে তিনি সন্তুষ্ট নন। এবং প্রচলিত অ্যাকাডেমিক আলোচনায় বীতস্পৃহ। কেননা, সৃজনশীল সাহিত্যিকের অন্তরতম অভিপ্রায়কে আবিষ্কার করাই হলো প্রকৃত সমালোচকের কাজ।

সাহিত্যালোক

গত জানুয়ারী মাসে অমলেন্দুবাবুর দশটি প্রবন্ধের একটি সংকলন বেরিয়েছে—'সাহিত্যালোক' নামে। আগাগোড়া লাইনো হরফে ছাপা। দু-রঙের প্রচ্ছদ—মার্জিত এবং সুরুচিসম্মত। প্রকাশক: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। দাম দশ টাকা।—মনে হয় পৃষ্ঠা-সংখ্যার তুলনায় কিছুটা বেশী।

দুই ঠাকুরের (রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ) সাহিত্যকীর্তির অনতি-আলোচিত কয়েকটি দিক নিয়েই লেখা হয়েছে প্রবন্ধগুলি। এবং বেশীর ভাগ প্রবন্ধই সম্পাদকের তাগিদে কিংবা সাময়িক কোনো উপলক্ষে লেখা। এসম্পর্কে মন্তব্য করার আগে প্রবন্ধগুলি প্রথম কোথায় বেরিয়েছিল, তা পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়ে রাখা দরকার। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেও সুস্পষ্ট একটি ধারণা পেতে সকলের সুবিধা হবে।

প্রথম প্রবন্ধ।। সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র: রবীন্দ্রনাথের বাক-প্রতিমা — বেরিয়েছিল পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ'-এর প্রথম খণ্ডে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।। 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বাক-প্রতিমা' ছাপা হয়েছিল 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়।

তৃতীয় প্রবন্ধ।। স্বর্গের জনতা সংঘ—বেরিয়েছিল 'উত্তরসূরীর' রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী সংখ্যায়।

চতুর্থ প্রবন্ধ।। হে কালবৈশাখী—'পূর্বপত্রে' প্রকাশিত।

পঞ্চম প্রবন্ধ।। 'নিরাভরণ কাব্য'। লেখা হয়েছিল রবীন্দ্র শতবর্ষ উপলক্ষে 'সংহিতা' পত্রিকায়।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।। হৃদয়ের পত্রপুটে—বেরিয়েছিল দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ'-এ।

সপ্তম ও অষ্টম প্রবন্ধদুটি যথাক্রমে 'লেখক অবনীন্দ্রনাথ' ও 'কথক অবনীন্দ্রনাথ'। ছাপা হয়েছিল যথাক্রমে 'চতুরঙ্গ' ও 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়'। আয়তনে দুটো প্রবন্ধই দীর্ঘ। নবম এবং দশম প্রবন্ধ—দুটি রিভিউ। দুটোই রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সংক্রান্ত সংকলনের সমালোচনা।

সচেতন পাঠক নিশ্চয় এই সূচী দেখেই অনুমান করতে পারছেন, সংকলনটির দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং বিষয় প্রায় অনালোচিত কয়েকটি দিক। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইমেজের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য নিয়ে এর আগে এমন পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবত আর কেউ করেননি।

আর অবনীন্দ্রনাথ?

বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে জানেন শিল্পী হিসেবে। লেখক ও কথক অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় এখনো তেমন স্পষ্ট নয়। অথচ বাংলা গদ্যের কুশলী রূপকার হিসেবে তাঁর সাফল্যের কথা ভাবতে গেলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। অমলেন্দুবাবু সেই জাদুকরের মনোজগৎ ও চিত্রশালার গূঢ় রহস্যটার আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছেন প্রবন্ধদুটি লিখে। বাংলাভাষায় এমন সাবজেক্টিভ আলোচনা খুব কমই হয়েছে।

অমলেন্দু বসুর সঙ্গে আলোচনা

পাঠকের কৌতূহল সাধারণত সোজাপথে চলে না। জানা কথাকে আরেকবার জেনে নিতে ইচ্ছে করে, অজানা তথ্যকে নতুন করে জানার আগ্রহ বাড়ে। এবং জানা-অজানার মধ্যবর্তী সংশয়কে কাটিয়ে নিতে ইচ্ছে করে বারবার।

অমলেন্দুবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের জীবনের এত বিচিত্র দিক থাকতে, আপনি তাঁর বাক-প্রতিমা নিয়েই

শুধু এইগুলো প্রবন্ধ লিখলেন কেন? ইমেজের নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

—রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকেই অনেক লেখা লিখেছেন। বেশীর ভাগই আকাডেমিক। আমি এভাবে লেখা পছন্দ করি না। তাছাড়া, বহির্জীবনের চাইতে অন্তর্জীবনের রহস্যময়তার দিকেই আমার ঝোঁক। কবিতার বিচার করতে হলেও সেই অন্তর্জীবনের সাক্ষ্যটাই গ্রহণ করা দরকার। আমার ধারণা, কবি-মানসিকতার বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যটিও কবিতার ঐ অন্তর্গূঢ় আলোচনাতেই ধরা পড়ে।

ইমেজ সম্পর্কে লেখার এটাই কি একমাত্র কারণ?

—না, অন্য কারণও আছে। রবীন্দ্রনাথের পোয়েটিক ইমেজ নিয়ে আজ পর্যন্ত খুব কম আলোচনা আমার চোখে পড়েছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোকবিজয় রাহা দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এছাড়া, এ-বিষয়ে তেমন কোনো ভালো আলোচনা আমি পড়িনি।

একটু থেমে, বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বললেন—ইমেজ নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য আছে তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে। তিনি যেমনভাবে যখন ভেবেছেন, ঠিক তেমনভাবেই বাক-প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। পরবর্তীকালেও সেসব ইমেজ ম্লান হয়নি। যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবিই যুগোত্তীর্ণ বাক-প্রতিমা নির্মাণে সক্ষম।

এমনিভাবেই আমাদের আলোচনা এগোচ্ছিল। কিছুটা এলোমেলো কথার মধ্য দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম : আলোচ্য বিষয়কে কি আপনি বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন, না, গত দিনের কথা মনে রেখে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে ভাবেন? বিশেষ করে, কবিতার শব্দ ব্যবহার, ইমেজ নির্মাণ প্রভৃতি সম্পর্কে যখন আলোচনা করেন, তখন সময়ের দূরত্ব কি বিচার-বিভ্রান্তির কারণ হয় না?

তিনি বললেন : যুগধর্মে কিন্তু আলঙ্কারিক গৌরব ম্লান হয় না। একালের মানুষ যখন, আমার বিচারের মানদণ্ডটা নিশ্চয়ই এখন একালেরই হবে। ঘটনার পরিবর্তন ঘটলেও সব সময় সৌন্দর্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সমালোচকের বিচারবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায় স্বীকার করি। তাই বলে, গতকালের নৈপুণ্যটাকে ধরতে পারবো না—তাই বা স্বীকার করি কি করে?

আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের গোটা জীবনটাকেই কি আপনি স্মরণে রেখেছিলেন, না, বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন কাব্য থেকে?

—রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জীবন ও সাহিত্যটাই ছিল আমার চোখের সামনে। খণ্ডিত কোনো ধারণা নিয়ে আমি কিছু লিখতে পারি না—লিখি না। এই সঙ্কলনের কয়েকটি প্রবন্ধে আমি এমন কতকগুলো ইমেজ বেছে নিয়েছি, যা কবির বিভিন্ন পর্বের রচনায় পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে বহুবার। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে শেষ পর্ব পর্যন্ত আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে গভীরভাবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোনো অপূর্ণতা কিম্বা ত্রুটি কি আপনার চোখে পড়েছে?

—রবীন্দ্রনাথের জীবন অখণ্ড এবং পূর্ণ। কোনো ত্রুটি বা অসঙ্গতি আমার নজরে পড়েনি। সেভাবে ভাবিওনি।

অবনীন্দ্র-প্রসঙ্গ

আমার ধারণা, এই সঙ্কলনের মূল্যবান সম্পদ অবনীন্দ্রনাথের ওপরে লেখা প্রবন্ধ দুটি। তার কারণ, এমনও হতে পারে, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের জাদুমন্ত্রে আমি আবিষ্ট।

অমলেন্দুবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, বাংলার ব্রত, ছড়া, লোকশিল্পের প্রতি আকর্ষণের ফলেই কি অবনীন্দ্রনাথের গদ্য এতটা লোকায়ত—স্বতঃস্ফূর্ত এবং কথকতার সারল্যে সমৃদ্ধ হয়নি?

—নিশ্চয়ই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে—বাড়ীর দারোয়ান, চাকরবাকর, সাহিস, কোচোয়ান, গঙ্গার ঘাটের মাঝিমাল্লা, যাত্রাগানের অধিকারী—সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর সহজ মেলামেশা। এ-কথা আমি 'কথক অবনীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে লিখেছি।

অবনীন্দ্রনাথের গদ্য কি সর্বজনীন সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী?

—না, নিশ্চয়ই না। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের ভঙ্গি বিশেষ ধরনের এবং বিশেষ বিষয়ের উপযোগী। আজকের দিনের শহরঘেঁষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভঙ্গিটি অচল: সাহিত্যের ভঙ্গি সর্বদাই বিষয় উপযোগী হবে।

রবীন্দ্রনাথও তো বাংলার লোকসাহিত্য, ব্রতের ছড়া ও লৌকিক শিল্প সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন? তাহলে, তিনি অবনীন্দ্রনাথের মতো গদ্যরচনায় সেই লোকায়ত রীতিটির ব্যবহার করলেন না কেন?

—অবনীন্দ্রনাথের মতো লোকজীবনের এত কাছাকাছি—একাত্ম হয়ে আসা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হয়নি। তিনি লোকসাহিত্যের সারল্য ও সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তার প্রয়োগ-কৌশলকে আয়ত্ত করতে পারেননি। অবনীন্দ্রনাথ কতবার যে রাত জেগে নিম্নশ্রেণীর মানুষের পাশাপাশি বসে যাত্রাগান শুনেছেন—তার ইয়ত্তা নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখাদুটির প্রেরণা পেলেন কোথেকে?

—'লেখক অবনীন্দ্রনাথ' লিখেছিলাম হুমায়ুন কবীরের অনুরোধে। এটাই প্রত্যক্ষ প্রেরণা। দীর্ঘকাল ধরেই আমি অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভাবছিলাম। আসলে, ঐ ভাবনা থেকেই লেখা দুটির সূত্রপাত।

নানাকথা

কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগেই অমলেন্দুবাবু বললেন, তাহলে পেছনের কথা কিছু বলি। ছাত্রজীবনের সেই রোমান্টিক, পেছনে ফেলে-আসা দিনগুলির কথা বলতে বুঝি সকলেরই ভালো লাগে।

বললেন : কলেজে পড়ার সময় ঢাকা থেকে আমরা একটা কাগজ বের করেছিলাম 'কণিকা' নাম দিয়ে। আর বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে বেরিয়েছিল 'ভগ্নরথ'। তবে, আমাদের কাগজটা তেমন ভালো হয়নি। 'ভগ্নরথ'-এর সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিল্পীর অভাব ছিল না। পরে, দুই গ্রুপ মিলে 'প্রগতি' নামে একটা কাগজ করেছিলাম।

সেই সময়ে জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

প্রগতি বন্ধ হবার পরেও আমাদের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়নি। মাঝে মাঝে বরিশাল যেতাম। জীবনানন্দের সঙ্গে গল্প হতো। এখনো তাঁর কয়েকটি চিঠি আছে আমার কাছে। কবিতা পত্রিকায় যখন বুদ্ধদেবের অনুরোধে 'সমালোচক এলিয়ট' ও 'গোটে' সম্পর্কে দুটো প্রবন্ধ লিখি, তখন জীবনানন্দ আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন তার প্রশংসা করে।

যেন স্মৃতি-বিস্মৃতির জগৎ থেকে অমলেন্দুবাবু কথা বলছিলেন।

বললেন : একালে কল্লোলে দুটো গল্প লিখেছিলাম। একটা প্রবন্ধও লিখেছি।

বললাম : বাংলা সমালোচনার বর্তমান স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

—অনিশ্চিত। কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। মুক্ত সমালোচনা প্রায় হয় না বললেই চলে। সাহিত্যের মতো বাংলাদেশে সমালোচনারও দুটো ধারা—হয় রাজনৈতিক মানদণ্ডে বিচার, না হয় বিশুদ্ধ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন।

দুঃখ করে বললেন : 'সাহিত্যকে কেন সাহিত্য হিসেবে দেখা হয় না? লেখককে কি লেখক হিসেবেই দেখা উচিত নয়?'

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, দুঃখিত। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। একটা জরুরী কাজ আছে। এখুনি বেরোতে হবে।

বললাম : আর দু-একটা প্রশ্ন করবো।

—করুন।

নতুন কি লিখছেন?

—অরুণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় চল্লিশের কবিদের একটা কবিতা-সঙ্কলন বেরোচ্ছে—তার ভূমিকা লিখে দিয়েছি। আগামী এক বছরের মধ্যেই আরো দুটো বই বেরুবে। দুটোই প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রথম বইটিতে থাকবে আধুনিক কবিদের ওপরে কয়েকটি আলোচনা। দ্বিতীয় বইটি তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের সংগ্রহ। হুমায়ুন কবীরের অনুরোধে এককালে 'চতুরঙ্গ'-এ একটি সিরিজ অব আর্টিকলস লিখেছিলাম। সেগুলিই এই সঙ্কলনে থাকবে।

—বৃন্দদর্শী

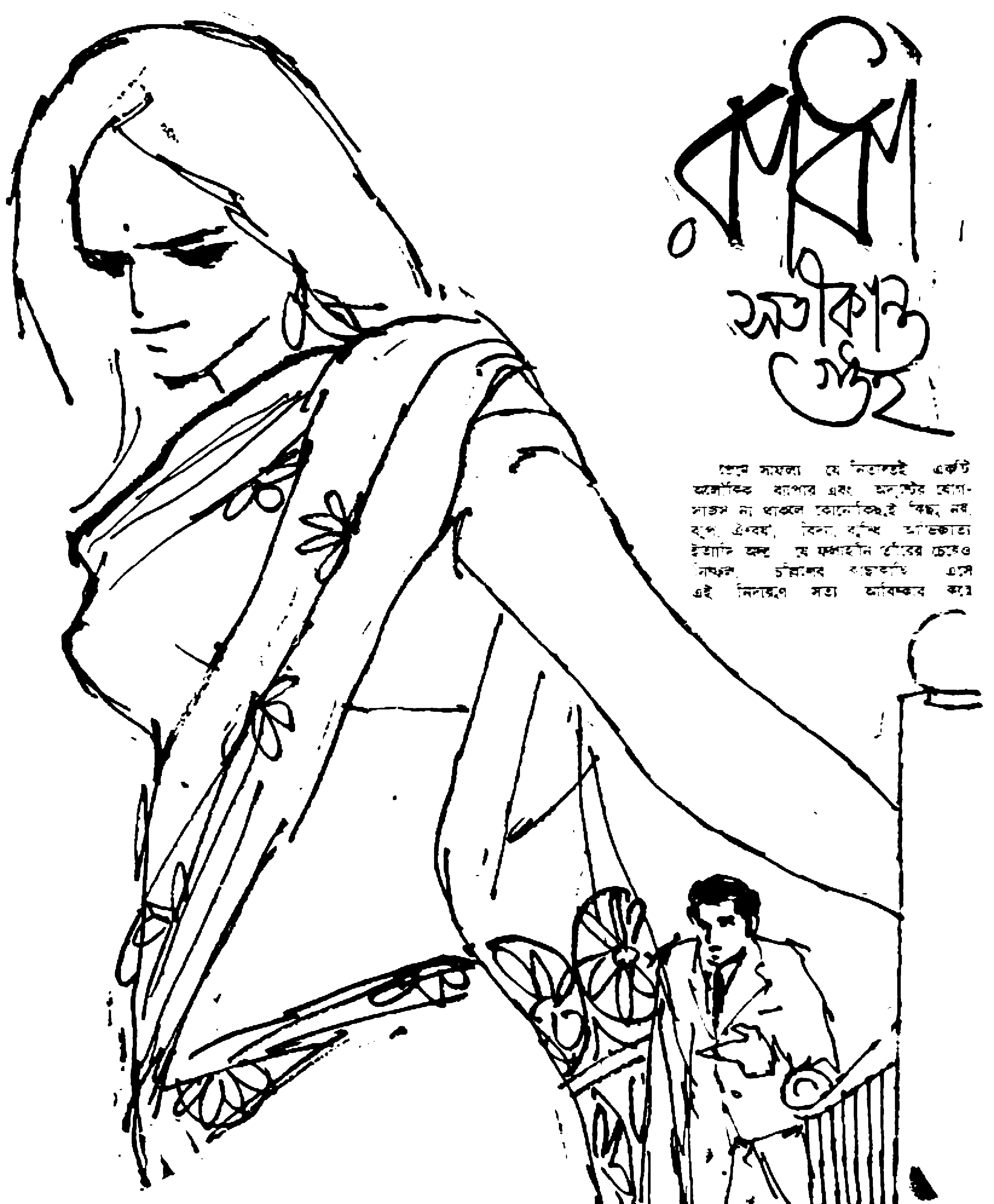

প্রেমে সাফল্য যে নিতান্তই একটি অলৌকিক ব্যাপার এবং অদৃষ্টের যোগসাজস না থাকলে কোনোকিছুই কিছু নয়. রূপ, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, আভিজাত্য ইত্যাদি অন্য যে [illegible] গৌরের চেয়েও নিষ্ফল. চরিত্রের [illegible] এসে এই নিদারুণ সত্য আবিষ্কার করে

ইন্দ্রজিত সোজা মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে পড়লেন। ব্যাঙ্ক ও সরকারী কাগজে অন্যূন আশি লক্ষ টাকা, মালাবার হিলস-এ হালফ্যাশানের একখানা চোখ-ধাঁধানো বাড়ি, তিনটি বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ছাপ এবং রবিবর্মা অঙ্কিত দুষ্মন্তের সঙ্গে যুবকরূপ সাদৃশ্য— এই চতুর্গুণের অধিকারী হয়েও প্রেমের চতুর্বর্গ ফল তো দূরের কথা, ইন্দ্রজিত লোভের বশেও একবার ফলও জুটলো না। প্রায় দশ বছর ইন্দ্রজিত প্রেমসমরে অক্লান্ত-ভাবে লড়ে গেলেন, বেছে বেছে চোখা চোখা বাণ মারলেন, তাঁর কলকাতার পাঁচটি তরুণী পরপর ধরাশায়ী হল, প্রেমনিবেদনের প্রায় সবকটা কৌশলও প্রয়োগ করা গেল তারপর প্রত্যেকেই কিছুকালের ভিতর বোঝো আলা সেরে উঠল। সতীর্থ আইবেরীর দলে হঠাৎকে দেখে যে পরিমাণে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর প্রেমবর্জিত তরুণী-দের সেরে উঠতে দেখে ইন্দ্রজিত তার চেয়ে কম বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ হলেন না। ইন্দ্রজিতের গুণাবলী বিচার করে তরুণীদের প্রত্যেকেই তার হাতে আহত ও নিহত হতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং তারাও ইন্দ্রজিতের ব্যর্থতায় কম দুঃখিত হল না।

শেষে একদিন পরামর্শ করে তারা ইন্দ্রজিতকে চায়ে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। সাত-পাঁচ চিন্তা করে ইন্দ্রজিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সুপ্রিয়া বাগচীর বাংলোয় চক্রের আয়োজন হয়েছিল। ইন্দ্রজিত সেখানে পৌঁছে কিছুটা অন্যমনস্ক অবস্থায় সোজা সিঁড়ি বেয়ে বাংলোর বারান্দায় উঠে এসেছিলেন। স্বাগত সম্ভাষণে সচেতন হবার পরমুহূর্তেই তিনি স্তম্ভিত হলেন। তাঁর ফর্সা মুখ লজ্জায় রোষে লাল হয়ে গেল।

ভালো মানুষ হঠাৎ চটে গেলে কী অনর্থ ঘটতে পারে, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে দীর্ঘকাল মেলামেশার ফলে পঞ্চ তরুণীর কারোই অজানা ছিল না। সুতপা ব্যানার্জি তাদের মুখপাত্রী হিসেবে বলল, 'আপনার দুঃখ ও ব্যর্থতা আমরা সমান ভাগ করে নিতে চাই, এই কথাটা জানাবার জন্যই আমরা কজন ব্যস্ত পড়েছি। আপনাকে অসম্মান বা বিদ্রূপ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই।'

লক্ষ্মী রায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'শুধু নিজের কথাই ভাববেন না, আমাদের কথাও ভাবুন।'

রাজশ্রী রাহা বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'আমাদের মতো আইবুড়োদের পক্ষে জালে পড়েও জড়িয়ে পড়তে না পারা যে কী দুর্ভাগ্য সহজেই অনুমান করতে পারবেন।'

মল্লিকা দাস বলল, 'শুধু গোড়া থেকেই যদি সমানে একটানা লড়াই চালাতেন, একটা হেস্তনেস্ত হত। থেকে থেকে ঢিল দিয়ে ভুল করলেন। অন্ততঃ একজন তো আপনার ঘর আলো করতে পারতাম।'

সুপ্রিয়া বাগচী বলল, 'আমি বিশেষ অভিভূত। টীকা-টিপ্পনীতে মন হাল্কা করি, সেটুকু শক্তিও অবশিষ্ট নেই। তবে এটা জেনে রাখুন মিস্টার সেন, এই চায়ের আসর আসলে আমাদের যৌথ প্রেমের শ্রাদ্ধ বাসর।'

পঞ্চতরুণী একযোগে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ইন্দ্রজিত তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। কোনো দিকে কারো দিকে দৃকপাত না করে গটগট করে বারান্দা থেকে নেমে এসে তাঁর ঝকঝকে সাদা মার্সিডিজ বেনজের ড্রাইভিং সিট-এ বসলেন।

ইন্দ্রজিতের চিঠির জবাবে ব্যারিস্টার অজয় ঘোষ লিখেছিলেন, 'তোমার সমস্যা যে কঠিন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার আচরণে স্তম্ভিত হয়েছি। আমার কোনো মক্কেল যদি আমার কাছে গণ্ডার শিকারের কৌশল সম্বন্ধে উপদেশ চেয়ে পাঠাতো, তাতে আমি যতো বিস্মিত হতাম তার চেয়ে ঢের অবাক হয়েছি তোমার অনুরোধে। সহজেই প্রেমে পড়বে ও বিনা আপত্তিতে হাবুডুবু খাবে এরকম একটি স্মার্ট ডানা-কাটা পরীর সন্ধান করতে বলেছো। আমি ব্যারিস্টার। ঘটক নই। তবু, কবি কালিদাসের উপর যে কারণে সরস্বতী ভর করেছিলেন, সেই একই কারণে অদৃষ্ট তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন। যথাসময় উপস্থিত অদৃষ্টঃ। তুমি যথাসত্বর চলে আসবে। আমার সিনিয়র নৃপেন গুপ্ত কিছুকাল আগে হার্ট অ্যাটাক-এ মারা গিয়েছেন। একটি আধুনিকা কন্যা ও একটা ফাঁকা ব্যাঙ্ক একাউন্ট রেখে গিয়েছেন। বিলিব্যবস্থার ভার আমার উপর।'

ফলে পাঁচদিন বাদে ইন্দ্রজিত চৌরঙ্গী অঞ্চলে অজয় ঘোষের বড় সাহেবী ফ্ল্যাটে সন্ধ্যা নাগাদ আবির্ভূত হলেন।

অজয় ঘোষ চুরুট মুখে ড্রইংরুমে ইন্দ্রজিতের প্রতীক্ষায় ছিলেন। বললেন, 'বোসো বোসো। কেমন আছো?'

ইন্দ্রজিত ম্লান হেসে বললেন, 'যেমন দেখছো।'

অজয় ঘোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ইন্দ্রজিতকে আপাদমস্তক দেখলেন। ঈষৎ মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'বিশেষ ভালো ঠেকছে না। অবস্থা সঙ্গীন।'

ইন্দ্রজিত অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, 'ভাই'—

কথা শেষ করতে না দিয়ে অজয় ঘোষ বললেন, 'ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। বুঝে নিয়েছি।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'বুঝেছো কিনা, অর্থাৎ একা থাকার কোনো মানে হয় না। সংসার নেই অথচ বয়-বাবুর্চি দারোয়ানের হাতে ঠকে নাজেহাল হচ্ছি।'

অজয় ঘোষ একটা সংক্ষিপ্ত হুঁ বলে উঠে গিয়ে ঘরের এককোণে একটা ক্যাবিনেট থেকে দুটো গেলাস ও আধখালি স্কচ-এর বোতল বার করলেন। সম্মুখে সেন্টারটেবিলে সাজ-সরঞ্জাম উপস্থিত রাখতে রাখতে বললেন।

'চলবে?'

ইন্দ্রজিত সবেগে মাথা নাড়লেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'বুঝেছি। এখনও পবিত্র শৈশব চলছে।'

ইন্দ্রজিত প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'তা নয়। আই হ্যাভ অ্যাবসোলিউটলি নো প্রেজুডিস।'

অজয় ঘোষ ইতিমধ্যে বেল টিপেছিলেন। বয় আসতে বললেন, 'সাবকো নিম্বুকা পানি দেও।'

ইন্দ্রজিত কী ভেবে বললেন, 'ইফ ইউ ইনসিস্ট এক-আধ পেগ চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

অজয় ঘোষ বললেন, 'থাক। শেষে মাথা ঘুরে পড়লে কেলেঙ্কারী হবে। ব্যাচেলারস্ ফ্ল্যাট। শেষটা তোমার পরিচর্যার জন্য পয়সা খরচ করে নার্স আনতে হবে।'

নিম্বুকা পানি এসে গিয়েছিল। নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা ঢাকবার জন্য ইন্দ্রজিত সঙ্গে সঙ্গে গেলাস তুলে নিয়ে মুখে ধরলেন।

অজয় ঘোষ খানিকটা হুইস্কি গলাধঃকরণ করে বললেন, 'মেয়েটি বিলিতি স্কুলে পড়েছে। আদব-কায়দাদুরস্ত। দারুণ স্মার্ট। সুশ্রী কিম্বা রীতিমতো সুন্দরী সেটা তোমার দেখার রকমের উপর নির্ভর করবে।'

উৎসাহিত হয়ে ইন্দ্রজিত কী বলতে গিয়ে হঠাৎ বিষম খেলেন।

অজয় ঘোষ ইন্দ্রজিতকে বেশ মনোযোগের সঙ্গে দেখে নিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন 'টেক ইট ঈজি।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'না, অর্থাৎ তোমার যদি সুন্দরী মনে হয়ে থাকে, তাহলে কোনো কথাই নেই।'

অজয় ঘোষের মা ছিলেন খাস ইংল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। সুপুরুষ পিতার সন্তান অজয় ঘোষকে মাতৃকুলের রংয়ের প্রসাদে একটি জাঁদরেল কার্তিক বলে মনে হত।

অজয় ঘোষ বললেন, 'চেহারায় হয়তো কোনো ত্রুটিই নেই। তবে শি ইজ নট সাফিসিয়েন্টলি এক্সপিরিয়েন্সড। অর্থাৎ অভিজ্ঞতায় বেশিদূর এগোয়নি।'

ইন্দ্রজিত অস্ফুটস্বরে বললেন, 'অভিজ্ঞতা? কিসের অভিজ্ঞতা?'

অজয় ঘোষ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, 'কী হিসেবে আবার! মেয়ে হিসেবে।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'সাংসারিক অভিজ্ঞতার কথা বলছ?'

অজয় ঘোষ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'ছোঃ। আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাই নাকি? সরল অর্থটা বুঝতে চেষ্টা করো।'

ইন্দ্রজিতের পাংশু মুখভাব লক্ষ্য করে অজয় ঘোষ পুনরায় বললেন, 'অভিজ্ঞতার ভয় পাবার কিছু নেই। সোনার বেলায় যেমন সোহাগা, চরিত্রের বেলায় অভিজ্ঞতা। আর চরিত্র বাদ দিলে মানুষের কতটুকু থাকে?'

কী প্রশ্ন করে কী জবাব পাবেন, ইন্দ্রজিত মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। অজয় ঘোষ মনে মনে হাসলেন। বললেন, 'তবে একেবারে কাঁচা নয়। এই কদিনেই কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে।'

ইন্দ্রজিতের হৃৎপিণ্ড হাতুড়ি পিটতে লাগল।

অজয় ঘোষ বললেন, 'এই কদিনে [illegible] ঘটেছে আমার অনুমোদনে

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

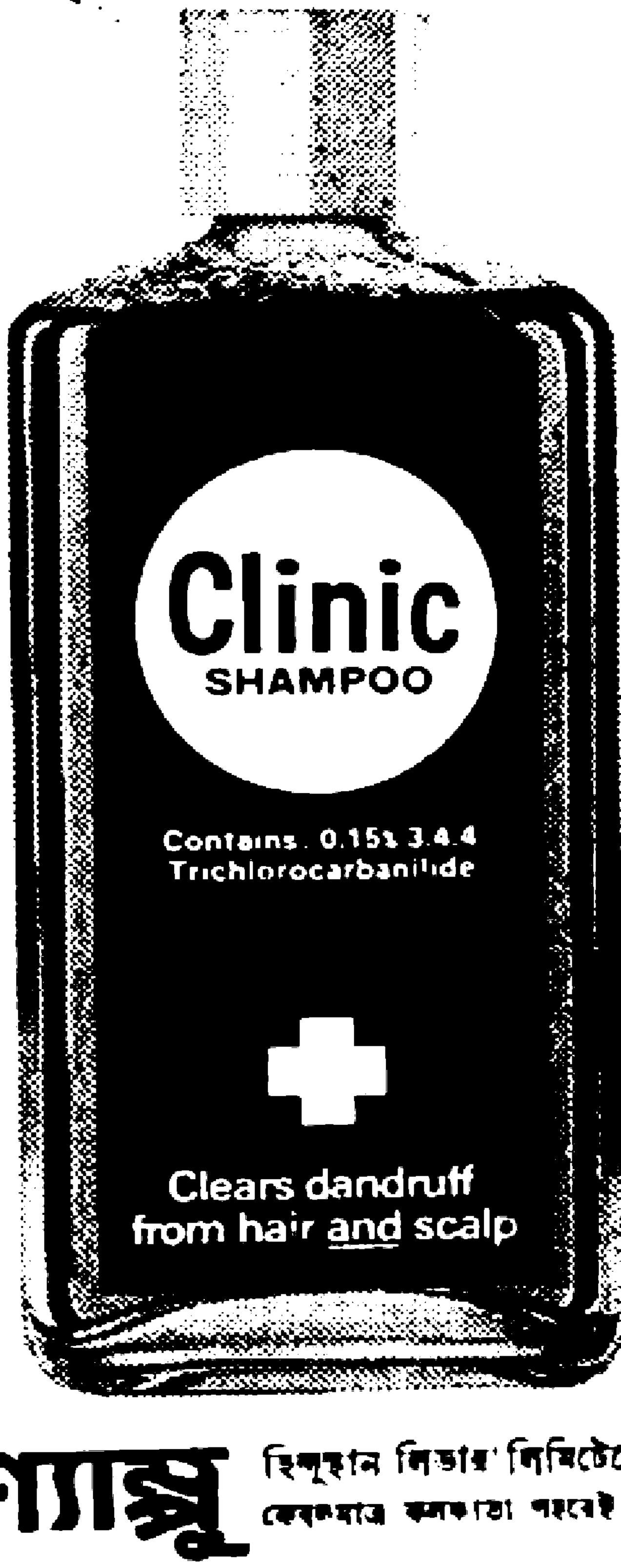

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

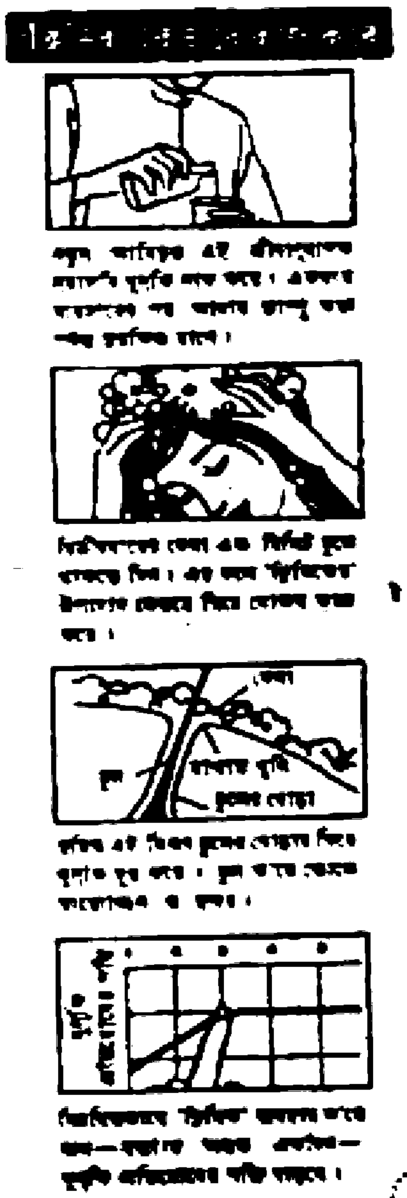

*০·১৫%৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে।'

ইন্দ্রজিতের মুখে কে কালি ঢেলে দিল। অজয় ঘোষের দিকে তাকিয়ে সভয়ে বললেন, 'ভাই, বেশী দূর গড়ায়নি তো?'

অজয় ঘোষ উঠে এসে ইন্দ্রজিতের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ডোন্ট বি সিলি। শি ইজ নট এ মাদার ইন্ডেট।' বিড় বিড় করে সেই সঙ্গেই বললেন, 'অলসো ইন এ সার্টেইন ওয়ে শি ইজ।' তারপর অনাবৃত্ত হেসে বললেন, 'চলো। রাধার সঙ্গে দেখা করিয়ে দি। স্বচক্ষে স্বকর্ণে দেখে-শুনে যাচাই করে নাও।'

রাধা নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজিতের বুকে সন্দেহ ও আশঙ্কার আলোড়ন ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। অকসফোর্ড ও হার্ভার্ডের কৃতী ছাত্র ইন্দ্রজিতের অবচেতনে মুহূর্তের ভগ্নাংশে নামতত্ত্বের এক পুরোনো বিতর্কের সহজ মীমাংসা হয়ে গেল। অবচেতনের স্তরে ইন্দ্রজিৎ সহজে অনায়াসে বুঝলেন নাম শুধু উদ্ভাবন নয়। নাম পূর্বোপুরি সৃষ্টি। এই নামই বৈষ্ণব কবির গানের ভিতর দিয়ে অনুভূতিমর্মরিত হৃদয়ের গভীর স্তরে প্রবেশ করেছিল। অভিধানের অতীত নিগূঢ় অর্থে সে টিকে থাকে। এই অর্থ মহাকবি সেকসপীয়রের উপলব্ধিতে ধরা দেয়নি। এই অর্থ বাদ দিলে নাম শুধুই নাম। সেকসপীয়রের টিপ্পনি-লাঞ্ছিত নাম।

টালিগঞ্জের উপান্তে হালে গজানো এক সৌখীন পাড়ায় একটা বিরাট বাড়ির সম্মুখে এসে গাড়ি থামল। ইন্দ্রজিত নামবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। অজয় ঘোষ বললেন, 'এখানে নামলে বাড়ি পৌঁছতে সিকি মাইল।' এই সময়ে বিশাল কটকটা মুখ ব্যাদান করতে গাড়িটা সোঁ করে বাড়ির হাতোয়ার সান-বাঁধানো রাস্তায় ঢুকে পড়ল। অবিলম্বে বাড়ির ঢাকা বারান্দার তলায় সদর কপাটের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

বয়-বেয়ারাদের সেলাম কুর্ণিশ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ততম উত্তর দিয়ে অজয় ঘোষ মহাদাপটে ড্রইংরুমে প্রবেশ করে গলা সপ্তমে তুলে ডাকলেন, 'শ্রীরাধে!' ইন্দ্রজিতকে একটা সোফায় প্রায় ঠেলে বসিয়ে দিয়ে আবার চেঁচালেন, 'আমরা উপস্থিত। মানময়ী! আচিরে আবির্ভূত হও।'

ড্রইংরুম থেকে একটা সিঁড়ি একপাক ঘুরে দোতলায় উঠে গিয়েছে। স্থাপত্যের এক আশ্চর্য নিদর্শন। এ সিঁড়ি শুধু উপরে উঠবার নয়, কোথাও পৌঁছে যাবার সিঁড়ি।

সিঁড়ির মাথায় দোতলায় ছায়ার ও শব্দের সূক্ষ্ম ঐকতানে কার আবির্ভাবের সাড়া পাওয়া গেল। ইন্দ্রজিত অজয় ঘোষের দৃষ্টি অনুসরণ করে সম্মুখে উপরে তাকালেন। চোখ ফেরাতে পারলেন না। অপার বিস্ময়ে রাধা নামের অধিকারিণীকে দেখলেন। কাকে দেখলেন, কেন দেখলেন, কোন্ যুগের কোন্ বঙ্গজনপদের অধিষ্ঠাত্রীকে দেখলেন ভেবে ইন্দ্রজিত কয়েক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিবির্বাজত এক বাদ্যবিশ্ব নাটকের আনন্দ-বেদনায় অংশ পৌঁছে গেলেন। সেই মুহূর্তে যদি তাঁর সম্মুখে থেকে ড্রইংরুমটা মুছে যেত, সুদূরদিগন্ত-রেখাঙ্কিত নীলসমুদ্রে একটি শঙ্খশুভ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা দিত, প্রাচীন কোনো গ্রীক কবির উদাত্ত কণ্ঠে যদি প্রেয়সী দেবীর বন্দনা শুনতে পেতেন, অসম্ভব জ্ঞানে অবিশ্বাস করতেন না। ঐ নীল সমুদ্র কখন নীল যমুনায় রূপান্তরিত হল, শঙ্খশুভ্র দ্বীপ বৃন্দাবনের শ্যামশোভায় বিলীন হল, কখন গ্রীক কবির কণ্ঠ ছাপিয়ে বৃন্দাবন লীলার একতাল গান মুখর হল, ইন্দ্রজিত টের পেলেন না। শুধু এই অপরূপ অঘটন প্রাণ-মন দিয়ে আস্বাদ করলেন।

রাধা নেমে এল। তন্বী তো বটেই। প্রায় শীর্ণ। অথচ নরম নিটোল। দূর থেকে দেখা বেলাশেষের সবুজ মাঠের মত। মুখে আলোর চেয়ে ছায়া বেশী। দুটি গভীর কালো চোখের দৃষ্টি সন্ধ্যার প্রদীপের তো। তার পক্ষে কখনো বিদ্যুৎ কটাক্ষ সম্ভব কিনা বলা কঠিন। ইন্দ্রজিত মুগ্ধ হলেন। মনে মনে দু-হাত জুড়ে অদৃষ্টকে প্রণাম করলেন।

ইন্দ্রজিত উঠে দাঁড়াতে গেলেন। অজয় ঘোষ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন, 'থাক, ভদ্রতা রাধাকেই করতে দাও।'

রাধা সুমিষ্ট কণ্ঠে বলল, 'বসুন।'

ইন্দ্রজিত বসলেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'রাধা, তুমি অবিলম্বে বোসো। আমার বন্ধুটি অসম্ভব সিভালরাস। তুমি যতক্ষণ না বসছ ও উসখুস করবে।'

রাধা হেসে বলল, 'কী আশ্চর্য! উনি অতিথি। বসতে ও'র দ্বিধা কী!' রাধা বসল।

অজয় ঘোষ রাধার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'বন্ধে-পলাতক আমার এই বন্ধুটি কলকাতায় আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছে। আশ্রয় মনের মতো হলে কলকাতায় গাঁটছড়া বাঁধা পড়তে আপত্তি নেই।' ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে অজয় ঘোষ বললেন, 'কি হে! ঠিক বলেছি কি না?'

'হ্যাঁ, না, অর্থাৎ' এই তিনটি কথা উচ্চারণ করে ইন্দ্রজিৎ ঘেমে নেয়ে উঠলেন। অসহায়ের মতো রাধার দিকে তাকালেন।

রাধা সলজ্জ হেসে মাথা হেঁট করল। চাপা গলায় বলল, 'বুঝেছি।'

অজয় ঘোষ বললেন, 'তোমরা দুজনে কী বলছ কী বুঝছো, আমি অন্ততঃ বুঝতে পারছি না। মুকাভিনয়ের ভাষা আমার জানা নেই।'

ইন্দ্রজিত মরীয়া হয়ে বললেন, অর্থাৎ ঐ গাঁটছড়ার ব্যাপারটা।

অজয় ঘোষ হেসে দিলেন। রাধা হাসতে গিয়ে ইন্দ্রজিতের মুখভাব লক্ষ্য করে নিজেকে সামলে নিল। প্রকাশ্যে বলল, 'হ্যাঁ।'

ইন্দ্রজিত সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রাধার দিকে তাকালো। কিন্তু অজয় ঘোষের সঙ্গে চোখা-চোখি হতে একটু দমে গেলেন।

অজয় ঘোষ সোফায় টান হয়ে আধা শোয়া অবস্থায় গলা সাফ করে নিয়ে কারো দিকেই না তাকিয়ে কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, "তোমাদের রকম সকম দেখে বোধ হচ্ছে তোমাদের একজন আর একজনকে একটা রোজিরোসেট গছাবার চেষ্টা করছ। এবং দুজনেই চক্ষু লজ্জায় হাঁ না বলতে না পেরে একটা আপোষে রাজী হচ্ছ। আমি তোমাদের একজনের অভিভাবক। আর একজনের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তোমরা সৌজন্যের আতিশয্যে ভুল করবে। আমি দাঁড়িয়ে দেখব। এ হতে পারে না। আমি যদিও সবে চল্লিশে পা দিয়েছি অভিজ্ঞতার ঘাটের কাছাকাছি। এ এমনই একটা ব্যাপার যে তাড়াহুড়ো করতে গেলে বিপদ ডেকে আনবে। দুজনেই সারাজীবনের জন্য পস্তাবে।"

ইন্দ্রজিত অজয় ঘোষের নাতিদীর্ঘ উক্তিতে অস্বস্তি বোধ করলেন। যা হবার, না হয়ে পারে না। তাকি সহজেই হঠাৎ হতে পারে না? রাধা আড়চোখে ইন্দ্রজিতকে দেখে মুখ নামিয়ে নিয়ে একটু হাসল। কিন্তু এ হাসি কোনো বিশেষ মুহূর্তের নারীসুলভ হাসি। এতে বিদ্রূপ বা পরিহাসের লেশমাত্র ছিল না।

ইন্দ্রজিত কিন্তু রাধাকে ভুল বুঝলেন। অজয় ঘোষের উদ্দেশে রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, 'আমি বরং এখন যাই। তোমরা আলোচনা করে নাও। প্রয়োজন হলে নয় পরে দেখা করব।"

রাধা আহতস্বরে বলল, "সে কি! ড্রিঙ্কস্ আনতে দিয়েছি। আপনি অতিথি। আপনাকে ছাড়ি কি করে?"

ইন্দ্রজিত বিরস বললেন, "আমি ড্রিঙ্ক করি না।"

রাধা আড়চোখে ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করে বলল, "আপনার এ কথা কিন্তু মেনে নিতে পারলাম না। মানুষ ডাঙায় বাস করলেও জল তাকে খেতেই হয়।" পরে শান্তকণ্ঠে বলল, "ড্রিঙ্কস্ বলতে আমি হুইস্কি জিন-এর কথা বলছি না। ফলের রস ঠাণ্ডা করে আনতে বলেছি। তাতে আপত্তি নেই তো?"

ইন্দ্রজিত বিশেষ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "না, না।"

রাধা ঈষৎ হাসল। তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজিতের হৃদয় সাড়া দিয়ে জেগে উঠল। তাঁর সম্মুখে যমুনা পুলিনের এক কল্পিত দৃশ্য ভেসে উঠল। এ দৃশ্যে তিনি নিজেকে এক বিশেষ ভূমিকায় দেখলেন।

নক্সাকাটা সৌখীন গেলাসে ঠাণ্ডা ফলের রস এল। অজয় ঘোষ একটা গেলাস তুলে নিয়ে দু একটা চুমুক দিয়ে হতাশ-কণ্ঠে বললেন, "তরুণ আগুনে যে ব্যক্তি তেষ্টা মেটায়, এই ফলের রসে সে কোন স্বাদ পাবে! উপযুক্ত পিতার কন্যা হয়েও সুরার মহিমা বুঝলেনা রাধা।"

রাধা ইন্দ্রজিতের উদ্দেশে বলল, 'বাবার সঙ্গে এই একটি ব্যাপারে অজয় কাকার বেশ বনিবনা ছিল।" তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "এ বাড়িতে তরুণ আগুনের আমদানি একটু কম হলে বাবা হয়তো আরো কয়েকটা বছর বাঁচতেন।"

অজয় মুখ বাঁকা করে বললেন, ছোয়াই ননসেন্স। জন্মমৃত্যু নিয়তির হাতে।"

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তাহলেও—"

অজয় ঘোষ বাধা দিয়ে বললেন, "বুঝেছি। এই একটি বিষয়ে তোমাদের উভয়ের মতের সম্পূর্ণ মিল দেখছি। কিন্তু এর চেয়েও ঢের গুরুতর নানা বিষয়ে মিল অমিলের প্রশ্ন উঠবে। তোমাদের পরিচয় হল। আজ এখানেই প্রথম দৃশ্য শেষ হোক। কাল থেকে কয়েকটা দিন তোমরা ধীরে সুস্থে সুবিধে মতো পরস্পরকে চিনবার জানবার চেষ্টা করো। মনে রেখো ফলাফল শুধু অদৃষ্টের হাতে নয়। খানিকটা তোমাদেরও হাতে।"

সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। যাবার সময় রাধার সঙ্গে ইন্দ্রজিতের দৃষ্টি বিনিময় হল। তাঁর বুকটা টনটন করে উঠল। তন্বী কৃষ্ণা রাধাকে বারবার দেখতে ইচ্ছা হল। রাধার নমস্কারের প্রত্যুত্তরে ছোট একটা নমস্কার জানিয়ে অজয় ঘোষের সঙ্গে তাঁকে বেরিয়ে আসতেই হল। শূন্য ড্রইংরুমে রাধা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল।

পরদিন টেলিফোন পেয়ে বিকেলের দিকে ইন্দ্রজিত রাধার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। রাধা ড্রইংরুমে তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল।

ইন্দ্রজিত বললেন, "আপনি ড্রইংরুমে?"

রাধা সহাস্যে বলল, "কেন, ড্রইংরুমে অপেক্ষায় থাকা কি উচিত হয়নি?"

ইন্দ্রজিত বললেন, "না, না, তা নয়। ভেবেছিলাম সিঁড়ির মাথায় আপনাকে দেখতে পাবো।"

রাধা হতবুদ্ধি হল। কিন্তু কী ভেবে মৃদু হেসে বলল, "কেন বলুন তো?"

কথার ফাঁদে পা দিয়ে সাহিত্যের কৃতী ছাত্র ইন্দ্রজিত রীতিমতো ফাঁদে আটকে গেলেন। বললেন, "যাদের সঙ্গে হাটে বাজারে আট পৌরে প্রয়োজনে দেখা হয় তাদের কথা আলাদা। সামনাসামনি হাতের কাছে পেলেই সুবিধে। কিন্তু যাদের বিশেষ করে চাই, সাধ হয় তারা উপর থেকে নীচে নেমে আসুক। ঐ নেমে আসাটাই আসল। ওতেই তৃপ্তি।"

রাধা হৃদয়াবেগ দমন করে সহজ হবার চেষ্টা করে ধীর কণ্ঠে বলল, "কথাটা শুনতে ভালো লাগল। একটু বুঝিয়ে বলুন।"

ইন্দ্রজিত বুঝলেন আষ্টেপৃষ্ঠে কথার প্যাঁচে জড়িয়েছেন। অগত্যা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ঈশ্বরের কথাই ধরুন না কেন। যখনই তাঁকে পেতে চাই কল্পনায় স্পষ্ট দেখি তিনি যেন উপর থেকে নীচে নেমে আসছেন।"

রাধা হেসে বলল, "কিন্তু আমি তো ঈশ্বর নই!"

একটু উদ্ভ্রান্ত হয়ে ইন্দ্রজিত বললেন, ঈশ্বর নন।' কিন্তু প্রেমতত্ত্বের বিচারে তাঁরই মতো, অন্ততঃ কাছাকাছি একজন।"

রাধা অভিভূত হল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "আপনি কবিতা লেখেন?"

ইন্দ্রজিত বললেন, "লিখতে পারি। কিন্তু লিখিনা।"

রাধা বলল, "আশ্চর্য! আমি লিখতে পারি না। অথচ লিখি। আপনি পারেন অথচ লেখেন না।"

ইন্দ্রজিত বললেন, "কাগজে কবিতা লেখার চেয়ে জীবন দিয়ে কবিতা লেখার ঢের বেশী মূল্য। আমি এই রকম একটা কবিতার মিল খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ইন্দ্রজিতের কথা শুনতে শুনতে রাধা কী এক চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেল। তারপর গভীর দৃষ্টিতে ইন্দ্রজিতকে দেখতে দেখতে বলল, 'ঈশ্বর করুন, জীবনের কবিতায় আপনি যেন মিল খুঁজে পান। আমি তো আজ পর্যন্ত পেলাম না। হয়তো কোনোকালেই পাবো না।"

ইন্দ্রজিত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "তা কি করে হয়! পেতেই হবে। আমি পেলে আপনিও পাবেন।"

রাধা বিষণ্ণ হেসে বলল, "যে কবি অপটু কিম্বা পটু হয়েও যার কপাল ভালো নয়, সে নিজেই যে শুধু মিল খুঁজে পায় না তা নয়। সে অপরের মিল ভেঙে দেয়। সে কবিতা খুঁজতে গেলেই জীবনের ছন্দ এলিয়ে যায়। মিল ভাঙতে থাকে।"

ইন্দ্রজিত কী বলবেন চিন্তা করে নিলেন। পরে বললেন, "আমি বারবার জীবনে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু তবুও আশা ছাড়িনি। আপনিই বা ছাড়বেন কেন?"

রাধা হতাশ কণ্ঠে বলল, "না ছেড়ে উপায় কী? একটা মস্তবড়মের আমিদের সম্মুখে এসে থেমে গিয়েছি। এগোবার উপায় নেই।"

রাধার কথার অর্থোদ্ধার করতে গিয়ে ইন্দ্রজিতের ললাটে দুর্ভাবনার রেখা ফুটে উঠল। রাধা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কী ভেবে সংগোপনে একটু হাসল। পরে ইন্দ্রজিতকে সম্বোধন করে বলল, 'একটু চা খান।"

ইন্দ্রজিত বললেন, "থাক।"

রাধা সবিস্ময়ে বলল, "কেন?"

ইন্দ্রজিত ধরা গলায় বললেন, "আপনার বিপদের কথা শোনার পর কী করে খাই?"

রাধা হেসে বলল, "কেন, আজ থেকে আপনি কি খাওয়া বন্ধ করে দেবেন?"

ইন্দ্রজিত অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "তা নয়। তবে এই মুহূর্তেই কী করে খাই?"

রাধা শান্ত কণ্ঠে বলল, "আমি নিজ হাতে তৈরী করব। আপনি খেলে আমার ভালো লাগবে।"

রাধা চা তৈরী করে সযত্নে একটি কাপ ইন্দ্রজিতের সম্মুখে রেখে বলল, "নিন।"

ইন্দ্রজিত কিন্তু কিছুতেই চায়ের কাপ স্পর্শ করার মতো জোর পেলেন না। রাধার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে নিষ্পলক চক্ষে চেয়ে রইলেন। রাধা তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে কাপটা ইন্দ্রজিতের মুখে তুলে ধরে বলল, "খান।"

ইন্দ্রজিত নিতান্ত বিব্রত বোধ করলেন। সেই সঙ্গে একটা আনন্দ ও উত্তেজনা তাঁকে নাড়া দিয়ে গেল। একটা চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা ধরে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা।"

রাধা দুচোখ ভরে ইন্দ্রজিতকে দেখতে দেখতে বলল, "এই রকম ছোটো একটা মিলও এর আগে অদৃষ্টে জোটেনি। ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন। আপনি চলে যাবেন, মিলটা কিন্তু থেকে যাবে।"

ইন্দ্রজিত বললেন, চলে যাবো বলে আসিনি। তবে যেতে বললে কিসের জোরে থাকবো?"

১৩৭৮'তে বাংলা সাহিত্যে 'শিবা'র

বৈশাখিক অবদান

সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অপরূপ কথা-কাহিনী

১। পেসু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

স্ত্রী অনেকেইহয়, সহধর্মিণী হয় ক'জন?

৪·৯০

২। তরুণ কবি "চক্রশূলে"র—

আজ আমি বেকার

১·২০

০ পাওয়া যাচ্ছে কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ায় ০

CENTRAL LIBRARY

রাধা ম্লান হেসে বলল, "একদিন নিজেই যেতে চাইবেন। সেদিন বলেও ধরে রাখতে পারব না।"

রাধার একথায় ইন্দ্রজিত অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাধা বলল, "কথা বলুন।"

ইন্দ্রজিত হাসতে চেষ্টা করলেন। জবাব দিতে হয় তাই বললেন, "কী কথা?"

রাধা ইন্দ্রজিতের চোখে চোখ রেখে বলল, "যে কোনো কথা। কবিতার কথাই নয় বলুন।"

ইন্দ্রজিত একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সাহস পাই না। কবিতার কথা বলতে গেলেই আপনার জীবনের অমিলের কথা মনে পড়ে যাবে।"

রাধা বলল, 'যায় যদি যাক না।'

রাধা বলল, "ওইতেই তো বিপদ। অমিলের কথা মনে পড়লেই কৌতূহলী মন অমিলের ইতিহাসের জন্য উৎসুক হয়ে পড়বে।"

রাধা বলল, "যদি একান্তই জানতে চান, ক্ষতি কী?"

ইন্দ্রজিত এবার রাধাকে দৃষ্টিবিদ্ধ করে বললেন, "তাহলে বলুন কিসের অমিল?"

রাধা ড্রইংরুমের কার্পেটের নক্সায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করে বলল, "বলব। কিন্তু আজ নয় কাল। বলার প্রয়োজন হবে না। স্বচক্ষে দেখবেন।"

কয়েক মিনিটের ভিতরই ইন্দ্রজিত বিদায় নিয়ে উঠে পড়লেন। হোটেলে না ফিরে সোজা অজয় ঘোষের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হলেন।

অজয় ঘোষ তখন ড্রইং রুমে সুরাদেবীর পরিমিত সাধনায় রত। ইন্দ্রজিতকে অতো রাতে বিবর্ণমুখে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, "প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে তুমি স্বশরীরে এসেছ না তোমার ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছ!"

ইন্দ্রজিতের তরফ থেকে এ রসিকতার কোনো প্রত্যুত্তর না পেয়ে অজয় ঘোষ বুঝলেন ব্যাপার গুরুতর। ভিন্ন পথ ধরতে হবে।

বললেন, "রাধার ওখানে গিয়েছিলে?"

ইন্দ্রজিত সংক্ষেপে জবাব দিলেন, "হুঁ।"

অজয় ঘোষ সোফায় নড়েচড়ে বসে বললেন, "কথা হল?"

ইন্দ্রজিত ক্লান্তস্বরে বললেন, 'হল। কিন্তু না হলেই ভালো হত।'

অজয় ঘোষ বললেন, "খুলে বলো।"

ইন্দ্রজিত বললেন, "কি করে বলি? বলো বলার মতো কোনো কথাই হল না। আমার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো কথাই স্পষ্ট করে বলল না।"

অজয় ঘোষ বললেন, "তবু যা হয়েছে সংক্ষেপে বলো।"

ইন্দ্রজিত সখেদে বললেন, "আমি মিলের খোঁজ নিতে গিয়ে মারাত্মক অমিলের হাহুতাশ শুনে এলাম।"

অজয় ঘোষ সবিস্ময়ে বললেন, "মিলের খোঁজ নিতে গিয়েছিলে? কিসের মিল?"

ইন্দ্রজিত বললেন, "কিসের আবার! কবিতার।"

বিস্ময়ে অজয় ঘোষের দু চক্ষুর মণি প্রায় ঠিকরে বার হয়ে এল। বললেন, "তুমি কি বম্বে থেকে কলকাতায় কবিতার মিলের খোঁজে এসেছ?"

ইন্দ্রজিত আহত কণ্ঠে বললেন, "বইয়ের কবিতার নয়, জীবনের কবিতার মিল।"

অজয় ঘোষ মনে মনে বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন, "রাধার জবাবটা যথাসম্ভব গুছিয়ে বলো। আমার জানা দরকার।"

ইন্দ্রজিত বললেন, "সরাসরি বলে দিল মিলের আশা ছেড়ে দিয়েছে। একটা মস্তবড় অমিলের সম্মুখে এসে থেমে গিয়েছে। এগোতে পারছে না।"

অজয় ঘোষ বললেন, "সুখবর। সেই মুহূর্তে তার হাতটা চেপে ধরে বুঝিয়ে দিলে না কেন যে আপনা আপনি মিল না এলে গায়ের জোরে মিলের ব্যবস্থা করা যায়?"

ইন্দ্রজিত চক্ষু কপালে তুলে বললেন, "গায়ের জোরে?"

অজয় ঘোষ বললেন, "তাতে আপত্তি কী? অনেক কবি সোজাপথে মিল খুঁজে না পেয়ে গায়ের জোরে মিল দেন। জীবনের কবিতার বেলায় তো কথাই নেই। জোর না খাটালে প্রায়ই মিল এসেও আসে না।"

ইন্দ্রজিত অনুযোগ করে বললেন, "কিন্তু তুমিই তো কাল চিনবার জানবার কথা বলেছিলে! তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করেছিলে!"

অজয় ঘোষ কথার খানিকটা ধরে দিয়ে বললেন, "যদি হাত চেপে ধরতে পারতে, রাধা তোমাকে চিনবার সুযোগ পেত। তুমিও তার বারো আনা বুঝে নিতে।"

ইন্দ্রজিতের মুখে গভীর হতাশা ফুটে উঠল। বললেন, "এখন কী করতে বলো?"

অজয় ঘোষ নির্বিকার চিত্তে বললেন, "ইংলিশ এখন আমাদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কাল প্রথম ফ্লাইটে ঘরের মেয়ে ঘরে অর্থাৎ বম্বে নিয়ে যাও। যাযাবর দিনগুলো বাদে আধুনিক প্রাকটিক্যাল দেখে এবং মিলের চুলচেরা হিসেব বিচার করে বাকী জীবন কাটিয়ে দাও।"

ইন্দ্রজিতকে নিরুত্তর দেখে অজয় ঘোষ বললেন "পারবে?"

ইন্দ্রজিত ম্লানমুখে মাথা নাড়লেন।

অজয় ঘোষ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "না পারার কী আছে! আমি তো আকণ্ঠ অমিল পান করে জীবনকবিতার অমিলের ভিতর দিব্যি বেঁচে আছি।"

ইন্দ্রজিতের দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অজয় ঘোষ বললেন, "ঠিক করে তো ইংলিশ সম্বন্ধে পঞ্চকন্যার পাপ কাটিয়ে পরিষ্কার হয়ে এসেছো। এটিকেও একটা কায়দায় পার কাটাও।"

ইন্দ্রজিত ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "তা হয় না।"

অজয় ঘোষ বললেন, "কেন হয় না। প্রেমে পড়েছো?

ইন্দ্রজিত ইতস্তত করে বললেন, "বুঝতে পারছি না। হয়তো বুঝবার ক্ষমতাই আমার নেই। শুধু এটুকুই বুঝেছি যে, নামের জোরে হোক কি নিজের জোরে হোক মেয়েটা একটা টানে আমাকে জড়িয়ে নিয়েছে।" ইন্দ্রজিত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অজয় ঘোষ ইন্দ্রজিতের নিকটে সরে এসে বসে বললেন, "তাই কলকাতা বম্বে নয়। রাধাও বম্বের পঞ্চকন্যার একজন নয়। যদি সুখশান্তির পরোয়া না করো, তোমার মূল লক্ষ্য যদি হয় প্রেম, লেগে থাকো। বিয়ে হোক না হোক, তোমার মিলের ভিতর রাধাকে পাও বা না পাও, যা সহজে মেলে না এমন কিছু পাবে। ধ্যানের ও আবিষ্কারের একটা নতুন জগতের কাছে এসে পড়েছো। কপাটের চাবিও কাছেই আছে। কিন্তু আমার পক্ষে তা তোমার হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে। তোমাকে বিনামূল্যে যে সুযোগ দিয়েছি তা কোনো মক্কেল চড়া ফী দিয়েও কোনো মুল্যেই তার ব্যারিস্টারের কাছ থেকে পায় না।"

ইন্দ্রজিত অজয় ঘোষের উপদেশের কতটুকু নিছক শ্লেষ কতটুকু সত্য চিন্তা করতে করতে ভূতগ্রস্তের মতো হোটেলে ফিরলেন।

পরদিন বিকেল হতে না হতেই ইন্দ্রজিত রাধার ড্রইংরুমে উপস্থিত হলেন। রাধা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল। ইন্দ্রজিতকে দেখে সে তার স্বভাবসুলভ লঘু পদক্ষেপে নেমে এল। হেসে বলল, "ড্রইংরুমে দেখতে পেলে পাছে রাগ করেন, সিঁড়ির মাথায় ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম।" পরে বলল, "বসবেন না? বসুন।"

ইন্দ্রজিত বললেন, "যখন এসেছি, একটু বসেই যাই।"

রাধা বিস্ময় ও অনুযোগ মিশিয়ে বলল, "সে কী? আজ তো অনেকক্ষণ বসবার কথা!"

রাধার কথার রকমটা ইন্দ্রজিতের ভাল লাগল। প্রকাশ্যে বললেন, "কেন?"

রাধা বলল, "বাঃ! কালকের সেই অমিলের কথা এর মধ্যেই ভুলে বসে আছেন?"

ইন্দ্রজিত বললেন, "ভুলিনি! ওর দুর্নিবার টানে আজ বরং একটু আগেই এসে পড়েছি।"

ইন্দ্রজিতকে নিষ্পলক চোখে দেখতে দেখতে রাধা বলল, "বেশ করেছেন। তবে কথা সুরু হবার আগেই চায়ের পাট সুরু হোক।"

বয় চায়ের পট কাপ ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম শোভিত ট্রে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হল।

রাধা পট-বে চা নাড়তে নাড়তে কী ভেবে হেসে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি চা তৈরী করতে পারেন?"

ইন্দ্রজিত এ কথার জবাব দিলেন না।

রাধা পুনরায় হেসে বলল, "আমি জানি পারেন না।"

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তা তৈরী করি না। প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই পারব।'

রাধা আয়তচক্ষে ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বলল, 'দেবেন আমাকে এক কাপ তৈরী করে?'

ইন্দ্রজিতের বিহ্বলভাব লক্ষ্য করে রাধা হাসল। বলল, 'আজ থাক। আর একদিন দেবেন।'

হঠাৎ ইন্দ্রজিতের মনে একটা নরম স্পর্শ লাগল। বললেন, 'থাকবে কেন? আজই তৈরী করে দিচ্ছি।'

ইন্দ্রজিত গরম পটে হাত দিতেই উঃ করে হাত সরিয়ে নিলেন। রাধা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'আজ কিন্তু আপনিই গোড়ায় মিল ভেঙে দিলেন।' তারপরই স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, না, ভুল বললাম। মিল দিলেন।'

ইন্দ্রজিত কিন্তু রাধার কথায় মোটেই আশ্বস্ত হলেন না। এই তুচ্ছ ঘটনার একটা নিগূঢ় অর্থ থাকতে পারে ভেবে বিমর্ষ বোধ করলেন।

চায়ের পাট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাধা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গিয়েছিল। খানিকবাদেই নীচের নেমে এল। লঘু পদক্ষেপে নয়। সন্তর্পণে। রাধা ড্রইংরুমে নেমে এল। ইন্দ্রজিতের সম্মুখে গিয়ে বলল, 'এই দেখুন।'

ইন্দ্রজিত দেখলেন রাধার কোলে মাস-নয়েকের একটি সুশ্রী নধর শিশু। তাঁর চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এল। প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই বললেন, 'বাঃ! ভারী সুন্দর তো!'

রাধার কণ্ঠে অদ্ভুত একটা সুর বাজল। বলল, 'এই হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অমিল। সব মিলের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।'

ইন্দ্রজিত হেসে বললেন, 'শিশু কখনো অমিল হতে পারে? শিশু সৃষ্টির প্রতীক। আর সৃষ্টির আসল অর্থই হচ্ছে মিল।'

রাধা নীরব হয়ে গিয়েছিল। ইন্দ্রজিত মুগ্ধচক্ষে শিশুকে দেখতে দেখতে বললেন, 'কার বাচ্চা?'

রাধা কেন হঠাৎ নিভে গেল। ইন্দ্রজিত রাধার এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিচলিত হলেন। গলা নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'মা বেঁচে নেই বুঝি?'

রাধা বলল, 'মরতে পারলে বেঁচে যেত।'

ইন্দ্রজিত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনো অঘটন ঘটেছে বুঝি?'

রাধা শিশুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'ও নিজেই একটা দুর্ঘটনা।'

'কেন?' প্রশ্ন করতে গিয়ে ইন্দ্রজিত থেমে গেলেন। তাঁর মনে একটা সন্দেহ এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সময় বুঝে ছোবল করল।

ইন্দ্রজিতের মুখভাবের সঙ্গে তাঁর গলার স্বর বদলে গেল। বললেন, 'এ শিশু কার? তোমার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?'

রাধা ম্লান হেসে বলল, 'আপনি থেকে তুমিতে নেমেছেন এই আমার লাভ।'

ইন্দ্রজিত রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'কথার জবাব দাও। এ শিশু কার?'

রাধা বলল, 'আবার কার? আমার।'

আশায় আকাঙ্ক্ষায় খণ্ডিত হয়ে ইন্দ্রজিত অনুনয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুষ্যি নিয়েছো বুঝি?'

রাধা মাথা নাড়ল।

'কুড়িয়ে পেয়েছো?'

ইন্দ্রজিতের প্রশ্নের জবাবে রাধা ফের মাথা নাড়ল।

কিছুক্ষণের জন্য ইন্দ্রজিত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অসহায়ের মতো রাধার ও শিশুর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। পরে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে নরমগলায় বললেন, 'রাধা। আমার কাছে তোমার কোন কথা গোপন থাকতে পারে না। খুলে বলো। আমাকে এরকম একটা নিদারুণ সন্দেহে ফেলে রেখো না।'

রাধা এ কথার জবাবে শুধু একটু হাসল। তার এ হাসির অর্থ বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিত কোনো ভরসাই পেলেন না। ধরা-গলায় বললেন, 'রাধা! আমি কল্পনায় তোমাকে নিয়ে একটা স্বর্গ তৈরী করার চেষ্টা করেছিলাম। এভাবে নিষ্ঠুর হাতে সে স্বর্গ ভেঙে দিও না।'

রাধার চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তুমি এর মা?'

রাধা মাথা নেড়ে সায় দিল।

'যেভাবে সচরাচর নারী সন্তানের মা হয় ঠিক সেভাবে?' ইন্দ্রজিত আশার একটা সংকীর্ণ পিচ্ছিল শিখরে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

রাধা এ কথার কোনো জবাব দিল না।

ইন্দ্রজিত অন্যপথে গিয়ে সঙ্কট এড়াবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'এ শিশুর পিতা কে?'

রাধার মুখ বিকৃত হল। সে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

অজয় ঘোষ একটা ড্রেসিংগাউন কোনো রকমে গায়ে জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে সোজা ড্রইংরুমে এলেন। অত রাতে তাঁর ফ্ল্যাটে ইন্দ্রজিতের আবির্ভাবে তাঁকে বিশেষ বিচলিত মনে হল না। কিন্তু পরমুহূর্তেই ইন্দ্রজিতের চোখের অস্বাভাবিক দৃষ্টি লক্ষ্য করে একটু আতঙ্কিত হলেন। বললেন, 'বোসো। তোমাকে বিশেষ উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত ঠেকছে! ব্যাপার কী?'

ইন্দ্রজিত ভগ্নকণ্ঠে বললেন, 'তোমার ঐ রাধা তো এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে!'

অজয় ঘোষ চুরুটে আগুন ধরিয়ে বললেন, 'ভয়ঙ্কর কাণ্ড?'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তুমি আদ্যোপান্ত সবই জানো।'

অজয় ঘোষ কৌতূহল প্রকাশ করে বললেন, 'অর্থাৎ!'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'গোড়াতেই তুমি অভিজ্ঞতার কথা তুলেছিলে। শি ইজ নট এ মাদার ইয়েট বললেই খাটো গলায় একটা লেজুড় জুড়ে দিয়ে বলেছিলে, ইন এ স্যাটেইন ওয়ে শি ইজ।'

অজয় ঘোষ সপ্রশংস দৃষ্টিতে ইন্দ্রজিতকে দেখতে দেখতে বললেন, 'আশ্চর্য মেমরি। অক্সফোর্ড হার্ভার্ড কি অমনি তিন তিনটে ডিগ্রি দেয়!'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'রাধা তো বেশ কিছুকাল সন্তানের মা হয়ে বসে আছে। বাপটি কে? তুমি?'

অজয় ঘোষ জিভ কেটে বললেন, 'ছিঃ ইন্দ্রজিত! হুইস্কি খাই, কখনো সখনো দু-চারটে মেয়েকে সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করে বলে এতটা নীচে নেমে যাইনি নিজের সন্তানের দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাবো।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তাহলে রাধার সন্তান কোত্থেকে এল?'

অজয় ঘোষ হাই তুলে বললেন, 'রাধা কী বলে?'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'ও সন্তানের মা, একথা ছাড়া কোনো কথাই বলতে রাজী নয়।'

অজয় ঘোষ বললেন, 'রাধাকে তোমার ভালো লাগে?'

ইন্দ্রজিত এ কথার জবাব দিলেন না।

'যদি বিশেষ ভালো লেগে থাকে তবে ব্যাপারটা চেপেই যাও না? মাথাব্যথা হিলসয়ে কে খোঁজ করতে যাচ্ছে বাচ্চা কার?' অজয় ঘোষ ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করতে থাকলেন।

ইন্দ্রজিত পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল বসে রইলেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'তুমি যেখানে হোঁচট খেয়েছো সেখানে একাধিক প্রেমিক ইতিপূর্বে আহত হয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সামলে নিয়েছে। তুমিও তাদের পথ ধরো।'

ইন্দ্রজিতের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে অজয় ঘোষ বললেন, 'বুঝেছি। তুমি তোমার নৈতিক সংস্কারের সঙ্গে কোনো রকমেই রাধার মাতৃত্বের ব্যাপারটা মানিয়ে নিতে পারছ না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র পথ খোলা আছে।'

ইন্দ্রজিত তেমন একটা আশ্বাস না পেলেও একটু জেগে উঠলেন।

অজয় ঘোষ শান্তকণ্ঠে বললেন, 'তুমি ঈশ্বর হয়ে যাও। অন্ততঃ হবার চেষ্টা করো।'

ইন্দ্রজিত আহতস্বরে বললেন, 'তামাসার একটা সীমা আছে।'

অজয় ঘোষ ইন্দ্রজিতের মন্তব্যে কর্ণপাত না করে বললেন, 'ঈশ্বর হয়ে যাও। এক লাফে নৈতিক সংস্কারের উপর উঠে যাবে। তখন মনে হবে তুমি রাধার সব। রাধা, তার সন্তান তোমারই এক একটা প্রকাশ। তখন দুঃখ পাওয়া দূরের কথা, পিতৃত্বের মাতৃত্বের প্রশ্ন তুচ্ছ মনে হবে।'

ইন্দ্রজিত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অজয় ঘোষ বললেন, আমাকে লোকে অর্থলোভী বিলাসী ব্যারিস্টার বলে জানে। কিন্তু আজীবন, অন্ততঃ মনেপ্রাণে ব্যারিস্টার হবার পর থেকে সমানে ঈশ্বর হবার সাধনা চালিয়ে চলেছি। না হলে মক্কেলদের পাপপুণ্য বোঝা কেবল কয়েকটা সোনারূপোর চাকির বিনিময়ে মাথায় বইতে পারতাম না।'

হঠাৎ শোবার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। অজয় ঘোষ টেলিফোন ধরতে গেলেন। আধ মিনিট না যেতেই ড্রইংরুমে শশব্যস্তে ফিরে এলেন। বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে। রাধা বিষ খেয়েছে।'

মিনিট পনেরোর ভিতর ইন্দ্রজিতকে নিয়ে অজয় ঘোষ রাধার ড্রইংরুমে ঢুকলেন। দারোয়ানদের শুকনো মুখ দেখে ইন্দ্রজিতের বুক অসাড় হয়ে গেল। জোর করে ইন্দ্রজিতকে একটা সোফায় বসিয়ে অজয় ঘোষ কয়েকটা লাফে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। ইন্দ্রজিত বসে বসে তাঁর জীবনের অবিশ্বাস্য এক দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

কয়েক মিনিট বাদে অজয় ঘোষ ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচের নেমে এলেন। তাঁর কোলে রাধার সন্তান। ইন্দ্রজিতের চোখের নীরব প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'ওভার ডোজ খেয়েছিল। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিছুতেই রাধাকে বাঁচানো গেল না।'

মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে অজয় ঘোষের কথা শুনে ইন্দ্রজিত নিজের ভিতর অনুভব করলেন।

ম্লান হেসে অজয় ঘোষ বললেন, রাধা তো মরে বাঁচল। কিন্তু সমস্যা তো পুরোপুরি মিটল না। তার সন্তানকে তো রেখে গেল। একে মানুষ করা, এর চলনসই একটা পিতৃপরিচয়ের ব্যবস্থা করা, কম ঝামেলার ব্যাপার নয়।'

সোফায় বসে শিশুকে অপটু হাতে আদর করতে করতে অজয় ঘোষ বললেন, 'রাধার শেষ ইচ্ছেটা ডাক্তারকে বলে গিয়েছে। কিন্তু সে ইচ্ছাপূরণ সম্ভব নয়।'

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

ইন্দ্রজিত উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'রাধার ইচ্ছাপূরণ করতে গেলে তার সন্তানের ভার তোমাকে নিতে হয়।'

ইন্দ্রজিতের দৃষ্টি চোখের জলে অস্পষ্ট হয়ে এল। উঠে এসে অজয় ঘোষের কোল থেকে রাধার সন্তানকে তুলে নিয়ে নিবিড় আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'আমি কিছুক্ষণ আগে আমার ড্রইংরুমে ঈশ্বর হবার কথা বলেছিলাম। গভীর দুঃখে যখন মানুষের অহংকার অভিমান চূর্ণ হয়, ঈশ্বর হবার পথ খুঁজে পায়।'

ইন্দ্রজিতের চোখ বেয়ে টসটস করে কয়েক ফোঁটা জল রাধার সন্তানের মুখে পড়ল। সে অবাক বিস্ময়ে ইন্দ্রজিতের দিকে তাকালো। ইন্দ্রজিতের মনে হল এভাবেই বুঝি পরমবিস্ময়ে মানুষ তার কল্পনার ঈশ্বরের দিকে তাকায়।

অজয় ঘোষ চুরুটে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বললেন, 'আর একটা ইচ্ছের কথা রাধা বলে গিয়েছে।'

ইন্দ্রজিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অজয় ঘোষের মুখের দিকে তাকালেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'মেয়েদের বোঝা ভার। বিশেষ করে রাধার মতো মেয়েকে। জীবনের কোন মুহূর্তে কোন ঘটনাকে অমূল্য মনে করে, বুদ্ধির বিচারে বোঝা যায় না।'

অজয় ঘোষ চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, 'রাধার ধারণা এ জীবনের পরও একটা জীবন আছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার ধারণা ছিল তোমার সঙ্গে তার আবার দেখা হবে। তোমাকে তার একটা ইচ্ছার কথা বলতে বলেছে।'

ইন্দ্রজিত কোনো কথা বললেন না।

অজয় ঘোষ বললেন, "রাধা বলে গিয়েছে সিঁড়ির মাথায় ও যে এসে দাঁড়াত, তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসত, তোমার ভাল লাগত। তার ইচ্ছা তুমি সিঁড়ির মাথার দিকে মুখ তুলে কিছুক্ষণ চোখ বুজে তার ধ্যান করবে। ঐ ধ্যানের জোরে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য আগের মতোই তোমাকে দেখা দিতে পারবে। একবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবে।'

ইন্দ্রজিত নিরুত্তর।

অজয় ঘোষ বললেন, 'জানি তুমি এ রকম ব্যাপার বিশ্বাস করো না।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তুমি করো?'

অজয় ঘোষ জবাবে বললেন, 'বিশ্বাস অবিশ্বাস না। কিন্তু সুরা সেবীর সাধনায় কখনো কখনো আধ্যাত্মিকতায় তুঙ্গ শিখরে উঠে একটা জিনিস শিখেছি। কোনো কিছুই নিছক তুচ্ছতার জোরে অবিশ্বাস করি না।'

ইন্দ্রজিতের চোখে অজয় ঘোষের কথায় একটা ঘোর নেমে এল। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যে কারণেই হোক তাঁর দুচোখের পাতা ভারী হয়ে বুজে এল।

সিঁড়ির মাথায় একটা ছায়া ও শব্দের সাড়া পাওয়া গেল। প্রথম দিনের মতো। ইন্দ্রজিৎ চোখ খুললেন। দেখলেন, চোখে জল মুখে হাসি রাধা।

ইন্দ্রজিত সেই প্রথম লজ্জা সঙ্কোচ অবিশ্বাস কাটিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন। রাধা।

রাধার দুচোখ থেকে গাল বেয়ে জলের ধারা নামল। সে নামতে গিয়ে থেমে গেল। কাঁপতে লাগল।

অজয় ঘোষ চেঁচিয়ে ইন্দ্রজিতকে বললেন। 'হাঁ করে দেখছিস? ওর মূর্চ্ছা এসে গিয়েছে। পড়ে যাবে। উঠে গিয়ে ধরো।'

ড্রইংরুমে রাধার সন্তান ও ওরা তিনজন কাছাকাছি এসে বসলেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'এখন তোমাকে বিষয়টা খুলে বলা চলে। কারণ পরীক্ষায় তুমি প্রথমদিকে বিশ্রীরকমে ফেল মারা সত্ত্বেও ফাইনালে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ।'

ইন্দ্রজিত রাধার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই বললেন, 'পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা?'

অজয় ঘোষ বললেন, 'কিসের আবার? প্রেমের। রাধা তোমার চিঠি পড়ে বলেছিল, পাঁচ-পাঁচবার যে লোকটা প্রেম করতে গিয়ে ফেল মেরেছে তাকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করা চলে না। অগত্যা এই পরীক্ষার ব্যবস্থা হল।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'বুঝলাম না।'

অজয় ঘোষ বললেন, 'পরীক্ষার আয়োজন আগে থেকেই হয়ে ছিল। রাধার বাবা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটি জারজ সন্তানের জন্মের কারণ হয়েছিলেন। বাপের লজ্জা ঢাকবার জন্য রাধা ঐ সন্তানকে নিজের সন্তান বলে চালালো। রাধার বাবা বেঁচে থাকলে রাধাকে নিশ্চয়ই বাধা দিতেন। আমিও দিয়েছিলাম। পিতার দায়িত্ব নিতে চেয়ে ছিলাম। কিন্তু রাধা শুনতে চাইনি। এখন অবশ্য বিষয়টা একা রাধার উপর নির্ভর করছে না। তুমি যদি সম্মত না হও—'

ইন্দ্রজিত রাধার কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ধরা গলায় বলল, 'একটা বিষয়ে রাধা আমার উপর ঘোর অবিচার করেছে।'

রাধা ইন্দ্রজিতের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

ইন্দ্রজিত অজয় ঘোষের দিকে চেয়ে বললেন। 'রাধার বিষ খাওয়ার ব্যাপার তুমি নিপুণ হাতে আগাগোড়া সাজিয়েছিলে। কিন্তু আমি তো সম্পূর্ণ একা। যদি বিষ খেয়ে বসতাম? কিম্বা অন্য কোনো উপায়ে আত্মহত্যা করতাম?'

রাধা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'তুমি তা পারবে না ইন্দ্রজিত। মৃত্যুকে চাইবার আগে আমাকে চাইবে। কারণ তোমার কাছে আমি মরণের চেয়েও বড়। তাই না—'

অভিনেত্রীর চোখে

আজকের নায়ক : শমিত ভঞ্জ

খান পনেরো বাংলা, দুখানা হিন্দী ছবি হাতে, কোনোটার কাজ শেষ, কোনোটার চলছে, শীগগিরই রিলিজ পাবে কোনো কোনোটা, কিন্তু নিজে যে কবে নিত্য স্যুটিংয়ের রুটিন বাঁধা জীবন থেকে একটু রিলিজ পাবেন। সেকথা বাংলা ফিল্মের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত নায়ক শমিত ভঞ্জ বলতে পারলেন না। এই দেখুন না, বোম্বে থেকে ফিরেছি হপ্তাখানেক, এর মধ্যে একটি দিনও রেস্ট পাইনি। সমানে স্যুটিং করে যাচ্ছি। এই লটের কাজ শেষ হবে ১২ এপ্রিল। তেরো তারিখই চলে যাব বোম্বে। ফিরব উনিশে। এসেই বেরিয়ে পড়ব আউটডোরে তোপচাঁচি। ফিরব ৫ মে। আবার যেতে হবে বোম্বে, পাঁচ কি ৬ তারিখ। আউটডোর শেষ করেই কলকাতায় ফিরব, উনিশ থেকে দোসরা জুন পর্যন্ত একটানা ইনডোরের কাজ। তেসরা আবার যাব বোম্বে, ওখানে ফিফটিনথ অব্দি ডেট দেওয়া আছে। পরদিনই আবার কলকাতায় ফিরতে হবে—ইনডোরের কাজ, আপ টু থার্টিয়েথ। তারপর আর মনে নেই। ডায়েরী দেখতে হবে।

প্রায় এক বছর ধরে সমানে এই এক রুটিন ফলো করে যাচ্ছেন যে মানুষটি, তাঁর মুখে চোখে কোথাও কিন্তু কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। পুরো ব্যাপারটাই যেন জস্ত একটা স্পোর্টস। এই স্পোর্টসে যেন ইকুলেস বোধহয় কম্পিটিটররা হাঁপিয়ে ওঠেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েন—চূড়ান্ত বাস্তবতাই এই খেলার চূড়ান্ত সাফল্য। সেই সাফল্য আজ শমিতের হাতের মুঠোয়। জিজ্ঞাসা করলাম কেমন করে, কোথা থেকে আজকের এই অবস্থায় এসে পৌঁছলেন?

পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি কাঠামোটার পঁচাত্তর কে-জি ভার হাল্কা হাসির সুক্ষ্ম রেখায় চাল্লিশ ইঞ্চি বুকের পাটা ছুঁয়ে পাতলা চাপা ঠোঁটের কোণায় কোণায় ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল: চলুন না স্টুডিওতে—যেতে যেতেই সব কথা হবে। কথা ছিল আজ সকাল দশটায় স্যুটিং শুরু হবে। কিন্তু কাল হঠাৎ প্যাক আপ হয়ে গেল। আজ আটটায় টাইম দিয়েছে। এদিকে আপনাকেও আসতে বলেছি।

রীতিমত বিব্রত লাগছিল কর্মব্যস্ত মানুষটাকে ভোরবেলা স্নান সেরে হাল্কা আকাশী নীল চাপা প্যান্টের ওপর লাল সাদা ডোরা কাটা হাওয়াই শার্টে দেখাচ্ছিলও চমৎকার। বললাম, তাই চলুন।

ইন্দ্রাণী পার্কের বাড়ীর সামনেই রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়েছিল চৌষট্টির মডেলের ঝকঝকে কালো ফিয়াটখানা। সরু গলি দিয়ে মিশেছে চওড়া গলিতে। গলি থেকে রাজপথ কয়েক গজ। পথটুকু গাড়ি না ঘুরিয়েই স্বচ্ছন্দে ব্যাক ড্রাইভ করলেন শমিত। সেই সঙ্গে উল্টে চললেন অতীত জীবনের পাতাগুলো।

তমলুকের বিখ্যাত ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী প্রীতিময় ভঞ্জের তিন ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে সেজ শমিতের জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চতুর্থ বছরে। ছেলেবেলা থেকেই প্রচণ্ড ডানপিটে। লম্বা চওড়া চেহারাটার দৌলতে আপারহ্যান্ড যে কোন দুঃসাধ্য কাজেই ব্যাকুগ্যাল নীতি দিত শমিত। সঙ্গে থাকত পাড়ার বন্ধু কমল (গুহ) আর দত্ত (হরিদাস সিংহ)।

ছেলেগুলোর এনার্জি যাতে মাথা ফাটাফাটিতেই না ফুরিয়ে যায়, তাই কম্পতরু ব্যায়াম সমিতির ট্রেনার দুর্গাদা ওদের ডেকে এনে ক্লাবে ঢুকিয়ে নিলেন। বেঞ্চপ্রেস, কারলিং, ডাম্বকিং, রাইজিং-এর সঙ্গে সঙ্গে কে পি বোস, মাদব চক্রবর্তী, রেন অ্যান্ড মার্টিনের চর্চা চলতে লাগল। সেই সঙ্গে স্কুলের এক একটা ধাপ উত্তরোনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটা উপসর্গ চাপিয়ে বসল শমিতের মাথায়—নাটক। পাড়ায় দলবেঁধে নিত্য নতুন নাটক করতে লাগল। স্কুলেও তাই। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ট্রেণ ভাড়া সম্বল করে চলে আসত কলকাতায়—মিনার্ভা, স্টার, রঙমহলের নতুন নাটক দেখতে। ভাল লাগলে সেই নাটকই আবার নিজেরা করত তমলুকে।

চলছিল বেশ। হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্টে সব গেল উল্টে-পাল্টে। ঠাকুরদা, ঠাকুমা, মা, বাবা, বোন ও দাদাদের সঙ্গে শমিতও যাচ্ছিল মামাবাড়ী। সেবারই ম্যাট্রিক পাশ

করেছে। ছাপ্পান্ন সাল। ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। ভিড়ের ঠেলায় কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল, তা টেরই পেল না শমিত। শুধু বুঝে ঠাকুর্দাকে এক হাতে ধরে দরজায় ঝুলে ঝুলেছিল। পাঁশকুড়া স্টেশন ছাড়িয়ে সবে স্পীড নিয়েছে ট্রেন, সিগন্যাল পোস্টে ধাক্কা খেয়ে লাইনের ধারেই গড়িয়ে পড়ল শমিত।

তারপর তিন বছর কেটেছে হাসপাতালে। মাথায় দারুণ লেগেছিল। লম্বা চুলের বোঝা সরিয়ে মাথার পেছনে সেই কাটা দাগটা দেখালেন। রক্তে সর্বাঙ্গ ভেসে গিয়েছিল। বাঁচার চান্সই নাকি ছিল না।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর এক নতুন উপসর্গ লক্ষ করা গেল ওর মধ্যে। কারণে অকারণে হঠাৎ হঠাৎ দারুণ রেগে ওঠে। তখন ওর জ্ঞান থাকে না। সে সময়ের একটা ঘটনার কথা বললেন শমিত।

কয়েকদিন ধরেই ছোট বোন শুক্লা বলছিল, কলেজে কে নাকি একটা ছেলে তাকে ডিসটার্ব করছে। শুনেই চটে গিয়েছিল শমিত। একদিন সোজা কলেজে গিয়ে ছেলেটিকে শাসিয়েও এল। ফল হোল উল্টো। শুক্লার বন্ধুরা এসে জানাল—দল পাকিয়ে ছেলেটা এখন সবাইকেই বিরক্ত করছে। আবার একদিন ওয়ার্নিং দিল শমিত। ওয়ার্নিং-এর রেজাল্ট হোল এই যে একদিন দুপুরে খেতে বসে খবর পেল ওরা নাকি সব আসছে—শমিতকে মারবে। পরের ইতিহাস তপনবাবুর 'আপনজনে' ডিটেলসে পাওয়া যাবে। মন্টু, কমল আর শমিত তিনজনে মিলে গোটা দলটাকে সেদিন মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল।

ছেলের রকম সকম দেখে বাবা গিয়েছিলেন রীতিমত ঘাবড়ে। তাই বেঁধে রাখার জন্য পারিবারিক ব্যবসায় ওকে টেনে নিলেন। কিন্তু শমিতের মন বসল না। টাকা আনা পাইয়ের হিসেবে ক্লান্ত হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ফের কলেজের খাতায় নাম লেখাল—ঝাড়গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পলিটেকনিকে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

কলেজে নাম লিখিয়েও কিন্তু নাটকের বাই কাটেনি। রেগুলার নাটক করে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আড়াই বছর কেটে গেল। থার্ড সাল শেষ হয় হয়। মাস পাঁচেক বাদেই ফাইন্যাল পরীক্ষা। একদিন হঠাৎ ওয়ার্কশপে কাজ করতে করতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল শমিত। ঝাড়গ্রাম ছেড়ে তমলুকে ফিরে এল। আর কলেজে ফিরে যায়নি।

কলেজ ছাড়া ইস্তক নাটকের বাই আরো বেড়ে গেল। শুধু নিজেরা করেই ক্ষান্ত হয় না, মাঝে মধ্যে কলকাতার দল ডেকে এনে যাত্রা, থিয়েটার করায় তমলুকে। তবু অশান্তি মেটে না।

শেষে একদিন কাউকে গোপন কথাটা না জানিয়েই চলে এল কলকাতা। কলকাতা এসে সবিতাব্রত দত্তের বিখ্যাত রূপকারে জয়েন করার জন্য অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে গেল। দিন কয়েক বাদেই চিঠি এল রূপকার থেকে জয়েন করার জন্য। এবার পার্মানেন্টলি দেশের পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে এল শমিত। এসে উঠল কলেজ স্ট্রীটের প্রেসিডেন্সী বোর্ডিংয়ে।

একটানা পাঁচ বছর থেকে, বোর্ডিংয়ে, বন্ধুর বাসায় পেয়িং গেস্ট হিসাবে কেটেছে শমিতের। খরচের সিংহভাগটুকু বাবাই জুগিয়েছেন। বাকীটুকু অ্যামেচার দলে 'খেপ' খেলে নিজেই উপায় করেছে শমিত।

পাঁচ বছর একে একে 'ব্যাপিকা বিদায়', 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী', 'কালের যাত্রা' ও 'অচলায়তন' পার্ট করেছে শমিত। তিল তিল করে নিজেকে গড়ে তুলেছে। সহজাত গানের গলা ছিল। রূপকারে এসে শিখল কি করে অভিনয় করতে হয়। অশিক্ষিতপটুত্ব নিপুণ শিক্ষকের তালিমে দিন দিন পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগল।

এরই মধ্যে একদিন দলের দাদা বঙ্কিম ঘোষের সঙ্গে দু নম্বর (নিউ থিয়েটার্স) গিয়েছিল স্যুটিং দেখতে। সাতষট্টি সাল। তপন সিংহের সহকারী বলাই সেনের ছবি 'সুরের আগুন'-এর স্যুটিং চলছিল। বঙ্কিমদা ছিলেন একটা ছোট রোলে। স্যুটিংয়ের ফাঁকে বঙ্কিমদাকে বলল—একটা চান্স হয় না?

বঙ্কিমদা বলাইদাকে আমার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। সেই সুবাদেই জীবনে প্রথম ফিল্মে নামার চান্স পেলাম। বলতে গেলে এক্সট্রার পার্ট। রাধামোহন ভট্টাচার্য গান গাইছেন, সঙ্গে তবলা সঙ্গত করছি আমি। একদিনের কাজ। পেয়েছিলাম পনেরোটা টাকা। আমার ফিল্ম জীবনের প্রথম উপার্জন

বলাইদাকে বলেছিলাম আবার ছবি করলে, যেন একটা চান্স দেন। মাস কয়েক বাদেই চান্স এল। এবার 'কেদার রাজা।' আউটডোর করতে দলবল নিয়ে বলাইদা তমলুকে গিয়েছিলেন, উঠেছিলেন আমাদের বাসায়। নিজে গিয়েছিলেন রবি বসু। রবিদা আমাদের তমলুকেরই লোক।

তমলুকে আমায় দেখে বলাইদা, তপনদা দুজনেই চমকে গিয়েছিলেন : তুমি এখানে? জবাবে বলেছিলাম, আপনারা আমাদের বাসাতেই উঠেছেন। ঐ ছবিতেও একটা কাজ জুটে গেল। একদিনের কাজ। পুলিশ ইন্সপেক্টরের রোল।

প্রথমদিন স্টুডিওর স্যুটিং করতে গিয়ে কোন অস্বস্তি বোধ করিনি। কিন্তু এবার দেশে নিজের পাড়ার পরিচিতদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে টু টেক ইউ ক্যামেরার রীতিমত নার্ভাস ফিল করছিলাম। বলাইদা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন। কপাল ভাল একটা টেকেই সটটা উৎরে গেল। হাতে পেলাম পঁচিশ টাকা।

বাস, আর কোন কাজ নেই। কলকাতায় ফিরে রোজ দুপুরে দু নম্বরে আড্ডা মারতে যাই। সন্ধেবেলায় নাটকের রিহার্সাল দিই। এমনি সময় একদিন তপনদা আমায় ডেকে বললেন—আমার নতুন ছবিতে তোমাকে একটা বড় রোল দেব।

আমাকে দিয়ে ডায়ালগ পড়ালেন। তারপর ডায়ালগগুলো দিয়ে বললেন, সড়গড় করে নিতে। আমাকে না কি টেস্ট দিতে হবে একটা। স্টুডিও পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ততদিনে মেক আপ টেস্ট, ভয়েস টেস্ট কথাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছি। কিন্তু আমিও যে কোনদিন টেস্ট দেওয়ার সুযোগ পাব, একথা ভাবিনি।

দিলীপদা (অভিনেতা দিলীপ রায়), বলাইদাকে গিয়ে ধরলাম—দেখিয়ে দিন কিভাবে বললে এই ডায়ালগগুলো উৎরোবে। ওঁরা আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন সেদিন। কপাল ভাল কোন টেস্ট দিতে হোল না। একবারেই চলে গেলাম আউটডোরে, ভুটানে। সঙ্গে ছিলেন অশোককুমার ও বৈজয়ন্তীমালা। 'হাটে-বাজারে' আমি করেছিলাম মোটর মেকানিক অমলের রোল।

বাই দি বাই বলে রাখি, ভুটানে যাওয়ার আগে দীর্ঘদিন আমি জণ্ডিসে ভুগেছি। শুনেছি অনেকদিন আমায় স্টুডিও পাড়ায় না দেখে তপনদা নাকি আমাকে সেবার বাদ দেওয়ার কথাই ভেবেছিলেন।

বাহান্নদিনের কাজ করেছিলাম, হাটে-বাজারে।' কেমন করেছিলাম, সেকথা তো দর্শকরা জানেনই।

এক নম্বরের (নিউ থিয়েটার্স) মেক-আপ রুমে বসে কথা হচ্ছিল। মেক

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও
অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার'
এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের
অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

আগের আয়নার সামনে টেবিলে খাতা ফেলে নোট করছিলাম, পাশেই রঙিন চাদর মোড়া চৌকিতে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে শমিত আমার একটার পর একটা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে এর মধ্যে। বার কয়েক মেক-আপম্যান এসেলো দিয়ে গেছেন। পরের সটেই শমিতকে চাই। এবার রেডি হওয়া দরকার। চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গা থেকে তাওয়াই শার্টটা খুলে রেখে একটা হাতকাটা গেঞ্জি চেয়ে নিলেন শমিত। তারপর আমার পাশেই আয়নার সামনে আর একটা চেয়ারে বসে স্পঞ্জ দিয়ে মুখটা ভেজাতে ভেজাতে নিজেই এবার প্রশ্ন করলেন, আর কি জানতে চান বলুন?

অমল কি করে হেনো হোল?—প্রশ্নটা করেই ওর মুখের দিকে সরাসরি তাকালাম। গালে সাবান মাখানোর ব্রাশের মত স্পঞ্জটা ঘষতে ঘষতে প্রশ্নটা শুনেই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আটষট্টিতে আমার বিয়ের সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে। তপনদাকে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলাম কার্ড নিয়ে। কার্ডটা দিয়ে হাসতে হাসতে তপনদা বললেন—তাহলে তো আর তুমি পারবে না?

আমি জানতামই না যে কি পারব না? শুনলাম 'আপনজনে' ঐ রোলটার জন্য আমার ভেবে রেখেছিলেন তপনদা। বললাম: নিশ্চয়ই পারব। আপনি চান্স দিয়ে দেখুন।

মেক আপ টেস্ট হোল। অনেক অনেক দিন ধরে রিহার্সাল চলল। তারপর গেলাম ফ্লোরে। মনে আছে প্রথমদিন রবিদার (রবি ঘোষ) সঙ্গে আমার স্যুটিং ছিল।

'আপনজনে' কাজ করতে করতেই নতুন অফার পেলাম দীনেন গুপ্তর 'নতুন পাতা' ও অজয় করের 'পরিণীতা।'

আটষট্টি, উনসত্তর দু বছরে যে চারটি ছবি করলাম চারটিই হিট। তার মধ্যে 'হাটে-বাজারে' ও 'আপনজন' করল গোল্ডেন জুবিলী। 'নতুন পাতা' ও 'পরিণীতা' সিলভার জুবিলী। তবু আটমাস আমি কোন কাজ পাইনি। চুপচাপ বেকার বসে-ছিলাম। রাস্তায় বেরোলে সবাই 'ছেনো' 'ছেনো' বলে পাগল করে তুলত। কিন্তু কেউ জানত না যে 'আপনজনের' ছেনোর মতই আমিও তখন বেকার।

উনসত্তরে শেষ হয় হয়। একদিন বুনম্বরে রবিদা (রবি ঘোষ) বললেন, বুবু (শমিত ভঞ্জের ডাক নাম) তাকে মানিকদা (সত্যজিৎ রায়) খুঁজছেন। আপনাকে ঠিক বলে বোঝাতে পারব না যে, খবরটা পেয়ে সেদিন কী ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম। তক্ষুনি গিয়ে ফোন করলাম মানিকদাকে মানিকদা বলছেন?

—কে?

—আমি শমিত।

—আরে তুমি তো ধুমকেতুর মত উদয় হয়ে উঠেছ।

মানিকদার বাসা আমি চিনতাম না। শুভেন্দুদা নিয়ে গেলেন। মনে আছে আমাকে দেখে মানিকদা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আও, বইঠহ। 'অরণ্যের দিন রাত্রিতে' আমি সিলেকটেড হলাম হরির রোলে।

তপনদার কাছে নর্মাল অ্যাকটিংয়ের যে ধারায় আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, মানিকদার কাছে সেটাই লেগে গেল কাজে। আসলে ব্যাপার কি জানেন, এ দুজনের কাছে অ্যাকটিং করতে হয় না—ওরাই করিয়ে নেন। সেটুকু শিখিয়ে দেন, তাই যদি করে উঠতে পারি তো এনাফ।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন শমিত। মুখে রং মাখা সারা। খুব হাল্কা রং। হাত বাড়িয়ে মেক-আপম্যানের হাত থেকে একটা ফুল স্লীভ টেরিলিন সার্ট চেয়ে নিলেন। হলুদে টাই বাঁধলেন। আকাশী নীল প্যান্ট পরলেন। স্যান্ডেল সরিয়ে পা জোড়া চকচকে সু জোড়ায় সেঁধিয়ে নিলেন। তারপর বার কয়েক আয়নায় মেক-আপটা দেখে নিয়ে বললেন, 'অরণ্যের দিন রাত্রির' পর থেকে হাতে প্রচুর কাজ এসে গেছে। একটানা করেও ফুরোতে পারছি না। ইন দা মিন টাইম 'বন জোৎস্না', 'রূপসী' 'প্রথম কদম ফুল', 'সোনা বউদি' রিলিজ করেছে। সামনে আরো অনেকগুলো পর পর রিলিজ করবে। আয়নার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন শমিত। সেটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কলম বন্ধ করে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আর তখনি প্রশ্ন করলাম পার ছবি কত পাচ্ছেন অ্যাভারেজ?

হেসে জবাব দিলেন শমিত: বাংলা ছবিতে পাই পনেরো হাজারের মত। তবে বন্ধু-বান্ধবদের রিকোয়েস্টে অনেক সময় আরো কম কাজ করতে হয়। হিন্দীতে পাচ্ছি ডবল।

কথা বলতে বলতে দুজনে এসে ফ্লোরের ভারী দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ভেতরে লাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট চলছে। আমাকে নমস্কার জানিয়ে ভেতরে চলে গেলেন শমিত। লক্ষ্য করলাম ফ্লোরে পা দেওয়ার আগে স্যুট-বুট পরা লম্বা চওড়া দেহটা সন্তর্পণে ঝুঁকে গিয়ে ফ্লোরের ধুলো মাথায় তুলে নিল। পরক্ষণেই আজকের নায়ক ফ্লোরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। বাইরে শেষ চৈত্রের ঠা-ঠা পোড়া রোদ। দু-একটা গাড়ি স্টুডিওর ফুলবাগানের অপভ্রংশের বাঁশের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। হতশ্রী, দারিদ্র্য পীড়িত, ছেঁড়া জামা কাপড়ে লজ্জাটুকু ঢাকা দিয়ে টেকনিসিয়ানরা ছোটাছুটি করছেন। দূরে গেটের সামনে পাহারাদার পুলিশ দাঁড়িয়ে। এই ভূমিতেই জন্ম নিয়েছেন কালকের নায়ক—আজকের নায়কও জন্মেছেন এই ভূমিতেই।

—সন্দীপন

শিশু আসে…

তার মায়ের কোল আলো করে। তার মুখের হাসি ও আধো আধো ভাষায় খেলে দেবলোকের সুষমা। শুধু মা-বাবা নয়, যে দেখে—সে-ই তার আপনজন। ধীরে ধীরে শিশু বড় হয়, ওকে ঘিরে কত আশা—একদিন ও বড় হবে—জীবনকে সার্থক করবে। কিন্তু সে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে তো বড়রাই।

শিশুর জন্মকালে
উপহার দেবার মত
এক নয়নভুলানো বই!

আমার শৈশব

তাকে এগিয়ে চলার পথ দেখাবে। এ ছাড়া এমন ছবিতে ছবিতে সাজান শৈশব-স্মৃতি-সম্ভার উপহার পেলে, উপহার-দাতাকে ও কি ভুলতে পারবে কোনদিন?

শিশু সাহিত্য সংসদ
প্রাইভেট লিমিটেড
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯
[৩৫-৭৬৬৯]

অমৃত নববর্ষ ১৩৭৮

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ। লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার রক্ত-স্রোতের উপর জেগে আছে তার অতন্দ্র প্রতিজ্ঞা—স্বাধীনতা। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা তাকে টলাতে পারে এ শপথ থেকে, কেননা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এক মন্ত্রে উজ্জীবিত, এক লক্ষ্যে নিবেদিত—স্বাধীনতা।

•

বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার সাধনা একদিনে পূর্ণ হয়নি। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তদান থেকে শুরু ক'রে প্রায় দু'দশক ধরে অগণিত কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা তৈরি করেছেন তার মাটি। আজ তাই সেখানে সাংস্কৃতিক জাগরণ আর স্বাধীনতার কামনা একাকার। এর প্রেরণা ওর আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে দিয়েছে পরম লগ্নের দিকে।

বাংলাদেশ সংখ্যা

•

বাংলাদেশের আজ সেই কালান্তরের মহাক্ষণে আমাদের ভাষার দোসর আত্মার সহোদর ওপার বাংলার সাহিত্যকৃতি ও চিন্তা-জগতের পরিচয় বহন করে আনবে অমৃত তার একাদশ জন্ম-দিনের নববর্ষ সংখ্যায়। এই সঙ্গে থাকছে সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি এবং সাম্প্রতিক তথ্য ও অজস্র সংবাদচিত্র।

বেরোবে ৭ মে ॥ দাম দু টাকা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-তিন

CENTRAL LIBRARY

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

(১)

কুড়ি বছর আগেকার ঘটনা।

রাজপুরীর মণিকুট্টিম নামে প্রাসাদের অলিন্দে সন্ধ্যাবেলায় বসুদেব অহিফেন নেশায় বিভোর হয়ে একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। একাকী তবু একা নয়, যেহেতু নেশার ঝোঁকে নিজেই পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ করছিলেন, যুক্তিতে ফাঁক ছিল না, তবে মাঝে মাঝে বাক্যে যে ফাঁক পড়ছিল সেটা অহিফেন প্রসাদাৎ।

মদ্যপান অতিশয় কদাচার। আর তাইতেই তো রাজার নিষেধ। ধন্য ধন্য রাজা। (হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়লেন) কিন্তু অহিফেনের উপর রাজার দৃষ্টি পড়ে নি তাই রক্ষে (আবার ঝিমকানি)। সৃষ্টির আদিতে কারণ সমুদ্র, তারপরে পৃথিবী, আগে মদ্য তারপরে—হাঁ তুমি কে?

চমকিয়ে উঠলেন বসুদেব। চমকাবার হেতু এই যে এ সময়টিতে কারো আসবার আদেশ ছিল না তাঁর কাছে। সম্পর্কোরে অহিফেন নেশার তাল কেটে যায়, অহিফেনী চিরনিঃসঙ্গ।

কে কে তুমি?

আমি তারা।

তারা তো সাতাশটি, তার মধ্যে কোনটি?

আমি আকাশের তারা নই।

তবে কি উদারা মুদারা তারা?

আহা সে তারাও নই।

তবে কোন্ তারা তাড়াতাড়ি বলে ফেল, সময় নষ্ট করো না।

একদিন তো আমি আসলে সময় নষ্ট হতো না।

তখন তো চাঁদ অহিফেন ধরি নি, তাই বৃথা অনেক সময় নষ্ট করেছি। শিগগির বলে কে তুমি?

চিনতে না পারলে আর বলে কি লাভ? এবারে বক্তার গলা ধরা-ধরা।

দেখো, বাপু, সত্যি কথা বলতে কি, এই সময়টিতে কেউ আমার নয় আর আমি কারো নই।

অন্য সময়ে যে আসতে দেয় না প্রহরী। এখন এলে কি করে?

প্রহরীও যে অহিফেনের নেশায় ঢুলছে।

বাহবা, বাহবা, প্রহরীর বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে। তা যখন এসেই পড়েছ আর গোলমাল করে নেশাটাও ফিকে করে এনেছ তখন বলেই ফেলো ব্যাপার কি?

চিনতে না পারলে কি বলবো! একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে ক্ষতি কি?

এতক্ষণ পরে বসুদেব জ্ঞানচক্ষু যোল আনা উন্মীলিত করে তাকালেন এবং তাকিয়েই বলে উঠলেন, ও তুমি তারা। তা এতক্ষণ বলো নি কেন? বসো, বসো।

না বসবো না, দাঁড়িয়েই বলে যাই যা বলতে এসেছিলাম।

আবার কি হল?

নূতন কিছু হয় নি, যা হওয়ার তা অনেক আগেই হয়েছে।

তবু শুনি।

আমার জরার কি করলে শুনি।

ছেলেটার নাম জরা রেখেছ নাকি? তা বয়স কত হল।

এইবার অঘ্রানে চার বছর পূর্ণ হবে।

বলো কি, এরই মধ্যে চার বছর হয়ে গেল?

তা হবে না! বয়স তো বাড়ে বই কমে না।

সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

আপনিই তো আনতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

তা বটে। সব কথা আমার মনে থাকে না।

সে কি রাজার ছেলে হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে?

আরে রাজার ছেলেরাই তো বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শোন নি পাণ্ডু রাজার ছেলেরা বারো বারো চব্বিশ বছর বনে বনে ঘুরে বেড়ালো, আজই না হয় রাজগী পেয়েছে।

তাদের সবাই রাজার ছেলে বলে জানতো তাই সম্মান পাচ্ছে কিন্তু আমার জরাকে তো জানে কাঙালের ছেলে বলে।

সময় হলেই জানবে, শুধু রাজার ছেলে বলে নয়, একেবারে রাজা বলে। ও হবে নিষাদদের রাজা।

অর্থাৎ ব্যাধ-বোরাডুদের রাজা। এ কি একটা বিচার হল। বাসুদেবের মতো জরাও তো আপনার পুত্র, তবে দুয়ে এমন প্রভেদ কেন?*

* শূদ্রাণী স্ত্রীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে জরার জন্ম। হরিবংশ, ২।১০৩।২৭

তারা অনেক আশা করে এসেছিল, এখন বসুদেবের শূন্যগর্ভ সান্ত্বনাবাক্য শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। আজ তার সমস্ত আশার সমাধি। অনেক দিন অনেক বার জরার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে সে বসুদেবের কাছে এসেছে, প্রত্যেকবার হবে, হবে, ব্যবস্থা করে দেব শুনেছে। আজ সেটুকু ভরসাও অন্তর্হিত হল।

যুবতী তারা রাজবাড়ীর দাসী ছিল। বর্ণে সে শূদ্রাণী। তার গর্ভে বসুদেবের ঔরসে একটি পুত্রের জন্ম হয়, সে আজ চার বছর আগেকার কথা। কাজেই শিশুটি বাসুদেবের বৈমাত্র ভাই। শিশুটির জন্মের পরে বসুদেব তার মাকে বোঝায় তার আর রাজবাড়ীতে না থাকাই উচিত, লোকে তাকে দাসী মনে করবে অথচ সে রাজপুত্রের মাতা। আবার ছেলেটি বড় হলে লোকে তাকে দাসীপুত্র মনে করবে অথচ সে বাসুদেবের বৈমাত্র ভ্রাতা। অবোধ রমণী সহজেই এই স্তোকবাক্য বিশ্বাস করে। বিশেষ তার মনে আত্মসম্মানবোধ কিছু প্রবল হওয়াতে সে এভাবে রাজবাড়ীতে বাস করতে অসম্মত হয়ে নগরের বাইরে বনের ধারে কুটির বাস করতে থাকে।

সে মাঝে মাঝে গোপনে এসে বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুত্রের জন্য একখানি গ্রাম ভিক্ষা করতো, আর রাজা-রাজড়াদের অকাতর রীতিতে একখানি গ্রামের বদলে পঞ্চগ্রাম দানের প্রতিশ্রুতি পেতো। যতই দিন যেতে লাগলো তারার আশা-ভরসা ততই ক্ষীণতর হয়ে আসতে থাকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করে নেবার আশায় এসেছিল, কিন্তু যা শুনলো তাতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া আর উপায় রইলো না।

তারা বসুদেবের উপরে অভিমান করে বসে না থেকে পুত্রকে সাধ্যানুসারে প্রতি-

পালন করতে লাগলো। সাধ্যের মধ্যে বন থেকে কাটকুটো কুড়িয়ে দিতো, ফলমূল আর শাক-সব্জি দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি। তবে সে একটি কাজ করলো, জরাকে ছেলেবেলা থেকেই তীর-ধনুক চালনা করতে উৎসাহিত করলো, ভাবলো আর কিছু না হোক ব্যাধবৃত্তি করে জীবিকার্জন করতে পারবে। ব্যাধের ছেলেদের সঙ্গে মিশে ক্রমে শিকারে তার হাত পাকা হয়ে উঠল।

মাঝে মাঝে পুত্র জিজ্ঞাসা করতো, মা, আমার বাবা কোথায়?

মা হাত দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিত। পুত্র কি বুঝতো জানি না। মা কেন আকাশের দিকে দেখাতো তাও জানি নে। হয়তো আকাশস্পর্শী রাজবাড়ীর অট্টালিকার কথা তার মনে পড়তো।

আজ রাজবাড়ী থেকে ফিরে এসে বুঝলো বসুদেবের আশা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য—তখন সে রীতিমতো জরাকে নিপুণ ব্যাধ করে তোলবার দিকে মন দিল। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে বসুদেবের উক্তি তার মনকে প্রভাবিত করেছিল, জরা হবে নিষাদদের রাজা। তবে সেই রাজগীর দীক্ষাই তাকে দেওয়া যাক না কেন।

বছর পনেরো-ষোল বয়সেই জরা রীতিমতো পাকা তীরন্দাজ হয়ে উঠল, বাঘ ভালুক বরাহ এক তীরের ঘায়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলতো সে। তার বীরত্বের খ্যাতি এমন ছড়িয়ে পড়লো —বনের ব্যাধের ছেলেরা এসে তার নেতৃত্ব মেনে নিল। তারা মাঝে মাঝে ভাবতো হয়তো বসুদেবের কথাই সত্য হতে চলল, কালক্রমে সে ব্যাধদের রাজা হয়ে উঠবে। এই সময় একটি শূদ্রাণী-কন্যার সঙ্গে জরার বিবাহ দিল তারা। বিবাহের কিছুদিন পরে তারার মৃত্যু হল। জরা খুব কাঁদলো, তারপরে মায়ের সৎকার করলো, আর তারপরেই দলবল নিয়ে বের হয়ে পড়লো শিকারে।

(১০)

কি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলে কেন?

জরা নিরুত্তর।

কি হল, কথা বলো না কেন? এত বড় একটা সুসংবাদ শুনিয়ে দিলাম, একেবারে ব্যাধের পুত্র থেকে রাজপুত্র হলে, কোথায় মিষ্টান্ন খাওয়াবে তা নয় যেন শূলদণ্ডের কথা শুনলে। নাও ওঠো—এই বলে ধৌম্য হাত ধরে টানলো জরাকে।

জরা উঠবার কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলো না।

তবে বসে থাকো, আমি চললাম।

এবারে জরা মুখ তুললো, সেই আবছায়া অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না, দেখা গেলে মনে হত এক লক্ষের মধ্যে এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে তার মুখের উপর দিয়ে, পাকা ইমারত ধসে পড়ে গিয়েছে।

কি সংবাদই না শোনালে। আমি শেষে কিনা ভাইকে হত্যা করলাম।

এই কথা শুনে ধৌম্য আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু অবসর পেলো না, জরা বলে চলল, বাসুদেব আমার ভাই, আমি বাসুদেবের ভাই, তাকে কিনা শেষে বধ করলাম! এই বলে কপালে করাঘাত করতে লাগলো।

কেন তাতে আর কি হয়েছে। যদুবংশের দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে থাকতেও অনুতাপ করছ।

কি দৃষ্টান্ত!

কি দৃষ্টান্ত শুধাচ্ছো! ভাই ভাইকে হত্যা করেছে, পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে, জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে হত্যা করেছে, যে যাকে সম্মুখে পেয়েছে হত্যা করেছে। রক্তের স্রোত নীল সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। আরও শুনতে চাও? ঐ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী লোক হানাহানি করে মরলো তারা কি ভাইবন্ধু বিচার করেছে? আর ঐ যে বাসুদেবের হত্যা তোমার প্রাণে এমন বেজেছে সেই বাসুদেবই তো এই হত্যার প্ররোচনাদাতা।

বাসুদেব প্ররোচনাদাতা!

হাঁ গো হাঁ। বাসুদেব বলো বাসুদেব, কৃষ্ণ বলো কৃষ্ণ, ভক্তির মাত্রা আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে ইচ্ছা করলে বলতে পারো শ্রীকৃষ্ণ। সেই বেটাই তো সব নষ্টের গোড়া।

কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে জরা।

অর্জুনের সারথি হয়ে বসুদেবের বেটা যখন রথ স্থাপন করলো কুরুসৈন্যের সম্মুখে, তখন অর্জুন বলে উঠল, এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এদের মারতে হবে? এরা যে সবাই ভাই-বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, শালা-সম্বন্ধী। না বাসুদেব, এ-কাজ আমার দ্বারা হবে না। তখন বাসুদেব কি বলল জানো?

জরা মন্ত্রের মতো শুধায়, কি বলল?

বলল, কর্তব্যের অনুরোধে, ধর্মের অনুরোধে যুদ্ধ করো, মরলে তোমার কোন গ্লানি নেই। এরকম যুদ্ধ করাই ধর্ম, না করাই অধর্ম! বুঝলে?

না, বুঝলাম না। সেটা হল লড়াই, আর এটা চোরের মতো লুকিয়ে মারা, জন্তু-জানোয়ার মনে করে মারা, এ হলো গিয়ে—।

দাঁড়াও, আগে ঐ কথাটুকুর জবাব দিয়ে নিই। অক্ষৌহিণী সৈন্য মুখোমুখি না হলে বুঝি লড়াই হয় না। তবে দ্বৈরথ যুদ্ধটা কি? আর চোরের মতো লুকিয়ে মারা—জয়দ্রথকে কিভাবে মারা হয়েছিল? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণকে কিভাবে মারা হয়েছিল, অশ্বত্থামা যে ঘুমন্ত বালকদের হত্যা করেছিল—এসব তবে কি। ভাই জরা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আদ্যন্ত বিবরণ জানলে কোন হত্যার আর মনে গ্লানি হয় না!

সব তো বুঝলাম কিন্তু মন যে মানে না।

তবে মনটা তোমার হাতছাড়া হয়েছে বুঝতে হবে। এর আগে কি কখনো মানুষ মারোনি?

মেরেছি বইকি!

তবে!

তারা তো ভাই নয়।

আবার ভাই! শুনলে তো ভাইকে মারাই সব মারার সেরা। নিজের ভাইকে না মেরে পরের ভাইকে মারলে বুঝি বীরত্ব হতো! আরে ছোঃ ছোঃ, সে তো ব্যাধ বোম্বাড়ের কাজ।

আমি ব্যাধ ছাড়া আর কি।

এতক্ষণ তবে তোমাকে কি শোনালাম, তুমি ব্যাধ নও, বোম্বাড় নও, তুমি রাজপুত্র, তুমি বসুদেবের পুত্র, বাসুদেবের ভাই! বংশে, রক্তে, জাতিতে তোমার জুড়ি নেই ভূ-ভারতে।

কিন্তু পৃথিবী যে কেঁপে উঠেছিল, চাঁদে যে গ্রহণ লেগেছিল, সমুদ্র যে গর্জে উঠেছিল।

ওসব কিছুই হয়নি, শুধু তোমার মনটায় ভয়ে ছোবল মেরেছিল।

তাই বা হবে কেন?

আর যাতে না হয় তারই ব্যবস্থা করবার জন্যেই তো পাকড়াও করেছি তোমাকে।

কি করবে আমাকে দিয়ে?
অনেক কাজ, মস্ত কাজ।
আমি করবো মস্ত কাজ!

হাঁ তুমি করবে, তুমিই করবে, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সে-কাজ হবে না।

আমি একা?
একা নও, হাজার হাজার লোক আছে।

তবে আবার আমাকে কেন?
তোমাকে এই জন্যে যে তোমার কপালে রাজটীকা আছে, তোমার দেহে রাজরক্ত আছে, তুমি রাজপুত্র। চলো, আর দেরী নয়।

তার আগে একটা কাজ সেরে আসতে হবে।

ষ্টকিস্টস : মেসার্স ডি সিটি স্টোর্স, ২০ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬, ফোন : ২৩-৩৩৯৪ এবং ২৩-৯১১.

আবার কি এমন কাজ পড়লো!

আমার স্ত্রী মরে পড়ে আছে।

কোথায়?

বাসুদেবের পায়ের কাছে।

মারলো কে?

বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে জরা বলল, আমিই মেরেছি।

বাহবা, বাহবা বলে লাফিয়ে উঠল খটাস। বলল, যদুবংশ যা পারেনি, কুরু-পাণ্ডব যা পারেনি—তুমি সেই কাজ করেছ। তোমাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না।

তারপরে কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা নামিয়ে এনে শুধালো, সে বুঝি বাসুদেবকে রক্ষা করতে গিয়েছিল?

না, বাসুদেব আগেই মারা গিয়েছিল। জরতী ধিক্কার দিয়েছিল আমাকে।

ধিক্কার দিয়েছিল তোমাকে। এমন স্ত্রীকে মারাই ধর্ম, না মারাই অধর্ম। তবে সেটি আর এতক্ষণ পড়ে আছে, শিয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

স্ত্রী-হত্যায় যার হাত কাঁপেনি সেই স্ত্রীর দেহটা শিয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গিয়েছে শুনে শিউরে উঠল জরা, বলে ফেলল, না না, তা কি করে হবে!

পত্নীর দেহটার উপরে স্বামীর নিঃসপত্ন অধিকার, সেই দেহে শিয়াল-কুকুরের হস্তক্ষেপ করার মতো পাষণ্ড স্বামীর পক্ষেও দুঃসহ।

খটাস বলল, যাও, শীগগির ফিরে এসো।

জরা রওনা হতে যাবে এমন সময়ে খটাসের মুখের দিকে তাকালো। তখন ভোরের আলো ফুটে ওঠায় সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। জরা যে-মুখ দেখল সে অতি ভয়ঙ্কর। চোখদুটো বিপর্যয় টেরা, বাঁ দিকের চোয়াল বিষম বাঁকা, দাঁত কতক আছে, কতক নাই। সমস্ত মুখমণ্ডল যেন ভূকম্পনে বিপর্যস্ত, কেবল উদ্ধত নাসিকা ও সুদৃঢ় চিবুক এই দুটো আজ যেন আত্মরক্ষা করে সগৌরবে দণ্ডায়মান। গায়ের রঙ মরচে-পড়া লোহার মতো, দেখলে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। আর হাসিটা, জরার বিস্ময় দেখে একবার হেসেছিল লোকটা, অতিশয় মারাত্মক, সেই বিসদৃশ হাসির আভায় সমস্ত মুখখানা অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

জরা তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, জরতীর দেহটা কোথাও নেই। আর বাসুদেবের দেহের শেষ চিহ্ন দগ্ধকাষ্ঠে ও নির্বাপিত অঙ্গারে তরঙ্গিত হচ্ছে সমুদ্রের শাদা ফেনায় ও মন্থর তরঙ্গ-ঘায়ে।

(১১)

বাসুদেবের মৃত্যু-সংবাদ লোকমুখে রাজপুরীতে গিয়ে পৌঁছলে রাজপুরুষ ও অমাত্যগণ এসে উপস্থিত হল। বৃদ্ধ, শিশু ও নারী ছাড়া যদুবংশীয় কেউ আর জীবিত ছিল না। যথাসাধ্য সকলে মিলে অন্ত্যেষ্টি সংকার করলো। বাসুদেবের পত্নীগণের মধ্যে রুক্মিণী ও জাম্ববতী চিতায় আরোহণ করে পতির অনুগমন করলো; সত্যভামা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বনে প্রস্থান করলো। এসব পুরাণ কথা, কাজেই আমাদের প্রয়োজন-বহির্ভূত। অন্ত্যেষ্টি সংকার শেষ হতে রাত শেষ হয়ে এল। সকলে সমুদ্রে স্নান সাঙ্গ করে ফিরে চলে গেল। মৃতপ্রায় জরতীকে কেউ লক্ষ্য করলো না।

ঊষাকালে সমুদ্রের সঞ্জীবনী বায়ুতে ধীরে ধীরে জরতীর চেতনা হতে শুরু করলো, তখনো চেতনার আলো-আঁধারি—পুরো জ্ঞানও নয়, পুরো অজ্ঞানও নয় এইরকম অবস্থা। হঠাৎ সে অনুভব করলো কেউ যেন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন এসেছে বুঝবার ক্ষমতা তার ছিল না, সে অসহায়ভাবে যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে রইলো।

সদ্য প্রাতঃস্নান সাঙ্গ করে একজন দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি জরতীর কাছে এসে দাঁড়ালো। সে এসেছিল বাসুদেবের অন্ত্যেষ্টি সংকারে যোগদানের উদ্দেশ্যে। কাজ শেষ হয়ে গেল, চিতায় এক আঁজলা জল দিয়ে যখন ফিরতে উদ্যত, তখন ঝোপের আড়ালে প্রচ্ছন্নপ্রায় জরতীর দেহ চোখে পড়লো তার। প্রথমে কৌতূহল, দ্বিতীয় মৃতদেহ কার, তারপরে অনুসন্ধিৎসা, এ কি সত্যই মৃত; তারপরে অনুকম্পা—যদি মৃত না হয়, তবে শুশ্রূষা আবশ্যক প্রভৃতি ভাবের প্রেরণায় নত হয়ে মৃত দেহটিকে পর্যবেক্ষণ করলো; বুঝলো না মৃত নয়, তবে মৃতপ্রায় বটে; শীঘ্র প্রতিকার না হলে মরতে বিলম্ব হবে না। তখন সে উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে এসে স্ত্রীলোকটির মাথায় দিল; আর নিকটে অনুসন্ধান করে বনৌষধি তুলে এনে রস নিষ্কাশিত করে তার নাসারন্ধ্রে ও কানের মধ্যে দিল। জরতীর এমনিতেই চৈতন্যোপলব্ধি হচ্ছিল, এখন জল সিঞ্চনে এবং ওষধির সাহায্যে শীঘ্রই পূর্ণ জ্ঞান ঘটলো। সে উঠে বসতে চেষ্টা করলে পুরুষটি বাধা দিয়ে বলল, মা, আরও একটু সুস্থ হও, তারপর উঠো।

জরতী বলল, প্রভু, আপনার কৃপায় এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি—এই বলে তাঁকে প্রণাম করলো।

পুরুষটি বলল, চলো তোমাকে ঘরে রেখে আসি, তুমি একা যেতে পারবে মনে হয় না। জরতী বলল, আমার ঘর নেই।

তখন দুইজনে নিম্নোক্ত কথোপকথন হল।

তোমাকে তো সধবা বলে মনে হচ্ছে, তোমার স্বামী কোথায়?

প্রভু, আমি হতভাগিনী, আমার স্বামী থেকেও নেই।

তোমার ঘরও নেই, স্বামীও নেই, তুমি এখানে কিভাবে এলে, কেন মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলে, সেসব কথা না হয় পরে শুনবো, এখন আমার ঘরে চলো।

আপনি তো প্রভু সন্ন্যাসী।

কি করে বুঝলে? ওঃ বুঝেছি, পরনের গেরুয়া কাপড়খানা দেখে। শাদা ধুতি সমুদ্রের জলে শীঘ্র ময়লা হয়ে যায় বলে স্নানের সময়ে গেরুয়া বসন পরি।

তারপরে একটু হেসে বলল, সংসারের অনেক ময়লা আত্মসাৎ করে গেরুয়ায়। না, মা, আমি গৃহী, আর আমার স্ত্রী আছে। চলো তোমাকে নিয়ে তার কাছে পৌঁছে দি, আমার মতোই নিশ্চিন্তে থাকবে।

কিন্তু প্রভু—

এর মধ্যে কিন্তু নেই মা।

আমি যে নীচ জাত।

আমি তো তা জানতে চাইনে, তাছাড়া বৈতরণী পেরিয়ে গেলে এপারের সমস্ত চিহ্ন ঘুচিয়ে দ্যায়। মৃত্যুর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তুমি তো বৈতরণী পেরিয়ে এসেছ।

এসব কথা পুরোপুরি বুঝবার ক্ষমতা জরতীর ছিল না, মোটের উপরে বুঝলো যে, পুরুষ যিনিই হোন তাঁর দ্বার তার কাছে অবারিত।

এবার জরতী একটু দ্বিধা করে বলল, আপনার পরিচয় তো জানি না, যদি অনুমতি করেন তবে আপনাকে প্রভু বলেই ডাকবো।

তাছাড়া আর কি বলে ডাকবে! সবাই আমাকে প্রভু বলেই ডাকে, আমার পুরো নাম প্রভুদয়াল।

তারপরে হেসে বললেন, দেখো তো, পিতামাতার কি কৃপা, তাঁরা এমন নাম রেখেছিলেন যে কারো উপরে প্রভুত্ব না করেও আমি সকলের প্রভু।

এইভাবে কথোপকথন করতে করতে দুজনে চলেছিল, প্রভুদয়াল আগে, জরতী পিছনে। জরতী দেখছিল কি উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, সমস্তটা ঋজু, কোথাও একটুকু টোল খায়নি। মাথায় প্রলম্বিত ঘন চুলে মাঝে মাঝে শাদা কেশ, বার্ধক্য যেন পরোয়ানাখানা সিংহদ্বারে ঝুলিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখনো ভরসা করে প্রবেশ করতে সাহস পাচ্ছে না।

ঐ যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ মা ওরই কাছে কয়েক ঘর লোকের বসতি, অধিকাংশই জেলে, ঐখানে আমার ঘর।

আমি জানি, ওখানে কখনো-সখনো খরগোশ শিকারে এসেছি।

চমৎকার, শিকার করতেও জানো দেখছি, তবে কি জানো খরগোশ বড় ভীরু প্রাণী, ওদের শিকার করে আনন্দ নেই।

জয়ন্তীর মুখে প্রায় এসে পড়েছিল যে, বাঘ-ভালুক শিকারের অভ্যাসও তার আছে। কিন্তু ভাবলো, না, একথা স্বীকার করলে আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়তে কতক্ষণ। তার বদলে সে বলল, না জেনে প্রভু বলে ডেকেছি, এখন জানবার পরে তো আর নাম ধরে ডাকতে পারি না।

বেশ তো একটা জী যোগ করে প্রভুজী বলো, অনেকেই তাই করে।

ক্রমে তারা পাহাড়গুলি গ্রামটার কাছে এসে পড়লো। এখানে সমুদ্রতীর ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে, এক কোটিতে পাহাড়গুলি, বিপরীত কোটিতে জয়ন্তীর কুটীর। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পাক দিয়ে উঠলো জয়ন্তীর বক্ষ কুহরে।

জয়ন্তীকে নিয়ে কুটীরে উপস্থিত হলে প্রভুদয়ালের পত্নী কিছুমাত্র বিস্মিত হল না, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, এসো, মা। যেন এতক্ষণ তার প্রতীক্ষাতেই ছিল।

জয়ন্তী আশ্চর্য বোধ করলো, ভাবলো ইনি কি জানতেন যে আমি আসবো। না শুধিয়ে পারলো না আপনি কি করে জানলেন যে আমি আসবো।

শোন কথা একবার। এমন তো নিত্য ঘটছে, তাই জানতাম কেউ আসবে।

এমন কি রোজ হচ্ছে?

হচ্ছে বইকি মা! অসহায় স্ত্রীপুরুষ শিশুকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসছেন, কুকুর-বেড়াল বাদ যায় না। শুনবে কি মা, একদিন তো একটা খোঁড়া বাঘ নিয়ে এসে হাজির, আমি তো ভয়ে মরি।

প্রভুদয়াল হেসে বলল, সে-সব তালিকা না হয় পরে শুনিয়ো, এখন জয়ন্তী-মাকে কিছু খেতে দাও, দেখছ না মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

জয়ন্তীকে নিয়ে কুটীরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে সে শুধালো, তা মা আপনাকে কি বলে ডাকবো?

কাশ্যপের মা বলো, সবাই তাই বলে।

জয়ন্তী ভাবলো একবার জিজ্ঞাসা করে কাশ্যপ কোথায়, তারপর ভাবলো, হয়তো মারা গিয়েছে, জিজ্ঞাসা করলে অকারণে ব্যথা দেওয়া হবে।

তার মুখের ভাব দেখে প্রভুদয়াল বলে উঠলো, কাশ্যপ বলে কেউ নেই, আমরা নিঃসন্তান।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়ন্তীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, তবে।

তবে তো জানি না, অনেককাল আগেকার কথা, জেলে পাড়ার সকলে, কেন জানি না, ঐ নামে ডাকতে শুরু করলো, তারপর থেকে ঐটাই বাহাল হয়ে আছে।

অমনি ডাকতে শুরু করলো বুঝি, সেই যাকে বেড়ালের বাচ্চা বলে এনেছিলে, পরে দেখা গেল বাঘের বাচ্চা—তারই তো নাম দেওয়া হয়েছিল কাশ্যপ। তারপর থেকেই আমি কাশ্যপের মা।

সে বাঘটা কোথায় মা!

প্রভুদয়াল বলল, বনের বাঘ বনে গিয়েছে, মাঝ থেকে উনি রয়ে গেলেন কাশ্যপের মা।

কাশ্যপের মায়ের সঙ্গে কুটীরে প্রবেশ করে জয়ন্তী দেখল, হাঁ কুটীর বটে, তার নিজের কুটীরকেও হার মানায়। আহা চালের ছাউনির কি মুন্সীয়ানা। সূর্য দেখা যায় অথচ জল পড়ে না। আর ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তাদের অনুপস্থিতি, গোটা দুই হাঁড়িকুঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। তবে হাঁ, সব অভাব পূর্ণ করে নিয়েছে প্রভুদয়ালের পত্নীর মূর্তিটি। সারসপাখীর বুকের পালকের মত রঙটি, শাদাও নয়, কালোও নয়, স্নিগ্ধ নামে যদি কোন রঙ থাকতো তবে সেই রঙ, দেখলেই মা বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। গলায় তুলসীর মালা, দীর্ঘ বিলম্বিত চুলের গোড়ায় একটি গেরো, একখানি মোটা বসন, হাতে একখানি লোহার কঙ্কণ ছাড়া সর্বদেহ নিরাভরণ।

জয়ন্তীর আহার শেষ হলে দুজনে কুটীর থেকে বের হয়ে এলে প্রভুদয়াল বলল, জয়ন্তী-মা, নিশ্চয় ভাবছে এইতো এদের দশা, তার উপরে আবার আমাকে জোটালো, এখন তিন জনেরই না খেয়ে মরতে হবে।

জয়ন্তী জিভ কেটে বলল, বাবা, এমন কথা আমার মনেও হয়নি, আপনি আমাকে প্রাণ দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, আর আমি এমন কথা ভাববো! বাবা, আমি পাপী, তবে পাষণ্ড নই।

না মা, তুমি ভাববে কেন? তবে অনেকে ভাবে কিনা। এমন কি আমার অনুগত জেলেদের মধ্যেও অনেকে ভাবে। সেদিন জগন্নাথ বুড়ো বলল, বাবা এত কষ্ট করো কেন? তোমাকে তো আমাদের রাজা খুব খাতির করেন, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি চেয়ে নাও না কেন?

জয়ন্তী বলল, জগন্নাথ তো মিথ্যা বলে নি বাবা, কিছু ব্রহ্মোত্তর থাকলে তো এত কষ্ট হতো না।

কষ্টটা কিসের মা, খাওয়ার পরার এই তো! আমাদের দেখেই বুঝতে পারছ, আমরা অনাহারক্লিষ্ট নই, আর অঙ্গেও বসন আছে। তবে আবার কেন? দেখো মা, শুধু দেহ ধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, তা জোটাতে কষ্ট হয় না, তার অতিরিক্ত দাবী করলেই গোলমাল শুরু হয়। সংসারে যত হানাহানি রেষারেষি, যত রক্তগঙ্গা ঐ অতিরিক্তটুকুর দাবী নিয়ে। এই যে এত বড় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা হয়ে গেল, তার মূলে ঐ অতিরিক্তর দাবী।

জয়ন্তী বলল, আপনার কথা শুনে চললে সংসারে তো গরীব থাকে না।

আমি কথা শোনাবার কে, আর আমার কথা শুনেই বা লোকে চলবে কেন? তবে একথা জেনো, কিছু গরীব লোক চিরকাল থাকবে, তবে তাদের সবাই যে ভাঙা কুটীরবাসী তা ভেবো না, সোনার মন্দিরেই গরীব লোকের সংখ্যা বেশি।

সে কি রকম বাবা?

তবে শোন, তারপরে জনান্তিকে বলল, কাশ্যপের মা তোমার তো এসব বক্তৃতা অনেকবার শোনা হয়েছে। এখন গৃহকার্য সম্পন্ন করে নাও।

জয়ন্তী ভাবলো, যা গৃহ তার আবার কাজ।

কাশ্যপের মা বলল, তা সত্যি, ও-সব কথা শুনতে শুনতে আমার কানের পোকা মরে গিয়েছে।

মরে যায়নি, ব্রাহ্মণী, কানের পোকা মাথায় গিয়ে ঢুকেছে।

এই দম্পতির কথা শুনে জয়ন্তীর বুকের ভিতরে পাক দিয়ে উঠল, আহা এমনিভাবেই তো তাদের মধ্যেও হাসিঠাট্টা চলতো, কালকেও বেজিটার চাল-চলন নিয়ে দুজনে অনেক রহস্য চলেছিল। তার পরে হঠাৎ কি হল, সমস্ত উল্টেপাল্টে গেল, কোথায় জয়া, আর কোথায় আজ সে।

হাঁ যা বলছিলাম, আবার আরম্ভ করলো প্রভুদয়াল, আমি মাঝে মাঝে রাজা উগ্রসেনকে দর্শন করতে যাই, রাজা আমাকে খুব আদর করেন। বলেন, ঠাকুর, তুমি এলে আনন্দ পাই, কারণ তুমি কখনো কিছু চাও না। অন্য সকলে আসে নানারকম দাবী নিয়ে, তাদের বড় ভয় করি।

আমি বললাম, মহারাজ, আপনার আছে, আপনি দান করবেন বইকি, আপনার কি ভয় করা চলে।

তিনি বললেন, ঠাকুর, দান তো যথাসাধ্য করি, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারি না। এত বায়বাহুল্য হয়ে গিয়েছে যে, নিত্য অভাব, নিত্য টানাটানি। তাই যে লোক কিছু চায় না, তাকে দেখলে আপনজন বলে মনে হয়।

ঐ পর্যন্ত বলে একটু থেমে বলল, তবেই তো দেখলে মা, ঐ সোনার সিংহাসনে বসে রাজা উগ্রসেন গরীব, আর পাহাড় কুঁড়ে থেকেও আমার অভাব নেই। অভাবের অভাবই ধন।

নাও, অনেক হয়েছে, এখন খেতে হবে না, ওঠো।

প্রভুদয়াল আহারের উদ্দেশ্যে গাত্রোত্থান করলো।

রাত আর কাটতে চায় না জরতীর। কুটীরের মধ্যে তিনজনে পাশাপাশি ভূমি-শয্যায়। ওরা দুজনে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুম সুখের পায়রা, সুখীর কাছে আসে, দুঃখীকে তার বড় ভয়।

কি হল জরার, কোথায় গেল সে। এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল, তারও তো জীবিত থাকবার কথা নয়। জরা গলা টিপে ধরেছিল, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তবে আবার জ্ঞান ফিরে আসতে গেল কেন। সে কি কেবল জীবনব্যাপী মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যে। কুটীরখানাও নাই, দূর থেকে তার আগুনের আভা দেখতে পেয়েছিল। অজ্ঞাতসারে একবার হাতটা যায় গলায়, সেখানে এখনো লেগে আছে জরার আঙুলের বজ্রস্পর্শের দাগ। আজ সারাদিন আঁচল দিয়ে সেটা ঢাকবার চেষ্টা করেছে। প্রভুদয়ালের চোখে পড়েনি, কিন্তু এড়াতে পারেনি কাশ্যপের মায়ের চোখ। অবশ্য মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি সে, তবে তার চোখ বারে বারে জিজ্ঞাসা করেছে—ওটা কিসের দাগ? সে-ও চোখে চোখে উত্তর দিয়েছে না, ওটা কিছু নয়। কিন্তু স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে। সেই উত্তরে যে সমস্ত ইতিহাস বেরিয়ে পড়বে। আজ সে দিনের মধ্যে অনেকবার ভেবেছে, সব খুলে বলবে প্রভুজীর কাছে, কিন্তু মন সরেনি। কোন্ স্ত্রী প্রকাশ করতে চায় স্বামীর দুর্গতির ইতিহাস। তাছাড়া তাতে বিপদ আছে স্বামীর। বাসুদেবকে হত্যা, বাসুদেব যে স্বয়ং ভগবান।

একবার সুযোগ বুঝে কথাটা পেড়েছিল প্রভুজীর কাছে, বলেছিল বাবা, ভগবান বাসুদেব অবশেষে দেহত্যাগ করলেন।

প্রভুজী বলেছিল, মা, ভগবানের কি জন্ম মৃত্যু আছে?

তবে কেন তিনি গেলেন?

দেখো মা যাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটি নড়ে না, তিনি কেন গেলেন, কেমন করে বুঝবো। একমাত্র তিনিই জানেন।

টেলিগ্রাম : জুয়েলারী
ফোন : ২৩-৬৬১১
জড়োয়া গহনা • ঘড়ি
•
গ্যারান্টিযুক্ত ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স অ্যাণ্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা-১

কিন্তু বাবা, যে লোকটা মারলো তার কি হবে?

রাজার শাসনে কি হবে রাজা জানে। তবে একথা নিশ্চয় ভগবানের বিধান অনুসারে দণ্ডই হবে না।

কেন?

কেন কি, লোকটা তাঁরই ইচ্ছায় চালিত হয়ে মেরেছে।

বাবা, বাসুদেব এত বড় বীর, শেষে কিনা তিনি সামান্য একটা লোকের হাতে মারা পড়লেন।

তাইতো স্বাভাবিক মা। ভারতবর্ষে এত বড় বীর কে আছে যে তাঁর সমকক্ষ। ওইতো বললাম, সামান্য কুশাঙ্কুরের আঘাতটা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট, তিনি দেহত্যাগ করবেনই, একটা উপলক্ষের মাত্র প্রয়োজন, ব্যাধের ঐ তীরটা সেই উপলক্ষটা জুগিয়েছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীর কি অস্ত্রের অভাব ছিল, তবে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রথচক্র-ধারণ করতে গেলেন কেন?

কেন বাবা!

সব অস্ত্রই তাঁর কাছে সমান, সব মানুষই তাঁর কাছে সমান, সমস্ত চরাচর তাঁর ইচ্ছার অঙ্গ।

তর্কে পেরে ওঠে না জরতী, চুপ করে থাকে।

কি মা চুপ করে রইলে যে। মনটা বিষন্ন কেন, শুধায় প্রভুদয়াল।

আর তো চোখে দেখতে পাবো না বাসুদেবকে, উত্তর দেয় জরতী।

এই কথা, চোখে দেখতে চাও? তাই দেখিয়ে দেবো।

একথাটা আরও দুর্বোধ্য মনে হয় জরতীর কাছে, প্রশ্নাত্মক চোখে তাকায় সে প্রভুজীর দিকে।

এই সব প্রশ্নোত্তর মালা জপ করতে থাকে বিনিদ্র জরতী, অবশেষে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙতে দেরী হয়েছিল জরতীর, উঠে দেখে স্বামী-স্ত্রী কেউ শয্যায় নেই। সে বাইরে এসে প্রভুদয়ালকে শুধায়, মা কোথায় গেলেন?

ঐ দেখো গিয়ে সমুদ্রের ধারে।

সে তাড়াতাড়ি চলল সমুদ্রের দিকে। বেশি যেতে হল না, কাছেই দেখতে পেলো কাশ্যপের মা একটা চুবড়ি নিয়ে কি যেন সংগ্রহ করছে।

ও কি করছ মা?

এসো না বাছা, আমাকে একটু সাহায্য করো।

সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপটা রাশিরাশি শামুক, ঝিনুক, কড়ি এনে ফেলছে বালুর উপরে, বেছে বেছে তারই কতক তুলছে চুবড়িতে কাশ্যপের মা। সেও কুড়োতে লেগে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝুড়ি উঠল ভরে।

এগুলো কি হবে মা?

এখনই দেখতে পাবে বাছা।

এমন সময় তিনজন নুলিয়া জেলে এসে হাজির হল। যে কাঠের টুকরোতে করে তারা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, সেই কাঠের মতো সরল দীর্ঘ, কালো তাদের গায়ের রঙ, পরনে এক-টুকরো কাপড়, মাথায় তেকোণা পাতার টুপি। তাদের দেখে কাশ্যপের মা বলল, আজ দেরি কেন বাবা জগন্নাথ।

মা আজ অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিলাম।

অনেক মাছ বুঝি পেলে।

তা কিছু পেয়েছি মা, তুমিও তো অনেক পেয়েছ, চুপড়ি যে ভরে গিয়েছে। তাহলে নিয়ে যাই।

হাঁ, নিয়ে যাও।

কী দিয়ে যাবো তোমাকে?

আজ কিছু আটা, আর চাল দিয়ে যেয়ো। আর দেখো, একখানা গড়ে শাড়িও চাই। এতে যদি না কুলোয় তবে না হয় শাড়িখানা থাক।

এতেই কুলিয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

তারপর একটু থেমে শুধালো, বক্তা সেই জগন্নাথ, এই মেয়েটি কে মা?

ওটি আমার মেয়ে।

তার কথা শুনে তিনজনে হেসে উঠল, মায়ের বাড়ীতে যে আসে সেই হয় মেয়ে, নয় ছেলে, কেবল আমরাই বাপ।

তোমরা বাপ কেন বাবা। তোমরাই খাওয়াচ্ছ পরাচ্ছ।

তোমাকে খাওয়াবো পরাবো এমন আমাদের সাধ্য কি? যে আমাদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে তোমাকেও ভরণপোষণ করছে সে। এই আমাদের বাবা, এই আমাদের সমুদ্দুর।

সে কথা সত্যি বাবা! ওরই নুন খেয়ে তো সবাই মানুষ।

নুলিয়ারা চুবড়ি নিয়ে চলে গেলে কাশ্যপের মা বলল, চলো মা এবার বাড়ীতে যাই।

সমস্ত ব্যাপারটা অবোধ্য লাগল জরতীর কাছে। সেটা বুঝতে পেরে কাশ্যপের মা বলল, বুঝলে না এই হচ্ছে আমাদের জীবিকার উপায়। আমি চুবড়ি ভরে শামুক-ঝিনুক কুড়োই, ওরা এসে দোকানে নিয়ে গিয়ে বিনিময়ে আমাদের দরকারী জিনিস এনে দেয়।

তারপরে মন্তব্য করলো, আমাদের দরকারই বা কতটুকু।

জরতী বলল, আমি এসে তো দরকার বাড়িয়ে দিলাম।

সেইজন্যেই তো দুমুঠো বেশি কুড়োলাম। কারো ক্ষতি হল না, না তোমার, না আমার, না সমুদ্রের, ওর নাম তো আবার রত্নাকর কিনা।

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানের কথা

মেঘ, জল ও বরফ কাছে পাঠানো আবহ উপগ্রহ থেকে ভূপৃষ্ঠের আলোকচিত্র। ছবি পাঠ নেবার সময় উপগ্রহটি প্রতিবার একটু করে পশ্চিমে সরে এসেছে আর ভূপৃষ্ঠের আলোকচিত্র উঠেছে ফালিতে ফালিতে বিভক্ত হয়ে। এই ফালিগুলো জোড়া লাগিয়ে গোটা ভূপৃষ্ঠের ছবি পাওয়া যায়। আলোকচিত্রের মধ্যস্থলে দেখা যাচ্ছে আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপ, বাঁদিকে দক্ষিণ আমেরিকা, ডানদিকে ভারত।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

দুয়ে দুয়ে চার, একথা যতোখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা চলে, ততোখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে কি আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলছেন, হ্যাঁ সম্ভব। সেজন্যে চাই সারা পৃথিবী জুড়ে তথ্য সংগ্রহের অতি বিপুল একটি আয়োজন এবং সংগৃহীত তথ্যকে দ্রুত বিশ্লেষণের উপযোগী অতি দক্ষ একটি ব্যবস্থা। সংগ্রহের কাজটি চলবে আবহ উপগ্রহের সাহায্যে, বিশ্লেষণের কাজটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় কোনোটিই অসাধ্য নয়। এবং উভয় ক্ষেত্রে সার্থক প্রয়াসেরও বহু নজির রয়েছে। অতএব বিশ্বাস করা চলে, ভবিষ্যতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং আগামী কয়েক দিনের বা আগামী কয়েক সপ্তাহের আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির ছবিটি গাণিতিক ছকের মতোই সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা যাবে। সকলেই জানেন, কিছুকাল আগে প্রচণ্ড বিধ্বংসী এক ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ব বাংলায় দশ লক্ষ জীবনহানি ঘটেছিল। এমন একটি দুর্বিপাক যে ঘটতে চলেছে, তার খবর আগে থেকে পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই অনেকখানি প্রস্তুত হওয়া যেত। আর শুধু তো দুর্বিপাক থেকে বাঁচা নয়, আবহাওয়ার পূর্বাভাস নির্ভুলভাবে জানতে পারাটা অন্য নানা কারণেও জরুরী, কৃষির জন্যে তো বটেই।

বিশ্ব আবহ সংস্থা (ডবলু-এম-ও) ১৯৬৭ সালের পঞ্চম কংগ্রেসে বিশ্ব-আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ (ডবলু-ডবলু-ডবলু) নামে চারবছরের একটি পরিকল্পনা নিয়েছিল। এ-বছরে এই পরিকল্পনাটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ১৯৬৭ সালে গৃহীত এই পরিকল্পনাতেও পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে সাবেকী ধরনের পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ওপরে। ইতিমধ্যে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণের জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের কার্যকারিতা ও সফলতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া আবহাওয়ার সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের জন্যে যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার তা সম্পন্ন করার জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহই যে সর্বোত্তম সহায়, তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। নিঃসন্দেহেই বলা চলে অতঃপর বিশ্ব-আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের কর্মসূচী পুরোপুরিভাবেই কৃত্রিম উপগ্রহের ওপরে নির্ভরশীল হবে, যেমন তথ্য সংগ্রহের জন্যে তেমনি সংগৃহীত তথ্য দ্রুত নিয়মের মধ্যে এনে বিশ্লেষণ-কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে দেওয়া চলে, সেজন্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যেও।

মূল প্রয়োজন হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে একটি পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যেসব বিজ্ঞানী এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের মতে এজন্যে চাই ভূপৃষ্ঠে ৪০০ কিলোমিটার তফাতে তফাতে আবহ পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র এবং বায়ুমণ্ডলের অন্তত ২০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত তথ্য-সংগ্রহ। এমন বিরাট একটি আয়োজন গড়ে তোলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। ডবলু-ডবলু-ডবলু পরিকল্পনায় চার বছরে ৩৬০০টি পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে ৮০০টি কেন্দ্রে থাকার কথা বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তর থেকে তথ্য-সংগ্রহের আয়োজন। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সমুদ্রপথে চলাচলকারী হাজার পাঁচেক বাণিজ্য জাহাজ, যেখান থেকে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ চলতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বাণিজ্য জাহাজের চলাচল সমুদ্রের ধরাবাঁধা এলাকায়, ভূপৃষ্ঠের অতি সামান্য এলাকাই তাতে ধরা পড়ে। উপরন্তু, দু-একখানি বাদ দিলে, কোনো জাহাজেরই পর্যবেক্ষণের এলাকা বন্দর বা উপকূলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিকল্পনায় অবশ্য আবহ জাহাজের কথাও বলা হয়েছে। পূর্ণ কার্যক্ষমতায় সজ্জিত এই জাহাজের সংখ্যা মোটে ৯টি।

অতএব, সারা পৃথিবী জুড়ে পর্যবেক্ষণ চালাতে হলে এই আয়োজন প্রায় কিছুই নয়। একে আরো অনেক অনেক বাড়িয়ে তুলতে হবে। অন্য অসুবিধের কথা ছেড়ে দিলেও খরচের ব্যাপারটা তাতে এমন বিরাট হয়ে দাঁড়ায় যে বাস্তব ক্ষেত্রে এমনি একটি আয়োজন কোনোকালে গড়ে তোলা যে যাবে তার সম্ভাবনা কম।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহের জন্যে সারা পৃথিবী জুড়ে পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব অবাস্তব। অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়। এই অন্য ব্যবস্থাটিই সম্ভব হতে পারে আবহ উপগ্রহের সাহায্যে।

মনে করা যাক আবহাওয়ার খবরাখবর নেবার উপযোগী যন্ত্রপাতি সমেত একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর আকাশে তোলা হল এবং বিশেষ একটি কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে পাক খাইয়ে দেওয়া হল। এই উপগ্রহ যখন পাক খাচ্ছে, পৃথিবীও তখন নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। ফলে উপগ্রহের পাক-খাওয়াটি কখনোই পৃথিবীর একই এলাকার ওপর দিয়ে পর-পর ঘটবার ঘটে না। প্রতিটি পাকে একটু একটু করে পশ্চিমের দিকে সরে যায় (কেননা অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরা পশ্চিম থেকে পুবে) এবং এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠের গোটা এলাকার আকাশ দিয়ে পাক খেয়ে চলে। অর্থাৎ এই একটি উপগ্রহ থেকেই ভূপৃষ্ঠের গোটা এলাকাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। এমন ধরনের উপগ্রহের কক্ষ হবে থাকে পৃথিবীর এক মেরু থেকে অন্য মেরুর দিকে। আবার উপগ্রহের কক্ষ যদি হয় পৃথিবীর পেট বরাবর বা বিষুবরেখা বরাবর তাহলে পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে ঘুরলেই ঘূর্ণক উপগ্রহের কক্ষটি কিন্তু ভূপৃষ্ঠের একই এলাকার আকাশে থেকে যায়, কেননা পৃথিবীর ঘোরা ও উপগ্রহের পাক খাওয়া এক্ষেত্রে একই দিকে। আবার এমনি একটি বিষুব-বরাবর উপগ্রহ যতক্ষণে পৃথিবীকে একবার পাক খাচ্ছে ঠিক ততক্ষণে পৃথিবীও যদি অক্ষের চারদিকে একবারটি ঘুরে যায়, তাহলে ভূপৃষ্ঠ থেকে তাকিয়ে মনে হবে উপগ্রহটি যেন আকাশের এক বিন্দুতে স্থির হয়ে অবস্থান করছে। পৃথিবী অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় ২৪ ঘন্টা, কাজেই এ-ধরনের ভূ-স্থির উপগ্রহের এক-একটি পাক খাওয়ার সময়ও হওয়া চাই ২৪ ঘন্টা।

বিষুব-বরাবর কক্ষের উচ্চতা যদি হয় ৩৫,৮০০ কিলোমিটার তাহলে এই কক্ষের উপগ্রহ পৃথিবীকে এক-একটি পাক দিতে সময় নেবে ২৪ ঘন্টা। অর্থাৎ, উপগ্রহটি হবে উঠবে ভূ-স্থির।

অন্যদিকে মেরু-বরাবর একটি কক্ষের উচ্চতা যদি হয় ১০০০ থেকে ১৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে তাহলে উপগ্রহটি প্রতি ১১৫ মিনিটে একবার করে পৃথিবীকে পাক খেয়ে চলবে, প্রতিটি পাকে খানিকটা পশ্চিমে সরে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের নতুন নতুন এলাকার আকাশ দিয়ে।

আবহাওয়ার খবরাখবর নেবার জন্যে দু-ধারের উপগ্রহেরই সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

খবরাখবর নেবার কাজটি সম্পন্ন হতে পারে দু-ধরনের পদ্ধতিতে। একটি পদ্ধতিতে একটি উপগ্রহ থেকে দিন ও রাত্রির সব সময়ে সরাসরি নিচের এলাকার আলোকচিত্র ও বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার মাপ নেওয়া হয়। যদি বা উপগ্রহটি এক্ষেত্রে হয়ে ওঠে একটি পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র। অপর পদ্ধতিতে উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের। এক্ষেত্রে উপগ্রহটি একটি তথ্যসংগ্রহ কেন্দ্র। উভয় ধরনের উপগ্রহে উভয় পদ্ধতির সমাবেশ ঘটতে পারে।

মার্কিন ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এমন কতকগুলো আবহ উপগ্রহ আকাশে তুলেছেন যা থেকে দিন-রাত্রির সব সময়ে ভূপৃষ্ঠের ও মেঘমণ্ডলের আলোকচিত্র তোলা হচ্ছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা তুলেছেন টাইরস এবং নিম্বাস—১ ও নিম্বাস-২। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তুলেছেন মীটিয়র ও কসমস পর্যায়ের অনেকগুলো উপগ্রহ। গোড়ার দিকের টাইরস ও নিম্বাস উপগ্রহগুলোতে আলোকচিত্র তোলার পদ্ধতি ছিল সাবেকী ধরনের। রাত্রিবেলা তোলা হত অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে। কিন্তু ১৯৭২ সালে টাইরস ও নিম্বাস পর্যায়ের যে-সব আবহ উপগ্রহ আকাশে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে আলোকচিত্র তোলার পদ্ধতি হবে উন্নততর। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মীটিয়র আবহ উপগ্রহ আকাশে তুলেছেন জোড় বেঁধে। যেমন মীটিয়র-১ ও মীটিয়র—২। এই দুটি উপগ্রহের কক্ষ এমনভাবে সম্পর্কিত যাতে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো একটি বিশেষ এলাকার ওপর দিয়ে একটি উপগ্রহ পার হয়ে যাবার ছ-ঘন্টা পরে অপরটি এসে হাজির হয়।

১৯৬৬ সালের পরে মার্কিন বিজ্ঞানীরা দুটি ভূ-স্থির উপগ্রহও আকাশে তুলেছেন : এ-টি-এস ১ ও এ-টি-এস-৩। দুটি উপগ্রহেই আছে তথ্য-সংগ্রহের ও যোগাযোগ স্থাপনের বিরাট আয়োজন। এ-টি-এস-১ ভূপৃষ্ঠ ও মেঘমণ্ডলের আলোকচিত্র নিয়ে থাকে কালো-সাদায়, এ-টি-এস-তিন যথাযথ রঙে। আলোকচিত্রের পরিধি ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ এলাকা জুড়ে।

কৃত্রিম উপগ্রহে বিশেষ ধরনের যন্ত্র স্থাপন করে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় তাপমাত্রার মাপ নেওয়ার ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন। মার্কিন বিজ্ঞানীদের আবহ উপগ্রহ নিম্বাস-৩ বর্তমানে সাফল্যের সঙ্গে একাজটি করে চলেছে। আগামী বছরে একই উদ্দেশ্যে আরো একটি উপগ্রহ তোলা হবে।

পর্যবেক্ষণের পরেই আসে যোগাযোগ স্থাপনের সমস্যা। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো অজস্র পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার বিস্তৃত পরিকল্পনাও বিজ্ঞানীরা করেছেন। মার্কিন বিজ্ঞানীদের ইন্‌টেলস্টাট উপগ্রহ ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের মল্‌নিয়া উপগ্রহ এক্ষেত্রে দুটি সফল দৃষ্টান্ত।

অতএব এমন বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে যে দূরে দূরে চার বলার মতো নিশ্চিত ভাবেই আগামী দিনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে।

—[illegible]

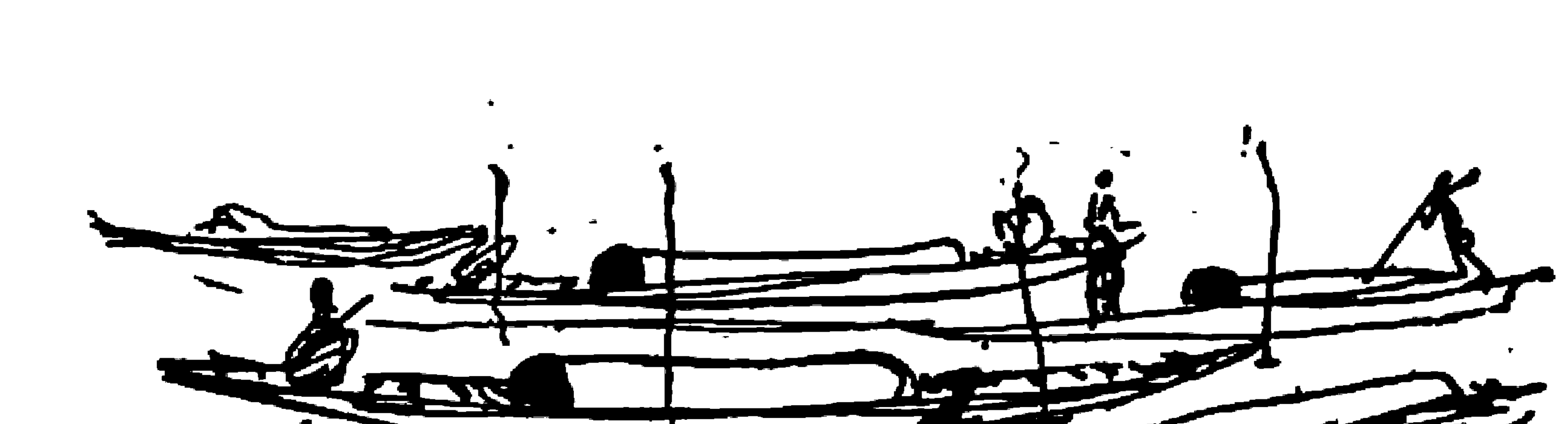

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মূলসূত্র

চতুর্থ অধ্যায়

সোভিয়েট বিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক সঙ্কট

ফ্যাসিস্ট তোষণনীতির পরিণাম

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েট বিপ্লব অনুষ্ঠানের পর হইতে গোটা পৃথিবী ধীরে ধীরে দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া যাইতেছিল। একদিকে ছিল কমিউনিস্ট রুশিয়া ও পৃথিবীর পরাধীন এবং দরিদ্র জনগণ এবং অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদী বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি। অবশ্য তখনও এই বিভেদ আজিকার মত এতটা স্পষ্ট ছিল না এবং বাহিরে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী আন্দোলিত হইতেছিল ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া—যে শক্তিপুঞ্জের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন হিটলার। হিটলার ও মুসোলিনী দুঃসময়ের ত্রাতারূপে ধনীদের নিকট প্রতিভাত হইলেন, তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিল দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, যে ব্যাধির হাতুড়ে দাওয়াইরূপে দেখা দিল ফ্যাসিজম।—যাহা ধনতন্ত্রবাদেরই চরম বিকৃতরূপ এবং যে মতবাদ ছিল জনগণের মুক্তি ও সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদের ঘোরতর বিরোধী। অথচ ইহা ধনতন্ত্রবাদী বৃটেন ও আমেরিকারও বিরোধী, যেহেতু ফ্যাসিজম এই 'তথাকথিত' ও 'দুর্বল' পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রকেও স্বীকার করিল না, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনায়ককে করিল সর্বময় প্রভু, আর জাতীয়তাবাদকে টানিয়া আনিল চরম সাম্রাজ্যবাদ সামরিক মতবাদের মধ্যে। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদকে স্বীকার করিয়া তাহা আনা হইল রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে, আবার শ্রেণীসংগ্রামকে দমন করিয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট বা মালিকদের 'লক-আউট'ও বন্ধ করিয়া দিল। সোজা কথায় মূলধনওয়ালা এবং পুঁজিপতিদের এক সব্যবস্থ নির্মম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল, যার নায়কত্ব পাইলেন একজন ডিকটেটার এবং যে ডিকটেটারের অধীন একটা রাষ্ট্র হইল সর্বপ্রকারে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এজেন্ট। সুতরাং সাধারণ ধনতন্ত্রের চেয়েও এই ফ্যাসিস্ট মতবাদ অধিকতর নগ্ন রুদ্র এবং জাতিবিদ্বেষ ও গণ-বিদ্বেষের বাহন ছিল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ক্যাপিটালিজম শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার বেপরোয়া তাগিদে ফ্যাসিজমকে আশ্রয় করিতেই বাধ্য।

১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মান রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে পাইলেন এবং তাঁর আত্মজীবনীতে নাৎসীবাদী রাষ্ট্রের যে সমস্ত নীতি ও লক্ষ্য ঘোষণা করিলেন, সেগুলি পূরণের জন্য এক নির্ধারিত কর্মপন্থা অনুসরণ করিলেন। সেগুলির প্রথমেই যুদ্ধকে মানবজাতির সবচেয়ে বড় আদর্শ এবং শান্তিকে ধ্বংসের পথ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। যথা,

(১) চিরন্তন সংগ্রামে মানুষ হইয়াছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর চিরন্তন শান্তিতে মানুষ হইবে ধ্বংস।

(২) যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য লইয়া কোন মৈত্রী অনুষ্ঠিত না হয়, তবে, উহা নিতান্ত বাজে এবং অর্থহীন।

(৩) ইউরোপে কখনও দুইটি রাষ্ট্রশক্তিকে মাথা তুলিতে দিও না। জার্মানীর পার্শ্বে ইতিমধ্যেই এমন কোন রাষ্ট্রশক্তি থাকিলে, অথবা ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকিলে উহাকে ধ্বংস করাই হইবে মহত্তম কর্তব্য।

(৪) কিম্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ বা ঈশ্বরের নিকট আবেদন করিয়াও জার্মানীর হৃতরাজ্যগুলি ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। একমাত্র সশস্ত্র বলপ্রয়োগ ছাড়া। তীব্র প্রতিবাদের দ্বারাও নহে, একমাত্র তরবারীর শক্তিতেই এই সমস্ত দেশের পুনরুদ্ধার সম্ভব। সুতরাং পররাষ্ট্রীয় নীতিতে এই তরবারীর সহযোগিতা খুঁজিতে হইবে।

(৫) পররাষ্ট্রীয় নীতির মূল লক্ষ্য হইল জার্মানীর সমস্ত ভূমি ও দেশগুলি পুনরায় ফেরৎ পাওয়া।

(৬) কেবলমাত্র ১৯১৪ সালের জার্মান রাষ্ট্র সীমানার উদ্ধারই জার্মানীর দাবী নহে। ভূগোল, রণনীতি, নিরাপত্তা বা জার্মান জনগণের সংখ্যা, কোন দিক দিয়া সেই সীমানা ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসম্মত ছিল না।

(৭) পূর্ব ইউরোপ ও বিশেষভাবে সোভিয়েট রাশিয়া হইতে নূতন দেশ কাড়িয়া লইয়া জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে হইবে।

(৮) বর্তমানে বৃটেন ও ইতালীকে হাতে রাখিয়া ফ্রান্সকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহা দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসী 'আঁতাত' বা মৈত্রী ভাঙ্গিয়া যাইবে। ফলে, জার্মানীর গতি স্বচ্ছন্দ, পার্শ্বদেশ সুরক্ষিত (সামরিক দিক হইতে) এবং কাঁচামাল সরবরাহের পথ সুগম হইবে।

(৯) যে রাষ্ট্র জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশের উপাদানগুলিকে এভাবে পরিপুষ্ট করে, সেই রাষ্ট্র একদা পৃথিবীর প্রভু হইতে পারিবে।

নূতন জার্মান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কের উদ্দেশ্য ও নীতির ইহাই নিখুঁত, স্পষ্ট এবং নগ্নচিত্র। এই চিত্রকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিবার জন্য তিনটি মূল পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হইল। যথা—

(১) ফ্রান্সকে কাবু করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সমর্থনের সুযোগ লইয়া ইউরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে।

(২) জার্মানীর সীমান্তবর্তী সমস্ত রাজ্যের অভ্যন্তরে নাৎসী আন্দোলন সংগঠন করিতে হইবে এবং বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে হত্যা ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।[১]

(৩) যথাযোগ্য অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক অবস্থা অনুকূল হইলেই যুদ্ধায়োজন করিতে হইবে। কিন্তু ইহা সার্থক করিতে হইলে আগে ইউরোপের 'সমষ্টিগত' নিরাপত্তার নীতি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

হিটলারের নেতৃত্বে নূতন নাৎসী জার্মান রাষ্ট্র যে নীতি, লক্ষ্য এবং পদ্ধতির কথা প্রচার করিল, তাহা এত নির্লজ্জ,

---

১ এই সন্ত্রাসবাদ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল। যথা, অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ডলফাস, পরবর্তীকালে ডাঃ সুসনিগ, যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজান্ডার রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডুকা (রুমানিয়ার পরেও হত্যাকাণ্ড হইয়াছে) এবং ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী বার্থো বার্লিনের সহিত চক্রান্তকারী বিভিন্ন দেশের ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। তদুপরি অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং পোল্যান্ডে বহু আভ্যন্তরীণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল নাৎসী চরদের দ্বারা। —লেখক

দূর এবং স্পষ্ট যে, নিতান্ত নির্বোধকেও সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিত ছিল না। ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ, নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার, পরের রাজ্য আক্রমণ, সাম্রাজ্য বিস্তার, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ভেদ-সৃষ্টি এবং হিংসা ও সশস্ত্র যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি কোন 'সাধু মতলবই' হিটলার গোপন করেন নাই। সুতরাং আজিকার তরুণ পাঠকের দল বিস্মিত হইয়া ভাবিতে পারেন যে, নাৎসী জার্মানীর এই সমস্ত ভয়াবহ অভিসন্ধির কথা জানিয়া শুনিয়াও বৃটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য শক্তিবর্গ হিটলারকে বাধা দিলেন না কেন এবং কেনই বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইতে দিলেন? ইহার প্রধান কারণ ইউরোপে নূতন প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক শক্তির নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ।

রাশিয়ার সাম্যবাদ যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, এজন্য গোড়া হইতেই শক্তিবর্গ চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের অত্যন্ত দুর্দিন ও সঙ্কট চলিতেছিল। সুতরাং যুদ্ধের মধ্যেই (১৯১৭, নভেম্বর) রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় এবং পরে রাশিয়া জার্মানীর সহিত সন্ধি করায় রাশিয়া কেবল 'দলত্যাগকারী' বলিয়াই প্রতিভাত হইল না, এই 'রক্তপিপাসু' সোভিয়েটরা মিত্রপক্ষের নিকট বিশ্বাসঘাতকের মত ভয়াবহ বলিয়াও বিবেচিত হইলেন। সুতরাং বৃটিশ, ফরাসী, আমেরিকান ও জাপ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই সোভিয়েট রাশিয়াকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। লয়েড জর্জ স্বীকার করিয়াছেন যে, একমাত্র বৃটিশ গভর্নমেন্টই তখন ১০ কোটি পাউণ্ড খরচ করিয়াছিলেন সোভিয়েট শাসন অবসানের জন্য। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব হইল না, তখন রাশিয়াকে 'একঘরে' করিয়া রাখা হইল দীর্ঘকাল ভদ্র রাষ্ট্রসমাজের বাহিরে। কিন্তু রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত জার্মানী, হাঙ্গেরী ও ইতালীতে শ্রমিক সাধারণ ও জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চার করিতেছিল। ইতালী পড়িল মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরির পাল্লায়। হাঙ্গেরী ও অস্ট্রিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফৎ (প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আসল কর্তাই ছিলেন বৃটেন ও ফ্রান্স) কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন প্রচুর ঋণদানের দ্বারা। বাকি রহিল জার্মানী—এখানকার শ্রমিক সাধারণ ও কমিউনিস্ট পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে বৃটিশ, ফরাসী ও জার্মান ধনিকদের চক্রান্তের ফলে ১৯৩০-৩৩ সালের চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গঠনের চেষ্টা ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সুযোগে হিটলারের নাৎসী দল যেমন জার্মান রাষ্ট্র দখল করিয়া লইল, তেমনই পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা জার্মানীকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিল।

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লয়েড জর্জ এক বক্তৃতায় স্পষ্টই বলিলেন যে, যদি শক্তিবর্গ জার্মানীতে নাৎসীদের পতন ঘটায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রক্ষণশীল, সমাজতান্ত্রিক কিংবা উদারনৈতিক কোন শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে না।—হইবে চরম সাম্যবাদ বা 'একস্ট্রিম কম্যুনিজম'-এর প্রতিষ্ঠা। কমিউনিস্ট রাশিয়ার চেয়ে কমিউনিস্ট জার্মানী অনেক বেশী বিপজ্জনক হইবে। সুতরাং বৃটিশ গভর্নমেন্টের উচিত সতর্কতার সঙ্গে চলা। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে লয়েড জর্জ কমন্সসভায় বক্তৃতায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, 'ইউরোপে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বৃটিশ রক্ষণশীলদের একমাত্র বড় আশ্রয় জার্মানী এবং দুই এক বৎসরের মধ্যেই এজন্য জার্মানীর দিকে আমাদের তাকাইতে হইবে। জার্মানী ইউরোপের ঠিক মধ্যস্থলে। সুতরাং জার্মানীর আত্মরক্ষার প্রাচীর যদি ভাঙ্গিয়া যায়, এবং কমিউনিস্টগণ তাহাকে পাইয়া বসে, তবে গোটা ইউরোপ সাম্যবাদী হইয়া পড়িবে। সুতরাং জার্মানীকে নিন্দা না করিয়া বরং বন্ধুর মত তাহাকে সাদর আহ্বান জানানো উচিত।

হিটলারী জার্মানীকে এভাবে বন্ধুর মতই বৃটেনের রক্ষণশীল এবং ধনতন্ত্রবাদী সমাজ গ্রহণ করিলেন। এমন কি তাঁহারা অকস্মাৎ ভার্সাই সন্ধির 'অবিচার' সম্পর্কে পর্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং জার্মানীকে আর্থিক সাহায্য ও কূটনৈতিক সমর্থন দিতে লাগিলেন। লণ্ডন সহরের মূলধনওয়ালাগণ হিটলারের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড' জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার জন্য অর্থ যোগাইতে লাগিলেন এবং ভিকার্স-আর্মস্ট্রং কোম্পানী (বৃটিশ সমরাস্ত্র নির্মাণের কারখানা) জার্মানীকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দিলেন।

জার্মানীকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি দ্বিধার তরবারির মত ব্যবহৃত হইতে লাগিল। একদিকে ফ্রান্সকে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তি হিসাবে খুব বাড়িতে না দেওয়া ও জার্মানীকে লোকার্ণো চুক্তির মত প্রকাশ্য বন্ধুতা মারফৎ পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দলে টানিয়া আনা এবং অন্য দিকে তাহাকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধতার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া।

"This British support of Hitler and of German re-armament has been governed by general considerations of British foreign policy. Continuously since Versailles Britain has given general support to the restoration of German power in order to counterbalance French power in Europe, and has sought in the same time to draw Germany into a Western orientation in opposition to the Soviet Union."

'World Politics', 1918-1936, by R. Palme Dutt, Page 267.

এদিকে জার্মানীও দেখিল যে, বৃটেনের সহায়তায় পশ্চিম ইউরোপে যদি সে 'গ্যারান্টি' পায় তবে, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দিকে ইচ্ছামত চলিবার তাহার কোন অসুবিধা নাই। সুতরাং বৃটিশ নীতি হিটলারের লক্ষ্য পূরণেই সহায়তা করিল। আর মিঃ চার্চিলের মতে ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে হিটলার জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার জন্য ১০০ কোটি পাউণ্ড খরচ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না, বরং হিটলারের ক্ষমতালাভের পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছুটিলেন জেনেভার বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে জার্মানীর পক্ষে ওকালতির জন্যে। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর প্রতি যে ঘোরতর অবিচার হইয়াছে, সেকথা বুঝাইবার দায়িত্ব লইলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি ফরাসী বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস (বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের বৃটিশ প্ল্যান অনুসারে) ও জার্মানবাহিনী দ্বিগুণ করিবার পক্ষে যুক্তি দেখাইলেন। তারপর মুসোলিনীর সহযোগিতায় ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে এক চতুঃশক্তির মৈত্রী প্রস্তাব আনিলেন। অর্থাৎ পশ্চিমের সকল রাষ্ট্রকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জোট পাকাইবার জন্য উৎসাহ দিলেন। অন্যথা ইউরোপে শান্তি রক্ষা করিতে হইলে রাশিয়াকে বাদ দিয়া এই সমস্ত প্রস্তাবের অন্য কোন অর্থ হয় না।

কেবল বৃটেনেই যে নাৎসী জার্মানীর পক্ষপাতী ধনিক ও শাসক সম্প্রদায় ছিল, এমন নহে। ফ্রান্সেও বহু কমিউনিস্ট বিদ্বেষী রাজনীতিক ও পুঁজিপতি হিটলারের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। অথচ ফ্রান্স ও জার্মানীর সঙ্গে অহি-নকুলের চিরবৈরিতার সম্পর্ক। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-বিদ্বেষ সাম্যবাদের ভয়ে 'চিরশত্রু' জার্মানীকে পর্যন্ত ফ্রান্সের মিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইল! একদল ফরাসী ধনিক ও রাজনীতিবিদের এই মনোভাব ও চক্রান্তের জন্যই হিটলারের হাতে ফ্রান্স দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এত দ্রুত পরাজিত হইয়াছিল। অবশ্য ফ্রান্সের সামরিক কর্তৃপক্ষ বা জেনারেল স্টাফ ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের মতে রাশিয়ার সহিত মৈত্রীই ছিল আত্মরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং ইহার বিপরীত পন্থা ছিল ফ্রান্সের পক্ষে আত্মহত্যার সমান। কিন্তু মঃ লাভাল ○, কর্ণেল ডি লা রোক, মঃ তার্দিউ প্রভৃতি হিটলারের সহিত সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল জার্মানীকে পূর্ব ইউরোপে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইতে দেওয়া। এজন্য ফ্রান্সের নিরাপত্তাও তাঁহাদের নিকট বড় প্রশ্ন ছিল না। মঃ ক্লেমেঁস, মঃ পঁয়েকার প্রভৃতি ফ্রান্সের রক্ষণশীল নেতারা ইতিপূর্বে যে

○ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে ইহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অনুসারে জার্মানীর বিরুদ্ধতা করিয়া আসিতেছিলেন, বর্তমান ক্ষেত্রে সাম্যবাদী রাশিয়ার ভীতি সেই পুরাতন নীতিকে পর্যন্ত অস্বীকার করিতে চাহিল।

"Even in France, which is directly menaced by Hitler, the reactionary Fascist and pro-Fascist sections of the bourgeoise have openly supported Hitler...... The Comite des Forges, the most powerful element of France finance-capital and the main backer of Fascism in France has continuously supplied the iron ore of Lorraine to Hitler which has made possible his re-armament."

'World Politics' by R. Palme Dutt.

অর্থাৎ ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় মূলধন-ওয়ালার দল হিটলারকে সমর্থন করিলেন এবং লোরেন খনির লৌহধাতু তাঁহাকে সরবরাহ করিলেন, যে লৌহের দ্বারা হিটলার তাঁহার অস্ত্রসজ্জা অনুসরণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঋণ ও লগ্নীর নাম করিয়া ১৯২৫-৩০ সালের মধ্যে প্রভূত অর্থ জার্মাণ শিল্পপতি ও মূলধনওয়ালা-দিগকে সহায়তা দিলেন, এই সাহায্যের দ্বারাই আবার হিটলার ও নাৎসী পার্টিকে পুষ্ট করা হইতে লাগিল। বড় বড় মার্কিন প্রাইভেট ব্যাঙ্ক মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মোট ১৮২ মিলিয়ন ডলার জার্মাণ শিল্প-সংস্থাগুলিকে ঋণ দিয়াছিল—

...."The big American Bankers financed the German cannon-kings,' who in turn financed Hitler".

সুতরাং হিটলারের ও নাৎসী পার্টির শক্তি বৃদ্ধিতে পয়সার কোন অভাব দেখা দিল না এবং ক্ষমতা লাভের পর হিটলার কর্তৃক অস্ত্র বা জার্মাণীব্যাপী সামরিক সড়ক নির্মাণেও (এর দ্বারা সেই সময়ে বেকার সমস্যারও যথেষ্ট প্রতিকার হইয়াছিল) হিটলারের খুব বেগ পাইতে হইল না। জার্মান শিল্প-সংস্থাগুলিকে ঋণদান ছাড়াও মার্কিন মূলধনওয়ালাগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জার্মানীকে মোট ১০০ কোটি ডলার লগ্নী করিয়াছিলেন। সোজা কথায় ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন পুঁজিপতিদের ক্রমাগত আনুকূল্য ও সাহায্যদানে এবং জার্মান শিল্পপতিদের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার সঙ্গে হিটলার ও নাৎসী দল এত অভূত-পূর্ব সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিল।৫*

---

*৫ পূর্ব জার্মানীর অধ্যাপক এ্যালবার্ট নরডেন রচিত 'Thus Wars Are Made', 1970, ৫৮-৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে।

আসলে ধনপতি ও শিল্পপতিদের পক্ষে সত্যকার দেশপ্রেমিক ও জনপ্রেমিক হওয়া যে কঠিন এই সমস্ত কাহিনী তারই প্রমাণ বহন করে আনে। অধ্যাপক নরডেন এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের বিখ্যাত শ্রমিক নেতা ও লেখক মিঃ ফেনার ব্রকওয়ের 'ডেথ পেইড এ ডিভিডেণ্ড' নামক পুস্তক থেকে এক চাঞ্চল্যকর উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাইয়াছেন কিভাবে জার্মানীর জগদ্বিখ্যাত অস্ত্রনির্মাণ কারখানা ক্রুপ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সন্ধিক্ষণে জার্মানীর ক্রুপ কোম্পানী ইংলণ্ডের বিখ্যাত ভিকার্স এণ্ড আর্মস্ট্রং কোম্পানীকে একটি নব আবিষ্কৃত হাতবোমা ফাটাইবার কৌশল প্যাটেণ্ট হিসাবে বিক্রি করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর বৃটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে জার্মান কোম্পানী এই বলিয়া নালিশ ঠুকিয়া দিল যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রতি হাতবোমা ব্যব-হারের জন্য বৃটিশ কোম্পানী মাত্র ১ শিলিং করিয়া দাম দিতেছে, অথচ ক্রুপের নির্মিত ১২ কোটি ৩০ লক্ষ হাতবোমা রণ-ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বৃটিশ কোম্পানীর নিকট জার্মান কোম্পানীর পাওনা ৬১ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং। অর্থাৎ ক্রুপ কোম্পানীর যে হাতবোমা (হ্যাণ্ড গ্রেনেড) তাদের শত্রুপক্ষ বৃটিশ পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্যবহার করিয়াছে ১৯১৪—১৮ সালে এবং যার ফলে হাজার হাজার জার্মান সৈন্য হতা-হত হইয়াছে, তার জন্য ক্রুপ কোম্পানী মূল্য ও মুনাফা দাবী করিতেছে। এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার বা দেশদ্রোহিতার জন্য ক্রুপের কোন দণ্ড হইল না, বরং পুরস্কার-স্বরূপ বৃটিশ কোম্পানীর অংশীদারত্ব জুটিল! ৬*

১৯১৯ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ২০ বৎসরের ইউরোপীয় ইতিহাস সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বৃটেন ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ ক্রমাগত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধতার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, যে নীতির ফলে ইউরোপে জার্মাণী এবং এশিয়ায় জাপান সাম্রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধায়োজনে প্রকৃত সহায়তা পাইয়াছিল। অবশ্য কেবল বৃটেনই এই ব্যাপারে একা দোষী নহে।

অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তিও সোভিয়েট বিরোধি-তায় তাহার সহযোগী ছিল এবং ১৯১৯ সালে পৃথিবীর ১৪টি রাষ্ট্র, যথা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী, ইতালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চেকোশ্লোভাকিয়া, সার্বিয়া, চীন, ফিনল্যাণ্ড, গ্রীস, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং তুরস্কের সৈন্যদল রাশিয়া আক্রমণ করিয়া-ছিল। অথচ মিত্রশক্তিবর্গ মুখে এই আক্র-মণের কথা স্বীকার করিলেন না, তাঁহারা নানা ছুতা দেখাইলেন—কখনও তাঁহারা বলিলেন যে, রাশিয়ার কোন যুদ্ধসম্ভার যাহাতে জার্মানীর হাতে না পড়ে, এজন্যই

---

*৬ পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃঃ ৭৩

তাঁহারা সৈন্য পাঠাইয়াছেন, কখনও বা তাঁহারা বলিলেন যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে রুশদিগকে সাহায্য করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। পরবর্তীকালে মিঃ চার্চিল তাঁহার গ্রন্থে ('The World Crisis: the aftermath') বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষ কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন ?—অবশ্যই না। তবে, তাঁহাদের সৈন্য সোভিয়েট রুশদিগকে দেখিবামাত্র গুলী করিয়াছে! সোভিয়েটের বিরুদ্ধ-বাদীদিগকে অস্ত্র জোগাইয়াছে। বন্দরগুলি অবরোধ এবং যুদ্ধজাহাজগুলি ডুবাইয়া দিয়াছে। অন্যান্য মিত্রশক্তি নিরপেক্ষ ছিলেন। এবং এই 'নিরপেক্ষতার যুদ্ধ' ও রাশিয়ার আপন গৃহযুদ্ধ চলিল আড়াই বৎসর। যাহার ফলে মোট ৭০ লক্ষ নরনারী ও শিশু মারা পড়িল—দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে ও যুদ্ধে। আর সোভিয়েট গভর্নমেন্টের মতে বৈষয়িক ক্ষতি রাশিয়ার হইয়াছিল ৬ হাজার কোটি ডলারের সমান। মিত্রপক্ষ রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই টাকার কোন হিসাব নাই। তবে, মিঃ চার্চিলের মতে ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃটেন খরচ করিয়াছিল ১০ কোটি পাউণ্ড এবং ফ্রান্স একমাত্র জেনারেল ডেনিকিনের সাহায্যের জন্যই ব্যয় করিয়াছিল ৩ কোটি হইতে ৪ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে। উত্তর রাশিয়াতে বৃটিশ সৈন্যদের অভিযানের জন্য খরচ হইয়াছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং জাপান সাইবেরিয়াতে ৭০ হাজার সৈন্য রক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিল ৯০ কোটি ইয়েন।

কিন্তু এই সমস্ত ব্যয়বহুল অভিযান ব্যর্থ হইবার পর ১৯২৫-২৬ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশে ও পরাধীন দেশে রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্তে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন দেখা দিল। আর সেই সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অতি জঘন্য নিন্দাবাদ, বিদ্বেষ ও নিদারুণ মিথ্যার অভিযানে ধনতন্ত্রবাদীগণ সারা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। সুতরাং ১৯২৬ সালের বসন্ত-কালে চীনের যে রাষ্ট্রবিপ্লব, কুমিন্টাং ও কমিউনিস্টদের সম্মিলিত ফ্রণ্টের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল, তাহাও 'মস্কোর চক্রান্ত' বলিয়া প্রতিভাত হইল। পশ্চিমের সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রসমূহ জাপানকে উস্কানি দিল এবং জাপ-সম্রাটও এশিয়াকে 'বলশেভিক বর্বরতা' হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতি-শ্রুতি দিলেন। জাপানী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল টানাকা হইলেন সম্রাটের প্রধান সহায়। তিনি রাশিয়াসহ গোটা বিশ্বজয়ের এক প্ল্যান ফাঁদিয়া বসিলেন—যাহা 'টানাকা মেমোরিয়াল' নামে খ্যাত। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে মাঞ্চুরিয়ার কুখ্যাত 'রণপ্রভু' জেনারেল চাং সো-লিন জাপানী গভর্ন-মেণ্টের ক্রীড়নকরূপে পিকিংস্থ সোভিয়েট দূতাবাসে হানা দিলেন এবং তিনি চীনের বিরুদ্ধে এক 'বলশেভিক চক্রান্ত' আবিষ্কার

করিলেন আর জেনারেল চিয়াং কাইশেক জাপানকে বৃটেন ও ফ্রান্সের সাহায্য ও উদ্দেশ্যে বশীভূত হইয়া কুমিন্টাং ও কমিউনিস্টদের ইউনাইটেড ফ্রণ্ট ভাঙিয়া দিলেন এবং সাংহাই, পিকিং ও অন্যান্য হাজার হাজার কমিউনিস্ট কিংবা কমিউনিস্ট সন্দেহে ধৃত উদারনৈতিকপন্থী যুবক, ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদিগকে বিনাবিচারে আটক, গ্রেপ্তার কিংবা গুলী করিয়া হত্যা করিলেন। চীন গৃহযুদ্ধে উন্মত্ত হইতে লাগিল, আর চীন-বিপ্লব ও রুশ-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গণবিক্ষোভ দেখা দিল।

এই অবস্থার মধ্যে ইউরোপে লোকার্ণো সম্মেলন—১৯২৬-২৭ সালে ইঙ্গ-ফরাসী রাজনীতিকগণ চাহিলেন জার্মানীকে দলে টানিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে। বৃটেনের গোঁড়া রক্ষণশীল দল ও ফ্রান্সের মঃ পয়েঙ্কার ও মার্শাল ফস প্রভৃতি এই চক্রান্তে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এবং ১৯২৭ সালের ২৭শে মে বৃটিশ পুলিশ ও গোয়েন্দাগণ লণ্ডনের সোভিয়েট বাণিজ্য দূতাবাসে 'Arcos House' হানা দিল এবং বার্লিন ও প্যারিসেও অনুরূপ হানা চলিল। যদিও কোথাও সোভিয়েট চক্রান্তের কোন দলিল বা প্রমাণ পাওয়া গেল না, তথাপি বৃটিশ গভর্নমেন্ট রাশিয়ার সহিত সমস্ত প্রকার কূটনৈতিক ও বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। এমনকি ১৯২৯ বা ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে বাহ্যতঃ পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সহায়তায় সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের এক বিরাট চক্রান্ত হইল। পলাতক রুশ ধনিকগণ বৃটেন ও ফ্রান্সের রক্ষণশীলদের সহায়তায় এই ষড়যন্ত্র করিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সাল হইতে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্গতি অকস্মাৎ বোমার মত ফাটিয়া পড়িল (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং সর্বত্র বেকার সমস্যা, দুর্ভিক্ষ ও অনশন দেখা দিল। বড় বড় ব্যাঙ্ক ও সওদাগরী অফিস কারবার গুটাইতে বাধ্য হইল। ফলে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনিকদের সমস্ত অভিযানের প্ল্যান মাটি হইয়া গেল। কারণ, সারা সভ্য পৃথিবীর সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল—ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের গভর্নর স্যর মণ্টেগু নরম্যানের মতে। কিন্তু এশিয়া খণ্ডে ধূর্ত জাপান দেখিল এই তার সুযোগ, সুতরাং ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপ সৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল 'চীনকে বলশেভিক মতবাদ হইতে রক্ষার জন্য।' আমেরিকা প্রতিবাদ জানাইলেন এবং বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে চীন আবেদন জানাইলেন। কিন্তু রুশ, বৃটেন ও ফ্রান্স জাপানী আক্রমণকে নিঃশব্দে অনুমোদন করিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা রচিত হইল।

এই সময় কেবল বাহিরের শত্রু নয়, ভিতরের শত্রুদলও সক্রিয় হইল। ১৯৩৩ সালে হিটলার কর্তৃক জার্মান রাষ্ট্র দখলের পর সারা ইউরোপে হত্যাকাণ্ড, বিশ্বাসঘাতকতা, নাশকতা এবং ষড়যন্ত্রের এক ঢেউ বহিয়া গেল। রাশিয়ার অভ্যন্তরে ট্রটস্কি এবং তাঁহার দলবল এক নিদারুণ 'বিশ্বাসঘাতকতার' ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হইলেন, যাহা শেষ হইল ১৯৩৬ সালে ইতিহাস-বিখ্যাত মস্কো ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে এবং বড় বড় ট্রটস্কিপন্থী নেতাদের প্রাণদণ্ডে। ট্রটস্কি রাশিয়া থেকে পলায়নলাভ পূর্বক দক্ষিণ আমেরিকার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং পরে আততায়ীর হাতে নিহত হইয়াছিলেন। রাশিয়ার ভিতরে এবং বাহিরে—ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া প্রভৃতি দেশে নাৎসী গুপ্তঘাতকেরা বহু লোকের প্রাণনাশ করিল। এই সমস্ত চক্রান্ত এত ব্যাপক এবং ভয়াবহ ছিল যে, ১৯৩৭ সালে রেড আর্মির কয়েকজন সেরা জেনারেল ও মার্শাল পর্যন্ত 'দেশদ্রোহিতার' অভিযোগে প্রাণ হারাইলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সোভিয়েট বিদ্বেষের জন্য ১৯৩৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকা ক্রমশঃ নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল। জার্মানী ও জাপান গোপনে চক্রান্ত করিতে লাগিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণের জন্য। জার্মান হাই-কম্যাণ্ড পোল্যাণ্ডের ফ্যাসিস্ত পক্ষপাতী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের সহিত সলাপরামর্শ করিতে লাগিলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে। বাল্টিক রাজ্য, বলকান রাজ্য এবং অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় নাৎসী আন্দোলন ও বিশ্বাসঘাতকতা দানা বাঁধিতে লাগিল। আর ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঃ লাভাল এবং বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব স্যর জন সাইমন ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ (১৯৩৫) ঘোষণা করিলেন, জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধির কয়েকটি ধারা হইতে মুক্তি দিতে। জার্মানীও তাহাই চাহিতেছিল। ঘটনার গতি দ্রুত আগাইয়া চলিল। ১লা মার্চ হিটলার ফ্রান্সের নিকট হইতে কয়লাখনির রাজ্য সার ফেরত পাইলেন এক গণ-ভোটের দ্বারা এবং এই ভোটগ্রহণের পিছনে ছিল নাৎসী সন্ত্রাসবাদের ভীতি। তারপর ১৬ই মার্চ নাৎসী জার্মানী যথারীতি ভার্সাই সন্ধি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং জার্মানীতে 'সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি' প্রবর্তন করিলেন এক হুকুমনামার দ্বারা। ফরাসী, বৃটিশ, পোল এবং ইতালীর রাজদূতদিগকে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়া হইল। ১০ই এপ্রিল জার্মানী বৃহৎ বোমারু বিমানবহর সৃষ্টির এক কর্মতালিকা প্রচার করিল। এবং ১৮ই জুন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ বলডুইন (রক্ষণশীল) বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে এক নূতন নৌ-চুক্তির কথা ঘোষণা করিলেন। তখন বৃটিশ নৌবহর ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। নূতন চুক্তি অনুসারে জার্মানী বৃটিশ নৌবহরের শতকরা ৩৫ ভাগের সমান নৌবল বৃদ্ধি করিতে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমগ্র সাবমেরিনবহরের সমান সাবমেরিন তৈয়ারীর অধিকারী হইল। অক্টোবর মাসে (১৯৩৫) ফ্রান্সের মঃ লাভাল এবং বৃটেনের স্যর স্যামুয়েল হোর (যিনি একদা কালে ভারতসচিবরূপে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন)—এই দুইজনের আশীর্বাদ পাইয়া মুসোলিনী আবিসিনিয়া বা আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাজ্য আক্রমণ এবং ১৯৩৬ সালের মে মাসে উহা দখল করিলেন। ৫ লক্ষ ফ্যাসিস্ত সৈন্য এই অভিযানে যোগ দিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানে অনগ্রসর হাবসীদের উপর বোমাবর্ষণ ও বিষাক্ত গ্যাস পর্যন্ত ব্যবহার করিল।

১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে যেমন চীন আবেদন জানাইয়াছিল বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের দরবারে, এক্ষেত্রেও তাহার পুনরাবৃত্তি হইল। ইতালী, জাপান ও জার্মানীর দৃষ্টান্তে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি শঙ্কিত হওয়ায় জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের একটা বৈঠকও বসিল এবং মৌখিক আদর্শ রক্ষার খাতিরে ইতালীকে 'আক্রমণকারী' বলিয়া ঘোষিত এবং তাহার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হইল—৭ই অক্টোবর, ১৯৩৫। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইতালী যথারীতি বৃহৎ শক্তিবর্গের নিকট হইতে সমরসম্ভারের প্রাণবস্তু লোহ, কয়লা এবং পেট্রোল সরবরাহ পাইতে লাগিল। এই প্রহসনের শেষ অঙ্কে দেখা গেল যে, ফ্রান্স মুসোলিনীর সঙ্গে আপোষ করিয়া ফেলিয়াছে এবং বৃটেন 'সাম্রাজ্যের প্রাণপ্রবাহের পথ' ভূমধ্যসাগরে ইতালীর সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' নীতি অবলম্বন করিয়াছে!

বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্রকে মুসোলিনী যখন এভাবে হত্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁরই দোসর হিটলার সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন রাইনল্যাণ্ডে—১৯৩৬ সালের ৭ই মার্চ। ১৯২৫ সালের লোকার্ণো চুক্তি অনুসারে জার্মানীসহ সমস্ত পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ রাইনল্যাণ্ডকে নিরস্ত্রীকৃত রাখিবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এজন্যই লোকার্ণো চুক্তিকে ইউরোপের একটা শান্তির যুগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী ও ইতালী—এই সমস্ত পশ্চিমী শক্তি এই চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা ইউরোপে শান্তি নিশ্চিত করিলেন, এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কারণ, এই চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা পরস্পরের রাজ্যসীমা মানিয়া চলিবে এবং বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার এই যে, ইউরোপে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলেও সোভিয়েট রাশিয়াকে কিন্তু সযত্নে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে হিটলার ভার্সাই সন্ধির মত লোকার্ণো চুক্তিপত্রও বাজে কাগজের টুকরার মত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ফরাসী সৈন্যেরা সীমান্তে দাঁড়াইয়া দেখিল, কিন্তু বাধা দেওয়ার হুকুম পাইল না। যদি হুকুম

পাইত, তাহা হইলে হিটলারের পক্ষে রাইনল্যাণ্ড পুনর্দখল করা সম্ভব হইত না। কিন্তু বৃটেন ফ্রান্সের সহায়তায় এমন কোন কাজ করিতে রাজী হইল না, যাহা দ্বারা যুদ্ধ বাধিতে পারে। অর্থাৎ ফ্রান্সকে বলপ্রয়োগ করিতে দেওয়া হইল না। আর হিটলার ঘোষণা করিলেন যে, তিনি রাইনল্যাণ্ড আবার দখল করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকে 'দুর্গায়িত' (fortify) করা হইবে না এবং ইউরোপে তাঁর আর কোন ভূমিগত দাবী নাই। তাঁর মতে 'বিস্ময়ের যুগ' শেষ হইয়াছে।

১৯৩৩ সালের ১৪ই অক্টোবর জার্মানী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছিল, জাপান উহার আগেই (২৭শে মার্চ) মাঞ্চুরিয়া অভিযানের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়াছিল এবং ইতালীও পরে সেই একই পন্থা অনুসরণ করিল, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭। ইউরোপে শান্তিরক্ষার জন্য বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি ভাঙ্গিয়া গেল এবং ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাৎকালীন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ লিটভিনোফ এই সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি অনুসরণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিষদে বারবার আবেদন জানাইলেন। কিন্তু সাম্যবাদ ভীত পশ্চিম ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ ইহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না—ফ্যাসিস্ট ব্যাঘ্র রুশ ভল্লুকের ঘাড় মটকাইবে, ইহাই ছিল তাহাদের ইচ্ছা এবং মতলব। সুতরাং জার্মানী, ইতালী এবং জাপানকে কোনপ্রকার বাধা দেওয়া হইল না। ইঙ্গ-ফরাসী নেতারা এক সর্বনাশা তোষণনীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন যে, এভাবে তাঁহারা যুদ্ধের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া যাইবেন। ডিক্টেটরগণও এই তোষণনীতির আসল কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহারা পরস্পরের সহিত চক্রান্ত করিয়া যেমন সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি ব্যর্থ করিয়া দিলেন, তেমনই পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া আরও সোভিয়েট বিদ্বেষ প্রচার করিতে লাগিলেন। জার্মানীর নিকট সমগ্র ইউরোপ ইতালীর নিকট ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আফ্রিকা এবং জাপানের নিকট পূর্ব এশিয়া রাজ্যবিস্তার ও প্রভুত্ব স্থাপনের স্ব স্ব এলাকা বলিয়া প্রতিভাত হইল। আর পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ যেন পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জকে তোষণ করিতে লাগিলেন। ১৯৩৬ সনের ২৫শে নভেম্বর জার্মানী ও জাপান কমিন্টার্ণ-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করিল এবং ১৯৩৭ সালের ৬ই নভেম্বর ইতালীও সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিল। এই ত্রয়স্পর্শ যোগের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত কমিনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের বিরোধিতা করা। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ মনে মনে খুসী হইলেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে, এই তিনের সহযোগিতায় যে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, একদিন সেই শক্তি তাদেরও বিপদ ঘটাইতে পারে।

১৯৩৭ সনের ৭ই জুলাই জাপান আবার চীনদেশ আক্রমণ করিল এবং পিকিং, টিয়েনসিন ও সাংহাই দখল করিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ উদাসীন রহিলেন। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ আধিপত্যের ভয়ে আমেরিকা আগের মতই প্রতিবাদ জানাইল, যদিও বিশেষ কোন ফল হইল না।

তারপর শুরু হইল স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের শোচনীয় নাটক, যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে আরও এক ধাপ অগ্রসর করিয়া আনিল।

স্পেনের নূতন রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্ট ভূমি-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের কতকগুলি আইন প্রবর্তন করিলেন। ফলে, রক্ষণশীল দল, ক্যাথলিক স্বার্থের বাহকগণ এবং বড় বড় ভূস্বামী আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন এবং ইহা কমিউনিস্টদের কাণ্ড বলিয়া চীৎকার শুরু করিলেন, যদিও স্পেনে কমিউনিস্ট বেশী ছিল না এবং পপুলার ফ্রণ্ট গভর্নমেণ্টও আদৌ সাম্যবাদী ছিলেন না। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? ফ্যাসিস্ট দলপতি জেনারেল ফ্রাঙ্কো দেখিলেন এই তাঁর সুযোগ। প্রায় সমগ্র সৈন্যদলের এবং মুর সৈন্যদের সহযোগিতায় তিনি রিপাবলিকান গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ১৮ই জুলাই (১৯৩৬) তারিখ বিদ্রোহ করিলেন স্পেনীয় মরক্কো হইতে। এই গৃহযুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া অক্ষশক্তিবর্গ তাঁদের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, স্পেনে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে দক্ষিণ দিকে ফ্রান্স কাবু হইবে, আর ইংলণ্ডের জিব্রাল্টার প্রণালীর জলপথ বিপন্ন হইবে। সুতরাং ইতালী ও জার্মানী জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দিতে লাগিল। দুই বৎসরে ইতালী লক্ষাধিক সৈন্য পাঠায় ফ্রাঙ্কোর সাহায্যের জন্য, আর জার্মানী দিল ট্যাঙ্ক, গোলাগুলী, কামান এবং বিমানবহরের সাহায্য ও সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসৈনিক। কেবল তাহাই নহে, তারা নূতন যান্ত্রিক যুদ্ধের পদ্ধতি এবং অস্ত্রগুলিও স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের রণাঙ্গনে পরীক্ষা করিতে [illegible] এই ব্যাপারে শঙ্কিত হইল এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায় [illegible] লিকান গভর্ণমেণ্ট [illegible] ও বিমান [illegible]

ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ-এর ফলে পাছে মহাযুদ্ধের প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া যায়, এই আশঙ্কায় ফ্রান্স ও বৃটেন জার্মানিকে সাহায্যদান ও হস্তক্ষেপে বিরত হইল এবং অক্ষশক্তিবর্গও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াই ইতালী ও জার্মানী প্রকাশ্যে পূর্ববৎ ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দিতে লাগিল। বৃটেন ও ফ্রান্স 'নন-ইণ্টারভেনসন'-এর দোহাই দিয়া দূরে সরিয়া রহিল এবং তাদের ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতদুষ্ট নীতি এই ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হইল যে, ইহা দ্বারা স্পেনে সাম্যবাদের গতিরুদ্ধ এবং ইউরোপে যুদ্ধ নিবারিত হইতেছে।

প্রায় তিন বৎসর তীব্র লড়াই এবং প্রায় আড়াই বৎসর রাজধানী মাদ্রিদ অবরোধের পর ৫ লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে ১৯৩৯ সনের ৪ঠা এপ্রিল জেনারেল ফ্রাঙ্কো পূর্ণ জয়লাভ করেন। ইউরোপে ফ্যাসিস্ট জয়যাত্রা অপ্রতিহত হইল।

কিন্তু স্পেনের এবং ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ সেদিন সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ, উহাই ছিল প্রথম ফ্যাসিজম বনাম গণতান্ত্রিক শক্তির দ্বন্দ্ব। সুতরাং স্পেনের রিপাব্লিকান সরকারকে সাহায্য করার জন্য পৃথিবীর নানা দেশের প্রগতিবাদী ও সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী লোকেরা স্বেচ্ছাসৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এজন্য যে বিখ্যাত ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড গঠিত হইয়াছিল, তাতে ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই সময় স্পেনের বার্সিলোনা রণক্ষেত্রে গিয়াছিলেন এবং শহরের উপকণ্ঠে স্বচক্ষে সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির ভণ্ডামী ও ফ্যাসিজমের ক্রূরতা নেহরুকে পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি আরও বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

ইতিমধ্যে ক্ষমতামত্ত এবং তোষণনীতিতে পুষ্ট হিটলার আরও দুঃসাহসী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমাগত সৈন্যবল ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। জার্মান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে সমস্ত রক্ষণশীল জেনারেল তাঁর সহিত একমত হইলেন না, তিনি তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন—১৯৩৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। তখন হইতে হিটলারের ভাষা ও কণ্ঠস্বর আরও উগ্র হইতে লাগিল। তিনি [illegible] সহিত জার্মানীর [illegible] দাবী করিয়াই [illegible] সমস্ত [illegible] এবং [illegible]

জন্য প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন। অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের জার্মান অধিবাসীদের একত্র করিবার উদ্দেশ্যে তিনি Lebensraum বা 'বাসভূমির' জন্য দাবী করিলেন। এজন্য পূর্ব সঙ্কল্প অনুযায়ী তিনি এই সমস্ত দেশের অভ্যন্তরে নাৎসী আন্দোলন সংগঠন করিলেন এবং ভিতর হইতে সন্ত্রাসবাদ ও নানাপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত গভর্নমেণ্টকে বিপাকে ফেলিবার নির্দেশ দিলেন। পরে 'আভ্যন্তরীণ গোলযোগ' ও 'জার্মানদের উপর অকথ্য পীড়নের' ধুয়া ধরিয়া হিটলার ও তাঁর দলবল 'নির্যাতিত জার্মানদের উদ্ধারের' জন্য বলপ্রয়োগ ও অন্যান্য কৌশল খাটাইতে লাগিলেন। ডাঃ গোয়েবল্‌সের প্রচারবিভাগ উগ্র হইয়া উঠিল।

এই কৌশলের প্রথম বলি হইল অস্ট্রিয়া। হিটলারী চক্রান্তের প্ররোচনায় সেখানকার নাৎসীদল Anschluss বা জার্মানীর সহিত মিলনের আন্দোলন চালাইল। তখনকার অস্ট্রিয়ার গভর্নমেণ্ট ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল এবং তাঁরা আবার সোসিয়্যালিস্ট পার্টিকে দমন করিয়া বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং একদিকে তথাকথিত ফ্যাসিস্ট আন্দোলন এবং অন্যদিকে দুর্বল গভর্নমেণ্ট, এই উভয়ের সুযোগ পাইয়া হিটলার তাঁর পার্বত্যভবন বিখ্যাত বার্শটেস্‌গাডেনে (ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত) অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ডাঃ সুশনিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জোরপূর্বক তাঁর কাছ থেকে অস্ট্রিয়ায় জার্মানীর প্রবেশের এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া লইলেন—১৯৩৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। ডাঃ সুশনিগ নাৎসীদের হাতে বন্দী হইলেন। ঠিক এক মাস পর ১২ই মার্চ জার্মান সৈন্যেরা অস্ট্রিয়া আক্রমণ এবং দখল করিল। এই ঘটনায় সারা ইউরোপ স্তম্ভিত হইল, কিন্তু হিটলারের বিরুদ্ধে কেহ অগ্রসর হইল না, পাছে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। রাইনল্যাণ্ড দখলের পর হিটলার যেমন বলিয়াছিলেন, অস্ট্রিয়া দখলের পরও তেমনই তিনি ঘোষণা করিলেন যে ইউরোপে আর তাঁর কোন জমিদারী দাবী নাই। এমনকি, তাঁর দক্ষিণহস্ত গোয়েরিং বৃটেনের নিকট হিটলারের নামে এই 'পবিত্র' প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়া বা অন্য কোন দেশ আক্রমণের কোন ইচ্ছা তাঁদের নাই।

কিন্তু বরাবরের মত ইহাও ছিল নিতান্তই ধাপ্পাবাজী। অস্ট্রিয়া দখলের পরেই জার্মানীতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ হইল। আর নাৎসী দলের পূর্ব চক্রান্ত অনুসারে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জেলার জার্মানরা হেনলেইনের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের দাবী ও বাইনার্বিটি হিসাবে তাদের উপর 'অত্যাচার ও পীড়নের' অভিযোগ করিতে লাগিল। চেক গভর্নমেণ্ট বৃটেনের 'মধ্যস্থতায়' বাধ্য হইয়া সুদেতেন জার্মানদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিলেন। কিন্তু এই অধিকার পাইবামাত্র তাহারা জার্মানীর সহিত মিলনের আন্দোলন আরম্ভ করিল। ইহার ফলে চলিল গুণ্ডামী ও বিশৃঙ্খলার অভিযান। হিটলার যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানীর পক্ষ হইতে ফেরৎ চাহিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া দৃঢ়তা দেখাইতে লাগিল, ফ্রান্সের সঙ্গে ছিল তাহার আত্মরক্ষার চুক্তি এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ারও ছিল মৈত্রী বন্ধন। সীমান্তের দুর্গাশ্রিত অঞ্চলে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত চেক সৈন্যেরা দণ্ডায়মান হইল, ফ্রান্স তার রিজার্ভ বাহিনীকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং গ্রেট বৃটেন বাধ্য হইয়া হিটলারকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিল যে, ফ্রান্স যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়, তবে তারাও ফ্রান্সকে সাহায্য করিবে। কিন্তু এবারও সোভিয়েট বিশ্বাসের জন্য সমস্ত ভণ্ডুল হইল। রাশিয়া বরাবরই ইউরোপীয় সঙ্কট লক্ষ্য করিয়া সকলের সঙ্গে একত্রে সমষ্টিগত নিরাপত্তা-নীতি অবলম্বনের জন্য প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে তার পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ছিল। কিন্তু বৃটেন তাতে রাজী হল না এবং ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ফ্যাসিস্ট তোষণনীতির চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইলেন।

এদিকে হিটলার ইঙ্গ-ফরাসী-চেক প্রতিরোধের মুখে দাঁড়াইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কেননা, তিনি জানিতেন যে, সাম্যবাদের ভীতিগ্রস্ত এই সমস্ত শক্তিবর্গ তাঁকে বাধা দিবেন না এবং যুদ্ধকেও তাঁরা এড়াইয়া চলিবেন। সুতরাং ১৯৩৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর হিটলার আবার ধাপ্পা দিলেন এবং আগের মতই ভূমিগত 'বৈরাগ্যের' (?) পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, এই সুদেতেনল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপে তাঁর আর কোন দাবী নাই, ইহাই শেষ এবং ইহা ফেরৎ পাইলেই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত এবং সুখী।

> "This is the last territorial claim I have to make in Europe. I have assured Mr. Chamberlain and I emphasise it now that when this problem is solved Germany has no more territorial problems in Europe.... We do not want any Czechs.... I shall not be interested in the Czech State any more".

চেম্বারলেনের বৃটেন ও দালাদিয়েরের ফ্রান্স সোভিয়েট বিদ্বেষে অন্ধ ও বুদ্ধিভ্রষ্ট ছিল—আবার হিটলারের প্রতিশ্রুতিকে তাঁরা বেদবাক্য মনে করিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন দুবার বিমানযোগে ছুটিলেন হিটলারের সকাশে, তাঁকে খুশী করিবার জন্য। বৃটেন ও ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর বিষম চাপ দিতে লাগিল নাৎসী জার্মানীকে আপোষের দ্বারা সন্তুষ্ট করার জন্য। এদিকে হিটলার দোস্ত মুসোলিনীও ছুটিয়া গেলেন আপোষ-মীমাংসার দাবীতে। বৃটেন ও ফ্রান্স হিটলারের দাবীতে সম্মত হইল এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাদ দিয়েই চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হইল ১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মিউনিক সম্মেলনে। হিটলারের দাবী অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়াও অবশ্য এই সম্মেলন হইতে বাদ গেল এবং মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

অক্ষশক্তিবর্গ কূটনীতির ধাপ্পাবাজীতে জয়যুক্ত হইলেন। কিন্তু হিটলার মিউনিক চুক্তি মারফৎ জার্মান-অধ্যুষিত সুদেতেনল্যাণ্ড ভুক্তিগত করিয়াই থামিলেন না। পরের বৎসর মার্চ মাসে অস্ট্রিয়ার অনুকরণে চেক প্রেসিডেণ্ট হাচাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন বার্লিনে এবং জোরপূর্বক সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীর 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত করিবার এক দলীলে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। নাৎসী সৈন্যেরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় মার্চ করিল এবং গোটা দেশ দখল করিল। কয়েকদিন পর লিথুয়ানিয়ায় জার্মান-অধ্যুষিত মেমেল বন্দরও (যাহা ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জার্মানীর হাতছাড়া হইয়াছিল) তিনি কাড়িয়া লইলেন। আবার হিটলার ঘোষণা করিলেন যে, ইউরোপে তাঁর ভূমিগত আর কোন দাবী নাই—ভার্সাই সন্ধির ক্ষতিপূরণ-ধারার এখানেই খতম।

ইহার দুই সপ্তাহ পর ইতালীর পালা। মুসোলিনী আক্রমণ করিলেন আড্রিয়াটিক উপসাগরের উপকূলবর্তী আলবানিয়া রাজ্য, হিটলার তাঁকে সমর্থন জানাইলেন। ১৯৩৯ সালের ৭ই এপ্রিল ক্ষুদ্র ও অসহায় আলবানিয়া রাজ্য মুসোলিনীর দখলে চলিয়া গেল—ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ নীরব দর্শকমাত্র রহিলেন।

সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়া এভাবে ইউরোপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিল। ফ্যাসিস্ট তোষণনীতি হিটলার ও মুসোলিনীকে শক্তিমত্তায় ও দিগ্বিজয়ে প্রমত্ত করিল এবং সোভিয়েট রাশিয়া সমষ্টিগত নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া একক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু বুদ্ধিমান স্তালিন বোকা বনিবার পাত্র ছিলেন না। সুতরাং সমগ্র জগৎ আর একটি বিস্ময়কর নাটকীয় ঘটনার সম্মুখীন হইল।—ইহার নাম রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইহাই ছিল শেষ ভূমিকা। (ক্রমশঃ)

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পর্ব

(৫)

এর আগে আমি পাঁচজনের একজন ছিলাম। স্বতন্ত্র হয়েও বৈশিষ্ট্য ছিল না। এখন তা নয়। আমি যেন নিজেই একটা দুনিয়া। একটা নতুন জগৎ। নতুন সত্তা নতুন অনুভূতি।

কিছুদিনের মধ্যে কত কি পাল্টে গেছে? গরম দুপুরে, শীতের রাত্রির মত আগে সময় যেন কাটতে চাইত না: ফুরতে চাইত না। এখন? বসন্তের মিষ্টি সন্ধ্যার মত দেখতে দেখতে দিনগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। দুপুরে সকালকে গ্রাস করেই অপরাহ্নের ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়ছে। তারপরই সৌরমন্ডলের অধিপতি সূর্য মৃত্যু আহত সৈনিকের মত মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করে চাঁদের কাছে। এ সব তো আগেও হতো কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হতো কি?

কখনই না।

সেই ছোট্টবেলায় নিরুপমাদির ক্লাসে শিখেছিলাম পৃথিবী অবিরত ঘুরছে। শিখেছিলাম, পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু অনুভব করিনি। করার কারণ পাইনি। এখন আমার জীবনে যেই একটু গতি এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন পাগলের মত ঘুরতে শুরু করেছে। আশ্চর্য!

সুখের দিনগুলো, মিষ্টি অনুভূতি-ভরা মুহূর্তগুলোর একটু বেশী গতি? বোধ হয় তাই। সিক্সথ ইয়ারে উঠেই আত্রেয়ীর বিয়ে হলো। আমরা দল বেঁধে ওর বিয়েতে গিয়েছিলাম কিন্তু বৌভাতে যাইনি। বিয়ের দিন পনের পর ও যখন প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে এলো, সেদিন আমাদের কি দারুণ হতাশা। শেষের দুটো ক্লাশ আর করতে পারলাম না। উত্তেজনায় অশান্তিতে কেউই ক্লাশে বসতে পারছিলাম না। সব মেয়েরাই বেরিয়ে পড়লাম। কফি হাউসের ভীড়ে গেলাম না। ইয়াই এম সি এ-র কেবিনেও ঢুকলাম না। বেকার ল্যাবরেটরীর পিছনে ফাঁকা মাঠের এক পাশে আত্রেয়ীকে ঘিরে আমরা সবাই বসলাম ফুলশয্যার গল্প শুনতে। কোন ভূমিকা না করে রেখা প্রশ্ন করল, আপনাদের পার্লামেন্টারি আক্রমণের মত [illegible]?

আত্রেয়ী হাসতে হাসতে বলল, সে রাত্রে কোন আক্রমণই হয়নি।

মাধুরী বলল, সুযোগ পেলেই আক্রমণ হয় আর ফুলশয্যায় আক্রমণ হলো না?

'না।'

পিছন থেকে কে যেন টিপ্পনী কাটল, বেশ গুলে দিচ্ছিস তো।

আত্রেয়ী আবার কি বলতে চেষ্টা করল কিন্তু রেখা বাধা দিয়ে জানতে চাইল, তুই কি মুসোলিনীর মত যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়েই পরাজয় স্বীকার করলি নাকি নাৎসীদের মত আরো কিছুক্ষণ লড়তে পেরেছিলি?

শুধু রেখা নয়, আমরা সবাই মিলে ওকে অনেকভাবে অনেকক্ষণ জেরা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত ওর কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ পেলাম না।

'সত্যি সেদিন রাত্রের কথা ভাবলে আমার নিজেরও অবাক লাগে। একটু গল্পগুজব কথাবার্তা বলতে বলতেই ভোর হয়ে গেল।'

এমন হয়। অনেকেরই হয়। জীবনের কোন না কোন সময়ে সবারই এমন হয়। মনে হচ্ছে এইত সেদিন সাগরের নিউ ফরেস্টে আসার কথা পিসীর কাছে শুনলাম। এর মধ্যেই দুটো মাস কেটে গেল? আর ক' সপ্তাহই বা ও এখানে আছে? দেখতে দেখতে এই কটা দিনও ঝড়ের বেগে উড়ে যাবে।

সাগরের প্রতি আমার প্রেম নেই কিন্তু একটা আশ্চর্য সমবেদনায় মনটা ভরে গেছে। ওর সবগুলো ডায়েরী আমি পড়েছি। পড়েছি মাগোর কথা, মানসীর কথা। ও নিজে আমাকে পড়তে দিয়েছে। সব কিছু জানিয়েছে। ওর মনে কোন গ্লানি নেই। মানসীকে ভালবাসার মধ্যেও কোন গ্লানি, কোন মালিন্য ছিল না। যদি কোন গ্লানি, কোন মালিন্য থাকত, ওর মনে, ওর ভালবাসায়, তাহলে অমন করে নতুন-পুরানো ডায়েরীগুলো আমার হাতে তুলে দিত না। দিতে পারত না। গোলাপে কোন মালিন্য নেই বলেই কন্টকে, আহত দেহটা দেখাতে কার্পণ্য করে না।

ওর ডায়েরী পড়ার পর, ওর ডায়েরীতে আমার নিজের কথা পড়ার পর সাগরের মুখোমুখি হতে আমার লজ্জা করছিল। ডায়েরীগুলো ফেরত দেবার কথা ভাবছিলাম কয়েকদিন ধরেই কিন্তু যেতে পারিনি। ভাবছিলাম আমার কাছে আসতে ওরও নিশ্চয়ই লজ্জা করছে। শেষ পর্যন্ত একদিন দুপুরবেলায় ও হঠাৎ এসে হাজির হলো। খুব ক্লান্ত ছিল। সামনের ঘরে ঢুকেই সোফায় মাথা হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। একটু পরেই জিজ্ঞাসা করল, সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' পড়েছেন?

ওর প্রশ্নে অবাক হলাম। ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ পড়েছি।

কেমন লেগেছে?

ভাল।

সাগর চ্যাটার্জির আবোল-তাবোলের চাইতেও ভাল?

ওর কথা শুনে না হেসে পারলাম না। আমার হাসি দেখে ও প্রশ্ন করল, তাহলে, সত্যি আবোল-তাবোল লিখেছি, কি বলুন?

ওর ক্লান্তি দেখেই আমি বুঝেছিলাম খেয়ে আসেনি। বললাম, দাঁড়ান, আগে খাবার ব্যবস্থা করি। তারপর কথা হবে।

কথা হয়েছিল। সেদিন খাবার সময় আর কয়েকদিন পরে আমার অসমাপ্ত ইন্টারভিউ নিতে নিতে কথা হয়েছিল।

সাগর বলেছিল, অন্যায়ভাবে আপনাকে নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছি, লিখেছি। ক্ষমা করবেন।

'ক্ষমা চাইবার মত অন্যায় তো আপনি করেন নি।'

'অন্যায় করেছি বৈকি। আপনাকে নিয়ে এত কথা ভাবা, লেখা অন্যায় না?'

ভাবনা-চিন্তা নিজের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাতে ন্যায়-অন্যায় কি আছে?'

ভাবনা-চিন্তায় বাধা দেওয়া যায় না বলেই কি অন্যায় নয়?'

কদিন পরে সকালবেলায় গেস্ট হাউসে গিয়েছিলাম। ও তখনও ঘুমুচ্ছে। কিছুক্ষণ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখলাম। ও যখন ঘুমিয়ে থাকে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, তখন ওকে আরো ভাল লাগে। মিষ্টি লাগে, সুন্দর লাগে। তবে বড় অসহায় মনে হয়। মায়া লাগে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো ছোট বেলায় ওকে আরো সুন্দর আরো মিষ্টি দেখতে ছিল। তখন ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে শুতে মাসোর নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগতো। মন ভরে যেত। এখন যদি আমার মত কেউ ....

ভাবতে গিয়েও লজ্জিত বোধ করলাম। আমি নিজেই কি ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে শোবার কথা ভাবতে গিয়েছিলাম? তাই কি হয়? হবার দরকার কি?

যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই। আমি বেশ বুঝতে পারি এসব ভাবনা-চিন্তার কোন যুক্তি নেই, অর্থ নেই। কিন্তু তবুও ভাবি। ভেবেছিলাম। এই তো কয়েক মুহূর্ত আগেই ভেবেছিলাম। মানুষের মন বিচিত্র। আরো বিচিত্র মেয়েদের মন। যৌবনের মন। বিমলদার মত যারা নসদু, ভক্তর ভাল না লাগলেও বাধা দিতে পারে না। পারিনি। কিন্তু সাগরের মত যারা পাশে থেকেও দাবী জানায় না, এগিয়ে আসে না, তাদের আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। আমি ক্লিওপেট্রা না হলেও অফ ট্রয় নই ঠিকই। তবুও একজন যুবতী তো বটে। মনে হচ্ছে যেন আমি হেরে যাচ্ছি, ব্যর্থ হচ্ছি। যে পরাজয়, যে ব্যর্থতা এই বয়সে আমার মত কোন মেয়ের পক্ষেই স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। হয়ত উচিতও নয়। বসন্তে যারা আনমনা হয় না, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যই কি কালবৈশাখী আসে?

আমিও কি কোন দিন কালবৈশাখীর মত......

খুব জোরে এক বুক নিশ্বাস টেনে সাগর পাশ ফিরল। রুবিয়া ডবলের ব্লাউজের উপর দিয়ে ঘাটাউ ভয়েলের শাড়ীর আঁচল টানতে টানতে আমি দু'পা পিছিয়ে গেলাম। ধরা পড়ার ভয়ে পিছিয়ে গেলাম। মনে মনে যা কিছুই ভাবি না কেন, যত দুর্বলতাই থাকুক না কেন, সেসব প্রকাশ করতে বড় দ্বিধা, বড় সঙ্কোচ।

না, না, আর এমন করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। ওর ঘুম ভাঙাবার জন্য এগিয়ে গেলাম। উঠুন অনেক বেলা হয়ে গেল!

আবার ডাকলাম, শুনেছেন? অনেক বেলা হয়ে গেছে।

একবার, দুবার, তিনবার ডাকলাম। উঠল না। কি করব? শেষ পর্যন্ত কপালে আর হাত দিয়ে একটু নাড়া দিয়ে ডাকলাম, উঠবেন না? অনেক বেলা হয়ে গেছে!

সাগর চোখ মেলে তাকিয়েই হাসল। একটু স্বপ্ন মাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। হাসতে হাসতে তাকাল। রোগের জীবাণুর মত প্রিয় জনের অনুভূতিও সংক্রামক। প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখ হয়, সুখে আনন্দ হয়। ওর হাসি দেখে আমিও হাসলাম।

হাসছিলাম ইন্টারভিউয়ের সময়েও। কয়েকটা মামুলি প্রশ্নের পর সাগর হাসতে হাসতে বলল, এবারের প্রশ্নের জন্য মার্জনা করবেন।

'কেন মার্জনা করবার কি হলো?'

'ফ্যামিলী প্ল্যানিং নিয়ে প্রশ্ন করব বলে।' লজ্জায় ও মুখ নীচু করেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিল।

'আমার তো কোন ফ্যামিলীই নেই।'

'তাতো জানি। তবুও কিছু হয়ত বলতে পারবেন।'

'আপনি কি করে জানছেন?'

'আমি জানি না; তবে প্ল্যানিং কমিশন অনুমান করে পূর্ণা বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েদের এ সম্পর্কে কিছু জানা আছে।'

ওর কথা শুনে আমার হাসি পেল। জানতে চাইলাম, আপনার অনুমানও কি তাই?

'অনেক মেয়েই জানে। তবে......'

'আপনার কি ধারণা আমিও জানি?'

'কোন ধারণা নিয়েই কাউকে ইন্টারভিউ করি না।'

আমি এবার ওর হাত থেকে ফর্মটা নিয়ে প্রশ্নগুলো পড়লাম। ফ্যামিলী প্ল্যানিং-এর কথা শুনেছেন? কোথায় শুনেছেন? কি শুনেছেন? কি কি উপায়ে ফ্যামিলী প্ল্যানিং করা যায় জানেন? আপনি কোনটি পছন্দ করেন? অন্যগুলি পছন্দ করেন না কেন? আপনার পরিচিতাদের মধ্যে কোনটি বেশী জনপ্রিয়? আরো কত কি। পড়তে পড়তে হাসি পেল। আমি ওর কলমটা নিয়ে টেবিলে গিয়ে ঐ প্রশ্নগুলোর পাশে একটা বড় ব্র্যাকেট দিয়ে লিখলাম, সময় এলে সব প্রশ্নের উত্তর দেব। এবার ফর্মটা ভাল করে ভাঁজ করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, যত্ন করে রেখে দিন। দিল্লী গিয়ে প্ল্যানিং কমিশনে জমা করে দেবেন।

এসব সত্ত্বেও সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়েছে।

পর পর দুদিন সাগরের দেখা পেলাম না। তারপর দিন বিকেলের দিকে পিসী টেলিফোন করল, হাঁরে সাগরের খবর জানিস?

না তো।

গেল কোথায়? কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে।

তুমি কি গেস্ট হাউসে খবর নিয়েছ?

হাঁ। ওরা কিছু জানে না।

'কবে আসবেন তাও বলে যাননি?'

'না।'

'পিসী একটু থামল। তারপর বলল, ছেলেটা তো মহা চিন্তায় ফেলল।

আমিও গেস্ট হাউসে অনেকবার টেলিফোন করেছি। আমারও চিন্তা হচ্ছিল। দুশ্চিন্তা। বারান্দায় চুপটি করে বসে বসে চাকাতা রোডের দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ একেবারে গেটের সামনে একটা অটো-রিকসা থামল। সাগর নামল। হাতে একটা ছোট্ট অ্যাটাচি কেস।'

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। কি ব্যাপার বলুন তো? কোথায় গিয়েছিলেন?

সাগর একবার মিষ্টি দৃষ্টিতে আমার দিকে শুধু তাকাল।

ওর চোখে আমারও চোখ পড়ল। লজ্জা করল। দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু কতক্ষণ? এক মুহূর্ত পরে আবার ওর দিকে, ওর চোখের দিকে তাকালাম। তখনও ও ঠিক একইভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। ভাল লাগল। একটু অস্বস্তি লাগলেও ভাল লাগল। বলল, অমন করে কি দেখছেন?

ও নির্বিবাদে জবাব দিল, আপনাকে।

'কেন আমাকে দেখার কি হলো?'

'আপনার উৎকণ্ঠা মাখা মুখখানা দেখতে ভাল লাগছে।'

আমি ঘুরে বারান্দার দিকে এগুতে এগুতে বললাম, আমার মুখে আবার উৎকণ্ঠার চিহ্ন কোথায় পেলেন?

ও পিছন থেকে জবাব দিল, সর্বত্র।

ড্রইংরুমের সোফায় সাগর বসতেই বললাম, পিসী আপনার উপর দারুণ রেগে গিয়েছেন।

'কেন?'

'কেন তা বুঝতে পারছেন না?'

'না।'

'এমন করে না বলে চলে গেলে রাগবেন না?'

'না।'

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, মাসো যা মানসী থাকলে এমন করে না বলে চলে যেতে পারতেন?

কথাটা বলে আর দাঁড়ালাম না। তাড়াতাড়ি শাড়ীর ভিতরে চলে গেলাম। রান্নাঘরে। কেটলিতে চায়ের জল চাপিয়ে

CENTRAL LIBRARY

ঘরেই দেখি রান্নাঘরের দরজায় সাগর। এর আগে কোনদিন রান্নাঘরের দিকে আসেনি। এই প্রথম। ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি এখানে কেন? পারলাম না। ইচ্ছা করল না। ওকে যেন দেখেও না দেখার ভান করলাম।

'চায়ের সঙ্গে কিছু খেতে দেবেন তো? ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

সাগর আমাকে ভালবাসে না। আমাকে ওর ভাল লাগে। আমাকে পছন্দ করে। আমি জানি। জানি ওর চাহনী পড়ে। জানি ওর ব্যবহারে। সংযত ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও মনের এই কথা, চাপা দেখা প্রকাশ পায়। আমি বুঝতে পারি। স্পষ্ট করে বুঝতে পারি।

সেদিন আমাদের এখানে চা-জলখাবার খেয়ে আমরা দুজনে পিসীর ওখানে গেলাম। পিসীকে সামনে পেয়েই সাগর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, বকলেন না।

পিসী তাড়াতাড়ি ওকে দুহাত দিয়ে তুলে বললেই সাগর আবার বলল, বকবেন না তো?

পিসী না হেসে পারল না। না, না, বকব কেন?

আচ্ছা ও যদি অমন করে পিসীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, আমার কাছে কি কিছুই......

ঠিক বুঝতে পারি না আমি ওর কাছে কি চাই। কি আশা করি। প্রত্যাশা করি। কি পেলে খুসী হই। মন ভরে যায়। এসব কিছুই বুঝতে পারি না, ধরতে পারি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি ওর কাছ থেকে আরো একটু কিছু চাই। ঐ একটু কিছু পেলে ভাল লাগত। সেদিন ও রান্নাঘরের দরজায় না দাঁড়িয়ে ভিতরে আসতে পারত না? আমার দুটো হাত ধরে বলতে পারত না, বুলা, রাগ করেছ? আমি তখনও গম্ভীর হয়ে থাকতাম। তখনও কি একবার দিয়ে সাগর মুখটা তুলে ধরে বলতে পারত না, রাগ করো না? ও যদি আমাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে আদর করত তাহলেও আমি কিছু বলতাম না? বলব কেন? জানি সে আমার ক্ষতি করবে না, অমর্যাদা করবে না, সে একটু আদর করলে আপত্তি করব কেন? বরং ভালই লাগবে। এইত আদর পাবার বয়স। শুধু আদর কেন? আরো কত কি পাবার বয়স হয়েছে আমার। সে সব তো চাইছি না, চাইতে পারি না। সময় হলে পাব। নিশ্চয়ই পাব। দেব। যা দেবার তা দেব।

যখনই একলা একলা চুপ করে বসে থাকি, রাতে শুয়ে থাকি, জানলা দিয়ে দূরের আকাশের তারা দেখি, দৈত্যের মত বিরাট কালো কালো পাহাড় দেখি তখন যত আজে-বাজে চিন্তা মাথায় আসে। কাউকে কিছু বলতে পারি না, বোঝাতে পারি না। প্রাণ খুলে কথা বলব, এমন কেউ নেই। বাড়ীর একমাত্র মেয়ে বলে বাবা-মা ভালবাসেন। খুব ভালবাসেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে তো মনের কথা বলা যায় না। তবু মা থাকতে দিনটা গড়িয়ে গড়িয়ে কাটত। এখন তো সারাদিন বোবা হয়ে বসে থাকি। পিসীর কাছে গেলে ভাল লাগে। কিন্তু পিসী তো পিসী। এখানে আমার সমবয়সী একটাও বাঙালী মেয়েকে পাইনি। বাবার অফিসের দু-একটা ছোকরা প্রথম প্রথম একটু ঘুর ঘুর করত। দুর্গা বাড়ীর লাইব্রেরীতে গেলে অর্ডি-ন্যান্স ফ্যাক্টরীর কিছু ছেলে অকারণে কথাবার্তা বলে আলাপ করত। দু-একজন ধুতি পাঞ্জাবী পরে রোমান্টিক দৃষ্টিতে চাইত। ওসব ভাল লাগতো না। এখনও লাগে না। একটা বিচিত্র শূন্যতার মধ্যে সাগর এলো। এলো কিন্তু ভিতরে ঢুকল না, দরজায় এসে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভিতরে আসার আমন্ত্রণ জানাইনি কিন্তু ভিতরে আসতেও তো মানা করিনি। আপত্তি করিনি। বাধা দিইনি। তবে কেন ও দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল? জানলা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি ও কি ঐ তারাগুলোর মত শুধু মিট মিট করে দেখবে? কাছে আসবে না? কাছে আসতে পারে না?

সাগর চলে গেলে কি করব? এই কটা দিন শেষ হলেই তো ও চলে যাবে। আর আসবে না। আমার দরকার হবে না। সেদিন কথায় কথায় বলেই ফেললাম, এবার তো আপনার যাবার সময় হয়ে এলো।

'এখনও অনেক দেরী।'

'অনেক দেরী মানে?'

'তিন সপ্তাহ তো নিশ্চয়ই।'

'তিন সপ্তাহ তো দেখতে দেখতে কেটে যাব।'

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব? যা ভাবছি, যা বলতে পারলে নিজে হাল্কা হতাম, তাতো বলতে পারছি না। পারব না। চুপ করেই রইলাম।

সাগর জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ আমার যাওয়ার ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ শুরু করলেন কেন?

'এমনি ভাবছিলাম আপনি আর কদিন আছেন।'

'কেন আমি চলে গেলে দুঃখ হবে?'

'আনন্দ হবে।'

ও হাসল। আনন্দ হবার কোন কারণ নেই, তা আমি জানি।

'কেমন করে জানলেন?'

'জানি কিন্তু বলতে পারব না।'

'আচ্ছা তিন সপ্তাহেই আপনার এখান-কার কাজ শেষ হবে?'

'হওয়া উচিত।'

'কাজ শেষ হলেই চলে যাবেন?'

'কেন? কাজ শেষ হলেও যাব না?'

'যাবেন না কেন? তবে কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবার কোন মানে হয় না।'

'হয় না?'

'—না।'

'তবে কি করব?'

'কি আবার করবেন? কাজ শেষ হবার পর কয়েকদিন একটু বিশ্রাম করবেন, একটু ঘুরবেন-ফিরবেন, তারপর যাবেন।'

'কদিন?'

'দশ-পনের দিন।'

'দশ-পনের দিন পরে গেলে আপনি খুশী হবেন?'

'শুধু আমি কেন, সবাই খুশী হবেন।'

'আমি আপনার কথা জানতে চাইছি।'

'আপনি থাকলে আমার কি ক্ষতি?'

'তা জানি। জানতে চাইছি আপনি খুশী হবেন কি?'

'আপনি থাকবেন কিনা তাই বলুন।'

সাগর একটু ভাবল। গভীরভাবে ভাবল।' তারপর বলল, কাজ শেষ হবার পরও সপ্তাহ খানেক থাকব তবে তাতে আপনি খুশী হবেন না। বরং আরো খারাপ লাগবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

ও হাসল, কেন? এবার একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার প্রতি আপনার এই সমবেদনা যে তখন আরো খারাপ লাগবে।

সমবেদনার মধ্যে কিছুটা কৃপা মেশান থাকে। কিছুটা ঔদার্য প্রচারের ব্যবস্থা থাকে। কিছুটা দম্ভ লুকিয়ে থাকে। আমি তা চাই না। সাগরকে কৃপা করব কেন? কৃপা দেখিয়ে ওকে ছোট করব কেন? এমন সুন্দর একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাক, ব্যর্থ হয়ে যাক, তা আমি চাই না। ও সারা জীবন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে, শূন্য মন নিয়ে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি সহ্য করতে পারব না। আমি যেখানেই থাকি না কেন, যার সঙ্গেই আমার বিয়ে হোক না কেন, সাগরের কথা আমি না ভেবে পারব না। প্রকাশ্যে না পারি লুকিয়ে লুকিয়ে ভাববো। একলা একলা ভাববো। স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে ভাববো। ছেলেকে কোলে করে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে ওর কথা ভাবতেই হবে। হয়ত খুব কৃতি পাত্রের সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে কিন্তু তার কপালে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙালে সে কি অমন স্নিগ্ধ মিষ্টি পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার দিকে চাইবে? সে কি আমার হাতের এক পেয়ালা চা খাবার জন্য অমন করে অনু-রোধ করবে? আমার স্বামী নিশ্চয়ই অনেক টাকা রোজগার করবে। আমাকে দামী দামী শাড়ী কিনে দেবে, নিজের মান-মর্যাদা-ঐতিহ্যের জন্য কিনে দেবে কিন্তু অত দিলেও কি সে মনে মনে তৃপ্তি পাবে? হয়ত গাড়ী চড়ব কিন্তু বোটানিক্সের পাশ দিয়ে পাম-পাইনের ছায়ায় ছায়ায় ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পিসীর বাড়ী যেতে যে আনন্দ পেয়েছি, তা কি পাব?

(ক্রমশঃ)

মনের কথা

অমরত্ব প্রসঙ্গে সরলবাবুর চিন্তা

—ট্রামরাস্তার ধারে বাড়ী। রাত বারোটা অবধি চলে ট্রাম বাস ট্যাক্সি প্রাইভেট গাড়ীর একটানা স্রোত। বিছানায় শুয়ে মনে হয় যেন কোনো জংশন স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে আমার নির্দিষ্ট ট্রেনের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ এক সময় টের পাই—সব-কিছু থেমে গেছে। প্যাসেঞ্জারেরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, সবুজ আলোর সিগন্যাল না দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার গন্তব্য স্থানে যাওয়া আর হলো না। তন্দ্রার ভাব কেটে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। সামনের বারান্দায় গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাই। স্রোতহীন, জনযানবহীন রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অজানা এক আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসে। বুকের কাছে একটা মৃদু চিনচিনে ব্যথা অনুভব করি, পা-দুটো ভারী হয়ে ওঠে, হাত দিয়ে বারান্দার রেলিংটা চেপে ধরি। সারাটা শরীরে একটা শিরশিরে ভাব, কেমন যেন একটা অস্বস্তি। আমি বুঝতে পারি না কেন ভয় পাচ্ছি।

সরলবাবু কথাগুলো বলে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন। চুয়াল্লিশ বছর বয়স, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, চোখে-মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। একটা ব্যাঙ্কের সিনিয়র অফিসার। দুই কন্যা ও স্ত্রী নিয়ে ভবানীপুরের দিকে বড় রাস্তার উপর একটা দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। এই ফ্ল্যাটে মাত্র কয়েক সপ্তাহ এসেছেন। এর আগে শিয়ালদার দিকে গলির মধ্যে একটা বাড়ীতে থাকতেন। এখানে এসে অবধি টেনশন ও নিদ্রাহীনতায় ভুগছেন। রাতে ভালো ঘুম হয় না, খিদেও তেমন নেই। ব্যাঙ্কে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়, ভুলচুক হলে খুবই বিপদ। কাঠ অফিসার বলে সুনাম আছে। ভয় হচ্ছে, সেই সুনাম বুঝি আর থাকে না। অফিস থেকে বাড়ী এসে খালি মনে হয় বোধহয় ভুল করে এসেছেন। পার্টির কাগজপত্রগুলো বোধহয় খুঁটিয়ে দেখা হয়নি; সইটা বোধহয় ঠিক ভেরিফাই করা হয়নি, স্টক-এর দামটা বোধহয় বেশী করে ধরেছেন; এইরকম নানা চিন্তা করতে করতে তন্দ্রা আসে। তন্দ্রার ঘোরে আজেবাজে স্বপ্ন দেখেন। মৃত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের স্বপ্ন। তারপর মনে হয় কোনো জংশন স্টেশনে গাড়ী বদল করার জন্যে তিনি অপেক্ষারত। ঘুম ভেঙে যায়, বারান্দায় এসে ঘুমন্ত রাস্তার দিকে তাকিয়ে অজানা আতঙ্কে সারা শরীর ভারী হয়ে ওঠে। অতিকষ্টে বারান্দা থেকে ঘরে এসে আলো জ্বালেন। রাত তখন দুটো। ঘুমের ওষুধ খেতেও তাঁর ভয় হয়। কিডনীর ক্ষত হবে বা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে, এ-ভয় নয়। তাঁর ভয় ঘুম না ভাঙার। যদি ওভারডোজ হয়ে যায়, যদি আর ঘুম না ভাঙে এই ভয়ে তিনি ঘুমের বড়ি পারতপক্ষে খেতে চান না। অবশ্য একেবারে যে খান না, এমন নয়। তাতে ফল বিশেষ হয় না। দুটোর কাছাকাছি বড়জোর তিনটের সময় ঘুম ভাঙে। তিনি মনে করেন, এই বাড়ীতে আসার কয়েকদিন পরের একটা ঘটনার সঙ্গে হয়তো ঘুম না হবার কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে। ঘটনাটা এমন কিছু নয়, তবু ডাক্তারকে বোধহয় জানানো দরকার। তাঁর এক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। শবানুগমন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, এগুলোকে তিনি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলেন। এসব বিষয়ে তাঁর মতামত বেশ র‍্যাডিক্যাল। মৃত্যুর পর এইসব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার এইসব লোকে, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অর্থহীন। মৃতকে স্মৃতির মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার এই নিষ্ফল চেষ্টার কোনো মানে হয় না। তিনি মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বলেন এসব কথা। তাঁর মৃত্যুর পর যেন সৎকার সমিতির গাড়ী করে সোজা কেওড়াতলার বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তাঁর দেহ সমর্পণ করা হয়। শ্রাদ্ধশান্তি শোকসভা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো যেন অনুষ্ঠিত না হয়। স্বর্গের অধিকারী পুরোহিত নেই বলে তাঁর কোনো দুঃখ নেই। পুন্নামক নরক থেকে পরিত্রাণের প্রয়োজন তাঁর হবে না। শোকসভায় মিলিত হবার মত তত বন্ধুর দল অবশ্য তাঁর নেই, কাজেই এ-সম্বন্ধে বিধান না দিলেও চলে। তবে যদি রিটায়ার করার আগে মৃত্যু হয়, অফিসের ছেলে-ছোকরারা একটা হাফ-হলিডে পাবার চেষ্টায় শোকসভাটভা ডেকে বসতে পারে। এবিষয়ে তাদের অবশ্য কোনো কিছু বলা চলে না। বলতে যাওয়া ছেলেমানুষী। তবে সুযোগ পেলে আলোচনাসূত্রে নিজের লাস্ট স্টেটমেন্ট তিনি অনেকবার অনেককে শুনিয়েছেন। এইসব কারণে শবানুগমন, শ্রাদ্ধবাসর, শোকসভা ইত্যাদি মৃত্যুপ্রসঙ্গিত সবকিছুর থেকে তিনি দূরে থাকতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্ত্রীর খুড়-তুতো ভাইয়ের শ্রাদ্ধবাসরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। বকুলপুর থেকে সারাদিনের দুর্ভোগের পর নতুন ফ্ল্যাটে যখন ফিরে এলেন, তখন রাত প্রায় বারোটা। স্ত্রী-কন্যাকে রেখে একা গাড়ী করে ফিরলেন। কোলকাতা প্রায় নিঝুম হয়ে আসছে। হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় এলেন, ট্রামরাস্তাটাকে ঘুমন্ত অজগরের মত দেখাচ্ছে, রাস্তার আলোগুলো নিষ্প্রভ। তাঁর মনে হল, অতীতের সেইসব মানুষের কথা, যারা একদিন এই রাস্তা দিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দবেদনা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে হেঁটে গেছে। সংখ্যায় এরা কত হবে? এই রাস্তাটার বয়স কত? রোজ এই রাস্তা দিয়ে কত লোক চলাচল করে? তাদের মধ্যে কতজন কত বছর বেঁচে থাকে? এই পথচারীদের মৃত্যুহার কত? মৃতদের কজনকে আপন-জনেরা মনে রেখেছে? কজনের বাৎসরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে? এইসব আবোল-তাবোল কথা মনে আসতেই সরল-বাবুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। সারারাত

প্রায় জেগে কাটালেন। পরদিন অফিসের চাকার দাঁতে আটকে গিয়ে নিজস্ব আহ্নিকগতিতে ঘূরপাক খেতে খেতে এসব চিন্তা থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি পেলেন। কিন্তু সেইদিনই প্রথম বোধহয় মনে হল যে, কাজে ভুল হয়ে যেতে পারে। কাগজপত্র বারবার খুঁটিয়ে দেখলেন, সই করার আগে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। সন্ধ্যায় বাড়ী এসে দেখলেন, স্ত্রী-কন্যা ফেরেননি। সেই সন্ধ্যাতে নাও ফিরতে পারেন, এরকম আভাস স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন; তা সত্ত্বেও তাঁদের জন্য উদ্বেগে রাত কাটলো। ঘুম ভেঙে গেল রাত দুটোয়। স্ত্রী-কন্যা সুস্থশরীরে বহাল তবিয়তে পরের দিনই ফিরে এলেন। কিন্তু উদ্বেগের ভাব কাটলো না। এখন তাঁর মনে হচ্ছে ঐ শ্রাদ্ধবাসরে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।

—ওখানে যাওয়াটাই বোধহয় ভুল হয়েছে। বায়ুভূতোনিরাশ্রয় বিদেহী আত্মাকে খাদ্যবস্ত্রশয্যা দিয়ে শ্রদ্ধা দেখানোর মত হাস্যকর ব্যাপারের ট্র্যাজিক দিকটা সেইদিন প্রথম নজরে পড়লো। এতদিন মনে হতো এসব বুঝি শুধু ব্রাহ্মণদের রুজিরোজগারের একটা ফিকির। সংহিতাগুলোর বিধান ঐ পরগাছা-শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার একটা কৌশল। চার্বাকী মনে সেদিন প্রথম ধাক্কা লাগলো। মৃতের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, যাজক-পুরোহিত সবার মধ্যে লক্ষ্য করলাম অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে আচারানুষ্ঠান, রিচুয়াল পালনের এক ঐকান্তিক আগ্রহ। মৃতকে সত্যিই বুঝি তারা মনে রাখতে চায়, অমর করতে চায়। এই অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দেখতে পেলাম প্রত্যেকের অমরত্বের কামনা। যে-অমরত্ব তারা কোনো-দিনই পাবে না, সেই দুর্লভ অমরত্বের কামনা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধশান্তি, শোকসভার অনুষ্ঠান, তাঁদের মনে রাখবার প্রতি-শ্রুতিও এ-সবের মধ্যে রয়েছে বিস্মৃতির অতলগহ্বরে তলিয়ে যাবার ভয় থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা।

সরলবাবুর সঙ্গে দুদিনের আলোচনায় আরো অনেক তথ্য সংগৃহীত হলো। তাঁর মনের আরো অনেক কথা জানতে পারলাম। তাঁকে অনেকটা বুঝতে পারলাম।

সরলবাবু মতবাদে অতি-আধুনিক। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মাপরমাত্মা ইত্যাদি সেকেলে অন্ধবিশ্বাস কাটিয়ে উঠেছেন ছাত্রজীবনে। অজ্ঞাবাদী নন, পুরোপুরি জড়বাদী। মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না—এ-কথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। সন্তানসন্ততির মধ্যে জীবনধারাকে প্রবাহিত রাখে ব্যক্তিমানুষ সহজাত বংশ-রক্ষা প্রবৃত্তির বশে। আত্মরক্ষা ও বংশ-রক্ষা এই দুই প্রবৃত্তির অধীন প্রতিটি মানুষ। প্রেম স্নেহ ইত্যাদি মানসিক ধর্ম ঐসব প্রবৃত্তির উদ্গতির (সাব্লিমেশন) ফল। পদার্থবিদ্যার কৃতী ছাত্র সরলবাবু দেহাতীত কোনো কিছুতেই বিশ্বাসী নন। মানুষের মহত্ব তিনি স্বীকার করেন না। মানুষের আচার-ব্যবহার, চলাফেরা কতক-গুলো রিফ্লেক্সের সমষ্টি। তিনি ব্যবহারবাদী (বিহেভিয়ারিস্ট) মনস্তত্বে বিশ্বাসী। মানুষের মনের মধ্যে কি ঘটছে না ঘটছে এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন আগে তিনি অনুভব করেননি। ব্যবহার দিয়ে তাকে বিচার করতে হবে। একটি বিশেষ উদ্দীপক একটি নির্দিষ্ট ব্যবহার সৃষ্টি করে। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা তার ব্যবহারে নিয়ন্ত্রিত করে না। সে একটা যন্ত্রের মত, একটা বিশেষ পরিবেশে এক বিশেষভাবে সাড়া দিতে বাধ্য। স্বাধীনতা তার নেই। বিচারশক্তি প্রয়োগে করছি—এই মিথ্যা অহংকার পোষণ করা তার পক্ষে উচিত নয়। জীবমাত্রেই পরিবেশের অধীন। বিশেষ পরিবেশে নির্দিষ্ট ব্যবহার ছাড়া, অন্য কিছু করার উপায় বা সামর্থ্য তার নেই। জন্ম-মৃত্যু মৈথুন, সবই যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে: আর এরই যোগফল হলো জীবন। এমন কোনো কাজ মানুষ করে না, যার জন্যে তাকে ঘৃণা করা যায় বা শ্রদ্ধা করা যায়। যন্ত্রের মত পরিবেশচালিত তার ব্যবহারের জন্যে তাকে প্রশংসা করা বা নিন্দা করা বোকামী। স্মৃতি উদ্‌যাপন, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সেই কারণে নিরর্থক। তাছাড়া, সত্যিই কি আমরা কাউকে চিরকাল মনে রাখতে পারি? যতই মহান সৃষ্টির অধিকারী হোক না কেন, কোনো যুগের কোনো ব্যক্তিমানুষ, তার সেই সৃষ্টির কথা কতদিন মানুষ মনে রাখতে পারে? প্রস্তর যুগের কি মহাপুরুষ ছিল না? সেই যুগের মানুষের কল্যাণ কামনায় কি কেউ নিজেকে উৎসর্গ করেনি? সে-যুগে কি কেউ শহীদ হয়নি? তার, সেই যুগের মানুষ তো চেয়েছিল তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। তার স্মৃতির দীপ অম্লান রাখতে। তার মৃত-দেহকে গুহার মধ্যে সযত্নে স্থাপন করে-ছিল, তার আত্মার জন্যে সংরক্ষিত রেখে-ছিল নানা ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, প্রস্তরগাত্রে তার পরিচয়কীর্তি নিজেদের কোনো সাংকেতিক লিপিতে নিশ্চয়ই লিখে রেখেছিল। কোথায় সেই পরিচয়? আমরা কি সেই লিপি উদ্ধার করে সেই মহাপুরুষদের কথা মনে আনতে পারি? সেদিনের ভার্জিল হোমর ব্যাস বাল্মীকি দু-চারজনকে কিতাবী পণ্ডিতরা ছাড়া আর কেউই মনে রাখছে না। তাজমহল রচনা পণ্ডশ্রম, অমর কাব্য রচনা মহাভ্রম। অবশ্য সরলবাবু জানেন, ওগুলোও রিফ্লেক্স। যারা মূর্তি গড়ছে, কাব্য রচনা করছে, শহীদ হচ্ছে, তাদের ওসব না করে উপায় ছিল না। সময়সাগরে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যেতে চায় না ব্যক্তিমানুষ। বংশরক্ষাপ্রবৃত্তির তাগিদে মানবজাতির জীবনধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায়, আবার আত্মরক্ষার তাগিদে একক ভাবেও বেঁচে থাকতে চায়। এই মরার পরে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা এবার তিনি লক্ষ্য করেছেন খুড়শ্বশুরের ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যে। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন যে, ঐ ঘটনাটির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই; এখন মনে হচ্ছে তাঁর এই আতঙ্ক অনুভূতি ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি থেকেই এসেছে।

সরলবাবু সত্যিই সরল মানুষ। অকপটে স্বীকার করলেন, তিনি জীবনে সুখী হননি। কাজ তিনি খুব মন দিয়ে করেন বটে, মাহিনাও মোটা পান; কিন্তু মনে হয় এ-কাজের জন্যে তাঁর মত প্রতিভার দরকার ছিল না। পরমাণু-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ, ঐ লাইনে গবেষণা করার বিশেষ ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পরিবেশ (ভাগ্য নয়!) বাদ সাধলো। শেষ পরীক্ষার ফল বেরুবার আগেই পরি-বারের জন্য কোনো রকম সঞ্চয় না রেখেই অবিবেচক পিতৃদেব দেহরক্ষা করলেন। চাকরীতে বাধ্য হয়েই তাঁকে ঢুকতে হলো সহকর্মীদের নিতান্ত সাধারণ পর্যায়ের মনে হয়। তাদের কাউকেই তিনি শ্রদ্ধা করতে পারেন না। মানুষমাত্রেই ঐরকম। বুদ্ধিহীন, আত্মপ্রচারে উন্মুখ। বিয়েটাও খুব সুখের হয়েছে বলা চলে না। স্ত্রী 'পদাপূজা' রোগে ভুগছেন। সারা দুপুর গাড়ী নিয়ে মার্কেটিং করে বেড়ান। অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনেন আর আল-মারীজাত করেন। ঐগুলো মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি বহন করে তাঁকে অমর করে রাখবে এই তাঁর কামনা। এই ছেলেমানুষী অমরত্বিলাসী স্ত্রীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাল-বাসা যায় না। মেয়েদুটির বয়স যথাক্রমে বারো ও সাত। ইংরিজী মিডিয়ম স্কুলে পড়ছে। তাদের মধ্যেও পদাপূজা রোগ সংক্রমিত করেছেন তাদের মাতৃদেবী। নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে স্ত্রীর সঙ্গে সারা-দিনরাত্রে দু-একবারের বেশী দেখা হয় না। শোবার ব্যবস্থা এই বাড়ীতে পৃথক হবার ফলে দেখাশোনা কম হচ্ছে। দেখাশোনা যদিও হয়, কথা-বার্তা কিছুই হয় না। বিল, ব্যালান্স, ঠাকুর-চাকরের মামুলি কথা বলেই আমাদের বাক্যভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়। স্ত্রী মেয়েদের নিয়ে হয় পার্টিতে বেরিয়ে যান, অথবা রেডিওগ্রাম নিয়ে বসেন। বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে দেমাকী মনে করে এড়িয়ে চলে, তিনিও ঠেকে বন্ধুত্ব রাখবার

প্রয়াস করেন না। সরলবাবু নানা ধরনের বই কেনেন ও রাত এগারোটা অবধি সমানে পড়াশুনো করেন। শুধু প্রাণ্ড লোকসভা নয়, সামাজিক সবরকম অনুষ্ঠানই তিনি এড়িয়ে চলেন। তাঁর হয়ে স্ত্রী-কন্যারাই সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। এই নতুন বাড়ীতে আসার পর থেকে ঘুম চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনার অভ্যাসও কেটে বসেছে।

এইবার সরলবাবুর জীবনকাহিনী থেকে তাঁর বর্তমান অসুস্থতার সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা যেতে পারে। নিজের ইচ্ছাকে কার্যকরী করবার চেষ্টা সরলবাবু কোনোদিন করেননি। তিনি যেরকম রেজাল্ট করেছিলেন, তাতে মনে হয় চেষ্টাচরিত্র করলে একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে বিদেশ গিয়ে পরমাণুবিজ্ঞানের চর্চা তিনি করতে পারতেন। তার জন্যে যে কষ্টস্বীকার বা সামান্য ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন ছিল, তা করার মত জোরালো ইচ্ছাশক্তি তাঁর ছিল না। সহজে চাকরী পেয়ে নিশ্চিন্ত জীবনের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তিনি গা ঢেলে দিলেন। সামাজিক মর্যাদা ও যৌতুকের লোভে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করলেন এবং নিজের এই দুর্বলতা ও লোভ নিজের কাছে অস্বীকার করার তাগিদে স্ত্রীকে ভালো চোখে দেখলেন না, ভালোবাসতে পারলেন না। স্ত্রীর রুচিবিকৃতি ও পরশ্রীকাতর মোহ তিনি কোনোদিন দূর করার আন্তরিক প্রচেষ্টা করেননি। সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সহানুভূতির সঙ্গে এই বুর্জোয়া সমাজের পরশ্রীকাতর প্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেননি। নিজের ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কথা ভেবেই বোধহয় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে চাননি। নিজেকে বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে, সব মানুষই বোধহয় তাঁর মত দুর্বল, পরিবেশের দাস। পরিবেশকে বদলে, পরিবেশের উপর আধিপত্য করেই মানুষ সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, এই সহজ কথাটি পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্রটির একবারও মনে পড়েনি। মানুষের ইতিহাস মানেই পরিবেশকে জয় করার ইতিহাস। এই সত্যটিকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন ও দার্শনিক তত্ত্ব খাড়া করে নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। সাধারণ মানুষ শাস্ত্রের ইচ্ছাকে বারবার বাগাড়ম্বরে আলোচনার মধ্যে টেনে এনেছেন—এ থেকে আমার মনে হয়েছে তিনি নিজে মনের মধ্যে অমরত্ব লাভের আশা পোষণ করতেন। পারমার্থিক বিজ্ঞানে নতুন অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন—এই ধরনের কোনো আশা গোপনে সযত্নে তিনি লালন করেছিলেন। হিরোশিমার ধ্বংস তাঁকে ছাত্রজীবনে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। চাকরী-জীবনে তিনি নিরাপত্তা পেয়েছেন, কিন্তু খ্যাতি অর্জনের সব সুযোগ-সুবিধা সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই চাকরীর উপর আকর্ষণ থাকলেও, চাকরীতে আনন্দ নেই। জগৎবিখ্যাত হয়ে মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার সকল সম্ভাবনা নিঃশেষিত বলেই, তিনি অমরত্ব প্রয়াসীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তাদের মূঢ়তায় মুহ্যমান। তাঁর মত আশাহত দুর্বল মানুষেরাই সিনিক হয় অথবা সিনিকত্বের ভান করে। নিজের (উচ্চাশার) ব্যর্থতা সম্বন্ধে সব সময়েই সজাগ, তাই সব-কিছুকে হেয় করার চেষ্টা। মহত্ত্বকে অস্বীকার করা, মানুষের মধ্যে শুধু যান্ত্রিক বা জৈবপ্রবৃত্তির আধিপত্য দেখা, —এসবই তাঁর নিজে মহৎ না হতে পারার বেদনাবোধের অভিব্যক্তির ফল। তিনি নিজের চিন্তায় এতই বিভোর যে, অন্যকে ভালবাসার, অন্যকে নিয়ে চিন্তা করার পর্যন্ত তাঁর সময় নেই। স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণকে তাই সযত্নে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা। নিজে বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-কন্যা সবার থেকে আলাদা, তাই প্রথম যৌবনের আশাভঙ্গের বেদনার তীব্রতা।

এইবার আমাদের জানা দরকার নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর থেকেই তার ব্যর্থতার বিকার আকারে দেখা দিল কেন? তিনি নিঃসঙ্গ, নিজের ইহজীবনে অতৃপ্ত, তাই পরজীবনের (যাকে তিনি অবিশ্বাসী বলে জাহির করেছেন) প্রতি আকৃষ্ট। আকর্ষণ প্রবল তাই আকর্ষণের বস্তু (লোকসভা, শ্রাদ্ধবাসর ইত্যাদি) থেকে সযত্নে দূরে দূরে থাকার প্রচেষ্টা। সিঁথির বাড়ী থেকে ভবানীপুরের বড় রাস্তার ফ্ল্যাটে আসায় অভ্যস্ত (স্টেরিওটাইপ) জীবনধারার ব্যতিক্রম ঘটেছে। স্ত্রীর থেকে পৃথক ঘরে অবস্থান তাঁকে আরো বেশি আত্মমুখীন করেছে। শ্রাদ্ধবাসরের অনুষ্ঠানাদি তাঁর মনের অবচেতনের সুপ্ত-বাসনাকে জাগিয়ে তুললো। এই সময় চোখে পড়লো অস্পষ্টভাবে আলোকিত শ্মশানঘাটের জ্বলন্ত ছবি। সারাদিন জীবনবন্যার আন্দোলনে কাঁপতে থাকে যে পথ, মধ্যরাত্রে তার অসহায় নিঃসঙ্গ মূর্তি দেখে মৃত্যুচিন্তা ও সেই সূত্রে অন্যান্য বিষাদচিন্তা তাঁর মনে এলো। সরলবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

—অলোকির

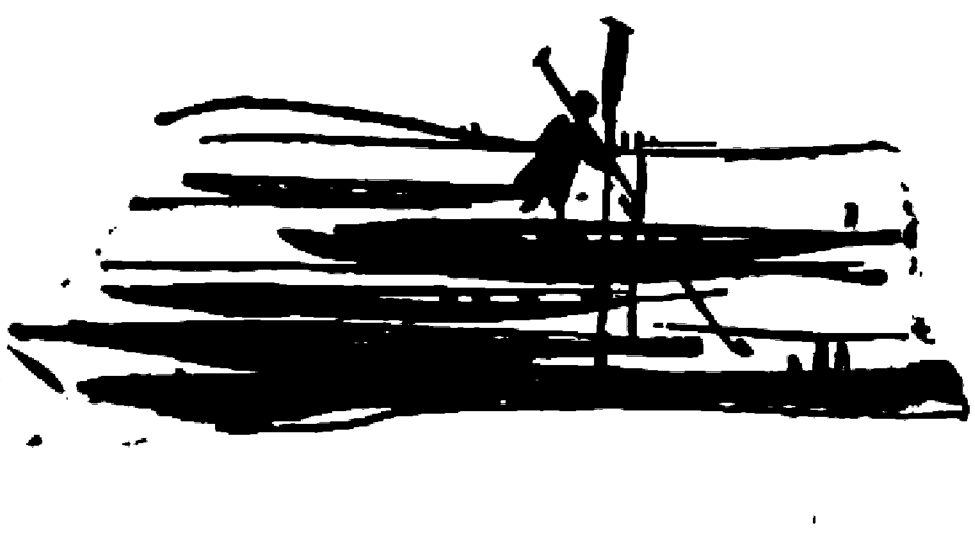

টান

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলা পা ঘষছিল। কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে গেলেই মন্টুর সঙ্গে দেখা হবে। মন্টুরা সকাল থেকেই চায়ের দোকানে আড্ডা জমায়। নীলাকে দেখা মাত্রই মন্টু একলাফে দোকান থেকে রাস্তায় আসবে এবং কমলদের বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত পাশে পাশে হাঁটবে। ওর বন্ধুরা নানারকম মন্তব্য করবে। ইদানীং ওর বন্ধুরা সকলেই জেনে ফেলেছে বলে প্রকাশ্যে ফষ্টিনষ্টি করতে ওদের বাধে না। অথচ বাজারের রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক ঘুর হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। পরীক্ষার সময় একটু চেপে না পড়লে কলেজটা পাশ করতে পারবে না। আর পাশ করতে না পারলে তিরিশ টাকার টিউশনিটা হাতছাড়া হবে। অথচ এই সাতসকালেই মন্টুর মুখোমুখি হতে নীলার ইচ্ছে করছিল না।

নীলা বাজারের রাস্তাই ধরল। হোক গে খানিকটা দেরি। তবু তো সকলের শোনদৃষ্টি থেকে বাঁচা যাবে। ইদানীং পাড়ার বুড়োগুলোও কেমন ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। কে জানে নীলা চলে যাবার পর ওরা কি আলোচনা করে!

মন্টু উসখুস করছিল। সাতটা বেজে গেল এখনও নীলার পাত্তা নেই। মন্টু আর এক ভাঁড় চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বাবলু মন্টুর গা ঘেঁষে বসল 'কী গুরু ঠিক মেজাজ আসছে না?' মন্টুর রাগ হচ্ছিল, এমন একটা টেনশানের সময় বাবলুর জোলো কথায় মন্টু কান দিল না। পিনকু মন্টুর ডান হাত। পিনকুর দিকে তাকিয়ে জিগেস করল 'কি ব্যাপার বলত, আজ কি নাগা মেরে দিল নাকি?' পিনকু যেন এইকথাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, 'এক চক্কর ঘুরে দেখে আসব নাকি? না দরকার নেই, রেগে যাবে। মনে হয় বাড়িতেই আটকে গেছে। সন্ধ্যের দিকে তো দেখা হবে।'

'গুরু আজ পকেটে একেবারে জি টি রোড। তুই শালা আজকাল কেমন হয়ে গেছিস। প্রেম-ট্রেম করলে সবাই বোকা বনে যায়। আর ওই ভিজেভিজে মেয়েটার জন্যে অত ভাবনা-চিন্তার কি আছে? মুখের কথা খসালে পুরো পাড়াটাই এনে হাজির করে দিতে পারি।' ভাবু বেশ উত্তেজিত হয়েই কথাগুলো বলে যাচ্ছিল 'তোর জন্যে বৃষ্টি মোল্লার সব ভাব মেরে যাবে।'

মন্টু এ কথার কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। পিনকুকে বলল, 'আমার জামাটা ইস্ত্রি করিয়ে রাখিস।' ভাবু গলার স্বর কমিয়ে জিগেস করল 'আজ রাতে তাহলে বেরোবে তো গুরু?' মন্টু বলল, 'আজ থাক, কাল দেখা যাবে। তবে তোরা যদি যেতে চাস যা।' মন্টু উঠে দাঁড়াল, 'আমার একটু কাজ আছে, আমি বেরোচ্ছি।'

সন্ধ্যের অনেক আগেই পাটভাঙা জামা-প্যান্ট পরে অপেক্ষা করছিল মন্টু। একবার ভাবল নীলার সঙ্গে দেখা হলে নিজের থেকে কথাই বলবে না। কিন্তু তাতেও তো কোন লাভ নেই। নিজের থেকে কথা না বললে নীলা হয়ত চুপচাপই

ছাটবে। মাঠ থেকে খানিকটা সময় নষ্ট হবে। নীলার মত মেয়ে ওকে ভালবাসবে এটা ওর চিন্তার বাইরেই ছিল। ফলে প্রথমদিকে ভরসা করে হাত বাড়ায়নি। তারপর নীলাই একদিন ওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করল। সেদিন নীলাকে একটা বাচ্চা মেয়ের মত লেগেছিল মন্টুর। ওর হাত চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল নীলা। কী হবে মন্টুদা, তুমি আমার মাকে বাঁচাও। তিনবার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গেছি কিছুতেই আসতে চাইলেন না। বললেন রাত্রে কল যাওয়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি। তাছাড়া গলির ভিতর মধ্যে তো যেতেই পারব না।' মন্টু সেদিন রাত দেড়টার সময় লরেন্স নিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে এনে হাজির করেছিল। সেই থেকে নীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। যে কোন প্রয়োজনে মন্টু হাজির। আর নীলারও যেন একটা টান পড়ে গিয়েছিল মন্টুর ওপর।

সন্ধ্যার একটু পরেই নীলা এসে দাঁড়াল পার্কটার কোণে। মন্টু দূর থেকে দেখছিল নীলা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মন্টু টুকটুক করে এসে নীলার সামনা-সামনি দাঁড়াল। নীলা হাঁটতে সুরু করল। মন্টুও পাশাপাশি। কেউই কোন কথা বলছে না। মন্টুর অসহ্য লাগছিল। থাকতে না পেরে নিজেই বলে ফেলল 'সকালে টিউশানি যাওনি?' 'না' খুব শান্ত গলায় উত্তর দিল নীলা। যেন কিছুই হয়নি। সকালে নির্দিষ্ট দেখা হওয়ার ব্যতিক্রম যেন ওর কিছুই মনে হয়নি। 'তার মানে? আমি তো ঠায় চোখ রেখে বসেছিলুম দোকানে।' 'বাজারের রাস্তা দিয়ে গেছি। তোমার বন্ধুরা সব বসে থাকে, হাংলার মত তাকায়, কমেন্ট করে আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া দিনের দিকে তোমার সঙ্গে হাঁটলে পাড়ার বুড়োরাও ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে দেখে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মন্টু। তাহলে ওকে এড়িয়ে যাবার জন্যে নীলা এটা করেনি। করেছে দুজনের কথাই ভেবে! ভালই করেছে। দুদিন পরে নীলা বৌ হয়ে তার ঘরে আসবে আর তাকে নিয়ে পাড়ায় বিচ্ছিরি বদনাম রটে যাওয়া কি ভাল! তার চেয়ে এই বেশ। সন্ধ্যের পর পাড়া ছাড়িয়ে দূরে কোথাও গিয়ে কাছা-কাছি বসা, চেনাশোনা কোন লোকজন নেই, স্বচ্ছন্দে মনের কথা বলা যায়। নীলাও খানিকটা সহজ হয়ে কথা বলতে পারবে।

ওরা পাড়া ছাড়িয়ে হাঁটছিল। খানিক দূরেই রেল লাইন, তারপরই মাঠ। নীলার অনেকদিনই ইচ্ছে করেছে মাঠে মাঠে হেঁটে বেড়াতে, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মাঠে বেড়াতে গা ছমছম করবে।

মন্টু নীলার কাঁধে হাত রাখল। 'জান আজকাল আর ওসব কাজে মন সরে না। আমি জানি তুমি যেমন আমায় ভালবাস তেমনি ঘেন্নাও কর। কি করব বল ছেলে-গুলো ছাড়ে না। ওদের মতে করে তালিম দিয়েছি আমি। একেবারে সরে গেলে ওরা বেইমান বলবে। যখনই তোমার কথা ভাবি তখন কেবলই মনে হয় এই নোংরা কাজ ছেড়ে দেব। কল-কারখানায় কি কোন পিওনের কাজও এর থেকে ভাল। কিন্তু পাচ্ছি কই। হাজার হাজার শিক্ষিত ছেলে হ্যা হ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পিওনের চাকরী পেলে বর্তে যায়, সেখানে আমার মত আকাট মুখ্যু কোথায় কাজ পাবে।

নীলার চুপ করে থাকা দেখে মন্টু বলল, 'কি আমার কথাগুলো শুনেছ না?' 'হ্যাঁ, শুনেছি। আর ভাবছি এ অঞ্চলের নাম করা মস্তান মন্টুদা তাহলে সত্যিই আমাকে ভালবাসে।' মন্টু আচমকা নীলাকে বুকের ওপর চেপে ধরে অস্বাভাবিক স্বরে বলে উঠল 'বিশ্বাস কর, তুমি পছন্দ কর না তাই ইদানীং আর মদ-টদ খাই না। ওরা আমাকে বলে বিয়ে পাড়িয়ে ব্রহ্মচারী হচ্ছিস। মেয়েমানুষের সঙ্গে ভাব করেছিস তো মদ বোতলের সঙ্গে কি। ওরা তোমাকে দেখতে পারে না। ওদের ধারণা তুমিই আমাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছ।' 'তোমার কি ধারণা?' 'আমার কোন ধারণা নেই নীলা। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। ওদের সঙ্গে আমি মেলামেশাই করব না।'

ওরা রেল ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়াল। চারদিক নিশ্চুপ। অনেক দূরে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে মিট মিট করে আলো জ্বলছে। নীলা মন্টুর বুক ঘেঁষে দাঁড়াল। দূরে একটা ট্রেন আসছে। রুপোর মত চকচকে আলো এসে পড়েছে ব্রিজের ওপর। সেই আলোয় নীলা নিবিষ্ট মনে দেখছিল মন্টুর সবল পুরুষ্ট দুটো হাত ব্রিজের লোহার রেলিংটা ধরে রয়েছে, হাতের শিরগুলো ফুলে রয়েছে। প্রশস্ত বুকের ওপর পাটভাঙা জামার কাচের বোতামগুলো চকচক করছে। চোখে মুখে শিশুর মত নমনীয়তা। নীলার ইচ্ছে করছিল মন্টুর মুখটা ওর বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে, ছেড়ে দাও, তুমি ওসব কাজ ছেড়ে দাও। এখন তোমাকে দেখে তো মনেই হয় না কোন অন্যায় কাজ তুমি করতে পার।'

ট্রেনের হুইসল শুনে মন্টুর চমক ভাঙল। নীলার হাতটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বলল 'নীলা তোমার কাছে এলে আমি সব ভুলে যাই, তোমার মুখটা চোখের ওপর ভেসে উঠলে পিস্তল ধরার জোর পাইনা হাতে। এই তো সেদিন মেরুডাঙার ওষুধের একচেটিয়া ব্যবসা-দারকে বাড়ি ফেরার পথে ওরা পাকড়াও করল, আমি সঙ্গে ছিলুম কিন্তু তার গায়ে হাত দিইনি।' নীলা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শিউরে উঠল। মন্টু কেমন মিইয়ে গেল। একথাগুলো নীলার ভাল লাগেনি বুঝতে পেরেই চুপ করল। নীলার চিবুকটা ডান হাতে তুলে ধরে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, 'মাইরি অন্যায় হয়ে গেছে, এসব কথা তোমার সামনে বলা ঠিক নয়। প্লিজ, ক্ষমা করে দাও।'

নীলা ভাবছিল তার সংসারের কথা। রুগিন বাপটার মুখে মা ভুগছে, ছোট ভাই-বোন দুটো প্রয়োজনীয় খাদ্যও পায় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চারটে টিউশানিতেও দুবেলা পেটভরা ভাতের সংস্থান হয় না। একটা স্কুল মাস্টারীর জন্যে হন্যে হয়ে কতদিন ঘুরেছে, কোন ফল হয়নি। যদি মন্টুদা না থাকত তাহলে হয়ত শুকিয়ে মরতে হত।

অমলের কথা নীলার মনে পড়ল। অমল মজুমদার। শিক্ষিত, মার্জিত। বিত্ত-বান ব্যবসাদারের একমাত্র ছেলে। সে নিজেই এগিয়ে এসেছিল নীলার কাছে। প্রথমদিকে নীলা কুণ্ঠিত ছিল। বড়লোকের ব্যাপার, অনেক খেয়ালের মতই হয়ত তাকে ভাললেগেছে। কিছুদিন পরে হয়ত মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু না, অমল দীর্ঘদিন ধরেই নীলার সঙ্গে মেলামেশা করেছে, ভালবেসেছে। নীলা কোনদিনই একটুকু ফাঁক অনুভব করেনি। নীলা পায়ের নিচে মাটি পেয়েছিল। অমলকে ঘিরে সাজানো সংসারের ছবি এঁকেছিল। জীবনে প্রথম ভালবাসার স্বাদ। সেই স্বাদেই নীলা ভরপুর ছিল। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোর কথা মনে হলে এখনও নীলা আঁতকে ওঠে। অমল ওর চূড়ান্ত সর্বনাশ করে দিল্লী পালিয়ে গেল। অমল কেন এমন করল তা আজও নীলার কাছে রহস্য। সেই অপমানের, তীব্র জ্বালার দিনগুলিতে ওকে বাঁচিয়েছে মন্টুদা। নার্সিং হোমে যাবার পয়সা ছিল না, সংসার চালানোর সংস্থান ছিল না। মন্টুদা সব জেনেই ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে-ছিল। পাড়ার ছেলে, নামকরা গুন্ডা, কিন্তু মন্টুদা না থাকলে আজ নীলা দাঁড়াত কোথায়।

কী অত ভাব বলত, দু-এক ঘন্টার জন্যে আমার কাছে থাকো, তার মধ্যে যদি ভেবে ভেবেই সময় কাটাও তো না এলেই পার।' মন্টুর কথায় অভিমানের ভাব ফুটে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে নীলা মন্টুর জামার বোতামে খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'ভাইটার পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না, জান, বুনো ছেলের মত দিনরাত ঘুরে বেড়ায়।' মন্টু একটুও সময় না দিয়ে উত্তর দিল, 'ঠিক আছে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে। তা এতদিন বলনি কেন। সব কথা চেপে চেপে রাখলে আমি আর কি করতে পারি। মাইরি, তোমরা মেয়েরা না বড্ড চাপা। আমি কিন্তু রেখে ঢেকে কথা বলতে পারি না, দুমদাম বলে ফেলি। শালা দুম করে কোনদিন ফুটে যাব, যেকটা দিন পার মজিগুলো চালিয়ে যাও।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে মন্টু যেন স্বস্তি পেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হোল এইরকম আনাড়ির মত বলে ফেলাটা নীলার কাছে ঠিক হল না। এক পা এগিয়ে নীলার কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মাইরি আবার আবোল-তাবোল বকে ফেলেছি।'

একটা মালগাড়ি এসে ব্রিজের নিচে ব্রেক কষল। হঠাৎ আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠল। বগিগুলো একটার সঙ্গে আর একটার ঠোকাঠুকিতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে

লাগল। মন্টু উঁকি মেরে দেখল সব বগিগুলো সীল করা। ওর হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। ডান হাতটা ডান-দিকের প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলে উঠল: 'ব্যাটা দাঁড়াবার আর জায়গা পেল না! এখুনি দলবল এসে জমে যাবে, চল খানিকটা এগিয়ে যাই।' ওরা বাইরের ব্রিজের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মাঠের ধারে এসে দাঁড়াল। 'কটা বেজেছে কে জানে, পিনকুশা হয়ত এতক্ষণ আমার খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। সেই সকাল থেকে আর ওদের দেখা দিইনি।'

একমাত্র অন্ধকারে নীলার হাঁফ ধরছিল ভয়ও বটে। মন্টুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। বুকের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে কাঁধের ওপর হাত রাখল। এখন আর একটুও ভয় করছে না। মন্টুর মত সবল পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে কোন মেয়ের ভয় পাওয়ার কথাও নয়। মন্টু একটি কথাও বলছে না। নীলার সহজ আত্মসমর্পণ ওর ভালই লাগছে। 'একটা যদি যেমন তেমন চাকরী যোগাড় করতে পারতুম, তাহলে এ-পাড়া ছেড়ে চলে যেতুম।' মন্টু মনে মনে বিড়বিড় করছিল, 'আগেকার জীবনটার জন্য অনুশোচনায় হয়, যদি কয়েক বছর আগে নীলার সঙ্গে আলাপ হত, যদি বাবলু, তারক ওরা সব দলে আমায় না টানত, তাহলে নীলার কাছে এমন কিছু কিছু দূরে থাকতে হত না।'

'চুপচাপ হয়ে গেলে কেন? এই তো

মারফি
মেরে-মুসাফির
প্রত্যেক স্টেশন স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে শোনা যায়

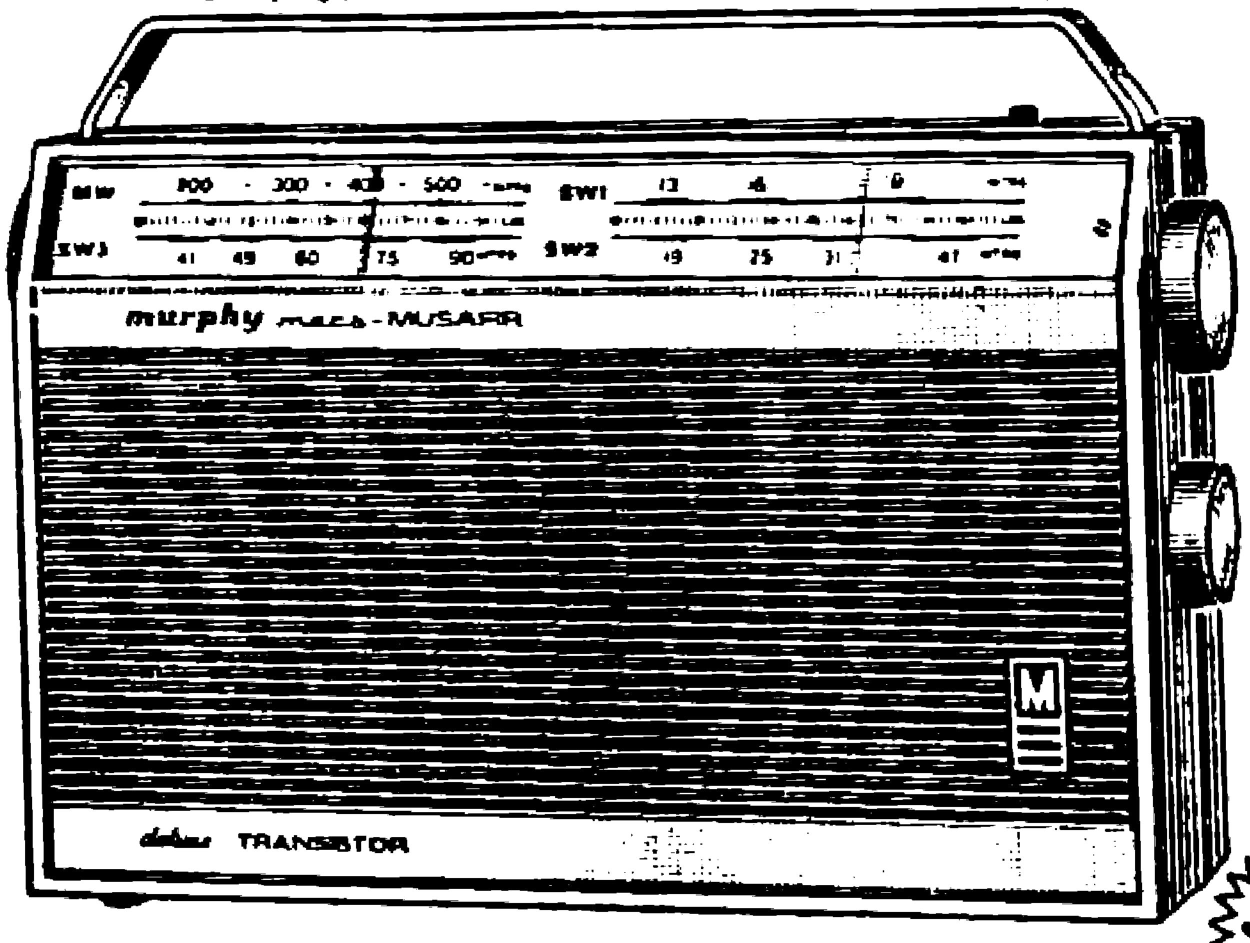

৩২৮ টাকা

৪-ব্যাণ্ড ডিলাক্স ট্রানজিস্টর

• এক্সাইজ ডিউটি সমেত। অন্যান্য চার্জ বাড়তি।

- সারা দুনিয়ার যে কোনও স্টেশন পাওয়ার জন্য অলওয়েভ।
- জোরালো আওয়াজ।
- আপনার পছন্দমত স্বর কম-বেশী করার জন্য হাই-লো টোন কণ্ট্রোল।
- অদৃশ্য ফেরাইট রড ও লুপ এরিয়েলের ব্যবস্থা থাকার দরুণ অতি সহজে স্টেশন ধরা যায়।
- সুন্দর, ছিমছাম, উচ্চস্তরের পলিস্টিরিনের দু-রঙা ক্যাবিনেট।
- ডায়াল স্কেল লম্বা ও সুস্পষ্ট এবং তাড়াতাড়ি সহজে টিউনিং করার জন্য দুটি কাঁটা আছে।
- বড় সাইজের ব্যাটারীতে চলে। এলিমিনেটর লাগিয়ে নিলে, বিজলীতেও চালানো যায়।

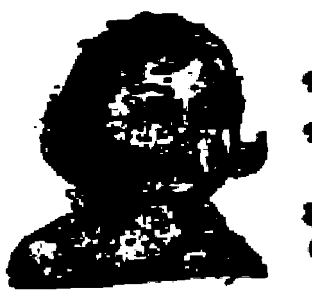

পরিষ্কার, প্রাণবন্ত ও জোরালো, এককথায় নিখুঁত ধ্বনি পরিবেশন করার জন্যই প্রত্যেক মারফি এখন "ম্যাগনিফাইড"

মারফি সারা দুনিয়ার জন্য!

বেশ কথা বলছিল। অনেকক্ষণ পিনকুদের কাছ ছাড়া তাই খারাপ লাগছে?' মন্টুর হাতটা নিজের দু'হাতের মধ্যে চেপে ধরে নীলা আবার বলল, 'বাবলুদের বোলো আমার ওপর সকলের অত চোখ রাখার দরকার নেই, গুরুর একজার চোখ থাকলেই চলবে।' 'না, ভাবছিলুম তুমি কত ভালো! মেয়েমানুষের ওপর ওদের রাগ কেন জান, কেউ ওদের পাত্তা দেয় না তাই।' খস-খস করে কিসের আওয়াজ হল, নীলা একপা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'চল এবার বাড়ি ফিরি, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

পরের দিন সকালে চায়ের দোকানটা একটু মিয়োনো। মন্টু তখনও এসে পৌঁছায়নি। ঘুম থেকে উঠতে ওর দেরি হয়েছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। কীসের একটা যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেছে। একদিকে নীলার ভালবাসার স্বাদে জীবনে একটা নতুন স্বাদের সন্ধান পেয়েছে অন্যদিকে তার বাবলুদের সঙ্গে দীর্ঘ কত বছরের কাজ-কারবার। ওদের সঙ্গে না থাকলে রুটি রোজগারের সন্ধান হবে কি করে! দোটানার মধ্যে পড়ে মন্টু বিব্রত হচ্ছিল। নীলার ওপর টানটা যেন দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে পিনকুদের ভেতর জমে থাকাতে ভাটা পড়ছে।

মন্টু দোকানে ঢুকতেই সকলে হৈ-হৈ করে উঠল। 'কাল ফাঁসিয়ে দিয়ে কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেলে গুরু। পুরো দিনটা বরবাদ হয়ে গেল। তুমি যেন মাইরি আজকাল মেয়েমানুষের মত তুলতুলে হয়ে গেছ।' 'আমাকে বাদ দিয়েই তোরা চালিয়ে যেতে পারতিস। আমি কি তোদের হাত-পা বেঁধে রেখেছিলুম।' মন্টু উদাসীন ভাবে কথাগুলো বলে গেল।

'এ কি বলছ গুরু, তুমি না থাকলে শালা গোকুল অন্ধকার।' একটু তোষামোদের ভঙ্গিতে ডাবু কথাকটা বলে ফেলেই চায়ের অর্ডার দিল।

পিনকু চুপচাপই ছিল, সব সময়েই সে মন্টুর পক্ষ সমর্থন করে। মন্টুর কাঁধের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বলল, 'কাল সন্ধ্যেবেলা পিয়ারাতলার কাবা এসেছিল তোমার খোঁজে। বললে জরুরী দরকার। কী একটাতে ফেঁসে গেছে।'

মন্টুর কোন উৎসাহ দেখা গেল না। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'বাবলু দশটা টাকা ছাড় তো, পিনকু ওদের বাজারটা করে দিক।' 'তা ছাড়ছি, কিন্তু শোন, মেয়েমানুষের সঙ্গে অত ল্যাপটালেপটি করিস না, শালা কোনসময় ভরাডুবি করে দেবে টেরও পাবি না।' মন্টুর কানের কাছে মুখ এনে বাবলু ফিসফিসিয়ে বলল, 'পাক্কা একটা প্ল্যান ভেঁজেছি, আজ রাত্তিরে কিন্তু তোকে থাকতেই হবে। অমল মজুমদারকে মনে আছে তো! শালা মিলিটারিতে ছিল, ওর বাবা মারা যাবার পর পুরো নার্সিংহোমটার ওই মালিক। মালের টাকার আণ্ডিল। আজ ও একটা হেভি পেমেন্ট পাবে, এবং ক্যাশ। রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ ফিরে ওটা হাপিস না করলে মাইরি শুকিয়ে মরতে হবে।'

মন্টু এক মিনিট কি ভেবে নিল, তারপর বলল, 'তোরা তৈরী থাকিস আমি নটা নাগাদ এসে যাব। শালা শয়তানের বাচ্চা তাহলে ফিরেছে।' মন্টুকে বেশ একটু উত্তেজিত দেখাল। যেন বেশ কিছুদিন পরে মনের মত খোরাক পেয়েছে। পরপর তিনটে সিগারেট পুড়িয়ে মন্টু উঠে দাঁড়াল, 'তোরা বোস, আমি একটু উঠছি, ঠিক নটায় এসে যাব।' 'গুরু নাগা যেন না, তাহলে একেবারে গাড্ডায় পড়ে যাব।' বাবলু পিছু পিছু কয়েক পা এগিয়ে গেল।

সন্ধ্যের কিছু আগেই নীলা এসে পার্কটার কোণে দাঁড়িয়েছিল। হালকা লাল রঙের শাড়ি, গাঢ় ব্লাউজের আভায় ওর মুখটা টসটসে দেখাচ্ছিল। সাধারণত ও সাজগোজ করে না, আজ হঠাৎই ওর মনে হোল নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে। মন্টু রোজ ওকে এক কাপড়ে দেখতেই অভ্যস্ত, একটু চমক দেওয়া যাবে।

দুপুরের লম্বা একটা ঘুম দেওয়ার পর মন্টুর চোখ-মুখ বেশ ভারি ভারি। দূর থেকে মন্টুকে আসতে দেখে নীলা ওর দিকে এগিয়ে গেল। নীলাকে একঝলক দেখে নিয়ে মন্টু বলল, 'কী ব্যাপার এত সাজগোজ! বেড়ে দেখাচ্ছে কিন্তু, ঠিক কনে-বৌয়ের মতন।' নীলা লাজুক মেয়ের মত মুখ নীচু করল। সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে দূর থেকে ওল্ড ব্রিজটাকে মাকড়সার জালের মত দেখাচ্ছে। একঝাঁক বক ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ব্রিজ টপকে মাঠের দিকে চলে গেল। মন্টু একটু চিন্তিত। বিকেলে ঘুম থেকে উঠেই ও ভাবছিল নীলার কাছে আজ বিয়ের কথাটা তুলবে। নীলার জন্যেই। পাড়ার লোকজনেরা ফিস-ফাস শুরু করেছে। নীলার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হওয়ার ব্যাপারটা সকলেই জানে। তাছাড়া কখন কী ঘটে যায়। নীলাকে ঠকান কি বিন্দুমাত্র কষ্ট দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। নীলাও যখন ভালবাসে তখন অহেতুক ঝুলিয়ে রেখে লাভ কি!

কি ভাবে কথাটা তুলবে মন্টু ভাবছিল। একটু সুন্দর করে না বলতে পারলে নীলা ক্ষুণ্ণ হবে। অথচ কেমন এলোমেলো কথা মুখ দিয়া বেরিয়ে পড়ে। গুছিয়ে কথা বলা তার ধাতে আসে না।

পায়ে পায়ে রেল ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়াতেই একটা ইঁট বোঝাই লরী ব্যাক করে এসে ওদের পাশে ব্রেক কষল। একটা নেড়ি কুত্তাকে বাঁচাতে লরিটাকে থামতে হোল। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ শব্দ তুলে ওদের পাশ বেয়ে চলে গেল। নীলা বলল, 'আজ তোমায় খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। কি হয়েছে?' 'না, হয়নি কিছু। ভাবছিলুম পাড়ার সবাই গুজুর গুজুর করছে, বিয়ে টিয়ে করে ফেলাই ভাল।' নীলা মুচকি হাসল। কত চাঁচাছোলা করে বলতে পারল মন্টু। 'তাই নাকি! তা বেশ তো। কত-দিনে হবে।' নীলা মৃদু হাসির ফাঁকে টেনেই জিগেস করল। 'তুমি বললেই লেগে পড়া যায়। কি আর ঝামেলা!' 'কিন্তু তার আগে তোমার একটা চাকরী থাকার না হলে কি ভাল দেখায়।' 'তা বটে, সে একটা লেগে-পড়ে বাগিয়ে নিতে হবে।' মন্টু এমনভাবে কথাটা বলল যেন একটু চেষ্টা করলেই ও একটা চাকরি পেয়ে যাবে। নীলা মন্টুর গলার নিচে মুখ রাখল, ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'অত তাড়াহুড়োর কি আছে। আমিও স্কুলটুলে একটা চাকরি পেয়ে যাই। ভয় নেই, আমি তো তোমারই।'

ব্রিজের ওপর লোকজন আনাগোনাটা আজ বেশি। ওরা মাঠের দিকে চলল। পাকুড় গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। ঝাঁকড়া পাকুড় গাছটা অন্ধকারে বনের মত দেখাচ্ছিল। মন্টু বলল, 'আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। না হলে ওরা আমাকে আস্ত রাখবে না।'

'কেন?' নীলার গলায় বিস্ময়ের সুর। 'একটা জরুরী কাজ আছে। তোমায় বলেই ফেলি কাজটা। একটা শাঁসালো পার্টি পেয়েছি। আজ রাতে মালকড়ি কিছু হস্তগত করতে হবে। সেই অমল, অমল মজুমদার এক পুঁটলি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরবে দশটা নাগাদ। ওকে ঘায়েল করে টাকাগুলো হাতাতে হবে। ব্যাটা বেশি পাঁয়তারা কষলে সাফ হয়ে যাবে।' অবলীলাক্রমে কথাগুলো বলে গেল মন্টু। 'সেই অমল, যে তোমার সর্বনাশ করে কেটে পড়ে ছিল। ব্যাটাকে বাগে পেলে আজ কলজে খুলে নেব।' মন্টু যেন তার বাবলুদের সঙ্গে কথা বলছে এমনি ভাব করে নীলার কাছ থেকে উত্তর আশা করল। মন্টুর কথা শেষ হবার আগেই নীলা মন্টুর হাতদুটো জোরে চেপে ধরল, 'লক্ষ্মীটি ওকে প্রাণে মের না, আমার কথা রাখ।' মন্টু ঝিনকে হাতদুটো ছাড়িয়ে নিল। নীলার মুখের ওপর চোখ রেখে মন্টু যেন আগুনের মত জ্বলে উঠল। অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন, ওর জন্যে এখনও তোমার এত দরদ কেন? এখনও ভুলতে পারনি? ওরা ঠিকই বলে-ছিল মেয়েমানুষ গোখরো সাপের বাচ্চা। যতই দুধ-কলা দাও ছোবল মারবেই। তাই যদি মনে ছিল, আমার সঙ্গে ছিনালী করার কি দরকার পড়ল! শয়তান, নেমক-হারাম।' মন্টু শক্ত হাত দুটো দিয়ে নীলার দুটো কাঁধ চেপে ধরেছে। অন্ধকারের মধ্যেও নীলা দেখতে পেল মন্টুর চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছে হাতের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, চোয়াল দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। নীলা ঠকঠক করে কাঁপছে। মন্টুর হাতদুটো বুঝি কাঁধ থেকে গলার কাছে এসে চেপে ধরবে। ভয়ংকর দৈত্যের রূপ নিয়ে মন্টু যেন তাকে ছিঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করবে। এই বীভৎস দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়েও নীলা যেন কার জন্যে প্রচণ্ড টান অনুভব করছিল। সেটা অমল কি মন্টুর জন্যে নীলা তা বুঝতে পারছিল না।

অঙ্গনা

বীরত্বের নয়া ইতিহাস

যুদ্ধে পরাজয় অবধারিত জেনে রাজপুত বীরাঙ্গনার দল ইজ্জত বাঁচানোর তাগিদে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দিতেন। এই আত্মদান ইতিহাসে জহরব্রত নামে অমর হয়ে আছে। বিদেশী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এধরণের ঘটনা তুলনারহিত। পররাজ্যলোলুপ হানাদারদের শ্মশানের শেষ ভস্মরাশি উপহার দেওয়াই ছিল সেদিন তাঁদের উদ্দেশ্য। রাজপুতনা বারবার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতার ডাক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে সে দেশের মরু-কান্তারে। এগিয়ে এসেছেন দেশপ্রেমিকের দল। গড়ে তুলেছেন দুর্জয় প্রতিরোধ পুরুষ এবং নারীর সম্মিলিত সামর্থ্য নিয়ে। পাশাপাশি লড়াই করেছেন। পুরুষ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। আর পরাজয়ের চরম মুহূর্তে নারী বেছে নিয়েছেন জহরব্রতের পথ—আত্মসম্মান এবং আত্মমর্যাদার রক্ষাকবচ।

সেই কবেকার ঐতিহাসিক কাহিনী আজ আবার স্মরণপথে উদিত। ইতিহাস নিখুঁত তুলি টেনে চলেছে আজ স্বাধীন বাংলাদেশে। রাজপুতনার মরু-কান্তার ছেড়ে এবার ইতিহাসের লীলাভূমি হলো সবুজ শ্যামল বঙ্গভূমি। পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে পূর্ববাংলা। সেখানকার মেয়েদেরও এমনিভাবে লড়াইয়ে সামিল হতে হয়েছে। পাক দখলদার ফৌজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের … হোস্টেলে … ইজ্জত বাঁচানোর জন্য প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্রী ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এছাড়া কোন পথ তাঁদের সামনে খোলা ছিল না। ইতিহাস এবার নতুন বাঁক নিলো। রাজপুতনার পাশাপাশি সৃষ্টি হলো এক নতুন কাহিনী সমতল পূর্ববাংলার তথা স্বাধীন বাংলাদেশে। সীমান্তের বেড়ার ওপারে এবার এক অনাস্বাদিত ইতিহাস, যার শরিক আমরা সবাই।

পাক হানাদার বাহিনী চিরাচরিত পথেই এগিয়ে চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সব ছাত্রই যোগ দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে। এই সুযোগ নিয়ে নিজেদের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য সভ্যতা-ভব্যতা এবং আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধের সমস্ত রীতি লঙ্ঘন করে এই হানাদারের দল চড়াও হয় বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলের মেয়েদের উপর। আত্মবিসর্জন করে তাঁদের অনেকেই এক নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সেই সুযোগটুকুও পেলেন না সবাই। বাদ বাকিদের খোঁজ তাই আজও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অজানা। হয়তো তাঁদের অনেককেই হতে হয়েছে সেই হানাদার নরপশুদের শিকার। কিন্তু যাঁরা আত্মবিসর্জন করে আত্মসম্মান বজায় রাখতে জানেন তাঁদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার কোন সুযোগই তারা পাবে না। এতে তাদের সর্বনাশ হবে আরো নিকটতর। সেই ইতিহাস আজ রচিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্র।

কোন এক দেশের মেয়েরা নিজেদের চুল দিয়ে ধনুকের ছিলা তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেদেশেও তখন এমনি স্বাধীনতার প্রশ্ন। মরণ-বাঁচনের সঙ্কট মুহূর্তে আর কোন পথ না পেয়ে ওঁরা নিজেদের চুল কেটে তৈরি করে দিলেন পুরুষের যুদ্ধাস্ত্র। সেই ইতিহাসই এবার স্বাধীন বাংলাদেশের মেয়েদের প্রেরণা জোগাচ্ছে। তাঁরা গড়ে তুলছেন আরো দুর্বার ইতিহাস। স্বাধীন বাংলাদেশ-এর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাক দখলদার বাহিনী হয়ে উঠেছে মরীয়া। যেকোন উপায়ে তারা বাঙালীর স্বাধীনতার সাধ চূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর। তাই তারা রাজপথে নামিয়েছে ট্যাংক। বিমান থেকে চলছে বোমাবর্ষণ। হজযাত্রীদের জাহাজে করে বাংলাদেশে সৈন্য পাঠাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছে সারা বাংলাদেশ। সমগ্র পূর্ব বাংলা জুড়ে তৈরি হয়েছে এক বিশাল রণাঙ্গন। সর্বত্র লড়ছে সবাই। কেউ পিছিয়ে নেই। এরই মধ্যে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন বীরাঙ্গনা রোশনারা বেগম। ঢাকা উওমেন্স কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। পড়াশোনাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু ইতিমধ্যে এসে গেছে স্বাধীনতার ডাক। নিজের চোখের সামনে তিনি দেখেছেন পাক দখলদার বাহিনীর নৃশংস পাশবিকতা। অস্থির হয়ে উঠেছেন। মনে মনে ঠিক করেছেন দখলদার

বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ালেই হবে এর উপযুক্ত জবাব। ক্রমে ক্রমে সে সঙ্কল্প হয়েছে অটল। ঢাকার রাজপথে প্যাটন ট্যাঙ্কের প্রচণ্ড দাপাদাপির সময় তিনি বুকে মাইন বেঁধে ট্যাংকের সামনে ঝাঁপ দেন। একটি জীবন নির্ভীক আত্মদানে একটি জীবন মারণযন্ত্রের বিনাশ। উড়ে গেল প্যাটন ট্যাঙ্ক। আর ঐতিহাসিক কীর্তিতে অমর হয়ে রইলেন রোশনারা।

সেদিন কলকাতার রাজপথে একটি বিরাট মহিলা মিছিল ধ্বনি তুললো : বীরাঙ্গনা রোশনারা জিন্দাবাদ। সেদিন-টিকেই চিহ্নিত করা হলো রোশনারা দিবস-রূপে। সবাই মুখর হলেন রোশনারার এহেন আত্মদানে। আমাদের অনেকের কাছেই যে ইতিহাসের এই অমূল্য উপাদান লুকিয়ে ছিল তা জেনে আমাদের যেন নতুন করে বোধোদয় হলো।

রোশনারার আত্মত্যাগে আজ উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ। মেয়েরা দলে দলে এবার নেমে পড়ছেন রণাঙ্গনে। হাতে তুলে নিয়েছেন সমরাস্ত্র। তাঁরা গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছেন। হাত থেকে হাতে ঘুরছে রাইফেল। পুরুষেরা সবাই গেছেন হানাদারদের মোকাবিলা করতে। বাড়ি আগলাচ্ছেন মেয়েরা। তাঁরা রাইফেল হাতে সদা জাগ্রত। স্বদেশ এবং নিজের সম্ভ্রম রক্ষায় এ হলো তাদের নতুন জীবন-চেতনা।

হাতিয়ার হাতে নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মেয়েরা লড়াই করছেন। নারকীয় পাক দখলদার বাহিনী নিজেদের বীরত্বের জয়ঢাক বাজানোর জন্য তাঁদের উপর চালাচ্ছে বেপরোয়া আক্রমণ। এ পর্যন্ত যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে, পাক সেনাবাহিনী একমাত্র যশোর ক্যান্টনমেন্টেই প্রায় চারশো স্বেচ্ছাসেবিকাকে গুলী করে মেরেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এঁদের গ্রেপ্তার করে আনার পর এই নারকীয় ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। এমনি ঘটনা কত ঘটেছে তার সঠিক হিসাব এখনি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। একদিন অবশ্য সবই প্রকাশ পাবে যেদিন পাক দখলদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশ হবে মুক্ত। সেদিন মহিলাদের এমনতরো আরো বীরত্বের কাহিনী জানা যাবে।

পাক দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের কোন লেখাজোখা নেই। মরীয়া হয়ে ওরা শেষ কামড় মেরে চলেছে। এমনি একটি ঘটনার কথা জানা গেল এই কিছুদিন আগে। পূর্ব বাংলা থেকে একটি জাহাজ বোঝাই হয়ে একদল মহিলা আসেন। এঁরা সবাই বিদেশিনী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর এঁদের অনেকেই মুখ খুলতে চাননি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, পূর্ব বাংলায় আজ যা হচ্ছে সে সম্বন্ধে কিছু বলে ওখানকার প্রবাসী বিদেশীদের আরো বিপদ ঘটাতে চাই না। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, ইয়াহিয়ার ফৌজের অত্যাচারের হাত থেকে বিদেশীরাও মুক্তি পাচ্ছে না। তাঁদেরও হতে হচ্ছে সমান নির্যাতিত।

এমনি একটি রিপোর্টও পাওয়া গেছে। পাক দখলদার ফৌজ দিনাজপুরে শহরের ব্যাপটিস্ট মিশন ভবনে হামলা করে। এই মিশনের নারীরাও তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। সেখানকার কয়েকটি খৃস্টান মেয়ের উপর তারা চরম অত্যাচার করে এবং মিশন ভবনটির এক বিরাট অংশ ভেঙে দেয়। এই সংবাদটা দিয়েছেন উক্ত ব্যাপটিস্ট মিশনের সঙ্গে যুক্ত মিঃ জি লিউইস। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সম্প্রতি পূর্ব দিনাজপুর পরিত্যাগ করে এসেছেন।

এই নির্বিচার অত্যাচার চলেছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে। কিন্তু অত্যাচারের মুখে সে দেশের মেয়েদের প্রতিরোধ হচ্ছে আরো দৃঢ়। হাতিয়ার হাতে নিয়ে তাঁরা লড়াই করছেন আবার পুরুষের পাশে পাশে থেকে তাঁদের করছেন সবরকম সাহায্য। এমনি একটি ঘটনা ঘটেছে কুষ্টিয়ায়। সেখানে মুক্তিফৌজ দখলদার বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এদিকে মুক্তি-ফৌজের খাবার যায় ফুরিয়ে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁরা কাহিল হয়ে পড়েন। অথচ অবরোধ ওঠানো সম্ভব নয়। তাহলে খাঁচা-ছাড়া বাঘ অত্যাচারের ঝড় বইয়ে দেবে। এমনি সময়ে এগিয়ে এলো নারী স্বেচ্ছাবাহিনী। তাঁরা পুরুষদের খাবার জোগান দিলো। নতুন উদ্যমে সঞ্জীবিত মুক্তিবাহিনী এবার পাক-দখলদারদের দিলো মরণ কামড়। শহর হলো মুক্ত।

এমনি ঘটেছে সর্বত্র। নারীরা বীরত্বের নয়া ইতিহাস রচনা করে চলেছে। ভীরুতা এবং কোমলতার অপবাদ ঘোচাতে আজ বাংলাদেশের মেয়েরা সংকল্পবদ্ধ। তাই তাঁরা আজ রণাঙ্গনে রণাঙ্গনে লড়ছেন। বুকে মাইন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ট্যাংকের সামনে। দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছাদ থেকে লাফিয়ে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার এবং আত্মরক্ষার পথ। নয়া ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে সর্বত্র। যেদিকে চোখ ফেরানো যায় সেখানে বীরত্বের কীর্তিগাথা। গর্বে বুক ভরে ওঠে এই ভেবে যে, এবার আমাদের নিজস্ব বীরত্বের যশোগাথা রচিত হচ্ছে।

উদাহরণ আর অনুপ্রেরণার জন্য এবার আমাদের আর ইতিহাস হাতড়ে মরতে হবে না। আমাদের মেয়ে রোশনারাই এখন সকল অনুপ্রেরণার উৎস। এক রোশনারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবেন অসংখ্য রোশনারা। তাঁরা হবেন আরো ভয়াল-ভয়ংকর। শুধু প্যাটন ট্যাঙ্ক নয় সমস্ত পাক-দখলদার বাহিনীকে উচ্ছেদ করবেন তাঁরা। তাঁদের দুর্ভেদ্য ব্যূহের সামনে ভেঙে পড়বে ওদের সকল প্রতিরোধ। পরিপূর্ণ স্বাধীন বাংলাদেশে ওরা বেঁচে থাকবেন স্বাধীন নাগরিকের দুর্লভ সম্মান নিয়ে। —প্রতিমা

সাবান একটি লাভ তিন রকম

নিকো *বীজাণুনাশক* সাবান অন্যান্য সাবানের চেয়ে আপনার ত্বকের বেশী পরিচর্যা করে

১ নিকো ত্বকের বীজাণু নাশ করে
২ নিকো ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে
৩ নিকো ত্বককে পরিষ্কার ও সুরক্ষা করে

নিকো সাবান দিয়ে প্রত্যহ স্নান করা ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা উপায়। নিকোর বীজাণুনাশক ফেনা ত্বকের বীজাণু নাশ করে ও দ্রুত ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সেই সঙ্গে নিকোর ভেষজ উপাদানগুলি সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে। নিকোতে এমন সব জোরালো বীজাণুনাশক পদার্থ আছে যা ছোটখাটো চর্মরোগ প্রতিরোধ করে আর মোলায়েম অথচ সম্পূর্ণভাবে আপনার ত্বক পরিষ্কার করে। ফলে, আপনার ত্বক হয়ে ওঠে লাবণ্যময় উজ্জ্বল তরতাজা। নিকো আপনার ত্বককে ব্রণ ও ঘামাচির হাত থেকে বাঁচায়। নিয়মিত ব্যবহার করলে মাথার খুসকি দূর করে। আপনার ত্বকের যত্ন ও স্বাস্থ্যের জন্য আজ থেকেই ব্যবহার করতে শুরু করুন তিনভাবে লাভজনক সাবান নিকো।

TRIPLE ACTION
NEKO
The Original Germicidal Soap
PARKE-DAVIS

JAISONS 72 BEN

'জপাৎ সিদ্ধি'র নায়িকা

অপ্রাপনীয়কে পাওয়া যায়, হওয়া যায় হয়তো যদি অবিরাম সাধনায় আসীন থাকা যায় অবিচল নিষ্ঠায়। যে থাকে ঐরাবতকে 'জপাৎ সিদ্ধি' সেই পায়।

খেলতে গিয়ে পা ভেঙে মেয়েটি কোথায় কপালে করাঘাত করে কান্নায় ককিয়ে উঠবে তা নয় সেই ভাঙা পায়েই স্কেটিংয়ে বিশ্বাবজয় করে এল—একবার নয়—পর পর দুবার। তাছাড়া সারা ইয়োরোপ বিজয়িনীর স্বর্ণমুকুট অনায়াসে স্বাচ্ছন্দে ক্রমান্বয়ে চারটি বছর শিরোভূষণ করতে পেরেছিল আর স্কেটিংয়ে দেহলাবণ্যের এমন অনবদ্য হিল্লোলিত বিচিত্র গতিভঙ্গিমায় সারা বিশ্বের আর কোন তরুণী এর আগে ব্যক্তিগত সাফল্যে উজ্জীবিত হতে পারে নি—এর পরেও না।

মাত্র বাইশ বছরের পুষ্পিত যৌবনের অধিশ্বরী এসবোর্কজি ডাইজেকস্ট্রা ডাক্তার কন্যা আমস্টারডামের অধিবাসিনী। তুষার তরঙ্গের কঠিনে তিনি যেন মূর্তিমতী ছন্দ সুর ও সৌন্দর্য। কখনো ব্রীড়ানতা মরালগামিনী কখনো ঘনিরেকণা মদালসা আবার কখনো অগ্নিশিখার মতো লীলাময়ী কখনো চকিতগামিনী কুরঙ্গী। আর এই জন্যেই তিনি দুনিয়ার স্কেটিং রসিকমহলের প্রশংসা অভিনন্দনে নন্দিত, ইয়োরোপ ও বিশ্ববিজয়ে বন্দিত হয়েছেন।

স্কেটিংয়ের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল দুধ-দাঁত যখন পড়েনি তখন থেকেই। হবে নাই বা কেন। সারা পরিবারে এই স্কেটিং-বাই। বাপ ডাক্তার হলে কি হবে স্কেটার হিসেবে ডাক্তারির চেয়েও তাঁর নাম বেশি। মাও কম যেতেন না। এক ভাই সেও। ঠাকুরদা আর ঠাকুমা নাতনীকে সাধ করে উপহার দিলেন এক জোড়া স্কেটস। ছোট্ট মেয়ে তাতে পা রেখে একবারে পাখি হয়ে উঠল। বরফের কঠিন মৃত্তিকার ওপর দিয়ে শুধু ভেসে যাওয়াই নয়—তার এই ভেসে যাওয়াকে তিনি ছন্দিত করে তোলবার জন্যে শিশুবয়স থেকেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৪৮-এ তুষারের কঠিন মৃত্তিকায় আবার তাঁকে দেখা গেল। স্কেটিংয়ে তাঁর পূর্বলাবণ্য আবার ফিরতে লাগল। এই সময় তাঁর বাবা চলে এলেন সাওয়েতে। ওখানেতেই তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভার প্রথম নিদর্শন রাখলেন। তখনও তাঁর বয়েস পুরো সাত বছর হয় নি। ছোট মেয়ের আশ্চর্য স্কেটিং-প্রতিভা দেখে সেখানকার মানুষজনেরা সোচ্চার হয়ে উঠল প্রশংসায়, 'নতুন এক সোনজা হেনির পুনর্জন্ম' বলে উদার অকুণ্ঠ কল্পনা করত। সোনজা হেনির পরে স্কেটিংয়ের গৌরব-ঐতিহ্যের এক অবিস্মরণীয় নায়িকা। তিন তিনবার, জয়-গৌরবে এবং অসম্ভবের সাধনায় এক বিরল স্বাক্ষর রেখেছিলেন, সারা দুনিয়ার স্কেটিং ক্রীড়াজগতে কমসে-কম দশবার ইয়োরোপ এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হয়ে। অলিম্পিকের স্বর্ণপদক নিজকণ্ঠে দুলিয়েছিলেন তিনবার। এসবোর্কজি এই কিংবদন্তির নায়িকা পুরোপুরি না হয়ে উঠলেও স্কেটিং-শৈলীতে কিন্তু সোনজা হেনিকে অবলীলায় অতিক্রম করেছিলেন। স্কেটিংয়ে লাফানোর লীলাবৈচিত্র্যে তিনি আজও অনন্যা। স্কেটিংয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় লাফানোটা হচ্ছে মূলকথা। বরফের ওপর নাচের ভঙ্গি দেখানো নয়। নৃত্যের চেয়ে অ্যাথলেটিকসের ভূমিকাটাই এখানে মুখ্য। তুষার-মৃত্তিকার উপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে শূন্যের বুকে যিনি যত লীলায়িত ভঙ্গিমায় লাফ দিয়ে নয়নাভিরাম দেহলীলায় বিচিত্ররূপিণী হয়ে উঠতে পারেন তিনি তত বাহবা কুড়োন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের খাতায় তত পয়েন্ট জমা হয়। শুধু একটি লীলায়িত ভঙ্গি নয়—একের মধ্যে দুই কখনো তিনের রকমফেরের সুত্রপাত ঘটানোর দক্ষতাই শ্রেষ্ঠত্বের কষ্টি-পাথরে সেরা নিরিখ। এইদিক দিয়ে এসবোর্কজি তাঁর স্বনামধন্যা পূর্বসুরীদের—সোনজা হেনি, বারবারা অ্যান স্কট, জ্যাকুলিন দু বিয়েফ, ক্যারল হেস প্রমুখাদের সমস্ত গৌরব ও খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছেন। বরং একটু ঘুরিয়ে বলা যায় : 'ফিগার-স্কেটিংয়ে এঁরা কেউ এসবোর্কজির সামনে দাঁড়াতেই পারেন নি।

শেষটাই যার এত আনন্দ-উজ্জ্বল, এমন গৌরবমহিমায় দীপ্ত, শুরুটা কিন্তু তার কঠোর কৃচ্ছ্রতায় অকরুণ অস্থির অতন্দ্র। শ্রেষ্ঠত্ব-আলোকের ঝরনাধারায় অভিষিক্ত হবার আগে অনেক রাত কেটেছে সূচিভেদ্য অন্ধকারের আড়ালে। জীবনে প্রতিটি দিনের শয্যা, বলতে গেলে, রচনা করতে হয়েছে তুষার-মৃত্তিকায়। দশ বছর বয়সেই তিনি ইংলণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন। এখানেই মিলল সত্যিকারের গুরু, ইংলণ্ডের 'জাত ট্রেনার' ফিগার-স্কেটিংয়ে পারিভূত প্রখ্যাত আরনল্ড গার্শটিউইলা, যিনি সম্রাজ্ঞী পারমিনী লতায় যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর কী অন্তহীন কৃচ্ছ্রতার বছরের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু হল। লণ্ডনে দিনের পর দিন কেটেছে রূপোলী আলোহীন অন্ধকারতলা ঘরে। সকাল থেকে শুরু করে বিকেল অবধি একটানা চলত তাঁর সাধনা, তাঁর অনলস অনুশীলন—কেবল লাফ খাওয়া, ঝাঁপ দেওয়া বিচিত্র ভঙ্গিমা আয়ত্ত করা। গুরুর স্থায়ী স্থিতি ছিল না কোন জায়গায়, নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে নানান কেন্দ্রে গিয়ে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাতেন। আর এসবোর্কজি গুরু দ্রোণাচার্যের 'একলব্য' শিষ্যের মতো গুরুকে অনুসরণ করে ফিরতেন। গুরুর সমস্ত শিক্ষাকে তিনি নিঃশব্দে আত্মসাৎ করে নিতেন। অন্য শিক্ষার্থীর শিক্ষা থেকেও তিনি পাঠগ্রহণ করতেন, অপরের সম্পূর্ণতার আলোয় নিজের অক্ষমতাকে বিচার করে দেখতেন। অকম্প্র নিষ্ঠা অভ্যাস আর সাধনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। খুব মন্দগতিতে সাফল্যের দর্পণে তিনি নিজের উদ্ভাসিত মুখ দেখতে শুরু করলেন। মাঝে মধ্যে প্রতিযোগিতায় হারও হতে লাগল। প্যারিসের ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় সপ্তম স্থান পেলেও অলিম্পিকের উইণ্টার গেমসে মুখ কালো করে ঘরে ফিরতে হল। যতই অসফল হচ্ছিলেন ততই তাঁর কানে উজ্জীবন মন্ত্র দিচ্ছিলেন তাঁর গুরু : তুমি বড় হবে, সেরা হবে, শ্রেষ্ঠ হবে : 'আজ না হয় যদি হতে পারে কাল'। বাধা-বিপত্তি অসাফল্য তাঁর সবসেরা হবার আকাঙ্ক্ষাকে দীপ্ত বাসনায় প্রজ্বলিত রেখে তাঁকে অবিরাম প্রেরণা যুগিয়ে যেতে লাগল। হেরে গেলেও পিছু হটে যেতেন না, ভগ্নজানু হয়ে মাথা নত করতেন না লজ্জায়। বরং মুখ তুলে তাঁর প্রেরণার আগুনে উদ্দীপ্ত হতে হতে মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলতেন : আজ আমি পারলাম না—চার বছরের মধ্যে আমি জয়ী হবোই, সবসেরা হবোই।

হলেনও। ১৯৬২ সাল বিপুল সাফল্যের বরণডালা সাজিয়ে নিয়ে এল তাঁর কাছে—প্রাগে বিশ্ববিজয়িনীর বিজয়-মালা কণ্ঠে দুলল। তারপরের বছরেও তাই। পর পর ক্রমান্বয়ে দুটি বছর বিশ্ব-জয়ের বিরল সৌভাগ্যের অধিকারিণী হলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠের স্বতোৎসারিত আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর সম্বর্ধনার মধ্যে দিয়ে খোলা গাড়িতে চড়ে তিনি আমস্টারডামের রাজপথ পরিক্রমণ করলেন। স্বয়ং হল্যাণ্ডের রাণী এবং রাজকুমারী এসে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের আর একটি ধাপ বাকি ছিল। অবশেষে তাও পূর্ণ হল। তিনি একই সঙ্গে হলেন ইয়োরোপ-বিজয়িনী, বিশ্ববিজয়িনী এবং অলিম্পিক বিজয়িনী। ১৯৬৪ সালে।

উত্থানপতনের বন্ধুর পথের মধ্যেই রয়েছে সাফল্যের সোপান—জপাৎ সিদ্ধির এই দীপ্ত নায়িকা তারই জীবন্ত প্রতি-মূর্তি। দেশকালের গণ্ডী পার হয়ে তাঁর জীবনের এই অসম্ভব উত্তরণের কাহিনী হেরে-যাওয়া পেছিয়ে-পড়া মানুষদের প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

—বিমল বসু

শিল্পী সংসদ প্রযোজিত বনপলাশীর পদাবলী ছবির মহরতে ক্যামেরাম্যান কানাই দে, পরিচালকঃ উত্তমকুমার এবং সুপ্রিয়া দেবী
ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

কু-মাতা কখনো নয়

সাংসারিক অভিজ্ঞতা বলে, যেখানে তিন বা তার চেয়ে বেশী ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবার, সেখানে সংসার ভাঙে মেজবৌয়ের জন্যে; আর যেখানে মাত্র দুই ভাই, সেখানে ভাঙে সেই বৌয়ের হাওয়া, যার স্বামীর উপার্জন বেশী। সংসার যখন ভাঙে, তখন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ভাগ-বাটরা নিয়ে অনেক সময় কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। এবং বিধবা মা যদি বেঁচে থাকেন ও তাঁর জন্যে তাঁর পরলোকগত স্বামী যদি কোনো বিশেষ ব্যবস্থা না করে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর আর অবস্থার ব্যবস্থা থাকে না। সেই যে কথায় আছে না, ভাগের মা গঙ্গা পায়না, সেই দুঃসহ অবস্থাতেই পড়তে হয় তাঁকে। **শ্রীরঞ্জিৎ শিকদার নিবেদিত, রঞ্জিৎমল কাঙ্কারিয়া প্রযোজিত এবং অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত "জননী"** ছবির যিনি জননী, সেই সর্বজয়া যখন দেখলেন যে, তাঁর দুই ছেলে উপেন ও ভূপেন ছেলে মানুষ করার জন্যে মায়ের কৃত দেনাকে সমানভাগে শোধ করা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিল এবং শেষ পর্যন্ত বিষয় বখরা করবার পরে মায়ের দায়িত্ব বহনের কথা নিয়ে কথা কাটাকাটিতে মেতে উঠল, তখন তিনি ওদের দুজনকেই ওঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবার জন্যে সবার অলক্ষ্যে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা হয়ত আরও অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যেত, যদি না উপেন-ভূপেন হত আসলে মাতৃভক্ত সন্তান। মায়ের রেখে-যাওয়া চিঠি থেকে যে-মুহূর্তে তারা আবিষ্কার করল, মা গৃহ ছেড়ে যে-দিকে দুচোখ যায়, সেই দিক পানে যাত্রা করেছেন, অমনই তারা নিজেদের ঝগড়া ভুলে ছুটল মাকে ফিরিয়ে আনতে এবং ওদের দুই বৌ—এমনকি ঝগড়াটে বীণা পর্যন্ত ফিরিয়ে-আনা মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

স্বামী মাধবচন্দ্রের অপঘাত মৃত্যুর (পথ চলতে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের ব্যাট থেকে ছিটকে আসা ক্রিকেট বল কপালে আছড়ে পড়ার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটল। এই ঘটনাকে চিত্রিত করে কাহিনীকার-পরিচালক হয়ত পথে-ঘাটে ক্রিকেট খেলা যে কতদূর পর্যন্ত মারাত্মক হতে পারে, তাই দেখাতে চেয়েছেন) পরে সর্বজয়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার জন্যে ছোটদের জামা-ফ্রক তৈরী করে ফেরি করেছেন, জীবনবীমার দালালী করেছেন এবং তাঁর স্বামীর অকৃত্রিম বাল্যবন্ধু, পশু-চিকিৎসক বিপিন-বাবুর কাছে থেকে প্রায়ই বিশ, পঁচিশ, তিরিশ টাকা করে ধার নিয়েছেন, যার মোট পরিমাণ শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে হাজার নয়েক টাকা। বলা যেতে পারে, উপেনের উকিল হওয়া এবং ভূপেনের ডাক্তার হওয়ার মূলে ছিল বিপিনের অকৃপণ সাহায্য। এমনকি, বিপিনের পরামর্শ ও চেষ্টায় দুই ভাইয়ের বিবাহ থেকে যে নগদ অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থ ও নব বধূদের গহনা সম্বল করে সর্বজয়া কন্যা চারুর বিবাহ দেন ধনীর পোষ্য, ইঞ্জিনীয়ার বিকাশের সঙ্গে। কাজেই সর্বজয়া যে একজন স্নেহশীলা জননী, একথা স্বীকার করে নিলেও ছেলেদের মানুষ করা বা তাদের ও তাদের একমাত্র ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া ব্যাপারে সর্বজয়া থেকেও বিপিনের দান ও কৃতিত্ব সমধিক। বড় বৌ ও বড় ছেলের কথায় তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন ছেলেদের কাছে ভারস্বরূপ মনে হওয়ায় তিনি অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন; কিন্তু এইটুকুই সর্বজয়াকে 'জননী' ছবির কেন্দ্রবিন্দুরূপে দর্শকের চোখে মহিমান্বিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কতখানি আত্মত্যাগ করে সর্বজয়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলেছিল, মানুষ হবার পরে ছেলেরা তাকে কি প্রতিদান দিল, মানুষ করা ছেলেদের কাছ থেকে দুঃখ পেয়েও সর্বজয়া ওদের চরম কোনো বিপর্যয়ের সময়ে নিজের প্রাণোৎসর্গ করেও ওদের ভালো করে গেল, এমনই এক মহিমময়ী চরিত্র আমরা দেখতে চেয়েছিলুম "জননী"তে। কিন্তু তেমন নাটকীয় গভীরতাপূর্ণ চিত্র আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে গেল।

বোম্বাইয়ের সুলোচনা চট্টোপাধ্যায় মা সর্বজয়ার চরিত্রে সংযত, অথচ দরদী অভিনয়ের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। ছোটভাই ডাক্তার ভূপেনের ভূমিকায় অজয় গাঙ্গুলী অত্যন্ত সাবলীল ও জীবন্ত অভিনয় করেছেন। এই ভূমিকা দেখে মনে হল, তিনি যেন ক্রমেই নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

রাজীব চৌধুরী বেশে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উপভোগ্য টাইপের সৃষ্টি করেছেন। উকিল উপেনের ভূমিকায় তরুণকুমার তাঁর নিজস্ব রীতিতে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। বিপিনবেশী কালী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। ধনীর নাতি, ইঞ্জিনীয়ার বিকাশের রোমান্টিক ভূমিকায় সমিত ভঞ্জ নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। চারুর ভূমিকায় পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পাশকরা ছাত্রী জয়া ভাদুড়ীর নাটনৈপুণ্য প্রকাশের বিশেষ কোনো সুযোগ নেই। কাজেই তাঁকে আমরা এছবিতে দেখলুম মাত্র, তার বেশী নয়। বীণার অসন্তোষ যেমন সন্দেরভাবে প্রকাশ করেছেন সুলতা চৌধুরী, বীণার স্বাভাবিক মাধুর্যও তেমনই প্রকাশিত হয়েছে লিলি চক্রবর্তীর দ্বারা। অপরাপর ভূমিকায় ভূপেন চক্রবর্তী (মাধব), অপর্ণা দেবী (বিকাশের মা), নন্দিতা দে (বিপিনের স্ত্রী), অজিত চট্টোপাধ্যায় (কাকাতুয়ার মালিক) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি মধ্যমান রক্ষিত হয়েছে। ছবিটিকে দ্রুতলয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব সম্পাদক শিবসাধন ভট্টাচার্যের। ছবির তিনখানি গানের মধ্যে দুখানি নীতিমূলক এবং একখানি বাসরের গান—তাও আবার বিশেষ বিশেষ গহনার উল্লেখে ভরা। এ-অবস্থায় না গানের রচনা, না গানের সুর—কিছুই প্রাণে পুলক জাগানোর মতো হওয়া সম্ভব নয় এবং এক্ষেত্রে তা হয়ওনি।

মায়ের মহিমা কীর্তন বিষয়ক গৃহস্থালীর ছবি 'জননী' সাধারণ দর্শককে কিছুটা খুশী করতে পারে।

—নান্দীকর

সলিল দত্ত পরিচালিত স্ত্রী চিত্রের মহরতে ক্ল্যাপ দিচ্ছেন বিভূতি লাহা।
ফটো : অমৃত

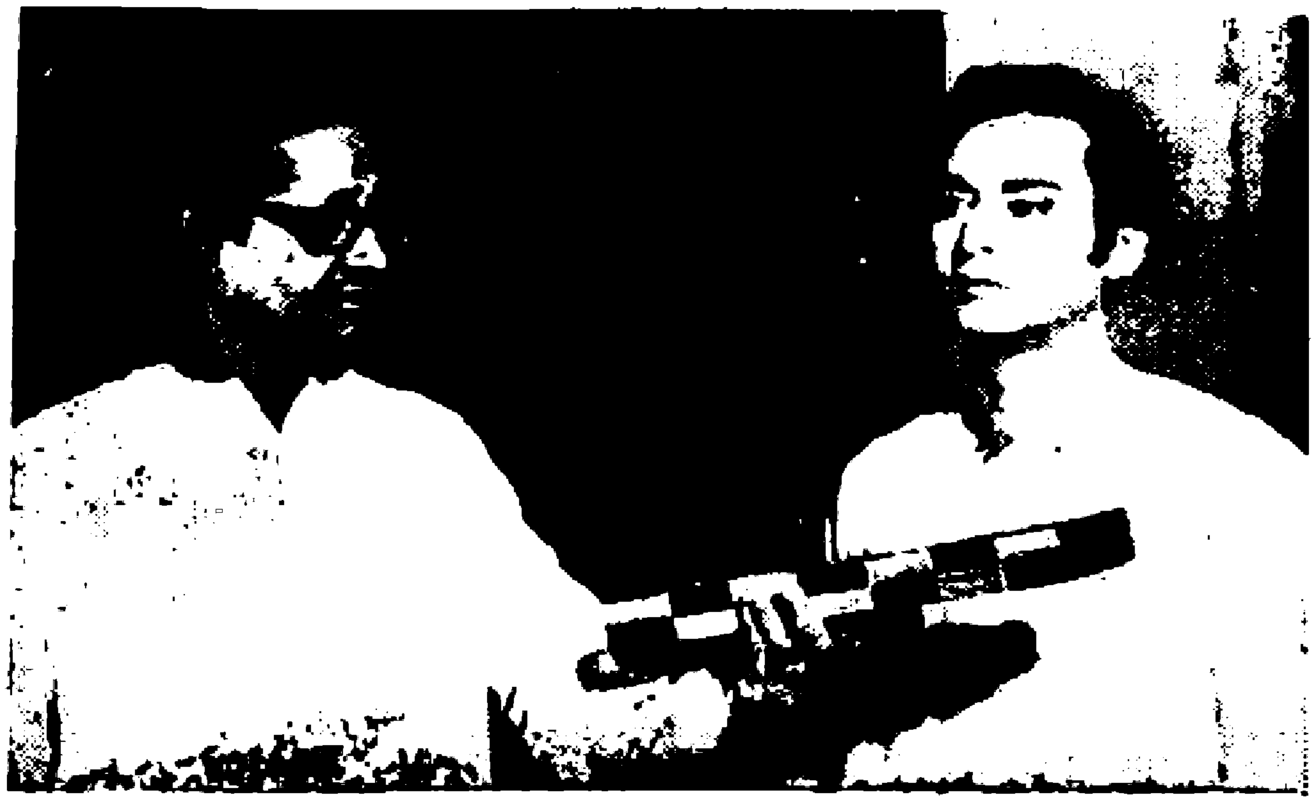

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৮৪৪৬)

নান্দীকার

শনি ৬, রবি ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা

২৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার ৬টায়
শের আফগান

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নতুন নাটক —
দেবনারায়ণ গুপ্তের

সীমা

প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩॥ ও ৬টায়

রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বস, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, রেনুকা দাস, কুমারী মিনু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

স্টুডিও থেকে

প্রতিবারের মত এবারেও পয়লা বৈশাখ স্টুডিওপাড়া ছিল বেশ জমজমাট। পূর্ব-নির্ধারিত মত তিনটে ছবির মহরৎ হয়েছে ঐদিন। শুনেছিলাম মান্না দে প্রযোজিত 'রজনীগন্ধা' এবং ইন্দোর সেনের 'পিকনিকে'র কাজও শুরু হবে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ঐ দুটি ছবির শুভ মহরৎ শেষ পর্যন্ত হয়নি।

মহরৎ হয়েছে তিনটি ছবির—এক, শিল্পী সংসদের 'বন পলাশীর পদাবলী' দুই—সলিল দত্তর 'স্ত্রী', তিন—মার্তণ্ডনী হাজরা।"

এন-টির এক নম্বরে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে দেখি দু নম্বর ফ্লোর জুড়ে ভয়ানক ব্যস্ততা। ফ্লোরের দরজা খুলে সামনের লনে সারি সারি চেয়ার পাতা। বুঝলাম অভ্যাগতদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। উত্তমবাবু দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে ক্যামেরা পজিশন নিয়ে আলোচনা করছেন আলোকচিত্রী কানাই দের সঙ্গে। দিলীপ মুখার্জি ফ্লোরে ঢুকতে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন ছবি প্রসঙ্গে। এক কোণে সুপ্রিয়া দেবী, সাবিত্রী বিশ্বাস, মাধবী মিত্র প্রমুখ মেক-আপ ব্যস্ত। তারা স্বজাতীয় সাজিত জমকালো উজ্জ্বলতম। ছবিতে এমন চেহারা সব অতীতের স্মৃতির মন আসছে না। অন্তর্নিহিত বিকাশ তার এখনকার স্ফুরণ এনে 'কাজকোজে আসছে না কেন এমন অর্থাৎ দেওয়া চলছে সম্প্রতি সম্প্রতি বুকফাটা থেকে এর-ওর সঙ্গে হাসাহাসিতে পর বাইরে চলে গেলেন।

ব্যস্ততা শুধু ফ্লোর জুড়ে নয়, বাইরেও। বাংলাদেশের প্রায় সব খ্যাতিমান কুশলী শিল্পী বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করছেন শুভ মুহূর্তের। প্রথম দর্শনে একে অপরকে 'জয় বাংলা' বলে স্বাগত জানাচ্ছেন। ভেতরে সব প্রাথমিক কাজ ঠিক হয়ে যাবার পর প্রবীণ পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জি অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে জানালেন শিল্পী সংসদের বিভিন্ন সদস্য কিভাবে এই ছবি তৈরীর পশ্চাতে কাজ করেছেন এবং এখনও করছেন। উত্তমকুমার পরিচালিত এ-ছবির বিভিন্ন চরিত্রে থাকবেন শিল্পী সংসদেরই বিভিন্ন শিল্পীরা (যতদূর শুনেছি এঁদের মধ্যে আছেন সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জি প্রমুখ)।

অর্ধেন্দুবাবুর ভাষণান্তে উত্তমবাবু পূর্ব নির্ধারিত দৃশ্যটির চিত্রগ্রহণ করলেন উপস্থিত সকলের অনুমতি নিয়ে। দৃশ্যটি ছিল জমিদারবাড়ীর মজলিশী আড্ডার কয়েকটি সংলাপ। দৃশ্যগ্রহণ শেষ হতে না হতেই কোকাকোলার বোতল এসে গেল। যাত্রা শুরু হোল আরেকটি ছবির। ফ্লোর থেকে বেরিয়ে দেখি ভিড় আরও বেড়েছে। অনুপকুমার, বাসবী নন্দী, বিভূতি লাহা, তরুণ মজুমদার, পিনাকী মুখার্জি, সলিল সেন, দিলীপ রায় ও আরও অনেকে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গালগল্পে রত। ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে এগার।

• • •

পরের ছবির মহরৎ ইন্দিরা ল্যাবের রেকর্ডিং রুমে। যেখানে তখন প্রোডাকশনের সলিল দত্ত পরিচালিত ছবি 'স্ত্রী'। ছবির দুই চরিত্রাভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার। মহরতের শিল্পী ওঁরা দুজনই।

দু নম্বর ফ্লোর থেকে সবাই আসছেন ইন্দিরা ল্যাবের দিকে। সস্ত্রীক (শ্রীমতী গীতাশ্রী দত্ত) সলিল দত্ত এলেন একটু

নাগে। রেকর্ডিং রুমে ঢুকে দেখি ভিড় একটু কম। চেয়ার অনেক খালি। কিছু-ক্ষণ পরে সৌমিত্রবাবু ঢুকলেন মেক-আপ নিয়ে। খালি চেয়ারগুলো তখন প্রায় ভর্তি হতে চলেছে। বিকাশ রায়, বিভূতিবাবু এলেন, এলেন দিলীপ সরকার, রণজিৎ কাঁকারিয়া, তরুণ মজুমদার, অনুপকুমার ও আরও অনেকে। রেকর্ডিং রুম। তাই কোনো সেট ফেলা হয়নি। পেছনে স্কাই কালারের ক্যানভাস একটি। বুমম্যান এগিয়ে-পিছিয়ে শব্দগ্রহণ যন্ত্রটিকে ঠিক জায়গায় দাঁড় করালেন। ক্যামেরা পজিশন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। ক্যামেরাম্যান বিজয় দে ক্যামেরার পেছনে বসতেই পরি-চালক সলিল দত্ত উপস্থিত সকলের অনুমতি নিলেন চিত্রগ্রহণের জন্য। ইতি-মধ্যে লাবরেটরীর একজন কর্মী পুজোর ফুল মাথায় ছুঁইয়ে কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়ে গেছেন সকলকে।

সলিলবাবুর অনুরোধে ক্ল্যাপস্টিক দিলেন বিভূতি লাহা। মাত্র একটি সংলাপ বাণীবন্ধ করা হোল। সৌমিত্রবাবু ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাল-বাসার অনেক চেহারা আছে, তুমি স্বৈ-চারিণী হয়ে পড়ছ।' উত্তমবাবু ও আরও অনেকে তখন সুটিং জোনের বাইরে দাঁড়িয়ে। সংলাপ শেষ হতে সবাই এক-যোগে হাততালি দিয়ে উঠলেন, সৌমিত্র-বাবুও বাদ গেলেন না। ইতিমধ্যে সন্দেশের ট্রে তখন সবার সামনে ঘুরছে। উত্তম-সৌমিত্রকে ঘিরে তখন অনুরাগীদের ভিড়। কেউ শুধু চোখ মেলে তাকিয়ে, কেউ বা বাড়িয়ে দিয়েছে অটোগ্রাফের খাতা। নিমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল ছবির প্রধান নারী চরিত্রে থাকবেন বাংলার খ্যাতনাম্নী একজন নায়িকা। শুনেছিলাম অপর্ণা সেনই সেই অভিনেত্রী। আপাততঃ শুনছি হয়তো বা পরিবর্তন হতে পারে।

সৌমিত্রবাবুর কাছে শুনলাম ছবির কাজ শুরু হতে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের আগে নয়। ইতিমধ্যে নায়িকা স্থির হলে জানানো হবে।

মঞ্চাভিনয়

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর 'সওদাগর' উপন্যাসের নাট্যরূপ শীঘ্রই মঞ্চস্থ করছে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ তাদের নতুনরূপে সজ্জিত প্রেক্ষাগৃহে। এর নাট্য-রূপ দিয়েছেন সমরেশ চক্রবর্তী। নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন পদ্মশ্রীভূষিতা তৃপ্তি মিত্র। অন্যান্য মুখ্য ভূমিকায় আছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, তরুণকুমার, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, অজিত মিত্র, শম্ভু বন্দ্যো-পাধ্যায়, গণেশ শর্মা, পান্নালাল চট্টো-পাধ্যায়, কমল গুপ্ত, আরতি দাস, অলকা গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় ও সুলতা চৌধুরী। অনেকদিন পর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন রবি ঘোষ। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন নচিকেতা ঘোষ এবং গান রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র। আলো ও মঞ্চের দায়িত্ব নিয়েছেন 'নেহরু' পুর-স্কার প্রাপ্ত রবীন্দ্র-ভারতীর অধ্যাপক অমর ঘোষ।

প্রতিটি সার্থক নাটকের অন্তর্নিহিত একটি বিশেষ বক্তব্য নিশ্চয়ই থাকবে, যার গতিবেগে চরিত্র আর ঘটনার সংঘাত দুর্বার হয়ে ওঠে আর সামগ্রিকভাবে নাটকটি তখনই যথার্থ শিল্পের আলোয় নিটোল হয়ে ওঠে। কিন্তু শুধুমাত্র বক্তব্যের অতিরিক্ত প্রচারই নাটক নয়, কাহিনীর আবর্তের মধ্য দিয়েই বক্তব্যকে খুঁজে নিতে হবে। চরিত্রের বিভিন্ন মানসিকতার সংঘর্ষে মুখরতাতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নাট্যকারের কোন বিশেষ প্রচ্ছন্ন জীবনদর্শন। কাহিনী প্রসারতা না পেলে, মানসিকতা স্পষ্টতা না পেলে, শুধু বক্তব্য কোন নাটককে শৈল্পিক মুক্তি দিতে পারে না।

সম্প্রতি 'রঙ্গনা'য় রূপাঙ্কন প্রযোজিত ইন্দ্রনাথ উপাধ্যায় রচিত দেহাই, ফাঁসি দেবেন না নাটকটি দেখতে দেখতে এই কথাগুলোই মনে ভীড় করে আসছিল। মনে হচ্ছিল একটি অসম্ভব মানবিক গুণ-সম্পন্ন কাহিনী ও প্রতিশ্রুতিময় চরিত্রের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বক্তব্য প্রকাশের চাপে যেন নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। আজকের

শুভ-উদ্বোধন

শুক্রবার, ২৩শে এপ্রিল!

আসছে সেই নয়নরঞ্জন অনন্য চলচ্চিত্র যা বিংশশতাব্দীর মনোভাব ও নাটককে প্রতিফলিত করবে!

প্যারাডাইস - জেম - মেনকা - প্রভাত
গণেশ - খান্না - রূপালী

নবভারত - ন্যাশনাল - অজন্তা - অশোক - থাকুরমহল - শ্রীকৃষ্ণ - লক্ষ্মী
স্বপ্না - রূপালিকা - মায়ারানী - জিনত্যা সিনেমা - চলচ্চিত্রম - রামকৃষ্ণ
অন্নপূর্ণা - জামশেদপুর টকীজ (জামশেদপুর) - করীম টকীজ
বিহার টকীজ (ঝরিয়া) - রে (ধানবাদ) - রূপকথা (আসানসোল)
— বুধানী/সিকার্স-প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত —

রূপে ন্যায় অন্যায়, দোষী ও নির্দোষ বিচারের নেপথ্যে যে মর্মান্তিক প্রহসন লুকিয়ে আছে, এ নাটকের তার প্রতিটি চরিত্রই যেন তো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে। সংলাপে আবেগের প্রাচুর্য থাকলেও কোন কোন জায়গায় অসাধারণ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছিল মঞ্চে। তাছাড়া নাটকটির নামকরণের মধ্যে একটা চমক যেমন আছে, তেমনি আছে একটি চিরন্তন মানবিক আবেদন।

অভিনয়ের ব্যাপারে শিল্পীদের আন্তরিকতা যৌথবৃত্তিভাবে নাট্যপ্রবাহকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। চরিত্রের অতলে ডুব দিয়ে যিনি আমাদেরও মানসিক কল্পনার অংশীদার হয়েছেন তিনি হলেন তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'মনীশ' আমাদের অনুভূতিকে তার প্রতিমুহূর্তেই আন্দোলিত করেছে। 'সরলের ভূমিকায় বীরেন ঘোষ যথাযথ রূপ দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর পোশাকে বয়স ও চরিত্রের গাম্ভীর্য মাঝে মাঝে যেন বিপর্যস্ত হয়েছে। 'সজল' চরিত্রে মোহন-লাল গঙ্গোপাধ্যায় সব সময়ে স্বচ্ছন্দ হোতে পারেননি, কিন্তু আরতি ঘোষের 'সুপ্তি' বেদনা আর হতাশার এক মর্মান্তিক ছবি তুলে ধরেছে।

নাটকটির নির্দেশনায় নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; কয়েকটি মুহূর্ত সৃষ্টিতে তাঁর শিল্পবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে। দু' একটি চরিত্র কয়েকটি মুহূর্তে মূল কাহিনীর মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে দর্শকদের বোঝাতে চেয়েছেন তাঁদের বক্তব্যকে। প্রয়োগ পরি-কল্পনার দিক দিয়ে এর মধ্যে কিছুটা ব্রেখটীয় রীতির আভাস পেলেও, তাতে আলোচ্য নাটকটির পরিবেশনা কিন্তু কোন অতিরিক্ত সৌন্দর্য লাভ করতে পারেনি।

সংস্কৃতি : চারুপোতার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সংস্কৃতি' গত ২৭ মার্চ বিশ্ব রঙ্গ-মঞ্চ দিবস উদ্‌যাপন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীনিমাই মান্না। নাটক ও নাটক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সর্বশ্রী কৃষ্ণ পাত্র, রণজিৎ গোস্বামী, অরূপ মান্না, অসিত পাত্র, বেণু গোস্বামী, সমীর পাখীরা। সভাপতির ভাষণে শ্রীমান্না আন্তর্জাতিক নাট্যধারার ওপর দীর্ঘ আলোচনা করেন।

গত ১১ এপ্রিল এই সংস্থা স্মৃতিশীল পরিবেশের মাঝে সংস্থার যুগপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পূর্ব-বাংলার মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতিতে নীরবতা পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বশ্রী বেণু গোস্বামী, নিমাই মান্না, দিলীপ রক্ষা, তপন চক্রবর্তী, কৃষ্ণ মান্না, সুধা মান্না, দীপান্বিতা মান্না, বীণা চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আমতা শাখার শিল্পীবৃন্দ গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সংস্থার সদস্য-সদস্যারা সুনির্মল বসুর 'আনন্দনাড়ু' ও কিরণ মৈত্রর 'অন্য ছায়া' নাটক দুটি শ্রীনিমাই মান্নার নির্দেশনায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

মহুয়া : মহুয়া (এণ্টালী) নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক ফেব্রুয়ারী মাসে মহুয়া উদ্বোধন ঘটেছে এবং এই মঞ্চে প্রতি মাসে নাট্যাভিনয় হচ্ছে। দুটি নাটক অভিনীত হওয়ার পর আসছে ২৫ এপ্রিল শ্রীশচীন ভট্টাচার্য রচিত 'পাশের ঘরের ভাড়াটে' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

নাট্য প্রতিযোগিতা : হাজারিবাগের 'মহুয়া' নাট্য সংস্থা এক সর্বভারতীয় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত দলকে সোনার মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। এবং অন্যান্য সফল প্রতিযোগীদেরও বিভিন্ন-ভাবে সম্মানিত করা হবে। অনুষ্ঠানের শুরু ১০ জুন, চলবে ১০ জুন পর্যন্ত। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ মে এবং যোগাযোগের ঠিকানা : সঞ্জয় গুহ-ঠাকুরতা, অবধায়ক—বাটা সু স্টোর্স, পোঃ ও জেলা—হাজারিবাগ, বিহার।

বিবিধ সংবাদ

বি-এফ-জে-এর সাধারণ সভায় 'বাঙলাদেশ' সম্পর্কিত প্রস্তাব

বি-এফ-জে-এর সভ্যগণ গেল শনিবার, ১৭ এপ্রিল একটি সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে 'বাঙলাদেশ' সম্পর্কে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলেন, "বাঙলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর যে বর্বরোচিত আক্রমণ চালানো হচ্ছে, তাতে এই সভা স্তম্ভিত ও ব্যথিত। যে-সকল শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবীদের এবং অসহায় জনসাধারণকে হাজারে হাজারে অকথ্যভাবে হত্যা করা হয়েছে ও হচ্ছে, তাদের জন্য এই সভা গভীর শোকপ্রকাশ করছে।" এক মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে সভ্যগণ এই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেন। অন্য এক প্রস্তাবে বাঙলাদেশের নিপীড়িত জনগণকে সাহায্য

করবার জন্যে একটি সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয় এবং সভাস্থলেই কয়েকজন সভ্যের কাছ থেকে প্রায় এক হাজার টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

যাদুসম্রাজ্ঞী উমা দাশগুপ্ত : কলকাতার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে একাধিকবার এবং পশ্চিমবাংলার শহর ও নগরের নাট্যমঞ্চে অসংখ্য সাহায্য প্রদর্শনীতে ভারতের একমাত্র মহিলা ঐন্দ্রজালিক যাদুভারতী

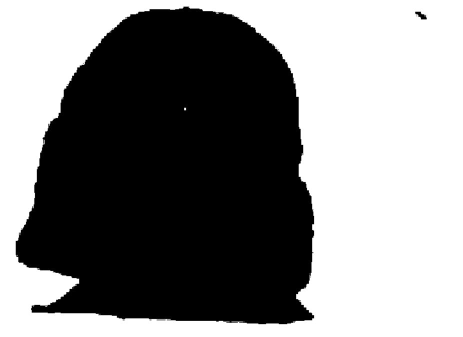

উমা দাশগুপ্ত ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে অসংখ্য মানুষের সহর্ষ অভিনন্দন লাভ করলেও দিল্লীর বেঙ্গলী এসোসিয়েশন আয়োজিত বাংলার সংস্কৃতি উৎসবে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মভলঙ্কার হলে গত ৮ই এবং ১০ই এপ্রিল যাদু প্রদর্শনে যে সাধুবাদ ও প্রশংসা পেয়েছেন তার বুঝি তুলনা মেলে না। দিল্লীর সম্ভ্রান্ত জ্ঞানী গুণী রসিকজনের সমাবেশে কুমারী দাশগুপ্ত তাঁর বহুবার প্রদর্শিত যাদুর খেলাগুলি নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে দেখালেন—প্রদর্শনশৈলীর অভিনবত্বে তিনি আজও দ্বিতীয়-রহিত। তাঁর সবশেষের অনুষ্ঠানটি ছিল অভিনব এবং তাৎপর্যপূর্ণ। একটি আধারে কতকগুলি ফুল রাখলেন। তারপর সেগুলি টেনে বার করে আনতেই চক্ষের পলক ফেলবার আগেই তা হয়ে গেল একটি মালা, যার অধমুখে লেখা 'জয় বাংলা।' সারা প্রেক্ষাগৃহ হর্ষধ্বনিতে বার বার কুমারী দাশগুপ্তকে অভিনন্দন জানাতে থাকল। প্রথম প্রদর্শনেই উমা দাশগুপ্ত দিল্লী জয় করে নিলেন। দিল্লী জয় করে কুমারী দাশগুপ্ত সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ভারতের বাঙালী-প্রধান শহর ও নগরগুলিতে পর্যায়ক্রমে যাদু প্রদর্শনের এক ব্যাপক পরিকল্পনা তিনি করেছেন। এইসব প্রদর্শনীতে সংগৃহীত অর্থ 'বাংলাদেশ' সেবা সাহায্যে তিনি অর্পণ করতে কৃতসংকল্প।

সোবোলের ইন্দ্রজাল : গত ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় কোলকাতা তথ্য কেন্দ্রে নিখিল ভারত নারী সম্মেলন (মধ্য কোলকাতা শাখা) কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী উপলক্ষে বিশিষ্ট যাদুকর সোবোল তাঁর বিচিত্র ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি 'শান্তির দূত' 'অরবিন্দের মায়া', 'বিশ্বের রহস্য', 'কালিকার বিচার', 'হর তাসের রহস্য' প্রভৃতি খেলাগুলি প্রদর্শন করেন।

শহীদ স্মৃতি তর্পণ : গত ১০ এপ্রিল মঙ্গলবার সকালে বহু তরুণ শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ও নাট্যকারদের উপস্থিতিতে 'পশ্চিমবঙ্গ-নাট্য সংরক্ষণ সমিতি'র সদস্যদের উদ্যোগে নিজস্ব সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে এক অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে জালিয়ানাওয়ালাবাগ দিবস পালন করা হয়। এ ছাড়াও এদিন ওপার বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে বিক্ষিপ্ত কথা ভাষণ দেন। সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এক প্রস্তাবে মুক্তিফৌজদের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। সভায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতা পাঠের ব্যবস্থা ছিল।

অথ স্টার থিয়েটার সম্পর্কিত

গেল বুধবার, ৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় রঞ্জিতমল কাংকারিয়া একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন সংপ্রতি স্টার থিয়েটারের হস্তান্তর সম্পর্কে আলোকপাত করবার জন্যে। নাট্যকার মন্মথ রায় ও দেবনারায়ণ গুপ্তের ভাষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, পূর্বতন অধিকারী সলিল মিত্র প্রধানত তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটায় তাঁর প্রাণপ্রিয় থিয়েটারটিকে শ্রীকাংকারিয়ার কাছে এই শর্তে হস্তান্তরিত করেছেন যে, তিনি ঠিক যেভাবে শিল্পী ও কর্মীদের মাসিক বেতন ইত্যাদি দিয়ে থিয়েটার চালাতেন, ঠিক সেইভাবে থিয়েটার চালাতে হবে এবং থিয়েটারের কোনোরকম রদবদল হবে না। ১৯৫২ সালে যে প্রখ্যাতযশা নাট্য-পরিচালক শিশির মল্লিক 'শ্যামলী' নাটকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্যে দায়ী ছিলেন, সেই শিশির মল্লিকমহাশয় থিয়েটার পরিচালনা বিষয়ে শ্রীকাংকারিয়াকে সাহায্য করবেন। শ্রীকাংকারিয়া নিজে এই কথাকে সমর্থন করে অধিকন্তু বললেন, আমি যদি এখানে 'সিনেমাস্কোপ' চালু করি, তাহলে তা থিয়েটারকে যথারীতি চলতে দিয়েই করব—থিয়েটারের কোনোরকম ক্ষতি করে নয়। আমরা আশা করব, শ্রীকাংকারিয়া স্টারের ঐতিহ্যকে মনে রেখে এর উন্নতিকল্পে যথার্থই নিয়োগ করবেন।

সুক্ষ্ম সমালোচক আর বিজ্ঞ চলচ্চিত্র রসিকসমাজে
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে অভিনন্দিত

'অলিখিত প্রথা আর নিরুদ্ভাপের সাহসের ছবি : রেহানা সুলতানের অসামান্য অভিনয় ভোলবার নয়।"
—আনন্দবাজার পত্রিকা

"অমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বাধিক দুঃসাহসের বিষয়বস্তুই পাওয়া গেল এক নবাগতের হাত থেকে।"
—অমৃতবাজার পত্রিকা

'ছবির অগ্রগতির ক্ষেত্রে 'চেতনা' নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।"
—দেশ

"নিরীক্ষামূলক দুঃসাহসের ছবি প্রশংসালাভের যোগ্য।"
—অমৃত

"অনুভূতি ও প্রয়োগসৌষ্ঠবে বলিষ্ঠ রেহানা সুলতানের আশাব্যঞ্জক বাস্তবানুগ, অনুভূতিপ্রবণ বাস্তব অভিব্যক্তি উল্লেখযোগ্য।"
—স্টেটসম্যান

নীতিন ফিল্মস-এর
চেতনা

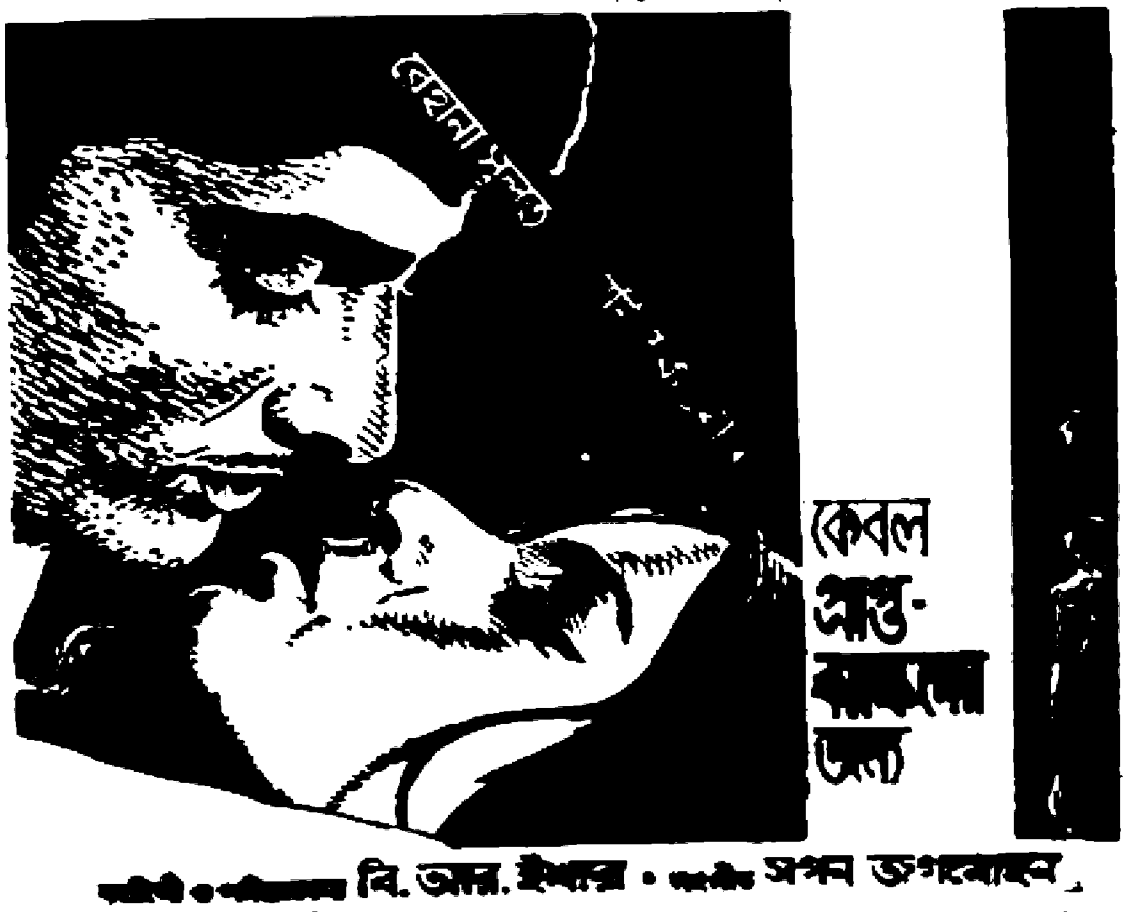

বি. আর. ইশারা • সপন জগমোহন

এলিট
প্রত্যহ
৩, ৬, ৯

কেরামতুল্লা খাঁ গিরিজা দেবী ভি জি যোগ

জলসা

ঠুংরীর আসরে অপূর্ব শিল্পী সমন্বয়: রবিবার নিউ আলিপুরের একটি প্রভাতী আসরে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেল পরিবেশিত বেনারসের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীমতী গিরিজা দেবীর প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টাব্যাপী একক গানের আসর জমে উঠেছিল শুধুমাত্র শিল্পীর গায়ন-নৈপুণ্যের জন্যেই নয়। তাঁর সঙ্গে সংগতে ছিলেন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ভি জি যোগ (বেহালা) শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (হারমোনিয়ম) এবং ওস্তাদ কেরামতুল্লা খান (তবলা)। এ হেন স্বনামখ্যাত ত্রয়ীর সম্মিলিত সাহচর্যে অনুষ্ঠানের বর্ণাঢ্য আকর্ষণ নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। শিল্পী গান শুরু করেন দেশী তোড়ি দিয়ে। রাগের অন্তর্নিহিত শান্ত বিষণ্ণতাকে এক অদ্ভুত [illegible] পরিবেশ সুর-মাধুর্যে [illegible] তুলে [illegible]ছিল। শ্রোতাদের অন্তর [illegible] আবেশে [illegible] না হয়ে পারে। কিন্তু এই অনির্বচনীয় বিষাদ মাধুর্যের রেশ যেন দানা বেঁধে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গেল যখন 'দেশী' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গিরিজা দেবী ধরলেন 'গান্ধারী বাহার।' অবশ্য স্বর-সমন্বয়ের বাহার ও শিল্পীর আনন্দভরা মেজাজ রস পরিবেশনে কোনো কার্পণ্য ঘটায়নি। কিন্তু শিল্পী তাঁর যথার্থ ব্যক্তিসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হলেন ঠুংরি অঙ্গের গানে। প্রথমেই 'চৈতী' দিয়ে শুরু হতেই বসন্ত সমাগমে নায়িকার উতলা চিত্তের আবেগ ও রং ছড়িয়ে পড়ল শ্রোতাদের চিত্তে। 'চৈত্রমাস বোলোরে কোয়েলিয়া'— স্মরণ করিয়ে দিল ঠুংরির ছোঁয়া ভাবপ্রধান সংগীত। ভাবনিষ্ঠতাই এর রসকেন্দ্র তাই 'রস সাধনা' অর্থাৎ প্রতিটি কথা ও সুরের তাৎক্ষণিক বিস্তার রচনায় ও প্রতিবার একই কথা বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় নিবেদন করার মধ্য দিয়ে [illegible] রসিকচিত্ত দুলে না উঠে পারে না।

কেরামত খানের সঙ্গতেই রাগের শুদ্ধতা বজায় রেখে টপ্পা অঙ্গে জমজমা ও বোলতানের ধ্বনি-তরঙ্গ শিল্পীর চোখের ইসারা, তাম্বুলরঞ্জিত অধরের সলাজ হাসি ও মুদ্রার ব্যঞ্জনায় যে রসরাগ রচনা করে তা একান্তই আস্বাদ ও অনুভবের বস্তু। কিন্তু 'বাজুবন্ধ'-এ ভৈরবীর কারুণ্যের স্পর্শে মনকে ভিজিয়ে দিয়েই আবার 'হোলি'র খণ্ডনে চঞ্চল হয়ে ওঠার ভাবসম্পত্তি রইল কি?

ভি জি যোগের বেহালা ও জ্ঞানবাবুর হারমোনিয়াম একাধারে শিল্পীর সুরধারাকে উচ্ছ্বসিত করা ও গানের ফাঁকে স্বর সমন্বয় বিনিময়ে নাটকীয় রূপকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। ত্রিতাল দীপচন্দী-তবলা ও সেতারখানির বিভিন্ন ছন্দে কেরামত খাঁর তবলা সম্পদের জবাব নেই।

ইকোটোন ডিস্কে নতুন কণ্ঠ

ইকোটোন লেবেলের ৪৫. আর পি এম রেকর্ডে একটি নতুন কণ্ঠ শোনা গেল। শিল্পীর নাম সাগর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি স্বরচিত সুরে সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দুটি গান গেয়েছেন 'আকাশে বন্দী বন্দী' তোমার ঐ অবাক চোখের'—একটি সুরপ্রধান অন্যটি ছন্দপ্রধান। শিল্পীর কণ্ঠ মধুর, গান দুটি গেয়েছেনও মিষ্টি করে।

নৃত্যবিতানের অনুষ্ঠান: গত রবিবার ৪ এপ্রিল স্বর্গীয় ব্রজবাসী সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নৃত্য বিতানের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীদের রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'। এতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন বজ্রসেনের ভূমিকায় কৌশিক সিনহা, শ্যামার ভূমিকায় শ্রীমতী জয়ন্তী গাঙ্গুলী। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে সর্বশ্রী গৌরী গুহ (উত্তীয়), কেকা সাহা, বিমান মুদ্রর অভিনয়ও চিত্তাকর্ষক হয়। মণিপুরী নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী স্বপনা দেবী ও দুর্গা ঘোষ দস্তিদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক জার্মানীর ভাইস কনসাল শ্রীএইচ ডি ওসিমার।

—চিত্রাঙ্গদা

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিন্টাস - L.৪০…

খেলার কথা

তিন দশক আগে

কমল ভট্টাচার্য

দিনান্তের আলো আস্তে আস্তে ছায়া ফেলছে সবুজ ঘাসের বুকে। সমস্ত মাঠের মধ্যে নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা। পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে বাংলা দলের খেলোয়াড়েরা একে একে ফিরে গেছে শিবিরে। কেমন যেন মনে হচ্ছে রণজি স্টেডিয়ামের ঘেরা প্রাঙ্গণে একটা চাপা হাহাকার গুমরে গুমরে বেড়াচ্ছে।

এ হাহাকার পরাজয়ের এ হাহাকার ব্যর্থতার। দলগত ব্যর্থতার জন্যে বাংলা এবারেও জয়মুকুট তুলে দিয়েছে বোম্বাই দলের মাথায়। ভাঙাচোরা দল নিয়ে লড়তে এসেছিলো বোম্বাই। বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ারসিকের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল, হয়তো এবারে বাংলা দল জিতবে। কিন্তু একটি ফুৎকারে সে আশার আলো নিভে গেল। এবারেও বাংলার ঘরে রণজি ট্রফি এলো না।

রণজি ট্রফি—ভারতীয় ক্রিকেটের সব চেয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিযোগিতা। ভাবতে ভাবতে মন চলে যায় অনেক দূরে—অনেক পিছনে। সেদিনের ইতিকথা আজও পর্দার ছবির মতো আমার চোখের সামনে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল। সেদিনের কৃতিত্বের কথা মনে করলে আজকের ব্যর্থতার গ্লানি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়।

আজ উনিশ শ' একাত্তর। সেরা সেরা ব্যাটসম্যান নিয়ে বাংলা দল রণজি ট্রফি ঘরে আনতে পারল না। তিন যুগ আগে উনিশ শ' উনচল্লিশ সালে দক্ষিণ পাঞ্জাবের কুশলী খেলোয়াড়দের পরাজিত করে বাংলা দল কিন্তু রণজি ট্রফি ছিনিয়ে নিয়েছিল।

ভাল লাগে অতীতকে রোমন্থন করতে। ব্যর্থতার গ্লানি ভুলতে স্মৃতিচারণ করি মাঝে মাঝে। তুলনা করি সেকাল এবং একাল বাংলার। বয়সের ভারে আজ প্রবীণ হয়েছি। কিন্তু সেই তিন যুগ আগে আমি ব্যাট করেছিলাম দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে, বল করেছিলাম ওয়াজীর আলি, লালা অমরনাথ, রোশনলালের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ পাঞ্জাবের এই সব যশস্বী ব্যাটসম্যানদের পরাজিত করে রণজি ট্রফিকে আমরা ঘরে আনতে পেরেছিলাম।

সেই একবারই রণজি ট্রফি পেয়েছে বাংলা দল। এবারের বোম্বাই দলে দিলীপ সারদেশাই, অজিত ওয়াদেকার, সুনীল গাভাসকার, অশোক মানকড় এবং সোলকার ছিলেন না। তাই ভেবেছিলাম এবার হয়তো বাংলা রণজি ট্রফি পাবে। কিন্তু হায়! সেমিফাইনালেই বাংলা পরাজিত হলো বোম্বাইয়ের কাছে।

সেদিন ছিল আঠারোই ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' উনচল্লিশ সাল। ঝাউবনে ঘেরা সবুজ ইডেন উদ্যানে বাংলা বনাম দক্ষিণ পাঞ্জাবের খেলা শুরু হল। সময়টা যদিও ফেব্রুয়ারী মাস, তবুও প্রচণ্ড গরম পড়েছিল কলকাতার বুকে। সেই অকাল গ্রীষ্মের রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা অনুশীলন করেছি।

বিল হিচ—ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার—যিনি 'হিচ্ এক্সপ্রেস' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনিই আমাদের কোচিং-এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অধিনায়ক ছিলেন টম লংফিল্ড। আমরা অর্থাৎ খেলোয়াড়রা অধিনায়ক লংফিল্ড এবং কোচ হিচের সঙ্গে প্রায়ই পরিকল্পনা করতাম প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কোন খেলোয়াড়কে কিভাবে পর্যুদস্ত করব। শুধু তাই নয়, আমাদের খেলোয়াড়দের যে-সব গলদ আছে, তা' সংশোধনের চেষ্টাও করতাম।

অনুশীলনের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে; সে সময়ের কোলকাতার ময়দানের সকল ফাস্টবোলারদের ডেকে আনা হয়েছিল ইডেন উদ্যানে। স্টানলি বেরেণ্ড এবং তিন মিত্র—বিমল, বিমান, সুহৃদ উপস্থিত থাকতেন প্রতিদিনের অনুশীলনে। আর থাকতেন বাংলা দলের কোচ বিল হিচ। অনুশীলনের প্রথম দিনেই সমস্যা দেখা দিল এইসব ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং শুরু করবে কোন খেলোয়াড়? অধিনায়ক লংফিল্ড ব্যাটসম্যানদের গায়ে বল মারতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে নাকি ব্যাটসম্যানদের ভয় ভেঙে যাবে। ভয় কিন্তু আমাদের ছিল না ফাস্ট বলে খেলতে। অন্ততঃ আমার তো নয়। এরিয়ান্স ক্লাবের ফাস্ট বোলার স্যুট ব্যানার্জি এবং বিমল মিত্রের বিরুদ্ধে তো অনেকবার খেলেছি। কিন্তু হিচ ও'দের তুলনায় খুব একটা শক্তিশালী ছিলেন না। সুতরাং ভয় কিসের।

লংফিল্ডের নির্দেশ নেমে এল আমাদের ওপর। আমরা এই পাঁচজন বাঙালী ছিলাম সেবারের বাংলা দলে—কার্তিক বসু, জিতেন ব্যানার্জি, কম্বার, তারা ভট্টাচার্য এবং আমি। অনুশীলনের সময় কার্তিক বসু কিন্তু পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন কলকাতার এইসব কুশলী ফাস্টবোলারদের। মোটের উপর, এই অনুশীলনে যথাদিনের ভয় ভাঙার থেকেও বেশী উপকৃত হয়েছিলাম ফিল্ডিংয়ে।—আমাদের ফিল্ডিংয়ের মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল।

অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ে সেদিনকার খেলা নিয়ে। প্রতিটি ঘটনায় আমরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি।

এসব ঘটনা ছাড়া আরও একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাবের ওয়াজীর আলী। তাঁর প্রতিটি মার এবং ভাবভঙ্গী আজও মনে গেঁথে আছে।

দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে আমরা ২২২ রান করেছিলাম। অপরদিকে দক্ষিণ পাঞ্জাবের চৌকস ক্রিকেটার ওয়াজির আলী একাই ২২২ রাণ করেন। অবশ্য তিনি খেলার সূচনায় আউট হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, সেদিন তিনি যে খেলা দেখিয়েছিলেন, সত্যিই অতুলনীয়। বাংলা দলে ছিলেন কয়েকজন উচ্চমানের বোলার—টম লংফিল্ড, জিতেন ব্যানার্জি, তারা ভট্টাচার্য, ম্যালকম প্রভৃতি। এইসব দুর্ধর্ষ বোলারদের বিরুদ্ধে ইডেনের উইকেটে রুখে দাঁড়ানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। তার প্রধান কারণ এইসব বোলাররা অত্যন্ত 'সিম'-এ বল করতেন এবং সুইং করাতেনও অদ্ভুতভাবে।

সে যুগে সারা ভারতে ইডেনই ছিল শ্রেষ্ঠ মাঠ। একমাত্র এখানেই সুইং করাতে জানলে অন্ততঃ দু'শো রান পর্যন্ত সুইং করানো সম্ভব হত। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য সেদিনের ইডেনের উইকেটের সঙ্গে আজকের উইকেটের কোন তুলনাই হয় না। অনেক তফাৎ সেদিনের সঙ্গে। আজকের উইকেট একদম প্রাণহীন। উইকেটে ঘাস নেই ছিটেফোঁটা মাত্র। দুঃখ হয়, কি বল করবে বোলাররা এ-ধরনের উইকেটে।

অথচ সেদিনের উইকেট ছিল সজীব প্রাণবন্ত। কতটুকু ঘাস থাকা দরকার, ঠিক ততটুকুই ছিল উইকেটে। সেদিন ইডেনের উইকেট দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন দক্ষিণ পাঞ্জাবের বোলাররা। তাঁরা বলেছিলেন, গোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, কিন্তু এরকম মনের মতো উইকেট দেখিনি কোথাও।

যাই হোক,—অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। ফিরে আসা যাক ওয়াজির আলীর কথায়। বল করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমার প্রতিটি বল তাঁর ব্যাটের মার খেয়ে কেমন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে কেমন পরাস্ত মনে হচ্ছে। হতাশায় ভেঙে পড়ার আগেই এগিয়ে এসেছেন টম লংফিল্ড। অদ্ভুত মানুষ এই লংফিল্ড। ভরসা দিয়ে বলতেন—তুমি বোলার, ব্যাটসম্যানকে অযথা প্রাধান্য দিও না। সাহস পেতাম অধিনায়কের কথায়। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য; আবার ম্লান হয়ে পড়তাম আলীর ক্রীড়া-চাতুর্যের সামনে।

সেদিন কিন্তু বল করতে বারবার এই কথা মনে হয়েছে আমার। আর সঙ্কুচিত হয়ে গেছি। ওয়াজির আলিকে আর এক 'ক্লাইড' ওয়ালকটের মতো আমার মনে হয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় ইনিংসে একটা ঘটনা ঘটেছিল যেরেন্ড যখন লালা অমরনাথকে আউট করে দেন। উত্তেজিত দর্শকরা মাঠের মধ্যে কমলালেবু ছুঁড়তে থাকেন। একটা লেবু গড়াতে গড়াতে উইকেটের কাছে প্রায় চলে গিয়েছিল। আমি আর লোভ সামলাতে পারিনি, সেটা তুলে নিলাম টুক করে।

অনেকক্ষণ বল করেছি, বুকের ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। জিভটা খরখরে হয়ে গেছে জলের অভাবে। ঠিক যেন শিরীষ কাগজের মতো। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর জলের বাক্স। এতো কষ্ট সহ্য করতে পারিনি। তাই লেবুটা খোসা ছাড়িয়ে সমস্তটা মুখের মধ্যে পুরে দিলুম।

শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতে-ছিলাম। প্রথম ইনিংসে আমাদের ২২২ রানের জবাবে দক্ষিণ পাঞ্জাব যখন ৩২৮ রান করে ইনিংস শেষ করে তখন আমরা কিন্তু অনেকেই ভেঙে পড়েছিলাম। বিশেষ করে ওয়াজির আলির ২২২ রান দেখে।

কিন্তু আমরা আবার সাহস ফিরে পেয়েছিলাম। মিলার, জ্যাণ্ডারগুচ, ম্যালকম তিনজনে বাংলাদলের বিপর্যয়কে কাটিয়ে নিয়ে গেলেন শক্ত হাতে ব্যাট করে। শেষ উইকেটের জুটিতে জব্বার এবং জিতেন বানার্জি দ্রুতগতিতে ৮৯ রান করেন। ৪২৮ রানের মাথায় বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

দক্ষিণ পাঞ্জাব দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে মধ্যাহ্নভোজের ঠিক আগে। তারা তখন আমাদের থেকে ৩১২ রানের পিছনে। আমাদের মনে তখন প্রচণ্ড আশা।

উইকেটের এক প্রান্ত থেকে আমি একাই বল করছি মরীয়া হয়ে। আমার প্রথম ওভারেই পরাজিত করলাম আবদুর রহমানকে। তারপর তারা ভট্টাচার্যের বলে মারোফং হোসেন ক্যাচ তুলে ফিরে গেলেন প্যাভিলিয়নে। ব্যক্তিগত ৩৭ রানের মাথায় লালা অমরনাথ আউট হয়ে যান বেরেন্ডের বলে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন দর্শকরা। জয়ের আশায় আমরাও উত্তেজিত। দক্ষিণ পাঞ্জাবের স্বভাবতই এসময়ে শোচনীয় অবস্থা। বাংলার বোলিংয়ের সামনে রুখে দাঁড়াতে পারছেন না। অধিনায়ক মহম্মদ সঈদ যখন ওয়াজির আলিকে ব্যক্তিগত দশ রানের মাথায় বোল্ড আউট করে দেন তখন আমরা উল্লসিত হয়ে উঠেছি, জয় আমাদের নিশ্চিত।

আজ ভাবি, সেদিন আমাদের বোলিং আর ফিল্ডিংয়ের সাফল্য আমাদের জয়-মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল। আজকের অভাব-গুলো অনেক বেশী প্রকট হয়ে ধরা দিচ্ছে সেদিনের তুলনায়।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ভারতবর্ষ : ৩৬০ রান (সুনীল গাভাস্কার ১২৪, দিলীপ সারদেশাই ৭৫ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৫১ রান। শেফার্ড ৭৮ রানে ৩ এবং হলফোর্ড ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

● ৪২৭ রান (গাভাস্কার ২২০ এবং ওয়াদেকার ৫৪ রান। নোরিজা ১২৯ রানে ৫ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৫২৬ রান (গারফিল্ড সোবার্স ১৩২, চার্লি ডেভিস ১০৫, মরিস ফস্টার ৯৯ এবং ডেসমণ্ড লুইস ৭২ রান। প্রসন্ন ১৪৬ রানে ৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ১০০ রানে ৪ উইকেট)

● ১৬৫ রান (৮ উইকেটে। লয়েড ৬৪ রান। আবিদ আলী ৭৩ রানে ৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ১১ রানে ২ উইকেট)

পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৬ দিনব্যাপী ৫ম টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়াতে ভারতবর্ষ ১—০ খেলায় (ড্র ৪) 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় এই প্রথম। ভারতবর্ষের বিপক্ষে আগের পাঁচটি টেস্ট সিরিজেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' পেয়েছিল। বর্তমানে এই দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ২৮টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১২, ভারতবর্ষের জয় ১ এবং ড্র ১৫।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক অজিত ওয়াদে-কার টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার ভার নিয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারত-বর্ষ ১ম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৪৭ রান সংগ্রহ করেছিল। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় গাভাস্কার তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরী করে নটআউট থাকেন (১০২ রান)।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের ১৮ মিনিট পর ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৩৬০ রানের মাথায় শেষ হয়। শেষ পাঁচটা উইকেটে ভারতবর্ষ ১১৩ রান সংগ্রহ করেছিল। গাভাস্কার তাঁর ১২৪ রানে আউট হন। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২টো উইকেট পড়ে ১১৭ রান উঠেছিল।

তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৭৭ (৫ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন সোবার্স (১১৪ রান) এবং ফস্টার (২৬ রান)। সোবার্সের এই সেঞ্চুরী তাঁর সরকারী টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ২৪তম সেঞ্চুরী — ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৮ম সেঞ্চুরী। ৫ম উইকেটের জুটিতে ডেভিস (১০৫ রান) এবং সোবার্স ২০৩ মিনিটের খেলায় দলের ১৭৭ রান সংগ্রহ করেন। এই দিনের খেলাতেও ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুব খারাপ হয়েছিল। ডেভিসের ২৯ রানের মাথায় আবিদ আলী সহজ ক্যাচ মাটিতে ফেলে দেন। সেই ডেভিস শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরী (১০৫ রান) করেন। আগের দিন আবিদ আলির হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে লুইস শেষ পর্যন্ত ৭২ রান তুলেছিলেন।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১ম ইনিংস ৫২৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৬৬ রানে এগিয়ে যায়। তাদের ৪২৫ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট (সোবার্স) পড়ার পরও ভারতীয় খেলোয়াড়রা চারটে 'ক্যাচ' নষ্ট করেন। লাঞ্চের পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শেষ চার উইকেটে ৬২ রান সংগ্রহ করেছিল। তাদের শেষ ৫ উইকেটে ১৪১ রান উঠেছিল।

ভারতবর্ষ ১৬৬ রানের পিছনে পড়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় ১ উইকেটে ৯৪ রান সংগ্রহ করে। খেলায় গাভাস্কার ৫৭ রান এবং ওয়াদেকার ২১ রান করে অপরাজিত থাকেন। ভারতবর্ষ তখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের থেকে ৭২ রানের পিছনে পড়ে-ছিল।

পঞ্চম দিনের শেষে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩২৪ (৪ উইকেটে)। গাভাস্কার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করে ১৮০ রানে অপরাজিত থাকেন। অধিনায়ক ওয়াদেকার (৫৪ রান) এবং গাভাস্কার ২য় উইকেটের জুটিতে দলের ১৪৮ রান তুলে খেলার ভিত শক্ত করেছিলেন। পঞ্চম দিনের শেষে ভারতবর্ষ ১৫৮ রানে এগিয়ে যায় এবং হাতে জমা থাকে ৬টা উইকেট।

৬ষ্ঠ দিনে মধ্যাহ্নভোজের ১৫ মিনিট পর ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ৪২৭ রানের মাথায় শেষ হয়। গাভাস্কার ২২০ রান করে আউট হন। তিনি ২০টা বাউণ্ডারী করেছিলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৬১ রানের পিছনে থেকে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের ১৬৫ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) ৫ম টেস্ট খেলা শেষ হয়। ফলে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়।

সাবাস গাভাস্কার!

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার তাঁর মাত্র ২১ বছর বয়সে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় অসাধারণ কৃতিত্বে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে শেষ ৫ম টেস্টে তিনি ১ম ইনিংসে সেঞ্চুরী (১২৪ রান) এবং ২য় ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরী (২২০ রান) করেন। তাঁর আগে সরকারী টেস্ট ক্রিকেটের একটি খেলায় এইভাবে সেঞ্চুরী এবং ডাবল সেঞ্চুরী করেছিলেন একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার ডগ ওয়াল্টার্স (২৪২

ও ১০০ রান, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, সিরিজ, ১৯৬৮-৬৯)। ডগলাসের এই সাফল্য স্বদেশে, অপরদিকে গাভাস্কারের বিদেশে।

গাভাস্কারকে নিয়ে ভারতবর্ষের মাত্র দুজন খেলোয়াড় সরকারী টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন। প্রথম করেন বিজয় হাজারে (১১৬ ও ১৪৫ রান, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে সদ্য-সমাপ্ত ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে গাভাস্কারের ৭৭৪ রান — যে-কোন দেশের বিপক্ষে একটি সরকারী টেস্ট সিরিজে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে সর্বাধিক মোট রানের রেকর্ড। এমনকি অপর কোন দেশের খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে একটি সরকারী টেস্ট সিরিজে এই রান তুলতে পারেননি।

ওঃ ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৬০০ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের এক সিরিজে নীচের ৬ জন খেলোয়াড় ৬০০ রান পূর্ণ করেছেন :

প্যাটসি হেনড্রেন (ইংল্যাণ্ড), ১৯২৯-৩০
খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ২, মোট রান ৬৯৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ২০৫, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ১১৫-৫০।

লেন হাটন (ইংল্যাণ্ড), ১৯৫৩-৫৪
খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ১, মোট রান ৬৭৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৫, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৯৬-৭১।

নীল হার্ভে (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৫৪-৫৫
খেলা ৫, ইনিংস ৭, নটআউট ১, মোট রান ৬৫০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৪, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০৮-৩৩।

হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ১৯৫৭-৫৮
খেলা ৫, ইনিংস ৯, নটআউট ০, মোট রান ৬২৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৭, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৬৯-৭৭।

সুনীল গাভাস্কার : ৫ম টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করে (১২৪ ও ২২০ রান) রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন।

দিলীপ সারদেশাই (ভারতবর্ষ), ১৯৭১
খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ০, মোট রান ৬৪২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২১২, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ৮০-২৫।

সুনীল গাভাস্কার (ভারতবর্ষ), ১৯৭১
খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ৩, মোট রান ৭৭৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২০, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৫৪·৮০

উপরের ৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে সুনীল গাভাস্কার সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের এক সিরিজে মোট ৬০০ রান পূর্ণ করেছেন। তাছাড়া একমাত্র তিনিই সর্বাধিক মোট রান (৭৭৪ রান) এবং সর্বাধিক গড় (১৫৪·৮০) করেছেন। আরও উল্লেখ্য, উপরের ৬ জনের মধ্যে প্যাটসি হেনড্রেন (ইংল্যাণ্ড) এবং সুনীল গাভাস্কার (ভারতবর্ষ) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে একটি সিরিজের চারটি টেস্ট ম্যাচ খেলে ৬০০ রান পূর্ণ করেছেন।

সোবার্সের বিশ্ব রেকর্ড

ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৫ম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে গারফিল্ড সোবার্স তাঁর ১৩২ রানের মধ্যে ১ রান সংগ্রহ করলে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে সর্বাধিক মোট ব্যক্তিগত রানের নতুন বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৮১, মোট রান ৭০৭০ (বিশ্ব-রেকর্ড), এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ৩৬৫ (বিশ্ব-রেকর্ড) এবং সেঞ্চুরী ২৪ (বিশ্ব-রেকর্ড থেকে ৫টি কম)।

পূর্বে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সর্বাধিক মোট ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব-রেকর্ড ছিল ইংল্যাণ্ডের ওয়ালি হ্যামণ্ডের (৮৫টি টেস্ট খেলায় মোট ৭২৪৯ রান)। এখানে উল্লেখ্য, সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক সেঞ্চুরীর বিশ্ব-রেকর্ড (২৯টি সেঞ্চুরী) ভাঙতে সোবার্সকে আরও ৬টি সেঞ্চুরী করতে হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

খেয়ে দেখুন
কী সুন্দর কফির স্বাদ!

নতুন বেরিয়েছে!
দামেও সুবিধে

রিকরি
ইনস্ট্যান্ট

কফি আর চিকরির নিখুঁত ব্লেন্ড

খাওয়া যায় চনমনে চাঙ্গা, কফির মজাই তো সেইখানে। রিকরি খান। দেখবেন সবসময় সেই আমেজ। টিনের কৌটোয় থাকে বলে এতে কফির স্বাদগন্ধ পুরোমাত্রায় বজায় থাকে। আর একেবারে নিখুঁতভাবে ব্লেণ্ড করা যাতে আপনার মর্জিমতন কখনও হালকা কখনও কড়া করে বানিয়ে নিতে পারেন। রিকরির অপূর্ব স্বাদ আজই উপভোগ করুন। রিকরি যে এত ভালো তার কারণ এটি তৈরি করেছেন নেসকাফে প্রস্তুতকারীরা—ইন্স্ট্যাণ্ট কফি তৈরিতে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি যাঁদের হাতযশ।

নেসকাফে
যাদের তৈরী
তাদেরই

রিকরি®
ইনস্ট্যান্ট

নেসলে-র তৈরী

CMNR-3-2445

চলুন হাওয়ায়-হাওয়ায়
আরো আরামভরা, আরো শৌখিন, বাটার সানওয়েভ স্যাণ্ডাল ঝকঝকে স্নিগ্ধ, বিলাসী ও হালকা। যেখানে-খুশি যখন-খুশি পায়ে দিন —দেখবেন কখনো আর পা থেকে খুলতে ইচ্ছে করছে না। এতই ভালো। স্যাণ্ডাল পরার এ এক নতুন শৌখিন সুখ—স্বাচ্ছন্দ্যের এক নতুন আবেশ। আজই পায়ে গলিয়ে নিন বাটার সর্বাধুনিক স্যাণ্ডাল : তার নকশায় সুরুচি, নকশায় আরাম।
বাটা সানওয়েভ
সানওয়েভ ১৭
Bata

CENTRAL LIBRARY

১০ম বর্ষ

৪র্থ খণ্ড

অমৃত

১[illegible] সংখ্যা

মূল্য

৫০ পয়সা

Friday 30th April, 1971 শুক্রবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৯৬৪	চিঠিপত্র		
৯৬৬	সাদাচোখে		—শ্রীসমদর্শী
৯৬৮	দেশে বিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৯৭১	সম্পাদকীয়		—
৯৭২	এক নজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৯৭৩	এই বন্ধ		—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
৯৭৭	জোৎস্নায় যখন	(গল্প)	—শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৯৮২	আশ্চর্য রক্তের রঙ	(কবিতা)	—শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়
৯৮২	বলেছিলাম যাবো	(কবিতা)	—শ্রীকবিরুল ইসলাম
৯৮২	বাংলা দেশ	(কবিতা)	—শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়
৯৮২	পূর্বগগনে অরুণোদয়	(কবিতা)	—শ্রীতপনকুমার ঘোষ
৯৮৩	জহীর আহমদ শরীফ		—আজাহারউদ্দীন খান
৯৮৭	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৯৮৮	নরেনদা—আমাদের নরেনদা	(কবিতা)	—শ্রীবনফুল
৯৯২	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৯৯৫	পূর্বাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
১০০২	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীরবিন্দ্রমন্ত
১০০৪	চাণক্য চাকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা	(রহস্য উপন্যাস)	—শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
১০০৯	সংস্কৃতির চোখে		—শ্রীসাঁঝবুস
১০১২	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
১০১৮	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
১০২১	আমি	(গল্প)	—শ্রীচিত্ত চট্টোপাধ্যায়
১০২৪	পূর্বঘাট থেকে টেকবোনা		—শ্রীউমা বসু
১০২৬	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
১০২৮	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদ
১০৩১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
১০৩৭	খেলার কথা		—শ্রীক্ষেত্রনাথ সিং
১০৩৮	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম রায়

বহুপ্রতীক্ষিত গ্রন্থখানি
প্রকাশিত হইয়াছে—

"দুর্গামা"

শ্রীশ্রীসারদামাতার মানসকন্যা,
তপস্বিনী গৌরীমাতার উত্তরসাধিকা,
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের পরিচালিকা,
দুর্গামাতার অপূর্ব জীবনচরিত।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।
(৪৪৮ পৃষ্ঠা, ২১ খানি ছবি)
মূল্য—আট টাকা

॥ ডাকযোগে লইলে মনিঅর্ডারে দশ টাকা পাঠাইবেন — আশ্রম-সম্পাদিকার নিকট। রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে গ্রন্থখানি যাইবে ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

১লা মে থেকে বেরুবে

বাঙলাদেশ

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক
জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
নিয়মিত লেখক

অন্নদাশঙ্কর রায়, ডঃ মহাদেব সাহা কল্পতরু সেনগুপ্ত, রথীন্দ্র চক্রবর্তী, ডঃ বিনয় দাশগুপ্ত, গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম মুখোপাধ্যায়, হলধর পটল, মৃণাল সেন।

প্রতি সংখ্যায় দেশের আরও ৮ জন প্রথম সারির সাংবাদিক ও লেখক লিখবেন :— পূর্ব বাঙলার মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনী পশ্চিম বাঙলার রাজা-রাজনীতি, সবোরের ভাষা, দিল্লীর চিঠি, ইনসাইড রিপোর্ট, শ্রমিক কৃষক কর্মচারী সংবাদ, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনা। কার্টুন, ফটো, চলচ্চিত্র, খেলাধুলো, পুস্তক সমালোচনা চিঠিপত্র ও আরও নানা আকর্ষণ।

প্রতি সংখ্যার মূল্য : ৩০ পয়সা। গ্রাহক হবার বার্ষিক চাঁদা সডাক ১৬.০০। ষাণ্মাসিক ৮.০০। ত্রৈমাসিক ৪.০০।

আপনার কপি নিয়মিত পাওয়ার জন্য নিকটবর্তী স্টল, এজেন্ট বা হকারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এজেন্সী বা ডাকে কাগজ সংগ্রহের জন্য লিখুন :

ম্যানেজার, বাঙলাদেশ পাবলিকেশনস
মার্কেন্টাইল বিল্ডিংস, 'বি' ব্লক
১ লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন নং : ২৩-৫৫০৬

VANGUARD
JHAMAPUKUR HOSIERY-CAL-9

★ COOLTY & TURKISH
★ WHITE & COLOURED
★ ALL SIZES AVAILABLE

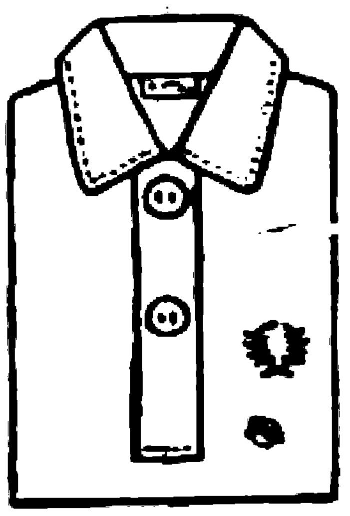

JHAMAPUKUR HOSIERY FACTORY (PRIVATE) LTD
22/A, Kalidas Singha Lane, Calcutta-9. 35-4832

চিঠিপত্র

সমাজ ও সাহিত্য

বিগত ১২ই চৈত্র ৪৬ সংখ্যা অমৃতে শ্রীমতী মলিনা মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করে না অভিমান করে যে পত্রখানা লিখেছেন তাতে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অশ্রদ্ধার মনোভাবই বেশী প্রকাশ পেয়েছে।

প্রত্যেক সমাজের উপরই প্রত্যেকের শ্রদ্ধা আছে, না হলে বিভিন্ন সমাজ শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি টিকে আছে কি করে। প্রত্যেক সমাজের লেখকই প্রত্যেক সমাজ শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির সঙ্গে দেখে থাকেন। তা না হলে তাদের সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য সমাজের বুকে টিকে থাকে কি করে। কোন লেখকই কোন নিকৃষ্ট সমাজের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, সর্বদেশের সব সমাজের জন্যই তাঁদের সৃষ্টি। তাই কোন সমাজকে ছোট করে অবজ্ঞা করে প্রকাশ করলে কোন সমাজই তা গ্রহণ করবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

সাহিত্যের চরিত্র, ঘটনা প্রকাশ করতে হলে কিছু বাস্তব ও কল্পনার আশ্রয় অবশ্যই নিতে হবে। শুধু কল্পনার রং দিয়ে বা বাস্তবের কঠিন ছোঁয়া দিয়ে কোন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে এই দুটোরই সমাবেশ প্রয়োজন।

ভারতীয় খৃষ্টান সমাজই ভারতে শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, আরও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে। কিন্তু তাই বলে কোন সাহিত্যেই তাঁদের পাঠকের উপর আঘাত করে বিকৃত করে, অবজ্ঞা করে সৃষ্টি করা হয় বলে নিশ্চয় প্রতীয়মান হবে না। অনেক বাংলা রচনাতেও বাঙালী সমাজকে অবজ্ঞা করে বা বিদ্রূপ করে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার অসংখ্য উদাহরণ আছে। কিন্তু তাই বলে কি মাথায় হাত দিয়ে সব গেল বলে বসে থাকতে হবে? উপন্যাস গল্পের যাঁরা পাঠক তাঁরা সবাই জানেন যে একটার প্রয়োজনে আর একটা সৃষ্টি হচ্ছে।

মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্য রামায়ণের কাহিনী নিয়ে লেখা। কিন্তু তাঁর কাব্যে রাবণ ও রামকে যেভাবে এঁকেছেন তা কি রামায়ণের রাম-রাবণের সাথে মেলে? তাই বলে কি আমরা রামায়ণকে অশ্রদ্ধা করি, বা মেঘনাদ বধ কাব্যকে অপবিত্র মনে করে সরিয়ে রেখেছি?

শ্রদ্ধেয় মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে যদি সাহিত্যের প্রয়োজনে কোন সমাজকে হেয় করে থাকেন, তবে তার জন্য অভিমান করা কি ঠিক হবে। শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রমুখ সাহিত্যিকরা তো খৃষ্টীয় সমাজকে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। তবে? শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের 'ভারতীয়' প্রসঙ্গে যে কথা লিখেছেন তা হলে তো কোন গল্প বা উপন্যাসের কোন নায়ক-নায়িকাকেই অসম্মান করে ছোট করে আঁকা চলবে না; কারণ তারাও তো মানুষেরই নকশা, কোন না কোন সমাজেরই চরিত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন—পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন মনের ভাবটা সত্য হলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে। তাহলে দেখা যায় যে কোন সমাজকে, কোন চরিত্রকে হেয় করার জন্য নয়, সাহিত্যের প্রয়োজনেই তাদের সৃষ্টি করা হয়।

'সেতুবন্ধ' উপন্যাসে খৃষ্টীয় সমাজকে হেয় করা হয়েছে শিশির ঘরের বিয়ের দায় এড়াবার জন্য। আসলে শিশির ঘরের প্রকাশের জন্য খৃষ্টীয় সমাজকে হেয় করা হয়েছে, অন্য কোন কারণে নয়।

হাস্যরস আনতে গেলে ব্যঙ্গ করে লিখতেই হয়। বিভূতিভূষণও তার ব্যতিক্রম করেননি। ব্যঙ্গ বা উপহাস না করে লিখলে হাস্যরস আসবে কোথা থেকে। কেরী সাহেবের মুন্সীতে যে খৃষ্টীয় সমাজের চিত্র আঁকা আছে, সেই আমলে তা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল?

খৃষ্টান সমাজের উপর শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাস বোধকরি গভীর নয়। তার প্রমাণ তাঁর লেখনিতেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন 'শিক্ষার, আভিজাত্যে বলে মর্যাদায় যে কোন ভারতীয় জাতির সঙ্গে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বহুজনই সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে।' তাঁর আস্থা গভীর হলে তিনি 'বহুজন' কথাটি পরিহার করতে পারতেন।

প্রত্যেক সমাজই প্রত্যেক সমাজকে অনুসরণ করছে তাদের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি গ্রহণ করে। শুধু নিজের সমাজ আঁকড়ে থাকলে উন্নতির সোপান বেয়ে বেঁচে থাকছে কি করে। তাই কোন লেখকই কোন সমাজকে অবজ্ঞা করে বা বিকৃত করে আঁকতে পারেন না। যদি সত্যই কোনদিন তেমন ঘটে তবে সে সাহিত্য বেঁচে থাকতে পারে না, পারবেও না। কোন সমাজই তা গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না।

কেরী সাহেবের মুন্সী 'সেতুবন্ধ' ও 'আধুনিক' এই তিনখানা মাত্র উপন্যাস পড়েই পত্র লেখিকার এরূপ মনোভাব সত্যই আশ্চর্যের।

পত্রলেখিকা ব্যক্তিগতভাবে তারাশঙ্করের স্নেহের পাত্রী বলে কি বোঝাতে চাইলেন তা ঠিক বোঝা গেল না।

কবি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার লেখা শেষ করছি 'আমাদের বঙ্গভাষার সাহিত্য সমালোচকরা আজকাল লেখা পাইলেই তাহার উদ্দেশ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন। বোধ করি তাহার প্রধান কারণ এই, একটা উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিলে তাহাদের লিখিবার তেমন সুবিধা হয় না।' আর এই উদ্দেশ্য ধরতে গিয়ে কিছু না কিছু চাপে। আর তাতেই তাঁদের উদ্দেশ্য সার্থক। কারণ কোন সাহিত্যই প্রকৃত দোষ মুক্ত নয়।

তবু পত্র লেখিকার সমাজবোধকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

হীরা চক্রবর্তী
প্রাক্তন সাহিত্য সম্পাদক,
জি সি সি
শিলচর।

বাংলা খেয়াল গান

আমি জানি না, আমার আবেদন হয়তো আপনার দরজায় পৌঁছবে কিনা। তবুও আশাবাদী হয়ে আমি আপনার কাছে আমার বক্তব্য রাখছি।

সংগীতের ক্ষেত্রে আমি একজন সাধারণ ছাত্র মাত্র, হয়তো আমি আমার ক্ষুদ্র অধিকারের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একথা জেনেও আমি যে লিখছি তার একমাত্র কারণ হল আমার বক্তব্য যাতে আপনার কাগজ মারফৎ সকলে জানতে পারেন।

আমার আবেদনের মূল বক্তব্য হল 'বাংলা খেয়ালের' প্রচলন ও প্রবর্তন সম্পর্কিত ব্যাপারে। প্রচলন ও প্রবর্তন কারুর উপেক্ষার অপেক্ষায় থাকে না বটে, তবে ন্যায়সংগত স্বীকৃতিটাকেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সাংগীতিক সভায়, জলসায়, বাণী-চিত্রে এবং আকাশবাণীতে যে উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশিত

চিঠিপত্র

হয়ে থাকে তা সাধারণত হিন্দী, উর্দু, তেলেগু প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় শাস্ত্রীয় সংগীতের কোন অংশেরই গান শোনার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি। রাগ-রাগিণীতে যে সমস্ত গান বাংলাভাষায় গাওয়া হয়, সংগীত সমাজে তা রাগপ্রধান বা মালসী গান বলে অভিহিত হয়ে থাকে। বাংলাভাষার কি শাস্ত্রীয় সংগীতের দরজায় প্রবেশাধিকার নেই?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বহু হিন্দী খেয়ালের বন্দেজে (কাঠামোতে) 'খেয়ালাংগ' রবীন্দ্রসংগীতের সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু তারা আপন স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের সীমা থেকে দূরে সরে গিয়ে গ্রহ তারা রবির মত আপন কক্ষপথে বিরাজ করছে। কিন্তু খেয়াল খেয়ালই, সুনির্দিষ্ট স্বরের ওপর ভিত্তি করে রচিত রাগের ওপর তার সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। তান মাঝে মাঝে তাল-লয়ের সংগে সংগতি স্থাপন করতে গিয়ে আবার মুখড়ায় ফিরে আসা। কাজেই সুর-প্রধান গানে ভাষা-বহুলতা অপ্রয়োজনীয়। তাই ভাষা এখানে পরিমিত। অন্য গানে যেমন ভাষার প্রাধান্য রেখে সুর সৃষ্টি করা হয়, এখানে ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ সুর বা রাগ-রাগিণীর প্রাধান্য রেখে ভাষা চয়ন করা।

কিন্তু সংগীত সমাজের একশ্রেণী সেবক ও শিল্পীদের ধারণা যে, বাংলা ভাষা নাকি খেয়াল গানের উপযোগী নয়। তাঁরা কেন একথা বলেন, তা বুঝি না। একটা ভাষাকে ব্যবহার করা নিজের দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে। অথবা কেউ কেউ তাঁদের সংরক্ষণশীল মনোভাবের জন্য 'বাংলা খেয়ালকে' শাস্ত্রীয় সংগীতের দরজায় আসতে দিতে অনিচ্ছুক?

এই ক্ষেত্রে রাজনীতির দূষিত হাওয়া কি আমাদের মনকে কলুষিত করতে পারে না? অবাঞ্ছিত প্রাদেশিকতা, যা ভারতীয় আদর্শের পরিপন্থী, তা একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না?

বর্তমানে বাংলা খেয়াল নিয়ে লেখালিখি চলছে। ইতিমধ্যে প্রখ্যাত শিল্পী (তবলা) শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী প্রমুখের চেষ্টায় মন্মথনাথ গাঙ্গুলি স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে এক বছর আগে বাংলা খেয়াল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। যে সমস্ত শিল্পী বাংলা খেয়াল নিয়ে অগ্রণী হয়েছেন তার মধ্যে আমার পূজনীয় গুরু শ্রদ্ধেয় শিল্পী সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এছাড়া সুর সেবক শ্রীমাখনলাল সোমের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য বলা চলে।

নিজের ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ভারতীয় সংবিধানকে অবমাননা করতে চাই না। 'বাগানে অনেক ফুল ফোটে, সেই ছোট ফুলগুলির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, সেই এক-একটি সৌন্দর্যের সমষ্টি নিয়ে বাগানের অখণ্ড সৌন্দর্য আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে' কাজেই এক্ষেত্রে খেয়াল খেয়ালই। তবে ভাষাগত প্রশ্নই বা কেন, কেনই বা তার বিকাশের পথে এত বাধা।

পূর্ণেন্দুশেখর সিংহ
কলকাতা—৩।

লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে

বৈকুণ্ঠের খাতা শীর্ষকে গ্রন্থদর্শী যে লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে যতই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলা হোক না কেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত গল্প 'স্টোভ' বেরিয়েছিল এক অখ্যাত পত্রিকায় নারায়ণবাবুর উপনিবেশের পাণ্ডুলিপি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পড়েছিলেন। কিন্তু একথা সত্য লিটল ম্যাগাজিনের লেখকরা বৃহৎ ম্যাগাজিনের গোষ্ঠীতন্ত্রের স্টীম রোলারে নিষ্পেষিত হন।

লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে পরিপুষ্টি দান করার ক্ষেত্রে বৃহৎ ম্যাগাজিনগুলি স্পেসের অভাব না ঘটিয়ে সুন্দর যুক্তি-সংগত রিভিউ লিখলে তা উদ্যোগীদের উৎসাহ বৃদ্ধির সহায়ক হোত। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বৃহৎ ম্যাগাজিনের সম্পাদক-মণ্ডলী নির্মম। তাঁরা স্থানাভাবের কথা তুলে বিনয় সহকারে ক্ষমা চেয়ে সকল কর্তব্যের অবসান ঘটান। অগত্যা উদ্যোগী আর লেখকগণ কি করতেই বা পারেন।

শুনেছি বিদেশে কতিপয় সাহিত্যিক একত্রিত হয়ে ফিল্ড স্থাপন করেন। অর্থবান ব্যক্তিরা অর্থ সাহায্য দিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করেন। সমবেত উদ্যম ও আর্থিক সহযোগিতা লেখকদের জীবনে আশার সঞ্চার করে। ভারতের অবস্থা সেদিক থেকে বিপরীতধর্মী। এখানে উদ্যম প্রথমদিকে থাকলেও পরে নিঃশেষ হয় একথা আগেই বলেছি। আর্থিক সহযোগিতাও দূর অস্ত। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই এই সাহায্য পায় না তো লেখক সম্প্রদায়। অন্যদিকে বৃহৎ ম্যাগাজিনগুলি নিজস্ব পরিবেশে সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে গোষ্ঠী-ভুক্ত ছাড়া কারো দিকে তাকাবার সময়ই পান না।

দীপংকর সেন
সম্পাদক, উত্তরাপথ। বারাণসী।

> **অমৃতে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দুমাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।**

উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অবসান

জীবনে এক একবার এমন একটা সময় আসে যখন মানুষ অতি সত্যকেও অতি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। সে সত্য যত নিষ্ঠুর নির্মম এবং ভয়ংকরই হোক না কেন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ি যখন দেখি আমাদের অতি পরিচিত অতি আপনজনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

কতজনের কথা বলব। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম থেকে আমার অতি প্রিয় হায়দার। ডঃ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার রীডার। এই হায়দার এসেছিল শান্তিনিকেতনে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে। ছোটখাট শান্ত প্রকৃতির একটি ছেলে। ভাবতেই পারিনি সে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে। আমিও গেছি শান্তিনিকেতনে সেই জুলাইতেই। আছি একই হস্টেলে। আমার সংগে প্রথম আলাপে হায়দারদা বলল, আমার সংগে একবার বোলপুর যাবে? কিছু কেনাকাটা আছে। সংগে সংগে রাজী হয়ে গেলাম। হেঁটে বোলপুর যাওয়া আর আসা। বাস। সিনিয়র হায়দারদা হয়ে গেল একেবারে আপন, আত্মজ। হায়দারদা থেকে হায়দার। তারপর হায়দার বি-এতে প্রথম হল। রবীন্দ্র-ভবনে ঢুকল। প্রাইভেটে এম-এ দিল। নোয়াখালীর সেই ছোটখাটো মানুষটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিল। সেই সময়কার শান্তিনিকেতনে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হয়েছিল। কতো টুকরো টুকরো কথা, কতো মধুর স্মৃতি মনে পড়ছে। হায়দার ভালোবেসেছিল বাংলাকে।

অজিত বিশ্বাস
রূপায়ন, রাঁচি।

শাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আবার ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের এক শরীক মুসলিম লীগের সাতজন সদস্যের মধ্যে একজন—জনাব হারুণ-অল-রশীদ হঠাৎ প্রগতিশীল বনে গেছেন। কোয়ালিশান মন্ত্রিসভার শরীক হওয়ার পূর্বে জনাব রশীদ যদি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতেন তবে দুষ্ট লোকেরা হয়ত তাঁর কার্যকলাপের উপর দুরভিসন্ধি আরোপ করার সুযোগ পেতেন না। কিন্তু বিধানসভা আহ্বানের পূর্বমুহূর্তে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে জনতা যদি তাঁকে পদলোভী ও স্বার্থান্বেষী বলে তবে দোষ দেওয়ার বিশেষ কিছু থাকে না। মন্ত্রী হতে না পারায় মনের দুঃখে নাকি জনাব রশীদ একেবারে বামপন্থী হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। একথাও শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশ সম্পর্কে পশ্চিমবাংলা তথা ভারত সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছেন তার সঙ্গে জনাব রশীদ খাপ খাওয়াতে পারছেন না। যাহোক, রশিদ সাহেব পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল রাজনীতির কাঁচা ভিৎ প্রায় ধ্বসে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। রশিদ সাহেবই এই নূতন মন্ত্রিসভার শরীক দলের প্রথম দলছুট।

এই দলছুট ব্যক্তিদের কার্যকলাপের ফলে রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের অনাস্থা ক্রমেই প্রকট করে তুলছে। ১৯৬৭ সালের পর থেকে প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে দলছুটরা রাজনীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে যে ঘৃণ্য মনোবৃত্তির পরিচয় অদ্যাবধি দিয়েছেন—যে কোন সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন লোক তা নিন্দা না করে পারবেন না। রাষ্ট্রনেতারা এই ডিফেকশান বন্ধ করবার জন্য অনেক গবেষণা চালিয়ে আইন প্রণয়ন করে এই জঘন্য রাজনৈতিক ডিগবাজী বন্ধ করার কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা এখনও সম্ভব হয় নি। ইন্দিরাজী স্বয়ং যখন এই রোগের কার্যকলাপে বিপন্ন হয়েছিলেন তখন তিনি এই রোগ প্রতিষেধকের উপায় সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান লোকসভায় তাঁর পজিশন এত দৃঢ় যে এই রাজনৈতিক রোগের দাওয়াই-এর কথা তাঁর দরকার নাই ততোটা। তবে সরকার যাই করুন, ডিফেকশান বন্ধ করবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা গৃহীত না হলেও গণ-দাওয়াই যে প্রয়োগ হতে শুরু করেছে, এটা শুভ লক্ষণ। গণ-দাওয়াই যে ডিফেকশান রোগের একটি বাস্তব প্রতিষেধক তা স্বীকার করতে হবে। কোনো একটি দলের ছাপ নিয়ে ও কর্মপন্থার উপর নির্ভর করে কোনো একজন সদস্য নির্বাচিত হলেন। কিন্তু আদর্শের ঝোঁক ধূম্রজাল বিস্তার করে স্বার্থান্বেষতার বশবর্তী হয়ে অনায়াসেই তিনি এ দল থেকে ও দলে পাড়ি জমালেন। এটা নিশ্চিতই অনৈতিক। কাজেই বেলপাড়ার আমজনতা রশিদ সাহেবের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল জনতার এমনিতর চাপ থাকলে এরকম রাজনীতি বিবর্জিত ব্যক্তিরা সতর্ক থাকবেন। শোনা যাচ্ছে, জনতার বিক্ষোভে রশিদ সাহেব নাকি মত পরিবর্তনের কথা ভাবছেন।

অত্যন্ত কমসংখ্যক মেজরিটি নিয়ে এবার গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন রাজ্যে সরকার গঠন করেছেন। কোয়ালিশান সরকারের সমর্থনে সদস্য সংখ্যা হচ্ছে—শাসক কংগ্রেস—১০৫+আদি কংগ্রেস ২+বাংলা কংগ্রেস ৫+পি এস পি ৩+গুর্খা লীগ ২+মুসলিম লীগ ৭+বিদ্রোহী এস এস পি ১=মোট ১২৫। আর এই দলকে সমর্থন জানিয়েছেন কম্যুনিস্ট পার্টির ১৩ ও ফরওয়ার্ড ব্লকের তিনজন সদস্য। সরকারের মোট সমর্থন ছিল ১৪১ জন সদস্যের। কিন্তু শাসক কংগ্রেস সদস্য শ্রীনেপাল রায় গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেওয়ার পর সমর্থক সদস্যের সংখ্যা ১৪০ দাঁড়ায়। তারপর জনাব রশিদের দলছুট হওয়ার পর ১৩৯ জন সদস্য গণতান্ত্রিক কোয়ালিশানের পক্ষে আছে। তবে একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্যকে নমিনেশান দেওয়ার পর কোয়ালিশানের শক্তি আবার ১৪০ দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আসন হল মোট ২৮০। বর্তমানে ৪টি আসন খালি থাকার ফলে ১৩৯ জন সদস্য যে পক্ষে থাকবে সেই পক্ষই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। অনেকের ধারণা ৪ জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্যকে মনোনীত করলেই কোয়ালিশান সরকারের আর আশঙ্কা থাকে না। আগে সংবিধানে ৪ জন সদস্যকেই মনোনয়ন দেওয়ার বিধান ছিল। বর্তমানে সংবিধানের সেই ধারা পরিবর্তিত করে রাজ্য বিধানসভায় একজন ও পার্লামেন্টে দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্যকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সদস্যই মনোনয়ন পেয়েছেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে বিরোধীপক্ষে সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১৩৬। এর মধ্যে বাম কম্যুনিস্ট পরিচালিত উদ্‌ফ্রে-এর ১২০+আর এস পি ৩+এস ইউ সি ৭+ঝাড়খণ্ড ২+জনসঙ্ঘ ১। কিন্তু বিরোধী বলেই সকলকে একসূত্রে গাঁথা যাবে না। কেননা জনসঙ্ঘ সি পি এম জোটের পক্ষে কখনই ভোট দেবে না। ঝাড়খণ্ড অবশ্য কংগ্রেস বিরোধিতার কথা বলেই সি পি এমের সহযাত্রী হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। শেষের তা কোথায় দাঁড়ায় তা দেখবার বিষয়। আর এস ইউ সির ভূমিকাও অনিশ্চিত।

এই পটভূমিকায় রাজ্য বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসছে ৩০শে মে। প্রথম শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে কোয়ালিশান সরকার ও মুখ্য বিরোধীগোষ্ঠী উদ্‌ফ্র। তিনটি বিষয়বস্তু বিধানসভায় আলোচিত হবে এবং তার উপর ভোট গ্রহণ করা হবে। প্রথম হচ্ছে অধ্যক্ষ বা স্পীকার নির্বাচন। দ্বিতীয় হচ্ছে রাজ্যপালের ভাষণ এবং তৃতীয় হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সহানুভূতি ও সমর্থনসূচক প্রস্তাব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশান সরকার ইচ্ছা করলে এখনই বিধানসভার অধিবেশন নাও ডাকতে পারতেন। কেন না, যে বাজেট সত্বর পাশ করানো সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, ভোট-অন-একাউন্টসে সে বাজেট পাশ হয়ে গেছে লোকসভায়। অতএব, জুন মাস অবধি বিধানসভার অধিবেশন না ডাকলেও চলত। কিন্তু কোয়ালিশান সরকার অধিবেশন আগে ডেকেই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হলে এ হেন প্রয়াস

দৃঢ়তার সঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝুঁকি অবশ্য নিতেই হয়, কিন্তু আখেরে শুভ ফল পাওয়া যায়। বিরোধীপক্ষ এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ পায় না।

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসসৃষ্টিকারী বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয় ব্যানার্জির অবসর আসন্ন। পাকাপাকিভাবে স্থির হয়েছে যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশানের পক্ষ থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য ও পূর্বতন বিধানসভায় যুক্তফ্রন্ট মনোনীত ডেপুটি স্পীকার শ্রী অপূর্বলাল মজুমদার অধ্যক্ষ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আর ডেপুটি স্পীকার পদের প্রার্থী হচ্ছেন শাসক কংগ্রেস নেতা শ্রীপীযূষ মুখার্জি। যদি ডিফেকশান না হয় তবে চিত্রটা পরিষ্কার। বিরোধীপক্ষ থেকে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য প্রার্থী কারা হবেন তা এখনও স্থির করা হয় নি। সমস্ত বিরোধীপক্ষকে সংহত করে সর্বসম্মত কোন প্রার্থী দাঁড় করানো যায় কিনা— এখনও সেই বিষয়ে উলফ-এর পক্ষ থেকে নেপথ্যে তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলকাতা পৌরসভার রাজনীতিটা যদি এই প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা হয় তবে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ, পৌরসভা রাজনীতির স্টেজ রিহার্সালের আসর মাত্র। মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচনের পটভূমিকায় আলোচনা করলে অধ্যক্ষ নির্বাচনের ফলশ্রুতি কি হবে সেই সম্পর্কে ধারণা মোটামুটিভাবে বোঝা যেতে পারে। যে দলগুলি পৌরসভার রাজনীতিতে যুযুৎসুর প্যাঁচ দিচ্ছিলেন তাঁরাই আবার বিধানসভার অলিন্দে কৌশল স্থির করবেন। আগের নিবন্ধেই বলা হয়েছিল, সি পি এম-এর প্রচেষ্টা হবে আর এস পি ও এস ইউ সি কে পুরোপুরিভাবে বিরোধীপক্ষে সমাবেশ করে সহযাত্রী করে তোলা। সি পি এম রাজনীতি আর এস পির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। আর এস পির কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ক্রমে সি পি এম-এর দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এর কারণ দুটি। প্রথম হচ্ছে অস্তিত্ব বজায় রাখা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে তাঁদের কেরালা রাজ্য শাখার থেকে পৃথক নীতি বজায় রাখা। বাস্তবের আঘাতে জর্জর কেরল আর এস পি ইতিমধ্যেই কংগ্রেসসমর্থিত কোয়ালিশান সরকারে যোগ দেওয়ার পর আর এস পির পশ্চিমবঙ্গ শাখা বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অপরাধে তাঁদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে রেখেছেন। অতএব, সেই নীতি বজায় রাখবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা মরীয়া হয়ে উঠেছেন। আবার সি পি এম সম্বন্ধে তাঁদের যে তত্ত্বগত পার্থক্য আছে সেই প্রশ্নে বারবার জোর দিয়ে কর্মীদের সি পি এম বিরোধী করে রেখেছিলেন। কাজেই গত নির্বাচনে দুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'নিরপেক্ষতার' সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সেই সূত্রোমাফিক চললে রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা সর্বাধিক। তাই আবার ধীরে ধীরে সি পি এম-এর সঙ্গে মিতালির ঝোঁক প্রকট হয়েছে।

'নিরপেক্ষতা' ক্ষেত্রবিশেষে যে আদৌ নিরপেক্ষতা নয়, পৌর নির্বাচনে তা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যদি এস ইউ সি তাঁদের দুটি ভোট বামপন্থী বা সি পি এম জোটের দিকে দিত তবে সমস্যা যে খুবই জটিল হত এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সি পি এম এই অবস্থায় এস ইউ সির বিরুদ্ধে যে খুবই শক্ত মনোভাব গ্রহণ করবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। সামনে বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন আছে বলে হয়ত আপাতত মুখ বন্ধ করে থাকবে সি পি এম। পৌর রাজনীতিতে হেরে গেলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সরকার পতনের জন্য এস ইউ সিকে দলে টানবার চেষ্টা করতে পারে সি পি এম। কিন্তু আর এস পির মত এস ইউ সি অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কায় আদৌ ভীত নয়। কারণ, সি পি এম-এর সঙ্গে সোজাসুজি পাঞ্জা লড়েই ঐ দল বিধানসভায় তাঁদের আসন সংখ্যা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সি পি এম-এর চারজন প্রার্থী এস ইউ সির কাছে জামানত হারিয়েছেন। কাজেই যতই প্রচার চলুক না কেন, তাঁরা সেই প্রচারকে ব্যর্থ করে দিতে সাংগঠনিক দিক থেকে পুরোপুরি সমর্থ। বিগত নির্বাচনে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কাজেই মনে হয় এস ইউ সির সঙ্গে নেপথ্যে আলোচনা করে যদি তাঁদের স্বমতে টানতে না পারেন, তবে শোনা যাচ্ছে এস-ইউ-সির কোন প্রার্থীর নাম তাঁদের অজান্তেই সি-পি-এম-এর সদস্য নয় এমন কোন মেম্বার অধ্যক্ষের পদের জন্য প্রস্তাব করে বসতে পারেন। খবরে জানা যায়, এস-ইউ-সিও এই কৌশলের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে একজন জাঁদরেল সি-পি-এম নেতার নাম প্রস্তাব করে বসবেন। এ ঘটনা যদি না ঘটে তবে পৌরসভায় এস-ইউ-সি যে ধরনের প্রস্তাব দিয়ে সি-পি-এমকে বেকায়দায় ফেলে ভোটের আসর থেকে তফাতে ছিলেন অনুরূপভাবে বিধানসভায়ও যদি একটি প্যাঁচ খেলেন তবে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর জয় বেশী ভোটের ব্যবধানেই হবে। এবং সে ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের যেই প্রার্থী হন না কেন, তিনি ১২৮ ভোটের বেশী কোন মতেই পাবেন না। এও শোনা যাচ্ছে যে, উলফ জোট একজন মুসলীম সদস্যকে—যিনি তাঁদের সমর্থনে জয়ী হয়েছেন—অধ্যক্ষ নির্বাচনে দাঁড় করাবার জন্য এবং একজন ঝাড়খণ্ড প্রার্থীকে সহকারী অধ্যক্ষ মনোনয়নের কথা আলোচনা করছেন। এই কৌশল নিয়েও কোয়ালিশন সরকারে ফাটল ধরাতে পারবে বলে মনে হয় না। কেননা উল্টো ব্যাপার ঘটবার সম্ভাবনাও নাকি রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অতএব ঘটনার গতিপ্রকৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রথম লড়াইয়ে কোয়ালিশন সরকার জিতবে।

তারপর আসছে দ্বিতীয় লড়াই রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের পর ভোট নেওয়ার প্রশ্নে। রীতিটা হচ্ছে এই, বিরোধীরা সংশোধনী প্রস্তাব তুলে রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করেন। সে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব বিরোধীরা জোর দিলে তার ওপর ভোট নিতে হয়। তারপর মূল প্রস্তাবের উপর ভোট গৃহীত হয়। যদি সংশোধনী প্রস্তাবেও সরকারের পরাজয় ঘটে তবে মন্ত্রিসভার ইস্তফা দিতে হয়। কাজেই সেই সংশোধনী প্রস্তাবের বক্তব্য বিষয়ে আগে ঐকমত প্রতিষ্ঠিত না হলে সব বিরোধী সদস্য যে তাকে সমর্থন করবে এমন আশা কম। আর রাজ্যপালের ভাষণ যদি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের কর্মসূচীর প্রতিবিম্ব হয়, তবে অনেকের পক্ষে তার বিরোধিতা করা হয়ত কঠিন হবে না, তবে নৈতিক দিক থেকে তা যুক্তিযুক্ত হবে না বলেই মনে হয়। কারণ, তাঁদের কর্মসূচী আসলে অধুনালুপ্ত যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীরই প্রতিচ্ছবি। তবে বিধানসভার ফ্লোরে পরিষদীয় রাজনীতির মারপ্যাঁচে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এবং তখনই দলগুলির আচরণে বৈষম্য ঘটে। নেপথ্যে থেকে যাঁরা রাজনীতির মারপ্যাঁচ খেলছেন তাঁরা খুবই অভিজ্ঞ। কাজেই আশা করা যায়, সি-পি-এম জোট বুদ্ধির খেলায় এঁটে উঠতে পারবে না। এই নেপথ্য রাজনীতির অংশীদার হলেন কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস-ইউ-সি। স্মরণ থাকা উচিত, অন্টোম এখনও একই সূত্রে গ্রথিত! এঁরা সকলেই রাজনীতির পাকা খেলোয়াড়।

তৃতীয়ত থাকবে বাংলাদেশের জনসংগ্রামের প্রতি সমর্থনের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে বিরোধী পক্ষ যতই বিপ্লবীয়ানার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন— কোয়ালিশন সরকার ও তার সমর্থকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সুফল পাওয়া কঠিন। যে সংশোধনীই আসুক না কেন, সরকার পক্ষ তা মেনে নিয়ে প্রস্তাবটিকে ঐকমতে পাশ করাতে পারেন। এতে বাধা কিছুই আসবে না। কেননা, অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওপার বাংলার বিপ্লব ও সংগ্রামের সমর্থনে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছেন তা প্রায় সব প্রগতিশীল রাষ্ট্রকে হার মানিয়েছে।

অতএব, অনেকেই যে আশঙ্কায় ভীত হয়েছেন তা অমূলক। ডিফেকশানও আর হবে না বলেই মনে হয়। যাঁরা দলছুট হয়েছিলেন, জনতার বিক্ষোভের পর তাঁরও নাকি মতিগতি পালটেছে। একথা বলেছেন মুসলীম লীগের দলীয় নেতারা। অতএব, বর্তমানে যে শক্তি কোয়ালিশন সরকারের আছে, মন্ত্রিসভা টিকে থাকার পক্ষে তা যথেষ্ট না হলেও সেটা আশঙ্কাজনকও নয়। তাছাড়া মন্ত্রিসভার শক্তি যে শুধু শরীকদের সমর্থকদের মধ্যেই সীমিত নয়, বিরোধী পক্ষের মধ্যেও যে তাঁদের সমর্থক আছে, পৌরসভার নির্বাচনেই তার কিছুটা হদিস পাওয়া গেছে। —মধ্যবর্তী

দেশে বিদেশে

একজন মুক্তিযোদ্ধা

বাংলাদেশের রণক্ষেত্রে সামরিকভাবে খানিকটা সাফল্যলাভ করলেও তিন সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ সামগ্রিক পরিস্থিতি আদৌ তাঁর নিজের অনুকূলে আনতে পারেন নি। গত সপ্তাহে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা প্রকাশ পেয়েছে।

ইয়াহিয়া ও তাঁর সামরিক চক্রের সবচেয়ে বড় যে ব্যর্থতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সেটা হল এই যে, তিন সপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পরও তাঁরা তাঁদের 'পূর্ব পাকিস্তানে' একটা প্রশাসন-ব্যবস্থাকে খাড়া করে তুলতে পারেন নি। চেষ্টার ত্রুটি তাঁরা করছেন না। সরকারী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক কার্যে রত কর্মীদের তাঁরা বারবার কাজে যোগ দিতে ডাক দিচ্ছেন এবং যোগ না দিলে কঠোর শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন। মুসলিম লীগ, জমাৎ-এ-ইসলামী প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল দলের মধ্য থেকে দালাল তৈরি করার জন্য তাঁরা অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোথাও কোথাও তাঁদের এই চেষ্টা যে কিছুটা সফল না হচ্ছে তা নয়। কিন্তু ইয়াহিয়া-চক্র আওয়ামী লীগের প্রতি ও ঐ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের গভীর আনুগত্যে ফাটল ধরাতে পারেন নি। যদি তাঁরা তা পারতেন তাহলে পাকিস্থানী ফৌজের পিছু পিছু একটা অসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা যেত। কিন্তু তা হচ্ছে না। ফৌজ শুধু হত্যা, ধ্বংস ও জুলুম করেই যাচ্ছে কর্তৃত্ব করতে পারছে না। এই ফৌজ যখন কোন শহরে বা গ্রামে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ছে তখন সেখানে গিয়ে তারা দেখছে, ঐ শহর বা গ্রাম জনশূন্য, পরিত্যক্ত। আবার যখন তারা ঐ গ্রাম বা শহর ছেড়ে যাচ্ছে তখন পিছনে রেখে যাচ্ছে একটা বিধ্বস্ত জনপদ। সাধারণভাবে এই হল চিত্র। এইভাবেই ইয়াহিয়ার ফৌজ একটা বিদেশী দখলদার বাহিনীর মতো বাংলাদেশে তাদের 'বিজয় অভিযান' চালিয়ে যাচ্ছে।

ইয়াহিয়া বাহিনীর আর একটা ব্যর্থতা এই যে, সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ তাদের সামান্য অস্ত্র সম্বল করে এখনও প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সংগ্রামের প্রথম দিকে মুক্তিফৌজের মধ্যে যেসব দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল এখন সেসব দূর করে

অমৃত নববর্ষ ১৩৭৮

বাংলা দেশ সংখ্যা

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

বাংলাদেশের কালান্তরের মহাক্ষণে আমাদের ভাষার দোসর আত্মার সহোদর ওপার বাংলার সাহিত্যকৃতি ও চিন্তাজগতের পরিচয় বহন করে আনবে অমৃত তার একাদশ জন্মদিনের নববর্ষ সংখ্যায়। এই সঙ্গে থাকছে সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি এবং সাম্প্রতিক তথ্য ও অজস্র সংবাদচিত্র।

একাদশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে
বেরোবে ৭ মে / দাম দু টাকা

বাঙলাদেশের অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত রচনার বিপুল সংগ্রহ

কুড়িটি সুনির্বাচিত ছোট গল্প

শওকত ওসমান, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, বন্দে আলী মিঞা, আবু জাফর শামসুদ্দীন, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, মাজহারুল ইসলাম, জুলফিকার মতিন, মুহম্মদ নুরুল হুদা, করুণাময় গোস্বামী, আসাদ চৌধুরী, পূরবী বসু, মাহবুব তালুকদার, মুহম্মদ সিরাজ, মাহবুব সাদিক, শেখ আতাউর রহমান, আলমগীর রহমান, বশীর আলহেলাল, হাসান হাফিজুর রহমান এবং জহুরুল ইসলাম।

একটি বড় গল্প

নির্মলেন্দু গুণ

রবীন্দ্রনাথ এবং অন্য প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধ

আহমদ শরীফ, মুহম্মদ ফজলুর রহমান, বদরুদ্দিন উমর, মোহম্মদ শহীদুর এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ

সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ
চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে আকর্ষণীয় আলোচনা
খেলাধুলা এবং নারী জগৎ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-তিন

তারা নিজেদের দীর্ঘ, অধিকতর কার্যকর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে তুলছে। প্রথম দিকে মুক্তিফৌজের লড়াই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সেই লড়াইয়ের জন্য তাদের না ছিল প্রস্তুতি, না ছিল পরিকল্পনা। বাংলাদেশের বিভিন্ন খণ্ডে যাঁরা আলাদা-আলাদাভাবে লড়াই করছিলেন তাঁদের নিজেদের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সমন্বয় ছিল না। সেই অবস্থায় এটা অস্বাভাবিক ছিল না। আলোচনার ছল করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এভাবে বাংলাদেশের মানুষের উপর মিলিটারি লেলিয়ে দেবেন, একথা দেশনেতা রাজনৈতিক নেতারা চিন্তাই করতে পারেন নি। সুতরাং মিলিটারির বিরুদ্ধে লড়াইএ নামার কোন প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা তাঁদের ছিলই না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ যখন হাতের সামনে যে যা পেল তাই নিয়ে যুদ্ধে দাঁড়াল এবং তারা যখন দেখল যে, ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈনিকরা, বাঙালী পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের লোকেরাও সামনে এগিয়ে এসেছে তখন লড়াইয়ের ময়দানে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একটা প্রতিরোধের চেহারা তৈরি হল। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে একটি আধুনিক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়তে গিয়ে মুক্তিবাহিনীকে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে; কিন্তু সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই আজ মুক্তিবাহিনী তাদের সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারছে। সংগ্রামের এই পর্যায়ে তারা শত্রুর সঙ্গে সামনাসামনি মোকাবেলা করবে না, গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় তাকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। সামনের বর্ষার পূর্বে বাংলার জলে ও মাটিতে এই ধরনের গেরিলা লড়াইয়ের অত্যন্ত উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হবে। তিন সপ্তাহ ধরে কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক ও বিমানের সঙ্গে লড়াই করেও, দখলদার ফৌজের অমানুষিক বর্বরতা ও সন্ত্রাস সহ্য করেও বাংলাদেশের মানুষের যে এখনও এই ধরনের গেরিলা লড়াইয়ের জন্য তৈরি হওয়ার মতো মনোবল রয়েছে, এটা ইয়াহিয়া-চক্রের বৃহৎ ব্যর্থতা।

পিণ্ডির শাসকরা স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের অভ্যুদয় বন্ধ করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। গত সপ্তাহেই এই সরকারের সদস্যরা জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের সাক্ষী রেখে ও রীতিমত অনুষ্ঠান করে এই সরকারের ঘোষণা সারা পৃথিবীর সামনে রেখেছেন। একটা স্বাধীন সরকার হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার একটি সত্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এইভাবে পূরণ করলেন।

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের ব্যর্থতার লক্ষণ অন্যান্য দিক থেকেও পরিস্ফুট। বাংলাদেশের যুদ্ধ পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর দারুণ আঘাত হানছে। পূর্ববঙ্গের কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল পশ্চিম পাকিস্তানের কলকারখানাগুলি বন্ধ হওয়ার উপক্রম। পূর্ববঙ্গ থেকে পাট ও চা রপ্তানী বন্ধ হওয়ার ফলে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন কমে গেছে। পাকিস্তানের টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্য কমাবার জন্য এর আগে থেকেই কিছুকাল যাবৎ বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সাহায্যদাতাদের তরফ থেকে পাকিস্তানের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এখন সেই চাপ আরও বাড়ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক তাঁদের প্রাপ্য ঋণ শোধ করার জন্য পাকিস্তানকে তাগাদা করছেন। এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করে দেখছে এবং এই পুনর্বিবেচনাসাপেক্ষে পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ রেখেছে।

ইয়াহিয়া খাঁর চণ্ডনীতির ব্যর্থতা ঘরে-বাইরে যতই পরিষ্কার হয়ে উঠছে তাঁর সরকার ততই মরিয়া হচ্ছেন। দেশের ভিতরে যে কোন সঙ্কটের সময় ইসলামাবাদের শাসকগোষ্ঠী অতীতে যা করেছেন এবারও তাঁরা তাই করছেন—অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে একটা বিরোধ বাধিয়ে তোলার জন্য তাঁরা যত্নবান হয়েছেন। ভারত-বিরোধী আবহাওয়া জোরদার করে তুলতে পারলে ইয়াহিয়া খাঁর অনেক লাভ। তিনি সারা দুনিয়াকে দেখাতে চাইছেন যে, বাংলাদেশের সংগ্রামটা আসল ঘটনা নয়, আসল ঘটনা হচ্ছে পাকিস্তানের প্রতি ভারতের শত্রুতা। তিনি জানেন যে, একবার ভারত-পাকিস্তান বিরোধের পরিচিত ছকে ব্যাপারটাকে ফেলতে পারলে পৃথিবীর ছোট-বড় সব দেশই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অস্বস্তিকর প্রশ্নটি চাপা দিয়ে বিশুদ্ধ বিবেকে ভারত ও পাকিস্তানকে শান্তির বাণী শোনাতে পারবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে রক্তক্ষয় ও পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর তার আঘাত নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে অস্থিরতার যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলিকে চাপা দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খাঁর পক্ষে সবচেয়ে জানা, সবচেয়ে সহজ রাস্তা হচ্ছে ভারত-বিরোধী জিগির তোলা।

এই দিকে লক্ষ্য রেখেই পাকিস্তান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে একটা কূটনৈতিক যুদ্ধে নামছেন। দিল্লীতে পাকিস্তান হাইকমিশনার অফিসের যে দুজন অফিসার ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেছেন তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হবে বলে পাকিস্তান দাবী জানিয়েছে। কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই-কমিশনার হোসেন আলি ও তাঁর অধস্তন অফিসার ও অন্যান্য বাঙালী কর্মীরা এই অফিস ভবনের উপর জয় বাংলা পতাকা উড়িয়ে এটিকে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনে পরিণত করেছেন। পাকিস্তান সরকার হোসেন আলির জায়গায় নূতন একজন ডেপুটি হাইকমিশনার নিযুক্ত করে এই নবনিযুক্ত ডেপুটি হাই-কমিশনারকে পুরানো ডেপুটি হাই-কমিশনার কার্যালয়ের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী করেছেন। পাকিস্তান সরকার শাসিয়েছেন যে, ভারত যদি তা না করে তাহলে তার ফল খারাপ হবে। অথচ, অন্যদিকে ভারত সরকার ঢাকা থেকে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার অফিসের কয়েকজন কর্মী ও তাঁদের পরিবার-পরিজনকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য যে চেষ্টা করছেন পাকিস্তান তাতে বাগড়া দিয়ে চলেছে। দুই দেশের মধ্যে এই কূটনীতির লড়াই ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে, বাংলাদেশের রণক্ষেত্রগুলি থেকে, তার বিধ্বস্ত গ্রাম ও শহরগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সীমান্ত পার হয়ে চলে আসার ফলে ভারতবর্ষে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিচ্ছে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ইতিমধ্যে লাখ তিনেকের বেশী আশ্রয়প্রার্থী এসেছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে; প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই সংখ্যা বাড়ছে। এই আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে গিয়ে রাজ্য সরকারগুলি হিমসিম খাচ্ছেন। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়েছেন যে, উদ্বাস্তুদের সাহায্য দেওয়ার খরচ পুরোপুরি তাঁরা যোগাবেন তাহলেও ইতিমধ্যে যেসব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায়, এত প্রবল বন্যার মতো সীমান্তের ওপার থেকে মানুষ আসছেন যে, এঁদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সব জায়গায় ঠিকমত করে ওঠা যাচ্ছে না। এই আশ্রয়প্রার্থীদের সেবা ও সাহায্য করার জন্য ইতিমধ্যে বিদেশের কয়েকটি সাহায্য সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ভারত সরকার এঁদের সাহায্য নেবেন কিনা বা এঁদের সাহায্য করতে আহ্বান করবেন কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না।

২০-৪-৭১ —পুণ্ডরীক।

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবে

বাংলাদেশের যুদ্ধের এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে একটি স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে। এই সরকার কিভাবে সামরিক প্রতিরোধের সঙ্গে-সঙ্গে মুক্ত বাংলাদেশে অসামরিক প্রশাসন চালু করেছেন তা আমরা বিস্তারিত না জানলেও অনুমান করা যায় যে, একটি যুদ্ধক্ষত দেশে মানুষের মনোবল ঠিক রাখা এবং যতটা সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখাই এই সরকারের প্রধান কাজ। এই এক মাসে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির কোনো তুলনা নেই। কারণ এই যুদ্ধ চলছে দুই অসম শক্তির সঙ্গে। একদিকে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী, অন্যদিকে নিরস্ত্র জনসাধারণ। জনগণের পক্ষে সশস্ত্র লোকের সংখ্যা তুলনায় খুবই কম। কারণ, অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং অস্ত্রে শিক্ষিত করে তোলা সময়সাপেক্ষ।

তা সত্ত্বেও গত এক মাসে বাংলাদেশের গণমুক্তিফৌজ আশ্চর্য মনোবল ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষও এমন একটি বর্বর বাহিনীর আক্রমণের মুখে নতিস্বীকার না করে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে অকাতরে। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায় নি। তবে কয়েকটি রাষ্ট্র এই স্বীকৃতির বিষয় বিবেচনা করছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশের প্রথম দাবী অবশ্যই ভারতের কাছে। ভারতের সংসদে বাংলার মানুষের ওপর এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিপীড়িত জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবী জানিয়েছেন, স্বাধীন বাংলা সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিতে। এই স্বীকৃতি দানে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। কারণ, যতই দিন যাচ্ছে বাংলাদেশের যুদ্ধের আঁচ এসে লাগছে সীমান্তের এপারে আমাদের গায়। আমরা চাই বা না চাই এই যুদ্ধের আঘাত আমাদের ওপর আসবেই এবং তা আসতে শুরু করেছে ইয়াহিয়া বাহিনীর আক্রমণের দিক থেকেই।

বৃটিশ লেবার পার্টির দুজন এম-পি পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত পরিদর্শন করে বলেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে যে হারে শরণার্থী আসছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার যদিও ভারত সুষ্ঠুভাবেই নিয়েছে তবু ভারতের একার পক্ষে এই দায়িত্ব বহন করা আর সম্ভব নয়। এঁরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দাবী জানিয়েছেন এই দুরূহ দায়িত্ব পালনের জন্য। ভারতবর্ষকে পাক বাহিনীর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া পরোক্ষভাবে বহন করতে হচ্ছে অথচ সেই আক্রমণকারী দেশের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হচ্ছে—এই বিসদৃশ ও অসঙ্গত অবস্থার অবসান হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে যত দেরী হবে জটিলতা তত বাড়বে। কলকাতায় প্রাক্তন পাকিস্থানী ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা দখল করে নিয়েছেন। প্রাক্তন ডেপুটি হাইকমিশনার বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। এই অবস্থায় ভারত সরকারের পক্ষে আর চুপ করে না থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা উচিত। বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণ ভারতের দিকেই অনেক আগ্রহ ও প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

যুদ্ধ মানুষের সীমাহীন দুর্গতির কারণ। অথচ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় অনিবার্য। বাংলার বুক থেকে যে রক্ত ঝরছে তা হল এই স্বাধীনতার জন্য রক্তপাত। ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, এই রক্তপাত ঘটাচ্ছে সেই সেনাবাহিনী যারা একই রাষ্ট্রের নামে বাংলাদেশকে দখলদারী উপনিবেশ করে রাখতে চায়। ১৯৪৭ সালে এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্যই ভারত এবং বঙ্গদেশ বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব বাংলা হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে পূর্ব বাংলার মানুষ সেদিন এই আশা করেছিল যে, সত্যিই বুঝি স্বাধীনতার আস্বাদ তাঁরা পাবেন। তাঁদের বুঝতে বেশী দিন লাগল না যে, শাসক ও শোষকের নাম বদল ও হাত বদল হয়েছে মাত্র। পূর্ব বাংলার মানুষ নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল সেদিন। এই দাসত্ব এত স্পষ্ট এবং নগ্ন ছিল যে, শিক্ষিত শ্রেণীই শুধু নয়, গ্রামের সাধারণ মানুষও তা বুঝতে পারল অবিলম্বেই। তারই বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ব বাংলার মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে। দফায়-দফায় হয়েছে রক্তক্ষরণ। কিন্তু কোনোদিন ঐ চিন্তা তাদের মনে আসে নি যে, পাকিস্তান থেকে তাদের বেরিয়ে যেতে হবে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই একটি সুখী, সমৃদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য চেয়েছিল বাংলার মানুষ। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা সেই মানবিক অধিকারও দেয় নি। বছরের পর বছর বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যে জুটেছে গুলীর আঘাত আর অর্থনৈতিক শোষণ।

সোনার বাংলা শ্মশান হয়ে গেল। কিন্তু এই প্রতিরোধ ছাড়া বাংলাদেশের মানুষের অন্য কোনো পথ ছিল না। এখন এই নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চাই পৃথিবীর মানুষের সমর্থন। পূর্ব বাংলার বর্ষীয়ান নেতা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রধান ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানিয়েছেন বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য সচেষ্ট হতে। বিদেশী অস্ত্রে সজ্জিত ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর সমস্ত পরাক্রম স্তব্ধ করে দেওয়া যায় যদি বিদেশী রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে। পূর্ব বাংলার মানুষকে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, এক মাসে বা ছ' মাসে এই যুদ্ধের ফয়সালা হবে না। একমাত্র বৃহৎ শক্তিবর্গ যদি একযোগে বাংলাদেশের পক্ষে এসে দাঁড়ায় তাহলেই যুদ্ধবিরতির আশা আছে। নতুবা এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবারই আশঙ্কা। তার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

এক নজরে

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা :

ভারতে লোকসংখ্যার যে সর্বশেষ হিসাব প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে লোকসংখ্যার হিসাবে রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ বিহার ও মহারাষ্ট্র পূর্বেকার দশকের মতোই যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশকে স্থানচ্যুত করে চতুর্থ স্থানটি দখল করেছে, আর অন্ধ্রপ্রদেশ পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববর্তী পঞ্চম স্থানটি।

ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা ৮ কোটি ৮০ লক্ষ, যা ভারতের মোট লোকসংখ্যার ১৬.১৪ শতাংশ। বিহারের বর্তমান লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৬৪ যা ভারতের লোকসংখ্যার ১০.০১ শতাংশ, মহারাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ৫ কোটি ০০ লক্ষ যা ভারতের লোকসংখ্যার ৯.২০ শতাংশ, আর পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ, যা ভারতের লোকসংখ্যার ৮.১২ শতাংশ।

ভারতের ২.৮৭ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু ভারতের লোকসংখ্যার ৮.১২ শতাংশ বাস করেছে এই রাজ্যে। অপরদিকে মধ্যপ্রদেশ ভারতের ১৪.৫৪ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত হলেও সেখানে বাস করে ভারতের লোকসংখ্যার ৭.৫৮ শতাংশ। এদিক থেকে ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশ মোটামুটিভাবে একটা সমতা রক্ষা করে চলেছে। ভারতের ১৬.৮১ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত উত্তরপ্রদেশে বাস করে ভারতের ১৬.১৪ শতাংশ লোক। লোকসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়, কেরলের পরেই। এ-রাজ্যে প্রতি বর্গকিলোমিটার স্থানে ৫০৭ জনের বাস। কেরলে প্রতি বর্গকিলোমিটার স্থানে বাস করে ৫৪৮ জন।

এ-রাজ্যে বিগত দশকে সবচেয়ে লোক বেড়েছে পশ্চিম দিনাজপুরে, প্রায় চল্লিশ শতাংশ। তারপরে লোক বেড়েছে মালদায়। লোকবৃদ্ধির বিশেষ তারতম্য ঘটেনি কুচবিহার, নদীয়া ও হাওড়ায়। জেলাগুলির মধ্যে সর্বাধিক লোকসংখ্যা মেদিনীপুরে, ৫৫ লক্ষ ১৫ হাজার এবং সবচেয়ে কম লোকসংখ্যা দার্জিলিং জেলায়, ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার।

লোকবৃদ্ধির ব্যাপারে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থানোন্নতি ঘটলেও, শিক্ষার ক্ষেত্রে সে এক ধাপ নেমে এসেছে। '৬১ সালের হিসেবে ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে শিক্ষার হারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল একাদশ, এবার সে দ্বাদশ স্থানে নেমে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন শিক্ষিতের হার ৩৩.০৫ শতাংশ। ভারতের রাজ্যগুলির শিক্ষিতের হারের তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সেখানে শিক্ষিতের হার ১৮.৩০ শতাংশ, '৬১ সালে ছিল ১১.০৩ শতাংশ। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র আসামে শিক্ষিতের হার বিগত এক দশকের ব্যবধানে হ্রাস পেয়েছে। সেখানে '৬১ সালে শিক্ষিতের হার ছিল ২৯.১৯ শতাংশ, '৭১ সালে তা হয়েছে ২৮.৭৪ শতাংশ।

ভয়ংকর স্বীকৃতি :

ফ্রান্সে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন নারী সংগঠনের নেতৃত্বে গর্ভধারিণীর খুশিমতো গর্ভপাতের আইনসম্মত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, রক্ষণশীল সরকার ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের বাধায় এ-ব্যাপারে কোন সাফল্যই এখনও পর্যন্ত আন্দোলনকারিণীদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। গর্ভপাত নিষিদ্ধ করে ও তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়ে ১৯২০ সালে ফ্রান্সে যে আইন পাশ হয়, আজও তা বলবৎ আছে, এবং কোন কোন সময়ের রক্ষণশীল শাসকরা ঐ কঠোর বিধিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারেই আইনভঙ্গকারিণীদের উপর প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ফ্রান্সের ভিসি সরকার জনৈক রজকিনীকে হাসিমুখে গর্ভপাত ঘটানোর অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এখনও পর্যন্ত ফ্রান্সে গর্ভপাত ঘটানোর অপরাধে একজনের দু' বছর জেল অথবা ১৪০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

কিন্তু নারী আন্দোলনের নেত্রীরা বলেন, এত সব কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ফ্রান্সে প্রতি বছর অন্তত দশ লক্ষ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। যাদের পয়সা আছে তারা সুইজারল্যান্ডে অথবা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য যেসব রাষ্ট্রে গর্ভপাত নিষিদ্ধ নয়, সেইসব স্থানে গিয়ে গর্ভপাত করিয়ে আসে। যারা তা পারে না, তাদের অতি গোপনে স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তারদের সাহায্যে গর্ভপাত করাতে হয়, যার ফলে বহু ক্ষেত্রে গর্ভিণীর মৃত্যু হয়, নয়ত সারাজীবন নানা ব্যাধি ও জনাবানবস্থা নিয়ে বেঁচে থাকে। তাই তাঁদের দাবি, মেয়েদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য ও অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য অবিলম্বে ফ্রান্সে গর্ভপাত-সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিনিষেধ বাতিল করে দিতে হবে।

সিংহলে যা ঘটে গেল :

দ্বীপরাষ্ট্র সিংহলে যা ঘটে গেল, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে তা অভিনব ঘটনা। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক বামপন্থী সমাজবাদীরূপেই পরিচিতা। বিগত সাধারণ নির্বাচনে বিপুল গণসমর্থনে জয়ী হয়ে তিনি যে সরকার গঠন করেন, তাতে তাঁর অনুগামীরা ছাড়াও মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি ও ট্রটস্কিপন্থী সমসমাজবাদী দলের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সিংহল সরকার হয় সম্পূর্ণ বামপন্থী সরকার ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, কম্যুনিস্ট চীন প্রভৃতির মিত্র।

কিন্তু হঠাৎ আরও বাম চে গুয়েভারাপন্থী একদল যুবক সাংঘাতিক সংকটে ফেললো শ্রীমতী বন্দরনায়েকের সরকারকে। চে গুয়েভারাও কম্যুনিস্ট, এবং অবশ্যই মার্কসবাদী ও কিউবার রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল কাস্ত্রোর সংগ্রামসাথী। তাঁর অনুগামীরা সিংহল সরকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করলো, সেটা নিশ্চয়ই কোন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সমর্থনে, শ্রীমতী বন্দরনায়েক ক্ষমতা হাতে পেয়েই যাদের সঙ্গে মিতালি করতে চেয়েছিলেন। আর শ্রীমতী বন্দরনায়েকের সরকার যখন বিপন্ন হল, তখন তাকে রক্ষা করতে কোন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র এগিয়ে এল না, এমনকি সোভিয়েট ইউনিয়নও নয়, যদিও সোভিয়েট অনুগামী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আছেন বন্দরনায়েকের মন্ত্রিসভায়। সিংহল সরকার শান্তির জন্য আবেদন জানালো পশ্চিম দুনিয়ার কাছে, এবং সেনাবাহিনী সাড়া দিয়ে অবিলম্বে হেলিকপ্টার ও সমরাস্ত্র পাঠাল বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র।

—প্রত্যক্ষদর্শী

এই যুদ্ধ

হিন্দু মুসলিম সমস্যার যখন আর কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না তখন আমরা দেশ ভাগাভাগি করে নিই। সেটাই যে আদর্শ সমাধান তা নয়। তবে সেটা বাস্তব সমাধান। অন্যান্য দেশেও তার অনুরূপ দেখা গেছে।

এখন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে আবার তেমনি এক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সমস্যার আর কোনো সমাধান সম্ভবপর নয় মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ষোল আনা লোক দাবী করেছেন, ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নতুন একটি সংবিধান। এ-দাবী মেনে নিলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অত্যধিক না হয়ে অত্যল্প হয়। অপরপক্ষে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা অত্যল্প না হয়ে অত্যধিক হয়। কোনো কেন্দ্রীয় সরকার এরকম একটা প্রস্তাব বিনা যুদ্ধে মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকও এ-প্রস্তাবের বিরোধী। তারাও বিনা যুদ্ধে মেনে নেবে না।

ছয় দফা কর্মসূচীকে আপসে মানিয়ে নিতে পারা যাবে না, এটা আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কতক নেতা তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাবেন ও সমবেত সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে ছয় দফা পাশ হয়ে যাবে। এতদিন বাদে অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁদের মোহভঙ্গ ঘটেছে। বিশ্বাসঘাতকের মতো অতর্কিত আঘাত হেনেছে পশ্চিমা ফৌজ। কাউকে সাবধান

অন্নদাশঙ্কর রায়

হবার জন্যে এক-আধঘণ্টা সময়ও দেয়নি। বিশুদ্ধ হিটলারী কায়দায় হাজার হাজার নরনারী ও শিশুকে কোতল করা হয়েছে। সমগ্র সভ্যজগৎ স্তম্ভিত। পাছে কেউ রিপোর্ট করে তা ভেবে বিদেশী রিপোর্টারদের জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই অতর্কিত আঘাতের উত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা তাঁদের প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এখন থেকে সেটি একটি প্রদেশ নয়, একটি দেশ। আর সেই দেশের নাম বাংলাদেশ। তার নিজস্ব পতাকা পাকিস্তানী পতাকার স্থান নিয়েছে। বিনা যুদ্ধে কোথাও কি একটি প্রদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়েছে, নিজের পতাকা ওড়াতে পেরেছে, নিজের সংবিধান রচনা করার অধিকার অর্জন করেছে? হতে পারত, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের সময় মাউন্টব্যাটেনকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিত। কেউ কেউ সে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু না বাঙালী হিন্দু, না বাঙালী মুসলমান কোনো পক্ষই সে পরামর্শ গ্রাহ্য করেনি। লগ্ন একবার পেরিয়ে গেলে আর ফেরে না। সেদিন যেটা বিনাযুদ্ধে সম্ভব ছিল আজ সেটার জন্যে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

একদিক থেকে এটা দুই পাকিস্তানের যুদ্ধ। আরেকদিক থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালীস্থানের যুদ্ধ। যেখানে এটা দুই পাকিস্তানের যুদ্ধ সেখানে আমাদের কিছু বলবার নেই। কিন্তু যেখানে এটা পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালীস্থানের যুদ্ধ

CENTRAL LIBRARY

দিনাজপুরের কোনো স্থানে মুক্তিফৌজের একজন সৈনিক। হাতে অস্ত্র, মুখে কঠোর প্রতিজ্ঞা

সেখানে আমরাও বাঙালী হিসাবে বাঙালীর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। আমরাও চাই বাঙালী বেঁচে থাকে, অকারণে মার খেয়ে না মরে। আমরাও চাই বাঙালী তার স্বাধিকার বুঝে নেয়, তার ঔপনিবেশিক মর্যাদা প্রত্যাখান করে, স্বাধীন জাতির মর্যাদায় ভূষিত হয়।

পাকিস্তান বাঙালীকে কী দিতে পারে, কী দিতে পারে না, সেটা এই তেইশ বছরে প্রত্যেকটি বাঙালী হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে। তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে সমুদ্র-পথে তিন হাজার মাইল দূরে বসে অন্য একটি ভাষাগোষ্ঠী। যেমন করত সাত হাজার মাইল দূরে বসে অন্য একটি বর্ণগোষ্ঠী। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের এক নেশন হওয়া দুরাশা। ওভাবে একটা সাম্রাজ্য হতে পারে, একটা নেশন হয় না। পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে একটা সাম্রাজ্য তুলে দেওয়া হয়েছে। তার মেরুদণ্ড হচ্ছে পশ্চিমা সৈন্যদল। সৈন্যদলে পাঞ্জাবী ও পাঠান একাধিপত্য যখন-তখন ডিকটেটর-শিপ ডেকে আনবেই। সুতরাং নতুন সংবিধান এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে কোনোদিন আবার ওরা ডিকটেটর না হতে পারে। ছয় দফা মেনে নিলে সেটা নিবারিত হতো। তা যখন মেনে নেওয়া হলো না তখন স্বতন্ত্র বাঙালীস্থান দাবী না করে উপায় রইল না। এখন এই দাবীকে জোরদার করতে হবে লড়াই দিয়ে রক্ত দিয়ে।

যে সংগ্রাম উভয়পক্ষেরই জীবনমরণ সংগ্রাম সে সংগ্রাম কখনো সাতদিনের মধ্যেই একপক্ষকে জয় ও অপরপক্ষকে পরাজয় এনে দেয় না। এমন কি সাত মাসের মধ্যেও নয়। এ ধরনের যুদ্ধ চলে বছরের পর বছর। কখনো জোর কদমে, কখনো ঢিমে তেতালায়। দীর্ঘকাল অচল অবস্থাও হতে পারে। সাধারণত দেখা যায় যে-পক্ষের খোরাকে টান পড়ে সে পক্ষ যুদ্ধে না মরলেও দুর্ভিক্ষে মরে ও সেই ভয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। খোরাকে টান না পড়লে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানরা আরো অনেকদিন লড়তে পারত, সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে জব্দ হতো না।

বর্তমান সংগ্রামে কেবল যে পশ্চিমা সৈন্যদের খোরাকে টান পড়তে পারে তাই নয়, বাঙালী মুক্তিযোদ্ধারাও দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে পারে। কোন্ পক্ষ যে কোন্ পক্ষের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাবে তা এখন থেকে জোর করে বলা যায় না। উৎসাহের বাষ্পই যুদ্ধের শকট চালনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যুদ্ধের বারো আনাই তেল নুন লকড়ির ব্যাপার। নেপোলিয়ন বলে গেছেন সৈন্যদল যাত্রা করে পেটের উপর ভর দিয়ে। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মরাঠারা অন্নকষ্টেই মারা যায়। পানীয় জল আগে থেকে মজুত রাখা হয়নি।

মাথা ঠান্ডা রেখে প্রত্যেকটি আইটেম ঠিকমতো প্ল্যান করতে হবে। এর জন্যে অজস্র অর্থেরও প্রয়োজন। টাকা থাকলে ফসল কেনা যায়। না থাকলে ভিক্ষা করতে হয়, লুট করতে হয়। জবরদস্তি টাকা আদায় করতে গেলে মিত্ররাও শত্রু হয়ে যায়। সমস্ত সংগ্রাম যে কী পরিমাণ ব্যয়সাপেক্ষ সে অভিজ্ঞতা আমার হয় মুর্শিদাবাদ চর অভিযান পরিচালনার ভার নিয়ে। শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি-যোদ্ধাদেরও হবে।

না, সংগ্রাম একটা তামাশা নয়। যা দেখবার জন্যে হাজার হাজার লোক বিনা-টিকিটে সীমান্তে গিয়ে হাজির হচ্ছে। এই যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী হবে বলে ধরে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁদের প্রয়োজনমতো সাহায্য করতে হবে। কিন্তু সরকারীভাবে নয়। সরকার থেকে যদি সাহায্য করা হয় সরকারও এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন। ভারতকে কেবল যে পাকিস্তানের সঙ্গেই যুঝতে হবে তা নয়, চীনের সঙ্গেও। অথচ ভারতের মিত্র বলতে কেউ থাকবে না। আমরা তো আশঙ্কা করি যে বিশ্বের জনমত ভারতের বিরুদ্ধেই যাবে। যেমন কাশ্মীরের বেলা গেছে। কাশ্মীরের দরুন ভারত যে ইউরোপে আমেরিকায় কতদূর অপ্রিয় তা যাঁরাই বিদেশে গেছেন তাঁরাই জানেন। অপ্রিয়তা আর বাড়াতে যাওয়া ভুল।

সারা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকেরা গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলছে। এদের অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে রাইফেল, তীর ও ধনুক এবং বাঁশের লাঠি। রাজশাহী শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে।

সাহায্য মানেই বেসরকারী সাহায্য। তার মানে প্রধানত খাদ্য আর অর্থ। অস্ত্র বললাম না, কারণ অস্ত্র পড়ে যেতে পারে শত্রুপক্ষের হাতে। অথবা চীনপন্থীদের হাতে। তাতে মুক্তিযুদ্ধের সুবিধা হবে না। তা ছাড়া অস্ত্র সাহায্য পাকিস্তান ক্ষমা করবে না।

আমরা যারা আর কিছু জোগাতে পারছিনে তারা মনের জোর জোগাব। সেটাও একান্ত আবশ্যক। গত মহাযুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ইংরেজদের, "স্বাধীন ভারতের নৈতিক সমর্থন বহু-সংখ্যক ব্যাটেলিয়নের সমমূল্য।" বাংলা-দেশের মুক্তিযোদ্ধারাও হৃদয়ঙ্গম করবেন যে স্বাধীন ভারতের নৈতিক সমর্থন বহু-সংখ্যক ব্যাটেলিয়নের মতো মূল্যবান।

ইচ্ছা করলে অহিংসভাবেও লড়তে পারা যায়। অহিংস সংগ্রাম আরো দীর্ঘকাল চালানো যায়। যতই দিন যাবে ততই পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত চঞ্চল হবে। ওরাও তো সামরিক শাসনের কবল থেকে মুক্তি চায়। ওরাও তো চায় গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন। কিছুদিন পরে দেখা যাবে ওরাই দাবী করছে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধন ও সংবিধান সংরচন। ওরাই চাইছে অন্তর্বর্তীকালের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন। অন্ততপক্ষে প্রাদেশিক সরকার গঠন। অথচ এদের প্রত্যেকটির চাবী শেখ মুজিবর রহমানের পকেটে। সেখান থেকে বার করে নেবার সাধ্য ইয়াহিয়া খান কিংবা জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেই। বাধ্য হয়ে একদিন শেখ মুজিবের সঙ্গে আবার কথাবার্তা শুরু করতে হবেই।

সামরিক আইন প্রত্যাহার না করলে শেখ মুজিব কথা কইবেন না। আর সামরিক আইন প্রত্যাহার করলে ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক অস্তিত্বই থাকবে না. অবশেষে এমন একটি দিন আসবে যেদিন ইয়াহিয়া খানকে অসুস্থতার অজুহাতে হয়তো গদী ছাড়তে হবে। তখন কেউ একজন উদ্যোগী হয়ে পাকিস্তানের জন্যে একটা প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্ট গড়বেন ও শেখ মুজিবের কথামতো সামরিক আইন রদ করবেন। যদি না সেটা ইয়াহিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি উঠে যায়। প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্টে বাংলাদেশের কেউ যদি যোগ না দেন তবে তার সঙ্গে আরো একটা প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্ট যোগ করতে হবে। তেমনি জাতীয় পরিষদে বাংলা-দেশের কেউ যদি যোগ না দেন তা হলে তার একভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে বসবে. আরেকভাগ পূর্ব পাকিস্তানে। সেইখানেই নতুন নাম গ্রহণ করা হবে বাংলাদেশ।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি জাতীয় পরিষদ দুভাগ হয়ে দুই স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করবেই। তেমনি প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্টও দুভাগ হয়ে দুই পাকিস্তান শাসন করবে। পুবেরটা নতুন নাম ধারণ করবে বাংলাদেশ।

তারপর দুই ভাগের মধ্যে সমান স্বাধীনভাবে কথাবার্তা চলবে। যাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রানীতি নিয়ে উভয়পক্ষে একটা সমঝোতা হয়। পররাষ্ট্র যদি এক হয় তবে পাকিস্তান একটা কনফেডারেশন হতে পারবে। যদি পরস্পর-বিরোধী হয় তবে সে আশা দুরাশা। শেখ মুজিব যখন ভারতের সঙ্গে ঝগড়া করবেনই না তখন ভুট্টোর ঝগড়া চালিয়ে যাবার জন্যে পৃথক রাষ্ট্র নিতে হবে। এই ইস্যুতেই পাকিস্তান ভেঙে দুই রাষ্ট্র হবে। সেটা এড়াতে হলে ভুট্টোকেও ভারতের সঙ্গে ঝগড়া ছাড়তে হবে।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই তত্ত্বের উপরে যে সব মুসলমান মিলে এক নেশন। সেই সুবাদে বহু পশ্চিমা মুসলমান পূর্ববঙ্গে গিয়ে ঘরকড়ী করেছে, সেটাই এখন তাদের হোমল্যান্ড। ধর্ম-ভিত্তিক হোমল্যান্ড। কিন্তু ইতিমধ্যে কালের চাকা ঘুরে গেছে। পূর্ববঙ্গের পরিবর্তিত মনোভাব হচ্ছে সব বাঙালী মিলে এক নেশন। সেই তত্ত্বের উপর বাংলাদেশ বলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। পূর্ববঙ্গ এখন আর পশ্চিমা মুসলমানের ধর্মভিত্তিক হোমল্যান্ড নয়, বাঙালী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের ভাষাভিত্তিক হোমল্যান্ড। এই যে ভাষা-ভিত্তিক হোমল্যান্ড এখানে পশ্চিমা মুসলমানদের স্থিতি হবে কী করে? তারা কি তা হলে বাঙালী বনে যাবে?

বেনাপোল চেকপোস্টে উড়ছে বাঙলা দেশের পতাকা।

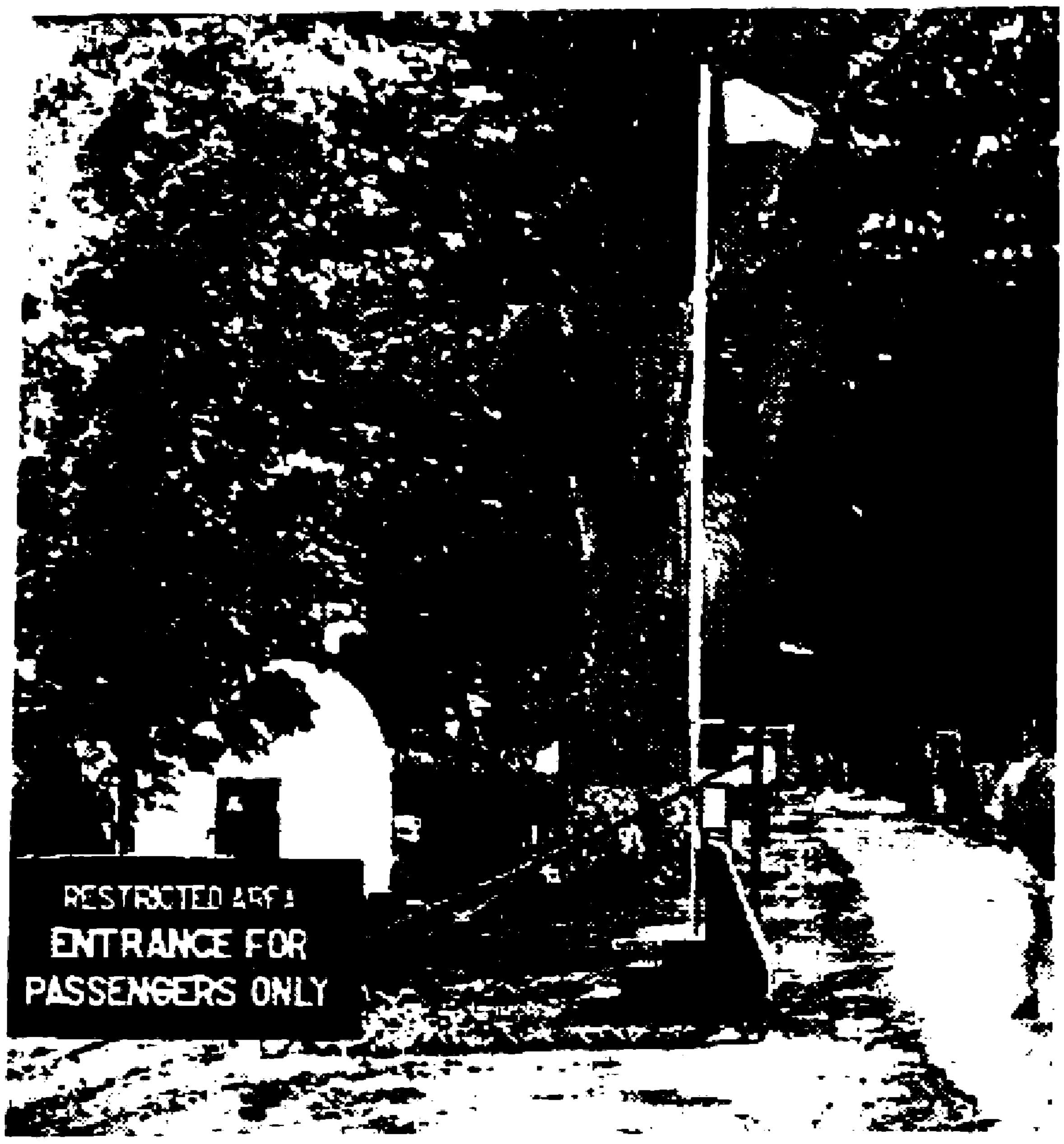

শেখ মুজিবর রহমান বলছেন, বসবাসকারী পশ্চিমারাও বাঙালী। তা শুনে তারা একটুও খুশি নয়। তারা একদিন আর সবাইকে উর্দুভাষী করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আজ তারাই কিনা বাংলাভাষী হবে! তাদের পক্ষে এটা একপ্রকার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি। তারা যদি জানত যে পূর্ববঙ্গ হবে বাঙালীদের বাসভূমি তা হলে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে জান মান কবুল করত না, যে যেখানে ছিল সেইখানে থেকে যেত, হিন্দুদের সঙ্গে বনিয়ে নিত। এখন যে তাদের এক্‌ল ওকুল দুকুল যেতে বসেছে। হায়, হায়, তারা কি এখন ইহুদীদের মতো ঘুরে বেড়াবে!

সুতরাং এইসব গৃহহারাদের গৃহ না দিলে পাকিস্তান বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করবে না। তাকে জন্মের সময় গলা টিপে মারবে। অপরপক্ষে পাকিস্তানের অস্তিত্বও বিপন্ন। পাকিস্তান যদি একটি কনফেডারেশন না হয়, তার পররাষ্ট্রনীতি যদি শেখ মুজিবর রহমানের ইচ্ছামতো চালিত না হয়ে ভুট্টো সাহেবের ইঙ্গিতে চালিত হয়, গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক শাসনই যদি হয় তার কার্টোগ্রাফ তা হলে পাকিস্তান ভেঙে চুরিয়ে যাবেই।

পাকিস্তান যদি দ্বিখণ্ডিত হয় তা হলে পূর্ববঙ্গও দ্বিখণ্ডিত হবে। একটা অপরটার অপরিহার্য শর্ত। যেমন ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলে পাঞ্জাব বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হয়। এই লজিক কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। পশ্চিমা মুসলমানকেও পূর্ববঙ্গের একটি ভগ্নাংশ ছেড়ে দিতে হবে। সমস্তটাই বাঙালীরা পাবে না। বাঙালীরা যেমন নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে নারাজ পশ্চিমারাও তেমনি নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে নারাজ। বাঙালীরা নিজ ভাষাভিত্তিক বাসভূমে, পশ্চিমারা নিজ ধর্মভিত্তিক বাসভূমে। একটি অদৃশ্য করাত পূর্ববঙ্গের অদৃষ্টকে চিরে দুভাগ করছে। এই যুদ্ধ সেই করাতের নির্দেশে চলেছে। বন্দর ও ক্যান্টনমেন্টগুলি পশ্চিমাদের দখলে থেকে যাবে বলে আশঙ্কা হয়। আর সব বাঙালীরা জয় করে নেবে।

না, আমার বিশ্বাস হয় না যে ভুট্টো তাঁর ভারতবিদ্বেষ ত্যাগ করবেন বা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির উপর মুজিবর রহমানের কর্তৃত্ব সহ্য করবেন। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত দুই ভাগই হয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলাও দুই ভাগ হবে। যেসব ক্যান্টনমেন্ট ও বন্দর পাকিস্তানী আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্স সহজে দখল করে রাখতে পারবে সেসব অঞ্চল তারা বাঙালী মুসলমানের ভাগ থেকে কেটে রাখবে। সেসব হবে অবাঙালী মুসলমানের পাওনা, এক পাউণ্ড মাংস। সেখানে উড়বে পাকিস্তানী নিশান। সেখানকার মতবাদ হবে পাকিস্তানী মতবাদ। সেখানকার শাসন হবে ইসলামাবাদের কলোনিয়াল শাসন। সেখানকার রাজনীতি হবে ইসলামিক রাষ্ট্রনীতির সামিল। সেখানে অমুসলমান যদি থাকে তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে থাকবে। সেখানে বাঙালী মুসলমান যদি থাকে সেও হবে সন্দেহভাজন নাগরিক।

আর সব অঞ্চল বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেখানকার রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান সকলেই সেখানে বাঙালী ও সকলেই সেখানে প্রথম শ্রেণীভুক্ত। সেখানে উড়বে বাংলাদেশের নিশান। ইসলামাবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেন কাবুলের সঙ্গে সম্পর্ক, কায়রোর সঙ্গে সম্পর্ক। কেউ কারো আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। কেউ কারো পররাষ্ট্রনীতিতে কণ্ঠরোধ করবে না। ভুট্টো যদি ইচ্ছা করেন ভারতের সঙ্গে লড়তে পারেন। মুজিবর যদি ইচ্ছা করেন ভারতের সঙ্গে বন্ধুতা করতে পারেন।

ধর্মভিত্তিকের সঙ্গে ভাষাভিত্তিকের একভাবে না একভাবে সন্ধি ঘটাতে হবেই। এইভাবে সন্ধি হলে যদি আপত্তি থাকে তো অপর একটি বিকল্প হচ্ছে পশ্চিমা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষার সনাতন গ্যারান্টি। ওরা থাকবে রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র হয়ে। ওদের আইনকানুন শিক্ষাদীক্ষা ভাষা নিশান স্বতন্ত্র। ওরা হয়তো দাবী করবে স্বতন্ত্র নির্বাচন-পদ্ধতি। এরকম একটা দুর্দান্ত মাইনরিটিকে হজম করতে গিয়ে রাষ্ট্র নাজেহাল হবে। কোনো রাষ্ট্রই একদল নাগরিকের একস্ট্রা টেরিটোরিয়াল রাইটস পছন্দ করে না। এ নিয়ে বিভিন্ন দেশে অনর্থ ঘটেছে। বাংলাদেশেও ঘটতে পারে। যাঁরা অখণ্ড পূর্ববঙ্গ চান তাঁদের এ সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। যারা মোকাবিলা করতে গিয়ে নাজেহাল হবেন তাঁরা বলবেন, এর চেয়ে কয়েকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

কোনো ভাবেই যদি সমাধান না হয় তবে এ যুদ্ধ বছরের পর বছর চলবে। পরে একদিন দেখা যাবে বামপন্থীরা যুদ্ধে নেমে তাকে একটা বৈপ্লবিক মোড় দিয়েছে। তখন আর ধর্মভিত্তিক বনাম ভাষাভিত্তিক থাকবে না। শ্রেণীভিত্তিক বা মতবাদভিত্তিক এসে স্থান কেড়ে নেবে। বেশ কিছু জায়গা লাল হয়ে যাবে।

শেষে ভারতও না জড়িয়ে পড়ে। ভারত জড়িয়ে পড়লে অন্যান্য দেশও। যেমন করে হোক এ সংগ্রামকে স্থানকালে নিবদ্ধ রাখতে হবে।

জ্যোৎস্নায় তখন / শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

ডিমের লাল কুসুমটা আগেই চামচে দিয়ে কেটে সরাৎ করে মুখে পুরে নিয়েছে এখন প্লেটের ওপর পড়ে থাকা সাদা অংশটায় খানিক গোলমরিচ আর নুন ছিটিয়ে নিল চারুলাল। সেই সঙ্গে নিজের বাগানের ফল প্রমাণ সাইজের মর্তমান কলাটা বাগিয়ে ধরল ডান হাতে। লম্বা বারান্দায় এখন মস্ত হয়ে রোদ পড়েছে—ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে পুকুর ধার থেকে। এ সব সময় চোখের পাতা দুটো খুলে রাখতে বড় কষ্ট হয় চারুর। এমন আদর-কাড়া শীত, পায়ের তলায় রোদ্দুর, প্লেটে প্লেটে সাজানো সব পুষ্টিকর খাদ্য—বেশ লাগে এ সব সময়—মনে হয় কোনদিন মরতে হবে না আর। আসলে মৃত্যুর মত বড় মাপের ব্যাপারগুলো আগে তেমন মাথায় ঢুকতো না চারুলালের—সবে বাহান্ন চলছে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো কথাই ওঠে না এখন। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে পট্ পট্ করে সমবয়সীদের জনা তিনেকের শ্রাদ্ধে ভুরিভোজন করার পর থেকেই বিষয়টা কেমন মাথার ভেতর গেঁথে গেছে। থেকে থেকেই মনে পড়ে যায় কথাটা।

পড়তাটা এখন বড় ভালো যাচ্ছে চারুর—হাতে হাত দিচ্ছে দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসছে ঘরে। এভাবে কয়েকটা বছর চালাতে পারলে সাধ-আহ্লাদের আর কিছু বাকি থাকবে না। আর কী আশা করতে পারে একজন মানুষ। ইতিমধ্যেই তো কম জমে নি চারুলালের। ধানী জমি-ই তো আশি বিঘে ছাড়িয়ে গেল, জমা নেওয়া পুকুর হোলো গোটা ছয়েক, গোটা দশেক রিকসা ভাড়া খাটছে দিনভোর। বাজারের লোভা স্টোর্স আর মেডিক্যাল হলের কথা না হয় বাদ-ই রইল। তার উপরে এমন বাগানঘেরা বাস্তুবাড়ি। এখানেই যা একটু খুঁৎ রয়ে গেছে। সুধীর মামার বিধবা বউ সৌরভী বাস্তুজমির কবলাখানা এখনও হাতছাড়া করেনি। হেনাতেনা বলে ঘোরাচ্ছে আজ মাস ছয়েক। তা চারুলালও কম যায় না—লেগে আছে ঠিক এঁটুলি হয়ে। কত আর পারবে একজন মেয়েমানুষ—সে দিকটাও ভেবে রেখেছে চারু। হাজার অনেক টাকা না হয় আরো খসাতে হবে তাকে জমি বাবদ। কলা আর ডিম শেষ করে সন্দেশের প্লেটটা নিয়ে পড়ল। কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখতে দিচ্ছে না চারু। আজকাল [illegible] বাজার সুপ চালাচ্ছে নিয়ম করে—দুপুরে ঘণ্টা তিনেকের বিশ্রাম—বিকেলে আধ মাইলটাক হাঁটা আর মাসে একবার করে রক্তচাপ হেনতেনা পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে রুটিন মাফিক। পুষ্টিকর খাদ্য আর সদা প্রফুল্ল মন—এ দুটোই আসলে দরকার। এসব বিষয়ে এতটুকু ফাঁকফোকর রাখতে দেবে না সে।

পুরো পেটে ঢেকুর তুলতে যাচ্ছিল, ক্ষীরোদা এলো সন্তর্পণে।

—একটা বিহিত আর না করলেই নয় বাবু। কালও গোটা দুই নিয়ে গেছে।

মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, চারু সামলে নিল সেটা।

—কালও গেছে আবার।...চল তো দেখি ব্যাপারটা।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে মুরগীর ঘর করেছে বাগানের একদিকটায়। তারের জাল দেওয়া কাঠের ছোটো ছোটো খাঁচা সব। একটা কিম্বাৎ তো সারাদিন ওসব নিয়ে আছে—শুধু একটা দুটো করে রোজ মুরগী চুরি যাচ্ছে আজকাল। বেড়া ফাঁক করে নিয়ে যাচ্ছে শিয়ালে।

লম্বা কোঠা সামনে চারুলাল সিঁড়িতে পা ফেলল। চওড়া ছাই রঙের এক একটা ধাপ—পাশাপাশি জনা তিনেক মানুষ একসঙ্গে পায়ে পা না ঠেকিয়েও ওঠানামা করতে পারে। নামতে নামতে চারু ক্ষীরোদার গায়ের গন্ধ পাচ্ছিল।

কোণের দিকে বেড়াটা একটুখানি ফাঁক হয়ে আছে—দেখে মেজাজটা আবার গরম হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিল চারু। বাড়িতে কাজের লোক-গুলো শুধু ফাঁকি দিয়ে সব সময় পয়সা নেবার তালে আছে, অথচ কাজের বেলায় সব এক একটা অকর্মার ধাড়ী। তবে মানুষজনের উপর আজকাল আর আগের মত রাগারাগি করতে ভরসা হয় না যেমন। দিনকালের অবস্থা খারাপ। কে যে কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। চারু মুখ ঘুরিয়ে দেখল মাটিতে উবু হয়ে বসে ক্ষীরোদা খাঁচাটা নাড়াচাড়া করছে। দেহে এখনও স্বাস্থ্য টইটম্বুর হয়ে আছে। গতর খোয়ানো মেয়েমানুষ, লোভ-লালসা একটু বেশী পরিমাণেই থাকে।

—ব্যাটাকে নিয়ে গোটা চারেক হবে মনে লয়।......নির্ঘাৎ শয়তান দুটো এসেছিল।

হিস্‌হিস্‌ শব্দ করে কথা বলে ক্ষীরোদা।

—দুবেলা ক্ষীরোদা, শালাদের জন্য এবার কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হচ্ছে। ...যোগেনকে একবার খবর দিও তো।

ঠোঁট দুটো ফাঁক করে মস্ত একটা হাই তুলল চারুলাল। তারপর সেই মুহূর্তেই ঠিক করে ফেলল কলার দলিলটা আর ফেলে রাখা ঠিক হচ্ছে না—আজ যে করেই হোক ওটাকে বাগিয়ে আনতেই হবে। বাগানের দিক থেকে জুতোর মচ্‌ মচ্‌ শব্দ তুলে কেউ আসছে। চারু মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

তারপর মানুষটা বাঁক নিতেই দেখল যা ভেবেছিল তাই, মানুষটা মোহনবাবু-ই। থানার বড়বাবুর বন্ধু, ওকালতির একটা ভেক আছে বাইরে আসলে মস্ত এক ঘুঘু বিশেষ।

মোহন মিত্তিরকে বেশীদূর আর এগুতে দিল না চারু। নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে যখন এসেছে তখন নির্ঘাৎ মামলাটা গোলমেলে। এসব ক্ষেত্রে একটু খাতির দেখাতে হয়। দু-পা বাড়িয়ে দিল সে।

—আরে...আরে কী সৌভাগ্য আমার? বলতে বলতে এগিয়ে গেল ক্ষীরোদা পেছন থেকে ডাকল।

—যোগেন আসবে কখন সিটা বলে গেলে নাইতো বাবু!

—বলিস বিকেলের দিকেই আসতে বলিস।

সোয়ামীখেগো মেয়েমানুষকে নিয়েই বড় ঝামেলা। সারাক্ষণ পুরুষমানুষের নজর কাড়তে চায়। চারু মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল।

—সৌভাগ্য তো আমার চারুবাবু... সকালে উঠেই এমন লক্ষ্মীমন্ত পুরুষের দেখা পেলাম, দিনটা মনে হচ্ছে ভালোই যাবে।

আলাপটা বড় গোছেরই হবে? কেমন মিষ্টি করে হাসছে শয়তানটা। চারু ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বসবার ঘরে ঢুকে মেজাজটা আরো বিগড়ে গেল খানিক, ঘরে ঝাট পড়েনি এখনও, জানলা দরজা খোলা হয়নি। ভেতরের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গলা তুলে চায়ের কথা বলতে গিয়ে একপলক ভেবে নিল চারু, পল্টন এখন কী করছে? মা মরা ছেলে...একটু বেশী বয়স পর্যন্ত মামাবাড়িতে মানুষ হয়েছে। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর বিষয় সম্পত্তি নিয়েই মেতে ছিল চারু। একটু গুছিয়ে বসবার পর ছেলের কথা মনে এল। নিজে থেকে দেখে গিয়ে ভাবসাব করে ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এলে পর চারু দেখল ছেলের মনে ততদিনে দাগ ধরে গেছে। মামারা সব এক একজন মস্ত মস্ত লীডার, ছেলেটাও সেই দলে ভিড়েছে। তবে অন্যদিকে কোনো ঘাটতি নেই, দেখতে শুনতেও যেমন, লেখা-পড়াতেও একেবারে সেরা ছাত্র। মহা শত্রুও নিন্দা করতে পারবে না ছেলের। শুধু এ দলটলগুলো না পড়লেই সব দিকে সোনায় সোহাগা হোতো চারুর।

—বড়বাবুই জোর করে পাঠালেন... আপনি তো আবার ওনার বন্ধু লোক... তাই আগে থেকে সাবধান করে পাঠালেন আর কি...।

চারুর মনে হল পেটে যেন একটু গ্যাস জমেছে, এই বয়সে রোজ নিয়ম করে দুবেলা ঘি টি খাওয়া ঠিক হচ্ছে না বোধহয়। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে একবার মধু ডাক্তারের চেম্বারে যাবে আগে থেকেই ঠিক করে রাখল।

—তা ছেলে আপনার খুবই ভালো... তবে কি না যা দিনকাল পড়েছে...।

মোহনবাবুর কথায় সায় দেবে কি দেবে না ভেবে পাচ্ছিল না চারু। লোকটা কথা বেচে খায়, বে-ফাঁস কিছু বলে ফেললে বড়বাবুকে আবার কী বলে দেবে। মেয়ে-মানুষটা এখনও বাড়ির দলিলটা আঁকড়ে আছে...সব ঝামেলা...একটা কিছু হেস্ত-নেস্ত করতে গেলে বড়বাবুর দরকার হবেই। এমনিতে ক্ষেতের মুলোটা, পুকুরের মাছটা নিয়ম করে পাঠিয়ে আসছে। সে ব্যাপারে কখনও এদিক ওদিক হয়নি। তবে মানুষটা মহা ঘোড়েল বলেই ভরসা হয় না কিছুতে, জাতটা থেকেই যায়। আর গৃহস্থ মানুষজনের ভয়টা একটু বেশী-ই থাকে। চারু কোনো রকমে গলা চেপে বলল।

—পল্টন কি কিছু করেছে?

—আরে না...না...সে সব কিছু নয়। এ তল্লাটে নতুন এসেছে তো, একটু যেন ভেবেচিন্তে চলে।

মোহন মিত্তিরের হাসিটা এতই নিঃশব্দে চলতে থাকে যে চারু সেদিকে অবাক হয়ে না তাকিয়ে পারে না। যদিও কথাটা ঠিকমত মগজে ঢোকে নি তার তবু সে ঘাড় হেলিয়ে বলে।

—এ আর বেশী কি...আমি খোকাকে বলে দেবোখন...।

বলতে বলতে তার চোখ যেন আদি-বিদের ধানী জমির পাকা ফসল, ছটা জমা নেওয়া পুকুরের কাঁচা মাছের স্তূপ আর সাতটা রিকশার দরুন জমা কুড়িটা কাগজের নোটের ওপর দিয়ে ঘুরে যায়। বাস্তুভিটের জমির দলিলটা যদিও সৌরভীর মুঠোয় তবু কথাটা শেষ করতে পেরে বেশ হাল্কা লাগে চারুর।

রোজ রাত্রে খাটে উঠবার সময় যদিও কোবরেজী মালসাটা খাচ্ছে নিয়ম করে তবু কড়কাপটার পর ঘুমুতে যাবার আগে আজকাল মনে হয় ওটা না হলেও চলে যেত ঠিকমত। খাটাখাটনির জন্য যতটুকু বল দরকার শরীরে তার কিছু বেশী আছে সেটা চারু টের পায়। নইলে ভোরবেলায়ও মুরগীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষীরোদাকে দেখে শরীরটা চনমন্‌ করে ওঠে কেন? গরম লাগছিল তার, উঠে গিয়ে পুকুর ধারের জানলাটা খুলে দিল। বাইরে আশ্বিনের রোদ। দুপুরের এক ঘুমের পর সরবতের গেলাসে চুমুক দিলে বেশ ফুরফুরে লাগে।

গরানহাটায় সুধীর উকিল বড় নাম-ডাক। যেমন নাচিয়ে গাইয়ে ছিল তেমনি ছিল রূপের ঝলক। সুধীর মামা প্রথম খবরটা আনল। বাপের বাক্স ভেঙে টাকাও জোগাল সে। দু বন্ধুতে সেদিন ফিটন ভাড়া নিয়ে রাতভোর ময়দানে ঘোরা হল সুধীকে কোলে বসিয়ে। তা রঙ তামাসা করতে জানত বটে সুধীর। উকিলটাও বড় ছিল। এক কথায় পাঁচ বিঘের জমিটা চারুর নামে লিখে দিয়েছিল বাড়িভিটে বাঁধবার সময়। চারু-ই তখন ভালোমানুষী দেখিয়ে দলিলটা ফেরে নেয়নি আর। অকালে সুধীরটাও মরল আর তার মুঠি দলিলখানা কব্জা করে টাকার বায়না পাকড়ে নিল।

বড় বড় কামড় দিয়ে বিস্কুট খাচ্ছে মোহন মিত্তির—চারু দেখল ক্ষীরোদা পুকুর ঘাটে বাসনের পাঁজাটা নিয়ে বসেছে। বাঁজা মেয়েমানুষের মত গা গতরে কাপড় রাখতে পারে না ঠিকমত। বুকের কাছে কাপড়টা খুলে কোলের কাছে লুটিয়ে আছে। একটু যে গলা বাড়িয়ে দেখবে ভালো করে তারও উপায় নেই এখন। মোহন হারামজাদাটা ভরিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছে।

ভেতরের ঘরে পল্টনের গলার আওয়াজ পাচ্ছিল চারু। মায়ের মতই গানের শখ আছে ছেলেটার। খোলা গলার গান শুনতেও বড় মিষ্টি লাগে। তবে মায়ের ছিল রামপ্রসাদী, ছেলে ধরেছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত। শুনে শুনেই গলায় তুলে নেয়

টপাটপ। এমন গুণধর ছেলে বউ থাকলে গৃহস্থরা সমাজে রুচিবান মানুষ বলে খ্যাতি পায়। যদিও ওসব চটকদার খ্যাতির কোনো মোহ নেই চারুর, তবে সমাজে তারও নামডাক আছে কিছু। ধানচালের কারবার, মাছের কারবার, লক্ষ্মীর কারবারে টাকাওয়ালা লোক বলে খ্যাতি আছে তার। এ অঞ্চলের লোকজন মানগণ্য করে, দুর্গা পূজো কমিটি বা স্থানীয় স্কুল কমিটিতে বাঁধা পদ আছে তার। গগন যদি এ সব নিয়ে থাকত তাহলে সুখটা খানিক বাড়তো চারুর। কিন্তু ছেলের মন ঘুরছে বাইরে বাইরে। যত সব উদ্ভট কল্পনা নিয়ে মেতে আছে সারাক্ষণ। মুখ ফুটে কিছু বলতে ভরসা হয় না। রেগে যেতে পারে। মনে মনে ছেলেকে ভয় পায় চারু, কিছুটা এড়িয়ে চলে সে। বাগানের এক পাশে একটা ছিমছাম পাকা [illegible] ঘর তুলে দিয়েছে। সেখানেই থাকে গগন। পড়াশুনা করে, ঘুমোয়। মাস গেলে ছেলের সঙ্গে একটা দুটোর বেশী কথাই হয় না চারুর। সুযোগ-ই বা কোথায়। ছেলের টাকা-পয়সার দরকার হলেও না হয় কথা ছিল। তা দিক থেকে তো গগন অনেকদিন থেকেই স্বাবলম্বী হয়ে গেছে। মাস গেলে মোটা টাকার স্কলারশিপ পায়, কলেজ থেকে দেয় বইপত্তর। স্কুল ফাইনালে দশ জনের একজন হয়েছিল। দয়া করে এখানকার এঁদোমার্কা কলেজে ভর্তি হয়েছে, নইলে তো কলকাতার বড় কলেজে যেতে

CENTRAL LIBRARY

পারত। চারুরও ইচ্ছে ছিল সেই রকম। মেয়ের জন্য কিছু খরচ করতে পারলে মনটা শান্তি পেত। কলকাতায় থাকলে না হয় মোটা টাকা হোস্টেল খরচা হিসাবে হাতে তুলে দিতে পারত। প্রথম প্রথম নিজে সামনে দাঁড়িয়ে দামী দামী পোশাক আশাক বানিয়ে দিত মেয়েকে কিন্তু দিদির কাছে রাগ প্রকাশ করার পর থেকে তাও বন্ধ। চারুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কোনোদিন কিছু বলেনি, বলবেও না। তেমন মেয়েই নয় শকুন। মেয়ের যা কিছু কথা চারুকে, বোনের মুখ থেকে শুনতে হয়। দিদির বড় ন্যাওটা। অসময় আবদার সবই তার কাছে মেয়ের।

সেখানে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল চারু। মোহন মিত্তির মৃদুলা মুকলে মুখ মুছছে।

—তাহলে উঠি, চারুবাবু।

—আজ্ঞে আজ্ঞা। হে' হেহে'—

মোহন মিত্তির বেরিয়ে যেতে চারু জানলায় গলা বাড়িয়ে দিল। বাসনমাজা শেষ করে পা ধুচ্ছে এখন ক্ষীরোদা। কালোকালো ঘাটের সিঁড়ির উঠে মুখ ডুবিয়ে ডুবিয়ে ভাতের দানা খাচ্ছে। সুখী প্রাণী। ধার দেনার দরকার পড়ে না জীবনে, বাস্তুভিটের দলিল পাকা করার প্রয়োজন হয় না। ঐ দলিলের দিকটায় যা একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে, নইলে চারুর নিজেকেও বেশ সুখী প্রাণী বলেই মনে হতে লাগল। মোহন মিত্তির, বড়বাবু বা গগন তার কাছে কোনো সমস্যা-ই নয়। অমন দু চারজন মানুষকে কায়দা করবার বুদ্ধি চারুর মগজের ভেতর আছে। অসুবিধাটা সুধীরের বউ সৌরভীকে নিয়েই রোজ এটা দাও ওটা দাও করে আসল কাজটা গুলিয়ে দিচ্ছে।

জানলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষীরোদা ঘরের ভেতর তাকিয়ে চোখ নামালে চারু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। বেওয়ারিশ মেয়েমানুষ, অনেক বাঁকা পথের সন্ধান রাখে।

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

ঐ গগনের জন্মের সময় পেটটা কাটতে হয়েছিল। বেশ লম্বা চওড়া হয়ে মোটাসোটা মানুষটার পেটের ভেতর শুয়ে ছিল ছেলে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এনেও শয্যাশায়ী হয়ে রইল মাস কয়েক। সবে তখন দু'চার টাকার মুখ দেখছে চারু, বাজারের মেডিকেল হলটা দাঁড়িয়ে গেছে। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকান হয়ে উঠতে যদিও আরো কিছুদিন লেগেছিল, তবু টাকা পয়সা আসছিল। সে সব কিছুই আর দেখা হয়ে উঠল না লোকের। সুখভোগ তার ভাগ্যেই ছিল না। তা কতই বা তখন বয়স চারুলালের। কখনও কখনও দু'চার দিন বাজারের মেয়েমানুষ নিয়ে একটু আধটু ফুর্তিফার্তা করেছে—শরীরের সুখ বলতে যা বোঝায় তেমন করে করা হয়ে ওঠে নি তখনও। তারপর তো একটানা কতগুলো বছর তো শুধু ব্যবসা দাঁড় করানোর কাজেই মেতে রইল। গুছিয়ে বসবার পর এই সবে অবসর মিলেছে তার। শরীরের খিদেটাও বাঘের মত হয়ে উঠেছে।

ক্ষীরোদা আসতে তাকে চোখ দিয়ে ইশারা করে দোতলায় উঠে গেল চারু। সে বাড়িতে থাকলে সহজে কেউ দোতালায় ওঠে না। আর তার শোবার ঘরে ঢোকার তো কারো কথাই ওঠে না। মস্ত পালঙ্কের উপর বসে জুৎ করে ক্ষীরোদাকে আঁকড়ে ধরল চারু। বাইরে ফুলের মত রোদ ফুটফুট করছে—হাওয়া দিচ্ছে অল্পস্বল্প। এই প্রথম শীতের দিকটায় সারাক্ষণই শরীরটা বেশ জোয়ান হয়ে থাকে। খানিক আদর করতেই জুড়িয়ে গেল মন। ক্ষীরোদা ফিসফিসিয়ে বলল।

—বিছে হারটা তো কই এখনও দিলে না বাবু।

—আরে হবে রে সব। একটু সবুর কর।

ঠোঁট দুটো অনেকখানি ফাঁক করে প্রশান্ত হাসল চারু।

দুপুরে এক ঘুমের পর উঠে নিরিবিলি শালার সেলাসে ছোটো ছোটো চুমুক দিতে দিতে গগনের সমস্যাটার একটা সমাধান খুঁজে পেল চারু। মাসখানেক বোম্বাই শহর থেকে ঘুরে এলে ধ্যানধারণা কিছুটা পালটাবে ছেলের। টাকা না হয় একটু বেশী করেই ধরিয়ে দেবে হাতে। চারু গলা তুলে গগনকে ডাকল।

অনেকদিন পর ছেলের মুখচোখ কাছ থেকে একটু বেশী করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল চারু। মাতৃমুখী ছেলে, শ্যাম বর্ণটা ছেলের মত মুখ চোখের চেহারাটা এখনও হারাতে তবু ধরেনি। একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথাটা পাড়ল চারু। সরাসরি বোম্বাই-এর ওষুধের ফ্যাক্টরি থেকেই মাল কেনার সুযোগ সুবিধাগুলো ভালো করে জেনে আসতে হবে গগনকে। যদিও অচেনা শহর, তবু কোনো অসুবিধা হবে না গগনের, চারুর এক খুড়তোতো ভাই বহুকাল হল বসবাস করছে ওখানে। মস্ত ব্যবসা তার। চারুর সঙ্গে নিয়মিত চিঠি-পত্রের যোগাযোগ আছে। আসলে মাসখানেক ওখানে কাটিয়ে এলে এদিকের ব্যাপারটাও ততদিনে অন্যরকম হবে। আর তার মধ্যে বড়বাবুকে একটা বড়গোছের ভেট দিয়ে দলিলটার বিষয়েও সব বন্দোবস্ত করে ফেলবে সে।

এই প্রথম ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে পেরে মন মেজাজটা প্রসন্ন হয়ে গেল চারুর। অনেকদিন পর ভুলে যাওয়া যাত্রাপালার এক কলি গানও গলায় উঠে এল তার। আসলে সমস্যাগুলো দেখতে শুনতেই যা বড়ো, ভেতরে কিন্তু একেবারেই ফোঁপরা। বিকেলে লাল বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ ধরে আকাশের আলো নিভে যাওয়াটা দেখল চারুলাল। তারপর গুটি গুটি পা ফেলে বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটল আধঘাইলটাক। ক্রমশ হাঁটা চলায় বেশ সম্ভ্রান্ত আর ভারিক্কী ভাব এসে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি পা ফেলার সময় টের পাচ্ছিল সে। এ রকম বয়সে পৌঁছে মানুষ একটু আধটু ভাবুক গোছের হয়ে পড়ে, তার উপরে সেই মানুষের যদি বেশ মোটা কিছু জমে যায় তাহলে নানা কুট-কাচালায় নিজেকে আচ্ছা করে জড়িয়ে ফেলে সে—ভোটে দাঁড়ায়—গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা করে, প্রসূতিসদনের দ্বার উদ্ঘাটন করতে ছোটে—কিশোরী ভজে, আর বেশ নামডাকের এক আধটা গুরুঠাকুর পাকড়ায়। সে সব দিক থেকে চারুলাল বরং এখনও অনেকটা ঠাণ্ডা গোছের আছে। যতটুকু না করলে নয় তার বেশী একচুলও পা বাড়ায় না।

ঢুকতে রঘু ডাক্তারের চেম্বারের রুগী সমেত ডাক্তারবাবু সকলেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ব্যাপার দেখে বেশ মজাই লাগে চারুলালের। তারপর বেশ খানিকটা সময় নিয়ে রঘু ডাক্তারের কাছে শরীরের রক্তচাপটা মাপায়—খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করে নেয়। বিগলিত রঘু ডাক্তার কথা বলবার সময় তোতলায় বার দুই।

—এমন শরীর আপনার, যা ইচ্ছে হবে তাই চালাবেন—তবে ঐ লক্ষ্য রাখবেন বায়ুর প্রকোপটা যেন না বাড়ে।

পরে মাঝরাস্তা পর্যন্ত চারুলালকে এগিয়ে দিয়ে গেলে সে কদমতলা থেকে একটা রিকসা ডেকে নেয়।

সৌরভীর সঙ্গে আজই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে চারু। না হয় হাজারখানেক টাকা দিয়েই দেবে। যদিও ঐ বাস্তুজমির দলিলের কথাটা বাদ দিলে সৌরভী মানুষটা খারাপ নয়। চারুর সঙ্গে বেশ একটা মধুর সম্পর্ক আছে তার। বাড়িতে গেলে ঢেকে বেশ খাতির যত্ন করে—শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে টাকাটা দিলে খুব একটা ঠকবে না চারু, বরং সৌরভীর সঙ্গে অন্য ধরনের একটা সম্পর্ক গড়ে তুলবার সুযোগ থাকবে।

মেয়েমানুষ সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা আছে চারুলালের তাতে করে সে এটা

বোঝে যে ঐ মানুষটার জীবনে সব সাধ-আহ্লাদই চিরকাল অপূর্ণ থেকে গেছে। স্বামী সুধীর ছিল দাপটে মানুষ। ঘরের এক মেয়েমানুষে মন উঠত না, বাজার ঘাটে ঘুরে ঘুরে করে বেড়াত। এদিকে সময়কালে একটা বাচ্চাকাচ্চাও হল না যে তাদের নেড়েচেড়ে স্বামীর দুঃখ ভুলবে। ভাবতে গিয়ে সৌরভীর জন্য কেমন এক ধরনের মায়া অনুভব করছিল চারু। এই ধরনের ভাবনা-চিন্তাটা নতুন বলেই কেমনধারা একটা নেশা জাগছিল মনে।

বাজারের কাছে রিকসেটা দাঁড় করিয়ে সৌরভীকে দেবার জন্য চারু দু খিলি মিঠে পান কিনল স্টকওয়ালার থেকে। তারপর হরিহরের ডেরায় ঢুকে রোজকার বাঁধা তিন পাত্তর চড়িয়ে নিল সন্ধ্যের ঝোঁকে। অন্যদিন জমিয়ে গল্পের আসর বসায়, আজ তাড়াতাড়ি শেষ করেই বেরিয়ে পড়ল।

বাজারের একটেরে সুধীর মল্লার চকমিলানো বাড়ি। আগে পরিবারের খুব রমরমা অবস্থা ছিল—হাকডাক ছিল মস্ত। এখন পড়ন্ত অবস্থা। বাজার থেকে বাঁধা আয় আছে কিছু, বছরকার ধান আসে জমি থেকে। বাচ্চা কাচ্চা নেই বলে কোন-রকমে আত্মীয়স্বজনদের ভাগবাটোয়ারা করে চলে যায় সৌরভীর। দালানের একটা অংশে আলাদা থাকে সে একটা ঝি সঙ্গে নিয়ে। চারু গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল।

সকালে চুলে সাবান দিয়েছিল—দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াতে চারু দেখল কটা চুলে সারা আকাশ ছাওয়া, ঠোঁটের উপর পিলসুজের আলোর মত হাসিটা কাঁপছে।

—এতদিন পরে আমাদের মনে পড়ল ঠাকুরপো।

ঢাউশ পালঙ্কের উপর সুতোর ঝালর দেওয়া গোলাপী রঙের উঁচু বালিশ, পুরু জাজিমের ওপর যেন আলো করে আছে। চারু নড়বড়ে হাতে পকেট থেকে পানের প্যাকেটটা বের করে এনে সৌরভীর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

যাক্...তবু এ মানুষটার সাধ-আহ্লাদের কথা এখনও একটু আধটু মনে রেখেছো তাহলে। পান পাতার মত মুখের গড়ন, মাটি রঙের পা। অনেক বড় মাপের একটা পাওনা যেন এই মুহূর্তে পেয়ে যাচ্ছে চারু এই মানুষটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বেশ পরিচিত জগতের টাকা হিসেবের খাতা থেকে বাদ এমন একটা পাওনা। বুকটা কেঁপে উঠছিল চারুর। জল নেই, মাটি নেই তবু কেমন একটা ফুলন্ত গাছ দাঁড়িয়ে। ভেতরের জমা হিসাবের অঙ্কটা কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছিল। দেওয়াল বাতির আলো পড়ে মুখের একটা পাশ ঝলমলে হয়ে আছে। সৌরভী বলল।

ক'দিন থেকেই তোমার কথা ভাবছিলাম—আজ না এলে লোক পাঠাতাম ডাকতে। কানে যেন কোনো কথাই ঢুকছে না চারুর। মেয়েমানুষ বলতে এতকালের ধ্যানধারণাটা হঠাৎ যেন চিড় খেয়ে যাচ্ছে। বিষয়ী লোকের গোলমাল খুব সহজে হয় না, তবু বুকের ভেতরটা যেন কেমন করছিল চারুর।

—ভাবছি দু চার মাস একটু তীর্থে ঘুরে আসব। তা মানুষের জীবন তো, কখন কী হয় বলা যায় না। তাই যাবার আগে জমির দলিলটা তোমায় দিয়েই যাই।

বলে সৌরভী ঘরের আলমারীটার দিকে এগিয়ে গেলে চারুর বুকের ভেতর কী যেন একটা শব্দ করে ফেটে গেল।

মোড়ের বটগাছটার কাছে এসে রিক্সোটা ছেড়ে দিল চারু। এখান থেকে বাড়ির পথটুকু হেঁটেই যাবে। নিজের পয়সা খরচ করে খোয়া ঢেলেছে, পাঁচ

দিয়েছে রাস্তায়। পা নামিয়ে বুকল টলছে এখনও। মেপে মেপে তিন পাত্তর মাত্র খেয়েছে তবু নেশা ধরেছে ঠিক। পা ফেলার সময় বেশ টের পাচ্ছিল সে। যেমন পয়সা নিয়েছে তেমনি নেশা দিয়েছে ঠকায় নি। জীবনে আজ আর কোনো ক্ষোভ নেই চারুর।

ঠান্ডা ঠান্ডা পা ফেলেই হাঁটছিল সে। বাড়ির গেটের কাছে দুদন্ড দাঁড়িয়ে দেখল জ্যোৎস্নায় আলোয় ভাসছে 'শোভা-ধাম'। ঐ বাড়িটা যে নিজের, বিশ্বাসই হতে চায় না এমন সুন্দর। গেট খুলে মোরামে ঢাকা পথটুকুর উপর পা রাখল চারু। এক পাশে ফুলবাগান, মস্ত দুটো বাহারী পামগাছ দুপাশে, ও দিকটায় মুরগীর ঘর, গোয়ালঘর, পুকুর। দালানে উঠতে গিয়েও কী ভেবে চারু ঘুরে মুরগীর ঘরটার দিকে গেল। রাস্তার বাঁক নিতেই চোখ দুটো তার অকারণেই আটকে গেল কিছু সময়ের জন্য। কাঁঠাল-গাছটার মাথার উপর মস্ত একখানা চাঁদ আটকে আছে। আর কী ফুটফুটে আলো চারপাশে। অনেক দূরের গাছে ঘুম ভেঙে কয়েকটা কাক খুব ডাকাডাকি করছে।

দূর থেকেও তারের জালে ঘেরা মুরগীর ঘরটা দেখতে পাচ্ছিল চারুলাল। ভেতরে ছোটো ছোটো সব খুপরীর মত ঘর। ভরপেট খেয়ে সবাই এখন বেশ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে। ভরপেট খাওয়া আর ঘুম পেলে ওদের গায়ে মধুর মত মিষ্টি মাংস লাগবে—কড়া আঁচে ঘন্টাখানেক ধরে সিদ্ধ করে নিলে সেই মাংসে জলের সঙ্গে সঞ্জীবনী ফোঁটা হয়ে মিশে যাবে। বড় জামবাটিতে করে সেই সঞ্জীবনী রস যত-দিন রোজ রাত্রে নিয়ম করে খেয়ে যাবে চারুলাল ততদিন আর তাকে কে পায়। একটানে আরো কয়েকটা বছর সে নির্বিঘ্নে পার করে নিতে পারবে।

গগনের জন্মের সময় সোডার পেটটা খুলতে হয়েছিল। তখন হাতে টাকা-পয়সা তেমন ছিল না চারুর, নন্দকেশাই-এর কাছে হাত পাততে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তা কী অবহেলা আর অশ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন ভদ্রলোক তখন। একবার চোখ তুলে চারপাশটা দেখল চারু—বাড়ির কোথাও একফোঁটা আলো নেই—জ্যোৎস্নায় আলোয় ঝিম ঝিম করছে চারপাশ। আজ একখানা খেলার মত খেলা দেখাল বটে সৌরভী। চারুলালের এতদিনকার সব ধ্যানধারণাগুলোকে একেবারে এলোমেলো করে দিয়ে গেল। বাঁ পাশের পকেটটায় একবার হাত ছুঁইয়ে নিল চারু, না দলিলটা ঠিক আছে, পড়ে টড়ে যায়নি।

ফেরবার পথে হু হু হাওয়ার ভেতর খানিকটা ভেসেই আসছিল যেন—দালানের সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে আর তখনি সাৎ করে কী যেন একটা কালো ফনা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াল। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেনি—হিস্ হিস্ শব্দ হতে সারা শরীরের ভেতর যেন এক পলকে বিদ্যুৎ খেলে গেল চারুর। জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করছে সাপটার গা—ফনাটা দুলছে মৃদু। আচমকা ভয় পেলে যেমন হয়, চারুর গলায় কোনো স্বর ফুটছিল না। অথচ সে প্রাণপণে পর পর বাড়ির মহিন্দরদের নাম, গগনের নাম, এমন কি ক্ষীরোদা ও সৌরভীর নাম করেও গলা ফাটিয়ে ডাকছিল। গলায় একফোঁটাও শব্দ ছিল না বলে কারোর কানেই পৌঁছচ্ছিল না সে ডাক, এ কথাটা বুঝতে পেরে ও এ জাতীয় ভয়ঙ্কর একটা সমস্যার কী ধরনের সমাধান হতে পারে তার কোনো সঠিক উপায় না পেয়ে আচমকাই মূক হয়ে গেল সে। সারা শরীরে ঝিনঝিনে ঘাম ছুটেছে, সে বেশ টের পাচ্ছিল উত্তে-জনায় শরীরের খুব গভীর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে উঠে আসছে এক অন্ধকারের স্রোত, তাকে ভাসিয়ে নেবে বলে। অথচ বড় নিরুপায়। আশী বিঘে ধানী জমি, ছটা জমা নেওয়া পুকুর, গোটা দশেক রিকশা ও 'শোভাধামের' মালিক চারুলাল বিপন্ন জ্যোৎস্নার ভেতর [illegible] মূর্তিটিকে সামনে রেখে নিরাশ্রয়ের মত দাঁড়িয়ে থাকল শুধু।

আশ্চর্য্য রক্তের রঙ ॥ অচ্যুত চ*

আশ্চর্য রক্তের রঙে রাঙা হলো
পথঘাট পাটক্ষেত নদীনালা গঞ্জের মৃত্তিকা
তোমরা শহিদ হলে,
তোমাদের মৃত্যু নেই।

ওখানে আকাশ লাল,
নবসূর্য প্রসবের অনন্ত যন্ত্রণা
অনুভূত প্রতিটি নাড়িতে,
রোমাঞ্চিত মায়ের শরীর;
মা তোমার বাংলা দেশ,
মা আমারও বাংলা দেশ
আশ্চর্য মুখের মিল তোমার আমার,
আশ্চর্য! মনের মিল তারও চেয়ে বেশী।

আমিও লড়াই করি মনে মনে
সর্বশক্তি দিয়ে,
ভেঙে যায় বলদর্পী শত্রুর শিবির,
দু হাতে কুর্নিশ করে
ফিরে যায় পশ্চনদীতীরে।
ততক্ষণে নবসূর্য তোমাদের মাথার উপরে
আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে জ্বলজ্বল করে।

বলেছিলাম যাবো ॥ কবিরুল ইসলাম

বলেছিলাম এই শরৎকালে আমি যাবো
বলেছিলাম যাবো।

বাংলা দেশ আমি কখনও চোখে দেখিনি—
শুধু রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে ছোটো গল্পে
কবিতায় ও গানে
আমি সেই উদ্ভিন্ন প্রতিমার আবাল্য সহচর
আমার অস্তিত্ব জুড়ে সেই বাঁশি সব সময় বেজে যাচ্ছে :
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি!

এবং এই আত্ম-আবিষ্কারের সূত্র ধরে বন্ধুর মতো এসেছে
বাংলা দেশের নবজাগ্রত সাহিত্য-সহোদর
যার পাতায় পাতায় চোখে মুখে মুদ্রিত আছে
তোমার জন্য আমার জন্য
নিমন্ত্রণের নীল চিঠি

উত্তরে বলেছিলাম এই শরৎকালে আমি যাবো
বলেছিলাম আমি যাচ্ছি॥

বাংলাদেশ ॥ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

শুধু জানি আমি
আর জানে মন
ভালোবাসি প্রাণ ভরে,
সোঁদা গন্ধ মৌ মৌ বাংলার মাটিরে
তাই যেন সারাক্ষণ তীব্র অন্বেষণ

হাঁস-ভরা পুকুরের জলে
আউষের ক্ষেতে ক্ষেতে
স্বপ্ন-ভরা ছায়া আলপনা
দুধে-ভরা ধলেশ্বরী কালো মেঘনা
আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায়
আর যেন না বিদায়,
জীবনের জয়গানে মুখরিত জনতা প্রাঙ্গণ
বাংলার প্রাঙ্গণ ভরে কী মুদ্র নিস্বন॥

পূর্বগগনে অরুণোদয় ॥

তপনকুমার ঘোষ

ওপার বাংলায় হানা দিয়েছে
বিদেশী শত্রুর দল।
কত না ঝরেছে রক্ত, কত না বয়েছে অশ্রু,
কত মায়ের চোখে।

সোনার বাংলা শ্মশান
বিদেশী ঘাতকের ঘৃণিত হাতে।
সে হাতও অচিরে হবে ধ্বংসে
জীবনেরই দুর্জয় আঘাতে।

হে বীর বাঙালি, জাগো জাগো,
আজ আর নাই কোনো ভয় :
শত্রু পদানত হবে, আমরা স্বাগত জানাই,
পূর্ব গগনে ঐ দেখ নব অরুণোদয়॥

ডক্টর আহমদ শরীফ

আজাহারউদ্দীন খান

প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায় ডঃ আহমদ শরীফ সাহেবের নাম এপার বাংলার বিদগ্ধ সমাজের কতিপয় গুণীজনের কাছে পরিচিত হলেও হতে পারে কিন্তু তার বাইরে তাঁর নাম কেউ শোনেন নি একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। তিনি সাহিত্যের যে ধারার পথিক ছিলেন তাতে তাঁর জনপ্রিয় হবার কথা নয় কিন্তু তিনি যে শাখায় চর্চা করতেন সেটি তাঁকে বিদগ্ধ সমাজে খ্যাতি ও প্রশান্ত প্রতিষ্ঠা দুই-ই এনে দিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি এম-এ পড়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে করতেই পি-এইচ-ডি হন। শুধু অধ্যাপক বলা ভুল তিনি প্রবন্ধকারী শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের মনে জিজ্ঞাসার দীপ প্রজ্জ্বলিত করাই তাঁর পঠনের বিশেষত্ব ছিল। এই বিশেষ গুণটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর আচার্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছ থেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ইয়াহিয়ার মিলিটারী একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় আবার গড়ে উঠবে কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদারহৃদয় আপনভোলা স্পষ্টবাদী দিলখোলা মানুষটিকে পাওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশজন অধ্যাপককে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে পাকিস্থানী হানাদাররা। রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের কোন যোগ ছিল না, প্রথম অপরাধ ছিল তাঁরা বাঙলাদেশকে ভালবেসেছিলেন আর দ্বিতীয় অপরাধ, বাঙালী ছিলেন জঙ্গীশাহীর তাঁবেদার তল্পীবাহক ছিলেন না। পঞ্চাশজনের নাম কাগজে বেরোয় নি কিন্তু যে কজনের নাম বেরিয়েছে তাঁদের মধ্যে আহমদ শরীফ সাহেবের নাম দেখে মর্মাহত হয়েছি। তিনি আমার পরিচিত ছিলেন। নির্বিরোধী শান্তশিষ্ট মানুষটি যিনি লেখাপড়ায় এবং গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি বাইরের সমাজজীবনের প্রতাপ প্রতিপত্তি হাতিয়ে নিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠার কাঙাল ছিলেন না। তা বলে অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ান নি, চারপাশের অন্যায়-অবিচার দেখে পাশ কাটিয়ে যান নি। লেখাপড়ার চর্চাতে জীবন অতিবাহিত করেও সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর যখন কোনো আঘাত এসেছে তখন তিনি জ্বলে উঠেছেন। ১৯৫২ খৃঃ যখন ভাষা আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছিল তখন তিনি রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। আবার যখন আয়ুবশাহীর কালো হাত বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে খর্ব করার জন্য রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও সাহিত্য প্রচার বন্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল তখন এই শান্ত মানুষটি অশান্ত হয়ে উঠেছিলেন, গবেষণার ঘর এঁটে ঘরে বসে না-দেখা বা না-শোনার ভান করেন নি। ছাত্রদের মাতৃভাষার প্রতি উদ্দীপ্ত করেছেন যা তাঁর গুরু শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁকে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের আর কী থাকে—রবীন্দ্রনাথই তো বাংলা ভাষা। প্রাণহীন দেহ কদিন থাকে! এই মানুষটিকে ফ্যাসিস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী গুলী করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

কয়েক বছর আগে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু আমাকে মর্মাহত করেছিল—ফুটে ওঠার আগেই ঝরে যাবার বেদনা কাটতে না কাটতেই শরীফ সাহেবের হত্যা সংবাদ আমাকে বিচলিত করেছে। হাই সাহেব সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রিকাতেই আহমদ শরীফ সাহেবের লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ই শেষে পত্রালাপে গিয়ে পৌঁছে। অনেকগুলো চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছিল কিন্তু সেগুলি এখন হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি নেই একথা ভাবতে পারছি না বলেই খোঁজার কাজেও মন দিতে পারছি না। আপাতত হাতের কাছে একটি চিঠি দেখতে পাচ্ছি সেটিই তুলে দিই। এর মধ্যে শরীফ সাহেবের সারল্য এবং অপরিচিতকে আপন করে নেবার একটি দুর্লভ গুণের ঝিলিক উঁকি মারছে।

১৮সি, ফুলার রোড
ঢাকা—২
৬-১১-৬৭

সুজনবরেষু,

আপনার চিঠির জবাব লিখতে দেরী হয়ে গেল—সে জন্য লজ্জিত। আইনের বাধাবন্ধে বইপত্রের আদান-প্রদান বন্ধ। তাই আপনাকে পুঁথি পরিচিতি ও সাহিত্য পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয় বর্তমানে। আপনাকে সুদিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

হাই সাহেব ভাল আছেন। ব্যস্ততার জন্যেই হয়তো আপনার পত্রের উত্তর দেন নি।

আশা করি সপরিজন কুশলেই আছেন। সালাম, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা রইল। বিনীত

আহমদ শরীফ

সুদিনের অপেক্ষায় তিনি আমাকে থাকতে বলেছিলেন—বিপ্লবের চাপে সেই বহু প্রতীক্ষিত সুদিনের দ্বার যখন উন্মোচনের পথে তখন তাঁকে হারালাম, এই বেদনায় সান্ত্বনা কোথায়?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ষান্মাসিক মুখপত্র 'সাহিত্য পত্রিকা' এবং বাঙলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকায় মুখ্যত শরীফ সাহেবের গবেষণার ফসল প্রকাশিত হয়েছে। এ দুটি পত্রিকায় তাঁর মুদ্রিত রচনার একটি তালিকা দিলাম যাতে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁর অন্বেষু মনের পরিচয় সুমুদ্রিত।

সাহিত্য পত্রিকা :

১৩৬৪ বর্ষা—বিদ্যাসুন্দরের কবি (পৃঃ ৭৭—১৩৩)
১৩৬৪ শীত—আলাওল বিরচিত তোহফা
১৩৬৫ শীত—গ্রন্থ পরিচয় (ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ১ম খন্ডের আলোচনা) [পৃঃ ৩০৯—৩১৩]
১৩৬৬ বর্ষা—সত্যকাল বিবাদ-সংবাদ বা যুগ সংবাদ : মুহম্মদ খান
১৩৬৭ বর্ষা—মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য [পৃঃ ১১৭—৩৩৪]
১৩৬৯ শীত—কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য [পৃঃ ২০৬—২১৩]
১৩৭০ শীত—রসুল-বিজয় [পৃঃ ১১৫—১১৭]
১৩৭১ বর্ষা—মোহাম্মদ খানের বংশলতিকার ইতিহাসের উপাদান [পৃঃ ১৭৫—১৭৯]
১৩৭২ বর্ষা—গ্রন্থ পরিচয় (ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত 'বাঙলা সাহিত্যের কথা' ১ম ও ২য় খন্ডের আলোচনা) [পৃঃ ২১২—২২০]
১৩৭২ শীত—গ্রন্থ পরিচয় (ডঃ আনিসুজ্জামান রচিত 'মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থের আলোচনা) [পৃঃ ১৭৭—১৯৫]
১৩৭৩ শীত—একটি প্রশস্তি কবিতা [পৃঃ ১০১—১১৬]

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা :

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৮৫—এতিম আলম বিরচিত আওয়াল-দে-বারোজ প্রশস্তি

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১০৬৬—সেখ ফয়জুল্লাহ বিরচিত যশনের চৌতিশা

৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১০৬৬—মুহম্মদ ফসীহ্ রচিত আরবী ত্রিশ হরফে মোনাজাত

৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১০৬৭—মুহম্মদ আকিল বিরচিত মুসানামা

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১০৬৮—মনুচেহের মানুষা পরী উপাখ্যান

৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১০৭০—গ্রামতোল নামা ও পদাবলী : আলাওল

৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১০৭০—বাউল তত্ত্ব

৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১০৭১—সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান চৌতিশা

৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১০৭২—চন্দ্রাবতী

এগুলির অধিকাংশেই শুধু বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ নয় এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ। এ ছাড়া 'বারেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', 'সমকাল', 'উত্তরণ', 'পূবালী', 'মাহেনও', 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকায় পুঁথি ও লোকসাহিত্য বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যার সব খবর আমি জানি না। তাঁর সম্পর্কে যে লিখতে হবে তা ভেবে নিয়ে আগে থেকে তথ্যও সংগ্রহ করে রাখি নি। যা আমার কাছে আছে তাই মন্থন করে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি আমার বেদনাহত চিত্তের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

॥ ২ ॥

আহমদ শরীফ প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ করে মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্য সাধনার ওপর তাঁর গবেষণাকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। তার একটি কারণ ছিল। সেটি হচ্ছে বিভাগ পূর্ববঙ্গের মুসলমান রচিত পুঁথিসাহিত্যের ওপর কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ যে কাজের সূত্রপাত করেছিলেন সেটিই বিভাগোত্তর যুগে পূর্ণতা লাভ করেছে আহমদ শরীফের হাতে। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সাহিত্য বিশারদের ভ্রাতুষ্পুত্র। হিন্দু-মুসলমান মিলিত বাংলা সাহিত্যের কথা আমরা মুখে বলেছি কিন্তু ডাক্তার সময় পাঠনের সময় পাঠ্যতালিকা তৈরীর সময় একতরফা আলোচনা হয়েছে এবং তার প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পেয়েছি—দেশ বিভাগ। আহমদ শরীফ সাহেব তাই ক্ষোভের সঙ্গে অপ্রিয় সত্যভাষণ উচ্চারণ করেছিলেন "যদি শুনতে ভাল শোনায় না কিন্তু বললেও ভুল হয় না, হিন্দু ইতিহাসকারেরা মুসলিম রচিত সাহিত্যকে উপেক্ষা করেছেন... হিন্দু পরিচালিত কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কোন প্রতিষ্ঠানেরই মুসলিম রচিত সংগ্রহের আগ্রহ ছিল না। তাই হিন্দু রচিত পুঁথির সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু পাশের মুসলিম ঘরে কোন খোঁজ করা হয়নি। একে নিতান্ত অবচেতন অবহেলা বলা চলে না, সচেতন উপেক্ষা বলতে হয়। তাই আলাউল—দৌলত কাজীর সৌজন্যমূলক নামোল্লেখেই মুসলিম সাধনার ইতিহাস সমাপ্ত হয়। ...সম্ভবত কারণেই হয়তো মুসলমান সমাজে দেখা দিল এর প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়াই বা বলি কি করে। হিন্দু ঐতিহাসিক যখন দায়িত্ব নিলেন না, তখন মুসলমানকেই এগিয়ে আসতে হল তাদের দানের পরিচয় দিতে।...কার্যত বাঙলায় হিন্দুসাহিত্য ও মুসলমান সাহিত্যের আলাদা আলাদা ইতিহাস গড়ে উঠেছে। অনেকটা বৃটিশ ও আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাসেরই মতো। তবু মুসলমানদের উদারতা অতুল। কেননা, তারা আজো জিজ্ঞাসা নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দু রচিত সাহিত্য পড়ে, স্কুল-কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। পশ্চিমবঙ্গীয়রা কিন্তু তা করে না, ক্ষতি অবশ্য তাদেরই। কেন না শুভ হয় না আত্মবিমুখতার পরিণাম। ইতিহাস তার সাক্ষী। চোখ বুঁজে থাকলেই সত্য-সূর্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, তার প্রসাদ কেবল নিজেকেই বঞ্চিত রাখা হয়।" (সাহিত্য পত্রিকা বর্ষা ১০৭২)। এক সমাজের Superiorty complex-এর দরুণ অন্য এক সমাজে Inferiority Complex দেখা দিয়েছে। মুসলমান ছাত্র বাংলা সাহিত্যে তাদের জাতির কী অবদান আছে মধ্যযুগের সাহিত্য প্রধানত মুসলিম বাংলা সাহিত্য তা জানতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যের তারাও যে একজন প্রধান অংশীদার একথা তথাকথিত বাঙালা চলতি সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করে তারা বুঝতে পারেনি। শরীফ সাহেব এই অভাব অনুভব করেই তাঁর জীবন, তাঁর সমস্ত সময়, তাঁর সবটুকু মেধা ও শক্তি, তাঁর অখণ্ড অবিচল অভিনিবেশ উৎসর্গ করে দিয়েছেন প্রাচীন সাহিত্য সংরক্ষণের কাজে এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে উদ্ধার করে সমাজের হীনমন্যতাবোধকে বিদূরিত করে ইতিহাসের লুক্কায়িত তথ্যকে সকলের গোচরে এনেছেন। যার ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্লিখনের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং পূর্ব বাঙলার মুসলমান তরুণকে বাংলা ভাষার প্রতি উদ্দীপ্ত করে পশ্চিমবাঙলার সাহিত্যের সমতলে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বেজন্যে ওধারের সাহিত্য সম্পর্কে এধারের মানুষের জানার উৎসুক্য তীব্র হয়ে উঠেছে।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথি যা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন সেগুলি শরীফ সাহেব যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পাদনা করে 'পুঁথি পরিচিতি' নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বের করেন। এই 'পুঁথি পরিচিতি' তাঁর একটি মহান কীর্তি—কবিও সংগ্রাহকের কৃতিত্ব সাহিত্যবিশারদের জন্য মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের প্রায় হাজার পুঁথিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করে প্রচুর টীকা-টিপ্পনী সহযোগে আহমদ শরীফ সাহেব একক চেষ্টায় এক অনালোকিত অধ্যায়কে আলোকিত করেছেন। পুঁথি রচয়িতাদের পরিচয় কালনির্ণয় শুধু বিস্তৃতভাবে দেননি, সেই কবিদের প্রামাণিকতা সম্পর্কে প্রচুর যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেছেন। পুঁথির প্রামাণিকতা প্রমাণ করার জন্য তাঁকে কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা তাঁর সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার বইটি না দেখলে বোঝানো যাবে না। এই গ্রন্থ সম্পর্কে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেছেন, 'মধ্যযুগের বাংলা মুসলিম সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে এই বিবরণ বর্ণিত পুঁথিগুলি বিশেষ মূল্যবান। বাংলার, বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলমান সমাজের, সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনার পক্ষে এই জাতীয় পুঁথির অনুশীলন অপরিহার্য। পুঁথিচর্চার দিক হইতেও ইহাদের নানা বৈচিত্র্যের যথেষ্ট মূল্য আছে।' (বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক) সামগ্রিকভাবে সংকলিত পুঁথি বাংলা সাহিত্যকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সেই প্রভাব পরবর্তীকালের লেখকরা নিজেদের মানসগঠনে কী পরিমাণে পুঁথি-রচয়িতাদের কাছে ঋণী সেই যোগসূত্রটি তিনি আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন। এই বইটির জন্যই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি হন। অনুসন্ধিৎসু অবাঙালী পাঠকদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এ বইটির ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ঢাকার পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৯৬০ সালে "A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts" নামে প্রকাশিত হয়েছে।

আমের শরীফ মধ্যযুগের সাহিত্যের অপরিচিতপূর্ব অনেক মূল্যবান পুঁথি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেছেন। সৈয়দ সুলতানের কাব্যরচনা কাল ও দৌলত উজির বাহরাম খানের আবির্ভাবকাল তথ্য প্রমাণ ও যুক্তিসহ নির্ণয় করেছেন। অনেকেই অর্থাৎ শহীদুল্লাহ সাহেব সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দরকে দ্বিজ শ্রীধরের অনূদিত বলে মনে করেন। কিন্তু শরীফ সাহেব প্রমাণ করেছেন যে সাবিরিদ খান যখন 'রসুলবিজয়' ও 'হানিফার দিগ্বিজয়' নামে দুখানা কাব্য রচনা করেছেন তখন শ্রীধরের রচনা আত্মসাৎ করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই বিশেষ করে তাঁরা যখন একই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। এ পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দরের বারজন কবি আবিষ্কৃত হয়েছে—দ্বিজ শ্রীধর, সাবিরিদ খান, গোবিন্দ দাস, নিধিরাম আচার্য, কঙ্ক, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম, বলরাম, কবীন্দ্র চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র, রাধাকান্ত ও রামপ্রসাদ। প্রথম চারজন কবির পুঁথি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের আবিষ্কার। 'বিদ্যা-

সুন্দরের কবি' নামক প্রবন্ধ বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উদ্ভব ও অন্যান্য রচয়িতাদের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করে তিনি বিদ্যাসুন্দর পাঁচালীর আদি রচয়িতার সম্মান কংককে না দিয়ে দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকেই দিয়েছেন। সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কৃত শ্রীধর রচিত বিদ্যাসুন্দর পুঁথির বিচার বিশ্লেষণ ও কাল নির্ণয় করে তিনি নিজ সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করেছেন, দ্বিজ শ্রীধর নিশ্চয়ই ১৫১৯ থেকে ১৫০২ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কংকের কাব্যও এ সময়েই রচিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কংক বড়জোর দ্বিজ শ্রীধরের সমসাময়িক ছিলেন, পূর্ববর্তী কিছুতেই নন। অবশ্য যদি চৈতন্য বন্দনাটা প্রক্ষিপ্ত না হয়। সুতরাং কংকের পক্ষে পাথুরে প্রমাণের অভাবে আমরা দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকে বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদি রচয়িতার গৌরব দান করছি।' কিন্তু কবি হিসেবে কাব্যবৈশিষ্ট্য ও কাব্যভাষার তুলনামূলক আলোচনায় শ্রীধরের থেকে সাবিরিদ খানকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেছেন, 'ভাষা ও উপমা-অলঙ্কারের সংযত ব্যবহারে আর পদলালিত্যে ও ছন্দ সৌন্দর্যে গোটা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় জুড়ি নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।...শ্রীধরের ভাষা আড়ষ্ট, বর্ণনভঙ্গী প্রাণহীন এবং বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। পক্ষান্তরে সাবিরিদের ভাষা শালীন, বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং গতিশীল। বর্ণনভঙ্গী রসাল এবং বর্ণনা বিস্তৃত। শ্রীধরের ভাষায় প্রাচীনতা বা সংস্কৃতানুগতা কম, পক্ষান্তরে সাবিরিদের ভাষা সংস্কৃতানুগত ও প্রাচীনতার পরিপোষক। উপমা ও অপরাপর অলঙ্কার প্রয়োগে সাবিরিদ খান শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু শ্রীধরের সে শক্তি বিরল।' প্রবন্ধের শেষে উভয় কবির রচিত খণ্ডিত পুঁথি দুটি যথাযথ টীকা-টিপ্পনী সহযোগে মুদ্রিত হয়েছে। তিনি আরও কয়েকটি পুঁথি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন যদিও প্রায় সবকটি পুঁথির আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। সম্পাদনার ক্ষেত্রে সাহিত্যবিশারদের মধ্যে ভাবাবেগ প্রবণতা ছিল আর শরীফ সাহেবের মধ্যে আছে দার্শনিকসুলভ যুক্তিবাদ। সাহিত্যবিশারদের বিশৃঙ্খল উপকরণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নতুন চিন্তা যুক্ত করে বিষয়ের পূর্ণতা দান করেছেন শরীফ সাহেব। যেমন, দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু' আলাউলের 'তোহফা' মুহম্মদ খানের 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' মুহম্মদ কবিরের 'মধুমালতী', জয়েনউদ্দীনের 'রসুল বিজয়', মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্তা', আলাওলের 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' প্রভৃতি। এই পুঁথি সম্পাদনার মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ পুঁথির পাঠোদ্ধার করেছেন, সুদীর্ঘ ভূমিকায় পুঁথিগুলির নানা বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছেন, পুঁথি রচয়িতা সম্পর্কে এমন কয়েকটি প্রয়োজনীয় সূত্রকে ধরিয়ে দিয়েছেন যাতে ছাত্র গবেষক সাধারণ পাঠক সকলেরই উপকৃত হবার কথা। 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' ও 'মধ্যযুগের গীতিকবিতার সংকলন' তাঁর গবেষণার এক সমৃদ্ধ ফসল। 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' গ্রন্থের ৮২ জন কবির ৪০২টি পদ সংগৃহীত হয়েছে। এই পদগুলি 'রূপ' 'অনুরাগ' 'বংশী' 'আক্ষেপ' 'দান' 'নৌকা' 'অভিসার' 'মিলন' 'সম্ভোগ' 'মান' 'বিরহ' 'আত্মবোধন' 'আত্মনিবেদন', 'প্রার্থনা' 'বাৎসল্য' ও 'বিবিধ' পর্বে বিভক্ত। বিভক্তকরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'সুফীমত প্রভাবিত হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের মনে রাধাকৃষ্ণের রাস, মৈথুন প্রভৃতি কল্পনা প্রশ্রয় পাওয়ার কথা নয়। তাই তাঁরা রূপ, অনুরাগ বংশী, অভিসার, মিলন বিরহ প্রভৃতিকে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কসূচক ও ব্যঞ্জক বলে গ্রহণ করতে পারলেও বস্ত্রহরণ, দান, সম্ভোগ, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতির সঙ্গে তাদের অধ্যাত্মতত্ত্বের মিল খুঁজে পাননি, তাই মুসলমানের লেখায় ও-সব শ্রেণীর পদ সাধারণত পাওয়া যায় না। তাঁদের রচনায় অনুরাগ বিরহবোধ এবং জীবন-জিজ্ঞাসাই বিশেষরূপে প্রকট। এই জীবন-জিজ্ঞাসামূলক পদকে 'আত্মবোধন' শ্রেণীভুক্ত করেছি। সৃষ্টিলীলা দেখে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে—এটিই রূপ : এ সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক বোধ জন্মে—এটিই অনুরাগ; এবং তাঁর প্রতি কর্তব্যবোধ জাগে—এটিই বংশী; আর সাধনার আদিস্তরে পাওয়া-না-পাওয়ার সংশয়বোধ থাকে—তারই প্রতীক নৌকা। এর পরে ভাবপ্রবণ মনে আত্মসমর্পণ ব্যঞ্জক সাধনার আকাঙ্ক্ষা উপ্ত হয়—এটিই অভিসার। এরপর সাধনায় এগিয়ে গেলে অধ্যাত্ম-স্বস্তি আসে—তাই মিলন। এরও পরে চরম আকাঙ্ক্ষা—একাত্ম হওয়ার যার নাম বাকাবিল্লাহ—এই-ই বিরহ।' গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় ভারতীয় ভক্তিবাদের ক্রম বিবর্তনের পটভূমিকায় বাঙলাদেশে ভক্তিধর্মের উদ্ভব কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সুফীতত্ত্বের মরমীয়া সাধন পন্থের আলোকে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙলার জনজীবনের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর যে গভীর যোগ আছে ভূমিকার মধ্যে সেকথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রতিটি পদকারের পরিচিতি দিয়েছেন। এক একটি গ্রন্থ তাঁর সুগভীর অধ্যবসায়, অসাধারণ নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্যের পরিচয় বহন করে। একক প্রয়াসে এরকম কাজ খুব কম গবেষকই করতে পেরেছেন। বিষয়ের একনিষ্ঠ সাধনা ও নিষ্কাম গবেষণা আদর্শের প্রতিমূর্তি তিনি।

অনেক গবেষক আছেন যাঁরা পূর্বকল্পিত মত ও বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়ে কোন অবস্থাতেই কোন বিষয়ের পুনর্বিবেচনা করার কথা চিন্তা করেন না। কিন্তু শরীফ সাহেবই এমন একজন গবেষক যিনি কোন পূর্বনির্দিষ্ট বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে তত্ত্ব খোঁজার গবেষক নন বলেই নিজের সিদ্ধান্তকে কখনও অভ্রান্ত বলে মনে করেন নি। উন্মুক্ত মন নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন বলেই তাঁর বিষয়সম্পৃক্ত অন্য লেখকের কোন নতুন বই প্রকাশিত হলেই নিজের তথ্যকে বার বার যাচাই করে নিতেন। ফলে কোন পুঁথি সম্পাদনার কাজ শেষ হয়েও শেষ হত না তাঁর কাছে। 'লায়লী-মজনু' কাব্যের ভূমিকায় ১৯৫৭ সালে তিনি দৌলত উজির বাহরাম খানের কাব্য রচনাকাল ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৩ খৃঃ বলে নির্ণয় করেছিলেন। পরে ১৯৬২ খৃঃ এ বংশে প্রকাশিত অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল' (জুলাই ১৯৬২) পাঠ করে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। 'সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশিত 'কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ শুষ্ক রুক্ষ দিনগুলিতে—
স্নো ভিউ হোটেল
দার্জিলিং
আপনার বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য কামনা করে
মার্জিত রুচি ভ্রমণবিলাসীদের একান্ত নির্ভরযোগ্য বাসস্থান
পূর্বাহ্নে স্থান সংরক্ষণের জন্য ফোন দার্জিলিং ৪০

সম্বন্ধে নতুন তথ্য শীর্ষক প্রবন্ধে দুটি সংশোধন করে বলেন যে ১০৫৬ সনের অব্যবহিত পূর্বে 'লায়লী মজনু' কাব্য রচিত হয়। 'সতাকাল বিবাদ সংবাদ' পুঁথির ভূমিকাতেও কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল সেগুলিও অকপটে স্বীকার করে পাঠ ও মন্তব্য সংশোধন করেছেন, 'সত্যকাল বিবাদ সংবাদ'-এর ভূমিকায় মুহম্মদ খানের কাব্যে প্রাপ্ত কবির আত্মপরিচয়াংশের পাঠ-গ্রহণে জটিলতায় বিভ্রান্ত হয়ে কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। সৈয়দ শাহ, শাহ আবদুল ওহাব, ও শাহ বিবারীকে তিন ভিন্ন ব্যক্তি বলে ধরেছিলাম বলে, কোনো কোনো পুঁথি-ধৃত 'মাতামহ' পাঠ গ্রহণ না করে, অন্যান্য পুঁথির পাঠকে যথার্থ বলে অনুমান করেছিলাম। ফলে অসমীচীন সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল। যাকে আমি চট্টগ্রামের পীর পরম্পরার-স্মৃতি বলে অভিহিত করেছি তা আসলে কবির মাতৃকুল পরিচিতি এবং কবির স্বকুলের পরিচিতিতেও বাচিক দেশ ও কীর্তি নির্দেশমত একটি ত্রুটি রয়ে গেছে। এখানে পাঠ ও মন্তব্য সংশোধন করছি এবং সে সূত্রে নতুন তথ্যও সন্নিবেশিত হচ্ছে।' তাঁর সিদ্ধান্তকে পুনর্বিচার করতে যে গ্রন্থটি সহায়তা করেছে সেটিও তিনি প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করেছেন, নানা প্রশ্ন তুলে এবং সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে ঐ সব ব্যাপারে নতুন তথ্য সন্ধানে আমাকে প্রবর্তনা দিয়েছেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়।' (শীত ১০৬১) অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থরচনাতেও তিনি ওখানে থেকেও যথাসাধ্য সহায়তা করেছেন যা 'নিবেদন' থেকে জানতে পারি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'আরও একজনের কাছে আমি ঋণী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আহমদ শরীফ। তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই, তা সত্ত্বেও তিনি আমায় সাহায্য করেছেন। তিনি মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বহুদিন ধরে অক্লান্তভাবে মূল্যবান গবেষণা করে চলেছেন। যখনই তাঁর কোন বই বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আমায় তা পাঠিয়েছেন। সেগুলি থেকে আমি এই বইয়ের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছি। এছাড়া পত্রযোগে যখন তাঁর কাছে কোন সাহায্য চেয়েছি, তিনি তা আমায় অবিলম্বে পাঠিয়ে দিয়েছেন—নানা অসুবিধা ও কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও।' (গ্রন্থকারের নিবেদন, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২)।

মধ্যযুগের সাহিত্যের ওপর গবেষণা করতে করতে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকেও তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য ছাত্রাবস্থাতেই শহীদুল্লাহ সাহেবের নিবিড় সান্নিধ্যে লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। পুঁথি সম্পাদনার ফাঁকে ফাঁকে গান ছড়া প্রবন্ধ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে শুরু করেন এবং বিলুপ্তের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেছেন কেননা ঐগুলি জাতির জীবনে একদিন প্রাণসত্তার করেছিল। পরিবর্তিত অবস্থাওয়ায় আজ সেগুলি টিকে থাকতে পারছে না, শিক্ষাপ্রসারের ফলে লোকমুখের আশ্রয় হারিয়ে ফেলছে। তা বলে তার মূল্য কমে যায় নি। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'আধুনিক অর্থে আমরা জাতি হিসেবে আজো গড়ে ওঠার মুখে। এ জন্যই আমাদের কাছে এমন লোকশ্রুতি ও লোকসাহিত্যের মূল্য অপরিমেয়। এর থেকেই জাগবে আমাদের ঐতিহ্যবোধ। এখানেই দেখতে পাব আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ—আমাদের জাতীয় মন-মননের গতি-প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিশ্চিত পরিচয় ঘটবে এ সবেরই মাধ্যমে। জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় সাহিত্য যদি জাতীয় জাগরণের অবলম্বন হয়, সাহিত্যকে যদি জাতির প্রাণ-রসের উৎস বলে মনে করি, তবে এগুলোর মূল্য অনস্বীকার্য। ছড়ায়, প্রবাদে-প্রবচনে যেমন, তেমনি এসব গান, গাথা, রূপকথা, উপকথা ও ইতিকথায় আমাদের জনজীবন, ঘর-ঘাট, মাঠ-বাট, মন-মনন, আচার-আচরণ প্রভৃতির স্বরূপ কোথাও চিত্রে, কোথাও ইঙ্গিতে নিহিত আছে। আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখিত হবে এসব উপাদান সম্বল করে।' (জাতীয় জীবনে লোক সাহিত্যের মূল্য : সমকাল, ফাল্গুন-চৈত্র ১০৬৪)

আহমদ শরীফ সাহেবের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হচ্ছে যে তাঁর গবেষণাকে পণ্ডিতজনেরা যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন এবং সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ অপরিহার্যবিধায় নিজেদের গ্রন্থে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণও করেছেন। বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত মনীষী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর তথ্যকে গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যের কথার (২য় খণ্ড) সমালোচনা প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ তাঁর গ্রন্থাদের উদ্ধৃত কয়েকটি ত্রুটি বিস্তৃতভাবে 'সাহিত্য' পত্রিকার বর্ষা ১০৭২ সংখ্যায় উল্লেখ করেছিলেন। শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি তবু বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে (কার্তিক ১০৭৪) যেখানে শরীফ সাহেবের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, সেখানে সানন্দে মেনে নিয়েছেন, যেখানে মানতে পারেন নি, সেখানেও তাঁর তথ্যকে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'ডঃ আহমদ শরীফ এবং অধ্যাপক আবু তালিব আমার সুযোগ্য প্রাক্তন ছাত্রদ্বয়ের সহকারিতায় এই সংস্করণ বিশেষ বিশেষ হিতসাধিত হইয়াছে।' তাই একথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যেতে পারে যে, মধ্যযুগের সাহিত্যের ওপর আহমদ শরীফের অধিকার তাঁকে ঐ যুগের বিশেষজ্ঞরূপে প্রতিপন্ন করেছে এবং সেই পরিচয়েই Serious সাহিত্যপাঠকের পরিশুদ্ধ চেতনার মধ্যে তিনি বিরাজ করবেন।

পরিশিষ্ট

আহমদ শরীফ সাহেব সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। পুঁথি পরিচিতি। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত। প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

(A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts In Munshi Abdul Karim's Collection. By Munshi Abdul Karim and Mr. Ahmad Sharif. English Edition by Dr. Sajjad Husain. Asiatic Society of Pakistan Publication No 3,1960. pp I-XXVII +1-589 Appendix I-XXVII.

২। তোহ্‌ফা। আলাউল বিরচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

৩। সত্যকাল বিবাদ সংবাদ। মুহম্মদ খান বিরচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

৪। মুসলিম কবির পদ সাহিত্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

৫। রসুল বিজয়। জয়েন উদ্দীন বিরচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

৬। মধ্যযুগের গীতি কবিতা। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

৭। লায়লী মজনু। দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত। প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ভূমিকা: ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক।

৮। নবীবংশ। মুহম্মদ কবির বিরচিত। ১৯৬০। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯। রাগতাল নামা পদাবলী। আলাওল বিরচিত। বাংলা একাডেমী। ঢাকা।

১০। নসীহৎনামাবার্তা। মুজাম্মিল বিরচিত। ১৯৬৫। বাংলা একাডেমী ঢাকা।

১১। সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল। আলাওল বিরচিত। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২২। সাবরিদ খান গ্রন্থাবলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১০। মধ্যযুগের রাগতালনামা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৪। মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৫। চন্দ্রাবতী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৬। বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৭। পুঁথির ফসল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনন্ত-নবীন নরেন্দ্র দেব

কবি নরেন্দ্র দেব দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁর আত্মীয়, সকলেই তাঁর প্রিয়, জীবনে কখনও কারো নিন্দা করেন নি নরেন দা। এই নরেন দা নামেই তিনি সর্বজনপরিচিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে আরেক অজাতশত্রু স্মরণীয় পুরুষ ছিলেন জলধর সেন, 'জলধরদা' নামে যিনি সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। নরেন্দ্র দেব এই জলধর দাদার অতি স্নেহভাজন ছিলেন, এমনকি নরেন্দ্র দেবের বিবাহে কন্যা সম্প্রদানও করেছেন এই জলধর দাদা। আর এক স্মরণীয় মানুষের স্নেহভাজন ছিলেন নরেন দা, তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাঁর জীবদ্দশায় 'শরৎ দা' বলে সবাই সম্বোধন করতেন। চল্লিশ বছরেরও ওপর এই সদা পরলোকগত সাহিত্যিককে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। সকল অবস্থায় প্রসন্ন, মধুর হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত। যে তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে তার জন্যও নরেন্দ্র দেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে সুমধুর আশ্বাসবাণী, এ আমরা অনেকবার শুনেছি।

'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কয়েক বছর আগে থেকেই তার যখন তোড়জোড় চলছিল তখন কবিদম্পতি একাধিক বৈঠকে উপস্থিত থেকে নানাবিধ উপদেশ ও পরামর্শ দান করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে 'অমৃত' একজন পৃষ্ঠপোষক থেকে বঞ্চিত হল যাঁর সংগে এই পত্রিকার অন্তরের যোগ ছিল।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র দেবের যে দীপ্ত পুরুষোচিত মূর্তি দেখেছি জীবনের শেষ দিনটিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মানুষটির মধ্যেও সেই পৌরুষের অভাব দেখিনি। অথচ কত কোমল, কত মধুর। মৃতদেহ দেখে মনে হয়েছে সদাহাস্যময়, পরিহাসরসিক নরেনদা এইবার হয়ত কিছু বলবেন।

উৎসবে, ব্যসনে, রাজদ্বারে, শ্মশানে যিনি হাজির থাকেন তিনিই বন্ধু। নরেন্দ্র দেব আজীবন এই নীতি প্রতিপালন করেছেন। বন্ধুজনের এই সংজ্ঞা তাঁর চরিত্রে আশ্চর্য খাপ খেয়ে যায়। বাংলা দেশে সাহিত্যিকরা পরিণত বয়সে পৌঁছালে বিস্মৃত হয়ে যান, এমনই এক বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের শ্রাদ্ধবাসরে দেখা গেল নরেন্দ্র দেব উপস্থিত, সবাই ভুলেছে তিনি কিন্তু ভোলেন নি। আবার রাজশেখর বসুর শবযাত্রায় নরেন্দ্র দেব মৃদু-গলায় বলছেন—কেউ হরিধ্বনি করছে না, এস আমরা বলি—বল হরি হরিবোল। অথচ নরেন্দ্র দেবের শরীর গত কয়েক বছর ধরে বেশ খারাপ ছিল। একই দিনে একাধিক বিবাহ সভায় যোগ দিয়েছেন নরেন্দ্র দেব এবং দক্ষিণ কলিকাতা থেকে উত্তর কলিকাতার পাইকপাড়া পর্যন্ত ছুটেছেও তিনি ক্লান্তি বোধ করেন নি।

আশ্চর্য সামাজিকতা জ্ঞান, পরিশীলিত রুচি, পরিমিতিবোধ ঠনঠনিয়ার প্রাচীন বংশের এই মানুষটিকে এক অবিস্মরণীয় সাহিত্যিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নরেন্দ্র দেব 'ভারতী' যুগের সাহিত্যিক। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে আজ বাকী আছেন শুধু অমল হোম, চারু রায় আর প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, বাকি সবাই তিরোহিত। 'ভারতী' যুগ বাংলা সাহিত্যের এক স্বর্ণ যুগ, 'ভারতী' যুগে যে আধুনিকতার উন্মেষ তারই বিকশিতরূপ 'কল্লোল যুগ'। ভারতী দলের সাহিত্যিকদের কল্লোলের কালের সাহিত্যিকদের সংগে যোগাযোগ ছিল। নরেনদার ধারাবাহিক উপন্যাস 'দাদুঘর' কল্লোলে প্রকাশিত হয়। সেকালের মাপকাঠিতে সেই উপন্যাস ছিল দুঃসাহসিক। পরে তিনি 'কৃত্তিবাসে'ও লিখেছেন শুনেছি।

নরেন্দ্র দেবের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৈপ্লবিক। তিনি শুধু কবি বা উপন্যাসকার হিসাবেই যে সাহসিকতার পরিচয় দেখিয়েছেন তা নয়, তাঁর নিজের জীবনে রাধারানী দত্তকে বিবাহ করেও তিনি যথেষ্ট দুঃসাহস প্রকাশ করেন। প্রচলিত সামাজিক অনুশাসন না মেনে তিনি যখন বিবাহ করলেন তখন এই কলকাতায় প্রচণ্ড হৈ-চৈ চলল এমনকি সংবাদপত্রেও বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে সেদিন সমর্থন করেছিল সে যুগের তরুণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা। দৈনিক বাংলার কথায় (সুভাষচন্দ্র পরিচালিত) এই বিবাহ সমর্থিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই কবি দম্পতিকে বিশেষ স্নেহ করতেন, তাঁর কয়েকখানি মূল্যবান চিঠি রাধারানী দেবীকে লিখিত। আবার শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসঙ্গী ছিলেন এই কবিদম্পতি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেছিলেন রাধারানী দেবী।

প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় কবিদম্পতি। নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবীও অনুরূপভাবে স্মরণযোগ্য। নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবী দীর্ঘদিন দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে ক্লেশভোগ করেছেন। তথাপি স্বামী-স্ত্রী কারো মুখে হাসির অভাব ঘটেনি।

নরেন্দ্র দেব শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানতেন, শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই তিনি শুনেছিলেন অনেক কথা। তাঁর সেইসব কাহিনীর কিছু হয়ত পাওয়া যাবে 'শরৎচন্দ্র' নামক অধুনা দুষ্প্রাপ্য জীবনীগ্রন্থে। এই সুন্দর জীবনীগ্রন্থটির নতুন সংস্করণ করার বিশেষ বাসনা ছিল নরেন দা-র।

নরেন্দ্র দেব লিখেছেন প্রচুর। তাঁর নরেন্দ্র দেবের গৃহিণী,

যাদুকর, খেলার পুতুল প্রভৃতি উপন্যাস-গুলি একদা জনপ্রিয় ছিল। বিশেষতঃ যাদুকর এবং খেলার পুতুল। তাঁর সচিত্র কাব্যগ্রন্থ 'বসুধারা' বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় গ্রন্থ। সিনেমার কলাকৌশল বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সে যুগে তিনি লিখেছিলেন তার নাম 'সিনেমা', এই জাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রথম। নরেন্দ্র দেব অনূদিত 'ওমর খৈয়াম', 'মেঘদূত' ও 'দেওয়ান-ই-হাফিজ' পড়েন নি পঞ্চাশোর্ধ্বে এমন শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় কম।

আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর পূর্বে বাংলা ভাষায় প্রথমতম কাব্যসঞ্চয়ন বা এনথোলজি সম্পাদনা করেন নরেন্দ্র দেব। 'কাব্য-দীপালি' নামক সেই চিত্রবহুল কাব্যগ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, চারু রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, যতীন্দ্র-কুমার সেন প্রভৃতি সেকালের প্রখ্যাত বাঙালী শিল্পীদের অজস্র ছবি ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সঞ্চয়নটির নামকরণ করেন 'কাব্য দীপালি'। এই গ্রন্থের ভূমিকায় নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন—

"এই গ্রন্থে আমি কেবলমাত্র একালের কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় একত্র করার চেষ্টা করেছি। বর্তমান যুগের ও সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আমি একেবারে আজকের দিনের সদ্যসমাগত কয়েকটি তরুণ কবির সুন্দর রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।"

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেকালের অনেক নবীন কবিকে স্বীকৃতি দান করেছিলেন। প্যালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারীর সমশ্রেণীর এই সঞ্চয়নগ্রন্থ বাংলা কবিতার জনপ্রিয়তা বর্ধনে সহায়ক হয়েছে। সেদিনের সেইসব অল্পখ্যাত কবিবৃন্দের নাম—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, জসিমউদ্দীন, অচিন্ত্যকুমার, শিবরাম, উমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী প্রভৃতি।

পরিণত বয়সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপ ভ্রমণ করেছিলেন নরেন্দ্র দেব সপরিবারে। 'সাহেব বিবির দেশে' নামক রম্য ভ্রমণকথায় তার সুখপাঠ্য বিবরণ তিনি লিখে গেছেন।

নরেন্দ্র দেব রচিত 'ফাল্গুনী' কবিতার কয়েকটি লাইন—

"তোমারে চিনেছি আমি আজ .
তরুণের স্বপ্নরাজ্যে তুমি যে গো
চির-যুবরাজ।"

আর তারপর আছে—

এলে তুমি অনন্ত-নবীনে
প্রকৃতির প্রহেলিকা মরণের কোলে
যুগে যুগে জরা-মৃত্যুহীন।।

নরেন্দ্র দেব সত্যই প্রকৃতির প্রহেলিকা। জরামৃত্যুহীন এই শরদ্বীপ্র মানুষটির বিয়োগে বাংলা সাহিত্য জগতে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হল, এই কথা অত্যুক্তি নয়।

—অজয়শঙ্কর

নরেনদা—আমাদের নরেনদা ॥

বনফুল

নরেনদা' চলে গেলেন ঃ
সারা জীবন একটি কথাই বলে গেলেন
'ভালবাসি'
ভালবাসি তোমাদের হাসি
তোমাদের আনন্দ
তোমাদের মুক্ত-প্রাণের ছন্দ।
তোমরা যা-ই হও, ছোট বড়, ভালো মন্দ
সুগন্ধ, নির্গন্ধ
দুর্বল প্রবল
সবল, প্রবল
দুর্বল, অবল
সার, অসার
আমার ঘরের দ্বার
অবারিত সকলের জন্য,
সকলকে পেয়ে আমি ধন্য।
সবার কাছে একটি জিনিসই প্রাণভরে চেয়েছি
প্রাণ ভরে পেয়েছি
সে জিনিসটি — ভালবাসা।
ওতেই মিটেছে সব সাধ পূরেছে সব আশা।
অফুরন্ত পেয়েছি
তোমাদের প্রেম-গঙ্গার পবিত্র নীরে সারা জীবন নেয়েছি।
এই তো পরম সুখ, এই তো পরম সম্বল,
এই তো অপার তৃপ্তি
অম্লান-দীপ্তি
এই তো অমিয় অপরিমেয়।
এই তো আমার পাথেয়......'

এই কথাই সারা-জীবন বলে গেলেন
অবশেষে চলে গেলেন।

তিনটি যুগের উপর দিয়ে বিরাট নদীর মতো
বয়ে গেল যে বিরাট জীবনধারা
আজ সেটা হঠাৎ হ'ল হারা
মহাজটিল একটা অজানা অরণ্যের আড়ালে।
তার অন্ধকার নিবিড়তার অন্তরালে
ফুটল তাঁর নূতন রূপ
অপরূপ অপরূপ।

দেখছি ওই বিরাট নদীর দু' পারে
দাঁড়িয়ে আছে সারে সারে
অনেক লোক, অনেক পল্লী, অনেক কুটির, অনেক প্রাসাদ
অনেক প্রেম, অনেক আশা, অনেক সাধ
অনেক নহবতখানায় অনেক পূরবীতে বাজছে অনেক নহবৎ।
আমিও দাঁড়িয়ে আছি নির্বাক জড়বৎ।
ভাবছি, যা হারালাম তা কি পাব আর
আকাশে কালো মেঘ, চারিদিকে অন্ধকার।

সাহিত্যের খবর

উল্টোরথ পুরস্কার।। এবারের উল্টোরথ পুরস্কার লাভ করেছেন কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু। 'উল্টোরথ' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বছরই এক কবিকে এই পুরস্কারে সম্মানীত করা হয়। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য পাঁচশত টাকা।

বাংলা সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জন বসু একটি স্মরণীয় নাম। ১৯১২ খৃঃ তাঁর জন্ম হয়। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় তিনি বার্তাসম্পাদক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের তিনি অন্যতম অধ্যাপক। এ পর্যন্ত তাঁর পঞ্চাশের উপর কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে। ১৯৬৬ সালে তিনি সোভিয়েট ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'কালো মেঘ' (উপন্যাস), 'পোড়ামাটি' (ছোটগল্প), 'স্বপ্ন কোরক' (ছোট গল্প), 'আরো সূর্যের কাছে' (কবিতা), 'অন্যকো বিকেল' (কবিতা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশের উপর কাব্যগ্রন্থটি খুবই অভিনন্দিত হয়েছে। এছাড়াও 'জীবনীচিত্র সমালোচিত' নামক গবেষণামূলক গ্রন্থটি বিদগ্ধ রসিকজনের দ্বারা বহুল প্রশংসিত হয়েছে। তিনি পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর রচিত সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তা সর্বদাই মানুষের সম্পর্কে। মানুষই তাঁর সাহিত্যের প্রধান বিষয়।

পরলোকে ফরাসী ঔপন্যাসিক।। প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও সমালোচক এম আন্দ্রে মুঁরি গত রবিবার, ১১ এপ্রিল প্যারীতে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বোদলেয়র, বালজাক প্রমুখের জীবনী খুবই খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৫৪ খৃঃ তিনি 'গ্র্যান্ড প্রিক্স ন্যাশানালে দ্য ল্যাটার' পুরস্কারে সম্মানিত হন।

পরলোকে অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।। বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় গত রবিবার পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬০ বৎসর। বাংলা ভাষায় তিনি প্রায় ১৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ। তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি সুদীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যে সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়।

সারা ভারত হাস্যকবি সম্মেলন।। গত শনিবার কলকাতার কলামন্দিরে সারা ভারত হাস্যকবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে লক্ষ্ণৌ থেকে মায়া দেবী, দিল্লি থেকে আদিত্য, হাথরাস থেকে কাকা হাথরাসি, উত্তরপ্রদেশ থেকে বিমলেশ প্রমুখ যোগদান করেন। শ্রোতারা খুব আনন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। এই ধরনের কবি সম্মেলন এর আগে কলকাতায় আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

ইরানী গবেষকের সম্মান।। এ বছর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একজন ইরানী গবেষককে পার্শীতে বক্তব্য ও একটি উপনিষদ অনুবাদের জন্য সম্মানিত করেছেন। তিনি অনুষ্ঠানে বলেন যে, ইউরোপের দার্শনিকরা পার্শীতে অনূদিত বেদ ও উপনিষদই প্রথম পাঠ করেন। শোপেনহাওয়ার পার্শী থেকেই জর্মন ভাষায় এর অনুবাদ করেন। কালিদাসের 'শকুন্তলা' পার্শী থেকেই জর্মনে অনূদিত হয়েছিল এবং তা পড়েই গ্যয়টে উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এভাবেই ভারতের সঙ্গে প্রতীচের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হারমেন হেস বুদ্ধের জীবন অবলম্বন করে একটি উপন্যাস রচনা করেন। এছাড়াও আরো বহু জর্মন লেখক এপথে অগ্রসর হয়েছেন আর তার দুয়ার প্রথম উন্মুক্ত করেছে পার্শী ভাষা।

আজকের জাপানী কবিতা।। 'পোয়েট্রি অস্ট্রেলিয়া' পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক কাব্য জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই পত্রিকাটি অস্ট্রেলিয়ার কবিতা প্রকাশ ছাড়াও মাঝে মাঝে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে অন্য দেশের প্রতিনিধিমূলক কবিতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন। এর আগে কানাডা, ইতালী, ফ্রান্স ও জর্মানীর কবিতার উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যাটি আধুনিক জাপানী কবিতার উপর। সমকালীন প্রতিষ্ঠিত জাপানী কবিদের এমন সুনির্বাচিত ইংরেজিতে অনূদিত সংকলন আমার চোখে এর আগে পড়েনি। কবিতাগুলি পড়ে ভারতীয় কবিতার সঙ্গে কেমন যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক কবিই প্রতীক হিসেবে 'কেলফুল', 'মাছরাঙা পাখি', 'পাহাড়', 'সূর্য' ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। বিশিষ্ট জাপানী কবিদের মধ্যে এই সংখ্যায় যাঁরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন, হায়ুমো শিবুয়া, শিরো মুরানো, ইওয়াতা হিরোসি, সাতো হারুমো, তোগো সার্নাকাচি, কিহারা কইচি, যোশিও হিরোশি প্রমুখ। এই কবিদের অধিকাংশেরই জন্ম ১৯২০ পর। কবিতাগুলির অনুবাদক বিশিষ্ট ইংরেজ কবি জেমস কিরকাপ। আধুনিক জাপানী কবিতা সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকদের কাছে পত্রিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

—চার্বাক

রমাপদ চৌধুরীর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ

পঃ বঃ সরকার সাহিত্যিক শ্রীরমাপদ চৌধুরীকে তাঁর 'এখনই' উপন্যাসের জন্য সাহিত্যে ১৯৭০-৭১ সালের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এই পুরস্কার বাবদ ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

নতুন বই

Elections 1971 — Edited by S. Sarkar, M. C. Sarkar and Sons Private Ltd, 14 Bankim Chatterjee St. Calcutta-12. Price: Rs. 4.00

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রা[illegible] ভারতে, এ যাবৎ কয়েকটি রাজ্যে মধ্যব[illegible] নির্বাচন হলেও, এই সর্বপ্রথম পার্লামেন্টে[illegible] জন্য মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে [illegible] কার্যকাল শেষ হবার প্রায় চৌদ্দমাস আ[illegible] পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন [illegible] ১—১০ মার্চ পর্যন্ত। শ্রীমতী ইন্দি[illegible] গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতব্যাপী [illegible] কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা যে বিপুলভাবে [illegible] গেছে তা প্রকাশিত হয়েছে এবারের নি[illegible]চনে।

হিন্দুস্থান ইয়ার বুকের [illegible] সম্পাদক শ্রী এস সরকার '৭১ সালের নি[illegible]চনের ফলাফল সম্বলিত একখানি [illegible] সম্পাদনা করেছেন। নির্বাচন সম্পর্কে [illegible] তথ্য পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। প[illegible] মেন্ট এবং বিভিন্ন রাজ্যে দলগত অ[illegible] বিস্তৃত পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। [illegible] সঙ্গে আছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রি[illegible] তালিকা। রাজনৈতিক দলগুলির উল্লে[illegible] পরিচয়। সেইসঙ্গে আছে রাজনৈ[illegible] নেতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বিভিন্ন রা[illegible]নৈতিক সংগঠন, সাংবাদিক এবং উৎ[illegible] ব্যক্তিদের কাছে বইটি সমাদৃত হবে।

তিনটি গল্প : দিলীপ সেনগুপ্ত। [illegible] জ্ঞান, ১১ ও টেমার লেন, কলকা[illegible] দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

তরুণ গল্পকার দিলীপ সেন[illegible] আলোচ্য সংকলনটি তিনটি ছোট [illegible] সমষ্টি। সংকলনটি যথার্থ অর্থে [illegible] 'বুকলেট'। সংকলিত গল্প তিনটির [illegible] 'জোনাকির শিশু', 'জানালা', 'অন্যরকৌ[illegible] তিনটি গল্পের মূল বিষয় সাম্প্রতিক [illegible]

সমাজ ও তাঁরাহিত অবস্থার মানুষের অন্তঃসম্ভাবনা ও বিষাদান্ত পরিণতি। সমকালকে মমতার স্পর্শ করেছেন লেখক, এবং শিল্পকবতার কালকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছেন শেষের রচনায়। তিনটি গল্পের মধ্যে সোনার বিন্দু সার্থকতম। এর বাল্য ও পরিণতির ব্যঞ্জনা, 'আমাশা' গল্পের প্রতীকী সমাপ্তি তরুণ লেখকের যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেয়। গদ্যের আড়ষ্টতা সরাতে পারলে লেখক ভবিষ্যতের শিল্প-ক্ষমতার পরিচয় দিতেন বলে মনে হয়।

আজিও তোমারই ঘরে, বাংলা দেশ—কবিতা গ্রন্থাগারের পক্ষে স্বদেশরঞ্জন দত্ত ও সামসুল হক কর্তৃক প্রচারিত। রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়াম (ব্লক : ২, রুম : ৬), কলকাতা-২৯। দাম : পঁচিশ পয়সা।

মধুসূদন দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রথীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, ফণিভূষণ আচার্য, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বাসুদেব দেব, পূর্ণেন্দু পত্রী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কবিরুল ইসলাম, শ্যামসুন্দর দে, সামসুল হক—এই কয়েকজন কবির কবিতার অংশ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই পুস্তিকায়।

সেই মন সেই মাহ (উপন্যাস)—রাম চক্রবর্তী। সজনী প্রেস, ৬৭।এ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা—৩৭। দাম : বারো টাকা।

বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে—কথাগুলো কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের। আলোচ্য উপন্যাসটি সেই অভিশপ্ত জীবনের বেদনার কাহিনী। বেদনা এবং অভিশাপ তিনটি জীবনের। তরুণ জীবনের প্রেম, প্রত্যাখ্যান এবং অন্তর্জ্বালার বিয়োগান্ত কাহিনী এই উপন্যাসের পটভূমি। শুরু, চিরাচরিত ত্রিমুখী সংঘর্ষ দিয়ে। সমতলভূমি থেকে কাহিনীর কথারম্ভ, মধ্য ও অন্ত আবর্তিত হয়েছে বাংলার বাইরে নিবিড় অরণ্যানীর আলোছায়াভরা রহস্যময় পরিবেশে। বহু বাধা বিপত্তির পর পরিমল চক্রবর্তী মাধবীকে একান্তভাবে পেয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ অরুণ রায় নানা ঘটনার মধ্যে ওদের দুজনার বন্ধু হয়ে দেখা দিল। কিন্তু পাহাড়ী-কন্যা দুরন্তযৌবনা জোয়া মাধবীর পরিমলের বিবাহিত জীবনে যেন বিষ নির্মিত হয়ে দেখা দিল। উদ্দাম যৌবনের শিকার হল পরিমল। স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে মিলমানে মিঃ হাইতে জোন এবং রাত্রে জাহাজ মিঃ হাইতে পরিণত হল। প্রেম প্রত্যাখ্যান এবং প্রেমের কামনার আগুনে জন্মজন্মান্তরে ছাই হয়ে গেল তিনটি জীবন। কল্পনাহীন অন্তরের ও বিকৃত কামনা নির্মম নিয়ামকের মতো টেনে নিয়ে

যায় মানুষকে আপন ধ্বংসের দিকে, তারই নৈতিক চিত্র দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন লেখক শ্রীচক্রবর্তী। কাহিনীর বুননে এবং নাটকীয় ঘটনার সমাবেশে কাহিনীকার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন শুরু থেকে শেষ অবধি।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান (কাহিনী)—ভগৎরাম তলওয়ার। চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, ৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা : ১২। দাম : চার টাকা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান নিয়ে এ পর্যন্ত বিস্তর বই বেরিয়েছে এবং আরো বেরুচ্ছে। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে বাস্তবতার চেয়ে কল্পনার আধিক্যই বেশি। আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনীকার শ্রীভগৎরাম তলওয়ার আজন্ম ব্রিটিশবিরোধী এবং বিপ্লবী। ভারত থেকে নেতাজীর অন্তর্ধানের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীও তিনি। নেতাজীর অন্তর্ধানের বিপদসঙ্কুল কৌতূহলোদ্দীপক অজানা অধ্যায় অন্তরঙ্গতার সঙ্গে উন্মোচন করেছেন কাহিনীকার শ্রীতলওয়ার। তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে মেলে ধরেছেন অন্তর্ধানের ('ইনসাইড স্টোরী') একেবারে ভেতরকার কাহিনী। বলা বাহুল্য বইখানি জনসমাদর লাভ করবে।

আবাজর্ভাব (গল্প সংকলন)—সত্যব্রত রায়। জ্ঞান নিকেতন, ১৮এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা : ১২। দাম : তিন টাকা।

ছোট গল্প সংকলন। হাসির গল্প সবগুলোই। টুকরো টুকরো ঘটনাকে ঘিরে কাহিনীগুলির মধ্যে হাস্যরস সঞ্চারের চেষ্টা লেখক করেছেন এবং পেয়েছেনও।

জিন্দের বন্দী (নাটক)—নবকুমার গড়াই। নবনাট্য নিষ্কাষণ, মজলপুর, হুগলী: দাম : চার টাকা।

'দি প্রিজনার অব জেন্ডা' ছায়াচিত্র কাহিনী একদিন দর্শকচিত্তে দারুণ উৎসাহ ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অ্যানথনী হোপের সেই জনপ্রিয় গ্রন্থের ছায়া নিয়ে নবীন নাট্যকার শ্রীনবকুমার গড়াই রচনা করেছেন 'জিন্দের বন্দী' নাটকটি। ছায়া নিলেও নাট্যশরীর গড়ে উঠেছে মৌলিক ঘটনা-সংস্থাপনে এবং চরিত্র সংলাপে। ফলে বিদেশী গন্ধ কোথাও না থাকায় এটি হয়ে উঠেছে একেবারে প্রায় মৌলিক নাটক। নাট্যামোদীদের কাছে এই নাটক সমাদর পাবে নিশ্চিত অবশ্যই।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কালি ও কলম (চৈত্র ১০৭৭)—সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৭, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : পঁচাত্তর পয়সা।

বাংলা দেশ ও সংস্কৃতির বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধটি সময়োপযোগী। ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সেই অবিস্মরণীয় উক্তি : 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়েও বেশি সত্য আমরা বাঙালী'—স্মরণ করা হয়েছে 'আমাদের কথা'য়। এ সংখ্যার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য লেখা সুরেশ চক্রবর্তীর 'আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ'। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন প্রভাতকুমার দত্ত, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, কালীকৃষ্ণ গুহ, চন্দন সেন, আবু করিম, রত্নেশ্বর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও আরো কয়েকজন।

ত্রিবর্ণ (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ '৭৮)—সম্পাদক : সেখ সদরউদ্দিন। ৪বি, মজাভান স্ট্রীট, কলকাতা : ১০। দাম : এক টাকা।

গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাটিকে 'সুস্বাগতম' বলে অভিনন্দিত করি। শুধু সাহিত্য নয় সমাজের প্রেমও এ পত্রিকার লক্ষ্য। পত্রিকাটিকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলবার জন্যে নানান বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। সূচনা-সংখ্যায় লিখেছেন : সর্বশ্রী নরেন্দ্র দেব, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, গোপাল ভৌমিক, শান্তশীল দাস, কল্পতরু নাগ, সেখ সদরউদ্দিন, হারাধন কর্মকার, কল্পনা সেন, ডাক্তারবাবু, শৈলেশ মুখোপাধ্যায়, হেমেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও মাসিক পত্রিকাটি মূলতঃ পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের জনকল্যাণে নিবেদিত তরুণ বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত। শহরগুলির এবং পল্লী-বাংলার সমস্যা এবং সংবাদ আশাকরি 'ত্রিবর্ণ'-দৃষ্টির দর্পণে প্রতিফলিত হবে।

আমার বাংলা (উদ্বোধনী সংখ্যা) : সম্পাদক : নবকুমার শীল ও অপূর্বকুমার সাহা। ৭৫।৫এ, বাগবাজার স্ট্রীট। কলকাতা-তিন। দাম পনের পয়সা।

বাংলা দেশে নতুন যুগের সূচনার পরিপ্রেক্ষিতে এপারের বাংলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকাটি। স্বাধীন বাংলা দেশ সম্পর্কে সংবাদ এবং কিছু তথ্য আছে পত্রিকাটিতে।

কণিকা (বসন্ত সংখ্যা) : সম্পাদক প্রশান্ত দাঁ ও বসন্ত রায়। ২৩।এ, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-৫। দাম : চল্লিশ পয়সা।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে : 'মানুষের অভিলাষ ও বাস্তবের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, ট্র্যাজেডির জন্ম সেখানেই।...অত্যন্ত আশার কথা, এই ট্র্যাজেডির ছোঁয়াচ, 'কণিকা'র লাগেনি।' পত্রিকাটির রচনামান উন্নত। 'একুশে ফেব্রুয়ারী' প্রসঙ্গে অভিমর্ষ জানুয়ারীর লেখাটি ভালো। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তপনকিরণ দাশ-

CENTRAL LIBRARY

গুপ্ত, প্রভাস শীল, মণি চক্রবর্তী, মানিকলাল দাস, দেবনাথ দাঁ, অসীম ঘোষ, প্রশান্ত দাঁ, অনন্ত রায়, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য।

আশীর্বাদ (চতুর্থ সংকলন)—সম্পাদক অসিতকুমার দে। পাবনা কলোনী, চাকদহ, নদীয়া। চল্লিশ পয়সা।

একালে আবার কোনো কাগজের নাম 'আশীর্বাদ' হয় নাকি? অনুমান হয়, সম্পাদক তরুণ বয়স্ক। সাহিত্যিক হবার উৎসাহে আছেন। প্রকাশিত লেখাগুলি কিছু দুর্বল নয়। কয়েকটি লেখা তো রীতিমতো উন্নত মানের। বিশেষ করে বীরেন্দ্র দত্তর প্রবন্ধটিতে (প্রেম নিসঙ্গতা শিল্প) অনেক কিছু ভাবনার খোরাক আছে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পুলকেশ দে সরকার, অমিতকুমার দে, অনিলচন্দ্র বসু ও আরো কয়েকজন। পত্রিকাটি ছাপা হয়েছে নিউজপ্রিন্টে।

বর্তমান—(নব বাংলা সংখ্যা) সম্পাদক : নরোত্তম বিশ্বাস। ৫৯ এল।২, নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড। কলকাতা-১১। দাম ৫০ পয়সা।

বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখেছেন পান্নালাল দাশগুপ্ত, অন্নদাশংকর রায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন গণেশ সেন, বিজয়লক্ষ্মী বড়ুয়া, শাহাদাত মহিউদ্দিন, আখতার হুসেন, মাহবুব তালুকদার, আবিদুর আজম আনসারী, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রণবেশ রায়, খান মোহাম্মদ ফারাবী, অমলেন্দু ঘোষ, চন্দন ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন।

প্রাপ্তি স্বীকার

স্বাক্ষর (নববর্ষ সংকলন '৭৮) সম্পাদক প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়। ৪৭ রামকমল সাহা লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া। পঁচিশ পয়সা। **বুলবুল** (ত্রৈমাসিক) সম্পাদক : এফ এম সিরাজুল ইসলাম। ২ ওয়ালিউল্লা লেন, কলকাতা-১৬। **সপ্তদীপা** (বিহারের ত্রৈমাসিক পত্রিকা) সম্পাদক : জীবনময় দত্ত ও রবীন দত্ত। এ।১২৬, কংকরবাগ কলোনী, পাটনা-১। **আমার সোনার বাংলা** (কবিতা সংকলন) সম্পাদক : কার্তিক ঘোষ ও সুভাষ চৌধুরী। ৭২।১ শিশির ভাদুড়ী সরণি, কলকাতা-৬। পঁচিশ পয়সা। **মুকুর** (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক : সুধীর ভৌমিক। রেল বাজার, শান্তিনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। এক টাকা। **বিস্তার** (জানুয়ারি-চৈত্র '৭৭) সম্পাদক : অজয় মিত্র ও নরেশ মালাকার ৩১ পোর্টার বাগান লেন, কলকাতা-৪। পঞ্চাশ পয়সা। **দীপিকা** (নববর্ষ '৭৮)—সম্পাদক : দীপঙ্কর গুহ ঠাকুর। বনমালী, হুগলী। পঁচিশ পয়সা। **সাইরেন**—সম্পাদক : গোপাল সাহা। বালুর ঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। এক টাকা।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস

সাহিত্য সমালোচনা যে কোন সাহিত্যের সম্পদ। বিদগ্ধ পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে এখন পর্যন্ত আমরা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একখানা পূর্ণাংগ ইতিহাস রচনা করতে পারিনি। অথচ বাংলা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য এবং বিস্তার অনুধাবন করলে এই বিভাগটির দৈন্য নজরে পড়বে। ইংরেজী-সাহিত্যের সমালোচনার ইতিহাস লিখে সেইন্টসবেরী এক বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। ইংরেজী সমালোচনা পাঠ করতে হলে সেইন্টসবেরীর বই অবশ্যই পঠনীয়। আমরা চাই সেইন্টসবেরীর মতন বাংলা দেশের কেউ একখানি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস লিখে এই রিক্ততা পূর্ণ করুন। গত একশ বছরে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহু গুণী সমালোচকের আবির্ভাব ঘটেছে। কেউ বঙ্কিমচন্দ্র, কেউ রবীন্দ্রনাথ এবং কেউবা শরৎচন্দ্র এবং হাল আমলের বাংলা-সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি এবং লেখকদের কাব্য-সাহিত্যাদির ব্যাপক আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য অনেক দিকপাল কবি এবং লেখক আছেন, যারা একসময়ে বিখ্যাত সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের নাম এই প্রসংগে বিশেষ স্মরণীয়। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের যথেষ্ট এবং বিচিত্র ধরনের সমালোচনা হয়েছে। কাজেই সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার যে প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম তা আশা করি স্বীকার্য। কিন্তু এই প্রসংগে আরো একটু বক্তব্য আছে, এবার তাই আলোচনা করব।

অন্যান্য কবি এবং লেখকদের কথা বাদ দিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্য নিয়ে এত ব্যাপক আলোচনা হয়েছে, যা একজন রসজ্ঞ পাঠকের পক্ষে সংগ্রহ করে পাঠ করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া অনেক সমালোচনা বিচ্ছিন্ন আকারে পাঠ করলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন সমালোচক কী-ভাবে এবং কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এদের সাহিত্য-কর্মকে বিচার করেছেন, তা বুঝতে হলে আলোচনার একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা (integrated discussion) বজায় রাখা দরকার। ধরা যাক পদাবলী সাহিত্যের কথা। পদাবলী সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন নিয়ে তথানিধি গবেষণা এবং আলোচনার অন্ত নেই। বিভিন্ন পদকর্তার রচনাকে সমালোচকরা নানাভাবে বিচার, বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করবার চেষ্টা করেছেন। লোক-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এটা সাহিত্যের নিয়ম।

ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করেন তারা নিশ্চয় জানেন যে একমাত্র শেকসপীয়রের নাটকগুলো নিয়ে যা আলোচনা হয়েছে, তা প্রায় ইতিহাস বিশেষ। ড্রাইডেন থেকে শুরু করে উইলসন নাইট পর্যন্ত সমালোচনার ধারাটি ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। এবং এই সমালোচনার ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে সতের শতকের সমালোচকদের সঙ্গে বিশ শতকের শেকসপীয়র সমালোচনার পার্থক্য কোথায়। কারণ সমালোচনার ধারা কখনও একরকম থাকে না। শেকসপীয়রের সমালোচনার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে টি এস এলিয়ট বলেছেন

> "Shakespeare criticism will always change as the world changes, ... The view of Shakespeare taken by different men at different times in different places forms an integral part of the development and change of European civilisation during the last 300 years." (A companion to Shakespearean studies).

ইংরেজি সাহিত্যে সিডনী থেকে শুরু করে অসংখ্য সমালোচক রয়েছেন। তার মধ্যে বিখ্যাত কবি কলরিজ, শেলী এবং ওয়ার্ডস ওয়ার্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেইন্টসবেরী তার হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ক্রিটিসিজম গ্রন্থে এইসব সমালোচকদের বিস্তৃত আলোচনা করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

বাংলা-সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য, মধুসূদনের কাব্য, নবীন সেনের কাব্য, মাইকেলের কাব্য, পদাবলী-সাহিত্য, পূর্ববংগ গীতিকা এবং লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে খ্যাতনামা সমালোচকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাছাড়া বাংলা ভাষাতত্ত্ব এবং দর্শন ও ধর্ম প্রসংগে অনেক আলোচনা হয়েছে। বংগ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা কিংবা বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলো বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনার ধারাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে তার ধারাবাহিকতা এবং একটা তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলা-সাহিত্যে সমালোচকের সংখ্যার অভাব নেই। বিভিন্ন সময়ের সাহিত্য এবং কাব্যকে সমালোচকরা কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং আজকের আধুনিক সমালোচনার সঙ্গে তাদের মূলগত পার্থক্য কোথায়, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাস একান্তভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন। এই ইতিহাস কেবলমাত্র সমালোচকদের ইতিহাস নয়, সমসাময়িক সময়ের এবং সমাজচিন্তার একটা ইতিহাস এই আলোচনায় বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে।

নিশীথ চক্রবর্তী

বইকুণ্ঠের খাতা

নজরুল জয়ন্তী আসছে

প্রত্যেক বছরই যা হয়, এবারো নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম হবে না। জ্যৈষ্ঠের গোড়ার দিকে বেরোবে দু-একটা বুকলেট, লিফলেট ও লিটল ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যা। তার সংবাদপত্রে ছাপা হবে, একটি ছোট্ট লেখাসহ ফুলের মালা গলায় দেওয়া বিদ্রোহী কবির একটি নির্বাক ছবি। হয়তো তাঁর সাম্প্রতিকতম স্বাস্থ্য ও চেহারার কিছুটা অস্ফুট আভাসও ফুটে উঠবে সেই ছবির মধ্যে।

বলুন, আর কিছু না?

হ্যাঁ, হবে আরো অনেক অনুষ্ঠান—মহাজাতি সদনে কিংবা অন্যত্র—বেতারে এবং অন্য বহু জায়গায়। বাংলাদেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা ভিড় করবেন তাঁর বাসায়। এবারেই জ্যৈষ্ঠের ভোরবেলা থেকেই চলবে নানাজনের যাতায়াত। কেউবা উপহার দেবেন লাল কিংবা সাদা ফুলের তোড়া। রজনী-গন্ধা কিংবা গোলাপের গুচ্ছ। কেউবা শুনিয়ে আসবেন সময়োপযোগী দু-একটা গান: 'কারার জানালায় নীরব কেন কবি?'

জল্পনা-কল্পনা

এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে উৎসবের প্রস্তুতি। অবশ্য সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে নয়, কাজ চলছে ভেতরে ভেতরে। পঁচিশে বৈশাখ না গেলে বোধহয় নজরুল-জয়ন্তী নিয়ে বাড়াবাড়ি চলে না। তবে যারা পুস্তিকা-টুস্তিকা বের করবেন, তাঁদের তো চুপ করে থাকার উপায় নেই।

সেদিন অনেক তরুণ কবি বললেন, এবার নজরুল-জয়ন্তী পালিত হবে, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশে—বাংলা দেশের জাগরণের আলোকে। বিদ্রোহী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল অবশ্য স্মরণীয়।

তিনি প্রস্তাব করেন, এবার যেন উৎসব অনুষ্ঠানে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত বা অন্য কোনো ভক্তিমূলক গানগুলি না-গাওয়া হয়। সঙ্গীত-বিচিত্রা, ভাষণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে সেই জ্বলন্ত রূপটাই ফুটিয়ে তোলা দরকার, যার মধ্যে থাকবে আত্মনিবেদন নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রত্যয়।

লক্ষ্য করেছি, কেউ তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি। কেননা, বাংলাদেশ এখন সবারই আলোচ্য বিষয়। লিটল ম্যাগাজিনের জন্য একজন তরুণ সম্পাদক বললেন, এবার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালন করা উচিত যুক্তভাবে। কেননা রবীন্দ্রনাথের গান এখন স্বাধীন পূর্ব বাংলার জাতীয় সঙ্গীত, তার মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে নজরুলের বিদ্রোহী রূপটাই আশ্চর্য রকমে উজ্জ্বল।

অর্থাৎ কেউ এখন নীরবে বসে নেই। দেশে যেন একটা জরুরী অবস্থা চলছে। কবিতার ফর্ম-টেকনিক নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য বিশেষ করছে না, ইজম-টিজম নিয়ে কুট তর্কটাও ভাটার দিকে। এখন সবাই আগ্রহ করেছেন রবীন্দ্র-নজরুলকে।

আনুষ্ঠানিক ব্যাপার

অন্য একদিনের কথা। আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশের সবচাইতে বড় যে মুক্তি সংগ্রাম, তার কথা। পূর্ববাংলার কবি-সাহিত্যিকরা অনেকে মারা গেছেন, যারা বাঁচছেন এবং তাদের রক্তপাতে তৈরী হচ্ছে একটি স্বাধীন দেশের বনিয়াদ। বলছিলাম, আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত বন্দুকবাজ শাসকদের কাছেও তা হলে নিরস্ত্র এই কবি-সাহিত্যিকরাও কম শক্তিশালী নন? অথচ এপারে বসে আমরা হা-হুতাশ করছি, আপশোস করছি, কিন্তু আগুনের মতো জ্বলে উঠতে পারছি না।

প্রসঙ্গক্রমে উঠেছিল নজরুলের নাম।

একজন বললেন, 'এবার নজরুল সম্পর্কে তিন-তিনটে লেখার অর্ডার পেয়েছি'—বলেই স্বগতোক্তি করলেন, কত্তো সব। ইয়ার্কি পেয়েছে? একটাও লিখবো না।

বললাম, রাগছেন কেন? না লিখলে আপনাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে কে?

—আরে না, না। লেখা না লেখার কথা হচ্ছে না। নজরুলকে নিয়ে ব্যবসা করতে চাইছে। এসব আমার ভালো লাগে না। 'নজরুল-স্মৃতি' 'নজরুল বিচিত্রা' বেরোচ্ছে, বেরোক—তাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই। একটা সিরিয়াস ব্যাপারকে হাল্কা করে দেওয়ার এরকম অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রত্যেকের সজাগ হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন করলাম, আপনার ক্ষোভের প্রত্যক্ষ কারণটা কি?

—ব্যবসা, ব্যবসা। রাগে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক, আমাদের দেশে সবই আনুষ্ঠানিক। পুজোর সময়ে পুজো-সাহিত্য, বৈশাখে রবীন্দ্র-সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠে নজরুল-সাহিত্য—যেন ঋতু-বৈচিত্র্যের মতো একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপার আর কি। বছরের অন্য সময়টায় আর কোনো সাড়াশব্দ, উচ্চবাচ্য নেই।

একটি প্রশ্ন ও কয়েকটি জিজ্ঞাসা—

তখন আমরা কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম কিছুটা বিব্রতও। কেননা, বস্তু-

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

ও

আরও বিচিত্র কাহিনী

পড়ে আনন্দ পাবেন

বেশী আমরা সবাই এই অভিযোগের সঙ্গে জড়িত। অনেকেই এ সম্বন্ধে কিছু লেখালেখি করি, বিদ্রোহী কবির স্বাস্থ্য দেখতে যাই, উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করি।

বললাম, তাহলে কি করা উচিত?

—কিছু কাজের কাজ করা উচিত। আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যাপারই আমার তেমন পছন্দ হয় না, আন্তরিক অনুসন্ধান দরকার।

একটু থেমে বললেন, একটা কমিটি গঠিত হয়েছিল বলে শুনেছি। খুশি হয়েছিলাম, সরকারী উদ্যোগে নজরুল-রচনাবলী বেরোবে বলে। কিন্তু দুঃসময়ের মতো এখন আর সে সবের কোনো সাড়া শব্দ নেই। এতদিনে কি নজরুল রচনাবলী বেরোনো উচিত ছিল না?

বললাম, বেসরকারী উদ্যোগে সেরকম একটা চেষ্টা চলছে। তবে বাধা অনেক।

ভদ্রলোক জোরের সঙ্গে বললেন, নজরুল সম্পর্কে কোনো বাধাই বাধা নয়। সরকার চেষ্টা করলে বের করতে পারতেন। প্রকাশকদের কাছ থেকে উপযুক্ত টাকা দিয়ে বইগুলির প্রকাশ-স্বত্ব কিনে নিতে পারতেন। তাছাড়া আবার অন্য বাধা কি?

বললাম, সেজন্যে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যায়।

পাল্টা প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক, করবে কে? যাঁরা এগারোই জ্যৈষ্ঠ গিয়ে কবিকে ফুলের মালা উপহার দেন, যারা সংবাদপত্রে আক্ষেপ করেন, তাঁদেরই উচিত এসব কাজ করা। শুনেছি, নজরুল-জয়ন্তী পালনের জন্য একটা কমিটিও আছে। তাঁরাই বা চুপ করে আছেন কেন?

বললাম, তাঁরা কি করতে পারেন?

—সরকারকে অনুরোধ করতে পারেন নজরুল রচনাবলী প্রকাশের জন্য—সস্তা দামে পরিবেশনের জন্য। অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব হবে না। তাছাড়া, নজরুলের বন্ধু-বান্ধবরা এখনো অনেকেই জীবিত আছেন। তাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খবরাখবর যেমন দিতে পারেন, তেমনি দিতে পারবেন বিভিন্ন রচনার প্রকাশকাল ও রচনাকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি। লক্ষ্য রাখবেন, নজরুল সম্পর্কে আমাদের ভাবাবেগ যত বেশী, আন্তরিকতা সেই পরিমাণেই কম।

একটু থেমে বললেন, নজরুল এখনো বেঁচে আছেন। অথচ তাঁর জীবনের বহু ঘটনা সম্পর্কে এখনই ভিন্ন মতের অবকাশ তৈরী হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা পর্যন্ত ক্রমাগত স্মৃতিভ্রষ্ট হচ্ছেন। নথিপত্র দেখে, পুরনো দিনের কাগজপত্র ঘেঁটে এখনই সেসব ভুল বের করা দরকার।

একটি উদ্যোগ—

সম্প্রতি 'আবদুল আজীজ আল-আমান স্থির করেছেন নজরুল-রচনাবলীর সবকটি খণ্ডই বের করবেন। এ ব্যাপারে তিনি দৃঢ় সংকল্প। বললেন, নজরুল রচনাবলী বের করা আমার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

আমি আগেই শুনেছিলাম, রচনাবলী বের করার জন্য আজীজ সাহেব নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করছেন, অপ্রকাশিত লেখার অনুসন্ধান করছেন এবং বহু লেখা পত্র পেয়েছেন।

তাঁর কাছেই শুনলাম, এপর্যন্ত তিন খণ্ড রচনাবলী প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এখনো অনেক বাকি। দু'খণ্ড ছাপা হয়ে যাবার পর, তৃতীয় খণ্ড বেরোতে পারছিল না কয়েকটি বইয়ের প্রকাশস্বত্ব সম্পর্কিত গোলমালে।

জিজ্ঞেস করলাম, বইয়ের প্রকাশকাল অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ডই কি ধারাবাহিক ভাবে ছাপা সম্ভব হচ্ছে? না, তাও হচ্ছে না?

সেভাবে প্রকাশের ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, নানারকমের অসুবিধে আছে। যখন যে-বই প্রকাশের অনুমতি পাচ্ছি এবং যখন যে-সব অপ্রকাশিত লেখার খোঁজ পাচ্ছি, তখনই তা সংগ্রহ করে ছাপতে দিতে হচ্ছে। সেজন্যেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তীকালে, নতুন মুদ্রণের সময় ওভাবে সাজাতে হবে।

আপনার কি মনে হয়, সম্পূর্ণ নজরুল রচনাবলী আপনি বের করতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই। আমি অন্তত সেরকম আশা রাখি।

অগ্নিবীণা, সঞ্চিতার কবিতাগুলি কি রচনাবলীতে ছাপতে পেরেছেন?

—পারিনি। এখনো পারমিশন পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস, আজ হোক কাল হোক পারমিশন আমি পাবোই। কেননা, নজরুল সম্পর্কে পাঠকের যেমন একটা আগ্রহ এবং মমতা আছে, প্রকাশকদেরও তেমনি দুর্বলতা আছে। কেবল আইনগত বাধার জন্য রচনাবলী প্রকাশ বন্ধ হয়ে থাকবে বলে আমার মনে হয় না।

রচনাবলী সম্পাদনা করতে গিয়ে কোনো নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন?

—বহু নতুন, চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর তথ্য পেয়েছি। তবে নজরুল রচনাবলী সম্পাদনা করতে গিয়ে নয়, আমার আসল কাজটা ছিল নজরুল-জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান। এবং সেই কাজ করতে গিয়েই এমন সব লেখার সন্ধান পেতে থাকি, যা ছিল এতদিন আমার অগোচরে। সেইসব লেখা সংগ্রহ করার ইচ্ছে থেকেই সূত্রপাত হলো নজরুল রচনাবলী প্রকাশের।

প্রেরণা ও উৎসাহ—

আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল কিছুটা এলোমেলো ভাবে। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের একটি দোকানে চা খেতে খেতে। স্বভাবতই সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি।

জিজ্ঞেস করলাম নজরুল সম্পর্কে ভাবনা শুরু করেন কবে থেকে?

যেন সেই সুদূর বাল্যকালের স্মৃতিই মনে পড়লো তাঁর। আজীজ সাহেব বললেন, স্কুল-জীবন থেকে দাউদপুর হাইস্কুলের ছাত্র। ক্লাস নাইনে পড়ি। সে সময়ে আমাদের স্কুলে হয়েছিল বিতর্ক সভার আয়োজন। বিষয় ছিল নজরুলের কবিতা। আমি আলোচনার জন্যে, তখনই নজরুল সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করি।

তারপর?

তার পরের ঘটনা আরো চমকপ্রদ। একদিন ট্রেনে আসতে আসতে এক অপরি-

বদরুদ্দিন উমর-এর

সাম্প্রদায়িকতা

লেখক অতীতের পূর্ব-পাকিস্তান এবং বর্তমানের স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত চিন্তাবিদ। বর্তমানের বাংলার মুক্তিযুদ্ধের পিছনে স্বচ্ছ, দূর দৃষ্টিসম্পন্ন এই চিন্তাবিদের অবদান অনস্বীকার্য। সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে পাক ভারতীয় উপ-মহাদেশের অগণিত বিশ্বাসপ্রবণ, সৎ এবং দরিদ্র মানুষ শ্রেণীস্বার্থ উদ্ধারের কাজে কি জঘন্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে সেকথা উপলব্ধি করাবার উদ্দেশ্যেই রচিত। দাম : পাঁচ টাকা

মিহির সেন-এর

লেনিনের মা

মহান লেনিনের জন্মবার্ষিকীতে প্রকাশিত লেনিনের মায়ের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও সংগ্রামময় কাহিনী। দাম : চার টাকা

নবপত্র প্রকাশন । ৫১ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা-৯

ছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল নজরুল সম্পর্কে। তিনিই আলোচনা করছিলেন। আমি শুনছিলাম কান পেতে। ভদ্রলোক বলছিলেন, নজরুল ফুরিয়ে যাচ্ছেন, এবং তাঁর সমকালীন বন্ধু-বান্ধবরাও বিদায় নিচ্ছেন পৃথিবী থেকে। অথচ তাঁর সম্পর্কে কেউ কিছু জানছেন না। এজনো দুঃখই প্রকাশ করছিলেন। এরপর আর দেরী করলে হয়তো নজরুল-জীবনের অনেক ঘটনাই ইতিহাস মুছে যাবে।

একটু থেমে বললেন, আমার মনে সেই কথাটিই গেঁথে যায়। প্রার্থমিকভাবে তখন থেকেই ছুটোছুটি করছি। সেটা বোধহয় ১৯৫২ সালের কথা।

বললাম, তাঁর নাম কি? যাঁর কাছ থেকে আপনি নজরুল-জীবনী লেখায় উৎসাহ পেয়েছিলেন? পরে কখনো তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?

—না তাঁর সঙ্গে আর কখনো যোগাযোগ হয়নি। তাঁকে আমি জানি না, চিনি না। মনে হয়, কোনো কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আমার 'নজরুল পরিক্রমা'র ভূমিকায় আমি সেকথা লিখেছি। তাঁর কথা-ই আমি সৌরীন্দ্রপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মুজফফর আহমদ, কাজী আবদুল ওদুদ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছে যাই। তা ছাড়া 'হিজ মাস্টার্স ভয়েসের' হেমচন্দ্র সোমের কাছেও গিয়েছিলাম আমি।

কে কি বললেন?

—মুজফফর আহমদ সাহেবের কাছে গিয়ে নতুন ইন্সপিরেশান পাই। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, যা করছ করে যাও, সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের গানগুলিও সংগ্রহ করো। চেষ্টা করলে হয়তো অন্যান্য তথ্যের হদিস পাবে, কিন্তু গানগুলোর খোঁজ পাবে না। তিনি প্রায় চার হাজার গান লিখেছিলেন।

পরে অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে বললেন আমি নজরুলের একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখছি, বিজ্ঞানভিত্তিক হবে। তাতে দেবো তাঁর জীবনের ক্রনোলজিক্যাল বিবরণ। নজরুলের রচনার উৎস এবং সৃজন মুহূর্তকে বোঝার জন্যেও সে বইটি হবে খুবই প্রয়োজনীয়। নজরুল-যুগকে বোঝার জন্যও তা সহায়ক হবে। কল্লোল যুগের বোহেমিয়ান জীবনধারা নজরুলের মধ্যেও ছিল।

সজনীকান্ত দাস, মোহিতলালের কাছে গিয়েছিলেন?

—না। যাইনি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ভেতর থেকে তাঁদের মতামতকে জেনে নিয়েছি। আর এখন তো কোনো উপায়ই নেই।

রচনা সংগ্রহে বাধা ও সাহায্য

আবদুল আজীজ আল-আমান দমবার লোক নন। কাজ করে যাচ্ছেন। হয়তো শীঘ্রই তিনি আরেকটি খণ্ড প্রকাশ করতে পারবেন।

বললাম, রচনা সংগ্রহ করতে গিয়ে কোথাও কোনো বাধা পেয়েছেন?

—সে আর বলবার নয়। একবার এক ভদ্রলোক তো বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আমি একজনের কথা জানি, যার কাছে নজরুলের হাজারখানেক কবিতা আছে, যার তিন-চারটের বেশী আমি সংগ্রহ করতে পারিনি—ঐ বিপদের ভয়ে।

তা ছাড়া?

'মাতাজয়া' বইটি নজরুল দিয়েছিলেন এক ভদ্রমহিলাকে। তাঁর কাছ থেকে সেটা আনা এক দুর্ঘট ব্যাপার। ভদ্রমহিলা বইটাকে ধরে রেখেছেন যখের ধনের মতো। বহু বুঝিয়ে কিছু লেখা নকল করে এনেছি।

আজীজ সাহেব বললেন, 'আত্মশক্তি' কাগজে নজরুলের কয়েকটা উল্লেখযোগ্য লেখা বেরিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও সেসব লেখা সংগ্রহ করতে পারিনি। তার মধ্যে একটি লেখা হলো, 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ'। আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

সাহায্য করেছেন কে কে?

—বিরূপতার চেয়ে আন্তরিকতাই আমি পেয়েছি বেশী। মন্মথ রায়, ব্যাঙ্কের সেফটি ভোল্ট থেকে আমাকে একটি অপ্রকাশিত চিঠি বের করে দিয়েছেন। নজরুলের 'চল চল চল' কবিতার পাণ্ডুলিপির কপিটিও আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তাছাড়া 'নজরুল হোম'-এর শান্তি মজুমদার ও 'মোহন লাইব্রেরীর' জীবনকুমার বসু অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের প্রকাশিত বইগুলি পুনর্মুদ্রণের। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পেয়েছি কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি। —রূপদর্শী

মিডিয়াম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড	কিলোসাইকলস্
১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১	২১৪৬০; ১৫০৯৫ ১১৭০০ ও ৯৬৪০
মিডিয়াম-ওয়েভ	
১৯০ মীটার	১৫৮০

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাহাড়তলীর যে দিকটায় প্রফুল্লদাল দম্পতির কুটীর তার একটা অংশ সমুদ্রের উপরে ঝুঁকে পড়েছে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়লে গভীর জলে পড়তে হবে। জয়ন্তী দেখল অপরাহ্নবেলায় প্রফুল্লদাল সেখানে একখানা পাথরের উপরে বসে একমনে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়ালো, বুঝতে পারলো না তিনি দেখছেন না ধ্যান করছেন। সময় বিশেষে ও দুই যে এক কি করে জানবে জয়ন্তী।

সমুদ্র তার অপরিচিত নয় কিন্তু তাতে এমন মুগ্ধভাবে দেখবার কি আছে ভেবে পায় না সে। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ফিরছে তীরের দিকে, সমুদ্রে দলে দলে নুলিয়ার নৌকা ফিরছে, পাখীর বিন্দুগুলো ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমে নৌকার রেখাগুলো। পশ্চিম দিগন্ত সূর্যাস্তের আভাময়, কাজেই সূক্ষ্মরেখা ক্ষুদ্র বিন্দু কিছুই চোখ এড়ায় না। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের জলতল মৃদুভাবে কম্পিত হচ্ছে। এসব দৃশ্য কতদিন সে দেখেছে। ব্যাধের গৃহিনী হলেও সমুদ্রের কাছে তার ঋণ কম নয়, যেদিন শিকার না জোটে সমুদ্র থেকে মাছ ধরে কাজ চালাতে হয়। তার পক্ষে অবশ্য নুলিয়ার মতো নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়া সম্ভব নয়, প্রয়োজনও হয় না। ঢেউয়ের ঝাপটায় মাছ এনে ফেলে ডাঙায়, জলের টানে নেমে যাওয়ার আগেই চটপট ধরে ফেললেই হল। কাজটায় সে খুব পটু।

কি দেখছ মা?

জয়ন্তী চমকে উঠে ভাবে কেমন করে জানলেন প্রভুজী যে সে এসেছে। তাই সে পাল্টে শুধালো, কেমন করে জানলেন বাবা যে আমি এসেছি, পা টিপে টিপে এসেছিলাম যাতে আপনি না জানতে পারেন।

মা মা পায়ের শব্দ পাইনি।

তবে কি করে জানলেন?

অনুভবে। যাক সে, বসো, বলে একখণ্ড পাথর দেখিয়ে দিলেন।

না বাবা আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, দরকার আছে।

আমাকে দিয়ে কি দরকার বাবা?

তুমি বলেছিলে বাসুদেব দেহত্যাগ করেছেন, তাকে আর দেখতে পাবে না।

দেহত্যাগ করলে আর কি করে দেখতে পাওয়া যায়।

আমি তো এতক্ষণ তাঁকেই দেখছিলাম।

অবিশ্বাসে বিস্ময়ে ব্যগ্রভাবে শুধায়, কোথায় তিনি?

এই তো তোমার সম্মুখে।

কিছু বুঝতে পারে না জয়ন্তী, বলে, কোথায়?

ঐ তো সম্মুখে।

ও তো সমুদ্র।

বাসুদেব নয় কেন?

তবু কিছু বুঝতে পারে না, বলে, বাবা আমি অবোধ।

প্রফুল্লদাল বলতে আরম্ভ করে। সনীল সমুদ্রে তাঁর দেহের নীল আভা দেখো, সমুদ্রের উদার বিস্তারে তাঁর বিশাল বক্ষস্থল, ঐ দেখো তাঁর বক্ষ মৃদু নিশ্বাসের তালে কম্পিত, আর সূর্যাস্তের দীপ্তি তাঁর বক্ষের কৌস্তভ মণি। মা, প্রাচীনেরা কল্পনা করেছিলেন যে সৃষ্টির আদিতে নারায়ণ সমুদ্রে শয়ান ছিলেন, আজও তিনি তেমনি শয়ান রয়েছেন, কেবল দেখবার অপেক্ষা।

সকলের কি তেমন দেখবার চোখ থাকে বাবা।

গোড়ায় কারোরই থাকে না। আমারই কি ছাই চোখ সম্পূর্ণ খুলেছে?

কি করলে সে চোখ পাওয়া যায়?

আর যে করেই হোক চোখ বুঁজে থেকে নয়। চোখ মেলে চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন দৃষ্টি খুলে যায়।

কথাগুলো যতই অবিশ্বাস্য হোক বক্তা বিশ্বাসভাজন জয়ন্তীর কাছে, ভাবে চেষ্টা করলে একদিন বুঝতে পারবে।

এমন সময় জগন্নাথ এসে উপস্থিত হয়।

কি জগন্নাথ, তার পরে খবর কি?

খবর কিছু নেই বাবা, মা-ঠাকরুণের বদলী জিনিস দিতে এসেছিলাম ভাবলাম একবার বাবাকে প্রণাম করে যাই।

বেশ বেশ বসো।

আপনার সামনে কি বসতে পারি?

প্রফুল্লদাল হেসে বললেন, তবে না হয় দাঁড়িয়ে থেকেই উত্তর দাও। নগরের দিকে তো যাওয়া আসা করো, রাজবাড়ীর খবর কি?

রাজা নেই তার রাজবাড়ী!

সে কি কথা। মহারাজা উগ্রসেন তো রয়েছেন।

তা আছেন বটে। তিনি অবশ্য নামে রাজা, কিন্তু সবাই জানে আসল রাজা ছিলেন বাবা বাসুদেব।

কে এমন কাজ করলো হে?

কি জানি বাবা। শুনলাম একটা ব্যাধ ধরা পড়েছে, তারই নাকি কাজ। আরও শুনলাম আসামীকে লোকটাকে শূলে দেওয়া হবে।

কেউ লক্ষ্য করলো না যে জগন্নাথের কথা শুনবামাত্র জয়ন্তী মাটিতে বসে পড়লো।

বলো কি হে। একেবারে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে?

আজ্ঞে তা জানিনে তবে বিচার হয়ে নিশ্চয় সে লোকটার শূলদণ্ড হবে।

তা বটে আমারই ভুল হয়েছিল, আগে বিচার পরে প্রমাণ এই হ'ল এখনকার রীতি। তা লোকটা কেন এমন গর্হিত কাজ করলো কিছু জানা গিয়েছে?

সকলের অজ্ঞাতসারে জয়ন্তী উঠে গিয়ে কুটীরে প্রবেশ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

রাতের বেলায় প্রফুল্লদালের পায়ের উপর পড়ে মাথা কুটতে লাগলো জয়ন্তী।

প্রভু বাঁচাও, বাঁচাও সেই হতভাগাকে যার হাতে নিহত হয়েছেন কৃষ্ণ বাসুদেব। তার চেয়ে বেশি হতভাগা আর একজন আছে যে সেই হত্যাকারীকে রক্ষা করতে অনুরোধ করছে—জানি নরকেও আমার স্থান হবে না, প্রভু, তবু না অনুরোধ করে পারছি না, সে আমার স্বামী।

এইভাবে কথাগুলো বলতে বলতে মাথা কুটে চলল জয়ন্তী, না আছে কথার বিরাম, না আছে মাথা কুটবার বিরাম, না আছে বিরাম চোখের জলের ধারার।

তার অসংলগ্ন কাতরোক্তি থেকে প্রফুল্লদাল ও তার স্ত্রী বুঝলো যে জয়ন্তীর স্বামী জরার শর নিক্ষেপের ফলে নিহত হয়েছেন বাসুদেব। না জেনেই শরনিক্ষেপ করেছিল একথা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য। কেননা, বাসুদেবকে হত্যা করার তার স্বার্থ ছিল না, যদিচ বাসুদেবকে সে চিনতো না। জয়ন্তী যে ঘটনাস্থলে এসে স্বামীকে বিদায় দিয়েছিল, স্বামী যে ক্রোধের বশে তাকে গলা টিপে নিহত মনে করে চলে গিয়েছে—তার এক প্রমাণ প্রফুল্লদালের মতপ্রায় জয়ন্তীর সাক্ষাৎলাভ, আর এক প্রমাণ জয়ন্তীর কণ্ঠে পাঁচ আঙুলের নীলার কান্তির মতো ছাপ। দিনের বেলায় ঐ ছাপ অনেকবার চোখে পড়েছিল দম্পতির মধ্যে মেয়েদের চোখে এসব চিহ্ন প্রায়ই এড়ায় না, যদিচ দেখেনি প্রফুল্লদালের চোখ। মেয়েদের চোখ কাছের খুঁটিনাটি দেখে পুরুষের চোখ দূরের বড় বড় বস্তু। মেয়েদের চোখ অণুবীক্ষণ, পুরুষের চোখ দূরবীক্ষণ।

দম্পতির মা অনেকবার ভেবেছিল জয়ন্তীকে শুধাবে ঐ নীলার কণ্ঠি এলো কোথা থেকে, সুযোগ করে উঠতে পারেনি। যাক এখন রহস্যের সমাধান হল।

CENTRAL LIBRARY

প্রভুদয়াল মন্দের মতো বসে আছে, অনেকক্ষণ তার পা ভিজে হিম হয়ে গিয়েছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় তার অবস্থা। স্বীকারোক্তির প্রথম অভিঘাতে একবার তার মনে হয়েছিল হতভাগিনীকে কুটীর থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারপরে মনে হয়েছিল মেয়েটার কি দোষ—মৃত্যু যাচ্‌না করে তার তো প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন বাঁচাবে মহাপাতকীকে, আর বাঁচাবার উপায়টাই বা কি, ক্ষমতাই বা তার কোথায়?

এমন সময় কাশ্যপের মা বলে উঠল, দেখো তুমি যে ইচ্ছা করলেই বাঁচাতে পারো।

কি বলছ অর্দিতি, আমি বাঁচাবো।

সঙ্কটকালে পত্নীর আসল নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

কি বলছ অর্দিতি রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে আমি বাঁচাবো কেমন করে?

কেন কঠিনটা কি! রাজা তোমাকে সমাদর করেন, তুমি তার কাছে কোনকালে কিছু প্রার্থনা করোনি, আজ এই লোকটার প্রাণভিক্ষা চাও না কেন।

প্রভুদয়াল ভাবলো এ না হলে আর স্ত্রীবুদ্ধি—কঠিন কাজে সরল পন্থা আবিষ্কার।

বলল, প্রার্থনা করতে গেলে ছোট হয়ে পড়তে হয়। স্বয়ং ভগবান যখন প্রার্থনা নিয়ে বলিরাজের সভায় গিয়েছিলেন তখন তাকে বামনরূপে যেতে হয়েছিল।

অর্দিতি হটবার পাত্রী নয়, বলল, স্বয়ং ভগবান যদি বামনরূপ ধরে থাকেন তাহলে তুমিও না হয় ধরলে, বিশেষ তাতে দুজনের প্রাণরক্ষা হয়।

দুজন আবার কোথায় দেখলে কাশ্যপের মা?

তুমি কি ভাবছ স্বামী মরলে ঐ মেয়েটা বেঁচে থাকবে। তুমি তো কতবার বুঝিয়ে বলেছ ভগবানকে কেউ মারতে পারে না, নিজের কার্য উদ্ধারের জন্য এসেছিলেন, কার্য উদ্ধার করে চলে গিয়েছেন, ঐ লোকটা নিমিত্তমাত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন যেমন নিমিত্তমাত্র হয়েছিলেন এখানে ঐ লোকটাও তেমনি নয় কি!

এ তর্কের উত্তর খুঁজে পায় না প্রভুদয়াল, কারণ এ সমস্ত যুক্তি তার নিজেরই, বুঝিয়েছে পত্নীকে আর জয়ন্তীকে। সে চুপ করে থাকে, তবু মনস্থির করতে পারে না।

কুটীরের মধ্যে তিনটি প্রাণীর নিশ্বাসের সঙ্গে তাল রক্ষা করে বাইরে সমুদ্র চলছে উত্তাল গর্জন। যে সমুদ্র এই কিছুক্ষণ আগে শান্ত ছিল এখন সে উন্মাদ। দুই ঢেউয়ের উত্থান-পতনের বিরামের মধ্যে শ্রুত হয় নিশাচর পাখীর কর্কশ তীক্ষ্ণ রব। ও যেন দুটো শব্দের পার্শ্বকাটাকে সরু সুতো দিয়ে গ্রথিত করে তোলবার চেষ্টা। শব্দের তোরণ ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠে শিখর রচনা করে হঠাৎ ধসে পড়ে যায়—অন্ধকারে ছুটে চলে আসে সর্পিল ফেনগুলো উপকূল ছাড়িয়ে অনেক ভিতরে।

জয়ন্তী পা ছাড়েনি, সে এমনি নিস্তব্ধ যে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হতে পারতো যদি না মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠতো। প্রভুদয়ালের মনে আত্মমর্যাদা ও অনুকম্পার লড়াই চলছে, কে জিতবে কে হারবে। আর অর্দিতির মনে দয়ার অটল দণ্ডকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে কৌতূহলের একটি সূক্ষ্ম স্বর্ণাভ বল্লরী। শূলদণ্ডে মৃত্যু না জানি মরণের সে কি অভিনব পন্থা।

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রভুদয়াল। বললো, অর্দিতি, নিজের মর্যাদাকে আর বড় করে তুলবো না, কাল সকালে রাজার কাছে গিয়ে জয়ার প্রাণভিক্ষা করবো।

এতক্ষণ নৈরাশ্যের তরঙ্গে তাড়িত হওয়া সত্ত্বেও, হয়তো বা সেইজন্যেই চৈতন্য লোপ পায়নি জয়ন্তীর, এবারে আশার উপকূল চোখে পড়তেই লুপ্তজ্ঞান হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো।

দ্বারকাপুরীর দক্ষিণ শ্মশান আজ লোকে লোকারণ্য। সমুদ্র আর পুরীর প্রাচীরের মধ্যে প্রকাণ্ড মাঠ, সমুদ্রের দিকে বালুর চর, উপরের দিকে শুকনো ডাঙা, কাছে কোথাও গাছপালা নেই। এখানেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের সাজা হয়ে থাকে, শূলে, মুণ্ডচ্ছেদ, হস্তচ্ছেদ যার প্রতি যেমন আদেশ, নিকটেই সমুদ্রের ধারে মৃতদেহ দাহের ব্যবস্থা, সেটা সরকারী খরচে হয়ে থাকে এই যা লাভ।

অনেককাল মৃত্যুদণ্ড কারো হয়নি। বাসুদেবের প্রভাবে রাজ্য সুশাসিত ছিল, তস্করাদি স্বধর্মে নিরস্ত ছিল। আর যারা শুনে তাদের অনেকে মারা পড়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, বাকিদের শখ সাময়িকভাবে মিটে গিয়েছিল সেই মহাহবে মানুষ খুন করা বীরত্বে। লোকে একরকম ভুলেই গিয়েছিল মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা। দক্ষিণ শ্মশানটা স্মৃতিযোগে মাত্র মনে ছিল। আজ এতকাল পরে সেখানে শূলদণ্ডের ব্যবস্থা হবে শুনে কাতারে কাতারে লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। দিবা প্রথম প্রহরের ঘণ্টা বাজলে অপরাধীকে শূলে চড়ানো হবে গতকাল ঢোল বাজিয়ে নগরে ঘোষণা করা হয়েছিল। কৌতূহলে আর উৎসাহে সে রাতে লোকের ঘুম হল না, ভোর হওয়ার আগেই তারা শ্মশানের দিকে রওনা হল। যারা অত্যুৎসাহী অর্থাৎ ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে চায় রাতের বেলাতেই তারা এসে শূলের কাছাকাছি জায়গা দখল করে নিয়েছিল। যারা পরে এসেছে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যেতে চায়, দুইদলে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়, মারামারি শুরু হয়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে, আরে বাপু খুনোখুনিটা কালকের জন্য তুলে রেখে দাও, আজকে একটাই যথেষ্ট।

অপর একজন উত্তর দেয় যতক্ষণ শূলে চড়ানো না হচ্ছে ততক্ষণ চলুক না। আমার আবার লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটবার শব্দ শুনতে বড় ভালো লাগে।

তৃতীয় ব্যক্তি বলে পরের মাথা ফাটলে ভালোই শোনার কথা।

আগের লোকটা বলে, নেহাৎ মিথ্যা বলোনি, নিজের মাথা ফাটলে শোনবার মতো মনের অবস্থা থাকে না।

কেন আমরা আছি কি করতে।

এমন সময় ঐ এসেছে, ঐ এসেছে, রব ওঠে।

আরে কে এসেছে?

তোমার সম্বন্ধী।

সে তো তুমি অনেকক্ষণ হাজির আছ।

ঐ যে নিয়ে আসছে, ঐ ঐ দেখো।

সকলে ঘাড় উঁচু করে, কিছু চোখে পড়ে না তখন আবার সামনে এগোবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ওদিকে রাজার শান্ত্রী ও কোটালের দল হঠ যাও, হঠ যাও রব করে লাঠি ঘোরাতে থাকে।

মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁক, সেখানে মনুষ্যপ্রমাণ উঁচু একটা লোহার শূল প্রোথিত। একজন জল্লাদ এরণ্ড তেলে সেটাকে মার্জিত করছে। কাছেই গোটা কতক কুকুর শেষ অঙ্কের আশায় লেজ নাড়তে নাড়তে সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে সমর্থন করছে।

ঐ নুলোগুলো মরতে এসেছে কেন বলে ওঠে একজন।

আর একজন তার অনুসরণ করে বলে শুধু কি নুলো, ঐ দেখ কানা, খোঁড়া কুঁজো, কুষ্ঠী বাপরে কত? হাজার হাজার মনে হচ্ছে।

কেন ওদের কি দেখবার শখ হয় না।

কিন্তু অন্ধগুলো কেন? ওরা দেখবে কি করে?

দেখতে না পায় শুনবে, ঐ যে কে যেন বলেছিল মাথা ফাটবার শব্দ শুনতে ভালো লাগে।

কিন্তু এ আপদগুলো এলো কি করে?

কেন নৌকা দেখতে পাচ্ছ না।

তাইতো বটে অনেক নৌকা জড়ো হয়েছে। একজন ছড়া কেটে বলে উঠল,

শখ দেখে যে মরে যাই
নৌকা নিয়ে এলো তাই।

আর একজন তার অনুবৃত্তি করলো

কানায় দেখে কালায় শোনে
বোবায় শেখে নথ গোনে।

অনেকে বলে ওঠে দেখো একবার মজা! চলতে পারে না তবু লাঠি ভর করে খুঁড়িয়ে গড়িয়ে আসা চাই।

আর কুষ্ঠেগুলোর রকম দেখো, হাতে গায়ে পায়ে কাপড় জড়ানো, বেটারা লাঠি ধরেছে কি করে?

প্রাণের দায়ে ঐ লাঠিই ওদের ভরসা।

তাহোক, ওদিকে যেয়ো না, ওদের বাতাস লাগলেও রোগে ধরবে।

আরে আমরা কি যাচ্ছি, ওরাই যে এসেছে। এমনিতরো উক্তি প্রত্যুক্তি চলতে থাকে।

বাস্তবিক লোকগুলোর কথা মিথ্যা নয়। শ্মশানের দক্ষিণ দিকে চরের উপরে সমুদ্রের ধারে অনেকটা জায়গা হাজার দুই কানা-খোঁড়া নুলো পঙ্গু কুঁজো ও কুষ্ঠরোগাক্রান্তে ভরে গিয়েছে। সকলেরই হাতে বিকলাঙ্গের শেষ নির্ভর লাঠি। সমুদ্রে ছোট ছোট নৌকা ডোঙা নারিকেলের গাছ মরবার কাষ্ঠখণ্ড তাকে নৌকা না বলাই উচিত। এ সমস্তর সংখ্যাও কম নয়, দেখ

খুঁজতে পারা যায় তারা অধিকাংশ নৌকায় এসেছে। জনতার অন্য অংশে কোলাহল কেবল এরা নীরব ও স্থির। জনতা যথাসম্ভব এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে অবস্থান করছে। অনেকে মাঝে মাঝে এদের ব্যঙ্গ করছে, ধিক্কার দিচ্ছে, কিন্তু এরা সেসব শুনেও শুনছে না, সকলেই শূলটার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

একদিকে মেয়েদের দঙ্গল বড় কম হয়নি। তাদের উৎসাহটাই সবচেয়ে বেশি। একঘেয়ে জীবনের মধ্যে নূতন স্বাদ এনেছে শূলে চড়ানোর ব্যাপারটা। সকাল বেলায় উঠে ঘরের কাজ সমাধা করবার জন্যে তারা অপেক্ষা করেনি, দরকারও ছিল না, যেহেতু স্বামীপুত্ররাও চলে এসেছে, কোলের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েরা এসে জুটেছে। একটা ছোট ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করলো, মা ঐ লোহার ডান্ডাটা কি হবে?

কি হবে কিরে বোকা ছেলে—ঐটার উপরে লোকটাকে বসাবে।

ছেলে আবদার ধরলো, ওটার উপরে আমি বসবো মা।

যেমন দস্যি তুই হয়েছিস একদিন হয়তো সত্যি বসতে হবে।

না, আমি আজই বসবো।

তার কথা শুনে পার্শ্ববর্তিনীরা হেসে উঠল। তাদের একজন বলল, আহা মাসি বসিয়ে দাও না কেন, ছেলে আবদার ধরেছে।

ছেলের মা বলল, ওকে নয় ওর বাপকে পেলে বসিয়ে দিতাম।

ভালই হতো মাসি, আর একটা ঘর করবার সুযোগ পেতে।

তুই যেমন পেয়েছিস।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

কাজেকাজেই মাসি, সব সময়ে তো বড় কথা বলবার সুযোগ হয় না।

ছেলেরা মায়ের কাছে আবদার ধরেছে। কেউ বলছে মা ছোলাভাজা কিনে দাও। কেউ বলছে, মা রামদানার লাড্ডু খাবো।

ফেরিওয়ালারা নানারকম খাদ্য কেনাবেচা করছে, মাটির খেলনা থেকে মুখরোচক খাদ্য কিছুই বাদ পড়েনি।

কোন ফেরিওয়ালা বলছে নাও খোকা, আচ্ছা রামদানার লাড্ডু, কেউ বলছে এই রথটা কিনে নাও খোকা—এই দেখো রথের উপরে কৃষ্ণ আর অর্জুন।

জনসাধারণ বাসুদেবের মৃত্যুতে দুঃখিত হয়েছিল, কারণ বাসুদেব সুখে দুঃখে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন, ছেলেদের খেলাধুলায় যোগ দিতেন, কখনো তাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতেন। তারা যখন শুনলো যে বাসুদেব মারা গিয়েছেন সকলে সত্যি দুঃখিত হল আর তাদের রাগ হল হত্যাকারীর উপরে। কিন্তু এখন তারা সেই হত্যাকারীর প্রতি একপ্রকার কৃতজ্ঞতা অনুভব করছিল, আজ তার জন্যেই এমন জমায়েৎ সম্ভব হল, কলকালে এমন মেলা বসেনি। ফেরিওয়ালারা সুযোগ বুঝে দু' পয়সা রোজগার করে নিচ্ছে, বাসুদেব তো আর ফিরবেন না, তবে দুটো পয়সা কামাই করবার সুযোগ হারিয়ে কি লাভ।

এমন সময়ে রাজপুরীর দিক থেকে নাকাড়ার শব্দ উঠল, অমনি সমস্ত জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল, জয় জগন্নাথ! ঐ আসছে, ঐ আসছে।

এবারে সত্য সত্যই আসছে। জনবৃত্তি সমস্ত শান্ত্রীর পাহারাধীন জরা সত্যই আসছে। কিন্তু হেঁটে আসবার কষ্ট সহ্য করতে হয়নি তাকে। গাধার উপরে উল্টোভাবে সে আসীন, মাথা তার ন্যাড়া করে দিয়ে ঘোল ঢেলে দেওয়া হয়েছে, ঘোলের ধারা এখনো সর্বাঙ্গে চিহ্নিত। হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধা, পা দুটো খোলা, নইলে গাধায় চাপাবার অধ্যায়টা বাদ দিতে হয়। আর তার আগে পিছে বাজছে রাজার নাকাড়া। মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে গাধায় চাপানোর অধ্যায়টা শূলদণ্ডের আসামীর পক্ষে গায়ে চিমটি কাটবার মতো অতি তুচ্ছ ব্যাপার হলেও দর্শকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মল্লযুদ্ধের ভূমিকা যেমন বাগ্‌যুদ্ধ—এও অনেকটা তেমনি। শূলে চড়ালেই রাজ-বিচারের সীমা ফুরালো,—তাই আগে যতটা সম্ভব লোকটাকে নাকেহাল করে নেওয়া যায়। কায়িক দণ্ডের ভূমিকা মানসিক লাঞ্ছনা। মনুষ্যত্ববোধকে একেবারে গুঁড়িয়ে নিষ্পিষ্ট করে না দিতে পারলে শান্তি পায় না মানুষের ন্যায়বুদ্ধি।

জনতা শৃঙ্খলা ভেঙে ছুটে চলল সেইদিকে, বেপরোয়া লাঠি চালাতে লাগলো শান্ত্রীরা, মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো অনেকের তবু কারো হুঁস নেই। ফাটামাথা জোড়া দিলেই চলবে কিন্তু এমন উৎসব তো রোজ হয় না। সামান্য মাথার জন্য পরোয়া করলে চলবে কেন এইরকম ভাব জনতার।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায়

এই উৎসবের মধ্যে এক পক্ষকাল

৬ মে থেকে ২০ মে

সুলভ মূল্যে—শতকরা ১২২ টাকা বাদ দিয়ে—রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতী প্রকাশিত ও প্রচারিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোনো পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুবিধা পাবেন।

॥ পুস্তকবিক্রেতাদের প্রতি নিবেদন ॥

নির্দিষ্ট সময়ে পুস্তকবিক্রেতাগণ যাতে ক্রেতাসাধারণকে পুস্তক সরবরাহ করতে পারেন সেজন্য নির্ধারিত অতিরিক্ত কমিশনে ৩ মে থেকে তাঁরা এই কয়টি কেন্দ্রে পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা ১২

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা ৭

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯

জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

বিশ্বভারতী শিল্পসদন
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

ছাত্রদের পুস্তকালয়
২৪ বিজয়চাঁদ রোড
বর্ধমান

ভারতী ভবন
গোবিন্দ মিত্র রোড
পাটনা ৪

ন্যাশনাল র‍্যাগার্স
২৬ মেন রোড
জামসেদপুর ১

বিশ্বভারতী

অবশেষে ভিড় ঠেলাঠেলে জনতার পাশে এসে দাঁড়ালো শূলদণ্ডটার কাছে, তখন আরক্ষপাল জনতাকে গলা ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল, বধহস্ত অবস্থায় সে পড়ে গেল। তাকে বললেই নাহতো, কিন্তু রাজ-বিচারের মর্যাদা রক্ষার পক্ষে ঘোষকটির সেটা কাম্য নয়। সে পড়ে যেতেই দুইজন শান্ত্রী এসে তার পা দুখানা আচ্ছা করে বেঁধে দিল। তখন সে অসহায়ভাবে পড়ে রইলো। এদিকে পিঠ হাল্কা হবে যেতেই গাধাটা সাধর্মীর নিতান্ত অসহায় বোধ করলো, এখন সে লেজ খাড়া করে চীৎকার অনুপাত শব্দে স্বরে আপত্তি জানাতে জানাতে মরীয়া হয়ে জনতা ভেদ করে দৌড় মারলো। সামনে থেকে সরে যাও কামড়ে দেবে, পিছন থেকে সরে যাও চাঁট মারবে সব বলতে বলতে ছেলের দল ছুটলো পিছনে।

এদিকে জনতার চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরা মরে আর কি!

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে উঠল, আরে লোকটা যে মরে যাবে তখন শূলে চাপাবে কাকে।

আর একজন উত্তর করলো, মরে যাবে, দেহটা নিয়ে তো যাবে না।

পূর্বোক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি বলল, আরে মরা মানুষকে শূলে চাপিয়ে কি লাভ! আসল মজাটাই তো বাদ পড়ে যাবে।

পাছে আসল মজাটা বাদ পড়ে যায়, পাছে মৃত্যুযন্ত্রণা ও মুমূর্ষুর কাতরোক্তি বাদ পড়ে যায়, শুধু দেহটা শূলেবিদ্ধ করে

কি লাভ, মনুষ্যজীবনে দেহটা তো নগণ্য, আত্মাই তো মুখ্য, প্রভৃতি নিগূঢ় বিষয় চিন্তা করে জনতা সরে গেল, জরা হাঁফ ফেলবার অবকাশ পেলো। যারা বলে জনতা কাণ্ডজ্ঞানহীন তারা মূর্খ।

তখন জনতার মধ্য থেকে নানারকম প্রশ্ন উঠতে লাগলো, কইগো কখন হবে।

আর তো দেরী করতে পারি না, আজ আবার একাদশীর পারণ, খিদের নাড়ি জ্বলে গেল।

তবে এসেছিলে কেন মরতে।

আঃ ম'লো যা, মরতে না মরা দেখতে। তুই মর, তোর চোদ্দপুরুষ মরু।

আহা বাছা ছেলেটা যে কেঁদে সারা হল, মাই দাও না মুখে।

অতটুকু ছেলে আনতে গেলে কেন?

কার কাছে রেখে আসি বাবা। তাছাড়া ভাবলাম ছেলেটাই বা বাদ পড়ে কেন, দেখে নিক শরীরে পুণ্য হবে।

ও কি বুঝবে?

বুঝবে বাবা বুঝবে, এ সংসারে কেউ অবুঝমান নয়। ছেলেটার বাপকে যখন ঝাঁটাপেটা করি তা দেখে ও হেসে ওঠে।

বাপরে বাপ, এ ছেলে বেঁচে থাকলে না জানি কি হবে।

কি আর হবে মাকে ঝাঁটাপেটা করবে।

না বাপু আর অপেক্ষা করতে পারি না। আজ সকালে আমার গোয়ালা বন্ধুর আসবার কথা সুদটা মিটিয়ে দেবার জন্য, আমি বাপু যাই।

যাও, সুদের আশায় এই আসনটা খোয়াবে।

অনেকেই যাই যাই করছে কিন্তু কেউ নড়ছে না। দেরী হয় সকলেরই অগোচর ইচ্ছা, কারণ একবার হয়ে গেলেই তো মজা ফুরালো, কাজেই আশার সুতো যতটা দীর্ঘ করা যায়।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একমাত্র চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সম্ভব। চিৎ হয়ে পড়ে রইলো জরা। সুসংলগ্নভাবে চিন্তা করবার শক্তি তার অনেকক্ষণ লোপ পেয়েছিল—অথচ চিন্তা না করে থাকাও কঠিন, তাই নানারকম চিন্তার উড়ো খড়কুটো তার মনের মধ্যে প্রবেশ করছিল, ভালো করে তাদের দেখে নেবার আগেই পরবর্তী অনুপ্রবেশকারীদের পথ ছেড়ে দিয়ে তারা পালিয়ে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার উপায় নেই, হঠাৎ চোখে পড়লো অনন্ত আকাশে দুটো শকুন উড়ছে, তারাও জনতার মতো প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল তবে তাদের প্রত্যাশা কিছু মাংস। জরা এত বুঝলো না, মৃত্যু যে অত্যাসন্ন একথা বুঝেও মানুষ বুঝতে চায় না। সে ভাবলো আহা হাতে তীরধনুক থাকলে এক তীরে দুটোকে নামাতে পারতো। মনে পড়লো একবার জরতীর সঙ্গে বাজি রেখে এক তীরে তিনটে টিয়ে পাখীকে গেঁথে ফেলেছিল, টিয়ে কত ছোট, শকুন কত বড়, ও নিশ্চয় পারে। এই প্রথম জরতীর কথা মনে পড়লো। না, আগেও একবার পড়েছিল, যখন তার মাথার ঘোল ঢেলে দেওয়া হল তার একটা ধারা গড়িয়ে চুকেছিল তার মুখে। সেই ঈষৎ লবণাক্ত ঘোলের স্বাদ মনে পড়িয়ে ছিল তার গৃহস্থ-জীবনের ও গৃহিণীর স্বাদ। ঘোলটা তার বড় প্রিয় খাদ্য। জরতী সেই জন্যে মাঝে মাঝেই ঘোল তৈরি করতো, সে লুব্ধনেত্রে বসে বসে সেই বিচিত্র প্রক্রিয়া দেখতো, ভাবতো, এই তো যথেষ্ট হয়েছে অকারণে আবার খানিকটা মন্থন করা কেন। এবারে দিলেই হয় এক চুমুকে জামবাটি শূন্য করে ফেলে। জরতী বলতো এত তাড়া করলে কি হয়, দেখছ না এখনো সবটুকু ননী ওঠেনি।

সে বলতো রাখো তোমার ননী, না হয় ওটুকুও খেয়ে ফেলি।

তুমি বড় লোভী।

আর তুমি! পাথরের থালা বোঝাই তেঁতুলের ঝোল যে পার করে দাও।

তুমি খাওনা বলেই আমাকে খেতে হয়, নইলে নষ্ট হবে।

নাও অনেক হয়েছে, এখন দাও।

যারা ঘোল ঢালছিল তাদের একজন বলে উঠল, লোকটার তেষ্টা পেয়েছে আর একটু ঘোল দাও।

একজন বাটি করে ঘোল দিচ্ছিল। পূর্বোক্তজন বলল, না, না, মাথায় ঢেলে দাও, গড়িয়ে মুখে ঢুকুক।

তাই দেওয়া হল। কিন্তু এবারে আর জরা খেলো না, হাত দিয়ে মুছে ফেলল, তখনো খোলা ছিল।

হঠাৎ জনতার কোলাহল কানে যেতেই, এতক্ষণ জনতার উপস্থিতি সম্বন্ধে তার সম্বিৎ ছিল না, সে ভাবলো এরা সব কারা, এখানে এত সকালে কেন। কোনরকমে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো চারদিকে চক্রাকারে জন-প্রাচীর। এবারে তাদের কথা ও কথার অর্থ বোধ হতে লাগলো জরার।

একজন বলছে আর মিছে দেরী কেন, দাও চাপিয়ে, ওদিকে যে হাটের বেলা বয়ে গেল।

তাই শুনে অপর একজন বলল, আরে আজ কি আর হাট বসবে, সবাই যে এখানে

তাহলে এখানেই হাট বসালে হতো, ফিরবার আর তাড়া থাকতো না।

প্রত্যুত্তরে অপর একজন বলল, যা বলেছ ভাই একসঙ্গে রথ দেখা কলাবেচা দুই-ই হতো।

রথ দেখা বলে রথ দেখা! মায় রথের চূড়ায় হনুমানকে অবধি দেখা হতো।

এই কথায় সকলের মনে পড়ে গেল যে আসল কাজটাই বাকি, এখনো চাপানো হয়নি লোকটাকে শূলে।

তখন একজন বালক এতক্ষণ যে বয়স্কদের উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনে আনবান হয়ে উঠেছে, লাঠির খোঁচা মেরে জরাকে বলল, এই বুড়ো ওটা দেখেছিস, এই বলে লাঠি দিয়ে ইসারায় শূলটা দেখিয়ে দিল।

এবারে প্রথম জরার চোখে পড়লো শূলটা, তাই তো ঐ তীক্ষ্ণাগ্র লৌহদণ্ডটা কেন?

সে কম্পান্বিতস্বরে বলে উঠল ওটা কেন?

একজন বলল, কেন এখনি বুঝতে পারবে।

একজন রসিক বলল, বুঝতে পারবে নিশ্চয় কিন্তু বোঝাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

পূর্বোক্ত রসিক ব্যক্তি নিজ রসিকতার প্রতিক্রিয়ায় আহ্লাদিত হয়ে তান দিয়ে গান ধরলো,

'ডুব দিয়ে রসের সাগরে
কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে গো।'

তারপরে আবার শূনিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করলো, শূল তিন রকম ভাই, পিত্তশূল, অম্লশূল আর লৌহশূল। আগের দুটোর ঠেলায় এখনো বেঁচে আছি, এ-বেটা লৌহশূলে চেপে ডুবে মরবে।

বেটার কচ্ছপের প্রাণ, সহজে মরবে মনে হয় না।

এবারে একজনের হুঁশ হল, শুধোলো—বেটা কি করেছে?

দেখা গেল যে, অধিকাংশেই জানে না কি তার অপরাধ। তার আবশ্যকও ছিল না, কেননা অবশ্যই একটা অপরাধ আছে, নইলে রাজা দণ্ড দেবেন কেন?

নাও ভাই এখন ওসব কচকচি রাখো, যে-আশায় এসেছি, সেটা এখন হয়ে যাক।

জনতার কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি থেকে জরা বুঝতে পারলো এত আয়োজন তারই জন্যে, ঐ শূলে হবে তাকে চাপানো। সমস্ত দেহ শিউরে উঠল, কিন্তু এখনি মনে হল খটাস তাকে অভয় দিয়ে বলে-ছিল, জরা ভাই এখন এদের সঙ্গে মারা-মারি করে লাভ নেই, এরা অনেক। এখন ওদের সঙ্গে যাও। যথাকালে আমাদের দলবল নিয়ে তোমাকে উদ্ধার করবো, নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু কোথায় খটাস; কোথায় বা তার দলবল। সে চারদিকে তাকিয়ে কোথাও দেখতে পায় না খটাসকে।

জরা ফিরে এসে খটাসের কাছে বসতে সে বলে উঠল, যাক দেরী হয়নি, এবারে বলো আমাদের কর্তব্য বলছি, এমন সময়ে ঘরের দেয়ালে কয়েকটি ছায়া পড়লো, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার পিছনে কায়া-ধারীরা প্রবেশ করলো, নগরপাল ও চার-জন শান্ত্রী।

জরা তাদের প্রবেশের কারণ বুঝতে পারলো না, তবে খটাসের না বুঝবার কারণ ছিল না, অনেকবার সে রাজপুরুষ-গণ কর্তৃক বন্দী হয়েছে, যদিচ প্রত্যেক-বারেই মুক্তিলাভ করেছে। সে জরার কানে কানে বলল, তোমাকে নিতে এসেছে, এখন বাধা দেওয়া সম্ভব নয়, ওরা পাঁচজন, আর সশস্ত্র, এখন যাও, যথাকালে তোমাকে ছাড়িয়ে আনবো, কোন ভয় নেই।

রাজপুরুষগণ দিহস্ত জরাকে বন্দী করে নিয়ে চলে গেল, খটাস চলল তার দলবলের সন্ধানে।

বাসুদেবের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে রাজা উগ্রসেন প্রধান নগরপালকে ডেকে জানিয়ে জরুরী আদেশ দিলেন, যেমন করেই হোক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। নগর-পাল বাসুদেবের মৃতদেহের কাছে গিয়ে দেখল যে, পায়ে একটি তীর বিদ্ধ। তীর

দেখে বুঝলো অবশ্যই একজন তীরন্দাজের কাজ। নগরপালের বুদ্ধি সূক্ষ্ম, চিরকালই এ-বস্তুটা সূক্ষ্ম হয় রাজপুরুষদের। তারপরে ন্যায়শাস্ত্রের অপরিহার্য নিয়মের সূত্র অনুসরণ করে বুঝলো তীরন্দাজ একজন শিকারী। তখন সে অন্য রাজপুরুষগণের সঙ্গে পরামর্শ করে খটাসের আস্তানায় হানা দিল, কারণ সমাজ-বিরোধীদের মজলিসের স্থান বলে জানা ছিল। সেখানে গিয়ে খটাসকে দেখল, তাকে চিনতো বলেই বুঝলো সে শিকারী নয়, অতএব অন্য লোকটা নিশ্চয় শিকারী। তাকে বন্দী করে বুদ্ধির গৌরবে গোঁফে তা দিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকালো, তাদের চোখে দেখতে পেলো সার্থক গৌরবের দীপ্তি। তখন সকলে মিলে জরাকে বেঁধে নিয়ে প্রস্থান করলো। ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে কী না সম্ভব।

রাজসভায় অপরাধীর বিচার হয়ে থাকে এমন একটা কথা জানতো জরা, তবে রাজদণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। এবারে হাড়ে হাড়ে জেনে বুঝতে পারলো রাজদণ্ড কাল্পনিক কোন বস্তু নয় একেবারে নীরেট সত্য, আর তার প্রক্রিয়াটা পীড়াদায়কভাবে কায়িক ব্যাপার। রাজদণ্ডের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার অন্তে সে যখন নেতিয়ে পড়েছে, তখন দাণ্ডীদের একজন লাথি মেরে ভূপাতিত করে বলল,- থাক বেটা এখন শুয়ে, আর রাত্রির মধ্যে যদি না মরিস, তবে কাল সকালে শূলে চড়ে স্বর্গে যাওয়ার সুখ অনুভব করতে পারবি। বিচারটা অপরাধী ধরা পড়বার সময়েই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এত কিছুক্ষণ করে দেখবার মতো তার মনের অবস্থা ছিল না। গায়ের ব্যথায় ও মনের অসাড়তায় শীঘ্রই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

জরা স্বপ্ন দেখছে, সে-স্বপ্ন এমন জীবন্ত যে, জেগে উঠেও তার সন্দেহ ঘোচে না—আবো তা স্বপ্ন কিনা কিম্বা সত্যই একটা আবির্ভাব ঘটে গিয়েছে। সে যেন একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকেছে। অন্ধকার এমন ঘন যে, নিজেকে অবধি দেখতে পাওয়া যায় না, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে টের পাওয়া যায় অস্তিত্ব। সে চলেছে তো চলেইছে, কোথায়, কেন জানে না। হঠাৎ চমকে উঠল, এ কোন্ মৃদু শব্দ, খটাসের হাসি নাকি! না গুহার গা থেকে একখানা পাথরের টুকরো গড়াতে গড়াতে পড়লো। এ-অন্ধকারের আর শেষ নেই। একি সত্যই কোনো গুহা, না কোন অজগরের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বোধ করি তাই হবে। তখন সে দেহ-মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল, বাসুদেব, বাসুদেব দয়া করো, রক্ষা করো, আমি পাতকী মহাপাতকী। আবার সেই মৃদু শব্দ। না এবারে খটাসের হাসি না হয়ে যায় না। না এবারেও গড়ায়মান পাথরের টুকরো।

হঠাৎ অনুভব করলো তার সমস্ত গা ঘামে ভিজে গিয়েছে, যেন এখনি স্নান করে উঠেছে, সমস্ত শরীর হিম, মনে হল তার শেষমুহূর্ত সমাসন্ন। তখন ভাবলো যদি মরতেই হয়, তার আগে একবার মুক্ত প্রাণভরে বাসুদেবকে ডেকে নেবে। বাসুদেব বাসুদেব বলে চীৎকার করতে করতে তার গলা ভেঙে গেল, কই কেউ তো সাড়া দিল না। জরতীর কাছে শুনেছিল বাসুদেব দয়াময় ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন না, তবে শুধু মুখে ডাকলে হবে না, মনে আন্তরিকতা থাকা চাই।

কোথায় তার মনে আন্তরিকতা। তখন সে বাসুদেব বলে ডাকতে ডাকতে পাথরের দেয়ালে মাথা কুটতে লাগলো। দেয়াল পাথরের বলেই টলল না। দরদর ধারা গড়াতে লাগল কপালে, হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝলো রক্ত, ঘাম এত ঘন হয় না।

রক্তস্রাবে শ্রান্ত হয়ে যখন বসে পড়লো, তখন সে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছে। সম্পূর্ণ হতাশা মৃত্যুর চেয়েও নীরেট। তার প্রতায় হল এ-অন্ধকার গুহারও নয়, অজগরের উদরেরও নয়, এ সেই জগৎ যেখানকার চন্দ্র এবং সূর্যে চিরন্তন পূর্ণগ্রহণ। এবারে কেঁদে উঠল, এ-কান্নায় সত্যই আন্তরিকতা ছিল, পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় নয়, নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার ইচ্ছায় এ-কান্না। পাপ জীবনের অংশ, নৈরাশ্য জীবনের অস্বীকৃতি। ঐ অবস্থাটা পাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

হঠাৎ সে দেখতে পেলো দূরে, অতি-দূরে একটি আলোর বিন্দু জোনাকির চেয়ে বড় নয়; বিন্দুটা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে—ছুটে আসছে তার দিকে, যত কাছে আসছে তত আয়তনে বড়, প্রভায় উজ্জ্বলতর হচ্ছে। এবারে সেই আলোকময় গোলক একটি উজ্জ্বল চক্রের আকার ধারণ করেছে। মনের মধ্যে চমক দিয়ে গেল—এই কি সেই গল্পে শ্রুত সুদর্শন-চক্র। তবে বুঝি তাকে বধ করবার উদ্দেশ্যেই তার আবির্ভাব। এক মুহূর্ত আগে যে সে সহস্রবার মৃত্যু কামনা করেছিল, ভয়ে বিহ্বল হল তার মন। তখনি মনে হল চক্র যদি এসে থাকে, তবে নিশ্চয় সঙ্গে আছেন চক্রধারী। ভয়ের থেকে উছলে উঠল আনন্দের বিদ্যুৎ। মেঘ বিদ্যুৎ অবিচ্ছেদ্য ভয়-আনন্দও কি তাই নয়!

এ কে? সম্মুখে তার এ কে? কে এই দিব্য দেহধারী পুরুষ? কেমন করে চিনবে জরা, এমন তো কখনো চোখে দেখেনি। তবে বুঝলো, যাঁর প্রভায় অন্ধকার জ্বলে উঠেছে, মুক্তিদান তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। পা জড়িয়ে ধরবার আশায় সে নত হল, নত হতেই চোখে পড়লো, বাম চরণে একটি রক্তের রেখা। মূর্ছিত হয়ে পড়বার আগে বুঝলো তবে তো বাসুদেবই এসেছেন বটে। কিন্তু কেন? দণ্ডদান, না মুক্তিদান কি তাঁর অভিপ্রায়। যিনি এমন উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল সমুজ্জ্বল, যিনি এমন নির্মল প্রসন্ন সুন্দর তিনি কি মুক্তি না দিয়ে দণ্ড দিতে পারেন! জরা মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই শান্ত্রী কারাকক্ষের দরজা খুলে গুঁতো মেরে জাগিয়ে দিল জরাকে। জরার তখনো স্বপ্নের ঘোর কাটেনি, সে বলে উঠল, দয়াময় তবে সত্যই এসেছ।

হাপরে বেটা যে এক রাত্রির মধ্যে মস্ত ধার্মিক হয়ে উঠল।

এই বলে মারলো আর এক গুঁতো।

জরা বুঝলো, এ-ব্যক্তি আর যেই হোক দয়াময়া তার বিশেষ গুণ নয়।

চল বেটা।

জরা শুধালো, কোথায়?

বিকট মুখভঙ্গী করে শান্ত্রী বলে উঠল, আবার কোথায়! বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাচ্ছি, নে এগো।

জরা ভাবলো বাসুদেবের তো বৈকুণ্ঠেই বাস।

তারপরে পর পর অল্পক্ষণের মধ্যে তার যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ঘটলো, তা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির সূচক মনে হল না। নাপিত এসে মাথা মুড়িয়ে দিল, দুজনে ঠেলে বসিয়ে দিল উল্টো করে গাধায়, একজন এক হাঁড়ি ঘোল ঢেলে দিল মাথার উপরে। তারপরে জনতার ধিক্কারধ্বনির মধ্যে এসে পৌঁছল দক্ষিণ শ্মশানে। এখানে অসহায়ভাবে শুয়ে শুয়ে স্মরণ করছে বাসুদেবকে নয়, খটাসকে। বাসুদেবের আবির্ভাব মায়া হলেও খটাসের আবির্ভাব কখনো মিথ্যা হবে না। খটাসের সেই বিদায়-আশ্বাস এখানে তার কানে বাজছে। রক্ষা করবে তো ভাই জিজ্ঞাসার উত্তরে খটাস বলেছিল, জরা, পুণ্যাত্মারা পাপীদের এড়িয়ে চলে বলেই তারা পরস্পরকে রক্ষা করে, পাপের জোরে পাপীরা ঘনিষ্ঠ, সে-জোরের বাঁধন বড় শক্ত।

জরা যখন এইসব চিন্তা করছিল, জনতা যখন বিলম্ব দেখে অধীর হয়ে উঠছিল, জরতী তখন জনতার একান্তে বসে কাঁদছিল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার সামর্থ্য তার হয়নি, সাহসেরও অভাব হয়েছিল। কি দেখতে কি দেখবে। জরার দণ্ড দেখতে আসেনি সে, প্রভুনরনাজ ক্ষমাপত্র নিয়ে উপস্থিত হবেন, জরা মুক্তি পাবে, তখন তাকে নিয়ে ফিরে যাবে এই আশায় এসেছিল। কিন্তু কোথায় এই ভিড়ের মধ্যে প্রভুনরনাজ, রাজা কি সত্যই তাঁর প্রার্থনা পূরণ করবেন, অন্যথা জরার দণ্ড অবধারিত — আশা-আকাঙ্ক্ষার, আকাঙ্ক্ষার ভাগটাই বেশি, সে কাঁদছিল।

একজন প্রবীণা তাকে শুধালো, বৌ কাঁদছ কেন?

কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। প্রবীণা আবার শুধালো, তোমার কি হয়েছে?

এবারে জরতী বলল, মা, আমি বড় দুঃখী।

এ-সংসারে দুঃখী কে নয় বৌ, তাব জন্যে কাঁদতে গেলে সারাজীবন কেঁদেই কাটাতে হয়।

কোথায় দুঃখ মা! সবাই তো হাসছে! সবাই তো গোলমাল করছে।

এ সমস্তই কামার রকমফের বৌ, দেখোনি জল হিমে জমে কঠিন হয়, এ হলোও কামার রূপান্তর। আমার দুঃখের কথা যদি জানতে—

কিন্তু তার দুঃখের ইতিহাস বলা আর হয়ে উঠল না, গম্ভীর রবে দামামা বেজে উঠল। জনতা হৈ-চৈ করে উঠল, ঐ যে নগরপাল আসছে, এবারে হবে।

সবাই মুখ্য নগরপাল শূলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ঘন ঘন দামামা বেজে সকলকে আশ্বাস দিচ্ছে, এবারে অপরাধীকে শূলে চড়ানো হবে। আশার উপকূল দেখতে পেয়ে জনতা শান্ত ভাব ধারণ করেছে।

একটা লম্বা লোকের মাথা আর সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছিল, যারা দেখতে পাচ্ছিল না, তাদের সবিশেষ জ্ঞাত করছিল সে। কাছেই উপবিষ্ট ছিল জয়ন্তী। সব কথা সে শুনতে পাচ্ছিল।

লম্বা লোকটা বলে যাচ্ছে—এবারে চারজন শান্ত্রী মিলে অপরাধীর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিচ্ছে। বাঁধন খোলা শেষ হয়ে গিয়েছে। শান্ত্রীরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে লোকটাকে। আহা, কিবা চেহারা লোকটার। মাথা ন্যাড়া, ঘোল ঢালায় মাঝে মাঝে সাদা হয়ে গিয়েছে। দেখো দেখো লোকটা একেবারে ভয়ডর নেই, আবার টুল টুল করে তাকানো হচ্ছে। নে নে ভালো করে সব দেখে নে, এখনি জন্মের দেখা শেষ হয়ে যাবে।

জয়ন্তী শুনছে আর কাঁদছে।

লম্বা লোকটা বলছে, এবারে সকলে মিলে লোকটাকে নিয়ে যাচ্ছে শূলের দিকে এখনি চাপিয়ে দেবে। তারপরে পার্শ্ববর্তীদের আশ্বাস দিয়ে বলে, তখন তোমরা সবাই দেখতে পাবে।

এবারে সবাই মিলে লোকটাকে উঁচুতে তুলছে।

আরও কিছু সে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার কথা শেষ হতে পারলো না।

জনতার দক্ষিণ দিকে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য অনুভূত হল, কি হচ্ছে, কি হচ্ছে, চুপ করো বাপু, শেষমুহূর্তে রসভঙ্গ করো না ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দ উঠতে থাকলো ভিড়ের মধ্যে থেকে। যারা ভিড়ের পিছনের দিকে দাঁড়িয়েছিল, তারা দেখতে পেলো হঠাৎ বিকলাঙ্গের দল উঠে দাঁড়িয়েছে; দেখতে পেলো বিকলাঙ্গগণ, কানা-খোঁড়া, নুব্জ-কুব্জ প্রভৃতির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। সকলে দেখে অবাক হয়ে গেল তাদের সকলেরই সুস্থ সবল শরীর, মাংসপেশী থেকে স্বাস্থ্যের বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। কোথায় খুলে পড়েছে তাদের গায়ের মাথার পটি, আর যে লাঠিগুলো ভর করে তারা এসেছিল, সেগুলো অপূর্ব দক্ষতার ঘূর্ণিত হচ্ছে তাদের হাতে। তারা সকলে শিক্ষিত সেনানীর মতো ব্যূহবদ্ধভাবে ঘূর্ণমান লাঠি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সকলের আগে আগে ঘটোৎকচ। তখন জনতার বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে পালা পালা ভাব, ভয়ের সঙ্গে ভগ্নী, যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো, সকলের আগে পালালো শান্ত্রী ও নগরপাল। মুহূর্ত মধ্যে দক্ষিণ শ্মশানের মস্ত মাঠ জনশূন্য হয়ে গেল। তখন ঘটোৎকচ পরিচালিত জনব্যূহ বিমুক্ত জয়ন্তকে কাঁধে তুলে নিয়ে জয়ধ্বনি করে উঠল। জয়ধ্বনি আসন্নমাত্র ঘটোৎকচের কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, চলো সকলে নগরের দিকে, আজ রাজবাড়ী লুটবো। তারপরে সেই কর্ণভেদী কাঠ চেরা অট্টহাসি যা শুনলে পথিকের রক্ত জমে স্থির হয়ে যায়। ঘটোৎকচের আদেশ পেয়ে জনতা আবার জয়ধ্বনি করে উঠল আর তারপরেই বাঁধভাঙা স্রোতের মতো সবাই ছুটলো নগরের দিকে।

ঠিক সেই সময়ে রাজার ক্ষমাপত্র হাতে নিয়ে প্রভুদয়াল এসে উপস্থিত হয়ে দেখল শ্মশান জনশূন্য, কেবল একপাশে একটি নারী মূর্ছিত। কাছে গিয়ে দেখল জয়ন্তী। তার চেতনা সম্পাদন করে তাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। প্রকৃত অবস্থার কিছুই সে জানতে পেলো না, জয়ন্তী জানতে পেলো, তবে এইমাত্র জানলো যে, জয়া জীবিত আছে।

সভাসদহীন বিরাট সভাগৃহে একটি দীপশিখা নিক্ষিপ্ত একটি মাত্র ছায়াসঙ্গী রাজা উগ্রসেন সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। সারাদিন এইভাবেই অতিবাহিত হয়েছে। মাঝে মাঝে আর্ত নগরের তুমুল হলহলার উচ্ছ্বাস এসে, সমুদ্রতরঙ্গের অভিঘাত যেমন তীরভূমিতে পৌঁছয়, তেমনিভাবে আঘাত করছে বৃদ্ধ রাজার কর্ণে। করবার কিছু নেই। রাজার হাত-পা অনুচের পরিজন, তারা সকলেই পলাতক, নয় লুণ্ঠেরাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লুণ্ঠনে নিযুক্ত। অরক্ষিত নগরের অসহায় নৃপতি।

যদুবংশের বীরগণ সকলেই মৃত। এখন যারা আছে সকলেই বেতনভুক। সারা মাসের বেতনের চেয়ে বেশি একদিনে জুটবে আশায় তারা লুণ্ঠেরাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অমাত্যগণ বৃদ্ধ, তারা অশক্ত। মহিষীদের অনেকে বলরাম ও বাসুদেবের সঙ্গে সহমৃতা। অন্যেরা অন্তঃপুরে ক্রোড়ন্যমানা। আর রাজপুরনারীরা! তাদের কথা ভাবতে চায় না উগ্রসেন, তাদের কীর্তি কিছুদিন হল রাজার কানে এসে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। কিছু করবার নাই।

এমন সময়ে পদশব্দে সচকিত হয়ে উঠলো উগ্রসেন, শুধালেন, কে?

মহারাজ, আমি কঞ্চুকী।

নগরের কি সংবাদ?

দস্যুরা নগর পরিত্যাগ করে গিয়েছে।

তার মানে নগরে লুণ্ঠন করবার মতো আর কিছু নেই। শান্ত্রীগণ কি করলো?

মহারাজ, কতক দস্যু-হস্তে নিহত, অধিকাংশ দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

রাজপুরনারীগণ?

কঞ্চুকী কোন উত্তর দিল না।

কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন কঞ্চুকী: থাক, তোমার নীরবতাই উত্তর। অর্জুনকে আনতে সহূক করে যাত্রা করেছে।

তা কদিন হল মহারাজ।

এখনো ফেরেনি। দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুরে পথ কত যোজন কঞ্চুকী।

যাতায়াতে অনেক শত যোজন পথ, মহারাজ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উগ্রসেন বললেন, যাতায়াতে অনেক শত যোজন পথ ভুলেই গিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

কঞ্চুকী নিঃশব্দে প্রস্থান করলো।

প্রবল প্রতাপশালী যদুবংশের অধিপতি মহারাজা উগ্রসেন মাথায় হাত দিয়ে একাকী বসে রইলেন। এমনি সংসারের বাজনা বটে! হঠাৎ তীব্র অট্টহাসি ধ্বনিত হল। কে হাসে? না, শূন্য কক্ষের আলো-আঁধারিতে গোটাকতক চামচিকে উড়ছে, তাদেরই পাখার শব্দ।'

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

পি. ব্যানার্জীর

অর্শ চিকিৎসা

৩০ দিন টাঃ ২·৫০
১৬ পুরিয়া চূর্ণ ২·২৫
মলম ৩০ গ্রাঃ ২·৫০

বিনামূল্যে বিবরণী দেওয়া হয়

পি. ব্যানার্জী

৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫
৫৩, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

চিকিৎসকের অনন্যসাধারণ স্বর্গীয় ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহান আদর্শে লিখিত একমাত্র হোমিও পারিবারিক চিকিৎসার বই

আধুনিক চিকিৎসা

বহুল পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ এই মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশ পাইবে। পুস্তকটি যাহাতে চিকিৎসকদেরও বহু উপকারে আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনেক নূতন সংযোজন করিয়াছি। পুস্তকের পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিলে পুস্তক প্রকাশের পরেই রেজিস্ট্রী ডাকে প্রেরণ করিব। কোন ডাক খরচা লাগিবে না।

মূল্য : ৮্ (শোভন) ও ৬্ (সাধারণ)

CENTRAL LIBRARY

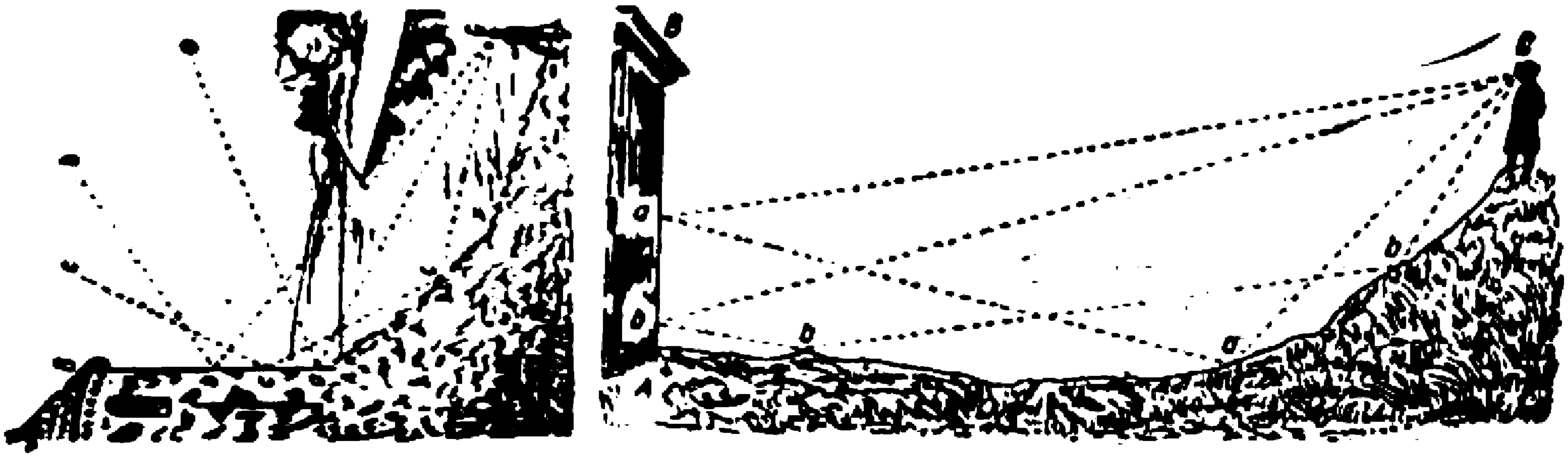

বিজ্ঞানের কথা

ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি

কোনো কোনো প্রেক্ষাগৃহে একেবারে সামনের সারিতে বসেও অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মুখের কথা স্পষ্ট শোনা যায় না। মনে হয় কথাগুলো যেন হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো প্রেক্ষাগৃহে ফিসফিস কথাও গমগম করে বেজে ওঠে। গির্জার প্রার্থনাসভায় পাদরি-মশাই খুব জোরে কথা বলেন না, কিন্তু প্রত্যেকটি শ্রোতার মনে হয় পাদরিমশাই তাঁর কানের কাছে মুখ এনে কথা বলছেন। আবার কোনো কোনো গির্জায় শব্দের গম গম করে বেজে ওঠাটা এমনই বেশি মাত্রায় যে খুব ভালো গলার গানও পণ্ড হয়ে যায়।

সবই নির্ভর করে শব্দ কতখানি ফিরে আসছে আর কতখানি মিলিয়ে যাচ্ছে তার ওপরে। শব্দের ফিরে আসার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। যাকে আমরা বলি প্রতিধ্বনি তা হচ্ছে শব্দের এই ফিরে আসা—প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা, যেমন ফিরে আসে আলো আয়নায় প্রতিফলিত হলে।

অরণ্যের ঘন গাছপালা যেখানে পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে, তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললে শব্দ ফিরে আসে। শব্দকে ফিরিয়ে দেয় অরণ্যের পাঁচিল। তেমনি ফিরিয়ে দিতে পারে উঁচু দেওয়াল, বড়ো অট্টালিকা, পর্বত বা অন্য কোনো আড়াল। আবার আড়ালের বিন্যাস এমন হতে পারে যে শব্দ একবার নয়, একই শব্দ বারবার ফিরে আসে। বিলাতে একটি দুর্গে ছিল যেখানে জানলায় দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়লে গুলির আওয়াজ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বার ফিরে আসত, জোরে চেঁচিয়ে দিলে বার তিরিশেক শোনা যেত সেই হাঁক।

আমরা যখন কথা বলি আশেপাশে কোনো না কোনো আড়াল থাকেই। আর আড়াল যদি থাকে তাতে ধাক্কা খেয়ে শব্দ ফিরে আসবেই, আয়না থেকে আলোর ঠিকরে আসার মতো। তাহলে তো আমাদের মুখের প্রত্যেকটি কথার ফিরে আসা উচিত। প্রত্যেকটি ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হওয়া উচিত। তা হয় না কেন?

আসলে প্রত্যেকটি কথা ফিরে আসে, প্রত্যেকটি ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, কিন্তু আমাদের কানে সব সময় তা পৌঁছয় না, কিংবা পৌঁছলেও এমনই সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছয় যে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি আমরা একই সঙ্গে শুনেছি, দুয়ের মধ্যে তফাত করতে পারিনি।

প্রতিধ্বনি কানে পৌঁছয় না—সেটা কোন অবস্থায়?

প্রথম ছবিতে এই অবস্থাটি দেখানো হয়েছে। আড়ালের সামনে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। তার মুখের কথা কিভাবে আড়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে তা ভাঙা ভাঙা রেখায় দেখানো হয়েছে। ছবি দেখে বোঝা যাবে প্রতিফলিত রেখাগুলো সবই মানুষটির মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোনোটিই তার কানে পৌঁছতে পারছে না। এক্ষেত্রে ফিরে আসা যে-কথাকে পৃথকভাবে শুনতে পাবার পরে আমরা বলি প্রতিধ্বনি তার কোনো অস্তিত্ব নেই। ছবি দেখলে আরো বোঝা যাবে মানুষটি রয়েছে নিচে, তার মাথা ছাড়িয়ে আড়াল উঠে গিয়েছে উঁচুতে। এমনি অবস্থায় শুনতে পাবার মতো প্রতিধ্বনি হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় ছবিতে আড়াল ও মানুষটি প্রায় মাথায় মাথায়। জমির ঢালটিও বাটির মতো খোলসমান, যাকে বলা হয় কনকেভ বা অবতল। ভাঙা ভাঙা রেখায় শব্দের যাওয়া ও ফিরে আসা দেখানো হয়েছে। ছবি দেখে বোঝা যাবে, ফিরে আসা শব্দ পৃথকভাবে শুনতে পাবার পরে যাকে আমরা বলি প্রতিধ্বনি তার অস্তিত্ব এখানে আছে।

এই দ্বিতীয় ছবিতেও মানুষটি যদি আড়ালের খুব কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু পৃথকভাবে শুনতে পাবার মতো প্রতিধ্বনি হবে না। শব্দের গতি সেকেন্ডে ৩৪০ মিটার। অর্থাৎ মানুষটি যদি আড়াল থেকে ৮৫ মিটার দূরে দাঁড়ায় তাহলে প্রতিধ্বনি সে শুনবে ঠিক আধ সেকেন্ড পরে। আরো সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি মিশে যাবারই সম্ভাবনা। তাছাড়া সব প্রতিধ্বনি সমান স্পষ্ট হয় না। শব্দ যতো আচমকা ও চড়া প্রতিধ্বনি ততো স্পষ্ট। এদিক থেকে প্রতিধ্বনি পরখ করার ধ্বনি হিসেবে হাততালিই সবচেয়ে ভালো; মানুষের গলার স্বর সবচেয়ে খারাপ, বিশেষ করে পুরুষের গলার স্বর, শিশুর ও নারীর চড়া গলায় স্বর খানিকটা চলতে পারে। কাজেই প্রতিধ্বনি কেমন হবে তা নির্ভর করে মূল শব্দের ওপরে—সেটি বন্দুকের গর্জন, না বিস্ফোরণের আওয়াজ, না বাঘের হুংকার, না মেয়েলি গলার গান?

আড়াল থেকে ৮৫ মিটার দূরে দাঁড়ালে প্রতিধ্বনি শোনা যায় ঠিক আধ সেকেন্ড পরে, একথা বলেছি। কথাটা উলটো দিক থেকে নিলে প্রতিধ্বনি ফিরে পাওয়ার সময়ের হিসাব থেকে দূরত্বের হিসাব কষা অসম্ভব ব্যাপার নয়। যেমন, আধ সেকেন্ড পরে প্রতিধ্বনি শোনা গেলে দূরত্ব দাঁড়ায় ৮৫ মিটার। জুলে ভার্নের পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাত্রা উপন্যাসে বুড়ো ও ভাইপো সুড়ঙ্গের পথে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তখন প্রতিধ্বনি ফিরে আসার সময়ের হিসেব থেকে বুড়ো হিসেব করে নিয়েছিলেন ভাইপো থেকে তিনি কতটা দূরে রয়েছেন। এক সময়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হত ওজন বাঁধা

দড়ি সমুদ্রের জলে নামিয়ে। এই পদ্ধতিতে সমুদ্রের গভীরতার মাপ নিতে হলে কী পরিমাণ দড়ির প্রয়োজন তা অনুমান করা চলে। আজকাল নেওয়া হয় প্রতিধ্বনি ফিরে আসার সময়ের হিসেব থেকে। শব্দ তৈরি হয় একটি যন্ত্রে, সেই শব্দ সমুদ্রের তলদেশে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে সেই যন্ত্রেই ধরা পড়ে। কতক্ষণ পরে ধরা পড়ল তা থেকে গভীরতার হিসেব। বাদুড় রাত্রিবেলা ওড়ার সময়ে সামনে কোনো বাধা আছে কিনা তা পরখ করে তার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে কিনা তা থেকে। তবে বাদুড়ের এই চিৎকারটি সাধারণ শব্দের মতো নয়, যাকে বলা হয়, শ্রবণাতীত শব্দ —তাই। কাজেই রাত্রিবেলা মতোই বাদুড় উড়ে যেতে আমরা দেখি না কেন তার চিৎকারটি শুনতে পাই না।

আড়ালকে বলেছি শব্দের আয়না। এই আয়নার চেহারাটি যদি হয় অবতল তাহলে ফিরে আসা শব্দগুলো অবতল থেকে নিকরানো আলোর মতোই একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হতে পারে। ঘরের মধ্যে এমনি একটি অবতল আড়াল যদি থাকে তার সেই আড়াল থেকে ফিরে আসা শব্দের কেন্দ্রীভবনের বিন্দুতে যদি বসানো হয় একটি মানুষের মূর্তি (তার ঠোঁট থাকবে এই বিন্দুতে), তাহলে ঘরের মধ্যে কথা বললেই মনে হবে মানুষের মূর্তিটি সেই কথাগুলো ফিসফিস করে বলছে।

প্রেক্ষাগৃহে প্রম্পটারের বসার স্থানটিকেও এমনি একটি অবতল আড়ালের মধ্যে রাখা চলে। তা হবে এমন যাতে প্রম্পটারের মুখের কথা প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে পড়তে না পারে কিন্তু মঞ্চে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রম্পটারের কথা দর্শকদের কানে পৌঁছলে কী অবস্থার সৃষ্টি হয় তা সকলেই জানেন। যাতে কোনোক্রমেই না পৌঁছয় তার ব্যবস্থা অবতল আড়ালের সাহায্য নিয়ে অনায়াসেই করা সম্ভব।

কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে অন্য যে ব্যবস্থাটি অবশ্যই থাকা দরকার তা হচ্ছে অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখের কথা সারা প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে দেওয়ার। এ জন্যে ধ্বনির প্রতিধ্বনি তোলার বিশেষ রকমের আয়োজন রাখতেই হয়। কিন্তু তা এমন বেশি মাত্রায় নয় যাতে মূল ধ্বনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ-জন্যে সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই শব্দকে মিলিয়ে দেবার ব্যবস্থাও। প্রত্যেকটি শব্দ যদি বড়ো বেশি গমগম করে বেজে ওঠে তবে বুঝতে হবে প্রেক্ষাগৃহের শব্দ-ব্যবস্থা খারাপ।

শব্দ মিলিয়ে দেবার ও শুষে নেবার সবচেয়ে সেরা আয়োজন হচ্ছে খোলা জানলা। ফুটো দিয়ে যেমন আলো মিলিয়ে যায় তেমনি ফাঁক-ফোকর দিয়ে শব্দ। এক বর্গমিটারের একটি খোলা জানলা হচ্ছে শব্দ শুষে নেবার একটি ইউনিট। প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদেরও তুলনা করা হয়ে থাকে খোলা জানলার সঙ্গে। প্রত্যেক দর্শক আক্ষরিক অর্থেই খানিকটা করে শব্দ শুষে নিচ্ছে। শূন্য প্রেক্ষাগৃহে বক্তার কথা এই খোলা জানলাটি পায় না, বক্তার পক্ষে তা বিরক্তিরই কারণ।

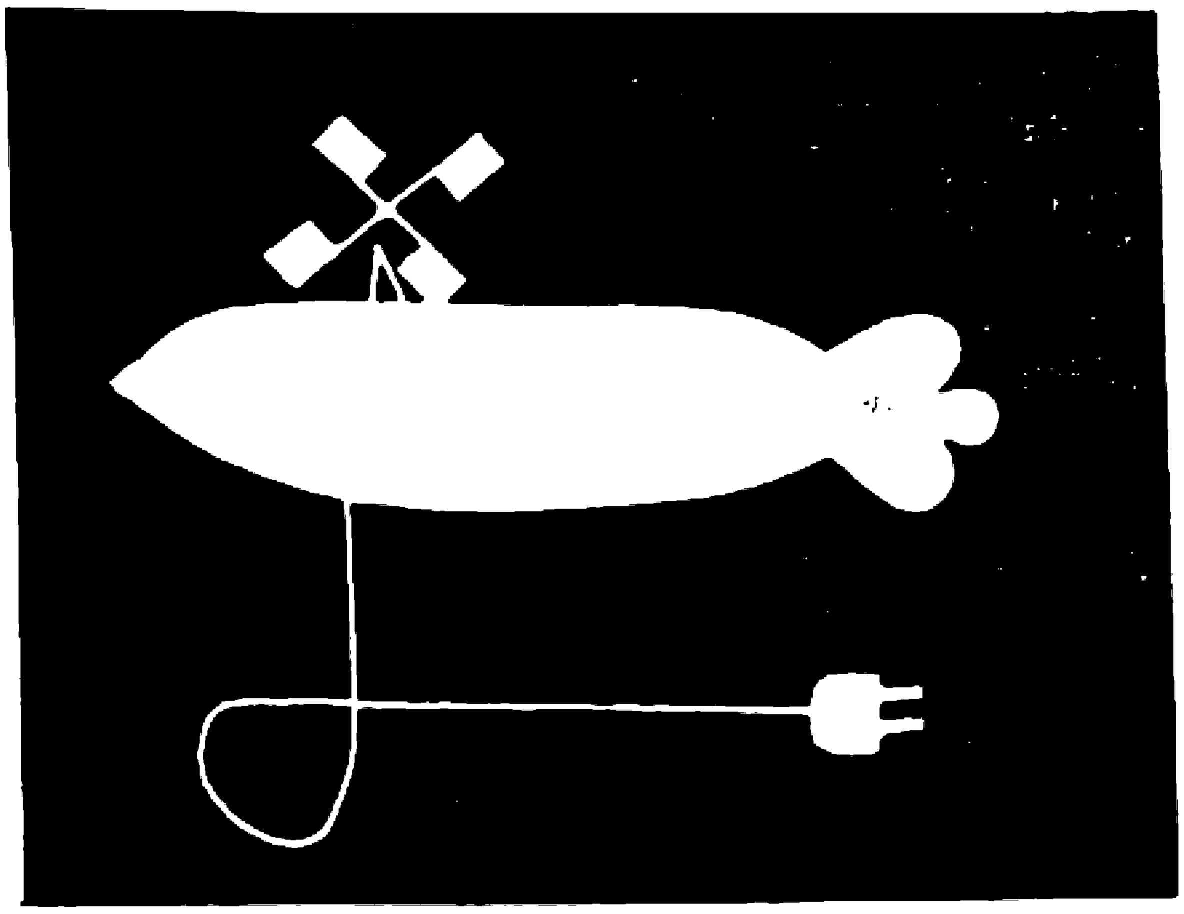

হাওয়াই জাহাজ ও হাওয়া-কল ঃ আকাশে বিদ্যুৎ উৎপাদন

সকলেই জানেন, জলবিদ্যুৎ তৈরি হয় জলের তোড়ে টারবাইন ঘুরিয়ে। আসলে বিদ্যুৎ তৈরি হয় জেনারেটর আর সেজন্যে জেনারেটরের ফিল্ডকয়েলটি একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘূর্ণিত হওয়া চাই। টারবাইন ঘুরিয়ে এই ফিল্ডকয়েলকেই ঘোরাবার বন্দোবস্ত। জলের তোড়ে না হয়ে অন্য কোনো উপায়েও ঘোরাবার ব্যবস্থা হতে পারে। বাষ্পের জোরে জেনারেটরের ফিল্ডকয়েল ঘোরাতে হলে কয়লা বা তেল পোড়াতে হয়, সেটা খরচের ব্যাপার। জলের তোড়ে ঘোরাতে এই খরচ বেঁচে যায়।

জলের তোড়েই যদি ঘোরানো চলে, বাতাসের ঝাপটাতেই বা ঘোরানো যাবে না কেন? হাওয়া-কল যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন বাতাসের ঝাপটায় পাখার ব্লেড ঘুরিয়ে একটি ঘূর্ণন তৈরি হয়ে থাকে। গম পেশাই করার যন্ত্র যদি তাতে চালু হতে পারে তাহলে জেনারেটরই বা নয় কেন? কিন্তু মনে রাখা দরকার জেনারেটর উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ, কাজেই ঘূর্ণনটি হওয়া চাই অবিরাম। ভূপৃষ্ঠে, এমনকি উঁচু পাহাড়ের চুড়োতেও, বাতাসের ঝাপটা সম্পর্কে একথা বলা চলে না যে তা অবিরাম। গম পেশাইয়ের যন্ত্র থেমে থেমে চললেও ক্ষতি নেই, জেনারেটরকে সর্বক্ষণ চালু রাখতেই হয়। এ-কারণে ভূপৃষ্ঠে বাতাসের ঝাপটায় জেনারেটর চালু করার কোনো পরিকল্পনা এতাবৎ হয় নি। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার উঁচুতে এমন একটি এলাকায় পৌঁছনো যায় যেখানে আছে বাতাসের অবিরাম ও সজোর একটি ঝাপটা। এলাকাটি বায়ুমণ্ডলের ট্রোপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে। ভূমণ্ডলকে পাক দিয়ে বাতাস এই এলাকায় উচ্চবেগে পশ্চিম-দিকে প্রবহমান।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পরিকল্পনা করেছেন, উঁচু আকাশের এই অবিরাম বায়ুপ্রবাহের কাজে লাগিয়ে একটি বিদ্যুৎ-তৈরির কারখানা বসাবেন। পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে অভিনব।

প্রকাণ্ড একটি হাওয়াই জাহাজ ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার উঁচুতে তোলা হবে। কৃত্রিম উপকরণে তৈরী অতীব মজবুত একটি দড়ি দিয়ে মাটির সঙ্গে বাঁধা থাকবে হাওয়াই জাহাজটি (এটি লম্বায় ১৬৮ মিটার, চওড়ায় ৫০ মিটার)। হাওয়াই জাহাজে থাকবে হাওয়া-কল ও জেনারেটর। অবিরাম ও সজোর বায়ুপ্রবাহে ঘুরবে হাওয়া-কল, সেই সঙ্গে ঘুরবে জেনারেটর।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনে করেন সাইবেরিয়ার বা একেবারে উত্তরের এলাকায় এই উপায়েই বিদ্যুৎ তৈরি করাটা অপেক্ষাকৃত কম খরচের। কেন না এসব এলাকায় পরিবহণের ব্যবস্থা এতই খারাপ যে দূর থেকে তার টেনে বিদ্যুতের প্রবাহ আনতে হলে কিংবা স্থানীয় বিদ্যুৎ কারখানাকে চালু রাখবার জন্যে দূর থেকে তেল বা কয়লার যোগান বজায় রাখতে হলে খরচ খুবই বেশি। তার চেয়ে আকাশে হাওয়াই জাহাজ তুলে আকাশেই বিদ্যুৎ তৈরির কারখানা চালু করার খরচ অপেক্ষাকৃত কম। আর এমনি একটি কারখানার সপক্ষে আরো একটি বলার কথা, এতে বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

আরো একটি সুবিধে আছে। দশ কিলোমিটার উঁচুতে ভাসমান হাওয়াই জাহাজ থেকে অবশ্যই টেলিভিশন প্রচার চলতে পারে। তাই সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনায় একই সঙ্গে দশ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে টেলিভিশন প্রচারের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। এমনিতে টেলিভিশন প্রচারের জন্যে স্তম্ভ তুলতে হয়। স্তম্ভ যতো উঁচু প্রচারের পাল্লা ততো বেশি। টেলিভিশন প্রচারের দিক থেকে এমনি একটি হাওয়াই জাহাজ দশ কিলোমিটার উঁচু একটি স্তম্ভ তোলার সামিল।

—অয়স্কান্ত

চাণক্য চাকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা

অদ্রীশ বর্ধন

চাণক্য চাকলাদার বৃদ্ধ, কুব্জ, পলিতকেশ। রোগজীর্ণ, কালক্রমে শীর্ণ, খাদ্যেও অরুচি। কিন্তু একদিন তিনি ছিলেন দুরন্ত, দুর্দম, দুর্বার। মুচি-পাড়ার মেসে থাকেন, প্রতি সন্ধ্যায় আফিং খান, তারপর ডাইরী লিখতে বসেন। আসলে ভদ্রলোক অ্যাডভেঞ্চার বই পড়েন, ফ্যানটাসটিক ফিল্ম দেখেন। আফিঙের মৌতাতে সেই সবই লেখেন...এ হল তারই ডাইরী......

উন্মাদ নৃত্যে প্রায় বিবসনা হয়ে গিয়েছিল ক্যাবারে নর্তকী।

হোটেল কক্ষ। অনেকগুলো রঙের ঝাপসা রোশনাই। তবুও ঘরের আনাচে-কানাচে অন্ধকারের স্তূপ। এরা নৃত্য-রসিক। সুধারসেও বঞ্চিত নয়। সেইসঙ্গে প্রেমময় সঙ্গিনী। বিবশা সঙ্গিনীদের কাজল-কালো আঁখি গাঢ় হয়ে উঠেছে সেক্স-হট মত্তমন কম্পন। ধমনীতে সুবর্ণমদিরাও কাজ শুরু করে দিয়েছে। সঙ্গী পুরুষের কর্কশ আলিঙ্গন তনুমন বিহ্বল করে তুলেছে।

এই হল দিল্লির হোটেল-রজনী। সারা পৃথিবীর মানুষকে এখানে দেখা যায়। জগৎসংসার তারা বিস্মৃত হয়। ঢুলু-ঢুলু চোখের সামনে শুধু হেলতে দুলতে থাকে কালনাগিনীসম রূপসী নর্তকী। একে একে খসে পড়তে থাকে তার দেহাবরণ। ধীরে ধীরে উন্মাদ হতে থাকে মিউজিক। এগিয়ে আসে চরম মুহূর্ত। রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে দর্শকদের।

যেন আরব্য উপন্যাসের নতুন সংস্করণ।

সে রাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মোহিনী নাচে দুলছে মায়াবিনী। পর্যায়ক্রমে অনাবৃত হচ্ছে তনু। যৌবন যেন ফেটে পড়ছে দেহতটে। আসছে......সেই মুহূর্ত আসছে......যখন সহসা স্তব্ধ হবে বাদ্যধ্বনি......গুরুগুরু নির্ঘোষে থরথর কম্পিত হবে উত্তাল বুক......বিদ্যুৎঝলকের মত দেখা দেবে ঐ......আদিম মানবী।

তিমিরাবৃত একটি কোণের টেবিলে মৃদুমন্দ ধোঁয়া উঠছিল একটি পাইপ থেকে। পাইপ অধিকারী মানুষটি আকারে বাঁশের মত সিধে। নিমীলিত নয়ন। যেন অপ্সরা-

নৃত্য আমেজ এনেছে সোমরসপানে বিভোর দেবরাজের চোখে।

পাঠক নিশ্চয় এঁকে চিনিছেন। ইনিই এ কাহিনীর নায়ক—মিঃ গ্রেট চাণক্য চাকলাদার।

চাণক্যর পাশে, প্রায় গা ঘেঁসে বসে এক উর্বশী। ডাকসাইটে এই সুন্দরীকে দিল্লির অভিজাত মহলে চেনে না হেন ব্যক্তি নেই। বড় ঘরের মেয়ে। রূপসাগরে যেন এইমাত্র ডুব দিয়ে এল—এমনি শ্রী। কিন্তু এহেন ডানাকাটা পরীও যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে চাণক্যর সঙ্গ পেয়ে।

চাণক্য কিন্তু নির্বিকার।

আচমকা কে যেন হাত রাখল চাণক্যর কাঁধে। আড়চোখে তাকাল চাণক্য। পর-মুহূর্তে পাইপ নামাল।

'মিঃ চাম্বকলাল!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত?'

ইঙ্গিত বুঝল চাণক্য। পার্শ্ববর্তিনী উর্বশীকে বলল—'রম্ভা, ডোন্ট মাইন্ড. কাউন্টারে গিয়ে দুটো তাম্রমুখ দিতে বলবে?'

স্মিতমুখে উঠে দাঁড়াল রম্ভা। চরণ নাড়তেই কিংকিনী শোনা গেল। মুখ ফেরাতেই নাকের একরত্তি হীরে থেকে বুঝি বিদ্যুৎ ছিটকে গেল। ঝিনিক-ঝিনিক শব্দে কাউন্টারের দিকে এগোল রম্ভা।

চাণক্য বলল—'কি খবর?'

'উনি ওয়েট করছেন।'

(উনি অর্থে ভারত সরকারের একজন হোমড়া-চোমড়া। যার প্রকৃত পদটি এখানে গোপন রাখা হল।)

'কোথায়?'

'মিনিস্ট্রিতে।'

'চলুন।' উঠে দাঁড়াল চাণক্য।

'গার্লফ্রেন্ডকে বলে গেলেন না?'

'ও জানে. আমাকে ধরা যায় না।'

আচমকা দামামা-ধ্বনি শুরু হল। এসেছে সেই চরম-মুহূর্ত। বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। সম্মোহিতের মত সভার চক্ষু নিরাবরণা রূপসীর ওপর।

চাণক্য কিন্তু ফিরেও তাকাল না।

•

জনপথের ওপর দিয়ে বায়ুবেগে উড়ে চলল চাম্বকলালের গাড়ি। এক কোণে বসে পাইপে 'গোল্ডব্লক' তামাক ঠাসতে ঠাসতে চাণক্য স্বপ্নালু চোখে সামনে তাকিয়ে রইল। মিশমিশে পুলওভারের ওপর বিশীর্ণ মুখ ভাবলেশহীন। আয়ত চোখে যেন ঈগলের স্বপন।

কাশলেন চাম্বকলাল। বললেন 'হ্যালো মিঃ চাকলাদার!'

'কর হোয়াট?'

'ইসাবেলাকে সিংহের গুহা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে।'

'সিংহের গুহা?' তাচ্ছিল্যের বঙ্কিম-হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে জাগ্রত হল। 'ওরা সিংহ নয়—শেয়াল।'

'যা বলেন। ইসাবেলার সে তেজও কিন্তু নেই। আপনি না গেলে স্বেচ্ছাচারী শত্রু।'

গম্ভীর হল চাণক্য। পাইপে অগ্নি-সংযোগ করল। ক্ষণেক নীরবতার পর বলল—'ইসাবেলাকে আপনি পুরো চেনেন নি। ওর তেজ ঘুমিয়ে থাকে—জাগাতে হয়।'

কাষ্ঠহাসি হাসলেন চাম্বকলাল—'তা হবে। কিন্তু এ-যাত্রা ইসাবেলা নিশ্চয় থাকছে না?'

ছোট ছোট ধূম্রপুঞ্জ নিক্ষেপ করতে করতে ইস্পাতকঠিন ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চাণক্য শুধু বলল—'কাজের চেহারা কী, তাই এখনো জানলাম না।'

চাম্বকলাল আর ঘাঁটাতে সাহস করল না।

•

মন্ত্রণালয়।

'উনি' তৈরি হয়েই ছিলেন। চাম্বকলালের পেছন পেছন ফিরোজ-চাং সেজে বিশাল টেবিলের সামনে আবির্ভূত হল চাণক্য। চোখ তুললেন 'উনি'। চশমা খুলে কিছুক্ষণ

আপনার জমানো টাকাকড়ি

আপনার নিজের এবং দেশের কাজে খাটতে দিন

ইউকোব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তার সুযোগ নিন

ইউকোব্যাঙ্কে একটি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলে আপনার টাকা জমা রাখুন। তা থেকে আপনিও সুদ পাবেন, আবার দেশের চাষবাস, ছোটখাটো শিল্প ও রপ্তানী ব্যবসায়েরও সাহায্য হবে। এসব কাজে আর্থিক সহায়তা দেবার নানাধরণের পরিকল্পনা আমরা করেছি।

ইউকোব্যাঙ্কের জিম্মায় রেখে আপনার জমানো টাকা খাটতে দিন—আপনার নিজের ও দেশের উন্নতি হবে, অভাব ঘুচে সচ্ছলতা আসবে।

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

ইউকোব্যাঙ্ক উন্নতির পথ সুগম করে

UCO-378

চেয়ে রইলেন। চাণক্যও চেয়ে রইল। চোখের দৃষ্টির দিয়ে দুজনে দুজনকে মেপে নিল।

চাণক্য দেখল এক বাগদাদী মানুষকে। ডাকসাইটে ব্যারিস্টার। এককালে আইন-জগতে তুফান সৃষ্টি যাঁর নেশা ছিল। যার প্রতাপে একদা সুপ্রীমকোর্টও উদ্বিগ্ন হত। প্রশস্ত ললাট, কেশহীন মসৃণ মাথা, আর হাই-ডেলের নলাচের মত অন্তর্ভেদী তীব্র চক্ষু। প্রচণ্ড মেধা, সেনানায়কের মত চাহনি।

আর উনি দেখলেন এক কিম্ভূত পুরুষকে। দেখে বিস্মিত হলেন। বংশ-দণ্ডের মত শীর্ণ দীর্ঘ এই মানুষটিই চাণক্য চাক্লাদার? যাকে ঘিরে বহু কিংবদন্তী, বহু গুজব, বহু কাহিনী যে কোনো কল্প-কাহিনীকেও টেক্কা মারতে পারে? নিবিড় কৌতুক নৃত্য করে উঠল তাঁর দুই মণিকায়। এ-ব্যক্তি গুজবের স্বপ্নলোকেই মানায় সত্যলোকে নয়।

সংক্ষিপ্ত অভিবাদন এবং প্রাথমিক শিষ্টাচারের পর আসল প্রসঙ্গে এল চাণক্য। কর্মবীর উনি সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন।

বললেন—'আইল্যান্ড অভ কিং নাংপোর নাম শুনেছেন?'

'কিং নাংপোর দ্বীপ জাভা সাগরে। বাটাভিয়া থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। সাউথ-ইস্ট এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দশ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার দ্বীপ। রাজা নাংপোর দ্বীপ

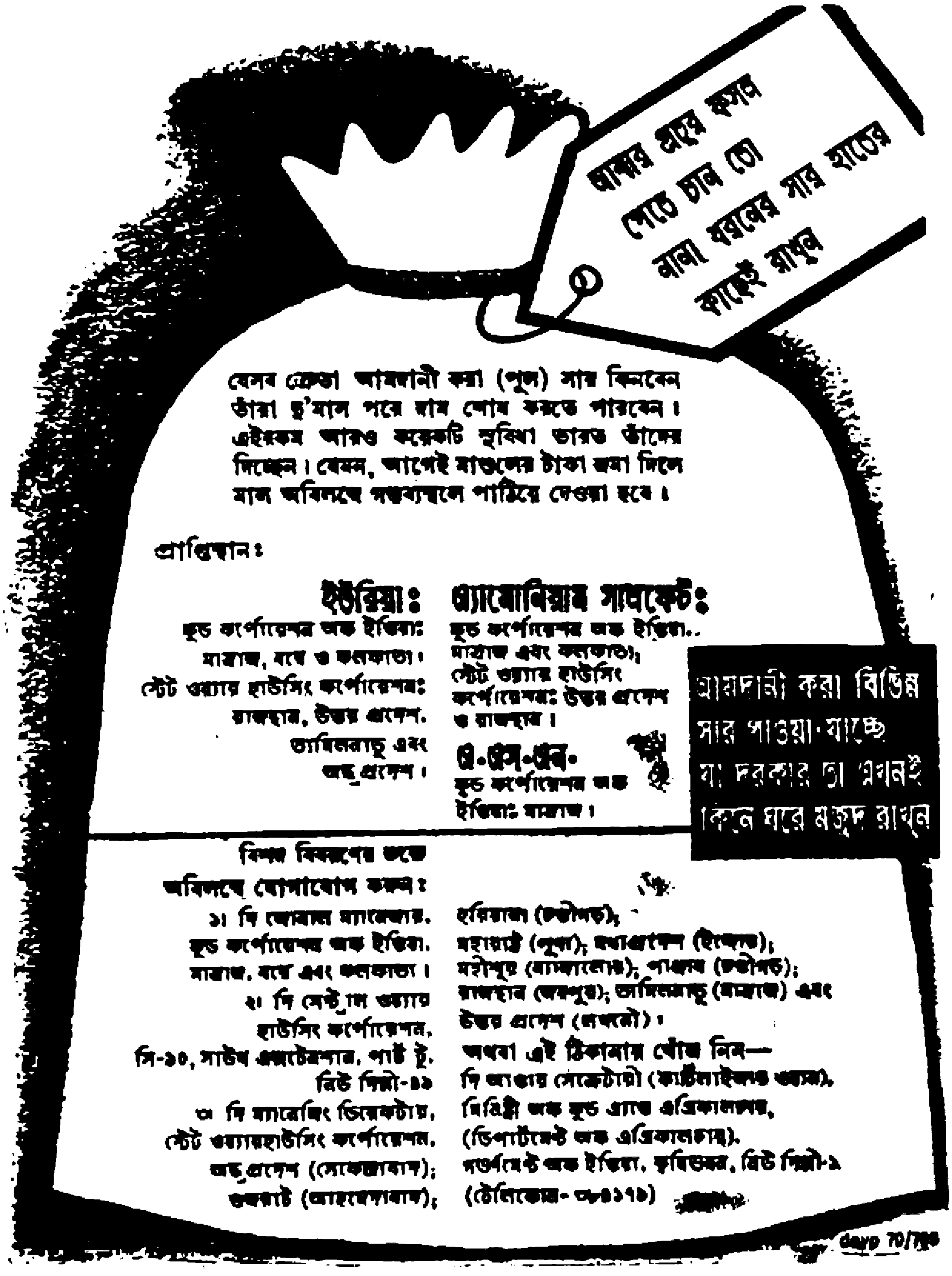

এদের মধ্যে প্রায় অখ্যাত বললেই চলে। ঐ দ্বীপই তাঁর রাজত্ব। দ্বীপের ঠিক মধ্যে আছে একটা বিশাল আগ্নেয়গিরি। এখন নিভে গেছে। কিন্তু আগ্নেয়ছাই জমিতে মিশে থাকায় ফলে জমি খুব উর্বর। রাজা নাংপোর তাই মশলার ব্যবসা থেকে ভালোই আয় হয়। গড়গড় করে যেন মুখস্থ বলে গেল চাণক্য।

পলকহীন চোখে চেয়ে ছিলেন 'ডাঁন'। নিখাদ বিস্ময়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বভাব-তীব্র দুই চোখে।

মৃদু হাসল চাণক্য। প্রথম সাক্ষাতেই 'ডাঁন'র দুই চোখের কৌতুক-নৃত্য তার নজর এড়ায়নি। এই হল তার পাল্টা পাওনাই।

মৃদু কণ্ঠে বললেন 'ডাঁন'—'আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! ইন্দোনেশিয়ার নাম অনেকে জানতে পারে, কিন্তু আইল্যাণ্ড অভ কিঙ নাংপো'র খবর অনেকেই রাখে না।'

'আরো একটা খবর রাখি।' এবার কৌতুক উঁকি দিল চাণক্যর ঈগল চোখে।

'যথা?'

'রাজা নাংপোর দ্বীপকে নিয়ে কেন আপনি ভাবিত, তা আমি বলতে পারি।'

'কেন?'

'এর পেছনে অবশ্য আমাদের এম-পি'-দের চাপ আছে। তাঁরাই তো দুদিন আগে পার্লামেন্টে বক্তৃতাকে অ্যাটম বোমা বানাতে নিম-রাজী করিয়েছেন প্রাইম মিনিস্টারকে।'

'কি বলতে চান আপনি?' প্রখর হয়ে উঠল 'ডাঁন'র চক্ষু।

নির্বিকার কণ্ঠে বলল চাণক্য—'গভর্ণমেন্ট অভ ইণ্ডিয়া অ্যাম্বিশন বাদে হয়ত পরমাণু নীতি পরিবর্তন করবে। এই তো সেদিন এক বিশেষজ্ঞ জানালেন, বেশি নয়, মাত্র আঠারো কোটি টাকা খরচ করলেই অ্যাটম বোমা বানানো যাবে। প্রতিরক্ষা বাজেটের আট পার্সেন্ট এজন্যে সরিয়ে রাখলেই চলবে। আর হ্যাঁ, প্লুটোনিয়াম দিয়ে হাতিয়ার তৈরী ছাড়াও ইউরেনিয়ামের কথা ভাবতে হবে। কেননা, সেন্ট্রি-ফিউজ পদ্ধতি দিয়ে ইউরেনিয়াম জোরদার করার ফলে অ্যাটম বোমা তৈরির খরচ এখন অর্ধেক হয়ে গেছে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল বিদগ্ধ মানুষটির।

নিমীলিত চোখে চাণক্য বলল—'রাজা নাংপো'র দ্বীপ আপনার টনক নড়িয়েছে এই কারণেই। কেন না, হঠাৎ ইউরেনিয়ামের এক বিপুল ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে রাজা নাংপোর মশলা-দ্বীপের আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে।'

ঘরে সহসা একটা অ্যাটম-বোমা ফাটলেও বোধ হয় গ্রেট 'ডাঁন' এতটা হতভম্ব হতেন না। তাঁর মুখচ্ছবি দেখে বোয়াল মাছের খাবি খাওয়ার কথাই মনে পড়ে গেল চাণক্যর এবং সে পরম সন্তোষ লাভ করল।

হৃষ্টচিত্তে একটা বিঘতখানেক লম্বা ফিলটার-টিপড বার করল চাণক্য। দিব্যি তরিবৎ করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। অগ্নিশিখা এবং ধূম্রজালের ফাঁক দিয়ে আড়চোখে দেখে নিল অ্যাটম-বোমা বিধ্বস্ত নাগাসাকি-হিরোশিমার মত 'ডাঁন'-মূর্তিকে।

মিনিটখানেক গেল সামলাতে। তারপর উত্তেজনা-রুদ্ধ মৃদুকণ্ঠে বললেন। 'ডাঁন'—'মাই গড! টপ সিক্রেট আপনি জানলেন কি করে?'

নাসাপথে উদ্গত ধোঁয়ার কুণ্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল চাণক্য। কুণ্ডলকে উদ্দেশ করেই বলল—'এটাই আমার মন্ত্র-গুপ্তি। কুল কর্মে যখন ছিলাম, তখন ইস্ট ইণ্ডিজে আমার একটা বড় ঘাঁটি ছিল। ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের হদিশ আপনি জেনেছেন আজ— কিন্তু আমি জেনেছি অনেক আগেই।'

ঢোক গিললেন 'ডাঁন'। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল ললাটে। চাণক্য চাকলাদার তাহলে কিংবদন্তী নয়? চাণক্য চাকলাদার অলীক নয়, ভয়ংকর সত্য! চাণক্য চাকলাদার স্বপ্নলোকের স্বপ্ন নয়—সত্যলোকের আতঙ্ক! লিকলিকে মানুষটির প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনে সহসা নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হল মিনিস্টারের।

চাণক্য সিগারেটের জ্বলন্ত অগ্রভাগের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। বলল—'এবার বলুন, আইল্যাণ্ড অভ নাংপোর সঙ্গে চাণক্য চাকলাদারকে কেন জড়াতে চান?'

'আমি চাই না। চায় ত্র্যম্বকলাল আর বন্দুক সিং। ওদের নার্ভ সামলাতেই কাঁপে কিনা।'

'স্যার—' ত্র্যম্বকলাল মুখ খুলতে গেল।

হাতের ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন 'ডাঁন'। বললেন, 'রাজা নাংপোর সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে। অবশ্য গভর্ণমেন্ট অভ ইন্দোনেশিয়াকে আমরা বাদ দিইনি। ইস্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সম্পদ ইণ্ডিয়াতেই আসবে। বিনিময়ে ইণ্ডিয়ার এমন কিছু সম্পদ রাজা নাংপোর দ্বীপে যাবে যা রাজার রত্নভাণ্ডারে নেই।'

'কী'?

'হীরে।'

'হীরে?'

'হ্যাঁ, হীরে। রাজা নাংপো মানুষটি একটু তেরিয়া মেজাজের। মশলার কারবার করে যা হয় আর কি। উনি কারেন্সি এক্সচেঞ্জ নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নন। প্রাথমিক খরচ বাবদ সাত কোটি টাকা ক্যাশ নিয়েছেন। বাকি টাকা অর্থাৎ ১৫ কোটি টাকা দিতে হবে হীরেতে।'

চাণক্যর চোখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। হতাশ হলেন 'ডাঁন'। বললেন—'কিঙ নাংপো হীরের ডাই নিজের হাতে ঘাঁটতে চান। কিন্তু এখান থেকে নিজে নিয়ে যেতে চান না। পনেরো কোটি টাকার হীরে আমরা জমা দিয়ে আসব বাটাভিয়ার খোয়োবুদ্রের ব্যাঙ্কে। মিঃ চাকলাদার পরিষ্কার তো?'

'বুঝেছি,' বলল চাণক্য।

'হীরে সংগ্রহ করা হচ্ছে বোম্বাইতে। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতার বাটাভিয়াগামী হীরে বোম্বাই বাক্স চালানো হবে। আমাদের দায়িত্ব এখানেই ফুরোচ্ছে না। যতক্ষণ না খোয়োবুদ্রের ব্যাঙ্কে হীরের বাক্স জমা পড়ছে, আমাদের শান্তি নেই।'

ত্র্যম্বকলাল বলল—'আমি বলছিলাম এরোপ্লেনে পাঠাতে। ছোট বাক্স বইতো নয়। প্লেনেই চলে যেতো।'

'উঁহু' তাতে বিপদ আছে। বছরখানেক আগে ছ' কোটি টাকার হীরে-জহরৎ নিয়ে একটা জেট প্লেন সুমাত্রার পাহাড়ে ভেঙে পড়েছিল। সুলতান সুম্বার বাকসাত ক্রসেট জোর' সুলতানেরই হীরে-মানিক নিয়ে যাচ্ছিল। প্লেন নিখোঁজ হওয়ার দেড় দিন পরে সুমাত্রার পাহাড়ী জঙ্গলে ক্রসেট জোরের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া যায়। হীরের বাক্স পাওয়া যায়নি। কিঙ নাংপো এ খবর জানেন কিনা জানি না। কেন না, খবরের কাগজ পড়ার বাতিক তাঁর নেই। তবে হুঁশিয়ার ব্যক্তি তিনি। উড়ন্ত বস্তুতে হীরে পাঠানোয় তাঁর মত নেই।'

'বেশ,' বলল চাণক্য। 'হীরে তাহলে জাহাজে যাচ্ছে। তাতে পাহারাও থাকবে নিশ্চয়?'

'তা থাকবে। যুদ্ধ-জাহাজেও যা থাকে না, সে ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'তা সত্ত্বেও আমাকে আপনি চাইছেন। কেন?'

'কেন না, হীরের খবর বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। তিমোরে দিলী বলে একটা বন্দর আছে জানেন তো?'

'জানি। তিমোর সমুদ্রের ঘাঁটি সেখানে।'

'কিছুদিন আগে আমাদের এক এজেন্টের মারফৎ খবর পেলাম, দাগাবাজ-মহলে নাকি জোর কানাঘুষো চলছে, শীগগিরই ইণ্ডিয়া থেকে বাক্স বাক্স হীরে চালান হবে বাটাভিয়াতে। আমি আরও খবর নিতে বললাম এজেন্টকে। কিন্তু হঠাৎ মারা গেল এজেন্ট।'

'খুন?'

'হ্যাঁ। নিছক কাকতালীয় হতে পারে। কিন্তু ত্র্যম্বকলাল আর বন্দুক সিংয়ের বিশ্বাস, হীরে লুঠের ষড়যন্ত্র যারা করছে, এজেন্টকে তারাই খুন করেছে।'

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট, কলকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

গ্রান্ডকমান্ড আর চুপ করে থাকতে পারল না—স্যার, গলায় পিয়ানোর তারের ফাঁস লাগিয়ে খুন করা পাকা খুনে ছাড়া কারো কাজ নয়। এর পেছনে নিশ্চয় বড় দল আছে।'

মৃদু হাসলেন উনি—শুনেছেন তো? ছায়া দেখেই এরা ভয় পায়। ওদের পাঁড়া-পাঁড়িতেই আপনাকে আমার দরকার। সরকারী পাহারাদাররা যা করবে করুক, আড়াল থেকে হাঁরে-চোরের দলকে আপনি নাজেহাল করুন। যদিও আমার বিশ্বাস পণ্ডশ্রমই হবে।'

গ্রান্ডকমান্ডের মুখ লাল হয়ে গেল। থেমে থেমে বলল—স্যার, সুন্দা সিংকে মনে পড়ে?'

যাকে তুমি সুমবা পাঠিয়েছো ক'দিন আগে?'

'আজ্ঞে হাঁ। পিয়ানোর তার দিয়ে যে খুন করতে পারে, তার কব্জির জোরের চেয়ে হাণ্টার-এর জোর বেশি কিনা জানবার জন্যই সুন্দা সিংকে পাঠিয়েছিলাম।

'বেশ তো।' কৌতুক-হাস্যে উজ্জ্বল হল উনির চক্ষু।

'গতকাল থেকে সুন্দা সিংয়ের কোনো খবর নেই। নির্দিষ্ট সময়ে তার রিপোর্ট এসে পৌঁছোয়নি সারা দিনেও।' একটু থামল গ্রান্ডকমান্ড। তারপর ঈষৎ কাঁপা ছিবিয়ে চিবিয়ে বলল—সুন্দা সিং হয়ত আর নেই। ইহজগতেই নেই।'

অন্ধকার হল উনির কৌতুক-উজ্জ্বল চক্ষু।

•

সুন্দা সিংকে যমদূত বহুবার ধরেও ধরতে পারেনি। কিন্তু এবার যে আর নিষ্কৃতি নেই, সুন্দা তা বুঝেছিল।

সুন্দা সিং অন্যান্য পঞ্জনবাসীদের মতই সুপুরুষ। দীর্ঘ, পেশীবহুল স্বাস্থ্য। গোঁফ-দাঁড়ি সমাচ্ছন্ন ভারি মুখ। বয়স চল্লিশের কাছে।

সুন্দা সিংকে গ্রান্ডকমান্ডের দক্ষিণ-হস্ত বললে অত্যুক্তি হবে না। গত দশ বছরে গ্রান্ডকমান্ডের নির্দেশে সুন্দাকে অনেক কিছুই করতে হয়েছে। আইনের রক্ষক, সে আর বরদাস্ত করবে না। প্রতিটি কাজই বিপজ্জনক। কয়েক ক্ষেত্রে তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়েছে। যমে-মানুষে লড়াই চলেছে। কিন্তু প্রতিবারেই কালান্তকের চমনাবের মুখ চুন করে যমালয়ে ফিরতে হয়েছে।

এবারের ব্যাপার অবশ্য স্বতন্ত্র। দুরন্ত জাহাজে যে মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সুন্দা সিং, বুঝেছে অবস্থা সঙ্গীন। নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে এক্টুকু বুঝেছিল ক'দিনের বাঁধন ...হাতে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

জাহাজ 'ভুক' দ্বীপে নাঙর ফেলবার পর ... ...দিকে সরাত। তখন রাত ... পাহাড়ে চাঁদ নেই। তাই অন্ধকার ... ...যেতে হয়েছে সুন্দাকে। মাইল দেড়েক এবড়ো-খেবড়ো পথে হোঁচট খেতে খেতে চড়াই পেরোতে হয়েছে। পাহাড়-চূড়ায় প্যাগোডা তার পরেই।

আসবার পথে প্রহরীদের সঙ্গে আলাপ জমাতে গিয়েছিল সুন্দা। ন্যাড়ের মধ্যে সন্ন্যাসী সিকা ওঝদের কয়েকটি চড় খেয়েছে লোকগুলো কম কথা বলে। ছাঁচশ জাতের ভাষা বলে। মাঝে মাঝে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীও বলে। খুব সম্ভব ইংরেজীর মাধ্যমেই ছাঁচশ জাতের মধ্যে ভাব-বিনিময় বজায় রেখেছে।

ফলেই রসনাকে সংযত করেছিল সুন্দা। বোম্বেটে কাহিনী দর্শনেন্দ্রিয়কে প্রখর করেছিল। ভবিষ্যতে কাজে লাগুক না লাগুক, সব গুপ্তচরেরই কর্তব্য অকুস্থলের একটা মন-ফটো তুলে নেওয়া।

দ্বীপটা ছোট। লম্বায় বড় জোর মাইল দেড়েক। চওড়ায় কম। অনেকটা তিমির পিঠের মত একটা পাহাড় দ্বীপের প্রায় মাঝে। শ' দুই ফুট উঁচু। চূড়ায় কাঠের প্যাগোডা।

ভগবান বুদ্ধের উপাসকদের সাধনক্ষেত্র নিরিবিলি এই দ্বীপেই হানা দিয়েছে রক্ত-লোভী লুণ্ঠেরার দল। এরা সংখ্যায় অনেক। সশস্ত্র। চোখেমুখে নির্ভীক নির্দ্বন্দ্ব ভাব। দৃষ্টি পাথর-কঠিন।

লুঠ এদের পেশা। হত্যা এদের নেশা। তর্জনীর প্রান্ত ঝিলবার ঘোরানোর কায়দা দেখেই এ-সত্য হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল সুন্দা সিংয়ের। প্রমাণ পেয়েছিল প্যাগোডায় ঢুকেই। দীর্ঘ অলিন্দপথের পাশে সারি সারি ঘর। একটি ঘরের মেঝেতে চট মুড়ে সেলাই করা সন্দেহজনক একটি বস্তু। সুন্দা সিং-এর মেরুদণ্ড শিহরিত হয়েছিল। মৃত-দেহ চটে মুড়লেও চেনা যায় বইকি।

প্যাগোডার পীত-বেশ সাধকদের তির্যক চোখে অপরিসীম বিষাদ। অপাঙ্গে ওরা দেখল সুন্দা সিংকে। বিষণ্ণ চোখে ভাব-বৈকল্য দেখা গেল না। সুন্দা সিং-এর পরিণতি যেন ওরা জানে।

অন্ধকার কুঠরির খড়ের গাদায় শায়িত সুন্দা সিং তাই এত নির্জীব। অহিংসার তপোবনে চরম হিংসা আশ্রয় নিয়েছে। ভিক্ষুরা তাই বাক্যহারা।

আচম্বিতে পায়ের দুহাট হল। দোর-গোড়ায় আবির্ভূত হল মর্কটদেহ এক মূর্তি। অলিন্দপথের ম্লান আলোকে দেখা গেল তার তির্যক চোখের উল্লাস, হলুদ-দাঁতের হাসি। লোকটা বর্মী, কি চীনে, কি থাই—ধরা মুস্কিল।

খট্টাসের মত অট্টহাসি হাসল মর্কটদেহ আগন্তুক। বলল—'ওহে সুন্দা সিং, ঘুম ভাঙল?' লোকটা ইংরেজী জানে।

মস্ত গলায় জবাব দিল সুন্দা—'আমার আমার পাশবালিশ ছাড়া ঘুম হয় না।'

প্যাগোডা কাঁপিয়ে খট্টাস-হাসি হাসল মর্কটদেহ মঙ্গোলীয়।—'সুন্দর পাঠা আমি দেখছি। লোভ কষ্টকর থাকে। নাও, উঠে পড়ো।'

কোথায়?'

'ওস্তাদের কাছে।'

'কে তোমার ওস্তাদ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না মর্কটদেহ মঙ্গোলীয়। তেরচা চোখে কৌতুক নাচিয়ে নীরবে নিরীক্ষণ করল সুন্দাকে। তারপর বলল—মাসা দাউদ।'

সুন্দা সিং-এর মনে হল, যেন টকটকে রাঙা একটা লোহ-শলাকা কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করল। মাসা দাউদ। নামটা অদ্ভুত, কিন্তু ভয়ংকর। জলে-স্থলে অন্ত-রীক্ষে মাসা দাউদের অদৃশ্য চক্রান্তজাল বিছোনো—সে-জালে কখন যে কার প্রাণ-বিয়োগ ঘটবে, তা অনিশ্চিত। মাসা দাউদ। মদ্য লুণ্ঠন এবং সন্ত্রাসের জন্য যে রাক্ষস-সম নিষ্ঠুর—অপরাধী মহলে সে মাসা দাউদ নামেই পরিচিত। কুবেরের মত ধনবান সে, কিম্পুরুষের মত তার অনুচরবর্গ।

মাসা দাউদের নাম শোনামাত্রই সুন্দা সিংয়ের ক্ষীণ আশাটুকুও তিরোহিত হল। এ-যাত্রা তার আর রেহাই নেই। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

•

প্যাগোডার কেন্দ্রস্থলে একটি ঘর। সুসজ্জিত। সম্ভবত প্রধান ভিক্ষুর দফতর।

মস্ত টেবিলের ওপর দু'পা তুলে দিয়ে অর্ধশায়িত মাসা দাউদ। নির্নিমেষে চেয়ে-ছিল। আর সুন্দা সিং দেখছিল বহু নারকীয় কাণ্ডের হোতা পিশাচশ্রেষ্ঠ মাসা দাউদকে। চ্যাটালো থ্যাবড়া মুখ। অর্ধ-নিমীলিত তির্যক চোখদুটো যেন দুখণ্ড নরক দিয়ে তৈরি। নিরুত্তাপ। অবিকল মড়ার চোখের মত।

সুন্দা সিং নির্ভীক থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু বেশ বুঝল, হৃদযন্ত্র আর স্থির থাকতে পারছে না।

সুন্দার ডান হাতে হাতকড়া। হাত-কড়ার অপর প্রান্ত মর্কটদেহ সেই মঙ্গো-লীয়র বাম কব্জিতে আঁটা। আসবার পথে তাই পলায়নের কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে-ছিল সুন্দা।

মাসা দাউদের নিরীক্ষণপর্ব শেষ হল। মর্কটদেহকে শুধোলো—কোথায় পেলে মাংচু?'

মাংচু বলল—'বাটাভিয়াতে কিছুদিন আগে একটা স্পাইকে খতম করেছিলাম মনে আছে?'

'আছে। পিয়ানোর তারে ফাঁস দিয়ে-ছিল ভুলটা।'

'হাঁ। তারপরেই এই টিকটিকিটা এসেছে। দলটাই পাকড়াও করেছে। আপনার হুকুম না জানা পর্যন্ত পিয়ানোর তার আর বার করেনি। আপনি যা বলবেন, তাই হবে।'

তর্জনীর নখ দিয়ে গাল চুলকোলো মাসা দাউদ। মড়ার চোখ মোটেই চঞ্চল হল না। শুধু বলল—মিসেস ফ্যানটম্যাস।'

'রাইট স্যার।' পরমানন্দে উদ্ভাসিত হল মাংচুর পীতানন—অনেকদিন হাতখালি যাচ্ছে মিসেস ফ্যানটম্যাসের।'

(ক্রমশঃ)

সংবাদের চোখে

আর একটুখানি পেতে চাইঃ সুধীর কর্মকার

শনিবার, ১৭ এপ্রিল। দুপুর দেড়টা থেকে বসে আছি ইস্টবেঙ্গল টেন্টে। আগের দিন ফোনে কথা হয়েছিল—সুধীর মনে-মনে চাকরী, অন্যান্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইত্যাদির লিস্ট-ফিস্ট ঘেঁটে বলেছিলেন, দুটো নাগাদ আসুন। ঘণ্টা দুয়েক অনায়াসেই গল্প করা যাবে। চারটের সময় আবার বেরোতে হবে, অফিস লীগের খেলা আছে একটা সাড়ে চারটেয়, বি জি প্রেস গ্রাউন্ডে। ওখান থেকেই চলে যাব ভবানীপুর টেন্টে। তারপর আর টাইম হবে না। ওদিকে রোববারই চলে যাব মাদ্রাজ, সন্তোষ ট্রফির খেলা।

আগে গেলে যদি আগেই ওঁকে পেয়ে যাই, সেই আশাতে আধ ঘণ্টা আগেই গিয়ে হাজির হয়েছি। না, সুধীর এখনো আসেন নি। মালি বলল, আসিব বই কি, উর খেলা আছে। টেন্টে আসিব।

টেন্টে, ক্লাবের ক্যান্টিনে, প্লেয়ার্স ড্রেসিংরুমে, গ্যালারীর ঘোরান সিঁড়িতে ক্লাবে ঢুকবার মুখে মোরাম বিছানো সরু পথে, বাইরে বটগাছতলায় তখন কয়েক শো কিশোর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে—ইস্টবেঙ্গলের খেলা, বেটন কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল, বম্বে ইলেভেনসের এগেনস্টে। খেলা আড়াইটায়, মোহনবাগান মাঠে। দুটো বাজতে চলল, সবাই এসে গেছে, জার্নাইল, মমতাজ, ওয়াহিদ, কামার আলি, সুধাদর্শন, গোবিন্দ, শিব দত্ত : আসেনি শুধু একজন—ইনাম। ক্লাব কর্তারা ঘন-ঘন ফোন করছেন। সাপোর্টাররা বার-বার এসে জিজ্ঞেস করছে—ইনাম আসে নি, আসবে না? ধুস, তাহলে আর খেলা দেখে কি হবে?

সোয়া দুটো। তখনো সুধীর আসে নি। অথচ সেজন্য কেউ চিন্তিত নয়, এক আমি ছাড়া। হত যদি এটা মে মাস। ক্লাবের লীগ খেলা শুরু হয়ে গেছে। অথচ খেলার পনেরো মিনিটও আর বাকী নেই শুরু হতে, তাহলে? ঐ একই সাপোর্টাররা কি পাগল করে তুলত না ক্লাবের কর্মকর্তাদের—সুধীর আসে নি, আসবে না? ধুস তাহলে আর খেলা দেখে কি হবে?

শুধু ক্লাব টিমে বা প্রাদেশিক দলে নয়, জাতীয় দলেও সুধীরকে বাদ দিয়ে কি কোন দল গড়া যায় আজ? বোধহয় না। বোধহয় কেন, পি কে, ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টারদের এক যুগের নয়নের মণি 'জালো' মনে করেন—ইম্পসিবল। সুধীর বর্তমানে ইন্ডিয়ার সেরা ব্যাক। ওকে বাদ দিয়ে কোন টিম গড়ার কথা ভাবাই অসম্ভব। জালোর কথা যে কতখানি খাঁটি তারই প্রমাণ মিলবে গত রবিবারের (১৮ এপ্রিল) খেলার পাতায় — 'ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় (১৯৭০) শ্রীসুধীর কর্মকারকে ক্লাবের পক্ষ থেকে 'পত্রিকা ট্রফি' উপহার দেওয়া হয়েছে।'

অথচ সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার যখন শনিবার সাড়ে তিনটেয় ক্লাব গেটে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, তখন খেলুড়ের চেহারা দেখে রীতিমত দমে গিয়েছিলাম। হাল্কা বেগুনী টেরিলিন ফুলহাতা সার্ট, বটল-গ্রীন কালো ডোরা প্যান্ট আর কালো সোয়েডের জুতোয় ঢাকা যে ছেলেটি স্মার্টলি হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে আসছে তাঁর গোঁফের রেখাও যে এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি ঠোঁটের ওপরে। দূরে সবুজ গ্যালারীতে বসে মস্ত মাঠে যাকে কতদিন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত ঘুরতে-ফিরতে দেখেছি, সে যে এত ছোট, এত অল্পবয়সী, তা কি কোনদিনও ভাবতে পেরেছিলাম!

কাছে এসে লাজুক হাসিতে বিনয় করে বললেন—সরি। জরুরী একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আসুন এবার।

সুধীরের হাতে একটা লাল-সাদা ডোরাকাটা কিটব্যাগ। জানতাম খেলা আছে, তবু মনে-মনে যে আশাটার অনেকক্ষণ ধরে একটু-একটু করে তা দিচ্ছিলাম—হয়তো আজ আর অফিস লীগের খেলায় খেলবে না, কারণই মাদ্রাজ চলে যাবে—

খামটা দেখেই বুঝলাম সেটা ভুল হয়েছে। চাকরী যে দিয়েছে, সে তো আর না খেলিয়ে ছাড়বে না, তা সে যত জরুরী খেলাই সামনে থাকুক না কেন।

ড্রেসিংরুমের বুকচাপা অন্ধকারে পোশাক পাল্টাতে-পাল্টাতে সুধীর আমার একটির পর একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলল। হাতে সময় খুব কম, সাড়ে চারটায় খেলা। বি জি প্রেস মাঠে কম করেও ইস্টবেঙ্গল টেন্ট থেকে কার্নিং করলে ধরে, হেঁটে যেতে হবে। আবার ছটায় হাজির হতে হবে ভবানীপুরে টেন্টে, বর্ষশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা। সময় খুব কম।

আর খুব কম সময়ের মধ্যেই তো সুধীর নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। দেশ ঢাকায়। দেশে যায় নি কখনো সুধীর। যাবে কি? পার্টিশনের পরে পরেই বাবা মুকুন্দলাল কর্মকার বাড়ীঘর, জায়গা-জমি, জমজমাট সোনা গয়নার দোকান সব ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। এসে উঠলেন টালার জলের ট্যাঙ্কের কাছে একটা দোতলা বাড়ীর একতলায়। এখানেই সুধীরের জন্ম পঞ্চান্ন সালে। পাঁচ ভাই এক বোনের মধ্যে সুধীর ন' ছেলে। বড় ভাইয়ের বয়সই আজ মোটে সাতাশ-আটাশ। মেজদা সুশীল এখনো পঁচিশ পেরোন নি। রিষড়া বিধান কলেজে বি-এ পড়েন সুশীল। চাকরীও করেন। আবার ফার্স্ট ডিভিশনে খিদিরপুরের ইনসাইডের প্লেয়ার।

ঐ মেজদাই সুধীরকে খেলার মাঠে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ীর সামনে ছোট্ট এক টুকরো জমি পড়েছিল। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে, মেজদা, সুধীরকে নিয়ে পাঁচসিকির রবারের বলে ফুটবল খেলতেন।

সিক্সটি ফোরে মুকুন্দবাবু বাসা পাল্টে উঠে এলেন পাইকপাড়ায়। দেড় যুগের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক কষ্টে আবার গড়ে তুলেছেন ছোট্ট একটা দোকান—শোভাবাজারে বেনেটোলা স্ট্রীটের ওপর জুয়েলারী শপ। ছেলে-মেয়েরা সব স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সুধীরও ভর্তি হোল পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইন্সটিটিউশনে।

টালা ছেড়ে পাইকপাড়ায় আসতেই মেজদা সুশীল গিয়ে নাম লেখালেন লোকাল ফুটবলের নার্সারীতে; দুগ্ধবাটী সঙ্ঘে। দাদার দেখাদেখি সুধীরও নাম লেখাল ক্লাবে। বাবার বিশেষ আপত্তি ছিল। বংশে কেউ কোনদিনও খেলে নি। বড় ছেলেও বাবার সঙ্গে দোকানে বসছে। খানদান থেকে এই মেজ আর ন' ছেলে দুটোর মাথায় যে কি ভূত চেপেছে?

ভূত না ছাড়লেও। ক্লাবের সেক্রেটারী নিশীথদা (শ্রীনিশীথ ব্যানার্জি) না থাকলে কোনদিনই বোধহয় ফুটবলের লাইনে আসতাম না। উনি সারাদিন আমাদের সঙ্গে লেগে থাকতেন। এ'র জন্যই বাবার আপত্তি সত্ত্বেও রেগুলার ফুটবল খেলতে শুরু করলাম। তখন আমাদের ক্লাবের কি অবস্থা। আমাদেরই একজন প্লেয়ার প্রশান্ত সিনহা, দীনু দাস। তাছাড়া এখনকার এরিয়ান্সের রামদাস, উয়াড়ির শ্যামসুন্দর সে এক সময় আমাদের ক্লাবে খেলেছেন। কোচ-টোচ কেউ ছিল না। টালা রেডিও পার্কে নিশীথদাই আমাদের খেলা শেখাতেন। রোজ খেলার আগে দশ-বারো বার গোটা পার্কটা চক্কর মারতাম, স্প্রিন্ট টানতাম, ইনসাইড, আউটসাইড বল ঘোরাতাম — এভাবেই আমার ফুটবলের হাতেখড়ি। চলুন, এবার বেরিয়ে পড়ি। সওয়া চারটে বাজে। সাড়ে চারটের খেলা। আধ মাইলটাক ছুটতে হবে।

তাকিয়ে দেখলাম ড্রেস করা কমপ্লিট। একটা স্পোর্টস গেঞ্জি আর সর্ট পরেছে, পায়ে মোজার ওপর কেডস, হাতে এক জোড়া ফুটবল বুট। সুধীর খেলার জন্য প্রস্তুত। বললাম, তাই চলুন—যেতে-যেতে পথেই কথা হবে।

আমরাও বেরোচ্ছি ঠিক এমনি সময় ইস্টবেঙ্গলের হকি প্লেয়াররা সব ফিরে আসছেন। তিন গোলে হারিয়ে দিয়েছেন বম্বে একাদশকে। ইনামুর মাঠেও আসেন নি। কচি-কাঁচাদের যে ভিড়টা হকি প্লেয়ারদের এসকর্ট করে মোহনবাগান মাঠ থেকে ইস্টবেঙ্গল টেন্টে নিয়ে এসেছিল তারাই এবার সুধীরদাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে ফেটে পড়ল। ইনাম আসেন নি তো কি হয়েছে, সুধীরদা তো এসেছেন। চলল তারাও পেছন-পেছন।

বটতলা বাঁয়ে রেখে, কাস্টমস মাঠ পেরিয়ে, রেড রোড ক্রস করে আমরা বি জি প্রেস মাঠের দিকে এগিয়ে চলেছি। চলতে চলতে কথা হচ্ছে। ছেলের দল সামনে-পিছনে দঙ্গল করে চলেছে। সুধীর বলে চললেন—সিক্সটি ফাইভেই স্কুল টীমে চান্স পেলাম। চান্স পেলাম মুগহাটীর জুনিয়র টীমেও। কিন্তু একটা মস্ত অসুবিধে দেখা দিল। রিষড়ায় নতুন গ্রামে আমাদের বাড়ী উঠেছে। আমরা সবাই রিষড়ায় চলে গেলাম।

রিষড়ায় এসে লোকাল ক্লাব অরোরায় ভর্তি হলাম। খেলা ও প্র্যাকটিস ঠিকই চলছিল, কিন্তু স্কুল যে মাথায় ওঠার যোগাড়। সেদিন হীরাবাবু (শ্রীহীরমোহন মুখার্জি), আমাদের মাস্টারমশাই যেভাবে আমায় সাহায্য করেছিলেন জীবনেও তা ভুলব না। রিষড়া টু স্কুল ট্রেনের মান্থলি আর গাড়ী ভাড়া মাসের পর মাস উনিই জুগিয়েছেন। উনি না থাকলে কোনদিনই বোধহয় আমার স্কুলে যাওয়া আর হত না। আমার সম্বন্ধে কিছু লিখলে দেখবেন যেন আমার মাস্টারমশাই-এর কথা বাদ না যায়। ওরকম লোক আর হয় না।

এইভাবেই স্কুল ও ফুটবল দুই চালিয়েছি। সিক্সটি সিক্সে চান্স পেলাম হুগলী জেলা একাদশে, আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায়। ঐ বছরই হুগলীর হয়ে খেলতে এলাম আই এফ এ শীল্ডে। প্রথম খেলা পড়েছিল জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে। আমরা এক গোলে জিতলাম। নেক্সট ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল মাঠে, জলন্ধর লিডার্সের বিরুদ্ধে। প্রথম দিন ড্র হোল, ওয়ান অল। পরের দিন আমরা তিন গোলে হেরে গেলাম।

হেরে গেছি। দু দিন ধরে হাড্ডা-হাড্ডির লড়াই করে ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলাম। মন-টন খুব খারাপ। এমন সময় কে এসে জানি বলল, আমায় জ্যোতিষদা (জ্যোতিষ গুহ) ডাকছেন। শুনেই চমকে উঠেছিলাম। আমায়? জ্যোতিষদা? ইস্টবেঙ্গলের জ্যোতিষদা? কেন?

গেলাম। খুব অল্প কথায় সরাসরি প্রস্তাব পাড়লেন জ্যোতিষদা—নেকসট ইয়ারে তুমি আমাদের ক্লাবে চলে এস।

ভেবে দেখুন, আমি একটা বোকা মফস্বলের ছেলে, কি খেলি নিজেও জানি না, সেই আমাকেই কিনা ডাকছেন ভারতের অন্যতম সেরা ফুটবল টিমের বড়কর্তা জ্যোতিষদা তাঁর দলের হয়ে খেলার জন্য। হুগলী টিম আমায় থার্ড ক্লাস ট্রেন ফেয়ার দিয়েছিল যাতায়াতের জন্য। সেদিন ফিরতি পথে মনে হোল যেন এরোপ্লেনে চেপে বাড়ী ফিরছি।

বাড়ীতে ফিরে বাবা ও দাদাদের সব বললাম। ও'রাও আমার মতই চমকে গিয়েছিলেন। পরামর্শ দিলেন—তোর বয়স কম। এখুনি অত বড় দলে নাম লেখাস না।

সেকথা বালী প্রতিভার কর্মকর্তারাও সেদিন সুধীরকে বলেছিলেন। অন্যায় কিছু বলেন নি। ক্যালকাটা ময়দানের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন কত সুধীরের অপমৃত্যু এভাবেই ঘটেছে। উঠতি বয়সে খেলায় চটক দেখিয়ে বড় টিমে চান্স পেয়ে, গ্যালারী ভর্তি হাজার-হাজার সাপোর্টার, দিকপাল সব খেলোয়াড়দের ভিড়ে তাল রাখতে না পেরে অল্প দিনেই তারা সব হারিয়ে গেছে। বালী প্রতিভা অফার দিল, সুধীরকে তারা বোম্বাইতে রোভার্স খেলাতে নিয়ে যাবে।

এদিকে জেলা ফুটবলের নেকসট ম্যাচ পড়েছে জলপাইগুড়িতে। আমি দলের সঙ্গে গেলাম। এখানেই কাগজে পড়লাম ইস্টবেঙ্গল এগজিবিশন ম্যাচ খেলতে আগরতলায় চলে গেছে।

জলপাইগুড়ির ফিক্সচার কমপ্লিট করে কলকাতায় ফিরে আমি বালীর সঙ্গে চলে গেলাম বোম্বাইতে রোভার্স খেলতে। দাঁড়ান। গাড়ীগুলো যাক। রাস্তাটা ক্রস করে বাকী কথা হবে।

লাইন দিয়ে গাড়ির ঝাঁক ছুটে আসছে—রেড রোড গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। একটু ভিড়টা ফাঁকা হতেই আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চওড়া রাজপথ পেরিয়ে এলাম। সামনে ইউনিভার্সিটি মাঠ, তারপর ডাফরিন রোড।

পরের বছর নাম লিখলাম বালী প্রতিভায়। লীগ, শীল্ড দুই খেললাম। গোটা সিজনটার জন্য হাতখরচা হিসাবে পেয়েছিলাম শ' পাঁচেক টাকা। আমার ফুটবলের প্রথম আয়।

CENTRAL LIBRARY

প্রথম আর বলছেন কেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি—এদেশে তো শুনি সব খেলোয়ারই উঠতি আর পড়তি বয়সে খেপ খেলে দু পয়সা কামান। আপনি?

না—লাজুক সুধীরের চোয়াল জোড়া দেখলাম মুহূর্তে শক্ত হয়ে উঠল। আমি খেপ খেলি নি, খেলি না। বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে দু চার জায়গায় মাঝে মাঝে খেলি বটে, তবে সে শুধু রিকোয়েস্ট রাখার জন্য; টাকা নিই না। টাকাটা বড় কথা নয়, সুধীর কথার মোড় ঘোরালেন. আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। জ্যোতিষদাকে কথা দিয়েও রাখলাম না।

পরের বছর অফার এল এরিয়ান্স থেকে। আটষট্টিতে আমি দল পাল্টালাম।

ঐ বছরই সুধীর জুনিয়র বেঙ্গল টিমে প্রথম চান্স পেলেন। ডুরান্ডও খেললেন ঐ বছরই প্রথম এরিয়ান্সের হয়ে। দু বছরেই কলকাতার মাঠে নিজের জায়গাটা (রাইট ব্যাক) পাকা করে ফেললেন সুধীর। নাম হয়েছে, রেটও প্রায় বেড়েছে পাঁচগুণ। অনেক ক্লাবেরই নজর এই ছোটখাট চাইনিজ ওয়ালটির দিকে। ঐ বছরই বরদলুই ট্রফির সেমি-ফাইনাল খেলতে গিয়ে আবার দেখা হল জ্যোতিষ গুহর সঙ্গে গৌহাটিতে।

সেমি-ফাইনাল — ইস্টবেঙ্গল ভার্সাস এরিয়ান্স। প্রথম দিন হোল ড্র। দ্বিতীয় দিন খেলা ভাঙ্গার এক মিনিট আগে একটা গোল দিয়ে ইস্টবেঙ্গল জিতে গেল। তার চেয়েও বড় জয় হোল ইস্টবেঙ্গলের। জ্যোতিষদার পার্সুয়েশানে দল ছাড়তে রাজী হলেন সুধীর।

কিন্তু চাইলেই কি সহজে ঘাঁটি খেলোয়াড়কে দলে টানা যায়। অফার তো শুধু ইস্টবেঙ্গলই দেয় নি। দিয়েছে ইস্টার্ণ রেল, বলেছে গার্ডের চাকরী দেবে। এরিয়ান্সও ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত ইস্ট-বেঙ্গলই জিতল। উনসত্তরে সুধীর এলেন ইস্টবেঙ্গলে।

সে বছর ইস্টবেঙ্গল পেয়েছিল শুধু রোভার্স কাপ। আর সুধীর পেলেন ক্রীড়া সাংবাদিকদের বিচারে বর্ষশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি হিসাবে 'পত্রিকা ট্রফি'

আটষট্টিতে এরিয়ান্সে থাকতেই সন্তোষ ট্রফিতে খেলবার সুযোগ এসেছিল সুধীরের। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার জন্য যেতে পারেন নি। উন-সত্তরে আবার সেই সুযোগ এল—এবার আসামের নওগাঁয়। বাংলাদল সন্তোষ ট্রফি নিয়ে ঘরে ফিরেছিল সেবার। ঐ বছরই আই এফ এ একাদশের হয়ে রাশিয়ান ও চেক দলের বিরুদ্ধে খেললেন সুধীর। কিন্তু আশা তখনো তত মেটেনি। মনে আছে, দিল্লীতে ডুরান্ড খেলতে গিয়ে প্রশান্তদা আর জর্নেলদার সেই কথা—এশিয়ান না খেললে জীবন অসার্থক।

সেই সুযোগ এল পরের বছর, সত্তরে। সত্তরে ইস্টবেঙ্গল এক মরশুমে তিনটে বড় ... ...রে তুলল—লীগ, শীল্ড ও ডুরান্ড। সুধীরও এগিয়ে চললেন আশা পূরণের পথে। জুলাইতে ইন্ডিয়ার হয়ে খেলতে গেলেন মার্ডেকায়। ডিসেম্বরে গেলেন ব্যাঙ্ককে, এশিয়াড খেলতে। তখন ওর বয়স মোটে কুড়ি। চোদ্দ বছরে চলে গিয়েছিলেন সুধীর মুগবাড়ীর সিনিয়র টিমে, বিশ বছরে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করলেন এশিয়ান গেমসে। ভুল গেলে চলবে না নইম, প্রসাদ, ভট্টাচ, অতীতের পাল্ব মিত্রিদের মত সাধা খেলোয়াড়দের ভিড়ে এভাবে নিজের জায়গা করে নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তার জন্য সুধীরকে কম খেসারত দিতে হয় নি, বা কম পরিশ্রম করতে হয়নি।

সে কথাতেই আসছি এবার। কথার ফাঁকে ফাঁকে ইউনিভার্সিটি মাঠ, ডাফরিন রোড, ওয়াই এম সি এ মাঠ ছাড়িয়ে কখন যে আমরা বি জি প্রেস মাঠে চলে এসেছি টেরও পাইনি। মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি অপোনেন্টরা নেমে গেছেন। রেফারী ঘন ঘন হুইসিল বাজাচ্ছেন। ইস্পাত দল এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল সুধীরের জন্য।

সুধীরকে দেখে ইস্পাতের ক্যাপ্টেন অতীতের নামকরা ব্যাক বিক্রম দেবনাথ এগিয়ে এলেন—হারি আপ সুধীর। এবার নামব। কেডস খুলে বুট পরতে পরতে ম্লান মুখে লাজুক হাসির আড়ালে সুধীর বললেন—গত বছর হিন্দুস্থান স্টীলে চাকরী পেয়েছি। স্পোর্টস এ্যাসিস-ট্যান্ট। একটু ওয়েট করবেন? আবার হাফ টাইমে কথা হবে।

ঘন ঘন হুইসিল বাজার ঝড়ের মধ্যে সুধীর দলের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়লেন। মুহূর্তে আরম্ভ হয়ে গেল অফিস লীগের খেলা। আর সেই সুযোগে আমি পাকড়াও করলাম পি দেকে। উনি মাঠের ধারে চেয়ারে বসে খেলা দেখছিলেন। আমি সুধীরকে কভার করছি শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন—লিখুন, ওকে নিয়ে লিখুন। ওর মত একটা ছেলে হয় না। খুব কাছে থেকে ওকে আমি দেখেছি: একটা ভাল খেলোয়াড়ের যা যা দরকার সব আছে ওর। মনে রাখবেন, ভাল বলতে আমি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলছি। তবে কি জানেন, ওর হাইটটা একটু শর্ট। ফলে শর্ট জাম্প ভাল দিতে পারে না। কর্ণারের সময় একটু লম্বা প্লেয়ার হলেই ওর মাথা থেকে বল ছোঁ নিতে পারবে। আমার তো মনে হয় ওর ব্যাকের পজিশন ছেড়ে হাফেই খেলা উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, সুধীর রাস্তায় আসতে আসতে এক সময় বলেছিলেন যে, জ্যোতিষ গুহ ইস্টবেঙ্গলে গোড়ার দিকে ওকে হাফেই খেলাতেন। নোটবুকে কথাটা যখন টুকছি কানে এল উনি বলছেন—ওর সঙ্গে নইমের খেলার খুব মিল আছে। তবে আমার মতে ও এখন নইমের চেয়েও বেটার খেলে। কলকাতায় যত ব্যাক ব্যাক আছে, তাদের সঙ্গেই ওর আর তুলনা চলে না।

হাফ টাইম হতেই মধ্য মাঠে ছুটে গেলাম। যেতেই হেসে বললেন সুধীর, বলুন, আর কি জানতে চান? লক্ষ কর-লাম একটুও টায়ার্ড হননি সুধীর। সে কথা বলতেই হেসে ফেললেন—দেখুন নব্বই মিনিটের খেলা খেলেও আমি টায়ার্ড হই না, এতো সবে পঁচিশ মিনিট খেলেছি। সারা বছর আমি প্র্যাকটিশ করি। ভোর সাড়ে চারটায় উঠে, পাঁচটায় ট্রেন ধরে কল-কাতায় চলে আসি। সাতটা থেকে নটা—একটানা দু ঘন্টা প্র্যাকটিশ করি। তারপর ক্লাবেই স্নান খাওয়া সেরে ছুটি অফিসে। ফলে দম হারালে চলবে কি করে?

দেখলাম এর একবর্ণও মিথ্যে নয়। পাক্কা এক ঘন্টা মাঠে দাবড়ে বেড়িয়েও ক্লান্ত হয় নি মোটেও। কয়েক বিন্দু ঘাম ঝরে পড়বার অপেক্ষায় কপালের আনাচের ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। পলকে বুট জোড়া খুলে কেডস পরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুধীর। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, আপনি বার বার দমের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, দেখুন আমি একটুও টায়ার্ড হই নি। হব কে? আমি সিগারেট পর্যন্ত ছুঁই না। খেলাকেই ভালবাসি শুধু, খেলা নিয়েই আছি। আছি বললে ভুল হবে, এটাই আমার জীবনের সব। খেলাই আমার পরিচিত করাল—খেলার সুবাদেই দেশ বিদেশের মাঠে ময়দানে যেতে পারছি। ফলে এখানে আমার কোন কমপ্লেক্স নেই।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গড়ের মাঠে বৈশাখের গাঢ় বিকেল ফিকে হয়ে আসছে। বিশাল সমুদ্রের ফেনার এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা দল করছে প্র্যাকটিশ, বৃদ্ধেরা বেরিয়েছেন সান্ধ্যভ্রমণে, শিশুরা প্র্যামে চেপে বাড়ীর আয়াদের সঙ্গে এসেছে খোলা মেলায় মুক্ত হতে। ছিপছিপে ছেলেটি ক্রমশঃ আমার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে। ডাফরিন রোড ছাড়িয়ে ইউনিভার্সিটি মাঠের ঢালুতে নেমে যাচ্ছে সন্ধ্যায়। একটু বাদেই হবে ওর সম্বর্ধনা। ভীষণ ব্যস্ত—প্র্যাকটিশ, চাকরী, খেলা, লোক জনের অনুরোধে আজ কাল আবার স্কুল বা ক্লাবের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনিতে প্রিসাইডও করতে হচ্ছে। কিন্তু কথাবার্তায় একটুও অহংকার নেই। ঠান্ডা মাথা। ক্যাল-কুলেটিভ। বিশ বছরেই এদেশের খেলার মাঠে একজন খেলোয়াড়ের যা যা প্রাপ্য থাকে সব ও পেয়েছে তবু অতৃপ্ত সুধীর। যাবার আগে বলেছিল, আর একটুখানি পেতে চাই। প্রি-অলিম্পিক বা অলিম্পিকে ইন্ডিয়ার হয়ে খেলা—সেই আমার লাস্ট অ্যাম্বিশন।

।সাম্বন্দ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

পঞ্চম অধ্যায়

মিউনিক চুক্তির কলঙ্ক

১৯৩৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ফিরিয়া আসিলেন লন্ডনে। ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটে মন্ত্রিভবনের সম্মুখে এক উদ্বিগ্ন জনতা ইউরোপের ভাগ্য জানিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। মিঃ চেম্বারলেন সেই জনতার উদ্দেশ্যে একখানি কাগজের টুকরা বিজ্ঞাপনের ভঙ্গীতে আন্দোলিত করিয়া বলিলেন : 'I believe it is peace in our time' অর্থাৎ এর দ্বারা আমাদের আমলে শান্তি সুনিশ্চিত হইল।

সেই কাগজের টুকরায় মিঃ চেম্বারলেন ও হের হিটলারের স্বাক্ষর ছিল। অপেক্ষমাণ জনতা ইউরোপের আসন্ন দুর্বিপাক নিবারিত হইল অনুমান করিয়া বিপুল করতালি ও ধ্বনির দ্বারা চেম্বারলেনকে অভিনন্দন জানাইল। কিন্তু সেই উৎসুক জনতা জানিত না যে, সেই স্বাক্ষরিত কাগজের টুকরা শীঘ্রই নাৎসী ঘূর্ণিঝড়ে দিগন্তে উড়িয়া যাইবে।

ইউরোপের বিগত ১০০ বছরের ইতিহাসে মিউনিক চুক্তির মত এত বড় কলঙ্কিত চুক্তি আর কখনও স্বাক্ষরিত হয় নাই। কারণ, এই চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার মত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকেই হিটলারী জার্মানীর নিকট বলি দেওয়া হইল না, চেক গভর্ণমেন্ট ও জনগণের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল। অবশ্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার উদ্ভব প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি অনুসারে। কিন্তু ১৯১৯ সালে যেভাবে এই রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল, তাতে এর সংগঠনের মধ্যেই গভীর ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল। কারণ, কতকগুলি ন্যাশনাল মাইনরিটির সমবায়ে এই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। যেমন, স্লোভাক, হাঙ্গেরীয়ান, রুথেনীয়ান ও জার্মান ইত্যাদি। অর্থাৎ একমাত্র চেকদের দ্বারা গঠিত কোন ন্যাশনাল স্টেট বা জাতীয় রাষ্ট্র নয়। বরং ওটা ছিল বিভিন্ন অধিজাতিবহুল রাষ্ট্র। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার দুইটি প্রাক্তন প্রদেশ, অস্ট্রিয়ার সাইলেসিয়া এবং হাঙ্গেরীর স্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া—এই রাজ্যখণ্ডগুলিকে নিয়া যে চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্র (মোট আয়তন ৫৪ হাজার বর্গমাইল) গঠিত হইল, তার মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে চেক ও স্লোভাক ছাড়া ছিল ৩৩ লক্ষ জার্মান, ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ম্যাগিয়ার (Magyars) ৪ লক্ষ ৮০ হাজার রুথেনীয়ান এবং বহু পোলিশ ও ইহুদী। কিন্তু এই রাষ্ট্রে মাইনরিটি বহুল হইলেও টমাস মাসারাইক ও এডোয়ার্ড বেনেসের নেতৃত্বে সুশাসিত ছিল এবং পশ্চিমী গণতন্ত্রের বিচারে পূর্ব ইউরোপের সবচেয়ে উন্নত, উদার ও সেরা রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু গোল বাধাইল সুদেতেন জেলার জার্মান সংখ্যালঘুরা। যারা নির্যাতিত সুদেতেন জার্মানরূপে হিটলারী প্রচার কার্যের দৌলতে সেদিনের আন্তর্জাতিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। গোড়া থেকেই জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের গর্বেতে ওরা কলরবমুখর ছিল এবং হিটলার কর্তৃক অস্ট্রিয়া গ্রাসের পর (যে অস্ট্রিয়াতেও অনুরূপ জার্মান সমস্যা ছিল) এই সুদেতেন জার্মানরা খাস জার্মানীর সহিত মিলিত হওয়ার জন্য বিরাট হট্টগোল সৃষ্টি করিল এবং কেন্দ্রীয় চেক গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত অত্যাচারের (যেমন, সমান অধিকার নাই, চাকুরির সুযোগ নাই, ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাই, উপযুক্ত মর্যাদা ও স্বাধীনতা নাই ইত্যাদি) অভিযোগ আনিয়া তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিল—যদিও আসলে এদের অভিযোগের সত্যকার কোন ভিত্তি ছিল না। কারণ, বৃটিশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টার ন্যাশনাল এফেয়ার্সের (১৯৩৮, এপ্রিল) এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সুদেতেন জার্মান রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রচার করা সত্ত্বেও চেক গভর্ণমেন্ট তাদের সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ এবং একগুঁয়ে মাইনরিটিরা একটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জীবন কেমন অসহ্য করিয়া তুলিতে পারে বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষে মুসলিম লীগের আন্দোলন তার প্রমাণ, যার ফলে শেষ পর্যন্ত আপোষ রফা হিসাবে ভারতবর্ষকে (১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে) পার্টিশান করিতে হইয়াছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জার্মানদের আন্দোলনেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মহম্মদ আলী জিন্নাকে নিশ্চয়ই হিটলারের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। কিন্তু জিন্নাসাহেবের অনুরূপ নেতৃত্বের কঠোরতা, কূটবুদ্ধি ও চতুরতা হিটলারের ছিল—যে নেতৃত্বের প্ররোচনা সুদেতেন জার্মানদের প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। হিটলার এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ওৎ পাতিয়া ছিলেন। কারণ, ভৌগোলিক সংস্থানের বিবেচনায় অস্ট্রিয়া গ্রাসের পর চেকোশ্লোভাকিয়া যেন নাৎসী নেকড়ের থাবার মধ্যে আসিয়া গেল—যে চেক রাষ্ট্রকে কোন মতেই অনিষ্ট করা হইবে না বলিয়া নাৎসী নেতারা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১১ই মার্চ সন্ধ্যায় বার্লিনের এক উৎসব অনুষ্ঠানে দুই নম্বর নাৎসী নেতা স্বয়ং হেরমান গোয়েরিং চেক রাষ্ট্রদূত মিঃ মাস্টনির (Mastny) হাতে হাত দিয়া বলেন :

> 'I give you my word of honour and speak also in the name of Fuhrer,

অর্থাৎ আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এবং স্বয়ং ফুয়ারের নামে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, অস্ট্রিয়া দখলের ফলে জার্মান চেকোশ্লোভাক সম্পর্কের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা হইবে না।

কিন্তু মুখে গোয়েরিং এই প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করিলেন বটে, কিন্তু তার অনেক আগেই চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পরিকল্পনা হইয়াছিল। কারণ, গোপন দলিল হাতে দেখা যায় যে, ভেরমাখটের (সৈন্যবাহিনীর) সুপ্রীম কমাণ্ডার ও সমরমন্ত্রী মার্শাল ফন ব্লমবার্গ হিটলারের সঙ্গে আলোচনার পর ১৯৩৭ সালের ২৪শে জুন এই মর্মে এক নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন যে, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতেছে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করা। এই আক্রমণের প্রস্তুতি হইবে শান্তির সময়ে এবং অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা চেক সৈন্য ও জনগণকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে কাবু করা।

১৯৩৭ সালের ৫ই নভেম্বর হিটলার রাইখ চ্যান্সেলারীতে বড় বড় সমর নেতা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর (তখন ফন নিউরাথ) বৈঠকে চার ঘণ্টার অধিক কাল ধরিয়া যে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তাতে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং এর রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল নিজের ধারণা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অস্ট্রিয়া দখলের পাঁচ সপ্তাহ পরে ১৯৩৮, ২১শে এপ্রিল জেনারেল কাইটেলের সঙ্গে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য ও অজুহাত সৃষ্টির জন্য স্থির করেন—

> "A lighting action on the basis of an incident (for example, the murder of the Guman envoy following an anti-German demonstration)".

অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে জার্মান বিরোধী বিক্ষোভ সংগঠন

CENTRAL LIBRARY

সাবান একটি লাভ তিন রকম

নিকো বীজাণুনাশক সাবান অন্যান্য সাবানের চেয়ে আপনার ত্বকের বেশী পরিচর্যা করে

১ নিকো ত্বকের বীজাণু নাশ করে

২ নিকো ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে

৩ নিকো ত্বককে পরিষ্কার ও সুরক্ষা করে

নিকো সাবান দিয়ে প্রত্যহ স্নান করা ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা উপায়। নিকোর বীজাণুনাশক ফেনা ত্বকের বীজাণু নাশ করে ও দ্রুত ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সেই সঙ্গে নিকোর ভেষজ উপাদানগুলি সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে। নিকোতে এমন সব জোরালো বীজাণুনাশক পদার্থ আছে যা ছোটখাটো চর্মরোগ প্রতিরোধ করে আর মোলায়েম অথচ সম্পূর্ণভাবে আপনার ত্বক পরিষ্কার করে। ফলে, আপনার ত্বক হয়ে ওঠে লাবণ্যময় উজ্জ্বল তরতাজা। নিকো আপনার ত্বককে ব্রণ ও ঘামাচির হাত থেকে বাঁচায়। নিয়মিত ব্যবহার করলে মাথার খুসকি দূর করে। আপনার ত্বকের যত্ন ও স্বাস্থ্যের জন্য আজ থেকেই ব্যবহার করতে শুরু করুন তিনভাবে লাভদায়ক সাবান নিকো।

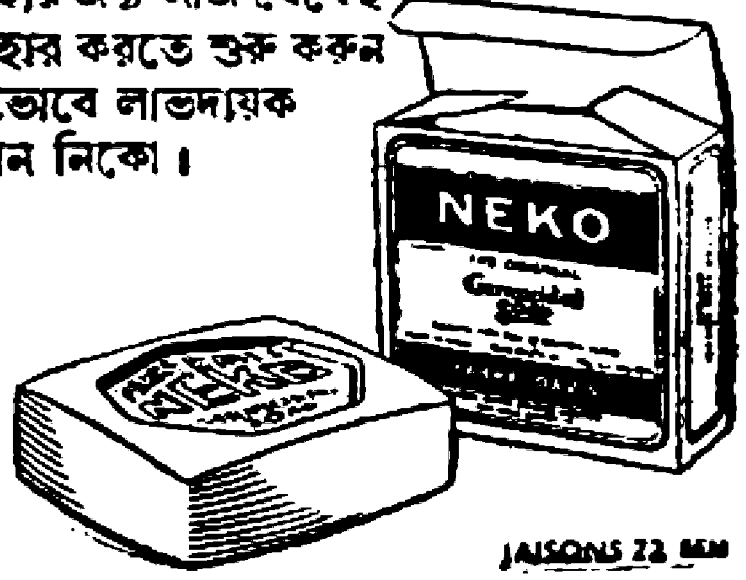

TRIPLE ACTION

NEKO

The Original Germicidal Soap

PARKE-DAVIS

JAISONS 22 BEN

করিয়া সেই হট্টগোলের সুযোগে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে খুন করা হইবে এবং সেই খুনের অজুহাত ধরিয়া বিদ্যুৎগতিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

একবার কল্পনা করুন নিজেদের রাষ্ট্রদূতকে নিজেরাই খুন করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন অপর একটি স্বাধীন দেশ দখলের অজুহাত সৃষ্টির জন্য: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎসতার আগেই নাৎসী নীতি ও নৈতিকতার কুত্র দৃষ্টান্ত। ১৯৩৮, ৩০শে মে হিটলার পুনরায় জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতিগণের নিকট এই মর্মে এক স্বাক্ষরিত 'গোপন হুকুমনামা' পাঠাইলেন—

'It is my irrevocuble decision to destroy Czechoslovakia before long through a military action!

অর্থাৎ সামরিক আক্রমণের দ্বারা অনতিকাল পূর্বেই চেকোশ্লোভাকিয়াকে ধ্বংস করাই আমার অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত। (এই উক্ত সামরিক পরিকল্পনায় চেকোশ্লোভাকিয়ার সাঙ্কেতিক নাম রাখা হইয়াছিল গ্রীণপ্লান)। *

এদিকে সুদেতেন জার্মান নাৎসী নেতা কোনরাড হেনলেইন বার্লিনের হিটলারী চক্রান্তের প্ররোচনায় চেক গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নানা ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালাতে লাগিলেন (১৯৩৮, এপ্রিল, এবং আরও বুদ্ধি ও পরামর্শের জন্য ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর খোদ হিটলারের কাছে গিয়া হাজির হইলেন। বার্লিন থেকে ফিরিয়া আসিয়াই হেনলেইন তাঁর সশস্ত্র পার্টি বাহিনীর দ্বারা চেক সরকারের নিরাপত্তা সংগঠনগুলির উপর আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন এবং এভাবে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল, সেই অজুহাত ধরিয়া হেনলেইনের দল প্রাগ সরকারের সঙ্গে আপোষ আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিল—৭ই সেপ্টেম্বর। এদিকে হিটলার আবার এই ঘটনার সূত্র ধরিয়া ১২ই তারিখ ন্যুরেমবার্গের পার্টি কংগ্রেসে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে বিষম তর্জন গর্জন করিলেন। এভাবে একদিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ সংগঠন করিয়া অপর দিকে দুনিয়াব্যাপী এই মর্মে প্রচারকার্য চালাইলেন যে, চেক সরকারী অত্যাচারে সুদেতেন জার্মানদের জীবন অতিষ্ঠ। অথচ ২৮শে মার্চ সুদেতেন জার্মানদের নেতা ও হিটলারের নিযুক্ত 'ভাইসরয়' হিসাবে হেনলেইন চেক সরকারের নিকট এমন সমস্ত দাবী পেশ করার মতলব আঁটিয়াছিলেন যে দাবী কোন সরকারই মানিয়া লইতে পারে না। হেনলেইন নিজেই এই বিষয়ে বলিয়াছিলেন—

'We must always demand so much that we can never be satisfied.

এভাবে ধাপ্পাবাজি ও জোর-জবরদস্তি দ্বারা যে অবস্থার সৃষ্টি করা হইল, তার প্রতিকারে বার্লিন থেকে দাবী করা হইল যে, সুদেতেন অঞ্চল জার্মান রাষ্ট্রকে হস্তান্তর না করিলে কিছুতেই শান্তি আসিবে না। নাৎসী সংবাদপত্রগুলিও জার্মান মাইনরিটিদের উপর চেক সরকারের অত্যাচার সম্পর্কে কাল্পনিক কিম্বা অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করিতে লাগিল এবং হিটলারের আগ্রাসী মনোভাবও ক্রমশঃ চড়া সুরে উঠিতে লাগিল। যদিও চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী রণনৈতিক পরিকল্পনা কাগজপত্রে প্রস্তুত ছিল, তথাপি তাঁর এমন একটা অস্পষ্ট আশা ছিল, যে, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের হট্টগোল থেকে ভূমধ্যসাগর নিয়া বৃটিশ-ফরাসী-ইতালী একটা প্রকাণ্ড বিরোধে জড়াইয়া পড়িবে কিম্বা ফ্রান্সে এমন একটা আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিবে যে, সেই সুযোগে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়াকে পাকা ফলটির মত পাড়িয়া আনিতে পারিবেন। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে কোন বিরোধ বাধিল না বটে, তথাপি হিটলার অষ্ট্রিয়ার মত চেকোশ্লোভাকিয়াও বিনা যুদ্ধে কাড়িয়া আনিতে পারিলেন এবং এই কার্য তিনি করিতে পারিলেন তাঁদেরই হাত দিয়া—অর্থাৎ বৃটিশ ও ফরাসী গবর্ণমেন্টের হাত দিয়া, যাঁদের কাছ থেকে বাধা ও বিপত্তির তিনি এত ভয় করিতেছিলেন।

*

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে হিটলার যেভাবে ক্রমশঃ উগ্রমূর্তি ধারণ করিতেছিলেন, তাতে ইউরোপে যুদ্ধ লাগিয়া যাইতে পারে এই আশংকায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি একা নন, সঙ্গী জুটাইলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঃ দালাদিয়েরকে, যিনি মুখে তোষণনীতির বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কাজে সেই নীতিই অনুমোদন করিয়া চলিতেন। আর তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ বনেট (Bonnet) ছিলেন তোষণ নীতির বা appeasment এর মূর্তিমান বিগ্রহ। সেই সময় বৃটিশ ও ফরাসী মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য কেবল সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিই বিরূপ ছিলেন না, নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলিকে তোয়াজ করিয়া তাঁদের খুসী করিবার জন্যও ব্যগ্র ছিলেন। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল যে এভাবে যুদ্ধ এড়ানো যাইবে এবং হিটলারী রাজ্য-পিপাসাকে পূর্ব দিকে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে। এই তোষণনীতির সবচেয়ে বড় পাণ্ডা ছিলেন বৃটেনের নেভিল চেম্বারলেন, মিউনিক চুক্তির কুকীর্তির জন্য যাঁর নাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে মসীলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মত বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফাক্স (বৃটিশ ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলনের যুগে যিনি লর্ড আরউইন নামে ভারতবর্ষের বড়লাট এবং গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের স্বাক্ষরকারী রূপে সেই সময় 'সাধু খৃষ্টান'রূপে গান্ধীবাদীদের কাছে বাহবা পাইয়াছিলেন), বার্লিনের বৃটিশ রাজদূত স্যার নেভিল হেণ্ডারসন এবং লর্ড রান্সিম্যান প্রভৃতি এই তোষণনীতি নাটকের এক-একজন ছোটবড় নায়ক ছিলেন। হিটলার কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখলের (১৯৩৮, ১২ই মার্চ) মুহূর্ত থেকেই বৃটিশ সরকার চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে 'সজাগ' হইলেন এবং তখনই এই বিষয়ে ফ্রান্সের মতামত জানিতে চাহিলেন। কারণ, বৃটিশ সরকার অনুধাবন করিলেন যে, লোকার্ণো চুক্তি (১লা এপ্রিল, ১৯২৫) অনুসারে ইউরোপে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের আছে। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের জন্য বল প্রয়োগ বা যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। অতএব জার্মান সংখ্যালঘুদের সমস্যা মীমাংসার জন্য চেকোশ্লোভাক গবর্ণমেন্টের উপর চাপ দিতে হবে। *

কিন্তু কাগজে-পত্রে চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা আদৌ খারাপ ছিল না। তার সামরিক শক্তি যেমন ভালো ছিল, তেমনি ফ্রান্সের সঙ্গে পারস্পরিক আত্মরক্ষার চুক্তি (১৯২৪) এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি (১৯৩৫) ছিল। আবার ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যেও পারস্পরিক আত্মরক্ষার চুক্তি ছিল (২রা মে, ১৯৩৫)। অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষার জন্য ফ্রান্স ও রাশিয়া চুক্তিবদ্ধ ছিল, কিন্তু তার সর্ত ছিল এই যে, ফ্রান্স প্রথমে যুদ্ধের জন্য আগাইয়া গেলে সোভিয়েট রাশিয়া পরে তার অনুসরণ করিবে।

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি বৃটেনের কোন চুক্তি বা আইনগত দায়-দায়িত্ব ছিল না, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও তার এই ধরনের কোন দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর যে সমস্ত চুক্তি ছিল, যদি প্রয়োজন মত সেগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইত, তবে মিউনিক চুক্তির কেলেঙ্কারি ঘটিত না। কারণ, হিটলার এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিতেন না এবং তাঁর সেনাপতিমণ্ডলী তখন পর্যন্ত ফ্রান্সের সামরিক শক্তিকে ভয় করিয়াই চলিতেন—যদিও সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে সকলেরই সংশয় ছিল। এবং এই সংশয়ের বড় কারণ ছিল রাশিয়ার বিখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলাসমূহ ও ষ্ট্যালিন কর্তৃক নিষ্ঠুর 'পার্জ' এর জন্য। যার জন্য বাইরে এমন ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, সোভিয়েট সামরিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মিউনিক চুক্তি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার বলিদান ঘটিল সম্পূর্ণ রূপে সোভিয়েট রাশিয়াকে এড়াইয়া কিম্বা তাকে সম্পূর্ণরূপে 'একঘরে' করিয়া। এমন কি চেক রাষ্ট্রপতি বেনেস এবং চেক পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই (৩০০ জনের মধ্যে মাত্র ৩০ জন ছিলেন কমিউনিষ্ট) ছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধী। অতএব রাশিয়ার সাহায্য তো দূরের কথা তার সঙ্গে বিশেষ

---

* অধ্যাপক এলবার্ট নরজেন প্রণীত 'Thus wars are made' এবং উইলিয়াম এল সীরার প্রণীত 'End of a Berlin Diary' চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

* 'The origins of the Second World War' —by A.J.P. Taylor, চেকোশ্লোভাকিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কোন পরামর্শের প্রয়োজনও অনুভূত হইল না।

অবশ্য অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে ফ্রান্স ও বৃটেন যেন গোড়া থেকেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিশেষভাবে বৃটেনের শাসকমহল হিটলারী ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে, ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলি অন্যায়, অসঙ্গত ও নীতিবিগর্হিত। সুতরাং এগুলির পরিবর্তন ঘটাইলে ইউরোপে যদি শান্তি রক্ষা করা যায়, তা' নীতি কি এবং সৌনিক থেকে হিটলারের দাবী নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। বিশেষতঃ সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও মানিয়া চলিতে হইবে। তারপর যুদ্ধ করিবার মত সামরিক প্রস্তুতিও তখন ছিল না। বৃটিশ সেনাপতিমণ্ডলী ফ্রান্স বা অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সহযোগীতায় এখন যুদ্ধযাত্রার বিরোধী ছিলেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৃটিশ ঐতিহাসিক, যেমন, এ জে পি টেলর এবং মিঃ পি কে সেম্প এই সমস্ত যুক্তি দেখাইয়া চেম্বারলেন ও অন্যান্যের দোষ স্খালনের কিম্বা তাঁদের সাফাই গাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। *

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যই অত সহজ এবং ভার্সাই সন্ধির কবলিত জার্মানীর প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য ফরাসী বা বৃটিশ সরকারী মহলের কি এতটা গরজ ছিল? কারণ, মহাযুদ্ধের পর হতে বার্লিনের পররাষ্ট্র দপ্তরের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, হিটলার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখলের আগেই ১৯৩৭ সালের ১৯শে নভেম্বর লর্ড হ্যালিফাক্স (তখন তিনি বৃটেনের লর্ড চ্যান্সেলার, পরে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হইয়াছিলেন) ওবারস্যালসবার্গে হিটলারের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন এবং সেই বৈঠকে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ফুয়েরার তাঁর নিজ দেশে কমিউনিজম ধ্বংস করিয়া পশ্চিম দিকে এই মতবাদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছেন। সুতরাং বৃটিশ সরকার মনে করেন যে, পশ্চিম ইউরোপে বলশেভিজম প্রতিরোধের পক্ষে জার্মানী একটি দুর্গস্বরূপ। লর্ড হ্যালিফাক্স 'সরলভাবে' আরও স্বীকার করিলেন যে, আজ হোক কাল হোক ইউরোপীয় ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসিবেই এবং পরিবর্তনের এই প্রশ্নগুলির মধ্যে রহিয়াছে ডানজিগ, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া......

...."changes in the European order .... which sooner or later probably would come about. These questions include Danzig and Austria and Czechoslovakia".

—(অধ্যাপক নরডেন কর্তৃক উদ্ধৃত)

অর্থাৎ চেম্বারলেনের সরকার এই দেশগুলির জন্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার হিটলারের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য যেন আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। উঁহার একমাত্র সর্ত ছিল এই যে হিটলারের পক্ষ থেকে যেন বলপ্রয়োগ করা না হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ না লাগে। সুতরাং চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়া যখন বিরোধ গভীরের বিপদ ডাকিয়া আনিবার সূত্রপাত করিতেছিল, তখন গোড়াতেই সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনোভ পররাজ্য আক্রমণ ও প্রতিরোধে বাধা দেওয়ার জন্য বৃটেন, ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া এই চতুঃশক্তির একটি সম্মেলন ডাকার জন্য এবং যৌথ নিরাপত্তার নীতি অবলম্বনের জন্য ১৭ই মার্চ (১৯৩৮) এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু বৃটিশ সরকারের পক্ষে মিঃ চেম্বারলেন তা অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সুদেতেন জার্মানদের নেতা হেনলেইন হিটলারের নির্দেশে ২৩শে এপ্রিল তারিখে এমন ৮টি দাবী চেক সরকারের কাছে উত্থাপন করিলেন, যেগুলি মানিয়া লইলে স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। এর ফলে ফ্রান্সের সরকারী মহলও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং দালাদিয়ের ও বনেট ২৮শে এপ্রিল তারিখ লন্ডনে গেলেন বৃটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য—বিশেষভাবে বার্লিনে ও প্রাগে একই সঙ্গে দুই গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কোন যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ('... Daladier urged strong joint and parallel action) কিন্তু চেম্বারলেন সাফ জানাইয়া দিলেন যে, ফ্রান্স বা চেকোশ্লোভাকিয়া কাহারও সাহায্যের জনাই বৃটেন অবিলম্বে আগাইয়া যাইবে না!

কারণ কি? কারণ এই যে, চেকোশ্লোভাকিয়া ভাগবাটোয়ারা সম্পর্কে চেম্বারলেন আগেই একটি প্ল্যান ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১০ই মে ইংলণ্ডের বিখ্যাত মহিলা লেডী এ্যাস্টরের গৃহে একদল মার্কিন ও কানাডীয় সাংবাদিকদের নিকট চেম্বারলেন এই তথ্য প্রকাশ করিলেন :

"On May 10, chambarlain revealed his plans for the break up of Czechoslovakia in Germany's behalf to a group of American and Canadian newspapermen at Lady Astor's. Neither France, Russia nor Britain would fight for Czechoslovakia, said the Prime Minister who also advocated his plan for a Four Power Pact, including Britain, France, Germany and Italy, from which Russia would be excluded. *

এই সংবাদ বিখ্যাত মার্কিন সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস ইত্যাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৪ই মার্চ এবং পরে কমন্স সভায় সমালোচনার জবাবে চেম্বারলেন এই সংবাদের কোন প্রতিবাদও করেন নাই।

চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়া যখন উত্তেজনা ক্রমেই বাড়িতেছিল তখন চেক গবর্নমেন্ট নাৎসী ভীতি প্রদর্শনের জবাবে ২০শে মে তারিখ হঠাৎ সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ জারি করিলেন। ফলে, ইউরোপে যুদ্ধ লাগে লাগে এই আশঙ্কায় প্যারিস ও লন্ডনের সরকারী মহলে আতঙ্ক দেখা দিল—যদিও চেক সরকারের এই আকস্মিক সৈন্য সমাবেশে হিটলারী দল কিছুটা ভড়কাইয়া গেল। কিন্তু বৃটেনে ও ফ্রান্সে এই গুজব উঠিল যে, যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ হিটলারকে প্রতিরোধের জন্য হাতেকলমে কিছু হইবে না। কিছুদিন অবশ্য এভাবে চলিবার পর জুলাই মাসে হিটলার আবার গর্জন করিলেন এবং ভয় দেখাইলেন যে, যদি একজন সুদেতেন জার্মানও চেকদের হাতে নিহত হয়, তবে তিনি সসৈন্যে মার্চ করিবেন। তখন চেম্বারলেন লর্ড রান্সিম্যানকে একজন স্বাধীন সালিশ হিসাবে নিযুক্ত করিয়া প্রাগে পাঠাইলেন (৪ঠা আগস্ট ১৯৩৮)। রান্সিম্যান ছিলেন বোর্ড অব ট্রেডের প্রাক্তন সভাপতি, রাজনীতি, বিশেষভাবে ইউরোপীয় রাজনীতির টানাপোড়েন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন জ্ঞানকাণ্ড ছিল না। সুতরাং তাঁর এই দৌত্যের আসল অর্থ ছিল চেম্বারলেনীয় তোষননীতির পরিপোষকতা করা, তিনি সুদেতেন জার্মানদের খুশী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন এবং তাদের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করিলেন। যদিও তিনি 'নিরপেক্ষ' সালিশ ছিলেন, তথাপি তিনি প্রাগে কয়েকজন ধনী নাৎসী জার্মানের প্রাসাদে বাস করিয়া তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া আসল সঙ্কটের মাস দেখা দিল সেপ্টেম্বরে। সুদেতেন জার্মানদের শান্ত রাখিবার জন্য প্রেসিডেন্ট বেনেস ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখ তাদের সমস্ত দাবীই মানিয়া লইলেন—যদিও হেনলেইনের দল এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বেনেস জানিতেন যে, সুদেতেন জার্মানদের যত দাবীই মানিয়া লওয়া হোক না কেন, তারা কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। এই সময় ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখ সুবিখ্যাত লন্ডন টাইমস পত্রিকা, যার সম্পাদক মিঃ জিওফ্রে ডসন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই পত্রিকাতে সুদেতেন অঞ্চল জার্মানীর নিকট অর্পণের জন্য এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সুপারিশ করা হইল। একই সময়ে প্যারিসের একটি পত্রিকাতেও (পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখপত্র) অনুরূপ প্রস্তাব করা হইল। আর ১২ই সেপ্টেম্বর নাৎসী পার্টি কংগ্রেসে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া ও বেনেসের বাপান্ত করিয়া ছাড়িলেন। অর্থাৎ সুদেতেন জার্মানদের ক্ষেপানো হইল। ফলে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারা এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ বাধাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চেক সরকার অতি দ্রুত এবং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলিল। সারাদেশে সামরিক আইন জারী হইল।

---

* পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের এবং 'The War' by Louis L. Snyder, P 89-90.

* The Cold War —by D.F. Fleming, 1961, P 71. Vol. 1

হিটলার ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে প্যারিসে ফরাসী সরকার স্নায়বিক দৌর্বল্য রোগে ভুগিতেছিলেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের ১০ই—১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রে চেম্বারলেনের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁকে জানাইলেন যে, যদি হিটলারকে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করা যায়, তবে, এই সঙ্কটের একটি সুমীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তৈয়ার হইয়াই ছিলেন এবং নিজের দায়িত্বেই (মন্ত্রিসভার অনুমোদনের আগেই) হিটলারের নিকট তারযোগে প্রার্থনা করিলেন এক সাক্ষাৎকারের জন্য। হিটলার তাঁর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং চেম্বারলেন ৬৯ বৎসর বয়সে এই প্রথম বিমানযোগে যাত্রা করিলেন মিউনিকে এবং সেখান থেকে ট্রেনযোগে তিনি বার্শেটসগাডেনে উপস্থিত হইলেন—হিটলারের এই সেই কুখ্যাত পল্লীভবন যেখানে ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রনেতা স্বাধীনতার মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হইয়াছেন। চেম্বারলেন সেখানে চা-পান করিলেন এবং হিটলারের সম্মুখে ধূমপান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কিছুটা গর্ব অনুভবও করিলেন। (হিটলার নিজে ধূমপান করিতেন না। সেহেতু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এটাই ছিল গর্বের কারণ!) কিন্তু আলোচনার প্রথমেই হিটলার তাঁর স্বভাব অনুযায়ী কড়া মেজাজ দেখাইলেন, কিন্তু চেম্বারলেন তাঁর তোষণ-নীতিতে অটল রহিলেন এবং সুদেতেন জেলা পৃথকীকরণের দাবীকে তিনি নীতি হিসাবে মানিয়া লইলেন। কিন্তু হিটলার এত অল্পে খুশী হইবার পাত্র ছিলেন না, তিনি দাবী করিলেন যে, অবিলম্বেই সমগ্র সুদেতেন অঞ্চল জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, অন্যথা যুদ্ধ বাধিতে পারে। তবে, এই বিষয়ে তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে দেওয়ার জন্য হিটলার চেম্বারলেনকে সময় দিতে রাজী আছেন। পরদিন তিনি ফিরিয়া আসিলেন লণ্ডনে।

এভাবে বারবার চেম্বারলেনকে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ছুটিয়া যাইতে হইল, যদিও হিটলার একবারের জন্যও লণ্ডনে আসিয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের (অন্ততঃ কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুযায়ী) প্রয়োজন মনে করেন নাই এবং এভাবে বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারকে (যাঁদের পদতলে পৃথিবীর বৃহত্তম ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য—ভারতবর্ষ-সহ কম্পমান ছিল) হিটলারের কাছে বার বার অসম্মান ও নতিস্বীকার করিতে হইল। লণ্ডন ও প্যারিসে বৃটিশ ও ফরাসী মন্ত্রিসভার তোষণনীতি পক্ষপাতী মন্ত্রিগণ একযোগে চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর চাপ দিলেন জার্মান সংখ্যাধিক্য এলাকাগুলি অবিলম্বে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য। অবশ্য খণ্ডিত চেকোশ্লোভাকিয়া সীমানা সম্পর্কে বৃটিশ সরকার গ্যারান্টি দিতে রাজী আছেন, যদি হিটলারের আপত্তির কারণ না ঘটে এবং যদি চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তার সামরিক মৈত্রী চুক্তি বাতিল করিয়া দেয়! ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট বেনেসকে এই অদ্ভুত অসম্মানজনক ও রাষ্ট্রের অপহানিকর প্রস্তাব গ্রহণের জন্য জানাইয়া দেওয়া হইল। প্রেসিডেন্ট বেনেস তাঁর মন্ত্রিসভা ও সামরিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে ক্রমাগত সেদিন ধরিয়া পরামর্শ করিলেন এবং অবশেষে জানাইলেন যে, ১৯২৫ সালের জার্মান-চেক সন্ধি অনুযায়ী তাঁরা সমগ্র চেক বিরোধের প্রশ্নটি সালিশী মীমাংসায় দিতে রাজী আছেন। কিন্তু এর জবাবে বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতেরা তৎক্ষণাৎ জানাইয়া দিলেন যে, এই সমস্ত প্রস্তাবের উপর বেশী জোর দেওয়া হইলে চেকো-শ্লোভাকিয়ার ভাগ্য সম্পর্কে বৃটেন ও ফ্রান্স কোন দায়িত্ব নিতে পারিবে না। এমন কি ২০শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহর রাত্রে যখন তিন রাত্রির অনিদ্রার পর প্রেসিডেন্ট বেনেস ঘুমাইতে গেলেন, তখন ঘণ্টাখানেক বাদেই বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতদ্বয় তাঁকে এক চরম পত্র দিয়া জানাইয়া দিলেন যে, বিনা-সর্তে এবং অবিলম্বে ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সারা রাত ধরিয়া চেক মন্ত্রীরা পরামর্শ করিলেন, কিন্তু লণ্ডন থেকে সেই রাতে ধৈর্যহীন ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর টেলিফোনে ভাসিয়া আসিল—'এত দেরী হচ্ছে কেন? এখনও কি বেনেস নতিস্বীকার করে নি?' *

পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় চেক সরকার নতিস্বীকার করিলেন। কিন্তু এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'একটা গোটা জাতি চোখের জলে ভাঙিয়া পড়ল'। চেক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন এবং জার্মান পক্ষপাতী জেনারেল সিরোভি নূতন চেক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার নতিস্বীকার সম্পর্কে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের এই সমস্ত প্রস্তাব লইয়া চেম্বারলেন দ্বিতীয়বার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হইলেন। এবার রাইনল্যাণ্ডের অন্তর্গত গডেসবার্গের একটি হোটেলে হিটলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ—চার বছর আগে এই হোটেল থেকেই হিটলার অতর্কিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন ক্যাপ্টেন রোয়েম গোষ্ঠীকে খতম করার জন্য। এবার সেই হোটেলেই হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে 'আপোষে' খতম করার জন্য চেম্বারলেনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর দুর্ভাগ্য আগের বারের চেয়েও ফুহরারের মেজাজ ও জঙ্গী-মূর্তি কঠোরতর হইয়া দেখা দিল। তিনি তাঁর দাবীর মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, ১লা অক্টোবরের মধ্যেই তিনি প্রস্তাবিত ও তাঁর নিজস্ব মানচিত্রে চিহ্নিত জেলাগুলি দখল করিয়া লইবেন এবং অন্যান্য এলাকাগুলি সম্পর্কে গণভোট গ্রহণ করিতে হইবে। ১লা অক্টোবরের আগেই এগুলি হওয়া চাই। তবে, সেই সঙ্গে তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, ইউরোপে এটাই তাঁর শেষ ভূমিখণ্ড দাবী—

"This is the last territorial claims I have to make in Europe'

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া চেম্বারলেন কমন্স সভায় বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে, হিটলারের এই নূতন দাবীর বহরে তিনি প্রথমে চমকাইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁর কাছে এটা গভীর আঘাতের (profound shock) মত ছিল। এবার বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং ফরাসী মন্ত্রিসভার তোষণপন্থীরাও অন্তত সাময়িকভাবে পিছু হটিতে বাধ্য হইলেন। কারণ, হিটলারের বাড়াবাড়িতে ইতিমধ্যে জনমত—বিশেষভাবে বৃটেনে প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং হিটলার গডেসবার্গে চেম্বারলেনের নিকট যে সমস্ত সর্ত দিয়াছিলেন, সেগুলি প্রত্যাখ্যাত হইল এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরামর্শ দেওয়া হইল তার সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করিবার জন্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে, চেক সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তার সমরশিল্প এবং সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যূহ অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ছিল। ১৫ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য রণক্ষেত্রে আগাইবার জন্য তৈয়ার হইয়াই ছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার যে চুক্তি ছিল, ফরাসী সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা পালনে অগ্রসর হইলেন। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর আংশিক সমাবেশ ঘটানো হইল। ২৮শে সেপ্টেম্বর সকাল ১২-২০ মিনিটে বৃটেনের নৌবহর সমাবেশের হুকুম জারী হইল—নৌমন্ত্রী মিঃ ডাফ কুপার মিঃ চার্চিলের মতই তোষণনীতির বিরোধী ছিলেন এবং এর অনেক আগেই ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) তারিখ মিঃ এন্থনি ইডেন চেম্বারলেনের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন। চার্চিলের মতে মিঃ চেম্বারলেন নিজ হাতে সমগ্র নীতি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ পরিহার করার উদ্দেশ্যে তিনি তোষণ-নীতির লজ্জাজনক ও অনিষ্টকর পন্থার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ২৬শে সেপ্টেম্বর পুনরায় চেম্বারলেনের পক্ষ থেকে হিটলারের নিকট স্যার হোরেস উইলসনের মারফৎ একটি ব্যক্তিগত আবেদন পাঠানো হইল। জবাবে হিটলার জানাইলেন যে, ২৮শে বুধবার বেলা দুটোর মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া যদি তাঁর দাবীগুলি গ্রহণ

The Cold War —by D.F. Fleming Vol. 1 P 78

না করে, তা হলে ১লা অকটোবর, শনিবার তিনি সসৈন্যে মার্চ করিবেন—এই মর্মে যে চরমপত্রের কথা তিনি গডেসবার্গে চেম্বারলেনকে বলিয়াছিলেন, সেই কথা থেকে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হইবেন না। সেদিন সন্ধ্যায় হিটলার বার্লিনের এক তীব্র বক্তৃতায় ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট বেনেস ও চেকোশ্লভাকিয়ার বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করিলেন, কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতি নরম মনোভাব দেখাইলেন—বোধহয় সেই মুহূর্তে ইঙ্গ-ফরাসী মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্তন দেখিয়া। এদিকে জার্মান জেনারেলদের সঙ্গেও হিটলারের মতবিরোধ চলিতেছিল বলপ্রয়োগের প্রশ্নে। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় যে রেডিও বক্তৃতা দিলেন, আজও তা স্মরণযোগ্য। এই বক্তৃতায় তিনি বলিলেন:

"How horrible, fantastic, incredible, it is that we should be digging trenches and trying on gas-masks here because of a quarrel in a far-away country between people of whom we know nothing! .... I would not hesitate to pay even a third visit to Germany if I thought it would do any good. ......

অর্থাৎ কী ভয়ঙ্কর, কী আজগুবী এবং অবিশ্বাস্য এমন কথা যে, কোথায় কোন্ দূরবর্তী অচেনা দেশে কোন অজানা লোকদের মধ্যে কী ঝগড়া হইতেছে, আর তারই জন্য আমাদের ট্রেঞ্চ কাটিতে ও গ্যাসমুখোস পরিতে হইবে। এর চেয়ে আমি বরং তৃতীয়বার জার্মানীতে যাইতেও প্রস্তুত আছি, যদি এর দ্বারা কিছু মঙ্গল হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

অতএব চেম্বারলেন তৃতীয়বার জার্মানীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্যার হোরেস উইলসনের মারফৎ প্রেরিত হিটলারের চিঠির জবাবে চেম্বারলেন লিখিলেন:

'আপনার চিঠি পড়ে আমার নিশ্চিত মনে হলো আপনি বিনা যুদ্ধেই এবং অবিলম্বেই আপনার মূল দাবীগুলির সবই পেতে পারেন। এজন্য আমি অনতিবিলম্বেই বার্লিনে এসে আপনার সঙ্গে ও চেক প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভূমিগুলি হস্তান্তর করা সম্পর্কে আলোচনা করতে রাজী আছি। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে ইতালী ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা একটা মীমাংসায় পৌঁছতে পারবো।'

এই সঙ্গে তিনি ইতালীর ডিকটেটর মুসোলিনীর নিকট এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন যে, তিনি যেন তাঁর (চেম্বারলেনের) প্রস্তাবিত হিটলারের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হন। কারণ এর দ্বারা আমাদের জনগণ যুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। *

হিটলারের বন্ধু মুসোলিনী এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত যখন বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে সুদেতেনল্যান্ডের আরও এলাকা হস্তান্তরের জন্য আলোচনা করিতেছিলেন, তখন মুসোলিনীর বার্তা আসিয়া হাজির হইল। চেম্বারলেন যে সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এই বার্তায় তা সমর্থন করিয়া হিটলারকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, ইতালীও এতে যোগ দিতে প্রস্তুত আছে। সুতরাং ২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা ৩টায় হিটলার চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরকে জানাইয়া দিলেন যে, পরদিন মিউনিকে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতে মুসোলিনীও উপস্থিত থাকিবেন।

অতএব চেম্বারলেন তৃতীয়বার বিমানপথে ছুটিলেন হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।

২৯শে সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা মিউনিক শহরে চেম্বারলেন, দালাদিয়ের এবং হিটলার ও মুসোলিনী একত্র হইলেন। লক্ষ্য করিবার এই যে, যে চেকোশ্লভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য এই ঐতিহাসিক সম্মেলন' ডাকা হইল, সেখানে চেকোশ্লভাকিয়ার একজন প্রতিনিধিও আমন্ত্রণ করা হইল না এবং ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ শক্তি সোভিয়েট রাশিয়াকেও ডাকা হইল না। বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা মন স্থির করিয়াই আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ চেকোশ্লভাকিয়ার স্বাধীনতা বলি দেওয়া হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। চেকোশ্লভাকিয়া সম্পর্কে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর আগে হইতেই একটা দলিল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, বৈঠক আরম্ভ হওয়ার আগে বার্লিনের ইতালীয় রাষ্ট্রদূত সেটি মুসোলিনীর হাতে দিলেন এবং মুসোলিনীও নিরপেক্ষ মধ্যস্থের ভান করিয়া সেটি বৈঠকে পেশ করিলেন। আর হিটলারও শান্তিরক্ষার নাম করিয়া প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি জানাইলেন। চেম্বারলেন এবং দালাদিয়েরও রাজী হইয়া গেলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৈঠকের কাজ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু রাত্রি দুটোর সময় এই চারজন রাষ্ট্রনেতা যখন মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য কলম হাতে নিলেন, তখন বৃহৎ দোয়াতদানিতে কলম ডুবাইতে গিয়া দেখিলেন কালি নাই! *

কিন্তু কালিশূন্য সেই দোয়াতদানি সত্ত্বেও মিউনিক চুক্তির কলঙ্ক কালিমা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কোনদিন মুছিয়া যাইবে না।

চেকোশ্লভাকিয়ার প্রতিনিধিরা পাশের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি দুটোর সময় তাঁদের ডাকা হইল চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরের নিকট। দালাদিয়ের তাঁদের হাতে সেই চুক্তিপত্র দিয়া পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে,—

"....this was a sentenec without right of appeal and without possibility of modification, ...

অর্থাৎ এটি একটি দণ্ডাজ্ঞা, এর বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলিবে না এবং আগামীকল্য বিকেল পাঁচটার মধ্যে এটি গ্রহণ করিতে হইবে!

চেম্বারলেন কোন মন্তব্য করিলেন না, তিনি হাই তুলিতেছিলেন এবং ক্লান্ত ছিলেন, তবে আরামদায়ক ক্লান্তি—(tired but pleasantly tired) *

হিটলারের চরমপত্র অনুযায়ী ১লা অকটোবর, ১৯৩৮ থেকেই জার্মানী সুদেতেন জেলাগুলি দখল করিতে শুরু করিবে এবং যে সমস্ত এলাকায় জার্মানরা মেজরিটি নয়, সেগুলিতে একটা আন্তর্জাতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে গণভোট গ্রহণ করা হইবে। জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স ও বৃটেন চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন সীমানার গ্যারাণ্টি দিবে এবং চেক কর্তৃক পরিত্যক্ত সমস্ত এলাকাগুলির কলকারখানা, অস্ত্রাগার, জিনিসপত্র ইত্যাদি যথাযথ বজায় রাখা হইবে।

চেকোশ্লোভাকিয়াকে এভাবে দুত বলিদানের পর চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে এক প্রাইভেট সাক্ষাতের জন্য মিলিত হইলেন তাঁর মিউনিকের ফ্ল্যাটে—৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে এবং বৃটেন ও জার্মানী পরস্পরের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করিবে না—এই মর্মে এক প্রতিশ্রুতিপত্রে দুইজনে সানন্দে স্বাক্ষর দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই প্রতিশ্রুতিপত্রটি চেম্বারলেন আগেই তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর দালাদিয়ের ও চেম্বারলেন স্ব স্ব রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা ইউরোপে যুদ্ধ নিবারিত হইল মনে করিয়া প্যারিসে ও লণ্ডনে উৎফুল্ল জনতা দুই রাষ্ট্রনেতাকে অভিনন্দন জানাইলেন। (প্যারিসে এই উপলক্ষে নৃত্যগীত ও ভোজ উৎসবেরও অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যেটা ছিল ফ্রান্সের আসন্ন দুর্বিপাকের সঙ্কেত স্বরূপ।) সন্ধ্যাবেলা ডাউনিং স্ট্রীটের জানালা থেকে প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিপত্রটিকেই উৎসুক জনতার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনের ভঙ্গীতে আন্দোলিত করিয়া বলিয়াছিলেন—

"I believe it is peace for our time".

অর্থাৎ আমার বিশ্বাস এর দ্বারা আমাদের আমলে শান্তি সুনিশ্চিত হইল। *

---

* চার্চিল রচিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২৪৬-৪৭ পৃঃ।

* Mr. Feilling প্রণীত চেম্বারলেনের জীবনচরিত থেকে চার্চিলের উদ্ধৃতি।

* The origins of the Second World War by A.J.P. Taylor, P 229.

* পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ২০১

মনের কথা

প্রেম ও অমরত্ব
বিধুবাবুর হা-হুতাশ

অমরত্ব নিয়ে আলোচনা করতে বিধুবাবু আসেন নি, আমিও প্রস্তুত ছিলাম না। তবুও একথা সে কথায় অমরত্ব প্রসঙ্গ উঠে পড়লো।

—রাজা বাদশারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে নিজেদের জাহির করতেন, নিজের বংশকে সিংহাসনের চিরস্থায়ী অধিকারী বলে নির্দেশ জারী করতেন, হুকুমনামা বা আশ্চর্যবোধ তাম্রখণ্ড বা প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ করতেন; নিজের নামের সঙ্গে অনেকগুলো বিশেষণ জুড়ে নিজেকে চিহ্নিত করতেন। এর মধ্যে প্রকাশ পেত তাঁদের অমরত্বের স্পৃহা। মর্তলোকে স্বর্গরাজ্য গড়বার পরিকল্পনা অমরত্বেরই বাসনা। প্রথমচাইল্ডস্কি যখন নিজের নামে শহর গড়ে তুলে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন, তখন অমরত্ব লাভের গোপন ইচ্ছাই তাঁদের চালনা করে। কঠোর তপশ্চর্যা ও আত্ম-নিপীড়ন দ্বারা মহর্ষি দেবর্ষিরা দেবত্ব বা অমরত্ব চান। বাল্মীকি, হোমার-ভার্জিল, দান্তে-শেক্সপীয়ার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা। এমন কি আমার আপনার মত সামান্য লোকের মনের গোপন কোণে উঁকি মারছে এই দুর্লভ বাসনা। তবে সেটা ঐ ডার্বি-সুইপের টিকিট কিনে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখার মত পাগলামী। ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা, শিল্পী, কবি, বিজ্ঞানীদের মধ্যে অমরত্বস্পৃহা যতটা তীব্র, আমাদের মত সাধারণের মধ্যে ততটা নয়। কথাটা কি ঠিক? আমার মনে হয় ঠিক নয়। আমরা বর্তমানের ঘানি টেনে টেনে শেষ করতে করতেই জীবনটা ফুরিয়ে ফেলি। দূর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তো দূরের কথা, অদূর ভবিষ্যৎ নিয়েই চিন্তা করারও সময় পাই না। অনেক কষ্টে চালু পথ ঠেলে পাথরটাকে উপরে তুলছি, আবার সেটা গড়িয়ে পড়ছে। সিসিফাসের অদৃষ্ট নিয়েই আমরা জন্মেছি। কনভেয়ার-বেল্টে চেপে কোথায় চলেছি, কে জানে? মেটিরিয়ালিজম্‌। একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা কিন্তু বাড়িয়ে বলেন না। সাঁড়াই বলুন তো ডাক্তারবাবু, চিন্তা করলে বাঁচার ইচ্ছা বজায় রাখা যায় কি? কিন্তু এই সব কারণেই, আমার মনে হয়, আমরা, সাধারণ মানুষেরা, আরো বেশি অমরত্ব-প্রয়াসী। পুরুষেরা আড্ডায় ভিড় করি চায়ের কাপে অথবা বকনামৃত পানে অমর হবার লোভে। সভাসমাবেশে জমায়েত হয়ে লক্ষ মানুষের সামিল হয়ে যাই। খণ্ড জীবনের নশ্বরতা দূর করার চেষ্টা করি। যেকোনও শক্তিমান নেতাদের অমরবাণী শুনে, তাঁদের জনক-সঙ্গ লাভ করে নিজেকে অমর ভাবি। তাঁদের ঝাণ্ডা তুলে ধরি মিছিলে, মনে আশা এ ঝাণ্ডা চিরদিন আকাশে উড়তে থাকবে। তাঁদের লেখানো স্লোগান আওড়াই পথেঘাটে। বাতাসে ভর করে অনন্তকাল ধরে স্লোগানগুলো বেঁচে থাকবে, এই বিশ্বাস আমাদের চালিত করে। আপনি যে অন্য লোকের মনের কথা, বেফাঁস বেতাক্কা চিন্তাগুলো পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন এর মধ্যে আপনার বেঁচে থাকার, মৃত্যুর পর অমর হবার বাসনাই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রেম, মিলন সম্ভাবনারহিত প্রেম, এই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষারই একটা অভিব্যক্তি।

বিধুবাবু এসেছিলেন প্রেমঘটিত এক সমস্যা নিয়ে। কয়েক দিনের আলোচনার পর অমরত্ব প্রসঙ্গ টেনে এনে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে তিনি সেটাকে আরো জটিল করে তুললেন। তিনি প্রথমটায় আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিলেন। সমস্যাটা প্রেম তাত্ত্বিক সমস্যা হিসাবে উত্থাপন করলেন। এই সমস্যাটা তাঁকে পীড়িত করেছে ঠিকই, কিন্তু তা বলে তাঁকে রোগী মনে করলে আমি ভুল করবো, এই সাবধানবাণী তিনি প্রথমেই উচ্চারণ করলেন। প্রেম কি? নরনারীর [illegible] একটা উদ্দেশ্য আছে: তার একটা মানে হয়, কিন্তু একতরফা আকর্ষণের তাৎপর্য কি? একটি পুরুষ স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রীর মধ্যে অবাঞ্ছিত কোনো কিছু দেখতে পায় না। স্ত্রীকে সর্বব্যাপারে, সব দিক থেকে নিজের উপযুক্ত মনে করে, স্ত্রীও তাকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিবেদন করে। স্বামী বোঝে স্ত্রী অনুরক্ত অনুগত ও নির্ভরযোগ্য। জানে, অন্য কোনো পুরুষের প্রতি তার কোনো রকমের আকর্ষণ নেই। পরিবারে সব দিক থেকে শান্তি ও শ্রী বিদ্যমান। এই অবস্থায় পুরুষ অন্য নারীর প্রতি যদি আকৃষ্ট হয়, তবে সেই পুরুষকে আমি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে পারি কিনা? স্ত্রী যদি এই কথা জানতে পারে, সে স্বামীকে ক্ষমা করতে পারে কিনা? এই সকল অদ্ভুত প্রশ্ন আর রহস্যময় উত্তর সরবরাহ করে বিধুবাবু আমাকে প্রথমটায় অস্থির করে তুললেন। তৃতীয় পুরুষ থেকে প্রথম পুরুষে আসতে, তত্ত্বগত সমস্যাকে ব্যক্তিগত সমস্যায় দাঁড় করাতে অবশ্য বেশী সময় লাগলো না। সংক্ষেপে বিধুবাবু সমাচার শোনাচ্ছি।

মোটা-সোটা বেঁটে-খাটো চেহারার বিধুবাবু আজ বাইশ বছর ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন। বর্তমানে এক মেয়েদের কলেজের সঙ্গে যুক্ত, বিভাগীয় প্রধান। বয়স প্রায় আটচল্লিশ। চুলে পাক ধরেছে। মেয়ে-পুরুষ নিয়ে তাঁর বিভাগে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা সাত। তিনজন মেয়ে, চারজন পুরুষ। বিধুবাবুর প্রকৃতিটা একটু খাপছাড়া, লোকে বলে বদমেজাজী, খিটখিটে। তাঁর মতে তিনি ডিসিপ্লিন মেনে চলতে চান, আর তাঁর বিভাগে ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে চান, তাই তিনি অনেকের কাছে অপ্রিয়। বিশেষ করে আজকালকার মেয়েদের কাছে। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে অল্পবয়সী যে তিনজন, তাঁরা ওঁকে আড়ালে [illegible] থাকে, তিনি জানেন। কারণ,

তিনি তাদের দিয়ে কোর্স কমপ্লিট করিয়ে নেবার জন্যে মাঝে মাঝে দু-একটা কড়া কথা বলে থাকেন। স্ত্রীর বয়স চল্লিশ। সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী লীলাকে তিনি সত্যিই ভালবাসেন। লীলা শুধু তাঁর সন্তানের গর্ভধারিণী নয়, সংসারের একচ্ছত্র কর্ত্রী ও বিধুবাবুর 'ফ্রেণ্ড ফিলজফার ও গাইড'। কলেজের ব্যাপার থেকে শুরু করে সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি সব ব্যাপারে লীলার পরামর্শ মূল্যবান মনে করেন বিধুবাবু। নারীরত্ন বলা যায় লীলাকে। লীলার বিরুদ্ধে কোনো রকম অভিযোগ করতে পারলে, বিধুবাবুর অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণের কারণ পাওয়া যেত; এটা আর সমস্যা আকারে দেখা দিত না। লীলা এম-এ পাশ করে প্রথম কয়েক বছর এক স্কুলে কাজ নিয়েছিল। এখন আর কোনো কাজ করে না। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, তিনটি সন্তান ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিধুবাবুর মাতা। শাশুড়ীকে দেখাশোনা করার জন্যেই লীলা চাকরী করে না। বিধুবাবু আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন যে, সব দিক থেকে লীলা তাঁর পরিচিত যে কোনো মেয়ের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এছাড়া, লীলার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে মাসে প্রায় হাজারখানেক টাকা আসে। সেটা না আসলে এই বাজারে মাস্টারী করে ছেলেমেয়ে মানুষ করার ক্ষমতা তাঁর হতো না। এতসব সত্ত্বেও তিনি আজ প্রায় দশ বছর ধরে অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসে আসছেন। লীলার চেয়ে তার বয়স খুব যে কম তা নয়। সে যদিও কুমারী তবুও লীলাকে তার থেকে কম-বয়সী মনে হয়। দেহমন কোনো দিক দিয়ে শান্তা লীলার সমকক্ষ নয়। তিন সন্তানের জননী লীলা, তবুও তার চোখে কটাক্ষ আছে, দেহে উত্তাপ আছে, মনে মাধুর্য আছে। লীলার দেহমনের একচ্ছত্র অধিকারী হয়েও, শান্তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন বিধুবাবু। কেন এই আকর্ষণ?

—শান্তার সঙ্গে দশ বছরের আলাপ। পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে আমি ওকে ভালবাসি। অবশ্য সেটা বুঝতে আমার সময় লেগেছে। শান্তা বাংলা পড়ায় আমাদের কলেজে। শান্ত ম্লান চেহারা। আমার সঙ্গে আলাপের সূত্র ওর ডকটরেট থিসিস। 'প্রেমের কবিতা, প্রাচীন ও আধুনিক', এই নিয়ে ও থিসিস তৈরী করেছিল। সেই সময় ইংরাজী ও ইয়োরোপের অন্যান্য ভাষার প্রেমের কবিতার রেফারেন্স সংগ্রহে ও আমার সাহায্যপ্রার্থী হয়। ওকে আমার ভাল লাগে ওর নিরলস পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে। দিনে প্রায় চোদ্দ পনেরো ঘণ্টা করে লেখাপড়ার কাজ করতো। এক জায়গায় বসে ও একনাগাড়ে আট দশ ঘণ্টা পড়তে পারে, শুনে প্রথমটায় আমার হিংসে হয়েছিল। আমি একটু ছটফটে ধরনের মানুষ। সারা দিনে পড়াশুনো করি বেশির ভাগ সময় কিন্তু একমনে আমি আধ ঘন্টার বেশি পড়তে পারি না। একখানা বই একটানা আমি শেষ করতে পারি না। আমি একসঙ্গে তিন-চারখানা, হয়তো তিন-চার বিষয়ের বই পড়ি। সকালে যেটা পড়ি, দুপুরে সেটায় মন বসে না। বিকেলে যা পড়ি, রাতে তা পড়ি না। লীলা বলে এটা নাকি জিনিয়াসের লক্ষণ। আমি মনে করি, এটা আমার অস্থিরচিত্ততার পরিচায়ক। শান্তার নিরলস একাগ্রচিত্ততাই ওর প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রথম ও প্রধান কারণ। প্রথম বছরখানেক ওকে অনেক কাব্য কবিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রেমের উৎস নিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতামত ওকে পড়ে শুনিয়েছি। এ আলোচনা করেছি প্রথম দিকে টীচার্স রুমে, পরে আমার নিজের ড্রইংরুমে। কয়েক মাসের মধ্যে শান্তা লীলার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিল। লীলার কাছে শান্তার পারিবারিক ইতিহাস জানলাম। হাওড়ার উপকণ্ঠে দাদা-বৌদির সঙ্গে থাকে। দাদা-বৌদির সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছে। তাঁরা বেশ ভদ্র। শান্তাকে ভালবাসেন। শান্তা অত শান্ত কেন? অত ম্লান কেন? এখনও কুমারী কেন? এইসব নানা প্রশ্ন মনে উঠেছে। তবে লীলা অথবা আমি এ নিয়ে কোনো গবেষণা কল্পনা করিনি। শান্তার কাছ থেকে কোনো আত্মপ্রকাশও হয়নি। লীলা বুদ্ধিমতী। কোনো মেয়ে অবিবাহিত আছে শুনলে সে মনে করে না যে এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে, এর পেছনে বিশেষ কোনো ইতিহাস আছে। ব্যর্থপ্রেম, দারিদ্র্য বা ঐ রকম কিছু। আমারই মত লীলা মামুলী ধরনের চিন্তাতে অভ্যস্ত নয়। লীলার মনে কোনো সন্দেহ বা বিদ্বেষের ছায়া পড়ে নি। আমার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করছিল শান্তা, এতে লীলা বা শান্তার দাদার কিছুমাত্র উদ্বেগ দেখিনি। কেউ এখনো পর্যন্ত জানে না যে আমি পঞ্চাশের প্রান্তে এসেও শান্তার চিন্তায় বিভোর। আর এই প্রেমচিন্তা আমার মনে জেগেছে আজ থেকে দশ বছর আগে। শান্তার সঙ্গে মেলামেশা অবাধ হলেও, কলেজের টীচার্স রুম ও আমার বাড়ীর সীমানার বাইরে আমরা কখনও দেখা সাক্ষাৎ করিনি। থিয়েটার সিনেমা পিকনিকে যেখানে গেছি লীলা বা কলেজের অন্য অনেকে থেকেছে। কাজেই আমাকে শান্তাকে নিয়ে কোনো কেচ্ছা-কাহিনী রটে নি, কোনো রকম গুজবও ওঠে নি। নিজের কাছে ছাড়া অন্য কারুর কাছে এই দশ বছরের মধ্যে একদিনও আমি ধরা পড়িনি। নিজের কাছে ধরা

আজ শিশুটি
জয় করছে
প্রতিটি মানুষের অন্তর...
সেই সৌভাগ্য-মুহূর্তগুলি
কি শুধু স্মৃতির মধ্যেই
সীমাবদ্ধ থাকবে?

পরিকল্পনা ▸ শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
চিত্ররূপ ▸ শ্রীঅমর দে

শোভন সংস্করণ—২৫. টাকা
সাধারণ সংস্করণ—১৫. টাকা

শিশু সাহিত্য সংসদ
প্রাইভেট লিমিটেড
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯
[৩৫-৭৬৬৯]

আমার শৈশব

এমন একটি আকর্ষণীয় বই যার রঙীন ছবির পাতায় পাতায় শিশুর জন্মকাল থেকে তার জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাধুর্যভরা নানা বৈশিষ্ট্যগুলি নথীভুক্ত করার ব্যবস্থা আছে। বড় হলে এ বই তাকে প্রেরণা যোগাবে সার্থক জীবন রূপায়নে।

পড়তেও সময় পেয়েছিল। ফিঁয়াসের ওর হয়ে গেলে আমার কাছে নিয়মিত আসা বন্ধ হলো। তখনই বুঝলাম আমি প্রতিদিন শান্তার আগমন প্রতীক্ষায় কতখানি উদগ্রীব হয়ে থাকি। তিন-চার দিন না এলেই, ফোনে একটা ছুতো করে ওকে ডেকে পাঠাই। একখানা বই হাতে তুলে দিই, অথবা ওর কাছে আধুনিক কোনো বাংলা কবির সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা করতে বসি। এই ভাবে ওকে দেখা, ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার আকুল আগ্রহ চরিতার্থ করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে স্ত্রীকে দিয়ে কোনো ছুটির দিনে ওকে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে আনাতাম। স্ত্রী কিছুই সন্দেহ করতো না। কিছুই বলতে পারতো না। আমার মুখের পেশীর কুঞ্চনে বা চোখের পাতার কম্পনে কোনো রকমে আমার মনোভাব প্রকাশ না পায়, সেদিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতাম। শান্তার সামনেও আমার কোনো রকম ভাবান্তর ঘটতো না। তাছাড়া আমরা এই একশো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের বিরাট দেহ, পাকা চুল, আর তিক্ত জিহ্বা, সকলেই ভাবে, রোমান্টিক প্রেমের কেন, সব রকম প্রেমের প্রতিষেধক। কাজেই কেউ আমাকে বুঝতে পারে নি। আমি এ দশ বছরে মুহূর্তের জন্যেও আত্মবিস্মৃত হইনি। আকারে-ইঙ্গিতেও কোনো দিন শান্তাকে আমার মনোভাব জানাইনি। শান্তা অনেক দিন ধরেই আমাকে কাকা বলে ডাকে এবং অগ্রজের মতই সমীহ করে। তার শান্ত ক্লান্ত চোখে কোনো দিন অন্যের ঝিলিক দেখিনি। ওর সামনে অনেক প্রেমের কবিতা পড়েছি, ওকে প্রেমের দেহতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক, নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুনিয়েছি, কিন্তু ওর মুখে কোনো নতুন রেখা ফোটে নি, ওর দেহে কোনো নতুন হাওয়া লাগে নি। ওকে অনেক কবিতা আওড়াতে শুনেছি, (বেশ সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে শান্তা) কিন্তু কবিতার অন্তরালে থেকেছে ওর মনের ছবি, কবিতার ঝংকারে ওর নিজের মনে কোনো আলোড়ন জেগেছে বলে মনে হয় নি। শান্তাও কি আমার মত আত্মগোপনের আর্ট আয়ত্ত করেছে? না ওর দেহমনের সব উত্তাপ অন্য কোথাও উজাড় করে দিয়ে এসেছে? কিন্তু ওর সম্বন্ধে কোনো কানা-ঘুষোও তো শোনা যায় না। অনেক ছেলের সঙ্গেই মেশে, কথা বলে। কিন্তু সে মেলা কথা বলার কোনো সময় তারা দ্বিতীয় কোনো অর্থ খুঁজে পায় না, খোঁজার চেষ্টা করে না। কোনো পুরুষবন্ধু থাকলে আমরা নিশ্চয়ই জানতাম। কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা থাকলে নিশ্চয়ই সে খবর আমার কানে আসতো। ও কি তা হলে মেরু প্রদেশের জমাটবাঁধা কোন হ্রদ? আকণ্ঠ আত্মরতিতে অত্যন্ত নার্সিসাস? এমন কোনো ঘনিষ্ঠ মেয়ে বন্ধু ওর নেই যে ওকে সমরতিভাবাপন্ন ভাবতে পারি? এই-সব নানা চিন্তা আজ দশ বছর ধরে আমাকে পীড়িত করছে।

অনেক বেশী পীড়িত বোধ করেছি নিজের এই আকর্ষণের কারণ ঠিক করতে না পেরে। আমি ওকে দেখতে চাই, ওর সঙ্গ চাই। এইতো প্রেমের লক্ষণ। কিন্তু কেন চাই? লীলার প্রেমে আমার দেহমন তৃপ্ত নয়, তাই বোধ হয় শান্তার প্রতি আমার আকর্ষণ। এই উত্তর আমার মনঃপূত হয় নি। নানাভাবে আমি নিজের দেহের ক্ষুধাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। শান্তার প্রতি আমার আকর্ষণ আসঙ্গ লিপ্সা নয়। ভাবতে পারেন, লীলার মধ্যে বোধ হয় মানসিকতার কোনো দৈন্য, চারিত্রিক কোনো ত্রুটি ছিল, যা শান্তার মধ্যে আবিষ্কার করে আমি প্রেমোন্মত্ত হয়েছি। না, অনেক চেষ্টা করেও আমি সে রকম কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি। চল্লিশ বছরের কোনো বিবাহিত পুরুষের পক্ষে দেহজ আকর্ষণ জন্মাতে পারে, কিন্তু তথাকথিত রোম্যান্টিক বা স্নায়বিক প্রেম জন্মানো খুবই বিচিত্র। স্নায়বিক প্রেম ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু দশ বছর ধরে সমানভাবে আকর্ষণ বোধ করছি। আমি কিছুতেই নিজের এই আকর্ষণের কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আপনার সঙ্গে অমরত্বের আলোচনা করতে গিয়ে সহসা মনে হল এ প্রেমের মূলে অমরত্বের স্পৃহা আছে। এই প্রেম থেকেই বোধ হয় দান্তে 'ডিভাইন কমেডির' প্রেরণা পেয়েছিলেন। বিয়াত্রিসকে চোখে দেখার সম্ভাবনা ছিল না বলেই কি দান্তের কাব্য-প্রতিভা জেগে উঠেছিল। কিন্তু আমি কেন কবিদের মত প্রেমে পড়বো? জীবনে এক লাইনও কবিতা লিখিনি, যদিও অনেক কবিতা পড়েছি, পড়িয়েছি। কাব্য সৃষ্টি করে অমর হবার কোনো সম্ভাবনা আমার নেই। তবে কেন এই আকর্ষণ? শান্তা যদি চোখের সামনে না থাকে, আমার মধ্যে সৃজন প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে। কিন্তু ছবি আঁকা বা কবিতা লেখা কি পঞ্চাশ বছরে শুরু করা যায়? হ্যাঁ, শান্তাকে না দেখলে আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়ি, বিচলিত বোধ করি। সেই বিষণ্ণতা, সেই বিচলিতত্তার সৃজনশক্তির মূল ধরে নাড়া দেবে। কিন্তু সেই সৃষ্টি কি মহান সৃষ্টি হবে? আমার বেদনাবোধ কি দুঃসহ হয়ে উঠবে? আপনি বোধ হয় সাবলিমেশনকে সকল সৃষ্টির উৎস বলে মনে করেন না? আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। সমস্যাটা বোধ হয় প্রেমের নয় অমরত্বের।

এই রকম উল্টোপাল্টা অনেক কথা বললেন বিধুবাবু। সমস্যা সমস্যাই রয়ে গেল। এবার আমি তাঁকে আমার ব্যাখ্যা বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

শান্তাকে তিনি ভালবেসেছেন। কারণ লীলার প্রতি নিয়মতান্ত্রিক প্রেমে বোধহয় একঘেয়েমি এসেছে। একটি মেয়ে তাঁর কাছে শিখতে এসেছে, জানতে এসেছে। তার সঙ্গে কলেজে অন্য যেসব মেয়ে দেখছেন তাদের অনেক ফারাক। শান্তার শান্ত ও সংযত স্বভাব প্রথমেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তাছাড়া তার নির্ভরতার ভাব বিধুবাবুর মনে সহানুভূতির উদ্রেক করেছে। লীলার মধ্যে নির্ভরতার ভাব, এই বশ্যতা স্বীকারের ভাব নেই। আকর্ষণ প্রধানত দেহজ নয় ঠিক, তা বলে দেহাতীতও নয়। দেহমন মিলে শান্তার যে সমগ্র সত্তা তার প্রতি বিধুবাবু আকৃষ্ট। মানুষের প্রেম দেশকালপাত্র বিশেষে বিশিষ্ট। এর কোনো সর্বগ্রাহ্য ফর্মুলা নেই। শান্তার সঙ্গে প্রেমের কাব্য আলোচনা ও আবৃত্তির মধ্যে এই প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে। প্রেমের কবিতায় মুগ্ধ প্রেমের বন্দনা আটত্রিশ বছরের বিধুবাবুকে নাড়া দিয়েছে। স্ত্রী-পুত্রের কাছে সম্মান হারাবার ভয় ছিল তাই শান্তাকে প্রেম নিবেদনের কোনো তাগিদ তিনি অনুভব করেন নি। তাছাড়া শান্তার মত মেয়ের কাছ থেকে এ বিষয়ে সাড়া বা উৎসাহ পাবেন না তিনি জানতেন। তাঁর প্রেমের মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তি আপাতদৃষ্টিতে নেই। লীলার সাহচর্যে দেহমন তাঁর তৃপ্ত, তাই এই শীতল শান্ত প্রকৃতির মেয়েটি তাঁকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। সারা জীবন কবিতা পড়েছেন আর পড়িয়েছেন বিধুবাবু কাব্যের পরিমণ্ডলে রোমান্টিক প্রেম জাগা খুব আশ্চর্য ব্যাপার কিছু নয়। রোম্যান্টিক অল্পবিস্তর আমরা সকলেই। নিজের রোম্যান্টিকতাকে অস্বীকার করা ও একটা অমরত্ব-তত্ত্ব আমদানি করা বিধুবাবুর দুর্বলতা। তিনি শান্তার প্রতি আকর্ষণে অপরাধ বোধ করছেন বলেই এই সব তত্ত্ব কথার প্রয়োজন হয়েছে, এই দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। অমরত্বের স্পৃহা সকলের আছে স্বীকার করে নিলেও, তাঁর প্রেম অমরত্ব-বাসনার অভিব্যক্তি। এই তত্ত্ব আমি মানতে পারলাম না। তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। হা-হুতাশ ও অপরাধবোধের মূল অন্যত্র।

—মনোবিদ

CENTRAL LIBRARY

আমি

চিত্ত চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা আমায় অনেক দিয়েছে। অনেক পেয়েছি ওর কাছ থেকে। সত্যিই আমি ধনী। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় আমার বয়স বেড়েছে। পুঁজি বেড়েছে। আমি চঞ্চল হয়েছি, স্থির হয়েছি। মৌন হয়ে ভাবনা-তরীতে পাড়ি জমিয়েছি। শৈশব, কৈশোর তারুণ্য পেরিয়ে যৌবনের পথে এগিয়ে গেছি অনেকটা। ওর আকাশটা কোথাও বিরাট বিস্তীর্ণ হয়ে দিগন্তে উধাও হয়ে গেছে। কোথাও মুছে গেছে। আলো-বাতাসহীন সংকটাবর্তে হাবুডুবু খেতে খেতে মিলিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে। তা যাক। তবু আমি আছি। শিল্পীর পটবিন্যাসের ভূমিকায়, বিশালতর দিকবলয় হয়ে। অসীমের রহস্যময়তায় অবগাহন করতে করতে। বাস্তব জীবনানন্দে সংগ্রামরত অর্থসংকট জর্জর ভাসমান আর্তনাদী প্রাণীর স্পর্শে। আমি আছি কলকাতার জীবন-সঙ্গীতে।

অনেক জায়গায় থেকেছি। বড় রাস্তা থেকে গলি ঘুঁজি—কত ঘুরেছি কত দেখেছি। যেমন ঘুরেছি, তেমন থেকেছি নেশার মত। তবু অজানা অচেনা থেকে গেছে কলকাতা। অদ্ভুত শহর। প্রতি মুহূর্তের ঘটনাই যেন এক-একটা মহাভারত।

এক-এক সময় থমকে দাঁড়িয়েছি। চমকে উঠে বোকার মত দেখেছি। ভেবেছি কত। না পেয়েছি কূল, না পেয়েছি কিনারা।

পার্ক লেনও ঠিক এমনি চমকে দিয়েছিল। এমন চমক অনন্ত। তা নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাইনি কোন দিন। অতও মনে পড়ত না। যেমন অনেক ছেড়ে আসা বাসস্থানকে মনে রাখতে পারি নি। রাখিও নি। বা রাখার মত তেমন কোন ঘটন-অঘটন ঘটে নি।

কিন্তু তবু পার্ক লেন একটি ব্যতিক্রম। এখানে আমার শৈশব কেটেছে। স্কুল-জীবনের অনেক খেলার সঙ্গী এখানে ছড়িয়েছিল। এদের কেউ কেউ স্কুল পালাত। কেউ কেউ স্কুলের নাম করে অন্য কোনখানে যেত। কেউ বা পরীক্ষায় টুকে পাশ করত, কেউ বা অতটা ধৈর্যও দেখাতে পারে নি। শহরের রং-রেখাতে হারিয়ে গেছে। আমি এদের মধ্যে থেকেও কিন্তু সম্পূর্ণ এদের মত হয়ে যাই নি বা পূর্ণ ভালও হতে পারি নি। ন যযৌ ন তস্থৌ গোছের। তবু বয়স আমার বোধহয় একটা আকর্ষণ ছিল। যা সকলের সঙ্গে এক করে দেখা যায় না। কিছুটা অন্তত স্বতন্ত্র ছিল। তা না হলে মনতোষদা আমায় স্নেহের দৃষ্টিতে দেখত না। অন্তত যা আমার মনে হয়। এবং তার নববধূর সঙ্গে পরিচয় করিয়েও দিত না। আমার পড়াশুনায় কিছু কিছু উৎসাহ করে হেসে পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল।

মনোরমা অর্থাৎ বৌদির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখতে - ছেলে-

CENTRAL LIBRARY

ছিলাম। চেহারায় যে চটক ছিল তা যেমন ঠিক তেমনই ঠিক ছিল। উন্নত তনু, উজ্জ্বল বর্ণ, সদাহাস্য মুখশ্রী। তবু সঙ্গে যেন একটা মমতা লুকিয়ে ছিল। আকর্ষণের টান থাকত। যা দূর থেকে কাছে টানত।

এই টানাটানিটা অন্যে উপলব্ধি করত কি না জানি না। তবে আমার বেশ জানি ভাল লাগত। ভাল লাগত কারণ অকারণে সেখানে দর্শনপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে। মাঝে মাঝে টুকটাক ফাই-ফরমাস যে খাটতে হত না তা নয়। একটা আনন্দও ছিল। মোহাচ্ছন্ন ভাব ছিল না। সংকোচ ছিল না। তাই লজ্জাও ধার ঘেঁষত না। আমারও কোন ভাব ভাবনা ছিল না।

ইচ্ছে হলে যেতাম। খেলায় মেতে উঠলে আর যাওয়া হত না। মনেও থাকত না। মণিদা ছিল নিতান্ত ভাল মানুষ। সদা স্বল্পবাক। আস্তে আস্তে কথা বলত। হৈ-চৈ বিশেষ পছন্দ করত না। কিন্তু মণিবৌদি? হাসত যখন—ঝরঝাটা হাসি। কথা বলত, তাও খুব আস্তে নয়, অন্তত মণিদার মত নয়ই। সেই মণিদাই এক-একদিন বলত দেখা হলে। হ্যাঁরে, ক'দিন আর মাসনি বুঝি। তোর মণিবৌদি যেতে বলেছে।

যাব বলতাম। সমনের জন্য অপেক্ষা করতাম ঠিকই কিন্তু সমন এসে গেলে যাব যাব করেও সব সময় যাওয়া হত না। কখনও বন্ধুদের সঙ্গে মেতে উঠতাম। কখনও বা বাসায় ফেরার তাড়া থাকত। অথচ তার মাঝে মধ্যে যেতাম।

গেলে কিন্তু মণিবৌদি খুব গম্ভীর হয়ে যেত কয়েক মিনিটের জন্য। যদি সেই যাওয়াটা কয়েক দিন অন্তর হত। বলত—বাবুর আসার সময় হল! ওঃ, কি রাজকার্যে যে ব্যস্ত থাকে, সে—বস্।

পরক্ষণেই আবার সেই হাসি-হাসি মুখ। খেতে দিত পরিপাটি করে। ঘর নিঃশব্দ হয়ে যেত। মনেই হত না আমরা ঘরে আছি।

তা এদিকে বাবুর পড়াশুনোটা ঠিক আছে? না, সেগুলো জলাঞ্জলি দিয়েই রাজকর্ম হচ্ছে!

একটা পিন দিয়ে যেন আমায় স্পর্শ করল। তেমন বোধ হত।

আমি এসব কথার ধারে-কাছেও যেতাম না। চুপ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করতাম। হয়ত মাথা নীচু করে থাকতাম, হয়ত বা কখন তাকিয়ে দেখতাম। সব সময় ফিটফাট থাকত। কাপড়ের সঙ্গে ব্লাউজ রঙের সামঞ্জস্য রক্ষা করত। কপালের টিপটি বেশ সুন্দর করে দিত। মনে হত রঙের খেলায় মেতে উঠত মণিবৌদি। দুজনের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয় নি। সুখের খবর অবশ্য জানি না। তবে অভাবও তেমন কোন দিন চোখে পড়ে নি।

আজ আর স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই যে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগত। মুখশ্রী অপূর্ব মনে হত সজ্জার কৌশলে। কিন্তু খুব যে একটা কারসাজি সেখানে আশ্রয় নিত সে কথা বলি না। গায়ের রঙের সঙ্গে যা কিছুই পরত সবই মানাত। হয়ত মানাত বলেই পরত।

আমার বন্ধুরা যদিও সংখ্যায় খুব কম ছিল, তারা মাঝে মাঝে গুঞ্জন তুলত। দু-একটা বিদ্রূপাত্মক কথা বলত—সেই বয়সেও। যেগুলো আমার ভাল লাগার কথা নয়। ভালও লাগত না। কিন্তু সে-গুলো নিয়ে মাথাও ঘামাতাম না। অন্তত বয়সটা সব মানিয়ে নিয়েছিল।

কয়েক বছর কাটার পর একদিন মণি-বৌদি-মণিদা ওরা হঠাৎ হারিয়ে গেল, মহা-নগরীর ভীড়ে। শুনেছি, পার্ক লেনের মায়া কাটিয়ে দক্ষিণের কোন এক সুন্দর বাড়িতে গিয়েছে। আমাকে একবার পর্যন্ত খবর দেয় নি। হঠাৎ যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেছে। প্রথম প্রথম একটু আঘাত লেগে-ছিল। কিন্তু তারপর সময় সেই ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়েছে। আমিও একদিন সেসব বেমালুম ভুলে গিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছি বলে মনে করেছিলাম।

একদিন চৌরঙ্গী দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলাম অন্যমনস্ক হয়ে। পাশ থেকে কে যেন হাত ধরে ফেললে। বলল, আরে অতনু যে!

মণিবৌদি!

হ্যাঁ, কতদিন পরে দেখা।

হ্যাঁ। কত দিন?

মনে মনে হয়ত হিসেব করে নিলে মণিবৌদি। তারপর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে টেনে টেনে বলল, বার ব-ছ-র। এক যুগ পরে।

হঠাৎ তলিয়ে গিয়ে যেন হাতড়াতে চাইল। চোখে চোখ রেখে বলল, কেমন আছিস?

যেমন দেখছেন।

ভাবছিলাম, বার বছর আগের মণি-বৌদি যেন আরও সুন্দর হয়েছে! রঙের ঢেউ জেগেছে। রঙের সমাবেশে রূপের জোয়ার। মনোমুগ্ধকর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েও কমনীয়তায় ভরপুর। নয় মাতা নয় কন্যা সুন্দরী রূপসী—যেন আরো কিছু। সকলের ঊর্ধ্বে।

হাঁ করে কি দেখছিস।

কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বললাম, দেখছি, কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। মাপতে চাইছি।

কি মনে হয়?

মনে যা হয় সব কি তার বলা যায়?

আজকাল বুঝি খুব দুষ্টু হয়েছিস। কত কথা শিখেছিস—। একটু থেমে বলল, একদিন চল্ আমার ওখানে। বল্, যাবি তো।

যাব। মণিদা কেমন আছেন?

যাবি। গিয়ে দেখে আসবি।

আজ একা বেরিয়েছেন নাকি!

অনেক দিন ধরে ভাল লাগছে না। তাই বেরিয়ে এলাম বন্দীশালা থেকে। মানে ঐ সংসার।

সংসারটা কী বন্দীশালা?

মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে আলো জ্বলে উঠেছে। রং-বেরং আলো। ঝকমকে চৌরঙ্গী। জন-স্রোতের শেষ নেই। বেশ জমজমাট। ট্রাম-বাসের ঘর-ঘর শব্দ। মনুমেন্টের ওপাশটা আবছা। তারপর অন্ধকারের সীমানা।

জিজ্ঞাসা করল, এখন কোথায় থাকিস? কি করিস? সংসার করছিস? একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন।

উত্তর পরে দেওয়া যাবে একদিন।

পাত্তা পাওয়া গেলে তো। না, আজই হোক। কিন্তু এখানে নয়। চল্ আমার সঙ্গে।

এখন! কোথায়?

আমার বাসায়। চিনে আসতে পারবি। চল্ চল্।

আমার হাত ধরে চলতে লাগল ট্রাম স্টপেজের দিকে। কোন আপত্তি শুনতে চাইল না। আমিও আর বাধা দিতে পারি নি।

ট্রামে করে চলতে লাগলাম দক্ষিণ কলকাতার দিকে।

মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। যখন মনে হল আমার ওপর মণিবৌদির তেমন জোর আছে। আমি আর না করতে পারিনি। লোভাতুর মন বোধ হয় চেয়েছিল তার সাংসারিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে। অনেক দিন পর হলেও।

গিয়ে দেখেছি হরিশ মুখার্জি রোডে দোতলার পরে দুখানা ঘর নিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটা ফ্ল্যাট। পরিচ্ছন্ন পাড়া। প্রথম ঘরটিকে বসবার উপযুক্ত করে সাজান। আধুনিক উপকরণের কোনটির অভাব নেই। পার্ক লেনের সঙ্গে এর অনেক অমিল চোখে পড়ে।

মণিদা ছিল ভেতরের ঘরে। ছেলেকে পড়াচ্ছিল। উঠে এসে জড়িয়ে ধরল। দীর্ঘ অদর্শনের পর হৃদয়-সঞ্চিত স্নেহ স্বতোৎ-সারিত হয়ে প্রকাশিত হল। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লাম। স্বল্পবাক সেই

লোকটির ওপর আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। দীর্ঘ নীরবতায় যে যোগসূত্র ছিন্ন হতে চলেছিল তা আবার সগৌরবে সরব হয়ে উঠল যেন।

চোখের বার, মনের বার। তাই বলে সে একদম মুছে যায় না। বুঝলাম, সময় সুযোগ পেলে সেটাই একদিন বড় হয়ে দেখা দেয়।

বেরিয়ে এলাম, মন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। মণিবৌদির ওপর অভিমানের যে ভার ছিল—তাও। রাত অনেক হয়েছে। রাস্তার দোকানগুলো অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে। দু-একটা হোটেল-রেস্টুরেন্ট তখনো খোলা। বারবার মনে পড়তে লাগল মণিবৌদির কাতর আহ্বান। আবার আসিস অতনু।

গভীরভাবে দেখতে চেষ্টা করেছি মণিবৌদিকে। তার হৃদয়ের ওঠানামাকে। এ তো চোখ দিয়ে দেখা নয়। হৃদয় দিয়ে দেখা। মন দিয়ে দেখা। কিন্তু অত অল্প সময়ের মধ্যে তা কি সম্ভব! তবু পূর্ণ দেখার অনুভূতি দিয়ে অভিজ্ঞতার পরিমাপ করতে চেষ্টা করেছি। মনে মনে সংকল্প করেছি—আবার আসব। এখানে থাকে যেন তৃপ্তির আশা, আনন্দের আশা।

আমি সমুদ্রের পিয়াসী। অনন্ত আমার জিজ্ঞাসা। তারই অবগাহনে ডুবতে চাই। সুখে দুঃখ, দুঃখে সুখ। সেখান থেকে আহরণ করে নিতে চাই অনাস্বাদিত অনুভূতি। দীর্ঘ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম সমপ্রীতি। মণিবৌদি তার প্রতীক। আমার আদর্শ, আমার আনন্দ, আমার বেদনা।

মানসিক প্রশান্তিতে আমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। আমার সব ধ্যান-ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপর কিন্তু অনেকদিন কেটে গেছে। বার বার করেও আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। একালের গতিশীলতা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক। অর্থ সংকটের জটিল গ্রন্থি-মোচনে সময়ের সব, নিঃশেষ হয়ে যায়। অবশিষ্ট যা থাকে তা দিয়ে আর লোক-লৌকিকতা চলে কিনা সন্দেহ। আমি তার ব্যতিক্রম হতে পারি না। সভ্যতার সংকট কাটিয়ে ওঠাও সব সময় হয় না।

মাঝে মাঝে মণিবৌদির কথা মনে হলেও শূন্য স্থানটা পূর্বেকার কোন বিশেষ অবস্থার সঙ্গে মিশিয়ে নেই। কল্পনা যেখানে জাল বোনে। সুতরাং ফাঁকা জায়গাটা ভরাট হয়ে ওঠে।

কলকাতা নিয়ন লাইটের আলোয় যতই ঝকমক করুক না কেন, অন্ধকার যেমন কাটে না, তেমনই অন্ধকারের অন্ধত্বও ঠিক থাকে না। নিস্তব্ধতা রাতের মাপকাঠি।

লোক চলাচল কমে আসছে। মনে হচ্ছে রাত হয়েছে। তবু চলছি। কোন উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য যে থাকতে হবে এমন কোন কথা নয়। হাঁটছি শুধু।

হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ঐ যে দোতলা বাড়িটা। ঘর ভেতর আলো জ্বলছে। রঙীন-রঙীন আলো। সেতারের সুর ভাসছে। একটা অজানা আবেগ আবেশ ভাব। মন কেমন-কেমন-উদাসীন হয়ে গেল।

কাছে এসে দেখলাম, না, ওটা তো নয়। একবার মাত্র আশা। ভুল হল। আবার এগিয়ে গেলাম। বাড়ির নম্বরটা মনে করে রাখি নি। দেখলে চিনতে পারব এই ভরসায় আসা। হ্যাঁ ঠিক তাই। এবার ঠিক এসেছি কিনা যাচাই করে নিই। সেই পান-বিড়ির দোকান। তার পাশে ছোট মিষ্টির দোকান। এখনও খোলা আছে।

ওপর দিকে চাইলাম একবার। মণিবৌদির বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে তালা কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জানালাগুলো সব বন্ধ। আলো জ্বলছে কিনা দেখতে পেলাম না। অনেকটা নিরাশ হয়ে পড়লাম। দেখা না হলে আসাটাই মাটি হয়ে যাবে।

ওপরে ওঠবার সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কেমন যেন তীব্র পদক্ষেপ। আলো নেই। অন্ধকার আছড়ে পড়েছে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। তাও বন্ধ। হাত দিয়ে কড়াটাকে দেখে নিলাম তালা দেওয়া আছে কিনা। না, তালা দেওয়া নয়। শুয়ে পড়েছে নাকি! রাত কম হয়নি। শুয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আলোর ক্ষীণ রশ্মি আসছে দরজার ফাঁক দিয়ে। কপাটে হাত দিতেই একটু সরে গেল। মনে হল জেগে আছে। বসেই আছে।

দরজা খুলব কি— অসময় হয়নি তো? পার্ক লেনের বাড়ীতে এ ভাবনা হয়নি। আজ কেন হচ্ছে? সময়ের পার্থক্য কি চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটায়! হয়ত হবে। এমনভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না।

কষ্ট করে দরজাটা ঠেলে দিলাম। একটু একটু করে দরজাটা খুলল। আলো এসে পড়ল। পড়ল আমার চোখে। সেই আলোতে দেখলাম মণিবৌদির দেহটা দুই হাতের বেষ্টনে আবদ্ধ। পুরুষের মাথাটি তার মাথার ওপর। মুখ দেখতে পাই নি।

চোখ ধাঁধিয়ে উঠল ঝাপসা হয়ে। কেমন টনটন করছে। মণিদা কি এমন হতে পারে! মুহূর্তের এই ঘটনা কেমন বিকল করে দিল। হারিয়ে দিল।

কলকাতার আকাশটা ছুটছে। হু-হু করে। রং বেরং আস্তরণগুলো মিলে মিশে একাকার হতে হতে কালো কালো হয়ে যাচ্ছে যেন।

আমি একটু একটু করে হারিয়ে যেতে লাগলাম। পুরুষ মুখ তুলে চাইল। অচেনা অজানা ছন্ন-গম্ভীর প্রস্তর মূর্তির অন-রূপ মুখ নিল। মাথা নীচু করে ও-ঘরে চলে গেল। প্রকৃতির বহুরূপ। অপলক চাইনি কেমন ফ্যাকাসে। মণিবৌদির এ-মুখ আমি কোন দিন দেখি নি। সুন্দর মুখশ্রীর অন্তরালে এ কিসের ছাপ! করুণ কণ্ঠস্বরে বলল—অতনু তুই! আয়।

প্রাণহীন আহ্বান। আমার তাই মনে হয়েছে।

আমাকে বোধহয় মণিবৌদি ভাবতেই পারে নি এ সময়! কিন্তু আমি ভাবছি—যদি মণিদা হত, আমি না হয়ে! তারপর-- না, অতটা কি সে ভেবেছিল!

আমি পরিবেশটাকে একাবে চাই নি। অথচ কি হয়ে গেল! যা আমার কোন হাত ছিল না। নিজেকে কেমন দোষী লাগল।

কিন্তু মণিবৌদি! সেই হাসিখুশী মেয়েটির অনন্তযৌবনা জোয়ার হঠাৎ এ কি ঢেউ লাগল। নিত্য নতুন ঢেউয়ে যা তীর-ভূমিকে সোহাগ জানায়—তাই কিনা এক-দিকে ভেঙেচুরে চুরমার করে দিতে চাইছে!

আজ আর জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। মণিবৌদি কেমন আছেন। আমার সুদীর্ঘ ধ্যান-ধারণা কেমন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে থাকল। বুঝলাম না মণিদা কি দোষ করেছে। বেচারা শান্ত সরল মানুষটি সব পেয়েও যেন সব হারিয়েছে! কোথায় সে! কেন গেছে! এখনো ফেরেনি কেন! অনেক 'কেন' জট পাকিয়ে গেল ক্রমশ।

কোন কথাই আমি বলতে পারি নি এতক্ষণ। বলতেও পারিনি। এবার বললাম —আজ চলি। গলার স্বর আটকিয়ে যাচ্ছিল। মুখের দিকে চাইলাম মণিবৌদির। অস্বাভাবিক সে চাউনি। শুধু বলল—আর বুঝি কোন দিন আসবি না!

কোন উত্তর দিতে পারি নি সে কথার। বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এলো, অন্ধকারের সঙ্গে। এ অন্ধকার হয়ত কেটে যাবে। কেটে যাবে যোগসূত্রগুলো। তবু তার অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে কি।

আমি অতনু সান্যাল। আমার অভি-জ্ঞতার বরণ হল।

প্রকাশিত হল !!

অনেকের প্রতীক্ষার ত্রৈমাসিক সংকলন

ঘোড় সওয়ার

(দাম এক টাকা)

এ সংখ্যায় লিখছেন : সমরেশ বসু, সৌরীন্দ্র ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্র মজুমদার, কার্তিক গুহ, অমল ভৌমিক, হিমাদ্রি বসু, অমর সেন, সুভাষ ঘোষাল, উত্তম ভট্টাচার্য, সঞ্জয় দাশ, শংকর সাহা, চন্দন সেন, শুভ মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible]।

সম্পাদনা : আশিস সান্যাল

৫০, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

生花

পূর্ণঘট থেকে ইকেবানা

অমরাবতী। ঘটে পদ্মফুল কদমফুল ও আম্রপাতা, ঘটটি বেদীর ওপরে রাখা হয়েছে।

উমা বসু

এখন প্রশ্ন হতে পারে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের বিপক্ষে বুদ্ধদেব আত্ম-মত প্রচার করেছিলেন, সে ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপ পূর্ণঘট প্রতীক ব্যবহার অবকাশে হয়েছিল কি না? পরবর্তীকালের মহাযানপন্থীদের ক্রিয়া-কলাপে ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে হিন্দুধর্মের বহু ভাবের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু বৌদ্ধ-যুগের প্রথম পর্বে হীনযানপন্থীদের মধ্যে ঘটের ব্যবহার ছিল কি?

এদেশে অতি পুরাতন শিল্পরাজির মধ্যে বৌদ্ধশিল্পের কেন্দ্ররূপে সাঁচী, ভারহুত ও অমরাবতীর নাম উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকবৃন্দ এ বিষয়ে ঐকমত পোষণ করেন যে, এসব শিল্প খৃষ্টপূর্ব ২০০ বছর পূর্ব থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী করা হয়েছিল। প্রথম যুগের ভাস্কর্যে হীনযানমতের ছাপ নানাভাবে দেখা যায়। বুদ্ধদেবের জীবনীর উপর যেসব কাজ রয়েছে তাতে কোথাও বুদ্ধদেবের আকৃতি গড়ার চেষ্টা করা হয় নি। এখানে কখনো পাদুকা কখনো বোধিবৃক্ষ আবার কোথাও সিংহাসন প্রতীক বুদ্ধদেবের উপস্থিতি প্রকাশ করছে। এই শিল্পসম্ভারের মাঝে বহু জায়গায় পূর্ণঘটের অলংকরণ রয়েছে দেখা যায়। সাঁচীর বিখ্যাত তোরণের গায়ে, ভারহুতের বেদিকায় ও অমরাবতীতে পূর্ণ-ঘটের সুন্দর নকসা কাজ, ঘটের মধ্যে পদ্ম-পাতা ফুল ও কলি রয়েছে। আবার কোন ঘটে জীবনচক্রের প্রতীক পদ্ম বা ফুল ও কলি রয়েছে। আবার কলি, ফুটন্ত ফুল ও ঝরে পড়া ফুলের নকসা রয়েছে। অমরা-বতীর বিরাট ঘটে নানারকমের ফুল রয়েছে যেমন পদ্ম, কদম, শালুক ও ছোট ছোট নাম না জানা ফুল, ঘটটির আকৃতি পাথর বা ধাতুর তৈরী ঘটের মতো, একটি ছোট বেদীর ওপর রয়েছে। এইসব ঘটে বিজোড় সংখ্যার ফুল ও পাতার ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। বৌদ্ধযুগের প্রাচীন ভাস্কর্যে ঘটের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব দেখে মনে হয় ঐ যুগে ঘটের ব্যবহার ছিল। এইসব ভাস্কর্যে হিন্দু রীতি অনুসরণ করে পদ্মফুল বা লক্ষ্মীমূর্তির প্রতীক ব্যবহারও চোখে পড়ে। পদ্মফুল ভারতবর্ষের সব আব-হাওয়াতেই সব মাটিতেই জন্মায়, উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমের রাজস্থানে প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভা দেখা যায়—যেমন রূপে তেমনি গুণে তাই এর কদরও সর্বত্র। প্রাচীন-কাল থেকেই পদ্মফুলের সৌন্দর্য ও গুণের জন্য নানা ভাবের প্রতীকরূপে এর ব্যবহার দেখা যায়—শিল্পে, কাব্যে ও ধর্মে। ভারতের শিল্পী তার চারুকলায় যেভাবে পদ্মের সমাদর দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। পদ্ম লক্ষ্মী, ঐশ্বর্য, শান্তি, পবিত্রতা ও নারীর প্রতিরূপে চিহ্নিত হয়। শ্বেতপদ্ম সত্ত্ব, রক্তপদ্ম রজঃ ও নীল পদ্ম তমঃ গুণের প্রতীক রূপেও ব্যবহার করা হয়। ভারতের শ্রীমা নামে পরিচিত ভাস্কর্যে যে মূর্তি দেখা যায় তার সঙ্গে গজলক্ষ্মী বা কমলে-কামিনী সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ মূর্তি কোথাও প্রকৃতি এবং কোথাও পৃথিবী রূপে বর্ণিত হয়েছে। অনেকে বুদ্ধদেবের জন্ম-বৃত্তান্ত জ্ঞাপক প্রতীক বলে এটিকে ভুল করেন। বুদ্ধদেবের জন্মসংক্রান্ত প্রতীকী কারুকার্যে সচরাচর মায়াদেবীকে শায়িত অবস্থায় দেখা যায়, কিন্তু ঊর্ধ্বে একটি মাত্র হাতীর মূর্তি থাকে এবং শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় দেবদেবীর মূর্তিও উপস্থিত করা হয়। উপরিউক্ত শ্রীমা মূর্তির সুন্দর

রাখা রয়েছে, সেটি হচ্ছে প্রকৃতিদেবীর উপর মেঘাধিপতি ইন্দ্রের ঐরাবত বর্ষণসিঞ্চন করছে, বারিধারা ঐরাবতের শুঁড়ের মতই পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, বারিসিঞ্চনে সকল প্রকৃতি ফুল ফল ও শস্যের বৈভবে ঐশ্বর্যময়ী হয়ে উঠবে তারই প্রতীক এই পূর্ণঘটে পদ্মের উপর বিরাজমান নারী-মূর্তি আর বারি সিঞ্চনরত হস্তীমূর্তি। এরূপ বহু ক্ষেত্রেই প্রাচীন বৌদ্ধ কারুকার্যে হিন্দু মতের ছায়া পড়েছে দেখা যায়। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বুদ্ধদেব তৎকালীন বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বাহ্যাড়ম্বরের বিরোধিতা করে যাগযজ্ঞ, প্রাণীহত্যা বা মূর্তি পূজা নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সব কিছুই মন্দ ও পরিত্যাজ্য এমন মত প্রকাশ করেন নি। সেরূপ অভিমত প্রকাশ করলে হিন্দুধর্মের ওতপ্রোতভাবে জড়িত পূর্ণঘট বা পদ্মফুল প্রতীক ব্যবহার হীনযান-পন্থীদের শিল্পকলায় দেখা যেত না। এইসব ভাস্কর্যে ঘটের আকৃতি সম্পূর্ণ ভারতীয়, রোমান বা গ্রীক ভাসের অনুকরণ করা হয় নি। পদ্মফুল ও পাতার গঠনশৈলীতে বিদেশের কোন প্রভাব পড়েছে মনে হয় না—সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় ছাঁদে গড়া ঘট ও পদ্মফুল। তৎকালীন পদ্মফুল সমেত ঘটের অলঙ্করণ রুচি দেখলে পূর্ণ-ঘট থেকেই ইকেবানার যাত্রা শুরু হয়েছে যে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। খৃষ্ট-পূর্ব শত বৎসর পূর্বেই ভারতের অজ্ঞাত শিল্পিবৃন্দ ইকেবানার ছবিখানি মূর্তিটি ধরে রেখেছেন পাথরের বুকে পদ্মফুলের বিচিত্র শোভায়।

পরবর্তীকালে মহাযানপন্থী বৌদ্ধমত ভারতবর্ষে ও বিদেশে প্রাধান্যলাভ করে। এঁদের আচার-বিচারে তান্ত্রিকমতের প্রভাব দেখা যায়, বুদ্ধমূর্তি পূজো শুরু হয়। এই যুগের বুদ্ধমূর্তির হাতে প্রায়শই পদ্মফুল অথবা পদ্মফুলসহ ঘট দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে অথবা বিদেশে এরূপ পদ্ম ও ঘট হাতে বুদ্ধমূর্তি বহু দেখা যায়। জাপানের কানসুজি মন্দিরে অথবা কামাকুরা মিউজিয়ামে রক্ষিত বুদ্ধমূর্তির হাতে এরূপ নিদর্শন দেখা যায়। শ্যামদেশে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর ফলকের উপর মূর্তির নিকটে সামান্য উঁচু বেদীতে পূর্ণঘট ও পদ্মফুলের ব্যবহার দেখা যায়। এস্থলে জাপানে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তির হাতে রাখা পুষ্পাধারটির সঙ্গে শ্যামদেশের ঘটটির আকৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। পূর্বের পাত্রটিতে চীন দেশের প্রভাব রয়েছে দেখা যায় কিন্তু শ্যামদেশের ঘট ভারতীয় ঘটের অনুরূপ। দক্ষিণে জলপথে সিংহল বা শ্যামদেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটায় সে দেশের ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে-ভারতীয় ছাপ হুবহু সুস্পষ্ট রয়েছে উত্তরে স্থলপথ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার পরোক্ষভাবে হওয়ায় তার চেহারা দেশ ও কালের ব্যবধান অনুযায়ী অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে পড়েছে। ইকেবানার রীতিনীতির সঙ্গে ভারতীয়ভাবের এত মিল পাওয়ায় মনে হয় ও-দেশের পূর্ণঘটের সঙ্গে আমাদের দেশের পূর্ণঘটের তফাৎ তার চেহারায়, নয়। এ-দেশে এর প্রাচীন রূপটি বদলায় নি তার কারণ পূর্ণঘটের প্রতীক ব্যবহার সম্বন্ধে যেমন সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের আছে ও-দেশে ততটা প্রকাশ হয় নি। দ্বিতীয়তঃ মননপ্রিয় ভারতবাসী প্রতিমা ও পূর্ণঘটের মধ্যে আরেকটি সোপান তৈরী প্রয়োজন-বোধ করে নি আর প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের বাস্তবতার অধিকারী ভাব-রাজ্যের ঘটে তাই জড়প্রকৃতি আসন পেয়েছে অজানাকে জানার জন্য। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে জাপানবাসীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য,—প্রকৃতির প্রতি অগাধ ভালবাসা আর নৈসর্গিকজ্ঞান। পূর্ণঘটের ফুলপাতার বিন্যাসে তাই জাপান তাঁদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার পথ খুঁজে পেয়েছেন—ধীরে ধীরে মুকুলিত হল ইকেবানার শ্বেত শতদল। যুগ পরিবর্তনকে মানিয়ে নিয়ে বিকশিত হয়েছে পূর্ণ গৌরবে, রূপে গন্ধে আকৃষ্ট করেছে বিশ্বের রসিকজনকে। আধুনিক যুগে ধর্মের স্থান নেই বিজ্ঞান আর শিল্প তার স্থান দখল করেছে, ধর্মীয় অনুশাসনের জায়গায় মানতে হবে বিজ্ঞান ও শিল্পের বাণী—তাই দেখি আধুনিকতার জোয়ার এসে ইকেবানার বুকেও ঢেউ তুলেছে নিয়ম ভাঙ্গার গান শুনিয়ে। ইকেবানা যথার্থই সার্থকনামা যুগের হাওয়ার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে দুলছে নানা ছন্দে—অতীতের অলসমন্থর ছন্দ ভুলে দুলেছে বর্তমানের ছন্দে, বর্তমানের গতির ছন্দে জেগে যেছে ভবিষ্যতের বাঁশীর সুরে। এখন চলেছে নতুন ছন্দের প্রস্তুতি। জীবনস্রোতের অবিচ্ছিন্ন ধারা বেয়ে ফুটে থাকবে ইকেবানার শতদল প্রাণময় পুষ্পসজ্জায় বিশ্ব-সত্তার পূর্ণ প্রতীকরূপে।

ভারহুতবেদিকা। আমপাতার মালা ঘটের গলায়। প্রকৃতির আবহমানতা আম্রপত্র, পুষ্প ও ফল ব্যবহারে করা হয়েছে।

---

* আলোকচিত্র দুটি কলিকাতা যাদুঘরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অঙ্গনা

দুঃসময়ের বন্ধু

এখন সারা দেশেই পোলট্রি ফার্মিং-এর কদর। দিনে দিনে এ ব্যাপারে সকলের আগ্রহ বাড়ছে। শুধু এরই মাধ্যমে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করছেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। নরসিংদির সেই ভদ্রমহিলার কথা তো আমাদের অনেকেরই জানা আছে। তিনি পোলট্রি থেকে মাসে যা রোজগার করেন তা বড়ো রোজগেরেকেও লজ্জা দেয়। অথচ নরসিংদির পাশেই রাজস্থানের উদয়পুরে পোলট্রি ফার্মিং-এর এখনো তেমন চল হয়নি। সেখানকার অধিবাসীরা এই ব্যবসাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত। প্রচলিত সংস্কারই এজন্য দায়ী বলে মনে হয়।

সংস্কার বড় বালাই। সেই কবে নাকি চিন্দুর বাড়ির চালে মুরগি বসলে সব অশুদ্ধ হয়ে যেতো। গোটা বাড়িতে গোবর চাল ছড়া দিয়ে শুদ্ধ হতে হতো। সবচেয়ে বেশি নজর পড়তো রান্নাঘরের উপর। যেহেতু রান্না এবং রসনার সঙ্গেই এই প্রাণীটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বাসন-কোসন সব ধুয়ে ফেলেও রেহাই মিলতো না। সদ্য নিকানো রান্নাঘর আবার নিকোতে হতো। সারাদিনই বাড়িতে ধোয়ামোছা চলতো অবিরাম। খাওয়া-দাওয়ার পাট সেদিন মাথায় তোলা থাকত।

সেই সংস্কারের ঘোর এখন অনেকটা ফিকে হয়েছে। অন্যায়ের বোঝাও হালকা হয়েছে। এখন বাড়ির চাল নয় কোন্ ছার, রান্নাঘরে মুরগির অবাধ প্রবেশাধিকার। অনেক বাড়িতেই এই ছাড়পত্র মিলেছে। অবশ্য সর্বত্র নয়। সেখানে কড়াকড়ি শিথিল হলেও বাড়াবাড়ি তেমনি বাতিক রয়ে গেছে। দিনকালের কথা বিবেচনা করে কেউ কেউ বাড়িতেই পোলট্রি করে বসেছেন। এতে যেমন বাড়তি দুটো পয়সা পাওয়া যায়, তেমনি মাছের উপর দিয়েই প্রোটিনের অভাবটা পুষিয়ে নেওয়া যায়। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য থেকেই পোলট্রির কদর ক্রমে বাড়ছে।

শহরের স্বল্প পরিসরে কেউ কেউ দশ পনেরোটা মুরগি নিয়ে ছোট্ট পোলট্রি চালিয়ে যান। ইচ্ছা থাকলেও এর বড় করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। সেদিক থেকে চাষীদের অবস্থা কিন্তু আলাদা। জায়গার সমস্যা তার নেই। তারা অনায়াসেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বড়গোছের পোলট্রি খুলতে পারে। পোলট্রি দেখাশোনার লোক তো ঘরেই আছে। আমি চাষী-বউয়ের কথা বলছি। গরু-বাছুর যেমন হাসিমুখে দেখা-শোনা তারা করে, পোলট্রির দায়িত্বও তেমনি সানন্দে নিতে পারে। এতে বরং আরো সুবিধা হবে।

কারণ, সবদিন সমান যায় না। যে বছর সময়মতো বৃষ্টি হয়, সে বছর চাষআবাদে জমি উপচে পড়ে। চাষীর মনে আনন্দ আর ধরে না। ফসলভর্তি জমির দিকে তাকিয়ে সে খুশির হাসি হাসে। কিন্তু দুঃসময় ঘনিয়ে আসতেও দেরি হয় না। যে বছর বরুণ দেবতা অকৃপণ হয়, বৃষ্টি ধারায় ভূমি সরস হয় না, চাষীকে তখন মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। খেতের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ ফেটে জল আসে। তার সামনে জমাট বাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। তার তখন ভাবনা, সম্বচ্ছর ছেলেপুলে নিয়ে খাব কি?

এমনি অবস্থা হয়েছিল কিছুদিন আগে উদয়পুরে। পরপর দু' সাল অজন্মা। চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এমন বিপদে যে তাদের পড়তে হবে আগে জানা ছিল না। ধারদেনা করে, ঘটিবাটি বেচে কিছুদিন চললো। কিন্তু সকলেরই তো ভাঁড়ে-মা-ভবানী অবস্থা। ধার দেবে

কে? ঘটিবাটি বেচেই বা চলে কদিন? পেটের জ্বালায় সবাই গাঁ ছাড়তে উদ্যত হলো। সেই পুরোনো কাহিনী।

চাষীদের এই দুরবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এলো উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব সংগঠক শ্রীবাবেল। তাঁরা দীর্ঘদিন থেকেই চাষীদের পোলট্রির উপযোগিতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে চেয়েছেন। কিন্তু চাষীরা এসব কলেজে পড়ুয়া বাবুদের কথায় কান দেয়নি। দেবার দরকারই হয়নি। কারণ, তখন ফসলে গোলা একেবারে টইটম্বুর। এরকম সুফলা জমি থাকতে কে আর মুরগি পুষতে যায়!

এবার কিন্তু ওরাই বিপদে মধুসূদন। ছাত্রবন্ধুরা আবার সেই পুরনো বক্তব্য নিয়ে এলেন। বোঝালেন, এভাবে গাঁ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে হাতের কাছে উপায় আছে। সে পথে চললে যেমন অজন্মায় কোনদিন ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না, তেমনি গাঁ ছেড়ে পালানোর কথাও মনে আসবে না।

আগে ওদের কথা শুনেছে। এবারও শুনলো। তবু খুঁতখুঁতুনি যায় না। মুরগি পোষার কথাটা ঠিক মনে ধরছে না। অথচ দুবেলা দুমুঠো পেটে দেবার জন্য কিছু করা দরকার। গাঁই গুঁই করতে করতেই শেষে এই কলেজে পড়ুয়া বাবুদের প্রস্তাবটাই মনে ধরলো। গাঁয়ে থাকা যাবে এবং আয়ের পথও খুলে যাবে এ প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

প্রথমেই এগিয়ে এলো কোঠারিয়া গ্রামের মেয়ে প্রতিভা। প্রতিভার দুই ভাই একটু দূরেই বসে ছিল। তারা তো বোনের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক। বোন তাকালো ভায়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দু ভাইও রাজী। এরপর ওরা তিনজনে ট্রেনিং নিয়ে এলো পোলট্রি চালানোর।

ট্রেনিং নিয়ে এসে আর সময় নষ্ট করলো না ভাইবোনেরা। একশো মুরগির বাচ্চা নিয়ে শুরু করে দিলো পোলট্রি। দেখতে দেখতে ওদের ব্যবসা বেশ জমে উঠলো। এদিকে দুই ভাই খুব একটা সময় করে উঠতে পারে না। কারণ, দু'সাল অজন্মার পর আবার বসুন্ধরা মুখ তুলে চেয়েছেন। ক্ষেতে কাজ শুরু হয়েছে। তাই দুই ভাইয়ের আর ফুরসত নেই। এখন পোলট্রির সমস্ত দায়িত্ব প্রতিভার।

প্রতিভা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে পোলট্রি চালাচ্ছে। চাষী পরিবারের মেয়ে হলেও সে লেখাপড়া শিখেছে। পোলট্রি চালানোর সবকিছুই ইতিমধ্যে আয়ত্ত করেছে। উদয়পুর থেকে তার গ্রাম পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। এই দূরত্ব সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। নিজে গিয়ে মুরগির খাবার নিয়ে আসে উদয়পুর পোলট্রি ব্রিডার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে। খাবার ছাড়াও মুরগিগুলি সম্পর্কে সবই প্রতিভার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

প্রতিভার দেখাদেখি অনেকেই এগিয়ে এসেছে। এমনি একজন বয়স্কা মহিলার বাড়ি উদয়পুরের কাছাকাছি খেমপুর-মালারি গ্রামে। পোলট্রি তার কাছে প্রায় অন্ধের যষ্ঠির মতন। স্বামী দুর্ঘটনায় পঙ্গু। এদিকে বাড়িতে চারটি বাচ্চা। সংসার অচল। মহিলা পড়লেন মহা ভাবনায়।

এমন সময় প্রতিভার কাছ থেকে পোলট্রি ট্রেনিং সেন্টারের খবর পেয়ে ছুটে গেল উদয়পুর। সেখানে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এল গাঁয়ে। তিনশো মুরগির বাচ্চা দিয়ে শুরু হলো পোলট্রি। তারপর দিনে দিনে মুরগির বাচ্চা আরো বেড়েছে। এখন সেই পোলট্রি মুরগির সংখ্যা হলো পাঁচশো। তিন মাসের মধ্যেই এই অভাবনীয় উন্নতি। এই পাঁচশো মুরগির পোলট্রি ফার্ম থেকে প্রতি মাসে আয় হচ্ছে তিনশো টাকা। এতে শুধু সংসারই চলছে না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও হচ্ছে। স্বামীর আকস্মিক পঙ্গুত্বের পর যে অন্ধকার তাকে হাঁ করে গিলতে এসেছিল পোলট্রির দৌলতে সে অন্ধকার কেটে গিয়ে সে এখন আলোর মুখোমুখি।

এমনিভাবে এগিয়ে এসেছে উদয়পুরের অনেক মেয়ে। পুরুষরাও পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। পোলট্রির ব্যাপারে মেয়েরা এক-চেটিয়া বাহাদুরি লুটে সেটা তাদের পৌরুষে আটকায়। তাই উদ্যোগী মহিলাদের পাশে তারাও দাঁড়াচ্ছে। নানাভাবে সাহায্য করছে।

রাজস্থানের চাষের ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের দেশে সাধারণত জমিতে লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বোনা এবং জলসেচ এ ধরনের খাটুনীর কাজগুলো পুরুষরাই করে থাকে। মেয়েরা এসব কাজে পুরুষের সহযোগী হিসাবেই থাকে। কিন্তু রাজস্থানে ঠিক তার উল্টো। মেয়েরা চাষের কাজে সক্রিয় অংশ নেয়। পুরুষদের ওপর তারা হয়তো খুব একটা নির্ভর করতে চায় না। সেজন্যেই পোলট্রির দায়িত্বও এককভাবে পুরুষদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। শুরুর সময় পুরুষরা সঙ্গে থাকলেও আস্তে আস্তে দায়িত্ব সম্পূর্ণ গিয়ে পড়ে মেয়েদের কাঁধে। আর মেয়েরা তো তাই চায়। এমন একটা সুখের ভরের চাবি তারা নিজেদের হাতেই রাখতে চায়। এই গৌরবে যেন আর কেউ ভাগ না বসাতে পারে।

দিনে দিনে উদয়পুরে পোলট্রি সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়ছে। সব ধরনের মেয়েরাই ক্রমে অধিক সংখ্যায় এগিয়ে আসছে। কারণ, একটা জিনিস তারা বুঝতে পেরেছে যে, পোলট্রি ফার্মিং যেমন সুসময়ে বাঁচায়, তেমনি দুর্দিনেও পরম বন্ধুর হাত বাড়িয়ে সাহায্য করে।

—প্রমীলা

কোকিল

ইন্দ্রাণী দাস

কোকিল কুহু কুহু রবে ডাক দিয়ে যায়,
সারা মানুষের মনকে জীবন মাতায়—
এই মন মাতানো ডাকে কে শেখায়
আনন্দে সে শুধু ঘুরে বেড়ায়,
—বলে যায় বন্ধুরা পিছু পিছু আয়।
কোকিল দিনে সে ডেকে বেড়ায়,
আর লাল রঙে দেয় নতুন আমের বোল।
যখন বসন্ত চলে যায়
তার সুখও হারায়।
সবাই তাকে চায়, তাকে
সে তো ধরা দেয় না কাকেও,
দূরে দূরে থাকে।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে প্রকাশিত সতীকান্ত গুহের 'রাধা' গল্পের

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৮	১	১ ও ২	বসে বসে পড়লেন	বসে পড়লেন
১০৮	১	৭	দমকপ্রদ	চমকপ্রদ
১০৮	১	১৪	প্রেমবিকাশের	প্রেমবিকাশের
১১০	১	২৫	অভিধানের	অভিধানের
১১০	৩	৯	। ('করবের' পর)	.
১১০	৩	১০	। ('দেখব'র পর)	.
১১০	৩	১১	অভিজ্ঞতায়	অভিজ্ঞতার
১১০	৩	১৮	। ('পারে না'র পর)	
১১০	৩	৩২	বিরস	বিরস কণ্ঠে
১১১	১	১	হোয়াই	হোয়াট
১১২	১	১৮	বাধা হলেন	ইঙ্গিত করলেন
১১২	২	৩২	ধব	ধার
১১২	২	৪১	[illegible]	আমির পান করে
১১৫	১	৭	[illegible]	আপনজোর
১১৫	১	৫০	[illegible]	দর্শিত জোরে
১১৫	[illegible]	১১	[illegible]	[illegible] কী
১১৪	৩	৫০	[illegible]	[illegible]লেন,

CENTRAL LIBRARY

জলসা

সাংবাদিক সম্মেলনে শিশিরকণা ধরচৌধুরী : উত্তর-ভারতের শীর্ষস্থানীয়া বেহালাবাদিকা শ্রীমতী শিশিরকণা ধর-চৌধুরী গত মঙ্গলবার (২০শে এপ্রিল) সাংবাদিক ও সঙ্গীতরসিক মহলের সঙ্গে একটি ঘরোয়া সম্মেলনে মিলিত হন।

প্রকাশকুণ্ঠ, লাজুক শিল্পী উপস্থিত সাংবাদিকদের সাজনম্র অভিবাদন জানিয়ে দ্বিধাসঙ্কোচকুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন : প্রেস কনফারেন্সে কিছু বলার চেয়ে আমার হাতে একটা বেহালা দিলেই বোধহয় সবচেয়ে ভালো হোত—বেহালাই আমার হয়ে কথা বলত।

কিন্তু প্রশ্নবাণ ঠিক যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত হলে বাজনার তারের মত হৃদয়ের তারেও কাঁপন লাগতে দেরী হয় না। বাকভীরু শিল্পীও বাচনকুশলী হয়ে উঠতে পারেন, তারই পরিচয় পাওয়া গেল সাংবাদিক ছাড়াও উপস্থিত সুধীবৃন্দের প্রশ্নের উত্তরে শিশিরকণার সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল বক্তব্যে।

পণ্ডিত ভি জি যোগ, ওস্তাদ আলি আকবর, গুরু আলাউদ্দিন এবং আরও নানান ওস্তাদের শিক্ষার পটভূমিকায় গড়ে ওঠা আপনার সঙ্গীত-দর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং সুখ্যাত শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত সম্বন্ধে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটি কি? এ ছিল সাংবাদিকদের প্রথম প্রশ্ন।

প্রত্যুত্তরে নম্র নেত্রে এবং কুণ্ঠিত স্বরে শিল্পী বললেন : আমি নিজেকে শিল্পী বলে মনেই করি না। শিক্ষার শুরুতে যেমন আজও তেমনি আমি শিক্ষার্থী। এখন তার চেয়ে বেশী কিছু এগিয়েছি বলে ত মনে হয় না। শিক্ষার কোনো শেষ নেই এই কথাটাই নতুন করে অনুভব করে আরো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছি, সঙ্গীত-সমুদ্রে অবগাহন করছি বটে কিন্তু কোনদিন কি পারাপার হতে পারব?

প্রথম যখন বাজাতে শুরু করি সবই খুব সহজ, আনন্দের জিনিস বলে মনে হোতো। কিন্তু যত বাজাচ্ছি, রেওয়াজ করছি, চিন্তা করছি, যতই ভেতরে প্রবেশ করছি ততই এই উপলব্ধিই হচ্ছে যে আমার জানাটা সীমাবদ্ধ, বোঝাটা অসম্পূর্ণ কারণ সঙ্গীতের পথ বড় কঠিন আর সাধনাসাপেক্ষ। এই উপলব্ধি থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগ্রহটা আরো দুর্বার হয়ে উঠছে। অনেকটা অজানা অনুভবের রহস্যের ঘোমটা খুলে তাকে দেখবার কৌতূহলের মত।

মেয়েরা বড় একটা এ যন্ত্রে হাত রাখেন না তবু এ যন্ত্রকেই কেন আপনি বেছে নিলেন?

পণ্ডিত ভি জি যোগই এর কারণ। আগে বেহালা বাজাতাম এই পর্যন্ত। কিন্তু বেহালাকে আশ্রয় করে সঙ্গীতের বিচিত্র বিভিন্ন ধারায় পরিক্রমণ করা যায় অনায়াসে—এই সত্যে পৌঁছলাম যোগ-সাহেবের বাজনা শুনে। তখনই বেহালাকে আমার 'নিজেরই যন্ত্র' বলে মনে হল। অনেক পরে এলাম আলি আকবরজীর সংস্পর্শে। বিস্ময়-বিহ্বলতা যেন আরো বাড়ল : বাজনায় এত রঙ, এত রস, এত আবেগের উদ্দীপনা অথচ ধ্যানের প্রশান্তি আনা অসম্ভব। বিরাট সমুদ্রের অশ্রান্ত ঢেউ ও অতল গভীরতা, গতির অভিসার দেখে আমি যেন সম্মোহিত হয়ে পড়লাম। তখনই এই সঙ্কল্পে দৃঢ় হলাম যেমন করে হোক এ বস্তু আয়ত্ত করতেই হবে। আবেগের বেগে নিজের অযোগ্যতার বাধাটা যেন ভুলেই গেলাম।

বেহালা মূলত ভিনদেশী যন্ত্র। ওদেশের শিল্পীদের শক্তিশালী সুরমূর্ছনা শুনে মনেই হয় না এর ওপর ভারতীয় শিল্পসুষমা ফোটান সম্ভব—বাধা আছে বিস্তর। আপনি কি বলেন?

—এ কথা মানি না। বাজাতে বসলে ভুলেই যাই আমার হাতে ধরা যন্ত্রটি ভিনদেশী—এদেশের যন্ত্র না ওদেশের। ওদেশের বোয়িং খুব পাওয়ারফুল। আশ্চর্য হবার মত আরো অনেক অশিক্ষ ওঁদের ভাঁড়ারে নিশ্চয় আছে। ওঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ওঁদের বাজনাই শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু ভারতীয় রাগ-ভাব বিস্তারের ঐ পদ্ধতি অনুকূল নয়। কারণ উভয় দেশের জীবনদর্শনের মতো সঙ্গীতের স্বধর্মও ভিন্ন, আবেদনও ভিন্নতর। কাজেই ভিনদেশী বেহালাকে এদেশে যাঁরা বাজাবেন—এ দেশের সঙ্গীত-ঐতিহ্যের অনুসারী বাদনশৈলী তাঁদেরই রচনা করে নিতে হবে।

—আপনার বাদনশৈলীর বক্তব্য কি?

নিজস্ব বক্তব্য পেশ করবার মত কোনো সঙ্গীত-ব্যক্তিত্ব আমার এখনও গড়ে ওঠেনি। তবে চেষ্টা করেছি গায়কী অঙ্গের সঙ্গে তন্ত্রকার অঙ্গের মেলবন্ধন ঘটাতে—পেরেছি কিনা জানি না।

চমৎকারভাবে পেরেছেন। আর এই জন্যই আপনার বাজনায় বৈচিত্র্যের যেন অন্ত নেই। এই সম্বন্ধে [illegible] প্রেরণা কোথা থেকে এল?

প্রথম শুনি পান্নালাল ঘোষের বাঁশী শুনে গায়কী অঙ্গের মনোহর লালিত্যে আকৃষ্ট হয়েছি। পরে আলি আকবর খাঁর গৎকিরী, লড়ফেরতার কত কঠিন ও উপভোগ্য আনাগোনা, তানের ছোলুর, রঙের বাহার—যেন এক আশ্চর্য ঐশ্বর্য-লোকের আভাস দিল। তখন থেকেই আমার ব্রত হোলো গায়কী ও গৎকিরী অঙ্গকে মিলিয়ে বেহালায় ভারতীয় পদ্ধতিতে এক বাদনশৈলী রচনা করবার।

—আর একটি প্রশ্ন। আগে প্রতিটি সঙ্গীত সম্মেলনেই আপনি ছিলেন অপরিহার্য শিল্পী। কিন্তু কেমন যেন ব্যতিক্রম ঘটছে, ইদানিং কোনো সম্মেলনেই আপনি বাজাচ্ছেন না। এর আড়ালে কোনো সাঙ্গীতিক রাজনীতি নেই ত?

—না। সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রণ না আসার জন্যে আমার কোনো অভিযোগ বা অভিমান নেই। আমার বাজনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অপূর্ণতা আছে যার জন্য সঙ্গীত সম্মেলনের কর্ম-কর্তাদের খুশী করতে পারছি না। যেদিন সম্পূর্ণতার সেই বিশেষ স্তরে পৌঁছব তখন আমন্ত্রণ আপনা থেকেই আসবে। শিল্পীর পরিশীলিত অন্তরের দৃঢ় অথচ বিনয়কোমল উক্তির সত্যতায় সকলের মনে মুগ্ধতার ছাপ রাখে।

সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে আহ্বায়ক প্রমথেশ সেন ঘোষণা করলেন যে, শিশির-কণার অজস্র অনুরাগীদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে আগামী ২রা মে সকালে সবরং সঙ্গীত সম্মেলনের পক্ষ হতে শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রসদনে শিশিরকণার একক আসরের আয়োজন করেছেন।

আলম উৎসব : আগামী ২রা মে সন্ধ্যা ৬টায় সি এল টি'র কর্মিবৃন্দ অবন মহলে প্রযোজিত 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ' পুতুল নাচ মঞ্চস্থ করবেন। ৭ই, ৮ই এবং ৯ই মে প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হবে। ১৫ই এবং ১৬ই মে অবনমহলে শিশুনাট্য সম্বন্ধে আলোচনাচক্র বসবে।

'নটরাজ' প্রযোজিত 'ফাল্গুনী' : 'ফাল্গুনী' গীতিনাট্য কবিগুরুর মানস-লালিত সেই অতি-প্রিয় এবং রবীন্দ্র-কাব্য ও সাহিত্যের অন্তর্বর্তীতত্ত্ব এক কাব্যময় প্রকাশ। চিরসবুজ বসন্তের যৌবনহিল্লোল সকল জীর্ণতাকে উড়িয়ে দিয়ে নবীন প্রাণের স্পন্দনে সঞ্জীবিত করে তাকে লাবণ্যশ্রীতে পরিপূর্ণ করে তোলে। বার্ধক্য ও যৌবন একই প্রাণপ্রবাহের-দুটি দিক।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবদর্শনকে সম্পূর্ণ রাবীন্দ্রিক ঢঙে পরিবেশন করে তার মূল রসকে অবিকৃত রাখার জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ প্রাপ্য বিশ্বজিৎ রায় পরিচালিত 'নটরাজ' সংস্থার সভ্যবৃন্দের। গত সপ্তাহে রবীন্দ্র-সদনে মঞ্চস্থ 'ফাল্গুনী' পরিহাসে, রঙে, ছন্দে ও সঙ্গীতে দুটি ঘণ্টা যেন সরস করে রেখেছিল। শান্তিনিকেতনের সান্নিধ্য-জাত বিশ্বজিৎ রায়ের শিল্পবোধ ও রবীন্দ্র-ঐতিহ্যবোধ উৎসব সাফল্যের অন্যতম কারণ। প্রসঙ্গত মঞ্চসজ্জায় কৃষ্ণচূড়া ও নানারঙা পুষ্পসমৃদ্ধ প্রকৃতির আভাস এবং এই পটভূমিকায় রঙিন পোশাক ও উত্তরীয় শোভিত নবীন দলের বাঁধভাঙা প্রাণোচ্ছাসই ফাল্গুনীর মর্মবাণী দর্শক-চিত্তে পৌঁছে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

সর্দাররূপী প্রসূন চৌধুরী নবীনের আনন্দ ও প্রবীণের অভিজ্ঞতার গভীরতাকে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যক্ত করেছেন। চন্দ্রোদয় ঘোষ, দীপ সেন, অশোক দত্ত, আভাস সেন, অমিত বসু, রজতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে মানব প্রকৃতির অন্যান্য চরিত্র যথাযোগ্যরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'শঙ্করম' তাঁর নৃত্যকুশলতা ও অভিব্যক্তি ও সজ্জায় মানবপ্রকৃতির ছবি হয়ে উঠেছেন। বেণুবন, শাখী এবং চাঁপাকে অনুভবগোচর করেন জর্নজিৎ রায়, মঞ্জুশ্রী মিত্র, সেবন্তী মজুমদার, কৃত্তিকা মিত্র মধুকেয়া রায়চৌধুরী, মৌসুমী গুহ, নার্গিস রহিম এবং কৃষ্ণা সেন।

একক সঙ্গীত এবং সমবেত সঙ্গীতের প্রত্যেকটিই সুগীত এবং নাট্যরস সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ। বিশ্বজিৎ রায় নৃত্য-সঙ্গীত ও নাট্যপরিচালকের ত্রিবিধ দায়িত্ব পরিচালনায় যোগ্যতার স্বাক্ষর ত রেখেইছেন এ ছাড়াও বাউলের ছোট্ট ভূমিকাতেও ইনি মুক্তপ্রাণের বাউলকে মূর্ত করে তোলেন। সব দিক দিয়ে 'ফাল্গুনী' গীতিনাট্য সার্থক হয়ে উঠেছিল।

বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মাহালিয়া জ্যাকসন

২১ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় কলকাতায় সেন্টপল ক্যাথিড্রেলে বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পী মাহালিয়া জ্যাকসন সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। ভগবৎ সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্যা তা আজ সর্বজনস্বীকৃত. ইউরোপের বহুদেশে ও আমেরিকায় প্রশংসার বহু পুষ্পমাল্যই তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে। কলকাতায় এই তাঁর প্রথম আগমন। ইন্দো আমেরিকান সোসাইটির উদ্যোগে তাঁর এই সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা। জনৈক নিগ্রো ক্রীতদাসের পৌত্রী শিল্পী মাহালিয়া জীবনে বহু অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছেন। কোন সময়ে রাঁধুনী, কোন সময়ে রজকিনী, কোন সময়ে শিশু পালয়িত্রী আর কোন সময়ে বা কারখানার শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছেন। নিয়মিত-ভাবে সঙ্গীত অনুশীলনের সুযোগ তিনি তাঁর জীবনে পান নি। কিন্তু তিনি যেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন সেখানেই শ্রোতৃবর্গ তাঁর অপূর্ব ভাবগাম্ভীর্য সুমধুর সঙ্গীতে বিমোহিত হয়েছেন। ইনি আমে-রিকার কলাম্বিয়া কোম্পানীর একজন বিশেষ শিল্পী এবং তাঁর গানের বহু রেকর্ড ঐ কোম্পানী করেছে।

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য লুইজিয়ানার নিউ অর্লিয়েন্সে মাহালিয়া জ্যাকসনের জন্ম। তাঁর বাপ মায়ের ছটি সন্তানের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তাঁর বাবা স্টিভেডোর বা জাহাজের মাল খালাস ও বোঝাই করার কাজ করতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন ব্যাপটিস্ট চার্চের মিনিস্টার। মাহালিয়া, পাঁচ বছর বয়সে তাঁর বাবার ঐ গির্জায় সমবেত ভগবৎ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতো।

ন বছর বয়সে স্কুল ছাটি হবার পর তাঁকে একটি লণ্ড্রিতে কাপড় কাচার কাজ করতে হতো। তার পরে আর তাঁর খুব বেশী পড়াশুনা হয়নি। মাত্র অষ্টম মান পর্যন্ত মাহালিয়া পড়েছিলেন। তারপর সংসার প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে তাঁকে পুরো সময়ের জনাই কাজে যোগ দিতে হলো প্রথমে লুইজিয়ানায় তুলার খেতে। তারপর চলে এলেন শিকাগোতে সেখানে কারখানায় কাজ নিলেন মাহালিয়া। তখন তাঁর বয়স ষোল।

ঐ সময়েই কোন মহড়ায় মাহালিয়ার সতেজ ও বলিষ্ঠ কণ্ঠ সালেমের ব্যাপটিস্ট চার্চের সঙ্গীত পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মাহালিয়াকে কেন্দ্র করে পাঁচজন শিল্পীকে নিয়ে একটি সঙ্গীতগোষ্ঠী তৈরী করেন। ঐ দলটি নানাস্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করে এবং এর ফলে শিল্পী হিসাবে মাহালিয়ার খ্যাতি নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

কালীঘাট স্মৃতি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে সভাপতি শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ভাষণ দিচ্ছেন। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মাহালিয়া জ্যাকসন

তখনও মাহালিয়া কারখানায় কাজ করতেন এবং অবসর সময়ে গির্জায় গির্জায় সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। সঙ্গীত ব্যতীত, কেশবিন্যাস, প্রসাধন এবং ফুল বিক্রীর ক্ষেত্রেও তিনি একজন দক্ষ শিল্পী। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এসব কাজও তিনি করেছেন এবং বেশ কিছু পয়সা উপার্জনও করেছেন।

আমেরিকার প্রখ্যাত কার্নেগী হলে ১৯৫০ খৃঃ তিনি প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তারপর অসংখ্যবার সেই হলে তাঁর অপূর্ব উদাত্ত কণ্ঠ শোনা গিয়েছে। শ্রোতৃবর্গকে প্রতিবারই তাঁর অপূর্ব সুর-লহরী বিমোহিত করেছে।

এই বিশিষ্ট শিল্পী ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, জার্মেনী, সুইডেন প্রভৃতি ইয়োরোপের নানা দেশে সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

কেবলমাত্র ভগবৎ সঙ্গীত বা গসপেল সিংগিং, ব্লুজ বা নিগ্রো করুণ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই নয় জাজ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তিনি একজন বিশিষ্ট শিল্পী। ডিউক এলিংটনের অর্কেস্ট্রা দলের শিল্পীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতমা। এই তিন প্রকার সঙ্গীত সম্পর্কে মাহালিয়া একবার বলেছিলেন যে, ব্লুজ, জাজ ও গসপেলের উৎস একই হতে পারে, একধরনের সঙ্গীত নয়, প্রত্যেকটিরই তাল লয় মানের দিক থেকে ভিন্ন রূপ, ভিন্ন আবেদন।

—চিত্রাঙ্গদা

এবার রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ডে নতুন

এবছর পঁচিশে বৈশাখে এইচ এম ভির শ্রদ্ধাঞ্জলি—
এপার বাংলার নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের নতুন রেকর্ড সংকলনের সঙ্গে ওপার বাংলার শিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের নতুন নতুন রেকর্ড :

৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেন্ডেড প্লে রেকর্ড

শ্যামল মিত্র

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুচিত্রা মিত্র

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

নীলিমা সেন

৪৫ আর-পি-এম
স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড

অশোক গুপ্ত

নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আরতি মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

সুনীল মল্লিক

লং প্লেয়িং রেকর্ড
সঙ্গস্‌ অব রবীন্দ্রনাথ—২য় খণ্ড

"বাংলাদেশ"এর শিল্পীদের কণ্ঠে :
৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেন্ডেড প্লে রেকর্ড
সন্জীদা খাতুন/ফাহমিদা খাতুন

রাখী চক্রবর্তী/কলিম শরাফী

৪৫ আর-পি-এম
স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড
ইফফৎ আরা দেওয়ান

EMI

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ইলেক্ট্রনিক, রেকর্ড ও অবকাশে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম)

GC 4466

প্রেক্ষাগৃহ

বাঙলায় যাকে আমরা বলি কোটিতে গোটিক, হিন্দীতে তাকেই বলা হয় 'লাখোঁ মে এক'। সত্যিই, মাদ্রাজের জেমিনী পিকচার্স-এর আধুনিকতম ছবি 'লাখোঁ মে এক'-এর নায়ক ভোলার মতো চরিত্র বাস্তব জগতে কোটিতেও একটি হয় কিনা সন্দেহ। বোম্বাই শহরের একটি ব্যারাক-বাড়ীর এক-তলায় সিঁড়ির নীচে সে মাথা গোঁজার স্থান পেয়েছে। বাড়ীতে বসবাসকারী প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারেরই সে হচ্ছে বিনা মাইনের চাকর। বাজার করে দেওয়া, দুধ আনা, ওষুধ খাওয়ানো, খবরের কাগজ কিনে আনা —হরেক রকম কাজের জন্যে সকলেই তার ওপর নির্ভর করে। নির্বিচারে, হাসিমুখে এই সব কাজ করার পরিবর্তে সে থালা হাতে ওদের দ্বারস্থ হয় কিছু আহারের জন্যে। গৃহস্থের দরজা গোড়ায় গিয়ে ও বলে : ভোলা এসেছে; আমি ভোলা। তখন দয়া করে কেউ কিছু দেয়, কেউ আবার নানারকম মিথ্যে অজুহাতে ফিরিয়েও দেয়। এই অবস্থার মধ্যে থেকেও ভোলা কিন্তু তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে এবং বেশ ভালোভাবেই। দেখা যায়, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হচ্ছে তিনজন লোক। এক তার কলেজের এক প্রফেসার, যিনি তাকে বই দিয়ে সাহায্য করেন; দুই, লরী ড্রাইভার শের সিং, যে তার সুখদুঃখ বোঝে, তাকে নানা রকমে সাহায্য করে এবং নিজের শক্তি দিয়ে তাকে রক্ষা করে; তিন, প্রৌঢ় দালাল, যিনি তার আন্তরিকতা ও সততায় মুগ্ধ। এরই মধ্যে আর একজন এল, যার মনকে সে ছুঁতে পেরেছিল। সে হচ্ছে মনোহরলালের কন্যা গৌরী। মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্যে বেশ কিছুদিন উন্মাদাশ্রমে চিকিৎসিত হয়ে সুস্থ হবার পরে সে মা-বাপের কাছে ফিরে এসেছে এবং খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে-থাকা মাখনলালের রোজগারী ছেলে জীবনের সঙ্গে বিবাহিত হতে গিয়েও হতে পারেনি, বিবাহমণ্ডপে তার বিকৃত মস্তিষ্কের কথা প্রকাশিত হওয়ায়। গৌরীর পরিচয় হ'ল সে পাগলী; আর ভোলার পরিচয়, সে দীনদুঃখী। দুজনকেই ঐ ব্যারাক-বাড়ীর অধিবাসীদের কাছ থেকে হেনস্তা সইতে হয় এবং এই সমান অবস্থাই উভয়কে পরস্পরের নিকটস্থ করে। শের সিংয়ের পরামর্শ-চালিত হয়ে ভোলা এবং গৌরী ক্রমে পরস্পরের প্রতি প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু ওদের মিলনের পথে আসে নানা রকম বাধা। হরেক রকম বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চিত্র-কাহিনীটি অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত ভোলা ও গৌরীকে কেমন করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, তাই নিয়েই ছবির শেষ পর্বটি গঠিত।

বলা যেতে পারে, 'লাখোঁ মে এক' ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, দর্শকদের আনন্দবিধান করা এবং তারই ফাঁকে চোখের সামনে কিছু জীবনাদর্শ তুলে ধরা। কিন্তু এ-ব্যাপারে বিভিন্ন পরিস্থিতি রচনার মাধ্যমে কাহিনী বিস্তারের ক্ষেত্রে বাস্তবানুগ হবার কিংবা সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার দিকে দৃষ্টি দেবার কোনো প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না।

মেহমুদের অভিনয়শক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেই যে কাহিনীটি রচিত হয়েছে, এ-কথা 'লাখোঁ মে এক' ছবির দর্শকমাত্রই স্বীকার করবেন। কিন্তু মেহমুদ যেখানে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে করুণরসের অবতারণা করবার চেষ্টায় সিরিয়াস অভিনয় করেন, সেখানে তাঁকে মেনে নেওয়া কঠিন। মেহমুদ যে কৌতুকাভিনয়ের জন্যে জনপ্রিয় সেই বিন্দুঃ ক্ষেত্রের বাইরে যাওয়া তাঁর উচিত নয়। বরং বলব, প্রাণ ভিলেনরূপে পরিচিত হলেও তিনি যে মহৎ চরিত্রও চিত্রিত করতে সমানভাবে সক্ষম, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখেছিলেন 'শহীদ'-চিত্রে। বর্তমান ছবিতে লরী ড্রাইভার শের সিংয়ের দিলখোলা চরিত্রটিকে উপভোগ্যভাবে সার্থক করে তুলেছেন তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রাণবন্ত অভিনয়ের দ্বারা। শের সিংয়ের কৌশলপ্রসূত ভোলার জ্যোতিষী সিদ্ধাপুরী বাপ অভিনয়ে হবার পরে শের সিং-বেশী প্রাণের এক বক্তৃতা যাত দুলো, এক মর্তীমসা লড়কা' গানের সঙ্গে তাগড়া নৃত্য দৃশ্যটি ভোলবার নয়। এই ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হচ্ছেন প্রাণ। নবাগতা রাধা নায়িকা গৌরীর চরিত্রটিকে দক্ষতার সঙ্গে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বিশেষ করে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় অপ্র-

ছদ্মবেশী/মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং উত্তমকুমার। পরিচালনা: অগ্রদূত ফটো: [illegible]

কৃতিত্বের অভিনয়ে তাঁর পারদর্শিতা লক্ষণীয়। এছাড়া নাজির হোসেন (দীন দয়াল), কানহাইয়ালাল (মনোহরলাল), রমেশ দেও (জীবন), মুকরী (মাখনলাল), ভোঁভড (প্রোফেসার), মদন পুরী (ভোলার সাজানো-বাপ), ললিতা পাওয়ার (মনোহরের স্ত্রী), অরুণা ইরাণী (জীবনের ভগ্নী), শুভা খোটে, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, পারভীন পাল প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। ভোলার পিছনে-লাগা অশিষ্ট যুবকদল সমগ্রভাবে অতি-অভিনয় করেছেন।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে আশানুরূপ দক্ষতার নিদর্শন দেখা যায়। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়, এইচ. শান্তারামের শিল্প নির্দেশনার, কে. এইচ. কাপাডিয়ার চিত্রগ্রহণের এবং এম. উমানাথের সম্পাদনার। ষোল রীলের সুদীর্ঘ ছবিকে যে আদৌ ক্লান্তিকর মনে হয়নি, তা' এই লেখকের রুচির গুণে। হেলেনের নৃত্য-গীত সংবলিত ক্যাবারে দৃশ্যটি আলোছায়ার সমন্বয়ে, দৃশ্যসজ্জাগুণে ও সম্পাদনার চাতুর্যে রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ছবির ছখানি গানের মধ্যে 'এক মজে কো বস্তু লুনো' পাঞ্জাবী গীত ও ধুনের অনুসারী হওয়ার ফলে যে অপ্রত্যাশিতভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, এ-কথা আগেই বলেছি। এ-ছাড়া বিভিন্ন জনপ্রিয় গানের কৌতুককর অনুকৃতি (প্যারডি) হিসেবে শুরুর গানটি প্রেক্ষাগৃহে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে। 'চন্দা ও চন্দা' গানটি নিশ্চয়ই রোমান্টিক। আনন্দ বক্সী রচিত গানে উপযোগী সুরসৃষ্টি করেছেন রাহুল দেববর্মণ। পন্ডিত মুখরাম শর্মা রচিত সংলাপ স্থানে স্থানে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষী।

এস. এস. বালন পরিচালিত ইস্টম্যান কালারে তোলা সুদীর্ঘ জেমিনীচিত্র "লাখো মে এক" অভিনয় ও সুরসমৃদ্ধ হওয়ার ফলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

নব সাজে নিউ এম্পায়ার
প্রত্যহ বেলা ১২টা ৩টা ৬টা ও রাত ৮-৩০টায়
শুভারম্ভ শুক্রবার ৩০শে এপ্রিল।
প্রেম—প্রতিহিংসা ও প্রতিবাদ নিষ্ঠুর

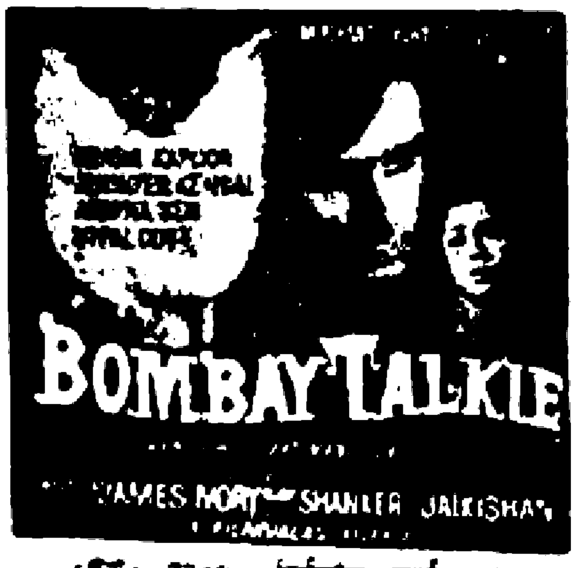

(ইং) ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র।

লাখো মে এক / প্রাণ

স্টুডিও থেকে

'স্বীকৃতি'র চিত্রগ্রহণ শেষ পর্যায়ে : গেল সপ্তাহে একটানা সাত দিনের শুটিং-এর পরে আশিস রায় প্রযোজিত একটি মন্ত্রীজ-এর দুঃসাহসিক ছবি 'স্বীকৃতি'র অন্তর্দেশের চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। কনক মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত এই নতুন আঙ্গিকের ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন—অমল মুখোপাধ্যায়। চরিত্র চিত্রণে আছেন শমিত ভঞ্জ, অপর্ণা সেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কল্যাণী মণ্ডল, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও মমতা মধুমতী (বোম্বে)।

ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হবে বিদেশে তোলা বহির্দৃশ্যাবলী। প্রযোজক আশীষ রায়, পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়, জনসংযোগসচিব শ্রীপঞ্চানন ও মুখ্য চরিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আসছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা ও লন্ডনে যাত্রা করবেন। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে ঢাকা ও লন্ডনে এর আগে আর কোন ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয় নি।

পিকক্ ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

মুক্তি প্রতীক্ষায় 'শচীমার সংসার' : ভূপেন রায় পরিচালিত মালবিকা চিত্রের 'শচীমার সংসার' ছবিটি সেন্সারের ছাড়পত্র পেয়ে মুক্তির দিন গুনছে। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য-রচনা এবং পরিচালনা করেছেন অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। সংগীতাংশ ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সংগীত পরিচালক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, শুক্লা পন্ডিত ও রত্না রায়। চরিত্রচিত্রণে আছেন—অসীমকুমার, সন্ধ্যারাণী দিলীপ রায়, মিহির ভট্টাচার্য শঙ্করনারায়ণ, শমিতা বিশ্বাস তরুণকুমার জহর রায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাগতা সংহিতা রায়, অসিতবরণ, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মাঃ অরবিন্দ, অমরেশ দাস, মিতা বর জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা চক্রবর্তী, রুণা চৌধুরী প্রমুখ শতাধিক শিল্পী। এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'এখনই'-র মুক্তি সমাগত : আজ শুক্রবার ৩০ এপ্রিল রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে তপন সিংহ পরিচালিত সমকালীন চিত্র 'এখনই'। রমাপদ চৌধুরী লিখিত জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে শ্রীসিংহ নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সুরসৃষ্টি দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন শ্রীসিংহ নিজেই। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন অপর্ণা সেন, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, মৃণাল মুখোপাধ্যায় ভাস্কর চৌধুরী এবং তিনজন নবাগত—দিলীপ বসু, শম্ভু ভট্টাচার্য ও রূপ মিত্র।

কে এল কাপুর প্রযোজিত ছবিটি ভারত সরকার কর্তৃক আসছে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগী চিত্ররূপে প্রেরিত হচ্ছে।

আসছে সপ্তাহে 'শরণ' : 'ও কোন থী?' ও 'গুমনাম'-এর স্রষ্টা এন এম সিপ্পির আর একটি স্মরণীয় সৃষ্টি 'শরণ' আসছে শুক্রবার ৭ মে মুক্তি লাভ করছে কলকাতার জনতা, কৃষ্ণা, প্রিয়া, জেম, মিত্রা, নবীনা ও শহরতলীর আরো ২৪টি চিত্রগৃহে মিউজিক্যাল ফিল্মসের পরিবেশনায়। সি পি দীক্ষিত পরিচালিত 'শরণ'-এর মুখ্য ভূমিকালিপিতে আছেন সঞ্জীবকুমার, রাখী, ফরিদা জালাল, শত্রুঘ্ন সিংহ ও মেহমুদ। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন আজকের অন্যতম সুরকার জুটী কল্যাণী-আনন্দজী।

মঞ্চাভিনয়

রবিরশ্মির 'বিশ্বজন মোহিছে' : রবীন্দ্রনাথের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবিরশ্মির প্রথম অনুষ্ঠান 'বিশ্বজন মোহিছে' আসছে ৩রা মে সন্ধ্যা ৭ টায় রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় আছেন সাগর সেন। নৃত্য পরিকল্পনা ও গ্রন্থনায় আছেন যথাক্রমে মঞ্জুলিকা দাস ও রামগোপাল এবং অধ্যাপক ভাস্কর বসু। রবিরশ্মির নবীন শিল্পীরা এতে অংশ নেবেন। শোনা যাচ্ছে, 'বিশ্বজন মোহিছে' রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির বহুমুখিতা সম্পর্কে একটি অনন্যসাধারণ প্রযোজনা রূপে পরিগণিত হবে।

নান্দীকারের 'তিন পয়সার পালার' শততম অভিনয় : নান্দীকারের সর্বাধুনিক প্রযোজনা ব্রেখটের 'দা থ্রি পেনি অপেরা' অনুসৃত 'তিন পয়সার পালা' নাটকের শততম অভিনয় শনিবার ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ছটায় 'রঙ্গনায়' অনুষ্ঠিত হল। নান্দীকার সংস্থা প্রতি শনি ও রবিবার এই নাটকের নিয়মিত অভিনয় করে চলেছে নবনির্মিত 'রঙ্গনা' মঞ্চে। এই নাটকের মুখ্য কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, মঞ্জু ভট্টাচার্য, সীমন্তিনী দাশ, গৌতম বসু প্রভৃতি। নাটকটির নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রংমহলের নতুন নাটক 'উত্তরণ' : বর্তমানকালে যে ক'জন কথাশিল্পীর নাম প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে, আশাপূর্ণা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'উত্তরণ' তাঁর একখানি সর্বজনপরিচিত উপন্যাস। বীরু মুখোপাধ্যায় এই কাহিনীর সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছেন। আসছে শনিবার ১ মে রংমহলে এই নাটকখানির শুভমুক্তি দিবস ঘোষিত হয়েছে। এখন থেকে প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিন যথারীতি নিয়মিতভাবে 'উত্তরণ' রংমহলে মঞ্চস্থ হবে। এই নাটকের প্রধানা নারী চরিত্রে চিত্র ও মঞ্চের সর্বজন স্নেহধন্যা অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে—অন্যান্য প্রধান চরিত্রাবলীতে থাকছেন, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ, আরতি, ইন্দিরা দে, রত্না ঘোষাল ও সরযূ দেবী। 'উত্তরণ' তার কাহিনী-বিন্যাস, সুষ্ঠু পরিচালনা এবং অনবদ্য অভিনয় মাধ্যমে বাংলার নাট্য রসিক সমাজে এক নবদিগন্ত সৃষ্টির দাবী নিয়ে উপস্থিত হবে বলে জানা গেছে। রংমহলের শিল্পীগোষ্ঠীও এই নাটকটির উপস্থাপনায় অর্থ ও পরিশ্রমের কোন ত্রুটি রাখছেন না। আমরা নাটকটিকে স্বাগত জানাই।

কৌশিকী : গত ১০ এপ্রিল কৌশিকী গোষ্ঠী থিয়েটার সেন্টারে 'বিস্ফোরিত বিবর' ও 'প্রেমতত্ত্ববোধিনী সংঘ' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করলেন। নাটক দুটির মধ্যে বিস্ফোরিত বিবর বিতর্কিত ও নাট্যগুণে অধিকতর সংবেদনশীল এবং ব্যাপ্তিতে গভীর। কিন্তু উপস্থাপনা ও আঙ্গিক বস্তাবুণগত ছিল নাটকটির পূর্ব সফলতার কারণ। বর্তমান প্রযোজনা পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি। প্রেমতত্ত্ববোধিনী সংঘ কৌশিকীর জনপ্রিয় নাটক। এবারের অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য হল সুন্দর টীমওয়ার্ক ও একটি বিশেষ সংলাপ সংযোজন। অভিনয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সত্যব্রত রায়, পূর্ণিমা রায়, অমল মণ্ডল, গৌতম মুখোপাধ্যায় ও মণ্টু চক্রবর্তী।

নাটকটির দুটি বিশেষ ভূমিকায় শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও শঙ্কা বসু প্রশংসনীয়। সত্যপ্রিয়সার লাহা, গাঙ্গুলীকে ভালো লাগে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন ছবি চক্রবর্তী, শঙ্কর চক্রবর্তী, মারিও ঘোষ ও অরবিন্দ সেনগুপ্ত। নাটকটির দ্বিতীয় পর্যায়ের আবহসঙ্গীত হিসাবে শনাইয়ের বাজনা বিশেষ অর্থবহ। নাটক দুটির পরিচালক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

পলাশীর পরে : ব্রাকটেলস ইণ্ডিয়া কোম্পানীজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যশিল্পীরা ইন্দু রায়ের নাট্য-নির্দেশনায় 'পলাশীর পরে'

এখনই/পরিচালনা : তপন সিংহ/অপর্ণা সেন

বাসরী চক্রবর্তী, কাজরী চক্রবর্তী, পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধা দাস পাপিয়া চক্রবর্তী, মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একক-রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশনা করবেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগঠক—বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ১৮ এপ্রিল মুক্ত অঙ্গনে 'অভিনয় পত্রিকা' আয়োজিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে এবং পাকিস্থানী হানাদারের নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদে আহূত সভায় কলকাতা এবং মফস্বলের সহস্রাধিক নাট্যকর্মী ও নাট্যামোদী উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজন ভট্টাচার্য। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর রতনকুমার ঘোষ নাট্যকর্মীদের স্বাগত জানিয়ে এই সভার গুরুত্ব ও 'অভিনয়'-এর ভূমিকার উল্লেখ করেন। কৃষ্ণ কুণ্ডু সভায় গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি নাট্যকর্মী হিসাবে আনুগত্যের অঙ্গীকার

নাটকটি বিস্ময়-সাফল্যে অভিনয় করলেন গত ২০শে মার্চ, ১৯৭১ কলকাতার রবীন্দ্র-সদন মঞ্চে। চরিত্র রূপায়ণে ও অভিনয়-নৈপুণ্যের উৎকর্ষে উচ্চ-প্রশংসিতদের মধ্যে রয়েছেন সুনীল মুখোপাধ্যায়, অমল চট্টোপাধ্যায়, অজিত মজুমদার, রঘুনাথ পাল, হরিপদ বসু, বীথি গাঙ্গুলী, হিমানী গাঙ্গুলী, রমা গুহ ও মায়া রায়। দলগত অভিনয়ের সর্বাধিক সাফল্যে সহায়ক-শিল্পী সুনীল বসু, হরিদাস মিত্র, জয়ন্ত রায়, হরিদাস অধিকারী, রবীন ভট্টাচার্য, সুব্রত নন্দী প্রমুখের সু-অভিনয় কৃতিত্বও অনস্বীকার্য।

চিঠি/পরিচালক নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সন্ধ্যা রায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন। —ফটো : অমৃত

অংশীদার : মিনারেলস এ্যান্ড মেটালস্ ট্রেডিং কর্পোরেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব গত ৬ এপ্রিল বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে গণাপদ বসুর 'অংশীদার' নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন সুনীল দাস, কাশীনাথ ঘোষ, প্রদীপ ব্যানার্জি, মণিময় ঘোষ, বিনয় গুপ্ত, অংশুমান প্রামাণিক, পৃথ্বিরাজ ব্যানার্জি, ভবেশ ব্যানার্জি, কল্যাণ মল্লিক দিলীপ দাশগুপ্ত, পিতাম্বর দাস, সুবোধ মণ্ডল, লোকনাথ ব্যানার্জি, অরুণ দাঁ, অলোকা গাঙ্গুলী, মঞ্জু চক্রবর্তী, মঞ্জুশ্রী বসু। প্রশান্ত ঘোষের সুপরিচালনায় ও দলগত অভিনয়-সৌষ্ঠবে নাটকটি সমবেত দর্শকদের আনন্দদান করে।

ক্ষুধিত পাষাণ : স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী মানুষের সাহায্যার্থে সুপরিচিত শিল্পী সংস্থা 'রাগিণী' আগামী ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' মঞ্চস্থ করবেন। নৃত্যনাট্যরূপদানে আছেন মিহির সেন, নৃত্য-নির্দেশনায় অসিত চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালনায় দীনেশ চন্দ, আলোকসম্পাতে তাপস সেন, মঞ্চসজ্জায় উজ্জ্বল সেনগুপ্ত ও কমল ঘোষ-দস্তিদার। নেপথ্য-অভিনয়ে থাকবেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্র ভট্টাচার্য। সঙ্গীতে পাপিয়া দাশগুপ্ত, অমর রায়, কৃষ্ণা গুপ্তা, নৃত্যে অসিত চট্টোপাধ্যায়, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, সাধন গুহ, বটু পাল,

করেন। তরুণ সান্যাল, ভীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায় নাটক রচনা ও তত্রস্থ প্রদেশে অভিনয়ের আবেদন জানান। শোভা সেন, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য বক্তারা এপার বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিও উল্লেখ করেন। সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর 'নাট্যায়ন' অভিনয় করেন অসিত ঘোষ রচিত বাংলা দেশের বর্তমান সংগ্রামের ইতিহাস আশ্রিত নাটক 'বিপ্লবী বাংলা'। পরিচালনা করেন অনিল দে।

বহুরূপী সংবাদ : বহুরূপীর নতুন নাট্য প্রযোজনা বাদল সরকার রচিত ও শম্ভু মিত্র নির্দেশিত 'পাগলা ঘোড়া' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে প্রতি রবিবার নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। পূর্ব ব্যবস্থানুসারে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান হবার কথা

রঞ্জনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সর্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৭৮৪০)
নান্দীকার
শনি ও রবি ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
(১০০—১০৬তম)
৬ই মে বৃহস্পতিবার ৬টায়
নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টারের চলতি নাটক সীমায় শরত চট্টোপাধ্যায় এবং সতীন্দ্র ভট্টাচার্য

নিমন্ত্রণ—পরিচালনা : তরুণ মজুমদার/অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়। ফটো : অমৃত

ছিল। কিন্তু নাটকটির অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও দর্শকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে এই নাটকের আরও কতকগুলি অনুষ্ঠান করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে।

ইতিমধ্যে 'বহুরূপী' অল্প কদিনের (১২—১৮ মে) জন্য বোম্বাই সফরে যাচ্ছেন। বহুরূপীর এটি চতুর্থ বোম্বাই সফর। এবারের উল্লেখযোগ্য আছে বহুরূপীর তেরটি বহুবিশ্রুত নাট্য-প্রযোজনা—রক্ত করবী, পাগলা ঘোড়া, বাকি ইতিহাস, চার অধ্যায় ও রাজা। বোম্বাইয়ের প্রভাদেবীতে রবীন্দ্র-নাট্যমন্দিরে এবারের অনুষ্ঠানের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। নাটকগুলির নির্দেশনা শম্ভু মিত্রের এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন বহুরূপীর বিশিষ্ট অভিনেতৃবৃন্দ।

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'রাজা' নাটকের একটি অভিনয়ের বিক্রয়-লব্ধ সমুদয় অর্থ শম্ভু নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা তহবিলে অর্পিত হবে।

বিবিধ সংবাদ

নববর্ষ উৎসব : নিবেদন নাট্য সংস্থা কর্তৃক গত ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার সারদা ভবন নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুধীরকুমার সেন। নববর্ষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শ্রীদেবেন্দ্রকুমার গুপ্ত ও সংগীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল। প্রধান কেন্দ্র সংস্থার সচিব শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশ্রী অমিতা ব্যানার্জি, নিখিল গুপ্ত (খেয়াল, ঠুংরী) এবং সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল (ধ্রুপদ ও ধামার)। তবলা সংগতে সহায়তা ও পাখোয়াজে বাদন বাজিয়েছেন [illegible]। বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর নাটক থেকে আবৃত্তি করে শোনান শ্রীগৌরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বহ্নিশিখা : গত ১১ এপ্রিল স্টেটব্যাঙ্ক বড়বাজার শাখার সভাবৃন্দ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বহ্নিশিখা' নাটকটি কোম্পানী মঞ্চের পরিচালনায় রঙমহলে মঞ্চস্থ করেন। পরিচালনার গুণে ও সমবেত অভিনয়ের ফলে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়েছিল। উল্লেখ্য অভিনয় করেন অসিত চক্রবর্তী, শৈলেন্দু চ্যাটার্জি, পরশুরাম মুখার্জি, পরমেশ গুপ্ত, অলোক ঘোষাল ও কমলেশ মুখার্জি। স্ত্রী চরিত্রে প্রতিমা পাল ও প্রিয়া চ্যাটার্জির অভিনয় স্বাভাবিক।

বর্ষ বরণ : অন্যান্য বছরের মত এ-বছরও গত পয়লা বৈশাখ বকুলবাগানপাড়া বান্ধব সমিতির উদ্যোগে সমিতিপ্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 'নববর্ষ বরণ' পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নাট্যকার ও সাহিত্যিক শ্রীঅমর বসু। নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও উত্তর কলকাতা নব-

স্টার থিয়েটার

(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)

আসন : ১৮৮০ • ফোন : ৫৫-১১৩১

— নতুন নাটক —

দেবনারায়ণ গুপ্তের

সীমা

প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার ৬টায়

প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২½ ও ৬টায়

রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো. নীলিমা দাস, মঞ্জরী চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুব্রত দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, রেবেকা পাল, তুলসী চক্র, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

রূপায়ন প্রযোজিত মোহাই ফাঁসি দেবেন না নাটকের একটি দৃশ্যে মোহন গাঙ্গুলী

বর্ষোৎসব সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য বাংলা নববর্ষের তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন।

রবীন্দ্র ভারতী : পশ্চিমবঙ্গ সংগীত, নাটক ও চারুকলা আকাদেমির ১৯৭০-৭১ সালের বাৎসরিক অকাদেমি পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছেন। আলোচ্য বৎসরে নাটক, সংগীত ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতজ্ঞ শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী এবং চিত্রশিল্পী শ্রীমুকুল দে'র নাম ঘোষিত হয়েছে। এঁদের প্রত্যেককে সম্মান নিদর্শন স্বরূপ অভিজ্ঞানপত্র-সহ নগদ দু'হাজার টাকা আগামী ১২ই মে, ১৯৭১ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেওয়া হবে।

পদাবলীর অনুষ্ঠান : রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী ২রা মে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রবীন্দ্রসদনে সাংস্কৃতিক সংস্থা 'পদাবলী' নিবেদন করছেন অর্ঘ্য। এতে রবীন্দ্রকাহিনীর মূকাভিনয় করবেন যোগেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ও সীমান্ত-পারের বাংলা দেশের কবিদের কবিতা আবৃত্তি করবেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'নিবন রজনী' নামে রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যের মিশ্র অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতবী দত্ত, গ্রন্থনাংশ পাঠ করবেন পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ। আলোকসম্পাত ও মঞ্চ-সজ্জায় আছেন তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত। পদাবলীর পরবর্তী পরিকল্পনা যোগেশ দত্তের একক মূকাভিনয় অনুষ্ঠান।

রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা : বালিগঞ্জ ইয়ংমেনস এসোসিয়েশন পরিচালিত সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ (যোগ্যতাক্রমিক সাজানো)।

আবৃত্তি —(সর্বসাধারণ বিভাগ) : সুমনা ব্যানার্জি, স্বপ্না দস্তিদার, রুবি দে-সরকার। (স্কুল ছাত্রছাত্রী বিভাগ) : গোপা দাশগুপ্ত, মলয় মুখোপাধ্যায়, মন্দিরা চন্দ। (বালক-বালিকা বিভাগ)—সুপর্ণা মুখোপাধ্যায়, মৈত্রেয় মুখোপাধ্যায়, ঈপ্সিতা মুখোপাধ্যায়। (শিশু বিভাগ)—সোমা সেনগুপ্ত, সেমা ঘোষ, ত্রিপর্ণা চক্রবর্তী, সঙ্গীতা দাস, শাশ্বতী গুপ্ত। (অবাঙ্গালী বিভাগ)—সাধনা শ্রীবাস্তব, এস কমলা, পি জি বিমলা। রচনা প্রতিযোগিতা—মিতা ঘোষ, সুতনুকা ব্যানার্জি, সোমা মিত্র, পদ্মজা বন্দ্যোপাধ্যায়।

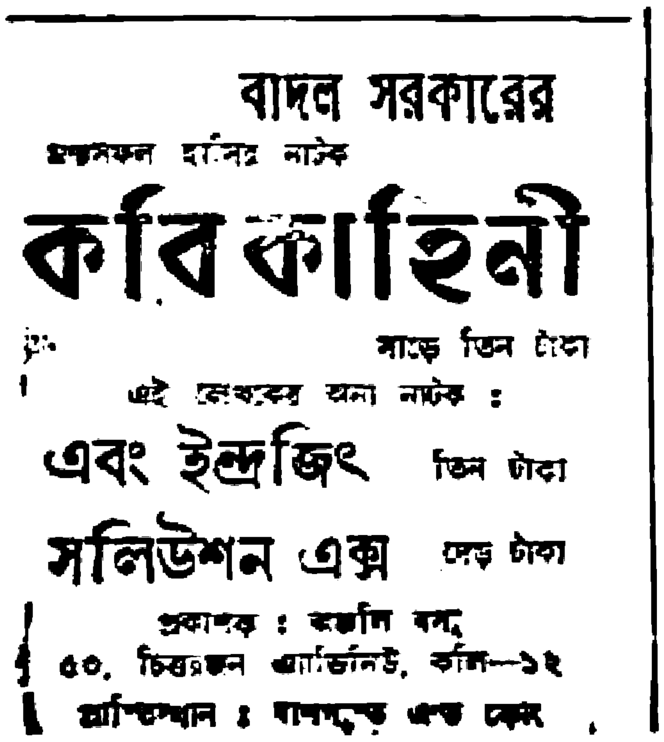

বহুরূপীর পাগলা ঘোড়া/দেবতোষ ঘোষ এবং শাওলী মিত্র

খেলার কথা

আদর্শ স্পোর্টসম্যান কিনো

শঙ্করবিজয় মিত্র

প্রকৃত ক্রীড়াবিদ দেশের সম্পদ। শুধু যে তার ক্রীড়াকৃতিতে দেশের সুনাম গড়ে তাই নয়, তার নিজস্ব ভাবনা চিন্তায় দেশমাতৃকার গৌরবের বিষয়টাই সবচেয়ে বড় হয়ে স্থান পায়, ব্যক্তিগত সাফল্যটা তার কাছে মুখ্য আকাঙ্খার বস্তু নয়। দেশাত্মবোধের একটা অভিনব প্রেরণা এইসব ক্রীড়াবিদদের অন্তস্তলে কাজ করে চলে। তাই সর্বদেশে সর্বকালে প্রকৃত ক্রীড়াবিদ বরেণ্য সন্তানরূপে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।

কেনিয়ার ক্রীড়াবিদ কিপচোগ কিনো এমনি এক বরেণ্য সন্তান। খেলাধুলোর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও অবিচ্ছিন্ন সাধনাই যে তাঁকে বরণীয় করে তুলেছে তাই নয়, তাঁর জীবনদর্শনে এই অনুরাগ দেশানুরাগের সঙ্গে এক হয়ে গেছে বলেই তাঁকে আজ নূতন আলোকে সকলের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

অন্ধকার আফ্রিকার ওপর আজ অনেক আলো—স্বাধীনতার আলো, নবজীবনের আলো, নবীন স্বপ্নের প্রভাত। সেই প্রভাতী আলোয় অনেক অজানা অচেনা মুখ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। ছোট্ট দেশ কেনিয়ার কয়েকটি অচেনা মুখ ক্রীড়াঙ্গনে আজ জ্বলজ্বল করছে। কিপচোগ কিনো তেমনি একটি মুখ। দেড় হাজার থেকে পাঁচ হাজার মিটারের মাঝারি দূরত্বের দৌড়ে কিনো এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এ্যাথলিটরা এই দূরত্বের দৌড়ে তাঁকে হারানো প্রায় অসাধ্য বলেই মনে করে। ১৫০০ মিটারে ওলিম্পিক ও কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ান ও তিন তিনটে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী কিপচোগ কিনো অতি সাদামাটা মানুষ। কথায় বার্তায়, চালচলনে কোথাও এতটুকু দর্পিতের ছাপ নেই। তবে কেনিয়াবাসীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা অতি উচ্চ। মাঝারি পাল্লার দূরত্বের দৌড়ে কোন সম্ভাবনাপূর্ণ দৌড়বীরের প্রসঙ্গ উঠলে কিনো তার স্বদেশবাসী দৌড়ানিয়াদের নাম করে বলতে থাকেন—'দেখবেন এদের মধ্য থেকে ভবিষ্যৎ 'কিপ' বেরিয়ে আসবে।' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থেকেই তিনি একথা বলে থাকেন। দৌড়ে না প্রতিযোগিতায় তাঁর কাছে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচের স্থান নেই। সহজ সরলভাবে তিনি একটা কথাই বোঝেন—যোগ্য ব্যক্তিরই জয় হবে। ভাগ্যান্বেষী হয়ে এগিয়ে যাও, যোগ্যতা থাকলে জয়মাল্য তোমার গলাতেই দুলবে।

এই মনোবৃত্তির ফলে জয়পরাজয়ে কিনো অবিচল থাকেন। দৌড়ে যোগ্যতর ব্যক্তির কাছে পরাজয়ে তার মনে কোন গ্লানি আসে না। আর এই লাভালাভ, পরস্পরকে সমভাবে গ্রহণ করার মূলে রয়েছে অকৃত্রিম দেশপ্রীতি। কিনো মনে করেন কেনিয়ার সম্মানে তিনি দৌড়চ্ছেন, প্রতিটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সময় এই প্রেরণাই তাঁকে শক্তি যুগিয়ে থাকে।

কিনোর জীবনদর্শনে সংকল্প, সংযম ও শৃঙ্খলাবোধ প্রধান স্থান পেয়ে থাকে। তিনি বলেন—এ্যাথলিটকে সঙ্কল্পে অবিচল ও সংযমে সপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। রোজকার রেওয়াজ যেমন ঠিক রাখতে হবে, মাঝে মাঝে এ্যাথলিটকে তেমনি প্রতিযোগিতায় নেমে নিজেকে যাচাই করে নিতে হবে। এর কোনটাই বাদ দেওয়া চলবে না কিংবা সাফল্যে দর্পিত হওয়া চলবে না। এগুলো সব ঠিক রেখে চললে সাফল্যের রাজপথ উন্মুক্ত হয়ে থাকবে।

ব্যক্তিগত জীবনে কিনো পুলিশ অফিসার। এখানেও তিনি সুশৃঙ্খলকামী—ওপরওয়ালার কর্তৃত্ব স্বীকারে ও কায়ুর কর্তব্য পালনে তিনি এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন না। তাঁর মতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই কর্তব্যনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন।

অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই কিনো বলেন—'আমি যখন কোন প্রতিযোগিতায় নামি তখন আমি কিপচোগ হিসাবে নামি না, কেনিয়ার কিপচোগ হিসাবে নামি। দেশই আমার প্রথম পরিচয়, নিজের পরিচয় পরে। প্রতিযোগিতার আসরে নেমে এই কথাটাই সব সময় আমার মনে পড়ে যে আমার দেশের লোকেদের সম্মানের জন্য আমাকে কিছু করতে হবে।'

কিনোর আরও একটি দৃঢ় অভিমত—দেশের প্রতিনিধি হিসেবে দৌড়ানর সময় কোন এ্যাথলিটের অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়। 'দেশের জন্য দৌড়তে গিয়ে যদি আমি টাকা পয়সা নিই তা হলে বুঝতে হবে দেশকে আমি ভালবাসি না। দেশের জন্য যখন তুমি সংগ্রাম কর তখন কি তুমি অর্থের প্রত্যাশা কর?'

নবজাগ্রত আফ্রিকার জ্বলন্ত দেশপ্রেমের একটি স্বতঃস্ফূর্ত নিদর্শনরূপে কিনোকে উপস্থাপিত করলে হয়ত খুব বেশি কিছু বলা হবে না। উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিপালিত এই সরল মানুষটিকে আধুনিক সমাজের সহস্র জটপাকানো লোকগুলোর কাছে হয়ত একটু বে-মানানই মনে হবে। রেখেঢেকে রহস্যে আবৃত করে তিনি কোন বক্তব্য পেশ করতে শেখেননি। তাই এই দৌড়ের সব বিষয়টাও তিনি পরিষ্কার খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করে থাকেন। বহু খ্যাতনামা প্রতিদ্বন্দ্বীদের যখন তিনি হিসেবনিকেশের নানা ছকের মধ্যে পরিকল্পনা নিতে দেখেন তখন তিনি খানিকটা অবাক না হয়ে পারেন না। কিনো লক্ষ্য রাখেন যে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তিনি এগোতে পারছেন কিনা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের কথা তিনি মনেই করেন না। তাঁর বক্তব্য হল—আমি আমার সাধ্যমত দৌড়াব। তোমার শক্তি থাকে এগিয়ে এসে আমাকে হারিয়ে দাও। তোমার শক্তিকে ত আমি দাবিয়ে রাখতে পারব না। আমি নিজের পথ রচনা করে চলব। সেখানে আমার শক্তিই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নিজের শক্তিকে দাবিয়ে রাখা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।'

এই মানসিকতার জন্যই কিনোকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের দৌড়গুলিতেও অনাবশ্যক জোরে দৌড়তে দেখা যায়। এ সম্পর্কে কিনোর যুক্তি হচ্ছে অনেক এ্যাথলিট এসব ক্ষেত্রে আলগা দিয়ে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। কেবলমাত্র যেসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অন্যান্য প্রতিযোগীরা অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে, ধরে ফেলবার কোন সম্ভাবনাই নেই কেবলমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে আলগা দেওয়া যেতে পারে।

কিনো মেক্সিকো ওলিম্পিকে পনেরোশো মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক পান। মেক্সিকোর এই দৌড়টিকে তিনি অতি আনন্দদায়করূপে অভিহিত করেন। এর কারণ তিনি সম্ভবত মার্কিন দৌড়বীর জিম রিয়ানকে পরাস্ত করে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন বলে। রিয়ানকে পরাস্ত করার একটা সঙ্কল্প নিয়েই তিনি মেক্সিকোতে গিয়েছিলেন বলে এই আনন্দ। রিয়ান ১৯৬৭ সালে ৩ মিঃ ৩৩·১ সেকেণ্ডে দেড় হাজার মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড করেন। তাই তাঁকে হারাবার সঙ্কল্প ছিল কিনোর মনে মনে। অবশ্য রিয়ানকে হারালেও কিনো তাঁর বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে পারেন নি। তবে ১৯৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ান এইচ ইলিয়ট ৩ মিঃ ৩৫·৬ সেঃ এর যে ওলিম্পিক রেকর্ড করেছিলেন তা অতিক্রম করে তিনি ৩ মিঃ ৩৪·৯ সেঃ এর নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন।

CENTRAL LIBRARY

সিংহের মত সাহস নিয়েই কিনো তাঁর এই স্বর্ণ পর্বের এক পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন। পরিকল্পনাটা হল এই যে তিনি তাঁর দেশবাসী প্রতিযোগী কেন কিপকোকে এই দৌড়ের প্রথমার্ধ সময়টা খুব জোরে দৌড়াতে বলেন এবং স্থির হয় তিনি নিজে কোথায় দিকের ট্র্যাকে রিয়ানের দৃষ্টির আড়ালে থেকে দৌড়াবেন। রিয়ান লক্ষ্য করে চলবে কিপকোকে এবং সেই সুযোগে প্রাণপণে দৌড়ে কিনো নিজেকে এগিয়ে নেবেন।

মতলবটা খুবই ছেলেমানুষী মনে হয়। বিশেষ করে ওলিম্পিকের ১৫০০ মিটারের মত গুরুত্বপূর্ণ দৌড়ে যে এটা কার্যকর হবে তা ভাবা যায় না। তবে সত্যি সত্যিই এটা কার্যকর হয়েছিল এবং প্রথম তিন ল্যাপ পর্যন্ত অর্থাৎ শেষ ১০০ মিটারের আগে পর্যন্ত প্রাণপণে দৌড়ে কিনো জয়ের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। রিয়ান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন এবং সময়ের অনুপাতে রিয়ান ২·৯ সেকেন্ড পেছনে ছিলেন।

বিজয়ের গৌরবে সকলেই আনন্দিত হয়, কিন্তু পরাজয়কে হাসিমুখে নিতে পারেন ক'জন? কিপচোগ কিনো তাদের মধ্যে একজন। আমেরিকার লস্ এঞ্জেলসে বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গকারী ১৫০০ মিটার দৌড়ে রিয়ানের নিকট পরাজিত হয়ে কিনো মোটেই দুঃখিত হন নি। কিনো তাঁর স্বভাবসুলভ অভ্যাসের বশে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়েও রিয়ানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিনো বলেছিলেন—'কেউ যদি শক্তিধর হয় তাহলে আমার মতে সেই শ্রেষ্ঠ। সে তার শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। আমি যদি তার শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে থাকি তাহলে আমার হতাশ হবার কিছু নেই। আমি তাতে আনন্দিতই হই। যে কোন বিষয়ে একটা লোকই প্রথম হয়। আমি যথাশক্তি পাল্লা দিয়েছি, প্রথম দু ল্যাপ দৌড়ে এগিয়েও ছিলাম। কিন্তু উন্নততর শক্তির কাছে আমাকে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। এতে আমি খুশীই হয়েছি।'

এডিনবরার কমনওয়েলথ গেমসে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে কিনো তৃতীয় স্থান পান। এই দৌড়ে প্রথম হন আয়ান স্টুয়ার্ট ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হন ম্যাকফা ফেরি। এই দৌড়ের শেষ চক্কর পর্যন্ত তিনজনের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং শেষ পর্যন্ত কিনোকে তৃতীয় স্থান পেয়েই তুষ্ট হতে হয়। এতেও কিনোর মনে কোন ক্ষোভ বা নৈরাশ্য স্থান পায় নি। দৌড়ে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে এতেই তাঁর আনন্দ এবং তিনি আনন্দের সঙ্গেই বললেন, 'যার যেমন শক্তি সে তেমনি স্থান পেয়েছে।' এতে কোন দুঃখ বা গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। প্রকৃত ক্রীড়াবিদের এটাই আসল পরিচয়।

সারা বিশ্বের লোক কিনোকে মাঝারি দূরত্বের দৌড়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর মনে করে। একবার এক ক্রীড়া সমালোচক তাঁকে একথা বললে উত্তরে তিনি বলেন—'লোকে কি মনে করে জানি না। আমি কিন্তু সে কথা ভাবি না। আমি মনে করি আমার চেয়ে ভাল দৌড়বীরা আছে। আর দৌড়াতে ভাল লাগে বলেই আমি দৌড়াই। অমুক অমুক দৌড়ে আমি জিতেছি বলেই আমি শ্রেষ্ঠ একথাও কখনও চিন্তা করি না। যেদিন প্রতিযোগিতায় সফল হই, জয়টা সেইদিনের। পরের দিনই হয়ত যে আমার চেয়ে ভাল দৌড়বীরা সেই জয়মালা তার কণ্ঠে দুলবে।'

এই ত সত্যকার স্পোর্টসম্যান।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্য-কাহিনী ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ১—০ খেলায় (ড্র ৪) 'রাবার' জয়ী হয়েছে। ভারতবর্ষের এই 'রাবার' জয়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে প্রথম এবং বিদেশের মাটিতে দ্বিতীয়। বিদেশে ভারতবর্ষের প্রথম 'রাবার' জয় নিউজিল্যান্ডে ১৯৬৮ সালে। ভারতবর্ষ এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে মোট ২১টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলে ৬টি সিরিজে 'রাবার' জয় করেছে—নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩টি, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১টি, পাকিস্তানের বিপক্ষে ১টি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১টি। এখন বা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় বাকি।

১৯৭১ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি ৫টি টেস্ট খেলা নিয়ে মোট ১০টি ম্যাচ খেলেছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়ায়—জয় ৩, হার ১ এবং খেলা ড্র ৯। ভারতবর্ষের জয়—(১) বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত দলের বিপক্ষে একদিনের খেলায় ১০১ রানে, (২) লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের বিপক্ষে তিনদিনব্যাপী খেলায় ৯ উইকেটে এবং (৩) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ২য় টেস্ট খেলায় ১২৫ রানে। ভারতবর্ষের হার—(১) বারবাদোজের কাছে ৯ উইকেটে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার সফরের ৯টি ম্যাচ খেলে মোট ১,২৪০ রান (গড় ৯৫·৩৮) সংগ্রহের সূত্রে ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এক মরসুমের ক্রিকেট খেলায় তাঁকে নিয়ে এ পর্যন্ত মাত্র ৪ জন খেলোয়াড় ১০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর আগের তিনজন হলেন—ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) এবং প্যাটসি হেনড্রেন (ইংল্যান্ড)।

সদ্য সমাপ্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গাভাস্কার ছাড়া ৫০০ রান পূর্ণ করেছেন আরও তিনজন—সারদেশাই (৯০৮ রান), ওয়াদেকার (৫২৫ রান) এবং জয়ন্তীলাল (৫০৬ রান)।

টেস্ট খেলার গড়

গাভাস্কার উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিং-য়ের গড় তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ৩ বার, মোট রান ৭৭৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২০, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৫৪·৮০। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন চার্লি ডেভিস—খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ৪ বার, মোট রান ৫২৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৫ নটআউট, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ১৩২·২৫।

টেস্ট সিরিজে ৫০০ বা তার বেশী রান করেছেন এই চারজন খেলোয়াড়—ভারতবর্ষের গাভাস্কার (৭৭৪ রান) এবং সারদেশাই (৬৪২ রান), অপরদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোবার্স (৫৯৭ রান) এবং ডেভিস (৫২৯ রান)। সোবার্স আর ৩ রান সংগ্রহ করলে ৬০০ রান পূর্ণ করার তালিকার গাভাস্কার এবং সারদেশাইয়ের সঙ্গে স্থান পেতেন। ব্যাটিংয়ের গড় ১০০ পূর্ণ করেছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়—ভারতবর্ষের গাভাস্কার (গড় ১৫৪·৮০) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ডেভিস (১৩২·২৫)।

বোলিংয়ের গড় তালিকায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক ভেঙ্কটরাঘন উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক ২২টি উইকেট পান এবং নিজ দলের পক্ষে শীর্ষস্থান লাভ করেন (গড় ৩৩·৮১)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলিংয়ের গড় তালিকায় সর্বাধিক উইকেট (১৭টি) এবং শীর্ষস্থান পান নোরিগা।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সুদীর্ঘ ৯৫ বছরের ইতিহাসে গাভাস্কার ছাড়া খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে ৭০০ রান পূর্ণ করেছেন একমাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জর্জ হেডলে। ১৯২৯-৩০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে পঞ্চম টেস্টের নায়ক সুনীল গাভাস্কার ব্যাট করছেন।

সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে জর্জ হেডলের পরিসংখ্যান দাঁড়ায় : খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ০, মোট রান ৭০৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৩, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ৮৭·৮৭। অপরদিকে সুনীল গাভাস্কারের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ৩, মোট রান ৭৭৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২০, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৫৪·৮০।

একটি টেস্ট সিরিজে চারটি ম্যাচ খেলে মোট ৭০০ রান পূর্ণ করেছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জর্জ হেডলে (মোট রান ৭০৩) এবং ভারতবর্ষের সুনীল গাভাস্কার (৭৭৪)। একদিক থেকে গাভাস্কারের ৭৭৪ রান বিশ্ব রেকর্ডে পরিণত হয়েছে; কারণ একটি টেস্ট সিরিজের চারটি ম্যাচ খেলে তাঁর থেকে কেউ বেশী মোট রান সংগ্রহ করেননি।

৫ম টেস্টে গাভাস্কারের ১২৪ ও ২২০ রান—আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একজনের পক্ষে একটি খেলায় সেঞ্চুরী এবং ডাবল সেঞ্চুরী করার দ্বিতীয় নজির।

গাভাস্কারের ৭৭৪ রান—ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রানের রেকর্ড।

গাভাস্কারের ৪টি সেঞ্চুরী—ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী করার রেকর্ড।

সেঞ্চুরী পার্টনারশীপ

উইকেট	রান	জুটি
১ম	১২৩	গাভাস্কার এবং মানকাদ (৩য় টেস্ট, ২য় ইনিংস)
২য়	১৪৮	গাভাস্কার এবং ওয়াদেকার (৫ম টেস্ট, ২য় ইনিংস)
৩য়	১১২	গাভাস্কার এবং বিশ্বনাথ (৩য় টেস্ট, ১ম ইনিংসে)
	১২২	গাভাস্কার এবং সারদেশাই (৫ম টেস্ট, ১ম ইনিংসে)
৫ম	১৬৪	সারদেশাই এবং সোলকার (২য় টেস্ট, ১ম ইনিংসে)
৬ষ্ঠ	১৩৭*	সারদেশাই এবং সোলকার (১ম টেস্ট, ১ম ইনিংসে)
৭ম	১৮৬	সারদেশাই এবং সেলকার (৪র্থ টেস্ট, ১ম ইনিংসে)
৯ম	১২২	সারদেশাই এবং প্রসন্ন (১ম টেস্ট, ১ম ইনিংসে)

* অসমাপ্ত

টেস্ট সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষ—৭টি সেঞ্চুরী

দিলীপ সারদেশাই (৩টি) : ২১২ রান (১ টেস্ট,) ১১২ রান (২য় টেস্ট) এবং ১৫০ রান (৪র্থ টেস্ট)।

সুনীল গাভাস্কার (৪টি) : ১১৬ রান (৩য় টেস্ট), নটআউট ১১৭ রান (৪র্থ টেস্ট) এবং ১২৪ ও ২২০ রান (৫ম টেস্ট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—৬টি সেঞ্চুরী

কানহাই (১টি) : নটআউট ১৫৮ রান (১ম টেস্ট)।

সোবার্স (৩টি) : নটআউট ১০৮ রান (৩য় টেস্ট), নটআউট ১৭৮ রান (৫র্থ টেস্ট) এবং ১৩২ রান (৫ম টেস্ট)।

ডেভিস (২টি) : নটআউট ১২৫ রান (৩য় টেস্ট) এবং ১০৫ রান (৫ম টেস্ট)।

বেটন কাপ

মোহনবাগান এবং জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স যুগ্মভাবে ১৯৭১ সালের বেটন কাপ জয়ী হয়েছে। অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি, কোন দলই গোল দিতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য, মোহনবাগান এই নিয়ে ৯ বার ফাইনালে খেলে ৮ বার বেটন কাপ জয়ী হল (এর মধ্যে যুগ্ম বিজয়ী ৪ বার)। মোহনবাগান বেটন কাপ জয়ী হয়েছে ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬৪ (ইস্ট-বেঙ্গলের সঙ্গে), ১৯৬৫ (কাস্টমসের সঙ্গে), ১৯৬৮, ১৯৬৯ (কোর অব সিগন্যালসের সঙ্গে) এবং ১৯৭১ সালে (বর্ডার সিকিউরিটি দলের সঙ্গে)।

'ডাবল' খেতাব

একই বছরে প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং বেটন কাপ জয়ী হয়েছে এই পাঁচটি দল : ক্যালকাটা কাস্টমস—

জে এম প্যাটেল

৮ বার, মোহনবাগান—৪ বার (১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬৯ ও ১৯৭১), রেঞ্জার্স—৩ বার, পোর্ট কমিশনার্স—২ বার এবং বি ই কলেজ (শিবপুর)—১ বার। ক্যালকাটা কাস্টমস উপর্যুপরি ৩ বছর (১৯০০-০২) যে এই ট্রফি জেতার পেয়েছিল তা আজও রেকর্ড হয়ে আছে।

আলোচ্য বছরের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ১—০ গোলে গত বছরের রোভার্স কাপ বিজয়ী ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। গত বছরের সেমি-ফাইনালে ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে দলেরই কাছে মোহনবাগান ০-১ গোলে হার স্বীকার করেছিল। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ০—১ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছিল।

এক ইনিংসে ৯টি উইকেট

এ পর্যন্ত নীচের ৮ জন বোলার সরকারী টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ৯টি করে উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। এই ৮ জনের মধ্যে আছেন—ইংল্যান্ডের ৩ জন, ভারতবর্ষের ২ জন, অস্ট্রেলিয়ার ১ জন, দক্ষিণ আফ্রিকার ১ জন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ জন খেলোয়াড়। এই ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র জিম লেকার (ইংল্যান্ড) এক ইনিংসের খেলায় ১০টি উইকেট পেয়েছেন (বিশ্ব রেকর্ড)।

সুভাষ গুপ্তে

উইকেট	রান	খেলোয়াড়	পক্ষে	বিপক্ষে	স্থান	বছর
৯টি	২৮	জি এ লোহম্যান	ইংল্যান্ড	দঃ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	১৮৯৫-৯৬
৯টি	১০৩	এস এফ বার্নেস	ইংল্যান্ড	দঃ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	১৯১৩-১৪
৯টি	১২১	এ এ মেলী	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যান্ড	মেলবোর্ন	১৯২০-২১
৯টি	৩৭	জিম লেকার	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৬
১০টি	৫৩	জিম লেকার	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৬
৯টি	১১৩	এইচ জে টেফিল্ড	দঃ আফ্রিকা	ইংল্যান্ড	জোহানেসবার্গ	১৯৫৬-৫৭
৯টি	১০২	সুভাষ গুপ্তে	ভারতবর্ষ	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	কানপুর	১৯৫৮-৫৯
৯টি	৬৯	জে এম প্যাটেল	ভারতবর্ষ	অস্ট্রেলিয়া	কানপুর	১৯৫৯-৬০
৯টি	৯৫	জ্যাক নরিগা	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ভারতবর্ষ	ত্রিনিদাদ	১৯৭১

তাছাড়া জিম লেকার একটি টেস্টে উভয় ইনিংসে ৯টি করে উইকেট পেয়েছে (এর মধ্যে একবার ১০টি উইকেট)। তিনি ছাড়া অপর কোন খেলোয়াড় টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ৯টি করে উইকেট মোট ২ বার পান নি।

একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ পর্যন্ত মাত্র ২১ জন খেলোয়াড় একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন। এঁদের মধ্যে তিনজন খেলোয়াড়—ইংল্যান্ডের হার্বার্ট সাটক্লিফ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জর্জ হেডলে এবং ক্লাইড ওয়ালকট দু'বার করে এই বিশেষ ক্রীড়া-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমানে একটি টেস্ট খেলায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী হয়েছে মোট ২৪ বার—ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ বার, অস্ট্রেলিয়া ৬ বার, ইংল্যান্ড ৬ বার, দক্ষিণ আফ্রিকা ২ বার, ভারতবর্ষ ২ বার এবং পাকিস্তান ১ বার।

একটি টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী এবং ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড় :

২৪২ ও ১০৩ রান—ডগ ওয়াল্টার্স (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সিডনি, ১৯৬৮-৬৯

১২৪ ও ২২০ রান—সুনীল গাভাস্কার (ভারতবর্ষ), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কুইন্স পার্ক ওভাল, ১৯৭১

একটি টেস্ট সিরিজে ২ বার একটি খেলায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী :

১২৬ ও ১১০ রান (ত্রিনিদাদ) এবং ১৫৫ ও ১১০ রান (কিংস্টন)—ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫

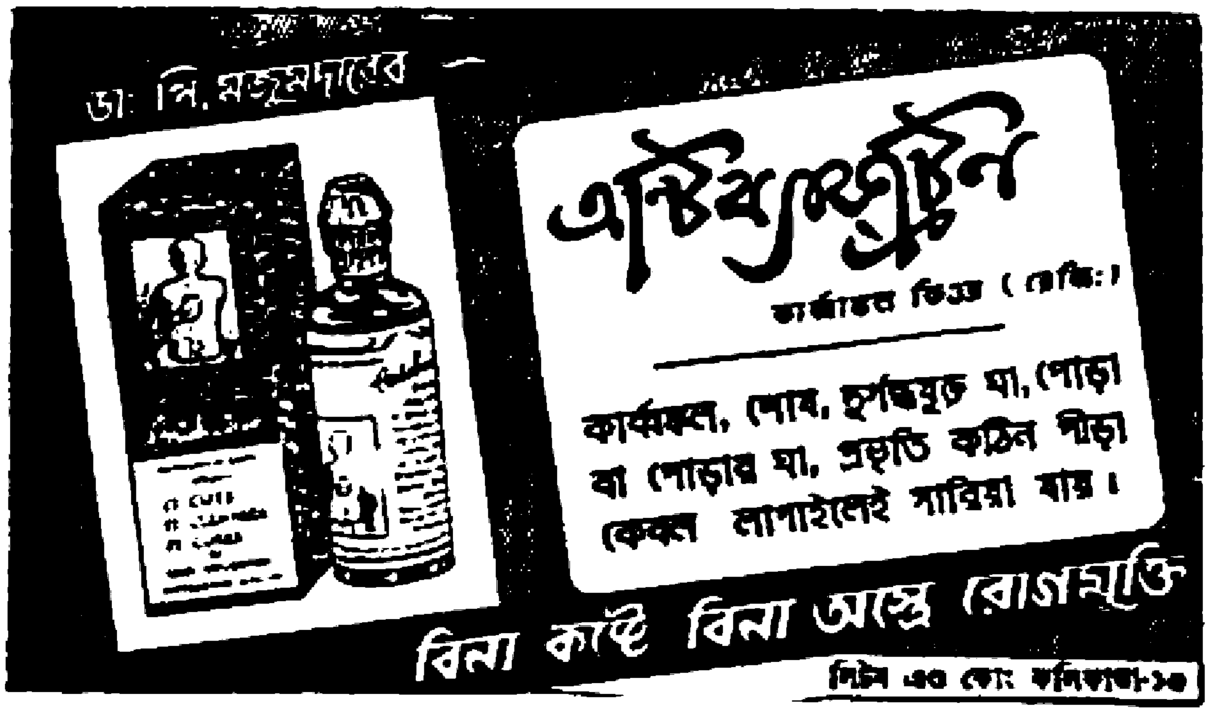

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।